উপন্যাস সমগ্র

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম খণ্ড

উপন্যাস সমগ্র

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম খন্ড

উপন্যাসগুলির তালিকা

- পথের পাঁচালি
- অপরাজিত
- আরণ্যক
- আদর্শ হিন্দু হোটেল
- দৃষ্টি প্রদীপ
- দেবযান
- বিপিনের সংসার
- অনুবর্তন
- দুই বাড়ী

পথের পাঁচালী

বল্লালী-বালাই

পথের পাঁচালী

প্রথম পরিচ্ছেদ

নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের একেবারে উত্তরপ্রান্তে হরিহর রায়ের ক্ষুদ্র কোঠাবাড়ী। হরিহর সাধারণ অবস্থার গৃহস্থ, পৈতৃক আমলের সামান্য জমিজমার আয় ও দু-চার ঘর শিষ্য সেবকের বার্ষিকী প্রণামীর বন্দোবস্ত হইতে সাদাসিধাভাবে সংসার চালাইয়া থাকে।

পূর্বদিন ছিল একাদশী। হরিহরের দূরসম্পর্কীয় দিদি ইন্দির ঠাক্‌রুণ সকালবেলা ঘরের দাওয়ায় বসিয়া চালভাজার গুঁড়া জলখাবার খাইতেছে। হরিহরের ছয় বৎসরের মেয়েটি চুপ করিয়া পাশে বসিয়া আছে ও পাত্র হইতে তুলিবার পর হইতে মুখে পুরিবার পূর্ব পর্যন্ত প্রতিমুঠা ভাজার গুঁড়ার গতি অত্যন্ত করুণভাবে লক্ষ্য করিতেছে এবং মাঝে মাঝে ক্রমশূন্যায়মান কাঁসার জামবাটির দিকে হতাশভাবে চাহিতেছে। দু-একবার কি বলি বলি করিয়াও যেন বলিতে পারিল না। ইন্দির ঠাক্‌রুণ মুঠার পর মুঠা উঠাইয়া পাত্র নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়া খুকীর দিকে চাহিয়া বলিল, ও মা, তোর জন্যে দুটো রেখে দেলাম না?—ওই দ্যাখো!

মেয়েটি করুণ চোখে বলিল, তা হোক পিতি, তুই খা—

দুটো পাকা বড় বীচে-কলার একটা হইতে আধখানা ভাঙ্গিয়া ইন্দির ঠাক্‌রুণ তাহার হাতে দিল। এবার খুকীর চোখ-মুখ উজ্জ্বল দেখাইল—সে পিসিমার হাত হইতে উপহার লইয়া মনোযোগের সহিত ধীরে ধীরে চুষিতে লাগিল।

ও ঘর হইতে তাহার মা ডাকিল, আবার ওখানে গিয়া ধন্না দিয়ে বসে আছে? উঠে আয় ইদিকে।

ইন্দির ঠাক্‌রুণ বলিল, থাক্ বৌ—আমার কাছে বসে আছে, ও কিছু করচে না। থাক্ বসে—

তবুও তাহার মা শাসনের সুরে বলিল, না, কেনই বা খাবার সময় ওরকম বসে থাকবে? ওসব আমি পছন্দ করি নে; চলে আয় বল্‌চি উঠে—

খুকী ভয়ে ভয়ে উঠিয়া গেল।

ইন্দির ঠাক্‌রুণের সঙ্গে হরিহরের সম্পর্কটা বড় দূরের। মামার বাড়ীর সম্পর্কে কি রকমের বোন। হরিহর রায়ের পূর্বপুরুষের আদি বাড়ী ছিল পাশের গ্রামে যশড়া-বিষ্ণুপুর। হরিহরের পিতা রামচাঁদ রায় মহাশয় অল্প-বয়সে প্রথমবার বিপত্নীক হইবার পরে অত্যন্ত ক্ষোভের সহিত লক্ষ্য করিলেন যে দ্বিতীয়বার তাঁহার বিবাহ দিবার দিকে পিতৃদেবের কোন লক্ষ্যই নাই। বছরখানেক কোনরকমে চক্ষুলজ্জায় কাটাইয়া দেওয়ার পরও যখন পিতার সেদিকে কোন উদ্যম দেখা গেল না, তখন রামচাঁদ মরীয়া হইয়া প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে নানারূপ অস্ত্র ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলেন। দুপুরবেলা কোথাও কিছু নাই, সহজ মানুষ রামচাঁদ আহারাদি করিয়া বিছানায় ছটফট করিতেছেন—কেহ নিকটে বসিয়া কি হইয়াছে জানিতে চাহিলে রামচাঁদ সুর ধরিতেন, তাঁহার আর কে আছে, কে-ই বা আর তাঁহাকে দেখিবে—এখন তাঁহার মাথা ধরিলেই বা কি—ইত্যাদি। ফলে এই নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে রামচাঁদের দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ হয়, এবং বিবাহের অল্পদিন পরে পিতৃদেবের মৃত্যু হইলে যশড়া-বিষ্ণুপুরের বাস উঠাইয়া রামচাঁদ স্থায়ীভাবে এখানেই বসবাস শুরু করেন। ইহা তাঁহার অল্প বয়সের কথা—রামচাঁদ এ গ্রামে আসিবার পর শ্বশুরের যত্নে টোলে সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করেন, এবং কালে এ অঞ্চলের মধ্যে ভাল পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তবে কোন বিষয়কর্ম কোনদিন তিনি করেন নাই, করার উপযুক্ত তিনি ছিলেন কিনা, সে বিষয়েও ঘোরতর সন্দেহের কারণ আছে। বৎসরের মধ্যে নয় মাস তাঁহার স্ত্রী-পুত্র শ্বশুরবাড়ীতেই থাকিত। তিনি নিজে পাড়ার পতিরাম মুখুয্যের পাশার আড্ডায়

অধিকাংশ সময় কাটাইয়া দুইবেলা ভোজনের সময় শ্বশুরবাড়ী হাজির হইতেন মাত্র; যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত—পণ্ডিতমশায়, বৌটা ছেলেটা আছে, আখেরটা তো দেখতে হবে ? রামচাঁদ বলিতেন—কোন ভাবনা নেই ভায়া, ব্রজো চক্কোত্তির ধানের মরাই-এর তলা কুড়িয়ে খেলেও এখন ওদের দু-পুরুষ হেসে-খেলে কাটবে। পরে তিনি ছক্কা ও পঞ্জুড়ির জোড় কি ভাবে মিলাইলে ঘর ভাঙিতে পারিবেন, তাহাই একমনে ভাবিতেন।

ব্রজ চক্রবর্তীর ধানের মরাই-এর নিত্যতা সম্বন্ধে তাঁহার আস্থা যে কতটা বে-আন্দাজী ধরনের হইয়াছিল, তাহা শ্বশুরের মৃত্যুতে পরে রামচাঁদের বুঝিতে বেশী বিলম্ব হয় নাই। এ গ্রামে তাঁহার জমিজমাও ছিল না, নগদ টাকাও বিশেষ কিছু নয়। দুই চারিটি শিষ্য-সেবক এদিকে ওদিকে জুটিয়াছিল, তাহাদের দ্বারা কোন রকমে সংসার চালাইয়া পুত্রটিকে মানুষ করিতে থাকেন। তাঁহার পূর্বে তাঁহার এক জ্ঞাতি-ভ্রাতার বিবাহ তাঁহার শ্বশুরবাড়ীতেই হয়। তাহারাও এখানেই বাস করিয়াছিল। তাহাদের দ্বারাও রামচাঁদের অনেক সাহায্য হইত। জ্ঞাতি-ভ্রাতার পুত্র নীলমণি রায় কমিসেরিয়েটে চাকরি করিতেন, কিন্তু কর্ম উপলক্ষে তাঁহাকে বরাবর বিদেশে থাকিতে হইত বলিয়া তিনি শেষকালে এখানকার বাস একরূপ উঠাইয়া বৃদ্ধা মাতাকে লইয়া কর্মস্থলে চলিয়া যান। এখন তাঁহাদের ভিটাতে আর কেহ নাই।

শোনা যায়, পূর্বদেশীয় এক নামজাদা কুলীনের সঙ্গে ইন্দির ঠাক্‌রুণের বিবাহ হইয়াছিল। স্বামী বিবাহের পর কালেভদ্রে এ গ্রামে পদার্পণ করিতেন। এক-আধ রাত্রি কাটাইয়া পথের খরচ ও কৌলীন্য-সম্মান আদায় করিয়া লইয়া, খাতায় দাগ আঁকিয়া পরবর্তী নম্বরের শ্বশুরবাড়ী অভিমুখে তল্‌পী-বাহক সহ রওনা হইতেন, কাজেই স্বামীকে ইন্দির ঠাক্‌রুণ ভাল মনে করিতেই পারে না। বাপ-মায়ের মৃত্যুর পর ভাই-এর আশ্রয়ে দু-মুঠা অন্ন পাইয়া আসিতেছিল, কপালক্রমে সে ভাইও অল্প বয়েসে মারা গেল। হরিহরের পিতা রামচাঁদ অল্প পরেই এ ভিটাতে বাড়ি তুলিলেন এবং সেই সময় হইতেই ইন্দির ঠাক্‌রুণের এ সংসারে প্রথম প্রবেশ। সে সকল আজিকার কথা নহে।

তাহার পর অনেকদিন হইয়া গিয়াছে, শাঁখারীপুকুরে নাল ফুলের বংশের পর বংশ কত আসিয়াছে, চলিয়া গিয়াছে। চক্রবর্তীদের ফাঁকা মাঠে সীতানাথ মুখুয্যে নতুন কলমের বাগান বসাইল এবং সে সব গাছ আবার বুড়া হইতেও চলিল। কত ভিটায় নতুন গৃহস্থ বসিল, কত জনশূন্য হইয়া গেল, কত গোলক চক্রবর্তী, ব্রজ চক্রবর্তী মরিয়া হাজিয়া গেল, ইছামতীর চলোর্মি-চঞ্চল স্বচ্ছ জলধারা অনন্ত কালপ্রবাহের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কুটার মত, ঢেউয়ের ফেনার মত, গ্রামের নীলকুঠির মত জন্‌সন টম্‌সন সাহেব, কত মজুমদারকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল।

শুধু ইন্দির ঠাক্‌রুণ এখনও বাঁচিয়া আছে। ১২৪০ সালের সে ছিপ্‌ছিপে চেহারার হাস্যমুখী তরুণী নহে, পঁচাত্তর বৎসরের বৃদ্ধা, গাল তোব্‌ড়াইয়া গিয়াছে, মাজা ঈষৎ ভাঙিয়া শরীর সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, দূরের জিনিস আগের মত চোখে ঠাহর হয় না, হাত তুলিয়া যেন রৌদ্রের ঝাঁজ হইতে বাঁচাইবার ভঙ্গিতে চোখ ঢাকিয়া বলে, কে আসে? নবীন? বেহারী? না, ও তুমি রাজু...

এই ভিটারই কি কম পরিবর্তনটা ইন্দির ঠাক্‌রুণের চোখের উপর ঘটিয়া গেল। ঐ ব্রজ চক্রবর্তীর যে ভিটা আজকাল জঙ্গল হইয়া পড়িয়া আছে, কোজাগরী লক্ষ্মী-পূর্ণিমার দিন গ্রামসুদ্ধ লোকের সেখানে পাত পাড়িত। বড় চণ্ডীমণ্ডপে কি পাশার আড্ডাটাই বসিত সকালে বিকালে। তখন কি ছিল ঐ রকম বাঁশবন। পৌষ-পার্বণের দিন ঐ ঢেঁকিশালে একমণ চাল কোটা হইত পৌষ-পিঠার জন্য--চোখ বুজিয়া ভাবিলেই ইন্দির ঠাক্‌রুণ সে সব এখনও দেখিতে পায় যে! ঐ রায়বাড়ীর মেজবৌ লোকজন সঙ্গে করিয়া চাল কুটাইতে আসিয়াছেন, ঢেঁকিতে দমাদম পাড় পড়িতেছে, সোনার বাউটি রাঙা হাতে একবার সামনে সরিয়া আসিতেছে আবার পিছাইয়া যাইতেছে, জগদ্ধাত্রীর মত রূপ, তেমনি স্বভাবচরিত্র। নতুন যখন ইন্দির ঠাক্‌রুণ বিধবা হইল, তখন প্রতি দ্বাদশীর দিন প্রাতঃকালে নিজের হাতে জলখাবার গোছাইয়া আনিয়া তাহাকে খাওয়াইয়া যাইতেন। কোথায় গেল কে! সেকালের আর কেহ বাঁচিয়া নাই যার সঙ্গে সুখদুঃখের দুটো কথা কয়।

তারপর ঐ সংসারে আশ্রয়দাতা রামচাঁদ মারা গেলেন, তাঁর ছেলে হরিহর তো হইল সেদিন।

রাখিয়া দেশছাড়া হইয়া গেল। আট দশ বছর প্রায় কোন খোঁজখবর ছিল না—কালেভদ্রে এক-আধখানা চিঠি দিত, কখনো কখনো দু'পাঁচ টাকা বুড়ীর নামে মনি অর্ডার করিয়া পাঠাইত। এই বাড়ী আগুলিয়া কত কষ্টে, কতদিন না খাইয়া প্রতিবেশীর দুয়ারে চাহিয়া চিন্তিয়া তাহার দিন গিয়াছে।

অনেকদিন পরে হরিহর আজ ছয় সাত বৎসর আসিয়া ঘর-সংসার পাতিয়াছে, তাহার একটি মেয়ে হইয়াছে—সেও প্রায় ছয় বৎসরেরটি হইতে চলিল। বুড়ী ভাবিয়াছিল এতদিনে সেই ছেলেবেলার ঘর-সংসার আবার বজায় হইল। তাহার সঙ্কীর্ণ জীবনে সে অন্য সুখ চাহে নাই, অন্য প্রকার সুখ-দুঃখের ধারণাও সে করিতে অক্ষম—আশৈশব-অভ্যস্ত জীবনযাত্রার পুরাতন পথে যদি গতির মোড়টা ঘুরিয়া দাঁড়ায় তাহা হইলেই সে খুশী, তাহার কাছে সেইটাই চরম সুখের কাহিনী।

হরিহরের ছোট্ট মেয়েটাকে সে একদণ্ড চোখের আড়াল করিতে পারে না—তাহার নিজেরও এক মেয়ে ছিল, নাম ছিল তার বিশ্বেশ্বরী। অল্প বয়সেই বিবাহ হয় এবং বিবাহের অল্প পরেই মারা যায়। হরিহরের মেয়ের মধ্যে বিশ্বেশ্বরী মৃত্যুপারের দেশ হইতে চল্লিশ বছর পরে তাহার অনাথা মায়ের কোলে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। জল্লিশ বছরের নিভিয়া-যাওয়া ঘুমন্ত মাতৃত্ব মেয়েটার মুখের বিপন্ন অপ্রতিভ ভঙ্গিতে, অবোধ চোখের হাসিতে—একমুহূর্তে সচকিত আগ্রহে, শেষ-হইতে চলা জীবনের ব্যাকুল ক্ষুধায় জাগিয়া উঠে।

কিন্তু যাহা সে ভাবিয়াছিল তাহা হয় নাই। হরিহরের বৌ দেখিতে সুন্দরী হইলে কি হইবে, ভারী ঝগড়াটে, তাহাকে তো দুই চক্ষু পাড়িয়া দেখিতে পারে না, বসিয়া বসিয়া অন্নধ্বংস করিতেছে।

সে খুঁটিনাটি লইয়া বুড়ীর সঙ্গে দু'বেলা ঝগড়া বাধায়। অনেকটা ঝগড়া চলিবার পর বুড়ী নিজস্ব একটি পিতলের ঘটী কাঁখে ও ডান হাতে একটা কাপড়ের পুঁটুটি ঝুলাইয়া বলিত—চল্লাম নতুন বৌ, আর যদি কখনো এ বাড়ীর মাটি মাড়াই, তবে আমার—। বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গিয়া বুড়ী মনের দুঃখে বাঁশবাগানে সারাদিন বসিয়া কাটাইত। বৈকালের দিকে সন্ধান পাইয়া হরিহরের ছোট মেয়েটা তাহার কাছে গিয়া আঁচল ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিত—ওঠ্ পিতিমা, মাকে বল্‌বো আল্ তোকে বক্‌বে না, আয় পিতিমা। তাহার হাত ধরিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে বুড়ী বাড়ী ফিরিত। সর্বজয়া মুখ ফিরাইয়া বলিত, ঐ এলেন! যাবেন আর কোথায়! যাবার কি আর চুলো আছে এই ছাড়া?....তেজটুকু আছে এদিকে ষোল আনা।

এ রকম উহারা বাড়ী আসার বৎসর-খানেকের মধ্যেই আরম্ভ হইয়াছে-বহুবার হইয়া গিয়াছে এবং মাঝে মাঝে প্রায়ই হয়।

হরিহরের পূর্বের ভিটায় খড়ের ঘরখানা অনেকদিন বে-মেরামতি অবস্থায় পড়িয়া আছে। এই ঘরটাতে বুড়ী থাকে। একটা বাঁশের আল্‌নায় খান দুই ময়লা ছেঁড়া থান। ছেঁড়া জায়গাটার দুই প্রান্ত একসঙ্গে করিয়া গেরো বাঁধা। বুড়ী আজকাল ছুঁচে সুতা পরাইতে পারে না বলিয়া কাপড় সেলাই করিবার সুবিধা নাই, বেশী ছিঁড়িয়া গেলে গেরো বাঁধে। একপাশে একখানা ছেঁড়া মাদুর ও কতকগুলি ছেঁড়া কাঁথা। একটা পুঁটলিতে রাজ্যের ছেঁড়া কাপড় বাঁধা। মনে হয় কাঁথা বুনিবার উপকরণ স্বরূপ সেগুলি বহুদিন হইতে সযত্নে সঞ্চিত আছে, কখনও দরকার হয় নাই, বর্তমানে দরকার হইলেও কাঁথা বুনিবার মত চোখের তেজ আর তাহার নাই। তবুও সেগুলি পরম যত্নে তোলা থাকে, ভাদ্রমাসে বর্ষার পর রৌদ্র ফুটিলে বুড়ী সেগুলি খুলিয়া মাঝে মাঝে উঠানে রৌদ্রে দেয়। বেতের পেঁট্‌রাটার মধ্যে একটা পুঁটলি বাঁধা কতকগুলো ছেঁড়া লালপাড় শাড়ী—সেগুলি তাহার মেয়ে বিশ্বেশ্বরীর; একটা পিতলের চাদরের ঘটী, একটা মাটির ছোবা, গোটা দুই মাটির ভাঁড়। পিতলের ঘটিতে চালভাজা ভরা থাকে, রাত্রে হামানদিস্তা দিয়া গুঁড়া করিয়া তাই মাঝে মাঝে খায়। মাটির ভাঁড়গুলার কোনটাতে একটুখানি তেল, কোনটাতে একটু নুন, কোনটাতে সামান্য একটু খেজুরের গুড়। সর্বজয়ার কাছে চাহিলে সব সময় মেলে না বলিয়া বুড়ী সংসার হইতে লুকাইয়া আনিয়া সেগুলি বিবাহের বেতের পেঁট্‌রার মধ্যে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া দেয়।

সর্বজয়া এ ঘরে আসে ক্বচিৎ কালেভদ্রে কখনো। কিন্তু সন্ধ্যার সময় তার মেয়ে ঘরের দাওয়ায় ছেঁড়া-কাঁথা-পাতা বিছানায় বসিয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত একমনে পিসিমার মুখে রূপকথা শোনে। খানিকক্ষণ

এ-গল্প ও-গল্প শুনিবার পর খুকি বলে,—পিতি, সেই ডাকাতের গল্পটা বল্ তো! গ্রামের একঘর গৃহস্থবাড়ীতে পঞ্চাশ বছর আগে ডাকাতি হইয়াছিল, সেই গল্প। ইতিপূর্বে বহুবার বলা হইয়া গেলেও কয়েকদিনের ব্যবধানে উহার পুনরাবৃত্তি করিতে হয়, খুকী ছাড়ে না। তাহার পর সে পিসিমার মুখে ছড়া শোনে। সেকালের অনেক ছড়া ইন্দির ঠাকরুণের মুখস্থ ছিল। অল্পবয়েসে ঘাটে পথে সমবয়সী সঙ্গিনীদের কাছে ছড়া মুখস্থ বলিয়া তখনকার দিনে ইন্দির ঠাক্রুণ কত প্রশংসা আদায় করিয়াছে। তাহার পর অনেক দিন সে এরকম ধৈর্যশীল শ্রোতা পায় নাই; পাছে মরিচা পড়িয়া যায়, সেইজন্য তাহার জানা সব ছড়াগুলিই আজকাল প্রতি সন্ধ্যায় একবার ক্ষুদ্র ভাইঝিটির কাছে আবৃত্তি করিয়া ধার শানাইয়া রাখে। টানিয়া টানিয়া আবৃত্তি করে—

ও ললিতে চাঁপকলিতে একটা কথা শুন্সে,
রাধার ঘরে চোর ঢুকেছে—

এই পর্যন্ত বলিয়া সে হাসি-হাসি মুখে প্রতীক্ষার দৃষ্টিতে ভাইঝির দিকে চাহিয়া থাকে। খুকী উৎসাহের সঙ্গে বলে—চূড়োবাঁধা এক-মিন্সে।—'মি' অক্ষরটার ওপর অকারণ জোর দিয়া ছোট মাথাটি সামনে তাল রাখিবার ভাবে ঝুঁকাইয়া পদটার উচ্চারণ শেষ করে। ভারি আমোদ লাগে খুকীর।

তাহার পিসি ভাইঝিকে ঠকাইবার চেষ্টায় এমন সব ছড়া আবৃত্তি করে ও পাদপূরণের জন্য ছাড়িয়া দেয়, যাহা হয়তো দশ পনের দিন বলা হয় নাই—কিন্তু খুকী ঠিক মনে রাখে, তাহাকে ঠকানো কঠিন।

খানিক রাত্রে তাহার মা খাইতে ডাকিলে সে উঠিয়া যায়।

পথের পাঁচালী — দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হরিহর রায়ের আদি বাসস্থান যশড়া-বিষ্ণুপুরের প্রাচীন ধনী-বংশ চৌধুরীরা নিষ্কর ভূমি দান করিয়া যে কয়েক ঘর ব্রাহ্মণকে সেকাল গ্রামে বাস করাইয়া ছিলেন, হরিহরের পূর্বপুরুষ বিষ্ণুরাম রায় তাহাদের মধ্যে একজন।

বৃটিশ শাসন তখনও দেশে বদ্ধমূল হয় নাই। যাতায়াতের পথ সকল ঘোর বিপদসঙ্কুল ও ঠগী, ঠ্যাঙাড়ে, জলদস্যু প্রভৃতিতে পূর্ণ থাকিত। এই ডাকাতের দল প্রায়ই গোয়ালা, বাগ্দী, বাউরী শ্রেণীর লোক। তাহারা অত্যন্ত বলবান—লাঠি এবং সড়কী চালানোতে সুনিপুণ ছিল। বহু গ্রামের নিভৃত প্রান্তে ইহাদের স্থাপিত ডাকাতে-কালীর মন্দিরের চিহ্ন এখনও বর্তমান আছে। দিনমানে ইহারা ভালমানুষ সাজিয়া বেড়াইত, রাত্রে কালীপূজা দিয়া দূর পল্লীতে গৃহস্থ-বাড়ী লুঠ করিতে বাহির হইত। তখনকার কালে অনেক সমৃদ্ধিশালী গৃহস্থও ডাকাতি করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতেন। বাংলা দেশে বহু জমিদার ও অবস্থাপন্ন গৃহস্থের অর্থের মূলভিত্তি যে এই পূর্বপুরুষ-সঞ্চিত লুণ্ঠিত ধনরত্ন, যাঁহারাই প্রাচীন বাংলার কথা জানেন, তাঁহারা ইহাও জানেন।

বিষ্ণুরাম রায়ের পুত্র বীরু রায়ের এইরূপ অখ্যাতি ছিল। তাঁহার অধীনে বেতনভোগী ঠাঙাড়ে থাকিত। নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের উত্তরে যে কাঁচা সড়ক ওদিকে চুয়াডাঙা হইতে আসিয়া নবাবগঞ্জ হইয়া টাকী চলিয়া গিয়াছে, ওই সড়কের ধার দিগন্তবিস্তৃত বিশাল সোনাডাঙার মাঠের মধ্যে, ঠাকুরঝি পুকুর নামক সেকালকার এক বড় পুকুরের ধারে ছিল ঠ্যাঙাড়েদের আড্ডা। পুকুরের ধারে প্রকাণ্ড বটগাছের তলে তাহারা লুকাইয়া থাকিত এবং নিরীহ পথিককে মরিয়া তাহার যথাসর্বস্ব অপহরণ করিত। ঠ্যাঙাড়েদের কার্যপ্রণালী ছিল অদ্ভূত ধরনের। পথ-চলতি লোকের মাথায় লাঠির আঘাত করিয়া আগেই তাহাকে মারিয়া ফেলিয়া তবে তাহার কাছে অর্থান্বেষণ করিত—মারিয়া ফেলিবার পর এরূপ ঘটনাও বিচিত্র ছিল না, দেখা গেল নিহত ব্যক্তির কাছে সিকি পয়সাও নাই। পুকুরের মধ্যে লাশ গুঁজিয়া রাখিয়া ঠ্যাঙাড়েরা পরবর্তী শিকারের উপর দিয়া এ বৃথা শ্রমটুকু পোষাইয়া লইবার আশায় নিরীহমুখে পুকুরপাড়ের গাছতলায় ফিরিয়া যাইত। গ্রামের উত্তরে এই বিশাল মাঠের মধ্যে সেই বটগাছ আজও আছে, সড়কের ধারের একটা অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিকে আজও ঠাকুরঝি পুকুর বলে। পুকুরের বিশেষ চিহ্ন নাই, চৌদ্দ আনা ভরাট্ হইয়া গিয়াছে—ধান আবাদ করিবার সময় চাষীদের লাঙলের ফালে সেই নাবাল জমিটুকু হইতে আজও মাঝে মাঝে নরমুণ্ড উঠিয়া থাকে।

শোনা যায় পূর্বদেশীয় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বালক-পুত্রকে সঙ্গে করিয়া কালীগঞ্জ অঞ্চল হইতে টাকী শ্রীপুরের ওদিকে নিজের দেশে ফিরিতেছিলেন। সময়টা কার্তিকমাসের শেষ, কন্যার বিবাহের অর্থসংগ্রহের জন্য ব্রাহ্মণ বিদেশে বাহির হইয়াছিলেন, সঙ্গে কিছু অর্থ ও জিনিসপত্র ছিল। হরিদাসপুরের বাজারে চটিতে রন্ধন-আহারাদি করিয়া তাঁহারা দুপুরের কিছু পরে পুনরায় পথে বাহির হইয়া পড়িলেন, ইচ্ছা রহিল যে সম্মুখে পাঁচক্রোশ দূরের নবাবগঞ্জ বাজারের চটিতে রাত্রি যাপন করিবেন। পথের বিপদ তাঁহাদের অবিদিত ছিল, কিন্তু আন্দাজ করিতে কিরূপ ভুল হইয়াছিল—কার্তিক মাসের ছোট দিন, নবাবগঞ্জের বাজারে পৌঁছিবার অনেক পূর্বে সোনাডাঙ্গা মাঠের মধ্যে সূর্যকে ডুবুডুবু দেখিয়া তাঁহারা দ্রুতপদে হাঁটিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ঠাকুরঝি পুকুরের ধারে আসিতেই তাঁহারা ঠ্যাঙাড়েদের হাতে পড়েন।

দস্যুরা প্রথম ব্রাহ্মণের মাথায় এক ঘা লাঠি বসাইয়া দিতেই তিনি প্রাণভয়ে চীৎকার করিতে করিতে পথ ছাড়িয়া মাঠের দিকে ছুটিলেন, ছেলেও বাবার পিছু পিছু ছুটিল। কিন্তু একজন বৃদ্ধ অপরে বালক—ঠ্যাঙাড়েদের সঙ্গে কতক্ষণ দৌড়পাল্লা দিবে? অল্পক্ষণেই তাহারা আসিয়া শিকারের নাগাল ধরিয়া ঘেরাও করিয়া ফেলিল। নিরুপায় ব্রাহ্মণ নাকি প্রস্তাব করেন, যে তাঁহাকে মারা হয় ক্ষতি নাই, কিন্তু তাঁহার পুত্রের জীবনদান—বংশের একমাত্র পুত্র—পিন্ডলোপ ইত্যাদি। ঘটনাক্রমে বীরু রায়ও নাকি সেদিনের দলের মধ্যে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। ব্রাহ্মণ বলিয়া চিনিতে পারিয়া প্রাণভয়ার্ত বৃদ্ধ তাঁহার হাতে-পায়ে পড়িয়া অন্তত পুত্রটির প্রাণরক্ষার জন্য বহু কাকুতি-মিনতি করেন—কিন্তু সরল ব্রাহ্মণ বুঝেন নাই, তাঁহার বংশের পিন্ডলোপের আশঙ্কায় অপরের মাথাব্যাথা হইবার কথা নহে, বরং তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে ঠ্যাঙাড়ে দলের অন্যরূপ আশঙ্কার কারণ আছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে হতভাগ্য পিতাপুত্রের মৃতদেহ একসঙ্গে ঠান্ডা হেমন্ত রাতে ঠাকুরঝি পুকুরের জলে টোকাপানা ও শ্যামাঘাসের দামের মধ্যে পুঁতিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিয়া বীরু রায় বাটী চলিয়া আসিলেন।

এই ঘটনার বেশী দিন পরে নয়, ঠিক পর বৎসর পূজার সময়। বাংলা ১২৩৮ সাল। বীরু রায় সপরিবারে নৌকাযোগে তাঁহার শ্বশুরবাড়ী হলুদবেড়ে হইতে ফিরিতেছিলেন। নকীপুরের নীচের বড় নোনা গাঙ পার হইয়া মধুমতীতে পড়িবার পর দুই দিনের জোয়ার খাইয়া তবে আসিয়া দক্ষিণ শ্রীপুরের কাছে ইছামতীতে পড়িতে হইত। সেখান হইতে আর দিন-চারেকের পথ আসিলেই স্বগ্রাম।

সারাদিন বাহিয়া আসিয়া অপরাহ্নে টাকীর ঘাটে নৌকা লাগিল। বাড়ীতে পূজা হইত। টাকীর বাজার হইতে পূজার দ্রব্যাদি কিনিয়া রাত্রিতে সেখানে অবস্থান করিবার পর প্রত্যুষে নৌকা ছাড়িয়া সকলে দেশের দিকে রওনা হইলেন। দিন দুই পরে সন্ধ্যার দিকে ধবলচিতের বড় খাল ও ইছামতীর মোহনায় একটা নির্জন চরে জোয়ারের অপেক্ষায় নৌকা লাগাইয়া রন্ধনের যোগাড় হইতে লাগিল। বড় চর, মাঝে মাঝে কাশঝোপ ছাড়া অন্য গাছপালা নাই। একস্থানে মাঝিরা ও অন্যস্থানে বীরু রায়ের স্ত্রী রন্ধন চড়াইয়াছিলেন। সকলেরই মন প্রফুল্ল, দুইদিন পরেই দেশে পৌঁছানো যাইবে। বিশেষত পূজা নিকটে, সে আনন্দ তো আছেই।

জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল। নোনা গাঙের জল চক্‌চক্ করিতেছিল। হু-হু হাওয়ায় চরের কাশফুলের রাশি আকাশ, জ্যোৎস্না, মোহনার জল একাকার করিয়া উড়িতেছিল। হঠাৎ কিসের শব্দ শুনিয়া দু-একজন মাঝি রন্ধন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। কাশঝোপের আড়ালে যেন একটা হুট্‌পাট শব্দ, একটা ভয়ার্ত কণ্ঠ একবার অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিয়াই তখনি থামিয়া যাইবার শব্দ। কৌতূহলী মাঝিরা ব্যাপার কি দেখিবার জন্য কাশঝোপের আড়ালটা পার হইতে না হইতে কি যেন একটা হুড়ুম করিয়া চর হইতে জলে গিয়া ডুব দিল। চরের সেদিকটা জনহীন—কিছু কাহারও চোখে পড়িল না।

কি ব্যাপার ঘটিয়াছে, কি হইল, বুঝিবার পূর্বেই বাকি দাঁড়ি-মাঝি সেখানে আসিয়া পৌঁছিল। গোলমাল শুনিয়া বীরু রায় আসিলেন, তাঁহার চাকর আসিল। বীরু রায়ের একমাত্র পুত্র নৌকাতে ছিল, সে কই? জানা গেল রন্ধনের বিলম্ব দেখিয়া সে খানিকক্ষণ আগে জ্যোৎস্নায় চরের মধ্যে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। দাঁড়ি-মাঝিদের মুখ শুকাইয়া গেল, এদেশের নোনা গাঙ সমুহের অভিজ্ঞতায় তাহারা বুঝিতে পারিল কাশবনের আড়ালে বালির চরে বৃহৎ কুমীর শুইয়া ওৎ পাতিয়া ছিল। ডাঙ্গা হইতে বীরু রায়ের পুত্রকে লইয়া গিয়াছে।

তাহার পর অবশ্য যাহা হয় হইল। নৌকার লগি লইয়া এদিকে ওদিকে খোঁজা-খুঁজি করা হইল, নৌকা ছাড়িয়া মাঝনদীতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত সকলে সন্ধান করিয়া বেড়াইল—তাহার পর কান্নাকাটি, হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি। গত বৎসর দেশের ঠাকুরঝি পুকুরের মাঠে প্রায় এই সময়ে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, যেমন এক অদৃশ্য বিচারক এ বৎসর ইছামতীর নির্জন চরে তাহার বিচার নিষ্পন্ন করিলেন। মূর্খ বীরু রায় ঠকিয়া শিখিলেন যে সে অদৃশ্য ধর্মাধিকরণের দন্ডকে ঠাকুরঝি পুকুরের শ্যামাঘাসের দামে প্রতারিত করিতে পারে না, অন্ধকারেও তাহা আপন পথ চিনিয়া লয়।

বাড়ী আসিয়া বীরু রায় আর বেশী দিন বাঁচেন নাই। এইরূপে তাঁহার বংশে এক অদ্ভুত ব্যাপারের সূত্রপাত হইল। নিজের বংশ লোপ পাইলেও তাঁহার ভাইয়ের বংশাবলী ছিল। কিন্তু বংশের জ্যেষ্ঠ সন্তান কখনও বাঁচিত না, সাবালক হইবার পূর্বেই কোন-না কোন রোগে মারা যাইত। সকলে বলিল, বংশে ব্রহ্মশাপ ঢুকিয়াছে। হরিহর রায়ের মাতা-তারকেশ্বর দর্শনে গিয়া এক সন্ন্যাসীর কাছে কাঁদাকাটা করিয়া একটি মাদুলি পান। মাদুলির গুণেই হৌক বা ব্রহ্মশাপের তেজ দুই পুরুষ পরে কর্পূরের মত উবিয়া যাওয়ার ফলেই হৌক, এত বয়সেও হরিহর আজও বাঁচিয়া আছে।

পথের পাঁচালী — তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দিন কতক পরে।

খুকী সন্ধ্যার পর শুইয়া পড়িয়াছিল। বাড়ীতে তাহার পিসীমা নাই, অদ্য দুই মাসের উপর হইল একদিন তাহার মায়ের সঙ্গে কি ঝগড়া-ঝাঁটি হওয়ার পর রাগ করিয়া দূর গ্রামে কোন্ এক আত্মীয়বাড়ীতে গিয়া আছে। মায়েরও শরীর এতদিন বড় অপটু ছিল বলিয়া তাহাকে দেখিবারও কোন লোক নাই। সম্প্রতি মা কাল হইতে আঁতুড় ঘরে ঢোকা পর্যন্ত সে কখন খায় কখন শোয় তাহা কেহ বড় দেখে না।

খুকী শুইয়া-শুইয়া যতক্ষণ পর্যন্ত ঘুম না আসিল, ততক্ষণ পিসিমার জন্য কাঁদিল। রোজ রাত্রে সে কাঁদে। তাহার পর খানিক রাত্রে কাহাদের কথাবার্তা শুনিয়া জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, কুড়ুনীর মা দাই রান্নাঘরের ছেঁচতলায় দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছে, পাড়ার নেড়ার ঠাকুরমা, আরও কে কে উপস্থিত আছেন। সকলেই যেন ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন। খুকী খানিকটা জাগিয়া থাকিয়া আবার শুইয়া পড়িল।

বাঁশবনে হাওয়া লাগিয়া শিরশির শব্দ হইতেছে, আঁতুড় ঘরে আলো জ্বলিতেছে ও কাহারা কথাবার্তা কহিতেছে। দাওয়ায় জ্যোৎস্না পড়িয়াছে, ঠান্ডা হাওয়ায় একটু পরে সে ঘুমাইয়া পড়িল। খানিক রাত্রে ঘুমের ঘোরে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ ও গোলমাল শুনিয়া আবার তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। তাহার বাবা ঘর হইতে বাহির হইয়া আঁতুড় ঘরের দিকে দৌড়িয়া ব্যস্তভাবে বলিতে বলিতে যাইতেছে—কেমন আছে খুড়ী? কি হয়েছে? আঁতুড় ঘরের ভিতর হইতে কেমন ধরণের গলার আওয়াজ সে শুনিতে পাইল। গলার আওয়াজটা তার মায়ের। অন্ধকারের মধ্যে ঘুমের ঘোরে সে কিছু বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিল। তাহার কেমন ভয়-ভয় করিতেছিল। মা ও-রকম করিতেছে কেন? কি হইয়াছে মায়ের?

সে আরও খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া কিছু বুঝিতে না পারিয়া শুইয়া পড়িল এবং একটু পরেই ঘুমাইয়া পড়িল। কতক্ষণ পরে সে জানে না—কোথায় যেন বিড়াল ছানার ডাকে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। চট্ করিয়া তাহার মনে পড়িল পিসিমার ঘরের দাওয়ায় ভাঙা উনুনের মধ্যে মেনী বিড়ালের ছানাগুলো সে বৈকালবেলা লুকাইয়া রাখিয়া আসিয়াছে—ছোট তুলতুলে ছানা কয়টি, এখনও চোখ ফুটে নাই। ভাবিল—ঐ যাঃ—ওদের হুলো বেড়ালটা এসে বাচ্চাগুলোকে সব খেয়ে ফেললে....ঠিক্।

ঘুমচোখে উঠিয়া তাড়াতাড়ি সে অন্ধকারের মধ্যে পিসিমার দাওয়ায় গিয়া উনুনের মধ্যে হাত পুরিয়া দেখিল বাচ্চা কয়টি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছে। হুলো বেড়ালের কোন চিহ্ন নাই কোনও দিকে। পারে সে অবাক হইয়া আসিয়া শুইয়া পড়িল এবং একটু পরেই ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুমের ঘোরে আবার কিন্তু কোথায় বিড়ালছানা ডাকিতেছিল।

পরদিন উঠিয়া সে চোখ মুছিতেছে, কুডুনীর মা দাই বলিল, ও খুকী, কাল রাত্তিরে তোমার একটা ভাই হয়েচে দেখবা না? ওমা, কাল রাত্তিরে এত চেঁচামেচি, এত কাণ্ড হয়ে গেল—কোথায় ছিলে তুমি? যা কাণ্ড হলো, কালপুরের পীরির দরগায় সিন্নি দেবানে—বড্ডো রক্ষে করেছেন রাত্তিরে।

খুকী এক দৌড়ে ছুটিয়া আঁতুড় ঘরের দুয়ারে গিয়া উঁকি মারিল। তাহার মা আঁতুড়ের খেজুর পাতার বেড়ার গা ঘেঁষিয়া শুইয়া ঘুমাইতেছে। একটি টুকটুকে অসম্ভব রকমের ছোট্ট, প্রায় একটা কাচের বড় পুতুলের চেয়ে কিছু বড় জীব কাঁথার মধ্যে শুইয়া—সেটিও ঘুমাইতেছে। গুলের আগুনের মন্দ মন্দ ধোঁয়ায় ভালো দেখা যায় না। সে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতেই জীবটা চোখ মেলিয়া মিট্‌মিট্ করিয়া চাহিয়া অসম্ভব রকমের ছোট্ট হাত দুটি নাড়িয়া নিতান্ত দুর্বলভাবে অতি ক্ষীণ সুরে কাঁদিয়া উঠিল। এতক্ষণ পরে খুকী বুঝিল রাত্রিতে বিড়ালছানার ডাক বলিয়া যাহা মনে করিয়াছিল তাহা কি। অবিকল বিড়ালছানার ডাক—দূর হইতে শুনিলে কিছু বুঝিবার জো নাই। হঠাৎ অসহায়, অসম্ভব রকমের ছোট্ট নিতান্ত ক্ষুদে ভাইটির জন্য দুঃখে, মমতায়, সহানুভূতিতে খুকীর মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। নেড়ার ঠাকুরমা ও কুডুনীর মা দাই বারণ করাতে সে ইচ্ছা সত্বেও আঁতুড় ঘরে ঢুকিতে পারিল না।

মা আঁতুড় হইতে বাহির হইলে খোকার ছোট্ট দোলাতে দোল দিতে দিতে খুকী কত কি ছড়া গান করে। সঙ্গে সঙ্গে কত সন্ধ্যাদিনের কথা, পিসিমার কথা মনে আসিয়া তাহার চোখ জলে ভিজিয়া যায়। এই রকমের কত ছড়া যে পিসিমা বলিত! খোকা দেখিতে পাড়ার লোক ভাঙ্গিয়া আসে। সকলে দেখিয়া বলে, ঘর-আলো-করা খোকা হয়েছে, কি মাথায় চুল, কি রং! বলাবলি করিতে করিতে যায়—কি হাসি দেখেচ ন' দি?

খুকী কেবল ভাবে, তাহার পিসিমা একবার যদি আসিয়া দেখিত! সবাই দেখিতেছে, আর তাহাদের পিসিমাই কোথায় গেল চলিয়া—আর কখনো ফিরিয়া আসিবে না? সে ছেলেমানুষ হইলেও এটুকু বুঝিয়াছে যে, এ বাড়ীতে বাবা কি মা কেহই পিসিমাকে ভালবাসে না, তাহাকে আনিবার জন্য কেহ গা করিবে না। দিনমানে পিসির ঘরের দিকে চাহিলে মন কেমন করে, ঘরের কপাটটা এক এক দিন খোলাই পড়িয়া থাকে। দাওয়ায় চামচিকার নাদি জমিয়াছে। উঠানে সে-রকম আর ঝাঁট পড়ে না, এখানে শেওড়ার চারা, ওখানে কচু গাছ—পিসিমা বুঝি হইতে দিত? খুকীর বড় বড় চোখ জলে ভরিয়া যায়—সেই ছড়া, সেই সব গল্প খুকী কি করিয়া ভোলে।

সেদিন হরি পালিতের মেয়ে আসিয়া তাহার মাকে বলিল, তোমাদের বুড়ী ঘাটের পথে দেখি মাঠের দিক থেকে একটা ঘটী আর পুঁটুলি হাতে করে আসছে—এসে চক্কোত্তি মশায়দের বাড়ীতে ঢুকে বসে আছে, যাও দুগগাকে পাঠিয়ে দাও, হাত ধরে ডেকে আনুক, তাহ'লে রাগ পড়বে এখন—

হরি পালিতেরই বাড়ী বসিয়া বুড়ী তখন পাড়ার মেয়েদের মুখে হরিহরের ছেলে হওয়ার গল্প শুনিতেছিল।

ও পিতি!

বুড়ী চমকিয়া চাহিয়া দেখিল দুর্গা হাঁপাইতেছে, যেন অত্যন্ত ছুটিয়া আসিয়াছে। বুড়ী ব্যগ্রভাবে দুর্গাকে হাত বাড়াইয়া ধরিতে গেল—সঙ্গে সঙ্গে দুর্গা ঝাঁপাইয়া বুড়ীর কোলে পড়িল—তাহার মুখে হাসি অথচ চোখে জল—উঠানে ঝি-বউ যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, অনেকের চোখে জল আসিল। প্রবীণা হরি পালিতের স্ত্রী বলিলেন—নেও ঠাকুরঝি, ও তোমার আর জন্মে মেয়ে ছিল, সেই মেয়েই তোমার আবার ফিরে এসেছে—

বাড়ী আসিলে খোকাকে দেখিয়া তো বুড়ী হাসিয়া কাঁদিয়া সারা হইল। কতদিন পরে ভিটায় আবার চাঁদ উঠিয়াছে।

বুড়ী সকালে উঠিয়া মহা খুশিতে ভিতর উঠান ঝাঁট দেয়, আগাছার জঙ্গল পরিষ্কার করে। দুর্গার মনে হয় এতদিনে আবার সংসারটা যেন ঠিকমত চলিতেছে, এতদিন যেন কেমন ঠিক ছিল না।

দুপুরে আহার করিয়া বুড়ী খিড়কির পিছনে বাঁশবনের উপর বসিয়া কঞ্চি কাটে। সেদিকে আর নদীর ধার পর্যন্ত লোকজনের বাস নাই, নদী অবশ্য খুব নিকটে নয়, প্রায় একপোয়া পথ—এই সমস্তটা শুধু বড় বড় আমবাগান ও ঝুপসি বাঁশবন ও অন্যান্য জঙ্গল। কঞ্চি কাটার সময় দুর্গা আসিয়া কাছে বসে, আবোল-তাবোল বকে। ছোট এক বোঝা কাটা কঞ্চি জড়ো হইলে দুর্গা সেগুলি বহিয়া বাড়ীর মধ্যে রাখিয়া আসে। কঞ্চি কাটিতে কাটিতে মধ্যাহ্নের অলস আমেজে শীতল বাঁশবনের ছায়ায় বুড়ীর নানা কথা মনে আসে।

সেই কতকাল আগের কথা সব।

সেই তিনি বার-তিনেক আসিয়াছিলেন—স্বপ্নের মতো মনে পড়ে। একবার তিনি পুঁটুলির মধ্যে কি খাবার আনিয়াছিলেন। বিশ্বেশ্বরী তখন দুই বৎসরের। সকলে বলিল, ওলা—চিনির ডেলার মত। ঘটীর জলে গুলিয়া সেও একটু খাইয়াছিল। সেই একজন লোক আসিল—পুরানো সেই পেয়ারা গাছটার কাছে ঠিক সন্ধ্যার সময় আসিয়া দাঁড়াইল, শ্বশুরবাড়ীর দেশ হইতে আসিয়াছে, একখানা চিঠি। চিঠি পড়িবার লোক নাই, ভাই গোলোকও পূর্ব বৎসর মারা গিয়াছে—ব্রজকাকার চণ্ডীমণ্ডপে পাশার আড্ডায় সে নিজে পত্তরখানা লইয়া গেল। সেদিনের কথা আজ স্পষ্ট মনে হয়—ন-জ্যেঠা, মেজ জ্যেঠা, ব্রজ কাকা, ও-পাড়ার পতিত রায়ের ভাই যদু রায়, আর ছিল গোলোকের সম্বন্ধী ভজহরি। পত্তর পড়িলেন সেজ জ্যেঠা। অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কে আনলে এ চিঠি রে ইন্দির? তাহার পর ইন্দির ঠাক্‌রুণকে বাড়ী আসিয়া তখনই হাতের নোয়া ও প্রথম যৌবনের সাধের জিনিস বাপ-মায়ের দেওয়া রূপার পৈঁছেজোড়া খুলিয়া রাখিয়া কপালের সিন্দুর মুছিয়া নদীতে স্নান করিয়া আসিতে হইল। কত কালের কথা—সে সব স্বপ্ন হইয়া গিয়াছে, তবু যেন মনে হয় সেদিনের!...

নিবারণের কথা মনে হয়—নিবারণ, নিবারণ! ব্রজ কাকার ছেলে নিবারণ! ষোল বৎসরের বালক, কি টকটকে গায়ের রং কি চুল! ঐ সে চণ্ডীমণ্ডপের পোতা জঙ্গলে ঢাকা পড়িয়া আছে, বাঁশবনের মধ্যে—ওই ঘরে সে কঠিন জ্বররোগে শয্যাগত হইয়া যায়-যায় হইয়াও দুই-তিন-দিন রহিল। আহা, বালক সর্বদা জল জল করিত কিন্তু ঈশান কবিরাজ জল দিতে বারণ করিয়াছিলেন—মৌরীর পুঁটুলি একটু করিয়া চুষানো হইতেছিল। নিবারণ চতুর্থ দিন রাত্রে মারা গেল, মৃত্যুর একটু আগেও সেই জল জল তার মুখে বুলি—তবুও একবিন্দু জল তাহার মুখে ঠেকানো হয় নাই। সেই ছেলে মারা যাওয়ার পর পাঁচদিনের মধ্যে বড় খুড়ীর মুখে কেউ জল দেওয়াইতে পারে নাই—পাঁচদিনের পর ভাশুর রামচাঁদ চক্কোত্তি নিজে ভ্রাতৃবধূর ঘরে গিয়া হাত জোড় করিয়া বলিলেন—তুই চলে গেলে আমার কি দশা হবে? এ বুড়ো বয়সে কোথায় যাব মা? বড় খুড়ী বনিয়াদী ধনী ঘরের মেয়ে ছিলেন—জগদ্ধাত্রীর মত রূপ, অমন রূপসী বধূ এ অঞ্চলে ছিল না। স্বামীর পদোদক না খাইয়া কখনও জল খান নাই—সেকালের গৃহিনী, রন্ধন করিয়া আত্মীয়-পরিজনকে খাওয়াইয়া নিজে তৃতীয় প্রহরে সামান্য আহার করিতেন। দান-ধ্যানে, অন্ন-বিতরণে ছিলেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। লোককে রাঁধিয়া খাওয়াইতে বড় ভালবাসিতেন। তাই ভাশুরের কথায় মনের কোমল স্থানে বুঝি ঘা লাগিল—তাহার পর তিনি উঠিয়াছিলেন ও জলগ্রহণ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু বেশীদিন বাঁচেন নাই, পুত্রের মৃত্যুর দেড় বৎসরের মধ্যেই তিনিও পুত্রের অনুসরণ করেন।

একটু জল দে মা—এতটুকু দে—

জল খেতে নেই, ছিঃ, বাবা—কবরেজ মশায় যে বারণ করেচেন—জল খায় না—

এতটুকু দে—এক ঢোক খাই মা—পায়ে পড়ি...

দুপুরের পাখপাখালির ডাকে সুদূর পঞ্চাশ বছরের পার হইতে বাঁশের মর্ মর্ শব্দ কানে ভাসিয়া আসে।

খুকী বলে—পিতি, তোর ঘুম নেগেচে? আয় শুবি চল্।

হাতের দা-খানা রাখিয়া বুড়ী বলে—ওই দ্যাখো, আবার পোড়া ঝিমুনি ধরেছে—অবেলায় এখন আর শোবো না মা—এইগুলো সাঙ্গ করে রাখি—নিয়ে আয় দিকি ঐ বড় আগালেডা?

খোকা প্রায় দশ মাসের হইল। দেখিতে রোগা রোগা গড়ন, অসম্ভব রকমের ছোট্ট মুখখানি। নীচের মাড়িতে মাত্র দু'খানি দাঁত উঠিয়াছে। কারণে অকারণে যখন-তখন সে সেই দু'খানি মাত্র দুধে-দাঁতওয়ালা মাড়ি বাহির করিয়া হাসে। লোকে বলে—বৌমা, তোমার খোকার হাসিটা বায়না করা। খোকাকে একটুখানি ধরাইয়া দিলে আর রক্ষা নাই, আপনা হইতে পাগলের মত এত হাসি সুরু করিবে যে, তাহার মা বলে—আচ্ছা খোকন, আজ থামো, বড্ড হেসেচো, আজ বড্ড হেসেচো—আবার কালকের জন্যে একটু রেখে দাও। মাত্র দুইটি কথা সে বলিতে শিখিয়াছে। মনে সুখ থাকিলে মুখে বলে জে-জে-জে-জে এবং দুধে-দাঁত বাহির করিয়া হাসে। মনে দুঃখ হইলে বলে, না-না-না-না ও বিশ্রী রকমের চীৎকার করিয়া কাঁদিতে শুরু করে। যাহা সামনে পায়, তাহারই উপর ঐ নতুন দাঁত দু'খানির জোর পরখ করিয়া দেখে—মাটির ঢেলা, এক টুকরো কাঠ, মায়ের আঁচল; দুধ খাওয়াইতে বসিলে কে এক সময় সে হঠাৎ কাঁসার ঝিনুকখানাকে মহা আনন্দে নতুন দাঁত দু'খানি দিয়া জোরে কামড়াইয়া ধরে। তাহার মা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলে—ওকি, হাঁরে ও খোকা, ঝিনুকখানাকে কামড়ে ধল্লি কেন?—ছাড় ছাড়—ওরে করিস কি—দু'খানা দাঁত তো তোর মোটে সম্বল—ভেঙে গেলে হাসবি কি করে শুনি? খোকা তবুও ছাড়ে না। তাহার মা মুখের ভিতর আঙুল দিয়া অতিকষ্টে ঝিনুকখানাকে ছাড়াইয়া লয়।

খুকীর উপর সব সময় নির্ভর করিয়া থাকা যায় না বলিয়া রান্নাঘরের দাওয়া খানিকটা উঁচু করিয়া বাঁশের বাখারি দিয়া ঘিরিয়া তাহার মধ্যে খোকাকে বসাইয়া রাখিয়া তাহার মা নিজের কাজ করে। খোকা কাটরার মধ্যে শুনানি হওয়া ফৌজদারী মামলার আসামীর মত আটক থাকিয়া কখনো আপন মনে হাসে, অদৃশ্য শ্রোতাগণের নিকট দুর্বোধ্য ভাষায় কি বকে, কখনো বাখারির বেড়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বাঁশবনের দিকে চাহিয়া থাকে। তাহার মা ঘাট হইতে স্নান করিয়া আসিলে—মায়ের ভিজে কাপড়ের শব্দ পাইতেই খোকা খেলা হইতে মুখ তুলিয়া এদিক-ওদিক চাহিতে থাকে ও মাকে দেখিতে পাইয়া একমুখ হাসিয়া বাখারির বেড়া ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। তার মা বলে—একি, ওমা, এই কাজল পরিয়ে মুখ মুছিয়ে দিয়ে গেলাম, একেবারে হাঁড়িচাচা পাখী সেজে বসে আছে? দেখি, এদিকে আয়। জোর করিয়া নাকমুখ রগড়াইয়া কাজল উঠাইতে গিয়া খোকার রাঙা মুখ একেবারে সিঁদুর হইয়া যায়—মহা আপত্তি করিয়া রাগের সহিত বলে, জে-জে-জে-জে, তাহার মা শোনে না।

ইহার পর মায়ের হাতে গামছা দেখিলেই খোকা খল্‌বল্ করিয়া হামাগুড়ি দিয়া একদিকে ছুটিয়া পালাইতে যায়, এক একদিন ঘাট হইতে আসিয়া সর্বজয়া বলে— খোকন বলে টু—উ—উ! দোলা তো খোকা' দোলে দোলে খোকন দোলে—! খোকা অমনি বসিয়া পড়িয়া সামনে পিছনে বেজায় দুলিতে থাকে ও মনের সুখে ছোট্ট হাত দুটি নাড়িয়া গান ধরে—

(গীত)

জে—এ—এ—জে—জে—জে—এ—এ—ই
জে—জে—জে—জে—এ
জে—জে—জে—জে—জে—জে

তার মা বলে, আচ্ছা থামো আর দুলো না খোকা, হয়েচে। কখনো কখনো কাজ করিতে করিতে সর্বজয়া কান পাতিয়া শুনিত, খোকার বেড়ার ভিতর হইতে কোন শব্দ আসিতেছে না—যেন সে চুপ করিয়া গিয়াছে! তাহার বুক ধড়াস্ করিয়া উঠিত—শেয়ালে নিয়ে গেল না তো? সে ছুটিয়া আসিয়া দেখিত খোকা সাজি উপুড়-করা একরাশ চাঁপা ফুলের মত মাটির উপর বে-কায়দায় ছোট্ট হাতখানি রাখিয়া কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, চারিদিক হইতে নাল্‌সে পিঁপড়ে, মাছি ও সুড়সুড়ি পিপড়ের দল মহালোভে ছুটিয়া আসিতেছে, খোকার পাতলা পাতলা রাঙা ঠোঁট দুটা ঘুমের ঘোরে যেন একটু একটু কাঁপিতেছে, ঘুমের ঘোরে সে যেন মাঝে মাঝে ঢোঁক গিলিয়া জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলিতেছে—যেন জাগিয়া উঠিল, আবার তখনই এমন ঘুমাইয়া পড়িতেছে যে নিশ্বাসের শব্দটিও পাওয়া যাইতেছে না।

সকাল হইতে সন্ধ্যা ও সন্ধ্যা হইতে অনেক রাত্রি পর্যন্ত তাহাদের বাঁশবাগানের ধারে নির্জন বাড়ীখানি দশ মাসের শিশুর অর্থহীন আনন্দ-গীতি ও অবোধ কলহাস্যে মুখরিত থাকে।

মা ছেলেকে স্নেহ দিয়া মানুষ করিয়া তোলে, যুগে যুগে মায়ের গৌরবগাথা তাই সকল জনমনের বার্তায় ব্যক্ত। কিন্তু শিশু যা মাকে দেয়, তাই কি কম? সে নিঃস্ব আসে বটে, কিন্তু তার মন-কাড়িয়া-লওয়া হাসি, শৈশবতারল্য, চাঁদ ছানিয়াগড়া মুখ, আধ আধ আবোল-তাবোল বকুনির দাম কে দেয়? ওই তার ঐশ্বর্য, ওরই বদলে সে সেবা নেয়, রিক্ত ভিক্ষুকের মত নেয় না।

এক একদিন যখন হরিহর বাজারের হিসাব কি নিজের লেখা লইয়া ব্যস্ত আছে—সর্বজয়া ছেলেকে লইয়া গিয়া বলে, ওগো, ছেলেটাকে একটু ধরো না? মেয়েটা কোথায় বেরিয়েছে—ঠাকুরঝি গিয়েচে ঘাটে....ধরো দিকি একটু! আমি নাইবো, না, ছেলে ঘাড়ে করে বসে থাকলেই হবে? হরিহর বলে—উঁহু, ওসব গোলমাল এখন এখানে নিয়ে এসো না, বড় ব্যস্ত। সর্বজয়া রাগিয়া ছেলেকে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যায়। হরিহর হিসাবপত্র লিখিতে লিখিতে হঠাৎ দেখে ছেলে তার চটিজুতার প্যাটিটা মুখে দিয়া চিবাইতেছে! হরিহর জুতাখানা কাড়িয়া লইয়া বলে—আঃ, দ্যাখো, বাধিয়ে গেল এক কাণ্ড, আছি একটা কাজ নিয়ে!

হঠাৎ একটা চড়ুই পাখী আসিয়া রোয়াকের ধারে বসে। খোকা বাবার মুখের দিকে চাহিয়া অবাক্ হইয়া সেদিকে দেখাইয়া হাত নাড়িয়া বলে—জে—জে—জে—জে—

হরিহরের বিরক্তি দূর হইয়া গিয়া ভারি মমতা হয়।

অনেক দিন আগের এক রাত্রির কথা মনে পড়ে।

নতুন পশ্চিম হইতে আসিয়া সেদিন সে গ্রামের সকলের পরামর্শে শ্বশুরবাড়ী স্ত্রীকে আনিতে গিয়াছিল। দুপুরের পর শ্বশুরবাড়ীর গ্রামের ঘাটে নৌকা পৌঁছিল। বিবাহের পর একটিবার মাত্র সে এখানে আসিয়াছিল, পথঘাট মনে ছিল না, লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া সে শ্বশুরবাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহার ডাকাডাকিতে একটি গৌরাঙ্গী ছিপছিপে চেহারার তরুণী কে ডাকিতেছে দেখিবার জন্য বাইরের দরজায় দাঁড়াইল, এবং তাহার সহিত চোখাচোকি হওয়াতে সেখান হইতে চট্ করিয়া সরিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল—হরিহর ভাবিতে লাগিল, মেয়েটি কে? তাহার স্ত্রী নয় তো? সে কি এত বড় হইয়াছে?

রাত্রিতে সন্ধান মিলিল। সর্বজয়া দারিদ্র্য হইতে রক্ষিত তাহার মায়ের একখানা লালপাড় মট্কা শাড়ী পরিয়া অনেক রাত্রে ঘরে আসিল। হরিহর চাহিয়া দেখিয়া বিস্মিত হইল। দশ বৎসর আগেকার সে বালিকাপত্নীর কিছুই আর এই সুন্দরী তরুণীতে নাই—কে যেন ভাঙ্গিয়া নতুন করিয়া গড়িয়াছে। মুখের সে কচিভাবটুকু আর নাই বটে, কিন্তু তাহার স্থানে যে সৌন্দর্য ফুটিয়াছে তাহা যে খুব সুলভ নহে হরিহরের সেটুকু বুঝিতে দেরি হইল না। হাত-পায়ের গঠন, গতিভঙ্গি সবই নিখুঁত ও নতুন।

ঘরে ঢুকিয়া সর্বজয়া প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল। যদিও সে বড় হইয়াছে, এ পর্যন্ত স্বামীর সহিত দেখা একরূপ ঘটে নাই বলিলেই চলে। নববিবাহিতার সে লজ্জাটুকু তাহাকে যেন নতুন করিয়া পাইয়া বসিল। হরিহর প্রথমে কথা কহিল। স্ত্রীর ডানহাতখানা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বিছানায় বসাইয়া বলিল—ব'সো এখানে, ভাল আছো?

সর্বজয়া মৃদু হাসিল। লজ্জাটা যেন কিছু কাটিয়া গেল। বলিল—এতদিন পরে বুঝি মনে পড়লো? আচ্ছা, কি বলে এতদিন ডুব মেরে ছিলে? পরে সে হাসিয়া বলিল—কেন, কি দোষ করেছিলাম বলো তো?

স্ত্রীর কথাবার্তায় আজ পাড়াগাঁয়ের টান ও ভঙ্গিটুকু হরিহরের নতুন ও ভারি মিষ্টি বলিয়া মনে হইল। পরে সে লক্ষ্য করিয়া দেখিল স্ত্রীর হাতে কেবল গাছকয়েক কড় ও কাঁচের চুড়ি ছাড়া অন্য কোন গহনা নাই। গরিব ঘরের মেয়ে, দিবার কেহ নাই, এতদিন খবর না লইয়া ভারি অন্যায় করিয়াছে সে। সর্বজয়াও চাহিয়া চাহিয়া স্বামীকে দেখিতে ছিল। আজ সারাদিন সে চারি-পাঁচ বার আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া দেখিয়াছে—স্বাস্থ্যময় যৌবন হরিহরের সুগঠিত শরীরের প্রতি অঙ্গে যে বীরের ভঙ্গি আনিয়া দিয়াছে, তাহা বাংলা দেশের পল্লীতে সচরাচর চোখে পড়ে না। বাপমায়ের কথাবার্তায় আজ সে শুনিয়াছে তাহার স্বামী পশ্চিম হইতে নাকি খুব লেখাপড়া শিখিয়া আসিয়াছে, টাকাকড়ির দিক হইতেও

দু'পয়সা না আনিয়াছে এমন নয়। এতদিনে তাহার দুঃখ ঘুচিল, ভগবান বোধ হয় এতদিনে মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। সকলেই বলিত স্বামী তাহার সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছে—আর কখনো ফিরিবে না। মনে-প্রাণে একথা বিশ্বাস না করিলেও স্বামীর পুনরাগমন এতকাল তাহার কাছে দুরাশার মতই ঠেকিয়াছে। কত রাত্রি দুশ্চিন্তায় জাগিয়া কাটাইয়াছে, গ্রামের বিবাহ উপনয়নের উৎসবে ভাল করিয়া যোগ দিতে পারে নাই—সকলেই আহা বলে, গায়ে পড়িয়া সহানুভূতি জানায়; অভিমানে তাহার চোখে জল আসিত—অনাবিল যৌবনের সোনালী কল্পনা এতদিন শুধু আড়ালে আবড়ালে নির্জন রাত্রিতে চোখের জলে ঝরিয়া পড়িয়াছে, কাহারও কাছে মুখ ফুটিয়া প্রকাশ করে নাই, কিন্তু বসিয়া বসিয়া কতদিন ভাবিত—এই তো সংসারের অবস্থা, যদি সত্যসত্যই স্বামী ফিরিয়া না আসে, তবে বাপমায়ের মৃত্যুর পরে কোথায় দাঁড়াইবে—কে আশ্রয় দিবে?

এতদিনে কিনারা মিলিল।

হরিহর হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা, আমাকে যখন তুমি ওবেলা দরজার বাইরে দেখলে—তখন চিনতে পেরেছিলে? সত্যি কথা বোলো কিন্তু—

সর্বজয়া হাসিয়া বলিল—নাঃ, তা চিনবো কেন! প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারিনি, তারপর তখুনি—

—আন্দাজে—

—আন্দাজে নয় গো, আন্দাজে নয়—সত্যি-সত্যি! দেখলে না, তখুনি মাথায় কাপড় দিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকলাম? তারপর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, তুমি বল তো, আমায় চিনতে পেরেছিলে? বল তো গা ছুঁয়ে?

নানা কেজো-অকেজো কথাবার্তায় রাত বাড়িতে লাগিল। পরলোকগত দাদার কথা উঠিতে সর্বজয়ার চোখের জল আর বাঁধ মানে না। হরিহর জিজ্ঞাসা করিল—বীণার বিয়ে কোথায় হল? ছোট শালীর নাম জানিত না, আজই শ্বশুরের মুখে শুনিয়াছে।

—তার বিয়ে হোল কুড়ুলে বিনোদপুর—ওই যে বড় গাঙ, কি বলে? মধুমতী।—সেই মধুমতীর ধারে।

একটা প্রশ্ন বার বার সর্বজয়ার মনে আসিতে লাগিল—স্বামী তাহাকে লইয়া যাইবে তো? না, দেখাশুনা করিয়া আবার চলিয়া যাইবে সেই কাশী গয়া? বলি বলি করিয়াও মুখ ফুটিয়া সে কথাটা কিন্তু কোনরূপেই জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না—তাহার মনের ভিতর কে যেন বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া বলিল—না নিয়ে যাক্ গে—আবার তা নিয়ে বলা, কেন এত ছোট হতে যাওয়া?—

হরিহর সমস্যার সমাধান নিজ হইতেই করিল। বলিল—কাল চল তোমাকে বাড়ী নিয়ে যাই নিশ্চিন্দিপুরে—

সর্বজয়ার বুকে ধড়াস করিয়া যেন ঢেঁকীর পাড় পড়িল—সামলাইয়া লইয়া মুখে বলিল—কালই কেন? এ্যাদ্দিন পরে এলে—দুদিন থাকো না কেন? বাবা মা কি তোমায় এখুনি ছেড়ে দেবেন? পরশু আবার আমার বকুলফুলের বাড়ী তোমায় নেমন্তন্ন করে গিয়েছে—

—কে তোমার বকুলফুল?...

—এই গাঁয়েই বাড়ী—এ পাড়ায়, আমার ও-পাড়াতে বিয়ে হয়েচে। পরে সে আবার হাসিয়া বলিল, কাল সকালে তোমাকে দেখতে আসবে বলেচে যে—

কথাবার্তার স্রোত একইভাবে চলিল—রাত্রি গভীর হইল। বাড়ীর ধারেই সজনে গাছে রাতজাগা পাখী অদ্ভুত রব করিয়া ডাকিতেছিল। হরিহরের মনে হইল বাংলার এই নিভৃত পল্লীপ্রান্তের বাঁশবনের ছায়ায় একখানি স্নেহব্যগ্র গৃহকোণ যখন তাহার আগমনের আশায় মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অভ্যর্থনাসজ্জা সাজাইয়া প্রতীক্ষা করিয়াছে, কিসের সন্ধানেই সে তখন পশ্চিমের অনুর্ব্বর অপরিচিত মরু-পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে গৃহহীন নিরাশ্রয়ের ন্যায় ঘুরিয়া মরিতেছিল যে!

রাত-জাগা পাখীটা একঘেয়ে ডাকিতেছিল, বাহিরের জ্যোৎস্না ক্রমে ক্রমে ম্লান হইয়া আসিতেছে। এক হিসেবে এই রাত্রি তাহার কাছে বড় রহস্যময় ঠেকিতেছিল, সম্মুখে তাহাদের নবজীবনের যে পথ

বিস্তীর্ণ ভবিষ্যতে চলিয়া গিয়াছে—আজ রাতটি হইতেই তাহার শুরু। কে জানে সে জীবন কেমন হইবে? কে জানে জীবন-লক্ষ্মী কোন্ সাজি সাজাইয়া রাখিয়াছেন তাহাদের সে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের পাথেয়-রূপে?

দুজনেরই মনে বোধ হয় অনেকটা অস্পষ্টরূপে একই ভাব জাগিতেছিল। দুজনেই চুপ করিয়া জানালার বাহিরের ফাঁকে জ্যোৎস্নারাত্রির দিকে চাহিয়া রহিল।

তারপর কতদিন কাটিয়া গিয়াছে। তখন কোথায় ছিল এই শিশুর পাত্তা?

পথের পাঁচালী

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইন্দির ঠাকুরুণ ফিরিয়া আসিয়াছে ছয় সাত মাইল, সর্বজয়া কিন্তু ইহার মধ্যে একদিনও বুড়ীর সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহে নাই। আজকাল তার আরও মনে হয় বুড়ী ডাইনি সাতকুলখাগীটাকে তাহার মেয়ে যেন তাহার চেয়েও ভালবাসে। হিংসা তো হয়ই, রাগও হয়। পেটের মেয়েকে পর করিয়া দিতেছে। দু'বেলা কথায় কথায় বুড়ীকে সময় থাকিতে পথ দেখিবার উপদেশ ঈঙ্গিতে জানাইয়া দেয়। সে পথ কোন দিকে—জ্ঞান হইয়া অবধি আজ পর্যন্ত সত্তর বৎসরের মধ্যে বুড়ী তাহার সন্ধান পায় নাই, এতকাল পরে কোথায় তাহা মিলিবে, ভাবিয়াই সে ঠাহর পায় না।

বর্ষার শেষদিকে বুড়ী অবশেষে এক যুক্তি ঠাওরাইল। ছয় ক্রোশ দূরে ভান্ডারহাটিতে তাহার জামাইবাড়ী। তাহার জামাই চন্দ্র মজুমদার বাঁচিয়া আছেন। জামাইয়ের অবস্থা বেশ ভাল, সম্পন্ন গৃহস্থ, অবশ্য মেয়ে মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জামাই-এর সঙ্গে সম্পর্ক উঠিয়া গিয়াছে—আজ পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বৎসরের আগেকার কথা—তাহার পর আর কখনও দেখাশোনা বা খবরাখবরের লেন-দেন হয় নাই। তবুও যদি সেখানে যাওয়া যায়, জামাই একটু আশ্রয় দিতে কি গররাজী হইবে?

সন্ধ্যার পূর্বে ভান্ডারহাটি গ্রামে ঢুকিয়া একখানা বড় চন্ডীমন্ডপের সম্মুখে গাড়োয়ান গাড়ী দাঁড় করাইল। গাড়োয়ানের ডাক-হাঁকে একজন চব্বিশ-পঁচিশ বৎসরের যুবক আসিয়া বলিল—কোথাকার গাড়ী? তাহার পিছনে পিছনে একজন বৃদ্ধ বাড়ীর ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে বাহির হইলেন—কে রাধু? জিগ্যেস্ করো কোথা থেকে আসছেন?

বুড়ী চিনিল—কিন্তু অবাক হইয়া রহিল—এই সেই তাহার জামাই চন্দর! চল্লিশ বৎসর পূর্বের সে সবল দোহারা-গড়ন সুচেহারা ছেলেটির সঙ্গে এই পক্ককেশ প্রবীণ ব্যক্তির মনে মনে তুলনা করিয়া সে যেন হাঁপাইয়া উঠিল। পরক্ষণেই কেমন এক বিভিন্ন ভাবের সংমিশ্রণে উৎপন্ন—না-হাসি-না-দুঃখ গোছের মনের ভাবে সে বিহ্বলের মত ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল। অনেক দিন পরে মেয়ের নাম ধরিয়া কাঁদিল।

বিস্ময়বিমূঢ় চন্দ্র মজুমদার প্রথমটা আকাশ-পাতাল হাতড়াইতেছিলেন, পরে ব্যাপারটা বুঝিলেন ও আসিয়া শাশুড়ীর পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিলেন। একটু সামলাইয়া বুড়ী মাথায় কাপড় তুলিয়া দিয়া ভাঙাগলায় বলিল—তোমার কাছে এয়েচি বাবাজী এতদিন পরে—একটুখানি আচ্ছয়ের জন্যি—আর কড়া দিনই বা বাঁচবো! কেউ নেই আর ত্রিভূবনে—এই বয়সে দুটো ভাত কাপড়ের জন্যি—

মজুমদার মহাশয় বড়ছেলেকে গাড়ীর দ্রব্যাদি নামাইতে বলিলেন ও ছেলের সঙ্গে শাশুড়ীকে বাড়ীর মধ্যে পাঠাইয়া দিলেন। দ্বিতীয়পক্ষের বিধবা মেয়ে ও বড় পুত্রবধূ সংসারের গৃহিণী। আরও তিনটি পুত্রপধূ আছে। নাতি-নাতিনীও তিন-চারটি।

তালগাছের গুঁড়ির খুঁটি ও আড়াবাঁধা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুইখানা দাওয়া উঁচু আটচালা ঘর জিনিসপত্র, সিন্দুকতোরঙ্গে বোঝাই, পা ফেলিবার স্থানাভাব। মজুমদার মহাশয়ের বিধবা মেয়েটির নাম হৈমবতী। খুব ভাল মেয়ে—সে নিজের হাতে ফল কাটিয়া জলখাবার সাজাইয়া অত্যন্ত আপ্যায়িত করিয়া কাছে বসাইয়া খাওয়াইল; একথা ওকথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, বলিল—দিদিমা, আমায় কখনো দেখেননি, না? কখনো তো এদিকে পায়ের ধূলো দ্যাননি এর আগে! আক কেটে দেবো দিদিমা? দাঁত আছে? পাশের রান্নাঘরে ছেলেমেয়েরা সন্ধ্যাবেলা ভাত খাইতে বসিয়া হৈ চৈ করিতেছে। একজন চেঁচাইয়া

বলিতেছে, ও মা দ্যাখো, উমি সব ডালটুকু আমার পাতে দিচ্ছে! পুত্রবধূ চেঁচাইতেছে, ওর কাছে খেতে বসিস্ কেন? রোজ না বলচি আলাদা বসবি—এই উমি, বড্ড বাড় হয়েচে, না?

কিন্তু দশ-বারো দিন কাটিয়া গেল, বুড়ীর সব কেমন নতুন নতুন ঠেকিতে লাগিল, তেমনি স্বস্তি পাওয়া যায় না—নতুন ধরণের ঘরদোর, নতুন পথঘাট, নতুন ভাবের গৃহস্থালী। কেমন যেন মনে হয় এ ঠিক তাহার নিজের নয়, সব পর। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়ই মনে পড়িত নিরিবিলি দাওয়া আর খুকী-খোকার মুখ। দিন কুড়িক পরে বুড়ী যাইবার জন্য ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। এখানে আর মন টেকে না। কর্ত্তার প্রথম পক্ষের শাশুড়ীর এ আকস্মিক আবির্ভাব ও তাঁহার মতলব শুনিয়া বাড়ীর বড়বধূ প্রথম হইতেই সন্তুষ্ট ছিলেন না, অন্তর্ধানে খুশী ছাড়া অ-খুশী হইলেন না। চন্দ্র মজুমদারের ইচ্ছা কি ছিল ভগবান জানেন, কিন্তু বড়ছেলে ও বড়বধূর ভয়ে কিছু বলিতে পারিলেন না।

অনেকদিন পরে আবার নিজের ঘরের দাওয়ায় দুর্গাকে কাছে লইয়া খোকাকে কাছে লইয়া বসিয়া জ্যোৎস্না-ঝরা নারিকেলশাখার মৃদু কম্পন দেখিতে দেখিতে সুখে বুড়ীর ঘুমের আমেজ আসে।

খুকী প্রথমে ভারী অভিমান করিয়াছিল, কথা কহিবে না, কাছে আসিবে না। নানা কথায় সান্ত্বনা দিবার পর আজকাল ভাব হইয়াছে। বুড়ী ভাইঝির মাথায় আদর করিয়া হাত বুলাইয়া বলে,—বেশ লাল একজোড়া ঢেঁকি ঝুমকো হয় তো দিব্যি মানায়, না আজকাল কি উঠেচে—ওগুলোকে বলে কি ছাই—

শীত আসিল। বুড়ী—ও পাড়ার গাঙ্গুলী বাড়ী গিয়া বুড়া রামনাথ গাঙ্গুলী মহাশয়ের কাছে বলিল—ও রাম, জাড় পড়লো বড্ড আবার—তা গায়ে একখানা বস্তর এমন নেই যে, সকালসন্দে একটু মুড়িসুড়ি দিয়ে বসি, তা আমায় যদি একখানা—

রাম গাঙ্গুলী বলিলেন—আচ্ছা দিদি, একদিন এসো, এ মাসটায় আর হবে না—ও মাসে বরং দেখবো।

বহুদিন যাবৎ হাঁটাহাঁটি ঘোরা-ফেরার পরে একদিন কুষ্টিয়ার রাঙা ছিটের সূতী চাদর একখানা বাহির করিয়া হাতে দিয়া বলিলেন—এই নাও দিদি, ভারি গরম জিনিস—সাড়ে ন' আনা দাম—এর চেয়ে ভাল জিনিস আর নবাবগঞ্জে পাওয়া যায় না—বুধবার এনে রেখেচি—দ্যাখো না খুলে?

বুড়ীর তখনও যেন বিশ্বাস হইতেছিল না। আহ্লাদে একগাল হাসিয়া সে সেখানাকে খুলিয়া গায়ে জাড়াইয়া বলিল—দিব্যি, কেমন ওম্—মোটা-সোটা দিব্যি কাপড়—আঃ দাদা, বেঁচে থাকো—কানাই বলাই বেঁচে থাকুক, অক্ষয় প্রমাই হোক—কাঙ্গাল গরিবকে কেউ দেয় না, ওই অন্নদার কাছে একখানা গায়ের কাপড় চাচ্চি আজ তিন বছর থেকে—দেব দেব বলে, তা দিলে না—সখটা মিটিয়ে নি, কড়া দিনই আর বা?

সর্বজয়াকে আহ্লাদ করিয়া দেখাইতেই সে বলিল, দ্যাখো ঠাকুরঝি, এ বাড়ি থেকে যে তুমি সাত দোর মেগে বেড়াবে তা হবে না, স্পষ্ট বলে দিচ্চি। ভিক্ষে মাগতে হয়, আলাদা বান্দোবস্ত করো—

বুড়ী সে কথা হজম করিয়া লইল। এরূপ অনেক কথাই তাহাকে দিনের মধ্যে দশবার হজম করিতে হয়। সেকালের ছড়াটা সে এখনও ভোলে নাই—

লাথি ঝাঁটা পায়ের তল,
ভাত পাথরটা বুকের বল—

দুর্গা ভারি খুশী হইয়া বলে, ক' পয়সা দাম পিতিমা—কেমন নাঙা—না? আশ্বাসের সুরে পিসি বলে, আমি মরে গেলে তোকে দিয়ে যাবো, তুই গায়ের দিস্ বড় হলে। নতুন চাদরের সোঁদা সোঁদা মাড়ের গন্ধটা বুড়ীর কাছে ভারি উপাদেয়, ভারি শৌখীন বলিয়া মনে হয়। সকালে চারখানা গায়ে জড়াইয়া ঝাঁট দিবার সময় মাঝে মাঝে নিজের দিকে চাহিয়া দেখে। নিষ্প্রয়োজনে ঘাটের পথে দাঁড়াইয়া থাকে, পথ-চলতি নিরীহ ঝি-বউকে ডাকিয়া বলে, কে যায়? রাজীর মা?—এত বেলা যে? ভূমিকা আর বেশী দূর না করিয়া একটু হাসিয়া নিজের গায়ের দিকে চাহিয়া বলে, এই গায়ের কাপড়খানা এবার ও-পাড়ার রামচাঁদ—সাড়ে ন' আনা দাম—

দু' একটা দুষ্ট মেয়ে বলে—উঃ, ঠাক্‌মাকে রাঙা কাপড়ে যা মানিয়েচে। ঠাক্‌মার বুঝি বিয়ে!

ও পাড়ার দাসীঠাকরণ আসিয়া হাসিমুখে বলিল—পয়সা দুটোর জন্যি এয়েছিলাম বৌ, ইন্দির পিসি কাল আমার কাছ থেকে একটা নোনা নিয়ে এল, বল্লে, কাল দাম গিয়ে চেয়ে নিয়ে এসো—

সর্বজয়া ঘরের কাজকর্ম করিতেছিল, অবাক হইয়া বলিল—নোনা কিনে এনেছে তোমার কাছ থেকে? দাসীঠাকরুণ ঘোর ব্যবসাদার মানুষ। সামান্য তেঁতুল আমড়া হইতে একগাছি শাক পর্যন্ত পয়সা না লইয়া কাহাকেও দেয় না। দাসীর অমায়িক ভাব অন্তর্হিত হইয়া গেল। বলিল—এনেচে কিনা জিজ্ঞেস করো না তোমার ননদকে! সকালবেলা কি মিথ্যা বলতে এলাম দুটো পয়সার জন্যি? চার পয়সার কমে আমি দেবো না—বললে বুড়োমানুষ খাবার ইচ্ছে হয়েছে—তা যাক দু'পয়সাতেই —

রাগে সর্বজয়ার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। নোনার মত ফল যাহা কিনা এত অপর্য্যাপ্ত বনে জঙ্গলে ফলে যে গরু বাছুরের পর্যন্ত খাইয়া অরুচি হইয়া যায়, তাহা আবার পয়সা দিয়া কিনিয়া খাইবার লোক যে পাড়াগাঁয়ে আছে, তাহা সর্বজয়ার ধারণায় আসে না।

ঠিক এই সময় ইন্দির বুড়ী কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সর্বজয়া তাহার উপর যেন ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিল—বলি হ্যাঁগা, তিন কাল গিয়েচে এককালে তো ঠেকেচ, যার ব'সে খাই তার পয়সার তো একটু দুখ-দরদ করে চলতে হয়? নোনা গিয়েচ কিনতে? কোথা থেকে তোমায় বসিয়ে আজ নোনা কাল দানা খাওয়াব? শখের পয়সা নিজে থেকে নিয়ে দাওগে যাও, পরের ওপর দিয়ে শখ করতে লজ্জা হয় না?

বুড়ীর মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল, একটুখানি হাসি আনিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—তা দে বৌ—পাকা নোনাডা, তা ভাবলাম নিই খেয়ে, কডা দিনই বা বাঁচবো? তা দিয়ে দে দুটো পয়সা—

সর্বজয়া চতুর্গুণ চীৎকার করিয়া বলিল—বড় পয়সা সস্তা দেখেচ কিনা? নিজের ঘটি-বাটি আছে বিক্রী করে দাও গিয়ে পয়সা—

পরে সে ঘড়া লইয়া খিড়কী দুয়ার দিয়া ঘাটের পথে বাহির হইয়া গেল।

দাসী খানিকটা দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল—আমার নাকে খৎ কানে খৎ, জিনিস বেচে এমন হয়রান তো কখনো হইনি! তোমায়ও বলি ইন্দির পিসি, নিজের পয়সাই যদি না ছিল তবে তোমার কাল নোনাটা আনা ভাল হয়নি বাপু, ও-রকম ধারে জিনিসপত্তর আর এনো না। তা তোমাদের ঝগড়া তোমরা কর, আমি গরিব লোক, ও বেলা আসবো, আমার পয়সা দুটো বাপু ফেলে দিও—

দাসীর পিছু পিছু খুকী বাহিরের উঠান পর্যন্ত আসিল। বলিতে বলিতে আসিল—পিসিমা বুড়ো মানুষ, একটা নোনা এনেছে, তা বুঝি বকে? খেতে ইচ্ছে হয় না, হ্যাঁ দাসীপিসি? বেশ নোনা, তোমায় আধখানা কাল দিয়েছে—তোমার বাড়ী বুঝি গাছ আছে পিসি?—পরে সে ডাকিয়া কহিল—শোনো না দাসীপিসি, আমি একটা পয়সা দেবো এখন, পুতুলের বাক্সে আছে, মা ঘরে চাবি দিয়ে ঘাটে গেল, এলে নুকিয়ে দেবো এখন, মাকে বোলো না যেন পিসি।

দুপুরের কিছু পূর্বে ইন্দির বুড়ী বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। বাঁ হাতে ছোট একটা ময়লা কাপড়ের পুঁটুলি, ডানহাতে পিতলের চাদরের ঘটিটা ঝুলানো, বগলে একটা পুরোনো মাদুর, মাদুরের পাড় ছিঁড়িয়া কাটিগুলি ঝুলিতেছে।

খুকী বলিল, ও পিসি, যাস্‌নে—ও পিসি কোথায় যাবি? পরে সে ছুটিয়া আসিয়া মাদুরের পিছনটা টানিয়া ধরিল। তুই চলে গেলে আমি কাঁদবো পিসি—ঠিক—

সর্বজয়া ঘরের দাওয়া হইতে বলিল, তা যাবে যাও, গেরস্তর অকল্যাণ করে যাওয়া কেন? ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করি, এতকাল যার খেলে তার একটা মঙ্গল তো দেখতে হয়, অনখ সময়ে না খেয়ে চলে গিয়ে তারপর গেরস্তর একটা অকল্যাণ বাধুক, এই তোমার ইচ্ছে তো? ঐ রকম কুচক্কুরে মন না হলে কি আর এই দশা হয়?...

বুড়ী ফিরিল না। খুকী কাঁদিতে কাঁদিতে অনেক দূর পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে গেল।

বুড়ী গিয়া গ্রামের ও-পাড়ার নবীন ঘোষালের বাড়ী উঠিল। নবীন ঘোষালের বউ সব শুনিয়া গালে হাত দিয়া বলিল—ওমা, এমন তো কখনো শুনিনি, হ্যাঁগো বুড়ী? তা থাকো তুমি, এইখানেই থাকো। মাস-দুই সেখানে থাকার পর বুড়ী সেখান হইতে বাহির হইয়া তিনকড়ি ঘোষালের বাড়ী ও তথা হইতে পূর্ণ চক্রবর্তীর বাড়ী আশ্রয় লইল। প্রত্যেক বাড়ীতেই প্রথম আপ্যায়নের হৃদ্যতাটুকু কিছুদিন পর উবিয়া যাওয়ার পরে বাড়ীর লোকে নানা রকমে বিরক্তি প্রকাশ করিত। পরামর্শ দিত ঝগড়া মিটাইয়া ফেলিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইতে। বুড়ী আরও দু'এক বাড়ী ঘুরিল, সব সময়ই তাহার ভরসা ছিল বাড়ী হইতে আর কেহ না হয়, অন্তত হরিহর ডাকিয়া পাঠাইবে। কিন্তু তিনমাস হইয়া গেল, কেহই আগ্রহ করিয়া ডাকিতে আসিল না। দুর্গাও আসে নাই। বুড়ী জানে ও-পাড়া হইতে এ-পাড়া অনেক দূরে, ছোট মেয়ে এতদূর আসিতে পারে না। সে আশায় আশায় ও-পাড়ায় দু'একবার গেল, খুকীর সঙ্গে দেখা হইল না।

বারো মাস লোকের বাড়ী আশ্রয় হয় না। পূব-পাড়ার চিন্তে গয়লানীর চালা ঘরখানি পড়িয়া ছিল—মাস দুই পরে সকলে মিলিয়া সেই ঘরখানি বুড়ির জন্য ঠিক করিয়া দিল এবং ঠিক করিল পাড়া হইতে সকলে কিছু কিছু সাহায্য করিবে। ঘরখানা নিতান্ত ছোট, ছিটে বেড়ার দেয়াল, পাড়া হইতে দূরে, একটা বাঁশবনের মধ্যে। লোকের মুখে শুনিত সর্বজয়া নাকি বলিয়াছে—তেজ দেখুক পাঁচজনে। এ বাড়ী আর না, আমার বাছাদের মুখের দিকে যে তাকায়নি—তাকে আর আমার দোরে মাথা গলাতে হবে না, ভাগাড়ে পড়ে মরুক গিয়ে। যাহাদের সাহায্য করিবার কথা ছিল, তাহারা কেন সেদিন অত উৎসাহের সঙ্গে যোগাইল, ক্রমে কিন্তু তাহাদের আগ্রহও কমিয়া গেল। বুড়ী ভাবে, কেন সেদিন অত রাগ করে চলে এলাম? বৌ বারণ কল্লে, খুকী কত কাঁদলে, হাত ধরে টানাটানি কল্লে—। নিজের উপর অত্যন্ত দুঃখে চোখের জলে দুই তোবড়ানো গাল ভাসিয়া যায়। বলে—শেষ কালডা এত দুঃখও ছিল অদৃষ্টে—আজ যদি মেয়েটা থাকতো—

চৈত্র মাসের সংক্রান্তি। সারাদিন বড় রৌদ্রের তেজ ছিল, সন্ধ্যার সময় একটু একটু বাতাস বহিতেছে, গোসাঁইপাড়ায় চড়কের ঢাক এখনও বাজিতেছে, মেলা এখনও শেষ হয় নাই।

রৌদ্রে এ বাড়ী ও-বাড়ী ঘুরিয়া ও দুর্ভাবনায় বুড়ীর রোজ সন্ধ্যার পরে একটু জ্বর হয়। সে মাদুর পাতিয়া দাওয়ায় চুপ করিয়া শুইয়া আছে, মাথার কাছে মাটির ভাঁড়ে জল। পিতলের চাদরের ঘটিটা ইতিমধ্যে চার আনায় বাঁধা দিয়া চাল কেনা হইয়াছে। জ্বরের তৃষ্ণায় মাঝে মাঝে একটু একটু জল মাটির ভাঁড় হইতে খাইতেছে।

—পিসিমা!....বুড়ী কাঁথা ফেলিয়া লাফাইয়া উঠিল, দাওয়ার পৈঠায় খুকী উঠিতেছে, পিছনে তাহাদের পাড়ার বেহারী চকত্তির মেয়ে রাজী। খুকীর পরনে ফর্সা কাপড়, আঁচলের প্রান্তে কি সব পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধা। বুড়ীর মুখ দিয়া বেশী কথা বাহির হইল না। প্রবল আগ্রহে সে শীর্ণ হাত বাড়াইয়া তাহাকে জ্বরতপ্ত বুকে জড়াইয়া ধরিল।

—বলিসনে কাউকে পিসি, কেউ যেন টের পায় না, চড়ক দেখে সন্দেবেলা চুপি চুপি এলাম, রাজীও এল আমার সঙ্গে, চড়কের মেলা থেকে এই দ্যাখ্ তোর জন্যে সব এনেচি—

খুকী পুঁট্‌লি খুলিল—

—মুড়কি পিসিমা, তোর জন্যে দু'পয়সার মুড়কি আর দুটো কদ্‌মা আর খোকার জন্যে একটা কাঠের পুতুল—। বুড়ী ভাল করিয়া উঠিয়া বসিল। জিনিসগুলো নাড়িতে নাড়িতে বলিল—দেখি দেখি, ও আমার মাণিক, কত জিনিস এনেচে দ্যাখো। রাজরাণী হও, গরিব পিসির ওপর এত দয়া। দেখি খোকার কাঠের পুতুলডা ! বাঃ দিব্যি পুতুল—কড়া পয়সা নিলে?....

এক ঝোঁক কথাবার্তার পরে খুকী বলিল—পিসি, তোর গা যে বড্ড গরম?

—সমস্ত দিন টউরে বেড়িয়ে এই রকমডা হয়েছে, তাই বলি একটু শুয়ে থাকি—

ছেলেমানুষ হইলেও দুর্গা পিসিমার রৌদ্রে ঘুরিবার কারণ বুঝিল। দুঃখে ও অনাহারে শীর্ণ পিসিমার

গায়ে সে সস্নেহে হাত বুলাইয়া বলিল, তুই অবশ্যি করে বাড়ী যাস্—সন্দে বেলা গল্প শুনতে পাইনে কিছু না—কাল যাবি—কেমন তো?

বুড়ী আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, বলিল, বৌ বুঝি তোকে কিছু বলে দিয়েছে আজ?

রাজী বলিল—খুড়ীমা তো কিছু বলে দেয়নি পিসিমা, ওকে তো এখানে খুড়ীমা আসতে দেয় না। আমরা বল্লে বকে, তবে তুমি যেও পিসিমা। তুমি একটুখানি ব'লো তাহলে খুড়ীমা আর কিছু বলবে না—

খুকী বলিল—কাল তুই ঠিক যাস্ পিসি, মা কিছু বলবে না—তা'হলে এখন বাড়ী যাই পিসি, কাউকে যেন বলিসনে? কাল সকালে ঠিক যাস্ কিন্তু।

সকালে উঠিয়া বুড়ী দেখিল শরীরটা একটু হালকা। একটু বেলা হইলে ছোট পুঁটুলিতে ছেঁড়া-খোঁড়া কাপড় দু'খানা ও ময়লা গামছাখানা বাঁধিয়া বুড়ী বাড়ীর দিকে চলিল। পথে গোপী বোষ্টমের বৌ বলিল, দিদি ঠাকরুণ তা বাড়ী যাচ্ছে বুঝি? বৌদিদির রাগ চলে গিয়েচে বুঝি?

বুড়ী একগাল হাসিল, বলিল—কাল দুর্গা যে সন্দে বেলা ডাকতে গিয়েছিল, কত কাঁদলে, বল্লে, মা বলেচে—চ' পিসি বাড়ী চ'—তা আমি বল্লাম—আজ তুই যা, সকালে বেলাডা হোক, আমি বাড়ী গিয়ে উঠবো—মেয়ের আমার কত কান্না, যেতে কি চায়!....তাই সকালে যাচ্ছি।

বুড়ী বাড়ী ঢুকিয়া দেখিল কেহ বাড়ী নাই। কাল সারারাত জ্বর ভোগের পর এতটা পথ রৌদ্রে দুর্ব্বল শরীরে আসিয়া বোধ হয় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, পুঁটুলিটা নামাইয়া সে নিজের ঘরের দাওয়ায় পৈঠায় বলিয়া পড়িল।

একটু পরেই খিড়কী দোর ঠেলিয়া সর্বজয়া স্নান করিয়া নদী হইতে ফিরিল। এদিকে চোখ পড়িলে বুড়ীকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সে বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া একটুখানি দাঁড়াইল, বুড়ী হাসিয়া বলিল—ও বৌ, ভাল আছিস্? এই অ্যালাম এ্যাদ্দিন পরে, তোদের ছেড়ে আর কোথায় যাবো এ বয়সে—তাই বলি—

সর্বজয়া আগাইয়া আসিয়া বলিল—তুমি এ বাড়ী কি মনে করে?

তার ভাবভঙ্গী ও গলার স্বরে বুড়ীর হাসিবার উৎসাহ আর বড় রহিল না। সর্বজয়া কথার উত্তর দিতে না দিয়াই বলিল—এ বাড়ী আর তোমার জায়গা কিছুতেই হবে না—সে তোমাকে আমি সেদিন বলে দিয়েচি—ফের কোন্ মুখে এয়েচ?

বুড়ী কাঠের মত হইয়া গেল, মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির হইল না। পরে সে হঠাৎ একেবারে কাঁদিয়া বলিল—ও বৌ, অমন করে বলিসনে—একটুখানি ঠাঁই দে আমারে—কোথায় যাবো আর শেষকালডা বল্ দিকিনি—তবু এই ভিটেটাতে—

—ন্যাও, আর ভিটের দোহাই দিতে হবে না, ভিটের কল্যাণ ভেবে আমার তো ঘুম নেই, যাও এক্ষুনি বিদেয় হও, নৈলে অনথ বাধাবো—

ব্যাপার এরূপ দাঁড়াইবে বুড়ী বোধ হয় আদৌ প্রত্যাশা করে নাই। জলমগ্ন ব্যক্তি যেমন ডুবিয়া যাইবার সময় যাহা পায় তাহাই আঁকড়াইয়া ধরিতে চায়, বুড়ী সেইরূপ মুঠা আঁকড়াইয়া আশ্রয় খুঁজিতে লক্ষ্যহীন ভাবে এদিক ওদিক চাহিল—আজ তাহার কেমন মনে হইল যে বহুদিনের আশ্রয় সত্য সত্যই তাহার পায়ের তলা হইতে সরিয়া যাইতেছে, আর তাহাকে ধরিয়া রাখিবার উপায় নাই।

সর্বজয়া বলিল—যাও আর বসে থেকো না ঠাকুরঝি, বেলা হয়ে যাচ্ছে আমার কাজকর্ম আছে, এখানে তোমার জায়গা কোনোরকমে দিতে পারবো না—

বুড়ী পুঁটুলি লইয়া অতিকষ্টে আবার উঠিল। বাহির দরজার কাছে যাইতে তাহার নজর পড়িল তাহার উঠান-ঝাঁটের ঝাঁটাগাছটা পাঁচিলের কোণে ঠেস দেওয়ানো আছে, আজ তিন-চার মাস তাহাতে কেহ হাত দেয় নাই। এই ভিটার ঘাসটুকু, ঐ কত যত্নে পোঁতা লেবু গাছটা, এই অত্যন্ত প্রিয় ঝাঁটাগাছটা, খুকী, খোকা, ব্রজ পিসের ভিটা—আর সত্তর বৎসরের জীবনে এ সব ছাড়া সে আর কিছু জানেও নাই, বুঝেও নাই।

চিরকালের মত তাহারা আজ দূরে সরিয়া যাইতেছে।

সজনেতলা দিয়া পুঁটুলি বগলে যাইতে পিছন হইতে রায়বাড়ীর গিন্নী বলিল—ঠাক্‌মা, ফিরে

যাচ্ছো কোথায়? বাড়ী যাবে না? উত্তর না পাইয়া বলিল—ঠাক্‌মা আজকাল কানের মাথা একেবারে খেয়েছে।

বৈকালে ও-পাড়া হইতে কে আসিয়া বলিল—ও মা-ঠাক্‌রুণ, তোমাদের বুড়ী বোধ হয় মরে যাচ্ছে, পালিতদের গোলার কাছে দুপুর থেকে শুয়ে আছে, রোদ্দুরে ফিরে যাচ্ছিল, আর যেতে পারেনি—একবার গিয়ে দেখে এস—দাদাঠাকুর বাড়ী নেই? একেবার পাঠিয়ে দেও না!

পালিতদের বড় মাচার তলায় গোলার পাশে ইন্দির ঠাকরুণ মরিতেছিল একথা সত্য। হরিহরের বাড়ী হইতে ফিরিতে ফিরিতে তাহার গা কেমন করে, রৌদ্রে আর আগাইতে না পারিয়া এইখানেই শুইয়া পড়ে। পালিতেরা চণ্ডীমণ্ডপে তুলিয়া রাখিয়াছিল। বুকে পিঠে তেল মালিশ, পাখার বাতাস, সব করিবার পরে বেশী বেলায় অবস্থা খারাপ বুঝিয়া নামাইয়া রাখিয়াছে। পালিত-পাড়ার অনেকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কেহ বলিতেছে—তা রোদ্দুরে বেরুলেই বা কেন? সোজা রোদ্দুরটা পড়েচে আজ? কেহ বলিতেছে—এখুনি সামলে উঠবে এমন, ভির্‌মি লেগেচে বোধ হয়—

বিশু পালিত বলিল—ভিরমি্‌ নয়। বুড়ী আর বাঁচবে না, হরিজেঠা বোধ হয় বাড়ী নেই, খবর তো দেওয়া হয়েচে, কিন্তু এতদূর আসে কে?

শুনিতে পাইয়া দীনু চক্রবর্তীর বড় ছেলে ফণী ব্যাপার কী দেখিতে আসিল। সকলে বলিল—দাও দাদাঠাকুর, ভাগ্যিস এসে পড়েচ, একটুখানি গঙ্গাজল মুখে দাও দিকি। দ্যাখো তো কাণ্ড, বামুনপাড়া না কিছু না—কে একটু মুখে জল দেয়?

ফণী হাতের বৈঁচিকাঠের লাঠিটা বিশু পালিতের হাতে দিয়া বুড়ীর মুখের কাছে বসিল। কুশী করিয়া গঙ্গাজল লইয়া ডাক দিল—ও পিসিমা।

বুড়ী চোখ মেলিয়া ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করিয়া মুখের দিকে চাহিয়াই রহিল, তাহার মুখে কোন উত্তর শুনা গেল না। ফণী আবার ডাকিল—কেমন আছেন পিসিমা? শরীর কি অসুস্থ মনে হচ্ছে? পরে সে গঙ্গজলটুকু মুখে ঢালিয়া দিল। জল কিন্তু মুখের মধ্যে গেল না, বিশু পালিত বলিল—আর একবার দাও দাদাঠাকুর—

আর খানিকক্ষণ পরে ফণী বুড়ীর চোখের পাতা বুজাইয়া দিতেই কোটরগত অনেকখানি জল শীর্ণ গাল-দুটা বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

ইন্দির ঠাক্‌রুণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে সেকালের অবসান হইয়া গেল।

পথের পাঁচালী — সপ্তম পরিচ্ছেদ

ইন্দির ঠাকরুণের মৃত্যুর পর চার-পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। মাঘ মাসের শেষ, শীত বেশ আছে। দুই পাশে ঝোপে-ঝোপে-ঘেরা সরু মাটির পথ বাহিয়া নিশ্চিন্দিপুরের কয়েকজন লোক সরস্বতীপূজার বৈকালে গ্রামের বাহিরের মাঠে নীলকণ্ঠ পাখী দেখিতে যাইতেছিল।

দলের একজন বলিল, ওহে হরি, ভূষণো গোয়ালার দরুণ কলাবাগানটা তোমরা কি ফের জমা দিয়েচো নাকি?

যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইল তাহাকে দেখিলে দশ বৎসর পূর্বের সে হরিহর রায় বলিয়া মনে হয় না। এখন মধ্যবয়সী, পুরদস্তুর সংসারী, ছেলেমেয়েদের বাপ হরিহর খাজনা সাধিয়া গ্রামে ঘোরে, পৈতৃক আমলের শিষ্যসেবকের ঘরগুলি সন্ধান করিয়া বসিয়া গুরুগিরি চালায়, হাটেমাঠে জমির ঘরামির সঙ্গে ঝিঙ্গে-পটলের দর-দস্তুর করিয়া ঘোরে, তাহার সঙ্গে আগেকার সে অবাধগতি, মুক্তপ্রাণ, ভবঘুরে যুবক হরিহরের কোন মিল নাই। ক্রমে-ক্রমে পশ্চিমের সে-জীবন অনেক দূরের হইয়া গিয়াছে—সেই চুর্ণার দুর্গের চওড়া প্রাচীরে বসিয়া বসিয়া দূর পাহাড়ের সূর্যাস্ত দেখা, কেদারের পথে তেজপাতার

বনে রাতকাটানো, শাহ্ কাশেম সুলেমানীর দরগার বাগান হইতে টক কমলালেবু ছিঁড়িয়া খাওয়া, গলিত রৌপ্যধারার মত স্বচ্ছ, উচ্ছল হিমশীতল স্বর্গনদী অলকানন্দা, দশাশ্বমেধ ঘাটের জলের ধারের রাণা—একটু একটু মনে পড়ে, যেন অনেকদিন আগেকার দেখা স্বপ্ন।

হরিহর সায়সূচক কিছু বলিতে গিয়া পিছন ফিরিয়া বলিল, ছেলেটা আবার কোথায় গেল? ও খোকা, খোকা-আ-আ—

পথের বাঁকের আড়াল হইতে একটি ছয় সাত বছরের ফুটফুটে সুন্দর, ছিপছিপে চেহারার ছেলে ছুটিয়া আসিয়া দলের নাগাল ধরিল। হরিহর বলিল—আবার পিছিয়ে পড়লে এরি মধ্যে? নাও এগিয়ে চলো—

ছেলেটা বলিল—বনের মধ্যে কি গেল বাবা? বড় বড় কান?

হরিহর প্রশ্নের দিকে কোনো মনোযোগ না দিয়া নবীন পালিতের সঙ্গে মৎস্যশিকারের পরামর্শ আঁটিতে লাগিল।

হরিহরের ছেলে পুনরায় আগ্রহের সুরে বলিল—কি দৌড়ে গেল বাবা বনের মধ্যে? বড় বড় কান?

হরিহর বলিল—কি জানি বাবা, তোমার কথার উত্তর দিতে আমি আর পারিনে। সেই বেরিয়ে অব্‌ধি শুরু করেচো এটা কি, ওটা কি—কি গেল বনের মধ্যে তা কি আমি দেখেচি? নাও এগিয়ে চলো দিকি!

বালক বাবার কথায় আগে আগে চলিল।

নবীন পালিত বলিল, বরং এক কাজ করো হরি, মাছ যদি ধরতে হয়, তবে বঁয়শার বিলে একদিন চলো যাওয়া যাক্—পূব-পাড়ার নেপাল পাড়ুই বাচ্ দিচ্ছে, রোজ দেড়মণ দু'মণ এইরকম পড়চে—পাঁচ-সেরের নীচে মাছ নেই। শুনলাম, একদিন শেষরাত্তিরে নাকি বিলের একেবারে মধ্যিখানে অথৈ জলে সাঁ সাঁ করে ঠিক যেন বক্‌না বাছুরের ডাক—বুঝ্‌লে।

সকলে একসঙ্গে আগাইয়া আসিয়া নবীন পালিতের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

—অনেক-কেলে পুরোনো বিল, গহিন জল, দেখেছো তো মধ্যিখানে জল যেন কালো শিউগোলা, পদ্মগাছের জঙ্গল, কেউ বলে রাঘব বোয়াল, কেউ বলে যক্ষি—যতক্ষণ ফর্সা না হোলো ততক্ষণ তো মশাই নৌকার ওপরে সকলে বসে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলো—

বেশ জমিয়া আসিয়াছে, হঠাৎ হরিহরের ছেলেটি মহা-উৎসাহে পাশের এক উলু-খড়ের ঝোপের দিকে আঙুল তুলিয়া চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া গেল—ঐ যাচ্ছে বাবা, দ্যাখো বাবা, ঐ গেল বাবা, বড় বড় কান ঐ—

তাহার বাবা পিছন হইতে ডাক দিয়া বলিল,—উঁহু উঁহু উঁহু—কাঁটা কাঁটা কাঁটা—পরে তাড়াতাড়ি আসিয়া খপ্ করিয়া ছেলের হাতখানি ধরিয়া বলিল,—আঃ বড্ড বিরক্ত কল্লে দেখচি তুমি, একশবার বারণ কচ্ছি তা তুমি কিছুতেই শুনবে না, ঐ জন্যেই তো আনতে চাচ্ছিলাম না।

বালক উৎসাহে ও আগ্রহে উজ্জ্বল মুখ উঁচু করিয়া বাবার দিকে তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি বাবা?

হরিহর বলিল—কি তা কি আমি দেখেচি! শূওর-টুওর হবে—নাও চলো, ঠিক রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটো—

— শূওর না বাবা, ছোট্ট যে! পরে সে নীচু হইয়া দৃষ্ট বস্তুর মাটি হইতে উচ্চতা দেখাইতে গেল।

—চল চল—হ্যাঁ—আমি বুঝতে পেরেচি, আর দেখাতে হবে না—চল দিকি!....

নবীন পালিত বলিল—ও হোলো খরগোশ, খোকা খরগোশ। এখানে খড়ের ঝোপে খরগোশ থাকে, তাই। বালক বর্ণপরিচয়ে 'খ'-এ খরগোশের ছবি দেখিয়াছে কিন্তু তাহা যে জীবন্ত অবস্থায় এ রকম লাফাইয়া পালায় বা তাহা আবার সাধারণ চক্ষুতে দেখিতে পাওয়া যায়, এ কথা সে কখনো ভাবে নাই।

খরগোশ।—জীবন্ত!—একেবারে তোমার সামনে লাফাইয়া পালায়;—ছবি না, কাচের পুতুল না—একেবারে কানখাড়া সত্যিকারের খরগোশ। এইরকম ভাঁটগাছ বৈঁচিগাছের ঝোপে!—জল-মাটির তৈরী নশ্বর পৃথিবীতে এ ঘটনা কি করিয়া সম্ভব হইল, বালক তাহা কোনমতেই ভাবিয়া ঠাহর করিতে পারিতেছিল না।

সকলে বনে ঘেরা সরু পথ ছাড়াইয়া মাঠে পড়িল। নদীর ধারের বাব্‌লা ও জীওল গাছের আড়ালে একটা বড় ইঁটের পাঁজার মত জিনিস পড়ে, ওটা পুরানো কালের নীলকুঠির জ্বালঘরের ভগ্নাবশেষ। সেকালে নীলকুঠির আমলে এই নিশ্চিন্দপুর বেঙ্গল ইণ্ডিগো কন্‌সারনের হেড কুঠি ছিল, এ অঞ্চলের চৌদ্দটা কুঠির উপর নিশ্চিন্দিপুর কুঠির ম্যানেজার জন্ লারমার দোর্দণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব করিত। এখন কুঠির ভাঙা চৌবাচ্চাঘর, জ্বালঘর, সাহেবের কুঠি, আপিস জঙ্গলাকীর্ণ ইঁটের স্তূপে পরিণত হইয়াছে। যে প্রবল-প্রতাপ লারমার সাহেবের নামে একসময় এ অঞ্চলে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খাইত, আজকাল দু'একজন অতিবৃদ্ধ ছাড়া সে লোকের নাম পর্যন্ত কেহ জানে না।

মাঠের ঝোপঝাপগুলো উলুখড়, বনকলমী, সোঁদাল ও কুলগাছে ভরা। কলমীলতা সারা ঝোপগুলার মাথা বড় বড় সবুজ পাতা বিছাইয়া ঢাকিয়া দিয়াছে—ভিতরে স্নিগ্ধ ছায়া, ছোট গোয়ালে, নাটাকাঁটা, ও নীল বন-অপরাজিতা ফুল সূর্যের আলোর দিকে মুখ উঁচু করিয়া ফুটিয়া আছে, পড়ন্ত বেলার ছায়ায় স্নিগ্ধ বনভূমির শ্যামলতা, পাখীর ডাক, চারিধারে প্রকৃতির মুক্ত হাতে ছড়ানো ঐশ্বর্য রাজার মত ভাণ্ডার বিলাইয়া দেয়, কোথাও এতটুকু দারিদ্র্যের আশ্রয় খুঁজিবার চেষ্টা নাই, মধ্যবিত্তের কার্পণ্য নাই। বেলাশেষের ইন্দ্রজালে মাঠ, নদী, বন মায়াময়।

মাঠের মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে নবীন পালিত মহাশয় একবার এই মাঠের উত্তর অংশের জমিতে শাঁকআলুর চাষ করিয়া কিরূপ লাভবান হইয়াছিলেন, সে গল্প করিতে লাগিলেন। একজন বলিল, কুঠির ইটগুলো নাকি বিক্রি হবে শুনছিলাম, নবাবগঞ্জের মতি দাঁ নাকি দরকস্তুর কচ্ছে। মতি দাঁর কথায় সে ব্যক্তি সামান্য অবস্থা হইতে কিরূপে ধনবান হইয়াছে সে কথা আসিয়া পড়িল। ক্রমে তাহা হইতে বর্তমান কালের দুর্মূল্যতা, আষাঢ়ুর বাজারে কুণ্ডুদের দোকান পুড়িয়া যাইবার কথা, গ্রামের দীনু গাঙ্গুলীর মেয়ের বিবাহের তারিখ কবে পড়িয়াছে প্রভৃতি বিবিধ আবশ্যকীয় সংবাদের আদান-প্রদান হইতে লাগিল।

হরিহরের ছেলে বলিল—নীলকণ্ঠ পাখী কৈ বাবা?

—এই দেখো এখন, বাব্‌লাগাছে এখুনি এসে বসবে—

বালক মুখ উঁচু করিয়া নিকটবর্তী সমুদয় বাব্‌লাগাছের মাথার দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। মাঠের ইতস্তত নীচু নীচু কুলগাছে অনেক কুল পাকিয়া আছে, বালক অবাক হইয়া লুব্ধদৃষ্টিতে সেদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল। কয়েকবার কুল পাড়িতে গিয়া বাবার বকুনিতে তাহাকে নিবৃত্ত হইতে হইল। এত ছোট গাছে কুল হয়? তাহাদের পাড়ায় যে কুলের গাছ আছে, তাহা খুব উঁচু বলিয়া ইচ্ছা থাকিলেও সে সুবিধা করিতে পারে না। ভারী আঁকুষিটা দুই হাতে আঁকড়াইয়া ধরিয়াও তুলিতে পারে না, কুপথ্যের জিনিস লুকাইয়া খাওয়া কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে—এ সে টের পায়। খবর পাইয়া মা আসিয়া বাড়ী ধরিয়া লইয়া যায়, বলে—ওমা আমার কী হবে! এমন দুষ্টু ছেলে হয়েচ তুমি? এই সেদিন উঠলে জ্বর থেকে আজ অমনি কুলতলায় ঘুরে বেড়াচ্ছ! একটুখানি পিছন ফিরেচি, আর অমনি এসে দেখি বাড়ী নেই! কটা কুল খেয়েচিস্, দেখি মুখ দেখি?

সে বলে, কুল খাইনি তো মা, তলায় একটাও কুল পড়ে নেই, আমি বুঝি পাড়তে পারি?

পরে সে টুকটুকে মুখটি মায়ের অত্যন্ত নিকটে লইয়া গিয়া হাঁ করে। তাহার মা ভাল করিয়া দেখিয়া পুত্রের ননীর মত গন্ধ বাহির হওয়া সুন্দর মুখে চুমা খাইয়া বলে—কক্‌খনো খেও না যেন খোকা! তোমার শরীর সেরে উঠুক, আমি কুল কুড়িয়ে আচার করে হাঁড়িতে তুলে রেখে দেবো—তাই বোশেক জষ্টি মাসে খেও; লুকিয়ে লুকিয়ে কক্‌খনো আর খেও না—কেমন তো?

হরিহর বলিল—কুঠি কুঠি বলছিলে, ঐ দ্যাখো খোকা, সাহেবদের কুঠি, দেখেচো?

নদীর ধারের অনেকটা জায়গা জুড়িয়া সেকালের কুঠিটা প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় হিংস্র জন্তুর কঙ্কালের মত পড়িয়া ছিল, গতিশীল কালের প্রতীক নির্জন শীতের অপরাহ্ন তাহার উপর অল্পে অল্পে তাহার ধূসর উত্তরচ্ছদবিশিষ্ট আস্তরণ বিস্তার করিল।

কুঠির হাতার কিছু দূরে কুঠিয়াল লারমার সাহেবের এক শিশুপুত্রের সমাধি পরিত্যক্ত ও জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় পড়িয়া আছে। বেঙ্গল ইণ্ডিগো কন্‌সার্‌নের বিশাল হেডকুঠির এইটুকু ছাড়া অন্য কোনও চিহ্ন আর অখণ্ড অবস্থায় মাটির উপর দাঁড়াইয়া নাই। নিকটে গেলে অনেক কালের কালো পাথরের ফলকে এখনও পড়া যায়—

Here lies Edwin Lermor,
The only son of John & Mrs. Lermor,
Born May 13, 1853, Died April 27, 1860.

অন্য অন্য গাছপালার মধ্যে একটি বন্য সোঁদাল গাছ তাহার উপর শাখাপত্রে ছায়াবিস্তার করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে, চৈত্র বৈশাখ মাসে আড়াই-বাঁকীর মোহনা হইতে জোর হাওয়ায় তাহার পীত পুষ্পস্তবক সারা দিনরাত ধরিয়া বিস্মৃত বিদেশী শিশুর ভগ্ন-সমাধির উপর রাশি রাশি পুষ্প ঝরাইয়া দেয়। সকলে ভুলিয়া গেলেও বনের গাছপালা শিশুটিকে এখনও ভোলে নাই।

বালক অবাক হইয়া চারিদিক চাহিয়া দেখিতেছে। তাহার ছয় বৎসরের জীবনে এই প্রথম সে বাড়ী হইতে এতদূরে আসিয়াছে। এতদিন নেড়াদের বাড়ী, নিজেদের বাড়ীর সামনেটা, বড়জোর রাণুদিদিদের বাড়ী, ইহাই ছিল তাহার জগতের সীমা। কেবল এক এক দিন তাহাদের পাড়ার ঘাটে মায়ের সঙ্গে স্নান করিতে আসিয়া সে স্নানের ঘাট হইতে আবছা দেখিতে পাওয়া কুঠির ভাঙা জ্বালঘরটার দিকে চাহিয়া দেখিত—আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিত, মা, ওদিকে কি সেই কুঠি? সে তাহার বাবার মুখে, দিদির মুখে, আরও পাড়ার কত লোকের মুখে কুঠির মাঠের কথা শুনিয়াছে, কিন্তু আজ তাহার প্রথম সেখানে আসা। ঐ মাঠের পর ওদিকে বুঝি মায়ের মুখের সেই রূপকথার রাজ্য? শ্যাম-লকাঁর দেশে বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর গাছের নীচে, নির্বাসিত রাজপুত্র যেখানে তলোয়ার পাশে রাখিয়া শুইয়া রাত কাটায়? ও-ধারে আর মানুষের বাস নাই, জগতের শেষ সীমাটাই এই। ইহার পর হইতেই অসম্ভবের দেশ, অজানার দেশ শুরু হইয়াছে।

বাড়ী ফিরিবার পথে সে পথের ধারের একটা নীচু ঝোপ হইতে একটা উজ্জ্বল রং-এর ফলের থোলো ছিঁড়িতে হাত বাড়াইল। তাহার বাবা বলিল, হাঁ হাঁ, হাত দিও না—আলকুশী আলকুশী। কি যে তুমি করো বাবা! বড্ড জ্বালালে দেখছি। আর কোনদিন কোথাও নিয়ে বেরুচ্চিনে বলে দিলাম—এক্ষুনি হাত চুলকে ফোস্কা হবে—পথের মাঝখান দিয়ে এত করে বলচি হাঁটতে—তা তুমি কিছুতেই শুনবে না।

—হাত চুলকুবে কেন বাবা?

—হাত চুলকুবে, বিষ বিষ—আলকুশীতে কে হাত দেয় বাবা? শুঁয়ো ফুটে রি রি করে জ্বলবে এক্ষুনি—তখন তুমি চীৎকার শুরু করবে।

গ্রামের মধ্যে দিয়া হরিহর ছেলেকে সঙ্গে করিয়া খিড়কির দোর দিয়া বাড়ী ঢুকিল। সর্বজয়া খিড়কির দোর খোলার শব্দে বাহিরে আসিয়া বলিল—এই এত রাত হোল! তা ওকে নিয়ে গিয়েচ, না একটা দোলাই গায়ে না কিছু।

হরিহর বলিল—আঃ, নিয়ে গিয়ে যা বিরক্ত! এদিকে যায়, ওদিকে যায়, সামলে রাখতে পারিনে—আলকুশীর ফল ধরে টানতে যায়। পরে ছেলের দিকে চাহিয়া বলিল—কুঠির মাঠ দেখবো, কুঠির মাঠ দেখবো—কেমন, হোল তো কুঠির মাঠ দেখা?

পথের পাঁচালী

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সকাল বেলা। আটটা কি নয়টা। হরিহরের পুত্র আপন মনে রোয়াকে বসিয়া খেলা করিতেছে, তাহার একটা ছোট টিনের বাক্স আছে, সেটার ডালা ভাঙা। বাক্সের সমুদয় সম্পত্তি সে উপুড় করিয়া মেঝেতে ঢালিয়াছে। একটা রং-ওঠা কাঠের ঘোড়া, চার পয়সা দামের, একটা টোল খাওয়া টিনের ভেঁপু-বাঁশী, গোটাকতক কড়ি। এগুলি সে মায়ের অজ্ঞাতসারে লক্ষ্মীপূজার কড়ির চুপড়ী হইতে খুলিয়া

লইয়াছিল ও পাছে কেহ টের পায় এই ভয়ে সর্বদা লুকাইয়া রাখে—একটা দু'পয়সা দামের পিস্তল, কতকগুলো শুকনো নাটা ফল। দেখিতে ভাল বলিয়া তাহার দিদি কোথা হইতে অনেকগুলি কুড়াইয়া আনিয়াছিল, কিছু তাহাকে দিয়াছে, কিছু নিজের পুতুলের বাক্সে রাখিয়া দিয়াছে। খানকতক খাপরার কুচি। গঙ্গাযমুনা খেলিতে এই খাপরাগুলির লক্ষ্য অব্যর্থ বলিয়া বিশ্বাস হওয়ায় সে এগুলি সযত্নে বাক্সে রাখিয়া দিয়াছে, এগুলি তাহার মহামূল্যবান সম্পত্তি। এতগুলি জিনিসের মধ্যে সবে সে টিনের বাঁশীটা কয়েকবার বাজাইয়া সেটির সম্বন্ধে বিগত কৌতুহল হইয়া তাহাকে এক পাশে রাখিয়া দিয়াছে। কাঠের ঘোড়া নড়াচড়া করা হইয়া গিয়াছে। সেটিও একপাশে পিঁজরাপোলের আসামীর ন্যায় পড়িয়া আছে। বর্তমানে সে গঙ্গা-যমুনা খেলিবার খাপড়াগুলিকে হাতে লইয়া মনে মনে দাওয়ার উপর গঙ্গা-যমুনার ঘর আঁকা কল্পনা করিয়া চোখ বুজিয়া খাপরা ছুঁড়িয়া দেখিতেছে তাক ঠিক হইতেছে কিনা।

এমন সময়ে তাহার দিদি দুর্গা উঠানের কাঁঠালতলা হইতে ডাকিল—অপু—ও—অপু—। সে এতক্ষণ বাড়ী ছিল না, কোথা হইতে এইমাত্র আসিল। তাহার স্বর একটু সতর্কতামিশ্রিত। মানুষের গলার আওয়াজ পাইয়া অপু কলের পুতুলের মত লক্ষ্মীর চুপড়ির কড়িগুলি তাড়াতাড়ি লুকাইয়া ফেলিল। পরে বলিল—কি রে দিদি?

দুর্গা হাত নাড়িয়া ডাকিল—আয় এদিকে—শোন্—

দুর্গার বয়স দশ এগারো বৎসর হইল। গড়ন পাতলা পাতলা, রং অপুর মত অতটা ফর্সা নয়, একটু চাপা। হাতে কাচের চুড়ি, পরনে ময়লা কাপড়, মাথার চুল রুক্ষ—বাতাসে উড়িতেছে, মুখের গড়ন মন্দ নয়, অপুর মত চোখগুলি বেশ ডাগর ডাগর। অপু রোয়াক হইতে নামিয়া কাছে গেল, বলিল,—কি রে?

দুর্গার হাতে নারিকেলের মালা। সেটা সে নীচু করিয়া দেখাইল, কতগুলি কচি আম কাটা। সুর নীচু করিয়া বলিল—মা ঘাট থেকে আসে নি তো?

অপু ঘাড় নাড়িয়া বলিল—উঁহু—

দুর্গা চুপি চুপি বলিল—একটু তেল আর একটু নুন নিয়ে আসতে পারিস? আমের কুসী জারাবো—

অপু আহ্লাদের সহিত বলিয়া উঠিল—কোথায় পেলি রে দিদি?

দুর্গা বলিল—পটলিদের বাগানে সিঁদুরকোটোর তলায় পড়ে ছিল—আন্ দিকি একটু নুন আর তেল?

অপু দিদির দিকে চাহিয়া বলিল—তেলের ভাঁড় ছুঁলে মা মারবে যে? আমার কাপড় যে বাসি?

—তুই যা না শিগগিরি করে, মা'র আসতে এখন ঢের দেরি—ক্ষার কাচতে গিয়েচে—শীগগির যা—

অপু বলিল—নারকেলের মালাটা আমায় দে। ওতে ঢেলে নিয়ে আসবো—তুই খিড়কী দোরে গিয়ে দ্যাখ মা আসচে কিনা।

দুর্গা নিম্নস্বরে বলিল—তেল টেল যেন মেঝেতে ঢালিসনে, সাবধানে নিবি, নইলে মা টের পাবে—তুই তো একটা হাবা ছেলে—

অপু বাড়ীর মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিলে দুর্গা তাহার হাত হইতে মালা লইয়া আমগুলি বেশ করিয়া মাখিল,—বলিল, নে হাত পাত।

—তুই অতগুলো খাবি দিদি?

—অতগুলি বুঝি হোল? এই তো—ভারি বেশী—যা, আচ্ছা নে আর দু'খানা—বাঃ, দেখতে বেশ হয়েচে রে, একটা লঙ্কা আনতে পারিস? আর একখানা দেবো তাহলে—

—লঙ্কা কি করে পাড়বো দিদি? মা যে তক্তার ওপর রেখে দ্যায়, আমি যে নাগাল পাইনে?

—তবে থাক্‌গে যাক্—আবার ওবেলা আন্‌বো এখন—পটলিদের ডোবার ধারের আমগাছটায় গুটী যা ধরেচে—দুপুরের রোদে তলায় ঝরে পড়ে—

দুর্গাদের বাড়ীর চারিদিকেই জঙ্গল। হরিহর রায়ের জ্ঞাতি-ভ্রাতা নীলমণি রায় সম্প্রতি গত বৎসর মারা গিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রী পুত্রকন্যা লইয়া নিজ পিত্রালয়ে বাস করিতেছেন। কাজেই পাশের এ ভিটাও জঙ্গলাবৃত হইয়া পড়িয়া আছে। নিকটে আর কোন লোকের বাড়ী নাই। পাঁচ মিনিটের পথ গেলে তবে ভুবন মুখুজ্যের বাড়ী।

হরিহরের বাড়ীটাও অনেক দিন হইয়া গেল মেরামত হয় নাই, সামনের দিকের রোয়াক ভাঙা, ফাটলে বন-বিছুটির ও কালমেঘ গাছের বন গজাইয়াছে—ঘরের দোর-জানালার কপাট সব ভাঙা, নারিকেলের দড়ি দিয়া গরাদের সঙ্গে বাঁধা আছে।

খিড়কী দোর ঝনাৎ করিয়া খুলিবার শব্দ হইল এবং একটু পরেই সর্বজয়ার গলা শুনা গেল—দুগ্‌গা, ও দুগ্‌গা—

দুর্গা বলিল—মা ডাকছে, যা দেখে আয়—ওখানা খেয়ে যা—মুখে যে নুনের গুঁড়ো লেগে আছে, মুছে ফ্যাল্—

মায়ের ডাক আর একবার কানে গেলেও দুর্গার এখন উত্তর দিবার সুযোগ নাই, মুখ ভর্তি। সে তাড়াতাড়ি জারানো আমের চাকলাগুলি খাইতে লাগিল। পরে এখনো অনেক অবশিষ্ট আছে দেখিয়া কাঁঠালগাছটার কাছে সরিয়া গিয়া গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়াইয়া সেগুলি গোগ্রাসে গিলিতে লাগিল। অপু তাহার পাশে দাঁড়াইয়া নিজের অংশ প্রাণপণে গিলিতেছিল, কারণ চিবাইয়া খাওয়ার আর সময় নাই। খাইতে খাইতে দিদির দিকে চাহিয়া সে দোষ সম্বন্ধে সচেতনতা-সূচক হাসি হাসিল। দুর্গা খালি মালাটা একটান্ মারিয়া ভেরেণ্ডাকচার বেড়া পার করিয়া নীলমণি রায়ের ভিটার দিকে জঙ্গলের মধ্যে ছুঁড়িয়া দিল। ভাইয়ের দিকে চাহিয়া বলিল—মুখটা মুছে ফ্যাল্ না বাঁদর, নুন লেগে রয়েছে যে...

পরে দুর্গা নিরীহভাবে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া বলিল—কি মা?

—কোথায় বেরুনো হয়েছিল শুনি? একলা নিজে কতদিকে যাবো? সকাল থেকে ক্ষার কেচে গা-গতর ব্যথা হয়ে গেল, একটুখানি কুটোগাছটা ভেঙে দু'খানা করা নেই, কেবল পাড়ায় পাড়ায় টো টো টোক্‌লা সেধে বেড়াচ্ছেন—সে বাঁদর কোথায়?

অপু আসিয়া বলিল, মা, খিদে পেয়েছে।

—রোসো রোসো, একটুখানি দাঁড়াও বাপু....একটুখানি হাঁপ জিরোতে দ্যাও। তোমাদের রাতদিন খিদে আর রাতদিন ফাই-ফরমাজ। ও দুগ্‌গা, দ্যাখ তো বাছুরটা হাঁক পাড়ছে কেন?

খানিকটা পরে সর্বজয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় বঁটি পাতিয়া শসা কাটিতে বসিল। অপু কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল—আর এট্টু আটা বের করো না মা, মুখে বড্ড লাগে।

দুর্গা নিজের ভাগ হাত পাতিয়া লইয়া সঙ্কুচিত সুরে বলিল—চালভাজা আর নেই মা?

অপু খাইতে খাইতে বলিল—উঃ, চিবানো যায় না। আম খেয়ে দাঁত টকে—

দুর্গার ভ্রুকুটিমিশ্রিত চোখ-টেপায় বাধা পাইয়া তাহার কথা অর্ধপথেই বন্ধ হইয়া গেল। তাহার মা জিজ্ঞাসা করিল,—আম কোথায় পেলি?

সত্য কথা প্রকাশ করিতে সাহসী না হইয়া অপু দিদির দিকে জিজ্ঞাসাসূচক দৃষ্টিতে চাহিল। সর্বজয়া মেয়ের দিকে চাহিয়া বলিল—তুই ফের এখন বেরিয়েছিলি বুঝি?

দুর্গা বিপন্নমুখে বলিল—ওকে জিগ্যেস করো না? আমি—এই তো এখন কাঁঠালতলায় দাঁড়িয়ে—তুমি যখন ডাক্‌লে তখন তো—

স্বর্ণ গোয়ালিনী গাই দুহিতে আসায় কথাটা চাপা পড়িয়া গেল। তাহার মা বলিল—যা বাছুরটা ধরগে যা—ডেকে ডেকে সারা হোল—কমলে বাছুর, ও সন্ন, এত বেলা ক'রে এলে কি বাঁচে? একটু সকাল করে না এলে এই তেতপ্পর পজ্জন্ত বাছুর বাঁধা—

দিদির পিছনে পিছনে অপুও দুধ দোয়া দেখিতে গেল। সে বাহির উঠানে পা দিতেই দুর্গা তাহার পিঠে দুম্ করিয়া নির্ঘাত এক কিল বসাইয়া দিয়া কহিল—লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর। পরে মুখ ভ্যাঙচাইয়া কহিল—আম খেয়ে দাঁত টকে গিয়েছে—আবার কোনো দিন আম দেবো খেও—ছাই দেবো—এই ওবেলাই পটলিদের কাঁকুড়তলির আম কুড়িয়ে এনে জারাবো, এত বড় বড় গুটি হয়েচে, মিষ্টি যেন গুড়—দেবো তোমায়? খেও এখন? হাবা একটা কোথাকার—যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে!

দুপুরের কিছু পরে হরিহর কাজ সারিয়া বাড়ী ফিরিল। সে আজকাল গ্রামের অন্নদা রায়ের বাটীতে গোমস্তার কাজ করে। জিজ্ঞাসা করিল—অপুকে দেখচিনে?

সর্বজয়া বলিল—অপু তো ঘুমুচ্ছে।

—দুগগা বুঝি—

—সে সেই খেয়ে বেরিয়েছে—সে বাড়ী থাকে কখন? দুটো খাওয়ার সঙ্গে যা সম্পর্ক। আবার সেই খিদে পেলে তবে আসবে—কোথায় কার বাগানে কার আমতলায় জামতলায় ঘুরছে—এই চত্তির মাসের রোদ্দুরে, ফের দ্যাখো না এই জ্বরে পড়লো বলে—এত বড় মেয়ে, বলে বোঝাবো কত? কথা শোনে, না কানে নেয়?

একটু পরে হরিহর খাইতে বসিয়া বলিল—আজ দশঘরায় তাগাদার জন্যে গেছলাম, বুঝলে? একজন লোক, খুব মাতব্বর, পাঁচটা ছয়টা গোলা বাড়ীতে, বেশ পয়সাওয়ালা লোক—আমায় দেখে দণ্ডবৎ করে বল্লে—দাদাঠাকুর আমায় চিনতে পাচ্ছেন? আমি বল্লাম—না বাপু, আমি তো কৈ–? বল্লে–আপনার কর্তা থাকতে তখন পূজা-আচ্চায় সব সময়েই তিনি আসতেন, পায়ের ধূলো দিতেন। আপনারা আমাদের গুরুতুল্য লোক, এবার আমরা বাড়ীসুদ্ধ মন্তর নেবো ভাবচি–তা আপনি যদি আজ্ঞে করেন, তবে ভরসা করে বলি—আপনিই কেন মন্তরটা দেন না? তা আমি তাদের বলেচি আজ আর কোন কথা বলব না, ঘুরে এসে দু-এক দিনে—বুঝলে?

সর্বজয়া ডালের বাটি হাতে দাঁড়াইয়া ছিল, বাটি মেঝেতে নামাইয়া সামনে বসিয়া পড়িল। বলিল—হ্যাঁগো, তা মন্দ কি? দাও না ওদের মন্তর? কি জাত? হরিহর সুর নামাইয়া বলিল–ব'লো না কাউকে।—সদ্‌গোপ। তোমার তো আবার গল্প করে বেড়ানো স্বভাব–

—আমি আবার কাকে বলতে যাবো, তা হোক গে সদগোপ, দাও গিয়ে দিয়ে, এই কষ্ট যাচ্ছে—ঐ রায়বাড়ীর আটটা টাকা ভরসা, তাও দু'তিন মাস অন্তর তবে দ্যায়–আর এদিকে রাজ্যের দেনা। কাল ঘাটের পথে সেজ ঠাকুরণ বল্লে—বৌমা, আমি বন্দক ছাড়া টাকা ধার দিইনে–তবে তুমি অনেক করে বল্লে–বলে দিলাম–আজ পাঁচ পাঁচ মাস হয়ে গেল, টাকা আর রাখতে পারবো না। এদিকে রাধা বোষ্টমের বৌ তো ছিঁড়ে খাচ্চে, দুবেলা তাগাদা আরম্ভ করেচে। ছেলেটার কাপড় নেই–দু'তিন জায়গায় সেলাই, বাছা আমার তাই পরে হাসিমুখে নেচে নেচে বেড়ায়–আমার এমন হয়েচে যে ইচ্ছে করে একদিকে বেরিয়ে যাই—

—আর একটা কথা ওরা বলছিল, বুঝলে? বলছিল গাঁয়ে তো বামুন নেই, আপনি যদি এই গাঁয়ে উঠে আসেন, তবে জায়গা-জমি দিয়ে বাস করাই—গাঁয়ে একঘর বামুন বাস করানো আমাদের বড্ড ইচ্ছে। তা কিছু ধানের জমিটমি দিতেও রাজী—পয়সার তো অভাব নেই। আজকাল চাষাদের ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা—ভদ্দর লোকেরাই হয়ে পড়েচে হা ভাত যো ভাত—

আগ্রহে সর্বজয়ার কথা বন্ধ হইবার উপক্রম হইল—এখখুনি। তা তুমি রাজী হলে না কেন? বললেই হত যে আচ্ছা আমরা আসবো। ও-রকম একটা বড় মানুষের আশ্রয়–এ গাঁয়ে তোমার আছে কে? শুধু ভিটে কামড়ে পড়ে থাকা—

হরিহর হাসিয়া বলিল—পাগল! তখুনি কি রাজী হতে আছে? ছোটলোক, ভাববে ঠাকুরের হাঁড়ি দেখছি শিকেয় উটেচে—উঁহু, ওতে খেলো হয়ে যেতে হয়—তা নয়, দেখি একবার চুপি চুপি মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে—আর এখন ওঠ বল্লেই কি ওঠা চলে? সব বেটা এসে বলবে টাকা দাও, নৈলে যেতে দেবো না—দেখি পরামর্শ করে কি রকম দাঁড়ায়—

এই সময়ে মেয়ে দুর্গা কোথা হইতে পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া বাহিরের দুয়ারের আড়াল হইতে সতর্কতার সহিত একবার উঁকি মারিল এবং অপর পক্ষ সম্পূর্ণ সজাগ দেখিয়া ও-ধারে পাঁচিলের পাশ বাহিয়া বাহির-বাটীর রোয়াকে উঠিল। দালানের দুয়ার আস্তে আস্তে ঠেলিয়া দেখিল উহা বন্ধ আছে। এদিকে রোয়াকে দাঁড়ানো অসম্ভব, রৌদ্রের তাপে পা পুড়িয়া যায়, কাজেই সে স্থান হইতে নামিয়া গিয়া উঠানের কাঁঠালতলায় দাঁড়াইল। রৌদ্রে বেড়াইয়া তাহার মুখ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, আঁচলের খুঁটে কি কতকগুলো যত্ন করিয়া বাঁধা। সে আসিয়াছিল এইজন্য যে, যদি বাহিরের দুয়ার খোলা পায় এবং মা ঘুমাইয়া থাকে, তবে ঘরের মধ্যে চুপি চুপি ঢুকিয়া একটু শুইয়া লইবে। কিন্তু বাবার, বিশেষত মার সামনে সম্মুখ দুয়ার দিয়া বাড়ী ঢুকিতে তাহার সাহস হইল না।

উঠানে নামিয়া সে কাঁঠালতলায় দাঁড়াইয়া কি করিবে ঠিক করিতে না পারিয়া নিরুৎসাহভাবে এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল। পরে সেখানেই বসিয়া পড়িয়া আঁচলের খুঁট খুলিয়া কতকগুলি শুক্না রড়া ফলের বীচি বাহির করিল। খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া সে আপন মনে সেগুলি গুণিতে আরম্ভ করিল, এক—দুই—তিন—চার....ছাব্বিশটা হইল। পরে সে দুই তিনটা করিয়া বীচি হাতের উল্টা পিঠে বসাইয়া উঁচু করিয়া ছুঁড়িয়া দিয়া পরে হাতের সোজা পিঠ পাতিয়া ধরিতে লাগিল। মনে মনে বলিতে লাগিল—অপুকে এইগুলো দেবো—আর এইগুলো পুতুলের বাক্সে রেখে দেবো—কেমন বীচিগুলো তেল চুকচুক কচ্ছে—আজই গাছ থেকে পড়েচে, ভাগ্যিস আগে গেলাম, নৈলে সব গরুতে খেয়ে ফেলে দিতো, ওদের রাঙী গাইটা একেবারে রাক্কস, সব জায়গায় যাবে, সেবার কতকগুলো এনেছিলাম আর এইগুলো নিয়ে অনেকগুলো হোল।

সে খেলা বন্ধ করিয়া সমস্ত বীচি আবার সযত্নে আঁচলের খুঁটে বাঁধিল। পরে হঠাৎ কি ভাবিয়া রুক্ষ চুলগুলি বাতাসে উড়াইতে উড়াইতে মহা খুশীর সহিত পুনরায় সোজা বাটীর বাহির হইয়া গেল।

পথের পাঁচালী

নবম পরিচ্ছেদ

অপুদের বাড়ী হইতে কিছু দূরে একটা খুব বড় অশ্বত্থ গাছ ছিল। কেবল তাহার মাথাটা উহাদের দালানের জানালা কি রোয়াক হইতে দেখা যায়। অপু মাঝে মাঝে সেইদিকে চাহিয়া দেখিত। যতবার সে চাহিয়া দেখে, ততবার তাহার যেন অনেক—অনেক—অনেক দূরের কোন দেশের কথা মনে হয়—কোন্ দেশ, এ তাহার ঠিক ধারণা হইল না—কোথায় যেন কোথাকার দেশ—মা'র মুখে ঐ সব দেশের রাজপুত্তুরদের কথাই সে শোনে।

অনেক দূরের কথায় তাহার শিশুমনে একটা বিস্ময়মাখানো আনন্দের ভাবের সৃষ্টি করিত। নীল রং-এর আকাশটা অনেক দূর, ঘুড়িটা—কুঠির মাঠটা অনেক দূর—সে বুঝাইতে পারিত না বলিতে পারিত না কাহাকেও, কিন্তু এসব কথায় তাহার মন যেন কোথায় উড়িয়া চলিয়া যাইত—এবং সর্বাপেক্ষা কৌতুকের বিষয় এই যে, অনেক দুরের এই কল্পনা তাহার মনকে অত্যন্ত চাপিয়া তাহাকে যেন কোথায় লইয়া ফেলিয়াছে—ঠিক সেই সময়ের মায়ের জন্য তাহার মন কেমন করিয়া উঠিত, যেখানে সে যাইতেছে সেখানে তাহার মা নাই, অমনি মায়ের কাছে যাইবার জন্য মন আকুল হইয়া পড়িত। কতবার যে এ রকম হইয়াছে। আকাশের গায়ে অনেক দুরে একটা চিল উড়িয়া যাইতেছে—ক্রমে ছোট্ট—ছোট্ট—ছোট্ট হইয়া নীলদের তালগাছের উঁচু মাথাটা পিছনে ফেলিয়া দুর আকাশে ক্রমে মিলাইয়া যাইতেছে—চাহিয়া দেখিতে দেখিতে যেমন উড়ন্ত চিলটা দৃষ্টিপথের বাহির হইয়া যাইত, অমনি সে চোখ নামাইয়া লইয়া বাহিরবাটি হইতে একদৌড়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠিয়া গৃহকার্যরত মাকে জড়াইয়া ধরিত। মা বলিত—দ্যাখো দ্যাখো ছেলের কাণ্ড দ্যাখো—ছাড়্—ছাড়্—দেখছিস সকড়ী হাত?....ছাড়ো মাণিক আমার, সোনা আমার, তোমার জন্য এই দ্যাখো চিংড়িমাছ ভাজছি—তুমি যে চিংড়িমাছ ভালোবাসো? হ্যাঁ, দুষ্টুমি করো না—ছাড়ো—

আহারাদির পর দুপুরবেলা তাহার মা কখনো কখনো জানালার ধারে আঁচল পাতিয়া শুইয়া ছেঁড়া কাশীদাসী মহাভারতখানা সুর করিয়া পড়িত। বাড়ীর ধারে নারিকেল গাছটাতে শঙ্খচিল ডাকিত, অপু নিকটে বসিয়া হাতের লেখা ক-খ লিখিতে লিখিতে একমনে মায়ের মুখের মহাভারত পড়া শুনিত। দুর্গাকে তাহার মা বলিত, একটা পান সেজে দে তো দুগ্‌গা। অপু বলিত, মা সেই ঘুঁটে কুড়ানোর গল্পটা? তাহার মা বলে—ঘুঁটে কুড়োনোর কোন্ গল্প বল তো—ও সেই হরিহোড়ের? সে তো অন্নদামঙ্গলে আছে, এতে তো নেই? পরে পান মুখে দিয়ে সুর করিয়া পড়িতে থাকিত—

রাজা বলে শুন শুন মুনির নন্দন।
কহিব অপূর্ব কথা না যায় বর্ণন।।
সোমদত্ত নামে রাজা সিন্ধুদেশে ঘর।
দেবদ্বিজে হিংসা সদা অতি—

অপু অমনি মায়ের মুখের কাছে হাতখানি পাতিয়া বলিত, আমায় একটু পান? মা চিবানো পান নিজের মুখ হইতে ছেলের প্রসারিত হাতের উপর রাখিয়া বলিত—এঃ, বড্ড তেতো—এই খয়েরগুলোর দোষ, রোজ হাটে বারণ করি ও-খয়ের যেন আনে না, তবুও—

জানলার বাহিরে বাঁশবনের দুপুরের রৌদ্র-মাখানো শেওড়া ঘেঁটু বনের দিকে চাহিয়া চাহিয়া মহাভারতের—বিশেষত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কথা শুনিতে শুনিতে সে তন্ময় হইয়া যায়। মহাভারতের সমস্ত চরিত্রের মধ্যে কর্ণের চরিত্র বড় ভাল লাগে তাহার কাছে। ইহার কারণ কর্ণের উপর তাহার কেমন একটা মমতা হয়। রথের চাকা মাটিতে পুঁতিয়া গিয়াছে—দুই হাতে প্রাণপণে সেই চাকা মাটি হইতে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন—সেই নিরস্ত্র অসহায়, বিপন্ন কর্ণের অনুরোধ মিনতি উপেক্ষা করিয়া অর্জুন তীর ছুঁড়িয়া মারিয়া ফেলিলেন। মায়ের মুখে এই অংশ শুনিতে শুনিতে দুঃখে অপুর শিশু হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিত, চোখের জল বাগ মানিত না—চোখ ছাপাইয়া তাহার নরম, তুলতুলে গাল বাহিয়া গড়াইয়া পড়িত—সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দুঃখে চোখে জল পড়ার যে আনন্দ, তাহা তাহার মনোরাজ্যে নব অনুভূতির সজীবত্ব লইয়া পরিচিত হইতে লাগিল। জীবন-পথের যে দিক মানুষের চোখের জলে, দীনতায়, মৃত্যুতে আশাহত, ব্যর্থতায় বেদনায় করুণ—পুরোনো বইখানার ছেঁড়া পাতার ভরপুর গন্ধে, মায়ের মুখের মিষ্ট সুরে, রৌদ্রভরা দুপুরের মায়া-অঙ্গুলি-নির্দেশে, তাহার শিশুদৃষ্টি অস্পষ্টভাবে সে পথের সন্ধান পাইত। বেলা পড়িলে মা গৃহকার্যে উঠিয়া গেলে, সে বাহিরে আসিয়া রোয়াকে দাঁড়াইয়া দুরের সেই অশ্বত্থ গাছটার দিকে এক এক দিন চাহিয়া দেখে—হয়তো কড়া চৈত্র-বৈশাখের রৌদ্রে গাছটার মাথা ধোঁয়া-ধোঁয়া অস্পষ্ট, নয়তো বৈকালের রাঙা রোদ অলসভাবে গাছটার মাথায় জড়াইয়া আছে—সকলের চেয়ে এই বৈকালের রাঙা-রোদ-মাখানো গাছটার দিকে চাহিয়াই তাহার মন কেমন করিত। কর্ণ যেন ঐ অশ্বত্থ গাছটার ওপারে আকাশের তলে, অনেক দুরে কোথায় এখনও মাটি হইতে রথের চাকা দুই হাতে প্রাণপণে টানিয়া তুলিতেছে—রোজই তোলে—রোজই তোলে—মহাবীর, কিন্তু চিরদিনের কৃপার পাত্র কর্ণ। বিজয়ী বীর অর্জুন নহে—যে রাজ্য পাইল, মান পাইল, রথের উপর হইতে বাণ ছুঁড়িয়া বিপন্ন শত্রুকে নাশ করিল; বিজয়ী কর্ণ—যে মানুষের চিরকালের চোখের জলে জাগিয়া রহিল, মানুষের বেদনায় অনুভূতিতে সহচর হইয়া বিরাজ করিল—সে।

এক-একদিন মহাভারতের যুদ্ধের কাহিনী শুনিতে শুনিতে তাহার মনে হয় যুদ্ধ জিনিসটা মহাভারতে বড় কম লেখা আছে। ইহার অভাব পূর্ণ করিবার জন্য এবং আশ মিটাইয়া যুদ্ধ জিনিসটা উপভোগ করিবার জন্য সে এক উপায় বাহির করিয়াছে। একটা বাখারি কিংবা হালকা কোন গাছের ডালকে অস্ত্ররূপে হাতে লইয়া সে বাড়ীর পিছনে বাঁশবাগানের পথে অথবা বাহিরের উঠানে ঘুরিয়া বেড়ায় ও আপন মনে বলে—তারপর দ্রোণ তো একেবারে দশ বাণ ছুঁড়লেন, অর্জুন করলেন কি,একেবারে দুশোটা বাণ দিলেন মেরে। তারপর—ওঃ—সে কি যুদ্ধ! বাণের চোটে চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল। (এখানে সে মনে মনে যতগুলি বাণ হইলে তাহার আশা মিটে তাহার কল্পনা করে, যদিও তাহার কল্পনার ধারা মার মুখে কাশীদাসী মহাভারতে বর্ণিত যুদ্ধের প্রণালী সম্বন্ধে যাহা শুনা আছে তাহা অতিক্রম করে না) তারপর তো অর্জুন করলেন কি, ঢাল তরোয়াল নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে পড়লেন—পরে এই যুদ্ধ! দুর্যোধন এলেন—ভীম এলেন—বাণে বাণে আকাশ অন্ধকার করে ফেলেচে—আর কিছু দেখা গেল না। মহাভারতের রথিগণ মাত্র অষ্টাদশ দিবস যুদ্ধ করিয়া নাম কিনিয়া গিয়াছেন, কিন্তু রক্ত-মাংসের দেহে জীবন্ত থাকিলে তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন যশোলাভের পথ ক্রমশই কিরূপ দুর্গম হইয়া পড়িতেছে। বালকের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করিতে তাঁহারা মাসের পর মাস সমানভাবে অস্ত্রচালনা করিতে পারিতেন কি?

গ্রীষ্মকালের দিনটা, বৈশাখের মাঝামাঝি।

নীলমণি রায়ের ভিটার দিকে জঙ্গলের ধারে সেদিন দুপুরের কিছু পূর্বে দ্রোণগুরু বড় বিপদে পড়িয়াছিলেন—কপিধ্বজ রথ একেবারে তাঁহার ঘাড়ের উপরে, গাণ্ডীব-ধনু হইতে ব্রহ্মাস্ত্র মুক্ত হইবার বিলম্ব চক্ষের পলক মাত্র, কুরুসৈন্যদলে হাহাকার উঠিয়াছে—এমন সময় শেওড়া বনের ওদিক হইতে

হঠাৎ কে কৌতুকের কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—ও কি রে অপু? অপু চমকিয়া উঠিয়া আকর্ণ টানা জ্যা-কে হঠাৎ ছাড়িয়া দিয়া চাহিয়া দেখিল তাহার দিদি জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতেছে। পরে চাহিতেই বলিল—হ্যাঁরে পাগল, আপন মনে কি বক্‌চিস্ বিড়্‌বিড়্ করে, আর হাত পা নাড়চিস্? পরে সে ছুটিয়া আসিয়া সস্নেহে ভাইএর কচি গালে চুমু খাইয়া বলিল—পাগল! কোথাকার একটা পাগল, কি বখছিলি রে আপন মনে?

অপু লজ্জিতমুখে বার বার বলিতে লাগিল—যাঃ····বক্‌ছিলাম বুঝি?····আচ্ছা, যাঃ—

অবশেষে দুর্গা হাসি থামাইয়া বলিল—আয় আমার সঙ্গে····

পরে সে অপুর হাত ধরিয়া বনের মধ্যে লইয়া চলিল। খানিক দূর গিয়া হাসিমুখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—দেখেচিস?····কত নোনা পেকেচে?····এখন কি করে পাড়া যায় বল্ দিকি?

অপু বলিল—উঃ, অনেক রে দিদি!—একটা কঞ্চি দিয়ে পাড়া যায় না?

দুর্গা বলিল—তুই এক কাজ কর, ছুটে গিয়ে বাড়ীর মধ্যে থেকে আঁকুষিটা নিয়ে আয় দিকি? আঁকুষি দিয়ে টান দিলে পড়ে যাবে দেখিস্ এখন—

অপু বলিল—তুই এখানে দাঁড়া দিদি, আমি আনচি—

অপু আঁকুষি আনিলে দুজনে মিলিয়া বহু চেষ্টা করিয়াও চার-পাঁচটার বেশী পাড়িতে পারিল না—খুব উঁচুগাছ, সর্বোচ্চ ডালে যে ফল আছে তাহা দুর্গা আঁকুষি দিয়াও নাগাল পাইল না। পরে সে বলিল—চল আজ এইগুলো নিয়ে যাই, নাইবার বেলায় মাকে সঙ্গে আন্‌বো—মার হাতে ঠিক নাগাল আসবে। দে নোনাগুলো আমার কাছে, তুই আঁকুষিটা নে। নোলক পর্‌বি?

একটা নীচু ঝোপের মাথায় ওড়্‌কলমী লতায় সাদা সাদা ফুলের কুঁড়ি, দুর্গা হাতের ফলগুলো নামাইয়া নিকটের ফুলের কুঁড়ি ছিঁড়িতে লাগিল। বলিল—এদিকে সরে আয় নোলক পরিয়ে দি—

তাহার দিদি ওড়্‌কলমী ফুলের নোলক পরিতে ভালবাসে, বনজঙ্গল সন্ধান করিয়া সে প্রায়ই খুঁজিয়া আনিয়া নিজে পরে ও ইতিপূর্বে কয়েকবার অপুকেও পরাইয়াছে। অপু কিন্তু মনে মনে নোলক-পরা পছন্দ করে না। তাহার ইচ্ছা হইল, বলে, নোলক তাহার দরকার নেই। তবে দিদির ভয়ে সে কিছুই বলিল না। দিদিকে চটাইবার ইচ্ছা তাহার আদৌ নাই, কারণ দিদিই বনজঙ্গল ঘুরিয়া কুলটা, জামটা, নোনাটা, আমড়াটা সংগ্রহ করিয়া তাহাকে লুকাইয়া খাওয়ায়, এমন সব জিনিস জুটাইয়া আনে, যাহা হয়তো কুপথ্য হিসাবে উহাদের খাইতে নিষেধ আছে, কাজেই অন্যায় হইলেও দিদির কথা না শুনা তাহার সাহসে কুলায় না।

একটা কুঁড়ি ভাঙিয়া সাদা জলের মত যে আঠা বাহির হইল, তাহার সাহায্যে দুর্গা অপুর নাকে কুঁড়িটি আঁটিয়া দিল, পরে নিজেও একটা পরিল—তারপর ভাইয়ের চিবুকে হাত দিয়া নিজের দিকে ভাল করিয়া ফিরাইয়া বলিল—দেখি, কেমন দেখাচ্ছে? বাঃ বেশ হয়েছে, চল মাকে দেখাইগে—

অপু লজ্জিতমুখে বলিল—না দিদি—

—চল না—খুলে ফেলিসনে যেন—বেশ হয়েচে—

বাড়ী আসিয়া দুর্গা নোনাফলগুলি রান্নাঘরের দাওয়ায় নামাইয়া রাখিল। সর্বজয়া রাঁধিতেছিল—দেখিয়া খুব খুশি হইয়া বলিল—কোথায় পেলি রে?

দুর্গা বলিল—ঐ লিচু-জঙ্গলে—অনেক আছে, কাল গিয়ে তুমি পাড়বে মা? এমন পাকা—একেবারে সিঁদুরের মত রাঙা—

সে আড়াল ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া বলিল—দ্যাখো মা—

অপু নোলক পরিয়া দিদির পিছনে দাঁড়াইয়া আছে। সর্বজয়া হাসিয়া বলিল—ও মা! ও আবার কে রে?—কে চিন্‌তে তো পারচি নে?—

অপু লজ্জায় তাড়াতাড়ি নাকের ডগা হইতে ফুলের কুঁড়ি খুলিয়া ফেলিল। বলিল—ঐ দিদি পরিয়ে দিয়েচে—

দুর্গা হঠাৎ বলিয়া উঠিল—চল্ রে অপু, ঐ কোথায় ডুগডুগী বাজচে, চল্, বাঁদর খেলাতে এসেচে ঠিক, শীগগির আয়—

আগে আগে দুর্গা ও তাহার পিছনে পিছনে অপু ছুটিয়া বাটীর বাহির হইয়া গেল। সম্মুখের পথ বাহিয়া, বাঁদর নয়, ও-পাড়ার চিনিবাস ময়রা মাথায় করিয়া খাবার ফেরি করিতে বাহির হইয়াছে। ও-

পাড়ায় তাহার দোকান, তা ছাড়া সে আমার গুড়ের ও ধানের ব্যবসাও করে। কিন্তু পুঁজি কম হওয়ায় কিছুতেই সুবিধা করিতে পারে না, অল্পদিনেই ফেল মারিয়া বসে। তখন হয়তো মাথায় করিয়া হাটে হাটে আলু পটল, কখনও পান বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। শেষে তাতেও যখন সুবিধা হয় না, তখন হয়তো সে ঝুলি ঘাড়ে করিয়া জাত-ব্যবসা আরম্ভ করে। পরে হঠাৎ একদিন দেখা যায় যে, আমার পাথুরে চুন মাথায় করিয়া বিক্রয় করিতে বেড়াইতেছে। লোকে বলে একমাত্র মাছ ছাড়া এমন কোনো জিনিস নাই, যাহা তাহাকে বিক্রয় করিতে দেখা যায় নাই। কাল দশহরা, লোকে আজ হইতেই মুড়কী সন্দেশ কিনিয়া রাখিবে। চিনিবাস হরিহর রায়ের দুয়ার দিয়া গেলেও বাড়ী ঢুকিল না। কারণ সে জানে এ বাড়ীর লোক কখনো কিছু কেনে না। তবুও দুর্গা-অপুকে দরজায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—চাই নাকি?

অপু দিদির মুখের দিকে চাহিল। দুর্গা চিনিবাসের দিকে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—নাঃ—

চিনিবাস ভুবন মুখুয্যের বাড়ী গিয়া মাথার চাঙারী নামাইতেই বাড়ীর ছেলেমেয়েরা কলরব করিতে করিতে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ভুবন মুখুয্যে অবস্থাপন্ন লোক, বাড়ীতে পাঁচ-ছয়টা গোলা আছে, এ গ্রামে অন্নদা রায়ের নীচেই জমিজমা ও সম্পত্তি বিষয়ে তাঁহার নাম করা যাইতে পারে।

ভুবন মুখুয্যের স্ত্রী বহুদিন মারা গিয়াছেন। বর্তমানে তাঁহার সেজ ভাইয়ের বিধবা স্ত্রী এ সংসারের কর্ত্রী।

সেজ-বৌ-এর বয়স চল্লিশের উপর হইবে, অত্যন্ত কড়া মেজাজের মানুষ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে।

সেজ-বৌ একখানা মাজা পিতলের সরায় করিয়া চিনিবাসের নিকট হইতে মুড়কী, সন্দেশ, বাতাসা দশহরা পূজার জন্য লইলেন। ভুবন মুখুয্যের ছেলেমেয়ে ও তাঁহার ছেলে সুনীল সেইখানেই দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদের জন্যও খাবার কিনিলেন। পরে অপুকে সঙ্গে লইয়া দুর্গা চিনিবাসের পিছন পিছন ঢুকিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া সেজ-বৌ নিজের ছেলে সুনীলের কাঁধে হাত দিয়া একটু ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন—যাও না, রোয়াকে উঠে গিয়ে খাও না। এখানে ঠাকুরের জিনিস, মুখ থেকে ফেলে এঁটো করে বসবে।

চিনিবাস চাঙারী মাথায় তুলিয়া পুনরায় অন্য বাড়ী চলিল। দুর্গা বলিল—আয় অপু, চল্ দেখিগে টুনুদের বাড়ী—

ইহারা সদর দরজা পার হইতেই সেজ-বৌ মুখ ঘুরাইয়া বলিয়া উঠিলেন—দেখতে পারিনে বাপু। ছুঁড়িটার যে কী হ্যাংলা স্বভাব—নিজের বাড়ী আছে, গিয়ে বসে কিনে খেগে যা না? তা না, লোকের দোর দোর, যেমন মা তেমনি ছা—

ইহাদের বাটীর বাহির হইয়া দুর্গা ভাইকে আশ্বাস দিবার সুরে বলিল—চিনিবাসের ভারি তো খাবার! বাবার কাছ থেকে দেখিস্ রথের সময় চারটে পয়সা নেবো—তুই দুটো, আমি দুটো। তুই আর আমি মুড়কী কিনে খাবো—

খানিকটা পরে ভাবিয়া ভাবিয়া অপু জিজ্ঞাসা করিল—রথের আর কতদিন আছে রে দিদি?

পথের পাঁচালী

দশম পরিচ্ছেদ

কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে।

সর্বজয়া ভুবন মুখুয্যের বাড়ীর কুয়া হইতে জল তুলিয়া আনিল; পিছনে পিছনে অপু মায়ের আঁচল মুঠা পাকাইয়া ধরিয়া ও-বাড়ী হইতে আসিল। সর্বজয়া ঘড়া নামাইয়া রাখিয়া বলিল—তা তুই পেছনে পেছনে অমন করে ঘুরতে লাগলি কেন বল্ দিকি? ঘরকন্নার কাজ-কর্ম সারবো তবে তো ঘাটে যাবো? কাজ কর্তে দিবি না—না?

অপু বলিল—তা হোক্—কাজ তুমি ও-বেলা ক'রো এখন মা, তুমি যাও ঘাটে। পরে মায়ের সহানুভূতি আকর্ষণের আশায় অতীব করুণস্বরে কহিল—আচ্ছা আমার খিদে কি পায় না? আজ চারদিন যে খাইনি!

—খাওনি তো করবো কি? রোদ্দুরে বেড়িয়ে বেড়িয়ে জ্বর বাধিয়ে বসবে, বল্লে কথা কানে নাও নাকি তোমরা? ছিষ্টির কাজ করবো তবে তো ঘাটে যাব। বসে তো নেই? যা ও-রকম দুষ্টুমি করিস্ নে—তোমাদের ফরমাজ মত কাজ করবার সাধ্যি আমার নেই, যা—

অপু মায়ের আঁচল আরও জোর করিয়া মুঠা পাকাইয়া ধরিয়া বলিল—কক্ষনো তোমায় কাজ কর্তে দেবো না। রোজই তো কাজ করো, একদিন বুঝি বাদ যাবে না? এক্ষুনি ঘাটে যাও—না, আমি শুন্‌বো না···করো দিকি কেমন কাজ করবে?

সর্বজয়া পুত্রের দিকে চাহিয়া বলিল—ও রকম দুষ্টুমি করো না, ছিঃ—এই হয়ে গ্যালো বলে, আর একটুখানি সবুর করো—ঘাটে যাবো, ছুটে এসে তোমার ভাত চড়িয়ে দোব—দুষ্টুমি করে কি? ছাড় আঁজল, ক'খানা পল্‌তার বড়া ভাজা খাবি বল দিকি?

ঘণ্টাখানেক পরে অপু মহা উৎসাহের সহিত খাইতে বসিল।

গ্লাস তুলিয়া সে ঢকঢক করিয়া অর্ধেকখানি খালি করিয়া ফেলিয়া, পরে আরও দু'এক গ্রাস খাইয়া কিছু ভাত পাতের নীচে ছড়াইয়া বাকি জলটুকু শেষ করিয়া হাত তুলিয়া বসিল।

—কৈ খাচ্ছিস কৈ? এতক্ষণ তো ভাত ভাত করে হাঁপাচ্ছিলে—পল্‌তার বড়া—পল্‌তার বড়া—ঐ তো সবই ফেলে রাখলি, খেলি কি তবে?

সর্বজয়া একবাটি দুধ-ভাত মাখিয়া পুত্রকে খাওয়াইতে বসিল। দেখি হাঁ কর—তোমার কপালখানা—মণ্ডা না মেঠাই না, দুটো ভাত আর ভাত—তা ছেলের দশা দেখলে হয়ে আসে—রোজ ভাত খেতে বসে মুখ কাঁচুমাচু—বাঁচবে কি খেয়ে? বাঁচতে কি এসেচ? আমায় জ্বালাতে এসেচ বৈ তো নয়—ওরকম মুখ ঘুরিও না, ছিঃ—হাঁ করো লক্ষ্মী—দেখি এই দলাটা হ'লেই হোয়ে গেল—আবার ওবেলা টুনুদের বাড়ীতে ভাসান হবে। তুই জানিস নে বুঝি? শীগ্‌গির শীগ্‌গির খেয়ে নিয়ে চলো। আমরা সব—

দুর্গা বাড়ী ঢুকিল। কোথা হইতে ঘুরিয়া আসিতেছে। এক পা ধুলা, কপালের সামনে একগোছা চুল সোজা হইয়া প্রায় চার আঙুল উঁচু হইয়া আছে। সে সব সময় আপন মনে ঘুরিতেছে—পাড়ার সমবয়সী ছেলেমেয়ের সঙ্গে তাহার বড় একটা খেলা-ধূলা নাই—কোথায় কোন্ ঝোপে বৈঁচি পাকিল, কাদের বাগানে কোন্ গাছটায় আমের গুটি বাঁধিয়াছে, কোন্ বাঁশতলায় শেয়াকুল খাইতে মিষ্টি—এ সব তাহার নখদর্পণে। পথে চলিতে চলিতে সে সর্বদা পথের দুই পাশে সতর্ক দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে চলিয়াছে—কোথাও কাঁচপোকা বসিয়া আছে কি না। যদি কোথাও কন্টিকারী গাছের পাকা ফল দেখিতে পাইল, তৎক্ষণাৎ খেলাঘরের বেগুন করিবার জন্য তাহা তুলিতে বসিয়া যাইবে। হয়তো পথে কোথাও বসিয়া সে নানারকমের খাপ্‌রা লইয়া ছুঁড়িয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে, গঙ্গা-যমুনা খেলায় কোন্‌খানায় ভাল তাক হয়—পরীক্ষায় যেখানা ভাল বলিয়া প্রমাণিত হইবে, সেখানা সযত্নে আঁচলে বাঁধিয়া লইবে। সর্বদাই সে পুতুলের বাক্স ও খেলাঘরের সরঞ্জাম লইয়া মহাব্যস্ত।

সে ঢুকিয়া অপরাধীর দৃষ্টিতে মায়ের দিকে চাহিল। সর্বজয়া বলিল—এলে! এসো, ভাত তৈরী। খেয়ে আমায় উদ্ধার করো—তারপর আবার কোন দিকে বেরুতে হবে বেরোও। বোশেখ মাসের দিন সকলের মেয়ে দ্যাখো গে যাও সেঁজুতি করচে, শিবপূজো করচে—আর এত বড় ধাড়ী মেয়ে—দিনরাত কেবল টো টো। সেই সকাল হতে না হতে বেরিয়েচে, আর এখন এই বেলা দুপুর ঘুরে গিয়েছে, এখন এল বাড়ী—মাথাটার ছিরি দ্যাখো না। না একটু তেল দেওয়া, না একটু চিরুনি ছোঁয়ানো—কে বলবে বামুনের মেয়ে, ঠিক যেন দুলে কি বাগ্‌দীদের কেউ—বিয়েও হবে ঐ দুলে-বাগ্‌দীদের বাড়ীতেই—আঁচলে ওগুলো কী ধন্‌দৌলত বাঁধা—খোল্—

দুর্গা ভয়ে ভয়ে আঁচলের খুঁট খুলিতে খুলিতে কহিল—ওই রায়কাকাদের বাড়ীর সাম্‌নে কালকাসুন্দে গাছে—পরে ঢোঁক গিলিয়া কহিল—এই অনেক বেনেবৌ তাই—

বেনেবৌয়ের কথায় হৃদয় গলে না এমন পাষাণ জীবও জগতে অনেক আছে। সর্বজয়া তেলেবেগুনে জ্বলিয়া কহিল—তোর বেনেবৌয়ের না নিকুচি করেচে, যত ছাই আর ভস্‌সো রাতদিন বেঁধে নিয়ে ঘুরচেন—আজ টান মেরে তোমার পুতুলের বাক্স ঐ বাঁশতলায় ডোবায় যদি না ফেলি তবে—

সর্বজয়ার কথা শেষ হইবার পূর্বেই এক ব্যাপার ঘটিল। আগে আগে মুখুয্যের বাড়ীর সেজ-ঠাকরুণ, পিছনে পিছনে তাঁহার মেয়ে টুনু ও দেওরের ছেলে সতু, তাহাদের পিছনে আর চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে সম্মুখ দরজা দিয়া বাড়ী ঢুকিল। সেজ-ঠাকুরণ কোনো দিকে না চাহিয়া বাড়ীর কাহারও সহিত কোনো আলাপ না করিয়া সোজা হন্ হন্ করিয়া ভিতরের দিকের রোয়াকে উঠিলেন। নিজের ছেলের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—কৈ নিয়ে আয়—বের কর্ পুতুলের বাক্স, দেখি—

এ বাড়ীর কেহ কোনো কথা বলিবার পূর্বেই টুনু ও সতু, দুজনে মিলিয়া দুর্গার টিনের পুতুলের বাক্সটা ঘর হইতে বাহির করিয়া আনিয়া রোয়াকে নামাইল এবং টুনু বাক্স খুলিয়া খানিকটা খুঁজিবার পর একছড়া পুঁতির মালা বাহির করিয়া বলিল—এই দ্যাখো মা, আমার সেই মালাটা—সেদিন যে সেই খেল্‌তে গিয়েছিল, সেদিন চুরি করে এনেচে।

সতু বাক্সের এক কোণ সন্ধান করিয়া গোটাকতক আমের গুটি বাহির করিয়া বলিল—এই দ্যাখো জেঠিমা, আমাদের সোনামুখী গাছের আম পেড়ে এনেচে।

ব্যাপারটা এত হঠাৎ হইয়া গেল বা ইহাদের গতিবিধি এ বাড়ীর সকলের কাছেই এত রহস্যময় মনে হইল যে এতক্ষণ কাহারও মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হয় নাই। এতক্ষণ পরে সর্বজয়া কথা খুঁজিয়া পাইয়া বলিল—কি, কি খুড়ীমা? কি হয়েচে? পরে সে রান্নাঘরের দাওয়া হইতে ব্যগ্রভাবে উঠিয়া আসিল।

—এই দ্যাখো না কি হয়েচে, কীর্তিখানা দ্যাখো না একবার—তোমার মেয়ে সেদিন খেলতে গিয়ে টুনুর পুতুলের বাক্স থেকে এই পুঁতির মালা চুরি করে নিয়ে এসেচে— মেয়ে কদিন থেকে খুঁজে খুঁজে হয়রান। তারপর সতু গিয়ে বল্‌লে যে, তোর পুঁতির মালা দুগ্‌গাদিদির বাক্সের মধ্যে দেখে এলাম—দ্যাখো একবার কাণ্ড—তোমার ও মেয়ে কম নাকি? চোর—চোরের বেহদ্দ চোর—আর ওই দ্যাখো না—বাগানের আমগুলো গুটি পড়তে দেরি হয় না—চুরি করে নিয়ে এসে বাক্সে লুকিয়ে রেখেচে।

যুগপৎ দুই চুরির অতর্কিততায় আড়ষ্ট হইয়া দুর্গা পাঁচিলের গায়ে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া ঘামিতেছিল। সর্বজয়া জিজ্ঞাসা করিল—এনিচিস্ এই মালা ওদের বাড়ী থেকে?

দুর্গা কথার উত্তর দিতে না দিতে সেজ-বৌ বলিলেন,—না আনলে কি আর মিথ্যে করে বলচি নাকি! বলি এই আম কটা দ্যাখো না? সোনামুখীর আম চেন, না কি? এও কি মিথ্যে কথা?

সর্বজয়া অপ্রতিভ হইয়া বলিল—না সেজখুড়ী, আপনার মিথ্যে কথা তা তো বলিনি! আমি ওকে জিগ্যেস্ করচি।

সেজ-ঠাক্‌রুণ হাত নাড়িয়া ঝাঁজের সহিত বলিলেন—জিগ্যেস করো আর যা করো বাপু, ও মেয়ে সোজা মেয়ে হবে না আমি বলে দিচ্চি—এই বয়সে যখন চুরি বিদ্যে ধরেচে, তখন এর পর যা হবে সে টেরই পাবে! চল্ রে সতু— নে আমের গুটিগুলো বেঁধে নে—বাগানের আমগুলো লক্ষ্মীছাড়া ছুঁড়ীর জ্বালায় যদি চোখে দেখবার জো আছে। টুনু, মালা নিইচিস্ তো?

সর্বজয়ার কি জানি কেমন একটু রাগ হইল—ঝগড়াতে সে কিন্তু পিছু হাঁটবার পাত্র নয়, বলিল—পুঁতির মালার কথা জানিনে, সেজ-খুড়ী, কিন্তু আমের গুটিগুলো সেগুলো পেড়েছে কি তলা থেকে কুড়িয়ে এনেচে, তার গায়ে তো নাম লেখা নেই সেজখুড়ী—আর ছেলেমানুষ যদি ধরো এনেই থাকে—

সেজ-ঠাক্‌রুণ অগ্নিমূর্তি হইয়া বলিলেন—বলি কথাগুলো তো বেশ কেটে কেটে বল্‌চো? বলি আমের গুটিতে নাম লেখা না-হয় নেই-ই, তোমাদের কোন্ বাগান থেকে এগুলো এসেচে তা বল্‌তে পার? বলি টাকাগুলোতেই তো নাম লেখা ছিল না—তা তো হাত পেতে নিতে পেরেছিলে? আজ এক বচ্ছরের ওপর হয়ে গ্যালো, আজ দেবো কাল দেবো—আস্‌বো এখন ওবেলা টাকা দিয়ে দিও—ও আমি আর রাখতে পারবো না—টাকার যোগাড় করে রেখো বলে দিচ্চি।

দলবলসহ সেজ-ঠাক্‌রুরণ দরজার বাহির হইয়া গেলেন। সর্বজয়া শুনিতে পাইল পথে কাহার উত্তরে তিনি বেশ উচ্চকণ্ঠেই বলিতেছেন—ওই এ-বাড়ীর ছুঁড়িটা, টুনুর বাক্স থেকে এই পুঁতির মালাছড়াটা চুরি করে নিয়ে গিয়ে করেচে কি নিজের বাক্সে লুকিয়ে রেখেচে—আর দ্যাখো না এই

আমগুলো পাশেই বাগান, যত ইচ্ছে পাড়লেই হোল—তাই বলতে গেলাম, তা আমায় আবার কেটে কেটে বল্‌চে (এখানে সেজ-বৌ সর্বজয়ার কথা বলিবার ভঙ্গী নকল করিলেন)—তা—এনেচে ছেলেমানুষ—ও রকম এনেই থাকে— ওতে কি তোমাদের নাম লেখা আছে নাকি? (সুর নীচু করিয়া) মা-ই কি কম চোর নাকি, মেয়ের শিক্ষে কি আর অম্‌নি হয়েচে? বাড়ীসুদ্ধ সব চোর—

অপমানে দুঃখে সর্বজয়ার চোখে জল আসিল। সে ফিরিয়া দুর্গার রুক্ষ চুলের গোছা টানিয়া ধরিয়া ডাল ভাত মাখা হাতেই দুড়দাড় করিয়া তাহার পিঠে কিলের উপর কিল ও চড়ের উপর চড় মারিতে মারিতে বলিতে লাগিল—আপদ্‌বালাই একটা কোত্থেকে এসে জুটেছে—ম'লে আপদ চুকে যায়—মরেও না যে বাঁচি—হাড় জুড়োয়—বেরো বাড়ী থেকে, দূর হয়ে যা—যা এখ্‌খুনি বেরো—

দুর্গা মার খাইতে খাইতে ভয়ে খিড়কী-দোর দিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। তাহার ছেঁড়া রুক্ষ চুলের গোছা দু-এক গাছা সর্বজয়ার হাতে থাকিয়া গেল।

অপু খাইতে খাইতে অবাক হইয়া সমস্ত ব্যাপার দেখিতেছিল। দিদি পুঁতির মালা চুরি করিয়া আনিয়াছিল কিনা তাহা সে জানে না—পুঁতির মালাটা সে ইহার আগে কোনও দিন দেখে নাই—কিন্তু আমের গুটি যে চুরির জিনিস নয় তাহা সে নিজে জানে। কাল বৈকালে দিদি তাকে সঙ্গে করিয়া টুনুদের বাগানে আম কুড়াইতে গিয়াছিল এবং সোনামুখীর তলায় আম কটা পড়িয়া ছিল, দিদি কুড়াইয়া লইল, সে জানে কাল হইতে অনেকবার দিদি বলিয়াছে—ও অপু, এবার সেই আমের গুটিগুলো জারাবো, কেমন তো? কিন্তু মা অসুবিধাজনকভাবে বাড়ী উপস্থিত থাকার দরুণ উক্ত প্রস্তাব আর কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নাই। দিদির অত্যন্ত আশার জিনিস আমগুলো এভাবে লইয়া গেল, তাহার উপর আবার দিদি এরূপ ভাবে মারও খাইল। দিদির চুল ছিঁড়িয়া দেওয়ায় মায়ের উপর তাহার অত্যন্ত রাগ হইল। যখন তাহার দিদির মাথার সামনে রুক্ষ চুলের এক গোছা খাড়া হইয়া বাতাসে উড়ে তখনই কি জানি কেন, দিদির উপর অত্যন্ত মমতা হয়—কেমন যেন মনে হয় দিদির কেহ কোথাও নাই—সে যেন একা কোথা হইতে আসিয়াছে—উহার সাথী কেহ এখানে নাই। কেবলই মনে হয়, কেমন করিয়া সে দিদির সকল দুঃখ ঘুচাইয়া দিবে—সকল অভাব পূরণ করিয়া তুলিবে। তাহার দিদিকে সে এতটুকু কষ্টে পড়িতে দিবে না।

খাওয়ার পরে অপু মায়ের ঘরের মধ্যে বসিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু তাহার মত থাকিয়া থাকিয়া কেবলই বাহিরে ছুটিয়া যাইতেছিল। বেলা একটু পড়িলে সে টুনুদের বাড়ী, পট্‌লিদের বাড়ী, নেড়াদের বাড়ী—একে একে সকল বাড়ী খুঁজিল—দিদি কোথাও নাই। রাজকৃষ্ট পালিতের স্ত্রী ঘাট হইতে জল লইয়া আসিতেছিল—তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—জেঠিমা, আমার দিদিকে দেখেচো? সে আজ ভাত খায়নি, কিছু খায়নি—মা তাকে আজ বড্ড মেরেচে—মার খেয়ে কোথায় পালিয়েচে—দেখেচো জেঠিমা?

বাড়ীর পাশের পথ দিয়া যাইতে যাইতে ভাবিল—বাঁশ-বাগানে সে যদি বসিয়া থাকে? সেদিকে গিয়া সমস্ত খুঁজিয়া দেখিল। সে খিড়কী-দরজা দিয়া বাড়ী ঢুকিয়া দেখিল, বাড়ীতে কেহ নাই। তাহার মা বোধ হয় ঘাটে কি অন্য কোথাও গিয়াছে। বাড়ীতে বৈকালের ছায়া পড়িয়া আসিয়াছে। সম্মুখের দরজার কাছে যে বাঁশঝাড় ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, তাহার একগাছা ঝুলিয়া-পড়া শুক্‌নো কঞ্চিতে তাহার পরিচিত সেই লেজ্‌ঝোলা হল্‌দে পাখীটা আসিয়া বসিয়াছে। রোজই সন্ধ্যার কিছু পূর্বে সে কোথা হইতে আসিয়া এই বাঁশঝাড়ের ঐ কঞ্চিখানার উপর বসে—রোজ—রোজ—রোজ। আরও কত কি পাখী চারিদিকের বলে কিচ-কিচ করিতেছে। নীলমণি রায়দের পোড়ো ভিটা গাছপালার ঘন ছায়ায় ভরিয়া গিয়েছে। অপু রোয়াকে দাঁড়াইয়া দূরের সেই অশ্বত্থ গাছটার মাথার দিকটায় চাহিয়া দেখিল—একটু একটু রাঙা রোদ গাছের মাথায় এখনো মাখানো, মগডালে একটা কি সাদা মত দুলিতেছে, হয় বক, নয় কাহারও ঘুড়ি ছিঁড়িয়া আটকাইয়া ঝুলিতেছে—সমস্ত আকাশ জুড়িয়া যেন ছায়া আর অন্ধকার নামিয়া আসিতেছে। চারিদিক নির্জন...কেহ কোনদিকেই নাই...নীলমণি রায়ের পোড়া ভিটায় কচুঝাড়ের কালো ঘন সবুজ নতুন পাতা চক্ চক্ করিতেছে। তাহার মন হঠাৎ হু-হু করিয়া উঠিল। কতক্ষণ হইল, সেই গিয়াছে, বাড়ী আসে নাই—কোথায় গেল দিদি?

ভুবন মুখুয্যের বাড়ীর ছেলেমেয়েরা মিলিয়া উঠানে ছুটোছুটি করিয়া লুকোচুরি খেলিতেছে। রাণু তাহাকে দেখিয়া ছুটিয়া আসিল—ভাই, অপু এসেচে...ও আমাদের দিকে হবে, আয় রে অপু।

অপু তাহার হাত ছাড়াইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল—আমি খেল্‌বো না রাণুদি,—দিদিকে দেখেচো?

রাণু জিজ্ঞাসা করিল—দুগ্‌গা? না, তাকে তো দেখিনি। বকুলতলায় নেই তো?

বকুলতলার কথা তাহার মনেই হয় নাই। সেখানে দুর্গা প্রায়ই থাকে বটে। ভুবন মুখুয্যের বাড়ী হইতে সে বকুলতলায় গেল। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে—বকুলগাছটা অনেক দূর পর্য্যন্ত জুড়িয়া ডালপালা ছড়াইয়া ঝুপসি হইয়া দাঁড়াইয়া আছে—তলাটা অন্ধকার। কেহ কোথাও নাই...যদি কোনো দিকে গাছপালার আড়ালে থাকে। সে ডাক দিল—দিদি, ও দিদি! দিদি?

অন্ধকার গাছটায় কেবল কতকগুলো বক পাখা ঝটপট করিতেছে মাত্র। অপু ভয়ে ভয়ে উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল। বকুলতলা হইতে একটু দূরে ডোবার ধারে খেজুর গাছ আছে, এখন ডাঁশা খেজুরের সময়, সেখানে তাহার দিদি মাঝে মাঝে থাকে বটে। কিন্তু অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, ডোবাটার দুই ধারে বাঁশবন, সেখানে যাইয়া দেখিতে তাহার সাহস হল না। বকুলগাছের গুঁড়ির কাছে সরিয়া গিয়া সে দুই-একবার চিৎকার করিয়া ডাকিল—ভাঁটশেওড়া বনে কি জন্তু তাহার গলার সাড়া পাইয়া খস্ খস্ শব্দ করিয়া ডোবার দিকে পলাইল।

বাড়ীর পথে ফিরিতে ফিরিতে হঠাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইল। সামনে সেই গাব গাছটা। একা সন্ধ্যার পর এ গাবগাছের তলার পথ দিয়া যাওয়া। সর্বনাশ! গায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে। কেন যে তাহার এই গাছটার নীচে দিয়া যাইতে ভয় করে, তাহা সে জানে না। কোন কারণ নাই, এমনিই ভয় করে এবং কারণ কিছু নাই বলিয়া ভয় অত্যন্ত বেশী করে। এত দেরি পর্যন্ত সে কোনো দিন বাড়ীর বাহিরে থাকে নাই—আজ তাহার সে খেয়াল হইল না। মন ব্যস্ত ও অন্যমনস্ক না থাকিলে সে কখনই এপথে আসিত না।

অপু খানিকক্ষণ অন্ধকার গাবতলাটার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া ফিরিল। তাহাদের বাড়ী যাইবার আর একটা পথ আছে—একটুখানি ঘুরিয়া পটলিদের বাড়ীর উঠান দিয়ে গেলে গাবতলার এ অজানা বিভীষিকার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

পটলির ঠাকুরমা সন্ধ্যার সময় বাড়ীর রোয়াকে ছেলেপিলেদের লইয়া হাওয়ায় বসিয়া গল্প করিতেছেন। পটলির মা রান্নাঘরে রাঁধিতেছেন। উঠানের মাচাতলায় বিধু জেলেনী দাঁড়াইয়া মাছ বিক্রয়ের পয়সা তাগাদা করিতেছে।

অপু বলিল—দিদিকে খুঁজতে গিয়েছিলাম ঠাকুমা—বকুলতলা থেকে আস্‌তে আস্‌তে—

ঠাকুরমা বলিলেন—দুগ্‌গা এই তো বাড়ী গেল। এই কতক্ষণ যাচ্ছে—ছুটে যা দিকি— বোধ হয় এখনও বাড়ী পৌঁছয়নি—

সে এক দৌড়ে বাড়ীর দিকে ছুটিল। পিছন হইতে পটলির বোন রাজী চেঁচাইয়া বলিল—কাল সকালে আসিস্ অপু—আমরা গঙ্গা-যমুনা খেলার নতুন ঘর কেটেচি! ঢেঁকশালের পেছনে নিমতলায় দুগ্‌গাকে বলিস—

তাহাদের বাড়ীর কাছে পৌঁছিয়া হঠাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল—দুর্গা আর্তস্বরে চীৎকার করিতে করিতে বাড়ীর দরজা দিয়া দৌড়াইয়া বাহির হইতেছে—পিছনে পিছনে তাহার মা কি একটা হাতে মারিতে মারিতে তাড়া করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে। দুর্গা গাবতলার পথ দিয়া ছুটিয়া পলাইল, মা দরজা হইতে ধাবমানা মেয়ের পিছনে চেঁচাইয়া বলিল—যাও বেরোও—একেবারে জন্মের মতো যাও—আর কক্ষনো বাড়ী যেন ঢুকতে না হয়—বালাই, আপদ চুকে যাক্—একেবারে ছাতিমতলায় দিয়ে আসি।

ছাতিমতলায় গ্রামের শ্মশান। অপুর সমস্ত শরীর যেন জমিয়া পাথরের মত আড়ষ্ট ও ভারী হইয়া গেল। তাহার মা সবেমাত্র ভিতরের বাড়ীতে ঢুকিয়া মাটির প্রদীপটা রোয়াকের ধার হইতে উঠাইয়া লইতেছে। সে পা টিপিয়া টিপিয়া বাড়ী ঢুকিতেই তাহার মা তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—তুমি আবার এক রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলে শুনি? মোটে তো আজ ভাত খেয়েচো?

তাহার মনে নানা প্রশ্ন জাগিতেছিল। দিদি আবার মার খাইল কেন? সে এতক্ষণ কোথায় ছিল? দুপুর বেলা দিদি কি খাইল? সে কি আবার কোন জিনিস চুরি করিয়া আনিয়াছে? কিন্তু ভয়ে কোন কথা না বলিয়া সে কালের পুতুলের মত মায়ের কথামত কাজ করিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল। পরে ভয়ে ভয়ে প্রদীপ উস্কাইয়া নিজের ছোট বইয়ের দপ্তরটি বাহির করিয়া পড়িতে বসিল। সে পড়ে মোটে তৃতীয় ভাগ—কিন্তু তাহার দপ্তরে দুখানা মোটা মোটা ভারী ইংরাজী কি বই, কবিরাজী ঔষধের তালিকা, একখানা পাতা ছেঁড়া দাশুরায়ের পাঁচালি, একখানা ১৩০৩ সালের পুরাতন পাঁজি প্রভৃতি আছে। সে নানাস্থান হইতে চাহিয়া এগুলি যোগাড় করিয়াছে এবং এগুলি না পড়িতে পারিলেও রোজ একবার করিয়া খুলিয়া দেখে।

খানিকক্ষণ দেওয়ালের দিকে চাহিয়া সে কি ভাবিল। পরে আর একবার প্রদীপ উস্কাইয়া দিয়া পাতা-ছেঁড়া দাশুরায়ের পাঁচালীখানা খুলিয়া অন্যমনস্কভাবে পাতা উল্‌টাইতেছে, এমন সময়ে সর্বজয়া এক পাটি দুধ হাতে করিয়া ঢুকিয়া বলিল—এস, খেয়ে নাও দিকি!

অপু দ্বিরুক্তি না করিয়া বাটি উঠাইয়া দুধ চুমুক দিয়া খাইতে লাগিল। অন্যদিন হইলে এত সহজে দুধ খাইতে রাজী করানো খুব কঠিন হইত। একটুখানি মাত্র খাইয়া সে বাটি মুখ হইতে নামাইল। সর্বজয়া বলিল—ওকি? নাও সবটুকু খেয়ে ফেলো—ওইটুকু দুধ ফেললে তবে বাঁচবে কি খেয়ে—

অপু বিনা প্রতিবাদে দুধের বাটি পুনরায় মুখে উঠাইল। সর্বজয়া দেখিল সে মুখে বাটি ধরিয়া রহিয়াছে কিন্তু চুমুক দিতেছে না—তাহার বাটিসুদ্ধ হাতটা কাঁপিতেছে...পরে অনেকক্ষণ মুখে ধরিয়া রাখিয়া হঠাৎ বাটি নামাইয়া সে মায়ের দিকে চাহিয়া ভয়ে কাঁদিয়া উঠিল। সর্বজয়া আশ্চর্য হইয়া বলিল—কি হোল রে? কি হয়েচে, জিভ কামড়ে ফেলেছিস্?

অপু মায়ের কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ের বাঁধ না মানিয়া ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল—দিদির জন্য বড্ড মন কেমন করছে!...

সর্বজয়া অল্পক্ষণ মাত্র চুপ করিয়া বসিয়া পরে সরিয়া আসিয়া ছেলের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে শান্তসুরে বলিতে লাগিল—কেঁদো না অমন করে কেঁদো না,—ঐ পট্‌লিদের কি নেড়াদের বাড়ী বসে আছে—কোথায় যাবে অন্ধকারে? কম দুষ্টু মেয়ে নাকি? সেই দুপুর বেলা বেরুল—সমস্ত দিনের মধ্যে আর চুলের টিকি দেখা গেল না—না খাওয়া, না দাওয়া, কোথায় ও-পাড়ার পালিতদের বাগানে বসে ছিল, সেখানে বসে কাঁচা আম আর জামরুল খেয়েছে, এক্ষুনি ডাকতে পাঠাচ্ছি—কেঁদো না অমন করে—আবার জ্বর আসবে—ছিঃ।

পরে সে আঁচল দিয়া ছেলের চোখের জল মুছাইয়া দিয়া বাকী দুধটুকু খাওয়াইবার জন্য বাটি তাহার মুখে তুলিয়া ধরিল—হাঁ করো দিকি, লক্ষ্মী সোনা, উনি এলেই ডেকে আন্‌বেন। এখন—একেবারে পাগল—কোত্থেকে একটা পাগল এসে জন্মেছে—আর এক চুমুক—হ্যাঁ—

রাত অনেক হইয়াছে। উত্তরের ঘরের তক্তাপোশে অপু ও দুর্গা শুইয়া আছে। অপুর পাশে তাহার মায়ের শুইবার জায়গা খালি আছে। কারণ মা এখনও রান্নাঘরের কাজ সারিয়া আসে নাই। তাহার বাবা আহারাদি সারিয়া পাশের ঘরে বসিয়া তামাক খাইতেছেন। বাবা বাড়ী আসিয়া দুর্গাকে পাড়া হইতে খুঁজিয়া আনিয়াছেন।

বাড়ী আসিয়া পর্যন্ত দুর্গা কাহারও সঙ্গে কোনো কথা বলে নাই। খাওয়া-দাওয়া সারিয়া আসিয়া চুপ করিয়া শুইয়াছে। অপু দুর্গার গায়ে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—দিদি, মা কি দিয়ে মেরেছিল রে সন্দে বেলা? তোর চুল ছিঁড়ে দিয়েচে?

দুর্গার মুখে কোন কথা নাই।

সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—আমার উপর রাগ করেছিস দিদি? আমি তো কিছু করিনি।

দুর্গা আস্তে আস্তে বলিল—না বৈকি! তবে সতু কি করে টের পেলে যে পুঁতির মালা আমার বাক্সে আছে?

অপু প্রতিবাদের উত্তেজনায় উঠিয়া বসিল।—না—সত্যি আমি তোর গা ছুঁয়ে বলচি দিদি, আমি তো দেখাইনি। আমি জানিনে যে তোর বাক্সে আছে—কাল সতু বিকেল বেলা এসেছিল, ওর সেই বড়

রাঙা ভাঁটাটা নিয়ে আমরা খেলছিলাম—তার পর, বুঝলি দিদি, সতু তোর পুতুলের বাক্স খুলে কি দেখছিল—আমি বল্লাম, ভাই, তুমি আমার দিদির বাক্সে হাত দিও না—দিদি আমাকে বকে—সেই সময় দেখেচে—

পরে সে দুর্গার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল—খুব লেগেচে রে দিদি? কোথায় মেরেচে মা?

দুর্গা বলিল—আমার কানের পাশে মা একটা বাড়ি যা মেরেছে—রক্ত বেরিয়েছিল, এখনও কন্ কন্ কচ্ছে, এইখানে এই দ্যাখ হাত দিয়ে! এই—

—এইখানে? তাই তো রে! কেটে গিয়েছে যে? একটু পিদিমের তেল লাগিয়ে দেব দিদি?

—থাকগে—কাল পালিতদের বাগানে বিকেল বেলা যাব বুঝলি? কামরাঙ্গা যা পেকেছে! এই এত বড় বড়, কাউকে যেন বলিসনে! তুই আর আমি চুপি চুপি যাবো—আমি আজ দুপুরবেলা দুটো পেড়ে খেয়েছি—মিষ্টি যেন গুড়—

পথের পাঁচালী

একাদশ পরিচ্ছেদ

এদিনের ব্যাপারটা এইরূপে ঘটিল।

অপু বাবার আদেশে তালপাতে সাতখানা ক খ হাতের লেখা শেষ করিয়া কি করা যায় ভাবিতে ভাবিতে বাড়ীর মধ্যে দিদিকে খুঁজিতে গেল। দুর্গা মায়ের ভয়ে সকালে নাহিয়া আসিয়া ভিতরের উঠানে পেঁপেতলায় পুণ্যিপুকুরের ব্রত করিতেছে। উঠানে ছোট্ট চৌকোণা গর্ত কাটিয়া তাহার চারিধারে ছোলা, মটর ছড়াইয়া দিয়াছিল—ভিজে মাটিতে সেগুলির অঙ্কুর বাহির হইয়াছে—চারিদিকে কলার ছোট বোগ পুঁতিয়া ধারে পিটুলি গোলার আলপনা দিতেছে—পদ্মলতা, পাখী, ধানের শীষ, নতুন ওঠা সূর্য।

দুর্গা বলিল—দাঁড়া, এই মন্তরটা বলে নিয়ে চল্ এক জায়গায় যাবো।

—কোথা রে দিদি?

—চল না, নিয়ে যাবো এখন, দেখিস এখন—। পরে আনুষঙ্গিক বিধি-অনুষ্ঠান সাঙ্গ করিয়া সে এক নিশ্বাসে আবৃত্তি করিতে লাগিল—

পুণ্যিপুকুর পুষ্পমালা কে পূজে রে দুপুর বেলা?
আমি সতী লীলাবতী ভায়ের বোন্ ভাগ্যবতী—

অপু দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল, বিদ্রূপের ভঙ্গিতে হাসিয়া বলিল—ইঃ।

দুর্গা ছড়া থামাইয়া ঈষৎ লজ্জা-মিশানো হাসির সঙ্গে বলিল—তুই ও-রকম কচ্চিস্ কেন? যা এখান থেকে—তোর এখানে কি?—যা।

অপু হাসিয়া চলিয়া গেল। যাইতে যাইতে আবৃত্তি করিতে লাগিল—আমি সতী লীলাবতী ভাই বোন্ ভাগ্যবতী, হি হি—ভাই বোন ভাগ্যবতী—হি হি—

দুর্গা বলিল, তোমার বড় ইয়ে হয়েচে, না? মাকে বলে তোমার ভ্যাংচানো বার করবো এখন—ব্রতানুষ্ঠান শেষ করিয়া দুর্গা বলিল, চল্ গড়ের পুকুরে অনেক পানফল হয়ে আছে—ভোঁদার মা বলছিল, চল্ নিয়ে আসি—

গ্রামের একেবারে উত্তরাংশে চারিধারে বাঁশবন ও আগাছা এবং প্রাচীন আম-কাঁঠালের বাগানের ভিতর দিয়া পথ। লোকালয় হইতে অনেক দূরে গভীর বন যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখানে মাঠের ধারে মজা পুকুরটা। কোনকালে গ্রামের আদি বাসিন্দা মজুমদারদের বাড়ীর চতুর্দিকে যে গড়খাই ছিল তাহার অন্য অংশ এখন ভরাট হইয়া গিয়াছে—কেবল এইখানটাতে বারো মাস জল থাকে, ইহারই নাম গড়ের পুকুর। মজুমদারদের বাড়ীর কোন চিহ্ন এখন নাই।

সেখানে পৌঁছিয়া তাহারা দেখিল পুকুরে পানফল অনেক আছে বটে, কিন্তু কিনারার ধারে বিশেষ কিছু নাই, সবই জল হইতে দূরে। দুর্গা বলিল—অপু, একটা বাঁশের কঞ্চি দ্যাখ তো খুঁজে—তাই দিয়ে টেনে আনবো। পরে সে পুকুরধারের ঝোপের শেওড়া গাছ হইতে পাকা শেওড়ার ফল তুলিয়া খাইতে লাগিল। অপু বনের মধ্যে কঞ্চি খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিতে পাইয়া বলিল—ও দিদি, ও ফল খাসনি!—দূর—আশ-শ্যাওড়ার ফল কি খায় রে! ও তো পাখীতে খায়—

দুর্গা পাকা ফল টিপিয়া বীজ বাহির করিতে করিতে বলিল—আয় দিকি—দ্যাখ দিকি খেয়ে—মিষ্টি যেন গুড়—কে বলেচে খায় না? আমি তো কত খেইচি।

অপু কঞ্চি কুড়ানো রাখিয়া দিদিরি কাছে আসিয়া বলিল—খেলে যে বলে পাগল হয়? আমায় একটা দে দিকি, দিদি—

পরে সে খাইয়া মুখ একটু কাঁচুমাচু করিয়া বলিল—এট্টু এট্টু তেতো যে দিদি—

—তা এট্টু তেতো থাকবে না? তা থাক্ কেমন মিষ্টি বল দিকি—কথা শেষ করিয়া দুর্গা খুব খুশির সহিত গোটাকতক পাকা ফল মুখের মধ্যে পুরিল।

জন্মিয়া পর্যন্ত ইহারা কোনো ভাল জিনিস খাইতে পায় নাই। অথচ পৃথিবীতে ইহারা নূতন আসিয়াছে, জিহ্বা ইহাদের নূতন—তাহা পৃথিবীর নানা রস, বিশেষত মিষ্টি রস আস্বাদ করিবার জন্য লালায়িত। সন্দেশ মিঠাই কিনিয়া সে পরিতৃপ্তি লাভ করিবার সুযোগ ইহাদের ঘটে না—বিশ্বের অনন্ত সম্পদের মধ্যে তুচ্ছ বনগাছ হইতে মিষ্টরস আহরণরত এই সব লুব্ধ দরিদ্র ঘরের বালকবালিকাদের জন্য তাই করুণাময়ী বনদেবীরা বনের তুচ্ছ ফুলফল মিষ্টি মধুতে ভরাইয়া রাখেন।

খানিকটা পরে দুর্গা পুকুরের জলে একটু নামিয়া বলিল—কত নাল ফুল রয়েছে অপু! দাঁড়া তুলচি। জলে আরও নামিয়া সে দুইটা ফুলের লতা ধরিয়া টানিল—ডাঙায় ছুঁড়িয়া বলিল—ধর অপু। অপু বলিল—পানফল তো খুব জলে—ওখানে কি ক'রে যাবি দিদি? দুর্গা একটা কঞ্চি দিয়া দূর জলের পানফলের গাছগুলো টানিবার চেষ্টা করিয়া পারিল না। বলিল—বড্ড গড়ানো পুকুর রে—গড়িয়ে যাচ্চি ডুবজলে—নাগাল পাই কি ক'রে? তুই এক কাজ কর্, পেছন থেকে আমার আঁচল ধ'রে টেনে রাখ দিকি, আমি কঞ্চি দিয়ে পানফলের ঐ ঝাঁকা টেনে আনি।

বনের মধ্যে হলদে কি একটা পাখী ময়না কাঁটা গাছের ডালের আগায় বসিয়া পাখা নাচাইয়া ভারি চমৎকার শিষ দিতেছিল। অপু চাহিয়া দেখিয়া বলিল—কি পাখী রে দিদি?

—পাখী-টাখী এখন থাক্—ধর দিকি বেশ ক'রে আঁচলটা টেনে, গড়িয়ে যাবো—জোর করে—

অপু পিছন হইতে আঁচল টানিয়া রহিল। দুর্গা পায়ে পায়ে নামিয়া যতদূর যায় কঞ্চি আগাইয়া দিল। কাপড়-চোপড় ভিজিয়া গেল তবু নাগাল আসে না—আরও একটুখানি নামিয়া আঙুলের আগায় মাত্র কঞ্চিখানাকে ধরিয়া টানিবার চেষ্টা করিল। অপু টানিয়া ধরিয়া থাকিতে থাকিতে শক্তিতে আর কুলাইতেছে না দেখিয়া পিছন হইতে হাসিয়া উঠিল। হাসির সঙ্গে আঁচল ঢিলা হওয়াতে দুর্গা জলের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল কিন্তু তখনই সামলাইয়া হাসিয়া বলিল—দূর, তুই যদি কোনো কাজের ছেলে—ধর ফের। অতিকষ্টে একটা পানফলের ঝাঁক কাছে আসিল—দুর্গা কৌতূহলের সহিত দেখিতে লাগিল কতগুলো পানিফল ধরিয়াছে। পরে ডাঙায় ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল—বড্ড কচি, এখনও দুধ হয়নি মধ্যে, আর একবার ধর্ তো। অপু আবার পিছন হইতে টানিয়া ধরিয়া রহিল। খানিকটা থাকিবার পর সে দিদির দিকে ঝুঁকিবার সঙ্গে সঙ্গে টানের চোটে আবার দু-এক পা জলের দিকে আগাইয়া আসিতে লাগিল—পরে কাপড় ভিজিয়া যায় দেখিয়া হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল।

দুর্গা হাসিয়া বলিল—দূর!

ভাইবোনের কলহাস্যে খানিকক্ষণ ধরিয়া পুকুরপ্রান্তের নির্জন বাঁশবাগান মুখরিত হইতে লাগিল। দুর্গা বলিল—এতটুকু যদি জোর থাকে তোর গায়ে! গাবের ঢেঁকি কোথাকার!

খানিকটা পরে দুর্গা জলে নামিয়া আর একবার চেষ্ট করিয়া দেখিতেছে, অপু ডাঙায় দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময় অপু পাশের একটা শেওড়া গাছের দিকে আঙুল দেখাইয়া চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল—দিদি, দ্যাখ্ কি এখানে!....পরে সে ছুটিয়া গিয়া মাটি খুঁড়িয়া কি তুলিতে লাগিল।

দুর্গা জল হইতে জিজ্ঞাসা করিল—কি রে? পরে সেও উঠিয়া ভাইয়ের কাছে আসিল।

অপু ততক্ষণে মাটি খুঁড়িয়া কি একটা বাহির করিয়া কোঁচার কাপড় দিয়া মাটি মুছিয়া সাফ করিতেছে। হাতে করিয়া আহ্লাদের সহিত দিদিকে দেখাইয়া বলিল—দ্যাখ দিদি, চক্‌চক্ কচ্ছে—কি জিনিস রে?

দুর্গা হাতে লইয়া দেখিল—গোলমত একদিক ছুঁচোলো পল-কাটা-কাটা চক্‌চকে কি একটা জিনিস। সে খানিকক্ষণ আগ্রহের সহিত নানাভাবে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে লাগিল।

হঠাৎ কি ভাবিয়া তাহার রুক্ষ চুলে-ঘেরা মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে ভয়ে ভয়ে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল কেহ দেখিতেছে কিনা। চুপিচুপি বলিল—অপু, এটা বোধ হয় হীরে! চুপ কর, চেঁচাসনে। পরে সে ভয়ে ভয়ে আর একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল।

অপু দিদির দিকে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। হীরক বস্তুটি তাহার অজ্ঞাত নয় বটে, মায়ের মুখে রূপকথার রাজপুত্র ও রাজকন্যার হীরামুক্তার অলঙ্কারের ঘটা সে অনেকবার শুনিয়াছে; কিন্তু হীরা জিনিসটা কি রকম দেখিতে, সে সম্বন্ধে তাহার মনে একটু ভুল ধারণা ছিল। তাহার মনে হইত হীরা দেখিতে মাছের ডিমের মত, হলদে হলদে, তবে নরম নয়—শক্ত।....

সর্বজয়া বাড়ী ছিল না, পাড়া হইতে আসিয়া দেখিল—ছেলেমেয়ে বাড়ীর ভিতর দিকে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। কাছে যাইতে দুর্গা চুপিচুপি বলিল—মা, একটা জিনিস কুড়িয়ে পেয়েচি আমরা। গড়ের পুকুরে পানফল তুলতে গিইছিলাম মা। সেখানে জঙ্গলের মধ্যে এইটে পোঁতা ছিল।

অপু বলিল—আমি দেখে দিদিকে বল্লাম, মা।

দুর্গা আঁচল হইতে জিনিসটা খুলিয়া মায়ের হাতে দিয়া বলিল—দ্যাখো দিকি কি এটা মা?

সর্বজয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। দুর্গা চুপিচুপি বলিল—মা, এটা ঠিক হীরে—নয়?

সর্বজয়ারও হীরক সম্বন্ধে ধারণা তাহাদের অপেক্ষা বেশী স্পষ্ট নহে। সে সন্দিগ্ধ সুরে জিজ্ঞাসা করিল—তুই কি করে জানলি হীরে?

দুর্গা বলিল—মজুমদারেরা বড়লোক ছিল তো মা? ওদের ভিটের জঙ্গলে কারা নাকি মোহর কুড়িয়ে পেয়েছিল—পিসি গল্প করতো। এটা একেবারে পুকুরের ধারে বনের মধ্যে পোঁতা ছিল, রোদ্দুর লেগে চক্‌চক্ কচ্ছিল, এ ঠিক মা হীরে।

সর্বজয়া বলিল—আগে উনি আসুন, ওঁকে দেখাই।

দুর্গা বাহিরে উঠানে আসিয়া আহ্লাদের সহিত ভাইকে বলিল—হীরে যদি হয় তবে দেখিস্ আমরা বড়মানুষ হয়ে যাবো।

অপু না বুঝিয়া বোকার মত হি হি করিয়া হাসিল।

ছেলেমেয়ে চলিয়া গেলে জিনিসটা বাহির করিয়া সর্বজয়া ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। গোলমত, ধারকাটা ও পলতোলা, এক মুখ ছুঁচোলো—যেন সিন্দুর কৌটার ঢাকনির উপরটা। বেশ চক্‌চকে। সর্বজয়ার মনে হইল যেন অনেক রকম রং সে ইহার মধ্যে দেখিতে পাইতেছে। তবে কাচ যে নয়—ইহা ঠিক। এ রকম ধরণের কাচ সে কখনো দেখিয়াছে বলিয়া তো মনে হয় না। হঠাৎ তাহার সমস্ত গা দিয়া যেন কিসের স্রোত বহিয়া গেল, তাহার মনের এক কোণে নানা সন্দেহের বাধা ঠেলিয়া একটা গাঢ় দুরাশা ভয়ে ভয়ে একটু উঁকি মারিল—সত্যিই যদি হীরে হয়, তা হোলে?

হীরক সম্বন্ধে তাহার ধারণাটা পরশপাথর কিংবা সাপের মাথার মণি জাতীয় ছিল। কাহিনী কথা মাত্র, বাস্তব জগতে বড় একটা দেখা যায় না। আর যদি বা দেখা যায়, তবে দুনিয়ার ঐশ্বর্য বোধ হয় এক টুকরো হীরার বদলে পাওয়া যাইতে পারে।

খানিকটা পরে একটা পুঁটুলি হাতে হরিহর বাড়ী ঢুকিল।

সর্বজয় বলিল—ওগো, শোনো, এদিকে এসো তো! দ্যাখো তো এটা কি!

হরিহর হাতে লইয়া বলিল—কোথায় পেলে?

—দুগ্‌গা গড়ের পুকুরে পানফল তুলতে গিয়েছিল, কুড়িয়ে পেয়েছে। কি বলো দিকি?

হরিহর খানিকটা উল্টাইয়া দেখিয়া বলিল—কাচ, না-হয় পাথর-টাথর হবে—এতটুকু জিনিস, ঠিক বুঝতে পারচি নে।

সর্বজয়ার মনে একটুখানি ক্ষীণ আশার রেখা দেখা দিল—কাচ হইলে তাহার স্বামী কি চিনিতে পারিত না? পরে সে চুপিচুপি, যেন পাছে স্বামী বিরুদ্ধযুক্তি দেখায় এই ভয়ে বলিল—হীরে নয় তো? দুগ্‌গা বলছিলো মজুমদার বাড়ীর গড়ে তো কত লোক কত কি কুড়িয়ে পেয়েচে। যদি হীরে হয়?

হ্যাঁ, হীরে যদি পথেঘাটে পাওয়া যেতো তবে আর ভাবনা কি ছিল? তুমিও যেমন! তাহার মনে মনে ধারণা হইল ইহা কাচ। পরক্ষণেই কিন্তু মনে হইল হয়তো হইতেও পারে। বলা যায় কি? মজুমদারেরা বড়লোক ছিল। বিচিত্র কি যে হয়তো তাহাদেরই গহনায়-টহনায় কোনো কালে বসানো ছিল, কি করিয়া মাটির মধ্যে পুঁতিয়া গিয়াছে। কথায় বলে, কপালে না থাকিলে গুপ্তধন হাতে পড়িলেও চেনা যায় না—শেষে কি দরিদ্র ব্রাহ্মণের গল্পের মত ঘটিবে!

সে বলিল—আচ্ছা দাঁড়াও, একবার বরং গাঙ্গুলী-বাড়ী দেখিয়ে আসি।

রাঁধিতে রাঁধিতে সর্বজয়া বার বার মনে মনে বলিতে লাগিল—দোহাই ঠাকুর, কত লোক তো কত কি কুড়িয়ে পায়! এই কষ্ট যাচ্ছে সংসারের—বাছাদের দিকে মুখ তুলে তাকিও—দোহাই ঠাকুর!

তাহার বুকের মধ্যে টিপ টিপ করিতেছিল।

খানিকটা পরে দুর্গা বাড়ী আসিয়া আগ্রহের সুরে বলিল—বাবা এখনও বাড়ী ফেরেনি, হ্যাঁ মা?

সঙ্গে সঙ্গে হরিহর বাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়া বলিল—হুঁ, তখনই আমি বল্লাম এ কিছুই নয়। গাঙ্গুলী মশায়ের জামাই সত্যবাবু কলকাতা থেকে এসেচেন—তিনি দেখে বল্লেন, এ একরকম বেলোয়ারী কাচ—ঝাড়-লণ্ঠনে ঝুলানো থাকে। রাস্তাঘাটে যদি হীরে জহরৎ পাওয়া যেত তা হলে—তুমিও যেমন!

পথের পাঁচালী দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বৈশাখ মাসের দিন। প্রায় দুপুর বেলা।

সর্বজয়া বাটনা বাটিতে বাটিতে ডান হাতের কাছে রক্ষিত একটা ফুলের সাজিতে (অনেকদিন হইতে ফুলের সহিত ইহার কোনো সম্পর্ক নাই, মশলা রাখিবার পাত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়) মশলা খুঁজিতে গিয়া বলিল—আবার জিরে-মরিচের পুঁটুলিটা কোথায় নিয়ে পালালি? বড্ড জ্বালাতন কচ্চিস্ অপু—রাঁধতে দিবিনে? তারপর একটু পরেই বোলো এখন—মা ক্ষিদে পেয়েছে!

অপুর দেখা নাই।

—দিয়ে যা বাপ আমার, লক্ষ্মী আমার—কেন জ্বালাতন কচ্চিস বল দিকি? দেখচিস বেলা হয়ে যাচ্ছে।

অপু রান্নাঘরের ভিতর হইতে দূয়ারের পাশ দিয়া ঈষৎ উঁকি মারিল; মায়ের চোখ সেদিকে পড়িতেই তাহার দুষ্টুমির হাসি-ভরা টুকটুকে মুখখানা শামুকের খোলার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িবার মত তৎক্ষণাৎ আবার দুয়ারের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল। সর্বজয়া বলিল—দ্যাখ দিকি কান্ড—কেন বাপু দিক করিস দুপুরবেলা? দিয়ে যা—

অপু পুনরায় হাসিমুখে ঈষৎ উঁকি মারিল।

—ঐ আমি দেখতে পেয়েছি—আর লুকুতে হবে না, দিয়ে যা—

—হি-হি-হি—আমোদের হাসি হাসিয়া সে আবার দুয়ারের আড়ালে মুখ লুকাইল।

সর্বজয়া ছেলেকে ভালরূপেই চিনিত। যখন অপু ছোট্ট খোকা দেড়বছরেরটি, তখন দেখিতে সে এখনকার চেয়েও টুকটুকে ফর্সা ছিল। সর্বজয়ার মনে আছে, সে তাহার ডাগর চোখ দুটিতে বেশ করিয়া কাজল পরাইয়া কপালের মাঝখানে একটা টিপ পরাইয়া দিত ও তাহার মাথায় একটা নীল রং-এর কম দামের ঘন্টিওয়ালা পশমের টুপি পরাইয়া, কোলে করিয়া সন্ধ্যার পূর্বে বাহিরের রকে দাঁড়াইয়া ঘুম পাড়াইবার উদ্দেশ্যে সুর টানিয়া টানিয়া বলিত—

আয় রে পাখী—ই—ই লেজঝোলা,
আমার খোকনকে নিয়ে—এ—এ—গাছে তোলা....

খোকা ট্যাঁপা-ট্যাঁপা ফুলো-ফুলো গালে মায়ের মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত, পরে হঠাৎ কি মনে করিয়া সম্পূর্ণ দন্তহীন মাড়ি বাহির করিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া মল-পরা অসম্ভবরূপ ছোট্ট

পায়ে মাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া মায়ের পিঠের দিকে মুখ লুকাইত। সর্বজয়া হাসিমুখে বলিত—ওমা, খোকা আবার কোথায় লুকুলো? তাই তো, দেখতে তো পাচ্ছিনে! ও খোকা!....পরে সে ঘাড়ের দিকে মুখ ফিরাইতেই শিশু আবার হাসিয়া মুখ সামনের দিকে ফিরাইত এবং নির্বোধের মত হাসিয়া মায়ের কাঁধে মুখ লুকাইত। যতই সর্বজয়া বলিত—ওমা, কৈ আমার খোকা কৈ—আবার কোথায় গেল কৈ দেখি, ততই শিশুর খেলা চলিত। বার বার সামনে পিছনে ফিরিয়া সর্বজয়ার ঘাড়ে ব্যথা হইলেও শিশুর খেলা শেষ হইত না। সে তখন একেবারে আন্‌কোরা টাট্‌কা, নতুন সংসারে আসিয়াছে। জগতের অফুরন্ত আনন্দভান্ডারের এক অণুর সন্ধান পাইয়া তাহার অবোধ মন তখন সেইটাকে লইয়াই লোভীর মত বার বার আস্বাদ করিয়াও সাধ মিটাইতে পারিতেছে না—তখন তাহাকে থামায় এমন সাধ্য তাহার মায়ের কোথায়? খানিকক্ষণ এরূপ করিতে করিতে তাহার ক্ষুদ্র শরীরে শক্তির ভান্ডার ফুরাইয়া আসিত—সে হঠাৎ যেন অন্যমনস্ক হইয়া হাই তুলিতে থাকিত—সর্বজয়া ছোট্ট হাঁ-টির সামনে তুড়ি দিয়া বলিত—ষাট ষাট—এই দ্যাখো দেয়ালা ক'রে ক'রে এইবার বাছার আমার ঘুম আস্‌চে। পরে সে মুগ্ধ নয়নে শিশুপুত্রের টিপ-কাজলপরা কচি মুখের দিকে চাহিয়া বলিত—কত রঙ্গই জানে সনকু আমার—তবুও তো এই ষেটের দেড় বছরের! হঠাৎ সে আকুল চুম্বনে খোকার রাঙা গাল দু'টি ভরাইয়া ফেলিত। কিন্তু মায়ের এই গাঢ় আদরের প্রতি সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়াই শিশুর নিদ্রাতুর আঁখিপাত ঢলিয়া আসিত, সর্বজয়া খোকার মাথাটা আস্তে আস্তে নিজের কাঁধে রাখিয়া বলিত—ওমা, সন্দেবেলা দ্যাখো ঘুমিয়ে পড়লো! এই ভাবছি সন্দেটা উৎরুলে দুধ খাইয়ে ঘুম পাড়াবো—দ্যাখো কান্ড!....

সর্বজয়া জানিত—ছেলে আট বছরের হইলে কি হইবে, সেই ছেলেবেলাকার মত মায়ের সহিত লুকোচুরি খেলিবার সাধ তাহার এখনও মিটে নাই।

এমন সব স্থানে সে লুকায় যেখান হইতে অন্ধও তাহাকে বাহির করিতে পারে; কিন্তু সর্বজয়া দেখিয়াও দেখে না। এক জায়গায় বসিয়াই এদিকে ওদিকে চায়, বলে—তাই তো! কোথায় গেল? দেখতে তো পাচ্ছিনে!....অপু ভাবে—মাকে কেমন ঠকাইতে পারা যায়! মায়ের সহিত এ খেলা করিয়া মজা আছে। সর্বজয়া জানে যে, খেলার যোগ দিবার ভান করিলে এইরূপ সারাদিন চলিতে পারে, কাজেই সে ধমক দিয়া কহিল—তা হোলে কিন্তু থাকলো পড়ে রান্নাবান্না। অপু, তুমি ঐ রকম করো, খেতে চাইলে তখন দেখবে মজাটা—

অপু হাসিতে হাসিতে গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া মশলার পুঁটুলি মায়ের সামনে রাখিয়া দিল।

তাহার মা বলিল, যা একটু খেলা করগে যা বাইরে। দেখগে যা দিকি তোর দিদি কোথায় আছে! গাবতলায় দাঁড়িয়ে একটু হাঁক দিয়ে দ্যাখ দিকি। তার আজ নাইবার দিন—হতচ্ছাড়া মেয়ের নাগাল পাওয়ার যো আছে? যা তো লক্ষ্মী ছেলে—

কিন্তু এখানে মাতৃ-আদেশ পালন করিয়া সুপুত্র হইবার কোনো চেষ্টা তাহার দেখা গেল না। সে বাটনা-বাটা-রত মায়ের পিছনে গিয়া কি করিতে লাগিল।

—হু-উ-উ-উ-উম্—

সর্বজয়া পিছন ফিরিয়া দেখিল অপু বড়ি দেওয়ার জন্য চালের বাতায় রক্ষিত একটা পুরানো চট আনিয়া মুড়ি দিয়া মেঝেতে হামাগুড়ি দিয়া বসিয়া আছে।

—দ্যাখো দ্যাখো, ছেলের কান্ড দ্যাখো একবার। ও লক্ষ্মীছাড়া, ওতে যে সাতরাজ্যির ধুলো। ফ্যাল্ ফ্যাল্—সাপ-মাকড় আছে না কি আছে ওর মধ্যে—আজ কদ্দিন থেকে তোলা রয়েছে—

—হু-উ-উ-উম্ (পূর্বাপেক্ষা গম্ভীর সুরে)

—নাঃ, বল্লে যদি কথা শোনে—বাবা আমার, সোনা আমার, ওখানা ফ্যাল্—আমার বাট্‌নারহাত—দুষ্টুমি কোরো না, ছিঃ!

থলে মোড়া মূর্ত্তিটা হামাগুড়ি দিয়া এবার দুই কদম আগাইয়া আসিল। সর্বজয়া বলিল—ছুঁবি ছুঁবি—ছুঁও না মাণিক আমার—ওঃ, ভয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গিইচি—ভারি ভয় হয়েছে আমার!

অপু হি-হি করিয়া হাসিয়া থলেখানা খুলিয়া এক পাশে রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মাথার

চুল, মুখ, চোখের ভুরু, কান ধূলায় ভরিয়া গিয়াছে। মুখ কাঁচুমাচু করিয়া সে সামনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাঁত কিচ্ কিচ্ করিতেছে।

—ওমা আমার কি হবে! হ্যাঁরে হতভাগা, ধুলো মেখে যে একেবারে ভূত সেজেছিস? উঃ—ওই পুরানো থলেটার ধুলো! এক্কেবারে পাগল!

ধূলিধূসরিত অবোধ পুত্রের প্রতি করুণা ও মমতায় সর্বজয়ার বুক ভরিয়া আসিল; কিন্তু অপুর পরনে বাসি কাপড়—নাহিয়া-ধুইয়া ছোঁয়া চলে না বলিয়া বলিল—ঐ গামছাখানা নে, ঐ দিয়ে ধুলোগুলো আগে ঝেড়ে ফ্যাল্। ছেলে যেন কি একটা!

খানিকটা পরে ছেলেকে রান্নাঘরে পাহারার জন্য বসাইয়া সে জল আনিতে বাহির হইয়া যাইতেছে, দেখে দরজা দিয়া দুর্গা বাড়ী ঢুকিতেছে। মুখ রৌদ্রে রাঙা, মাথার চুল উসকোখুসকো, অথচ ধুলোমাখা পায়ে আলতা পরা। একেবারে মায়ের সামনে পড়াতে আঁচলে বাঁধা আম দেখাইয়া ঢোঁক গিলিয়া কহিল—এই পুণ্যিপুকুরের জন্যে ছোলার গাছ আনতে গেলাম রাজীদের বাড়ী, আম পেড়ে এনেচে ভাগ হচ্ছে, তাই রাজীর পিসিমা দিলে।

—আহা, মেয়ের দশা দ্যাখো, পায়ে খড়ি উড়চে, মাথার চুল দেখলে গায়ে জ্বর আসে;—পুণ্যিপুকুরের জন্য ভেবে তো তোমার রাত্তিরে ঘুম নেই!—পরে মেয়ের পায়ের দিকে চাহিয়া কহিল—ফের বুঝি লক্ষ্মীর চুবড়ী থেকে আলতা বের করে পরা হয়েচে?

দুর্গা আঁচল দিয়া মুখ মুছিয়া উস্কোখুসকো চুল কপাল হইতে সরাইয়া বলিল—লক্ষ্মীর চুবড়ির আল্‌তা বৈকি! আমি সেদিন হাটে বাবাকে দিয়ে আলতা আনালাম এক পয়সার, তার দরুণ দু'পাতা আল্‌তা আমার পুতুলের বাক্সে ছিল না বুঝি?

হরিহর কল্‌কে হাতে রান্নাঘরের দাওয়ায় আগুন লইতে আসিল।

সর্বজয়া বলিল—ঘন্টায় ঘন্টায় তামাকে আগুন দি কোথা থেকে? সুঁদরীকাঠের বন্দোবস্ত করে রেখেচো কিনা একেবারে! বাঁশের চেলার আগুন কতক্ষণ থাকে যে আবার ঘড়ি-ঘড়ি তামাক খাওয়ার আগুন যোগাবো? পরে আগুন তুলিবার জন্য রক্ষিত একটা ভাঙা পিতলের হাতাতে খানিকটা আগুন উঠাইয়া বিরক্তমুখে সামনে ধরিল। পরে সুর নরম করিয়া বলিল—কি হোল?

—এই রকম ছিল তো সবই ঠিক, বাড়ীসুদ্ধ সবাই মন্তর নেবার কথাই হয়েছিল, কিন্তু একটু মুস্কিল হয়ে যাচ্ছে। মহেশ বিশ্বেসের শ্বশুরবাড়ীর বিষয়-আশয় নিয়ে কি গোলমাল বেধেছে, বিশ্বেস মশায় গিয়েচে সেখানে চলে—সে-ই আসল মালিক কিনা। তাই আবার একটু পিছিয়ে গেল; আবার এদিকেও তো অকাল পড়চে আষাঢ় মাস থেকে।

—আর সেই যে বাসের জায়গা দেবে, বাস করাবে বলছিল, তার কি হোল?

—এই নিয়ে একটু মুস্কিল বেঁধে গেল কিনা! ধরো যদি মন্তর নেওয়া পিছিয়ে যায়, তবে ও-কথা আর কি ক'রে ওঠাই?

সর্বজয়া খুব আশায় আশায় ছিল, সংবাদ শুনিয়া আশাভঙ্গ হইয়া পড়িল। বলিল, তা ওখানে না হয়, অন্য কোন জায়গায় দ্যাখো না? বিদেশে মান আছে, এখানে কেউ পোঁছে? এই দ্যাখো আম-কাঁঠালের সময় একটা আম-কাঁঠাল ঘরে নেই—মেয়েটা কাদের বাড়ী থেকে আজ দুটো আধপচা আম নিয়ে এল।—পরে সে উদ্দেশ্যে বাড়ীর পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল—এই ঘরের দোর থেকে ঝুড়ি-ঝুড়ি আম পেড়ে নিয়ে যায়—বাছারা আমার চেয়ে চেয়ে দ্যাখে,—এ কি কম কষ্ট!

বাগানের কথার উল্লেখে হরিহর বলিল—উঃ, ও কি কম ধড়িবাজ নাকি! বছরে পঁচিশ টাকা খাজনা ফেলে-ঝেলে হোত, তাই কিনা লিখে নিলে পাঁচ টাকায়! আমি গিয়ে এত করে বললাম, কাকা আমার ছেলেটা মেয়েটা আছে, ঐ বাগানে আম-জাম কুড়িয়ে মানুষ হচ্ছে। আমার তো আর কোথাও কিছু নেই। আর ধরুন, আমাদের জ্ঞাতির বাগান—আপনার তো ঈশ্বর ইচ্ছেয় কোনো অভাব নেই, দুটো অত বড় বাগান রয়েচে, আম জাম নারকেল সুপারি—আপনার অভাব কি? বাগানখানা গিয়ে ছেড়ে দিন গে যান! তা বল্লে কি জানো? বল্লে নীলমনি দাদা বেঁচে থাকতে ওর কাছে নাকি তিনশো টাকা ধার করেছিল, তাই অমনি করে শোধ করে নিল। শোন কথা! নীলমণিদাদার বড্ড অভাব ছিল

কিনা, তাই তিনশো টাকার জন্যে গিয়েছে ভুবন মুখুয্যের কাছে হাত পাততে! বৌদিকে ভালমানুষ পেয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে নিলে আর কি!

—ভালমানুষ তো কত! সেও নাকি বলেছে, জ্ঞাতিশত্তুর—পর-হাতে বাগান থাকলে তো আর কিছু পাওয়া যাবে না, ফল-পাকুড় এমনিই খাবে, তার চেয়ে কিছু কম জমাতেও যদি বন্দোবস্ত হয়, খাজনাটা তো পাওয়া যাবে।

হরিহর বলিল—খাজনা কি আর আমি দিতাম না? বাগান জমা দেবে, তাই কি আমায় জানতে দিলে? বৌদিদিকে—লুচি-মোহনভোগ খাইয়ে হাত ক'রে চুপি চুপি লিখিয়ে নিলে!....

পথের পাঁচালী ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বৈকালের দিকটা হঠাৎ চারিদিক অন্ধকার করিয়া কালবৈশাখীর ঝড় উঠিল। অনেকক্ষণ হইতে মেঘ-মেঘ করিতেছিল, তবুও ঝড়টা যেন খুব শীঘ্র আসিয়া পড়িল। অপুদের বাড়ীর সামনে বাঁশঝাড়ের বাঁশগুলো পাঁচিলের উপর হইতে ঝড়ের বেগে হটিয়া ওধারে পড়াতে বাড়ীটা যেন ফাঁকা ফাঁকা দেখাইতে লাগিল—ধূলা বাঁশপাতা, কাঁটালপাতা, খড় চারিধার হইতে উড়িয়া তাহাদের উঠান ভরাইয়া ফেলিল। দুর্গা বাটীর বাহির হইয়া আম কুড়াইবার জন্য দৌড়িল—অপুও দিদির পিছু পিছু ছুটিল। দুর্গা ছুটিতে ছুটিতে বলিল—শীগগিরি ছোট্, তুই বরং সিঁদুরকৌটা-তলায় থাক্ আমি যাই সোনামুখী-তলায়—দৌড়ো—দৌড়ো। ধূলায় চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে—বড় বড় গাছের ডাল ঝড়ে বাঁকিয়া গাছ নেড়া-নেড়া দেখাইতেছে। গাছে গাছে সোঁ সোঁ, বোঁ বোঁ শব্দে বাতাস বাধিতেছে—বাগানে শুকনা ডাল, কুটা, বাঁশের খোলা উড়িয়া পড়িতেছে—শুকনা বাঁশপাতা ছুঁচালো আগাটা উঁচুদিকে তুলিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আকাশে উঠিতেছে—কুক্‌শিমা গাছের শুঁয়োর মত পালকওয়ালা সাদা সাদা ফুল ঝড়ের মুখে কোথা হইতে অজস্র উড়িয়া আসিতেছে—বাতাসের শব্দে কান পাতা যায় না!

সোনামুখী-তলায় পৌঁছিয়াই অপু মহা-উৎসাহে চীৎকার করিতে করিতে লাফাইয়া এদিক ওদিক ছুটিতে লাগিল—এই যে দিদি, ওই একটা পড়লো রে দিদি—ঐ আর একটা রে দিদি! চীৎকার যতটা করিতে লাগিল তাহার অনুপাতে সে আম কুড়াইতে পারিল না। ঝড় ঘোর রবে বাড়িয়া চলিয়াছে। ঝড়ের শব্দে আম পড়ার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না, যদিবা শোনা যায় ঠিক কোন জায়গা বারবর শব্দটা হইল—তাহা ধরিতে পারা যায় না। দুর্গা আট-নয়টা আম কুড়াইয়া ফেলিল, অপু এতক্ষণের ছুটোছুটিতে মোটে পাইল দুইটা। তাহাই সে খুশির সহিত দেখাইয়া বলিতে লাগিল—এই দ্যাখ দিদি, কত বড় দ্যাখ্—ঐ একটা পড়লো—ওই ওদিকে—

এমন সময় হৈ-হাই শব্দে ভুবন মুখুয্যের বাড়ীর ছেলে-মেয়েরা সব আম কুড়াইতে আসিতেছে শোনা গেল। সতু চেঁচাইয়া বলিল—ও ভাই, দুগ্‌গাদি আর অপু আম কুড়ুচ্ছে—

দল আসিয়া সোনামুখী-তলায় পৌঁছিল। সতু বলিল—আমাদের বাগানে কেন এয়েচ আম কুড়ুতে? সেদিন মা বারণ করে দিয়েচে না? দেখি কতগুলো আম কুড়িয়েচো?

পরে দলের দিকে চাহিয়া বলিল—সোনামুখীর কতগুলো আম কুড়িয়েচে দেখেছিস টুনু?—যাও আমাদের বাগান থেকে দুগ্‌গাদি—মাকে গিয়ে নইলে বলে দেবো।

রাণু বলিল—কেন তাড়িয়ে দিচ্ছিস সতু? ওরাও কুড়ুক—আমরাও কুড়ুই।

—কুড়োবে বই কি! ও এখানে থাকলে সব আম ওই নেবে। আমাদের বাগানে কেন আসবে ও?—না, যাও দুগ্‌গাদি—আমাদের তলায় থাকতে দেবো না।

অন্য সময় হইলে দুর্গা হয়তো এত সহজে পরাজয় স্বীকার করিত না—কিন্তু সেদিন ইহাদের কৃত অভিযোগে মায়ের নিকট মার খাইয়া তাহার পুনরায় বিবাদ বাধাইবার সাহস ছিল না। তাই খুব সহজেই পরাজয় স্বীকার করিয়া লইয়া সে একটু মনমরা ভাবে বলিল—অপু, আয় রে চল্। পরে হঠাৎ মুখে কৃত্রিম উল্লাসের ভাব আনিয়া বলিল—আমরা সেই জায়গায় যাই চল্ অপু, এখানে থাকতে না দিলে ব'য়ে গেল—বুঝলি তো?—এখানকার চেয়েও বড় বড় আম—তুই আমি মজা করে কুড়োবো

এখন—চলে আয়—এবং এখানে এতক্ষণ ছিল বলিয়া একটা বৃহত্তর লাভ হইতে বঞ্চিত ছিল, চলিয়া যাওয়ায় প্রকৃতপক্ষে শাপে বর হইল, সকলের সম্মুখে এইরূপ ভাব দেখাইয়া যেন অধিকতর উৎসাহের সহিত অপুকে পিছনে লইয়া রাংচিতার বেড়ার ফাঁক গলিয়া বাগানের বাহির হইয়া গেল। রাণু বলিল—কেন ভাই ওদের তাড়িয়ে দিলে—তুমি ভারি হিংসুক কিন্তু সতুদা! রাণুর মনে দুর্গার চোখের ভরসা-হারা চাহনি বড় ঘা দিল।

অপু অতশত বোঝে নাই, বেড়ার বাহিরের পথে আসিয়া বলিল—কোন্ জায়গায় বড় বড় আম রে দিদি? পুঁটুদের সল্‌তেখাগী-তলায়? কোন্ তলায় দুর্গা তাহা ঠিক করে নাই, একটু ভাবিয়া বলিল—চল্ গড়ের পুকুরের ধারের বাগানে যাবি—ওদিকে সব বড় বড় গাছ আছে—চল্—। গড়ের পুকুর এখান হইতে প্রায় পনেরো মিনিট ধরিয়া সুঁড়িপথে অনবরত বন-বাগান অতিক্রম করিয়া তবে পৌঁছানো যায়। অনেককালের প্রাচীন আম ও কাঁঠালের গাছ—গাছতলায় বন-চালতা ময়না-কাঁটা ষাঁড়া গাছের দুর্ভেদ্য জঙ্গল। দূর বলিয়া এবং জনপ্রাণীর বাসশূন্য গভীর বনের মধ্যে বলিয়া এসব স্থানে কেহ বড় একটা আম কুড়াইতে আসে না। কাছির মত মোটা মোটা অনেককালের পুরানো গুলঞ্চ লতা এ-গাছে ও-গাছে দুলিতেছে—বড় বড় প্রাচীন গাছের তলাকার কাঁটাভরা ঘন ঝোপ-জঙ্গল খুঁজিয়া তলায় পড়া আম বাহির করা সহজসাধ্য তো নহেই, তাহার উপর ঘনায়মান নিবিড়-কৃষ্ণ ঝোড়ো মেঘে ও বাগানের মধ্যের জঙ্গলে গাছের আওতায় এরূপ অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়াছে যে, কোথায় কি ভাল দেখা যায় না। তবু খুঁজিতে খুঁজিতে নাছোড়বান্দা দুর্গা গোটা আট-দশ আম পাইল।

হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল—ওরে অপু—বৃষ্টি এল!

সঙ্গে সঙ্গে ঝড়টা যেন খানিকক্ষণ একটু নরম হইল—ভিজে মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ পাওয়া গেল—একটু পরেই মোটা মোটা ফোঁটায় চড়বড় করিয়া গাছের পাতায় বৃষ্টি পড়িতে শুরু করিল।

—আয় আমরা এই গাছতলায় দাঁড়াই—এখানে বৃষ্টি পড়বে না—

দেখিতে দেখিতে চারিদিক ধোঁয়াকার করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি নামিল—বৃষ্টির ফোঁটা পড়িবার জোরে গাছের পাতা ছিঁড়িয়া উড়িয়া পড়িতে লাগিল—ভরপুর টাট্‌কা ভিজা মাটির গন্ধ আসিতে লাগিল। ঝড় একটু যেন নরম পড়িয়াছিল—তাহাও আবার বড় বাড়িল—দুর্গা যে গাছতলায় দাঁড়াইয়াছিল, এমনি হয়তো হঠাৎ তথায় বৃষ্টি পড়িত না, কিন্তু পূবে হাওয়ার ঝাপটা গাছতলা ভাসাইয়া লইয়া চলিল। বাড়ী হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে—অপু ভয়ের স্বরে বলিল—ও দিদি—বড্ড যে বৃষ্টি এল!

—তুই আমার কাছে আয়—দুর্গা তাহাকে কাছে আনিয়া আঁচল দিয়া ঢাকিয়া কহিল—এ বিষ্টি আর কতক্ষণ হবে—এই ধরে গেল বলে—বিষ্টি হোল ভালই হোল—আমরা আবার সোনামুখী-তলায় যাবো এখন, কেমন তো?

দুজনে চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল—

নেবুর পাতায় করমচা,
হে বিষ্টি ধ'রে যা—

কড়্-কড়্—কড়াৎ....প্রকাণ্ড বন বাগানের অন্ধকার মাথাটা যেন এদিক হইতে ওদিক পর্যন্ত চিরিয়া গেল—চোখের পলকের জন্য চারিধারে আলো হইয়া উঠিল—সামনের গাছের মগডালে থোলো থোলো বন-ধুঁধুল ফল ঝড়ে দুলিতেছে। অপু দুর্গাকে ভয়ে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—ও দিদি!

—ভয় কি রে! রাম রাম বল্—রাম রাম রাম রাম—নেবুর পাতায় করমচা হে বিষ্টি ধরে যা—নেবুর পাতায় করমচা হে বিষ্টি ধ'রে যা—নেবুর পাতায় করমচা—

বৃষ্টির ঝাপটায় তাহাদের কাপড় চুল ভিজিয়া টস্‌টস্ করিয়া জল ঝরিতে লাগিল—গুম্-গুম্-গুম্-ম্-ম্—চাপা গম্ভীর ধ্বনি—একটা বিশাল লোহার রুল কে যেন আকাশের ধাতব মেঝেতে এদিকে হইতে ওদিকে টানিয়া লইয়া বেড়াইতেছে—অপু শঙ্কিত সুরে বলিল—ঐ দিদি, আবার—

—ভয় নাই, ভয় কি?—আর একটু সরে আয়—এঃ, তোর মাথাটা ভিজে যে একেবারে জুবড়ি হয়ে গিয়েছে—

চারিধারে শুধু মুষলধারে বৃষ্টিপতনের হুস্-স্-স্-স্ একটানা শব্দ, মাঝে মাঝে দমকা ঝড়ের সোঁ-ও-ও-ও, বোঁ-ও-ও-ও-ও রব, ডালপালার ঝাপটের শব্দ—মেঘের ডাকে কানে তালা ধরিয়া যায়। এক-একবার দুর্গার মনে হইতেছিল সমস্ত বাগানখানা ঝড়ে মড়-মড় করিয়া ভাঙ্গিয়া উপুড় হইয়া তাহাদের চাপা দিল বুঝি।

অপু বলিল—দিদি, বিষ্টি যদি আর না থামে?

হঠাৎ ঝটিকাক্ষুব্ধ অন্ধকার আকাশের এ-প্রান্ত হইতে লক্‌লকে আলো জিহ্বা মেলিয়া বিদ্রূপের বিকট অট্টহাস্যের রোল তুলিয়া এক লহমায় ও-প্রান্তের দিকে ছুটিয়া গেল।

কড়্-কড়্-কড়াৎ!

সঙ্গে সঙ্গে বাগানের মাথায় বৃষ্টির ধোঁয়ার রাশি চিরিয়া ফাড়িয়া উড়াইয়া, ভৈরবী প্রকৃতির উন্মত্ততার মাঝখানে ধরা পড়া দুই অসহায় বালক-বালিকার চোখ ঝলসাইয়া তীক্ষ্ণ নীল বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

অপু ভয়ে চোখ বুজিল।

দুর্গা শুষ্ক গলায় উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল,—বাজ পড়িতেছে নাকি?—গাছের মাথায় বন-ধুঁধুলের ফল দুলিতেছে।

সেই বড় লোহার রুলটাকে আকাশের ওদিক হইতে কে যেন আবার এদিকে টানিয়া আনিতেছিল—

শীতে অপুর ঠক্ ঠক্ করিয়া দাঁতে দাঁত লাগিতেছিল—দুর্গা তাহাকে আরও কাছে টানিয়া আনিয়া শেষ আশ্রয়ের সাহসে বার বার দ্রুত আবৃত্তি করিতে লাগিল—নেবুর পাতায় করম্‌চা হে বিষ্টি ধরে যা—নেবুর পাতায় করমচা....ভয়ে তাহার স্বর কাঁপিতেছিল।

সন্ধ্যা হইবার বেশী বিলম্ব নাই। ঝড়-বৃষ্টি খানিকক্ষণ থামিয়া গিয়াছে। সর্বজয়া বাহিরের দরজায় দাঁড়াইয়া আছে। পথে জমিয়া যাওয়া বৃষ্টির জলের উপর ছপ্-ছপ্ শব্দ করিতে করিতে রাজকৃষ্ণ পালিতের মেয়ে আশালতা পুকুর ঘাটে যাইতেছিল। সর্বজয়া জিজ্ঞাসা করিল—হাঁ মা, দুর্গা আর অপুকে দেখেছিস্ ওদিকে?

আশালতা বলিল—না খুড়ীমা, দেখিনি তো। কোথায় গিয়েচে? তারপর হাসিয়া বলিল—কি ব্যাঙ-ডাকানি জল হয়ে গেল খুড়ীমা!

—সেই ঝড়ের আগে দুজনে বেরিয়েচে আম কুড়োতে যাই বলে, আর তো ফেরেনি—এই ঝড়-বিষ্টি গেল, সন্দে হলো, ও মা, কোথায় গেল তবে?

সর্বজয়া উদ্বিগ্ন মনে বাড়ীর মধ্যে ফিরিয়া আসিল। কি করিবে ভাবিতেছে এমন সময় খিড়কীর দরজা ঠেলিয়া খুলিয়া আপাদমস্তক সিক্ত অবস্থায় দুর্গা আগে আগে একটা ঝুনা নারিকেল হাতে ও পিছনে পিছনে অপু একটা নারিকেলের বাগ্‌লো টানিয়া লইয়া বাড়ী ঢুকিল। সর্বজয়া তাড়াতাড়ি ছেলে-মেয়ের কাছে গিয়া বলিল—ওমা আমার কি হবে! ভিজে যে সব একেবারে পান্তা ভাত হয়েচিস্! কোথায় ছিলি বিষ্টির সময়? ছেলেকে কাছে আনিয়া মাথায় হাত দিয়া বলিল—ওমা, মাথাটা যে ভিজে একেবারে জুবড়ি। পরে আহ্লাদের সহিত বলিল—নারকোল কোথা পেলি রে দুর্গা?

অপু ও দুর্গা দুজনেই চাপা কণ্ঠে বলিল—চুপ চুপ মা—সেজজেঠিমা বাগান যাচ্ছে—এই গেল—ওদের বাগানের বেড়ার ধারের দিকে যে নারকোল গাছটা ওর তলায় পড়ে ছিল। আমরাও বেরুচ্চি, সেজজেঠিমাও ঢুকলো।

দুর্গা বলিল—অপুকে তো ঠিক দেখেচে—আমাকেও বোধ হয় দেখেচে। পরে সে উৎসাহের সঙ্গে অথচ চাপা সুরে বলিতে লাগিল—একেবারে গাছের গোড়ায় পড়ে ছিল মা, আগে আমি টের পাইনি, সোনামুখী-তলায় যদি আম প'ড়ে থাকে তাই দেখতে গিয়ে দেখি বাগলোটা পড়ে রয়েচে। অপুকে বললাম—অপু বাগলোটা নে—মার ঝাঁটার কষ্ট, ঝাঁটা হবে। তারপরই দেখি—হস্তস্থিত নারিকেলটার দিকে উজ্জ্বল মুখে চাহিয়া বলিল—বেশ বড়, না মা?

অপু খুশির সুরে হাত নাড়িয়া বলিল—আমি অমনি বাগলোটা নিয়ে ছুট—

সর্বজয়া বলিল—বেশ বড় দোমালা নারকোলটা। ছেঁচতলায় রেখে দে, জল দিয়ে নেবো—

অপু অনুযোগের সুরে বলিল—তুলি বলো মা নারকোল নেই, নারকোল নেই,—এই তো হোল নারকোল! এইবার কিন্তু বড়া করে দিতে হবে। আমি ছাড়বো না—কখ্‌খনো—

বৃষ্টির জলে ছেলেমেয়ের মুখ বৃষ্টিধোয়া জুঁই ফুলের মত সুন্দর দেখাইতেছিল। ঠান্ডায় তাহাদের ঠোঁট নীল হইয়া গিয়াছে, মাথার চুল ভিজিয়া কানের সঙ্গে লেপটাইয়া লাগিয়া গিয়াছে। সর্বজয়া বলিল—আয় সব, কাপড় ছাড়িয়ে দিই আগে, পায়ে জল দিয়ে রোয়াকে ওঠ্‌ সব—

খানিক পরে সর্বজয়া কুয়ার জল তুলিতে ভুবন মুখুজ্যের বাড়ী গেল। ভুবন মুখুয্যের খিড়কী-দোর পর্যন্ত যাইতেই সে শুনিল সেজঠাকরুণ বাড়ীর মধ্যে চীৎকার করিয়া বাড়ী মাথায় করিতেছেন।

—এক মুঠো টাকা খরচ করে তবে বাগান নেওয়া—মাগ্‌না তো নয়। তার কোনো কুটোটা যদি হাঘরেদের জন্যে ঘরে ঢুকবার যো আছে! ঐ ছুঁড়ীটা রাদ্দিন বাগানে বসে আছে, কুটোগাছটা নিয়ে গিয়ে ঘরে তুলবে—এতে মাগীরও শিক্ষে আছে, ও মাগী কি কম নাকি?—ও মা, ভাবলাম বিষ্টি থেমেচে, যাই একবার বাগানটা গিয়ে দেখে আসি—এই এত বড় নারকোলটা কুড়িয়ে নিয়ে একেবারে দুড়্‌দুড়্‌ দৌড়!—এত শত্তুরতা যেন ভগবান্‌ সহ্যি না করেন—উচ্ছন্ন যান্‌, উচ্ছন্ন যান্‌—এই ভস্‌ সন্দে বেলা বলচি, আর যেন নারকোল খেতে না হয়—একবার শীগ্‌গির যেন ছাতিমতলা সই হন—

সর্বজয়া খিড়কীর বাহিরে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ছেলেমেয়ের বর্ষণসিক্ত কচিমুখ মনে করিয়া সে ভাবিল যদি গালাগাল ওদের লাগে! বাবা যে লোক! দাঁতে বিষ আছে! কি করি? কথাটা ভাবিতেই তাহার গা শিহরিয়া উঠিয়া সর্বশরীর যেন অবশ হইয়া গেল। সে আর মুখুয্যেবাড়ী ঢুকিল না—আশশেওড়া বনে, বাঁশঝাড়ের তলায় বর্ষণস্তব্ধ সন্ধ্যায় জোনাকী জ্বলিতেছে, পা যেন আর উঠিতে চাহে না—ভয়ে ভয়ে সে জল তুলিবার ছোট্ট বালতিটা ও ঘড়া কাঁখে লইয়া বাড়ীর দিকে ফিরিল।

পথে আসিতে আসিতে ভাবিল—যদি নারকোলটা ওদের ফেরত দিই—তাহলেও কি গাল লাগবে? তা কেন লাগবে—যার জিনিস তাকে তো ফেরৎ দেওয়া হোল, তা কখনো লাগে?

বাড়ীতে পা দিয়েই মেয়েকে বলিল—দুর্গ্‌গা, নারকোলটা সতুদের বাড়ী দিয়ে আয় গিয়ে।

অপু ও দুর্গা অবাক হইয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—

দুর্গা বলিল—এখ্‌খুনি?

—হ্যাঁ—এখ্‌খুনি দিয়ে আয়। ওদের খিড়কীর দোর খোলা আছে। চট করে যা। বলে আয়, আমরা কুড়িয়ে পেইছিলাম, এই নাও দিয়ে গেলাম।

—অপু আমাকে একটু দাঁড়াবে না, মা? বড্ড অন্ধকার হয়েচে, চল্‌ অপু আমার সঙ্গে।

ছেলেমেয়ে চলিয়া গেলে সর্বজয়া তুলসীতলায় প্রদীপ দিতে দিতে গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—ঠাকুর, নারকোল ওরা শত্তুরতা ক'রে কুড়ুতে যায়নি সে তো তুমি জানো, এ গাল যেন ওদের না লাগে। দোহাই ঠাকুর, ওদের তুমি বাঁচিয়ে-বর্তে রেখো ঠাকুর। ওদের তুমি মঙ্গল কোরো। তুমি ওদের মুখের দিকে চেও। দোহাই ঠাকুর।

পথের পাঁচালী

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

গ্রামের প্রসন্ন গুরুমহাশয় বাড়ীতে একখানা মুদীর দোকান করিতেন। এবং দোকানেরই পাশে তাঁহার পাঠশালা ছিল। বেত ছাড়া পাঠশালায় শিক্ষাদানের বিশেষ উপকরণ-বাহুল্য ছিল না। তবে এই বেতের উপর অভিভাবকদেরও বিশ্বাস গুরুমহাশয়ের অপেক্ষা কিছু কম নয়। তাই তাঁহারা গুরুমহাশয়কেও বলিয়া দিয়াছিলেন, ছেলেদের শুধু পা খোঁড়া এবং চোখ কানা না হয়, এইটুকু মাত্র নজর রাখিয়া তিনি যত ইচ্ছা বেত চালাইতে পারেন। গুরুমহাশয়ও তাঁহার শিক্ষাদানের উপযুক্ত ক্ষমতা ও উপকরণের অভাব একমাত্র বেতের সাহায্যে পূর্ণ করিবার চেষ্টায় এরূপ বেপরোয়া ভাবে বেত চালাইয়া থাকেন যে ছাত্রগণ পা খোঁড়া ও চক্ষু কানা হওয়ার দুর্ঘটনা হইতে কোনরূপে প্রাণে বাঁচিয়া যায় মাত্র।

পৌষ মাসের দিন। অপু সকালে লেপ মুড়ি দিয়া রৌদ্র উঠিবার অপেক্ষায় বিছানায় শুইয়া ছিল,

মা আসিয়া ডাকিল—অপু, ওঠ শীগ্‌গির করে, আজ তুমি যে পাঠশালায় পড়তে যাবে! কেমন সব বই আনা হবে তোমার জন্যে, শেলেট্। হ্যাঁ ওঠো, মুখ ধুয়ে নাও, উনি তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে পাঠশালায় দিয়ে আসবেন।

পাঠশালার নাম শুনিয়া অপু সদ্য-নিদ্রোত্থিত চোখ দুটি তুলিয়া অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার ধারণা ছিল যে যাহারা দুষ্টু ছেলে, মার কথা শোনে না, ভাইবোনদের সঙ্গে মারামারি করে, তাহাদেরই শুধু পাঠশালায় পাঠানো হইয়া থাকে। কিন্তু সে তো কোনদিন ওরূপ করে না, তবে সে কেন পাঠশালায় যাইবে?

খানিক পরে সর্বজয়া পুনরায় আসিয়া বলিল—ওঠ অপু, মুখ ধুয়ে নাও, তোমায় অনেক করে মুড়ি বেঁধে দেবো এখন, পাঠশালায় ব'সে ব'সে খেও এখন লক্ষ্মী মাণিক!

মায়ের কথায় উত্তরে সে অবিশ্বাসের সুরে বলিল—ইঃ! পরে মায়ের দিকে চাহিয়া জিভ বাহির করিয়া চোখ বুজিয়া একপ্রকার মুখভঙ্গী করিয়া রহিল, উঠিবার লক্ষণ দেখাইল না।

কিন্তু অবশেষে বাবা আসিয়া পড়াতে অপুর বেশী জারিজুরি খাটিল না, যাইতে হইল। মা'র প্রতি অভিমানে তাহার চোখে জল আসিতেছিল, খাবার বাঁধিয়া দিবার সময় বলিল—আমি কখ্‌খনো আর বাড়ী আসচিনে, দেখো!

—ষাট, ষাট, বাড়ী আসবিনে কি! ওকথা বলতে নেই, ছিঃ! পরে তাহার চিবুকে হাত দিয়া চুমু খাইয়া বলিল—খুব বিদ্যে হোক, ভাল করে লেখাপড়া শিখো, তখন দেখবে তুমি কত বড় চাকরি করবে, কত টাকা হবে তোমার, কোনো ভয় নেই।—ওগো, তুমি গুরুমহাশয়কে ব'লে দিও যেন ওকে কিছু বলে না।

পাঠশালায় পৌঁছাইয়া দিয়া হরিহর বলিল—ছুটি হবার সময়ে আমি আবার এসে তোমাকে বাড়ী নিয়ে যাবো, অপু ব'সে ব'সে লেখো, গুরুমহাশয়ের কথা শুনো, দুষ্টুমি কোরো না যেন! খানিকটা পরে পিছন ফিরিয়া অপু চাহিয়া দেখিল বাবা ক্রমে পথের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল। অকূল সমুদ্র! সে অনেকক্ষণ মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। পরে ভয়ে ভয়ে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, গুরুমহাশয় দোকানের মাচায় বসিয়া দাঁড়িতে সৈন্ধব লবণ ওজন করিয়া কাহাকে দিতেছেন, কয়েকটি বড় বড় ছেলে আপন আপন চাটাইএ বসিয়া নানারূপ কুস্বর করিয়া কি পড়িতেছে ও ভয়ানক দুলিতেছে। তাহার অপেক্ষা আর একটু ছোট ছেলে খুঁটিতে ঠেস দিয়া আপন মনে পাততাড়ির তালপাতা মুখে পুরিয়া চিবাইতেছে। আর একটি বড় ছেলে, তাহার গালে একটা আঁচিল, সে দোকানের মাচার নীচে চাহিয়া কি লক্ষ্য করিতেছে। তাহার সামনে দুজন ছেলে বসিয়া শ্লেটে একটা ঘর আঁকিয়া কি করিতেছিল। একজন চুপিচুপি বলিতেছিল, আমি এই ঢ্যারা দিলাম, অন্য ছেলেটি বলিতেছিল, এই আমার গোল্লা, সঙ্গে সঙ্গে তার শ্লেটে আঁক পড়িতেছিল ও মাঝে মাঝে আড়চোখে বিক্রয়রত গুরুমহাশয়ের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। অপু নিজের শ্লেটে বড় বড় করিয়া বানান লিখিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে ঠিক জানা যায় না, গুরুমহাশয় হঠাৎ বলিলেন—এই ফনে, শ্লেটে ওসব কি হচ্ছে রে? সম্মুখের সেই ছেলে দুটি অমনি শ্লেটখানা চাপা দিয়া ফেলিল, কিন্তু গুরুমহাশয়ের শ্যেনদৃষ্টি এড়ানো বড় শক্ত, তিনি বলিলেন, এই সতে, ফনের শ্লেটটা নিয়ে আয় তো! তাঁহার মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে বড় আঁচিলওয়ালা ছেলেটি ছোঁ মারিয়া শ্লেটখানা উঠাইয়া লইয়া গিয়া দোকানের মাচার উপর হাজির করিল।

—হুঁ, এসব কি লেখা হচ্ছে শ্লেটে?—সতে, ধরে নিয়ে আয় তো দুজনকে, কান ধরে নিয়ে আয়!

যেভাবে বড় ছেলেটা ছোঁ মারিয়া শ্লেট লইয়া গেল, এবং যেভাবে বিপন্ন মুখে সামনের ছেলে দুটি পায়ে পায়ে গুরুমহাশয়ের কাছে যাইতেছিল, তাহাতে হঠাৎ অপুর বড় হাসি পাইল, সে ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। পরে খানিকটা হাসি চাপিয়া রাখিয়া আবার ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

গুরুমহাশয় বলিলেন, হাসে কে? হাস্‌চো কেন খোকা, এটা কি নাট্যশালা? অ্যাঁ? এটা নাট্যশালা নাকি ?

নাট্যশালা কি, অপু তাহা বুঝিতে পারিল না, কিন্তু ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গেল।

—সতে, একখানা থান ইট নিয়ে আয় তো তেঁতুলতলা থেকে বেশ বড় দেখে?

অপু ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল, তাহার গলা পর্যন্ত কাঠ হইয়া গেল, কিন্তু ইট আনীত হইলে সে দেখিল, ইটের ব্যবস্থা তাহার জন্য নহে, ঐ ছেলে দুটির জন্য। বয়স অল্প বলিয়াই হউক বা নতুন ভর্তি বলিয়াই হউক, গুরুমহাশয় সেযাত্রা তাহাকে রেহাই দিলেন।

পাঠশালা বসিত বৈকালে। সবসুদ্ধ আট-দশটি ছেলেমেয়ে পড়িতে আসে। সকলেই বাড়ী হইতে ছোট ছোট মাদুর আনিয়া পাতিয়া বসে; অপুর মাদুর নাই, সে বাড়ী হইতে একখানা জীর্ণ কার্পেটের আসন আনে। যে ঘরটায় পাঠশালা হয়, তার কোনো দিকে বেড়া বা দেওয়াল কিছু নাই, চারিধারে খোলা; ঘরের মধ্যে সারি দিয়া ছাত্রগণ বসে। পাঠশালা ঘরের চারিপাশে বন, পিছন দিকে গুরুমহাশয়ের পৈতৃক আমলের বাগান। অপরাহ্নের তাজা গরম রৌদ্র বাতাবীলেবু, গাব ও পেয়ারাফুলী আম গাছটার ফাঁক দিয়া পাঠশালার ঘরের বাঁশের খুঁটির পায়ে আসিয়া পড়িয়াছে। নিকটে অন্য কোনোদিকে কোনো বাড়ী নাই, শুধু বন ও বাগান, একধারে একটা যাতায়াতের সরু পথ।

আট-দশটি ছেলেমেয়ের মধ্যে সকলেই বেজায় দুলিয়া নানারূপ সুর করিয়া পড়া মুখস্থ করে; মাঝে মাঝে গুরুমহাশয়ের গলা শোনা যায়,—এই ক্যাবলা, ওর শেলেটের দিকে চেয়ে কি দেখচিস? কান ম'লে ছিঁড়ে দেবো একেবারে! নুটু, তোমার ক'বার নেতি ভিজুতে হবে? ফের যদি দেখি নেতি ভিজুতে উঠেচ....

গুরুমহাশয় একটা খুঁটি হেলান দিয়া একখানা তালপাতার চাটাই-এর উপর বসিয়া থাকেন। মাথার তেলে বাঁশের খুঁটির হেলান-দেওয়ার অংশটি পাকিয়া গিয়াছে। বিকালবেলা প্রায়ই গ্রামের দীনু পালিত কি রাজু রায় তাঁহার সহিত গল্প করিতে আসেন। পড়াশুনার চেয়ে এই গল্প শোনা অপুর অনেক বেশী ভাল লাগিত। রাজু রায় মহাশয় প্রথম যৌবনে 'বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস' স্মরণ করিয়া কিভাবে আষাঢুর হাটে তামাকের দোকান খুলিয়াছিলেন সে গল্প করিতেন। অপু অবাক হইয়া শুনিত। বেশ কেমন নিজের ছোট্ট দোকানের ঝাঁপটা তুলিয়া বসিয়া দা দিয়া তামাক কাটা, তারপর রাত্রে নদীতে যাওয়া, ছোট্ট হাঁড়িতে মাছের ঝোল ভাত রাঁধিয়া খাওয়া, হয়তো মাঝে মাঝে তাদের সেই মহাভারতখানা কি বাবার সেই দাশুরায়ের পাঁচালীখানা মাটির প্রদীপের সামনে খুলিয়া বসিয়া বসিয়া পড়া। বাহিরে অন্ধকারে বর্ষারাতে টিপ টিপ বৃষ্টি পড়িতেছে, কেহ কোথাও নাই, পিছনের ডোবায় ব্যাঙ ডাকিতেছে—কি সুন্দর! বড় হইলে সে তামাকের দোকান করিবে।

এই গল্পগুজব এক এক দিন আবার ভাব ও কল্পনার সর্বোচ্চ স্তরে উঠিত, গ্রামের ও-পাড়ার রাজকৃষ্ণ সান্যাল মহাশয় যেদিন আসিতেন। যে কোনো গল্প হউক, যত সামান্যই হউক না কেন, সেটি সাজাইয়া বলিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল অসাধারণ। সান্যাল মহাশয় দেশভ্রমণ-বাতিক-গ্রস্ত ছিলেন। কোথায় দ্বারকা, কোথায় সাবিত্রী পাহাড়, কোথায় চন্দ্রনাথ, তাহা আবার একা দেখিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইত না, প্রতিবারই স্ত্রী-পুত্র লইয়া যাইতেন এবং খরচপত্র করিয়া সর্বস্বান্ত হইয়া ফিরিতেন। দিব্য আরামে নিজের চন্ডীমন্ডপে বসিয়া থেলো হুঁকা টানিতেছেন, মনে হইতেছে সান্যাল মহাশয়ের মতন নিতান্ত ঘরোয়া, সেকেলে, পাড়াগাঁয়ের প্রচুর অবসরপ্রাপ্ত গৃহস্থ বেশী আর বুঝি নাই, পৈতৃক চন্ডীমন্ডপে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছেন। হঠাৎ একদিন দেখা গেল সদর দরজায় তালাবন্ধ, বাড়ীতে জনপ্রাণীর সাড়া নাই। ব্যাপার কি? সান্যাল মশায় সপরিবারে বিন্ধ্যাচল না চন্দ্রনাথ ভ্রমণে গিয়াছেন। অনেকদিন আর দেখা নাই, হঠাৎ একদিন দুপুর বেলা ঠুকঠুক শব্দে লোকে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, দুই গরুর গাড়ী বোঝাই হইয়া সান্যাল মহাশয় সপরিবারে বিদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন ও লোকজন ডাকাইয়া হাঁটুসমান উঁচু জলবিছুটি ও অর্জুন গাছের জঙ্গল কাটিতে কাটিতে বাড়ী ঢুকিতেছেন।

একটা মোটা লাঠি হাতে তিনি লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া পাঠশালায় আসিয়া উপস্থিত হইতেন—এই যে প্রসন্ন, কি রকম আছো, বেশ জাল পেতে বসেছ যে! ক'টা মাছি পড়লো!

নামতা-মুখস্থ-রত অপুর মুখ অমনি অসীম আহ্লাদে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। সান্যাল মশায় যেখানে তালপাতার চাটাই টানিয়া বসিয়াছেন সেদিকে হাতখানেক জমি উৎসাহে আগাইয়া বসিত। শ্লেট বই মুড়িয়া একপাশে রাখিয়া দিত, যেন আজ ছুটি হইয়া গিয়াছে, আর পড়াশুনার দরকার নাই; সঙ্গে সঙ্গে তাহার ডাগর ও উৎসুক চোখ দুটি গল্পের প্রত্যেক কথা যেন দুর্ভিক্ষের ক্ষুধার আগ্রহে গিলিত।

কুঠির মাঠের পথে যে জায়গাটাকে এখন নাল্‌তাকুড়ির জোল বলে, ঐখানে আগে—অনেক কাল আগে—গ্রামের মতি হাজরার ভাই চন্দর হাজরা কি বনের গাছ কাটিতে গিয়াছিল। বর্ষাকাল—এখানে ওখানে বৃষ্টির জলের তোড়ে মাটি খসিয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ চন্দর হাজরা দেখিল এক জায়গায় যেন একটা পিতলের হাঁড়ির কানামত মাটির মধ্য হইতে একটুখানি বাহির হইয়া আছে। তখনই সে খুঁড়িয়া বাহির করিল। বাড়ী আসিয়া দেখে—এক হাঁড়ি সেকেলে আমলের টাকা। তাই পাইয়া চন্দর হাজরা দিনকতক খুব বাবুগিরি করিয়া বেড়াইল—এসব সান্ন্যাল মহাশয়ের নিজের চোখে দেখা।

এক এক দিন রেলভ্রমণের গল্প উঠিত। কোথায় সাবিত্রী পাহাড় আছে, তাহাতে উঠিতে তাঁহার স্ত্রীর কি রকম কষ্ট হইয়াছিল, নাভিগয়ায় পিন্ড দিতে গিয়া পান্ডার সঙ্গে হাতাহাতি হইবার উপক্রম। কোথাকার এক জায়গায় একটা খুব ভাল খাবার পাওয়া যায়, সান্ন্যাল মশায় নাম বলিলেন—প্যাঁড়া। নামটা শুনিয়া অপুর ভারি হাসি পাইয়াছিল—বড় হইলে সে 'প্যাঁড়া' কিনিয়া খাইবে।

আর একদিন সান্ন্যাল মশায় একটা কোন্‌ জায়গায় গল্প করিতেছিলেন। সে জায়গায় নাকি আগে অনেক লোকের বাস ছিল, সন্ধ্যার সময় তেঁতুলের জঙ্গলের মধ্যে দিয়া তাঁহারা সেখানে যান—সান্ন্যাল মশায় বার বার যে জিনিসটা দেখিতে যান তাহার নাম বলিতেছিলেন—"চিকামসজিদ"। কি জিনিস তাহা প্রথমে সে বুঝিতে পারে নাই, পরে কথাবার্তার ভাবে বুঝিয়াছিলেন একটা ভাঙা পুরানো বাড়ী। অন্ধকারপ্রায় হইয়া আসিয়াছিল—তাঁহারা ঢুকিতেই এক ঝাঁক চামচিকা সাঁ করিয়া উড়িয়া বাহির হইয়া গেল। অপু বেশ কল্পনা করিতে পারে—চারিধারে অন্ধকার তেঁতুল জঙ্গল, কেউ কোথাও নাই, ভাঙা পুরানো দরজা, যেমন সে ঢুকিল অমনি সাঁ করিয়া চামচিকার দল পলাইয়া গেল—রাণুদের পশ্চিমদিকের চোরাকুঠুরির মত অন্ধকার ঘরটা।

কোন্‌ দেশে সান্ন্যাল মহাশয় একজন ফকিরকে দেখিয়াছিলেন, সে এক অশত্থতলায় থাকিত। এক ছিলিম গাঁজা পাইলে সে খুশি হইয়া বলিত— আচ্ছা কোন্‌ ফল তোমরা খাইতে চাও বল। পরে ঈপ্সিত ফলের নাম করিলে সে সম্মুখের যে কোনো একটা গাছ দেখাইয়া বলিত— যাও, ওখানে গিয়া লইয়া আইস। লোকে গিয়া দেখিত হয়তো আমগাছে বেদানা ফলিয়া আছে কিংবা পেয়ারা গাছে কলার কাঁদি ঝুলিয়া আছে।

রাজু রায় বলিতেন—ও সব মন্তর-তন্তরের খেলা আর কি! সেবার আমার এক মামা—

দীনু পালিত কথা চাপা দিয়া বলিতেন—মন্তরের কথা যখন ওঠালে, তখন একটা গল্প বলি শোনো। গল্প নয়, আমার স্বচক্ষে দেখা। বেলেডাঙার বুধো গাড়োয়ানকে তোমরা দেখেচো কেউ? রাজু না দেখে থাকো, রাজকৃষ্ণ ভায়া তো খুব দেখেচো। কাঠের দড়ি-বাঁধা এক ধরণের খড়ম পায়ে দিয়ে বুড়ো বরাবর নিতে-কামারের দোকানে লাঙলের ফাল পোড়াতে আস্‌তো। একশ' বছর বয়সে মারা যায়, মারাও গিয়েছে আজ পঁচিশ বছরের ওপর। জোয়ান বয়সে আমরা তার সঙ্গে হাতের কব্জির জোরে পেরে উঠতাম না। একবার—অনেক কালের কথা—আমার তখন সবে হয়েচে উনিশ-কুড়ি বয়েস, চাক্‌দা থেকে গঙ্গাচান ক'রে গরুর গাড়ী ক'রে ফিরছি। বুধো গাড়োয়ানের গাড়ী—গাড়ীতে আমি, আমার খুড়ীমা, আর অনন্ত মুখুয্যের ভাইপো রাম, যে আজকাল উঠে গিয়ে খুলনায় বাস করছে। কানসোনার মাঠের কাছে প্রায় বেলা গেল। তখন ওসব দিকে কি রকম ভয়ভীতি ছিল, তা রাজকৃষ্ণ ভায়া জানো নিশ্চয়। একে মাঠের রাস্তা, সঙ্গে মেয়েমানুষের দল, কিছু টাকাকড়িও আছে—বড্ড ভাবনা হোল! আজকাল যেখানে নতুন গাঁ-খানা বসেচে—ওই বরাবর এসে হোল কি জানো? জন-চারেক ষণ্ডামার্কোগোছের মিশকালো লোক এসে গাড়ীর পেছন দিকের বাঁশ দুদিক থেকে ধল্লে। এদিকে দুজন, ওদিকে দুজন। দেখে তো মশাই আমার মুখে আর রা-টা নেই, কোনো রকমে গাড়ীর মধ্যে ব'সে আছি, এদিকে তারাও গাড়ীর বাঁশ ধরে সঙ্গেই আস্‌চে, সঙ্গেই আস্‌চে, সঙ্গেই আস্‌চে। বুধো গাড়োয়ান দেখি পিট্‌ পিট্‌ ক'রে পেছন দিকে চাইচে। ইশারা করে আমাদের কথা বলতে বারণ ক'রে দিলে। বেশ আছে! এদিকে গাড়ী একেবারে নবাবগঞ্জে থানার কাছাকাছি এসে পড়ল। বাজার দেখা যাচ্চে, তখন সেই লোক ক'জন বল্লে—ওস্তাদজী, আমাদের ঘাট হয়েচে, আমরা বুঝতে পারিনি, ছেড়ে দাও। বুধো গাড়োয়ান বল্লে—সে হবে না ব্যাটারা। আজ সব থানায় নিয়ে গিয়ে বাঁধিয়ে দোব। অনেক কাকুতি-মিনতির পর বুধো বল্লে—আচ্ছা যা, ছেড়ে দিলাম এবার, কিন্তু কক্ষনো এরকম

আর করিসনি! তবে তারা বুধো গাড়োয়ানের পায়ের ধুলো নিয়ে চলে গেল। আমার স্বচক্ষে দেখা। মন্তরের চোটে ওই যে ওরা বাঁশ এসে ধরেছে, অমনি ধ'রেই রয়েচে—আর ছাড়াবার সাধ্যি নেই—চলেছে গাড়ীর সঙ্গে! একেবারে পেরেক-আঁটা হয়ে গিয়েছে। তা বুঝলে বাপু? মন্তর-তন্তরের কথা—

গল্প বলিতে বলিতে বেলা যাইত। পাঠশালার চারিপাশের বনজঙ্গলে অপরাহ্নের রাঙা রৌদ্র বাঁকা ভাবে আসিয়া পড়িত। কাঁঠাল গাছের জগডুমুর গাছের ডালে ঝোলা গুলঞ্চ লতার গায়ে টুনটুনি পাখী মুখ উঁচু করিয়া বসিয়া দোল খাইত। পাঠশালাঘরে বনের গন্ধের সঙ্গে লতাপাতার চাটাই ছেঁড়াখোড়া বই-দপ্তর, পাঠশালার মাটির মেজে ও কড়া দা-কাটা তামাকের ধোঁয়া, সবসুদ্ধ মিলিয়া এক জটিল গন্ধের সৃষ্টি করিত।

সে গ্রামের ছায়া-ভরা মাটির পথে একটি মুগ্ধ গ্রাম্য বালকের ছবি আছে। বইদপ্তর বগলে লইয়া সে তাহার দিদির পিছন পিছনে সাজিমাটি দিয়া কাচা, সেলাই করা কাপড় পরিয়া পাঠশালা হইতে ফিরিতেছে, তাহার ছোট্ট মাথাটির অমন রেশমের মত নরম চিক্কণ সুখ-স্পর্শ চুলগুলি তাহার মা যত্ন করিয়া আঁচড়াইয়া দিয়াছে—তাহার ডাগর ডাগর সুন্দর চোখ দুটিতে কেমন যেন অবাক ধরনের চাহনি—যেন তাহারা এ কোন্ অদ্ভুত জগতে নতুন চোখ মেলিয়া চাহিয়া চাহিয়া দিশাহারা হইয়া উঠিয়াছে। গাছপালায় ঘেরা এইটুকুই কেবল তার পরিচিত দেশ—এখানেই মা রোজ হাতে করিয়া খাওয়ায়, চুল আঁচড়াইয়া দেয়, দিদি কাপড় পরাইয়া দেয়, এই গণ্ডীটুকু ছাড়াইলেই তাহার চারিধারে ঘিরিয়া অপরিচয়ের অকূল জলধি! তাহার শিশুমন থৈ পায় না।

ঐ যে বাগানের ওদিকে বাঁশবন—ওর পাশ কাটিয়া যে সরু পথটা ওধারে কোথায় চলিয়া গেল—তুমি বরাবর সোজা যদি ও-পথটা বাহিয়া চলিয়া যাও তবে শাঁখারীপুকুরের পাড়ের মধ্যে অজানা গুপ্তধনের দেশে পড়িবে—বড় গাছের তলায় সেখানে বৃষ্টির জলে মাটি খসিয়া পড়িয়াছে—কত মোহরভরা হাঁড়ি-কলসীর কানা বাহির হইয়া আছে, অন্ধকার বনঝোপের নীচে, কচু ওল ও বন-কলমীর চক্‌চকে সবুজ পাতার আড়ালে চাপা—কেউ জানে না কোথায়।

একদিন পাঠশালায় এমন একটি ঘটনা হইয়াছিল, যাহা তাহার জীবনের একটি নতুন অভিজ্ঞতা।

সেদিন বৈকালে পাঠশালায় অন্য কেহ উপস্থিত না থাকায় কোন গল্পগুজব হইল না, পড়াশুনা হইতেছিল—সে গিয়া বসিয়া পড়িতেছিল শিশুবোধক—এমন সময় গুরু-মহাশয় বলিলেন—শেলেট নেও, শ্রুতিলিখন লেখো—

মুখে মুখে বলিয়া গেলেও অপু বুঝিয়াছিল গুরু-মহাশয় নিজের কথা বলিতেছেন না, মুখস্থ বলিতেছেন, সে যেমন দাশুরায়ের পাঁচালী ছড়া মুখস্থ বলে তেম্‌নি।

শুনিতে শুনিতে তাহার মনে হইল অনেকগুলো অমন সুন্দর কথা একসঙ্গে পর পর সে কখনো শোনে নাই। ও 'সকল' কথার অর্থ সে বুঝিতেছিল না, কিন্তু অজানা শব্দ ও ললিত পদের ধ্বনি, ঝঙ্কার-জড়ানো এক অপরিচিত শব্দসঙ্গীত, অনভ্যস্ত শিশুকর্ণে অপূর্ব ঠেকিল এবং সব কথার অর্থ না বোঝার দরুণই কুহেলি-ঘেরা অস্পষ্ট শব্দ-সমষ্টির পিছন হইতে একটা অপূর্ব দেশের ছবি বারবার উঁকি মারিতেছিল।

বড় হইয়া স্কুলে পড়িবার সময় সে বাহির করিয়াছিল ছেলেবেলাকার এই মুখস্থ শ্রুতিলিখন কোথায় আছে—

“এই সেই জনস্থান-মধ্যবর্তী প্রস্রবণ-গিরি। ইহার শিখরদেশ আকাশপথে সতত-সমীর-সঞ্চারমাণ-জলধর-পটল সংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত—অধিত্যকাপ্রদেশ ঘন-সন্নিবিষ্ট বন-পাদপসমূহে সমাচ্ছন্ন থাকাতে স্নিগ্ধ শীতল ও রমণীয়....পাদদেশে প্রসন্ন-সলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া....।”

সে ঠিক বলিতে পারে না, বুঝাইতে পারে না, কিন্তু সে জানে—তাহার মনে হয়, অনেক সময়েই মনে হয়—সেই যে বছর দুই আগে কুঠির মাঠে সরস্বতী পূজার দিন নীলকণ্ঠ পাখী দেখিতে গিয়াছিল, সেদিন মাঠের ধার বাহিয়া একটা পথকে দূরে কোথায় যাইতে দেখিয়াছিল সে। পথটার দু'ধারে যে কত কি অচেনা পাখী, অচেনা গাছপালা, অচেনা বনঝোপ, —অনেকক্ষণ সেদিন সে পথটার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া ছিল। মাঠের ওদিকে পথটা কোথায় যে চলিয়া গিয়াছে তা ভাবিয়া সে কুল পায় নাই।

তাহার বাবা বলিয়াছিল—ও সোনাডাঙা মাঠের রাস্তা, মাধবপুর দশঘরা হয়ে সেই ধলচিতের খেয়াঘাটে গিয়ে মিশেচে।

ধলচিতের খেয়াঘাটে নয়, সে জানিত, ও পথটা আরও অনেক দূর গিয়াছে; রামায়ণ-মহাভারতের দেশে।

সেই অশথ্ গাছের সকলের চেয়ে উঁচু ডালটার দিকে চাহিয়া থাকিলে যাহার কথা মনে উঠে—সেই বহুদূরের দেশটা।

শ্রুতিলিখন শুনিতে শুনিতে সেই দুই-বছর-আগে-দেখা-পথটার কথাই তাহার মনে হইয়া গেল। ঐ পথের ওধারে অনেক দূরে কোথায় সেই জনস্থান-মধ্যবর্তী প্রস্রবণ-পর্বত! বনঝোপের স্নিগ্ধ গন্ধে, না-জানার ছায়া নামিয়া আসা ঝিকিমিকি সন্ধ্যায়, সেই স্বপ্নলোকের ছবি তাহাকে অবাক্ করিয়া দিল। কতদূরে সে প্রস্রবণ-গিরির উন্নত শিখর, আকাশপথে সতত-সঞ্চরমাণ মেঘমালায় যাহার প্রশান্ত, নীল সৌন্দর্য সর্বদা আবৃত থাকে?

সে বড় হইলে যাইয়া দেখিবে।

কিন্তু সে বেতসীকন্টকিত তট, বিচিত্রপুলিনা গোদাবরী, সে শ্যামল জনস্থান, নীল মেঘমালায় ঘেরা সে অপূর্ব শৈলপ্রস্থ, রামায়ণে বর্ণিত কোনো দেশে ছিল না। বাল্মীকি বা ভবভূতিও তাহাদের সৃষ্টিকর্তা নহেন। কেবল অতীত দিনের কোনো পাখীডাকা গ্রাম্য সন্ধ্যায় এক মুগ্ধমতি গ্রাম্য বালকের অপরিণত শিশু-কল্পনার দেশে তাহারা ছিল বাস্তব, একেবারে খাঁটি, অতি সুপরিচিত। পৃথিবীপৃষ্ঠে যাহাদের ভৌগোলিক অস্তিত্ব কোনোকালে সম্ভব ছিল না, শুধু এক অনভিজ্ঞ শৈশবমনেই সে কল্পজগতের প্রস্রবণ-পর্বত তাহার সতত-সঞ্চরমাণ মেঘজালে ঢাকা নীল শিখরমালার স্বপ্ন লইয়া অক্ষয় আসন পাতিয়া বসিল!

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

দুর্গা ভাইকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছিল। পাড়ার নানাস্থানে খুঁজিয়া কোথাও পাইল না। অন্নদা রায় মহাশয়ের বাড়ীর কাছে আসিয়া ভাবিল—একবার এখানে দেখে যাই, খুড়ীমার সঙ্গেও দেখাটা হবে এখন—

অন্নদা রায়ের বাড়ী ঢুকিতেই একটা হৈ হৈ চীৎকার ও কান্নাকাটির কলরব তাহার কানে গেল। বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া সে দরজার কাছে দাঁড়াইল। রোয়াকের একপাশে দাঁড়াইয়া অন্নদা রায়ের বিধবা ভগ্নী সখী ঠাকরুণ চীৎকার করিয়া বাড়ী ফাটাইতেছেন ঃ

—তাই কি মনে একটু ভয় আছে নাকি? ঢের ঢের জাঁহাবাজ মেয়েমানুষ দেখিচি, এমন আর কক্ষনো দেখিনি রে বাপু, পায়ে গড় করি—বলে ঐ যমের মত সোয়ামী, রাগলে হাড়ে মাসে এক রাখে না—তাই না হয় বাপু, একটু সমঝে চলি? সত্যিই তো, আজ তিন দিন ধরে বলচে ধানগুলো একটু রোদে দাও, ওগো ধানগুলো একটু রোদে দাও—কথা কি গেরাহ্যি হয় নাকি? না, কানে যায়? কার কথা কে শোনে! গেরস্ত ঘরের বৌ ধান ভানবে, কাজ করবে এই জানি—তা না, রাদ্দিন পটের বিবি সেজে বসে আছে!—'পটের বিবি' জিনিসটি পরিস্ফুট করিবার জন্য উত্তমরূপে সাজিয়া যেরূপ ভাবে বসিয়া থাকা উচিত বলিয়া সখী ঠাকরুণের ধারণা তিনি এখানে তাহার অভিনয় করিলেন—এ তো বাপু কখনো কোথাও বাপের জন্মে দেখিনি, শুনিওনি—

দালানের মধ্য হইতে অন্নদা রায়ের পুত্রবধূ নাকীসুরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—পটের বিবি হয়ে সেজে বসে থাকি নাকি! কাল যে দশ সের মুগের ডাল ভাজলাম সারা বিকেল ধ'রে? দুপুর বেলা খেয়েই আরম্ভ করিচি, আর যখন পাঁচটার গাড়ী যাওয়ার শব্দ পেলাম তখনও খোলার তাতেই বসে আছি, দু-ধামা ডাল ভাজা রে, ভাঙা রে—ক'রে অন্ধকার হয়ে গিয়েচে তখন উঠিচি— সে কি অমনি হয়? গা-গতর ব্যথা হয়ে গেচে, রাত্তিরে বলি বুঝি জ্বর হোল, এমনি গায়ে-হাতে ব্যথা—তা কি কেউ

দ্যাখে? তার ওপর সকাল বেলা বিনি দোষে এই মার—কেন সংসারে কি বসে বসে খাই?

এমন সময় অন্নদা রায়ের ছেলে গোকুল এক হাতে একখানা কাঁচা বাঁশের পাতাসুদ্ধ ডগা ও আর এক হাতে দা লইয়া বাড়ী ঢুকিল। স্ত্রীর কান্নার শেষ অংশ শুনিতে পাইয়া গর্জন করিয়া কহিল—এখনও তোমার হয়নি—এখনও তোমার অদেষ্টে বেস্তর দুক্‌খু আছে দেখচি—আমার রাগ বাড়িও না মেলা সক্কাল বেলা! আজ তিনদিন ধরে ধানগুলো রোদ্দুরে দেওয়ার জন্যে বলে বলে হয়রান—এই মেঘলা মেঘলা যাচ্চে, এর পর ধানগুলো যদি কলিয়ে যায়, তবে তোমার কোন্ বাবা এসে সামলাবে?....সারা বছরের পিন্ডি জুটবে কোত্থেকে?

গোকুলের বউ হঠাৎ কান্না বন্ধ করিয়া তেজের সহিত জোর গলায় বলিয়া উঠিল—তুমি আমার বাবা তুলে গালাগালি কোরো না ব'লে দিচ্চি—আমার বাবা কি করেচে তোমার, কেন তুমি বাবার নামে যখন তখন যা তা বলবে?

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে গোকুল হাতের বাঁশ নামাইয়া রাখিয়া দা হাতে এক লাফে রোয়াকের সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া কহিল—তবে রে! আজ তোমার একদিন কি আমার একদিন—তোমার বাপের বাড়ী আবদার না ঘুচিয়ে আমি আজ—

একটা খুনোখুনি ব্যাপার বুঝি বা হয় দেখিয়া বাড়ীর কৃষাণ উঠান হইতে ডাকিয়া কহিল—কি করেন দা-ঠাকুর—কি করেন, থামুন, থামুন—পরে সে ছুটিয়া রোয়াকে উঠিল—দুর্গাও ছুটিয়া আসিল—সখী ঠাকরুণও রোয়াক হইতে দালানের মধ্যে ঢুকিলেন—খুব একটা হৈ চৈ হইল। দালানের মধ্যে গোকুলের স্ত্রী স্বামীর উদ্যত আক্রমণের সম্মুখে পিছাইয়া গিয়া মার ঠেকাইবার জন্য দুই হাত তুলিয়া দেওয়ালের গায়ে প্রাণপণে ঠেস দিয়া জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, চোখে তার ভয়ের দৃষ্টি—কৃষাণ গিয়াই গোকুলের হাত হইতে দা-খানা কাড়িয়া লইল; পরে তাহাকে ধরিয়া দালানের বাহিরে আনিতে আনিতে বলিতে লাগিল—কি করেন দা-ঠাকুর, থামুন—আঃ—আসুন নেমে।

গোকুলের বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের কম নয়, কিন্তু দেহ তেমন সবল নহে, বলিষ্ঠ কৃষাণের সহিত ম্যালেরিয়া-দুর্বল দেহ লইয়া হাত ছাড়াছাড়ির চেষ্টা করিতে গেলে দুর্বলতাই অধিকতর প্রকাশ হইয়া পড়িবে বুঝিয়া বলিতে বলিতে নামিল—দ্যাখো না—একটা ডোল ধান, বীজ ধান, জল পেয়ে যদি কলিয়ে যায়, ও কি আর রোয়া হবে? আজ তিনদিন ধরে বল্‌চি—আবার তেজডা দেখলে তো?—তোমার তেজ আমি—

দুর্গা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল, কিন্তু এ সময় খুড়ীমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় কথাবার্তার সময় নহে বুঝিয়া সে একপ্রকার নিঃশব্দেই অন্নদা রায়ের বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল।

পাঁচু বাঁড়ুয্যের বাড়ীর কাছে জামতলায় একজন লোক ঘটিবাটি সারাইতে বসিয়াছে। কাঠের কয়লার হাপরে গনগনে আগুন, পাড়ার লোকের অনেক ভাঙা ঘটিবাটি জড় করা। বেঁটে ধরণের লোকটা, পাকসিটে গড়নের চেহারা, বয়স কত বুঝিবার উপায় নেই, ত্রিশও হইতে পারে, পঞ্চাশও হইতে পারে, গলায় ত্রিকণ্ঠি তুলসীর মালা, মুখের ডান দিকে একটা কাটার দাগ—হাতের কব্জিতে দড়ির মত শির বাহির হইয়া আছে; পরনে আধময়লা ধুতি। পাড়ার অনেক ছেলেমেয়ে তাহাকে ঘিরিয়া ঘটিবাটি সারানো দেখিতেছে। দুর্গাও গেল। লোকটা বলিল—কি চাই খুকী?

সে বলিল—কিছু না, দেখবো।

বাড়ী ফিরিয়া মা'র কাছে বলিল—আজ মা গোকুল কাকা খুড়ীমাকে যা মেরেছে সে কি বলবো—পরে সে আনুপূর্বিক বর্ণনা করিল।

সর্বজয়া বলিল—গোঁয়ার-গোবিন্দ চাষা একটা বৈ তো নয়! —আহা ভালমানুষ বৌটা এমন হাতে আর এমন বাড়ীতে পড়েচে—ঠেঙা খেতে খেতেই জীবনটা গেল।

—আমাকে তো বড্ড ভালবাসে—যখন যা বাড়ীতে হবে, আমার জন্যে তুলে রেখে দেবে। খুড়ীমার কান্না দেখে এমন কষ্ট হোল মা! সখী ঠাক্‌মা আবার এখন উলটে খুড়ীমাকেই বকে—

সে তিন-চার দিন জামতলায় ঘটিবাটি সারানো দেখিতে গেল। লোকটি তাহার বাড়ী, বাপের নাম সব খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসা করিয়া। বলিল—তোমাদের বাড়ীর জিনিসপত্তর সারাবে না? নিয়ে এসো না খুকী?

দুর্গা বাড়ী আসিয়া মাকে বলিল—আমাদের ভাঙা ঘটি-গাড়ুগুলো দেবে মা, একজন বেশ ভালমানুষ লোক এসেচে—ওপাড়ার পথে জামতলায় বসে সারাচ্ছে—

লোকটা তার নাম বলে পিতম—জাতে নাকি কাঁসারী। হাপর জ্বালাইতে জ্বালাইতে এক একবার সোজা হইয়া বসিয়া বলে—জয় রাধে!—রাধে গোবিন্দ! সকাল বেলা তাহার কাছে পাড়ার অনেকে আসিয়া জোটে। সে চিমটা দিয়া হাপর হইতে আগুন উঠাইয়া অনবরত তামাক সাজিয়া ভদ্রলোকদের হাতে দিতেছে—দিবার সময় মুখখানা বিনয়ে কাঁচুমাচু করিয়া ঘাড় একধারে কাৎ করিয়া বলে—হেঁ হেঁ, তামাক ইচ্ছে করুন বাবাঠাকুর! রাধারাণী-পদ ভরসা!....নারকেলের কথা আর বলবেন না বাবাঠাকুর, আর বছর জষ্টিমাসে বলি দিই গোটাকতক চারা বসিয়ে!—আধকাঠা-খানেক জমিতে ছগণ্ডা চারা কিনে লাগিয়ে দিলাম—তা ব্যাঙের উপদ্রুতে—একেবারে মূলশেকড়-টুলশেকড় সবসুদ্দ....কটা টাকাই মাটি।

মুখুয্যে মশায় সকাল হইতে ঠায় বসিয়া আছেন, কোনো রকমে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া পিতলের ঘড়া বিনামূল্যে সারাইয়া লইবেন। তামাক খাইতে খাইতে পূর্ব কথার খেই ধরিয়া বলিলেন—এই তো গেল কান্ড বাপু—তা—এবারও তো ভেবেছিলাম কুড়িখানেক চারা বাড়ীর পেছনে—তা এমন ম্যালেরিয়া ধরল—তোমাদের ওদিকে কি রকম হে কারিগর? (তিনি সকাল হইতেই তাহাকে কারিগর বলিয়া ডাকিতেছেন)।

—পরিপুন্নু—আজ্ঞে পরিপুন্নু—ম্যালেরিয়ার কথা বলবেন না বাবাঠাকুর—হাড় জ্বালিয়ে খেয়েচে—এই নিন্ আপনার ঘড়াটা, ছটা পয়সা দেবেন—

মুখুয্যে মশায় ঘড়াটা হাতে লইয়া উঠিয়া পড়িয়া বলেন—হ্যাঁ! এর জন্যে আবার পয়সা—দিলে একটা জিনিস ব্রাহ্মণকে সারিয়ে অমনি কার্তিক মাসের দিনটা—তার আবার—

পিতম তাড়াতাড়ি মুখুয্যে মশায়ের ঘড়াটা ধরিয়া অত্যন্ত অমায়িক ভাবে হাসিয়া বলে—আজ্ঞে না, মাপ করবেন বাবাঠাকুর, এমনি সারিয়ে দিতে পারবো না—এখনো সক্কাল বেলা বউনি হয়নি। আজ্ঞে না—তা পারবো না—ঘড়াটা রেখে যান্—বাড়ী গিয়ে পহা কটা পাঠিয়ে দেবেন—

দুর্গার মা বলে—দেখিস দিকি—ভাঙা বাসন-কোসন বদলে নতুন বাসন-কোসন অনেক সময় ওরা দেয়—জিজ্ঞেস করিস তো।

পিতম খুব রাজী। দুর্গা বাড়ী হইতে বহিয়া বহিয়া এক রাশ পুরানো গাড়ু ঘটিবাটি ঘড়া তাহার কাছে লইয়া গিয়া হাজির করে। অর্ধেক দিনটা সে জামতলাতেই কাটায়—হাপর জ্বালানো, রাং ঝাল করা বসিয়া বসিয়া দেখে। পিতম বলিয়াছে তাহাকে একটা পিতলের আংটি গড়াইয়া দিবে—ইহাও বলিয়াছে যে, সারাইবার পয়সা তাহাদের লাগিবে না। সর্বজয়া শুনিয়া বলে—আহা বড্ড ভাল লোকটা তো! আসচে বুধবার অপুর জন্মবারটা, বলিস্ তাকে আসতে—আমাদের এখানে দুটো ডাল-ভাত পেরসাদ পেয়ে যাবে এখন—

বুধবার সকালে উঠিয়া দুর্গা জামতলায় গিয়া দেখিল লোকটা নাই। জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিল পূর্বদিন সন্ধ্যার পর কোন্ সময়ে সে দোকান উঠাইয়া চলিয়া গিয়াছে—হাপরের গর্ত ও পোড়া কয়লার রাশি ছাড়া অন্য কোন চিহ্ন নাই। দুর্গা এখানে ওখানে খোঁজ করিল—একে ওকে জিজ্ঞাসা করিল, কেহ জানে না সে কোথায় গিয়াছে। ভয়ে দুর্গার মুখ শুকাইয়া গেল—মা শুনিলে কি বলিবে! সংসারের অর্ধেক বাসন তাহার কাছে যে! সে দুর্গাকে বলিয়াছিল, ঝিকরহাটির বাজারে তাহার কাঁসারির দোকান আছে, সেখানে সে খবর পাঠাইয়াছে—তাহার ভাই একদিনের মধ্যে নতুন বাসন লইয়া আসিয়া পড়িল বলিয়া—আসিলেই ভাঙাচোরা বাসনগুলো সব বদলাইয়া দিবে। কোথায়ই বা সে—আর কোথায়ই বা তাহার ভাই! কোথায় সে যে গেল তাহা দুর্গা অনেক খুঁজিয়াও পাইল না। কেবলমাত্র তাহাদেরই জিনিস গিয়াছে—অন্য হুঁশিয়ার লোকের এক টুকরো পিতলও খোয়া যায় নাই।

সারাদিনের পর সন্ধ্যার সময় দুর্গা কাঁদো কাঁদো মুখে মাকে সব বলিল। হরিহর বিদেশে—কেই বা খোঁজ করে, কেই বা দেখে। সর্বজয়া অবাক হইয়া যায়! বলে—একবার তোর রায় জেঠামশায়কে গিয়ে বল তো! ওমা এমন কথা তো কখনো শুনিনি!....হরিহর বাড়ী আসিলে ঝিকরহাটির বাজারে খোঁজ করা হইয়াছিল—পিতম নামক কোন লোকের সেখানে কাঁসারির দোকান নাই বা উক্ত চেহারার কোনো লোকও সেখানে নাই।

কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে। ভাদ্র মাস।

অপু বৈকাল বেলা বেড়াইতে যাইবার সঙ্কল্প করিতেছে, এমন সময় তাহার মা পিছনে ডাকিয়া বলিল—কোথায় বেরুচ্চিস রে অপু?—চাল ভাজা আর ছোলা ভাজা ভাজচি—বেরিও না যেন।....এক্ষুনি খাবি—

অপু শুনিয়াও শুনিল না—যদিও সে চাল-ছোলা ভাজা খাইতে ভালবাসে বলিয়াই মা তাহার জন্য ভাজিতে বসিয়াছে ইহা সে জানে—তবুও সে কি করিতে পারে?—এতক্ষণে কি খেলাটাই চলিতেছে নীলুদের বাড়ীতে? সে যখন বাহির দরজার পা দিয়াছে, মার ডাক আবার কানে গেল—বেরুলি বুঝি!—ওঁ অপু, বা রে দ্যাখো মজা ছেলের! গরম গরম খাবি—আমি তাড়াতাড়ি ঘাট থেকে এসে ভাজতে লাগলাম—ও অপু-উ-উ—

অপু এক ছুট দিয়া নীলুদের বাড়ী গিয়া পৌঁছিল। অনেক ছেলে জুটিয়াছিল, অপু আসিবার আগেই খেলা সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে। নীলু বলিল—চল্ অপু, দক্ষিণ মাঠে পাখীর ছানা দেখতে যাবি? অপু রাজী হইলে দুজনে দক্ষিণ মাঠে গেল। ধান ক্ষেতের ওপারেই নবাবগঞ্জের বাঁধা সড়কটি পূর্ব পশ্চিমে লম্বা হইয়া যেন মাঠের মাঝখান চিরিয়া চলিয়া গিয়াছে। গ্রাম হইতে এক মাইলের উপর হইবে। অপু এতদূর কখনো বেড়াইতে আসে নাই—তাহার মনে হইল যেন সমস্ত পরিচিত জিনিসের গন্ডী ছাড়াইয়া কোথায় কতদূরে নীলুদা তাহাকে টানিয়া আনিল! একটুখানি পরেই সে বলিল, বাড়ী চল নীলুদা, আমায় মা বকবে, সন্দে হয়ে যাবে, আমি একা গাবতলার পথ দিয়ে যেতে পারবো না। তুমি বাড়ী চল—

ফিরিতে যাইয়া নীলু পথ হারাইয়া ফেলিল। ঘুরিয়া ফিরিয়া কাহাদের একটা বড় আমবাগানের ধার দিয়া একটা পথ মিলিল। সন্ধ্যা হইবার তখনও কিছু বিলম্ব আছে, আকাশে আবার মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছে—এমন সময় চলিতে চলিতে নীলু হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া অপুর কনুই-এ টান দিয়া সম্মুক দিকে চাহিয়া ভয়ের সুরে বলিল—ও ভাই অপু!

অপু সঙ্গীর ভয়ের কারণ বুঝিতে না পারিয়া বলিল—কি রে নীলুদা? পরে সে চাহিয়া দেখিল, যে সুঁড়িপথটা দিয়া তাহারা চলিতেছিল, তাহা কাহাদের উঠানে গিয়া শেষ হইয়াছে—উঠানে একখানা ছোট্ট চালাঘর ও একটা বিলাতী আমড়ার গাছ। তাহার কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই নীলু ভয়ের সুরে বলিয়া উঠিল—আতুরী ডাইনীর বাড়ী!

অপুর মুখ শুকাইয়া গেল....আতুরী ডাইনীর বাড়ী!....সন্ধ্যেবেলা কোথায় আসিয়া তাহারা পড়িয়াছে! কে না জানে যে ওই উঠানের গাছে চুরি করিয়া বিলাতী আমড়া পাড়িবার অপরাধে ডাইনীটা জেলেপাড়ার কোন্ এক ছেলের প্রাণ কাড়িয়া লইয়া কচুর পাতায় বাঁধিয়া জলে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল, পরে মাছে তাহা খাইয়া ফেলিবার সঙ্গে সঙ্গে বেচারীর আমড়া খাইার সাধ এ জন্মের মত মিটিয়া যায়! কে না জানে সে ইচ্ছা করিলে চোখের চাহনিতে ছোট ছেলেদের রক্ত চুষিয়া খাইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারে, যাহার রক্ত খাওয়া হইল, সে কিছুই জানিতে পারিবে না, কিন্তু বাড়ী গিয়া খাইয়া-দাইয়া সেই যে বিছানায় শুইবে আর পরদিন উঠিবে না! কতদিন শীতের রাত্রে লেপের তলায় শুইয়া দিদির মুখে আতুরী ডাইনীর গল্প শুনিতে শুনিতে সে বলিয়াছে—রাত্রিতে তুই ওসব গল্প বলিসনে দিদি, আমার ভয় করে,—তুই সেই কুঁচবরণ রাজকন্যের গল্পটা বল্ দিকি?

ঝাপসা দৃষ্টিতে সে সম্মুখে চাহিয়া দেখিতে গেল বাড়ীর কেহ আছে কিনা এবং চাহিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সমস্ত শরীর যেন জমিয়া হিম হইয়া গেল....বেড়ার বাঁশের আগড়ের কাছে....অন্য কেহ

নয়, একেবারে স্বয়ং আতুরী ডাইনী তাহাদের—এমন কি যেন শুধু তাহারই দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া!....

যাহার জন্য এত ভয়, তাহাকে একেবারে সম্মুখেই এভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া অপুর সামনে পিছনে কোনো দিকেই পা উঠিতে চাহিল না।

আতুরী বুড়ী ভুরু কুঁচকাইয়া তোব্‌ড়ানো গালটা আরও ঝুলাইয়া ভাল করিয়া লক্ষ্য করিবার ভঙ্গীতে মুখটা সামনের দিকে একটু বাড়াইয়া দিয়া পায়ে পায়ে তাহাদের দিকে আগাইয়া আসিতে লাগিল। অপু দেখিল সে ধরা পড়িয়াছে, কোনো দিকেই আর পলাইবার পথ নাই—যে কারণেই হউক ডাইনীর রাগটা তাহার উপরেই—এখনই তাহার প্রাণ সংগ্রহ করিয়া কচুর পাতায় পুরিবে!

মুখের খাবার ফেলিয়া, মায়ের ডাকের উপর ডাক উপেক্ষা করিয়া সে যে আজ মায়ের মনে কষ্ট দিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে তাহার ফল এই ফলিতে চলিল। সে অসহায়ভাবে চারিদিকে চাহিয়া বলিল—আমি কিছু জানিনে—ও বুড়ী পিসি—আমি আর কিছু করবো না—আমায় ছেড়ে দাও, আমি ইদিকে আর কখনো আসবো না—আজ ছেড়ে দাও ও বুড়ী পিসি—

নীলু তো ভয়ে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল—কিন্তু অপুর ভয় এত হইয়াছিল যে, চোখে তাহার জল ছিল না।

বুড়ী বলিল—ভয় কি মোরে, ও বাবারা? মোরে ভয় কি?....পরে খুব ঠাট্টা করা হইতেছে ভাবিয়া হাসিয়া বলিল, মুই কি ধ'রে নেবো খোকারা? এস মোর বাড়ীতি এস—আমচুর দেবানি এস—

এখন সে কি করে!....উপায়?

বুড়ী তাহার দিকে আরও খানিক আগাইয়া আসিতে আসিতে বলিল—ভয় কি ও মোর বাবারা? মুই কিছু বলবো না, ভয় কি মোরে?

আর কি, সব শেষ! মায়ের কথা না শুনিবার ফল ফলিবার আর দেরি নাই, হাত বাড়াইয়া তাহারা প্রাণটা সংগ্রহ করিয়া এখনি কচুর পাতায় পু—রিল! প্রতি মুহূর্তেই তাহার আশঙ্কা হইতেছিল যে এখনি এ বুড়ী হাসিমুখ বদ্‌লাইয়া ফেলিয়া বিকট মূর্তি ধরিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিবে—রাক্ষসী রাণীর গল্পের মত! বনের অজগর সাপের দৃষ্টির কুহকে পড়িয়া হরিণশিশু নাকি অন্য দিকে চোখ ফিরাইতে পারে না, তাহারও চোখদুটির কুহক-মুগ্ধ দৃষ্টি সেরূপ বুড়ীর মুখের উপর দৃঢ়নিবদ্ধ ছিল—সে আড়ষ্ট কণ্ঠে দিশাহারা ভাবে বলিয়া উঠিল, ও বুড়ী পিসি, আমার মা কাঁদবে, আমায় আজ আর কিছু বোলো না—আমি তোমার গাছে কোনো দিন আমড়া নিতে আসিনি—আমার মা কাঁদবে—

আতঙ্কে সে নীলবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে....বাড়ী, ঘরদোর, গাছপালা, নীলু, চারিধার যেন ধোঁয়া ধোঁয়া। কেহ কোনোদিকে নাই...কেবল একমাত্র সে আর আতুরী ডাইনীর ক্রূর দৃষ্টি মাখানো একজোড়া চোখ....আর অনেক দূরে কোথায় যেন মা আর তাহার চাল-ভাজা খাওয়ার ডাক!....

পরক্ষণেই কিন্তু অত্যধিক ভয়ে তাহার একরূপ মরীয়া সাহস যোগাইল, একটা অস্পষ্ট আর্তরব সে প্রাণভয়ে দিশাহারা অবস্থায় সে সম্মুখের ভাঁট, শেওড়া, রাংচিতার জঙ্গল ভাঙিয়া ডিঙাইয়া সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারে যেদিকে দুই চোখ যায় ছুটিল—নীলুও ছুটিল তাহার পিছনে পিছনে।....

ইহাদের ভয়ের কারণ কি বুঝিতে না পারিয়া বুড়ী ভাবিল—মুই মাত্তিও যাইনি, ধত্তিও যাইনি—কাঁচা ছেলে, কি জানি মোরে দেখে কেন ভয় পালে সন্দেবেলা? খোকাডা কাদের?

অপু যখন বাড়ী আসিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সর্বজয়া সবে উনুন ধরাইয়া তালের বড়া ভাজিবার আয়োজন করিতেছে, দুর্গা নিকটে বসিয়া তাল চাঁচিয়া রস বাহির করিতেছে—ছেলেকে দেখিয়া বলিল—কোথায় ছিলি বল্ দিকি? সেই বেরিয়েচো বিকেলবেলা, কিছুই তো আজ খাবার খেলিনে—খিদেতেষ্টা পায় না?

মায়ের নিকট বলিবার জিনিস অপুর মনে স্তূপাকার হইয়া সকলেই একসঙ্গে বাহিরে আসিবার জন্য এরূপভাবে চেষ্টা পাইতেছিল যে, পরস্পরের ঠেলাঠেলিতে পরস্পরের নির্গমনপথ এককালীন রুদ্ধ হইয়া গিয়া অপুকে একেবারে নির্বাক করিয়া দিল। সে শুধু বলিল—আমি কি কাপড় ছাড়বো মা? আমার এখানা ওবেলার কাপড়—

পরে সে বিস্ময়ের সহিত দেখিল যে, মা তাহাকে চালভাজা দিবার কোনো আগ্রহই না দেখাইয়া তালের রসটা ঘন না পাতলা হইয়াছে, তাহাই অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিতেছে। পরীক্ষা শেষ হইয়া গেলে দুর্গাকে বলিল—দু-চারখানা ভেজে দেখি, না হয়, বড় তক্তপোশের নীচেটায় চালের গুঁড়ো আছে, আর দুটো নিয়ে আসিস এখন—পরে ছেলের দিকে চাহিয়া বলিল—দাঁড়া অপু, তোকে গরম গরম ভেজে দিচ্ছি।

অপু বলিল—কেন মা, চাল-ভাজা কৈ?

—তা চাল ভাজা তুই খেলি কৈ? এতবার ডাকলাম, তুই বেরিয়ে চলে গেলি—ঠাণ্ডা হয়ে গেল, দুর্গা খেয়ে ফেল্লে, তা এই বড়া তো হয়ে গেল বলে। ভাজবো আর দেবো—

অপু সেই বৈকালবেলা হইতে মনের মধ্যে যে তাসের ঘর নির্মাণ করিতেছিল, এক ফুঁয়ে কে তাহা একেবারে ভূমিসাৎ করিয়া দিল। এই তাহার মা তাহাকে ভালবাসে! সে বৈকালবেলা বাটীর বাহিরে যাওয়ার পর হইতে অনবরত ভাবিতেছে—মা না জানি কত দুঃখই করিতেছে তাহার জন্য! অপু আমার এখনও কেন যে এলো না, তার জন্যে এত ক'রে ঘাট থেকে এসে ভাজলাম, আহা সে দুটো খেলে না—হাঁ, দায় পড়িয়াছে, তাহার জন্য ভাবিয়া তো মায়ের ঘুম নাই—মা দিব্যি সেগুলি দিদিকে খাওয়াইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে—সে-ই শুধু এতক্ষণ মিছামিছি ভাবিয়া মরিতেছিল।

দুর্গা বলিল—মা শীগ্‌গির শীগ্‌গির ভেজে নাও। বড্ড মেঘ ক'রে আস্‌চে, বিষ্টি এলে আর ভাজা হবে না,—ঘরে যে জল পড়ে!—সেদিনকার মত হবে কিন্তু—

দেখিতে দেখিতে চারিধার ঘিরিয়া ঘনাইয়া-আসা মেঘের ছায়ায় বাঁশবনের মাথা কালো হইয়া উঠিল। খুব মেঘ জমিয়া আকাশ অন্ধকার হইয়াছে, অথচ বৃষ্টি এখনও নামে নাই,—এ সময় মনে এক প্রকার আনন্দ ও কৌতূহল হয়—না জানি কি ভয়ঙ্কর বৃষ্টিই আসিতেছে, পৃথিবী বুঝি ভাসাইয়া লইয়া যাইবে—অথচ বৃষ্টি হয় প্রতিবারই, পৃথিবী কোনবারেই ভাসায় না, তবুও এ মোহটুকু ঘোচে না! দুর্গার মন সেই অজানার আনন্দে ভরিয়া উঠিল, সে মাঝে মাঝে দাওয়ার ধারে আসিয়া নীচু চালের ছাঁচ হইতে মুখ বাড়াইয়া মেঘান্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল।

সর্বজয়া খানকতক বড়া ভাজিয়া বলিল—এই বাটিটা ক'রে ওকে দে তো দুগ্‌গা।—ওর খিদে পেয়েচে, বিকেল থেকে কিছু তো খায় নি! এই শেষ কথাই কাল হইল—এতক্ষণ অপু যা হয় এক রকম ছিল কিন্তু মায়ের শেষের দিকের আদরের সুরে তাহার অভিমানের বাঁধ একেবারে ভাঙিয়া পড়িল, সে বড়াসুদ্ধ বাটিটা ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল—আমি খাবো না তো বড়া, কখ্‌খনো খাবো না—যাও—

সর্বজয়া ছেলের কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইয়া রহিল। গরীবের ঘরকন্না, কত কষ্টে যে কি যোগাড় করিতে হয় সে-ই জানে। আর হতভাগা ছেলেটা কিনা দু-দু'বার সেই কত কষ্টে সংগৃহীত মুখের জিনিস নষ্ট করিল! ক্ষোভে, রাগে সে ছেলের দিকে চাহিয়া বলিল—তোমার আজ হয়েছে কি! তোমার অদৃষ্টে আজ ছাই লেখা আছে, খেও এখন তাই গরম গরম—

এবার অপুর পালা। এ রকম কথা মা'র মুখে সে কখনো শোনে নাই। কোথায় সে চাহিতেছে, মা দুটো আদরের কথা বলিয়া সান্ত্বনা করিবে, না সন্ধ্যাবেলা এমন নিষ্ঠুর কথা! সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, আচ্ছা মা, আমি চালভাজা খাইনি তাতে আমার মনে কষ্ট হয় না? আমি বিকেল থেকে ভাবছিনে বুঝি? আমি—আমি কখ্‌খনো তোমার বাড়ী আর আস্‌চিনে—আমি ছাই খাবো, কেন আমি ছাই খাবো? আর দিদি বুঝি সব ভাল ভাল জিনিস খাবে? আমি আস্‌বো না তোমার বাড়ী, কখ্‌খনো আস্‌বো না—।

পরে সে আতুরী বুড়ীর বাড়ী হইতে এইমাত্র যেরূপ অন্ধকার, কাঁটাবন, আমবন না মানিয়া ছুটিয়াছিল এখনও রাগে আত্মহারা হইয়া দাওয়া হইতে নামিয়া বাহিরের উঠানের দিকে ঠিক সেইরূপ মরীয়ার মত ছুটিল। ভাই-এর অভিমান-ভরা দৃষ্টি, ফুলা ঠোঁট ও কথা বলিবার ধরণ দুর্গার নিকট এরূপ হাস্যকর ঠেকিল যে সে হাসিয়া প্রায় গড়াইয়া পড়িল।—হি হি—অপুটা—একেবারে পাগল মা, কেমন বল্লে—পরে ভাই-এর কথা বলিবার উক্তির নকল করিয়া বলিল—আমি চালভাজা খাইনি—হি হি—তাতে বুঝি আমার কষ্ট হয় না? বোকা একেবারে যা—ও অপু, শুনে যা ও অপু-উ-উ—

অপু ছুটিয়া পাঁচিলের পাশের পথ দিয়া পিছনের বাঁশবাগানের দিকে ছুটিল। আকাশে মেঘ তখনও থমকিয়া আছে; বাঁশবনের তলাটা ঝোপেঝাড়ে নির্জন বর্ষাসন্ধ্যায় ঘুটঘুটে অন্ধকার। সহজ অবস্থায় এরূপ স্থানে এ-সময় একা আসিবার কল্পনাই সে করিতে পারিত না কোনদিনও। কিন্তু বর্তমানে চারিধারের নির্জনতা ও অন্ধকার, বাঁশঝাড়ের মধ্যে কিসের খড়খড় শব্দ, অদূরে সলতেখাগী আমগাছে ভূতের প্রবাদ প্রভৃতি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল—আমি কখ্খনো বাড়ী যাবো না তো!—এ জন্মে আর বাড়ী যাবো না—

অভিমানের প্রথম বেগটা কাটিয়া গেলে তাহার একটু গা ছমছম করিতে লাগিল—ভয়ে ভয়ে সে একবার দূরের সল্‌তে-খাগী আমগাছটার দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার মনে হইল—এখন যদি একটা ভূতে আমায় তুলে একবারে মগডালে নিয়ে যায় তো বেশ হয়—মা খুঁজে খুঁজে কেঁদে মরে—ভাবে, কেন সন্দেবেলা ছাই খাও বল্লাম, তাই তো খোকা আমার রাগ করে কোথায় অন্ধকারে মেঘ মাথায় বেরিয়ে চলে গেল, আর ফিরে এলো না। ভূতের হাতে সে মরিয়া গেলে মা'র কি রকম কষ্ট হইবে তাহা সে খানিকক্ষণ প্রতিহিংসার আনন্দে উপভোগ করিল। পরে সেখান হইতে সে গিয়া পাঁচিলের পাশের পথে দাঁড়াইল। তাহার ভয়-ভয় করিতেছিল—সম্মুখের বাঁশঝাড়ে একটা যেন অস্পষ্ট শব্দ হইল, অপু একবার ভয়ে ভয়ে চোখ উঁচু করিয়া চাহিয়া দেখিল। তাহার মা ও দিদি রাণুদের বাড়ীর দিকে ডাকিতেছে—ও অপু-উ-উ! বাঁশঝাড়ে আবার যেন একটা শব্দ হইল। সে মনে মনে বড় অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু মুস্কিল এই যে, তাহাকে খোসামোদ না করিলে সে নিজেই অত রাগের মাথায় বাড়ী গিয়া ঢুকিবে, সত্য সত্য এতটা আত্মসম্মানজ্ঞানশূন্য সে নয় নিশ্চয়ই। এবার তাহার দিদি রাণুদের বাড়ীর খিড়কী দিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে যেন। সে ছুটিয়া দরজার সামনে পাঁচিলের কোণটাতে দাঁড়াইল। হঠাৎ আসিতে আসিতে পাঁচিলের পাশে চোখ পড়িতেই দুর্গা চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল, ওই দাঁড়িয়ে রয়েচে মা!....এই দ্যাখো পাঁচিলের পাশে। পরে সে ছুটিয়া গিয়া ভাইয়ের হাত ধরিল। (ছুটিবার আবশ্যকতা ছিল না)—ওরে দুষ্টু, এখানে চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে থাকা হয়েচে, আর আমি আর মা সমস্ত জায়গা খুঁজে বেড়াচ্চি, এই দ্যাখো।

দুজনে মিলিয়া তাহাকে বাড়ীর মধ্যে ধরিয়া লইয়া গেল।

পথের পাঁচালী — ষোড়শ পরিচ্ছেদ

এবার বাড়ী হইতে যাইবার সময় হরিহর ছেলেকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল। বলিল—বাড়ী থেকে কিছু খেতে পায় না, তবুও বাইরে বেরুলে দুধটা, ঘিটা—ওর শরীরটা সারবে এখন।

অপু জন্মিয়া অবধি কোথাও কখনো যায় নাই। এ গাঁয়েরই বকুলতলা, গোসাঁইবাগান, চালতেতলা, নদীর ধার—বড়জোর নবাবগঞ্জ যাইবার পাকা সড়ক—এই পর্যন্ত তাহার দৌড়। মাঝে মাঝে বৈশাখ কি জ্যৈষ্ঠ মাসে খুব গরম পড়িলে তাহার মা বৈকালে নদীর ঘাটে দাঁড়াইয়া থাকিত। নদীর ওপারের খড়ের মাঠে বাবলা গাছে গাছে হলুদ রংএর ফুল ফুটিয়া থাকিত, গরু চরিত, মোটা গুলঞ্চলতাদুলানো শিমুল গাছটাকে দেখিলে মনে হইত যেন কতকালের পুরাতন গাছটা। রাখালেরা নদীর ধারে গরুকে জল খাওয়াইতে আসিত, ছোট্ট একখানা জেলেডিঙ্গি বাহিয়া তাহাদের গাঁয়ের অক্রুর মাঝি মাছ ধরিবার দোয়াড়ি পাতিতে যাইত, মাঠের মাঝে মাঝে ঝাড় ঝাড় সোঁদালি ফুল বৈকালের ঝিরঝিরে বাতাসে দুলিতে থাকিত—ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ এক-একদিন ওপারের সবুজ খড়ের জমির শেষে নীল আকাশটা যেখানে আসিয়া দূর গ্রামের সবুজ বনরেখার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, সেদিকে চাহিয়া দেখিতেই তাহার মনটা কেমন হইয়া যাইত—সে সব প্রকাশ করিয়া বুঝাইয়া বলিতে জানিত না। শুধু তাহার দিদি ঘাট হইতে উঠিলে সে বলিত—দিদি, দিদি, দ্যাখ দ্যাখ্ ঐদিকে—পরে সে মাঠের শেষের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিত—ঐ যে? ঐ গাছটার পিছনে? কেমন অনেক দূর, না?

দুর্গা হাসিয়া বলিত—অনেক দূর—তাই দেখাচ্ছিলি? দূর, তুই একটা পাগল!

আজ সেই অপু সর্বপ্রথম গ্রামের বাহিরে পা দিল। কয়েকদিন পূর্ব হইতেই উৎসাহে তাহার রাত্রিতে ঘুম হওয়া দায় হইয়া পড়িয়াছিল, দিন গুনিতে গুনিতে অবশেষে যাইবার দিন আসিয়া গেল।

তাহাদের গ্রামের পথটি বাঁকিয়া নবাবগঞ্জের সড়ককে ডাইনে ফেলিয়া মাঠের বাহিরে আষাঢ়ু-দুর্গাপুরের কাঁচা রাস্তার সঙ্গে মিশিয়াছে। দুর্গাপুরের রাস্তায় উঠিয়াই সে বাবাকে বলিল—বাবা, যেখান দিয়ে রেল যায় সেই রেলের রাস্তা কোন্ দিকে?

তাহার বাবা বলিল—সামনেই পড়বে এখন, চলো না। আমরা রেল লাইন পেরিয়ে যাব এখন—

সেবার তাহাদের রাঙী গাইয়ের বাছুর হারাইয়াছিল। নানা জায়গা খুঁজিয়াও দুই তিন দিন ধরিয়া কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। সে তাহার দিদির সঙ্গে দক্ষিণ মাঠে বাছুর খুঁজিতে আসিয়াছিল। পৌষ মাস, ক্ষেতে ক্ষেতে কলাই গাছের ফলে দানা বাঁধিয়াছে, সে ও তাহার দিদি নীচু হইয়া ক্ষেত হইতে মাঝে মাঝে কলাই ফল তুলিয়া খাইতেছিল—তাহাদের সামনে কিছুদূরে নবাবগঞ্জের পাকা রাস্তা, খেজুর গুড় বোঝাই গরুর গাড়ীর সারি পথ বাহিয়া ক্যাঁচ ক্যাঁচ করিতে করিতে আষাঢ়ুর হাটে যাইতেছিল।

তাহার দিদি পাকা রাস্তা ওপারে বহুদূরে ঝাপসা মাঠের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া কি দেখিতেছিল, হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল,—এক কাজ করবি অপু, চল যাই আমরা রেলের রাস্তা দেখে আসি, যাবি? অপু বিস্ময়ের সুরে দিদির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—রেলের রাস্তা—সে যে অনেক দূর! সেখানে কি ক'রে যাবি?

তাহার দিদি বলিল—বেশী দূর বুঝি! কে বলেচে তোকে—ঐ পাকা রাস্তার ওপারে তো—না?

অপু বলিল—নিকটে হ'লে তো দেখা যাবে? পাকা রাস্তা থেকে দেখা যায়—চল দিকি দিদি, গিয়ে দেখি।

দুইজনে অনেকক্ষণ নবাবগঞ্জের সড়কে উঠিয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিল। তাহার দিদি বলিল—বড্ড অনেক দূর, না? যাওয়া যাবে না—

—কিছু তো দেখা যায় না—অত দূর গেলে আবার আসব কি ক'রে? তাহার সতৃষ্ণ দৃষ্টি কিন্তু দূরের দিকে আবদ্ধ ছিল, লোভও হইতেছিল, ভয়ও হইতেছিল। হঠাৎ তাহার দিদি মরীয়া ভাবে বলিয়া উঠিল—চল্ যাই দেখে আসি অপু—কতদূর আর হবে? দুপুরের আগে ফিরে আসবো এখন, হয়তো রেলের গাড়ী যাবে এখন—মাকে বল্‌বো বাছুর খুঁজতে দেরি হয়ে গেল—

প্রথমে তাহারা একটুখানি এ-দিক ও-দিক চাহিয়া দেখিল কেহ তাহাদিগকে লক্ষ্য করিতেছে কিনা। পরে পাকা রাস্তা হইতে নামিয়া পড়িয়া দুপুর রোদে ভাই বোনে মাঠ বিল জলা ভাঙিয়া সোজা দক্ষিণ মুখে ছুটিল। দৌড়, দৌড়, দৌড়—নবাবগঞ্জের লাল রাস্তা ক্রমে অনেক দূর পিছাইয়া পড়িল—রোয়ার মাঠ, জলসত্রতলা, ঠাকুর-ঝি পুকুর বামধারে, ডানধারে দূরে দূরে পড়িয়া রহিল—সামনে একটা ছোট বিল নজরে আসিতে লাগিল। তাহার দিদি হাসিয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—মা টের পেলে কিন্তু—পিঠের ছাল তুলবে। অপু একবার হাসিল—মরীয়ার হাসি। আবার দৌড়, দৌড়, দৌড়—জীবনে এই প্রথম বাধাহীন, গণ্ডীহীন মুক্তির উল্লাসে তাহাদের তাজা তরুণ রক্ত তখন মাতিয়া উঠিয়াছিল—পরে কি হইবে, তাহা ভাবিবার অবসর কোথায়?

পরে যাহা হইল, তাহা সুবিধাজনক নয়। খানিক দূরে গিয়া একটা বড় জলা পড়িল একেবারে সামনে— হোগলা আর শোলা গাছে ভরা, তাহার উপর তাহার দিদি পথ হারাইয়া ফেলিল—কোনো গ্রামও চোখে পড়ে না—সামনে কেবল ধানক্ষেত, জলা, আর বেত-ঝোপ। ঘন বেতবনের ভিতর দিয়া যাওয়া যায় না, পাঁকে জলে পা পুঁতিয়া যায়, রৌদ্র এমন বাড়িয়া উঠিল যে, শীতকালেও তাহাদের গা দিয়া ঘাম ঝরিতে লগিল—দিদির পরনের কাপড় কাঁটায় নানা স্থানে ছিঁড়িয়া গেল, তাহার নিজের পায়ে দু'তিন বার কাঁটা টানিয়া টানিয়া বাহির করিতে হইল—শেষে রেলরাস্তা দূরের কথা, বাড়ী ফেরাই মুস্কিল হইয়া উঠিল। অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে, পাকা রাস্তাও আর দেখা যায় না, জল ভাঙিয়া ধানক্ষেত পার হইয়া যখন তাহারা বহু কষ্টে আবার পাকা রাস্তায় আসিয়া উঠিল তখন দুপুর ঘুরিয়া গিয়াছে। বাড়ী আসিয়া তাহার দিদি ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা কথা বলিয়া তবে নিজের ও তাহার পিঠ

বাঁচাইল।

সেই রেলের রাস্তা আজ এমনি সহজভাবেই সামনে পড়িবে—সেজন্য ছুটিতে হইবে না, পথ হারাইতে হইবে না—বকুনি খাইতে হইবে না!

কিছু দূর গিয়া সে বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া দেখিল নবাবগঞ্জের পাকা সড়কের মত একটা উঁচু রাস্তা মাঠের মাঝখান চিরিয়া ডাইনে বাঁয়ে বহুদূর গিয়াছে। রাঙা রাঙা খোয়ার রাশি উঁচু হইয়া ধারের দিকে সারি দেওয়া। সাদা সাদা লোহার খুঁটির উপর যেন একসঙ্গে অনেক দড়ির টানা বাঁধা—যতদূর দেখা যায়, ঐ সাদা খুঁটি ও দড়ির টানা বাঁধা দেখা যাইতেছে—

তাহার বাবা বলিল—ঐ দ্যাখো খোকা, রেলের রাস্তা—

অপু একদৌড়ে ফটক পার হইয়া রাস্তার উপর আসিয়া উঠিল। পরে সে রেলপথের দুইদিকে বিস্ময়ের চোখে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। দুইটা লোহা বরাবর পাতা কেন? উহার উপর দিয়া রেলগাড়ী যায়? কেন? মাটির উপর দিয়া না গিয়া লোহার ওপর দিয়া যায় কেন? পিছ্‌লাইয়া পড়িয়া যায় না? কেন? ওগুলোকে তার বলে? তাহার মধ্যে সোঁ সোঁ কিসের শব্দ? তারে খবর যাইতেছে? কাহারা খবর দিতেছে? কি করিয়া খবর দেয়? ওদিকে কি ইস্টিশান? এদিকে কি ইস্টিশান?

সে বলিল—বাবা, রেলগাড়ী কখন আস্‌বে? আমি রেলগাড়ী দেখবো বাবা।

—রেলগাড়ী এখন কি ক'রে দেখবে?....সেই দুপুরের সময় রেলগাড়ী আসবে, এখনও দু'ঘন্টা দেরি!

—তা হোক বাবা, আমি দেখে যাবো, আমি কখ্‌খনো দেখিনি—হ্যাঁ বাবা—

—ও রকম কোরো না, ঐ জন্য তোমায় কোথাও আনতে চাইনে—এখন কি ক'রে দেখবে? সেই দুপুর একটা অবধি ব'সে থাকতে হবে তা হোলে এই ঠায় রোদ্দুরে, চল্‌ আসবার দিন দেখাবো।

অপুকে অবশেষে জল-ভরা চোখে বাবার পিছনে পিছনে অগ্রসর হইতে হইল।

তুমি চলিয়া যাইতেছ....তুমি কিছুই জানো না, পথের ধারে তোমার চোখে কি পড়িতে পারে, তোমার ডাগর নবীন চোখ বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধায় চারিদিককে গিলিতে গিলিতে চলিয়াছে—নিজের আনন্দের এ হিসাবে তুমিও একজন দেশ-আবিষ্কারক। অচেনার আনন্দকে পাইতে হইলে পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে, তাহার মানে নাই। আমি যেখানে আর কখনো যাই নাই, আজ নতুন পা দিলাম, যে নদীর জলে নতুন স্নান করিলাম, যে গ্রামের হাওয়ায় শরীর জুড়াইল, আমার আগে সেখানে কেহ আসিয়াছিল কিনা, তাহাতে আমার কি আসে যায়? আমার অনুভূতিতে তাহা যে অনাবিষ্কৃত দেশ। আমি আজ সর্বপ্রথম মন, বুদ্ধি, হৃদয় দিয়া উহার নবীনতাকে আস্বাদ করিলাম যে!

আমডোব! ছোট্ট চাষাদের গাঁ-খানা—কেমন নামটি! মেয়েরা উঠানে বিচালি কাটিতেছে, ছাগল বাঁধিতেছে, মুরগীকে ভাত খাওয়াইতেছে, বড় লোকেরা পাট শুকাইতেছে, বাঁশ কাটিতেছে—দেখিতে দেখিতে গাঁ পিছনে ছাড়িয়া একেবারে বাইরের মাঠ....বিলে জল থৈ থৈ করিতেছে....উড়ি ধানের ক্ষেতে বক বসিয়া আছে....নাল ফুলের পাতা ও ফুটন্ত ফুলে জল দেখা যায় না।

খল্‌সেমারির বিলের প্রান্তে ঘন সবুজ আউশ ধানের ক্ষেতের উপরকার বৃষ্টিধৌত, ভাদ্রের আকাশের সুনীল প্রসার। সারা চক্রবাল জুড়িয়া সূর্যাস্তের অপরূপ বর্ণচ্ছটা, বিচিত্র রং-এর মেঘের পাহাড়, মেঘের দ্বীপ, মেঘের সমুদ্র, মেঘের স্বপ্নপুরী....খোলা আকাশের সহিত এরকম পরিচয় তাহার এতদিন হয় নাই, মাঠের পারের দূরের দেশটা এবার তাহার রহস্য-অবগুণ্ঠন খুলিল আট বছরের ছেলেটির কাছে।

যাইতে যাইতে বড় দেরি হইল। তাহার বাবা বলিল—তুমি বড্ড হাঁ-করা ছেলে, যা দ্যাখো তাতেই হাঁ ক'রে থাকো কেন অমন? জোরে হাঁটো।

সন্ধ্যার পর তাহারা গন্তব্য স্থানে পৌঁছিল। শিষ্যের নাম লক্ষ্মণ মহাজন, বেশ বড় চাষী ও অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। বাহিরের বড় আটচালা ঘরে মহা আদরে তাহাদের থাকিবার স্থান করিয়া দিল।

লক্ষ্মণ মহাজনের ছোটভাইয়ের স্ত্রী সকালে স্নান করিবার জন্য পুকুরের ঘাটে আসিয়াছে—জলে নামিতে গিয়া পুকুরের পাড়ে নজর পড়াতে সে দেখিল পুকুরপাড়ের কলাবাগানে একটি অচেনা ছোট

ছেলে একখানি কঞ্চি হাতে কলাবাগানের একবার এদিক একবার ওদিক পায়চারি করিতেছে ও পাগলের মত আপন মনে বকিতেছে। সে ঘাড় নামাইয়া কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কাদের বাড়ী এসেছ, খোকা?

অপুর যত জারিজুরি তাহার মায়ের কাছে। বাহিরে সে বেজায় মুখচোরা।

প্রথমটা অপুর মাথায় আসিল যে টানিয়া দৌড় দেয়। পরে সঙ্কুচিত সুরে বলিল—ওই ওদের বাড়ী—

বধূটি বলিল—বটঠাকুরদের বাড়ী? বট্‌ঠাকুরের গুরুমশায়ের ছেলে? ও!

বধূ সঙ্গে করিয়া তাহাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া গেল। তাহাদের বাড়ী পৃথক—লক্ষ্মণ মহাজনের বাড়ী হইতে সামান্য দূরে, কিন্তু মধ্যে পুকুরটা পড়ে।

বধূর ব্যবহারে অপুর লাজুকতা কাটিয়া গেল। সে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া ঘরের জিনিসপত্র কৌতূহলের সহিত চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। ওঃ, কত কি জিনিস!....তাহাদের বাড়ীতে এ রকম জিনিস নাই। এরা খুব বড়লোক তো! কড়ির আল্‌না, রং-বেরং-এর ঝুলন্ত শিকা, পশমের পাখী, কাঁচের পুতুল, মাটির পুতুল, শোলার গাছ—আরও কত কি!—দু-একটা জিনিস সে ভয়ে ভয়ে হাতে তুলিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল।

বধূ এতক্ষণ ভাল করিয়া ছেলেটির মুখের দিকে চাহিয়া দেখে নাই—কাছের গোড়ায় দেখিয়া মনে হইল যে, এ এখনও ভারি ছেলেমানুষ, মুখের ভাব যেন পাঁচ বছরের ছেলের মত কচি। এমন সুন্দর অবোধ চোখের ভাব সে আর কোন ছেলের চোখে এ পর্যন্ত দেখে নাই—এমন রং, এমন গড়ন, এমন সুন্দর মুখ, এমন তুলি দিয়া আঁকা ডাগর ডাগর নিষ্পাপ চোখ—অচেনা ছেলেটির উপর বধূর বড় মমতা হইল।

অপু বসিয়া নানা গল্প করিল—বিশেষ করিয়া কল্যকার রেলপথের কথাটি। খানিকটা পরে বধূ মোহনভোগ তৈয়ারী করিয়া খাইতে দিল। একটা বাটিতে অনেকখানি মোহনভোগ, এত ঘি দেওয়া যে আঙুলে ঘিয়ে মাখামাখি হইয়া যায়। অপু একটুখানি মুখে তুলিয়া খাইয়া অবাক হইয়া গেল—এমন অপূর্ব জিনিস আর সে কখনো খায় নাই তো!—মোহনভোগে কিসমিস্ দেওয়া কেন? কৈ তাহার মায়ের তৈরী মোহনভোগে তো কিসমিস্ থাকে না? বাড়ীতে সে মা'র কাছে আবদার ধরে—মা, আজ আমাকে মোহনভোগ ক'রে দিতে হবে! তাহার মা হাসিমুখে বলে—আচ্ছা ওবেলা তোকে ক'রে দেবো—পরে সে শুধু সুজি জলে সিদ্ধ করিয়া একটু গুড় মিশাইয়া পুলটিসের মত একটা দ্রব্য তৈয়ারী করিয়া কাঁসার সরপুরিয়া থালাতে আদর করিয়া ছেলেকে খাইতে দেয়। অপু তাহাই খুশির সহিত এতদিন খাইয়া আসিয়াছে, মোহনভোগ যে এরূপ হয় তাহা সে জানিত না। আজ কিন্তু তাহার মনে হইল এ মোহনভোগে আর মায়ের তৈয়ারী মোহনভোগে আকাশ-পাতাল তফাৎ!....সঙ্গে সঙ্গে মায়ের উপর করুণায় ও সহানুভূতিতে তাহার মন ভরিয়া উঠিল। হয়তো তাহার মাও জানে না যে, এ রকমের মোহনভোগ হয়!—সে যেন আবছায়া ভাবে বুঝিল, তাহার মা গরীব, তাহারা গরীব—তাই তাহাদের বাড়ী ভাল খাওয়া-দাওয়া হয় না।

একদিন পাড়ার এক ব্রাহ্মণ প্রতিবেশীর বাড়ী অপুর নিমন্ত্রণ হইল। দুপুর বেলা সে-বাড়ীর একটি মেয়ে আসিয়া অপুকে ডাকিয়া লইয়া গেল। ওদের রান্নাঘরের দাওয়ায় যত্ন করিয়া পিঁড়ি পাতিয়া জল ছিটাইয়া অপুকে খাবার জায়গা করিয়া দিল। যে মেয়েটি অপুকে ডাকিতে আসিয়াছিল, নাম তার অমলা, বেশ টুকটুকে ফর্সা রং, বড় বড় চোখ, বেশ মুখখানি, বয়স তার দিদির মত। অমলার মা কাছে বসিয়া তাহাকে খাওয়াইলেন, নিজের হাতের তৈয়ারী চন্দ্রপুলি পাতে দিলেন। খাওয়ার পরে অমলা তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী দিয়া গেল। সেদিন বৈকালে খেলিতে খেলিতে অপুর পায়ের আঙুল হঠাৎ বাগানের বেড়ার দুই বাঁশের ফাঁকে পড়িয়া আটকাইয়া গেল। টাট্‌কা-চেরা নতুন বাঁশের বেড়া, আঙুল কাটিয়া রক্তারক্তি হইল, অমলা ছুটিয়া আসিয়া পা-খানা বাঁশের ফাঁক হইতে বাহির না করিলে গোটা আঙুলটাই কাটা পড়িত। সে চলিতে পারিতেছিল না, অমলা তাহাকে কোলে করিয়া গোলার পাশ হইতে পাথরকুচির পাতা তুলিয়া বাটিয়া আঙুলে বাঁধিয়া দিল। পাছে বাবার বকুনি খাইতে হয়,

এই ভয়ে অপু একথা কাহারও কাছে প্রকাশ করিল না।

সে রাত্রে শুইয়া অপু শুধু অমলারই স্বপ্ন দেখিল। সে অমলার কোলে বেড়াইতেছে, অমলার কাছে বসিয়া আছে, অমলার সঙ্গে খেলা করিতেছে, অমলা তাহার পায়ের আঙুলে পটি বাঁধিয়া দিতেছে, সে ও অমলা রেলরাস্তায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে—অমলার হাসিভরা চোখমুখ ঘুমের ঘোরে সারারাত নিজের কাছে কাছে। ভোরে সে শুধু খুঁজিতে লাগিল অমলা কখন আসে। আরও সব ছেলেমেয়েরা আসিল, খেলা আরম্ভ হইয়া গেল, ক্রমে বেশ বেলা হইল—কিন্তু অমলার দেখা নাই। বাড়ীর ভিতর হইতে বধূ খাবার খাইবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইল—রোজ সকালে বিকলে বধূ নিজের হাতে খাবার তৈরী করিয়া তাহাকে খাওয়াইত—খাওয়া শেষ করিয়া আসিবার সময় সে বধূকে জিজ্ঞাসা করিল—সকালে কি অমলাদিদি এসেছিল? না, সে আসে নাই। ক্রমে আরও বেলা হওয়াতে খেলা ভাঙিয়া গেল। তাহার বাবা তাহাকে স্নান করিবার জন্য ডাকিল। তবুও কোথায় অমলা? অভিমানে তাহার মন ছাপাইয়া উঠিল, বেশ, নাই বা আসিল? অমলার সহিত তাহার জন্মের মত আড়ি—আর যদি সে কখনো তাহার সহিত কথা কয়! বৈকালেও খেলা আরম্ভ হইল, আর সকলেই আসিল—অমলা নাই। পাঁচ ছয়টি ছেলেমেয়ে খেলিতে আসিলেও অপুর মনে হইল, কাহার সহিত সে খেলিবে? কেহই উপযুক্ত খেলার সাথী বলিয়া মনে হইল না! উৎসাহহীন ভাবে সে খানিকক্ষণ খেলা করিল, তবুও অমলার দেখা নাই।

পরদিন সকালে অমলা আসিল। অপু কোনো কথা বলিল না। অমলা যেখানে বসে, সে তাহার ত্রিসীমানায় ঘেঁষে না, অথচ মাঝে মাঝে আড়চোখে চাহিয়া দেখে, সে যে রাগ করিয়া এরূপ করিতেছে, অমলা তাহা বুঝিয়াছে কিনা। অমলা সত্যই প্রথমটা বুঝিতে পারে নাই, পরে যখন সে বুঝিল যে, কিছু একটা হইয়াছে নিশ্চয়, তখন সে কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি খোকা, কথা বলচো না কেন?....কি হয়েচে?

অপু অতশত বোঝে না, সে অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল—কি হয়েচে বৈকি! তা কিছু কি আর হয়েচে? কাল আসনি কেন?

অমলা অবাক্ হইয়া বলিল—আসিনি, তাই কি?—সেইজন্যে রাগ হয়েচে? অপু ঘাড় নাড়াইয়া জানাইল, ঠিক তাই। অমলা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া অপুকে হাত ধরিয়া লইয়া চলিল বাড়ীর ভিতর। সেখানে বধূ সব শুনিয়া প্রথমটা হাসিয়া খুন হইল, পরে মুখে হাসি টিপিয়া বলিল—তা হোলে অমলা, তোমার আর এখন বাড়ী যাওয়ার যো নাই তো দেখচি—কি আর করবে, খোকা যখন তোমাকে ছাড়তে পারে না, তখন এখানেই থেকে যাও—আর না হয়—

বধূর কথার ভঙ্গিতে অমলা কি জানি কি একটা ঠাওরাইয়া লজ্জিত প্রতিবাদের সুরে বলিল—আচ্ছা যাও বৌদি—ও-রকম করলে কিন্তু কক্ষণো আর তোমাদের বাড়ী—

খানিকক্ষণ পরে অপু অমলার সঙ্গে তাহাদের বাড়ী গেল। অমলা তাহাদের আলমারি খুলিয়া কাঁচের বড় মেম-পুতুল, মোমের পাখী, গাছ, আরও কত কি দেখাইল। কালীগঞ্জের স্নানযাত্রার মেলা হইতে সে-সব নাকি কেনা, অপু জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল। নতুন নতুন খেলার জিনিস—একটা রবারের বাঁদর, সেটা তুমি যেদিকে যাও, তোমার দিকে চাহিয়া চোখ পিট্‌পিট্ করিবে—একটা কিসের পুতুল, সেটার পেট টিপিলে দুহাতে মৃগীরোগীর মত হঠাৎ হাত পা ছুঁড়িয়া খঞ্জনী বাজাইতে থাকে—সকলের চেয়ে আশ্চর্যের জিনিস হইতেছে একটা টিনের ঘোড়া; রাণুদির কাকা তাহাদের বাড়ীর দালানের ঘড়িতে যেমন দম দেয়, ঐরকম দম দিয়া ছাড়িয়া দিলে সেটা খড়্‌খড়্ করিয়া মেঝের উপর চলিতে থাকে—অনেক দূর যায়—ঠিক যেন একেবারে সত্যিকারের ঘোড়া। সেইটা দেখিয়া অপু অবাক হইয়া গেল। হাতে তুলিয়া বিস্ময়ের সহিত উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া অমলার দিকে চাহিয়া বলিল—এ কি রকম ঘোড়া, বেশ তো! এ কোথা থেকে কেনা, এর দাম কত?

তাহার পর অমলার তাহাকে একটা সিঁদুরের কৌটা খুলিয়া দেখাইল—সেটার মধ্যে রাঙা রং-এর একখানা ছোট রাংতার মত কি। অপু বলিল—ওটা কি? রাংতা? অমলা হাসিয়া বলিল—রাংতা হবে কেন?—সোনার পাত দেখনি অপু? অপু সোনার পাত দেখে নাই। সোনার রং কি অত রাঙা?

সোনার পাতখানা নাড়িয়া চাড়িয়া ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। অমলার সহিত বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে সে ভাবিল—আহা, দিদিটার ও-সব খেলনা কিছুই নেই—মরে কেবল শুকনো নাটাফল আর রড়ার বিচি কুড়িয়ে, আর শুধু পরের পুতুল চুরি ক'রে মার খায়!....তাহার দিদির বয়সী অন্য কোনো মেয়ের খেল্‌নার ঐশ্বর্য কত বেশী, তাহা সে এ পর্যন্ত কোনো দিন দেখে নাই, আজ তুলনা করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়া দিদির প্রতি অত্যন্ত করুণায় তাহার মনটা যেন গলিয়া গেল। তাহার পয়সা থাকিলে সে দিদিকে একটা কলের ঘোড়া কিনিয়া দিত—আর একটা রবারের বাঁদর....তুমি যেদিকে যাও, তোমার দিকে চাহিয়া সেটা চোখ পিট্‌পিট্‌ করে....

বধূর কাছে একজোড়া পুরানো তাস ছিল; ঠিক একজোড়া বলা চলে না, সেটা নানা জোড়া তাসের পরিত্যক্ত কাগজগুলি এক জায়গায় করা আছে মাত্র—অপু সেগুলি লইয়া মধ্যে মধ্যে নাড়ে চাড়ে। রাণুদির বাড়ীতে মাঝে মাঝে দুপুরবেলা তাসের আড্ডা বসিত, সে বসিয়া বসিয়া খেলা দেখিত। টেক্কা, গোলাম, সাহেব, বিবি—কাগজ ধরা লইয়া মারামারি হয়—বেশ খেলা! সে তাস খেলিতে জানে না, তাহার মা দিদি কেহই জানে না। এক-এক দিন তাহার মা তাস খেলিতে যায়, তাহার মাকে লইয়া কেহ বসিতে চায় না, সকলে বলে, ও কিছু খেলা জানে না; এক এক দিন তাহার মা তাস খেলিতে বসে, এমন ভাব দেখায় যেন সে খুব পাকা খেলোয়াড়—খানিকক্ষণ পরেই কিন্তু ধরা পড়ে। কেউ বলে, ও বৌ, একি? এখানে টেক্কা মেরে বসলে যে! দেখলে না ওহাতে রংয়ের গোলাম কাটলে?—তোমার চোখের সামনে যে? তাহার মা তাড়াতাড়ি অজ্ঞতা ঢাকিতে যায়, হাসিয়া বলে, তাই তো! বড্ড তো ভুল হয়ে গেছে, ও ঠাকুরঝি, মোটেই তো মনে নেই। পরে সে আবার খেলিতে থাকে, মুখ টিপিয়া হাসে, এর ওর দিকে চায়, এমন ভাবটা দেখায় যে তাহার কাছে সকলের হাতের তাসের খবরই আছে, এবার একটা কিছু না করিয়া সে ছাড়িবে না—কিন্তু খানিকটা পরে একজন অবাক হইয়া বলিয়া উঠে—একি বৌমা, দেখি? ওমা আমার কি হবে! তোমার হাতে যে, এমন বিন্তি ছিল, দেখাওনি? তাহার মা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বিজ্ঞের ভাব করিয়া বলে,—আছে, আছে, ওর মধ্যে একটা কথা আছে! ইচ্ছে ক'রেই দেখাই নি। সে আসলে বিন্তি কিসে হয় সব জানে না—তাহার খেলুড়ে রাগ করিয়া বলে—ওর মধ্যে আবার কথাটা কি শুনি? এমন হাতটা নষ্ট কল্লে? দাও তুমি তাস সেজবৌকে, দাও, তোমায় আর খেলতে হবে না—ঢের হয়েচে। তাহার মা অপমান ঢাকিতে গিয়া আবার হাসে—যেন কিছুই হয় নাই, সব ঠাট্টা উহারা ঠাট্টা করিয়া বলিতেছে, সেও সেই ভাবেই লইতেছে।....

সে যদি একজোড়া তাস পায় তবে সে, মা ও দিদি খেলে। খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরবেলা তাদের বাড়ীর বনের ধারের দিকের সেই জানালাটা....যেটার কবাটগুলোর মধ্যে কি পোকায় কাটিয়া সরিষার মত গুঁড়া করিয়া দিয়াছে....নাড়া দিলে ঝুর্‌ঝুর্‌ করিয়া ঝরিয়া পড়ে, পুরানো কাঠের গুঁড়ার গন্ধ বার হয়—জানালার ধারের বন থেকে দুপুরের হাওয়ায় গন্ধভেদালি লতার কটু গন্ধ আসে, রোয়ার্কের কালমেঘের গাছের জঙ্গলে দিদির পরিচিত কাঁচপোকাটা একবার ওড়ে, আবার বসে, আবার ওড়ে আবার বসে—নির্জন দুপুরে তারা তিনজনে সেই জানালাটির ধারে মাদুর পাতিয়া বসিয়া আপন মনে তাস খেলিবে। কিসে কিসে বিন্তি হয় তাদের নাই-বা থাকিল জানা, তাদের খেলায় বিন্তি না দেখাইতে পারিলেও চলিবে—সেজন্য কেহ কাহাকেও উঠাইয়া দিবে না, কোন অপমানের কথা বলিবে না, কোন হাসি-বিদ্রূপ করিবে না, যে যেরূপ পারে সেইরূপই খেলিবে। খেলা লইয়া কথা—নাই বা হইল বিন্তি দেখানো!

সন্ধ্যার পরে বধূর ঘরে অপুর নিমন্ত্রণ ছিল। খাইতে বসিয়া খাবার জিনিসপত্র ও আয়োজনের ঘটা দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল। ছোট একখানা ফুলকাটা রেকাবিতে আলাদা করিয়া নুন ও নেবু কেন? নুন নেবু তো মা পাতেই দেয়! প্রত্যেক তরকারির জন্যে খাবার আলাদা আলাদা বাটি!—তরকারিই বা কত! অত বড় গল্‌দা চিংড়ির মাথাটা কি তাহার একার জন্য?

লুচি! লুচি! তাহার ও দিদির স্বপ্নকামনার পারে এক রূপকথার দেশের নীল-বেলা আবছায়া দেখা যায়....কত রাতে, দিনে, ওলের ডাঁটাচচ্চড়ি ও লাউ-ছেঁচকি দিয়া ভাত খাইতে খাইতে, কত জল-খাবার-খাওয়া-শূন্য সকালে বিকালে, অন্যমনস্ক মন হঠাৎ লুব্ধ উদাস গতিতে ছুটিয়া চলে সেখানে—

লওয়ার মানেই পরাজয়—বিশু ডানপিটে ছেলে, তাহাকে দৌড়িয়া ধরা কি খেলায় হারানো সোজা নয়। একবার অমলা স্পষ্টই বিরক্তি প্রকাশ করিল। অপু প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল যাহাতে সে জেতে, যাহাতে অমলা সন্তুষ্ট হয়—কিন্তু বিস্তর চেষ্টা সত্ত্বেও সে আবার হারিয়া গেল।

সে-বার দল গঠন করিবার সময় অমলা ঝুঁকিল বিশুর দিকে।

অপুর চোখে জল ভরিয়া আসিল। খেলা তাহার কাছে হঠাৎ বিস্বাদ মনে হইল—অমলা বিশুর দিকে ফিরিয়া সব কথা বলিতেছে, হাসিখুশি সবই তাহার সঙ্গে। খানিকটা পরে বিশু কি কাজে বাড়ী যাইতে চাহিলে অমলা তাহাকে বার বার বলিল যে, সে যেন আবার আসে। অপুর মনে অত্যন্ত ঈর্ষা হইল, সারা সকালটা একেবারে ফাঁকা হইয়া গেল! পরে সে মনে মনে ভাবিল—বিশু খেলা ছেড়ে চলে যাচ্ছে—গেলে খেলার খেলুড়ে কমে যাবে, তাই অমলাদি ঐরকম বলচে, আমি গেলে আমাকেও বলবে, ওর চেয়েও বেশী বলবে। হঠাৎ সে চলিয়া যাইবার ভান করিয়া বলিল—বেলা হয়ে যাচ্ছে, আমি যাই, নাইবো। অমলা কোনো কথা বলিল না, কেবল কামারদের ছেলে নাড়ুগোপাল বলিল—আবার ও-বেলা এসো ভাই!

অপু খানিক দূর গিয়া একবার পিছনে চাহিল—তাহাকে বাদ দিয়া কাহারও কোনো ক্ষতি হয় নাই, পুরাদমে খেলা চলিতেছে, অমলা মহা উৎসাহে খুঁটির কাছে বুড়ী হইয়া দাঁড়াইয়াছে—তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিতেছে না।

অপু আহত হইয়া অভিমানে বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল, কাহারও সঙ্গে কোনো কথা বলিল না।

ভারি তো অমলাদি! না চাহিল তাহাকে—তাতেই বা কি?....

দিন দুই পরে হরিহর ছেলেকে লইয়া বাড়ী আসিল।

এই মোটে কয়দিন, এরই মধ্যে সর্বজয়া ছেলেকে না দেখিয়া আর থাকিতে পারিতেছিল না।

দুর্গার খেলা কয়দিন হইতে ভালরকম জমে নাই, অপুর বিদেশ-যাত্রার দিনকতক আগে দেশী-কুমড়ার শুকনো খোলার নৌকা লইয়া ঝগড়া হওয়াতে দুজনের মুখ দেখাদেখি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল—এখন আরও অনেক কুমড়ার খোলা জমিয়াছে, দুর্গা কিন্তু আর সেগুলি জলে ভাসাইতে যায় না—কেন মিছিমিছি এ নিয়ে ঝগড়া ক'রে তার কান ম'লে দিলাম? আসুক সে ফিরে, আর কক্ষনো তার সঙ্গে ঝগড়া নয়, সব খোলা সে-ই নিয়ে নিক্।

বাড়ী আসিয়া অপু দিন পনেরো ধরিয়া নিজের অদ্ভুত ভ্রমণকাহিনী বলিয়া বেড়াইতে লাগিল। কত আশ্চর্য জিনিস সে দেখিয়াছে এই কয়দিনে! রেলের রাস্তা, যেখান দিয়া সত্যিকারের রেলগাড়ী যায়! মাটির আতা, পেঁপে, শসা—অবিকল যেন সত্যিকার ফল! সেই পুতুলটা, যেটার পেট টিপিলে মৃগীরোগীর মত হাত-পা ছুঁড়িয়া হঠাৎ খঞ্জনী বাজাইতে শুরু করে! অমলাদি! কতদূর যে সে গিয়াছিল, কত পদ্মফুল ভরা বিল, কত অচেনা নতুন গাঁ পার হইয়া কত মাঠের উপরকার নির্জন পথ বাহিয়া, সেই যে কোন গাঁয়ে পথের ধারের কামার-দোকানে বাবা তাহাকে জল খাওয়াইতে লইয়া গেলে, তাহারা তাহাকে বাড়ীর মধ্যে ডাকিয়া লইয়া যত্ন করিয়া পিঁড়ি পাতিয়া বসাইয়া দুধ, চিঁড়ে, বাতাসা খাইতে দিয়াছিল! কোন্‌টা ফেলিয়া সে কোন্‌টার গল্প করে!

রেলরাস্তার গল্প শুনিয়া তাহার দিদি মুগ্ধ হইয়া যায়, বার বার জিজ্ঞাসা করে—কত বড় নোয়াগুনো দেখলি অপু? তার টাঙানো বুঝি? খুব লম্বা? রেলগাড়ী দেখতে পেলি? গেল?

না—রেলগাড়ী অপু দেখে নাই। ঐটাই কেবল বাদ পড়িয়াছে—সে শুধু বাবার দোষে। মোটে ঘন্টা চার-পাঁচ রেলরাস্তার ধারে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেই দেখা যাইত—কিন্তু বাবাকে সে কিছুতেই বুঝাইয়া উঠিতে পারে নাই।

বেলা হইয়া যাওয়াতে ব্যস্ত অবস্থায় সর্বজয়া তাড়াতাড়ি অন্যমনস্কভাবে সদর দরজা দিয়া ঢুকিয়া উঠানে পা দিতেই কি যেন একটা সরু দড়ির মত বুকে আটকাইল ও সঙ্গে সঙ্গে কি যেন একটা পটাং

করিয়া ছিঁড়িয়া যাইবার শব্দ হইল এবং দুদিক হইতে দুটা কি, উঠানে ঢিলা হইয়া পড়িয়া গেল। সমস্ত কার্যটি চক্ষের নিমেষে হইয়া গেল, কিছু ভাল করিয়া দেখিবার কি বুঝিবার পূর্বেই।

অল্পখানিক পরেই, অপু বাড়ী আসিল! দরজা পার হইয়া উঠানে পা দিতেই সে থমকাইয়া দাঁড়াইয়া গেল—নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না—এ কি! বা রে, আমার টেলিগিরাপের তার ছিঁড়লে কে?

ক্ষতির আকস্মিকতায় ও বিপুলতায় প্রথমটা সে কিছু ঠাহর করিতে পারিল না। পরে একটু সামলাইয়া লইয়া চাহিয়া দেখিল উঠানের মাটিতে ভিজা পায়ের দাগ এখনও মিলায় নাই। তাহার মনের ভিতর হইতে কে ডাকিয়া বলিল—মা ছাড়া আর কেউ নয়। কক্‌খনো আর কেউ নয়, ঠিক মা। বাড়ী ঢুকিয়া সে দেখিল মা বসিয়া বেশ নিশ্চিন্তমনে কাঁঠালবীচি ধুইতেছে। সে হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল এবং যাত্রা-দলের অভিমন্যুর মত ভঙ্গিতে সামনের দিকে ঝুঁকিয়া বাঁশীর সপ্তমের মত রিনরিনে তীব্র মিষ্টসুরে কহিল—আচ্ছা মা, আমি কষ্ট ক'রে ছোটাগুলো বন বাগান ঘেঁটে নিয়ে আসি নি?

সর্বজয়া পিছনে চাহিয়া বিস্মিতভাবে বলিল—কি নিয়ে এসেচিস্? কি হয়েচে—

—আমার বুঝি কষ্ট হয় না? কাঁটায় আমার হাত পা ছ'ড়ে যায় নি বুঝি?

—কি বলে পাগলের মত? হয়েচে কি?

—কি হয়েচে! আমি এত কষ্ট ক'রে টেলিগিরাপের তার টাঙালাম আর ছিঁড়ে দেওয়া হয়েচে, না?

—তুমি যত উদ্‌ঘুট্টি কান্ড ছাড়া তো এক দন্ড থাকো না বাপু!—পথের মাঝখানে কি টাঙানো রয়েচে—কি জানি টেলিগিরাপ কি কি-গিরাপ, আসচি তাড়াতাড়ি, ছিঁড়ে গেল—তা এখন কি করবো বলো—

পরে সে পুনরায় নিজ কাজে মন দিল।

উঃ! কি ভীষণ হৃদয়হীনতা! আগে আগে সে ভাবিত বটে যে, তাহার মা তাহাকে ভালবাসে। অবশ্য যদিও তাহার সে ভ্রান্ত ধারণা অনেকদিন ঘুচিয়া গিয়াছে—তবুও মাকে এতটা নিষ্ঠুর পাষাণীরূপে কখনো স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই। কাল সারাদিন কোথায় নীলমণি জেঠার ভিটা, কোথায় পালিতদের বড় আমবাগান, কোথায় প্রসন্ন গুরুমহাশয়ের বাঁশবন—ভয়ানক ভয়ানক জঙ্গলে একা ঘুরিয়া বহু কষ্টে উঁচু ডাল হইতে দোলানো গুলঞ্চলতা কত কষ্টে যোগাড় করিয়া সে আনিল, এখুনি রেল-রেল খেলা হইবে, সব ঠিকঠাক্, আর কি না....

হঠাৎ সে মাকে একটা খুব কড়া, খুব রূঢ়, খুব একটা প্রাণ-বিঁধানো কথা বলিতে চাহিল—এবং খানিকটা দাঁড়াইয়া বোধ হয় অন্য কিছু ভাবিয়া না পাইয়া আগের চেয়েও তীব্র নিখাদে বলিল—আমি আজ ভাত খাবো না যাও—কখ্‌খনো খাবো না—

তাহার মা বলিল—না খাবি না খাবি যা—ভাত খেয়ে একেবারে রাজা ক'রে দেবেন কিনা? এদিকে তো রান্না নামাতে তর সয় না—না খাবি যা, দেখবো ক্ষিদে পেলে কে খেতে দ্যায়?

ব্যস্! চক্ষের পলকে—সব আছে, আমি আছি তুমি আছ—সেই তাহার মা কাঁঠালবীচি ধুইতেছে—কিন্তু অপু কোথায়? সে যেন কর্পূরের মত উবিয়া গেল! কেবল ঠিক সেই সময়ে দুর্গা বাড়ী ঢুকিতে দরজার কাছে তাহাকে পাশ কাটাইয়া ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়া বিস্মিত সুরে ডাকিয়া বলিল—ও অপু, কোথায় যাচ্ছিস্ অমন করে, কি হয়েচে, ও অপু শোন—

তাহার মা বলিল—জানিনে আমি, যত সব অনাছিষ্টি কাণ্ড বাপু তোমাদের, হাড় মাস কালি হয়ে গেল—কি এক পথের মাঝখানে টাঙিয়ে রেখেচে, আসচি, ছিঁড়ে গেল—তা এখন কি হবে? আমি কি ইচ্ছে ক'রে ছিঁড়িচি? তাই ছেলের রাগ—আমি ভাত খাবো না—না খাস্ যা, ভাত খেয়ে সব একেবারে স্বগ্‌গে ঘণ্টা দেবে কিনা তোমরা?

মাতাপুত্রের এরূপ অভিমানের পালায় দুর্গাকেই মধ্যস্থ হইতে হয়—সে অনেক ডাকাডাকি পরে বেলা দুইটায় সময় ভাইকে খুঁজিয়া বাহির করিল। সে শুষ্কমুখে উদাসনয়নে ও-পাড়ার পথে রায়েদের বাগানে পড়ন্ত আমগাছের গুঁড়ির উপর বসিয়া ছিল।

বৈকালে যদি কেহ অপুদের বাড়ী আসিয়া তাহাকে দেখিত তবে সে কখনই মনে করিতে পারিত না যে, এ সেই অপু—যে আজ সকালে মায়ের উপর অভিমান করিয়া দেশত্যাগী হইয়াছিল। উঠানের এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্যন্ত তার টাঙানো হইয়া গিয়াছে। অপু বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল, কিছুই বাকী নাই, ঠিক যেন একবারে সত্যিকার রেলরাস্তার তার।

সে সতুদের বাড়ী গিয়া বলিল—সতুদা, আমি টেলিগিরাপের তার টাঙিয়ে রেখেচি আমাদের বাড়ীর উঠানে, চল রেল-রেল খেলা করি—আসবে?

—তার কে টাঙিয়ে দিল রে?

—আমি নিজে টাঙালাম। দিদি ছোটা এনে দিয়েছিল—

সতু বলিল—তুই খেলগে্ যা, আমি এখন যেতে পারবো না—

অপু মনে মনে বুঝিল, বড় ছেলেদের ডাকিয়া দল বাঁধিয়া খেলার যোগাড় করা তাহার কর্ম নয়। কে তাহার কথা শুনিবে? তবুও আর একবার সতুর কাছে গেল। নিরাশ মুখে রোয়াকের কোণটা ধরিয়া নিরুৎসাহভাবে বলিল—চল না সতুদা, যাবে? তুমি আমি আর দিদি খেলবো এখন? পরে সে প্রলোভনজনক ভাবে বলিল—আমি টিকিটের জন্যে এতগুলো বাতাবী নেবুর পাতা তুলে এনে রেখেচি। সে হাত ফাঁক করিয়া পরিমাণ দেখাইল।—যাবে?

সতু আসিতে চাহিল না। অপু বাহিরে বড় মুখ-চোরা, সে আর কিছু না বলিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল। দুঃখে তার চোখে প্রায় জল আসিতেছিল—এত করিয়া বলিতেও সতুদা শুনিল না!

পরদিন সকালে সে ও তাহার দিদি দুজনে মিলিয়া ইট দিয়া একটা বড় দোকানঘর বাঁধিয়া জিনিসপত্রের যোগাড়ে বাহির হইল। দুর্গা বনজঙ্গলে উৎপন্ন দ্রব্যের সন্ধান বেশী রাখে—দুজনে মিলিয়া নোনাপাতার পান, মেটে আলু, ফলের আলু, রাধালতা ফুলের মাছ, তেলাকুচির পটল, চিচ্চিড়ের বরবটি, মাটির ঢেলার সৈন্ধব লবণ—আরও কত কি সংগ্রহ করিয়া আসিয়া দোকান সাজাইতে বড় বেলা করিয়া ফেলিল। অপু বলিল—চিনি কিসের করবি রে দিদি?

দুর্গা বলিল—বাঁশতলার পথে সেই টিবিটায় ভাল বালি আছে—মা চাল-ভাজা ভাজবার জন্যে আনে! সেই বালি চল্ আনি গে—সাদা চক্ চক্ করচে—ঠিক একেবারে চিনি—

বাঁশবনে চিনি খুঁজিতে খুঁজিতে তাহারা পথের ধারের বনের মধ্যে ঢুকিল। খুব উঁচু একটা বন, চটকা গাছের আগডালে একটা বড় লতার ঘন সবুজ আড়ালে, টুকটুকে রাঙা, বড় বড় সুগোল কি ফল দুলিতেছে। অপু ও দুর্গা দুজনেই দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। অনেক চেষ্টায় গোটা কয়েক ফল নীচের দিকে লতার খানিকটা অংশ ছিঁড়িয়া তলায় পড়িতেই মহা আনন্দে দুজনে একসঙ্গে ছুটিয়া গিয়া সেগুলিকে মাটি হইতে তুলিয়া লইল।

পাকা ফল মোটে তিনটি। প্রধানত বিপণি সজ্জার উদ্দেশ্যেই তাহা দোকানে এরূপ ভাবে রক্ষিত হইল যে, খরিদ্দার আসিলে প্রথমেই যেন নজরে পড়ে। পুরাদরে বেচাকেনা আরম্ভ হইয়া গেল। দুর্গা নিজেই পান কিনিয়া দোকানের পান প্রায় ফুরাইয়া ফেলিল। খেলা খানিকটা অগ্রসর হইয়াছে এমন সময় সদর দরজা দিয়া সতুকে ঢুকিতে দেখিয়া অপু মহা আনন্দে তাহাকে আগাইয়া আনিতে দৌড়িয়া গেল—ও সতুদা, দ্যাখো না কি রকম দোকান হয়েচে, কেমন ফল দ্যাখো। আমি আর দিদি পেড়ে আন্‌লাম—কি ফল বলো দিকি? জানো?

সতু বলিল—ও তো মাকাল ফল—আমাদের বাগানে ক-ত ছিল! সতু আসিতে অপু যেন কৃতার্থ হইয়া গেল। সতুদা তাহাদের বাড়ীতে তো বড় একটা আসে না—তা ছাড়া সতুদা বড় ছেলেদের দলের চাঁই। সে আসাতে খেলার ছেলেমানুষিটুকু যেন ঘুচিয়া গেল।

অনেকক্ষণ পুরা মরসুমে খেলা চলিবার পর দুর্গা বলিল—ভাই আমাকে দুমণ চাল দাও, খুব সরু, কাল আমার পুতুলের বিয়ের পাকা দেখা, অনেক লোক খাবে—

সতু বলিল—আমাদের বুঝি নেমন্তন্ন, না?

দুর্গা মাথা দুলাইয়া বলিল—না বৈ ক! তোমরা তো হলে কনে যাত্রী—কাল সকালে এসে নকুতো ক'রে নিয়ে যাবো—সতুদা, রাণুকে বলবে আজ রাত্তিরে যেন একটু চন্দন বেটে রাখে। কাল সকালে নিয়ে আসবো—

দুর্গার কথা ভাল করিয়া শেষ হয় নাই এমন সময় সতু দোকানে বিক্রয়ার্থে রক্ষিত পণ্যের মধ্য হইতে কি-একটা তুলিয়া লইয়া হঠাৎ দৌড় দিয়া দরজার দিকে ছুটিল—সঙ্গে সঙ্গে অপুও, ওরে দিদি রে—নিয়ে গেল রে—বলিয়া তাহার রিনরিনে তীব্র মিষ্ট গলায় চীৎকার করিতে করিতে তাহার পিছনে পিছনে ছুটিল।

বিস্মিত দুর্গা ভাল করিয়া ব্যাপারটা কি বুঝিবার আগেই সতু ও অপু দৌড়াইয়া দরজার বাহির হইয়া চলিয়া গেল! সঙ্গে সঙ্গে খেলাঘরের দিকে চোখ পড়িতেই দুর্গা দেখিল সেই পাকা মাকাল ফল তিনটির একটিও নাই!....

দুর্গা একছুটে দরজার কাছে আসিয়া দেখিল, সতু গাবতলার পথে আগে আগে ও অপু তাহা হইতে নিকটে পিছু পিছু ছুটিতেছে। সতুর বয়স অপুর চেয়ে তিন চার বৎসরের বেশী, তাহা ছাড়া সে অপুর মত ওরকম ছিপ্‌ছিপে মেয়েলী গড়নের নয়—বেশ জোরালো হাত-পা ওয়ালা ও শক্ত—তাহার সহিত ছুটিয়া অপুর পারিবার কথা নহে—তবুও যে সে ধরি-ধরি করিয়া তুলিয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ এই যে সতু ছুটিতেছে পরের দ্রব্য আত্মসাৎ করিয়া এবং অপু ছুটিতেছে প্রাণের দায়ে।

হঠাৎ দুর্গা দেখিল যে সতু ছুটিতে ছুটিতে পথে একবারটি যেন নীচু হইয়া পিছনে ফিরিয়া চাহিল—সঙ্গে সঙ্গে অপুও হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল—সতু ততক্ষণে ছুটিয়া দৃষ্টির বাহির হইয়া চাল্‌তেতলার পথে গিয়া পড়িয়াছে।

দুর্গা ততক্ষণে দৌড়িয়া গিয়া অপুর কাছে পৌঁছিল। অপু একদম চোখ বুজিয়া একটু সামনের দিকে নীচু হইয়া ঝুঁকিয়া দুই হাতে চোখ রগড়াইতেছে—দুর্গা বলিল—কি হয়েচে রে অপু?

অপু ভাল করিয়া চোখ না চাহিয়াই যন্ত্রণার সুরে দু'হাত দিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে বলিল—সতুদা চোখে ধুলো ছুঁড়ে মেরেচে দিদি—চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না রে—

দুর্গা তাড়াতাড়ি অপুর হাত নামাইয়া বলিল—সর্ সর্ দেখি—ওরকম ক'রে চোখ রগড়াস নে, দেখি?—

অপু তখনি দু'হাত আবার চোখে উঠাইয়া আকুল সুরে বলিল—উঁহু ও দিদি—চোখের মধ্যে কেমন হচ্ছে—আমার চোখ কানা হয়ে গিয়েচে দিদি—

—দেখি দেখি ওরকম করে চোখে হাত দিসনে—সর্—পরে সে কাপড়ে ফুঁ পাড়িয়া চোখে ভাপ দিতে লাগিল। কিছু পরে অপু একটু একটু চোখ মেলিয়া চাহিতে লাগিল—দুর্গা তাহার চোখের পাতা তুলিয়া অনেকবার ফুঁ দিয়া বলিল—এখন বেশ দেখতে পাচ্ছিস্?—আচ্ছা তুই বাড়ী যা....আমি ওদের বাড়ী গিয়ে ওর মাকে আর ঠাক্‌মাকে সব ব'লে দিয়ে আসচি— রাণুকেও বল্‌বো—আচ্ছা দুষ্টু ছেলে তো—তুই যা আমি আসছি এখ্‌খনি—

রাণুদের খিড়্‌কি দরজা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া দুর্গা কিন্তু আর যাইতে সাহস করিল না। সেজঠাক্‌রুণকে সে ভয় করে। খানিকক্ষণ খিড়্‌কির কাছে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিয়া সে বাড়ী ফিরিল। সদর দরজা দিয়া ঢুকিয়া সে দেখিল অপু দরজার বাম ধারের কবাটখানি একটুখানি সামনে ঠেলিয়া দিয়া তাহারই আড়ালে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে কাঁদিতেছে। সে ছিঁচকাঁদুনে ছেলে নয়, বড় কিছুতেই সে কখনো কাঁদে না—রাগ করে, অভিমান করে বটে, কিন্তু কাঁদে না। দুর্গা বুঝিল আজ তাহার অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছে, অত সাধের ফলগুলি গেল....তাহা ছাড়া আবার চোখে ধূলা দিয়া এরূপ অপমান করিল! অপুর কান্না সে সহ্য করিতে পারে না—তাহার বুকের মধ্যে কেমন যেন করে।

সে গিয়া ভাইয়ের হাত ধরিল—সান্ত্বনার সুরে বলিল—কাঁদিস নে অপু—আয় তোকে আমার সেই কড়িগুলো সব দিচ্চি—আয়—চোখে কি আর ব্যথা বাড়চে?....দেখি, কাপড়খানা বুঝি ছিঁড়ে ফেলেচিস?

খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরবেলা অপু কোথাও বাহির না হইয়া ঘরে থাকে। অনেকদিনের জীর্ণ পুরাতন কোঠা-বাড়ীর পুরাতন ঘর। জিনিসপত্র, কাঠের সেকালের সিন্দুক, কটা রং-এর সেকালের

বেতের প্যাঁট্‌রা, কড়ির আল্‌না, জলচৌকিতে ঘর ভরানো। এমন সব বাক্স আছে যাহা অপু কখনো খুলিতে দেখে নাই, তাতে রক্ষিত এমন সব হাঁড়ি-কলসী আছে, যাহার অভ্যন্তরস্থ দ্রব্য সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

সব-সুদ্ধ মিলিয়া ঘরটিতে পুরানো জিনিসের কেমন একটা পুরানো পুরানো গন্ধ বাহির হয়—সেটা কিসের গন্ধ সে জানে না, কিন্তু সেটা যেন বহু অতীত কালের কথা মনে আনিয়া দেয়—সে অতীত দিনে অপু ছিল না, কিন্তু এই কড়ির আল্‌না ছিল, ঐ ঠাকুরদাদার বেতের ঝাঁপিটা ছিল, ঐ বড় কাঠের সিন্দুকটা ছিল, ওই যে সোঁদালি গাছের মাথা বনের মধ্যে হইতে বাহির হইয়া আছে, ওই পোড়াজঙ্গলে-ভরা জায়গাটাতে কাহাদের বড় চন্ডীমন্ডপ ছিল, আরও কত নামের কত ছেলেমেয়ে একদিন এই ভিটাতে খেলিয়া বেড়াইত, কোথায় তারা ছায়া হইয়া মিলাইয়া গিয়াছে, কতকাল আগে!

যখন একা ঘরে থাকে, মা ঘাটে যায়—তখন তাহার অত্যন্ত লোভ হয় ওই বাক্সটা, বেতের ঝাঁপিটা খুলিয়া দিনের আলোয় বাহির করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখে কি অদ্ভুত রহস্য উহাদের মধ্যে গুপ্ত আছে। ঘরের আড়ার সর্বোচ্চ তাকে কাঠের বড় বারকোশে যে তালপাতার পুঁথির স্তূপ ও খাতাপত্র আছে, বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিয়াছিল সেগুলি তাহার ঠাকুরদাদা রামচাঁদ তর্কালঙ্কারের—তাহার বড় ইচ্ছা ওইগুলি যদি হাতের নাগালে ধরা দেয়, তবে সে একবার নীচে নামাইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে। এক-একদিন বনের ধারে জানালাটায় বসিয়া দুপুরবেলা সে সেই ছেঁড়া কাশীদাসের মহাভারতখানা লইয়া পড়ে, সে নিজেই খুব ভাল পড়িতে শিখিয়াছে, আগেকার মত আর মুখে শুনিতে হয় না, নিজেই জলের মত পড়িয়া যায় ও বুঝিতে পারে। পড়াশুনায় তাহার বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ, তাহার বাবা মাঝে মাঝে তাহাকে গাঙ্গুলীবাড়ীর চন্ডীমন্ডপে বৃদ্ধদের মজলিসে লইয়া যায়, রামায়ণ কি পাঁচালী পড়িতে দিয়া বলে, পড়ো তো বাবা, এঁদের একবার শুনিয়ে দাও তো? বৃদ্ধেরা খুব তারিফ করেন, দীনু চাটুজ্যে বলেন—আর আমার নাতিটা, এই তোমার খোকারই বয়স হবে, দুখানা বর্ণপরিচয় ছিঁড়লে বাপু, শুনলে বিশ্বাস করবে না, এখনো ভাল করে অক্ষর চিনলে না—বাপের ধারা পেয়ে বসে আছে—ঐ যে-কদিন আমি আছি রে বাপু, চক্ষু বুজলেই লাঙলের মুঠো ধরতে হবে। পুত্রগর্বে হরিহরের বুক ভরিয়া যায়। মনে মনে ভাবে—ও কি তোমাদের হবে? কল্লে তো চিরকাল সুদের কারবার!—হোলামই বা গরীব, হাজার হোক পন্ডিত-বংশ তো বটে, বাবা মিথ্যেই তালপাতা ভরিয়ে ফেলেন নি পুঁথি লিখে, বংশে একটা ধারা দিয়ে গিয়েছেন, সেটা যাবে কোথায়?

তাহাদের ঘরের জানালার কয়েক হাত দূরেই বাড়ীর পাঁচিল এবং পাঁচিলের ওপাশ হইতেই পাঁচিলের গা ঘেঁষিয়া কি বিশাল আগাছার জঙ্গল আরম্ভ হইয়াছে! জানালায় বসিয়া শুধু চোখে পড়ে সবুজ সমুদ্রের ঢেউয়ের মত ভাঁটশেওড়া গাছের মাথাগুলো, এগাছে ওগাছে দোদুল্যমান কত রকমের লতা, প্রাচীন বাঁশঝাড়ের শীর্ষ বয়সের ভারে যেখানে সোঁদালি, বন-চালতা গাছের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, তাহার নীচের কালো মাটির বুকে খঞ্জন পাখীর নাচ! বড় গাছপালার তলায় হলুদ, বনকচু, কটু ওলের ঘন সবুজ জঙ্গল ঠেলাঠেলি করিয়া সূর্যের আলো দিকে মুখ ফিরাইতে প্রাণপণ করিতেছে, এই জীবনের যুদ্ধে যে গাছটা অপারগ হইয়া গর্বদৃপ্ত প্রতিবেশীর আওতায় চাপা পড়িয়া গিয়াছে, তাহার পাতাগুলি বিবর্ণ, মৃত্যুপান্ডুর ডাঁটা গলিয়া আসিল,—মরণাহত দৃষ্টির সম্মুখে শেষ-শরতের বন-ভরা পরিপূর্ণ ঝলমলে রৌদ্র, পরগাছার ফুলের আকুল আর্দ্র সুগন্ধ মাখানো পৃথিবীটা তাহার সকল সৌন্দর্য-রহস্য, বিপুলতা লইয়া ধীরে ধীরে আড়ালে মিলাইয়া চলিয়াছে।

তাহাদের বাড়ীর ধার হইতে এ বনজঙ্গল একদিকে সেই কুঠির মাঠ, অপর দিকে নদীর ধার পর্যন্ত একটানা চলিয়াছে। অপুর কাছে এ বন অফুরন্ত ঠেকে, সে দিদির সঙ্গে কতদূর এ বনের মধ্যে তো বেড়াইয়াছে, বনের শেষ দেখিতে পায় নাই—শুধু এইরকম তিত্তিরাজ গাছের তলা দিয়া পথ, মোটা মোটা গুলঞ্চলতা-দুলানো থোলো থোলো বনচালতার ফল চারিধারে। সুঁড়ি পথটা একটা আমবাগানে আসিয়া শেষ হয়, আবার এগাছের ওগাছের তলা দিয়া বন-কলমী, নাটা-কাঁটা, ময়না-ঝোপের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে কোথায় কোন্ দিকে লইয়া গিয়া ফেলিতেছে, শুধুই বন-ধুঁধুলের লতা কোথায় সেই ত্রিশূন্যে দোলে, প্রাচীন শিরীষ গাছের শেওলা-ধরা ডালের গায়ে পরগাছার ঝাড় নজরে আনে!

এই বন তার শ্যামলতার নবীন স্পর্শটুকু তার আর তার দিদির মন বুলাইয়া দিয়াছিল। জন্মিয়া অবধি এই বন তাহাদের সুপরিচিত, প্রতি পলের প্রতি মুহূর্তের নীরব আনন্দে তাহাদের পিপাসুহৃদয় কত বিচিত্র, কত অপূর্ব রসে ভরিয়া তোলে। বর্ষাসতেজ, ঘন সবুজ ঝোপের মাথায় নাটা-কাঁটার সুগন্ধ ফুলের হলুদ রং-এর শীষ, আসন্ন সূর্যাস্তের ছায়ায় মোটা ময়না-কাঁটা ডালের আগায় কাঠবিড়ালীর লঘুগতি আসাযাওয়া, পত্রপুষ্পফলের সে প্রাচুর্য, সবাকার অপেক্ষা যখন ঘন বনের প্রান্তবর্তী, ঝোপঝাপের সঙ্গীহীন বাঁকা ডালে বনের কোনো অজানা পাখী বসিয়া থাকে, তখন তাহার মনের বিচিত্র, অপূর্ব, গভীর আনন্দরসের বর্ণনা সে মুখে বলিয়া কাহাকেও বুঝাইতে পারে না। সে যেন স্বপ্ন, যেন মায়া, চারিপাশে ঘিরিয়া পাখী গান গায়, ঝুর ঝুর করিয়া ঝরিয়া ফুল পড়ে, সূর্যাস্তের আলো আরও ঘন ছায়াময় হয়।

এই বনের মধ্যে কোথায় একটা মজা পুরানো পুকুর আছে, তারই পাড়ে যে ভাঙা মন্দিরটা আছে, আজকাল যেমন পঞ্চানন্দ ঠাকুর গ্রামের দেবতা, কোনো সময়ে ঐ মন্দিরের বিশালাক্ষী দেবী সেই রকম ছিলেন। তিনি ছিলেন গ্রামের মজুমদার বংশের প্রতিষ্ঠিত দেবতা, এক সময়ে কি বিষয়ে সফলমনস্কাম হইয়া তাঁহারা দেবীর মন্দিরে নরবলি দেন, তাহাতে রুষ্টা হইয়া দেবী স্বপ্নে জানাইয়া যান যে তিনি মন্দির পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, আর কখনো ফিরিবেন না। অনেক কালের কথা, বিশালাক্ষী পূজা হইতে দেখিয়াছে এরূপ কোনো লোক আর জীবিত নাই, মন্দির ভাঙিয়া চুরিয়া গিয়াছে, মন্দিরের সম্মুখের পুকুর মজিয়া ডোবায় পরিণত হইয়াছে, চারিধার বনে ছাইয়া ফেলিয়াছে, মজুমদার বংশেও বাতি দিতে আর কেহ নাই।

কেবল—সেও অনেকদিন আগে—গ্রামের স্বরূপ চক্রবর্তী ভিন-গাঁ হইতে নিমন্ত্রণ খাইয়া ফিরিতেছিলেন—সন্ধ্যার সময় নদীর ঘাটে নামিয়া আসিতে পথের ধারে দেখিলেন একটি সুন্দরী ষোড়শী মেয়ে দাঁড়াইয়া। স্থানটি লোকালয় হইতে দূরে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, পথে কেহ কোথাও নাই, এ সময় নিরালা বনের ধারে একটি অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়েকে দেখিয়া স্বরূপ চক্রবর্তী দস্তুরমতো বিস্মিত হইলেন। কিন্তু তিনি কোনো কথা কহিবার পূর্বেই মেয়েটি ঈষৎ গর্বমিশ্রিত অথচ মিষ্টসুরে বলিল—আমি এ গ্রামের বিশালাক্ষী দেবী। গ্রামে অল্পদিনে ওলাওঠার মড়ক আরম্ভ হবে—ব'লে দিও চতুর্দশীর রাত্রে পঞ্চানন্দতলায় একশ আটটা কুমড়ো বলি দিয়ে যেন কালীপূজা করে। কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই স্তম্ভিত স্বরূপ চক্রবর্তীর চোখের সামনে মেয়েটি চারিধারের শীত-সন্ধ্যার কুয়াশায় ধীরে ধীরে যেন মিলাইয়া গেল। এই ঘটনার দিন কয়েক পরে সত্যই সেবার গ্রামে ভয়ানক মড়ক দেখা দিয়াছিল।

এ সব গল্প কতবার শুনিয়াছে। জানালার ধারে দাঁড়াইলেই বিশালাক্ষী ঠাকুরের কথা তাহার মনে ওঠে। দেবী বিশালাক্ষীকে একটিবার দেখিতে পাওয়া যায় না? হঠাৎ সে বনের পথে হয়ত গুলঞ্চের লতা পাড়িতেছে—সেই সময়—

খুব সুন্দর দেখিতে রাঙাপাড় শাড়ী পরনে, হাতে গলায় মা-দুর্গার মত হার বালা।

—তুমি কে?

—আমি অপু।

—তুমি বড় ভাল ছেলে, কি বর চাও?

সে বিছানায় গিয়া শোয়। এক একবার ঝিরঝিরে হাওয়ায় কত কি লতাপাতার তিক্তমধুর গন্ধ ভাসিয়া আসে, ঠিক দুপুরবেলা, অনেকদূরের কোনো বড় গাছের মাথার উপর হইতে গাঙচিল টানিয়া টানিয়া ডাকে, যেন এই ছোট্ট গ্রামখানির অতীত ও বর্তমান সমস্ত ছোটখাটো দুঃখ শান্তি দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে, শরৎ-মধ্যাহ্নের রৌদ্রভরা, নীল নির্জন আকাশ-পথে, এক উদাস, গৃহবিবাগী পথিক-দেবতার সুকণ্ঠের অবদান দূর হইতে দূরে মিলাইয়া চলিয়াছে।

কখন সে ঘুমাইয়া পড়ে বুঝিতে পারে না, ঘুমাইয়া উঠিয়া দেখে বেলা একেবারে নাই। জানালার বাহিরে সারা বনটায় ছায়া পড়িয়া আসিয়াছে, বাঁশঝাড়ের আগায় রাঙা রোদ।

প্রতিদিন এই সময়—ঠিক এই ছায়া-ভরা বৈকালটিতে, নির্জন বনের দিকে চাহিয়া তাহার অতি অদ্ভুত কথা সব মনে হয়। অপূর্ব খুশিতে মন ভরিয়া ওঠে, মনে হয় এ রকম লতাপাতার মধুর গন্ধভরা

দিনগুলি ইহার আগে কবে একবার যেন আসিয়াছিল, সে সব দিনের অনুভূত আনন্দের অস্পষ্ট স্মৃতি আসিয়া এই দিনগুলিকে ভবিষ্যতের কোন্ অনির্দিষ্ট আনন্দের আশায় ভরিয়া তোলে। মনে হয় একটা যেন কিছু ঘটিবে, এ দিনগুলি বুঝি বৃথা যাইবে না—একটা বড় কোনো আনন্দ ইহাদের শেষে অপেক্ষা করিয়া আছে যেন!

এই অপরাহ্ণগুলির সঙ্গে, আজন্মসাথী সুপরিচিত এই আনন্দভরা বহুরূপী বনটার সঙ্গে কত রহস্যময়, স্বপ্ন-দেশের বার্তা যে জড়ানো আছে। বাঁশঝাড়ের উপরকার ছায়া-ভরা আকাশটার দিকে চাহিয়া কবচ-কুন্ডল মাগিয়া লইতে হাত পাতিয়াছে, পিটুলি-গোলা পান করিয়া কোথাকার এক ক্ষুদ্র দরিদ্র বালক খেলুড়েদের কাছে 'দুগ্ধ খেয়েছি' বলিয়া উল্লাসে নৃত্য করে—ঐ যে পোড়ো ভিটার বেলতলাটা—ওইখানেই তো শরশয্যাশায়িত প্রবীণ বীর ভীষ্মদেবের মরণাহত ওষ্ঠে তীক্ষ্ণবাণে পৃথিবী ফুঁড়িয়া অর্জুন ভোগবতীধারা সিঞ্চন করিয়াছিলেন। প্রথম যৌবনে সরযূতটের কুসুমিত কাননে মৃগয়া করিতে গিয়া দশরথ মৃগভ্রমে যে জল-আহরণরত দরিদ্র বালককে বধ করেন—সে ঘটিয়াছিল ওই রাণুদিদিদের বাগানের বড় জাম গাছটার তলায় যে ডোবা—তাহারই ধারে।

তাহাদের বাড়ী একখানা বই আছে, পাতাগুলো সব হল্‌দে, মলাটটার খানিকটা নাই, নাম লেখা আছে 'বীরাঙ্গনা কাব্য', কিন্তু লেখকের নাম জানে না, গোড়ার দিকের পাতাগুলি ছিঁড়িয়া গিয়াছে। বইখানা বড় ভাল লাগে—তাহাতে সে পড়িয়াছে ঃ-

অদূরে দেখিনু হ্রদ, সে হ্রদের তীরে
রাজরথী একজন যান গড়াগড়ি
ভগ্নঊরু! দেখি উচ্চে উঠিনু কাঁদিয়া
এ কি কুস্বপন নাথ দেখাইলে মোরে!

কলুইচন্ডী ব্রতের দিন মায়ের সঙ্গে গ্রামের উত্তর মাঠে যে পুরোনো মজা পুকুরের ধারে সে বনভোজন করিতে যায়—কেউ জানে না—চারিধারে বনে ঘেরা সেই পুকুরটাই মহাভারতের সেই দ্বৈপায়ন হ্রদ। ঐ নির্জন মাঠের পুকুরটার মধ্যে সে ভগ্নঊরু, অবমানিত বীর থাকে একা একা, কেউ দেখে না, কেউ খোঁজ করে না। উত্তর মাঠের কলাবেগুনের ক্ষেত হইতে কৃষাণেরা ফিরিয়া আসে, জনমানুষের চিহ্ন থাকে না কোনো দিকে—সোনাডাঙা মাঠের পারের অনাবিষ্কৃত, বসতিশূন্য, অজানা দেশে চন্দ্রহীন রাত্রির ঘন অন্ধকার ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করে, তখন হাজার হাজার বছরের পুরাতন মানব-বেদনা কখনো বা দরিদ্র পিতার প্রবঞ্চনা-মুগ্ধ অবোধ বালকের উল্লাসে, কখনো বা এক ভাগ্যহত, নিঃসঙ্গ অসহায় রাজপুত্রের ছবিতে তাহার প্রবর্ধমান, উৎসুক মনের সহানুভূতিতে জাগ্রত ও সার্থক হয়। ঐ অজ্ঞাতনামা লেখকের বইখানা পড়িতে পড়িতে কতদিন যে তাহার চোখের পাতা ভিজিয়া আসিয়াছে।

তাঁহার বাবা বাড়ী নাই। বাড়ী থাকিলে তাহাকে এক মনে ঘরে বসিয়া দপ্তর খুলিয়া পড়িতে হয়,একেবারে বেলা শেষ হয়ে যায় তবুও ছুটি হয় না। তাহার মন ব্যাকুল হইয়া ওঠে। আর কতক্ষণ বসিয়া বসিয়া শুভঙ্করী আর্যা মুখস্থ করিবে? আজ আর বুঝি সে খেলা করিবে না? বেলা বুঝি আর আছে? বাবার উপর ভারী রাগ হয়, অভিমান হয়।

হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে ছুটি হইয়া যায়। বই দপ্তর কোনরকমে ঝুপ করিয়া এক জায়গায় ফেলিয়া রাখিয়া ছায়াভরা উঠানে গিয়া খুশিতে সে নাচিতে থাকে।

অপূর্ব, অদ্ভুত বৈকালটা....নিবিড় ছায়াভরা গাছপালার ধারে খেলাঘর....গুলঞ্চলতার তার টাঙানো....খেজুর ডালের ঝাঁপ....বনের দিক থেকে ঠান্ডা ঠান্ডা গন্ধ বাহির হয়....রাঙা রোদটুকু জেঠামহাশয়দের পোড়ো বাতাবীলেবু গাছের মাথায় চিক্ চিক্ করে....চক্‌চকে বাদামী রঙ-এর ডানাওয়ালা তেড়ো পাখী বনকলমী ঝোপে উঠিয়া আসিয়া বসে....তাজা মাটির গন্ধ....ছেলেমানুষের জগৎ ভরপুর আনন্দে উছলিয়া ওঠে, কাহাকে সে কি করিয়া বুঝাইবে সে কি আনন্দ!

সন্ধ্যার পর সর্বজয়া ভাত চড়াইয়াছিল। অপু দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া আছে। খুব অন্ধকার, একটানা ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকিতেছে।

অপু জিজ্ঞাসা করিল—পূজোর আর কদিন আছে, মা?

দুর্গা বঁটি পাতিয়া তরকারী কাটিতেছিল। বলিল, আর বাইশ দিন আছে, না মা?

সে হিসাব ঠিক করিয়াছে। তাহার বাবা বাড়ী আসিবে, অপুর, মায়ের, তাহার জন্য পুতুল, কাপড়, আলতা।

আজকাল সে বড় হইয়াছে বলিয়া তাহার মা অন্য পাড়ায় গিয়া নিমন্ত্রণ খাইতে দেয় না। লুচি খাইতে কেমন তাহা সে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে। ফুট্‌ফুটে কোজাগরী পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-ভরা রাত্রে বাঁশবনের আলোছায়ার জাল-বুননি পথ বাহিয়া সে আগে আগে পাড়ায় পাড়ায় বেড়াইয়া লক্ষ্মীপূজার খই-মুড়ি ভাজা আঁচল ভরিয়া লইয়া আসিত। বাড়ীতে বাড়ীতে শাঁখ বাজে, পথে লুচিভাজার গন্ধ বাহির হয়, হয়তো পাড়ার কেউ পূজার শীতলের নৈবেদ্য একখানা তাহাদের বাড়ীতে পাঠাইয়া দেয়। সেও অনেক খই-মুড়ি আনিত, তাহার মা দুইদিন ধরিয়া তাহাদের জলপান খাইতে দিত, নিজেও খাইত। সেবার সেজ ঠাকরুণ বলিয়াছিল—ভদ্দর লোকের মেয়ে আবার চাষা লোকের মত বাড়ী বাড়ী ঘুরে খই-মুড়ি নিয়ে বেড়াবে কি? ওসব দেখতে খারাপ....ওরকম আর পাঠিও না বৌমা—সেই হইতে সে আর যায় না।

দুর্গা বলিল—তাস খেলবে?

—তা যা, ও ঘর থেকে তাসটা নিয়ে আয় একটু খেলি—

দুর্গা বিপন্নমুখে অপুর দিকে চাহিল।

অপু হাসিয়া বলিল—চল্‌ আমি দাঁড়াচ্চি—

তাহাদের মা বলিল—আহা-হা মেয়ের ভয় দেখে আর বাঁচিনে, সারাদিন বলে হেঁট-মাটি ওপর ক'রে বেড়াবার সময় ভয় থাকে না, আর রাত্রিতে এঘর থেকে ওঘরে যেতে একেবারে সব আড়ষ্ট!....

শিষ্যবাড়ী হইতে অপুর আনা সেই তাসজোড়াটা। তাস খেলায় তিনজনেরই কৃতিত্ব সমান। অপু, এখনও সব রং চেনে না—মাঝে মাঝে হাতের তাস বিপক্ষদলের খেলোয়াড় মাকে দেখাইয়া বলে, এটা কি রং, রুইতন? দ্যাখো না মা—

দুর্গার মন আজ খুব খুশি আছে। রাত্রিরে রান্না প্রায়ই হয় না, ওবেলার বাসি ভাত তরকারী থাকে। আজ ভাত চড়িয়াছে, তরকারী রান্না হইবে, ইহাতে তাহার মহা আনন্দ। আজ যেন একটা উৎসবের দিন। অপু বলিল—তাস খেলতে খেল্‌তে সেই গল্পটা বলো না মা, সেই শ্যামলঙ্কার গল্পটা?

হঠাৎ সে মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়ে। মায়ের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে আবদারের সুরে বলে—সেই ছড়াটা বলো না মা, সেই —শ্যামলঙ্কা বাটনা বাটে মাটিতে লুটায় কেশ।

দুর্গা বলিল—খেলায় সময় ছড়া বল্‌লে খেলা কি ক'রে হবে অপু? ওঠ্—

সর্বজয়া বলিল—দুগ্‌গা, পাতালকোঁড় আজ কোথায় পেলি রে?

—সে যে গোসাঁইদের বড় বাগানটা আছে? সেই রাঙী গাই খুঁজতে একবার তুই আর আমি, অপু? সেখানে অনেক ফুটেছিল, কেউ টের পায়নি মা, খুব বন কি না? তা হলে লোকে তুলে নিয়ে যেতো—

অপু বলিল—সেখানে গিইছিলি? উঃ, সে যে বড্ড বন রে দিদি!

সর্বজয়া সস্নেহে বার বার ছেলের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। সেদিনকার সেই অপু—আয় চাঁদ আয়, খোকনের কপালে টি-ই-ই-ই দিয়ে যা—বলিলে বার বার কলের পুতুলের মত চাঁদের মত কপালখানি অঙ্গুলিবদ্ধ হস্তের দিকে ঝুঁকাইয়া দিত, সে কি না আজ তাস খেলিতে বসিয়াছে! তাহার কাছে দৃশ্যটা বড় অভিনব ঠেকে। অপু খেলিতে না পারিলে বা আশা করিয়া কোনো পিট্‌ জিতিতে না পারিলে কিংবা অপুর হাতে খারাপ তাসগুলো গিয়া নিজের হাতে ভাল তাস আসিলে, বিপক্ষদেলর খেলোয়াড় হইয়াও তাহার মনে কষ্ট হইতেছিল।

দুর্গা বলিল—আজ কি হয়েছে জানো মা—

অপু বলিল—যাঃ, তা হ'লে তোর সঙ্গে আড়ি করবো, ব'লে দ্যাখ—

—করগে যা আড়ি—শোনো মা, ও পোস্তদানার নাম জানে না, আজ রাজীদের বাড়ী পোস্তদানা

রদ্দুরে দিয়েচে, ও বল্লে, কি রাজীদি? রাজী বল্লে, যষ্টিমধু, খেয়ে দ্যাখ—ও খেয়ে এল মা সেখানে দাঁড়িয়ে, বুঝতে পাল্লে না যে পোস্ত—এমন বোকা—না মা?

অপু মুখে বলিল বটে কিন্তু দিদির সহিত সে আড়ি করিবে না। সেই যে যেদিন তাহার পাকা মাকাল ফলগুলো সতুদা লইয়া পলাইয়াছিল, সেদিন তাহার দিদি সারাদিন বন বাগান খুঁজিয়া সন্ধ্যার সময় কোথা হইতে আঁচলে বাঁধিয়া এক রাশ মাকাল ফল আনিয়া তাহার সম্মুখে খুলিয়া দেখাইয়া বলিল—কেমন হলো এখন? বড্ড যে কাঁদছিলি সকালবেলা? সে সন্ধ্যায় কিসে সে বেশী আনন্দ পাইয়াছিল—মাকাল ফলগুলো হইতে কি দিদির মুখের, বিশেষ করিয়া তাহার ডাগর চোখের মমতা-ভরা স্নিগ্ধ হাসি হইতে—তাহা সে জানে না।

ছক্কার খেলা অপু বুঝে সুঝে খেলিস্?—দুর্গা মহাখুশির সহিত তাস কুড়াইয়া সাজাইতে লাগিল।....

—কি ফুলের গন্ধ বেরুচ্চে, না দিদি?

তাহাদের মা বলিল, তাহাদের জেঠামশায়দের ভিটার পিছনে ছাতিমগাছ আছে, সেই ফুলের গন্ধ। অপু ও দুর্গা দুজনেই আগ্রহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁ মা, ওই ছাতিমতলায় একবার বাঘ এসেছিল বলেছিলে না? কিন্তু তাহার মা তাড়াতাড়ি তাস ফেলিয়া উঠিয়া বলিল—ঐ যাঃ ভাত পুড়ে গেল, ধরাগন্ধ বেরিয়েচে—ভাতটা নামিয়া দাঁড়া বলচি—

খাইতে বসিয়া দুর্গা বলিল—পাতালকোঁড়ের তরকারীটা কি সুন্দর খেতে হয়েচে মা! তাহার মুখ স্বর্গীয় তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে অপুও বলিল—বাঃ! খেতে ঠিক মাংসের মত, না দিদি? পাতালকোঁড় এক জায়গায় কত ফুটে আছে মা, আমি ভাবি ব্যাঙের ছাতা, তাই তুলি নে—উভয়ের উচ্ছুসিত প্রশংসা-বাক্যে সর্বজয়ার বুক গর্বে ও তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল। তবুও কি আর উপযুক্ত উপকরণ সে পাইয়াছে? লোকের বাড়ীতে ভোজে রাঁধিতে ডাকে সেজঠাক্রুণকে, ডাকুকু না দেখি একবার তাহাকে, রান্না কাহাকে বলে সেজঠাকরুণকে সে—হাঁ। সর্বজয়া বলিল—অপুর হাতে জল ঢেলে দে দুর্গ্গা, ও কি ছেলের কান্ড? ঐ রাস্তার মাঝখানে মুখ ধোয়? রোজই রাত্রে তুমি ওই পথের উপর—

কিন্তু অপু আর এক পাও নড়িতে চাহে না, সম্মুখের সেই ভাঙা পাঁচিলের ফাঁক, অন্ধকার বাঁশবন, ঝোপ-জঙ্গলের অন্ধকার ঝিঙের বিচির মত কালো। পোড়ো ভিটেবাড়ী....আর অজানা কত কি বিভীষিকা! সে বুঝিতে পারে না যেখানে প্রাণ লইয়া টানাটানি সেখানে পথের উপর আঁচানোটাই কি এত বেশী?

তাহার পরে সকলে গিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। রাত্রি গভীর হয়, ছাতিম ফুলের উগ্র সুবাসে হেমন্তের আঁচ-লাগা শিশিরার্দ্র নৈশ বায়ু ভরিয়া যায়। মধ্যরাত্রে বেণুবনশীর্ষে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের ম্লান জ্যোৎস্না উঠিয়া শিশিরসিক্ত গাছপালায়, ডালে-পাতায় চিক্‌চিক্ করে। আলো-আঁধারের অপরূপ মায়ায় বনপ্রান্ত ঘুমন্ত পরীর দেশের মত রহস্য-ভরা! শন্ শন্ করিয়া হঠাৎ হয়তো এক ঝলক হাওয়া সোঁদালির ডাল দুলাইয়া, তেলাকুচা ঝোপের মাথা কাঁপাইয়া বহিয়া যায়।

এক-একদিন এই সময়ে অপুর ঘুম ভাঙিয়া যাইত।

সেই দেবী যেন আসিয়াছেন সেই গ্রামের বিস্মৃতা অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিশালাক্ষী।

পুলিনশালিনী ইছামতীর ডালিমের রোয়ার মত স্বচ্ছ জলের ধারে, কুচা শেওলা ভরা ঠান্ডা কাদায় কতদিন আগে যাহাদের চরণ-চিহ্ন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তীরের প্রাচীন সপ্তপর্ণটাও হয়তো যাদের দেখে নাই, পুরানো কালের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মন্দিরে তারাই এক সময়ে ফুল-ফল-নৈবেদ্যে পূজা দিত, আজকালকার লোকেরা কে তাঁহাকে জানে?

তিনি কিন্তু এ গ্রামকে এখনো ভোলেন নাই।

গ্রাম নিষুতি হইয়া গেলে অনেক রাত্রে, তিনি বনে বনে ফুল ফুটাইয়া বেড়ান, বিহঙ্গ-শিশুদের দেখাশুনা করেন, জ্যোৎস্না-রাত্রের শেষ প্রহরে ছোট্ট ছোট্ট মৌমাছিদের চাকগুলি বুনো-ভাঁওরা, নট্‌কান, পুঁয়ো ফুলের মিষ্ট মধুতে ভরাইয়া দেন।

তিনি জানেন কোন্ ঝোপের কোণে বাসক ফুলের মাথা লুকাইয়া আছে, নিভৃত বনের মধ্যে ছাতিম ফুলের দল কোথায় গাছের ছায়ায় শুইয়া, ইছামতীর কোন্ বাঁকে সবুজ শেওলার ফাঁকে ফাঁকে নীল-

পাপড়ি কলমীফুলের দল ভিড় পাকাইয়া তুলিতেছে, কাঁটা গাছের ডালপালার মধ্যে ছোট্ট খড়ের বাসায় টুনটুনি পাখীর ছেলেমেয়েরা কোথায় ঘুম ভাঙিয়া উঠিল।

তাঁর রূপের স্নিগ্ধ আলোয় বন যেন ভরিয়া গিয়াছে। নীরবতায়, জ্যোৎস্নায়, সুগন্ধে, অস্পষ্ট আলো-আঁধারের মায়ায় রাত্রির অপরূপ শ্রী।

দিনের আলোর ফুটিবার আগেই কিন্তু বনলক্ষ্মী কোথায় মিলাইয়া যান, স্বরূপ চক্রবর্তীর পর তাঁহাকে কেহ কোনোদিন দেখে নাই।

পথের পাঁচালী সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

গ্রামের অন্নদা রায় মহাশয় সম্প্রতি বড় বিপদে পড়িয়াছেন।

গ্রামের জরীপ আসাতে উত্তর মাঠে তাঁবু পড়িয়াছে। জরীপের বড় কর্মচারী মাঠের মধ্যে নদীর ধারে অফিস খুলিয়াছেন, ছোটখাটো আমলাও সঙ্গে আসিয়াছে বিস্তর। গ্রামের সকল ভদ্রলোকই কিছু জমিজমার মালিক; পিতৃপুরুষের অর্জিত এই সব সম্পত্তির নিরাপদ কূলে জীবনতরণীর লগি কষিয়া পুঁতিয়া জড় পদার্থের ন্যায় উদ্যমহীন, গতিহীন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় দিনগুলি একরূপ বেশই কাটিতেছিল কিন্তু এবার সকলেই একটু বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। রাম হয়ত শ্যামের জমি নির্বিবাদে নিজের বলিয়া ভোগ করিয়া আসিতেছে, যদু দশ বিঘার খাজনায় বারো বিঘা নিরুপদ্রবে দখল করিতেছে, এতদিন যাহা পূর্ণ শান্তিতে নিষ্পন্ন হইতেছিল, এইবার সেই সকলের মধ্যে গোলমাল পৌঁছিল। বিপদ একরূপ হইলেও অন্নদা রায়ের বিপদ একটু অন্য ধরনের বা একটু বেশী গুরুতর। তাঁহার এক জ্ঞাতিভ্রাতা বহুদিন যাবৎ পশ্চিম-প্রবাসী। এতদিন তিনি উক্ত প্রবাসী জ্ঞাতির আম-কাঁটালের বাগান ও জমি নির্বিঘ্নে ভোগ করিতেছিলেন এবং সম্পূর্ণ ভরসা ছিল জরীপের সময় পারিয়া উঠিলে সবই, অন্ততঃপক্ষে কতকাংশ নিজের বলিয়া লিখাইয়া লইবেন, কিন্তু কি জানি গ্রামের কে উক্ত প্রবাসী জ্ঞাতিকে কি পত্র লিখিয়াছে—ফলে অদ্য দিন দশেক হইল জ্ঞাতিভ্রাতার জ্যেষ্ঠপুত্রটি জরীপের সময় বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনা করিতে আসিয়াছে। মুখের গ্রাস তো গেলই, তাহা ছাড়া বিপদ আরও আছে। ঐ আত্মীয়ের অংশের ঘরগুলিই বাড়ীর মধ্যে ভাল, রায় মহাশয় গত বিশ বৎসর সেগুলি নিজে দখল করিয়া আসিতেছেন, সেগুলি ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে—জ্ঞাতিপুত্রটি শৌখীন ধরণের কলেজের ছেলে, একখানিতে শোয়, একখানিতে পড়াশুনা করে—উপরের ঘরখানি হইতে সিন্দুক, বন্ধকী মাল, কাগজপত্রাদি সরাইয়া ফেলিতে হইয়াছে। নীচের যে ঘরে পালিতপাড়া হইতে সস্তাদরে কেনা কড়িবরগা রক্ষিত ছিল, সে ঘরও শীঘ্র ছাড়িয়া দিতে হইবে।

বৈকালবেলা। অন্নদা রায়ের চন্ডীমন্ডপে পাড়ার কয়েকটি লোক আসিয়াছেন—এই সময়েই পাশা খেলার মজলিস্ বসে। কিন্তু অদ্য এখনও কাজ মেটে নাই। অন্নদা রায় একে একে সমাগত খাতক-পত্র বিদায় করিতেছিলেন।

উঠানের রোয়াকের ঠিক নীচেই এক অল্পবয়সী কৃষক-বধূ একটা ছোট ছেলে সঙ্গে লইয়া অনেকক্ষণ হইতে ঘোমটা দিয়া বসিয়া ছিল, সে এইবার তাহার পালা অসিয়াছে ভাবিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রায় মহাশয় মাথা সামনে একটু নীচু করিয়া চশমার উপর হইতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—কে? তোর আবার কি?

কৃষক-বধূটি আঁচলের খুঁট খুলিতে খুলিতে নিম্নকণ্ঠে বলিল—মুই কিছু টাকার যোগাড় করিচি অনেক কষ্টে, মোর টাকাডা নেন.... আর গোলার চাবিটা খুলে দ্যান, বড্ড কষ্ট যাচ্ছে মনিব ঠাকুর, সে আর কি বল্‌বো—

অন্নদা রায়ের মুখ প্রসন্ন হইল, বলিলেন—হরি, নেও তো ওর টাকাটা গুনে। খাতাখানায় দেখো তারিখটা, সুদটা আর একবার হিসেব ক'রে দেখো—

কৃষক-বধূ আঁচলের খুঁট হইতে টাকা বাহির করিয়া হরিহরের সম্মুখে রোয়াকের ধারে রাখিয়া দিল। হরিহর গুণিয়া বলিল—পাঁচ টাকা?

রায় মহাশয় বলিলেন—আচ্ছা—জমা ক'রে দাও—তার পর আর টাকা কৈ?

—ওই এখন ন্যান্, তারপরে দোবো—মুই গতর খাটিয়ে—শোধ ক'রে তোলবো, এখন ওই নিয়ে মোর গোলার চাবিডা খুলে দ্যান, মোর মাতোরে দুটো খেইয়ে তো আগে বাঁচাই, তা পর ঘরদোর ফুটো হয়ে গিয়েছে, সে না হয়—

এমন নিরুদ্বেগে কথা বলিতেছিল যেন গোলার চাবি তাহার করতলগত হইয়া গিয়াছে। রায় মহাশয়কে চিনিতে তাহার বিলম্ব ছিল।

রায় মহাশয় কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিলেন—ওঃ, ভাবী যে দেখছি মাগীর আব্দার, চল্লিশ টাকার কাছাকাছি সুদে আসলে বাকী—পাঁচ টাকা এনিচি, নিয়ে গোলা খুলে দ্যান, ছোট লোকের কান্ডই আলাদা।—যা এখন দুপুরবেলা দিক্ করিস্ নে—

কৃষক-বধূ চন্ডীমন্ডপের অন্য কাহারও অপরিচিতা নহে, দীনু ভট্‌চায্যি চোখে ভাল দেখিতেন না, বলিলেন—কে ও অন্নদা?

—ওই ও-পাড়ার তম্‌রেজের বৌ—দিন চারেক হোল তম্‌রেজ না মারা গিয়েচে? সুদে আসলে চল্লিশ টাকা বাকী, তাই মরবার দিনই বিকেল থেকে গোলায় চাবি দিয়ে রেখেচি, এখন গোলা খুলিয়ে দ্যান্—হেন করুন—তেন করুন—

পায়ের তলা হইতে মাটি সরিয়া গেলেও তম্‌রেজের বৌ অত চম্‌কিয়া উঠিত না—সে ব্যাপার এখন অনেকটা বুঝিল, আগাইয়া আসিয়া বলিল—ওকথা বলবেন না মনিব ঠাকুর, মোর খোকার একটা রূপার নিমফল ছেল, ও বছর গড়িয়ে দিইছিল! তাই ভোঁদা সেক্‌রার দোকানে বিক্রী কল্লে পাঁচটা টাকা দেলে— ছেলেমানুষের জিনিস ব্যাচবার ইচ্ছে ছেল না, তা কি করি, এখন দুটো খেইয়ে বাঁচি, ভাবলাম এর পর দিন দেন মালিক তো মোর বাছারে মুই আবার নিমফল গড়িয়া দেবো! তা দেন মনিব ঠাকুর চাবিডা গিয়ে—

—যা যা—এখন যা—এ সব টাকাকড়ির কান্ড কি নাকে কাঁদ্‌লেই মেটে? তা মেটে না। সে তুই কি বুঝবি, থাক্‌তো তোর সোয়ামী তো বুঝতো, যা এখন দিক্ করিস্ নি—ওই পাঁচ টাকা তোর নামে জমা রৈল—বাকী টাকা নিয়ে আয় তারপর দেখা যাবে—

অন্নদা রায় চশমা খুলিয়া খাপের মধ্যে পুরিতে পুরিতে উঠিয়া পড়িলেন ও বাড়ীর ভিতর চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিলেন। তম্‌রেজের বৌ আকুল সুরে বলিয়া উঠিল—কনে যান্ ও মনিব ঠাকুর, মোর খোকার একটা উপায় ক'রে যান, ওরে মুই খাওয়াবো কি, এক পয়সার মুড়ি কিনে দেবার যে পয়সা নেই—মোর গোলা না খুলে দ্যান, মোর টাকা কডা মোরে ফেরত দ্যান,—

রায় মহাশয় মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন—যা যা সন্দে বেলা মাগী ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করিস নে—এক মুঠো টাকা জলে যাচ্চে তার সঙ্গে খোঁজ নেই, গোলা খুলে দাও, টাকা ফেরত দাও—গোলায় আছে কি তোর? জোর শলি চারেক ধান, তাতে টাকা শোধ যাবে? ও পাঁচ টাকাও উসুল হয়ে রৈল, আমার টাকা দেখ্‌বো না! ওঁর ছেলে কি খাবে ব'লে দাও—ছেলে কি খাবে তা আমি কি জানি? যা, পারিস্ তো নালিশ ক'রে খোলাগে যা—

রায় মহাশয় বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলে দীনু ভট্‌চায্যি বলিলেন—হ্যাঁগো বৌ, তম্‌রেজ কদ্দিন হ'লো—কৈ তা তো—

—বুধবারের দিন বাবা ঠাকুর, হাট থে ভাঙন মাছ আন্‌লে, পেঁয়াজ দিয়ে রাঁধলাম—ভাত দেলাম—সহজ মানুষ ভাল খেলে দিব্যি— খেয়ে বল্‌লে মোর শীত করচে, কাঁথা চাপা দিয়ে দ্যাও, দেলাম—ওমা সঁইতে তারা উঠ্‌তি না উঠ্‌তি মানুষ দেখি আর সাড়াশব্দ দেয় না, দুপুর হতি না হতি মোরে পথে বসিয়ে—মোর খোকারে পথে বসিয়ে—চোখের জলে তাহার গলা আট্‌কাইয়া গেল। মিনতির সুরে বলিল—আপনারা এট্টু বলেন—ব'লে গোলার চাবিডা দিইয়ে দ্যান, সংসারে বড্ড কষ্ট হয়েচে—কর্জ কি মুই বাকী রাখবো— যে ক'রে হোক—

এই সময়ে নবাগত জ্ঞাতিপুত্রটি আসিয়া পড়াতে কথাবার্তা বন্ধ হইল। দীনু বলিলেন—এস হে নীরেন বাবাজী, মাঠের দিকে বেড়াতে গিয়েছিলে বুঝি? এই তোমার বাপ-ঠাকুরদার দেশ বুঝলে হে, কি রকম দেখ্‌লে বল?

নীরেন একটু হাসিল। তাহার বয়স একুশ-বাইশের বেশী নয়, বেশ বলিষ্ঠ গড়ন, সুপুরুষ। কলিকাতার কলেজে আইন পড়ে, অত্যন্ত মৌনী প্রকৃতির মানুষ—দেখিবার জন্য পিতা কর্তৃক প্রেরিত হইলেও কাজকর্ম সে কিছুই দেখে না বোঝেও না, দিনরাত নভেল পড়িয়া ও বন্দুক ছুঁড়িয়া কাটায়। সঙ্গে একটি বন্দুক আনিয়াছে, শিকারের ঝোঁক খুব।

নীরেন উপরে নিজের ঘরে ঢুকিতে গিয়া দেখিল, গোকুলের স্ত্রী ঘরের মেজেতে বসিয়া পড়িয়া মেজে হইতে কি খুঁটিয়া তুলিতেছে। দোরের কাছে যাইতেই তাহার নজর পড়িল, তাহার দামী বিলাতী আলোটা মেজেতে বসানো। উহার কাঁচের ডুম্‌টা ভাঙিয়া চুরমার হইয়াছে, সারা মেজেতে কাঁচ ছড়ানো। দোরের কাছে জুতার শব্দ পাইয়া গোকুলের স্ত্রী চম্‌কাইয়া পিছন ফিরিয়া চাহিল, সে আঁচল পাতিয়া মেজে হইতে কাঁচের টুকরোগুলি খুঁটিয়া খুঁটিয়া তুলিতেছিল, —ভাবে মনে হয় প্রতিদিনের মত ঘর পরিষ্কার করিতে আসিয়া আলোটি জ্বালিতে গিয়াছিল, কি করিয়া ভাঙিয়া ফেলিয়াছে এবং আলোর মালিক আসিবার পূর্বেই নিজেই অপরাধের চিহ্নগুলি তাড়াতাড়ি সরাইয়া ফেলিবার চেষ্টায় ছিল হঠাৎ বামাল ধরা পড়িয়া অত্যন্ত অপ্রতিভ হইল। ক্ষতিকারিণীর লজ্জার ভারটা লঘু করিয়া দিবার জন্যই নীরেন হাসিয়া বলিয়া উঠিল—এই যে বৌদি, আলোটা ভেঙে ব'সে আছেন বুঝি? এই দেখুন ধরা প'ড়ে গেলেন, জানেন তো আইন পড়ি। আচ্ছা এখন একটু চা ক'রে নিয়ে আসুন তো বৌদি, চট্ করে, দেখি কেমন কাজের লোক। দাঁড়ান আলোটা জ্বেলে নিই, ভাগ্যিস বাক্সে আর একটা ডুম্ আছে।

গোকুলের স্ত্রী সলজ্জ সুরে বলিল, দেশলাই আন্‌বো ঠাকুরপো?

নীরেন কৌতুকের সুরে বলিল—দেশলাই আনেন নি তবে আলো পেড়ে কি করছিলেন শুনি?

বধূ এবার হাসিয়া ফেলিল, নিম্নসুরে বলিল—ঝুল প'ড়ে রয়েচে, ভাবলুম একটু মুছে দিই, তা যেমন কাঁচটা নামাতে গেলাম, কি জানি ও সব ইংরিজি কলের আলো—কথা শেষ না করিয়াই সে পুনরায় সলজ্জ হাসিয়া নীচে পলাইল!

নীরেন দশ বারো দিন আসিয়াছে বটে, সম্পর্কে বৌদিদি হইলেও গোকুলের স্ত্রীর সঙ্গে তাহার বিশেষ আলাপ হয় নাই। কাঁচ ভাঙার সন্ধ্যা হইতে উভয়ের মধ্যে নূতন পরিচয়ের সঙ্কোচটা কাটিয়া গেল! নীরেন অবস্থাপন্ন পিতার পুত্র, তাহার উপর বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ে এই প্রথম আসা, নিঃসঙ্গ আনন্দহীন প্রবাসে দিনগুলি কাটিতে চাহিতেছিল না। সমবয়সী বৌদির সহিত পরিচয়ের পথটা সহজ হইয়া যাওয়ার পর হইতে সকাল-সন্ধ্যায় চা-পানের সময়টি সহজ আদান-প্রদানের মাধুর্যে আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠিল!....

দুপুরে সেদিন দুর্গা বেড়াইতে আসিল। রান্নাঘরের দুয়ারে উঁকি মারিয়া বলিল—কি রাঁধচো ও খুড়ীমা? বধূ বলিল—আয় মা আয়, একটু কাজ ক'রে দিবি? একা আর পেরে উঠ্‌চিনে!....দুর্গা মাঝে মাঝে যখনই আসে, খুড়ীমার কার্যে সাহায্য করে। সে মাছ কুটিতে কুটিতে বলেল—হ্যাঁ খুড়ীমা এ কাঁকড়া কোথায় পেলে? এ কাঁক্‌ড়া তো খায় না।

—কেন খাবে না রে, দূর! বিধু জেলেনী ব'লে গেল এ কাঁকড়া সবাই খায়।

—হ্যাঁ খুড়ীমা, ওমা সেকি, তুমি কিন্‌লে?

—কিন্‌লামই তো, ওই অতগুলো পাঁচ পয়সায় দিয়েচে বিধু।

দুর্গা কিছু বলিল না। মনে মনে ভাবিল—খুড়ীমার আর সব ভাল, কেবল একটু বোকা! এ কাঁকড়া আবার পয়সা দিয়ে কেনেই বা কে, খায়ই বা কে? ভালমানুষ পেয়ে বিধু ঠকিয়ে নিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এই সরলা খুড়ীমাটির উপর তাহার স্নেহ নিবিড়তর হইয়া উঠিল।

সেদিন নাকি গোকুল-কাকা খুড়ীমার মাথায় খড়মের বাড়ি মারিয়াছিল—স্বর্ণ গোয়ালিনী তাহাদের বাড়ী গল্প করে। সে-ও সেদিন নদীর ঘাটে স্নান করিতে গিয়েছিল। খুড়ীমা স্নান করিতে আসিয়া মাথা ডুবাইয়া স্নান করিল না, পাছে জ্বালা করে। সেদিন দুঃখে তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল; কিন্তু কিছু বলে নাই পাছে খুড়ীমা অপ্রতিভ হয়—এক ঘাট লোকের সাম্‌নে লজ্জা পায়। তবুও রায়-জেঠি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—বৌমা নাইলে না?....খুড়ীমা হাসিয়া উত্তর দিল—নাবো না আজ আর দিদিমা, শরীরটা ভাল নেই।....

খুড়ীমা ভাবিয়াছিল তাহার মার খাওয়ার কথা বুঝি কেহ জানে না। কিন্তু খুড়ীমা ঘাট হইতে উঠিয়া গেলেই রায়-জেঠি বলিল—দেখেচো বৌটাকে কি রকম মেরেচে গোক্‌লো, মাথার চুলে রক্ত একেবারে আটা হয়ে এঁটে আছে!....রায়-জেঠির ভারি অন্যায়। জানো তো বাপু, তবে আবার জিজ্ঞেস করাই বা কেন, আর সকলকে বলাই বা কেন?....

মাছ ধুইয়া রাখিয়া চলিয়া যাইবার সময় দুর্গা ভয়ে ভয়ে বলিল—খুড়ীমা, তোমাদের চিঁড়ের ধান আছে? মা বলছিল অপু চিঁড়ে খেতে চেয়েছে, তা আমাদের তো এবার ধান কেনা হয়নি।....গোকুলের বউ চুপি চুপি বলিল—আসিস এখন দুপুরের পর। ....দালানের দিকে ইশারায় দেখাইয়া কহিল—ঘুমুলে আসিস্!

দুর্গা জিজ্ঞাসা করিল—খুড়ীমা, তোমাদের বাড়ী কে এসেছে, আমি একদিনও দেখিনি কিন্তু।

—ঠাকুরপোকে দেখিসনি? এখন নেই কোথায় বেরিয়েচে, বিকেলবেলা আসিস্, দেখা হবে এখন।....তারপর গোকুলের বউ হাসিয়া বলিল—তোর সঙ্গে ঠাকুরপোর বিয়ে হলে কিন্তু দিব্যি মানায়।

দুর্গা লজ্জায় রাঙা হইয়া বলিল্—দূর!

গোকুলের বউ আবার হাসিয়া বলিল—কেন রে, দূর কেন? কেন, আমাদের মেয়ে কি খারাপ? দেখি?....সে দুর্গার চিবুকে হাত দিয়া মুখখানা একটু উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া বলিল—দ্যাখ তো এমন দুগ্‌গা-প্রতিমার মত সুন্দর মুখখানি। হোলই বা বাপের পয়সা নেই?

দুর্গা ঝাঁকুনি দিয়া নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া কহিল—যাও, খুড়ীমা যেন কি....পরে সে একপ্রকার ছুটিয়াই খিড়কী দোর দিয়া বাহির হইয়া গেল। যাইতে যাইতে সে ভাবিল—খুড়ীমার আর সব ভাল, কেবল একটু বোকা, নৈলে দ্যাখো না....? দূর!....

দুর্গা চলিয়া যাইতে না যাইতে স্বর্ণ গোয়ালিনী দুধ দুহিতে আসিল। বধূ ঘর হইতে বলিল—ও সন্ন, আমার হাত জোড়া, বাছুরটা ওই বাইরের উঠোনে পিটুলি-গাছে বাঁধা আছে—নিয়ে আয়, আর রোয়াকে ঘটিটা মাজা আছে দ্যাখ।

সখী ঠাক্‌রুণের এতক্ষণে পূজাহ্নিক সমাপ্ত হইল। তিনি বাহিরে আসিয়া উত্তর দিকে স্থানীয় কালীমন্দিরের উদ্দেশে মুখ ফিরাইয়া প্রণাম করিতে করিতে টানিয়া টানিয়া আবৃত্তির সুরে বলিতে লাগিলেন—দোহাই মা সিদ্ধেশ্বরী, দিন দিও মা, ভবসমুদ্দুর পার কোরো মা—মা রক্ষেকালী, রক্ষে কোরো, মা-গো!

গোকুলের বউ রান্নাঘর হইতে ডাকিয়া বলিল—ও পিসিমা, নারকোলের নাড়ু রেখে দিইচি, দুটো খেয়ে জল খান।

হঠাৎ সখী ঠাক্‌রুণ রোয়াক হইতে ডাক দিলেন—বৌমা, দেখে যাও তো এদিকে।

স্বর শুনিয়া গোকুলের বউএর প্রাণ উড়িয়া গেল। সখী ঠাক্‌রুণকে সে যমের মত ভয় করে। মায়া-দয়া বিতরণ সম্বন্ধে ভগবান সখী ঠাক্‌রুণের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখান নাই—একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। রোয়াকের কোণে জড়ো-করা মাজা বাসনগুলির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া, আঙুল দিয়া দেখাইয়া কহিলেন—দ্যাখো তো চক্ষু দিয়ে, দেখতে পাচ্ছো? একেবারে সম্পষ্ট জলের দাগ দেখ্‌লে তো? এইখান থেকে সন্ন ঘটি তুলে নিয়ে গিয়েচে, তারপর সেই শূদ্দুরের ছোঁয়া এঁটো বাসন আবার হেঁসেলে নিয়ে সাত-রাজ্যি জজানো হয়েচে ! হাঃ! জাতজন্মো একেবারে গেল।

সখী ঠাক্‌রুণ হতাশভাবে রোয়াকে বসিয়া পড়িলেন। যেন উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যু সংবাদ পাইলে ইহার চেয়ে বেশি হতাশ হইতে পারিতেন না।

—হাঘরে হাড়হাবাতে ঘরের মেয়ে আনলেই অমনি হয়, ভদ্দর লোকের রীত শিখ্‌বেই বা কোথা থেকে—জানবেই বা কোথা থেকে? বাসন মাজলি তো দেখলি নে এটোঁ গেল কি রৈল? তিনপহর বেলা হয়েচে, ভাবলাম একটু জল মুখে দিই! শূদ্দুরের এঁটো, এখ্‌খানি নেয়ে মরতে হোত—ভাগ্যিস ঘটিটা ছুঁইনি!

গোকুলের বউ বিষণ্ণমুখে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল—কেন মত্তে সন্ন পোড়ামুখীকে ঘটি তুলে নিতে বল্লাম, নিজে দিলেই হোত।

সখী ঠাকুরুণ মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন—ধিঙ্গি হয়ে দাঁড়িয়ে রৈলে যে? যাও হাঁড়ি কুড়ি ফেলে দাও গিয়ে। বাসন-কোসন মেজে আনো ফের। রান্নাঘরে গেবর দিয়ে নেয়ে এসো। যত লক্ষ্মীছাড়া ঘরের মেয়ে জুটে সংসারটাকে ছারখারে দিলে।....সখী ঠাক্রুণ রাগে গর্‌গর্‌ করিতে করিতে ঘরে ঢুকিলেন, বাহিরের খররৌদ্র তাঁহার সহ্য হইতেছিল না।

হুকুম-মত সকল কাজ সারিতে বেলা একেবারে পড়িয়া গেল। নদীতে সে যখন পুনরায় স্নান করিতে গেল, তখন রৌদ্র, ক্ষুধাতৃষ্ণায় ও পরিশ্রমে তাহার মুখ শুকাইয়া ছোট হইয়া গিয়াছে!

ঘাটে বৈকালের ছায়া খুব ঘন, ওপারে বড় শিমুল গাছটায় রোদ চিক্ চিক্ করিতেছে। নদীর বাঁকে একখানা পাল-তোলা নৌকা দাঁড় বাহিয়া বাঁক ঘুরিয়া যাইতেছে। হালের কাছে একজন লোক দাঁড়াইয়া কাপড় শুকাইতেছে, কাপড়টা ছাড়িয়া দিয়াছে, বাতাসে নিশানের মত উড়িতেছে। মাঝনদীতে একটা বড় কচ্ছপ মুখ তুলিয়া নিঃশ্বাস লইয়া অবার ডুবিয়া গেল— সোঁ-ও-ও-ও-ভুস্।

নদীর জলের কেমন একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা গন্ধ আসে, ছোট্ট নদী; ওপারের চরে একটা পানকৌড়ি মাছ-ধরা বাঁশের দোয়াড়ির উপর বসিয়া অছে।

এই সময় প্রতিদিন তাহার শৈশবের কথা মনে পড়ে—

পানকৌড়ি পানকৌড়ি, ডাঙায় ওঠোসে......

গোকুলের বউ খানিকক্ষণ পানকৌড়িটির দিকে চাহিয়া রহিল। মায়ের মুখ মনে পড়ে। সংসারে অর কেহ নাই যে, মুখের দিকে চায়। মায়ের কি মরিবার বয়স হইয়াছিল? গরীব পিতৃকুলে কেবল এক গাঁজাখোর ভাই আছে, সে কোথায় কখন থাকে—তার ঠিকানা নাই। গত বৎসর পূজার সময় এখানে আসিয়া চার দিন ছিল। সে লুকাইয়া লুকাইয়া ভাইকে নিজের বাক্স হইতে যাহা সামান্য কিছু পুঁজি—সিকিটা দু'য়ানিটা বাহির করিয়া দিত। পরে একদিন সে হঠাৎ এখান হইতে উধাও হইল। চলিয়া গেলে প্রকাশ পাইল যে, এক কাবুলি আলোয়ান-বিক্রেতার নিকট একখানি আলোয়ান ধারে কিনিয়া তাহার খাতায় ভগ্নীপতির নাম লিখাইয়া দিয়াছে। তাহা লইয়া অনেক হৈ চৈ হইল। পিতৃকুলের অনেক সমালোচনা, অনেক অপমান! ভাইটির সেই হইতে অর কোন সন্ধান নাই।

নিঃসহায় ছন্নছাড়া ভাইটার জন্য সন্ধ্যাবেলা কাজের ফাঁকে মনটা হু-হু করে। নির্জন মাঠের পথের দিকে চাহিয়া মনে হয়, গৃহহারা পথিক ভাইটা হয়তো দূরের কোন জনহীন আঁধার মেঠোপথ বাহিয়া একা কোথায় চলিয়াছে, রাত্রে মাথা গুঁজিবার স্থান নাই, মুখে দিকে চাহিবার কোনো মানুষ নাই।....

বুকের মধ্যে উদ্বেল হইয়া উঠে, চোখের জলে ছায়া ভরা নদীর জল, মাঠ, ঘাট, ওপারের শিমুল গাছটা, বাঁকের মোড়ে বড় নৌকাখানা—সব ঝাপ্‌সা হইয়া আসে।

পথের পাঁচালী অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

অপু সেদিন জেলেপাড়ায় কড়ি খেলিতে গিয়েছিল। বেলা দুইটা বা আড়াইটার কম নয়, রৌদ্র অত্যন্ত প্রখর। প্রথমে সে তিনকড়ি জেলের বাড়ী গেল। তিনকড়ির ছেলে বঙ্কা পেয়ারাতলার বাখারি চাঁচিতেছিল, অপু বলিল—এই কড়ি খেলবি? খেলিবার ইচ্ছা থাকিলেও বঙ্কা বলিল, তাহাকে এখনি নৌকায় যাইতে হইবে, খেলা করিতে গেলে বাবা বকিবে! সেখান হইতে সে গেল রামচরণ জেলের বাড়ী। রামচরণ দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছিল; অপু বলিল—হৃদয় বাড়ী আছে? রামচরণ বলিল—হৃদয়কে কেন ঠাকুর? কড়ি খেলা বুঝি? এখন যাও হৃদে বাড়ী নেই।

ঠিক-দুপুর বেলায় ঘুরিয়া অপুর মুখ রাঙা হইয়া গেল। আরও কয়েক স্থানে বিফলমনোরথ হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে বাবুরাম পাড়ুইয়ের বাড়ীর নিকটবর্তী তেঁতুলতলার কাছে আসিয়া তাহার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তেঁতুলতলায় কড়ি খেলার আড্ডা খুব জমিয়াছে। সকলেই জেলেপাড়ার ছেলে কেবল ব্রাহ্মণপাড়ার ছেলের মধ্যে আছে পটু। অপুর সঙ্গে পটুর তেমন আলাপ নাই, কারণ পটুর যে পাড়ায় বাড়ী, অপুদের বাড়ী তাহা হইতে অনেক দূর। অপুর চেয়ে বয়েসে পটু কিন্তু ছোট; অপুর মনে

আছে, প্রথম যেদিন প্রসন্ন গুরুমশায়ের পাঠশালায় ভর্তি হইতে যায়, সেদিন এই ছেলেটিকেই সে শান্তভাবে বসিয়া তালপাতা মুখে পুরিয়া চিবাইতে দেখিয়াছিল। ...অপু তাহার কাছে গিয়া বলিল—কটা কড়ি? ... পটু কড়ির গোঁজে বাহির করিয়া দেখাইল। রাঙা সূতার বুনানি ছোট্ট গেঁজেটি—তাহার অত্যন্ত শখের জিনিস। বলিল, সতেরোটা এনেছি—সাতটা সোনা-গেঁটে; হেরে গেলে আরও আন্‌বো।... পরে সে গেঁজেটা দেখাইয়া হাসিমুখে কহিল—কেমন দেখচিস? গেঁজটায় একপণ কড়ি ধরে।

খেলা আরম্ভ হইল। প্রথমটা পটু হারিতেছিল, পরে জিতিতে শুরু করিল। কয়েকদিন মাত্র আগে পটু আবিষ্কার করিয়াছে যে. কড়ি-খেলায় তাহার হাতের লক্ষ্য অব্যর্থ হইয়া উঠিয়াছে; সেইজন্যই সে দিগ্বিজয়ের উচ্চাশায় প্রলুব্ধ হইয়া এতদূর আসিয়াছিল। খেলার নিয়মানুসারে পটু উপর হইতে টুক্ করিয়া বড় কড়ি দিয়া তাক্ ঠিক করিয়া মারিতেই যেমন একটা কড়ি বোঁ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া যায় অমনি পটুর মুখ অসীম আহ্লাদে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। পরে সে জিতিয়া-পাওয়া কড়িগুলি তুলিয়া গেঁজের মধ্যে পুরিয়া লোভে ও আনন্দে বার বার গেঁজেটির দিকে চাহিয়া দেখে, সেটা ভর্তি হইতে আর কত বাকী!

কয়েকজন জেলের ছেলে কি পরামর্শ করিল। একজন পটুকে বলিল—আর এক হাত তফাৎ থেকে তোমায় মারতে হবে ঠাকুর, তোমার হাতে টিপ্ বেশী!

পটু বলিল—বা রে, তা কেন, টিপ্ বেশী থাকাটা দোষ বুঝি? তোমরাও জেত না, আমি তো কাউকে বারণ করিনি।

পরে সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, জেলের ছেলেরা সব একদিকে হইয়াছে। পটু ভাবিল—এত বেশি কড়ি আমি কোনদিন জিতি নি; আজ আর খেল্‌চি নে—খেল্লে কি আর এই কড়ি বাড়ী নিয়ে যেতে পারবো? আবার একহাত বাধ্ বেশী! সব হেরে যাব!....হঠাৎ সে কড়ির ছোট্ট থলিটি হাতে লইয়া বলিল—আমি এক হাত বেশী নিয়ে খেলবো না, আমি বাড়ী যাচ্ছি।....পরে জেলের ছেলেদের ভাবভঙ্গী ও চোখের নিষ্ঠুর দৃষ্টি দেখিয়া সে নিজের অজ্ঞাতসারে নিজের কড়ির থলিটি শক্ত মুঠায় চাপিয়া রাখিল।

একজন আগাইয়া আসিয়া বলিল—তা হবে না ঠাকুর, কড়ি জিতে পালাবে বুঝি?....সঙ্গে সঙ্গে সে হঠাৎ পটুর থলিসুদ্ধ হাতটা চাপিয়া ধরিল। পটু ছাড়াইয়া লইতে গেল, কিন্তু জোরে পারিল না; বিষণ্নমুখে বলিল—বা-রে, ছেড়ে দাও না আমার হাত!—পিছন হইতে কে একজন তাহাকে ঠেলা মারিল; সে পড়িয়া গেল বটে, কিন্তু থলি ছাড়িল না। সে বুঝিয়াছে এইটিই কাড়িবার জন্য ইহাদের চেষ্টা! পড়িয়া গিয়া সে প্রাণপণে থলিটা পেটের কাছে চাপিয়া রাখিতে গেল; কিন্তু একে সে ছেলেমানুষ তাহাতে গায়ের জোরও কম, জেলেপাড়ার বলিষ্ঠ ও তাহার চেয়ে বয়সে বড় ছেলেদের সঙ্গে কতক্ষণ যুঝিতে পারিবে! হাত হইতে কড়ির থলিটি অনেকক্ষণ কোন্ ধারে ছিটকাইয়া পড়িয়াছিল—কড়িগুলি চারিধারে ছত্রাকার হইয়া গেল।

অপু প্রথমটা পটুর দুর্দশায় একটু খুশী না হইয়াছিল তাহা নহে, কারণ সে-ও অনেক কড়ি হারিয়াছে। কিন্তু পটুকে পড়িয়া যাইতে দেখিয়া, বিশেষ করিয়া তাহাকে অসহায় ভাবে পড়িয়া মার খাইতে দেখিয়া তাহার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল, সে ভিড় ঠেলিয়া আগাইয়া গিয়া বলিল—ছেলেমানুষ, ওকে তোমরা মারচ কেন? বা রে, ছেড়ে দাও—ছাড়ো! পরে সে পটুকে মাটি হইতে উঠাইতে গেল, কিন্তু পিছন হইতে কাহার হাতের ঘুঁষি খাইয়া খানিকক্ষণ সে চোখে কিছু দেখিতে পাইল না; তারপর ঠেলাঠেলিতে সে-ও মাটিতে পড়িয়া গেল।

অপুকেও সেদিন বেদম প্রহার খাইতে হইত নিশ্চয়ই, কারণ তাহার মেয়েলী ধরনের হাতে-পায়ে কোন জোর ছিল না, কিন্তু ঠিক সময়ে নীরেন এই পথে আসিয়া পড়াতে বিপক্ষ-দল সরিয়া পড়িল। পটুর লাগিয়াছিল খুব বেশী; নীরেন তাহাকে মাটি হইতে উঠাইয়া গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া দিল। একটু সামলাইয়া লইয়াই সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল—ছড়ানো কড়িগুলোর দু'একটি ছাড়া বাকিগুলি অদৃশ্য, মায় কড়ির থলিটি পর্যন্ত। পরে সে অপুর কাছে সরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—অপুদা, তোমার বেশী লাগে নি তো?

এতদূরে ঠিক দুপুরবেলা জেলের ছেলেদের দলে মিশিয়া কড়ি খেলিতে আসিবার জন্য নীরেন দু'জনকেই বকিল। সময় কাটাইবার জন্য নীরেন পাড়ার ছেলেদের লইয়া অন্নদা রায়ের চন্ডীমন্ডপে পাঠশালা খুলিয়াছিল, সেখানে গিয়া কাল হইতে পড়িবার জন্য দু'জনকেই বার বার বলিল। পটু চলিতে চলিতে শুধুই ভাবিতেছিল—কেমন সুন্দর কড়ির গেঁজেটা আমার, সেদিন অত করে ছিবাসের কাছে চেয়ে নিলাম—গেল! আমি যদি কড়ি জিতে আর না খেলি তা ওদের কি? সে তো আমার ইচ্ছে!....

বাড়ী ঢুকিয়াই অপু দুর্গাকে বলিল—দিদি, শিউলিতলায় গুঁড়ির কাছে আমি একটা বাঁকা-কঞ্চি রেখে গিইছি, আর তুই বুঝি সেটাকে ভেঙে দু'খন্ড ক'রে রেখেচিস?

দুর্গা সেখানাকে ভাঙিয়াছিল ঠিকই।—আহা, ভারী তো একখানা বাঁকা-কঞ্চি! তোর যত পাগলামি—বাঁশ-বাগানে খুঁজলে কঞ্চি আর মিলবে না বুঝি? কঞ্চির ভারী অমিল কিনা!

অপু লজ্জিত মুখে বলিল—অমিল না তো কি? তুই এনে দে দিকি ওইরকম একখানা কঞ্চি! আমি কত খুঁজেপেতে নিয়ে আস্‌বো, আর তুই সব ভেঙেচুরে রাখবি—বেশ তো!

তার চোখে জল আসিয়া গেল।

দুর্গা বলিল—দেবো এখন এনে যত চাস, কান্না কিসের?

বাঁকা কঞ্চি অপুর জীবনে এক অদ্ভুত জিনিস! একখানা শুকনো, হালকা, গোড়ার দিক মোটা আগার দিক সরু বাঁকা-কঞ্চি হাতে করিলেই অপুর মন পুলকে শিহরিয়া ওঠে, মনে অদ্ভুত সব কল্পনা জাগে। একখানা বাঁকা-কঞ্চি হাতে করিয়া একদিন সে সারা সকাল কি বৈকাল আপনমনে বাঁশবনের পথে কি নদীর ধারে বেড়াইয়া বেড়ায়; কখনো রাজপুত্র, কখনো তামাকের দোকানী, কখনো ভ্রমণকারী, কখনো বা সেনাপতি, কখনো মহাভারতের অর্জুন—কল্পনা করে ও আপনমনে বিড় বিড় করিয়া কাল্পনিক ঘটনা যাহা ওই অবস্থায় তাহার জীবনে ঘটিলে তাহার আনন্দ হইত, সেই সব ঘটনা বলিয়া যায়। কঞ্চি যত মনের মত হাল্‌কা হইবে ও পরিমাণমত বাঁকা হইবে, তাহার আনন্দ ও কল্পনা ততই পরিপূর্ণতা লাভ করে; কিন্তু সে রকম কঞ্চি সংগ্রহ করা যে কত শক্ত অপু তাহা বোঝে। কত খুঁজিয়া তবে একখানা মেলে।

অপু যে বাঁকা-কঞ্চি হাতে এরকম করিয়া বেড়ায়, এ কথা কেউ না শুনিতে পারে অপুর সেদিকে অত্যন্ত চেষ্টা। এরূপ অবস্থায় লোকে তাহাকে আপনমনে বকিতে দেখিলে পাগল ভাবিবে বা অন্য কিছু মনে করিবে, এই আশঙ্কায় সে পারতপক্ষে জন-সমাগমপূর্ণ স্থানে অথবা যেদিকে কেহ হঠাৎ আসিয়া পড়িতে পারে, সে সব দিকে না গিয়া নদীর ধারে—নির্জন বাঁশবনের পথে—নিজেদের বাড়ীর পিছনে তেঁতুল-তলায় ঘোরে। এ অবস্থায় তাহাকে কেহ না দেখে, সেদিকে তাহার অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি! ক্বচিৎ যদি কেহ আসিয়া পড়ে, তখনি সে জিভ্ কাটিয়া হাতের কঞ্চিখানা ফেলিয়া দেয়—পাছে কেহ কিছু মনে করে—এজন্য তাহার ভারী লজ্জা।

কেবল জানে তাহার দিদি। দিদি তাহাকে এ অবস্থায় দু'একবার দেখিয়া ফেলিয়াছিল, কাজেই দিদির কাছে আর লুকাইয়া কি হইবে? তাই সে বাঁকা-কঞ্চির কথা দিদিকে স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করিল। অন্য লোক হইলে, লজ্জায় অপু কখনই এ কথার উল্লেখ করিতে পারিত না, যদিও কেহই জানে না অপুর সহিত বাঁকা-কঞ্চির কি রহস্যময় সম্পর্ক, তবুও অপুর মনে হয় সকলেই সেকথা জানে, বলিলেই সকলে তাহাকে পাগল বলিয়া ঠাট্টা করিবে। কে বুঝিবে—একখানা বাঁকা-কঞ্চি হাতে পাইলে, সে না খাইয়া-দাইয়া নদীর ধারে কি কোনো জনহীন বনের পথে কি অপূর্ব আনন্দেই সারাদিন একা একা কাটাইয়া দিতে পারে!....

দিদিকে অনুরোধ করিয়াছিল—মাকে যেন এসব বলিস্‌নে দিদি!....দুর্গা বলে নাই!

সে জানে, অপু একটা পাগল! ভারী মমতা হয় ওর ওপর, ছোট্ট বোকা আদুরে ভাইটা—এসব মাকে বলিয়া কি হইবে?....

মধুসংক্রান্তির ব্রতের পূর্বদিন সর্বজয়া ছেলেকে বলিল—কাল তোদের মাস্টার মশায়কে নেমন্তন্ন ক'রে আসিস—বলিস দুপুর-বেলা এখানে খেতে।

মোটা চালের ভাত, পেঁপের ডালনা, ডুমুরের সুক্তনি, থোড়ের ঘন্ট, চিংড়ি মাছের ঝোল, কলার বড়া ও পায়েস।

দুর্গাকে তাহার মা পরিবেশন-কার্যে নিযুক্ত করিয়াছে। নিতান্ত আনাড়ি,—ভয়ে ভয়ে এমন সন্তর্পণে সে ডালের বাটি নিমন্ত্রিতের সম্মুখে রাখিয়া দিল—যেন তাহার ভয় হইতেছে এখনি কেহ বকিয়া উঠিবে। অত মোটা চালের ভাত নীরেনের খাওয়া অভ্যাস নাই; এত কম তৈলঘৃতের রান্না তরকারি কি করিয়া লোকে খায় তাহা সে জানে না। পায়েস পান্‌সে—জল-মিশানো দুধের তৈরী, একবার মুখে দিয়াই পায়েস-ভোজনের উৎসাহ তাহার অর্ধেক কমিয়া গেল। অপু মহা খুসি ও উৎসাহসহকারে খাইতেছিল; এত সুখাদ্য তাহাদের বাড়ীতে দু'একদিন মাত্র হইয়াছে—আজ তাহার স্মরণীয় উৎসবের দিন!—আপনি আর একটু পায়েস নিন্ মাস্টার মশায়।....নিজে সে এটা-ওটা বার বার দিদির কাছে চাহিয়া লইতেছিল।

বাড়ী ফিরিলে গোকুলের বউ হাসিমুখে বলিল—দুগ্‌গাকে পছন্দ হয় ঠাকুর্‌পো? দিব্যি দেখতে-শুনতে! আহা! গরীবের ঘরের মেয়ে, বাপের পয়সা নেই। কার হাতে যে পড়বে?—সারা জীবন প'ড়ে প'ড়ে ভুগ্‌বে। তা তুমি ওকে বিয়ে কর না কেন ঠাকুরপো, তোমাদেরই পালটি ঘর—মেয়েও দিব্যি; ভাইবোনের দু'জনের কেমন বেশ পুতুল-পুতুল গড়ন!....

জরীপের তাঁবু হইতে ফিরিতে গিয়া নীরেন সেদিন গ্রামের পিছনের আমবাগানের পথ ধরিয়াছিল। একটা বনে-ঘেরা সরু পথ বাহিয়া আসিতে আসিতে দেখিল বাগানের ভিতর হইতে একটি মেয়ে সম্মুখের পথের উপর আসিয়া উঠিতেছে, সে চিনিল—অপুর বোন দুর্গা। জিজ্ঞাসা করিল—কি খুকি, তোমাদের বাগান বুঝি এইটে?

দুর্গা পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিয়া লজ্জিত হইল, কিছু বলিল না।

পরে সে পথের পাশে দাঁড়াইয়া নীরেনকে পথ ছাড়িয়া দিতে গেল। নীরেন বলিল—না না খুকী, তুমি চল আগে আগে। তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হোল। ঐদিকে একটা পুকুরের ধারে গিয়ে পড়েছিলাম, তারপর পথ খুঁজে হায়রান। যে বন তোমাদের দেশে!

দুর্গা যাইতে যাইতে হঠাৎ থামিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া নীরেনের মুখের দিকে চাহিবার চেষ্টা করিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার কাপড়ের ভিতর হইতে কিসের ফল গোটাকতক পথের উপর পড়িয়া গেল।

নীরেন বলিল—কি যেন পড়ে গেল খুকী! কিসের ফল ওগুলো?

দুর্গা নীচু হইয়া কুড়াইতে কুড়াইতে সঙ্কুচিতভাবে বলিল—ও কিচ্ছু না, মেটে আলু।

—মেটে আলু? খেতে ভাল লাগে বুঝি? কি করে খায়?

এ প্রশ্ন দুর্গার কাছে অত্যন্ত কৌতূহলজনক ঠেকিল। একটি পাঁচ বছরের ছেলে যা জানে, চশ্‌মা পরা একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি তাহা জানে না। সে বলিল—এ ফল তো খায় না, এ তো তেতো।

—তবে তুমি যে—

দুর্গা সলজ্জসুরে বলিল—আমি নিয়ে যাচ্ছি এমনি—খেল্‌বার জন্যে।....একথা তাহার মনে ছিল যে, এই চশ্‌মা-পরা ছেলেটির সঙ্গেই সেদিন খুড়ীমা ঠাট্টাচ্ছলে তাহার বিবাহের কথা তুলিয়াছিল। তাহার ভারী কৌতূহল হইতেছিল, ছেলেটিকে সে ভাল করিয়া দেখে। কিন্তু মধুসংক্রান্তির ব্রতের দিনেও তাহা সে পারে নাই, আজও পারিল না।

—অপুকে ব'লো কাল সকালে যেন বই নিয়ে যায়—বল্‌বে তো?

দুর্গা চলিতে চলিতে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল।

আর একটু গিয়া পাশের একটা পথ দেখাইয়া বলিল—এই পথ দিয়ে গেলে আপনার খুব সোজা হবে।

নীরেন বলিল—আচ্ছা, আমি চিনে যাব এখন, তোমাকে একটু এগিয়ে দিই, তুমি একলা যেতে পারবে?

দুর্গা আঙুল দিয়া দেখাইয়া কহিল—ঐ তো আমাদের বাড়ী একটু এগিয়ে গিয়েই, আমি তো—এইটুকু একলা যাবো এখন। আপনি আর—

দুর্গাকে ইঁহার আগে নীরেন কখনও ভাল করিয়া দেখে নাই,—চোখ দুটির অমন সুন্দর ভাব কেবল দেখিয়াছে ইহারই ভাই অপুর মধ্যে। যেন পল্লীপ্রান্তের নিভৃত চূত-বকুল-বীথির প্রগাঢ় শ্যামলস্নিগ্ধতা

ডাগর চোখ দুটির মধ্যে অর্ধসুপ্ত রহিয়াছে। প্রভাত এখনো হয় নাই, রাত্রিশেষের অলস অন্ধকার এখনো জড়াইয়া আছে। তবে তাহা প্রভাতের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় বটে,—কত সুপ্ত আঁখির জাগরণ কত কুমারীর ঘাটে যাওয়া, ঘরে ঘরে কত নবীন জাগরণের অমৃত উৎসব—জানলায় জানলায় ধূপগন্ধ।

দুর্গা খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া কেমন যেন উস্‌খুস করিতে লাগিল। নীরেনের মনে হইল সে কি বলিবে মনে করিতে পারিতেছে না। সে বলিল—না খুকী, তোমাকে আর একটু এগিয়ে দিই? চল, তোমাদের বাড়ীর সামনে দিয়েই যাই।

দুর্গা ইতস্তত করিতে লাগিল, পরে একটু মুখ টিপিয়া হাসিল। নীরেনের মনে হইল এইবার সে কথা বলিবে। পরক্ষণে কিন্তু দুর্গা ঘাড় নাড়িয়া তাহার সহিত যাইতে হইবে না জানাইয়া দিয়া, বাড়ীর পথ ধরিয়া চলিয়া গেল।

দুপুর বেলা। ছাদে কাপড় তুলিতে আসিয়া গোকুলের বউ নীরেনের ঘরের দুয়ারে উঁকি দিয়া দেখিল। গরমে নীরেন বিছানায় শুইয়া খানিকটা এপাশ-ওপাশ করিবার পর, নিদ্রার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, মেঝেতে মাদুর পাতিয়া বাড়ীতে পত্র লিখিতেছিল।

গোকুলের বউ হাসিয়া বলিল—ঘুমোও নি যে ঠাকুরপো? আমি ভাবলাম ঠাকুরপো ঘুমিয়ে পড়েচে বুঝি, আজ মোচার ঘন্ট যে বড় খেলে না—পাতেই রেখে এলে, সেদিন তো সব খেয়েছিলে?

আসুন বৌদি। মোচার ঘন্ট খাবো কি? বাঙালে কান্ড সব; যে ঝাল তাতে খেতে ব'সে কি চোখে দেখতে পাই—কোন্‌টা ঘন্ট, কোন্‌টা কি?

গোকুলের বউ ঘরের দুয়ারের গব্‌রাটে মাথাটা হেলাইয়া ঠেস দিয়া, অভ্যস্তভাবে মুখের নীচু দিকটা আঁচল দিয়া চাপিয়া দাঁড়াইল।

—ইস্, ঠাকুরপো, বড্ড শহুরে চাল দিচ্ছ যে! ওইটুকু ঝাল আর তোমাদের সেখানে কেউ খায় না—না?

—মাপ করবেন বৌদি, এতে যদি 'ওইটুকু' হয়, তবে আপনাদের বেশীটা একবার খেয়ে না দেখে আমি এখান থেকে যাচ্ছি না! যা থাকে কপালে—যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপান্ন! দিন্ একদিন চক্ষুলজ্জার মায়া কাটিয়ে যত খুশী লঙ্কা।

—ওমা আমার কি হবে! চক্ষুলজ্জার ভয়েই শিল-নোড়ার পাট তুলে দিয়ে চুপ ক'রে ব'সে আছি নাকি ঠাকুরপো? শোনো কথা ঠাকুরপোর—বলে কিনা যাঁহা বাহান্ন....হাসির চোটে তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। খানিকটা পরে সামালাইয়া লইয়া বলিল—আচ্ছা তোমাদের সেখানে গরম কেমন ঠাকুরপো?

—সেখানে, কোথায়? কলকাতায় না পশ্চিমে? পশ্চিমে গরম কি রকম সে এখান থেকে কি বুঝতে পারবেন! সে বাংলাদেশে থেকে বোঝা যাবে না। বোশেখ মাসের দিকে রাত্রে কি কেউ ঘরের মধ্যে শুতে পারে? ছাদে বিকেলে জল ধ'রে ছাদ ঠান্ডা ক'রে রেখে তাইতে রাত্রে শুতে হয়।

—আচ্ছা, তোমরা যেখানে থাক এখান থেকে কতদূর?

—এখান থেকে রেলে প্রায় দু'দিনের রাস্তা। আজ সকালের গাড়ীতে মাঝেরপাড়া স্টেশনে চড়লে কাল দুপুর-রাত্রে পৌঁছানো যায়।

—আচ্ছা ঠাকুরপো, শুনিচি নাকি গয়াকাশীর দিকে পাহাড় কেটে রেল নিয়ে গিয়েচে—সত্যি?

—সত্যি। অনেক বড় বড় পাহাড়, ওপরে জঙ্গল—তার ভেতর দিয়ে যখন রেলগাড়ী যায়—একেবারে অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না, গাড়ীর মধ্যে আলো জ্বেলে দিতে হয়।

গোকুলের বউ উৎসুকভাবে বলিল—আচ্ছা, ভেঙে পড়ে না?

—ভেঙে পড়বে কেন বৌদি? বড় বড় এঞ্জিনিয়ারে সুড়ঙ্গ তৈরী করেচে, কত টাকা খরচ করেচে, ভাঙলেই হোল! এ কি আপনাদের রায়পাড়ার ঘাটের ধাপ যে দু'বেলা ভাঙচে?

এঞ্জিনিয়ার কোন্ জিনিস গোকুলের বউ তাহা বুঝিতে পারিল না। বলিল—পাহাড়টা মাটির না পাথরের?

—মাটিরও আছে, পাথরেরও আছে। নাঃ বৌদি, আপনি একেবারে পাড়াগেঁয়ে। আচ্ছা আপনি রেলগাড়ীতে কতদূর গিয়েছেন?

গোকুলের বউ আবার কৌতুকের হাসি হাসিয়া উঠিল। চোখ প্রায় বুজিয়া মুখ একটুখানি উপরের দিকে তুলিয়া ছেলেমানুষের ভঙ্গিতে বলিল—ওঃ, ভারী দূর গিইচি, একেবারে কাশী গয়া মক্কা গিইচি! সেই ও-বছর পিস্‌শাশুড়ী আর সতুর মা'র সঙ্গে আড়ংঘাটার যুগলকিশোর দেখতে গিইছিলাম। সেই আমার জন্মের মধ্যে কম্ম—রেলগাড়ীতে চড়া!

এই মেয়েটি অল্পক্ষণের মধ্যেই সামান্য সূত্র ধরিয়া তাহার চারিপাশের এমন একটা হাসি-কৌতুকের জাল বুনিতে পারে—যাহা নীরেনের ভাল লাগে। যে ধরনের লোকের মনের মধ্যে আনন্দের এমন অফুরন্ত ভান্ডার থাকে, যার কারণে-অকারণে অন্তর্নিহিত আনন্দের উৎস মনের পাত্র উপচাইয়া পড়িয়া অপরকেও সংক্রামিত করিয়া তোলে, এই পল্লীবধূটি সেই দলের একজন। আজকাল নীরেন মনে মনে ইহারই আগমনের প্রতীক্ষা করে—না আসিলে নিরাশ হয়; এমন কি যেন একটি গোপন অভিমানও হইয়া থাকে।

—আচ্ছা বৌদি, আপনাদের সবাই চলুন, একবার পশ্চিমে সব বেড়িয়ে নিয়ে আসি।

—এ বাড়ীর লোকে বেড়াতে যাবে পশ্চিমে! তুমিও যেমন ঠাকুরপো! তাহলে উত্তর মাঠের বেগুন ক্ষেতে চৌকি দেবে কে?

কথার শেষে সে আর একদফা ব্যঙ্গমিশ্রিত কৌতুকের হাসি হাসিয়া উঠিল। একটু পরে গম্ভীর হইয়া নীচু সুরে বলিল—দ্যাখো ঠাকুরপো, একটা কথা রাখ্‌বে?

—কি কথা বলুন আগে?

—যদি রাখো তো বলি!

—ও সাদা কাগজে সই করা আমার দ্বারা হবে না, বৌদি! জানেন তো আইন পড়ি। আগে কথাটা শুনবো, তারপর কথার উত্তর দেবো।

গোকুলের বউ দুয়ার ছাড়িয়া ঘরের মধ্যে আসিল। কাপড়ের ভিতর হইতে একটা কাগজের মোড়ক বাহির করিয়া বলিল—এই মাক্‌ড়ী দু'টো রেখে আমায় পাঁচটা টাকা দেবে?

নীরেন বিস্ময়ের সুরে বলিল—কেন বলুন তো?

—সে এখন বলবো না। দেবে ঠাকুরপো?

—আগে বলুন টাকা দিয়ে কি হবে? নৈলে কিন্তু—

গোকুলের বৌ নিম্নসুরে বলিল—আমি এক জায়গায় পাঠাবো। দ্যাখো তো এই চিঠিখানার ওপরের ঠিকানাটা ইংরিজিতে কি লেখা আছে!

নীরেন পড়িয়া বলিল—আপনার ভাই, না বৌদি?

—চুপ চুপ, এ বাড়ীর কাউকে বোলো না যেন। পাঁচটা টাকা চেয়ে পাঠিয়েচে, কোথায় পাবো ঠাকুরপো, কি রকম পরাধীন জানো তো? তাই ভাবলাম এই মাক্‌ড়ী দু'টো—টাকা পাঁচটা দাও গিয়ে ঠাকুরপো—হতভাগা ছোঁড়াটির কি কেউ আছে ভূভারতে?....গোকুলের বউ-এর গলার স্বর চোখের জলে ভারী হইয়া উঠিল।

নীরেন বলিল—টাকা আমি দেবো বৌদি, পাঁচটা হয় দশটা হয়, আপনি যখন হয় শোধ দেবেন; কিন্তু মাক্‌ড়ী আমি নিতে পারবো না—

গোকুলের বউ কৌতূকের ভঙ্গীতে ঘাড় দুলাইয়া হাসিমুখে বলিল—তা হবে না ঠাকুরপো, বাঃ বেশ তো তুমি! তারপর আমি তোমার ঋণ রেখে ম'রে যাই আর তুমি—সে হবে না, ও তোমায় নিতেই হবে। আচ্ছা ঠাকুরপো, নীচে অনেক কাজ প'ড়ে রয়েচে—

সে দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, কিন্তু সিঁড়ির কাছ পর্যন্ত গিয়াই ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় নিম্নস্বরে বলিল—কিন্তু টাকার কথা যেন কাউকে বোলো না ঠাকুরপো! কাউকে না—বুঝলে?

দুর্গা কাঁথার তলা হইতে অত্যন্ত খুশির সহিত ডাকিল—অপু, ও অপু!

অপু জাগিয়াই ছিল, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোন কথা বলে নাই। বলিল—দিদি, জানালাটা বন্ধ ক'রে দিবি? বড্ড ঠান্ডা হাওয়া আসচে।

দুর্গা উঠিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া বলিল—রাণুর দিদির বিয়ে কবে জানিস? আর কিন্তু বেশী দেরি নাই। খুব ঘটা হবে, ইংরিজি বাজনা আসবে। দেখিচিস্ তুই ইংরিজি বাজনা?

—হাঁ, সব মাথায় টুপি প'রে বাজায়, এই বড় বড় বাঁশি—মস্ত বড় ঢাক আমি দেখেচি—আর একরকম বাঁশি বাজায়, কালো কালো, অত বড় নয়, ফুলোট্ বাঁশি বলে—এমন চমৎকার বাজে! ফুলোট্ বাঁশি শুনিচিস্?

দুর্গা আর একটা কথা ভাবিতেছিল।

কাল সে বৈকালে ও-পাড়ার খুড়ীমার কাছে বেড়াইতে যায়। একথা সেকথার পর খুড়ীমা জিজ্ঞাসা করিল, দুগ্‌গা, তোর সঙ্গে ঠাকুরপোর কোথায় দেখা হয়েছিল রে?

সে বলিল—কেন খুড়ীমা?....পরে সে সেদিনের কথা বলিল— কৌতুকের সুরে বলিল, পথ হারিয়ে খুড়ীমা ওতেই—একেবারে গড়ের পুকুর—সেই বনের মধ্যে—

খুড়ীমা হাসিয়া বলিল—আমি কাল ঠাকুরপোকে বলছিলাম তোর কথা—বলছিলাম—গরীবের মেয়ে ঠাকুরপো, কিছু দেবার থোবার সাধ্যি তো নেই বাপের—বড্ড ভাল মেয়ে— যেন একালেরই মেয়ে না—তা ওকে নাওগে না? তাই ঠাকুরপো তোর কথা-টথা জিগ্যেস করছিল—বল্লে, ঘাটের পথে সেদিন কোথায় দেখা হোল—পথ ভুলে ঠাকুরপো কোথায় গিয়ে পড়েছিল—এই সব। তারপর আমি আজ তিনদিন ধ'রে বল্‌চি শ্বশুর-ঠাকুরকে দিয়ে তোর বাবাকে বলাবো। ঠাকুরপোর যেন মত আছে মনে হোল, তোকে যেন মনে লেগেচে—

দুর্গা গোয়াল হইতে বাছুর বাহির করিয়া রৌদ্রে বাঁধিল বটে, কিন্তু অন্যদিন বাড়ীর কাজ তবু তো যাহোক্ কিছু করে, আজ সে ইচ্ছা তাহার মোটেই হইতেছিল না। এক-একদিন, তাহার এরকম মনের ভাব হয়; সেদিন সে কিছুতেই গন্ডিতে আট্‌কাইয়া থাকিতে পারে না—কে তাহাকে পথে পথে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়। আজ যেন হাওয়াটা কেমন সুন্দর, সকালটা না-গরম-না-ঠান্ডা, কেমন মিষ্ট গন্ধ পাওয়া যায় নেবুফুলের—যেন কি একটা মনে আসে, কি তাহা সে বলিতে পারে না।

বাড়ীর বাহির হইয়া সে রাণুদের বাড়ী গেল। ভূবন মুখুজ্যে অবস্থাপন্ন গৃহস্থ, এই তাঁর প্রথম মেয়ের বিবাহ, খুব ঘটা করিয়াই বিবাহ হইবে। বাজিওয়ালা আসিয়া বাজির দরদস্তুর করিতেছে। সীতানাথ ও-অঞ্চলের বিখ্যাত রসুনচৌকী বাজিয়ে, তাহারও বায়না হইয়াছে, বিবাহ উপলক্ষে নানাস্থান হইতে কুটুম্বের দল আসিতে শুরু করিয়াছে। তাহাদের ছেলেমেয়েতে বাড়ীর উঠান সরগরম।

দুর্গার মনে ভারি আনন্দ হইল—আর দিনকতক পরে ইহাদেরই বাড়ীতে কত বাজি পুড়িবে। সে কোনো বাজি কখনও দেখে নাই, কেবল একবার গাঙ্গুলী বাড়ীর ফুলদোলে একটা কি বাজি দেখিয়াছিল, হুস করিয়া আকাশে উঠিয়া একেবারে যেন মেঘের গায়ে গিয়া ঠেকে, সেখান হইতে আবার পড়িয়া যায়, এমন চমৎকার দেখায়!....অপু বলে হাউই বাজি।

দুপুরের পর মা দালানে আঁচল বিছাইয়া একটু ঘুমাইয়া পড়িলে, সে সুড়ুৎ করিয়া পুনরায় বাড়ীর বাহির হইল। ফাল্গুনের মাঝামাঝি, রৌদ্রের তেজ চড়িয়াছে, একটানা তপ্ত হাওয়ায় রাণুদের বাগানের বড় নিমগাছটার হল্‌দে পাতাগুলো ঘুরিতে ঘুরিতে ঝরিয়া পড়িতেছে— কেহ কোনদিকে নাই, নেড়াদের বাড়ীর দিকে কে যেন একটা টিন বাজাইতেছে। বু-উ-উ-উ করিয়া কি একটা শব্দ হইল। কাঁচপোকা! দুর্গা নিজের অনেকটা অজ্ঞাতসারে তাড়াতাড়ি আঁচল মুঠার মধ্যে পাকাইয়া চকিত দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল।

কাঁচপোকা নয়, সুদর্শন পোকা।

তাহার মুঠার আঁচল আপনা-আপনি খুলিয়া গেল—আগ্রহের সহিত পা টিপিয়া টিপিয়া সে পোকাটার দিকে আসিতে লাগিল। সামনের পথের উপর বসিয়াছে, পাখার উপর শ্বেত ও রক্ত চন্দনের ছিটার মত বিন্দু বিন্দু দাগ।

সুদর্শন পোকা—ঠিক পোকা নয়—ঠাকুর। দেখিতে পাওয়া অত্যন্ত ভাগ্যের কাজ—তাহার মার মুখে, আরও অনেকের মুখে সে শুনিয়াছে। সে সন্তর্পণে ধূলার পর বসিয়া পড়িল, পরে হাত একবার

কপালে ঠেকাইয়া আর একবার পোকার কাছে লইয়া গিয়া বার বার দ্রুতবেগে আবৃত্তি করিতে লাগিল—সুদর্শন, সুভালাভালি রেখো....সুদর্শন, সুভালাভালি রেখো....সুদর্শন, সুভালাভালি রেখো (অবিকল এই রূপই সে অপরের মুখে বলিতে শুনিয়াছে)। পরে সে নিজের কিছু কথা মন্ত্রের মধ্যে জুড়িয়া দিল—অপুকে ভালো রেখো, মাকে ভালো রেখো, বাবাকে ভাল রেখো, ওপাড়ার খুড়ীমাকে ভালো রেখো—পরে একটু ভাবিয়া ইতস্তত করিয়া বলিল—নীরেনবাবুকে ভালো রেখো, আমার বিয়ে যেন ওখানেই হয় সুদর্শন, রাণুর দিদির মত বাজি-বাজনা হয়।

ভক্তের অর্ঘ্যের আতিশয্যে পোকাটা ধূলার উপর বিপন্নভাবে চক্রাকারে ঘুরিতেছিল, দুর্গা মনের সাধ মিটাইয়া প্রার্থনা শেষ করিয়া শ্রদ্ধার সহিত পাশ কাটাইয়া গেল।

পাড়ার ভিতরকার পথে পথে মাথার উপর প্রথম ফাল্গুনের সুনীল, এমন কি অনেকটা ময়ূরকণ্ঠী রং-এর আকাশ গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ে।

শেওড়া বনের মাঝখান দিয়া নদীর ঘাটের সরু পথ। সুঁড়ি পথের দুধারেই আমবাগান। তপ্ত বাতাস আম্র-বাউলের মিষ্টি গন্ধে, বনে বনে মৌমাছি ও কাঁচপোকার গুঞ্জনরবে, ছায়াগহন আমবনে কোকিলের ডাকে, সিগ্ধ হইয়া আসিতেছে।

বাগানগুলি পার হইয়া চড়কতলার মাঠ। ঘাসে ভরা মাঠে ছায়া পড়িয়া গিয়াছে। দুর্গা ঝোপের মধ্যে মধ্যে সেঁয়াকুল খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল—সেঁয়াকুল এখন আর বড় থাকে না, শীতের শেষে ঝরিয়া যায়। ওই উঁচু ঢিবিতে ঝোপের মধ্যের একটা গাছে অনেক সেঁয়াকুল সেদিনও তো সে খাইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখন আর নাই, সব ঝরিয়া গিয়াছে, গোলমরিচের মতো শুক্না সেঁয়াকুল ঘন ঝোপের তলা বিছাইয়া পড়িয়া আছে। এক ঝাঁক শালিক পাখী ঝোপের মধ্যে কিচ্ কিচ্ করিতেছিল, দুর্গা নিকট যাইতে উড়িয়া গেল।

তাহার মনে খুশির আবার একটা প্রবল ঢেউ আসিল। উৎসবের নৈকট্য, রাণুর দিদির বাসরে রাত জাগা ও গান শুনিবার আশা—

খুশিতে তাহার ইচ্ছা হইল সে মাঠের এধার হইতে ওধার পর্যন্ত ছুটিয়া বেড়ায়।

একবার সে হাতদুটা ছাড়াইয়া ডানার মতো লম্বা করিয়া দিয়া খানিকটা ঘুরপাক খাইয়া খানিকটা ছুটিয়া গেল। উড়িতে চায়!....শরীর তো হাল্কা জিনিস—হাত ছড়াইয়া ডানার মত বাতাস কাটিতে কাটিতে যদি যাওয়া যাইত!

শুধু শব্দ করিবার আনন্দে সে শুক্না ঝরাপাতার রাশির উপর ইচ্ছা করিয়া জোরে জোরে পা ফেলিয়া মচ্ মচ্ শব্দ করিতে করিতে চলিল। পাতা ভাঙিয়া গিয়া শুক্না শুক্না ধূলা মিশানো, খানিকটা সোঁদা সোঁদা খানিকটা তিক্ত গন্ধে জায়গাটা ভরিয়া গেল।

সাম্‌নে একটু দূরে সোনাডাঙার মাঠের দিকে যাইবার কাঁচা সড়ক। একখানা গরুর গাড়ী ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দে মাঠের পথের দিকে যাইতেছে। টাট্‌কা কাটা কঞ্চির ঘেরা বাঁধিয়া তাহার উপর কাঁথা ও ছেঁড়া লাল নক্সা পাড় কাপড় ঘিরিয়া ছই তৈয়ারী করিয়াছে। ছই এর মধ্যে কাহাদের একটা ছোট্ট মেয়ে একঘেয়ে, একটানা ছেলেমানুষ ধরণে কাঁদিতে কাঁদিতে যাইতেছে—কোন গাঁয়ের চাষাদের মেয়ে বোধ হয় বাপের বাড়ী হইতে শ্বশুরবাড়ী চলিয়াছে।

দুর্গা অবাক্ হইয়া একদৃষ্টে গাড়ীখানার দিকে চাহিয়া রহিল।

বিয়ের পর মা, বাবা, অপু—সব ছাড়িয়া এই রকম কোথায় কতদূরে চলিয়া যাইতে হইবে হয়ত—যখন তখন সেখান হইতে তাহারা আসিতে দিবে কি? সে এতক্ষণ একথা ভাবিয়া দেখে নাই—এই বাগান, বাসকফুলের ঝাড়, রাঙী গাইটা, উঠানের কাঁঠালতলাটা যাহা সে এত ভালোবাসে, এই শুক্না পাতার গন্ধ, ঘাটের পথ এইসব ছাড়িয়া যাইতে হইবে চিরকালের জন্য! ছইএর মধ্যের ছোট্ট মেয়েটা বোধহয় এই দুঃখেই কাঁদিতেছে।

কাঁচা সড়কটা ছাড়াইয়া আর একটা ছোট্ট পোড়ো মাঠ পার হইলেই নদী।

ওপারের জেলেরা কি মাছ ধরিতেছে? খয়রা? এপারে আসিলে দু'পয়সার মাছ কিনিয়া বাড়ী লইয়া যাইত। অপু খয়রা মাছ খাইতে বড় ভালবাসে!

বাড়ী ফিরিয়া সন্ধ্যার পর সে অনেকক্ষণ ধরিয়া পুতুলের বাক্স গোছাইল। ঘরের মেঝেতে তাহার মা তেল পুরিতে গিয়া অনেকটা কেরোসিন তেল ফেলিয়া দিয়াছে, তাহার গন্ধ বাহির হইতেছে, হাওয়াটা যেন একটু গরম। পুতুল-গুছানো প্রায় শেষ হইয়াছে, অপু আসিয়া বলিল—তুই বুঝি আমার বাক্স থেকে ছোট আর্সিখানা বের ক'রে নিয়েচিস্ দিদি?

—হুঁ—আর্সি তো আমার—আমি তো আগে দেখতে পেয়েছিলাম, তক্তপোশের নীচে পড়েছিল। যাও, আমি আর্সি আমার বাক্সে রাখবো। বেটাছেলে আবার আর্সি নিয়ে কি হবে?

—বা রে, তোমার আর্সি বই কি? ও-পাড়ার খুড়ীমাদের বাড়ী থেকে মা তো কি বের্তোতে আর্সি এনেছিল, আমি তো আগেই মার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলাম। না দিদি, দাও—

কথা শেষ করিয়াই সে দিদির পুতুলের বাক্সের কাছে বসিয়া পড়িয়া তাহার মধ্যে আর্সি খুঁজিতে লাগিল।

দুর্গা ভাইয়ের গালে এক চড় লাগাইয়া দিয়া বলিল—দুষ্টু কোথাকার—আমি পুতুল গুছিয়ে রেখেচি আর উনি হাণ্ডুল-পাণ্ডুল করচেন—যা আমার বাক্সে হাত দিতে হবে না তোমায়—দেবো না আমি আর্সি।

কিন্তু কথা শেষ না হইতেই অপু ঝাঁপাইয়া তাহার ঘাড়ের উপর পড়িয়া তাহার রুক্ষ চুলের গোছা টানিয়া আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। কান্না আটকানো গলায় বলিতে লাগিল—কেন তুমি আমাকে মারবে? আমার লাগে না বুঝি?—দাও আমায়—মাকে বোলে দেবো—লক্ষ্মীর চুপ্‌ড়ি থেকে আল্‌তা চুরি কোরেচ—

আল্‌তা চুরির কথায় দুর্গা খেপিয়া গেল। ভাই এর কান ধরিয়া তাকে ঝাঁকুনি দিয়া উপরি উপরি কয়েকটা চড় দিতে দিতে বলিল—আল্‌তা নিইচি?—আমি আল্‌তা নিইচি, লক্ষ্মীছাড়া দুষ্টু বাঁদর! আর তুমি যে লক্ষ্মীর চুপ্‌ড়ির গা থেকে কড়িগুলো খুলে ঢুকিয়ে রেখেচ, মাকে ব'লে দেবো না?

চীৎকার, কান্না ও মারামারির শব্দ শুনিয়া সর্বজয়া ছুটিয়া আসিল।

ততক্ষণে দুর্গা অপুর কান ধরিয়া তাহাকে মাটিতে প্রায় শোয়াইয়া ফেলিয়াছে—অপুও প্রাণপণে দুর্গার চুলের গোছা মুঠি পাকাইয়া টানিয়া এরূপ ধরিয়া আছে, যে দুর্গার মাথা তুলিবার ক্ষমতা নাই।

অপুর লাগিয়াছিল বেশী। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—দ্যাখো না মা, আমার আর্সিখানা বাক্স থেকে বের ক'রে নিজের বাক্সে রেখে দিয়েচে—দিচ্চে না—এমন চড় মেরেচে গালে—

দুর্গা প্রতিবাদ করিয়া বলিল—না মা, দ্যাখো না আমার পুতুলের বাক্স গোছাচ্ছি, ও এসে সেগুলো সব—

সর্বজয়া আসিয়া মেয়ের পিঠের উপর দুম্ দুম্ করিয়া সজোরে কয়েকটি কিল বসাইয়া দিয়া বলিল—ধাড়ী মেয়ে—কেন তুই ওর গায়ে হাত দিবি যখন তখন?—ওতে আর তোতে অনেক তফাৎ জানিস?—আর্সি—আর্সি তোমার কোন্ পিণ্ডিতে লাগবে শুনি? কথায় কথায় উনি যান ওকে তেড়ে মার্তে। মরণ আর কি! পুতুলের বাক্স—রোসো—

কথা শেষ না করিয়াই সে মেয়ের গুছানো পুতুলের বাক্স উঠাইয়া একটান মারিয়া বাহির উঠানে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

—ধাড়ী মেয়ের কোনো কাজ নেই, কেবল খাওয়া আর পাড়ায় পাড়ায় টো টো ক'রে বেড়ানো—আর কেবল পুতুলের বাক্স! ও সব টেনে এক্ষুনি বাঁশবাগানে ফেলে দিয়ে আসচি। দিচ্চি তোমার খেলা ঘুচিয়ে একেবারে—

দুর্গার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। পুতুলের বাক্স তাহার প্রাণ, দিনের মধ্যে দশবার সে পুতুলের বাক্স গোছায়—পুতুল, রাংতা, ছোপানো কাপড়, আল্‌তা, কত কষ্টের সংগ্রহ করা নাটফল, টিনমোড়া আর্সিখানা, পাখীর বাসা—সব অন্ধকার উঠানের মধ্যে কোথায় কি চড়াইয়া পড়িল। মা যে তাহার পুতুলের বাক্স এরূপ নির্মমভাবে ফেলিয়া দিতে পারে, একথা কখনও সে ভাবিতে পারিত না! কত কষ্টে কত জায়গা হইতে যোগাড় করা কত জিনিস উহার মধ্যে!

কোনো কথা বলিতে সাহস না করিয়া সে কেন অবাক হইয়া রহিল।

অপুর কাছেও বোধ হয় শাস্তিটা বেশী কঠোর বলিয়াই ঠেকিল। সে আর কোনো কথা না বলিয়া চুপচাপ গিয়া শুইয়া পড়িল।

রাত্রি অনেক হইয়াছে, মেঝেতে কেরোসিন তেলের গন্ধ বাহির হইতেছে, ঘরের মধ্যে বাঁশবাগানের মশা বিন্ বিন্ করিতেছে, খানিকক্ষণ বসিয়া বসিয়া দুর্গা গিয়া চুপ করিয়া শুইয়া পড়িল।

ভাঙা জানালা দিয়া ফাগুন জ্যোৎস্নার আলো বিছানায় পড়িয়াছে, পোড়ো ভিটার দিক হইতে ভুর ভুর করিয়া লেবু ফুলের গন্ধ আসিতেছে।

একবার তাহার মনে হইল উঠিয়া গিয়া পুতুলের বাক্সটা ও ছড়ানো জিনিসগুলা তুলিয়া আনে—কাল সকালে কি আর পাওয়া যাইবে? কত কষ্টের জিনিসগুলো! কিন্তু সাহস পাইল না। আনিতে গেলে মা যদি আবার মারে?

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। হঠাৎ সে গায়ের উপর কাহার হাত অনুভব করিল। অপু ভয়ে ভয়ে ডাকিল—দিদি? দুর্গা কোনো জবাব দিবার পূর্বেই অপু বালিশে মুখ গুঁজিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—আমি আর করবো না—আমার ওপর রাগ করিসনে দিদি—তোর পায়ে পড়ি। কান্নার আবেগে তাহার গলা আটকাইয়া যাইতে লাগিল।

দুর্গা প্রথমটা বিস্মিত হইল—পরে সে উঠিয়া বসিয়া ভায়ের কান্না থামাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।—কাঁদিসনে, চুপ চুপ, মা শুনতে পেলে আবার আমায় বকবে, চুপ, কাঁদতে নেই—আচ্ছা আমি রাগ করবো না, কেঁদো না ছিঃ—চুপ—

তাহার ভয় হইতেছিল অপুর কান্না শুনিলে মা আবার হয়তো তাহাকেই মারিবে।

অনেক করিয়া সে ভাইয়ের কান্না থামাইল। পরে শুইয়া শুইয়া তাহাকে নানা গল্প, বিশেষত রাণুর দিদির বিয়ের গল্প বলিতে লাগিল। একথা-ওকথার পর অপু দিদির গায়ে হাত দিয়া চুপি চুপি বলিল—একটা কথা বলবো দিদি?—তোর সঙ্গে মাষ্টার মশায়ের বিয়ে হবে—

দুর্গার লজ্জা হইল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার অত্যন্ত কৌতূহলও হইল; কিন্তু ছোট ভাইএর কাছে এ সম্বন্ধে কোনো কথাবার্তা বলিতে তাহার সঙ্কোচ হওয়াতে সে চুপ করিয়া রহিল।

অপু আবার বলিল—খুড়ীমা বল্‌ছিল রাণুর মায়ের কাছে আজ বিকালে। মাষ্টার মশায়ের নাকি অমত নেই—

কৌতূহলের আবেগে চুপ করিয়া থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল। সে তাচ্ছিল্যের সুরে বলিল—হ্যাঁ বল্‌ছিল—যাঃ—তোর সব যেমন কথা—

অপু প্রায় বিছানায় উঠিয়া বসিল,—সত্যি বল্‌চি দিদি, তোর গা ছুঁয়ে বল্‌চি। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে, আমাকে দেখেই তো কথা উঠ্‌ল। বাবাকে দিয়ে পত্তর লেখাবে সেই মাষ্টার মশায়ের বাবা যেখানে থাকেন সেখানে—

—মা জানে?

—আমি এসে মাকে জিগ্যেস করবো ভাবলাম—ভুলে গিইচি। জিগ্যেস করবো দিদি? মা বোধ হয় শোনে নি; কাল খুড়ীমা মাকে ডেকে নিয়ে বল্‌বে বল্‌ছিল—

পরে সে বলিল—তুই কত রেলগাড়ী চড়বি দেখিস, মাষ্টার মশাইরা থাকেন এখান থেকে অনেক দূরে—রেলে যেতে হয়—

দুর্গা চুপ করিয়া রহিল।

সে রেলগাড়ীর ছবি দেখিয়াছে—অপুর একখানা বইয়ের মধ্যে আছে। খুব লম্বা, অনেকগুলো চাকা, সামনের দিকে কল, সেখানে আগুন দেওয়া আছে, ধোঁয়া ওড়ে। রেলগাড়ীখানা আগাগোড়া লোহার, চাকাও তাই—গরুর গাড়ীর মত কাঠের চাকা নয়। রেল লাইনের ধারে কোনো খড়ের বাড়ী নাই, থাকিতে পারে না, পুড়িয়া যায়। রেলগাড়ী যখন চলে তখন তাহার নল হইতে আগুন বাহির হয় কিনা! সে ভাই-এর গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল—তোকেও সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবো। তাহার পর দুজনেই চুপ করিয়া ঘুমাইবার যোগাড় করিল। ঘুমাইতে গিয়া একটা কথা বার বার দুর্গার মনে হইতেছিল—ঠাকুর সুদর্শন তাহার কথা শুনিয়াছেন! আজই তো সুদর্শনের কাছে সে—ঠাকুরের বড্ড দয়া—মা তো ঠিক কথা বলে!

অপু বলিল—লীলাদির জন্যে কেমন চমৎকার শাড়ী কেনা হয়েচে, আজ লীলাদির কাকা বিয়ের জন্যে কিনে এনেচে রাণাঘাট থেকে, সেজ জেঠিমা বল্লে—বালুচরের শাড়ী—

দুর্গা হাসিমুখে বলিল—একটা ছড়া জানিস?···· পিসি বল্‌তো,

বালুচরের বালুর চরে একটা কথা কই—
মোষের পেটে ময়ূরছানা দেখে এলাম সই।

পথের পাঁচালী

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

অপু কাউকে একথা এখনো বলে নাই—তাহার দিদিকেও না।

সেদিন চুপি চুপি দুপুরে সে যখন তাহার বাবার ঐ বই-বোঝাই কাঠের সিন্দুকটা লুকাইয়া খুলিয়াছিল, সিন্দুকটার মধ্যে একখানা বইএর মধ্যেই এই অদ্ভুত কথাটার সন্ধান পাইয়াছে!

উঠানের উপর বাঁশঝাড়ের ছায়া তখন পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ হয় নাই, ঠিক-দুপুরে সোনাভাঙার তেপান্তর মাঠের সেই প্রাচীন অশ্বত্থ গাছের ছায়ার মত এক জায়গায় একরাশ ছায়া জমাট বাঁধিয়া ছিল।

একদিন সে দুপুরবেলা বাপের অনুপস্থিতিতে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া চুপি চুপি বইএর বাক্সটা লুকাইয়া খুলিল। অধীর আগ্রহের সহিত সে এ-বই ওবই খুলিয়া খানিকটা করিয়া ছবি দেখিতে এবং খানিকটা করিয়া বই-এর মধ্যে ভাল গল্প লেখা আছে কি না দেখিতে লাগিল। একখানা বইএর মলাট খুলিয়া দেখিল নাম লেখা আছে 'সর্ব-দর্শন-সংগ্রহ'। ইহার অর্থ কি, বইখানা কোন্ বিষয়ের তাহা সে বিন্দুবিসর্গও বুঝিল না। বইখানা খুলিতেই একদল কাগজ-কাটা পোকা নিঃশব্দে বিবর্ণ মার্বেল কাগজের নীচে হইতে বাহির হইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে যেদিকে দুই চোখ যায় দৌড় দিল। অপু বইখানা নাকের কাছে লইয়া গিয়া ঘ্রাণ লইল, কেমন পুরানো গন্ধ! মেটে রঙের পুরু পুরু পাতাগুলোর এই গন্ধটা তাহার বড় ভাল লাগে—গন্ধটায় কেবলই বাবার কথা মনে করাইয়া দেয়।

যখনই এ গন্ধ সে পায় তখনই কি জানি কেন তাহার বাবার কথা মনে পড়ে।

অত্যন্ত পুরানো মার্বেল কাগজের বাঁধাই করা মলাটের নানাস্থানে চটা উঠিয়া গিয়াছে। এই পুরানো বইএর উপরই তাহার প্রধান মোহ। সেজন্য সে বইখানা বালিশের তলায় লুকাইয়া রাখিয়া অন্যান্য বই তুলিয়া বাক্স বন্ধ করিয়া দিল।

লুকাইয়া পড়িতে পড়িতে এই বইখানিতেই একদিন সে পড়িল বড় অদ্ভুত কথাটা! হঠাৎ শুনিলে মানুষ আশ্চর্য হইয়া যায় বটে—কিন্তু ছাপার অক্ষরে বইখানার মধ্যে এ কথা লেখা আছে, সে পড়িয়া দেখিল। পারদের গুণ বর্ণনা করিতে করিতে লেখক লিখিয়াছেন,—শকুনির ডিমের মধ্যে পারদ পুরিয়া কয়েকদিন রৌদ্রে রাখিতে হয়, পরে সেই ডিম মুখের ভিতর পুরিয়া মানুষ ইচ্ছা করিলে শূন্যমার্গে বিচরণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়।

অপু নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না—আবার পড়িল—আবার পড়িল।

পরে নিজের ডালাভাঙা বাক্সটার মধ্যে বইখানা লুকাইয়া রাখিয়া বাহিরে গিয়া কথাটা ভাবিতে ভাবিতে সে অবাক্ হইয়া গেল।

দিদিকে জিজ্ঞাসা করে—শকুনিরা বাসা বাঁধে কোথায় জানিস দিদি?

তাহার দিদি বলিতে পারেনা। সে পাড়ার ছেলেদের—সতু, নীলু, কিনু, পটল, নেড়া—সকলকে জিজ্ঞাসা করে। কেউ বলে সে এখানে নয়; উত্তর মাঠে উঁচু গাছের মাথায়। তাহার মা বকে—এই দুপুরবেলা কোথায় ঘুরে বেড়াস! অপু ঘরে ঢুকিয়া শুইবার ভান করে, বইখানা খুলিয়া সেই জায়গাটা আবার পড়িয়া দেখে—আশ্চর্য! এ সহজে উড়িবার উপায়টা কেউ জানে না? হয়তো এই বইখানা আর কাহারো বাড়ী নাই, শুধু তাহার বাবারই আছে; হয়তো এই জায়গাটা আর কেহ পড়িয়া দেখে নাই, শুধু তাহারই চোখে পড়িয়াছে এতদিনে।

বইখানার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া আবার সে আঘ্রাণ লয়—সেই পুরানো পুরানো গন্ধটা! এই বইয়ে যাহা লেখা আছে, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে তাহার মনে আর কোন অবিশ্বাস থাকে না।

পারদের জন্য ভাবনা নাই—পারদ মানে পারা সে জানে। আয়নার পেছনে পারা মাখানো থাকে, একখানা ভাঙা আয়না বাড়ীতে আছে, উহা যোগাড় করিতে পারিবে এখন। কিন্তু শকুনির ডিম এখন সে কোথায় পায়?

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে এক একদিন তাহার দিদি ডাকে—আয় শোন্ অপু, মজা দেখবি আয়। পরে সে একমুঠো পাতের ভাত লইয়া বাড়ীর খিড়্কি-দোরের বাঁশ বাগানে গিয়া হাঁক দেয়—আয় ভুলো—তু-উ-উ-উ। ডাক দিয়াই দুর্গা ভাইয়ের দিকে হাসি হাসি মুখে চুপ করিয়া চাহিয়া থাকে, যেন কি অপূর্ব রহস্যপুরীর দুয়ার এখনই তাহাদের চোখের সাম্‌নে খুলিয়া যায়! হঠাৎ কোথা হইতে কুকুরটা আসিয়া পড়তেই দুর্গা হাত তুলিয়া বলিয়া উঠে—ওই এসেচে! কোত্থেকে এলো দেখ্‌লি?—খুশিতে সে হিহি করিয়া হাসে।

রোজ রোজ এই কুকুরকে ভাত খাওয়ানোর ব্যাপারে দুর্গার আমোদ হয় ভারী।—তুমি হাঁক দেও, কেউ কোথাও নাই, চারিদিকে চুপ্! ভাত মাটিতে নামাইয়া দুর্গা চোখ বুজিয়া থাকে; আশা ও কৌতূহলের ব্যাকুলতায় বুকের মধ্যে টিপ্ টিপ্ করে; মনে মনে ভাবে—আজ ভুলো আস্‌বে না বোধ হয়, দেখি দিকি কোত্থেকে আসে! আজ কি আর শুনতে পেয়েছে!—

হঠাৎ ঘনঝোপে একটা শব্দ ওঠে—

চক্ষের নিমেষে বনজঙ্গলের লতাপাতা ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ভুলো কোথা হইতে নক্ষত্রবেগে আসিয়া হাজির।

অমনি দুর্গার সমস্ত গা দিয়া একটা কিসের স্রোত বহিয়া যায়। বিস্ময় ও কৌতুকে তাহার মুখ-চোখ উজ্জ্বল দেখায়! মনে মনে ভাবে—ঠিক শুন্‌তে পায় তো, আসে কোত্থেকে! আচ্ছা কাল একটু চুপি চুপি ডেকে দেখবো দিকি, তাও শুন্‌তে পাবে?

এই আমোদ উপভোগ করিতে সে মায়ের বকুনি সহ্য করিয়াও রোজ খাইবার সময় নিজে বরং কিছু কম খাইয়া কুকুরের জন্য কিছু ভাত পাতে সঞ্চয় করিয়া রাখে।

অপু কিন্তু দিদির কুকুর ডাকিবার মধ্যে কি আমোদ আছে তাহা খুঁজিয়া পায় না। দিদির ওসব মেয়েলি ব্যাপারের মধ্যে সে নাই। অধীর আগ্রহে ভোজনরত শীর্ণ কুকুরটার দিকে সে চাহিয়াও দেখে না, শুধু শকুনির ডিমের কথা ভাবে।

অবশেষে সন্ধান মিলিল। হীরু নাপিতের কাঁটালতালায় রাখালেরা গরু বাঁধিয়া গৃহস্থের বাড়ীতে তেল-তামাক আনিতে যায়। অপু গিয়া তাহাদের পাড়ার রাখালকে বলিল—তোরা কত মাঠে মাঠে বেড়াস, শকুনির বাসা দেখ্‌তে পাস? আমায় যদি একটা শকুনির ডিম এনে দিস আমি দুটো পয়সা দেবো।

দিন-চারেক পরেই রাখাল তাহাদের বাড়ীর সামনে আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া কোমরের থলি হইতে দুইটা কালো রং-এর ছোট ছোট ডিম বাহির করিয়া বলিল—এই দ্যাখো ঠাকুর এনিচি। অপু তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইয়া বলিল—দেখি। পরে আহ্লাদের সহিত উল্টাইতে পাল্টাইতে বলিল—শকুনির ডিম! ঠিক তো? রাখাল সে সম্বন্ধে ভুরি ভুরি প্রমাণ উত্থাপিত করিল। ইহা শকুনির ডিম কিনা এ সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো কারণ নাই, সে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া কোথাকার কোন উঁচু গাছের মগডাল হইতে ইহা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে—কিন্তু দুই আনার কমে দিবে না।

পারিশ্রমিক শুনিয়া অপু অন্ধকার দেখিল। বলিল, দুটো পয়সা দেবো, আর আমার কড়িগুলো নিবি? সব দিয়ে দেবো, এক টিনের ঠোঙা কড়ি—সব। এই এত বড় বড় সোনাগেঁটে—দেখবি, দেখাবো?

রাখালকে সাংসারিক বিষয়ে অপুর অপেক্ষা অনেক হুঁশিয়ার বলিয়া মনে হইল। সে নগদ পয়সা ছাড়া কোনো রকমেই রাজী হয় না। অনেক দরদস্তুরের পর আসিয়া চার পয়সায় দাঁড়াইল। অপু দিদির কাছে চাহিয়া চিন্তিয়া দুটা পয়সা যোগাড় করিয়া তাহাকে চুকাইয়া দিয়া ডিম দুটি লইল। তাহা ছাড়া রাখাল কিছু কড়িও লইল। এই কড়িগুলা অপুর প্রাণ, অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যার বিনিময়েও সে এই কড়ি কখনো হাতছাড়া করিত না অন্য সময়; কিন্তু আকাশে উড়িবার আমোদের কাছে কি-আর বেগুন বীচি খেলা!

ডিমটা হাতে করিয়া তাহার মনটা যেন ফুঁ-দেওয়া রবারের বেলুনের মত হাল্কা হইয়া ফুলিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা সন্দেহের ছায়া তাহার মনে আসিয়া পৌঁছিল, এটুকু এতক্ষণ ছিল না; ডিম হাতে পাওয়ার পর হইতে যেন কোথা হইতে ওটুকু দেখা দিল খুব অস্পষ্ট। সন্ধ্যার আগে আপনমনে নেড়াদের জামগাছের কাটা গুঁড়ির উপর বসিয়া সে ভাবিতে লাগিল, সত্যি সত্যি উড়া যাইবে তো! সে উড়িয়া কোথায় যাইবে? মামার বাড়ীর দেশে? বাবা যেখানে আছে সেখানে? নদীর ওপারে? শালিখ্ পাখী ময়না পাখীর মত ও-ই আকাশের গায়ে তারাটা যেখানে উঠিয়াছে?

সেই দিনই, কি তাহার পরদিন। সন্ধ্যার একটু আগে দুর্গা সলিতার জন্য ছেঁড়া নেকড়া খুঁজিতেছিল। তাকের হাঁড়ি-কলসীর পাশে গোঁজা সলিতা পাকাইবার ছেঁড়া-খোঁড়া কাপড়ের টুকরার তাল হাত্ড়াইতে হাত্ড়াইতে কি যেন ঠক্ করিয়া তাহার পিছন হইতে গড়াইয়া মেজের উপর পড়িয়া গেল। ঘরের ভিতর অন্ধকার, ভাল দেখা যায় না, দুর্গা মেজে হইতে উঠাইয়া লইয়া বাহিরে আসিয়া বলিল—ওমা কিসের দুটো বড় বড় ডিম এখানে। এঃ, প'ড়ে একেবারে গুঁড়ো হয়ে গিয়েচে—দেখেচো কি পাখী ডিম পেড়েচে ঘরের মধ্যে মা!

তাহার পর কি ঘটিল, সে কথা না তোলাই ভালো। অপু সেদিন রাত্রে খাইল না····কান্না···হৈ হৈ কাণ্ড। তাহার মা ঘাটে গল্প করে—ছেলেটার যে কি কাণ্ড, ওমা এমন কথা তো কখনো শুনি নি—শুনেচো সেজ ঠাকুরঝি, শকুনির ডিম নিয়ে মানুষে উড়তে পারে—ওই ওদের বাড়ীর রাখাল ছোঁড়াটা, বদ্‌মায়েশের ধাড়ি। তাকে বুঝি বলেচে, সে কোত্থেকে দুটো কাগের না কিসের ডিম এনে বলেচে,—এই নেও শকুনির ডিম। তাই নাকি আবার চার পয়সা দিয়ে কিনেচে তার কাছে। ছেলেটা যে কি বোকা সে আর তোমার কাছে কি বল্‌বো সেজ ঠাকুরঝি—কি করি যে এ ছেলে নিয়ে আমি!

কিন্তু বেচারী সর্বজয়া কি করিয়া জানিবে, সকলেই তো কিছু 'সর্ব-দর্শন-সংগ্রহ' পড়ে নাই, বা সকলেই কিছু পারদের গুণও জানে না।

আকাশে তাহা হইলে তো সকলেই উড়িত।

পথের পাঁচালী

বিংশ পরিচ্ছেদ

অনেকদিন হইতে গ্রামের বৃদ্ধ নরোত্তম দাস বাবাজির সঙ্গে অপুর বড় ভাব। গাঙ্গুলী পাড়ার গৌরবর্ণ, দিব্যকান্তি, সদানন্দ বৃদ্ধ সামান্য খড়ের ঘরে বাস করেন। বিশেষ গোলমাল ভালবাসেন না, প্রায়ই নির্জনে থাকেন, সন্ধ্যার পর মাঝে মাঝে গাঙ্গুলীদের চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া বসেন। অপুর বাল্যকাল হইতেই হরিহর ছেলেকে সঙ্গে করিয়া মাঝে মাঝে নরোত্তম দাসের কাছে লইয়া যাইত—সেই হইতেই দুজনের মধ্যে খুব ভাব। মাঝে মাঝে অপু গিয়া বৃদ্ধের নিকট হাজির হয়, ডাক দেয়,—দাদু, আছো? বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া তালপাতার চাটাইখানা দাওয়ায় পাতিয়া দিয়া বলেন—এসো দাদাভাই এসো, বসো বসো—

অন্যস্থানে অপু মুখচোরা, মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না—কিন্তু এই সরল শান্তদর্শন বৃদ্ধের সঙ্গে সে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচে মিশিয়া থাকে, বৃদ্ধের সঙ্গে তাহার আলাপ, খেলার সঙ্গীদের সঙ্গে আলাপের মত ঘনিষ্ঠ, বাধাহীন ও উল্লাস-ভরা! নরোত্তম দাসের কেহ নাই, বৃদ্ধ একাই থাকেন—এক স্বজাতীয় বৈষ্ণবের মেয়ে কাজকর্ম করিয়া দিয়া চলিয়া যায়। অনেক সময় সারা বিকাল ধরিয়া অপু বসিয়া গল্প শোনে ও গল্প করে। একথা সে জানে যে, নরোত্তম দাস বাবাজি তাহার বাবার অপেক্ষাও বয়সে অনেক বড়, অন্নদা রায়ের অপেক্ষাও বড়—কিন্তু এই বয়োবৃদ্ধতার জন্যই অপুর কেমন যেন মনে হয় বৃদ্ধ তাহার সতীর্থ, এখানে আসিলে তাহার সকল সঙ্কোচ, সকল লজ্জা আপনা হইতেই ঘুচিয়া যায়। গল্প করিতে করিতে, অপু মন খুলিয়া হাসে, এমন সব কথা বলে যাহা অন্যস্থানে সে ভয়ে বলিতে পারে না, পাছে প্রবীণ লোকেরা কেহ ধমক দিয়া 'জ্যাঠা ছেলে' বলে। নরোত্তম দাস বলেন—দাদু, তুমি আমার গৌর,—তোমাকে দেখলে আমার মনে হয় দাদু, আমার গৌর তোমার বয়সে ঠিক তোমার মতই সুন্দর, সুশ্রী, নিষ্পাপ ছিলেন—ওই রকম ভাব-মাখানো চোখ ছিল তাঁরও—

অন্যস্থানে এ কথায় অপুর হয়ত লজ্জা হইত, এখানে সে হাসিয়া বলে—দাদু তা হোলে এবার তুমি আমায় সেই বইখানার ছবি দেখাও।

বৃদ্ধ ঘর হইতে 'প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা' খানা বাহির করিয়া আনেন। তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় গ্রন্থ, নির্জনে পড়িতে পড়িতে তিনি মুগ্ধ বিভোর হইয়া থাকেন। ছবি মোট দুখানি, দেখানো শেষ হইয়া গেলে বৃদ্ধ বলিলেন, আমি মর্‌বার সময়ে বইখানা তোমাকে দিয়ে যাবো দাদু, তোমার হাতে বইয়ের অপমান হবে না—

তাঁহার এক শিষ্য মাঝে মাঝে পদ রচনা করিয়া তাঁহাকে শুনাইতে আসিত। বৃদ্ধ বিরক্ত হইয়া বলিতেন, পদ বেঁধেচো বেশ করেচো, ওসব আমায় শুনিও না বাপু, পদকর্তা ছিলেন বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস—তাঁদের পর ওসব আমার কানে বাজে—ওসব গিয়ে অন্য জায়গায় শোনাও।

সহজ, সামান্য, অনাড়ম্বর জীবনের গতিপথে বাহিয়া এখানে কেমন যেন একটা অন্তঃসলিলা মুক্তির ধারা বহিতে থাকে, অপুর মন সেটুকু কেমন করিয়া ধরিয়া ফেলে। তাহার কাছে তাহা তাজা মাটি, পাখী, গাছপালার সাহচর্যের মত অন্তরঙ্গ ও আনন্দপূর্ণ ঠেকে বলিয়াই দাদুর কাছে আসিবার আকর্ষণ তাহার এত প্রবল।

ফিরিবার সময় অপু নরোত্তম দাসের উঠানের গাছতলাটা হইতে একরাশি মুচুকুন্দ-চাঁপা ফুল কুড়াইয়া আনে। বিছানায় সেগুলি সে রাখিয়া দেয়। তাহার পরে সন্ধ্যায় আলো জ্বলিলেই বাবার আদেশে পড়িতে বসিতে হয়। ঘণ্ট-খানেকের বেশী কোনোদিনই পড়িতে হয় না, কিন্তু অপুর মনে হয় কত রাতই যে হইয়া গেল! পরে ছুটি পাইয়া সে শুইতে যায়, বিছানায় শুইয়া পড়ে,—আর অমনি আজকের দিনের সকল খেলাধূলা সারাদিনের সকল আনন্দের স্মৃতিতে ভরপুর হইয়া বিছানায় রাখা মুচুকুন্দ-চাঁপার গন্ধ তাহার ক্লান্ত দেহমনকে খেলাধূলার অতীত ক্ষণগুলির জন্য বিরহাতুর বালক-প্রাণকে অভিভূত করিয়া বহিতে থাকে। বিছানায় উপুড় হইয়া ফুলের রাশির মধ্যে মুখ ডুবাইয়া সে অনেকক্ষণ ঘ্রাণ লয়।

সেদিন তাহার দিদি চুপি চুপি বলে—চড়ুইভাতি কর্‌বি অপু?

তাহাদের দোর দিয়া পাড়ার সকলে কুলুই-চণ্ডীর ব্রতের বন-ভোজনে গ্রামের পিছনের মাঠে যায়, তাহার মাও যায়। কিন্তু তাহাকে লইয়া যায় না। সেখানে সব নিজের নিজের জিনিসপত্র। অত চাল-ডাল তাহাদের নাই। আর বন-ভোজনে গিয়া সকলে বাহির করে কত কি জিনিস, ভাল চাল, ডাল, ঘি, দুধ—তাহার মা বাহির করে শুধু মোটা চাল, মটরের-ডাল-বাটা, আর দুই একটি বেগুন। পাশে বসিয়া ভুবন মুখুয্যেদের সেজ ঠাক্‌রুণের ছেলেমেয়েরা নতুন আখের গুড়ের পাটালি দিয়া দুধ ও কলা মাখিয়া ভাত খায়, নিজের ছেলেমেয়েদের জন্য তাহার মায়ের মন কেমন করে।

তাহার অপুও ওই-রকম দুধ কলা দিয়া পাটালি মাখিয়া ভাত খাইতে ভালবাসে!····

শান্ত মাঠের ধারের বনে রাঙা সন্ধ্যা নামে, বাঁশবনের পথে ফিরিতে শুধু ছেলের মুখই মনে পড়ে।

নীলমণি রায়ের জঙ্গলাকীর্ণ ভিটার ওধারের খানিকটা বন দুর্গা নিজের হাতে দা দিয়া কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া ভাইকে বলিল—দাঁড়িয়ে দ্যাখ্ তেঁতুলতলায় মা আস্‌চে কিনা—আমি চাল বের ক'রে নিয়ে আসি শীগ্‌গির ক'রে—

একটা ভাল নারিকেলের মালায় দুই পলা তেল চুপি চুপি তেলের ভাঁড়টা হইতে বাহির করিয়া আনিল। অপহৃত মালামাল বাহিরে আনিয়া ভাইয়ের জিম্মা করিয়া বলিল—শীগগির নিয়ে যা, দৌড়ো অপু—সেইখানে রেখে আয়, দেখিস যেন গরু-টরুতে খেয়ে ফেলে না—

এমন সময় মাতোর মা তাহার ছোট ছেলেকে পিছনে লইয়া খিড়কীর দোর দিয়া উঠানে ঢুকিল। দুর্গা বলিল—এদিকে কোত্থেকে তম্‌রেজের বৌ?

মাতোর মায়ের বয়সও খুব বেশী না, দেখিতেও মন্দ ছিল না, কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর হইতেই কষ্টে পড়িয়া মলিন ও শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। বলিল—কুঠীর মাঠে গিয়েছিলাম কাঠ কুড়ুতি—বুঁইচের মালা নেবা?

দুর্গা তো বন বাগান খুঁজিয়া নিজেই কত বৈঁচিফল প্রায়ই তুলিয়া আনে, ঘাড় নাড়াইয়া বলিল—সে কিনিবে না।

মাতোর মা বলিল—নেও না দিদি ঠাক্‌রোণ, বেশ মিষ্টি বুঁইচে মধুখালির বিলির ধারে থেকে তুলেলাম—কোঁচড় হইতে একগাছা মালা বাহির করিয়া দেখাইয়া বলিল—দেখো কত বড় বড়! কাঠ নিয়ে বাজারে যেতি, বিক্রী কত্তি, পয়সা পেতি বড্ড বেলা হয়ে যাবে, মাতোরে ততক্ষণ এক পয়সার মুড়ি কিনে দেতাম। নেও, পয়সায় দু গাছ দেবানি—

দুর্গা রাজী হইল না, বলিল—অপু, ঘটিতে একগাল খানিক চা'লভাজা আছে, নিয়ে এসে মাতোর হাতে দে তো! উহারা খিড়কী দোর দিয়াই পুনরায় বাহির হইয়া গেলে দুজনে জিনিসপত্র লইয়া চলিল।

চারিদিক বনে ঘেরা। বাহির হইতে দেখা যায় না। খেলাঘরের মাটির ছোবার মত ছোট্ট একটি হাঁড়িতে দুর্গা ভাত চড়াইয়া দিয়া বলিল—এই দ্যাখ অপু, কত বড় বড় মেটে আলুর ফল নিয়ে এসিচি এক জায়গা থেকে। পুঁটিদের তালতলায় একটা ঝোপের মাথায় অনেক হয়ে আছে, ভাতে দোবো····

অপু মহা উৎসাহে শুক্‌না লতা-কাটি কুড়াইয়া আনে। এই তাহাদের প্রথম বন-ভোজন। অপুর এখনও বিশ্বাস হইতেছিল না যেন, এখানে সত্যিকারের ভাত-তরকারী রান্না হইবে, না খেলাঘরের বন-ভোজন, যা কতবার হইয়াছে, সে রকম হইবে,—ধূলার ভাত, খাপরার আলুভাজা, কাঁঠাল পাতার লুচি?

কিন্তু বড় সুন্দর বেলাটি!—বড় সুন্দর স্থান বন-ভোজনের! চারিধারে বনঝোপ, ওদিকে তেলাকুচা লতার দুলুনি, বেলগাছের তলে জঙ্গলে শেওড়া গাছে ফুলের ঝাড়, আধপোড়া কটা দূর্বাঘাসের উপর খঞ্জন পাখীরা নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে, নির্জন ঝোপ-ঝাপের আড়ালে নিভৃত নিরালা স্থানটি। প্রথম বসন্তের দিনে ঝোপে ঝোপে নতুন কচি পাতা, ঘেঁটুফুলের ঝাড় পোড়ো ভিটাটা আলো করিয়া ফুটিয়া আছে, বাতাবি লেবু গাছটায় কয়দিনের কুয়াসায় ফুল অনেক ঝরিয়া গেলেও থোপা থোপা সাদা সাদা ফুল উপরের ডালে চোখে পড়ে।

দুর্গা আজকাল যেন এই গাছপালা, পথঘাট এই অতি পরিচিত গ্রামের প্রতি অন্ধিসন্ধিকে অত্যন্ত বেশী করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতেছে। আসন্ন বিরহের কোন্ বিষাদে এই কত প্রিয় গাবতলার পথটি, ওই তাহাদের বাড়ীর পিছনের বাঁশবন, ছায়াভরা নদীর ঘাটটি আচ্ছন্ন থাকে। তাহার অপু—তাহার সোনার খোকা ভাইটি, যাহাকে এক বেলা না দেখিয়া সে থাকিতে পারে না, মন হু হু করে—তাহাকে ফেলিয়া সে কতদূর যাইবে!

আর যদি সে না ফেরে—যদি নিতম পিসির মত হয়?

এই ভিটাতেই নিতম পিসি ছিল, বিবাহ হইয়া কতদিন আগে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, আর বাপের ভিটাতে ফিরিয়া আসে নাই। অনেককাল আগের কথা—ছেলেবেলা হইতে গল্প শুনিয়া আসিতেছে। সকলে বলে বিবাহ হইয়াছিল মুর্শিদাবাদ জেলায়,—সে কতদূরে? কোথায়? কেহ আর তাহার খোঁজখবর করে না; আছে কি নাই, কেহ জানে না। বাপকে নিতম পিসি আর দেখে নাই, মাকে আর দেখে নাই, ভাই-বোনকেও না। সব একে একে মরিয়া গিয়াছে। মাগো, মানুষ কেমন করিয়া এমন নিষ্ঠুর হয়! কেন তাহার খোঁজ কেহ যে আর করে নাই! কতদিন সে নির্জনে এই নিতম পিসির কথা ভাবিয়া চোখের জল ফেলিয়াছে! আজ যদি হঠাৎ সে ফিরিয়া আসে—এই ঘোর জঙ্গল-ভরা জনশূন্য বাপের ভিটা দেখিয়া কি ভাবিবে?

তাহারও যদি ঐ রকম হয়? ঐ তাহার বাবাকে, মাকে, অপুকে ছাড়িয়া—আর কখনো দেখা হইবে না—কখনো না—কখনো না—এই তাহাদের বাড়ী, গাবতলা, ঘাটের পথ?

ভাবিলে গা শিহরিয়া ওঠে, দরকার নাই। কি জানি কেন আজকাল তাহার মনে হয় একটা কিছু তাহার জীবনে শীঘ্র ঘটিবে। একটা এমন কিছু জীবনে শীঘ্রই আসিতেছে যাহা আর কখনো আসে না। দিন-রাতে খেলা-ধূলার, কাজ-কর্মের ফাঁকে ফাঁকে এ কথা তাহার প্রায়ই মনে হয়···ঠিক সে বুঝিতে পারে না তাহা কি, বা কেমন করিয়া সেটার আসিবার কথা মনে উঠে, তবুও মনে হয়, কেবলই মনে হয়, তাহা আসিতেছে··· আসিতেছে···শীঘ্রই আসিতেছে···

চড়ুই-ভাতির মাঝামাঝি অপুদের বাড়ীর উঠানে কাহার ডাক শোনা গেল। দুর্গা বলিল—বিনির গলা যেন—নিয়ে আয় তো ডেকে অপু। একটু পরে অপুর পিছনে পিছনে দুর্গার সমবয়সী একটি কালো মেয়ে আসিল—একটু হাসিয়া যেন কতকটা সম্ভ্রমের সুরে বলিল—কি হচ্চে দুর্গা দিদি?

দুর্গা বলিল—আয় না বিনি, চড়ুই-ভাতি কচ্চি—বোস্—

মেয়েটি ওপাড়ার কালীনাথ চক্কত্তির মেয়ে—পরনে আধময়লা শাড়ী, হাতে সরু সরু কাঁচের চুড়ি, একটু লম্বা গড়ন, মুখ নিতান্ত সাদাসিধা। তাহার বাপ যুগীর বামুন বলিয়া সামাজিক ব্যাপারে পাড়ায় তাহাদের নিমন্ত্রণ হয় না, গ্রামের একপাশে নিতান্ত সঙ্কুচিত ভাবে বাস করে। অবস্থাও ভাল নয়। বিনি দুর্গার ফরমাইজ খাটিতে লাগিল খুব। বেড়াইতে আসিয়া হঠাৎ সে যেন একটা লাভজনক ব্যাপারের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, এখন ইহারা তাহাকে সে উৎসবের অংশীদার স্বীকার করিবে কি না করিবে—এরূপ একটা দ্বিধামিশ্রিত উল্লাসের ভাব তাহার কথাবার্তায় ভাবভঙ্গিতে প্রকাশ পাইতেছিল। দুর্গা বলিল—বিনি, আর দুটো শুক্‌নো কাঠ দ্যাখ্ তো—আগুনটা জ্বলচে না ভাল—

বিনি তখনি কাঠ আনিতে ছুটিল এবং একটু পরে একবোঝা শুক্‌নো বেলের ডাল আনিয়া হাজির করিয়া বলিল—এতে হবে দুগ্‌গা দিদি—না আর আন্‌বো?···দুর্গা যখন বলিল—বিনি এসেচে—ও-ও তো এখানে খাবে—আর দুটো চাল নিয়ে আয় অপু—বিনির মুখখানা খুশিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। খানিকটা পরে বিনি জল আনিয়া দিল। আগ্রহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল—কি কি তরকারী দুগ্‌গা দিদি?

ভাত নামাইয়া দুর্গা তেলটুকু দিয়া বেগুন তাহাতে ফেলিয়া দিয়া ভাজে। খানিকটা পরে সে অবাক হইয়া ছোবার দিকে চাহিয়া থাকে, অপুকে ডাকিয়া বলে—ঠিক একেবারে সত্যিকারের বেগুন ভাজার মত রং হচ্চে দেখচিস অপু! ঠিক যেন মা'র রান্না বেগুন-ভাজা না?

অপুরও ব্যাপারটা আশ্চর্য বোধ হয়। তাহারও এতক্ষণ যেন বিশ্বাস হইতেছিল না যে, তাহাদের বন-ভোজনে সত্যিকার ভাত, সত্যিকার বেগুন-ভাজা সম্ভবপর হইবে! তাহার পর তিনজনে মহা আনন্দে কলার পাতে খাইতে বসে, শুধু ভাত আর বেগুন-ভাজা আর কিছু না। অপু গ্রাস মুখে তুলিবার সময় দুর্গা সেদিকে চাহিয়া ছিল, আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে,—কেমন হয়েচে রে বেগুন ভাজা?

অপু বলে,—বেশ হয়েচে দিদি, কিন্তু নুন হয় নি যেন—

লবণকে রন্ধনের উপকরণের তালিকা হইতে ইহারা অদ্য একেবারেই বাদ দিয়াছে, লবণের বালাই রাখে নাই। কিন্তু মহাখুশিতে তিনজনে কোষো মেটে আলুর ফল ভাতে ও পান্‌সে আধপোড়া বেগুন-ভাজা দিয়া চড়ুইভাতির ভাত খাইতে বসিল। দুর্গার এই প্রথম রান্না, সে বিস্ময়মিশানো আনন্দের সঙ্গে নিজের হাতের শিল্প-সৃষ্টি উপভোগ করিতেছিল! এই বন-ঝোপের মধ্যে, এই শুকনো আতাপাতার রাশের মধ্যে, খেজুর তলায় ঝরিয়া-পড়া খেজুর পাতার পাশে বসিয়া সত্যিকারের ভাত তরকারী খাওয়া।

খাইতে খাইতে দুর্গা অপুর দিকে চাহিয়া হি হি করিয়া খুশির হাসি হাসিল। খুশিতে ভাতের দলা তাহার গলার মধ্যে আটকাইয়া যাইতেছিল যেন। বিনি খাইতে খাইতে ভয়ে ভয়ে বলিল—একটু তেল আছে দুগ্‌গাদি? মেটে আলুর ফল ভাতে মেখে নিতাম।

দুর্গা বলিল—অপু, ছুটে নিয়ে আয় একটু তেল—

যে জীবন কত শত পুলকের ভাণ্ডার, কত আনন্দ-মুহূর্তের আলো-জ্যোৎস্নার অবদানে মণ্ডিত, ইহাদের সে মাধুরীময় জীবনযাত্রার সবে তো আরম্ভ। অনন্ত যে জীবন পথ দূর হইতে বহুদূরে দৃষ্টির কোন্ ওপারে বিসর্পিত, সে পথের ইহারা নিতান্ত ক্ষুদ্র পথিকদল, পথের বাঁকে ফুলেফলে দুঃখেসুখে, ইহাদের অভ্যর্থনা একেবারে নূতন।

আনন্দ! আনন্দ! প্রসারের আনন্দ, জীবনের মাঝে মাঝে যে আড়াল আছে, বিশাল তুষারমৌলি গিরিসঙ্কটের ওদিকের যে পথটা দেখিতেছে না, তাহার আনন্দ! আজকের আনন্দ! সামান্য, সামান্য, ছোটখাটো তুচ্ছ জিনিসের আনন্দ!

অপু বলিল—মাকে কি বল্‌বি দিদি? আবার ওবেলা ভাত খাবি?

—দূর মাকে কখনো বলি! সন্দের পর দেখিস্ খিদে পাবে এখন—

যুগীর বামুন বলিয়া পাড়ায় জল খাইতে চাহিলে লোকে ঘটিতে করিয়া জল খাইতে দেয়; তাহাও আবার মাজিয়া দিতে হয়। বিনি দু-একবার ইতস্তত করিয়া অপুর গ্লাসটা দেখাইয়া বলিল—আমার গালে একটু জল ঢেলে দেও তো, অপু? জল তেষ্টা পেয়েছে!

অপু বলিল—নাও না বিনিদি, তুমি নিয়ে চুমুক দিয়ে খাও না!

তবু যেন বিনির সাহস হয় না। দুর্গা বলিল—নে না বিনি, গেলাসটা নিয়ে খা না?

খাওয়া-দাওয়া হইয়া গেলে দুর্গা বলিল—হাঁড়িটা ফেলা হবে না কিন্তু, আবার আর একদিন বনভোজন কর্‌বো—কেমন তো, ওই কুলগাছটার ওপরে টাঙিয়ে রেখে দেবো।

অপু বলিল—হ্যাঁ, ওখানে থাকবে কিনা? মাতোর মা কাঠ কুড়োতে আসে, দেখতে পেলে নিয়ে যাবে দিদি—ভারি চোর—

একটা ভাঙা পাঁচিলের ঘুলঘুলির মধ্যে ছোবাটা দুর্গা রাখিয়া দিল।

অপুর বুক টিপ্ টিপ্ করিতেছিল। ঐ ঘুলঘুলিটার ওপিঠে আর একটা ছোট ঘুলঘুলি আছে, তাহার মধ্যে অপু লুকাইয়া চুরুটের বাক্স রাখিয়া দিয়াছে, দিদি সেদিকে যদি যাইয়া পড়ে।

নেড়াদের বাড়ীতে কিছুদিন আগে নেড়ার ভগ্নীপতি ও তাঁহার এক বন্ধু আসিয়াছিল। কলিকাতার কাছে কোথায় বাড়ী। খুব বাবু, খুব চুরুট খায়। এই একবার খাইল, আবার এই খাইতেছে। অপুর মনে মনে অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছিল সেও একবার চুরুট খাইয়া দেখিবে, কেমন লাগে। সে নেড়ার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া গ্রামের হরিশ যুগীর দোকান হইতে তিন পয়সায় রাঙা কাগজ মোড়া দশটি চুরুট কিনিয়া আনে। সেদিন এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে একা বসিয়া চুপি চুপি একটা চুরুট ধরাইয়া খাইয়াছিল—ভাল লাগে নাই, তেতো তেতো কেমন একটা ঝাঁঝ—দুটান খাইয়া সে আর খাইতে পারে নাই, কিন্তু তাহার ভাগের বাকী চারটি চুরুট সে ফেলিয়াও দিতে পারে নাই, নেড়ার ভগ্নীপতির নিকট সংগৃহীত একটা খালি চুরুটের বাক্সে সে-কয়টি সে ওই পোড়োভিটের জঙ্গলে ভাঙা পাঁচিলের ঘুলঘুলিতে লুকাইয়া রাখিয়া দিয়াছে। প্রথম চুরুট খাইবার দিন চুরুট টানা শেষ হইয়া গেলে ভয়ে তাহার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিতেছিল, পাছে মুখের গন্ধে মা টের পায়। পাকা কুল অনেক করিয়া খাইয়া নিজের মুখের হাই হাত পাতিয়া ধরিয়া অনেকবার পরীক্ষা করিয়া তবে সে সেদিন পুনর্বার মনুষ্যসমাজে প্রবেশ করিয়াছিল। যায় বুঝি আজ বামালসুদ্ধ ধরা পড়িয়া!

কিন্তু দিদির পাঁচিলের ওপিঠে যাইবার দরকার হয় না। এপিঠেই কাজ সারা হইয়া যায়।

পথের পাঁচালী

একবিংশ পরিচ্ছেদ

কথাটা সর্বজয়া ঘাটে গিয়া পাড়ার মেয়েদের মুখে শুনিল।

আজ কয়েকদিন হইতে নীরেনের সঙ্গে অন্নদা রায়ের, বিশেষ করিয়া তাঁহার ছেলে গোকুলের মনান্তর চলিতেছিল। কাল দুপুর বেলা নাকি খুব ঝগড়া ও চেঁচামেচি বাধে। ফলে কাল রাত্রেই নীরেন জিনিসপত্র লইয়া এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে। অন্নদা রায়ের প্রতিবেশী যজ্ঞেশ্বর দীঘ্‌ড়ীর স্ত্রী হরিমতি বলিতেছিলেন—সত্যি মিথ্যে জানিনে, ক'দিন থেকে তো নানারকম কথা শুনতে পাচ্ছি—আমি বাপু বিশ্বেস্ করিনে, বৌটে তেমন নয়। আবার নাকি শুন্‌লাম নীরেন লুকিয়ে টাকা দিয়েছে, বৌ নাকি টাকা কোথায় পাঠিয়েছিল, নীরেনের হাতের লেখা রসিদ ফিরে এসে গোকুলের হাতে পড়েচে এই সব।—যাক্ বাপু, সে সব পরের কুচ্ছ শুনে কি হবে? নীরেন শুন্‌লাম বল্‌চে—আপনারা সকলে মিলে একজনের ওপর অত্যাচার কর্তে পারেন তাতে দোষ হয় না?—আপনারা যা ভাবেন ভাবুন, বৌ-ঠাক্‌রুণ একবার হুকুম করুন আমি ওঁকে এই দণ্ডে আমার হারানো মায়ের মত মাথায় ক'রে নিয়ে যাবো—তারপর আপনারা যা করবার করবেন। তারপর খুব হৈ চৈ খানিকক্ষণ হোল—সন্দের আগেই সে গয়লাপাড়া থেকে একখানা গাড়ী ডেকে আন্‌লে, জিনিসপত্তর নিয়ে চ'লে গেল।

সর্বজয়া কথাটা শুনিয়া বড় দমিয়া গেল। ইতিমধ্যে স্বামীকে দিয়া অন্নদা রায়কে নীরেনের পিতার নিকট এ বিবাহ সম্বন্ধে পত্র লিখিতে অনুরোধ করিয়াছে। নীরেনকে আরও দুইবার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ

করিয়াছিল—'ছেলেটিকে তাহার অত্যন্ত পছন্দ হইয়াছে। হরিহর তাহাকে অনেকবার বুঝাইয়াছে নীরেনের পিতা বড়লোক—তাহাদের ঘরে তিনি কি আর পুত্রের বিবাহ দিবেন? সর্বজয়া কিন্তু আশা ছাড়ে নাই, তাহার মনের মধ্যে কোথায় যেন সাহস পাইয়াছে—এ বিবাহের যোগাযোগ যেন দুরাশা নয়, ইহা ঘটিবে। হরিহর মনে মনে বিশ্বাস না করিলেও স্ত্রীর অনুরোধে অন্নদা রায়াকে কয়েকবার তাগিদ দিয়াছিল বটে। কিন্তু এখন যে বড় বিপদ ঘটিল!

ইতিমধ্যে একদিন পথে দুর্গার সঙ্গে গোকুলের বউয়ের দেখা হইল। সে চুপি চুপি দুর্গাকে অনেক কথা বলিল, নীরেন কেন চলিয়া গেল তাহারই ইতিহাস। বলিতে বলিতে তাহার চোখ ছাপাইয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

—এই রকম ঝাঁটালাথি খেয়েই দিন যাবে—কেউ নেই দুগ্‌গা—তাই কি, ভাইটা মানুষ? কোথাও যে দুদিন জুড়ুবো সে জায়গা নেই—

সহানুভূতিতে দুর্গার বুক ভরিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে খুড়ীমার কলঙ্কের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও তাহার দুঃখে সান্ত্বনাসূচক নানা কথা অস্পষ্টভাবে তাহার মনের মধ্যে জোট পাকাইয়া উঠিল। সব কথা গুছাইয়া বলিতে না পারিয়া শুধু বলিল, ওই সখী ঠাকুরমা যা লোক! বলুক গে না, সে করবে কি? কেঁদো না খুড়ীমা লক্ষ্মীটি, আমি রোজ যাবো তোমার কাছে—

সর্বজয়া শুনিয়া আগ্রহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল—বৌমা কি বল্লে-টল্লে দুর্গা?.... তা নীরেনের কথা কিছু হোল নাকি?

দুর্গা লজ্জিত সুরে বলিল—তুমি কাল জিগ্যেস্ কোরো না ঘাটে? আমি জানি নে—

অপু একবার জিজ্ঞাসা করিল,—খুড়ীমার কাছে কি শুন্‌লি, মাষ্টার মশায় আর আসবেন না?

দুর্গা ধমক দিয়া কহিল—তা আমি কি জানি—যাঃ—

পড়ন্ত রোদে ছায়াভরা পথটি কেমন যেন মন-কেমন-করা-করা। সে তাহার ভাইএর জন্য। এ-রকম তাহার হয়, কতবার হইয়াছে, বেশীক্ষণ ধরিয়া যদি সে বাড়ী না থাকে, কি ভাইকে না দেখে, ভাইয়ের রাশি রাশি কাল্পনিক দুঃখের কথা মনে হইয়া মনের মধ্যে কেমন করে।

তাহার অমন দুধে-আল্‌তা রংএর সোনার পুতুলের মত ভাইটা ময়লা আধছেঁড়া মত একখানা কাপড় পরিয়া বাড়ীর দরজার সাম্‌নে আপনমনে একা একা কড়ি চালিয়া বেগুন-বীচি খেলিতেছে। তাহার কাছে পয়সা চায় এটা-ওটা কিনিতে, সে দিতে পারে না—ভারী কষ্ট হয় মনে—

দিন কয়েক পরে। ভুবন মুখুয্যের বাড়ী রাণুর দিদির বিবাহ শেষ হইয়া গিয়াছে বটে কিন্তু এখনও কুটুম্ব-কুটুম্বিনীরা সকলে যান নাই। ছেলেমেয়েও অনেক। একটি ছোট্ট মেয়ের সঙ্গে দুর্গার বেশ আলাপ হইয়াছে, তাহার নাম টুনি। তাহার বাপও আসিয়াছিলেন। আজ দুপুরের পর স্ত্রী ও কন্যাকে কিছুদিনের জন্য এখানে রাখিয়া কর্মস্থানে গিয়াছেন। ঘন্টা খানেক পরে, সেজ ঠাকরুণ এ ঘরে কি কাজ করিতেছিলেন, টুনির মায়ের গলা তাঁহার কানে গেল। সেজ ঠাকরুণ দালানে আসিয়া বলিলেন—কি রে হাসি, কি? টুনির মা উত্তেজিতভাবে ও ব্যস্তভাবে বিছানাপত্র, বালিসের তলা হাত্‌ড়াইতেছে, উঁকি মারিতেছে, তোষক উল্টাইয়া ফেলিয়াছে; বলিল—এই একটু আগে আমার সেই সোনার সিঁদুরের কৌটোটা এই বিছানার পাশে এইখান্‌টায় রেখেছি, খোকা দোলায় চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, উনি বাড়ী থেকে এলেন—আর তুলতে মনে নাই—কোথায় গেল আর তো পাচ্ছি নে?—

সেজ ঠাকরুণ বলিলেন—ওমা সে কি? হাতে করে নিয়ে যাস্‌নি তো?

—না দিদিমা, এইখানে রেখে গেলুম। বেশ মনে আছে, ঠিক এইখানে—

সকলে মিলিয়া খানিকক্ষণ চারিদিকে খোঁজাখুঁজি করা হইল, কৌটার সন্ধান নাই। সেজ ঠাক্‌রুণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, দালানে প্রথমটা এ বাড়ীর ছেলেমেয়ে ছিল, তারপর খাওয়ার ডাক পড়িলে ছেলেমেয়েরা সব খাবার খাইতে যায়, তখন বাহিরের লোকের মধ্যে ছিল দুর্গা। সেজ ঠাক্‌রুণের ছোট মেয়ে টেঁপি চুপি চুপি বলিল—আমরা যেই খাবার খেতে গেলাম দুগ্‌গাদি তখন দেখি যে খিড়কীর দোর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্চে, এই মাত্তর আবার এসেচে—

সেজ ঠাক্‌রুণ চুপি চুপি কি পরামর্শ করিলেন, পরে রুক্ষসুরে দুর্গাকে বলিলেন—কৌটো দিয়ে দে দুগ্‌গা, কোথায় রেখেচিস বল্‌—বার কর্‌ এখ্‌খুনি বল্‌চি—

দুর্গার মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছিল, সেজ ঠাক্‌রুণের ভাবভঙ্গিতে তাহার জিব যেন মুখের মধ্যে জড়াইয়া গেল। অস্পষ্টভাবে কি বলিল ভাল বোঝা গেল না।

টুনির মা এতক্ষণ কোনো কথা বলে নাই—একজন ভদ্রঘরের মেয়েকে সকলে মিলিয়া চোর বলিয়া ধরাতে একটু অবাক্‌ হইয়া গিয়াছিল, বিশেষতঃ দুর্গাকে সে কয়েকদিন এখানে দেখিতেছে, দেখিতে বেশ চেহারা বলিয়া দুর্গাকে পছন্দ করে—সে চুরি করিবে ইহা কি সম্ভব? সে বলিল—ও নেয় নি বোধ হয় সেজদি—ও কেন—

সেজ ঠাক্‌রুণ বলিলেন—তুমি চুপ করে থাকো না! তুমি ওর কি জানো, নিয়েচে কি না নিয়েচে আমি জানি ভাল ক'রে—

একজন বলিলেন—তা নিয়ে থাকিস বের ক'রে দে, নয়তো কোথায় আছে বল্‌—আপদ চুকে গেল। দিয়ে দে লক্ষ্মীটি, কেন মিথ্যে—

দুর্গা যেন কেমন হইয়া গিয়াছিল—তাহার পা ঠক্‌ ঠক্‌ করিয়া কাঁপিতেছিল—সে দেওয়ালে ঠেস্‌ দিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আমি তো জানিনে কাকীমা—আমি তো—

সেজ ঠাক্‌রুণ বলিলেন—বল্লেই আমি শুনবো? ঠিক ও নিয়েচে—ওর ভাব দেখে আমি বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, ভাল কথায় বলচি কোথায় রেখেচিস দিয়ে দে, জিনিস দিয়ে দাও তো কিছু বোল্‌বো না—আমার জিনিস পেলেই হোল—

পূর্বোক্ত কুটুম্বিনী বলিলেন—ভদ্দর লোকের মেয়ে চুরি করে কোথাও শুনিনি তো কখনো। এই পাড়াতেই বাড়ী নাকি?

সেজ ঠাক্‌রুণ বলিলেন—তুমি ভাল কথার কেউ নও! দেখবে তুমি মজাটা একবার, তুমি আমার বাড়ীর জিনিস নিয়ে হজম কর্তে গিয়েচো—এ কি যা তা পেয়েচ বুঝি?—তোমায় আমি আজ—

পরে তিনি দুর্গার হাতখানা ধরিয়া হিড়্‌হিড়্‌ করিয়া টানিয়া তাহাকে দালানের ঠিক মাঝখানে আনিয়া বলিলেন, দুর্গা, বল্‌ এখনও কোথায় রেখেচিস্‌?....বল্‌বি নে?.... না, তুমি জানো না, তুমি খুকী—তুমি কিছু জানো না— শীগ্‌গিরি বল্‌, নৈলে দাঁতের পাটি একেবারে সব ভেঙে গুঁড়ো ক'রে ফেলবো এখুনি! বল্‌ শীগ্‌গির —বল্‌ এখনো বল্‌চি—

টুনির মা হাত ধরিতে আগাইয়া আসিতেছিল, একজন কুটুম্বিনী বলিলেন, রোসো না, দেখ্‌চো না ওই ঠিক নিয়েচে। চোরের মারই ওষুধ—দিয়ে দাও এখুনি মিটে গেল, —কেন মিথ্যে—

দুর্গার মাথার মধ্যে কেমন করিতেছিল। সে অসহায়ভাবে চারিদিকে চাহিয়া অতি কষ্টে শুক্‌নো জিবে জড়াইয়া উচ্চারণ করিল—আমি তো জানিনে কাকীমা, ওরা সব চ'লে গেল আমিও তো—কথা বলিবার সময় সে ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া সেজ ঠাক্‌রুণের দিকে চোখ রাখিয়া দেওয়ালের দিকে ঘেঁষিয়া যাইতে লাগিল।

পরে সকলে মিলিয়া আরও খানিকক্ষণ তাহাকে বুঝাইল। তাহার সেই এক কথা—সে জানে না।

কে একজন বলিল—পাকা চোর—

টেঁপি বলিল—বাগানের আমগুলো তলায় পড়বার জো নেই কাকীমা—

শেষোক্ত কথাতেই বোধ হয় সেজ ঠাক্‌রুণের কোন ব্যথায় ঘা লাগিল। তিনি হঠাৎ বাজখাঁই রকমের আওয়াজ ছাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন—তবে রে পাজি, নচ্ছার চোরের ঝাড়, তুমি জিনিস দেবে না? দেখি তুমি দেও কি না দেও! কথা শেষ না করিয়াই তিনি দুর্গার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহার মাথাটা লইয়া সজোরে দেওয়ালে ঠুকিতে লাগিলেন। বল্‌ কোথায় রেখেচিস্‌—বল্‌ এখুনি—বল্‌ শীগ্‌গির—বল্‌—

টুনির মা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া সেজ ঠাক্‌রুণের হাত ধরিয়া বলিল, করেন কি—করেন কি সেজদি—থাক্‌গে আমার কৌটো—ওরকম ক'রে মারেন কেন?—ছেড়ে দিন—থাক্‌, হয়েছে, ছাড়ুন, ছিঃ! টুনি মার দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল। পূর্বোক্ত কুটুম্বিনী বলিলেন—এঃ, রক্ত পড়ছে যে....

দুর্গার নাক দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া রক্ত পড়িতেছে কেহ লক্ষ্য করে নাই। বুকের কাপড়ের খানিকটা রক্তরাঙা হইয়া উঠিয়াছে।

টুনির মা বলিলেন,—শীগ্‌গির একটু জল নিয়ে আয় টেঁপি— রোয়াকের বাল্‌তিতে আছে দ্যাখ্—

চেঁচামিচে ও হৈ চৈ শুনিয়া পাশের বাড়ীর কামারদের ঝি-বৌরা ব্যাপার কি দেখিতে আসিল। রাণুর মা এতক্ষণ ছিলেন না—দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে কামার-বাড়ী বসিয়া গল্প করিতেছিলেন—তিনিও আসিলেন।

মারের চোটে দুর্গার মাথার মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল, সে দিশাহারা ভাবে ভিড়ের মধ্যে একবার চাহিয়া কি দেখিল।

জল আসিলে রাণুর মা তাহার চোখে মুখে জল দিয়া তাহাকে ধরিয়া বসাইলেন। তাহার মাথার মধ্যে কেমন ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল, সে দিশাহারা ভাবে বসিয়া পড়িল। রাণুর মা বলিলেন—অমন ক'রে কি মারে সেজদি?....রোগা মেয়েটা—ছিঃ—

— তোমরা ওকে চেনো নি এখনো। চোরের মার ছাড়া ওষুধ নেই এই ব'লে দিলুম—মারের এখনো হয়েছে কি— না পাওয়া গেলে ছাড়্‌বো নাকি? হরি রায় আমায় যেন শূলে ফাঁসে দেয় এরপর—

রাণুর মা বলিলেন—হয়েচে, এখন একটু সাম্‌লাতে দেও সেজ্‌দি—যে কান্ড করেচো—

টুনির মা বলিল—ওমা, এত হবে জানলে কে কৌটোর কথা বলতো?....চাইনে আমার কৌটো—ওকে ছেড়ে দাও সেজ্‌দি—

সেজ ঠাক্‌রুণ এত সহজে ছাড়িতেন কিনা বলা যায় না, কিন্তু জনমত তাঁহার বিরুদ্ধে রায় দিতে লাগিল।....কাজেই তিনি আসামীকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

রাণুর মা তাহাকে ধরিয়া ওদিকের দরজা খুলিয়া খিড়কীর উঠানে বাহির করিয়া দিলেন। বলিলেন—খুব ক্ষেণে আজ বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলি যা হোক! যা, আস্তে আস্তে যা—টেঁপি খিড়কীটা ভাল ক'রে খুলে দে—

দুর্গা দিশাহারা ভাবে খিড়কী দিয়া বাহির হইয়া গেল, মেয়েছেলে ও যাহারা উপস্থিত ছিল—সকলে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

একজন বলিল—তবুও তো স্বীকার কল্লে না—কি রকম দেখচো একবার? ....চোখ দিয়ে কিন্তু এক ফোঁটা জল পড়লো না—

রাণুর মা বলিলেন—জল পড়বে কি, ভয়েই শুকিয়ে গিয়েচে। চোখে কি আর জল আছে? ওইরকম ক'রে মারে সেজদি!

পথের পাঁচালী

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

গ্রামে বারোয়ারী চড়কপূজার সময় আসিল। গ্রামের বৈদ্যনাথ মজুমদার চাঁদার খাতা হাতে বাড়ী বাড়ী চাঁদা আদায় করিতে আসিলেন। হরিহর বলিল, না খুড়ো, এবার আমার এক টাকা চাঁদা ধরাটা অনেয্য হয়েছে—এক টাকা দেবার কি আমার অবস্থা? বৈদ্যনাথ বলিলেন—না হে না, এবার নীলমণি হাজরার দল। এ রকম দলটি এ অঞ্চলে কেউ চক্ষেও দেখেনি। এবার পালপাড়ার বাজারে মহেশ সেক্‌রার বালক-কেত্তনের দল গাইবে, তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া চাই-ই—

বৈদ্যনাথ এমন ভাব দেখাইলেন যেন নিশ্চিন্দিপুরবাসিগণের জীবন-মরণ এই প্রতিযোগিতার সাফল্যের উপর নির্ভর করিতেছে।

অপু একটা কঞ্চি টানিতে টানিতে বাড়ী ঢুকিয়া বলিল—পাকা কঞ্চি বাবা, তোমার খুব ভালো কলম হবে, ডোবার ধারের বাঁশতলায় পড়ে ছিল, কুড়িয়ে আন্‌লাম—পরে সে হাসিমুখে সেটা কতকটা উঁচু করিয়া তুলিয়া দেখাইয়া বলিল, হবে না বাবা তোমার কলম? কেমন পাকা, না?

চড়কের আর বেশী দেরি নাই। বাড়ী বাড়ী গাজনের সন্ন্যাসী নাচিতে বাহির হইয়াছে। দুর্গা ও অপু আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীদলের পিছনে পিছনে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইল। অন্য অন্য

গৃহস্থ বাড়ী হইতে পুরানো কাপড় দেয়, চা'ল পয়সা দেয়—কেউ বা ঘড়া দেয়—তাহারা কিছুই দিতে পারে না দুটো চা'ল ছাড়া—এজন্য তাহাদের বাড়ীতে এ দল কোনো বারই আসে না! দশ বারো দিন সন্ন্যাসী-নাচনের পর চড়কের পূর্বরাত্রে নীলপূজা আসিল।

নীলপূজার দিন বৈকালে একটা ছোট খেজুরগাছে সন্ন্যাসীরা কাঁটা ভাঙে—এবার দুর্গা আসিয়া খবর দিল প্রতি বৎসরের সে গাছটাতে এবার কাঁটা-ভাঙা হইবে না, নদীর ধারে আর একটা গাছ সন্ন্যাসীরা এবার পূর্ব হইতেই ঠিক করিয়াছে। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে দল বাঁধিয়া দুর্গা ও অপু সেখানে গিয়া জোটে। তারপর কাঁটা-ভাঙার নাচ হইয়া গেলে সকলে চড়কতলাটাতে একবার বেড়াইতে যায়। খেজুরের ডাল দিয়া নীলপূজার মন্ডপ ঘিরিয়াছে—চড়কতলার মাঠের শেওড়াবন ও অন্যান্য জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে। সেখানে ভুবন মুখুয্যেদের বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে দেখা হইল—রাণী, পুঁটি, টুনু—এদের বাড়ীতে কড়া শাসন আছে, দুর্গার মত টো টো করিয়া যেখানে সেখানে বেড়াইবার হুকুম নাই—অতি কষ্টে বলিয়া কহিয়া ইহারা চড়কতলা পর্যন্ত আসিয়াছে।

টুনু বলিল—আজ রাত্রে সন্নিসিরা শ্মশান জাগাতে যাবে—

রাণী বলিল—আহা, তা বুঝি আর জানিনে? একজন মড়া হবে। তাকে বেঁধে নিয়ে যাবে শ্মশানের সেই ছাতিমতলায়। তাকে আবার বাঁচাবে, তারপর মড়ার মুন্ড নিয়ে আসবে—ছড়া বল্‌তে বল্‌তে আসবে—ওর সব মন্তর আছে—

দুর্গা বলিল—আমি জানি ওদের ছড়া, শুন্‌বি বোল্‌বো?

স্বগ্‌গো থেকে এলো রথ
নাম্‌লো খেতুতলে
চব্বিশ কুটী বাণবর্ষা শিবের সঙ্গে চলে—
সত্যযুগের মড়া আর আওল যুগের মাটি
শিব শিব বল রে ভাই ঢাকে দ্যাও কাঠি—

পরে হাসিয়া বলে—কেমন চমৎকার এবার গোষ্টবিহারের পুতুল হয়েচে নীলুদা? ....দাশু কুমোরের বাড়ী দেখে এলাম— দেখিস্‌নি রাণু?

পুঁটি বলিল—সত্যিকার মড়ার মুন্ড রাণুদি?

—নয় তো কি? অনেক রাত্রে যদি আসিস্ তো দেখতে পাবি। চল্ ভাই আমরা বাড়ী যাই—আজ রাতটা ভালো নয়—আয়রে অপু, দুগ্‌গাদি আয়।

অপু বলিল—কেন ভালো নয় রাণুদি? কি আজ হবে রাতে?....

রাণী বলিল— সে সব কথা বল্‌তে নাই—তুই আয় বাড়ী। অপু গেল না, কিন্তু দুর্গা ওদের দলের সঙ্গে চলিয়া গেল। তারপর হঠাৎ মেঘ করিল, সন্ধ্যার মেঘে ঘনীভূত করিয়া তুলিল। অপু বাড়ী ফিরিতেছে, পথে জনপ্রাণী নাই, সন্ধ্যা হইতে শ্মশানের ও মড়ার মুন্ডের গল্প শুনিয়া তাহার কেমন ভয় ভয় করিতেছে। মোড়ের বাঁশবনের কাছে আসিয়া মনে হইল কিসের যেন কটুগন্ধ বাহির হইতেছে। সে দ্রুত পদে চলিতে লাগিল। আর একটুখানি গিয়া নেড়ার ঠাকুরমার সঙ্গে দেখা। নেড়ার ঠাকুরমা নীলপূজার নৈবেদ্য হাতে চড়কতলায় পূজা দিতে যাইতেছে। অপু অন্ধকারে প্রথমটা চিনিতে পারে নাই, পরে চিনিয়া বলিল—কিসের গন্ধ বেরিয়েছে ঠাকুরমা?

বুড়ী বলিল—আজ ওঁরা সব বেরিয়েচেন কিনা?....তারই গন্ধ আর কি—

অপু বলিল—কারা ঠাকুরমা?

—কারা আবার—শিবের দলবল, সন্দেবেলা ওঁদের নাম করতে নাই—রাম রাম—রাম রাম—

অপুর গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। চারিধারে অন্ধকার সন্ধ্যা, আকাশে কালো মেঘ, বাঁশবন, শ্মশানের গন্ধ, শিবের অনুচর ভূতপ্রেত—ছোট ছেলের মন বিস্ময়ে, ভয়ে, রহস্যে, অজানার অনুভূতিতে ভরিয়া উঠিল। সে আতঙ্কের সুরে বলিল—আমি কি করে বাড়ী যাবো ঠাক্‌মা!....

বুড়ী বকিয়া উঠিল। —তা এত রাত করাই বা কেন বাপু আজকের দিনে?....এসো আমার সঙ্গে। নীল পূজার থালাখানা দিয়ে আসি, তারপর এগিয়ে দেবো'খন। ধন্যি যা হোক—

বারোয়ারী তলায় ঘাস চাঁচিয়া প্রকান্ড বাঁশের মেরাপ বাঁধিয়া সামিয়ানা টাঙানো হইয়াছে। যাত্রার দল আসে আসে—এখনও পৌঁছে নাই, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে, লোকে বলে কাল সকালের গাড়ীতে আসিবে, সকাল চলিয়া গেলে বৈকালের আশায় থাকে। অপুর স্নানাহার বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে।....রাত্রে অপুর ঘুম হয় না, বাঁধ ভাঙা বন্যার স্রোতের মত কৌতূহল ও খুশির যে কী প্রবল অদম্য উচ্ছ্বাস! বিছানায় ছট্‌ফট্ এপাশ-ওপাশ করে। যাত্রা হবে! যাত্রা হবে! যাত্রা হবে!

মায়ের বারণ আছে অত বড় মেয়ে পাড়া ছাড়িয়া কোথাও না যায়, দুর্গা চুপি চুপি গিয়া দেখিয়া আসিয়া রাজলক্ষ্মীর কাছে আসর-সজ্জা ও বাঁশের গায়ে ঝুলানো লাল নীল কাগজের অভিনবত্ব সম্বন্ধে গল্প করে, অপুর মনে হয়, যে পঞ্চাননতলায় সে দু'বেলা কড়িখেলা করে, সেই তুচ্ছ অত্যন্ত পরিচিত সামান্য স্থানটাতে আজ বা কাল নীলমণি হাজরার দলের যাত্রার মত একটা অভূতপূর্ব অবাস্তব ঘটনা ঘটিবে, এও কি সম্ভব? কথাটা যেন তাহার বিশ্বাসই হয় না।

হঠাৎ শুনিতে পাওয়া যায় আজ বিকালেই দল আসিবে। এক ঝলক রক্ত যেন বুক হইতে নাচিয়া চল্‌কাইয়া একেবারে মাথায় উঠিয়া পড়ে।....

কুমার-পাড়ার মোড়ে দুপুরের পর হইতেই সকল ছেলের সঙ্গে দাঁড়াইয়া থাকিবার পর দূরে একখানা গরুর গাড়ী তাহার চোখে পড়িল, সাজের বাক্স বোঝাই গাড়ী এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ খানা! পটু একে একে আঙুল দিয়া গুণিয়া খুশির সুরে বলিল—অপুদা, আমরা এদের পেছনে পেছনে এদের বাসায় গিয়ে দেখে আসি, যাবি? সাজের গাড়ীগুলার পিছনে দলের লোকেরা যাইতেছে, সকলের মাথায় টেরিকাটা, অনেকের জুতা হাতে। পটু একজন দাড়িওয়ালা লোককে দেখাইয়া কহিল—এ বোধ হয় রাজা সাজে, না অপুদা?

আকাশ-বাতাসের রং একেবারে বদ্‌লাইয়া গেল—অপু মহা উৎসাহে বাড়ী ফিরিয়া দেখে তাহার বাবা দাওয়ায় বসিয়া কি লিখিতেছে ও গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতেছে। সে ভাবে, যাত্রা আসিবার কথা তাহার বাবাও জানিতে পারিয়াছে, তাই এত স্ফূর্তি। উৎসাহে হাত নাড়িয়া বলে—সাজ একেবারে পাঁচ গাড়ী বাবা! এ রকম দল!—

হরিহর শিষ্যবাড়ী বিলি করার জন্য কাগজে কবচ লিখিতেছিল, মুখ তুলিয়া বিস্ময়ের সুরে বলে—কিসের সাজ রে খোকা? অপু আশ্চর্য হইয়া যায়, এত বড় ঘটনা বাবার জানা নাই! বাবাকে সে নিতান্ত কৃপার পাত্র বিবেচনা করে।

সকালে উঠিয়া অপুকে পড়িতে বসিতে হয়। খানিক পরে সে কাঁদো কাঁদো ভাবে বলে—আমি বারোয়ারীতলায় যাবো বাবা, সকলে যাচ্চে আর আমি এখন বুঝি ব'সে ব'সে পড়বো? এখ্‌খুনি যদি যাত্রা আরম্ভ হয়?

তাহার বাবা বলে—পড়ো, পড়ো, এখন ব'সে পড়ো, যাত্রা আরম্ভ হ'লে ঢোল বাজবার শব্দ তো শুন্‌তে পাওয়া যাবে? তখন না হয় যেও এখন। প্রৌঢ় বয়সের ছেলে, নিজে সব সময়ে আজকাল বিদেশে থাকে, অল্পদিনের জন্য বাড়ী আসিয়া ছেলেকে চোখছাড়া করিতে মন চায় না। অভিমানে রাগে অপুর চোখ দিয়া জল পড়িতে থাকে, সে কান্নাভরা গলায় আবার শুভঙ্করী শুরু করে—মাস মাহিনা যার যত দিন তার পড়ে কত?

কিন্তু সকালে যাত্রা বসে না, খবর আসে ওবেলা বসিবে। ওবেলা অপু মায়ের কাছে যাইয়া কাঁদো কাঁদো ভাবে বাবার অত্যাচারের কাহিনী আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করে। সর্বজয়া আসিয়া বলে—দাও না গো ছেলেটাকে ছেড়ে? বছরকারের দিনটা—তোমার ন মাস বাড়ীতে থাকা নেই বছরে, আর ও একদিনের পড়াতে একেবারে তক্কালঙ্কার ঠাকুর হয়ে উঠবে কিনা?

অপু ছুটি পায়। সারা দুপুর তাহার বারোয়ারীতলায় কাটে। বৈকালে যাত্রা বসিবার পূর্বে বাড়ীতে খাবার খাইতে আসিল। বাবা রোয়াকে বসিয়া কবচ লিখিতেছে। অন্যদিন এ সময় তাহাকে তাহার বাবার কাছে বসিয়া বই পড়িতে হয়। পাছে ছেলে চটিয়া যায় এই ভয়ে তাহার বাবা তাহাকে খুশী রাখিবার জন্য নানারকম কৌতূকের আয়োজন করে। বলে খোকা চট ক'রে শিলেটে লিখে আনো দিকি, ঐঃ ভূত বাপ্ রে!....অপু সব অদ্ভুত ধরনের কথা শুনিয়া হাসিয়া খুন হয়, তাড়াতাড়ি লিখিয়া আনিয়া

দেখায়। বলে—বাবা এইটে হয়ে গেলে আমি কিন্তু চলে যাবো।....তাহার বাবা বলে—যেও এখন, যেও এখন, খোকা—আচ্ছা চট্ ক'রে লিখে আনো দিকি— আর একটা অদ্ভুত কথা বলে। অপু আবার হাসিয়া উঠে।

আজ কিন্তু অপুর মনে হইল, বাহির হইতে কি একটা প্রচন্ড শক্তি আসিয়া তাহাকে তাহার বাবার নিকট হইতে সরাইয়া লইয়া গিয়াছে। বাবা নির্জন ছায়াভরা বৈকালে বাঁশ বন ঘেরা বাড়ীতে একা বসিয়া বসিয়া লিখিতেছে, কিন্তু এমন শক্তি নাই যে, তাহাকে বসাইয়া রাখে। এখন যদি বলে—খোকা, এস পড়তে বসো—অমনি চারিদিক হইতে একটা যেন ভয়ানক প্রতিবাদের হট্টগোল উঠিবে। সকলে যেন বলিবে—না, না এ হয় না! এ হয় না! যাত্রা যে বসে বসে!....কোন উল্লাসের প্রবল শক্তি তাহার বাবাকে যেন নিতান্ত অসহায় নিরীহ দুর্বল করিয়া দিয়াছে। সাধ্য নাই যে, তাহার পড়িবার কথা পর্যন্ত মুখে উচ্চারণ করে। বাবার জন্য অপুর মন কেমন করে।

দুর্গা বলিল—অপু, তুই মাকে বল না আমিও দেখতে যাবো। অপু বলে—মা, দিদি কেন আসুক না আমার সঙ্গে? চিক্ দিয়ে ঘিরে দিয়েচে, সেইখেনে বসবে? মা বলে—এখন থাক; আমি ওই ওদের বাড়ীর মেয়েরা যাবে, তাদের সঙ্গে যাবো,—আমার সঙ্গে যাবে এখন।

বারোয়ারীতলায় যাইবার সময় দুর্গা পিছন হইতে তাহাকে ডাকিল—শোন অপু! পরে সে কাছে আসিয়া হাসি-হাসি মুখে বলিল—হাত পাত দিকি! অপু হাত পাতিতেই দুর্গা তাহার হাতে দুটা পয়সা রাখিয়াই তাহার হাতটা নিজের দু'হাতের মধ্যে লইয়া মুঠা পাকাইয়া দিয়া বলিল—দু পয়সায় মুড়কী কিনে খাস্, নয়তো যদি নিচু বিক্রি হয় তো কিনে খাস্। ইহার দিনসাতেক পূর্বে একদিন অপু আসিয়া চুপি চুপি দিদিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—তোর পুতুলের বাক্সে পয়সা আছে? একটা দিবি? দুর্গা বলিয়াছিল—কি হবে পয়সা তোর? অপু দিদির মুখের দিকে চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল—নিচু খাবো—কথা শেষ করিয়া সে পুনরায় লজ্জার হাসি হাসিল। কৈফিয়তের সুরে বলে— বোষ্টমদের বাগানে ওরা মাচা বেঁধেচে দিদি, অনেক নিচু পেড়েচে, দু-ঝুড়ি-ই-ই—এক পয়সায় ছটা, এই এত বড় বড়, একেবারে সিঁদুরের মত রাঙা, সতু কিন্‌লে, সাধন কিন্‌লে—পরে একটু থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আছে দিদি? দুর্গার পুতুলের বাক্সে সেদিন কিছুই ছিল না, সে কিছু দিতে পারে নাই। অপুকে বিরস-মুখে চলিয়া যাইতে দেখিয়া সেদিন তাহার খুব কষ্ট হইয়াছিল, তাই কাল বৈকালে সে বাবার কাছে পয়সা দুটা চড়ক দেখিবার নাম করিয়া চাহিয়া লয়। সোনার ভাঁটার মত ভাইটা, মুখের আবদার না রাখিতে পারিলে দুর্গার ভারী মন কেমন করে।

অপু চলিয়া গেলে তাহার মা ঘাট হইতে আসিয়া বলে—দুগ্‌গা একটা কাজ কর তো! রাণুদের বাগান থেকে দুটো সাদা গন্ধভেদালির পাতা খুঁজে নিয়ে আয় তো—অপুর শরীরটা অসুখ করেচে, একটু ঝোল করে দোব!—

মায়ের কথায় সে একছুটে রাণুদের বাগানে যায়—বাগানে মানুষ-সমান উঁচু ঘন আগাছার জঙ্গলের মধ্যে গন্ধভেদালির পাতা খুঁজিতে খুঁজিতে মনের সুখে মাথা দুলাইয়া পিসিমার মুখে ছেলেবেলায় শেখা একটি ছড়া আবৃত্তি করে—

হলুদ বনে বনে—
নাক-ছাবিটি হারিয়ে গেছে সুখ নেইকো মনে—

পথের পাঁচালী

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

যাত্রা আরম্ভ হয়। জগৎ নাই, কেহ নাই—শুধু অপু আছে, আর নীলমণি হাজরার যাত্রার দল আছে সামনে। সন্ধ্যার আগে বেহালায় ইমন্ আলাপ করে, ভাল বেহালাদার। পাড়াগাঁয়ের ছেলে, কখনও সে ভাল জিনিস শোনে নাই—উদাস-করুণ সুরে হঠাৎ মন কেমন করিয়া উঠে.... মনে হয় বাবা এখনও বসিয়া বাড়ীতে সেই কি লিখিতেছে—দিদি আসিতে চাহিয়াও আসিতে পারে নাই। প্রথম যখন জরির সাজ-পোশাক পরিয়া টাঙানো ঝাড় ও কড়ির আলো-সজ্জিত আসরে রাজার মন্ত্রীর দল আসিতে আরম্ভ

করে, অপু মনে ভাবে এমন সব জিনিস তাহার বাবা দেখিল না! সবাই তো আসরে আসিয়াছে গ্রামের, তাহাদের পাড়ার কোনও লোক তো বাকী নাই! বাবা কেন এখনো....? পালা দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে। সেবার সে বালক-কীর্তনের দলের যাত্রা শুনিয়াছিল—সে কি, আর এ কি! কি সব সাজ! কি সব চেহারা!....

হঠাৎ পিছন হইতে কে বলে—খোকা বেশ দেখতে পাচ্ছ তো?....তাহার বাবা কখন আসিয়া আসরে বসিয়াছে অপু জানিতে পারে নাই। বাবার দিকে ফিরিয়া বলে—বাবা, দিদি এসেচে? ...চিকের মধ্যে বুঝি?

মন্ত্রীর গুপ্ত ষড়যন্ত্রে যখন রাজা রাজ্যচ্যুত হইয়া স্ত্রী পুত্র লইয়া বনে চলিতেছেন, তখন কাঁদুনে সুরে বেহালার সঙ্গত হয়। তারপর রাজা করুণ রস বহুক্ষণ জমাইয়া রাখিবার জন্য স্ত্রীপুত্রের হাত ধরিয়া এক এক পা করিয়া থামেন, আর এক এক পা অগ্রসর হইতে থাকেন, সত্যিকার জগতে কোন বনবাস-গমনোদ্যত রাজা নিতান্ত অপ্রকৃতিস্থ না হইলে একদল লোকের সম্মুখে সেরূপ করে না। বিশ্বস্ত রাজ-সেনাপতি রাগে এমন কাঁপেন যে মৃগী-রোগগ্রস্ত রোগীর পক্ষেও তাহা হিংসার বিষয় হইবার কথা। অপু অপলক চোখে চাহিয়া বসিয়া থাকে, মুগ্ধ বিস্মিত হইয়া যায়; এমন তো সে কখনো দেখে নাই।

তারপর কোথায় চলিয়া গিয়াছেন রাজা, কোথায় গিয়াছেন রাণী! ....ঘন নিবিড় বনে শুধু রাজপুত্র অজয় ও রাজকুমারী ইন্দুলেখা ভাইবোনে ঘুরিয়া বেড়ায়! কেউ নাই যে তাহাদের মুখের দিকে চায়, কেউ নেই যে নির্জন বনে তাহাদের পথ দেখাইয়া লইয়া চলে। ছোট ভাইয়ের জন্য ফল আনিতে একটু দূরে চলিয়া যাইয়া ইন্দুলেখা আর ফেরে না। অজয় বনের মধ্যে বোনকে খুঁজিয়া বেড়ায়—তাহার পর নদীর ধারে হঠাৎ খুঁজিয়া পায় ইন্দুলেখার মৃতদেহ—ক্ষুধার তাড়নায় বিষফল খাইয়া সে মরিয়া গিয়াছে। অজয়ের করুণ গান—কোথা ছেড়ে গেলি এ বনকান্তারে প্রাণপ্রিয় প্রাণসাথী রে—শুনিয়া অপু এতক্ষণ মুগ্ধ চোখে চাহিয়াছিল—আর থাকিতে পারে না, ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদে।

কলিঙ্গরাজের সহিত বিচিত্রকেতুর যুদ্ধে তলোয়ার খেলা কী!.... যায়, বুঝি ঝাড়গুলা গুঁড়া হয়, নয় তো কোন হতভাগ্য দর্শকের চোখ দুটি বা যায়! রব ওঠে—ঝাড় সামলে —ঝাড় সামলে!....কিন্তু অদ্ভুত যুদ্ধকৌশল—সব বাঁচাইয়া চলে—ধন্য বিচিত্রকেতু!

মধ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়া জুড়ির দীর্ঘ গান ও বেহালায় কসরৎ-এর সময় অপুকে তাহার বাবা ডাকিয়া বলে—ঘুমে পাচ্ছে....বাড়ী যাবো খোকা? ....ঘুম! সর্বনাশ!....না সে বাড়ী যাইবে না। বাহিরে ডাকিয়া তাহার বাবা বলে—এই দুটো পয়সা রাখো বাবা, কিছু কিনে খেও, আমি বাড়ী গেলাম। অপুর ইচ্ছা হয় সে এক পয়সার পান কিনিয়া খাইবে, পানের দোকানের কাছে অত্যন্ত কিসের ভিড় দেখিয়া অগ্রসর হইয়া দ্যাখে, অবাক কান্ড! সেনাপতি বিচিত্রকেতু হাতিয়ারবন্দ অবস্থায় বার্ডসাই কিনিয়া ধরাইতেছেন—তাঁহাকে ঘিরিয়া রথযাত্রার ভিড়। আশ্চর্যের উপর আশ্চর্য!....রাজকুমাক অজয় কোথা হইতে আসিয়া বিচিত্রকেতুর কনুইএ হাত দিয়া বলিল—এক পয়সার পান খাওয়াও না কিশোরীদা? রাজপুত্রের প্রতি সেনাপতির বিশ্বস্ততার নিদর্শন দেখা গেল না—হাত ঝাড়া দিয়া বলিল—যাঃ অত পয়সা নেই—ওবেলা সাবানখানা যে দুজনে মাখলে আমাকে কি বলেছিলে? রাজপুত্র পুনরায় বলিল—খাওয়াও না কিশোরীদা? আমি বুঝি কখনো কিছু দিইনি তোমাকে? বিচিত্রকেতু হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেল।

অপুর সমবয়সী হইবে। টুকটকে, বেশ দেখিতে, গানের গলা বড় সুন্দর। অপু মুগ্ধ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া থাকে—বড় ইচ্ছা হয় আলাপ করিতে। হঠাৎ সে কিসের টানে সাহসী হইয়া আগাইয়া যায়—একটু লজ্জার সঙ্গে বলে—পান খাবে?....অজয় একটু অবাক্ হয়, বলে—তুমি খাওয়াবে? নিয়ে এস না। দুজনে ভাব হইয়া যায়। ভাব বলিলে ভুল হয়। অপু মুগ্ধ, অভিভূত হইয়া যায়! ইহাকেই সে এতদিন মনে মনে চাহিয়া আসিয়াছে—এই রাজপুত্র অজয়কে। তাহার মায়ের শত রূপকথার কাহিনীর মধ্য দিয়া, শৈশবের শত স্বপ্নময়ী মুগ্ধ কল্পনার ঘোরে তাহার প্রাণ ইহাকেই চাহিয়াছে—এই চোখ, এই মুখ, এই গলার স্বর! ঠিক সে যাহা চায় তাহাই। অজয় জিজ্ঞাসা করে—তোমাদের বাড়ী কোথায় ভাই?....আমাকে একজনের বাড়ী খেতে দিয়েছে, বড্ড বেলায় খেতে দেয়। তোমাদের বাড়ীতে খায় কে?....

খুশিতে অপুর সারা গা কেমন করে, সে বলে—ভাই, আমাদের বাড়ীতে একজন খেতে যায়, সে আজ দেখলাম ঢোলক বাজাচ্চে—তুমি কাল থেকে যেও, আমি এসে ডেকে নিয়ে যাবো—ঢোলকওয়ালা না হয় তুমি যে বাড়ীতে আগে খেতে, সেখানে যাবে—

খানিকক্ষণ দু'জনে এদিক-ওদিক বেড়াইবার পর অজয় বলে—আমি যাই ভাই, শেষ সিনে আমার গান আছে—আমার পার্ট কেমন লাগচে তোমার?

শেষ রাত্রে যাত্রা ভাঙিলে অপু বাড়ী আসে। পথে আসিতে আসিতে যে যেখানে কথা বলে, তাহার মনে হয় যাত্রার এক্‌টো হইতেছে। বাড়ীতে তাহার দিদি বলে—ও অপু, কেমন যাত্রা শুনলি?....অপুর মনে হয়, গভীর জনশূন্য বনের মধ্যে রাজকুমারী ইন্দুলেখা কি বলিয়া উঠিল। কিসের যে ঘোর তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। মহা খুশির সহিত সে বলে—কাল থেকে, অজয় যে সেজেছিল মা, সে আমাদের বাড়ী খেতে আস্‌বে—

তাহার মা বলে—দুজনে খাবে?—দুজনকে কোত্থেকে—

অপু বলে—তা না, একজন তো চ'লে যাবে, শুধু অজয় খাবে।

দুর্গা বল্লে—কেমন যাত্রা রে অপু?....এমন কক্ষনো দেখিনি—কেমন গান কল্লে যখন সেই রাজকন্যা ম'রে গেল?....অপুর তো রাত্রে ঘুমের ঘোরে চারিধারে যেন বেহালা সঙ্গীত হয়। ভোর হইলে একটু বেলায় তাহার ঘুম ভাঙে—শেষ রাত্রে ঘুমাইয়াছে, তৃপ্তির সঙ্গে ঘুম হয় নাই, সূর্যের তীক্ষ্ণ আলোয় চোখে যেন সুঁচ বিঁধে। চোখে জল দিলে জ্বালা করে। কিন্তু তাহার কানে একটা বেহালা-ঢোল-মন্দিরার ঐকতান বাজ্‌না তখনও যেন বাজিতেছে—তখনও যেন সে যাত্রার আসরেই বসিয়া আছে।

ঘাটের পথে যাইতে পাড়ার মেয়েরা কথা বলিতে বলিতে যাইতেছে, অপুর মনে হইল কেহ ধীরাবতী, কেহ কলিঙ্গদেশের মহারাণী, কেহ রাজপুত্র অজয়ের মা বসুমতী। দিদির প্রতি কথায়, হাত পা নাড়ার ভঙ্গীতে, রাজকন্যা ইন্দুলেখা যেন মাখানো! কাল যে ইন্দুলেখা সাজিয়াছিল তাহাকে মানাইয়াছিল মন্দ নয় বটে, কিন্তু তাহার মনে মনে রাজকন্যা ইন্দুলেখার যে প্রতিমা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা তাহার দিদিকে লইয়া, ঐ রকম গায়ের রং, অমনি বড় বড় চোখ, অমনি সুন্দর মুখ, অমনি সুন্দর চুল!

ইন্দুলেখা তাহার সকল করুণা, স্নেহ, মাধুরী লইয়া কোন্ সেকালের দেশের অতীত জীবনের পরে আবার তাহার দিদি হইয়া যেন ফিরিয়া আসিয়াছে—কাল তাই ইন্দুলেখার কথার ভঙ্গীতে প্রতি পদক্ষেপে দিদিই যেন ফুটিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। যখন গভীর বনে সে শতস্নেহে ছোট ভাইকে জড়াইয়া রাখিয়াছিল, তাকে খাওয়াইবার জন্য ফল আহরণ করিতে গিয়া এক নির্জন বনের মধ্যে হারাইয়া গেল—সেই একদিনের মাকাল ফলের ঘটনাটাই অপুর ক্রমাগত মনে হইতেছিল।

দুপুর বেলা খাইবার জন্য অপু গিয়া অজয়কে ডাকিয়া আনিল। তাহার মা দুজনকে এক জায়গায় খাইতে দিয়া অজয়ের পরিচয় লইতে বসিল। সে ব্রাহ্মণের ছেলে, তাহার কেহ নাই, এক মাসী তাহাকে মানুষ করিয়াছিল, সেও মরিয়া গিয়াছে। আজ বছরখানেক যাত্রার দলে কাজ করিতেছে। সর্বজয়ার ছেলেটির উপর খুব স্নেহ হইল—বার বার জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে খাওয়াইল। খাওয়াইবার উপকরণ বেশী কিছু নাই, তবু ছেলেটি খুব খুশির সঙ্গে খাইল। তাহার পর দুর্গা মাকে চুপি চুপি বলিল—মা, ওকে সেই কালকের গানটা গাইতে বল না—সেই "কোথা ছেড়ে গেলি এ বন-কান্তারে প্রাণপ্রিয় প্রাণসাথী রে"—

অজয় গলা ছাড়িয়া গান গাহিল—অপু মুগ্ধ হইয়া গেল—সর্বজয়ার চোখের পাতা ভিজিয়া আসিল। আহা, এমন ছেলের মা নাই! তাহার পর সে আরও গান গাহিল। সর্বজয়া বলিল—বিকেলে মুড়ি ভাজ্‌বো, তখন এসে অবিশ্যি করে মুড়ি খেয়ে যেও—লজ্জা করো না যেন—যখন খুশি আসবে, আপনার বাড়ীর মত, বুঝলে?

অপু তাহাকে সঙ্গে করিয়া নদীর ধারের দিকে বেড়াইতে গেল। সেখানে অজয় বলিল, ভাই, তোমার তো গলা মিষ্টি—একটা গান গাও না?....অপুর খুব ইচ্ছা হইল ইহার কাছে গান গাহিয়া সে বাহাদুরি লইবে। কিন্তু বড় ভয় করে—এ একজন যাত্রাদলের ছেলে—এর কাছে তার গান গাওয়া? নদীর ধারে বড় শিমুলগাছটার তলায় চলা-চল্‌তির পথ হইতে কিছুদূরে বাঁশঝোপের আড়ালে দুজনে

বসে। অপু অনেক কষ্ট লজ্জা কাটাইয়া একটা গান করে—শ্রীচরণে ভার একবার গা তোল হে অনন্ত—দাশু রায়ের পাঁচালীর গান বাবার মুখে শুনিয়া সে লিখিয়া লইয়াছে। অজয় অবাক্ হইয়া যায়, বলে—তোমার এমন গলা ভাই? তা তুমি গান গাও না কেন?....আর একটা গাও। অপু উৎসাহিত হইয়া আর একটা ধরে—খেয়ার আশে বসে রে মন ডুবল বেলা খেয়ার ধারে। তাহার দিদি কোথা হইতে শিখিয়া আসিয়া গাহিত, সুরটা বড় ভাল লাগায় অপু তাহার কাছ হইতে শিখিয়াছিল—বাড়ীতে কেহ না থাকিলে মাঝে মাঝে গানটা তাহারা দুজনে গাহিয়া থাকে।

গান শেষ হইলে অজয় প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বলিল—এমন গলা থাকলে যে কোনো দলে ঢুক্‌লে পোনেরো টাকা ক'রে সেধে দেবে বল্‌চি তোমায়—এর ওপর একটু যদি শেখো!

বাড়ীতে কেহ না থাকিলে দিদির সাম্‌নে গাহিয়া অপু কতদিন দিদিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে—হ্যাঁ দিদি, আমার গলা আছে? গান হবে?....দিদি তাহাকে বরাবর আশ্বাস দিয়া আসিয়াছে। কিন্তু দিদির আশ্বাস যতই আশাপ্রদ হৌক, আজ একজন সঙ্গীতদক্ষ খাস যাত্রার দলের নামকরা মেডেলওয়ালা গায়কের মুখে এ প্রশংসার কথা শুনিয়া আনন্দে অপু কি বলিয়া উত্তর করিবে ঠাওর করিতে পারিল না।

বলিল—তোমার ঐ গানটা আমায় শেখাও না?....তাহার পর দুইজন গলা মিলাইয়া সে গানটা গাহিল।

অনেকক্ষণ হইয়া গেল। নদী বাহিয়া ছপ ছপ করিয়া নৌকা চলিতেছে, নদীর পাড়ের নীচে জলের ধারে একজন কি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, অজয় বলিল—কি খুঁজচে ভাই? অপু বলিল—ব্যাঙাচি খুঁজচে, ছিপে মাছ ধরবে—তাহার পর বলিল— আচ্ছা ভাই তুমি আমাদের এখানে থাকো না কেন?....যেও না কোথাও, থাকবে?

এমন চোখ, এমন মিষ্টি গলার সুর! তাহার উপর অপুর কাছে সে সেই রাজপুত্র অজয়! কোন্ বনে ফিরিতে ফিরিতে অসহায় ছন্নছাড়া রূপবান্ রাজার ছেলের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হইয়া ভাব হইয়া গিয়াছে—চিরজন্মের বন্ধু! আর তাহাকে কি করিয়া ছাড়া যায়?

অজয়ও অনেক মনের কথা বলিয়া ফেলিল। এমন সাথী তাহার আর জুটে নাই। সে প্রায় চল্লিশ টাকা জমাইয়াছ। আর একটু বড় হইলে সে এ-দল ছাড়িয়া দেবে। অধিকারী বড় মারে। সে আশুতোষ পালের দলে যাইবে—সেখানে বড় সুখ, রোজ রাত্রে লুচি। না খাইলে তিন আনা পয়সা খোরাকী দেয়। এ দল ছাড়িলে সে আবার অপুদের বাড়ী আসিবে ও সে সময় কিছুদিন থাকিবে। বৈকালের কিছু আগে অজয় বলিল—চল ভাই, আজ আবার এখুনি আসর হবে, সকাল সকাল ফিরি। যদি "পরশুরামের দর্প-সংহার" হয়, তবে আমি নিয়তি সাজবো, দেখো কেমন একটা গান আছে—

আরও তিন দিন যাত্রা হইল। গ্রামসুদ্ধ লোকের মুখে যাত্রা ছাড়া আর কথা নাই। পথে ঘাটে মাঠে গাঁয়ের মাঝি নৌকা বাহিতে বাহিতে, রাখাল গরু চরাইতে চরাইতে যাত্রার পালার নতুন শেখা গান গায়। গ্রামের মেয়েরা দলের ছেলেদের বাড়ী ডাকাইয়া যাহার যে গান ভাল লাগিয়াছে তাহার মুখে সে গান ফরমাইশ করিয়া শুনিতে লাগিলেন। অপু আরও তিন-চারটা নতুন গান শিখিয়া ফেলিল। একদিন সে যাত্রার দলের বাসায় অজয়ের সঙ্গে গিয়াছে, সেখানে তাহাকে দলের সকলে মিলিয়া ধরিল, তাহাকে একটা গান গাহিতে হইবে। সেখানে সকলে অজয়ের মুখে শুনিয়াছে সে খুব ভাল গান গাইতে পারে। অপু বহু সাধ্যসাধনার পর নিজের বিদ্যা ভাল করিয়া জাহির করিবার খাতিরে একটা গাহিয়া ফেলিল। সকলে তাহাকে ধরিয়া অধিকারীর নিকটে লইয়া গেল। সেখানেও তাহাকে একটা গাহিতে হইল। অধিকারী কালো রং-এর ভুঁড়িওয়ালা লোক, আসরে জুড়ি সাজিয়া গান করে। গান শুনিয়া বলিল—এস না খোকা, দলে আস্‌বে? অপুর বুকখানা আনন্দে ও গর্বে দশহাত হইল। আরও সকলে মিলিয়া তাহাকে ধরে—এস, চলো তোমাকে আমাদের দলে নিয়ে যাই। অপুর তো ইচ্ছা সে এখনি যায়। যাত্রার দলে কাজ করা মনুষ্যজীবনের চরম উদ্দেশ্য, সেকথা এতদিন সে কেন জানিত না, ইহাই তো আশ্চর্যের বিষয়। সে গোপনে অজয়কে বলিল—আচ্ছা ভাই, এখন যদি আমি দলে যাই, আমাকে কি সাজতে দেবে? অজয় বলিল—এখন এই সখী-ঠখী, কি বালকের পার্ট এই রকম, তারপর ভাল ক'রে শিখলে—

অপু সখী সাজিতে চায় না—জরির মুকুট মাথায় সে সেনাপতি সাজিয়া তলোয়ার ঝুলাইবে, যুদ্ধ করিবে। বড় হইলে সে যাত্রার দলে যাইবেই, উহাই তাহার জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য। অজয় তাহাকে চুপি চুপি কষ্টিপাথরের রং একটা ছোক্‌রাকে দেখাইয়া কহিল, এই যে দেখেচো, এর নাম বিষ্টু তেলি। আমার সঙ্গে মোটে বনে না, আমার নিজের পয়সায় দেশলাই কিনে বালিশের তলায় রেখে শুই, দেশলাই উঠিয়ে নেয় চুরুট খেতে, আর দেয় না। আমি বলি আমার রাত্রে ভয় করে, দেশলাইটা দাও! অন্ধকারে মন ছম্ ছম্ করে, তাই সেদিন চেয়েছিলাম ব'লে এমনি থাবড়া একটা মেরেচে। নাচে ভালো ব'লে অধিকারী বড় খাতির করে, কিছু বলবারও যো নেই—

দিন পাঁচেক পরে যাত্রা দলের গাওনা শেষ হইয়া গেলে তাহারা রওনা হইল। অজয় বাড়ীর ছেলের মত যখন তখন আসিত যাইত, এই কয়দিনের মধ্যে সে যেন অপুরই আর এক ভাই হইয়া পড়িয়াছিল। অপুরই বয়সী ছোট ছেলে, সংসারে কেহ নাই শুনিয়া সর্বজয়া তাহাকে এ কয়দিন অপুর মত যত্ন করিয়াছে। দুর্গাও তাহাকে আপন ভাইয়ের চোখে দেখিয়াছে—তাহার কাছে গান শিখিয়া লইয়াছে, কত গল্প শুনাইয়াছে, তাহার পিসিমার কথা বলিয়াছে, তিনজনে মিলিয়া উঠানে বড় ঘর আঁকিয়া গঙ্গা-যমুনা খেলিয়াছে, খাইবার সময় জোর করিয়া বেশী খাইতে বাধ্য করিয়াছে। যাত্রাদলে থাকে, কে কোথায় দ্যাখে, কোথায় শোয়, কি খায়, আহা বলিবার কেহ নাই; গৃহ-সংসারের যে স্নেহস্পর্শ বোধ হয় জন্মাবধিই তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই, অপ্রত্যাশিত ভাবে আজ তাহার স্বাদ লাভ করিয়া লোভীর মত সে কিছুতেই ছাড়িয়া যাইতে চাহিতেছিল না।

যাইবার সময় সে হঠাৎ পুঁটুলি খুলিয়া কষ্টে সঞ্চিত পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া সর্বজয়ার হাতে দিতে গেল। একটু লজ্জার সুরে বলিল—এই পাঁচটা টাকা দিয়ে দিদির বিয়ের সময় একখানা ভাল কাপড়—

সর্বজয়া বলিল—না বাবা, না—তুমি মুখে বল্‌লে এই খুব হোল, টাকা দিতে হবে না, তোমার এখন টাকার কত দরকার—বিয়ে-থাওয়া ক'রে সংসারী হতে হবে—

তবু সে কিছুতেই ছাড়ে না। অনেক বুঝাইয়া তবে তাহাকে নিরস্ত করিতে হইল।

তাহার পর সকলে উহাদের বাড়ীর দরজার সামনে খানিকটা পথ পর্যন্ত তাহাকে আগাইয়া দিতে আসিল। যাইবার সময় সে বার বার বলিয়া গেল, দিদির বিয়ের সময় অবশ্য করিয়া যেন তাহাকে পত্র দেওয়া হয়।

গাবতলায় ছায়ায় তাহার সুকুমার বালকমূর্তি ভাঁটশেওড়া ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেলে হঠাৎ সর্বজয়ার মনে হইল, বড্ড ছেলেমানুষ, আহা, এই বয়সে বেরিয়েছে নিজের রোজগার নিজে কর্তে। অপুর আমার যদি ঐরকম হোত—মাগো!....

পথের পাঁচালী

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

প্রথম প্রথম যখন হরিহর কাশী হইতে আসিল তখন সকলে বলিত তাহার ভবিষ্যৎ বড় উজ্জ্বল, এ অঞ্চলে ওরকম বিদ্যা শিখিয়া কেহ আসে নাই। তাহার বিদ্যার সুখ্যাতি সকলের মুখে ছিল, সকলে বলিত সে এইবার একটা কিছু করিবে। সর্বজয়াও ভাবিত, শীঘ্রই উহারা তাহার স্বামীকে ডাকাইয়া একটা ভাল চাকুরি দিবে (কাহারা চাকুরি দেয় সে সম্বন্ধে তাহার ধারণা ছিল কুয়াসাচ্ছন্ন সমুদ্রবক্ষের মত অস্পষ্ট)। কিন্তু মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর করিয়া বহুকাল চলিয়া গেল, অর্ধরাত্রির মাথায় কোন জরির পোশাকপরা ঘোড়সওয়ার সভাপণ্ডিত পদের নিয়োগ-পত্র লইয়া ছুটিয়া আসিল না, বা আরব্য উপন্যাসের দৈত্য কোন মণি-খচিত মায়াপ্রাসাদ আকাশ বাহিয়া উড়াইয়া আনিয়া তাহাদের ভাঙা ঘরে বসাইয়া দিয়া গেল না, বরং সে ঘরের পোকা-কাটা কবাট দিন দিন আরও জীর্ণ হইতে চলিল, কড়িকাঠ আরও ঝুলিয়া পড়িতে চাহিল; আগে যাও বা ছিল তাও আর সব থাকিতেছে না, তবু সে একেবারে আসা ছাড়ে নাই। হরিহরও বিদেশ হইতে আসিয়া প্রতিবারই একটা না একটা আশার কথা এমনভাবে বলে, যেন সব ঠিক, অল্পমাত্র বিলম্ব আছে, অবস্থা ফিরিল বলিয়া। কিন্তু হয় কৈ?.....

জীবন বড় মধুময় শুধু এইজন্য যে, এই মাধুর্য্যের অনেকটাই স্বপ্ন ও কল্পনা দিয়া গড়া। হোক না স্বপ্ন মিথ্যা, কল্পনা বাস্তবতার লেশশূন্য; নাই বা থাকিল সব সময় তাহাদের পিছনে সার্থকতা; তাহারাই যে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাহারা আসুক, জীবনে অক্ষয় হোক্ তাহাদের আসন; তুচ্ছ সার্থকতা, তুচ্ছ লাভ।

হরিহর বাড়ী হইতে গিয়াছে প্রায় দুই-তিন মাস। টাকাকড়ি খরচপত্র অনেকদিন পাঠায় নাই। দুর্গা অসুখে ভুগিতেছে একটু বেশী, খায় দায় অসুখ হয়, দুদিন একটু ভাল থাকে, হঠাৎ একদিন আবার হয়।

সর্বজয়া মেয়ের বিবাহের জন্য স্বামীকে প্রায়ই তাগাদা দেয়। স্বামীকে দিয়া দুই-তিনখানা পত্র নীরেন্দ্রের পিতা রাজ্যেশ্বরবাবুর নিকট লিখিয়াছে। সেদিকের আশাও সে এখনও ছাড়ে নাই। হরিহর বলে, তুমি কি খেপ্‌লে নাকি? ওসকল বড়লোকের কাণ্ড, রাজ্যেশ্বর কাকা কি আর আমাদের পুঁছবেন? তবুও সর্বজয়া ছাড়ে না; বলে, লেখো না আর একখানা, লিখেই দ্যাখো না—নীরেন তো পছন্দই ক'রে গিয়েছেন। দুই এক মাস চলিয়া যায়, বিশেষ কোন উত্তর আসে না, আবার সে স্বামীকে পত্র লিখিবার তাগাদা দিতে শুরু করে।

এবার হরিহর যখন যখন বিদেশে যায়, তখন বলিয়া গিয়াছে এইবার সে এখান হইতে উঠিয়া অন্যত্র বাস করিবার একটা কিছু ঠিক করিয়া আসিবেই।

পাড়ার একপাশে নিকনো পুছানো ছোট্ট খড়ের ঘর দু'তিনখানা। গোয়ালে হৃষ্টপুষ্ট দুগ্ধবতী গাভী বাঁধা, মাচা ভরা বিচালী, গোলা ভরা ধান। মাঠের ধারের মটর ক্ষেতের তাজা, সবুজ গন্ধ খোলা হাওয়ার উঠান দিয়া বহিয়া যায়। পাখী ডাকে—নীলকণ্ঠ, বাবুই, শ্যামা। অপু সকালে উঠিয়া বড় মাটির ভাঁড়ে দোয়া এক পাত্র সফেন কালো গাই-এর দুধের সঙ্গে গরম মুড়ির ফলার খাইয়া পড়িতে বসে। দুর্গা ম্যালেরিয়ায় ভোগে না। সকলেই জানে, সকলেই খাতির করে, আসিয়া পায়ের ধূলা লয়। গরীব বলিয়া কেহ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে না।

...শুধুই স্বপ্ন দেখে, দিন নাই, রাত নাই, সর্বজয়া শুধুই স্বপ্ন দেখে। তাহার মনে হয়, এতকাল পরে সত্য-সত্যই একটা কিছু লাগিয়া যাইবে। মনের মধ্যে কে যেন বলে।

কেন এতদিন হয় নাই? কেন এতকাল পরে? সেই ছেলেবেলাকার দিনে জামতলায় সজনেতলায় ঘুরিবার সময় হইতে সেঁজুতির আলপনা আঁকা মন্ত্রের সঙ্গে এ সাধ যে তাহার মনে জড়াইয়া আছে, লক্ষ্মীর আল্‌তাপরা পায়ের দাগ আঁকা আঙিনায় শ্বশুরবাড়ীর ঘর-সংসার পাতাইবে। এরকম ভাঙা পুরানো কোঠা বাঁশবন কে চাহিয়াছিল?

দুর্গা একটা ছোট্ট মানকচু কোথা হইতে যোগাড় করিয়া আনিয়া রান্নাঘরে ধর্ণা দিয়া বসিয়া থাকে। তাহার মা বলে, তোর হোল কি দুগ্‌গা? আজ কি ব'লে ভাত খাবি? কাল সন্ধ্যেবেলাও তো জ্বর এসেচে? দুর্গা বলে, তা হোক্ মা, সে জ্বর বুঝি—একটু তো মোটে শীত করলো?....তুমি এই মানকচুটা ভাতে দিয়ে দুটো ভাত—। তাহার মা বলে—যাঃ, অসুখ হয়ে তোর খাই খাই বড্ড বেড়েছে। আজ কাল ভাল যদি থাকিস তো পরশু বরং দেবো—

অনেক কাকুতিমিনতির পর না পারিয়া শেষে দুর্গা মানকচু তুলিয়া রাখিয়া দেয়। খানিকটা চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, আপন মনে বলে, আজ খুব ভাল আছি, আজ আর জ্বর আস্‌বে না আমার—ওবেলা দুখানা রুটি আর আলুভাজা খাবো। একটু পরে হাই ওঠে, সে জানে ইহা জ্বর আসার পূর্বলক্ষণ। তবুও সে মনকে বোঝায়, হাই উঠুক, এম্‌নি তো কত হাই ওঠে, জ্বর আর হবে না। ক্রমে শীত করে, রৌদ্রে গিয়া বসিতে ইচ্ছা হয়। সে রৌদ্রে না গিয়া মনকে প্রবোধ দেয় যে, শীত বোধ হওয়া একটা স্বাভাবিক শারীরিক ব্যাপার, জ্বর আসার সহিত ইহার সম্পর্ক কি?

কিন্তু কোনো প্রবোধ খাটে না। রৌদ্র না পড়িতে পড়িতে জ্বর আসে, সে লুকাইয়া গিয়া রৌদ্রে বসে, পাছে মা টের পায়। তাহার মন হু-হু করে, ভাবে—জ্বর জ্বর ভেবে এরকম হচ্ছে, সত্যি সত্যি জ্বর হয়নি—

রাঙা রোদ শেওলাধরা ভাঙা পাঁচিলের গায়ে গিয়া পড়ে। বৈকালের ছায়া ঘন হয়। দুর্গার মনে হয় অন্যমনস্ক হইয়া থাকিলে জ্বর চলিয়া যাইবে। অপুকে বলে, বোস্ দিকি একটু আমার কাছে, আয় গল্প করি।

একদিন আর-বছর ঘন বর্ষার রাতে সে ও অপু মতলব আঁটিয়া শেষরাত্রে পিছনে সেজ ঠাক্‌রুণদের বাগানে তাল কুড়াইতে গিয়াছিল, হঠাৎ দুর্গার পায়ে পট্‌ করিয়া এক কাঁটা ফুটিয়া গেল। যন্ত্রণায় পিছু হটিয়া বাঁ পা-খানা যেখানে রাখিল, সেখনে বাঁ পায়েও পট্‌ করিয়া আর একটা!....সকাল বেলা দেখা গেল, পাছে রাত্রে উহারা কেহ তাল কুড়াইয়া লয়, এজন্য সতু তালতলার পথে সোজা করিয়া সারি সারি বেল-কাঁটা পুঁতিয়া রাখিয়াছে।

আর একদিন যা আশ্চর্য ব্যাপার!—

কোথা হইতে সেদিন এক বুড়া বাঙাল মুসলমান একটা বড় রং-চং করা কাচবসানো টিনের বাক্স লইয়া খেলা দেখাইতে আসে। ওপাড়ায় জীবন চৌধুরীর উঠানে সে খেলা দেখাইতেছিল। দুর্গা পাশেই দাঁড়াইয়াছিল। তাহার পয়সা ছিল না। আর সকলে এক এক পয়সা দিয়া বাক্সের গায়ে একটা চোঙের মধ্যে দিয়া কি সব দেখিতেছিল।

বুড়া মুসলমানটি বাক্স বাজাইয়া সুর করিয়া বলিতেছিল, তাজ বিবিকা রোজা দেখো, হাতী বাঘকা লড়াই দেখো! এক-একজনের দেখা শেষ হইলে যেমন সে চোঙ হইতে চোখ সরাইয়া লইতেছিল অমনি দুর্গা তাহাকে মহা আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেছিল, কি দেখলি রে ওর মধ্যে? সব সত্যিকারের?

উঃ! সে কি অপূর্ব ব্যাপার দেখিয়াছে তাহা তাহারা বলিতে পারে না।....কি সে সব!

সকলের দেখা একে একে হইয়া গেল। দুর্গা চলিয়া যাইতেছিল, বুড়া মুসলমানটি বলিল, দেখবে না খুকী?....দুর্গা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, নাঃ—আমার কাছে পয়সা নাই।

লোকটি বলিল, এসো এসো খুকী, দেখে যাও—পয়সা লাগ্‌বে না—

দুর্গার একটু লজ্জা হইয়াছিল, মুখে বলিল,—নাঃ—কিন্তু আগ্রহে কৌতুহলে তাহার বুকের মধ্যে ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করিয়া উঠিল।

লোকটি বলিল, এসো এসো, দোষ কি ?....এসো, দ্যাখো—

দুর্গা উজ্জ্বলমুখে পায়ে পায়ে বাক্সের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল বটে, তবুও সাহস করিয়া মুখটা চোঙের মধ্যে দিতে পারে নাই। লোকটি বলিল, এই নলটার মধ্যে দিয়া তাকাও দিকি খুকী?

দুর্গা মাথার উড়ন্ত চুলের গোছা কানের পাশে সরাইয়া দিয়া চাহিয়া দেখিল। পরের দশ মিনিটের কথার সে কোনো বর্ণনা করিতে পারে না। সত্যিকারের মানুষ ছবিতে কি করিয়া দেখা যায়? কত সাহেব, মেম, ঘরবাড়ী, যুদ্ধ, সে সব কথা সে বলিতে পারে না! কি জিনিসই সে দেখিয়াছিল!

অপুকে দেখাইতে বড় ইচ্ছা করে, দুর্গা কতবার খুঁজিয়াছে, ও খেলা আর কোনও দিন আসে নাই।

গল্প ভাল করিয়া শেষ হইতে না হইতে দুর্গা জ্বরের ধমকে আর বসিতে পারে না, উঠিয়া ঘরের মধ্যে কাঁধা মুড়ি দিয়া শোয়।

আজকাল বাবা বাড়ী নাই, অপুকে আর খুঁজিয়া মেলা দায়। বই দপ্তরে ঘুণ ধরিবার যোগাড় হইয়াছে। সকাল বেলা সেই যে এক পুঁটুলি কড়ি লইয়া বাহির হয়, আর ফেরে একেবারে দুপুর ঘুরিয়া গেলে খাইবার সময়। তাহার মা বকে—ছেলের না নিকুচি করেচে—তোমার লেখাপড়া একেবারে ছিকেয় উঠ্‌লে? এবার বাড়ী এলে সব কথা ব'লে দেবো, দেখো এখন তুমি—

অপু ভয়ে ভয়ে দপ্তর লইয়া বসে। বইগুলো খুব চারিদিকে ছড়ায়। মাকে বলে, একটু খয়ের দাও মা, আমি দোয়াতের কালিতে দেবো—

পরে সে বসিয়া বসিয়া হাতের লেখা লিখিয়া রৌদ্রে দেয়। শুকাইয়া গেলে খয়ের-ভিজানো কালি চক্‌ চক্‌ করে—অপু মহাখুশির সহিত সেদিকে চাহিয়া থাকে—ভাবে—আর একটু খয়ের দেবো কাল থেকে—ওঃ কী চক্‌ চক্‌ করছে দেখো একবার! পানের বাটা হইতে মাকে লুকাইয়া বড় একখণ্ড খয়ের লইয়া কালির দোয়াতে দেয়। পরে লেখা লিখিয়া শুখাইতে দিয়া কতটা আজ জ্বলজ্বল করে দেখিবার জন্য কৌতূহলের সহিত সেদিকে চাহিয়া থাকে। মনে হয়—আচ্ছা যদি আর একটু দি?

একদিন মার কাছে ধরা পড়িয়া যায়। মা বলে, ছেলের লেখার সঙ্গে খোঁজ নেই। কেবল ড্যালা ড্যালা খয়ের রোজ দরকার—রেখে দে খয়ের—

ধরা পড়িয়া একটু অপ্রতিভ হইয়া বলে, খয়ের নৈলে কালি হয় বুঝি?....আমি বুঝি এমনি এমনি—

—না খয়ের নৈলে কালি হবে কেন? এইসব রাজ্যির ছেলে আর লেখাপড়া কচ্চে না—তাদের সের সের খয়ের রোজ যোগানো রয়েচে যে দোকানে! যাঃ—

অপু বসিয়া বসিয়া একখানা খাতায় নাটক লেখে। বহু লিখিয়া খাতাখানা সে প্রায় ভরাইয়া ফেলিয়াছে, মন্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতায় রাজা রাজ্য ছাড়িয়া বনে যান, রাজপুত্র নীলাম্বর ও রাজকুমারী অম্বা বনের মধ্যে দস্যুর হাতে পড়েন, ঘোর যুদ্ধ হয়, পরে রাজকুমারীর মৃতদেহ নদীতীরে দেখা যায়। নাটকে সতু বলিয়া একটি জটিল চরিত্র সৃষ্ট হইবার অল্পপরেই বিশেষ কোনো মারাত্মক দোষের বর্ণনা না থাকা সত্ত্বেও সে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। নাটকের শেষদিকে রাজপুত্রী অম্বার নারদের বরে পুনর্জীবন প্রাপ্তি বা বিশ্বস্ত সেনাপতি জীবনকেতুর সহিত তাঁহার বিবাহ প্রভৃতি ঘটনায় যাঁহারা বলেন যে গত বৈশাখ মাসে দেখা যাত্রার পালা হইতে এক নামগুলি ছাড়া মূলতঃ কোন অংশই পৃথক নহে, বা সেই হইতেই ইহা হুবহু লওয়া তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, অতীতের কোনো এক নীরব জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে নির্জন বাসকক্ষের স্তিমিতদীপশয্যায় এক প্রাচীন কবির নীলমেঘের মত দৃশ্যমান ময়ূর-নিনাদিত দূর বনভূমির স্বপ্ন যদি কালিদাসকে মুক্ত মেঘের ভ্রমণ বর্ণনে অনুপ্রাণিত করিয়া থাকে, তাহা হইলেই বা কি?....সে বিস্মৃত শুভ-যামিনীর বন্দনা মানুষে নিজের অজ্ঞাতসারে হাজার বৎসর ধরিয়া করিয়া আসিতেছে।

আগুন দিয়াই আগুন জ্বালানো যায়, ছাই-এর ঢিপিতে মশাল গুঁজিয়া কে কোথায় মশাল জ্বালে?...

দপ্তরে একখানা বই আছে—বইখানার নাম চরিতমালা, লেখা আছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। পুরানো বই, তাহার বাবার নানা জায়গা হইতে ছেলের জন্য বই সংগ্রহ করিবার বাতিক আছে, কোথা হইতে এখানা আনিয়াছিল, অপু মাঝে মাঝে খানিকটা পড়িয়া থাকে। বইখানিতে যাঁহাদের গল্প আছে সে ঐ রকম হইতে চায়! হাটে আলু বেচিতে পাঠাইলে কৃষকপুত্র রস্কো বেড়ার ধারে বসিয়া বসিয়া বীজগণিতের চর্চা করিত, কাগজের অভাবে চাম্‌ড়ার পাতে ভোঁতা আল দিয়া অঙ্ক কষিত, মেষপালক ডুবাল ইতস্ততঃ সঞ্চরণশীল মেষদলকে যদৃচ্ছ বিচরণের সুযোগ দিয়া একমনে গাছতলায় বসিয়া ভূচিত্র পাঠে মগ্ন থাকিত—সে ঐ রকম হইতে চায়।...'বীজগণিত' কি জিনিস? সে বীজগণিত পড়িতে চায় রস্কোর মত। সে এই হাতের লেখা লিখিতে চায় না, ধারাপাত কি শুভঙ্করী এসব তাহার ভাল লাগে না। ঐরকম নির্জন গাছতলায়, বনের ছায়া, কি বেড়ার ধারে বসিয়া বসিয়া সে "ভূচিত্র" (জিনিসটা কি?) পাতিয়া পড়িবে, বড় বড় বই পড়িবে, পণ্ডিত হইবে ঐ রকম। কিন্তু কোথায় পাইবে সে সব জিনিস? কোথায় বা 'ভূচিত্র', কোথায় বা 'বীজগণিত', কোথায়ই বা লাটিন ব্যাকরণ?—এখানে শুধুই কড়ি কষার আর্যা, আর তৃতীয় নাম্‌তা।

মা বকিলে কি হইবে, যাহা সে পড়িতে চায়, তাহা এখানে কই?

পথের পাঁচালী

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

কয়দিন খুব বর্ষা চলিতেছে। অন্নদা রায়ের চণ্ডীমণ্ডপে সন্ধ্যাবেলায় মজলিস বসে। সেদিন সেখানে নীলকুঠির ভুয়ো গল্প হইতে শুরু হইয়া পুরীর কোন্ মন্দিরের মাথায় পাঁচ মণ ভারী চুম্বক পাথর বসানো আছে, যাহার আকর্ষণের বলে নিকটবর্তী সমুদ্রগামী জাহাজ প্রায়ই পথভ্রষ্ট হইয়া আসিয়া তীরবর্তী মগ্ন শৈলে লাগিয়া ভাঙিয়া যায় প্রভৃতি—আরব্য উপন্যাসের গল্পের মত নানা আজগুবী কাহিনীর বর্ণনা চলিতেছিল। শ্রোতাদের কাহারও উঠিবার ইচ্ছা ছিল না, এরকম আজগুবী গল্প ছাড়িয়া কাহারও বাড়ী যাইতে মন সরিতেছিল না। ভূগোল হইতে শীঘ্রই গল্পের ধারা আসিয়া জ্যোতিষে পৌঁছিল। দীনু চৌধুরী বলিতেছিলেন—ভৃগু সংহিতার মত অমন বই তো আর নেই! তুমি যাও, শুধু জন্মরাশিটা গিয়ে দিয়ে দাও, তোমার বাবার নাম, কোন্ কুলে জন্ম, ভূত ভবিষ্যৎ সব ব'লে দেবে—তুমি মিলিয়ে নাও—গ্রহ ও রাশিচক্রের যত রকম ইয়ে হয়—তা সব দেওয়া অছে কি না? মায় তোমার পূর্বজন্ম পর্যন্ত—

সকলে সাগ্রহে শুনিতেছিলেন, কিন্তু রামময় হঠাৎ বাহিরের দিকে চাহিয়া বলিলেন—না, ওঠা যাক্, এর পর যাওয়া যাবে না—দেখচো না—দেখচো না কান্ডখানা? একটা বড় ঝট্কা-টট্কা না হোলে বাঁচি, গতিক বড় খারাপ, চলো সব—

বৃষ্টির বিরাম নাই। একটু থামে, আবার জোরে আসে, বৃষ্টির ছাটে চারিধার ধোঁয়া ধোঁয়া।

হরিহর মোট পাঁচটা টাকা পাঠাইয়াছিল, তাহার পর আর পত্রও নাই, টাকাও নাই। সেও অনেক দিন হইয়া গেল—রোজ সকালে উঠিয়া সর্বজয়া ভাবে আজ ঠিক খরচ আসিবে। ছেলেকে বলে, তুই খেলে খেলে বেড়াস ব'লে দেখতে পাস্নে, ডাক বাক্সটার কাছে ব'সে থাক্বি—পিওন যেমন আস্বে আর অম্নি জিগ্যেস করবি—

অপু বলে—বা, আমি বুঝি ব'সে থাকি নে? কালও তো এলো পুঁটিদের চিঠি, আমাদের খবরের কাগজ দিয়ে গেল—জিগ্যেস্ করে এস দিকি পুঁটিকে? কাল তবে আমাদের খবরের কাগজ কি ক'রে এল? আমি থাকিনে বৈ কি?

বর্ষা রীতিমত নামিয়াছে। অপু মায়ের কথায় ঠায় রায়েদের চণ্ডীমণ্ডপে পিওনের প্রত্যাশায় বসিয়া থাকে। সাধু কর্মকারের ঘরে চালা হইতে গোলা পায়রার দল ভিজিতে ভিজিতে ঝটাপট্ করিয়া উড়িতে উড়িতে রায়েদের পশ্চিমের ঘরের কার্নিসে আসিতেছে, চাহিয়া চাহিয়া দ্যাখে। আকাশের ডাককে সে বড় ভয় করে। বিদ্যুৎ চম্কাইলে মনে মনে ভাবে—দেবতা কিরকম নলপাচ্চে দেখেচো, এইবার ঠিক ডাক্বে—পরে সে চোখ বুজিয়া কানে আঙুল দিয়া থাকে।

বাড়ী ফিরিয়া দ্যাখে মা ও দিদি সারা বিকাল ভিজিতে ভিজিতে রাশীকৃত কচুর শাক তুলিয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় জড় করিয়াছে।

অপু বলে—কোত্থেকে আন্লে মা? উঃ কত!

দুর্গা হাসিয়া বলে—কত—! উঁ-উঃ! তোমার তো ব'সে ব'সে সুবিধে!....ওই ওদের ডোবার জামতলা থেকে—এই এতটা এক হাঁটু জল! যাও দিকি?...

সকালে ঘাটে গিয়া নাপিত-বৌয়ের সঙ্গে দেখা হয়। সর্বজয়া কাপড়ের ভিতর হইতে কাঁসার একখানা রেকাবী বাহির করিয়া বলে, এই দ্যাখো জিনিসখানা, খুব ভালো—ভরণ না, কিছু না, ফুল কাঁসা। তুমি বলেছিলে, তাই বলি যাই নিয়ে—এ সে জিনিস নয়, এ আমার বিয়ের দান—এখন এ জিনিস আর মেলে না—

অনেক দরদস্তুরের পর নাপিত-বৌ নগদ একটি আধুলি আঁচল হইতে খুলিয়া দিয়া রেকাবীখানা কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া লয়। কাউকে যেন না প্রকাশ করে—সর্বজয়া এ অনুরোধ বার বার করে।

দুই একদিনে ঘনীভূত বর্ষা নামিল। হু-হু পূবে হাওয়া, খানাডোবা সব থৈ-থৈ করিতেছে—পথে ঘাটে একহাঁটু জল, দিনরাত সোঁ সোঁ, বাঁশবনে ঝড় বাধে—বাঁশের মাথা মাটিতে লুটাইয়া পড়ে—আকাশের কোথাও ফাঁক নাই—মাঝে মাঝে আগেকার চেয়ে অন্ধকার করিয়া আসে—কালো কালো মেঘের রাশ হু-হু উড়িয়া পূব হইতে পশ্চিমে চলিয়াছে—দূর আকাশের কোথায় যেন দেবাসুরের মহাসংগ্রাম বাধিয়াছে, কোন্ কৌশলী সেনানায়কের চালনায় জলস্থল-আকাশ একাকারে ছাইয়া ফেলিয়া বিরাট দৈত্যসৈন্য, বাহিনীর পর বাহিনী, অক্ষৌহিণীর পর অক্ষৌহিণী, অদৃশ্য রথী মহারথীদের নায়কত্বে ঝড়ের বেগে অগ্রসর হইতেছে—প্রজ্বলন্ত অত্যুগ্র দেববজ্র আগুন উড়াইয়া চক্ষের নিমেষে বিশাল কৃষ্ণচমূর এদিক্-ওদিক্ পর্যন্ত ছিঁড়িয়া ফাঁড়িয়া এই ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিতেছে—এই আবার কোথা হইতে রক্তবীজের বংশ করাল কৃষ্ণছায়ায় পৃথিবী অন্তরীক্ষ অন্ধকার করিয়া ঘিরিয়া আসিতেছে।

মহাঝড়!

দিন রাত সোঁ-সোঁ শব্দ—নদীর জল বাড়ে—কত ঘরদোর কত জায়গায় যে পড়িয়া গেল!...নদী-নালা জলে ভাসিয়া গিয়াছে—গরু-বাছুর গাছের তলে, বাঁশবনে, বাড়ীর ছাঁচতলায় অঝোরে দাঁড়াইয়া ভিজিতেছে, পাখী-পাখালীর শব্দ নাই কোনোদিকে ! চার পাঁচ দিন সমান ভাবে কাটিল—কেবল ঝড়ের শব্দ আর অবিশ্রান্ত ধারাবর্ষণ! —অপু দাওয়ায় উঠিয়া তাড়াতাড়ি ভিজা মাথা মুছিতে বলিল—আমাদের বাঁশতলায় জল এসেচে দিদি, দেখবি? দুর্গা কাঁথা মুড়ি দিয়া শুইয়াছিল—না উঠিয়াই বলিল কতখানি জল এসেচে রে?...অপু বলে, তোর জ্বর সার্লে কাল দেখে আসিস্।...তেঁতুলতলার পথে হাঁটু জল! পরে জিজ্ঞাসা করে—মা কোথায় রে?...

ঘরে একটা দানা নেই—দুটোখানি বাসি চালভাজা মাত্র আছে। অপু কান্নাকাটি করে, তা হবে না মা, আমার খিদে্ পায় না বুঝি—আমি দুটি ভাত খাবো—হুঁ-উ—

তার মা বলিল, লক্ষ্মী মাণিক আমার—ও রকম কি করে! চালভাজা মেখে দেবো এখন—রাঁধবো কেমন ক'রে, দেখচিস্ নে কি রকম সেঁওটা করেচে?—উনুনের মধ্যে এক উনুন জল যে? পরে সে কাপড়ের ভিতর হইতে একটা কি বাহির করিয়া হাসিমুখে দেখাইয়া বলে—এই দ্যাখ্ একটা কইমাছ বাঁশতলায় কানে হেঁটে দেখি বেড়াচ্চে—বন্যের জল পেয়ে সব উঠে আসছে গাঙ থেকে—বরোজ পোতার ডোবা ভেসে নদীর সঙ্গে এক হয়ে গিয়েচে কিনা?...তাই সব উঠে আস্‌চে—

দুর্গা কাঁথা ফেলিয়া ওঠে—অবাক হইয়া যায়। বলে, দেখি মা মাছটা? হাঁ মা, কইমাছ বুঝি কানে হেঁটে বেড়ায়? আর আছে?...

অপু এখনি বৃষ্টিমাথায় ছুটিয়া যায় আর কি—অনেক কষ্টে মা তাহাকে থামায়।

দুর্গা বলে—একটু জ্বর সারলে কাল সকালে চল্ অপু, তুই আর আমি বাঁশবাগান থেকে মাছ নিয়ে আস্‌বো এখন। পরে সে অবাক্ হইয়া ভাবে—বাঁশবাগানে মাছ! কী ক'রে এল? বাঃ তো!—মা কি ভাল ক'রে খুঁজেচে। খুঁজলে আরও সেখানে আছে—দেখতে পেলাম না কি রকম কইমাছ কানে হাঁটে—কাল সকালে দেখবো—সকালে জ্বর সেরে যাবে—

চারিদিকের বন-বাগান ঘিরিয়া সন্ধ্যা নামে। সন্ধ্যার মেঘে ত্রয়োদশীর অন্ধকারে চারিধার একাকার। দুর্গা যে বিছানা পাতিয়া শুইয়া আছে, তাহারই এক পাশে তাহার মা ও অপু বসে। সর্বজয়া ভাবে—আজ যদি এখ্‌খুনি একখানা পত্তর আসে নীরেন বাবাজীর? কি জানি, তা হ'তে কি আর পারে না? নীরেন তো পছন্দই ক'রে গিয়েচেন—কি জানি কি হোল অদেষ্টে! নাঃ, সে সব কি আর আমার অদেষ্টে হবে? তুমিও যেমন! তা হোলে আর ভাবনা ছিল কি?

ওদিকে ভাইবোনে তুমুল তর্ক বাধিয়া যায়। অপু সরিয়া মায়ের কাছে ঘেঁষিয়া বসে—ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেজায় শীত করে। হাসিয়া বলে—মা—কি? সেই—শামলঙ্কা বাট্‌না বাটে মাটিতে লুটায় কেশ?...

দুর্গা বলে—ততক্ষণে মা আমার ছেড়ে গিয়েচেন দেশ—

অপু বলে—দূর—হাঁ মা তাই? ততক্ষণে মা আমার ছেড়ে গিয়েচেন দেশ?—কথা বলিয়াই সে দিদির অজ্ঞতায় হাসে।

সর্বজয়ার বুকে ছেলের অবোধ উল্লাসের হাসি শেলের মত বেঁধে। মনে মনে ভাবে—সাতটা নয় পাঁচটা নয়—এই তো একটা ছেলে—কি অদেষ্ট যে ক'রে এসেছিলাম—তার মুখের আবদার রাখতে পারিনে—ঘি না, লুচি না, সন্দেশ না—কি না শুধু দুটো ভাত—নিনক্যি!... আবার ভাবে—এই ভাঙা ঘর, টানাটানির সংসার—অপু মানুষ হোলে আর এ দুঃখ থাকবে না—ভগবান তাকে মানুষ কোরে তোলেন যেন।...

তাহার পর সে বসিয়া বসিয়া গল্প করে, যখন প্রথম সে নিশ্চিন্দিপুরে ঘর করিতে আসিয়াছিল, তখন এক বৎসর এই রকম অবিশ্রান্ত বর্ষায় নদীর জল এত বাড়িয়াছিল যে ঘাটের পথে মুখুয্যেবাগানের কাছে বড় বোঝাই নৌকা পর্যন্ত আসিয়াছে।

অপু বলে—কত বড় নৌকো মা?

—মস্ত—ওই যে খোট্টাদের চূণের নৌকো, সাজিমাটির নৌকো মাঝে মাঝে আসে দেখিচিস্ তো—অত বড—

দুর্গা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে—মা তুমি চারগুছির বিনুনি করতে জানো?

অনেক রাত্রে সর্বজয়ার ঘুম ভঙিয়া যায়—অপু ডাকিতেছে—মা, ওমা ওঠো—আমার গায়ে জল পড়চে—

সর্বজয়া উঠিয়া আলো জ্বালে—বাহিরে ভয়ানক বৃষ্টির শব্দ হইতেছে। ফুটা ছাদ দিয়া ঘরের সর্বত্র জল পড়িতেছে। সে বিছানা সরাইয়া পাতিয়া দেয়। দুর্গা অঘোর জ্বরে শুইয়া আছে—তাহার মা গায়ে হাত দিয়া দ্যাখে তাহার গায়ের কাঁথা ভিজিয়া সপ সপ করিতেছে। ডাকিয়া বলে—দুর্গা—ও দুর্গা শুন্‌ছিস?...একটু ওঠ দিকি? বিছানাটা সরিয়ে নি—ও দুর্গা—শীগ্‌গির, একেবারে ভিজে গেল যে সব?...

ছেলেমেয়ে ঘুমাইয়া পড়িলেও সর্বজয়ার ঘুম আসে না। অন্ধকার রাত—এই ঘন বর্ষা...তাহার মন ছম্‌ছম্ করে—ভয় হয় একটা যেন কিছু ঘটিবে...কিছু ঘটিবে। বুকের মধ্যে কেমন যেন করে। ভাবে—সে মানুষেরই বা কি হোল? কোন পত্তরও আসে না—টাকা মরুক্‌গে যাক। এরকম তো কোনোবার হয় না?...তাঁর শরীরটা ভাল আছে তো? মা সিদ্ধেশ্বরী, স-পাঁচ আনার ভোগ দেবো, ভাল খবর এনে দাও মা—

তার পরদিন সকালের দিকে সামান্য একটু বৃষ্টি থামিল। সর্বজয়া বাটীর বাহির হইয়া দেখিল বাঁশবনের মধ্যের ছোট ডোবাটা জলে ভর্তি হইয়া গিয়াছে। ঘাটের পথে নিবারণের মা ভিজিতে ভিজিতে কোথায় যাইতেছিল, সর্বজয়া ডাকিয়া বলিল—ও নিবারণের মা শোন্—পরে সলজ্জভাবে বলিল—সেই তুই একবার বলিছিলি না, বিন্দাবুনি চাদরের কথা তোর ছেলের জন্যে—তা নিবি?...

নিবারণের মা বলিল—আছে? দেয়া একটু ধরুক, মোর ছেলেরে সঙ্গে ক'রে এখনি আস্‌বো এখন—নতুন আছে মা-ঠাক্‌রুণ, না পুরোনো?...

সর্বজয়া বলিল, তুই আয় না—এখুনি দেখ্‌বি?...একটু পুরোনো, কিন্তু সে কেউ গায়ে দেয় নি—ধোয়াতোলা আছে—পরে একটু থামিয়া বলিল—তোরা আজকাল চাল ভান্‌চিস্ নে?...

নিবারণের মা বলিল—এই বাদলায় কি ধান শুকোয় মা ঠাক্‌রোণ...খাবার ব'লে দুটোখানি রেখে দিইচি অম্‌নি—

সর্বজয়া বলিল—এক কাজ কর না—তাই গিয়ে আমায় আধকাঠা খানেক আজ দিয়ে যাবি?...একটু সরিয়া আসিয়া মিনতির সুরে বলিল—বৃষ্টির জন্যে বাজার থেকে চাল আনাবার লোক পাচ্ছিনে—টাকা নিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চি তা কেউ যদি রাজী হয়—বড় মুস্কিলে পড়িচি মা—

নিবারণের মা স্বীকার হইয়া গেল, বলিল—আস্‌বো এখন নিয়ে, কিন্তু সে ভেটেল ধানের চালির ভাত কি আপনারা খেতে পারবেন মা-ঠাক্‌রোণ?...বড্ড মোটা—

নিমছাল সিদ্ধ দুর্গা আর খাইতে পারে না। তাহার অসুখ একভাবেই আছে। ঔষধ নাই, ডাক্তার নাই, বৈদ্য নাই। বলে—এক পয়সার বিস্কুট আনিয়ে দেবে মা, নোন্‌তা, মুখে বেশ লাগে।

সাবু তাই জোটে না, তার বিস্কুট!

বৈকালবেলা হইতে আবার ভয়ানক বৃষ্টি নামিল। বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ও যেন বেশী করিয়া আসে—ঘোর বর্ষণমুখর নির্জন, জলে থৈ-থৈ, হু-হু পূবে হাওয়া বওয়া, মেঘে অন্ধকারে একাকার ভাদ্র-সন্ধ্যা! আবার সেই রকম কালো কালো পেঁজা তুলোর মত মেঘ উড়িয়া চলিয়াছে...বৃষ্টির শব্দে কান পাতা যায় না—দরজা জানালা দিয়া ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপ্‌টার সঙ্গে বৃষ্টির ছাট্ হু-হু করিয়া ঢোকে—ছেঁড়া থলে ছেঁড়া কাপড় গোঁজা ভাঙা কপাটের আড়ালের সাধ্য কি যে ঝড়ের ভীম আক্রমণের মুখে দাঁড়ায়।

বেশী রাত্রে সকলে ঘুমাইলে বেশী বৃষ্টি নামিল। সর্বজয়ার ঘুম আসে না—সে বিছানায় উঠিয়া বসে। বাহিরে শুধু একটানা হুস্ হুস্ জলের শব্দ; ক্রুদ্ধ দৈত্যের মত গর্জমান একটানা গোঁ গোঁ রবে ঝড়ের দমকা বাড়ীতে বাধিতেছে!··· জীর্ণ কোঠাখানা এক একবারের দম্‌কায় যেন থর থর করিয়া কাঁপে...ভয়ে তাহার প্রাণ উড়িয়া যায়...গ্রামের একধারে বাঁশবনের মধ্যে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে লইয়া নিঃসহায়!...মনে মনে বলে—ঠাকুর, আমি মরি তাতে খেতি নেই—এদের কি করি?—এই রাত্তিরে যাই বা কোথায়?...মনে মনে বসিয়া বসিয়া ভাবে—আচ্ছা যদি কোঠা পড়ে, তবে দালানের দেওয়ালটা বোধ হয় আগে পড়বে—যেমন শব্দ হবে অমনি পান্‌চালার দোর দিয়ে এদের টেনে বার ক'রে নেবো—

সে যেন আর বসিয়া থাকিতে পারে না—কয়দিন সে ওলশাক কচুশাক সিদ্ধ করিয়া খাইয়া দিন কাটাইতেছে—নিজে উপবাসের পর উপবাস দিয়া ছেলেমেয়েকে যাহা কিছু সামান্য খাদ্য ছিল খাওয়াইতেছে—শরীর ভাবনায় অনাহারে দুর্বল, মাথার মধ্যে কেমন করে।

ঝড়ের গোঁ গোঁ শব্দ, অনেক রাত্রে ঝড় বাড়িল। বাহিরে কি ঝট্‌কা আসিল! উপায়! একবার বড় একটা দম্‌কায় ভয় পাইয়া সে ঝড়ের গতিক বুঝিবার জন্য সন্তর্পণে দালানের দুয়ার খুলিয়া বাহিরের

রোয়াকে মুখ বাড়াইল...বৃষ্টির ছাটে কাপড় চুল সব ভিজিয়া গেল—হু-হু একটানা হাওয়ার শব্দে বৃষ্টিপতনের ঝড়ের শব্দ ঢাকিয়া গিয়াছে—বাহিরে কিছু দেখা যায় না—অন্ধকারে মেঘে আকাশে-বাতাসে গাছপালায় সব একাকার! ঝড়-বৃষ্টির শব্দে আর কিছু শোনা যায় না।

এই হিংস্র অন্ধকার ও ক্রূর ঝটিকাময়ী রজনীর আত্মা যেন প্রলয়দেবের দূতরূপে ভীম ভৈরব বেগে সৃষ্টি গ্রাস করিতে ছুটিয়া আসিতেছে—অন্ধকারে, রাত্রে, গাছপালায়, আকাশে, মাটিতে তাহার গতিবেগ বাধিয়া শব্দ উঠিতেছে—সু-ইশ সু-উ-উ-উইশ্...সু উ উ উ ই শ...এই শব্দের প্রথমাংশের দিকে বিশ্বগ্রাসী দূতটা যেন পিছু হটিয়া বল-সঞ্চয় করিতেছে-সু উ উ—এবং শেষের অংশটায় পৃথিবীর উচ্চ নীচ তাবৎ বায়ুস্তর আলোড়ন, মন্থন করিয়া বায়ুস্তরে বিশাল তুফান তুলিয়া তাহার সমস্ত আসুরিকতার বলে সর্বজয়াদের জীর্ণ কোঠাটার পিছনে ধাক্কা দিতেছে—ই ই-শ্...! কোঠা দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে...আর থাকে না! ইহার মধ্যে যেন কোনো অধীরতা, বিশৃঙ্খলতা, ভ্রম-ভ্রান্তি নাই—যেন দৃঢ়, অভ্যস্ত, প্রণালীবদ্ধ ভাবের কর্তব্যকার্য!...বিশ্বটাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চূর্ণ করিয়া উড়াইয়া দেওয়ার ভার যে লইয়াছে, যুগে যুগে এরকম কত হাস্যমুখী সৃষ্টিকে বিধ্বস্ত করিয়া অনন্ত আকাশের অন্ধকারে তারাবাজির মত ছড়াইয়া দিয়া আসিয়াছে সে মহাশক্তিমান্ ধ্বংসদূত—এ তার অভ্যস্ত কার্য...এতে তার অধীরতা উন্মত্ততা সাজে না...

আতঙ্কে সর্বজয়া দোর বন্ধ করিয়া দিল...আচ্ছা যদি এখন একটা কিছু ঘরে ঢোকে? মানুষ কি অন্য কোন জানোয়ার? চারিদিকে ঘন বাঁশবন, জঙ্গল, লোকজনের বসতি নাই—মাগো! জলের ছাটে ঘর ভাসিয়া যাইতেছে...হাত দিয়া দেখিল ঘুমন্ত অপুর গা জলে ভিজিয়া ন্যাতা হইয়া যাইতেছে...সে কি করে? আর কত রাত আছে? সে বিছানা হাতড়াইয়া দেশলাই খুঁজিয়া কেরোসিনের ডিবাটা জ্বালে। ডাকে—ও অপু ওঠ্ তো? জল পড়চে—। অপু ঘুমচোখে জড়িত গলায় কি বলে বোঝা যায় না। আবার ডাকে—অপু? শুন্‌চিস ও অপু? ওঠ দিকি! দুর্গাকে বলে—পাশ ফিরে শো তো দুগ্‌গা। বড্ড জল পড়চে—একটু স'রে, পাশ ফের্ দিকি—

অপু উঠিয়া বসিয়া ঘুমচোখে চারিদিকে চায়— পরে আবার শুইয়া পড়ে। হুড়ুম করিয়া বিষম কি শব্দ হয়, সর্বজয়া তাড়াতাড়ি আবার দুয়ার খুলিয়া বাহিরের দিকে উঁকি মারিয়া দেখিল —বাঁশবাগানের দিকটা ফাঁকা ফাঁকা দেখাইতেছে—রান্নাঘরের দেওয়াল পড়িয়া গিয়াছে!...তাহার বুক কাঁপিয়া ওঠে—এইবার বুঝি পুরানো কোঠাটা—? কে আছে কাহাকে সে এখন ডাকে? মনে মনে বলে—হে ঠাকুর, আজকার রাতটা কোনো রকমে কাটিয়ে দাও, হে ঠাকুর, ওদের মুখের দিকে তাকাও—

তখন ভাল করিয়া ভোর হয় নাই, ঝড় থামিয়া গিয়াছে কিন্তু বৃষ্টি তখনও অল্প অল্প পড়িতেছে। পাড়ার নীলমণি মুখুয্যের স্ত্রী গোহালে গরুর অবস্থা দেখিতে আসিতেছেন, এমন সময় খিড়্কীদোরে বার বার ধাক্কা শুনিয়া দোর খুলিয়া বিস্ময়ের সুরে বলিলেন—নতুন বৌ!...সর্বজয়া ব্যস্তভাবে বলিল—ন'দি একবার বট্ঠাকুরকে ডাকো দিকি?...একবার শীগ্‌গির আমাদের বাড়ীতে আসতে বলো—দুগ্‌গা কেমন করচে!

নীলমণি মুখুয্যের স্ত্রী আশ্চর্য হইয়া বলিলেন—দুগ্‌গা? কেন কি হয়েচে দুগ্‌গার?...

সর্বজয়া বলিল—কদিন থেকে তো জ্বর হচ্ছিল—হচ্ছে আবার যাচ্ছে—ম্যালেরিয়ার জ্বর, কাল সন্দে থেকে জ্বর বড্ড বেশি—তার ওপর কাল রাত্রে কি রকম কাণ্ড তো জানই—একবার শীগ্‌গির বট্ঠাকুরকে—

তাহার বিস্রস্ত কেশ ও রাত-জাগা রাঙা রাঙা চোখের কেমন দিশাহারা চাহনি দেখিয়া নীলমণি মুখুয্যের স্ত্রী বলিলেন—ভয় কি বৌ—দাঁড়াও আমি এখুনি ডেকে দিচ্চি—চল আমিও যাচ্ছি—কাল আবার রাত্তিরে গোয়ালের চালখানা পড়ে গেল—বাবা কাল রাত্তিরের মত কাণ্ড আমি তো কখনো দেখিনি—শেষরাত্রে সব উঠে গরুটরু সরিয়ে রেখে আবার শুয়েচে কিনা?...দাঁড়াও আমি ডাকি—

একটু পরে নীলমণি মুখুয্যে, তাঁহার বড় ছেলে ফণি, স্ত্রী ও দুই মেয়ে সকলে অপুদের বাড়িতে আসিলেন। রাত্রের অন্ধকারে সেই দৈত্যটা যেন সারা গ্রামখানা দলিত, পিষ্ট, মথিত করিয়া দিয়া

আকাশ-পথে অন্তর্হিত হইয়াছে—ভাঙা গাছের ডাল, পাতা, চালের খড়, কাঁচা বাঁশপাতা, বাঁশের কঞ্চিতে পথ ঢাকিয়া দিয়াছে—ঝড়ের বাঁশ নুইয়া পথে আটকাইয়া রহিয়াছে। ফণি বলিল—দেখেচেন বাবা কাণ্ডখানা? সেই নবাবগঞ্জের পাকা রাস্তা থেকে বিলিতি চট্‌কা গাছটার পাতা উড়িয়ে এনেচে!...নীলমণি মুখুয্যের ছোট ছেলে একটা মরা চড়ুই পাখী বাঁশপাতার ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিল।

দুর্গার বিছানার পাশে অপু বসিয়া আছে—নীলমণি মুখুয্যে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—কি হয়েছে বাবা অপু?

অপুর মুখে উদ্বেগের চিহ্ন। বলিল, দিদি কি সব বক্‌ছিল জেঠামশায়।

নীলমণি বিছানার পাশে বসিয়া বলিলেন—দেখি হাতখানা?...জ্বরটা একটু বেশী, আচ্ছা কোনো ভয় নেই—ফণি, তুমি একবার চট ক'রে নবাবগঞ্জে চলে যাও দিকি শরৎ ডাক্তারের কাছে—একেবারে ডেকে নিয়ে আস্‌বে। পরে তিনি ডাকিলেন—দুর্গা, ও দুর্গা? দুর্গার অঘোর আচ্ছন্ন ভাব, সাড়া শব্দ নাই। নীলমণি বলিলেন, এঃ, ঘরদোরের অবস্থা তো বড্ড খারাপ? জল প'ড়ে কাল রাত্রে ভেসে গিয়েচে...তা বৌমার লজ্জার কারণই বা কি—আমাদের ওখানে না হয় উঠলেই হোত? হরিটারও কাণ্ডজ্ঞান আর হোল না এ জীবনে—এই অবস্থায় এইরকম ঘরদোর সারানোর একটা ব্যবস্থা না ক'রে কি যে করচে, তাও জানিনে—চিকালটা ওর সমান গেল—

তাঁহার স্ত্রী বলিলেন—ঘর সারাবে কি, খাবার নেই ঘরে, নৈলে কি এরকম আতান্তরে ফেলে কেউ বিদেশে যায়? আহা, রোগা মেয়েটা কাল সারারাত ভিজেচে—একটু জল গরম করতে দাও—ওই জানালাটা খুলে দাও তো ফণি?

একটু বেলায় নবাবগঞ্জ হইতে শরৎ ডাক্তার আসিলেন—দেখিয়া শুনিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। বলিয়া গেলেন যে বিশেষ ভয়ের কোনো কারণ নেই, জ্বর বেশী হইয়াছে, মাথায় জলপট্টি নিয়মিতভাবে দেওয়ার বন্দোবস্ত করিলেন। হরিহর কোথায় আছে জানা নাই—তবুও তাহার পূর্ব ঠিকানায় তাহাকে একখানি পত্র দেওয়া হইল।

পরদিন ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গেল—আকাশের মেঘ কাটিতে শুরু করিল। নীলমণি মুখুয্যে দুবেলা নিয়মিত দেখাশোনা করিতে লাগিলেন। ঝড় বৃষ্টি থামিবার পরদিন হইতেই দুর্গার জ্বর আবার বড় বাড়িল। শরৎ ডাক্তার সুবিধা বুঝিলেন না। হরিহরকে আর একখানা পত্র দেওয়া হইল।

অপু তাহার দিদির মাথার কাছে বসিয়া জলপটি দিতেছিল। দিদিকে দু-একবার ডাকিল—ও দিদি শুন্‌ছিস্, কেমন আছিস্, ও দিদি? দুর্গার কেমন আচ্ছন্ন ভাব। ঠোঁট নড়িতেছে—কি যেন আপন মনে বলিতেছে, ঘোর ঘোর। অপু কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া দু-একবার চেষ্টা করিয়াও কিছু বুঝিতে পারিল না।

বৈকালের দিকে জ্বর ছাড়িয়া গেল। দুর্গা আবার চোখ মেলিয়া চাহিতে পারিল এতক্ষণ পরে। ভারী দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, চিঁচিঁ করিয়া কথা বলিতেছে, ভাল করিয়া না শুনিলে বোঝা যায় না কি বলিতেছে।

মা গৃহকার্যে উঠিয়া গেলে অপু দিদির কাছে বসিয়া রহিল। দুর্গা চোখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—বেলা কত রে?

অপু বলিল—বেলা এখনও অনেক আছে—রদ্দুর উঠেচে আজ দেখেচিস্ দিদি? এখনও আমাদের নারকেল গাছের মাথায় রোদ্দুর রয়েচে—

খানিকক্ষণ দুজনেই কোনো কথা বলিল না। অনেকদিন পরে রৌদ্র ওঠাতে অপুর ভারি আহ্লাদ হইয়াছে। সে জানালার বাহিরে রৌদ্রালোকিত গাছটার মাথায় চাহিয়া রহিল। খানিকটা পরে দুর্গা বলিল—শোন্ অপু—একটা কথা শোন্—

—কি রে দিদি? পরে সে দিদির মুখের আরও কাছে মুখ লইয়া গেল।

—আমায় একদিন তুই রেলগাড়ী দেখাবি?

—দেখাবো এখন—তুই সেরে উঠলে বাবাকে ব'লে আমরা একদিন গঙ্গা নাইতে যাবো রেলগাড়ী ক'রে—

সারা দিন রাত্রি কাটিয়া গেল। ঝড় বৃষ্টি কোনও কালে হইয়াছিল মনে হয় না। চারিধারে দারুণ শরতের রৌদ্র!

সকাল দশটার সময় নীলমণি মুখুয্যে অনেকদিন পরে নদীতে স্নান করিতে যাইবেন বলিয়া তেল মাখিতে বসিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রীর উত্তেজিত সুর তাঁর কানে গেল—ওগো, এসো তো একবার এদিকে শীগ্‌গীর—অপুদের বাড়ীর দিক থেকে যেন একটা কান্নার গলা পাওয়া যাচ্চে—

ব্যাপার কি দেখিতে সকলে ছুটিয়া গেলেন।

সর্বজয়া মেয়ের মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিতেছে—ও দুগ্‌গা চা দিকি—ওমা, ভাল ক'রে চা দিকি—ও দুগ্‌গা—

নীলমণি মুখুয্যে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—কি হয়েচে—সরো সব সরো দিকি—আহা কি সব বাতাসটা বন্ধ ক'রে দাঁড়াও?

সর্বজয়া ভাসুর-সম্পর্কের প্রবীণ প্রতিবেশীর ঘরের মধ্যে উপস্থিতি ভুলিয়া গিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—ওগো, কি হোল, মেয়ে অমন করচে কেন?

দুর্গা আর চাহিল না।

আকাশের নীল আস্তরণ ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে অনন্তের হাতছানি আসে—পৃথিবীর বুক থেকে ছেলেমেয়েরা চঞ্চল হইয়া ছুটিয়া গিয়া অনন্ত নীলিমার মধ্যে ডুবিয়া নিজেদের হারাইয়া ফেলে—পরিচিত ও গতানুগতিক পথের বহুদূরপারে কোন পথহীন পথে—দুর্গার অশান্ত, চঞ্চল প্রাণের বেলায় জীবনের সেই সর্বাপেক্ষা বড় অজানার ডাক আসিয়া পৌঁছিয়াছে!

তখন আবার শরৎ ডাক্তারকে ডাকা হইল—বলিলেন—ম্যালেরিয়ার শেষ স্টেজটা আর কি—খুব জ্বরের পর যেমন বিরাম হয়েচে আর অমনি হার্টফেল ক'রে—ঠিক এরকম একটা case হয়ে গেল সেদিন দশঘরায়—

আধঘণ্টার মধ্যে পাড়ার লোকে উঠান ভাঙিয়া পড়িল।

পথের পাঁচালী — ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

হরিহর বাড়ীর চিঠি পায় নাই।

এবার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া হরিহর রায় প্রথমে গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর যায়। কাহারও সঙ্গে তথায় পরিচয় ছিল না। শহর-বাজার জায়গা, একটা না একটা কিছু উপায় হইবে এই কুহকে পড়িয়াই সে সেখানে গিয়েছিল। গোয়াড়ীতে কিছুদিন থাকিবার পর সে সন্ধান পাইল যে, শহরে উকিল কি জমিদারের বাড়ীতে দৈনিক বা মাসিক চুক্তি হিসাবে চণ্ডীপাঠ করার কার্য প্রায়ই জুটিয়া যায়। আশায় আশায় দিন পনেরো কাটাইয়া বাড়ী হইতে পথখরচ বলিয়া যৎসামান্য যাহা কিছু আনিয়া ছিল ফুরাইয়া ফেলিল, অথচ কোথাও কিছু সুবিধা হয় না।

সে পড়িল মহাবিপদে—অপরিচিত স্থান, কেহ একটি পয়সা দিয়া সাহায্যে করে এমন নাই—খোড়ে বাজারের যে হোটেলটিতে ছিল পয়সা ফুরাইয়া গেলে সেখান হইতে বাহির হইতে হইল। একজনের নিকট শুনিল স্থানীয় হরিসভায় নবাগত অভাবগ্রস্থ ব্রাহ্মণ পথিককে বিনামূল্যে থাকিতে ও খাইতে দেওয়া হয়। অভাব জানাইয়া হরিসভার একটা কুঠুরির একপাশে থাকিবার স্থান পাইল বটে, কিন্তু সেখানে বড় অসুবিধা, অনেকগুলি নিষ্কর্মা গাঁজাখোর লোক রাত্রিতে সেখানে আড্ডা করে, প্রায় সমস্ত রাত্রি হৈ হৈ করিয়া কাটায়, এমন কি গভীর রাত্রিতে এক-একদিন এমন ধরণের স্ত্রীলোকের যাতায়াত দেখা যাইতে লাগিল যাহাদের ঠিক হরিমন্দির-দর্শন-প্রার্থিনী ভদ্রমহিলা বলে মনে হয় না।

অতিকষ্টে দিন কাটাইয়া সে শহরের বড় বড় উকিল ও ধনী গৃহস্থের বাড়ীতে ঘুরিতে লাগিল। সারাদিন ঘুরিয়া অনেক রাত্রিতে ফিরিয়া এক-একদিন দেখিত তাহার স্থানটিতে তাহারাই বিছানাটি টানিয়া লইয়া কে একজন অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। হরিহর কয়েকদিন বাহিরের

বারান্দায় শুইয়া কাটাইল। প্রায়ই এরূপ হওয়াতে ইহা লইয়া গাঁজাখোর সম্প্রদায়ের সহিত তাহার একটু বচসা হইল। পরদিন প্রাতে তাহারা হরিসভায় সেক্রেটারীর কাছে গিয়া কি লাগাইল তাহারাই জানে—সেক্রেটারী-বাবু নিজ বাড়ীতে হরিহরকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন ও বলিলেন, তাহাদের হরিসভায় তিনদিনের বেশী থাকিবার নিয়ম নাই, সে যেন অন্যত্র বাসস্থান দেখিয়া লয়।

সন্ধ্যার পরে জিনিসপত্র লইয়া হরিহরকে হরিসভার বাড়ী হইতে বাহির হইতে হইল।

খোড়ে নদীর ধারে অল্প একটু নির্জন স্থানে পুঁটুলিটা নামাইয়া রাখিয়া নদীর জলে হাত মুখ ধুইল।

সারাদিন কিছু খাওয়া হয় নাই—সেদিন একটি কাঠের গোলাতে বসিয়া শ্যামাবিষয় গান করিয়াছিল—গোলার অধিকারী একটি টাকা প্রণামী দেয়—সেই টাকাটি হইতে কিছু পয়সা ভাঙাইয়া বাজার হইতে মুড়ি ও দই কিনিয়া আনিল। খাবার গলা দিয়ে যেন নামে না—মাত্র দিনদশেকের সম্বল রাখিয়া সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছে। অদ্য প্রায় দুই মাসের উপর হইয়া গেল—এ পর্যন্ত একটি পয়সা পাঠাইতে পারে নাই—এতদিন কি করিয়া তাহাদের চলিতেছে! অপু বাড়ী হইতে আসিবার সময় বার বার বলিয়া দিয়াছে—তাহার জন্য একখানা পদ্মপুরাণ কিনিয়া লইয়া যাইবার জন্য। ছেলে বই পড়িতে বড় ভালোবাসে—মাঝে মাঝে সে যে বাপের বাক্স-দপ্তর হইতে লুকাইয়া বই বাহির করিয়া লইয়া পড়ে, তাহা হরিহর বুঝিতে পারে—বাক্সের ভিতর আনাড়ি হাতের হেলাগোছা করা থাকে—কোন্ বই বাবা বাক্সের কোথায় রাখে, ছেলে তাহা জানে না—উল্টাপাল্টা করিয়া সাজাইয়া চুরি ঢাকিবার অক্ষম চেষ্টা করে—হরিহর বাড়ী ফিরিয়া বাক্স খুলিলেই বুঝিতে পারে ছেলের কীর্তি।

তাহার বাড়ী হইতে আসিবার পূর্বে হরিহর যুগীপাড়া হইতে একখানা বটতলার পদ্য পদ্মপুরাণ পড়িবার জন্য লইয়া আসে—অপু বইখানা দখল করিয়া বসিল—রোজ রোজ পড়ে—কুচুনী পাড়ায় শিবঠাকুরের মাছ ধরিতে যাওয়ার কথাটা পড়িয়া তাহার ভারী আমোদ—হরিহর বলে—বইখানা দ্যাও বাবা, যাদের বই তারা চাচ্চে যে! অবশেষে একখানা পদ্মপুরাণ তাহাকে কিনিয়া দিতে হইবে—এই শর্তে বাবাকে রাজী করাইয়া তবে সে বই ফেরৎ দেয়। আসিবার সময় বার বার বলিয়াছে—সেই বই একখানা এনো কিন্তু, বাবা, এবার অবিশ্যি অবিশ্যি। দুর্গার উঁচু নজর নাই, সে বলিয়া দিয়াছে, একখানা সবুজ হাওয়াই কাপড় ও একপাতা ভাল দেখিয়া আলতা লইয়া যাইবার জন্য। কিন্তু সে সব তো দূরের কথা, কি করিয়া বাড়ীর সংসার চলিতেছে সেই না এখন সমস্যা! সন্ধ্যার পর পূর্ব-পরিচিত কাঠের গোলাটায় গিয়া সে রাত্রের মত আশ্রয় লইল। ভালো ঘুম হইল না—বিছানায় শুইয়া বাড়ীতে কি করিয়া কিছু পাঠায় এই ভাবনায় এপাশ-ওপাশ করিতে লাগিল।

সকালে উঠিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে সে লক্ষ্যহীন ভাবে একস্থানে দাঁড়াইল। রাস্তার ওপারে একটা লাল ইঁটের লোহার ফটকওয়ালা বাড়ী। অনেকক্ষণ চাহিয়া তাহার কেমন মনে হইল এই বাড়ীতে গিয়া দুঃখ জানাইলে তাহার একটা উপায় হইবে। কলের পুতুলের মত সে ফটকের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। সাজানো বৈঠকখানা, মার্বেল পাথরের ধাপে স্তরে স্তরে বসানো ফুলের টব, পাথরের পুতুল, পাম্, দরজায় ঢুকিবার স্থানে পা-পোষ পাতা। একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বৈঠকখানায় খবরের কাগজ পড়িতেছেন—অপরিচিত লোক দেখিয়া কাগজ পাশে রাখিয়া সোজা হইয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তুমি? কি দরকার?

হরিহর বিনীতভাবে বলিল—আজ্ঞে আমি ব্রাহ্মণ—সংস্কৃত পড়া আছে, চণ্ডী পাঠ-টাট্ করি—তা ভাগবত কি গীতা পাঠও—

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি ভাল করিয়া কথা না শুনিয়াই তাঁহার সময় অত্যন্ত মূল্যবান্, বাজে কথা শুনিবার সময় নিতান্ত সংক্ষেপ জানাইয়া দিবার ভাবে বলিলেন—না, এখানে ওসব কিছু এখন সুবিধে হবে না, অন্য জায়গায় দেখুন।

হরিহর মরীয়া ভাবে বলিল—আজ্ঞে নতুন শহরে এসেচি, একেবারে কিছু হাতে নেই—বড় বিপদে পড়িচি, ক'দিন ধ'রে কেবলই—

প্রৌঢ় লোকটি তাড়াতাড়ি বিদায় করিবার ভঙ্গীতে ঠেস দেওয়ার তাকিয়াটা উঠাইয়া একটা কি তুলিয়া লইয়া হরিহরের দিকে হাত বাড়াইয়া বলিলেন—এই নিন, যান্, অন্য কিছু হবে-টবে না, নিন। সেটা যে শ্রেণীর মুদ্রাই হউক সেইটাই অন্য সুরে দিতে আসিলে হরিহর লইতে কিছুমাত্র আপত্তি করিত

না—এরূপ সে বহুস্থানে লইয়াছেও; কিন্তু সে বিনীতভাবে বলিল—আজ্ঞে ও আপনি রাখুন, আমি এম্‌নি কারুর কাছে নিইনে—আমি শাস্ত্র পাঠ-টাট্ করি—তা ছাড়া কারুর কাছে—আচ্ছা থাক্—

একটু শুভযোগ বোধ হয় ঘটিয়াছিল। রক্ষিত মহাশয়ের কাঠের গোলাতেই একদিন একটা সন্ধান জুটিল। কৃষ্ণনগরে কাছে একটা গ্রামে একজন বর্ধিষ্ণু মহাজন গৃহ দেবতার পূজা-পাঠ করিবার জন্য একজন ব্রাহ্মণ খুঁজিতেছে, যে বরাবর টিকিয়া থাকিবে। রক্ষিত মহাশয়ের যোগাযোগে অবিলম্বে হরিহর সেখানে গেল—বাড়ীর কর্তাও তাহাকে পছন্দ করিলেন। থাকিবার ঘর দিলেন, আদর-আপ্যায়নের কোন ত্রুটি হইল না।

কয়েকদিন কাজ করিবার পরেই পূজা আসিয়া পড়িল। বাড়ী যাইবার সময় বাড়ীর কর্তা দশ টাকা প্রাণামী ও যাতায়াতের গাড়ীভাড়া দিলেন, গোয়াড়ীতে রক্ষিত মহাশয়ের নিকট বিদায় লইতে আসিলে সেখান হইতে পাঁচটি টাকা প্রণামী পাওয়া গেল।

আকাশে-বাতাসে গরম রৌদ্রের গন্ধ, নীল নির্মেঘ আকাশের দিকে চাহিলে মনে হঠাৎ উল্লাস আসে, বর্ষাশেষের সরস সবুজ লতাপাতায় পথিকের চরণভঙ্গীতে কেমন একটা আনন্দ মাখানো। রেলপথের দুপাশে কাশ ফুলের ঝাড় গাড়ীর বেগে লুটাইয়া পড়িতেছে, চলিতে চলিতে কেবলই বাড়ীর কথা মনে হয়।

একদল শান্তিপুরের ব্যবসায়ী লোক পূজার পূর্বে কাপড়ের গাঁট ক্রয় করিতে কলিকাতায় গিয়াছিল, চূর্ণীঘাটের খেয়ার নৌকায় উঠিয়া কলরব করিতেছে—সর্বত্র একটা উৎসবের উল্লাস। রাণাঘাটের বাজারে সে স্ত্রী ও পুত্রকন্যার জন্য কাপড় কিনিল। দুর্গা লালপাড় কাপড় পরিতে ভালবাসে, তাহার জন্য বাছিয়া একখানা ভাল কাপড়, ভাল দেখিয়া আল্‌তা কয়েক পাতা। অপুর 'পদ্মপুরাণ' অনেক সন্ধান করিয়াও মিলিল না, অবশেষে একখানা 'সচিত্র চণ্ডী-মাহাত্ম্য বা কালকেতুর উপাখ্যান' ছয় আনা মূল্যে কিনিয়া লইল। গৃহস্থালীর টুক্‌টাক দু'একটা জিনিস সর্বজয়া বলিয়া দিয়াছিল—একটা কাঠের চাকী-বেলুনের কথা, তাহাও কিনিল।

দেশের স্টেশনে নামিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে বৈকালের দিকে সে গ্রামে আসিয়া পৌঁছিল। পথে বড় একটা কাহারও সহিত দেখা হইল না, দেখা হইলেও সে হন্ হন্ করিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে কাহারও দিকে বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া বাড়ীর দিকে চলিল। দরজায় ঢুকিতে ঢুকিতে আপন মনে বলিল—উঃ, দ্যাখো কাণ্ডখানা, বাঁশ-ঝাড়টা ঝুঁকে পড়েচে একেবারে পাঁচিলের ওপর, ভুবন কাকা কাটাবেনও না—মুস্কিল হয়েচে আচ্ছা—পরে সে বাড়ীর উঠানে ঢুকিয়া অভ্যাসমত আগ্রহের সুরে ডাকিল—ওমা দুগ্‌গা —ও অপু—

তাহার গলার স্বর শুনিয়া সর্বজয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

হরিহর হাসিয়া বলিল—বাড়ীর সব ভালো? এরা সব কোথায় গেল? বাড়ী নেই বুঝি?

সর্বজয়া শান্তভাবে আসিয়া স্বামীর হাত হইতে পুঁটুলিটা নামাইয়া লইয়া বলিল, এসো—ঘরে এসো। স্ত্রীর অদৃষ্টপূর্ব শান্তভাব হরিহর লক্ষ্য করিলেও তাহার মনে কোনো খটকা হইল না—তাহার কল্পনার স্রোত তখন উদ্দাম বেগে অন্যদিকে ছুটিয়াছে—এখনই ছেলে মেয়ে ছুটিয়া আসিবে—

দুর্গা আসিয়া হাসিমুখে বলিবে—কি বাবা এর মধ্যে? অমনি ছেলে মেয়ে ছুটিয়া আসিবে—মেয়ের কাপড় ও আলতার পাতা এবং ছেলের সচিত্র 'চণ্ডী-মাহাত্ম্য বা কালকেতুর উপাখ্যান' ও টিনের রেলগাড়ীটা দেখাইয়া তাহাদের তাক্ লাগাইয়া দিবে। সে ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিল, বেশ কাঁঠালের চাকী—বেলুন এনিচি এবার। পরে কিছু নিরাশামিশ্রিত সতৃষ্ণ নয়নে চারিদিকে চাহিয়া বলিল, কৈ—অপু দুগ্‌গা এরা বুঝি সব বেরিয়েচে—

সর্বজয়া আর কোনো মতেই চাপিতে পারিল না। উচ্ছাসিত কণ্ঠে ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল—ওগো দুগ্‌গা কি আর আছে গো—মা যে আমাদের ফাঁকি দিয়ে চ'লে গিয়েচে গো—এতদিন কোথায় ছিলে!

গাঙ্গুলী বাড়ীর পূজা অনেক কালের। এ কয়দিন গ্রামে অতি বড় দরিদ্রও অভুক্ত থাকে না। সব বনেদী বন্দোবস্ত, নির্দিষ্ট সময়ে কুমোর আসিয়া প্রতিমা গড়ায়, পোটো চালচিত্র করে, মালাকার সাজ যোগায়, বারাসে-মধুখালির দ' হইতে বাউরিরা রাশি রাশি পদ্মফুল তুলিয়া আনে!

আঁসমালির দীনু সানাইদার অন্য অন্য বৎসরের মত রসুনচৌকী বাজাইতে আসিল। প্রভাতের আকাশ আগমনীর আনন্দ সুর বাজিয়া ওঠে—আসন্ন হেমন্ত ঋতুর স্নেহঅভ্যর্থনা—নব ধান্যগুচ্ছের, নব আগন্তুক শেফালিদলের, হিমালয়ের পার হইতে উড়িয়া আসা পথিক-পাখী শ্যামার, শিশিরস্নিগ্ধ মৃণাল-ফোটা হেমন্তসন্ধ্যার।

নূতন কাপড় পরাইয়া ছেলেকে সঙ্গে লইয়া হরিহর নিমন্ত্রণ খাইতে যায়। একখানা অগোছালো চুলে-ঘেরা ছোট মুখের সনির্বন্ধ গোপন অনুরোধ দুয়ারের পাশের বাতাসে মিশাইয়া থাকে—হরিহর পথে পা দিয়ে কেমন অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে—ছেলেকে বলে, এগিয়ে চলো, অনেক বেলা হয়ে গিয়েচে বাবা—

গাঙ্গুলী বাড়ীর প্রাঙ্গণ উৎসববেশে সজ্জিত হাসিমুখ ছেলেমেয়েতে ভরিয়া গিয়াছে। অপু চাহিয়া দেখিল সতু ও তাহার ভাই কেমন কমলানেবু রংএর জামা গায়ে দিয়াছে—সবুজ শাড়ী পরিয়া ও দিব্য চুল বাঁধিয়া রাণু দিদিকে যা মানাইয়াছে! গাঙ্গুলী বাড়ীর মেয়ে সুনয়নী খোঁপায় রজনীগন্ধা ফুল গুঁজিয়া আর পাঁচ-ছয়টি মেয়ের সঙ্গে পূজার দালানে দাঁড়াইয়া খুব গল্প করিতেছে ও হাসিতেছে। সুনয়নী বাদে বাকী মেয়েদের সে চেনে না, বোধ হয় অন্য জায়গা হইতে উহাদের বাড়ী পূজার সময় আসিয়া থাকিবে—শহরের মেয়ে বোধ হয়, যেমন সাজাগোজ, তেমন দেখিতে! অপু একদৃষ্টে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল। ওদিকে কে চেঁচাইয়া বলিতেছে—বড় সামিয়ানাটা আনবার ব্যবস্থা এখনও হোল না?—বাঃ—তোমাদের যা কাজ-কর্ম, দেখো এখন এর পর মজাটা। তারপর ব্রাহ্মণ খেতে বস্‌বে কি বেলা পাঁচটায়?

পথের পাঁচালী সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

দেখিতে দেখিতে দিন কাটিয়া গেল। শীতকালও শেষ হইতে চলিয়াছে।

দুর্গার মৃত্যুর পর হইতে সর্বজয়া অনবরত স্বামীকে এ গ্রাম হইতে উঠিয়া যাইবার তাগিদ দিয়া আসিতেছিল, হরিহরও নানাস্থানে চেষ্টার কোন ত্রুটি করে নাই। কিন্তু কোনো স্থানেই কোনো সুবিধা হয় নাই। সে আশা সর্বজয়া আজকাল একরূপ ছাড়িয়াই দিয়াছে। মধ্যে গত শীতকালে হরিহরের জ্ঞাতিভ্রাতা নীলমণি রায়ের বিধবা স্ত্রী এখানে আসিয়াছেন ও নিজেদের ভিটা জঙ্গলাবৃত হইয়া যাওয়াতে ভুবন মুখুয্যের বাটীতে উঠিয়াছেন। হরিহর নিজের বাটীতে বৌদিদিকে আনাইয়া রাখিবার যথেষ্ট আগ্রহ দেখাইয়া ছিল কিন্তু নীলমণি রায়ের স্ত্রী রাজী হন নাই। এখানে বর্তমানে তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে মেয়ে অতসী ও ছোট ছেলে সুনীল। বড় ছেলে সুরেশ কলিকাতায় স্কুলে পড়ে, গ্রীষ্মের বন্ধের পূর্বে এখানে আসিতে পারিবে না। অতসীর বয়স বছর চৌদ্দ, সুনীলের বয়স আট বৎসর। সুনীল দেখিতে তত ভাল নয় ; কিন্তু অতসী বেশ সুশ্রী, তবে খুব সুন্দরী বলা চলে না। তাহা হইলেও বরাবর ইহারা লাহোরে কাটাইয়াছে, নীলমণি রায় সেখানে কমিসারিয়েটে চাকরি করিতেন, সেখানে লালিত পালিত; কাজেই পশ্চিম-প্রদেশ-সুলভ নিটোল স্বাস্থ্য ইহাদের প্রতি অঙ্গে।

ইহারা এখানে প্রথম আসিলে সর্বজয়া বড়মানুষ জা'য়ের সঙ্গে মেশামেশি করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল। সুনীলের মা নগদে ও কোম্পানীর কাগজে দশ হাজার টাকার মালিক এ কথা জানিয়া জায়ের প্রতি সম্ভ্রমে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া যায়, গায়ে পড়িয়া আলাপ জমাইবার চেষ্টা কম করে নাই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সর্বজয়া নির্বোধ হইলেও বুঝিতে পারিল যে, সুনীলের মা তাহাকে ততটা আমল দিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহার স্বামী চিরকাল বড় চাকরি করিয়া আসিয়াছেন, তিনি ও তাঁহার ছেলেমেয়ে অন্যভাবে জীবনযাপনে অভ্যস্ত। শুরু হইতেই তিনি দরিদ্র জ্ঞাতি পরিবার হরিহরের সঙ্গে এমন একটা ব্যবধান রাখিয়া চলিতে লাগিলেন যে সর্বজয়া আপনিই হটিয়া আসিতে বাধ্য হইল। কথায়, ব্যবহারে, কাজে, খুঁটিনাটি সব ব্যাপারেই তিনি জানাইয়া দিতে লাগিলেন যে, সর্বজয়া কোনরকমেই তাঁহাদের সঙ্গে সমানে সমানে মিশিবার যোগ্য নহে। তাঁহাদের কথাবার্তায়, পোশাক-পরিচ্ছদে, চালচলনে এই ভাবটা অনবরত প্রকাশ পায় যে, তাঁহারা অবস্থাপন্ন ঘর। ছেলেমেয়ে সর্বদা ফিট্‌ফাট্ সাজিয়া আছে, কাপড়

এতটুকু ময়লা হইতে পায় না, চুল সর্বদা আঁচড়ানো, অতসীর গলায় হার, হাতে সোনার চুড়ি, কানে সোনার দুল, একপ্রস্থ চা ও খাবার না খাইয়া সকালে কেহ কোথাও বাহির হয় না, সঙ্গে পশ্চিমা চাকর আছে, সে-ই সব গৃহকর্ম করে—মোটের উপর সর্ব বিষয়েই সর্বজয়াদের দরিদ্র সংসারের চাল-চলন হইতে উহাদের ব্যাপারের বহু পার্থক্য।

সুনীলের মা নিজের ছেলেকে গ্রামের কোনো ছেলের সঙ্গেই বড় একটা মিশিতে দেন না, অপুর সঙ্গেও নয়—পাছে পাড়াগাঁয়ের এই সব অশিক্ষিত অসভ্য ছেলেপিলেদের দলে মিশিয়া তাঁহার ছেলেমেয়ে খারাপ হইয়া যায়। তিনি এ গ্রামে বাস করিবার জন্য আসেন নাই, জরীপের সময় নিজেদের বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতে আসাই তাঁহার উদ্দেশ্য। ভুবন মুখুয্যেরা ইঁহাদের কিছু জমা রাখেন, সেই খাতিরে পশ্চিম কোঠায় দুখানা ঘর ইঁহাদের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছেন, রান্নাবান্না খাওয়া-দাওয়াও ইঁহাদের পৃথক হয়। ভুবন মুখুয্যেদের সঙ্গে ব্যবহারে সুনীলের মায়ের কোনো পার্থক্য দৃষ্ট হয় না; কারণ ভুবন মুখুয্যের পয়সা আছে, কিন্তু সর্বজয়াকে তিনি একেবারে মানুষের মধ্যেই গণ্য করেন না।

দোলের সময় নীলমণি রায়ের বড় ছেলে সুরেশ কলিকাতা হইতে আসিয়া প্রায় দিন দশেক বাড়ী রহিল। সুরেশ অপুরই বয়সী, ইংরাজী স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। দেখিতে খুব ফর্সা নয়, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। নিয়মিত ব্যায়াম করে বলিয়া শরীর বেশ বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্যবান। অপুর অপেক্ষা এক বৎসর মাত্র বয়স বেশী হইলেও আকৃতি ও গঠনে পনের-ষোল বৎসরের ছেলের মত দেখায়। সুরেশও এপাড়ার ছেলের সঙ্গে বড় একটা মেশে না। ওপাড়ায় গাঙ্গুলীবাড়ীর রামনাথ গাঙ্গুলীর ছেলে তাহার সহপাঠী। গাঙ্গুলীবাড়ী রামনবমী দোলের খুব উৎসব হয়, সেই উপলক্ষ্যে সেও মামার বাড়ী বেড়াইতে আসিয়াছে। সুরেশ অধিকাংশ সময় সেখানেই কাটায়, গাঁয়ের অন্য কোনো ছেলে মিশিবার যোগ্য বলিয়া সেও বোধ হয় বিবেচনা করে না।

যে পোড়ো ভিটাটা জঙ্গলাবৃত হইয়া বাড়ীর পাশে পড়িয়া থাকিত সে জ্ঞান হইয়া অবধি দেখিতেছে, সেই ভিটার লোক ইহারা। সে হিসাবে ইহাদিগের প্রতি অপুর একটা বিচিত্র আকর্ষণ। তাহার সমবয়সী সুরেশ কলিকাতায় পড়ে—ছুটিতে বাড়ী আসিলে তাহার সহিত আলাপ করিবার জন্য অনেকদিন হইতে সে প্রতীক্ষায় ছিল। কিন্তু সুরেশ আসিয়া তাহার সহিত তেমন মিশিল না, তা ছাড়া সুরেশের চালচলন কথাবার্তার ধরণ এমনি যে সে যেন প্রতিপদেই দেখাইতে চায়, গ্রামের ছেলেদের চেয়ে সে অনেক বেশী উঁচু। সমবয়সী হইলেও মুখচোরা অপু তাহাতে আরও ভয় পাইয়া কাছে ঘেঁসে না।

অপু এখনও পর্যন্ত কোনো স্কুলে যায় নাই, সুরেশ তাহাকে লেখাপড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিয়াছে, আমি বাড়ীতে বাবার কাছে পড়ি। দোলের দিন গাঙ্গুলীদের পুকুরে বাঁধাঘাটে জলপাইতলায় বসিয়া সুরেশ গ্রামের ছেলেদিগকে দিগ্বিজয়ী নৈয়ায়িক পণ্ডিতের ভঙ্গীতে এ-প্রশ্ন ও-প্রশ্ন করিতেছিল। অপুকে বলিল—বল তো ইণ্ডিয়ার বাউণ্ডারী কি? জিওগ্রাফী জানো?

অপু বলিতে পারে নাই। সুরেশ আবার জিজ্ঞাসা করিল, অঙ্ক কি কষেচ? ডেসিমল্ ফ্র্যাকশান কষতে পারো?

অপু অতশত জানে না। না জানুক, তাহার সেই টিনের বাক্সটিতে বুঝি কম বই আছে? একখানা নিত্যকর্মপদ্ধতি, একখানা পুরানো প্রাকৃতিক ভূগোল, একখানা শুভঙ্করী, পাতা-ছেঁড়া বীরাঙ্গনা কাব্য একখানা, মায়ের সেই মহাভারত—এই সব। সে ঐ সব বই পড়িয়াছে,—অনেকবার পড়া হইয়া গেলেও আবার পড়ে। তাহার বাবা প্রায়ই এখান ওখান হইতে চাহিয়া চিন্তিয়া বই আনিয়া দেয়, ছেলে খুব লেখাপড়া শিখিবে, পণ্ডিত হইবে, তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে, এ বিষয়ে বিকারের রোগীর মত তাহার একটা অদম্য অপ্রশমনীয় পিপাসা। কিন্তু তাহার পয়সা নাই, দূরের স্কুলের বোর্ডিং-এ রাখিয়া দিবার মত সঙ্গতির একান্ত অভাব, নিজেও খুব বেশী লেখাপড়া জানে না। তবুও যতক্ষণ সে বাড়ী থাকে নিজের কাছে বসাইয়া ছেলেকে এটা ওটা পড়ায়, নানা গল্প করে, ছেলেকে অঙ্ক শিখাইবার জন্য নিজে একখানা শুভঙ্করীর সাহায্যে বাল্যের অধীত বিস্মৃত বিদ্যা পুনরায় ঝালাইয়া তুলিয়া তবে ছেলেকে অঙ্ক কষায়। যাহাতেই মনে করে ছেলের জ্ঞান হইবে, সেইটাই হয় ছেলেকে

পড়িতে দেয়, নতুবা পড়িয়া শোনায়। সে বহুদিন হইতে বঙ্গবাসীর গ্রাহক, অনেক দিনের পুরানো বঙ্গবাসী তাহাদের ঘরে জমা আছে, ছেলে বড় হইলে পড়িবে এজন্য হরিহর সেগুলিকে সযত্নে বাণ্ডিল বাঁধিয়া তুলিয়া রাখিয়া দিয়াছিল, এখন সেগুলি কাজে লাগিতেছে। মূল্য দিতে না পারায় নূতন কাগজ আর তাহাদের আসে না, কাগজওয়ালারা কাগজ দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে। ছেলে যে এই ‘বঙ্গবাসী’ কাগজখানার জন্য কিরূপ পাগল, শনিবার দিনটা সকালবেলা খেলাধূলা ফেলিয়া কেমন করিয়া সে যে ভুবন মুখুয্যের চণ্ডীমণ্ডপে ডাকবাক্সটার কাছে পিওনের প্রত্যাশায় হাঁ করিয়া বসিয়া থাকে—হরিহর তাহা খুব জানে বলিয়াই ছেলের এত আদরের জিনিসটা যোগাইতে না পারিয়া তাহার বুকের ভিতর বেদনায় টনটন করে।

অপু তবুও পুরাতন ‘বঙ্গবাসী’ পড়িয়া অনেক গল্প শিখিয়াছে। পটুর কাছে বলে—লিউকা ও রাফেল মার্টিনিক দ্বীপের অগ্ন্যুৎপাত, সোনাকরা যাদুকরের গল্প, আরও কত কথা। কিন্তু স্কুলের লেখাপড়া তাহার কিছুই হয় না। মোটে ভাগ পর্যন্ত অঙ্ক জানে, ইতিহাস নয়, ব্যাকরণ নয়, জ্যামিতি পরিমিতির নামও শোনে নাই, ইংরাজির দৌড় ফার্স্ট বুকের গোড়ার পাতা।

ছেলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাহার মায়ের একটু অন্যরূপ ধারণা। সর্বজয়া পাড়াগাঁয়ের মেয়ে। ছেলে স্কুলে পড়িয়া মানুষ হইবে এ উচ্চ আশা তাহার নাই। তাহার পরিচিত মহলে কেউ কখনো স্কুলের মুখ দেখে নাই। তাহাদের যে সব শিষ্য-বাড়ী আছে, ছেলে আর কিছুদিন পরে সে সব ঘরে যাতায়াত করিবে, সেগুলি বজায় রাখিবে, ইহাই তাহার বড় আশা। আরও একটা আশা সর্বজয়া রাখে। গ্রামের পুরোহিত দীনু ভট্টাচার্য বৃদ্ধ হইয়াছে। ছেলেরাও কেহ উপযুক্ত নয়। রাণীর মা, গোকুলের বউ, গাঙ্গুলী বাড়ীর বড়বধূ সকলেই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে তাঁহারা ইহার পর অপুকে দিয়া কাজকর্ম করাইবেন, দীনু ভট্টাচার্যের অবর্তমানে তাঁহার গাঁজাখোর পুত্র ভোম্বলের পরিবর্তে নিষ্পাপ, সরল, সুশ্রী এই ছেলেটি গ্রামের মনসা-পূজায় লক্ষ্মী-পূজায় তহাদের আয়োজনের সঙ্গী হইয়া থাকিবে, গ্রামের মেয়েরা এই চায়। অপুকে সকলেই ভালবাসে। ঘাটে পথে প্রতিবেশিনীদের মুখে এ ইচ্ছা প্রকাশ করিতে সর্বজয়া অনেকবার শুনিয়াছে এবং এইটাই বর্তমানে তাহার সব চেয়ে উচ্চ আশা। সে গরীব ঘরের মেয়ে, গরীব ঘরের বধূ, ইহা ছাড়া কোনো উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ধারণা নাই। এই যদি ঘটে তাহা হইলেই শেষ রাত্রের স্বপ্নকে সে হাতের মুঠোয় পায়।

একদিন এ কথা ভুবন মুখুয্যের বাড়ীতে উঠিয়াছিল। দুপুরের পর সেখানে তাসের আড্ডায় পাড়ার অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। সর্বজয়া সকলের মন যোগাইবার ভাবে বলিল—এই বড় খুড়ী আছেন, ঠাকুমা আছেন, মেজদি আছেন, এঁদের যদি দয়া হয় তবে অপু আমার সামনের ফাগুনে পৈতেটা দিয়ে নিয়ে গাঁয়ের পূজোটাতে হাত দিতে পারে। ওর আমার তা হলে ভাবনা কি? আট দশ ঘর শিষ্যবাড়ী আছে, আর যদি মা সিদ্ধেশ্বরীর ইচ্ছেয় গাঙ্গুলী বাড়ীর পুজোটা বাঁধা হয়ে যায় তাহ'লেই—

সুনীলের মা মুখ টিপিয়া হাসিলেন। তাঁহার ছেলে সুরেশ বড় হইলে আইন পড়িয়া—তাঁহার জেঠতুতো ভাই পাটনার বড় উকিল, তাঁহার কাছে আসিয়া ওকালতী করিবে। সুরেশের সে মামা নিঃসন্তান অথচ খুব পসারওয়ালা উকীল। এখন হইতেই তাঁহাদের ইচ্ছা যে সুরেশকে কাছে রাখিয়া লেখাপড়া শেখান,—কিন্তু সুনীলের মা পরের বাড়ী ছেলে রাখিতে যাইবেন কেন ইত্যাদি সংবাদ নির্বোধ সর্বজয়ার মত হাউ হাউ না বকিয়াও, ইতিপূর্বে মাঝে-মিশালে কথাবার্তার ফাঁকে তিনি সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

ভুবন মুখুয্যের বাড়ীর বাহিরে আসিয়া সর্বজয়া ছেলেকে বলিল—শোন একটা কথা—পরে চুপি চুপি বলিল—তোর জেঠীমার কাছে গিয়া বলিস্ না যে, জেঠীমা আমার জুতো নেই—আমায় একজোড়া জুতো দাও না কিনে?

অপু বলিল, কেন মা?

—বলিস্ না, বড়লোক ওরা, চাইলে হয়তো ভলো একজোড়া জুতো দেবে এখন—দেখিস্নি যেমন ঐ সুরেশের পায়ে আছে? তোর পায়ে ওইরকমই লাল জুতো বেশ মানায়—

অপু লাজুক মুখে বলিল—আমার বড় লজ্জা করে, আমি বলতে পারবো না—কি হয়তো ভাববে—আমি...

সর্বজয়া বলিল—তা এতে আবার লজ্জা কি!...আপনার জন—বলিস না —তাতে কি?

—হুঁ...উ—আমি বলতে পারবো না মা। আমি কথা বল্‌তে পারিনে জেঠীমার সামনে...

সর্বজয়া রাগ করিয়া বলিল—তা পারবে কেন? তোমার যত বিদ্ধি সব ঘরের কোণে—খালি পায়ে বেড়িয়ে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছো, আজ দু'বছর পায়ে নেই জুতো সে ভালো, বড়লোক, চাইলে হয়ত দিয়ে দিত কিনে—তা তোমার মুখ দিয়ে বাক্যি বেরুবে না—মুখচোরার রাজা—

পূর্ণিমার দিন রাণীদের বাড়ী সত্যনারায়ণের পূজার প্রসাদ আনিতে অপু সেখানে গেল। রাণী তাহাকে ডাক দিয়া হাসিমুখে বলিল—আমাদের বাড়ী তো আগে আগে কত আস্‌তিস্‌, আজকাল আসিস্‌ নে কেন রে?

—কেন আসবো না রাণুদি,—আসি তো?

রাণী অভিমানের সুরে বলিল—হ্যাঁ আসিস্‌! ছাই আসিস্‌! আমি তোর কথা কত ভাবি। তুই ভাবিস্‌ আমার, আমাদের কথা?

—না বৈ কি! বা রে—মাকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখো দিকি?

এ ছাড়া অন্য কোনো সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ তাহার যোগাইল না। রাণী তাহাকে সেখানে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া নিজে গিয়া তাহার জন্য ফল প্রসাদ ও সন্দেশ লইয়া আসিয়া হাতে দিল। হাসিয়া বলিল,—থালা সুদ্ধ নিয়ে যা, আমি কাল গিয়ে খুড়ীমার কাছ থেকে নিয়ে আসবো—

রাণীর মুখের হাসিতে তাহার উপর একটা পরম নির্ভরতার ভাব আসিল অপুর। রাণুদি কি সুন্দর দেখিতে হইয়াছে আজকাল, রাণুদির মত সুন্দরী এ পর্যন্ত অন্য কোন মেয়ে সে দেখে নাই। অতসীদি সর্বদা বেশ ফিটফাট থাকে বটে, কিন্তু দেখিতে রাণুদির কাছে লাগে না। তাহা ছাড়া অপু জানে এ গ্রামের মেয়েদের মধ্যে, রাণুদির মত মন কোনো মেয়েরই নয়। দিদির পরই যদি সে কাহাকেও ভালবাসে তো সে রাণুদি। রাণুদিও যে তাহার দিকে টানে তাহা কি আর অপু জানে না?

সে থালা তুলিয়া চলিয়া যাইবার সময় একটু ইতস্তত করিয়া বলিল—রাণুদি, তোমাদের এই পশ্চিমের ঘরের আলমারিতে যে বইগুলো আছে সতুদা পড়তে দেয় না। একখানা দেবে পড়তে? পড়েই দিয়ে যাব।

রাণী বলিল—কোন্‌ বই আমি তো জানিনে, দাঁড়া আমি দেখছি—

সতু প্রথমে কিছুতেই রাজী হয় না, অবশেষে বলিল—আচ্ছা পড়তে দিই, যদি এক কাজ করিস্‌। আমাদের মাঠের পুকুরে রোজ মাছ চুরি যাচ্ছে—জেঠামশায় আমাকে বলেছে, সেখানে গিয়ে দুপুরবেলা চৌকি দিতে,—আমার সেখানে একা একা ভাল লাগে না, তুই যদি যাস্‌ আমার বদলে তবে বই পড়তে দেবো—

রাণী প্রতিবাদ করিয়া বলিল—বেশ তো? ও ছেলেমানুষ সেই বনের মধ্যে ব'সে মাছ চৌকি দেবে বৈ কি? তুমি বুড়ো ছেলে পারো না, আর ও যাবে? যাও তোমার বই দিতে হবে না, আমি বাবার কাছে চেয়ে দেবো—

অপু কিন্তু রাজী হইল। রাণীর বাবা ভুবন মুখুয্যে বিদেশে থাকেন, তাঁহার আসিবার অনেক দেরি অথচ এই বইগুলার উপর তাহার বড় লোভ। এগুলি পড়িবার লোভে সে কতদিন লুব্ধচিত্তে সতুদের পশ্চিমের ঘরটায় যাতায়াত করিয়াছে। দু-একখানা একটু আধটু পড়িয়াছেও। কিন্তু সতু নিজে তো পড়েই না, তাহাকেও পড়িতে দেয় না। নায়কের ঠিক সঙ্কটময় মুহূর্তটিতেই হাত হইতে বই কাড়িয়া লইয়া বলে—রেখে সে অপু, এ সব ছোট কাকার বই, ছিঁড়ে যাবে, দে।

অপু হাতে স্বর্গ পাইয়া গেল।

প্রতিদিন দুপুরবেলা আলমারী হইতে বাছিয়া এক-এক খানি করিয়া বই সতুর নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া যায় ও বাঁশবনের ছায়ায় কতকগুলো শেওড়াগাছের কাঁচা ডাল পাতিয়া তাহার উপর উপুড়

হইয়া শুইয়া একমনে পড়ে। বই অনেক আছে—প্রণয়-প্রতিমা, সরোজ-সরোজিনী, কুসুম-কুমারী, সচিত্র যৌবনে যোগিনী নাটক, দস্যু-দুহিতা, প্রেম-পরিণাম বা অমৃত গরল, গোপেশ্বরের গুপ্তকথা....সে কত নাম করিবে! এক-একখানি করিয়া সে ধরে, শেষ না করিয়া আর ছাড়িতে পারে না। চোখ টাটাইয়া ওঠে, রগ টিপ্ টিপ্ করে; পুকুরধারের নির্জন বাঁশবনের ছায়া ইতিমধ্যে কখন দীর্ঘ হইয়া মজা পুকুরটার পাটা-শেওলার দামে নামিয়া আসে, তাহার খেয়ালই থাকে না কোন্ দিক দিয়া বেলা গেল!

কি গল্প! সরোজিনীকে সঙ্গে লইয়া সরোজ নৌকাযোগে মুর্শিদাবাদ যাইতেছেন, পথে নবাবের লোকে নৌকা লুটিয়া তাহাদের বন্দী করিল। নবাবের হুকুমে সরোজের হইয়া গেল প্রাণদন্ড, সরোজিনীকে একটা অন্ধকার ঘরে চাবিতালা বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিল। গভীর রাত্রে কক্ষের দরজা খুলিয়া গেল, নবাব মত্ত অবস্থায় কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—সুন্দরী, আমার হুকুমে সরোজ মরিয়াছে, আর কেন....ইত্যাদি। সরোজিনী সদর্পে ঘাড় বাঁকাইয়া বলিলেন--রে পিশাচ, রাজপুত রমণীকে তুই এখনও চিনিস্ নাই, এ দেহে প্রাণ থাকিতে....ইত্যাদি। এমন সময় কাহার ভীম পদাঘাতে কারাগারের জানালা ভাঙিয়া গেল। নবাব চমকিয়া উঠিয়া দেখিলেন—একজন জটাজুটধারী তেজঃপুঞ্জকলেবর সন্ন্যাসী, সঙ্গে যমদূতের মত বলিষ্ঠ চারি-পাঁচজন লোক। সন্ন্যাসী রোষকষায়িত নয়নে নবাবের দিকে চাহিয়া বলিলেন—নরাধম, রক্ষক হইয়া ভক্ষক? পরে সরোজিনীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—মা, আমি তোমার স্বামীর গুরু—যোগানন্দ স্বামী, তোমার স্বামীর প্রাণহানি হয় নাই, আমার কমন্ডলুর জলে পুনর্জীবন লাভ করিয়াছে, এখন তুমি চল মা আমার আশ্রমে, বৎস সরোজ তোমার অপেক্ষা করিয়া আছে।....গ্রন্থকারের লিপি-কৌশল সুন্দর,—সরোজের এই বিস্ময়জনক পুনরুজ্জীবন আরও বিশদভাবে ফুটাইবার জন্য তিনি পরবর্তী অধ্যায়ের প্রতি পাঠকের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিয়া বলিতেছেন—এইবার চল পাঠক, আমরা দেখি বধ্যভূমিতে সরোজের প্রাণদন্ড হইবার পর কি উপায়ে তাঁহার পুনর্জীবন লাভ সম্ভব হইল....ইত্যাদি।

এক-একটি অধ্যায় শেষ করিয়া অপুর চোখ ঝাপসা হইয়া আসে—গলায় কি যেন আট্‌কাইয়া যায়। আকাশের দিকে চাহিয়া সে দুই-এক মিনিট কি ভাবে,—আনন্দে বিস্ময়ে, উত্তেজনায় তাহার দুই কান দিয়া যেন আগুন বাহির হইতে থাকে, রুদ্ধনিঃশ্বাসে পরবর্তী অধ্যায়ে মন দেয়। সন্ধ্যা হইয়া যায়, চারিধারে ছায়া দীর্ঘ হইয়া আসে, মাথার উপর বাঁশঝাড়ে কত কী পাখীর ডাক শুরু হয়, উঠি-উঠি করিয়াও বইয়ের পাতার এক-ইঞ্চি ওপরে চোখ রাখিয়া পড়িতে থাকে—যতক্ষণ অক্ষর দেখা যায়।

এইরকম বই তো সে কখনো পড়ে নাই! কোথায় লাগে সীতার বনবাস আর ডুবালের গল্প?

বাড়ী আসিলে তাহার মা বকে—এমন হাবলা ছেলেও তুই? পরের মাছ চৌকি দিস্ গিয়ে সেই একলা বনের মধ্যে ব'সে একখানা বই পড়বার লোভে? আচ্ছা বোকা পেয়েছে তোকে।

কিন্তু বোকা অপুর লাভ যেদিক দিয়া আসে, তাহার মায়ের সেদিক সম্বন্ধে কোন ধারণাই নাই। আজকাল সে দুইখানা বই পাইয়াছে 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত' ও 'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা'।....উইটিবি, বৈঁচিবনের প্রেক্ষাপটে নিস্তব্ধ দুপুরের মায়ার দৃশ্যের পর দৃশ্য পরিবর্তিত হইয়া চলে—জেলেখা নদীর উপর বসিয়া আহত নরেনের শুশ্রূষা করিতেছে, আওরঙ্গজেবের দরবারে নিজেকে পাঁচহাজারী মনসবদারের মধ্যে স্থান পাইতে দেখিয়া শিবাজী রাগে ফুলিয়া ভাবিতেছেন—শিবাজী পাঁচ-হাজারী? একবার পুনায় যাও তো, শিবাজীর ফৌজে কত পাঁচ-হাজারী মনসবদার আছে গণিয়া আসিবে!....

রাজাবারার মরুপর্বতে, দিল্লী-আগ্রার রঙমহালে, শিস্‌মহালে, ওড়না-পোশোয়াজ-পরা সুন্দরীদলের সঙ্গে তাহার সারাদিনমান কাটে। এ কোন্ জগৎ—যেখানে শুধু জ্যোৎস্না, তলোয়ার-খেলা, সুন্দর মুখের বন্ধুত্ব, আহেরিয়া-উৎসবে দীর্ঘবর্শা হাতে ঘোড়ায় চড়িয়া ঊষর উপত্যকা ও ভুট্টাক্ষেত্র পার হইয়া ছোটা?....

বীরের যাহা সাধ্য, রাজপুতের যাহা সাধ্য, মানুষের যাহা সাধ্য—প্রতাপসিংহ তাহা করিয়াছিলেন। হলদিঘাটের পার্বত্য বর্ত্মের প্রতি পাষাণ-ফলকে তাহার কাহিনী লেখা আছে। দেওয়ারের রণক্ষেত্রের দ্বাদশ সহস্র রাজপুতের হৃদয়রক্তে তাহার কাহিনী অক্ষয় মহিমায় লেখা আছে।

বহুদিন পরেও প্রাচীন যোদ্ধৃগণ শীতের রাত্রিতে অগ্নিকুন্ডের পার্শ্বে বসিয়া পৌত্রপৌত্রিগণের নিকট হল্‌দিঘাটের অদ্ভুত বীরত্বের কথা বলিত।....

অদৃশ্যহস্তনিক্ষিপ্ত একটি বর্শা আসিল।—অপু এই গ্রামের চিরশ্যাম বনভূমির ছায়ায়, লতাপাতার নিবিড়তায়, ভিজামাটির গন্ধে মানুষ হইয়াছে—তবুও সে জানে রাজপুতানার ভীল-প্রদেশের বা আরাবল্লী-মেবারের প্রত্যেকটি স্থান, নাহারা মগ্‌রোর অপূর্ব বন্য সৌন্দর্য সে ভাল করিয়াই চেনে। পর্বত হইতে অবতরণশীল শস্ত্রপাণি তেজসিংহের মূর্তি কি সুন্দর মনে হয়!....

"সেই চপ্পন প্রদেশে অনেকদিন অবধি সেই ভীল গ্রামের নির্জন কন্দরে ও উন্নতশিখরে রজনী দ্বিপ্রহরের সময় একটি রমণী-কণ্ঠ-নিঃসৃত গীত শ্রুত হইত। অতি প্রত্যুষে নির্জন প্রান্তরে, পথিকগণ কখনও কখনও একটি রমণীর পান্ডুর মুখ ও চঞ্চল-নয়ন দেখিতে পাইত; লোকে বলিত কোন বিশ্রামশূন্যা উদ্বিগ্ন বনদেবী হইবে"....সেই গানের অস্পষ্ট করুণ মূর্ছনা যেন অপুর কানে বাঁশবাগানের পিছন হইতে ভাসিয়া আসে!....

কমলমীর, সূর্যগড়ের যুদ্ধ, সেনাপতি শাহবাজ খাঁ, সুন্দরী নূরজাহান, পুষ্পকুমারী, বন্য ভীলপ্রদেশ, বীরবালক চন্দনসিংহ—দূর সুদূর কল্পনা।—তবু কত নিকট, কত বাস্তব মনে হয়। রাজবারার মরুভূমি আর নীল আরাবল্লীর উন্নত পর্বতের শিখরে শিখরে চেনার বৃক্ষে ফুল ফুটিয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে, দেবী মিবারলক্ষ্মীর অলক্ত-রক্তপদচিহ্ন আঁকা রহিয়াছে বুনাস ও বরী নদীর তটভূমির শিলাখন্ডে, ঝরণার উপলরাশির উপরে, বাজ্‌রা ও জওয়ার-ক্ষেত ও মৌউল বনে।....

চিতোর রক্ষা হইল না! রাণা অমরসিংহ বাদশাহের সম্মান গ্রহণ করিলেন। সর্বহারা পিতা প্রতাপসিংহ যিনি পঁচিশ বৎসর ধরিয়া বনে পর্বতে ভীলের পাল লইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তিনি ব্যথাক্ষুব্ধচিত্তে কোথা হইতে দেখিয়াছিলেন এ সব?....

অপু চোখের জলে পুকুর, উইটিবি, বৈঁচিবন, বাঁশবাগান—সব ঝাপ্‌সা হইয়া আসে।

সেদিন দুপুরে তাহার বাবা একটা কাগজের মোড়ক দেখাইয়া হাসিমুখে বলিল—দ্যাখো তো খোকা, কি বলো দিকি?

অপু তাড়াতাড়ি বিছানার উপর উঠিয়া বসিল; উৎসাহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল—খবরের কাগজ? না বাবা?

সেদিন রামকবচ লিখিয়া দিয়া বেহারী ঘোষের শাশুড়ীর নিকট যে তিনটি টাকা পাইয়াছে, স্ত্রীকে গোপন করিয়া হরিহর তারই মধ্যে দু'টাকা খবরের কাগজের দাম পাঠাইয়া দিয়াছিল, স্ত্রী জানিতে পারিলে অন্য পাঁচটা অভাবের গ্রাস হইতে টাকা দুইটাকে কোনো মতেই বাঁচানো যাইত না।

অপু বাবার হাত হইতে তাড়াতাড়ি কাগজের মোড়কটা লইয়া খুলিয়া ফেলে। হাঁ—খবরের কাগজ বটে। সেই বড় বড় অক্ষরে 'বঙ্গবাসী' কথাটা লেখা, সেই নতুন কাগজের গন্ধটা, সেই ছাপা সেই সব—যাহার জন্য বৎসরখানেক পূর্বে সে তীর্থের কাকের মত অধীর আগ্রহে ভুবন মুখুয্যেদের চন্ডীমন্ডপের ডাকবাক্সটার কাছে পিওনের অপেক্ষায় প্রতি শনিবারে হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিত! খবরের কাগজ! খবরের কাগজ! কি সব নতুন খবর না জানি দিয়াছে? কি অজানা কথা সব লেখা আছে ইহার বড় বড় পাতায়?

হরিহরের মনে হয়—দুইটি টাকার বিনিময়ে ছেলের মুখে সে আনন্দের হাসি ফুটাইয়া তুলিয়াছে, তাহার তুলনায় কোন বন্ধকী মাক্‌ড়ী খালাসের আত্মপ্রসাদ মোটেই বেশী হইত না!

অপু খানিকক্ষণ পড়িয়া বলে—দ্যাখো বাবা, একজন 'বিলাত যাত্রী'র চিঠি বেরিয়েছে, আজ থেকেই নতুন বেরুলো। খুব সময়ে আমাদের কাগজটা এসেছে—না বাবা?

তবুও তার মনে দুঃখ থাকিয়া যায় যে গত বৎসর কাগজখানা হঠাৎ উহারা বন্ধ করিয়া দেওয়াতে জাপানী মাকড়সাসুরের গল্পটার শেষ ভাগ তাহার পড়া হয় নাই, রাইকো রাজসভায় যাওয়ার পর তাহার যে কি ঘটিল তাহা সে জানিতে পারে নাই।....

একদিন রাণী বলিল—তোর খাতায় তুই কি লিখচিস্ রে?

অপু বিস্ময়ের সুরে বলিল—কোন্ খাতায়? তুমি কি ক'রে—

—আমি তোদের বাড়ী সেদিন দুপুরে যাইনি বুঝি? তুই ছিলিনে, খুড়ীমার সঙ্গে কতক্ষণ ব'সে কথা বোল্লাম। কেন, খুড়ীমা তোকে বলেনি? তাই দেখলাম তোর বইএর দপ্তরে তোর রাঙা খাতাখানায় কি সব লিখিচিস্—আমার নাম রয়েচে, আর দেবী সিংহ না কি একটা—

অপু লজ্জায় লাল হইয়া বলিল—ও একটা গল্প।

—কি গল্প রে? আমায় কিন্তু পড়ে শোনাতে হবে।

পরদিন রাণী একখানা ছোট বাঁধানো খাতা অপুর হাতে দিয়া বলিল—এতে তুই আমাকে একটা গল্প লিখে দিস্—একটা বেশ ভাল দেখে। দিবি তো? অতসী বল্‌ছিল তুই ভাল লিখতে পারিস্ নাকি! লিখে দে, আমি অতসীকে দেখাবো।....

অপু রাত্রে বসিয়া বসিয়া খাতা লেখে। মাকে বলে—আর একটা পলা তেল দাও না মা। এইটুকু লিখে রাখি আজ।....তাহার মা বলে—আজ রাত্তিরে আর পড়ে না—মোটে দু'পলা তেল আছে, কাল আবার রাঁধবো কি দিয়ে? এইখানে রাঁধছি, এই আলোতে ব'সে পড়।—অপু ঝগড়া করে।

মা বকে—এঃ, ছেলের রাত্তির হোলে যত লেখা-পড়ার চাড়্—সারাদিন চুলের টিকিটি দেখবার যো নেই। সকালে করিস্ কি? যা তেল দেবো না।

অবশেষে অপু উনুনের পাড়ে কাঠের আগুনের আলোয় খাতাখানা আনিয়া বসে। সর্বজয়া ভাবে—অপু আর একটু বড় হোলে আমি ওকে ভালো দেখে বিয়ে দেবো। এ ভিটেতে নতুন পাকা বাড়ী উঠবে। আস্‌চে বছর পৈতেটা দিয়ে নিই, তারপর গাঙ্গুলীবাড়ীর পূজোটা যদি বাঁধা হয়ে যায়—

....চার-পাঁচদিন পরে সে রাণীর হাতে খাতা ফিরাইয়া দিলে রাণী আগ্রহের সহিত খাতা খুলিতে খুলিতে বলিল—লিখেচিস্?

অপু হাসি-হাসি মুখে বলিল—দ্যাখো না খুলে?

রাণী দেখিয়া খুশির সুরে বলিল—ওঃ, অনেক লিখেচিস্ যে রে! দাঁড়া অতসীকে ডেকে দেখাই।

অতসী দেখিয়া বলিল—অপু লিখেচে না আরও কিছু—ইস্! এ সব বই দেখে লেখা।

অপু প্রতিবাদের সুরে বলিল—ইঃ, বই দেখে বই কি? আমি তো গল্প বানাই—পটুকে জিজ্ঞেস্ ক'রো দিকি অতসীদি? ওকে বিকেলে গাঙের ধারে ব'সে ব'সে কত বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলিনে বুঝি?

রাণী বলিল—না ভাই, ও লিখেচে আমি জানি। ও ওই রকম লেখে। খাসা যাত্রার পালা লিখেছিল খাতাতে, আমায় পড়ে শোনালো।....পরে অপুকে বলিল—নাম লিখে দিস্‌নি তোর? নাম লিখে দে।

অপু এবার একটু অপ্রতিভতার সুরে বলিল যে, গল্পটা তাহার শেষ হয় নাই, হইলেই নাম লিখিয়া দিবে এখন। 'সচিত্র যৌবনে-যোগিনী' নাটকের ধরণে গল্প আরম্ভ করিলেও শেষটা কিরূপ হইবে সে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে নাই; অথচ দীর্ঘ দিন তাহার কাছে খাতা থাকিলে রাণুদি—বিশেষ করিয়া অতসীদি পাছে তাহার কবিপ্রতিভা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পড়ে, এই ভয়ে অসমাপ্ত অবস্থাতেই সেখানা ফেরৎ দিয়াছে।....

তাহার বাবা বাড়ীতে নাই। সকালে উঠিয়া সে তাহাদের গ্রামের আর সকলের সঙ্গে পাশের গ্রামে আদ্যশ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে গেল। সুনীলও গেল তাহার সঙ্গে। নানা গ্রামের ফলারে বামুনের দল পাঁচ-ছয় ক্রোশ দূর হইতেও হাঁটিয়া আসিয়াছে। এক এক ব্যক্তি পাঁচ-ছয়টি করিয়া ছেলেমেয়ে সঙ্গে করিয়া আসিয়াছে; সকলকে সুবিধামত স্থানে বসাইতে গিয়া একটা দাঙ্গা বাধিবার উপক্রম। প্রত্যেকের পাতে চারিখানি করিয়া লুচি দিয়া যাইবার পর পরিবেশনকারীরা বেগুনভাজা পরিবেশন করিতে আসিয়া দেখিল কাহারও পাতে লুচি নাই,—সকলেই পার্শ্ববর্তী চাদরে বা গামছায় লুচি তুলিয়া বসিয়া আছে!....ছোট ছোট ছেলে অতশত না বুঝিয়া পাতের লুচি ছিঁড়িতে যাইতেছে—তাহার বাপ বিশ্বেশ্বর ভট্‌চায্ ছোঁ মারিয়া ছেলের পাত হইতে লুচি উঠাইয়া পাশের চাদরে রাখিয়া বলিল—এগুলো রেখে দাও না! আবার এখুনি দেবে, খেও এখন।

তাহার পর খানিকক্ষণ ধরিয়া ভীষণ শোরগোল হইতে লাগিল—"লুচির ধামাটা এ সারিতে" "কুম্‌ড়োটা যে আমার পাতে একেবারেই", "ওহে, গরম গরম দেখে", "মশাই কি দিলেন হাত দিয়ে দেখুন দিকি, স্রেফ কাঁচা ময়দা"....ইত্যাদি। ছাঁদার পরিমাণ লইয়া কর্মকর্তাদের সঙ্গে ব্রাহ্মণের তুমুল বিবাদ! কে একজন চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—তা হোলে সেখানে ভদ্দরলোকেদের নেমন্তন্ন করতে নেই। স-পাঁচ গন্ডা লুচি এ একেবারে ধরা-বাঁধা ছাঁদার রেট—বল্লাল সেনের আমল থেকে বাঁধা রয়েচে। চাইনে তোমার ছাঁদা, কন্দপ্পো মজুমদার এমন জায়গায় কখনও—

কর্মকর্তা হাতে-পায়ে ধরিয়া কন্দর্প মজুমদারকে প্রসন্ন করিলেন।

অপুও এক পুঁটুলি ছাঁদা বহিয়া আনিল। সর্বজয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া হাসিমুখে বলিল—ওমা, এ যে কত এনেচিস—দেখি খোল্ তো? লুচি, পানতুয়া, গজা—কত রে! ঢেকে রেখে দি, সকালবেলা খেও এখন।

অপু বলিল—তোমায়ও কিন্তু মা খেতে হবে—তোমার জন্যে আমি চেয়ে দু'বার ক'রে পানতুয়া নিইচি।

সর্বজয়া বলিল—হ্যাঁরে, তুই বল্লি নাকি আমার মা খাবে দাও?—তুই তো একটা হাবলা ছেলে!

অপু ঘাড় ও হাত নাড়িয়া বলিল—হ্যাঁ, তাই বুঝি আমি বলি! এমন ক'রে বল্লাম তারা ভাবলে আমি খাবো।

সর্বজয়া খুশির সহিত পুঁটুলিটা তুলিয়া ঘরে লইয়া গেল।

খানিকক্ষণ পরে অপু সুনীলদের বাড়ী গেল। উহাদের ঘরের রোয়াকে পা দিয়াই শুনিল, সুনীলের মা সুনীলকে বলিতেছেন—ওসব কেন ব'য়ে আনলি বাড়ীতে? কে আনতে বলেচে তোকে? সুনীলও সকলের দেখাদেখি ছাঁদা বাঁধিয়াছিল, বলিল—কেন মা, সবাই তো নিলে—অপুও তো এনেচে।

সুনীলের মা বলিলেন—অপু আনবে না কেন—ও ফলারে বামুনের ছেলে! ও এরপর ঠাকুরপূজো ক'রে আর ছাঁদা বেঁধে বেড়াবে,—ওই ওদের ধারা। ওর মা-টাও অমনি হ্যাংলা। ঐজন্যে আমি তখন তোমাদের নিয়ে এ গাঁয়ে আসতে চাইনি। কুসঙ্গে পড়ে যত কুশিক্ষে হচ্ছে! যা, ওসব অপুকে ডেকে দিয়ে আয়—যা; না হয় ফেলে দিগে যা। নেমন্তন্ন করেচে নেমন্তন্ন খেলি—ছোটলোকের মত ওসব বেঁধে আনবার দরকার কি!

অপু ভয় পাইয়া আর সুনীলের ঘরে ঢুকিল না। বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে ভাবিল—যাহা তাহার মা পাইয়া এত খুশী হইল, জেঠাইমা তাহা দেখিয়াই এত রাগিল কেন? খাবারগুলো কি ঢেলামাটি যে, সেগুলো ফেলিয়া দিতে হইবে? তাহার মা হ্যাংলা? সে ফলারে বামুনের ছেলে? বা রে, জেঠিমা যেন অনেক পানতুয়া-গজা খাইয়াছে, তাহার মা তো ও-সব কিছুই খাইতে পায় না। আর সে-ই বা নিজে এসব ক'দিন খাইয়াছে? সুনীলের কাছে যাহা অন্যায়, তাহার কাছে সেটা কেমন করিয়া অন্যায় হইতে পারে।

লেখাপড়া বড় একটা তাহার হয় না, সে এই সবই করিয়া বেড়ায়। ফলার খাওয়া, ছাঁদা বাঁধা, বাপের সঙ্গে শিষ্যবাড়ী যাওয়া, মাছধরা। সেই ছোট্ট ছেলে পটু—জেলে পাড়ায় কড়ি খেলিতে গিয়া যে সে-বার মার খাইয়াছিল—সে এ সব বিষয়ে অপুর সঙ্গী। আজকাল সে আরও বড় হইয়াছে, মাথাতে লম্বা হইয়াছে, সব সময় অপুদার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। ওপাড়া হইতে এপাড়ায় আসে শুধু অপুদার সঙ্গে খেলিতে, আর কাহারও সঙ্গে সে বড় একটা মেশে না। তাহাকে বাঁচাইতে গিয়া অপুদা যে জেলের ছেলেদের হাতে মার খাইয়াছিল, সেকথা সে এখনো ভোলে নাই।

মাছ ধরিবার শখ অপুর অত্যন্ত বেশী। সোনাডাঙা মাঠের নীচে ইছামতীর ধারে কাঁচিকাটা খালের মুখে ছিপে খুব মাছ ওঠে। প্রায়ই সে এইখানটি গিয়া নদীতীরে একটা বড় ছাতিম গাছের তলায় মাছ ধরিতে বসে। স্থানটা তাহার ভারী ভালো লাগে, একেবারে নির্জন, দুধারে নদীর পাড়ে কত কি গাছপালা নদীর জলে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, ওপারে ঘন সবুজ উলুবন, মাঝে মাঝে লতাদোলানো কদম-শিমূল গাছ, বেগুনী রংএর বনকলমী ফুলে ছাওয়া ঝোপ, দূরে মাধবপুর গ্রামের বাঁশবন, পাখীর ডাকে বনের ছায়ায় উলুবনের শ্যামলতায় মেশামেশি মাখামাখি স্নিগ্ধ নির্জনতা!

সেই ছেলেবেলায় প্রথম কুঠীর-মাঠে আসার দিনটি হইতে এই মাঠ-বন-নদীর কি মোহ যে তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে! ছিপ ফেলিয়া ছাতিম গাছের ছায়ায় বসিয়া চারিদিকে চাহিতেই তাহার মন অপূর্ব পুলকে ভরিয়া ওঠে। মাছ হোক বা না হোক, যখনই ঘন বৈকালের ছায়া মাঠের ধারের খেজুর ঝোপের ডাঁসা খেজুরের গন্ধে ভরপুর হইয়া ওঠে, স্নিগ্ধ বাতাসে চারিধার হইতে বৌ-কথা-কও, পাপিয়ার ডাক ভাসিয়া আসে, ডালে-ডালে অভ্র-আবীর ছড়াইয়া সূর্যদেব সোনাডাঙার মাঠের সেই ঠ্যাঙাড়ে বটগাছটার আড়ালে হেলিয়া পড়েন, নদীর জল কালো হইয়া যায়, গাঙশালিকের দল কলরব করিতে করিতে বাসায় ফেরে, তখনই তাহার মন বিভোর হইয়া ওঠে, পুলক-ভরা চোখে চারিদিকে চাহিয়া দেখে; মনে হয়—মাছ না পাওয়া গেলেও রোজ রোজ সে এইখানটিতে আসিয়া বসিবে, ঠিক এই বড় ছাতিম গাছের তলাটাতে।

মাছ প্রায়ই হয় না, শরের ফাৎনা স্থির জলে দন্ডের পর দন্ড নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত অটল। একস্থানে অতক্ষণ বসিয়া থাকিবার ধৈর্য তাহার থাকে না, সে এদিকে ওদিকে ছট্ফট করিয়া বেড়ায়, ঝোপের মধ্যে পাখীর বাসার খোঁজে, ফিরিয়া আসিয়া হয়ত চোখে পড়ে ফাৎনা একটু একটু ঠুকরাইতেছে! ছিপ তুলিয়া-বলে—দূর! ঝেঁয়া মাছের ঝাঁক লেগেচে, এখানে কিছু হবে না। ....পরে সেখান হইতে ছিপ তুলিয়া একটু দূরে শেওলা দামের পাশে গিয়া টোপ ফেলে। জলটার গভীর কালো রঙএ মনে হয় বড় রুই কাৎলা এখনি টোপ গেলে আর কি! ভ্রম ঘুচিতে বেশী দেরী হয় না, শরের ফাৎনা নির্বিকল্প সমাধির অবস্থা প্রাপ্ত হয়।....

এক-একদিন সে এক-একখানা বই সঙ্গে করিয়া আনিয়া বসে।

ছিপ ফেলিয়া বই খুলিয়া পড়ে। সুরেশের নিকট হইতে সে একখানা নীচের ক্লাসের ছবিওয়ালা ইংরেজি বই ও তাহার অর্থপুস্তক চাহিয়া লইয়াছে। ইংরাজি সে বুঝিতে পারে না, অর্থপুস্তক দেখিয়া গল্পের বাংলাটা বুঝিয়া লয় ও ইংরাজি বইখানাতে শুধু ছবি দেখে। দূর দেশের কথা ও সকল রকম মহত্ত্বের কাহিনী ছেলেবেলা হইতেই তাহার মনকে বড় দোলা দেয়, এই বইখানাতে সে ধরণের অনেকগুলি গল্প আছে। কোথাকার মুক্ত প্রান্তরে একজন ভ্রমণকারী বিষম তুষারঝটিকার মধ্যে পথ হারাইয়া চক্রাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে শীতে প্রাণ হারায়, অজানা মহাসমুদ্রে পাড়ি দিয়া ক্রিস্টোফার কলম্বাস কিরূপে আমেরিকা আবিষ্কার করিলেন—এমনি সব গল্প। যে দু'টি ইংরাজ বালক-বালিকা সমুদ্রতীরের শৈলগাত্রে গাঙচিলের বাসা হইতে ডিম সংগ্রহ করিতে গিয়া বিপদগ্রস্ত হইয়াছিল, সে সাহসিনী বালিকা প্রাস্‌কোভিয়া লপুলফ নির্বাসিত পিতার নির্বাসনদন্ড প্রত্যাহার করিবার আশায় জনহীন তুষারাবৃত প্রান্তরের পথে সুদূর সাইবেরিয়া হইতে একা বাহির হইয়াছিল—তাহাদের যেন সে দেখিলেই চিনিতে পারে।

স্যার ফিলিপ সিডনীর ছোট্ট গল্পটুকু পড়িয়া তাহার চোখ দু'টি জলে ভরিয়া যায়। সুরেশকে গিয়া জিজ্ঞাসা করে—সুরেশদা, এই গল্পটা জানো তুমি? বড় ক'রে বলো না?

সুরেশ বলে—ও, জুট্‌ফেনের যুদ্ধের কথা!

অপু অবাক হইয়া বলে—কি সুরেশদা? জুট্‌ফেন! কোথায় সে?

সুরেশ ঐটুকুর বেশী আর বলিতে পারে না।....

মাসখানেক পরে একদিন।

মাছ ধরিতে গিয়া একটা বড় সরপুঁটি মাছ কি করিয়া তাহার ছিপে উঠিয়া গেল।

লোভ পাইয়া সে জায়গাটি আর অপু ছাড়ে না—গাছের ডালপালা ভাঙিয়া আনিয়া বিছাইয়া বসে।

ক্রমে বেলা যায়, নদীর ধারের মাঠে আবার এই অপূর্ব নীরবতা, ওপারের দেয়াড়ের মাঠের পারে সুদূপ্রসারী সবুজ উলুবনে কাশঝোপে, কদম-শিমুল গাছের মাথায় আবার তাহার শৈশব পুলকের শুভমুহূর্তের অতি পরিচিত, পুরাতন সাথী—বৈকালের মিলিয়ে-যাওয়া শেষ রোদ!

বঙ্গবাসীতে বিলাত যাত্রীর চিঠির মধ্যে পড়া সেই সুন্দর গল্পটি তাহার মনে পড়ে....

সে সুরেশদাদার ইংরাজি ম্যাপে ভূমধ্যসাগর কোথায় দেখিয়াছে, তারই ওপারে ফ্রান্স দেশ সে জানে। কতকাল আগে ফ্রান্স দেশের বুকে তখন বৈদেশিক সৈন্যবাহিনী চাপিয়া বসিয়াছে, দেশ বিপন্ন,

রাজা শক্তিহীন, চারিদিকে অরাজকতা, লুঠ-তরাজ! জাতির এই ঘোর অপমানের দিনে, লোরেন্ প্রদেশের অন্তঃপাতী কে ক্ষুদ্র গ্রামে এক দরিদ্র কৃষকদুহিতা পিতার মেষপাল চরাইতে যায়, আর মেষের দলকে ইতস্ততঃ ছাড়িয়া দিয়া নিভৃত পল্লীপ্রান্তরে তৃণভূমির উপর বসিয়া সুনীল নয়ন দু'টি আকাশের পানে তুলিয়া নির্জনে দেশের দুর্দশা চিন্তা করে। দিনের পর দিন এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাহার নিষ্পাপ কুমারী-মনে উদয় হইল কে তাহাকে বলিতেছে—তুমি ফ্রান্সের রক্ষাকর্ত্রী, তুমি গিয়া রাজসৈন্য জড় কর, অস্ত্র ধর, দেশের জাতির পরিত্রাণের ভার তোমার হাতে। দেবী মেরী তাহার উৎসাহদাত্রী,—দূর স্বর্গ হইতে তাঁহার আহ্বান আসে দিনের পর দিন। তারপর নবতেজোদৃপ্ত ফরাসী সৈন্যবাহিনী কি করিয়া শত্রুদলকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিল, কি করিয়া ভাবময়ী কুমারী নিজে অস্ত্র ধরিয়া দেশের রাজাকে সিংহাসনে বসাইলেন, তারপর অজ্ঞানান্ধ লোকে কি করিয়া তাঁহাকে ডাইনী অপবাদে জীবন্ত পুড়াইয়া মারিল, এ সকল কথাই সে আজ পড়িয়াছে।

এই বৈকাল বেলাটাতে, এই শান্ত নদীর ধারে গল্পটি ভাবিতে ভাবিতে কি অপূর্ব ভাবেই তাহার মন পূর্ণ হইয়া যায়!—কুমারীর যুদ্ধের কথা, জয়ের কথা, অন্য সব কথা সে তত ভাবে না। কিন্তু সে ছবিটি তাহার বার বার মনে আসে, তাহা শুধু নির্জন প্রান্তরে চিন্তারতা বালিকা আর চারিধারে যদৃচ্ছ-বিচরণশীল মেষদল, নিম্নে শ্যাম তৃণভূমি, মাথার উপর মুক্ত নীল আকাশ। একদিকে দুর্ধর্ষ বৈদেশিক শত্রু, নিষ্ঠুরতা, জয়লালসার দর্প. রক্তস্রোত,—অপরদিকে এক সরলা, দিব্য ভাবময়ী নীলনয়না পল্লীবালিকা। ছবিটা তাহার প্রবর্ধমান বালকমনকে মুগ্ধ করিয়া দেয়।

আরও ছবি মনে আসে। কতদূরের নীল-সমুদ্র-ঘেরা মার্টিনিক দ্বীপ। চারিদিকে আখের খেত, মাথার উপর নীল আকাশ—বহু—বহু দূর—শুধু নীল আকাশ আর নীল সমুদ্র!—শুধু নীল আর নীল! আরও কত কি, তাহা বুঝানো যায় না—বলা যায় না।

ছিপ গুটাইয়া সে বাড়ীর দিকে যাইবার যোগাড় করে। নদীর ধারে ধারে নতশীর্ষ বাবলা ও সাঁইবাব্‌লার বন নদীর স্নিগ্ধ কালো জলে ফুলের ভার ঝরাইয়া দিতেছে। সোনাডাঙা মাঠের মাঝে ঠ্যাঙাড়ে বটগাছটার আড়ালে প্রকান্ড রক্তবর্ণ সূর্য হেলিয়া পড়িয়াছে, —যেন কোন্ দেবশিশু অলকার জ্বলন্ত ফেনিল সোনার সমুদ্র হইতে ফুঁ দিয়া একটা বুদ্বুদ তুলিয়া খেলাচ্ছলে আকাশে উড়াইয়া দিয়াছিল, এইমাত্র সেটা পশ্চিম দিগন্তে পৃথিবীর বনান্তরালে নামিয়া পড়িতেছে!

পিছন হইতে কে তাহার চোখ টিপিয়া ধরিল। সে জোর করিয়া হাত দিয়া চোখ ছাড়াইয়া লইতেই পটু খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া সাম্‌নে আসিয়া বলিল—তোকে খুঁজে খুঁজে কোথাও পাইনে অপুদা; তারপর ভাবলাম তুই ঠিক মাছ ধর্তে এইছিস্, তাই এলাম। মাছ হয়নি?....একটাও না? চল্ বরং একখানা নৌকা খুলে নিয়ে বেড়িয়ে আসি—যাবি?

কদমতলায় সাহেবের ঘাটে অনেক দূরদেশ হইতে নৌকা আসে,—গোলপাতা-বোঝাই, ধান-বোঝাই, ঝিনুক-বোঝাই নৌকা সারি সারি বাঁধা। নদীতে জেলেদের ঝিনুক-তোলা নৌকায় বড় জাল ফেলিয়াছে। এ সময় প্রতি বৎসরই ইহারা দক্ষিণ হইতে ঝিনুক তুলিতে আসে ; মাঝ নদীতে নৌকায় নৌকায় জোড়া দিয়া দাঁড় করিয়া রাখিয়াছে। অপু ডাঙায় বসিয়া দেখিতেছিল,—একজন কালোমত লোক বার বার ডুব দিয়া ঝিনুক খুঁজিতেছে ও অল্পক্ষণ পরে নৌকার পাশে উঠিয়া হাতের থলি হইতে দু'চারিখানা কুড়ানো ঝিনুক বালি-কাদার রাশি হইতে ছাঁকিয়া নৌকার খোলে ছুঁড়িয়া ফেলিতেছে। অপু খুশির সহিত পটুকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—দেখিছিস্ পটু, কতক্ষণ ডুব দিয়ে থাকে? আয় গুনে দেখি এক-দুই ক'রে! পারিস তুই অতক্ষণ ডুবে থাক্‌তে?....

নদীর দূর্বাঘাস-মোড়া তীরটি ঢালু হইয়া জলের কিনারা পর্যন্ত নামিয়া গিয়াছে, এখানে-ওখানে বোঝাই নৌকায় খোঁটা পোঁতা—নোঙর ফেলা। ইহারা কত দেশ হইতে আসিয়াছে, কত বড় নদী খাল পার হইয়া, বড় বড় নোনা গাঙের জোয়ার-ভাঁটা-তুফান খাইয়া বেড়ায়, —অপুর ইচ্ছা করে মাঝিদের কাছে বসিয়া সে সব দেশের গল্প শোনে। তাহার কেবল নদীতে নদীতে সমুদ্রে সমুদ্রে বেড়াইতে ইচ্ছা হয়, আর কিছু সে চায় না। সুরেশের বইখানাতে নানা দেশের নাবিকদের কথা পড়িয়া অবধি ঐ ইচ্ছাই তাহার মনে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে! পটু ও সে নৌকার কাছে গিয়া দর করে—ও মাঝি, এই গোলপাতা

একপাটি কি দর?....তোমার এই ধানের নৌকা কোথাকার, ও মাঝি? ....ঝালকাঠির? সে কোন্ দিকে, এখেন থেকে কতদূর?....

পটু বলিল—অপু-দা, চল্ তেঁতুলতলার ঘাটে একখানা ডিঙি দেখি, একটু বেড়িয়ে আসি চল্।

দু'জনে তেঁতুলতলার ঘাট হইতে একখানা ছোট্ট ডিঙি খুলিয়া লইয়া, তাহাকে এক ঠেলা দিয়া ডিঙির উপর চড়িয়া বসিল। নদীজলের ঠান্ডা আর্দ্র গন্ধ উঠিতেছে, কলমী-শাকের দামে জলপিপি বসিয়া আছে, চরের ধারে-ধারে চাষীরা পটোলক্ষেত নিড়াইতেছে, কেহ ঘাস কাটিয়া আঁটি বাঁধিতেছে, চালতেপোতার বাঁকে তীরবর্তী ঘন ঝোপে গাঙ্‌শালিকের দল কলরব করিতেছে, পড়ন্ত বেলায় পূব আকাশের গায়ে নানারঙের মেঘস্তূপ।

পটু বলিল—অপু-দা একটা গান কর না? সেই গানটা সেদিনের!

অপু বলিল—সেটা না। বাবার কাছে সুর শিখে নিয়েছি একটা খুব ভাল গানের। সেইটে গাইবো, আর-এট্টু ওদিকে গিয়ে কিন্তু ভাই, এখানে ডাঙায় ওই সব লোক রয়েচে—এখানে না।

—তুই ভারি লাজুক অপু-দা। কোথায় লোক রয়েচে কতদূরে, আর তোর গান গাইতে—দূর, ধর সেইটে!

খানিকটা গিয়া অপু গান শুরু করে। পটু বাঁশের চটার বৈঠাখানা তুলিয়া লইয়া নৌকার গলুইএ চুপ করিয়া বসিয়া একমনে শোনে; নৌকা বাহিবার আবশ্যক হয় না, স্রোতে আপনা-আপনি ভাসিয়া ডিঙিখানা ঘুরিতে ঘুরিতে লা-ভাঙার বড় বাঁকের দিকে চলে। অপুর গান শেষ হইলে পটু একটা গান ধরিল। অপু এবার বাহিতেছিল। নৌকা কম দুরে আসে নাই—লা-ভাঙার বাঁকটা নজরে পড়িতেছিল এরই মধ্যে। হঠাৎ পটু ঈশানকোণের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—ও অপু-দা, কি রকম মেঘ উঠেচে দেখচিস্! এখুনি ঝড় এলো ব'লে—নৌকা ফেরাবি?

অপু বলিল—হোক্‌গে ঝড়, ঝড়েই তো নৌকা বাইতে—গান গাইতে লাগে ভালো, চল আরও যাই।

কথা বলিতে বলিতে ঘন কালো মেঘখানা মাধবপুরের মাঠের দিক হইতে উঠিয়া সারা আকাশ ভরিয়া ফেলিল, তাহার কালো ছায়া নদীজল ছাইয়া ফেলিল। পটু উৎসুক চোখে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। অনেক দূরে সোঁ সোঁ রব উঠিল, একটা অস্পষ্ট গোলমালের সঙ্গে অনেক পাখীর কলরব শোনা গেল, ঠান্ডা হাওয়া বহিল, ভিজা মাটির গন্ধ ভাসিয়া আসিল। পাখাওয়ালা আকন্দের বীজ মাঠের দিক হইতে অজস্র উড়িয়া আসিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে গাছপালা মাথা লুটাইয়া দোলাইয়া ভাঙিয়া ভীষণ কালবৈশাখীর ঝড় উঠিল।

নদীর জল ঘন কালো হইয়া উঠিল, তীরের সাঁইবাব্‌লা ও বড় বড় ছাতিম গাছের ডালপালা ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইল, সাদা বকের দল কালো আকাশের নীচে দীর্ঘ সারি বাঁধিয়া উড়িয়া পলাইল! অপুর বুক ফুলিয়া উঠিল, উৎসাহে উত্তেজনায় সে হাল ছাড়িয়া চারিধারে চাহিয়া ঝড়ের কাণ্ড দেখিতে লাগিল, পটু কোঁচার কাপড় খুলিয়া ঝড়ের মুখে পালের মত উড়াইয়া দিতেই বাতাস বাঁধিয়া সেখানা ফুলিয়া উঠিল!

পটু বলিল—বড্ড মুখোড় বাতাস অপু-দা , সামনে আর নৌকা যাবে না। কিন্তু যদি উল্টে যায়? ভাগ্যিস সুনীলকে সঙ্গে ক'রে আনিনি!

অপু কিন্তু পটুর কথা শুনিতেছিল না, সেদিকে তাহার কান ছিল না—মনও ছিল না। সে নৌকায় গলুইয়ে বসিয়া একদৃষ্টে ঝটিকাক্রুদ্ধ নদী ও আকাশের দিকে চাহিয়াছিল। তাহার চারিধারে কালো নদীর নর্তনশীল জল, উড়ন্ত বকের দল, ঝোড়ো মেঘের রাশি, দক্ষিণ দেশের মাঝিদের ঝিনুকের স্তূপগুলা, স্রোতে ভাসমান কচুরীপানার দাম সব মুছিয়া যায়! নিজেকে সে বঙ্গবাসী কাগজের সেই বিলাত-যাত্রী কল্পনা করে! কলিকাতা হইতে তাহার জাহাজ ছাড়িয়াছে; বঙ্গোপসাগরের মোহনায় সাগরদ্বীপ পিছনে ফেলিয়া সমুদ্র-মাঝের কত অজানা ক্ষুদ্র দ্বীপ পার হইয়া, সিংহল-উপকূলের শ্যামসুন্দর নারিকেলবনশ্রী দেখিতে দেখিতে কত অপূর্ব দেশের নীল পাহাড় দূরচক্রবালে রাখিয়া, সূর্যাস্তের রাঙা আলোয় অভিষিক্ত হইয়া, নতুন দেশের নব নব দৃশ্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়া চলিয়াছে!—চলিয়াছে!—চলিয়াছে!

এই ইছামতীর জলের মতই কালো, গভীর ক্ষুব্ধ, দূরের সে অদেখা সমুদ্রবক্ষ; এই রকম সবুজ বনঝোপ আরব সমুদ্রের সে দ্বীপটিতেও। সেখানে এইরকম সন্ধ্যায় গাছতলায় বসিয়া এডেন বন্দরে সেই বিলাত-যাত্রী লোকটির মত সে রূপসী আরবী মেয়ের হাত হইতে এক গ্লাস জল চাহিয়া লইয়া খাইবে। চাল্‌তেপোতার বাঁকের দিকে চাহিলে খবরের কাগজে বর্ণিত জাহাজের পিছনে সেই উড়নশীল জলচর পক্ষীর ঝাঁককে সে একেবারে স্পষ্ট দেখিতে পায় যেন!...

সে ওই সব জায়গায় যাইবে, ওই সব দেখিবে, বিলাত যাইবে, জাপান যাইবে, বাণিজ্যযাত্রা করিবে, বড় সওদাগর হইবে, অনবরত দেশ-বিদেশে সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরিবে, বড় বড় বিপদের মুখে পড়িবে; চীনসমুদ্রের মধ্যে আজিকার এই মনমাতানো কালবৈশাখীর ঝড়ের মত বিষম ঝড়ে তাহার জাহাজ ডুব-ডুবু হইলে "আমার অপূর্ব ভ্রমণ"-এ পঠিত নাবিকদের মত সেও জালি-বোটে করিয়া ডুবোপাহাড়ের গায়ে-লাগা গুগ্‌লি-শামুক পুড়াইয়া খাইতে খাইতে অকূল দরিয়ায় পাড়ি দিবে! ওই যে মাধবপুর গ্রামের বাঁশবনের মাথায় তুঁতে রংএর মেঘের পাহাড় খানিকটা আগে ঝুঁকিয়াছিল—ওরই ওপারে সেই সব নীল-সমুদ্র, অজানা বেলাভূমি, নারিকেলকুঞ্জ, আগ্নেয়গিরি, তুষারবর্ষী প্রান্তর, জেলেখা, সরযূ, গ্রেস্ ডার্লিং, জুট্‌ফেন, গাঙ্গচিল্-পাখীর-ডিম-আহরণরতা সেই সব সুশ্রী ইংরাজ বালক-বালিকা, সোনাকর যাদুকর বটগার, নির্জন প্রান্তরে চিন্তারতা লোরেনের সেই নীলনয়না পল্লীবালা জোয়ান—আরও কত কি আছে! তাহার টিনের বাক্সের বই কখানা, রাণু-দিদিদের বাড়ীর বইগুলি, সুরেশ-দাদার কাছে চাহিয়া লওয়া বইখানা, পুরাতন 'বঙ্গবাসী' কাগজগুলো ওই সব দেশের কথাই তাহাকে বলে; সেসব দেশে কোথায় কাহারা যেন তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। সেখান হইতে তাহার ডাক আসিবে একদিন —সে-ও যাইবে!

এ কথা তাহার ধারণায় আসে না কতদূরে সে সব দেশ, কে তাহাকে লইয়া যাইবে, কি করিয়া তাহার যাওয়া সম্ভব হইবে! আর দিনকতক পরে বাড়ী-বাড়ী ঠাকুরপূজা করিয়া যাহাকে সংসার চালাইতে হইবে, রাত্রিতে যাহার পড়িবার তেলের জন্য মায়ের বকুনি খাইতে হয়, অত বয়স পর্যন্ত যে ইস্কুলের মুখ দেখিল না, ভাল কাপড়, ভাল জিনিস যে কাহাকে বলে জানে না—সেই মূর্খ, অখ্যাত সহায়-সম্পদহীন পল্লীবালককে বৃহত্তর জীবনের আনন্দ-যজ্ঞে যোগ দিতে কে আহ্বান করিবে?

এ সব প্রশ্ন মনে জাগিলে হয়ত তাহার তরুণ-কল্পনার রথবেগ—তাহার আশা ভরা জীবন-পথের দুর্বার মোহ, সকল ভয় সকল সংশয়কে জয় করিতে পারিত; কিন্তু এসকল কথা তাহার মনেই ওঠে না। শুধু মনে হয়—বড় হইলেই সব হইবে, অগ্রসর হইলেই সকল সুযোগ-সুবিধা পথের মাঝে কুড়াইয়া পাইবে....এখন শুধু বড় হইবার অপেক্ষা মাত্র! সে বড় হইলে সুযোগ পাইবে, দিক্ দিক্ হইতে তাহার সাদর আমন্ত্রণ আসিবে,—সে জগৎ জানার, মানুষ চেনার দিগ্বিজয়ে যাইবে।

রঙীন্ ভবিষ্যৎজীবন-স্বপ্নে বিভোর হইয়া তাহার বাকী পথটুকু কাটিয়া যায়। বৃষ্টি আর পড়ে না, ঝড়ে কালো মেঘের রাশি উড়াইয়া আকাশ পরিষ্কার করিয়া দিতেছিল। তেঁতুলতলার ঘাটে ডিঙি ভিড়িতেই তাহার চমক ভাঙে; নৌকা বাঁধিয়া পটুর আগে আগে সে বাঁশবনের পথে উল্লাসে শিস্ দিতে দিতে বাড়ীর দিকে চলে। সে-ও তাহার মা ও দিদির মত স্বপ্ন দেখিতে শিখিয়াছে।

পথের পাঁচালী

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

আসলে অপু কিন্তু ঘুমায় নাই, সে জাগিয়া ছিল। চোখ বুজিয়া শুইয়া রাত্রে মায়ের সঙ্গে বাবার যেসব কথাবার্তা হইতেছিল, সে সব শুনিয়াছে। তাহারা এদেশের বাস উঠাইয়া কাশী যাইতেছে। এদেশ অপেক্ষা কাশীতে থাকিবার নানা সুবিধার কথা বাবা গল্প করিতেছিল মায়ের কাছে। বাবা অল্প বয়েসে সেখানে অনেকদিন ছিল, সে দেশের সকলের সঙ্গে বাবার আলাপ ও বন্ধুত্ব, সকলে চেনে বা মানে। জিনিসপত্রও সস্তা। তাহার মা খুব আগ্রহ প্রকাশ করিল, সে সব সোনার দেশে কখনও কাহারও অভাব নাই—দুঃখ এ-দেশে বারোমাস লাগিয়াই আছে, সাহস করিয়া সেখানে যাইতে পারিলেই সব দুঃখ

ঘুচিবে। মা আজ যাইতে পাইলে আজই যায়, একদিনও আর থাকিবার ইচ্ছা নাই। শেষে স্থির হইল বৈশাখ মাসের দিকে তাহাদের যাওয়া হইবে।...

গঙ্গানন্দপুরের সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুর-বাড়ীতে সর্বজয়ার পূজা মানত ছিল। ক্রোশ তিনেক দূরে কে পূজা দিতে যায়—এইজন্য এ-পর্যন্ত মানত শোধ হয় নাই। এবার এদেশ হইতে যাইবার পূর্বে পূজা দিয়া যাওয়া দরকার, কিন্তু খুঁজিয়া লোক মিলিল না। অপু বলিল—সে পূজা দিয়া আসিবে ও ঐ গ্রামে তাহার পিসিমা থাকেন, তাহার সহিত কখনো দেখাশোনা হয় নাই, অমনি দেখা করিয়া আসিবে। তাহার মা বলিল—যাঃ, বকিস্ নে তুই, একলা যাবি বৈ কি? এখান থেকে প্রায় চার-ক্রোশ পথ।

অপু মায়ের সঙ্গে তর্ক শুরু করিল—আমি বুঝি সবদিন এইরকম বাড়ীতে বসে থাকবো? যেতে পারবো না কোথাও বুঝি? আমার বুঝি চোখ নেই, কান নেই, পা নেই?

—সব আছে, উনি একলা যাবেন সেই গঙ্গানন্দপুর—বড় সাহসী পুরুষ কিনা!

অবশেষে কিন্তু অপুর নির্বন্ধাতিশয্যে তাহাকেই পাঠাইতে হইল।

সোনাডাঙা মাঠের বুক চিরিয়া উঁচু মাটির পথ। পথের দু'ধারে মাঠের মধ্যে শুধুই আকন্দফুলের বন, দীর্ঘ শ্বেতাভ ডাঁটাগুলি ফুলের ভারে নত হইয়া দূর্বাঘাসের উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে। পথে কোনো লোক নাই, দুপুরের অল্পই দেরি আছে, গাছপালার ছায়া ছোট হইয়া আসিতেছে। অপুর খালি পায়ে বেলেমাটির তাত লাগিতেছিল—তাহাতে বেশ আরাম হয়। পথের ধারের বন-ঝোপে কত কি ফুল ফুটিয়াছে, সাঁইবাব্‌লা গাছের নতুন ফোটা ফুলের শীর্ষ সূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া আছে, ছোট এক রকমের গাছে রাঙা রাঙা বনডুমুরের মত কি ফল অজস্র পাকিয়া টুক্‌টুক্ করিতেছে, মাটির মধ্য হইতে কেমন রোদ্‌পোড়া সোঁদা সোঁদা গন্ধ বাহির হইতেছে।... সে মাঝে মাঝে নীচু হইয়া ঝোপের ভিতর হইতে খুঁজিয়া খুঁজিয়া বৈঁচিফল তুলিয়া হাতে-সেলাই-করা রাঙা সাটিনের জামাটার দু'পকেট ভর্তি করিয়া লইতেছিল।

যাইতে যাইতে তাহার মন পুলকে ভরিয়া উঠিতেছিল। সে কাহাকেও বলিতে পারে না যে, সে কী ভালবাসে এই মাটির তাজা রোদপোড়া গন্ধটা, এই ছায়াভরা দূর্বাঘাস, সূর্যের আলোমাখানো মাঠ, পথ, গাছপালা, পাখী, বনঝোপ, ঐ দোলানো ফুলফলের থোলো, আলকুশী, বনকলমী, নীল অপরাজিতা। ঘরে থাকিতে তাহার মোটেই ইচ্ছা হয় না; ভারী মজা হয় যদি বাবা তাহাকে বলে— খোকা, তুমি শুধু পথে-পথে বেড়িয়ে বেড়াও, তাহা হইলে এইরকম বনফুল-ঝুলানো ছায়াচ্ছন্ন ঝোপের তলা দিয়া ঘুঘু-ডাকা দূর বনের দিকে চোখ রাখিয়া এই রকম মাটির পথটি বাহিয়া শুধুই হাঁটে—শুধুই হাঁটে।....মাঝে মাঝে হয়তো বাঁশবনের কঞ্চির ডালে ডালে শর্-শ্‌র শব্দ, বৈকালের রোদে সোনার সিঁদুর ছড়ানো আর নানা রঙ-বেরঙএর পাখীর গান।

অপুর শৈশব কাটিতেছিল এই প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে। এক ঋতু কাটিয়া গিয়া কখন অন্য ঋতু পড়ে— গাছপালায়, আকাশে বাতাসে, পাখীর কাকলীতে তাহার বার্তা রটে। ঋতুতে ঋতুতে ইছামতীর নব নব পরিবর্তনশীল রূপ সম্বন্ধে তাহার চেতনা জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল—কোন্ ঋতু গাছপালায় জলে-স্থলে-শূন্যে ফুলে ফলে কি পরিবর্তন ঘটায় তাহা সে ভাল করিয়া চিনিয়া ফেলিয়াছে। ইহাদের সহিত এই ঘনিষ্ঠ যোগ সে ভালবাসে, ইহাদের ছাড়া সে জীবন কল্পনা করিতে পারে না। এই বিরাট অপরূপ ছবি চোখের উপরে রাখিয়া সে মানুষ হইতেছিল। গ্রীষ্মের খরতাপ ও গরমের অবসানে সারা দিকচক্রবাল্ জুড়িয়া ঘননীল মেঘসজ্জার গম্ভীর সুন্দর রূপ, অস্তবেলায় সোনাডাঙার মাথার উপরকার আকাশে কত বর্ণের মেঘের খেলা, ভাদ্রের শেষে ফুটন্ত কাশ-ফুলে-ভরা মাধবপুরের দূরপ্রসারিত চর, চাঁদিনী রাতে জ্যোৎস্নাজালের খুপ্‌রি-কাটা বাঁশবনের তলা,—অপুর স্ফুটনোন্মুখ কৈশোরের সতেজ আগ্রহভরা অনাবিল মনে ইহাদের অপূর্ব বিশাল সৌন্দর্য চিরস্থায়ী ছাপ মারিয়া দিয়াছিল, কান্তিরসের চোখ খুলিয়া দিয়াছিল, চুপি চুপি তাহার কানে অমৃতের দীক্ষামন্ত্র শুনাইয়াছিল।—অপু কখনো জীবনে এ শিক্ষা বিস্মৃত হয় নাই। চিরজীবন সৌন্দর্যের পূজারী হইবার ব্রত নিজের অলক্ষিতে মুক্তরূপা প্রকৃতি তাহাকে তাহা ধীরে ধীরে গ্রহণ করাইতেছিলেন।....

নতিডাঙ্গার বাঁওড়ে কাহারা মাছ ধরিয়াছে। সে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিল। গ্রামের মধ্যে একটা কানা ভিখারী একতারা বাজাইয়া গান গাহিয়া ভিক্ষা করিতেছে—ও গান তো অপু জানে—কতবার গাহিয়াছে ঃ—

'দিন-দুপুরে চাঁদের উদয় রাত পোহানো হোল ভার।....'

বোষ্টম দাদু গানটা খুব ভাল গায়।

হরিশপুরের মধ্যে ঢুকিয়া পথের ধারে একটা ছোট্ট চালাঘরের পাঠশালা বসিয়াছে, ছেলেরা সুর করিয়া নামতা পড়িতেছে, সে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল। গুরুমশায়ের বয়স বেশী নয়, তাহাদের গাঁয়ের প্রসন্ন গুরুমশায়ের চেয়ে অনেক কম।

আর এক কথা তাহার বার বার মনে হইতেছিল। এই তো সে বড় হইয়াছে, আর ছোট নাই, ছোট থাকিলে কি আর মা একা কোথাও ছাড়িয়া দিত?....এখন কেবলই চলা, কেবলই সামনে আগাইয়া যাওয়া। তাহা ছাড়া, আস্‌চে মাসের এই দিনটিতে তাহারা কতদূর, কোথায় চলিয়া যাইবে! কোথায় সেই কাশী—সেখানে!

বৈকালের দিকে গঙ্গানন্দপুরে গিয়া পৌঁছিল। পাড়ার মধ্যে পৌঁছিতেই কোথা হইতে রাজ্যের লজ্জা তাহাকে এমন পাইয়া বসিল যে, সে কোনো দিকে চাহিতেই পারিল না। কায়ক্লেশে সম্মুখের পথে দৃষ্টি রাখিয়া কোনোরকমে পথ চলিতে লাগিল। তাহার মনে হইল সকলেই তাহার দিকে চাহিতেছে। সে যে আজ আসিবে তাহা যেন সকলেই জানে; হয়তো ইহারা এতক্ষণ মনে মনে বলিতেছে—এই সেই যাচ্ছে, দ্যাখ্ দ্যাখ্ চেয়ে। ....সে যে পুঁটুলির ভিতর বাঁধিয়া নারিকেল-নাড়ু লইয়া যাইতেছে, তাহাও যেন সকলেই জানে। তাহার পিসেমশায় কুঞ্জ চক্রবর্তীর বাড়ীটা কোন্‌দিকে এ কথাটা পর্য্যন্ত সে কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

অবশেষে এক বুড়ীকে নির্জনে পাইয়া তাহাকেই জিজ্ঞাসা করাতে সে বাড়ী দেখাইয়া দিল। বাড়ীটার সামনে পাঁচিল-ঘেরা। উঠানে ঢুকিয়া সে কাহারও সাক্ষাৎ পাইল না। দু—একবার কাশিল, মুখ দিয়া কথা বাহির হয় সাধ্য কি? কতক্ষণ সে চৈত্রমাসের খররৌদ্রে বাহিরের উঠানে দাঁড়াইয়া থাকিত ঠিকানা নাই, কিন্তু খানিকটা পরে একজন আঠারো-উনিশ বছরের শ্যামবর্ণ মেয়ে কি কাজে বাহিরে আসিয়া রোয়াকে পা দিতেই দেখিল—দরজার কাছে কাহাদের একটি অপরিচিত, প্রিয়দর্শন বালক পুঁটুলি-হাতে লজ্জাকুণ্ঠিত ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। মেয়েটি বিস্মিতভাবে বলিল—তুমি কে খোকা? কোত্থেকে আস্‌চো? ....অপু আনাড়ির মত আগাইয়া আসিয়া অতিকষ্টে উচ্চারণ করিল—এই আমার বাড়ী—নিশ্চিন্দিপুরে, আমার—নাম অ-অপু।

তাহার মনে হইতেছিল, না আসিলেই ভাল হইত! হয়তো তাহার পিসীমা তাহার এরূপ অপ্রত্যাশিত আগমনে বিরক্ত হইবে, হয়তো ভাবিবে কোথা হইতে আবার এক আপদ আসিয়া জুটিল!.... তাহা ছাড়া, —কে জানিত আগে যে অপরিচিত স্থানে আসিয়া কথাবার্তা কওয়া এত কঠিন কাজ? তার কপাল ঘামিয়া উঠিল।

কিন্তু মেয়েটি তখনই ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া মহা-আদরে রোয়াকে উঠাইয়া লইয়া গেল। তাহার মা-বাবা কেমন আছেন সেকথা জিজ্ঞাসা করিল। তাহার চিবুকে হাত দিয়া কত আদরের কথা বলিল। দিদিকে যদিও কখনও দেখে নাই তবুও দিদির নাম করিয়া খুব দুঃখ করিল। নিজের হাতে তাহার গায়ের জামা খুলিয়া হাতমুখ ধোয়াইয়া শুক্‌নো গামছা দিয়া মুছাইয়া তাড়াতাড়ি এক গ্লাস চিনির শরবৎ করিয়া আনিল। পিসী বলিতে সে যাহা ভাবিয়াছিল তাহা নয়, অল্প বয়স, রাজীর দিদির চেয়ে একটু বড়।

তাহার পিসীও তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। জ্ঞাতি-সম্পর্কের ভাইপোটি যে দেখিতে এত সুন্দর বা তাহার বয়স এত কম তাহার পিসী বোধ হয় ইতিপূর্বে জানিত না। তাই পাশের বাড়ী হইতে একজন প্রতিবেশিনী আসিয়া অপুর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে একটু গর্বের সহিত বলিল—আমার ভাইপো, নিশ্চিন্দিপুরে বাড়ী, খুড়তুতো ভায়ের ছেলে; সম্পর্কে খুবই আপন, তবে আসা-যাওয়া নেই তাই! ....পরে সে পুনরায় গর্বের চোখে অপুর দিকে চাহিয়া রহিল। ভাবটা'এই—দ্যাখো আমার ভাইপোর কেমন রাজপুত্তুরের মত চেহারা, এখন বোঝ কি দরের—কি বংশের মেয়ে আমি!....

সন্ধ্যার পর কুঞ্জ চক্রবর্তী বাড়ী আসিল। পাক্‌শিটে-মারা চোয়াড়ে-চোয়াড়ে চেহারা, বয়স বুঝিবার উপায় নাই। তাহার পিসীকে দেখিয়া তাহার যেমন লজ্জা হইয়াছিল, পিসেমশায়কে তেমনি তাহার ভয় হইল। ছেলেবেলায় সে যে প্রসন্ন গুরুমশায়ের কাছে পড়িত, তেমনি যেন চেহারাটা। মনে হইল এ লোক যেন এখনই বলিতে পারে—বড্ড জ্যাঠা ছেলে দেখচি তো তুমি?....

পরদিন সকালে উঠিয়া অপু পাড়ার পথে এদিকে-ওদিকে একটু ঘুরিয়া আসিল। চারিদিক জঙ্গলে ভরা, ফাঁকা জমি—দূর্বাঘাস প্রায় নাই, এমন জঙ্গল। এই একটা বাড়ী, আবার বনে-ঘেরা সুঁড়ি পথ বাহিয়া গিয়া আবার দূরে একটা বাড়ী। অনেক সময় লোকের বাড়ীর উঠানের উপর দিয়া পথ। তাহার বয়সী দু'চারজনকে খেলা করিতে দেখিল বটে, কিন্তু সকলেই তাহার দিকে এমন হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল যে, তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিবার চেষ্টা করা তো দূরের কথা, সে তাহাদের মুখের দিকে চাহিতে পারিল না।

পিসীর বাড়ীর দিকে ফিরিবার সময়ও বিপদ। এরূপ সকালে মার কাছে সে চিঁড়া, মুড়ি, নাড়ু বা বাসি-ভাত খাইয়া থাকে। এখানে কি উহারা দিবে? কাল তো রাত্রে ভাত খাইবার সময় দুধের সঙ্গে সন্দেশ কিনিয়া আনিয়া দিয়াছে। আজ যদি সে এখনই ফিরে, তবে হয়তো উহারা ভাবিবে ছেলেটা ভারী পেটুক; খাবার খাইবার লোভে-লোভে এত সকালে বাড়ী ফিরিল। রোজ রোজ খাবার খাওয়া কি ভাল? .... এখন সে কি করে? নাঃ, বাড়ী ফিরিবে না। আরও খানিক পথে পথে ফিরিয়া একেবারে সেই ভাত খাওয়ার সময়ের একটু আগে বাড়ী যাইবে। অপরিচিত জায়গায় এতক্ষণ পথেই বা কোথায় দাঁড়াইয়া থাকে?

পায়ে পায়ে সে অবশেষে বাড়িতেই আসিয়া পৌঁছিল।

একটি ছয়-সাত বছরের মেয়ে একটা কাঁসার বাটি হাতে বাড়ী ঢুকিয়া উঠান হইতে ডাকিয়া কহিল—নাউ রেঁধেচো জেঠিমা, মোরে একটু দেবে?....অপুর পিসীমা ভিতর হইতে বলিল—কে রে, গুল্‌কী? না, ওবেলা রাঁধবো, এসে নিয়ে যাস্‌...গুল্‌কী বাটি নামাইয়া রোয়াকের ধারে দাঁড়াইয়া রহিল। মাথার চুলগুলা ঝাঁকড়া ঝাঁক্‌ড়া, ছেলেদের চুলের মত খাটো। ময়লা কাপড় পরনে, মাথায় তেল নাই, রং শ্যামবর্ণ। অপুর দিকে চাহিয়া, কি বুঝিয়া একবার ফিক্‌ করিয়া হাসিয়া সে বাটি উঠাইয়া চলিয়া গেল।

অপু জিজ্ঞাসা করিল—মেয়েটা কাদের পিসীমা?

তাহার পিসী বলিল—কে, গুল্‌কী? ওদের বাড়ী এখানে না—ওর মা-বাপ কেউ কোথাও নেই। নিবারণ মুখুয্যের বৌ—এই যে পাশের বাড়ি, ওর দূর-সম্পর্কের জেঠী—সেখানেই থাকে।

পরদিন পাড়ার একটা ছেলে আসিয়া যাচিয়া তাহার সঙ্গে ভাব করিল ও সঙ্গে করিয়া গ্রামের সকল পাড়া ঘুরাইয়া দেখাইয়া বেড়াইল। বাড়ী ফিরিবার পথে দেখিল—সে অনাথা মেয়ে গুল্‌কী পথের ধারে পা ছড়াইয়া একলাটি বসিয়া কি খাইতেছে। তাহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি আঁচল গুটাইতে গেল—আঁচলে একরাশ আধপাকা বকুল ফল। অপু ইতিমধ্যে পিসীমার কাছে তাহার আরও পরিচয় লইয়াছে; নিবারণ মুখুয্যের বৌ ভাল ব্যবহার করে না, লোক ভাল নয়। পিসীমা বলিতেছিল— জেঠী তো নয় রনচণ্ডী, কত দিন খেতেও দেয় না, এর বাড়ী ওর বাড়ী খেয়ে বেড়ায়। নিজের পুষ্যিই সাতগন্ডা—তাদেরই জোটে না, তায় আবার পর!....গুল্‌কীকে দেখিয়া অপুর মোটেই লজ্জা হয় না—ছোট্ট একটুকু মেয়েটা, আহা কেহ নাই! তাহার সঙ্গে ভাব করিতে অপুর বড় ইচ্ছা হইল। সে কাছে গিয়া বলিল—আঁচলে কি লুকচ্চিস্‌ দেখি খুকী?....গুল্‌কী হঠাৎ আঁচল গুটাইয়া লইয়া ফিক করিয়া হাসিয়া নীচু হইয়া দৌড় দিল। তাহার কান্ড দেখিয়া অপুর হাসি পাইল। ছুটিবার সময় গুল্‌কীর আঁচলের বকুলফল পড়িতে পড়িতে চলিয়াছিল, সেগুলি সে কুড়াইতে কুড়াইতে বলিল—প'ড়ে গেল, সব প'ড়ে গেল, নিয়ে যা তোর বকুল ও খুকী, কিছু বোলবো না, ও খুকী! ....গুল্‌কী ততক্ষণে উধাও হইয়াছে।

পুকুরে স্নান সারিয়া আসিয়া সে বসিয়া আছে, এমন সময় দেখিতে পাইল খিড়কী দরজার আড়াল হইতে গুল্‌কী একবার একটুখানি করিয়া উঁকি মারিতেছে আর একবার মুখ লুকাইতেছে। তাহার সহিত চোখোচোখি হওয়াতে গুল্‌কী ফিক্‌ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। অপু দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—দাঁড়া,

তোকে ধরচি এক দৌড়ে— বলিয়া সে খিড়কী-দরজার দিকে ছুটিল। গুল্‌কী আর পেছনদিকে না চাহিয়া পথ বাহিয়া সোজা পুকুরপাড়ের দিকে ছুট্ দিল। কিন্তু অপুর সঙ্গে পারিবে কেন? নিরুপায় দেখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িতেই অপু তাহার ঝাঁকড়া চুলগুলো মুঠায় চাপিয়া ধরিয়া বলিল—বড় ছুট দিচ্ছিলি যে? আমার সঙ্গে ছুটে বুঝি তুই পারবি, খুকী? ....গুল্‌কীর প্রথম ভয় হইয়াছিল বুঝি বা তাহাকে মারিবে! কিন্তু অপু চুলের মুঠি ছাড়িয়া দিয়া হাসিয়া ফেলায়, সে বুঝিল এ একটা খেলা। সে আবার সেই রকম হাসিয়া ফেলিল।

অপুর বড় দয়া হইল। তাহার মুখের হাসিতে এমন একটা আভাস ছিল যাহাতে অপুর মনে হইল এ তাহার সঙ্গে ভাব করিতে চায়—খেলা করিতে চায়; কিন্তু ছেলেমানুষ কথা কহিতে জানে না বলিয়া এইরকম উঁকিঝুঁকি মারিয়া—ফিক্ করিয়া হাসিয়া—দৌড়িয়া পলাইয়া—তাহার ইচ্ছা প্রকাশ করে। অন্য উপায় ইহার জানা নেই। এ যেন ঠিক তাহার দিদি! এই বয়সে দিদি যেন এই রকমই ছিল—এই রকম আঁচলে কুল-বেল-বৈঁচি বাঁধিয়া আপন মনে ঘুরিয়া বেড়াইত, কেহ বুঝিত না, কেহ দেখিত না, এই রকম পেটুক—এই রকম বুদ্ধিহীন ছোট মেয়ে!

অপু ভাবিল—এর সঙ্গে কেউ খেলা করে না, একে নিয়ে একটু খেলি। আহা, মা-বাপ-হারা দুঃখী মেয়ে, আপন মনে বেড়ায়!—সে গুল্‌কীর চুলের মুঠা ছাড়িয়া দিয়া হাত ধরিয়াছিল, বলিল—খেলা করবি খুকী? চল্ ঐ পুকুরের পাড়ে। না, এক কাজ কর খুকী, আমি তোকে ধরবো—আর তুই ছুটে যাবি; ঐ কাঁঠাল গাছটা বুড়ী। আয়—

মুঠা ছাড়িয়া দিতেই গুল্‌কী আর না দাঁড়াইয়া আবার নীচু হইয়া দৌড় দিল। অপু চেঁচাইয়া বলিল—আচ্ছা যা, যা দেখি কদ্দূর যাবি—ঠিক তোকে ধরব দেখিস। আচ্ছা, ঐ গেলি তো এই দ্যাখ—বলিয়া নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া সে এক দৌড় দিল—চু-উ-উ-উ। গুল্‌কী পিছন দিকে চাহিয়া অপুকে দৌড়িতে দেখিয়া প্রাণপণে যতটুকু তাহার ক্ষুদ্র শক্তিতে কুলায় দৌড়িবার চেষ্টা করিল—কিন্তু অপু একটুখানি ছুটিয়া গিয়াই তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। ভারী ছুটতে শিখিচিস্ খুকী না? তা-কি তুই আমার সঙ্গে পারিস্? চল চোর-চৌকিদার খেলা করবি—তুই হবি চোর—এই কাঁঠাল পাতা চুরি করে পালাবি, বুঝলি?....আর আমি হবো চৌকিদার, তোকে ধরবো।

গুল্‌কীর মুখে হাসি আর ধরিতেছিল না—হয়তো সে এতক্ষণ মনে মনে চাহিতেছিল এই সুন্দর ছেলেটির সঙ্গে ভাব করিতে। মাথা নাড়িয়া আশ্বাস দিবার সুরে বলিল—কাঁইবিচি নেবে? অপু মনে ভাবিল চাষার গ্রামে থাকিয়া ও এই সব কথা শিখিয়াছে—তাহাদের গ্রামে যেমন গোয়ালা কি সদ্‌গোপের ছেলেমেয়েরা কথা বলে তেমনি।

দুপুরবেলা তাহার পিসীমা ডাকিলে পিছনে পিছনে গুল্‌কী আসিল। অপুর খাওয়া হইয়া গেলে তাহার পিসী জিজ্ঞাসা করিল—ভাত খাবি গুল্‌কী? অপুর পাতে বোস্—মোচার ঘন্ট আছে—ডাল দিচ্চি, অপু ভাবিল—আহা, ও খাবে জান্‌লে দুখানা মাছ এর জন্যে রেখে দিতাম। গুল্‌কী দ্বিরক্তি না করিয়া নির্লজ্জভাবে খাইতে বসিল। অনেকগুলি ভাত চাহিয়া লইয়া ডাল দিয়া সেগুলি মাখিল, পরে অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া অত ভাত না খাইতে পারিয়া পাতের পাশে রাশীকত ঠেলিয়া রাখিল। তবুও উঠিবার নাম করে না। অপুর পিসীমা হাসিয়া বলিল—আর খেতে হবে না গুল্‌কী—হাঁসফাঁস কচ্চিস—নে ওঠ্, কত ভাত নিয়ে ফেল্‌লি দ্যাখ্ তো? তোর কেবল দিষ্টি-খিদে—পরে বলিল, জেঠীমার কান্ড দ্যাখো—এতখানি বেলা হয়েচে—কাঁচা মেয়েটা—ভাত খেতে ডাকেও না? হলোই বা পর—তা হলেও কচি তো?....

শনিবারে সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে অপু পূজা দিতে গেল। আচার্য ঠাকুরের খুব লম্বা সাদা দাড়ি বুকের ওপর পড়িয়াছে, বেশ চেহারা। তাঁহার বিধবা মেয়ে বাপের সঙ্গে সঙ্গে আসে, পূজার আয়োজন করিয়া দেয়, বাপকে খুব সাহায্য করে। মেয়েটি বলিল—চার পয়সা দক্ষিণে কেন খোকা? এতে তো হবে না, বারের পূজোতে দু'আনা দক্ষিণে লাগবে—। অপু বলিল—আমার মা যে চার পয়সা দিয়েচে মোটে, আর তো আমার কাছে নেই? মেয়েটি খানকতক কলা মূলা বাছিয়া একখানা পাতায় মুড়িয়া তাহার

হাতে দিয়া বলিল—ঠাকুরের প্রসাদ এতে রৈল, বেলপাতা আর সিঁদুরও দিলাম, তোমাদের বাড়ীর মেয়েদের দিও। অপু ভাবিল— বেশ লোক এরা, আমার যদি পয়সা থাকতো আরও দু'পয়সা দিতাম—

পিসীমার বাড়ী ফিরিয়া সে বাহিরের রোয়াকে জ্যোৎস্নার আলোতে বসিয়া পিসীমার সঙ্গে পূজার গল্প করিতেছে, পাশের গুল্‌কীদের বাড়ীতে হঠাৎ গুল্‌কীর সরু গলার আকাশ-ফাটানো চীৎকার শোনা গেল—ওরে জেঠী, অমন ক'রে মেরো না—ওরে বাবারে—ও জেঠী মোর পিঠ কেটে অক্ত পড়চে—মেরো না জেঠী—সঙ্গে সঙ্গে একটা কর্কশ গলার চিৎকার শোনা গেল—হারামজাদী—বদমায়েস—চৌধুরীদের বাড়ী গিয়েচো নেমন্তন্ন খেতে এমনি তোমার নোলা? তোমার নোলায় যদি আজ হাতা পুড়িয়ে ছেঁকা না দিই—লোকের বাড়ী খেয়ে খেয়ে বেড়াবে আর শতেকক্ষোয়ারীরা চোখের মাথা খেয়ে দেখ্‌তে পায় না, বলে কি না খেতে দেয় না—আপদ্ বালাই কোথাকার—বাড়ীতে তোমায় খেতে দেয় না?....তোমায় আজ—

অপুর পিসীমা বলিল—দেখচো, ঠেস্ দিয়ে দিয়ে কথা শুনিয়ে শুনিয়ে বল্‌চে? সত্যি কথা বল্লেই লোকের সঙ্গে আর ভাব থাকে না—তা হলেই তুমি খারাপ—।

অপুর মনটা আকুলি-বিকুলি করিতেছিল। চোখের জলে গলা আড়ষ্ট হওয়ার দরুন কোনো কথা মুখ দিয়া বাহির হইল না।

পরদিন সন্ধ্যার কিছু আগে আহারাদি সারিয়া অপু গোয়ালাপাড়ার দিকে চলিল। আগের দিন তাহার পিসেমশায় ঠিক করিয়া দিয়াছে এ গ্রাম হইতে নবাবগঞ্জে তামাক বোঝাই গাড়ী যাইবে, সেই গাড়ীতে উঠিয়া সন্ধ্যার সময় রওনা হইলে সকালের দিকে নিশ্চিন্দিপুরের পথে তাহাকে উহারা নামাইয়া দিবে।

অল্পদূরে গিয়া বামুনপাড়ার পথের মোড়ে গুল্‌কীর সঙ্গে দেখা। সে সন্ধ্যায় খেলা করিয়া বাড়ী ফিরিতেছে। অপু বলিল—বাড়ী চলে যাচ্ছি রে খুকী আজ—সারাদিন ছিলি কোথায়? খেলতে এলিনে কিছু না—। পরে গুল্‌কী অবিশ্বাসের হাসি হাসিতেছে দেখিয়া বলিল—সত্যি রে, সত্যি বলচি, এই দ্যাখ্ পুঁটলি, কার্তিক গোয়ালার বাড়ী গিয়া গাড়ী উঠবো—আয় না আমার সঙ্গে একটু এগিয়ে দিবি?

গুল্‌কী পিছনে পিছনে অনেকদূর চলিল। বামুনপাড়া ছাড়িয়া খানিকটা ফাঁকা মাঠ। তাহার পরেই গোয়ালাপাড়া। গুল্‌কী মাঠের ধার পর্যন্ত আসিল। অপুর রাঙা সাটিনের জামাটার দিকে আঙুল দেখাইয়া কহিল—তোমার এই রাঙা জামাটা ক' পয়সা?

অপু হাসিমুখে বলিল—দু'টাকা—তুই নিবি? গুল্‌কী ফিক্ করিয়া হাসিল। অর্থাৎ তুমি যদি দাও, এখ্‌খনি....

হঠাৎ সামনের পথে চোখ ফিরাইতেই অপু দেখিতে পাইল, মাঠের শেষে গাছপালার ফাঁকে আলো হইয়া উঠিয়াছে—অমনি কেমন করিয়া তাহার মনে হইল আগামী মাসের এমন দিনটাতে তাহারা কোথায় কতদূরে চলিয়া যাইবে! পরে গুল্‌কীকে বলিল—আর আসিস্ নে খুকী, তুই চলে যা—অনেকদূরে এসে গিইচিস—তোর বাড়ীতে হয়তো আবার বকবে—চলে যা খুকী—আবার এলে দেখা হবে, কেমন তো? হয়তো আর আসবো না, আমরা কাশী চলে যাবো বোশেখ্ মাসে, সেখানে বাস করবো—গুল্‌কী আর একবার ফিক্ করিয়া হাসিল।

সেদিন পূর্ণিমা কি চতুর্দশী এমনি একটা তিথি। সে এদিকে আর কখনও আসে নাই, কিন্তু বাল্যের এই একা প্রথম বিদেশ-গমন সম্পর্কিত একটা ছবি অনেক দিন পর্যন্ত তাহার মনে ছিল—সোজা মাঠের পথে দূর-প্রান্তে গাছপালার ফাঁকে পূর্ণচন্দ্র উঠিতেছে (বা চতুর্দশীর চন্দ্র, তাহার ঠিক মনে ছিল না)। পিছনে পিছনে অল্পদিনের পরিচিতা, অনাথা, অবোধ ঝাঁকড়াচুল ছোট একটি মেয়ে তাহাকে আগাইয়া দিতে আসিয়াছে।

বৈশাখ মাসের প্রথমে হরিহর নিশ্চিন্দিপুর হইতে বাস উঠাইবার সব ঠিক করিয়া ফেলিল। যে জিনিসপত্র সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়া চলিবে না, সেগুলি বিক্রয় করিয়া ফেলিয়া নানা খুচরা দেনা শোধ করিয়া দিল। সেকালের কাঁঠালকাঠের বড় তক্তপোষ, সিন্দুক, পিঁড়ি ঘরে অনেকগুলি ছিল, খবর পাইয়া ওপাড়া হইতে পর্যন্ত খরিদ্দার আসিয়া সস্তাদরে কিনিয়া লইয়া গেল।

গ্রামের মুরুব্বীরা আসিয়া হরিহরকে বুঝাইয়া নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নিশ্চিন্দিপুরে দুগ্ধ ও মৎস্য কত সস্তা বা কত অল্প খরচে এখানে সংসার চলে সে বিষয়ের একটা তুলনামূলক তালিকাও মুখে মুখে দাখিল করিয়া দিলেন। কেবল রাজকৃষ্ণ ভট্টাচার্য স্ত্রী সাবিত্রীব্রত উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া অনেকক্ষণ কথাবার্তার পর বলিলেন—বাপু, আছেই বা কি দেশে যে থাকতে বোল্‌বো—তা ছাড়া এক জায়গায় কাদায় গুণ পুঁতে থাকাও কোনো কাজের নয়, এ আমি নিজেকে দিয়ে বুঝি—মন ছোট হয়ে থাকে, মনের বাড় বন্ধ হয়ে যায়। দেখি এবার তো ইচ্ছা আছে একবার চন্দ্রনাথটা সেরে আসবো যদি ভগবান দিন দেন—

রাণী কথাটা শুনিয়া অপুদের বাড়ী আসিল। অপুকে বলিল—হ্যাঁরে অপু, তোরা নাকি এ গাঁ ছেড়ে চ'লে যাবি? সত্যি?

অপু বলিল—সত্যি রাণুদি, জিজ্ঞাসা করো মাকে—

তবুও রাণী বিশ্বাস করে না। শেষে সর্বজয়ার মুখে সব শুনিয়া রাণী অবাক্ হইয়া গেল। অপুকে বাহিরের উঠানে ডাকিয়া বলিল—কবে যাবি রে?

—সামনের বুধবারের পরের বুধবারে—

—আসবি নে আর কখনো?

রাণীর চোখ অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, বলিল—তুই যে বলিস নিশ্চিন্দিপুর আমাদের বড় ভাল গাঁ, এমন নদী, এমন মাঠ কোথাও নেই—সে গাঁ ছেড়ে তুই যাবি কি করে?

অপু বলিল—আমি কি করবো, আমি তো আর বলিনি যাবার কথা? বাবার সেখানে বাস করবার মন, এখানে আমাদের চলে না যে? আমার লেখা খাতাটা তোমাকে দিয়ে যাবো রাণুদি, বড় হোলে হয়তো আবার দেখা হবে—

রাণী বলিল—আমার খাতাতে গল্পটাও তো শেষ করে দিলি নে, খাতায় নাম সইও কোরে দিলি নি, তুই বেশ ছেলে তো অপু?

চোখের জল চাপিয়া রাণী দ্রুতপদে বাটীর বাহির হইয়া গেল। অপু বুঝিতে পারে না রাণুদি মিছামিছি কেন রাগ করে! সে কি নিজের ইচ্ছাতে দেশ ছাড়িয়া যাইতেছে?

স্নানের ঘাটে পটুর সঙ্গে অপুর কত কথা হইল। পটুও কথাটা জানিত না, অপুর মুখে সব শুনিয়া তাহার মনটা বেজায় দমিয়া গেল। ম্লানমুখে বলিল—তোর জন্যে নিজে জলে নেমে কত কষ্টে শেওলা সরিয়ে ফুট্ কাটলাম, একদিনও মাছ ধরবিনে তাতে?

এবার রামনবমীর দোল, চড়কপূজা ও গোষ্ঠবিহার অল্পদিন পরে পরে পড়িল। প্রতি বৎসর এই সময় অপূর্ব অসংযত আনন্দে অপুর বুক ভরিয়া তোলে। সে ও দিদি এ সময় আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিত। অপুর দিক হইতে অবশ্য এবারও তাহার কোনো ত্রুটি হইল না।

চড়কের দিন গ্রামের আতুরী বুড়ী মারা গেল। নতুন যে মাঠটাতে আজকাল চড়কের মেলা বসে, তাহারই কাছে আতুরী বুড়ীর সেই দো-চালা ঘরখানা। অনেক লোক জড় হইয়াছে দেখিয়া সেও সেখানে দেখিতে গেল। সেই যে একবার আতুরী ডাইনীর ভয়ে বাঁশবন ভাঙিয়া দৌড় দিয়াছিল—তখন সে ছোট ছিল—এখন তাহার সে কথা মনে হইলে হাসি পায়। আজ তাহার মনে হইল আতুরী বুড়ী ডাইনী নয়, কিছু নয়। গ্রামের একধারে লোকালয়ের বাহিরে একা থাকিত— গরীব, অসহায়, ছেলে ছিল না,

মেয়ে ছিল না, কেহ দেখিবার ছিল না, থাকিলে কি আজ সারাদিন ঘরের মধ্যে মরিয়া পড়িয়া থাকিত? সংকারের লোক হয় না? পাঁচু জেলের ছেলে একটা হাঁড়ি বাহিরে আনিয়া ঢালিল—এক-হাঁড়ি শুক্‌নো আমচুর। ঝোড়ো আম কুড়াইয়া বুড়ী আম্‌সি আমচুর তৈয়ারী করিয়া রাখিয়া দিত ও তাহা হাটে হাটে বিক্রয় করিয়া দিনপাত করিত। অপু তাহা জানে, কারণ গত রথের মেলাতেও তাহাকে ডালা পাতিয়া আম্‌সি বিক্রয় করিতে দেখিয়াছে।

চড়কটা যেন এবার কেমন ফাঁকা ঠেকিতে লাগিল। আর-বছরও চড়কের বাজারে দিদি নতুন পট্ কিনিয়া কত আনন্দ করিয়াছে। মনে আছে সেদিন সকালে দিদির সহিত তাহার ঝগড়া হইয়াছিল। বৈকালে তাহার দিদি বলিল—পয়সা দেবো অপু, একখানা সীতাহরণের পট দেখিস যদি মেলায় পাস্? অপু প্রতিশোধ লইবার জন্য বলিল—যত সব পান্‌সে পুতু পুতু পট, তাই তোর কিনতে হবে, আমি পারবো না যা—কেন রামরাবণের যুদ্ধ একখানা কেন্ না? তাহার দিদি বলিল—তোর কেবল যুদ্ধ আর যুদ্ধ— ছেলের যা কান্ড! কেন ঠাকুর-দেবতার পট বুঝি ভাল হোল না? ....দিদির শিল্পানুভূতি শক্তির উপর অপুর কোনো কালেই শ্রদ্ধা ছিল না।

তাহাদের বেড়ায় গায়ে রাংচিতা ফুল লাল হইয়া ফুটিলে, তাহার মুখ মনে পড়ে, পাখীর ডাকে, সদ্যফোটা ওড়কল্‌মীর ফুলের দুলুনিতে— দিদির জন্য মন কেমন করে। মনে হয় যাহার কাছে ছুটিয়া গিয়া বলিলে খুশী হইত, সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে—কতদূর! ....আর কখনো, কখনো—সে এসব লইয়া খেলা করিতে আসিবে না।....

মেলার গোলমালের মধ্যে কে চমৎকার বাঁশী বাজাইতেছে। নতুন সুর তাহার বড় ভালো লাগে—খুঁজিয়া বাহির করিল—মালপাড়ার হারাণ মাল এক বান্ডিল বাঁশের বাঁশি চাঁচিয়া বিক্রয় করিবার জন্য আনিয়াছে ও বিজ্ঞাপন স্বরূপ একটা বাঁশি নিজে বাজাইতেছে। অপু জিজ্ঞাসা করিল—একটা ক' পয়সা? হারাণ মাল তাহাকে খুব চেনে। কতবার তাহাদের রান্নাঘর ছাইয়া দিয়া গিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল—তোমরা নাকি শোন্‌লাম খোকা গাঁ ছেড়ে চল্লে? তা কোথায় যাচ্চ—হ্যাঁগা? অপু দেড় পয়সা দিয়া সরু বাঁশি একটা কিনিল। বলিল—কোন্ কোন্ ফুটোতে আঙুল টেপো হারাণকাকা? একবার দেখিয়া দাও দিকি?

মনে আছে একবার অনেক রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া সে খানিকক্ষণ জাগিয়া ছিল। দূরে নদীতে অন্ধকার রাত্রে জেলেদের আলোয় মাছধরা দোনা-জালের একঘেয়ে একটানা ঠক্ ঠক্ শব্দ হইতেছিল। এমন সময় তাহার কানে গেল অনেক দূরে যেন কুঠির মাঠের পথের দিকে অত রাত্রে কে খোলা গলায় গান গাহিয়া পথ চলিয়াছে। কুঠির মাঠের পথে বেশী রাত্রে বড় একটা কেহ হাঁটে না, তবুও আধঘুমে কতদিন যে নিশীথ রাত্রির জ্যোৎস্নায় অচেনা পথিক-কণ্ঠে মধুকানের পদ-ভাঙা গানের তানকে দূর হইতে দূরে মিলাইয়া যাইতে শুনিয়াছে—কিন্তু সেবার যাহা শুনিয়াছিল তাহা একেবারে নতুন। সুরটা সে আয়ত্ত করিতে পারে নাই—আধ-জাগরণের ঘোরে সুষমাময়ী সুরলক্ষ্মী দুই ঘুমের মাঝখানের পথ বাহিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, কোনোদিন আর তাঁহার সন্ধান মিলে নাই—কিন্তু অপু কি তাহা কোনোদিন ভুলিবে?

চড়ক দেখিয়া নানা গাঁয়ের চাষাদের ছেলেমেয়েরা রঙীন কাপড় জামা, কেউ বা নতুন কোরা শাড়ী পরনে, সারি দিয়া ঘরে ফিরিতেছে। ছেলেরা বাঁশি বাজাইতে বাজাইতে চলিয়াছে। গোষ্ঠবিহারের মেলা দেখিতে চার-পাঁচ ক্রোশ দূর হইতেও লোকজন আসিয়াছিল। শোলার পাখী, কাঠের পুতুল, রঙীন কাগজের পাখা, রং-করা হাঁড়ি, ছোবা—সকলেরই হাতে কোন না কোন জিনিস। চিনিবাস বৈষ্ণব মেলায় বেগুনী ফুলুরীর দোকান খুলিয়াছিল, তাহার দোকান হইতে অপু দু'পয়সার তেলে-ভাজা খাবার কিনিয়া হাতে লইয়া বাড়ীর দিকে চলিল। ফিরিতে ফিরিতে মনে হইল, যেখানে তাহারা উঠিয়া যাইতেছে সেখানে কি এরকম গোষ্ঠবিহার হয়? হয়তো সে আর চড়কের মেলা দেখিতে পাইবে না! মনে ভাবিল সেখানে যদি চড়ক না হয় তবে বাবাকে বলবো, আমি মেলা দেখবো বাবা, নিশ্চিন্দিপুর চল যাই—না হয় দু'দিন এসে খুড়ীমাদের বাড়ী থেকে যাবো?

চড়কের পরদিন জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা হইতে লাগিল। কাল দুপুরে আহারাদির পর রওনা হইতে হইবে।

সন্ধ্যার সময় রান্নাঘরের দাওয়ায় তাহার মা তাহাকে গরম গরম পরোটা ভাজিয়া দিতেছিল। নীলমণি জেঠার ভিটায় নারিকেল গাছটার পাতাগুলি জ্যোৎস্নার আলোয় চিক্‌চিক্ করিতেছে—চাহিয়া দেখিয়া অপুর মন দুঃখে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এতদিন নতুন দেশে যাইবার জন্য তাহার যে উৎসাহটা ছিল, যতই যাওয়ার দিন কাছে আসিয়া পড়িতেছে, ততই আসন্নবিরহের গভীর ব্যথায় তাহার মনের সুরটি করুণ হইয়া বাজিতেছে।

এই তাহাদের বাড়ী-ঘর, ওই বাঁশবন, সল্‌তে-খাগীর আমবাগানটা, নদীর ধার, দিদির সঙ্গে চড়ুইভাতি করার ওই জায়গাটা—এ সব সে কত ভালোবাসে! ওই অমন নারিকেল গাছ কি তাহারা যেখানে যাইতেছে সেখানে আছে? জ্ঞান হইয়া পর্যন্ত এই নারিকেল গাছ সে এখানে দেখিতেছে, জ্যোৎস্নারাত্রে পাতাগুলি কি সুন্দর দেখায়! সুমুখ জ্যোৎস্না-রাত্রে এই দাওয়ায় বসিয়া জ্যোৎস্না-ঝরা নারিকেল শাখার দিকে চাহিয়া কত রাত্রে দিদির সঙ্গে সে দশ-পঁচিশ খেলিয়াছে, কতবার মনে হইয়াছে কি সুন্দর দেশ তাহাদের এই নিশ্চিন্দিপুর! যেখানে যাইতেছে, সেখানে কি রান্নাঘরের দাওয়ার পাশে বনের ধারে এমন নারিকেল গাছ আছে? সেখানে কি সে মাছ ধরিতে পারিবে, আম কুড়াইতে পারিবে, নৌকা বাহিতে পরিবে, রেল রেল খেলিতে পারিবে, কদমতলার সায়েবের ঘাটের মত ঘাট কি সে দেশে আছে? এই তো বেশ ছিল তাহারা, কেন এসব মিছামিছি ছাড়িয়া যাওয়া?

দুপুরে এক কাণ্ড ঘটিল।

তাহার মা সাবিত্রীব্রতের নিমন্ত্রণে গিয়াছে, হরিহর পাশের ঘরে আহারাদি সারিয়া ঘুমাইতেছে, অপু ঘরের মধ্যে তাকের উপরিস্থিত জিনিসপত্র কি লইয়া যাইতে পারে না পারে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছে। উঁচু তাকের উপর একটা মাটির কলসী সরাইতে গিয়া তাহার ভিতর হইতে কি একটা জিনিস গড়াইয়া মেঝের উপর পড়িয়া গেল। সে সেটাকে মেজে হইতে কুড়াইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিল। ধূলা ও মাকড়সার ঝুল মাখা হইলেও জিনিসটা কি বা তাহার ইতিহাস বুঝিতে তাহার বাকি রহিল না।

সেই ছোট্ট সোনার কৌটাটা আর বছর যেটা সেজঠাক্‌রুণদের বাড়ী হইতে চুরি গিয়াছিল!

দুপুরে কেহ বাড়ী নাই, কৌটাটা হাতে লইয়া অনেকক্ষণ অন্যমনস্কভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, বৈশাখ দুপুরের তপ্ত রৌদ্রভরা নির্জনতায় বাঁশবনের শন্ শন্ শব্দ অনেক দূরের বার্তার মত কানে আসে। আপন মনে বলিল—দিদি হতভাগী চুরি ক'রে এনে ওই কলসীটার মধ্যে লুকিয়ে রেখে দিইছিল!

সে একটুখানি ভাবিল, পরে ধীরে ধীরে খিড়্‌কী-দোরের কাছে গিয়া দাঁড়াইল—বহুদূর পর্যন্ত বাঁশবন যেন দুপুরের রৌদ্রে ঝিমাইতেছে, সেই শঙ্খচিলটা কোন্ গাছের মাথায় টানিয়া টানিয়া ডাকিতেছে, দ্বৈপায়ন হ্রদে লুক্কায়িত প্রাচীন যুগের সেই পরাজিত ভাগ্যহত রাজপুত্রের বেদনাকরুণ মধ্যহ্নটা! একটুখানি দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে হাতের কৌটাটাকে একটান মারিয়া গভীর বাঁশবনের দিকে ছুঁড়িয়া ফেলাইয়া দিল। তাহার দিদি ভুলো কুকুরকে ডাক দিলে যে ঘন বনঝোপের ভিতর দিয়া ভুলো হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিত, ঠিক তাহারই পাশে রাশীকৃত শুক্‌না বাঁশ ও পাতার রাশির মধ্যে বৈঁচি-ঝোপের ধারে কোথায় গিয়া সেটা গড়াইয়া পড়িল।

মনে মনে বলিল—রইল ওইখানে কেউ জান্‌তে পারবে না কোনো কথা, ওখানে আর কে যাবে?

সোনার কৌটার কথা অপু কাহাকেও কিছু জানাইল না, কখনও জানায় নাই, এমন কি মাকেও না।

দুপুর একটু গড়াইয়া গেলে হীরু গাড়োয়ানের গরুর গাড়ী রওনা হইল। সকালের দিকে আকাশে একটু একটু মেঘ ছিল বটে কিন্তু বেলা দশটার পূর্বেই সেটুকু কাটিয়া গিয়া পরিপূর্ণ প্রচুর বৈশাখী মধ্যাহ্নের রৌদ্র গাছেপালায় পথে মাঠে যেন অগ্নিবৃষ্টি করিতেছে। পটু গাড়ীর পিছনে পিছনে অনেক দূর পর্যন্ত আসিতেছিল, বলিল—অপুদা এবার বারোয়ারীতে ভাল যাত্রাদলের বায়না হয়েচে, তুই শুন্‌তে পেলিনে এবার—

অপু বলিল—তুই পালার কাগজ একখানা বেশী করে নিবি, আমায় পঠিয়ে দিবি—

আবার সেই চড়কের মাঠের ধার দিয়া রাস্তা! মেলার চিহ্ন স্বরূপ সারা মাঠটায় কাটা ডাবের খোলা গড়াগড়ি যাইতেছে, কাহারা মাঠের একপাশে রাঁধিয়া খাইতেছে, আগুনে কালো মাটির ঢেলা ও একপাশে কালিমাখা নতুন হাঁড়ি পড়িয়া আছে। হরিহর চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, তাহার যেন কেমন কেমন ঠেকিতেছিল। কাজটা কি ভাল হইল? কতদিনের পৈতৃক ভিটা, ওই পাশের পোড়ো ভিটাতে সে সব ধুমধাম একেবারে শেষ হইয়া গিয়াছিলই তো, যা-ও বা মাটির প্রদীপ টিম্ টিম্ করিতেছিল, আজ সন্ধ্যা হইতে চিরদিনের জন্য নিবিয়া গেল। পিতা রামচাঁদ তর্কবাগীশ স্বর্গ হইতে দেখিয়া কি মনে করিবেন?

গ্রামের শেষ বাড়ী হইতেছে আতুরী বুড়ীর সেই দোচালা ঘরখানা, যতক্ষণ দেখা গেল অপু হাঁ করিয়া সেদিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পরই একটা বড় খেজুর বাগানের পাশ দিয়া গাড়ী গিয়া একেবারে আষাঢ়ু যাইবার বাঁধা রাস্তার উপর উঠিল। গ্রাম শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সর্বজয়ার মনে হইল যা কিছু দারিদ্র যা কিছু হীনতা, যা কিছু অপমান সব রহিল পিছনে পড়িয়া—এখন সামনে শুধু নতুন সংসার, নতুন জীবনযাত্রা, নব সচ্ছলতা!...

ক্রমে রৌদ্র পড়িল—গাড়ী তখন সোনাডাঙার মাঠের মধ্যে দিয়া যাইতেছিল। হরিহর মাঠের মধ্যের একটা বড় বটগাছ দেখাইয়া কহিল—ওই দ্যাখো ঠাকুরঝি পুকুরের ঠ্যাঙাড়ে বটগাছ। সর্বজয়া তাড়াতাড়ি মুখ বাহির করিয়া দেখিল। পথ হইতে অল্প দূরেই একটা নাবাল জমির ধারে বিশাল বটগাছটা চারিধারে ঝুরি গাড়িয়া বসিয়া আছে। সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও তাহার বালকপুত্রের গল্প সে কতবার শুনিয়াছে। আজ হইতে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে তাহার শ্বশুরের পূর্বপুরুষ এই রকম সন্ধ্যাবেলা ওই বটতলায় নিরীহ ব্রাহ্মণ ও তাহার অবোধপুত্রকে অর্থলোভে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়া পাশের ওই নাবাল জমি, যেটা সকলের ঠাকুরঝি পুকুর ছিল—ওইখানে পুঁতিয়া রাখিয়াছিল। ছেলেটির মা হয়তো পুত্রের বাড়ী ফিরিবার আশায় কত মাস, কত বছর বৃথা অপেক্ষা করিত, সে-ছেলে আর ফিরে নাই—মাগো! সর্বজয়ার চোখ হঠাৎ জলে ঝাপ্‌সা হইয়া আসে, গলায় কি একটা আট্‌কাইয়া যায়!

সোনাডাঙার মাঠ এ অঞ্চলের সকলের বড় মাঠ। এখানে ওখানে বনোঝোপ শিমুল বাবুল গাছ, খেজুর গাছে খেজুর কাঁদি ঝুলিতেছে, সোঁদালি ফুলের ঝাড় দুলিতেছে, চারিধারে বৌ-কথা-কও পাপিয়ার ডাক। দূরপ্রসারী মাঠের উপর তিসির ফুলের রংএর মত গাঢ় নীল আকাশ উপুড় হইয়া পড়িয়াছে, দৃষ্টি কোথাও বাধে না, ঘন সবুজ ঘাসে মোড়া উঁচু নীচু মাঠের মধ্যে কোথাও আবাদ নাই, শুধুই গাছপালা-বনঝোপের প্রাচুর্য আর বিশাল মাঠটার শ্যামপ্রসার, সম্মুখে কাঁচা মাটির চওড়া পথটা গৃহত্যাগী উদাস বাউলের মত দূর হইতে দূরে আপন মনে আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে। একটু দূরে গিয়া বারাসে-মধুখালির বিল পড়িল। কোন্ প্রাচীন কালের নদী শুকাইয়া গিয়া জীবনের যাত্রাপথের পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে, অন্তর্হিত নদীর বিশাল খাতটা এখন পদ্মফুলে ভরা বিল। অপু গাড়ীতে বসিয়া মাঠ ও চারিধারের অপূর্ব আকাশের রংটা দেখিতে দেখিতে যাইতেছিল। বেলাশেষের স্বপ্নপটে আবার কত কি শৈশব-কল্পনার আসা-যাওয়া! এই তো সে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়াছে! এখন হয়তো কোথায় কতদূর চলিবে, যাওয়া তার সবে আরম্ভ হইল, এইবার হয়তো সে-সব দেশ, স্বপ্ন-দেখা সে অপূর্ব জীবন!

হরিহর দূরের একটা গ্রাম আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—ওই হল ধঞ্চে-পলাশগাছি, ওরই ওপাশে নাটাবেড়ে—ওইখানে বনবিবির দরগাতলায় শ্রাবণ মাসে ভারী মেলা হয়, এমন সস্তা কুমড়ো আর কোথাও মেলে না।

আষাঢ়ু বাজারের নীচে খেয়ায় বেত্রবতী পার হইবার সময় চাঁদ উঠিল, জ্যোৎস্নার আলোয় জল চিক্ চিক্ করিতেছিল। আজ আষাঢ়ুর হাট, কয়েকজন হাটুরে লোক কলরব করিতে করিতে ওপার হইতে খেয়ানৌকায় এপারে আসিতেছে। অপুদের গাড়ীসুদ্ধ পার হইয়া ওপারে উঠিল। অপু বাবাকে বলিয়া আষাঢ়ুর বাজার দেখিতে নামিল। ছোট বাজার, সারি সারি ঝাঁপতোলা দোকান, সেক্‌রার দোকানের ঠুক্‌ঠাক্ শুনা যাইতেছে, খেজুরগুড়ের আড়তের সাম্‌নে বহু গরুর গাড়ীর ভিড়। মাঝেরপাড়া স্টেশন এখনও প্রায় চারি ক্রোশ, রাস্তা কাঁচা হইলেও বেশ চওড়া, দুধারে নীলকুঠির সাহেবদের আমলে

রোপিত বট, অশ্বত্থ, তুঁতগাছ। বৈশাখ মাসের প্রথমে পথিপার্শ্বের বট-অশ্বত্থের ডালের মধ্যে কোথায় কোকিল ডাকিয়া সারা হইতেছে, সারা পথটা প্রাচীন বটের সারির ঝুরি দোলানো। কচি পাতার রাশি জ্যোৎস্না লাগিয়া স্বচ্ছ দেখাইতেছে।

বাংলার বসন্ত, চৈত্র বৈশাখের মাঠে, বনে, বাগানে, যেখানে-সেখানে, কোকিলের এলোমেলো ডাকে, নতপল্লব নাগকেশর গাছের অজস্র ফুলের ভারে, বনফুলের গন্ধভরা জ্যোৎস্নাসিগ্ধ দক্ষিণহাওয়ায় উল্লাসে আনন্দনৃত্য শুরু করিয়াছে। এরূপ অপরূপ বসন্তদৃশ্য অপু জীবনে এই প্রথম দেখিল। এই অল্প বয়সেই তাহার মনে বাংলার মাঠ, নদী, নিরালা বনপ্রান্তরের সুমুখ জ্যোৎস্না রাত্রির যে মায়ারূপ অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল, তাহার উত্তরকালের শিল্পীজীবনের কল্পনামুহূর্তগুলি মাধুর্যে ও প্রেরণায় ভরিয়া তুলিবার তাহাই ছিল শ্রেষ্ঠ উপাদান।

রাত্রি প্রায় দশটার সময় স্টেশনে আসিয়া গাড়ী পৌঁছিল। আজ অনেকক্ষণ হইতেই কখনও গাড়ী স্টেশনে পৌঁছাইবে সেই আশায় অপু বসিয়াছিল, গাড়ী থামিতেই নামিয়া সে একদৌড়ে গিয়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে হাজির হইল। সন্ধ্যা সাড়ে আটটার ট্রেন অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে, বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সে জানিয়াছে সারারাত্রির মধ্যে আর ট্রেন নাই। ঐ হীরু গাড়োয়ানের গরু দুইটার জন্যই এরূপ ঘটিল, নতুবা এখনি সে ট্রেন দেখিতে পাইত। প্ল্যাটফর্মে একরাশ তামাকের গাঁট্ সাজানো—দুজন রেলের লোক একটা লোহার বাক্স মত দেখিতে অথচ খুব লম্বা ডাণ্ডাওয়ালা কলে তামাকের গাঁট চাপাইয়া কি করিতেছে। জ্যোৎস্না পড়িয়া রেলের পাটি চিক্ চিক্ করিতেছে। ওদিকে রেল লাইনের ধারে একটা উঁচু খুঁটির গায়ে দুটা লাল আলো, এদিকে আবার ঠিক সেই রকম দুটা লাল আলো। স্টেশনের ঘরে টেবিলের উপরে চৌপায়া তেলের লণ্ঠন জ্বলিতেছে। একরাশ বাঁধানো খাতাপত্র। অপু দরজার কাছে গিয়া খানিকটা দাঁড়াইয়া দেখিল, একটা ছোট্ট খড়মের বউলের মত জিনিস টিপিয়া স্টেশনের বাবু খট্ খট্ শব্দ করিতেছে।

ইস্টিশান! ইস্টিশান! বেশী দেরি নয়, কাল সকালেই সে রেলের গাড়ী শুধু যে দেখিবে তাহা নয়, চড়িবেও!...

প্ল্যাটফর্ম হইতে নড়িতে তাহার মন সরিতেছিল না। কিন্তু তাহার বাবা ডাকিতে আসিল। খড়মের বউলের মত জিনিসটাই নাকি টেলিগ্রাফের কল, তাহার বাবা বলিল।

অপু ফিরিয়া দেখিল স্টেশনের পুকুর-ধারে রাঁধিয়া খাইবার যোগাড় হইতেছে। আর একখানি গাড়ী পূর্ব হইতেই সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল। আরোহীর মধ্যে আঠারো-উনিশ বৎসরের এক বৌ ও একটি যুবক। অপু শুনিল বৌটি হবিব্‌পুরের বিশ্বাসদের বাড়ীর, ভাইয়ের সঙ্গে বাপের বাড়ী যাইতেছে। তাহার মায়ের সঙ্গে বৌটির খুব ভাব হইয়া গিয়াছে। তাহার মা খিচুড়ীর চালডাল ধুইতেছে, বৌটি আলু ছাড়াইতেছে। রান্না একত্র হইবে।

সকাল সাড়ে সাতটায় ট্রেন আসিল। অপু হাঁ করিয়া অনেকক্ষণ হইতে গাড়ী দেখিবার জন্য প্ল্যাটফর্মের ধারে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার বাবা বলিল, খোকা, অত ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থেকো না, সরে এসো এদিকে। একজন খালাসীও লোকজনদের হটাইয়া দিতেছিল।

কত বড় ট্রেনখানা। কি ভয়ানক শব্দ! সামনের একেই ইঞ্জিন বলে? উঃ, কী কাণ্ড!

হবিব্‌পুরের বৌটি ঘোমটা খুলিয়া কৌতূহলের সহিত প্রবেশমান ট্রেনখানার দিকে চাহিয়া ছিল।

গাড়ীতে হৈ হৈ করিয়া মোট-ঘাট সব উঠানো হইল। কাঠের বেঞ্চি সব মুখোমুখি করিয়া পাতা। গাড়ীর মেঝেটা যেন সিমেন্টের বলিয়া মনে হইল। ঠিক যেন ঘর একখানা; জানালা দরজা সব হুবহু! এই ভারী গাড়ীখানা, যাহা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা সে আবার চলিবে, সে বিশ্বাস অপুর হইতেছিল না। কি জানি হয়তো নাও চলিতে পারে; হয়তো উহারা এখনই বলিতে পারে, ওগো তোমরা সব নামিয়া যাও, আমাদের গাড়ী আজ আর চলিবে না! তারের বেড়ার এদিকে একজন লোক একবোঝা উলুঘাস মাথায় করিয়া ট্রেনখানা চলিয়া যাওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল, অপুর মনে হইল লোকটা কৃপার পাত্র! আজিকার দিনে যে গাড়ী চড়িল না, সে বাঁচিয়া থাকিবে কি করিয়া? হীরু গাড়োয়ান ফটকের বাহিরে দাঁড়াইয়া গাড়ীর দিকে চাহিয়া আছে।

গাড়ী চলিল। অদ্ভুত, অপূর্ব দুলুনি! দেখিতে দেখিতে মাঝেরপাড়া স্টেশন, লোকজন, তামাকের গাঁট, হাঁ-করিয়া-দাঁড়াইয়া-থাকা হীরু গারোয়ান, সকলকে পিছনে ফেলিয়া গাড়ী বাহিরের উলুখড়ের মাঠে আসিয়া পড়িল। গাছপালাগুলো সটসট করিয়া দুদিকের জানালার পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া পলাইতেছে—কী বেগ! এরই নাম রেলগাড়ী! উঃ, মাঠখানা যেন ঘুরাইয়া ফেলিতেছে! ঝোপঝাপ গাছপালা, উলুখড়ের ছাউনি, ছোটখাটো চাষাদের ঘর সব একাকার করিয়া দিতেছে! গাড়ীর তলায় জাঁতা-পেষার মত একটা একটানা শব্দ হইতেছে—সাম্‌নের দিকে ইঞ্জিনের কি শব্দটা!

মাঝেরপাড়া স্টেশনের ডিসট্যান্ট সিগন্যালখানাও ক্রমে মিলাইয়া যাইতেছে!....

অনেক দিন আগের সেই দিনটা!

সে ও দিদি যেদিন দুজনে বাছুর খুঁজিতে মাঠ-জলা ভাঙিয়া উধ্বশ্বাসে রেলের রাস্তা দেখিতে ছুটিয়া গিয়াছিল! সেদিন—আর আজ?

ঐ যেখানে আকাশের তলে আষাঢ়ু-দুর্গাপুরের বাঁধা সড়কের গাছের সারি ক্রমশঃ দূর হইতে দূরে গিয়া পড়িতেছে, ওরই ওদিকে যেখানে তাহাদের গাঁয়ের পথ বাঁকিয়া আসিয়া সোনাডাঙা মাঠের মধ্যে উঠিয়াছে, সেখানে পথের ঠিক সেই মোড়টিতে, গ্রামের প্রান্তের বুড়ো জামতলাটায় তাহার দিদি যেন ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া তাহাদের রেলগাড়ীর দিকে চাহিয়া আছে!...

তাহাকে কেহ লইয়া আসে নাই, সবাই ফেলিয়া আসিয়াছে, দিদি মারা গেলেও দু'জনের খেলা করার পথেঘাটে, বাঁশবনে, আমতলায় সে দিদিকে যেন এতদিন কাছে কাছে পাইয়াছে, দিদির অদৃশ্য স্নেহস্পর্শ ছিল নিশ্চিন্দিপুরের ভাঙা কোঠাবাড়ীর প্রতি গৃহ-কোণে—আজ কিন্তু সত্য-সত্যই দিদির সহিত চিরকালের ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল!...

তাহার যেন মনে হয় দিদিকে আর কেহ ভালবাসিত না, মা নয়, কেউ নয়! কেহ তাহাকে ছাড়িয়া আসিতে দুঃখিত নয়।

হঠাৎ অপুর মন এক বিচিত্র অনুভূতিতে ভরিয়া গেল। তাহা দুঃখ নয়, শোক নয়, বিরহ নয়, তাহা কি সে জানে না। কত কি মনে আসিল অল্প এক মুহূর্তের মধ্যে ...আতুরী ডাইনী...নদীর ঘাট...তাহাদের কোঠাবাড়ীটা... চাল্‌তেতলার পথ...রাণুদি...কত বৈকাল, কত দুপুর... কতদিনের কত হাসিখেলা...পটু... দিদির মুখ...দিদির কত না-মেটা সাধ....

দিদি এখনও একদৃষ্টে চাহিয়া আছে—

পরক্ষণেই তাহার মনের মধ্যের অবাক ভাষা চোখের জলে আত্মপ্রকাশ করিয়া যেন এই কথাই বার বার বলিতে চাহিল—আমি চাইনি দিদি, আমি তোকে ভুলিনি, ইচ্ছে ক'রে ফেলেও আসিনি—ওরা আমায় নিয়ে যাচ্চে—

সত্যই সে ভুলে নাই।

উত্তরজীবনে নীলকুন্তলা সাগরমেখলা ধরণীর সঙ্গে তাহার খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিয়াছিল। কিন্তু যখনই গতির পুলকে তাহার সারা দেহ শিহরিয়া উঠিতে থাকিত, সমুদ্রগামী জাহাজের ডেক্ হইতে প্রতি মুহূর্তে নীল আকাশের নব নব মায়ারূপ চোখে পড়িত, হয়তো দ্রাক্ষাকুঞ্জবেষ্টিত কোন নীল পর্বতসানু সমুদ্রের বিলীন চক্রবাল সীমায় দূর হইতে দূরে ক্ষীণ হইয়া পড়িত, দূরের অস্পষ্ট আবছায়া-দেখিতে-পাওয়া বেলাভূমি এক প্রতিভাশালী সুরস্রষ্টার প্রতিভার দানের মত মহামধুর কুহকের সৃষ্টি করিত তাহার ভাবময় মনে—তখনই, এই সব সময়েই, তাহার মনে পড়িত এক ঘনবর্ষার রাতে, অবিশ্রান্ত বৃষ্টির শব্দের মধ্যে এক পুরনো কোঠার অন্ধকার ঘরে, রোগশয্যাগ্রস্ত এক পাড়াগাঁয়ের গরীব ঘরের মেয়ের কথা—

—অপু, সেরে উঠলে আমায় একদিন রেলগাড়ী দেখাবি?

মাঝেরপাড়া স্টেশনের ডিস্‌ট্যান্ট সিগন্যালখানা দেখিতে দেখিতে কতদূরে অস্পষ্ট হইতে হইতে শেষে মিলাইয়া গেল।

দুপুরের পর রাণাঘাট স্টেশনে গাড়ী বদল করিতে হইল। অপুর চোখে দু-দুবার কয়লার গুঁড়া পড়া সত্ত্বেও সে গাড়ীর জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া সারাদিনটা বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে। স্টেশনে স্টেশনে ওগুলোকে কি বলে? সিগন্যাল? পড়িতেছে উঠিতেছে কেন? গাড়ী যেখানে লাগিতেছে সেখানটা উঁচুমত ইঁটের গাঁথা, ঠিক যেন রোয়াকের মত। তাকে প্ল্যাটফর্ম বলে? কাঠের গায়ে বড় বড় অক্ষরে ইংরাজী ও বাংলাতে সব স্টেশনের নাম লেখা আছে—কুড়ুলগাছি, গোবিন্দপুর, বানপুর। গাড়ী ছাড়িবার সময় ঘন্টা পড়ে —ঢং ঢং ঢং ঢং—চার ঘা—অপু শুনিয়াছে, একটা বড় লোহার চাকার চারিধারে হাতলপরানো, তাহাই ঘুরাইলে সিগ্ন্যাল পড়ে—কুড়ুলগাছি স্টেশনে অপু লক্ষ্য করিয়া দেখিল।

সর্বজয়া এবার লইয়া মোটে দুইবার রেলে চড়িল। আর একবার সেই কোন্ কালে—উনি তখন নতুন কাশী হইতে আসিয়া দেশে সংসার পাতিয়াছেন—জ্যৈষ্ঠমাসে আড়ংঘাটায় যুগলকিশোর ঠাকুর দেখিতে গিয়াছিল—সে কি আজকার কথা? সে খুশির সহিত স্টেশনে স্টেশনে মুখ বাড়াইয়া লোকজনের ওঠা-নামা লক্ষ্য করিতেছিল—বউঝিরা উঠিতেছে নামিতেছে—কেমন সব চেহারা, কেমন কাপড়-চোপড়, গহনাপত্র। জগন্নাথপুর স্টেশনে ভাল মোয়া ফিরি করিতেছে দেখিয়া সে ছেলেকে বলিল—অপু, মুড়ির মোয়া খাবি? তুই তো ভালবাসিস্, নেবো তোর জন্যে? স্টেশনে টেলিগ্রাফের তারের ওপর কি পাখী বসিয়া দোল খাইতেছে, অপু ভাল করিয়া চাহিয়া চাহিয়া আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিল —দ্যাখো মা, কাদের বাড়ীর খাঁচা থেকে একটা ময়নাপাখী পালিয়ে এসেচে!

নৈহাটি স্টেশনে গাড়ী বদলাইয়া গঙ্গার প্রকান্ড পুলটার উপর দিয়া যাইবার সময় সূর্য অস্ত যাইতেছিল, সর্বজয়া একদৃষ্টে চাহিয়া ছিল—ওপার হইতে হুহু বাতাস বহিতেছে, গঙ্গার জলে নৌকা, দুপারে কত ভাল ভাল বাড়ী বাগান, এ সব দৃশ্য জীবনে সে কখনো দেখে নাই। ছেলেকে দেখাইয়া বলিল—দেখেচিস অপু, একখানা ধোঁয়ার জাহাজ? পরে সে যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া আপন মনে বলিল—মা গঙ্গা, তোমার ওপর দিয়ে যাচ্চি, অপরাধ নিও না মা, কাশীতে গিয়ে ফুল-বিল্বিপত্রে তোমায় পূজা করবো, অপুকে ভালো রেখো, যে জন্যে যাওয়া তা যেন হয়, সেখানে যেন আশ্রয় হয় মা—

আনন্দে পুলকে, অনিশ্চিততার রহস্যে তার হৃদয় দুলিতেছিল—এরকম মনোভাব এর আগে সে কখনো অনুভব করে নাই। সুবিধায় হৌক, অসুবিধায় হৌক, অবাধ মুক্ত জীবনের আনন্দ সে পাইল এই প্রথম, তার চিরকালের বাঁশবনের বেড়া ঘেরা ক্ষুদ্র সীমায় বদ্ধ পল্লীজীবনে এরকম সচল দৃশ্যরাজি, এরকম অভিনব গতির বেগ, এত অনিশ্চয়ের পুলকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় কখনও হয় নাই—যে জীবন চারিধারে পাঁচিল দেওয়াল তুলিয়া আপনাকে আপনি ছোট করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা আজ চলিয়াছে, চলিয়াছে, সম্মুখে চলিয়াছে—ওই পশ্চিম আকাশের অস্তমান সূর্যকে লক্ষ্য করিয়া—নদ-নদী, দেশবিদেশ—ডিঙাইয়া ছুটিয়াছে—এই চলিয়া চলার বাস্তবতাকে সে প্রতি হৃদয় দিয়া অনুভব করিতেছিল আজ!—এই তো সেদিন এক বৎসর আগেও নিশ্চিন্দিপুরের বাড়ীতে কত রাত্রে শুইয়া সে যখন ভাবিত, সুবিধা হইলে একবার চাকদা কি কালীগঞ্জে গঙ্গাস্নানে যাইবে, তখনই তাহা সম্ভবের ও নিশ্চয়তার বহু বাহিরের জিনিস বলিয়া মনে হইয়াছে—আর আজ?

ব্যান্ডেল স্টেশনে গাড়ী আসিবার একটু আগে সম্মুখের বড় লাইন দিয়া একখানা বড় গাড়ী হু হু শব্দে ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। অপু বিস্ময়ের সঙ্গে সেদিকে চাহিয়া রহিল। কি আওয়াজ!—উঃ! ব্যান্ডেল স্টেশনে পৌঁছিয়া তাহারা গাড়ী হইতে নামিল। এদিকে-ওদিকে এঞ্জিন দৌড়িতেছে, বড় বড় মালগাড়ীগুলা স্টেশন কাঁপাইয়া প্রতি পাঁচমিনিট অন্তর না থামিয়া চলিয়া যাইতেছে। হৈ হৈ শব্দ—এদিকে এঞ্জিনের সিটির কানে-তালা-ধরা আওয়াজ, ওদিকে আর একখানা যাত্রীগাড়ী ছাড়িয়া যাইতেছে, গার্ড-সবুজ নিশান দুলাইতেছে—সন্ধ্যার সময় স্টেশনের পূর্বে পশ্চিমে লাইনের ওপর এত সিগ্ন্যাল ঝাঁকে ঝাঁকে—লাল সবুজ আলো জ্বলিতেছে—রেল, এঞ্জিন. গাড়ী, লোকজন!—

একটু রাত্রি হইলে তাহাদের কাশী যাইবার গাড়ী আসিয়া বিকট শব্দে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইল। বিশাল স্টেশন, বেজায় লোকের ভিড়—সর্বজয়া কেমন দিশেহারা হইয়া গেল—তাড়া খাইয়া অনভ্যস্ত আড়ষ্ট পায়ে পায়ে স্বামীর পিছনে একখানা কামরার দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইতেই হরিহর অতিকষ্টে দুর্জয় ভিড় ঠেলিয়া বেপথুমানা স্ত্রীকে ও দিশেহারা পুত্রকে কায়ক্লেশে গাড়ীর বেঞ্চিতে বসাইয়া দিয়া কুলীর সাহায্যে মোট-গাঁট উঠাইয়া দিল।

ভোরের দিকে সর্বজয়ার তন্দ্রা গেল ছুটিয়া। ট্রেন ঝড়ের বেগে ছুটিয়াছে—মাঠ, মাটি, গাছপালা একাকার করিয়া ছুটিয়াছে—রাত্রের গাড়ী বলিয়া তাহারা সকলে একগাড়ীতেই উঠিয়াছে—হরিহর তাহাকে মেয়ে-কাম্‌রায় দেয় নাই। গাড়ীতে ভিড় আগের চেয়ে কম—এক এক বেঞ্চে এক একজন লম্বা হইয়া শুইয়া ঘুমাইতেছে। উপরের বেঞ্চে একজন কাবুলী নাক ডাকাইতেছে। অপু কখন উঠিয়া হাঁ করিয়া জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া আছে।

হরিহর জাগিয়া উঠিয়া ছেলেকে বলিল—ওরকম ক'রে বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকো না খোকা, এখ্‌খুনি চোখে কয়লায় গুঁড়া পড়বে—

কয়লার গুঁড়া তো নিরীহ জিনিস, চোখ দুটা যদি উপড়াইয়া চলিয়াও যায় তবুও অপুর সাধ্য নাই যে, জানালার দিক হইতে এখন সে চোখ ফিরাইয়া লইতে পারে। সে প্রায় সারারাত্রি ঠায় এইভাবে বসিয়া। বাবা মা তো ঘুমাইতেছিল— সে যে কত কি দেখিয়াছে! কত স্টেশনে গাড়ী দাঁড়ায় নাই, আলো লোকজন সুদ্ধ স্টেশনটা হুস করিয়া হাউইবাজীর মত পাশ কাটাইয়া উড়িয়া চলিয়া যাইতেছিল—রাত্রে কখন তাহার একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া যাইতেই সে মুখ বাহির করিয়া দেখিল যে, গভীর রাত্রির জ্যোৎস্নায় রেলগাড়ীখানা ঝড়ের বেগে একটা কোন নদীর ছোট সাঁকো পার হইতেছে,—সাম্‌নে খুব উঁচু একটা কালোমত টিবি, টিবিটার ওপরে অনেক গাছপালা, নদীর জলে জ্যোৎস্না পড়িয়া চিক্ চিক্ করিয়া উঠিল, আকাশের সাদা সাদা মেঘ—তারপর সেই ধরণের বড় বড় আরও কয়েকটা টিবি, আরও সেই রকম গাছপালা। তাহার পর একটা বড় স্টেশন, লোকজন, আলো—পাশের লাইনে একখানা গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল—একজন পানওয়ালার সঙ্গে একটা লোকের যা ঝগড়া হইয়া গেল!—স্টেশনে একটা বড় ঘড়ি ছিল—সে তাহার মাস্টার মশায় নীরেনবাবুর কাছে ঘড়ি দেখিতে শিখিয়াছিল, গুনিয়া গুনিয়া দেখিল রাত্রি তিনটা বাজিয়া বাইশ মিনিট হইয়াছে। তারপর আবার গাড়ী ছাড়িল—আবার কত গাছ, আবার সেই ধরণের উঁচু উঁচু টিবি—অনেক সময়ে রেলের রাস্তার দুধারেই সেইরকম টিবি—গাড়ীতে সবাই ঘুমাইতেছে, ইহারা যদি কিছু দেখিবে না তবে রেলগাড়ী চড়িয়াছে যে কেন! কাহাকে সে জিজ্ঞাসা করে যে অত টিবি কিসের? এক একবার সে জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া ঝুঁকিয়া মাটির দিকে চাহিয়া নিরূপণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল গাড়ীখানা কত জোরে যাইতেছে—চুল বাতাসে উড়িয়া মুখে পড়ে, মাটি দেখা যায় না, যেন কে মাটির গায়ে কতকগুলি সরল রেখা টানিয়া চলিয়াছে—উঃ! রেলগাড়ী কি জোরে যায়! —কৌতূহলে, উত্তেজনায় সে একবার এদিকের জানালায়, একবার ওদিকের জানালায় মুখ বাড়াইয়া দেখিতেছিল।

মাঝে মাঝে পূর্বদিকের দ্রুতবিলীয়মান অস্পষ্ট জ্যোৎস্না-ভরা মাঠের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার মনে হইতেছিল, কত দূরে তাহারা আসিয়াছে! এসব কোন্ দেশের উঁচু নীচু মাঠ দিয়া তাহারা চলিয়াছে?

সকালের দিকে সে আবার একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, একটা প্রকান্ড স্টেশনে সশব্দে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইতেই তাহার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল—প্ল্যাটফর্মের পাথরের ফলকে নাম লেখা আছে—পাটনা সিটি।

তাহার পর কত স্টেশন চলিয়া গেল। কি বড় বড় পুল! গাড়ী চলিয়াছে, চলিয়াছে, মনে হয় বুঝি পুলটা শেষ হইবে না—কত ধরণের সিগ্‌ন্যাল, কত কল-কারখানা, একটা কোন্ স্টেশনের ঘরের মধ্যে একটা লোহার থামের গায়ে চোঙ্‌লাগানো মত—তাহারই মধ্যে মুখ দিয়া একজন রেলের বাবু কি কথা কহিতেছে—প্রাইভেট নম্বর?....হাঁ আচ্ছা—সিক্সটি নাইন্—সিক্সটি নাইন্—হাঁ?....উনসত্তর....ছয়ের পিঠে নয়—হাঁ—হাঁ—

সে অবাক্ হইয়া বাবাকে জিজ্ঞাসা করিল—ও কি কল বাবা? ওর মধ্যে মুখ দিয়ে ওরকম বল্‌চে কেন?

তখন বেলা খুব পড়িয়া গিয়াছে, এমন সময় হরিহর বলিল—এইবার আমরা কাশী পৌঁছে যাবো, বাঁ দিকে চেয়ে থেকো, গঙ্গার পুলের উপর গাড়ী উঠলেই কাশী দেখা যাবে—

অপু একটা কথা অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিতেছিল। আজ সে সারা পথ টেলিগিরাপের তার ও খুঁটি দেখিতে দেখিতে আসিতেছে—সেই একটিবার ছাড়া এমন করিয়া এর আগে কখনও দেখে নাই জীবনে। এইবার যদি সে রেল-রেল খেলার সুযোগ পায়, তখনই সে ওই ধরণের তারের খুঁটি বসাইবে। কি ভুলটাই করিত আগে! যেখানে যাইতেছে, সেখানকার বনে গুলঞ্চ-লতা পাওয়া যায় তো?

দিন পনেরো কাটিয়া গিয়াছে। বাঁশফট্‌কা গলির একখানা মাঝারি গোছের তেতলা বাড়ীর একতলায় হরিহর বাসা লইয়া আছে। কোনো পূর্বপরিচিত লোকের সন্ধান সে মিলাইতে পারে নাই। আগে যাহারা যেসব জায়গায় ছিল, এখন সেসব স্থানে তাহাদের সন্ধান কেহ দিতে পারে না। কেবল বিশ্বেশ্বরের গলির পুরাতন হালুইকর রামগোপাল সাহু এখনও বাঁচিয়া আছে।

বাড়ীর ওপরের তলায় একজন পাঞ্জাবী সপরিবারে থাকে, মাঝের তলায় এক বাঙালী ব্যবসায়ী থাকে, বাইরের ঘরটা তাঁর দোকান ও গুদাম—আশেপাশের দু'তিন ঘরে তাঁর রন্ধন ও শয়নঘর।

এ পাঁচছয় দিনে সর্বজয়া নিকটবর্তী সকল জায়গা স্বামীর সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিয়াছে। স্বপ্নেও কখনো সে এমন দৃশ্যের কল্পনা করে নাই,—এমন মন্দির! এমন ঠাকুর-দেবতা! এত ঘরবাড়ী! আড়ংঘাটার যুগলকিশোরের মন্দির এতদিন তাহার কাছে স্থাপত্য শিল্পের চরম উৎকর্ষের নিদর্শন জানা ছিল—কিন্তু বিশ্বনাথের মন্দির?—অন্নপূর্ণার মন্দির? দশাশ্বমেধ ঘাটের ওপরকার লালপাথরের মন্দিরগুলা?

মধ্যে একদিন সে পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটির স্ত্রীর সঙ্গে রাত্রে বিশ্বনাথের আরতি দেখিতে গিয়াছিল—সে যে কি ব্যাপার তাহা সে মুখে বলিতে পারে না। ধূপ-ধূনার ধোঁয়ায় মন্দির অন্ধকার হইয়া গেল—সাত-আটজন পূজারী একসঙ্গে মন্ত্র পড়িতে লাগিল—কি ভিড়, কি জাঁকজমক, কত বড় ঘরের মেয়েরা দেখিতে আসিয়াছিল, তাহাদের বেশ ভূষারই বা কি বাহার! কোথাকার একজন রাণী আসিয়াছিলেন—সঙ্গে চার-পাঁচজন চাকরাণী। দামী বারাণসী শাড়ী পরনে, সোনার কল্কাবসানো আঁচলটা আরতির পঞ্চপ্রদীপের আলোয় আগুনের মত জ্বলিতেছিল—কি টানা ডাগর চোখ—কি ভুরু কি মুখশ্রী—সত্যিকার রাণী সে কখনো দেখে নাই—গল্পেই শুনিয়াছে—হাঁ, রাণীর মত রূপ বটে! তাঁহাকে বেশীক্ষণ ধরিয়া দেখিয়াছে, কি ঠাকুরের আরতি বেশিক্ষণ দেখিয়াছে, তাহা সে জানে না।

ঠাকুর-দেবতার মন্দির ছাড়া এক-একখানা বসতবাড়ীই বা কি!....দুর্গোৎসবের নিমন্ত্রণে নিশ্চিন্দিপুরের গাঙ্গুলীবাড়ী গিয়া সে গাঙ্গুলীদের নাটমন্দির, দো-মহলা বাড়ী, বাঁধানো পুকুরঘাট দেখিয়া মনে মনে কত ঈর্ষান্বিত হইত—মনে আছে একবার দুর্গাকে বলিয়াছিল—দেখেচিস্ বড়লোকের বাড়ীঘরের কি লক্ষ্মীছিরি?—এখন সে যেসব বাড়ী রাস্তার দুধারে দেখিতেছে—তাহার কাছে গাঙ্গুলীবাড়ী—

এত গাড়ীঘোড়া একসঙ্গে যাইতে কখনও সে দেখে নাই। গাড়ীই বা কত ধরণের! আসিবার দিন রাণাঘাটে নৈহাটিতে সে ঘোড়ার গাড়ী দেখিয়াছে বটে, কিন্তু এত ধরণের গাড়ী সে আগে কখনো দেখে নাই। দু-চাকার গাড়ীই যে কত যায়!....তাহার তো ইচ্ছা করে পথের ধারে দাঁড়াইয়া দুদন্ড এইসব দ্যাখে—কিন্তু পাঞ্জাবী স্ত্রীলোকটি সঙ্গে থাকে বলিয়া লজ্জায় পারে না।

অপু তো একেবারে অবাক্ হইয়া গিয়াছে। এরকম কান্ডকারখানা সে কখনো কল্পনায় আনিতে পারে নাই। তাহাদের বাসা হইতে দশাশ্বমেধ ঘাট বেশী দূর নয়, রোজ বিকালে সে সেখানে বেড়াইতে যায়। রোজই যেন চড়কের মেলা লাগিয়াই আছে। এখানে গান হইতেছে, ওখানে কথা হইতেছে, ওদিকে কে একজন রামায়ণ পড়িতেছে, লোকজনের ভিড়, হাসিমুখ, উৎসব, অপু সেখানে শুধু ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়া দেখে আর সন্ধ্যার পর বাড়ী আসিয়া মহাউৎসাহে গল্প করে।

কাহাদের চাকর একটি ছোট ছেলেকে কোমরে দড়ি বাঁধিয়া রোজ বেড়াইতে আনে, অপু ভাব করিয়াছে—তার নাম পল্টু, ভাল কথা কহিতে জানে না, ভারী চঞ্চল, তাই পাছে হারাইয়া যায় বলিয়া বাড়ীর লোকেদের এই জেল-কয়েদীর মত ব্যবস্থা। অপু হাসিয়া খুন। চাকরকে অনুরোধ করিয়াছিল কিন্তু সে ভয়ে দড়ি খুলিতে চাহে না। বন্দী নিতান্ত ক্ষুদ্র ও অবোধ—এ ধরণের ব্যবহার যে প্রতিবাদযোগ্য,

সে জ্ঞানই তাহার নাই। আসিলে সর্বজয়া রোজ তাহাকে বকে—এক্‌লা এক্‌লা ওরকম যাস কেন? শহর বাজার জায়গা, যদি রাস্তা হারিয়ে ফেলিস?....মায়ের আশঙ্কা যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, একথা সে মাকে হাত নাড়িয়া দুবেলা অধ্যবসায়সহকারে বুঝায়।

কাশীতে আসিয়া হরিহরের আয়ও বাড়িল। কয়েক স্থানে হাঁটাহাঁটি করিয়া সে কয়েকটি মন্দিরে নিত্য পুরাণ-পাঠের কার্য যোগাড় করিল। তাহা ছাড়া একদিন সর্বজয়া স্বামীকে বলিল—দশাশ্বমেধ ঘাটে রোজ বিকেলে পুঁথি নিয়ে বোসো না কেন? কত ফিকিরে লোক পয়সা আনে, তোমার কেবল ব'সে ব'সে পরামর্শ আঁটা—

স্ত্রীর তাড়া খাইয়া হরিহর কাশীখন্ডের পুঁথি লইয়া বৈকালে দশাশ্বমেধ ঘাটে বসে। পুরাণ পাঠ করা তাহার কিছু নতুন ব্যবসায় নহে, দেশে শিষ্যবাড়ী গিয়া কত ব্রতপার্বণ উপলক্ষ্যে সে এ কাজ করিয়াছে। পুঁথি খুলিয়া সুস্বরে সে বন্দনা গান শুরু করে—

বর্হাপীড়াভিরামং মৃগমদতিলকং কুন্ডলাক্রান্তগন্ডং।
....স্মিতসুভগমুখং স্বাধরে ন্যস্ত বেণুং
....ব্রহ্মগোপালবেশং।

ভিড় মন্দ হয় না।

বাসায় ফিরিয়া বালির কাগজে কি লেখে। স্ত্রীকে বলে, শুধু শ্লোক প'ড়ে গেলে কেউ শুনতে চায় না—ওই বাঙাল কথকটার ওখানে আমার চেয়ে বেশী ভিড় হয়—ভেবেচি গোটাকতক পালা লিখবো, গান থাকবে, কথাকতার মতও থাকবে, নৈলে লোক জমে না—বাঙালটার সঙ্গে পরশু আলাপ হোল, দেবনাগরীর অক্ষর-পরিচয় নেই, শুধু ছড়া কেটে মেয়ে ভুলিয়ে পয়সা নেয়.... আমার রেকাবী কুড়িয়ে ছ' আনা, আট আনা, আর ওর একটা টাকার কম নয়....শুন্‌বে একটু কেমন লিখ্‌চি?

খানিকটা সে পড়িয়া শোনায়। বলে—ওই কথকের পুঁথি দেখে বনের বর্ণনাটা লিখে নেবো ভেবেচি—তা কি দেবে?

—তুমি কোন্‌খানটায় ব'সে কথা বলো বল তো? একদিন শুন্‌তে যেতে হবে—

—যেও না, ষষ্ঠীর মন্দিরের নীচেই বসি—কালই যেও, নূতন পালাটা বল্‌বো, কাল একাদশী আছে, দিনটা ভালো—

—আস্‌বার সময় বিশ্বেশ্বরের গলির দোকান থেকে চার পয়সার পানফলের জিলিপী এনো দিকি অপুর জন্যে—সেদিন ওপরের খোট্টা বউ কি পুজো ক'রে আমায় ডেকে নিয়ে গিয়ে জল খেতে দিলে, বল্লে, পানফলের জিলিপী, বিশ্বেশ্বরের গলিতে পাওয়া যায়, খেতে গিয়ে ভাব্‌লাম অপু জিলিপী খেতে বড় ভালবাসে—তা জল খেতে দিয়েচে আমি আর কি ব'লে নিয়ে আসি—এনো দিকি আজ চার পয়সার।

কয়েকদিন ধরিয়া হরিহরের কথকতা শুনিতে বেশ ভিড় হইতেছে। একখানা বড় বারকোষে করিয়া নারদঘাটের কালীবাড়ীর ঝি বড় একটা সিধা আনিয়া অপুদের দাওয়ায় নামাইল। সর্বজয়া হাসিমুখে বলিল—আজ বুঝি বারের পূজো? উনি বাড়ী আসচেন দেখ্‌লে, হাঁ ঝি? চলিয়া গেলে ছেলেকে ডাকিয়া বলিল—এদিকে আয় অপু—এই দ্যাখ্‌ তোর সেই নারকেলের ফোঁপল—তুই ভালবাসিস্‌? কিশ্‌মিশ, কলা, কত বড় বড় আম দেখেছিস্‌, আয় খাবি, দিই—বোস্‌ এখানে—

উৎসাহ পাইয়া হরিহর পুরাতন খাতাপত্রের তাড়া আবার বাহির করে। সর্বজয়া বলে—ধ্রুবচরিত্র শুন্‌তে শুন্‌তে লোকের কান যে ঝালাপালা হোল, নতুন একটা কিছু ধরো না? সারা সকাল ও দুপুর বসিয়া হরিহর একমনে জড়ভরতের উপাখ্যানকে কথকতার পালার আকারে লিখিয়া শেষ করে। মনে পড়ে এই কাশীতেই বসিয়া আজ বাইশ বৎসর পূর্বে যখন সে গীতগোবিন্দের পদ্যানুবাদ করে, তখন তাহার বয়স ছিল চব্বিশ বৎসর। দেশে গিয়া জীবনের উদ্দেশ্য যেন নিজের কাছে আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। কাশীতে এত ছিল না—দেশে ফিরিয়া চারিধারে দাশুরায়ের গান, দেওয়ানজীর গান, গোবিন্দ অধিকারীর শুকসারীর দ্বন্দ্ব, লোকা ধোপার দলের মতি জুড়ির গানের বিস্তৃত প্রচলন ও পসার তাহার মনে একটা নতুন ধরণের প্রভাব বিস্তার করিল।

রাত্রে স্ত্রীর কাছে গল্প করিত— বাজারের বারোয়ারীতে কবির গান হচ্চে বুঝলে? ব'সে ব'সে শুন্‌লাম, বুঝলে? ....সোজা পদ সব....কিছুই না, রও না, সংসারটা একটু গুছিয়ে নিয়ে বসি ভাল হয়ে—নতুন ধরণের পালা বাঁধবো—এরা সকলে গায় সেই সব মান্ধাতা আমলের পদ—রাজুকে তাই কাল বলছিলাম—

অনেক রাত্রে উঠিয়া এক-একদিন হরিহর বাহিরে দাওয়ায় বসিয়া কি ভাবিত, অনির্দ্দিষ্ট কোন্‌ আনন্দে তাহার মন যেন পালকের মত হালকা হইয়া উঠিত।

কি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তাহার সম্মুখে!....

ঝাড়লণ্ঠনের আলো-দোলানো বড় আসরে সে দেখিতে পায়, দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে তাহার ছড়া, গান, শ্যামা-সঙ্গীত, পদ, রাত্রির পর রাত্রি ধরিয়া গাওনা হইতেছে। কত দূর-দূরান্তর হইতে মাঠ ঘাট ভাঙিয়া লোক খাবারের পুঁটুলি বাঁধিয়া আনিয়া বসিয়া আছে শুনিতে। দলের অধিকারী তাহার বাড়ী আসিয়া সাধিয়া পালা চাহিয়া লইয়া গিয়াছে।

বাঃ! ভারী চমৎকার তো! কার বাঁধা ছড়া?—"কবির গুরু ঠাকুর হরু—" হরু ঠাকুরের?—না। নিশ্চিন্দিপুরের হরিহর রায় মহাশয়ের।

এই দশাশ্বমেধ ঘাটেই বসিয়া তো বাইশ বৎসর পূর্বে মনে মনে কত ভাঁঙাগড়া করিয়াছে—তারপর কবে সে সব ধীরে ধীরে ভুলিয়া গেল—কবে ধীরে ধীরে নূতন খাতাপত্রের তাড়া বাক্সের অনাদৃত, গুপ্ত কোণ আশ্রয় করিয়া দিনের আলো হইতে মুখ লুকাইয়া রহিল—যৌবনের স্বপ্নজাল জীবন-মধ্যাহ্নে কুয়াসার মত দিগন্তে মিলাইয়া গেল।

হারানো যৌবনের দিকে চাহিয়া দেখিলে বুকের মধ্যে কেমন করিয়া ওঠে, কত কথা মনে পড়ে—জীবনের সে সব দিনকে আর একটিবারও ফেরানো যায় না?

দশাশ্বমেধ ঘাটে অনেক ছেলের সঙ্গে অপুর ভাব হইয়াছে। কিন্তু এখানে তাহার বয়সী সব ছেলেই স্কুলে পড়ে, সে-ই কেবল এখনো স্কুলে পড়ে নাই। নিশ্চিন্দিপুরে মাছ ধরিয়া ও নৌকায় বেড়াইয়া দিন কাটানো চলিত বটে, কিন্তু এখানে সমবয়সীদের কাছে কিছু পড়ে না বলিতে লজ্জা করে।

তাহা ছাড়া দশাশ্বমেধ ঘাটে যেসব ছেলের সঙ্গে তাহার ভাব হইয়াছে, সবাই অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। পল্টুর দাদা একদিন কথায় কথায় বলিয়াছিল যে তাহার বাবাকে খুব বিদেশে বেড়াইতে হয়। অপু বলিয়াছিল—কেন, তোমাদের বুঝি খুব শিষ্য-বাড়ী আছে?

পল্টুর দাদা আশ্চর্য হইয়া বলিল—শিষ্য-বাড়ী? কিসের ভাই?....

অপু সদুত্তর দিবার পূর্বেই সে বলিল—আমার বাবা কন্ট্রাক্টরী করেন কি না? তা ছাড়া কাঁথিতে ছোট জমিদারী আছে—তবে আজকাল কিস্তি দিয়ে কিই বা থাকে?

এক-একদিন বৈকালে অপু দশাশ্বমেধ ঘাটে বেড়াইতে গিয়া বাবার মুখে পুরাণপাঠ শোনে। হরিণশিশু শ্বাপদ কর্তৃক নিহত হইলে হরিণবালকের স্নেহাসক্ত রাজর্ষি ভরতের করুণ বিরহবেদনা এ পরিশেষে তাঁহার মৃত্যুর কাহিনী ষষ্ঠী মন্দিরে পৈঠার উপর বসিয়া একমনে শুনিতে শুনিতে তাহার চোখে জল আসে—এদিকে আবার যখন সিন্ধু সৌবীরের রাজা রহুগণ তাঁহার স্বরূপ না জানিয়া ব্রহ্মর্ষি ভরতকে শিবিকাবাহক নিযুক্ত করেন—তখন হইতে কৌতূহল ও উৎকণ্ঠায় তাহার বুক দুরু দুরু করে, মনে হয় এইবার একটা কিছু ঘটিবে; ঠিক ঘটিবে। কথকতার শেষ পূরবী সুরের আশীর্বচনটি তাহার ভারী ভাল লাগে—

কালে বর্ষতু পর্জন্যং পৃথিবী শস্যশালিনী
লোকাঃ সন্তু নিরাময়াঃ....

সন্ধ্যার দিকে মন্দিরে মন্দিরে শঙ্খঘন্টার ধ্বনির সঙ্গে অস্তসূর্যের রাঙা আভা ও পূরবীর মূর্ছনার সঙ্গে হরিণ-বালকের বিয়োগবেদনাতুর রাজর্ষির ব্যথা যেন মিশাইয়া থাকে।

বাড়ীতে কাগজ কলম বাবার কাছে লইয়া গিয়া বলে—আমায় লিখে দাও না বাবা, ঐ যে তুমি গাও—কালে বর্ষতু পর্জন্যং?

হরিহর খুশী হইয়া বলে—তুই বুঝি শুনিস্‌ খোকা?

—আমি তো রোজই থাকি—তুমি কাল যখন ভরতের মা মারা যাওয়ার কথা বল্‌ছিলে আমি তখন তো তোমার পিছন দিকে বসে—ষষ্ঠীর মন্দিরের ধাপে—

—তোর কি রকম লাগে—ভাল লাগে?

—খু-উ-উ-উ-ব। আমি তো রোজ রোজ শুনি—

অপু কিন্তু একটা কথা লুকায়। যেদিন তাহার সঙ্গীরা থাকে, সেদিন কিন্তু বাবার দিকে সে যায় না। সেদিন বাবার নিকট দিয়া যাইতেছিল, তাহার বাবা দেখিতে পাইয়া ডাকিল—খোকা, ও খোকা—

তাহার সঙ্গের বন্ধুটি বলিল—তোমাকে চেনে নাকি?

অপু শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানায়, হাঁ। সে বাবার কাছে আসে নাই সেদিন। তাহার বাবা ঘাটে কথকতা করিতেছে, একথা বন্ধুরা পাছে টের পায়! সে পল্টুর দাদা ছাড়া অন্য বন্ধুদের কাছে গল্প করিয়াছে, কাশীতে তাহাদের বাড়ী আছে, তাহারা কাশীতে হাওয়া বদলাইতে আসিয়াছে, দেশে খুব বড় বাড়ী, তাহার বাবা কন্ট্রাক্টরী করেন, তা ছাড়া দেশে জমিদারীও আছে। শেষে বলে—কিন্তু জমিদারী থাকলে কি হবে, কিস্তি দিয়ে কিই বা থাকে?

তাহার বন্ধুদের বয়স তাহার অপেক্ষা খুব বেশী নয় বলিয়াই বোধ হয় তাহার বর্ণিত গল্পের সঙ্গে তাহার পোশাক-পরিচ্ছদের অসঙ্গতি ধরা পড়ে না, বিশেষতঃ তাহার সুন্দর মুখের গুণে সব মানাইয়া যায়।

পূর্ণিমার দিন কথক ঠাকুরের ওখানে বেশ ভিড় হইল। সন্ধ্যার পর হরিহর কথা শেষ করিয়া ঘাটের রাণায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে, কথক ঠাকুর জলে হাত মুখ ধুইতে নামিল। হরিহরকে দেখিয়া বলিল—এই যে আপনিও আছেন, দেখলেন তো কাণ্ড, পুন্নিমের দিনটা—বলি আজ দিনটা ভাল আছে, বামন-ভিক্ষে লাগাই—মাসে মাসে এই কাশীতে বামন-ভিক্ষা হোলে পরে পনের সের আধমণ ক'রে চাল পড়তো—আজকাল মশাই মহা বামন-ভিক্ষেতেও লোকে আর ভেজে না—চালের তো একটা দানাও না—এদিকে সিকে পাঁচেক হবে, তার মধ্যে আবার দুটো অচল দোয়ানি!....মশায়ের শিক্ষা কোথায়?

—শিক্ষা তো ছিল এই কাশীতেই অনেকদিন আগে। তবে এত দিন দেশেই ছিলাম—এইবার এখানে এসে বাসা ক'রে আছি....

—মশায়ের বাসা কি নিকটে? ....একটু চা খাওয়াতে পারেন?....কদিন থেকে ভাব্‌চি একটু চা খাবো—এই দেখুন না, চাদরের মুড়োয় চা বেঁধে নিয়ে ঘুরি, বলি না হয় কোনো হালুইকরের দোকানে একটু গরম জল করিগে.... গলা বসে গিয়েচে, একটু লোন্-চা খেলে গলাটা....

—হাঁ হাঁ, আসুন না এই তো নিকটেই আমার বাসা—চলুন না? কথককে লইয়া হরিহর বাড়ী আসিল।

চা খাওয়ায় পাট কোন কালে নাই। কড়ায় জল গরম করিয়া চা তৈরী হইল। অপু কাঁসার গ্লাসে চা ও রেকাবীতে কিছু খাবার কথকের সামনে লইয়া আসিল। খাবার দেখিয়া কথকঠাকুর ভারি খুশি হইল—খাবারের আশা সে করে নাই।

—এটি ছেলে বুঝি! বাঃ, বেশ ছেলে তো আপনার? ভারী সুন্দর দেখতে —বাঃ—এস এস বাবা, থাক্ থাক্ কল্যাণ হোক—লোন্-চা করিয়েচেন তো মশায়?....দেখি—

হরিহর বলিল—আপনার কি ছেলেপিলে সব এখানেই—

—সংসারই নেই তো ছেলেপিলে? ....দশ বিঘে জমিও বেরিয়ে গেল অথচ ও মূলেও হাভাত—জমি ক'বিঘে যদি আজ থাক্‌তো—তো আজ কি এই এতদূরে আসি—আপনিও যেমন!....এসব কি আর দেশ মশাই? ....বিশ্বেশ্বর অবিশ্যি মাথায় থাকুন—এমন শীতকাল যাচ্চে মশাই—না একটু খেজুর রস, না একটু গুড় পাটালি—আমার নিজের মশাই দু'কুড়ি খেজুর গাছ—

—মশাইয়ের দেশটা কোথায়?

—সাতক্ষীরের সন্নিকটে—বাদুড়ে-শীতলকাটি জানেন? শীতনকাটির চক্কত্তিরা খুব ঘরানা—

হরিহর তামাক সাজিয়া নিজে কয়েক টান্ দিয়া কথকঠাকুরের হাতে দিয়া বলিল—খান—

—কিছু না মশায়, ফাগুন মাসের দিকে তো যাই—একটা বাগান আছে, দিয়ে আসি বিক্রি ক'রে—আমরা আবার শ্রোত্রিয় কিনা? ....তা জমি দশ বিঘে ছিল তাই বন্ধক দিয়ে পণ যোগাড় করলাম—বিয়েও করলাম, —মশাই দশ বছর ঘর করলাম—হোল কি জানেন? সন্ধ্যাবেলা রান্নাঘরের চাল থেকে কুমড়ো কাটতে গিয়েচে— ছিল মশাই সেখানে সাপ আমার জন্যে তৈরী হয়ে—হাতে দিয়েচে কামড়ে —আমি আবার নেই সেদিন বাড়ী—কেই বা বদ্যি কবরেজ দেখিয়েচে, কেই বা করেচে— পাটুলির ঘাট পার হচ্চি— গাঁয়ের মহেশ সাধুখাঁ ওপার থেকে আসচে, আমায় বল্লে—শিগ্‌গির বাড়ী যান মশায়—আপনার বাড়ী বড় বিপদ—কি বিপদ তা বলে না—বাড়ী পৌঁছে দেখি আগের রাত্রিতেই বৌ তো গিয়েচে ম'রে! —এই গেল ব্যাপার মশাই...জমিকে জমি গেল—এদিকেও—। সেই থেকে বলি যাই, দেশে থেকে আর কিই বা হবে—কোত্থেকে পাবো তিন-চারশ টাকা যে আবার বিয়ে করবো? ....যাই বিশ্বনাথের ওখানে....অন্নকষ্টটা তো হবে না....আজ বছর আষ্টেক হয়ে গেল—এক খুড়তুতো ভাই আছে—জমিজমা সামান্য যা একটু আছে, দখল ক'রে ব'সে আছে—বলে তোমার ভাগ নেই—বেশ বাপু নেই তো নেই—গোলমালের মধ্যে কখ্‌খনো আমি যাবো না—করগে যা দখল। উঠি মশাই—আপনার এখানে বেশ চা খাওয়া গেল—আপনার ছেলেটি কোথায় গেল? ....বেশ ছেলে, খাসা ছেলে—

পুরানো চামড়ায় তালি দেওয়া ক্যাম্বিসের জুতা জোড়াটা ঝাড়িয়া লইয়া কথকঠাকুর পায়ে দিয়া দরজার কাছে আসিল—যাইতে যাইতে বলিল—কালও লাগাবো বামনভিক্ষে—দেখি কি হয়—

পথের পাঁচালী একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

হরিহরের বাসাটা বিশেষ ভাল নয়। নীচের তলায় স্যাঁৎসেঁতে ঘর, তাও মাত্র দুখানি, এত অন্ধকার যে হঠাৎ বাহির হইতে আসিলে ঘরের কোনো জিনিস নজরে পড়ে না। এরকম স্থানে সর্বজয়া কখনো বাস করে নাই, তাহাদের দেশের বাড়ী পুরানো হইলেও রৌদ্রহাওয়া খেলিবার বড় বড় দরজা জানালা ছিল, সেকালের উঁচু ভিতের কোঠা খট্ খট্ করিত, শুক্‌না। এ বাসার স্যাঁৎসেঁতে মেজে ও অন্ধকারে সর্বজয়ার মাথা ধরে। অপু তো মোটেই ঘরে থাকে না, সূর্যালোকপুষ্ট নবীন তরুর ন্যায় শুধু আলোর দিকে তার মুখটি থাকে ফিরানো, নিশ্চিন্দিপুরের মুক্ত মাঠে, নদীর আলো-হাওয়ায় মানুষ হইয়া এই বদ্ধঘরের অন্ধকারে তাহার প্রাণ হাঁপাইয়া ওঠে, একদণ্ডও সে সেখানে তিষ্ঠিতে পারে না।

কাশী দেখিয়া সে একটু নিরাশ হইয়াছে। বড় বড় বাড়ীঘর থাকিলে কি হইবে, এখানে বন নাই মোটেই।

সন্ধ্যার দিকে একদিন কথকঠাকুর হরিহরের বাসায় আসিল। একথা ওকথার পর বলিল— কৈ আপনার ছেলেকে দেখচি নে?

হরিহর বলিল—কোথায় বেরিয়েচে খেলা করতে, দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকেই বোধ হয় বেরিয়েচে—

কথকঠাকুর উড়ানির প্রান্তে কি দ্রব্য খুলিতে খুলিতে বলিল—আপনার ছেলের সঙ্গে বড় ভাব হয়ে গিয়েচে মশাই—সেদিন ঘাটে কাছে ডেকে বসিয়ে অনেকক্ষণ ওর সঙ্গে কথা কইলাম—কড়ি খেলতে ভালবাসে তাই এই দুটো বড় বড় সমুদ্রের কড়ি সেদিন ব্রতের সিধেয় কারা দিইছিল, ভাবলাম ওকে দিয়ে আসি—রেখে দিন আপনি, ও এলে দেবেন—

অগ্রহায়ণ মাসের শেষে অপু বাবাকে ধরিল সে স্কুলে ভর্তি হইবে। বলিল—সবাই পড়ে ইস্কুলে বাবা, আমিও পড়বো—ওই তো গলির মোড় ছাড়িয়ে একটুখানি গিয়েই ভাল ইস্কুল—

হরিহর ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করিয়া দিল। যদিও ছাত্রবৃত্তি স্কুল তবে ইংরাজী পড়াও হয়। প্রসন্ন গুরুমশায়ের পাঠশালা ছাড়িয়া দেওয়ার পরে— সে চার পাঁচ বছর হইয়া গিয়াছে—এই তাহার পুনরায় অন্য বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া।

মাঘ মাসের মাঝামাঝি কথকঠাকুর এক টুকরো বালির কাগজ হাতে একদিন হরিহরের বাসায় আসিয়া হাজির। কাগজের টুকরো দেখাইয়া বলিল—দেখুন তো মশাই পড়ে, এই রকম যদি লিখি তবে হয়?

হরিহর পড়িয়া পড়িয়া দেখিল, কাশীবাসী রামগোপাল চক্রবর্তী নামে কোনো লোক কথকঠাকুরের নামে স্বগ্রামের দশবিঘা জমি দানপত্র লিখিয়া দিতেছে, অমুক অমুক সাক্ষী, স্থান দশাশ্বমেধ ঘাট, অমুক তারিখ। কথকঠাকুর বলিল—ব্যাপারটা কি জানেন! আমাদের দেশে কুমুরে গ্রামের রামগোপাল চক্কত্তি ভারী পণ্ডিত ছিলেন, মরবার বছর খানেক আগে আমাকে বল্লেন—রামধন, তোমার তো কিচ্ছু নেই, ভাব্‌চি তোমাকে বিঘে দশেক জমি দান করব—তুমি নেবে কি? তা ভাব্‌লাম সদ্‌ব্রাহ্মণ, দিতে চাচ্ছেন, দোষই বা কি? তারপর তিনি মুখে মুখে জমিটা আমায় দিয়ে দিলেন। দিলেন দিলেন—এতকাল তত গা করিনি. কাশীতেই থাক্‌বো, দেশে ঘরে থাকবো না, কি হবে জমি? তারপর চক্কত্তি মশায় গেলেন মারা। জমির দানটা মুখে মুখেই রয়ে গেল। এতকাল পরে ভাবচি দেশে যাবো—ছেলেপিলে না হলে কি আর মানুষ মশাই? আপনাকে বলতে কি, শ'তিনেক টাকা হাতে করেচি—করেচি জলাহার করে মশাই—আর শ'দুই টাকা পেলে শ্রোত্রিয় ঘরের মেয়ে পাওয়া যায়—তা যদি তাই ঘটে, তবে জমিটা দরকার হবে তো? ভাবলুম মুখে মুখে দান, সে কি আর চক্কত্তি মশাই-এর ছেলেরা মানবে? ভেবে চিন্তে এই কাগজখানা ব'সে লিখিচি—নিজেই লিখিচি মশাই, সইটই সব—দুজন সাক্ষী, সব বানানো—দেখি লেখা কাগজ যদি মানে। গিয়ে বোলবো এই দ্যাখো তোমার বাবা এই জমিটা দান করেচেন—

উঠিবার সময় কথকঠাকুর বলিল—ভালো কথা মশাই, মঙ্গলবার মাঘীপূর্ণিমার দিন আপনার ছেলেকে আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবো ওই টেওটার রাজার ঠাকুরের বাড়ীতে, ঠিক মান মন্দিরের গায়েই একেবারে। সন্ধ্যের পর বছর বছর ব্রাহ্মণভোজন করায় কি না। একটু সগর্বে বলিল—আমায় একখানা করে নেমন্তন্ন পত্তর দ্যায়, বেশ ভাল খাওয়ায়, চমৎকার। আমি এসে নিয়ে যাবো সেদিন কিন্তু।

মাঘী পূর্ণিমার দিন শেষরাত্রি হইতে পথে স্নানার্থীদের ভিড় দেখিয়া সর্বজয়া অবাক হইয়া গেল। দলে দলে মেয়ে পুরুষে "জয় বিশ্বনাথজী কি জয়", "বোলো বোম্" বলিতে বলিতে দুরন্ত মাঘের শীতকে উপক্ষা করিয়া স্নানের জন্য চলিয়াছে। একটু বেলা হইলে পাঞ্জাবী স্ত্রীলোকটির সঙ্গে সর্বজয়াও স্নান করিতে গেল—গঙ্গার ঘাটের জল, সিঁড়ি, মন্দির, পথ সব উৎসববেশে সজ্জিত নরনারীতে পূর্ণ। জলে নামা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। ষষ্ঠীর মন্দিরে লাল নিশান উড়িতেছে।

সন্ধ্যার আগে কথকঠাকুর অপুকে লইতে আসিল। সর্বজয়া বলিল—পাঠিয়ে দাও গিয়ে, কেউ নেই, অপুর ওপর একটা দম হয়েচে, দশাশ্বমেধ ঘাটে ওকে ডেকে কাছে বসিয়ে গল্প করে, একদিন নাকি পেঁপে কিনে খাইয়েচে—পাঠিয়ে দাও, লোক ভালো—

অপু প্রথমে কথকঠাকুরের সঙ্গে তাহার বাসায় গেল। খোলার ঘর, মাটির দেওয়ালের নানাস্থানে খড়ি দেওয়া হিসাব লেখা। নমুনা ঃ—

সিয়ারসোলের রাণীর বাড়ী ভাগবত পাঠ ....৪্
মুসম্মত কুন্তার ঠাকুর বাড়ী ... ঐ ... ... ২্
ধারক লালজী দোবের একদিনের খোরাকী ... ৪।·

বিশেষ কিছু আসবাবপত্র নাই। একখানা সরু চৌকী পাতা, একটা ছোট টিনের তোরঙ্গ, একটা দড়ি-টাঙানো আল্‌না, একজোড়া খড়ম। দেওয়ালের গায়ে পেরেকে একটা বড় পদ্মবীজের মালা টাঙানো।

কথকঠাকুর বলিল—কমলালেবু খাবে?

অপু ঘাড় নাড়িয়া বলিল—আছে আপনার?

৪্ ৪ টাকা। ২্ ২ টাকা। ।· চার আনা, এখনকার ২৫ পয়সার সমতুল্য।

কি জানি কেন এই কথকঠাকুরের কাছে তাহার কোনোপ্রকার লজ্জা কি সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল না। লেবুর খোসা ছাড়াইতে ছাড়াইতে জিজ্ঞাসা করিল—"কালে বর্ষতু পর্জন্যং" জানেন আপনি?

—কালে বর্ষতু পর্জন্যং? খুব জানি, রোজ বলি তো, একদিন শুনো না—

—এখন বলুন না একটিবার?

কথক সুর করিয়া বলিল বটে কিন্তু অপুর মনে হইল তাহার বাবার মুখে শুনিলে আরও ভাল লাগে, কথকের গলা বড় মোটা।

দেশে লইয়া যাইবার জন্য কথকঠাকুর নানা খুচ্‌রা মাটির ও পাথরের জিনিস—পুতুল, খেল্‌না, শিবলিঙ্গ মালা, কাঠের কাঁকই সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। অপুকে দেখাইয়া বলিল—কাশীর জিনিস, সবাই বল্‌বে কি এনেচ দেখি! তাই নিয়ে যাবো—

নানা সরু গলি পার হইয়া একটা অন্ধকার বাড়ীর দরজার সামনে আসিয়া কথকঠাকুর দাঁড়াইল। নীচু হইয়া দরজা দিয়া অতি কষ্টে কথকের সঙ্গে ঢুকিয়া অপুর মনে হইল বাড়ীটায় কেহ কোথাও নাই, সব নিঝুম। কথকঠাকুর দু'একবার গলায় কাশির শব্দ করিতে কে একজন দালানের চারপাই হইতে ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া মোটা গলায় হিন্দীতে কি জিজ্ঞাসা করিল, অপু তাহা বুঝিতে পারিল না। কথকঠাকুর পরিচয় দিবার পরেও মনে হইল লোকটা তাহাকে চিনেও না বা তাহাদের আগমন প্রত্যাশাও করে নাই। পরে লোকটা যেন একটু বিরক্তির সহিত কাহাকে কি জিজ্ঞাসা করিতে গেল। কিন্তু ফিরিতে এত দেরি করিতে লাগিল যে, অপুর মনে হইল হয়তো ইহারা বলিবে তোমাদের তো নিমন্ত্রণ হয় নাই, যাও তোমরা। যাহাই হউক, অন্ধকারে ঠায় পনেরো মিনিট দাঁড়াইবার পরে লোকটা ফিরিয়া আসিয়া দালানের একস্থানে আধ-অন্ধকারে খানকতক শাল্‌পাতা পাতিয়া ইহাদের বসাইয়া দিল। একটা মোটা পিতলের লোটায় জল দিয়া গিয়াছে। কথকঠাকুর যেন ভয়ে ভয়ে গিয়া আসনের উপর বসিল। রাজার বাড়ী কি না জানি খাওয়ায়? অধীর আগ্রহে অপু প্রায় আরও বিশ মিনিট পাতা পাতিয়া বসিয়া রহিল—কাহারও দেখা নাই। নিমন্ত্রণ খাইতে পাইবার নিশ্চয়তার সম্বন্ধে যখন পুনরায় অপুর মনে সন্দেহ দেখা দিতেছে ঠিক সেই সময় পরিবেষ্টার আবির্ভাবরূপ অঘটন ঘটিল। মোটা মোটা আটার পুরী ও স্বাদ-গন্ধহীন বেগুনের ঘন্ট— শেষে খুব বড় বড় লাড্ডু। অপু কামড়াইতে গিয়া লাড্ডুতে দাঁত বসাইতে পারিল না, এত কঠিন। কথকঠাকুর চাহিয়া চাহিয়া সেই মোটা পুরী খান দশ-বারো আগ্রহের সহিত খাইল। মাঝে মাঝে অপুর দিকে চাহিয়া বলিতেছিল—পেট ভরে খাও, লজ্জা কোরো না, বেশ খাওয়ায়—বেশ লাড্ডু না? দাঁতে এখনও খুব জোর আছে, বেশ চিবুতে পারি।

একশত বৎসর একসঙ্গে থাকিলেও কেহ হয়তো আমার হৃদয়ের বাহিরে থাকিয়া যায় যদি না কোনো বিশেষ ঘটনায় সে আমার হৃদয়ের কবাট খুলিতে পারে। আজকার এই নিমন্ত্রণ খাইতে আসার অনাদর, অবজ্ঞা, অপু বালক হইলেও বুঝিয়াছিল। তাহার পরও এই খাইবার লোভে ও আনন্দে অপুর অন্তরতম হৃদয়ে ঘা লাগিল। তাহার মনে হইল এ কথকঠাকুর অতি অভাজন। ভাবিল, কথকঠাকুর কখনো কিছু খেতে পায় না, আহা এই লাড্ডু তাই অমন ক'রে খাচ্ছে—ওকে একদিন মাকে ব'লে বাসাতে নেমন্তন্ন করে খাওয়াবো—

করুণা ভালবাসার সব চেয়ে মূল্যবান মশলা, তার গাঁথুনী বড় পাকা হয়। তাহার শৈশব মনে এই বিদিশী, দুদিনের পরিচিত, বাঙাল কথকঠাকুর তাহার দিদি ও গুল্‌কীর সঙ্গে এক হারে গাঁথা হইয়া গেল সুদ্ধ এক লাড্ডু খাইবার অধীর লোভের ভঙ্গীতে।

ইহার অল্পদিন পরেই কথকঠাকুর দেশে চলিয়া গেল। রাজঘাটের স্টেশনে কথকঠাকুরের নির্বন্ধাতিশয্যে হরিহর অপুকে সঙ্গে করিয়া তাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিতে গেল। হরিহরের মনে হইল আজ বাইশ বৎসর পূর্বে সে যাহা করিতে দেশে গিয়াছিল—এই ব্যক্তি তাহার বর্তমান বয়সের চেয়েও অন্ততঃ আট বৎসর বেশী বয়সে তাহাই করিতে অর্থাৎ নূতন করিয়া সংসার পাতিতে দেশে চলিয়াছে। সুতরাং তাহারই বা বয়সটা এমন কি হইয়াছে? কোন কাজ করিবার সময়ের অভাব হইতে পারে তাহার?

গাড়ী ছাড়িলে অপুর চোখে জল আসিল। বালকের প্রাণে সময়ে সময়ে বয়স্ক লোকের উপর স্থায়ী সত্যিকার স্নেহ আসে। দুর্লভ বলিয়াই তাহা বড় মূল্যবান।

মাঘ মাসের শেষের দিকে একদিন হরিহর হঠাৎ বাড়ী ঢুকিয়াই উঠানের ধারে বসিয়া পড়িল। সর্বজয়া কি করিতেছিল, কাজ ফেলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া বলিল,—কি হয়েচে, এমন ক'রে ব'সে পড়লে যে? স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া কিন্তু মুখের কথাটা তাহার মুখেই রহিয়া গেল। হরিহরের চোখ দুটা জবাফুলের মত লাল, ডান হাতখানা যেন কাঁপিতেছে। সর্বজয়া হাত ধরিয়া তুলিতে আসিতে সে ঘোর-ঘোর আচ্ছন্নভাবে বলিল—খোকা কোথায় গেল? খোকা?

সর্বজয়া গায়ে হাত দিয়া দেখিল জ্বরে তাহার গা পুড়িয়া যাইতেছে। সন্তর্পণে হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া গিয়া তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া বলিল—অপু আস্‌চে, তাকে ডেকে নিয়ে গিয়েচে ওপরের ওই নন্দবাবু, বোধ হয় গোধুলিয়ার মোড়ে তার দোকানে নিয়ে গিয়েচে—

অপু দোকানে যায় নাই, নন্দবাবুর ঘরের সামনে ছাদে বসিয়া বসিয়া বই পড়িতেছিল। মাসখানেক হইল নন্দবাবুর সঙ্গে অপুর খুব আলাপ জমিয়াছে। নন্দবাবুর বয়স কত তাহা ঠিক করিয়া বুঝিবার ক্ষমতা তাহার হয় নাই, তবে তাহার বাবার চেয়ে ছোট মনে হয়। নন্দবাবুর উপরের ঘরে সে অনেকগুলি বই আবিষ্কার করিয়াছে—নন্দবাবু যখন ঘরে থাকে তখন বই লইয়া ছাদে বসিয়া পড়ে। কিন্তু ভয় হয় পাছে নন্দবাবু পড়িতে না দিয়া বই কাড়িয়া লয়, কারণ একদিন সেরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল। ছাদের এক কোণে রৌদ্রে বসিয়া অপু বই পড়িতেছিল, নন্দবাবু ঘরের ভিতর কি খুঁজিতে খুঁজিতে বাহিরে আসিয়া তাহাকে দেখিতে পাইয়া ধমক দিয়া বলিল —আরে রেখে দাও, তোমার ব'সে ব'সে যত ঐ সব বই পড়া, কোথাকার জিনিস কোথায় রাখো তার ঠিক নেই, কাজের সময় খুঁজে মেলে না—যাও, রাখো বই, যাও—

সে তো ঘরের অন্য কোনো জিনিসে হাত দেয় না, তবে তাহাকে বকিবার কারণ কি? সেই হইতে সে ভয়ে ভয়ে বই লইয়া থাকে।

নন্দবাবু সন্ধ্যার সময় টেরি কাটিয়া ভাল জামা কাপড় পরিয়া শিশি হইতে কি গন্ধ মাখিয়া রোজ বেড়াইতে যায়। অপুর গায়ে একদিন শিশি হইতে ছড়াইয়া দিয়াছিল, বেশ ভুরভুরে গন্ধটা।

সন্ধ্যার পরও সে আগে আগে নন্দবাবুর ঘরে পড়িতে যাইত। কিন্তু সন্ধ্যার পরে নন্দবাবু আলমারি হইতে একটা বোতল লইয়া লাল-মত একটা ঔষধ খায়। সে সময়ে সে একদিন ঘরে গিয়া পড়িলে তাহাকে ভারী বকিয়াছিল। নন্দবাবুর ঘরে উঠিবার সিঁড়ি অন্যদিকে— আর একদিন রাত্রে হঠাৎ ওপরের ঘরে গিয়া সে দেখিয়াছিল একটি কে স্ত্রীলোক ঘরের মধ্যে বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া নন্দবাবু বলিয়াছিল—এখন যাও অপূর্ব, ইনি আমার শালী—দেখতে এসেচেন্ এখুনি চলে যাবেন। ফিরিয়া আসিতে আসিতে সে শুনিয়াছিল নন্দবাবু বলিতেছে —ও আমাদের নীচের ভাড়াটের ছেলে—কিছু বোঝে-সোঝে না।

নন্দবাবু তাহাকে প্রায়ই তাহার মার কথা জিজ্ঞাসা করে। বলে—তোমার মাকে ব'লে পান নিয়ে এস দিকি? আমার চাকরটা পান সাজতে জানে না—

অপু মায়ের কাছে আবদার করিয়া ওপরে প্রায়ই পান আনে। নন্দবাবু মাঝে মাঝে বলে—তোমার মা আমার কথা কিছু বলেন-টলেন নাকি—না? —অপু বাড়ী আসিয়া মাকে বলে—নন্দবাবু বেশ লোক মা—তোমার কথা রোজ জিজ্ঞেস্ করে—

—বল্‌ছিল তোমার মাকে বোলো, আমি তাঁর কথা জিজ্ঞেস করি-টরি—বেশ লোক—

—করুক গে—তুই পাজি ছেলে অত ওপরের ঘরে যাস্-টাস্ কেন? বিকেলে ওপরে ব'সে ব'সে কি করিস্?

হরিহরের জ্বরটা একটু কমিল। অপু স্কুল হইতে আসিয়া বই নামাইয়া রাখিতেছে। পায়ের শব্দ পাইয়া হরিহর বলিল—খোকা এস, একটু বসো বাবা—

অপু বসিয়া বসিয়া স্কুলের গল্প করিতে লাগিল। হাসিমুখে নীচু সুরে বলিল—এই দুমাস তো স্কুলে গিইচি, এরই মধ্যে বাবা, স্কুলের সবাই খুব ভালবাসে, রোজ রোজ ফার্স্ট বসি—স্কুলে আমাদের ক্লাসে একখানা কাগজ ছাপিয়ে বার করবে এক মাস অন্তর। আমাকে সেই দলে নিয়েচে—তোমায় দেখাবো বাবা বেরুলে—

হরিহরের বুকের ভিতরটা মমতায় বেদনায় কেমন করে। অপু একখানা কাগজ বাহির করিয়া বলে—একটা লেখা লিখেচি—কাগজখানা ছাপাবে বলেচে, আমার নামে—কিন্তু যারা দুটাকা কোরে চাঁদা দেবে শুধু তাদেরই লেখা ছাপ্‌বে বলেচে—দু'টাকা দেবে বাবা?

হরিহর অধীর আগ্রহে ছেলের হাত হইতে কাগজখানা লইয়া পড়িতে শুরু করে। ছেলে যে লেখে সে খবর সে জানিত না। রাজপুত্রের মৃগয়ার গল্প সুন্দর বানানো, হরিহর খুশি হইয়া বালিশে ভর দিয়া উঠিয়া বসে, বলে—তুই লিখিচিস্ খোকা?

—আমি তো আরো কত লিখিচি বাবা, ভূতের গল্প, রাজকন্যের—বাড়ী থাক্‌তে রাণুদির খাতায় লিখে লিখে দিতাম তো—

সর্বজয়া টাকার নাম শুনিয়া দিতে চাহে না। স্বামী অসুখে পড়িয়া এ অবস্থায় যাহা আছে তাহা সংসারের খরচেই কুলাইবে না, দরকার নাই ছাপানো কাগজে। হরিহর বুঝাইয়া বলিয়া টাকা দেওয়ায়, বলে—দাও গিয়ে, আহা খোকার লেখাটা ছাপিয়া আসুক, সেরে উঠে পথ্যি করলেই ঠাকুর-বাড়ীর ভাগবত পাঠটা তো ঠিকই রয়েচে—ওতেও তো গোটা দশেক টাকা পাবো—

দিন দুই পরে অপু নিরাশ মুখে রাঙা ঠোঁট ফুলাইয়া বাবার কাছে চুপি চুপি আসিয়া বলে—হ'লো না বাবা। ছাপাখানাওয়ালার লোকেরা বেশী দাম চেয়েচে, তাই আজ স্কুলে ব'লে দিয়েচে, চার টাকা করে চাঁদা চাই,—

ছেলের মুখের নিরাশার ভাব হরিহরের বুকে খচ্ করিয়া বিঁধে। খানিকক্ষণ অন্য কথার পর সে বলে—দ্যাখ দিকি খোকা তোর মা কোথায় গেল....বালিসের তলা চাবির থোলো বাহির করিয়া দিয়া বলে—চুপি চুপি ওই কাঠের ছাপ বাক্স, যেটাতে আমার কঞ্চি কলমের বান্ডিল আছে, ওইটে খোল তো?....কোণে দ্যাখ্ তো ক'টাকা আছে? তাহার পর হরিহর সন্তর্পণে বাক্স-খোলা-নিরত পুত্রের দিকে মমতার চোখে চাহিয়া থাকে। অবোধ, অবোধ, নিতান্ত অবোধ!...ওর সুন্দর, শুভ্র চাঁদের মত ললাটটি ওর মায়ের ললাট, চোখ দুটি ওর মায়ের চোখ। যখন হরিহর প্রথম যৌবনে বিবাহ করিয়া স্ত্রীকে ঘরে আনে, নববধূ সর্বজয়ার অবিকল সেই মুখের হাসি এগারো বছরের অপুর অনাবিল, নবীন মুখে।

অকারণে হরিহরের বুকের মধ্যে স্নেহসমুদ্র উদ্বেল উত্তাল হইয়া উঠিয়া চোখে জল ভরিয়া আনে।

অপু যেন প্রথম বসন্তের নবকিশলয়, তাহার মুখের আনন্দ যেন প্রভাতের নব-অরুণ আভা, তার ডাগর ডাগর নীলাভ চোখ দুটির চাহনির মধ্যে নিজের অতীত যৌবনদিনের সে অসীম স্বপ্ন, সুনীল পাহাড়ের নবীন শালতরুশ্রেণীর উল্লাস-মর্মর....কূলহারা সমুদ্রের দূরাগত সঙ্গীতধ্বনি।

অপু চুপি চুপি বাবাকে দেখাইয়া বলে—চারটে টাকা আছে বাবা!—হরিহর সময় অসময়ের জন্য টাকা কয়টি রাখিয়া দিয়াছে নিজের বাক্সে লুকাইয়া, স্ত্রী জানে না, কাজেই সে নিশ্চিন্তমনে বলিতে পারিল—নিয়ে যা খোকা, চাঁদা দিয়ে দিস্, কিন্তু তোর মাকে যেন বলিস্‌নে।

অপু খুশির সুরে বলে—ছাপা বেরুলে তোমায় দেখাবো বাবা, আমার নামে ছাপিয়ে দেবে বলেচে—এই সোমবারের পরের সোমবারে বেরুবে—

পরদিন সকাল হইতে হরিহরের অসুখ আবার বাড়িল।

সর্বজয়া ভয় পাইয়া ছেলেকে বলিল—নন্দবাবুকে বলগে যা তো—একবার এসে দেখে যান্—

নন্দবাবু দেখিয়া বলিল—একজন ডাক্তার ডাকতে হবে অপূর্ব, তোমার মাকে বলো।

বৈকালে নন্দবাবুই একজন ডাক্তার সঙ্গে করিয়া আনিল। ডাক্তার দেখিয়া শুনিয়া বলিল—ঠান্ডা লেগে হয়েচে, ব্রঙ্কো-নিমোনিয়া —ভাল নার্সিং চাই,—নীচের ঘরে কি এমনি করে থাকে! ....খোকা, তুমি একটা শিশি নিয়ে এস আমার ডাক্তারখানায়, ওযুধ দেবো—

অপু কয়দিন গিয়া দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর ডাক্তারের ডিস্‌পেন্সরী হইতে ঔষধ আনিল।

বিশেষ কোনো ফল দেখা গেল না। দিন দিন হরিহর দুর্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। এদিকে টাকা যে কয়টি ছিল—ভিজিটে ও পথ্যে খরচ হইয়া গেল। ডাক্তার বলিল, অন্ততঃ এক সের করিয়া দুধ ও অন্যান্য ফল না খাইতে দিলে রোগী দুর্বল হইয়া পড়িবে। সাড়ে তিন টাকা দামের একটা বিলাতী পথ্যের ব্যবস্থাও দিয়া গেল। বিদেশ-বিভুঁই জায়গা। একবার দেখিয়া সাহস দেয় এমন লোক নাই, সর্বজয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিল।

এই বিপদের মধ্যে সর্বজয়া আবার এক নতুন বিপদে পড়িল। উপরের ছাদে দাঁড়াইয়া ঝুঁকিয়া দেখিলে রাঁধিবার ঘর দেখা যায়। ইতিপূর্বেও সে মাঝে মাঝে নন্দবাবুকে ছাদ হইতে তাহার রান্নাঘরের দিকে উঁকিঝুঁকি মারিতে দেখিয়াছে, সম্প্রতি হরিহরের অসুখ হইবার পর হইতে নন্দবাবু বড় বাড়াইয়া তুলিল। নানা অছিলায় সে দিনে দশবার ঘরের মধ্যে আসে—আগে আগে অপুকে আড়াল করিয়া জিজ্ঞাসা করিত—আজকাল সরাসরিই তাহাকে সম্বোধন করিয়া কথাবার্তা বলে। প্রথমটা সর্বজয়া কিছু মনে করে নাই—বরং বিপদের সময় এই অনাত্মীয় লোকটি যথেষ্ট সাহায্য ও দেখাশুনা করিতেছে ভাবিয়া মনে মনে কৃতজ্ঞই ছিল, কিন্তু ক্রমেই যেন তাহার মনে হইতে লাগিল যে, এই যে বাড়াবাড়ি—ইহা কোথায় যেন বেখাপ ঠেকিতেছে। নন্দবাবু নিজে পান কিনিয়া আনিয়া সম্মুখে রাখিয়া বলে—চাকরদের হাতে পান সাজা—জীবনটা গেল বৌঠাকরুণ্—সাজুন দিকি একবার—তাহাতেও সর্বজয়া দোষ ধরে নাই, বরং এই প্রবাসী আত্মীয়স্নেহবঞ্চিত লোকটির উপর মনে মনে একটু করুণাই হইত—কিন্তু ঘনিষ্ঠতা ক্রমে শোভনতার সীমা ডিঙাইতে চলিল। আজকাল পান আনিয়া বলে—রাখো দিকি বৌঠাকরুণ! হাত হইতে সর্বজয়া লইবে—এইরূপই যেন চায়। অপু তো পাগল—অধিকাংশ সময়ই বাটীতে তাহাকে খুঁজিয়া মেলে না—ওঘরে হরিহর অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকে—আর ঠিক সেই সময়টিতেই নন্দবাবু ঘরে আসিবে রোগী দেখিতে! ....ছলছুতায় একথা-ওকথায় আধঘন্টা না কাটাইয়া সে ঘর হইতে যায় না। বলে—কোনো ভয় নেই বৌঠাকরুণ—আমি আছি ওপরে—অপূর্ব থাকে না থাকে—ওই সিঁড়িটার ওপর গিয়ে ডেকো না! বিপদের সময় অত বাছতে গেলে....একটু চুন দাও তো! বোঁটা নেই?....আহা আঙুলের মাথাতে করেই একটু দাও না অম্‌নি—

হরিহরের জ্ঞান হইলেই ছেলের জন্য অস্থির হইয়া উঠে। এদিক-ওদিকে চাহিয়া ক্ষীণসুরে বলে—খোকা কৈ! খোকা কৈ! ....সর্বজয়া বলে—আসচে, তাই কি হতচ্ছাড়া ছেলে একটু কাছে বস্‌বে....বেরিয়েচে বুঝি সেই ঘাটে। ছেলে বাড়ী এলো বলে—বসতে পারিস্‌নে একটু কাছে!....খোকা খোকা ক'রে পাগল—খোকার তো ভেবে ঘুম নেই—যা বস্‌গে যা, গায়ে মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিতে নেই বুঝি? ছেলে হয়ে স্বগ্‌গে ঘন্টা দেবেন কি না?

অপু অপ্রতিভ মুখে বাবার শিয়রের পাশে বসে। কিন্তু খানিক বসিয়াই মনে ভাবে —ওঃ! কতক্ষণ ব'সে থাকবো—বেশ তো? আমার বুঝি একটু বেড়াতে কি খেলা করতে নেই। কন্‌কনে ঠান্ডায় পা অবশ হইয়া আসে। তাহার মন ছট্‌ফট করে—একদৌড়ে একেবারে সেই দশাশ্বমেধ ঘাট। জলের রাণা, নির্মল মুক্ত হওয়া, সুবেশ নরনারীর ভিড়। পল্টু...সুবীর....গুলু....পটল—পল্টুর দাদা। রামনগরের রাজার সেই ময়ূরপঙ্খীটায় আজ আবার বাচ, বেলা চারটার সময়! উস্‌খুস্ করিতে করিতে চক্ষুলজ্জায় সন্ধ্যা করিয়া ফেলে, মায়ের ভয়ে যাইতে সাহস পায় না।

সকালে সর্বজয়া একদিন ছেলেকে বলিল্—হ্যাঁরে, ওই সাদা বাড়ীটার পাশে কোন্ ছত্তর জানিস?

—উঁহু—

—তুই ছত্তরে খাস্‌নি একদিনও এখানে এসে? কাশীতে এলে ছত্তরে খেতে হয় কিন্তু, জানিসনে বুঝি! খেয়ে আসিস না আজ? ....দেখেই আসিস্ না?

—কাশীতে এলে ছত্তরে খেতে হয় কেন?

—খেলে পুণ্যি হয়—আজ দশাশ্বমেধ ঘাটে নেয়ে অমনি ছত্তর থেকে খেয়ে আসিস্—বুঝলি!

বেলা বারোটার সময় সত্র হইতে খাইয়া অপু বাড়ী ফিরিল। তাহার মা রান্নাঘরের বারান্দায় বসিয়া বাটিতে কি লইয়া খাইতেছিল—তাহাকে দেখিয়া প্রথমটা লুকাইবার চেষ্টা করিল বটে কিন্তু অপু অত্যন্ত কাছে আসিয়া পড়িয়াছে—লুকাইতে গেলে সন্দেহ জাগানো হয় ভাবিয়া সহজ সুরে বলিবার চেষ্টা করিল—খেয়ে এলি? কেমন খাওয়ালে রে?

মা অড়হরের ডাল-ভিজা খাইতেছে।

—ভালো না—কুমড়োর একটা ছাই ঘন্ট— বসে ব'সে হয়রাণ—বড্ড ময়লা কাপড়-পরা লোক সব খেতে যায়—আমি আর যাচ্ছি নে, পুণ্যতে আমার দরকার নেই—ওকি খাচ্চ মা? তোমার বের্তো নাকি? রান্না হয় নি?

—আজ তো আমার কুল্‌ইচন্ডী—এই দুটো অড়লের ডাল ভিজে—বেশ খেতে লাগে—আমি বড্ড ভালবাসি....খাবি দুটো ওবেলা?

রাত্রিতেও রান্না হইল না। তাহার মা বলিল—অড়লের ডাল ভিজে খেয়ে দ্যাখ দিকি? বেশ লাগবে এখন—এবেলা রাঁধলাম না, ভারী তো খাস, এত কটা ভাত বসিস্ বই তো নয়—ওই খেয়ে কি আর খেতে পার্‌বি?

পরদিন দুপুরে নন্দবাবু একতাড়া পান অপুর হাতে দিয়া বলিল—তোমার মার কাছ থেকে সেজে নিয়ে এসো তো? রোগীর ঘরের পাশের ঘরে সর্বজয়া বসিয়া পান সাজিতেছে; নন্দবাবু জুতার শব্দ করিতে করিতে উপর হইতে নামিয়া রোগীর ঘরে ঢুকিল। এবং অতি অল্পক্ষণ পরেই সেখান হইতে বাহির হইয়া সর্বজয়া যে-ঘরে পান সাজিতেছে সেখানে ঢুকিল। সারারাত্রি জাগিয়া কাটাইয়া সর্বজয়ায় ঝিমানি ধরিয়াছিল, জুতার শব্দে চমক ভাঙিলে একেবারে সম্মুখে নন্দবাবুকে দেখিয়া সে জড়সড় হইয়া ঘোমটা টানিয়া দিল। নন্দবাবু বলিল—পান সাজা হয়েচে বৌঠাকরুণ? সর্বজয়া নীরবে সাজা পানের খিলিগুলি রেকাবিতে করিয়া সামনের দিকে ঠেলিয়া দিতে নন্দবাবু এক খিলি তুলিয়া মুখের মধ্যে পুরিয়া বলিল—চুন বড্ড কম হয় বৌঠকরুণ তোমার পানে, সরো দেখি আমি নিচ্চি—

সর্বজয়ার কোলের কাছে পানের বাটা। বাড়ীতে কেহ নাই, অপু কোথায় বাহির হইয়াছে। পাশের ঘরে হরিহর ঔষধের বশে ঘুমাইতেছে। নিস্তব্ধ দুপুর। হঠাৎ সর্বজয়ার মনে হইল যেন নন্দবাবু চুন লইবার অছিলায় অনাবশ্যকরূপে—তাহার অত্যন্ত কাছে ঘেঁষিয়া আসিতে চাহিতেছে—একটা অস্পষ্ট চীৎকার করিয়া এক লহমার মধ্যে সে উঠিয়া গিয়া ঘরের বাহিবে দাঁড়াইল। একটা বিদ্যুতের মত কিসের স্রোত তাহার পা হইতে মাথা পর্যন্ত খেলিয়া গেল। আঙুল দিয়া সিঁড়ি দেখাইয়া তীব্রস্বরে বলিল—চলে যান এখ্‌খুনি ওপরে—কখ্‌খনো আর নীচে আসবেন না—নীচে এলে আমি মাথা খুঁড়ে খুন হবো—কেন আপনি আসেন? খবরদার আর আসবেন না—

সর্বজয়া পড়িল মহা ফাঁপরে। বিদেশ জায়গা, এই রোগী ঘরে—নিঃসহায়, হাতে একটি পয়সা নাই, একটি পরিচিত লোক কোনো দিকে নাই, ছেলের বছর এগারো বয়স মোটে—তাও বুদ্ধিশুদ্ধি নাই, নিতান্ত নির্বোধ। এদিকে এই সব উৎপাত।

উপরের পাঞ্জাবী স্ত্রীলোকটি কালেভদ্রে নীচে নামে—এক আধ বার সর্বজয়াকে উপরে তাহার ঘরে লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু পাঁচ-ছয় মাস কাশীতে আসিয়াও সর্বজয়া না পারে হিন্দী বলিতে না পারে ভাল বুঝিতে, কাজেই আলাপ মোটেই জমে নাই। অদ্য তাহার কাছে গিয়া নন্দবাবুর ঘটনা আনুপূর্বিক বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। পাঞ্জাবী মেয়েটির নাম সূরযকুঁয়ারী, স্বামী-স্ত্রী দুজনেই পাঞ্জাবের রোয়ালসর জেলার অধিবাসী; স্বামীটি রেলে ওভারসিয়ারের কাজ করে। মেয়েটির বয়স খুব অল্প না হইলেও দেখিতে কম বয়সী, গৌরাঙ্গী, আয়তনয়না, আঁটসাঁট দীর্ঘগড়ন। সে সব শুনিয়া বলিল— কোনো ভয় নাই, আপনি নির্ভয়ে থাকুন, আবার যদি কিছু বদমায়েসীর ভাব দেখেন আমায় বলবেন, আমার স্বামীকে দিয়া উহার নাক কাটিয়া ঠান্ডা করিয়া ছাড়িব।....

ঠিক দুপুর। কয় রাত্রি জাগিবার পর সর্বজয়া মেঝেতে আঁচল পাতিয়া শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। উত্তরের ঘরের জানালা দিয়া একফালি রৌদ্র আসিয়া সরু উঠানটাতে বাঁকাভাবে পড়িয়াছে। অপু মাটির মাল্‌সাতে গাঁদাফুলের গাছ লাগাইয়াছিল, দু-তিনটা একপেটে গাঁদা নিতান্ত বিরক্তভাবে ফুটিয়া আছে,—তলায় একটা বিড়াল-ছানা বসিয়া। অপু বাবার বিছানার পাশেই বসিয়া ছিল। তাহার বাবা আজ সকাল হইতে একটু ভাল আছে—ডাক্তার বলিয়াছে বোধ হয় জীবনের আশা হইল। ভাল থাকিলেও রোগীর খুব চৈতন্য আছে বলিয়া মনে হয় না, বেহুঁশ অবস্থা। তাহার বাবা হঠাৎ চোখ খুলিয়া তাহার দিকে খানিকটা চাহিয়া থাকিয়া কি বলিল। অপুর মনে হইল বাবা তাহাকে আরও কাছে সরিয়া

যাইতে বলিতেছে। অপু সরিয়া যাইতে হরিহর রোগশীর্ণ ক্ষীণ দুই হাতে ছেলের গলা জড়াইয়া ধরিয়া নীরবে তাহার মুখের দিকে অনেকক্ষণ ধরিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। অপু একটু অবাক্ হইল, বাবার চোখের ও-রকম দৃষ্টি কখনো সে দেখে নাই।

রাত্রি দশটার সময় নিদ্রিত অপুর কি শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল। ঘরে ক্ষীণ আলো জ্বলিতেছে—মা অঘোরে ঘুমাইতেছে, বাবার গলার মধ্যে নানাসুরে যেন কি একটা শব্দ হইতছে। তাহার কেমন ভয় ভয় ঠেকিল। ঝুলমাখানো কড়িকাঠ, স্যাঁতা মেজে, হাড়ভাঙা শীত, কাঠকয়লার আগুনের ধোঁয়া—সব মিলিয়া যেন একটা দুঃস্বপ্ন। বাবার অসুখ সারিলে যে বাঁচা যায়!

শেষ রাত্রে তাহার মায়ের ঠেলা পাইয়া তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল।—অপু, ও অপু ওঠ, শীগ্গির গিয়ে ওপরে থেকে হিন্দুস্থানী বৌকে ডেকে আন্তো—

অপু উঠিয়া শুনিল বাবার গলার সেই শব্দটা আরও বাড়িয়াছে। উপর হইতে সূরযকুঁয়ারী আসিবার একটু পরেই রাত্রি চারটার সময় হরিহর মারা গেল।

মাঝ-বর্ষার ধারামুখর কুয়াসাচ্ছন্ন দিনে মনে হয় যে পৃথিবীর রৌদ্রদীপ্ত দিনগুলো স্বপ্ন না সত্য? এই মেঘ, এই দুর্দিন, অনন্ত ভবিষ্যতের পথে এরাই রহিল চিরসাথী—দিগন্তের মায়া-লীলার মত চৈত্র-বৈশাখের যে দিনগুলা অতীতে মিলাইয়া গিয়াছে—আর কি তাহা ফিরিয়া আসে?

চারিধার হইতে সর্বজয়াকে কি এক কুয়াসায় ঘিরিয়া ফেলিল। তাহার মধ্য দিয়া না দেখা যায় পথ, না চেনা যায় সাথী, না জানা যায় কোথায় আছি। সন্দেহ হয় এ কুয়াসা বোধ হয় বেলা হইলে রৌদ্র উঠিলেও কাটিবে না, এর পেছনে আছে আকাশ-ছাওয়া ফিকে ধূসর রং-এর সারাদিনব্যাপী অকাল বাদলের মেঘ।

বিপদের দিনে পাঞ্জাবী ওভারসিয়ার জালিম সিং ও তাহার স্ত্রী যথেষ্ট উপকার করিল। জালিম সিং অফিস কামাই করিয়া সৎকারের লোকের জন্য বাঙালীটোলায় ঘোরাঘরি করিতে লাগিল। খবর পাইয়া রামকৃষ্ণ মিশনের কয়েকজন সেবকও আসিয়া পৌঁছিল।

মণিকর্ণিকার ঘাটে সৎকার-অন্তে সন্ধ্যাবেলা অপু স্নান করিয়া ঠান্ডা পশ্চিমে বাতাসে কাঁপিতে কাঁপিতে পৈঠার উপর উঠিল। রামকৃষ্ণ মিশনের একজন সেবক ও নন্দবাবু তাহাকে উত্তরীয় পরাইতেছিল। বেলা খুব পড়িয়া গিয়াছে, অস্ত-দিগন্তের ম্লান আলো পাথরের মন্দিরগুলার আগাটুকুতে মাত্র চিক্চিক্ করিতেছে। সারাদিনের ব্যাপারে দিশেহারা অপুর মনে হইল তাহার বাবার পরিচিত গলায় উৎসুক শ্রোতাগণের সম্মুখে কে যেন বসিয়া আবৃত্তি করিতেছে—

কালে বর্ষতু পর্জন্যং পৃথিবী শস্যশালিনী....
লোকাঃ সন্তু নিরাময়ঃ....

যে বাবাকে সকলে মিলিয়া আজ মণিকর্ণিকার ঘাটে দাহ করিতে আনিয়াছিল,—রোগে, জীবনের যুদ্ধে পরাজিত সে বাবা স্বপ্ন মাত্র—অপু তাহাকে চেনে না, জানে না—তাহার চিরদিনের একান্ত নির্ভরতার পাত্র, সুপরিচিত, হাসিমুখ বাবা জ্ঞান হইয়া অবধি পরিচিত সহজ সুরে, সুকণ্ঠে, প্রতিদিনের মত কোথায় বসিয়া যেন উদাস পূরবীর সুরে আশীর্বাচন গান করিতেছে—

কালে বর্ষতু পর্জন্যং পৃথিবী শস্যশালিনী....
লোকাঃ সন্তু নিরাময়।....

পথের পাঁচালী

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কোনোরূপে মাসখানেক কাটিল। এই একমাসের মধ্যে সর্বজয়া নানা উপায় চিন্তা করিয়াছে কিন্তু কোনোটাই সমীচীন মনে হয় না। দু-একবার দেশে ফিরিবার কথাও যে তাহার না মনে হইয়াছে এমন নয়, কিন্তু যখনই সে কথা মনে ওঠে, তখনই সে তাহা চাপিয়া যায়। প্রথমত তো দেশের এক ভিটাটুকু ছাড়া বাকী সব কতক দেনার দায়ে, কতক এমনি বেচিয়া কিনিয়া আসা হইয়াছে, জমিজমা কিছুই আর

নাই। দ্বিতীয়ত সেখান হইতে বিদায় লইবার পূর্বে সে পথে-ঘাটে বৌ-ঝিদের সম্মুখে নিজেদের ভবিষ্যদের সুখের ছবি কতভাবে আঁকিয়া দেখাইয়াছে। নিশ্চিন্দিপুরের মাটি ছাড়িয়া যাওয়ার অপেক্ষা মাত্র, এ পোড়া মূর্খের দেশে তাহার স্বামীর কদর কেহ বুঝিল না, কিন্তু যেখানে যাইতেছে সেখানে যে তাহাকে সকলে লুফিয়া লইবে, অবস্থা ফিরিতে যে এক বৎসরও দেরি হইবে না—এ কথা হাতমুখ নাড়িয়া সর্বজয়া কতভাবে তাহাদের বুঝাইয়াছে! এই তো চৈত্র মাস, এক বৎসর এখনও পূর্ণ হয় নাই। ইহারই মধ্যে এরূপ নিঃসম্বল দীন অবস্থায়, তাহার উপরে বিধবার বেশে সেখানে ফিরিয়া গিয়া সকলের সম্মুখে দাঁড়াইবার কথাটা ভাবিতেই সে লজ্জায় সঙ্কোচে মাটিতে মিশিয়া যাইতেছিল। যাহা হইবার এখানেই হউক, ছেলের হাত ধরিয়া কাশীর পথে পথে ভিক্ষা করিয়া ছেলেকে মানুষ করিবে, কে দেখিতে আসিবে এখানে?

মাসখানেক পরে একটা সুবিধা হইল। কেদার ঘাটের এক ভদ্রলোক মিশনের অফিসে জানাইলেন যে, তাঁহার পরিচিত এক ধনী পরিবারের জন্য একটি ব্রাহ্মণের মেয়ে আবশ্যক, জাতের মেয়ে, ঘরে আসিবেন, কাজকর্মে সাহায্য করিবেন। মিশন এরূপ কোনো লোকের সন্ধান দিতে পারেন কি না? শেষ পর্যন্ত মিশনের যোগাযোগে ভদ্রলোকটি অপুদের সেখানে পাঠাইতে রাজী হইলেন। সর্বজয়া অকূল সমুদ্রে কূল পাইয়া গেল। দিন-দুই পরে সেই ভদ্রলোকটি বলিয়া পাঠাইলেন যে, বাসা একেবারে উঠাইয়া যাইবার জন্য যেন ইহারা প্রস্তুত হয়, কারণ সেই ধনী গৃহস্থদের বাটী কাশীতে নয়, তাঁহাদের বাড়ীর কাহারা কাশীতে বেড়াইতে আসিয়াছেন, ফিরিবার সময় সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন।

প্রকাণ্ড বড় হলদে রঙের বাড়ীটা। কাশীতে যে রকম বড় বড় বাড়ী আছে, সেই ধরনের খুব বড় বাড়ী। সকলের পিছনে পিছনে সর্বজয়া ছেলেকে লইয়া সঙ্কুচিতভাবে বাড়ীর ভিতর ঢুকিল।

অন্তঃপুরে পা দিতেই অভ্যর্থনার একটা রোল উঠিল—তাহার জন্য নহে—যে দলটি এইমাত্র কাশী হইতে বেড়াইয়া ফিরিল, তাহাদের জন্য।

ভিড় ও গোলমাল একটু কমিলে বাড়ীর গিন্নি সর্বজয়ায় সম্মুখে আসিলেন। খুব মোটাসোটা, এক সময়ে বেশ সুন্দরী ছিলেন বোঝা যায়, বয়স পঞ্চাশের উপর। গিন্নিকে প্রণাম করিতেই তিনি বলিলেন—থাক্, থাক্, এলো, এসো—আহা এই অল্প বয়সেই এই—এটি ছেলে বুঝি? খাসা ছেলে—কি নাম?

আর একজন কে বলিলেন—বাড়ী বুঝি কাশীতেই? না?—তবে বুঝি—

সকলের কৌতূহল-দৃষ্টির সম্মুখে সর্বজয়া বড় লজ্জা ও অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। গিন্নির হুকুমে যখন ঝি তাহার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে তাহাকে লইয়া গেল, তখন সে হাঁপ ফেলিয়া বাঁচিল।

পরদিন হইতে সর্বজয়া চুক্তিমত রান্নার কাজে ভর্তি হইল। রাঁধুনী সে একা নয়, চার-পাঁচজন আছে। তিন-চারটা রান্নাঘর। আঁশ নিরামিষ, দুধের ঘর, রুগীর ঘর, বাহিরের লোকদিগের রান্নার আলাদা ঘর। ঝি-চাকরের সংখ্যা নাই। রান্নাবাড়ীটা অন্তঃপুরের মধ্যে হইলেও পৃথক। সেদিকটা যেন ঝি-চাকর-বামুনের রাজত্ব। বাড়ীর মেয়েরা কাজ বলিয়া ও বুঝাইয়া দিয়া যান, বিশেষ কারণ না ঘটিলে রান্নাবাড়ীতে বড় একটা থাকেন না।

সর্বজয়া কি রাঁধিবে একথা লইয়া আলোচনা হয়। সর্বজয়ার বরাবরই বিশ্বাস সে খুব ভাল রাঁধিতে পারে। সে বলিল, নিরামিষ তরকারী রান্নার ভার বরং তাহার উপর থাকুক। রাঁধুনী বামনী মোক্ষদা মুচকি হাসিয়া বলিল—বাবুদের রান্না তুমি করবে? তা হ'লেই তো চিত্তির। পরে পাঁচি-ঝিকে ডাক দিয়া কহিল, শুন্‌চিস্ ও পাঁচি, কাশীর ইনি বল্‌চেন নাকি বাবুদের তরকারী রাঁধবেন! কি নাম গা তোমার? ভুলে যাই—মোক্ষদার ওষ্ঠের কোণের ব্যঙ্গের হাসিতে সর্বজয়া সেদিন সঙ্কোচে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু দু-একদিনেই সে বুঝিতে পারিল যে তাহার পাড়াগাঁয়ের কোনো তরকারী রান্না সেখানে খাটিবে না। ঝোলে যে এত চিনি মিশাইতে হয় বা বাঁধাকপি ফ্রিটার্স বলিয়া যে একটা তরকারী আছে, একথা সে এই প্রথম শুনিল।

গৃহিণী সর্বজয়াকে মাস দুই বেশ যত্ন করিয়াছিলেন। হাল্‌কা কাজ দেওয়া, খোঁজখবর নেওয়া। ক্রমে ক্রমে অন্য পাঁচজনের সমান হইয়া দাঁড়াইতে হইল। বেলা দুইটা পর্যন্ত কাজ করার পর প্রথম প্রথম সে

বড় অবসন্ন হইয়া পড়ে, এভাবে অনবরত আগুনের তাতে থাকার অভ্যাস তাহার কোনো কালে নাই, অত বেলায় খাইবার প্রবৃত্তি বড় একটা থাকে না। অন্য অন্য রাঁধুনীরা নিজেদের জন্য আলাদা করিয়া মাছ তরকারী লুকাইয়া রাখে, কতক খায়, কতক বাহিরে কোথাও লইয়া যায়। সে পাতের কাছে একবার বসে মাত্র!

রান্নার বিচার ব্যাপার দেখিয়া সর্বজয়া অবাক হইয়া যায়, এত বড় কাণ্ড-কারখানার ধারণা কোনো দিন স্বপ্নেও তাহার ছিল না, বিস্মিত হইয়া মনে মনে ভাবে,—দু'বেলায় তিন সের ক'রে তেলের খরচ? রোজ একটা যজ্ঞির তেল-ঘিএর খরচ!...পাড়াগাঁয়ের গরীব ঘরের ছোট সংসারের অভিজ্ঞতা লইয়া সে এসব বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

একদিন সরু চালের ভাত রান্নার বড় ডেক্‌চিটা নামাইবার সময় মোক্ষদা বাম্‌নীকে ডাক দিয়া বলিল—ও মাসীমা, ডেক্‌চিটা একটুখানি ধরবে?

মোক্ষদা শুনিয়াও শুনিল না।

এদিকে ভাত ধরিয়া যায় দেখিয়া নিজেই নামাইতে গিয়া ভারী ডেক্‌চিটা কাত করিয়া ফেলিল, গরম ফেন পায়ের পাতায় পড়িয়া তখনি ফোস্কা পড়িয়া গেল। গৃহিণী সেই দিনই তাহাকে রুটীর ঘরে বদ্‌লি করিয়া বলিয়া দিলেন, পা না সারা পর্যন্ত তাহাকে কোনো কাজ করিতে হইবে না।

সর্বজয়া ছেলেকে লইয়া নীচের একটা ঘরে থাকে। ঘরটা পশ্চিমদিকের দালানের পাশেই। কিন্তু সেটা এত নীচু, আর মেজে এত স্যাঁচসেঁতে এবং ঘরটাতে সব সময় এমন একটা গন্ধ বাহির হয় যে, কাশীর ঘরও এর চেয়ে অনেক ভাল ছিল। দেয়ালের নীচের দিকটা নোনা-ধরা, রাঙা রাঙা বড় বড় ছোপ, প্রতিবার বাহির হইতে ঢুকিয়াই অপু বলে—উঃ, কিসের গন্ধ দেখচো মা, ঠিক যেন পুরানো চা'লের কি কিসের গন্ধ বল দিকি?...নীচের এ ঘরগুলো কর্তৃপক্ষ মনুষ্যবাসের উপযুক্ত করিয়া তৈয়ারী করেন নাই, সেইজন্যই এগুলিতে চাকর-বাকর রাঁধুনীরা থাকে।

উপরের দালানের সব ঘরগুলি অপু বাহির হইতে বেড়াইয়া বেড়াইয়া দেখিয়াছে, বড় বড় জানালা দরজা। জানালায় সব কাচ বসনো। ঘরে ঘরে গদীআঁটা বড় বড় চেয়ার, ঝক্‌ঝকে টেবিল, যেন মুখ দেখা যায়, এত ঝক্‌ঝক্ করে। অপুদের বাড়ীতে যেমন কার্পেটের পুরানো আসন ছিল, ঐ রকম কিন্তু ওর চেয়েও ঢের ভাল, পুরু ও প্রায় নতুন—কার্পেট মেজেতে পাতা। দেওয়ালে আয়না টাঙানো, এত বড় বড় যে, অপুর সমস্ত চেহারাখানা তাহাতে দেখা যায়। সে মনে মনে ভাবে—এত বড় বড় কাচ পায় কোথায়? জুড়ে জুড়ে করেচে বোধ হয়—

দোতলার বারান্দায় আর একটা বড় ঘর আছে—সেটা প্রায়ই বন্ধ থাকে, মাঝে মাঝে চাকর-বাকরে আলো হাওয়া খাওয়াইবার জন্য খোলে। সেটার মধ্যে কি আছে জানিবার জন্য অপুর অদম্য কৌতূহল হয়। একদিন ঘরের দরজা খোলা দেখিয়া সে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াছিল। কি বড় বড় ছবি! পাথরের পুতুল! বড় বড় গদী-আঁটা চেয়ার,—আয়না,—সে ঘুরিয়া বেড়াইয়া সব দেখিতেছে, এমন সময় ছটু খানসামা তাহাকে ঘরের মধ্যে দেখিতে পাইয়া রুখিয়া আসিয়া বলিল—কোন্ বা?...কাহে ইস্‌মে ঘুসা?

হয়তো সেদিন সে মারই খাইত, কিন্তু বাড়ীর একজন ঝি দালান দিয়া যাইতে দেখিয়া বলিল—এই ছটু, ছেড়ে দাও, কিছু বোলো না—ওর মা এখানে থাকে—দেখ্‌চে দেখুক না—

সকলের খাওয়া-দাওয়া সারা হইলে সর্বজয়া বেলা আড়াইটার সময় নিজের ঘরটিতে আসিয়া খানিকটা শোয়। সারাদিনের মধ্যে এই সময়ের মধ্যে কেবল মায়ের সঙ্গে মন খুলিয়া কথা হয় বলিয়া মাঝে মাঝে অপু এসময় ঘরে আসে। তাহার মা তাহাকে একবার করিয়া দিনের মধ্যে চায়। এ বাড়ীতে আসা পর্যন্ত অপু যেন দূরে চলিয়া গিয়াছে। সারাদিন খাটুনি আর খাটুনি—ছেলের সঙ্গ হইতে দূরে থাকিতে হয়। বহুরাত্রে কাজ সারিয়া আসিতে অপু ঘুমাইয়া পড়ে, কথা হয় না। এই দুপুরটার জন্য তার মন তৃষিত হইয়া থাকে।

দোরে পায়ের শব্দ হইল। সর্বজয়া বলিল—কে, অপু! আয়—দোর ঠেলিয়া বাম্‌নী মাসী ঘরে ঢুকিল। সর্বজয়া বলিল—আসুন, মাসীমা বসুন। সঙ্গে সঙ্গে অপুও আসিল। বাম্‌নী মাসী বাবুদের সম্পর্কে আত্মীয়া। কাজেই তাহাকে খাতির করিয়া বসাইল। বাম্‌নী মাসীর মুখ ভারী-ভারী। খানিকক্ষণ

চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—দেখলে তো আজ কাণ্ডখানা বড়-বৌমার? বলি কি দোষটা...তুমি তো বরাবরই রুটীর ঘরে ছিলে? মাছ, ঘি এনে চুপড়ীতে ক'রে রেখে গেল, আমি ভাবলাম বাঁধাকপিতে বুঝি—কি রকম অপমানটা দেখলে তো একবার? পোলোয়ার মাছ তো সে কথা ঝিকে দিয়ে ব'লে পাঠালে তো হোত। সদু ঝিও কি কম বদ্‌মায়েসের ধাড়ী নাকি?...গিন্নীর পেয়ারের ঝি কিনা? মাটি মাড়িয়ে চলে না, ওপরে গিয়ে সাতখানা ক'রে লাগায়—ওই তো ছিরিকণ্ঠ ঠাকুরও ছিল—বলুক দিকি?

গল্প করিতে করিতে বেলা যায়। মাসী ব'লে, যাই জলখাবারের ময়দা মাখিগে—

চারটে বাজ্‌লো—

মাসী চলিয়া গেলে অপু মায়ের কাছে ঘেঁষিয়া বসিল। তাহার মা আদর করিয়া চিবুকে হাত দিয়া বলিল—কোথায় থাকিস্ দুপুরে বল্ তো?...

অপু হাসিয়া বলিল—ওপরের বৈঠকখানা ঘরে কলের গান বাজচে মা—শুন্‌ছিলাম—ঐ বারান্দাটা থেকে—

সর্বজয়া খুশি হইল।

—হ্যাঁরে, তোর সঙ্গে বাবুদের ছেলেদের ভাব-সাব হয় নি?....তোকে ডেকে বসায়?....

—খুব-উ-উব!....

অপু এটা মিথ্যা বলিল। তাহাকে ডাকিয়া কেহ বসায় না। ওপরের বৈঠকখানাতে গ্রামোফোন বাজানোর শব্দ পাইলেই খানিকটা ইতস্ততঃ করিয়া পরে ভয়ে ভয়ে উপরে উঠিয়া যায় ও বৈঠকখানার দোরের পাশ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া গান শোনে। প্রতি মুহূর্তেই তাহার ভয় হয় এইবার হয়তো উহারা তাহাকে বলিবে নীচে চলিয়া যাইতে। গান শেষ হইলে নীচে নামিবার সময় ভাবে—কেউ তো কিছু বক্‌লে না? কেন বক্‌বে? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান শুনি বাইরে, আমি তো বাবুদের ঘরের মধ্যে যাচ্ছি নে? এরা ভাল খুব—

এ বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গেও তার মেলামেশা হইল না। তাহারা উহাকে আমলই দেয় নাই। সেদিন রমেন, টেবু, সমীর, সন্তু—ইহারা এক চৌকা পিঁড়ির মত তক্তা সামনে পাতিয়া কাঠের কালো কালো গুটি চালিয়া এক রকম খেলা খেলিতেছিল, নাম নাকি ক্যারাম খেলা—সে খানিকটা দূরে দাঁড়াইয়া খেলাটা দেখিতেছিল—তার চেয়ে বেগুনবিচি খেলা ঢের ভালো।

বৈশাখের প্রথমে বড়বাবুর মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে বাড়ী সরগরম হইয়া উঠিল। গয়া, মুঙ্গের, এলাহাবাদ, কলিকাতা, কাশী নানাস্থান হইতে কুটুম্ব-কুটুম্বিনীদের আগমন শুরু হইল। সকলেই বড়লোকের ঘরের মেয়ে ও বড়লোকের বধূ, প্রত্যেকের সঙ্গে নিজেদের ঝি-চাকর আসিয়াছে। নীচের তলার দালান-বারান্দা রাত্রে তাহারাই দখল করে। সারারাত্রি হৈ চৈ।

সকালে সর্বজয়াকে ডাকিয়া গিন্নী বলিলেন—ও অপূর্বের মা, তুমি এক কাজ করো, এখন দিন দুই রান্নাঘরের কাজ তোমার থাকুক, নানান্ জায়গা থেকে তত্ত্ব আসচে, তুমি আর ছোট মোক্ষদা সে সবগুলো গুছিয়ে তোমাদের রুটীর ঘরের ভাঁড়ারে তোলাপাড়া করো—মিষ্টি খাবার ওখানেই রেখো, ফল-ফুলুরী যা দেখবে পচ্‌বার মত, সদুঝির হাতে পাঠিয়ে দেবে, নয়ত রেখে দিও, জলখাবারের সময় নিয়ে আসবে বাম্‌নী মাসী—

সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঝি-বেহারাদের মাথায় কত জায়গা হইতে যে কত তত্ত্ব আসিতে লাগিল সর্বজয়া গুণিয়া সংখ্যা করিতে পারে না। মিষ্টান্নের জায়গা দিতে পারা যায় না, ছোট ছোট রূপার চন্দনের বাটি জমিয়া গেল পনেরো-ষোলটা। আম এখনও উঠে নাই, তবু একটা বড় ধামা আমে বোঝাই হইয়া গেল।

সর্বজয়া বাম্‌নী মাসীর হাতে খাবার তুলিয়া দিতে দিতে ভাবে—এই এত ভালোমন্দ, এত কাণ্ড, তাই কি ছেলেটার জন্য কিছু—আহা, বাছা আমার সরকারদের খাবার ঘরের কোণটায় কাঁচুমাচু হয়ে ব'সে দুটো ভাত খায়, না দিতে পারি দুখানা ভালো দেখে মাছ, না একটু ভালো তরকারী, না এক হাতা দুধ—তখ্‌খুনি ঐ সদু হারামজাদী লাগাবে নিজের ছেলের পাতে বাবুদের হেঁসেল থেকে সব—

বিবাহের দিন খুব ভিড়। বরপক্ষ সকালের গাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিয়া শহরের অন্য এক বাড়ীতে ছিল। সন্ধ্যার কিছুপূর্বে প্রকাণ্ড শোভাযাত্রা করিয়া বর আসিল।

বাহিরের উঠান নিমন্ত্রিতদের দলে ভরিয়া গিয়াছে। সারা উঠানটাতে শতরঞ্জি পাতা, এক কোণে চওড়া জরিপাড় লাল মখমলে মোড়া উঁচু বরাসন, জরির ঝালর-দোলানো নীল সাটিনের চাঁদোয়া, দুপাশে কিংখাবের তাকিয়া, বড় বড় বেলফুলের মালা তিনগাছা করিয়া চাঁদোয়ার খিলানে খিলানে টাঙানো। চারিপাশে বরযাত্রীগণের চেয়ার ও কৌচ্‌। বিলাতী সেন্ট্‌ ও গোলাপ জলের পিচ্‌কারী ঘন ঘন ছুটিতেছে।

অপু এ সমস্ত বিশেষ কিছু দেখে নাই, সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। একবার মাত্র সে বাড়ীর মধ্যে গিয়াছিল, তখন স্ত্রী-আচার হইতেছে, রাত্রি অনেক! মাকে কোথাও খুঁজিয়া পাইল না, উৎসবের ভিড়ে কে জানে কোথায় কি কাজে ব্যস্ত আছে। দামী বেনারসী শাড়ী-পরা মেয়েদের ভিড়ে উঠানের কোথাও এতটুকু স্থান ফাঁকা নাই। ছোটবাবুর মেয়ে অরুণা কাহাকে ডাকিয়া বাহিরের বৈঠকখানা হইতে বড় অর্গ্যানটা বাড়ীর ভিতর আনিতে বলিতেছে।

বিবাহের দুই দিন পরে শখের থিয়েটার উপলক্ষে আবার খুব হৈ চৈ। উঠানের এক কোণে স্টেজ বাঁধা হইয়াছে। গোলাপফুলে ও অর্কিডে স্টেজটা খুব চমৎকার সাজানো। পাঁচশত ডালের প্রকাণ্ড ঝাড়টা স্টেজের মধ্যে খাটানো হইল। এ কয়দিনের ব্যাপার তো একেই অপুর তাক্‌ লাগিয়াছে, আজকার থিয়েটার জিনিসটা কি সে আদৌ জানে না, আগ্রহ ও কৌতূহলের সহিত পূর্ব হইতেই ভাল জায়গাটি দখল করিয়া রাখিবার জন্য সে আসরের সামনের দিকে সন্ধ্যা হইতে বসিয়া রহিল।

ক্রমে-ক্রমে একে একে নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা আসিতে লাগিলেন, চারিদিকে আলো জ্বলিয়া উঠিল। বাড়ীর দারোয়ানেরা জরির উর্দী পরিয়া বাহিরে ও দরজার কাছে দাঁড়াইল। সরকার ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া কাজ দেখাইতে লাগিল। কনসার্ট আরম্ভ হইল। যখন ড্রপসিন উঠিবার আর বেশী দেরি নাই, বাড়ীর গোমস্তা গিরিশ সরকার তাহার কাছে আসিয়া নীচু হইয়া চাহিয়া দেখিয়া বলিল—কে? অপু মুখ উঁচু করিয়া চাহিয়া দেখিল কিন্তু মুখচোরা বলিয়া অনেকক্ষণ কথা কহিতে পারিল না। তাহাকে জবাব দিবার অবকাশ না দিয়াই গিরিশ সরকার বলিল—ওঠো, ওঠো, এখানে বাবুরা বস্‌বেন—ওঠো—গিরিশ সরকার আন্দাজে তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিল।

অপু পিছনে চাহিয়া বিপন্নমুখে নাম্‌তা পড়ার সুরে বলিল—আমি সন্দে থেকে এইখানটায় বসে আছি, পেছনে যে সব ভর্তি, কোথায় যাবো?.... তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে গিরিশ সরকার তাহার হাতের নড়া ধরিয়া জোরে ঝাঁকুনি দিয়া উঠাইয়া দিয়া বলিল—তোর না কিছু করেছে, জ্যাঠা ছোকরা কোথাকার, জ্ঞান নেই, একেবারে সাম্‌নে বাবুরা বসবেন, উনি রাঁধুনীর ব্যাটা এসেচেন মুখের কাছে বস্‌তে! কোথায় যাবো ওঁকে ব'লে দ্যাও—ফাজিল জ্যাঠা কোথাকার—যা এখান থেকে যা, ওই থামটার কাছে বস্‌গে যা কোথাও—

পিছন হইতে দু'একজন কর্মকর্তা বলিলেন—কি হয়েচে, কি হয়েচে গিরিশ—কিসের গোল? কে ও?

—এই দেখুন না ম্যানেজারবাবু, এই জ্যাঠা ছোক্‌রা বাবুদের এখানে এসে ব'সে আছে, একেবারে সামনে—চন্দননগরের ওঁরা এসেচেন, বসবার জায়গা নেই—উঠ্‌তে বল্‌চি, আবার মুখোমুখি তর্ক!

ম্যানেজারবাবু বলিলেন—দাও না দুই থাপ্পড় বসিয়ে—

অপু জড়সড় হইয়া কোনো দিকে না চাহিয়া অভিভূতের মত আসরের বাহির হইয়া আসিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল আসরের সকলের চোখ তাহার দিকে, সকলেই কৌতূহলের সহিত তাহার দিকে চাহিয়া আছে! প্রথমটা ভাবিল হঠাৎ এক দৌড় দিয়া সে এখনি এক আসর লোকের চোখের আড়ালে যে কোন জায়গায় ছুটিয়া পালায়। তাহার পর সে গিয়া এক থামের আড়ালে দাঁড়াইল। তাহার গা ঠক্‌ঠক্‌ করিয়া কাঁপিতেছিল ভয়ে, অপমানে, লজ্জায়, তাহার সূক্ষ্ম অনুভূতির পর্দাগুলিতে হঠাৎ বেখাপ্পা গোছের কাঁপুনি লাগিয়াছিল। একটু সামলাইয়া লইয়া থামের আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া দেখিল....কিন্তু চারিধারে চাকর-বাকর, ওপরের বারান্দায় চিকের আড়ালে মেয়েরা, ঝি-রাঁধুনীরা নীচের বারান্দায়

দাঁড়াইয়া আছে—তাহারা তো সকলেই ব্যাপারটা দেখিয়াছে, কি মনে করিতেছে উহারা! না জানিয়া কি কাণ্ডই করিয়া বসিয়াছে! সে তো জানে না ওটা বাবুদের জায়গা! সে বার বার মনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল তাহাকে সম্ভবতঃ কেহ চিনিতে পারে নাই। কে না কে, কত তো বাইরের লোক আসিয়াছে—কে তাহাকে চিনিয়াছে?

তাহার পর থিয়েটার আরম্ভ হইয়া গেল। সেদিকে তাহার লক্ষ্যই রহিল না। সম্মুখের এই লোকের ভিড়, বদ্ধ বায়ু, আলোর মেলা, দারোয়ান চাকরের হৈ চৈ—কোনোদিকে তাহার খেয়াল রহিল না। ছটু খানসামা একটা রূপার হাঁসের পানদান লইয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের সারিতে পান বিলি করিতেছিল—সেইটার দিকে চাহিয়া অপুর গা যেন কেমন করিয়া উঠিল। ওপরের ঘেরা বারান্দার দিকে চাহিয়া ভাবিল, ওদিকে মা নাই তো? যদি মা একথা জানিতে পারে! কিন্তু অপুর ভয় সম্পূর্ণ অমূলক, তাহার মা তখন সে অঞ্চলে ছিল না, এসব কথা তাহার কানেও যায় নাই।

পথের পাঁচালী

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পরের বাড়ী নিতান্ত পরাধীন অবস্থায় চোরের মত থাকা সর্বজয়ার জীবনে এই প্রথম। সুখে হৌক্, দুঃখে হৌক্, সে এতদিন একা ঘরের একা গৃহিণী ছিল। দরিদ্র সংসারের রাজরাণী—সেখানে তাহার হুকুম এই এত বড় বাড়ীর গৃহিণী, বৌ-রাণীদের চেয়ে কম কার্যকরী ছিল না। এ যেন সর্বদা জুজু হইয়া থাকা, সর্বদা মন যোগাইয়া চলা, আর একজনের মুখের দিকে চাহিয়া পথ হাঁটা, পান থেকে চুন না খসে!—ছোটর ছোট তস্য ছোট!.....এ তাহার অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। খাটিতে খাটিতে মুখে রক্ত ওঠে— কিন্তু এখানে খাটার মূল্য নাই। প্রাণপণে খাটো—কেহ নাম করিবার নাই। উহারা যখন দিবে তখন গর্বের সঙ্গে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিবে—তোমার খাটার মূল্য দিতেছ বলিয়া সামনে সামনে দিবে না। তোমাকে হাঁটু গাড়িয়া লইতে হইবেই।

এ ক্রমে তাহার অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু উপায় কি?.... বাইরে যাইবার সুবিধা কৈ? আশ্রয় কে দিবে? কোথায় দাঁড়াইবে?....

চিরকাল এইরকম কাটিবে? যতদিন বাঁচিবে ততদিন? ওই বামনী মাসীর মত?...

বিবাহের উৎসবের জের এখনও মেটে নাই, আজ মেয়েদের প্রীতিভোজ, সন্ধ্যার পর হইতেই নিমন্ত্রিত মহিলাদের গাড়ী পিছনের গেটে আসিতে শুরু করিল। ভিতরের বড় দরজা পার হইয়া সম্মুখেই মেয়ে-মহলের দোতলার বারান্দায় উঠিবার চওড়া মার্বেলের সিঁড়িটা নীলফুলের কাজ-করা কার্পেট দিয়া মোড়া। সারা বারান্দাতে ও সিঁড়িতে গ্যাসের আলো, দোতলার বারান্দায় উঠিবার মুখে বড় বড় গ্যাসের ঝাড় জ্বলিতেছে। দুই বৌ-রাণী ও বাড়ীর মেয়েরা অভ্যর্থনা করিয়া সকলকে উপরে পাঠাইয়া দিতেছিলেন। নিমন্ত্রিতা মেয়েরা কেহ মুচকি হাসিয়া, কেহ হাসির লহর তুলিয়া কেহ ধীর, কেহ ক্ষীপ্র, কেহ সুন্দর অপূর্ব গতি-ভঙ্গীতে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেছেন।

অপু অনেকক্ষণ হইতে নীচের বারান্দায় একটা থামের কাছে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। এ ধরণের দৃশ্য জীবনে সে এই প্রথম দেখিল, সেদিন বিবাহের রাত্রিতে ঘুমাইয়া পড়িবার দরুণ সে বিশেষ কিছু দেখে নাই। সকলের চেয়ে তাহার ভাল লাগিতেছিল এ বাড়ীর মেয়ে সুজাতাকে। সে কার্পেট-মোড়া-মার্বেল পাথরের সিঁড়ি বাহিয়া এক-একবার নামিয়া আসিতেছে, নিমন্ত্রিতাদের মধ্যে কাহারও দিকে চাহিয়া হাসিমুখে বলিতেছে—বা বেশ তো মনি-দি? একেবারে রাত আটটা কোরে? বকুলবাগানের বৌদি এলেন না? অভ্যর্থিতা সুন্দরী হাসিয়া বলিলেন—গাড়ী সাজিয়ে ব'সে আছি বেলা ছটা থেকে....বেরুনো তো সোজা নয় ভাই, সব তৈরী না হলে তো....জানোই তো সব—

সুজাতা কাঞ্চনফুল রংএর দামী চায়না ক্রেপের হাতকাটা জামার ফাঁকা দিয়া বাহির হওয়া শুভ্র, সুগোল, নিটোল বাহু দিয়া পিছন হইতে নিমন্ত্রিতাকে বেষ্টন করিয়া আদরের ধরণে তাঁহার ডান কাঁধে মুখ রাখিয়া একসঙ্গে উপরে উঠিতে লাগিল। বলিতে বলিতে চলিল—মা বল্‌ছিলেন বকুলবাগানের বৌদি নাকি সাম্‌নের মাসে যাবেন কল্‌কাতা—বুধবারে মা গেছলেন যে—ঠিক কিছু হোল?

সিঁড়ির ওপরের ধাপে মেজ বৌ-রাণী দেখা দিলেন। বয়স একটু বেশী, বোধ হয় ত্রিশের উপর, অপূর্ব সুন্দরী। তাঁর বেশের কোনো বাহুল্য নাই, ফিকে চাঁপারং-এর চওড়া লালপাড় রেশমী শাড়ীর প্রান্ত মাথার চুলে হীরার ক্লিপ দিয়া আঁটা, সিঁড়ির বড় ঝাড়ের আলোয় গলার সরু সোনার চেন চিক্ চিক্ করিতেছিল, সুন্দর গড়ন, একটু ধীর, গম্ভীর—এই বয়সেও দুধে- আলতা রং এর আভা অপূর্ব। মাসখানেক হইল উপযুক্ত ভাই মারা যাওয়াতে একটুখানি বিষাদের ছায়া পরিণত মুখের সৌন্দর্যকে একটি সংযত শ্রী দান করিয়াছে।

মণি-দি উঠিতে উঠিতে মেজ বৌ-রাণীকে সম্মুখে দেখিয়া সিঁড়ির ওপরই দাঁড়াইয়া গেলেন—মেজ বৌদির শরীর আজকাল কেমন আছে? এই দেখুন না, একবার আস্‌বো আস্‌বো ক'রে....কাল ওঁরা এটোয়া থেকে সব এলেন, তাই নিয়ে অনেক রাত অব্‌ধি....

এত সুন্দর দেখিতে মানুষ হয়, অপুর এ ধারণা ছিল না। অপু ইঁহাকে এই প্রথম দেখিল কারণ ইনি এতদিন এখানে ছিলেন না, ভাইয়ের মৃত্যুর পর সবে দিনকয়েক হইল বাপের বাড়ী হইতে আসিয়াছেন—সে মুগ্ধ চোখে অপলক বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। এই আলো, চারিধারে সুন্দরীর মেলা, দামী পুষ্পসারের মৃদু মনমাতানো সৌরভ, বীণার ঝঙ্কারের মত সুর ও হাসির লহরীতে তাহার কেমন এক নেশা জমিয়া গেল। এই যদি সারাদিন চলে?....

মেজ বৌ-রাণী অনেকক্ষণ হইতে দেখিতেছিলেন সিঁড়ির কোণে একজন অপরিচিত ছেলে দাঁড়াইয়া আছে। সকলকে তিনি জানেন না—তাঁহার বাপও খুব বড়লোক, প্রায়ই বাপের বাড়ী থাকেন। দু'ধাপ নামিয়া আসিয়া মৃদুকণ্ঠে ডাকিয়া বলিলেন—খোকা, এস উঠে। দাঁড়িয়ে কেন? তুমি কোত্থেকে আস্‌চ?....

অপু অন্যদিকে চাহিয়া অন্য একদল আগন্তুকদের লক্ষ্য করিতেছিল—হঠাৎ ফিরিয়া চাহিয়া তাহাকেই মেজ বৌ-রাণী ডাকিতেছেন দেখিয়া প্রথমটা বিস্মিত হইল—যেন বিশ্বাস করিতে পারিল না। পরে রাজ্যের লজ্জা আসিয়া জুটিটেই সে উপরে উঠিয়া যাইবে কি ছুটিয়া পলাইবে ভাবিতেছে—এমন সময় মেজ বৌ-রাণী নিজেই নামিয়া আসিলেন—কাছে আসিয়া বলিলেন—কোত্থেকে আস্‌চ খোকা?....

অতি কষ্টে অনেক চেষ্টায় অপুর মুখ দিয়া বাহির হইল—আমি—আমি—ঐ—আমার মা—এই বাড়ী থাকেন— সঙ্গে সঙ্গে তাহার অত্যন্ত ভয় হইল যে, এখানে সে দাঁড়াইয়া আছে—কোথাকার রাঁধুনীর ছেলে—একথা শুনিয়া এখনি হয়তো ইনি কাহাকেও ডাকিয়া বলিবেন—ইহাকে গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দাও এখান থেকে।....

মেজ বৌ-রাণী কিন্তু সে সব কিছুই করিলেন না—তিনি বিস্মিত মুখে বলিলেন—এ বাড়ী থাকেন তোমার মা?....কে বল তো....কি করেন? কতদিন তোমরা এসেচ?

অপু ভাঙা ভাঙা কথায় আবোলতাবোল ভাবে পরিচয় দিল। মেজ বৌ-রাণী বোধ হয় ইহাদের কথা এবার আসিয়া শুনিয়াছেন—বলিলেন—ও তোমরা কাশী থেকে এসেচ বুঝি?....কি নাম তোমার?—তাহার সুন্দর, সরল চোখের দিকে চাহিয়া তাঁহার বোধ হয় কেমন করুণা হইল। বলিলেন—এস না ওপরে দাঁড়াবে—এখানে কেন?—ওপরে এস—

অপু চোরের মত বৌ-রাণীর পিছনে পিছনে উপরে উঠিয়া কোণ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। উপরে মেয়েদের বড় মজলিশ, সারা বারান্দাটা কার্পেট-মোড়া। ধারে ধারে বড় বড় কাঁচকড়ার টবে গোলাপ গাছ, এরিকা পাম। কোণে বড় বৈঠকখানার অর্গ্যানটা। একটি মেয়ে খানিকক্ষণ সাধাসাধির পরে অর্গ্যানের ধারে ছোট গদি আঁটা টুলে গিয়া বসিলেন ও দু'একবার হালকা হাতে চাবি টিপিয়া—খানিকক্ষণ চুপ করিয়া হাসিমুখে একটি গান ধরিলেন। মেয়েটি দেখিতে সুশ্রী নয়, রংটা মাঝামাঝি, কিন্তু গানের গলা ভারী সুন্দর। তাহার পর আর একটি মেয়ে গান গাহিলেন, এ মেয়েটি দেখিতে তত ভাল নয়। মেজ বৌ-রাণীর মেয়ে লীলা একটি হাসির কবিতা ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে আবৃত্তি করিয়া সকলকে খুব হাসাইল। ভারী সুন্দর মেয়ে, মায়ের মত সুশ্রী। আর কি মিষ্টি হাসি!

অপু ভাবিতেছিল এই সময় তাঁহার মা একবার উপরে আসিয়া দেখিল না কেন? কোথায় রহিল মা কোন্ রান্নাঘরে পড়িয়া, হয়তো কাজ করিতেছে, এ সব মা আর কোথায় দেখিতে পাইবে?

মেয়েদের মজলিশ চলিতেছে, এমন সময় নীচে এক হৈ চৈ উঠিল। গিরিশ সরকারের গলাটা খুব শোনা যাইতেছিল।

সদু ঝি হাসিতে হাসিতে উপরে উঠিয়া বলিল—পোড়ানি!....কাণ্ড দ্যাখো....হি হি....বলে কিনা হুঁকোর মধ্যে....হি হি....।

দুই-তিনজন নিমন্ত্রিতা মহিলা জিজ্ঞাসা করিলেন—কি হয়েচে রে? কি?

—ঐ ঠিকে ঠাকুর একটা এসেছিল কোত্থেকে....লুচি ভাজতে গিয়েচে....সরকারদের খাবার ঘরের উঠোনে বসে লুচি ভাজচে....বলে আমি বাইরে থেকে একবার....হুঁকোর মধ্যে....হি হি....নিয়ে যাচ্চে পুরে চুরি করে....আধসেরের ওপর....গোমস্তা মশায় ধরেচে....রামনিহোর সিং মার যা দিচ্চে....চুলের ঝুঁটি না ধরে—

সর্বজয়ার আজ সকাল হইতে নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ ছিল না। প্রায় দু মণ মাছ ভাজার ভার তাহার একার উপর—সকাল আট্‌টা হইতে সে মাছের ঘরে এই কাজেই লাগিয়া আছে। চেঁচামেচি শুনিয়া সে ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিল এক উঠান লোকের মধ্যে একজন পঁচিশ-ত্রিশ বছরের পাতলা ময়লা রংএর, ময়লা কাপড়-পরা বামুনের ছেলেকে দু-তিনজন মিলিয়া কেহ কিল, কেহ চড় বর্ষণ করিতেছে—লোকটা ঠিকে রাঁধুনী, অদ্যকার কার্যের জন্যই বাহির হইতে আসিয়াছিল—সে নাকি হুঁকার ভিতর করিয়া ঘি চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে। তাহার সে হুঁকাটি একদিকে ছিটকাইয়া ঘিটুকু উঠানের একদিকে পড়িয়া গিয়াছে—কাছা মারের চোটে খুলিয়া গিয়াছে—লোকটা বিপন্নভাবে সাফাই গাহিবার চেষ্টা করিতেছে এবং হুঁকার ভিতর ঘৃত পাওয়া যে খুব স্বাভাবিক এবং নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা বা ইহার মধ্যে সন্দেহের বা আশ্চর্য হইবার কথা কিছুই নাই—এই কথা উন্মত্ত জনসঙ্ঘকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে। কথা শেষ না করিতে দিয়াই শম্ভুনাথ সিং দারোয়ান তাহাকে এমন এক ঠেলা মারিল যে, সে অস্ফুট স্বরে বাবা রে বলিয়া দালানের কোণের দিকে ঘুরিয়া পড়িয়া গেল এবং থামের কোণে মাথাটা ঠক্ করিয়া জোরে লাগিয়া বোধ হয় রক্তও বাহির হইল।

সর্বজয়া ক্ষেমি ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল—কি হয়েচে ক্ষেমিমাসী?....আহা ওরকম ক'রে মারে?....বামুনের ছেলে....

ক্ষেমি বলিল—মারবে না! হাড় গুঁড়ো করে ছাড়বে....মারার হয়েচে কি এখনো...পুলিশে দেবে, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা—

ক্ষেমি ঝির মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল।

সে উপরে উঠিবার সিঁড়ির দিকে চাহিয়াই তটস্থ অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিল। সর্বজয়া চাহিয়া দেখিল একজন পঁয়ষট্টি-সত্তর বছরের বৃদ্ধা সিঁড়ি বাহিয়া নামিতেছেন, পাশাপাশি গৃহিণী, পিছনে দুই বৌ-রাণী ও বাড়ীর মেয়ে অরুণা ও সুজাতা। সকল ঝি-চাকরের দল তটস্থ অবস্থায় সিঁড়ির নীচের বারান্দায় কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া—এ উহার পিঠে উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিল। সর্বজয়া ক্ষেমি ঝিকে চুপি চুপি বলিল, কে ক্ষেমিমাসী? ক্ষেমি ঝি ফিস্‌ফিস্ করিয়া কি বলিল— কোথাকার রাণীমা—সর্বজয়া ভাল শুনিতে পাইল না। কিন্তু তাহার মনে হইল ঠিক এইরকম চেহারার মানুষ সে যেন কোথায় আগে দেখিয়াছে। গিন্নী কাহাকে বলিলেন—খিড়কীর ফটকে ইঁহার পাল্কী আসিয়াছে কিনা দেখিয়া আসিতে। বৃদ্ধার নিজের সঙ্গেও দুই-তিনটি ঝি আসিয়াছে, তাহারা পিছনে পিছনে আছে। নানা বিদায় আপ্যায়নের বিনিময় হইল, বহু বিনীত হাস্য বিস্তার লাভ করিল, হঠাৎ এ বাড়ীর ঝি-চাকরের দল মাটিতে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া খানিকক্ষণ যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়া রহিল। সর্বজয়া মনে মনে ভাবিল—এরা এত বড়লোক, এরা যখন এত খাতির করছে, তখন তো যে সে নয়......! বৃদ্ধার যোল বেহারার প্রকাণ্ড পাল্কীটা খিড়কীর ফটকেই এতক্ষণ ছিল, বৃদ্ধাও পাল্কীতে উঠিলেন। তাঁহার দারোয়ানেরা পাল্কীর সামনে পিছনে দাঁড়াইল। তাঁহাকে বিদায় দিয়া গৃহিণী, অন্যানা মেয়ের উপরে উঠিয়া গেলেন।

মাসীমা রুটির ঘরে আসিয়া চুপি চুপি বললেন—পয়সা রে বাপু, দেখলে তো পয়সার আদরটা? নিজেরই মস্ত জমিদারী, দুলাখ টাকা দান করেছেন, বাঙাল দেশের কোথাকার কলেজের জন্যে—পয়সারই আদর—আর এই তো আমিও আছি....ওদের তো আপনার লোক....গেরাজ্জি করে কেউ!

সর্বজয়ার কিন্তু সেদিন মন ছিল না। এইমাত্র তাহার মনে পড়িয়াছে। অনেকটা এইরকম চেহারার ও এইরকম বয়েসের—সেই তাহার বুড়ি ঠাকুরঝি ইন্দির ঠাক্‌রুণ, সেই ছেঁড়া কাপড় গেরো দিয়া পরা,

ভাঙা পাথরে আমড়া ভাতে ভাত, তুচ্ছ একটা নোনাফলের জন্য কত অপমান, কেউ পোঁছে না, কেউ মানে না, দুপুর বেলায়, সেই বাড়ী হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া, পথে পড়িয়া সেই দীন মৃত্যু....

সর্বজয়ার অশ্রু বাধা মানিল না।

মানুষের অন্তর-বেদনা মৃত্যুর পরপারে পৌঁছায় কিনা সর্বজয়া জানে না, তবু সে আজ বার বার মনে মনে ক্ষমা চাহিয়া অপরিণত বয়সের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহিল।

পথের পাঁচালী — চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কয়েকদিন পরে অপু দালান দিয়া যাইতেছে, উপরের সিঁড়ি বাহিয়া মেজ বৌ-রাণীর মেয়ে লীলা নামিতেছিল। তাহাকে দেখিতে পাইয়া বলিল—দাঁড়াও না? তোমার নাম কি,—অপু না কি?

অপু বলিল—অপু ব'লে ডাকে—ভাল নাম শ্রীঅপূর্বকুমার রায়....

সে একটু অবাক্ হইল। এ বাড়ীর ছেলেমেয়েরা কখনও ডাকিয়া তাহার সঙ্গে কথা কহে নাই। লীলা কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কি সুন্দর মুখ! রাণুদি, অতসী-দি, অমলাদি, সকলেই দেখিতে ভাল বটে কিন্তু তখন সে তাহাদের চেয়ে ভাল কাহাকেও দেখে নাই। এ বাড়ী আসিয়া পর্যন্ত তাহার পূর্বেকার ধারণা একেবারে বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। বিশেষ করিয়া মেজ বৌ-রাণীর মত সুন্দর কোনো মেয়ের কল্পনাও সে করে নাই। লীলাও মায়ের মত সুন্দরী—সেদিন যখন লীলা মেয়ের মজলিশে হাসির কবিতা বলিতেছিল, তখন অপু একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল, কবিতা সে ভাল শোনে নাই।

লীলা বলিল—তোমরা কতদিন এসেচ আমাদের বাড়ী? সেবার এসে তো দেখিনি?

—আমরা ফাল্গুন মাসে এইচি, এই ফাল্গুন মাসে—

—কোত্থেকে এসেচ তোমরা?

—কাশী থেকে। আমার বাবা সেইখানেই মারা গেলেন কিনা—তাই—

অপুর যেন বিশ্বাস হইতেছিল না। সারা ঘটনাটা এখনও যেন অবাস্তব, অসম্ভব ঠেকিতেছিল। লীলা, মেজ বৌ-রাণীর মেয়ে লীলা তাহাকে ডাকিয়া যাচিয়া তাহার সঙ্গে কথা কহিতেছে! খুশিতে তাহার সারা গা কেমন করিতে লাগিল!

লীলা বলিল—চল, আমার পড়ার ঘরে গিয়ে বসি, মাস্টার মশায়ের আসবার সময় হয়েচে—এস—

অপু জিজ্ঞাসা করিল—আমি যাবো?

লীলা হাসিয়া বলিল—বারে, বল্‌চি তো চল, তুমি তো ভারী লাজুক?—এস—তুমি দেখোনি আমার পড়ার ঘর? ওই পশ্চিমের দালানের কোণে?....

ঘর বেশী বড় নয় কিন্তু সাজানো। একটি ছোট পাথরের টেবিল দুপাশে দুখানা চামড়ার গদি-আঁটা চেয়ার পাতা। একখানা বড় ছবিওয়ালা ক্যালেণ্ডার। সবুজ কাঁচকড়ার খোলে একটা ছোট টাইমপিস্ ঘড়ি। একটা বই রাখিবার ছোট দেরাজ। চার-পাঁচখানা বাঁধানো ফটোগ্রাফ এ দেওয়ালে, ও দেওয়ালে। লীলা একটা চামড়ার এ্যাটাসি কেস্ খুলিয়া বলিল—এই দ্যাখো আমার জলছবি, মাস্টার মশায় কিনে দিয়েছেন, ভাগ শিখলে আরও দেবেন, জলছবি ওঠাতে জানো?

অপু বলিল—তুমি ভাগ জানো না?

—তুমি জানো? ভাগ কষেছ?

অপু তাচ্ছিল্যের সহিত ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল—কবে!...

এই ভঙ্গিতে অপুর সুন্দর মুখখানি আরো ভারি সুন্দর দেখাইল।

লীলা হাসিয়া উঠিয়া বলিল—তুমি বেশ মজার কথা বলতে পারো তো? পরে সে অপুর ঠোঁটের নীচে হাত দিয়া বলিল—এটা কি? তিল? বেশ দেখায় তো তোমার মুখে, তিলে বেশ মানিয়েচে, তোমার বয়স কত? তেরো? আমার এগারো—তোমার চেয়ে দুবছরের ছোট—

অপু বলিল—তুমি সেদিন মুখস্ত বলেছিলে, একটা হাসির ছড়া, বেশ লেগেচে আমার—

—তুমি জানো কবিতা?

—জানি—বাবার একখানা বই আছে, তা থেকে শিখিচি—

—বলো দিকি?

লীলার গলার সুর কি মিষ্টি, এমন সুর সে কোন মেয়ের এ পর্যন্ত শোনে নাই।

অপু ঘাড় দুলাইয়া বলিল—

যে জনের খড় পেতে খেজুর চেটায় ঘুমিয়ে কাল কাটে,
তাকে খাট-পালঙ্ক খাসা মশারি খাটিয়ে দিলে কি খাটে?

কথার শেষে সে জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়ে। বলিল—দাশু রায়ের পাঁচালীর ছড়া, আমার কাছে বই আছে—

লীলা হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে আর কি। বলিল—তুমি ভারী মজার কথা জানো তো? এমন হাসাতে পারো তুমি!....

লীলার মুখের প্রশংসায় অপুর মনে আহ্লাদ ধরে না। সে উৎসাহের সুরে বলিল—আর একটা বলবো? আমি আরও জানি—পরে সে কড়িকাঠের দিকে চোখ তুলিয়া একটুখানি ভাবিয়া লইয়া পরে আবার ঘাড় দুলাইয়া আরম্ভ করে—

মুনির চিন্তা চিন্তামণি নাই অন্য আশা
নিষ্কর্মা লোকের চিন্তা তাস আর পাশা।
ধনীর চিন্তা ধন আর নিরেনব্বই এর ধাক্কা,
যোগীর চিন্তা জগন্নাথ, ফকিরের চিন্তা মক্কা,
গৃহস্থের চিন্তা বজায় রাখতে চারি চালের ঠাট্‌টা,
শিশুর চিন্তা সদাই মাকে, পশুর চিন্তা পেট্‌টা।

এ ছড়ার সকল কথার অর্থ লীলা বুঝিতে পারিল না। কিন্তু আবার হাসিয়া গড়াইয়া পড়িবার যোগাড় করিল। বলিল, দাঁড়াও লিখে নেবো—

লীলা এ্যাটাসি কেস্‌টা হইতে কলম বাহির করিয়া বলিল—বল দিকি?

অপু আবার বলিতে শুরু করিল। খানিকটা পরে একটু অবাক্ হইয়া বলিল—কালি নেওনি তো লিখেচ কেমন করে?

লীলা বলিল—এ তো ফাউন্টেন পেন—কালি তো লাগে না, এর মধ্যে ভরা আছে—জানো না?

অপুর হাতে লীলা কলমটা তুলিয়া দিল। অপু উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া বলিল—এ তো বেশ, কালিতে মোটে ডোবাতে হয় না!

—তা নয়, কালি ভরা থাকে, ভরে নিতে হয়—এই দ্যাখো, দেখিয়ে দি—

—বাঃ বেশ তো! দেখি একবারটি—

লীলা কলমটা অপুর হাতে দিয়া হাসিমুখে বলিল—তোমায় দিয়ে দিলাম একেবারে—

অপু অবাক্ হইয়া লীলার দিকে চাহিল। পরে লজ্জিতমুখে বলিল—না আমি নেবো না—

লীলা বলিল—কেন?

—উঁহু—

—কেন?

—নাঃ!

লীলা একটু দুঃখিত হইল। বলিল—নাও না?...আমি আর একটা বাবার কাছ থেকে নেবো, নাও তুমি এটা, দেখি তোমার হাত? বাস!...ফেরত দিতে পারবে না।

ব্যাপারটা অপুর সম্পূর্ণ অবাস্তব ঠেকিল। সে বলিল—কিন্তু তোমায় যদি কেউ বকে?

লীলা বলিল—ফাউন্টেন পেন দেবার জন্য? কেউ বক্‌বে না, আমি মাকে বলবো অপূর্বকে দিয়ে দিলাম—বাবার কাছ থেকে আর একটা নেবো—বাবার ফটো দেখবে?...ওই ক্যালেন্ডারের পাশে টাঙানো—দাঁড়াও পাড়ি—

তাহার পর লীলা আরও দু-তিনখানি ফটো দেখাইল। আলমারি হইতে খানকতক বই বাহির করিয়া বলিল—মাস্টার মশায় কিনে দিয়েচেন—তুমি কোন্ স্কুলে পড়ো?

অপু কাশীতে সেই যা দিনকতক স্কুলে পড়িয়াছিল, আর ঘটে নাই। বলিল—কাশীতে পড়তাম এখন আর পড়ি নে—কথাটা বলিতে সে সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল বলিয়াই শেষের কথাটা এমন সুরে বলিল, যেন না পড়িয়া খুব একটা বাহাদুরি করিতেছে। একখানা বইয়ে অনেক ছবি। অপু বলিল—বইখানা পড়তে দেবে একবারটি?

লীলা বলিল—নাও না? আমার আরও অনেক ছবির বই আছে, তিন বছরের বাঁধানো মুকুল আছে, মায়ের ঘরের আলমারিতে, এনে দেবো, পড়ো—

অপু বলিল—আমার কাছেও বই আছে, আনবো?

লীলা বলিল—চলো, তোমাদের ঘরে যাই—

লীলাকে নিজেদের ঘরে লইয়া যাইতে অপুর লজ্জা করিতে লাগিল। আসবাবপত্র কিছু নাই, ছেঁড়া বালিশের ওয়াড়, আল্‌নায় গায়ে দেওয়ার কাঁথা। লীলা তবুও গেল। অপু নিজের টিনের বাক্সটা খুলিয়া একখানা কি বই হাসি-হাসি মুখে দেখাইয়া গর্বের সুরে বলিল—আমার লেখা, এই দ্যাখো ছাপার অক্ষরে লেখা আছে আমার নাম—

লীলা তাড়াতাড়ি হাত হইতে লইয়া বলিল—দেখি দেখি?

সেই কাশীর স্কুলের ম্যাগাজিনখানা। হরিহর ছেলের গল্প ছাপানো দেখিয়া যাইতে পারে নাই, তাহার মৃত্যুর তিন দিন পরে কাগজ বাহির হয়। লীলা পড়িতে লাগিল, অপু তাহার পাশে বসিয়া উৎফুল্ল মুখে লীলার চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া পঠিত লাইনগুলি নিজেও মনে মনে একবার করিয়া পড়িয়া যাইতেছিল। শেষ করিয়া লীলা প্রশংসমান চোখে অপুর মুখের দিকে খানিকটা চাহিয়া বলিল—বেশ তো হয়েচে, আমি এখানা নিয়ে যাই, মাকে দেখাবো—

অপুর ভারী লজ্জা হইল। বলিল—না—

লীলা শুনিল না। কাগজখানা হাতে করিয়া রাখিল। বলিল—নিশ্চিন্দিপুর লেখা আছে, নিশ্চিন্দিপুর কোথায়?

—নিশ্চিন্দিপুর যে আমাদের গাঁ—সেইখানেই তো আমাদের আসল বাড়ী—কাশীতে তো মোটে বছর খানেক হ'ল আমরা—

এমন সময় ছোট মোক্ষদা দুয়ারের কাছে আসিয়া ঘরের মধ্যে মুখ বাড়াইয়া কহিল—ওমা দিদিমণি, তুমি এখানে ব'সে? আমার পোড়ানি! ওদিকে মাস্টারবাবু ব'সে ব'সে হয়রান, আমি ওপর নীচে সব ঘর খুঁজে খুঁজে—তা কে জানে তুমি এঁদো-পড়া কুঠুরিতে—এস এস—

লীলা বলিল—যা তুই, আমি যাচ্ছি, যা—

ছোট মোক্ষদা বলিল—তা বসবার কি এই জায়গা নাকি? বলে আমাদেরই তাই মাথা ধরে—তাই কি ওই আস্তাবলের খোট্টা মিন্সেরা ঘোড়ার জায়গাগুলো ঝাঁট দেয়, না ধোয়? উঁহু-হু কি গন্ধ আসছে দ্যাখো—এস দিদিমণি, শিগ্‌গির—

লীলা বলিল—যাবো না যাঃ, আমি আজ পড়বো না, যা বল্‌গে যা—কে তোকে বলচে এখানে বক্‌বক্ করতে? যা মাকে বল্‌গে যা—

ছোট মোক্ষদা খর্ খর্ করিয়া চলিয়া গেল। অপু বলিল—তোমার মা বক্‌বেন না? কেন ওকে ওরকম বল্লে?

পরদিন দুপুরে সে নিজের ঘরে ঘুমাইতেছিল। কাহার ঠেলায় ঘুম ভাঙিয়া চোখ চাহিয়াই দেখিল—লীলা হাসিমুখে বিছানার পাশে। সে মেজেতে মাদুর পাতিয়া ঘুমাইতেছিল, লীলা হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাহাকে ঠেলা মারিয়া উঠাইয়াছে, এখনও সেই ভাবেই কৌতুকপূর্ণ ডাগর চোখে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। হাসিমুখে বলিল—বেশ তো, দুপুর বেলায় বুঝি এমন ঘুমোয়? আমি বা'র থেকে ডাক দিলাম, এসে দেখি খুব ঘুম—

অপু কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিতে মুছিতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। বলিল—সকালবেলা পড়তে আসোনি? আমি তো পড়ার ঘর-টর সব খুঁজে দেখি কেউ কোথাও নেই—

লীলা অপুর স্কুলের সেই কাগজখানা অপুর হাতে দিয়া বলিল—মাকে প'ড়ে শোনালাম কাল রাত্রে, মা নিজেও প'ড়ে দেখলেন। অপুর সারা গা খুশিতে কেমন করিয়া উঠিল। অত্যন্ত লজ্জা ও সংকোচ বোধ হইল। মেজ বৌ-রাণী তাহার লেখা পড়িয়াছেন।

লীলা বলিল—এসো আমার পড়ার ঘরে, সখা-সাথী বাঁধানো এনে রেখেচি তোমার জন্যে—অপু আল্‌নার দিকে চাহিল। তাহার ভাল কাপড়খানা এখনও শুকায় নাই, যেখানা পরিয়া আছে সেখানা পরিয়া বাহিরে যাওয়া যায় না। বলিল—এখন যাবো না—

লীলা বিস্ময়ের সুরে বলিল—কেন?

অপু ঠোঁট চাপিয়া সকৌতুক হাসিমুখে ঘাড় নাড়িল। সে জানে না তাহার মুখ কি অপূর্ব সুন্দর দেখায় এই ভঙ্গীতে।

লীলা মিনতির সুরে বলিল—এস এস—

অপু আবার মুখ টিপিয়া হাসিল।

—বাবা, কি একগুঁয়ে ছেলে যে তুমি! না বল্লে আর হাঁ হ'বার যো নেই বুঝি? আচ্ছা দাঁড়াও, বইটা এখানে—

অপু হাসি চাপিতে না পারিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

লীলা বলিল—অত হাসি কেন? কি হয়েচে বলো—না বল্‌তেই হবে—বলো ঠিক—

অপু আল্‌নার দিকে হাসি-ভরা চোখের ইঙ্গিত করিল মাত্র, কিছু বলিল না।

এবার লীলা বুঝিল। আল্‌নার কাছে গিয়া হাত দিয়া বলিল—একটুখানি শুকিয়েচে, তুমি বসো, আমি বইখানা আনি—ফাউন্টেন পেনে লিখচো? কেমন, বেশ ভাল লেখা হয় তো?

তাহার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া লীলার আনা বই দুজনে দেখিল। বই মাদুরে পাতিয়া দুই জনে পাশাপাশি হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া উপুড় হইয়া বই এর উপর ঝুঁকিয়া বই দেখিতেছিল। লীলার রেশমের মত চিক্‌ন নরম চুলগুলি অপুর খোলা গায়ে লাগিয়া যেন গা সির্ সির্ করে। হঠাৎ লীলা বই হইতে মুখ তুলিয়া বলিল—তুমি গান জানো?

অপু ঘাড় নাড়িল।

—তবে একটা গাও—

—তুমি জানো?

—একটু একটু, কেন বিয়ের দিন শোনোনি?

ছোট মোক্ষদা ঝি ঘরে উঁকি মারিয়া কহিল—এই যে দিদিমণি এখানে। আমিও মনে ভেবেচি তাই, উপরে নেই, পড়ার ঘরে নেই, তবে ঠিক—এস দিকি, এই দুধটুকু খেয়ে যাও, জুড়িয়ে গেল—হাতে করে খুঁজে খুঁজে হয়রান—

রূপার ছোট গ্লাসে এক গ্লাস দুধ! লীলা বলিল—রেখে যা—এসে এর পর গ্লাস নিয়ে যাস্—ঝি চলিয়া গেল। আরও খানিকটা বইয়ের ছবি দেখা চলিল। এক ফাঁকে লীলা দুধের গ্লাস হাতে তুলিয়া বলিল—তুমি খেয়ে নাও আদ্ধেকটা—

অপু লজ্জিত সুরে বলিল—না।

—তোমাকে ভারী খোশামোদ কর্তে হয় সব তাতে—কেন ওরকম? আমাদের মূলতানি গরুর দুধ—খেয়ে নাও—ক্ষীরের মত দুধ, লক্ষ্মী ছেলে—

অপু চোখ কুঁচকাইয়া বলিল—ইঃ লক্ষ্মী ছেলে? ভারী ইয়ে কি না? উনি আবার—

লীলা দুধের গ্লাস অপুর মুখে তুলিয়া দিয়া ঘাড় নাড়াইয়া বলিল—আর লজ্জায় কাজ নেই—আমি চোখ বুজে আছি, নাও—

অপু এক চুমুকে খানিকটা দুধ খাইয়া ফেলিয়া মুখ নামাইয়া লইল ও ঠোঁটের উপরের দুধের দাগ তাড়াতাড়ি কোঁচার খুঁটে মুছিতে মুছিতে হাসিয়া ফেলিল।

লীলা গ্লাসে চুমুক দিয়া বাকী দুধটুকু শেষ করিল, পরে সেও খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—বেশ মিষ্টি দুধ, না?

—আমার এঁটো খেলে কেন? খেতে আছে পরের এঁটো?

—আমার ইচ্ছে—একটুখানি থামিয়া কহিল—তুমি বল্লে জলছবি তুল্‌তে জানো, ছাই জানো, দাও তো আজ আমার ক'খানা জলছবি তুলে?

পথের পাঁচালী — পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি সর্বজয়া চাহিয়া-চিন্তিয়া কোনো রকম অপুর উপনয়নের ব্যবস্থা করিল। পরের বাড়ী, ঠাকুর-দালানের রোয়াকের কোণে ভয়ে ভয়ে কাজ সারিতে হইল। বাম্‌নী মাসী নাড়ু ভাজিতে সাহায্যে করিল, দু'একজন রাঁধুনী-বামুনঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল, বাহিরের সম্ভ্রান্ত লোকের মধ্যে বীরু গোমস্তা ও দীনু খাতাঞ্জি। উপনয়ন মিটিয়া যাওয়ার দিনকতক পরে অপু নিজের ঘরটিতে বসিয়া বসিয়া লীলার দেওয়া বাঁধানো মুকুল পড়িতেছিল। খোলা দরজা দিয়া কে ঘরে ঢুকিল। অপু যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করিতেই পারিল না, তাহার পরই বলিয়া উঠিল—এ কি, বাঃ—কখন—

লীলা কৌতুক ও হাসিভরা চোখে দাঁড়াইয়া। অপু বলিল—বাঃ বেশ তো তুমি। ব'লে গেলে সোমবারে আস্‌বো কল্‌কাতা থেকে, কত সোমবার হয়ে গেল—ফিরবার নামও নেই—

লীলা হাসিয়া মেজেতে বসিয়া পড়িল। বলিল—আস্‌বো কি ক'রে? স্কুলে ভর্তি হয়েচি, বাবা দিয়েচেন ভর্তি ক'রে, বাবার শরীর খারাপ, এখন আমরা কলকাতার বাড়ীতেই থাকব কি না? এখন ক'দিন ছুটি আছে তাই মার সঙ্গে এলাম—আবার বুধবারে যাবো।

অপুর মুখ হইতে হাসি মিলাইয়া গেল। বলিল—থাক্‌বে না আর তোমরা এখানে?

লীলা বলিল—বাবার শরীর ভালো হ'লে আবার আসবো—

পরে সে হাসিমুখে বলিল—চোখ বুজে থাকো তো একটু?

অপু বলিল—কেন?

—থাকো না?

অপু চক্ষু বুজিল ও সঙ্গে সঙ্গে হাতে কি একটা ভারী জিনিসের স্পর্শ অনুভব করিল। চোখ খুলিতেই লীলা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। একটা কার্ড বোর্ডের বাক্স তাহার কোলের উপর। বাক্সটা খুলিয়া ফেলিয়া লীলা দেখাইল দেশী ধুতি-চাদর ও রাঙা সিল্কের একটা পাঞ্জাবি। লীলা হাসিমুখে বলিল—মা দিয়েচেন—কেমন হয়েচে? তোমার পৈতের জন্যে—

ধুতি-চাদর বিশেষ করিয়া পাঞ্জাবিটা দরের জিনিস, ব্যবহার করা দূরের কথা এ বাড়ীতে পা দিবার পূর্বে অপু চক্ষেও কখনো দেখে নাই।

লীলা অপুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—এক মাসে তোমার মুখ বদ্‌লে গিয়েছে? আরও বড় দেখাচ্চে, দেখি নতুন বামুনের পৈতে?—তারপর কান বিঁধতে লাগলো না? আমার ছোট মামাতো ভাইয়ের পৈতে হোল কিনা, সে কেঁদে ফেলেছিল—

হঠাৎ অপু একখণ্ড মুকুল দেখাইয়া বলিল—পড়েচো এ গল্পটা?

লীলা বলিল—কি দেখি?

অপু পড়িয়া শোনইল। সমুদ্রের তলায় কোন্ স্থানে স্পেনদেশের এক ধনরত্ন পুর্ণজাহাজ দুই তিনশত বৎসর পূর্বে ডুবিয়া যায়—আজ পর্যন্ত অনেক খোঁজ করিয়াছে, কেহ স্থানটা নির্ণয় করিতে পারে নাই। গল্পটা এইমাত্র পড়িয়া সে ভারী খুশী হইয়াছে।

বলিল—কেউ বার কর্তে পারেনি—কত টাকা আছে জানো? একক, দশক, শতক, সহস্র, অযুত, লক্ষ—পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ডের সোনা-রূপা....এক পাউণ্ডে তের টাকা—গুণ করো দিকি?* তাহার পরে সে তাড়াতাড়ি একটু কাগজে আঁকটা কষিয়া দেখাইয়া বলিল—এই দ্যাখো এত টাকা!····আগেও সে

১৯২৮ সালের হিসাবে এক পাউন্ডের দাম ছিল ভারতীয় মুদ্রায় ১৩ টাকা।

আঁকটা একবার কষিয়াছে। উজ্জ্বলমুখে বলিল—আমি বড় হলে যাবো— দেখ্‌বো গিয়ে—ঠিক বার কর্‌বো দেখো—কেউ সন্ধান পায়নি এখনও সেখেনে—

লীলা সন্দিগ্ধ হইয়া বলিল—তুমি যাবে? কোন্ জায়গায় আছে তুমি বার করবে কি করে?

—এই দ্যাখো লিখেচে "পোর্তো প্লাতার সন্নিহিত সমুদ্রগর্ভে"—খুঁজে বার করবো।....

সে গল্পটি পড়িয়াই ভাবিয়াছে, ভালোই হইয়াছে কেহ বাহির করিতে পারে নাই। সবাই সব বাহির করিয়া লইলে তাহার জন্য কি থাকিবে? সে বড় হইয়া তবে কি তুলিবে? এখন সে যাওয়া পর্যন্ত থাকিলে হয়!....

লীলার বয়স কম হইলেও খুব বুদ্ধিমতী। ভাবিয়া ভাবিয়া বলিল—ওদের মত জাহাজ পাবে কোথায়? তোমার একখানা আলাদা জাহাজ চাই—ওদের মতন—

—সে হয়ে যাবে, কিনবো, বড় হোলে আমার টাকা হবে না বুঝি?

এবার বোধ হয় লীলার অনেকটা বিশ্বাস হইল। সে এ লইয়া আর কোনও তর্ক উঠাইল না।

খানিকটা পরে বলিল—তুমি কলকাতা গিয়েচ?

অপু ঘাড় নাড়িয়া বলিল—আমি দেখিনি কখ্‌খনো—খুব বড় শহর?—এর চেয়ে বড়?

লীলা হাসিয়া বলিল—ঢের ঢের—

কাশীর চেয়েও বড়?

—কাশী আমি দেখিনি—

তারপর সে অপুকে নিজের পড়ার ঘরে লইয়া আসিল। একখানা খাতা দেখাইয়া বলিল—দ্যাখো তো কেমন ফুলগাছ এঁকেচি, কি রকম ড্রইংটা?

অপু খানিকটা পরে বলিল—আমি শুইগে, মাথাটা বড্ড ধরেচে—

লীলা বলিল—দাঁড়াও আমি একটা মন্তর জানি মাথা-ধরা সারাবার—দেখি? পরে সে দুহাতের আঙুল দিয়া কপাল এমন ভাবে টিপিয়া দিতে লাগিল যে অপু হাসিয়া বলিল—উঃ বড় সুড়সুড়ি লাগ্‌চে।

লীলা হাসিয়া বলিল—আমার বড় মামাতো ভাইকে কুস্তি শেখায় একজন পালোয়ান আছে, তার কাছে শেখা—বেশ ভালো না? সেরেচে তো?

দিনকতক পরেই লীলারা পুনরায় কলিকাতায় চলিয়া গেল।

অপু মাকে বলিয়া কহিয়া একটা ছোট স্কুলে যায়। যে বড় রাস্তার ধারে ইঁহাদের বাড়ী সেখান হইতে কিছুদূর গিয়া বাঁ-ধারে ছোট গলির মধ্যে একতলা বাড়ীতে স্কুল। জনপাঁচেক মাস্টার, ভাঙা বেঞ্চি, হাতল-ভাঙা চেয়ার, তেলকালি ওঠা ব্ল্যাকবোর্ড, পুরানো ম্যাপ খানকতক—ইহাই স্কুলের আস্‌বাব। স্কুলের সাম্‌নেই খোলা ড্রেন, অপুদের ক্লাস হইতে জানালা দিয়া বাহিরে চাহিলে পাশের বাড়ীর চুনবালির কাজ-বিরহিত নগ্ন ইঁটের দেওয়াল নজরে পড়ে। সে স্কুলে যাইতে যাইতে দেখে ধাঙড়ে ড্রেন সাফ্ করিতে করিতে চলিয়াছে, স্থানে স্থানে ময়লা জড়ো করা। সারাদিন স্কুলের মধ্যে কেমন একটা বদ্ধ বাতাসের গন্ধ, পাশের এক হিন্দুস্থানী ভুজাওয়ালা দুপুরের পর কয়লার আঁচ দেয়, কাঁচা কয়লার ধোঁয়ার মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ বাহির হয়, অপুর মাথার মধ্যে কেমন করে, স্কুলের বাহিরে আসিয়া যেন সেটা কাটিতে চায় না।

তাহার ভাল লাগে না, মোটেই ভাল লাগে না, শহরের এই সব ইঁট-সিমেন্টের কান্ড-কারকানায় তাহার হাঁফ ধরে, কেমন যেন দম আট্‌কাইয়া আসে। কিসের অভাবে প্রাণটা যেন আকুলি-বিকুলি করে, সে বুঝিতে পারে না কিসের অভাবে।

পথে ঘাস খুব কম, গাছপালা বেশী নাই, দু'একটা এখানে ওখানে। সুর্‌কীর পথ, পাকা ড্রেন, দুই বাড়ীর মাঝখানের ফাঁকে আবর্জনা, ময়লা জল, ছেঁড়া কাপড়, কাগজ। একদিন সে এক সহপাঠীর সঙ্গে তাহাদের বাড়ীতে গিয়াছিল। একতলা খোলার ঘর। অপরিসর উঠানের চারিধারের ঘরগুলিতে এক-একঘর গৃহস্থ ভাড়াটে থাকে। দোরের গায়ে পুরানো চটের পর্দা। ঘরের মেঝে উঠান হইতে বিঘতের

বেশী উঁচু নয়, কাজেই আর্দ্রতা কাটে না। ঘরের মধ্যে আলো-হাওয়ার বালাই নাই। উঠান বিশ্রী নোংরা, সকল গৃহস্থই একসঙ্গে কয়লার আঁচ দিয়াছে, আবার সেই মিষ্টি মিষ্টি গন্ধটা। সবসুদ্ধ মিলিয়া অপুর অত্যন্ত খারাপ লাগে, মন যেন ছোট এতটুকু হইয়া যায়, সেদিন তাহারা উহাকে বসিতে বলিলেও সে বেশীক্ষণ থাকিতে পারে নাই, সদর রাস্তায় আসিয়া তবুও অনেকটা স্বস্তি বোধ করিয়াছিল।

বাড়ী ফিরিয়াও সেই বদ্ধতা। বরং যেন আরও বেশী। এখানে ইট-সিমেন্ট আর মার্বেল পাথরে চারিধার মায় উঠান পর্যন্ত বাঁধানো। অপু মাটি দেখিতে না পাইলে থাকিতে পারে না, এখানে যা মাটি আছে, তাও যেন অন্যরকম। যে মাটির সঙ্গে তার পরিচয় এ যেন সে মাটি নয়। তাহা ছাড়া ইহাদের বাড়ী চলিবার ফিরিবার স্বাধীনতা কৈ? থাকিতে হয় ভয়ে ভয়ে চোরের মত ! কে কি বলিবে, উঁচু গলায় কথা কওয়া যায় না, ভয় করে।

এক-একদিন অপু দপ্তরখানায় গিয়া দেখিয়াছে বুড়ো খাতাঞ্জি একটা লোহার সিক বসানো খাঁচার মত ঘরে অন্ধকারের মধ্যে বসিয়া থাকে। অনেকগুলি খেরো বাঁধানো হিসাবের খাতা একদিকে স্তূপীকৃত করা। ছোট্ট কাঠের হাতবাক্স সাম্‌নে করিয়া বুড়ো সারাদিন ঠায় একটা ময়লা চিট তাকিয়া হেলান দিয়া আছে। ঘরে এত অন্ধকার যে, দিনমানেও মাঝে মাঝে ছোট্ট রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বলে। গিরিশ গোমস্তা জমাসেরেস্তায় বসে। নিচু তক্তপোশের উপর ময়লা চাদর পাতা—চারিধারে দু'কোণে কাপড়ে বাঁধা রাশি রাশি দপ্তর। সে ঘরটা খাতাঞ্জিখানার মত অত অন্ধকার নয়, দু'তিনটা বড় বড় জানালাও আছে, কিন্তু তক্তপোশের নীচে রাশীকৃত তামাকের গুল ও ছেঁড়া কাগজ এবং কড়িকাঠে মাকড়সার জাল ও কেরোসিন আলোর ঝুল। যখন বীরু মুহুরী হাঁকিয়া বলে—ওহে রামদয়াল দেখো তো, গত তৌজিতে বাদ্যকর খাতে কত খরচ লেখা আছে?...তখনই কি জানি কেন অপুর মনে দারুণ বিতৃষ্ণা আবার জাগিয়ে উঠে।

সকালবেলা। অপু দেউড়ির কাছটায় আসিয়া দেখিল বাড়ীর ছেলেরা চেয়ার-গাড়ীটা ঠেলিয়া খেলিতেছে। গাড়ীটা নূতন তৈয়ারী হইয়া আসিয়াছে, ডাণ্ডালাগানো লোহার চেয়ার, উপরে চামড়ার গদী, বড় বড় চাকা—ঝক্‌ঝকে দেখিতে। সে কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছে, রমেন বলিল—এই, এসে ঠেল তো একবার আমাদের—

এই গাড়ীটা আসা অবধি অপুর মনে মনে ইহার উপর লোভ আছে, খুশি হইয়া বলিল—ঠেলচি, আমায় একবার চড়্‌তে দেবেন তো?

রমেন বলিল—আচ্ছা হবে, ঠেল্ তো—খুব জোরে দিবি—

খুব খানিকক্ষণ খেলা হইবার পর রমেন হঠাৎ বলিল—আচ্ছা খুব হয়েচে এবেলা—থাক্ আর নয়—পরে গাড়ী লইয়া সকলে চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া অপু বলিল—আমি এট্টু চড়বো না?

রমেন বলিল—আচ্ছা যা যা, এ বেলা আর চড়ে না, বেশী চড়লে আবার ভেঙে যাবে—দেখা যাবে ও-বেলা—

ক্ষোভে অপুর চোখে জল আসিল। সে এতক্ষণ ধরিয়া আশায় আশায় ইহাদের সকলকে প্রাণপণে ঠেলিয়াছে।

বলিল—বা, আপনি যে বল্লেন আমাকে একবার চড়্‌তে দেবেন আমার পালায়? আমি সকলকে ঠেল্‌লাম—বেশ তো ! সেদিনও ওইরকমই চড়ালেন না শেষকালে—

রমেন বলিল—ঠেল্‌লি কেন তুই, না ঠেল্‌লেই পাত্তিস্—যা—কে বলেচে তোকে চড়তে দেবে? গাড়ী কিন্‌তে পয়সা লাগে না?

সে বলিল—কেন আপনিও বল্লেন, ওই সন্তুও তো বল্লে—ঠেলে ঠেলে আমার হাত গিয়েছে—আর আমি বুঝি একবারটি—বেশ তো আপনি—

রমেন গরম হইয়া বলিল—আমি বলিনি যা—

সন্তু বলিল—ফু-র্-র্-র্,—বক দেখেচ?

কোনও কিছু না হঠাৎ বড়বাবুর ছেলে টেবু আসিয়া তাহার গলায় হাত দিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে বলিল—যা যা—আমরা চড়াবো না আমাদের খুশি—তোর নিজের ঘরের দিকে যা—এদিক আসিস্ কেন খেলতে?

টেবু অপুর অপেক্ষা বয়সে ছোট বলিয়া তাহার কৃত অপমানের দরুণই হউক বা সকলের ঠাট্টা-বিদ্রূপের জন্যই হউক—অপুর মাথা কেমন বেঠিক হইয়া গেল—সে ঝাঁকুনি দিয়া ঘাড় ছিনাইয়া লইয়া টেবুকে এক ধাক্কা মারিতেই টেবু ঘুরিয়া গিয়া দেওয়ালের উপর পড়িয়া গেল—কপালটা দেওয়ালে লাগিয়া খানিকটা কাটিয়া রক্তপাত হইতে টেবু সঙ্গে সঙ্গে বিকট চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ঝি-চাকর ছুটিয়া আসিল, খানসামা দারোয়ান ছুটিয়া আসিল—উপরের বৈঠকখানায় বড়বাবু সকালবেলা কাছারী করিতেছিলেন, তিনি সদলবলে নীচে নামিয়া আসিলেন। দশ দিক হইতে দশ ঘটি জল···· বাতাস···জলপটি, হৈ-হৈ কাণ্ড!

গোলমাল একটু কমিলে বড়বাবু বলিলেন—কৈ, কে মেরেচে দেখি? রামনিহোরা সিং দারোয়ান পিছন হইতে ঠেলিয়া অপুকে বড়বাবুর সামনে দাঁড় করাইয়া দিল।

বড়বাবু বলিলেন—এ কে? ওই সেই কাশীর বামুনঠাক্রুণের ছেলে না?

গিরিশ সরকার আগাইয়া আসিয়া বলিল—ভারী বদ্ ছোক্রা—আবার জ্যাঠামি ওর যদি শোনেন বাবু, সেই সেবার থিয়েটারের দিন, বসেচে একেবারে সকলের মুখের সামনে বাবুদের জায়গায়, স'রে বস্‌তে বলেচি, মুখোমুখি তর্ক কি? সেদিন আবার দেখি ওই শেঠেদের বাড়ীর মোড়ে রাস্তায় একটা লাল পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে বার্ডসাই খেতে খেতে আসচে—এই বয়েসেই তৈরি—

বড়বাবু রমেনকে বলিলেন—সকালে আজ তোমাদের মাস্টার আসেনি? পড়াশুনো ছিল না? এই, আমার বেতের ছড়িটা নিয়ে এসো তো কেউ? ওর সঙ্গে মিশে খেলা কর্তে কে বলে দিয়েচে তোমাদের?

রমেন কাঁদো কাঁদো মুখে বলিল—ও-ই তো আমাদের খেলার সময় আসে, আমরা কেন যাবো, জিজ্ঞেস করুন বরং সন্তুকে—আপনার সেই ছবিওয়ালা ইংরাজী ম্যাগাজিনগুলোর ছবি দেখতে চায়—আবার বড় বৈঠকখানায় ঢুকে এটা সেটা নেড়েচেড়ে দেখে—

গিরিশ সরকার বলিল—দেখুন, শখটা দেখুন আবার—

এবার অপুর পালা। বড়বাবু বলিলেন। —স'রে এসো এদিকে—টেবুকে মেরেছ কেন?

ভয়ে অপুর প্রাণ ইতিপূর্বেই উড়িয়া গিয়াছিল, সে রাগের মাথায় ধাক্কা দিয়াছিল বটে কিন্তু এত কাণ্ডের জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে আড়ষ্ট জিহ্বা দ্বারা অতি কষ্টে উচ্চারণ করিল—টেবু আমাকে আগে তো—আমাকে—

বড়বাবু কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিলেন—টেবুর বয়স কত আর তোমার বয়স কত জান?

গুছাইয়া বলিতে জানিলে অপুর পক্ষ হইতেও একথা বলা চলিত যে টেবুর বয়স কিছু কম হইলেও কার্যে সে অপুর জেঠামশাই নীলমণি রায় অপেক্ষাও পাকা। বলা চলিতে পারিত যে, টেবু ও এ-বাড়ীর সব ছেলেই বিনা কারণে যখন তখন তাহাকে বাঙাল বলিয়া খেপায়, বক দেখায়, পিছন হইতে মাথায় ঠোকর মারে—সে না হয় একটু খেলা করিতে যায় এই তো তাহার অপরাধ। কিন্তু উঠানভরা লোকারণ্যের কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে বিশেষ করিয়া বড়বাবুর সঙ্গে কথা কহিতে জিহ্বা তাহার তালুর সঙ্গে জুড়িয়া গিয়াছিল—সে শুধু বলিল—টেবু—আমাকে—শুধু শুধু—আমাকে এসে—

বড়বাবু গর্জন করিয়া বলিলেন—স্টুপিড়, ডেঁপো ছোক্রা—কে তোমাকে বলে দিয়েচে এদিকে এসে এদের সঙ্গে মিশতে—এই দাও তো বেতটা—এগিয়ে এস—এস—

সপাং করিয়া এক ঘা সজোরে পিঠে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সে কেমন বিস্ময়ের চোখে বড়বাবু ও তাঁহার পুনর্বার উদ্যত বেতের ছড়িটার দিকে চাহিল—জীবনে সে কখনও ইহার পূর্বে মার খায় নাই, বাবার কাছেও নয়,—তাহার বিভ্রান্ত মন যেন প্রথমটা প্রহার খাওয়ার সত্যটাকে গ্রহণ করিতে পারিতেছিল না—পরে সে কতকটা নিজের অজ্ঞাতসারেই বেতটা ঠেকাইবার জন্য হাত দুখানা উঠাইল। কিন্তু এবার আর তাহার দুঃখ করিবার কিছু রহিল না যে, সে তাহার পালার বেলা ফাঁকে পড়িল। বেতের সপাসপ শব্দে টেবুকেও কপালের ব্যথা ভুলিয়া চাহিয়া দেখিতে হইল। রাঁধুনীর ছেলের যাহাতে স্পর্ধা আর না

হয়, বড়বাবু এ বিষয়ে তাহাকে সুশিক্ষাই দিলেন। অন্য বেত হইলে ভাঙিয়া যাইত, এ বেতটা বোধ হয় খুব দামী ।

বড়বাবু হাঁপ জিরাইয়া লইয়া বলিলেন—বুড়ো ধাড়ী বয়াটে ছোক্‌রা কোথাকার, আজ তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, ফের যদি শুনি এ বাড়ীর কোনো ছেলের সঙ্গে মিশেচ কান ধ'রে তক্ষুনি বাড়ী থেকে বিদেয় ক'রে দেবো—পরে কাহার দিকে চাহিয়া কহিলেন—দেখুন না ধীরেনবাবু, বিধবা মা, সতীশবাবু ম্যানেজার কাশী থেকে আন্‌লেন, ভাবলাম জাতের মেয়ে থাকুক—দেখুন কাণ্ড, মা ভাত রাঁধে—উনি পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে সিগারেট খেয়ে বেড়ান—

ধীরেনবাবু বলিলেন—ওসব ওই রকমই হয়ে থাকে—এরপর কোকেন খাবে—মা'র বাক্স ভাঙবে—ওর নিয়মই ওই—তার ওপর আবার কাশীর ছেলে—

বাড়ীর মধ্যে সব কথা গিয়া পৌছয় না, অপুর মার খাওয়ার কথা কিন্তু সর্বজয়া শুনিল। একটু ভাল করিয়াই শুনিল। গৃহিণী বলিলেন—ওরকম যদি গুণ্ডা ছেলে হয় তা হ'লে বাছা—ইত্যাদি। রুটির ঘর হইতে আসিয়া দেখিল অপু স্কুলে গিয়াছে, মাকে কিছু বলে নাই, এসব কথা সে কখনো মাকে বলেও না। রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে সর্বজয়ার গা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল, সর্বাঙ্গ হইতে যেন ঝাল বাহির হইতে থাকিল, ঘরে না থাকিতে পারিয়া সে বাহিরের অপরিসর বারান্দাটাতে আসিয়া দাঁড়াইল।

তাহার অপুর গায়ে হাত! সে যে এখনও বলে, মা সিঁড়ির ঘর দিয়ে যখন তুমি রান্নাবাড়ী থেকে আস্‌বে তখন রাত্রে তোমায় একদিন এমন ভয় দেখাবো?···তাহার কি কোন বুদ্ধি আছে? কত লাগিয়াছিল, কে তাহাকে বুঝিয়াছে সেখানে, কে শুনিয়াছে তাহার কান্না?

সর্বজয়ার বুক ফাটিয়া কান্না আসিল। ···

অন্ধকার রাত···আকাশে দু'একটা তারা জ্বল্ জ্বল্ করে—আস্তাবলের মাথায় আমলকী গাছের ডালে বাতাস বাধে, দালানের কোণের লোহার ফুট চৌবাচ্চার পাশে বসিয়া কথাটা ভাবিতে ভাবিতে কান্নার বেগে তাহার সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল—

—ঠাকুর, ঠাকুর, ও আমার বড় আদরের ধন, তুমি তো জানো ও একদণ্ড চোখের আড়াল থেকে সর্‌লে আমি স্থির থাক্‌তে পারি নে, যা কিছু শাস্তি দেবার আমার ওপর দিয়ে দাও, ঠাকুর ওকে কিছু বোলো না, আমার বুক ফেটে যায় ঠাকুর, তা আমি সইতে পার্‌বো না—

সকাল সকাল অপুদের স্কুলের ছুটি হইয়া গেল। তাহার ক্লাসের ছেলেরা ধরিল তাহাদের ফুটবল খেলায় অপুকে রেফারী হইতে হইবে। অপু ভারী খুশি হইল, ফুটবল খেলা সে এ শহরে আসিবার পূর্বে কোনোদিন দেখে নাই, সে খুব ভাল খেলিতেও পারে না, তবুও কিন্তু ক্লাসের ছেলেরা তাহাকেই সকলের চেয়ে পছন্দ করে, খেলায় রেফারী হইতে প্রায়ই তাহার ডাক পড়ে।

সে বলিল—সেই বড় হুইসিলটা বাড়ী থেকে নিয়ে আসি ভাই, বাক্সে প'ড়ে রয়েচে, আমি ঠিক চারটের সময় মাঠে যাবো এখন—

পথে আসিতে আসিতে অপুর সকালের কথাটা মনে উঠিল। আজ সারা দিনটাই সে সে-কথা ভাবিয়াছে। বার্ডসাই খাইতে গিয়া সেদিন গিরিশ সরকারের সামনে পড়িয়া গিয়াছিল একথা ঠিক কিন্তু বার্ডসাই কি সে রোজ খায়? সেদিন মেজ বৌরাণীর দেওয়া রাঙা পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়া স্কুল হইতে ফিরিবার পথে তাহার হঠাৎ সখ হইয়াছিল, এই রকম পাঞ্জাবি গায়ে দিয়া বাবুরা বার্ডসাই খায়, সেও একবার খাইবে। তাই খাবারের পয়সাটায় বার্ডসাই কিনিয়া সে ধরাইয়া খাইতেছিল, কিন্তু সেই একদিন নিশ্চিন্দিপুরে লুকাইয়া খাইতে গিয়াও ভাল লাগে নাই, সেদিনও লাগিল না। তাহার মনে হইয়াছিল—দূর! এ না কিনে এক পয়সার ছোলাভাজা কিন্‌লে বেশ হোত! এ যে কেন লোকে কিনে খায়; কিন্তু গিরিশ সরকার না জানিয়া-শুনিয়া তাহাকে যা-তা বলিল কেন?

ভাগ্যিস লীলা এখানে নেই। থাকিলে সে দেখিলে বড় লজ্জার কথা হইত। মাও বোধ হয় টের পায় নাই। পাছে মা টের পায় এই জন্যই তো সে ওবেলা তাড়াতাড়ি স্কুলে চলিয়া আসিয়াছিল।

লীলা কতদিন এখানে আসে নাই! সেই আর বছর গিয়াছে আর আসে নাই। এখন আসিলেই কি আর উহারা তাহার সহিত কথা কহিতে দিবে?

বাড়ী ফিরিতেই দেউড়ির কাছটায় আসিয়া শুনিল উপরের বৈঠকখানায় কলের গান হইতেছে। শব্দটা কানে যাইতেই সে খুশি-ভরা উৎসুক চোখে মুখ উঁচু করিয়া দোতলার জানলার নীচে রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া গেল। রাস্তা হইতে গানের কথা সব বোঝা যায় না। কিন্তু সুরটি ভারী চমৎকার, শুনিতে শুনিতে—স্কুল, খেলা, রেফারীগিরি, ওবেলার মার-খাওয়া, মন হইতে সব একেবারে মুছিয়া গেল।

গানের সুরে তাহার মনটা আপনা-আপনি কোথায় উড়িয়া যায়—সেই তখন নিশ্চিন্দিপুরের নদীর ধারে বেড়াইতে গিয়া কতদিন দেখিত, ওপারের উলুখড়ের মাঠে ছোট রাঙা ফুলে-ভরা শিমুল-চারা, তাহাদের পিছনে কত দূরে নীল আকাশের পট—খড়ের মাঠ যেন আঁকা, রাঙা-ফুল শিমুল-চারা যেন আঁকা, শুক্‌না ডালে কি পাখী বসিয়া থাকিত সব যেন আঁকা। তাহাদের সকলের পিছনে সেই দেশটা, ব-হু-উ-দূরের দেশটা— কোন্ দেশ তাহার জানা নেই, মাত্র মনের খুশিতে সেটা ধরা দিত।

কে যেন ডাকে, কতদূর হইতে উচ্ছ্বসিত আনন্দভরা পরিচিত সুরের ডাক আসে—অপু—উ-উ-উ-উ—

মন খুশিতে ভরিয়া উঠিয়া সাড়া দেয়—যা-আ-আ-ই-ই-ই—

তাহাদের ছোট ঘরটাতে ফিরিতে তাহার মা জিজ্ঞাসা করিল—সকাল সকাল এলি যে?

সে বলিল—ওপর ক্লাসের ছেলেরা বল খেলায় জিতেছে তাই হাপ স্কুল—

তাহার মা বলিল—আয় বোস্ এখানে। খানিকক্ষণ পরে গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—আজ তোকে ওরা কি জন্যে নাকি ডেকে নিয়ে গিয়ে নাকি—বকেচে?

—নাঃ, ওই টেবুর একটুখানি লেগেচে তাই বড়বাবু ডেকে বল্‌ছিলেন কি হয়েচে, —তাই—

—বকে-টকে নি তো?

—নাঃ—

তাহার মা খানিকক্ষণ চুপ থাকিয়া বলিল—একটা কথা ভাব্‌চি, এখান থেকে চ'লে যাবি?

সে আশ্চর্য হইয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিল। পরে হঠাৎ খুশি হইয়া বলিয়া উঠিল— কোথায় মা, নিশ্চিন্দিপুর? সেই বেশ তো, চলো, আমি সেখানে ঠাকুর-পূজো করবো—পৈতেটা তো হয়ে গিয়েচে—নিজেদের দেশ, বেশ হবে—এখানে আর থাক্‌বো না—

সর্বজয়া বলিল—সে কথাও তো ভাবচি আজ দু'বছর। সেখানে যাবি বলচিস্, কি আর আছে বল্ দিকি সেখানে? এক বাড়ীখানা তাও আজ তিন বছর বর্ষার জল পাচ্চে, তার কিছু কি আছে এ্যাদ্দিন? মান্ধাতার আমলের পুরোনো বাড়ী—ছিল একটু ধানের জমি, তাও তো—গিয়ে মাথা গোঁজাবার জায়গাটুকু নেই—শত্তুর হাসাতে যাওয়া...খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—একটা কাজ কল্লে হয়, চল্ বরং—আচ্ছা কাশী যাবি?

বিশেষ কিছু ঠিক হইল না। তাহার মায়ের তখনও খাওয়া হয় নাই। স্নান সারিয়া পুনরায় রান্নাবাড়ী চলিয়া গেল। অপুর একটা কথা মনে হইল। তাহার গানের গলা আছে, দিদি বলিত, যাত্রাদলের বন্ধুও সেবার বলিয়াছিল। সে যদি কোন যাত্রাদলে যায়, তাহাকে নেয় না? এখানে মা'র বড় কষ্ট। এখান হইতে সে মাকে লইয়া যাইবে!

উঃ কি গরম। রান্নাবাড়ীর নলের মুখে ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিতেছে, কার্নিসের গায়ে রোদ....ঘরের ভিতরটা এরই মধ্যে অন্ধকার...আস্তাবলে মাতাবিয়া সহিস কি হিন্দী বুলি বলিতেছে...পাথর-বাঁধানো মেঝেতে ঘোড়ার খুর ঠুকিবার খট্ খট্ আওয়াজ...ড্রেনের সেই গন্ধ...তাহার মাথাটা এমন ধরিয়াছে যেন ছিঁড়িয়া পড়িতেছে। সে ভাবিল। ....এখন একটু শুয়ে নিই, এরপর উঠে খেলার মাঠে যাবো—মোটে তিনটে বেজেছে—এখনও বড় রোদটা।

বিছানায় শুইয়া একটা কথাই তাহার বার বার মনে আসিতে লাগিল। এ কথাটা এতদিন এভাবে সে ভাবিয়া দেখে নাই। এতদিন যেন তাহার মনের কোন্ কোণে সব সময়েই স্পষ্টভাবে জাগিয়া থাকিত যে, এ সবের শেষে যেন তাহাদের গ্রাম অপেক্ষা করিয়া আছে—তাহাদের জন্য! যদিও সেখান হইতে চলিয়া আসিবার সময় ফিরিবার কোনো কথাই ছিল না—সে-জানে, তবুও এ মোহটুকু তার একেবারে কাটে নাই।

কিন্তু আজকার সমুদয় ব্যাপারে বিশেষ করিয়া মায়ের ও বড়বাবুর কথায় তাহাদের নিরাশ্রয়তা ও গৃহহীনতার দিকটা তাহার কাছে বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিল। আর কি কখনও সে তাহাদের গাঁয়ে ফিরিতে পাইবে না?—কখনো না?—কখনো না?

এই বিদেশ, এই গিরিশ সরকার, এই চোর হইয়া থাকা—না হয় মায়ে ছেলে হাত ধরিয়া ছন্নছাড়া পথে পথে চিরকাল—এরাই কি কায়েম হইতে আসিয়াছে?

আস্তাবলে দুই সহিসে ঝগড়া বাঁধাইয়াছে, রান্নাবাড়ীর ছাদে কাকের দল ভাতের লোভে দলে দলে জুটিতেছে—একটু পরে তাহার মনে হইল, একই কি কথা অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিতেছে, একই কি কথা। আস্তাবলে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ থামে নাই... সে যেন মাটির ভিতর কোথায় সেঁধিয়া যাইতেছে...খুব, খুব মাটির ভিতর...নীচের দিকে কে যেন টানিতেছে...বেশ আরাম...মাথা ধরা নাই, বেশ আরাম।...

উঃ—কি রোদটাই ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছে! দিদির যা কাণ্ড—এত রোদ্দুরে চড়ুই-ভাতি! সে বলিতেছে—দিদি শুয়ে নে, এত রোদ্দুরে চড়ুইভাতি?

রাণুদি কানের কাছে বসিয়া কি সব কথা, অনেক কি সব কথা বলিয়া যাইতেছে। রাণুদির ছলছলে ডাগর চোখ দুটি অভিমান-ভরা। সে কি করিবে? নিশ্চিন্দিপুরে তাহাদের চলে না যে? রাণু-দি না লীলা?

হারাণ কাকা বাঁশের বাঁশি বেচিবার জন্য আনিয়া বাজাইতেছে...ভারী চমৎকার বাজায়! সে বাবাকে বলিল—এক পয়সার বাঁশের বাঁশি কিনবো বাবা, একটা পয়সা দেবে?...

তাহার বাবা তাহার বড় বড় চুল কানের পাশে তুলিয়া দিতে দিতে আদর করিয়া বলিতেছে—বেশ হয়েচে তোর গল্পটা, ছাপিয়ে এলে আমায় দেখ্‌তে দিস্‌ খোকা?

সে বলিতেছে—কোকেন কি বাবা? গিরিশ সরকার বলেচে আমি নাকি কোকেন খাবো—

বাবার গলায় পদ্মবীজের মালা। সেই কথকঠাকুরের মত।

তাহাদের মাঝেরপাড়ার ইষ্টিশান। কাঠের বড় তক্তাটায় লেখা আছে, মা-ঝে-র—পা-ড়া। সে আগে আগে ভারী বোঁচকাটা পিঠে, মা পিছনে পিছনে। তাহার গায়ে রাঙা পাঞ্জাবিটা। কেমন ছায়া সারাপথে। আকাশে সন্ধ্যাতারা উঠিয়াছে। পাকা বটফলের গন্ধে-ভরা বাতাসটা।

নিশ্চিন্দিপুরের পথ যেন ফুরাইতেছে না...সে চলিয়াছে...চলিয়াছে...সে আর মা...এ পথে একা কখনো আসে নাই, পথ সে চিনিতে পারিতেছে না...ও কাস্তে-হাতে কাকা, শুনচো, নিশ্চিন্দিপুরের পথটা এট্টু ব'লে দ্যাও না আমাদের? যশড়া-নিশ্চিন্দিপুর, বেত্রবতীর ওপারে?

তাহার মা ঘরে ঢুকিয়া বলিল—হাঁরে, ওঠ্‌, ও অপু, বেলা যে আর নেই, বল্‌লি যে কোথায় খেলতে যাবি?—ওঠ্‌-ওঠ্‌।

সে মায়ের ডাকে ধড়্‌মড় করিয়া বিছানায় উপর উঠিয়া বসিয়া চারিদিকে চাহিল—উঃ কি বেলাই গিয়াছে!..রোদ একেবারে কোথায় উঠিয়া গিয়াছে? তাহার মা বলিল—বললি যে কোথায় খেলতে যাবি, তা গেলি কৈ? অবেলায় প'ড়ে প'ড়ে কি ঘুমটাই দিলি? দেবো তোর সেই বাঁশিটা বের্‌ করে?

তোরঙ্গ হইতে বাহির করিয়া বাঁশিটা মা বিছানার কোণে রাখিয়া দিল বটে, সে কিন্তু রেফারীগিরি করিতে যাওয়ার কোনো উৎসাহ দেখাইল না। ঘরের ভিতর এরই মধ্যে অন্ধকার! উঠিয়া আসিয়া জানালার কাছে অন্যমনস্কভাবে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। বেলা একেবারে নাই। এক অসহ্য গুমোট! আস্তাবলের ড্রেনের গন্ধটা যেন আরও বাড়িয়াছে। ফটকের পেটাঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া বোধ হয় ছ'টা বাজাইতেছে।

ওই আস্তাবলের মাথায় যে আকাশটা , ওরই ওপারে পূর্বদিকে বহুদূরে তাহাদের নিশ্চিন্দিপুর।

আজ কতদিন সে নিশ্চিন্দিপুর দেখে নাই—তি-ন বৎসর! কতকাল!

সে জানে, নিশিন্দিপুর তাহাকে দিনে-রাতে সব সময় ডাকে, শাঁখারীপুকুর ডাক দেয়, বাঁশবনটা ডাক দেয়, সোনাডাঙার মাঠ ডাক দেয়, কদমতলার সায়েবের ঘাট ডাক দেয়, দেবী বিশালাক্ষী ডাক দেন।

পোড়ো ভিটার মিষ্টি লেবু ফুলের গন্ধে সজনেতলায় ছায়ায় ছায়ায় আবার কবে গতিবিধি? আবার কবে তাহাদের বাড়ীর ধারের শিরীষ সোঁদালি বনে পাখীর ডাক?

এতদিনে তাহাদের সেখানে ইছামতীতে বর্ষার ঢল নামিয়াছে। ঘাটের পথে শিমুল তলায় জল উঠিয়াছে। ঝোপে ঝোপে নাটা-কাঁটা, বনকলমীর ফুল ধরিয়াছে। বন অপরাজিতার নীল ফুলে বনের মাথা ছাওয়া।

তাহাদের গ্রামের ঘাটটাতে কুঁচ-ঝোপের পাশে রাজুকাকা হয়তো এতক্ষণে তাহার অভ্যাসমত অবেলায় স্নান করিতে নামিয়াছে, চাল্‌তেপোতার বাঁকে নতুন কষাড় বনের ধারে ধারে অক্রুর মাঝি মাছ ধরিবার দোয়াড়ী পাতিয়াছে, আজ সেখানকার হাট-বার, ঠাকুরঝি-পুকুরের সেই বটগাছটার পিছনে দিগন্তের কোনো রাঙা আগুনের ফেনার মত সূর্য অস্ত যাইতেছে, আর তাহারই তলাকার মেঠোপথ বাহিয়া গ্রামের ছেলে পটু, নীলু, তিনু, ভোলা সব হাট করিয়া ফিরিতেছে।

এতক্ষণে তাদের বনে-ঘেরা বাড়ীটার উঠানটাতে ঘন ছায়া পড়িয়া আসিতেছে, কিচ্‌ কিচ্‌ করিয়া পাখী ডাকিতেছে, সেই মিষ্ট নিঃশব্দ শান্ত বৈকাল—সেই হল্‌দে পাখীটা আজও আসিয়া পাঁচিলের উপরের কঞ্চির ডালটাতে সেই রকমই বসে, মায়ের হাতে পোঁতা লেবুচারাটাতে হয়তো এতদিন লেবু ফলিতেছে।...

আরো কিছুক্ষণ পরে তাহাদের সে ভিটায় সন্ধ্যার অন্ধকার হইয়া যাইবে, কিন্তু সে সন্ধ্যায় সেখানে কেহ সাঁজ জ্বালিবে না, প্রদীপ দেখাইবে না, রূপকথা বলিবে না। জনহীন ভিটায় উঠান-ভরা কালমেঘের জঙ্গলে ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকিবে, গভীর রাত্রে পিছনের ঘন বনে জগ্‌ডুমুর গাছে লক্ষ্মীপেঁচার রব শোনা যাইবে.... কেহ কোনোদিন সেদিক মাড়াইবে না, গভীর জঙ্গলে চাপা-পড়া মায়ের সে লেবুগাছটার সন্ধান কেহ কোনোদিন জানিবে না, ওড়ু-কলমীর ফুল ফুটিয়া আপনা-আপনি ঝরিয়া পড়িবে, কুল নোনা মিথ্যাই পাকিবে, হলদে-ডানা তেড়ো পাখীটা কাঁদিয়া ফিরিবে।

বনের ধারে সে অপূর্ব মায়াময় বৈকালগুলি মিছামিছিই নামিবে চিরদিন।

ওবেলা এক উঠান লোকের সম্মুখে বিনাবিচারে মার খাইয়াও তাহার চোখ দিয়া এক ফোঁটা জল বাহির হয় নাই, কিন্তু এখন নির্জন ঘরের জানালাটাতে একা-একা দাঁড়াইয়া হঠাৎ সে কাঁদিয়া আকুল হইল, উচ্ছ্বসিত চোখের জল ঝর-ঝর করিয়া পড়িয়া তাহার সুন্দর কপোল ভাসাইয়া দিতেই চোখ মুছিতে হাত উঠাইয়া আকুল সুরে মনে মনে বলিল—আমাদের যেন নিশ্চিন্দিপুর ফেরা হয়—ভগবান—তুমি এই কোরো, ঠিক যেন নিশ্চিন্দিপুর যাওয়া হয়—নৈলে বাঁচবো না—পায়ে পড়ি তোমার—

পথের দেবতা প্রসন্ন হাসিয়া বলেন—মূর্খ বালক, পথ তো আমার শেষ হয়নি তোমাদের গ্রামের বাঁশের বনে, ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়ের বটতলায় কি ধলচিতের খেয়াঘাটের সীমানায়? তোমাদের সোনাডাঙা মাঠ ছাড়িয়ে, ইছামতী পার হয়ে, পদ্মফুলে ভরা মধুখালি বিলের পাশ কাটিয়ে, বেত্রবতীর খেয়ায় পাড়ি দিয়ে, পথ আমার চলে গেল সামনে, সামনে, শুধুই সামনে....দেশ ছেড়ে বিদেশের দিকে, সূর্যোদয় ছেড়ে সূর্যাস্তের দিকে, জানার গন্ডী এড়িয়ে অপরিচয়ের উদ্দেশ্যে....

দিন রাত্রি পার হয়ে, জন্ম মরণ পার হয়ে, মাস, বর্ষ, মন্বন্তর, মহাযুগ পার হয়ে চ'লে যায়....তোমাদের মর্মর জীবন-স্বপ্ন শেওলা-ছাতার দলে ভ'রে আসে, পথ আমার তখনও ফুরোয় না....চলে..চলে....চলে.....এগিয়েই চলে....

অনির্বাণ তার বীণা শোনা শুধু অনন্ত কাল আর অনন্ত আকাশ...

সে পথের বিচিত্র আনন্দ-যাত্রার অদৃশ্য তিলক তোমার ললাটে পরিয়েই তো তোমায় ঘরছাড়া ক'রে এনেছি!....

চল এগিয়ে যাই।

অপরাজিত

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

দুপুর প্রায় গড়াইয়া গিয়াছে। রায়চৌধুরীদের বাড়ির বড় ফটকে রবিবাসরীয় ভিখারীদের ভিড় এখনও ভাঙে নাই। বীরু মুহুরীর উপর ভিখারীর চাউল দিবার ভার আছে, কিন্তু ভিখারীদের মধ্যে পর্যন্ত অনেকে সন্দেহ করে যে, জমাদার শম্ভুনাথ সিংহের সঙ্গে যোগ-সাজসের ফলে তাহারা ন্যায্য প্রাপ্য হইতে প্রতিবারই বঞ্চিত হইতেছে। ইহা লইয়া তাহাদের ঝগড়া দ্বন্দ্ব কোনকালেই মেটে নাই। শেষ পর্যন্ত দারোয়ানেরা রাগিয়া ওঠে, রামনিহোরা সিং দু চারজনকে গলাধাক্কা দিতে যায়। তখন হয় বুড়ো খাজাঞ্চি মহাশয়, নয়তো গিরীশ গোমস্তা আসিয়া ব্যাপারটা মিটাইয়া দেয়। প্রায় কোন রবিবারই ভিখারী-বিদায় ব্যাপারটা বিনা গোলমালে নিষ্পন্ন হয় না।

রান্না-বাড়িতে কি একটা লইয়া এতক্ষণ রাঁধুনীদের মধ্যে বচসা চলিতেছিল। রাঁধুনী বামনী মোক্ষদা থালায় নিজের ভাত সাজাইয়া লইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া সরিয়া পড়াতে সেখানকার গোলমালও একটুও কমিল। রাঁধুনীদের মধ্যে সর্বজয়ার বয়স অপেক্ষাকৃত কম—বড়লোকের বাড়ি—শহর-বাজার জায়গা, পাড়াগেঁয়ে মেয়ে বলিয়া ইহাদের এসব কথাবার্তায় সে বড় একটা থাকে না। তবুও মোক্ষদা বামনী তাহাকে মধ্যস্থ মানিয়া সদু-ঝিয়ের কি অবিচারের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিতেছিল। যখন যে দলে থাকে, তখন সে দলের মন যোগাইয়া কথা বলাটা সর্বজয়ার একটা অভ্যাস, এজন্য তাহার উপর কাহারও রাগ নাই। মোক্ষদা সরিয়া পড়ার পর সর্বজয়াও নিজের ভাত বাড়িয়া লইয়া তাহার থাকিবার ছোট ঘরটাতে ফিরিল। এ বাড়িতে প্রথম আসিয়া বছর-দুই ঠাকুরদালানের পাশের যে ঘরটাতে সে থাকিত, এ ঘরটা সেটা নয়; তাহারই সাম্‌নাসাম্‌নি পশ্চিমের বারান্দার কোণের ঘরটাতে সে এখন থাকে—সেই রকমই অন্ধকার, সেই ধরণেরই স্যাঁতসেঁতে মেজে, তবে সে ঘরটার মত ইহার পাশে আস্তাবল নাই, এই একটু সুবিধার কথা।

সর্বজয়া তখনও ভাল করিয়া ভাতের থালা ঘরের মেজেতে নামায় নাই, এমন সময় সদু-ঝি অগ্নিমূর্তি হইয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল।

—বলি, মুখি বাম্‌নী কী পরচের দিচ্ছিল তোমার কাছে শুনি? বদমায়েশ মাগী কোথাকার, আমার নামে যখন-তখন যার-তার কাছে লাগিয়ে করবে কি জিগ্যেস করি? ব'লে দেয় যেন বড় বৌরানীর কাছে—যায় যেন বলতে—তুমিও দেখে নিও ব'লে দিচ্ছি বাছা, আমি যদি গিন্নিমার কাছে ব'লে ওকে এ বাড়ি থেকে না তাড়াই তবে আমি রামনিধি ভড়ের মেয়ে নই—নই—নই—এই তোমায় বলে দিলুম।

সর্বজয়া হাসিমুখে বলিল, না সদু-মাসী, সে বললেই অমনি আমি শুনবো কেন? তা ছাড়া ওর স্বভাব তো জানো—ওই রকম, ওর মনে কোন রাগ নেই, মুখে হাউ-হাউ ক'রে বকে—এমন তো কিছু বলেও নি—আর তা ছাড়া আমি আজ দু'মাস দশ মাস তো নয়,

তোমায় দেখচি আজ তিন বছর—বল্‌লেই কি আর আমি শুনি? তিন বচ্ছর এ বাড়িতে ঢুকিচি, কৈ তোমার নামে—

সদু-ঝি একটু নরম হইয়া বলিল, অপু কোথায়, দেখচি নে—আজ তো রবিবার—ইস্কুল তো আজ বন্দ—

সর্বজয়া প্রতিদিন রান্নাঘরের কাজ সারিয়া আসিয়া তবে স্নান করে, তেলের বাটিতে বোতল হইতে নারিকেল তৈল ঢালিতে ঢালিতে বলিল, কোথায় বেরিয়েচে। ওই শেঠেদের বাড়ির পাশে কোন এক বন্ধুর বাড়ি, সেখানে ছুটির দিন যায় বেড়াতে। তাই বুঝি বেরিয়েচে। ছেলে তো নয়, একটা পাগল—দুপুর রোদ্দুর রোজ মাথার ওপর দিয়ে যাওয়া চাই তার। দাঁড়িয়ে কেন, বোসো না মাসী!

সদু বলিল, না, তুমি খাও, আর বসবো না—ভাবলুম. যাই কথাটা গিয়ে শুনে আসি, তাই এলুম। বোলো ওবেলা মুখি বাম্‌নীকে, একটু বুঝিয়ে দিও—খোকাবাবুর ভাতে সেই দইয়ের হাঁড়ি বৈ-করা মনে নেই বুঝি? সদুর পেটে অনেক কথা আছে, বুঝলে? দেখতেই ভালমানুষটি, বোলো বুঝিয়ে—

সদু-ঝি চলিয়া গেলে সর্বজয়া তেল মাখিতে বসিল। একটু পরে দোরের কাছে পায়ের শব্দে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিয়া বলিল, ওঃ, রোদ্দুরে ঘুরে তোর মুখ যে একেবারে রাঙা হয়ে গিয়েচে! বোস্ বোস্—আয়—ওমা আমার কি হবে!

অপু ঘরের ভিতর ঢুকিয়া একেবারে সোজা বিছানায় গিয়া একটা বালিশ টানিয়া শুইয়া পড়িল। হাত-পাখাখানা সজোরে নাড়িয়া মিনিটখানেক বাতাস খাইয়া লইয়া মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল, এখনও নাও নি? বেলা তো দুটো—

সর্বজয়া বলিল, ভাত খাবি দুটো?

অপু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না—

—খা না দুটোখানি? ডাল ছানার ডালনা আছে, সকালে শুধু তো ডাল আর বেগুন-ভাজা দিয়ে খেয়ে গিইচিস্। খিদে পেয়েচে আবার এতক্ষণ—

অপু বলিল, দেখি কেমন?

পরে সে বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া মেজেতে ভাতের থালার ঢাকনি উঠাইতে গেল। সর্বজয়া বলিল, ছুঁস নে, ছুঁস নে—থাক এখন, নেয়ে এসে দেখাচ্চি।

অপু হাসিয়া বলিল, ছুঁস নে ছুঁস নে কেন? কেন? আমি বুঝি মুচি? ব্রাহ্মণকে বুঝি অমনি বলতে আছে? পাপ হয় না?

—যা হয় হবে। ভারি আমার বামুন, সন্ধ্যে নেই, আহ্নিক নেই, বাচবিচের জ্ঞান নেই, এঁটো জ্ঞান নেই—ভারি আমার—

খানিকটা পরে সর্বজয়া স্নান সারিয়া আসিয়া ছেলেকে বলিল, আমার পাতে বসিস্ এখন।

অপু মুখে হাসি টিপিয়া বলিল, আমি কারুর পাতে বস্‌চি নে, ব্রাহ্মণের খেতে নেই কারুর এঁটো।

সর্বজয়া খাইতে বসিলে অপু মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া স্বর নিচু করিয়া বলিল, আজ এক জায়গার একটা চাকরির কথা বলেচে মা একজন। ইস্টিশানের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে, গাড়ি যখন এসে লাগবে—লোকেদের কাছে নতুন পাঁজি বিক্রী করতে হবে। পাঁচ টাকা মাইনে আর জলখাবার। ইস্কুলে পড়তে পড়তেও হবে। একজন বলছিল।

ছেলে যে চাকুরির কথা একে ওকে জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়ায় সর্বজয়া একথা জানে। চাকুরি হইলে সে মন্দ কথা নয়, কিন্তু অপুর মুখে চাকুরির কথা তাহার মোটেই ভাল লাগে না। সে তো এমন কিছু বড় হয় নাই। তাহা ছাড়া রৌদ্র আছে, বৃষ্টি আছে। শহর-বাজার জায়গা, পথে ঘাটে গাড়িঘোড়া—কত বিপদ! অত বিপদের মুখে ছেলেকে ছাড়িয়া দিতে সে রাজী নয়।

সর্বজয়া কথাটা তেমন গায়ে মাখিল না। ছেলেকে বলিল, আয় বোস্ পাতে—হয়েচে আমার। আয়—

অপু খাইতে বসিয়া বলিল, বেশ ভাল হয়, না মা? পাঁচ টাকা ক'রে মাইনে। তুমি জমিও। তারপর মাইনে বাড়াবে বলেচে। আমার বন্ধু সতীনদের বাড়ির পাশে খোলার ঘর ভাড়া আছে—দু'টাকা মাসে। সেখানে আমরা যাবো—এদের বাড়ি তোমার যা খাটুনি! ইস্কুল থেকে অমনি চলে যাবো ইস্টিশানে—খাবার সেখানেই খাবো। কেমন তো?

সর্বজয়া বলিল—রুটি ক'রে দেবো, বেঁধে নিয়ে যাস্।

দিন দশেক কাটিয়া গেল। আর কোন কথাবার্তা কোনো পক্ষেই উঠিল না। তাহার পর বড়বাবু হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং অত্যন্ত সঙ্গীন ও সঙ্কটাপন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া তাঁহার দিন-পনেরো কাটিল। বাড়িতে সকলের মুখে, ঝি-চাকর-দারোয়ানদের মুখে বড়বাবুর অসুখের বিভিন্ন অবস্থার কথা ছাড়া আর অন্য কথা নাই।

বড়বাবু সামলাইয়া উঠিবার দিনকয়েক পর একদিন অপু আসিয়া হাসি-হাসি মুখে মাকে বলিল, আজ মা, বুঝলে, একটা ঘুড়ির দোকানে বলেচে যদি আমি ব'সে ব'সে ঘুড়ি জুড়ে দি আঠা দিয়ে, তারা সাত টাকা ক'রে মাইনে আর রোজ দু'খানা করে ঘুড়ি দেবে। মস্ত ঘুড়ির দোকান, ঘুড়ি তৈরী ক'রে কলকাতায় চালান দেয়—সোমবারে যেতে বলেচে—

এ আশার দৃষ্টি, এ হাসি এ সব জিনিস সর্বজয়ার অপরিচিত নয়। দেশে নিশ্চিন্দিপুরের ভিটাতে থাকিতে কতদিন, দীর্ঘ পনেরো-ষোল বৎসর ধরিয়া মাঝে মাঝে কতবার স্বামীর মুখে এই ধরণের কথা সে শুনিয়াছে। এই সুর, এই কথার ভঙ্গি সে চেনে। এইবার একটা কিছু লাগিয়া যাইবে—এইবার ঘটিল, অল্পই দেরি। নিশ্চিন্দিপুরের যথাসর্বস্ব বিক্রয় করিয়া পথে বাহির হওয়ার মূলেও সেই সুরেরই মোহ।

চারি বৎসর এখনও পূর্ণ হয় নাই, এই দশা ইহার মধ্যে। কিন্তু সর্বজয়া চিনিয়াও চিনিল না। আজ বহুদিন ধরিয়া তাহার নিজের গৃহ বলিয়া কিছু নাই, অথচ নারীর অন্তর্নিহিত নীড় বাঁধিবার পিপাসাটুকু ভিতরে ভিতরে তাহাকে বড় পীড়া দেয়। অবলম্বন যতই তুচ্ছ ও ক্ষণভঙ্গুর হউক, মন তাহাই আঁকড়াইয়া ধরিতে ছুটিয়া যায়, নিজেকে ভুলাইতে চেষ্টা করে।

তাহা ছাড়া পুত্রের অনভিজ্ঞ মনের তরুণ উল্লাসকে পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতার চাপে শ্বাসরোধ করিয়া মারিতে মায়াও হয়।

সে বলিল, তা যাস্ না সোমবারে! বেশ তো,—দেখে আসিস্। হ্যাঁ শুনিস নি, মেজ বৌরানী যে শীগ্‌গির আসচেন, আজ শুনছিলাম রান্না-বাড়িতে—

অপুর চোখমুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, আগ্রহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল, কবে মা, কবে?

—এই মাসের মধ্যেই আসবেন। বড়বাবুর শরীর খারাপ, কাজ-টাজ দেখতে পারেন না, তাই মেজবাবু এসে থাকবেন দিন-কতক।

লীলা আসিবে কি-না একথা দুই-দুইবার মাকে বলি বলি করিয়াও কি জানি কেন সে শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। বাহিরে যাইতে যাইতে মনে মনে ভাবিল, তাদের বাড়ির সবাই আস্‌চে, মা বাবা আসচে, আর সে কি সেখানে পড়ে থাকবে? সে-ও আসবে —ঠিক আসবে।

পরদিন সে স্কুল হইতে ফিরিয়া তাহাদের ঘরটাতে ঢুকিতেই তাহার মা বলিল, অপু, আগে খাবার খেয়ে নে। আজ একখানা চিঠি এসেচে, দেখাচ্ছি।

অপু বিস্মিতমুখে বলিল, চিঠি? কোথায়? কে দিয়েচে মা?

কাশীতে তাহার বাবার মৃত্যুর পর হইতে এ পর্যন্ত আজ আড়াই বৎসরের উপর এ বাড়িতে তাহারা আসিয়াছে, কই, কেহ তো একখানা পোস্টকার্ডে একছত্র লিখিয়া তাহাদের খোঁজ করে নাই? লোকের যে পত্র আসে, একথা তাহারা তো ভুলিয়াই গিয়াছে!

সে বলিল, কই দেখি?

পত্র—তা আবার খামে! খামটার উপরে মায়ের নাম লেখা! সে তাড়াতাড়ি পত্রখানা খাম হইতে বাহির করিয়া অধীর আগ্রহের সহিত সেখানাকে পড়িতে লাগিল। পড়া শেষ করিয়া বুঝিতে-না-পারার দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, ভবতারণ চক্রবর্তী কে মা?—পরে পত্রের উপরকার ঠিকানাটা আর একবার দেখিয়া বলিল, কাশী থেকে লিখেচে।

সর্বজয়া বলিল, তুই তো ওঁকে নিশ্চিন্দিপুরে দেখেচিস্!—সেই সেবার গেলেন, দুগ্‌গাকে পুতুলের বাক্স কিনে দিয়ে গেলেন, তুই তখন সাত বছরের। মনে নেই তোর? তিনদিন ছিলেন আমাদের বাড়ি।

—জানি মা, দিদি বলতো তোমার জ্যাঠামশায় হন—না? তা এতদিন তো আর কোনও—

—আপন নয়, দূর সম্পর্কের। জ্যাঠামশায় তো দেশে বড়-একটা থাকতেন না, কাশী-গয়া, ঠাকুর-দেবতার জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন, এখনও বেড়ান ওঁদের দেশ হচ্চে মনসাপোতা, আড়ংঘাটার কাছে। সেখেন থেকে ক্রোশ দুই—সেবার আড়ংঘাটায় যুগল দেখতে গিয়ে ওঁদের বাড়ি গিয়ে ছিলাম দু'দিন। বাড়িতে মেয়ে-জামাই থাকত। সে মেয়ে-জামাই তো লিখেচেন মারা গিয়েচে—ছেলেপিলে কারুর নেই—

অপু বলিল, হ্যাঁ, তাই তো লিখেচেন। নিশ্চিন্দিপুরে গিয়ে আমাদের খোঁজ করেচেন। সেখানে শুনেচেন কাশী গিইচি। তারপর কাশীতে গিয়ে আমাদের সব খবর জেনেচেন। এখানকার ঠিকানা নিয়েচেন বোধ হয় রামকৃষ্ণ মিশন থেকে।

সর্বজয়া হাসিয়া বলিল—আমি দুপুরবেলা খেয়ে একটু বলি গড়াই—ক্ষেমিঝি বললে তোমার একখানা চিঠি আছে। হাতে নিয়ে দেখি আমার নাম—আমি তো অবাক হয়ে গেলাম। তারপর খুলে পড়ে দেখি এই—নিতে আসবেন লিখেচেন শীগ্‌গির। দ্যাখ্ দিকি, কবে আসবেন লেখা আছে কিছু?

অপু বলিল, বেশ হয়, না মা? এদের এখেনে একদণ্ড ভাল লাগে না। তোমার খাটুনিটা কমে—সেই সকালে উঠে রান্না-বাড়ি ঢোকো, আর দুটো তিনটে—

ব্যাপারটা এখনও সর্বজয়া বিশ্বাস করে নাই। আবার গৃহ মিলিবে, আশ্রয় মিলিবে, নিজের মনোমত ঘর গড়া চলিবে! বড়লোকের বাড়ির এ রাঁধুনীবৃত্তি, এ ছন্নছাড়া জীবনযাত্রায় কি এতদিনে—বিশ্বাস হয় না। অদৃষ্ট তেমন নয় বলিয়া ভয় করে।

তাহার পর দু'জনে মিলিয়া নানা কথাবার্তা চলিল। জ্যাঠামশায় কি রকম লোক, সেখানে যাওয়া ঘটিলে কেমন হয়,—নানা কথা উঠিবার সময় অপু বলিল—শেঠেদের বাড়ির পাশে কাঠগোলায় পুতুলনাচ হবে একটু পরে। দেখে আসবো মা?

—সকাল সকাল ফিরবি, যেন ফটক বন্ধ ক'রে দেয় না, দেখিস—

পথে যাইতে যাইতে খুশিতে তাহার গা কেমন করিতে লাগিল। মন যেন শোলার মত হাল্‌কা। মুক্তি, এতদিন পরে মুক্তি! কিন্তু লীলা যে আসিতেছে? পুতুলনাচের আসরে বসিয়া কেবলই লীলার কথা মনে হইতে লাগিল। লীলা আসিয়া তাহার সহিত মিশিবে তো? হয়ত এখন বড় হইয়াছে, হয়ত আর তাহার সঙ্গে কথা বলিবে না।

পুতুলনাচ আরম্ভ হইতে অনেক দেরি হইয়া গেল। না দেখিয়াও সে যাইতে পারিল না। অনেক রাত্রে যখন আসর ভাঙিয়া গেল, তখন তাহার মনে পড়িল, এত রাত্রে বাড়ি ঢোকা যাইবে না, ফটক বন্ধ করিয়া দিয়াছে, বড়লোকের বাড়ির দারোয়ানরা কেহ তাহার জন্য গরজ করিয়া ফটক খুলিয়া দিবে না। সঙ্গে সঙ্গে বড় ভয়ও হইল। রাত্রিতে এ রকম একা সে বাড়ির বাহিরে কাটায় নাই। কোথায় এখন সে থাকে? মা-ই বা কি বলিবে!

আসরের সব লোক চলিয়া গেল। আসরের কোণে একটা পান-লেমনেডের দোকানে তখনও বেচা-কেনা চলিতেছে। সেখানে একটা কাঠের বাক্সের উপর সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তারপর কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে জানে না, ঘুম ভাঙিয়া দেখিল ভোর হইয়া গিয়াছে, পথে লোক চলাচল আরম্ভ হইয়াছে।

সে একটু বেলা করিয়া বাড়ি ফিরিল। ফটকের কাছে বাড়ির গাড়ি দুইখানি তৈয়ার হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। দেউড়িতে ঢুকিয়া খানিকটা আসিয়া দেখিল বাড়ির তিন-চার জন ছেলে সাজিয়া গুজিয়া কোথায় চলিয়াছে। নিজেদের ঘরের সামনে নিস্তারিণী ঝিকে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, মাসীমা, এত সকালে গাড়ি যাচ্ছে কোথায়? মেজবাবুরা কি আজকে আসবেন?

নিস্তারিণী বলিল, তাই তো শুনছি। কাল চিঠি এসেচে—শুধু মেজবাবু আর বৌরানী আসবেন, লীলা দিদিমণি এখন আসবে না—ইস্কুলের এগ্‌জামিন। সেই বড়দিনের সময় তবে আসবে। গিন্নীমা বলছিলেন বিকেলে—

অপুর মনটা একমুহূর্তে দমিয়া গেল। লীলা আসিবে না। বড়দিনের ছুটিতে আসিলেই বা কি—সে তো তাহার আগে এখান হইতে চলিয়া যাইবে। যাইবার আগে একবার দেখা হইয়া যাইত এই সময় আসিলে। কতদিন সে আসে নাই।

তাহার মা বলিল, বেশ ছেলে তো, কোথায় ছিলি রাত্তিরে? আমার ভেবে সারারাত চোখের পাতা বোজে নি কাল।

অপু বলিল, রাত বেশী হয়ে গেল, ফটক বন্ধ ক'রে দেবে জানি, তাই আমার এক বন্ধু ছিল, আমার সঙ্গে পড়ে, তাদেরই বাড়িতে—। পরে হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, না মা, সেখানে পানের দোকানে একটা কেরোসিন কাঠের বাক্স পড়ে ছিল, তার উপর শুয়ে—

সর্বজয়া বলিল ওমা, আমার কি হবে! এই সারারাত ঠাণ্ডায় সেখেনে—লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, যেও তুমি ফের কোনদিন সন্ধ্যের পর কোথাও—তোমার বড় ইয়ে হয়েচে, না?

অপু হাসিয়া বলিল—তা আমি কি ক'রে ঢুকবো বলো না? ফটক ভেঙে ঢুকবো?

রাগটা একটু কমিয়া আসিলে সর্বজয়া বলিল—তারপর জ্যাঠামশায় তো কাল এসেচেন। তুই বেরিয়ে গেলে একটু পরেই এলেন, তোর খোঁজ করলেন, আজ ওবেলা আবার আসবেন। বললেন, এখেনে কোথায় তাঁর জানাশুনো লোক আছে, তাদের বাড়ি থাকবেন। এদের বাড়ি থাকবার অসুবিধে—পরশু নিয়ে যেতে চাচ্চেন।

অপু বলিল, সত্যি? কি কি বল না মা, কি সব কথা হ'ল?

আগ্রহে অপু মায়ের পাশে চৌকির ধারে বসিয়া পড়িয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিল। দু'জনের অনেক কথাবার্তা হইল। জ্যাঠামশায় বলিয়াছেন, তাঁহার আর কেহ নাই, ইহাদেরই উপর সব ভার দিয়া তিনি কাশী যাইবেন। অনেকদিন পরে সংসার পাতিবার আশায় সর্বজয়া আনন্দে উৎফুল্ল। ইহাদের বাড়ি হইতে নানা টুকটাক্ গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় জিনিস নানা সময় সংগ্রহ করিয়া সযত্নে রাখিয়া দিয়াছে। একটা বড় টিনের টেমি দেখাইয়া বলিল, সেখেনে রান্নাঘরে জালবো—কত বড় লম্পটা দেখেচিস? দু'পয়সার তেল ধরে।

দুপুরের পর সে মায়ের পাতে ভাত খাইতে বসিয়াছে, এমন সময় দুয়ারের সামনে কাহার ছায়া পড়িল। চাহিয়া দেখিয়া সে ভাতের গ্রাস আর মুখে তুলিতে পারিল না।

লীলা!

পরক্ষণেই লীলা হাসিমুখে ঘরে ঢুকিল; কিন্তু অপুর দিকে চাহিয়া সে যেন একটু অবাক হইয়া গেল। অপুকে যেন আর চেনা যায় না—সে তো দেখিতে বরাবরই সুন্দর, কিন্তু এই দেড় বৎসরে কি হইয়া উঠিয়াছে সে? কি গায়ের রং, কি মুখের শ্রী, কি সুন্দর স্বপ্ন-মাখা চোখদুটি! লীলার যেন একটু লজ্জা হইল। বলিল, উঃ, আগের চেয়ে মাথাতে কতবড় হয়ে গিয়েচ!

লীলার সম্বন্ধেও অপুর ঠিক সেই কথাই মনে হইল। এ যেন সে লীলা নয়, যাহার সঙ্গে সে দেড় বৎসর পূর্বে অবাধে মিলিয়া মিশিয়া কত গল্প ও খেলা করিয়াছে। তাহার তো মনে হয় না লীলার মত সুন্দরী মেয়ে সে কোথাও দেখিয়াছে—রাণুদিও নয়। খানিকক্ষণ সে যেন চোখ ফিরাইতে পারিল না।

দু'জনেই যেন একটু সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিল।

অপু বলিল, তুমি কি ক'রে এলে? আমি আজ সকালেও জিজ্ঞেস করিচি। নিস্তারিণী মাসী বললে, তুমি আসবে না, এখন স্কুলের ছুটি নেই—সেই বড়দিনের সময় নাকি আসবে?

লীলা বলিল, আমার কথা তোমার মনে ছিল?

—না, তা কেন? তারপর এতদিন পরে বুঝি—বেশ—একেবারে ডুমুরের ফুল—

—ডুমুরের ফুল আমি, না তুমি? খোকামণির ভাতের সময় তোমাকে যাওয়ার জন্যে চিঠি লেখালাম ঠাকুরমায়ের কাছে, এ বাড়ির সবাই গেল, যাও নি কেন?

অপু এসব কথা কিছু জানে না। তাহাকে কেহ বলে নাই। জিজ্ঞাসা করিল, খোকামণি কে?

লীলা বলিল, বাঃ আমার ভাই! জানো না?···এই এক বছরের হলো।

লীলার জন্য অপুর মনে একটু দুঃখ হইল। লীলা জানে না যাহাকে সে এত আগ্রহ করিয়া ভাইয়ের অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, এ বাড়িতে তাহার স্থান কোথায় বা অবস্থা কি। সে বলিল—দেড় বছর আসো নি—না? পড়চ কোন ক্লাসে?

লীলা তক্তপোশের কোণে বসিয়া পড়িল। বলিল, আমি আমার কথা কিছু বলবো না আগে—আগে তোমার কথা বলো। তোমার মা ভাল আছেন? তুমিও তো পড়ো—না?

—আমি এবারে মাইনর ক্লাসে উঠবো—পরে একটু গর্বিত মুখে বলিল, আর বছর ফার্স্ট হয়ে ক্লাসে উঠেচি, প্রাইজ দিয়েচে।

লীলা অপুর দিকে চাহিল। বেলা তিনটার কম নয়। এত বেলায় সে খাইতে বসিয়াছে? বিস্ময়ের সুরে বলিল, এখন খেতে বসেচ, এত বেলায়?

অপুর লজ্জা হইল। সে সকালে সরকারদের ঘরে বসিয়া খাইয়া স্কুলে যায়—শুধু ডাল-ভাত,—তাও শ্রীকণ্ঠ ঠাকুর বেগার-শোধ ভাবে দিয়া যায়, খাইয়া পেট ভরে না, স্কুলেই ক্ষুধা পায়, সেখান হইতে ফিরিয়া মায়ের পাতে ভাত ঢাকা থাকে, বৈকালে তাহাই খায়। আজ ছুটির দিন বলিয়া সকালেই মায়ের পাতে খাইতে বসিয়াছে।

অপু ভাল করিয়া উত্তর দিতে পারিল না বটে, কিন্তু লীলা ব্যাপারটা কতক না বুঝিল এমন নহে। ঘরের হীন আসবাব-পত্র, অপুর হীন বেশ—অবেলায় নিরুপকরণ দু'টি ভাত সাগ্রহে খাওয়া—লীলার কেমন যেন মনে বড় বিঁধিল। সে কোন কথা বলিল না।

অপু বলিল, তোমার সব বই এনেচ এখেনে? দেখাতে হবে আমাকে। ভাল গল্প কি ছবির বই নেই?

লীলা বলিল, তোমার জন্যে কিনে এনেচি আসবার সময়। তুমি গল্পের বই ভালোবাসো ব'লে একখানা 'সাগরের কথা' এনেচি, আরও দু-তিনখানা এনেচি। আনচি, তুমি খেয়ে ওঠো।

অপুর খাওয়া প্রায় শেষ হইয়াছিল, খুশিতে বাকীটা কোনো রকমে শেষ করিয়া উঠিয়া পড়িল। লীলা লক্ষ্য করিয়া দেখিল, সে পাতের সবটা এমন করিয়া খাইয়াছে, পাতে একটা দানাও পড়িয়া নাই। সঙ্গে সঙ্গে তাহার উপর লীলার কেমন একটা অপূর্ব মনের ভাব হইল—সে ধরণের অনুভূতি লীলার জীবনে এই প্রথম, আর কাহারও সম্পর্কে সে ধরণের কিছু তো কখনও হয় নাই।

একটু পরে লীলা অনেক বই আনিল। অপুর মনে হইল, লীলা কেমন করিয়া তাহার মনের কথাটি জানিয়া, সে যাহা পড়িতে জানিতে ভালবাসে সেই ধরণের বইগুলি আনিয়াছে। 'সাগরের কথা' বইখানাতে অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প। সাগরের তলায় বড় বড় পাহাড় আছে, আগ্নেয়গিরি আছে, প্রবাল নামক এক প্রকার প্রাণী আছে, দেখিতে গাছপালার মত—কোথায় এক মহাদেশ নাকি সমুদ্রের গর্ভে ডুবিয়া আছে—এই সব।

লীলা একখানা পুরাতন খাতা দেখাইল। তাহার ঝোঁক ছবি আঁকিবার দিকে; বলিল—সেই তোমায় একবার ফুলগাছ এঁকে দেখতে দিলাম মনে আছে? তারপর কত এঁকেচি দেখবে?

অপুর মনে হইল লীলার হাতের আঁকা আগের চেয়ে এখন ভাল হইয়াছে। সে নিজে একটা রেখা কখনো সোজা করিয়া টানিতে পারে না—ড্রইংগুলি দেখিতে দেখিতে লীলার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বেশ এঁকেচো তো। তোমাদের ইস্কুলে করায়, না এমনি আঁকো?

এতক্ষণ পরে অপুর মনে পড়িল লীলা কোন্ স্কুলে পড়ে, কোন্ ক্লাসে পড়ে। সে কথা কথা কিছুই জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। বলিল—তোমাদের কি ইস্কুল? এবার কোন্ ক্লাসে পড়চো?

—এবার মাইনর সেকেণ্ড ক্লাসে উঠেচি—গিরীন্দ্রমোহিনী গার্লস্ স্কুল—আমাদের বাড়ির পাশেই—

অপু বলিল, জিজ্ঞেস করবো?

লীলা হাসি মুখে ঘাড় নাড়িয়া চুপ করিয়া রহিল।

অপু বলিল, আচ্ছা বলো—চট্টগ্রাম কর্ণফুলির মোহনায়—কি ইংরেজি হবে?

লীলা ভাবিয়া বলিল, চিট্টাগং ইজ্ অন্ দি মাউথ অফ্ দি কর্ণফুলি।

অপু বলিল, ক'জন মাস্টার তোমাদের সেখেনে?

—আটজন, হেড মিস্ট্রেস্ এণ্ট্রান্স পাশ, আমাদের গ্রামার পড়ান। পরে সে বলিল—মা'র সঙ্গে দেখা করবে না?

—এখন যাবো, না একটু পরে যাবো? বিকেলে যাবো এখন, সেই ভাল।—তাহার পরে সে একটু থামিয়া বলিল, তুমি শোন নি লীলা, আমরা যে এখান থেকে চলে যাচ্ছি।

লীলা আশ্চর্য হইয়া অপুর দিকে চাহিল। বলিল—কোথায়?

—আমার এক দাদামশায় আছেন, তিনি এতদিন পরে আমাদের খোঁজ পেয়ে তাঁদের দেশের বাড়িতে নিয়ে যেতে এসেচেন।

অপু সংক্ষেপে সব বলিল।

লীলা বলিয়া উঠিল—চলে যাবে? বাঃ রে!

হয়তো সে কি আপত্তি করিতে যাইতেছিল, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিল, যাওয়া না-যাওয়ার উপর অপুর তো কোনও হাত নাই, কোনও কথাই এক্ষেত্রে বলা চলিতে পারে না।

খানিকক্ষণ কেহই কথা বলিল না।

লীলা বলিল, তুমি বেশ এখানে থেকে ইস্কুলে পড়ো না কেন? সেখানে কি ইস্কুল আছে? পড়বে কোথায়? সে তো পাড়াগাঁ।

—আমি থাক্‌তে পারি কিন্তু মা তো আমায় এখেনে রেখে থাক্‌তে পারবে না, নইলে আর কি—

—না হয় এক কাজ কর না কেন? কল্‌কাতায় আমাদের বাড়ি থেকে পড়বে। আমি মাকে বলবো, অপূর্ব আমাদের বাড়িতে থাক্‌বে; বেশ সুবিধে—আমাদের বাড়ির সামনে আজকাল ইলেক্‌ট্রিক ট্রাম হয়েছে—এঞ্জিন্‌ও নেই, ঘোড়াও নেই, এমনি চলে—তারের মধ্যে বিদ্যুৎ পোরা আছে, তাতে চলে।

—কি রকম গাড়ি? তারের ওপর দিয়ে চলে?

—একটা ডাণ্ডা আছে। তারে ঠেকে থাকে, তাতেই চলে। কলকাতা গেলে দেখবে এখন—ছ-সাত বছর হ'ল ইলেক্‌ট্রিক ট্রাম হয়েছে, আগে ঘোড়ায় টানতো—

আরও অনেকক্ষণ দু'জনের কথাবার্তা চলিল।

বৈকালে সর্বজয়ার জ্যাঠামশায় ভবতারণ চক্রবর্তী আসিলেন। অপুকে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। ঠিক করিলেন, দুইদিন পরে বুধবারের দিন লইয়া যাইবেন। অপু দু-একবার ভাবিল লীলার প্রস্তাবটা একবার মায়ের কাছে তোলে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কথাটা আর কার্যে পরিণত হইল না।

সকালের রৌদ্র ফুটিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই উলা স্টেশনে গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল। এখান হইতেই মনসাপোতা যাইবার সুবিধা। ভবতারণ চক্রবর্তী পূর্ব হইতেই পত্র দিয়া গোরুর গাড়ির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। কাল রাত্রে একটু কষ্ট হইয়াছিল। এক্সপ্রেস্ ট্রেনখানা দেরিতে পৌছানোর জন্য ব্যাণ্ডেল হইতে নৈহাটীর গাড়িখানা পাওয়া যায় নাই। ফলে বেশী রাত্রে নৈহাটীতে আসিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল।

সারারাত্রি জাগরণের ফলে অপু কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল সে জানে না। চক্রবর্তী মহাশয়ের ডাকে উঠিয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল একটা স্টেশনের প্লাটফর্মে গাড়ি লাগিয়াছে। সেখানেই তাদের নামিতে হইবে। কুলীরা ইতিমধ্যে তাহাদের কিছু জিনিসপত্র নামাইয়াছে।

গোরুর গাড়িতে উঠিয়া চক্রবর্তী মহাশয় অনবরত তামাক টানিতে লাগিলেন। বয়স সত্তরের কাছাকাছি হইবে, একহারা পাতলা চেহারা, মুখে দাড়ি গোঁফ নাই, মাথার চুল সব পাকা। বলিলেন—জয়া, ঘুম পাচ্ছে না তো ?

সর্বজয়া হাসিয়া বলিল, আমি তো নৈহাটীতে ঘুমিয়ে নিইচি আধঘণ্টা, অপুও ঘুমিয়েচে। আপনারই ঘুম হয় নি—

চক্রবর্তী মহাশয় খুব খানিকটা কাশিয়া লইয়া বলিলেন,—ওঃ, সোজা খোঁজটা করেচি তোদের! আর-বছর বোশেখে মেয়েটা গেল মারা, হরিধন তো তার আগেই। এই বয়সে হাত পুড়িয়ে রেঁধেও খেতে হয়েচে,—কেউ নেই সংসারে। তাই ভাবলাম হরিহর বাবাজীর তো নিশ্চিন্দিপুর থেকে উঠে যাবার ইচ্ছে ছিল অনেকদিন থেকেই, যাই এখানেই নিয়ে আসি। একটু ধানের জমি আছে, গৃহদেবতার সেবাটাও হবে! গ্রামে ব্রাহ্মণ তেমন নেই,—আর আমি তো এখানে থাকব না। আমি একটু কিছু ঠিক ক'রে দিয়েই কাশী চলে যাবো। একরকম ক'রে হরিহর নেবেন চালিয়ে। তাই গেলাম নিশ্চিন্দিপুর—

সর্বজয়া বলিল, আপনি বুঝি আমাদের কাশী যাওয়ার কথা শোনেন নি ?

—তা কি ক'রে শুনবো ? তোমাদের দেশে গিয়ে শুনলাম তোমরা নেই সেখানে। কেউ তোমাদের কথা বলতে পারে না—সবাই বলে তারা এখান থেকে বেচে-কিনে তিন-চার বছর হ'ল কাশী চলে গিয়েচে। তখন কাশী যাই। কাশী আমি আছি আজ দশ বছর। খুঁজতেই সব বেরিয়ে পড়লো। হিসেব ক'রে দেখলাম হরিহর যখন মারা যান, তখন আমিও কাশীতেই আছি, অথচ কখনো দেখাশুনো হয় নি, তা হলে কি আর—

অপু আগ্রহের সুরে বলিল, নিশ্চিন্দিপুরে আমাদের বাড়িটা কেমন আছে, দাদামশায় ?

—সেদিকে আমি গেলাম কৈ! পথেই সব খবর পেলাম কি-না। আমি আর সেখানে দাঁড়াই নি। কেউ ঠিকানা দিতে পারলে না। ভুবন মুখুয্যে মশায় অবিশ্যি খাওয়া-দাওয়া করতে বললেন, আর তোমার বাপের একশো নিন্দে—বুদ্ধি নেই, সাংসারিক জ্ঞান নেই—হেন তেন। যাক্ সে সব কথা, তোমরা এলে ভাল হ'ল। যে ক'ঘর যজমান আছে তোমাদের বছর তাতে কেটে যাবে। পাশেই তেলিরা বেশ অবস্থাপন্ন, তাদের ঠাকুর প্রতিষ্ঠা আছে। আমি পুজোটুজো করতাম অবিশ্যি, সেটাও হাতে নিতে হবে ক্রমে। তোমাদের নিজেদের জিনিস দেখে শুনে নিতে হবে—

উলা গ্রামের মধ্যেও খুব বন, গ্রাম ছাড়াইয়া মাঠের পথেও বনঝোপ। সূর্য আকাশে অনেকখানি উঠিয়া গিয়াছে। চারিধারে প্রভাতী রৌদ্রের মেলা, পথের ধারে বনতুলসীর জঙ্গল, মাঠের ঘাসে এখনও স্থানে স্থানে শিশির জমিয়া আছে, কোন্ রূপকথার দেশের মাকড়সা যেন রূপালী জাল বুনিয়া রাখিয়াছে। মাঝে মাঝে কিসের একটা গন্ধ, বিশেষ কোনো ফুল ফলের গন্ধ নয় কিন্তু। শিশিরসিক্ত ঘাস, সকালের বাতাস, অড়হরের ক্ষেত, এখানে ওখানে বনজ গাছপালা, সবশুদ্ধ মিলাইয়া একটা সুন্দর সুগন্ধ।

অনেক দিন পরে এই সব গাছপালার প্রথম দর্শনে অপুর প্রাণে একটা উল্লাসের ঢেউ

উঠিল। অপূর্ব, অদ্ভুত, সুতীব্র; মিনমিনে ধরণের নয়, পান্‌সে পান্‌সে জোলো ধরণের নয়। অপুর মন সে শ্রেণীরই নয় আদৌ, তাহা সেই শ্রেণীর যাহা জীবনের সকল অবদানকে, ঐশ্বর্যকে প্রাণপণে নিংড়াইয়া চুষিয়া আঁটিসার করিয়া খাইবার ক্ষমতা রাখে। অল্পেই নাচিয়া ওঠে, অল্পে দমিয়াও যায়—যদিও পুনরায় নাচিয়া উঠিতে বেশী বিলম্ব করে না।

মনসাপোতা গ্রামে যখন গাড়ি ঢুকিল তখন বেলা দুপুর। সর্বজয়া ছইয়ের পিছন দিকের ফাঁক দিয়া চাহিয়া দেখিতেছে তাহার নূতনতম জীবনযাত্রা আরম্ভ করিবার স্থানটা কি রকম। তাহার মনে হইল গ্রামটাতে লোকের বাস একটু বেশী, একটু যেন বেশী ঠেসাঠেসি, ফাঁকা জায়গা বেশী নাই, গ্রামের মধ্যে বেশী বনজঙ্গলের বালাইও নাই। একটা কাহাদের বাড়ি, বাহির-বাটীর দাওয়ায় জনকয়েক লোক গল্প করিতেছিল, গোরুর গাড়িতে কাহারা আসিতেছে দেখিয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। উঠানে বাঁশের আলনায় মাছ ধরিবার জাল শুকাইতে দিয়াছে। বোধ হয় গ্রামের জেলেপাড়া।

আরও খানিক গিয়া গাড়ি দাঁড়াইল। ছোট্ট উঠানের সামনে একখানি মাঝারি গোছের চালা ঘর, দু'খানা ছোট্ট দোচালা ঘর, উঠানে একটা পেয়ারা গাছ ও একপাশে একটা পাতকুয়া। বাড়ির পিছনে একটা তেঁতুল গাছ—তাহার ডালপালা বড় চালাঘরখানার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। সামনের উঠানটা বাঁশের জাফরি দিয়া ঘেরা। চক্রবর্তী মহাশয় গাড়ি হইতে নামিলেন। অপু মা'কে হাত ধরিয়া নামাইল।

চক্রবর্তী মহাশয় আসিবার সময় যে তেলিবাড়ির উল্লেখ করিয়াছিলেন, বৈকালের দিকে তাহাদের বাড়ির সকলে দেখিতে আসিল। তেলি-গিন্নী খুব মোটা, রং বেজায় কালো। সঙ্গে চার পাঁচটি ছেলেমেয়ে, দু'টি পুত্রবধূ। প্রায় সকলেরই হাতে মোটা মোটা সোনার অনন্ত দেখিয়া সর্বজয়ার মন সম্ভ্রমে পূর্ণ হইয়া উঠিল। ঘরের ভিতর হইতে দু'খানা কুশাসন বাহির করিয়া আনিয়া সলজ্জভাবে বলিল, আসুন আসুন, বসুন।

তেলি-গিন্নী পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিলে ছেলেমেয়ে ও পুত্রবধূরাও দেখাদেখি তাহাই করিল। তেলি-গিন্নী হাসিমুখে বলিল, দুপুরবেলা এলেন মা-ঠাকরুণ একবার বলি যাই। এই যে পাশেই বাড়ি, তা আসতে পেলাম না। মেজছেলে এল গোয়াড়ী থেকে—গোয়াড়ী দোকান আছে কি-না! মেজ বৌমার মেয়েটা ন্যাওটো, মা দেখতে ফুরসৎ পায় না, দুপুরবেলা আমাকে একেবারে পেয়ে বসে—ঘুম পাড়াতে পাড়াতে বেলা দুটো। ঘুংড়ি কাশি, গুপী কবরেজ বলেছে ময়ূরপুচ্ছ পুড়িয়ে মধু দিয়ে খাওয়াতে। তাই কি সোজাসুজি পুড়্‌লে হবে মা, চৌষট্টি কৈজৎ—কাঁসার ঘটির মধ্যে পোরো, তা ঘুঁটের জাল করো, তা ঢিমে আঁচে চড়াও। হ্যাঁরে হাজরী, ভোঁদা গোয়াড়ী থেকে কাল মধু এনেছে কি-না জানিস্?

আঠারো উনিশ বছরের একটি মেয়ে ঘাড় নাড়িয়া কথার উত্তর দিবার পূর্বেই তেলি-গিন্নী তাহাকে দেখাইয়া বলিল, ওইটি আমার মেজ মেয়ে—বহরমপুরে বিয়ে দিয়েছি। জামাই বড়বাজারে এদের দোকানে কাজকর্ম করেন। নিজেদেরও গোলা, দোকান রয়েছে কালনা—বেয়াই সেখানে দেখেন শোনেন। কিন্তু হলে হবে কি মা—এমন কথা ভূভারতে কেউ কখনো

শোনে নি। দুই ছেলে, নাতি নাতনী, বেয়ান মারা গেলেন ভাদ্দর মাসে, মাঘ মাসে বুড়ো আবার বিয়ে ক'রে আনলে। এখন ছেলেদের সব দিয়েচে ভেন্ন করে। জামাইয়ের মুশকিল, ছেলেমানুষ—তা উনি বলেচেন, তা এখন তুমি বাবা আমাদের দোকানেই থাকো, কাজ দেখো শোনো শেখো, ব্যবসাদারের ছেলে, তারপর একটা হিল্লে লাগিয়ে দেওয়া যাবে।

বড় পুত্রবধূ এতক্ষণ কথা বলে নাই। সে ইহাদের মত হুড্ বার্নিস নয়, বেশ টক্‌টকে রং। বোধ হয় শহর-অঞ্চলের মেয়ে। এ-দলের মধ্যে সে-ই সুন্দরী, বয়স বাইশ-তেইশ হইবে। সে নীচের ঠোঁটের কেমন চমৎকার এক প্রকার ভঙ্গি করিয়া বলিল, এঁরা এসেচেন সারাদিন খাওয়া-দাওয়া হয় নি, এঁদের আজকের সব ব্যবস্থা তো করে দিতে হবে? বেলাও তো গিয়েছে, এঁরা আবার রান্না করবেন।

এই সময় অপু বাড়ির উঠানে ঢুকিল। সে আসিয়াই গ্রামখানা বেড়াইয়া দেখিতে বাহিরে গিয়াছিল। তেলি-গিন্নী বলিল—কে মা-ঠাকরুণ? ছেলে বুঝি? এই এক ছেলে? বাঃ, চেহারা যেন রাজপুত্তুর।

সকলেরই চোখ তাহার উপর পড়িল। অপু উঠানে ঢুকিয়াই এতগুলি অপরিচিতের সম্মুখে পড়িয়া কিছু লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। পাশ কাটাইয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিতেছিল, তাহার মা বলিল, দাঁড়া না এখেনে। ভারি লাজুক ছেলে মা—এখন ওইটুকুতে দাঁড়িয়েচে—আর এক মেয়ে ছিল, তা—সর্বজয়ার গলার স্বর ভারী হইয়া আসিল। গিন্নী ও বড় পুত্রবধূ একসঙ্গে বলিল, নেই, হ্যাঁ মা? সর্বজয়া বলিল, সে কি মেয়ে মা! আমায় ছলতে এসেছিল, কি চুল, কি চোখ, কি মিষ্টি কথা? বকো-ঝকো, গাল দাও, মা'র মুখে উঁচু কথাটি কেউ শোনে নি কোন দিন।

ছোটবৌ বলিল, কত বয়সে গেল মা?

—এই তেরোয় পড়েই—ভাদ্রমাসে তেরোয় পড়ল, আশ্বিন মাসের ৭ই—দেখতে দেখতে চার বছর হয়ে গেল।

তেলি-গিন্নি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া কহিল—আহা মা, তা কি করবে বলো, সংসারে থাকতে গেলে সবই···তাই উনি বল্‌লেন—আমি বল্‌লাম আসুন তাঁরা—চক্কত্তি মশায় পূজা-আচ্চা করেন—তা উনি মেয়েজামাই মারা যাওয়ার পর থেকে বড় থাকেন না। গাঁয়ে একঘর বামুন নেই—কাজকর্মে সেই গোয়াড়ী দৌড়তে হয়—থাকলে ভালো! বীরভূম না বাঁকুড়ো জেলা থেকে সেবার এল কি চাটুয্যে। কি নামটা রে পাঁচী? বললে বাস করবো। বাড়ি থেকে চালডাল সিধে পাঠিয়ে দিই। তিন মাস রইল, বলে আজ ছেলেপিলে আন্‌ব—কাল ছেলেপিলে আন্‌ব—ও মা এক মাগী গোয়ালার মেয়ে উঠোন-ঝাঁট দিত আমাদের, তা বলি বামুন মানুষ এসেছে, ওঁরও কাজটা করে দিস। ঘেন্নার কথা শোনো মা, আর বছর শিবরাত্রির দিন—তাকে নিয়ে—

বউ-দু'টি ও মেয়েরা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সর্বজয়া অবাক্ হইয়া বলিল, পালালো নাকি?

—পালালো কি এমন তেমন পালালো মা? সেই সঙ্গে আমাদের এক প্রস্ত বাসন। কিছুই জানি নে মা, সব নিজের ঘর থেকে···বলি আহা বামুন এসেচে—সঙ্ক, আছে বাড়তি। তা সেই বাসন সবশুদ্ধ নিয়ে দু'জনে নিউদ্দিশ! যাক্ সে সব কথা মা, উঠি তাহলে আজ! রান্নার কি আছে না-আছে বলো মা, সব দিই বন্দোবস্ত করে।

আট দশ দিন কাটিয়া গেল; সর্বজয়া ঘরবাড়ি মনের মত করিয়া সাজাইয়াছে। দেওয়াল উঠান নিকাইয়া পুঁছিয়া লইয়াছে। নিজস্ব ঘরদোর অনেকদিন ছিল না, নিশ্চিন্দিপুর ছাড়িয়া অবধিই নাই—এতদিন পরে একটা সংসারের সমস্ত ভার হাতে পাইয়া সে গত চার বৎসরের সঞ্চিত সাধ মিটাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

জ্যাঠামশায় লোক মন্দ নহেন বটে, কিন্তু শীঘ্রই সর্বজয়া দেখিল তিনি একটু বেশী কৃপণ। ক্রমে ইহাও বোঝা গেল—তিনি যে নিছক পরার্থপরতার ঝোঁকেই ইহাদের এখানে আনিয়াছেন তাহা নহে, অনেকটা আনিয়াছেন নিজের গরজে। তেলিদের প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরটি পূজা না করিলে সংসার ভাল রূপ চলে না, তাহাদের বার্ষিক বৃত্তিও বন্ধ হইয়া যায়। এই বার্ষিক বৃত্তি সম্বল করিয়াই তিনি কাশী থাকেন। পাকা লোক, অনেক ভাবিয়াচিন্তিয়া তবে তিনি ইহাদের আনিয়া তুলিয়াছেন। সর্বজয়াকে প্রায়ই বলেন—জয়া, তোর ছেলেকে বল কাজকর্ম সব দেখে নিতে। আমার মেয়াদ আর কত দিন? ওদের বাড়ির কাজটা দিক না আরম্ভ ক'রে—সিধের চালেই তো মাস চলে যাবে।

সর্বজয়া তাহাতে খুব খুশী।

সকলের তাগিদে শীঘ্রই অপু পূজার কাজ আরম্ভ করিল—দু'টি একটি করিয়া কাজকর্ম আরম্ভ হইতে হইতে ক্রমে এপাড়ায় ওপাড়ায় অনেক বাড়ি হইতেই লক্ষ্মীপূজায় মাকাল পূজায় তাহার ডাক আসে। অপু মহা উৎসাহে প্রাতঃস্নান করিয়া উপনয়নের চেলীর কাপড় পরিয়া নিজের টিনের বাক্সের বাংলা নিত্যকর্মপদ্ধতিখানা হাতে লইয়া পূজা করিতে যায়। পূজা করিতে বসিয়া আনাড়ীর মত কোন্ অনুষ্ঠান করিতে কোন্ অনুষ্ঠান করে। পূজার কোন পদ্ধতি জানে না—বার বার বইয়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখে কি লেখা আছে—'বজ্রায় হুং' বলিবার পর শিবের মাথায় বজ্রের কি গতি করিতে হইবে—ওঁ ব্রহ্মপৃষ্ঠ ঋষি সুতলছন্দঃ কূর্মো দেবতা' বলিয়া কোন্ মুদ্রায় আসনের কোণ কি ভাবে ধরিতে হইবে—কোন রকমে গোঁজামিল দিয়া কাজ সারিবার মত পটুত্বও তাহার আয়ত্ত হয় নাই, সুতরাং পদে পদে আনাড়ীপনাটুকু ধরা পড়ে।

একদিন সেটুকু বেশী করিয়া ধরা পড়িল ওপাড়ার সরকারদের বাড়ি। যে ব্রাহ্মণ তাহাদের বাড়িতে পূজা করিত, সে কি জন্য রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, গৃহদেবতা নারায়ণের পূজার জন্য তাহাদের লোক অপুকে ডাকিয়া লইয়া গেল। বাড়ির বড় মেয়ে নিরুপমা পূজার যোগাড় করিয়া দিতেছিল, চৌদ্দ বছরের ছেলেকে চেলী পরিয়া পুঁথি বগলে গম্ভীর মুখে আসিতে দেখিয়া সে একটু অবাক্ হইল। জিজ্ঞাসা করিল, তুমি পুজো করতে পারবে? কি নাম

তোমার? চক্কত্তি মশায় তোমার কে হন? মুখচোরা অপুর মুখে বেশী কথা যোগাইল না, লাজুক মুখে সে গিয়া আনাড়ীর মত আসনের উপর বসিল।

পূজা কিছুদূর অগ্রসর হইতে না হইতে নিরুপমার কাছে পূজারীর বিদ্যা ধরা পড়িয়া গেল। নিরুপমা হাসিয়া বলিল, ওকি? ঠাকুর নামিয়ে আগে নাইয়ে নাও, তবে তো তুলসী দেবে?—অপু থতমত খাইয়া ঠাকুর নামাইতে গেল।

নিরুপমা বসিয়া পড়িয়া বলিল—উহু, তাড়াতাড়ি ক'রো না। এই টাটে আগে ঠাকুর নামাও—আচ্ছা, এখন বড় তাম্র কুণ্ডুতে জল ঢালো—

অপু ঝুঁকিয়া পড়িয়া বইয়ের পাতা উল্টাইয়া স্নানের মন্ত্র খুঁজিতে লাগিল। তুলসীপত্র পরাইয়া শালগ্রামকে সিংহাসনে উঠাইতে যাইতেছে, নিরুপমা বলিল, ওকি? তুলসীপাতা উপুড় ক'রে পরাতে হয় বুঝি? চিৎ ক'রে পরাও—

ঘামে রাঙামুখ হইয়া কোন রকমে পূজা সাঙ্গ করিয়া অপু চলিয়া আসিতেছিল, নিরুপমা ও বাড়ির অন্যান্য মেয়েরা তাহাকে আসন পাতিয়া বসাইয়া ভোগের ফলমূল ও সন্দেশ জলযোগ করাইয়া তবে ছাড়িয়া দিল।

মাসখানেক কাটিয়া গেল।

অপুর কেমন মনে হয় নিশ্চিন্দিপুরের সে অপূর্ব মায়ারূপ এখানকার কিছুতেই নাই। এই গ্রামে নদী নাই, মাঠ থাকিলেও সে মাঠ নাই, লোকজন বেশী, গ্রামের মধ্যেও লোকজন বেশী। নিশ্চিন্দিপুরের সেই উদার স্বপ্নমাখানো মাঠ, সে নদীতীর এখানে নাই, তাদের দেশের মত গাছপালা, অত ফুলফল, পাখি, নিশ্চিন্দিপুরের সে অপূর্ব বন-বৈচিত্র্য, কোথায় সে সব? কোথায় সে নিবিড় পুষ্পিত ছাতিম বন, ডালে ডালে সোনার সিঁদুর ছড়ানো সন্ধ্যা?

সরকার বাড়ি হইতে আজকাল প্রায়ই পূজা করিবার ডাক আসে। শান্তস্বভাব ও সুন্দর চেহারার গুণে অপুকেই আগে চায়। বিশেষ বারব্রতের দিনে পূজাপত্র সারিয়া অনেক বেলায় সে ধামা করিয়া নানাবাড়ির পূজার নৈবেদ্য ও চাল-কলা বহিয়া বাড়ি আনে। সর্বজয়া হাসিমুখে বলে, ওঃ, আজ চাল তো অনেক হয়েচে!—দেখি! সন্দেশ কাদের বাড়ির নৈবিদ্যিতে দিলে রে!

অপু খুশীর সহিত দেখাইয়া বলে, কুণ্ডুবাড়ি থেকে কেমন একছড়া কলা দিয়েচে, দেখেচো মা?

সর্বজয়া বলে, এবার বোধ হয় ভগবান মুখ তুলে চেয়েচেন, এদের ঘরে থাকা যাক্, গিন্নী লোক বড় ভালো। মেজছেলের শ্বশুরবাড়ি থেকে তত্ত্ব পাঠিয়েচে—অসময়ের আম—অমনি আমার এখানে পাঠিয়ে দিয়েচে—খাস্ এখন দুধ দিয়ে।

এত নানারকমের ভাল জিনিস সর্বজয়া কখনো নিজের আয়ত্তের মধ্যে পায় নাই। তাহার কতকালের স্বপ্ন! নিশ্চিন্দিপুরের বাড়িতে কত নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে, উঠানের উপর ঝুঁকিয়া-পড়া বাঁশবনের পত্রস্পন্দনে, ঘুঘুর ডাকে, তাহার অবসর অন্যমনস্ক মন যে অবাস্তব সচ্ছলতার ছবি

আপন মনে ভাঙিত গড়িত—হাতে খরচ নাই, ফুটা বাড়িতে জল পড়ে বৃষ্টির রাত্রে, পাড়ায় মুখ পায় না, সকলে তুচ্ছ করে, তাচ্ছিল্য করে, মানুষ বলিয়াই গণ্য করে না—সে সব দিনের স্মৃতির সঙ্গে, আমরুল শাকের বনে পুরানো পাঁচিলে দীর্ঘছায়ার সঙ্গে যে সব দূরকালের দুরাশার রঙে রঙিন ভবিষ্যৎ জড়ানো ছিল—এই তো এতদিনে তাহারা পৃথিবীর মাটিতে নামিয়া আসিয়াছে।

পূজার কাজে অপুর অত্যন্ত উৎসাহ। রোজ সকালে উঠিয়া সে কলুপাড়ার একটা গাছ হইতে রাশীকৃত কচি কচি বেলপাতা পাড়িয়া আনে। একটা খাতা বাঁধিয়াছে, তাহাতে সর্বদা ব্যবহারের সুবিধার জন্য নানা দেবদেবীর স্তবের মন্ত্র, স্নানের মন্ত্র, তুলসীদান প্রণালী লিখিয়া লইয়াছে। পাড়ায় পূজা করিতে নিজের তোলা ফুল-বেলপাতা লইয়া যায়, পূজার সকল পদ্ধতি নিখুঁতভাবে জানা না থাকিলেও উৎসাহ ও একাগ্রতায় সে সকল অভাব পূরণ করিয়া লয়।

বর্ষাকালের মাঝামাঝি অপু একদিন মাকে বলিল যে, সে স্কুলে পড়িতে যাইবে।

সর্বজয়া আশ্চর্য হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কোন্ ইস্কুলে রে?

—কেন, এই তো আড়বোয়ালেতে বেশ ইস্কুল রয়েচে।

—সে তো এখেন থেকে যেতে-আসতে চার ক্রোশ পথ। সেখানে যাবি হেঁটে পড়তে?

সর্ব্বজয়া কথাটা তখনকার মত উড়াইয়া দিল বটে, কিন্তু ছেলের মুখে কয়েকদিন ধরিয়া বার বার কথাটা শুনিয়া সে শেষে বিরক্ত হইয়া বলিল, যা খুশি করো বাপু, আমি জানি নে। তোমরা কোনো কালে কারুর কথা তো শুনলে না? শুনবেও না—সেই একজন নিজের খেয়ালে সারাজন্ম কাটিয়ে গেল, তোমারও তো সে ধারা বজায় রাখা চাই! ইস্কুলে পড়বো! ইস্কুলে পড়বি তো এদিকে কি হবে? দিব্যি একটা যাহোক্ দাঁড়াবার পথ তবু হয়ে আসছে—এখন তুমি দাও ছেড়ে—তারপর ইদিকেও যাক্, ওদিকেও যাক্—

মায়ের কথায় সে চুপ করিয়া গেল। চক্রবর্তী মহাশয় গত পৌষ মাসে কাশী চলিয়া গিয়াছেন, আজকাল তাহাকেই সমস্ত দেখিতে শুনিতে হয়। সামান্য একটু জমি-জমা আছে, তাহার খাজনা আদায়, ধান কাটাইবার বন্দোবস্ত, দশকর্ম, গৃহদেবতার পূজা। গ্রামে ব্রাহ্মণ নাই, তাহারাই একঘর মোটে। চাষী কৈবর্ত ও অন্যান্য জাতির বাস, তাহা ছাড়া এ-পাড়ায় কুণ্ডুরা ও ও-পাড়ার সরকারেরা। কাজে কর্মে ইহাদের সকলেরই বাড়ি অপুকে ষষ্ঠীপূজা মাকালপূজা করিয়া বেড়াইতে হয়। সবাই মানে, জিনিসপত্র দেয়।

সেদিন কি একটা তিথি উপলক্ষে সরকার-বাড়ি লক্ষ্মীপূজা ছিল। পূজা সারিয়া খানিক রাত্রে জিনিসপত্র একটা পুঁটুলি বাঁধিয়া লইয়া সে পথ বাহিয়া বাড়ির দিকে আসিতেছিল; খুব জ্যোৎস্না, সরকার বাড়ির সামনে নারিকেল গাছে কাঠঠোক্রা শব্দ করিতেছে। শীত বেশ পড়িয়াছে; বাতাস খুব ঠাণ্ডা, পথে ক্ষেত্র কাপালির বেড়ায় আমড়া গাছে বউল ধরিয়াছে। কাপালিদের বাড়ির পিছনে বেগুনক্ষেতের উঁচুনিচু জমিতে এক জায়গায় জ্যোৎস্না

পড়িয়া চক্ চক্ করিতেছে,—পাশের খাদটাতেই অন্ধকার। অপু মনে মনে কল্পনা করিতে করিতে যাইতেছিল যে, উঁচু জায়গাটা একটা ভালুক, নিচুটা জলের চৌবাচ্চা, তার পরের উঁচুটা স্কুলের ঢিবি। মনে মনে ভাবিল—কমলালেবু দিয়েচে, বাড়ি গিয়ে কমলালেবু খাবো। মনের সুখে শহরে-শেখা একটা গানের একটা চরণ সে গুন্ গুন্ করিয়া ধরিল—

সাগর কূলে বসিয়া বিরলে হেরিব লহরী মালা—

অনেকদিনের স্বপ্ন যেন আবার ফিরিয়া আসে। নিশ্চিন্দিপুরে থাকিতে ইছামতীর তীরের বনে, মাঠে কত ধূসর অপরাহ্নের, কত জ্যোৎস্না-রাতের সে সব স্বপ্ন! এই ছোট্ট চাষাগাঁয়ের চিরকালই এ রকম ষষ্ঠীপূজা মাকালপূজা করিয়া কাটাইতে হইবে?

সারাদিনের রোদে-পোড়া মাটি নৈশ শিশিরে স্নিগ্ধ হইয়া আসিয়াছে, এখন শীতের রাতের ঠাণ্ডা হাওয়ায় তাহারই সুগন্ধ।

অপুর মনে হইল রেলগাড়ির চাকায় চাকায় যেমন শব্দ হয়—ছোট্ঠাকুরপো—বট্ঠাকুর-পো—ছোট্ঠাকুর-পো—বট্ঠাকুর-পো—

দুই-এক দিনের মধ্যে সে মায়ের কাছে কথাটা আবার তুলিল। এবার শুধু তোলা নয়, নিতান্ত নাছোড়বান্দা হইয়া পড়িল। আড়বোয়ালের স্কুল দুই ক্রোশ দূরে, তাই কি? সে খুব হাঁটিতে পারিবে এটুকু। সে বুঝি চিরকাল এই রকম চাষাগাঁয়ে বসিয়া বসিয়া ঠাকুরপূজা করিবে? বাহিরে যাইতে পারিবে না বুঝি!

তবু আরও মাস দুই কাটিল। স্কুলের পড়াশোনা সর্বজয়া বোঝে না সে যাহা বোঝে তাহা পাইয়াছে। তবে আবার ইস্কুলে পড়িয়া কি লাভ? বেশ তো সংসার গুছাইয়া উঠিতেছে। আর বছর কয়েক পরে ছেলের বিবাহ—তারপরই একঘর মানুষের মত মানুষ।

সর্বজয়ার স্বপ্ন সার্থক হইয়াছে।

কিন্তু অপুর তাহা হয় নাই। তাহাকে ধরিয়া রাখা গেল না—শ্রাবণের প্রথমে সে আড়বোয়ালের মাইনর স্কুলে ভর্তি হইয়া যাতায়াত শুরু করিল।

এই পথের কথা সে জীবনে কোনোদিন ভোলে নাই—এই একটি বৎসর ধরিয়া কি অপরূপ আনন্দই পাইয়াছিল—প্রতিদিন সকালে-বিকালে এই পথ হাঁটিবার সময়টাতে।…নিশ্চিন্দিপুর ছাড়িয়া অবধি এত আনন্দ আর হয় নাই।

ক্রোশ দুই পথ। দুধারে বট, তুঁতের ছায়া, ঝোপঝাপ, মাঠ, মাঝে মাঝে অনেকখানি ফাঁকা আকাশ। স্কুলে বসিয়া অপুর মনে হইত সে যেন একা কতদূর বিদেশে আসিয়াছে, মন চঞ্চল হইয়া উঠিত—ছুটির পরে নির্জন পথে বাহির হইয়া পড়িত।—বৈকালের ছায়ায় ঢ্যাঙা তাল-খেজুরগাছগুলা যেন দিগন্তের আকাশ ছুঁইতে চাহিতেছে—পিড়িং পিড়িং পাখির ডাক—হু হু মাঠের হাওয়ার পাকা ফসলের গন্ধ আনিতেছে—সর্বত্র একটা মুক্তি, একটা আনন্দের বার্তা।…

কিন্তু সর্বাপেক্ষা সে আনন্দ পাইত পথ-চলতি লোকজনের সঙ্গে কথা কহিয়া। কত ধরণের

লোকের সঙ্গে পথে দেখা হইত—কত দূর-গ্রামের লোক পথ দিয়া হাঁটিত, কত দেশের লোক কত দেশে যাইত। অপু সবেমাত্র একা পথে বাহির হইয়াছে, বাহিরের পৃথিবীটার সহিত নতুন ভাবে পরিচয় হইতেছে, পথে ঘাটে সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়া তাহাদের কথা জানিতে তাহার প্রবল আগ্রহ। পথ চলিবার সময়টা এইজন্য বড় ভালো লাগে, সাগ্রহে সে ইহার প্রতীক্ষা করে, স্কুলের ছুটির পর পথে নামিয়াই ভাবে—এইবার গল্প শুনবো। পরে ক্ষিপ্রপদে আগাইয়া আসিয়া কোনো অপরিচিত লোকের নাগাল ধরিয়া ফেলে। প্রায়ই চাষালোক, হাতে হুঁকোকল্কে। অপু জিজ্ঞাসা করে—কোথায় যাচ্ছ, হ্যাঁ কাকা? চলো আমি মনসা-পোতা পর্যন্ত তোমার সঙ্গে যাবো। মামজোয়ান গিইছিলে? তোমাদের বাড়ি বুঝি? না? শিকুড়ে? নাম শুনেচি, কোন্‌দিকে জানি নে। কি খেয়ে সকালে বেরিয়েচ, হ্যাঁ কাকা?…

তারপর সে নানা খুঁটিনাটি কথা জিজ্ঞাসা করে—কেমন সে গ্রাম, ক'ঘর লোকের বাস, কোন্ নদীর ধারে? ক'জন লোক তাদের বাড়ি, কত ছেলেমেয়ে, তারা কি করে?…

কত গল্প, কত গ্রামের কিংবদন্তী, সেকাল-একালের কত কথা, পল্লীগৃহস্থের কত সুখদুঃখের কাহিনী—সে শুনিয়াছিল এই এক বৎসরে। সে চিরদিন গল্প-পাগলা, গল্প শুনিতে শুনিতে আহার-নিদ্রা ভুলিয়া যায়—যত সামান্য ঘটনাই হোক, তাহার ভাল লাগে। একটা ঘটনা মনে কি গভীর রেখাপাতই করিয়াছিল!

কোন্ গ্রামের এক ব্রাহ্মণবাড়ির বৌ এক বাগ্‌দীর সঙ্গে কুলের বাহির হইয়া গিয়াছিল—আজ অপুর সঙ্গীটি এইমাত্র তাকে শামুকপোতার বিলে গুগ্‌লি তুলিতে দেখিয়া আসিয়াছে। পরণে ছেঁড়া কাপড়, গায়ে গহনা নাই, ডাঙায় একটি ছোট ছেলে বসিয়া আছে বোধ হয় তাহারই। অপু আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার দেশের মেয়ে? তোমায় চিনতে পারলে?

হ্যাঁ, চিনিতে পারিয়াছিল। কত কাঁদিল, চোখের জল ফেলিল, বাপমায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিল। অনুরোধ করিল যেন এসব কথা দেশে গিয়া সে না বলে। বাপ-মা শুনিয়া কষ্ট পাইবে। সে বেশ সুখে আছে। কপালে যাহা ছিল, তাহা হইয়াছে।

সঙ্গীটি উপসংহারে বলিল, বামুন-বাড়ির বৌ, হর্তেলের মত গায়ের রঙ—যেন ঠাক্‌রুণের পির্‌তিমে!

দুর্গা-প্রতিমার মত রূপসী একটি গৃহস্থবধূ ছেঁড়া কাপড় পরণে শামুকপোতার বিলে হাঁটুজল ভাঙিয়া চুপড়ি হাতে গুগ্‌লি তুলিতেছে—কত কাল ছবিটা তাহার মনে ছিল।

সেদিন সে স্কুলে গিয়া দেখিল স্কুলসুদ্ধ লোক বেজায় সন্ত্রস্ত। মাস্টারেরা এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি করিতেছেন। স্কুল-ঘর গাঁদা ফুলের মালা দিয়া সাজানো হইতেছে, তৃতীয় পণ্ডিত মহাশয় খামোকো একটা সুবৃহৎ সিঁড়িভাঙা ভগ্নাংশ কষিয়া নিজের ক্লাশের বোর্ড পুরাইয়া রাখিয়াছেন। হঠাৎ আজ স্কুল-ঘরের বারান্দা ও কম্পাউণ্ড এত সাফ করিয়া রাখা হইয়াছে, যে, যাহারা বারোমাস এস্থানের সহিত পরিচিত, তাহাদের বিস্মিত হইবার কথা। হেডমাস্টার

ফণীবাবু খাতাপত্র, এ্যাডমিশন বুক, শিক্ষকগণের হাজিরা বই লইয়া মহা ব্যস্ত। সেকেণ্ড পণ্ডিতকে ডাকিয়া বলিলেন, ও অমূল্যবাবু, চৌঠো তারিখে খাতায় যে নাম সই করেন নি? আপনাকে ব'লে ব'লে আর পারা গেল না। দেরিতে এসেছিলেন তো খাতায় সই ক'রে ক্লাসে গেলেই হ'ত? সব মনে থাকে, এইটের বেলাতেই—

অপু শুনিল একটার সময় ইন্সপেক্টর আসিবেন স্কুল দেখিতে। ইন্সপেক্টর আসিলে কি করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে হইবে তৃতীয় পণ্ডিত মহাশয় ক্লাশের ছেলেদের সে বিষয়ে তালিম দিতে লাগিলেন।

বারোটার কিছু পূর্বে একখানা ঘোড়ার গাড়ি আসিয়া স্কুলের সামনে থামিল। হেডমাস্টার তখনও ফাইল তুরস্ত শেষ করিয়া উঠিতে পারেন নাই বোধ হয়—তিনি এত সকালে ইন্সপেক্টর আসিয়া পড়াটা প্রত্যাশা করেন নাই, জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া গাড়ি দেখিতে পাইয়াই উঠি-পড়ি অবস্থায় ছুটিলেন। তৃতীয় পণ্ডিত মহাশয় হঠাৎ তড়িৎস্পৃষ্ট ভেকের মত সজীব হইয়া উঠিয়া তারস্বরে ও মহা উৎসাহে (অন্যদিন এই সময়টাই তিনি ক্লাসে বসিয়া মাধ্যাহ্নিক নিদ্রাটুকু উপভোগ করিয়া থাকেন) দ্রব পদার্থ কাহাকে বলে তাহার বর্ণনা আরম্ভ করিলেন। পাশের ঘরে সেকেণ্ড পণ্ডিত মহাশয়ের হুঁকোর শব্দ অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সহিত বন্ধ হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উচ্চকণ্ঠ শোনা যাইতে লাগিল। শিক্ষক বলিলেন, মতি, তোমরা অবশ্যই কমলালেবু দেখিয়াছ, পৃথিবীর আকার—এই হরেন—কমলালেবুর ন্যায় গোলাকার—

হেডমাস্টারের পিছনে পিছনে ইন্সপেক্টর স্কুল ঘরে ঢুকিলেন। বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বৎসর হইবে, বেঁটে, গৌরবর্ণ, সাটিন জিনের লম্বা কোট গায়ে, সিল্কের চাদর গলায়, পায়ে সাদা ক্যাম্বিসের জুতা, চোখে চশমা। গলার স্বর ভারী। প্রথমে তিনি অফিস-ঘরে ঢুকিয়া খাতাপত্র অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখার পরে বাহির হইয়া হেডমাস্টারের সঙ্গে ফার্স্ট ক্লাসে গেলেন। অপুর বুক ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করিতেছিল। এইবার তাহাদের ক্লাসে আসিবার পালা। তৃতীয় পণ্ডিত মহাশয় গলার সুর আর এক গ্রাম চড়াইলেন।

ইন্সপেক্টর ঘরে ঢুকিয়া বোর্ডের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এরা কি ভগ্নাংশ ধরেছে? তৃতীয় পণ্ডিত মহাশয়ের মুখ আত্মপ্রসাদে উজ্জ্বল দেখাইল; বলিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, দু' ক্লাসে আমিই অঙ্ক কষাই কি না। ও ক্লাসেই অনেকটা এগিয়ে দিই—সরল ভগ্নাংশটা শেষ করে ফেলি—

ইন্সপেক্টর এক এক করিয়া বাঙলা রিডিং পড়িতে বলিলেন। পড়িতে উঠিয়াই অপুর গলা কাঁপিতে লাগিল। শেষের দিকে তাহার পড়া বেশ ভাল হইতেছে বলিয়া তাহার নিজেরই কানে ঠেকিল। পরিষ্কার সতেজ বাঁশির মত গলা। রিনরিনে মিষ্টি।

—বেশ, বেশ রিডিং। কি নাম তোমার?

তিনি আরও কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন। তারপর সবগুলি ক্লাস একে একে ঘুরিয়া আসিয়া জলের ঘরে ডাব ও সন্দেশ খাইলেন। তৃতীয় পণ্ডিত মহাশয় অপুকে বলিলেন, তুই হাতে ক'রে এই ছুটির দরখাস্তখানা নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাক, তোকে খুব পছন্দ করেছেন, যেমন

বাইরে আসবেন, অমনি দরখাস্তখানা হাতে দিবি—দু'দিন ছুটি চাইবি—তোর কথায় হয়ে যাবে—এগিয়ে যা।

ইন্সপেক্টর চলিয়া গেলেন। তাঁহার গাড়ি কিছুদূর যাইতে না যাইতে ছেলেরা সমস্বরে কলরব করিতে করিতে স্কুল হইতে বাহির হইয়া পড়িল। হেডমাস্টার ফণীবাবু অপুকে বলিলেন, ইন্সপেক্টরবাবু খুব সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছেন তোমার ওপর। বোর্ডের একজামিন দেওয়াবো তোমাকে দিয়ে—তৈরী হও, বুঝলে?

বোর্ডের পরীক্ষা দিতে মনোনীত হওয়ার জন্য যত না হউক, ইন্সপেক্টরের পরিদর্শনের জন্য দু'দিন স্কুল বন্ধ থাকিবার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সে বাড়ির দিকে রওনা হইল। অন্য দিনের চেয়ে দেরি হইয়া গিয়াছে। অর্ধেক পথ চলিয়া আসিয়া পথের ধারে একটা সাঁকোর উপর বসিয়া মায়ের দেওয়া খাবারের পুঁটুলি খুলিয়া রুটি, নারিকেলকোরা ও গুড় বাহির করিল। এইখানটাতে বসিয়া রোজ সে স্কুল হইতে ফিরিবার পথে খাবার খায়। রাস্তার বাঁকের মুখে সাঁকোটা, হঠাৎ কোনো দিক হইতে দেখা যায় না, একটা বড় তুঁত-গাছের ডালপালা নত হইয়া ছায়া ও আশ্রয় দুই-ই যোগাইতেছে। সাঁকোর নীচে আমরুল শাকের বনের ধারে একটু একটু জল বাধিয়াছে, মুখ বাড়াইলে জলে ছায়া পড়ে। অপুর কেমন একটা অস্পষ্ট ভিত্তিহীন ধারণা আছে যে, জলটা মাছে ভর্তি, তাই সে একটু একটু রুটির টুক্‌রা উপর হইতে ফেলিয়া দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখে মাছে ঠোক্‌রাইতেছে কি না।

সাঁকোর নীচের জলে হাত মুখ ধুইতে নামিতে গিয়া হঠাৎ তাহার চোখে পড়িল একজন ঝাঁকড়া-চুল কালো-মত লোক রাস্তার ধারের মাঠে নামিয়া লতা-কাঠি কুড়াইতেছে। অপু কৌতুহলী হইয়া চাহিয়া রহিল। লোকটা খুব লম্বা নয়, বেঁটে ধরণের, শক্ত হাত পা, পিঠে একগাছা বড় ধনুক, একটা বড় বোঁচকা, মাথার চুল লম্বা লম্বা, গলায় রাঙা ও সবুজ হিংলাজের মালা। সে অত্যন্ত কৌতুহলী হইয়া ডাকিয়া বলিল, ওখানে কি খুঁজচো? পরে লোকটির সঙ্গে তাহার আলাপ হইল। সে জাতিতে সাঁওতাল, অনেক দূরে কোথায় দুমকা জেলা আছে, সেখানে বাড়ি। অনেক দিন বর্ধমানে ছিল, বাঁকা বাঁকা বাংলা বলে, পায়ে হাঁটিয়া সেখান হইতে আসিতেছে। গন্তব্য স্থান অনির্দেশ্য—এরূপে যতদূর যাওয়া যায় যাইবে, সঙ্গে তীর ধনুক আছে, পথের ধারে বনে মাঠে যাহা শিকার মেলে—তাহাই খায়। সম্প্রতি একটা কি পাখি মারিয়াছে, মাঠের কোন ক্ষেত হইতে গোটাকয়েক বড় বড় বেগুনও তুলিয়াছে—তাহাই পুড়াইয়া খাইবার যোগাড়ে শুক্‌নো লতা-কাঠি কুড়াইতেছে। অপু বলিল, কি পাখি দেখি? লোকটা ঝোলা হইতে বাহির করিয়া দেখাইল একটা বড় হড়িয়াল ঘুঘু। সত্যিকারের তীর ধনুক—যাহাতে সত্যিকারের শিকার সম্ভব হয়—অপু কখনও দেখে নাই। বলিল, দেখি একগাছা তীর তোমার? পরে হাতে লইয়া দেখিল, মুখে শক্ত লোহার ফলা, পিছনে বুনোপাখির পালক বাঁধা—অদ্ভুত কৌতুহলপ্রদ ও মুগ্ধকর জিনিস!—

—আচ্ছা এতে পাখি মরে, আর কি মরে?

লোকটা উত্তর দিল, সবই মারা যায়—খরগোস, শিয়াল, বেঁজী, এমন কি বাঘ পর্যন্ত। তবে বাঘ মারিবার সময় তীরের ফলায় অন্য একটা লতার রস মাখাইয়া লইতে হয়।…তাহার পর সে তুঁতগাছতলায় শুক্‌না পাতালতার আগুন জ্বালিল। অপুর পা আর সেখান হইতে নড়িতে চাহিল না—মুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল, লোকটা পাখিটার পালক ছাড়াইয়া আগুনে ঝলসাইতে দিল, বেগুনগুলাও পুড়াইতে দিল।

বেলা অত্যন্ত পড়িলে অপু বাড়ি রওনা হইল। আহার শেষ করিয়া লোকটা তখন তাহার বোঁচকা ও তীর ধনুক লইয়া রওনা হইয়াছে। এ রকম মানুষ সে তো কখনো দেখে নাই। বাঃ—যেদিকে দুই চোখ যায় সেদিকে যাওয়া—পথে পথে তীর ধনুক দিয়া শিকার করা, বনের লতাপাতা কুড়াইয়া গাছতলায় দিনের শেষে বেগুন পুড়াইয়া খাওয়া! গোটা আষ্টেক বড় বড় বেগুন সামান্য একটু নুনের ছিটা দিয়া গ্রাসের পর গ্রাস তুলিয়া কি করিয়াই নিমেষের মধ্যে সাবাড় করিয়া ফেলিল!…

মাস কয়েক কাটিয়া গেল। সকালবেলা স্কুলের ভাত চাইতে গিয়া অপু দেখিল রান্না চড়ানো হয় নাই। সর্বজয়া বলিল, আজ যে কুলুইচণ্ডী পূজো—আজ স্কুলে যাবি কি ক'রে? …ওরা বলে গিয়েচে ওদের পূজোটা 'সেরে দেওয়ার জন্যে—পূজোবারে কি আর স্কুলে যেতে পার্‌বি? বড্ড দেরী হয়ে যাবে।

—হ্যাঁ, তাই বৈ কি? আমি পূজো করতে গিয়ে স্কুল কামাই করি আর কি? আমি ওসব পারবো না, পূজোটুজো আমি আর করবো কি ক'রে, রোজই তো পূজো লেগে থাকবে আর আমি বুঝি রোজ রোজ—তুমি ভাত নিয়ে এস, আমি ওসব শুনছিনে—।

—লক্ষ্মী বাবা আমার। আচ্ছা, আজকের দিনটা পূজোটা সেরে নে। ওরা বলে গিয়েচে ওপাড়াসুদ্ধ পূজো হবে। চাল পাওয়া যাবে এক ধামার কম নয়, মানিক আমার, কথা শোনো, শুনতে হয়!

অপু কোন মতেই কথা শুনিল না। অবশেষে না খাইয়াই স্কুলে চলিয়া গেল। সর্বজয়া ভাবে নাই যে, ছেলে সত্যসত্যই তাহার কথা ঠেলিয়া না খাইয়া স্কুলে চলিয়া যাইবে। যখন সত্যই বুঝিতে পারিল, তখন তাহার চোখের জল আর বাধা মানিল না। ইহা সে আশা করে নাই।

অপু স্কুলে পৌঁছিতেই হেডমাস্টার ফণীবাবু তাহাকে নিজের ঘরে ডাক দিলেন। ফণীবাবুর ঘরেই স্থানীয় ব্রাঞ্চ পোস্ট-অফিস, ফণীবাবুই পোস্টমাস্টার। তিনি তখন ডাকঘরের কাজ করিতেছিলেন। বলিলেন, এসো অপূর্ব, তোমার নম্বর দেখবে? আজ ইন্সপেক্টর অফিস থেকে পাঠিয়ে দিয়েচে—বোর্ডের এগ্‌জামিনে তুমি জেলার মধ্যে প্রথম হয়েচ—পাঁচ টাকার একটা স্কলারশিপ পাবে যদি আরো পড়ো তবে। পড়বে তো?

এই সময় তৃতীয় পণ্ডিত মহাশয় ঘরে ঢুকিলেন। ফণীবাবু বলিলেন, ওকে সে কথা এখন বললাম পণ্ডিতমশাই। জিজ্ঞেস করচি আরও পড়বে তো?

তৃতীয় পণ্ডিত বলিলেন, পড়বে না, বাঃ! হীরের টুক্‌রো ছেলে, স্কুলের নাম রেখেছে। ওরা যদি না পড়ে তো পড়বে কে, কেষ্ট তেলির বেটা গোবর্ধন? কিচ্ছু না, আপনি ইন্সপেক্টর অফিসে লিখে দিন যে, ও হাই স্কুলে পড়বে। ওর আবার জিজ্ঞেসটা কি?—ওঃ, সোজা পরিশ্রম করিচি মশাই ওকে ভগ্নাংশটা শেখাতে?

প্রথমটা অপু যেন ভাল করিয়া কথাটা বুঝিতে পারিল না। পরে যখন বুঝিল তখন তাহার মুখে কথা যোগাইল না। হেডমাস্টার একখানা কাগজ বাহির করিয়া তাহার সামনে ধরিয়া বলিলেন—এইখানে একটা নাম সই ক'রে দাও তো। আমি কিন্তু লিখে দিলাম যে, তুমি হাইস্কুলে পড়বে। আজই ইন্সপেক্টর আফিসে পাঠিয়ে দেবো।

সকাল সকাল ছুটি লইয়া বাড়ি ফিরিবার পথে মায়ের করুণ মুখচ্ছবি বার বার তাহার মনে আসিতে লাগিল। পথের পাশে দুপুরের রৌদ্রভরা শ্যামল মাঠ, প্রাচীন তুঁত বটগাছের ছায়া, ঘন শালপত্রের অন্তরালে ঘুঘুর উদাস কণ্ঠ, সব যেন করুণ হইয়া উঠিল। তাহার মনে এই অপূর্ব করুণ ভাবটি বড় গভীর ছাপ রাখিয়া গিয়াছিল। আজিকার দুপুরটির কথা উত্তর জীবনে বড় মনে আসিত তাহার। কত—কতদিন পরে আবার এই শ্যামচ্ছায়াভরা বীথি, বাল্যের অপরূপ জীবনানন্দ, ঘুঘুর ডাক, মায়ের মনের একদিনের দুঃখটি—অনন্তের মণিহারে গাঁথা দানাগুলির একটি, পশ্চিম দিগন্তে প্রতি সন্ধ্যায় ছিঁড়িয়া-পড়া, বহুবিস্মৃত মুক্তাবলীর মধ্যে কেমন করিয়া অক্ষয় হইয়া ছিল।

বাড়িতে তাহার মাও আজ সারাদিন খায় নাই। ভাত চাহিয়া না পাইয়া ছেলে না খাইয়াই চলিয়া গিয়াছে স্কুলে—সর্বজয়া কি করিয়া খাবারের কাছে বসে? কুলুইচণ্ডীর ফলার খাইয়া অপু বৈকালে বেড়াইতে গেল।

গ্রামের বাহিরে ধঞ্চেক্ষেতের ফসল কাটিয়া লওয়া হইয়াছে। চারি ধারে খোলা মাঠ পড়িয়া আছে। আবার সেই সব রঙীন কল্পনা; সে পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়াছে! তার স্বপ্নের অতীত! মোটে এক বছর পড়িয়াই বৃত্তি পাইল।...সুমুখের জীবনের কত ছবিই আবার মনে আসে! ঐ মাঠের পারে রক্ত আকাশটার মত রহস্যস্বপ্নভরা যে অজানা অকূল জীবন-মহাসমুদ্র!...পুলকে সারাদেহ শিহরিয়া উঠে। মাকে এখনও সব কথা বলা হয় নাই। মায়ের মনের-বেদনার রঙে যেন মাঠ, ঘাট, অস্তদিগন্তের মেঘমালা রাঙানো। গভীর ছায়াভরা সন্ধ্যা মায়ের দুঃখভরা মনটার মত ঘুলি-ঘুলি অন্ধকার।

দালানের পাশের ঘরে মিটি মিটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। সর্বজয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় ছেলেকে ওবেলার কুলুইচণ্ডী-ব্রতের চিঁড়ে-মুড়কির ফলার খাইতে দিল। নিকটে বসিয়া চাঁপাকলার খোসা ছাড়াইয়া দিতে দিতে বলিল, ওরা কত দুঃখ করলে আজ। সরকার-বাড়ি থেকে বলে গেল তুই পুজো করবি—তারা খুঁজতে এলে আমি বললাম, সে স্কুলে চলে গিয়েছে। তখন তারা আবার ভৈরব চক্কত্তিকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ওই অত বেলায়—তুই যদি যেতিস্—

—আজ না গিয়ে ভাল করিচি মা। আজ হেডমাস্টার বলেচে আমি এগ্‌জামিনে

স্কলারশিপ পেইচি। বড় স্কুলে পড়লে মাসে পাঁচ টাকা ক'রে পাবো। স্কুলে যেতেই হেডমাস্টার ডেকে বললে—

সর্বজয়ার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কোথায় পড়তে হবে?

—মহকুমার বড় স্কুলে।

—তা তুই কি বল্‌লি?

—আমি কিছু বলি নি। পাঁচটা করে টাকা মাসে মাসে দেবে, যদি না পড়ি তবে তো আর দেবে না। ওতে মাইনেও ফ্রি করে নেবে আর ওই পাঁচ টাকাতে বোর্ডিং-এ থাকবার খরচও কুলিয়ে যাবে।

সর্বজয়া আর কোন কথা বলিল না। কি কথা সে বলিবে? যুক্তি এতই অকাট্য যে তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার কিছুই নাই। ছেলে স্কলারশিপ পাইয়াছে, শহরে পড়িতে যাইবে, ইহাতে মা-বাপের ছেলেকে বাধা দিয়া বাড়ি বসাইয়া রাখিবার পদ্ধতি কোথায় চলিত আছে? এ যেন তাহার বিরুদ্ধে কোন্ দণ্ডী'তার নির্মম অকাট্য দণ্ড উঠাইয়াছে, তাহার দুর্বল হাতের সাধ্য নাই যে ঠেকাইয়া রাখে। ছেলেও ঐদিকে ঝুঁকিয়াছে! আজকার দিনটিই যেন কার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিল সে। ভবিষ্যতের সহস্র সুখস্বপ্ন কুয়াসার মত অনন্তে বিলীন হইয়া যাইতেছে কেন আজকার দিনটিতে বিশেষ করিয়া?

মাসখানেক পরে বৃত্তি পাওয়ার খবর কাগজে পাওয়া গেল।

যাইবার পূর্বদিন বৈকালে সর্বজয়া ব্যস্তভাবে ছেলের জিনিসপত্র গুছাইয়া দিতে লাগিল। ছেলে কখনও একা বিদেশে বাহির হয় নাই, নিতান্ত আনাড়ী, ছেলে-মানুষ ছেলে। কত জিনিসের দরকার হইবে, কে থাকিবে তখন সেখানে যে মুখে মুখে সব অভাব যোগাইয়া ফিরিবে, সব জিনিস হাতে লইয়া বসিয়া থাকিবে? খুঁটিনাটি—একখানা কাঁথা পাতিবার, একখানি গায়ের—একটি জল খাইবার গ্লাস, ঘরের তৈরী এক শিশি সরের ঘি, এক পুঁটুলি নারিকেল নাড়ু; অপু ফুলকাটা একটা মাঝারি জামবাটিতে দুধ খাইতে ভালবাসে—সেই বাটিটা, ছোট একটা বোতলে মাখিবার চৈ-মিশানো নারিকেল তৈল, আরও কত কি। অপুর মাথার'বালিশের পুরানো ওয়াড় বদলাইয়া নূতন ওয়াড় পরাইয়া দিল। দধি-যাত্রার আবশ্যকীয় দই একটা ছোট পাথরবাটিতে পাতিয়া রাখিল। ছেলেকে কি করিয়া বিদেশে চলিতে হইবে সে বিষয়ে সহস্র উপদেশ দিয়াও তাহার মনে তৃপ্তি হইতেছিল না। ভাবিয়া দেখিয়া যেটি বাদ দিয়াছে মনে হয় সেটি তখনি-আবার ডাকিয়া বলিয়া দিতেছিল।

—যদি কেউ মারে টারে, কত দুষ্ট ছেলে তো আচে, অমনি মাস্টারকে বলে দিবি—বুঝলি? রাত্তিরে ঘুমিয়ে পড়িস নে যেন ভাত খাবার আগে! এ তো বাড়ি নয় যে কেউ তোকে ওঠাবে—খেয়ে তবে ঘুমুবি—নয়তো তাদের বলবি, যা হয়েচে তাই দিয়ে ভাত দাও—বুঝলি তো?

সন্ধ্যার পর সে কুণ্ডুদের বাড়ি মনসার ভাসান শুনিতে গেল। অধিকারী নিজে বেহুলা সাজিয়া পায়ে ঘুঙুর বাঁধিয়া নাচে—বেশ গানের গলা। খানিকটা শুনিয়া তাহার ভাল লাগিল না। শুধু ছড়া কাটা ও নাচ সে পছন্দ করে না,—যুদ্ধ নাই, তলোয়ার-খেলা নাই, যেন পান্‌সে-পান্‌সে।

তবুও আজিকার রাতটি বড় ভাল লাগিল তাহার। এই মনসা ভাসানোর আসর, এই নতুন জায়গা, এই অচেনা গ্রাম্য বালকের দল, ফিরিবার পথে তাহাদের পাড়ার বাঁকে প্রস্ফুটিত হেনা ফুলের গন্ধ-ভরা নৈশ বাতাস জোনাকি-জ্বলা অন্ধকারে কেমন মায়াময় মনে হয়।···

রাত্রে সে আরও দু-একটা জিনিস সঙ্গে লইল। বাবার হাতের লেখা একখানা গানের খাতা, বাবার উদ্ভট শ্লোকের খাতাখানা বড় পেঁটরাটা হইতে বাহির করিয়া রাখিল—বড় বড় গোটা গোটা ছাঁদের হাতের লেখাটা বাবার কথা মনে আনিয়া দেয়। গানগুলির সঙ্গে বাবার গলার স্বর এমন ভাবে জড়াইয়া আছে যে, সেগুলি পড়িয়া গেলেই বাবার সুর কানে বাজে। নিশ্চিন্দিপুরের কত ক্রীড়াক্লান্ত শান্ত সন্ধ্যা, মেঘমেদুর বর্ষামধ্যাহ্ন, কত জ্যোৎস্না-ভরা রহস্যময়ী রাত্রি বিদেশ-বিভুঁই-এর সেই দুঃখ-মাখানো দিনগুলির সঙ্গে এই গানের সুর যেন জড়াইয়া আছে—সেই দশাশ্বমেধ ঘাটের রাণা, কাশীর পরিচিত সেই বাঙাল কথকঠাকুর।

সর্বজয়ার মনে একটা ক্ষীণ আশা ছিল যে, হয়ত ছেলে শেষ পর্যন্ত বিদেশে যাইবার মত করিবে না। কিন্তু তাহার অপু যে পিছনের দিকে ফিরিয়াও চাহিতেছে না। সে যে এত খাটিয়া, একে-ওকে বলিয়া কহিয়া তাহার সাধ্যমত যতটা কুলায়, ছেলের ভবিষ্যৎ জীবনের অবলম্বন একটা খাড়া করিয়া দিয়াছিল—ছেলে তাহা পায়ে দলিয়া যাইতেছে—কি জানি কিসের টানে! কোথায়? তাহার স্নেহদুর্বল দৃষ্টি তাহাকে দেখিতে দিতেছিল না যে, ছেলের ডাক আসিয়াছে বাহিরের জগৎ হইতে। সে জগৎটা তাহার দাবী আদায় করিতে তো ছাড়িবে না—সাধ্য কি সর্বজয়ার যে চিরকাল ছেলেকে আঁচলে লুকাইয়া রাখে?

যাত্রার পূর্বে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের দধির ফোঁটা অপুর কপালে পরাইয়া দিতে দিতে বলিল —বাড়ি আবার শীগ্‌গির শীগ্‌গির আসবি কিন্তু, তোদের ইতুপূজোর ছুটি দেবে তো?

—হ্যাঁ, ইস্কুলে বুঝি ইতুপূজোর ছুটি হয়? তাতে আবার বড় ইস্কুল। সেই আবার আসবো গরমের ছুটিতে।

ছেলের অকল্যাণের আশঙ্কায় উচ্ছ্বসিত চোখের জল বহু কষ্টে সর্বজয়া চাপিয়া রাখিল।

অপু মায়ের পায়ের ধুলা লইয়া ভারী বোঁচকাটা পিঠে ঝুলাইয়া লইয়া বাড়ির বাহির হইয়া গেল।

মাঘ মাসের সকাল। কাল একটু একটু মেঘ ছিল, আজ মেঘ-ভাঙা রাঙা রোদ কুণ্ডু-বাড়ির দো-ফলা আম গাছের মাথায় ঝলমল করিতেছে—বাড়ির সামনে বাঁশবনের তলায় চক্‌চকে সবুজ পাতার আড়ালে বুনো আদার রঙীন ফুল যেন দূর ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্নের মত সকালের বুকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সবে ভোর হইয়াছে। দেওয়ানপুর গবর্ণমেণ্ট মডেল ইন্‌স্টিটিউশনের ছেলেদের বোর্ডিং-ঘরের সব দরজা এখনও খুলে নাই। কেবল স্কুলের মাঠে দুইজন শিক্ষক পায়চারী করিতেছেন। সম্মুখের রাস্তা দিয়া এত ভোরেই গ্রাম হইতে গোয়ালারা বাজারে দুধ বেচিতে আনিতেছিল, একজন শিক্ষক আগাইয়া আসিয়া বলিলেন—দাঁড়াও, ও ঘোষের পো, কাল দুধ দিয়ে গেলে তা নিছক জল, আজ দেখি কেমন দুধটা!

অপর শিক্ষকটি পিছু পিছু আসিয়া বলিলেন, নেবেন না সত্যেনবাবু, একটু বেলা না গেলে ভাল দুধ পাওয়া যায় না। আপনি নতুন লোক, এসব জায়গার গতিক জানেন না, যার-তার কাছে দুধ নেবেন না—আমার জানা গোয়ালা আছে, কিনে দেবো বেলা হলে।

বোর্ডিং-বাড়ির কোণের ঘরে দরজা খুলিয়া একটি ছেলে বাহির হইয়া আসিল ও দূরের করোনেশন ক্লক-টাওয়ারের ঘড়িতে কয়টা বাজিয়াছে চাহিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল। সত্যেনবাবুর সঙ্গী শিক্ষকটির নাম রামপদবাবু, তিনি ডাকিয়া বলিলেন—ওহে সমীর, ওই যে ছেলেটি এবার ডিষ্ট্রিক্ট স্কলারশিপ পেয়েছে, সে কাল রাত্রে এসেছে না?

ছেলেটি বলিল, এসেছে স্যার, ঘুমুচ্ছে এখনও। ডেকে দেবো?—পরে সে জানালার কাছে গিয়া ডাকিল, অপূর্ব, ও অপূর্ব!

ছিপছিপে পাতলা চেহারা, চোদ্দ পনেরো বৎসরের একটি খুব সুন্দর ছেলে চোখ মুছিতে মুছিতে বাহির হইয়া আসিল। রামপদবাবু বলিলেন, তোমার নাম অপূর্ব! ও!—এবার আড়বোয়ালের স্কুল থেকে স্কলারশিপ পেয়েছ?—বাড়ি কোথায়? ও! বেশ বেশ, আচ্ছা, স্কুলে দেখা হবে।

সমীর জিজ্ঞাসা করিল, স্যার, অপূর্ব কোন্ ঘরে থাকবে এখনও সেকেন্ মাস্টার মশায় ঠিক করে দেন নি। আপনি একটু বলবেন?

রামপদবাবু বলিলেন, কেন তোর ঘরে তো সীট খালি রয়েছে—ওখানেই থাকবে।

সমীর বোধ হয় ইহাই চাহিতেছিল, বলিল,—আপনি একটু বলবেন তাহলে সেকেন্—

রামপদবাবু চলিয়া গেলে অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, ইনি কে? পরে পরিচয় শুনিয়া সে একটু অপ্রতিভ হইল। হয়ত বোর্ডিং-এর নিয়ম নাই এত বেলা পর্যন্ত ঘুমানো, সে না জানিয়া শুনিয়া প্রথম দিনটাতেই হয়ত একটা অপরাধের কাজ করিয়া বসিয়াছে।···

একটু বেলা হইলে সে স্কুল-বাড়ি দেখিতে গেল। কাল অনেক রাত্রে আসিয়া পৌছিয়াছিল, ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পায় নাই। রাত্রের অন্ধকারে আবছায়া-দেখিতে-পাওয়া সাদা রং-এর প্রকাণ্ড স্কুল বাড়িটা তাহার মনে একটা আনন্দ ও রহস্যের সঞ্চার করিয়াছিল।

এই স্কুলে সে পড়িতে পাইবে!···কতদিন শহরে থাকিতে তাহাদের ছোট স্কুলটা হইতে

বাহির হইয়া বাড়ি ফিরিবার পথে দেখিতে পাইত—হাই স্কুলের প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ডে ছেলেরা সকলেই এক ধরণের পোশাক পরিয়া ফুটবল খেলিতেছে। তখন কতদিন মনে হইয়াছে এত বড় স্কুলে পড়িতে যাওয়া কি তাহার ঘটিবে কোন কালে—এসব বড়লোকের ছেলেদের জন্য। এতদিনে তাহার আশা পূর্ণ হইতে চলিল।

বেলা দশটার কিছু আগে বোর্ডিং-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বিধুবাবু তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে কোন্ ঘরে আছে, নাম কি, বাড়ি কোথায়, নানা জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া বলিলেন, সমীর ছোকরা ভাল, একসঙ্গে থাকলে বেশ পড়াশুনো হবে। এখানকার পুকুরের জলে নাইবে না কখনো—জল ভালো নয়, স্কুলের ইন্দারার জলে ছাড়া—আচ্ছা যাও, এদিকে আবার ঘণ্টা বাজবার সময় হ'ল।

সাড়ে দশটায় ক্লাস বসিল। প্রথম বই খাতা হাতে ক্লাস রুমে ঢুকিবার সময় তাহার বুক আগ্রহের ঔৎসুক্যে ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছিল। বেশ বড় ঘর, নীচু চৌকির উপর মাস্টারের চেয়ার পাতা—খুব বড় ব্ল্যাকবোর্ড। সব ভারী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, নিখুঁতভাবে সাজানো। চেয়ার, বেঞ্চি, টেবিল, ডেস্ক সব ঝক্‌ঝক্ করিতেছে, কোথাও একটু ময়লা বা দাগ নাই।

মাস্টার ক্লাসে ঢুকিলে সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। এ নিয়ম পূর্বে সে যে সব স্কুলে পড়িত সেখানে দেখে নাই। কেহ স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিলে উঠিয়া দাঁড়াইবার কথা মাস্টার শিখাইয়া দিতেন। সত্য সত্যই এতদিন পরে সে বড় স্কুলে পড়িতেছে বটে!…

জানালা দিয়া চাহিয়া দেখিল পাশের ক্লাস-রুমে একজন কোট-প্যাণ্টপরা মাস্টার বোর্ডে কি লিখতে দিয়া ক্লাসের এদিক-ওদিক পায়চারী করিতেছেন—চোখে চশমা, আধপাকা দাড়ি বুকের উপর পড়িয়াছে, গম্ভীর চেহারা। সে পাশের ছেলেকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, উনি কোন্ মাস্টার ভাই ?

ছেলেটি বলিল—উনি মিঃ দত্ত, হেডমাস্টার—ক্রিশ্চান, খুব ভালো ইংরিজি জানেন।

অপূর্ব শুনিয়া নিরাশ হইল যে তাহাদের ক্লাসে মিঃ দত্তের কোন ঘণ্টা নাই। থার্ড ক্লাসের নিচে কোন ক্লাসে তিনি নাকি নামেন না।

পাশেই স্কুলের লাইব্রেরী, ন্যাপ্‌থালিনের গন্ধ-ভরা পুরোনো বই-এর গন্ধ আসিতেছিল। ভাবিল এ ধরণের ভরপুর লাইব্রেরীর গন্ধ কি কখনো ছোটখাটো স্কুলে পাওয়া যায় ?

ঢং ঢং করিয়া ক্লাস শেষ হওয়ার ঘণ্টা পড়ে—আড়বোয়ালের স্কুলের মত একখণ্ড রেলের পাটির লোহা বাজায় না, সত্যিকারের পেটা ঘড়ি।—কি গম্ভীর আওয়াজটা!…

টিফিনের পরের ঘণ্টায় সত্যেনবাবুর ক্লাস। চব্বিশ-পঁচিশ বৎসরের যুবক, বেশ বলিষ্ঠ গড়ন, ইঁহার মুখ দেখিয়া অপুর মনে হইল ইনি ভারী বিদ্বান, বুদ্ধিমানও বটে। প্রথম দিনেই ইঁহার উপর কেমন এক ধরণের শ্রদ্ধা তাহার গড়িয়া উঠিল! সে শ্রদ্ধা আরও গভীর হইল ইঁহার মুখের ইংরিজি উচ্চারণে।

ছুটির পর স্কুলের মাঠে বোর্ডিং-এর ছেলেদের নানা ধরণের খেলা শুরু হইল। তাহাদের ক্লাসের ননী ও সমীর তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া অন্য সকল ছেলেদের সহিত পরিচয় করাইয়া

দিল। সে ক্রিকেট খেলা জানে না, ননী তাহার হাতে নিজের ব্যাটখানা দিয়া তাহাকে বল মারিতে বলিল ও নিজে উইকেট্ হইতে একটু দূরে দাঁড়াইয়া খেলার আইনকানুন বুঝাইয়া দিতে লাগিল।

খেলার অবসানে যে-যাহার স্থানে চলিয়া গেল। খেলার মাঠে পশ্চিম কোণে একটা বড় বাদাম গাছ, অপু গিয়া তাহার তলায় বসিল। একটু দূরে গবর্ণমেণ্টের দাতব্য ঔষধালয়। বৈকালেও সেখানে একদল রোগীর ভিড় হইয়াছে, তাহাদের নানা কলরবের মধ্যে একটি ছোট মেয়ের কান্নার সুর শোনা যাইতেছে। অপূর্ব কেমন অন্যমনস্ক হইয়া গেল। চৌদ্দ-পনেরো বৎসর বয়সের মধ্যে এই আজ প্রথম দিন, যেদিনটি সে মায়ের নিকট হইতে বহুদূরে আত্মীয়-বন্ধুহীন প্রবাসে একা কাটাইতেছে। সেদিক দিয়া দেখিতে গেলে আজ তাহার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন।

কত কথা মনে ওঠে, এই সুদীর্ঘ পনেরো বৎসরের জীবনে কি অপূর্ব বৈচিত্র্য, কি ঐশ্বর্য!

সমীর টেবিলে আলো জ্বালিয়াছে। অপুর কিছু ভালো লাগিতেছিল না—বিছানায় গিয়া শুইয়া রহিল। খানিকটা পরে সমীর পিছনে চাহিয়া তাহাকে সে অবস্থায় দেখিয়া বলিল, পড়বে না?

অপু বলিল, একটু পরে—এই উঠচি।

—আলোটা জ্বালিয়ে রাখো, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এখুনি দেখতে আসবে, শুয়ে আছ দেখলে বকবে।

অপু উঠিয়া আলো জ্বালিল। বলিল, রোজ আসেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট! সেকেণ্ড মাস্টার তো—না?

সমীরের কথা ঠিক। অপু আলো জ্বালিবার একটু পরেই বিধুবাবু ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি রকম লাগলো আজ ক্লাসে? পড়াশুনো সব দেখে নিয়েচ তো? সমীর, ওকে একটু দেখিয়ে দিস তো কোথায় কিসের পড়া। ক্লাসের রুটিনটা ওকে লিখে দে বরং—সব বই কেনা হয়েচে তো তোমার? জিওমেট্রি নেই? আচ্ছা, আমার কাছে পাওয়া যাবে, এক টাকা সাড়ে পাঁচ আনা, কাল সকালে আমার ঘর থেকে গিয়ে নিয়ে এসো একখানা।

বিধুবাবু চলিয়া গেলে সমীর পড়িতে বসিল; কিন্তু পিছনে চাহিয়া পুনরায় অপূর্বকে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া সে কাছে আসিয়া বলিল, বাড়ির জন্যে মন কেমন করচে—না?

তাহার পর সে খাটের ধারে বসিয়া তাহাকে বাড়ীর সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। বলিল, তোমার মা একা থাকেন বাড়িতে? আর কেউ না? তাঁর তো থাকতে কষ্ট হয়।

অপূর্ব বলিল, ও কিসের ঘণ্টা ভাই?

—বোর্ডিং-এর খাওয়ার ঘণ্টা—চলো যাই।

খাওয়া-দাওয়ার পর দুই-তিনজন ছেলে তাহাদের ঘরে আসিল। এই সময়টা আর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ভয় নাই, তিনি নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। শীতের রাত্রে

আর বড় একটা বাহির হন না। ছেলেরা এই সময়ে এঘর-ওঘর বেড়াইয়া গল্পগুজবের অবকাশ পায়। সমীর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া বলিল, এসো নৃপেন, এই আমার খাটে বসো—শিশির যাও ওখানে—অপূর্ব জানো তাস খেলা ?

নৃপেন বলিল, হেডমাস্টার আসবে না তো ?

শিশির বলিল, হ্যাঁ, এত রাত্তিরে আবার হেডমাস্টার—

অপূর্বও তাস খেলিতে বসিল বটে কিন্তু শীঘ্রই বুঝিতে পারিল, মায়ের ও দিদির সঙ্গে কত কাল আগে খেলার সে বিদ্যা লইয়া এখানে তাসখেলা খাটিবে না। তাসখেলায় ইহারা সব ঘুণ, কোন্ হাতে কি তাস আছে সব ইহাদের নখদর্পণে। তাহা ছাড়া এতগুলি অপরিচিত ছেলের সম্মুখে তাহাকে তাহার পুরাতন মুখচোরা রোগে পাইয়া বসিল; অনেক লোকের সামনে সে মোটেই স্বচ্ছন্দে কথাবার্তা বলিতে পারে না। মনে হয়, কথা বলিলেই হয়ত ইহারা হাসিয়া উঠিবে। সে সমীরকে বলিল, তোমরা খেলো, আমি দেখি। শিশির ছাড়ে না। বলিল, তিনদিনে শিখিয়ে দোব, ধরো দিকি তাস।

বাহিরে যেন কিসের শব্দ হইল। শিশির সঙ্গে সঙ্গে চুপ করিয়া গেল এবং হাতের তাস লুকাইয়া পরের পাঁচ মিনিট এমন অবস্থায় রহিল যে সেখানে একটা কাঠের পুতুল থাকিলে সেটাও তাহার অপেক্ষা বেশী নড়িত। সকলেরই সেই অবস্থা। সমীর টেবিলের আলোটা একটু কমাইয়া দিল। আর কোন শব্দ পাওয়া গেল না। নৃপেন একবার দরজার ফাঁক দিয়া বাহিরের বারান্দাতে উঁকি মারিয়া দেখিয়া আসিয়া নিজের তাস সমীরের তোশকের তলা হইতে বাহির করিয়া বলিল, ও কিছু না, এস এস—তোমার হাতের খেলা শিশির।

রাত এগারোটার সময় পা টিপিয়া টিপিয়া যে যাহার ঘরে চলিয়া গেলে অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের রোজ এমনি হয় নাকি ? কেউ টের পায় না ? আচ্ছা, চুপ ক'রে বসেছিল, ও ছেলেটা কে ?

ছেলেটাকে তাহার ভাল লাগিয়াছে। ঘরে ঢুকিবার পর হইতে সে বেশী কথা বলে নাই, তাহার খাটের কোণটিতে নীরবে বসিয়া ছিল। বয়স তেরোচৌদ্দ হইবে, বেশ চেহারা। ইহাদের দলে থাকিয়াও সে এতদিনে তাসখেলা শেখে নাই, ইহাদের কথাবার্তা হইতে অপূর্ব বুঝিয়াছিল।

পরদিন শনিবার। বোর্ডিং-এর বেশীর ভাগ ছেলেই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে ছুটি লইয়া বাড়ি চলিয়া গেল। অপূর্ব মোটে দুই দিন হইল আসিয়াছে; তাহা ছাড়া যাতায়াতে খরচ-পত্রও আছে, কাজেই তাহার যাওয়ার কথাই উঠিতে পারে না। কিন্তু তবু তাহার মনে হইল, এই শনিবারে একবার মাকে দেখিয়া আসিলে মন্দ হইত না,—সারা শনিবারের বৈকালটা কেমন খালি-খালি ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকিতেছিল।

সন্ধ্যার সময় সে ঘরে আসিয়া আলো জ্বালিল। ঘরে সে একা, সমীর বাড়ি চলিয়া গিয়াছে, এ রকম চুণকাম-করা ঘরে একা থাকিবার সৌভাগ্য কখনও তাহার হয় নাই, সে

খুশী হইয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া নিজের খাটে বসিয়া রইল। মনে মনে ভাবিল, এইবার সমীরের মত একটা টেবিল আমার হয়? একটা টেবিলের দাম কত, সমীরকে জিজ্ঞাসা করবো।

পরে সে আলোটা লইয়া গিয়া সমীরের টেবিলে পড়িতে বসিল। রুটিনে লেখা আছে—সোমবার পাটীগণিতের দিন। অঙ্ককে সে বাঘ বিবেচনা করে। বইখানা খুলিয়া সভয়ে প্রশ্নাবলীর অঙ্ক কয়েকটি দেখিতেছে, এমন সময় দরজা দিয়া ঘরে কে ঢুকিল। কাল রাত্রের সেই শান্ত ছেলেটি। অপু বলিল—এসো, এসো, ব'সো।

ছেলেটি বলিল, আপনি বাড়ি যান নি?

অপু বলিল, না, আমি তো মোটে পরশু এলাম, বাড়িও দূরে। গিয়ে আবার সোমবারে আসা যাবে না।

ছেলেটি অপুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অপু বলিল—বোর্ডিং-এ যে আজ একেবারেই ছেলে নেই, সব শনিবারেই কি এমনই হয়? তুমি বাড়ি যাও নি কেন? তোমার নামটা কি জানি নে ভাই।

—দেবব্রত বসু—আপনার মনে থাকে না। বাড়ি গেলাম না কি ইচ্ছে ক'রে? সেকেন্ মাস্টার ছুটি দিলে না। ছুটি চাইতে গেলাম, বললে, আর শনিবারে গেলে আবার এ শনিবারে কি? হবে না, যাও।

তাহার পর সে বসিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ গল্প করিল। তাহার বাড়ি শহর হইতে মাইল বারো দূরে, ট্রেনে যাইতে হয়। সে শনিবারে বাড়ি না গিয়া থাকিতে পারে না, মন হাঁপাইয়া উঠে, অথচ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছুটি দিতে চায় না। তাহার কথাবার্তার ধরণে অপু বুঝিতে পারিল যে, বাড়ি না যাইতে পারিয়া মন আজ খুবই খারাপ, অনবরত বাড়ির কথা ছাড়া অন্য কথা সে বড় একটা বলিল না।

দেবব্রত খানিকটা বসিয়া থাকিয়া অপুর বালিশটা টানিয়া লইয়া শুইয়া পড়িল। অনেকটা আপন মনে বলিল, সামনের শনিবারে ছুটি দিতেই হবে, সেকেন্ মাস্টার না দেয় হেডমাস্টারের কাছে গিয়ে বলবো।

অপু এ ধরণের দূর প্রবাসে একা রাত্রিবাস করিতে আদৌ অভ্যস্ত নয়, চিরকাল মা-বাপের কাছে কাটাইয়াছে, আজকার রাত্রিটা তাহার সম্পূর্ণ উদাস ও নিঃসঙ্গ ঠেকিতেছিল।

দেবব্রত হঠাৎ বিছানা হইতে উঠিয়া বলিল, আপনি দেখেন নি বুঝি? জানেন না? আসুন না আপনাকে দেখাই, আসুন উঠে!

পরে সে অপুর হাত ধরিয়া পিছনের দেওয়ালের বড় জানালাটার কাছে লইয়া গিয়া দেখাইল, সেটার পাশাপাশি দু'টি গরাদে তুলিয়া ফেলিয়া আবার বসানো চলে। একটা লোক অনায়াসে সেই ফাঁকটুকু দিয়া ঘরে যাতায়াত করিতে পারে। বলিল, শুধু সমীরদা আর গণেশ জানে, কাউকে যেন বলবেন না।

একটু পরে বোর্ডিং-এর খাওয়ার ঘণ্টা পড়িল।

খাওয়ার আগে অপু বলিল, আচ্ছা ভাই, এ কথাটার মানে জানো?

এক খণ্ড ছাপা কাগজ সে দেবব্রতকে দেখিতে দিল। বড় বড় অক্ষরে কাগজখানাতে লেখা আছে—Literature. এত বড় কথা সে এ পর্যন্ত কমই পাইয়াছে, অর্থটা জানিবার খুব কৌতূহল। দেবব্রত জানে না, বলিল, চলুন, খাওয়ার সময় মণিদাকে জিজ্ঞেস করবো।

মণিমোহন সেকেণ্ড ক্লাসের ছাত্র, দেবব্রত কাগজখানা দেখাইলে সে বলিল, এর মানে সাহিত্য। এ ম্যাক্‌মিলান কোম্পানীর বইয়ের বিজ্ঞাপন, কোথায় পেলে?

অপু হাত তুলিয়া দেখাইয়া বলিল, ওই লাইব্রেরীর কোণটায় কুড়িয়ে পেয়েছি, লাইব্রেরীর ভেতর থেকে কেমন ক'রে উড়ে এসেছে বোধ হয়। কাগজখানার আঘ্রাণ লইয়া হাসিমুখে বলিল, কেমন ন্যাপ্‌থালিনের গন্ধটা!

কাগজখানা সে যত্ন করিয়া রাখিয়া দিল।

হেডমাস্টারকে অপু অত্যন্ত ভয় করে। প্রৌঢ় বয়স, বেশ লম্বা, মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি-গোঁফ—অনেকটা যাত্রার দলের মুনির মত। ভারী নাকি কড়া মেজাজের লোক, শিক্ষকেরা পর্যন্ত তাঁহাকে ভয় করিয়া চলেন। অপু এতদিন তাঁহাকে দূর হইতে দেখিয়া আসিতেছিল। একদিন একটা বড় মজা হইল। সত্যেনবাবু ক্লাসে আসিয়া বাংলা হইতে ইংরেজী করিতে দিয়াছেন, এমন সময় হেডমাস্টার ক্লাসে ঢুকিতেই সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। হেডমাস্টার বইখানা সত্যেনবাবুর হাত হইতে লইয়া একবার চোখ বুলাইয়া দেখিয়া লইয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন—আচ্ছা, এই যে এতে ভিক্টর হিউগো কথাটা লেখা আছে, ভিক্টর হিউগো কে ছিলেন জানো? ক্লাস—নীরব। এ নাম কেহ জানে না। পাড়াগাঁয়ের স্কুলের ফোর্থ ক্লাসের ছেলে, কেহ নামও শোনে নাই।—

—কে বলতে পারো—তুমি—তুমি?

ক্লাসে সূচ পড়িলে তাহার শব্দ শোনা যায়।

অপুর অস্পষ্ট মনে হইল নামটা—যেন তাহার নিতান্ত অপরিচিত নয়, কোথাও যেন সে পাইয়াছে ইহার আগে। কিন্তু তাহার পালা আসিল ও চলিয়া গেল, তাহার মনে পড়িল না। ওদিকের বেঞ্চিটা ঘুরিয়া যখন প্রশ্নটা তাহাদের সম্মুখের বেঞ্চের ছেলেদের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তখন তাহার হঠাৎ মনে পড়িল, নিশ্চিন্দিপুরে থাকিতে সেই পুরাতন 'বঙ্গবাসী' গুলার মধ্যে কোথায় সে এ-কথাটা পড়িয়াছে—বোধ হয়, সেই 'বিলাত যাত্রীর চিঠি'র মধ্যে হইবে। তাহার মনে পড়িয়াছে! পরক্ষণেই সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—ফরাসী দেশের লেখক, খুব বড় লেখক। প্যারিসে তাঁর পাথরের মূর্তি আছে, পথের ধারে।

হেডমাস্টার বোধ হয় এ ক্লাসের ছেলের নিকট এ ভাবের উত্তর আশা করেন নাই, তাহার দিকে চশমা-আঁটা জলজলে চোখে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিতেই অপু অভিভূত ও সঙ্কুচিত অবস্থায় চোখ নামাইয়া লইল। হেডমাস্টার বলিলেন, আচ্ছা, বেশ। পথের ধারে নয়, বাগানের মধ্যে মূর্তিটা আছে—বসো; বসো সব।

সত্যেনবাবু তাহার উপর খুব সন্তুষ্ট হইলেন। ছুটির পর তাহাকে সঙ্গে করিয়া নিজের বাসায় লইয়া গেলেন। ছোটোখাটো বাড়ি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, একাই থাকেন। স্টোভ

জ্বালিয়া চা ও খাবার করিয়া তাহাকে দিলেন, নিজেও খাইলেন। বলিলেন, আর একটু ভাল ক'রে গ্রামারটা পড়বে—আমি তোমাকে দাগ দিয়ে দেখিয়ে দেবো।

অপুর লজ্জাটা অনেকক্ষণ কাটিয়া গিয়াছিল, সে আলমারিটার দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—ওতে আপনার অনেক বই আছে?

সত্যেনবাবু আলমারি খুলিয়া দেখাইলেন। বেশীর ভাগই আইনের বই, শীঘ্রই আইন পরীক্ষা দিবেন। একখানা বই তাহার হাতে দিয়া বলিলেন—এখানা তুমি পড়ো—বাংলা বই, ইতিহাসের গল্প।

অপুর আরও দু'-একখানা বই নামাইয়া দেখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারিল না।

মাস দুই-তিনের মধ্যে বোর্ডিং-এর সকলের সঙ্গে তাহার খুব জানাশোনা হইয়া গেল।

হয়ত তাহা ঘটিত না, কারণ তাহার মত লাজুক ও মুখচোরা প্রকৃতির ছেলের পক্ষে সকলের সহিত মিশিয়া আলাপ করিয়া লওয়াটা একরূপ সম্ভবের বাহিরের ব্যাপার, কিন্তু প্রায় সকলেই তাহার সহিত যাচিয়া আসিয়া আলাপ করিল। তাহাকে কে খুশী করিতে পারে—ইহা লইয়া দিনকতক যেন বোর্ডিং-এর ছেলেদের মধ্যে একটা পাল্লা দেওয়া চলিল। খাবার-ঘরে খাইতে বসিবার সময় সকলেরই ইচ্ছা—অপু তাহার কাছে বসে, এ তাড়াতাড়ি বড় পিঁড়িখানা পাতিয়া দিতেছে, ও ঘি খাইবার নিমন্ত্রণ করিতেছে। প্রথম প্রথম সে ইহাতে অস্বস্তি বোধ করিত, খাইতে বসিয়া তাহার ভাল করিয়া খাওয়া ঘটিত না, কোন রকমে খাওয়া সারিয়া উঠিয়া আসিত। কিন্তু যেদিন ফার্স্টক্লাসের রমাপতি পর্যন্ত তাহাকে নিজের পাতের লেবু তুলিয়া দিয়া গেল, সেদিন সে মনে মনে খুশী তো হইলই, একটু গর্বও অনুভব করিল। রমাপতি বয়সে তাহার অপেক্ষা চার-পাঁচ বৎসরের বড়, ইংরেজি ভাল জানে বলিয়া হেডমাস্টারের প্রিয়পাত্র, মাস্টারেরা পর্যন্ত খাতির করিয়া চলেন, একটু গম্ভীরপ্রকৃতির ছেলেও বটে। খাওয়া শেষ করিয়া আসিতে আসিতে সে ভাবিল, আমি কি ওই শ্যামলালের মত? রমাপতিদা পর্যন্ত সেধে লেবু দিল! দেয় ওদের? কথাই বলে না।

দেবব্রত অন্ধকারের মধ্যে কাঁঠালতলাটায় তাহারই অপেক্ষা করিতেছিল। বলিল—আপনার ঘরে যাবো অপূর্বদা, একটা টাস্ক একটু ব'লে দেবেন?

পরে সে হাসিমুখে বলিল, আজ বুধবার, আর চারদিন পরেই বাড়ি যাবো। শনিবারটা ছেড়ে দিন, মধ্যে আর তিনটে দিন। আপনি বাড়ি যাবেন না, অপূর্বদা?

প্রথম কয়েকমাস কাটিয়া গেল। স্কুল-কম্পাউণ্ডের সেই পাতাবাহার ও চীনা-জবার ঝোপটা অপুর বড় প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। সে রবিবারের শান্ত দুপুরে রৌদ্রে পিঠ দিয়া শুকনা পাতার রাশির মধ্যে বসিয়া বসিয়া বই পড়ে। ক্লাসের বই পড়িতে তাহার ভাল লাগে না, সে-সব বই-এর গল্পগুলি সে মাসখানেকের মধ্যেই পড়িয়া শেষ করিয়াছে। কিন্তু মুশকিল এই যে, স্কুল লাইব্রেরীতে ইংরেজি বই বেশী; যে বইগুলার বাঁধাই চিত্তাকর্ষক, ছবি বেশী,

সেগুলা সবই ইংরেজি। ইংরেজি সে ভাল বুঝিতে পারে না, কেবল ছবির তলাকার বর্ণনাটা বোঝে মাত্র।

একদিন হেডমাস্টারের অফিসে তাহার ডাক পড়িল। হেডমাস্টার ডাকিতেছেন শুনিয়া তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল। ভয়ে ভয়ে অফিসঘরের দুয়ারের কাছে গিয়া দেখিল, আর একজন সাহেবী পোশাক-পরা ভদ্রলোক ঘরের মধ্যে বসিয়া আছেন। হেডমাস্টারের ইঙ্গিতে সে ঘরে ঢুকিয়া দু'জনের সামনে গিয়া দাঁড়াইল।

ভদ্রলোকটি ইংরেজিতে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন ও সামনের একখানা পাতার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি দেখিয়া লইয়া একখানি ইংরেজি বই তাহার হাতে দিয়া ইংরেজিতে বলিলেন, এই বইখানা তুমি পড়তে নিয়েছিলে ?

অপু দেখিল, বইখানা The World of Ice, মাসখানেক আগে লাইব্রেরী হইতে পড়িবার জন্য সে লইয়াছিল। সবটা ভাল বুঝিতে পারে নাই।

সে কম্পিত কণ্ঠে বলিল, ইয়েস—

হেডমাস্টার গর্জন করিয়া বলিলেন, ইয়েস স্যর !

অপুর পা কাঁপিতেছিল, জিভ শুকাইয়া আসিতেছিল, থতমত খাইয়া বলিল, ইয়েস স্যর—

ভদ্রলোকটি পনরায় ইংরেজিতে বলিলেন, স্লেজ কাকে বলে ?

অপু ইহার আগে কখনও ইংরেজি বলিতে অভ্যাস করে নাই, ভাবিয়া ভাবিয়া ইংরেজিতে বানাইয়া বলিল, এক ধরণের গাড়ি, কুকুরে টানে। বরফের উপর দিয়া যাওয়ার কথাটা মনে আসিলেও হঠাৎ সে ইংরেজি করিতে পারিল না।

—অন্য গাড়ির সঙ্গে স্লেজের পার্থক্য কি ?

অপু প্রথমে বলিল, স্লেজ হ্যাজ—তারপরই তাহার মনে পড়িল—আর্টিক্‌ল-সংক্রান্ত কোন গোলযোগ এখানে উঠিতে পারে। 'এ' বা 'দি' কোনটা বলিতে হইবে তাড়াতাড়ির মাথায় ভাবিবার সময় না পাইয়া সোজাসুজি বহুবচনে বলিল, স্লেজেস্ হ্যাভ নো হুইল্‌স্—

—অরোরা বোরিয়ালিস কাহাকে বলে ?

অপুর চোখমুখ উজ্জ্বল দেখাইল। মাত্র দিন কতক আগে সত্যেনবাবুর কি একখানা ইংরেজি বইতে সে ইহার ছবি দেখিয়াছিল। সে জায়গাটা পড়িয়া মানে না বুঝিলেও এ-কথাটা খুব গাল-ভরা বলিয়া সত্যেনবাবুর নিকট উচ্চারণ জানিয়া মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছিল। তাড়াতাড়ি বলিল, অরোরা বোরিয়ালিস ইজ এ কাইণ্ড অব্ এ্যাটমোস্‌ফেরিক ইলেক্‌ট্রিসিটি—

ফিরিয়া আসিবার সময় শুনিল, আগন্তুক ভদ্রলোকটি বলিতেছেন, আন্‌ইউজুয়াল ফর এ বয় অব্ ফোর্থ ক্লাস। কি নাম বললেন ? এ স্ট্রাইকিংলি হ্যাণ্ডসাম বয়—বেশ বেশ !

অপু পরে জানিয়াছিল তিনি স্কুল-বিভাগের বড় ইন্সপেক্টর, না বলিয়া হঠাৎ স্কুল দেখিতে আসিয়াছিলেন।

পরে সে রমাপতির ঘরে আঁক বুঝিতে যায়। রমাপতি অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে, নিজের সীট বেশ সাজাইয়া রাখিয়াছে। টেবিলের উপর পাথরের দোয়াতদানি, নতুন নিব পরানো

কলমগুলি সাফ করিয়া গুছাইয়া রাখিয়াছে, বিছানাটি ধবধবে, বালিশের ওপর তোয়ালে। অপুর সঙ্গে পড়া শুনার কথাবার্তা মিটিবার পর সে বলিল, এবার তোমায় সরস্বতী পূজোতে ছোট ছেলেদের লীডার হ'তে হবে, আর তো বেশী দেরিও নেই, এখন থেকেই চাঁদা আদায়ের কাজে বেরুনো চাই।

উঠিবার সময় ভাবিল, রমাপতিদার মত এই রকম একটা দোয়াতদানি হয় আমার? চমৎকার ফুলকাটা? লিখে আরাম আছে। হ্যাঁ, চাঁদা চাইতে যাবো বৈ কি? ওসব হবে না আমার দিয়ে।—আসল কথা সে বেজায় মুখচোরা, কাহারও সহিত কথা বলিতে পারিবে না।

সে নিজের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, দেবব্রত সমীরের টেবিলে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া শুইয়া আছে। অপু বলিল, কি দেবু, বাড়ি যাও নি আজ?

দেবব্রত মাথা না তুলিয়াই বলিল, দেখুন না কাণ্ড সেকেন্ মাস্টারের, ছুটি দিলে না—ও শনিবারে বাড়ি যাই নি, আপনি তো জানেন অপূর্বদা! বললে, তুমি ফি শনিবারে বাড়ি যাও, তোমার ছুটি হবে না—

দেবব্রতর জন্য অপুর মনে বড় কষ্ট হইল। বাড়ির জন্য তাহার মনটা সারা সপ্তাহ ধরিয়া কি রকম তৃষিত থাকে অপু সে সন্ধান রাখে। মনে ভাবিল, ওরই ওপর সুপারিন্টেণ্ডেন্টের যত কড়াকড়ি। থাকতে পারে না, ছেলেমানুষ,—আচ্ছা লোক!

অপু বলিল, রমাপতিদাকে দিয়ে আমি একবার বিধুবাবুকে বলাবো?

দেবব্রত ম্লান হাসিয়া বলিল, কাকে বলাবেন? তিনি আছেন বুঝি? মেয়ের জন্যে নিজে বেহারাকে দিয়ে বাজার থেকে কমলালেবু আনালেন, কপি আনালেন। তিনি বাড়ি চলে গিয়েছেন কোন্ কালে, সে দুটোর ট্রেনে—আর এখন বলেই বা কি হবে, আমাদের লাইনের গাড়িও তো চলে গিয়েছে—আজ আর গাড়ি নেই।

অপু তাহাকে ভুলাইবার জন্য বলিল, এসো একটা খেলা করা যাক। তুমি হও চোর, একখানা বই চুরি ক'রে লুকিয়ে থাকো, আমি ডিটেক্‌টিভ হবো, তোমাকে ঠিক খুঁজে বার করবো—কিংবা ওইটে যেন একটা নক্সা, তুমি ব্যাগের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে পালাবে, আমি তোমাকে খুঁজে বার করবো—পড়ো নি 'নিহিলিস্ট রহস্য'? চমৎকার বই—ওঃ কি সে কাণ্ড? প্রতুলের কাছে আছে, চেয়ে দেবো।

দেবব্রতের খেলাধূলা ভাল লাগিতেছিল না, তবুও অপুর কথার কোন প্রতিবাদ না করিয়া মাথা তুলিয়া বসিল। বলিল, আমি লাইব্রেরীর ওই কোণটায় গিয়ে লুকিয়ে থাকবো?

—লুকিয়ে থাকতে হবে না, এই কাগজখানা একটা দরকারী নক্সা, তুমি পকেটের মধ্যে নিয়ে যেন রেলগাড়িতে যাচ্ছো, আমি বার ক'রে দেখে নেবো, তুমি পিস্তল বার ক'রে গুলি করতে আসবে—

দেবব্রতকে লইয়া খেলা জমিল না, একে সে 'নিহিলিস্ট রহস্য' পড়ে নাই, তাহার উপর তাহার মন খারাপ। নূতন ধরণের যুদ্ধ-জাহাজের নক্সাখানা সে বিনা বাধায় ও এত সহজে

বিপক্ষের গুপ্তচরকে চুরি করিতে দিল যে, তাহাকে এসব কার্যে নিযুক্ত করিলে রুশীয় সম্রাটকে পতনের অপেক্ষায় ১৯১৭ সালের বলশেভিক বিদ্রোহের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিতে হইত না।

বেলা প্রায় পড়িয়া আসিয়াছে। বোর্ডিং-এর পিছনে দেওয়ানী আদালতের কম্পাউণ্ডে অর্থী-প্রত্যর্থীর ভিড় কমিয়া গিয়াছে। দেবব্রত জানালার দিকে চাহিয়া বলিল, ক্লক-টাওয়ারের ঘড়িতে ক'টা বেজেচে দেখুন না একবার? কাউকে বলবেন না অপূর্বদা, আমি এখুনি বাড়ি যাবো।

অপু বিস্ময়ের সুরে বলিল, এখন যাবে কিসে? এই যে বললে ট্রেন নেই?

দেবব্রত স্বর নিচু করিয়া বলিল—এগারো মাইল তো রাস্তা মোটে, হেঁটে যাবো, একটু রাত যদি হ'য়ে পড়ে জ্যোৎস্না আছে, বেশ যাওয়া যাবে।

—এগারো মাইল রাস্তা এখন এই পড়ন্ত বেলায় হেঁটে যেতে যেতে কত রাত হবে জানো? রাস্তা কখনো হেঁটেচো তুমি? তা ছাড়া না ব'লে যাওয়া—যদি কেউ টের পায়?

কিন্তু দেবব্রতকে নিবৃত্ত করা গেল না। সে কখনও রাস্তা হাঁটে নাই তাহা ঠিক, রাত্রি হইবে তাহা ঠিক, বিধুবাবুর কানে কথাটা উঠিলে বিপদ আছে, সবই ঠিক, কিন্তু বাড়ি সে যাইবেই—সে কিছুতেই থাকিতে পারিবে না—যাহা ঘটে ঘটিবে। অবশেষে অপু বলিল, তা হ'লে আমিও তোমার সঙ্গে যাই।

দেবব্রত বলিল, তা হ'লে সবাই টের পেয়ে যাবে, আপনি তিন-চার মাস বোর্ডিং ছেড়ে কোথাও যান নি, খাবার-ঘরে না দেখতে পেলে সবাই জানতে পারবে।

দেবব্রত চলিয়া গেলে অপু কাহারও নিকট সে কথা বলিল না বটে, কিন্তু পরদিন সকালে খাওয়ার-ঘরে দেখা গেল দেবব্রতের অনুপস্থিতি অনেকে লক্ষ্য করিয়াছে। রবিবার বৈকালে সমীর আসিলে তাহাকে সে কথাটা বলিল। পরদিন সোমবার দেবব্রত সকলের সম্মুখে কি করিয়া বোর্ডিং-এর কম্পাউণ্ডে ঢুকিবে বা ধরা পড়িলে কৃতকার্যের কি কৈফিয়ৎ দিবে এই লইয়াই দু'জনে অনেক রাত পর্যন্ত আলোচনা করিল।

কিন্তু সকালে উঠিয়া দেবব্রতকে সমীরের বিছানায় শুইয়া ঘুমাইতে দেখিয়া সে দস্তুরমত অবাক হইয়া গেল। সমীর বাহিরে মুখ ধুইতে গিয়াছিল, আসিলে জানা গেল যে, কাল অনেক রাত্রে দেবব্রত আসিয়া জানালায় শব্দ করিতে থাকে। পাছে কেউ টের পায় এজন্য পিছনের জানালার খোলা-গরাদেটা তুলিয়া সমীর তাহাকে ঘরে ঢুকাইয়া লইয়াছে।

অপু আগ্রহের সঙ্গে গল্প শুনিতে বসিল। কখন সে বাড়ি পৌছিল? রাত কত হইয়াছিল, তাহার মা তখন কি করিতেছিলেন?—ইত্যাদি।

রাত অনেক হইয়াছিল। বাড়িতে রাত্রের খাওয়া প্রায় শেষ হয় হয়। তাহার মা ছোট ভাইকে প্রদীপ ধরিয়া রান্নাঘর হইতে বড়ঘরের রোয়াকে পৌছাইয়া দিতেছেন এমন সময়—

অপু কত দিন নিজে বাড়ি যায় নাই। মাকে কত দিন সে দেখে নাই। ইহার মত হাঁটিয়া যাতায়াতের পথ হইলে এতদিনে কতবার যাইত। রেলগাড়ি, গহনার নৌকা, আবার খানিকটা হাঁটা-পথও। যাতায়াতে দেড় টাকা খরচ, তাহার একমাসের জলখাবার। কোথায়

পাইবে দেড় টাকা যে, প্রতি শনিবার তো দূরের কথা, মাসে অন্তত একবারও বাড়ি যাইবে? জলখাবারের পয়সা বাঁচাইয়া আনা আষ্টেক পয়সা হইয়াছে, আর একটা টাকা হইলেই—বাড়ি। হয়ত এক টাকা জমিতে জমিতে গরমের ছুটিই বা আসিয়া যাইবে, কে জানে?

পরদিন স্কুলে হৈ হৈ ব্যাপার। দেবব্রত যে লুকাইয়া কাহাকেও না বলিয়া বাড়ি চলিয়া গিয়াছিল এবং রবিবার রাত্রে লুকাইয়া বোর্ডিং-এ ঢুকিয়াছে, সে কথা কি করিয়া প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। বিধুবাবু সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট—সে কথা হেডমাস্টারের কানে তুলিয়াছেন। ব্যাপারের গুরুত্ব বুঝিয়া সমীরের প্রাণ ভয়ে উড়িয়া গেল, সে-ই যে জানালার ভাঙা গরাদে খুলিয়া দেবব্রতকে তাহাদের ঘরে ঢুকাইয়া লইয়াছে, সে কথা হেডমাস্টার জানিতে পারিলে কি আর রক্ষা থাকিবে? সমীর রমাপতির ঘরে গিয়া অবস্থাটা বুঝিয়া আসিল। দেবব্রত নিজেই সব স্বীকার করিয়াছে, সাক্ষ্য প্রমাণের প্রয়োজন হয় নাই, কিন্তু সমীরের জানালা খুলিয়া দেওয়ার কথা কিছুই বলে নাই। বলিয়াছে, সে সোমবার খুব ভোরে চুপি চুপি লুকাইয়া বোর্ডিং-এ ঢুকিয়াছে, কেহ টের পায় নাই। স্কুল বসিলে ক্লাসে ক্লাসে হেডমাস্টারের সার্কুলার গেল যে, টিফিনের সময় স্কুলের হলে দেবব্রতকে বেত মারা হইবে, সকল ছাত্র ও টিচারদের সে সময় সেখানে উপস্থিত থাকা চাই।

সমীর গিয়া রমাপতিকে বলিল, আপনি একবার বলুন না রমাপতিদা হেডমাস্টারকে, ও ছেলেমানুষ, থাকতে পারে না বাড়ি না গিয়ে, আপনি তো জানেন ও কি রকম home-sick? মিথ্যে মিথ্যে ওকে তিন শনিবার ছুটি দিলে না সেকেন্ মাস্টার, ওর কি দোষ?

উপর-ক্লাসের ছাত্রদের ডেপুটেশনকে হেডমাস্টার হাঁকাইয়া দিলেন। টিফিনের সময় সকলে হলে একত্র হইলে দেবব্রতকে আনা হইল। ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া ছোট হইয়া গিয়াছে। হেডমাস্টার বজ্রগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিলেন যে, এই প্রথম অপরাধ বলিয়া তিনি শুধু বেত মারিয়াই ছাড়িয়া দিতেছেন নতুবা স্কুল হইতে তাড়াইয়া দিতেন।—রীতিমত বেত চলিল। কয়েক ঘা বেত খাইবার পরই দেবব্রত চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। হেডমাস্টার গর্জন করিয়া বলিলেন, চুপ! bend this way, bend! মার দেখিয়া বিশেষ করিয়া দেবব্রতের কান্নায় অপুর চোখে জল আসিয়া গেল। মনে পড়িল, লীলাদের বাড়ি এই রকম মার একদিন সেও খাইয়াছিল বড়বাবুর কাছে, সেও বিনা দোষে।

অপু উঠিয়া বারান্দায় গেল। ফিরিয়া আসিতে সমীর ধমক দিয়া চুপি চুপি বলিল, তুই ও-রকম কাঁদছিস্ কেন অপূর্ব? থাম্ না—হেডমাস্টার বকবে—

সরস্বতী পূজার সময় তাহার আট আনা চাঁদা ধরাতে অপু বড় বিপদে পড়িল। মাসের শেষ, হাতেও পয়সা-তেমন নাই, অথচ সে মুখে কাহাকেও 'না' বলিতে পারে না, সরস্বতী পূজার চাঁদা দিয়া হাত একেবারে খালি হইয়া গেল। বৈকালে সমীর জিজ্ঞাসা করিল, খাবার খেতে গেলি নে অপূর্ব?

সে হাসিয়া ঘাড় নাড়িল।

সমীর তাহার সব খবর রাখে, বলিল, আমি বরাবর দেখে আসচি অপূর্ব, হাতের পয়সা ভারী বে-আন্দাজি খরচ করিস্ তুই—বুঝেসুজে চললে এরকম হয় না—আট আনা চাঁদা কে দিতে বলেছে ?

অপু হাসিমুখে বলিল, আচ্ছা, আচ্ছা, যা, তোকে আর শেখাতে হবে না—ভারী আমার গুরুঠাকুর—

সমীর বলিল, না হাসি নয়, সত্যি কথা বলছি। আর এই ননী, ভুলো, রাসবেহারী—ওদের ও-রকম বাজারে নিয়ে গিয়ে খাবার খাওয়াস্ কেন ?

অপু তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলিল, যাঃ বকিস নে—ওরা ধরে খাওয়াবার জন্যে, তা করবো কি ?

সমীর রাগ করিয়া বলিল, খাওয়াতে বললেই অমনি খাওয়াতে হবে ? ওরাও দুষ্টুর ধাড়ি, তোকে পেয়েছে ওই রকম তাই। অন্য কারুর কাছে তো কই ঘেঁষে না। আড়ালে তোকে বোকা বলে তা জানিস্ ?

—হ্যাঁ বলে বৈকি !

—আমার মিথ্যে কথা বলে লাভ ? সেদিন মণিদার ঘরে তোর কথা হচ্ছিল ; ওই বদমায়েস রাসবেহারীটা বলছিল—ফাঁকি দিয়ে খেয়ে নেয়,—আর ও-সব কলার লজেঞ্জুস কিনে এনে বিলিয়ে বাহাদুরি করতে কে বলেছে তোকে !

সমীর নিতান্ত মিথ্যা বলে নাই। জীবনে এই প্রথম নিজের খরচপত্র অপুকে নিজে বুঝিয়া করিতে হইতেছে, ইহার পূর্বে কখনও পয়সাকড়ি নিজের হাতের মধ্যে পাইয়া নাড়াচাড়া করে নাই—কাজেই সে টাকা-পয়সার ওজন বুঝিতে পারে না, স্কলারশিপের টাকা হইতে বোর্ডিং-এর খরচ মিটাইয়া টাকা-দুই হাতখরচের জন্য বাঁচে—এই দেড় টাকা দু'টাকাকে সে টাকার হিসাবে না দেখিয়া পয়সার হিসাবে দেখিয়া থাকে। ইতিপূর্বে কখনও আটটা পয়সা একত্র হাতের মধ্যে পায় নাই—একশো কুড়িটা পয়সা তাহার কাছে কুবেরের ধনভাণ্ডারের সমান অসীম মনে হয়! মাসের প্রথমে ঠিক রাখিতে না পারিয়া সে দরাজ হাতে খরচ করে—বাঁধানো খাতা কেনে, কালি কেনে, খাবার খায়। প্রায়ই দু'চারজন ছেলে আসিয়া ধরে তাহাদিগকে খাওয়াইতে হইবে। তাহার খুব প্রশংসা করে, পড়াশুনার তারিফ করে! অপু মনে মনে অত্যন্ত গর্ব অনুভব করে, ভাবে—সোজা ভাল ছেলে আমি! সবাই কি খাতির করে! তবুও তো মোটে পাঁচ মাস এসিচি!

মহা খুশীর সহিত তাহাদিগকে বাজারে লইয়া গিয়া খাবার খাওয়ায়। ইহার উপর আবার কেহ কেহ ধার করিতে আসে, অপু কাহাকেও 'না' বলিতে পারে না।

এরূপ করিলে কুবেরের ভাণ্ডার আর কিছু বেশী দিন টিকিতে পারে বটে, কিন্তু একশত কুড়িটা পয়সা দশদিনের মধ্যেই নিঃশেষে উড়িয়া যায়, মাসের বাকি দিনগুলিতে কষ্ট ও টানা-টানির সীমা থাকে না। দু'দশটা পয়সা যে যাহা ধার লয়, মুখচোরা অপু কাহারও কাছে তাগাদা করিতে পারে না,—প্রায়ই তাহা আর আদায় হয় না।

সমীর ব্যাডমিণ্টনের র‍্যাকেট হাতে বাহির হইয়া গেল। অপু ভাবিল—বলুক বোকা, আমি তো আর বোকা নই? পয়সা ধার নিয়েচে কেন দেবে না—সবাই দেবে।

পরে সে একখানা বই হাতে লইয়া তাহার প্রিয় গাছপালা-ঘেরা সেই কোণটিতে বসিতে যায়। মনে পড়ে এতক্ষণ সেখানে ছায়া পড়িয়া গিয়াছে, চীনে-জবা গাছে কচি কচি পাতা ধরিয়াছে। যাইবার সময় ভাবে, দেখি আর ক'টা লজেঞ্চুস্ আছে?—পরে বোতল হইতে গোটাকতক বাহির করিয়া মুখে পুরিয়া দেয়।—ভাবে, আসছে মাসের টাকা পেলে ঐ যে আনারসের একরকম আছে, তাই কিনে আনবো এক শিশি—কি চমৎকার এগুলো খেতে! এ ধরণের ফলের আস্বাদযুক্ত লজেঞ্চুস্ সে আর কখনও খায় নাই!

কম্পাউণ্ডে নামিয়া লাইব্রেরীর কোণটা দিয়া যাইতে যাইতে সে হঠাৎ অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। একজন বেঁটে-মত লোক ইঁদারার কাছে দাঁড়াইয়া স্কুলের কেরাণী ও বোর্ডিং-এর বাজার-সরকার গোপীনাথ দত্তের সঙ্গে আলাপ করিতেছে।

তাহার বুকের ভিতরটা কেমন ছাঁৎ করিয়া উঠিল…সে কিসের টানে যেন লোকটার দিকে পায়ে পায়ে আগাইয়া গেল…লোকটা এবার তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়াছে—হাতটা কেমন বাঁকাইয়া আছে, তখনি কথা শেষ করিয়া সে ইঁদারার পাড়ের গায়ে ঠেস্-দেওয়ানো ছাতাটা হাতে লইয়া কম্পাউণ্ডের ফটক দিয়া বাহির হইয়া গেল।

অপু খানিকক্ষণ একদৃষ্টে সেদিকে চাহিয়া রহিল। লোকটাকে দেখিতে অবিকল তাহার বাবার মত।

কতদিন সে বাবার মুখ দেখে নাই। আজ চার বৎসর!

উদ্গত চোখের জল চাপিয়া জবাতলায় গিয়া সে গাছের ছায়ায় চুপ করিয়া বসিল।

অন্যমনস্কভাবে বইখানা সে উল্টাইয়া যায়। তাহার প্রিয় সেই তিন-রঙা ছবিটা বাহির করিল, পাশের পৃষ্ঠার সেই পদ্যটা।

স্বদেশ হইতে বহুদূরে, আত্মীয়স্বজন হইতে বহুদূরে, আলজিরিয়ার কর্কশ, বন্ধুর, জলহীন মরুপ্রান্তে একজন মুমূর্ষু তরুণ সৈনিক বালুশয্যায় শায়িত। দেখিবার কেহ নাই। কেবল জনৈক সৈনিকবন্ধু পাশে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া মুখে চামড়ার বোতল হইতে একটু একটু জল দিতেছে। পৃথিবীর নিকট হইতে শেষ বিদায় লইবার সময় সম্মুখের এই অপরিচিত, ধূসর উঁচুনিচু বালিয়াড়ি, পিছনের আকাশে সান্ধ্যসূর্যরক্তচ্ছটা, দূরে খর্জুরকুঞ্জ ও উর্ধ্বমুখ উষ্ট্রশ্রেণীর দিকে চোখ রাখিয়া মুমূর্ষু সৈনিকটির কেবলই মনে পড়িতেছে বহুদূরে রাইন নদীতীরবর্তী তাহার জন্মপল্লীর কথা…তাহার মা আছেন সেখানে। বন্ধু, তুমি আমার মায়ের কাছে খবরটা পৌঁছাইয়া দিও, ভুলিও না।…

For my home is in distant Bingen, Fair Bingen on the Rhine!…

মাকে অপু দেখে নাই আজ পাঁচ মাস!—সে আর থাকিতে পারে না…বোর্ডিং তাহার ভাল লাগে না, স্কুল আর ভাল লাগে না, মাকে না দেখিয়া আর থাকা যায় না।

এই সব সময়ে এই নির্জন অপরাহ্নগুলিতে নিশ্চিন্দিপুরের কথা কেমন করিয়া তাহার মনে পড়িয়া যায়। সেই একদিনের কথা মনে পড়ে।···

বাড়িতে পাশের পোড়ো ভিটার বনে অনেকগুলো ছাতারে পাখি কিচমিচ করিতেছিল, কি ভাবিয়া একটা ঢিল ছুঁড়িয়া মারিতেই দলের মধ্যে ছোট একটা পাখি ঘাড় মোচড়াইয়া টুপ করিয়া ঝোপের নিচে পড়িয়া গেল, বাকীগুলা উড়িয়া পলাইল। তাহার ঢিলে পাখি সত্য সত্য মরিবে ইহা সে ভাবে নাই, দৌড়িয়া গিয়া মহা আগ্রহে দিদিকে ডাকিল, ওরে দিদি, শীগ্‌গির আয় রে, দেখবি একটা জিনিস, ছুটে আয়—

দুর্গা আসিয়া দেখিয়া বলিল, দেখি, দে-দিকি আমার হাতে! পরে সে নিজের হাতে পাখিটিকে লইয়া কৌতূহলের সহিত নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। ঘাড় ভাঙিয়া গিয়াছে, মুখ দিয়া রক্ত উঠিয়াছে, দুর্গার আঙুলে রক্ত লাগিয়া গেল। দুর্গা তিরস্কারের সুরে বলিল, আহা কেন মারতে গেলি তুই?

অপুর বিজয়গর্বে উৎফুল্ল মন একটু দমিয়া গেল।

দুর্গা বলিল, আজ কি বার রে? সোমবার না? তুই তো বামুনের ছেলে—চল, তুই আর আমি একে নিয়ে গিয়ে গাঙের ধারে পুড়িয়ে আসি, এর গতি হয়ে যাবে।

তারপর দুর্গা কোথা হইতে একটা দেশলাই সংগ্রহ করিয়া আনিল, তেঁতুলতলার ঘাটের এক ঝোপের ধারে শুকনো পাতার আগুনে পাখিটাকে খানিক পুড়াইল, পরে আধ-ঝল্‌সানো পাখিটা নদীর জলে ফেলিয়া দিয়া সে ভক্তিভাবে বলিল—হরিবোল হরি, হরি ঠাকুর ওর গতি করবেন, দেখিস্! আহা কি ক'রেই ঘাড়টা থেঁতলে দিয়েছিলি? কখ্‌খনো ওরকম করিস নে আর। বনে জঙ্গলে উড়ে বেড়ায়, কারুর কিছু করে না, মারতে আছে, ছিঃ!—

নদী হইতে অঞ্জলি ভরিয়া জল তুলিয়া দুর্গা চিতার জায়গাটা ধুইয়া দিল।

সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফিরিবার সময় কে জানে তাহারা কোন্ মুক্ত বিহঙ্গ আত্মার আশীর্বাদ লইয়া ফিরিয়াছিল।···

দেবব্রত আসিয়া ডাক দিতে অপুর নিশ্চিন্দিপুরের স্বপ্ন মিলাইয়া গেল।

দেবব্রত বলিল, অপূর্বদা এখানে ব'সে আছেন? আমি ঠিক ভেবেচি আপনি এখানেই আছেন—কি কথা ভাবচেন—মুখ ভার ভার—

অপু হাসিয়া বলিল—ও কিছু না, এস ব'সো। কি? চলো দেখি রাসবেহারী কি করছে।

দেবব্রত বলিল, না, যাবেন না অপূর্বদা, কেন ওদের সঙ্গে মেশেন? আপনার নামে লাগিয়েচে, ধোপার পয়সা দেয় না, পয়সা বাকী রাখে এই সব। যাবেন না ওদের ওখানে—

—কে বলেচে এসব কথা?

—ওই ওরাই বলে। বিনোদ ধোপাকে শিখিয়ে দিচ্ছিল আপনার কাছে পয়সা বাকি না রাখতে। বলছিল, ও আর দেবে না—তিন বারের পয়সা নাকি বাকি আছে?

অপু বলিল, বা রে, বেশ লোক তো সব! হাতে পয়সা ছিল না তাই দিই নি—এই সামনের মাসে প্রথমেই দিয়ে দেবো—তা আবার ধোপাকে শিখিয়ে দেওয়া—আচ্ছা তো সব।

দেবব্রত বলিল—আবার আপনি ওদের যান খাওয়াতে! আপনার সেই খাতাখানা নিয়ে ওই বদমাইস্ হিমাংশুটা আজ কত ঠাট্টা তামাসা করছিল—ওদের দেখান কেন ওসব?

অপূর্ব বলিল, এসব কথা আমি জানি নে, আমি লিখছিল্যাম ননীমাধব এসে বলে—ওটা কি? তাই একটুখানি পড়ে শোনালাম। কি কি—কি বলছিল?

—আপনাকে পাগল বলে—যত রাজ্যির গাছপালার কথা নাকি শুধু শুধু খাতায় লেখা! আবোল-তাবোল শুধু তাতেই ভর্তি? ওরা তাই নিয়ে হাসে। আপনি চুপ ক'রে এইখানে মাঝে মাঝে এসে বসেন বলে কত কথা তুলেছে—

অপুর রাগ হইল, একটু লজ্জাও হইল। ভাবিল, খাতাখানা না দেখালেই হ'ত সেদিন! দেখতে চাইলে তাই তো দেখালাম, নইলে আমি সেধে তো আর—

মাঝে মাঝে তাহার মনে কেমন একটা অস্থিরতা আসে, এসব দিনে বোর্ডিং-এর ঘরে আবদ্ধ থাকিতে মন চাহে না। কোথায় কোন মাঠ বৈকালের রোদে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, ছায়াভরা নদীজলে কোথায় নববধূর নাকছাবির মত পানকলস শেওলার কুচা কুচা শাদা ফুল ফুটিয়া নদীজল আলো করিয়া রাখিয়াছে, মাঠের মাঝে উঁচু ডাঙায় কোথায় ঘেঁটুফুলের বন… এই সবের স্বপ্নে সে বিভোর থাকে, মুক্ত আকাশ, মুক্ত মাঠ, গাছপালার জন্য মন কেমন করে। গাছপালা না দেখিয়া বেশীদিন থাকা তাহার পক্ষে একেবারে অসম্ভব! মনে বেশী কষ্ট হইলে একখানা খাতায় সে বসিয়া বসিয়া যত রাজ্যের গাছের ও লতাপাতার নাম লেখে এবং যে ধরণের ভূমিশ্রীর জন্যে মনটা তৃষিত থাকে, তাহারই একটা কল্পিত বর্ণনায় খাতা ভরাইয়া তোলে। সেখানে নদীর পাশেই থাকে মাঠ, বাবলা বন, নানা বনজ গাছ, পাখিডাকা সকাল-বিকালের রোদ…ফুল! ফুলের সংখ্যা থাকে না। বোর্ডিং-এর ঘরটায় আবদ্ধ থাকিয়াও মনে মনে সে নানা অজানা মাঠে বনে নদীতীরে বেড়াইয়া আসে। একখানা বাঁধা খাতাই সে এভাবে লিখিয়া পুরাইয়া ফেলিয়াছে!

অপু ভাবিল, বলুক গে, আর কখ্খনো কিছু দেখাচ্ছি নে। ওদের সঙ্গে এই আমার হ'য়ে গেল। দেবো আবার কখনো ক্লাসের ট্রানশ্লেসন বলে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ফাল্গুন মাসের প্রথম হইতেই স্কুল-কম্পাউণ্ডের চারিপাশে গাছপালার নতুন পাতা গজাইল। ক্রিকেট খেলার মাঠে বড় বাদাম গাছটার রক্তাভ-কচি সবুজ পাতা সকালের রৌদ্রে দেখিতে হইল চমৎকার, শীত একেবারে নাই বলিলেই হয়।

বোর্ডিং-এর রাসবিহারীর দল পরামর্শ করিল মাম্‌জোয়ানে দোলের মেলা দেখিতে যাইতে হইবে। মাম্‌জোয়ানের মেলা এ অঞ্চলের বিখ্যাত মেলা।

অপু খুশির সহিত রাসবিহারীদের দলে ভিড়িল। মাম্‌জোয়ানের মেলার কথা অনেক দিন

হইতে সে শুনিয়া আসিতেছে। তাহা ছাড়া নিশ্চিন্দিপুর ছাড়িয়া পর্যন্ত কোথাও মেলা বা বারোয়ারি আর কখনও দেখা ঘটে নাই।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বিধুবাবু দু'দিনের ছুটি দিলেন। অপু অনেকদিন পরে যেন মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। ক্রোশ তিনেক পথ—মাঠ ও কাঁচা মাটির রাস্তা। ছোট ছোট গ্রাম, কুমারেরা চাক ঘুরাইয়া কলসা গড়িতেছে। পথের ধারের ছোট দোকানে দোকানদার রেড়ির ফলের বীজ ওজন করিয়া লইতেছে—সজিনা গাছ সব ফুলে ভর্তি—এমন চমৎকার লাগে।...ছুটি-ছাটা ও শনি-রবিবারে সীমাবদ্ধ না হইয়া এই যে জীবনধারা পথের দুই পাশে, দিনে রাত্রে, শত দুঃখে-সুখে আকাশ-বাতাসের তলে, নিরাবরণ মুক্ত প্রকৃতির সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পাতাইয়া চঞ্চল আনন্দে ছুটিয়া চলিয়াছে,—এই জীবনধারার সহিত সে নিজেকে পরিচিত করিতে চায়।

মাঠে কাহারা শুকনো খেজুর ডালের আগুনে রস জাল দিতেছে দেখিয়া তাহার ইচ্ছা হইল—সে তাহাদের কাছে গিয়া খানিকক্ষণ রস জ্বাল দেওয়া দেখিবে, বসিয়া বসিয়া শুনিবে উহারা কি কথাবার্তা বলিতেছে।

ননী বলিল, তোকে পাগল বলি কি আর সাধে? দূর, দূর,—আর কি দেখবি ওখানে?

অপু অপ্রতিভ মুখে বলিল, আয় না ওরা কি বলছে শুনি? ওরা কত গল্প জানে, জানিস? আয় না—

রাজু রায়ের পাঠশালার সেই দিনগুলি হইতে বয়স্ক লোকের গল্পের ও কথাবার্তার প্রতি তাহার প্রবল মোহ আছে—একটা বিস্তৃততর, অপরিচিত জীবনের কথা ইহাদের মুখে শোনা যায়। অপু ছাড়িয়া যাইতে রাজী নয়—রাসবিহারীর দল অগত্যা তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া গেল।

সুশ্রী চেহারার ভদ্রলোকের ছেলে দেখিয়া মুচিরা খুব খাতির করিল। খেজুর-রস খাইতে আসিয়াছে ভাবিয়া মাটির নতুন ভাঁড় ধুইয়া জিরান কাটের টাটকা রস লইয়া আসিল। ইহাদের কাছে অপু আদৌ মুখচোরা নয়। ঘণ্টাখানেকের উপর সে তাহাদের সেখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গুড় জ্বাল দেওয়া দেখিল।

মামজোয়ানের মেলায় পৌঁছিতে তাহার হইয়া গেল বেলা বারোটা। প্রকাণ্ড মেলা, ভয়ানক ভিড়; রৌদ্রে তিন ক্রোশ পথ হাঁটিয়া মুখ রাঙা হইয়া গিয়াছে, সঙ্গীদের মধ্যে কাহাকেও সে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দুই-ই পাইয়াছে, ভাল খাবার খাইবার পয়সা নাই, একটা দোকান হইতে সামান্য কিছু খাইয়া এক ঘটি জল খাইল। তাহার পর একটা পাখীর খেলার তাঁবুর ফাঁক দিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল—ভিতরে কি খেলা হইতেছে। একজন পশ্চিমা লোক হটাইয়া দিতে আসিল।

অপু বলিল, কত ক'রে নেবে খেলা দেখতে?...দুপয়সা দেব—দেখাবে?

লোকটি বলিল, এখন খেলা শুরু হইয়া গিয়াছে, আধঘণ্টা পরে আসিতে।

একটা পানের দোকানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, যাত্রা কবে বসবে জানো?

বৈকালে লোকের ভিড় খুব বাড়িল। দোকানে দোকানে, বিশেষ করিয়া পানের

দোকানগুলিতে খুব ভিড়। খেলা ও ম্যাজিকের তাঁবুগুলির সামনে খুব ঘণ্টা ও জয়ঢাক বাজিতেছে। অপু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল—একটা বড় তাঁবুর বাহিরে আলকাতরা-মাখা জন দুই লোক বাঁশের মাচার উপর দাঁড়াইয়া কৌতূহলী জনতার সম্মুখে খেলার অত্যাশ্চর্যতা ও অভিনবত্বের নমুনা স্বরূপ একটা লম্বা লাল-নীল কাগজের মালা নানা অঙ্গভঙ্গি-সহকারে মুখ হইতে টানিয়া বাহির করিতেছে।

সে পাশের একটা লোককে জিজ্ঞাসা করিল, এ খেলা ক'পয়সা জানো?

নিশ্চিন্দিপুরে থাকিতে বাবার বইয়ের দপ্তরে একখানা পুরাতন বই ছিল, তাহার মনে আছে, বইখানার নাম 'রহস্য লহরী'। রুমাল উড়াইয়া দেওয়া, কাটামুণ্ডুকে কথা-বলানো, এক ঘণ্টার মধ্যে আম-চারায় ফল-ধরানো প্রভৃতি নানা ম্যাজিকের প্রক্রিয়া বইখানাতে ছিল। অপু বই দেখিয়া দু-একবার চেষ্টা করিতে গিয়াছিল, কিন্তু নানা বিলাতী ঔষধের ফর্দ ও উপকরণের তালিকা দেখিয়া, বিশেষ করিয়া "নিশাদল" দ্রব্যটি কি বা তাহা কোথায় পাওয়া যায় ঠিক করিতে না পারিয়া, অবশেষে ছাড়িয়া দেয়।

সে মনে মনে ভাবিল—ওই সব দেখেই তো ওরা শেখে! বাবার সেই বইখানাতে কত ম্যাজিকের কথা লেখা ছিল!—নিশ্চিন্দিপুর থেকে আসবার সময় কোথায় যে গেল বইখানা!

চারিধারে বাজনার শব্দ, লোকজনের হাসি-খুশি, খেলো সিগারেটের ধোঁয়া, ভিড়, আলো, সাজানো দোকানের সারি, তাহার মন উৎসবের নেশায় মাতিয়া উঠিল।

একদল ছেলেমেয়ে একখানা গোরুর গাড়ির ছইয়ের ভিতর হইতে কৌতূহল ও আগ্রহে মুখ বাড়াইয়া ম্যাজিকের তাঁবুর জীবন্ত বিজ্ঞাপন দেখিতে দেখিতে যাইতেছে। সকল লোককেই সিগারেট খাইতে দেখিয়া তাহার ইচ্ছা হইল সেও খায়—একটা পানের দোকানে ক্রেতার ভিড়ের পিছনে খানিকটা দাঁড়াইয়া অবশেষে একটা কাঠের বাক্সের উপর উঠিয়া একজনের কাঁধের উপর দিয়া হাতটা বাড়াইয়া দিয়া বলিল, এক পয়সার দাও তো? এই যে এইদিকে—এক পয়সার সিগারেট—ভাল দেখে দিও—যা ভালো।

একটা গাছের তলায় বইয়ের দোকান দেখিয়া সেখানে গিয়া দাঁড়াইল। চটের থলের উপর বই বিছানো, দোকানী খুব বুড়া, চোখে সুতা-বাঁধা চশমা। একখানা ছবিওয়ালা চটি আরব্য উপন্যাস অপুর পছন্দ হইল—সে পড়ে নাই—কিন্তু দোকানী দাম বলিল আট আনা! হাতে পয়সা থাকিলে সে কিনিত।

বইখানা আর একবার দেখিতে গিয়া হঠাৎ সম্মুখের দিকে চোখ পড়াতে সে অবাক হইয়া গেল। সম্মুখের একটা দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া আছে—পটু! তার নিশ্চিন্দিপুরের বাল্যসঙ্গী পটু!

অপু তাড়াতাড়ি আগাইয়া গিয়া গায়ে হাত দিতেই পটু মুখ ফিরাইয়া তাহার দিকে চাহিল—প্রথমটা যেন চিনিতে পারিল না—পরে প্রায় চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, অপুদা?… এখানে কি ক'রে, কোথা থেকে অপুদা?…

অপু বলিল, তুই কোথা থেকে ?

—আমার তো দিদির বিয়ে হয়েচে এই লাউখালি। এইখেন থেকে দু-কোশ। তাই মেলা দেখতে এলাম—তুই কি ক'রে এলি কাশী থেকে ?—

অপু সব বলিল। বাবার মৃত্যু, বড়লোকের বাড়ি, মনসাপোতা স্কুল। জিজ্ঞাসা করিল, বিনিদির বিয়ে হয়েছে মামজোয়ানের কাছে ? বেশ তো—

অপুর মনে পড়িল, অনেকদিন আগে দিদির চড়ুইভাতিতে বিনিদির ভয়ে ভয়ে আসিয়া যোগ দেওয়া। গরীব অগ্রদানী বামুনের মেয়ে, সমাজে নিচু স্থান, নম্র ও ভীরু চোখ দু'টি সর্বদাই নামানো, অল্পেই সন্তুষ্ট।

দু'জনেই খুব খুশী হইয়াছিল। অপু বলিল—মেলার মধ্যে বড্ড ভিড় ভাই, চল্ কোথাও একটু ফাঁকা জায়গাতে গিয়ে বসি—অনেক কথা আছে তোর সঙ্গে।

বাহিরের একটা গাছতলায় দু'জনে গিয়া বসিল—তাহাদের বাড়িটা কি ভাবে আছে ?··· রাণুদি কেমন ?···নেড়া, পটল, নীলু, সতুদা ইহারা ?···ইছামতী নদীটা ? পটু সব কথার উত্তর দিতে পারিল না, পটুও আজ অনেকদিন গ্রাম-ছাড়া। পটুর আপন মা নাই, সৎমা। অপুরা দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ার পর হইতে সে সঙ্গীহীন হইয়া পড়িয়াছিল, দিদির বিবাহের পরে বাড়িতে একেবারেই মন টিকিল না। কিছুদিন এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল পড়াশুনার চেষ্টায়। কোথাও সুবিধা হয় নাই। দিদির বাড়ি মাঝে মাঝে আসে, এখানে থাকিয়া যদি পড়াশুনার সুযোগ হয়, সেই চেষ্টায় আছে। অনেকদিন গ্রাম-ছাড়া, সেখানকার বিশেষ কিছু খবর জানে না। তবে শুনিয়া আসিয়াছিল—শীঘ্রই রাণীদির বিবাহ হইবে, সে তিন বছর আগেকার কথা, এতদিন নিশ্চয় হইয়া গিয়াছে।

পটু কথা বলিতে বলিতে অপুর দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল।

রূপকথার রাজপুত্রের মত চেহারা হইয়া উঠিয়াছে অপুদার।···কি সুন্দর মুখ!·· অপুদার কাপড়চোপড়ের ধরণও একেবারে পরিবর্তিত হইয়াছে।

অপু তাহাকে একটা খাবারের দোকানে লইয়া গিয়া খাবার খাওয়াইল, বাহিরে আসিয়া বলিল, সিগারেট খাবি ? তাহাকে ম্যাজিকের তাঁবুর সামনে আনিয়া বলিল, ম্যাজিক দেখিস নি তুই ? আয় তোকে দেখাই—পরে সে আট পয়সার দুইখানা টিকিট কাটিয়া উৎসুক মুখে পটুকে লইয়া ম্যাজিকের তাঁবুতে ঢুকিল।

ম্যাজিক দেখিতে দেখিতে অপু জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁরে, আমরা চলে এলে রাণুদি বলতো নাকি কিছু আমাদের—আমার কথা ? নাঃ—

খুব বলিত। পটুর কাছে কতদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছে অপু তাহাকে কোনো পত্র লিখিয়াছে কি না, তাহাদের কাশীর ঠিকানা কি ? পটু বলিতে পারে নাই। শেষে পটু বলিল, বুড়ো নরোত্তম বাবাজী তোর কথা ভারী বলতো!

অপুর চোখ জলে ভরিয়া আসিল। তাহার বোষ্টমদাদু এখনও বাঁচিয়া আছে ?—এখনও তাহার কথা ভুলিয়া যায় নাই ? মধুর প্রভাতের পদ্মফুলের মত ছিল দিনগুলা—আকাশ

ছিল নির্মল, বাতাস কি শান্ত, নবীন উৎসাহ ভরা মধুচ্ছন্দ! মধুর নিশ্চিন্দিপুর! মধুর ইছামতীর কলমর্মর!···মধুর তাহার দুঃখী দিদি দুর্গার স্নেহভরা ডাগর চোখের স্মৃতি!···কতদুর, ক—ত দুর চলিয়া গিয়াছে সে দিনের জীবন। খেলাঘরের দোকানে ক্ষোনা-পাতার পান বিক্রী, সেই সতুদার মাকাল ফল চুরি করিয়া দৌড় দেওয়া!···

একবার একখানা বইতে সে পড়িয়াছিল দেবতার মায়ায় একটা লোক স্নানের সময় জলে ডুব দিয়া পুনরায় উঠিবার যে সামান্য ফাঁকটুকু তাহারই মধ্যে ষাট বৎসরের সুদীর্ঘ জীবনের সকল সুখ দুঃখ ভোগ করিয়াছিল—যেন তাহার বিবাহ হইল, ছেলেমেয়ে হইল, তাহারা সব মানুষ হইল, কতক বা মরিয়া গেল, বাকীগুলির বিবাহ হইল, নিজেও সে বৃদ্ধ হইয়া গেল—হঠাৎ জল হইতে মাথা তুলিয়া দেখে—কোথাও কিছু নয়, সে যেখানে সেখানেই আছে, কোথায় বা ঘরবাড়ি, কোথায় বা ছেলেমেয়ে!···

গল্পটা পড়িয়া পর্যন্ত মাঝে মাঝে সে ভাবে তাহারও ওরকম হয় না? এক-এক সময় তাহার মনে হয় হয়ত বা তাহার হইয়াছে। এ সব কিছু না—স্বপ্ন। বাবার মৃত্যু, এই বিদেশে, এই স্কুলে পড়া—সব স্বপ্ন। কবে একদিন ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া দেখিবে সে নিশ্চিন্দিপুরের বাড়িতে তাহাদের সেই বনের ধারের ঘরটাতে আষাঢ়ের পড়ন্ত বেলায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল—সন্ধ্যার দিকে পাখির কলরবে জাগিয়া উঠিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে ভাবিতেছে, কি সব হিজিবিজি অর্থহীন স্বপ্নই না সে দেখিয়াছে ঘুমের ঘোরে!...বেশ মজা হয়, আবার তাহার দিদি ফিরিয়া আসে, তাহার বাবা, তাহাদের বাড়িটা।

একদিন ক্লাসে সত্যেনবাবু একটা ইংরেজি কবিতা পড়াইতেছিলেন, নামটা গ্রেভ্‌স্ অফ এ হাউস্‌হোল্ড। নির্জনে বসিয়া সেটা আবৃত্তি করিতে করিতে তাহার চোখ দিয়া জল পড়ে। ভাইবোনেরা একসঙ্গে মানুষ, এক মায়ের কোলেপিঠে, এক ছেঁড়া কাঁথার তলে। বড় হইয়া জীবনের ডাকে কে কোথায় গেল চলিয়া—কাহারও সমাধি সমুদ্রে, কাহারও কোন্ অজানা দেশের অপরিচিত আকাশের তলে, কাহারও বা ফুল-ফোটা কোন্ গ্রাম্য বনের ধারে।

আপনা-আপনি পথ চলিতে চলিতে এই সব স্বপ্নে সে বিভোর হইয়া যায়। কত কথা যেন মনে ওঠে! যত লোকের দুঃখের দুর্দশার কাহিনী। নিশ্চিন্দিপুরের জানালার ধারে বসিয়া বাল্যের সে ছবি দেখা—সেই বিপন্ন কর্ণ, নির্বাসিতা সীতা, দরিদ্র বালক অশ্বত্থামা, পরাজিত রাজা দুর্যোধন, পল্লীবালিকা জোয়ান। বুঝাইয়া বলিবার বয়স তাহার এখনও হয় নাই; ভাবকে সে ভাষা দিতে জানে না—অল্পদিনের জীবনে অধীত সমুদয় পদ্য ও কাহিনী অবলম্বন করিয়া সে যেভাবে জগৎকে গড়িয়া তুলিয়াছে—অনাবিল তরুণ মনের তাহা প্রথম কাব্য—তার কাঁচা জীবনে সুখে দুঃখে, আশায় নিরাশায় গাঁথা বনফুলের হার।—প্রথম উচ্চারিত ঋক্‌মন্ত্রের কারণ ছিল যে বিস্ময় যে আনন্দ—তাহাদেরই সগোত্র, তাহাদেরই মত ঋদ্ধিশীল ও অবাচ্য সৌন্দর্যময়।

রাগরক্ত সন্ধ্যার আকাশে সত্যের প্রথম শুকতারা।

কে জানে ওর মনের সে-সব গহন গভীর গোপন রহস্য ? কে বোঝে ?

ম্যাজিকের তাঁবু হইতে বাহির হইয়া দু'জনে মেলার মধ্যে ঢুকিল। বোর্ডিং-এর একটি ছেলের সঙ্গেও তাহার দেখা হইল না, কিন্তু তাহার আমোদের তৃষ্ণা এখনও মেটে নাই, এখনও ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিবার ইচ্ছা। বলিল—চল্ পটু, দেখে আসি যাত্রা বসবে কখন—যাত্রা না দেখে যাস্ নে যেন।

পটু বলিল, অপুদা কোন্ ক্লাসে পড়িস্ তুই ?…

অপু অন্যমনস্কভাবে বলিল, ঐ যে ম্যাজিক দেখলি, ও আমার বাবার একখানা বই ছিল, তাতে সব লেখা ছিল, কি ক'রে করা যায়—জিনিস পেলে আমিও করতে পারি—

—কোন্ ক্লাসে তুই—

—ফোর্থ ক্লাসে। একদিন আমাদের স্কুলে চল্, দেখে আসবি—দেখবি কত বড় স্কুল—রাত্রে [illegible] কাছে থাকবি এখন—একটু থামিয়া বলিল—সত্যি এত জায়গায় তো গেলাম, নিশ্চিন্দিপুরের মত আর কিছু লাগে না—কোথাও ভাল লাগে না—

—তোরা যাবি নে আর সেখানে ? সেখানে তোদের জন্যে সবাই দুঃখু করে, তোর কথা তো সবাই বলে—পরে সে হাসিয়া বলিল, অপুদা, তোর কাপড় পরবার ধরণ পর্যন্ত বদলে গেছে, তুই আর সেই নিশ্চিন্দিপুরের পাড়াগেঁয়ে ছেলে নেই—

অপু খুব খুশী হইল। গর্বের সহিত গায়ের শার্টটা দেখাইয়া বলিল, কেমন রংটা, না ? ফার্স্ট ক্লাসের রমাপতিদার গায়ে আছে, তাই দেখে এটা কিনেছি—দেড় টাকা দাম।

সে একথা বলিল না যে শার্টটা সে অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া অপরের দেখা-দেখি দরজির দোকান হইতে ধারে কিনিয়াছে, দরজির অনবরত তাগাদা সত্ত্বেও এখনও দাম দিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

বেলা বেশ পড়িয়া আসিয়াছে। আল্‌কাৎরা-মাখা জীবন্ত বিজ্ঞাপনটি বিকট চিৎকার করিয়া লোক জড়ো করিতেছে।

পটু সন্ধ্যার কিছু পূর্বে দিদির বাড়ির দিকে রওনা হইল। অপুর সহিত এতকাল পরে দেখা হওয়াতে সে খুব খুশী হইয়াছে। কোথা হইতে অপুদা কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে! তবুও স্রোতের তৃণের মত ভাসিতে ভাসিতে অপুদা আশ্রয় খুঁজিয়া পাইয়াছে, কিন্তু এই তিন বৎসরকাল সে-ও তো ভাসিয়াই বেড়াইতেছে এক রকম, তাহার কি কোন উপায় হইবে না ?

সন্ধ্যার পর বাড়ি পৌছিল। তাহার দিদি বিনির বিবাহ বিশেষ অবস্থাপন্ন ঘরে হয় নাই, মাটির বাড়ি, খড়ের চাল, খানদুই-তিন ঘর। পশ্চিমের ভিটায় পুরানো আমলের কোঠা ভাঙিয়া পড়িয়া আছে, তাহারই একটা ঘরে বর্তমানে রান্নাঘর, ছাদ নাই, আপাততঃ খড়ের ছাউনি একখানা চাল ইটের দেওয়ালের গায়ে কাৎভাবে বসানো।

বিনি ভাইকে খাবার খাইতে দিল। বলিল—কি রকম দেখলি মেলা ?… সে এখন

আঠারো-উনিশ বছরের মেয়ে, বিশেষ মোটাসোটা হয় নাই, সেই রকমই আছে। গলার স্বর শুধু বদলাইয়া গিয়াছে।

পটু হাসিমুখে বলিল, আজ কি হয়েচে জানিস দিদি, অপুর সঙ্গে দেখা হয়েচে—মেলায়।

বিনি বিস্ময়ের সুরে বলিল, অপু! সে কি ক'রে—কোথা থেকে—

পরে পটুর মুখে সব শুনিয়া সে অবাক্ হইয়া গেল বলিল—বড্ড দেখতে ইচ্ছে করে—আহা সঙ্গে ক'রে আন্‌লি নে কেন?…দেখতে বড় হয়েচে? ..

—সে অপুই আর নেই। দেখলে চেনা যায় না; আরও সুন্দর হয়েচে দেখতে—তবে সেই রকম পাগলা আছে এখনো—ভারী সুন্দর লাগে—এমন হয়েচে!…এতকাল পরে দেখা হয়ে আমার মেলায় যাওয়াই আজ সার্থক হয়েচে। খুড়িমা মনসাপোতা থাকে বললে।

—সে এখান থেকে কত দূর? ..

—সে অনেক, রেলে যেতে হয়! মামজোয়ান থেকে ন'-দশ কোশ হবে।

বিনি বলিল, আচ্ছা একদিন নিয়ে আসিস না অপুকে, একবার দেখতে ইচ্ছে করে—

ছাদ-ভাঙা রান্না-বাড়ির রোয়াকে পটু খাইতে বসিল। বিনি বলিল, তোর চক্কত্তি মশায়কে একবার বলে দেখিস দিকি কাল? বলিস বছর তিনেক থাকতে দাও, তার পর নিজের চেষ্টা নিজে করবো—

পটু বলিল, বছর তিনেকের মধ্যে পড়া শেষ হয়ে যাবে না—ছ'সাত বছরের কমে কি পাশ দিতে পারব?…অপুদা বাড়িতে পড়ে কত লেখাপড়া জানত—আমি তো তাও পড়ি নি, তুমি একবার চক্কত্তি মশায়কে বলো না দিদি?

বিনি বলিল—আমিও বলবো এখন। বড্ড ভয় করে—পাছে আবার বট্ ঠাকুরঝি হাত-পা নেড়ে ওঠে—বট্ ঠাকুরঝিকে একবার ধরতে পারিস্?—আমি কথা কইলে তো কেউ শুনবে না, ও যদি বলে তবে হয়—

পটু যে তাহা বোঝে না এমন নয়। অর্থাভাবে দিদিকে ভাল পাত্রের হাতে দিতে পারা যায় নাই, দোজবর, বয়সও বেশি। ও-পক্ষের গুটিকতক ছেলেমেয়েও আছে, দুই বিধবা ননদ বর্তমান, ইহারা সকলেই তাহার দিদির প্রভু। ভালমানুষ বলিয়া সকলেই তাহার উপর দিয়া ষোল আনা প্রভুত্ব চালাইয়া থাকে। উদয়াস্ত খাটিতে হয়, বাড়ির প্রত্যেকেই বিবেচনা করে তাহাকে দিয়া ব্যক্তিগত ফরমাইশ খাটাইবার অধিকার উহাদের প্রত্যেকেরই আছে, কাজেই তাহাকে কেহ দয়া করে না।

অনেক রাত্রে বিনির স্বামী অর্জুন চক্রবর্তী বাড়ি ফিরিল। মামজোয়ানের বাজারে তাহার খাবারের দোকান আছে, আজকাল মেলার সময় বলিয়া রাত্রে একবার আহার করিতে আসে মাত্র। খাইয়াই আবার চলিয়া যায়, রাত্রেও কেনা-বেচা হয়। লোকটি ভারি কৃপণ; বিনি রোজই আশা করে—ছোট ভাইটা এখানে কয়দিন হইল আসিয়াছে, এ পর্যন্ত কোন দিন একটা রসগোল্লাও তাহার জন্য হাতে করিয়া বাড়ি আসে নাই, অথচ নিজেরই তো খাবারের দোকান। এ রকম লোকের কাছে ভাইয়ের সম্বন্ধে কি কথাই বা সে বলিবে!

তবুও বিনি বলিল। স্বামীকে ভাত বাড়িয়া দিয়া সে সামনে বসিল, ননদেরা কেহ রান্নাঘরে নাই, এ ছাড়া আর সুযোগ ঘটিবে না। অর্জুন চক্রবর্তী বিস্ময়ের সুরে বলিল—পটল? এখানে থাকবে?...

বিনি মরীয়া হইয়া বলিল—ওই ওর সমান অপূর্ব ব'লে ছেলে—আমাদের গাঁয়ের, সেও পড়ছে। এখেনে যদি থাকে তবে এই মামুজোয়ান ইস্কুলে গিয়ে পড়তে পারে—একটা হিল্লে হয়—

অর্জুন চক্রবর্তী বলিল—ওসব এখন হবে-টবে না, দোকানের অবস্থা ভাল নয়, দোলের বাজারে খাজনা বেড়ে গিয়েছে দুনো, অথচ দোকানে আয় নেই। মামুজোয়ানে খটি খুলে চার আনা সের ছানা—তাই বিকুচ্ছে দশ আনায়, তা লাভ করবো, না খাজনা দোবো, না মহাজন মেটাবো? মেলা দেখে বাড়ি চলে যাক্—ও সব ঝক্কি এখন নেওয়া বল্‌লেই নেওয়া—।

বিনি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—বোশেখ মাসের দিকে আসতে বলবো?

অর্জুন চক্রবর্তী বলিল—বোশেখ মাসের বাকীটা আর কি—আর মাসদেড়েক বৈ তো নয়!...ওসব এখন হবে না, ওসব নিয়ে এখন দিক্ ক'রো না—ভাল লাগে না, সারাদিন খাটুনির পর—বলে নিজের জ্বালায় ভাই বাঁচি নে তা আবার—হুঁ—

বিনি আর কিছু বলিতে সাহস করিল না। মনে মনে কষ্ট হইল—ভাইটা আশা করিয়া আসিয়াছিল—দিদির বাড়ি থাকিয়া পড়িতে পারিবে! বলিল—আচ্ছা, অপু কেমন ক'রে পড়চে রে?

পটু বলিল—সে যে এস্কলারশিপ পেয়েচে—তাতেই খরচ চলে যায়।

বিনি বলিল—তুই তা পাস নে? তাহলে তোরও তো—

পটু হাসিয়া বলিল—না পড়েই এস্কলারশিপ পাবো—বা তো—পাশ দিলে তবে পাওয়া যাবে, সে সব আমার হবে না, অপুদা ভাল ছেলে—ও কি আর আমার হবে?...

বিনি বলিল—তুই অপুকে একবার ব'লে দেখ্‌দি? ও ঠিক একটা কিছু তোকে জোগাড় ক'রে দিতে পারে।

দু'জনে পরামর্শ করিয়া তাহাই অবশেষে যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিল।

সর্বজয়া পিছু পিছু উঠিয়া বড়ঘরের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিতে আসিল, সম্মুখের উঠানে নামিয়া বলিল—মাঝে মাঝে এস বৌমা, বাড়ি আগলে পড়ে থাকতে হয়, নইলে দুপুর বেলা এক একবার ভাবি তোমাদের ওখানে একটু বেড়িয়ে আসি। সেদিন বাপু গয়লাপাড়ায় চুরি হ'য়ে যাওয়ার পর বাড়ি ফেলে যেতে ভরসা পাই নে।

তেলি বাড়ির বড় বধু বেড়াইতে আসিয়াছিল, তিন বৎসরের ছোট মেয়েটির হাত ধরিয়া হাসিমুখে চলিয়া গেল।

এতক্ষণ সর্বজয়া বেশ ছিল। ইহারা সব দুপুরের পর আসিয়াছিল, গল্পগুজবে সময়টা তবুও

একরকম কাটিল। কিন্তু একা একা সে তো আর থাকিতে পারে না। শুধুই, সব সময়ই, দিন নাই রাত্রি নাই,—অপুর কথা মনে পড়ে। অপুর কথা ছাড়া অন্য কোন কথাই তাহার মনে স্থান পায় না।

আজ সে গিয়াছে এই পাঁচ মাস হইল। কত শনিবার কত ছুটির দিন চলিয়া গিয়াছে এই পাঁচমাসের মধ্যে! সর্বজয়া সকালে উঠিয়া ভাবিয়াছে—আজ দুপুরে আসিবে! দুপুর চলিয়া গেলে ভাবিয়াছে বৈকালে আসিবে। অপু আসে নাই!

অপুর কত জিনিস ঘরে পড়িয়া আছে, কত স্থান হইতে কত কি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া রাখিয়া গিয়াছে—অবোধ পাগল ছেলে!…শূন্য ঘরের দিকে চাহিয়া সর্বজয়া হাঁপায়, অপুর মুখ মনে আনিবার চেষ্টা করে। এক একবার তাহার মনে হয় অপুর মুখ সে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে। যতই জোর করিয়া মনে আনিবার চেষ্টা করে ততই সে মুখ অস্পষ্ট হইয়া যায়…অপুর মুখের আদলটা মনে আনিলেও ঠোঁটের ভঙ্গিটা ঠিক মনে পড়ে না, চোখের চাহনিটা মনে পড়ে না…সর্বজয়া একেবারে পাগলের মত হইয়া ওঠে—অপুর, তাহার অপুর মুখ সে ভুলিয়া যাইতেছে!

কেবলই অপুর ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। অপু কথা বলিতে জানিত না, কোন্ কথার কি মানে হয় বুঝিত না। মনে আছে…নিশ্চিন্দিপুরের বাড়িতে থাকিতে একবার রান্নাবাড়ির দাওয়ায় কাঁঠাল ভাঙিয়া ছেলেমেয়েকে দিতেছিল। দুর্গা বাটি পাতিয়া আগ্রহের সহিত কাঁঠাল-ভাঙা দেখিতেছে, অপু দুর্গার বাটিটা দেখাইয়া হাসিমুখে বলিয়া উঠিল—দিদি কাঁটালের বড় প্রভু, না মা? সর্বজয়া প্রথমটা বুঝিতে পারে নাই, শেষে বুঝিয়াছিল, 'দিদি কাঁঠালের বড় ভক্ত' এ কথাটি বুঝাইতে 'ভক্ত' কথাটার স্থানে 'প্রভু' ব্যবহার করিয়াছে। তখন অপুর বয়স নয় বৎসরের কম নয়, অথচ তখনও সে কাজে—কথায় নিতান্ত ছেলেমানুষ।

একবার নতুন পরণের কাপড় কোথা হইতে ছিঁড়িয়া আসিবার জন্য অপু মার খাইয়াছিল। কতদিনের কথা, তবুও ঠিক মনে আছে। হাঁড়িতে আমসত্ত্ব, কুলচুর রাখিবার জো ছিল না, অপু কোন্ ফাঁকে ঢাকনি খুলিয়া চুরি করিয়া খাইবেই। এই অবস্থায় একদিন ধরা পড়িয়া যায়, তখনকার সেই ভয়ে-ছোট-হইয়া-যাওয়া রাঙা মুখখানি মনে পড়ে। বিদেশে একা কত কষ্টই হইতেছে, কে তাহাকে সেখানে বুঝিতেছে!

আর একদিনের কথা সে কখনো ভুলিবে না। অপুর বয়স যখন তিন বৎসর, তখন সে একবার হারাইয়া যায়। খানিকটা আগে সম্মুখের উঠানের কাঁঠাল-তলায় বসিয়া খেলা করিতে তাহাকে দেখা গিয়াছে, ইহারই মধ্যে কোথায় গেল!…পাড়ায় কাহারও বাড়িতে নাই, পিছনের বাঁশবনেও নাই—চারিধারে খুঁজিয়া কোথাও অপুকে পাইল না। সর্বজয়া কাঁদিয়া আকুল হইল—কিন্তু যখন হরিহর বাড়ির পাশের বাঁশতলার ডোবাটা খুঁজিবার জন্য ও-পাড়া হইতে জেলেদের ডাকিয়া আনাইল, তখন তাহার আর কান্নাকাটি রহিল না। সে কেমন কাঠের মত হইয়া ডোবার পাড়ে দাঁড়াইয়া জেলেদের জাল-ফেলা দেখিতে লাগিল। পাড়াসুদ্ধ লোক ভাঙিয়া পড়িয়াছিল—ডোবার পাড়ে অক্রুর জেলে টানাজালের বাঁধন

খুলিতেছিল, সর্বজয়া ভাবিল অক্রূর মাঝিকে চিরকাল সে নিরীহ বলিয়া জানে, ভাল মানুষের মত কতবার মাছ বেচিয়া গিয়াছে তাহাদের বাড়ি—সে সাক্ষাৎ যমের বাহন হইয়া আসিল কি করিয়া? শুধু অক্রূর মাঝি নয়, সবাই যেন যমদূত, ও অন্য লোকেরা, যাহারা মজা দেখিতে ছুটিয়াছে, তাহারা—এমন কি তাহার স্বামী পর্যন্ত। সে-ই তো গিয়া ইহাদের ডাকিয়া আনিয়াছে। সর্বজয়ার মনে হইতেছিল যে, ইহারা সকলে মিলিয়া তাহার বিরুদ্ধে ভিতরে ভিতরে কি একটা ষড়যন্ত্র আঁটিয়াছে—কোন হৃদয়হীন নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্র।

ঠিক সেই সময়ে দুর্গা অপুকে খুঁজিয়া আনিয়া হাজির করিল। অপু নাকি নদীর ধারের পথ দিয়া হন্ হন্ করিয়া হাঁটিয়া একা একা সোনাডাঙার মাঠের দিকে যাইতেছিল, অনেকখানি চলিয়া গিয়াছিল। তাহার পর ফিরিতে গিয়া বোধহয় পথ চিনিতে পারে নাই। বাড়ির কাঁঠাল-তলায় বসিয়া খেলা করিতে করিতে কখন কোন্ ফাঁকে বাহির হইয়া গিয়াছে, কেহ জানে না।

যখন সকলে যে-যাহার বাড়ি চলিয়া গেল, তখন সর্বজয়া স্বামীকে বলিল—এ ছেলে কোনদিন সংসারী হবে না, দেখে নিও—

হরিহর বলিল—কেন?···তা ও-রকম হয়, ছেলেমানুষে গিয়েই থাকে—

সর্বজয়া বলিল—তুমি পাগল হয়েছ!···তিন বছর বয়সে অন্য ছেলে বাড়ির বাইরে পা দেয় না, আর ও কিনা গাঁ ছেড়ে, বাঁশবন, মাঠ ভেঙ্গে গিয়েছে সেই সোনাডাঙার মাঠের রাস্তায়। তাও ফেরবার নাম নেই—হন্ হন্ ক'রে হেঁটেই চলেছে।—কখ্খনো সংসারে মন দেবে না, তোমাকে ব'লে দিলাম—এ আমার কপালেই লেখা আছে!

কত কথা সব মনে পড়ে—নিশ্চিন্দিপুরের বাড়ির কথা, দুর্গার কথা। এ জায়গা ভাল লাগে না, এখন মনে হয়, আবার যদি নিশ্চিন্দিপুর ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব হইত! একদিন যে-নিশ্চিন্দিপুর ছাড়িয়া আসিতে উৎসাহের অবধি ছিল না, এখন তাহাই যেন রূপকথার রাজ্যের মত সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপারকার ধরা-ছোঁয়ার বাহিরের জিনিস হইয়া পড়িয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে প্রথম বসন্তের পুষ্পসুবাসমধুর বৈকাল বহিয়া যায়, অলস অস্ত-আকাশে কত রং ফুটিয়া আবার মিলাইয়া যায়, গাছপালায় পাখি ডাকে। এ রকম একদিন নয়, কতদিন হইয়াছে।

কোন কিছু ভালমন্দ জিনিস পাইলেই সেটুকু সর্বজয়া ছেলের জন্য তুলিয়া রাখে। কুণ্ডুদের বাড়ির বিবাহের তত্ত্বে সন্দেশ আসিলে সর্বজয়া প্রাণ ধরিয়া তাহার একটা খাইতে পারে নাই। ছেলের জন্য তুলিয়া রাখিয়া রাখিয়া অবশেষে যখন হাঁড়ির ভিতর পচিয়া উঠিল তখন ফেলিয়া দিতে হইল। পৌষপার্বণের সময় হয়ত অপু বাড়ি আসিবে, পিঠা খাইতে ভালবাসে, নিশ্চয় আসিবে। সর্বজয়া চাল কুটিয়া সমস্ত আয়োজন ঠিক করিয়া রাখিয়া বসিয়া রহিল—কোথায় অপু?

এক সময় তাহার মনে হয়, অপু আর সে অপু নাই। সে যেন কেমন হইয়া গিয়াছে, কই অনেকদিন তো সে মাকে হুঁ-উঁ-উ করিয়া ভয় দেখায় নাই, অকারণে আসিয়া তাহাকে

জড়াইয়া ধরে নাই, একোণে ওকোণে লুকাইয়া দুষ্টুমি-ভরা হাসিমুখে উঁকি মারে নাই, যাহা তাহা বলিয়া কথা ঢাকিতে যায় নাই! ভাবিয়া কথা বলিতে শিখিয়াছে—এসব সর্বজয়া পছন্দ করে না। অপুর ছেলেমানুষির জন্য সর্বজয়ার মন তৃষিত হইয়া থাকে, অপু না বাড়ুক, সে সব সময়ে তাহার উপরে একান্ত নির্ভরশীল ছোট্ট খোকাটি হইয়া থাকুক—সর্বজয়া যেন মনে মনে ইহাই চায়। কিন্তু তাহার অপু যে একেবারে বদলাইয়া যাইতেছে!...

অপুর উপর মাঝে মাঝে তাহার অত্যন্ত রাগ হয়। সে কি জানে না—তাহার মা কি রকম ছটফট করিতেছে বাড়িতে! একবারটি কি এতদিনের মধ্যে আসিতে নাই? ছেলেবেলায় সন্ধ্যার পর এ-ঘর হইতে ও-ঘরে যাইতে হইলে মায়ের দরকার হইত, মা খাওয়াইয়া না দিলে খাওয়া হইত না—এই সেদিনও তো। এখন আর মাকে দরকার হয় না—না? বেশ—তাহারও ভাবিবার দায় পড়িয়া গিয়াছে, সে আর ভাবিবে না। বয়স হইয়া আসিল, এখন ইষ্টচিন্তা করিয়া কাল কাটাইবার সময়, ছেলে হইয়া স্বর্গে ধ্বজা তুলিবে কি না!

কিন্তু শীঘ্রই সর্বজয়া আবিষ্কার করিল—ছেলের কথা না ভাবিয়া সে একদণ্ডও থাকিতে পারে না। এতদিন সে ছেলের কথা প্রতিদিনের প্রতিমুহূর্তে ভাবিয়া আসিয়াছে। অপুর সহিত অসহযোগ করিলে জীবনটাই যেন ফাঁকা, অর্থহীন, অবলম্বনশূন্য হইয়া পড়ে—তাহার জীবনে আর কিছুই নাই—এক অপু ছাড়া!...

এক একদিন নির্জন দুপুর বেলা ঘরে বসিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদে।

সে দিন বৈকালে সে ঘরে বসিয়া কার্পাস তুলার বীজ ছাড়াইতেছিল, হঠাৎ সম্মুখের ছোট ঘুলঘুলি জানালার ফাঁক দিয়া বাড়ির সামনের পথের দিকে তাহার চোখ পড়িল। পথ দিয়া কে যেন যাইতেছে—মাথার চুল ঠিক যেন অপুর মত, ঘন কালো, বড় বড় ঢেউখেলানো, সর্বজয়ার মনটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। মনে মনে ভাবিল—এ অঞ্চলের মধ্যে এ রকম চুল তো কখনও কারও দেখি নি কোনদিন—সেই শত্তুরের মত চুল অবিকল!

তাহার মনটা কেমন উদাস অন্যমনস্ক হইয়া যায়, তুলার বীজ ছাড়াইতে আর আগ্রহ থাকে না।

হঠাৎ ঘরের দরজায় কে যেন টোকা দিল। তখনি আবার মৃদু টোকা। সর্বজয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দোর খুলিয়া ফেলে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করিতে পারে না।

অপু দুষ্টুমি-ভরা হাসিমুখে দাঁড়াইয়া আছে। নিচু হইয়া প্রণাম করিবার আগেই সর্বজয়া পাগলের মত ছুটিয়া গিয়া ছেলেকে জড়াইয়া ধরিল।

অপু হাসিয়া বলিল—টের পাও নি তুমি, না মা? আমি ভাবলাম আস্তে আস্তে উঠে দরজায় টোকা দেবো।

সে মাম্‌জোয়ানের মেলা দেখিতে আসিয়া একবার বাড়িতে না আসিয়া থাকিতে পারে নাই। এত নিকটে আসিয়া মা'র সঙ্গে দেখা হইবে না! পুলিনের নিকট রেলভাড়া ধার লইয়া তবে আসিয়াছে। একটা পুঁটলি খুলিয়া বলিল, তোমার জন্যে ছুঁচ আর গুলিসুতো এনেচি—আর এই ছাখো কেমন কাঁচা পাঁপর এনেছি মুগের ডালের—সেই কাশীতে তুমি ভেজে দিতে!

অপুর চেহারা বদলাইয়া গিয়াছে। অন্য ধরণের জামা গায়ে—কি সুন্দর মানাইয়াছে! সর্বজয়া বলে, বেশ জামাটা—এবার বুঝি কিনেচিস ?

মা'র দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে দেখিয়া অপু খুব খুশী। জামাটা ভাল করিয়া দেখাইয়া বলিল—সবাই বলে জামাটার রং চমৎকার হয়েচে—চাঁপাফুলের মত হবে ধুয়ে এলে—এই তো মোটে কোরা।

বোর্ডিং-এ গিয়া অপু এই কয় মাস মাস্টার ও ছাত্রদের মধ্যে যাহাকেই মনে মনে প্রশংসা করে, কতকটা নিজের জ্ঞাতসারে কতকটা অজ্ঞাতসারে তাহারই হাবভাব, কথা বলিবার ভঙ্গি নকল করিয়াছে। সত্যেনবাবুর, রমাপতির, দেবব্রতের, নতুন আঁকের মাস্টারের! সর্বজয়ার যেন অপুকে নতুন নতুন ঠেকে। পুরাতন অপু যেন আর নাই। অপু তো এ রকম মাথা পিছনের দিকে হেলাইয়া কথা বলিত না? সে তো পকেটে হাত পুরিয়া এ ভাবে সোজা হইয়া দাঁড়াইত না?

সন্ধ্যার সময় মায়ের রাঁধিবার স্থানটিতে অপু পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া গল্প করে। সর্বজয়া আজ অনেকদিন পরে রাত্রে রাঁধিতে বসিয়াছে।—সেখানে কত ছেলে একসঙ্গে থাকে? এক ঘরে ক'জন? দু'বেলাই মাছ দেয়? পেট ভরিয়া ভাত দেয় তো? কি খাবার খায় সে বৈকালে? কাপড় নিজে কাচিতে হয়? সে তাহা পারে তো!—পড়াশুনার কথা সর্বজয়া জিজ্ঞাসা করিতে জানে না, শুধু খাওয়ার কথাই জিজ্ঞাসা করে। অপুর হাসিতে, ঘাড় দুলুনিতে, হাত-পা নাড়াতে, ঠোঁটের নিচের ভঙ্গিতে সর্বজয়া আবার পুরানো অপু, চিরপরিচিত অপুকে ফিরিয়া পায়। বুকে চাপিতে ইচ্ছা করে। সে অপুর গল্প শোনে না, শুধু মুখের দিকেই চাহিয়া থাকে।

—হাতে পায়ে বল পেলাম মা, এক এক সময় মনে হ'ত—অপু ব'লে কেউ ছিল না, ও যেন স্বপ্ন দেখিচি, আবার ভাবতাম—না, সেই চোখ, টুকটুকে ঠোঁট, মুখের তিল—স্বপ্ন নয়, সত্যিই তো—রাঁধতে বসেও কেবল মনে হয় মা, অপুর আসা স্বপ্ন হয় তো, সব মিথ্যে—তাই কেবল ওর মুখেই চেয়ে ঠাউরে দেখি—

অপু চলিয়া যাইবার কয়েকদিন পরে সর্বজয়া তেলিগিন্নির কাছে গল্প করিয়াছিল।

পরদিনটাও অপু বাড়ি রহিল।

যাইবার সময় মাকে বলিল—মা, আমাকে একটা টাকা দাও না? কতকগুলো ধার আছে এ মাসে, শোধ করব, দেবে?

সর্বজয়ার কাছে টাকা ছিল না, বিশেষ কখনও থাকে না। তেলিরা ও কুণ্ডুরা জিনিস-পত্রটা, কাপড়খানা, সিধাটা—এই রকমই দিয়া সাহায্য করে। নগদ টাকাকড়ি কেহ দেয় না। তবু ছেলের পাছে কষ্ট হয় এজন্য সে তেলিগিন্নির নিকট হইতে একটা টাকা ধার করিয়া আনিয়া ছেলের হাতে দিল।

সন্ধ্যার আগে অপু চলিয়া গেল, ক্রোশ দুই দূরে স্টেশন, সন্ধ্যার পরেই ট্রেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বৎসর দুই কোথা দিয়া কাটিয়া গেল।

অপু ক্রমেই বড় জড়াইয়া পড়িয়াছে, খরচে আয়ে কিছুতেই আর কুলাইতে পারে না। নানাদিকে দেনা—কতভাবে হুঁশিয়ার হইয়াও কিছু হয় না। এক পয়সার মুড়ি কিনিয়া দুই বেলা খাইল, নিজে সাবান দিয়া কাপড় কাচিল, লজেঞ্চুস্ ভুলিয়া গেল।

পরদিনই আবার বোর্ডিং-এর ছেলেদের দল চাঁদা করিয়া হালুয়া খাইবে। অপু হাসিমুখে সমীরকে বলিল—দু' আনা ধার দিবি সমীর, হালুয়া খাবো?—দু' আনা ক'রে চাঁদা—ওই ওরা ওখানে করছে—কিশমিশ দিয়ে বেশ ভাল ক'রে করচে—

সমীরের কাছে অপুর দেনা অনেক। সমীর পয়সা দিল না।

প্রতিবার বাড়ি হইতে আসিবার সময় সে মায়ের যৎসামান্য আয় হইতে টাকাটা আধুলিটা প্রায়ই চাহিয়া আনে—মা না দিতে চাহিলে রাগ করে, অভিমান করে, সর্বজয়াকে দিতেই হয়।

ইহার মধ্যে আবার পটু মাঝে মাঝে আসিয়া ভাগ বসাইয়া থাকে। সে কিছুই সুবিধা করিতে পারে নাই পড়াশুনার। নানাস্থানে ঘুরিয়াছে, ভগ্নীপতি অর্জুন চক্রবর্তী তো তাহাকে বাড়ি ঢুকিতে দেয় না। বিনিকে এ সব লইয়া কম গঞ্জনা সহ্য করিতে হয় নাই বা কম চোখের জল ফেলিতে হয় নাই; কিন্তু শেষ পর্যন্ত পটু নিরাশ্রয় ও নিরবলম্ব অবস্থায় পথে পথেই ঘোরে, যদিও পড়াশুনার আশা সে এখনও অবধি ছাড়ে নাই। অপু তাহার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু সুবিধা করিতে পারে নাই। দু'-তিন মাস হয়ত দেখা নাই, হঠাৎ একদিন কোথা হইতে পুঁটলি বগলে করিয়া পটু আসিয়া হাজির হয়, অপু তাহাকে যত্ন করিয়া রাখে, তিন-চারদিন ছাড়ে না, সে না চাহিলেও যখন যাহা পারে হাতে গুঁজিয়া দেয়—টাকা পারে না, সিকিটা, দুয়ানিটা। পটু নিশ্চিন্দিপুরে আর যায় না—তাহার বাবা সম্প্রতি মারা গিয়াছেন—সৎমা দেশের বাড়িতে তাঁহার দুই মেয়ে লইয়া থাকেন, সেখানে ভাই বোন কেহই আর যায় না। পটুকে দেখিলে অপুর ভারি একটা সহানুভূতি হয়, কিন্তু ভাল করিবার তাহার হাতে আর কি ক্ষমতা আছে?

একদিন রাসবিহারী আসিয়া দু'আনা পয়সা ধার চাহিল। রাসবিহারী গরীবের ছেলে, তাহা ছাড়া পড়াশুনায় ভাল নয় বলিয়া বোর্ডিং-এ খাতিরও পায় না। অপুকে সবাই দলে নেয়, পয়সা দিতে না পারিলেও নেয়। কিন্তু তাহাকে পোঁছেও না। অপু এ সব জানিত বলিয়াই তাহার উপর কেমন একটা করুণা। কিন্তু আজ সে নানা কারণে রাসবিহারীর প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না। বলিল, আমি কোথায় পাবো পয়সা?—আমি কি টাকার গাছ?—দিতে পারবো না যাও।—রাসবিহারী পীড়াপীড়ি শুরু করিল। কিন্তু অপু একেবারে বাঁকিয়া বসিল। বলিল, কক্ষনো দেবো না তোমায়—যা পারো করো।

রমাপতির কাছে ছেলেদের একখানা মাসিক পত্র আসে তাহাতে সে একদিন 'ছায়াপথ'

সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ পড়িল। 'ছায়াপথ' কাহাকে বলে ইহার আগে জানিত না—এতবড় বিশাল কোন জিনিসের ধারণাও কখনো করে নাই—নক্ষত্রের সম্বন্ধেও কিছু জানা ছিল না। শরতের আকাশ রাত্রে মেঘমুক্ত—বোর্ডিং-এর পিছনে খেলার কম্পাউণ্ডে রাত্রে দাঁড়াইয়া ছায়াপথটা প্রথম দেখিয়া সে কী আনন্দ! জলজলে সাদা ছায়াপথটা কালো আকাশের বুক চিরিয়া কোথা হইতে কোথায় গিয়াছে—শুধু নক্ষত্রে ভরা!

কাঁঠাল-তলাটায় দাঁড়াইয়া সে কতক্ষণ মুগ্ধনেত্রে আকাশের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—নবজাগ্রত মনের প্রথম বিস্ময়!...

পৌষ মাসের প্রথমে অপুর নিজের একটু সুবিধা ঘটিল। নতুন ডেপুটীবাবুর বাসাতে ছেলেদের জন্য একজন পড়াইবার লোক চাই। হেডপণ্ডিত তাহাকে ঠিক করিয়া দিলেন। দু'টি ছেলে পড়ানো, থাকা ও খাওয়া।

দুই-তিনদিনের মধ্যেই বোর্ডিং হইতে বাসা উঠাইয়া অপু সেখানে গেল। বোর্ডিং-এ অনেক বাকী পড়িয়াছে, সুপারিটেণ্ডেণ্ট তলে তলে হেডমাস্টারের কাছে এসব কথা রিপোর্ট করিয়াছেন, যদিও অপু তাহা জানে না।

বাহিরের ঘরে থাকিবার জায়গা স্থির হইল। বিছানা-পত্র গুছাইয়া পাতিয়া লইতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। সন্ধ্যার পরে খানিকটা বেড়াইয়া আসিয়া রাঁধুনি ঠাকুরের ডাকে বাড়ির মধ্যে খাইতে গেল। দালানে ঘাড় গুঁজিয়া খাইতে খাইতে তাহার মনে হইল—একজন কে পাশের দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ হইতে তাহার খাওয়া দেখিতেছেন। একবার মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিতে তিনি সরিয়া আসিলেন। খুব সুন্দরী মহিলা, তাহার মায়ের অপেক্ষাও বয়স অনেক—অনেক কম। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার বাড়ি কোথায়?

অপু ঘাড় না তুলিয়া বলিল, মনসাপোতা—অনেক দূর এখেন থেকে—

—বাড়িতে কে কে আছেন?

—শুধু মা আছেন, আর কেউ না।

—তোমার বাবা বুঝি ··ভাই বোন ক'টি তোমরা?

—এখন আমি একা। আমার দিদি ছিল—সে সাত-আট বছর হ'ল মারা গিয়েচে।—

কোনো রকমে তাড়াতাড়ি খাওয়া সারিয়া সে উঠিয়া আসিল। শীতকালেও সে যেন ঘামিয়া উঠিয়াছে?

পরদিন সকালে অপু বাড়ির ভিতর হইতে খাইয়া আসিয়া দেখিল, বছর তেরো বয়সের একটি সুন্দরী মেয়ে ছোট্ট একটি খোকার হাত ধরিয়া বাহিরের ঘরে দাঁড়াইয়া আছে। অপু বুঝিল—সে কাল রাত্রের পরিচিতা মহিলাটির মেয়ে। অপু আপন মনে বই গুছাইয়া স্কুলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল, মেয়েটি একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতেছিল। হঠাৎ অপুর ইচ্ছা হইল, এ মেয়েটির সামনে কিছু পৌরুষ দেখাইবে—কেহ তাহাকে বলিয়া দেয় নাই, শিখায় নাই, আপনা আপনি তাহার মনে হইল। হাতের কাছে অন্য কিছু না পাইয়া সে নিজের অঙ্কের ইনস্ট্রুমেণ্ট বাক্সটা বিনা কারণে খুলিয়া প্রোটেক্টর, সেট্‌স্কোয়ার, কম্পাসগুলাকে

বিছানার উপর ছড়াইয়া ফেলিয়া পুনরায় সেগুলা বাক্সে সাজাইতে লাগিল। কি জানি কেন অপুর মনে হইল, এই ব্যাপারেই তাহার চরম পৌরুষ দেখানো হইবে। মেয়েটি দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল, কোনো কথা বলিল না, অপুও কোনো কথা বলিল না।

আলাপ হইল সেদিন সন্ধ্যায়। সে স্কুল হইতে আসিয়া সবে দাঁড়াইয়াছে, মেয়েটি আসিয়া লাজুক চোখে বলিল—আপনাকে মা খাবার খেতে ডাকচেন।

আসন পাতা—পরোটা, বেগুন ভাজা, আলু চচ্চড়ি, চিনি। অপু চিনি পছন্দ করে না, গুড়ের মত জিনিস নাই, কেন ইহারা এমন সুন্দর গরম গরম পরোটা চিনি দিয়া খায় ?···

মেয়েটি কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। বলিল—মাকে বলব আর দিতে ?

—না ; তোমরা চিনি খাও কেন ?···গুড় তো ভাল—

মেয়েটি বিস্মিতমুখে বলিল—কেন, আপনি চিনি খান না ?

—ভালবাসি নে—রুগীর খাবার—খেজুরে গুড়ের মত কি আর খেতে ভাল ?—মেয়েটির সামনে তাহার আদৌ লজ্জা ছিল না, কিন্তু এই সময়ে মহিলাটি ঘরে ঢোকাতে অপুর লম্বা লম্বা কথা বন্ধ হইয়া গেল। মহিলাটি বলিলেন—ওকে দাদা ব'লে ডাকবি নির্মলা, কাছে ব'সে খাওয়াতে হবে রোজ। ও দেখছি যে-রকম লাজুক, এ পর্যন্ত তো আমার সঙ্গে একটা-কথাও বললে না—না দেখলে আধপেটা খেয়ে উঠে যাবে!

অপু লজ্জিত হইল। মনে মনে ভাবিল ইঁহাকে সে মা বলিয়া ডাকিবে। কিন্তু লজ্জায় পারিল না, সুযোগ কোথায় ? এমনি খামকা মা বলিয়া ডাকা—সে বড়—সে তাহা পারিবে না।

মাসখানেক ইঁহাদের বাড়ি থাকিতে থাকিতে অপুর কতকগুলি নতুন বিষয়ে জ্ঞান হইল। সবাই ভারী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আটপৌরে পোশাকপরিচ্ছদও সুদৃশ্য ও সুরুচিসম্মত। মেয়েদের শাড়ি পরিবার ধরণটি বেশ লাগে, একে সবাই দেখিতে সুশ্রী, তাহার উপর সুদৃশ্য শাড়ি-সেমিজে আরও সুন্দর দেখায়। এই জিনিসটা অপু কখনও জানিত না, বড়লোকের বাড়ি থাকিবার সময়ও নহে, কারণ সেখানে ঐশ্বর্যের আড়ম্বরে তাহার অনভ্যস্ত চক্ষু ধাঁধিয়া গিয়াছিল—সহজ গৃহস্থ জীবনের দৈনন্দিন ব্যাপারের পর্যায়ে তাহাকে সে ফেলিতে পারে নাই।

অপু যে-সমাজ, যে-আবহাওয়ায় মানুষ—সেখানকার কেহ এ ধরণের সহজ সৌন্দর্যময় জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত নয়। নানা জায়গায় বেড়াইয়া নানা ধরণের লোকের সঙ্গে মিশিয়া তাহার আজকাল চোখ ফুটিয়াছে ; সে আজকাল বুঝিতে পারে নিশ্চিন্দিপুরে তাহাদের গৃহস্থালী ছিল দরিদ্রের, অতি দরিদ্রের গৃহস্থালী। শিল্প নয়, শ্রী ছাঁদ নয়, সৌন্দর্য নয়, শুধু খাওয়া আর থাকা।

নির্মলা আসিয়া কাছে বসিল। অপু অ্যালজেব্রার শক্ত আঁক কষিতেছিল, নির্মলা নিজের বইখানা খুলিয়া বলিল—আমায় ইংরেজিটা একটু ব'লে দেবেন দাদা ? অপু বলিল—এসে জুটলে ? এখন ওসব হবে না, ভারী মুশকিল, একটা আঁকও সকাল থেকে মিললো না।

নির্মলা নিজে বসিয়া পড়িতে লাগিল। সে বেশ ইংরেজি জানে, তাহার বাবা যত্ন করিয়া শিখাইয়াছেন, বাংলাও খুব ভাল জানে।

একটু পড়িয়াই সে বইখানা বন্ধ করিয়া অপুর আঁক কষা দেখিতে লাগিল। খানিকটা আপন মনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর আর একবার ঝুঁকিয়া দেখিয়া অপুর কাঁধে হাত দিয়া ডাকিয়া বলিল—এদিকে ফিরুন দাদা, আচ্ছা এই পদ্যটা মিলিয়ে—

অপু বলিল—যাও! আমি জানি নে, ওই তো তোমার দোষ নির্ম্মলা, আঁক মিলচে না, এখন তোমার পদ্য মেলাবার সময়—আচ্ছা লোক—

নির্ম্মলা মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিল—এ পদ্যটা আর মেলাতে হয় না আপনার—বলুন দিকি—সেই গাছ গাছ নয়, যাতে নেই ফল—

অপু আঁক-কষা ছাড়িয়া বলিল—মিলবে না? আচ্ছা দ্যাখো—পরে খানিকটা আপন মনে ভাবিয়া বলিল—সেই লোক লোক নয়, যার নেই বল—হ'ল না?

নির্ম্মলা লাইন দু'টি আপন মনে আবৃত্তি করিয়া বুঝিয়া দেখিল কোথায়ও কানে বাধিতেছে কি না। ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আচ্ছা এবার বলুন তো আর একটা—

—আমি আর বলব না—তুমি ওরকম দুষ্টুমি কর কেন? আমি আঁকগুলো কষে নিই, তারপর যত ইচ্ছা পদ্য মিলিয়ে দেবো—

—আচ্ছা এই একটা—সেই ফুল ফুল নয়, যার—

—মাকে এখুনি উঠে গিয়ে ব'লে আসবো, নির্ম্মলা—ঠিক বলছি, ওরকম যদি—

নির্ম্মলা রাগ করিয়া উঠিয়া গেল। যাইবার সময় পিছন ফিরিয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—ওবেলা কে খাবার ব'য়ে আনে বাইরের ঘরে দেখবো—

এরকম প্রায়ই হয়, অপু ইহাতে ভয় পায় না। বেশ লাগে নির্ম্মলাকে।

পূজার পর নির্ম্মলার এক মামা বেড়াইতে আসিলেন। অপু শুনিল, তিনি নাকি বিলাতফেরৎ—নির্ম্মলার ছোট ভাই নন্তুর নিকট কথাটা শুনিল। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশের বেশী নয়, রোগা শ্যামবর্ণ। এ লোক বিলাতফেরৎ!

বাল্যে নদীর ধারে ছায়াময় বৈকালে পুরাতন 'বঙ্গবাসী'তে পড়া সেই বিলাতযাত্রীর চিঠির মধ্যে পঠিত আনন্দভরা পুরাতন পথ বাহিয়া মরুভূমির পার্শ্বের সুয়েজ খালের ভিতর দিয়া, নীল ভূমধ্যসাগরমধ্যস্থ দ্রাক্ষাকুঞ্জ-বেষ্টিত কর্সিকা দূরে ফেলিয়া সেই মধুর স্বপ্নমাখা পথ-যাত্রা।

এই লোকটা সেখানে গিয়াছিল? এই নিতান্ত সাধারণ ধরণের মানুষটা—যে দিব্য নিরীহমুখে রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া মোচার ঘণ্ট দিয়া ভাত খাইতেছে!

দু'এক দিনেই নির্ম্মলার মামা অমরবাবুর সহিত তাহার খুব আলাপ হইয়া গেল।

বিলাতের কত কথা সে জানিতে চায়। পথের ধারে সেখানে কি সব গাছপালা? আমাদের দেশের পরিচিত কোন গাছ সেখানে আছে? প্যারিস খুব বড় শহর? অমরবাবু নেপোলিয়নের সমাধি দেখিয়াছেন? ডোভারের খড়ির পাহাড়? ব্রিটিশ মিউজিয়ামে নাকি নানা অদ্ভুত জিনিস আছে—কি কি? আর ভেনিস?—ইতালির আকাশ নাকি দেখিতে অপূর্ব?

পাড়াগাঁয়ের স্কুলের ছেলে, এত সব কথা জানিবার কৌতূহল হইল কি করিয়া অমরবাবু

বুঝিতে পারেন না। এত আগ্রহ করিয়া শুনিবার মত জিনিস সেখানে কি আর আছে! একঘেয়ে—ধোঁয়া—বৃষ্টি—শীত। তিনি পয়সা খরচ করিয়া সেখানে গিয়াছিলেন সাবান-প্রস্তুত প্রণালী শিখিবার জন্য, পথের ধারের গাছপালা দেখিতে যান নাই বা ইতালির আকাশের রং লক্ষ্য করিয়া দেখিবার উপযুক্ত সময়ের প্রাচুর্যও তাঁর ছিল না।

নির্মলাকে অপুর ভাল লাগে, কিন্তু সে তাহা দেখাইতে জানে না। পরের বাড়ি বলিয়াই হউক, বা একটু লাজুক প্রকৃতির বলিয়াই হউক, সে বাহিরের ঘরে শান্তভাবে বাস করে—কি তাহার অভাব, কোন্‌টা তাহার দরকার, সে কথা কাহাকেও জানায় না। অপুর এই উদাসীনতা নির্মলার বড় বাজে, তবুও সে না চাহিতেই নির্মলা তাহার ময়লা বালিশের ওয়াড় সাবান দিয়া নিজে কাচিয়া দিয়া যায়, গামছা পরিষ্কার করিয়া দেয়, ছেঁড়া কাপড় বাড়ির মধ্যে লইয়া গিয়া মাকে দিয়া সেলাইয়ের কলে সেলাই করিয়া আনিয়া দেয়। নির্মলা চায় অপূর্ব-দাদা তাহাকে ফাই ফরমাশ করে, তাহার প্রতি হুকুমজারি করে; কিন্তু অপু কাহারও উপর কোনো হুকুম কোনোদিন করিতে জানে না—এক মা ছাড়া। দিদি ও মায়ের সেবায় সে অভ্যস্ত বটে, তাও সে-সেবা অযাচিতভাবে পাওয়া যাইত তাই। নইলে অপু কখনও হুকুম করিয়া সেবা আদায় করিতে শিখে নাই। তা ছাড়া সে সমাজের যে স্তরের মধ্যে মানুষ, ডেপুটিবাবুরা সেখানকার চোখে ব্রহ্মলোকবাসী দেবতার সমকক্ষ জীব। নির্মলা ডেপুটিবাবুর বড় মেয়ে—রূপে, বেশভূষায়, পড়াশুনায়, কথাবার্তায় একমাত্র লীলা ছাড়া সে এ পর্যন্ত যত মেয়ের সংস্পর্শে আসিয়াছে—সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সে কি করিয়া নির্মলার উপর হুকুম-জারি করিবে? নির্মলা তাহা বোঝে না—সে দাদা বলিয়া ডাকে, অপুর প্রতি একটা আন্তরিক টানের পরিচয় তাহার প্রতি কাজে—কেন অপূর্ব-দাদা তাহাকে প্রাণপণে খাটাইয়া লয় না, নিষ্ঠুরভাবে অযথা ফাই-ফরমাস করে না? তাহা হইলে সে খুশী হইত।

চৈত্র মাসের শেষে একদিন ফুটবল খেলিতে খেলিতে অপুর হাঁটুটা কি ভাবে মচ্‌কাইয়া গিয়া সে মাঠে পড়িয়া গেল। সঙ্গীরা তাহাকে ধরাধরি করিয়া আনিয়া ডেপুটীবাবুর বাসায় দিয়া গেল। নির্মলার মা ব্যস্ত হইয়া বাহিরের ঘরে আসিলেন, কাছে গিয়া বলিলেন—দেখি দেখি, কি হয়েছে? অপুর উজ্জ্বল গৌরবর্ণ সুন্দর মুখ ঘামে ও যন্ত্রণায় রাঙা হইয়া গিয়াছে, ডান পা-খানা সোজা করিতে পারিতেছে না। মনিয়া চাকর নির্মলার মা'র স্লিপ লইয়া ডাক্তারখানায় ছুটিল। নির্মলা বাড়ি ছিল না, ভাইবোনদের লইয়া গাড়ি করিয়া মুন্সেফবাবুর বাসায় বেড়াইতে গিয়াছিল। একটু পরে সরকারী ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। সন্ধ্যার আগে নির্মলা আসিল। সব শুনিয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া বলিল—কই দেখি, বেশ হয়েছে—দস্যিবৃত্তি করার ফল হবে না? ভারী খুশী হয়েছি আমি—

নির্মলা কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল। অপু মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইয়া ভাবিল—যাক্ না, আর কখনও যদি কথা কই—

আধ ঘণ্টা পরেই নির্মলা আসিয়া হাজির। কৌতুকের সুরে বলিল—পায়ের ব্যথা-ট্যথা

জানি নে, গরম জল আনতে ব'লে দিয়ে এলাম, এমন ক'রে সেঁক দেবো—লাগে তো লাগ্‌বে—দুষ্টুমি করার বাহাদুরি বেরিয়ে যাবে—কমলা লেবু খাবেন একটা ?—না, তাও না ?

মনিয়া চাকর গরম জল আনিলে নির্মলা অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া ব্যথার উপর সেঁক দিল ; নির্মলার ভাইবোনেরা সব দেখিতে আসিয়া ধরিল—ও দাদা, এইবার একটা গল্প বলুন না। অপুর মুখে গল্প শুনিতে সবাই ভালবাসে।

নির্মলা বলিল—হ্যাঁ, দাদা এখন পাশ ফিরে শুতে পারছেন না—এখন গল্প না বললে চলবে কেন ? চুপ ক'রে ব'সে থাকো সব—নয়তো বাড়ির মধ্যে পাঠিয়ে দোব।

পরদিন সকালটা নির্মলা আসিল না। দুপুরের পর আসিয়া বৈকাল পর্যন্ত বসিয়া নানা গল্প করিল, বই পড়িয়া শুনাইল। বাড়ির ভিতর হইতে থালায় করিয়া আখ ও শাঁখ-আলু কাটিয়া লইয়া আসিল। তাহার পর তাহাদের পদ্যমেলানোর আর অন্ত নাই! নির্মলার পদটি মিলাইয়া দিয়াই অপু তাহাকে আর একটা পদ মিলাইতে বলে—নির্মলাও অল্প কয়েক মিনিটে তাহার জবাব দিয়া অন্য একটা প্রশ্ন করে। কেহ কাহাকেও ঠকাইতে পারে না।

ডেপুটীবাবুর স্ত্রী একবার বাহিরের ঘরে আসিতে আসিতে শুনিয়া বলিলেন—বেশ হয়েছে, আর ভাবনা নেই—এখন তোমরা দু'ভাইবোনে একটা কবির দল খুলে দেশে দেশে বেড়িয়ে বেড়াও গিয়ে—

অপু লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া রহিল। ডেপুটীবাবুর স্ত্রীর বড় সাধ অপু তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকে। সে যে আড়ালে তাঁহাকে মা বলে, তাহা তিনি জানেন—কিন্তু সামনাসামনি অপু কখনো তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকে নাই, এজন্য ডেপুটীবাবুর স্ত্রী খুব দুঃখিত।

অপু যে ইচ্ছা করিয়া করে না তাহা নহে। ডেপুটীবাবুর বাসায় থাকিবার কথা এবার সে বাড়িতে গিয়া মায়ের কাছে গল্প করাতে সর্বজয়া ভারী খুশী হইয়াছিল। ডেপুটীবাবুর বাড়ি! কম কথা নয়! সেখানে কি করিয়া থাকিতে হইবে, চলিতে হইবে সে বিষয়ে ছেলেকে নানা উপদেশ দিয়া অবশেষে বলিয়াছিল—ডেপুটীবাবুর বউকে মা ব'লে ডাকবি—আর ডেপুটীবাবুকে বাবা ব'লে ডাকবি—

অপু লজ্জিত মুখে বলিয়াছিল—হ্যাঁ, আমি ওসব পারবো না—

সর্বজয়া বলিয়াছিল—তাতে দোষ কি ?—বলিস, তাঁরা খুশী হবেন—কম একটা বড়লোকের আশ্রয় তো নয়!—তাহার কাছে সবাই বড় মানুষ।

অপু তখন মায়ের নিকট রাজী হইয়া আসিলেও এখানে তাহা কার্যে পরিণত করিতে পারে নাই। মুখে কেমন বাধে, লজ্জা করে।

একদিন—অপু তখন একমাস হইল সারিয়া উঠিয়াছে—নির্মলা বাহিরের ঘরে চেয়ারে বসিয়া কি বই পড়িতেছিল. ঘোর বর্ষা সারা দিনটা, বেলা বেশী নাই—বৃষ্টি একটু কমিয়াছে। অপু বিনা ছাতায় কোথা হইতে ভিজিতে ভিজিতে আসিয়া দৌড়াইয়া ঘরে ঢুকিতেই নির্মলা বই মুড়িয়া বলিয়া উঠিল—এঃ, আপনি যে দাদা ভিজে একেবারে—

অপুর মনে যে জন্যই হউক খুব স্ফূর্তি ছিল—তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—চট্ ক'রে চা আর খাবার—তিন মিনিটে—

নির্মলা বিস্মিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত আনন্দিত হইল। এ রকম তো কখনও হুকুমের সুরে অপূর্বদা বলে না! সে হাসিমুখে মুখ টিপিয়া বলিল—পারবো না তিন মিনিটে—ঘোড়ায় জিন দিয়ে এলেন কিনা একেবারে!

অপু হাসিয়া বলিল—আর তো বেশীদিন না—আর তিনটি মাস তোমাদের জ্বালাবো, তারপর চলে যাচ্চি—

নির্মলার মুখ হইতে হাসি মিলাইয়া গেল। বিস্ময়ের সুরে বলিল—কোথায় যাবেন!

—তিনি মাস পরেই এগ্‌জামিন—দিয়েই চলে যাবো, কলকাতায় পড়বো পাশ হলে—

নির্মলা এতদিন সম্ভবত এটা ভাবিয়া দেখে নাই, বলিল—আর এখানে থাকবেন না?

অপু ঘাড় নাড়িল। খানিকটা থামিয়া কৌতুকের সুরে বলিল—তুমি তো বাঁচো, যে খাটুনি—তোমার তো ভাল—ওকি? বা রে—কি হলো—শোন নির্মলা—

হঠাৎ নির্মলা উঠিয়া গেল কেন—চোখে কি কথায় তাহার এত জল আসিয়া পড়িল, বুঝিতে না পারিয়া সে মনে মনে অনুতপ্ত হইল। আপন মনে বলিল—আর ওকে ক্যাপাবো না—ভারী পাগল—আহা, ওকে সব সময় খোঁচা দিই—সোজা খেটেছে ও, যখন পা ভেঙে পড়ে ছিলাম পনেরো দিন ধরে, জানতে দেয় নি যে আমি নিজের বাড়িতে নেই—

ইহার মধ্যে আবার একদিন পটু আসিল। ডেপুটীবাবুর বাসাতে অপু উঠিয়া আসিবার পর সে কখনও আসে নাই। খানিকটা ইতস্ততঃ করিয়া বাসায় ঢুকিল। এক-পা ধূলা, রুক্ষ চুল, হাতে পুঁটুলি। সে কোন সুবিধা খুঁজিতে আসে নাই, এদিকে আসিলে অপুর সঙ্গে দেখা না করিয়া সে যাইতে পারে না। পটুর মুখে অনেক দিন পর সে রাণুদির খবর পাইল। পাড়াগাঁয়ের নিঃসহায় নিরুপায় ছেলেদের অভ্যাসমত সে গ্রামের যত মেয়েদের শ্বশুরবাড়ি ঘুরিয়া বেড়ানো শুরু করিয়াছে। বাপের বাড়ির লোক, অনেকের হয়ত বা খেলার সঙ্গী, মেয়েরা আগ্রহ করিয়া রাখে, ছাড়িয়া দিতে চাহে না, যে কয়টা দিন থাকে খাওয়া সম্বন্ধে নির্ভাবনা। কোন স্থানে দু'দিন, কোথাও পাঁচদিন—মেয়েরা আবার আসিতে বলে, যাবার সময় খাবার তৈয়ারী করিয়া সঙ্গে দেয়। এ এক ব্যবসা পটু ধরিয়াছে মন্দ নয়—ইহার মধ্যে সে তাহাদের পাড়ার সব মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে দু-চার বার ঘুরিয়া আসিয়াছে।

এইভাবেই একদিন রাণুদির শ্বশুরবাড়ি সে গিয়াছে—সে গল্প করিল। রাণুদির শ্বশুরবাড়ি রাণাঘাটের কাছে—তাঁহারা পশ্চিমে কোথায় চাকুরী উপলক্ষে থাকেন—পূজার সময় বাড়ি আসিয়াছিলেন, সপ্তমী পূজার দিন অনাহূতভাবে পটু গিয়া হাজির। সেখানে আট দিন ছিল। রাণুদির যত্ন কি! তাহার দুরবস্থা শুনিয়া গোপনে তিনটা টাকা দিয়াছিল, আসিবার সময় নতুন ধুতি চাদর, এক পুঁটুলি বাসি লুচি সন্দেশ।

অপু বলিল—আমার কথা কিছু বললে না?

—শুধুই তোর কথা। যে কয়দিন ছিলাম, সকালে সন্ধ্যাতে তোর কথা। তারা আবার

একাদশীর দিনই পশ্চিমে চলে যাবে, আমাকে রাণুদি বললে, ভাড়ার টাকা দিচ্ছি, তাকে একবার নিয়ে আয় এখানে—ছ'বচ্ছর দেখা হয় নি—তা আমার আবার জর হ'ল—দিদির বাড়ি এসে দশ-বারোদিন পড়ে রইলাম—তোর ওখানে আর যাওয়া হ'ল না—ওরাও চলে গেল পশ্চিমে—

—ভাড়ার টাকা দেয় নি ?

পটু লজ্জিত মুখে বলিল—হ্যাঁ, তোর আর আমার যাতায়াতের ভাড়া হিসেব ক'রে—সেও খরচ হয়ে গেল, দিদি কোথায় আর পাবে, আমার সেই ভাড়ার টাকা থেকে নেবু ডালিম ওষুধ—সব হ'ল। রাণুদির মতন অমন মেয়ে আর দেখি নি অপুদা, তোর কথা বলতে তার চোখে জল পড়ে—

হঠাৎ অপুর গলা যেন কেমন আড়ষ্ট হইয়া উঠিল—সে তাড়াতাড়ি কি দেখিবার ভান করিয়া জানালার বাহিরের দিকে চাহিল।

—শুধু রাণুদি না, যত মেয়ের শ্বশুরবাড়ি গেলাম, রাণীদি, আশালতা, ওপাড়ার সুনয়নীদি—সবাই তোর কথা আগে জিজ্ঞেস করে—

ঘণ্টা দুই থাকিয়া পটু চলিয়া গেল।

দেওয়ানপুর স্কুলেই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা গৃহীত হয়। খরচ-পত্র করিয়া কোথাও যাইতে হইল না। পরীক্ষার পর হেডমাস্টার মিঃ দত্ত অপুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বলিলেন—বাড়ি যাবে কবে ?

এই কয় বৎসরে হেডমাস্টারের সঙ্গে তাহার কেমন একটা নিবিড় সৌহার্দ্যের সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছে, দু'জনের কেহই এতদিনে জানিতে পারে নাই সে বন্ধন কতটা দৃঢ়।

অপু বলিল—সামনের বুধবারে যাব ভাবছি।

—পাশ হলে কি করবে ভাবছো ? কলেজে পড়বে তো ?

—কলেজে পড়বার খুব ইচ্ছে, স্যর।

—যদি স্কলারশিপ না পাও ?

অপু মৃদু হাসিয়া চুপ করিয়া থাকে।

—ভগবানের ওপর নির্ভর ক'রে চলো, সব ঠিক হয়ে যাবে। দাঁড়াও, বাইবেলের একটা জায়গা পড়ে শোনাই তোমাকে—

মিঃ দত্ত খ্রীষ্টান। ক্লাসে কতদিন বাইবেল খুলিয়া চমৎকার চমৎকার উক্তি তাহাদের পড়িয়া শুনাইয়াছেন, অপুর তরুণ মনে বুদ্ধদেবের পীতবাসধারী সৌম্যমূর্তির পাশে, তাহাদের গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিশালাক্ষীর পাশে, বোষ্টমদাদু নরোত্তম দাসের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যের পাশে, দীর্ঘদেহ শান্তনয়ন যীশুর মূর্তি কোন্ কালে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল—তাহার মন যীশুকে বর্জন করে নাই, কাঁটার মুকুট পরা, লাঞ্ছিত, অপমানিত এক দেবোন্মাদ যুবককে মনে প্রাণে বরণ করিতে শিখিয়াছিল।

মিঃ দত্ত বলিলেন—কলকাতাতেই পড়ো—অনেক জিনিস দেখবার শেখবার আছে—

কোন কোন পাড়াগাঁয়ের কলেজে খরচ কম পড়ে বটে কিন্তু সেখানে মন বড় হয় না, চোখ ফোটে না, আমি কলকাতাকেই ভাল বলি।

অপু অনেকদিন হইতেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছে, কলেজে পড়িবে এবং কলিকাতার কলেজেই পড়িবে।

মিঃ দত্ত বলিলেন—স্কুল লাইব্রেরীর 'লে মিজারেব্‌ল্‌'-খানা তুমি খুব ভালবাসতে—ওখানা তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি, আমি আর একখানা কিনে নেবো।

অপু বেশী কথা বলিতে জানে না—এখনও পারিল না—মুখচোরার মত খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া হেডমাস্টারের পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া আসিল।

হেডমাস্টারের মনে হইল—তাঁহার দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের শিক্ষক-জীবনে এ রকম আর কোন ছেলের সংস্পর্শে তিনি কখনও আসেন নাই।--ভাবময়, স্বপ্নদর্শী বালক, জগতে সহায়হীন, সম্পদহীন! হয়ত একটু নির্বোধ, একটু অপরিণামদর্শী—কিন্তু উদার, সরল, নিষ্পাপ, জ্ঞান-পিপাসু ও জিজ্ঞাসু। মনে মনে তিনি বালকটিকে বড় ভালবাসিয়াছিলেন।

তাঁহার জীবনে এই একটি আসিয়াছিল, চলিয়া গেল। ক্লাসে পড়াইবার সময় ইহার কৌতূহলী ডাগর চোখ ও আগ্রহোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া ইংরেজীর ঘণ্টায় কত নতুন কথা, কত গল্প, ইতিহাসের কাহিনী বলিয়া যাইতেন—ইহার নীরব, জিজ্ঞাসু চোখ দু'টি তাঁহার নিকট হইতে যেরূপ জোর করিয়া পাঠ আদায় করিয়া লইয়াছে, সেরূপ আর কেহ পারে নাই, সে প্রেরণা সহজলভ্য নয়, তিনি তাহা জানেন।

গত চার বৎসরের স্মৃতি-জড়ানো দেওয়ানপুর হইতে বিদায় লইবার সময়ে অপুর মন ভাল ছিল না। দেবব্রত বলিল—তুমি চলে গেলে অপূর্বদা, এবার পড়া ছেড়ে দেবো।

নির্মলার সঙ্গে বাহিরের ঘরে দেখা। ফাল্গুন মাসের অপূর্ব অদ্ভুত দিনগুলি। বাতাসে কিসের যেন মৃদু স্নিগ্ধ, অনির্দেশ্য সুগন্ধ। আমের বউলের সুবাস সকালের রৌদ্রকে যেন মাতাল করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু অপুর আনন্দ সে-সব হইতে আসে নাই—গত কয়েকদিন ধরিয়া সে রাইডার হ্যাগার্ডের 'ক্লিওপেট্রা' পড়িতেছিল। তাহার তরুণ কল্পনাকে অদ্ভুতভাবে নাড়া দিয়াছে বইখানা। কোথায় এই হাজার হাজার বৎসরের পুরাতন সমাধি- জ্যোৎস্নাভরা নীলনদ, বিস্মৃত 'রা' দেবের মন্দির!—ঔপন্যাসিক হ্যাগার্ডের স্থান সমালোচকের মতে যেখানেই নির্দিষ্ট হউক তাহাতে আসে যায় না—তাহার নবীন, অবিকৃত মন একদিন যে গভীর আনন্দ পাইয়াছিল বইখানা হইতে—এইটাই বড় কথা তাহার কাছে।

নির্মলার সহিত দেখা অপুর মনের সেই অবস্থায়,--অপ্রকৃতিস্থ, মত্ত, রঙীন—সে তখন শুধু একটা সুপ্রাচীন রহস্যময়, অধুনালুপ্ত জাতির দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! ক্লিওপেট্রা? হউন তিনি সুন্দরী—তাঁহাকে সে গ্রাহ্য করে না! পিরামিডের অন্ধকার গর্ভগৃহে বহু হাজার বৎসরের সুপ্তি ভাঙিয়া সম্রাট মেন্কাউ-রা গ্রানাইট পাথরের সমাধি-সিন্দুকে যখন রোষে পার্শ্বপরিবর্তন করেন—মনুষ্য সৃষ্টির পূর্বেকার জনহীন আদিম পৃথিবীর নীরবতার মধ্যে শুধু

সিহোর নদী লিবীয়া মরুভূমির বুকের উপর দিয়া বহিয়া যায়—অপূর্ব রহস্যে ভরা মিশর ! অদ্ভুত নিয়তির অকাট্য লিপি ! তাহার মন সারা দুপুর আর কিছু ভাবিতে চায় না।

গরম বাতাসে দমকা ধূলাবালি উড়াইয়া আনিতেছিল বলিয়া অপু দরজা ভেজাইয়া বসিয়াছিল, নির্মলা দরজা ঠেলিয়া ঘরে আসিল। অপু বলিল—এস এস, আজ সকালে তো তোমাদের স্কুলে প্রাইজ হ'ল—কে প্রাইজ দিলেন, মুন্সেফবাবুর স্ত্রী, না ? ঐ মোটা-মত যিনি গাড়ি থেকে নামলেন, উনিই তো ?

—আপনি বুঝি ওদিকে ছিলেন তখন ? মাগো, কি মোটা ?—আমি তো কখনো—পরে হঠাৎ যেন মনে পড়িল এইভাবে বলিল, তারপর আপনি তো যাবেন আজ, না দাদা ?

—হাঁ, দুটোর গাড়িতে যাবো—রামধারিয়াকে একটু ডেকে নিয়ে এস তো—জিনিসপত্তরগুলো একটু বেঁধে দেবে।

—রামধারিয়া কি আপনার চিরকাল ক'রে দিয়ে এসেছে নাকি ? কই, কি জিনিস আগে বলুন না।

দুইজনে মিলিয়া বইয়ের ধূলা ঝাড়িয়া গোছানো, বিছানা বাঁধা চলিল। নির্মলা অপুর ছোট টিনের তোরঙ্গটা খুলিয়া বলিল—মাগো ! কি ক'রে রেখেছেন বাক্সটা ! কাপড়ে, কাগজে, বইয়ে হাণ্ডুল পাণ্ডুল—আচ্ছা এত বাজে কাগজ কি হবে দাদা ? ফেলে দেবো ?···

অপু বলিয়া উঠিল—হাঁ হাঁ—না না—ওসব ফেলো না।

সে আজ দুই-তিন বছরের চিঠি, নানা সময়ে নানা-কথা-লেখা কাগজের টুকরা সব জমাইয়া রাখিয়াছে। অনেক স্মৃতি জড়ানো সেগুলির সঙ্গে, পুরাতন সময়কে আবার ফিরাইয়া আনে—সেগুলি প্রাণ ধরিয়া অপু ফেলিয়া দিতে পারে না। কবে কোন্ কালে তাহার দিদি দুর্গা নিশ্চিন্দিপুরে থাকিতে আদর করিয়া তাহাকে কোন্ বন হইতে একটা পাখীর বাসা আনিয়া দিয়াছিল, কতকালের কথা,—বাসাটা সে আজও বাক্সে রাখিয়া দিয়াছে—বাবার হাতের লেখা একখানা কাগজ—আরও কত কি।

নির্মলা বলিল—এ কি ? আপনার মোটে দুখানা কাপড়, আর জামা নেই ?

অপু হাসিয়া বলিল—পয়সাই নেই হাতে তা জামা ! নইলে ইচ্ছা তো আছে সুকুমারের মত একটা জামা করাবো—ওতে আমাকে যা মানায়—ওই রংটাতে—

নির্মলা ঘাড় নাড়িয়া বলিল—থাক থাক, আর বাহাদুরি করতে হবে না। এই রইল চাবি, এখুনি হারিয়ে ফেলবেন না যেন আবার। আমি মিশির ঠাকুরকে বলে দিয়েছি, এখুনি লুচি ভেজে আনবে—দাঁড়ান, দেখি গিয়ে আপনার গাড়ির কত দেরি ?

—এখনও ঘণ্টা দুই ! মা'র সঙ্গে দেখা ক'রে যাবো, আবার হয়ত কত দিন পরে আসবো তার ঠিক কি ?

—আসবেনই না। আপনাকে আমি বুঝি নি ভাবছেন ? এখান থেকে চলে গেলে আপনি আবার এ-মুখো হবেন ?—কখ্‌খনো না।

অপু কি প্রতিবাদ করিতে গেল, নির্মলা বাধা দিয়া বলিল—সে আমি জানি। এই

দু'বছর আপনাকে দেখে আসছি দাদা, আমার বুঝতে বাকী নেই, আপনার শরীরে মায়া দয়া কম।

—কম ?—বা রে—এ তো তুমি—আমি বুঝি—

—দাঁড়ান, দেখি গিয়ে মিশির ঠাকুর কি করছে—তাড়া না দিলে সে কি আর—

নির্মলার মা যাইবার সময় চোখের জল ফেলিলেন। কিন্তু নির্মলা বাড়ির মধ্যে কি কাজে ব্যস্ত ছিল, মায়ের বহু ডাকাডাকিতেও সে কাজ ফেলিয়া বাহিরে আসিতে পারিল না। অপু স্টেশনের পথে যাইতে যাইতে ভাবিল—নির্মলা আচ্ছা তো! একবার বার হ'ল না—যাবার সময়টা দেখা হ'ত—আচ্ছা খামখেয়ালি!

যখন তখন রেলগাড়িতে চড়াটা ঘটে না বলিয়াই রেলে চড়িলেই তাহার একটা অপূর্ব আনন্দ হয়। ছোট্ট তোরঙ্গ ও বিছানাটার মোট লইয়া জান'লার ধারে বসিয়া চাহিয়া দেখিতে দেখিতে কত কথা মনে আসিতেছিল! এখন সে কত বড় হইয়াছে—একা একা ট্রেনে চড়িয়া বেড়াইতেছে। তারপর এমনি একদিন হয়ত নীল নদের তীরে, ক্লিওপেট্রার দেশে—এক জ্যোৎস্না রাতে শত শত প্রাচীন সমাধির বুকের উপর দিয়া অজানা সে যাত্রা!

স্টেশনে নামিয়া বাড়ি যাইবার পথে একটা গাছতলা দিয়া যাইতে যাইতে মাঝে মাঝে কেমন একটা সুগন্ধ—মাটির, ঝরা পাতার, কোন্ ফুলের। ফাল্গুনের তপ্ত রৌদ্র গাছে গাছে পাতা ঝরাইয়া দিতেছে, মাঠের ধারে অনেক গাছে নতুন পাতা গজাইয়াছে—পলাশের ডালে রাঙা রাঙা নতুন ফোটা ফুল যেন আরতির পঞ্চপ্রদীপের ঊর্ধ্বমুখী শিখার মত জ্বলিতেছে। অপুর মন যেন আনন্দে শিহরিয়া ওঠে—যদিও সে ট্রেনে আজ সারা পথ শুধু নির্মলা আর দেবব্রতের কথা ভাবিয়াছে···কখনো শুধুই নির্মলা, কখনো শুধুই দেবব্রত—তাহার স্কুলজীবনে এই দুইটি বন্ধু যতটা তাহার প্রাণের কাছাকাছি আসিয়াছিল, অতটা নিকটে অমনভাবে আর কেহ আসিতে পারে নাই, তবুও তাহার মনে হয় আজকার আনন্দের সঙ্গে নির্মলার সম্পর্ক নাই, দেবব্রতের নাই—আছে তার নিশ্চিন্দিপুরের বাল্যজীবনের স্নিগ্ধস্পর্শ, আর বহুদূর-বিসর্পিত, রহস্যময় কোন্ অন্তরের ইঙ্গিত—সে মনে বালক হইলেও এ-কথা বোঝে।

প্রথম যৌবনের শুরু, বয়ঃসন্ধিকালে রূপ ফাটিয়া পড়িতেছে,—এই ছায়া, বউলের গন্ধ, বনান্তরে অবসন্ন ফাল্গুনদিনে পাখির ডাক, ময়ূরকণ্ঠী রং-এর আকাশটা—রক্তে যেন এদের নেশা লাগে—গর্ব, উৎসাহ, নবীন জীবনের আনন্দভরা প্রথম পদক্ষেপ। নির্মলা তুচ্ছ! আর এক দিক হইতে ডাক আসে—অপু আশায় আশায় থাকে।

নিরাবরণ মুক্ত প্রকৃতির এ আহ্বান, রোমান্সের আহ্বান—তার রক্তে মেশানো, এ আসিয়াছে তাহার বাবার নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে—বন্ধনমুক্ত হইয়া ছুটিয়া বাহির হওয়া, মন কি চায় না-বুঝিয়াই তাহার পিছু পিছু দৌড়ানো, এ তাহার নিরীহ শান্ত-প্রকৃতি ব্রাহ্মণপণ্ডিত পিতামহ রামহরি তর্কালঙ্কারের দান নয়—যদিও সে তাঁর নিস্পৃহ জ্ঞানপিপাসা ও অধ্যয়নপ্রিয়তাকে লাভ করিয়াছে বটে। কে জানে পূর্ব-পুরুষ ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়ের উচ্ছৃঙ্খল রক্ত কিছু আছে কি-না—

তাই তাহার মনে হয় কি যেন একটা ঘটিবে, তাহারই প্রতীক্ষায় থাকে।

অপূর্ব গন্ধে-ভরা বাতাসে, নবীন বসন্তের শ্যামলশ্রীতে, অস্তসূর্যের রক্ত আভায় সে রোমান্সের বার্তা যেন লেখা থাকে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাড়িতে অপু মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করিল। কলিকাতায় যদি পড়িতে যায় স্কলারশিপ না পাইলে কি কোন সুবিধা হইবে? সর্বজয়া কখনও জীবনে কলিকাতা দেখে নাই—সে কিছু জানে না। পড়া তো অনেক হইয়াছে আর পড়ার দরকার কি?—অপুর মনে কলেজে পড়িবার ইচ্ছা খুব প্রবল। কলেজে পড়িলে মানুষ বিদ্যার জাহাজ হয়। সবাই বলিবে কলেজের ছেলে।

মাকে বলিল—না-ই যদি স্কলারশিপ পাই, তাই বা কি? একরকম ক'রে হয়ে যাবে—রমাপতিদা বলে, কত গরীবের ছেলে কলকাতায় পড়চে, গিয়ে একটু চেষ্টা করলেই নাকি সুবিধা হয়ে যাবে, ও আমি ক'রে নেবো মা—

কলিকাতায় যাইবার পূর্বদিন রাত্রে আগ্রহে উত্তেজনায় তাহার ঘুম হইল না। মাথার মধ্যে যেন কেমন করে, বুকের মধ্যেও। গলায় যেন কি আটকাইয়া গিয়াছে। সত্য সত্য সে কাল এমন সময় কলিকাতায় বসিয়া আছে?···কলিকাতায়! কলিকাতা সম্বন্ধে কত গল্প, কত কি সে শুনিয়াছে। অতবড় শহর আর নাই। কত কি অদ্ভুত জিনিস দেখিবার আছে, বড় বড় লাইব্রেরী আছে, সে শুনিয়াছে বই চাহিলেই সেখানে বসিয়া পড়িতে দেয়।

বিছানায় শুইয়া সারারাত্রি ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। বাড়ির পিছনের তেঁতুল গাছের ডালপালা অন্ধকারকে আরও ঘন করিয়াছে, ভোর আর কিছুতেই হয় না। হয়ত তাহার কলিকাতা যাওয়া ঘটিবে না, কলেজে পড়া ঘটিবে না, কত লোক হঠাৎ মারা গিয়াছে, এমনি হয়ত সেও মরিয়া যাইতে পারে। কলিকাতা না দেখিয়া, কলেজে অন্তত কিছুদিন পড়ার আগে যেন সে না মরে!—দোহাই ভগবান।

কলিকাতায় সে কাহাকেও চেনে না, কোথায় গিয়া উঠিবে ঠিক জানা নাই, পথঘাটও জানা নাই। মাসকতক আগে দেবব্রত তাহাকে নিজের এক মেশোমশাইয়ের কলিকাতার ঠিকানা দিয়া বলিয়াছিল, দরকার হইলে এই ঠিকানায় গিয়া তাহার নাম করিলেই তিনি আদর করিয়া থাকিবার স্থান দিবেন। ট্রেনে উঠিবার সময় অপু সে-কাগজখানা বাহির করিয়া পকেটে রাখিল। রেলের পুরানো টাইমটেবলের পিছন হইতে ছিঁড়িয়া লওয়া একখানা কলিকাতা শহরের নক্সা তাহার টিনের তোরঙ্গটার মধ্যে অনেকদিন আগে ছিল, সেখানাও বাহির করিয়া বসিল।

ইহার পূর্বেও অপু শহর দেখিয়াছে, তবুও ট্রেন হইতে নামিয়া শিয়ালদহ স্টেশনের সম্মুখের

বড় রাস্তায় একবার আসিয়া দাঁড়াইতেই সে অবাক্ হইয়া গেল। এরকম কাণ্ড সে কোথায় দেখিয়াছে? ট্রামগাড়ি ইহার নাম? আর এক রকমের গাড়ি নিঃশব্দে দৌড়াইয়া চলিয়াছে, অপু কখনও না দেখিলেও মনে মনে আন্দাজ করিল, ইহারই নাম মোটর গাড়ি। সে বিস্ময়ের সহিত দু-একখানার দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল; স্টেশনের অফিস ঘরে সে মাথার উপর একটা কি চাকার মত জিনিস বন্ বন্ বেগে ঘুরিতে দেখিয়াছে, সে আন্দাজ করিল উহাই ইলেকট্রিক পাখা।

যে-ঠিকানা বন্ধু দিয়াছিল, তাহা খুঁজিয়া বাহির করা তাহার পক্ষে এক মহা মুশকিলের ব্যাপার, পকেটে রেলের টাইমটেবলের মোড়ক হইতে সংগ্রহ করা কলিকাতার যে নক্সা ছিল তাহা মিলাইয়া হ্যারিসন রোড খুঁজিয়া বাহির করিল। জিনিসপত্র তাহার এমন বেশী কিছু নহে, বগলে ছোট বিছানাটি ও ডান হাতে ভারী পুঁটুলিটা ঝুলাইয়া পথ চলিতে চলিতে সামনে পাওয়া গেল আমহার্স্টস্ট্রীট। তাহার পর আরও খানিক ঘুরিয়া সে পঞ্চানন দাসের গলি বাহির করিল।

অখিলবাবু সন্ধ্যার আগে আসিলেন, কালো নাদুস নুদুস চেহারা, অপুর পরিচয় ও উদ্দেশ্য শুনিয়া খুশী হইলেন ও খুব উৎসাহ দিলেন। ঝিকে ডাকাইয়া তখনই খাবার আনাইয়া অপুকে খাইতে দিলেন, সারাদিন খাওয়া হয় নাই জানিতে পারিয়া তিনি এত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন যে, নিজে সন্ধ্যাহ্নিক করিবার জন্য আসনখানি মেসের ছাদে পাতিয়াও আহ্নিক করিতে ভুলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার সময় সে মেসের ছাদে শুইয়া পড়িল। সারাদিন বেড়াইয়া সে বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

সে তো কলিকাতায় আসিয়াছে—মিউজিয়াম, গড়ের মাঠ দেখিতে পাইবে তো?... বায়োস্কোপ দেখিবে.. এখানে খুব বড় বায়োস্কোপ আছে সে জানে। তাহাদের দেওয়ানপুরের স্কুলে একবার একটা ভ্রমণকারী বায়োস্কোপের দল গিয়াছিল, তাহাতেই সে জানে বায়োস্কোপ কি অদ্ভুত দেখিতে। তবে এখানে নাকি বায়োস্কোপে গল্পের বই দেখায়। সেখানে তাহা ছিল না—রেলগাড়ি দৌড়াইতেছে, একটা লোক হাত পা নাড়িয়া মুখভঙ্গি করিয়া লোক হাসাইতেছে—এই সব। এখানে বায়োস্কোপে গল্পের বই দেখিতে চায়। অখিলবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, বায়োস্কোপ যেখানে হয়, এখান থেকে কত দূর?

অখিলবাবুর মেসে খাইয়া অপু ইহার-উহার পরামর্শমত নানাস্থানে হাঁটাহাঁটি করিতে লাগিল, কোথাও বা থাকিবার স্থানের জন্য, কোথাও বা ছেলে পড়াইবার সুবিধার জন্য, কাহারও কাছে বা কলেজে বিনা বেতনে ভর্তি হইবার যোগাযোগের জন্য। এদিকে কলেজে ভর্তি হইবার সময়ও চলিয়া যায়, সঙ্গে যে কয়টা টাকা ছিল তাহা পকেটে লইয়া একদিন সে ভর্তি হইতে বাহির হইল। প্রেসিডেন্সী কলেজের দিকে সে ইচ্ছা করিয়াই ঘেঁষিল না, সেখানে সবদিকেই খরচ অত্যন্ত বেশী। মেট্রোপলিটান কলেজ গলির ভিতর, বিশেষতঃ পুরানো ধরণের বলিয়া সেখানেও ভর্তি হইতে ইচ্ছা হইল না। মিশনারীদের কলেজ হইতে

একদল ছেলে বাহির হইয়া সিটি কলেজে ভর্তি হইতে চলিয়াছিল, তাহাদের দলে মিশিয়া গিয়া কেরানীর নিকট হইতে কাগজ চাহিয়া লইয়া নাম লিখিয়া ফেলিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাড়িটার গড়ন ও আকৃতি তাহার কাছে এত খারাপ ঠেকিল যে, কাগজখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সে বাহিরে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। অবশেষে রিপন কলেজের বাড়ি তাহার কাছে বেশ ভাল ও উঁচু মনে হইল। ভর্তি হইয়া সে আর একটি ছাত্রের সঙ্গে ক্লাস-রুমগুলি দেখিতে গেল। ক্লাসে ইলেকট্রিক পাখা। কি করিয়া খুলিতে হয়? তাহার সঙ্গী দেখাইয়া দিল। সে খুশীর সহিত তাহার নীচে খানিকক্ষণ বসিয়া রহিল, এত হাতের কাছে ইলেকট্রিক পাখা পাইয়া বার বার পাখা খুলিয়া বন্ধ করিয়া দেখিতে লাগিল।

অখিলবাবুদের মেসে থাকা ও পড়াশুনা দুইয়েরই ঘোর অসুবিধা। এক এক ঘরের মেজেতে তিনটি ট্রাঙ্ক, কতকগুলি জুতার বাক্স, কালি বুরুশ, তিনটি হুঁকা। ঘরে আর কোন আসবাবপত্র নাই, রাত্রে আলো সবদিন জ্বলে না। ঘর দেখিয়া মনে হয় ইহার অধিবাসীগণের জীবনে মাত্র দুইটি উদ্দেশ্য আছে—অফিসে চাকরি করা ও মেসে আসিয়া খাওয়া ও ঘুমানো। এক এক ঘরে যে তিনটি বাবু থাকেন তাঁহারা ছ'টার সময় অফিস হইতে আসিয়া হাতমুখ ধুইয়া যে যাঁর বিছানায় শুইয়া পড়িয়া চুপ করিয়া তামাক টানিতে থাকেন, একটু আধটু গল্পগুজব যা হয়, প্রায়ই অফিস সংক্রান্ত; তারপরেই আহারাদি সারিয়া নিদ্রা। অখিলবাবু কোথায় ছেলে পড়ান, অফিসের পর সেখান হইতে ফিরিতে দেরি হইয়া যায়। তিনিও সারাদিন খাটুনির পর মেসে আসিয়া শুইয়া পড়েন।

অপু এ রকম ঘরে এতগুলি লোকের সহিত এক বিছানায় কখনও শুইতে অভ্যস্ত নয়, রাত্রে তাহার যেন হাঁপ ধরে, ভাল ঘুম হয় না। অন্য কোথাও কোন রকম সুবিধা না হইলে সে যাইবে কোথায়? তাহা ছাড়া অপুর আর এক ভাবনা মায়ের জন্য। স্কলারশিপ পাইলে সেই টাকা হইতে মাকে কিছু কিছু পাঠাইবার আশ্বাস সে আসিবার সময় দিয়া আসিয়াছে কিন্তু কোথায় বা স্কলারশিপ, কোথায় বা কি। মা'র কিরূপে চলিতেছে, দিন যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাবনাই তাহার আরও প্রবল হইল।

মাসের শেষে অখিলবাবু অপুর জন্য একটা ছেলে পড়ানো ঠিক করিয়া দিলেন, দুইবেলা, একটা ছোট ছেলে ও একটি মেয়েকে পড়াইতে হইবে, মাসে পনেরো টাকা।

অখিলবাবুর মেসে পরের বিছানায় শুইয়া থাকা তাহার পছন্দ হয় না। কিন্তু কলেজ হইতে ফিরিয়া পথে কয়েকটি মেসে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, পনেরো টাকা মাত্র আয়ে কোনো মেসে থাকা চলে না। তাহার ক্লাসের কয়েকটি ছেলে মিলিয়া একখানা ঘর ভাড়া করিয়া থাকিত, নিজেরাই রাঁধিয়া খাইত, অপুকে তাহারা লইতে রাজী হইল।

যে তিনটি ছেলে একসঙ্গে ঘর ভাড়া করিয়া থাকে, তাহাদের সকলেরই বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলায়। ইহাদের মধ্যে সুরেশ্বরের আয় কিছু বেশী, এম-এ ক্লাসের ছাত্র, চল্লিশ টাকার টিউশনি আছে। জানকী যেন কোথায় ছেলে পড়াইয়া কুড়ি টাকা পায়। নির্মলের আয়

আরও কম। সকলের আয় একত্র করিয়া যে মাসে যাহা অকুলান হয়, সুরেশ্বর নিজেই তাহা দিয়া দেয়, কাহাকেও বলে না। অপু প্রথমে তাহা জানিত না, মাস দুই থাকিবার পর তাহার সন্দেহ হইল প্রতিমাসে সুরেশ্বর পঁচিশ-ত্রিশটাকা দোকানের দেনা শোধ করে, অথচ কাহারও নিকট চায় না কেন? সুরেশ্বরের কাছে একদিন কথাটা তুলিলে, সে হাসিয়া উড়াইয়া দিল। সে বেশী এমন কিছু দেয় না, যদিই বা দেয়—তাতেই বা কি? তাহাদের যখন আয় বাড়িবে তখন তাহারাও অনায়াসে দিতে পারিবে, কেহ বাধা দিবে না তখন।

নির্মল রবিঠাকুরের কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে ঘরে ঢুকিল। তাহার গায়ে খুব শক্তি, সুগঠিত মাংসপেশী, চওড়া বুক। অপুর মতই বয়স। হাতের ভিতর একটা কাগজের ঠোঙা দেখাইয়া বলিল—নূতন মটরশুঁটি লঙ্কা দিয়ে ভেজে—

অপু হাত হইতে ঠোঙাটা কাড়িয়া লইয়া বলিল—দেখি? পরে হাসিমুখে বলিল—সুরেশ্বরদা, স্টোভ ধরিয়ে নিন—আমি মুড়ি আনি—ক'পয়সার আনবো? এক-দুই-তিন-চার—

—আমার দিকে আঙুল দিয়ে গুণো না ওরকম—

অপু হাসিয়া নির্মলের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল—তোমার দিকেই আঙুল বেশী ক'রে দেখাবো—তিন-তিন-তিন—

নির্মল তাহাকে ধরিতে যাইবার পূর্বে সে হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। সুরেশ্বর বলিল—একরাশ বই এনেছে কলেজের লাইব্রেরী থেকে—এতও পড়তে পারে—মায় মম্‌সেনের রোমের হিস্ট্রি এক ভল্যুম—

অপুর গলা মিষ্টি বলিয়া সন্ধ্যার পর সবাই গান গাওয়ার জন্য ধরে। কিন্তু পুরাতন লাজুকতা তাহার এখনও যায় নাই, অনেক সাধ্যসাধনার পর একটি বা দুটি গান গাহিয়া থাকে, আর কিছুতেই গাওয়ানো যায় না। কিন্তু রবিঠাকুরের কবিতার সে বড় ভক্ত, নির্মলের চেয়েও। যখন কেহ ঘরে থাকে না, নির্জনে হাত-পা নাড়িয়া আবৃত্তি করে—

সন্ন্যাসী উপগুপ্ত
মথুরাপুরীর প্রাচীরের তলে
একদা ছিলেন সুপ্ত।

ইতিহাসের অধ্যাপক মিঃ বসুকে অপুর সবচেয়ে ভাল লাগে। সবদিন তাঁহার ক্লাস থাকে না—কলেজের পড়ায় কোন উৎসাহ থাকে না সেদিন। কালো রিবন-ঝোলানো পাঁশ-নে চশমা পরিয়া উজ্জ্বলচক্ষু মিঃ বসু ক্লাসরুমে ঢুকিলেই সে নড়িয়া চড়িয়া সংযত হইয়া বসে, বক্তৃতার প্রত্যেক কথা মন দিয়া শোনে। এম-এ-তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। অপুর ধারণায় মহাপণ্ডিত।—গিবন বা মম্‌সেন বা লর্ড ব্রাইস্ জাতীয়। মানবজাতির সমগ্র ইতিহাস—ঈজিপ্ট, ব্যাবিলন, আসিরিয়া, ভারতবর্ষীয় সভ্যতার উত্থানপতনের কাহিনী তাঁহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ছবির মত পড়িয়া আছে।

ইতিহাসের পরে লজিকের ঘণ্টা। হাজিরা ডাকিয়া অধ্যাপক পড়ানো শুরু করিবার সঙ্গে

সঙ্গেই ছেলে কমিতে শুরু করিল। অপু এ ঘণ্টায় পিছনের বেঞ্চিতে বসিয়া লাইব্রেরী হইতে লওয়া ইতিহাস, উপন্যাস বা কবিতার বই পড়ে, অধ্যাপকের কথার দিকে এতটুকু মন দেয় না, শুনিতে ভাল লাগে না। সেদিন একমনে অন্য বই পড়িতেছে হঠাৎ অধ্যাপক তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কি প্রশ্ন করিলেন। প্রশ্নটা সে শুনিতে পায় নাই, কিন্তু ক্লাস হঠাৎ নীরব হইয়া যাওয়াতে তাহার চমক ভাঙ্গিল, চাহিয়া দেখিল সকলেরই চোখ তাহার দিকে। সে উঠিয়া দাঁড়াইল। অধ্যাপক বলিলেন—তোমার হাতে ওখানা লজিকের বই ?

অপু বলিল—না স্যর, প্যালগ্রেভের গোল্‌ডেন ট্রেজারি—

—তোমাকে যদি আমার ঘণ্টায় পার্সেণ্টেজ না দিই ? পড়া শোনো না কেন ?

অপু চুপ করিয়া রহিল। অধ্যাপক তাহাকে বসিতে বলিয়া পুনরায় অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন। জানকী চিম্‌টি কাটিয়া বলিল—হ'ল তো ? রোজ রোজ বলি লজিকের ঘণ্টায় আমাদের সঙ্গে পালাতে—তা শোনা হয় না—আয় চলে—

দেড়শত ছেলের ক্লাস। পিছনের বেঞ্চের সামনের দরজাটি ছেলেরা ইচ্ছা করিয়া খুলিয়া রাখে পালাইবার সুবিধার জন্য। জানকী এদিক ওদিক চাহিয়া সুড়ুৎ করিয়া সরিয়া পড়িল। তাহার পরে বিরাজ। অপুও মহাজনদের পথ ধরিল। নীচে আসিলে লাইব্রেরীয়ান বলিল—কি রায় মশায়, আমাদের পার্বণীটা কি পাব না ?

অপু খুব খুশী হয়। কে তাহাকে চিনিত পাঁচ মাস আগে! এতবড় কলিকাতা শহর, এতবড় কলেজ, এত ছেলে। এখানেও তাহাকে রায় মশায় বলিয়া খাতির করিতেছে, তাহার কাছে পার্বণী চাহিতেছে! হাসিয়া বলে—কাল এনে দোব ঠিক সত্যবাবু, আজ ভুলে গিইচি—আপনি এক ভল্যুম গিবন্ দেবেন কিন্তু আজ—

উৎসাহে পড়িয়া গিবন্ বাড়ি লইয়া যায় বটে কিন্তু ভাল লাগে না। এত খুঁটিনাটি বিরক্তিকর মনে হয়। পরদিন সেখানা ফেরত দিয়া অন্য ইতিহাস লইয়া গেল।

পূজার কিছু পূর্বে অপুদের বাসা উঠিয়া গেল। খরচে আয়ে অনেকদিন হইতেই কুলাইতেছিল না, সুরেশ্বরের ভাল টিউশনিটি হঠাৎ হাতছাড়া হইল—কে বাড়তি খরচ চালায় ? নির্ম্মল ও জানকী অন্য কোথায় চলিয়া গেল, সুরেশ্বর গিয়া মেসে উঠিল। অপুর যে মাসিক আয়, কলেজের মাহিনা দিয়া তাহা হইতে বারো টাকা বাঁচে—কলিকাতা শহরে বারো টাকায় যে কিছুতেই চলিতে পারে না, অপুর সে জ্ঞান এতদিনেও হয় নাই। সুতরাং সে ভাবিল বারো টাকাতেই চলিবে, খুব চলিবে। বারো টাকা কি কম টাকা!

কিন্তু বারো টাকা আয়ও বেশী দিন রহিল না, একদিন পড়াইতে গিয়া শুনিল, ছেলের শরীর খারাপ বলিয়া ডাক্তার হাওয়া বদলাইতে বলিয়াছে, পড়াশুনা এখন বন্ধ থাকিবে। এক মাসের মাহিনা তাহারা বাড়তি দিয়া জবাব দিল।

টাকা কয়টি পকেটে করিয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া অপু আকাশ-পাতাল ভাবিতে ভাবিতে ফুটপাথ বাহিয়া চলিল। সুরেশ্বরের মেসে সে জিনিসপত্র রাখিয়া দিয়াছে, সেইখানেই

গেস্ট-চার্জ দিয়া খায়, রাত্রে মেসের বারান্দাতে শুইয়া থাকে। টাকা যাহা আছে, মেসের দেনা মিটাইতে যাইবে। সামান্য কিছু হাতে থাকিতে পারে বটে, কিন্তু তাহার পর?

সুরেশ্বরের মেসে আসিয়া নিজের নামের একখানি পত্র ডাকবাক্সে দেখিল। হাতের লেখাটা সে চেনে না—খুলিয়া দেখিল চিঠিখানা মায়ের, কিন্তু অপরের হাতের লেখা। হাতে ব্যথা হইয়া মা বড় কষ্ট পাইতেছেন, অপু কি তিনটি টাকা পাঠাইয়া দিতে পারে? মা কখনো কিছু চায় না, মুখ বুজিয়া সকল দুঃখ সহ্য করে, সে-ই বরং দেওয়ানপুরে থাকিতে নানা ছল-ছুতায় মাঝে মাঝে কত টাকা মায়ের কাছ হইতে লইয়াছে। হাতে না থাকিলেও তেলিবাড়ি হইতে চাহিয়া-চিন্তিয়া মা যোগাড় করিয়া দিত। খুব কষ্ট না হইলে কখনো মা তাহাকে টাকার জন্য লেখে নাই।

পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া গুণিয়া দেখিল সাতাশটি টাকা আছে। মেসের দেনা সাড়ে পনেরো টাকা বাদে সাড়ে এগারো টাকা থাকে। মাকে কত টাকা পাঠানো যায়? মনে মনে ভাবিল—তিনটে টাকা তো চেয়েছে, আমি দশ টাকা পাঠিয়ে দিই, মনিঅর্ডার পিওন যখন টাকা নিয়ে যাবে, মা ভাববে, বুঝি তিন টাকা কিংবা হয়তো দুটাকার মনি-অর্ডার—জিজ্ঞেস করবে, কত টাকা? পিওন যেই বলবে দশ টাকা, মা অবাক হয়ে যাবে। মাকে তাক্ লাগিয়ে দেবো—ভারী মজা হবে, বাড়িতে গেলে মা শুধু সেই গল্পই করবে দিনরাত—

অপ্রত্যাশিত টাকা প্রাপ্তিতে মায়ের আনন্দোজ্জ্বল মুখখানা কল্পনা করিয়া অপু ভারী খুশী হইল। বৌবাজার পোস্টাফিস হইতে টাকাটা পাঠাইয়া দিয়া সে ভাবিল—বেশ হ'ল! আহা, মাকে কেউ কখনো দশ টাকার মনিঅর্ডার এক সঙ্গে পাঠায় নি—টাকা পেয়ে খুশী হবে। আমার তো এখন রইল দেড় টাকা, তারপর একটা কিছু ঠিক হয়ে যাবেই।

কলেজের একটি ছেলের সঙ্গে তাহার খুব বন্ধুত্ব হইয়াছে। সেও গরীব ছাত্র, ঢাকা জেলায় বাড়ি, নাম প্রণব মুখার্জি। খুব লম্বা, গৌরবর্ণ, দোহারা চেহারা, বুদ্ধিপ্রোজ্জ্বল দৃষ্টি। কলেজ-লাইব্রেরীতে একসঙ্গে বসিয়া' বই পড়িতে পড়িতে দু'জনের আলাপ। এমন সব বই দু'জনে লইয়া যায়, যাহা সাধারণ ছাত্রেরা পড়ে না, নামও জানে না। ফার্স্ট-ইয়ারের ছেলেকে মম্‌সেন লইতে দেখিয়া প্রণব তাহার দিকে প্রথম আকৃষ্ট হয়। আলাপ ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছে।

অপু শীঘ্রই বুঝিতে পারিল, প্রণবের পড়াশুনা তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী! অনেক গ্রন্থকারের নামও সে কখনও শোনে নাই—নীট্‌শে, এমার্সন, টুর্গেনেভ, ব্রেস্টেড্—প্রণবের কথায় সে ইহাদের বই পড়িতে আরম্ভ করিল। তাহারই উৎসাহে সে পুনরায় ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সহিত গিবন্ শুরু করিল, ইলিয়াডের অনুবাদ পড়িল।

অপুর পড়াশুনার কোনও বাঁধাবাঁধি রীতি নাই। যখন যাহা ভাল লাগে, কখনও ইতিহাস, কখনও নাটক, কখনও কবিতা, কখনও প্রবন্ধ, কখনও বিজ্ঞান। প্রণব নিজে অত্যন্ত সংযমী ও শৃঙ্খলাপ্রিয়—সে বলিল—ওতে কিছু হবে না ওরকম পড় কেন?

অপু চেষ্টা করিয়াও পড়াশুনায় শৃঙ্খলা আনিতে পারিল না। লাইব্রেরীঘরের ছাদ পর্যন্ত উঁচু বড় বড় বইয়ে ভরা আলমারির দৃশ্য তাহাকে দিশাহারা করিয়া দেয়। সকল বই-ই খুলিয়া দেখিতে সাধ যায়—Gases of the Atmosphere—স্যার উইলিয়াম র‍্যামজের! সে পড়িয়া দেখিবে কি কি গ্যাস! Extinct Animals—ই. রে. ল্যান্‌কাস্টার, জানিবার তার ভয়ানক আগ্রহ! Worlds Around Us—প্রক্টর! উঃ, বইখানা না পড়িলে রাত্রে ঘুম হইবে না। প্রণব হাসিয়া বলে—দূর! ও কি পড়া? তোমার তো পড়া নয়, পড়া পড়া খেলা—

এত বড় লাইব্রেরী, এত বই! নক্ষত্রজগৎ হইতে শুরু করিয়া পৃথিবীর জীবজগৎ, উদ্ভিদজগৎ আনুবীক্ষণিক প্রাণিকুল, ইতিহাস—সব সংক্রান্ত বই। তাহার অধীর উৎসুক মন চায় এই বিশ্বের সব কথা জানিতে। বুঝিতে পারুক আর নাই পারুক—একবার বইগুলি খুলিয়া দেখিতেও সাধ যায়! লুপ্ত প্রাণীকুল সম্বন্ধে খানকতক ভাল বই পড়িল—অলিভার লজের Pioneers of Science—বড় বড় নীহারিকাদের ফটো দেখিয়া মুগ্ধ হইল। নীট্‌শে ভাল বুঝিতে না পারিলেও দু-তিনখানা বই পড়িল। টুর্গেনেভ একেবারে শেষ করিয়া ফেলিল, বারোখানা না ষোলখানা বই। চোখের সামনে টুর্গেনেভ এক নতুন জগৎ খুলিয়া দিয়া গেল—কি অপূর্ব হাসি-অশ্রুমাখানো কল্পলোক!

প্রণবের কাছেই সে সন্ধান পাইল, শ্যামবাজারে এক বড়লোকের বাড়ি দরিদ্র ছাত্রদের খাইতে দেওয়া হয়। প্রণবের পরামর্শে সে ঠিকানা খুঁজিয়া সেখানে গেল। এ পর্যন্ত কখনও কিছু সে চায় নাই, কাহারও কাছে চাহিতে পারে না; আত্মমর্যাদাবোধের জন্য নহে, লাজুকতা ও আনাড়ীপনার জন্য। এতদিন সে-সবের দরকারও হয় নাই, কিন্তু আর যে চলে না!

খুব বড়লোকের বাড়ি; দারোয়ান বলিল—কি চাই?

অপু বলিল, এখানে গরীব ছেলেদের খেতে দেয়, তাই জানতে—কাকে বলবো জানো?

দারোয়ান তাহাকে পাশের দিকে একটা ছোট ঘরে লইয়া গেল।

ইলেক্‌ট্রিক পাখার তলায় একজন মোটাসোটা ভদ্রলোক বসিয়া বসিয়া কি লিখিতেছিলেন। মুখ তুলিয়া বলিলেন—এখানে কি দরকার আপনার?

অপু সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল—এখানে কি পুওর স্টুডেণ্টদের খেতে দেওয়া হয়? তাই আমি—

—আপনি দরখাস্ত করেছিলেন?

কিসের দরখাস্ত অপু জানে না।

—জুন মাসে দরখাস্ত করতে হয়, আমাদের নাম্বার লিমিটেড কিনা, এখন আর খালি নেই। আবার আসছে বছর—তাছাড়া, আমরা ভাবছি ওটা উঠিয়ে দেবো, এস্টেট রিসিভারের হাতে যাচ্ছে, ও-সব আর সুবিধে হবে না।

ফিরিবার সময় গেটের বাহিরে আসিয়া অপুর মনে বড় কষ্ট হইল। কখনও সে কাহারও

নিকট কিছু চায় নাই, চাহিয়া বিমুখ হইবার দুঃখ কখনও ভোগ করে নাই, চোখে তাহার প্রায় জল আসিল।

পকেটে মাত্র আনা দুই পয়সা অবশিষ্ট আছে—এই বিশাল কলিকাতা শহরে তাহাই শেষ অবলম্বন। কাহাকেই বা সে এখানে চেনে, কাহার কাছে যাইবে? অখিলবাবুর মেসে দুই মাস সে প্রথম খাইয়াছে, সেখানে যাইতে লজ্জা করে। সুরেশ্বরের নিজেরই চলে না; তাহার উপর সে কখনও জুলুম করিতে পারিবে না।

আরও কয়েকদিন কাটিয়া গেল। কোনদিন সুরেশ্বরের মেসে এক বেলা খাইয়া, কোনদিন বা জানকীর কাছে কাটাইয়া চলিতেছিল। একদিন সারাদিন না খাওয়ার পর সে নিরুপায় হইয়া অখিলবাবুর মেসে সন্ধ্যার পর গেল! অখিলবাবু অনেকদিন পর তাহাকে পাইয়া খুব খুশী হইলেন। রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর অনেকক্ষণ গল্পগুজব করিলেন। বলি বলি করিয়াও অপু নিজের দুর্দশার কথা অখিলবাবুকে বলিতে পারিল না। তাহা হইলে হয়তো তিনি তাহাকে ছাড়িবেন না, সেখানে থাকিতে বাধ্য করিবেন। সে জুলুম করা হয় অনর্থক।

কিন্তু এদিকে আর চলে না! এক জায়গায় বই, এক জায়গায় বিছানা। কোথায় কখন রাত কাটাইবে কিছু ঠিক নাই—ইহাতে পড়াশুনা হয় না। পরীক্ষাও নিকটবর্তী। না খাইয়াই বা কয় দিন চলে!

অখিলবাবুর মেস হইতে ফিরিবার পথে একটা খুব বড় বাড়ি। ফটকের কাছে মোটর গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। এই বাড়ির লোকে যদি ইচ্ছা করে তবে এখনি তাহার কলিকাতায় থাকার সকল ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারে। সাহস করিয়া যদি সে বলিতে পারে, তবে হয়তো এখনি হয়। একবার সে বলিয়া দেখিবে?

কোথাও কিছু সুবিধা না হইলে তাহাকে বাধ্য হইয়া পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া দেশে ফিরিতে হইবে। এই লাইব্রেরী, এত বই, বন্ধুবান্ধব, কলেজ—সব ফেলিয়া হয়তো মনসাপোতায় গিয়া আবার পুরাতন জীবনের পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে। পড়াশুনা তাহার কাছে একটা রোমান্স, একটা অজানা বিচিত্র জগৎ দিনে দিনে চোখের সামনে খুলিয়া যাওয়া, ইহাকে সে চায়, ইহাই এতদিন চাহিয়া আসিয়াছে। কলেজ হইতে বাহির হইয়া চাকরি, অর্থোপার্জন—এসব কথা সে কোনদিন ভাবে নাই, তাহার মাথার মধ্যে কোনদিন এসব সাংসারিক কথা ঢোকে নাই—সে চায় এই অজানার রোমান্স—এই বিচিত্র ভাবধারার সহিত আরও ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ। প্রাচীন দিনের জগৎ, অধুনালুপ্ত অতিকায় প্রাণীদল, বিশাল শূন্যের দৃশ্য, অদৃশ্য গ্রহনক্ষত্ররাজি, ফরাসী বিদ্রোহ—নানা কথা। এই সব ছাড়িয়া শালগ্রাম হাতে মনসাপোতায় বাড়ি-বাড়ি ঠাকুর পূজা…!

অপুর মনে হইল—এই রকমই বড় বাড়ি আছে, লীলাদের, কলিকাতারই কোন জায়গায়। অনেকদিন আগে লীলা তাহাকে বলিয়াছিল, কলিকাতায় তাহাদের বাড়িতে থাকিয়া পড়িতে। সে ঠিকানা জানে না—কোথায় লীলাদের বাড়ি, কে-ই বা এখানে তাহাকে বলিয়া দিবে,

তাহা ছাড়া সে-সব আজ ছয়-সাত বছরের কথা হইয়া গেল, এতদিন কি আর লীলা তাহার কথা মনে রাখিয়াছে? কোন্ কালে ভুলিয়া গিয়াছে।

অপু ভাবিল—ঠিকানা জানলেই কি আর আমি সেখানে যেতে পারতাম, না, গিয়ে কিছু বলতে—সে আমার কাজ নয়—তার ওপর এই অবস্থায়! দূর, তা কখনও হয়? তাছাড়া লীলার বিয়ে-থাওয়া হয়ে এতদিন সে শ্বশুরবাড়ি চলে গিয়েছে। সে-সব কি আর আজকের কথা?

ক্লাসে জানকী একদিন একটা সুবিধার কথা বলিল। সে ঝামাপুকুরে কোন্ ঠাকুরবাড়িতে রাত্রে খায়। সকালে কোথায় ছেলে পড়াইয়া একবেলা তাহাদের সেখানে খায়। সম্প্রতি সে বোনের বিবাহে বাড়ি যাইতেছে, ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত অপু রাত্রে ঠাকুরবাড়িতে তাহার বদলে খাইতে পারে। বাড়ি যাইবার পূর্বে ঠাকুরবাড়ির সেবাইতকে বলিয়া কহিয়া সে সব ব্যবস্থা করিয়া যাইবে এখন! অপু রাজী আছে?

রাজী? হাতে স্বর্গ পাওয়া নিতান্ত গল্পকথা নয় তাহা হইলে!...

ঠাকুরবাড়ির খাওয়া নিতান্ত মন্দ নয়, অপুর কাছে তাহা খুব ভাল লাগে। আলোচালের ভাত, টক, কোনও কোনও দিন ভোগের পায়সও পাওয়া যায়, তবে মাছ-মাংসের সম্পর্ক নাই, নিরামিষ।

কিন্তু এ তো আর দু'বেলা নয়; শুধু রাত্রে। দিনমানটাতে বড় কষ্ট হয়। দুই পয়সার মুড়ি ও কলের জল। তবুও তো পেটটা ভরে! কলেজ হইতে বাহির হইয়া বৈকালে তাহার এত ক্ষুধা পায় যে গা ঝিম্ ঝিম করে, পেটে যেন এক ঝাঁক বোলতা হুল ফুটাইতেছে—পয়সা জুটাইতে পারিলে অপু এ সময়টা পথের ধারের দোকান হইতে এক পয়সার ছোলাভাজা কিনিয়া খায়।

সব দিন পয়সা থাকে না, সেদিন সন্ধ্যার পরেই ঠাকুরবাড়ি চলিয়া যায়, কিন্তু ঠাকুরের আরতি শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে খাইতে দিবার নিয়ম নাই—তাও একবার নয়, দুইবার দুটি ঠাকুরের আরতি। আরতির কোন নির্দিষ্ট সময় নাই, সেবাইত ঠাকুরের মর্জি ও সুবিধামত রাত আটটাতেও হয়, ন'টাতেও হয়, দশটাতেও হয়, আবার এক-একদিন সন্ধ্যার পরেই হয়।

কলেজে যাইতে সেদিন মুরারী বলিল—সি. সি. বি.-র ক্লাসে কেউ যেও না—আমরা সব স্ট্রাইক করেছি।

অপু বিস্ময়ের সুরে বলিল, কেন, কি করেছে, সি. সি. বি.?

মুরারী হাসিয়া বলিল,—করে নি কিছু, পড়া জিজ্ঞেস করবে বলেছে রোমের হিস্ট্রির। একপাতাও পড়ি নি, না পারলে বকুনি দেবে কি রকম জানো তো?

গজেন বলিল—আমার তো আরও মুশকিল! রোমের হিস্ট্রির বই-ই যে আমি কিনি নি!

মন্মথ আগে সেন্ট্ জেভিয়ারে পড়িত, সে বিলাতী নাচের ভঙ্গিতে হাত লম্বা করিয়া বার কয়েক পাক খাইয়া একটা ইংরাজি গানের চরণ বার দুই গাহিল। অপু বলিল—কিন্তু পার্সেণ্টেজ যাবে যে!

প্রতুল বলিল—ভারী একদিনের পার্সেণ্টেজ। তা আমি ক্লাসে নাম প্রেজেণ্ট ক'রেও পালিয়ে আসতে পারি—সে তো আর তুমি পারবে না ?

অপু বলিল—খুব পারি! পারবো না কেন ?

প্রতুল বলিল—সে তোমার কাজ নয়, সি. সি. বি.-র চোখে ভারী ইয়ে—আমরা বলে তাই এক একদিন সরষেফুল দেখি, তা তুমি! পারো পালিয়ে আসতে ?

—এখ্খুনি। দ্যাখো সবাই দাঁড়িয়ে—পারি কি না পারি, কিন্তু যদি পারি খাওয়াতে হবে ব'লে দিলাম—

অপু উৎসাহে সিঁড়ি ভাঙিয়া উপরে উঠিয়া গেল। গজেন বলিল—কেন ওকে আবার ওসব শেখাচ্ছিস্ ?

—শেখাচ্ছি মানে ? ভাজা মাছখানা উল্টে খেতে জানে না—ভারী সাধু!

মুরারী বলিল—না, না, তোমরা জানো না, অপূর্ব ভারী pure spirit! সেদিন—

—হ্যাঁ হ্যাঁ, জানি, ও-রকম সুন্দর চেহারা থাকলে আমাদেরও কত সার্টিফিকেট আসতো—বাবা, বঙ্কিমবাবু কি আর সাধে সুন্দর মুখের গুণ গেয়ে গেছেন ?

—কি বাজে বক্‌ছিস প্রতুল ? দিন দিন ভারী ইতর হয়ে উঠ্‌ছিস কিন্তু—

প্রিন্সিপ্যালের গাড়ি কলেজের সামনে আসিয়া লাগাতে যে যেদিকে সুবিধা পাইল সরিয়া পড়িল।

মিঃ বসুর ক্লাসে নামটা প্রেজেণ্ট করিয়াই আজ অপু পলাইবার পথ খুঁজিতে লাগিল। বাঁ দিকের দরজাটা একদম খোলা, প্রোফেসারের চোখ অন্যদিকে। সুযোগ খুঁজিতে খুঁজিতে প্রোফেসারের চোখ আবার তাহার দিকে পড়িল, কাজেই খানিকক্ষণ ভালমানুষের মত নিরীহ-মুখে বসিয়া থাকিতে বাধ্য হইল। এইবার একবার অন্য দিকেই চোখ পড়িলেই হয়! হঠাৎ প্রোফেসার তাহাকেই প্রশ্ন করিলেন,—Was Marius justified in his action ?

সর্বনাশ! মেরিয়াস কে! একদিনও সে যে রোমের ইতিহাসের লেক্‌চার শোনে নাই!

উত্তর না পাইয়া প্রোফেসার অন্য একটা প্রশ্ন করিলেন—What do you think of Sulla's—

অপু বিপন্নমুখে কড়িকাঠের দিকে চোখ তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রাস্কেল্ মণিলালটা মুখে কাপড় গুঁজিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতেছে!

প্রোফেসার বিরক্ত হইয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন।

—You, You there—you behind the pillar—

এবার মণিলালের পালা। সে থামের আড়ালে সরিয়া বসিবার বৃথা চেষ্টা হইতে বিরত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দেখা গেল সুল্লা বা মেরিয়াসের সম্বন্ধে অপুর সহিত তাহার মতের কোন পার্থক্য নাই, সমানই নির্বিকার। মণিলালের দুর্গতিতে অপু খুব খুশী হইয়া পাশের ছেলেকে আঙুলের খোঁচা দিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল—Rightly served! ভারী হাসি হচ্ছিল—

—চুপ চুপ—এখুনি আবার এদিকে চাইবে সি. সি. বি., কথা শুনলে—

—এবার আমি সোজা—

পিছন হইতে নৃপেন ব্যস্তস্বরে বলিল—এইবার আমায় জিজ্ঞেস্ করবে—ডেটটা ভাই দে না শীগ্‌গির ব'লে—শীগ্‌গির—

অপুর পাশের ছেলেটি বলিল—কে কাকে ডেট বলে দাদা—মেরিভেল পুলারের বইয়ের রং কেমন এখনও চাক্ষুষ দেখি নি—কেটে পড়ো না সোজা—

অপু খানিকক্ষণ হইতেই প্রোফেসারের দৃষ্টির গতি একমনে লক্ষ্য করিতেছিল, সে বুঝিতে পারিল ও-কোণ হইতে একবার এদিকে ফিরিলে পালানো অসম্ভব হইবে, কারণ এদিকে এখনও অনেক ছেলেকে প্রশ্ন করিতে বাকী। এই সুবর্ণসুযোগ। বিলম্ব করিলে···।

দু' একবার উসখুস করিয়া, একবার এদিক ওদিকে চাহিয়া অপু সাঁ করিয়া খোলা দরজা দিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

পিছু পিছু হরিদাস—অল্প পরেই নৃপেন।···

তিনজনেই উপরের বারান্দাতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করিয়া তর্ তর্ করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া একেবারে একতলায় নামিয়া আসিল!

অপু পিছন ফিরিয়া সঙ্গীদের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—হি-হি-হি—উঃ—আর একটু হলেই—

নৃপেন বলিল—আমাকে তো—মিনিট-দুই দেরি—কাল হয়েছে কি বুঝলে ?—

অপু বলিল—যাক, এখানে আর দাঁড়িয়ে খোশগল্প করার কোনও দরকার দেখছি নে। এখুনি প্রিন্সিপ্যাল নেমে আসবেন, গাড়ি লাগিয়েছে দরজায়—কমনরুমে বরং এস—

একটু পরে সকলে বাহির হইয়া পড়িল। আজ আর ক্লাস ছিল না। কে গ্রাহ্য করে বুড়ো সি. সি. বি. ও তাঁহার রোমের ইতিহাসের যত বাজে প্রশ্ন ?

অপু কিন্তু কিছু নিরাশ হইল। ক্লাস হইতে পালাইতে পারিলে প্রতুলের দল খাওয়াইবে বলিয়াছিল! কিন্তু লাইব্রেরীয়ানের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, তাহারা অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে।—কোন্ সকালে দুই পয়সার মুড়ি ও এক পয়সার ফুলুরি খাইয়া বাহির হইয়াছে—পেট যেন দাউ দাউ জ্বলিতেছিল, কিছু খাইতে পারিলে হইত! ক্লাসে এতক্ষণ বেশ ছিল, বুঝিতে পারে নাই, বাহিরে আসিয়া ক্ষুধার যন্ত্রণাই প্রবল হইয়া উঠিল। এদিকে পকেটে একটাও পয়সা নাই। সে ভাবিল—ওরা আচ্ছা তো ? বললে খাওয়াবো, তাই তো আমি পালাতে গেলাম, নিজেরা এদিক সরে পড়েছে কোন্ কালে!··· এখন কিছু খেলে তবুও রাত অবধি থাকা যেতো—আজ সোমবার, আটটার মধ্যেই আরতি হয়ে যাবে—উঃ ক্ষিদে যা পেয়েছে!—

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এ ধরণের কষ্ট করিতে অপু কখনও অভ্যস্ত নয়। বাড়ির এক ছেলে, চিরকাল বাপ-মায়ের আদরে কাটাইয়াছে। শহরে বড়লোকের বাড়িতে অন্য কষ্ট থাকিলেও খাওয়ার কষ্টটা অন্ততঃ ছিল না। তাছাড়া সেখানে মাথার উপর ছিল মা, সকল আপদবিপদে সর্বজয়া ডানা মেলিয়া ছেলেকে আড়াল করিয়া রাখিতে প্রাণপণ করিত, কোনও কিছু আঁচ লাগিতে দিত না। দেওয়ানপুরে স্কলারশিপের টাকায় বালক-বুদ্ধিতে যথেষ্ট শৌখিনতা করিয়াছে—খাইয়াছে, খাওয়াইয়াছে, ভাল ভাল জামা কাপড় পরিয়াছে,—তখন সে সব জিনিস সস্তাও ছিল।

কিন্তু শীঘ্রই অপু বুঝিল—কলিকাতা দেওয়ানপুর নয়। এখানে কেহ কাহাকেও পোঁছে না। ইউরোপে যুদ্ধ বাধিয়া গত কয়েক মাসের মধ্যে কাপড়ের দাম এত চ'ড়িয়াছে যে, কাপড় আর কেনা যায় না! ভাল কাপড় তাহার মোটে আছে একখানা, একটি টুইল শার্ট সম্বল। ছেলেবেলা হইতেই ময়লা কাপড় পরিতে সে ভালবাসে না, দু-তিনদিন অন্তর সাবান দিয়া কাপড় কাচিয়া শুকাইলে, তবে তাহাই পরিয়া বাহির হইতে পারে। সবদিন কাপড় ঠিক সময়ে শুকায় না, কাপড় কাচিবার পরিশ্রমে এক-একদিন আবার ক্ষুধা এত বেশী পায় যে, মাত্র দু'পয়সার খাবারে কিছুই হয় না—ক্লাসে লেকচার শুনিতে বসিয়া মাথা যেন হঠাৎ শোলার মত হালকা বোধ হয়।

এদিকে থাকার কষ্টও খুব। সুরেশ্বর এম-এ পরীক্ষা দিয়া বাড়ি চলিয়া গিয়াছে, তাহার মেসে আর থাকিবার সুবিধা নাই। যাইবার আগে সুরেশ্বর একটা ঔষধের কারখানার উপরে একটা ছোট ঘরে তাহার থাকিবার স্থান ঠিক করিয়া দিয়া গিয়াছে। ঐ কারখানায় সুরেশ্বরের জানাশোনা একজন লোক কাজ করে ও রাত্রে ওপরের ঘরটাতে থাকে। ঠিক হইয়াছে, যতদিন কিছু একটা সুবিধা না হইতেছে, ততদিন অপু ওই ঘরটাতে লোকটার সঙ্গে থাকিবে। ঘরটা একে ছোট, তাহার উপর অর্ধেকটা ভর্তি ঔষধ-বোঝাই প্যাকবাক্সে। রাশিকৃত জঞ্জাল বাক্সগুলির পিছনে জমানো, কেমন একটা গন্ধ! নেংটি ইঁদুরের উৎপাতে কাপড়চোপড় রাখিবার জো নাই, অপুর একমাত্র টুইল শার্টটার দু' জায়গায় কাটিয়া ফুটা করিয়া দিয়াছে! রাত্রে ঘরময় আরসোলার উৎপাত। ঘরের সে লোকটা যেমন নোংরা তেমনই তামাকপ্রিয়, রাত্রে উঠিয়া অন্ততঃ তিনবার তামাক সাজিয়া খায়। তাহার কাশির শব্দে ঘুম হওয়া দায়। ঘরের কোণে তামাকের গুল রাশিকৃত করিয়া রাখিয়া দেয়। অপু নিজে বার দুই পরিষ্কার করিয়াছিল। এক টুকরা রবারের ফিতার মতই ঘরের নোংরামিটা স্থিতিস্থাপক—পূর্বাবস্থায় ফিরিতে এতটুকু দেরি হয় না। খাওয়া-পরা-থাকিবার কষ্ট অপু কখনও করে নাই. বিশেষ করিয়া একলা যুঝিতে হইতেছে বলিয়া কষ্ট আরও বেশী।

অন্যমনস্কভাবে যাইতে যাইতে সে কৃষ্ণদাস পালের মূর্তির মোড়ে আসিল। যুদ্ধের নূতন খবর বাহির হইয়াছে বলিয়া কাগজওয়ালা হাঁকিতেছে। শেয়ালদার একটা ট্রাম হইতে লোকজন নামা-উঠা করিতেছে। একটি চোখে-চশমা তরুণ যুবকের দিকে একবার চাহিয়াই

মনে হইল—চেনা-চেনা মুখ! একটু পরে সেও অপুর দিকে চাহিতে দুইজনে চোখাচোখি হইল। এবার অপু চিনিয়াছে—সুরেশদা! নিশ্চিন্দিপুরের বাড়ির পাশের সেই পোড়ো ভিটার মালিক নীলমণি জ্যাঠামশায়ের ছেলে সুরেশ!

সুরেশও চিনিয়াছিল। অপু তাড়াতাড়ি কাছে গিয়া হাসিমুখে বলিল, সুরেশদা যে!

যেবার দুর্গা মারা যায়, সে বৎসর শীতকালে ইহারা যা কয়েক মাসের জন্য দেশে গিয়াছিল, তাহার পর আর কখনও দেখাসাক্ষাৎ হয় নাই। সুরেশ আকৃতিতে যুবক হইয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘ সবল দেহ, সুগঠিত হাত পা। বাল্যের সে চেহারার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে।

সুরেশ সহজ-সুরেই বলিল—আরে, অপূর্ব? এখানে কোথা থেকে?

সুরেশের খাঁটি শহুরে গলার সুরে ও উচ্চারণ-ভঙ্গিতে অপু একটু ভয় খাইয়া গেল।

সুরেশ বলিল—তারপর এখানে কি চাকরি-টাকরি করা হচ্ছে?

—না—আমি যে পড়ি ফার্স্ট ইয়ারে রিপনে—

—তাই নাকি? তা এখন যাওয়া হচ্ছে কোথায়?

অপু সে-কথার কোনও উত্তর না দিয়া আগ্রহের সুরে বলিল, জ্যেঠিমা কোথায়?

—এখানেই, শ্যামবাজারে! আমাদের বাড়ি কেনা হয়েছে সেখানে—

সুরেশের সহিত সাক্ষাতে অপু ভারী খুশী হইয়াছিল। তাহাদের বাড়ির পাশের যে পোড়ো ভিটার বনঝোপের সহিত তাহার ও দিদি দুর্গার আবাল্য অতিমধুর পরিচয়, সেই ভিটারই লোক ইহারা। যদিও কখনও সেখানে ইহারা বাস করে নাই, শহরে শহরেই ঘোরে, তবুও তো সে ভিটারই লোক, তাহা ছাড়া দশ রাত্রির জ্ঞাতি, অতি আপনার জন।

অপু বলিল—অতসীদি এখানে আছে? সুনীল? সুনীল কি পড়ে?

—এবার সেকেন ক্লাসে উঠেছে—আচ্ছা, যাই তাহ'লে, আমার ট্রাম আসছে—

সুরেশের সুরে কোনও আগ্রহ বা আন্তরিকতা ছিল না, সে এমন সহজ সুরে কথা বলিতেছিল, যেন অপুর সঙ্গে তাহার দুইবেলা দেখা হয়। অপু কিন্তু নিজের আগ্রহ লইয়া এত ব্যস্ত ছিল যে সুরেশের কথাবার্তার সে-দিকটা তাহার কাছে ধরা পড়িল না।

—আপনি কি করেন সুরেশদা?

—মেডিকেল কলেজে পড়ি, এবার থার্ড ইয়ার—

—আপনাদের ওখানে একদিন যাব সুরেশদা—জ্যেঠিমার সঙ্গে দেখা ক'রে আসবো—

সুরেশ ট্রামের পা-দানিতে পা দিয়া উঠিতে উঠিতে অনাসক্ত সুরে বলিল, বেশ বেশ, আমি আসি এখন—

এতদিন পরে সুরেশদার সহিত দেখা হওয়াতে অপুর মনে এমন বিস্ময় ও আনন্দ হইয়াছিল, যে ট্রামটা ছাড়িয়া দিলে তাহার মনে পড়িল—সুরেশদার বাড়ির ঠিকানাটা তো জিজ্ঞাসা করা হয় নাই!

সে চলন্ত ট্রামের পাশে ছুটিতে ছুটিতে জিজ্ঞাসা করিল—আপনাদের বাড়ির ঠিকানাটা—ও সুরেশদা, ঠিকানাটা যে—

সুরেশ মুখ বাড়াইয়া বলিল—চব্বিশ-এর দুই সি, বিশ্বকোষ লেন, শ্যামবাজার—

পরের রবিবার সকালে স্নান করিয়া অপু শ্যামবাজারে সুরেশদার ওখানে যাইবার জন্য বাহির হইল। আগের দিন টুইল শার্টটা ও কাপড়খানা সাবান দিয়া কাচিয়া শুকাইয়া লইয়াছিল, জুতার শোচনীয় দুরবস্থা ঢাকিবার জন্য একটি পরিচিত মেসে এক সহপাঠীর নিকট হইতে জুতার কালি চাহিয়া নিজে বুরুশ করিয়া লইল। সেখানে অতসীদি ইত্যাদি রহিয়াছেন, দীনহীন বেশে কি যাওয়া চলে?

ঠিকানা খুঁজিয়া বাহির করিতে দেরি হইল না। ছোট-খাটো দোতলা বাড়ি, আধুনিক ধরণে তৈয়ারী। ইলেকট্রিক লাইট আছে, বাহিরে বৈঠকখানা, পাশেই দোতলার উঠিবার সিঁড়ি। সুরেশ বাড়ি ছিল না, ঝিয়ের কাছে সে পরিচয় দিতে পারিল না, বৈঠকখানায় তাহাকে লইয়া বসাইয়া ঝি চলিয়া গেল। ঘড়ি, ক্যালেণ্ডার, একটা পুরনো রোল-টপ ডেস্ক, খানককত চেয়ার! ভারী সুন্দর বাড়ি তো! এত আপনার জনের কলিকাতায় এরকম বাড়ি আছে, ইহাতে অপু মনে মনে একটু গর্ব ও আনন্দ অনুভব করিল। টেবিলে একখানা সেদিনের অমৃতবাজার পড়িয়া ছিল, উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া যুদ্ধের খবর পড়িতে লাগিল।

অনেক বেলায় সুরেশ আসিল।

তাহাকে দেখিয়া বলিল, এই যে অপূর্ব, কখন এলে?

অপু হাসিমুখে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—আসুন সুরেশদা—আমি, আমি অনেকক্ষণ ধরে —বেশ বাড়িটা তো আপনাদের!—

—এটা আমার বড়মামা—যিনি পাটনার উকিল, তিনি কিনেছেন; তাঁরা তো কেউ থাকেন না, আমরাই থাকি? বসো, আমি আসি বাড়ির মধ্যে থেকে—

অপু মনে মনে ভাবিল—এবার সুরেশদা বাড়ির ভেতর গিয়ে বললেই জ্যেঠিমা ডেকে পাঠাবে, এখানে খেতে বলবে—

কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সুরেশ বাড়ির ভিতর হইতে বাহির হইল না! সে যখন পুনরায় আসিল, তখন বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া পড়িয়া নিশ্চিন্তস্বরে বলিল, তারপর?...বলিয়াই খবরের কাগজখানা হাতে তুলিয়া চোখ বুলাইতে লাগিল। অপু দেখিল সুরেশ পান চিবাইতেছে! খাওয়ার আগে এত বেলায় পান খাওয়া অভ্যাস, না-কি খাওয়া হইয়া গেল!

দুই চারিটা প্রশ্নের জবাব দিতে ও খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে একটা বাজিল। সুরেশের চোখ ঘুমে বুজিয়া আসিতেছিল। সে হঠাৎ কাগজখানা টেবিলে রাখিয়া দিয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িয়া বলিল, তুমি না হয় বসে কাগজ পড়ো, আমি একটুখানি শুয়ে নি। একটা ডাব খাবে?—

ডাব খাইবে কি রকম, এত বেলায়, এ অবস্থায়? অপু ভাল বুঝিতে না পারিয়া বলিল, ডাব? না থাক, এত বেলায়—ইয়ে—না।

সেই যে সুরেশ বাড়ি ঢুকিল—একটা—দুইটা—আড়াইটা, আর দেখা নাই। ইহারা

কত বেলায় খায়! রবিবার বলিয়া বুঝি এত দেরি? কিন্তু যখন তিনটা বাজিয়া গেল, তখন অপুর মনে হইল, কোথাও কিছু ভুল হইয়াছে নিশ্চয়। হয় সে-ই ভুল বুঝিয়াছে, না হয় উহারা ভুল করিয়াছে। তাহার এত ক্ষুধা পাইয়াছিল যে, সে আর বসিতে পারিতেছে না। উঠিবে কিনা ভাবিতেছে, এমন সময় সুরেশের ছোট ভাই সুনীল বাড়ির ভিতর হইতে বাহিরে আসিল। অপু ডাকিবার পূর্বেই সে সাইকেল লইয়া বাড়ির বাহিরে কোথায় চলিয়া গেল!

সেই সুনীল—যাহাকে সঙ্গে লইয়া নিমন্ত্রণে ছাঁদা বাঁধিবার দরুণ জ্যেঠিমা তাহাকে ফলারে-বামুনের ছেলে বলিয়াছিলেন! ইঁহাদের যে এতদিন পর আবার দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাহা যেন অপু ভাবে নাই। সুনীলকে দেখিয়া তাহার বিস্ময় ও আনন্দ দুই-ই হইল। এ যেন কেমন একটা ঠিক বুঝানো যায় না—

ইহাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিবার মূলে অপুর কোন স্বার্থসিদ্ধি বা সুযোগ-সন্ধানের উদ্দেশ্য ছিল না, বা ইহা যে নিতান্ত গায়ে পড়িয়া আলাপ জমাইবার মত দেখাইতেছে—একবারও সে কথা তাহার মনে উদয় হয় নাই! এখানে তাহার আসিবার মূলে সেই বিস্ময়ের ভাব—যাহা তাহার জন্মগত। কে আবার জানিত, খাস কলিকাতা শহরে এতদিন পরে নিশ্চিন্দিপুরের বাড়ির পাশের পোড়ো ভিটাটার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দেখা হইয়া যাইবে। এই ঘটনাটুকু তাহাকে মুগ্ধ করিবার পক্ষে যথেষ্ট। এ যেন জীবনের কোন্ অপরিচিত বাঁকে পত্রপুষ্পে সজ্জিত অজানা কোন্ কুঞ্জবন—বাঁকের মোড়ে ইহাদের অস্তিত্ব যেন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

বিস্ময় মনের অতি উচ্চভাব এবং উচ্চ বলিয়াই সহজলভ্য নয়। সত্যকার বিস্ময়ের স্থান অনেক উপরে—বুদ্ধি যার খুব প্রশস্ত ও উদার, মন সব সময় সতর্ক—নূতন ছবি, নূতন ভাব গ্রহণ করিবার ক্ষমতা রাখে—সে-ই প্রকৃত বিস্ময়-রসকে ভোগ করিতে পারে। যাদের মনের যন্ত্র অলস, মিনমিনে—পরিপূর্ণ, উদার বিস্ময়ের মত উচ্চ মনোভাব তাদের অপরিচিত থাকিয়া যায়।

বিস্ময়কে যাঁহারা বলিয়াছেন Mother of Philosophy তাঁহারা একটু কম বলেন। বিস্ময়ই আসল Philosophy, বাকীটা তাহার অর্থসঙ্গতি মাত্র।

তিনটার পর সুরেশ বাহির হইয়া আসিল। সে হাই তুলিয়া বলিল—কাল রাত্রে ছিল নাইট-ডিউটি, চোখ মোটে বোজে নি—তাই একটু গড়িয়ে নিলাম—চল, মাঠে ক্যালকাটা টিমের হকি খেলা আছে—একটু দেখে আসা যাক্—

অপু মনে মনে সুরেশদাকে ঘুমের জন্য অপরাধী ঠাওর করিবার জন্য লজ্জিত হইল। সারারাত কাল বেচারী ঘুমায় নাই—তাহার ঘুম আসা সম্পূর্ণ স্বাভাবিকই তো।···

সে বলিল—আমি আর মাঠে যাবো না সুরেশদা, কাল এগজামিন আছে, পড়া তৈরী হয় নি মোটে—আমি যাই—ইয়ে—জ্যেঠিমার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে গেলে হতো—

সুরেশ বলিল—হ্যাঁ হাঁ—বেশ তো—এসো না—

অপু সুরেশের সঙ্গে সঙ্কুচিত ভাবে বাড়ির মধ্যে ঢুকিল। সুরেশের মা ঘরের মধ্যে বসিয়াছিলেন—সুরেশ গিয়া বলিল—এ সেই অপূর্ব মা—নিশ্চিন্দিপুরের হরিকাকার ছেলে – তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে—

অপূর্ব পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল—সুরেশের কথার ভাবে তাহার মনে হইল, সে যে এতক্ষণ আসিয়া বাহিরের ঘরে বসিয়া আছে সে কথা সুরেশদা বাড়ির মধ্যে আদৌ বলে নাই।

জ্যেঠিমার মাথার চুল অনেক পাকিয়া গিয়াছে বলিয়া অপুর মনে হইল। অপুর প্রণামের উত্তরে তিনি বলিলেন, এস—এস—থাক্, থাক্—কলকাতায় কি করো?

অপু ইতিপূর্বে কখনো জ্যোঠিমার সম্মুখে কথা বলিতে পারিত না। গম্ভীর ও গর্বিত (যেটুকু সে ধরিতে পারিত না) চালচলনের জন্য জ্যেঠিমাকে সে ভয় করিত। আনাড়ী ও অগোছালো সুরে বলিল, এই এখানে পড়ি, কলেজে পড়ি।

জ্যেঠিমা যেন একটু বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, কলেজে পড়? ম্যাট্রিক পাশ দিয়েছ?

—আর বছর ম্যাট্রিক পাশ করেছি—

—তোমার বাবা কোথায়?—তোমরা তো সেই কাশী চলে গিয়েছিলে, না?

—বাবা তো নেই—তিনি তো কাশীতেই…

তারপর অপু সংক্ষেপে বলিল সব কথা। এই সময়ে পাশের ঘর হইতে একটি বাইশ তেইশ বছরের তরুণী এ ঘরে ঢুকিতেই অপু বলিয়া উঠিল, অতসীদি না?…

অতসী অনেক বড় হইয়াছে, তাহাকে চেনা যায় না। সে অপুকে চিনিতে পারিল, বলিল, অপূর্ব কখন এলে?

আর একটি মেয়ে ও-ঘর হইতে আসিয়া দোরের কাছে দাঁড়াইল। পনেরো ষোল বৎসর বয়স হইবে, বেশ সুশ্রী, বড় বড় চোখ। কথা বলিতে বলিতে সেদিকে চোখ পড়াতে অপু দেখিল, মেয়েটি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। খানিকটা পরে অতসী বলিল—মণি, দেখে এসো তো দিদি, কুশিকাঁটাগুলো ও-ঘরের বিছানায় ফেলে এসেছি কি না?

মেয়েটি চলিয়া গেল এবং একটু পরেই আবার দুয়ারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল—না বড়দি দেখলাম না তো?

জ্যেঠিমা অল্প দুই চারিটা কথার পরই কোথায় উঠিয়া গেলেন। অতসী অনেকক্ষণ কথাবার্তা কহিল। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করিল। তারপর সেও চলিয়া গেল। অপু ভাবিতেছিল, এবার সে উঠিবে কিনা। কেহই ঘরে নাই, এ সময় ওঠাটা কি উচিত হইবে?…ক্ষুধা একবার উঠিয়া পড়িয়া গিয়াছে এখন ক্ষুধা আর নাই, তবে গাঁ ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে। যাওয়ার কথা কাহাকেও ডাকিয়া বলিয়া যাইবে?…

দোরের কাছে গিয়া সে দেখিল সেই মেয়েটি বারান্দা দিয়া ও-ঘর হইতে বাহির হইয়া সিঁড়ির দিকে যাইতেছে—আর কেহ কোথাও নাই, তাহাকেই না বলিলে চলে না। উদ্দেশে ডাকিয়া বলিল—এই গিয়ে—আমি যাচ্ছি, আমার আবার কাজ—

মেয়েটি তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল—চলে যাবেন? দাঁড়ান, পিসিমাকে ডাকি—চা খেয়েছেন?

অপু বলিল—চা তা—থাক্, বরং অন্য একদিন—

মেয়েটি বলিল—বসুন, বসুন—দাঁড়ান চা আনি—পিসিমাকে ডাকি দাঁড়ান।

কিন্তু খানিকটা পরে মেয়েটিই এক পেয়ালা চা ও একটা প্লেটে কিছু হালুয়া আনিয়া তাহার সামনে বসিল। অপু ক্ষুধার মুখে হালুয়াটুকু গো-গ্রাসে গিলিল। গরম চা খাইতে গিয়া প্রথম চুমুকে মুখ পুড়াইয়া ফেলিয়া ঢালিয়া ঢালিয়া খাইতে লাগিল।

মেয়েটি বলিল—আপনি বুঝি ওদের খুড়তুতো ভাই? থাক্ প্লেটটা এখানেই—আর একটু হালুয়া আন্‌ব?

—হালুয়া?…নাঃ—ইয়ে তেমন ক্ষিদে নেই—হাাঁ, সুরেশদার বাবা আমার জ্যাঠামশাই হতেন, জ্ঞাতি সম্পর্ক—

এই সময় অতসী ঘরে ঢোকাতে মেয়েটি চায়ের বাটি ও প্লেট লইয়া চলিয়া গেল।

জ্যেঠিমা আর আসিলেন না। অপু অতসীর কাছে বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পরে ঠাকুরবাড়িতে খাইয়া অনেক রাত্রে সে নিজের থাকিবার স্থানে ফিরিয়া দেখিল আজও একজন লোক সেখানে রাত্রের জন্য আশ্রয় লইয়াছে। মাঝে মাঝে এরকম আসে, কারখানার লোকের দু-একজন আত্মীয়-স্বজন মাঝে মাঝে আসে ও দু-চার দিন থাকিয়া যায়। একে ছোট ঘর, থাকিবার কষ্ট, তাহাতে লোক বাড়িলে এইটুকু ঘরের মধ্যে তিষ্ঠানো দায় হইয়া উঠে। লোকটার পরণের কাপড় এমন ময়লা যে, ঘরের বাতাসে একটা অপ্রীতিকর গন্ধ। অপু সব সহ্য করিতে পারে, এক ঘরে এ-ধরণের নোংরা স্বভাবের লোকের ভিড়ের মধ্যে শুইতে পারে না, জীবনে কখনো সে তা করে নাই—ইহা তাহার অসহ্য! কোথায় রাত্রে আসিয়া নির্জনে একটু পড়াশুনা করিবে—না, ইহাদের বক্‌বকের চোটে সে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। নতুন লোকটি বড়বাজারের আলু-পোস্তায় আলুর চালান লইয়া আসে—হুগলী জেলার কোন জায়গা হইতে, অপু জানে, আরও একবার আসিয়াছিল। লোকটি বলিল—কোথায় যান ও মশায়? আবার বেরোন না-কি?

অপু বলিল, এইখানটাতে দাঁড়িয়ে—বেজায় গরম আজ…

একটু পরে লোকটা বলিয়া উঠিল—হাাঁ, হাাঁ, হাাঁ, বিছানাটা কি মহাশয়ের? আসুন, আসুন, সরিয়ে ন্যান্ একটু—এঃ—হুঁকোর জলটা গেল গড়িয়ে পড়ে—দুত্তোর—না—

অপু বিছানা সরাইয়া পুনরায় বাহিরে আসিল। সে কি বলিবে? এখানে তাহার কি জোর খাটে? উহারাই উপরোধে পড়িয়া দয়া করিয়া থাকিতে দিয়াছে এখানে। মুখে কিছু না বলিলেও অপু অন্যদিন হয়তো মনে মনে বিরক্ত হইত, কিন্তু আজ সে সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক ছিল। বাহিরের বারান্দায় জীর্ণ কাঠের রেলিং ধরিয়া অন্ধকারের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল—সুরেশদাদের কেমন চমৎকার বাড়ি কলিকাতায়। ইলেকৃট্রিক পাখা, আলো, ঘরগুলি কেমন সাজানো, মেয়েটির কেমন সুন্দর কাপড় পরণে। চারিটা না বাজিতে চা, জলখাবার, চারি-

দিকে যেন লক্ষ্মীশ্রী, কিছুরই অভাব নাই।

তাহাদেরই যে কি হইয়াছে, কোথায় মা আছে একটেরে পড়িয়া, কলিকাতা শহরে এই রকম ছন্নছাড়া অবস্থায় সে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, পেট পুরিয়া আহার জোটে না, পরণে নাই কাপড়!…

দিন তিনেক পরে জগদ্ধাত্রী পূজা। কলিকাতায় এত উৎসব জগদ্ধাত্রী পূজায়, তা সে জানিত না। দেশে কখনও এ পূজা কোথাও হইত না—অন্ত কোথাও দেখে নাই। গলিতে গলিতে, সর্বত্র উৎসবের নহবৎ বাজিতেছে, কত দুয়ারের পাশে কলাগাছ বসানো, দেবদারুর পাতার মালা টাঙানো।

কাঠের কারখানার পাশের গলিটার মধ্যে একজন বড়লোকের বাড়িতে পূজা। সন্ধ্যার সময় নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা সারি বাঁধিয়া বাড়িটার মধ্যে ঢুকিতেছে—অপু ভাবিল, সেও যদি যায়!…কতকাল নিমন্ত্রণ খায় নাই! কে তাহাকে চিনিবে?…খুব লোভও হইল, ভয়ও হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শীতকালের দিকে একদিন কলেজ ইউনিয়নে প্রণব একটা প্রবন্ধ পাঠ করিল। ইংরেজীতে লেখা, বিষয়—'আমাদের সামাজিক সমস্যা'; বাছিয়া বাছিয়া শক্ত ইংরেজীতে সে নানা সমস্যার উল্লেখ করিয়াছে; বিধবা-বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা, পণপ্রথা, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি। সে প্রত্যেক সমস্যাটি নিজের দিক হইতে দেখিতে চাহিয়াছে এবং প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সনাতন প্রথার স্বপক্ষেই মত দিয়াছে। প্রণবের উচ্চারণ ও বলিবার ভঙ্গি খুব ভাল, যুক্তির ওজন অনুসারে সে কখনও ডান হাতে ঘুষি পাকাইয়া, কখনও মুঠাদ্বারা বাতাস আঁকড়াইয়া, কখনও বা সম্মুখের টেবিলে সশব্দে চাপড় মারিয়া বাল্য বিবাহের প্রয়োজনীয়তা ও স্ত্রীশিক্ষার অসারত্ব প্রমাণ করিয়া দিল। প্রণবের বন্ধুদলের ঘন ঘন করতালিতে প্রতিপক্ষের কানে তালা লাগিবার উপক্রম হইল।

অপর পক্ষে উঠিল মন্মথ—সেই যে-ছেলেটি পূর্বে সেণ্ট জেভিয়ারে পড়িত। লাটিন জানে বলিয়া ক্লাসে সকলে তাহাকে ভয় করিয়া চলে, তাহার সামনে কেহ ভয়ে ইংরেজী বলে না, পাছে ইংরেজীর ভুল হইলে তাহার বিদ্রূপ শুনিতে হয়। সাহেবদের চাল-চলন, ডিনারের এটিকেট, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে ক্লাসের মধ্যে সে অথরিটি—তাহার উপর কারুর কথা খাটে না। ক্লাসের এক হতভাগ্য ছাত্র সাহেবপাড়ার কোন রেস্তোরাঁতে তাহার সহিত খাইতে গিয়া ডান হাতে কাঁটা ধরিবার অপরাধে এক সপ্তাহকাল ক্লাসে সকলের সামনে মন্মথর টিট্‌কারি সহ্য করে। মন্মথর ইংরেজী আরও চোখা, কম আড়ষ্ট, উচ্চারণও সাহেবী ধরণের! কিন্তু একেই তাহার উপর ক্লাসের অনেকের রাগ আছে, এদিকে আবার সে বিদেশী বুলি আওড়াইয়া

সনাতন হিন্দুধর্মের চিরাচরিত প্রথার নিন্দাবাদ করিতেছে ; ইহাতে একদল ছেলে খুব চটিয়া উঠিল—চারিদিক হইতে 'Shame, shame',—Withdraw, withdraw', রব উঠিল—তাহার নিজের বন্ধুদল প্রশংসাসূচক হাততালি দিতে লাগিল—ফলে এত গোলমালের সৃষ্টি হইয়া পড়িল যে, মন্মথ বক্তৃতার শেষের দিকে কি বলিল সভার কেহই তাহার একবর্ণও বুঝিতে পারিল না।

প্রণবের দলই ভারী। তাহারা প্রণবকে আকাশে তুলিল, মন্মথকে স্বধর্মবিরোধী নাস্তিক বলিয়া গালি দিল, সে যে হিন্দুশাস্ত্র একছত্রও না পড়িয়া কোন্ স্পর্ধায় বর্ণাশ্রমধর্মের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সভায় কথা বলিতে সাহস করিল, তাহাতে কেহ কেহ আশ্চর্য হইয়া গেল। লাটিন-ভাষার সহিত তাহার পরিচয়ের সত্যতা লইয়াও দু'একজন তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিল। (লাটিন জানে বলিয়া অনেকের রাগ ছিল তাহার উপর)।—একজন দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল,—প্রতিপক্ষের বক্তার সংস্কৃতে যেমন অধিকার, যদি তাঁহার লাটিন ভাষার অধিকারও সেই ধরণের—

আক্রমণ ক্রমেই ব্যক্তিগত হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া সভাপতি—অর্থনীতির অধ্যাপক মিঃ দে বলিয়া উঠিলেন– 'Come, come, Manmatha has never said that he is a Seneca or a Lucretius—have the goodness to come to the point.'

অপু এই প্রথম এ-রকম ধরণের সভায় যোগ দিল—স্কুলে এসব ছিল না, যদিও হেডমাস্টার প্রতিবারই হইবার আশ্বাস দিতেন। এখানে এদিনকার ব্যাপারটা তাহার কাছে নিতান্ত হাস্যাস্পদ ঠেকিল! ওসব মামুলি কথা মামুলিভাবে বলিয়া লাভ কি? সামনের অধিবেশনে সে নিজে একটা প্রবন্ধ পড়িবে। সে দেখাইয়া দিবে—ওসব একঘেয়ে মামুলি বুলি না আওড়াইয়া কি ভাবে প্রবন্ধ লেখা যায়। একেবারে নূতন এমন বিষয় লইয়া সে লিখিবে, যাহা লইয়া কখনও কেহ আলোচনা করে নাই।

এক সপ্তাহ খাটিয়া প্রবন্ধ লিখিয়া ফেলিল। নাম—'নূতনের আহ্বান'। সকল বিষয়ে পুরাতনকে ছাঁটিয়া একেবারে বাদ। কি আচার-ব্যবহার, কি সাহিত্য, কি দেখিবার ভঙ্গি—সব বিষয়েই নূতনকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। অপু মনে মনে অনুভব করে, তাহার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যাহা খুব বড়, খুব সুন্দর। তাহার উনিশ বৎসরের জীবনের প্রতিদিনের সুখদুঃখ, পথের যে-ছেলেটি অসহায় ভাবে কাঁদিয়া উঠিয়াছে, কবে এক অপরাহ্নের ম্লান আলোয় যে পাখিটা তাহাদের দেশের বনের ধারে বসিয়া দোল খাইত, দিদির চোখের মমতা-ভরা দৃষ্টি, লীলার বন্ধুত্ব, রাণুদি, নির্মলা, দেবব্রত, রৌদ্রদীপ্ত নীলাকাশ, জ্যোৎস্না রাত্রি—নানা কল্পনার টুকরা, কত কি আশা-নিরাশার লুকোচুরি—সবসুদ্ধ লইয়া এই যে উনিশটি বৎসর—ইহা তাহার বৃথা যায় নাই—কোটি কোটি যোজন দূর শূন্যপার হইতে সূর্যের আলো যেমন নিঃশব্দ জ্যোতির অবদানে শীর্ণ শিশু-চারাকে পত্রপুষ্পফলে সমৃদ্ধ করিয়া তোলে, এই উনিশ বৎসরের জীবনের মধ্য দিয়া শাশ্বত অনন্ত তেমনি ওর প্রবর্ধমান তরুণ প্রাণে তাহার বাণী পৌঁছাইয়া দিয়াছে—ছায়ান্ধকার তৃণভূমির গন্ধে, ডালে ডালে সোনার সিঁদুর-মাখানো

অপরূপ সন্ধ্যায়; উদার কল্পনায় ভরপুর নিঃশব্দে জীবনমায়ায়।—সে একটা অপূর্ব শক্তি অনুভব করে নিজের মধ্যে—এটা যেন বাহিরে প্রকাশ করিবার জিনিস—মনে মনে ধরিয়া রাখার নয়। কোথায় থাকিবে প্রণব আর মন্মথ?...সবাই মামুলি কথা বলে। সকল বিষয়ে এই মামুলি ধরণ যেন তাহাদের দেশের একচেটে হইয়া উঠিতেছে—যে মন গরুড়ের মত ডিম ফুটিয়া বাহির হইয়া সারা পৃথিবীটার রস-ভাণ্ডার গ্রাস করিতে ছুটিতেছে, সে তীব্র আগ্রহ-ভরা পিপাসার্ত নবীন মনের সকল কল্পনা তাহাতে তৃপ্ত হয় না। ইহারই বিরুদ্ধে, ইহাদের সকলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে, সব ওলট পালট করিয়া দিবার নিমিত্ত সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে তাহাদিগকে এবং সে-ই হইবে তাহার অগ্রণী।

দিন কতক ধরিয়া অপু ক্লাসে ছেলেদের মধ্যে তাহার স্বভাবসিদ্ধ ধরণে গর্ব করিয়া বেড়াইল যে, এমন প্রবন্ধ পড়িবে যাহা কেহ কোনদিন লিখিবার কল্পনা করে নাই, কেহ কখনও শোনে নাই ইত্যাদি। লজিকের ছোকরা-প্রোফেসার ইউনিয়নের সেক্রেটারী, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি ব'লে নোটিশ দেবো তোমার প্রবন্ধের হে, বিষয়টা কি?

পরে নাম শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন,—বেশ, বেশ! নামটা বেশ দিয়েছ—but why not পুরাতনের বাণী—? অপু হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিল। নির্দিষ্ট দিনে যদিও ভাইস-প্রিন্সিপ্যালের সভাপতি হইবার কথা নোটিশে ছিল, তিনি কার্যবশতঃ আসিতে পারিলেন না। ইতিহাসের অধ্যাপক মিঃ বসুকে সভাপতির আসনে বসিতে সকলে অনুরোধ করিল। ভিড় খুব হইয়াছে, প্রকাশ্য সভায় অনেক লোকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কিছু করা অপুর এই প্রথম। প্রথমটা তাহার পা কাঁপিল, গলাও খুব কাঁপিল, কিন্তু ক্রমে বেশ সহজ হইয়া আসিল। প্রবন্ধ খুব সতেজ—এ-বয়সে যাহা কিছু দোষ থাকে—উচ্ছ্বাস, অনভিজ্ঞ আইডিয়ালিজ্‌ম্, ভালমন্দ নির্বিশেষে পুরাতনকে ছাঁটিয়া ফেলিবার দম্ভ—বেপরোয়া সমালোচনা, তাহার প্রবন্ধে কোনটাই বাদ যায় নাই। প্রবন্ধ পড়িবার পরে খুব হৈ-চৈ হইল। খুব তীব্র সমালোচনা হইল। প্রতিপক্ষ কড়া কড়া কথা শুনাইয়া দিতে ছাড়িল না। কিন্তু অপু দেখিল অধিকাংশ সমালোচকই ফাঁকা আওয়াজ করিতেছে। সে যাহা লইয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছে, সে বিষয়ে কাহারও কিছু অভিজ্ঞতাও নাই, বলিবার বিষয়ও নাই, তাহারা তাহাকে মন্মথর শ্রেণীতে ফেলিয়া দেশদ্রোহী, সমাজদ্রোহী বলিয়া গালাগালি দিতে শুরু করিয়াছে।

অপু মনে মনে একটু বিস্মিত হইল। হয়ত সে আরও পরিস্ফুট করিয়া লিখিলে ভাল করিত। জিনিসটা কি পরিষ্কার হয় নাই? এত বড় সভার মধ্যে তাহার নিতান্ত অন্তরঙ্গ দু'একজন বন্ধু ছাড়া সকলেই তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে,—টিটকারি গালাগালির অংশের জন্ত মন্মথকে হিংসা করার তাহার কিছুই নাই। শেষে সভাপতি তাহাকে প্রতিবাদের উত্তর দিবার অধিকার দেওয়াতে সে উঠিয়া ব্যাপারটা আরও খুলিয়া বলিবার চেষ্টা করিল। দু'চারজন সমালোচক—যাহাদের প্রতিবাদ সে বসিয়া নোট করিয়া লইয়াছিল, তাহাদিগকে উত্তর দিতে গিয়া যুক্তির খেই হারাইয়া ফেলিল। অপর পক্ষ এই অবসরে আর এক পালা হাসিয়া লইতে ছাড়িল না। অপু রাগিয়া গিয়াছিল, এইবার যুক্তির পথ না ধরিয়া উচ্ছ্বাসের

পথ ধরিল। সকলকে সংকীর্ণমনা বলিয়া গালি দিল, একটা বিদ্রূপাত্মক গল্প বলিয়া অবশেষে টেবিলের উপর একটা কিল মারিয়া এমার্সনের একটা কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে বক্তৃতার উপসংহার করিল।

ছেলেদের দল খুব গোলমাল করিতে করিতে হলের বাহির হইয়া গেল। বেশীর ভাগ ছেলে তাহাকে যা-তা বলিতেছিল—নিছক বিদ্যা জাহির করিবার চেষ্টা ছাড়া তাহার প্রবন্ধ যে অন্য কিছুই নহে, ইহাও অনেকের মুখে শোনা যাইতেছিল। সে শেষের দিকে এমার্সনের এই কবিতাটি আবৃত্তি করিয়াছিল—

I am the owner of the sphere
Of the seven stars and the solar year.'

তাহাতেই অনেকে তাহাকে দাম্ভিক ঠাওরাইয়া নানারূপ বিদ্রূপ ও টিটকারি দিতেও ছাড়িল না। কিন্তু অপু ও-কবিতাটায় নিজেকে আদৌ উদ্দেশ করে নাই, যদিও তাহার নিজেকে জাহির করার স্পৃহাও কিছু কম ছিল না বা মিথ্যা গর্ব প্রকাশে সে ক্লাসের কাহারও অপেক্ষা কম নহে, বরং বেশী।

তাহার নিজের দলের কেহ কেহ তাহাকে ঘিরিয়া কথা বলিতে বলিতে চলিল। ভিড় একটু কমিয়া গেলে সে সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া কলেজ হইতে বাহির হইতে যাইতেছিল, গেটের কাছে একটি সতেরো আঠারো বছরের লাজুক প্রকৃতির ছেলে তাহাকে বলিল—একটুখানি দাঁড়াবেন ?

অপু ছেলেটিকে চেনে না, কখনও দেখে নাই। একহারা, বেশ সুশ্রী, পাতলা সিল্কের জামা গায়ে, পায়ে জরির নাগরা জুতা।

ছেলেটি কুণ্ঠিতভাবে বলিল,—আপনার প্রবন্ধটা আমায় একটু পড়তে দেবেন ? কাল আবার আপনাকে ফেরত দেব।

অপুর আহত আত্মাভিমান পুনরায় হঠাৎ ফিরিয়া আসিল। খাতাখানা ছেলেটির হাতে দিয়া বলিল,—দেখবেন কাইণ্ডলি, যেন হারিয়ে না যায়—আপনি বুঝি—সায়েন্স ?—ও !

পরদিন কলেজ বসিবার সময় ছেলেটি গেটেই দাঁড়াইয়াছিল—অপুর হাতে খাতাখানা ফিরাইয়া দিয়া ছোট একটি নমস্কার করিয়াই ভিড়ের মধ্যে কোথায় চলিয়া গেল। অন্যমনস্ক-ভাবে ক্লাসে বসিয়া অপু খাতাখানা উল্টাইতেছিল, একখানা কি কাগজ খাতাখানার ভিতর হইতে বাহির হইয়া ইলেকট্রিক পাখার হাওয়ায় খানিকটা উড়িয়া গেল। পাশের ছেলেটি সেখানা কুড়াইয়া তাহার হাতে দিলে সে পড়িয়া দেখিল, পেন্সিলে লেখা একটি কবিতা—তাহাকে উদ্দেশ করিয়া :—

শ্রীযুক্ত অপূর্বকুমার রায়

করকমলেষু—

বাঙ্গালী সমাজ যেন পঙ্কময় বদ্ধ জলাশয়
নাহি আলো স্বাস্থ্যভরা, বহে হেথা বায়ু বিষময়
জীবন-কোরকগুলি, অকালে শুকায়ে পড়ে ঝরি,
বাঁচাবার নাহি কেহ, সকলেই আছে যেন মরি।
নাহি চিন্তা, নাহি বুদ্ধি, নাহি ইচ্ছা নাহি উচ্চ আশা,
সুখদুঃখ হীন এক জড়পিণ্ড, নাহি মুখে ভাষা।
এর মাঝে দেখি যবে কোনো মুখ উজ্জ্বল সরস,
নয়নে আশার দৃষ্টি, ওষ্ঠপ্রান্তে জীবন হরষ—
অধরে ললাটে ভ্রূতে প্রতিভার সুন্দর বিকাশ,
স্থির দৃঢ় কণ্ঠস্বরে ইচ্ছাশক্তি প্রত্যক্ষ প্রকাশ,
সম্ভ্রমে হৃদয় পুরে, আনন্দ ও আশা জাগে প্রাণে,
সম্ভাসিতে চাহে হিয়া বিমল প্রীতির অর্ঘ্যদানে।
তাই এই ক্ষীণ-ভাষা ছন্দে গাঁথি দীন উপহার
লজ্জাহীন অসঙ্কোচে আনিয়াছি সম্মুখে তোমার,
উচ্চ লক্ষ্য, উচ্চ আশা বাঙ্গালায় এনে দাও বীর
সুযোগ্য সন্তান যে রে তোরা সবে বঙ্গ জননীর।

গুণমুগ্ধ
শ্রী—
ফার্স্ট ইয়ার, সায়েন্স, সেক্‌সন বি।

অপু বিস্মিত হইল। আগ্রহের ও ঔৎসুক্যের সহিত আর একবার পড়িল—তাহাকে উদ্দেশ করিয়া লেখা এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। একে চায় তো আরে পায়,—একেই নিজের কথা পরকে জাঁক করিয়া বেড়াইতে সে অদ্বিতীয়, তাহার উপর তাহারই উদ্দেশে লিখিত এক অপরিচিত ছাত্রের এই পত্র পাইয়া আনন্দে ও বিস্ময়ে সে ভুলিয়া গেল যে, ক্লাসে স্বয়ং মিঃ বসু ইতিহাসের বক্তৃতায় কোন এক রোমান সম্রাটের অমানুষিক ঔদরিকতার কাহিনী সবিস্তারে বলিতেছেন। সে পাশের ছেলেকে ডাকিয়া পত্রখানা দেখাইতে যাইতেই জানকী খোঁচা দিয়া বলিল,—এই! সি. সি. বি. এখুনি বকে উঠবে—তোর দিকে তাকাচ্ছে, সামনে চা—এই!···

আঃ—কতক্ষণে সি. সি. বি.-র এই বাজে বকুনি শেষ হইবে!···বাহিরে গিয়া সকলকে চিঠিখানা দেখাইতে পারিলে যে সে বাঁচে!—ছেলেটিকেও খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

ছুটির পর গেটের কাছেই ছেলেটির সঙ্গে দেখা হইল। বোধ হয় সে তাহারই অপেক্ষায়

দাঁড়াইয়াছিল। কলেজের মধ্যে এইরূপ একজন মুগ্ধ ভক্ত পাইয়া অপু মনে মনে গর্ব অনুভব করিয়াছিল বটে, কিন্তু সে-ই তাহার পুরাতন মুখচোরা রোগ! তবে তাহার পক্ষে একটু সাহসের বিষয় এই দাঁড়াইল যে, ছেলেটি তাহার অপেক্ষাও লাজুক। অপু গিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া তাহার হাত ধরিল। কিছুক্ষণ কথাবার্তা হইল। কেহই কাগজে লেখা পত্রটার কোনও উল্লেখ করিল না, যদিও দুজনেই বুঝিল যে, তাহাদের আলাপের মূলে কালকের সেই চিঠিখানা। কিছুক্ষণ পর ছেলেটি বলিল,—চলুন কোথাও বেড়াতে যাই, কলকাতার বাইরে কোথাও মাঠে—শহরের মধ্যে হাঁপ ধরে—কোথাও একটা ঘাস-দেখবার জো নেই—

কথাটা শুনিয়াই অপুর মনে হইল, এ ছেলেটি তো সম্পূর্ণ অন্য প্রকৃতির। ঘাস না দেখিয়া কষ্ট হয় এমন কথা তো আজ প্রায় এক বৎসর কলিকাতার অভিজ্ঞতায় কলেজের কোন বন্ধুর মুখে শোনে নাই।

সাউথ সেক্‌শনের ট্রেনে গোটাচারেক স্টেশন পরে তাহারা নামিল। অপু কখনও এদিকে আসে নাই। ফাঁকা মাঠ, কেয়া ঝোপ, মাঝে মাঝে হোগলা বন। সরু মেঠো পথ ধরিয়া দুজনে হাঁটিয়া চলিতেছিল—ট্রেনের অল্প আধঘণ্টার আলাপেই দু'জনের মধ্যে একটা নিবিড় পরিচয় জমিয়া উঠিল। মাঠের মধ্যে একটা গাছের তলায় ঘাসের উপরে দুজনে গিয়া বসিল।

ছেলেটি নিজের ইতিহাস বলিতেছিল—

হাজারিবাগ জেলায় তাহাদের এক অভ্রের খনি ছিল, ছেলেবেলায় সে সেখানেই মানুষ। জায়গাটার নাম বড়বনী, চারিধারে পাহাড় আর শাল-পলাশের বন, কিছু দূরে দারুকেশ্বর নদী! নিকটে পাহাড়ের গায়ে একটা ঝর্ণা।...পড়ন্ত বেলায় শালবনের পিছনের আকাশটা কত কি রঙে রঞ্জিত হইত—প্রথম বৈশাখে শাল-কুসুমের ঘন সুগন্ধ দুপুরে রৌদ্রকে মাতাইত, পলাশবনে বসন্তের দিনে যেন ডালে ডালে আরতির পঞ্চপ্রদীপ জ্বলিত—সন্ধ্যার পরই অন্ধকারে গা ঢাকিয়া বাঘেরা আসিত ঝর্ণার জল পান করিতে—বাংলো হইতে একটু দূরে বালির উপর কতদিন সকালে বড় বড় বাঘের পায়ের থাবার দাগ দেখা গিয়াছে।

সেখানকার জ্যোৎস্না রাত্রি! সে রাত্রির বর্ণনা নাই, ভাষা যোগায় না। স্বর্গ যেন দূরের নৈশ-কুয়াসাচ্ছন্ন অস্পষ্ট পাহাড়শ্রেণীর ওপারে—ছায়াহীন, সীমাহীন, অনন্তরস-ক্ষরা জ্যোৎস্না যেন দিক্‌চক্রবালে তাহারই ইঙ্গিত দিত।

এক-আধদিন নয়, শৈশবের দশ দশটি বৎসর সেখানে কাটিয়াছে। সে অন্য জগৎ, পৃথিবীর মুক্ত প্রসারতার রূপ সেখানে চোখে কি মায়া-অঞ্জন মাখাইয়া দিয়াছে,—কোথাও আর ভাল লাগে না! অভ্রের খনিতে লোকসান হইতে লাগিল, খনি অপরে কিনিয়া লইল, তাহার পর হইতেই কলিকাতায়। মন হাঁপাইয়া ওঠে—খাঁচার পাখির মত ছটফট করে। বাল্যের সে অপূর্ব আনন্দ মন হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গিয়াছে।

অপু এ ধরণের কথা কাহারও মুখে এ পর্যন্ত শোনে নাই—এ যে তাহারই অন্তরের কথার

প্রতিধ্বনি। গাছপালা, নদী, মাঠ ভালবাসে বলিয়া দেওয়ানপুরে তাহাকে সবাই বলিত পাগল। একবার মাঘমাসের শেষে পথে কোন গাছের গায়ে আলোকলতা দেখিয়া রমাপতিকে বলিয়াছিল,—কেমন সুন্দর! দেখুন দেখুন রমাপতিদা—

রমাপতি মুরুব্বিয়ানার সুরে বলিয়াছিল মনে আছে—ওসব যার মাথায় ঢুকেছে তার পরকালটি একেবারে ঝরঝরে হয়ে গেছে।

পরকালটা কি জন্য যে ঝরঝরে হইয়া গিয়াছে, একথা সে বুঝিতে পারে নাই—কিন্তু ভাবিয়াছিল রমাপতিদা স্কুলের মধ্যে ভাল ছেলে, ফার্স্ট ক্লাসের ছাত্র, অবশ্যই তাহার অপেক্ষা ভাল জানে। এ পর্যন্ত কাহারও নিকট হইতেই সে ইহার সায় পায় নাই, এই এতদিন পরে ইহাকে ছাড়া। তাহা হইলে তাহার মত লোকও আছে!…সে একেবারে সৃষ্টিছাড়া নয়!…

অনিল বলিল—দেখুন, এই এত ছেলে কলেজে পড়ে, অনেকের সঙ্গে আলাপ ক'রে দেখেছি—ভাল লাগে না—dull, unimaginative mind; পড়তে হয় পড়ে যাচ্ছে, বিশেষ কোন বিষয়ে কৌতূহলও নেই, জানবার একটা সত্যিকার আগ্রহও নেই। তাছাড়া, এত ছোট কথা নিয়ে থাকে যে, মন মোটে—মানে, কেমন যেন,—যেন মাটির উপর hop ক'রে ক'রে বেড়ায়! প্রথম সেদিন আপনার কথা শুনে মনে হ'ল, এই একজন অন্য ধরণের, এ দলের নয়।

অপু মৃদু হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল। এসব সে-ও নিজের মনের মধ্যে অস্পষ্ট ভাবে অনুভব করিয়াছে, অপরের সঙ্গে নিজের এ পার্থক্য মাঝে মাঝে তাহার কাছে ধরা পড়িলেও সে নিজের সম্বন্ধে আদৌ সচেতন নয় বলিয়া এ জিনিসটা বুঝিতে পারিত না। তাহা ছাড়া অপুর প্রকৃতি আরও শান্ত, উগ্রতাশূন্য ও উদার,—পরের তীব্র সমালোচনা ও আক্রমণের ধাতই নাই তাহার একেবারে!—কিন্তু তাহার একটা মহৎ দোষ এই যে, নিজের বিষয়ে কথা একবার পাড়িলে সে আর ছাড়িতে চায় না—অপরেও যে নিজেদের সম্বন্ধে বলিতে ইচ্ছা করিতে পারে, তরুণ বয়সের অনাবিল আত্মম্ভরিতা ও আত্মপ্রত্যয় সে বিষয়ে তাহাকে অন্ধ করিয়া রাখে। সুতরাং সে নিজের বিষয়ে একটানা কথা বলিয়া যায়—নিজের ইচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, নিজের ভালমন্দ লাগা, নিজের পড়াশুনা। নিজের কোন দুঃখদুর্দশার কথা বলে না, কোন ব্যথা-বেদনার কথা তোলে না—জলের উপরকার দাগের মত সে-সব কথা তাহার মনে মোটে স্থান পায় না—আনকোরা তাজা নবীন চোখের দৃষ্টি শুধুই সম্মুখের দিকে, সম্মুখের বহুদূর দিক্‌চক্রবাল রেখারও ওপারে—আনন্দ ও আশায় ভরা এক অপূর্ব রাজ্যের দিকে।

সন্ধ্যার পরে বাসায় ফিরিয়া চিম্‌নি-ভাঙা পুরনো হিঙ্কসের লণ্ঠনটা জ্বালিয়া সে পকেট হইতে অনিলের চিঠিখানা বাহির করিয়া আবার পড়িতে বসিল। আমায় যে ভাল বলে, সে আমার পরম বন্ধু, আমার মহৎ উপকার করে, আমার আত্মপ্রত্যয়কে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে সাহায্য করে, আমার মনের গভীর গোপন কোনও লুকানো রত্নকে দিনের আলোয় মুখ দেখাইতে সাহস দেয়!

পড়িতে পড়িতে পাশের বিছানার দিকে চাহিয়া মনে পড়ে—আজ আবার তাহার ঘরের

অপর লোকটির এক আত্মীয় কাঁচরাপাড়া হইতে আসিয়াছে এবং এই ঘরেই শুইবে। সে আত্মীয়টির বয়স বছর ত্রিশেক হইবে ; কাঁচরাপাড়া লোকো অফিসে চাকরি করে, বেশী লেখাপড়া না জানিলেও অনবরত যা-তা ইংরেজী বলে, হরদম সিগারেট খায়, অত্যন্ত বকে, অকারণে গায়ে পড়িয়া ভাই ভাই বলিয়া কথা বলে, তাহার মধ্যে বারো আনা থিয়েটারের গল্প, অমুক য়্যাক্‌ট্রেস তারাবাঈ-এর ভূমিকায় যে-রকম অভিনয় করে, অমুক থিয়েটারের বিধুমুখীর মত গান—বিশেষ ক'রে 'হীরার দুল' প্রহসনে বেদেনীর ভূমিকায়, 'নয়ন জলের ফাঁদ পেতেছি' নামক সেই বিখ্যাত গানখানি সে যেমন গায়, তেমন আর কোথায়, কে গাহিতে পারে ?—তিনি এজন্য বাজি ফেলিতে প্রস্তুত আছেন।

এসব কথা অপুর ভাল লাগে না, থিয়েটারের কথা শুনিতে তাহার কোনও কৌতূহল হয় না। এ লোকটির চেয়ে আলুর ব্যবসাদারটি অনেক ভাল। সে পাড়াগাঁয়ের লোক, অপেক্ষাকৃত সরল প্রকৃতির, আর এত বাজে কথা বলে না ; অন্তত তাহার সঙ্গে তো নয়ই। এ ব্যক্তিটির যত গল্প তাহার সঙ্গে।

মনে মনে ভাবে—একটু ইচ্ছে করে—বেশ একা একটি ঘর হয়, একা বসে পড়াশুনো করি, টেবিল থাকে একটা, বেশ ফুল কিনে এনে গ্লাসের জলে দিয়ে সাজিয়ে রাখি। এ ঘরটায় না আছে জানলা, পড়তে পড়তে একটু খোলা আকাশ দেখবার জো নাই, তামাকের গুল রোজ পরিষ্কার করি, আর রোজ ওরা এই রকম নোংরা করবে—মা ওয়াড় ক'রে দিয়েছিল, ছিঁড়ে গিয়েছে, কি বিশ্রী তেল-চিটচিটে বালিশটা হয়েছে—! এবার হাতে পয়সা হ'লে একটা ওয়াড় করবো।

অনিলের সঙ্গে পরদিন বৈকালে গঙ্গার ধারে বেড়াইতে গেল। চাঁদপাল ঘাটে, প্রিন্সেপ্‌স্ ঘাটে বড় বড় জাহাজ নোঙর করিয়া আছে, অপু পড়িয়া দেখিল : কোনটার নাম 'বম্বে', কোনটার নাম 'ইদজ্জু মারু'। সেদিন বৈকালে নতুন ধরণের রং-করা একখানা বড় জাহাজ দেখিয়াছিল, নাম লেখা আছে 'শেনানডোয়া', অনিল বলিল, আমেরিকান মাল জাহাজ,—জাপানের পথে আমেরিকায় যায়। অপু অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া জাহাজখানা দেখিল। নীল পোশাক-পরা একটা লস্কর রেলিং ধরিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া জলের মধ্যে কি দেখিতেছে। লোকটি কি সুখী! কত দেশবিদেশে বেড়ায়, কত সমুদ্রে পাড়ি দেয়, চীন সমুদ্রে টাইফুনে পড়িয়াছে, পিনাং-এর নারিকেলকুঞ্জের ছায়ায় কত দুপুর কাটাইয়াছে, কত ঝড়বৃষ্টির রাত্রে এই রকম রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া বাত্যাক্ষুব্ধ, উত্তাল, উন্মত্ত মহাসমুদ্রের রূপ দেখিয়াছে। কিন্তু ও লোকটা বোঝে কি ? কিছুই না। ও কি দূর হইতে ফুজিয়ামা দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছে ? দক্ষিণ আমেরিকার কোনও বন্দরে নামিয়া পথের ধারে কি গাছপালা আছে তাহা নিবিষ্ট মনে সাগ্রহে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে ? হয়ত জাপানের পথের ধারে বাংলা দেশের পরিচিত কোনও ফুল আছে, ও লোকটি জানে না, হয়ত কালিফোর্ণিয়ার শহরবন্দর হইতে দূরে নির্জন Sierra-র ঢালুতে বনঝোপের নানা অচেনা ফুলের সঙ্গে তাহাদের দেশের সন্ধ্যামণি ফুলও ফুটিয়া থাকে, ও লোকটা কি কখনও সেখানে সূর্যাস্তের রাঙা আলোয় বড়

একখণ্ড পাথরের উপর আপন মনে বসিয়া নীল আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিয়াছে ?

অথচ ও লোকটারই অদৃষ্টে ঘটিতেছে দেশ-বিদেশে ভ্রমণ, সমুদ্রে-সমুদ্রে বেড়ানো—যাহার চোখ নাই, দেখিতে জানে না ; আর সে যে শৈশব হইতে শত সাধ পুষিয়া রাখিয়া আসিতেছে মনের কোণে, তাহার কি কিছুই হইবে না ?…কবে যে সে যাইবে ! ..কলিকাতার শীতের রাত্রের এ ধোঁয়া তাহার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। চোখ জ্বালা করে, নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে, কিছু দেখা যায় না, মন তাহার একেবারে পাগল হইয়া উঠে—এ এক অপ্রত্যাশিত উপদ্রব ! কে জানিত শীতকালে কলিকাতার এ চেহারা হয় !

ওই লোকটার মত জাহাজের খালাসী হইতে পারিলেও সুখ ছিল !

Ship ahoy !…কোথাকার জাহাজ ?…

কলিকাতা হইতে পোর্ট মর্সবি, অস্ট্রেলেশিয়া ,

ওটা কি উঁচু-মত দূরে ?

প্রবালের বড় বাঁধ—The Great Barrier Reef—

এই সমুদ্রের ঠিক এই স্থানে, প্রাচীন নাবিক টাস্‌ম্যান ঘোর তুফানে পড়িয়া মাস্তুল ভাঙা পালছেঁড়া ডুবু ডুবু অবস্থায় অকূলে ভাসিতে ভাসিতে বারো দিনের দিন কূল দেখিতে পান—সেইটাই—সেকালে ভ্যান ডিমেন্‌স্‌-ল্যাণ্ড, বর্তমানে টাস্‌মেনিয়া।.. কেমন দূরে নীল চক্রবালরেখা !…উড়ন্ত সিন্ধুশকুনদলের মাতামাতি, প্রবালের বাঁধের উপর বড় বড় ঢেউয়ের সবেগে আছড়াইয়া পড়ার গম্ভীর আওয়াজ।

উপকূলরেখার অনেক পিছনে যে পাহাড়টা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, ওটা হয়ত জলহীন দিক-দিশাহীন ধূ ধূ নির্জন মরুর মধ্যে…শুধুই বালি আর শুকনা বাবুল গাছের বন,…শত শত ক্রোশ দূরে ওর অজানা অধিত্যকায় লুকানো আছে সোনার খনি, কালো ওপ্যালের খনি…এই খর, জ্বলন্ত, মরুরৌদ্রে খনির সন্ধানে বাহির হইয়া কত লোক ওদিকে গিয়াছিল আর ফেরে নাই, মরুদেশের নানা স্থানে তাহাদের হাড়গুলা রৌদ্রে বৃষ্টিতে ক্রমে সাদা হইয়া আসিল।

অনিল বলিল, চলুন, আজ সন্ধ্যে হয়ে গেল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জাহাজ দেখে আর কি হবে ?…

অপু সমুদ্র-সংক্রান্ত বহু বই কলেজ-লাইব্রেরী হইতে লইয়া পড়িয়া ফেলিয়াছে ! কেমন একটা নেশা, কখনও কোন ছাত্র যাহা পড়ে না, এমন সব বই। বহু প্রাচীন নাবিক ও তাহাদের জলযাত্রার বৃত্তান্ত, নানা দেশ আবিষ্কারের কথা, সিবাস্টিয়ান ক্যাবট, এরিক্‌সন, কর্টেজ ও পিজারো কর্তৃক মেক্সিকো ও পেরু বিজয়ের কথা। দুর্ধর্ষ স্পেনীয় বীর পিজারো ব্রেজিলের জঙ্গলে রূপার পাহাড়ের অনুসন্ধানে গিয়া কি করিয়া জঙ্গলের মধ্যে পথ হারাইয়া বেঘোরে অনাহারে সসৈন্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল—আরও কত কি।

পরদিন কলেজ পালাইয়া দু'জনে দুপুরবেলা স্ট্র্যাণ্ড রোডের সমস্ত স্টীমার কোম্পানীর অফিসগুলি ঘুরিয়া বেড়াইল। প্রথমে 'পি-এণ্ড-ও'। টিফিনের সময় কেরানীবাবুরা নীচের

জলখাবার ঘরে বসিয়া চা খাইতেছেন, কেহ বিড়ি টানিতেছেন। অপু পিছনে রহিল, অনিল আগাইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—আজ্ঞে, আমরা জাহাজে চাকরি খুঁজ্‌ছি, এখানে খালি আছে জানেন ?

একজন টাক-পড়া রোগা চেহারার বাবু বলিলেন,—চাকরি ?—জাহাজে···কোন্ জাহাজে ?

—যে কোন জাহাজে —

অপুর বুক উত্তেজনায় ও কৌতুহলে ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছিল, কি বুঝি হয়।

বাবুটি বলিলেন, জাহাজের চাকরিতে তোমাদের চলবে না হে ছোকরা,—দ্যাখো, একবার ওপরে মেরিন্ মাস্টারের ঘরে খোঁজ করো।

কিছুই হইল না। 'বি-আই-এস্-এন্' তথৈবচ। 'নিপন্-ইউশেন-কাইশা'ও তাই। টার্ণার মরিসনের অফিসে তাহাদের সহিত কেহ কথাও কহিল না। বড় বড় বাড়ি, সিঁড়ি ভাঙিয়া ওঠা-নামা করিতে করিতে শীতকালেও ঘাম দেখা দিল। অবশেষে মরীয়া হইয়া অপু গ্লাডস্টোন ওয়াইলির অফিসে চারতলায় উঠিয়া মেরিন্ মাস্টারের কামরায় ঢুকিয়া পড়িল। খুব দীর্ঘদেহ, অত বড় গোঁফ সে কখনও কাহারও দেখে নাই। সাহেব বিরক্ত হইয়া ঘণ্টা বাজাইয়া কাহাকে ডাক দিল। অপুর কথা কানেও তুলিল না। একজন প্রৌঢ় বয়সের বাঙালীবাবু ঘরে ঢুকিয়া ইহাদের দেখিয়া বিস্ময়ের সুরে বলিলেন—এ ঘরে কি ? এসো, এসো, বাইরে এসো।

বাহিরে গিয়া অনিলের মুখে আসিবার উদ্দেশ্য শুনিয়া বলিলেন, কেন হে ছোকরা ? বাড়ি থেকে রাগ ক'রে পালাচ্ছ ?

অনিল বলিল,—না, রাগ ক'রে কেন পালাব ?

—রাগ ক'রে পালাচ্ছ না তো এ মতি হ'ল কেন ? জাহাজে চাকরি খুঁজছো—, কোন্ চাকরি হবে জানো ? খালাসীর চাকরি···এক বছরের এগ্রিমেণ্টে জাহাজে উঠতে হবে। বাঙালীর খাওয়া জাহাজে পাবে না···কষ্টের একশেষ হবে, গোরা লস্করগুলো অত্যন্ত বদমায়েস, তোমাদের সঙ্গে বনবে না। আরও নানা কষ্ট—স্টোকারের কাজ পাবে, কয়লা দিতে দিতে জান হয়রান হবে—সে সব কি তোমাদের কাজ ?

—এখন কোনও জাহাজ ছাড়ছে নাকি ?

—জাহাজ তো ছাড়ছে 'গোলকুণ্ডা'—আর সাতদিন পরে মঙ্গলবারে ছাড়বে মাল জাহাজ—কলম্বো হয়ে ডারবান যাবে—

দু'জনেই মহা পীড়াপীড়ি শুরু করিল। তাহাদের কোনও কষ্ট হইবে না, কষ্ট করা তাহাদের অভ্যাস আছে। দয়া করিয়া তিনি যদি কোন ব্যবস্থা করেন। অপু প্রায় কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল—তা হোক, দিন আপনি জোগাড় ক'রে—ওসব কিছু কষ্ট না—দিন আপনি—গোরা লস্করে কি করবে আমাদের ? কয়লা খুব দিতে পারবো—

কেরানীবাবুটি হাসিয়া বলিলেন,—এ কি ছেলেখেলা হে ছোক্‌রা ! কয়লা দেবে তোমরা !

বুঝতে তো পারছো না সেখানকার কাণ্ডকারখানা! বয়লারের গরম, হাওয়া নেই, দম বন্ধ হয়ে আসবে—চার শভেল্ কয়লা দিতে না দিতে হাতের শিরা দড়ির মত ফুলে উঠবে—আর তাতে ওই ডেলিকেট্ হাত—হাঁপ জিরুতে দেবে না, দাঁড়াতে দেখলে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব মারবে চাবুক—দশ হাজার ঘোড়ার জোরের এঞ্জিনের স্টিম বজায় রাখতে হবে সব সময়, নিঃশ্বাস ফেলবার সময় পাবে না—আর গরম কি সোজা! কুম্ভীপাক নরকের গরম ফার্ণেসের মুখে! সে তোমাদের কাজ?...

তবুও দু'জনে ছাড়ে না।

ইহারা যে বাড়ি হইতে পালাইয়া যাইতেছে, সে ধারণা বাবুটির আরও দৃঢ় হইল। বলিলেন,—নাম ঠিকানা দিয়ে যাও তো তোমাদের বাড়ির। দেখি তোমাদের বাড়িতে না হয় নিজে একবার যাব।

কোনো রকমেই তাঁহাকে রাজী করাইতে না পারিয়া অবশেষে তাহারা চলিয়া আসিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

একদিন অপু দুপুরবেলা কলেজ হইতে বাসায় ফিরিয়া আসিয়া গায়ের জামা খুলিতেছে, এমন সময় পাশের বাড়ির জানালাটার দিকে হঠাৎ চোখ পড়িতে সে আর চোখ ফিরাইয়া লইতে পারিল না। জানালাটির গায়ে খড়ি দিয়া মাঝারি অক্ষরে মেয়েলি ছাঁদে লেখা আছে—'হেমলতা আপনাকে বিবাহ করিবে।' অপু অবাক হইয়া খানিকটা সেদিক চাহিয়া রহিল এবং পরক্ষণেই কৌতুকের আবেগে হাতের নোটখাতাখানা মেঝেতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া আপন মনে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

পাশেই বাড়ি—তাহার ঘরটা হইতে জানালাটা হাত পাঁচ ছয় দূরে—মধ্যে একটা সরু গলি! অনেকদিন সে দেখিয়াছে, পাশের বাড়ির একটি মেয়ে জানালার গরাদে ধরিয়া এদিকে চাহিয়া আছে, বয়স চৌদ্দ-পনেরো। রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, বেশ মুখখানা, যদিও তাহাকে সুন্দরী বলিয়া কোনদিনও অপুর মনে হয় নাই। তাহার কলেজ হইতে আসিবার সময় হইলে প্রায়ই সে মেয়েটিকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিত। ক্রমে শুধু দাঁড়ানো নয়, মেয়েটি তাহাকে দেখিলেই হঠাৎ হাসিয়া জানালার আড়ালে মুখ লুকায়, কখনও বা জানালাটার খড়খড়ি বারকতক খুলিয়া বন্ধ করিয়া মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করে, দিনের মধ্যে দু'বার তিনবার, চারবার কাপড় বদলাইয়া ঘরটার মধ্যে অকারণে ঘোরাফেরা করে এবং ছুতানাতায় জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। কতদিন এ-রকম হয়, অপু মনে মনে ভাবে—মেয়েটা আচ্ছা বেহায়া তো! কিন্তু আজকের এ ব্যাপার একেবারে অপ্রত্যাশিত।

আজ ও-বেলা উড়ে ঠাকুরের হোটেলে খাইতে গিয়া সে দেখিয়াছিল, সুন্দর ঠাকুর মুখ ভার

করিয়া বসিয়া আছে। দুই-তিনমাসের টাকা বাকী, সামান্য পুঁজির হোটেল, অপূর্ববাবু ইহার কি ব্যবস্থা করিতেছেন? আর কতদিন এ ভাবে সে বাকী টানিয়া যাইবে?...সুন্দর ঠাকুরের কথায় তাহার মনে যে দুর্ভাবনার মেঘ জমিয়াছিল, সেটা কৌতুকের হাওয়ায় এক মুহূর্তে কাটিয়া গেল!—আচ্ছা তো মেয়েটা? ন্যাখো কি লিখে রেখেছে—ওদের—হো-হো—আচ্ছা—হি-হি—

সেদিন আর মেয়েটিকে দেখা গেল না, যদিও সন্ধ্যার সময় একবার ঘরে ফিরিয়া সে দেখিল, জানালার সে খড়ির লেখা মুছিয়া ফেলা হইয়াছে। পরদিন সকালে ঘরের মধ্যে মাদুর বিছাইয়া পড়িতে পড়িতে মুখ তুলিতেই অপু দেখিতে পাইল, মেয়েটি জানালার ধারে দাঁড়াইয়া আছে! কলেজে যাইবার কিছু আগে মেয়েটি আর একবার আসিয়া দাঁড়াইল। সবে স্নান সারিয়া আসিয়াছে, লালপাড় শাড়ি পরণে, ভিজে চুল পিঠের উপর ফেলা, সোনার বালা পরা নিটোল ডান হাতটি দিয়া জানালার গরাদে ধরিয়া আছে। অল্পক্ষণের জন্য—

কথাটা ভাবিতে ভাবিতে সে কলেজে গেল। সেখানে অনেকের কাছে ব্যাপারটা গল্প করিল। প্রণব তো শুনিয়া হাসিয়া খুন, জানকীও তাই। সবাই আসিয়া দেখিতে চায়—এ যে একেবারে সত্যিকার জানালা-কাব্য! সত্যেন বলিল, নভেল ও মাসিকের পাতায় পড়া যায় বটে, কিন্তু বাস্তব জগতে এ-রকম যে ঘটে তাহা তো জানা ছিল না!...নানা হাসি তামাশা চলিল, সকলেই যে ভদ্রতাসঙ্গত কথা বলিয়াই ক্ষান্ত রহিল তাহা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে।

তারপর দিনচারেক বেশ কাটিল, হঠাৎ একদিন আবার জানালায় লেখা—'হেমলতা আপনাকে বিবাহ করিবে'। জানালার খড়খড়ির গায়ে এমনভাবে লেখা যে, জানালা খুলিয়া লম্বা কজাটা মুড়িয়া ফেলিলে লেখাটা শুধু তাহার ঘর হইতেই দেখা যায়, অন্য কারুর চোখে পড়িবার কথা নহে। প্রণবটা যদি এ সময় এখানে থাকিত! তারপর আবার দিন-দুই সব ঠাণ্ডা।

সেদিন একটু মেঘলা ছিল—সকালে কয়েক পশ্‌লা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। দুপুরের পরই আবার খুব মেঘ করিয়া আসিল। কারখানার উঠানে মালবোঝাই মোটর লরীগুলার শব্দ একটু থামিলেও দুপুরের 'শিফ্‌ট'-এ মিস্ত্রীদের প্যাক্‌বাক্সের গায়ে লোহার বেড় পরাইবার দুম্‌দাম আওয়াজ বেজায়। এই বিকট আওয়াজের জন্য দুপুরবেলা এখানে তিষ্ঠানো দায়।

অপু ঘুমাইবার বৃথা চেষ্টা করিয়া উঠিয়া বসিতেই দেখিল, মেয়েটি জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অল্পক্ষণের জন্য দু'জনের চোখোচোখি হইল! মেয়েটি অন্য অন্য দিনের মত আজও হাসিয়া ফেলিল। অপুর মাথায় দুষ্টুমি চাপিয়া গেল। সেও আগাইয়া গিয়া জানালার গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইল—তারপর সে নিজেও হাসিল। মেয়েটি একবার পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল কেহ আসিতেছে কিনা—পরে সেও আসিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইল! অপু কৌতুকের সুরে বলিল,—কিগো হেমলতা, আমায় বিয়ে করবে?"

মেয়েটি বলিল—করবো। কথা শেষ করিয়া সে হাসিয়া ফেলিল।

অপু বলিল,—কি জাত তোমরা—বামুন ?—আমি কিন্তু বামুন।

মেয়েটি খোঁপায় হাত দিয়া একটা কাঁটা ভাল করিয়া গুঁজিয়া দিতে দিতে বলিল—আমরাও বামুন।—পরে হাসিয়া বলিল—আমার নাম তো জেনেছেন, আপনার নাম কি ?

অপু বলিল, ভাল নাম অপূর্ব, আমরা বাঙ্গাল দেশের লোক—শহরের মেয়ে তোমরা—আমাদের তো ছ'চোখে দেখতেই পারো না—তাই না ? তোমায় একটা কথা বলি শোন। ...ওরকম লিখো না জানালার গায়ে—যদি কেউ টের পায় ?

মেয়েটি আর একবার পিছন ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, কে টের পাবে ? কেউ দেখতে পায় না ওদিক থেকে—আমি যাই, কাকীমা আসবে ঠাকুরঘর থেকে। আপনি বিকেলে রোজ থাকেন ?

মেয়েটি চলিয়া গেলে অপুর হাসি পাইল। পাগল না তো ? ঠিক—এতদিন সে বুঝিতে পারে নাই··· মেয়েটি পাগল ! মেয়েটির চোখে তাই কেমন একটা অদ্ভুত ধরণের দৃষ্টি। কথাটা মনে হইবার সঙ্গে সঙ্গে একটা গভীর করুণা ও অনুকম্পায় তাহার সারা মন ভরিয়া গেল। মেয়ের বাপকে সে মাঝে মাঝে প্রায়ই দেখে—প্রৌঢ়, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, কোন অফিসের কেরানী বোধ হয়। সে কলেজে যাইবার সময় রোজ ভদ্রলোক ট্রামের অপেক্ষায় ফুটপাথের ধারে দাঁড়াইয়া থাকেন। হয়ত মেয়েটির বাবাই, নয়ত কাকা বা জ্যাঠামশায়, কি মামা—মোটের উপর তিনিই একমাত্র অভিভাবক। খুব বেশী অবস্থাপন্ন বলিয়া মনে হয় না। হয়ত তাহাকে দেখিয়া মেয়েটা ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে—এ-রকম তো হয় !

তাহার ইচ্ছা হইল, এবার মেয়েটিকে দেখিতে পাইলে তাহাকে দু'টা মিষ্ট কথা, দু'টা সান্ত্বনার কথা বলিবে। কেহ কিছু মনে করিবে ? যদি নিতাইবাবু টের পায় ?—পায় পাইবে।

খবরের কাগজে সে মাঝে মাঝে ছেলে-পড়ানোর বিজ্ঞাপন খুঁজিত, একদিন দেখিল কোন একজন ডাক্তারের বাড়ির জন্য একজন প্রাইভেট টিউটর দরকার। গেল সে সেখানে। দোতলা বড় বাড়ি, নিচে বৈঠকখানা কিন্তু সেখানে বড় কেহ বসে না, ডাক্তারবাবুর কন্‌সাল্‌টিং রুম দোতলার কোণের কামরায়, সেখানেই রোগীর ভিড়। অপু গিয়া দেখিল, নিচের ঘরটাতে অন্যূন জন-পনেরো নানা বয়সের লোক তীর্থের কাকের মত হাঁ করিয়া বসিয়া—সেও গিয়া একপাশে বসিয়া গেল। তাহার মনে মনে বিশ্বাস ছিল, ঐ বিজ্ঞাপনটা শুধু তাহারই চোখে পড়িয়াছে—এত সকালে, অত ছোট ছোট অক্ষরে এককোণে লেখা বিজ্ঞাপনটা—সে ভাবিয়াছিল—উঃ...এ যে ভিড় দেখা যায় ক্রমেই বাড়িয়া চলিল !

কাহাকে পড়াইতে হইবে ; কোন্ ক্লাসের ছেলে, কত বড়, কেহই জানে না। পাশের একটি লোক জিজ্ঞাসা করিল—মশাই জানেন কিছু, কোন্ ক্লাসের—

অপু বলিল, সেও কিছুই জানে না। একটি আঠারো উনিশ বছরের ছোক্‌রার সঙ্গে অপুর আলাপ হইল। ম্যাট্রিকুলেশন ফেল করিয়া হোমওপ্যাথিক পড়ে, টিউশনির নিতান্ত দরকার,

না হইলেই চলিবে না, সে না-কি কালও একবার আসিয়াছিল, নিজের দুরবস্থার কথা সব কর্তাকে জানাইয়া গিয়াছে, তাহার হইলেও হইতে পারে ঘণ্টাখানেক ধরিয়া অপু দেখিতেছিল, কাঠের সিঁড়িটা বাহিয়া এক-একজন লোক উপরের ঘরে উঠিতেছে এবং নামিবার সময় মুখ অন্ধকার করিয়া পাশের দরজা দিয়া বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। যদি তাহারও না হয়। পড়া বন্ধ করিয়া মনসাপোতা—কিন্তু সেখানেই বা চলিবে কিসে?

চাকর আসিয়া জানাইল, আজ বেলা হইয়া গিয়াছে, ডাক্তারবাবু কাহারও সঙ্গে এখন আর দেখা করিবেন না। এক-একখানা কাগজে সকলে নিজের নিজের নামধাম ও যোগ্যতা লিখিয়া রাখিয়া যাইতে পারেন, প্রয়োজন বুঝিলে জানানো যাইবে।

ছেঁদো কথা। সকলেই একবার ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িল প্রত্যেকেরই মনে মনে বিশ্বাস—একবার গৃহস্বামী তাহাকে চাক্ষুষ দেখিয়া তাহার গুণ শুনিলে আর চাকুরি না দিয়া থাকিতে পারিবেন না! অপুও ভাবিল সে উপরে যাইতে পারিলে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিত।—তবে সে নিজের দুরবস্থার কথা কাহারও কাছে বলিতে পারিবে না! তাহার লজ্জা করে, দৈন্যের কাঁদুনি গাহিয়া পরের সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা—অসম্ভব। লোকে কি করিয়া যে করে! প্রথম প্রথম সে কলিকাতায় আসিয়া ভাবিয়াছিল, কত বড়লোকের বাড়ি আছে কলিকাতায়, চাহিলে একজন দরিদ্র ছাত্রের উপায় করিয়া দিতে কেহ কুণ্ঠিত হইবে না। কত পয়সা তো তাহাদের কত দিকে যায়? কিন্তু তখন সে নিজেকে ভুল বুঝিয়াছিল, চাহিবার প্রবৃত্তি, পরের চোখে নিজেকে হীন প্রতিপন্ন করিবার প্রবৃত্তি, এ-সব তাহার মধ্যে নাই। তাহার আছে—সে যাহা নয় তাহা হইতেও নিজেকে বড বলিয়া জাহির করিবার, বাহাদুরী করিবার, মিথ্যা গর্ব করিয়া বেড়াইবার একটা কু-অভ্যাস। তাহার মায়ের নির্বুদ্ধিতা এইদিক দিয়া ছেলেতে বর্তাইয়াছে, একেবারে হুবহু—অবিকল। এই কলিকাতা শহরে মহা কষ্ট পাইলেও সে নিতান্ত অন্তরঙ্গ এক-আধজন ছাড়া কখনও কাহাকে—তাও নিজের মুখে কখনও কিছু বলে না। পাছে ভাবে গরীব!

ইতস্ততঃ করিয়া সেও অপরের দেখাদেখি কাঠের সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে গেল। নিচের উঠান হইতে চাকর হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল—আরে কাহে আপ্‌লোক উপরমে যাতে হেঁ বাত্‌ নেহি মান্‌তে হেঁ, এ বড়া মুশ্‌কিল—। অপু সে কথা গ্রাহ্য না করিয়া উপরে উঠিয়া গেল। প্রৌঢ় বয়সের একটি ভদ্রলোক ঘরের মধ্যে বসিয়া, হোমিওপ্যাথি-পড়া ছোকরাটির সঙ্গে কি তর্ক চলিতেছে বাহির হইতে বুঝা গেল—ছোকরাটি কি বলিতেছে, ভদ্রলোকটি কি বুঝাইতেছেন! সে ছোকরা একেবারে নাছোড়বান্দা, টিউশনি তাহার চাই-ই! ভদ্রলোকটি বলিতেছেন, 'ম্যাট্রিকুলেশন-ফেল টিউটার দিয়া তিনি কি করিবেন? ক্রমে সকলে একে একে বাহিরে আসিয়া চলিয়া গেল। অপু ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া সসঙ্কোচে বলিল,—আপনাদের কি একজন পডাবার লোক দরকার—আজ সকালের কাগজে বেরিয়েছে—

যেন সে এত লোকের ভিড়, উপরে উঠার নিষেধাজ্ঞা, কাগজে নামধাম লিখিয়া রাখিবার উপদেশ কিছুই জানে না! আসলে সে ইচ্ছা করিয়া এরূপ ভালমানুষ সাজে নাই—অপরিচিত

স্থানে আসিয়া অপরিচিত লোকের সহিত কথা কহিতে গিয়া আনাড়ীপনার দরুন কথার মধ্যে নিজের অজ্ঞাতসারে একটা স্তাকা সুর আসিয়া গেল।

ভদ্রলোক একবার আপাদমস্তক তাহাকে দেখিয়া লইলেন, তারপর একটা চেয়ার দেখাইয়া বলিলেন, বসুন। আপনি কি পাশ?—ও, আই-এ পড়ছেন,—দেশ কোথায়?…ও!… এখানে থাকেন কোথায়?—হুঁ!

তিনি আরও যেন খানিকক্ষণ তাহাকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন। মিনিট পনেরো পরে —অপু বসিয়াই আছে—ডাক্তারবাবু হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন,—দেখুন, পড়ানো মানে—আমার একটি মেয়ে—তাকেই পড়াতে হবে। যাকে তাকে তো নিতে পারি নে—কিন্তু আপনাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে—ওরে শোন্ তোর দিদিমণিকে ডেকে নিয়ে আয় তো—বল্‌গে আমি ডাকছি—

একটু পরে মেয়েটি আসিল। বছর পনেরো বয়স, তন্বী, সুন্দরী, বড় বড় চোখ, আঙুলের গড়ন ভারি সুন্দর, রেশমী জামা গায়ে, চওড়া পাড় শাড়ি, গলায় সোনার সরু চেন, হাঁতে প্লেন বালা। মাথায় চুল এত ঘন যে, দু'ধারের কান যেন ঢাকিয়া গিয়াছে—জাপানী মেয়েদের মত ফাঁপানো খোঁপা!

—এইটি আমার মেয়ে, নাম প্রীতিবালা। বেথুন স্কুলে পড়ে, এইবার সেকেণ্ড ক্লাসে উঠেছে। ইনি তোমার মাস্টার খুকি—আজ বাদ দিয়ে কাল থেকে উনি আসবেন—হ্যাঁ, এঁর মুখ দেখেই আমার মনে হয়েছে ইনিই ঠিক হবেন। বয়স আপনার আর কত হবে—এই উনিশ-কুড়ি, মুখ দেখেই তো মনে হয় ছেলেমানুষ, তাছাড়া একটা distinction-এর ছাপ রয়েছে। খুকি বসো মা—

টিউশনি জোটার আনন্দে যত হোক-না-হোক, ভদ্রলোক যে বলিয়াছেন তাহার মুখে একটা distinction-এর ছাপ আছে—এই আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া সে সারাটা দিন কাটাইল, ও ক্লাসে, পথে, বাসায়, হোটেলে—সর্বত্র বন্ধুবান্ধবদের কাছে কথাটা লইয়া নির্বোধের মত খুব জাঁক করিয়া বেড়াইল। মাহিনা যত নির্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী বলিল, মেয়েটির সৌন্দর্য-ব্যাখ্যা অনেক বাড়াইয়া করিল, ইত্যাদি।

কিন্তু পরদিন পড়াইতে গিয়া দেখিল—মেয়েটি দেওয়ানপুরের নির্মলা নয়। সেরকম সরলা, স্নেহময়ী, হাস্যমুখী নয়—অল্প কথা কয়, খাটাইয়া লইতে জানে, একটু যেন গর্বিত! কথাবার্তা বলে হুকুমের ভাবে। অমুক অঙ্কটা কাল বুঝিয়ে দেবেন, অমুকটা কাল ক'রে আনবেন, আজ আরও একঘণ্টা বেশী পড়াবেন, পরীক্ষা আছে—ইত্যাদি! একদিন কোন কারণে আসিতে না পারিলে পরদিন কৈফিয়ৎ তলব করিবার সুরে অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করে। অপু মনে মনে বড় ভয় খাইয়া গেল, যে রকম মেয়ে, কোন্ দিন পড়ানোর কোন্ ত্রুটির কথা বাবাকে লাগাইবে, চাকুরির দফা গয়া—পথে বসা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকিবে না। ছাত্রীর উপর অসন্তুষ্টি ও বিরক্তিতে তাহার মন ভরিয়া উঠিল!

মাসখানেক কাটিয়া গেল। প্রথম মাসের মাহিনা পাইয়াই মাকে কিছু টাকা পাঠাইয়া

দিল। বৌবাজার ডাকঘর হইতে টাকাটা পাঠাইয়া সে চলিয়া যাইতেছিল, সঙ্গের বন্ধুটি বলিল, এসো তো ভাই একটু চোরাবাজারে, একটা ভাল অপেরাগ্লাস কাল দর ক'রে রেখে এসেছি—নিয়ে আসি।

চোরাবাজারের নামও কখনও অপু শোনে নাই। ঢুকিয়া দেখিয়াই সে অবাক্ হইয়া গেল। নানা ধরণের জিনিসপত্র, খেলনা, আসবাবপত্র, ছবি, ঘড়ি, জুতা, কলের গান, বই, বিছানা, সাবান, কৌচ, কেদারা—সবই পুরানো মাল। অপুর মনে হইল—বেশ সস্তা দরে বিকাইতেছে। একটা ফুলের টব, দর বলিল ছ'আনা। একটা ভাল দোয়াতদান দশ আনা। এগারো টাকায় কলের গান মায় রেকর্ড! এত দিন কলিকাতায় আছে, এত সস্তায় এখানে জিনিসপত্র বেচা-কেনা হয়, তা তো সে জানে না। এত শৌখিন জিনিসের এত কম দাম।

তাহার মাথায় এক খেয়াল আসিয়া গেল। পরদিন সে বাকী টাকা হাতে বৈকালে আসিয়া চোরাবাজারে ঢুকিল। মনে মনে ভাবিল—এইবার একটু ভাল ভাবে থাকবো, ওরকম গোয়ালঘরে আর থাকতে পারি নে—যেমন নোংরা তেমনি অন্ধকার। প্রথমেই সে কালকার ফুলদানিজোড়া কিনিল। দোয়াতদানের উপর অনেকদিন হইতে ঝোঁক, সেটিও কিনিল। একটা জাপানী পর্দা, খানচারেক ছবি, খানকতক প্লেট, একটা আয়না, ঝুটা পাথর-বসানো ছোট একটা আংটি। ছেলেমানুষের মত আনন্দে শুধু জিনিসগুলিকে দখলে আনিবার ঝোঁকে যাহাই চোখে ভাল লাগিল, তাহাই কিনিল। দাঁও বুঝিয়া দু'একজন দোকানদার বেশ ঠকাইয়াও লইল। ডবল-উইকের একটা পিতলের টেবিলল্যাম্প পছন্দ হওয়াতে দোকানীকে জিজ্ঞাসা করিল,—এটার দাম কত? দোকানী বলিল,—সাড়ে তিন টাকা। অপুর বিশ্বাস এ-রকম আলোর দাম পনেরো-ষোল টাকা। এরূপ মনে হওয়ার একমাত্র কারণ এই যে, অনেকদিন আগে লীলাদের বাড়ি থাকিবার সময় সে এই ধরণের আলো লীলার পড়িবার ঘরে টেবিলে জ্বলিতে দেখিয়াছিল। সে বেশী দর কষিতে ভরসা করিল না, চার আনা মাত্র কমাইয়া তিন টাকা চার আনা মূল্যে সেই মান্ধাতার আমলের টেবিল ল্যাম্পটা মহা খুশীর সহিত কিনিয়া ফেলিল! মুটের মাথায় জিনিসপত্র চাপাইয়া সে সোৎসাহে ও সাগ্রহে সব বাসায় আনিয়া হাজির করিল ও সারাদিন খাটিয়া ঘরদোর ঝাড়িয়া, ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া ছবিগুলি দেওয়ালে টাঙাইল, সস্তা জাপানী পর্দাটা দরজায় ঝুলাইল, আয়নাটাকে গজাল আঁটিয়া বসাইল, ফুলদানির জন্য ফুল কিনিয়া আনিতে ভুলিয়া গিয়াছিল, সেগুলিকে ধুইয়া মুছিয়া আপাততঃ জানালার ধারে রাখিয়া দিল, দোয়াতদানটা তেঁতুল দিয়া মাজিয়া ঝক্‌ঝকে করিয়া রাখিল। টেবিল ল্যাম্পটা পরিষ্কার করিয়া, বাহিরে অনেকদিনের একটা খালি প্যাকবাক্স পড়িয়াছিল, সেটা ঝাড়িয়া মুছিয়া টেবিলে পরিণত করিয়া সন্ধ্যার পর টেবিল-ল্যাম্পটা সেটার উপর রাখিয়া পড়িতে বসিল। বই হইতে মুখ তুলিয়া সে ঘন ঘন ঘরের চারিদিকে খুশীর সহিত চাহিয়া দেখিতেছিল—ঠিক একেবারে যেন বড়লোকদের সাজানো ঘর। ছবি, পর্দা, ফুলদানি, টেবিল-ল্যাম্প সব!—এতদিন পয়সা ছিল না, হয় নাই। কিন্তু এইবার কেন সে মহিষের মত বিলের কাদায় লুটাইয়া পড়িয়া থাকিতে যাইবে?

বাহাদুরি করিবার ঝোঁকে পরদিন সে ক্লাসের বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া নিজের ঘরে খাওয়াইল—প্রণব, জানকী, সতীশ, অনিল এমন কি সেণ্ট জেভিয়ার কলেজের সেই ভূতপূর্ব ছাত্র চালবাজ মন্মথকে পর্যন্ত।

মন্মথ ঘরে ঢুকিয়া বলিল—হুর্‌রে!—আরে আমাদের অপূর্ব এসব করেছে কি! কোত্থেকে বাজে রাবিশ এক পুরনো পর্দা জুটিয়েছে দ্যাখো। এত খাবার কে খাবে?

অপু নীচের কারখানায় হেড্ মিস্ত্রীকে বলিয়া তাহাদের বড় লোহার চায়ের কেটলিটা ও একটা পলিতা-বসানো সেকেলে লোহার স্টোভ ধার করিয়া আনিয়া চা চড়াইয়াছে, একরাশ কমলালেবু; সিঙ্গাড়া, কচুরী, পানতুয়া, কলা ও কাঁচা পাঁপর কিনিয়া আনিয়াছে—সবাই দেখিতে দেখিতে খাবার অর্ধেকের উপর কমাইয়া আনিল। কথায় কথায় অপু তাহাদের দেশের বাড়ির কথা তুলিল—মস্ত দোতলা বাড়ি নদীর ধারে, এখনও পূজার দালানটা দেখিলে তাক্ লাগে, দেশে এখনও খুব নাম—দেনার দায়ে মস্ত জমিদারী হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে, তাই আজ এ অবস্থা—নহিলে ইত্যাদি।

প্রণব চা পরিবেশন করিতে গিয়া খানিকটা জানকীর পায়ের উপর ফেলিয়া দিল। ঘরসুদ্ধ সবাই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সতীশ আসিয়াই সটান্ শুইয়া পড়িয়াছিল অপুর বিছানায়, বলিল,—ওহে তোমরা কেউ আমার গালে একটা পানতুয়া ফেলে দাও তো!—হাঁ ক'রে আছি—

সতীশ বলিল,—হাঁ হে ভাল কথা মনে পড়েছে! তোমার সেই জানালা কাব্যের নায়িকা কোন্ দিকে থাকেন? এই জানালাটি নাকি?—

অনিল বাদে আর সকলেই হাসি ও কলরবের সঙ্গে সেদিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে গেল—অপু লজ্জামিশ্রিত সুরে বলিল—না না ভাই, ওদিক যেও না—সে কিছু না, সব বানানো কথা আমার—ওসব কিছু না—

মেয়েটি পাগল এই ধারণা হওয়া পর্যন্ত তাঁহার কথা মনে উঠিলেই অপুর মন করুণার্দ্র হইয়া ওঠে। তাহাকে লইয়া এই হাসি-ঠাট্টা তাহার মনে বড় বিঁধিল। কথার সুর ফিরাইবার জন্য সে-নতুন-কেনা পর্দাটার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। পরে হঠাৎ মনে পড়াতে সে সেই ঝুটা পাথরের আংটিটা বাহির করিয়া খুশীর সহিত বলিল,—এটা দ্যাখো তো কেমন হয়েছে? কত দাম হবে! মন্মথ দেখিয়া বলিল,—এ কোথাকার একটা বাজে পাথর বসানো আংটি, কেমিকেল সোনার, এর আবার দামটা কি···দূর!

অনিলের এ কথাটা ভাল লাগিল না! মন্মথ ইতিপূর্বে অপুর পর্দাটা দেখিয়া নাক সিঁটকাইয়াছে, ইহাও তার ভাল লাগে নাই। সে বলিল—তুমি তো জহুরী নও, সব তাতেই চাল দিতে আস কেন? চেনো এ পাথর?

—জহুরী হবার দরকারটা কি শুনি—এটা কি এমারেল্ড, না হীরে, না—

—শুধু এমারেল্ড আর হীরের নাম শুনে রেখেছ বৈ তো নয়? এটা কর্নেলিয়ান—চেনো কর্নেলিয়ান? অভ্রের খনিতে পাওয়া যায়, আমাদের ছিল, আমি খুব ভাল জানি।

অনিল খুব ভালই জানে অপুর আংটির পাথরটা কর্নেলিয়ান্ নয়, কিছুই নয়—শুধু মন্মথর কথার প্রতিবাদ করিয়া মন্মথর চালিয়াতি কথাবার্তায় অপুর মনে কোনও ঘা না লাগে সেই চেষ্টায় কর্নেলিয়ান্ ও টোপাজ পাথরের আকৃতি প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিতে লাগিল। তার অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধে মন্মথ সাহস করিয়া আর কিছু বলিতে পারিল না!

তাহার পর প্রণব একটা গান ধরাতে উভয়ের তর্ক থামিয়া গেল। আরও অনেকক্ষণ ধরিয়া হাসিখুশী, কথাবার্তা ও আরও বার-দুই চা খাইবার পরে অন্য সকলে বিদায় লইল, কেবল অনিল থাকিয়া গেল, অপুও তাহাকে থাকিতে অনুরোধ করিল।

সকলে চলিয়া যাইবার কিছু পরে অনিল ভর্ৎসনার সুরে বলিল—আচ্ছা, এসব আপনার কি কাণ্ড? (সে এতদিনের আলাপে এখনও অপুকে 'তুমি' বলে না) কেন এসব কিনলেন মিছে পয়সা খরচ ক'রে।

অপু হাসিয়া বলিল,—কেন তাতে কি? এসব তো—ভাল থাকতে কি ইচ্ছে যায় না?

—খেতে পান না এদিকে, আর মিথ্যে এই সব—সে যাক্, এই দামে পুরানো বইয়ের দোকানের সে গিবনের সেটটা যে হয়ে যেতো। আপনার মত লোকও যদি এই ভূয়ো মালের পেছনে পয়সা খরচ করেন তবে অন্য ছেলের কথা কি? একটা পুরানো দূরবীন যে এই দামে হয়ে যেতো! আমার সন্ধানে একটা আছে ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের এক জায়গায়—একটা সাহেবের ছিল—স্যাটার্নের রিং চমৎকার দেখা যায়—কম টাকায় হ'ত, মেম বিক্রী ক'রে ফেল্‌ছে অভাবে—আপনি কিছু দিতেন, আমি কিছু দিতাম, দু'জনে কিনে রাখলে ঢের বেশী বুদ্ধির কাজ হ'ত—

অপু অপ্রতিভের হাসি হাসিল। দূরবীনের উপর তাহার লোভ আছে অনেকদিন হইতে। এতক্ষণে তাহার মনে হইল—এ টাকায় ইহা অপেক্ষাও সস্তায় হইতে পারিত বটে। কিন্তু সে যে ভাল থাকিতে চায়, ভাল ঘরে সুদৃশ্য সুরুচিসম্মত আসবাবপত্র রাখিতে চায়—সেটাও তো তার কাছে বড় সত্য—তাহাকেই বা সে মনে মনে অস্বীকার করে কি করিয়া?

অনিল আর কিছু বলিল না। পুরানো বাজারের এ-সব সস্তা খেলো মালকে তাহার বন্ধু যে এত খুশীর সহিত ঘরে আনিয়া ঘর সাজাইয়াছে, ইহাতেই সে মনে মনে চটিয়াছিল—শুধু অপুর মনে আর বেশী আঘাত দিতে ইচ্ছা না থাকায় সে বিরক্তি চাপিয়া গেল।

অপু বলিল—হুল্লোড়ে প'ড়ে তোমার খাওয়া হ'ল না অনিল, আর খানকতক কাঁচা পাঁপর ভাজবো?

অনিল আর খাইতে চাহিল না। অপু বলিল—তবে চলো, কোথাও বেরুই—গড়ের মাঠে কি গঙ্গার ধারে।

অনিলও তাই চায়, বলিল, দেখুন অপূর্ববাবু, উনিশ কুড়ি একুশ বছর থেকে পঞ্চাশ ষাট বছর বয়সের লোকে পর্যন্ত কি রকম গলির মধ্যে বাড়ির সামনেকার ছোট্ট রোয়াকটুকুতে বসে আড্ডা দিচ্ছে—এমন চমৎকার বিকেল, কোথাও বেরুনো নেই, শরীরের বা মনের কোনও অ্যাড্‌ভেঞ্চার নেই, আসনপিঁড়ি হয়ে সব ষষ্ঠী বুড়ি সেজে ঘরের কোণের কথা, পাড়ার গুজব,

কি দরে কে ওবেলা বাজারে ইলিশ মাছ কিনেছে সেই সব—ওঃ হাউ আই হেট দেম্! আপনি জানেন না, এই সব র‍্যাঙ্ক স্টুপিডিটি দেখলে আমার রক্ত গরম হয়ে ওঠে—বরদাস্ত করতে পারি নে মোটে—গা যেন কেমন—

—কিন্তু ভাই, তোমার ও-গডের মাঠে আমার মন ভোলে না—মোটরের শব্দ, মোটর বাইকের ফট্ ফট্ আওয়াজ, পেট্রোল গ্যাসের গন্ধ, ট্রামের ঘড়ঘড়ানি—নামেই ভাই মাঠ, গঙ্গার কথা আর না-ই বা তুললাম!

—কাল আপনাকে নিয়ে যাব এক জায়গায়! বুঝতে পারবেন একটা জিনিস—একটা ছেলে—আমার এক বন্ধুর বন্ধু—ছেলেটা সাউথ আফ্রিকায় মানুষ হয়েছে, সেইখানেই জন্ম—সেখান থেকে তার বাবা তাদের নিয়ে চলে এসেছে কলকাতায়, ফিয়ার্স লেনে থাকে। তার মুখের কথা শুনে এমন আনন্দ হয়! এমন মন! এখানে থেকে মরে যাচ্ছে—শুনবেন তার মুখে সেখানকার জীবনের বর্ণনা—হিংসে হয়, সত্যি!

অপু এখনি যাইতে চায়! অনিল বলিল, আজ থাক্ কাল ঠিক যাব দু'জনে! দেখুন অপূর্ববাবু, কিছু যেন মনে করবেন না, আপনাকে তখন কি সব বললাম ব'লে। আপনারা কি জন্যে তৈরী হয়েছেন জানেন? ওসব চিপ ফাইনারীর খদ্দের আপনারা কেন হবেন? দেখুন, এ পুরুষ তো কেটে গেল, এ সময়ের কবি, বৈজ্ঞানিক, দাতা, লেখক, ডাক্তার, দেশ-সেবক—এঁরা তো কিছুদিন পরে সব কৌত হবেন, তাঁদের হাত থেকে কাজ তুলে নিতে হবে কাদের, না, যারা এখন উঠছে। একদল তো চাই এই জেনারেশনের হাত থেকে সেই সব কাজ নেবার? সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, আর্টে, দেশসেবায়, গানে—সব কিছুতে, নতুন দল যারা উঠছে, বিশেষ ক'রে যাদের মধ্যে গিফ্‌ট্ আছে, তাদের কি হুল্লোড় ক'রে কাটাবার সময়?

অপু মুখে হাসিয়া কথাটা উড়াইয়া দিল বটে, কিন্তু মনে মনে ভারী খুশী হইল—কথার মধ্যে তাহারও যে দিবার কিছু আছে বা থাকিতে পারে সেদিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে বুঝিয়া।

পরে দু'জনে বেড়াইতে বাহির হইল।

নবম পরিচ্ছেদ

ছাত্রীকে পড়াইতে যাইবার সময় অপুর গায়ে যেন জ্বর আসে, ছুটি-ছাটার দিনটা না যাইতে হইলে সে যেন বাঁচিয়া যায়। অদ্ভুত মেয়ে! এমন কারণে-অকারণে প্রভুত্ব জাহির করার চেষ্টা, এমন তাচ্ছিল্যের ভাব—এই রকম সে একমাত্র অতসীদি'তে দেখিয়াছে!

একদিন সে ছাত্রীর একটা রূপা-বাঁধানো পেন্সিল হারাইয়া ফেলিল। পকেটে তুলিয়া লইয়া গিয়াছিল, কোথায় ফেলিয়াছে, তারপর আর কিছু খেয়াল ছিল না, পরদিন প্রীতি সেটা

চাহিতেই তাহার তো চক্ষুস্থির! সঙ্কুচিতভাবে বলিল—কোথায় যে হারিয়ে ফেললাম—কাল বরং একটা কিনে—

প্রীতি অপ্রসন্ন মুখে বলিল, ওটা আমার দাদুমণির দেওয়া বার্থ-ডে গিফ্‌ট্ ছিল—

ইহার পর আর কিনিয়া আনিবার প্রস্তাবটা উথাপিত করা যায় না, মনে মনে ভাবিল, কাল থেকে ছেড়ে দেবো।—এখানে আর চলবে না।

কি একটা ছুটির পরদিন সে পড়াইতে গিয়াছে, প্রীতি জিজ্ঞাসা করিল, কাল যে আসেন নি?

অপু বলিল, কাল ছিল ছুটির দিনটা—তাই আর আসি নি।

প্রীতি রুষ্ট করিয়া বলিয়া বসিল—কেন, কাল তো আমাদের সরকার, বাইরের দু'জন চাকর, ড্রাইভার সব এসেছিল? আমার পড়াশুনো কিছু হ'ল না, আজ ডিটেন্ ক'রে রাখলে পাঁচটা অবধি।

অপুর হঠাৎ বড় রাগ হইল, দুঃখও হইল। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আমি তোমাদের সরকার কি রাঁধুনীঠাকুর তো নই, প্রীতি! কাল স্কুল-কলেজ সব বন্ধ ছিল, এজন্য ভাবলাম আর যাব না। আমার যদি ভুলই হয়ে থাকে—তোমার সেই রকম মাস্টার রেখো যিনি এখানে বাজার-সরকারের মত থাকবেন। আমি কাল থেকে আর আসব না বলে যাচ্ছি।

বাড়ির বাহিরে আসিয়া মনে হইল—দেওয়ানপুরের নির্মলাদের কথা। তাহারাও তো অবস্থাপন্ন, তাহাদের বাড়িতেও সে প্রাইভেট মাস্টার ছিল, কিন্তু সেখানে সে ছিল বাড়ির ছেলের মত—নির্মলার মা দেখিতেন ছেলের চোখে, নির্মলা দেখিত ভাইয়ের চোখে—সে স্নেহ কি পথেঘাটে সুলভ? নির্মলার মত মমতাময়ীকে তখন সে চিনিয়াও চেনে নাই, আজ নতুন করিয়া তাহাকে আর চিনিয়া লাভ কি? আর লীলা? সে কথা ভাবিতেই বুকের ভিতরটা যেন কেমন করিয়া উঠিল—যাক্ সে সব কথা।

হাতের টাকায় কিছুদিন চলিল। ইতিমধ্যে কলেজে একটা বড় ঘটনা হইয়া গেল, প্রণব লেখাপড়া ছাড়িয়া কি নাকি দেশের কাজ করিতে চলিয়া গেল। সকলে বলিল, সে এনার্কিস্ট দলে যোগ দিয়াছে।

প্রণব চলিয়া যাওয়ার মাসখানেক পর একদিন অপু হোটেলে খাইতে গিয়া দেখিল, সুন্দর-ঠাকুর হোটেলওয়ালার মুখ ভার ভার। দু'তিন মাসের টাকা বাকী, পাওনাদার আর কত দিন শোনে? আজ সে স্পষ্ট জানাইল, দেনা শোধ না করিলে আর সে খাইতে পাইবে না। বলিল—বাবু, অন্য খদ্দের হলে মাসের পয়লাটি যেতে দিই নে—ওই ক্লষ্টোবাবু খায়, ওদের পাটের কলের হপ্তাটি পেলে দিয়ে দেয়—তুমি বলে আমি কিছু বলছি না—দু'মাসের ওপর আজ নিয়ে সাত দিন। যাক্ আর পারবো না, আপুনি আর আসবেন না—আমার ভাত একজন ভদ্দরনোকের ছেলে খেয়েছে ভাববো, আর কি করব?

কথাগুলি খুব ন্যায্য এবং আদৌ অসঙ্গত নয়, কিন্তু খাইতে গিয়া এরূপ রূঢ় প্রত্যাখ্যানে

অপুর চোখে জল আসিল। তাহার তো একদিনও ইচ্ছা ছিল না যে, ঠাকুরকে সে ফাঁকি দিবে, কিন্তু সেই প্রীতির টিউশনিটা ছাড়িয়া দেওয়ার পর আজ দুই-তিনমাস একেবারে নিরুপায় অবস্থায় ঘুরিতেছে যে!

বিপদের উপর বিপদ। দিন-দুই পরে কলেজে গিয়া দেখিল নোটিশ বোর্ডে লিখিয়া দিয়াছে, যাহাদের মাহিনা বাকী আছে, এক সপ্তাহের মধ্যে শোধ না করিলে কাহাকেও বার্ষিক পরীক্ষা দিতে দেওয়া হইবে না। অপু চক্ষে অন্ধকার দেখিল। প্রায় গোটা এক বৎসরের মাহিনাই যে তাহার বাকী।—মাত্র মাস-দুইয়ের মাহিনা দেওয়া আছে—সেই প্রথম দিকে একবার, আর প্রীতির টিউশনির টাকা হইতে একবার—তাহার পর হইতে খাওয়াই জোটে না তো কলেজের মাহিনা!—দশ মাসের বেতন ছ' টাকা হিসাবে ষাট টাকা বাকী। কোন দিক হইতে একটা কলঙ্কধরা নিকেলের সিকিও আসিবার সুবিধা নাই যাহার, ষাট টাকা সে এক সপ্তাহের মধ্যে কোথা হইতে যোগাড করিবে? হয়ত তাহাকে পরীক্ষা দিতে দিবে না, গ্রীষ্মের ছুটির পর সেকেণ্ড ইয়ারে উঠিতে দিবে না, সারা বছরের কষ্ট ও পরিশ্রম সব ব্যর্থ নিরর্থক হইয়া যাইবে।

কলেজ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সন্ধ্যার সময় সে হাত-খরচের পয়সা হইতে চাউল ও আলু কিনিয়া আনিয়া থাকিবার ঘরের সামনের বারান্দাতে রান্নার যোগাড় করিল। হোটেলে খাওয়া বন্ধ হইবার পর হইতে আজ কয়দিন নিজে রাঁধিয়া খাইতেছে। হিসাব করিয়া দেখিয়াছে ইহাতে খুব সস্তায় হয়। কাঠ কিনিতে হয় না। নিচের কারখানার ছুতার-মিস্ত্রীদের ঘর হইতে কাঠের চোঁচ ও টুক্‌রা কুড়াইয়া আনে, পাঁচ-ছ'য় পয়সায় খাওয়া দাওয়া হয়। আলুভাতে ডিমভাতে আর ভাত। ভাত চড়াইয়া ডাক দিল—ও বহু—বহু—নিয়ে এসো, আমার হয়ে গেল ব'লে—ছোট কাঁসিটাও এনো—

কারখানার দারোয়ান শম্ভুদত্ত তেওয়ারীর বৌ একখানা বড় পিতলের থালা ও কাঁসি লইয়া উপরে আসিল—এক লোটা জল ও গোটাকতক কাঁচা লঙ্কাও আনিল।

থালা বাসন নাই বলিয়া সে-ই দুই বেলা থালা আনিয়া দেয়। হাসিমুখে বলিল, মছ্‌লিকা তরকারী হম্‌ নেহি ছুঁয়ে গা বাবুজি—

—কোথায় তোমার মছ্‌লি?—ও শুধু আলু—একটু হলুদবাটা এনে দ্যাও না বহু? রোজ রোজ আলুভাতে ভাল লাগে না—

বহুকে ভাল বলিতে হইবে, রোজ উচ্ছিষ্ট থালা নামাইয়া লইয়া যায়, নিজে মাজিয়া লয়—হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণে যাহা কখনও করে না—অপু বাধা দিয়াছিল, বহু বলে, তুম্‌ তো হামারে লেড়কাকে বরাবর হোগে বাবুজী—ইস্‌মে ক্যা হ্যাঁয়?—

দিনকতক পর মায়ের একটা চিঠি আসিল, হঠাৎ পিছালাইয়া পড়িয়া সর্বজয়ার পায়ে বড় লাগিয়াছে, পয়সার কষ্ট যাইতেছে! মায়ের অভাবের খবর পাইলে অপু বড় ব্যস্ত হইয়া ওঠে, মায়ের নানা কাল্পনিক দুঃখের চিন্তায় তাহার মনকে অস্থির করিয়া তোলে, হয়ত আজ পয়সার অভাবে মায়ের খাওয়া হইল না, হয়ত কেহ দেখিতেছে না, মা আজ দু'দিন উপবাস

করিয়া আছে, এই-সব নানা ভাবনা আসিয়া জোটে, নিজের আলুভাতে ভাতও যেন গলা দিয়া নামিতে চায় না।

এদিকে আর এক গোলমাল—কারখানার ম্যানেজার ইতিপূর্বে তাহাকে বার-দুই ডাকাইয়া বলিয়াছিলেন, উপরে সে যে ঘরে আছে তার সমস্তটাই ঔষধের গুদাম করা হইবে—সে যেন অন্যত্র বাসা দেখিয়া লয়—বলিয়াছিলেন আজ মাস তিনেক আগে, তাহার পর আর কোনও উচ্চবাচ্য করেন নাই—অপুও থাকিবার স্থানের জন্য কোথায় কি ভাবে কাহার কাছে গিয়া চেষ্টা করিবে বুঝিতে না পারিয়া একরূপ নিশ্চেষ্টই ছিল এবং নিশ্চিন্ত ভাবে দিন যাইতে দেখিয়া ভাবিয়াছিল, ও-কথা হয়ত আর উঠিবে না—কিন্তু এইবার যেন সময় পাইয়াই ম্যানেজার বেশী পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন।

হাতের পয়সা ফুরাইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে অপু এত সাধ করিয়া কেনা শখের আসবাবগুলি বেচিতে আরম্ভ করিল। প্রথমে গেল প্লেটগুলি—তাও কেহই কিনিতে চায় না—অবশেষে চৌদ্দ আনায় এক পুরানো দোকানদারের কাছে বেচিয়া দিল। সেই দোকানদারই ফুলদানিটা আট আনায় কিনিল, দু'খানা ছবি দশ আনায়। তবু শেষ পর্যন্ত সে স্যাণ্ডোর ডাম্বেলটা ও জাপানী পর্দাটা প্রাণপণে আঁকড়াইয়া রহিল।

সে শীঘ্রই আবিষ্কার করিল—ছাতু জিনিসটার অসীম গুণ—সস্তার দিক হইতেও বটে, অল্প খরচে পেট ভরাইবার দিক হইতেও বটে। আগে আগে চৈত্র বৈশাখ মাসে তাহার মা নতুন যবের ছাতু কুটিয়া তাহাদের খাইতে দিত—তখন ছাতু ছিল বৎসরের মধ্যে একবার পালপার্বণে শখ করিয়া খাইবার জিনিস, তাহাই এখন হইয়া পড়িল প্রাণধারণের প্রধান অবলম্বন। আগে একটু আধটু গুড়ে তাহার ছাতু খাওয়া হইত না, গুড় আরও বেশী করিয়া দিবার জন্য মাকে কত বিরক্ত করিয়াছে, এখন খরচ বাঁচাইবার জন্য শুধু নুন ও তেওয়ারী-বহুর নিকট হইতে কাঁচা লঙ্কা আনাইয়া তাই দিয়া খায়। অভ্যাস নাই, খাইতে ভাল লাগে না!

কিন্তু ছাতু খুব সুস্বাদু না হউক, তাহাও বিনা পয়সায় পাওয়া যায় না। অপু বুঝিতেছিল—টানাটানি করিয়া আর বড়-জোর দিনদশেক—তারপর কূলকিনারাহীন অজানা মহাসমুদ্র। ...তখন কি উপায়?

সে রোজ সকালে উঠিয়া নিকটবর্তী এক লাইব্রেরীতে গিয়া দৈনিক ইংরেজী-বাংলা কাগজে ছেলে-পড়ানোর বিজ্ঞাপন খুঁজিয়া দেখে। গ্যাস-পোস্টের গায়েও অনেক সময় এই ধরণের বিজ্ঞাপন মারা থাকে—চলিতে চলিতে গ্যাস পোস্টের বিজ্ঞাপন দেখিয়া বেড়ানো তাহার একটা বাতিক হইয়া দাঁড়াইল। প্রায়ই বাড়িভাড়ার বিজ্ঞাপন।—আলো ও হাওয়াযুক্ত ভদ্রপরিবারের থাকিবার উপযোগী দুইখানি কামরা ও রান্নাঘর, ভাড়া নামমাত্র। যদি বা কালেভদ্রে এক-আধটা ছেলে-পড়ানোর বিজ্ঞাপন পাওয়া যায়, তার ঠিকানাটি আগে কেহ ছিঁড়িয়া দিয়াছে। কাপড় ময়লা হইয়া আসিল বেজায়, সাবানের অভাবে কাচিতে পারিল না। তেওয়ারীর স্ত্রী একদিন সোডা সাবান দিয়া নিজেদের কাপড় সিদ্ধ করিতে বসিয়াছে, অপু নিজের ময়লা শার্ট ও ধুতিখানা লইয়া গিয়া বলিল, বহু, তোমার সাবানের বোল্ একটু

দেবে, আমি এ দুটোয় মাখিয়ে রেখে দি—তারপর ওবেলা কলেজ থেকে এসে কলে জল এনে কেচে দেবো—দেবে ? ..

তেওয়ারী-বধূ বলিল, দে দিজিয়ে না বাবুজী, হাম্ হাঁড়ি মে ডাল দেগা।

অপু ভাবে—আহা বহু কি ভালো লোক!—যদি কখনও পয়সা হয় ওর উপকার করবো—

এক একবার তাহার মনে হয়, যদি কিছু না জোটে, তবে এবার হয়ত কলেজ ছাড়িয়া দিয়া মনসাপোতা ফিরিতে হইবে—কিন্তু সেখানেও আর চলিবার কোনও উপায় নাই, তেলি ও কুণ্ডুরা পূজার জন্য অন্যস্থান হইতে পূজারী-বামুন আনাইয়া জায়গা-জমি দিয়া বাস করাইয়াছে। আজ কয়েকদিন হইল মায়ের পত্রে সে-খবর জানিয়াছে, এখন তাহার মাকেও আর তেলিরা তেমন সাহায্য করে না, দেখে-শোনে না। মায়ের একাই চলে না—তার মধ্যে সে আবার কোথায় গিয়া জুটিবে?—তাহা ছাড়া পড়াশুনা ছাড়া? অসম্ভব!

সে নিজে বেশ বুঝিতে পারে, এই এক বৎসরে তাহার মনের প্রসারতা এত বাড়িয়া গিয়াছে, এমন একটা নতুনভাবে সে জগৎটাকে, জীবনটাকে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে—যা' কিনা দশ বৎসর মনসাপোতা কি দেওয়ানপুরে পড়িয়া হাবুডুবু খাইলেও সম্ভব হইয়া উঠিত না। সে এটুকু বেশ বোঝে, কলেজে পড়িয়া ইহা হয় নাই, কোনও প্রফেসারের বক্তৃতাতেও না—যাহা কিছু হইয়াছে, এই বড় আলমারীভরা লাইব্রেরীটার কাছে সে তাহার জন্য কৃতজ্ঞ।

যতক্ষণ সে লাইব্রেরীতে থাকে, ততক্ষণ তাহার খাওয়া-দাওয়ার কথা তত মনে থাকে না। এই সময়টা একটা খেয়ালের ঘোরে কাটে। খেয়ালমত এক একটা বিষয়ে প্রশ্ন জাগে মনে, তাহার উত্তর খুঁজিতে গিয়া বিকারের রোগীর মত অদম্য পিপাসায় সে সম্বন্ধে যত বই পাওয়া যায় হাতের কাছে—পড়িতে চেষ্টা করে। কখনও খেয়াল—নক্ষত্র জগৎ...কখনও প্রাচীন গ্রীস ও রোমের জীবনযাত্রা প্রণালীর সহিত একটা নিবিড় পরিচয়ের ইচ্ছা—কখনও কীট্‌স্, কখনও হল্যাণ্ড রোজের নেপোলিয়ন। কোন খেয়াল থাকে দু'দিন, কোনোটা আবার একমাস! তার কল্পনা সব সময়ই বড় একটা কিছুকে আশ্রয় করিয়া পুষ্টিলাভ করিতে চায়—বড় ছবি, জাতির উত্থান-পতনের কাহিনী, চাঁদের দেশের পাহাড়শ্রেণী, বর্তমান মহাযুদ্ধ, কোন বড়লোকের জীবনী।

কারখানার ম্যানেজার আর একদিন তাগিদ দিলেন। খুব সুখের বাসা ছিল না বটে, কিন্তু এখন সে যায় কোথায়? হাতে কিছু না থাকায় সে এবার পর্দাটা একদিন বেচিতে লইয়া গেল। এটা তাহার বড় শখের জিনিস ছিল। পর্দাটাতে একটা জাপানী ছবি আঁকা—ফুলে ভরা চেরী গাছ, একটু জলরেখা, মাঝ-জলে বড় বড় ভিক্টোরিয়া রিজিয়া ফুটিয়া আছে, ওপারে ঢেউখেলানো কাঠের ছাদওয়ালা একটা দেবমন্দির, দূরে ফুজিসানের তুষারাবৃত শিখর একটু একটু নজরে পড়ে। এই ছবিখানার জন্যই সে পর্দাটা কিনিয়াছিল, এইজন্যই এত দিন হাতছাড়া করিতে পারে নাই—কিন্তু উপায় কি? সাড়ে তিন টাকা দিয়া কেনা ছিল, বহু দোকান ঘুরিয়া তাহার দাম হইল একটাকা তিন আনা।

পর্দা বেচিয়া অনেকদিন পর সে ভাত রাঁধিবার ব্যবস্থা করিল। ছাতু খাইয়া খাইয়া অরুচি ধরিয়া গিয়াছে, বাজার হইতে এক পয়সার কলমী শাকও কিনিয়া আনিল। মনে পড়িল—সে কলমী শাক ভাজা খাইতে ভালবাসিত বলিয়া ছেলেবেলায় দিদি যখন-তখন গড়ের পুকুর হইতে কত কলমী তুলিয়া আনিত! দিন সাতেক পর্দা-বেচা পয়সায় চলিল মন্দ নয়, তারপরই যে-কে সে-ই! আর পর্দা নাই, কিছুই নাই, একেবারে কানাকড়িটা হাতে নাই।

কলেজ যাইতে হইল না-খাইয়া। বৈকালে কলেজ হইতে বাহির হইয়া সত্যই মাথা ঘুরিতে লাগিল, আর সেই মাথা ঝিম্ ঝিম্ করা, পা নড়িতে না চাওয়া। মুশকিল এই যে, ক্লাসে মিথ্যা গর্ব ও বাহাদুরির ফলে সকলেই জানে, সে অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে, কাহারও কাছে বলিবার মুখও তো নাই। দু'একজন যাহারা জানে—যেমন জানকী—তাহাদের নিজেদের অবস্থাও তথৈবচ।

সারাদিন না খাইয়া সন্ধ্যার সময় বাসায় আসিয়াই শুইয়া পড়িল। রাত আটটার পরে আর না থাকিতে পারিয়া তেওয়ারী-বধূকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ছোলা কি অড়হরের ডাল আছে, বহু? আজ আর ক্ষিদে নেই তেমন, রাঁধবো না আর, ভিজিয়ে খেতাম।

সকালে উঠিয়াই প্রথমে তাহার মনে আসিল যে, আজ সে একেবারে কপর্দকশূন্য। আজও কালকার মত না খাইয়া কলেজে যাইতে হইবে। কতদিন এভাবে চালাইবে সে? না খাইয়া থাকার কষ্ট ভয়ানক—কাল লজিকের ঘণ্টার শেষে সেটা সে ভাল করিয়া বুঝিয়াছিল—বিকালের দিকে ক্ষুধাটা পড়িয়া যাওয়াতে তত কষ্ট বোঝা যায় নাই—কিন্তু সেই বেলা দুটোর সময়টা!···পেটে ঠিক যেন বোলতার ঝাঁক হুল ফুটাইতেছে—বার দুই জল খাইবার ঘরে গিয়া গ্লাস-কতক জল খাইয়া কাল যন্ত্রণাটা অনেকখানি নিবারণ হইয়াছিল। আজ আবার সেই কষ্ট সম্মুখে!

হাতমুখ ধুইয়া বাহির হইয়া বেলা দশটা পর্যন্ত সে আবার নানা গ্যাস-পোস্টের বিজ্ঞাপন দেখিয়া বেড়াইল, তাহার পর বাসায় না ফিরিয়া সোজা কলেজে গেল। অন্য কেহ কিছু লক্ষ্য না করিলেও অনিল দু'তিনবার জিজ্ঞাসা করিল—আপনার কোনও অসুখ-বিসুখ হয়েছে? মুখ শুকনো কেন? অপু অন্য কথা পাড়িয়া প্রশ্নটা এড়াইয়া গেল। বই লইয়া আজ সে কলেজে আসে নাই, খালি হাতে কলেজ হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় রাস্তায় খানিকটা ঘুরিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল, মা আজ দিন-বারো আগে টাকা চাহিয়া পত্র পাঠাইয়াছিল—টাকাও দেওয়া হয় নাই, পত্রের জবাবও না।

কথাটা ভাবিতেই সে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল—না-খাওয়ার কষ্ট সে ভাল বুঝিয়াছে—মায়েরও হয়ত বা এতদিন না খাওয়া শুরু হইয়াছে, কে জানে? তাহা ছাড়া মায়ের স্বভাবও সে ভাল বোঝে, নিজের কষ্টের বেলা মা কাহাকেও বলিবে না বা জানাইবে না, মুখ বুজিয়া সমুদ্র গিলিবে।

অপু অস্থির হইয়া পড়িল। এখন কি করে সে! জ্যাঠাইমাদের বাড়ি গিয়া সব খুলিয়া বলিবে?—গোটাকতক টাকা যদি এখন ধার পাওয়া যায় সেখানে, মাকে তো আপাততঃ

পাঠাইয়া দেওয়া যাইবে এখন।—কিন্তু খানিকটা ভাবিয়া দেখিল, সেখানে গিয়া সে টাকার কথা তুলিতেই পারিবে না—জ্যাঠাইমাকেই সে মনে মনে ভয় করে। অখিলবাবু? সামান্য মাহিনা পায়, সেখানে গিয়া টাকা চাহিতে বাধে। তাহার এক সহপাঠীর কথা হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, খুব বেশী আলাপ নাই, কিন্তু শুনিয়াছে বড়লোকের ছেলে—একবার যাইয়া দেখিবে কি? ছেলেটির বাড়ি বৌবাজারের একটা গলিতে, কলকাতার বনেদি ঘর, বড় তেতলা বাড়ি, পুজার দালান, সামনে বড় বড় সেকেলে ধরণের থাম, কার্নিসে একঝাঁক পায়রার বাসা; বাহিরের ফ্লোরের খোপটা একজন হিন্দুস্থানী ভুজাওয়ালা ভাড়া লইয়া ছাতুর দোকান খুলিয়াছে। একটু পরেই অপুর সহপাঠী ছেলেটি বাহিরে আসিয়া বলিল—কৈ, কে ডাকছে—ও—তুমি?—রোল টুএল্‌ভ; এক্সিউজ মি—তোমার নামটা জানি নে ভাই—sorry—এস, এস, ভেতরে এস।

খানিকক্ষণ বসিয়া গল্পগুজব হইল। খানিকক্ষণ গল্প করিতে করিতে অপু বুঝিল, এখানে টাকার কথা তোলাটা তাহার পক্ষে কতদূর দুঃসাধ্য ব্যাপার।—অসম্ভব—তাহা কি কখনও হয়? কি বলিয়া টাকা ধার চাহিবে সে এখানে? এই আমাকে এই—গোটাকতক টাকা ধার দিতে পার ক'দিনের জন্যে? কথাটা কি বিশ্রী শোনাইবে! ভাবিতেও যেন লজ্জা ও সঙ্কোচে তাহার মুখ ঘামিয়া রাঙা হইয়া উঠিল। ছেলেটি বলিল—বা রে এখুনি উঠবে কি?—না না, বোসো, চা খাও—দাঁড়াও, আমি আসছি—

ঘিয়ে-ভাজা চিঁড়ে, নিমকি, পেঁপে-কাটা, সন্দেশ ও চা। অপু ক্ষুধার মুখে লোভীর মত সেগুলি ব্যগ্রভাবে গোগ্রাসে গিলিল। গরম চা কয়েক চুমুক খাইতে শরীরের ঝিম্ ঝিম্ ভাবটা কাটিয়া মনের স্বাভাবিক অবস্থা যেন ফিরিয়া আসিল এবং আসিবার সঙ্গে সঙ্গে এখানে টাকা ধার চাওয়াটা যে কতদূর অসম্ভব সেটাও বুঝিল। বন্ধুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাহিরে আসিয়া ভাবিল—ভাগ্যিস্—হাউ য়্যাব্‌সার্ড। তা' কি কখনও আমি—দূর!

রাত্রিতে শুইয়া ভাবিতে ভাবিতে তাহার মনে পড়িল, আগামীকাল নববর্ষের প্রথম দিন! কাল কলেজের ছুটি আছে। কাল একবার শ্যামবাজারে জ্যাঠাইমাদের বাড়িতে যাইবে, নববর্ষের দিনটা জ্যাঠাইমাকে প্রণাম করিয়া আসাও হইবে—সেটাও একটা কর্তব্য, তাহা ছাড়া—

মনে মনে ভাবিল—কাল গেলে জ্যেঠিমা কি আর না খাইয়ে ছেড়ে দেবে? বছরকারের দিনটা—সেদিন সুরেশদা তো আর বাড়ির মধ্যে বলে নি—বললে কি আর খেতে বলত না? সুরেশদা ওই রকম ভুলো মানুষ।—

ভুল কাহার, পরদিন অপুর বুঝিতে দেরি হইল না। সকালে ন'টার সময় সুরেশদের বাড়ি গিয়া প্রথমে বাহিরে কাহাকেও পাইল না। বলা না, কওয়া না, হুপ্ করিয়া কি বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া যাইবে? কি সমাচার, না নববর্ষের দিন প্রণাম করিতে আসিয়াছি—ছুতাটা যে বড় দুর্বল! সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে সে খানিকক্ষণ পরে বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া একেবারে জ্যাঠাইমাকে পাইল দরজার সামনের রোয়াকে। প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলা

লইল, জ্যাঠাইমার মুখে যে বিশেষ প্রীতি বিকশিত হইল না, তাহা অপু ছাড়া যে-কেহ বুঝিতে পারিত। তাহার সংবাদ লইবার জন্য তিনি বিশেষ কোন আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না, সে-ই নিজের সঙ্কোচ ঢাকিবার জন্য অতসীদি কবে শ্বশুরবাড়ি গিয়াছে, সুনীল বুঝি কোথায় বাহির হইয়াছে প্রভৃতি ধরণের যামুলি প্রশ্ন করিয়া যাইতে লাগিল।

তারপর জ্যাঠাইমা কোথায় চলিয়া গেলেন, কেহ বাড়ি নাই, সে দালানের একটি বেঞ্চিতে বসিয়া একখানা এস. রায়ের ক্যাটালগ নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিবার ভান করিল। বইখানার মধ্যে একখানা বিবাহের প্রীতি-উপহার, হাতে লইয়া বিস্ময়ের সহিত দেখিল—সেখানা সুরেশের বিবাহের! সে দুঃখিতও হইল, আশ্চর্যও হইল, মাত্র মাসখানেক আগে বিবাহ হইয়াছে, সুরেশদা তাহার ঠিকানা জানে, সবই জানে, অথচ কি জ্যাঠাইমা, কি সুরেশদা, কেহই তাহাকে জানায় নাই।

'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় বেলা সাড়ে দশটা পর্যন্ত বসিয়া থাকিয়া সে জ্যাঠাইমার কাছে বিদায় লইয়া চলিয়া আসিল; জ্যাঠাইমা নির্লিপ্ত, অন্যমনস্ক সুরে বলিল—আচ্ছা তা' এসো—থাক্, থাক্—আচ্ছা।

ফুটপাতে নামিয়া সে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। মনে মনে ভাবিল—সুরেশদার বিয়ে হয়ে গিয়েছে ফাল্গুন মাসে, একবার বললেও না!—অথচ আমাদের আপনার লোক—আজ দ্যাখো না নববর্ষের দিনটা খেতেও বললে না—

খানিকদূরে আসিতে আসিতে তাহার কেমন হাসিও পাইল। আচ্ছা যদি বলতাম, জ্যেঠিমা আমি এখানে এবেলা খাবো তাহলে—হি-হি—তাহলে কি হতো!

বাসার কাছে পথে সুন্দর-ঠাকুর হোটেলওয়ালার সঙ্গে দেখা। দু-দু'বার নাকি সে অপুর বাসায় গিয়াছে, দেখা পায় নাই, আজ পয়লা বৈশাখ, হোটেলের নতুন খাতা—টাকা দেওয়া চাই-ই। সুন্দর-ঠাকুর চীৎকারের সুরে বলিল—ভাতের তো এক পয়সা দিলে না—আবার লুচি খেলে বাবু ন'দিন—সাত আনা হিসাবে সাত নং তেষট্টি আনা—তিন টাকা পনেরো আনা—আজ তিন মাস ঘোরাচ্ছেন, আজ খাতা মহরৎ—না দিলে হবেই না ব'লে দিচ্ছি।

অপুর দোষ—লোভে পড়িয়া সে কোথা হইতে শোধ দিবে না ভাবিয়াই ধারে আট-নয় দিন লুচি খাইয়াছিল। সুন্দর-ঠাকুরের চড়া চড়া কথায় পথে লোক জুটিয়া গেল—পথে দাঁড়াইয়া অপদস্থ হওয়ার ভয়ে সে কোথা হইতে দিবে বিন্দুবিসর্গ না ভাবিয়াই বলিল, বৈকালে নিশ্চয়ই সব শোধ করিয়া দিবে।

বৈকালে একটা বিজ্ঞাপনে দেখিল কোন্ স্কুলে একজন ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করা শিক্ষক দরকার, টাট্‌কা মারিয়া দিয়া গিয়াছে, এখনও কেহ ছেঁড়ে নাই। খুঁজিয়া তখনি বাহির করিল, মেছুয়াবাজারের একটা গলির মধ্যে কাহাদের ভাড়া বাড়ির বাহিরের ঘরে স্কুল—আপার প্রাইমারী পাঠশালা। জনকতক বৃদ্ধ বসিয়া দাবা খেলিতেছেন, একজন তাহার মধ্যে নাকি স্কুলের হেডমাস্টার। অঙ্কের শিক্ষক—দশ টাকা মাহিনা—ইত্যাদি। বাজার যা তাতে ইহাই যথেষ্ট।

অপুর মন বেজায় দমিয়া গেল। এই অন্ধকার স্কুলঘরটার, দারিদ্র্য, এই ত্রিকালোত্তীর্ণ বৃদ্ধগণের মুখের একটা বুদ্ধিহীন সন্তোষের ভাব ও মনের স্থবিরত্ব, ইহাদের সাহচর্য হইতে তাহাকে দূরে হটাইয়া লইতে চাহিল! যাহা জীবনের বিরোধী, আনন্দের বিরোধী, সর্বোপরি—তাহার অস্থিমজ্জাগত যে রোমাঞ্চের তৃষ্ণা—তাহার বিরোধী, অপু সেখানে একদণ্ড তিষ্ঠিতে পারে না। ইহারা বৃদ্ধ বলিয়া যে এমন ভাব হইল অপুর, তাহা নয়, ইহাদের অপেক্ষাও বৃদ্ধ ছিলেন শৈশবের সঙ্গী নরোত্তম দাস বাবাজী। কিন্তু সেখানে সদাসর্বদা একটা মুক্তির হাওয়া বহিত, কাশীর কথকঠাকুরকেও এইজন্যই ভাল লাগিয়াছিল। অসহায়, দরিদ্র বৃদ্ধ একটা আশাভরা আনন্দের বাণী বহন করিয়া আনিয়াছিলেন তাহার মনে—যেদিন জিনিসপত্র বাঁধিয়া হাসিমুখে নতুন সংসার বাঁধিবার উৎসাহে রাজঘাটের স্টেশনে ট্রেনে চড়িয়া দেশে রওনা হইয়াছিলেন।

স্কুল হইতে যখন সে বাহির হইল, বেলা প্রায় গিয়াছে। তাহার কেমন একটা ভয় হইল—এ ভয়টা এতদিন হয় নাই। না খাইয়া থাকিবার বাস্তবতা ইতিপূর্বে এভাবে কখনও নিজের জীবনে সে অনুভব করে নাই—বিশেষ করিয়া যখন এখানে খাইতে-পাওয়া নির্ভর করিতেছে নিজের কিছু একটা খুঁজিয়া বাহির করিবার সাফল্যের উপর। কিন্তু তাহার সকলের চেয়ে দুর্ভাবনা মায়ের জন্য। একটা পয়সা সে মাকে পাঠাইতে পারিল না, আজ এতদিন মা পত্র দিয়াছে—কি করিয়া চলিতেছে মায়ের!···

কিন্তু এখানে তো কোনও কিছু আশা দেখা যায় না—এত বড় কলিকাতা শহরে পাড়াগাঁয়ের ছেলে, সহায় নাই, চেনাশোনো নাই, সে কোথায় যাইবে—কি করিবে?···

পথে একটা মাড়োয়ারীর বাড়িতে বোধ হয় বিবাহ। সন্ধ্যার তখনও সামান্য বিলম্ব আছে, কিন্তু এরই মধ্যে সামনের লাল-নীল ইলেকট্রিক আলোর মালা জ্বালাইয়া দিয়াছে, দু'চারখানা মোটর ও জুড়িগাড়ি আসিতে শুরু করিয়াছে। লুচি-ভাজার মন-মাতানো সুগন্ধে বাড়ির সামনেটা ভরপুর। হঠাৎ অপু দাঁড়াইয়া গেল। ভাবিল—যদি গিয়ে বলি আমি একজন পুওর স্টুডেন্ট—সারাদিন খাই নি—তবে খেতে দেবে না?—ঠিক দেবে—এত বড় লোকের বাড়ি, কত লোক তো খাবে—বলতে দোষ কি? কে-ই বা চিনবে আমায় এখানে?···

কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারিল না। সে বেশ বুঝিল, মনে ষোল আনা ইচ্ছা থাকিলেও মুখ দিয়া একথা সে বলিতে পারিবে না কাহারও কাছে—লজ্জা করিবে। লজ্জা না করিলে সে যাইত। মুখচোরা হওয়ার অসুবিধা সে জীবনে পদে পদে দেখিয়া আসিতেছে।...

কলিকাতা ছাড়িয়া মনসাপোতা ফিরিবে? কথাটা সে ভাবিতে পারে না—প্রত্যেক রক্তবিন্দু বিদ্রোহী হইয়া ওঠে। তাহার জীবন-সন্ধানী মন তাহাকে বলিয়া দেয় এখানে জীবন, আলো, পুষ্টি, প্রসারতা—সেখানে অন্ধকার, দৈন্য, নিভিয়া যাওয়া। কিন্তু উপায় কই তাহার হাতে? সে তো চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। সব দিকেই গোলমাল। কলেজের মাহিনা না দিলে, আপাততঃ পরীক্ষা দিতে দিলেও, বেতন শোধ না করিলে প্রমোশন বন্ধ। থাকিবার স্থানের এই দশা, দু'বেলা ওষুধের কারখানার ম্যানেজার উঠিয়া যাইবার তাগিদ দেয়, আহার তথৈবচ, সুন্দর-ঠাকুরের দেনা, মায়ের কষ্ট—একেই তো সে সংসারানভিজ্ঞ, স্বপ্নদর্শী প্রকৃতির—

কিসে কি সুবিধা হয় এমনিই বোঝে না—তাহাতে এই কয় দিনের ব্যাপার তাহাকে একেবারে দিশাহারা করিয়া তুলিয়াছে।

বাসায় আসিয়া ছাদের উপর বসিল। একখানা খাপ্‌রা কুড়াইয়া আনিয়া ভাবিল—আচ্ছা দেখি দিকি কোন্ পিঠটা পড়ে? পরে, নিশ্চিন্দিপুরে বাল্যে দিদির কাছে যেমন শিখিয়াছিল, সেইভাবে চোখ বুজিয়া খাপ্‌রাটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেখিল—একবার—দু'বার—কলিকাতা ছাড়িয়া যাওয়ার দিকটাই পড়ে। তৃতীয় বার ফেলিয়া দেখিতে আর তাহার সাহস হইল না।

বাল্যকাল হইতে নিশ্চিন্দিপুরের বিশালাক্ষী দেবীর উপর তাহার অসীম শ্রদ্ধা। করুণাময়ী দেবীর কথা কত সে শুনিয়াছে, সে তো তাঁর গ্রামের ছেলে—কলিকাতায় কি তাঁর শক্তি খাটে না?

পরীক্ষা হইবার দিনকয়েক পরে একদিন অনিল তাহাকে জানাইল, সায়েন্স সেক্‌শনের মধ্যে সে গণিত ও বস্তু-বিজ্ঞানে প্রথম হইয়াছে, প্রফেসরের বাড়ি গিয়া নম্বর জানিয়া আসিয়াছে। অপু শুনিয়া আন্তরিক সুখী হইল, অনিলকে সে ভারী ভালবাসে, সত্যিকার চরিত্রবান্ বুদ্ধিমান ও উদারমতি ছাত্র। অনিলের যে জিনিসটা তাহার ভাল লাগে না, সেটা তাহার অপরকে তীব্রভাবে আক্রমণ ও সমালোচনা করিবার একটা দুর্দমনীয় প্রবৃত্তি। কিন্তু এ পর্যন্ত কোন তুচ্ছ কাজে বা জিনিসে অপু তাহার আসক্তি দেখে নাই—কোনও ছোট কথা, কি সুবিধার কথা, কি বাজে খোসগল্প তাহার মুখে শোনে নাই।

অপু দেখিয়াছে সব সময় অনিলের মনে একটা চাঞ্চল্য, একটা অতৃপ্তি—তাহার অধীর মন মহাভারতের বকরূপী ধর্মরাজের মত সব সময়ই যেন প্রশ্ন ফাঁদিয়া বসিয়া আছে—কা চ বার্তা?

অপুর সহিত এইজন্যই অনিলের মিলিয়াছিল ভাল। দুজনের আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রবৃত্তি এক ধরণের। অপুর বাংলা ও ইংরেজী লেখা খুব ভাল, কবিতা-প্রবন্ধ, মায় একখানা উপন্যাস পর্যন্ত লিখিয়াছে। দু'তিনখানা বাঁধানো খাতা ভর্তি—লেখা এমন কিছু নয়, গল্পগুলি ছেলেমানুষি ধরণের উচ্ছ্বাসে ভরা, কবিতা রবি ঠাকুরের নকল, উপন্যাসখানাতে—জলদস্যুর দল, প্রেম, আত্মদান কিছুই বাদ যায় নাই—কিন্তু এইগুলি পড়িয়াই অনিল সম্প্রতি অপুর আরও ভক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

সপ্তাহের শেষে দুজনে বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াইতে গেল। একটা ঝিলের ধারে ঘন সবুজ লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে বসিয়া অনিল বন্ধুকে একটা সুসংবাদ দিল। বাগানে আসিয়া গাছের ছায়ায় এইভাবে বসিয়া বলিবে বলিয়াই এতক্ষণ অপেক্ষায় ছিল। তাহার বাবার এক বন্ধু তাহাকে খুব ভালবাসেন, বড়বনীর অভ্রের খনির তিনি ছিলেন একজন অংশীদার, তিনি গত পরীক্ষার ফলে অনিলের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া নিজের খরচে বিদেশে পাঠাইতে চাহিতেছেন, আই. এস্‌সি.-টা পাস দিলেই সোজা বিলাত বা ফ্রান্স।

—কেম্‌ব্রিজে কি ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজিতে পড়বো, রাদারফোর্ড আছেন, টম্‌সন্ আছেন—এঁদের সব দু'বেলা দেখতে পাওয়া একটা পুণ্য—খুব

থামলে জার্মানীতে যাব, মস্ত জাত—বিরাট ভাইটালিটি—গয়টে, অস্টওয়াল্‌ডের দেশ—ওখানে কি আর না যাব ?

অনিল অপুর বিদেশে যাইবার টান জানে—বলিল, আপনাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবো। না-হয় দু'জনে আমেরিকায় চলে যাব—আমি সব ঠিক করব দেখবেন।

অনিলের প্রভাব যেমন অপুর জীবনে বিস্তার লাভ করিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে অপুর চরিত্রের পবিত্রতা, মনের ছেলেমানুষি ও ভাবগ্রাহিতা অনিলের কঠোর সমালোচনা ও অযথা আক্রমণ-প্রবৃত্তিকে অনেকটা সংযত করিয়া তুলিতেছিল। দূরের পিপাসা অপুর আরও অনেক বেশী, অনেক উদ্দাম—কলিকাতার ধোঁয়াভরা, সঙ্কীর্ণ, ভ্যাপ্‌সা-গন্ধ সিওয়ার্ড ভিচের ভিতর হইতে বাহির হইয়া হঠাৎ যেন একটা উদার প্রান্তর, জ্যোৎস্না-মাখা মুক্ত আকাশ, পাখিদের আনন্দভরা পক্ষ-সঙ্গীতের, একটা বন-প্রান্তের রহস্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় অপুর কথার সুরে, জীবন-পিপাসু নবীন চোখের দৃষ্টিতে, অন্ততঃ অনিলের তো মনে হয়।

কোন্ পথে যাওয়া হইবে সে কথা উঠিল। অপু উৎসাহে অনিলের কাছে ঘেঁষিয়া বলিল—এসো একটা প্যাক্ট করি—দেখি হাত ? এসো, আমরা কখ্‌খনো কেরানীগিরি করব না, পয়সা পয়সা করব না কখ্‌খনো—সামান্য জিনিসে ভুলব না কখনও—ব্যাস্…পরে মাটিতে একটা ঘুসি মারিয়া বলিল—খুব বড় কাজ কিছু একটা করব জীবনে।

অনিল সাধারণতঃ অপুর মত নিজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠে না, তবুও আজ উৎসাহের মুখে অনেক কথা বলিয়া ফেলিল, বিলাতে পড়া শেষ করিয়া সে আমেরিকায় যাইবে, জাপান হইয়া দেশে ফিরিবে। বিদেশ হইতে ফিরিয়া সারাজীবন বৈজ্ঞানিক গবেষণা লইয়াই থাকিবে।

অপু বলিল—যখন দেশে ছিলাম, তখন আমার একখানা 'প্রাকৃতিক ভূগোল' ব'লে ছেঁড়া, পুরনো বই ছিল—তাতে লেখা ছিল এমন সব নক্ষত্র আছে, যাদের আলো আজও এসে পৃথিবীতে পৌঁছয় নি, সে-সব এত দূরে—মনে আছে, সন্ধ্যের সময় একটা নদীতে নৌকো ছেড়ে দিয়ে নৌকোর ওপর বসে সে কথা ভাবতাম, ওপারে একটা কদম গাছ ছিল, তার মাথাতে একটা তারা উঠত সকলের আগে, তারাটার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতাম—কি যে একটা ভাব হ'ত মনে! একটা mystery, একটা uplift-এর ভাব—ছেলেমানুষ তখন, সে-সব বুঝতাম না, কিন্তু সেই থেকে যখনই মনে দুঃখ হয়েছে, কি কোনও ছোট কাজে মন গিয়েছে, তখনই আকাশের নক্ষত্রদের দিকে চাইলেই আবার ছেলেবেলার সেই uplift-এর ভাবটা, একটা joy বুঝলে ? একটা অদ্ভুত transcendental joy—সে ভাই মুখে তোমাকে—

বেলা পড়িলে দু'জনে স্টীমারে কলিকাতায় ফিরিল।

পরদিন কলেজের কমন-রুমে অনেকক্ষণ আবার সেই কথা।

কলেজ হইতে উৎফুল্ল মনে বাহির হইয়া অনিল প্রথমে দোকানে এক কাপ চা খাইল,

পরে ফুটপাথের ধারে দাঁড়াইয়া একটুখানি ভাবিল, কালীঘাটে মাসীর বাড়ি যাওয়ার কথা আছে, এখন যাইবে কিনা। একখানা বই কিনিবার জন্য একবার কলেজ স্ট্রীটেও যাওয়া দরকার। কোথায় আগে যায়? অপূর্ব একমাত্র ছেলে, যার কথা তার সব সময় মনে হয়। যে কোনরূপে হউক অপূর্বকে সে নিশ্চয়ই বিদেশ দেখাইবে।

তলপেটে অনেকক্ষণ হইতে একটা কী বেদনা বোধ হইতেছিল, এইবার যেন একটু বাড়িয়াছে, হাঁটিয়া চৌরঙ্গীর মোড় পর্যন্ত যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, সেটা আর না যাওয়াই ভাল। সম্মুখেই ডালহাউসি স্কোয়ারের ট্রাম, সে ভাবিল—পরেরটাতে যাব, বেজায় ভিড়, ততক্ষণ বরং চিঠিখানা ডাকে ফেলে আসি।

নিকটেই লাল রংয়ের গোল ডাকবাক্স ফুটপাথের ধারে, ডাক বাক্সটার গা ঘেঁষিয়া একজন মুসলমান ফেরিওয়ালা পাকা কাঁচকলা বিক্রী করিতেছে, তাহার বাজরায় পা না লাগে এই জন্য এক পায়ে ভর করিয়া অন্য পা-খানা একটু অস্বাভাবিক রকমে পিছনে বাঁকাভাবে পাতিয়া সে সবে চিঠিখানা ডাকবাক্সের মুখে ছাড়িয়া দিয়াছে—এমন সময় হঠাৎ পিছন হইতে যেন কে তীক্ষ্ণ বর্শা দিয়া তাহার দেহটা এফোঁড়-ওফোঁড় করিয়া দিল, এক নিমেষে, অনিল সেটাতে হাত দিয়া সামলাইতেও যেন অবকাশ পাইল না।···হঠাৎ যেন পায়ের তলা হইতে মাটিটা সরিয়া গেল···চোখে অন্ধকার—কাঁচকলার বাজরার কানাটা মাথায় লাগিতেই মাথাটায় একটা বেদনা—মুসলমানটি কি বলিয়া উঠিল—হৈ হৈ, বহু লোক—কি হয়েছে মশায়?···কি হ'ল মশায়?···সরো সরো—বাতাস করো···বরফ নিয়ে এসো···এই যে আমার রুমাল নিন না···

অনিলের দু'টি মাত্র কথা শুধু মনে ছিল—একবার সে অতিকষ্টে গোঙাইয়া গোঙাইয়া বলিল—রি—রিপন কলেজ—অপূর্ব রায়—রিপন—

আর মনে ছিল সামনের একটা সাইন বোর্ড—গনেশচন্দ্র দাঁ এণ্ড কোং—কারবাইডের মশলা, তারপরেই সেই তীক্ষ্ণ বর্শাটা পুনরায় কে যেন সজোরে তলপেটে ঢুকাইয়া দিল—সঙ্গে সঙ্গে সব অন্ধকার—

কতক্ষণ পরে সে জানে না, তাহার জ্ঞান হইল। একটা বাক্স বা ঘরের মধ্যে সে শুইয়া আছে, ঘরটা বেজায় দুলিতেছে—পেটে ভয়ানক যন্ত্রণা—কাহারা কি বলিতেছে, অনেক মোটরগাড়ির ভেঁপুর শব্দ—আবার ধোঁয়া ধোঁয়া···

পুনরায় যখন অনিলের জ্ঞান হইল, সে চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিল একটা বড় সাদা দেওয়ালের পাশে একখানা খাটে সে শুইয়া আছে। পাশে তাহার বাবা ও ছোট কাকা বসিয়া, আরও তিনজন অপরিচিত লোক। নার্সের পোশাক-পরা দু'জন মেম। এটা হাসপাতাল? কোন্ হাসপাতাল? কি হইয়াছে তাহার?···তলপেটের যন্ত্রণা তখনও সমান, শরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে, সারা দেহ যেন অবশ।

পরদিন বেলা দশটার সময় অপু গেল। সে-ই কাল খবর পাইয়া তখনি ছুটিয়া শিয়ালদহের মোড়ে গিয়াছিল। সঙ্গে ছিল সত্যেন ও চার-পাঁচজন ছেলে। টেলিফোনে অ্যাম্বুলেন্স

গাড়ি আনাইয়া তখনি সকলে মিলিয়া তাহাকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আনা হয় ও বাড়িতে খবর দেওয়া হয়। ডাক্তার বলেন হার্নিয়া···স্ট্র্যাঙ্গুলেটেড হার্নিয়া...তখনি অস্ত্র করা হইয়াছে।···

বৈকালেও সে গেল। কেবিন ভাড়া করা হইয়াছে, অনিলের মা বসিয়া ছিলেন, অপু গিয়া পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল। অনিল এখন অনেকটা ভাল আছে, অস্ত্র করার পরে বেজায় যন্ত্রণা পাইয়াছিল, সারারাত ও সারাদিন—দুপুরের পর সেটা একটু কম। তাহার মুখ রক্তশূন্য পাণ্ডুর। সে হাসিয়া অপুর হাত ধরিয়া কাছে বসাইল, বলিল—স্বাস্থ্যের মতন জিনিস আর নেই, যতই বলুন—এই তিনটে দিন যেন একেবারে মুছে গিয়েছে জীবন থেকে।

অপু বলিল—বেশী কথা বলো না, যন্ত্রণা কেমন এখন ?

অনিলের মা বলিলেন,—তোমার কথা সব শুনেছি, ভাগ্যিস তুমি ছিলে বাবা সেদিন !

অনিল বলিল,—দেখবেন মজা, ঘণ্টা নাড়লেই নার্স এখুনি ছুটে আসবে—বাজাব দেখবেন ?—সে হাসিয়া একটা হাত-ঘণ্টা বাজাতেই লম্বা একজন নার্স আসিয়া হাজির। সে চলিয়া গেলে অনিলের মা বলিলেন—কি যে করিস্ মিছিমিছি ? ছিঃ—

দুজনেই খুব হাসিতে লাগিল !

খানিকক্ষণ গড়ের মাঠের দিকে বেড়াইয়া সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরিয়া অপু সবে আলোটি জ্বালিয়াছে, এমন সময় সত্যেন ও অনিলের পিসতুতো ভাই ফণী—অপু তাহাকে হাসপাতালে প্রথম দেখিয়াছে, সেখানেই প্রথম আলাপ—ব্যস্ত-সমস্ত অবস্থায় ঘরে ঢুকিল—সত্যেন বলিল—ওঃ, তোমাকে দু'বার এর আগে খুঁজে গেছি—এখুনি হাসপাতালে এস—জান না ?...

অপু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে উহাদের মুখের দিকে চাহিতেই ফণী বলিল—অনিল মারা গিয়েছে এই সাড়ে ছটার সময়—হঠাৎ।

সকলে ছুটিতে ছুটিতে হাসপাতালে গেল। অনিলের মৃতদেহ খাট হইতে নামাইয়া সাদা চাদর দিয়া ঢাকিয়া মেঝেতে রাখিয়াছে। বহু আত্মীয়স্বজনে কেবিন-ভরিয়া গিয়াছে, ক্লাসের অনেক ছেলে উপস্থিত, একদল ছেলে এইমাত্র এসেন্স ও ফুলের তোড়া লইয়া কেবিনে ঢুকিল। অল্পপরেই মৃতদেহ নিমতলায় লইয়া যাওয়া হইল।

সব কাজ শেষ হইতে রাত্রি তিনটা বাজিয়া গেল।

অন্য সকলে গঙ্গাস্নান করিতে লাগিল। অপু বলিল, তোমরা নাও, আমি গঙ্গায় নাইবো না, কলের জলে সকালবেলা নাইবো। কলকাতার গঙ্গায় নাইতে আমার মন যায় না।

অনিলের বাবার মত লোক সে কখনও দেখে নাই। এত বিপদেও তিনি সারারাত বাঁধানো চাতালে বসিয়া ধীরভাবে কাঠের নল বসানো সট্‌কাতে তামাক টানিতেছেন! অপুকে বার-দুই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—বাবা তোমার ঘুম লাগে নি তো ?···কোনও কষ্ট হয় তো বলো বাবা।

অপু শুনিয়া চোখের জল রাখিতে পারে নাই।

সুনীল সিগারেট কেসটা তাহার জিম্মায় রাখিয়া জলে নামিল, সে ঘাটের ধাপের উপর

বসিয়া রহিল। অন্ধকার আকাশে অসংখ্য জলজলে নক্ষত্র, রাত্রিশেষের আকাশে উজ্জ্বল সপ্তর্ষিমণ্ডল ওপারে জেসপ কোম্পানীর কারখানার মাথায় ঝুঁকিয়া পড়িতেছে, পূর্ব-আকাশে চিত্রা প্রত্যাসন্ন দিবালোকের মুখে মিলাইয়া যাইতেছে। অপু মনের মধ্যে কোনও শোক কি দুঃখের ভাব খুঁজিয়া পাইল না—কিন্তু মাত্র তিনদিন আগে কোম্পানীর বাগানে বসিয়া যেমন অনিলের সঙ্গে গল্প করিয়াছিল, সারা আকাশের অসংখ্য নক্ষত্ররাজির দিকে চাহিয়া বাল্যে নদীর ধারে বসিয়া সন্ধ্যার প্রথম নক্ষত্রটি দেখিবার দিনগুলির মত এক অপূর্ব, অবর্ণনীয় রহস্যের ভাবে তাহার মন পরিপূর্ণ হইয়া গেল—কেমন মনে হইতে লাগিল, কি একটা অসীম রহস্য ও বিপুলতার আবেগে নির্বাক নক্ষত্রজগৎটা যেন মুহূর্তে মুহূর্তে স্পন্দিত হইতেছে।

অনিলের মৃত্যুর পর অপু বড় মুষড়াইয়া পড়িল। কেমন এক ধরণের অবসাদ শরীরে ও মনে আশ্রয় করিয়াছে, কোন কাজে উৎসাহ আসে না, হাত-পা উঠে না।

বৈকালে ঘুরিতে ঘুরিতে সে কলেজ-স্কোয়ারের একখানা বেঞ্চির উপর বসিল। এতদিন তো এখানে রহিল, কিছুই স্থির হইল না, এভাবে আর কতদিন চলে? ভাবিল, না হয় অ্যাম্বুলেন্সে যেতাম, কলেজের অনেকে তো যাচ্ছে, কিন্তু মা কি তা যেতে দেবে?

পরে ভাবিল—বাড়ি চলে যাই, মাসখানেক অর্ডারলি রিট্রিট্ করা যাক।

পাশে একজন দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক অনেকক্ষণ হইতে বসিয়াছিলেন। মধ্যবয়সী লোক, চোখে চশমা, হাতের শিরগুলি দড়ির মত মোটা। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সাঁতারের ম্যাচ কবে হবে জানেন?

অপু জানে না, বলিতে পারিল না। ক্রমে দু-চার কথায় আলাপ জমিল। সাঁতারেরই গল্প। কথায় কথায় প্রকাশ পাইল—তিনি ইউরোপ ও আমেরিকার বহু স্থান ঘুরিয়াছেন। অপু কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিল।

ভদ্রলোক বলিলেন,—আমার নাম সুরেন্দ্রনাথ বসু মল্লিক—

অনেকদিনের একটা কথা অপুর মনে পড়িয়া গেল, সে সোজা হইয়া বসিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—আমি আপনাকে চিনি, আপনি অনেকদিন আগে বঙ্গবাসীতে ‘বিলাত যাত্রীর চিঠি’ লিখতেন।

—হ্যাঁ হ্যাঁ—ঠিক. সে দশ এগারো বছর আগেকার কথা—তুমি কি ক’রে জানলে? পড়তে না কি?

—ওঃ, শুধু পড়তাম না, হাঁ ক’রে বসে থাকতাম কাগজখানার জন্যে—তখন আমার বয়েস বছর দশ। পাড়াগাঁয়ে থাকতাম—কি inspiration যে পেতাম আপনার লেখা থেকে!···

ভদ্রলোকটি ভারী খুশী হইলেন। সে কি করে, কোথায় থাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। বলিলেন,—দ্যাখো কোথায় ব’সে কে লেখে আর কোথায় গিয়ে তার বীজ উড়ে পড়ে—বিলেতে হ্যাম্পস্টেডের একটা বোর্ডিং-এ ব’সে লিখতাম, আর বাংলার এক obscure পাড়াগাঁয়ের এক ছোট ছেলে আমার লেখা পড়ে—বাঃ-বাঃ—

ভদ্রলোকটির ব্যবসা-বাণিজ্যে খুব উৎসাহ দেখা গেল! মাদ্রাজে সমুদ্রের ধারে জমি লইয়াছেন, নারিকেল ও ভ্যানিলার চাষ করিবেন। নিঃসম্বল তেরো বৎসরের নিগ্রো বালককে ইউরোপে আসিয়া নিজের উপার্জন নিজে করিতে দেখিয়াছেন—দেশের যুবকদের চাসবাস করিতে উপদেশ দেন।

ভদ্রলোকটিকে আর অপুর অপরিচিত মনে হইল না। তাহার বাল্য-জীবনের কতকগুলি অবর্ণনীয়, আনন্দ-মুহূর্তের জন্য এই প্রৌঢ় ব্যক্তিটি দায়ী, ইহারই লেখার ভিতর দিয়া বাহিরের জগতের সঙ্গে সেই আনন্দ-ভরা প্রথম পরিচয়—

সম্পূর্ণ নতুন ধরণের উৎসাহ লইয়া সে ফিরিল। কে জানিত বঙ্গবাসীর সে লেখকের সঙ্গে এভাবে দেখা হইয়া যাইবে!···শুধু বাঁচিয়া থাকাই এক সম্পদ, তোমার বিনা চেষ্টাতেই এই অমৃতময়ী জীবনধারা প্রতি পলের রসপাত্র পূর্ণ করিয়া তোমার অন্যমনস্ক, অসতর্ক মনে অমৃত পরিবেশন করিবে···সে যে করিয়া হউক বাঁচিবে।

সন্ধ্যা ঠিক হয় নাই, উঠানে তেলি-বাড়ির বড় বৌ দাঁড়াইয়া কি গল্প করিতেছিল, দূর হইতে অপুকে আসিতে দেখিয়া হাসিমুখে বলিল—কে আসছে বলুন তো মা-ঠাক্‌রুণ?—সর্বজয়ার বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল, অপু নয় তো—অসম্ভব—সে এখন কেন—

পরক্ষণেই সে ছুটিয়া আসিয়া অপুকে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিল। সর্বজয়ার চোখের জলে তাহার জামার হাতটা ভিজিয়া উঠিল। মাকে যেন এবার নিজের অপেক্ষা মাথায় ছোট, দুর্বল ও অসহায় বলিয়া অপুর মনে হইতে লাগিল। তপঃকৃশ শবরীর মত ক্ষীণাঙ্গী, আলুথালু, অর্ধরুক্ষ চুলের গোছা একদিকে পড়িয়াছে, মুখের চেহারা এখনও সুন্দর, গ্রীবা ও কপালের রেখাবলী এখনও অনেকাংশে ঋজু ও সুকুমার। তবে এবার মায়ের চুল পাকিয়াছে, কানের পাশের চুলে পাক ধরিয়াছে। নিজের সবল দৃঢ় বাহুবেষ্টনে, সরলা, চিরদুঃখিনী মাকে সংসারের সহস্র দুঃখ-বিপদ হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে অপুর ইচ্ছা যায়। এ ভাবটা এইবার প্রথম সে মনের মধ্যে অনুভব করিল, ইতিপূর্বে কখনও হয় নাই।

বড়-বৌ একপাশে হাসিমুখে দাঁড়াইয়াছিল, সে অপুকে ছোট দেখিয়াছে এখন আর তাহাকে দেখিয়া ঘোমটা দেয় না। সর্বজয়া বলিল,—এবার ও এসেছে বৌমা, এবার কালই কিন্তু—

অপু নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কি খুড়ীমা, কাল কি?

বড়-বৌ হাসিয়া বলিল,—দেখো কাল,—আজ বলবো না তো!

খিচুড়ী খাইতে ভালবাসে বলিয়া সর্বজয়া অপুকে রাত্রে খিচুড়ী রাঁধিয়া দিল; পেট ভরিয়া খাওয়া ঘটিল, এই সাত-আটদিন পর আজ মায়ের কাছে। সর্বজয়া জিজ্ঞাসা করিল,—হ্যাঁ রে সেখানে খিচুড়ী খেতে পাস?

অপুর শৈশবে তাহার মা শত প্রতারণার আবরণে নগ্ন দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর রূপকে তাহাদের শিশুচক্ষুর আড়াল করিয়া রাখিত, এখন আবার অপুর পালা। সে বলিল,—হুঁ, বাদলা হলেই খিচুড়ী হয়।

—কি ডালের করে?

—মুগের বেশী, মসুরীরও করে, খাঁড়ি মসুরী।

—সকালে জলখাবার খেতে দেয় কি কি?

অপু প্রাতঃকালীন জলযোগের এক কাল্পনিক বিবরণ খুব উৎসাহের সহিত বিবৃত করিয়া গেল। মোহনভোগ, চা, এক-একদিন লুচিও দেয়। খাওয়ার বেশ সুবিধা!

প্রীতির টুইশানি কোন্‌কালে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু অপু সেকথা মাকে জানায় নাই; সর্বজয়া বলিয়া—হ্যাঁরে, তুই যে সে মেয়েটিকে পড়াস—তাকে কি ব'লে ডাকিস? খুব বড়লোকের মেয়ে, না?

—তার নাম ধরেই ডাকি—

—দেখতে-শুনতে বেশ ভাল?

—বেশ দেখতে—

—হ্যাঁ রে, তোর সঙ্গে বিয়ে দেয় না? বেশ হয় তা হ'লে—

অপু লজ্জারক্ত মুখে বলিল,—হ্যাঁ—তারা হ'ল বড়লোক—আমার সঙ্গে—তা কি কখনও—তোমার যেমন কথা!

সর্বজয়ার কিন্তু মনে মনে বিশ্বাস অপুর মত ছেলে পাইলে লোকে এখনি লুফিয়া লইবে। অপু ভাবে, তবুও তো মা আসল কথা কিছুই জানে না। প্রীতির টুইশানি থাকিলে কি আর না খাইয়া দিন যায় কলিকাতায়!

অপু দেখিল—সে যে টাকা পাঠায় নাই, মা একটিবারও সে-কথা উত্থাপন করিল না, শুধুই তাহার কলিকাতার অবস্থানের সুবিধা-অসুবিধা সংক্রান্ত নানা আগ্রহ-ভরা প্রশ্ন। নিজেকে এমনভাবে সর্বপ্রকারে মুছিয়া বিলোপ করিতে তাহার মায়ের মত সে আর কাহাকেও এ পর্যন্ত দেখে নাই। সে জানিত বাড়ি গেলে এ লইয়া মা কোন কথা তুলিবে না।

সর্বজয়া একটা এনামেলের বাটি ও গ্লাস ঘরের ভিতর হইতে আনিয়া হাসিমুখে বলিল,—এই ছাখ, এই ছ'খানা ছেঁড়া কাপড় বদলে তোর জন্যে নিইচি—বেশ ভালো, না?...কত বড় বাটিটা ছাখ।

অপু ভাবিল, মা যা ছাখে তাই বলে ভালো, এ আর কি ভালো, যদি আমার সেই পুরানো দোকানে কেনা প্লেটগুলো মা দেখতো!

কলিকাতার সে দুরূহ জীবন-সংগ্রামের পর এখানে বেশ আনন্দে ও নির্ভাবনায় দিন কাটে। রাত্রে মায়ের কাছে শুইয়া সে আবার নিজেকে ছেলেমানুষের মত মনে করে—বলে, সেই গানটা কি মা, ছেলেবেলায় তুমি আর আমি শুয়ে শুয়ে রাত্রে গাইতাম—এক-একদিন দিদিও—সেই চিরদিন কখনও সমান না যায়—কভু বনে বনে রাখালেরি সনে, কভু বা রাজত্ব পায়—

পরে আবদারের সুরে বলে—গাও না মা, গানটা?

সর্বজয়া হাসিয়া বলে—হাঁ, এখন কি আর গলা আছে—দূর—

—এসো দু'জনে গাই—এসো না মা—খুব হবে, এসো—

সর্বজয়ার মনে আছে—অপু যখন ছোট ছিল তখন কোনো কোনো মেয়ে-মজলিসে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের গান সেখানে হয়ত হইত, অপুর গলা ছিল খুব মিষ্টি কিন্তু তাহাকে প্রথমে কিছুতেই গান-গাওয়ানো যাইত না—অথচ যেদিন তাহার গাহিবার ইচ্ছা হইত, সেদিন মায়ের কাছে চুপি চুপি বার বার বলিত, আমি কিন্তু আজ গান গাইবো না, গাইতে বলো না। অর্থাৎ সেদিন তাকে এক-আধবার বলিলেই সে গাহিবে। সর্বজয়া ছেলের মন বুঝিয়া অমনি বলিত—তা অপু এবার কেন একটা গান কর্ না?…দু' একবার লাজুক মুখে অস্বীকার করার পর অমনি অপু গান শুরু করিয়া দিত।

সেই অপু এখন একজন মানুষের মত মানুষ। এত রূপ এ অঞ্চলের মধ্যে কে কবে দেখিয়াছে? একহারা চেহারা বটে, কিন্তু সবল, দীর্ঘ, শক্ত হাত-পা। কি মাথায় চুল, কি ডাগর চোখের নিষ্পাপ পবিত্র দৃষ্টি; রাঙা ঠোঁটের দু' পাশে বাল্যের সে সুকুমার ভঙ্গী এখনও বিলুপ্ত হয় নাই, শুধু সর্বজয়াই তাহা ধরিতে পারে।

অপু কিন্তু সে ছেলেবেলার অপু আর নাই। প্রায় সবই বদ্‌লাইয়া গিয়াছে, সে অপূর্ব হাসি, সে ছেলেমানুষী, সে কথায় কথায় মান অভিমান, অবদার, গলায় সে রিণ্‌রিণে মিষ্টি স্বর—এখনও অপুর স্বর খুবই মিষ্টি—তবুও সে অপরূপ বাল্যস্বর, সে চাঞ্চল্য—পাগলামি—সে সবের কিছুই নাই। সব ছেলেই বাল্যে সমান ছেলেমানুষ থাকে না, কিন্তু অপু ছিল মূর্তিমান শৈশব। সরলতায়, দুষ্টামিতে, রূপে,ভাবুকতায়—দেবশিশুর মত! এক ছেলে ছিল তাই কি,শত ছেলেতে কি হয়? সর্বজয়া মনে মনে বলে—বেশী চাই নে, দশটা পাঁচটা চাই নে ঠাকুর, ওকেই আর জন্মে আবার কোলজোড়া ক'রে দিও।

সর্বজয়ার জীবনের-পাত্র পরিপূর্ণ করিয়া অপু যে অমৃত শৈশবে পরিবেশন করিয়াছে, তারই স্মৃতি তার দুঃখ-ভরা জীবন-পথের পাথেয়। আর কিছুই সে চায় না।

কোনো কোনো দিন রাত্রে অপু মায়ের কাছে গল্প শুনিতে চায়। সর্বজয়া বলে—তুই তো কত ইংরেজী বই পড়িস, কত কি—তুই একটা গল্প বল না বরং শুনি। অপু গল্প করে। দু'জনে নানা পরামর্শ করে; সর্বজয়া পুত্রের বিবাহ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। কাঁটাদহের সাণ্ডাল বাড়ি নাকি ভালো মেয়ে আছে সে শুনিয়াছে, অপু পাশটা দিলেই এইবার…

তারপর অপু বলিল,—ভালোকথা মা—আজকাল জ্যেঠিমারা কলকাতার বাড়ি পেয়েছে যে! সেদিন তাদের বাড়ি গেছলাম—

সর্বজয়া বলে,—তাই নাকি?‥ তোকে খুব যত্নটত্ন করলে?—কি খেতে দিলে—

অপু নানা কথা সাজাইয়া বানাইয়া বলে। সর্বজয়া বলে,—আমায় একবার নিয়ে যাবি—কলকাতা কখনও দেখি নি, বট্‌ঠাকুরদের বাড়ি দুদিন থেকে মা-কালীর চরণ দর্শন ক'রে আসি তা হ'লে?…

অপু বলে,—বেশ তো মা, নিয়ে যাব; যেও সেই পূজোর সময়।

সর্বজয়া বলে,—একটা সাধ আছে অপু, বট্‌ঠাকুরদের দরুন নিশ্চিন্দিপুরের বাগানখানা তুই মানুষ হয়ে যদি নিতে পারতিস ভুবন মুখুয্যেদের কাছ থেকে, তবে—

সামান্য সাধ, সামান্য আশা। কিন্তু যার সাধ, যার আশা, তার কাছে তা ছোটও নয়, সামান্যও নয়। মায়ের ব্যথা কোন্‌খানে অপুর তাহা বুঝিতে দেরি হয় না। মায়ের অত্যন্ত ইচ্ছা নিশ্চিন্দিপুরে গিয়া বাস করা, সে অপু জানে। সর্বঃ বলে,—তুই মানুষ হ'লে, তোর একটা ভাল চাকরি হ'লে, তোর বৌ নিয়ে তখন আবার নিশ্চিন্দিপুরে গিয়ে ভিটেতে কোঠা উঠিয়ে বাস করবো। বাগানখানা কিন্তু যদি নিতে পারিস—বড় ইচ্ছে হয়।

অপুর কিন্তু একটা কথা মনে হয়, মা আর বেশীদিন বাঁচিবে না। মায়ের চেহারা অত্যন্ত রোগা হইয়া গিয়াছে এবার, কেবলই অসুখে ভুগিতেছে। মুখে যত রকম সান্ত্বনা দেওয়া, যত আশার কথা বলা—সব বলে। জানালার ধারে তক্তপোশে দুপুরের পর মা একটু ঘুমাইয়া পড়ে, অনেক বেলা পড়িয়া যায়। অপু কাছে আসিয়া বসে, গায়ে হাত দিয়া বলে,—গা যে তোমার বেশ গরম, দেখি ?

সর্বজয়া সে-সব কথা উড়াইয়া দেয়। এ-গল্প ও-গল্প করে। বলে,—হ্যাঁরে, অতসীর মা আমার কথা-টথা কিছু বলে ?

অপু মনে মনে ভাবে—মা আর বাঁচবে না—বেশী দিন। কেমন যেন—কেমন—কি ক'রে থাকব মারা গেলে ?

অনেক বেলা পড়িয়া যায়—

জানালার পাশেই একটা আতা গাছ। আতা-ফুলের মিষ্টি ভুরভুরে গন্ধ বৈকালের বাতাসে। একটু পোড়ো জমি। এক ঢিবি সুরকি। একটা চারা জামরুল গাছ। পুরানো বাড়ির দেয়ালের ধারে ধারে বনমূলার গাছ। কণ্টিকারীর ঝাড়। একটা জায়গার কঞ্চি দিয়া ঘিরিয়া সর্বজয়া শাকের ক্ষেত করিয়াছে।

একটা অদ্ভুত ধরণের মনের ভাব হয় অপুর। কেমন এক ধরণের গভীর বিষাদ…মায়ের এই সব ছোটখাটো আশা,তুচ্ছ সাধ—কত নিষ্ফল।…মা কি ওই শাকের ক্ষেতের শাক খাইতে পারিবে ?—কালীঘাটের কালীদর্শন করিবে জ্যাঠাইমার বাসায় থাকিয়া !…নিশ্চিন্দিপুরের আমবাগান…

এক ধরণের নির্জনতা…সঙ্গীহীনতার ভাব…মায়ের উপর গভীর করুণা…রাঙা রোদ মিলাইতেছে চারা জামরুল গাছটাতে…সন্ধ্যা ঘনাইতেছে। ছাতারে ও শালিক পাখির দল কিচ্-মিচ্ ও ঝটাপটি করিতেছে।…

অপুর চোখে জল আসিল…কি অদ্ভুত নির্জনতা-মাখানো সন্ধ্যাটা! মুখে হাসিয়া সস্নেহে মায়ের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল,—আচ্ছা, মা, বড় বোয়ের সঙ্গে বাজি রেখেছিলে কি নিয়ে—বলো না—বললে না তো সেদিন ?…

ছুটি ফুরাইলে অপু বাড়ি হইতে রওনা হইল।

স্টেশনে আসিয়া কিন্তু ট্রেন পাইল না, গহনার নৌকা আসিতে অত্যন্ত দেরি হইয়াছে, ট্রেন আধ ঘণ্টা পূর্বে ছাড়িয়া দিয়াছে।

সর্বজয়া ছেলের বাড়ি হইতে যাইবার দিনটাতে অন্যমনস্ক থাকিবার জন্য কাপড়, বালিশের

ওয়াড় সাজিমাটি দিয়া সিদ্ধ করিয়া বাঁশবনের ডোবার জলে কাচিতে নামিয়াছে—সন্ধ্যার কিছু পূর্বে অপু বাড়ির দাওয়ায় জিনিসপত্র নামাইয়া ছুটিয়া ডোবার ধারে গিয়া পিছন হইতে ডাকিল,—মা! ..

সর্বজয়া ভুলিয়া থাকিবার জন্য দুপুর হইতে কাপড় সিদ্ধ লইয়া ব্যস্ত আছে, চমকিয়া পিছন দিকে চাহিয়া আনন্দ-মিশ্রিত সুরে বলে,—তুই!—যাওয়া হ'ল না?

অপু হাসিমুখে বলে,—গাড়ি পাওয়া গেল না—এসো বাড়ি—

বাঁশবনের ছায়ায় মায়ের মুখে সেদিন যে অপূর্ব আনন্দের ও তৃপ্তির ছাপ পড়িয়াছিল, অপু পূর্বে কোনও দিন তাহা দেখে নাই—বহুকাল পর্যন্ত মায়ের এ মুখখানা তাহার মনে ছিল। সেদিন রাত্রে দু'জনে নানা কথা। অপু আবার ছেলেবেলাকার গল্প শুনিতে চায় মা'র মুখে—সর্বজয়া লজ্জিতসুরে বলে,—হ্যাঁ, আমার আবার গল্প!···সে সব ছেলেবয়েসের গল্প—তা বুঝি এখন শুনে তোর ভাল লাগবে? অপুকে আর সর্বজয়া বুঝিতে পারে না—এ সে ছোট্ট অপু নয়, যে ঠোঁট ফুলাইলেই সর্বজয়া বুঝিত ছেলে কি চাহিতেছে···এ কলেজের ছেলে, তরুণ অপু, এর মন, মতিগতি, আশা আকাঙ্ক্ষা—সর্বজয়ার অভিজ্ঞতার বাহিরে···অপু বলে,—না মা, তুমি সেই ছেলেবেলার শ্যামলঙ্কার গল্পটা করো। সর্বজয়া বলে,—তা আবার কি শুনবি—তুই বরং তোর বইয়ের একটা গল্প বল—কত ভালো গল্প তো পড়িস? ··

পরদিন সে কলিকাতায় ফিরিল।

কলেজ সেইদিনই প্রথম খুলিয়াছে, প্রমোশন পাওয়া ছেলেদের তালিকা বাহির হইয়াছে, নোটিশ বোর্ডের কাছে রথযাত্রার ভিড়—সে অধীর আগ্রহে ভিড় ঠেলিয়া নিজের নামটা আছে কিনা দেখিতে গেল।

আছে! দু'তিনবার বেশ ভাল করিয়া দেখিল। আরও আশ্চর্য এই যে, পাশেই যে সব ছেলে পাশ করিয়াছে অথচ বেতন বাকী থাকার দরুণ প্রমোশন পায় নাই, তাহাদের একটা তালিকা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যে অপুর নাম নাই, অথচ অপু জানে তাহারই সর্বাপেক্ষা বেশী বেতন বাকী!

সে ব্যাপারটা বুঝিতে না পারিয়া ভিড়ের বাহিরে আসিল। কেমন করিয়া এরূপ অসম্ভব সম্ভব হইল, নানাদিক হইতে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াও তখন কিছু ঠাহর করিতে পারিল না।

দু-তিনদিন পরে তাহার এক সহপাঠী নিজের প্রমোশন বন্ধ হওয়ার কারণ জানিতে অফিস-ঘরে কেরানীর কাছে গেল, সে-ও গেল সঙ্গে। হেড ক্লার্ক বলিল—একি ছেলের হাতের মোয়া হে ছোকরা! কত রোল?···পরে একখানা বাঁধানো খাতা খুলিয়া আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—এই দ্যাখো রোল টেন—লাল কালির মার্কা মারা রয়েছে—দু' মাসের মাইনে বাকী—মাইনে শোধ না দিলে প্রমোশন দেওয়া হবে না, প্রিন্সিপালের কাছে যাও, আমি আর কি করবো?

অপু তাড়াতাড়ি ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতে গেল—তাহার রোল নম্বর কুড়ি—একই পাতায়।

দেখিল অনেক ছেলের নামের সঙ্গে সঙ্গে কালিতে 'ডি' লেখা আছে অর্থাৎ ডিফল্টার—মাহিনা দেয় নাই। সঙ্গে সঙ্গে নামের উল্টাদিকে মন্তব্যের ঘরে কোন্ কোন্ মাসের মাহিনা বাকী তাহা লেখা আছে। কিন্তু তাহার নামটাতে কোন কিছু দাগ বা আঁচড় নাই—একেবারে পরিষ্কার মুক্তার মত হাতের লেখা জ্বলজ্বল করিতেছে—রায় অপূর্বকুমার—লাল কালির একটা বিন্দু পর্যন্ত নাই, ..

ঘটনা হয়ত খুব সামান্য, কিছুই না—হয়ত একটা সম্পূর্ণ কলমের ভুল, না হয় কেরানীর হিসাবের ভুল, কিন্তু অপুর মনে ঘটনাটা গভীর রেখাপাত করিল।

মনে আছে—অনেকদিন আগে ছেলেবেলায় তাহার দিদি যেবার মারা গিয়াছিল, সেবার শীতের দিনে বৈকালে নদীর ধারে বসিয়া ভাবিত, দিদি কি নরকে গিয়াছে? সেখানকার বর্ণনা সে মহাভারতে পড়িয়াছিল, ঘোর অন্ধকার নরকে শত শত বিকটাকার পাখী ও তাহাদের চেয়েও বিকটাকার যমদূতের হাতে পড়িয়া তাহার দিদির কি অবস্থা হইতেছে! কথাটা মনে আসিতেই বুকের কাছটায় কি একটা আটকাইয়া যেন গলা বন্ধ হইয়া আসিত—চোখের জলে কাশবন শিমুলগাছ ঝাপসা হইয়া আসিত, কি জানি কেন, সে তাহার হাস্যমুখী দিদির সঙ্গে মহাভারতোক্ত নরকের পারিপার্শ্বিক অবস্থার যেন কোন মতেই খাপ খাওয়াইতে পারিত না। তাহার মন বলিত, না—না—দিদি সেখানে নাই—সে জায়গা দিদির জন্য নয়।

তারপর ওপারে কাশবনে ম্লান সন্ধ্যার রাঙা আলো যেন অপূর্ব রহস্য মাখানো মনে হইত—আপনা আপনি তাহার শিশুমন কোন্ অদৃশ্য শক্তির নিকট হাতজোড় করিয়া প্রার্থনা করিত—আমার দিদিকে তোমরা কোন কষ্ট দিও না—সে অনেক কষ্ট পেয়ে গেছে—তোমাদের পায়ে পড়ি, তাকে কিছু বলো না—

ছেলেবেলার সে সহজ নির্ভরতার ভাব সে এখনও হারায় নাই। এই সেদিনও কলিকাতায় পড়িতে আসিবার সময়ও তাহার মনে হইয়াছিল—যাই না, আমি তো একটা ভাল কাজে যাচ্ছি—কত লোক তো কত চায়, আমি বিদ্যে চাইছি—আমার এর উপায় ভগবান ঠিক ক'রে দেবেন—। তাহার এ নির্ভরতা আরও দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাইয়াছিলেন দেওয়ানপুরের হেডমাস্টার মিঃ দত্ত। তিনি ছিলেন—ভক্ত ও বিশ্বাসী খৃস্টান। তিনি তাহাকে যে-সব কথা বলিতেন অন্য কোনও ছেলের সঙ্গে সে ভাবের কথা বলিতেন না। শুধু গ্রামার এ্যালজেব্রা নয়—কত উপদেশের কথা, গভীর বিশ্বাসের কথা, ঈশ্বর, পরলোক, অন্তরতম অন্তরের নানা গোপন বাণী। হয়ত বা তাঁহার মনে হইয়াছিল, এ বালকের মনের ক্ষেত্রে এসকল উপদেশ সময়ে অঙ্কুরিত হইবে।

শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি, রাস্তায় ফেরিওয়ালা হাঁকিতেছে, 'পেয়ারাফুলি আম', 'ল্যাংড়া আম'—দিনরাত টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি, পথঘাটে জল কাদা। এই সময়টার সঙ্গে অপুর কেমন একটা নিরাশ্রয়তা ও নিঃসম্বলতার ভাব জড়িত হইয়া আছে, আর-বছর ঠিক এই সময়টিতে

কলিকাতায় নূতন আসিয়া অবলম্বন-শূন্য অবস্থায় পথে পথে ঘুরিতে হইয়াছিল, কি না জানি হয়, কোথায় না জানি কি সুবিধা জুটিবে—এবারও তাই।

ঔষধের কারখানায় এবার আর স্থান হয় নাই। এক বন্ধুর মেসে দিনকতক উঠিয়াছিল, এখন আবার অন্য একটি বন্ধুর মেসে আছে। নানাস্থানে ছেলেপড়ানোর চেষ্টা করিয়া কিছুই জুটিল না, পরের মেসেই বা চলে কি করিয়া? তাহা ছাড়া এই বন্ধুটির ব্যবহার তত ভাল নয়, কেমন যেন বিরক্তির ভাব সর্বদাই—তাহার অবস্থা সবই জানে অথচ একদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, সে মেস খুঁজিয়া লইতে এত দেরি কেন করিতেছে—এ মাসটার পরে আর কোথাও সিট কি খালি পাওয়া যাইবে? অপু মনে বড় আহত হইল। একদিন তাহার হঠাৎ মনে হইল খবরের কাগজ বিক্রয় করিলে কেমন হয়? কলিকাতার খরচ চলে না? মাকেও তো···

অপু সব সন্ধান লইল। তিন পয়সা দিয়া নগদ কিনিয়া আনিতে হয় খবরের কাগজের অফিস হইতে, চার পয়সার বিক্রী, এক পয়সা লাভ কাগজ পিছু; কিন্তু মূলধন তো চাই; কাহারও কাছে হাত পাতিতে লজ্জা করে, দিবেই বা কে? এই কলিকাতা শহরে এমন একজনও নাই যে তাহাকে টাকা ধার দেয়। সে সুদ দিতে রাজী আছে। সমীরের কাছে যাইতে ইচ্ছা হয় না, সে ভাল করিয়া কথা কয় না! ভাবিয়া-চিন্তিয়া অবশেষে কারখানার তেওয়ারী-বৌয়ের কাছে গিয়া সব বলিল। তেওয়ারী-বৌ সুদ লইবে না। লুকাইয়া দু'টা মাত্র টাকা বাহির করিয়া দিল, তবে আশ্বিন মাসে তাহারা দেশে যাইবে, তাহার পূর্বে টাকাটা দেওয়া চাই।

ফিরিবার পথে অপু ভাবিল···বহুর পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে করে, মায়ের মত দ্যাখে, আহা কি ভালো লোক!

পরদিন সকালে সে ছুটিল অমৃতবাজার পত্রিকা অফিসে! সেখানে কাগজ-বিক্রেতাদের মারামারি, সবাই আগে কাগজ চায়। অপু ভিড়ের মধ্যে ঢুকিতে পারিল না—কাগজ পাইতে বেলা হইয়া গেল। তাহার পর আর এক নূতন বিপদ—অন্য কাগজওয়ালাদের মত কাগজ হাঁকিতে পারা তো দূরের কথা, লোকে তাহার দিকে চাহিলে সে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, গলা দিয়া কোনও কথা বাহির হয় না। সকলেই তাহার দিকে চায়, সুশ্রী সুন্দর ভদ্রলোকের ছেলে কাগজ বিক্রয় করিতেছে, এ দৃশ্য তখনকার সময়ে কেহ দেখে নাই—অপু ভাবে—বা রে, আমি কি চড়কের নতুন সঙ্ নাকি? খানিক দূরে আর একটা জায়গায় চলিয়া যায়। কাহাকেও বিনীতভাবে মুখের দিকে না চাহিয়া বলে—একখানা খবরের কাগজ নেবেন? অমৃতবাজার?

কলেজে যাইবার পূর্বে মাত্র আঠারোখানি বিক্রয় হইল। বাকীগুলি এক খবরের কাগজের ফেরিওয়ালা তিন পয়সা দরে কিনিয়া লইল। পরদিন লজ্জাটা অনেকটা কমিল, ট্রামে অনেকগুলি কাগজ কাটিল, বোধ হয় বাঙালী ভদ্রলোকের ছেলে বলিয়াই তাহার নিকট হইতে অনেকে কাগজ লইল।

মাসের শেষে একদিন কলেজ লাইব্রেরীতে সে বসিয়া আছে, হঠাৎ হলে খুব হৈ-চৈ উঠিল।

গিয়া দেখে কোথাকার একজন ছেলে লাইব্রেরীর একখানা বই চুরি করিয়া পালাইতেছিল, ধরা পড়িয়াছে—তাহারই গোলমাল। অপু তাহাকে চিনিল—একদিন আর বছর সে ঠাকুরবাড়িতে খাইতে যাইতেছিল। ওই ছেলেটিও বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটের দত্তবাড়ি দরিদ্র ছাত্র হিসাবে খাইতে যাইতেছিল, শীতের রাত্রি, খুব বৃষ্টি আসাতে দু'জনে এক গাড়ি-বারান্দার নীচে ঝাড়া দু'ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকে। ছেলেটি তখন অনেক দূর হইতে হাঁটিয়া অতদূর খাইতে যায় শুনিয়া অপুর মনে বড় দয়া হয়। সে নাম জানিত, মেট্রোপলিটন কলেজে থার্ড ইয়ারের ছেলে তাহাও জানিত, কিন্তু কোনও কথা প্রকাশ করিল না। কলেজ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পুলিসের হাতে দিবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন, দর্শনের অধ্যাপক বৃদ্ধ প্রসাদদাস মিত্র মধ্যস্থতা করিয়া ছাড়িয়া দিলেন।

অপুর মনে বড় আঘাত লাগিল—সে পিছু পিছু গিয়া অখিল মিস্ত্রি লেনের মোড়ে ছেলেটিকে ধরিল। ছেলেটির নাম হরেন। সে দিশাহারার মত হাঁটিতেছিল, অপুকে চিনিতে পারিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল! অত্যন্ত অচল হইয়াছে, ছেঁড়া কাপড়, চারিদিকে দেনা, দত্তবাড়ি আজকাল আর খাইতে দেয় না—বর্ধমান জেলায় দেশ, এখানে কোনও আত্মীয়স্বজন নাই। অপু মির্জাপুর পার্কে একখানা বেঞ্চিতে তাহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া বসাইল, ছেলেটার মুখে বসন্তের দাগ, রং কালো, চুল রুক্ষ, গায়ের শার্ট কব্জির অনেকটা উপর পর্যন্ত ছেঁড়া। অপুর চোখে জল আসিতেছিল, বলিল—তোমাকে একটা পরামর্শ দিই শোনো—খবরের কাগজ বিক্রি করবে? বাদামভাজা খাওয়া যাক্—এসো—এই বাদামভাজা—

পূজা পর্যন্ত দুজনের বেশ চলিল। পূজার পরই পুনর্মূষিক—তেওয়ারী-বৌয়ের দেনা শোধ করিয়া যাহা থাকিল, তাহাতে মাসিক খরচের কিছু অংশ কুলান হয় বটে, বেশীটাই হয় না। সেকেণ্ড ইয়ারের টেস্ট পরীক্ষাও হইয়া গেল, এইবারই গোলমাল—সারা বছরের মাহিনা ও পরীক্ষার ফী দিতে হইবে অল্পদিন পরেই।

উপায় কিছুই নাই। সে কাহারও কাছে কিছু চাহিতে পারিবে না। হয়ত পরীক্ষা দেওয়াই হইবে না। সত্যই তো, এত টাকা—এ তো আর ছেলেখেলা নয়? মন্মথকে একদিন হাসিয়া সব কথা খুলিয়া বলে। মন্মথ শুনিয়া অবাক হইয়া গেল, বলিল—এসব কথা আগে জানাতে হয় আমাকে। মন্মথ সত্যই খুব খাটিল। নিজের দেশের বার লাইব্রেরিতে চাঁদা তুলিয়া প্রায় পঞ্চাশ টাকা আনিয়া দিল, কলেজে প্রফেসারদের মধ্যে চাঁদা তুলিয়া ফেলিল, অল্পদিনের মধ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে অনেকগুলি টাকা আসিতে দেখিয়া অপু নিজেই আশ্চর্য হইয়া গেল। কিন্তু বাকী বেতন একরূপ শোধ হইলেও তখনও পরীক্ষার ফি-এর এক পয়সাও জোগাড় হয় নাই, মন্মথ ও বৌবাজারের সেই ছেলেটি বিশ্বনাথ—দু'জনে মিলিয়া ভাইস-প্রিন্সিপ্যালকে গিয়া ধরিল, অপূর্বকে কলেজের বাকী বেতন কিছু ছাড়িয়া দিতে হইবে।

এদিকে ঔষধের কারখানায় থাকিবার সুবিধার জন্ত অপু পুনরায় কারখানার ম্যানেজারের নিকটে গেল। এই মাসতিনেক যদি সেখানে থাকিবার সুবিধা পায়, তবে পরীক্ষার পড়াটা

করিতে পারে। এর-ওর-তার মেসে সারা বছর অস্থিতপঞ্চকভাবে থাকিয়া তেমন পড়াশুনা হয় নাই। কারখানার আর সকলে অপুকে চিনিত, পছন্দও করিত, তাহারা বলিল—ওহে, তুমি একবার মিঃ লাহিড়ীর কাছে যেতে পার? ওর কাছে বলাই ভুল—মিঃ লাহিড়ী কারখানার একজন ডিরেক্টর, তার চিঠি যদি আনতে পার, ও সুড়-সুড় ক'রে রাজী হবে এখন। ঠিকানা লইয়া অপু উপরি উপরি তিন-চার দিন ভবানীপুরে মিঃ লাহিড়ীর বাড়িতে গেল, দেখা পাইল না,—বড়লোকের গাড়িবারান্দার ধারে বেঞ্চের উপর বসিয়া বসিয়া চলিয়া আসে। দিনকতক কাটিল।

সেদিন রবিবার। ভাবিল, আজ আর দেখা না করিয়া আসিবে না। মিঃ লাহিড়ী বাড়ি নাই বটে, তবে বেলা এগারোটার মধ্যে আসিবেন। খানিকক্ষণ বসিয়া আছে, এমন সময় একজন ঝি আসিয়া বলিল—আপনাকে দিদিমণি ডাকছেন—

অপু আশ্চর্য হইয়া গেল। কোন্ দিদিমণি তাহাকে ডাকিবেন এখানে? সে বিস্ময়ের সুরে বলিল—আমাকে? না—আমি তো—

ঝি ভুল করে নাই, তাহাকেই। ডানধারে একটা বড় কামরা, অনেকগুলা বড় বড় আলমারী, প্রকাণ্ড বনাত-মোড়া টেবিল, চামড়ার গদি-আঁটা আরাম চেয়ার ও বসিবার চেয়ার। সরু বারান্দা পার হইয়া একটা চকমিলানো ছোট পাথর-বাঁধানো উঠান। পাশের ছোট ঘরটায় হাতল-হীন চেয়ারে একটি আঠারো-উনিশ বছর বয়সের তরুণী বসিয়া টেবিলে বই কাগজ ছড়াইয়া কি লিখিতেছে, পরণে সাদাসিদে আটপৌরে লালপাড় শাড়ি, ব্লাউজ, ঢিলে-খোঁপা, গলায় সরু চেন, হাতে প্লেন বালা—অপরূপ সুন্দরী! সে ঘরে ঢুকিতেই মেয়েটি হাসিমুখে চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

অপু স্বপ্ন দেখিতেছে না তো? সকালে সে আজ কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছে!··· নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করিয়াও করা যায় না—আপনা-আপনি তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল—লীলা!

লীলা মৃদু মৃদু হাসিমুখে তাহার দিকে চাহিয়া ছিল। বলিল—চিনতে পেরেছেন তো দেখছি? আপনাকে কিন্তু চেনা যায় না—ওঃ কতকাল পর—আট বছর খুব হবে—না?

অপু এতক্ষণ পর কথা ফিরিয়া পাইল। সম্মুখের এই অনিন্দ্যসুন্দরী তরুণী লীলাও বটে, না-ও বটে। কেবল হাসির ভঙ্গি ও একধরণের হাত রাখিবার ভঙ্গিটা পরিচিত পুরানো।

সে বলিল, আট বছর—হ্যাঁ তা—তো—তোমাকেও দেখলে চেনা যায় না! অপু 'আপনি' বলিতে পারিল না, মুখে বাধিল, লীলার সম্বোধনে সে মনে আঘাত পাইয়াছিল।

লীলা বলিল—আপনাকে দু'দিন দেখেছি, পরশু কলেজে যাবার সময় গাড়িতে উঠছি, দেখি কে একজন গাড়িবারান্দার ধারে বেঞ্চিতে ব'সে—দেখে মনে হ'ল কোথায় দেখেছি যেন—আবার কালও দেখি ব'সে—আজ সকালে বাইরের ঘরে খবরের কাগজখানা এসেছে কিনা দেখতে জানলা দিয়ে দেখি আজও ব'সে—তখন হঠাৎ মনে হ'ল আপনি···তখনই ঝিকে

বলেছি, মা আসছেন—কি করছেন কলকাতায় ? রিপনে ?—বাঃ, তা এতদিন আছেন, একদিন এখানে আসতে নেই ?

বাল্যের সেই লীলা !—একজন অত্যন্ত পরিচিত, অত্যন্ত আপনার লোক যেন দূরে চলিয়া গিয়া পর হইয়া পড়িয়াছে। 'আপনি' বলিবে না 'তুমি' বলিবে, দিশাহারা অপু তাহা ঠাহর করিতে পারিল না। বলিল,—কি ক'রে আসব ? আমি কি ঠিকানা জানি ?

লীলা বলিল—ভাল কথা, আজ এখানে হঠাৎ কি ক'রে এসে পড়লেন ?

অপু লজ্জায় বলিতে পারিল না যে, সে এখানে থাকিবার স্থানের সুপারিশ ধরিতে আসিয়াছে। লীলা জিজ্ঞাসা করিল—মা ভাল আছেন ? বেশ—আপনার বুঝি সেকেণ্ড ইয়ার ? আমার ফার্স্ট ইয়ার আর্টস্।

একটি মহিলা ঘরে ঢুকিলেন। অপু চিনিল, বিস্মিতও হইল। লীলার মা মেজ-বৌরানী, কিন্তু বিধবার বেশ। আট দশ বৎসর পূর্বের সে অতুলনীয় রূপরাশি এখনও একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া না গেলেও দেখিলে হঠাৎ চেনা যায় না। অপু পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল। মেজ-বৌরানী বলিলেন—এসো বাবা এসো, লীলা কালও একবার বলেছে, কে এক জন বসে আছে মা, ঠিক বর্ধমানের সেই অপূর্বর মত—আজ আমাকে গিয়ে বললে, ও আর কেউ নয় ঠিক অপূর্ব—তখুনি আমি ঝিকে দিয়ে ডাকতে পাঠালাম—বসো, দাঁড়িয়ে কেন বাবা ? ভাল আছ বেশ ? তোমার মা কোথায় ?

অপু সঙ্কুচিতভাবে কথার উত্তর দিয়া গেল। মেজ-বৌরানীর কথায় কি আন্তরিকতার সুর ! যেন কত কালের পুরাতন পরিচিত আত্মীয়তার আবহাওয়া। অপু কি করিতেছে, কোথায় থাকে, মা কোথায় থাকেন, কি করিয়া চলে, এবার পরীক্ষা দিয়া পুনরায় পড়িবে কি না, নানা খুঁটিনাটি প্রশ্ন। তারপর তিনি চা ও খাবারের বন্দোবস্ত করিতে বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেলে—অপু বলিল—ইয়ে, তোমার বাবা কি—

লীলা ধরা গলায় বলিল—বাবা তো, এই তিন বছর হ'ল—এটা মামার বাড়ি—

অপু বলিল—ও ! তাই ঝি বললে দিদিমণি ডাকছেন।—মানে উনি—না ?···মিঃ লাহিড়ী কে হন তোমার ?

—দাদামশায়—উনি ব্যারিস্টার, তবে আজকাল আর প্র্যাক্‌টিশ করেন না—বড় মামা হাইকোর্টে বেরুচ্ছেন আজকাল। ও-বছর বিলেত থেকে এসেছেন।

চা ও খাবার খাইয়া অপু বিদায় লইল। লীলা বলিল—বড় মামার মেয়ের নেম্-ডে পার্টি, সামনের বুধবারে। এখানে বিকেলে আসবেন অবিশ্যি অপূর্ববাবু—ভুলবেন না যেন—ঠিক কিন্তু ভুলবেন না।

পথে আসিয়া অপুর চোখে প্রায় জল আসিল। 'অপূর্ববাবু' !—

লীলাই বটে, কিন্তু ঠিক কি সেই এগারো বছরের কৌতুকময়ী সরলা স্নেহময়ী লীলা ?··· সে লীলা কি তাহাকে 'অপূর্ববাবু' বলিয়া ডাকিত ? তবুও কি আন্তরিকতা ও আত্মীয়তা !··· আর নিজের আপনার লোক জ্যাঠাইমাও তো কলিকাতায় আছেন—মেজ-বৌরানী সম্পূর্ণ

পর হইয়া আজ তাহার বিষয়েতে যত খুঁটিনাটি আন্তরিক আগ্রহে প্রশ্ন করিলেন, জ্যাঠাইমা কোনও দিন তাহা করিয়াছেন ?…

বাসায় ফিরিয়া কেবলই লীলার কথা ভাবিল। তাহার মনের যে স্থান লীলা দখল করিয়া আছে ঠিক সে স্থানটিতে আর কেহই তো নাই! কিন্তু সে এ লীলা নয়। সে লীলা স্বপ্ন হইয়া কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে—আর কি তাহার দেখা মিলিবে কোনও কালে? সে ঠিক বুঝিতে পারিল না—আজকার সাক্ষাতে সে আনন্দিত হইয়াছে কি ব্যথিত হইয়াছে।

বুধবারের পার্টির জন্য সে টুইল শার্টটা সাবান দিয়া কাচিয়া লইল। ভাবিল, নিজের যাহা আছে তাহাই পরিয়া যাইবে, চাহিবার চিন্তিবার আবশ্যক নাই। তবুও যেন বড় হীনবেশ হইল। মনে মনে ভাবিল, হাতে যখন পয়সা ছিল, তখন লীলার সঙ্গে দেখা হ'ল না—আর এখন একেবারে এই দশা, এখন কিনা—!

লীলার দাদামশায় মিঃ লাহিড়ী খুব মিশুক লোক। অপুকে বৈঠকখানায় বসাইয়া খানিকটা গল্পগুজব করিলেন। লীলা আসিল, সে ভারি ব্যস্ত, একবার দু-চার কথা বলিয়াই চলিয়া গেল। কোনও পার্টিতে কেহ কখনও তাহাকে নিমন্ত্রণ করে নাই। যখন এক এক করিয়া নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক ও মহিলাগণ আসিতে আরম্ভ করিলেন, তখন অপু খুব খুশী হইল। কলিকাতা শহরে এ রকম ধনী উচ্চশিক্ষিত পরিবারে মিশিবার সুযোগ—এ বুঝি সকলের হয়? মাকে গিয়া গল্প করিবার মত একটা জিনিস পাইয়াছে এতদিন পরে! মা শুনিয়া কি খুশীই যে হইবে!

বৈঠকখানায় অনেক সুবেশ যুবকের ভিড়, প্রায় সকলেই বড়লোকের ছেলে, কেহ বা নতুন ব্যারিস্টারী পাশ করিয়া আসিয়াছে, কেহ বা ডাক্তার, বেশীর ভাগ বিলাত-ফেরত। কি লইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া তর্ক হইতেছিল। কর্পোরেশন ইলেক্‌শন লইয়া কথা কাটাকাটি। অপু এ বিষয়ে কিছু জানে না, সে একপাশে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

পাড়াগাঁয়ের কোন একটা মিউনিসিপ্যালিটির কথায় সেখানকার নানা অসুবিধার কথাও উঠিল।

একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক, মাথায় কাঁচাপাকা চুল, চোখে সোনা-বাঁধানো চশমা, একটু টানিয়া টানিয়া কথা বলিবার অভ্যাস, মাঝে মাঝে মোটা চুরুটে টান দিয়া কথা বলিতেছিলেন—দেখুন মিঃ সেন, এগ্রিকালচারের কথা যে বলছেন, ও শখের ব্যাপার নয়—ও কাজ আপনার আমার নয়, ইট্ মাস্ট বি ব্রেড্ ইন্ দি বোন্—জন্মগত একটা ধাত গড়ে না উঠলে শুধু কলের লাঙ্গল কিনলে ও হয় না—

প্রতিপক্ষ একজন ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসরের যুবক, সাহেবী পোশাক-পরা, বেশ সবল ও সুস্থকায়। তিনি অধীরভাবে সামনে ঝুঁকিয়া বলিলেন—মাপ করবেন রমেশবাবু, কিন্তু একথায় কোনও ভিত্তি আছে ব'লে আমার মনে হয় না। আপনি কি বলতে চান তা হ'লে এডুকেশন, অর্গ্যানিজেশন, ক্যাপিটাল—এসবের মূল্য নেই এগ্রিকালচারে? এই যে—

—আছে, সেকেণ্ডারী—

—তবে চাষার ছেলে ভিন্ন কোনও শিক্ষিত লোক কখনও ওসবে যাবে না?···কারণ ইট্‌ ইজ্‌ নট ব্রেড্‌ ইন্‌ হিজ বোন্‌? অদ্ভুত কথা আপনার—আমার সঙ্গে কেম্ব্রিজে একজন আইরিশ ছাত্র পড়ত—লম্বা লম্বা চুল মাথায়, সুন্দর চেহারা, ধরণধারণে ট্রু পোয়েট। হয়ত সারারাত জেগে হল্লা করছে, একটা বেহালা নিয়ে বাজাচ্ছে—আবার হয়ত দেখুন সারাদিন পড়ছে, ব'সে কি লিখছে—নয় তো ভাবছে—ডিগ্রী নিয়ে চলে গেল বেরিয়ে ক্যানাডায়—গবর্ণমেণ্ট হোমস্টেড্‌ ল্যাণ্ডে জংলী জমি নিলে—ছোট্ট একটা কাঠের কুঁড়েঘরে সেই দুর্ধর্ষ শীতের মধ্যে তিন-চার বৎসর কাটালে—হোমস্টেড্‌ ল্যাণ্ডের নিয়ম হচ্ছে টাইট্‌ল হবার আগে পাঁচ বৎসর জমির ওপর বাস করা চাই—থেকে জমি পরিষ্কার করলে, নিজের হাতে রোজ জমি সাফ করে—লোকজন নেই, দুশো একর জমি, ভাবুন কতদিনে—

ওদিকে একদলের মধ্যে আলোচনা বেশ ঘনাইয়া আসিল। একজন কে বলিয়া উঠিল—ওসব মর‍্যালিটী, আপনি যা বলছেন, সেকেলে হয়ে পড়েছে—এটা তো মানেন যে, ওসব তৈরি হয়েছে বিশেষ কোনও সামাজিক অবস্থায়, সমাজকে বা ইন্‌ডিভিডুয়ালকে প্রোটেক্‌শান্‌ দেবার জন্যে, সুতরাং—

—বটে, তাহ'লে সবাই সুবিধাবাদী আপনারা। নর্ম্যাটিভ ভ্যালু ব'লে কোনও কিছুর স্থান নেই দুনিয়ায়?...ধরুন যদি—

অপু খুব খুশী হইল। কলিকাতার বড়লোকের বাড়ির পার্টিতে সে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছে, তাহা ছাড়া শিক্ষিত বিলাত-ফেরত দলের মধ্যে এভাবে। নাটক-নভেলে পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতা কখনও হয় নাই। সে অতীব খুশীর সহিত চারিধারে চাহিয়া একবার দেখিল—মার্বেলের বড় ইলেক্‌ট্রিক ল্যাম্প কড়ি হইতে ঝুলিতেছে, সুন্দর ফুলকাটা ছিটের কাপড়ে ঢাকা কৌচ, সোফা, দামী আয়না—বড় বড় গোলাপ, মোরাদাবাদের পিতলের গোলাপদানী। নিজের বসিবার কৌচখানা সে দু-একবার অপরের অলক্ষিতে টিপিয়া টিপিয়া দেখিল। তাহা ছাড়া এ-ধরণের কথাবার্তা—এই তো সে চায়! কোথায় সে ছিল পাড়াগাঁয়ের গরীব ঘরের ছেলে—তিন ক্রোশ পথ হাঁটিয়া মামজোয়ানের স্কুলে পড়িতে যাইত, সে এখন কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে! এ-ধরণের একটা উৎসবের মধ্যে তাহার উপস্থিতি ও পাঁচজনের একজন হইয়া বসিবার আত্মপ্রসাদে ঘরের তাবৎ উপকরণ ও অনুষ্ঠানকে যেন সে সারা দেহ-মন দ্বারা উপভোগ করিতেছিল।

কৃষিকার্যে উৎসাহী ভদ্রলোকটি অন্য কথা তুলিয়াছেন, কিন্তু অপুর দক্ষিণ ধারের দলটি পূর্ব আলোচনাই চালাইতেছেন এখনও। অপুর মনে হইল সে-ও এ-আলোচনায় যোগদান করিবে, আর হয়ত এ-ধরণের সম্ভ্রান্ত সমাজে মিশিবার সুযোগ জীবনে কখনও ঘটিবে না। এই সময় দু-এক কথা এখানে বলিলে সে-ও তো একটা আত্মপ্রসাদ। ভবিষ্যতে ভাবিয়া আনন্দ পাওয়া যাইবে। পাঁস-নে চশমা-পরা যুবকটির নাম হীরক সেন। নতুন পাশ-করা ব্যারিস্টার। মুখে বেশ বুদ্ধির ছাপ—কি কথায় সে বলিল—ওসব মানি নে বিমলবাবু, দেহ একটা এঞ্জিন—এঞ্জিনের যতক্ষণ স্টীম থাকে, চলে—যেই কলকব্জা বিগড়ে যায়, সব বন্ধ—

অপু অবসর খুঁজিতেছিল, এই সময় তাহার মনে হইল এ-বিষয়ে সে কিছু কথা বলিতে পারে। সে দু একবার চেষ্টা করিয়া সাহস সঞ্চয় করিয়া কতকটা আনাড়ী, কতকটা মরীয়ার মত আরক্তমুখে বলিল—দেখুন মাপ করবেন, আমি আপনার মতে ঠিক মত দিতে পারি নে—দেহটাকে এঞ্জিনের সঙ্গে তুলনা করুন ক্ষতি নেই, কিন্তু যদি বলেন দেহ ছাড়া আর কিছু নেই—

ঘরের সকলেই তাহার দিকে যে কতকটা বিস্ময়ে, কতকটা কৌতুকের সহিত চাহিতেছে, সেটুকু সে বুঝিতে পারিল—তাহাতে সে আরও অভিভূত হইয়া পড়িল—সঙ্গে সঙ্গে সেটুকু চাপিবার চেষ্টায় আরও মরীয়া হইয়া উঠিল।

একজন বাধা দিয়া বলিল—মশায় কি করেন, জানতে পারি কি ?

—আমি এবার আই-এ দেবো।

পাঁস-নে চশমা-পরা যে যুবকটি এঞ্জিনের কথা তুলিয়াছিল, সে বলিল,—ইউনিভার্সিটির আরও দু-ক্লাস পড়ে এ তর্কগুলো করলে ভাল হয় না ?

সে এমন অতিরিক্ত শান্তভাবে কথাগুলি বলিল যে, ঘরসুদ্ধ লোক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। অপুর মুখ দাড়িমের মত লাল হইয়া উঠিল।

যদি সে পূর্ব হইতেই ধারণা করিয়া না লইত যে, সে এ-সভায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র এবং উহারা দয়া করিয়া তাহার এখানে উপস্থিতি সহ্য করিতেছে—তাহা হইলে এমন উগ্র ও অভদ্রভাবের প্রত্যুত্তরে হয়ত তাহার রাগ হইত—কিন্তু সে তো কোনও কিছুতেই এদের সমকক্ষ নয়!—রাগ করিবার মত ভরসা সে নিজের মধ্যে খুঁজিয়া পাইল না। তার অত্যন্ত লজ্জা হইল—এবং সঙ্গে সঙ্গে সেটা ঢাকিবার জন্য সে আরও মরীয়ার সুরে বলিল—ইউনিভার্সিটির ক্লাসে না পড়লে যে কিছু জানা যায় না একথা আমি বিশ্বাস করি নে—আমি একথা বলতে পারি কোনও ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র যে-কোনও কলেজের হিস্ট্রিতে কি ইংলিশ পোইট্রিতে—কিংবা জেনারেল নলেজে পারবে না আমার সঙ্গে।

নিতান্ত অপটু ধরণের কথা—সকলে আরও একদফা হাসিয়া উঠিল।

তারপর তাহারা নিজেদের মধ্যে অন্য কথাবার্তায় প্রবৃত্ত হইল। অপু আধঘণ্টা থাকিলেও তাহার অস্তিত্বই যেন সকলে ভুলিয়া গেল। উঠিবার সময় তাহারা নিজেদের মধ্যে করমর্দন ও পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল, তাহার দিকে কেহ ফিরিয়াও চাহিল না।

যেভাবে সকলে তাহাকে উড়াইয়া দিল, বা মানুষের মধ্যে গণ্য করিল না, তাহাতে সত্যই অপু অপমান ও লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়িল। তাহার পাশ কাটাইয়া সকলে চলিয়া গেল—কেহ একটা প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করিল না, তাহার সম্বন্ধে কেহ কোন কৌতূহলও দেখাইল না। অপু মনে মনে ভাবিল—বেশ. না বলুক কথা—আমি কি জানি না-জানি, তার খবর ওরা কি জানে ? সে জানত অনিল...

সে চলিয়া যাইতেছে, এমন সময় লীলা আসিয়া তাহাকে নিজে বাড়ির মধ্যে লইয়া গেল। বলিল,—মা, অপূর্ববাবু না খেয়েই চুপি চুপি পালাচ্ছিলেন !

লীলা বৈঠকখানায় ব্যাপারটা না জানিতে পারে ..

একটি ছোট আট-নয় বৎসরের ছেলেকে দেখাইয়া বলিল—একে চেনেন অপূর্ববাবু? এ সেই খোকামণি, আমার ছোট ভাই, এর অন্নপ্রাশনেই আপনাকে একবার আসতে বলেছিলুম, মনে নেই?

লীলার কয়েকটি সহপাঠিনী সেখানে উপস্থিত, সে সকলকে বলিল—তোমরা জান না, অপূর্ববাবুর গলা খুব ভাল, তবে গান গাইবেন কিনা জানি নে, মানে বেজায় লাজুক, আমি ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি, একটা অনুরোধ রাখবেন অপূর্ববাবু?

অপু অনেকের অনুরোধ-উপরোধে অবশেষে বলিল—আমি বাজাতে জানি নে—কেউ যদি বরং বাজান!—

খাওয়াটা ভালই হইল! তবুও রাত্রে বাসায় ফিরিতে ফিরিতে তাহার মনে হইতেছিল—আর কখনও এখানে সে আসিবে না। বড়লোকের সঙ্গে তাহার কিসের খাতির—দরকার কি আসিবার? একটা দারুণ অতৃপ্তি।

যেদিন অপুর পরীক্ষা আরম্ভ হইবে তাহার দিন-পাঁচেক আগে অপু পত্রে জানিল মায়ের অসুখ, হস্তাক্ষর তেলি-বাড়ির বড় বৌয়ের।

সন্ধ্যার সময় অপু বাড়ি পৌঁছিল।

সর্বজয়া কাঁথা গায়ে দিয়া শুইয়া আছে, দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া মনে হয়। অপুকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। অনেক দিন হইতেই অসুখে ভুগিতেছে, পরীক্ষার পড়ার ব্যাঘাত হওয়ার ভয়ে খবর দেয় নাই, সেদিন তেলি-বৌ জোর করিয়া নিজে পত্র দিয়াছে। এমন যে কিছু শয্যাগত অবস্থা তাহা নয়, খায়-দায়, কাজকর্ম করে। আবার অসুখও হয়। সন্ধ্যা হইলেই শয্যা আশ্রয় করে, আবার সকালে উঠিয়া গৃহকর্ম শুরু করে। চিরদিনের গৃহিনীপনা এ অসুস্থ শরীরেও তাহাকে ত্যাগ করে নাই।

অপু বলিল—উঠো না বিছানা থেকে মা—শুয়ে থাকো—দেখি গা!

—তুই আয় বোস্—ও কিছু না—একটু জ্বর হয়, খাই-দাই—ও এমন সময়ে হয়েই থাকে। বোশেখ মাসের দিকে সেরে যাবে—তুই যে মেয়েকে পড়াস, সে ভাল আছে তো?

সর্বজয়ার রোগশীর্ণ মুখের হাসিতে অপুর চোখে জল আসিল। সে পুঁটুলি খুলিয়া গোটাকতক কমলালেবু, বেদানা, আপেল বাহির করিয়া দেখাইল। জিনিসপত্র সস্তায় কিনিতে পারিলে সর্বজয়া ভারি খুশী হয়। অপু জানে মাকে আমোদ দিবার এটা একটা প্রকৃষ্ট প্রন্থা। কমলালেবুগুলা দেখাইয়া বলে—কত সস্তায় কলকাতায় জিনিসপত্র পাওয়া যায় দ্যাখো—লেবুগুলো দশপয়সা—

প্রকৃতপক্ষে লেবু-ক'টির দাম ছ' আনা।

সর্বজয়া আগ্রহের সহিত বলিল—দেখি? ওমা, এখানে যে ওগুলোর দাম বারো আনার কম নয়—এখানে সব ডাকাত।

চার পয়সার এক তাড়া পান দেখাইয়া বলিল—বৈঠকখানা বাজার থেকে ছু' পয়সায়—ছাখো মা—

সর্বজয়া ভাবে—এবার ছেলের সংসারী হইবার দিকে মন গিয়াছে, হিসাব করিয়া সে চলিতে শিখিয়াছে।

অপু ইচ্ছা করিয়াই লীলার সঙ্গে সাক্ষাতের কথাটা উঠায় না। ভাবে, মা মনে মনে দুরাশা পোষণ করে, হয়ত এখনি বলিয়া বসিবে—লীলার সঙ্গে তোর বিয়ে হয় না ?···দরকার কি, অসুস্থ মায়ের মনে সে-সব দুরাশার ঢেউ তুলিয়া ?

এমন সব কথা কখনও অপু মায়ের সামনে বলে না, যাহা কিনা মা বুঝিবে না। জগৎ সংসারটাকে মায়ের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের উপযোগী করিয়াই সে মায়ের সম্মুখে উপস্থিত করে।

দিন-তিনেক সে বাড়ি রহিল। রোজ দুপুরে জানালার ধারের বিছানাটিতে সর্বজয়া শুইয়া থাকে, পাশে সে বসিয়া নানা গল্প করে। ক্রমে বেলা যায়, রোদ প্রথমে ওঠে রান্নাঘরের চালায়, পরে বেড়ার ধারের পল্‌তেমাদার গাছটার মাথায়, ক্রমে বাঁশঝাড়ের ডগায়! ছায়া পড়িয়া যায় বৈকালের ঘন ছায়ায় অপুর মনে আবার একটা বিপুল নির্জনতা ও সঙ্গহীনতার ভাব আনে—গত গ্রীষ্মের ছুটির দিনের মত।

সর্বজয়া হাসিয়া বলে—পাশটা হ'লে এবার তোর বিয়ের ঠিক করেচি এক জায়গায়। মেয়ের দিদিমা এসেছিল এখানে, বেশ লোক—

ঘরের কোণে একটা তাকে সংসারের জিনিসপত্র সর্বজয়া রাখিয়া দেয়—একটা হাঁড়িতে আমসত্ব, একটা পাত্রে আচার। অপু চিরকালের অভ্যাস অনুসারে মাঝে মাঝে ভাঁড় হাঁড়ি খুঁজিয়া-পাতিয়া মাকে লুকাইয়া এটা-ওটা চুরি করিয়া খায়! এ কয়দিনও খাইয়াছে। সর্বজয়া বিছানায় চোখ বুজিয়া শুইয়া থাকে, টের পায় না—সেদিন দুপুরে অপু জানালাটার কাছে দাঁড়াইয়া আছে—গায়ে মায়ের গামছাখানা। হঠাৎ সর্বজয়া চোখ চাহিয়া বলিল—আমার গামছাখানা আবার পিষচো কেন ?—ওখানা তিলে বড়ি দেবো ব'লে রেখে দিইচি—কুণ্ডুদের বাড়ির গামছা ওখানা, ভারি টন্‌কো—আর সরে সরে তাকটার ঘাড়ে যাচ্চ কেন ?—ছুঁসনে তাক—তুমি এমন দুষ্টু হয়েচো, বাসি কাপড়ে ছুঁয়েছিলে তাকটা ?

কথাটা অপুর বুকে কেমন বিঁধিল—মা সেরে উঠে তিলে বড়ি দেবে ? তা দিয়েছে! মা আর উঠছে না—হঠাৎ তাহার মনে হইল, এই সেদিনও তো সে তাক হইতে আমসত্ব চুরি করিয়াছে···মা, অসহায় মা বিছানায় জ্বরের ঘোরে পড়িয়া ছিল···একুশ বৎসর ধরিয়া মায়ের যে শাসন চলিয়াছিল আজ তাহা শিথিল হইয়া পড়িতেছে, দুর্বল হইয়া পড়িতেছে, নিজের অধিকার আর বোধ হয় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে না কখনও···

অপু চতুর্থদিন সকালে চলিয়া গেল, কালই পরীক্ষা। চুকিয়া গেলেই আবার আসিবে। শেষরাত্রে ঘুম ভাঙিয়া শোনে, সর্বজয়া রান্নাঘরে ইতিমধ্যে কখন ঘুম হইতে উঠিয়া চলিয়া গিয়াছে, ছেলের সঙ্গে গরম পরোটা দেওয়া যাইবে।

সর্বজয়ার এরকম কোনও দিন হয় নাই। অপু চলিয়া যাওয়ার দিনটা হইতে বৈকালে তাহার এত মন হু হু করিতে লাগিল, যেন কেহ কোথাও নাই, একটা অসহায় ভাব, মনের উদাস অবস্থা। কত কথা, সারা জীবনের কত ঘটনা, কত আনন্দ ও অশ্রুজলের ইতিহাস একে একে মনে আসিয়া উদয় হয়। গত একমাস ধরিয়া এসব কথা মনে হইতেছে। নির্জনে বসিলেই বিশেষ করিয়া...। ছেলেবেলায় বুধী বলিয়া গাই ছিল বাড়িতে.. বাল্যসঙ্গিনী হিমিদি...দুজনে একসঙ্গে দো-পেটে গাঁদাগাছ পুঁতিয়া জল দিত। একদিন হিমিদি ও সে বন্যার জলে মাঠে ঘড়া-বুকে সাঁতার কাটিতে গিয়া ডুবিয়া গিয়াছিল আর একটু হলেই সেদিন...

বিবাহ...মনে আছে সেদিন দুপুরে খুব বৃষ্টি হইয়াছিল...তাহার ছোট ভাই তখন বাঁচিয়া, লুকাইয়া তাহাকে নাড়ু দিয়া গিয়াছিল হাতের মুঠায়। ছোট্ট ছেলেবেলার অপু...কাঁচের পুতুলের মত রূপ...প্রথম স্পষ্ট কথা শিখিল, কি জানি কি করিয়া শিখিল 'ভিজে'। একদিন অপুকে কদমা হাতে বসাইয়া রাখিয়াছিল।—কেমন খেলি ও খোকা?

অপু দন্তহীন মুখে কদমা চিবাইতে চিবাইতে ফুলের মত মুখটি তুলিয়া মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল—'ভিজে'। হি-হি—ভাবিলে এখনও সর্বজয়ার হাসি পায়।

সেদিন দুপুর হইতেই বুকে মাঝে মাঝে ফিক্-ধরা বেদনা হইতে লাগিল। তেলি-বৌ আসিয়া তেল গরম করিয়া দিয়া গেল। দু'-তিনবার দেখিয়াও গেল। সন্ধ্যার পর কেহ কোথাও নাই। একা নির্জন বাড়ি। জ্বরও আসিল।

রাত্রে খুব পরিষ্কার আকাশে ত্রয়োদশীর প্রকাণ্ড বড় চাঁদ উঠিয়াছে। জীবনে এই প্রথম সর্বজয়ার একা থাকিতে ভয় ভয় করিতে লাগিল। খানিক রাত্রে একবার যেন মনে হইল, সে জলের তলায় পড়িয়া আছে,নাকে মুখে জল ঢুকিয়া নিঃশ্বাস একেবারে বন্ধ হইয়া আসিতেছে... একেবারে বন্ধ। সে ভয়ে এক-গা ঘামিয়া ধড়মড় করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। সে কি মরিয়া যাইতেছে? এই কি মৃত্যু?—সে এখন কাহাকে ডাকে? জীবনে সর্বপ্রথম এই তাহার জীবনের ভয় হইল—ইহার আগে কখনও তো এমন হয় নাই! পরে নিজের ভয় দেখিয়া তাহার আর একদফা ভয় হইল। ভয় কিসের? না—না—মৃত্যু, সে এরকম নয়। ও কিছু না।

কত চুরি, কত পাপ...চুরিই যে কত করিয়াছে তাহার কি ঠিক আছে? ছেলেমেয়েকে খাওয়াইতে অমুকের গাছের কলার কাঁদিটা, অমুকের গাছের শসাটা লুকাইয়া রাখিত তক্তপোশের তলায়—ভুবন মুখুয্যেদের বাড়ি হইতে একবার দশ পলা তেল ধার করিয়া আনিয়া ভালমানুষ রাণুর মার কাছে পাঁচ পলা শোধ দিয়া আসিয়াছিল, মিথ্যা করিয়া বলিয়াছিল—পাঁচ পলাই তো নিয়ে গিছলাম ন'দি—বোলো সেজ ঠাকুরঝিকে। সারাজীবন ধরিয়া শুধু দুঃখ ও অপমান। কেন আজ এসব কথা মনে উঠিতেছে?

ঘর অন্ধকার।...খাটের তলায় নেংটি ইঁদুর খুট্ খুট্ করিতেছে। সর্বজয়া ভাবিল, ওদের বাড়ির কলটা না আনলে আর চলে না—নতুন মুগগুলো সব খেয়ে ফেললে। কিন্তু নেংটি ইঁদুরের শব্দ তো?—সর্বজয়ার আবার সেই ভয়টা আসিল...দুর্দমনীয় ভয়...সারা শরীর যেন

ধীরে ধীরে অসাড় হইয়া আসিতেছে ভয়ে···পায়ের দিক হইতে ভয়টা সুড়সুড়ি কাটিয়া উপরের দিকে উঠিতেছে, যতটা উঠিতেছে, ততটা অসাড় করিয়া দিতেছে...না—পায়ের দিক হইতে না—হাতে আঙুলের দিক হইতে···কিন্তু তাহার সন্দেহ হইতেছে কেন? ইঁদুরের শব্দ নয় কেন? কিসের শব্দ? কখনও তো এমন সন্দেহ হয় না?···হঠাৎ সর্বজয়ার মনে হইল,না—পায়ের ও হাতের দিক হইতে সুড়সুড়ি কাটিয়া যাহা উপরের দিকে উঠিতেছে তাহা ভয় নয়—তাহা মৃত্যু। মৃত্যু? ভীষণ ভয়ে সর্বজয়া ধড়মড় করিয়া আবার বিছানা হইতে উঠিতে গেল··· চীৎকার করিতে গেল···খুব···খুব চীৎকার, আকাশফাটা—অনেকক্ষণ চীৎকার করিয়াছে, আর সে চেঁচাইতে পারে না···গলা ভাঙিয়া আসিয়াছে ··কেউ আসিল না তো?···কিন্তু সে তো বিছানা হইতে·· বিছানা হইতে উঠিল কখন?...সে তো উঠে নাই—ভয়টা সুড়সুড়ি কাটিয়া সারা দেহ ছাইয়া ফেলিয়াছে, যেন খুব বড় একটা কালো মাকড়সা শুঁড়ের বিষে দেহ অবশ ···অসাড়...হাতও নাড়ানো যায় না···পা-ও না···সে চীৎকার করে নাই · ভুল।...

সুন্দর জ্যোৎস্না উঠিয়াছে···একজনের কথাই মনে হয় অপু...অপু···অপুকে ফেলিয়া সে থাকিতে পারিতেছে না···অসম্ভব।...বিস্ময়ের সহিত দেখিল—সে নিজে অনেকক্ষণ কাঁদিতেছে! —এতক্ষণ তো টের পায় নাই! ..আশ্চর্য।···চোখের জলে বালিশ ভিজিয়া গিয়াছে যে! ··

জ্যোৎস্না অপূর্ব, ভয় হয় না...কেমন একটা আনন্দ...আকাশটা, পুরাতন আকাশটা যেন স্নেহে প্রেমে জ্যোৎস্না হইয়া গলিয়া ঝরিয়া বিন্দুতে বিন্দুতে নিজেকে নিঃশেষ করিয়া দিতেছে ...টুপ···টুপ···টুপ···টাপ···। আবার কান্না পায়···জ্যোৎস্নার আলোয় জানালার গরাদে ধরিয়া হাসিমুখে ও কে দাঁড়াইয়া আছে?...সর্বজয়ার দৃষ্টি পাশের জানালার দিকে নিবদ্ধ হইল···বিস্ময়ে, আনন্দে রোগশীর্ণ মুখখানা মুহূর্তে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল···অপু দাঁড়াইয়া আছে।···এ অপু নয়···সেই ছেলেবেলাকার ছোট্ট অপু ··এতটুকু অপু···নিশ্চিন্দিপুরের বাঁশবনের ভিটেতে এমন কত চৈত্র-জ্যোৎস্না-রাতে ভাঙা জানালার ফাঁক দিয়া জ্যোৎস্নার আলো আসিয়া পড়িতে যাহার দন্তহীন ফুলের কুঁড়ির মত কচি মুখে...সেই অপু ওর ছেলে-মানুষ খঞ্জন পাখির মত ডাগর ডাগর চোখের নীল চাহনি...চুল কোঁকড়া কোঁকড়া···মুখচোরা, ভালমানুষ লাজুক বোকা, জগতের ঘোরপ্যাচ কিছুই একেবারে বোঝে না···কোথায় যেন সে যায়···নীল আকাশ বাহিয়া বহু দূরে···বহু দূরের দিকে, সুনীল মেঘপদবীর অনেক উপরে··· যায়···যায়···যায়···যায়···মেঘের ফাঁকে যাইতে যাইতে মিলাইয়া যায় ··

বুঝি মৃত্যু আসিয়াছে।···কিন্তু তার ছেলের বেশে, তাকে আদর করিয়া আগু বাড়াইয়া লইতে·· এতই সুন্দর···

কি হাসি! কি মিষ্টি হাসি ওর মুখের!...

পরদিন সকালে তেলি-বাড়ির বড়-বৌ আসিল। দরজায় রাত্রে খিল দেওয়া হয় নাই, খোলাই আছে, বড়-বৌ আপন মনে বলিল—রাত্রে দেখছি মা-ঠাকরুণের অসুখ খুব বেড়েছে, খিলটাও দিতে পারেন নি।

বিছানার উপর সর্বজয়া যেন ঘুমাইতেছেন। তেলি-বৌ একবার ভাবিল—ডাকিবে না—কিন্তু পথ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ডাকিয়া উঠাইতে গেল। সর্বজয়া কোনও সাড়া দিল না, নড়িলও না। বড়-বৌ আরও দু-একবার ডাকাডাকি করিল, পরে হঠাৎ কি ভাবিয়া নিকটে আসিয়া ভাল করিয়া দেখিল।

পরক্ষণেই সে সব বুঝিল।

সর্বজয়ার মৃত্যুর পর কিছুকাল অপু এক অদ্ভুত মনোভাবের সহিত পরিচিত হইল। প্রথম অংশটা আনন্দ-মিশ্রিত—এমন কি মায়ের মৃত্যু-সংবাদ প্রথম যখন সে তেলি-বাড়ির তারের খবরে জানিল, তখন প্রথমটা তাহার মনে একটা আনন্দ, একটা যেন মুক্তির নিঃশ্বাস . একটা বাঁধন-ছেঁড়ার উল্লাস…অতি অল্পক্ষণের জন্য—নিজের অজ্ঞাতসারে। তাহার পরই নিজের মনোভাবে তাহার দুঃখ ও আতঙ্ক উপস্থিত হইল। এ কি! সে চায় কি! মা যে নিজেকে একেবারে বিলোপ করিয়া ফেলিয়াছিল তাহার সুবিধার জন্য। মা কি তাহার জীবনপথের বাধা?—কেমন করিয়া সে এমন নিষ্ঠুর, এমন হৃদয়হীন—তবুও সত্যকে সে অস্বীকার করিতে পারিল না। মাকে এত ভালবাসিত তো, কিন্তু মায়ের মৃত্যু-সংবাদটা প্রথমে যে একটা উল্লাসের স্পর্শ মনে আনিয়াছিল—ইহা সত্য—সত্য—তাহাকে উড়াইয়া দিবার উপায় নাই। তাহার পর সে বাড়ি রওনা হইল। উলা স্টেশনে নামিয়া হাঁটিতে শুরু করিল। এই প্রথম এ পথে সে যাইতেছে—যেদিন মা নাই! গ্রামে ঢুকিবার কিছু আগে আধমজা কোদলা নদী, এ সময়ে হাঁটিয়া পার হওয়া যায়—এরই তীরে কাল মাকে সবাই দাহ করিয়া গিয়াছে! বাড়ি পৌঁছিল বৈকালে। এই সেদিন বাড়ি হইতে গিয়াছে, মা তখনও ছিল…ঘরে তালা দেওয়া, চাবি কাহাদের কাছে? বোধ হয় তেলি-বাড়ি ওরা লইয়া গিয়াছে। ঘরের পৈঠায় অপু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। উঠানের বাহিরে আগড়ের কাছে এক জায়গায় পোড়া খড় জড়ো করা। সেদিকে চোখ পড়িতেই অপু শিহরিয়া উঠিল—সে বুঝিয়াছে—মাকে যাহারা সৎকার করিতে গিয়াছিল, দাহ অন্তে তাহারা কাল এখানে আগুন ছুঁইয়া নিমপাতা খাইয়া শুদ্ধ হইয়াছে—প্রথাটা অপু জানে…মা মারা গিয়াছে এখনও অপুর বিশ্বাস হয় নাই…একুশ বৎসরের বন্ধন, মন এক মুহূর্তে টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারে নাই…কিন্তু পোড়া খড়গুলাতে নগ্ন, রূঢ়, নিষ্ঠুর সত্যটা…মা নাই! মা নাই! …বৈকালের কি রূপটা! নির্জন, নিরালা, কোনও দিকে কেহ নাই। উদাস পৃথিবী, নিস্তব্ধ বিবাগী রাঙা-রোদভরা আকাশটা। . অপু অর্থহীন দৃষ্টিতে পোড়া খড়গুলার দিকে চাহিয়া রহিল।…

কিন্তু মায়ের গায়ের কাঁথাখানা উঠানের আলনায় মেলিয়া দেওয়া কেন? কাঁথাখানা মায়ের গায়ে ছিল…সঙ্গেই তো যাওয়ার কথা। অনেক দিনের কাঁথা, নিশ্চিন্দিপুরের আমলের, মায়ের হাতে সেলাই করা, কল্কা-কাটা রাঙা সুতার কাজ।…কতক্ষণ সে বসিয়া ছিল জানে না, রোদ প্রায় পড়িয়া আসিল। তেলি-বাড়ির বড় ছেলে নাদুর ডাকে চমক ভাঙিতেই সে

তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। ম্লান হাসিয়া বলিল—এই যে আমার ঘরের চাবিটা তোমাদের বাড়ি ?…

নাড়ু বলিল—কখন এলে, এখানে বসে একলাটি—বেশ তো দাদাঠাকুর—এসো আমাদের বাড়ি। অপু বলিল, না ভাই, তুমি চাবিটা নিয়ে এসো—ঘরের মধ্যে দেখি জিনিস-গুলোর কি ব্যবস্থা। চাবি দিয়া নাড়ু চলিয়া গেল। বলিল,—ঘর খুলে দ্যাখো, আমি আসছি এখুনি। অপু ঘরে ঢুকিল। তক্তপোশের উপর বিছানা নাই, বালিশ, মাদুর কিছু নাই—শূন্য তক্তপোশটা পড়িয়া আছে—তক্তপোশের তলায় একটা পাথরের খোরায় কি ভিজানো—খোরাটা হাতে তুলিয়া দেখিল। চিরতা না নিমছাল কি ভিজানো—মায়ের ওষুধ।

বাহিরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। কে বলিল—ঘরের মধ্যে কে ?—খোরাটা তক্তপোশের কোণে নামাইয়া রাখিয়া বাহিরে দাওয়ায় আসিল। নিরুপমা দিদি—নিরুপমাও অবাক—গালে আঙুল দিয়া বলিল—তুমি! কখন এলে ভাই ?—কৈ, কেউ তো বলে নি!…

অপু বলিল—না, এই তো এলাম,—এই এখনও আধঘণ্টা হয় নি।

নিরুপমা বলিল—আমি বলি রোদ পড়ে গিয়েছে, কাঁথাটা কেচে মেলে দিয়ে এসেছি বাইরে, যাই কাঁথাখানা তুলে রেখে আসি কুণ্ডুদের বাড়ি। তাই আসছি—

অপু বলিল—কাঁথাখানা মায়ের গায়ে ছিল, না নিরুদি ?

—কোথায় ?…পরশু রাতে তো তাঁর—পরশু বিকেলে বড় বৌকে বলেছেন কাঁথাখানা সরিয়ে রাখো মা—ও আমার অপুর জন্যে, বর্ষাকালে কলকাতা পাঠাতে হবে—সেই পুরানো তুলোজমানো কালো কম্বলটা ছিল…সেইখানা গায়ে দিয়েছিলেন—তিনি আবার প্রাণ ধ'রে তোমার কাঁথা নষ্ট করবেন ?…তাই কাল যখন ওরা তাঁকে নিয়ে-থুয়ে গেল তখন ভাবলাম রুগীর বিছানায় তো ছিল কাঁথাখানা, জলকাচা ক'রে রোদে দিই—কাল আর পারি নি—আজ সকালে ধুয়ে আলনায় দিয়ে গেলাম—তা এসো—আমাদের বাড়ি—ওসব শুনবো না—মুখ শুকনো—হবিষ্যি হয় নি ? এসো—

নিরুপমার আগে আগে সে কলের পুতুলের মত তাদের বাড়ি গেল। সরকার মহাশয় কাছে ডাকিয়া বসাইয়া অনেক সান্ত্বনার কথা বলিলেন।

নিরুদি কি করিয়া মুখ দেখিয়া বুঝিল খাওয়া হয় নাই। নাড়ুও তো ছিল—কৈ কোনও কথা তো বলে নাই ?

সন্ধ্যার পর নিরুপমা একখানা রেকাবীতে আখ ও ফলমূল কাটিয়া আনিল। একটা কাঁসার বাটিতে কাঁচামুগের ডাল-ভিজা, কলা ও আখের গুড় দিয়া নিজে একসঙ্গে মাখিয়া আনিয়াছে। অপু কারুর হাতে চটকানো জিনিস খায় না, ঘেন্না ঘেন্না করে…কিন্তু আজ নিরুদির হাতে খাইতে তাহার দ্বিধা রহিল না…প্রথমটা মুখে তুলিতে একটুখানি গা-কেমন করিতেছিল। তারপর দুই-এক গ্রাস খাইয়া মনে হইল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক আস্বাদই তো!…নিজের হাতে বা মায়ের হাতে মাখিলে যা হইত—তাই। পরদিন হবিষ্যের সময় নিরুপমা গোয়ালে সব যোগাড়যন্ত্র করিয়া অপুকে ডাক দিল। উনুনে ফুঁ পাড়িয়া কাঠ ধরাইয়া দিল। ফুটিয়া উঠিলে বলিল—এইবার নামিয়ে ফ্যালো, ভাই।

অপু বলিল—আর একটু না—নিরুদি ?

নিরুপমা বলিল—নামাও দেখি, ও হয়ে গিয়েছে। ডালবাটাটা জুড়োতে দাও—

সব মিটিয়া গেলে সে কলিকাতায় ফিরিবার উদ্যোগ করিল। সর্বজয়ার জাঁতিখানা, সর্বজয়ার হাতে সই-করা খানদুই মনিঅর্ডারের রসিদ চালের বাতায় গোঁজা ছিল—সেগুলি, সর্বজয়ার নখ কাটিবার নরুণটা, পুঁটলির মধ্যে বাঁধিয়া লইল। দোয়ের পাশে ঘরের কোণে সেই তাকটা—আসিবার সময় সেদিকে নজর পড়িল। আচারভরা ভাঁড়, আমসত্ত্বের হাঁড়িটা, কুলচুর, মায়ের গঙ্গাজলের পিতলের ঘটি, সবই পড়িয়া আছে ..যে যত ইচ্ছা খুশী খাইতে পারে যাহা খুশী ছুঁইতে পারে, কেহ বকিবার নাই, বাধা দিবার নাই। তাহার প্রাণ ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। যে মুক্তি চায় না···অবাধ অধিকার চায় না—তুমি এসে শাসন করো, এসব ছুঁতে দিও না, হাত দিতে দিও না—ফিরে এসো মা···ফিরে এসো···

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল, একটা তীব্র ঔদাসীন্য সব বিষয়ে, সকল কাজে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই ভয়ানক নির্জনতার ভাবটা। পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছিল, কলিকাতায় থাকিতে একদণ্ডও ইচ্ছা হয় না···মন পাগল হইয়া উঠে, কেমন যেন পালাই-পালাই ভাব হয় সর্বদা, অথচ পালাইবার স্থান নাই, জগতে সে একেবারে একাকী—সত্যসত্যই একাকী।

এই ভয়ানক নির্জনতার ভাব এক এক সময় অপুর বুকে পাথরের মত চাপিয়া বসে, কিছুতেই সেটা সে কাটাইয়া উঠিতে পারে না, ঘরে থাকা তাহার পক্ষে তখন আর সম্ভব হয় না। গলিটার বাহিরে বড় রাস্তা, সামনে গোলদীঘি, বৈকালে গাড়ি, মোটর, লোকজন ছেলেমেয়ে। বড় মোটর-গাড়িতে কোনও সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের মেয়েরা বাড়ির ছেলেমেয়েদের লইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছে, অপুর মনে হয় কেমন সুখী পরিবার!—ভাই, বোন, মা, ঠাকুরমা, পিসিমা, রাঙাদি, বড়দা, ছোট কাকা। যাহাদের থাকে তাহাদের কি সব দিক দিয়াই এমন করিয়া ভগবান দিয়া দেন! অন্যমনস্ক হইবার জন্য এক-একদিন সে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের লাইব্রেরীতে গিয়া বিলাতী ম্যাগাজিনের পাতা উল্টাইয়া থাকে। কিন্তু কোথাও বেশীক্ষণ বসিবার ইচ্ছা হয় না, শুধুই কেবল এখানে-ওখানে, ফুটপাথ হইতে বাসায়, বাসা হইতে ফুটপাথে। এক জায়গায় বসিলেই শুধু মায়ের কথা মনে আসে, উঠিয়া ভাবে গোলদীঘিতে আজ সাঁতারের ম্যাচের কি হ'ল দেখে আসি বরং—কলিকাতায় থাকিতে ইচ্ছা করে না, মনে হয় বাহিরে কোথাও চলিয়া গেলে শান্তি পাওয়া যাইত—যে কোনও জায়গায়, যে কোন জায়গায়—পাহাড়ে, জঙ্গলে, হরিদ্বারে কেদার-বদরীর পথে—মাঝে মাঝে ঝরণা, নির্জন অধিত্যকায় কত ধরণের বিচিত্র বন্যপুষ্প, দেওদার ও পাইন বনের ঘন ছায়া, সাধু-সন্ন্যাসী, দেবমন্দির, রামচটি, শ্যামচটি কত বর্ণনা তো সে বইয়ে পড়ে, একা বাহির হইয়া পড়া মন্দ কি ? —কি হইবে এখানে শহরের ঘিঞ্জি ও ধোঁয়ার বেড়াজালের মধ্যে ?

কিন্তু পয়সা কৈ ? তাও তো পয়সার দরকার। তেলিরা কুড়ি টাকা দিয়াছিল মাতৃশ্রাদ্ধের দরুণ, নিরুপমা নিজে হইতে পনেরো, বড়-বৌ আলাদা দশ। অপু সে টাকার এক

পয়সাও রাখে নাই, অনেক লোকজন খাওয়াইয়াছে। তবু তো সামান্যভাবে তিলকাঞ্চন শ্রাদ্ধ!

দশপিণ্ড দানের দিন সে কি তীব্র বেদনা! পুরোহিত বলিতেছেন—প্রেতা শ্রীসর্বজয়া দেবী—অপু ভাবে কাহাকে প্রেত বলিতেছে? সর্বজয়া দেবী প্রেত? তাহার মা, প্রীতি আনন্দ ও দুঃখ-মুহূর্তের সঙ্গিনী, এত আশাময়ী, হাস্যময়ী, এত জীবন্ত যে ছিল কিছুদিন আগেও, সে প্রেত? সে আকাশস্থো নিরালম্বো বায়ুভূত-নিরাশ্রয়ঃ?

তারপরই মধুর আশার বাণী—আকাশ মধুময় হউক, বাতাস মধুময় হউক, পথের ধূলি মধুময় হউক, ওষধি সকল মধুময় হউক, বনস্পতি মধুময় হউক, সূর্য, চন্দ্র, অন্তরীক্ষস্থিত আমাদের পিতা মধুময় হউন।

সারাদিনব্যাপী উপবাস, অবসাদ, শোকের পর এ মন্ত্র অপুর মনে সত্য সত্যই মধুবর্ষণ করিয়াছিল, চোখের জল সে রাখিতে পারে নাই। হে আকাশের দেবতা, বাতাসের দেবতা, তাই কর, মা আমার অনেক কষ্ট ক'রে গিয়েছে, তাঁর প্রাণে তোমাদের উদার আশীর্বাদের অমৃতধারা বর্ষণ কর।

এই অবস্থায় শুধুই ইচ্ছা করে যারা আপনার লোক, যারা তাহাকে জানে ও মাকে জানিত, তাহাদের কাছে যাইতে। এক জ্যাঠাইমারা আছেন—কিন্তু তাঁহাদের সহানুভূতি নাই, তবু সেখানেই যাইতে ইচ্ছা করে। তবুও মনে হয়, হয়ত জ্যাঠাইমা মায়ের সম্বন্ধে দু'-পাঁচটা কথা বলিবেন এখন, দুটা সহানুভূতির কথা হয়ত বলিবেন—।

মাস-তিনেক এভাবে কাটিল। এ তিন মাসের কাহিনী তাহার জীবনের ইতিহাসে একটা একটানা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের কাহিনী। ভবিষ্যৎ জীবনে অপু এ গলিটার নিকট দিয়া যাইতে যাইতে নিজের অজ্ঞাতসারে একবার বড় রাস্তা হইতে গলির মোড়ে চাহিয়া দেখিত, আর কখনও সে ইহার মধ্যে ঢোকে নাই।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে সে একদিন খবরের কাগজে দেখিল—যুদ্ধের জন্য লোক লওয়া হইতেছে, পার্ক স্ট্রীটে তাহার অফিস। দুপুরে ঘুরিতে ঘুরিতে সে গেল পার্ক স্ট্রীটে।

টেবিলে একরাশ ছাপানো ফর্ম পড়িয়া ছিল, অপু একখানা তুলিয়া পড়িয়া রিক্রুটিং অফিসারকে বলিল—কোথাকার জন্য লোক নেওয়া হবে?

—মেসোপটেমিয়া, রেলওয়ে ও ট্রান্সপোর্ট বিভাগের জন্য। তুমি কি টেলিগ্রাফ জানো—না মোটর মিস্ত্রী?

অপু বলিল সে কিছুই নহে। ও-সব কাজ জানে না, তবে অন্য যে-কোন কাজ—কি কেরানীগিরি—

সাহেব বলিল—না, দুঃখিত। আমরা শুধু কাজ-জানা লোক নিচ্ছি—বেশীর ভাগ মোটর ড্রাইভার, সিগন্যালার, স্টেশন মাস্টার সব।

এই অবস্থায় একদিন লীলার সঙ্গে দেখা। ইতস্ততঃ লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন

ডালহাউসি স্কোয়ারের মোড়ে সে রাস্তা পার হইবার জন্ত অপেক্ষা করিতেছে, সামনে একখানা হল্‌দে রঙের বড় মিনার্ভা গাড়ি ট্রাফিক পুলিসে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছিল—হঠাৎ গাড়িখানার দিক হইতে তাহার নাম ধরিয়া কে ডাকিল।

সে গাড়ির কাছে গিয়া দেখিল, লীলা ও আর দু-তিনটি অপরিচিতা মেয়ে। লীলার ছোটভাই ড্রাইভারের পাশে বসিয়া। লীলা আগ্রহের সুরে বলিল—আপনি আচ্ছা তো অপূর্ববাবু? তিন-চার মাসের মধ্যে আর দেখা করলেন না, কেন বলুন তো? মা সেদিনও আপনার কথা—

অপুর আকৃতিতে একটা কিছু লক্ষ্য করিয়া সে বিস্ময়ের সুরে বলিল—আপনার কি হয়েছে? অসুখ থেকে উঠেছেন নাকি? শরীর—মাথার চুল অমন ছোট-ছোট, কি হয়েছে বলুন তো?

অপু হাসিয়া বলিল—কই না, কি হবে—কিছু তো হয় নি?

—মা কেমন আছেন?

—মা? তা মা—মা তো নেই। ফাল্গুন মাসে মারা গিয়েছে।

কথা শেষ করিয়া অপু আর এক দফা পাগলের মত হাসিল।

হয়ত বাল্যের সে প্রীতি নানা ঘটনায়, বহু বৎসরের চাপে লীলার মনে নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল, হয়ত ঐশ্বর্যের আঁচ লাগিয়া সে মধুর বাল্যমন অন্ত ভাবে পরিবর্তিত হইয়াছিল ধীরে-ধীরে, অপুর মুখের এই অর্থহীন হাসিটা যেন একখানা তীক্ষ্ণ ছুরির মত গিয়া তাহার মনের কোন্ গোপন মণিমঞ্জুষার রুদ্ধ ঢাকনির ফাঁকটাতে হঠাৎ একটা সজোরে চাড়া দিল, এক মুহূর্তে অপুর সমস্ত ছবিটা তাহার মনের চোখে ভাসিয়া উঠিল—সহায়হীন, মাতৃহীন, আশ্রয়হীন, পথে-পথে বেড়াইতেছে—কে মুখের দিকে চাহিবার আছে?

লীলার গলা আড়ষ্ট হইয়া গেল, একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—আপনি আমাদের ওখানে কবে আসবেন বলুন—না, ও-রকম বললে হবে না! এ-কথা আমাদের জানানো আপনার উচিত ছিল না? অন্ততঃ মাকেও বলা তো—কাল সকালে আসুন—ঠিক বলুন আসবেন? কেমন ঠিক তো—সেবারকার মত করবেন না, কিন্তু—ভাল কথা, আপনার ঠিকানাটা বলুন তো কি—ভুলবেন না, কিন্তু—

গাড়ি চলিয়া গেল।

বাসায় ফিরিয়া অপু মনের মধ্যে অনেক তোলাপাড়া করিল। লীলার মুখে সে একটা কিসের ছাপ দেখিয়াছে, বর্তমান অবস্থায় মন তাহার এই আন্তরিকতা স্নেহস্পর্শটুকুরই কাঙাল বটে—কিন্তু এই বেশে কোথাও যাইতে ইচ্ছা হয় না, এই জামায়, এই কাপড়ে, এই ভাবে। থাক বরং।

তিনদিন পর নিজের নামে একখানা পত্র আসিতে দেখিয়া সে বিস্মিত হইল—মা ছাড়া আর তো কাহারও পত্র সে পায় নাই। কে পত্র দিল? পত্র খুলিয়া পড়িল :—

অপূর্ববাবু,

আপনার এখানে আসবার কথা ছিল সোমবারে, কিন্তু আজ শুক্রবার হয়ে গেল আপনি এলেন না। আপনাকে মা একবার অবিশ্যি অবিশ্যি আসতে বলেছেন, না এলে তিনি খুব দুঃখিত হবেন। আজ বিকেলে পাঁচটার সময় আপনার আসা চাই-ই। নমস্কার নেবেন।

লীলা

কথাটা লইয়া মনের মধ্যে সে অনেক তোলাপাড়া করিল। কি লাভ গিয়া? ওরা বড়মানুষ, কোন্ বিষয়ে সে ওদের সঙ্গে সমান, যে ওদের বাড়ি যখন-তখন যাইবে? মেজ-বৌরানী যে তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সেই কথাটা তাহার মনে অনেকবার যাওয়া-আসা করিল—সেইটা, আর লীলার আন্তরিকতা। কিন্তু মেজ-বৌরানী কি তার মায়ের অভাব দূর করিতে পারিবেন? তিনি বড়লোকের মেয়ে, বড়লোকের বধূ! তাহার মায়ের আসন হৃদয়ের যে স্থানটিতে, সে শুধু তাহার দুঃখিনী মা অর্জন করিয়াছে তাহার বেদনা, ব্যর্থতা, দৈন্য-দুঃখ শত অপমান দ্বারা—ছয় সিলিণ্ডারের মিনার্ভা গাড়িতে চড়িয়া কোনও ধনীবধূ—হউন তিনি স্নেহময়ী, হউন তিনি মহিমময়ী—তাঁহার সেখানে প্রবেশাধিকার কোথায়?

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে পরীক্ষার ফল বাহির হইল। প্রথম বিভাগের প্রথম সতের জনের মধ্যে তাহার নাম, বাংলাতে সকলের মধ্যে প্রথম হইয়াছে, এজন্য একটা সোনার মেডেল পাইবে। এমন কেহ নাই যাহার কাছে খবরটা বলিয়া বাহাদুরি করা যাইতে পারে। কোনও পরিচিত বন্ধুবান্ধব পর্যন্ত এখানে নাই—ছুটিতে সব দেশে গিয়াছে। জ্যাঠাইমার কাছে যাইবে? ··গিয়া জানাইবে জ্যাঠাইমাকে? কি লাভ, হয়ত তিনি বিরক্ত হইবেন, দরকার নাই যাওয়ার।

দশম পরিচ্ছেদ

আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি সব কলেজ খুলিয়া গেল, অপু কোনও কলেজে ভর্তি হইল না। অধ্যাপক মিঃ বসু তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া ইতিহাসে অনার্স কোর্স লওয়াইতে যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন! অপু ভাবিল—কি হবে আর কলেজে পড়ে? সে সময়টা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে কাটাব, বি. এ-র ইতিহাসে এমন কোন নতুন কথা নেই যা আমি জানি নে। ও দু'বছর মিছিমিছি নষ্ট, লাইব্রেরীতে তার চেয়ে অনেক পড়ে ফেলতে পারব এখন। তা ছাড়া ভর্তির টাকা, মাইনে, এ সব পাই বা কোথায়?

একটা কিছু চাকুরি না খুঁজিলে চলে না। খবরের কাগজ বিক্রয়ের পুঁজি অনেকদিন ফুরাইয়া গিয়াছে, মায়ের মৃত্যুর পর সে কাজে আর উৎসাহ নাই। একটা ছোট ছেলে পড়ানো আছে, তাতে শুধু দুটো ভাত খাওয়া চলে দু'বেলা—কোন মতে ইক্‌মিক্ কুকারে আলুসিদ্ধ, ডালসিদ্ধ ও ভাত। মাছ, মাংস, দুধ, ডাল, তরকারী তো অনেকদিন-আগে-দেখা স্বপ্নের মত মনে হয়—যাক্ সে সব, কিন্তু ঘর-ভাড়া, কাপড়জামা, জলখাবার, এসব চলে কিসে? তাহা

ছাড়া অপুর অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে যে, কলিকাতায় ছেলে-পড়ানো বাবার মুখে শৈশবে শেখা উদ্ভট শ্লোকের পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুর মত চপল, আজ যদি যায় কাল দাঁড়াইবার স্থান নাই!

কয়েকদিন ধরিয়া খবরের কাগজ দেখিয়া দেখিয়া পাইওনিয়ার ড্রাগ স্টোর্সে একটা কাজ খালি দেখা গেল দিন কতক পরে। আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড়ে বড় দোকান, পিছনে কারখানা, তখনও ভিড় জমিতে শুরু হয় নাই, অপু ঢুকিয়াই এক স্থূলকায় আধাবয়সী ভদ্রলোকের একেবারে সামনে পড়িল। ভদ্রলোক বলিলেন, কাকে চান?

অপু লাজুক মুখে বলিল—আজ্ঞে, চাকরি খালির বিজ্ঞাপন দেখে—তাই—

—ও! আপনি ম্যাট্রিক পাশ?

—আমি এবার আই-এ—

ভদ্রলোক পুনরায় তাকিয়ায় ভর দিয়া হাল ছাড়িয়া দিবার সুরে বলিলেন—ও আই-এ পাশ নিয়ে আমরা কি করব, আমাদের লেবেলিং ও মাল বট্‌লিং করার জন্যে লোক চাই। খাটুনিও খুব, সকাল সাতটা থেকে সাড়ে দশটা, মধ্যে দেড় ঘণ্টা খাবার ছুটি, আবার বারোটা থেকে পাঁচটা, কাজের চাপ পড়লে রাত আটটাও বাজবে—

—মাইনে কত?

—আপাতত পনেরো, ওভারটাইম খাটলে দু'আনা জলখাবার—সে-সব আপনাদের কলেজের ছোকরার কাজ নয় মশায়—আমরা এমনি মোটামুটি লোক চাই!

ইহার দিনকতক পরে আর একটা চাকুরি খালির বিজ্ঞাপন দেখিয়া গেল ক্লাইভ স্ট্রীটে। দেখিল, সেটা একটা লোহা-লক্কড়ের দোকান, বাঙালী ফার্ম। একজন ত্রিশ-বত্রিশ বছরের অত্যন্ত চুল-ফাঁপানো, টেরি-কাটা লোক ইস্ত্রি-করা কামিজ পরিয়া বসিয়া আছে, মুখের নিচের দিকের গড়নে একটা কর্কশ ও স্থূলভাব, এমন ধরণের চেহারা ও চোখের ভাবকে সে মাতাল ও কুচরিত্র লোকের সঙ্গে মনে মনে জড়িত করিয়া থাকে। লোকটি অত্যন্ত অবজ্ঞার সুরে বলিল—কি, কি এখানে?

অপুর নিজেকেই অত্যন্ত ছোট বোধ হইল নিজের কাছে। সে সঙ্কুচিত সুরে বলিল—এখানে একটা চাকরি খালি দেখে আসছি!

লোকটার চেহারা বড়লোকের বাড়ির উচ্ছৃঙ্খল, অসচ্চরিত্র, বড় ছেলের মত। পূর্বে এ ধরণের চরিত্রের সহিত তাহার পরিচয় হইয়াছে, লীলাদের বাড়ি বর্ধমানে থাকিতে। এই টাইপটা সে চেনে।

লোকটা কর্কশ সুরে বলিল—কি কর তুমি?

—আমি আই-এ পাশ—করি নে কিছু—আপনাদের এখানে—

—টাইপ রাইটিং জান? না?—যাও যাও, এখানে হবে না—ও কলেজ-টলেজ এখানে চলবে না—যাও—

সেদিনকার ব্যাপারটা বাসায় আসিয়া গল্প করাতে ক্যাম্বেল স্কুলের ছাত্রটির এক কাকা

বলিলেন—ওদের আজকাল ভারি দেমাক, যুদ্ধের বাজারে লোহার দোকানদার সব লাল হয়ে যাচ্ছে, দালালেরা পর্যন্ত দু-পয়সা ক'রে নিলে।

অপু বলিল—দালাল আমি হ'তে পারি নে ?

—কেন পারবেন না, শক্তটা কি ? আমার শ্বশুর একজন বড় দালাল, আপনাকে নিয়ে যাব একদিন—সব শিখিয়ে দেবেন, আপনাদের মত শিক্ষিত ছেলে তো আরও ভাল কাজ করবে—

মহা-উৎসাহে ক্লাইভ স্ট্রীট অঞ্চলের লোহার বাজারে দালালি করিতে বাহির হইয়া প্রথম দিন-চার-পাঁচ ঘোরাঘুরিই সার হইল ; কেহ ভাল করিয়া কথাও বলে না, একদিন একজন বড় দোকানী জিজ্ঞাসা করিল,—বোল্‌টু আছে ? পাঁচ ইঞ্চি পাঁচ জ ? অপু বোল্‌টু কাহাকে বলে জানে না, কোন্ দিকের মাপ পাঁচ ইঞ্চি পাঁচ জ তাহাও বুঝিতে পারিল না। নোটবুকে টুকিয়া লইল, মনে মনে ভাবিল, একটা অর্ডার তো পাইয়াছে, খুঁজিবার মতও একটা কিছু জুটিয়াছে এতদিন পরে।

পাঁচ ইঞ্চি পাঁচ জ বোল্‌টু এ-দোকান ও-দোকান দিন-চারেক বৃথা খোঁজা-খুঁজির পর তাহার ধারণা পৌঁছিল যে, জিনিসটা বাজারে সুলভপ্রাপ্য নয় বলিয়াই দোকানী এত সহজে তাহাকে অর্ডার দিয়াছিল। একদিন একজন দালাল বলিল—মশাই সওয়া ইঞ্চি ঘেরের সীসের পাইপ দিতে পারেন যোগাড় ক'রে আড়াই শো ফুট ? যান না অর্ডারটা নিয়ে আসুন এই পাশেই ইউনাইটেড মেশিনারি কোম্পানীর অফিস থেকে।

পাশেই খুব বড় বাড়ি। আফিসের লোকে প্রথমে তাহাকে অর্ডার দিতে চায় না, অবশেষে জিজ্ঞাসা করিল···মাল আমাদের এখানে ডেলিভারি দিতে পারবেন তো ?···

এ কথার মানে ঠিক না বুঝিয়াই সে বলিল—হাঁ তা দিতে পারব।

বহু খুঁজিয়া কলেজ স্ট্রীটের যে দোকান হইতে মাল বাহির হইল, তাহারা মাল নিজের খরচে কোথাও ডেলিভারি দিতে রাজী নয়, অপু নিজের ঘাড়ে ঝুঁকি লইয়া গরুর গাড়িতে সীসার পাইপ বোঝাই দেওয়াইল—রাজা উডমাণ্ড্ স্ট্রীটে দুপুর রৌদ্রে মাল আনিয়া হাজিরও করিল। ইউনাইটেড মেশিনারি কোম্পানী কিন্তু গাড়ির ভাড়া দিতে একদম অস্বীকার করিল, মাল তো এখানে ডেলিভারী দিবার কথা ছিল,তবে গাড়ি-ভাড়া কিসের ? অপু ভাবিল, না হয় নিজের দালালির টাকা হইতে গাড়ি ভাড়াটা মিটাইয়া দিবে এখন। এখন কাজে নামিয়া অভিজ্ঞতাটাই আসল, না-ই বা হইল বেশী লাভ।

সে বলিল—আমার ব্রোকারেজটা ?

—সে কি মশাই, আপনি সাড়ে পাঁচ আনা ফুটে দর দিয়েছেন, আপনার দালালি নেন নি ? তা কখনও হয়!—

অপু জানে না যে,প্রথম দর দিবার সময়ই তাহার মধ্যে দালালি ধরিয়া দিবার নিয়ম,সবাই তাহা দিয়া থাকে, সেও যে তাহা দেয় নাই, একথা কেহই বিশ্বাস করিল না। বার-বার সেই কথা তাহাদের বুঝাইতে গিয়া নিজের আনাড়ীপনাই বিশেষ করিয়া ধরা পড়িল। সীসার

পাইপওয়ালার গোমস্তা তাহাদের বিল বুঝিয়া পাইয়া চলিয়া গেল—তিনদিন ধরিয়া রৌদ্রে ছুটাছুটি ও পরিশ্রম সার হইল, একটি পয়সাও তাহাকে দিল না কোন পক্ষই। খোট্টা গাড়োয়ান পথ বন্ধ করিয়া দাঁড়াইল বলিল—হামারা ভাড়া কৌন দেগা ?

একজন বৃদ্ধ মুসলমান দালানের এক পাশে দাঁড়াইয়া ব্যাপার দেখিতেছিল, অপু আফিস হইতে বাহিরে আসিলেই সে বলিল, বাবু আপনি কত দিন এ কাজে নেমেছেন—কাজ তো কিছুই জানেন না দেখছি—

অপুকে সে-কথা স্বীকার করিতে হইল। লোকটি বলিল—আপনি লেখাপড়া জানেন, ও-সব খুচরো কাজ ক'রে আপনার পোষাবে না! আপনি আমার সঙ্গে কাজে নামবেন ?—বড় মেশিনারির দালালি, ইঞ্জিন, বয়লার এই সব। এক-একবারে পাঁচ-শো সাত-শো টাকা রোজগার হবে—বাবু ইংরেজি জানি নে তাই, তা যদি জানতাম, এ বাজারে এতদিন গুছিয়ে··· নামবেন আমার সঙ্গে ?

অপু হাতে স্বর্গ পাইয়া গেল। গাড়োয়ানকে ভাড়াটা যে দণ্ড দিতে হইল, আনন্দের আতিশয্যে সেটাও গ্রাহের মধ্যে আনিল না। মুসলমানটির সঙ্গে তাহার অনেকক্ষণ কথাবার্তা হইল—অপু নিজের বাসার ঠিকানা দিয়া দিল। স্থির হইল, কাল সকাল দশটার সময় এইখানে লোকটি তাহার অপেক্ষা করিবে।

অপু রাত্রে শুইয়া মনে মনে ভাবিল—এতদিন পরে একটা সুবিধে জুটেছে,—এইবার হয়ত পয়সার মুখ দেখবো।

কিন্তু মাসখানেক কিছুই হইল না···একদিন দালালটি তাহাকে বলিল—দুটোর পর আর বাজারে থাকেন না, এতে কি হয় কখনও বাবু? যান কোথায় ?

অপু বলিল, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে পড়তে যাই—দুটো থেকে সাতটা পর্যন্ত থাকি। একদিন যেও, দেখাবো কত বড় লাইব্রেরী।

লাইব্রেরীতে ইতিহাস খুব আগ্রহের সঙ্গে পড়ে, কোন এক দরিদ্র ঘরের ছোট ছেলের কাহিনী পড়িতে বড় ইচ্ছা যায়, সংসারে দুঃখকষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ—তাহাদের জীবনের অতি ঘনিষ্ঠ ধরণের সংবাদ জানিতে মন যায়।

মানুষের সত্যকার ইতিহাস কোথায় লেখা আছে? জগতের বড় ঐতিহাসিকদের অনেকেই যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাজনৈতিক বিপ্লবের ঝাঁঝে, সম্রাট, সম্রাজ্ঞী, মন্ত্রীদের সোনালী পোশাকের জাঁকজমকে, দরিদ্র গৃহস্থের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। পথের ধারের আমগাছে তাহাদের পুঁটুলিবাঁধা ছাতু কবে ফুরাইয়া গেল, সন্ধ্যায় ঘোড়ার হাট হইতে ঘোড়া কিনিয়া আনিয়া পল্লীর মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের ছেলে তাহার মায়ের মনে কোথায় আনন্দের ঢেউ তুলিয়াছিল—ছ' হাজার বছরের ইতিহাসে সে-সব কথা লেখা নাই—থাকিলেও বড় কম—রাজা যযাতি কি সম্রাট অশোকের শুধু রাজনৈতিক জীবনের গল্প সবাই শৈশব হইতে মুখস্থ করে—কিন্তু ভারতবর্ষের, গ্রীসের, রোমের, যব-গম ক্ষেতের ধারে, ওলিভ, বন্যদ্রাক্ষা, মার্টল ঝোপের ছায়ায় ছায়ায় যে প্রতিদিনের জীবন, হাজার হাজার বছর ধরিয়া প্রতি সকাল সন্ধ্যায়

যাপিত হইয়াছে—তাহাদের সুখ-দুঃখ আশানিরাশার গল্প, তাহাদের বুকের স্পন্দনের ইতিহাস সে জানিতে চায়।

কেবল মাঝে মাঝে এখানে ওখানে ঐতিহাসিকদের লেখা পাতায় সম্মিলিত সৈন্যব্যূহের এই আড়ালটা সরিয়া যায়, সারি বাঁধা বর্শার অরণ্যের ফাঁকে দূর অতীতের এক ক্ষুদ্র গৃহস্থের ছোট বাড়ি নজরে আসে। অজ্ঞাতনামা কোন লেখকের জীবন-কথা, কি কালের স্রোতে কূলে-লাগা এক টুকরা পত্র, প্রাচীন মিশরের কোন্ কৃষক পুত্রকে শস্য কাটিবার কি আয়োজন করিতে লিখিয়াছিল,—বহু হাজার বছর পর তাদের টুকরা ভূগর্ভে প্রোথিত মৃণ্ময়পাত্রের মত দিনের আলোয় বাহির হইয়া আসে।

কিন্তু আরও ঘনিষ্ঠ ধরণের, আরও তুচ্ছ জিনিসের ইতিহাস চায় সে। মানুষ, মানুষের বুকের কথা জানিতে চায়। আজ যা তুচ্ছ, হাজার বছর পরে তা মহাসম্পদ। ভবিষ্যতের সত্যকার ইতিহাস হইবে এই কাহিনী, মানুষের মনের ইতিহাস, তার প্রাণের ইতিহাস!

আর একটা দিক তাহার চোখে পড়ে। একটা জিনিস বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠে তাহার কাছে—মহাকালের এই মিছিল। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের ইতিহাস গিবন ভ্রমশূন্য লিখিয়াছেন, কি অন্য কেহ ভ্রমশূন্য লিখিয়াছেন, এ বিষয়ে তাহার তত কৌতূহল নাই, সে শুধু কৌতূহলাক্রান্ত মহাকালের এই বিরাট মিছিলে। হাজার যুগ আগেকার কত রাজা, রাণী, সম্রাট, মন্ত্রী, খোজা, সেনাপতি, বালক, যুবা, কত অশ্রুনয়না তরুণী, কত অর্থলিপ্সু রাজপুরুষ—যাহারা অর্থের জন্য অন্তরঙ্গ বন্ধুর গুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়া তাহাকে ঘাতকের কুঠারের মুখে দ্বিধা বোধ করে নাই—অনন্ত কালসমুদ্রে ইহাদের ভাসিয়া যাওয়ার, বুদ্বুদের মত মিলাইয়া যাওয়ার দিক্‌টা। কোথায় তাদের বৃথা শ্রমের পুরস্কার, তাদের অর্থলিপ্সার সার্থকতা ?

এদিকে ছুটাছুটিই সার হইতেছে—কাজে কিছুই হয় না। সে তো চায়-না বড়মানুষ হইতে—খাওয়া-পরা চলিয়া গেলেই সে খুশী—পড়াশুনা করার সে সময় পায় ও নিশ্চিন্ত হইতে পারে। কিন্তু তাও তো হয় না, টুইশানি না থাকিলে একবেলা আহারও জুটিত না যে। তা ছাড়া এ সব জায়গার আবহাওয়াই তাহার ভাল লাগে না আদৌ। চারিধারে অত্যন্ত হুঁশিয়ারী, দর-কষাকষি,...শুধু টাকা...টাকা . টাকা সংক্রান্ত কথাবার্তা—লোকজনের মুখে ও চোখের ভাবে ইতর ও অশোভন লোভ যেন উগ্রভাবে ফুটিয়া বাহির হইতেছে—এদের পাকা বৈষয়িক কথাবার্তায় ও চালচলনে অপু ভয় খাইয়া গেল! লাইব্রেরীর পরিচিত জগতে আসিয়া সে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে প্রতিদিন।

একদিন মুসলমান দালালটি বাজারে তাহার কাছে দুইটি টাকা ধার চাহিল। বড় কষ্ট যাইতেছে, পরের সপ্তাহেই দিয়া দিবে এখন। অপু ভাবিল—হয়ত বাড়িতে ছেলেমেয়ে আছে, রোজগার নাই এক পয়সা। অর্থাভাবের কষ্ট যে কি সে তাহা ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে এই দুই বৎসরে—নিজের বিশেষ স্বাচ্ছল্য না থাকিলেও একটি টাকা বাসা হইতে আনিয়া পরদিন বাজারে লোকটাকে দিল।

ইহার দিন সাতেক পর অপু সকালে ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া ঘরের দোরে কাহার ধাক্কার শব্দ পাইয়, দোর খুলিয়া দেখিল—মুসলমান দালালটি হাসিমুখে দাঁড়াইয়া।

—এসো, এসো আবদুল, তারপর খবর কি?

—আদাব বাবু, চলুন, ঘরের মধ্যে বলি। এ-ঘরে আপনি একলা থাকেন, না আর কেউ—ওঃ—বেশ ঘর তো বাবু!

—এসো বসো। চা খাবে?

চা-পানের পর আবদুল আসিবার উদ্দেশ্য বলিল। বারাকপুরে একটা বড় বয়লারের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, ঠিক সেই ধরণের বয়লারেরই আবার এদিকে একটা খরিদ্দার জুটিয়া গিয়াছে, কাজটা লাগাইতে পারিলে তিনশো টাকার কম নয়—একটা বড় দাঁও। কিন্তু মুশকিল দাঁড়াইয়াছে এই যে, এখনই বারাকপুরে গিয়া বয়লারটি দেখিয়া আসা দরকার এবং কিছু বায়না দিবারও প্রয়োজন আছে—অথচ তাহার হাতে একটা পয়সাও নাই। এখন কি করা?

অপু বলিল—খদ্দের মাল ইন্‌স্পেকশনে যাবে না?

—আগে আমরা দেখি. তবে তো খদ্দেরকে নিয়ে যাব?—দেড় পার্সেণ্ট ক'রে ধরলেও সাড়ে চারশো টাকা থাকবে আমাদের—খদ্দের হাতের মুঠোয় রয়েছে—আপনি নির্ভাবনায় থাকুন—এখন টাকার কি করি?

অপু পূর্বদিন টুইশানির টাকা পাইয়াছিল, বলিল—কত টাকার দরকার? আমি তো ছেলে-পড়ানোর মাইনে পেয়েছি—কত তোমার লাগবে বলো।

হিসাবপত্র করিয়া আট টাকা পড়িবে দেখা গেল। ঠিক হইল—আবদুল এবেলা বয়লার দেখিয়া আসিয়া ওবেলা বাজারে অপুকে সব খবর দিবে। অপু বাক্স খুলিয়া টাকা আনিয়া আবদুলের হাতে দিল।

বৈকালে সে পাটের এক্সচেঞ্জের বারান্দাতে বেলা পাঁচটা পর্যন্ত আগ্রহের সহিত আবদুলের আগমন প্রতীক্ষা করিল। আবদুল সেদিন আসিল না, পরদিনও তাহার দেখা নাই। ক্রমে একে একে সাত-আটদিন কাটিয়া গেল—কোথায় আবদুল? সারা বাজার ও রাজা উডম্যাণ্ড স্ট্রীটের লোহার দোকান আগাগোড়া খুঁজিয়াও তাহার সন্ধান মিলিল না। ক্লাইভ স্ট্রীটের একজন দোকানদার শুনিয়া বলিল—কত টাকা নিয়েছে আপনার মশাই। আবদুল তো? মশাই জোচ্চোরের ধাড়ী—আর টাকা পেয়েছেন,…টাকা নিয়ে সে দেশে পালিয়েছে—আপনিও যেমন!…

প্রথমে সে কথাটা বিশ্বাস করিল না। আবদুল সে রকম মানুষ নয়, তাহা ছাড়া এত লোক থাকিতে তাহাকে কেন ঠকাইতে যাইবে?

কিন্তু এ ধারণা বেশীদিন টিকিল না। ক্রমে জানা গেল আবদুল দেশে যাইবে বলিয়া যাহার কাছে সামান্য কিছু পাওনা ছিল, সব আদায় করিয়া লইয়া গিয়াছে দিন-সাতেক আগে। কাঁটাপেরেকের দোকানের বৃদ্ধ বিশ্বাস মহাশয় বলিলেন—আশ্চর্য্যি কথা মশাই, সবাই জানে

আবদুলের কাণ্ডকারখানা আর আপনি তাকে চেনেন নি দু-তিনমাসেও? রাধে-কৃষ্ট! বেটা জুয়াচোরের ধাড়ী, হার্ডওয়ারের বাজারে সবাই চিনে ফেলেছে, এখানে আর সুবিধে হয় না, তাই গিয়ে আজকাল জুটেছে মেশিনারির বাজারে। কোনও দোকানে তো আপনার একবার জিগ্যেস করাও উচিত ছিল। হার্ডওয়ারের দালালি করা কি আপনার মত ভালমানুষের কাজ মশাই? আপনার অল্প বয়স, অন্য কাজ কিছু দেখে নিন গে। এখানে কথা বেচে খেতে হবে, সে আপনার কর্ম্ম নয়, তবুও ভাল যে আটটা টাকার ওপর দিয়ে গিয়েছে—

আট টাকা বিশ্বাস মহাশয়ের কাছে যতই তুচ্ছ হউক অপুর কাছে তাহা নয়। ব্যাপার বুঝিয়া চোখে অন্ধকার দেখিল—গোটা মাসের ছেলে পড়ানোর দরুণ সব টাকাটাই যে সে তুলিয়া দিয়াছে আবদুলের হাতে! এখন সারা মাস চলিবে কিসে! বাড়ি ভাড়ার দেনা, গত মাসের শেষে বন্ধুর কাছে ধার—এ সবের উপায়?

দিশাহারা ভাবে পথ চলিতে চলিতে সে ক্লাইভ স্ট্রীটে শেয়ার মার্কেটের সামনে আসিয়া পড়িল। দালাল ও ক্রেতাদের চীৎকার, মাড়োয়ারীদের ভিড় ও ঠেলাঠেলি, থর্নিক্রফ্‌ট ছ' আনা, থর্নিক্রফ্‌ট ছ' আনা, নাগরমল সাড়ে পাঁচ আনা—বেজায় ভিড়, বেজায় হৈ-চৈ, লালদীঘির পাশ কাটাইয়া লাটসাহেবের বাড়ির সম্মুখ দিয়া সে একেবারে গড়ের মাঠের মধ্যে কেল্লার দক্ষিণে একটা নির্জন স্থানে একটা বড় বাদাম গাছের ছায়ায় আসিয়া বসিল।

আজই সকালে বাড়িওয়ালা একবার তাগাদা দিয়াছে, কাপড় একেবারে নাই, না কুলাইলেও ছেলে পড়ানোর টাকা হইতে কাপড় কিনিবে ঠিক করিয়াছিল, রুম-মেট তো নিত্য ধারের জন্য তাগাদা করিতেছে। আবদুল শেষকালে এভাবে ঠকাইল তাহাকে? চোখে তাহার জল আসিয়া পড়িল—দুঃখদিনের সাথী বলিয়া কত বিশ্বাস যে করিত সে আবদুলকে!

অনেকক্ষণ সে বসিয়া রহিল। ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে দুপুর, বেলা দেড়টা আন্দাজ। কেহ কোন দিকে নাই, আকাশ মেঘমুক্ত, দূরপ্রসারী নীল আকাশের গায়ে কালো বিন্দুর মত চিল উড়িয়া চলিয়াছে···দূর হইতে দূরে, সেই ছেলেবেলাকার মত—ছোট হইতে হইতে ক্রমে মিলাইয়া চলিয়াছে। একজন ঘেসেড়া বর্ষার লম্বা লম্বা ঘাস কাটিতেছে। ছোট একটি খোট্টাদের মেয়ে ঝুড়িতে ঘুঁটে কুড়াইতেছে।..দূরে খিদিরপুরের ট্রাম যাইতেছে···গঙ্গার দিকে বড় একটা জাহাজের চোঙ—ফোর্টের বেতারের মাস্তুল—এক...দুই···তিন...চার···আকাশ কি ঘন নীল ···এই তো চারিধারের মুক্ত সৌন্দর্য, এই কম্পমান শ্রাবণ দুপুরের খররৌদ্র...বিদ্যুৎ . সূর্য··· রাত্রির তারা...প্রেম···মা···দিদি...অনিল···মাথার উপরে নিঃসীম নীল আকাশ.. মৃত্যুপারের দেশ···চিররাত্রির অন্ধকারে যেখানে শাঁই শাঁই রবে ধূমকেতুর দল আগুনের পুচ্ছ দুলাইয়া উড়িয়া চলে—গ্রহ ছোটে, চন্দ্রসূর্য লাটিমের মত আপনার বেগে আপনি ঘুরিয়া বেড়ায়··· তুহিন শীতল ব্যোমপথে দূরে দূরে দেবলোকের মেরু-পর্বতের ফাঁকে ফাঁকে তাহারা মিট মিট করে—এই পরিপূর্ণ মহিমার মধ্যে জন্ম লইয়া আটটা টাকা···তুচ্ছ আট টাকা···এ কোন্ বিচিত্র জগৎ!···কিসের থর্নিক্রফ্‌ট্ আর নাগরমল?

কখন বেলা পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছিল, কখন একটু দূরে একটা ফুটবল টিমের খেলা আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল—একটা বল ধুম্ করিয়া তাহার একেবারে সামনে আসিয়া পড়াতে তাহার চমক ভাঙিল। উঠিয়া সে বলটা দু'হাতে ধরিয়া সজোরে একটা লাথি মারিয়া সেটাকে ধাবমান লাইন্‌স্‌ম্যানের দিকে ছুঁড়িয়া দিল।

একদিন পথে হঠাৎ প্রণবের সঙ্গে দেখা। দুজনেই ভারি খুশী হইল। সে কলিকাতায় আসিয়া পর্যন্ত অপুকে কত জায়গায় খুঁজিয়াছে, প্রথমটা সন্ধান পায় নাই, পরে জানিতে পারে অপূর্ব পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া কোথায় চাকুরিতে ঢুকিয়াছে। প্রণব রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া বৎসর-খানেক হাজতভোগের পর সম্প্রতি খালাস হইয়াছে, হাসিয়া বলিল—কিছুদিন গবর্ণমেণ্টের অতিথি হয়ে এলুম রে, এসেই তোর কত খোঁজ করেছি—তারপর, কোথায় চাকরি করিস্, মাইনে কত?

অপু হাসিমুখে বলিল—খবরের কাগজের অফিসে, মাইনে সত্তর টাকা!

সর্বৈব মিথ্যা। টাকা চল্লিশেক মাইনে পায়, কি একটা ফণ্ড বাবদ কিছু কাটিয়া লওয়ার পর হাতে পৌঁছায় তেত্রিশ টাকা ক'আনা। একটু গর্বের সুরে বলিল, চাকরি সোজা নয়, রয়টারের বাংলা করার ভার আমার ওপর—বুধবারের কাগজে 'আর্ট' ও ধর্ম বলে' লেখাটা আমার, দেখিস পড়ে।

প্রণব হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল—তুই ধর্মের সম্বন্ধে লিখ্‌তে গেলি কি নিয়ে রে! কি জানিস তুই—

—ওখানেই তোমার গোলমাল। ধর্ম মানে তুই যা বলতে চাইছিস, সেটা হচ্ছে collective ধর্ম, আমি বলি ওটার প্রয়োজনীয়তা ছিল আদিম মানুষের সমাজে, আর একটা ধর্ম আছে, যা কিনা নিজের নিজের, আমার ধর্ম আমার, তোমার ধর্ম তোমার, এইটের কথাই আমি—যে ধর্ম আমার নিজের তা যে আর কারো নয়, তা আমার চেয়ে কে ভাল বোঝে?

—বৌবাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে ওসব কথা হবে না, আয় গোলদীঘিতে লেকচার দিবি।

—শুন্‌বি তুই? চল্ তবে—

গোলদীঘিতে আসিয়া দুজনে একটা নির্জন কোণ বাছিয়া লইল। প্রণব বলিল—বেঞ্চের উপর দাঁড়া উঠে।

অপু বলিল—দাঁড়াচ্ছি, কিন্তু লোক জমবে না তো? তা হ'লে কিন্তু আর একটি কথাও বলব না।

তারপর আধঘণ্টাটাক অপু বেঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া ধর্ম সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দিয়া গেল। সে নিষ্কপট ও উদার—যা মুখে বলে মনে মনে তাহা বিশ্বাস করে। প্রণব শেষ পর্যন্ত শুনিবার পর ভাবিল—এসব কথা নিয়ে খুব তো নাড়াচাড়া করেছে মনের মধ্যে? একটু পাগলামির ছিট্ আছে, কিন্তু ওকে ঐজন্যেই এত ভালবাসি।

অপু বেঞ্চ হইতে নামিয়া বলিল—কেমন লাগ্‌ল?—

—তুই খুব sincere, যদিও একটু ছিটগ্রস্ত—

অপু লজ্জামিশ্রিত হাস্যের সহিত বলিল—যাঃ—

প্রণব বলিল—কিন্তু কলেজটা ছেড়ে ভাল কাজ করিস নি, যদিও আমি জানি তাই সেদিন বিনয়কে বল্‌ছিলাম যে অপূর্ব কলেজে না গিয়েও যা পড়াশুনা করবে, তোমরা দু'বেলা কলেজের সিমেণ্ট ঘষে ঘষে উঠিয়ে ফেললেও তা হবে না। ওর মধ্যে একটা সত্যিকার পিপাসা রয়েছে যে—

নিজের প্রশংসা শুনিয়া অপু খুব খুশী—বালকের মত খুশী। উজ্জ্বলমুখে বলিল—অনেকদিন পরে তোর সঙ্গে দেখা, চল তোকে কিছু খাওয়াইগে—কলেজ মেট্‌দের আর কারুর দেখা পাই নে—আমোদ করা হয় নি কতদিন যে—মা মারা যাওয়ার পর থেকে তো ··

প্রণব বিস্ময়ের স্বরে বলিল—মাও মারা গিয়েছেন!

—ওঃ, সে কথা বুঝি বলি নি? সে তো প্রায় এক বছর হ'তে চল্‌ল—

সামনেই একটা চায়ের দোকান। অপু প্রণবের হাত ধরিয়া সেখানে ঢুকিল। প্রণবের ভারি ভাল লাগিল অপুর এই অত্যন্ত খাঁটি ও অকৃত্রিম, আগ্রহভরা হাত ধরিয়া টানা। সে মনে মনে ভাবিল—এরকম warmth আর sincerity ক'জনের মধ্যে পাওয়া যায়? বন্ধু তো মুখে অনেকেই আছে—অপু একটা জুয়েল।

অপু বলিল—কি খাবি বল?···এই বেয়ারা, কি আছে ভাল?

খাইতে খাইতে প্রণব বলিল—তারপর চাকরির কথা বল—যে বাজার—কি ক'রে জোটালি?

অপু প্রথমে লোহার বাজারের দালালির গল্প করিল। হাসিয়া বলিল—তারপর আবদুলের মহাভিনিষ্ক্রমণের পরে হার্ডওয়ার আর জমলো না—ঘুরে ঘুরে বেড়াই চাকরি খুঁজে, বুঝলি—একদিন একজন বললে, বি-এন-আর আফিসে অনেক নতুন লোক নেওয়া হচ্ছে—গেলুম সেখানে। খুব লোকের ভিড়, চাকরি অনেক খালি আছে, ইংরিজি লিখতে-পড়তে পারলেই চাকরি হচ্ছে। ব্যাপার কি, শুনলাম মাস-দুই হ'ল স্ট্রাইক চল্‌ছে—তাদের জায়গায় নতুন লোক নেওয়া হচ্ছে—

প্রণব চায়ে চুমুক দিয়া বলিল—চাকরি পেলি?

—শোন্ না, চাকরি তখুনি হয়ে গেল, প্রিন্সিপ্যালের সার্টিফিকেটটাই কাজের হ'ল, তখুনি ছাপানো ফর্মে য়্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার দিয়ে দিলে, বাইরে এসে ভারি আনন্দ হল মনটাতে। চল্লিশ টাকা মাইনে, যেতে হবে গঞ্জাম জেলায়, অনেকদূর, যা ঠিক চাই তাই—বেণ্টিক স্ট্রীটের মোড়ে একটা দোকানে বসে মনের খুশীতে উপুরি উপরি চার কাপ চা খেয়ে ফেললাম—ভাব্‌লাম এতদিন পর পয়সার কষ্টটা তো ঘুচ্‌ল? ··আর কি খাবি? এই বেয়ারা আর দুটো ডিম ভাজা—না-না খা—

—দু'দিন চাকরি হয়েছে বলে বুঝি—তোর সেই পুরানো রোগ আজও—হ্যাঁ তারপর?

—তারপর বাড়ি এসে রাতে শুয়ে শুয়ে মনটাতে ভাল বললে না—ভাবলাম, ওরা একটা

সুবিধে আদায় করবার জন্য স্ট্রাইক করেছে, দু'মাস তাদেরও ছেলেমেয়ে কষ্ট পাচ্ছে, তাদের মুখের ভাতের থালা কেড়ে খাব শেষকালে?—আবার ভাবি, যাই চলে, অতদূর কখনো দেখি নি, তা ছাড়া মা মারা যাওয়ার পর কলকাতা আর ভাল লাগে না, যাইগে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত—ফের ওদের আফিসে গেলাম—ছাপানো ফর্মখানা ফেরত দিয়ে এলাম, বলে এলাম আমার যাওয়ার সুবিধা হবে না—

প্রণব বলিল—তোর মুখ আর চোখ look full of music and poetry.—প্রথম থেকে আমি জানি এ একজন আইডিয়ালিস্ট ছোকরা—তোদের দিয়েই তো এসব হবে তোর এ খবরের কাগজের কাজ কখন?

—রাত ন'টার পর যেতে হয়, রাত তিনটের পর ছুটি। ভারি ঘুম পায়, এখনও রাত-জাগা অভ্যেস হয় নি, তবে সুবিধে আছে, সকাল দশটা-এগারোটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে নি, সারাদিন লাইব্রেরীতে কাটাতে পারি—

খাওয়া-দাওয়া ভালই হইল। অপু বলিল—জল খাস্ নে—চল্ কলেজ স্কোয়ারে শরবৎ খাব—বেশ মিষ্টি লাগে খেতে।—লেমন স্কোয়াশ খেয়েছিস—আয়,—

কলেজের অত ছেলের মধ্যে এক অনিল ও প্রণব ছাড়া সে আর কাহাকেও বন্ধুভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই, অনেকদিন পরে মন খুলিয়া আলাপের লোক পাইয়া তাহার গল্প আর ফুরাইতেছিল না। বলিল, গাছপালা যে কতদিন দেখি নি, ইট আর সিমেণ্ট অসহ্য হয়ে পড়েছে। আমাদের অফিসে একজন কাজ করে, তার বাড়ি হাওড়া জেলা, সেদিন বলছে, বাড়ির বাগানে আগাছা বেড়ে উঠেছে, তাই সাফ করছে রবিবারে-রবিবারে। আমি তাকে বলি, কি গাছ মিত্তির মশাই? সে বলে—কিছু না, ঝুপি গাছ। আমি বলি—বলুন না, কি কি গাছ? রোজ সোমবারে সে বাড়ি থেকে এলে তাকে এই কথা জিগ্যেস করি—সে হয়ত ভাবে, আচ্ছা পাগল! রাত্রে, ভাই, সারারাত প্রেসের ঘড়ঘড়ানি, গরম, প্রিণ্টারের তাগাদার মধ্যে আমার কেবল মিত্তির মশায়ের বাড়ির সেই ঝুপি বনের কথা মনে হয়—ভাবি কি কি না জানি গাছ। এদিকে চোখ ঘুমে ঢুলে আসে, রাত একটার পর শরীর এলিয়ে পড়তে চায়, শরীরের বাঁধন যেন ক্রমে আলগা হয়ে আসে, কুঁজোর জল চোখে মুখে ঝাপ্‌টা দিয়ে ফুলো-ফুলো রাঙা-রাঙা, জ্বালা-করা চোখে আবার কাজ করতে বসি—ইলেক্‌ট্রিক বাতিতে যেন চোখে ছুঁচ বেঁধে—আর এত গরমও ঘরটাতে।

পরে সে আগ্রহের সুরে বলিল—একদিন রবিবারে চল তুই আর আমি কোনও পাড়া-গাঁয়ে গিয়ে মাঠে, বনের ধারে ধারে সারাদিন বেড়িয়ে কাটাব—বেশ সেখানেই লতা-কাঠি কুড়িয়ে আমরা রাঁধব—বিকেল হবে—পাখীর ডাক যে কতকাল শুনি নি। দোয়েল কি বৌ-কথা-কও, এদের ডাক তো ভুলেই গিয়েছি, রবিবার দিনটা ছুটি, চল্ যাবি?—এখন কত ফুল ফুটবারও সময়—আমি অনেক বনের ফুলের নাম জানি দেখিস্ চিনিয়ে দেব। যাবি প্রণব, চল আজ থিয়েটার দেখি? স্টারে 'সধবার একাদশী' আছে—যাবি?

নিজেই দু'খানা গ্যালারির টিকিট কিনিল—থিয়েটার ভাঙিলে অনেক রাত্রিতে ফিরিবার

পথে অপু বলিল—কি হবে বাকী রাতটুকু ঘুমিয়ে; আজ বসে গল্প ক'রে রাত কাটাই। কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ারের কাছে আসিয়া অপু বন্ধুর হাত ধরিয়া রেলিং টপকাইয়া স্কোয়ারের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল—বলিল—আয় আয়, এই বেঞ্চিটাতে বসি, আমি নিমচাঁদের পার্ট প্লে করব, দেখবি—

প্রণব হাসিয়া বলিল—তোর মাথা খারাপ আছে—এত রাতে বেশী চেঁচাস্ নি—পুলিশ এসে তাড়িয়ে দেবে—কিন্তু খানিকটা পর প্রণবও মাতিয়া উঠিল। দু'জনে হাসিয়া আবোল-তাবোল বকিয়া আরও ঘণ্টাখানেক কাটাইল। অপু একটা বেঞ্চির উপরে গড়াগড়ি দিতেছিল ও মুখে নিমচাঁদের অনুকরণে ইংরাজি কি কবিতা আবৃত্তি করিতেছিল—প্রণবের ভয়সূচক স্বরে উঠিয়া বসিয়া চাহিয়া দেখিল ফুটপাথের উপর একজন পাহারাওয়ালা। অমনি সে বেঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—Hail, Holy Light! Heaven's First born!—পরে দুইজনেই ডাফ্ স্ট্রীটের দিকের রেলিং টপকাইয়া সোজা দৌড় ছিল।

রাত্রি আর বেশী নাই। আমহার্স্ট স্ট্রীটের একটা বড় লাল বাড়ির পৈঠায় অপু গিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল—কোথায় আর যাবো—আয় বোস্ এখানে—

প্রণব বলিল—একটা গান ধর তবে—

অপু বলিল—বাড়ির লোকে দোর খুলে বেরিয়ে আসবে—কোন রকমে পুলিশের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছি—

—কেমন পাহারাওয়ালাটাকে চেঁচিয়ে বললুম—Hail, Holy Light!—হি-হি—টেরও পায় নি? কোথা দিয়ে পালালুম—নিমচাঁদের মত হয় নি?—হি-হি—

প্রণব বলিল—তোর মাথায় ছিট্ আছে—যাঃ সারা রাতটা ঘুম হ'ল না তোর পাল্লায় পড়ে—গা একটা গানই গা—আস্তে আস্তে ধর—আবার হাসে, যাঃ—

ইহারই দিন-পনেরো পরে একদিন প্রণব আসিয়া বলিল—তোকে নিয়ে যাব বলে এলাম—আমার মামাতো বোনের বিয়ে হবে সোমবারে, শুক্রবার রাত্রে আমরা যাব, খুলনা থেকে স্টীমারে যেতে হয়, অনেকদিন কোথাও যাস নি, চল আমার সঙ্গে, দিন-চার-পাঁচের ছুটি পাবি নে?

ছুটি মিলিল। ট্রেনে উঠিবার সময় তাহার ভারি আনন্দ। অনেকদিন কলিকাতা ছাড়িয়া যায় নাই, অনেকদিন রেলেও চড়ে নাই। সকালবেলা স্টিমারে উঠিবার সময় ভৈরবের ওপার হইতে তরুণ সূর্য ওঠার দৃশ্যটা তাহাকে মুগ্ধ করিল। নদী খুব বড় ও চওড়া, স্টীমার প্রণবের মামার বাড়ির ঘাটে ধরে না, পাশের গ্রামে নামিয়া নৌকায় যাইতে হয়। অপু এ অঞ্চলে কখনও আসে নাই, সম্পূর্ণ অপরিচিত দেশ, নদীর ধারে সুপারির সারি, বাঁশ, বেত-বন, অসংখ্য নারিকেল গাছ। টিনের চালাওয়ালা গোলা গঞ্জ। অদ্ভুত ধরণের নাম,স্বরূপকাটি, যশাইকাটি।

দক্ষিণ-পূর্ব কোণ ও খাড়া পশ্চিম, দু'দিক হইতে প্রকাণ্ড দু'টা নদী আসিয়া পরস্পরকে ছুঁইয়া অর্ধচন্দ্রাকারে বাঁকিয়া গিয়াছে, সেখানটাতে জলের রং ঈষৎ সবুজ এবং এই সঙ্গমস্থানেরই ও-পারে আধ মাইলের মধ্যে প্রণবের মামার বাড়ির গ্রাম গঙ্গানন্দকাটি।

নদীর ঘাট হইতে বাড়িটা অতি অল্প দূরে। এ গ্রামের মধ্যে ইহারাই অবস্থাপন্ন সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ।

অনেকবার অপু এ ধরণের বাড়ির ছবি কল্পনা করিয়াছে, এই ধরণের বড় নদীর ধারে, শহর-বাজারের ছোঁয়াচ ও আবহাওয়া হইতে বহু দূরে, কোন এক অখ্যাত ক্ষুদ্র পাড়াগাঁয়ের সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ, আগে অবস্থা ভাল ছিল, অথচ এখন নাই, নাট মন্দির, পূজার দালান, দোলমঞ্চ, রাসমঞ্চ, সবই থাকিবে, অথচ সে-সব হইবে ভাঙা, শ্রীহীন—আর থাকিবে প্রাচীন ধনীবংশের শান্ত মর্যাদাবোধ, মান সম্মান, উদারতা! প্রণবের মামার বাড়ির সঙ্গে সব যেন হুবহু মিলিয়া গেল।

ঘাট হইতে দুই সারি নারিকেল গাছ সোজা একেবারে বাড়ির দেউড়িতে গিয়া শেষ হইয়াছে, বাঁয়ে প্রকাণ্ড পূজার দালান, ডাইনে হলুদ রঙের কলসী বসানো ফটক ও ফুলবাগান, দোলমঞ্চ, রাসমঞ্চ, নাটমন্দির। খুব জৌলুস নাই কোনটারই, কার্নিস খসিয়া পড়িতেছে, একরাশ গোলাপায়রা নাটমন্দিরের মেজেতে চরিয়া বেড়াইতেছে, এক-আধটা ঝটাপট করিয়া ছাদে উড়িয়া পলাইতেছে, একখানা ষোল-বেহারার সেকেলে হাঙরমুখো পালকি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে! দেখিয়া মনে হয়—এক সময় ইহাদের অবস্থা খুব ভাল ছিল, বর্ত্তমানে পসারহীন ডাক্তারের দ্বারসংযুক্ত অনাদৃত পিতলের পাতের মত শ্রীহীন ও মলিন।

'পুলু এসেছে, পুলু এসেছে'—'এই যে পুলু'—'এটি কে সঙ্গে?' 'ও! বেশ বেশ, স্টীমার কি আজ লেট? ওরে নিবারণেকে ডাক, ব্যাগটা বাড়ির মধ্যে নিয়ে যা, আহা থাক্ এসো এসো, দীর্ঘজীবী হও।'

প্রণব তাহাকে একেবারে বাড়ির মধ্যে লইয়া গেল। অপু অপরিচিত বাড়ির মধ্যে অন্দরমহলে যথারীতি অত্যন্ত লাজুক মুখে ও সঙ্কোচের সহিত ঢুকিল। প্রণবের বড় মামীমা আসিয়া কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন! অপুকে দেখিয়া বলিলেন—এ ছেলেটিকে কোথেকে আনলি পুলু? এ মুখ যেন চিনি—

প্রণব হাসিয়া বলিল—কি ক'রে চিনবেন মামীমা? ও কি আর বাঙ্গাল দেশের মানুষ?

প্রণবের মামীমা বলিলেন—তা নয় রে, কতবার পটে আঁকা ছবি দেখেছি, ঠাকুরদেবতার মুখের মত মুখ—এসো এসো দীর্ঘজীবী হও—

প্রণবের দেখাদেখি অপুও পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল।

—এসো এসো, বাবা আমার এসো—কি সুন্দর মুখ—দেশ কোথায় বাবা?

সন্ধ্যার পর সারাদিনের গরমটা একটু কমিল। দেউড়ির বাহিরে আরতির কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, চারিদিকে শাঁখ বাজিল। উপরের খোলাছাদে শীতলপাটি পাতিয়া অপু একা বসিয়া ছিল, প্রণব ঘুম হইতে সন্ধ্যার কিছু আগে উঠিয়া কোথায় গিয়াছে। কেমন একটা নতুন ধরণের অনুভূতি—সম্পূর্ণ নতুন ধরণের—কি সেটা? কে জানে, হয়ত শাঁখের রব বা আরতির বাজনার দরুণ—কিংবা হয়ত···

মোটের উপর এ এক অপরিচিত জগৎ। কলিকাতার কর্মব্যস্ত, কোলাহল-মুখর ধূমধূলি-পূর্ণ আবহাওয়া হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এক ভিন্ন জীবনধারার জগৎ।

নারিকেলশ্রেণীর পত্রশীর্ষে নবমীর জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে, এইমাত্র ফুটিল, অপু লক্ষ্য করে নাই। কি কথা যেন সব মনে আসে। অনেকদিনের কথা।

পিছন হইতে প্রণব বলিল—কেমন, গাছপালা গাছপালা ক'রে পাগল, দেখলি তো গাছপালা নদীতে আসতে? কি রকম লাগল বল শুনি—

অপু বলিল—সে যা লাগল তা লাগল—এখন কি মনে হচ্ছে জানিস এই আরতি শুনে? ছেলেবেলায়, আমার দাদু ছিল ভক্ত বৈষ্ণব, তাঁর মুখে শুনতাম, 'বংশী বটতট কদম্ব নিকট, কালিন্দী ধীর সমীর'—যেন—

সিঁড়িতে কাহাদের পায়ের শব্দ শোনা গেল। প্রণব ডাকিয়া বলিল—কে রে? মেনী? শোন্—

একটি তেরো-চৌদ্দ বছরের বালিকা হাসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইল। প্রণব বলিল—কে, কে রে? মেয়েটি পিছন ফিরিয়া কাহাদের দিকে একবার চাহিয়া দেখিয়া বলিল—সবাই আছে, ননী-দি, দাসী-দি, মেজ-দি, সরলা—তাস খেলব চিলেকোঠার ঘরে—

অপু মনে মনে ভাবিল—এ বাড়ির মেয়ে-ছেলে সবাই দেখতে ভারি সুন্দর তো?

প্রণব বলিল—এটি মামার ছোট মেয়ে, এরই মেজ বোনের বিয়ে। ক' বোনের মধ্যে সে-ই সকলের চেয়ে সুশ্রী—মেনী ডাক তো একবার অপর্ণাকে?

মেনী সিঁড়িতে গিয়া কি বলিতেই একটা সম্মিলিত মেয়েলি কণ্ঠের চাপা হাস্যধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল, অল্পক্ষণ পরেই একটি ষোল-সতেরো বছরের নতমুখী সুন্দরী মেয়ে দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রণব বলিল—ও আমার বন্ধু, তোরও সুবাদে দাদা—লজ্জা কাকে এখানে রে? এটি মামার মেজ মেয়ে অপর্ণা—এরই—

মেয়েটি চপলা নয়, মৃদু হাসিয়া তখনই সরিয়া গেল, কি সুন্দর এক ঢাল চুল! কিছুদিন আগে পড়া একটা ইংরাজী উপন্যাসের একটা লাইন বার বার তাহার মনে আসিতে লাগিল—Do they breed goddesses at Slocum Magna? Do...they...breed...goddesses...at Slocum Magna?

এ রাতটার কথা অপুর চিরকাল মনে ছিল।

পরদিন প্রণবের সঙ্গে অপু তাহার মামার বাড়ির সবটা ঘুরিয়া দেখিল। প্রাচীন ধনীবংশ বটে। বাড়ির উত্তর দিকে পুরাতন আমলের আবাস-বাটি ও প্রকাণ্ড সাতদুয়ারী পূজার দালান ভগ্ন অবস্থায় পড়িয়া আছে, ওপারে অন্যতম সরিক-রামদুর্লভ বাঁড়ুয্যের বাড়ি। পুরাতন আমলের বসতবাটি বর্তমানে পরিত্যক্ত, রামদুর্লভের ছোট ভাই সেখানে বাস করিতেন। কি কারণে তাঁহার একমাত্র পুত্র নিরুদ্দেশ হইয়া যাওয়াতে তাঁহারা বেচিয়া-কিনিয়া কাশীবাসী হইয়াছেন।

এ সব কথা প্রণবের মুখেই ক্রমে ক্রমে শোনা গেল।

স্নানের সময়ে সে নদীতে স্নান করিতে চাহিলে সকলেই বারণ করিল—এখানকার নদীতে এ সময়ে কুমীরের উৎপাত খুব বেশী, পুকুরে স্নান করাই নিরাপদ।

বৈকালে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক কাছারী-বাড়ির বারান্দাতে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন, দিন-পনেরো পূর্বে নিকটস্থ কোন গ্রামের জনৈক তাঁতির ছেলে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইয়া যায়, সম্প্রতি তাহাকে রায়মঙ্গলের এক নির্জন চরে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। ছেলেটি বলে, তাহাকে নাকি পরীতে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিল, প্রমাণস্বরূপ সে আঁচলের খুঁট খুলিয়া কাঁচা লবঙ্গ, এলাচ ও জায়ফল বাহির করিয়া দেখাইয়াছে, এ-অঞ্চলের ত্রিসীমানায় এ সকলের গাছ নাই—পরী কোথা হইতে আনিয়া উপহার দিয়াছে।

প্রণবের মামীমা দুপুরে কাছে বসিয়া দুজনকে খাওয়াইলেন, অনেকদিন অপুর অদৃষ্টে এত যত্ন আদর বা এত ভাল খাওয়া-দাওয়া জোটে নাই। চিনি, ক্ষীর, মশলা, কর্পূর, ঘৃত, জীবনে কখনও তাহাদের দরিদ্র গৃহস্থালীতে এ সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে নাই। মায়ের সংসারে চালের গুঁড়া, গুড় ও সরিষার তৈলের কারবার ছিল বেশী।

একাদশ পরিচ্ছেদ

পরদিন বিবাহ। সকাল হইতে নানা কাজে সে বাড়ির ছেলের মত খাটিতে লাগিল। নাট-মন্দিরে বরাসন সাজানোর ভার পড়িল তাহার উপর। প্রাচীন আমলের বড় জাজিম ও শতরঞ্চির উপর সাদা চাদর পাতিয়া ফরাস বিছানো, কাচের সেজ ও বাতির ডুম টাঙ্গানো, দেবদারু পাতার ফটক বাঁধা, কাগজ কাটিয়া দম্পতির উদ্দেশ্যে আশীষবাণী রচনা, সকাল আটটা হইতে বেলা তিনটা পর্যন্ত এসব কাজে কাটিল।

সন্ধ্যার সময় বর আসিবে। বরের গ্রাম এই নদীরই ধারে, তবে দশ বারো ক্রোশ দূরে, নদীপথেই আসিতে হইবে। বরের পিতা ও-অঞ্চলের নাকি বড় গাঁতিদার, তাহা ছাড়া বিস্তৃত মহাজনী কারবারও আছে।

বরের নৌকা আসিতে একটু বিলম্ব হইতে পারে, প্রথম লগ্নে বিবাহ যদি না হয় রাত্রি দশটার লগ্ন বাদ যাইবে না।

ব্যাপার বুঝিয়া অপু বলিল—রাত তো আজ জাগতেই হবে দেখছি, আমি এখন একটু ঘুমিয়ে নি ভাই, বর এলে আমাকে ডেকে তুলো এখন।

প্রণব তাহাকে তেতলার চিলে-কোঠার ঘরে লইয়া গিয়া বলিল—এখানে হৈ-চৈ কম, এখানে ঘুম হবে এখন, আমি ঘণ্টা দুই পরে ডাকবো।

ঘরটা ছোট, কিন্তু খুব হাওয়া, দিনের শ্রান্তিতে সে শুইতে না শুইতে ঘুমাইয়া পড়িল।

কতক্ষণ পরে সে ঠিক জানে না, কাহাদের ডাকাডাকিতে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল।

সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, বর এসেছে বুঝি? উঃ, রাত অনেক হয়েছে তো! কিন্তু প্রণবের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইল—একটা কিছু যেন ঘটিয়াছে। সে বিস্ময়ের সুরে বলিল—কি—কি—প্রণব—কিছু হয়েছে নাকি?

উত্তরের পরিবর্তে প্রণব তাহার বিছানার পাশে বসিয়া পড়িয়া কাতর মুখে তাহার দিকে চাহিল, পরে ছল্-ছল্ চোখে তাহার হাত দু'টি ধরিয়া বলিল—ভাই আমাদের মান রক্ষার ভার তোমার হাতে আজ রাত্রে, অপর্ণাকে এখুনি তোমায় বিয়ে করতে হবে, আর সময় বেশী নেই, রাত খুব অল্প আছে, আমাদের মান রাখো ভাই।

আকাশ হইতে পড়িলেও অপু এত অবাক্ হইত না।

প্রণব বলে কি? প্রণবের মাথা খারাপ হইয়া গেল নাকি? না—কি সে ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখিতেছে!

এই সময়ে দুজন গ্রামের লোকও ঘরে ঢুকিলেন, একজন বলিলেন—আপনার সঙ্গে যদিও আমার পরিচয় হয় নি, তবুও আপনার কথা সব পুলুর মুখে শুনেছি—এদের আজ বড় বিপদ, সব বলছি আপনাকে, আপনি না বাঁচালে আর উপায় নেই—

ততক্ষণ অপু ঘুমের ঘোরটা অনেকখানি কাটাইয়া উঠিয়াছে, সে না-বুঝিতে পারার দৃষ্টিতে একবার প্রণবের, একবার লোক দুইটির মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। ব্যাপারখানা কি!

ব্যাপার অনেক।

সন্ধ্যার ঘণ্টাখানেক পর বরপক্ষের নৌকা আসিয়া ঘাটে লাগে। লোকজনের ভিড় খুব, দু-তিনখানা গ্রামের প্রজাপত্র উৎসব দেখিতে আসিয়াছে। বরকে হাঙরমুখো সেকেলে বড় পাল্‌কিতে উঠাইয়া বাজনা-বাদ্য ও ধুমধামের সহিত মহা সমাদরে ঘাট হইতে নাটমন্দিরে বরাসনে আনা হইতেছিল—এমন সময় এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটিল। বাড়ির উঠানে পাল্‌কিখানা আসিয়া পৌঁছিয়াছে, হঠাৎ বর নাকি পাল্‌কি হইতে লাফাইয়া পড়িয়া চেঁচাইয়া বলিতে থাকে—হুক্কা বোলাও, হুক্কা বোলাও!!

সে কি বেজায় চীৎকার!

একমুহূর্তে সব গোলমাল হইয়া গেল। চীৎকার হঠাৎ থামে না, বরকর্তা স্বয়ং দৌড়িয়া গেলেন, বর পক্ষের প্রবীণ লোকেরা ছুটিয়া গেলেন,—চারিদিকে সকলে অবাক্, প্রজারা অবাক্, গ্রামসুদ্ধ লোক অবাক্! সে এক কাণ্ড! চোখে না দেখিলে, বুঝানো কঠিন—আর কি যে লজ্জা, সারা উঠান জুড়িয়া প্রজা, প্রতিবেশী, আত্মীয়কুটুম্ব, পাড়ার ও গ্রামের ছোট বড় সকলে উপস্থিত, সকলের সাম্‌নে—বাঁড়ুয্যে বাড়ির মেয়ের বিবাহে এ ভাবের ঘটনা ঘটিবে, তাহা স্বপ্নাতীত, এ উহার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে, মেয়েদের মধ্যে কান্নাকাটি পড়িয়া গেল। বর যে প্রকৃতিস্থ নয়, একথা বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না।

বরপক্ষ যদিও নানাভাবে কথাটা ঢাকিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কেহ বলিলেন, গরমে ও সারাদিনের উপবাসের কষ্টে—ও-কিছু নয়, ও-রকম হইয়া থাকে,···কিন্তু ব্যাপারটা অত

সহজে চাপা দেওয়া গেল না, ক্রমে ক্রমে নাকি প্রকাশ হইতে লাগিল যে, বরের একটু সামান্য ছিট আছে বটে,—কিংবা ছিল বটে, তবে সেটা সব সময় যে থাকে তা নয়, আজকার গরমে, বিশেষ উৎসবের উত্তেজনায়—ইত্যাদি। ব্যাপারটা অনেকখানি সহজ হইয়া আসিতেছিল, নানা পক্ষের বোঝানোতে আবার সোজা হাওয়া বহিতে শুরু করিয়াছিল, মেয়ের বাপ শশীনারায়ণ বাঁড়ুয্যেও মন হইতে সমস্তটা ঝাড়িয়া ফেলিতে প্রস্তুত ছিলেন—তাহা ছাড়া উপায়ও অবশ্য ছিল না—কিন্তু এদিকে মেয়ের মা অর্থাৎ প্রণবের বড় মামীমা মেয়ের হাত ধরিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া খিল দিয়াছেন,—তিনি বলেন, জানিয়া-শুনিয়া তাঁহার সোনার প্রতিমা মেয়েকে তিনি ও-পাগলের হাতে কখনই তুলিয়া দিতে পারিবেন না, যাহা অদৃষ্টে আছে ঘটিবে। সকলের বহু অনুনয় বিনয়েও এই তিন-চার ঘণ্টার মধ্যে তিনি আর ঘরের দরজা খোলেন নাই, নাকি তেমন তেমন বুঝিলে মেয়েকে রাম-দা দিয়া কাটিয়া নিজের গলায় দা বসাইয়া দিবেন এমনও শাসাইয়াছেন, সুতরাং কেহ দরজা ভাঙ্গিতে সাহস করে নাই! অপর্ণাও এমনি মেয়ে, সবাই জানে, মা তাহার গলায় যদি সত্যই রাম-দা বসাইয়া দেয়ও, সে প্রতিবাদে মুখে কখনও টুঁ শব্দটি উচ্চারণ করিবে না, মায়ের ব্যবস্থা শান্তভাবেই মানিয়া লইবে।

পিছনের ভদ্রলোকটি বলিলেন, আপনি না রক্ষা করলে আর কেউ নেই, হয় এদিকে একটা খুনোখুনি হবে, না হয় সকাল হলেই ও-মেয়ে দো-পড়া হয়ে যাবে—এ সব দিকের গতিক তো জানেন না, দো-পড়া হ'লে কি আর ও মেয়ের বিয়ে হবে মশাই?···আহা, অমন সোনার পুতুল মেয়ে, এত বড় ঘর, ওরই অদৃষ্টে শেষে কিনা এই কেলেঙ্কারী! এ রাত্রের মধ্যে আপনি ছাড়া আর এ অঞ্চলে ও-মেয়ের উপযুক্ত পাত্র কেউ নেই—বাঁচান আপনি—

অপুর মাথায় যেন কিসের দাপাদাপি, মাতামাতি···মাথার মধ্যে যেন চৈতন্যদেবের নগর-সংকীর্তন শুরু হইয়াছে!···এ কি সঙ্কটে তাহাকে ভগবান ফেলিলেন! সকল প্রকার বন্ধনকে সে ভয় করে, তাহার উপর বিবাহের মত বন্ধন! এই তো সেদিন মা তাহাকে মুক্তি দিয়া গেলেন···আবার এক বৎসর ঘুরিতেই—একি!

মেয়েটির মুখ মনে হইল···আজই সকালে নিচের ঘরে তাহাকে দেখিয়াছে···কি শান্ত, সুন্দর গতিভঙ্গি। সোনার প্রতিমাই বটে, তাহার অদৃষ্টে উৎসবের দিনে এই ব্যাপার!··· তাহা ছাড়া রাম-দা-এর কাণ্ডটা...কি করে সে এখন?···

কিন্তু ভাবিবার অবসর কোথায়? পিছনে প্রণব দাঁড়াইয়া কি বলিতেছে, সেই ভদ্রলোক দু'টি তার হাত ধরিয়াছেন—তাহাও সে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে পারিত—কিন্তু মেয়েটিও যেন শান্ত ডাগর চোখ দু'টি তুলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে; সেই যে কাল সন্ধ্যায় প্রণবের আহ্বানে ছাদের উপরে যেমন তাহার পানে চাহিয়াছিল—তেমনি অপরূপ স্নিগ্ধ চাহনিতে ··নির্বাক মিনতির দৃষ্টিতে সেও যেন তাহার উত্তরের অপেক্ষা করিতেছে।...

সে বলিল, চল ভাই, যা করতে বলবে, আমি তাই করব, এসো।

নিচে কোথাও কোন শব্দ নাই, উৎসব-কোলাহল থামিয়া গিয়াছে, বরপক্ষ এ বাড়ি হইতে সদলবলে উঠিয়া গিয়া ইঁহাদের শরিক রামদুর্লভ বাঁড়ুয্যের চণ্ডীমণ্ডপে আশ্রয় লইয়াছেন,

এ-বাড়ির ঘরে-ঘরে খিল বন্ধ। কেবল নাটমন্দিরে উত্তর বারান্দার স্থানে স্থানে দু-চারজন জটলা করিয়া কি বলাবলি করিতেছে, আশ্চর্য এই যে, সম্প্রদান-সভায় পুরোহিত মহাশয় এত গোলমালের মধ্যেও ঠিক নিজের কুশাসনখানির উপর বসিয়া আছেন, তিনি নাকি সেই সন্ধ্যার সময় আসনে বসিয়াছেন আর উঠেন নাই।

সকলে মিলিয়া লইয়া গিয়া অপুকে বরাসনে বসাইয়া দিল।

এসব ঘটনাগুলি পরবর্তী জীবনে অপুর তত মনে ছিল না, বাংলা খবরের কাগজের ছবির মত অস্পষ্ট ধোঁয়া ধোঁয়া ঠেকিত। তাহার মন তখন এত দিশাহারা ও অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ছিল, চারিধারে কি হইতেছে, তাহার আদৌ লক্ষ্য ছিল না।

আবার দু-একটা যাহা লক্ষ্য করিতেছিল, যতই তুচ্ছ হোক্ গভীরভাবে মনে আঁকিয়া গিয়াছিল, যেমন—সামিয়ানার কোণের দিকে কে একজন ডাব কাটিতেছিল, ডাবটা গোল ও রাঙা, কাটারির বাঁটটা বাঁশের—অনেকদিন পর্যন্ত মনে ছিল।

রেশমী-চেলী-পরা সালঙ্কারা কন্যাকে সভায় আনা হইল, বাড়ির মধ্যে হঠাৎ শাঁখ বাজিয়া উঠিল, উলুধ্বনি শোনা গেল, লোকে ভিড় করিয়া সম্প্রদান-সভার চারিদিকে গোল হইয়া দাঁড়াইল। পুরোহিতের কথায় অপু চেলী পরিল, নূতন উপবীত ধারণ করিল, কলের পুতুলের মত মন্ত্রপাঠ করিয়া গেল। স্ত্রী-আচারের সময় আসিল, তখনও সে অন্যমনস্ক, নববধূর মত সে-ও ঘাড় গুঁজিয়া আছে, যে ব্যাপারটা ঘটিতেছে চারিধারে তখনও যেন সে সম্যক্ ধারণা করিতে পারে নাই—কানের পাশ দিয়া কি একটা যেন শির্ শির্ করিয়া উপরের দিকে উঠিতেছে—না—ঠিক উপরের দিকে নয়, যেন নিচের দিকে নামিতেছে।

প্রণবের বড় মামীমা কাঁদিতেছিলেন তাহা মনে আছে, তিনিই আবার গরদের শাড়ীর আঁচল দিয়া তাহার মুখের ঘাম মুছাইয়া দিলেন, তাহাও মনে ছিল। কে একজন মহিলা বলিলেন—মেয়ের শিবপুজোর জোর ছিল বড়বৌ, তাই এমন বর মিললো। ভাঙা দালান যে রূপে আলো করেছে!

শুভদৃষ্টির সময় সে এক অপূর্ব ব্যাপার! মেয়েটি লজ্জায় ডাগর চোখ দু'টি নত করিয়া আছে, অপু কৌতূহলের সহিত চাহিয়া দেখিল, ভাল করিয়াই দেখিল, যতক্ষণ কাপড়ের ঢাকাটা ছিল, ততক্ষণ সে মেয়েটির মুখ ছাড়া অন্যদিকে চাহে নাই—চিবুকের গঠন-ভঙ্গিটি এক চমক দেখিয়াই সুঠাম ও সুন্দর মনে হইল। প্রতিমার মত রূপই বটে, চূর্ণ অলকের দু-এক গাছা কানের আশে-পাশে পড়িয়াছে, হিঙ্গুল রঙের ললাটে ও কপোলে বিন্দু বিন্দু ঘাম। কানে সোনার দুলে আলো পড়িয়া জ্বলিতেছে।

বাসর হইল খুব অল্পক্ষণ, রাত্রি অল্পই ছিল। মেয়েদের ভিড়ে বাসর ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই বিবাহ ভাঙিয়া যাইতে নিজের নিজের বাড়ি চলিয়া গিয়াছিলেন, কোথা হইতে একজনকে ধরিয়া আনিয়া অপর্ণার বিবাহ দেওয়া হইতেছে শুনিয়া তাঁহারা পুনরায় ব্যাপারটা দেখিতে আসিলেন। একরাত্রে এত মজা এ অঞ্চলের অধিবাসীর

ভাগ্যে কখনও জোটে নাই—কিন্তু পথ-হইতে-ধরিয়া-আনিয়া বরকে দেখিয়া সকলে একবাক্যে স্বীকার করিলেন—এইবার অপর্ণার উপযুক্ত বর হইয়াছে বটে।

প্রণবের বড় মামীমা তেজস্বিনী মহিলা, তিনি বাঁকিয়া না বসিলে বোধ হয় ওই বায়ুরোগগ্রস্ত পাত্রটির সহিতই আজ তাঁহার মেয়ের বিবাহ হইয়া যাইত নিশ্চয়ই। এমন কি তাঁহার অমন রাশ-ভারী স্বামী শশীনারায়ণ বাঁড়ুয্যে যখন নিজে বদ্ধ-দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন—বড়বৌ, কি কর পাগলের মত, দোর খোলো, আমার মুখ রাখো—ছিঃ—তখনও তিনি অচল ছিলেন। তিনি বলিলেন—মা, যখনই একে পুলুর সঙ্গে দেখেছি, তখনই আমার মন যেন বলছে এ আমার আপনার লোক—ছেলে তো আরও অনেক পুলুর সঙ্গে এসেছে গিয়েছে কিন্তু এত মায়া কারোর উপর হয়নি কখনও—ভেবে দ্যাখো মা, এ মুখ আর লোকালয়ে দেখাবো না ভেবেছিলাম—ও ছেলে যদি আজ পুলুর সঙ্গে এ বাড়ি না আস্‌তো—

পূর্বের সেই প্রৌঢ়া বাধা দিয়া বলিলেন—তা কি ক'রে হবে মা, ওই যে তোমার অপর্ণার স্বামী, তুমি আমি কেনারাম মুখুয্যের ছেলের সঙ্গে ওর সম্বন্ধ ঠিক করতে গেলে কি হবে, ভগবান যে ওদের দুজনের জন্যে দুজনকে গড়েছেন, ও ছেলেকে যে আজ এখানে আসতেই হবে মা—

প্রণবের মামীমা বলিলেন—আবার যে এমন ক'রে কথা বলব তা আজ দু'ঘণ্টা আগেও ভাবিনি—এখন আপনারা পাঁচজনে আশীর্বাদ করুন, যাতে—যাতে—

চোখের জলে তাঁহার গলা আড়ষ্ট হইয়া গেল। উপস্থিত কাহারো চোখ শুষ্ক ছিল না, অপুও অতি কষ্টে উদ্গত অশ্রুজল চাপিয়া বসিয়া রহিল। প্রণবের মামীমার উপর শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে তাহার মন…মায়ের পরই বোধ হয় এমন আর কাহারও উপর…কেবল আর একজন আছেন—মেজবৌরাণী—লীলার মা।

তা ছাড়া মায়ের উপর তাহার মনোভাব, শ্রদ্ধা বা ভক্তির ভাব নয়, তাহা আরও অনেক ঘনিষ্ঠ, অনেক গভীর, অনেক আপন—বত্রিশ নাড়ীর বাঁধনের সঙ্গে সেখানে যেন যোগ—সে-সব কথা বুঝাইয়া বলা যায় না…যাক্‌ সে কথা।

বিশ্বাসঘাতক প্রণব কোথা হইতে আসিয়া সকলকে জানাইয়া দিল যে, নূতন জামাই খুব ভাল গাহিতে পারে। অপর্ণার মা তখনই বাসর হইতে চলিয়া গেলেন; বালিকা ও তরুণীর দল একে চায় তো আরে পায়, এদিকে অপু ঘামিয়া রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। না সে পারে ভালো করিয়া কাহারো দিকে চাহিতে, না মুখ দিয়া বাহির হয় না কোন কথা। নিতান্ত পীড়াপীড়িতে একটা রবিবাবুর গান গাহিল, তারপর আর কেহ ছাড়িতে চায় না—সুতরাং আর একটা। মেয়েরাও গাহিলেন, একটি বধূর কণ্ঠস্বর ভারী সুমিষ্ট। প্রৌঢ়া ঠান্‌দি নববধূর গা ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন—ওরে ও নাত্‌নি, তোর বর ভেবেছে ও বাঙাল দেশে এসে নিজেই গান গেয়ে আসর মাতিয়ে দেবে—শুনিয়ে দে না তোর গলা—জারিজুরি একবার দে না ভেঙে—

অপু মনে মনে ভাবে—কার বর? ..সে আবার কার বর?…এই সুসজ্জিতা সুন্দরী নতমুখী মেয়েটি তাহার পাশে বসিয়া, এ তার কে হয়?…স্ত্রী…তাহারই স্ত্রী?

পরদিন সকালে পূর্বতন বরপক্ষের সহিত তুমুল কাণ্ড বাধিল। উভয় পক্ষে বিস্তর তর্ক, ঝগড়া, শাপাশাপি, মামলার ভয় প্রদর্শনের পর কেনারাম মুখুয্যে দলবলসহ নৌকা করিয়া স্বগ্রামের দিকে যাত্রা করিলেন। প্রণব বড়মামাকে বলিল—ওসব বড় লোকের মুখ্যু জড়ভরত ছেলের চেয়ে আমি যে অপূর্বকে কত বড় মনে করি!.. একা কলকাতা শহরে সহায়হীন অবস্থায় ওকে যা দুঃখের সঙ্গে লড়াই করতে দেখেছি আজ তিন বছর ধ'রে, ওকে একটা সত্যিকারের মানুষ ব'লে ভাবি।

অপুর ঘর-বাড়ি নাই, ফুলশয্যা এখানেই হইল। রাত্রে অপু ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, ঘরের চারিধার ফুল ও ফুলের মালায় সাজানো, পালঙ্কের উপর বিছানায় মেয়েরা একরাশ বৈশাখী চাঁপাফুল ছড়াইয়া রাখিয়াছে, ঘরের বাতাসে পুষ্পসারের মৃদু সৌরভ। অপু সাগ্রহে নববধূর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। বাসরের রাত্রের পর আর মেয়েটির সহিত দেখা হয় নাই বা এ পর্যন্ত তাহার সঙ্গে কথাবার্তা হয় নাই আদৌ—আচ্ছা ব্যাপারটা কি রকম ঘটিবে? অপুর বুক কৌতূহলে ও আগ্রহে ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছিল।

খানিক রাত্রে নববধূ ঘরে ঢুকিল। সঙ্গে সঙ্গে অপুর মনে আর একদফা একটা অবাস্তবতার ভাব জাগিয়া উঠিল। এ মেয়েটি তাহারই স্ত্রী? স্ত্রী বলিতে যাহা বোঝায় অপুর ধারণা ছিল তা যেন এ নয়···কিংবা হয়ত স্ত্রী বলিতে ইহাই বোঝায়, তাহার ধারণা ভুল ছিল। মেয়েটি দোরের কাছে ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় দাঁড়াইয়া ঘামিতেছিল—অপু অতিকষ্টে সঙ্কোচ কাটাইয়া মৃদুস্বরে বলিল—আপনি—তু—তুমি দাঁড়িয়ে কেন? এখানে এসে ব'স—

বাহিরে বহু বালিকাকণ্ঠের একটা সম্মিলিত কলহাস্যধ্বনি উঠিল। মেয়েটিও মৃদু হাসিয়া পালঙ্কের একধারে বসিল—লজ্জায় অপুর নিকট হইতে দূরে বসিল। এই সময় প্রণবের ছোট মামীমা আসিয়া বালিকার দলকে বকিয়া-ঝকিয়া নিচে নামাইয়া লইয়া যাইতে অপু খানিকটা স্বস্তি বোধ করিল। মেয়েটির দিকে চাহিয়া বলিল—তোমার নাম কি?

মেয়েটি মৃদুস্বরে নতমুখে বলিল—শ্রীমতী অপর্ণা দেবী—সঙ্গে সঙ্গে সে অল্প একটু হাসিল। যেমন সুন্দর মুখ তেমনি সুন্দর মুখের হাসিটা—কি রং!···কি গ্রীবার ভঙ্গি! চিবুকের গঠনটি কি অপরূপ—মুখের দিকে চাহিয়া উজ্জ্বল বাতির আলোয় অপুর যেন কিসের নেশা লাগিয়া গেল।

দু'জনেই খানিকক্ষণ চুপ। অপুর গলা শুকাইয়া আসিয়াছিল। কুঁজা হইতে জল ঢালিয়া এক গ্লাস জলই সে খাইয়া ফেলিল। কি কথা বলিবে সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না, ভাবিয়া ভাবিয়া অবশেষে বলিল—আচ্ছা, আমার সঙ্গে বিয়ে হওয়াতে তোমার মনে খুব কষ্ট হয়েছে—না?

বধূ মৃদু হাসিল।

—বুঝতে পেরেছি ভারী কষ্ট হয়েছে—তা আমার—

—যান্—

এই প্রথম কথা, তাহাকে এই প্রথম সম্বোধন। অপুর সারাদেহে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া

গেল, অনেক মেয়ে তো ইতিপূর্বে তাহার সঙ্গে কথা বলিয়াছে, এ রকম তো কখনও হয় নাই ?...

দক্ষিণের জানালা দিয়া মিঠা হাওয়া বহিতেছিল, চাঁপাফুলের সুগন্ধে ঘরের বাতাস ভরপুর।

অপু বলিল—রাত দুটো বাজে, শোবে না ? ইয়ে—এখানেই তো শোবে ?

মা ও দিদির সঙ্গে ভিন্ন কখনও অন্য কোনও মেয়ের সঙ্গে এক বিছানায় সে শোয় নাই, একা একঘরে এতবড় অনাত্মীয়, নিঃসম্পর্কীয় মেয়ের পাশে এক বিছানায় শোওয়া—সেটা কি ভাল দেখাইবে ? কেমন যেন বাধ বাধ ঠেকিতেছিল। একবার তাহার হাতখানা মেয়েটির গায়ে অসাবধানতাবশত ঠেকিয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে সারা গা শিহরিয়া উঠিল। কৌতূহলে ও ব্যাপারের অভিনবতায় তাহার শরীরের রক্ত যেন টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতেছিল—ঘরের উজ্জ্বল আলোয় অপুর সুন্দর মুখ রাঙা ও একটা অস্বাভাবিক দীপ্তিসম্পন্ন দেখাইতেছিল।

হঠাৎ সে কিসের টানে পাশ ফিরিয়া মেয়েটির গায়ে ভয়ে ভয়ে হাত তুলিয়া দিল। বলিল—সেদিন যখন আমার সঙ্গে প্রথম দেখা হ'ল, তুমি কি ভেবেছিলে ?

মেয়েটি মৃদু হাসিয়া তাহার হাতখানা আস্তে আস্তে সরাইয়া দিয়া বলিল—আপনি কি ভেবেছিলেন আগে বলুন ?...সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের সুঠাম, পুষ্পপেলব হাতখানি বাতির আলোয় তুলিয়া ধরিয়া হাসিমুখে বলিল—গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে—এই দেখুন কাঁটা দিয়েছে—কেন বলুন না ?...কথা শেষ করিয়া সে আবার মৃদু হাসিল।

এতগুলি কথা একসঙ্গে এই প্রথম ? কি অপূর্ব রোমান্স এ ! ইহার অপেক্ষা কোন্ রোমান্স আছে আর এ জগতে, না চিনিয়া, না বুঝিয়া সে এতদিন কি হিজিবিজি ভাবিয়া বেড়াইয়াছে !...জীবনের জগতের সঙ্গে এ কি অপূর্ব ঘনিষ্ঠ পরিচয় !..তাহার মাথার মধ্যে কেমন যেন করিতেছে, মদ খাইলে বোধ হয় এরকম নেশা হয়...ঘরের মধ্যে যেন আর থাকা যায় না...বেজায় গরম। সে বলিল—একটু বাইরের ছাদে বেড়িয়ে আসি, খুব গরম না ? আসছি এখুনি—

বৈশাখের জ্যোৎস্না রাত্রি—রাত্রি বেশী হইলেও বাড়ির লোক এখনও ঘুমায় নাই, বৌভাত কাল এখানে হইবে, নিচে তাহারই উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছে। দালানের পাশে বড় রোয়াকে ঝিয়েরা কচুর শাক কুটিতেছে, রান্না-কোঠার পিছনে নতুন খড়ের চালা বাঁধা হইয়াছে সেখানে এত রাত্রে পানতুয়া ভিয়ান হইতেছে—সে ছাদের আলিসার ধারে দাঁড়াইয়া দেখিল।

ছাদে কেহ নাই, দূরের নদীর দিক হইতে একটা ঝিরঝিরে হাওয়া বহিতেছে। দু'দিন যে কি ঘটিয়াছে তাহা যেন সে ভাল করিয়া বুঝিতেই পারে নাই—আজ বুঝিয়াছে। কয়েকদিন পূর্বেও সে ছিল সহায়শূন্য, বন্ধুশূন্য, গৃহশূন্য, আত্মীয়শূন্য জগতে সম্পূর্ণ একাকী, মুখের দিকে চাহিবার ছিল না কেহই। কিন্তু আজ তো তাহা নয়, আজ ওই মেয়েটি যে কোথা হইতে আসিয়া পাশে দাঁড়াইয়াছে, মনে হইতেছে যেন ও জীবনের পরম বন্ধু।

মা এ-সময় কোথায় ?...মায়ের যে বড় সাধ ছিল মনসাপোতার বাড়িতে শুইয়া শুইয়া কত

রাত্রে সে-সব কত সাধ, কত আশার গল্প···মায়ের সোনার দেহ কোদ্‌লাতীরের শ্মশানে চিতাগ্নিতে পুড়িবার রাত্রি হইতে সে আশা-আকাঙ্ক্ষার তো সমাধি হইয়াছিল···মাকে বাদ দিয়া জীবনের কোন্ উৎসব···

অপু আকুল চোখের জলে চারিদিকে ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল।

বৈশাখী শুক্লা দ্বাদশী রাত্রির জ্যোৎস্না যেন তাহার পরলোকগত দুঃখিনী মায়ের আশীর্বাদের মত তাহার বিভ্রান্ত হৃদয়কে স্পর্শ করিয়া সরল শুভ্র মহিমায় স্বর্গ হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কলিকাতার কর্ম্মকঠোর, কোলাহলমুখর, বাস্তব জগতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গত কয়েকদিনের জীবনকে নিতান্ত স্বপ্ন বলিয়া মনে হইল অপুর। একথা কি সত্য—গত শুক্রবার বৈশাখী পূর্ণিমার শেষরাত্রে সে অনেক দূরের নদী-তীরবর্ত্তী এক অজানা গ্রামের অজানা গৃহস্থবাটির রূপসী মেয়েকে বলিয়াছিল—আমি এ বছর যদি আর না আসি অপর্ণা ?···

প্রথমবার মেয়েটি একটু হাসিয়া মুখ নিচু করিয়াছিল, কথা বলে নাই।

অপু আবার বলিয়াছিল—চুপ ক'রে থাকলে হবে না, তুমি যদি বলো আসব, নৈলে আসব না, সত্যি অপর্ণা। বলো কি বলবে ?

মেয়েটি লজ্জারক্তমুখে বলিয়াছিল—বা রে, আমি কে ? মা রয়েছেন, বাবা রয়েছেন, ও'দের—আপনি ভারী—

—বেশ আসব না তবে। তোমার নিজের ইচ্ছে না থাকে—

—আমি কি সে কথা বলেছি ?

—তা হলে ?

—আপনার ইচ্ছে যদি হয় আসতে, আসবেন—না হয় আসবেন না, আমার কথায় কি হবে ?

ও-কথা ইহার বেশী আর অগ্রসর হয় নাই, অন্য সময় এ ক্ষেত্রে হয়ত অপুর অত্যন্ত অভিমান হইত, কিন্তু এ ক্ষেত্রে কৌতুহলটাই তাহার মনের অন্য সব প্রবৃত্তিকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে—ভালবাসার চোখে মেয়েটিকে সে এখনও দেখিতে পারে নাই, যেখানে ভালবাসা নাই, সেখানে অভিমানও নাই।

সেদিন বৈকালে গোলদীঘির মোড়ে একজন ফেরিওয়ালা চাঁপাফুল বেচিতেছিল, সে আগ্রহের সহিত গিয়া ফুল কিনিল। ফুলটা আঘ্রাণের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু মনের মধ্যে একটা বেদনা সে সুস্পষ্ট অনুভব করিল, একটা কিছু পাইয়া হারাইবার বেদনা, একটা শূন্যতা, একটা খালি-খালি ভাব···মেয়েটির মাথায় চুলের সে গন্ধটাও যেন আবার পাওয়া যায়।···

অন্যমনস্কভাবে গোলদীঘির এক কোণে ঘাসের উপর অনেকক্ষণ একা বসিয়া বসিয়া সেদিনের সেই রাতটি আবার সে মনে আনিবার চেষ্টা করিল। মেয়েটির মুখখানি কি রকম যেন ?···ভারী সুন্দর মুখ···কিন্তু এই কয়দিনের মধ্যেই সব যেন মুছিয়া অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে—মেয়েটির মুখ মনে আনিবার ও ধরিয়া রাখিবার যত বেশী চেষ্টা করিতেছে সে, ততই সে-মুখ দ্রুত অস্পষ্ট হইয়া যাইতেছে। শুধু নতপল্লব কৃষ্ণতার-চোখ-দু'টির ভঙ্গি অল্প অল্প মনে আসে, আর মনে আসে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের সে স্নিগ্ধ হাসিটুকু। প্রথমে ললাটে লজ্জা ঘনাইয়া আসে, ললাট হইতে নামে ডাগর দু'টি চোখে, পরে কপোলে—তারপরই যেন সারা মুখখানি অল্পক্ষণের জন্য অন্ধকার হইয়া আসে···ভারী সুন্দর দেখায় সে সময়। তারপরই আসে সেই অপূর্ব্ব সুন্দর হাসিটি, ওরকম হাসি আর কারও মুখে অপু কখনও দেখে নাই। কিন্তু মুখের সব আদলটা তো মনে আসে না—সেটা মনে আনিবার জন্য সে ঘাসের উপর শুইয়া অনেকক্ষণ ভাবিল, অনেকক্ষণ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া দেখিল—না কিছুতেই মনে আসে না—কিংবা হয়ত আসে অতি অল্পক্ষণের জন্য, আবার তখনই অস্পষ্ট হইয়া যায়। অপর্ণা—কেমন নামটি···?

জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি প্রণব কলিকাতায় আসিল। বিবাহের পর এই তাহার সঙ্গে প্রথম দেখা। সে আসিয়া গল্প করিল, অপর্ণার মা বলিয়াছেন—তাঁহার কোন্ পুণ্যে এরকম তরুণ দেবতার মত রূপবান জামাই পাইয়াছেন জানেন না—তাহার কেহ কোথাও নাই শুনিয়া চোখের জল রাখিতে পারেন নাই।

অপু খুশী হইল, হাসিয়া বলিল—তবুও তো একটা ভাল জামা গায়ে দিতে পারলাম না, সাদা পাঞ্জাবী গায়ে বিয়ে হ'ল—দূর!…না খেয়ে-দেয়ে একটা সিল্কের জামা করালুম, সেটা গেল ছিঁড়ে-ছুটে, তখন তুমি এলে তোমার মামার বাড়িতে নিয়ে যেতে, তার আগে আসতে পারলে না—আচ্ছা, সিল্কের জামাটাতে আমায় কেমন দেখাতো?

—ওঃ—স্বাক্ষাৎ য়্যাপোলো বেল্‌ভেডিয়ার!…ঢের ঢের হামবাগ দেখেছি, কিন্তু তোর জুড়ি খুঁজে পাওয়া ভার—বুঝলি?

না—কিন্তু একটা কথা। অপর্ণার মা কি বলেন তাহা জানিতে অপুর তত কৌতূহল নাই—অপর্ণা কি বলিয়াছে?—অপর্ণা?…অপর্ণা কিছু বলে নাই?…হয়ত কেনারাম মুখুয্যের ছেলের সঙ্গে বিবাহ না হওয়াতে মনে মনে দুঃখিত হইয়াছে—না?

প্রণবের মামা এ বিবাহে তত সন্তুষ্ট হন নাই, স্ত্রীর উপরে মনে মনে চটিয়াছেন এবং তাঁহার মনের ধারণা—প্রণবই তাহার মামীমার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া নিজের বন্ধুর সঙ্গে বোনের বিবাহ দেওয়াইয়াছে। নাম নাই, বংশ নাই, চালচুলা নাই—চেহারা লইয়া কি মানুষ ধুইয়া খাইবে…কিন্তু এসব কথা প্রণব অপুকে কিছু বলিল না।

একটা কথা শুনিয়া সে দুঃখিত হইল।—কেনারাম মুখুয্যের ছেলেটি নিজে দেখিয়া মেয়ে পছন্দ করিয়াছিল। অপর্ণাকে বিবাহ করার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল তাহার—কিন্তু হঠাৎ বিবাহ-সভায় আসিয়া কি যেন গোলমাল হইয়া গেল, সারারাত্রি কোথা দিয়া কাটিল, সকালবেলা যখন একটু হুঁশ হইল, তখন সে দাদাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—দাদা, আমার বিয়ে হ'ল না?

এখনও তাহার অবশ্য ঘোর কাটে নাই…বাড়ি ফিরিবার পথেও তাহার মুখে ওই কথা—এখন নাকি সে বন্ধ উন্মাদ! ঘরে তালা দিয়ে রাখা হইয়াছে।

অপু বলিল—হাসিস কেন, হাসবার কি আছে?…পাগল তো নিজের ইচ্ছেয় হয় নি, সে বেচারির আর দোষ কি? ও নিয়ে হাসি ভাল লাগে না।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া ঘুম হয় না—কেবলই অপর্ণার কথা মনে আসে। প্রণব এ কি করিয়া দিল তাহাকে? সে যে বেশ ছিল, এ কোন্ সোনার শিকল তাহার মুক্ত, বন্ধনহীন হাতে-পায়ে অদৃশ্য নাগপাশের মত দিন দিন জড়াইয়া পড়িতেছে? লাইব্রেরীতে বসিয়া কেবল আজকাল বাংলা উপন্যাস পড়ে—দেখিল তাহার মত বিবাহ নভেলে অনেক ঘটিয়াছে, অভাব নাই।

পূজার সময় শ্বশুরবাড়ি যাওয়া ঘটিল না। এক তো অর্থাভাবে সে নিজের ভাল জামা-কাপড় কিনিতে পারিল না, শ্বশুরবাড়ি হইতে পূজার তত্ত্বে যাহা পাওয়া গেল, তাহা পরিয়া সেখানে যাইতে তাহার ভারী বাধবাধ ঠেকিল। তাহা ছাড়া অপর্ণার মা চিঠির উপর চিঠি দিলে কি হইবে, তাহার বাবার দিক হইতে জামাইকে পূজার সময় লইয়া যাইবার বিশেষ কোন আগ্রহ দেখা গেল না বরং তাঁহার নিকট হইতে উপদেশপূর্ণ পত্র পাওয়া গেল যে, একটা ভাল চাকুরি বাকুরি যেন সে শীঘ্র দেখিয়া লয়, এখন অল্প বয়স, এই তো অর্থ উপার্জনের সময়, এখন আলস্য ও ব্যসনে কাটাইলে, এমনি ধরণের নানা কথা। এখানে বলা আবশ্যক, এ বিবাহে তিনি অপুকে একেবারেই ফাঁকি দিয়াছিলেন, কেনারাম মুখুয্যের ছেলেকে যাহা দিবার কথা ছিল তাহার সিকিও এ জামাইকে দেন নাই।

ছুটি পাওয়া গেল পুনরায় বৈশাখ মাসে। পূর্বদিন রাত্রে তাহার কিছুতেই ঘুম আসে না, কি রকম চুল ছাঁটা হইয়াছে, আয়নায় দশবার দেখিল। ওই সাদা পাঞ্জাবীতে তাহাকে ভাল মানায়—না, এই তসরের কোটটাতে?

অপর্ণার মা তাহাকে পাইয়া হাতে যেন আকাশের চাঁদ পাইলেন। সেদিনটা খুব বৃষ্টি,

অপু নৌকা হইতে নামিয়া বাড়ির বাহিরের উঠানে পা দিতেই, কে পূজার দালানে বসিয়াছিল, ছুটিয়া গিয়া বাড়ির মধ্যে খবর দিল। এক মুহূর্ত্তে বাড়ির উপরের নিচের সব জানালা খুলিয়া গেল, বাড়িতে ঝি-বৌয়ের সংখ্যা নাই, সকলে জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন—মুষলধারায় বৃষ্টিপাত অগ্রাহ্য করিয়া অপর্ণার মা উঠানে তাহাকে আগু বাড়াইয়া লইতে ছুটিয়া আসিলেন, সারা বাড়িতে একটা আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল।

ফুলশয্যার সেই ঘরে, সেই পালংকেই রাত্রে শুইয়া সে অপর্ণার প্রতীক্ষায় রহিল।

এক বৎসরে অপর্ণার এ কি পরিবর্ত্তন! তখন ছিল বালিকা—এখন ইহাকে দেখিলে যেন আর চেনা যায় না!...নীলার মত চোখ-ঝলসানো সৌন্দর্য্য ইহার নাই বটে, কিন্তু অপর্ণার যাহা আছে, তাহা উহাদের কাহারও নাই। অপুর মনে হইল দু-একখানা প্রাচীন পটে আঁকা তরুণী দেবীমূর্ত্তির, কি দশমহাবিদ্যার ষোড়শী মূর্ত্তির মুখে এ-ধরণের অনুপম, মহিমাময় স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য সে দেখিয়াছে। একটু সেকেলে, একটু প্রাচীন ধরণের সৌন্দর্য্য...সুতরাং দুষ্প্রাপ্য। যেন মনে হয় এ খাঁটি বাংলার জিনিস, দূর পল্লীপ্রান্তরের নদীতীরের সকল শ্যামলতা, সকল সরসতা, পথিপ্রান্তে বনফুলের সকল সরলতা ছানিয়া এ মুখ গড়া, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বাংলার পল্লীর চূত-বকুল-বীথির ছায়ায় ছায়ায় কত অপরাহ্ণে, নদীঘাটের যাওয়া আসার পথে এই উজ্জ্বলশ্যামবর্ণা, রূপসী তরুণী বধূদের লক্ষ্মীর মত আলতা-রাঙা পদচিহ্ন কতবার পড়িয়াছে, মুছিয়াছে, আবার পড়িয়াছে...ইহাদেরই স্নেহ-প্রেমের, দুঃখ-সুখের কাহিনী, বেহুলা লখিন্দরের গানে, ফুল্লরার বারোমাস্যায়, সুবচনীর ব্রতকথায়, বাংলার বৈষ্ণব-কবিদের রাধিকার রূপ-বর্ণনায়, পাড়াগাঁয়ের ছড়ায়, উপকথায় সুয়োরানী দুয়োরানীর গল্পে!

অপু বলিল—তোমার সঙ্গে কিন্তু আড়ি, সারা বছরে একখানা চিঠি দিলে না কেন?—

অপর্ণা সলজ্জ মৃদু একটু হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল। তারপর একবার ডাগর চোখদু'টি তুলিয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া-চাহিয়া দেখিল। খুব মৃদুস্বরে মুখে হাসি টিপিয়া বলিল —আর আমার বুঝি রাগ হতে নেই?...

অপু দেখিল—এতদিন কলিকাতায় সে জারুল কাঠের তক্তপোশে শুইরা অপর্ণার যে মুখ ভাবিত—আসল মুখ একেবারেই তাহা নহে—ঠিক এই অনুপম মুখই সে দেখিয়াছিল বটে ফুলশয্যার রাত্রে, এমন ভুলও হয়!

—পূজোর সময় আসি নি তাই—তুমি ভাবতে কিনা?—ও-সব মুখের কথা, ছাই ভাবতে!...

—না গো না, মা বললেন, তুমি আসবে ষষ্ঠীর দিন, ষষ্ঠী গেল, পূজো গেল, তখনও মা বললেন তুমি একাদশীর পর আসবে—আমি—

অপর্ণা হঠাৎ থামিয়া গেল, অল্প একটু চাহিয়া চোখ নিচু করিল।

অপু আগ্রহের সুরে বলিল—তুমি কি, বললে না?

অপর্ণা বলিল—আমি জানি নে, বলব না—

অপু বলিল—আমি জানি আমার সঙ্গে বিয়ে হওয়াতে তুমি মনে মনে—

অপর্ণা স্নেহপূর্ণ তিরস্কারের সুরে ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল—আবার ওই কথা?...ও-সব কথা বলতে আছে?—ছিঃ—বলো না—

—তা কৈ, তুমি খুশী হয়েছ, একথা তো তোমার মুখে শুনি নি অপর্ণা—

অপর্ণা হাসিমুখে বলিল—তারপর কতদিন তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে গো শুনি —সেই আর-বছর বোশেখ আর এ বোশেখ—

—আচ্ছা বেশ, এখন তো দেখা হ'ল, এখন আমার কথার উত্তর দাও।

অপর্ণা কি-একটা হঠাৎ মনে পড়িবার ভঙ্গিতে তাহার দিকে চাহিয়া আগ্রহের সুরে বলিল—তুমি নাকি যুদ্ধে যাচ্ছিলে, পুলুদা বলছিল, সত্যি ?—

—যাই নি, এবার ভাবছি যাবো—এখান থেকে গিয়েই যাবো—

অপর্ণা ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল—আচ্ছা থাক্ গো, আর রাগ করতে হবে না, আচ্ছা তোমার কথার কি উত্তর দেব বলো তো ?—ওসব আমি মুখে বলতে পারব না—

—আচ্ছা, যুদ্ধ কাদের মধ্যে বেধেছে, জানো ?···

—ইংরেজদের সঙ্গে আর জার্মানির সঙ্গে—আমাদের বাড়িতে বাংলা কাগজ আসে। আমি পড়ি যে।

অপর্ণা রুপার ডিবাতে পান আনিয়াছিল, খুলিয়া বলিল—পান খাবে না ?···

বাহিরে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। এতটুকু গরম নাই, ঠান্ডা রাতটির ভিজা মাটির সুগন্ধে ঝিরঝিরে দক্ষিণ হাওয়া ভরপুর, একটু পরে সুন্দর জ্যোৎস্না উঠিল।

অপু বলিল—আচ্ছা অপর্ণা, চাঁপাফুল পাওয়া যায় তো কাউকে কাল বলো না, বিছানায় রেখে দেবে ? আছে চাঁপাগাছ কোথাও ?

—আমাদের বাগানেই আছে। আমি একথা কাউকে বলতে পারব না কিন্তু—তুমি বলো কাল সকালে ওই নৃপেনকে, কি অনাদিকে···কি আমার ছোট বোনকে বলো—

—আচ্ছা কেন বল তো চাঁপাফুলের কথা তুললাম ?

অপর্ণা সলজ্জ হাসিল। অপুর বুঝিতে দেরি হইল না যে, অপর্ণা তাহার মনের কথা ঠিক ধরিয়াছে। তাহার হাসিবার ভঙ্গিতে অপু একথা বুঝিল। বেশ বুদ্ধিমতী তো অপর্ণা !···

সে বলিল—হ্যাঁ একটা কথা অপর্ণা, তোমাকে একবার কিন্তু নিয়ে যাব দেশে, যাবে তো ?

অপর্ণা বলিল—মাকে বলো, আমার কথায় তো হবে না···

—তুমি রাজী কি না বলো আগে—সেখানে কিন্তু কষ্ট হবে। অপু একবার ভাবিল—সত্য কথাটা খুলিয়া বলে। কিন্তু সেই পুরাতন গর্ব ও বাহাদুরির ঝোঁক !—বলিল—অবিশ্যি একদিন আমাদেরও সবই ছিল। যেখানে থাকতুম—আমার পৈতৃক দেশ—এখন তো দোতলা মস্ত বাড়ি—মানে সবই—তবে শরিকানী মামলা আর মানে ম্যালেরিয়ায়—বুঝলে না ? এখন যেখানে থাকি, সেখানে দু'খানা চালাঘর, তাও মা মারা যাওয়ার পর আর সেখানে যাই নি, তোমাদের মত ঝি-চাকর নেই, নিজের হাতে সব করতে হবে—তা আগে থেকেই ব'লে রাখি। তুমি হলে জমিদারের মেয়ে—

অপর্ণা কৌতুকের সুরে বলিল—আছিই তো জমিদারের মেয়ে। হিংসে হচ্ছে বুঝি ? একটু থামিয়া শান্ত সুরে বলিল—কেন একশ'বার ওকথা বলো ?···তুমি কাল মাকে বাবাকে ব'লে রাজী করাও, আমি তোমার সঙ্গে যেখানে নিয়ে যাবে যাবো, গাছতলাতেও যাবো, আমি তোমার সব কথা জানি, পুলুদা মায়ের কাছে বলছিল, আমি সব শুনেছি। যেখানে নিয়ে যাবে, নিয়ে চল, তোমার ইচ্ছে আমার তাতে মতামত কি ?

রাত্রে দুজনের কেহ ঘুমাইল না।

বধূকে লইয়া সে রওনা হইল। শ্বশুর প্রথমটা আপত্তি তুলিয়াছিলেন—নিয়ে তো যেতে চাইছ বাবাজী, কিন্তু এখন নিয়ে গিয়ে তুলবে কোথায় ? চাকরি-বাকরি ভাল কর, ঘর-দোর ওঠাও, নিয়ে যাবার এত তাড়াতাড়িটা কি ?

সিঁড়ির ঘরে অপর্ণার মা স্বামীকে বলিলেন—হ্যাঁগা, তোমার বুদ্ধি-সুদ্ধি লোপ পেয়ে

যাচ্ছে দিন দিন—না কি ? জামাইকে ও-সব কথা বলেছ ? আজকালকার ছেলেমেয়েদের ধরণ আলাদা, তুমি জান না। ছেলেমানুষ জামাই, টাকাকড়ি, চাকরিবাকরি ভগবান যখন দেবেন তখন হবে। আজকালের মেয়েরা ও-সব বোঝে না, বিশেষ ক'রে তোমার মেয়ে সে ধরণেরই নয়, ওর মন আমি খুব ভাল বুঝি। দাও গিয়ে পাঠিয়ে ওকে জামাইয়ের সঙ্গে—ওদের সুখ নিয়েই সুখ।

উৎসাহে অপুর রাত্রে ঘুম হয় না এমন অবস্থা, কাল সারাদিন অপর্ণাকে লইয়া রেল স্টীমারে কাটানো—উঃ!···শুধু সে, আর কেউ না। রাত্রে অস্পষ্ট আলোকে অপর্ণাকে ভাল করিয়া দেখিবারই সুযোগ হয় না, দিনে দেখা হওয়া এ বাড়িতে অসম্ভব—কিন্তু কাল সকালটি হইতে তাহারা দুজনে—মাঝে আর কোন বাধা ব্যবধান থাকিবে না!

কিন্তু স্টীমারে অপর্ণা রহিল মেয়েদের জায়গায়। তিন ঘণ্টা কাল সেভাবে কাটিল। তার পরেই রেল।

এইখানেই অপু সর্ব্বপ্রথম গৃহস্থালী পাতিল স্ত্রীর সঙ্গে। ট্রেনের তখনও অনেক দেরি। যাত্রীদের রান্না-খাওয়ার জন্য স্টেশন হইতে একটু দূরে ভৈরবের ধারে ছোট ছোট খড়ের ঘর অনেকগুলি—তারই একটা চার আনায় ভাড়া পাওয়া গেল। অপু দোকানের খাবার আনিতে যাইতেছে দেখিয়া বধূ বলিল—তা কেন ? এই তো এখানে উনুন আছে, যাত্রীরা সব রেঁধে খায়, এখনও তো তিন-চার ঘণ্টা দেরি গাড়ির, আমি রাঁধব।

অপু ভারী খুশী। সে ভারী মজা হইবে! এ কথাটা এতক্ষণ তাহার যে কেন মনে আসে নাই!

মহা উৎসাহে বাজার হইতে জিনিসপত্র কিনিয়া আনিল। ঘরে ঢুকিয়া দেখে ইতিমধ্যেই কখন বধূ স্নান সারিয়া ভিজা চুলটি পিঠের উপর ফেলিয়া, কপালে সিন্দূরের টিপ্ দিয়া লালজরিপাড় মটকার শাড়ি পরিয়া ব্যস্তসমস্ত অবস্থায় এটা-ওটা ঠিক করিতেছে। হাসিমুখে বলিল—বাড়িওয়ালী জিগ্যেস করছে উনি তোমার ভাই বুঝি ? আমি হেসে ফেলতেই বুঝতে পেরেছে, বলছে—জামাই! তাই তো বলি!—আরও কি বলিতে গিয়া অপর্ণা লজ্জায় কথা শেষ করিতে না পারিয়া হাসিয়া ফেলিল।

অপু মুগ্ধনেত্রে বধূর দিকে চাহিয়া ছিল। কিশোরীর তনুদেহটি বেড়িয়া স্ফুটনোন্মুখ যৌবন কি অপূর্ব্ব সুষমায় আত্মপ্রকাশ করিতেছে। সুন্দর নিটোল গৌর বাহু দুটি, চুলের খোঁপার ভঙ্গিটি কি অপরূপ! গভীর রাত্রে শোবার ঘরে এ পর্য্যন্ত দেখাশোনা, দিনের আলোয় স্নানের পরে এ অবস্থায় তাহার স্বাভাবিক গতিবিধি লক্ষ্য করিবার সুযোগ কখনও ঘটে নাই—আজ দেখিয়া মনে হইল অপর্ণা সত্যই সুন্দরী বটে।

কাঁচা কাঠ কিছুতেই ধরে না, প্রথমে বধূ, পরে সে নিজে, ফুঁ দিয়া চোখ লাল করিয়া ফেলিল। প্রৌঢ়া বাড়িওয়ালী ইহাদের জন্য নিজের ঘরে বাটনা বাটিতে গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া দু'জনের দুর্দ্দশা দেখিয়া বলিল—ওগো মেয়ে, সরো বাছা, জামাইকে যেতে বলো। তোমাদের কি ও কাজ মা ? সরো আমি দি ধরিয়ে।

বধূ তাগিদ দিয়া অপুকে স্নানে পাঠাইল। নদী হইতে ফিরিয়া সে দেখিল—ইহার মধ্যে কখন বধূ বাড়িওয়ালীকে দিয়া বাজার হইতে রসগোল্লা ও ছানা আনাইয়াছে, রেকাবীতে পেঁপে কাটা, খাবার ও গ্লাসে নেবুর রস মিশানো চিনির শরবৎ। অপু হাসিয়া বলিল—উঃ, ভারী গিন্নীপনা যে! আচ্ছা তরকারীতে নুন দেওয়ার সময় গিন্নীপনার দৌড়টা একবার দেখা যাবে।

অপর্ণা বলিল—আচ্ছা গো দেখো—পরে ছেলেমানুষের মত ঘাড় দুলাইয়া বলিল—ঠিক হ'লে কিন্তু আমায় কি দেবে ?

অপু কৌতুকের সুরে বলিল—ঠিক্ হ'লে যা দেব, তা এখুনি পেতে চাও ?

—যাও, আচ্ছা তো দুষ্টু !

একবার সে রন্ধনরত বধূর পিছনে আসিয়া চুপি-চুপি দাঁড়াইল। দৃশ্যটা এত নতুন, এত অভিনব ঠেকিতেছিল তাহার কাছে ! এই সুঠাম, সুন্দরী পরের মেয়েটি তাহার নিতান্ত আপনার জন—একমাত্র পৃথিবীতে আপনার জন ! পরে সে সন্তর্পণে নিচু হইয়া পিঠের উপরে এলানো চুলের গিঁঠটা ধরিয়া অতর্কিতে এক টান দিতেই বধূ পিছনে চাহিয়া কৃত্রিম কোপের সুরে বলিল—উঃ ! আমার লাগে না বুঝি ?···ভারী দুষ্টু তো···রান্না থাকবে পড়ে ব'লে দিচ্ছি যদি আবার চুল ধরে টানবে—

অপু ভাবে, মা ঠিক এই ধরণের কথা বলিত—এই ধরণেরই স্নেহ-প্রীতিঝরা চোখ। সে দেখিয়াছে, কি দিদি, কি রানু-দি, কি লীলা, কি অপর্ণা—সকলেরই মধ্যে মা যেন অল্পবিস্তর মিশাইয়া আছে—ঠিক সময়ে ঠিক অবস্থায় ইহারা একই ধরণের কথা বলে, চোখে-মুখে একই ধরণের স্নেহ ফুটিয়া ওঠে।

একটি ভদ্রলোক অনেকক্ষণ হইতে প্লাটফর্মে পায়চারী করিতেছিলেন। ট্রেনে উঠিবার কিছু পূর্বে অপু তাঁহাকে চিনিতে পারিল, দেওয়ানপুরের মাস্টার সেই সত্যেনবাবু। অপু থার্ডক্লাসে পড়িবার সময়ই ইনি আইন পাশ করিয়া স্কুলের চাকুরি ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, আর কখনও দেখা হয় নাই। পুরাতন ছাত্রকে দেখিয়া খুশী হইলেন, অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন, অন্যান্য ছাত্রদের মধ্যে কে কি করিতেছে শুনিবার আগ্রহ দেখাইলেন।

তিনি আজকাল পাটনা হাইকোর্টে ওকালতি করিতেছেন, চালচলন দেখিয়া অপুর মনে হইল—বেশ দু'পয়সা উপার্জন করেন। তবুও বলিলেন, পুরানো দিনই ছিল ভাল, দেওয়ানপুরের কথা মনে হইলে কষ্ট হয়। ট্রেন আসিলে তিনি সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিলেন।

অপর্ণাকে সব ভাল করিয়া দেখাইবার জন্য শিয়ালদহ স্টেশনে নামিয়া অপু একখানা ফিটন গাড়ি ভাড়া করিয়া খানিকটা ঘুরিল।

অপু একটা জিনিস লক্ষ্য করিল, অপর্ণা কখনও কিছু দেখে নাই বটে, কিন্তু কোনও বিষয়ে কোনও অশোভন ব্যগ্রতা দেখায় না। ধীর, স্থির, সংযত, বুদ্ধিমতী—এই বয়সেই চরিত্রগত একটা কেমন সহজ গাম্ভীর্য—যাহার পরিণতি সে দেখিয়াছে ইহারই মায়ের মধ্যে ; উছলিয়া-পড়া মাতৃত্বের সঙ্গে চরিত্রের সে কি দৃঢ় অটলতা !

মনসাপোতা পেঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। অপু বাড়িঘরের বিশেষ কিছু ঠিক করে নাই, কাহাকেও সংবাদ দেয় নাই, কিছু না—অথচ হঠাৎ স্ত্রীকে আনিয়া হাজির করিয়াছে। বিবাহের পর মাত্র একবার এখানে দুদিনের জন্য আসিয়াছিল, বাড়িঘর অপরিষ্কার, রাত্রিবাসের অনুপযুক্ত, উঠানে ঢুকিয়া পেয়ারা গাছটার তলায় সন্ধ্যার অন্ধকারে বধূ দাঁড়াইয়া রহিল, অপু গরুর গাড়ি হইতে তোরঙ্গ ও কাঠের হাতবাক্সটা নামাইতে গেল। উঠানে পাশের জঙ্গলে নানা পতঙ্গ কুস্বর করিয়া ডাকিতেছে, ঝোপে-ঝাপে জোনাকির ঝাঁপ জ্বলিতেছে।

কেহ কোথাও নাই, কেহ তরুণ দম্পতিকে সাদরে বরণ ও অভ্যর্থনা করিয়া ঘরে তুলিয়া লইতে ছুটিয়া আসিল না, তাহারাই দুজনে টানাটানি করিয়া নিজেদের পেঁটরা-তোরঙ্গ মাত্র দেশলাইয়ের কাঠির আলোর সাহায্যে ঘরের দাওয়ায় তুলিতে লাগিল। সে আজ কাহাকেও ইচ্ছা করিয়াই খবর দেয় নাই, ভাবিয়াছিল মা যখন বরণ করে নিতে পারলেন না আমার বৌকে, অত সাধ ছিল মার—তখন আর কাউকে বরণ করতে হবে না, ও অধিকার আর কাউকে বুঝি দেব ?

অপর্ণা জানিত তাহার স্বামী দরিদ্র—কিন্তু এ রকম দরিদ্র তাহা সে ভাবে নাই। তাহাদের পাড়ার নাপিত-বাড়ির মত নিচু, ছোট চালাঘর। দাওয়ার একধারে গরু বাছুর

উঠিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, ছাঁচতলায় কাই বীচি ফুটিয়া বর্ষার জলে চারা বাহির হইয়াছে··· একস্থানে খড় উড়িয়া চালের বাখারি ঝুলিয়া পড়িয়াছে···বাড়ির চারিধারে কি পোকা একঘেয়ে ডাকিতেছে···এরকম ঘরে তাহাকে দিন কাটাইতে হইবে? অপর্ণার মন দমিয়া গেল। কি করিয়া থাকিবে সে এখানে? মায়ের কথা মনে হইল···খুড়ীমাদের কথা মনে হইল···ছোট ভাই বিনুর কথা মনে হইল···কান্না ঠেলিয়া বাহিরে আসিতে চাহিতেছিল···সে মরিয়া যাইবে এখানে থাকিলে···

অপু খুঁজিয়া-পাতিয়া একটা লণ্ঠন জ্বালিল। ঘরের মাটির মেঝেতে পোকায় খুঁড়িয়া মাটি জড় করিয়াছে। তক্তপোশের একটা পাশ ঝাড়িয়া তাহার উপর অপর্ণাকে বসাইল··· সবে অপর্ণাকে অন্ধকার ঘরে বসাইয়া লণ্ঠনটা হাতে বাহিরে হাতবাক্সটা আনিতে গেল··· অপর্ণার গা ছম ছম করিয়া উঠিল অন্ধকারে···পরক্ষণেই অপু নিজের ভুল বুঝিয়া আলো হাতে ঘরে ঢুকিয়া বলিল—দ্যাখো কাণ্ড, তোমাকে একা অন্ধকারে বসিয়ে রেখে—থাক্ লণ্ঠনটা এখানে—

অপর্ণার কান্না আসিতেছিল।···

আধঘণ্টা পরে ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া ঘরটা একরকম রাত্রি কাটানোর মত দাঁড়াইল। কি খাওয়া যায় রাত্রে?—রান্নাঘর ব্যবহারের উপযোগী নাই তো বটেই, তা ছাড়া চাল, ডাল, কাঠ কিছুই নাই। অপর্ণা তোরঙ্গ খুলিয়া একটা পুঁটুলি বার করিয়া বলিল—ভুলে গিয়েছিলাম তখন, মা নাড়ু দিয়েছিলেন এতে বেঁধে—অনেক আছে—এই খাও।

অপু অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিল। সংসার কখনও করে নাই—এই নতুন—নিতান্ত আনাড়ী—অপর্ণাকে এ অবস্থায় এখানে আনা ভাল হয় নাই, সে এতক্ষণে বুঝিয়াছে। অপ্রতিভের সুরে বলিল—রাণাঘাট থেকে কিছু খাবার নিলেই হ'ত—তোমাকে একলা বসিয়ে রেখে যাই কি ক'রে—নৈলে ক্ষেত্র কাপালীর বাড়ি থেকে চিঁড়ে আর দুধ—যাব?···

অপর্ণা ঘাড় নাড়িয়া বারণ করিল।

তেলিদের বাড়িতে কেউ ছিল না, তিন-চারি মাস হইল তাহারা কলিকাতায় আছে, বাড়ি তালাবন্ধ, নতুবা কাল রাত্রে ইহাদের কথাবার্তা শুনিয়া সে-বাড়ির লোক আসিত। সকালে সংবাদ পাইয়া ও-পাড়া হইতে নিরুপমা ছুটিয়া আসিল। অপু কৌতুকের সুরে বলিল—এসো, এসো নিরুদিদি, এখন মা নেই, তোমরা কোথায় বরণ ক'রে ঘরে তুলবে, দুধে-আলতার পাথরে দাঁড় করাবে, তা না তুমি সকালে পান চিবুতে চিবুতে এলে। বেশ যা হোক্!

নিরুপমা অনুযোগ করিয়া বলিল—তুমি ভাই সেই চোদ্দ বছরে যেমন পাগলাটি ছিলে, এখনও ঠিক সেই আছ। বৌ নিয়ে আসছো তা একটা খবর না, কিছু না। কি ক'রে জানব তুমি এ অবস্থায় একজন ভদ্রলোকের মেয়েকে এই ভাঙা-ঘরে হুপ্ ক'রে এনে তুলবে? ছি ছি, দ্যাখ তো কাণ্ডখানা? রাত্রে যে রইলে কি ক'রে এখানে, সে কেবল তুমিই পার।

নিরুপমা গিনি দিয়া বৌ-এর মুখ দেখিল।

অপু বলিল—তোমাদের ভরসাতেই কিন্তু ওকে এখানে রেখে যাব নিরুদি। আমাকে সোমবার চাকরিতে যেতেই হবে।

নিরুপমা বৌ দেখিয়া খুব খুশী, বলিল—আমি আমাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রেখে দেব বৌকে, এখানে থাকতে দেব না।

অপু বলিল—তা হবে না, আমার মায়ের ভিটেতে সন্ধ্যে দেবে কে তাহলে? রাত্রে তোমাদের ওখানে শোবার জন্যে নিয়ে যেও।

নিরুপমা তাতেই রাজী। চৌদ্দ বছরের ছেলে যখন প্রথম চেলী পরিয়া তাহাদের বাড়ি পূজা করিতে গিয়াছিল, তখন হইতে সে অপুকে সত্য সত্য স্নেহ করে, তাহার দিকে টানে। অপু ঘরবাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ায় সে মনে মনে খুব দুঃখিত হইয়াছিল। মেয়েরা গতিকে বোঝে না, বাহিরকে বিশ্বাস করে না, মানুষের উদ্দাম ছুটিবার বহির্মুখী আকাঙ্ক্ষাকে শান্ত সংযত করিয়া তাহাকে গৃহস্থালী পাতাইয়া, বাসা বাঁধাইবার প্রবৃত্তি নারী-মনের সহজাত ধর্ম্ম, তাহাদের সকল মাধুর্য্য, স্নেহ, প্রেমের প্রয়োগ-নৈপুণ্য এখানে। সে শক্তিও এত বিশাল যে খুব কম পুরুষই তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া জয়ী হইবার আশা করিতে পারে। অপু বাড়ি ফিরিয়া নীড় বাঁধাতে নিরুপমা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।

কলিকাতায় ফিরিয়া অপুর আর কিছু ভাল লাগে না, কেবল শনিবারের অপেক্ষায় দিন গুণিতে থাকে। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে যাহারা নব-বিবাহিত তাহাদের সঙ্গে কেবল বিবাহিত জীবনের গল্প করিতে ও শুনিতে ভাল লাগে। কোনও রকমে এক সপ্তাহ কাটাইয়া শনিবার দিন সে বাড়ি গেল। অপর্ণার গৃহিণীপনায় সে মনে মনে আশ্চর্য্য না হইয়া পারিল না। এই সাত-আট দিনের মধ্যেই অপর্ণা বাড়ির চেহারা একেবারে বদলাইয়া ফেলিয়াছে! তেলি-বাড়ির বুড়ী ঝিকে দিয়া নিজের তত্ত্বাবধানে ঘরের দেওয়াল লেপিয়া ঠিক করাইয়াছে। দাওয়ার মাটি ধরাইয়া দিয়াছে, রাঙা এলামাটি আনিয়া চারিধারে রঙ করাইয়াছে, নিজের হাতে এখানে তাক, ওখানে কুলুঙ্গি গাঁথিয়াছে, তক্তপোশের তলাকার রাশীকৃত ইঁদুরের মাটি নিজেই উঠাইয়া বাইরে ফেলিয়া গোবর-মাটি লেপিয়া দিয়াছে। সারা বাড়ি যেন ঝক্-ঝক্ তক্-তক্ করিতেছে। অথচ অপর্ণা জীবনে এই প্রথম মাটির ঘরে পা দিল। পূর্ব্ব গৌরব যতই ক্ষুণ্ণ হউক, তবুও সে ধনীবংশের মেয়ে, বাপ-মায়ের আদরে লালিত, বাড়ি থাকিতে নিজের হাতে তাহাকে কখনও বিশেষ কিছু করিতে হইত না।

মাসখানেক ধরিয়া প্রতি শনিবারে বাড়ি যাতায়াত করিবার পর অপু দেখিল তাহার যাহা আয়, ফি শনিবার বাড়ি যাওয়ার খরচ তাহাতে কুলায় না। সংসারে দশ-বারো টাকার বেশী মাসে এ পর্য্যন্ত সে দিতে পারে নাই। সে বোঝে—ইহাতে সংসার চালাইতে অপর্ণাকে দস্তুর-মতো বেগ পাইতে হয়। অতএব ঘন ঘন বাড়ি যাওয়া বন্ধ করিল।

ডাকপিয়নের খাকির পোশাক যে বুকের মধ্যে হঠাৎ এরূপ ঢেউ তুলিতে পারে, ব্যগ্র আশার আশ্বাস দিয়াই পরমুহূর্ত্তে নিরাশ ও দুঃখের অতলতলে নিমজ্জিত করিয়া দিতে পারে, পনেরো টাকা বেতনের আমহার্স্ট স্ট্রীট পোস্টাফিসের পিওন যে একদিন তাহার দুঃখ-সুখের বিধাতা হইবে, এ কথা কবে ভাবিয়াছিল? পূর্ব্বে কালে-ভদ্রে মায়ের চিঠি আসিত, তাহার জন্য এরূপ ব্যগ্র প্রতীক্ষার প্রয়োজন ছিল না। পরে মায়ের মৃত্যুর পর বৎসরখানেক তাহাকে একখানি পত্রও কেহ দেয় নাই! উঃ, কি দিনই গিয়াছে সেই এক বৎসর! মনে আছে, তখন রোজ সকালে চিঠির বাক্স বৃথা আশায় একবার করিয়া খোঁজ করিয়া হাসিমুখে পাশের ঘরের বন্ধুকে উদ্দেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিত—আরে, বীরেন বোসের জন্যে তো এ বাসায় আর থাকা চলে না দেখছি?—রোজ রোজ যত চিঠি আসে তার অর্দ্ধেক বীরেন বোসের নামে!

বন্ধু হাসিয়া বলিত—ওহে পাঁচজন থাকলেই চিঠিপত্তর আসে পাঁচদিক থেকে। তোমার নেই কোনও চুলোয় কেউ, দেবে কে চিঠি?

বোধ হয় কথাটা রূঢ় সত্য বলিয়াই অপুর মনে আঘাত লাগিল কথাটায়। বীরেন বোসের নানা ছাঁদের চিঠিগুলি লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া দেখিত—সাদা খাম, সবুজ খাম, হলদে খাম, মেয়েলি হাতের লেখা পোস্টকার্ড, এক একবার হাতে তুলিয়া লোভ দমন করিতে না পারিয়া দেখিয়াছেও—ইতি তোমার দিদি, ইতি তোমার মা, আপনার স্নেহের ছোট বোন

সুশী, ইত্যাদি। বীরেন বোস মিথ্যা বলে নাই, চারিদিকে আত্মীয় বন্ধু থাকিলেই রোজ পত্র আসে—তাহার চিঠি তো আর আকাশ হইতে পড়িবে না! আজকাল আর সে দিন নাই। পত্র লিখিবার লোক হইয়াছে এতদিনে।

জন্মাষ্টমীর ছুটিতে বাড়ি যাওয়ার কথা, কিন্তু দিনগুলা মাসের মত দীর্ঘ।

অবশেষে জন্মাষ্টমীর ছুটি আসিয়া গেল। এডিটারকে বলিয়া বেলা তিনটার সময় অফিস হইতে বাহির হইয়া সে স্টেশনে আসিল। পথে নববিবাহিত বন্ধু অনাথবাবু বৈঠকখানা বাজার হইতে আম কিনিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ট্রাম ধরিতে ছুটিতেছেন। অপুর কথার উত্তরে বলিলেন—সময় নেই, তিনটে পনেরো ফেল করলে আবার সেই চারটে পঁচিশ, দু'ঘণ্টা দেরি হয়ে যাবে বাড়ি পৌঁছতে—আচ্ছা আসি, নমস্কার!

দাড়িটা ঠিক কামানো হইয়াছে তো?

মুখ রৌদ্রে, ধুলায় ও ঘামে যে বিবর্ণ হইয়া যাইবে তাহার কি? কী গাধাবোট গাড়িখানা, এতক্ষণে মোটে নৈহাটি? বাড়ি পৌঁছিতে প্রায় সন্ধ্যা হইতে পারে। খুশির সহিত ভাবিল, চিঠি লিখে তো যাচ্ছি নে, হঠাৎ দেখে অপর্ণা একেবারে অবাক হয়ে যাবে এখন—

বাড়ি যখন পৌঁছিল, তখনও সন্ধ্যার কিছু দেরি। বধূ বাড়ি নাই, বোধ হয় নিরুপমাদের বাড়ি কি পুকুরের ঘাটে গিয়াছে। কেহ কোথাও নাই। অপু ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পুঁটলি নামাইয়া রাখিয়া সাবানখানা খুঁজিয়া বাহির করিয়া আগে হাত মুখ ও মাথা ধুইয়া ফেলিয়া তাকের আয়না ও চিরুনীর সাহায্যে টেরী কাটিল। পরে নিজের আগমনের সকল চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল।

আধঘণ্টা পরেই সে ফিরিল। বধূ ঘরের মধ্যে প্রদীপের সামনে মাদুর পাতিয়া বসিয়া কি বই পড়িতেছে। অপু পা টিপিয়া টিপিয়া তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। এটা অপুর পুরানো রোগ; মায়ের সঙ্গে কতবার এরকম করিয়াছে। হঠাৎ কি একটা শব্দে বধূ পিছন ফিরিয়া চাহিয়া ভয়ে ধড়মড় করিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতে অপু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বধূ অপ্রতিভের সুরে বলিল—ওমা তুমি! কখন—কৈ—তোমার তো—

অপু হাসিতে হাসিতে বলিল—কেমন জব্দ। আচ্ছা তো ভীতু।

বধূ ততক্ষণে সামলাইয়া লইয়া হাসি মুখে বলিল—বা রে, ওই রকম ক'রে বুঝি আচমকা ভয় দেখাতে আছে? ক'টার গাড়িতে এলে এখন—তাই বুঝি আজ ছ-সাত দিন চিঠি দেওয়া হয় নি—আমি ভাবছি—

অপু বলিল—তারপর, তুমি কি রকম আছ, বল? মায়ের চিঠিপত্র পেয়েছ?

—তুমি কিন্তু রোগা হয়ে গিয়েছ, অসুখ-বিসুখ হয়েছিল বুঝি?

—আমার এবারকার চিঠির কাগজটা কেমন? ভালো না? তোমার জন্যে এনেছি পঁচিশখানা। তারপর রাত্রে কি খাওয়াবে বল?

—কি খাবে বলো? ঘি এনে রেখেছি, আলুপটলের ডালনা করি—আর দুধ আছে—

পরদিন সকালে উঠিয়া অপু দেখিয়া অবাক হইল, বাড়ির পিছনের উঠানে অপর্ণা ছোট ছোট বেড়া দিয়া শাকের ক্ষেত, বেগুনের ক্ষেত করিয়াছে। দাওয়ার ধারে ধারে নিজের হাতে গাঁদার চারা বসাইয়াছে। রান্নাঘরের চালায় পুঁইলতা, লাউলতা উঠাইয়া দিয়াছে। দেখাইয়া বলিল,—আজ পুঁই-শাক খাওয়াব আমার গাছের! ওই দোপাটিগুলো দ্যাখো? কত বড়, না? নিরুপমা দিদি বীজ দিয়েছেন। আর একটা জিনিস দ্যাখো নি? এসো দেখাব—

অপুর সারা শরীরে একটা আনন্দের শিহরণ বহিল। অপর্ণা যেন তাহার মনের গোপন কথাটি জানিয়া বুঝিয়াই কোথা হইতে একটা ছোট চাঁপা গাছের ডাল আনিয়া মাটিতে পুঁতিয়াছে, দেখাইয়া বলিল—দ্যাখো কেমন—হবে না এখানে?

—হবে না আর কেন? আচ্ছা, এত ফুল থাকতে চাঁপা ফুলের ডাল যে পুঁততে গেলে?

অপর্ণা সলজ্জমুখে বলিল—জানি নে—যাও।

অপু তো লেখে নাই, পত্রে তো একথা অপর্ণাকে জানায় নাই যে, মিত্তির বাড়ির কম্পাউণ্ডের চাঁপাফুল গাছটা তাহাকে কি কষ্টই না দিয়াছে এই দু'মাস! চাঁপা ফুল যে হঠাৎ তাহার এত প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, একথাটি মনে মনে অনুমান করিবার জন্য এই কর্ম্মব্যস্ত, সদা-হাসিমুখ মেয়েটির উপর তাহার মন কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল।

অপর্ণা বলিল—এখানে একটু বেড়া দিয়ে ঘিরে দেবে? মাগো কি ছাগলের উৎপাতই তোমাদের দেশে! চারাগাছ থাকতে দেয় না, রোজ খেয়েদেয়ে সারা দুপুর কঞ্চি হাতে দাওয়ায় ব'সে ছাগল তাড়াই আর বই পড়ি—দুপুরে রোজ নিরুদি আসেন, ও-বাড়ির মেয়েরা আসে, ভারী ভাল মেয়ে কিন্তু নিরুদিদি।

আজ সারাদিন ছিল বর্ষা। সন্ধ্যার পর একটানা বৃষ্টি নামিয়াছে, হয়ত বা সারা রাত্রি ধরিয়া বর্ষা চলিবে। বাহিরে কৃষ্ণাষ্টমীর অন্ধকার মেঘে ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছে। বধূ বলিল—রান্নাঘরে এসে বসবে? গরম গরম সেঁকে দি—। অপু বলিল—তা হবে না, আজ এসো আমরা দুজনে এক পাতে খাবো! অপর্ণা প্রথমটা রাজী হইল না, অবশেষে স্বামীর পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়া একটা থালায় রুটি সাজাইয়া খাবার ঠাঁই করিল।

অপু দেখিয়া বলিল—ও হবে না, তুমি আমার পাশে বসো, ও-রকম বসলে চলবে না। আরও একটু—আরও—পরে সে বাঁ-হাতে অপর্ণার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—এবার এসো দু'জনে খাই—

বধূ হাসিয়া বলিল—আচ্ছা তোমার বদখেয়ালও মাথায় আসে, মাগো মা! দেখতে তো খুব ভালমানুষটি!

লাভের মধ্যে বধূর একরূপ খাওয়াই হইল না সেরাত্রে। অন্যমনস্ক অপু গল্প করিতে করিতে থালার রুটি উঠাইতে উঠাইতে প্রায় শেষ করিয়া ফেলিল—পাছে স্বামীর কম পড়িয়া যায় এই ভয়ে সে বেচারী খান-তিনের বেশী নিজের জন্য লইতে পারিল না। খাওয়া-দাওয়ার পর অপর্ণা বলিল—কই, কি বই এনেছ বললে, দেখি?

দু'জনেই কৌতুকপ্রিয়, সমবয়সী, সুস্থমন, বালকবালিকার মত আমোদ করিতে, গল্প করিতে, সারারাত জাগিতে, অকারণে অর্থহীন বকিতে দুজনেরই সমান আগ্রহ, সমান উৎসাহ। অপু একখানা নতুন-আনা বই খুলিয়া বলিল—পড়ো তো এই পদ্যটা?

অপর্ণা প্রদীপের সলতেটা চাঁপার কলির মত আঙুল দিয়া উস্কাইয়া দিয়া পিলসুজটা আরও নিকটে টানিয়া আনিল। পরে সে লজ্জা করিতেছে দেখিয়া অপু উৎসাহ দিবার জন্য বলিল—পড়ো না, কই দেখি?

অপর্ণা যে কবিতা এত সুন্দর পড়িতে পারে অপুর তাহা জানা ছিল না। সে ঈষৎ লজ্জাজড়িত স্বরে পড়িতেছিল—

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা
কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা—

অপু পড়ার প্রশংসা করিতেই অপর্ণা বই মুড়িয়া বন্ধ করিল। স্বামীর দিকে উজ্জ্বল-মুখে চাহিয়া কৌতুকের ভঙ্গিতে বলিল—থাকগে পড়া, একটা গান করো না!

অপু বলিল—একটা টিপ পরো না খুকী ! ভারী সুন্দর মানাবে তোমার কপালে—

অপর্ণা সলজ্জ হাসিয়া বলিল—যাও—

—সত্য বলছি অপর্ণা, আছে টিপ ?—

—আমার বয়সে বুঝি টিপ পরে ? আমার ছোট বোন শান্তির এখন টিপ পরবার বয়স তো—

কিন্তু শেষে তাহাকে টিপ পরিতেই হইল। সত্যই ভারী সুন্দর দেখাইতেছিল, প্রতিমার চোখের মত টানা, আয়ত সুন্দর চোখ দুটির উপর দীর্ঘ, ঘনকালো, জোড়া ভুরুর মাঝখানটিতে টিপ মানাইয়াছে কি সুন্দর ! অপুর মনে হইল—এই মুখের জন্যই জগতের টিপ সৃষ্টি হইয়াছে—প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোয় এই টিপ-পরা মুখখানি বার-বার সতৃষ্ণ চোখে চাহিয়া দেখিবার জন্যই।

অপর্ণা বলে—ছাই দেখাচ্ছে, এ বয়সে কি টিপ মানায় ? কি করি পরের ছেলে, বললে তো আর কথা শুনবে না তুমি !

—না গো পরের মেয়ে, শোনো, একটু সরে এসো তো—

—ভারী দুষ্টু—এত জ্বালাতনও তুমি করতে পার !…

অপু বলিল—আচ্ছা, আমায় দেখতে কেমন দেখায় বলো—না সত্যি—কেমন মুখ আমার ? ভাল, না পেঁচার মত ?

অপর্ণার মুখ কৌতুকে উজ্জ্বল দেখাইল—নাক সিঁটকাইয়া বলিল—বিশ্রী, পেঁচার মত।

অপু কৃত্রিম অভিমানের সুরে বলিল—আর তোমার মুখ তো ভাল, তা হলেই হয়ে গেল। যাই, শুইগে যাই—রাত কম হয় নি—কাল ভোরে আবার—

বধূ খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

এই রাত্রিটা গভীর দাগ দিয়া গিয়াছিল অপুর মনে। মাটির ঘরের আনাচে-কানাচে, গাছপালায় বাঁশবনে, ঝিম্-ঝিম্ নিশীথের একটানা বর্ষার ধারা। চারিধারই নিস্তব্ধ। পূর্বদিকের জানালা দিয়া বর্ষাসজল বাদল রাতের দমকা হাওয়া মাঝে মাঝে আসে—মাটির প্রদীপের আলোতে, খড়ের মেজেতে মাদুর বিছাইয়া সে ও অপর্ণা !

অপু বলিল—দ্যাখো আজ রাত্রে মায়ের কথা মনে হয়—মা যদি আজ থাকত !

অপর্ণা শান্ত সুরে বলিল—মা সবই জানেন, যেখানে গিয়াছেন, সেখানে থেকে সবই দেখছেন। পরে সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া চোখ তুলিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—দ্যাখো, আমি মাকে দেখেছি।

অপু বিস্ময়ের দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চাহিল। অপর্ণার মুখে শান্ত, স্থির বিশ্বাস ও সরল পবিত্রতা ছাড়া আর কিছু নাই।

অপর্ণা বলিল—শোন, একদিন কি মাসটায়, তোমার সেদিন চিঠি এল দুপুর বেলা। বিকেলে আঁচল পেতে পান্‌চালায় পিঁড়েতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি—সেদিন সকালে উঠোনের ঐ লাউগাছটাকে পুঁতেছি, কঞ্চি কেটে তাকে উঠিয়েছি, খেতে অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে, বুঝলে ? স্বপ্নে দেখছি—একজন কে দেখতে বেশ সুন্দর, লালপেড়ে শাড়ি-পরা, কপালে সিঁদুর, তোমার মুখের মত আদল, আমায় আদর ক'রে মাথার চুলে হাত বুলিয়ে বলছেন—ও আবাগীর মেয়ে, অবেলায় শুয়ো না, ওঠো, অসুক-বিসুক হবে আবার ? তারপর তিনি তার হাতের সিঁদুরের কৌটো থেকে আমার কপালে সিঁদুর পরিয়ে দিতেই আমি চমকে জেগে উঠলাম—এমন স্পষ্ট আর সত্যি বলে মনে হ'ল যে তাড়াতাড়ি কপালে হাত দিয়ে দেখতে গেলাম সিঁদুর লেগে আছে কি না—দেখি কিছুই না—বুক ধড়াস্ ক'রে উঠল—চারিদিকে অবাক হয়ে চেয়ে দেখি সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে—বাড়িতে কেউ নেই—খানিকক্ষণ না

পারি কিছু করতে—হাত পা যেন অবশ—তারপরে মনে হল, এ মা—আর কেউ না, ঠিক মা। মা এসেছিলেন এয়োতির সিঁদুর পরিয়ে দিতে। কাউকে বলি নি, আজ বললাম তোমায়।

বাহিরে বর্ষাধারার অবিশ্রান্ত রিম্‌ঝিম শব্দ। একটা কি পতঙ্গ বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে তান রাখিয়া একটানা ডাকিয়া চলিয়াছে, মাঝে মাঝে পূবে হাওয়ার দমকা, অপর্ণার মাথার চুলের গন্ধ। জীবনের এই সব মুহূর্ত্ত বড় অদ্ভুত। অনভিজ্ঞ হইলেও অপু তাহা বুঝিল। হঠাৎ ক্ষণিক বিদ্যুৎ-চমকে যেন অন্ধকার পথের অনেকখানি নজরে পড়ে। এমন সব চিন্তা মনে আসে, সাধারণ অবস্থায়, সুস্থ মনে সারাজীবনেও সে-সব চিন্তা মনে আসিত না।··· কেমন একটা রহস্য···আত্মার অদৃষ্টলিপি···একটা বিরাট অসীমতা···

কিন্তু পরক্ষণেই চোখ জলে ভরিয়া আসিল। সে কোনও কথা বলিল না। কোন মন্তব্য প্রকাশ করিল না, কেহই কোন কথা বলিল না।

খানিকটা পরে সে বলিল, আর একটা কবিতা পড়ো—শুনি বরং—

অপর্ণা বলিল—তুমি একটা গান করো—

অপু রবিঠাকুরের গান গাহিল একটা, দুইটা তিনটা। তারপর আবার কথা, আবার গল্প। অপর্ণা হাসিয়া বলিল—আর রাত নেই কিন্তু—ফর্সা হয়ে এল—

—ঘুম পাচ্ছে ?

—না। তুমি একটা কাজ করো না ? কাল আর যেও না—

—অফিস কামাই করব ? তা কি কখনও চলে ?

ভোর হইয়া গেল। অপর্ণা উঠিতে যাইতেছিল, অপু কোন্ সময় ইতিমধ্যে তাহার আঁচলের সঙ্গে নিজের কাপড়ের সঙ্গে গিঁট বাঁধিয়া রাখিয়াছে, উঠিতে গিয়া টান পড়িল। অপর্ণা হাসিয়া বলিল—ওমা তুমি কি ! আচ্ছা দুষ্টু তো ··এখুনি হারাণের মা কাজ করতে আসবে—বুড়ী কি ভাববে বল দিকি ? ভাববে, এত বেলা অবধি ঘরের মধ্যে—মাগো মা, ছাড়ো, লজ্জা করে—ছিঃ।

অপু ততক্ষণে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া পড়িয়াছে।

—ছাড়ো, ছাড়ো, লক্ষ্মী—ছিঃ—এখুনি এল বলে বুড়ী, পায়ে পড়ি তোমার, ছাড়ো—

অপু নির্ব্বিকার।

এমন সময়ে বাহিরে হারাণের মায়ের গলা শোনা গেল। অপর্ণা ব্যস্তভাবে মিনতির সুরে বলিল—ওই এসেছে বুড়ী—ছাড়ো, ছিঃ—লক্ষ্মীটি—ওরকম দুষ্টুমি করে না—লক্ষ্মী—

হারাণের মা কপাটের গায়ে ধাক্কা দিয়া বলিল—ও বৌমা, ভোর হয়ে গিয়েছে। ওঠো, ওঠো, ঘড়া-ঘটিগুলো বার ক'রে দেবে না ?

অপু হাসিয়া উঠিয়া আঁচলের গিঁট খুলিয়া দিল।

অফিস কামাই করিয়া সে-দিনটাও অপু বাড়িতেই রহিয়া গেল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে স্বাস্থ্য প্রদর্শনী উপলক্ষে খুব ভিড়। অপু অনেক দিন হইতে ইন্‌স্টিটিউটের সভ্য, তাহাদের জনকয়েকের উপর শিশুমঙ্গল ও খাদ্য বিভাগের তত্ত্বাবধানের ভার আছে। দুপুর হইতে সে এই কাজে লাগিয়া আছে। মন্মথ বি-এ পাশ, এটর্নির আর্টিক্‌ল্‌ড ক্লার্ক হইয়াছে। তাহার সহিত একদিন ইন্‌স্টিটিউটের বসিবার ঘরে ঘোর তর্ক। অপুর দৃঢ় বিশ্বাস—যুদ্ধের পর ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাইবে। বিলাতে লয়েড

জর্জ বলিয়াছেন, যুদ্ধশেষে ভারতবর্ষকে আমরা আর পদানত করিয়া রাখিব না। ভারতকে দিয়া আর ক্রীতদাসের কার্য্য করাইয়া লইলে চলিবে না। Indians must not remain as hewers of wood and drawers of water.

এই সময়েই একদিন ইন্‌স্টিটিউটের লাইব্রেরিতে কাগজ খুলিয়া একটা সংবাদ দেখিয়ে সে অবাক হইয়া গেল। জোয়ান অব্ আর্ককে রোমান্ ক্যাথলিক যাজক-শক্তি তাঁহাদের ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সাধুর তালিকাভুক্ত করিয়াছেন।

তার শৈশবের আনন্দ-মুহূর্ত্তের সঙ্গিনী সেই পল্লীবালিকা জোয়ান—ইছামতীর ধারে শান্ত বাবলা-বনের ছায়ায় বসিয়া শৈশবের সে স্বপ্নভরা দিনগুলিতে যাহার সঙ্গে প্রথম পরিচয়! ইহার পর সে একদিন সিনেমাতে জোয়ান অব্ আর্কের বাৎসরিক স্মৃতি-উৎসব দেখিল। ডম্‌রেমির নিভৃত পল্লীপ্রান্তে ফ্রান্সের সকল প্রদেশ হইতে লোকজন জড়ো হইয়াছে—পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে কত নরনারী আসিয়াছে, সামরিক পোশাকে সজ্জিত ফরাসী সৈনিক কর্ম্মচারীর দল···সবসুদ্ধ মিলিয়া এক মাইল দীর্ঘ বিরাট শোভাযাত্রা ···জোয়ানের সঙ্গে তার নাড়ীর কি যেন যোগ—জোয়ানের সম্মানে তার নিজের বুক যেন গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিতেছিল, শৈশবের স্বপ্নের সে-মোহ অপু এখনও কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই।

বড় হইয়া অবধি সে এই মেয়েটিকে কি শ্রদ্ধার চোখে ভক্তির চোখে দেখিয়া আসিয়াছে এতদিন, সে-কথা জানিত এক অনিল—নতুবা কল্পনা যাহাদের পঙ্গু, মন মিনমিনে, পান্‌সে—তাহাদের কাছে সে-কথা তুলিয়া লাভ কি? কলেজে পড়িবার সময় সে বড় ইতিহাসে জোয়ানের বিস্তৃত বিবরণ পড়িয়াছে—অতীত শতাব্দীর সেই অবুঝ নিষ্ঠুরতা, ধর্ম্মমতের গোঁড়ামি, খুঁটিতে বাঁধিয়া হৃদয়হীন দাহন—সূর্য্যদেবের রথচক্রের দ্রুত আবর্ত্তনে অসীম আকাশে যেমন দুপুর হয় বৈকাল, বৈকাল হয় রাত্রি, রাত্রি হয় প্রভাত—মহাকালের রথচক্রের আবর্ত্তনে এক শতাব্দীর অন্ধকারপুঞ্জ তেমনি পরের শতাব্দীতে দূরীভূত হইয়া যাইতেছে। সত্যের শুকতারা একদিন যে প্রকাশ হইবেই, জীবনের দুঃখ দৈন্যের অন্ধকার শুধু যে প্রভাতেরই অগ্রদূত কলকাকলিময়, ফুল-ফোটা অমৃত-ঝরা প্রভাত।

অন্যমনস্ক মনে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া সে খাদ্য-বিভাগের ঘরে ঢুকিতে যাইতেছে, কে তাহাকে ডাকিল। ফিরিয়া চাহিয়া দেখিয়া প্রথমটা চিনিতে পারিল না—পরে বিস্ময়ের সুরে বলিল—প্রীতি, না? এগ্‌জিবিশন্ দেখতে এসেছিলে বুঝি? ভাল আছ?

প্রীতি অনেক বড় হইয়াছে। দেখিয়া বুঝিল, বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সে সঙ্গিনী একটি প্রৌঢ়া মহিলাকে ডাকিয়া বলিল—মা, আমার মাস্টার মশায় অপূর্ব্ববাবু—সেই অপূর্ব্ববাবু।

অপু প্রণাম করিল। প্রীতি বলিল—আচ্ছা আপনার রাগ তো? এক কথায় ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন! দেখুন, কত ছোট ছিলুম, বুঝতুম কিছু? তারপর আপনাকে কত খোঁজ করেছিলুম, আর কোনও সন্ধানই কেউ বলতে পারলে না। আপনি আজকাল কি করছেন মাস্টার মশায়?

—ছেলেও পড়াই, রাত্রে খবরের কাগজের অফিসে চাকরিও করি—

—আচ্ছা মাস্টার মশাই, আপনাকে যদি বলি, আমাদের বাড়ি কি আপনি আর যাবেন না?

অপুর মনে পূর্ব্বতন ছাত্রীর উপর কেমন একটা স্নেহ আসিল। কথা গুছাইয়া বলিতে জানিত না, কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিয়াছিল সে সময়—তাহারও অত সহজে রাগ করা ঠিক হয় নাই। সে বলিল,—তুমি অত অপ্রতিভ ভাবে কথা বলছ কেন প্রীতি! দোষ আমারই, তুমি না হয় ছেলেমানুষ ছিলে, আমার রাগ করা উচিত হয় নি—

ঠিকানা বিনিময়ের পর প্রীতি পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিয়া বিদায় লইল।

আবার অপুর এ-কথা মনে না হইয়া পারিল না—কাল মহাকাল, সবারই মধ্যে পরিবর্ত্তন আনিয়া দিবে···তোমার বিচারের অধিকার কি ?

আরও মাস দুই কোন রকমে কাটাইয়া অপু পূজার সময় দেশে গেল। সেদিন ষষ্ঠী, বাড়ির উঠানে পা দিয়া দেখিল পাড়ার একদল মেয়ে ঘরের দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া হাসিকলরব করিতেছে—অপু উপস্থিত হইতে অপর্ণা ঘোমটা টানিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল। পাড়ার মেয়েদের সে আজ ষষ্ঠী উপলক্ষে বৈকালিক জলযোগের নিমন্ত্রণ করিয়া নিজের হাতে সকলকে আল্‌তা সিঁদুর পরাইয়াছে। হাসিয়া বলিল, ভাগ্যিস এলে! ভাবছিলাম এমন কলার বড়াটা আজ ভাজলাম—

—সত্যি, কৈ দেখি ?

—বা রে, হাত মুখ ধোও—ঠাণ্ডা হও—অমন পেটুক কেন তুমি ?···পেটুক গোপাল কোথাকার !

পরে সে রেকাবিতে খাবার আনিয়া বলিল,—এগুলো খেয়ে ফেলো, তারপর আরও দেব—দ্যাখো তো খেয়ে, মিষ্টি কম হয় নি তো ?—তোমার তো আবার একটুখানি গুড়ে হবে না।

খাইতে খাইতে অপু ভাবিল—বেশ তো শিখেছে করতে ! বেশ—

পরে দেওয়ালের দিকে চোখ পড়াতে বলিল,—বাঃ, ও-রকম আলপনা দিয়েছে কে ? ভারী সুন্দর তো ! অপর্ণা মৃদু হাসিয়া বলিল,—ভাদ্র মাসের লক্ষ্মীপুজোতে তো এলে না ! আমি বাড়িতে পুজো করলাম,—মা করতেন, সিঁদুরমাখা কাঠা দেখি তোলা রয়েছে, তাতে নতুন ধান পেতে—বামুন খাওয়ালাম। তুমি এলেও দু'টি খেতে পেতে গো—তারই ঐ আল্‌পনা—

—তাই তো ! তুমি ভারী গিন্নী হয়ে উঠেছ দেখছি ! লক্ষ্মীপুজো, লোক খাওয়ানো—আমার কিন্তু এসব ভারী ভাল লাগে অপর্ণা—সত্যি, মাও খুব ভালবাসতেন—একবার তখন আমরা এখানে নতুন এসেছি—একজন বুড়োমত লোক আমাদের উঠোনের ধারে এসে দাঁড়িয়ে বললে,—খোকা ক্ষিদে পেয়েছে, দুটো মুড়ি খাওয়াতে পারো ?—আমি মাকে গিয়ে বললাম, মা, একজন মুড়ি খেতে চাচ্ছে, ওকে খানকতক রুটি করে খাওয়ালে ভারী খুশী হবে,—খাওয়াবে মা ? মা কি করলে বলো তো ?

—রুটি তৈরী ক'রে বুঝি—

—তা নয়। মা একটু ক'রে সরের ঘি ক'রে রাখত, আমি বোর্ডিং থেকে বাড়িটাড়ি এলে পাতে দিত। আমায় খুশী করবার জন্য মা সেই ঘি দিয়ে আট-দশখানা পরোটা ভেজে লোকটাকে ডেকে, দাওয়ার কোলে পিঁড়ি পেতে খেতে দিলে। লোকটা তো অবাক, তার মুখের এমন ভাব হ'ল !

রাত্রে অপর্ণা বলিল—দ্যাখো, মা চিঠি লিখেছেন,—পুজোর পর মুরারি-দা আসবেন নিতে, পাঁচ-ছ'মাস যাই নি, তুমি যাবে আমাদের ওখানে ?

অপুর বড় অভিমান হইল। সে এত আশা করিয়া পূজার সময় বাড়ি আসিল, আর এ-দিকে কিনা অপর্ণা বাপের বাড়ি যাওয়ার জন্য পা বাড়াইয়া আছে ? সে-ই তাহা হইলে ভাবিয়া মরে, অপর্ণার কাছে বাপেরবাড়ি যাওয়াটাই অধিকতর লোভনীয় !

অপু উদাস সুরে বলিল—বেশ, যাও। আমার যাওয়া ঘট্‌বে না, ছুটি নেই এখন। কথাটা শেষ করিয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইয়া বই পড়িতে লাগিল। অপর্ণা খানিকক্ষণ পরে বলিল—এবার যে বইগুলো এনেছ আমার জন্যে, ওর মধ্যে একখানা 'চয়নিকা' তো আনলে

না ? সেই যে সে-বার বলে গেলে জন্মাষ্টমীর সময় ? এক-আধ কথার জবাব পাইয়া ভাবিল সারাদিনের কষ্টে স্বামীর হয়ত ঘুম আসিতেছে। তখন সেও ঘুমাইয়া পড়িল।

দশমীর পরদিনই মুরারি আসিয়া হাজির। জামাইকেও যাইতে হইবে, অপর্ণার মা বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, ইত্যাদি নানা পীড়াপীড়ি শুরু করিল। অপু বলিল—পাগল ! ছুটি কোথায় যে যাব আমি ? বোনকে নিতে এসেছ, বোনকেই নিয়ে যাও ভাই—আমরা গরীব চাকুরে লোক, তোমাদের মত জমিদার নই—আমাদের কি গেলে চলে ?

অপর্ণা বুঝিয়াছিল স্বামী চটিয়াছে, এ অবস্থায় তাহার যাইবার ইচ্ছা ছিল না আদৌ, কিন্তু বড় ভাই লইতে আসিয়াছে সে কি করিয়াই বা 'না' বলে ? দো-টানার মধ্যে সে বড় মুশকিলে পড়িল। স্বামীকে বলিল—দ্যাখো, আমি যেতাম না। কিন্তু মুরারি-দা এসেছেন, আমি কি কিছু বলতে পারি ?···রাগ করো না লক্ষ্মীটি, তুমি এখন না যাও, কালীপুজোর ছুটিতে অবিশ্যি ক'রে যেও—ভুলো না যেন।

অপর্ণা চলিয়া যাইবার পর মনসাপোতা আর এক দিনও ভাল লাগিল না। কিন্তু বাধ্য হইয়া সে রাত্রিটা সেখানে কাটাইতে হইল, কারণ অপর্ণারা গেল বৈকালের ট্রেনে। কোনদিন লুচি হয় না কিন্তু দাদার কাছে স্বামীকে ছোট হইতে না হয়, এই ভাবিয়া অপর্ণা দুইদিনই রাত্রে লুচির ব্যবস্থা করিয়াছিল—আজও স্বামীর খাবার আলাদা করিয়া ঘরের কোণে ঢাকিয়া রাখিয়া গিয়াছে। লুচি ক'খানা খাইয়াই অপু উদাস মনে জানালার কাছে আসিয়া বসিল। খুব জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, বাড়ির উঠানের গাছে গাছে এখনও কি পাখি ডাকিতেছে, শূন্য ঘর, শূন্য শয্যাপ্রান্ত—অপুর চোখে প্রায় জল আসিল। অপর্ণা সব বুঝিয়া তাহাকে এই কষ্টের মধ্যে ফেলিয়া গেল। বড়লোকের মেয়ে কিনা ?···আচ্ছা বেশ।···অভিমানের মুখে সে একথা ভুলিয়া গেল যে, অপর্ণা আজ ছ'মাস শূন্যে বাড়িতে শূন্য শয্যায় তাহারই মুখ চাহিয়া কাটাইয়াছে !

পরদিন প্রত্যুষে অপু কলিকাতা রওনা হইল। সেখানে দিনচারেক পরেই অপর্ণার এক পত্র আসিল,—অপু সে পত্রের কোনও জবাব দিল না। দিন পাঁচ-ছয় পরে অপর্ণার আর একখানা চিঠি। উত্তর না পাইয়া ব্যস্ত আছে, শরীর ভাল আছে তো ? অসুখ-বিসুখের সময়, কেমন আছে পত্রপাঠ যেন জানায়, নতুবা বড় দুর্ভাবনার মধ্যে থাকিতে হইতেছে। তাহারও কোন জবাব গেল না।

•

মাসখানেক কাটিল।

কার্ত্তিক মাসের শেষের দিকে একদিন একখানা দীর্ঘ পত্র আসিল। অপর্ণা লিখিয়াছে—ওগো, আমার বুকে এমন পাষাণ চাপিয়ে আর কতদিন রাখবে, আমি এত কি অপরাধ করেছি তোমার কাছে ? ··আজ একমাসের ওপর হ'ল তোমার একছত্র লেখা পাই নি, কি ক'রে দিন কাটাচ্ছি, তা কাকে জানাব ? দ্যাখো, যদি কোন দোষই ক'রে থাকি, তুমি যদি আমার উপর রাগ করবে তবে ত্রিভুবনে আর কার কাছে দাঁড়াই বল তো ?

অপু ভাবিল,—বেশ জব্দ, কেন যাও বাপের বাড়ি ?—আমাকে চাইবার দরকার কি, কে আমি ? সঙ্গে সঙ্গে একটা অপূর্ব্ব পুলকের ভাব মনের কোণে দেখা দিল—পথে, ট্রামে, অফিসে, বাসায়, সব-সময়, সকল অবস্থতেই মনে না হইয়া পারিল না যে, পৃথিবীতে একজন কেহ আছে, যে সর্ব্বদা তাহার জন্য ভাবিতেছে, তাহারই চিঠি না পাইলে সে-জনের দিন কাটিতে চাহে না, জীবন বিস্বাদ লাগে। সে যে হঠাৎ এক সুন্দরী তরুণীর নিকট এতটা প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে—এ অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ অভিনব ও অদ্ভুত তাহার কাছে। অতএব তাহাকে আরও ভাবাও, আরও কষ্ট দাও, তাহার রজনী আরও বিনিদ্র করিয়া তোল।

সুতরাং অপর্ণার মিনতি বৃথা হইল। অপু চিঠির জবাব দিল না।

এদিকে অপুদের অফিসের অবস্থা বড় খারাপ হইয়া আসিল। কাগজ উঠিয়া যাইবার যোগাড়, একদিন স্বত্বাধিকারী তাহাদের কয়েকজনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, কি করা উচিত সে-সম্বন্ধে পরামর্শ। কথাবার্তার গতিকে বুঝিল কাগজের পরমায়ু আর বেশী দিন নয়। তাহার একজন সহকর্মী বাহিরে আসিয়া বলিল—এ বাজারে চাকরিটুকু গেলে মশাই দাঁড়াবার জো নেই একেবারে—বোনের বিয়েতে টাকা ধার, সুদে-আসলে অনেক দাঁড়িয়েছে, সুদটা দিয়ে থামিয়ে রাখার উপায় যদি না থাকে, মহাজন বাড়ি ক্রোক দেবে মশাই, কি যে করি!

ইতিমধ্যে অপু একদিন লীলাদের বাড়ি গেল। যাওয়া সেখানে ঘটে নাই প্রায় বছর দুই, হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে তাহাকে দেখিয়া লীলা আনন্দ ও বিস্ময়ের সুরে বলিয়া উঠিল—একি আপনি! আজ নিতান্তই পথ ভুলে বুঝি এদিকে এসে পড়লেন? অপু যে শুধু অপ্রতিভ হইল তাহা নয়, কোথায় যেন সে নিজেকে অপরাধী বিবেচনা করিল। একটুখানি আনাড়ীর মত হাসি ছাড়া লীলার কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না। লীলা বলিল—এবার না হয় আপনার পরীক্ষার বছর, তার আগে তো অনায়াসেই আসতে পারতেন? অপু মৃদু হাসিয়া বলিল—কিসের পরীক্ষা? সে সব তো আজ বছর দুই ছেড়ে দিয়েছি। এখন খবরের কাগজের অফিসে চাকরি করি।

লীলা প্রথমটা অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কথাটা যেন বিশ্বাস করিল না, পরে দুঃখিতভাবে বলিল,—কেন, কি জন্যে ছাড়লেন পড়া, শুনি? আ-প-নি পড়া ছেড়েছেন!

লীলার চোখের ওই দৃষ্টিটা অপুর প্রাণে কেমন একটা বেদনার সৃষ্টি করিল, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার দৃষ্টি, তবুও সে হাসিমুখে কৌতুকের সুরে বলিল—এমনি দিলুম ছেড়ে, ভাল লাগে না আর, কি হবে পড়ে? তাহার এই হাল্‌কা কৌতুকের সুরে লীলা মনে আঘাত পাইল, অপূর্ব কি ঠিক সেই পুরানো দিনের অপূর্বই আছে? না যেন।

অপু বলিল—তুমি তো পড়ছ, না?

লীলা নিজের সম্বন্ধে কোন কথা হঠাৎ বলিতে চায় না, অপুর প্রশ্নের উত্তরে সহজভাবে বলিল—এবার আই-এ পাশ করেছি, থার্ড ইয়ারে পড়ছি। আপনি আজকাল পুরানো বাসায় থাকেন, না, আর কোথাও উঠে গিয়েছেন?

লীলার মা ও মাসীমা আসিলেন। লীলা নিজের আঁকা ছবি দেখাইল। বলিল—এবার আপনার মুখে 'স্বর্গ' হইতে বিদায়'টা শুনব, মা আর মাসীমা সেই জন্যে এসেছেন।

আরও খানিক পরে অপু বিদায় লইয়া বাহিরে আসিল, লীলা বৈঠকখানার দোর পর্যন্ত সঙ্গে আসিল, অপু হাসিয়া বলিল,—লীলা, আচ্ছা ছেলেবেলায় তোমাদের বাড়িতে কোন বিয়েতে তুমি একটা হাসির কবিতা বলেছিলে মনে আছে? মনে আছে সে কবিতাটা?

—উঃ! সে আপনি মনে ক'রে রেখেছেন এতদিন! সে সব কি আজকের কথা?

অপু অনেকটা আপন মনেই অন্যমনস্কভাবে বলিল—আর একবার তুমি তোমার জন্যে আনা দুধ অর্ধেকটা খাওয়ালে আমায় জোর ক'রে, শুনলে না কিছুতেই—ওঃ, দেখতে দেখতে কত বছর হয়ে গেল!

বলিয়া সে হাসিল, কিন্তু লীলা কোনও কথা বলিল না। অপু একবার পিছন দিকে চাহিল, লীলা অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া কি যেন দেখিতেছে।

ফিরিবার পথে একটা কথা তাহার বার বার মনে আসিতেছিল। অপর্ণা সুন্দরী বটে,

কিন্তু লীলার সঙ্গে এ-পর্য্যন্ত দেখা কোন মেয়ের তুলনা হয় না, হওয়া অসম্ভব। লীলার রূপ মানুষের মত নয় যেন, দেবীর মত রূপ, মুখের অনুপম শ্রীতে, চোখের ও ভ্রূর ভঙ্গিতে, গায়ের রং-এ, গলার সুরে, গতির ছন্দে।

অপু বুঝিল সে লীলাকে ভালবাসে, গভীরভাবে ভালবাসে, কিন্তু তা আবেগহীন, শান্ত, ধীর ভালবাসা। মনে তৃপ্তি আনে, স্নিগ্ধ আনন্দ আনে, কিন্তু শিরায় উপশিরায় রক্তের তাণ্ডব নর্ত্তন তোলে না। লীলা তাহার বাল্যের সাথী, তাহার উপর মায়ের পেটের বোনের মত একটা মমতা, স্নেহ ও অনুকম্পা, একটা মাধুর্য্যভরা ভালবাসা।

দিন কয়েক পরে, একদিন লীলার দাদামশায়ের এক দারোয়ান আসিয়া তাহাকে একখানা পত্র দিল, উপরে লীলার হাতের ঠিকানা লেখা। পত্রখানা সে খুলিয়া পড়িল। দু-লাইনে পত্র, একবার বিশেষ প্রয়োজনে আজ বা কাল ভবানীপুরের বাড়িতে যাইতে লিখিয়াছে।

লীলা সাদাসিধা লালপাড় শাড়ি পরিয়া মাঝের ছোট ঘরে তাহার সঙ্গে দেখা করিল। যাহাই সে পরে, তাহাতেই তাহাকে কি সুন্দর না মানায়! সকাল আটটা, লীলা বোধ হয় বেশীক্ষণ ঘুম হইতে উঠে নাই, রাত্রির নিদ্রালুতা এখনও যেন ডাগর ডাগর সুন্দর চোখ হইতে একেবারে মুছিয়া যায় নাই, মাথার চুল অবিন্যস্ত, ঘাড়ের দিকে ঈষৎ এলাইয়া পড়িয়াছে, প্রভাতের পদ্মের মত মুখের পাশে চূর্ণকুন্তলের দু-এক গাছা। অপু হাসিমুখে বলিল—থার্ড ইয়ার ব'লে বুঝি লেখাপড়া ঘুচেছে! আটটার সময় ঘুম ভাঙল? না, এখনও ঠিক ভাঙে নি?

লীলা যে কত পছন্দ করে অপুকে তাহার এই সহজ আনন্দ, খুশি ও হালকা হাসির আবহাওয়ার জন্য। ছেলেবেলাতেও সে দেখিয়াছে, শত দুঃখের মধ্যেও অপুর আনন্দ-উজ্জ্বলতা ও কৌতুকপ্রবণ মনের খুশি কেহ আটকাইয়া রাখিতে পারিত না, এখনও তাই, একরাশ বাহিরের আলো ও তারুণ্যের সজীব জীবনানন্দ সে সঙ্গে করিয়া আনে যেন, যখনই আসে—আপনা-আপনিই এসব কথা লীলার মনে হইল। তাহার মনে পড়িল, মায়ের মৃত্যুর খবরটা সে এই রকম হাসিমুখেই দিয়াছিল লালদীঘির মোড়ে।

—আসুন, বসুন, বসুন। কুড়েমি ক'রে ঘুমুই নি, কাল রাত্রে বড় মামীমার সঙ্গে বায়োস্কোপে গেছলাম সাড়ে-নটার শো'তে। ফিরতে হয়ে গেল পৌনে বারো, ঘুম আসতে দেড়টা। বসুন, চা আনি।

জাপানী গালার সুদৃশ্য চায়ের বাসনে সে চা আনিল। সঙ্গে পাঁউরুটি-টোস্ট, খোলাসুদ্ধ ডিম, কি এক প্রকার শাক, আধখানা ভাঙা আলু—সব সিদ্ধ, ধোঁয়া উড়িতেছে। অপু বলিল—এসব সাহেবী বন্দোবস্ত বোধ হয় তোমার দাদামশায়ের, লীলা? ডিম, তা আবার খোলাসুদ্ধ, এ শাকটা কি?

লীলা হাসিমুখে বলিল,—ওটা লেটুস্। দাঁড়ান, ডিম ছাড়িয়ে দি। আপনার দাড়ির কাছে ও কাটা দাগটা কিসের? কামাবার সময় কেটে ফেলেছেন বুঝি?

অপু বলিল,—ও কিছু না, এমনি কিসের। ব'সো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? তুমি চা খাবে না?

লীলার ছোট ভাই ঘরে ঢুকিয়া অপুর দিকে চাহিয়া হাসিল, নাম বিমলেন্দু, দশ-এগারো বছরের সুশ্রী বালক। লীলা তাহাকে চা ঢালিয়া দিল, পরে তিনজনে নানা গল্প করিল। লীলা নিজের আঁকা কতকগুলি ছবি দেখাইল, নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বলিল। সে এম. এ. পাশ করিবে, নয় তো বি. এ. পাশ করিয়া বিদেশে যাইতে চায়, দাদামশায়কে রাজী করাইয়া লইবে, ইউরোপের বড় আর্ট গ্যালারিগুলির ছবি দেখিবে, ফিরিয়া আসিয়া অজন্তা

দেখিতে যাইবে, তার আগে নয়। একটা আলমারী দেখাইয়া বলিল—দেখুন না এই বইগুলো ? ভ্যাসারির লাইভস্—এডিশনটা কেমন ?···ছবিগুলো দেখুন—সেন্ট্ অ্যান্টনির ছবিটা আমার বড় ভাল লাগে, কেমন একটা তপস্যাস্তব্ধ ভাব, না ?—ইন্স্টলমেন্ট সিস্টেমে এগুলো কিনেছি—আপনি কিনবেন কিছু ? ওদের ক্যান্ভাসার আমাদের বাড়ি আসে, তা হ'লে ব'লে দি—

অপু বলিল—কত ক'রে মাসে ?···ভ্যাসারির এডিশনটা তা'হলে না হয়—

—এটা কেন কিনবেন ? এটা তো আমার কাছেই রয়েছে—আপনার যখন দরকার হবে, নেবেন—আমার কাছে যা যা আছে, তা আপনাকে কিনতে হবে কেন ?—দাঁড়ান, আর একটা বইয়ের একখানা ছবি দেখাই—

অপু ছবিটার দিক হইতে আর একবার লীলার দিকে চাহিয়া দেখিল—বতিচেলির প্রিন্সেস্ দেস্ত্ খুব সুন্দরী বটে, কিন্তু বতিচেলির বা দ্য-ভিঞ্চির প্রতিভা লইয়া যদি লীলার এই অপূর্ব সুন্দর মুখ, এই যৌবন-পুষ্পিত দেহলতা ফুটাইয়া তুলিতে পারিত কেউ ?···

কথাটা সে বলিয়াই ফেলিল—আমি কি ভাবছি বলব লীলা ? আমি যদি ছবি আঁকতে পারতাম, তোমাকে মডেল ক'রে ছবি আঁকতাম—

লীলা সে কথার কোন জবাব না দিয়া হঠাৎ বলিল—ভাল কথা, আচ্ছা অপূর্ববাবু, একটা ভাল চাকরি কোথাও যদি পাওয়া যায় তো করবেন ?

অপু বলিল—কেন করব না ; কিসের চাকরি ?

লীলা বিবরণটা বলিয়া গেল। তাহার দাদামশায় একটা বড় স্টেটের এটর্নি, তাদের অফিসে একজন সেক্রেটারী দরকার—মাইনে দেড়শো টাকা, চাকরিটা দাদামশায়ের হাতে, লীলা বলিলেই এখনই হইয়া যায়, সেই জন্যেই আজ তাহাকে এখানে ডাকিয়া আনা।

অপুর মনে পড়িল, সেদিন কথায় কথায় সে লীলার কাছে নিজের বর্ত্তমান চাকুরির দুরাবস্থা ও খবরের কাগজখানা উঠিয়া যাওয়ার কথাটা কি সম্পর্কে একবারটি তুলিয়াছিল।

লীলা বলিল—সেদিন রাত্রে আমি তাঁর মুখে কথাটা শুনলাম, আজ সকালেই আপনাকে পত্র পাঠিয়ে দিয়েছি, আপনি রাজী আছেন তো ? আসুন, দাদামশায়ের কাছে আপনাকে নিয়ে যাই, ও'র একখানা চিঠিতে হয়ে যাবে।

কৃতজ্ঞতায় অপুর মন ভরিয়া গেল। এত কথার মধ্যে লীলা চাকুরি যাওয়ার কথাটাই কি ভাবে মনে ধরিয়া বসিয়াছিল !—

লীলা বলিল—আপনি আজ দুপুরে এখানে না খেয়ে যাবেন না। আসুন,—পাখাটা দয়া ক'রে টিপে দিন না।

কিন্তু চাকুরি হইল না। এসব ব্যাপারের অভিজ্ঞতা না থাকায় লীলা একটু ভুল করিয়াছিল, দাদামশায়কে বলিয়া রাখে নাই অপুর কথা। দিন দুই আগে লোক লওয়া হইয়া গিয়াছে। সে খুব দুঃখিত হইল, একটু অপ্রতিভও হইল। অপু দুঃখিত হইল লীলার জন্য। বেচারী লীলা ! সংসারের কোন অভিজ্ঞতা তাহার কি আছে ? একটা চাকুরি খালি থাকিলে যে কতখানা উমেদারীর দরখাস্ত পড়ে, বড়লোকের মেয়ে, তাহার খবর কি করিয়া জানিবে ?

লীলা বলিল—আপনি এক কাজ করুন না, আমার কথা রাখতে হবে কিন্তু, ছেলেবেলার মত একগুঁয়ে হলে কিন্তু চলবে না—প্রাইভেটে বি. এ.-টা দিয়ে দিন। আপনার পক্ষে সেটা কঠিন না কিছু।

অপু বলিল—বেশ দেব।

লীলা উৎফুল্ল হইয়া উঠিল—ঠিক ? অনার ব্রাইট ?

—অনার ব্রাইট।

শীতের অনেক দেরি, কিন্তু এরই মধ্যে লীলাদের গাড়িবারান্দার পাশে জাফরিতে ওঠানো মার্শালনীলের লতায় ফুল দেখা দিয়াছে, বারান্দার সিঁড়ির দু'পাশের টবে বড় বড় পল নিরোন ও ব্ল্যাক প্রিন্স ফুটিয়াছে। বর্ষাশেষে চাইনিজ ফ্যান্ পামের পাতাগুলো ঘনসবুজ।

পদ্মপুকুর রোডে পা দিয়া অপুর চোখ জলে ভরিয়া আসিল। লীলা, ছেলেমানুষ লীলা—সে কি জানে সংসারের রূঢ়তা ও নিষ্ঠুর সঙ্ঘর্ষের কাহিনী? আজ তাহার মনে হইল, লীলার পায়ে একটা কাঁটা ফুটিলে সেটা তুলিয়া দিবার জন্য সে নিজের সুখ শান্তি সম্পূর্ণ উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য করিতে পারে।

বিবাহের পর লীলার সঙ্গে এই প্রথম দেখা, কিন্তু দু-একবার বলি বলি করিয়াও অপু বিবাহের কথা বলিতে পারিল না, অথচ সে নিজে ভালই বোঝে যে, না বলিতে পারিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

এক বৎসর চলিয়া গিয়াছে। পুনরায় পূজার বিলম্ব অতি সামান্যই।

শনিবার। অনেক অফিস আজ বন্ধ হইবে, অনেকগুলি সম্মুখের মঙ্গলবারে বন্ধ। দোকানে দোকানে খুব ভীড়—ঘণ্টাখানেক পথে হাঁটিলে হ্যাণ্ডবিল হাত পাতিয়া লইতে লইতে ঝুড়িখানেক হইয়া উঠে। একটা নতুন স্বদেশী দেশলাইয়ের কারখানা পথে পথে জাঁকাল বিজ্ঞাপন মারিয়াছে।

আমড়াতলা গলির বিখ্যাত ধনী ব্যবসাদার নকুলেশ্বর শীলের প্রাসাদোপম সুবৃহৎ অট্টালিকার নিম্নতলেই ইঁহাদের অফিস। অনেকগুলি ঘর ও দুটা বড় হল কর্ম্মচারিতে ভর্ত্তি। দিনমানেও ঘরগুলির মধ্যে ভালো আলো যায় না বলিয়া বেলা চারটা না বাজিতেই ইলেকট্রিক আলো জ্বলিতেছে।

ছোকরা টাইপিস্ট নৃপেন সন্তর্পণে পর্দ্দা ঠেলিয়া ম্যানেজারের ঘরে ঢুকিল। ম্যানেজার নকুলেশ্বর শীলের বড় জামাই দেবেন্দ্রবাবু। ভারী কড়া মেজাজের মানুষ। বয়স পঞ্চাশ ছাড়াইয়াছে, দোহারা ধরণের চেহারা। বেশ ফর্সা, মাথায় টাক। এক কলমের খোঁচায় লোকের চাকরি খাইতে এমন পারদর্শী লোক খুব অল্পই দেখা যায়। দেবেন্দ্রবাবু বলিলেন —কি হে নৃপেন?

নৃপেন ভূমিকাস্বরূপ দুইখানা টাইপ-ছাপা কি কাগজ মঞ্জুর করাইবার ছলে তাঁহার টেবিলের উপর রাখিল।

সহি শেষ হইলে নৃপেন একটু উঁশখুশ করিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া আরক্তমুখে বলিল—আমি—এই—আজ বাড়ি যাব—একটু সকালে, চারটেতে গাড়ি কি না? সাড়ে তিনটেতে না গেলে—

—তুমি এই সেদিন তো বাড়ি গেলে মঙ্গলবারে। রোজ রোজ সকালে ছেড়ে দিতে গেলে অফিস চলে কেমন ক'রে? এখনও তো একখানা চিঠি টাইপ কর নি দেখছি—

এ অফিসে শনিবারে সকালে ছুটির নিয়ম নাই। সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার পূর্ব্বে কোনদিন অফিসের ছুটি নাই। কি শনিবার কি অন্যদিন। কোনও পাল-পার্ব্বণে ছুটি নাই, কেবল পূজার সময় এক সপ্তাহ, শ্যামাপূজায় একদিন ও সরস্বতী পূজায় একদিন। অবশ্য রবিবারগুলি বাদ। ইহাদের বন্দোবস্ত এইরূপ—চাকরি করিতে হয় কর, নতুবা যাও চলিয়া। এ ভয়ানক বেকার সমস্যার দিনে কর্ম্মচারিগণ নবমীর পাঁঠার মত কাঁপিতে কাঁপিতে চাণক্য-

শ্লোকের উপদেশ মত চাকরিকে পুরোভাগে বজায় ও ছুটিছাটা, অপমান-অসুবিধাকে পশ্চাদ্দিকে নিক্ষেপ করতঃ কায়ক্লেশে দিন অতিবাহিত করিয়া চলিয়াছেন।

নৃপেন কি বলিতে যাইতেছিল—দেবেনবাবু বাধা দিয়া বলিলেন—মল্লিক য়্যাণ্ড্ চৌধুরীদের মর্টগেজখানা টাইপ করেছিলে ?

নৃপেন কাঁদ-কাঁদ মুখে বলিল—আজ্ঞে, কই ওদের অফিস থেকে তো পাঠিয়ে দেয় নি এখনও ?

—পাঠিয়ে দেয় নি তো ফোন কর নি কেন ? আজ সাতদিন থেকে বলছি—কচি খোকা তো নও ?···যা আমি না দেখব তাই হবে না ?

নৃপেনের ছুটির কথা চাপা পড়িয়া গেল এবং সে বেচারী পুনরায় সাহস করিয়া সে-কথা উঠাইতেও পারিল না।

সন্ধ্যার অল্প পূর্বে ক্যাশ ও ইংলিশ ডিপার্টমেণ্টের কেরানীরা বাহির হইল—অন্য অন্য কেরানীগণ আরও ঘণ্টাখানেক থাকিবে। অত্যন্ত কম বেতনের কেরানী বলিয়া কেহই তাহাদের মুখের দিকে চায় না, বা তাহারা নিজেরাও আপত্তি উঠাইতে ভয় পায়।

দেউড়িতে দারোয়ানেরা বসিয়া খৈনী খাইতেছে, ম্যানেজার ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের যাতায়াতের সময় উঠিয়া দাঁড়াইয়া ফৌজের কায়দায় সেলাম করে, ইহাদিগকে পোঁছেও না।

ফুটপাথে পা দিয়া নৃপেন বলিল—দেখলেন অপূর্ববাবু, ম্যানেজার বাবুর ব্যাপার ? এক দিন সাড়ে তিনটের সময় ছুটি চাইলাম, তা দিলে না—অন্য সব অফিস দেখুন গিয়ে দুটোতে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তারা সব এতক্ষণে ট্রেনে যে যার বাড়ি পৌঁছে চা খাচ্ছে আর আমরা এই বেরুলাম—কি অত্যাচারটা বলুন দিকি ?

প্রবোধ মুহুরী বলিল—অত্যাচার ধ'লে মনে কর ভায়া, কাল থেকে এস না, মিটে গেল। কেউ তো অত্যাচার পোয়াতে বলে নি। ওঃ, ক্ষিদে যা পেয়েছে ভায়া, একটা মানুষ পেলে ধরে খাই এমন অবস্থা। রোজ রোজ এমনি—হার্টের রোগ জন্মে গেল ভায়া, শুধু না খেয়ে খেয়ে—

অপু হাসিয়া বলিল—দেখবেন প্রবোধ-দা, আমি পাশে আছি, এ যাত্রা আমাকে না হয় রেহাই দিন। ধরে খেতে হয় রাস্তার লোকের ওপর দিয়ে আজকের ক্ষিদেটা শান্ত করুন। আমি আজ তৈরী হয়ে আসি নি। দোহাই দাদা !

তাহার দুঃখের কথা লইয়া এরূপ ঠাট্টা করাতে প্রবোধ মুহুরী খুব খুশী হইল না। বিরক্তমুখে বলিল, তোমাদের তো সব তাতেই হাসি আর ঠাট্টা, ছেলেছোকরার কাছে কি কোন কথা বলতে আছে···আমি যাই, তাই বলি ! হাসি সোজা ভাই, কই দাও দিকি ম্যানেজারকে ব'লে পাঁচ টাকা মাইনে বাড়িয়ে ? হুঁঃ, তার বেলা—

অপুকে হাঁটিতে হয় রোজ অনেকটা। তার বাসা শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের মধ্যে, গোলদীঘির কাছে। তের টাকা ভাড়াতে নীচু একতলা ঘর, ছোট রান্নাঘর। সামান্য বেতনে দু'জায়গায় সংসার চালানো অসম্ভব বলিয়া আজ বছরখানেক হইল সে অপর্ণাকে কলিকাতায় আনিয়া বাসা করিয়াছে। তবুও এখানে চাকরিটি জুটিয়াছিল তাই রক্ষা !···

শৈশবের স্বপ্ন এ ভাবেই প্রায় পর্য্যবসিত হয়। অনভিজ্ঞ তরুণ মনের উচ্ছ্বাস, উৎসাহ—মাধুর্য্য-ভরা রঙীন ভবিষ্যতের স্বপ্ন—স্বপ্নই থাকিয়া যায়। যে ভাবে বড় সওদাগর হইবে, দেশে দেশে বাণিজ্যের কুঠী খুলিবে, তাহাকে হইতে হয় পাড়াগাঁয়ের হাতুড়ে ডাক্তার, যে ভাবে ওকালতি পাশ করিয়া রাসবিহারী ঘোষ হইবে, তাহাকে হইতে হয় কয়লার দোকানী, যাহার আশা থাকে সারা পৃথিবী ঘুরিয়া দেখিয়া বেড়াইবে, কি দ্বিতীয় কলম্বস হইবে, তাহাকে হইতে হয় চল্লিশ টাকা বেতনের স্কুলমাষ্টার।

শতকরা নিরানব্বই জনের বেলা যা হয়, অপুর বেলাও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। যথা-নিয়মে সংসার-যাত্রা, গৃহস্থালী, কেরানীগিরি, ভাড়া বাড়ি, মেলিন্‌স্‌ ফুড ও অয়েলক্লথ। তবে তাহার শেষোক্ত দুটির এখনও আবশ্যক হয় নাই—এই যা।

অপর্ণা ঘরের দোরের কাছে বঁটি পাতিয়া কুট্‌না কুটিতেছে, স্বামীকে দেখিয়া বলিল—আজ এত সকাল সকাল যে! তারপর সে বঁটিখানা ও তরকারীর চুপড়ি একপাশে সরাইয়া রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অপু বলিল, খুব সকাল আর কৈ, সাতটা বেজেছে, তবে অন্যদিনের তুলনায় সকাল বটে। হ্যাঁ, তেলওয়ালা আর আসে নি তো?

—এসেছিল একবার দুপুরে, ব'লে দিয়েছি বুধবারে মাইনে হ'লে আসতে। তোমার আসবার দেরি হবে ভেবে এখনও আমি চায়ের জল চড়াই নি।

কলের কাছে অন্য ভাড়াটেদের ঝি-বৌয়েরা এ সময় থাকে বলিয়া অপর্ণা স্বামীর হাত মুখ ধুইবার জল বারান্দার কোণে তুলিয়া রাখে। অপু মুখ ধুইতে গিয়া বলিল, রজনীগন্ধা গাছটা হেলে পড়েছে কেন বল তো? একটু বেঁধে দিও।

চা খাইতে বসিয়াছে, এমন সময়ে কলের কাছে কোন প্রৌঢ়া-কণ্ঠের কর্কশ আওয়াজ শোনা গেল—তা হলে বাপু একশো টাকা বাড়িভাড়া দিয়ে সাহেব পাড়ায় থাকো গে। আজ আমার মাথা ধরেছে, কাল আমার ছেলের সর্দি লেগেছে—পালার দিন হলেই যত ছুতো। নাও না, সারা ওপরটাই তোমরা ভাড়া নাও না; দাও না পঁয়ষট্টি টাকা—আমরা না হয় আর কোথাও উঠে যাই, রোজ রোজ হাঙ্গামা কে সহ্য করে বাপু?

অপু বলিল—আবার বুঝি আজ বেধেছে গাঙ্গুলী-গিন্নীর সঙ্গে?

অপর্ণা বলিল—নতুন ক'রে বাধবে কি, বেধেই তো আছে। গাঙ্গুলী-গিন্নীরও মুখ বড় খারাপ, হালদারদের বৌটা ছেলেমানুষ, কোলের মেয়ে নিয়ে পেরে ওঠে না, সংসারে তো আর মানুষ নেই, তবুও আমি এক-একদিন গিয়ে বাট্‌না বেটে দিয়ে আসি।

সিঁড়ি ও রোয়াক ধুইবার পালা লইয়া উপরের ভাড়াটেদের মধ্যে এ রেষারেষি, দ্বন্দ্ব—অপু আসিয়া অবধি এই এক বৎসরের মধ্যে মিটিল না। সকলের অপেক্ষা তাহার খারাপ লাগে ইহাদের এই সংকীর্ণতা, অনুদারতা। কট্‌ কট্‌ করিয়া শক্ত কথা শুনাইয়া দেয়—বাঁচিয়া, বাঁচাইয়া কথা বলে না, কোন্‌ কথায় লোকের মনে আঘাত লাগে, সে কথা ভাবিয়াও দেখে না।

বাড়িটাতে হাওয়া খেলে না, বারান্দাটাতে বসিলে হয়ত একটু পাওয়া যায়, কিন্তু একটু দূরেই ঝাঁঝরি-ড্রেন, সেখানে সারা বাসার তরকারীর খোসা, মাছের আঁশ, আবর্জনা, বাসি ভাত-তরকারী পচিতেছে, বর্ষার দিনে বাড়িময় ময়লা ও আধময়লা কাপড় শুকাইতেছে, এখানে তোবড়ানো টিনের বাক্স, ওখানে কয়লার ঝুড়ি। ছেলেমেয়েগুলো অপরিষ্কার, ময়লা পেনী বা ফ্রক পরা। অপুদের নিজেদের দিকটা ওরই মধ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিলে কি হয়, এই ছোট্ট বারান্দার টবে দু-চারটে রজনীগন্ধা, বিঁদ্যাপাতার গাছ রাখিলে কি হয়, এই এক বৎসর সেখানে আসিয়া অপু বুঝিয়াছে, জীবনের সকল সৌন্দর্য, পবিত্রতা, মাধুর্য এখানে পলে পলে নষ্ট করিয়া দেয়, এই আবহাওয়ার বিষাক্ত বাষ্পে মনের আনন্দকে গলা টিপিয়া মারে। চোখে পীড়া দেয় যে অসুন্দর, তা ইহাদের অঙ্গের আভরণ। থাকিতে জানে না, বাস করিতে জানে না, শূকরপালের মত খায় আর কাদায় গড়াগড়ি দিয়া মহা আনন্দে দিন কাটায়। এত কুশ্রী বেষ্টনীর মধ্যে দিন দিন যেন তাহার দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে।

কিন্তু উপায় নাই, মনসাপোতা থাকিলেও আর কুলায় না, অথচ তের টাকা ভাড়ায় এর চেয়ে ভাল ঘর শহরে কোথাও মেলে না। তবুও অপর্ণা এই আলো-হাওয়াবিহীন স্থানেও

শ্রী-ছাঁদ আনিয়াছে, ঘরটা নিজের হাতে সাজাইয়াছে, বাক্সপেঁটরাতে নিজের হাতে বোনা ঘেরাটোপ, জানালায় ছিটের পর্দা, বালিশ মশারী সব ধপ ধপ করিতেছে, দিনে দু'তিনবার ঘর ঝাঁট দেয়।

এই বাড়ির উপরের তলার ভাড়াটে গাঙ্গুলীদের একজন দেশস্থ আত্মীয় পীড়িত অবস্থায় এখানে আসিয়া দু-তিন মাস আছেন। আত্মীয়টি প্রৌঢ়, সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে। দেখিয়া মনে হয় অতি দরিদ্র, বড়লোক আত্মীয়ের আশ্রয়ে এখানে রোগ সারাইতে আসিয়াছেন ও চোরের মত একপাশে পড়িয়া আছেন। বৌটি যেমন শান্ত তেমনি নিরীহ,—ইতিপূর্বেও কখনও কলিকাতায় আসে নাই—দিনরাত জুজুর মত হইয়া আছে। মা সারাদিন সংসারের খাটুনি খাটে, সময় পাইলেই, রুগ্ণ স্বামীর মুখের দিকে উদ্বিগ্নদৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া থাকে। তাহার উপর গাঙ্গুলী-বৌয়ের ঝংকার, বিরক্তি প্রদর্শন, মধুবর্ষণ তো আছেই। অত্যন্ত গরীব, অপু রোগী দেখিতে যাইবার ছলে মাঝে মাঝে বেদানা, আঙ্গুর, লেবু দিয়া আসিয়াছে। সেদিনও বড় ছেলেটিকে জামা কিনিয়া দিয়াছে।

এদিকে তাহারও চলে না। এ সামান্য আয়ে সংসার চালানো একরূপ অসম্ভব। অপর্ণা অন্যদিকে ভাল গৃহিণী হইলেও পয়সা-কড়ির ব্যাপারটা ভাল বোঝে না—দুজনে মিলিয়া মহা আমোদে মাসের প্রথম দিকটা খুব খরচ করিয়া ফেলে—শেষের দিকে কষ্ট পায়।

কিন্তু সকলের অপেক্ষা কষ্টকর হইয়াছে অফিসের এই ভূতগত খাটুনি। ছুটি বলিয়া কোনও জিনিস নাই এখানে। ছোট ঘরটিতে টেবিলের সামনে ঘাড় গুঁজিয়া বসিয়া থাকা সকাল এগারোটা হইতে বৈকাল সাতটা পর্যন্ত। আজ দেড় বৎসর ধরিয়া এই চলিতেছে। এই দেড় বৎসরের মধ্যে সে শহরের বাহিরে কোথাও যায় নাই। অফিস আর বাসা, বাসা আর অফিস। শীলবাবুদের দমদমার বাগান-বাড়িতে সে একবার গিয়াছিল, সেই হইতে তাহার মনের মধ্যে সাধ নিজের মনের মত গাছ-পালায় সাজানো বাগান-বাড়িতে বাস করা। অফিসে যখন কাজ থাকে না, তখন একখানা কাগজে কাল্পনিক বাগান-বাড়ির নক্সা আঁকে। বাড়িটা যেমন তেমন হউক, গাছপালার বৈচিত্র্যই থাকিবে বেশী। গেটের দু'ধারে দুটা চীনা বাঁশের ঝাড় থাকুক। রাঙা সুরকীর পথের ধারে ধারে রজনীগন্ধা ও ল্যাভেণ্ডার ঘাসের পাড় বসানো বকুল ও কৃষ্ণচূড়ার ছায়া।

বাড়িতে ফিরিয়া চা ও খাবার খাইয়া স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করে—হ্যাঁ, তারপর কাঁটালি চাঁপার পারগোলাটা কোন্ দিকে হবে বলো তো?

অপর্ণা স্বামীকে এই দেড় বছরে খুব ভাল করিয়া বুঝিয়াছে। স্বামীর এইসব ছেলেমানুষিতে সেও সোৎসাহে যোগ দেয়। ব'লে—শুধু কাঁটালি চাঁপা? আর কি কি থাকবে, জানলার জাফরিতে কি উঠিয়ে দেব বল তো?

যে আমড়াতলার গলির ভিতর দিয়া সে অফিস যায় তাঁহার মত নোংরা স্থান আর আছে কি-না সন্দেহ। ঢুকিতেই শুঁটকী চিংড়ি মাছের আড়ত সারি সারি দশ-পনেরোটা। চড়া রৌদ্রের দিনে যেমন তেমন, বৃষ্টির দিনে কার সাধ্য সেখান দিয়া যায়? স্থানে স্থানে মারোয়াড়ীদের গরু ও ষাঁড় পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া—পিচপিচে কাদা, গোবর, পচা আপেলের খোলা।

নিত্য দু'বেলা আজ দেড় বৎসর এই পথে যাতায়াত।

তা ছাড়া রোজ বেলা এগারোটা হইতে সাতটা পর্যন্ত এই দারুণ বদ্ধতা! অফিসে অন্য যাহারা আছে, তাহাদের ইহাতে তত কষ্ট হয় না। তাহারা প্রবীণ, বহুকাল ধরিয়া তাহাদের খাকের কলম শীলবাবুদের সেরেস্তায় অক্ষয় হইয়া বিরাজ করিতেছে, তাহাদের গর্বও এইখানে। রোকড়-নবীশ রামধনবাবু বলেন—হেঁ হেঁ, কেউ পারবে না মশাই, আজ এক

কলমে বাইশ বছর হ'ল বাবুদের এখানে—কোন ব্যাটার ফুঁ খাটবে না বলে দিও—চার সালের ভূমিকম্প মনে আছে? তখন কর্ত্তা বেঁচে, গদী থেকে বেরুচ্ছি, ওপর থেকে কর্ত্তা হেঁকে বললেন, ওহে রামধন, পোস্তা থেকে ল্যাংড়া আমের দরটা জেনে এসো দিকি চট ক'রেণ বেরুতে যাবো মশাই—আর যেন মা বাসুকি একেবারে চৌদ্দ হাজার ফণা নাড়া দিয়ে উঠলেন—সে কি কাণ্ড মশাই? হেঁ হেঁ, আজকের লোক নই—

কষ্ট হয় অপুর ও ছোকরা টাইপিস্ট নৃপেনের। সে বেচারী উঁকি মারিয়া দেখিয়া আসে ম্যানেজার ঘরে বসিয়া আছে কিনা। অপুর কাছে টুলের উপর বসিয়া বলে, এখনও ম্যানেজার হাইকোর্ট থেকে ফেরেন নি বুঝি, অপূর্ব্ববাবু—ছটা বাজে, আজ ছুটি সেই সাতটায়—

অপু বলে, ও-কথা আর মনে করিয়ে দেবেন না, নৃপেনবাবু। বিকেল এত ভালবাসি, সেই বিকেল দেখি নি যে আজ কত দিন। দেখুন তো বাইরে চেয়ে, এমন চমৎকার বিকেলটি, আর এই অন্ধকার ঘরে ইলেকট্রিক আলো জ্বেলে ঠায় বসে আছি সেই সকাল দশটা থেকে।

মাটির সঙ্গে যোগ অনেকদিনই তো হারাইয়াছে, সে সব বৈকাল তো এখন দূরের স্মৃতি মাত্র। কিন্তু কলিকাতা শহরের যে সাধারণ বৈকালগুলি তাও তো সে হারাইতেছে প্রতিদিন। বেলা পাঁচটা বাজিলে এক-একদিন লুকাইয়া বাহিরে গিয়া দাঁড়াইয়া সম্মুখের বাড়ির উঁচু কার্ণিশের উপর যে একটুখানি বৈকালের আকাশ চোখে পড়ে তারই দিকে বুভুক্ষুর দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে।

সামনেই উপরের ঘরে মেজবাবু বন্ধুবান্ধব লইয়া বিলিয়ার্ড খেলিতেছেন, মার্কারটা রেলিং-এর ধারে দাঁড়াইয়া সিগারেট খাইয়া পুনরায় ঘরে ঢুকিল। মেজবাবুর বন্ধু নীলরতন-বাবু একবার বারান্দায় আসিয়া কাহাকে হাঁক দিলেন। অপুর মনে হয় তাহার জীবনের বৈকালগুলি এরা পয়সা দিয়া কিনিয়া লইয়াছে, সবগুলি এখন ওদের জিম্মায়, তাহার নিজের আর কোন অধিকার নাই উহাতে।

প্রথম জীবনের সে-সব মাধুরীভরা মুহূর্ত্তগুলি যৌবনের কলকোলাহলে কোথায় মিলাইয়া গেল? কোথায় সে নীল আকাশ, মাঠ, আমের বউলের গন্ধভরা জ্যোৎস্নারাত্রি? পাখি আর ডাকে না, ফুল আর ফোটে না, আকাশ আর সবুজ মাঠের সঙ্গে মেশে না—ঘেঁটুফুলের ঝোপে সদ্যফোটা ফুলের তেতো গন্ধ আর বাতাসকে তেতো করে না। জীবনে সে যে রোমান্সের স্বপ্ন দেখিয়াছিল—যে স্বপ্ন তাহাকে একদিন শত দুঃখের মধ্য দিয়া টানিয়া আনিয়াছে তার সন্ধান তো কই এখনও মিলিল না? এ তো একরঙা ছবির মত বৈচিত্র্যহীন, কর্ম্মব্যস্ত, একঘেয়ে জীবন—সারাদিন এখানে অফিসের বন্ধুজীবন, রোকড়, খতিয়ান, মর্টগেজ, ইনকামট্যাক্সের কাগজের বোঝার মধ্যে পক্বকেশ প্রবীণ ঝুনো সংসারাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সঙ্গে সাপিনা ধরানোর প্রকৃষ্ট উপায় সম্বন্ধে পরামর্শ করা, এটর্নিদের নামে বড় বড় চিঠি মুশাবিদা করা—সন্ধ্যায় পায়রার খোপের মত অপরিষ্কার নোংরা বাসাবাড়িতে ফিরিয়াই তখনি আবার ছেলে পড়াইতে ছোটা।

কেবল এক অপর্ণাই এই বন্ধ জীবনের মধ্যে আনন্দ আনে। অফিস হইতে ফিরিলে সে যখন হাসিমুখে চা লইয়া কাছে দাঁড়ায়, কোনদিন হালুয়া, কোনদিন দু-চারখানা পরোটা, কোনদিন বা মুড়ি নারিকেল রেকাবিতে সাজাইয়া সামনে ধরে, তখন মনে হয় এ যদি না থাকিত! ভাগ্যে অপর্ণাকে সে পাইয়াছিল! এই ছোট্ট পায়রার খোপকে যে গৃহ বলিয়া মনে হয় সে শুধু অপর্ণা এখানে আছে বলিয়া, নতুবা চৌকী, টুল, বাসন-কোসন, জানালার পর্দ্দা, এসব সংসার নয়; অপর্ণা যখন বিশেষ ধরণের শাড়িটি পরিয়া ঘরের মধ্যে ঘোরাফেরা করে, অপু ভাবে, এ স্নেহনীড় শুধু ওরই চারিধারে ঘিরিয়া, ওরই মুখের হাসি বুকের স্নেহ যেন পরম আশ্রয়, নীড় রচনা সে ওরই ইন্দ্রজাল।

অফিসে সে নানা স্থানের ভ্রমণকাহিনী পড়ে, ডেস্কের মধ্যে পুরিয়া রাখে। পুরানো বইয়ের দোকান হইতে নানা দেশের ছবিওয়ালা বর্ণনাপূর্ণ বই কেনে—নানা দেশের রেলওয়ে বা স্টীমার কোম্পানী যে সব দেশে যাইতে সাধারণকে প্রলুব্ধ করিতেছে—কেহ বলিতেছে, হাওয়াই দ্বীপে এস একবার—এখানকার নারিকেল কুঞ্জে, ওয়াকিকির বালুময় সমুদ্রবেলায় জ্যোৎস্নারাত্রে যদি তারাভিমুখী উর্ম্মিমালার সঙ্গীত না শুনিয়া মর, তবে তোমার জীবন বৃথা।

এলো-পাশো দেখ নাই। দক্ষিণ কালিফোর্ণিয়ার চুনাপাথরের পাহাড়ের ঢালুতে, শান্ত রাত্রির তারাভরা আকাশের তলে কম্বল বিছাইয়া একবারটি ঘুমাইয়া দেখিও শীতের শেষে নুড়িভরা উঁচুনীচু প্রান্তরে কর্কশ ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে দু-এক ধরণের মাত্র বসন্তের ফুল প্রথম ফুটিতে শুরু করে, তখন সেখানকার সোডা-আল্‌কালির পলিমাটিপড়া রৌদ্রদীপ্ত মুক্ত মরুবলয়ের রহস্যময় রূপ—কিংবা ওয়ালোয়া হ্রদের তীরে উন্নত পাইন ও ডগ্‌লাস ফারের ঘন অরণ্য, হ্রদের স্বচ্ছ, বরফগলা জলের তুষারকিরিটী মাজামা অগ্নেয়গিরি প্রতিচ্ছায়ার কম্পন—উত্তর আমেরিকার ঘন স্তব্ধ, নির্জ্জন অরণ্যভূমির নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল দৃশ্যরাজি, কর্কশ বন্ধুর পর্ব্বতমালা, গম্ভীরনিনাদী জলপ্রপাত, ফেনিল পাহাড়ী নদীতীরে বিচরণশীল বল্‌গা হরিণের দল, ভালুক, পাহাড়ী ছাগল, ভেড়ার দল, উষ্ণ প্রস্রবণ, তুষারপ্রবাহ, পাহাড়ের ঢালুর গায়ে সিডার ও মেপল গাছের বনের মধ্যে বুনো ভ্যালেরিয়ান্‌ ও ভায়োলেট্‌ ফুলের বিচিত্র বর্ণসমাবেশ—দেখ নাই এসব ? এস এস।

টাহিটি! টাহিটি! কোথায় কত দূরে, কোন্‌ জ্যোৎস্নালোকিত রহস্যময় কুলহীন স্বপ্ন-সমুদ্রের পারে, শুভরাত্রে গভীর জলের তলায় যেখানে মুক্তার জন্ম হয়, সাগরগুহায় প্রবালের দল ফুটিয়া থাকে, কানে শুধু দূরশ্রুত সঙ্গীতের মত তাহাদের অপূর্ব্ব আহ্বান ভাসিয়া আসে। অফিসের ডেস্কে বসিয়া এক একদিন সে স্বপ্নে ভোর হইয়া থাকে—এই সবের স্বপ্নে। ঐ রকম নির্জ্জন স্থানে, যেখানে লোকালয় নাই, ঘন নারিকেল কুঞ্জের মধ্যে ছোট কুটিরে, খোলা জানালা দিয়া দূরের নীল সমুদ্র চোখে পড়িবে—তার ওপারে মরকতশ্যাম ছোট ছোট দ্বীপ, বিচিত্র পক্ষীরাজি, অজানা দেশের অজানা আকাশের তলে তারার আলোয় উজ্জ্বল মাঠটা একটা রহস্যের বার্ত্তা বহিয়া আনিবে—কুটিরের ধারে ফুটিয়া থাকিবে ছোট ছোট বনফুল—শুধু সে আর অপর্ণা।

এই সব বড়লোকের টাকা আছে, কিন্তু জগৎকে দেখিবার, জীবনকে বুঝিবার পিপাসা কই এদের ? এ সিমেণ্টে বাঁধানো উঠান, চেয়ার, কোচ, মোটর—এ ভোগ নয়, এই শৌখীন বিলাসিতার মধ্যে জীবনের সবদিকে আলো-বাতাসের বাতায়ন আটকাইয়া এ মরিয়া থাকা—কে বলে ইহাকে জীবন ? তাহার যদি টাকা থাকিত ? কিছুও যদি থাকিত, সামান্যও কিছু ! অথচ ইহারা তো লাভ ক্ষতি ছাড়া আর কিছু শেখে নাই, বোঝেও না, জানে না, জীবনে আগ্রহও নাই কিছুতেই, ইহাদের সিন্দুক-ভরা নোটের তাড়া।

এই অফিস-জীবনের বন্ধতাকে অপু শান্তভাবে, নিরুপায়ের মত দুর্ব্বলের মত মাথা পাতিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারে নাই। ইহার বিরুদ্ধে, এই মানসিক দারিদ্র্য ও সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে তাহার মনে একটা যুদ্ধ চলিতেছে অনবরত, সে হঠাৎ দমিবার পাত্র নয় বলিয়াই এখনও টিকিয়া আছে,—ফেনোচ্ছল সুরার মত জীবনের প্রাচুর্য্য ও মাদকতা তাহার সারা অঙ্গের শিরায় উপশিরায়—ব্যগ্র, আগ্রহভরা তরুণ জীবন বুকের রক্তে উন্মত্ততালে স্পন্দিত হইতেছে দিনরাত্রি—তাহার স্বপ্নকে আনন্দকে নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া মারিয়া ফেলা খুব সহজসাধ্য নয়।

কিন্তু এক এক সময় তাহারও সন্দেহ আসে। জীবন যে এই রকম হইবে, সূর্য্যোদয়

হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত প্রতি দণ্ড পল যে তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর বৈচিত্র্যহীন ঘটনায় ভরিয়া উঠিবে, তাহার কল্পনা তো তাহাকে এ আভাস দেয় নাই। তবে কেন এমন হয়! তাহাকে কাঁচা, অনভিজ্ঞ পাইয়া নিষ্ঠুর জীবন তাহাকে এতদিন কি প্রতারণাই করিয়া আসিয়াছে? ছেলেবেলায় মা যেমন নগ্ন দারিদ্র্যের রূপকে তাহার শৈশবচক্ষু হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে চাহিত তেমনই!···

দেখিতে দেখিতে পূজা আসিয়া গেল। আজ দু'বৎসর এখানে সে চাকরি করিতেছে, পূজার পূর্ব্বে প্রতিবারই সে ও নৃপেন টাইপিস্ট কোথাও না কোথাও যাইবার পরামর্শ আঁটিয়াছে, নক্সা আঁকিয়াছে, ভাড়া কষিয়াছে, কখনও পুরুলিয়া কখনও পুরী—যাওয়া অবশ্য কোথাও হয় না। তবুও যাইবার কল্পনা করিয়াও মনটা খুশী হয়। মনকে বোঝায় এবার না হয় আগামী পূজায় নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—কেহ বাধা দিতে পারিবে না।

শনিবার অফিস বন্ধ হইয়া গেল। অপুর আজকাল এমন হইয়াছে বাড়ি ফিরিয়া অপর্ণার মুখ দেখিতে পারিলে যেন বাঁচে, কতক্ষণে সাতটা বাজিবে, ঘন ঘন ঘড়ির দিকে সতৃষ্ণ চোখে চায়। পাঁচটা বাজিয়া গেলে অকুল সময়-সমুদ্রে যেন থৈ পাওয়া যায়—আর মোটে ঘণ্টা-দুই। ছ'টা—আর এক। হোক্ পায়রার খোপের মত বাসা, অপর্ণা যেন সব দুঃখ ভুলাইয়া দেয়। তাহার কাছে গেলে আর কিছু মনে থাকে না।

অপর্ণা চা ও খাবার আনিল। এ সময়টা আধঘণ্টা সে স্বামীর কাছে থাকিতে পায়, গল্প করিতে পায়; আর সময় হয় না, এখনি আবার অপুকে ছেলে পড়াইতে বাহির হইতে হইবে। অপু এ-সময় তাহাকে সব দিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখিয়াছে, ফরসা লালপাড় শাড়িটি পরা, চুলটি বাঁধা, পায়ে আলতা, কপালে সিঁদুরের টিপ—মূর্ত্তিমতী গৃহলক্ষ্মীর মত হাসিমুখে তাহার জন্য চা আনে, গল্প করে, রাত্রে কি রান্না হইবে রোজ জিজ্ঞাসা করে, সারাদিনের বাসার ঘটনা বলে। বলে, ফিরে এসো, দুজনে আজ মহারাণী ঝিন্দন আর দিলীপ সিংহের কথাটা প'ড়ে শেষ ক'রে ফেলব।

বার-দুই অপু তাহাকে সিনেমায় লইয়া গিয়াছে, ছবি কি করিয়া নড়ে অপর্ণা বুঝিতে পারে না, অবাক হইয়া দেখে, গল্পটাও ভাল বুঝিতে পারে না। বাড়ি আসিয়া অপু বুঝাইয়া বলে।

চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়া অপু বলিল—এবার তো তোমায় নিয়ে যেতে লিখেছেন শ্বশুরমশায়, কিন্তু অফিসের ছুটির যা গতিক—রাম এসে কেন নিয়ে যাক্ না? তারপর আমি কার্ত্তিক মাসের দিকে না হয় দু-চারদিনের জন্যে যাব? তা ছাড়া যদি যেতেই হয় তবে এ সময় যত সকালে যেতে পারা যায়—এ সময়টা বাপ-মায়ের কাছে থাকা ভাল ভেবে দেখলাম।

অপর্ণা লজ্জারক্তমুখে বলিল—রাম ছেলেমানুষ, ও কি নিয়ে যেতে পারবে? তা ছাড়া মা তোমায় কতদিন দেখেন নি, দেখ্‌তে চেয়েছেন।

—তা বেশ চলো, আমিই যাই। রামের হাতে ছেড়ে দিতে ভরসা হয় না, এ অবস্থায় একটু সাবধানে ওঠা-নামা করতে হবে কিনা। দাও তো ছাতাটা, ছেলে পড়িয়ে আসি। যাওয়া হয় তো চলো কালই যাই।—হ্যাঁ একটা সিগারেট দাও না?

—আবার সিগারেট! আটটা সিগারেট সকাল থেকে খেয়েছো—আর পাবে না—আবার পড়িয়ে এলে একটা পাবে।

—দাও দাও লক্ষ্মীটি—রাতে আর চাইব না—দাও একটি।

অপর্ণা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া হাসিমুখে বলিল—আবার রাত্রে তুমি কি ছাড়বে আর একটা না নিয়ে? তেমন ছেলে তুমি কিনা!···

বেশী সিগারেট খায় বলিয়া অপু সিগারেটের টিন অপর্ণার জিম্মায় রাখিবার প্রস্তাব

করিয়াছিল। অপর্ণার কড়াকড়ি বন্দোবস্ত সব সময় খাটে না, অপু বরাদ্দ অনুযায়ী সিগারেট নিঃশেষ করিবার পর আরও চায়, পীড়াপীড়ি করে, অপর্ণাকে শেষকালে দিতেই হয়। তবে ঘরে সিগারেট না মিলিলে বাহিরে গিয়া সে পারতপক্ষে কেনে না—অপর্ণাকে প্রবঞ্চনা করিতে মনে বড় বাধে—কিন্তু সবদিন নয়, ছুটি-ছাটার দিন বাড়িতে প্রাপ্য আদায় করিয়াও আরও দু-এক বাক্স কেনে, যদিও সে কথা অপর্ণাকে জানায় না।

ছেলে পড়াইয়া আসিয়া অপু দেখিল উপরের রুগ্‌ণ ভদ্রলোকটির ছোট মেয়ে পিন্টু তাহাদের ঘরের এককোণে ভীত, পাংশু মুখে বসিয়া আছে। বাড়িসুদ্ধ হৈ-চৈ! অপর্ণা বলিল, ওগো এই পিন্টু গাঙ্গুলীদের ছোট খুকীকে নিয়ে গোলদীঘিতে বেড়াতে বেরিয়েছিল। ও-বুঝি চীনেবাদাম খেয়ে কলে জল খেতে গিয়েছে, আর ফিরে এসে দ্যাখে খুকী নেই, তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ওর মা তো একেই জুজু হয়ে থাকে, আহা সে বেচারী তো নবমীর পাঁঠার মত কাঁপছে আর মাথা কুটছে। আমি পিন্টুকে এখানে লুকিয়ে রেখে দিয়েছি নইলে ওর মা ওকে আজ গুঁড়ো ক'রে দেবে। আর গাঙ্গুলী-গিন্নী যে কি কাণ্ড করছে, জানোই তো তাকে, তুমিও একটু দেখো না গো!

গাঙ্গুলী-গিন্নী মরাকান্নার আওয়াজ করিতেছেন, কানে গেল।—ওগো আমি দুধ দিয়ে কি কালসাপ পুষেছিলাম গো! আমার এ কি সর্বনাশ হ'ল গো মা, ওগো তাই আপদেরা বিদেয় হয় না আমার ঘাড় থেকে—এতদিনে মনোবাঞ্ছা—ইত্যাদি।

অপু তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল, বলিল—পিন্টু খেয়েছে কিছু?

—খাবে কি? ও কি ওতে আছে? গাঙ্গুলী-গিন্নী দাঁত পিষছে, আহা, ওর কোন দোষ নেই, ও কিছুতেই নিয়ে যাবে না, সেও ছাড়বে না, তাকে আগলে রাখা কি ওর কাজ!

সকলে মিলিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে খুকীকে কলুটোলা থানায় পাওয়া গেল। সে পথ হারাইয়া ঘুরিতেছিল, বাড়ির নম্বর, রাস্তার নাম বলিতে পারে না, একজন কনস্টেবল এ অবস্থায় তাহাকে পাইয়া থানায় লইয়া গিয়াছিল।

বাড়ি আসিলে অপর্ণা বলিল—পাওয়া গিয়েছে ভালই হ'ল, আহা বৌটাকে আর মেয়েটাকে কি ক'রেই গাঙ্গুলী-গিন্নী দাঁতে পিষছে গো! মানুষ মানুষকে এমনও বলতে পারে! কাল নাকি এখান থেকে বিদেয় হতে হবে—হুকুম হয়ে গিয়েছে।

অপু বলিল—কিছু দরকার নেই। কাল আমরা তো চলে যাচ্ছি, আমার তো আসতে এখনও চার-পাঁচ দিন দেরি। ততদিন ও'রা রুগী নিয়ে আমাদের ঘরে এসে থাকুন, আমি এলেও অসুবিধে হবে না, আমি না হয় এই পাশেই বরদাবাবুদের মেসে গিয়ে রাত্রে শোব। তুমি গিয়ে বলো বৌ-ঠাকরুণকে। আমি বুঝি অপর্ণা! আমার মা আমার বাবাকে নিয়ে কাশীতে আমার ছেলেবেলায় ওই রকম বিপদে পড়েছিল—তোমাকে সে সব কথা কখনও বলি নি, অপর্ণা। বাবা মারা গেলেন, হাতে একটা সিকি-পয়সা নেই আমাদের, সেখানকার দু'একজন লোক কিছু কিছু সাহায্য করলে, হবিষ্যির খরচ জোটে না—মা-তে আমাতে রাত্রে শুধু অড়রের ডাল ভিজে খেয়ে কাটিয়েছি। আমি তখন ছেলেমানুষ, বছর দশেক মোটে বয়েস—গরীব হওয়ার কষ্ট যে কি, তা আমার বুঝতে বাকী নেই—কাল সকালেই ও'রা এখানে আসুন।

অপর্ণা যাইবার সময় পিন্টুর-মা খুব কাঁদিল। এ বাড়িতে বিপদে-আপদে অপর্ণা যথেষ্ট করিয়াছে। রোগীর সেবা করিয়া ছেলেমেয়েকে দেখিতে সময় পাইত না, তাহাদের চুল বাঁধা, টিপ পরানো, খাবার খাওয়ানো, সব নিজের ঘরে ডাকিয়া আনিয়া অপর্ণা করিত। পিন্টু তো মাসীমা বলিতে অজ্ঞান, সকলের কান্না থামে তো পিন্টুকে আর থামানো যায় না। বউয়ের বয়স অপর্ণার চেয়ে অনেক বেশী। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, চিঠি দিও ভাই,

দুটো দু-ঠাঁই ভালয় ভালয় হয়ে গেলে আমি মায়ের পুজো দেবো।

ঘরের চাবি পিণ্টুর মায়ের কাছে রহিল।

রেলে ও স্টীমারে অনেকদিন পর চড়া। দুজনেই হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। দুজনেই খুব খুশী। অপর্ণাও পল্লীগ্রামের মেয়ে, শহর তাহার ভাল লাগে না। এতটুকু ঘরে কোনদিন থাকে নাই, সকাল ও সন্ধ্যাবেলা যখন সব বাসাড়ে মিলিয়া একসঙ্গে কয়লার উনুনে আগুন দিত, ধোঁয়ায় অপর্ণার নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিত, চোখ জ্বালা করিত, সে কি ভীষণ যন্ত্রণা! সে নদীর ধারের মুক্ত আলো-বাতাসে প্রকাণ্ড বাড়িতে মানুষ হইয়াছে। এসব কষ্ট জীবনে এই প্রথম—এক একদিন তাহার তো কান্না পাইত। কিন্তু এই দুই বৎসরে সে নিজের সুখ-সুবিধার কথা বড় একটা ভাবে নাই। অপুর উপর তাহার একটা অদ্ভুত স্নেহ গড়িয়া উঠিয়াছে, ছেলের উপর মায়ের স্নেহের মত। অপুর কৌতুকপ্রিয়তা, ছেলেমানুষি, খেয়াল, সংসার-অনভিজ্ঞতা, হাসি-খুশি, এসব অপর্ণার মাতৃত্বকে অদ্ভুতভাবে জাগাইয়া তুলিয়াছে। তাহার উপর স্বামীর দুঃখময় জীবনের কথা, ছাত্রাবস্থায় দারিদ্র্য ও অনাহারের সঙ্গে সংগ্রাম—সে সব শুনিয়াছে। সে-সব কথা অপু বলে নাই, সে-সব বলিয়াছে প্রণব। বরং অপু নিজের অবস্থা অনেক বাড়াইয়া বলিয়াছিল—নিশ্চিন্দিপুরের নদীর ধারের পৈতৃক বৃহৎ দোতলা বাড়িটার কথাটা আরও দু-একবার না তুলিয়াছিল এমন নহে—নিজে কলেজ হোস্টেলে ছিল এ কথাও বলিয়াছে। বুদ্ধিমতী অপর্ণার স্বামীকে চিনিতে বাকী নাই। কিন্তু স্বামীর কথা সে যে সর্বৈব মিথ্যা বলিয়া বুঝিয়াছে এ ভাব একদিনও দেখায় নাই। বরং সস্নেহে বলে—দ্যাখো, তোমাদের দেশের বাড়িটাতে যাবে যাবে বললে, একদিনও তো গেলে না—ভাল বাড়িখানা,—পুলুদার মুখে শুনেছি, জমিজমাও বেশ আছে—একদিন গিয়ে বরং সব দেখে-শুনে এসো। না দেখলে কি ও-সব থাকে?···

অপু আমতা আমতা করিয়া বলে—তা যেতামই তো কিন্তু বড় ম্যালেরিয়া। তাতেই তো সব ছাড়লাম কিনা? নৈলে আজ অভাব কি?···

কিন্তু অসতর্ক মুহূর্তে দু-একটা বেফাঁস কথা মাঝে মাঝে বলিয়াও ফেলে, ভুলিয়া যায় আগে কি বলিয়াছিল কোন্ সময়। অপর্ণা কখনও দেখায় নাই যে, এ সব কথার অসামঞ্জস্য সে বুঝিতে পারিয়াছে। না খাইয়া যে কষ্ট পায় অপর্ণার এ কথা জানা ছিল না। সচ্ছল ঘরের আদরে লালিতা মেয়ে, দুঃখ-কষ্টের সন্ধান সে জানে না। মনে মনে ভাবে, এখন হইতে স্বামীকে সে সুখে রাখিবে।

এটা একটা নেশার মত তাহাকে পাইয়াছে। অল্পদিনেই সে আবিষ্কার করিয়া ফেলিল, অপু কি কি খাইতে ভালবাসে। তালের ফুলুরি সে করিতে জানিত না, কিন্তু অপু খাইতে ভালবাসে বলিয়া মনসাপোতায় নিরুপমার কাছে শিখিয়া লইয়াছিল।

এখানে সে কতদিন অপুকে কিছু না জানাইয়া বাজার হইতে তাল আনাইয়াছে, সব উপকরণ আনাইয়াছে। অপু হয়তো বর্ষার জলে ভিজিয়া অফিস হইতে বাসায় ফিরিয়া হাসিমুখে বলিত—কোথায় গেলে অপর্ণা? এত সকালে রান্নাঘরে কি, দেখি? পরে উঁকি দিয়া দেখিয়া বলিত, তালের বড়া ভাজা হচ্ছে বুঝি! তুমি জানলে কি ক'রে—বা রে!···

অপর্ণা উঠিয়া স্বামীর শুকনো কাপড়ের ব্যবস্থা করিয়া দিত, বলিত, এসো না, ওখানেই ব'সে খাবে, গরম গরম ভেজে দি—। অপুর বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিত। ঠিক এই ভাবেরই কথা বলিত মা। অপুর অদ্ভুত মনে হয়, মায়ের মত স্নেহশীলা, সেবাপরায়ণা, সেইরকম অন্তর্যামিনী। বার্দ্ধক্যের কর্ম্মক্লান্ত মা যেন ইহারই নবীন হাতে সকল ভার সঁপিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে। মেয়েদের দেখিবার চোখ তাহার নতুন করিয়া ফোটে, প্রত্যেককে দেখিয়া

মনে হয়, এ কাহারও মা, কাহারও স্ত্রী, কাহারও বোন। জীবনে এই তিনরূপেই সে নারীকে পাইয়াছে, তাহাদের মঙ্গল হস্তের পরিবেষণে এই ছাব্বিশ বৎসরের জীবন পুষ্ট হইয়াছে, তাহাদের কি চিনিতে বাকী আছে তাহার?

স্টীমার ছাড়িয়া দুজনে নৌকায় চড়িল। অপর্ণার খুড়তুতো ভাই মুরারি উহাদের নামাইয়া লইতে আসিয়াছিল, সে-ও গল্প করিতে করিতে চলিল। অপর্ণা ঘোমটা দিয়া একপাশে সরিয়া বসিয়াছিল। হেমন্ত-অপরাহ্ণের স্নিগ্ধ ছায়া নদীর বুকে নামিয়াছে, বাঁ দিকের তীরে সারি সারি গ্রাম, একখানা বড় হাঁড়ি-কলসী বোঝাই ভড় যশাইকাটির ঘাটে বাঁধা।

অপুর মনে একটা মুক্তির আনন্দ—আর মনেও হয় না যে জগতে শীলেদের অফিসের মত ভয়ানক স্থান আছে। তাহার সহজ আনন্দ-প্রবণ মন আবার নাচিয়া উঠিল, চারিধারের এই শ্যামলতা, প্রসার, নদীজলের গন্ধের সঙ্গে তাহার যে নাড়ীর যোগ আছে।

কৌতুক দেখিবার জন্য অপর্ণাকে লক্ষ্য করিয়া হাসিমুখে বলিল—ওগো কলাবৌ, ঘোমটা খোলো, চেয়ে দ্যাখো, বাপের বাড়ির দ্যাশ্‌টো চেয়ে দ্যাখো গো—

মুরারি হাসিমুখে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল। অপর্ণা লজ্জায় আরও জড়সড় হইয়া বসিল। আরও খানিকটা আসিয়া মুরারি বলিল—তোমরা যাও, এইখানেই হাটে যদি বড় মাছ পাওয়া যায়, জ্যাঠাইমা কিনতে বলে দিয়েছেন। এইটুকু হেঁটে যাব এখন।

মুরারি নামিয়া গেলে অপর্ণা বলিল—আচ্ছা, তুমি কি? দাদার সামনে ওইরকম ক'রে আমায়—তোমার সেই দুষ্টুমি এখনও গেল না? কি ভাবলে বল তো দাদা—ছিঃ! পরে রাগের সুরে বলিল—দুষ্টু কোথাকার, তোমার সঙ্গে আমি আর কোথাও কখ্‌খনো যাবো না —কখ্‌খনো না, থেকো একলা বাসায়।

—বয়েই গেল! আমি তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে সেধেছিলুম কিনা? আমি নিজে মজা ক'রে রেঁধে খাব।

—তাই খেও। আহা হা, কি রান্নার ছাঁদ, তবু যদি আমি না জানতাম! আলু ভাতে, বেগুন ভাতে, সাত রকম তরকারী সব ভাতে—কি রাঁধুনী!

—নিজের দিকে চেয়ে কথা বলো। প্রথম যেদিন খুলনার ঘাটে রেঁধেছিলে, মনে আছে —সব আলুনি?

—ওমা মা আমার কি হবে! এত বড় মিথ্যেবাদী তুমি, সব আলুনি! ওমা আমি কোথায়—

—সব। বিলকুল। মায় পটলভাজা পর্য্যন্ত।

অপর্ণা রাগ করিতে গিয়া হাসিয়া ফেলিল, বলিল—তুমি ভাঙন মাছ খাও নি? আমাদের এ নোনা গাঙের ভাঙন মাছ ভারী মিষ্টি। কাল মাকে বলে তোমায় খাওয়াব।

—লজ্জা করবে না তার বেলায়? কি বলবে মাকে—ও মা, এই আমার—

অপর্ণা স্বামীর মুখে হাত চাপা দিয়া বলিল—চুপ।

ঠিক সন্ধ্যার সময় অপর্ণাদের ঘাটে নৌকা লাগিল। দুজনেরই মনে এক অপূর্ব্ব ভাব। শটিবনের সুগন্ধভরা স্নিগ্ধ হেমন্ত-অপরাহ্ণ তার সবটা কারণ নয়, নদীতীরে ঝুপ্‌সি হইয়া থাকা গোলগাছের সবুজ সারিও নয়, কারণ—তাহাদের আনন্দ-প্রবণ অনাবিল যৌবন—ব্যগ্র, নবীন, আগ্রহভরা যৌবন।

জ্যোৎস্নারাত্রে উপরের ঘরে ফুলশয্যার সেই পালঙ্কে বাতি জ্বালিয়া বসিয়া পড়িতে পড়িতে সে অপর্ণার প্রতীক্ষায় থাকে। নারিকেলশাখায় দেবীপক্ষের বকের পালকের মত শুভ্র চাঁদের আলো পড়ে, বাহিরের রাত্রির দিকে চাহিয়া কত কথা মনে আসে, কত সব

পুরাতন স্মৃতি—কোথায় যেন এই ধরণের সব পুরানো দিনের কত জ্যোৎস্না ঝরা রাত। এ যেন সব আরব্য-উপন্যাসের কাহিনী, সে ছিল কোন্‌ কুঁড়েঘরে, পেট পুরিয়া সব দিন খাইতেও পাইত না—সে আজ এত বড় প্রাচীন জমিদার ঘরের জামাই, অথচ আশ্চর্য এই যে, এইটাই মনে হইতেছে সত্য। পুরানো দিনের জীবনটা অবাস্তব, অস্পষ্ট, ধোঁয়া ধোঁয়া মনে হয়।

হেমন্তের রাত্রি। ঠাণ্ডা বেশ। কেমন একটা গন্ধ বাতাসে, অপুর মনে হয় কুয়াসার গন্ধ। অনেক রাত্রে অপর্ণা আসে। অপু বলে—এত রাত যে! আমি কতক্ষণ জেগে বসে থাকি!

অপর্ণা হাসে। বলে—নিচে কাকাবাবুর শোবার ঘর। আমি সিঁড়ি দিয়ে এলে পায়ের শব্দ ওঁর কানে যায়—এই জন্য উনি ঘরে খিল না দিলে আসতে পারি নে। ভারী লজ্জা করে।

অপু জানালার খড়খড়িটা সশব্দে বন্ধ করিয়া দিল। অপর্ণা লাজুক মুখে বলিল—এই শুরু হ'ল বুঝি দুষ্টুমি? তুমি কী!—কাকাবাবু এখনো ঘুমোন নি যে!

অপু আবার খটাস করিয়া খড়খড়ি খুলিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চসুরে বলিল—অপর্ণা, এক গ্লাস জল আনতে ভুলে গেলে যে!…ও অপর্ণা—অপর্ণা?…

অপর্ণা লজ্জায় বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজড়াইয়া পড়িয়া রহিল।

ভোর রাত্রেও দুজনে গল্প করিতেছিল।

সকালের আলো ফুটিল। অপর্ণা বলিল—তোমার ক'টায় স্টীমার?…সারারাত তো নিজেও ঘুমুলে না, আমাকেও ঘুমুতে দিলে না—এখন খানিকটা ঘুমিয়ে থাকো—আমি অনাদিকে পাঠিয়ে তুলে দেব'খন বেলা হলে। গিয়েই চিঠি দিও কিন্তু। জানলার পর্দাগুলো ধোপার বাড়ি দিও—আমি না গেলে আর সাবান কে দেবে? সস্নেহে স্বামীর গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল—কি রকম রোগা হয়ে গিয়েছ—এখন তোমাকে কাছছাড়া করতে ইচ্ছে করে না—কলকাতায় না মেলে দুধ, না মেলে কিছু। এখানে এসময় কিছুদিন থাকলে শরীরটা সারত। রোজ অফিস থেকে এসে মোহনভোগ খেও—পিণ্টুর মাকে বলে এসেছি—সে-ই ক'রে দেবে। এখন তো খরচ কমল? বেশী ছেলে পড়ানোতে কাজ নেই। যাই তাহলে?

অপু বলিল—ব'সো, ব'সো—এখনও কোথায় তেমন ফর্সা হয়েছে?—কাকার উঠতে এখনও দেরি!

অপর্ণা বলিল—হ্যাঁ, আর একটা কথা—দ্যাখো, মনসাপোতার ঘরটা এবার খুঁটি দিয়ে রেখো। নইলে বর্ষার দিকে বড্ড খরচ পড়ে যাবে, কলকাতার বাসায় তো চিরদিন চলবে না—ওই হ'ল আপন ঘরদোর। এবার মনসাপোতায় ফিরব, বাস না করলে খড়ের ঘর টেঁকে না। যাই এবার, কাকা এবার উঠবেন। যাই?

অপর্ণা চলিয়া গেলে অপুর মন খুঁত খুঁত করিতে লাগিল। এখনও বাড়ির কেহই উঠে নাই—কেন সে অপর্ণাকে ছাড়িয়া দিল? কেন বলিল—যাও! তাহার সম্মতি না পাইলে অপর্ণা কখনই যাইত না।

কিন্তু অপর্ণা আর একবার আসিয়াছিল ঘণ্টাখানেক পরে, চা দেওয়া হইবে কিনা জিজ্ঞাসা করিতে—অপু তখন ঘুমাইতেছে। খোলা জানালা দিয়া মুখে রৌদ্র লাগিতেছে। অপর্ণা সন্তর্পণে জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল। ঘুমন্ত অবস্থায় স্বামীকে এমন দেখায়! এমন একটা মায়া হয় ওর ওপরে! সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় ভাবিল, মা সত্যিই বলে বটে, পটের মুখ—পটে আঁকা ঠাকুর দেবতার মত মুখ—

চলিয়া আসিবার সময়ে কিন্তু অপর্ণার সঙ্গে দেখা হইল না। অপুর আগ্রহ ছিল, কিন্তু আত্মীয় কুটুম্ব পরিজনে বাড়ি সরগরম—কাহাকে যে বলে অপর্ণাকে একবার ডাকিয়া দিতে? মুখচোরা অপু ইচ্ছাটা কাহাকেও জানাইতে পারিল না। নৌকায় উঠিয়া মুরারির ছোট ভাই বিশু বলিল—আসবার সময় দিদির সঙ্গে দেখা ক'রে এলেন না কেন, জামাইবাবু? দিদি সিঁড়ির ঘরে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল, আপনি যখন চলে আসেন—

কিন্তু নৌকা তখন জোর ভাঁটার টানে যশাইকাটির বাঁকের প্রায় কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

এবার কলিকাতায় আসিয়া অনেকদিন পরে দেওয়ানপুরের বাল্যবন্ধু দেবব্রতের সঙ্গে দেখা হইল। সে আমেরিকা যাইতেছে। পরস্পরের দেখা-সাক্ষাৎ না হওয়ায় কেহ কাহারও ঠিকানা জানিত না। অথচ দেবব্রত এখানেই কলেজে পড়িতেছিল, এবার বি. এস-সি. পাস করিয়াছে।…অপুর কাছে ব্যাপারটা আশ্চর্য ঠেকিল, আনন্দ হইল, হিংসাও হইল। প্রতি শনিবারে বাড়ি না যাইয়া যে থাকিতে পারিত না, সেই ঘর-পাগল দেবব্রত আমেরিকা চলিয়া যাইতেছে!

মাস দুই-তিন বড় কষ্টে কাটিল। আজ এক বছরের অভ্যাস--অফিস হইতে বাসায় ফিরিয়া অপর্ণার হাসিভরা মুখ দেখিয়া কর্মক্লান্ত মন শান্ত হইত। আজকাল এমন কষ্ট হয়! বাসায় না ফিরিয়াই সোজা ছেলে পড়াইতে যায় আজকাল, বাসায় মন লাগে না, খালি খালি ঠেকে।

লীলারা কেহ এখানে নাই। বর্ধমানের বিষয় লইয়া কি সব মামলা মকদ্দমা চলিতেছে, অনেকদিন হইতে তাহারা সেখানে।

একদিন রবিবারে সে বেলুড় মঠ বেড়াইয়া আসিয়া অপর্ণাকে এক লম্বা চিঠি দিল, ভারী ভাল লাগিয়াছে জায়গাটা, অপর্ণা এখানে আসিলে একদিন বেড়াইয়া আসিবে। এসব পত্রের উত্তর অপর্ণা খুব শীঘ্রই দেয়, কিন্তু পত্রখানার কোন জবাব আসিল না—দু'দিন, চারদিন, সাতদিন হইয়া গেল। তাহার মন অস্থির হইয়া উঠিল—কি ব্যাপার? অপর্ণা হয়ত নাই, সে মারা গিয়াছে—ঠিক তাই। রাত্রে নানা রকম স্বপ্ন দেখে—অপর্ণা ছলছল চোখে বলিতেছে—তোমায় তো বলেছিলাম আমি বেশিদিন বাঁচব না, মনে নেই? সেই মনসাপোতায় একদিন রাত্রে?—আমার মনে কে বলত। যাই—আবার আর জন্মে দেখা হবে।

পরদিন পড়িবে শনিবার। সে অফিসে গেল না, চাকুরির মায়া না করিয়াই সুটকেস গুছাইয়া বাহির হইয়া যাইতেছে এমন সময় শ্বশুরবাড়ির পত্র পাইল। সকলেই ভাল আছে। যাক্—বাঁচা গেল! উঃ, কি ভয়ানক দুর্ভাবনার মধ্যে ফেলিয়াছিল উহারা! অপর্ণার উপর একটু অভিমানও হইল। কি কাণ্ড, মন ভাল না থাকিলে এমন সব অদ্ভুত কথাও মনে আসে। কয়দিন সে ক্রমাগত ভাবিয়াছে, 'ওগো মাঝি তরী হেথা' গানটা কলিকাতায় আজকাল সবাই গায়। কিন্তু গানটার বর্ণনার সঙ্গে তার শ্বশুরবাড়ির এত হুবহু মিল হয় কি করিয়া? গানটা কি তাহার বেলায় খাটিয়া যাইবে?

শনিবার অফিস হইতে ফিরিয়া দেখিল, মুরারি তাহার বাসায় বার-বারান্দায় চেয়ারখানাতে বসিয়া আছে। শ্যালককে দেখিয়া অপু খুব খুশী হইল—হাসিমুখে বলিল, এ কি, বাস্‌রে! সাক্ষাৎ বড়কুটুম যে। কার মুখ দেখে না জানি যে আজ সকালে—

মুরারি খামে-আঁটা একখানা চিঠি তাহার হাতে দিল—কোন কথা বলিল না। অপু পত্রখানা হাত বাড়াইয়া লইতে গিয়া দেখিল, মুরারির মুখ কেমন হইয়া গিয়াছে। সে যেন চোখের জল চাপিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে।

অপুর বুকের ভিতরটা হঠাৎ যেন হিম হইয়া গেল। কেমন করিয়া আপনা-আপনি তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল—অপর্ণা নেই ?

—মুরারি নিজেকে আর সামলাইতে পারিল না।

—কি হয়েছিল ?

—কাল সকালে আটটার সময় প্রসব হ'ল—সাড়ে ন'টার সময়—

—জ্ঞান ছিল ?

—আগাগোড়া। ছোট কাকীমার কাছে চুপি চুপি নাকি বলেছিল ছেলে হওয়ার কথা তোমাকে তার ক'রে জানাতে। তখন ভালই ছিল। হঠাৎ ন'টার পর থেকে—

ইহার পর অপু অনেক সময় ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইত—সে তখন স্বাভাবিক সুরে অতগুলি প্রশ্ন একসঙ্গে করিয়াছিল কি করিয়া! মুরারি বাড়ি ফিরিয়া গল্প করিয়াছিল—অপূর্ব্বকে কি ক'রে খবরটা শোনাব, সারা রেল স্টীমারে শুধু তাই ভেবেছিলাম—কিন্তু সেখানে গিয়ে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম, আমায় বলতে হ'ল না—ওই খবর টেনে বার করলে।

মুরারি চলিয়া গেলে সন্ধ্যার দিকে একবার অপুর মনে হইল, নবজাত পুত্রটি বাঁচিয়া আছে, না নাই ? সে কথা তো মুরারিকে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই বা সে-ও কিছু বলে নাই। কে জানে, হয়ত নাই।

কথাটা ক্রমে বাসার সকলেই শুনিল। পরদিন যথারীতি অফিসে গিয়াছিল, অফিস হইতে ফিরিয়া হাতমুখ ধুইতেছে, উপরের ভাড়াটে বন্ধু সেন মহাশয় অপুদের ঘরের বারান্দাতে উঠিলেন। অপু বলিল—এই যে সেন মহাশয়, আসুন, আসুন।

সেন মহাশয় জিহ্বা ও তালুর সাহায্যে একটা দুঃখসূচক শব্দ উচ্চারণ করিয়া টুলখানা টানিয়া লইয়া হতাশভাবে বসিয়া পড়িলেন।

—আহা-হা, রূপে সরস্বতী গুণে লক্ষ্মী। কলের কাছে সেদিন মা আমার সাবান নিয়ে কাপড় ধুচ্ছেন, আমি সকাল সকাল স্নান করব বলে ওপরের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি। বললাম—কে, বৌমা ? তা মা আমার একটু হাসলেন—বলি তা থাক, মায়ের কাপড় কাচা হয়ে যাক্। স্নানটা না হয় ন'টার পরেই করা যাবে এখন—একদিন ইলিশ মাছের দইমাছ রেঁধেছেন, অমনি তা বাটি ক'রে ওপরে পাঠিয়ে দিয়েছেন—আহা কি নরম কথা, কি লক্ষ্মীশ্রী—সবই শ্রীহরির ইচ্ছে! সবই তাঁর—

তিনি উঠিয়া যাইবার পর আসিলেন গাঙ্গুলী-গৃহিণী। বয়সে প্রবীণা হইলেও ইনি কখনও অপুর সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে কথাবার্ত্তা বলেন নাই। আধঘোমটা দিয়া ইনি দোরের আড়াল হইতে বলিতে লাগিলেন—আহা, জলজ্যান্ত বৌটা, এমন হবে তা কখনও জানি নি, ভাবি নি—কাল আমার বড় ছেলে নবীন বলছে রাত্তিরে, যে, মা শুনেছ এইরকম, অপূর্ব্ব-বাবুর স্ত্রী মারা গিয়েছেন এই মাত্তর খবর এল—তা বাবা আমি বিশ্বাস করি নি। আজ সকালে আবার বাটুল বললে—তা বলি, যাই জেনে আসি—আসব কি বাবা, দুই ছেলের আপিসের ভাত, বাটুলের আজকাল আবার দমদমার গুলির কারখানার কাজ, দুটো নাকে-মুখে গুঁজেই দৌড়োয়, এখন আড়াই টাকা হপ্তা, সাহেব বলেছে বোশেখ মাস থেকে দেড় টাকা বাড়িয়ে দেবে। ওই এক ছেলে রেখে ওর মা মারা যায়, সেই থেকে আমারই কাছে—আহা তা ভেবো না বাবা—সবারই ও কষ্ট আছে,—তুমি পুরুষ মানুষ তোমার ভাবনা কি বাবা ? বলে—

বজায় থাকুক্ চূড়ো-বাঁশী
মিলবে কত সেবাদাসী—

—একটা ছেড়ে দশটা বিয়ে কর না কেন ?—তোমার বয়েসটাই বা কি এমন—

অপু ভাবিল—এরা লোক ভাল তাই এসে এসে বলছে। কিন্তু আমায় কেন একটু একা থাকতে দেয় না? কেউ না আসে ঘরে সেই আমার ভাল। এরা কি বুঝবে?

সন্ধ্যা হইয়া গেল। বারান্দায় যে কোণে ফুলের টব সাজানো, দু-একটা মশা সেখানে বিন্‌ বিন্‌ করিতেছে। অন্যদিন সে সেই সময়ে আলো জ্বালে, স্টোভ জ্বালিয়া চা ও হালুয়া করে, আজ অন্ধকারের মধ্যে বারান্দার চেয়ারখানাতে বসিয়াই রহিল…একমনে সে কি একটা ভাবিতেছিল…গভীরভাবে ভাবিতেছিল।

ঘরের মধ্যে দেশলাই জ্বালার শব্দে সে চমকিয়া উঠিল। বুকের ভিতরটা যেন কেমন করিয়া উঠিল—মুহূর্তের জন্য মনে হইল যেন অপর্ণা আছে। এখানে থাকিলে এই সময় সে স্টোভ ধরাইত, সন্ধ্যা দিত। ডাকিয়া বলিল—কে?

পিণ্টু আসিয়া বলিল—ও কাকাবাবু—মা আপনাদের কেরোসিনের তেলের বোতলটা কোথায় জিজ্ঞেস করলে—

অপু বিস্ময়ের সুরে বলিল—ঘরে কে রে, পিণ্টু? তোর মা? ও! বৌ-ঠাকরুণ?—বলিতে বলিতে সে উঠিয়া দেখিল পিণ্টুর মা ঘরের মেঝেতে স্টোভ মুছিতেছে।

—বৌ-ঠাকরুণ, তা আপনি আবার কষ্ট ক'রে কেন মিথ্যে—আমি বরং ওটা—

তেলের বোতলটা দিয়া সে আবার আসিয়া বারান্দাতে বসিল। পিণ্টুর মা স্টোভ জ্বালিয়া চা ও খাবার তৈরী করিয়া পিণ্টুর হাতে পাঠাইয়া দিল ও রাত্রি নয়টার পর নিজের ঘর হইতে ভাত বাড়িয়া আনিয়া অপুদের ঘরের মেজেতে খাইবার ঠাঁই করিয়া ভাতের থালা ঢাকা দিয়া রাখিয়া গেল।

পিণ্টুর বাবা সারিয়া উঠিয়াছেন, তবে এখন বড় দুর্বল, লাঠি ধরিয়া সকালে বিকালে একটু-আধটু গোলদীঘিতে বেড়াইতে যান, নিচের একঘর ভাড়াটে উঠিয়া যাওয়াতে সেই ঘরেই আজকাল ইঁহারা থাকেন। ডাক্তার বলিয়াছে, আর মাসখানেকের মধ্যে দেশে ফেরা চলিবে। পরদিন সকালেও পিণ্টুর মা ভাত দিয়া গেল। বৈকালে অফিস হইতে আসিয়া কাপড় জামা না ছাড়িয়াই বাহিরে বারান্দাতে বসিয়াছে। বউটি স্টোভ ধরাইতে আসিল।

অপু উঠিয়া গিয়া বলিল—রোজ রোজ আপনাকে এ কষ্ট করতে হবে না, বৌদি। আমি এই গোলদীঘির ধারের দোকান থেকে খেয়ে আসব চা।

বউটি বলিল—আপনি অত কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন ঠাকুরপো, আমার আর কি কষ্ট? টুলটা নিয়ে এসে এখানে বসুন, দেখুন চা তৈরী করি।

এই প্রথম পিণ্টুর মা তাহার সহিত কথা কহিল। পিণ্টু বলিল—কাকাবাবু, আমাকে গোলদীঘিতে বেড়াতে নিয়ে যাবে—একটা ফুলের চারা তুলে আন্‌ব, এনে পুঁতে দেব।

বউটির বয়স ত্রিশের মধ্যে—পাত্‌লা একহারা গড়ন, শ্যামবর্ণ, মাঝামাঝি দেখিতে, খুব ভালও নয়, মন্দও নয়। অপু টুলটা দুয়ারের কাছে টানিয়া বসিল। বউটি চায়ের জল নামাইয়া বলিল—এক কাজ করি ঠাকুরপো, একেবারে চাট্টি ময়দা মেখে আপনাকে খানকতক লুচি ভেজে দি—ক'খানাই বা খান—একেবারে রাতের খাবারটা এই সঙ্গেই খাইয়ে দি—সারাদিনে ক্ষিদেও তো পেয়েছে।

মেয়েটির নিঃসংকোচ ব্যবহারে তাহার নিজের সংকোচ ক্রমে চলিয়া যাইতেছিল। সে বলিল—বেশ, করুন। মন্দ কি। ওরে পিণ্টু, ওই পেয়ালাটা নিয়ে আয়—

—থাক, থাক ঠাকুরপো, আমি ওকে আলাদা দিচ্ছি। কেট্‌লিতে এখনও চা আছে—আপনি খান। আপনাদের বেলুনটা কোথায় ঠাকুরপো?

—সত্যি আপনি বড্ড কষ্ট করছেন, বৌ-ঠাকরুণ—আপনাকে এত কষ্ট দেওয়াটা—

পিণ্টুর মা বলিল—আপনি বার বার ও রকম বলছেন কেন? আপনারা আমার যা

উপকার করেছেন, তা নিজের আত্মীয়ও করে না আজকাল। কে পরকে থাকবার জন্যে ঘর ছেড়ে দেয়?···কিন্তু আমার সে বলবার মুখ তো দিলেন না ভগবান, কি করি বলুন। আমি রুগী সামলে মেয়েকে যদি খাওয়াতে না পারি, তাই সে দুবেলা আপনি খেয়ে অফিসে গেলেই পিন্টুকে নিজে গিয়ে ডেকে এনে আপনার পাতে খাওয়াত। এক একদিন—

কথা শেষ না করিয়াই পিন্টুর মা হঠাৎ চুপ করিল। অপুর মনে হইল ইহার সঙ্গে অপর্ণার কথা কহিয়া সুখ আছে, এ বুঝিবে, অন্য কেহ বুঝিবে না।

সারাদিন অপু কাজকর্মে ভুলিয়া থাকিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে, যখনই একটু মনে আসে অমনি একটা কিছু কাজ দিয়া সেটাকে চাপা দেয়। আগে সে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হইয়া বসিয়া কি ভাবিত, খাতাপত্রে গল্প কবিতা লিখিত—কাজ ফাঁকি দিয়া অন্য বই পড়িত। কিন্তু অপর্ণার মৃত্যুর পর হইতে সে দশগুণ খাটিতে লাগিল, সকলের কাছে কাজের তাগাদা করিয়া বেড়ায়, সারাদিনের কাজ দু'ঘণ্টায় করিয়া ফেলে, তাহার লেখা চিঠি টাইপ করিতে করিতে নৃপেন বিরক্ত হইয়া উঠিল।

পূর্ণিমা তিথিটা অপর্ণা ছাদের আলিসার ধারে দাঁড়াইয়া, এই তো গত কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রিতে লক্ষ্মীর মত মহিমময়ী, কি সুন্দর ডাগর চোখ দুটি, কি সুন্দর মুখশ্রী। অপুর মনে হইয়াছিল, ওর ঘাড় ফেরাবার ভঙ্গিটা যেন রাণীর মত—এক এক সময় সম্ভ্রম আসে মনে। অপর্ণা হাসিয়া বলে—আমার যে লজ্জা করে, নইলে সকালে তোমার খাবার ক'রে দিতে ইচ্ছে করে, আমার ছোট বোন লুচি ভাজতে জানে না,—সেজ খুড়ীমা ছেলে সামলে সময় পান না—মা থাকেন ভাঁড়ারে, তোমার খাবার কষ্ট হয়—না? হঠাৎ অপুর মনে হয়—দূর ছাই—কি লিখে যাচ্ছি মিছে—কি হবে আর এসবে?···

কি বিরাট শূন্যতা—কি যেন এক বিরাট ক্ষতি হইয়া গিয়াছে, জীবনে আর কখনও তাহা পূর্ণ হইবার নহে—কখনও নয়, কাহারও দ্বারা না—সম্মুখে বৃক্ষ নাই, লতা নাই, ফুলফল নাই—শুধু এক রুক্ষ ধূসর বালুকাময় বহুবিস্তীর্ণ মরুভূমি।

মাসখানেক পরে পিন্টুর মা চোখের জলে ভাসিয়া বিদায় লইল। পিন্টুর বাবা বেশ সবল হইয়া উঠিয়াছেন, দুইজনেই আত্মীয়ের মত নানা সান্ত্বনার কথা বলিয়া গেল। পিন্টুর মা বলিল—কখনো ভাই দেখি নি, ঠাকুরপো। আপনাকে সেই ভাইয়ের মত পেলুম, কিন্তু করতে পারলাম না কিছু—দিদি বলে' যদি মাঝে মাঝে আমাদের ওখানে যান—তবে জানব সত্যিই আমি ভাই পেয়েছি।

অপু সংসারের বহু দ্রব্য পিন্টুদের জিনিসপত্রের সঙ্গে বাঁধিয়া দিল—ডালা, কুলো, ধামা, বঁটি, চাকী, বেলুন। পিন্টুর মা কিছুতেই সে সব লইতে রাজী নয়—অপু বলল, কি হবে বৌঠান, সংসার তো উঠে গেল, ওসব আর হবে কি, অন্য কাউকে বিলিয়ে দেওয়ার চেয়ে আপনারা নিয়ে যান, আমার মনে তৃপ্ত হবে তবুও।

মৃত্যুর পর কি হয় কেহই বলিতে পারে না? দু-একজনকে জিজ্ঞাসাও করিল—ওসব কথা ভাবিয়া তো তাহাদের ঘুম নাই। মেসে বরদাবাবুর উপর তাহার শ্রদ্ধা ছিল, তাঁহার কাছেও একদিন কথাটা পাড়িল। বরদাবাবু তাহাকে মামুলি সান্ত্বনার কথা বলিয়া কর্ত্তব্য সমাপন করিলেন। একদিন পল ও ভার্জিনিয়ার গল্প পড়িতে পড়িতে দেখিল মৃত্যুর পর ভার্জিনিয়া প্রণয়ী পলকে দেখা দিয়াছিল—হতাশ মন এইটুকু সূত্রকেই ব্যগ্র আগ্রহে আঁকড়াইয়া ধরিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তবুও তো এতটুকু আলো! সে অফিসে, মেসে, বাসায় যে সব লোকের সঙ্গে কারবার করে—তাহারা নিতান্ত মামুলি ধরণের সাংসারিক জীব—অপুর প্রশ্ন শুনিয়া তাহারা আড়ালে হাসে, চোখ টেপাটেপি করে—করুণার হাসি হাসে। এইটাই অপু বরদাস্ত করিতে পারে না আদৌ। একদিন একজন সন্ন্যাসীর সন্ধান

পাইয়া দরমাহাটার এক গলিতে তাঁহার কাছে সকালের দিকে গেল। লোকের খুব ভিড়, কেহ দর্শনপ্রার্থী, কেহ ঔষধ লইতে আসিয়াছে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর অপুর ডাক পড়িল। সন্ন্যাসী গেরুয়াধারী নহেন, সাদা ধুতি পরণে, গায়ে হাত-কাটা বেনিয়ান, জলচৌকির উপর আসন পাতিয়া বসিয়া আছেন। অপুর প্রশ্ন শুনিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন—আপনার স্ত্রী কতদিন মারা গেছেন? মাস দুই?—তার পুনর্জন্ম হয়ে গিয়েছে।—অপু অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি ক'রে আপনি—মানে—

সন্ন্যাসীজী বলিলেন—মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই হয়। এতদিন থাকে না—আপনাকে বলে দিচ্ছি, বিশ্বাস করতে হয় এসব কথা। ইংরিজি পড়ে আপনারা তো এ সব মানেন না। তাই হতে হবে।

অপুর একথা আদৌ বিশ্বাস হইল না। অপর্ণা, তাহার অপর্ণা, আর মাস আট-নয় পরে অন্য দেশে কোন গৃহস্থের ঘরে সব ভুলিয়া ছোট খুকী হইয়া জন্মিবে?…এত স্নেহ, এত প্রেম, এত মমতা—এসব ভুয়োবাজি? অসম্ভব!…সারারাত কিন্তু এই চিন্তায় সে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল—একবার ভাবে, হয়ত সন্ন্যাসী ঠিকই বলিয়াছেন—কিন্তু তার মন বলে, ও-কথাই নয়—মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা স্বয়ং পিতামহ ব্রহ্মা আসিয়া বলিলেও সে-কথা বিশ্বাস করিবে না। দুঃখের মধ্যে হাসিও পাইল।—ভাবিল অপর্ণার পুনর্জন্ম হয়ে গেছে, ওর কাছে টেলিগ্রাম এসেছে! হাম্‌বাগ কোথাকার—দ্যাখ না কাণ্ড!…

এত ভয়ানক সঙ্গীহীনতার ভাব গত দশ-এগারো মাস তাহার হয় নাই। পিণ্টুরা চলিয়া যাওয়ার পর বাসাও আর ভাল লাগে না, অপর্ণার সঙ্গে বাসাটা এতখানি জড়ানো যে, আর সেখানে থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল। তদুপরি বিপদ, গাঙ্গুলী-গিন্নী তাঁহার কোন বোনঝির সঙ্গে তাহার বিবাহের যোগাযোগের জন্য একেবারে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। তাহাকে একা একটু বসিতে দেখিলে সংসারের অসারত্ব, কথিত বোনঝিটির রূপগুণ, সম্মুখের মাঘ মাসে মেয়েটিকে একেবারে দেখিয়া আসিবার প্রস্তাব, নানা বাজে কথা।

নিজে রাঁধিয়া খাওয়ার ব্যবস্থা—অবশ্য ইতিপূর্বে সে বরাবরই রাঁধিয়া খাইয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু এবার যেন রাঁধিতে গিয়া কাহার উপর একটা সুতীব্র অভিমান। ঘরটাও বড় নির্জন, রাত্রিতে প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠে। পাষাণভারের মত দারুণ নির্জনতা সব সময় বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া থাকে। এমন কি, শুধু ঘর নয়, পথে-ঘাটে অফিসেও তাই—মনে হয় জগতে কেহ কোথাও আপনার নাই।

তাহার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কে কোথায় চলিয়া গিয়াছে ঠিকানা নাই—প্রণবও নাই এখানে। মুখের আলাপী দু'চারজন বন্ধু আছে বটে কিন্তু ও-সব বে-দরদী লোকের সঙ্গ ভাল লাগে না। রবিবার ও ছুটির দিনগুলি তো আর কাটেই না—অপুর মনে পড়ে বৎসরখানেক পূর্বেও শনিবারের প্রত্যাশায় সে-সব আগ্রহভরা দিন-গণনা—আর আজকাল? শনিবার যত নিকটে আসে তত ভয় বাড়ে।

বৌবাজারের এক গলির মধ্যে তাহার এক কলেজ-বন্ধুর পেটেণ্ট ঔষধের দোকান। অপর্ণার কথা ভুলিয়া থাকিবার জন্য সে মাঝে মাঝে সেখানে গিয়া বসে। এ রবিবার দিনটাও বেড়াইতে বেড়াইতে গেল। কারবারের অবস্থা খুব ভাল নয়। বন্ধুটি তাহাকে দেখিয়া বলিল—ও, তুমি?—আমার আজকাল হয়েছে ভাই—'কে আসিল বলে চমকিয়ে চাই, কাননে ডাকিলে পাখি'—সকাল থেকে হরদম পাওনাদার আসছে আর যাচ্ছে—আমি বলি বুঝি কোন পাওনাদার এল, ব'স ব'স।

অপু বসিয়া বলিল—কাবুলীর টাকাটা শোধ দিয়েছ?

—কোথা থেকে দেব দাদা? সে এলেই পালাই, নয় তো মিথ্যে কথা বলি। খবরের

কাগজে বিজ্ঞাপনের দেনার দরুন—ছোট আদালতে নালিশ করেছিল, পরশু এসে বাক্সপত্র আদালতের বেলিফ্ সীল ক'রে গিয়েছে। তোমার কাছে বলতে কি, এবেলার বাজারের খরচটা পর্যন্ত নেই—তার ওপর ভাই বাড়িতে সুখ নেই। আমি চাই একটু ঝগড়াঝাঁটি হোক, মান-অভিমান হোক—তা নয়, বৌটা হয়েছে এমন ভাল মানুষ সাত চড়ে রা নেই—

অপু হাসিয়া উঠিয়া বলিল— বল কি হে, সে তোমার ভাল লাগে না বুঝি ?···

—রামোঃ—পানসে লাগে, ঘোর পানসে। আমি চাই একটু দুষ্টু হবে, একগুঁয়ে হবে—স্মার্ট হবে—তা নয় এত ভাল মানুষ, যা বলছি তাই করছে—সংসারের এই কষ্ট, হয়তো একবেলা খাওয়াই হ'ল না—মুখে কথাটি নেই! কাপড় নেই—তাই সই, ডাইনে বললে তক্ষুণি ডাইনে, বাঁয়ে বললে বাঁয়ে—নাঃ, অসহ্য হয়ে পড়েছে। বৈচিত্র্য নেই রে ভাই। পাশের বাসার বৌটা সেদিন কেমন স্বামীর উপর রাগ ক'রে কাচের গ্লাস, হাতবাক্স দুমদাম্ করে আছাড় মেরে ভাঙলে, দেখে হিংসে হ'ল, ভাবলাম হায় রে, আমার কি কপাল! না, হাসি না—আমি তোমাকে সত্যি সত্যি প্রাণের কথা বলছি ভাই—এরকম পানসে ঘরকন্না আর আমার চলছে না—বিলিভ্ মি—অসম্ভব!···ভালমানুষ নিয়ে ধুয়ে খাব ?···একটা দুষ্টু মেয়ের সন্ধান দিতে পার ?···

—কেন, আবার বিয়ে করবে নাকি ?—একটাকে পার না খেতে দিতে—তোমার দেখছি সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়—

—না ভাই, এ সুখ আমার আর—জীবনটা এখন দেখছি একেবারে ব্যর্থ হ'ল, মনের কোনও সাধই মিটল না—এক এক সময় ভাবি ওর সঙ্গে আমার ঠিক মিলন হয় নি—মিলন যদি ঘটত তা হলে দ্বন্দ্বও হ'ত—বুঝলে না ?···কে, টেঁপি ?—এই আমার বড় মেয়ে—শোন, তোর মা'র কাছ থেকে দুটো পয়সা নিয়ে দু'পয়সার বেগুনি কিনে নিয়ে আয় তো আমাদের জন্যে, পার অমনি চায়ের কথা বলে দে—

—আচ্ছা মরণের পর মানুষ কোথায় যায় জান ? বলতে পার ?

—ও সব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাই নি কখনও। পাওনাদার কি ক'রে তাড়ানো যায় বলতে পার ? এখুনি কাবুলীওয়ালা একটা আসবে নেবুতলা থেকে। আঠার টাকা ধার নিয়েছি, চার আনা টাকা পিছু সুদ হপ্তায়। দু-হপ্তার সুদ বাকী, কি যে আজ তাকে বলি ?—স্কাউন্ড্রেলটা এল বলে—দিতে পার দুটো টাকা ভাই ?

—এখন তো নেই কাছে, একটা আছে, রেখে দাও। কাল সকালে আর একটা টাকা দিয়ে যাব এখন। এই যে টেঁপি, বেশ বেগুনি এনেছিস্—না না, আমি খাব না, তোমরা খাও, আচ্ছা এই—এই একখানা তুলে নিলাম, নিয়ে যা টেঁপি।

বন্ধুর দোকান হইতে বাহির হইয়া সে খানিকটা লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরিল। লীলা কি এখানে আছে ? একবার দেখিয়া আসিবে ? প্রায় এক বৎসর লীলারা এখানে নাই, তাহার দাদামহাশয় মামলা করিয়া লীলার পৈতৃক-সম্পত্তি কিছু উদ্ধার করিয়াছেন, আজকাল লীলা মায়ের সঙ্গে আবার বর্দ্ধমানের বাড়িতেই ফিরিয়া গিয়াছে। থার্ড ইয়ারে ভর্ত্তি হইয়া এক বৎসর পড়িয়াছিল—পরীক্ষা দেয় নাই, লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়াছে।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ভবানীপুরে লীলাদের ওখানে গেল। রামলগন বেয়ারা তাহাকে চেনে, বৈঠকখানায় বসাইল, মিঃ লাহিড়ী এখানে নাই, রাঁচি গিয়াছেন। লীলা দিদিমণি ? কেন, সে-কথা কিছু বাবুর জানা নাই ? দিদিমণির তো বিবাহ হইয়া গিয়াছে গত বৈশাখ মাসে। নাগপুরে জামাইবাবু বড় ইঞ্জিনিয়ার, বিলাতফেরত—একেবারে খাঁটি সাহেব, দেখিলে চিনিবার জো নাই। খুব বড়লোকের ছেলে—এদের সমান বড়লোক। কেন, বাবুর কাছে নিমন্ত্রণের চিঠি যায় নাই ?

অপু বিবর্ণমুখে বলিল—কই না, আমার কাছে, হ্যাঁ—না আর ব'সব না—আচ্ছা।

বাহিরে আসিয়া জগৎটা যেন অপুর কাছে একেবারে নির্জন, সঙ্গীহীন, বিস্বাদ ও বৈচিত্র্যহীন ঠেকিল। কেন এ রকম মনে হইতেছে তাহার? লীলা বিবাহ করিবে ইহার মধ্যে অসম্ভব তো কিছু নাই! সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তবে তাহার মন খারাপ করিবার কি আছে? ভালই তো। জামাই ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষিত, অবস্থাপন্ন—লীলার উপযুক্ত বর জুটিয়াছে, ভালই তো।

রাস্তা ছাড়িয়া ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সম্মুখের মাঠটাতে অর্ধ অন্ধকারের মধ্যে সে উদ্‌ভ্রান্তের মত অনেকক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইল।

লীলার বিবাহ হইয়াছে, খুবই আনন্দের কথা, ভাল কথা। ভালই তো।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কলিকাতা আর ভাল লাগে না, কিছুতেই না—এখানকার ধরাবাঁধা রুটিনমাফিক কাজ, বন্ধতা, একঘেয়েমি—এ যেন অপুর অসহ্য হইয়া উঠিল। তা ছাড়া একটা যুক্তিহীন ও ভিত্তিহীন অস্পষ্ট ধারণা তাহার মনের মধ্যে ক্রমেই গড়িয়া উঠিতেছিল—কলিকাতা ছাড়িলেই যেন সর্ব দুঃখ দূর হইবে—মনের শান্তি আবার ফিরিয়া পাওয়া যাইবে।

শীলেদের অফিসের কাজ ছাড়িয়া দিয়া অবশেষে সে চাঁপদানীর কাছে একটা গ্রাম্য স্কুলের মাস্টারি লইয়া গেল। জায়গাটা না-শহর, না-পাড়াগাঁ গোছের - চারিধারে পাটের কল ও কুলিবস্তি, টিনের চালাওয়ালা দোকানঘর ও বাজার, কয়লার গুঁড়োফেলা রাস্তার কালো ধুলো ও ধোঁয়া, শহরের পারিপাট্যও নাই, পাড়াগাঁয়ের সহজ শ্রীও নাই।

বড়দিনের ছুটিতে প্রণব ঢাকা হইতে কলিকাতায় অপুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। সে জানিত অপু আজকাল কলিকাতায় থাকে না—সন্ধ্যার কিছু আগে সে গিয়া চাঁপদানী পৌঁছিল।

খুঁজিয়া খুঁজিয়া অপুর বাসাও বাহির করিল। বাজারের একপাশে একটা ছোট্ট ঘর—তার অর্ধেকটা একটা ডাক্তারখানা, স্থানীয় একজন হাতুড়ে ডাক্তার সকালে বিকালে রোগী দেখেন। বাকী অর্ধেকটাতে অপুর একখানা তক্তপোশ, একটা আধময়লা বিছানা, খানকতক বই, একটা বাঁশের আলনায় খানকতক কাপড় ঝুলানো। তক্তপোশের নিচে অপুর স্টীলের তোরঙ্গটা।

অপু বলিল—এসো এসো, এখানকার ঠিকানা কি ক'রে জানলে?

—সে কথার দরকার নেই। তারপর কলকাতা ছেড়ে এখানে কি মনে ক'রে?—বাস্! এমন জায়গায় মানুষ থাকে?

—খারাপ জায়গাটা কি দেখলি? তা ছাড়া কলকাতায় যেন আর ভাল লাগে না—দিনকতক এমন হ'ল যে, বাইরে যেখানে হয় যাব, সেই সময় এখানকার মাস্টারিটা জুটে গেল, তাই এখানে এলুম। দাঁড়া, তোর চায়ের কথা বলে আসি—।

পাশেই একটা বাঁকুড়ানিবাসী বামুনের তেলেভাজা পরোটার দোকান। রাত্রে তাদেরই দোকানে অতি অপকৃষ্ট খাদ্য কলংক-ধরা পিতলের থালায় আনীত হইতে দেখিয়া প্রণব অবাক হইয়া গেল—অপুর রুচি অন্ততঃ মার্জিত ছিল চিরদিন, হয়ত তাহা সরল ছিল, অনাড়ম্বর ছিল, কিন্তু অমার্জিত ছিল না। সেই অপুর এ কি অবনতি! এ-রকম একদিন নয়, রোজই রাত্রে নাকি এই তেলেভাজা পরোটাই অপুর প্রাণধারণের একমাত্র উপায়। এত অপরিষ্কারও তো সে অপুকে কস্মিন্‌কালে দেখিয়াছে এমন মনে হয় না।

কিন্তু প্রণবের সবচেয়ে বুকে বাজিল যখন পরদিন বৈকালে অপু তাহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া পাশের এক স্যাকরার দোকানে নীচ-শ্রেণীর তাসের আড্ডায় অতি ইতর ও স্থূল ধরণের হাস্য-পরিহাসের মধ্যে বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া মহানন্দে তাস খেলিতে লাগিল।

অপুর ঘরটাতে ফিরিয়া আসিয়া প্রণব বলিল—কাল আমার সঙ্গে চল্ অপু—এখানে তোকে থাকতে হবে না—এখান থেকে চল্।

অপু বিস্ময়ের সুরে বলিল—কেন রে, কি খারাপ দেখলি এখানে? বেশ জায়গা তো, বেশ লোক সবাই। ওই যে দেখলি বিশ্বম্ভর স্বর্ণকার—উনি এদিকের একজন বেশ অবস্থাপন্ন লোক, ওঁর বাড়ি দেখিস নি! গোলা কত! মেয়ের বিয়েতে আমায় নেমন্তন্ন করেছিল, কি খাওয়ানটাই খাওয়ালেন—উঃ! পরে খুশীর সহিত বলিল—এখানে ওঁরা সব বলেছেন আমায় ধানের জমি দিয়ে বাস করাবেন—নিকটেই বেগমপুরে ওঁদের—বেশ জায়গা—কাল তোকে দেখাব চল—ওঁরাই ঘরদোর বেঁধে দেবেন বলেছেন···আপাতত মাটির, মানে, বিচুলির ছাউনি, এদেশে উলুখড় হয় না কিনা!

প্রণব সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করিল—অপু তর্ক করিল, নিজের অবস্থার প্রাধান্য প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে নানা যুক্তির অবতারণা করিল, শেষে রাগ করিল, বিরক্ত হইল—যাহা সে কখনও হয় না। প্রকৃতিতে তাহার রাগ বা বিরক্তি ছিল না কখনই। অবশেষে প্রণব নিরুপায় অবস্থায় পরদিন সকালের ট্রেনে কলিকাতায় ফিরিয়া গেল।

যাইবার সময় তাহার মনে হইল, সে অপু যেন আর নাই—প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্য একদিন যাহার মধ্যে উছলিয়া উঠিতে দেখিয়াছে, আজ সে যেন প্রাণহীন নিষ্প্রভ। এমনতর স্থূল তৃপ্ত বা সন্তোষ-বোধ, এ ধরণের আশ্রয় আঁকড়াইয়া ধরিবার কাঙালপনা কই অপুর প্রকৃতিতে তো ছিল না কখনও!

স্কুল হইতে ফিরিয়া রোজ অপু নিজের ঘরে রোয়াকে একটা হাতলভাঙা চেয়ার পাতিয়া বসিয়া থাকে। এখানে সে অত্যন্ত একা ও সঙ্গীহীন মনে করে, বিশেষ করিয়া সন্ধ্যাবেলা। সেটা এত অসহনীয় হইয়া উঠে, কোথাও একটু বসিয়া গল্পগুজব করিতে ভাল লাগে, মানুষের সঙ্গ স্পৃহণীয় মনে হয়, কিন্তু এখানে অধিকাংশই পাটকলের সর্দ্দার, বাবু, বাজারের দোকানদার, তাও সবাই তাহার অপরিচিত। বিশু স্যাকরার দোকানের সান্ধ্য আড্ডা সে নিজে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে, তবুও ন'টা-দশটা পর্য্যন্ত রাত একরকম কাটে ভালই।

অপুর ঘরের রোয়াকটার সামনেই মার্টিন কোম্পানীর ছোট লাইন, সেটা পার হইয়া একটা পুকুর, জল যেমন অপরিষ্কার, তেমনি বিস্বাদ। পুকুরের ওপারে একটা কুলিবস্তি, দুবেলা যত ময়লা কাপড় সবাই এক পুকুরেই কাচিতে নামে। রৌদ্র উঠিলেই কুলি লাইনের ছাপ-মারা খয়েরী-রংয়ের বারো-হাতী শাড়ি পুকুরের ও-পারের ঘাসের উপর রৌদ্রে মেলানো অপুর রোয়াক হাতে দেখিতে পাওয়া যায়; কুলিবস্তির ও-পাশে গোটাকতক বাদাম গাছ, একটা ইটখোলা, খানিকটা ধানক্ষেত, একটা পাটের গাটবন্দী কল। এক একদিন রাত্রে ইটের পাঁজার ফাটলে ফাটলে রাঙা বেগুনী আলো জ্বলে, মাঝে মাঝে নিভিয়া যায়, আবার জ্বলে, অপু নিজের রোয়াকে বসিয়া বসিয়া মনোযোগের সঙ্গে দেখে। রাত দশটায় মার্টিন লাইনের একখানা গাড়ি হাওড়ার দিক হইতে আসে—অপুর রোয়াক ঘেঁষিয়া যায়—পোঁটলা-পুঁটুলি, লোকজন, মেয়েরা—পাশেই ষ্টেশনে গিয়া থামে, একটু পরেই বাঁকুড়াবাসী ব্রাহ্মণটি তেলেভাজা পরোটা ও তরকারী আনিয়া হাজির করে, খাওয়া শেষ করিয়া শুইতে অপুর প্রায় এগারোটা বাজে। দিনের পর দিন একই রুটিন। বৈচিত্র্যও

নাই, বদলও নাই।

অপু কাহারো সহিত গায়ে পড়িয়া আত্মীয়তা করিতে যায় যে, কোন মতলব আঁটিয়া তাহা নহে, ইহা সে যখনই করে, তখনই সে করে নিজের অজ্ঞাতসারে—নিঃসঙ্গতা দূরে করিবার অচেতন আগ্রহে। কিন্তু নিঃসঙ্গতা কাটিতে চায় না সব সময়। যাইবার মত জায়গা নাই, করিবার মত কাজও নাই—চুপচাপ বসিয়া বসিয়া সময় কাটে না। ছুটির দিনগুলি তো অসম্ভবরূপ দীর্ঘ হইয়া পড়ে।

নিকটেই ব্রাঞ্চ পোস্টাফিস। অপু রোজ বৈকালে ছুটির পরে সেখানে গিয়া বসিয়া প্রতিদিনের ডাক অতি আগ্রহের সহিত দেখে। ঠিক বৈকালে পাঁচটার সময় সব্-অফিসের পিওন চিঠিপত্র-ভরা সীল-করা ডাক-ব্যাগটি ঘাড়ে করিয়া আনিয়া হাজির করে, সীল ভাঙিয়া বড় কাঁচি দিয়া সেটার মুখের বাঁধন কাটা হয়। এক একদিন অপুই বলে—ব্যাগটা খুলি চরণবাবু?

চরণবাবু বলেন - হ্যাঁ হ্যাঁ, খুলুন না, আমি ততক্ষণ ইস্টাম্পের হিসেবটা মিলিয়ে ফেলি—এই নিন্ কাঁচি!

পোস্টকার্ড, খাম, খবরের কাগজ, পুলিন্দা, মনি-অর্ডার। চরণবাবু বলেন—মনি-অর্ডার সাতখানা? দেখেছেন কাণ্ডটা মশাই, এদিকে টাকা নেই মোটে। টোটালটা দেখুন না একবার দয়া ক'রে—সাতান্ন টাকা ন' আনা? তবেই হয়েছে—রইল পড়ে, আমি তো আর ইস্ত্রীর গয়না বন্ধক দিয়ে টাকা এনে মনি-অর্ডার তামিল করতে পারি না মশাই? এদিকে ক্যাশ বুঝে নেওয়া চাই বাবুদের রোজ রোজ—

প্রতিদিন বৈকালে পোস্টমাস্টারের 'টহলদারী করা অপুর কাছে অত্যন্ত আনন্দদায়ক কাজ। সাগ্রহে স্কুলের ছুটির পর পোস্টাপিসে দৌড়ানো চাই-ই তাহার। তার সবচেয়ে আকর্ষণের বস্তু খামের চিঠিগুলি। প্রতিদিনের ডাকে বিস্তর খামের চিঠি আসে—নানাধরণের খাম, সাদা, গোলাপী, সবুজ, নীল। চিঠি-প্রাপ্তিটা চিরদিনই জীবনের একটি দুর্লভ ঘটনা বলিয়া, চিরদিনই চিঠির—বিশেষ করিয়া খামের চিঠির—প্রতি তাহার কেমন একটা বিচিত্র আকর্ষণ। মধ্যে দু' বৎসর অপর্ণা সে পিপাসা মিটাইয়াছিল - এক একখানা খাম বা তাহার উপরের লেখাটা এতটা হুবহু সে রকম, যে প্রথমটা হঠাৎ মনে হয় বুঝি বা সেই-ই চিঠি দিয়াছে। একদিন শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের বাসায় এই রকম খামের চিঠি তাহারও কত আসিত।

তাহার নিজের চিঠি কোনদিন থাকে না, সে জানে তাহা কোথাও হইতে আসিবার সম্ভাবনা নাই—কিন্তু শুধু নানা ধরণের চিঠির বাহ্যদৃশ্যের মোহটাই তাহার কাছে অত্যন্ত প্রবল।

একদিন কাহার একখানি মালিকশূন্য সাকিমশূন্য পোস্টকার্ডের চিঠি ডেড-লেটার অফিস হইতে ঘুরিয়া সারা অঙ্গে ভক্ত বৈষ্ণবের মত বহু ডাক-মোহরের ছাপ লইয়া এখানে আসিয়া পড়িল। বহু সন্ধান করিয়াও তাহার মালিক জুটিল না। সেখানা রোজ এ-গ্রাম ও-গ্রাম হইতে ঘুরিয়া আসে—পিওন কৈফিয়ৎ দেয়, এ নামে কোন লোকই নাই এ অঞ্চলে। ক্রমে— চিঠিখানা অনাদৃত অবস্থায় এখানে-ওখানে পড়িয়া থাকিতে দেখা গেল—একদিন ঘরঝাঁট দিবার সময় জঞ্জালের সঙ্গে কে সামনের মাঠের ঘাসের উপরে ফেলিয়া দিয়াছিল, অপু কৌতুহলের সঙ্গে কুড়াইয়া লইয়া পড়িল—

শ্রীচরণকমলেষু

মেজদাদা, আজ অনেকদিন যাবৎ আপনি আমাদের নিকট কোন পত্রাদি দেন না এবং আপনি কোথায় আছেন, কি ঠিকানা না জানিতে পারায় আপনাকেও আমরা পত্র লিখি

নাই। আপনার আগের ঠিকানাতেই এ পত্রখানা দিলাম, আশা করি উত্তর দিতে ভুলবেন না। আপনি কেন আমাদের নিকট পত্র দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন, তাহার কারণ বুঝিতে সক্ষম হই নাই। আপনি বোধহয় আমাদের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন, তাহা না হইলে আপনি আমাদের এখানে না আসিলেও একখানা পত্র দিতে পারেন। এতদিন আপনার খবর না জানিতে পারিয়া কি ভাবে দিন যাপন করিতেছি তাহা সামান্য পত্রে লিখিলে কি বিশ্বাস করিবেন মেজদাদা? আমাদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি একেবারেই ফুরাইয়া গিয়াছে? সে যা হোক, যেরূপ অদৃষ্ট নিয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছি সেইরূপ ফল। আপনাকে বৃথা দোষ দিব না। আশা করি আপনি অসন্তোষ হইবেন না। যদি অপরাধি হইয়া থাকে, ছোট বোন বলিয়া ক্ষমা করিবেন। আপনার শরীর কেমন আছে, আপনি আমার সভক্তি প্রণাম জানিবেন, খুব আশা করি পত্রের উত্তর পাইব। আপনার পত্রের আশায় পথ চাহিয়া রহিলাম। ইতি—

সেবিকা
কুসুমলতা বসু

কাঁচা মেয়েলি হাতের লেখা, লেখার অপটুত্ব ও বানান-ভুলে ভরা। সহোদর বোনের চিঠি নয়, কারণ পত্রখানা লেখা হইতেছে জীবনকৃষ্ণ চক্রবর্তী নামের কোন লোককে। এত আগ্রহপূর্ণ, আবেগভরা পত্রখানার শেষকালে এই গতি ঘটিল? মেয়েটি ঠিকানা জানে না, নয় তো লিখিতে ভুলিয়াছে! অপটু লেখার ছত্রে ছত্রে যে আন্তরিকতা ফুটিয়াছে তাহার প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য পত্রখানা সে তুলিয়া লইয়া নিজের বাক্সে আনিয়া রাখিল। মেয়েটির ছবি চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে—পনেরো-ষোল বৎসর বয়স, সুঠাম গড়ন, ছিপছিপে পাতলা, একরাশ কালো কোঁক্ড়া কোঁক্ড়া চুল মাথায়। ডাগর চোখ।···কোথায় সে তাহার মেজদাদার পত্রের উত্তরের অপেক্ষায় বৃথাই পথ চাহিয়া আছে! মানবমনের এত প্রেম, এত আগ্রহভরা আহ্বান, পবিত্র বালিকাহৃদয়ের এ অমূল্য অর্ঘ্য কেন জগতে এভাবে ধূলায় অনাদরে গড়াগড়ি যায়, কেহ পোঁছে না, কেহ তা লইয়া গর্ব্ব করে না?

বিশ্বম্ভর স্যাকরার দোকানে সেদিন রাত এগারটা পর্য্যন্ত জোর তাসের আড্ডা চলিল—সবাই উঠিতে চায়, সবাই বলে রাত বেশী হইয়াছে, অথচ অপু সকলকে অনুরোধ করিয়া বসায়, কিছুতেই খেলা ছাড়িতে চায় না। অবশেষে অনেক রাত্রে বাসায় ফিরিতেছে, কলুদের পুকুরের কাছে স্কুলের থার্ড পণ্ডিত আশু সান্যাল লাঠি ঠক্‌ঠক্‌ করিতে করিতে চলিয়াছেন। অপুকে দেখিয়া বলিলেন, কি অপূর্ব্ববাবু যে, এত রাত্রে কোথায়?

—কোথাও না; এই বিশু স্যাক্‌রার দোকানে তাসের—

থার্ড পণ্ডিত এদিক-ওদিক চাহিয়া নিম্ন সুরে বলিলেন—একটা কথা আপনাকে বলি, আপনি বিদেশী লোক—পূর্ণ দাঁড়ীর খপ্পরে পড়ে গেলেন কি ক'রে বলুন তো?

অপু বুঝিতে না পারিয়া বলিল, খপ্পরে-পড়া কেমন বুঝতে পারছি নে—কি ব্যাপারটা বলুন তো?

পণ্ডিত আরও নিচু সুর করিয়া বলিল—ওখানে অত ঘন ঘন যাওয়া-আসা আপনার কি ভাল দেখাচ্ছে, ভাবছেন? ওদের টাকাকড়ি দেওয়া ও-সব? আপনি হচ্ছেন ইস্কুলের মাস্টার, আপনাকে নিয়ে অনেক কথা উঠেছে, তা বোধ করি জানেন না?

—না! কি কথা?

—কি কথা তা আর বুঝতে পারছেন না মশাই? হুঁ—পরে কিছু থামিয়া বলিলেন—ও সব ছেড়ে দিন, বুঝলেন? আরও একজন আপনার আগে ঐ রকম খপ্পরে পড়েছিল, এখানকার নন্দ গুঁইয়ের আবগারী দোকানে কাজ করত, ঠিক আপনার মত অল্প বয়স—

মশাই, টাকা শুষে শুষে তাকে একেবারে—ওদের ব্যবসাই ঐ। সমাজে একঘরে করবার কথা হচ্ছে—থার্ড পণ্ডিত একটু থামিয়া একটু অর্থসূচক হাস্য করিয়া বলিলেন,—আর ও-মেয়ের এমন মোহই বা কি, শহর অঞ্চলে বরং ওর চেয়ে ঢের—

অপু এতক্ষণ পর্য্যন্ত পণ্ডিতের কথাবার্ত্তার গতি ও বক্তব্য-বিষয়ের উদ্দেশ্য কিছুই ধরিতে পারে নাই—কিন্তু শেষের কথাটাতে সে বিস্ময়ের সুরে বলিল—কোন্ মেয়ে, পটেশ্বরী ?

—হ্যা হ্যা হ্যা, থাক্ থাক্, একটু আস্তে—

—কি করেছে বল্‌ছেন পটেশ্বরী ?

—আমি আর কি বলছি কিছু, সবাই যা বলে আমিও তাই বলছি। নতুন কথা আর কিছু বলছি কি ? যাবেন না ও-সবে, তাতে বিদেশী লোক, সাবধান ক'রে দি। ভদ্রলোকের ছেলে, নিজের চরিত্রটা আগে রাখতে হবে ভাল, বিশেষ যখন ইস্কুলের শিক্ষক এখানকার।

থার্ড পণ্ডিত পাশের পথে নামিয়া পড়িলেন। অপু প্রথমটা অবাক্ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু বাসায় ফিরিতে ফিরিতে সমস্ত ব্যাপারটা তাহার কাছে পরিষ্কার হইয়া গেল।

পূর্ণ দীঘুড়ীর বাড়িতে যাওয়া-আসার ইতিহাসটা এইরূপ—

প্রথমে এখানে আসিয়া অপু কয়েকজন ছাত্র লইয়া এক সেবা-সমিতি স্থাপন করিয়াছিল। একদিন সে স্কুল হইতে ফিরিতেছে, পথে একজন অপরিচিত প্রৌঢ় ব্যক্তি তাহার হাত দু'টো জড়াইয়া ধরিয়া প্রায় ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া বলিল, আপনারা না দেখলে আমার ছেলেটা মারা যেতে বসেছে—আজ পনেরো দিন টাইফয়েড্, তা আমি কলের চাকরি বজায় রাখব, না রুগীর সেবা করব ? আপনি দিন-মানটার জন্যে জনাকতক ভলাণ্টিয়ার যদি আমার বাড়ি—আর সেই সঙ্গে যদি দু-একদিন আপনি—

তেত্রিশ দিনে রোগী আরাম হইল। এই তেত্রিশ দিনের অধিকাংশ দিনই অপু নিজে ছাত্রদের সঙ্গে প্রাণপণে খাটিয়াছে। রাত্রি তিনটায় ঔষধ খাওয়াইতে হইবে, অপু ছাত্রদিগকে জাগিতে না দিয়া নিজে জাগিয়াছে, তিনটা না বাজা পর্য্যন্ত বাহিরের দাওয়ার একপাশে বই পড়িয়া সময় কাটাইয়াছে, পাছে অমনি বসিয়া থাকিলে ঘুমাইয়া পড়ে।

একদিন দুপুরে টাল খাইয়া রোগী যায়-যায় হইয়াছিল। দীঘুড়ী মশায় পাটকলে, সে দিন ভলাণ্টিয়ার-দলের আবার কেহই ছিল না, দুপুরে ভাত খাইতে গিয়াছিল। অপু দীঘুড়ী মশায়ের স্ত্রীকে ভরসা দিয়া বুঝাইয়া শান্ত রাখিয়া মেয়ে দু'টির সাহায্যে গরম জল করাইয়া বোতলে পুরিয়া সেঁক-তাপ ও হাত পা ঘষিতে ঘষিতে আবার দেহের উষ্ণতা ফিরিয়া আসে।

ছেলে সারিয়া উঠিলে দীঘুড়ী মশায় একদিন বলিলেন—আপনি আমার যা উপকারটা করেছেন মাস্টার মশায়—তা এক মুখে আর কি বলব—আমার স্ত্রী বলছিল, আপনার তো রেঁধে খাওয়ার কষ্ট—এই একমাসে আপনি তো আমাদের আপনার লোক হয়ে পড়েছেন—তা আপনি কেন আমাদের ওখানেই খান না ? আপনি বাড়ির ছেলের মত থাকবেন, খাবেন, কোনও অসুবিধে আপনার হতে পারে না।

সেই হইতেই অপু এখানে একবেলা করিয়া খায়।

পরিচয় অল্প দিনের বটে, কিন্তু বিপদের দিনের মধ্য দিয়া সে পরিচয়—কাজেই ঘনিষ্ঠতা ক্রমে আত্মীয়তায় পরিণত হইতে চলিয়াছে। অপু পূর্ণ দীঘুড়ীর স্ত্রীকে শুধু 'মাসিমা' বলিয়া ডাকে তাহাই নয়, মাসের বেতন পাইলে সবটা আনিয়া নতুন-পাতানো মাসিমার হাতে তুলিয়া দেয়। সে-টাকার হিসাব প্রতি মাসের শেষে মাসিমা মুখে মুখে বুঝাইয়া দিয়া আরও চার-পাঁচ টাকা বেশী খরচ দেখাইয়া দেন এবং পরের মাসের মাহিনা হইতে কাটিয়া রাখেন। বাজারে বিশু স্যাকরা একদিন বলিয়াছিল—দীঘুড়ী বাড়ি টাকা রাখবেন না

অমন ক'রে, ওরা অভাবী লোক, বিশেষ ক'রে দীঘড়ী-গিন্নী ভারী খেলোয়াড় মেয়েছেলে, বিদেশী লোক আপনি, আপনাকে বলে রাখি, ওদের সঙ্গে অত মেলামেশার দরকার কি আপনার ?

মেয়ে-দুইটির সঙ্গে সে মেশে বটে। বড় মেয়েটির নাম পটেশ্বরী, বয়স বছর চৌদ্দ-পনেরো হইবে, রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, তবে তাহাকে দেখিয়া সুন্দরী বলিয়া কোনদিনই মনে হয় নাই অপুর। তবে এটুকু সে লক্ষ্য করিয়াছে, তাহার সুবিধা অসুবিধার দিকে বাড়ির এই মেয়েটিই একটু বেশী লক্ষ্য রাখে। পটেশ্বরী না রাঁধিয়া দিলে অর্ধেক দিন বোধ হয় তাহাকে না খাইয়াই স্কুলে যাইতে হইত। তাহার ময়লা রুমালগুলি নিজে চাহিয়া লইয়া সাবান দিয়া রাখে, ছোট ভাইয়ের হাতে টিফিনের সময় তাহার জন্য আটার রুটি পাঠাইয়া দেয়, অপু খাইতে বসিলে পান সাজিয়া রুমালে জড়াইয়া রাখে। কি একটা ব্রতের সময় বলিয়াছিল, আপনার হাত দিয়ে ব্রতটা নেব মাস্টার মশাই ! এ সবের জন্য সে মনে মনে মেয়েটির উপর কৃতজ্ঞ—কিন্তু এ সব জিনিস যে বাহিরের দিক হইতে এরূপ ভাবে দেখা যাইতে পারে, একথা পর্যন্ত তাহার মনে কখনও উদয় হয় নাই—সে জানেই না এ ধরনের সন্দিগ্ধ ও অশুচি মনোভাবের খবর।

সে বিস্মিতও হইল, রাগও করিল। শেষে ভাবিয়া চিন্তিয়া পরদিন হইতে পূর্ণ দীঘড়ীর বাড়ি যাওয়া-আসা বন্ধ করিল। ভাবিল—কিছু না, মাঝে পড়ে পটেশ্বরীকে বিপদে পড়তে হবে।

ইতিমধ্যে বাঁকুড়াবাসী বামুনটি রাশীকৃত বাজার-দেনা ফেলিয়া একদিন ঝাঁঝরা, হাতা ও বেলুনখানা মাত্র সম্বল করিয়া চাঁপদানীর বাজার হইতে রাতারাতি উধাও হইয়াছিল, সুতরাং আহারাদির খুবই কষ্ট হইতে লাগিল।

দীঘড়ী-বাড়ি হইতে ফিরিয়া সে মনে মনে ভাবিল, এ-রকম বাবা-মা তো কখনও দেখি নি ? বেচারীকে এ-ভাবে কষ্ট দেওয়া—ছিঃ—যাক্, ওদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক আর রাখব না।

সেদিন ছুটির পর অপু একখানা খবরের কাগজ উল্টাইতে উল্টাইতে দেখিতে পাইল একটা শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধের লেখক তাহার বন্ধু জানকী এবং নামের তলায় ব্র্যাকেটের মধ্যে লেখা আছে—On deputation to England.

জানকী ভাল করিয়া এম-এ ও বি-টি পাশ করিবার পর গবর্নমেণ্ট স্কুলে মাস্টারি করিতেছে এ-সংবাদ পূর্বেই সে জানিত কিন্তু তাহার বিলাত যাওয়ার কোন খবরই তাহার জানা ছিল না। কে-ই বা দিবে ? দেখি দেখি—বা রে ! জানকী বিলাত গিয়াছে, বাঃ—

প্রবন্ধটা কৌতূহলের সহিত পড়িল। বিলাতের একটা বিখ্যাত স্কুলের শিক্ষাপ্রণালী ও ছাত্রজীবনের দৈনন্দিন ঘটনা-সংক্রান্ত আলোচনা। বাহির হইয়া পথ চলিতে চলিতে ভাবিল, উঃ, জানকী যে জানকী—সেও গেল বিলেত !

মনে পড়িল কলেজ-জীবনের কথা—বাগবাজারের সেই শ্যামরায়ের মন্দির ও ঠাকুরবাড়ি—গরীব ছাত্রজীবনে জানকীর সঙ্গে কতদিন সেখানে খাইতে যাওয়ার কথা। ভালই হইয়াছে, জানকী কম কষ্টটা করিয়াছিল কি একদিন ! বেশ হইয়াছে, ভালই হইয়াছে।

এ-অঞ্চলের রাস্তায় বড় ধুলো, তাহার উপর আবার কয়লার গুঁড়া দেওয়া—পথ হাঁটা মোটেই প্রীতিকর নয়। দুধারে কুলিবস্তী; ময়লা দড়ির চারপাই পাতিয়া লোকগুলো তামাক টানিতেছে ও গল্প করিতেছে। এ-পথ চলিতে চলিতে অপরিচ্ছন্ন, সংকীর্ণ বস্তী-গুলির দিকে চাহিয়া সে কতবার ভাবিয়াছে, মানুষ কোন্ টানে, কিসের লোভে এ-ধরণের নরককুণ্ডে স্বেচ্ছায় বাস করে ? জানে না, বেচারীরা জানে না, পলে পলে এই নোংরা

আবহাওয়া তাহাদের মনুষ্যত্বকে, রুচিকে, চরিত্রকে, ধর্ম্মস্পৃহাকে গলা টিপিয়া খুন করিতেছে। সূর্য্যের আলো কি ইহারা কখনও ভোগ করে নাই? বন-বনানীর শ্যামলতাকে ভালবাসে নাই? পৃথিবীর মুক্ত রূপকে প্রত্যক্ষ করে নাই?

নিকটে মাঠ নাই, বেগমপুরের মাঠ অনেক দূরে, রবিবার ভিন্ন সেখানে যাওয়া চলে না। সুতরাং খানিকটা বেড়াইয়াই সে ফিরিল।

অনেকদিন হইতে এ-অঞ্চলের মাঠে ও পাড়াগাঁয়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এদিকের গাছ-পালা ও বনের ফুলের একটা তালিকা ও বর্ণনা সে একখানা বড় খাতায় সংগ্রহ করিয়াছে। স্কুলের দু-একজন মাস্টারকে দেখাইলে তাঁহারা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। ও-সবের কথা লইয়া আবার বই! পাগল আর কাকে বলে!

বাসায় আসিয়া আজ আর সে বিশু স্যাকরার আড্ডায় গেল না। বসিয়া বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে জানকীর কথা মনে পড়িল। বিলাতে—তা বেশ। কতদিন গিয়াছে কে জানে? ব্রিটিশ মিউজিয়ম-টিউজিয়ম এতদিনে সব দেখা হইয়া গিয়াছে নিশ্চয়। পুরানো নর্ম্যান দুর্গ দু-একটা, পাশে পাশে জুনিপারের বন, দূরে ঢেউ-খেলানো মাঠের সীমায় খড়িমাটির পাহাড়ের পিছনে সন্ধ্যাধূসর আটলাণ্টিকের উদার বুকে অস্ত-আকাশের রঙিন প্রতিচ্ছায়া, কি কি গাছ, পাড়াগাঁয়ের মাঠের ধারে কি কি বনের ফুল? ইংল্যাণ্ডের বনফুল নাকি ভারী দেখিতে সুন্দর—পপি, ক্লিম্যাটিস, ডেজী।

বিশু স্যাকরার দোকান হইতে লোক ডাকিতে আসে, আসিবার আজ এত দেরি কিসের? খেলুড়ে ভীম সাধুখাঁ, মহেশ সাবুই, নীলু ময়রা, ফকির আড্ডি—ইহারা অনেকক্ষণ আসিয়া বসিয়া আছে—মাস্টার মশায়ের যাইবার অপেক্ষায় এখনও খেলা যে আরম্ভ হয় নাই।

অপু যায় না—তাহার মাথা ধরিয়াছে—না, আজ সে আর খেলায় যাইবে না।

ক্রমে রাত্রি বাড়ে, পদ্মপুকুরের ও-পারে কুলিবস্তীর আলো নিবিয়া যায়, নৈশ-বায়ু শীতল হয়, রাত্রি সাড়ে দশটায় আপ ট্রেন হেলিতে-দুলিতে ঝক-ঝক শব্দে রোয়াকের কোল ঘেঁষিয়া চলিয়া যায়, পয়েণ্টসম্যান আঁধারে-লণ্ঠন-হাতে আসিয়া সিগন্যালের বাতি নামাইয়া লইয়া যায়। জিজ্ঞাসা করে—মাস্টারবাবু, এখনও বসিয়ে আছেন?

—কে ভজুয়া? হ্যাঁ—সে এখনো বসিয়া আছে।

কিসের ক্ষুধা—কিসের যেন একটা অতৃপ্ত ক্ষুধা!

ও-বেলা একখানা পুরানো জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের বই লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল—এখানা খুব ভাল বই এ-সম্বন্ধে। শীলেদের বাড়ির চাকরিজীবনে কিনিয়াছিল—এখানা হইতে অপর্ণাকে কতদিন নীহারিকা ও নক্ষত্রপুঞ্জের ফটোগ্রাফ দেখাইয়া বুঝাইয়া দিত—ও-বেলা যখন সেখানা লইয়া পড়িতেছিল তখন তাহার চোখে পড়িল, অতি ক্ষুদ্র সাদা রংয়ের—খালি চোখের খুব তেজ না থাকিলে দেখা প্রায় অসম্ভব—এরূপ একটা পোকা বইয়ের পাতায় চলিয়া বেড়াইতেছে। ওর সম্বন্ধে ভাবিয়াছিল—এই বিশাল জগৎ, নক্ষত্রপুঞ্জ, উল্কা, নীহারিকা, কোটি কোটি দৃশ্য-অদৃশ্য জগৎ লইয়া এই অনন্ত বিশ্ব—ও-ও তো এরই একজন অধিবাসী—এই যে চলিয়া বেড়াইতেছে পাতাটার উপরে, ও-ই ওর জীবনানন্দ—কতটুকু ওর জীবন, আনন্দ কতটুকু?

কিন্তু মানুষেরই বা কতটুকু? ঐ নক্ষত্র-জগতের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধই বা কি? আজকাল তাহার মনে একটা নৈরাশ্য ও সন্দেহবাদের ছায়া মাঝে মাঝে যেন উঁকি মারে। এই বর্ষাকালে সে দেখিয়াছে, ভিজা জুতার উপর এক রকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছাতা গজায়—কতদিন মনে হইয়াছে মানুষও তেমনি পৃথিবীর পৃষ্ঠে এই রকম ছাতার মত জন্মিয়াছে—এখানকার উষ্ণ বায়ুমণ্ডল ও তাহার বিভিন্ন গ্যাসগুলা প্রাণপোষণের অনুকূল একটা অবস্থার

সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া। এরা নিতান্তই এই পৃথিবীর, এরই সঙ্গে এদের বন্ধন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো, ব্যাঙের ছাতার মতই হঠাৎ গজাইয়া উঠে, লাখে লাখে, পালে পালে জন্মায়, আবার পৃথিবীর বুকেই যায় মিলাইয়া। এরই মধ্য হইতে সহস্র ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ ঘটনার আনন্দ, হাসি-খুশিতে দৈন্য-ক্ষুদ্রতাকে ঢাকিয়া রাখে—গড়ে চল্লিশটা বছর পরে সব শেষ। যেমন ঐ পোকার সব শেষ হইয়া গেল তেমনি।

এই অবোধ জীবগণের সঙ্গে ঐ বিশাল নক্ষত্র-জগতের, ঐ গ্রহ, উল্কা, ধূমকেতু—ঐ নিঃসীম নাক্ষত্রিক বিরাট শূন্যের কি সম্পর্ক? সুদূরের পিপাসাও যেমন মিথ্যা, অনন্ত জীবনের স্বপ্নও তেমনি মিথ্যা—ভিজা জুতার বা পচা বিচালী-গাদায় ব্যাঙের ছাতার মত যাহাদের উৎপত্তি—এই মহনীয় অনন্তের সঙ্গে তাদের কিসের সম্পর্ক?

মৃত্যুপারে কিছুই নাই, সব শেষ। মা গিয়াছে—অপর্ণা গিয়াছে—অনিল গিয়াছে—সব দাঁড়ি পড়িয়া গিয়াছে—পূর্ণচ্ছেদ।

ঐ জ্যোতির্বিজ্ঞানের বইখানাতে যে বিশ্বজগতের ছবি ফুটিয়াছে, ঐ পোকাটার পক্ষে যেমন তাহার কল্পনা ও ধারণা সম্পূর্ণ অসম্ভব, এমন সব উচ্চতর বিবর্তনের প্রাণী কি নাই যাহাদের জগতের তুলনায় মানুষের জগৎটা ঐ বইয়ের পাতায় বিচরণশীল প্রায় আনুবীক্ষণিক পোকাটার জগতের মতই ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, নগণ্য?

হয়ত তাহাই সত্য, হয়ত মানুষের সকল কল্পনা, সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান মিলিয়া যে বিশ্বটার কল্পনা করিয়াছে সেটা বিরাট বাস্তবের অতি ক্ষুদ্র এক ভগ্নাংশ নয়,—তাহা নিতান্ত এ পৃথিবীর মাটির,…মাটির… মাটির।

আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের জগতের তুলনায় ঐ পোকাটার জগতের মত! হয়ত তাহাই, কে বলিবে হ্যাঁ কি না?

মানুষ মরিয়া কোথায় যায়? ভিজা জুতাকে রৌদ্রে দিলে তাহার উপরকার ছাতা কোথায় যায়?

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

স্কুলের সেক্রেটারী স্থানীয় বিখ্যাত চাউল ব্যবসায়ী রামতারণ গুইয়ের বাড়ি এবার পূজার খুব ধুমধাম। স্কুলের বিদেশী মাস্টার মহাশয়েরা কেহ বাড়ি যান নাই, এই বাজারে চাকুরিটা যদি বা জুটিয়া গিয়াছে, এখন সেক্রেটারীর মনস্তুষ্টি করিয়া সেটা তো বজায় রাখিতে হইবে! তাঁহারা পূজার কয়দিন সেক্রেটারীর বাড়িতে প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া লোকজনের আদর-অভ্যর্থনা, খাওয়ানোর বিলি-বন্দোবস্ত প্রভৃতিতে মহাব্যস্ত, সকলেই বিজয়া দশমীর পরদিন বাড়ি যাইবেন। অপুর হাতে ছিল ভাঁড়ার। ঘরের চার্জ—কয়দিন রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত খাটিবার পর বিজয়া দশমীর দিন বৈকালে সে ছুটি পাইয়া কলিকাতায় আসিল।

প্রায় এক বৎসরের একঘেয়ে ওই পাড়াগেঁয়ে জীবনের পরে বেশ লাগে শহরের এই সজীবতা। এই দিনটার সঙ্গে বহু অতীত দিনের নানা উৎসব-চপল আনন্দস্মৃতি জড়ানো আছে, কলিকাতায় আসিলেই যেন পুরানো দিনের সে-সব উৎসবরাজি তাহাকে পুরাতন সঙ্গী বলিয়া চিনিয়া ফেলিয়া প্রীতিমধুর কলহাস্যে আবার তাহাকে ব্যগ্র আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া ফেলিবে। পথে চলিতে চলিতে নিজের ছেলের কথা মনে হইতে লাগিল বার বার। তাহাকে দেখা হয় নাই—কি জানি কি রকম দেখিতে হইয়াছে। অপর্ণার মত, না তাহার মত?… ছেলের উপর অপু মনে মনে খুব সন্তুষ্ট ছিল না, অপর্ণার মৃত্যুর জন্য সে মনে মনে ছেলেকে দায়ী করিয়া বসিয়াছিল বোধ হয়। ভাবিয়াছিল, পূজার সময় একবার সেখানে

গিয়া দেখিয়া আসিবে—কিন্তু যাওয়ার কোন তাগিদ মনের মধ্যে খুঁজিয়া পাইল না। চক্ষুলজ্জার খাতিরে খোকার পোশাকের দরুন পাঁচটি টাকা শ্বশুরবাড়িতে মনি-অর্ডার করিয়া পাঠাইয়া পিতার কর্তব্য সমাপন করিয়াছে।

আজিকার দিনে শুধু আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা যায়। কিন্তু তাহার কোনও পূর্বপরিচিত বন্ধু আজকাল আর কলিকাতায় থাকে না, কে কোথায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। গ্রে স্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়াইয়া প্রতিমা দেখিতে দেখিতে ভাবিতে লাগিল—কোথায় যাওয়া যায়?

তার পরে সে লক্ষ্যহীনভাবে চলিল। একটা সরু গলি, দুজন লোকে পাশাপাশি যাওয়া যায় না, দুধারে একতলা নীচু স্যাঁতসেঁতে ঘরে ছোট ছোট গৃহস্থেরা বাস করিতেছে—একটা রান্নাঘরে ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের একটি বৌ লুচি ভাজিতেছে, দুটি ছোট মেয়ে ময়দা বেলিয়া দিতেছে—অপু ভাবিল, একবৎসর পরে আজ হয়ত ইহাদের লুচি খাইবার উৎসব-দিন। একটা উঁচু রোয়াকে অনেকগুলি লোক কোলাকুলি করিতেছে, গোলাপী সিল্কের ফ্রকপরা কোঁকড়াচুল একটি ছোট মেয়ে দরজার পর্দা তুলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে। একটা দৃশ্যে তাহার ভারী দুঃখ হইল। এক মুড়ির দোকানে প্রৌঢ়া মুড়িওয়ালীকে একটি অল্পবয়সী নীচশ্রেণীর পতিতা মেয়ে বলিতেছে—ও দিদি—দিদি? একটু পায়ের ধুলো দ্যাও। পরে পায়ের ধুলা লইয়া বলিতেছে, একটু সিন্ধি খাওয়াবে না, শোনো—ও দিদি? মুড়িওয়ালী তাহার কথায় আদৌ কান না দিয়া সোনার মোটা অনন্ত-পরা ঝিয়ের সহিত কথাবার্তা কহিতেছে—মেয়েটি তাহার মনোযোগ ও অনুগ্রহ আকর্ষণ করিবার জন্য আবার প্রণাম করিতেছে ও আবার বলিতেছে- দিদি, ও দিদি? একটু পায়ের ধুলো দ্যাও। পরে হাসিয়া বলিতেছে—একটু সিন্ধি খাওয়ানে না, ও দিদি?

অপু ভাবিল, এ রূপহীনা হতভাগিনীও হয়ত কলিকাতায় তাহার মত একাকী, কোন্ খোলার ঘরের অন্ধকার গর্ভগৃহ হইতে আজিকার দিনের উৎসবে যোগ দিতে তাহার চুনুরি শাড়িখানা পরিয়া বাহির হইয়াছে। পাশের দোকানের অবস্থাপন্ন মুড়িওয়ালীর অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতেছে, উৎসবের অংশ হইতে যাহাতে সে বঞ্চিত না হয়। ওর চোখে ওই মুড়িওয়ালীই হয়ত কত বড়লোক!

ঘুরিতে ঘুরিতে সেই কবিরাজ-বন্ধুটির দোকানে গেল। বন্ধু দোকানেই বসিয়া আছে, খুব আদর করিয়া বলিল—এসো, এসো ভাই, ছিলে কোথায় এতদিন? বন্ধুর অবস্থা পূর্বাপেক্ষাও খারাপ, পূর্বের বাসা ছাড়িয়া নিকটের একটা গলিতে সাড়ে তিন টাকা ভাড়াতে একটা খোলার ঘর লইয়াছে—নতুবা চলে না। বলিল—আর ভাই পারি নে, এখন হয়েছে দিন-আনি দিন-খাই অবস্থা—আমি আর স্ত্রী দুজনে মিলে বাড়িতে আচার-চাটনি, পয়সা প্যাকেট চা—এই সব ক'রে বিক্রি করি—অসম্ভব স্ট্রাগল করতে হচ্ছে ভাই, এসো বাসায় এসো।

নীচু স্যাঁতসেঁতে ঘর। বন্ধুর বৌ বা ছেলেমেয়ে কেহই বাড়ি নাই—পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে গলির মুখে বড় রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া প্রতিমা দেখিতেছে। বন্ধু বলিল—এবার আর ছেলেমেয়েদের কাপড়-টাপড় দিতে পারি নি—বলি ঐ পুরানো কাপড় ধোপার বাড়ি থেকে কাচিয়ে পরু। বৌটার চোখে জল দেখে শেষকালে ছোট মেয়েটার জন্য একখানা ডুরে শাড়ি—তাই। ব'স ব'স, চা খাও, বাঃ, আজকের দিনে যদি এলে। দাঁড়াও, ডেকে আনি ওকে।

অপু ইতিমধ্যে গলির মোড়ের দোকান হইতে আট আনার খাবার কিনিয়া আনিল। খাবারের ঠোঙা হাতে যখন সে ফিরিয়াছে তখন বন্ধু ও বন্ধুপত্নী বাসায় ফিরিয়াছে।—

বাঃ রে, আবার কোথায় গিয়েছিলে—ওতে কি? খাবার? বাঃ রে, খাবার তুমি আবার কেন—

অপু হাসিমুখে বলিল—তোমার আমার জন্যে তো আনি নি? খুকী রয়েছে, ঐ খোকা রয়েছে—এস তো মানু—কি নাম? রমলা? ও বাবা, বাপের শখ দ্যাখ—রমলা! বৌ-ঠাকরুণ—ধরুন তো এটা।

বন্ধুপত্নী আধঘোমটা টানিয়া প্রসন্ন হাসিভরা মুখে ঠোঙাটি হাতে লইলেন। সকলকে চা ও খাবার দিলেন। সেই খাবারই।

আধঘণ্টাটাক পর অপু বলিল—উঠি ভাই, আবার চাঁপদানীতেই ফিরব - বেশ ভাল ভাই—কষ্টের সঙ্গে তুমি এই যে লড়াই করছ—এতেই তোমাকে ভাল করে চিনে নিলাম—কিন্তু বৌ-ঠাকরুণকে একটা কথা বলে যাই -অত ভালমানুষ হবেন না—আপনার স্বামী তা পছন্দ করেন না। দু-একদিন একটু-আধটু চুলোচুলি, হাতা-যুদ্ধ বেলুন-যুদ্ধ—জীবনটা বেশ একটু সরস হয়ে উঠবে—বুঝলেন না? এ আমার মত নয় কিন্তু, আমার এই বন্ধুটির মত—আচ্ছা আসি, নমস্কার।

বন্ধুটি পিছু পিছু আসিয়া হাসিমুখে বলিল ওহে তোমার বৌ-ঠাকরুণ বলছেন, ঠাকুরপোকে জিজ্ঞেস কর, উনি বিয়ে করবেন, না, এই রকম সন্ন্যিসি হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াবেন? ··উত্তর দাও।

অপু হাসিয়া বলিল—দেখে শুনে আর ইচ্ছে নেই ভাই, বলে দাও।

বাইরে আসিয়া ভাবে—আচ্ছা তবু এরা আজ ছিল বলে বিজয়ার আনন্দটা করা গেল। সত্যিই শান্ত বৌটি। ইচ্ছে করে এদের কোনও হেল্প করি—কি ক'রে হয়, হাতে এদিকে পয়সা কোথায়?

তাহার পর কিসের টানে সে ট্রামে উঠিয়া একেবারে ভবানীপুরে লীলাদের বাড়ি গিয়া হাজির হইল। রাত তখন প্রায় সাড়ে-আটটা। লীলার দাদামশায়ের লাইব্রেরী-ঘরটাতে লোকজন কথাবার্ত্তা বলিতেছে - গাড়িবারান্দাতে দুখানা মোটর দাঁড়াইয়া আছে—পোকার উপদ্রবের ভয়ে হলের ইলেকট্রিক আলোগুলিতে রাঙা সিল্কের ঘেরাটোপ বাঁধা। মার্ব্বেলের সিঁড়ির ধাপ বাহিয়া হলের সামনের চাতালে উঠিবার সময় সেই গন্ধটা পাইল - কিসের গন্ধ ঠিক সে জানে না, হয়ত দামী আসবাবপত্রের গন্ধ, নয়ত লীলার দাদামশাইয়ের দামী চুরুটের গন্ধ—এখানে আসিলেই ওটা পাওয়া যায়।

লীলা—এবার হয়ত লীলা···অপুর বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল।

লীলার ছোট ভাই বিমলেন্দু তাহাকে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া হাত ধরিল।

এই বালকটিকে অপুর বড় ভাল লাগে - মাত্র বার দুই ইহার আগে সে অপুকে দেখিয়াছে, কিন্তু কি চোখেই যে দেখিয়াছে! একটু বিস্ময়মাখানো আনন্দের সুরে বলিল—অপূর্ব্ববাবু, আপনি এতদিন পরে কোথা থেকে? আসুন, আসুন, বসবেন। বিজয়ার প্রণামটা, দাঁড়ান।

—এসো এসো, কল্যাণ হোক, মা কোথায়?

—মা গিয়েছেন বাগবাজারের বাড়িতে—আসবেন এখুনি—বসুন।

—ইয়ে—তোমার দিদি এখানে তো—না?—ও।

এক মুহূর্ত্তে সারা বিজয়া দশমীর উৎসবটা, আজিকার সকল ছুটাছুটি ও পরিশ্রমটা অপুর কাছে বিস্বাদ, নীরস, অর্থহীন হইয়া গেল। শুধু আজ বলিয়া নয়, পূজা আরম্ভ হইবার সময় হইতেই সে ভাবিতেছে—লীলা পূজার সময় নিশ্চয় কলিকাতায় আসিবে—বিজয়ার দিন গিয়া দেখা করিবে। আজ চাঁপদানীর চটকলে পাঁচটার ভোঁ বাজিয়া প্রভাত

সূচনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে অসীম আনন্দের সহিত বিছানায় শুইয়া ভাবিয়াছিল—বৎসর দুই পরে আজ লীলার সঙ্গে ওবেলা দেখা হইবে এখন! সেই লীলাই নাই এখানে!…

বিমলেন্দু তাহাকে উঠিতে দিল না। চা ও খাবার আনিয়া খাওয়াইল। বলিল—বসুন, এখন উঠতে দেব না, নতুন আইসক্রিমের কলটা এসেছে—বড়মামার বন্ধুদের জন্যে সিদ্ধির আইসক্রিম হচ্ছে—খাবেন সিদ্ধির আইসক্রিম? রোজ দেওয়া—আপনার জন্যে এক ডিশ আনতে বলে এলুম। আপনার গান শোনা হয় নি কতদিন, না সত্যি, একটা গান করতেই হবে—ছাড়ছি নে।

—লীলা কি সেই রায়পুরেই আছে? আসবে-টাসবে না?…

—এখন তো আসবে না দিদি—দিদির নিজের ইচ্ছেতে তো কিছু হবার জো নেই—দাদামশায় পত্র লিখেছিলেন, জামাইবাবু উত্তর দিলেন এখন নয়, দেখা যাবে এর পর।

তাহার পর সে অনেক কথা বলিল। অপু এ-সব জানিত না।—জামাইবাবু লোক ভাল নয়, খুব রাগী, বদমেজাজী। দিদি খুব তেজী মেয়ে বলিয়া পারিয়া উঠে না—তবু ব্যবহার আদৌ ভাল নয়। নীচু সুরে বলিল—নাকি খুব মাতালও—দিদি তো সব কথা লেখে না, কিন্তু এবার বড়দিদির ছেলে কিছুদিন বেড়াতে গিয়েছিল নাকি গরমের ছুটিতে, সে এসে সব বললে। বড়দিদিকে আপনি চেনেন না? সুজাতাদি? এখানেই আছেন, এসেছেন আজ—ডাকব তাঁকে?

অপুর মনে পড়িল সুজাতাকে। বড় বৌরানীর মেয়ে বাল্যের সেই সুন্দরী, তন্বী সুজাতা—বর্দ্ধমানের বাড়িতে তাহারই যৌবনপুষ্পিত তনুলতাটি একদিন অপুর অনভিজ্ঞ শৈশবচক্ষুর সম্মুখে নারী-সৌন্দর্য্যের সমগ্র ভাণ্ডার যেন নিঃশেষে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়াছিল—বারো বৎসর পূর্ব্বের সে উৎসবের দিনটা আজও এমন স্পষ্ট মনে পড়ে!

একটু পরে সুজাতা হাসিমুখে পর্দ্দা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিল, কিন্তু একজন অপরিচিত, সুদর্শন, তরুণ যুবককে ঘরের মধ্যে দেখিয়া প্রথমটা সে তাড়াতাড়ি পিছু হটিয়া পর্দ্দাটা পুনরায় টানিতে যাইতেছিল—বিমলেন্দু হাসিয়া বলিল—বাঃ রে, ইনিই তো অপূর্ব্ববাবু বড়দি, চিনতে পারেন নি?

অপু উঠিয়া পায়ের ধুলো লইয়া প্রণাম করিল। সে সুজাতা আর নাই, বয়স ত্রিশ পার হইয়াছে, খুব মোটা হইয়া গিয়াছে, মাথার সামনের দিকে দু-এক গাছা চুল উঠিতে শুরু হইয়াছে, যৌবনের চটুল লাবণ্য গিয়া মুখে মাতৃত্বের কোমলতা। বর্দ্ধমানে থাকিতে অপুর সঙ্গে একদিনও সুজাতার আলাপ হয় নাই—রাঁধুনীর ছেলের সঙ্গে বাড়ির বড় মেয়ের কোনু আলাপই বা সম্ভব ছিল? সবাই তো আর লীলা নয়! তবে বাড়ির রাঁধুনী বামনীর ছেলেটিকে ভয়ে ভয়ে বড়লোকের বাড়িতে একতলা দালানের বারান্দাতে অনেকবার সে বেড়াইতে, ঘোরাফেরা করিতে দেখিয়াছে বটে।

সুজাতা বলিল—এসো এসো, ব'স। এখানে কি কর? মা কোথায়?

—মা তো অনেকদিন মারা গিয়েছেন।

—তুমি বিয়ে-থাওয়া করেছ তো—কোথায়?

সে সংক্ষেপে সব বলিল। সুজাতা বলিল—তা আবার বিয়ে কর নি? না না, বিয়ে ক'রে ফেল, সংসারে থাকতে গেলে ও-সব তো আছেই, বিশেষ যখন তোমার মা-ও নেই। সে বাড়ির আর মেয়ে-টেয়ে নেই?

অপুর মনে হইল, লীলা থাকিলে, সে 'তোমার মা' এ-কথা না বলিয়া শুধু 'মা' বলিত, তাহাই সে বলে। লীলার মত আর কে এমন দয়াময়ী আছে তাহার জীবনে, যে তাহার সকল দারিদ্র্যকে, সকল হীনতাকে উপেক্ষা করিয়া পরিপূর্ণ করুণায় ও মমতায় স্নেহপাণি

সহজ বন্ধুত্বের মাধুর্য্যে তাহার দিকে এমন প্রসারিত করিয়া দিয়াছে? সুজাতার কথার উত্তর দিতেই এ-কথাটা ভাবিয়া সে কেমন অন্যমনস্ক হইয়া গেল।

সুজাতা ভিতরে চলিয়া গেলে অপুর মনে হইল শুধু মাতৃত্বের শান্ত কোমলতা নয়, সুজাতার মধ্যে গৃহিণীপনার প্রবীণতাও আসিয়া গিয়াছে। বলিল আসি ভাই বিমল, আমার আবার সাড়ে দশটায় গাড়ি।

বিমলেন্দু তাকে আগাইয়া দিতে তাহার সহিত অনেকদূর আসিল। বলিল—আর বছর ফাগুন মাসে দিদি এসেছিল, দিন পনেরো ছিল। কাউকে বলবেন না, আপনার পুরানো আপিসে একবার আমায় পাঠিয়েছিল আপনার খোঁজে—সবাই বললে তিনি চাকরি ছেড়ে চলে গিয়েছেন কোথায় কেউ জানে না। আপনার কথা আমি লিখব, আপনার ঠিকানাটা দিন্ না?···দাঁড়ান, লিখে নিই।

মাঘীপূর্ণিমার দিনটা ছিল ছুটি। সারাদিন সে আশে-পাশের গ্রামগুলো পায়ে হাঁটিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। সন্ধার অনেক পরে সে বাসায় আসিয়া শুইবামাত্র ঘুমাইয়া পড়িল। কত রাত্রে জানে না, তক্তপোশের কাছের জানালাতে কাহার মৃদু করাঘাতের শব্দে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। শীত এখনও বেশী বলিয়া জানালা বন্ধই ছিল, বিছানার উপর বসিয়া সে জানালাটা খুলিয়া ফেলিল। কে যেন বাহিরের রোয়াকে জ্যোৎস্নার মধ্যে দাঁড়াইয়া! কে?—উত্তর নাই। সে তাড়াতাড়ি দুয়ার খুলিয়া বাহিরের রোয়াকে আসিয়া অবাক হইয়া গেল—কে একটি স্ত্রীলোক এত রাত্রে তাহার জানালার কাছে দেয়াল ঘেঁষিয়া বিষন্নভাবে দাঁড়াইয়া আছে।

অপু আশ্চর্য্য হইয়া কাছে গিয়া বলিল—কে ওখানে? পরে বিস্ময়ের সুরে বলিল—পটেশ্বরী! তুমি এখানে এত রাত্রে! কোথা থেকে - তুমি শ্বশুরবাড়ি ছিলে, এখানে কি ক'রে—

পটেশ্বরী নিঃশব্দে কাঁদিতেছিল, কথা বলিল না—অপু চাহিয়া দেখিল, তাহার পায়ের কাছে একটা ছোট পুঁটুলি পড়িয়া আছে। বিস্ময়ের সুরে বলিল কেঁদো না পটেশ্বরী, কি হয়েছে বল। আর এখানে এ-ভাবে দাঁড়িয়েও তো—শুনি কি হয়েছে? তুমি এখন আসছ কোত্থেকে বল তো?

পটেশ্বরী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল- রিষড়ে থেকে হেঁটে আসছি—অনেক রাত্তিরে বেরিয়েছি, আমি আর সেখানে যাব না—

—আচ্ছা, চলো চলো, তোমায় বাড়িতে দিয়ে আসি—কি বোকা মেয়ে! এত রাত্তিরে কি এ ভাবে বেরুতে আছে।···ছিঃ—আর এই কনকনে শীতে, গায়ে একখানা কাপড় নেই কিছু না - এ কি ছেলেমানুষি!

—আপনার পায়ে পড়ি মাস্টার মশাই, আপনি বাবাকে বলবেন, আর যেন সেখানে না পাঠায়—সেখানে গেলে আমি মরে যাব - পায়ে পড়ি আপনার—

বাড়ির কাছাকাছি গিয়া বলিল—বাড়িতে যেতে বড্ড ভয় করছে, মাস্টার মশায়—আপনি একটু বলবেন বাবাকে মাকে বুঝিয়ে—

সে এক কান্ড আর কি অত রাত্রে! ভাগ্যে রাত অনেক, পথে কেহ নাই।

অপু তাহাকে সঙ্গে লইয়া দীঘড়ী-বাড়ি আসিয়া পটেশ্বরীর বাবাকে ডাকিয়া তুলিয়া সব কথা বলিল। পূর্ণ দীঘড়ী বাহিরে আসিলেন, পটেশ্বরী আমগাছের তলায় বসিয়া পড়িয়া হাঁটুতে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতেছে ও হাড়ভাঙা শীতে ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে না একখানা শীতবস্ত্র, না একখানা মোটা চাদর।

বাড়ির মধ্যে গিয়া পটেশ্বরী কাঁদিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিল—একটু পরে পূর্ণ দীঘড়ী তাহাকে ডাকিয়া বাড়ির মধ্যে লইয়া গিয়া দেখাইলেন পটেশ্বরীর হাতে, পিঠে ঘাড়ের কাছে প্রহারের কালশিরার দাগ, এক এক জায়গায় রক্ত ফুটিয়া বাহির হইতেছে—মাকে ছাড়া দাগগুলি সে আর কাহাকেও দেখায় নাই, তিনি আবার স্বামীকে দেখাইয়াছেন। ক্রমেই জানা গেল পটেশ্বরী নাকি রাত বারোটা হইতে পুকুরের ঘাটে শীতের মধ্যে বসিয়া ভাবিয়াছে কি করা যায়—দু ঘণ্টা শীতে ঠক্‌ঠক্‌ করিয়া কাঁপিবার পরও সে বাড়ি আসিবার সাহস সঞ্চয় করিতে না পারিয়া মাস্টার মহাশয়ের জানালায় শব্দ করিয়াছিল।

মেয়েকে আর সেখানে পাঠানো চলিতে পারে না এ কথা ঠিক। দীঘড়ী মশাই অপুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার কোন উকীল বন্ধু আছে কি-না; এ সম্বন্ধে একটা আইনের পরামর্শ বিশেষ আবশ্যক—মেয়ের ভরণপোষণের দাবী দিয়া তিনি জামাইয়ের নামে নালিশ করিতে পারেন কি না। অপু দিন দুই শুধুই ভাবিতে লাগিল এক্ষেত্রে কি করা উচিত।

সুতরাং স্বভাবতই সে খুব আশ্চর্য্য হইয়া গেল, যখন মাঘীপূর্ণিমার দিন-পাঁচেক পরে সে শুনিল পটেশ্বরীর স্বামী আসিয়া পুনরায় তাহাকে লইয়া গিয়াছে।

কিন্তু তাহাকে আরও বেশী আশ্চর্য্য হইতে হইল, সম্পূর্ণ আর এক ব্যাপারে। একদিন সে স্কুল হইতে ছুটির পরে বাহিরে আসিতেছে, স্কুলের বেহারা তাহার হাতে একখানা চিঠি দিল—খুলিয়া পড়িল, স্কুলের সেক্রেটারী লিখিতেছেন, তাহাকে আর বর্তমানে আবশ্যক নাই—এক মাসের মধ্যে সে যেন অন্যত্র চাকুরি দেখিয়া লয়।

অপু বিস্মিত হইল—কি ব্যাপার! হঠাৎ এ নোটিশের মানে কি? সে তখনই হেডমাস্টারের কাছে গিয়া চিঠিখানি দেখাইল। তিনি নানা কারণে অপুর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। প্রথম, সেবাসমিতি দলগঠন অপুই করিয়াছিল, নেতৃত্বও করিত সে। ছেলেদের সে অত্যন্ত প্রিয়পাত্র, তাহার কথায় ছেলেরা ওঠে বসে। জিনিসটা হেডমাস্টারের চক্ষুশূল। অনেকদিন হইতেই তিনি সুযোগ খুঁজিতেছিলেন—ছিদ্রটা এত দিন পান নাই পাইলে কি আর একটা অনভিজ্ঞ ছোক্‌রাকে জব্দ করিতে এতদিন লাগিত?

হেডমাস্টার কিছু জানেন না—সেক্রেটারীর ইচ্ছা, তাঁহার হাত নাই। সেক্রেটারী জানাইলেন, কথাটা এই যে, অপূর্ববাবুর নামে নানা কথা রটিয়াছে, দীঘড়ী-বাড়ীর মেয়েটির এই সব ঘটনা লইয়া। অনেকদিন হইতেই এ লইয়া তাঁহার কানে কোন কোন কথা গেলেও তিনি শোনেন নাই। কিন্তু সম্প্রতি ছেলেদের অভিভাবকদের মধ্যে অনেকে আপত্তি করিতেছেন যে, ও-রূপ চরিত্রের শিক্ষককে স্কুলে কেন রাখা হয়। অপুর প্রতিবাদ সেক্রেটারী কানে তুলিলেন না।

—দেখুন, ও-সব কথা আলাদা। আমাদের স্কুলের ও ছাত্রদের দিক থেকে এ-ব্যাপারটা অন্যভাবে আমরা দেখব কিনা! একবার যাঁর নামে কুৎসা রটেছে, তাঁকে আর আমরা শিক্ষক হিসাবে রাখতে পারি নে তা সে সত্যিই হোক, বা মিথ্যেই হোক।

অপুর মুখ লাল হইয়া গেল এই বিরাট অবিচারে। সে উত্তেজিত সুরে বলিল—বেশ তো মশায়, এ বেশ জাস্টিস্‌ হ'ল তো! সত্যি মিথ্যে না জেনে আপনারা একজনকে এই বাজারে অনায়াসে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিচ্ছেন—বেশ তো?

বাহিরে আসিয়া রাগে ও ক্ষোভে তাহার চোখে জল আসিয়া গেল। মনে ভাবিল এসব হেডমাস্টারের কারসাজি—আমি যাব তাঁর বাড়ি খোশামোদ করতে? যায় যাক্‌ চাকরি! কিন্তু এদের অদ্ভুত বিচার বটে—ডিফেন্ড্‌ করার একটা সুযোগ তো খুনী আসামীকেও দেওয়া হয়ে থাকে, তা-ও এরা আমায় দিলে না!

কয়দিন সে বসিয়া ভাবিতে লাগিল, এখানকার চাকুরির মেয়াদ তো আর এই মাসটা—

তারপর কি করা যাইবে? স্কুলে এক নতুন মাস্টার কিছুদিন পূর্ব্বে কোন এক মাসিক পত্রিকায় গল্প লিখিয়া দশটা টাকা পাইয়াছিলেন। গল্পটা সেই ভদ্রলোকের কাছে অপু অনেকবার শুনিয়াছে। আচ্ছা, সেও এখানে বসিয়া খাতায় একটা উপন্যাস লিখিতে শুরু করিয়াছিল—মনে মনে ভাবিল—দশ-বারো চ্যাপ্টার তো লেখা আছে, উপন্যাসখানা যদি লিখে শেষ করতে পারি, তার বদলে কেউ টাকা দেবে না? কেমন হচ্ছে কে জানে; একবার রামবাবুকে দেখাব।

নোটিশ-মত অপুর কাজ ছাড়িবার আর বিলম্ব নাই, একদিন পোস্টাফিসের ডাক্-ব্যাগ খুলিয়া খাম ও পোস্টকার্ডগুলি নাড়িতে-চাড়িতে একখানা বড়, চৌকা সবুজ রংএর মোটা খামের ওপর নিজের নাম দেখিয়া বিস্মিত হইল – কে তাহাকে এত বড় শৌখিন খামে চিঠি দিল। প্রণব নয়, অন্য কেহ নয়, হাতের লেখাটা সম্পূর্ণ অপরিচিত।

খুলিয়া দেখিলেই তো তাহার সকল রহস্য এখনই চলিয়া যাইবে, এখন থাক, বাসায় গিয়া পড়িবে এখন। এই অজানার আনন্দটুকু যতক্ষণ ভোগ করা যায়!

রান্না-খাওয়ার কাজ শেষ হইতে মার্টিন কোম্পানীর রাত দশটার গাড়ি আসিয়া পড়িল, বাজারের দোকানে দোকানে ঝাঁপ পড়িল। অপু পত্রখানা খুলিয়া দেখিল—দুখানা চিঠি, একখানা ছোট চার-পাঁচ লাইনের, আর একখানা মোটা সাদা কাগজে—পরক্ষণেই আনন্দে, বিস্ময়ে, উত্তেজনায় তার বুকের রক্ত যেন চলকাইয়া উঠিয়া গেল মাথায়—সর্ব্বনাশ, কার চিঠি এ! চোখকে যেন বিশ্বাস করা যায় না – লীলা তাহাকে লিখিতেছে! সঙ্গের চিঠিখানা তার ছোট ভাইয়ের—সে লিখিতেছে, দিদির 'এ পত্রখানা তাহার পত্রের মধ্যে আসিয়াছে, অপুকে পাঠাইবার অনুরোধ ছিল দিদির, পাঠানো হইল।

অনেক কথা, ন' পৃষ্ঠা ছোট ছোট অক্ষরের চিঠি! খানিকটা পড়িয়া সে খোলা হাওয়ায় আসিয়া বসিল। কি অবর্ণনীয় মনোভাব, বোঝানো যায় না, বলা যায় না। আরম্ভটা এইরকম—

ভাই অপূর্ব্ব,

অনেকদিন তোমার কোন খবর পাই নি—তুমি কোথায় আছ, আজকাল কি কর, জানবার ইচ্ছে হয়েছে অনেকবার কিন্তু কে বলবে, কার কাছেই বা খবর পাব? সেবার কলকাতায় গিয়ে বিনুকে একদিন তোমার পুরানো ঠিকানায় তোমার সন্ধানে পাঠিয়েছিলাম—সে বাড়িতে অন্য লোক আজকাল থাকে, তোমার সন্ধান দিতে পারে নি, কি করেই বা পারবে? একথা বিনু বলে নি তোমায়?

আমি বড় অশান্তিতে আছি এখানে, কখনও ভাবি নি এমন আমার হবে। কখনও যদি দেখা হয় তখন সব বলব। এই সব অশান্তির মধ্যে যখন আবার মনে হয় তুমি হয়ত মলিন-মুখে কোথায় পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছ—তখন মনের যন্ত্রণা আরও বেড়ে যায়। এই অবস্থায় হঠাৎ একদিন বিনুর পত্রে জানলাম বিজয়া দশমীর দিন তুমি ভবানীপুরের বাড়িতে গিয়েছিলে, তোমার ঠিকানাও পেলাম।

বর্দ্ধমানের কথা মনে হয়? অত আদরের বর্দ্ধমানের বাড়িতে আজকাল আর যাবার জো নেই। জ্যাঠামশায় মারা যাওয়ার পর থেকেই রমেন-দা বড় বাড়াবাড়ি ক'রে তুলেছিল। আজকাল সে যা করছে, তা তুমি হয়ত কখনও শোনও নি। মানুষের ধাপ থেকে সে যে কত নীচে নেমে গিয়েছে, আর যা কীর্ত্তিকারখানা, তা লিখতে গেলে পুঁথি হয়ে পড়ে। কোন মাড়োয়ারীর কাছে নিজের অংশ বন্ধক রেখে টাকা ধার করেছিল এখন তার পরামর্শে পার্টিশান স্যুট আরম্ভ করেছে—বিনুকে ফাঁকি দেবার উদ্দেশ্যে। এ-সব তোমার মাথায় আসবে কোনও দিন?

কত রাত পর্য্যন্ত অপু চোখের পাতা বুজাইতে পারিল না। লীলা যাহা লিখিয়াছে তাহার অপেক্ষা বেশী যেন লেখে নাই। সারা পত্রখানিতে একটা শান্ত সহানুভূতি স্নেহ-প্রীতি, করুণা। এক মুহূর্ত্তে আজ দু বৎসরব্যাপী এই নির্জ্জনতা অপুর যেন কাটিয়া গেল—এইমাত্র সে ভাবিতেছিল সংসারে সে একা - তাহার কেহ কোথাও নেই। লীলার পত্রে জগতের চেহারা যেন এক মুহূর্ত্তে বদলাইয়া গেল। কোথায় সে—কোথায় লীলা।·· বহুদূরের ব্যবধান ভেদ করিয়া তাহার প্রাণের উষ্ণ প্রেমময় স্পর্শ অপুর প্রাণে লাগিয়াছে—কিন্তু কি অপূর্ব্ব রসায়ন এ স্পর্শটা—কোথায় গেল অপুর চাকুরি যাইবার দুঃখ - কোথায় গেল গোটা-দুই বৎসরের পাষাণভারের মত নির্জ্জনতা নারীহৃদয়ের অপূর্ব্ব রসায়নের প্রলেপ তাহার সকল মনে, সকল অঙ্গে, কী যে আনন্দ ছড়াইয়া দিল। লীলা যে আছে,···সব সময় তাহার জন্য ভাবে—দুঃখ করে, জীবনে অপু আর কি চায়? সাক্ষাতের আবশ্যক নাই, জন্মজন্মান্তর ব্যাপিয়া এই স্পর্শটুকু অক্ষয় হইয়া বিরাজ করুক।···

লীলার পত্র পাইবার দিন-বারো পরে তাহার যাইবার দিন আসিয়া গেল।

ছেলেরা সভা করিয়া তাহাকে বিদায়-সম্বর্দ্ধনা দিবার উদ্দেশ্যে চাঁদা উঠাইতেছিল - হেডমাস্টার খুব বাধা দিলেন। যাহাতে সভা না হইতে পায় সেইজন্য দলের চাঁইদিগকে ডাকিয়া টেস্ট পরীক্ষার সময় বিপদে ফেলিবেন বলিয়া শাসাইলেন—পরিশেষে স্কুল-ঘরে সভার স্থানও দিতে চাহিলেন না, বলিলেন - তোমরা ফেয়ারওয়েল দিতে যাচ্ছ, ভাল কথা, কিন্তু এসব বিষয়ে আয়রন্ ডিসিপ্লিন চাই - যার চরিত্র নেই, তার কিছুই নেই, তার প্রতি কোনও সম্মান তোমরা দেখাও, এ আমি চাই নে, অন্তত স্কুল-ঘরে আমি তার জায়গা দিতে পারি নে।

সেদিন আবার বড় বৃষ্টি। মহেন্দ্র সাঁবুই-এর আটচালায় জনত্রিশেক উপরের ক্লাসের ছেলে হেডমাস্টারের ভয়ে লুকাইয়া হাতে লেখা অভিনন্দনপত্র পড়িয়া ও গাঁদাফুলের মালা গলায় দিয়া অপুকে বিদায়-সম্বর্দ্ধনা জানাইল, সভা ভঙ্গের পর জলযোগ করাইল। প্রত্যেকে পায়ের ধূলা লইয়া, তাহার বাড়ি আসিয়া বিছানাপত্র গুছাইয়া দিয়া, নিজেরা তাহাকে বৈকালে ট্রেনে তুলিয়া দিল।

অপু প্রথমে আসিল কলিকাতায়।

একটা খুব লম্বা পাড়ি দিবে—যেখানে সেখানে—যেদিকে দুই চোখ যায়—এতদিনে সত্যই মুক্তি। আর কোনও জালে নিজেকে জড়াইবে না—সব দিক হইতে সতর্ক থাকিবে—শিকলের বাঁধন অনেক সময় অলক্ষিতে জড়ায় কিনা পায়ে!

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে গিয়া সারা ভারতবর্ষের ম্যাপ ও য়্যাট্‌লাস কয়দিন ধরিয়া দেখিয়া কাটাইল—ড্যানিয়েলের ওরিয়েন্টাল সিনারি ও পিংকার্টনের ভ্রমণ-বৃত্তান্তের নানাস্থান নোট করিয়া লইল—বেঙ্গল নাগপুর ও ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলের নানাস্থানের ভাড়া ও অন্যান্য তথ্য জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়াইল। সত্তর টাকা আছে, ভাবনা কিসের?

কিন্তু যাওয়ার আগে একবার ছেলেকে চোখের দেখা দেখিয়া যাওয়া দরকার না? সেই দিনই বৈকালের ট্রেনে সে শ্বশুরবাড়ি রওনা হইল। অপর্ণার মা জামাইকে এতটুকু তিরস্কার করিলেন না, এতদিন ছেলেকে না দেখিতে আসার দরুণ একটি কথাও বলিলেন না। বরং এত আদর-যত্ন করিলেন যে অপু নিজেকে অপরাধী ভাবিয়া সঙ্কুচিত হইয়া রহিল। অপু বাড়ির লোকজনের সঙ্গে কথা কহিতেছে, এমন সময়ে তাহার খুড়শাশুড়ী একটি সুন্দর খোকাকে কোলে করিয়া সেখানে আসিলেন। অপু ভাবিল—বেশ খোকাটি তো! কাদের? খুড়শাশুড়ী বলিলেন—যাও তো খোকন, এবার তোমার আপনার লোকের কাছে। ধন্যি যাহোক, এমন নিষ্ঠুর বাপ কখনও দেখি নি। যাও তো একবার কোলে—

ছেলে তিন বৎসর প্রায় ছাড়াইয়াছে—ফুটফুটে সুন্দর গায়ের রং—অপর্ণার মত ঠোঁট ও মুখের নীচেকার ভঙ্গী, চোখ বাপের মত ডাগর ডাগর। কিন্তু সবসুদ্ধ ধরিলে অপর্ণার মুখের আদলই বেশী ফুটিয়া উঠে খোকার মুখে। প্রথমে সে কিছুতেই বাবার কাছে আসিবে না, অপরিচিত মুখ দেখিয়া ভয়ে দিদিমাকে জড়াইয়া রহিল—অপুর মনে ইহাতে আঘাত লাগিল। সে হাসিমুখে হাত বাড়াইয়া বার বার খোকাকে কোলে আনিতে গেল—ভয়ে শেষকালে খোকা দিদিমার কাঁধে মুখ লুকাইয়া রহিল। সন্ধ্যার সময় খানিকটা ভাব হইল। তাহাকে দু-একবার 'বাবা' বলিয়া ডাকিলও। একবার কি একটা পাখি দেখিয়া বলিল—ফাখি, ফাখি, উই এক্তা ফাখি নেবো বাবা—

'প'কে কচি জিব ও ঠোঁটের কি কৌশলে 'ফ' বলিয়া উচ্চারণ করে, কেমন অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়। আর এত কথাও বলে খোকা!

কিন্তু বেশীর ভাগই বোঝা যায় না—উলটো-পালটা কথা, কোন্ কথার উপর জোর দিতে গিয়া কোন্ কথার উপর দেয়—কিন্তু অপুর মনে হয় কথা কহিলে খোকার মুখ দিয়া যেন মানিক ঝরে—সে যাহাই কেন বলুক না, প্রত্যেক ভাঙা, অশুদ্ধ, অপূর্ণ কথাটি অপুর মনে বিস্ময় জাগায়। সৃষ্টির আদিম যুগ হইতে কোন শিশু যেন কখনও 'বাবা' বলে নাই, 'জল' বলে নাই,—কোন্ অসাধ্য সাধনই না তাহার খোকা করিতেছে!

পথে বাবার সঙ্গে বাহির হইয়াই খোকা বকুনি শুরু করিল। হাত-পা নাড়িয়া কি বুঝাইতে চায়—অপু না বুঝিয়াই অন্যমনস্ক সুরে ঘাড় নাড়িয়া বলে—ঠিক ঠিক। তারপর কি হ'ল রে খোকা?

একটা বড় সাঁকো পথে পড়ে, খোকা বলে—বাবা যাব—ওই দেখব।

অপু বলে—আস্তে আস্তে নেমে যা—নেমে গিয়ে একটা কু-উ করবি—

খোকা আস্তে আস্তে ঢালু বাহিয়া নীচে নামে—জলনিকাশের পথটার ফাঁকে ওদিকের গাছপালা দেখা যাইতেছে - না বুঝিয়া বলে—বাবা, এই মধ্যে একতা বাগান --

—কু করো তো খোকা, একটা কু করো।

খোকা উৎসাহের সহিত বাঁশির মত সুরে ডাকে—কু-উ-উ—পরে বলে—তুমি কলুন বাবা?

অপু হাসিয়া বলে—কু-উ-উ-উ-উ—

খোকা আমোদ পাইয়া নিজে আবার করে—আবার বলে—তুমি কলুন?…বাড়ি ফিরিবার পথে বলে, খবিছাক এনো বাবা—দিদিমা খবিছাক আঁড়বে - খবিছাক ভালো—। ন্ধ্যাবেলা খোকা আরও কত গল্প করে। এখানকার চাঁদ গোল। মাসিমার বাড়ি একবার গয়াছিল, সেখানকার চাঁদ ছোট—এতটুকু! অতটুকু চাঁদ কেন বাবা? শীঘ্রই অপু দেখিল খোকা দুষ্টুও বড়। অপু পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া গুণিতেছে, খোকা দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া সবাইকে বলে—দ্যাখ, কত তাকা!—আয় আয়—

পরে একটা টাকা তুলিয়া লইয়া বলে—এতা আমি কিছুতি দেবো না।—হাতে মুঠো াধিয়া থাকে—আমি কাঁচের ভাঁতা কিনবো—অপু ভাবে খোকাটা দুষ্টুও তো হয়েছে—া—দে—টাকা কি করবি?

—না কিছুতি দেবো না—হি-হি—ঘাড় দুলাইয়া হাসে।

অপুর টাকাটা হাত হইতে লইতে কষ্ট হয়—তবু লয়। একটা টাকার ওর কি দরকার? মছামিছি নষ্ট।

কলিকাতা ফিরিবার সময়ে অপর্ণার মা বলিলেন—বাবা আমার মেয়ে গিয়েছে, যাক্—কন্তু তোমার কষ্টই হয়েছে আমার বেশী! তোমাকে যে কি চোখে দেখেছিলাম বলতে

পারি নে, তুমি যে এ রকম পথে পথে বেড়াচ্ছ, এতে আমার বুক ফেটে যায়, তোমার মা বেঁচে থাকলে কি বিয়ে না করে পারতে? খোকনের কথাটাও তো ভাবতে হবে, একটা বিয়ে কর বাবা।

নৌকায় আবার পীরপুরের ঘাটে আসা। অপর্ণার ছোট খুড়তুত ভাই ননী তাহাকে তুলিয়া দিতে আসিতেছিল।

খররৌদ্রে বড়দলের নোনাজল চক্-চক্ করিতেছে। মাঝ নদীতে একখানা বাদাম-তোলা মহাজনী নৌকা, দূরে বড়দলের মোহনার দিকে সুন্দরবনের ধোঁয়া ধোঁয়া অস্পষ্ট সীমারেখা।

আশ্চর্য! এরই মধ্যে অপর্ণা যেন কত দূরের হইয়া গিয়াছে। অসীম জলরাশির প্রান্তের ওই অনতিস্পষ্ট বনরেখার মতই দূরের—অনেক দূরের।

অপুদের ডিঙিখানা দক্ষিণতীর ঘেঁষিয়া যাইতেছিল, নৌকার তলায় ছলাৎ ছলাৎ শব্দে ঢেউ লাগিতেছিল, কোথাও একটা উঁচু ডাঙা, কোথাও পাড় ধসিয়া নদীগর্ভে পড়িয়া যাওয়ায় কাশঝোপের শিকড়গুলো বাহির হইয়া ঝুলিতেছে। একটা জায়গায় আসিয়া অপুর হঠাৎ মনে হইল, জায়গাটা সে চিনিতে পারিয়াছে—একটা ছোট খাল, ডাঙার উপরে একটা হিজল গাছ। এই খালটিতেই অনেকদিন আগে অপর্ণাকে কলিকাতা হইতে আনিবার সময় সে বলিয়াছিল—ও কলা-বৌ, ঘোমটা খোল, বাপের বাড়ির দ্যাশটা চেয়েই দ্যাখো—

তারপর স্টীমার চড়িয়া খুলনা, বাঁ দিকে সে একবার চাহিয়া দেখিয়া লইল। ওই যে ছোট্ট খড়ের ঘরটি—প্রথম যেখানে সে ও অপর্ণা সংসার পাতে।

সেদিনকার সে অপূর্ব আনন্দমুহূর্তটিতে সে কি স্বপ্নেও ভাবিয়াছিল যে এমন একদিন আসিবে, যেদিন শূন্যদৃষ্টিতে খড়ের ঘরখানার দিকে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে সমস্ত ঘটনাটা মনে হইবে মিথ্যা স্বপ্ন?

নির্নিমেষ, উৎসুক, অবাক চোখে সেদিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে অপুর কেমন এক দুর্দমনীয় ইচ্ছা হইতে লাগিল একবার ঘরখানার মধ্যে যাইতে, সব দেখিতে। হয়তো অপর্ণার হাতের উনুনের মাটির ঝিঁকটা এখনও আছে—আর যেখানে বসিয়া সে অপর্ণার হাতের জলখাবার খাইয়াছিল। প্রথম যেখানটিতে অপর্ণা ট্রাঙ্ক হইতে আয়না চিরুনি বাহির করিয়া তাহার জন্য রাখিয়া দিয়াছিল…

ট্রেনে উঠিয়া জানালার ধারে বসিয়া থাকে। স্টেশনের পর স্টেশন আসে ও চলিয়া যায়, অপু শুধুই ভাবে বড়দলের তীর, চাঁদাকাটার বন, ভাঁটার জল কল্‌কল্‌ করিয়া নামিয়া যাইতেছে, ··একটি অসহায় ক্ষুদ্র শিশুর অবোধ হাসি—অন্ধকার রাত্রে বিকীর্ণ জলরাশির ওপারে কোথায় দাঁড়াইয়া অপর্ণা যেন সেই মনসাপোতার বাড়ির পুরাতন দিনগুলির মত দুষ্টুমিভরা চোখে হাসিমুখে বলিতেছে—আর কক্ষনো যাবো না তোমার সঙ্গে। আর কক্ষনো না দেখে নিও।

ফাল্গুন মাস। কলিকাতায় সুন্দর দক্ষিণ হাওয়া বহিতেছে, সকালে একটু শীতও, বোর্ডিংয়ের বারান্দাতে অপু বিছানা পাতিয়া শুইয়া ছিল। খুব ভোরে ঘুম ভাঙিয়া বিছানায় শুইয়া শুইয়াই তাহার মনে হইল, আজ আর স্কুল নাই, টিউশনি নাই—আর বেলা দশটায় নাকে-মুখে গুঁজিয়া কোথাও ছুটিতে হইবে না—আজ সমস্ত সময়টা তাহার নিজের, তাহা লইয়া সে যাহা খুশি করিতে পারে—আজ সে মুক্ত!···মুক্ত···!···মুক্ত! —আর কাহাকেও গ্রাহ্য করে না সে! কথাটা ভাবিতেই সারা দেহ অপূর্ব উল্লাসে শিহরিয়া উঠিল

—বাঁধন-ছেঁড়া মুক্তির উল্লাস! বহুকাল পর স্বাধীনতার আস্বাদন আজ পাওয়া গেল। ঐ আকাশের ক্রমবিলীয়মান নক্ষত্রটার মতই আজ সে দূর পথের পথিক—অজানার উদ্দেশ্যে সে যাত্রার আরম্ভ হয়ত আজই হয়, কি কালই হয়!

পুলকিত মনে বিছানা হইতে উঠিয়া নাপিত ডাকাইয়া কামাইল, ফর্সা কাপড় পড়িল। পুরাতন শৌখিনতা আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠার দরুন দরজির দোকানে একটা মটকার পাঞ্জাবি তৈয়ারি করিতে দিয়াছিল, সেটা নিজে গিয়া লইয়া আসিল। ভাবিল—একবার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে গিয়ে দেখে আসি নতুন বই কি এসেছে, আবার কতদিনে কলিকাতায় ফিরি, কে জানে? বৈকালে মিউজিয়মে রকফেলার ট্রাস্টের পক্ষ হইতে মশক ও ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে বক্তৃতা ছিল। অপুও গেল। বক্তৃতাটি সচিত্র। একটি ছবি দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল। মশকের জীবনেতিহাসের প্রথম পর্যায়ে সেটা থাকে কীট—তারপর হঠাৎ কীটের খোলস ছাড়িয়া সেটা পাখা গজাইয়া উড়িয়া যায়। ঠিক যে সময়ে কীটদেহটা অসাড়, প্রাণহীন অবস্থায় জলের তলায় ডুবিয়া যাইতেছে—নব-কলেবরধারী মশকটা পাখা ছাড়িয়া জল হইতে শূন্যে উড়িয়া গেল।

মানুষেরও তো এমন হইতে পারে! জলের তলায় সন্তরণকারী অন্যান্য মশক কীটের চোখে তাদের সঙ্গী তো মরিয়াই গেল—তাদের চোখের সামনে দেহটা তলাইয়া যাইতেছে। কিন্তু জলের উর্দ্ধে যে জগতে মশক নবজন্ম লাভ করিল, এরা তো তার কোনও খবরই রাখে না, সে জগতে প্রবেশের অধিকার তখনও তারা তো অর্জ্জন করে নাই—মৃত্যু দ্বারা, অন্ততঃ তাদের চোখে যা মৃত্যু তার দ্বারা। এই মশক নিম্নস্তরের জীব, তার পক্ষে যা বৈজ্ঞানিক সত্য, মানুষের পক্ষে তা কি মিথ্যা?

কথাটা সে ভাবিতে ভাবিতে ফিরিল।

যাইবার আগে একবার পরিচিত বন্ধুদের সহিত দেখা করিতে বাহির হইয়া পরদিন সকালে সে সেই কবিরাজ বন্ধুটির দোকানে গেল। দোকানে তাহার দেখা পাওয়া গেল না, উড়িয়া ছোকরা-চাকরকে দিয়া খবর পাঠাইয়া পরে সে বাসার মধ্যে ঢুকিল।

সেই খোলার-বাড়ি—সেই বাড়িটাই আছে। সংকীর্ণ উঠানের একপাশে দুখানা বেলে-পাথরের শিল পাতা। বন্ধুটি নোড়া দিয়া কি পিষিতেছে, পাশে বড় একখানা খবরের কাগজের উপর একরাশ ধূসর রংয়ের গুঁড়া। সারা উঠান জুড়িয়া কুলায়-ডালায় নানা শিকড়-বাকড় রৌদ্রে শুকাইতে দেওয়া হইয়াছে।

বন্ধু হাসিয়া বলিল, এসো এসো, তারপর এতদিন কোথায় ছিলে? কিছু মনে করো না ভাই, খারাপ হাত, মাজন তৈরি করছি—এই দ্যাখ না ছাপানো লেবেল—চন্দ্রমুখী মাজন, মহিলা হোম ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সিণ্ডিকেট—আজকাল মেয়েদের নাম না দিলে পাব্‌লিকের সিমপ্যাথি পাওয়া যায় না, তাই ঐ নাম দিয়েছি। ব'স ব'স—ওগো, বার হয়ে এসো না। অপূর্ব এসেছে, একটু চা-টা করো।

অপু হাসিয়া বলিল, সিণ্ডিকেটের সভ্য তো দেখছি আপাতত মোটে দুজন, তুমি আর তোমার স্ত্রী এবং খুব যে য়্যাক্‌টিভ সভ্য তাও বুঝছি।

হাসিমুখে বন্ধু-পত্নী ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন, তাঁহার অবস্থা দেখিয়া অপুর মনে হইল, অন্য শিলখানাতে তিনিও কিছু পূর্ব্বে মাজন-পেষা-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাহার আসিবার সংবাদ পাইয়াই শিল ছাড়িয়া ঘরের মধ্যে পলাইয়াছিলেন। হাত-মুখের গুঁড়া ধুইয়া ফেলিয়া সভ্য-ভব্য হইয়া বাহির হইলেও মাথার এলোমেলো উড়ন্ত চুলে কপালের পাশের ঘামে সে কথা জানাইয়া দেয়।

বন্ধু বলিল—কি করি বল ভাই, দিনকাল যা পড়েছে, পাওনাদারের কাছে দুবেলা

অপমান হচ্ছে, ছোট আদালতে নালিশ ক'রে দোকানের ক্যাশবাক্স সীল ক'রে রেখেছে। দিন একটা টাকা খরচ -বাসায় কোন দিন খাওয়া হয়, কোন দিন—

বন্ধু-পত্নী বাধা দিয়া বলিলেন, তুমি ও-কাঁদুনি গেয়ো অন্য সময়। এখন উনি এলেন এতদিন পর, একটু চা খাবেন, ঠাণ্ডা হবেন, তা না তোমার কাঁদুনি শুরু হ'ল।

—আহা, আমি কি পথের লোককে ধরে বলতে যাই? ও আমার ক্লাসফ্রেণ্ড, ওদের কাছে দুঃখের কথাটা বললেও—ইয়ে, পাতা চায়ের প্যাকেট একটা খুলে নাও না? আটা আছে নাকি? আর দ্যাখ, না হয় ওকে খান-চারেক রুটি অন্তত—

—আচ্ছা, সে ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না। পরে অপুর দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন—আপনি সেই বিজয়া দশমীর পর আর একদিনও এলেন না যে বড়?

চা ও পরোটা খাইতে খাইতে অপু নিজের কথা সব বলিল—শীঘ্রই বাহিরে যাইতেছে, সে কথাটাও বলিল। বন্ধু বলিল, তবেই দ্যাখো ভাই, তবু তুমি একা আর আমি স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এই কলকাতা শহরের মধ্যে আজ পাঁচ-পাঁচটি বছর যে কি ক'রে দিন কাটাচ্ছি তা আর···এই সব নিয়ে একরকম চালাই, পয়সা-প্যাকেট চা আছে, খদিরাদি মোদক আছে। মাজনের লাভ মন্দ না, কিন্তু, কি জান, এই কৌটোটা পড়ে যায় দেড়-পয়সার ওপর, মাজনে, লেবেলে, ক্যাপসুলে তাও প্রায় দু'পয়সা—তোমার কাছে আর লুকিয়ে কি করব, স্বামী-স্ত্রীতে খাটি কিন্তু মজুরী পোষায় কই? তবুও তো দোকানীর কমিশন ধরি নি হিসেবের মধ্যে। এদিকে চার পয়সার বেশী দাম করলে কম্‌পিট করতে পারব না।

খানিক পরে বন্ধু বলিল—ওহে তোমার বৌঠাকরুণ বলছেন, আমাদের তো একটা খাওয়া পাওনা আছে, এবার সেটা হয়ে যাক্‌ না কেন?—বেশ একটা ফেয়ারওয়েল ফিস্ট হয়ে যাবে এখন, তবে উলটো, এই যা—

অপু মনে মনে ভারী কৃতজ্ঞ হইয়া উঠিল বন্ধু-পত্নীর প্রতি। ইহাদের মলিন বেশ ও ছেলেমেয়েগুলির জীর্ণ চেহারা হইতে ইহাদের ইতিহাস সে ভালই বুঝিয়াছিল। কিছু ভালো খাবার আনাইয়া খাওয়ানো, একটু আমোদ আহ্লাদ করা—কিন্তু হয়ত সেটা দরিদ্র সংসারে সাহায্যের মত দেখাইবে। যদি ইহারা না লয় বা মনে কিছু ভাবে?—ও-পক্ষ হইতে প্রস্তাবটা আসিতে সে ভারী খুশী হইল।

ভোজের আয়োজনে ছ-সাত টাকা ব্যয় করিয়া অপু বন্ধুর সঙ্গে ঘুরিয়া বাজার করিল। কই মাছ, গলদা-চিংড়ি, ডিম, আলু, ছানা, দই, সন্দেশ।

হয়তো খুব বড় ধরণের কিছু ভোজ নয়, কিন্তু বন্ধু-পত্নীর আদরে হাসিমুখে তাহা এত মধুর হইয়া উঠিল! এমন কি এক সময়ে অপুর মনে হইল আসলে তাহাকে খাওয়ানোর জন্যই বন্ধু-পত্নীর এ ছল। লোকে ইষ্টদেবতাকেও এত যত্ন করে না বোধ হয়। পিছনে সব সময় বন্ধুর বৌটি পাখা হাতে বসিয়া তাহাদের বাতাস করিতেছিলেন, অপু হাত উঠাইতেই হাসিমুখে বলিলেন—ও হবে না, আপনি আর একটু ছানার ডালনা নিন—ও কি, মোচার চপ পাতে রাখলেন কার জন্যে? সে শুনব না

এই সময় একটি পনেরো-ষোল বছরের ছেলে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। বন্ধু বলিল—এসো, এসো কুঞ্জ, এসো বাবা, এইটি আমার শালীর ছেলে, বাগবাজারে থাকে। আমার সে ভায়রা-ভাই মারা গেছে গত শ্রাবণ মাসে। পাটের প্রেসে কাজ করত, গঙ্গার ঘাটে রেললাইন পেরিয়ে আসতে হয়। তা রোজই আসে, সেদিন একখানা মালগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তা ভাবলে, আবার অতখানি ঘুরে যাব? যেমন গাড়ির তলা দিয়ে গলে আসতে গিয়েছে আর অমনি গাড়িখানা দিয়েছে ছেড়ে। তারপর চাকায় কেটে-কুটে একেবারে আর কি—দু'টি মেয়ে, আমার শালী আর এই ছেলেটি, একরকম ক'রে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্যে চলছে।

উপায় কি ? ··তাই আজ ভাল খাওয়াটা আছে, কাল স্ত্রী বললে, যাও কুঞ্জকে বলে এসো—ওরে বসে যা বাবা, থালা না থাকে পাতা একখানা পেতে। হাত-মুখটা ধুয়ে আয় বাবা—এত দেরি ক'রে ফেললি কেন ?

বেলা বেশী ছিল না। খাওয়া-দাওয়ার পর গল্প করিতে করিতে অনেক রাত হইয়া গেল। অপু বলিল, আচ্ছা, আজ উঠি ভাই, বেশ আনন্দ হ'ল আজ অনেকদিন পরে—

বন্ধু বলিল, ওগো, অপূর্ব্বকে আলোটা ধরে গলির মুখটা পার ক'রে দাও তো ? আমি আর উঠতে পারি নে—

একটা ছোট্ট কেরোসিনের টেমি হাতে বৌটি অপুর পিছনে পিছনে চলিল।

অপু বলিল, থাক, বৌঠাকরুণ, আর এগোবেন না, এমন আর কি অন্ধকার, যান আপনি—

—আবার কবে আসবেন ?

—ঠিক নেই, এখন একটা লম্বা পাড়ি তো দি—

—কেন, একটা বিয়ে-থা করুন না ? পথে পথে সন্ন্যাসী হয়ে এ রকম বেড়ানো কি ভাল ? মাও তো নেই শুনেছি। কবে যাবেন আপনি ?·· যাবার আগে একবার আসবেন না, যদি পারেন।

—তা হয়ে উঠবে না বৌঠাকরুণ। ফিরি যদি আবার তখন বরং—আচ্ছা নমস্কার।

বৌটি টেমি হাতে গলির মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

পরদিন সে সকালে উঠিয়া ভাবিয়া দেখিল, হাতের পয়সা নানারকমে উড়িয়া যাইতেছে, আর কিছুদিন দেরি করিলে যাওয়াই হইবে না। এখানেই আবার চাকরির উমেদার হইয়া দোরে দোরে ঘুরিতে হইবে। কিন্তু আকাশপাতাল ভাবিয়াও কিছু ঠিক হইল না। একবার মনে হয় এটা ভাল, আবার মনে হয় ওটা ভাল। অবশেষে স্থির করিল স্টেশনে গিয়া সম্মুখে যাহা পাওয়া যাইবে, তাহাতেই উঠা যাইবে। জিনিস-পত্র বাঁধিয়া গুছাইয়া হাওড়া স্টেশনে গিয়া দেখিল, আর মিনিট পনেরো পরে চার নম্বর প্ল্যাটফর্ম হইতে গয়া প্যাসেঞ্জার ছাড়িতেছে। একখানা থার্ড ক্লাসের টিকিট কিনিয়া সোজা ট্রেনে উঠিয়া জানালার ধারের একটা জায়গায় সে নিজের বিছানাটি পাতিয়া বসিল।

অপু কি জানিত এই যাত্রা তাহাকে কোন্ পথে চালিত করিয়া লইয়া চলিয়াছে ? এই চারটা বিশ মিনিটের গয়া প্যাসেঞ্জার ? পরবর্তী জীবনে সে কতবার ভাবিয়াছে যে সে তো পাঁজি দেখিয়া যাত্রা শুরু করে নাই, কিন্তু কোন মহাশুভ মাহেন্দ্রক্ষণে সে হাওড়া স্টেশনে থার্ড ক্লাস টিকিট ঘরের ঘুলঘুলিতে ফিরিঙ্গি মেয়ের কাছে গিয়া একখানা টিকিট চাহিয়াছিল—দশ টাকার একখানা নোট দিয়া সাড়ে পাঁচ টাকা ফেরত পাইয়াছিল। মানুষ যদি তাহার ভবিষ্যৎ জানিতে পারিত !

অপু বর্ত্তমানে এসব কিছুই ভাবিতেছিল না। এত বয়স হইল, কখনও সে গ্র্যাণ্ডকর্ড লাইনে বেড়ায় নাই, সেই ছেলেবেলায় দুটি বার ছাড়া ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলেও আর কখনও চড়ে নাই, রেলে চড়িয়া দূরদেশে যাওয়ার আনন্দে সে ছেলেমানুষের মতই উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল।

রাস্তার ধারে গাছপালা ক্রমশঃ কিরূপ বদলাইয়া যায়, লক্ষ্য করিবার ইচ্ছা অনেকদিন হইতে তাহার আছে, বর্ধমান পর্যন্ত দেখিতে দেখিতে গেল, কিন্তু তাহার পরই অন্ধকারে আর দেখা গেল না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

পরদিন বৈকালে গয়ায় নামিয়া সে বিষ্ণুপাদমন্দিরে পিণ্ড দিল। ভাবিল, আমি এসব মানি বা না মানি, কিন্তু সবটুকু তো জানি নে? যদি কিছু থাকে, বাপমায়ের উপকারে লাগে! পিণ্ড দিবার সময়ে ভাবিয়া ভাবিয়া ছেলেবেলায় বা পরে যে যেখানে মারা গিয়াছে বলিয়া জানা ছিল, তাহাদের সকলেরই উদ্দেশে পিণ্ড দিল। এমন কি, পিসিমা ইন্দির ঠাকরুণকে সে মনে করিতে না পারিলেও দিদির মুখে শুনিয়াছে,—তাঁর উদ্দেশে—আতুরী ডাইনী বুড়ীর উদ্দেশেও।

বৈকালে বুদ্ধগয়া দেখিতে গেল। অপুর যদি কাহারও উপর শ্রদ্ধা থাকে তবে তাহার আবাল্য শ্রদ্ধা এই সত্যদ্রষ্টা মহাসন্ন্যাসীর উপর। ছেলের নাম তাই সে রাখিয়াছে অমিতাভ।

বামে ক্ষীণস্রোতা ফল্গু কটা রঙের বালুশয্যায় ক্লান্ত দেহ এলাইয়া দিয়াছে, ওপারে হাজারিবাগ জেলার সীমান্তবর্ত্তী পাহাড়শ্রেণী, সারাপথে ভারী সুন্দর ছায়া, গাছপালা, পাখির ডাক, ঠিক যেন বাংলাদেশ। সোজা বাঁধানো রাস্তাটি ফল্গুর ধারে ধারে ডালপালার ছায়ায় ছায়ায় চলিয়াছে, সারাপথ অপু স্বপ্নাভিভূতের মত এক্কার উপর বসিয়া রহিল। একজন হালফ্যাশানের কাপড়-পরা তরুণী মহিলা ও সম্ভবত তাঁহার স্বামী মোটরে বুদ্ধগয়া হইতে ফিরিতেছেন, অপু ভাবিল হাজার হাজার বছর পরেও এ কোন্ নূতন যুগের ছেলেমেয়ে—প্রাচীনকালের সেই পীঠস্থানটি এমন সাগ্রহে দেখিতে আসিয়াছিল? মনে পড়ে সেই অপূর্ব রাত্রি, নবজাত শিশুর চাঁদমুখ · ছন্দক···গয়ার জঙ্গলে দিনের পর দিন সে কি কঠোর তপস্যা। কিন্তু এ মোটর গাড়ি? শতাব্দীর ঘন অরণ্য পার হইয়া এমন একদিন নামিয়াছে পৃথিবীতে, পুরাতনের সবই চূর্ণ করিয়া, উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া নবযুগের পত্তন করিয়াছে। রাজা শুদ্ধোধনের কপিলাবস্তুও মহাকালের স্রোতের মুখে ফেনার ফুলের মত কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, কোন চিহ্নও রাখিয়া যায় নাই—কিন্তু তাঁহার দিগ্বিজয়ী পুত্র দিকে দিকে যে বৃহত্তর কপিলাবস্তুর অদৃশ্য সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন--তাঁহার প্রভুত্বের নিকট এই আড়াই হাজার বৎসর পরেও কে না মাথা নত করিবে?

গয়া হইতে পরদিন সে দিল্লী এক্সপ্রেসে চাপিল—একেবারে দিল্লীর টিকিট কাটিয়া। পাশের বেঞ্চিতেই একজন বাঙালী ভদ্রলোক ও তাঁহার স্ত্রী যাইতেছিলেন! কথায় কথায় ভদ্রলোকটির সঙ্গে আলাপ হইয়া গেল। গাড়িতে আর কোন বাঙালী নাই, কথাবার্ত্তার সঙ্গী পাইয়া তিনি খুব খুশী। অপুর কিন্তু বেশী কথাবার্ত্তা ভাল লাগিতেছিল না। এরা এ-সময় এত বক-বক করে কেন? মারোয়াড়ী দুটি তো সাস্যরাম হইতে নিজেদের মধ্যে বকুনি শুরু করিয়াছে, মুখের আর বিরাম নাই।

খুশীভরা, উৎসুক, ব্যগ্র মনে সে প্রত্যেক পাথরের নুড়িটি, গাছপালাটি লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছিল। বামদিকের পাহাড়শ্রেণীর পিছনে সূর্য্য অস্ত গেল, সারা পশ্চিম আকাশটা লাল হইয়া আছে, আনন্দের আবেগে সে দ্রুতগামী গাড়ির দরজা খুলিয়া দরজার হাতল ধরিয়া দাঁড়াইতেই ভদ্রলোকটি বলিয়া উঠিলেন, উঁহু, পড়ে যাবেন, পাদানিতে স্লিপ করলেই—বন্ধ করুন মশাই।

অপু হাসিয়া বলিল, বেশ লাগে কিন্তু, মনে হয় যেন উড়ে যাচ্ছি।

গাছপালা, খাল, নদী, পাহাড়, কাঁকর-ভরা জমি, গোটা শাহাবাদ জেলাটা তাহার পায়ের তলা দিয়া পলাইতেছে। অনেক দূর পর্য্যন্ত শোণ নদের বালুর চড়া জ্যোৎস্নায় অদ্ভুত দেখাইতেছে। নীল নদ? ঠিক এটা যেন নীল নদ। ওপারে সাত-আট মাইল গাধার পিঠে চড়িয়া গেলে ফ্যারাও রামেসিসের তৈরী আবুসিম্বেলের বিরাট পাষাণ মন্দির—ধূসর অস্পষ্ট

কুয়াসায় ঘেরা মরুভূমির মধ্যে অতীতকালের বিস্মৃত দেবদেবীর মন্দির, এপিস, আইসিস, হোরাস, হাথর, রা—নীল নদ যেমন গতির মুখে উপলখণ্ড পাশে ঠেলিয়া রাখিয়া পলাইয়া চলে—মহাকালের বিরাট রথচক্র তাণ্ডব-নৃত্যছন্দে সব স্থাবর অস্থাবর জিনিসকে পিছু ফেলিয়া মহাবেগে চলিবার সময় এই বিরাট গ্রানাইট মন্দিরকে পথের পাশে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে, জনহীন মরুভূমির মধ্যে বিস্মৃত সভ্যতার চিহ্ন—মন্দিরটা, কোন বিস্মৃত ও বাতিল দেবদেবীর উদ্দেশ্যে গঠিত ও উৎসর্গীকৃত।

একটু রাত্রে ভদ্রলোকটি বলিলেন, এ লাইনে ভাল খাবার পাবেন না, আমার সঙ্গে খাবার আছে, আসুন খাওয়া যাক।

তাঁহার স্ত্রী কলার পাতা চিরিয়া সকলকে বেঞ্চির উপর পাতিয়া দিলেন—লুচি, হালুয়া ও সন্দেশ—সকলকে পরিবেশন করিলেন। ভদ্রলোকটি বলিলেন, আপনি খানকতক বেশী লুচি নিন, আমরা তো আজ মোগলসরাইয়ে ব্রেকজার্নি করব, আপনি তো সোজা দিল্লী চলেছেন।

এ-ও অপুর এক অভিজ্ঞতা। পথে বাহির হইলে এত শীঘ্রও এমন ঘনিষ্ঠতা হয়! এক গলির মধ্যে শহরে শত বর্ষ বাস করিলেও তো তাহা হয় না? ভদ্রলোকটি নিজের পরিচয় দিলেন নাগপুরের কাছে কোন গবর্নমেন্ট রিজার্ভ ফরেস্ট-এ কাজ করেন, ছুটি লইয়া কালীঘাটে শ্বশুরবাড়ি আসিয়াছিলেন, ছুটি অন্তে কর্মস্থানে চলিয়াছেন। অপুকে ঠিকানা দিলেন। বার বার অনুরোধ করিলেন, সে যেন দিল্লী হইতে ফিরিবার পথে একবার অতি অবশ্য অবশ্য যায়, বাঙালীর মুখ মোটে দেখিতে পান না—অপু গেলে তাঁহারা তো কথা কহিয়া বাঁচেন। মোগলসরাই-এ গাড়ি দাঁড়াইল। অপু মালপত্র নামাইতে সাহায্য করিল। হাসিয়া বলিল—আচ্ছা বৌঠাকরুণ, নমস্কার, শীগ্‌গিরই আপনাদের ওখানে উপদ্রব করছি কিন্তু।

দিল্লীতে ট্রেন পৌঁছাইল রাত্রি সাড়ে এগারোটায়।

গাজিয়াবাদ স্টেশন হইতেই সে বাহিরের দিকে ঝুঁকিয়া চাহিয়া দেখিল—যে-দিল্লীতে গাড়ি আসিতেছিল তাহা এস. কপুর কোম্পানীর দিল্লী নয়, লেজিসলেটিভ য়্যাসেম্ব্লীর মেম্বারদের দিল্লী নয়, এসিয়াটিক পেট্রোলিয়মের এজেন্টের দিল্লী নয়—সে দিল্লী সম্পূর্ণ ভিন্ন—বহুকালের বহুযুগের নরনারীদের—মহাভারত হইতে শুরু করিয়া রাজসিংহ ও মাধবী-কঙ্কণ,—সমুদয় কবিতা, উপন্যাস, গল্প, নাটক, কল্পনা ও ইতিহাসের মাল-মশলায় তাহার প্রতি ইটখানা তৈরি, তার প্রতি ধূলিকণা অপুর মনের রোমান্সে সকল নায়ক-নায়িকার পুণ্য-পাদপূত—ভীষ্ম হইতে আওরঙ্গজেব ও সদাশিব রাও পর্যন্ত গান্ধারী হইতে জাহানারা পর্যন্ত—সাধারণ দিল্লী হইতে সে দিল্লীর দূরত্ব অনেক!—দিল্লী হনোজ দূর অস্তু, বহুদূরের বহুশতাব্দীর দূর পারে, সে দিল্লী কখনও কেহ দেখে নাই।

আজ নয়, মনে হয় শৈশবে মায়ের মুখে মহাভারত শোনার দিন হইতে ছিরের পুকুরের ধারের বাঁশবনের ছায়ায় কাঁচা শেওড়ার ডাল পাতিয়া 'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা' ও 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত' পড়িবার দিনগুলি হইতে, সকল ইতিহাস, যাত্রা, থিয়েটার, কত গল্প, কত কবিতা, এই দিল্লী, আগ্রা, সমগ্র রাজপুতানা ও আর্যাবর্ত—তাহার মনে একটি অতি অপরূপ, অভিনব, স্বপ্নময় আসন অধিকার করিয়া আছে—অন্য কাহারও মনে সে রকম আছে কিনা, সেটা প্রশ্ন নয়, তাহার মনে আছে এইটাই বড় কথা।

কিন্তু বাহিরে ঘন অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না—অনেকক্ষণ চাহিয়া কেবল কতকগুলো সিগন্যালের বাতি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না, একটা প্রকাণ্ড ইয়ার্ড কেবিন, লেখা

আছে, 'দিল্লী জংশন ইস্ট'—একটা গ্যাসোলিনের ট্যাঙ্ক—তাহার পরই চারিদিকে আলোকিত প্ল্যাটফর্ম—প্রকাণ্ড দোতলা স্টেশন – সেই পিয়ার্স সোপ, কিটিংস পাউডার, হলস্ ডিসটেম্পার, লিপটনের চা। আবদুল আজিজ হাকিমের রোশনেসেকাৎ, উৎকৃষ্ট দাদের মলম।

নিজের ছোট ক্যান্‌ভাসের সুটকেস ও ছোট বিছানাটা হাতে লইয়া অপু স্টেশনে নামিল—রাত অনেক, শহর সম্পূর্ণ অপরিচিত, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, ওয়েটিংরুম দোতলায়, রাত্রি সেখানে কাটানোই নিরাপদ মনে হইল।

সকালে উঠিয়া জিনিসপত্র স্টেশনে জমা দিয়া সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। অর্ধমাইল-ব্যাপী দীর্ঘ শোভাযাত্রা করিয়া সুসজ্জিত হস্তীপৃষ্ঠে সোনার হাওদায় কোন শাহাজাদী নগর ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন কি? দুধারে আবেদনকারী ও ওমরাহ্‌ দল আভূমি তসলীম করিয়া অনুগ্রহ ভিক্ষার অপেক্ষায় করজোড়ে খাড়া আছে কি? নব আগন্তুক নরেন্দ্রনাথ পাৎশা বেগমের কোন্‌ সরাইখানায় ধূমপানরত বৃদ্ধ পারশ্যদেশীয় শেখের নিকট পথের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল?

কিন্তু এ যে একেবারে কলিকাতার মতই সব! এমন কি মণিলাল জুয়েলার্সের বিজ্ঞাপন পর্যন্ত। দুজন লোক কলিকাতা হইতে বেড়াতে আসিয়াছিল, টাঙাভাড়া সস্তা পড়িবে বলিয়া তাহাকে তাহারা সঙ্গে লইবার প্রস্তাব করিল। কুতুবের পথে একজন বলিল, মশাই, আরও বার-দুই দিল্লী এসেছি, কুতুবের মুরগীর কাটলেট খান নি কখনও, না? আঃ—সে যা জিনিস, চলুন, এক ডজন কাটলেট অর্ডার দিয়ে তবে উঠব কুতুবমিনারে।

বাল্যকালে দেওয়ানপুরে পড়িবার সময় পুরানো দিল্লীর কথা পড়িয়া তাহার কল্পনা করিতে গিয়া বার বার স্কুলের পাশের একটা পুরাতন ইটখোলার ছবি অপুর মনে উদয় হইত, আজ অপু দেখিল পুরাতন দিল্লী বাল্যের সে ইঁটের পাঁজাটা নয়। কুতুবমিনার নতুন দিল্লী শহর হইতে যে এতদূরে তাহা সে ভাবে নাই। তদুপরি সে দেখিয়া বিস্মিত হইল, এই দীর্ঘ পথের দুধারে মরুভূমির মত অনুর্বর কাঁটাগাছ ও ফণিমনসার ঝোপে ভরা রৌদ্র-দগ্ধ প্রান্তরের এখানে ওখানে সর্বত্র ভাঙা বাড়ি, মিনার, মসজিদ, কবর, খিলান, দেওয়াল। সাতটা প্রাচীন মৃত রাজধানীর মূক কঙ্কাল পথের দুধারে উঁচুনিচু জমিতে বাবলাগাছ ও ও ক্যাক্‌টাস গাছের ঝোপ-ঝাপের আড়ালে হৃতগৌরব নিস্তব্ধতায় আত্মগোপন করিয়া আছে—পৃথ্বীরায় পিথোরার দিল্লী, লালকোট, দাসবংশের দিল্লী, তোগলকদের দিল্লী, আলাউদ্দীন খিলজীর দিল্লী, শিরি ও জাহানপনাহ্‌, মোগলদের দিল্লী। অপু জীবনে এ রকম দৃশ্য দেখে নাই, কখনো কল্পনাও করে নাই, সে অবাক হইল, অভিভূত হইল, নীরব হইয়া গেল, গাইড-বুক উল্টাইতে ভুলিয়া গেল, ম্যাপের নম্বর মিলাইয়া দেখিতে ভুলিয়া গেল—মহাকালের এই বিরাট শোভাযাত্রা একটার পর একটা বায়োস্কোপের ছবির মত চলিয়া যাইবার দৃশ্যে সে যেন সম্বিৎহারা হইয়া পড়িল। আরও বিশেষ হইল এই জন্য যে, মন তাহার নবীন আছে। কখনও কিছু দেখে নাই, চিরকাল আঁস্তাকুড়ের আবর্জনায় কাটাইয়াছে অথচ মন হইয়া উঠিয়াছে সর্বগ্রাসী, বুভুক্ষু। তাই সে যাহা দেখিতেছিল, তাহা যেন বাহিরের চোখটা দিয়া নয়, সে কোন্‌ তীক্ষ্ণদর্শী তৃতীয় নেত্র, যেটা না খুলিলে বাহিরের চোখের দেখাটা নিষ্ফল হইয়া যায়।

ঘুরিতে ঘুরিতে দুপুরের পর সে গেল কুতব হইতে অনেক দূরে গিয়াসুদ্দীন তোগলকের অসমাপ্ত নগর—তোগলকাবাদে। গ্রীষ্ম দুপুরের খররৌদ্রে তখন চারিধারের উষরভূমি আগুন-রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। দূর হইতে তোগলকাবাদ দেখিয়া মনে হইল যেন কোন দৈত্যের হাতে গাঁথা এক বিরাট পাষাণ-দুর্গ। তৃণ-বিরল উষরভূমি, পত্রহীন বাবলা ও কণ্টকময় ক্যাক্‌টাসের পটভূমিতে খররৌদ্রে সে যেন এক বর্বর অসুরবীর্য সু-উচ্চ পাষাণ দুর্গপ্রাচীর

হইতে সিন্ধু, কাথিয়াবাড়, মালব, পাঞ্জাব,—সারা আর্য্যাবর্ত্তকে ভ্রূকুটি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কোথাও সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের প্রচেষ্টা নাই বটে, নিষ্ঠুর বটে, রুক্ষ বটে, কিন্তু সবটা মিলিয়া এমন বিশালতার সৌন্দর্য্য, পৌরুষের সৌন্দর্য্য, বর্ব্বরতার সৌন্দর্য্য—যা মনকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করে, হৃদয়কে বজ্রমুষ্টিতে আঁকড়াইয়া ধরে। সব আছে, কিন্তু দেহে প্রাণ নাই, চারিধারে ধ্বংসস্তূপ, কাঁটাগাছ, বিশৃঙ্খলতা, বড় বড় পাথর গড়াইয়া উঠিবার পথ বুজাইয়া রাখিয়াছে—মৃতমুখের ভ্রূকুটি মাত্র।

সাধু নিজামউদ্দীনের অভিশাপ মনে পড়িল—ইয়ে বাসে গুজর, ইয়ে রাহে গুজর—

পৃথ্বীরায়ের দুর্গের চবুতরার উপর যখন সে দাঁড়াইয়া - হি-হি, কি মুশকিল, কি অদ্ভুতভাবে নিশ্চিন্দিপুরের সেই বনের ধারের ছিরে পুকুরটা এ দুর্গের সঙ্গে জড়িত হইয়া আছে, বাল্যে তাহারই ধারের শেওড়াবনে বসিয়া 'জীবন-প্রভাত' পড়িতে পড়িতে কতবার কল্পনা করিত, পৃথ্বীরায়ের দুর্গ ছিরে পুকুরের উঁচু ও-দিকের পাড়টার মত বুঝি। এখনও ছবিটা দেখিতে পাইতেছে—কতকগুলি গুগুলি শামুক, ও-পারের বাঁশঝাড়। যাক্, চবুতরার উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে দূরে পশ্চিম আকাশের চারিধারের মহাশ্মশানের উপর ধূসর ছায়া ফেলিয়া সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের কাহিনী আকাশের পটে আগুনের অক্ষরে লিখিয়া সূর্য্য অস্ত গেল। সে সব অতি পবিত্র, গোপনীয় মুহূর্ত্ত অপুর জীবনের - দেবতারা তখন কানে কানে কথা বলেন, তাহার জীবনে এরূপ সূর্য্যাস্ত আর ক'টা বা আসিয়াছে? ভয় ও বিস্ময় দুই-ই হইল, সারা গায়ে যেন কাঁটা দিয়া উঠিল, কি অপূর্ব্ব অনুভূতি! জীবনের চক্রবালনেমি এতদিন যে কত ছোট অপরিসর ছিল, আজকার দিনটির পূর্ব্বে তাহা জানিত না।

নিজামউদ্দীন আউলিয়ার মসজিদ প্রাঙ্গণে সম্রাট-দুহিতা জাহানারার তৃণাবৃত পবিত্র কবরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মসজিদ-দ্বারে ক্রীত দু-চার পয়সার গোলাপফুল ছড়াইতে ছড়াইতে অপুর অশ্রু বাধা মানিল না। ঐশ্বর্য্যের মধ্যে, ক্ষমতার দম্ভের মধ্যে লালিত হইয়াও পুণ্যবতী শাহাজাদীর এ দীনতা, ভাবুকতা, তাহার কল্পনাকে মুগ্ধ রাখিয়াছে চিরদিন। এখনও যেন বিশ্বাস হয় না যে, সে যেখানে দাঁড়াইয়া আছে সেটা সত্যই জাহানারার কবর-ভূমি। পরে সে মসজিদ হইতে একজন প্রৌঢ় মুসলমানকে ডাকিয়া আনিয়া কবরের শিরোদেশের মার্ব্বেল ফলকের সেই বিখ্যাত ফার্সী কবিতাটি দেখাইয়া বলিল, মেহেরবানি করকে পঢ়িয়ে, হাম লিখ লেঙ্গে।

প্রৌঢ়টি কিঞ্চিৎ বকশিশের লোভে খামখেয়ালী বাঙালী বাবুটিকে খুশী করার জন্য জোরে জোরে পড়িল—

বিজুস গ্যাহ্ কসে ন-পোশদ্ মজার ইমা-রা।
কি কবর্বপোষ্-ই-ঘরীবান্ হামিন্ মীগ্যাহ্ বস অস্ত্।

পরে সে কবি আমীর খসরুর কবরের উপরও ফুল ছড়াইল।

পরদিন বৈকালে শাহ্জাহানের লালপাথরের কেল্লা দেখিতে গিয়া অপরাহ্নের ধূসর ছায়ায় দেওয়ান-ই-খাসের পাশের খোলা ছাদে একখানা পাথরের বেঞ্চিতে বহুক্ষণ বসিয়া রহিল। মনে হইল এসব স্থানের জীবনধারার কাহিনী কেহ লিখিতে পারে নাই। গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, কবিতায় যাহা পড়িয়াছে, সে সবটাই কল্পনা, বাস্তবের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই। সে জেবউন্নিসা, সে উদিপুরী বেগম, সে মমতাজমহল, সে জাহানারা—আবাল্য যাহাদের সঙ্গে পরিচয়, সবগুলিই কল্পনা-সৃষ্ট প্রাণী, বাস্তবজগতের মমতাজ বেগম, উদিপুরী, জেবউন্নিসা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। কে জানে এখানকার সে সব রহস্যভরা ইতিহাস? মূক যমুনা তাহার সাক্ষী আছে, গৃহভিত্তির প্রতি পাষাণখণ্ড

তাহার সাক্ষী আছে, কিন্তু তাহারা তো কথা বলিতে পারে না !

তিনদিন পর সে বৈকালের দিকে কাট্‌নী লাইনের একটা ছোট্ট স্টেশনে নিজের বিছানা ও সুটকেসটা লইয়া নামিয়া পড়িল। হাতে পয়সা বেশী ছিল না বলিয়া প্যাসেঞ্জার ট্রেনে এলাহাবাদ আসিতে বাধ্য হয়—তাই এত দেরি। কয়দিন স্নান নাই, চুল রুক্ষ, উস্ক-খুস্ক—জোর পশ্চিমা বাতাসে ঠোঁট শুকাইয়া গিয়াছে।

ট্রেন ছাড়িয়া চলিয়া গেল। ক্ষুদ্র স্টেশন, সম্মুখে একটা ছোট্ট পাহাড়। দোকান-বাজারও চোখে পড়িল না।

স্টেশনের বাহিরের বাঁধানো চাতালে একটু নির্জ্জন স্থানে সে বিছানার বাণ্ডিলটা খুলিয়া পাতিল। কিছুই ঠিক নাই, কোথায় যাইবে, কোথায় শুইবে, মনে এক অপূর্ব্ব অজানা আনন্দ।

শতরঞ্জির উপর বসিয়া সে খাতা খুলিয়া খানিকটা লিখিল, পরে একটা সিগারেট খাইয়া সুটকেসটা ঠেস দিয়া চুপচাপ বসিয়া রহিল। টোকা মাথায় একজন গোঁড় যুবককে কাঁচা শালপাতার পাইপ খাইতে খাইতে কৌতূহলী-চোখের কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া অপু বলিল, উমেরিয়া হিঁয়াসে কেত্তা দূর হোগা ?

প্রথমবার লোকটা কথা বুঝিল না। দ্বিতীয়বারে ভাঙা হিন্দীতে বলিল, তিশ মীল্।

ত্রিশ মাইল রাস্তা! এখন সে যায় কিসে? মহা মুশকিল! জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, ত্রিশ মাইল পথের দুধারে শুধু বন আর পাহাড়। কথাটা শুনিয়া অপুর ভারি আনন্দ হইল। বন, কি রকম বন ? খুব ঘন ? বাঘ পর্য্যন্ত আছে ? বাঃ—কিন্তু এখন কি করিয়া যাওয়া যায় ?

কথায় কথায় গোঁড় লোকটি বলিল, তিন টাকা পাইলে সে নিজের ঘোড়াটা ভাড়া দিতে রাজী আছে।

অপু রাজী হইয়া ঘোড়া আনিতে বলাতে লোকটা বিস্মিত হইল। আর বেলা কতটুকু আছে, এখন কি জঙ্গলের পথে যাওয়া যায় ? অপু নাছোড়াবান্দা। সামনের এই সুন্দর জ্যোৎস্নাভরা রাত্রে জঙ্গলের পথে ঘোড়ায় চাপিয়া যাওয়ার একটা দুর্দ্দমনীয় লোভ তাহাকে পাইয়া বসিল—জীবনে এ সুযোগ কটা আসে, এ কি ছাড়া যায় ?

গোঁড় লোকটি জানাইল, আরও একটাকা খোরাকি পাইলে সে তল্পি বহিতে রাজী আছে। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে অপু ঘোড়ায় চড়িয়া রওনা হইল—পিছনে মোট-মাথায় লোকটা।

স্নিগ্ধ রাত্রি—স্টেশন হইতে অল্পদূরে একটা বস্তি, একটি পাহাড়ী নালা, বাঁক ঘুরিয়াই পথটা শাল-বনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। চারিধারে জোনাকি পোকা জ্বলিতেছে—রাত্রির অপূর্ব্ব নিস্তব্ধতা, ত্রয়োদশীর চাঁদের আলো শাল-পলাশের পাতার ফাঁকে ফাঁকে মাটির উপর যেন আলো-আঁধারের বুটি-কাটা জাল বুনিয়া দিয়াছে। অপু পাহাড়ী লোকটার নিকট হইতে একটা শালপাতার পাইপ ও সে-দেশী তামাক চাহিয়া লইয়া ধরাইল বটে, কিন্তু দু'টান দিতেই মাথা কেমন ঘুরিয়া উঠিল—শালপাতার পাইপটা ফেলিয়া দিল।

বন সত্যই ঘন—পথ আঁকা-বাঁকা, ছোট ঝরণা এখানে-ওখানে, উপল-বিছানো পাহাড়ী নদীর তীরে ছোট ফার্নের ঝোপ, কি ফুলের সুবাস, রাত্রিচর পাখির ডাক। নির্জ্জনতা, গভীর নির্জ্জনতা !

মাঝে-মাঝে সে ঘোড়াকে ছুটাইয়া দেয়, ঘোড়া-চড়া অভ্যাস তাহার অনেকদিন হইতে আছে। বাল্যকালে মাঠের ছুটা ঘোড়া ধরিয়া কত চড়িয়াছে, চাঁপদানীতেও ডাক্তারবাবুটির

ঘোড়ায় প্রায় প্রতিদিনই চড়িত।

সারারাত্রি চলিয়া সকাল সাড়ে সাতটায় উমেরিয়া পৌঁছিল। একটা ছোট গ্রাম,—পোস্টাফিস, ছোট বাজার ও কয়েকটা গালার আড়ত। ফরেস্ট রেঞ্জার ভদ্রলোকটির নাম অবনীমোহন বসু। তিনি তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন - আসুন, আসুন, আপনি পত্র দিলেন না, কিছু না, ভাবলুম বোধ হয় এখনও আসবার দেরি আছে—এতটা পথ এলেন রাতারাতি? ভয়ানক লোক তো আপনি!

পথেই একটা ছোট নদীর জলে স্নান করিয়া চুল আঁচড়াইয়া সে ফিট্‌ফাট হইয়া আসিয়াছে। তখনই চা খাবারের বন্দোবস্ত হইল। অপু লোকটিকে নিজের মনিব্যাগ শূন্য করিয়া চার টাকা দিয়া বিদায় দিল।

দুপুরের আহারের সময় অবনীবাবুর স্ত্রী দুজনকে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইলেন। অপু হাসিমুখে ব'লিল, এখানে আপনাদের জ্বালাতন করতে এলুম বৌঠাকরুণ!

অবনীবাবুর স্ত্রী হাসিয়া বলিলেন, -না এলে দুঃখিত হতাম আমরা কিন্তু জানি আপনি আসবেন। কাল ওঁকে বলছিলাম আপনার আসবার কথা, এমন কি আপনার থাকবার জন্যে সাহেবের বাংলোটা ঝাঁট দিয়ে ধুয়ে রাখার কথাও হ'ল— ওটা এখন খালি পড়ে আছে কিনা।

—এখানে আর কোন বাঙালী কি অন্য কোন দেশের শিক্ষিত লোক নিকটে নেই?

অবনীবাবু বলিলেন, আমার এক বন্ধু খুরিয়ার পাহাড়ে তামার খনির জন্যে প্রসপেকটিং করছেন -মিঃ রায়চৌধুরী, জিওলজিস্ট, বিলেতে ছিলেন অনেকদিন - তিনি ঐখানে তাঁবুতে আছেন—মাঝে মাঝে তিনি আসেন।

অল্প দিনেই ইঁহাদের সঙ্গে কেমন একটা সহজ মধুর সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিল যাহা কেবল এই সব স্থানে, এই সব অবস্থাতেই সম্ভব, কৃত্রিম সামাজিকতার হুমকি এখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক বন্ধুত্বের দাবিকে ঘাড় গুঁজিয়া থাকিতে বাধ্য করে না বলিয়াই। একদিন বসিয়া বসিয়া সে খেয়ালের বশে কাগজে একটা কথকতার পালা লিখিয়া ফেলিল। সেদিন সকালে চা খাইবার সময় বলিল, দিদি, আজ ও-বেলা আপনাদের একটা নতুন জিনিস শোনাব।

অবনীবাবুর স্ত্রীকে সে দিদি বলিতে শুরু করিয়াছে। তিনি সাগ্রহে ব'লিলেন, কি, কি বলুন না? আপনি গান জানেন—না? আমি অনেকদিন ওঁকে বলেছি আপনি গান জানেন।

—গানও গাইব, কিন্তু একটা কথকতার পালা শোনাব, আমার বাবার মুখে শোনা জড়ভরতের উপাখ্যান।

দিদির মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি হাসিয়া স্বামীকে কহিলেন, দেখলে গো - দ্যাখ! বলি নি আমি, গলার স্বর অমন, নিশ্চয়ই গান জানেন - খাটল না কথা?

দুপুরবেলা দিদি তাহাকে তাস খেলার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করিলেন।

—লেখা এখন থাক্‌। তাস জোড়াটা না খেলে খেলে পোকায় কেটে দিলে- এখানে খেলার লোক মেলে না—যখন ওঁর বন্ধু মিঃ রায়চৌধুরী আসেন তখন মাঝে-মাঝে খেলা হয়—আসুন আপনি। উনি, আর আপনি—

—আর একজন?

—আর কোথায়? আমি আর আপনি বসব—উনি, একা দু'হাত নিয়ে খেলবেন।

জ্যোৎস্না রাত্রে বাংলোর বারান্দাতে সে কথকতা আরম্ভ করিল। জড়ভরতের বাল্যজীবনের করুণ কাহিনী নিজেরই শৈশব-স্মৃতির ছায়াপাতে, সত্য ও পূত হইয়া উঠে, কাশীর

দশাশ্বমেধ ঘাটে বাবার গলার স্বর কেমন করিয়া অলক্ষিতে তাহার গলায় আসে—শালবনের পত্রমর্ম্মরে, নৈশপাখির গানের মধ্যে রাজর্ষি ভরতের সরল বৈরাগ্য ও নিস্পৃহ আনন্দ যেন প্রতি সুরমূর্চ্ছনাকে একটি অতি পবিত্র মহিমাময় রূপ দিয়া দিল। কথকতা থামিলে সকলেই চুপ করিয়া রহিল। অপু খানিকটা পর হাসিয়া বলিল—কেমন লাগল ?

অবনীবাবু একটু ধর্ম্মপ্রাণ লোক, তাঁহার খুবই ভাল লাগিয়াছে—কথকতা দু-একবার শুনিয়াছেন বটে; কিন্তু এ কি জিনিস ! ইহার কাছে সে সব লাগে না।

কিন্তু সকলের চেয়ে মুগ্ধ হইলেন অবনীবাবুর স্ত্রী। জ্যোৎস্নার আলোতে তাঁহার চোখে ও কপালে অশ্রু চিক্‌-চিক্‌ করিতেছিল। অনেকক্ষণ তিনি কোন কথা বলিলেন না। স্বদেশ হইতে দূরে এই নিঃসন্তান দম্পতির জীবনযাত্রা এখানে একেবারে বৈচিত্র্যহীন, বহুদিন এমন আনন্দ তাঁহাদের কেহ দেয় নাই।

দিন দুই পরে অবনীবাবুর বন্ধু মিঃ রায়চৌধুরী আসিলেন, ভারী মনখোলা ও অমায়িক ধরণের লোক, বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, কানের পাশে চুলে পাক ধরিয়াছে, বলিষ্ঠ গঠন ও সুপুরুষ। একটু অতিরিক্ত মাত্রায় মদ খান। জব্বলপুর হইতে হুইস্কি আনাইয়াছেন কিরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়া, খানিকক্ষণ তাহার বর্ণনা করিলেন। অবনীবাবুও যে মদ খান অপু তাহা ইতিপূর্ব্বে জানিত না। মিঃ রায়চৌধুরী অপুকে বলিলেন, আপনার গুণের কথা সব শুনলাম, অপূর্ব্ববাবু। সে আপনাকে দেখেই আমার মনে হয়েছে। আপনার চোখ দেখলে যে কোন লোক আপনাকে ভাবুক বলবে। তবে কি জানেন, আমরা হয়ে পড়েছি ম্যাটার-অব-ফ্যাক্ট। আজ আপনাকে আর একবার কথকতা করতে হবে, ছাড়চি নে আজ।

কথাবার্ত্তায়, গানে, হাসিখুশিতে সেদিন প্রায় সারারাত কাটিল। মিঃ রায়চৌধুরী চলিয়া যাইবার দিন তিনেক পরে একজন চাপরাসী তাঁহার নিকট হইতে অপুর নামে একখানা চিঠি আনিল। তাঁহার ওখানে একটা ড্রিলিং তাঁবুর তত্ত্বাবধানের জন্য একজন লোক দরকার। অপূর্ব্ববাবু কি আসিতে রাজী আছেন ? আপাতত মাসে পঞ্চাশ টাকা ও বাসস্থান। অপুর নিকট ইহা একেবারে অপ্রত্যাশিত। ভাবিয়া দেখিল, হাতে আনা দশেক পয়সা মাত্র অবশিষ্ট আছে, উঁহারা অবশ্য যতই আত্মীয়তা দেখান, গান ও কথকতা করিয়া চিরদিন তো এখানে কাটানো চলিবে না ? আশ্চর্য্যের বিষয়, এতদিন কথাটা আদৌ তাহার মনে উদয় হয় নাই যে কেন ?

মিঃ রায়চৌধুরীর বাংলো প্রায় মাইল-কুড়ি দূর। তিনদিন পরে ঘোড়া ও লোক আসিল। অবনীবাবু ও তাঁহার স্ত্রী অত্যন্ত দুঃখের সহিত তাহাকে বিদায় দিলেন। পথ অতি দুর্গম, উমেরিয়া হইতে তিন মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকে গেলেই ঘন জঙ্গলের মধ্যে ডুবিয়া যাইতে হয়। দুই-তিনটা ছোট ছোট পাহাড়ী নদী, আবার ছোট ছোট ফার্ন ঝোপ, ঝরণা—একটার জলে অপু মুখ ধুইয়া দেখিল জলে গন্ধকের গন্ধ। পাহাড়িয়া করবী ফুটিয়া আছে, বাতাস নবীন মাদকতায় ভরা, খুব স্নিগ্ধ, এমন কি যেন একটু গা সির্‌-সির্‌ করে—এই চৈত্র মাসেও।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে সে গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া গেল। খনির কার্য্যকারিতা ও লাভালাভের বিষয় এখনও পরীক্ষাধীন, মাত্র খান চার-পাঁচ চওড়া খড়ের ঘর। দুইটা বড় বড় তাঁবু, কুলীদের থাকিবার ঘর, একটা অফিস ঘর। সবসুদ্ধ আট-দশ বিঘা জমির উপর সব। চারিধার ঘেরিয়া ঘন, দুর্গম অরণ্য, পিছনে পাহাড়, আবার পাহাড়।

মিঃ রায়চৌধুরী বলিলেন—খুব সাহস আছে আপনার তা আমি বুঝেছি যখন শুনলাম আপনি রাত্রে ঘোড়ায় চড়ে উমেরিয়া এসেছিলেন। ও পথে রাত্রে এদেশের লোকও যেতে সাহস পায় না।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

অপুর এক সম্পূর্ণ নতুন জীবন শুরু হইল এ-দিনটি হইতে। এমন এক জীবন, যাহা সে চিরকাল ভালবাসিয়াছে, যাহার স্বপ্ন দেখিয়া আসিয়াছে। কিন্তু কোনদিন যে হাতের মুঠায় নাগাল পাওয়া যাইবে তাহা ভাবে নাই।

তাহাকে যে ভিন্ন তাঁবুর তত্ত্বাবধানে থাকিতে হইবে, তাহা এখান হইতে আরও সতেরো-আঠারো মাইল দূরে। মিঃ রায়চৌধুরী নিজের একটা ঘোড়া দিয়া তাহাকে পরদিনই কর্মস্থানে পাঠাইয়া দিলেন। নতুন স্থানে আসিয়া অপু অবাক্ হইয়া গেল। বন ভালবাসিলে কি হইবে, এ ধরণের বন কখনও দেখে নাই। নিবিড় বনানীর প্রান্তে উচ্চ তৃণ-ভূমি, তারই মধ্যে খড়ের বাংলোঘর, একটা পাতকুয়া, কুলীদের বাশের খুপড়ি, পিছনে ও দক্ষিণে পাহাড়, সেদিকের ঘন বন কত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত তাহা চোখে দেখিয়া আন্দাজ করা যায় না—ক্রোশের পর ক্রোশ ধরিয়া পাহাড়, একটার পিছনে আর একটা, আর গভীর জনমানবহীন অরণ্য, সীমা নাই, কূল-কিনারা নাই। চারিদিকের দৃশ্য অতি গম্ভীর। তাঁবুর ঠিক পিছনেই পাহাড় শ্রেণীর একটা স্থান আবার অনাবৃত, বেজায় খাড়া ও উঁচু—বিরাটকায় নগ্ন গ্রানাইট্ চূড়াটা বৈকালের শেষ রোদে কখনও দেখায় রাঙা, কখনও ধূসর, কখনও ঈষৎ তাম্রাভ কালো রংয়ের—এরূপ গম্ভীর-দৃশ্য আরণ্যভূমির কল্পনাও জীবনে সে করে নাই কখনও!

অপুর সারাদিনের কাজও খুব পরিশ্রমের, সকালে স্নানের পর কিছু খাইয়াই ঘোড়ায় উঠিতে হয়, মাইল চারেক দূরের একটা জায়গায় কাজ তদারক করিবার পর প্রায়ই মিঃ রায়-চৌধুরীর ষোলো মাইল দূরবর্তী তাঁবুতে গিয়া রিপোর্ট করিতে হয়—তবে সেটা রোজ নয়, দু'দিন অন্তর অন্তর। ফিরিতে কোন দিন হয় সন্ধ্যা, কোন দিন বা রাত্রি এক প্রহর দেড় প্রহর। সবটা মিলিয়া কুড়ি-পঁচিশ মাইলের চক্র, পথ কোথাও সমতল, কোথাও ঢালু, কোথাও দুর্গম। ঢালুটাতে জঙ্গল আছে তবে তার তলা অনেকটা পরিষ্কার, ইংরাজীতে যাকে বলে open forest—কিন্তু পোয়াটাক পথ যাইতে না যাইতে সে মানুষের জগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া ঘন অরণ্যের নির্জনতার মধ্যে একেবারে ডুবিয়া যায়—সেখানে জন নাই, মানুষ নাই, চারিপাশে বড় বড় গাছ, ডালে পাতায় নিবিড় জড়াজড়ি, পথ নাই বলিলেও হয়, কখনও ঘোড়া চালাইতে হয় পাহাড়ী নদীর শুষ্ক খাত বাহিয়া, কখনও গভীর জঙ্গলের দুর্ভেদ্য বেত-বন ঠেলিয়া—যেখানে বন্যশূকর বা সম্বর হরিণের দল যাতায়াতের সুঁড়ি পথ তৈরি করিয়াছে সে পথে। কত ধরণের গাছ, লতা, গাছের ডালে এখানে-ওখানে বিচিত্র রঙয়ের অর্কিড, নিচে ম্যাজোলিয়ার হলুদ ফুল ফুটিয়া প্রভাতের বাতাসকে গন্ধভরাক্রান্ত করিয়া তোলে। ঘোড়া চালাইতে চালাইতে অপুর মনে হয় সে যেন জগতে সম্পূর্ণ একা, সারা দুনিয়ার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নাই—শুধু আছে সে, আর তাহার ঘোড়াটি ও চারিপাশের এই অপূর্বদৃষ্ট বিজন বন! আর কি নির্জনতা! কলিকাতার বাসায় নিজের বন্ধ-দুয়ার ঘরটার কৃত্রিম নির্জনতা নয়, এ ধরণের নির্জনতার সঙ্গে তাহার কখনও পরিচয় ছিল না। এ নির্জনতা বিরাট, অদ্ভুত, এমন কিছু, যাহা পূর্ব হইতে ভাবিয়া অনুমান করা যায় না, অভিজ্ঞতার অপেক্ষা রাখে।

ভারী পছন্দ হয় এ জীবন, গল্পের বইয়ে-টইয়ে যে রকম পড়িত, এ যেন ঠিক তাহাই। খোলা জায়গা পাইলেই ঘোড়া ছাড়িয়া দেয়, গতির আনন্দে সারা দেহে একটা উত্তেজনা আসে। খানাখন্দ, শিলা, পাইওরাইটের স্তূপ কে মানে? নত শাল-শাখা এড়াইয়া দোদুল্যমান অজানা লতার পাশ কাটাইয়া পৌরুষ-ভরা উদ্দামতার আনন্দে তীরবেগে ঘোড়া উড়াইয়া চলে।

ঠিক এই সব সময়েই তাহার মনে পড়ে—প্রায়ই মনে পড়ে—শীলেদের অফিসের সেই তিনবৎসর-ব্যাপী বন্ধ, সংকীর্ণ, অন্ধকার কেরানী-জীবনের কথা। কখনও চোখ বুজিলে অফিসটা সে দেখিতে পায়, বাঁয়ে নৃপেন টাইপিস্ট বসিয়া খট-খট করিতেছে, রামধন নিকাশনবিস বসিয়া খাতাপত্র লিখিতেছে, সেই বাঁধানো মোটা ফাইলের দপ্তরটা—নিকাশনবিসের পিছনের দেওয়াল চুন-বালি খসিয়া দেখিতে হইয়াছে যেন একটি পূজা-নিরত পুরুতঠাকুর। রোজ সে ঠাট্টা করিয়া বলিত, 'ও রামধনবাবু, আপনার পুরুতঠাকুর আজ ফুল ফেলবেন না ?' উঃ সে কি বন্ধতা—এখন যেন সে-সব একটা দুঃস্বপ্নের মত মনে হয়।

সারাদিনের পরিশ্রমের পর সে বাংলোয় ফিরিয়া পাতকুয়ার ঠাণ্ডা জলে স্নান করিয়া একপ্রকার বন্য লেবুর রস মিশানো চিনির শরবত খায় গরমের দিনে, শরীর যেন জুড়াইয়া যায়—তার পরই রামচরিত মিশ্র আসিয়া রাত্রের খাবার দিয়া যায়—আটার রুটি, কুমড়া বা ঢ্যাঁড়সের তরকারী ও অড়হরের ডাল। বারো-তেরো মাইল দূরের এক বস্তি হইতে জিনিস-পত্র সপ্তাহ অন্তর কুলীরা লইয়া আসে—মাছ একেবারেই মেলে না, মাঝে-মাঝে অপু পাখি শিকার করিয়া আনে। একদিন সে বনের মধ্যে এক হরিণকে বন্দুকের পাল্লার মধ্যে পাইয়া অবাক হইয়া গেল—বড়শিঙ্গা কিংবা সম্বর হরিণ ভারী সতর্ক, মানুষের গন্ধ পাইলে তার ত্রিসীমানায় থাকে না—কিন্তু তাহার ঘোড়ার বারো-গজের মধ্যে এ হরিণটা আসিল কিরূপে? খুশী ও আগ্রহের সহিত বন্দুক উঠাইয়া লক্ষ্য করিতে গিয়া সে দেখিল লতাপাতার আড়াল হইতে শুধু মুখটি বাহির করিয়া হরিণটিও অবাক চোখে তাহার দিকে চাহিয়া আছে—ঘোড়ায় চড়া মানুষ দেখিয়া ভাবিতেছে হয়ত, এ আবার কোন্ জীব!···হঠাৎ অপুর বুকের মধ্যটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল—হরিণের চোখ দুটি যেন তাহার খোকার চোখের মত! অমনি ডাগর ডাগর, অমনি অবোধ, নিষ্পাপ : সে উদ্যত বন্দুক নামাইয়া তখনি টোটাগুলি খুলিয়া লইল। এখানে যতদিন ছিল, আর কখনও শিকারের চেষ্টা করে নাই।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হয় সন্ধ্যার পরেই, তার পরে সে নিজের খড়ের বাংলোর কম্পাউণ্ডে চেয়ার পাতিয়া বসে।—অপূর্ব নিস্তব্ধতা! অস্পষ্ট জ্যোৎস্না ও আঁধারে পিছনকার পাহাড়ের গম্ভীরদর্শন অনাবৃত গ্রানাইট প্রাচীরটা কি অদ্ভুত দেখায়! শালকুসুমের সুবাসভরা অন্ধকার, মাথার উপরকার আকাশে অগণিত নৈশ নক্ষত্র। এখানে অন্য কোন সাথী নাই, তাহার মন ও চিন্তার উপর অন্য কাহারও দাবী-দাওয়া নাই, উত্তেজনা নাই, উৎকণ্ঠা নাই—আছে শুধু সে, আর এই বিশাল অরণ্য প্রকৃতির কর্কশ, বন্ধুর, বিরাট সৌন্দর্য্য আর আছে এই নক্ষত্রভরা নৈশ আকাশটা।

বাল্যকাল হইতেই সে আকাশ ও গ্রহ-নক্ষত্রের প্রতি আকৃষ্ট। কিন্তু এখানে তাদের এ কি রূপ! কুলীরা সকাল সকাল খাওয়া সারিয়া ঘুমাইয়া পড়ে—রামচরিত মিশ্র মাঝে মাঝে অপুকে সাবধান করিয়া দেয়, তাম্বুকা বাহার মৎ বৈঠিয়ে বাবুজী—শেরকা বড়া ডর হ্যায়—পরে সে কাঠকুটা জ্বালিয়া প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড করিয়া গ্রীষ্মের রাত্রেও বসিয়া আগুন পোহায়—অবশেষে সেও যাইয়া শুইয়া পড়ে, তাহার অগ্নিকুণ্ড নিভিয়া যায়—স্তব্ধ রাত্রি, আকাশ অন্ধকার···পৃথিবী অন্ধকার···আকাশে বাতাসে অদ্ভুত নীরবতা, আবলুসের ডালপাতার ফাঁকে দু-একটা তারা যেন অসীম রহস্যভরা মহাব্যোমের বুকের স্পন্দনের মত দিপ্‌দিপ্ করে, বৃহস্পতি স্পষ্টতর হয়, উত্তর-পূর্ব কোণের পর্ব্বতসানুর বনের উপরে কালপুরুষ উঠে, এখানে-ওখানে অন্ধকারের বুকে আগুনের আঁচড় কাটিয়া উল্কাপিণ্ড খসিয়া পড়ে। রাত্রি গভীর হইবার সঙ্গে সঙ্গে নক্ষত্রগুলো কি অদ্ভুতভাবে স্থান পরিবর্ত্তন করে! আবলুস ডালের ফাঁকের তারাগুলো ক্রমশঃ নিচে নামে, কালপুরুষ ক্রমে পর্ব্বতসানুর দিক হইতে

মাথার উপরকার আকাশে সরিয়া আসে, বিশালকায় ছায়াপথটা তেরছা হইয়া ঘুরিয়া যায়, বৃহস্পতি পশ্চিম আকাশে ঢলিয়া পড়ে। রাত্রির পর রাত্রি এই গতির অপূর্ব্ব লীলা দেখিতে দেখিতে এই শান্ত সনাতন জগৎটা যে কি ভয়ানক রুদ্র গতিবেগ প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে তাহার স্নিগ্ধতা ও সনাতনত্বের আড়ালে, সে সম্বন্ধে অপুর মন সচেতন হইয়া উঠিল—অদ্ভুতভাবে সচেতন হইয়া উঠিল। জীবনে কখনও তাহার এত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় নাই বিশাল নক্ষত্র-জগৎটার সঙ্গে, এভাবে হইবার আশাও কখনও কি ছিল?

অপুর বাংলো-ঘরের পিছনে ও দক্ষিণে পাহাড়, পিছনকার পাহাড়তলী আধমাইলের কম, দক্ষিণের পাহাড় মাইল দুই দূরে। সামনের বহুদূর বিস্তৃত উঁচুনীচু জমিটা শাল ও পপরেল চারা ও এক প্রকার অর্ধশুষ্ক তৃণে ভরা অনেক দূর পর্যন্ত খোলা। সারা পশ্চিম দিক্‌চক্রবাল জুড়িয়া বহুদূরে বিন্ধ্য পর্ব্বতের নীল অস্পষ্ট সীমারেখা, ছিন্দওয়ারা ও মহাদেও শৈলশ্রেণী—পশ্চিমা বাতাসের ধুলা-বালি যেদিন আকাশকে আবৃত না করে সেদিন বড় সুন্দর দেখায়। মাইল এগারো দূরে নর্ম্মদা বিজন বনপ্রান্তরের মধ্যে দিয়া বহিয়া চলিয়াছে, খুব সকালে ঘোড়ায় উঠিয়া স্নান করিতে গেলে বেলা নয়টার মধ্যে ফিরিয়া আসা যায়।

দক্ষিণে পর্ব্বতসানুর ঘন বন নিবিড়, জনমানবহীন, রুক্ষ ও গম্ভীর। দিনের শেষে পশ্চিম গগন হইতে অস্ত-সূর্য্যের আলো পড়িয়া পিছনের পাহাড়ের যে অংশটা খাড়া ও অনাবৃত, তাহার গ্রানাইট্‌ দেওয়ালটা প্রথমে হয় হলুদে, পরে হয় মেটে সিঁদুরের রং, পরে জরদা রঙের হইতে হইতে হঠাৎ ধূসর ও তারপরেই কালো হইয়া যায়। ওদিক দিগন্তলক্ষ্মীর ললাটে আলোর টিপের মত সন্ধ্যাতারা ফুটিয়া উঠে, অরণ্যানী ঘন অন্ধকারে ভরিয়া যায়, শাল ও পাহাড়ী বাঁশের ডালাপালায় বাতাস লাগিয়া একপ্রকার শব্দ হয় রামচরিত ও জহুরী সিং নেকড়ে বাঘের ভয়ে আগুন জ্বালে, চারিধারে শিয়াল ডাকিতে শুরু করে, বন-মোরগ ডাকে অন্ধকার আকাশে দেখিতে দেখিতে গ্রহ, তারা, জ্যোতিষ্ক, ছায়াপথ একে একে দেখা দেয়। পৃথিবী, আকাশ-বাতাস অপূর্ব্ব রহস্যভরা নিস্তব্ধতায় ভরিয়া আসে, তাঁবুর পাশের দীর্ঘ ঘাসের বন দুলাইয়া এক একদিন বন্যবরাহ পলাইয়া যায়, দূরে কোথায় হায়েনা উন্মাদের মত হাসিয়া উঠে, গভীর রাত্রে কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা চাঁদ পাহাড়ের পিছন হইতে ধীরে ধীরে উঠিতে থাকে, এ যেন সত্যই গল্পের বইয়ে-পড়া জীবন।

এক এক দিন বৈকালে সে ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে যায়। শুধুই উঁচু-নীচু অর্ধশুষ্ক তৃণভূমি, ছোটবড় শিলাখণ্ড ছড়ানো, মাঝে মাঝে শাল ও বাদাম গাছ। আর এক জাতীয় বড় বন্য গাছের কি অপূর্ব্ব আঁকাবাঁকা ডালপালা, চৈত্রের রৌদ্রে পাতা ঝরিয়া গিয়াছে, নীল আকাশের পটভূমিতে পত্রশূন্য ডালপালা যেন ছবির মত দেখা যায়। অপুর তাঁবু হইতে মাইল-তিনেক দূরে একটা ছোট পাহাড়ী নদী আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে, অপু তাহার নাম রাখিয়াছে বক্রতোয়া। গ্রীষ্মকালে জল আদৌ থাকে না, তাহারই ধারে একটা শাল-ঝাড়ের নিচের একখানা পাথরের উপর সে এক একদিন গিয়া বসে, ঘোড়াটা গাছের ডালে বাঁধিয়া রাখে—স্থানটা ঠিক ছবির মত।

স্বর্ণাভ বালুর উপর অন্তর্হিত বন্যনদীর উপর-ঢাকা চরণ-চিহ্ন—হাত কয়েক মাত্র প্রশস্ত নদীখাত, উভয় তীরই পাষাণময়, ওপারে কঠিন ও দানাদার কোয়ার্ট্‌জাইট্‌ ও ফিকে হলুদে রঙের বড় বড় পাথরের চাঁইয়ে ভরা, অতীত কোন্‌ হিম-যুগের তুষার নদীর শেষ প্রবাহে ভাসিয়া আসিয়া এখানে হয়ত আটকাইয়া গিয়াছে, সোনালী রঙের নদী-বালু হয়ত সুবর্ণ-রেণু মিশানো, অস্ত সূর্য্যের রাঙা আলোয় অত চক্‌-চক্‌ করে কেন নতুবা? নিকটে সুগন্ধ-লতা-কস্তুরীর জঙ্গল, খরবৈশাখী রৌদ্রে শুষ্ক শুঁটিগুলি ফাটিয়া মৃগনাভির গন্ধে

অপরাহ্নের বাতাস ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। বরুতোয়া হইতে খানিকটা দূরে ঘন বনের মধ্যে পাহাড়ের গায়ে একটা ছোট ঝরণা, যেন উঁচু চৌবাচ্চা ছাপাইয়া জল পড়িতেছে এমন মনে হয়। নিচের একটা খাতে গ্রীষ্মদিনেও জল থাকে। রাত্রে ওখানে হরিণদের দল জল খাইতে আসে শুনিয়া অপু কতবার দেড় প্রহর রাত্রে ঘোড়ায় চড়িয়া সেখানে গিয়াছে, কখনও দেখে নাই। গ্রীষ্ম গেল, বর্ষাও কাটিল, শরৎকালে বন্য শেফালিবনে অজস্র ফুল ফুটিল, বরুতোয়ার শাল-ঝাড়টার কাছে বসিলে তখনও ঝরণার শব্দ পাওয়া যায়—এমন সময়ের এক জ্যোৎস্না-রাত্রে সে জহুরী সিংকে সঙ্গে লইয়া জায়গাটাতে গেল। দশমীর জ্যোৎস্না ডালে-পাতায়, পাহাড়ী বাদাম বনের মাথায়—স্নিগ্ধ বাতাসে শেফালির ঘন মিষ্ট গন্ধ। এই জ্যোৎস্না-মাখা বনভূমি, এই রাত্রির স্তব্ধতা, এই শিশিরার্দ্র নৈশ বায়ু—এরা যেন কত কালের কথা মনে করাইয়া দেয়, যেন দূরে কোনও জন্মান্তরের কথা।

হরিণের দল কিন্তু দেখা গেল না।

এই সব নির্জ্জন স্থানে অপু দেখিল মনের ভাব সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়। শহরে বা লোকালয়ে যে-মন আত্মসমস্যা লইয়া ব্যাপৃত থাকে, ambition লইয়া ব্যস্ত থাকে, এখানকার উদার নক্ষত্রখচিত আকাশের তলায় সে-সব আশা, আকাঙ্ক্ষা, সমস্যা অতি তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। মন আরও ব্যাপক হয়, উদার হয়, দ্রষ্টা হয়, angle of vision একদম বদলাইয়া যায়। এই জন্য অনেক অনেক বই-ই গার্হস্থ্য সমাজে যা খুব ঘোরতর সমস্যামূলক ও প্রয়োজনীয় ও উপাদেয়—এখানকার নিঃসঙ্গ ও বিশ্বতোমুখী জীবনে তা অতি খেলো, রসহীন ও অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। এখানে ভাল লাগে সেই সব, যাহা শাশ্বত কালের। এই অনন্তের সঙ্গে যাহার যোগ আছে। অপুর সেই গ্রহবিজ্ঞানের বইখানা যেমন—এখন যেন তাদের নতুন অর্থ হয়। এত ভাবিতে শেখায়! চৈতন্যের কোন্ নতুন দ্বার যেন খুলিয়া যায়।

ফাল্গুন মাসে একজন ফরেস্ট সার্ভেয়ার আসিয়া মাইল দশেক দূরে বনের মধ্যে তাঁবু ফেলিলেন। অপু তাঁহার সহিত ভাব করিয়া ফেলিল। মাদ্রাজী ভদ্রলোক, বেশ লেখাপড়া জানা। অপু প্রায়ই সন্ধ্যাটা সেখানে কাটাইত, চা খাইত, গল্পগুজব করিত, ভদ্রলোক থিওডোলাইট্ পাতিয়া এ-নক্ষত্র ও-নক্ষত্র চিনাইয়া দিতেন, এক একদিন আবার দুপুরে নিমন্ত্রণ করিয়া একরকম ভাতের পিঠা খাওয়াইতেন, অপু সকালে উঠিয়া যাইত, দুপুরের পর খাওয়া সারিয়া ঘোড়ায় নিজের তাঁবুতে ফিরিত।

ফিরিবার পথে ডানদিকের পাহাড়ী ঢালুতে বহুদূর ব্যাপিয়া শীতের শেষে লোহিয়া ও বিজনির ফুলের বন। ঘোড়া থামাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিত, তাঁবুতে ফিরিবার কথা ভুলিয়া যাইত। যে কখনও এমন নির্জ্জন আরণ্যভূমিতে—যেখানে ক্রোশের পর ক্রোশ যাও লোক নাই, জল নাই, গ্রাম নাই, বস্তি নাই—সে-সব স্থানের মুক্ত আকাশের তলে কঠিন ব্যালাস্ট্ কি গ্রানাইটের রুক্ষ পর্ব্বত-প্রাচীরের ছায়ায়, নিম্নভূমিতে, ঢালুতে ঝাঁ-ঝাঁ দুপুরে রাশি রাশি অগণিত বেগুনি জরদা ও শ্বেতাভ হলুদ রঙের বন্য লোহিয়া ও বিজনির ফুলের বন না দেখিয়াছে—তাহাকে এ দৃশ্যের ধারণা করানো অসম্ভব হইবে। এমন কত শত বৎসর ধরিয়া প্রতি বসন্তে রাশি-রাশি ফুল ফুটিয়া ঝরিতেছে, কেহ দেখিবার নাই, শুধু ভোমরা ও মৌমাছিদের মহোৎসব।

একদিন অমর-কণ্টক দেখিতে যাইবার জন্য অপু মিঃ রায়চৌধুরীর নিকট ছুটি চাহিল। মনটা ইহার আগে অত্যন্ত উতলা হইয়াছিল, কেন যে উতলা হইল, কারণটা কিছুতেই ভাল ধরিতে পারিল না। ভাবিল এই সময় একবার ঘুরিয়া আসিবে।

মিঃ রায়চৌধুরী শুনিয়া বলিলেন—যাবেন কিসে? পথ কিন্তু অত্যন্ত খারাপ, এখান থেকে প্রায় আশি মাইল দূরে হবে, এর মধ্যে ষাট মাইল ডেন্‌স্ ভার্জিন ফরেস্ট—বাঘ, ভালুক, নেকড়ের দল সব আছে। বিনা বন্দুকে যাবেন না, ঘোড়া সহিস নিয়ে যান—রাত হবার আগে আশ্রয় নেবেন কোথাও—সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়ার বাঘ, রসগোল্লাটির মত লুফে নেবে নইলে। ঐ জন্যে কত দিন আপনাকে বারণ করেছি এখানেও সন্ধ্যের পর তাঁবুর বাইরে বসবেন না—বা অন্ধকারে বনের পথে একা ঘোড়া চালাবেন না—তা আপনি বড্ড রেক্‌লেস।

তখন সে উৎসাহে পড়িয়া বিনা ঘোড়াতেই বাহির হইল বটে, কিন্তু দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার সময় সে নিজের ভুল বুঝিতে পারিল—ধারালো পাথরের নুড়িতে জুতার তলা কাটিয়া চিরিয়া গেল, অতদূর পথ হাঁটিবার অভ্যাস নাই, পায়ে এক বিরাট ফোস্কা উঠিয়াছে। পিছনে রামচরিত বোঁচকা লইয়া আসিতেছিল, সে সমানে পথ হাঁটিয়া চলিয়াছে, মুখে কথাটি নাই। বহু দূরের একটা পাহাড় দেখাইয়া বলিল, ওর পাশ দিয়া পথ। পাহাড়টা ধোঁয়া ধোঁয়া দেখা যায়, বোঝা যায় না, মেঘ না পাহাড়—এত দূরে। অপু ভাবিল পায়ে হাঁটিয়া অতদূরে সে যাইবে ক'দিনে?

এ ধরণের ভীষণ আরণ্যভূমি, অপুর মনে হইল এ অঞ্চলে এতদিন আসিয়াও সে দেখে নাই। সে যেখানে থাকে, সেখানকার বন ইহার তুলনায় শিশু, নিতান্ত অবোধ শিশু। দুপুরের পর যে বন শুরু হইয়াছে তাহা এখনও শেষ হয় নাই, অথচ সন্ধ্যা হইয়া আসিল।

অন্ধকার নামিবার আগে একটা উঁচু পাহাড়ের উপরকার চড়াই পথে উঠিতে হইল—উঠিয়াই দেখা গেল—সর্ব্বনাশ, সামনে আবার ঠিক এমনি আর একটা পাহাড়। অপুর পায়ের ব্যথাটা খুব বাড়িয়াছিল, তৃষ্ণাও পাইয়াছিল বেজায়—অনেকক্ষণ হইতে জলের সন্ধান মেলে নাই, আবলুস গাছের তলা বিছাইয়া অম্লমধুর কেঁদফল পড়িয়া ছিল—সারা দুপুর তাহাই চুষিতে চুষিতে কাটিয়াছে কিন্তু জল অভাবে আর চলে না।

দূরে দূরে, উত্তরে ও পশ্চিমে নীল পর্ব্বতমালা। নিম্নের উপত্যকার ঘন বনানী সন্ধ্যার ছায়ায় ধূসর হইয়া আসিতেছে, সরু পথটা বনের মধ্য দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া নামিয়া গিয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয়, সম্মুখের পাহাড়টার ওপারে এক মাইলের মধ্যে বন-বিভাগের একটা ডাকবাংলো পাওয়া গেল। চা'রধারে নিবিড় শালবন, মধ্যে ছোট্ট খড়ের ঘর। খাল ও বন বিভাগের লোকেরা মাঝে মাঝে রাত্রি কাটায়।

এ রাত্রির অভিজ্ঞতা ভারি অদ্ভুত ও বিচিত্র। বাংলোতে অপুরা একটি প্রৌঢ় লোককে পাইল, সে ইহারই মধ্যে ঘরে খিল দিয়া বসিয়া কি পড়িতেছিল, ডাকাডাকিতে উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল লোকটা মৈথিলী ব্রাহ্মণ, নাম আজবলাল ঝা। বয়স ষাট বা সত্তর হইবে। সে সেই রাত্রে নিজের ভাণ্ডার হইতে আটা ঘৃত বাহির করিয়া আনিয়া অপুর নিষেধ সত্ত্বেও উৎকৃষ্ট পুরি ভাজিয়া আনিল—পরে অতিথি-সৎকার সারিয়া সে ঘরের মধ্যে বসিয়া সুস্বরে সংস্কৃত রামায়ণ পড়িতে আরম্ভ করিল। কিছু পরেই অপু বুঝিল লোকটা সংস্কৃত ভাল জানে—নানা কাব্য উত্তমরূপে পড়িয়াছে। নানা স্থান হইতে শ্লোক মুখস্থ বলিতে লাগিল—কাব্যচর্চ্চায় অসাধারণ উৎসাহ, তুলসীদাসী রামায়ণ হইতে অনর্গল দোঁহা আবৃত্তি করিয়া যাইতে লাগিল।

ক্রমে ওঝাজী নিজের কাহিনী বলিল। দেশ ছিল দ্বারভাঙা জেলায়। সেখানেই শৈশব কাটে, তের-বৎসর বয়সে উপনয়নের পর এক বেনিয়ার কাছে চাকরি লইয়া কাশী আসে। পড়াশুনা সেইখানেই—তারপরে কয়েক জায়গায় টোল খুলিয়া ছাত্র পড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিল—কোথাও সুবিধা হয় নাই। পেটের ভাত জুটে না, নানা স্থানে ঘুরিবার পর এই ডাকবাংলোয় আজ সাত-আট বছর বসবাস করিতেছে। লোকজন বড় এখানে কেহ আসে

না, কালেভদ্রে এক-আধ জন, সে-ই একা থাকে, মাঝে মাঝে তের মাইল দূরের বস্তি হইতে খাবার জিনিস ভিক্ষা করিয়া আনে, বেশ চলিয়া যায়। সে আছে আর আছে তার কাব্যগ্রন্থগুলি—তার মধ্যে দুখানা হাতে-লেখা পুঁথি, মেঘদূত ও কয়েক সর্গ ভট্টি।

অপুর এত সুন্দর লাগিল এই নিরীহ, অদ্ভুত প্রকৃতির লোকটির কথাবার্ত্তা ও তাহার আগ্রহভরা কাব্যপ্রীতি—এই নির্জন বনবাসেও একটা শান্ত সন্তোষ। তবে লোকটি যেন একটু বেশী বকে, বিদ্যাটি যেন বেশী জাহির করিতে চায়—কিন্তু এত সরলভাবে করে যে, দোষ ধরাও যায় না। অপু বলিল—পণ্ডিতজী, আপনাকে এখানে থাকতে দেয়, কেউ কিছু বলে না?

—না বাবুজী, নাগেশ্বরপ্রসাদ বলে একজন ইঞ্জিনীয়ার আছেন, তিনি আমাকে খুব মানেন, সেই জন্যে কেউ কিছু বলে না।

কথায় কথায় অপু বলিল—আচ্ছা পণ্ডিতজী, এ বন কি অমর-কণ্টক পর্য্যন্ত এমনি ঘন?

—বাবুজী, এই হচ্ছে প্রসিদ্ধ বিন্ধ্যারণ্য। অমর-কণ্টক ছাড়িয়ে বহুদূর পর্য্যন্ত বন, এমনি ঘন—চিত্রকূট ও দণ্ডকারণ্য এই বনের পশ্চিমদিকে। এর বর্ণনা শুনুন তবে নৈষধচরিতে—দময়ন্তি রাজ্যভ্রষ্ট নলের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পরে এই বনে পথ হারিয়ে ঘুরেছিলেন—ঋক্ষবান্‌ পর্ব্বতের পাশের পথ দিয়ে তিনি বিদর্ভ দেশে যান। রামায়ণেও এই বনের বর্ণনা শুনবেন অরণ্যকাণ্ডে। শুনুন তবে।

অপু ভাবিল লোকটা বর্ত্তমানের কোনও ধার ধারে না, প্রাচীন শিক্ষা-দীক্ষায় একেবারে ডুবিয়া আছে—সব কথায় পুরাণের কথা আনিয়া ফেলে। লোকটিকে ভারি অদ্ভুত লাগিতেছিল—সারাজীবন এখানে-ওখানে ঘুরিয়া কিছুই করিতে পারে নাই—এই বনবাসে নিজের প্রিয় পুঁথিগুলি লইয়া বৎসরের পর বৎসর কাটাইয়া চলিয়াছে, কোন দুঃখ নাই, কষ্ট নাই। এ ধরণের লোকের দেখা মেলে না বেশী।

ওঝাজী সুস্বরে রামায়ণের বনবর্ণনা পড়িতেছিল। কি অদ্ভুতভাবে যে চারিপাশের দৃশ্যের সঙ্গে খাপ খায়। নির্জন শালবনে অস্পষ্ট জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, তেন্দু ও চিরঞ্জী গাছের পাতাগুলি এক এক জায়গায় ঘন কালো দেখাইতেছে, বনের মধ্যে শিয়ালের দল ডাকিয়া উঠিয়া প্রহর ঘোষণা করিল।

কোথায় রেল, মোটর, এরোপ্লেন, ট্রেড-ইউনিয়ন? ওঝাজীর মুখে অরণ্যকাণ্ডের শ্লোক শুনিতে শুনিতে সে যেন অনেক দূরের এক সুপ্রাচীন জাতির অতীত সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে গিয়া পড়িল একেবারে। অতীতের গিরিতরঙ্গিণী-তীরবর্ত্তী তপোবন, হোমধূমপবিত্র গোধূলির আকাশতলে বিস্তৃত অগ্নিশালা, স্রুগভাণ্ড, অজিন, কুশ, সমিধ, জলকলস, চীর ও কৃষ্ণাজিন পরিহিত সজপা মুনিগণের বেদপাঠধ্বনি...শান্ত গিরিসানু...বনজ কুসুমের সুগন্ধ...গোদাবরীতটে পুন্নাগ নাগকেশরের বনে পুষ্প-আহরণরতা সুমুখী আশ্রম-বালকগণ...কৃশাঙ্গী রাজবধূগণ...ক্ষীণ-জ্যোৎস্নায় নদীজল আলো হইয়া উঠিয়াছে, তীরে স্থলবেতসের বনে ময়ূর ডাকিতেছে...

সে যেন স্পষ্ট দেখিল, এই নিবিড় অজানা অরণ্যানীর মধ্য দিয়া নির্ভীক, কবাটবক্ষ, ধনুষ্পাণি, প্রাচীন রাজপুত্রগণ সকল বিপদকে অতিক্রম করিয়া চলিয়াছেন। দূরে নীল মেঘের মত পরিদৃশ্যমান ময়ূর-নিনাদিত ঘন বন, দুর্গম পথের নানা স্থানে শ্বাপদ রাক্ষসে পূর্ণ খন্দ, গুহা, গহ্বর, মহাগজ ও মহাব্যাঘ্র দ্বারা অধ্যুষিত...অজানা ও মৃত্যুসঙ্কুল—চারিধারে পর্ব্বতরাজির ধাতুরঞ্জিত শৃঙ্গসকল আকাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে—কুন্দগুল্ম, সিন্দুবার, শিরীষ, অর্জ্জুন, শাপ, নীপ, বেতস, তিনিশ ও তমাল তরুতে শ্যামায়মান গিরিসানু...শরদ্বারা বিদ্ধ রুরু ও পৃষতমৃগ আগুনে ঝলসাইয়া খাওয়া, বিশাল

ইঙ্গুদী তরুমূলে সতর্ক রাত্রি যাপন···

ওঝাজী উৎসাহ পাইয়া অপুকে একটা পুঁটুলি খুলিয়া একরাশ সংস্কৃত কবিতা দেখাইলেন গর্ব্বের সহিত বলিলেন, বাবুজী, ছেলেবেলা থেকেই সংস্কৃত কবিতায় আমার হাত আছে, একবার কাশী-নরেশের সভায় আমার গুরুদেব ঈশ্বরশরণ আমায় নিয়ে যান। একজোড়া দোশালা বিদায় পেয়েছিলাম, এখনও আছে। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার কথা। —তারপর তিনি অনেকগুলি কবিতা শুনাইলেন, বিভিন্ন ছন্দের সৌন্দর্য্য ও তাহাতে তাঁহার রচিত শ্লোকের কৃতিত্ব সরল উৎসাহে বর্ণনা করিলেন। এই ত্রিশ বৎসর ধরিয়া ওঝাজী বহু কবিতা লিখিয়াছেন, ও এখনও লেখেন, সবগুলি সযত্নে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াও দিয়াছেন, একটিও নষ্ট হইতে দেন নাই, তাহাও জানাইলেন।

একটা অদ্ভুত ধরণের দুঃখ ও বিষাদ অপুর হৃদয় অধিকার করিল। কত কথা মনে আসিল, তাহার বাবা এই রকম গান ও পাঁচালি লিখিত তাহার ছেলেবেলায়। কোথায় গেল সে সব? যুগ যে বদল হইয়া যাইতেছে, ইহারা তাহা ধরিতে পারে না। ওঝাজীর এত আগ্রহের সহিত লেখা কবিতা কে পড়িবে? কে আজকাল ইহার আদর করিবে? কোন্ আশা ইহাতে পুরিবে ওঝাজীর? অথচ কত ঐকান্তিক আগ্রহ ও আনন্দ ইহার পিছনে আছে। চাঁপদানীর পোস্টাফিসে কুড়াইয়া পাওয়া সেই ছোট মেয়েটির নাম-ঠিকানা-ভুল পত্রখানার মতই তাহা ব্যর্থ ও নিরর্থক হইয়া যাইবে!

সকালে উঠিয়া সে ওঝাজীকে একখানা দশটাকার নোট দিয়া প্রণাম করিল। নিজের একখানা ভাল বাঁধানো খাতা লিখিবার জন্য দিল—কাছে আর টাকা বেশী ছিল না, থাকিলে হয়ত আরও দিত। তাহার একটা দুর্ব্বলতা এই যে, যে একবার তাহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিয়াছে তাহাকে দিবার বেলায় সে মুক্তহস্ত, নিজের সুবিধা-অসুবিধা তখন সে দেখে না।

ডাকবাংলো হইতে মাইল খানেক পরে পথ ক্রমে উপরের দিকে উঠিতে লাগিল, ক্রমে আরও উপরে, উচ্চ মালভূমির উপর দিয়া পথ—শাল, বাঁশ, খয়ের ও আবলুসের ঘন অরণ্য—ডাইনে বামে উঁচুনীচু ছোট বড় পাহাড় ও টিলা—শালপুষ্পসুরভি সকালের হাওয়া যেন মনের আয়ু বাড়াইয়া দেয়। চতুর্থ দিন বৈকালে অমর-কণ্টক হইতে কিছু দূরে অপরূপ সৌন্দর্য্যভূমির সঙ্গে পরিচয় হইল—পথটা সেখানে নীচের দিকে নামিয়াছে, দুই দিকে পাহাড়ের মধ্যে সিকিমাইল চওড়া উপত্যকা, দুধারের সানুদেশের বন অজস্র ফুলে ভরা—পলাশের গাছ যেন জ্বলিতেছে। হাত দুই উঁচু পাথরের পাড়, মধ্যে গৈরিক বালু ও উপল-শয্যায় শিশু শোণ—নির্ম্মল জলের ধারা হাসিয়া খুশিয়া আনন্দ বিলাইতে বিলাইতে ছুটিয়া চলিয়াছে—একটা ময়ূর শিলাখণ্ডের আড়াল হইতে নিকটের গাছের ডালে উঠিয়া বসিল। অপুর পা আর নড়িতে চায় না—তার মুগ্ধ ও বিস্মিত চোখের সম্মুখে শৈশব কল্পনার স্বর্গকে কে আবার এভাবে বাস্তবে পরিণত করিয়া খুলিয়া বিছাইয়া দিল!

এত দূরবিসর্পিত দিগ্বলয় সে কখনও দেখে নাই, এত নির্জ্জনতার কখনও ধারণা ছিল না তাহার—বহুদূরে পশ্চিম আকাশের অনতিস্পষ্ট সুদীর্ঘ নীল শৈলরেখার উপরকার আকাশটাতে সে কি অপরূপ বর্ণসমুদ্র!

কি অপূর্ব্ব দৃশ্য চোখের সম্মুখে যে খুলিয়া যায়! এমন সে কখনও দেখে নাই—জীবনে কখনও দেখে নাই।

এ বিপুল আনন্দ তাহার প্রাণে কোথা হইতে আসে!

এই সন্ধ্যা, এই শ্যামলতা, এই মুক্ত প্রসারের দর্শনে যে অমৃত মাখানো আছে, সে মুখে তাহা কাহাকে বলিবে?···কে তাহার এ চোখ ফুটাইল, কে সাঁঝ-সকালের, সূর্য্যাস্তের, নীল বনানীর শ্যামলতার মায়া-কাজল তাহার চোখে মাখাইয়া দিল?

দূরবিসর্পিত চক্রবালরেখা দিগন্তের যতটুকু ঘেরিয়াছে, তাহারই কোন কোন অংশে, বহুদূরে নেমির শ্যামলতা অনতিস্পষ্ট সান্ধ্যদিগন্তে বিলীন, কোন কোন অংশ ধোঁয়া ধোঁয়া দেখা-যাওয়া বনরেখায় পরিস্ফুট, কোন দিকে সাদা-সাদা বকের দল আকাশের নীলপটে ডানা মেলিয়া দূর হইতে দূরে চলিয়াছে···মন কোথাও বাধে না। অবাধ, উদার দৃষ্টি; পরিচয়ের গণ্ডি পার হইয়া যাইয়া অদৃশ্য অজানার উদ্দেশে ভাসিয়া চলে···

তাহার মনে হইল সত্য, সত্য, সত্য—এই শান্ত নির্জ্জন আরণ্যভূমিতে বনের ডালপালার আলোছায়ার মধ্যে পুষ্পিত কোবিদারের সুগন্ধে দিনের পর দিন ধরিয়া এক একটি নব জগতের জন্ম হয়—ঐ দূরে ছায়াপথের মত তাহা দূরবিসর্পিত, এটুকু শেষ নয়, এখানে আরম্ভও নয়—তাহাকে ধরা যায় না অথচ এই সব নীরব জীবনমুহূর্ত্তে অনন্ত দিগন্তের দিকে বিস্তৃত তাহার রহস্যময় প্রসার মনে মনে বেশ অনুভব করা যায়। এই এক বৎসরের মধ্যে মাঝে মাঝে সে তাহা অনুভব করিয়াছেও—এই অদৃশ্য জগৎটার মোহস্পর্শ মাঝে মাঝে বৈশাখী শালমঞ্জরীরা উন্মাদ সুবাসে, সন্ধ্যা-ধূসর অনতিস্পষ্ট গিরিমালার সীমারেখায়, নেকড়ে বাঘের ডাকে ভরা জ্যোৎস্নাস্নাত শুভ্র জনহীন আরণ্যভূমির গাম্ভীর্য্যে, অগণিত তারাখচিত নিঃসীম শূন্যের ছবিতে। বৈকালে ঘোড়াটি বাঁধিয়া যখনই বক্রতোয়ার ধারে বসিয়াছে, যখনই অপর্ণার মুখ মনে পড়িয়াছে, কতকাল ভুলিয়া যাওয়া দিদির মুখখানা মনে পড়িয়াছে, একদিন শৈশব-মধ্যাহ্নে মায়ের-মুখে-শোনা মহাভারতের দিনগুলার কথা মনে পড়িয়াছে—তখনই সঙ্গে সঙ্গে তাহার ইহাও মনে হইয়াছে যে, যে-জীবন যে-জগৎকে আমরা প্রতিদিনের কাজকর্ম্মে হাটে-ঘাটে হাতের কাছে পাইতেছি জীবন তাহা নয়, এই কর্ম্মব্যস্ত অগভীর একঘেয়ে জীবনের পিছনের একটি সুন্দর পরিপূর্ণ, আনন্দ-ভরা সৌম্য জীবন লুকানো আছে—সে এক শাশ্বত রহস্যভরা গহন গভীর জীবন-মন্দাকিনী, যাহার গতি কল্প হইতে কল্পান্তরে ; দুঃখকে তাহা করিয়াছে অমৃতত্বের পাথেয়, অশ্রুকে করিয়াছে অনন্ত জীবনের উৎসধারা···

আজ তাহার বসিয়া বসিয়া মনে হয়, শীলেদের বাড়ি চাকুরি তাহার দৃষ্টিকে আরও শক্তি দিয়াছিল, অন্ধকার অফিস ঘরে একটুখানি জায়গায় দশটা হইতে সাতটা পর্য্যন্ত আবদ্ধ থাকিয়া একটুখানি খোলা জায়গার জন্য সে কি তীব্র লোলুপতা, বুভুক্ষা—দুই টিউশনির ফাঁকে গড়ের মাঠের দিকের বড় গির্জ্জাটার চূড়ার পিছনকার আকাশের দিকে তৃষিত চোখে চাহিয়া থাকার সে কি হ্যাংলামি ! কিন্তু সেই বদ্ধ জীবনই পিপাসাকে আরও বাড়াইয়া দিয়াছিল, শক্তির অপচয় হইতে দেয় নাই, ধরিয়া বাঁধিয়া সংহত করিয়া রাখিয়াছিল। আজ মনে হয় চাঁপদানীর হেড মাস্টার যতীশবাবুও তাহার বন্ধু—জীবনের পরম বন্ধু—সেই নিষ্পাপ দরিদ্র ঘরের উৎপীড়িতা মেয়ে পটেশ্বরীও। ভগবান তাহাকে নিমিত্তস্বরূপ করিয়াছিলেন—তাহারা সকলে মিলিয়া চাঁপদানীর সেই কুলী-বস্তির জীবন হইতে তাহাকে জোর করিয়া দূরে করিয়া না দিলে আজও যে সেখানেই থাকিয়া যাইত। এমন সব অপরাহ্নে সেখানে বিশু স্যাকরার দোকানের সান্ধ্য আড্ডায় মহা খুশিতে আজও বসিয়া তাস খেলিত।

এ কথাও প্রায়ই মনে হয়, জীবনকে খুব কম মানুষেই চেনে। জন্মগত ভুল সংস্কারের চোখে সবাই জীবনকে বুঝিবার চেষ্টা করে, দেখিবার চেষ্টা করে, দেখাও হয় না, বোঝাও হয় না। তা ছাড়া সে চেষ্টাই বা ক'জন করে ?···

অমর-কণ্টক তখনও কিছু দূরে। অপু বলিল, রামচরিত, কিছু শুকনো ডাল আর শালপাতা কুড়িয়ে আন, চা করি। রামচরিতের ঘোর আপত্তি তাহাতে। সে বলিল, হুজুর, এসব বনে বড় ভালুকের ভয়। অন্ধকার হবার আগে অমর-কণ্টকের ডাকবাংলোয় যেতে হবে। অপু বলিল, তাড়াতাড়ি চা হয়ে যাবে, যাও না তুমি। পরে সে বড় লোটাটায়

শোণের জল আনিয়া তিন টুকরা পাথরের উপর চাপাইয়া আগুন জ্বালিল। হাসিয়া বলিল, একটা ভজন গাও রামচরিত, যে আগুন জ্বলেছে, এর কাছে তোমার ভালুক এগোবে না, নির্ভয়ে গাও।

জ্যোৎস্না উঠিল। চারিধারে অদ্ভুত, গম্ভীর শোভা। কল্যকার কাব্যপুরাণের রেশ তাহার মন হইতে এখনও যায় নাই। বসিয়া বসিয়া মনে হইল সত্যই যেন কোন্ সুন্দরী চারুনেত্রা রাজবধূ—নব-পুষ্পিতা মল্লীলতার মত তন্বী লীলাময়ী—এই জনহীন নিষ্ঠুর আরণ্যভূমিতে পথ হারাইয়া বিপন্নার মত ঘুরিতেছেন—তাঁহার উদ্‌ভ্রান্ত স্বামী ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে—দূরে ঋক্ষবান্ পর্ব্বতের পার্শ্ব দিয়া বিদর্ভ যাইবার পথটি কে তাঁহাকে বলিয়া দিবে।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

নন্-কো-অপারেশনের উত্তেজনাপূর্ণ দিনগুলি তখন বছর তিনেক পিছাইয়া পড়িয়াছে, এমন সময় একদিন প্রণব রাজসাহী জেল হইতে খালাস পাইল।

জেলে তাহার স্বাস্থ্যহানি হয় নাই, কেবল চোখের কেমন একটা অসুখ হইয়াছে, চোখ কর্‌কর্ করে, জল পড়ে। জেলের ডাক্তার মিঃ সেন চশমা লইতে বলিয়াছেন এবং কলিকাতার এক চক্ষুরোগবিশেষজ্ঞের নামে একটি পত্রও দিয়াছেন।

জেল হইতে বাহির হইয়া সে ঢাকা রওনা হইল এবং সেখান হইতে গেল স্বগ্রামে। এক প্রৌঢ়া খুড়ীমা ছাড়া তাহার আর কেহ নাই, বাপ মা শৈশবেই মারা গিয়াছেন, এক বোন ছিল, সেও বিবাহের পর মারা যায়।

সন্ধ্যার কিছু আগে সে বাড়ি পৌঁছিল। খুড়ীমা ভাঙা রোয়াকের ধারে কম্বলের আসন পাতিয়া বসিয়া মালা জপ করিতেছিলেন, তাহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। খুড়ীমার নিজের ছেলেটি মানুষ নয়, গাঁজা খাইয়া বেড়ায়, প্রণবকে ছেলেবেলা হইতে মানুষ করিয়াছেন, ভালওবাসেন, কিন্তু লেখাপড়া জানিলে কি হইবে, তাঁহার পুনঃ পুনঃ সদুপদেশ সত্ত্বেও সে কেবলই নানা হাঙ্গামায় পড়িতেছে, ইচ্ছা করিয়া পড়িতেছে।

এ বৃদ্ধবয়সে শুধু তাঁহারই মরণ নাই, ইত্যাদি নানা কথা ও তিরস্কার প্রণবকে রোয়াকের ধারে দাঁড়াইয়া শুনিতে হইল। বাগানের বড় কাঁঠাল গাছের একটা ডাল কে কাটিয়া লইয়া গিয়াছে, খুড়ীমা চৌকি দিয়া বেড়ান কখন, তিনি ও-সব পারিবেন না, তাঁহাকে যেন কাশী পাঠাইয়া দেওয়া হয়, কারণ কর্ত্তাদের অত কষ্টের বিষয়-সম্পত্তি চোখের উপর নষ্ট হইয়া যাইতেছে, এ দৃশ্য দেখাও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।

দিনচারেক বাড়ি থাকিয়া খুড়ীমাকে একটু শান্ত করিয়া চশমার ব্যবস্থার দোহাই দিয়া সে কলিকাতায় রওনা হইল। সোদপুরে খুড়ীমার একজন ছেলেবেলার-পাতানো গোলাপফুল আছেন, তাঁহারা প্রণবকে দেখিতে চান একবার, সেখানে যেন সে অবশ্য অবশ্য যায়, খুড়ীমার মাথার দিব্য। প্রণব মনে মনে হাসিল। বৎসর-চার পূর্ব্বে গোলাপ-ফুলের বড় মেয়েটির যখন বিবাহের বয়স হইয়াছিল, তখন খুড়ীমা ওই কথাই বলিয়াছিলেন, কিন্তু প্রণব যাওয়ার সময় করিয়া উঠিতে পারে নাই। তারপরই আসিল নন-কো-অপারেশনের ঢেউ, এবং নানা দুঃখ দুর্ভোগ। সেটির বিবাহ হইয়াছে, এবার বোধ হয় ছোটটির পালা।

কলিকাতায় আসিয়া সে প্রথমে অপুর খোঁজ করিল, পরিচিত স্থানগুলিতে গিয়া দেখিল, দু-একদিন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী খুঁজিল, কারণ যদি অপু কলিকাতায় থাকে তবে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে না আসিয়া থাকিতে পারিবে না। কোথাও তাহার সন্ধান মিলিল

না। চাঁপদানীতে যে অপু নাই তাহা তিন বৎসর আগে জেলে ঢুকিবার সময় জানিত, কারণ তাহারও প্রায় এক বৎসর আগে অপু সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছে।

একদিন সে মন্মথদের বাড়ি গেল। তখন রাত প্রায় আটটা, বাহিরের ঘরে মন্মথ বসিয়া কাগজপত্র দেখিতেছে, সে আজকাল এটর্নি, খুড়-শ্বশুরের বড় নামডাকে ও পশারের সাহায্যে নূতন বসিলেও দু'পয়সা উপার্জন করে। মন্মথ যে ব্যবসায়ে উন্নতি করিবে, তাহার প্রমাণ সেদিনই পাইল।

ঘণ্টাখানেক কথাবার্ত্তার পরে রাত সাড়ে-সাতটার কাছাকাছি মন্মথ যেন একটু উসখুস করিতে লাগিল—যেন কাহার প্রতীক্ষা করিতেছে। একটু পরেই একখানা বড় মোটরগাড়ি আসিয়া দরজায় লাগিল, একটি পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছরের যুবকের হাত ধরিয়া দু'জন লোক ঘরে প্রবেশ করিল। প্রণব দেখিয়াই বুঝিল, যুবকটি মাতাল অবস্থায় আসিয়াছে। সঙ্গের লোক দুইটির মধ্যে একজনের একটা চোখ খারাপ, ঘোলাটে ধরণের—বোধ হয় সে-চোখে দেখিতে পায় না, অপর লোকটি বেশ সুপুরুষ। মন্মথ হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, এই যে মল্লিক মশায়, আসুন, ইনিই মিঃ সেনশর্ম্মা ?···বসুন, নমস্কার। গোপালবাবু, বসুন এইখানে। আর ও'কে আমাদের কনডিশনস্ সব বলেছেন তো ?

ধরণে প্রণব বুঝিল মল্লিক মশায় বড় পাকা লোক। উত্তর দিবার পূর্ব্বে তিনি একবার প্রণবের দিকে চাহিলেন। প্রণব উঠিতে যাইতেছিল, মন্মথ বলিল—না, না, বসো হে। ও আমার ক্লাসফ্রেণ্ড, একসঙ্গে কলেজে পড়তুম—ও ঘরের লোক, বলুন আপনি! মল্লিক মশায় একটা পুঁটুলি খুলিয়া কি সব কাগজ বাহির করিলেন, তাঁহাদের মধ্যে নিম্নসুরে খানিকক্ষণ কি কথাবার্ত্তা হইল। সঙ্গের অন্য লোকটি দু-বার যুবকটির কানে-কানে ফিস্-ফিস্ করিয়া কি কি বলিল, পরে যুবক একটা কাগজে নাম সই করিল। মন্মথ দু'বার সইটা পরীক্ষা করিয়া কাগজখানা একটা খামের মধ্যে পুরিয়া টেবিলে রাখিয়া দিল ও একরাশ নোটের তাড়া মল্লিক মশায়কে গুণিয়া দিল। পরে দলটি গিয়া মোটরে উঠিল।

প্রণব অপুর মত নির্ব্বোধ নয়, সে ব্যাপারটা বুঝিল। যুবকটির নাম অজিতলাল সেনশর্ম্মা, কোনও জমিদারের ছেলে। যে জন্যই হউক, সে দুই হাজার টাকার হ্যাণ্ডনোট কাটিয়া দেড় হাজার টাকা লইয়া গেল এবং মল্লিক মশায় তাহার দালাল, কারণ, সকলকে মোটরে উঠাইয়া দিয়া তিনি আবার ফিরিয়া আসিলেন ও পুনরায় প্রণবের দিকে বিরক্তির দৃষ্টিতে চাহিয়া মন্মথের সঙ্গে নিম্নসুরে কিসের তর্ক উঠাইলেন—সাড়ে সাত পার্সেণ্টের জন্য তিনি যে এতটা কষ্ট স্বীকার করেন নাই, এ কথা কয়েকবার শুনাইলেন। ঠিক সেই সময়েই প্রণব বিদায় লইল।

পরদিন মন্মথের সঙ্গে আবার দেখা। মন্মথ হাসিয়া বলিল—কালকের সেই কাপ্তেন-বাবুটি হে—আবার শেষরাত্রে তিনটের সময় মোটরে এসে হাজির। আবার চাই হাজার টাকা,—থোকে থার্টিফাইভ পার্সেণ্ট লাভ মেরে দিলুম। মল্লিক লোকটা ঘুঘু দালাল। বড়লোকের কাপ্তেন ছেলে যখন শেষরাতে হ্যাণ্ডনোট কাটছেন, তখন আমরা যা পারি ক'রে নিতে—আমার কি, লোকে যদি দেড়হাজার টাকার হ্যাণ্ডনোট কেটে এক হাজার নেয় আমার তাতে দোষ কি ? এই-সব চরিয়েই তো আমাদের খেতে হবে! কত রাত এমন আসে দ্যাখ না, টাকার যা বাজার কলকাতায়, কে দেবে ?

প্রণব খুব আশ্চর্য্য হইল না। ইহাদের কার্য্যকলাপ সে কিছু কিছু জানে, এক অপ্রকৃতিস্থ মাতাল যুবকের নিকট হইতে ইহারা এক রাত্রিতে হাজার টাকা অসৎ উপায়ে উপার্জ্জন করিয়া বড় গলায় সেইটাই আবার বাহাদুরি করিয়া জাহির করিতেছে! হতভাগ্য যুবকটির জন্য প্রণবের কষ্ট হইল—মত্ত অবস্থায় সে যে কি সই করিল, কত টাকা তাহার

বদলে পাইল, হয়ত বা তাহা সে বুঝিতেও পারিল না।

কলিকাতা হইতে সে মামার বাড়ি আসিল। মাতৃসমা বড় মামীমা আর ইহজগতে নাই। গত বৎসর পূজার সময় তিনি—প্রণব তখন জেলে। সেখানেই সে সংবাদটা পায়। গঙ্গানন্দকাটির ঘাটে নৌকা ভিড়িতে তাহার চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। কাল ট্রেনে সারা রাত ঘুম হয় নাই আদৌ, তাড়াতাড়ি স্নানাহার সারিয়া দোতলার কোণের ঘরে বিশ্রামের জন্য যাইয়া দেখিল, বিছানার উপর একটি পাঁচ ছয় বৎসরের ছেলে চুপ করিয়া শুইয়া! দেখিয়া মনে হইল, একরাশ বাসি গোলাপফুল কে যেন বিছানার উপর উপুড় করিয়া ঢালিয়া রাখিয়াছে—হ্যাঁ, সে যাহা ভাবিয়াছে তাই—জ্বরে ছেলেটির গা যেন পুড়িয়া যাইতেছে, মুখ জ্বরের ধমকে লাল, ঠোঁট কাঁপিতেছে, কেমন যেন দিশেহারা ভাব। মাথার দিকে একখানা রেকাবিতে দুখানা আধ-খাওয়া ময়দার রুটি ও খানিকটা চিনি। প্রণব জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কাজল, না?

খোকা যেন হঠাৎ চমক ভাঙিয়া কতকটা ভয় ও কতকটা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, কোনও কথা বলিল না।

প্রণবের মনে বড় কষ্ট হইল—ইহাকে ইহারা এ-ভাবে একা উপরের ঘরে ফেলিয়া রাখিয়াছে! অসহায় বালক একলাটি শুইয়া মুখ বুজিয়া জ্বরের সঙ্গে যুঝিতেছে, পথ্য দিয়াছে কি—না, দুখানা ময়দার হাতে-গড়া রুটি ও খানিকটা লাল চিনি! আর কিছু জোটে নাই ইহাদের? জ্বরের ঘোরে তাহাই বালক যাহা পারিয়াছে খাইয়াছে। প্রণব জিজ্ঞাসা করিল—খোকা রুটি কেন, সাবু দেয় নি তোমায়?

খোকা বলিল—ছাবু নেই।

—নেই কে বললে?

—মা-মাসীমা বললে ছাবু নেই।

সে জ্বরে হাঁপাইতেছে দেখিয়া প্রণব ঠাণ্ডা জল আনিয়া তাহার মাথাটা বেশ করিয়া ধুইয়া দিয়া পাখার বাতাস করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এরূপ করিতেই জ্বরটা একটু কমিয়া আসিল, বালক কতকটা সুস্থ হইল। দিশেহারা ও হাঁস-ফাঁস ভাবটা কাটিয়া গেল। প্রণব বলিল—বল তো আমি কে?

খোকা বলিল—জা-জা-জা-জানি নে তো?

প্রণব বলিল—আমি তোমার মামা হই খোকা। তোমার বাবা বুঝি আসে নি এর মধ্যে?

কাজল ঘাড় নাড়িয়া বলিল—ন্-ন্-না তো, বাবা কতদিন আসে নি।

প্রণব কৌতূহলের সুরে বলিল—তুমি এত তোৎলা হ'লে কি ক'রে, কাজল?

সে অপুর ছেলেকে খুব ছোটবেলায় দেখিয়াছিল। আজ দেখিয়া মনে হইল, অপুর ঠোঁটের সুকুমার রেখাটুকু ও গায়ের সুন্দর রংটি বাদে ইহার মুখের বাকী সবটুকু মায়ের মত।

কাজল ভাবিয়া ভাবিয়া বলিল—আমার বাবা আসবে না?

—আসবে না কেন? বাঃ!

—ক-ক-কবে আসবে?

—এই এল বলে। বাবার জন্যে মন কেমন করে বুঝি?

কাজল কিছু বলিল না।

অপুর উপরে প্রণবের খুব রাগ হইল। ভাবিল—আচ্ছা পাষণ্ড তো? মা-মরা কচি বাচ্চাটাকে বেঘোরে ফেলে রেখে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে বসে আছে! ওকে এখানে কে দেখে তার নেই ঠিক—দয়া মায়া নেই শরীরে?

শশীনারায়ণ বাঁড়ুয্যে প্রণবের নিকট জামাইয়ের যথেষ্ট নিন্দা করিলেন—বন্ধুর সঙ্গে

বিয়ের যোগাযোগটি তো ঘটিয়েছিলে, ভেবে দ্যাখো তো আজ পাঁচ বচ্ছরের মধ্যে নিজের ছেলেকে একবার চোখের দেখা দেখতে এল না, ত্রিশ-চল্লিশ টাকা মাইনের চাকরি করছেন আর ঘুরে বেড়াচ্ছেন ভবঘুরের মত, চাল নেই চুলো নেই, কোন জন্মে যে করবেন সে আশাও নেই—ব'লো না, হাড়ে চটেছি আমি, এদিকে ছেলেটিও কি অবিকল তাই !···এই বয়েস থেকেই তেমনি নির্ব্বোধ, অথচ যেমনি চঞ্চল তেমনি একগুঁয়ে। চঞ্চল কি একটু আধটু ? ঐটুকু তো ছেলে, একদিন করেছে কি, একদল গরুর গাড়ির গাড়োয়ানের সঙ্গে চলে গিয়েছে সেই পীরপুরের বাজারে—এদিকে আমরা খুঁজে পাই নে, চারিদিকে লোক পাঠাই—শেষে মাখন মুহুরীর সঙ্গে দেখা, সে ধরে নিয়ে আসে। খাওয়াও, দাওয়াও, মেয়ের ছেলে কখনও আপনার হয় না, যে পর সে-ই পর।

খোকা বাপের মত লাজুক ও মুখচোরা—কিন্তু প্রণবের মনে হইল, এমন সুন্দর ছেলে সে খুব কম দেখিয়াছে। সারা গা বাহিয়া যেন লাবণ্য ঝরিতেছে, সদাসর্ব্বদা মুখ টিপিয়া কেমন এক করুণ, অপ্রতিভ ধরণের হাসি হাসে—মুখখানা এত লাজুক ও অবোধ দেখায় সে সময় !···কেমন যে একটা করুণা হয় ! এখানে কয়েক দিন থাকিয়া প্রণব বুঝিয়াছে, দিদিমা মারা যাওয়ার পর এ বাড়িতে বালককে যত্ন করিবার আর কেহ নাই—সে কখন খায়, কখন শোয়, কি পরে—এ সব বিষয়ে বাড়ির কাহারও দৃষ্টি নাই। শশীনারায়ণ বাঁড়ুয্যে তো নাতিকে দু'চক্ষে দেখিতে পারেন না, সর্ব্বদা কড়া শাসনে রাখেন। তাঁহার বিশ্বাস এখন হইতে শাসন না করিলে এ-ও বাপের মত ভবঘুরে হইয়া যাইবে, অথচ বালক বুঝিয়া উঠিতে পারে না, দাদামহাশয় কেন তাহাকে অমন উঠিতে-তাড়া বসিতে-তাড়া দেন—ফলে সে দাদামহাশয়কে যমের মত ভয় করে, তাঁহার ত্রিসীমানা দিয়া হাঁটিতে চায় না।

কলিকাতায় ফিরিয়া প্রণব দেবব্রতর সঙ্গে দেখা করিল। দেবব্রত একটু বিষণ্ণ—বিলাত যাইবার পূর্ব্বে সে একটি মেয়েকে নিজের চোখে দেখিয়া বিবাহের জন্য পছন্দ করিয়াছিল—কিন্তু তখন নানা কারণে সম্বন্ধ ভাঙিয়া যায়—সে আজ তিন বৎসর পূর্ব্বের কথা। এবার বিদেশ হইতে ফিরিয়া সে নিছক কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া সন্ধান লইয়া জানে মেয়েটির এখনও বিবাহ হয় নাই। মেয়েটির ডান পায়ের হাঁটুতে নাকি কি হইয়াছে, ডাক্তারে সন্দেহ করিতেছেন বোধ হয় তাহাতে চিরজীবনের জন্য ঐ পা খাটো হইয়া থাকিবে—এ অবস্থায় কে-ই বা বিবাহ করিতে অগ্রসর হইবে ? শুনিবামাত্র দেবব্রত ধরিয়া বসিয়াছে সে ঐ মেয়েকেই বিবাহ করিবে—মায়ের ঘোর আপত্তি, পিসেমহাশয়ের আপত্তি, মামাদের আপত্তি—সে কিন্তু নাছোড়বান্দা। হয় ঐ মেয়েকে বিবাহ করিবে, নতুবা দরকার নাই বিবাহে।

দেবব্রতর সঙ্গে প্রণবের খুব ঘনিষ্ঠ আলাপ ছিল না, অপুর সঙ্গে ইতিপূর্ব্বে বার দুই-তিন তাহার কাছে গিয়াছিল এই মাত্র। এবার সে যায় অপুর কোন সন্ধান দিতে পারে কিনা তাহাই জানিবার জন্য। কিন্তু এই বিবাহ-বিভ্রাটকে অবলম্বন করিয়া মাস-দুইয়ের মধ্যে দু'জনের একটা ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠিল।

দেবব্রত এই সব গোলমালের দরুন পিশেমহাশয়ের বাসা ছাড়িয়া কলিকাতা হোস্টেলে উঠিয়াছিল—বৈকালে সেখানে একদিন প্রণব বেড়াইতে গিয়া শুনিল, দেবব্রতর মা এ বিবাহে মত দিয়াছেন। দেবব্রত বলিল—ঠিক সময় এসেছেন, আমি ভাবছিলুম আপনার কথা—কাল পিসেমশায় আর বড় মামা যাবেন মেয়েকে আশীর্ব্বাদ করতে, আপনিও যান ওঁদের সঙ্গে। ঠিক বিকেল পাঁচটায় এখানে আসবেন।

মেয়ের বাড়ি গোয়াবাগানে। ছোট দোতলা বাড়ি, নিচে একটা প্রেস। মেয়ের বাপ গভর্ণমেণ্টের চাকরি করেন। মেয়েটিকে দেখিয়া খুব সুন্দরী বলিয়া মনে হইল না প্রণবের,

গায়ের রং যে ফর্সা তাও নয়, তবে মুখে এমন কিছু আছে যাতে একবার দেখিলে বার বার চাহিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে। ঘাড়ের কাছে একটা যৌতুকচিহ্ন, চুল বেশ বড় বড় ও কোঁকড়ানো। বিবাহের দিনও উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে ধার্য্য হইয়া গেল।

দেবব্রত সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ-ঘরের ছেলে। দুঃখ কষ্ট কাহাকে বলে জানে না, এ পর্য্যন্ত বরাবর যথেষ্ট পয়সা হাতে পাইয়াছে, তাহার পিসেমহাশয় অপুত্রক, তাঁহার সম্পত্তি ও কলিকাতার দু'খানা বাড়ি দেবব্রতই পাইবে। কিন্তু পয়সা অপব্যয় করার দিকে দেবব্রতর ঝোঁক নাই, সে খুব হিসাবী ও সতর্ক এ বিষয়ে। সাংসারিক বিষয়ে দেবব্রত খুব হুঁশিয়ার—পাটনায় যে চাকরিটা সে সম্প্রতি পাইয়াছে, সে শুধু তাহার যোগাড়-যন্ত্র ও সুপারিশ ধরিবার কৃতিত্বের পুরস্কার—নতুবা কুড়ি-বাইশ জন বিলাত-ফেরত অভিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ারের দরখাস্তের মধ্যে তাহার মত তরুণ ও অনভিজ্ঞ লোকের চাকুরি পাইবার কোন আশা ছিল না। শাঁখারিটোলায় দেবব্রতের পিসেমহাশয় তারিণী মিত্রের বাড়ি হইতেই দেবব্রত বিবাহ করিতে গেল। পিসিমার ইচ্ছা ছিল খুব বড় একটা মিছিল করিয়া বর রওনা হয়, কিন্তু পিসেমহাশয় বুঝাইলেন ও সব একালের ছেলে—বিশেষ করিয়া দেবব্রতর মত বিলাত-ফেরত ছেলে—পছন্দ করিবে না। মায়ের নিকট বিবাহ করিতে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিবার সময় দেবব্রতর চোখ ভিজিয়া উঠিল—স্বর্গগত স্বামীকে স্মরণ করিয়া দেবব্রতর মা-ও চোখের জল ফেলিলেন—সবাই বকিল, তিরস্কার করিল। একজন প্রতিবেশিনী হাসিয়া বলিলেন—দোর-ধরুণীর টাকা কৈ ?···

দেবব্রতর পিসিমা বলিলেন—আমার কাছে গুণে নিও মেজবৌ। ও-কি দোর-ধরা হ'ল ? আমার ছেলেবেলায় আমাদের বাঙাল দেশে নিয়ম ছিল দেখেছি, সাতজন এয়ো আর সাতজন কুমারী এই চোদ্দজনকে দোর-ধরুণীর টাকা দিয়ে তবে বর বেরুতে পেত বাড়ি থেকে। একালে তো সব দাঁড়িয়েছে—

দেবব্রত একটুখানি দাঁড়াইল। ফিরিয়া বলিল—মা, শোন একটু।···

আড়ালে গিয়া চুপি চুপি বলিল—চাটুয্যে-বাড়ির মেয়েটা দোর ধরার জন্য দাঁড়িয়েছিল, আমি জানি, ছোট পিসিমা তাকে সরিয়ে দিয়েছেন—এ-সবেতে আমার মনে বড় কষ্ট হয়, মা। এই দশ টাকার নোটটা রাখো, তাকে তুমি দিও—কেন তাকে সরালে বল তো—আমি জানি অবিশ্যি কেন সরিয়েছে—কিন্তু এতে লোকের মনে কষ্ট হয় তাও ওরা বোঝে না !

মা বলিলেন—ও-কথা তোর ওদের বলবার দরকার নেই—টাকা দিলি আমি দেবো এখন। ছোট ঠাকুরঝির দোষ কি, বিধবা মেয়েকে কি বলে আজ সামনে রাখে বল না ? হিঁদুর নিয়মগুলো তো মানতে হবে, সবাই তো তোমার মত ব্রহ্মজ্ঞানী হয়নি এখনো। মেয়েটার দোষ দিইনে, তার আর বয়স কি—ছেলেমানুষ—সে না হয় অত বোঝে-সোঝে না, আমোদে নেচে দোর ধরবে বলে দাঁড়িয়েছে—তার বাপ-মায়ের তো এটা দেখতে হয়। শুভকাজের দিন বিধবা মেয়েকে কেন এখানে পাঠানো বাপু ? তা নয়—গরীব কিনা, পাঠিয়েছে—যা কিছু ঘরে আসে—। যাক্। আমি দেবো এখন—তা হ্যাঁ রে, পাঁচটা দিলেই তো হ'ত—এত কেন ?···

—না মা, ঐ থাক্, দিও; ছোটপিসিমাকে ব'লো বুঝিয়ে ওতে শুভকাজ এগোয় না, আরও পিছিয়ে যায়।

দু-তিনখানা বাড়ির মোড়ে চাটুয্যে-বাড়িটা। ইহারা সবাই ছাপাখানায় কাজ করে, বৃদ্ধ চাটুয্যে মহাশয়ও আগে কম্পোজিটরের কাজ করিতেন, আজকাল চোখে দেখেন না বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। আজকাল তাঁহার কাজ প্রতিবেশীর নিকট অভাব জানাইয়া আধুলি ধার করিয়া বেড়ানো। দেবব্রত ইঁহাদের সকলকেই অনেক দিন হইতে চেনে।

তাহার গোলাপফুল সাজানো মোটরখানা চাটুয্যে-বাড়ির সম্মুখে মোড় ঘুরিবার সময় দেবব্রত কেবলই ভাবিতেছিল, কোনও জানালার ফাঁক দিয়া তের বৎসরের বিধবা মেয়েটা হয়ত কৌতূহলের সহিত তাহাদের মোটর ও ফিটন গাড়ির সারির দিকে চাহিয়া আছে।

রাত্রের গোড়ার দিকেই বিবাহ ও বরযাত্রীভোজন মিটিয়া গেল।

দেবব্রত বাসরে গিয়া দেখিল, সেখানে অত্যন্ত ভিড়—বাসরের ঘর খুব বড় নয়—সামনের দালানেও স্থান নাই, অন্য অন্য ঘরের বাক্স তোরঙ্গ সব দালানে বাহির করা হইয়াছে, অথচ মেয়েদের ভিড় এত বেশী যে বসা তো দূরের কথা, সকলের দাঁড়াইবার জায়গাও নাই। সে বড় শালাকে বলিল—দেখুন, যদি অনুমতি করেন, একটু ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যে জাহির করি। এই ট্রাংকগুলো এখানে রাখার কোন মানে নেই—লোক ডাকিয়ে দেওয়ালের দিকে এক সারি এখানে, আর এক সারি ক'রে দিন সিঁড়ির ধাপে ধাপে—বুঝলেন না?···যাবার আসবারও কষ্ট হবে না অথচ এদের জায়গা হবে এখন। তাহার ছোট শালীরা ব্যাপারটা লইয়া তাহাকে কি একটা ঠাট্টা করিল। সবাই হাসিয়া উঠিল।

রাত্রি একটার পর কিন্তু যে-যাহার স্থানে চলিয়া গেল। দেবব্রত বাসর হইতে বাহির হইয়া দালানের একটা স্টীলের তোরঙ্গের উপর বসিয়া একটা সিগারেট ধরাইল। তাহার মনে আনন্দের সঙ্গে কেমন একটা উত্তেজনা। মনে মনে একটা তৃপ্তিও অনুভব করিল।··· জীবন এখন সুনির্দিষ্ট পথে চলিবে—লক্ষ্মীছাড়ার জীবন শেষ হইল। পাটনার চাকুরিতে একটা সুবিধা এই যে, জায়গা খুব স্বাস্থ্যকর, বাড়িভাড়া সস্তা, বছরে পঞ্চাশ টাকা করিয়া মাহিনা বাড়িবে—তবে প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের সুদ কিছু কম। সে ভাবিল—যাই তো আগে, ফৈজুদ্দীন হোসেনকে একটু হাতে রাখতে হবে, ওর হাতেই সব—অন্য ডিরেক্টর তো কাঠের পুতুল। ক্যাণ্টনমেণ্টের ক্লাবে গিয়েই ভর্ত্তি হয়ে যাবো—ওরা আবার ওসব দেখলে ভেজে কিনা!

নববধূ এখনও ঘুমায় নাই, দেবব্রত গিয়া বলিল—বাইরে এসো না সুনীতি, কেউ নেই। আসবে?

নববধূ চেলীর পুঁটুলি নয়, কিন্তু পায়ের জন্য তার উঠিতে কষ্ট হয়—দেবব্রত তাহাকে সযত্নে ধরিয়া দালানে আনিয়া তোরঙ্গটার উপর ধীরে ধীরে বসাইয়া দিল। নববধূ হাসিয়া বলিল—ওই দোরটা বন্ধ করে দাও—সিঁড়ির ওইটে—শেকল উঠিয়ে দাও—হ্যাঁ—ঠিক হয়েছে—নৈলে এক্ষুনি কেউ এসে পড়বে।

দেবব্রত পাশে বসিয়া বলিল—রাত জেগে কষ্ট হচ্ছে খুব—না?

—কি এমন কষ্ট, তা ছাড়া দুপুরবেলা আমি ঘুমিয়েছি খুব।

—আচ্ছা, তুমি কনে-চন্দন পরো নি কেন সুনীতি? এখানে সে চলন নেই?

মেয়েটি সলজ্জমুখে বলিল—মা পরাতে বলেছিলেন—

—তবে?

—জ্যাঠাইমা বললেন, তুমি নাকি পছন্দ করবে না।

দেবব্রত হাসিয়া উঠিয়া বলিল—কেন বল তো—বিলেত-ফেরত বলে? বা তো—

পরে সে বলিল—আমি সাত তারিখে পাটনায় যাব, বুঝলে, তোমাকে আর মাকে এসে নিয়ে যাব মাস দুই পরে, সুনীতি। তোমার বাবাকে বলে রেখেছি।

মেয়েটি নতমুখে বলিল—আচ্ছা একটা কথা বলব? কিছু মনে করবে না?···

—বল না, কি মনে করব?—

—আচ্ছা, আমার এই পা নিয়ে তুমি যে বিয়ে করলে, যদি পা না সারে? দ্যাখ, তোমার গা ছুঁয়ে সত্যি বলছি আমার ইচ্ছে ছিল না বিয়ের। মাকে কতবার বুঝিয়ে বলেছি, মা

এই তো আমার পায়ের দশা, পরের ওপর অনর্থক কেন বোঝা চাপানো সারাজীবন—তা মা বললেন তুমি নাকি খুব—তোমার নাকি খুব ইচ্ছে। আচ্ছা কেন বল তো এ মতি তোমার হ'ল ?

দেবব্রত বলিল—স্পষ্ট কথা বললে তুমিও কিছু মনে করবে না সুনীতি ? তাহলে বলি শোন, তোমার এই পায়ের দোষ যদি না হ'ত তবে আমি অন্য জায়গায় বিয়ে ক'রে ফেলতুম …যেদিন থেকে শুনেছি পায়ের দোষের জন্য তোমার বিয়ে এই তিন বছরের মধ্যে হয় নি—সেদিন থেকে আমার মন বলেছে ওখানেই বিয়ে করব, নয় তো নয়। অন্য জায়গায় বিয়ে করলে মনে শান্তি পেতাম না সুনীতি। সেই যে তোমাকে দেখে গিয়েছিলুম, তারপর বিয়ে তখন ভেঙে গেল, কিন্তু তোমার মুখখানা কতবার যে মনে হয়েছে !…কেন কে জানে—আমি কাব্যি করছি নে সুনীতি, ওসব আমার আসে না, আমি সত্য কথা বলছি।

তারপর সে আজ ওবেলায় চাটুয্যে-বাড়ির বিধবা মেয়েটির কথা বলিল। বলিল—দ্যাখ এও তো কাব্যের কথা নয়—আজ বিয়ের আসনে বসে কেবলই সেই ছোট মেয়েটার কথা মনে হয়েছে। ছোট পিসিমা তাকে তাড়িয়ে দিয়ে আজ আমার অর্দ্ধেক আনন্দ মাটি করেছেন সুনীতি—তোমার কাছে বলছি, আর কাউকে ব'লো না যেন ! এ কেউ বুঝবে না, আমার মা-ও বোঝেন নি।

ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া রাত্রি দুইটা বাজিল।

কাজলের মুশকিল বাধে রোজ সন্ধ্যার সময়। খাওয়া-দাওয়া হইয়া গেলে তাহার মাসীমা বলেন, ওপরে চলে যাও, শুয়ে পড় গিয়ে। কাজল বিপন্নমুখে রোয়াকের কোণে দাঁড়াইয়া শীতে ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিতে থাকে। ওপরে কেউ নাই, মধ্যে একটা অন্ধকার সিঁড়ি, তাহার উপর দোতলার পাশের ঘরটাতে আলনায় একরাশ লেপকাঁথা বাঁধা আছে। আধ-অন্ধকারে সেগুলা এমন দেখায় !

আগে আগে দিদিমা সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়া আসিতেন। দিদিমা আর নাই, মামীমারা খাওয়াইয়া দিয়াই খালাস। সেদিন সে সেজ দিদিমাকে বলিয়াছিল, তিনি ঝংকার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, আমার তো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, এখন তোমায় যাই শোওয়াতে। একা এটুকু আর যেতে পারেন না, সেদিন তো পীরপুরের হাটে একা পালিয়ে যেতে পেরেছিলে ? ছেলের ন্যাক্‌রা দেখে বাঁচিনে।

নিরুপায় হইয়া ভয়ে ভয়ে সিঁড়ি বাহিয়া সে উপরে উঠে। কিন্তু ঘরে ঢুকিতে আর সাহস না করিয়া প্রথমটা দোরের কাছে দাঁড়াইয়া থাকে। কোণে কড়ির আলনার নীচে দাদামহাশয়ের একরাশ পুরানো হুঁকার খোল ও হুঁকা-দান। এককোণে মিটমিটে তেলের প্রদীপ, তাতে সামান্য একটুখানি আলো হয় মাত্র, কোণের অন্ধকার তাহাতে আরও যেন সন্দেহজনক দেখায়। এখানে একবার আসিলে আর কেহ কোথাও নাই, ছোট মামীমা নাই, ছোটদিদিমা নাই, দলু নাই, টাটি নাই—শুধু সে আর চারিপাশের এই-সব অজানা বিভীষিকা। কিন্তু এখানেই বা সে কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবে—ছোট মাসীমা ও বিন্দু-ঝি এঘরে শোয়, তাহাদের আসিতে এখনও বহু দেরি, শীতের হাওয়ায় হাড়-কাঁপুনি ধরিয়া যায় যে ! অগত্যা সে অন্যান্য দিনের মত চোখ বুজিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া নিজের বিছানার উপর উঠিয়াই ছোট লেপটা একেবারে মুড়ি দিয়া ফেলে। কিন্তু বেশীক্ষণ লেপমুড়ি দিয়া থাকিতে পারে না—ঘরের মধ্যে কোন কিছু নাই তো ? মুখ খুলিয়া একবার ভীতচোখে চারিধারে চাহিয়া দেখিয়া আবার লেপমুড়ি দেয়—আর যত রাজ্যের ভুতের গল্প কি ঠিক ছাই এই সময়টাতে মনে আসে !

দিদিমা থাকিতে এ-সব কষ্ট ছিল না। দিদিমা তাহাকে ঘুম না পাড়াইয়া নামিতেন না। কাজল উপরে আসিয়াই বিছানার উপরকার সাজানো লেপ-কাঁথার স্তূপের উপর খুশী ও আমোদের সহিত বার বার লাফাইয়া পড়িয়া চেঁচাইতে থাকিত—আমি জলে ঝাঁপাই—হি-হি—আমি জলে ঝাঁপাই—ও দিদিমা—হি-হি—

কোনোরকমে দিদিমা তাহার লাফানো হইতে নিবৃত্ত করিয়া শোয়াইতে কৃতকার্য হইলে সে দিদিমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিত,—এইবার এক্‌তা গ-গ-অ-প্প।—কথার শেষের দিকে পাতলা রাঙা ঠোঁট দুটি ফুলের কুঁড়ির মত এক জায়গায় জড় করিয়া না আনিলে কথা মুখ দিয়া বাহির হইত না। তাহার দিদিমা হাসিয়া বলিত—যে গুড় খাস, গুড় খেয়ে খেয়ে এমনি তোৎলা। গল্প বলব, কিন্তু তুমি পাশ ফিরে চুপটি ক'রে শোবে, নড়বেও না, চড়বেও না। কাজল ভ্রু কুঁচকাইয়া ঘাড় সামনের দিকে নামাইয়া থুৎনী প্রায় বুকের উপর লইয়া আসিত। পরে চোখের ভুরু উপরের দিকে উঠাইয়া হাসি-ভরা চোখে চুপ করিয়া দিদিমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। দিদিমা বলিত, দুষ্টুমি ক'রো না দাদাভাই, আমার এখন অনেক কাজ, তোমার দাদু আবার এখুনি পাশার আড্ডা থেকে আসবেন, তাঁকে খেতে দেব। ঘুমোও তো লক্ষ্মী ভাইটি! কাজল বলিত, ইল্লি!···দা-দা-দাদুকে খাবার দেবে তো ছোট মামীমা, তু-তুমি এখন যাবে বৈ কি?—এক্‌তা গ-গ-অ-প্প কর, হ্যাঁ দিদিমা—

এ ধরণের কথা সে শিখিয়াছে বড় মাসতুতো ভায়েদের কাছে। তাহার বড় মাসীমার ছেলে দলু কথায় কথায় বলে—ইল্লি! কাজলও শুনিয়া শুনিয়া তাহাই ধরিয়াছে।

তাহার পর দিদিমা গল্প করিতেন, কাজল জানালার বাহিরে তারাভরা, স্তব্ধ, নৈশ আকাশের দিকে চাহিয়া একবার মুখ ফুলাইত আবার হাঁ করিত, আবার ফুলাইত আবার হাঁ করিত। দিদিমা বলিত—আঃ, ছিঃ দাদু! ও-রকম দুষ্টুমি করলে ঘুমুবে কখন? এখুনি তোমার দাদু ডাকবেন আমায়, তখন তো আমায় যেতে হবে। চুপটি ক'রে শোও। নইলে ডাকব তোমার দাদুকে?

দাদামহাশয়কে কাজল বড় ভয় করে, এইবার সে চুপ হইয়া যাইত। কোথায় গেল সেই দিদিমা! সে আরও বছর দেড় আগে, তখন তাহার বয়স সাড়ে-চার বছর—একদিন ভারি মজার ব্যাপার ঘটিয়াছিল। সে রাত্রে ঘুমাইতেছিল, সকালে উঠিলে অরু চুপি চুপি বলিল—ঠাকুমা কাল রাতে মারা গিয়েছে, জানিস নে কাজল?

—কো-কোথায় গিয়েছে?

—মারা গিয়েছে, সত্যি আজ শেষরাত্রে নিয়ে গিয়েছে। তুই ঘুমুচ্ছিলি তখন।

—আবার ক-কবে আসবে?

অরু বিজ্ঞের সুরে বলিল—আর বুঝি আসে? তুই যা বোকা। ঠাকুরমাকে তো পোড়াতে নিয়ে চলে গেছে ওই দিকে।—সে হাত তুলিয়া নদীর বাঁকের দিকে দেখাইয়া দিল।

অরু ভারী চালবাজ। সব তাতেই ওই রকম চাল দেয়, ভারি তো এক বছরের বড়, দেখায় যেন সব জানে, সব বোঝে। ওই চালবাজির জন্যই তো কাজল অরুকে দেখিতে পারে না।

সে খুব বিস্মিতও হইল। দিদিমা আর আসিবে না! কেন?···কি হইয়াছে দিদিমার?···বা-রে!

কিন্তু সেই হইতে দিদিমাকে আর সে দেখিতে পায় নাই। গোপনে গোপনে অনেক কাঁদিয়াছে, কোথায় দিদিমা এরকম একরাত্রের মধ্যে নিরুদ্দেশ হইয়া যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে অনেক ভাবিয়াছে, কিছু ঠিক করিতে পারে নাই।

আজকাল আর কেহ কাছে বসিয়া খাওয়ায় না, সঙ্গে করিয়া উপরে লইয়া আসে না, গল্প

করে না। একলাটি এই অন্ধকারের মধ্যে দিয়া আসিয়া উপরের ঘরে শুইতে হয়। সকলের চেয়ে মুশকিল হইয়াছে এইটাই বেশী কি-না।

বিংশ পরিচ্ছেদ

আরও এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। চৈত্র মাস যায় যায়।

অপু অনেকদিন পরে দেশে ফিরিতেছিল। গাড়ির মধ্যে একজন মুসলমান ভদ্রলোক লক্ষ্ণৌ-এর খরমুজার গুণ বর্ণনা করিতেছিল, অনেকে মন দিয়া শুনিতেছিল—অপু অন্যমনস্ক ভাবে জানালার বাহিরে চাহিয়া ছিল। কতক্ষণে গাড়ি বাংলা দেশে আসিবে? সাতসমুদ্র তেরোনদী পারের রূপকথার রাজ্য বাংলা! আজ দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ বৎসর সে বাংলার শান্ত, কমনীয় রূপ দেখে নাই, এই বৈশাখে বাঁশের বনে বনে শুকনো বাঁশখোলার তলা-বিছাইয়া পড়িয়া-থাকা কাঞ্চনফুলে-ভরা সান-বাঁধানো পুকুরের ঘাটে সদ্যস্নাত নতমুখী তরুণীর মূর্ত্তি—কলিকাতার মেস-বাটী, দালানের রেলিং-এ কাপড় মেলিয়া দেওয়া, বাবুরা সব আফিসে, নিচের বালতিতে বৈকাল তিনটার সময় কলের মুখ হইতে জল পড়িতেছে···এ সব সুপরিচিত প্রিয় দৃশ্যগুলি আর একবার দেখিবার জন্য—উঃ, মন কি ছট্‌ফট্‌ই না করিয়াছে গত ছ'বছর! বাংলা ছাড়িয়া সে ভাল করিয়া বাংলাকে চিনিয়াছে, বুঝিয়াছে। কতক্ষণে বাংলাকে দেখা যাইবে আজ? সন্ধ্যা ঠিক সাতটার সময়।

রাণীগঞ্জ ছাড়িয়া অনেক দূর আসিবার পরে, বালুময় মাঠের মধ্যে সিঙ্গারণ নদীর গ্রীষ্মের জল খররৌদ্রে শুকাইয়া গিয়াছে—দূর গ্রামের মেয়েরা আসিয়া নদীখাতের বালু খুঁড়িয়া সেই জলে কলসী ভর্ত্তি করিয়া লইতেছে—একটি কৃষক-বধূ জল-ভরা কলসী কাঁখে রেলের ফটকের কাছে দাঁড়াইয়া গাড়ি দেখিতেছে—অপু দৃশ্যটা দেখিয়া পুলকিত হইয়া উঠিল—সারা শরীরে একটা অপূর্ব্ব আনন্দ-শিহরণ! কতদিন বাংলার মেয়ের এ পরিচিত ভঙ্গিটি সে দেখে নাই! চোখ, মন জুড়াইয়া গেল।

বর্দ্ধমান ছাড়াইয়া নিদাঘ অপরাহ্নের ঘন ছায়ায় একটা অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়িল। একটা ছোট পুকুর ফুটন্ত পদ্মফুলে একেবারে ভরা, ফুলে পাতায় জল দেখা যায় না—ওপারে বিচালি-ছাওয়া গৃহস্থের বাটী, একটা প্রাচীন সজিনা গাছ জলের ধারে ভাঙিয়া পড়িয়া গলিয়া খসিয়া যাইতেছে, একটা গোবরগাদা—আজ সারাদিনের আগুন-বৃষ্টির পরে, বিহার ও সাঁওতালপরগণার বন্ধুর, আগুন-রাঙা ভূমিশ্রীর পরে, ছায়াভরা পদ্মপুকুরটা যেন সারা বাংলার কমনীয় রূপের প্রতীক হইয়া তাহার চোখে দেখা দিল।

হাওড়া স্টেশনে ট্রেনটা আসিয়া দাঁড়াইতেই সে যেন খানিকটা অবাক হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—এত আলো, এত লোকজন, এত ব্যস্ততা, এত গাড়ি-ঘোড়া জীবনে যেন সে এই প্রথম দেখিতেছে, হাওড়া পুল পার হইবার সময় ওপারের আলোকোজ্জ্বল মহানগরীর দৃশ্যে সে যেন মুগ্ধ হইয়া গেল—ওগুলা কি? মোটর বাস? কই আগে তো ছিল না কখনও? কি বড় বড় বাড়ি কলিকাতায়, ফুটপাতে কি লোকজনের ভিড়! বাড়ির মাথায় একটা কিসের বিজ্ঞাপনের বিজলী আলোর রঙীন হরপ একবার জ্বলিতেছে, আবার নিভিতেছে—উঃ, কী কাণ্ড!

হ্যারিসন রোডের একটা বোর্ডিং-এ উঠিয়া একা একটা ঘর লইল—স্নানের ঘর হইতে সাবান মাখিয়া স্নান সারিয়া সারাদিনের ধুমধুলি ও গরমের পর ভারী আরাম পাইল। ঘরের আলোর সুইচ টিপিয়া ছেলেমানুষের মত আনন্দে আলোটাকে একবার জ্বালাইতে একবার নিভাইতে লাগিল—সবই নূতন মনে হয়। সবই অদ্ভুত লাগে।

পরদিন সে কলিকাতার সর্বত্র ঘুরিল—কোন পরিচিত বন্ধু-বান্ধবের সহিত দেখা হইল না। বৌবাজারের সেই কবিরাজ বন্ধুটি বাসা উঠাইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, পূর্বপরিচিত মেসগুলিতে নূতন লোকেরা আসিয়াছে, কলেজ স্কোয়ারের সেই পুরাতন চায়ের দোকানটি উঠিয়া গিয়াছে।

সন্ধ্যার সময় সে একটা নূতন বাংলা থিয়েটারে গেল শুধু বাংলা গান শোনার লোভে। বেশী দামের টিকিট কিনিয়া রঙ্গমঞ্চের ঠিক সম্মুখের সারির আসনে বসিয়া পুলকিত ও উৎসুক চোখে সে চারিদিকের দর্শকের ভিড়টা দেখিতেছিল। একটা অঙ্কের শেষে সে বাহিরে আসিল, ফুটপাতে একজন বুড়ী পান বিক্রী করিতেছে, অপুকে বলিল, বাবু, পান নেবেন না? নেন না! অপু ভাবিল, সবাই মিঠে পান কিনছে বড় আয়নাওয়ালা দোকান থেকে। এ বুড়ীর পান বোধ হয় কেউ কেনে না—আহা, নিই এর কাছ থেকে।

সকলেরই উপর কেমন একটা করুণার ভাব, সবারই উপর কেমন একটা ভালবাসা, সহানুভূতির ভাব—অপুর মনের বর্তমান অবস্থায় বুড়ী পানওয়ালী হাত পাতিয়া দশটা টাকা চাহিয়া বসিলেও সে তৎক্ষণাৎ তাহা দিতে পারিত।

দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে সে বাহির হইয়া বুড়ীটার কাছে পান কিনিতে যাইতেছে, এমন সময় পিছনের আসনের দিকে তাহার নজর পড়িল।

সে একটু আগাইয়া গিয়া কাঁধে হাত দিয়া বলিল—সুরেশ্বরদা, চিনতে পারেন?

কলিকাতায় প্রথম ছাত্র-জীবনের সেই উপকারী বন্ধু সুরেশ্বর, সঙ্গে একটি তরুণী মহিলা। সুরেশ্বর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—গুডনেস্ গ্রেসাস্! আমাদের সেই অপূর্ব না?

অপু হাসিয়া বলিল, কেন, সন্দেহ হচ্ছে নাকি? ওঃ কতদিন পরে আপনার সঙ্গে—, ওঃ?

—দেখে সন্দেহ হবার কথা বটে। মুখের চেহারা বদলেছে, রঙটা একটু তামাটে—যদিও you are as handsome as ever—ও, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই—ইনি আমার বেটার-হাফ। আর ইনি আমার বন্ধু অপূর্ববাবু—কবি, ভাবুক, লেখক, ভবঘুরে এ্যাণ্ড হোয়াট নট্—তারপর, কোথায় ছিলে এতদিন?

—কোথায় ছিলুম না তাই বরং জিজ্ঞেস করুন—in all sorts of places—তবে সভ্য জগৎ থেকে দূরে—ছ'বছর পর কাল কলকাতায় এসেছি। ও ড্রপ উঠল বুঝি, এখন থাক, বলব এখন।

—মোস্ট বাজে প্লে। তার চেয়ে চলো, তোমার সঙ্গে বাইরে যাই—

অপু বন্ধুকে সিগারেট দিয়া নিজে সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে বলিল—আপনার এ-সব দেখে একঘেয়ে হয়ে গিয়েছে, তাই ভাল লাগছে না বোধ হয়। আমার চোখ নিয়ে যদি দেখতেন, তবে ছ'বছর বনবাসের পর উড়িয়াদের রামযাত্রাও ভাল লাগত। জানেন সুরেশ্বরদা, সেখানে আমার ঘর থেকে কিছু দূরে এক জায়গায় একটা গিরগিটি থাকত—সেটা এবেলা-ওবেলা রঙ বদলাত, দু'টি বেলা তাই শখ ক'রে দেখতে যেতুম—তাই ছিল একমাত্র তামাশা, তাই দেখে আনন্দ পেতুম।

রাত সাড়ে ন'টায় থিয়েটার ভাঙিল। তারপর সে থিয়েটার-ঘর হইতে নিঃসৃত সুবেশ নরনারীর স্রোতের দিকে চাহিয়া রহিল—এই আলো, লোকজন, সাজানো দোকানপসার—এসব সে ছেলেমানুষের মত আনন্দে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল।

স্ত্রীকে মাণিকতলায় শ্বশুরবাড়িতে নামাইয়া দিয়া সুরেশ্বর অপুর সহিত কর্পোরেশন স্ট্রীটের এক রেস্তোরাঁয় গিয়া উঠিল। অপুর কথা সব শুনিয়া বলিল—এই পাঁচ বছর ওখানে ছিলে? মন-কেমন করত না দেশের জন্যে?

—Oh, at times I felt so terribly homesick—homesick for Bengal—শেষ দু-বছর দেশ দেখবার জন্য পাগল হয়েছিলুম— ।

ফুটপাত বাহিয়া কয়েকটি ফিরিঙ্গি মেয়ে হাসি কলরব করিতে করিতে পথ চলিতেছে, অপু সাগ্রহে সেদিকে চাহিয়া রহিল। মানুষের গলার সুর মানুষের কাছে এত কাম্যও হয়। রাস্তাভরা লোকজন, মোটর গাড়ি, পাশের একটি একতলা বাড়িতে সাজানো গোছানো ছোট্ট ঘরে কয়েকটি সাহেবের ছেলেমেয়ে হুটোছুটি করিয়া খেলা করিতেছে—সবই অদ্ভুত সবই সুন্দর বলিয়া মনে হয়। আলোকোজ্জ্বল রেস্তোরাঁটায় অনবরত লোকজন ঢুকিতেছে, বাহির হইতেছে, মোটর হর্নের আওয়াজ, মোটর বাইকের শব্দ, একখানা রিক্‌সা গাড়ি ঠুং ঠুং করিতে করিতে চলিয়া গেল—অপু চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল—যেন এসব সে কখনও দেখে নাই।

সুরেশ্বরকে বলিল—দেখুন জানালার ধারে এসে—ঐ যে নক্ষত্রটা দেখছেন, আজ ক'বছর ধ'রে ওটাকে উঠতে দেখেছি ঘন বন-জঙ্গল-ভরা পাহাড়ের মাথার ওপরে। আজ ওটাকে হোয়াইটওয়ে লেড্‌লর বাড়ির মাথার ওপরে উঠতে দেখে কেমন নতুন নতুন ঠেকছে। এই তো পৌনে দশটা রাত? এ সময় গত পাঁচ বৎসর শুধু আমি জঙ্গল পাহাড়—আর তোঁড়িয়ার ডাক, কখনো কখনো বাঘের ডাকও— । আর কি loneliness! শহরে বসে সে সব বোঝা যাবে না।

সুরেশ্বরও নিজের কথা বলিল। চট্টগ্রাম অঞ্চলে কোন কলেজের অধ্যাপক, বিবাহ করিয়াছে কলিকাতায়। সম্প্রতি শালীর বিবাহ উপলক্ষে আসিয়াছে। বলিল—দ্যাখ ভাই, তোমার ও জীবন একবার আস্বাদ করতে ইচ্ছে হয়—কিন্তু তখন কি জানতুম বিয়ে এমন জিনিস হয়ে দাঁড়াবে? যদি কিছু করতে চাও জীবনে, বিয়ে ক'রো না কখনও, বলে দিলুম। বিয়ে করো নি তো?

অপু হাসিয়া বলিল—ওঃ, আমি ভাবছি আপনার এ লেকচার যদি বৌদি শুনতেন!···

—না না, শোনো। সত্যি বলছি, সে উনিশ-শো পনেরো সালের সুরেশ্বর আর নই আমি। সংসারের হাড়িকাঠে যৌবন গিয়েছে, শক্তি গিয়েছে, স্বপ্ন গিয়েছে, জীবনটা বৃথা খুইয়েছি—কত কি করবার ইচ্ছে ছিল—ও, যেদিন এম. এ. ডিপ্লোমাটা নিয়ে কন্‌ভোকেশন হল থেকে বেরুলাম, মনে আছে মাঘের শেষ, গোলদীঘির দেবদারু গাছে নতুন পাতা গজিয়েছে, সবে দখিনা হাওয়া শুরু হয়েছে, গাউন সমেত এক দোকানে গিয়ে ফটো ওঠালুম, কি খুশী! মনে হ'ল, সারা পৃথিবীটা আমার পায়ের তলায়! ফটোখানা আজও আছে—চেয়ে দেখে ভাবি, কি ছিলুম কি হয়ে দাঁড়িয়েছি! পাড়াগাঁয়ের কলেজে তিন-শো চব্বিশ দিন একই কথা আওড়াই, দলাদলি করি, প্রিন্সিপ্যালের মন যোগাই, স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করি, ছেলেদের ডাক্তার দেখাই, এর মধ্যে মেয়ের বিয়ের ভাবনাও ভাবি—না না, তুমি হেসো না, এসব ঠাট্টা নয়।

অপু বলিল—এত সেণ্টিমেণ্টাল হয়ে পড়লেন কেন হঠাৎ সুরেশ্বরদা—এক পেয়ালা কফি—

—না না, তোমাকে পেয়ে সব বললুম, কারুর কাছে বলি নে, কে বুঝবে, তারা সবাই দেখছে, দিব্যি চাকরি করছি, মাইনে বাড়ছে, তবে তো বেশই আছি। আমি যে মরে যাচ্ছি, তা কেউ বুঝবে না।

রেস্তোরাঁ হইতে বাহির হইয়া পরস্পর বিদায় লইল। অপু বলিল—জানেন তো বলেছে—In each of us a child has lived and a child has died—a child of promise, who never grew up—আচ্ছা, জীবনটা অদ্ভুত জিনিস সুরেশ্বরদা—অত সহজে তাকে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। আচ্ছা আসি, বড় আনন্দ পেলুম আজ। যখন প্রথম

কলকাতায় পড়তে আসি, জায়গা ছিল না, তখন আপনারা জায়গা দিয়েছিলেন, সে কথা ভুলি নি এখনও।

পরদিন দুপুর পর্যন্ত সে ঘুমাইয়া কাটাইল। বৈকালের দিকে ভবানীপুরে লীলার মামার বাড়ি গেল। অনেক দিন সে লীলার কোন সংবাদ জানে না—দূর হইতে লাল ইঁটের বাড়িটা চোখে পড়িতেই একটা আশা ও উদ্বেগে বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিয়া উঠিল, লীলা এখানে আছে,—না নাই—যদি গিয়া দেখে সে আছে! সেই একদিন দেখা হইয়াছিল অপর্ণার মৃত্যুর পূর্বে। আজ আট বৎসর হইতে চলিল—এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আর কোন দিন দেখা হয় নাই।

প্রথমেই দেখা হইল লীলার ভাই বিমলেন্দুর সঙ্গে। সে আর বালক নাই, খুব লম্বা হইয়া পড়িয়াছে, মুখের চেহারা অন্য রকম দাঁড়াইয়াছে। বিমলেন্দু প্রথমটা যেন অপুকে চিনিতে পারিল না, পরে চিনিয়া বৈঠকখানার পাশের ঘরে লইয়া বসাইল। দু পাঁচ মিনিট এ-কথা ও-কথার পরে অপু যতদূর সম্ভব সহজ স্বরে বলিল—তারপর তোমার দিদির খবর কি—এখানে না শ্বশুরবাড়ি?

বিমলেন্দু কেমন একটা আশ্চর্য সুরে বলিল—ও, ইয়ে আসুন আমার সঙ্গে—চলুন।

কেমন একটা অজানা আশঙ্কায় অপুর মন ভরিয়া উঠিল, ব্যাপার কি? একটু পরে গিয়া বিমলেন্দু রাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া নীচু স্বরে বলিল—দিদির কথা কিছু শোনেন নি আপনি?

অপু উদ্বিগ্নমুখে বলিল—না—কি? লীলা আছে তো?

—আছেও বটে, নেইও বটে। সে সব অনেক কথা, আপনি ফ্যামিলির ফ্রেন্ড বলে বলছি। দিদি ঘর ছেড়েছে। স্বামী গোড়া থেকেই ঘোর মাতাল—অতি কু-চরিত্র। বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীটের এক ইহুদী মেয়েকে নিয়ে বাড়াবাড়ি আরম্ভ ক'রে দিলে—তাকে নিজের বাসাতে রাত্রে নিয়ে যেতে শুরু করলে। দিদিকে জানেন তো? তেজী মেয়ে, এ সব সহ্য করার পাত্রী নয়—সেই রাত্রেই ট্যাক্সি ডাকিয়ে পদ্মপুকুরে চলে আসে নিজের ছোট মেয়েটাকে নিয়ে। মাস দুই পর একদিন দাদাবাবু এল, মেয়েকে সিনেমা দেখাবার ছুতো ক'রে নিয়ে গেল জব্বলপুরে…আর দিদির কাছে পাঠায় না। তারপর দিদি যা করেছে—সে যে আবার দিদি করতে পারত তা কখনও কেউ ভাবে নি। হীরক সেনকে মনে আছে? সেই যে ব্যারিস্টার হীরক সেন, আমাদের এখানে পার্টিতে দেখেছেন অনেকবার। সেই হীরক সেনের সঙ্গে দিদি একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। এক বৎসর কোথায় রইল—আজকাল ফিরে এসেছে, কিন্তু হীরক সেনকে ছেড়েছে। একা আলিপুরে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকে। এ বাড়িতে তার নাম আর করার উপায় নেই। মা কাশীবাসিনী হয়েছেন, আর আসবেন না।

কথা শেষ করিয়া বিমলেন্দু নিজেকে একটু সংযত করার জন্যই বোধ হয় একটু চুপ করিয়া রহিল। পরে বলিল,—হীরক সেন কিছু না—এ শুধু তার একটা শোধ তোলা মাত্র, সেন তো শুধু উপলক্ষ। আচ্ছা, তবে আসি অপূর্ববাবু, এখন কিছু দিন থাকবেন তো এখানে?—বিমলেন্দু চলিয়া যায় দেখিয়া অপু কথা খুঁজিয়া পাইল, তাড়াতাড়ি তাহার হাতখানা ধরিয়া অকারণে বলিল—শোনো, শোনো, লীলা আলিপুরে আছে তা হলে?

এ প্রশ্ন সে করিতে চাহে নাই, সে জানে এ প্রশ্নের কোন অর্থ নাই। কিন্তু এক সঙ্গে এত কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছিল—কোন্‌টা সে জিজ্ঞাসা করিবে?

বিমলেন্দু বলিল,—এতে আমাদের যে কি মর্ম্মান্তিক—বর্দ্ধমানে আমাদের বাড়ির সেই নিস্তারিণী ঝিকে মনে আছে? সে দিদিকে ছেলেবেলায় মানুষ করেছে, পুজোর সময় বাড়ি গেলুম, সে ভেউ-ভেউ ক'রে কাঁদতে লাগল। সে-বাড়িতে দিদির নাম পর্যন্ত করার জো নেই। রমেনদা আজকাল বাড়ির মালিক, বুঝলেন না? দিদিও সুখে নেই, বলবেন না কাউকে,

আমি লুকিয়ে যাই, এত কাঁদে মেয়ের জন্যে। হীরক সেন দিদির টাকাগুলো দু হাতে উড়িয়েছে, আবার বলেছিল বিলেতে বেড়াতে নিয়ে যাবে। সেই লোভ দেখিয়েই নাকি টানে—দিদি আবার তাই বিশ্বাস করত। জানেন তো দিদিরও ঝোঁক আছে, চিরকাল।

বিমলেন্দু চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, অপু আবার গিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল—তুমি মাঝে মাঝে কোন্ সময়ে যাও?—বিমলেন্দু বলিল—রোজ যে যাই তা নয়, বিকেলে দিদি মোটরে বেড়াতে আসে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনের মাঠে, ঐখানে দেখা করি।

বিমলেন্দু চলিয়া গেলে অপু অন্যমনস্ক ভাবে হাঁটিতে হাঁটিতে রসা রোডে আসিয়া পড়িল—কি ভাবিতে ভাবিতে সে শুধুই হাঁটিতে লাগিল। পথের ধারে একটা পার্ক, ছেলেমেয়েরা খেলা করিতেছে। দড়ি ঘুরাইয়া ছোট মেয়েরা লাফাইতেছে, সে পার্কটায় ঢুকিয়া একটা বেঞ্চের উপর বসিল। লীলার উপর রাগ বা অভিমান কোনটাই হইল না, সে অনুভব করিল, এত ভালবাসে নাই সে কোনদিনই লীলাকে। এই আট বৎসরে লীলা তো তাহার কাছে অবাস্তব হইয়া পড়িয়াছে, তাহার মুখ পর্যন্ত ভাল মনে হয় না, অথচ মনের কোন্ গোপন অন্ধকার কোণে এত ভালবাসা সঞ্চিত হইয়াছিল তাহার জন্য! ভাবিল, ওর দাদামশায়েরই যত দোষ, কে এ বিয়ে দিতে মাথার দিব্য দিয়েছিল তাঁকে? বেচারী লীলা! সবাই মিলে ওর জীবনটা নষ্ট ক'রে দিলে!

কিছুদিন কলিকাতায় থাকিবার পরে সে বাসা বদলাইয়া অন্য এক বোর্ডিং-এ গিয়া উঠিল। পুরানো দিনের কষ্টগুলো আবার সবই আসিয়া জুটিয়াছে—একা এক ঘরে থাকিবার মত পয়সা হাতে নাই, অথচ দুই-তিনটি কেরানীবাবুর সঙ্গে এক ঘরে থাকা আজকাল তাহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব মনে হয়। লোক তাঁহারা ভালই, অপুর চেয়ে বয়স অনেক বেশী, সংসারী, ছেলেমেয়ের বাপ। ব্যবহারও তাঁহাদের ভাল। কিন্তু হইলে কি হয়, তাঁহাদের মনের ধারা যে-পথ অবলম্বনে গড়িয়া উঠিয়াছে অপু তাহার সহিত আদৌ পরিচিত নয়। সে নির্জনতা-প্রিয়, একা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে চায়, সেইটাই এখানে হইবার জো নাই। হয়ত সে বৈকালের দিকে বারান্দাটাতে সবে আসিয়া বসিয়াছে--কেশববাবু হুঁকা হাতে পিছন হইতে বলিয়া উঠিলেন—এই যে অপূর্ববাবু, একাটি বসে আছেন? চৌধুরী-ব্রাদার্স বুঝি এখনও অফিস থেকে ফেরেন নি? আজ শোনেন নি বুঝি মোহনবাগানের কাণ্ডটা? আরে রামোঃ—শুনুন তবে—

কলিকাতা তাহার পুরাতন রূপে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। সেই ধুলা, ধোঁয়া, গোলমাল, একঘেয়েমি, সংকীর্ণতা, সব দিনগুলা এক রকমের হওয়া—সেই সব।

সে চলিয়া আসিত না, কিংবা হয়ত আবার এতদিনে চলিয়া যাইত, মুশকিল এই যে, মিঃ রায়চৌধুরীও ওখানকার কাজ শেষ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া একটি জয়েন্টস্টক কোম্পানী গড়িবার চেষ্টায় আছেন, অপুকে তাঁহার অফিসে কাজ দিতে রাজী হইয়াছেন। কিন্তু অপু বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল, গত ছ'বছরের জীবনের পরে আবার কি সে অফিসের ডেস্কে বসিয়া কেরানীগিরি করিতে পারিবে? এদিকে পয়সা ফুরাইয়া আসিল যে! না করিলেই বা চলে কিসে?

সেখানে থাকিতে, এই ছয় বৎসরে যা হইয়াছিল, অপু বোঝে এখানে তা চব্বিশ বৎসরেও হইত না। আর্টের নতুন স্বপ্ন সেখানে সে দেখিয়াছে।

ওখানকার সূর্যাস্তের শেষ আলোয়, জনহীন প্রান্তরে, নিস্তব্ধ আরণ্যভূমির মায়ায়, অন্ধকার-ভরা নিশীথ রাত্রির আকাশের নীচে, শালমঞ্জরীর ঘন সুবাসভরা দুপুরের রোদে সে জীবনের গভীর রহস্যময় সৌন্দর্যকে জানিয়াছে।

কিন্তু কলিকাতার মেসে তাহা তো মনে আসে না—সে ছবিকে চিন্তায় ও কল্পনায় গড়িয়া

তুলিতে গভীরভাবে নির্জন চিন্তার দরকার হয়—সেইটাই তাহার হয় না এখানকার মেসজীবনে। সেখানে তাহার নির্জন প্রাণের গভীর, গোপন আকাশে সত্যের যে নক্ষত্রগুলি স্বতঃস্ফূর্ত ও জ্যোতিষ্মান্ হইয়া দেখা দিয়াছিল, এখানকার তরল জীবনানন্দের পূর্ণ জ্যোৎস্নায় হয়ত তাহারা চিরদিনই অপ্রকাশ রহিয়া যাইত।

মনে আছে, সে ভাবিয়াছিল, ঐ সৌন্দর্যকে, জীবনের ঐ অপূর্ব রূপকে সে যতদিন কালি-কলমে বন্দী করিয়া দশজনের চোখের সামনে না ফুটাইতে পারিবে—ততদিন সে কিছুতেই ক্ষান্ত হইবে না—

আর একদিন সেখানে সে কি অদ্ভুত শিক্ষাই না পাইয়াছিল।

ঘোড়া করিয়া বেড়াইতেছিল। এক জায়গায় বনের ধারে ঝোপের মধ্যে অনেক লতাগাছে গা লুকাইয়া একটা তেলাকুচা গাছ। তেলাকুচা বাংলার ফল—অপরিচিত মহলে একমাত্র পরিচিত বন্ধু, সেখানে দাঁড়াইয়া গাছটাকে দেখিতে বড় ভাল লাগিতেছিল।···তেলাকুচা লতার পাতাগুলা সব শুকাইয়া গিয়াছে, কেবল অগ্রভাগে ঝুলিতেছিল একটা আধ-পাকা ফল। তারপর দিনের পর দিন সে ঐ লতাটার মৃত্যু-যন্ত্রনা লক্ষ্য করিয়াছে। ফলটা যতই পাকিয়া উঠিতেছে, বোঁটার গোড়ায় যে অংশ সবুজ ছিল, সেটুকু যতই রাঙা সিঁদুরের রং হইয়া উঠিতেছে, লতাটা ততই দিন দিন হলুদে শীর্ণ হইয়া শুকাইয়া আসিতেছে।

একদিন দেখিল, গাছটা সব শুকাইয়া গিয়াছে, ফলটাও বোঁটা শুকাইয়া গাছে ঝুলিতেছে, তুলতুলে পাকা, সিঁদুরের মত টুকটুকে রাঙা—যে কোন পাখি, বানর কি কাঠাবেড়ালীর অতি লোভনীয় আহার্য। যে লতাটা এতদিন ধরিয়া ন' কোটি মাইল দূরের সূর্য হইতে তাপ সংগ্রহ করিয়া, চারিপাশের বায়ুমণ্ডল হইতে উপাদান লইয়া মৃত, জড়পদার্থ হইতে এ উপাদেয় খাবার তৈয়ারী করিয়াছিল, তাহার জীবনের উদ্দেশ্য শেষ হইয়া গিয়াছে—ঐ পাকা টক্‌টকে ফলটাই তাহার জীবনের চরম পরিণতি! ফলটা পাখিতে কাঠবেড়ালীতে খাইবে, এজন্য গাছটাকে তাহারা ধন্যবাদ দিবে না; তেলাকুচা লতাটা অজ্ঞাত, অখ্যাতই থাকিয়া যাইবে। তবুও জীবন তাহার সার্থক হইয়াছে—ঐ টুক্‌টুকে ফলটাতে ওর জীবন সার্থক হইয়াছে। যদি ফলটা কেউ না-ই খায়, তাহাতেও ক্ষতি নাই, মাটিতে ঝড়িয়া পড়িয়া আরও কত তেলাকুচার জন্ম ঘোষণা করিবে, আরও কত লতা, কত ফুল-ফল, কত পাখির আহার্য।

মন তখন ছিল অদ্ভুত রকমের তাজা, সবল, গ্রহণশীল, সহজ আনন্দময়। তেলাকুচা-লতার এই ঘটনাটা তাহার মনে বড় ধাক্কা দিয়াছিল—সে কি ঐ সামান্য বন-ঝোপের তেলাকুচা-লতাটার চেয়েও হীন হইবে?···তাহার জীবনের কি উদ্দেশ্য নাই? সে জগতে কি কিছু দিবে না?

সেখানে কতদিন শালবনের ছায়ায় পাথরের উপর বসিয়া দুপুরে এ প্রশ্ন মনে জাগিয়াছে! ···কত নিস্তব্ধ তারাভরা রাত্রে গভীর বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাঁবুর বাহিরের ঘন নৈশ অন্ধকারের দিকে চাহিয়া চাহিয়া এই সব স্বপ্নই মনে জাগিত। বহু দূরে, দূর ভবিষ্যতে শিরীষফুলের পাপড়ির মত নরম ও কচি-মুখ কত শত অনাগত বংশধরদের কথা মনে পড়িত, খোকার মুখখানা কি অপূর্ব প্রেরণা দিত সে সময়!—ওদেরও জীবনে কত দুঃখরাত্রের বিপদ আসিবে, কত সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইবে—তখন যুগান্তের এপার হইতে দৃঢ়হস্ত বাড়াইয়া দিতে হইবে তোমাকে—তোমার কত শত বিনিদ্র রজনীর মৌন জনসেবা, হে বিস্মৃত পথের মহাজন পথিক, একদিন সার্থক হইবে—অপরের জীবনে।

দুঃখের নিশীথে তাহার প্রাণের আকাশে সত্যের যে নক্ষত্ররাজি উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে—তা সে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া যাইবে, জীবনকে সে কি ভাবে দেখিল তাহা লিখিয়া রাখিয়া যাইবে—

নিজের প্রথম বইখানির দিনে দিনে প্রবর্ধমান পাণ্ডুলিপিকে সে সস্নেহ প্রতীক্ষার চোখে দেখে—বইয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কত কথা তাহার আগ্রহভরা বক্ষস্পন্দনে আশা, আনন্দের সঙ্গীত জাগায়—মা যেমন শিশুকে চোখের সম্মুখে কান্নাহাসির মধ্য দিয়া বাড়িতে দেখেন, দুরু দুরু বক্ষে তাহার ভবিষ্যতের কথা ভাবেন—তেমনি।

বই-লেখার কষ্টটুকু করার চেয়ে বইয়ের কথা ভাবিতে ভাল লাগে। কাদের কথা বইয়ে লেখা থাকিবে ?—কত লোকের কথা। গরীবদের কথা। ওদের কথা ছাড়া লিখিতে ইচ্ছা হয় না।

পথে ঘাটে, হাটে, গ্রামে, শহরে, রেলে কত অদ্ভুত ধরণের লোকের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়াছে জীবনে—কত সাধু-সন্ন্যাসী, দোকানী, মাস্টার, ভিখারী, গায়ক, পুতুল-নাচওয়ালা, আম-পাড়ানি, ফেরিওয়ালা, লেখক, কবি, ছেলে-মেয়ে—এদের কথা।

আজিকার দিন হইতে অনেক দিন পরে—হয়তো শত শত বৎসর পরে তাহার নাম যখন এ-বছরের-ফোটা-শালফুলের মঞ্জরীর মত—কিংবা তাহার ঘরের কোণের মাকড়সার জালের মত—কোথায় মিলাইয়া যাইবে, তখন তাহার কত অনাগত বংশধর কত সকালে সন্ধ্যায়, মাঠে, গ্রাম্য নদীতীরে, দুঃখের দিনে, শীতের সন্ধ্যায় অথবা অন্ধকার গহন নিস্তব্ধ দুপুর রাত্রে, শিশিরভেজা ঘাসের উপর তারার আলোর নীচে শুইয়া-শুইয়া তাহার বই পড়িবে—কিংবা বইয়ের কথা ভাবিবে।

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কত আশঙ্কাও জাগে। যদি কেউ না পড়ে ? আবার ভাবে, পৃথিবীর কোন্ অতীতে আদিম যুগের শিল্পীদল দুর্গম গিরিগুহার অন্ধকারে বৃষ, বাইসন, ম্যামথ আঁকিয়া গিয়াছিল—প্রাচীনদিনের বিস্মৃত প্রতিভা এতকাল পর তাহার দাবি আদায় করিতেছে—নতুবা ক্যান্টাব্রিয়া, দর্দঞ্ ও পিরেনিজের পর্বতগুহাগুলায় দেশবিদেশের মনীষী ও ভ্রমণকারীদের এত ভিড় কিসের ? তেলাঁকুচা লতাটা শুকাইয়া গিয়াছে ; কিন্তু সে জীবন দিয়া ফলটাকে মানুষ করিয়া গিয়াছে যে ! আত্মদানের ফল বৃথা যাইবে না। কত গাছ গজাইবে ওর বীজে—

নিজের প্রথম বইখানি—মনে কত চিন্তাই আসে। অনভিজ্ঞ মন সবতাতেই অবাক হইয়া যায়, সবতাতেই গাঢ় পুলক অনুভব করে।

এই তাহার বই লেখার ইতিহাস।

কিন্তু প্রথম ধাক্কা খাইল বইখানার পাণ্ডুলিপি হাতে দোকানে দোকানে ঘুরিয়া। অজ্ঞাতনামা লেখকের বই কেহ লওয়া দূরে থাকুন, ভাল করিয়া কথাও বলে না। একটা দোকানে খাতা রাখিয়া যাইতে বলিল। দিন পাঁচেক পরে তাহাদের একখানা পোস্টকার্ড পাইয়া অপু ভাল কাপড় পরিয়া, জুতা বুরুশ করিয়া বন্ধুর চশমা ধার করিয়া দুরু দুরু বক্ষে সেখানে গিয়া হাজির হইল। অত ভাল বই তাহার—পড়িয়া হয়ত উহারা অবাক হইয়া গিয়াছে।

দোকানের মালিক প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিল না, পরে চিনিয়া বলিল—ও ! ওহে সতীশ, এঁর সেই খাতাখানা এঁকে দিয়ে দাও তো—বড় আলমারির দেরাজে দেখো।

অপুর কপাল ঘামিয়া উঠিল। খাতা ফেরত দিতে চায় কেন ? সে বিবর্ণ মুখে বলিল—আমার বইখানা কি—

না। নতুন লেখকের বই নিজের খরচে তাহারা ছাপাইবে না। তবে যদি সে পাঁচ শত টাকা খরচ দেয়, তবে সে অন্য কথা। অপু অত টাকা কখনও এক জায়গায় দেখে নাই।

পরদিন সকালে বিমলেন্দু অপুর বাসায় আসিয়া হাজির। বৈকালে পাঁচটায় সময় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনের মাঠে লীলা আসিবে, বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছে

তাহাকে লইয়া যাইতে।

বৈকালে বিমলেন্দু আবার আসিল। দুজনে মাঠে ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করিবার পর বিমলেন্দু একটা হলদে রঙের মোটর দেখাইয়া বলিল, ঐ দিদি আসছে—আসুন, গাছতলায় গাড়ি পার্ক করবে, এখানে ট্র্যাফিক পুলিশে আজকাল বড় কড়াকড়ি করে।

অপুর বুক ঢিপ্-ঢিপ্ করিতেছিল। কি বলিবে, কি বলিবে সে লীলাকে?

বিমলেন্দু আগে আগে, অপু পিছনে পিছনে। লীলা গাড়ি হইতে নামে নাই, বিমলেন্দু গাড়ির জানালার কাছে গিয়া বলিল,—দিদি, অপূর্ববাবু এসেছেন, এই যে।—পরক্ষণেই অপু গাড়ির পাশে দাঁড়াইয়া হাসিমুখে বলিল—এই যে, কেমন আছ, লীলা?

সত্যই অপূর্ব সুন্দর। অপুর মনে হইল, যে-কবি বলিয়াছেন, সৌন্দর্য্যই একটা মহৎ গুণ, যে সুন্দর তাহার আর কোন গুণের দরকার হয় না, তিনি সত্যদর্শী, অক্ষরে অক্ষরে তাঁহার উক্তি সত্য।

তবুও আগের লীলা নাই, একটু মোটা হইয়া পড়িয়াছে, মুখের সে তরুণ লাবণ্য আর কই? মুখের পরিণত সৌন্দর্য্য ঠিক তাহার মা মেজবৌরানীর এ বয়সে যাহা ছিল তাই, সেই ছেলেবেলায় বর্ধমানের বাটীতে দেখা মেজবৌরানীর মুখের মত। উদ্দাম লালসামাখা সৌন্দর্য্য নয়—শান্ত, বরং যেন কিছু বিষণ্ণ।

বাড়ির বাহির হইয়া গিয়াছে যে-মেয়ে, তাহার ছবির সঙ্গে অপু কিছুতেই এই বিষণ্ণ-নয়না দেবীমূর্ত্তিকে খাপ খাওয়াইতে পারিল না। লীলা ব্যস্ত হইয়া হাসিমুখে বলিল—এসো, অপূর্ব এসো। তুমি তো আমাদের ভুলেই গিয়েচ একেবারে। উঠে এসে বসো। চলো, তোমাকে একটু বেড়িয়ে নিয়ে আসি। শোভা সিং, লেক—

লীলা মধ্যে বসিল, ও-পাশে বিমলেন্দু, এ-পাশে অপু, অপুর মনে পড়িল বাল্যকাল ছাড়া লীলার এত কাছে সে আর কখনও বসে নাই। বার বার লীলার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। এতকাল পরে লীলাকে আবার এত কাছে পাইয়াছে—বার বার দেখিয়াও যেন তৃপ্তি হইতেছিল না। লীলা অনর্গল বকিতেছিল, নানারকম মোটরগাড়ির তুলনামূলক সমালোচনা করিতেছিল, মাঝে মাঝে অপুর সম্বন্ধে এটা-ওটা প্রশ্ন করিতেছিল। লেক দেখিয়া অপু কিন্তু নিরাশ হইল। সে মনে মনে ভাবিল—এই লেক! এরই এত নাম! এ কলকাতার বাবুদের ভাল লাগতে পারে—ভারী তো! লীলা আবার এরই এত সুখ্যাতি করছিল—আহা, বেচারী কলকাতা ছেড়ে বিশেষ কোথাও তো যায় নি!—লীলা পাছে অপ্রতিভ হয় এই ভয়ে সে নিজের মতটা আর ব্যক্ত করিল না। একটা নারিকেল গাছের তলায় বেঞ্চি পাতা—সেখানে দুজনে বসিল। বিমলেন্দু মোটর লইয়া লেক ঘুরিতে গেল। লীলা হাসিমুখে বলিল—তারপর, তুমি নাকি দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিলে?

—তোমার শ্বশুরবাড়ির দেশে গিয়েছিলুম—জব্বলপুরের কাছে।—বলিয়া ফেলিয়া অপু ভাবিল কথাটা বলা ভাল হয় নাই, হয়তো লীলার মনে কষ্ট হইবে—ছিঃ—

কথাটা ঘুরাইয়া ফেলিয়া বলিল—আচ্ছা ঐ দ্বীপ-মতন ব্যাপারগুলো—ওতে যাবার পথ নেই···

—সাঁতার দিয়ে যাওয়া যায়। তুমি তো ভালো সাঁতার জানো—না? ও-সব কথা যাক—এতদিন কোথায় ছিলে, কি করছিলে বলো। তোমাকে দেখে আজ এত খুশী হয়েছি!···আমার বাসায় এসো আলিপুরে—চা খাবে। একটু তামাটে রঙ হয়েছে, কেন? ···রোদে ঘুরে ঘুরে বুঝি—আচ্ছা, আমার কথা তোমার মনে ছিল?

অপু একটু হাসিল। কোন নাটুকে ধরণের কথা সে মুখে বলিতে পারে না। আর এই সময়েই যত মুখচোরা রোগ আসিয়া জোটে! কতকাল পরে তো লীলাকে একা কাছে

পাইয়াছে—কিন্তু মুখে কথা যোগায় কৈ ?···কত কথা লীলাকে বলিবে ভাবিয়াছিল—এখন লীলাকে কাছে পাইয়া সে-সব কথা মুখ দিয়া তো বাহির হয়ই না—বরং নিতান্ত হাস্যকর বলিয়া মনে হয়।

হঠাৎ লীলা বলিল—হ্যাঁ ভালো কথা, তুমি নাকি বই লিখেছ ? একদিন আমাকে দেখাবে না, কি লিখলে ? আমি জানি তুমি একদিন বড় লেখক হবে, তোমার সেই ছেলেবেলার গল্প লেখার কথা মনে আছে ? তখন থেকেই জানি।

পরে সে একটা প্রস্তাব করিল। বিমলেন্দুর মুখে সে সব শুনিয়াছে, বইওয়ালারা বই লইতে চায় না—ছাপাইতে কত খরচ পড়ে ? এ বই ছাপাইয়া বাহির করিবার সমুদয় খরচ দিতে সে রাজী।

অপ্রত্যাশিত আনন্দে অপুর সারা শরীরে যেন একটা বিদ্যুতের ঢেউ খেলিয়া গেল। সব খরচ ! যত লাগে ! তবুও আজ সে মুখে কিছু বলিল না।

অপুর মনে লীলার জন্য একটা করুণা ও অনুকম্পা জাগিয়া উঠিল, ঠিক পুরাতন দিনের মত। লীলারও কত আশা ছিল আর্টিস্ট হইবে, ছবি আঁকিবে, অনভিজ্ঞ তরুণ বয়সে তাহারই মত কত কি স্বপ্নের জাল বুনিত। এখন শুধু নতুন নতুন মোটরগাড়ি কিনিতেছে, সাহেবী দোকানে লেস কিনিয়া বেড়াইতেছে—পুরাতন দিনের যজ্ঞবেদীতে আগুন কই, নিভিয়া গিয়াছে। যজ্ঞ কিন্তু অসমাপ্ত। কৃপার পাত্র লীলা ! অভাগিনী লীলা !

ঠিক সেই পুরাতন দিনের মত মনটি আছে কিন্তু। তাহাকে সাহায্য করিতে মায়ের-পেটের-মমতাময়ী-বোনের মতই হাত বাড়াইয়া দিয়াছে অমনি। আশৈশব তাহার বন্ধু··· তাহার সম্বন্ধে অন্ততঃ ওর মনের তারটি খাঁটি সুরেই বাজিল চিরদিন। এখানেও হয়ত করুণা, মমতা, অনুকম্পা—ওদেরই বাড়িতে না তাহার মা ছিল রাঁধুনী, কে জানে হয়তো কোন্ শুভ মুহূর্তে তাহার হীনতা, দৈন্য, অসহায় বাল্যজীবন, বড়লোকের মেয়ে লীলার কোমল বাল্য-মনে ঘা দিয়াছিল, সহানুভূতি, করুণা, মমতা জাগাইয়াছিল। সকল সত্যকার ভালবাসার মশলা এরাই—এরা যেখানে নাই, ভালবাসা সেখানে মাদকতা আনিতে পারে, মোহ আনিতে পারে, কিন্তু চিরস্থায়িত্বের স্নিগ্ধতা আনে না।

সে ভাবিল, লীলার মনটা ভাল বলে সেই সুযোগে সবাই ওর টাকা নিচ্ছে। ও বেচারী এখনও মনে সেই ছেলেমানুষটি আছে—আমি ওকে exploit করতে পারব না। দরকার নেই আমার বই-ছাপানোয়।

এদিকে মুশকিল। হাতের টাকা ফুরাইল। চাকুরিও জোটে না।

মিঃ রায়চৌধুরী অনবরত ঘুরাইতে ও হাঁটাইতে লাগিলেন। অপু যেখানে ছিল সেখানে আবার এঁরা ম্যাঙ্গানিজের কাজ আরম্ভ করিয়াছেন, অপু ধরিয়া পড়িল তাহাকে আবার সেখানে পাঠানো হউক। অনেকদিন ঘোরানোর পর মিঃ রায়চৌধুরী একদিন প্রস্তাব করিলেন, সে আরও কম টাকা বেতনে সেখানে যাইতে রাজী আছে কি না ? অপমানে অপুর চোখে জল আসিল, মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। একথা বলিতে উহারা আজ সাহস করিল শুধু এইজন্য যে, উহারা জানে যতই কমে হউক না কেন সে সেখানে ফিরিয়া যাইতে রাজী হইবে। অর্থের জন্য নয় —অর্থের জন্য এ অপমান সে সহ্য করিবে না নিশ্চয়।

কিন্তু···

শরতের প্রথম—নিচের অধিত্যকায় প্রথম আবলুস ফল পাকিতে শুরু করিয়াছে বটে, কিন্তু মাথার উপরে পর্ব্বতসানুর উচ্চস্থানে এখনও বর্ষা শেষ হয় নাই। টেঁপারী বনে এখনও ফল পাকিয়া হলুদে হইয়া আছে, ভালুক-দল এখনও সন্ধ্যার পরে টেঁপারী খাইতে

নামে, টিয়া পাখির ঝাঁক সারাদিন কলরব করে, আরও উপরে যেখান হইতে বাদাম ও সেগুন বনের শুরু, সেখানে অজস্র সাদা মাজুফল, আরও উপরে রিঠাগাছে থোলো-থোলো ফুল ধরিয়াছে, এমন কি ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখিলে দু-একটা রিঠাগাছে এখনও দু এক ঝাড় দেরিতে-ফোটা রিঠা ফুলও পাওয়া যাইতে পারে।

সেখানকার সেই বিরাট রুক্ষ আরণ্যভূমি, নক্ষত্রালোকিত আলো-আঁধার, উদার জনহীন, বিশাল তৃণভূমি, সেই টানা একঘেয়ে পশ্চিমে হাওয়া, সেই অবাধ জ্যোৎস্না, স্বাধীনতা, প্রসারতা, সেই বিরাট নির্জনতা তাহাকে আবার ডাকিতেছে।

এক এক সময় তাহার মনে হয় কানাডায়, অস্ট্রেলিয়ায়, নিউজিল্যাণ্ডে, আফ্রিকায় মানুষ প্রকৃতির এই মুক্ত সৌন্দর্য্যকে ধ্বংস করিতেছে সত্য, গাছপালাকে দূর করিয়া দিতেছে বটে, কিন্তু প্রকৃতি একদিন প্রতিশোধ লইবে। ট্রপিকস্-এর অরণ্য আবার জাগিবে, মানুষকে তাহারা তাড়াইবে, আদিম অরণ্যানী আবার ফিরিবে। ধরাবিদ্রাবণকারী সভ্যতাদর্পী মানুষ যে স্থানে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছে, পর্ব্বতমালার নাম দিয়াছে নিজের দেশের রাজার নামে, হ্রদের নাম দিয়াছে রাজমন্ত্রীর নামে; ওর শুশুক, পাখি, শিল, বল্গা-হরিণ, ভালুককে খুন করিয়াছে—তেল, বসা, চামড়ার লোভে, ওর মহিমময় পাইন অরণ্য ধূলিসাৎ করিয়া কাঠের কারখানা খুলিয়াছে, এ সবের প্রতিশোধ একদিন আসিবে।

এ যেন এমন একটা শক্তি যা বিপুল, বিশাল, বিরাট। অসীম ধৈর্য্যের ও গাম্ভীর্য্যের সহিত সে সংহত শক্তিতে চুপ করিয়া অপেক্ষা করিতেছে, কারণ সে জানে তাহার নিজ শক্তির বিপুলতা। অপু একবার ছিন্দওয়ারার জঙ্গলে একটা খনির সাইডিং লাইন তৈরি হওয়ার সময়ে আরণ্যভূমির তপস্যাস্তব্ধ, দূরদর্শী, রুদ্রদেবের মত মৌন, এই গম্ভীর ভাব লক্ষ্য করিয়াছিল। ঐ শক্তিটা ধীরভাবে শুধু সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছে মাত্র।

অপুর কিন্তু চাকরি হইল না। এবার একা মিঃ রায়চৌধুরীর হাত নয়। জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানীর অন্যান্য ডাইরেক্টররা নাকি রাজী হইল না। হয়ত বা তাহারা ভাবিল, এ-লোকটার সেখানে ফিরিবার এত আগ্রহ কেন? পুরানো লোক, চুরির সুলুক-সন্ধান জানে, সেই লোভেই যাইতেছে। তা ছাড়া ডাইরেক্টররাও মানুষ, তাহাদেরও প্রত্যেকেরই বেকার ভাগনে, ভাইপো, শালীর ছেলে আছে।

সে ভাবিল, চাকরি না হয়, বইখানা বাহির করিয়া দেখিবে চলে কিনা। মাসিক পত্রিকায় দু-একটা গল্পও দিল, একটা গল্পের বেশ নাম হইল, কিন্তু টাকা কেহ দিল না। হঠাৎ তাহার মনে হইল -অপর্ণার গহনাগুলি শ্বশুরবাড়িতে আছে, সেগুলি সেখান হইতে এই সাত-আট বৎসর সে আনে নাই। সেগুলি বেচিয়া তো বই বাহির করার খরচ যোগাড় হইতে পারে! এই সহজ উপায়টা কেন এতদিন মাথায় আসে নাই?

সে লীলার কাছে আরও কয়েকবার গেল, কিন্তু কথাটা প্রকাশ করিল না। উপন্যাসের খাতাখানা লইয়া গিয়া পড়িয়া শোনাইল। লীলা খুব উৎসাহ দেয়। একদিন লীলা হিসাব করিতে বসিল বই ছাপাইতে কত লাগিবে। অপু ভাবিল—অন্য কেউ যদি দিত হয়ত নিতুম, কিন্তু লীলা বেচারীর টাকা নেব না।

একদিন সে হঠাৎ খবরের কাগজে তাহার সেই কবিরাজ বন্ধুটির ঔষধের দোকানের বিজ্ঞাপন দেখিতে পাইল। সেইদিনই সন্ধ্যার পর সে ঠিকানা খুঁজিয়া সেখানে গেল, সুকিয়া স্ট্রীটের একটা গলিতে দোকান। বন্ধুটি বাহিরেই বসিয়া ছিল, দেখিয়া বলিয়া উঠিল—বাঃ তুমি! তুমি বেঁচে আছ দাদা?

অপু হাসিয়া বলিল—উঃ, কম খুঁজি নি তোমায়! ভাগ্যিস্ আজ তোমার শিল্পাশ্রমের

বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়ল, তাই তো এলুম। তারপর কি খবর বল? দোকানের আসবাবপত্র দেখে মনে হচ্ছে, অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছ!

বন্ধু খানিকটা চুপ করিয়া রহিল। খানিকটা এ-গল্প ও-গল্প করিল। পরে বলিল—এসো, বাসায় এসো।

ছোট সাদা রঙের দোতলা বাড়ি, নীচের উঠানে একটা টিনের শেডের তলায় আট-দশটি লোক কি সব জিনিস প্যাক্ করিতেছে, লেবেল আঁটিতেছে, অন্যদিকে একটা কল ও চৌবাচ্চা, আর একটা টিনের শেডে গুদাম। উপরে উঠিয়াই একটা মাঝারি হলঘর, দু'পাশে দু'টা ছোট-ছোট ঘর, বেশ সাজানো। একটা সেঠ্ টমাসের বড় ক্লক ঘড়ি দালানে টকটক করিতেছে। বন্ধু ডাকিয়া বলিল—ওরে বিন্দু, শোন, তোর মাকে বল, এক্ষুনি দু'পেয়ালা চা দিতে।

অপু উৎসুকভাবে বলিল—তার আগে একবার-বৌঠাকরুণের সঙ্গে দেখাটা করি—বিন্দুকে বল তাঁকে এদিকে একবার আসতে বলতে? না কি, এখন অবস্থা ফিরেছে বলে তিনি আর আমার সঙ্গে দেখা করবেন না?

কবিরাজ বন্ধু ম্লানমুখে চুপ করিয়া রহিল—পরে নিম্নস্বরে অনেকটা যেন আপন মনেই বলিল—সে আর তোমার সঙ্গে দেখা করবে না ভাই। তাকে আর কোথায় পাবে? রমলা আর সে দুজনেই ফাঁকি দিয়েছে!

অপু অবাক মুখে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

—এ মাঘে রমলা গেল, পরের শ্রাবণে সে গেল। ওঃ, সে কি সোজা কষ্ট গিয়েছে ভাই? তখন ওদিকে কাবুলীর দেনা, এদিকে মহাজনের দেনা—বাড়িতে যমে-মানুষে টানাটানি চলেছে। তোমার কথা কত বলত। এই শ্রাবণে পাঁচ বচ্ছর হয়ে গিয়েছে। তারপর বিয়ে করব, না, করব না,—আজ বছর তিনেক হ'ল বদ্যিবাটীতে—

তারপর বন্ধুর কথায় নতুন-বৌ চা ও খাবার লইয়া অপুর সামনেই আসিল। শ্যামবর্ণ, স্বাস্থ্যবতী, কিশোরী মেয়েটি, চোখ মুখ দেখিয়া মনে হয় খুব চট্‌পটে, চতুর। খাবার খাইতে গিয়া খাবারের দলা যেন অপুর গলায় আটকাইয়া যায়। বন্ধুটি নিজের কোন্ কালির বড়ি ও পাতা চায়ের প্যাকেটের খুব বিক্রি ও ব্যবসায়ের দিক হইতে এ-দুটি দ্রব্যের সাফল্যের গল্প করিতেছিল।

উঠিবার সময় বাহিরে আসিয়া অপু জিজ্ঞাসা করিল—নতুন বৌটি দেখতে তো বেশ, এ-দিকেও বেশ গুণবতী, না?

—মন্দ না। কিন্তু বড় মুখরা ভাই। আগের তাকে তো জানতে? সে ছিল ভাল মানুষ। এর পান থেকে চুন খসলেই—কি করি ভাই, আমার ইচ্ছে ছিল না যে আবার—

ফুটপাথে একা পড়িয়াই অপুর মনে পড়িল, পটুয়াটোলার সেই খোলার বাড়ির দরজার প্রদীপ হাতে হাস্যমুখী, নিরাভরণা, দরিদ্র গৃহলক্ষ্মীকে—আজ ছ'বছর কাটিয়া গেলেও মনে হয় যেন কালকার কথা!

একবিংশ পরিচ্ছেদ

কাজল বড় হইয়া উঠিয়াছে, আজকাল গ্রামের সীতানাথ পণ্ডিত সকালে একবেলা করিয়া পড়াইয়া যান, কিন্তু একটু ঘুমকাতুরে বলিয়া সন্ধ্যার পরে দাদামশাইয়ের অনেক বকুনি সত্ত্বেও সে পড়িতে পারে না, চোখের পাতা যেন জড়াইয়া আসে, অনেক সময় যেখানে-সেখানে ঘুমাইয়া পড়ে—রাত্রে কেহ যদি ডাকিয়া খাওয়ায়, তবেই খাওয়া হয়। তা ছাড়া, বেশী রাত্রে খাইতে হইলে দাদামশায়ের সঙ্গে বসিয়া খাইতে হয়—সে এক বিপদ।

দাদামশায়ের সহিত পারতপক্ষে কাজল খাইতে বসিতে চাহে না। বড় ভাত ফেলে, ছড়ায়—গুছাইয়া খাইতে জানে না বলিয়া দাদামশায় তাকে খাইতে বসিয়া সহবৎ শিক্ষা দেন।

কাজল আলুভাতে দিয়া শুকনা ভাত খাইতেছে—দাদামশায় হাঁকিয়া বলিলেন—ডাল দিয়ে মাখো—শুধু ভাত খাচ্চো কেন?—মাখো—মেখে খাও—

তাড়াতাড়ি কম্পিত ও আনাড়ী হাতে ডাল মাখিতে গিয়া থালার কানা ছাড়াইয়া কিছু ডাল-মাখা ভাত মাটিতে পড়িয়া গেল। দাদামশায় ধমক দিয়া উঠিলেন—পড়ে গেল, পড়েগেল—আঃ, ছোঁড়া ভাতটা পর্যন্ত যদি গুছিয়ে খেতে জানে!—তোল্ তোল্—খুঁটে খুঁটে তোল্—

কাজল ভয়ে ভয়ে মাটি-মাখা ভাতগুলি থালার পাশ হইতে আবার থালায় তুলিয়া লইল।

—বেগুন পটোল ফেলছিস্ কেন?—ও খাবার জিনিস না?—সব একসঙ্গে মেখে নে—

খানিকটা পরে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল, কাজল উচ্ছেভাজা খায় নাই—তখন অম্বল দিয়া খাওয়া হইয়া গিয়াছে—তিনি বলিলেন—উচ্ছেভাজা খাসনি?—খাও—ও অম্বলমাখা ভাত ঠেলে রাখো। উচ্ছেভাজা তেতো বলিয়া কাজলের মুখে ভালো লাগে না—সে তাতে হাতও দেয় নাই। দাদামশায়ের ভয়ে অম্বল-মাখা ভাত ঠেলিয়া রাখিয়া তিক্ত উচ্ছেভাজা একটি একটি করিয়া খাইতে হইল—একখানি ফেলিবার জো নাই—দাদামশায়ের সতর্ক দৃষ্টি। ভাত খাইবে কি কান্নায় কাজলের গলায় ভাতের দলা আটকাইয়া যায়। খাওয়া হইয়া গেলে মেজ মামীমার কাছে গিয়া বলিয়া কহিয়া একটা পান লয়—পান খুলিয়া দেখে কি কি মশলা আছে, পরে মিনতির সুরে একবার মেজমামীমার কাছে, একবার ছোট মামীমার কাছে বলিয়া বেড়ায়—ইতি একটু কাৎ, ও মামীমা তোমার পায়ে পড়ি—একটু কাৎ দাও না—। কাঠ অর্থাৎ দারুচিনি। মামীমারা ঝংকার দিয়ে বলেন—রোজ রোজ ডালচিনি চাই—ছেলে আবার শৌখিন কত!…উঃ, তায় আবার জিব দেখা চাই—মুখ রাঙা হ'ল কিনা—

তবে পড়াশুনার আগ্রহ তাহার বেশী ছাড়া কম নয়। বিশ্বেশ্বর মুহুরীর হাতবাক্সে কেশরঞ্জনের উপহারের দরুন গল্পের বই আছে অনেকগুলি। খুনী আসামী কেমন করিয়া ধরা পড়িল, সেই সব গল্প। আর পড়িতে ইচ্ছা করে আরব্য উপন্যাস, কি ছবি! কি গল্প! দাদামশায়ের বিছানার উপর একদিন পড়িয়া ছিল—সে উল্টাইয়া দেখিতেছে, টের পাইয়া বিশ্বেশ্বর মুহুরী কাড়িয়া লইয়া বলিল, এঃ, আট বছরের ছেলের আবার নবেল পড়া? এইবার একদিন তোমার দাদামশায় শুনতে পেলে দেখো কি করবে।

কিন্তু বইখানা কোথায় আছে সে জানে—দোতলায় শোবার ঘরের সেই কাঁঠালকাঠের সিন্দুকটার মধ্যে—একবার যদি চাবিটা পাওয়া যাইত! সারারাত জাগিয়া পড়িয়া ভোরের আগেই তাহা হইলে তুলিয়া রাখে।

এ কয়েকদিন বৈকালে দাদামশায় বসিয়া বসিয়া তামাক খান, আর সে পণ্ডিতমশায়ের কাছে বসিয়া বসিয়া পড়ে। সেই সময় পণ্ডিতমশায়ের পেছনকার অর্থাৎ চণ্ডীমণ্ডপের উত্তরধারের সমস্ত ফাঁকা জায়গাটা অদ্ভুত ঘটনার রঙ্গভূমিতে পরিণত হয়, ঘটনাটাও হয়ত খুব স্পষ্ট নয়, সে ঠিক বুঝাইয়া বলিতে তো পারে না! কিন্তু দিদিমার মুখে শোনা নানা গল্পের রাজপুত্র ও পাত্রের পুত্রেরা নাম-না-জানা নদীর ধারে ঠিক অই সন্ধ্যাবেলাটাতেই পেঁছায়—কোন্ রাজপুরীকে কাঁপাইয়া রাজকন্যাদের সোনার রথ বৈকালের আকাশপানে উঠিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়—সে অন্যমনস্ক হইয়া দেওয়ালের পাশে ঝুঁকিয়া আকাশটার দিকে চাহিয়া থাকে, কেমন যেন দুঃখ হয়—ঠিক সেই সময় সীতানাথ পণ্ডিত বলেন—দেখুন, দেখুন, বাঁড়ুয্যেমশায়, আপনার নাতির কাণ্ডটা দেখুন, শ্লেটে বুড়ুকে লিখতে দিলাম, তা গেল চুলোয়—হাঁ করে তাকিয়ে কি দেখছে দেখুন—এমন অমনোযোগী ছেলে যদি—

দাদামশায় বলেন—দিন না ধাঁ করে এক থাপ্পড় বসিয়ে গালে—হতভাগা ছেলে

কোথাকার—হাড় জ্বালিয়েছে, বাবা করবে না খোঁজ, আমার ঘাড়ে এ বয়সে যত ঝুঁকি।

তবে কাজল যে দুষ্টু হইয়া উঠিয়াছে, এ কথা সবাই বলে। একদণ্ড সুস্থির নয়, সর্বদা চঞ্চল, একদণ্ড চুপ করিয়া থাকে না, সর্বদা বকিতেছে। পণ্ডিতমশায় বলেন—দেখ্ তো দলু কেমন অঙ্ক কষে? ওর মধ্যে অনেক জিনিস আছে—আর তুই অঙ্কে একেবারে গাধা।—পণ্ডিত পিছন ফিরিলেই কাজল মামাতো-ভাই দলুকে আঙুল দিয়া ঠেলিয়া চুপিচুপি বলে,—তো-তোর মধ্যে অনেক জিনিস আছে, কি জিনিস আছে রে, ভাত-ডাল খি-খিচুড়ি··· খিচুড়ি? হি-হি ইল্লি! খিচুড়ি খাবি, দলু?

দাদামশায়ের কাছে আবার নালিশ হয়।

তখন দাদামশায় ডাকিয়া শাস্তিস্বরূপ বানান জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করেন—বানান কর সূর্য্য। কাজল বানানটা জানে, কিন্তু ভয়জনিত উত্তেজনার দরুন হঠাৎ তাহার তোতলামিটা বেশী করিয়া দেখা দেয়—দু'একবার চেষ্টা করিয়াও 'দন্ত্য স' কথাটা কিছুতেই উচ্চারণ করিতে পারিবে না বুঝিয়া অবশেষে বিপন্নমুখে বলে—তা-তালব্য শয়ে দীর্ঘ-উকার—

ঠাস্ করিয়া চড় গালে। ফরসা গাল, তখনই দাড়িমের মত রাঙা হইয়া ওঠে, কান পর্য্যন্ত রাঙা হইয়া যায়। কাজলের ভয় হয় না, একটা নিষ্ফল অভিমান হয়—বাঃ রে, বানানটা তো সে জানে, কিন্তু মুখে যে আটকাইয়া যায় তা তার দোষ কিসের? কিন্তু মুখে অত কথা বলিয়া বুঝাইয়া প্রতিবাদ বা আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার মত এতটা জ্ঞান তাহার হয় নাই—সবটা মিলিয়া অভিমানের মাত্রাটাই বাড়াইয়া তোলে। কিন্তু অভিমানটা কাহার উপর সে নিজেও ভাল বোঝে না।

এই সময়ে কাজলের জীবনে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল।

সীতানাথ পণ্ডিতমহাশয় একটু-আধটু জ্যোতিষের চর্চ্চা করিতেন। কাজলের পড়িবার সময় তাহার দাদামশায়ের সঙ্গে সীতানাথ পণ্ডিত সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন—পাঁজি দেখিয়া ঠিকুজি তৈয়ারী, জন্মের লগ্ন ও যোগ গণনা, আয়ুষ্কাল নির্ণন ইত্যাদি। আজ বছরখানেক ধরিয়া কাজল প্রায়ই এসব শুনিয়া আসিতেছে—যদিও সেখানে সে কোন কথা বলে না।

কার্ত্তিক মাসের শেষ, শীত তখনও ভাল পড়ে নাই। বাড়ির চারিপাশে অনেক খেজুর-বাগান, শিউলিরা কার্ত্তিকের শেষে গাছ কাটিয়াছে। শীতের ঠাণ্ডা সান্ধ্য বাতাসে টাটকা খেজুর-রসের গন্ধ মাখানো থাকে।

কাজলদের পাড়ায় ব্রহ্মঠাকরুণ এই সময় কি রোগে পড়িলেন! ব্রহ্মঠাকরুণের বয়স কত তা নির্ণয় করা কঠিন—মুড়ি ভাজিয়া বিক্রয় করিতেন, পতি-পুত্র কেহই ছিল না—কাজল অনেকবার মুড়ি কিনিতে গিয়াছে তাঁহার বাড়ি। অত্যন্ত খিটখিটে মেজাজের লোক, বিশেষ করিয়া ছেলেপিলেদের দু'চক্ষু পাড়িয়া দেখিতে পারিতেন না—দূর দূর করিতেন, উঠানে পা দিলে পাছে গাছটা ভাঙে, উঠানটা খুঁড়িয়া ফেলে - এই ছিল তাঁহার ভয়। কাজলকে বাড়ির কাছাকাছি দেখিলে বলিতেন—একটা যেন মগ—মগ একটা—বাড়ি যা বাপু—কঞ্চি-টঞ্চির খোঁচা মেরে বসবি—যা বাপু এখান থেকে। ঝালের চারাগুলো মাড়াস নে—

সেদিন দুপুরের পর তাহার মামাতো-বোন অরু বলিল—বেহ্ম-ঠাকুমা মর-মর হয়েছে, সবাই দেখতে যাচ্ছে—যাবি কাজল?

ছোট্ট একতলা বাড়ির ঘর, পাড়ার অনেকে দেখিতে আসিয়াছে—মেজেতে বিছানা পাতা, কাজল ও অরু দোরের কাছে দাঁড়াইয়া উঁকি মারিয়া দেখিল। ব্রহ্মঠাকরুণকে আর চেনা যায় না, মুখের চেহারা যেমন শীর্ণ তেমনি ভয়ঙ্কর. চক্ষু কোটরগত, তাহার ছোট-মামা

কাছে বসিয়া আছে, হারু কবিরাজ দাওয়ায় বসিয়া লোকজনের সঙ্গে কি কথা বলিতেছে।

বৈকালে দু-তিনবার শোনা গেল ব্রহ্মঠাকরুণের রাত্রি কাটে কিনা সন্দেহ।

কাজল কিছু বিস্মিত হইল। এমন দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্রহ্মঠাকরুণ, যাঁহাকে গামছা পরিয়া উঠানে গোবরজল ছিটাইতে দেখিয়া সে তখনই ভাবিত—তাহার দাদামশায়ের মত লোক পর্য্যন্ত যাঁহাকে মানিয়া চলে—তাহার এ কি দশা হইয়াছে আজ!…এত অসহায়, এত দুর্ব্বল তাঁহাকে কিসে করিয়া ফেলিল?

ব্রহ্মঠাকরুণ সন্ধ্যার আগে মারা গেলেন। কাজলের মনে হইল পাড়াময় একটা নিস্তব্ধতা —কেমন একটা অবোধ্য বিভীষিকার ছায়া যেন সারা পাড়াকে অন্ধকারের মত গ্রাস করিতে আসিতেছে…সকলেরই মুখে যেন একটা ভয়ের ভাব।

শীতের সন্ধ্যা ঘনাইয়াছে। পাড়ার সকলে ব্রহ্মঠাকরুণের সৎকারের ব্যবস্থা করিতে তাঁহার বাড়ির উঠানে সমবেত হইয়াছে। কাজলের দাদামশায়ও গিয়াছেন। কাজল ভয়ে ভয়ে খানিকটা দূরে অগ্রসর হইয়া দেখিতে গেল কিন্তু ব্রহ্মঠাকরুণের বাড়ি পর্য্যন্ত যাইতে পারিল না—কিছু দূরে একটা বাঁশঝাড়ের নীচে দাঁড়াইয়া রহিল। সেখান হইতে উঠানটা বা বাড়িটা দেখা যায় না—কথাবার্ত্তার শব্দও কানে আসে না। বাতাস লাগিয়া বাঁশঝাড়ের কঞ্চিতে কঞ্চিতে শব্দ হইতেছে· চারিধার নির্জ্জন…কাজলের বুক দুরু-দুরু করিতেছিল··একটা অদ্ভুত ধরনের ভাবে তাহার মন পূর্ণ হইল—ভয় নয়, একটা বিস্ময়-মাখানো রহস্যের ভাব…অন্ধকারে গা লুকাইয়া দু-একটা বাদুড় আকাশ দিয়া উড়িয়া চলিয়াছে…অন্যদিন এমন সময়ে বাদুড় দেখিলেই কাজল বলিয়া উঠে—বাদুড় বাদুড় মেথর, যা খাবি তা তে'তর—

আজ উড়নশীল বাদুড়ের দৃশ্য তাহার মনে কৌতুক না জাগাইয়া সেই অজানা রহস্যের ভাবই যেন ঘনীভূত করিয়া তুলিল!—

ব্রহ্মঠাকরুণ মারা গেলেন বটে—কিন্তু মৃত্যুকে কাজল এই প্রথম চিনিল। দিদিমা মারা গিয়াছিলেন কাজলের পাঁচবছর বয়সে—তাহাও গভীর রাত্রে কাজল তখন ঘুমাইয়া ছিল—কিছু দেখে নাই—বোঝেও নাই। এবার মৃত্যুর বিভীষিকা, এই অপূর্ব্ব রহস্য তাহার শিশুমনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। একা একা বেড়ায়, তেমন সঙ্গী-সেজুড় নাই—আর ঐ সব কথা ভাবে। একদিন তাহার মনে হইল যদি সেও ব্রহ্মঠাকরুণের মত মরিয়া যায়! …হাত-পায়ে যেন সে বল হারাইয়া ফেলিল,—সত্য, সে-ও হয়তো মারা যাইবে!…

দিনের পর দিন ভয়টা বাড়িতে লাগিল। একলা শুইয়া শুইয়া কথাটা ভাবে—নদীর বাঁধা ঘাটের পৈঠায় সন্ধ্যার সময় বসিয়া ঐ কথাই মনে ওঠে।…এই বড়দলের তীরে দিদিমার মত, ব্রহ্মঠাকরুণের মত তার দেহও একদিন পুড়াইতে—

কথাটা ভাবিতেই ভয়ে সর্ব্বশরীর যেন অবশ হইয়া আসে…

কাজল তাহার জন্মের সালটা জানিত; কিছুদিন আগে তাহার দাদামশায় সীতানাথ পণ্ডিতের কাছে কাজলের ঠিকুজি করাইয়াছিলেন—সে সে-সময় সেখানে ছিল। কিন্তু তারিখটা জানে না—তবে মাঘ মাসের শেষের দিকে, তা জানে।

একদিন সে দুপুরে চুপি চুপি কাছারিঘরে ঢুকিল। তাকের উপরে রাশীকৃত পুরানো পাঁজি সাজানো থাকে। চুপি চুপি সবগুলি নামাইয়া ১৩৩০ সালের পাঁজিখানা বাছিয়া লইয়া মাঘ মাসের শেষের দিকের তারিখগুলা দেখিতে লাগিল—কি সে বুঝিল সে-ই জানে —তাহার মনে হইল ২৫-শে মাঘ বড় খারাপ দিন। ঐ দিন জন্মিলে আয়ু কম হয়, খুব কম। তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল—ঐ দিনটাতেই হয়তো সে জন্মিয়াছে।…ঠিক।…

বড়মামীকে বৈকালে জিজ্ঞাসা করিল—আমি জন্মেছি কত তারিখে মামীমা? বড়

মামীমার তো তাহা ভাবিয়া ঘুম নাই! তিনি জানেন না। বড় মামাতো ভাই পটলকে জিজ্ঞাসা করিল—আমি কবে জন্মেছি জানিস্ পটলদা?…পটলের বয়স বছর দশেক, সে কি করিয়া জানিবে? দাদামশায়ের কাছে ঠিকুজি আছে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে ভরসা হয় না। একদিন সীতানাথ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন—কেন, সে খোঁজে তোমার কি দরকার? সে থাকিতে না পারিয়া সোজাসুজি বলিয়াই ফেলিল— আ-আমি ক-কতদিন বাঁচব, পণ্ডিতমশায়?…

সীতানাথ পণ্ডিত অবাক্ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন- এমন কথা কোন ছেলের মুখে কখনও তিনি শুনেন নাই। শশীনারায়ণ বাঁড়ুয্যেকে ডাকিয়া কহিলেন—শুনেছেন ও বাঁড়ুয্যেমশায়, আপনার নাতি কি বলছে?

শশীনারায়ণ শুনিয়া বলিলেন—এদিকে তো বেশ ইঁচড়-পাকা? দু'মাসের মধ্যে আজও তো দ্বিতীয় নামতা রপ্ত হ'ল না—বলো বারো পোনেরং কত?

কাজলের ভয়কে কেহই বুঝিল না। কাজল ধমক খাইল বটে, কিন্তু ভয় কি তাহাতে যায়? এক এক সময়ে তাহার মন হাঁপাইয়া ওঠে—কাহাকেও বলিতে পারে না, বুঝাইতে পারে না…এখন সে কি করে? এখানে তাহার কথা কেহ শুনিবে না, রাখিবে না তাহা সে বোঝে। তাহার বাবাকে বলিতে পারিলে হয়তো উপায় হইত।

বর্ষাকালের শেষের দিকে সে দু-একবার জ্বরে পড়ে। জ্বর আসিলে উপরের ঘরে একলাটি একটা কিছু টানিয়া গায়ে দিয়া চুপ করিয়া শুইয়া থাকে। কাহারও পায়ের শব্দে মুখ তুলিয়া বলে ও মামীমা জ্বর এয়েচে আমার—একটা লে-এ-এ-প বে-বের করে দাও না?—ইচ্ছা করে কেহ কাছে বসে, কিন্তু বাড়ির এত লোক সবাই নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত। জ্বরের প্রথম দিকে কিন্তু চমৎকার লাগে, কেমন যেন একটা নেশা, সব কেমন অদ্ভুত লাগে। ঐ জানালার গরাদেতে একটা ডেও-পিঁপড়ে বেড়াইতেছে, চুনে-কালিতে মিশাইয়া জানালার কবাটে একটা দাড়িওয়ালা মজার মুখ। জানালার বাহিরের নারিকেল গাছে নারিকেলসুদ্ধ একটা কাঁদি ভাঙিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। নিচে তাহার ছোট মামাতো বোন অরু, 'ভাত ভাত' করিয়া চিৎকার শুরু করিয়াছে- বেশ লাগে। কিন্তু শেষের দিকে বড় কষ্ট, গা জ্বালা করে, হাত-পা ব্যথা করে, সারা শরীর ঝিম্ ঝিম্ করে, মাথা যেন ভার বোঝা, এ সময় কেহ কাছে আসিয়া যদি বসে!

কাছারির উত্তর গায়ে পাথের ধারে এক বুড়ীর খাবারের দোকান, বারো মাস খুব সকালে উঠিয়া সে তেলেভাজা বেগুনি ফুলুরি ভাজে। কাজল তাহার বাঁধা খরিদ্দার। অনেকবার বকুনি খাইয়াও সে এ লোভ সামলাইতে সমর্থ হয় নাই। সারিবার দিন দুই পরেই কাজল সেখানে গিয়া হাজির। অনেকক্ষণ সে বসিয়া বসিয়া ফুলুরিভাজা দেখিল, পুঁইপাতার বেগুনি, জবাপাতার তিল-পিটুলি। অবশেষে সে অপ্রতিভ মুখে বলে—আমায় পুঁইপাতার বেগুনি দাও না দিদিমা? দেবে? এই নাও পয়সাটা।

বুড়ী দিতে চায় না, বলে—না খোকা দাদা, সেদিন জ্বর থেকে উঠেছ, তোমার বাড়ির লোকে শুনলে আমায় বকবে—কিন্তু কাজলের নির্বন্ধাতিশয্যে অবশেষে দিতে হয়।

একদিন বিশ্বেশ্বর মুহুরীর কাছে ধরা পড়িয়া যায়। বুড়ীর দোকান হইতে বাহির হইয়া জবাপাতার তিল-পিটুলির ঠোঙা-হাতে খাইতে খাইতে পুকুর পাড় পর্যন্ত গিয়াছে—বিশ্বেশ্বর আসিয়া ঠোঙাটি কাড়িয়া লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল আচ্ছা পাজি ছেলে তো? আবার ঐ তেলে-ভাজা খাবারগুলো রোজ রোজ খাওয়া?

কাজল বলিল—আমি খা-খা-খাচ্ছি তা তো-তোমার কি?

বিশ্বেশ্বর মুহুরী হঠাৎ আসিয়া তাহার কান ধরিয়া একটা ঝাঁকুনি দিয়া বলিল—আমার

কি, বটে ?

রাগে অপমানে কাজলের মুখ রাঙা হইয়া গেল। ইহাদের হাতে মার খাওয়ার অভিজ্ঞতা তাহার এই প্রথম। সে ছেলেমানুষি সুরে চিৎকার করিয়া বলিল—মুখপুড়ি, হতচ্ছাড়া তু-মি মাল্‌লে কেন ?

বিশ্বেশ্বর তাহার গালে জোরে এক চড় বসাইয়া দিয়া বলিল—আমি কেন, এসো তো কর্ত্তার কাছে একবার—এসো।

কাজল পাগলের মত যা তা বলিয়া গালি দিতে লাগিল। চড়ের চোটে তখন তাহার কান মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছে, এবং বোধ হয় এ অপমানের কোনও প্রতিকার এখানকার কাহারও নিকট হইতে হইবার আশা নাই, মুহূর্ত্ত-মধ্যে ঠাওরাইয়া বুঝিয়া চিৎকার করিয়া বলিল—আমার বা-বাবা আসুক, বলে দেব, দেখো—দেখো তখন—

বিশ্বেশ্বর হাসিয়া বলিল—আচ্ছা যাও, তোমার বাবার ভয় আমি একেবারে গর্ত্তের মধ্যে যাব আর কি ? আজ পাঁচ বছরের মধ্যে খোঁজ নিলে না, ভারী তো—। হয়ত একথা বলিতে বিশ্বেশ্বর সাহস করিত না, যদি সে না জানিত তাহার এ জামাইটির প্রতি কর্ত্তার মনোভাব কিরূপ।

কাজল রাগের মাথায় ও কতকটা পাছে বিশ্বেশ্বর দাদামশায়ের কাছে ধরিয়া লইয়া যায় সেই ভয়ে, পুকুরের দক্ষিণ-পাড়ের নারিকেল বাগানের দিকে ছুটিয়া যাইতে যাইতে বলিতে লাগিল—দেখো না, দেখো তুমি, বাবা আসুক না—পরে পিছন দিকে চাহিয়া খুব কড়া কথা শুনানো হইতেছে, এমন সুরে বলিল—তোমার পেটে খি-খিচুড়ি আছে, খি-খিচুড়ি খাবে—খিচুড়ি ?

নদীর বাঁধাঘাটে সেদিন সন্ধ্যাবেলা বসিয়া বসিয়া সে অনেকক্ষণ দিদিমার কথা ভাবিল। দিদিমা থাকিলে বিশ্বেশ্বর মুহুরী গায়ে হাত তুলিতে পারিত ? সে জবাপাতার বেগুনি খায় তো ওর কি ?

ঐ একটা নক্ষত্র খসিয়া পড়িল। দিদিমা বলিত নক্ষত্র খসিয়া পড়িলে সে সময় পৃথিবীতে কেউ না কেউ জন্মায়। মরিয়া কি নক্ষত্র হয় ? সে যদি মারা যায়, হয়তো অমনি আকাশের গায়ে নক্ষত্র হইয়া ফুটিয়া থাকিবে।

আরও মাস কয়েক পরে, ভাদ্রমাসের শেষের দিকে। দাদামশায়ের বৈকালিক মিছরির পানা খাওয়ার শ্বেত পাথরের গেলাসটা তাহার বড় মামীমা মাজিয়া ধুইয়া উপরের ঘরের বাসনের জলচৌকিতে রাখিতে তাহার হাতে দিল। সিঁড়িতে উঠিবার সময় কেমন করিয়া গেলাস হাত হইতে পড়িয়া চুরমার হইয়া গেল ভাঙিয়া। কাজলের মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল, তাহার ক্ষুদ্র হৃৎপিণ্ডের গতি যেন মিনিটখানেকের জন্য বন্ধ হইয়া গেল, যাঃ, সর্বনাশ! দাদামশায়ের মিছরিপানার গেলাসটা যে! সে দিশেহারা অবস্থায় টুকরাগুলো তাড়াতাড়ি খুঁটিয়া খুঁটিয়া তুলিল; পরে অন্য জায়গায় ফেলিলে পাছে কেহ টের পায়, তাই তাড়াতাড়ি আরব্য উপন্যাস যাহার মধ্যে আছে সেই বড় কাঠের সিন্দুকটার পিছনে গোপনে রাখিয়া দিল। এখন সে কি করে! কাল যখন গেলাসের খোঁজ পড়িবে বিকালবেলা, তখন সে কি জবাব দিবে ?

কাহারও কাছে কোন কথা বলিল না, বাকী দিনটুকু ভাবিয়া ভাবিয়া কিছু ঠিক করিতেও পারিল না; এক জায়গায় বসিতে পারে না, উদ্বিগ্ন মুখে ছট্‌ফট্ করিয়া বেড়ায়—ঐ রকম একটা গেলাস আর কোথাও পাওয়া যায় না ? একবার সে এক খেলুড়ে বন্ধুকে চুপি চুপি বলিল,—ভাই তো-তোদের বাড়ি একটা পাথরের গে-গেলাস আছে ?

কোথায় সে এখন পায় একটা শ্বেত পাথরের গেলাস ? রাত্রে একবার তাহার মনে হইল সে বাড়ি ছাড়িয়া পলাইয়া যাইবে। কলিকাতা কোন্ দিকে ? সে বাবার কাছে চলিয়া যাইবে কলিকাতায়—কাল বৈকালের পূর্বেই।

কিন্তু রাত্রে পালানো হইল না। নানা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া সে সকালে ঘুম ভাঙিয়া উঠিল, দুই-তিন বার কাঠের সিন্দুকটার পিছনে সন্তর্পণে উঁকি মারিয়া দেখিল, গেলাসের টুকরাগুলা সেখান হইতে কেহ বাহির করিয়াছে কিনা। বড় মামীমার সামনে আর যায় না, পাছে গেলাসটা কোথায় জিজ্ঞাসা করিয়া বসে। দুপুরের কিছু পরে বাড়ির রাস্তা দিয়া কে একজন সাইকেল চড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া সে নাটমন্দিরের বেড়ার কাছে ছুটিয়া দেখিতে গেল—কিন্তু সাইকেল দেখা তাহার হইল না, নদীর বাঁধাঘাটে একখানা কাহাদের ডিঙিনৌকা লাগিয়াছে, একজন ফর্সা চেহারার লোক একটা ছড়ি ও ব্যাগ হাতে ডিঙি হইতে নামিয়া ঘাটের সিঁড়িতে পা দিয়া মাঝির সঙ্গে কথা কহিতেছে—কাজল অবাক হইয়া ভাবিতেছে, লোকটা কে, এমন সময় লোকটা মাঝির সঙ্গে কথা শেষ করিয়া এদিকে মুখ ফিরাইল। সঙ্গে সঙ্গে কাজল অল্পক্ষণের জন্য চোখে যেন ধোঁয়া দেখিল, পরক্ষণেই সে নাটমন্দিরের বেড়া গলাইয়া বাহিরের নদীর ধারে রাস্তাটা বাহিয়া বাঁধাঘাটের দিকে ছুটিল। যদিও অনেক বছর পরে দেখা, তবুও কাজল চিনিয়াছে লোকটিকে তাহার বাবা।

অপু খুলনার স্টীমার ফেল করিয়াছিল। নতুবা সে কাল রাত্রেই এখানে পৌঁছিত। সে মাঝিদের জিজ্ঞাসা করিতেছিল, পরশু ভোরে নৌকা এখানে আনিয়া তাহাকে বরিশালের স্টীমার ধরাইয়া দিতে পারিবে কিনা। কথা শেষ করিয়াই ফিরিয়া চাহিয়া সে দেখিল একটি ছোট সুশ্রী বালক ঘাটের দিকে দৌড়িয়া আসিতেছে। পরক্ষণেই সে চিনিল। আজ সারা পথ নৌকায় সে ছেলের কথা ভাবিয়াছে, না জানি সে কত বড় হইয়াছে, কেমন দেখিতে হইয়াছে, তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছে, না মনে রাখিয়াছে! ছেলের আগেকার চেহারা তাহার মনে ছিল না। এই সুন্দর বালকটিকে দেখিয়া সে যুগপৎ প্রীত ও বিস্মিত হইল—তাহার সেই তিন বছরের ছোট্ট খোকা এমন সুদর্শন লাবণ্যভরা বালকে পরিণত হইল কবে ?

সে হাসিমুখে বলিল—কি রে খোকা, চিনতে পারিস্ ?

কাজল ততক্ষণে আসিয়া অসীম নির্ভরতার সহিত তাহার কোমর জড়াইয়া ধরিয়াছে—ফুলের মত মুখটি উঁচু করিয়া হাসি-ভরা চোখে বাবার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—না বৈ কি ? আমি বেড়ার ধার থেকে দেখেই ছুট দিইছি—এতদিন আস নি কে-কেন বাবা ?

একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল। এতদিন তো ভুলিয়া ছিল, কিন্তু আজ এইমাত্র—হঠাৎ দেখিবামাত্রই—অপুর বুকের মধ্যে একটা গভীর স্নেহসমুদ্র উদ্বেল হইয়া উঠিল। কি আশ্চর্য্য, এই ক্ষুদ্র বালকটি তাহারই ছেলে, জগতে নিতান্ত অসহায় হাত-পা হারা, অবোধ—জগতে সে ছাড়া ওর আর কেউ তো নাই! কি করিয়া এতদিন সে ভুলিয়া ছিল!

কাজল বলিল—ব্যাগে কি বাবা ?

—দেখবি ? চল দেখাব এখন। তোর জন্যে কেমন পিস্তল আছে, একসঙ্গে দুম্ দুম আওয়াজ হয়, ছবির বই আছে দুখানা। কেমন একটা রবারের বেলুন—

—তো-তো-তোমাকে একটা কথা বলব বাবা ? তো-তোমার কাছে একটা পাথরের গে-গেলাস আছে ?

—পাথরের গেলাস ? কেন রে, পাথরের গেলাস কি হবে ?

কাজল চুপি চুপি বাবাকে গেলাস ভাঙার কথা সব বলিল। বাবার কাছে কোন ভয় হয় না। অপু হাসিয়া ছেলের গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল—আচ্ছা চল্, কোনো ভয় নেই।

সঙ্গে সঙ্গে কাজলের সব ভয়টা কাটিয়া গেল, একজন অসীম শক্তিধর বজ্রপাণি দেবতা যেন হঠাৎ বাহুদ্বয় মেলিয়া তাহাকে আশ্রয় ও অভয়দান করিয়াছে—মাভৈঃ।

রাত্রে কাজল বলিল—আমি তোমার সঙ্গে যাব বাবা।

অপুর অনিচ্ছা ছিল না, কিন্তু কলিকাতায় এখন নিজেরই অচল। সে ভুলাইবার জন্য বলিল—আচ্ছা হবে, হবে। শোন্‌ একটা গল্প বলি খোকা। কাজল চুপ করিয়া গল্প শুনিল। বলিল—নিয়ে যাবে তো বাবা ? এখানে সবাই বকে, মারে বাবা ! তুমি নিয়ে চল, তোমার কত কাজ করে দেব।

অপু হাসিয়া বলে কাজ করে দিবি ? কি কাজ করে দিবি রে খোকা ?

তারপর সে ছেলেকে গল্প শোনায়, একবার চাহিয়া দেখে, কখন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। খানিক রাত্রি পর্যন্ত সে একখানা বই পড়িল, পরে আলো নিভাইবার পূর্বে ছেলেকে ভাল করিয়া শোয়াইতে গেল। ঘুমন্ত অবস্থায় বালককে কি অদ্ভুত ধরণের অবোধ, অসহায়, দুর্বল ও পরাধীন মনে হইল অপুর ! কি অদ্ভুত ধরণের অসহায় ও পরাধীন ! সে ভাবে, এই যে ছেলে, পৃথিবীতে এ তো কোথাও ছিল না, যাচিয়াও তো আসে নাই—অপর্ণা ও সে, দু'জনে যে উহাকে কোন্‌ অনন্ত হইতে সৃষ্টি করিয়াছে তাহার পর সংসারে আনিয়া অবোধ নিষ্পাপ বালককে, একা এভাবে সংসারে ছাড়িয়া দিয়া পালানো কি অপর্ণাই সহ্য করিবে ? কিন্তু এখন কোথায়ই বা লইয়া যায় ?

প্রাচীন গ্রীসের এক সমাধির উপরে সেই যে স্মৃতিফলকটির কথা সে পড়িয়াছিল ফ্রেডারিক হ্যারিসনের বই-এ —

This child of ten years
Philip, his father laid here,
His great hope, Nikoteles.

সে দূর কালের ছোট্ট বালকটির সুন্দর মুখ, সুন্দর রং, দেব-শিশুর মত সুন্দর দশ বৎসরের বালক নিকোটিলিসকে আজ রাত্রে সে যেন নির্জন প্রান্তরে খেলা করিতে দেখিতে পাইতেছে—সোনালী চুল, ডাগর ডাগর চোখ। তাহার স্নেহস্মৃতি গ্রীসের সে নির্জন প্রান্তরের সমাধিক্ষেত্রের বুকে অমর হইয়া আছে। শতশতাব্দী পূর্বে সেই বিরহী পিতৃহৃদয়ের সঙ্গে সে যেন আজ নিজের নাড়ির যোগ অনুভব করিল। মনে হইল, মানুষ সব কালে, সব অবস্থায় এক, এক। কিংবা…দেবতার মন্দির-দ্বারে আরোগ্যকামী বহু যাত্রী জড়ো হইয়াছে নানা দিক্‌দেশ হইতে…ছোট ছেলেটির গরীব বাবা তাহাকে আনিয়াছে…ছেলেটি অসুখে ভোগে, রুগ্‌ণ, স্বপ্নে দেবতা আসিয়া বলিলেন—যদি তোমার রোগ সারিয়ে দিই, আমায় কি দেবে ইউফেনিস্‌ ? উঃ, সত্যি ! অসুখ সারিলে সে বাঁচে ! ছেলেটি উৎসাহের সুরে বলিল—দশটা মার্বেল আমার আছে, সব কটাই দিয়ে দেব…দেবতা খুশীর সুরে বলিলেন—স-ব ক-টা ! বলো কি ?—বেশ বেশ, রোগ সারিয়ে দেব তোমার।

বাৎসল্যরসের এমন গভীর অনুভূতি জীবনে তাহার এই প্রথম…

অনেক দিন পরে উপরের ঘরটাতে শুইল। সেই তাহার ফুলশয্যার খাটটাতে। কাজল পাশেই ঘুমাইতেছে—কিন্তু রাত পর্যন্ত তাহার নিজের ঘুম আসিল না। জানালার বাহিরে চাহিয়া চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিল। গত পাঁচ ছয় বৎসর বিদেশে সম্পূর্ণ অন্য ধরণের জীবনযাত্রা ও নবতর অনুভূতিরাজির ফলে পুরাতন দিনের অনেক অনুভূতিই অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে—এখানকার তো আরও, কারণ আট নয়'বৎসর এখানকার জীবনের সঙ্গে কোনো প্রত্যক্ষ যোগ নাই। তাই আজ এই চিলে-কোঠার বহু-পরিচিত ঘরটা, এই পালংকটা, ঐ সুপারি বনের সারি—এসব যেন স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছে। ঠিক আবার পুরানো দিনের

মত জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, ঠিক সেই সব দিনের মত নাটমন্দির হইতে নৈশ কীর্ত্তনের খোলের আওয়াজ আসিতেছে—কিন্তু সে অপু নাই—বদলাইয়া গিয়াছে—বেমালুম বদলাইয়া গিয়াছে।

স্ত্রীর গহনা বেচিয়া বই ছাপাইয়া ফেলিল পূজার পরেই।

কেবল হার ছড়াটা বেচিতে পারিল না। অপর্ণার অন্যান্য গহনার অপেক্ষা সে এই হার ছড়াটার সঙ্গে বেশী পরিচিত। তাই হারটা সামনে খুলিয়া খানিকক্ষণ ভাবিল, অপর্ণার সেই হাসি-হাসি মুখখানা যেন ঝাপসা-মত মনে পড়ে—প্রথমটাতে হঠাৎ যেন খুব সুস্পষ্ট মনে আসে—আধ সেকেণ্ড কি সিকি সেকেণ্ড মাত্র সময়ের জন্য—তারপরই ঝাপসা হইয়া যায়। ঐ আধ সেকেণ্ডের জন্য মনে হয়, সে-ই সেরকম ঘাড় বাঁকাইয়া মুখে হাসি টিপিয়া সামনে দাঁড়াইয়া আছে।

ছাপানো বই-এর প্রথম কপিখানা দপ্তরীর বাড়ি হইতে আনাইয়া দেখিয়া সে দুঃখ ভুলিয়া গেল। কিছু না, সব দুঃখ দূর হইবে। এই বই-এ সে নাম করিবে।

আজ বিশ বৎসরের দূর জীবনের পার হইতে সে নিশ্চিন্দিপুরের পোড়ো ভিটাকে অভিনন্দন পাঠাইল মনে মনে। যেখানেই থাকি, ভুলি নি। যাহাদের বেদনার রঙে তাহার বইখানা রঙীন, কত স্থানে, কত অবস্থায় তাহাদের সঙ্গে পরিচয়, হয়ত কেউ বাঁচিয়া আছে, কেউ বা নাই। তাহারা আজ কোথায় সে জানে না, এই নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকার-শান্তির মধ্য দিয়া সে মনে মনে সকলকেই আজ তাহার ধন্যবাদ জানাইতেছে।

মাসকয়েকের জন্য একটা ছোট অফিসে একটা চাকরি জুটিয়া গেল তাই রক্ষা। এক জায়গায় আবার ছেলে পড়ায়। এসব না করিলে খরচ চলে বা কিসে, বই-এর বিজ্ঞাপনের টাকাই বা আসে কোথা হইতে। আবার সেই সাড়ে নটার সময় আপিসে দৌড়, সেখান হইতে বাহির হইয়া একটা গলির মধ্যে একতলা বাসার ছোট্ট ঘরে দুটি ছেলে পড়ানো। বাড়ির কর্ত্তার কিসের ব্যবসা আছে, এই ঘরে তাঁহাদের প্যাকবাক্স ছাদের কড়ি পর্য্যন্ত সাজানো। তাহারই মাঝখানে ছোট তক্তপোশে মাদুর পাতিয়া ছেলে-দুটি পড়ে—সন্ধ্যার পরে অপু যখনই পড়াইতে গিয়াছে, তখনই দেখিয়াছে কয়লার ধোঁয়ায় ঘরটা ভরা।

শীতকাল কাটিয়া পুনরায় গ্রীষ্ম পড়িল। বই-এর অবস্থা খুব সুবিধা নয়, নিজে না খাইয়া বিজ্ঞাপনের খরচ যোগায়, তবু বই-এর কাটতি নাই! বইওয়ালারা উপদেশ দেয়, এডিটারদের কাছে, কি বড় বড় সাহিত্যিকদের কাছে যান, একটু যোগাড়যন্ত্র ক'রে ভাল সমালোচনা বার করুন, আপনাকে চেনে কে, বই কি হাওয়ায় কাটবে মশাই! অপু সে সব পারিবে না, নিজের লেখা বই বগলে করিয়া দোরে দোরে ঘুরিয়া বেড়ানো তাহার কর্ম্ম নয়। এতে বই কাটে ভাল, না কাটে সে কি করিবে?

অতএব জীবন পুরাতন পরিচিত পথ ধরিয়াই বহিয়া চলিল—আপিস আর ছেলে-পড়ানো। রাত্রে আর একটা নতুন বই লেখে। ও যেন একটা নেশা, বই বিক্রি হয়-না-হয়, কেউ পড়ে-না-পড়ে, তাহাকে যেন লিখিয়া যাইতেই হইবে।

মেসে লেখার অত্যন্ত অসুবিধে হইতেছে দেখিয়া সে একটা ছোট একতলা বাড়ির নীচেকার একটা ঘর আট টাকায় ভাড়া লইয়া সেখানে উঠিয়া গেল। মেসের বাবুরা লোক বেশ ভালই—কিন্তু তাহাদের মানসিক ধারা যে-পথ অবলম্বনে চলে অপুর পথ তা নয়—তাহাদের মূর্খতা, সংস্কার, সীমাবদ্ধতা ও সর্ব্বরকমের মানসিক দৈন্য অপুকে পীড়া দেয়। খানিকক্ষণ মিষ্টালাপ হয়তো এদের সঙ্গে চলিতে পারে—কিন্তু বেশীক্ষণ আড্ডা দেওয়া অসম্ভব—বরং কারখানার ননী মিস্ত্রী, কি চাঁপাদানীর বিশু স্যাকরার আড্ডার লোকজনকে

ভালই লাগিত—কারণ তাহারা যে জগৎটাতে বাস করিত—অপুর কাছে সেটা একেবারেই অপরিচিত—তাহাদের মোহ ছিল, সেই অজানা ও অপরিচয়ের মোহ, কাশীর কথক ঠাকুর কি অমরকণ্টকের আজবলাল ঝা-কে যে কারণে ভাল লাগিয়াছিল। কিন্তু এরা সে ধরণের অনন্যসাধারণ নয়, নিতান্তই সাধারণ ও নিতান্ত ক্ষুদ্র। কাজেই বেশীক্ষণ থাকিলেই হাঁপ ধরে। অপুর নতুন ঘরটাতে দরজা জানালা কম, দক্ষিণ দিকের ছোট জানালাটা খুলিলে পাশের বাড়ির ইঁট-বার করা দেওয়ালটা দেখা যায় মাত্র। ভাবিল—তবুও তো একা থাকতে পারব—লেখাটা হবে।

বাড়ি বদল করার দিনটা জিনিসপত্র সরাইতে ও ঘর গুছাইতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। হাত-পা ধুইয়া ঠাণ্ডা হইয়া বসিল।

আজ রবিবার ছেলে-পড়ানো নাই। বাপ্! নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। সেই অতটুকু ঘর, কয়লার ধোঁয়া আর রাজ্যের প্যাকবাক্সের টার্পিন তেলের মত গন্ধ। আজ কয়েক দিন হইল কাজলের একখানা চিঠি পাইয়াছে, এই প্রথম চিঠি, কাটাকুটি বানান ভুলে ভর্ত্তি। আর একবার পত্রখানা বাহির করিয়া পড়িল—বার-পনেরো হইল এইবার লইয়া। বাবার জন্য তাহার মন কেমন করে, একবার যাইতে লিখিয়াছে, একখানা আরব্য উপন্যাস ও একটা লণ্ঠন লইয়া যাইতে লিখিয়াছে, যেন বেশী দেরি না হয়! অপু ভাবে ছেলেটা পাগল, লণ্ঠন কি হবে? লণ্ঠন?···দ্যাখ্ তো কাণ্ড। উঠিয়া ঘরে আলো জ্বালিয়া ছেলের পত্রের জবাব লিখিল। সে আগামী শনিবার তাহাকে দেখিতে যাইতেছে। সোম ও মঙ্গলবার ছুটি, ট্রেনে স্টীমারে বেজায় ভিড়। খুলনার স্টীমার এবারও ফেল করিল। শ্বশুরবাড়ি পোঁছিতে বেলা দুপুর গড়াইয়া গেল।

নৌকা হইতেই দেখে কাজল ঘাটে তাহার অপেক্ষায় হাসিমুখে দাঁড়াইয়া—নৌকা থামিতে-না-থামিতে সে ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। মুখ উঁচু করিয়া বলিল—বাবা,—আমার আরব্য উপন্যাস?—অপু সে-কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে। কাজল কাঁদ-কাঁদ সুরে বলিল—হুঁ-উঁ বাবা, এত ক'রে লিখলাম, তুমি ভুলে গেলে—লণ্ঠন?···

অপু বলিল,—আচ্ছা তুই পাগল নাকি—কি করবি?—

কাজল বলিল—সে লণ্ঠন নয় বাবা!···হাতে ঝুলনো যায়, রাঙা কাচ, সবুজ কাচ বের করা যায় এমনি ধারা। হুঁ-উঁ, তুমি আমার কোন কথা শোনো না। একটা আর্শি আনবে বাবা?

—আর্শি?—কি করবি আর্শি?

—আমি আর্শিতে ছুঁয়া দেখবো—

অপর্ণার দিদি মনোরমা অনেকদিন পরে বাপের বাড়ি আসিয়াছেন। বেশ সুন্দরী, অনেকটা অপর্ণার মত মুখ। ছোট ভগ্নীপতিকে পাইয়া খুব আহ্লাদিত হইলেন, স্বর্গগত মা ও বোনের নাম করিয়া চোখের জল ফেলিলেন। অপু তাহার কাছে সত্যকার স্নেহ-ভালবাসা পাইল। সন্ধ্যাবেলা অপু বলিল—আসুন দিদি, ছাদের উপর ব'সে আপনার সঙ্গে একটু গল্প করি।

ছাদ নির্জ্জন, নদীর ধারেই, অনেকদূর পর্য্যন্ত দেখা যায়।

অপু বলিল—আমার বিয়ের রাতের কথা মনে হয় মনোরমাদি?

মনোরমা মৃদু হাসিয়া বলিলেন—সেও যেন এক স্বপ্ন! কোথা থেকে কি যেন সব হয়ে গেল ভাই—এখন ভেবে দেখলে—সেদিন তাই এই ছাদের উপর বসে অনেকক্ষণ ধরে ভাবছিলুম—তোমাকেও তো আমি সেই বিয়ের পর আর কখনও দেখি নি। এবার এসেছিলুম ভাগ্যিস, তাই দেখাটা হ'ল।

হাসির ভঙ্গি ঠিক অপর্ণার মত, মুখের কত কি ভাব, ঠিক তাহারই মত—বিস্মৃতির জগৎ হইতে সে-ই যেন আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।

মনোরমা অনুযোগ করিয়া বলিলেন—তুমি তো দিদি বলে খোঁজও কর না ভাই। এবার পুজোর সময় বরিশালে যেও—বলা রইল, মাথার দিব্যি। আর তোমার ঠিকানাটা আমায় লিখে দিও তো!

কোথা হইতে কাজল আসিয়া বলিল—বাবা একটা অর্থ জান?…

—অর্থ? কি অর্থ?

কাজলের মুখ তাহার অপূর্ব সুন্দর মনে হয়—কেমন একধরণের ঘাড় একধারে বাঁকাইয়া চোখে খুশীর হাসি হাসিয়া কথাটা শেষ করে, আবার তখন বোকার মতই হাসে—হঠাৎ যেন মুখখানা করুণ ও অপ্রতিভ দেখায়। ঠিক এই সময়েই অপুর মনে ওই স্নেহের বেদনাটা দেখা দেয় - কাজলের ঐ ধরণের মুখভঙ্গিতে।

—বল দেখি, বাবা, 'এখান থেকে দিলাম সাড়া, সাড়া গেল সেই বামুনপাড়া?' কি অর্থ? অপু ভাবিয়া ভাবিয়া বলিল—পাখি।

কাজল ছেলেমানুষি হাসির খই ফুটাইয়া বলিল—ইল্লি! পাখি বুঝি? শাঁক তো—শাঁকের ডাক। তুমি কিচ্ছু জানো না বাবা।

অপু বলিল—ছিঃ বাবা, ও-রকম ইল্লি-টিল্লি বলো না, বলতে নেই ও-কথা, ছিঃ।

—কেন বলতে নেই বাবা?…

—ও ভাল কথা নয়।

আসিবার আগের দিন রাত্রে কাজল চুপি চুপি বলিল—এবার আমায় নিয়ে যাও বাবা, আমার এখানে থাকতে একটুও ভাল লাগে না।

অপু ভাবিল—নিয়েই যাই এবারে, এখানে ওকে কেউ দেখে না, তাছাড়া লেখাপড়াও এখানে থাকলে যা হবে!

পরদিন সকালে ছেলেকে লইয়া সে নৌকায় উঠিল। অপর্ণার তোরঙ্গ ও হাতবাক্সটা এখানে আট-নয় বৎসর পড়িয়া আছে, তাহার বড় শালী সঙ্গে দিয়া দিলেন। ইহাদের তুলিয়া দিতে আসিয়া ঘাটে দাঁড়াইয়া চোখের জল ফেলিলেন। অপুকে বার বার বরিশালে যাইতে অনুরোধ করিলেন। সকালের নবীন রোদ ভাঙা নাটমন্দিরের গায়ে পড়িয়াছে। নদীজল হইতে একটা আমিষ গন্ধ আসিতেছে। শ্বশুর মহাশয়ের তামাক-খাওয়ার কয়লা পোড়ানোর জন্য শুকনা ডালপালায় আগুন দেওয়া হইয়াছে নদীর ধারটাতেই। কুণ্ডলী পাকাইয়া ধোঁয়ার রাশ উপরে উঠিতেছে। সকালের বাতাসটা বেশ ঠাণ্ডা। আজ বহু বৎসর আগে যেদিন বন্ধু প্রণবের সঙ্গে বিবাহের নিমন্ত্রণে এ বাটী আসিয়াছিল তখন সে কি ভাবিয়াছিল এই বাড়িটার সহিত তাহার জীবনে এমন একটি অদ্ভুত যোগ সাধিত হইবে? আজও সেদিনটার কথা বেশ স্পষ্ট মনে আছে, আগের দিন একটা গ্রামোফোনের গান শুনিয়াছিল—'বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি।' শুনিয়া গানটা মুখস্থ করিয়াছিল ও সারাপথে ও স্টীমারে আপন মনে গাহিয়াছিল। এখনও গুন্ গুন্ করিয়া গানটা গাহিলে সেই দিনটা আবার ফিরিয়া আসে।

ছেলেকে সঙ্গে লইয়া অপু প্রথমে মনসাপোতা আসিল। বছর ছয়-সাত এখানে আসা ঘটে নাই। এই সময়ে দিনকয়েকের ছুটি আছে, এইবার একবার না দেখিয়া গেলে আর আসা ঘটিবে না অনেকদিন।

ঘরদোরের অবস্থা খুব খারাপ। অপুর মনে পড়িল, ঠিক এই অপরিষ্কার ভাঙা ঘরে

এই বালকের মাকে সে একদিন আনিয়া তুলিয়াছিল। তেলিদের বাড়ি হইতে চাবি আনিয়া ঘরের তালা খুলিয়া ফেলিল। খড় নানাস্থানে উড়িয়া পড়িয়াছে, ইঁদুরের গর্ত্ত, পাড়ার গরু-বাছুর উঠিয়া দাওয়া ভাঙিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে, উঠানে বনজঙ্গল।

কাজল চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া অবাক হইয়া বলিল, বাবা, এইটে তোমাদের বাড়ি?

অপু হাসিয়া বলিল—তোমাদেরও বাড়ি বাবা। মামার বাড়ির কোঠা দেখেছ জন্মে অবধি, তাতে তো চলবে না, পৈতৃক সম্পত্তি তোমার এই।

সকালে উঠিয়া একটি খবরে সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। নিরুপমা আর নাই। সে গত পৌষ মাসে তীর্থ করিতে গিয়াছিল, পথে কলেরা হয়, সেখানেই মারা যায়। নিরুপমার জ্যাঠা বৃদ্ধ সরকার মহাশয় বলিতেছেন—আর দাদাঠাকুর, তোমরা লেখাপড়া শিখে দেশে তো আর আসবে না? মেয়েটার কথা মনে হলে আর অন্ন মুখে ওঠে না। হ'ল কি জান, বললে কুড়ুলের পাটে মেলা দেখতে যাব। তার তো জানো পুজো-আচ্চা এক বাতিক ছিল। পাড়ার সবাই যাচ্ছে, আমি বলি, তা যাও। ওমা, তিনদিন পর সকালে খবর এল নিরু মা মর-মর, শান্তিপুরের পথে একটা দোকানে কি সমাচার, না কলেরা। গেলুম সবাই ছুটে। পেঁছুতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। আমরা যখম গেলুম তখন বাক্‌রোধ হয়ে গিয়েছে, চিনতে পারলে, চোখ দিয়ে হু-হু জল পড়তে লাগল। দাদাঠাকুর—মা আমার পাড়াসুদ্ধ সবারই উপকার ক'রে বেড়াত তুমি সবই জান—আর অসুখ দেখে সেই পাড়ার লোকই…যারা সঙ্গে ছিল, পথের ধারের একটা দোচালা ভাঙা ঘরে মাকে আমার ফেলে সবাই পালিয়েছে। পাশের দোকানীটা লোক ভাল—সে-ই একটু দেখাশুনা করেছে। চিকিৎসে হয় নি, পত্তরও হয় নি, বেঘোরে নিরু-মাকে হারালুম।

সরকার-বাড়ি হইতে ফিরিতে একটু বেলা হইয়া গেল। উঠানে পা দিয়া ডাকিল ও খোক—কাযল দুপুরে ঘুমাইতেছিল, কখন ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়াছে এবং তেলি-বাড়ি হইতে আঁকশি যোগাড় করিয়া আনিয়া উঠানের গাছের চাঁপা ফুল পাড়িবার জন্য নিচের একটা ডালে আঁকশি বাধাইয়া টানাটানি করিতেছে।

দৃশ্যটা তাহার কাছে অদ্ভুত মনে হইল। অপর্ণার পোঁতা সেই চাঁপাফুল গাছটা। কবে তাহার ফুল ধরিয়াছে, কবে গাছটা মানুষ হইয়াছে, গত সাত বৎসরের মধ্যে অপুর সে খোঁজ লওয়ার অবকাশ ছিল না—কিন্তু খোকা কেমন করিয়া—

সে বলিল—খোকা ফুল পাড়ছিস্ তো, গাছটা কে পুঁতেছিল জানিস্?

কাজল বাবার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—তুমি এসো না বাবা, ঐ ডালটা চেপে ধরো না! মোটে দুটো পড়েছে।

অপু বলিল—কে পুঁতেছিল জানিস গাছটা? তোর মা!

কিন্তু মা বলিলে কাজল কিছুই বোঝে না! জ্ঞান হইয়া অবধি সে দিদিমা ছাড়া আর কাহাকেও চিনিত না, দিদিমাই তাহার সব। মা একটা অবাস্তব কাল্পনিক ব্যাপার মাত্র। মায়ের কথায় তার মনে কোনও বিশেষ সুখ বা দুঃখ জাগায় না।

অনেকদিন পরে মনসাপোতা আসা। সকলেই বাড়িতে ডাকে, নানা সদুপদেশ দেয়। ক্ষেত্র কপালী অপুকে ডাকিয়া অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিল, দুধ পাঠাইয়া দিল—ঘর ছাইবার জন্য ভড়েরা এক গাড়ি উলুখড় দিতে চাহিল।

রাত্রে আবার কি কাজে সরকার-বাড়ির সামনের পথ দিয়া আসিতে হইল। বাড়িটার দিকে যেন চাওয়া যায় না। গোটা মনসাপোতাটা নিরুদির অভাবে ফাঁকা হইয়া গিয়াছে তাহার কাছে। নিরুদি, আজ খোকাকে নিয়ে এসেছি, তুমি এসে ওকে দেখবে না, আদর করবে না, খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত ক'রে দেবে না?

রাত্রে অপু আর কিছুতেই ঘুমাইতে পারে না। চোখের সামনে নিরুপমার সেই হাসি-হাসি মুখ, সেই অনুযোগের সুর। আর একটি বার দেখা হয় না তাহার সঙ্গে?

কাজলকে সে কলিকাতায় লইয়া আসিল পরদিন বৈকালের ট্রেনে। সন্ধ্যার পর গাড়িখানা শিয়ালদহ স্টেশনে ঢুকিল। এত আলো, এত বাড়ি-ঘর, এত গাড়িঘোড়া—কি কাণ্ড এ সব! কাজল বিস্ময়ে একেবারে নির্ব্বাক হইয়া গেল। সে শুধু বাবার হাত ধরিয়া চারিদিকে ডাগর চোখে চাহিতে চাহিতে চলিল।

হ্যারিসন রোডের বড় বড় বাড়িগুলা দেখাইয়া একবার সে বলিল—ওগুলো কাদের বাড়ি, বাবা? অত বাড়ি?

বাবার বাসাটায় ঢুকিয়া কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া সে গলির মোড়ে দাঁড়াইয়া বড় রাস্তার গাড়িঘোড়া দেখিতে লাগিল। অবাক-জলপান জিনিসটা কি? বাবার দেওয়া দুটো পয়সা কাছে ছিল, এক পয়সার অবাক-জলপান কিনিয়া খাইয়া সে সত্যই অবাক হইয়া গেল। মনে হইল, এমন অপূর্ব্ব জিনিস সে জীবনে আর কখনও খায় নাই। চাল-ছোলা ভাজা সে অনেক খাইয়াছে। কিন্তু কি মশলা দিয়া ইহারা তৈরী করে এই অবাক-জলপান?

অপু তাহাকে ডাকিয়া বাসার মধ্যে লইয়া গেল--ওরকম একলা কোথাও যাস্ নে খোকা। হারিয়ে যাবি কি, কি হবে। যাওয়ার দরকার নেই।

কাজলের দুঃস্বপ্ন কাটিয়া গিয়াছে। আর দাদামশায়ের বকুনি খাইতে হইবে না, একা গিয়া দোতলার ঘরে রাত্রিতে শুইতে হইবে না, মামীমাদের ভয়ে পাতের প্রত্যেক ভাতটি খুঁটিয়া গুছাইয়া খাইতে হইবে না। একটি ভাত পাতের নিচে পড়িয়া গেলে বড় মামীমা বলিত - পেয়েছ পরের, দেদার ফেল আর ছড়াও ; বাবার অন্ন তো খেতে হ'ল না কখনো!

ছেলেমানুষ হইলেও সব সময় এই বাবার খোঁটা কাজলের মনে বাজিত -

অপু বাসায় আসিয়া দেখিল, কে একখানা চিঠি দিয়াছে তাহার নামে—অপরিচিত হস্তাক্ষর। আজ পাচ-ছয় দিন পত্রখানা আসিয়া চিঠির বাক্সে পড়িয়া আছে। খুলিয়া পড়িয়া দেখিল একজন অপরিচিত ভদ্রলোক তাহাকে লিখিতেছেন, তাহার বই পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছেন, শুধু তিনি নহেন, তাঁহার বাড়িসুদ্ধ সবাই—প্রকাশকের নিকট হইতে ঠিকানা জানিয়া এই পত্র লিখিতেছেন, তিনি তাহার সহিত দেখা করিতে চাহেন।

দু-তিনবার চিঠিখানা পড়িল। এতদিন পরে বোঝা গেল যে, অন্ততঃ একটি লোকেরও ভাল লাগিয়াছে তাহার বইখানা।

পরের প্রশংসা শুনিতে অপু চিরকালই ভালবাসে, তবে বহু দিন তাহার অদৃষ্টে সে জিনিসটা জোটে নাই--প্রথম যৌবনের সেই সরল হামবড়া ভাব বয়সের অভিজ্ঞতার ফলে দূর হইয়া গিয়াছিল, তবুও সে আনন্দের সহিত বন্ধুবান্ধবের নিকট চিঠিখানা দেখাইয়া বেড়াইল।

পরের দিন কাজল চিড়িয়াখানা দেখিল, গড়ের মাঠ দেখিল। মিউজিয়ামে অধুনালুপ্ত সেকালের কচ্ছপের প্রস্তরীভূত বৃহৎ খোলা দু'টি দেখিয়া সে অনেকক্ষণ অবাক্ হইয়া চাহিয়া চাহিয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিল। পরে অপু ফিরিয়া যাইতেছে, কাজল বাবার কাপড় ধরিয়া টানিয়া দাঁড় করাইয়া বলিল—শোন বাবা!—কচ্ছপ দুটোর দিকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—আচ্ছা এ দুটোর মধ্যে যদি যুদ্ধ হয় তবে কে জেতে বাবা! ··অপু গম্ভীর মুখে ভাবিয়া ভাবিয়া বলে—ওই বাঁ দিকেরটা জেতে।—কাজলের মনের দ্বন্দ্ব দূর হয়।

কিন্তু গোলদীঘিতে মাছের ঝাঁক দেখিয়া সে সকলের অপেক্ষা খুশী। এত বড় বড় মাছ আর এত একসঙ্গে! মেলা ছেলেমেয়ে মাছ দেখিতে জুটিয়াছে বৈকালে, সেও বাবার কথায় এক পয়সার মুড়ি কিনিয়া জলে ছড়াইয়া দিয়া অধীর আগ্রহে মাছের খেলা দেখিতে লাগিল।

তুমি ছিপে ধরবে বাবা? কত বড় বড় মাছ?

অপু বলিল—চুপ্ চুপ্ ও মাছ ধরতে দেয় না।

ফুটপাতে একজন ভিখারী বসিয়া। কাজল ভয়ের সুরে বলিল—শিগগির একটা পয়সা দাও বাবা, নইলে ছুঁয়ে দেবে।—তাহার বিশ্বাস, কলিকাতার যেখানে যত ভিখারী বসিয়া আছে ইহাদের পয়সা দিতেই হইবে, নতুবা ইহারা আসিয়া ছুঁইয়া দিবে, তখন তোমার বাড়ি ফিরিয়া স্নান করিতে হইবে সন্ধ্যাবেলা, কাপড় ছাড়িতে হইবে—সে এক মহা হাঙ্গামা।

বর্ষাকালের মাঝামাঝি অপুর চাকরিটি গেল। অর্থের এমন কষ্ট সে অনেক দিন ভোগ করে নাই। ভাল স্কুলে দিতে না পারিয়া সে ছেলেকে কর্পোরেশনের ফ্রি স্কুলে ভর্তি করিয়া দিল। ছেলেকে দুধ পর্যন্ত দিতে পারে না, ভাল কিছু খাওয়াইতে পারে না। বইয়ের বিশেষ কিছু আয় নাই। হাত এদিকে কপর্দকশূন্য।

কাজলের মধ্যে অপু একটা পৃথক জগৎ দেখিতে পায়। দু'টা টিনের চাকতি, গোটা দুই মার্বেল, একটা কল-টেপা খেলনা, মোটরগাড়ি, খান দুই বই—ইহাতে যে মানুষ কিসে এত আনন্দ পায়—অপু তাহা বুঝিতে পারে না। চঞ্চল ও দুষ্ট ছেলে—পাছে হারাইয়া যায়, এই ভয়ে অপু তাহাকে মাঝে মাঝে ঘরে চাবি দিয়া রাখিয়া নিজের কাজে বাহির হইয়া যায়—এক একদিন চার পাঁচ ঘণ্টাও হইয়া যায়—কাজলের কোনো অসুবিধা নাই—সে রাস্তার ধারের জানালাটায় দাঁড়াইয়া পথের লোকজন দেখিতেছে—না হয়, বাবার বইগুলো নাড়িয়া চাড়িয়া ছবি দেখিতেছে মোটের উপর আনন্দেই আছে।

এই বিরাট নগরীর জীবনস্রোত কাজলের কাছে অজানা দুর্বোধ্য। কিন্তু তাহার নবীন মন ও নবীন চক্ষু যে-সকল জিনিস দেখে ও দেখিয়া আনন্দ পায় বয়স্ক লোকের ক্লান্ত দৃষ্টিতে তাহা অতি তুচ্ছ। হয়তো আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলে—দ্যাখো বাবা, ওই চিলটা একটা কিসের ডাল মুখে ক'রে নিয়ে যাচ্ছিল, সামনের ছাদের আলসেতে লেগে ডালটা ওই দ্যাখো বাবা রাস্তায় পড়ে গিয়েচে—

বাবার সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইয়া এত ট্রাম, মোটর, লোকজনের ভিড়ের মাঝখানে কোথায় একটা কাক ফুটপাতের ধারে ড্রেনের জলে স্নান করিতেছে তাই দেখিয়া তাহার মহা আনন্দ—তাহা আবার বাবাকে না দেখাইলে কাজলের মনে তৃপ্তি হইবে না। সব বিষয়েই বাবাকে আনন্দের ভাগ না দিতে পারিলে, কাজলের আনন্দ পূর্ণ হয় না। খাইতে খাইতে বেগুনিটা, কি তেলে-ভাজা কচুরিখানা এক কামড় খাইয়া ভাল লাগিলে বাকী আধখানা বাবার মুখে গুঁজিয়া দিবে—অপুও তাহা খাইয়া ফেলে—ছিঃ, আমার মুখে দিতে নেই—একথা বলিতে তার প্রাণ কেমন করে—কাজেই পিতৃত্বের গাম্ভীর্যভরা ব্যবধান অকারণে গড়িয়া উঠিয়া পিতা-পুত্রের সহজ সরল মৈত্রীকে বাধাদান করে নাই, কাজল জীবনে বাবার মত সহচর পায় নাই—এবং অপুও বোধ হয় কাজলের মত বিশ্বস্ত ও একান্ত নির্ভরশীল তরুণ বন্ধু খুব বেশী পায় নাই জীবনে।

আর কি সরলতা!—পথে হয়ত দুজনে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে, কাজল বলিল—শোনো বাবা, একটা কথা—শোনো, চুপি চুপি বলব—পরে পথের এদিক ওদিক চাহিয়া লাজুক মুখে কানে কানে বলে—ঠাকুর বড় দুটোখানি ভাত দ্যায় হোটেলে—আমার খেয়ে পেট ভরে না—তুমি বলবে বাবা? বললে আর দুটো দেবে না?

দিনকতক গলির একটা হোটেলে পিতাপুত্রে দুজনে খায়—হোটেলের ঠাকুর হয়ত শহরের ছেলের হিসেবে ভাত দেয় কাজলকে—কিন্তু পাড়াগাঁয়ের ছেলে কাজল বয়সের অনুপাতে দুটি বেশী ভাতই খাইয়া থাকে।

অপু মনে মনে হাসিয়া ভাবে—এই কথা আবার কানে কানে বলা !… রাস্তার মধ্যে ওকে চেনেই বা কে আর শুনছেই বা কে !…ছেলেটা বেজায় বোকা।

আর একদিন কাজল লাজুক মুখে বলিল—বাবা একটা কথা বলব ?

—কি ?

—নাঃ বাবা—বলব না—

—বল্ না কি ?

কাজল সরিয়া আসিয়া চুপি চুপি লাজুক সুরে বলিল—তুমি মদ খাও বাবা ?

অপু বিস্মিত হইয়া বলিল—মদ ?…কে বলেছে তোকে ?

—সেই যে সেদিন খেলে ? সেই রাস্তার মোড়ে একটা দোকান থেকে ? পান কিনলে আর সেই যে—

অপু প্রথমটা অবাক হইয়া গিয়াছিল—পরে বুঝিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল,—দূর বোকা—সে হলো লেমনেড্—সেই পানের দোকানে তো ?…তোর ঠান্ডা লেগেছিল বলে তোকে দিই নি।…খাওয়াব তোকে একদিন, ও একরকম মিষ্টি শরবৎ। দূর—

কাজলের কাছে অনেক ব্যাপার পরিষ্কার হইয়া গেল। কলিকাতায় আসিয়া সে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছিল যে এখানে মোড়ে মোড়ে মদের দোকান—পান ও মদ একসঙ্গে বিক্রয় হয় প্রায় সর্বত্র। সোডা লেমনেড্ সে কখনো দেখে নাই ইহার আগে, জানিত না—কি করিয়া সে ধরিয়া লইয়াছে বোতলে ওগুলো মদ। তাই তো সেদিন বাবাকে খাইতে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছিল—এত দিন লজ্জায় বলে নাই। সেই দিনই অপু তাহাকে লেমনেড্ খাওয়াইয়া তাহার ভ্রম ঘুচাইয়া দিল।

এই অবস্থায় একদিন সে বিমলেন্দুর পত্র পাইল, একবার আলিপুরে লীলার ওখানে পত্রপাঠ আসিতে। লীলার ব্যাপার সুবিধা নয়। তাহারও আর্থিক অবস্থা বড় শোচনীয়। নিজের যাহা কিছু ছিল গিয়াছে, আর কেহ দেয়ও না, বাপের বাড়িতে তাহার নাম করিবার পর্যন্ত উপায় নাই। ইদানীং তাহার মা কাশী হইতে তাহাকে টাকা পাঠাইতেন। বিমলেন্দু নিজের খরচ হইতে বাঁচাইয়া কিছু টাকা দিদির হাতে দিয়া যাইত। তাহার উপর মুশকিল এই যে লীলা বড়মানুষের মেয়ে, কষ্ট করা অভ্যাস নাই, হাত ছোট করিতে জানে না।

এই রকম কিছুদিন গেল। লীলা যেন দিন দিন কেমন হইয়া যাইতেছিল। অমন হাস্যমুখী লীলা, তাহার মুখে হাসি নাই, মনমরা বিষণ্ণ ভাব। শরীরও যেন দিন দিন শুকাইয়া যাইতে থাকে। গত বর্ষাকাল এই ভাবেই কাটে, বিমলেন্দু পূজার সময় পীড়াপীড়ি করিয়া ডাক্তার দেখায়। ডাক্তার বলেন, থাইসিসের সূত্রপাত হইয়াছে, সতর্ক হওয়া দরকার।

বিমলেন্দু লিখিয়াছে—লীলার খুব জ্বর। ভুল বকিতেছে, কেহই নাই, সে একা ও একটি চাকর সারারাত জাগিয়াছে, আত্মীয়স্বজন কেহ ডাকিলে আসিবে না, কি করা যায় এ অবস্থায়। অপু এখানে আজকাল তত আসিতে পারে না, অনেকদিন লীলাকে দেখে নাই। লীলার মুখ যেন রাঙা, অস্বাভাবিকভাবে রাঙা ও উজ্জ্বল দেখাইতেছে।

বিমলেন্দু শুষ্কমুখে বলিল—কাল রঘুয়ার মুখে খবর পেয়ে এসে দেখি এই অবস্থা। এখন কি করি বলুন তো ? বাড়ির কেউ আসবে না, আমি কাউকে বলতেও যাব না, মাকে একখানা টেলিগ্রাম করে দেব ?

অপু বলিল—মা যদি না আসেন ?

—কি বলেন ? এক্ষুনি ছুটে আসবেন—দিদি-অন্ত প্রাণ তাঁর। তিনি যে আজ চার

বছর কলকাতামুখো হন নি, সে এই দিদির কাণ্ডই তো। মুশকিল হয়েছে কি জানেন, কাল রাত্রেও বকেছে, শুধু খুকী, খুকী, অথচ তাকে আনানো অসম্ভব।

অপু বলিল—আর এক কাজ করতে হবে, একজন নার্স আমি নিয়ে আসি ঠিক করে। মেয়েমানুষের নার্সিং পুরুষকে দিয়ে হয় না। বসো তোমরা।

দুই তিন দিনে সবাই মিলিয়া লীলাকে সারাইয়া তুলিল। জ্ঞান হইলে সে একদিন কেবল অপুকে ঘরের মধ্যে দেখিতে পাইয়া কাছে ডাকিয়া ক্ষীণ সুরে বলিল—কখন এলে অপূর্ব?

রোগ হইতে উঠিয়াও লীলার স্বাস্থ্য ভাল হইল না। শুইয়া আছে তো শুইয়াই আছে, বসিয়া আছে তো বসিয়াই আছে। মাথার চুল উঠিয়া যাইতে লাগিল। আপন মনে গুম্‌ হইয়া বসিয়া থাকে, ভাল করিয়া কথাও বলে না, হাসেও না। কোথাও নড়িতে চড়িতে চায় না। ইতিমধ্যে কাশী হইতে লীলার মা আসিলেন। বাপের বাড়ি থাকেন, রোজ মোটরে আসিয়া দু'তিন ঘণ্টা থাকেন—আবার চলিয়া যান। ডাক্তার বলিয়াছে, স্বাস্থ্যকর জায়গায় না লইয়া গেলে রোগ সারিবে না।

দুপুর বেলাটা - কিন্তু একটু মেঘ করার দরুন রৌদ্র নাই কোথাও। অপু লীলার বাসায় গিয়া দেখিল লীলা জানালার ধারে বসিয়া আছে। সে সব সময় আসিতে পারে না, কাজলকে একা বাসায় রাখিয়া আসা চলে না। ভারী চঞ্চল ও রীতিমত নির্বোধ ছেলে। তাহা ছাড়া রান্নাবান্না ও সমুদয় কাজ করিতে হয় অপুর, কাজলকে দিয়া কুটাগাছটা ভাঙিবার সাহায্য নাই, সে খেলাধুলা লইয়া সারাদিন মহাব্যস্ত—অপু তাহাকে কিছু করিতে বলেও না, ভাবে—আহা, খেলুক একটু। পুওর মাদারলেস্ চাইল্ড!

লীলা ম্লান হাসিয়া বলিল—এস।

—এরা কোথায়? বিমলেন্দু কোথায়? মা এখনও আসেন নি?

—বসো। বিমলেন্দু এই কোথায় গেল। নার্স তো নিচে, বোধ হয় খেয়ে একটু ঘুমুচ্ছে।

—তারপর কোথায় যাওয়া ঠিক হ'ল—সেই ধরমপুরেই? সঙ্গে যাবেন কে—

—মা আর বিমল।

খানিকক্ষণ দুজনেই চুপ করিয়া রহিল। পরে লীলা তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল—আচ্ছা অপূর্ব, বর্দ্ধমানের কথা মনে হয় তোমার?

অপু ভাবিল, আহা, কি হয়ে গিয়েচে লীলা!

মুখে বলিল—মনে থাকবে না কেন খুব মনে আছে!

লীলা অন্যমনস্কভাবে বলিল—তোমরা সেই ওদিকের একটা ঘরে থাকতে—সেই আমি যেতুম—

—তুমি আমাকে একটা ফাউন্টেন পেন দিয়েছিলে মনে আছে লীলা? তখন ফাউন্টেন পেন নতুন উঠেচে।—মনে নেই তোমার?

লীলা হাসিল।

অপু হিসাব করিয়া বলিল—তা ধর প্রায় আজ বিশ-বাইশ বছর আগেকার কথা।

লীলা খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—অপূর্ব, কেউ মোটরটা কিনবে বলতে পারো, তোমার সন্ধানে আছে?

লীলার অত সাধের গাড়িটা…এত কষ্টে পড়িয়াছে সে!—

লীলা বলিল—আমি সে সব গ্রাহ্য করি নে, কিন্তু মা-ও ভাবেন—যাক্‌ সে সব কথা। তুমি আমাকে কোথাও নিয়ে যাবে অপূর্ব?

—কোথায় ?

—যেখানে হোক্। তোমার সেই পোর্তো প্লাতায়—মনে নেই, সেই যে সমুদ্রের মধ্যে কোন্ ডুবোজাহাজ উদ্ধার করে বলেছিলে সোনা আনবে? সেই যে 'মুকুলে' পড়ে বলেছিলে ?

কথাটা অপুর মনে পড়িল। হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ সেই—ঠিক। উঃ সে কথা মনে আছে তোমার !

—আমি বলেছিলাম, কেমন ক'রে যাবে ? তুমি বলেছিলে, জাহাজ কিনে সমুদ্রে যাবে। অপু হাসিল। শৈশবের সাধ-আশার নিষ্ফলতা সম্বন্ধে সে কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল, লীলাও এ ধরণের নানা আশা পোষণ করিত, বিদেশে যাইবে, বড় আর্টিস্ট হইবে ইত্যাদি—ওর সামনে আর সে কথা বলার আবশ্যক নাই।

কিন্তু লীলাই আবার খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—যাবে না ? যাও যাও—পরে হি-হি করিয়া হাসিয়া কেমন একটা অদ্ভুত সুরে বলিল—সমুদ্র থেকে সোনা আনবে তো তোমরাই—পোর্তো প্লাতা থেকে, না ?···দ্যাখো, এখনও ঠিক মনে ক'রে রেখেছি—রাখি নি ? হি-হি—একটু চা খাবে ?

লীলার মুখের শীর্ণ হাসি ও তাহার বাঁধুনীহারা উদ্‌ভ্রান্ত আল্‌গা ধরণের কথাবার্ত্তা অপুর বুকে তীক্ষ্ন তীরের মত বিঁধিল। সঙ্গে সঙ্গে বুঝিল এত ভালবাসে নাই সে লীলাকে আর কোনো দিন আজ যত বাসিয়াছে।

—দুপুর বেলা চা খাব কি ? সেজন্য ব্যস্ত হয়ো না লীলা।

লীলা বলিল—তোমার মুখে সেই পুরনো গানটা শুনি নি অনেকদিন—সেই 'আমি চঞ্চল হে'—গাও তো ?

মেঘলা দিনের দুপুর। বাহিরের দিকে একটা সাহেব-বাড়ির কম্পাউণ্ডে গাছের ডালে অনেকগুলি পাখি কলরব করিতেছে। অপু গান আরম্ভ করিল, লীলা জানালার ধারেই বসিয়া বাহিরের দিকে মুখ রাখিয়া গানটা শুনিতে লাগিল। লীলার মনে আনন্দ দিবার জন্য অপু গানটা দু-তিনবার ফিরাইয়া ফিরাইয়া গাহিল। গান শেষ হইয়া গেল, তবু লীলা জানালার বাহিরেই চাহিয়া আছে, অন্যমনস্কভাবে যেন কি জিনিস লক্ষ্য করিতেছে।

খানিকক্ষণ কাটিয়া গেল। দুজনেই চুপ করিয়া ছিল। হঠাৎ লীলা বলিল—একটা কথার উত্তর দেবে ?

লীলার গলার স্বরে অপু বিস্মিত হইল। বলিল—কি কথা ?···

—আচ্ছা, বেঁচে লাভ কি ?

অপু এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না—বলিল—এ কথার কি—এ কথা কেন ?

—বল না ?···

—না লীলা। এ ধরণের কথাবার্ত্তা কেন ? এর দরকার নেই।

—আচ্ছা, একটা সত্যি কথা বলবে ? ··

—কি বল ?···

—আচ্ছা, আমাকে লোকে কি ভাবে ?

সেই লীলা ! তাহার মুখে এ রকম দুর্ব্বল ধরণের কথাবার্ত্তা, সে কি কখনও স্বপ্নেও ভাবিয়াছিল ! অপু এক মুহূর্ত্তে সব বুঝিল—অভিমানিনী তেজস্বিনী লীলা আর সব সহ্য করিতে পারে, লোকের ঘৃণা তাহার অসহ্য। গত কয়েক বৎসরে ঠিক তাহাই জুটিয়াছে তাহার কপালে। এতদিন সেটা বোঝে নাই—সম্প্রতি বুঝিয়াছে—জীবনের উপর টান হারাইতে বসিয়াছে।

অপুর গলায় যেন একটা ডেলা আটকাইয়া গেল। সে যতদূর সম্ভব সহজ সুরে বলিল—এ ধরণের কথা সে এ পর্য্যন্ত কোনো দিন লীলার কাছে বলে নাই, কোনো দিন না—দ্যাখো লীলা, অন্য লোকের কথা জানি নে, তবে আমার কথা শুনবে? আমি তোমাকে আমার চেয়ে অনেক বড় তো ভাবিই—অনেকের চেয়ে বড় ভাবি—তোমাকে কেউ চেনে নি, চিনলে না, এই কথা ভাবি।—আজ নয় লীলা, এতটুকু বেলা থেকে তোমায় আমি জানি, অন্য লোক ভুল করতে পারে, কিন্তু আমি—

লীলা যেন অবাক্ হইয়া গেল, কখনও সে এ রকম দেখে নাই অপুকে। সে জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল—সত্যি বলছ?—কিন্তু অপুর মুখ দেখিয়া হয়ত বুঝিল প্রশ্নটা অনাবশ্যক। পরক্ষণেই খেয়ালী অপু আর একটা কাজ করিয়া বসিল—এটাও সে ইহার আগে কখনো করে নাই। লীলার খুব কাছে সরিয়া গিয়া তার ডান হাতখানা নিজের দুহাতের মধ্যে লইয়া লীলাকে নিজের দিকে টানিয়া তার মুখ ফিরাইল। পরে গভীর স্নেহে তার উত্তপ্ত ললাটে, কানের পাশের চূর্ণ কুন্তলে হাত বুলাইতে বুলাইতে দৃঢ়স্বরে বলিল—তুমি আমি ছেলেবেলার সাথী, লীলা—আমরা কেউ কাউকে ভুলব না—কোনো অবস্থাতেই না। এতদিন ভুলি নি-ও কখনো লীলা।

লীলার সারাদেহ শিহরিয়া উঠিল…যাহা আজ অপুর মুখে, কথার সুরে ডাগর চোখের অকপট দৃষ্টিতে পাইল—জীবনে কোনোদিন কাহারও কাছ হইতে তাহা সে কখনও পায় নাই—আজ সে দেখিল অপুকে চিরকাল ভালবাসিয়া আসিয়াছে—বিশেষ করিয়া অপুর মাতৃবিয়োগের পর লালদীঘির সামনের ফুটপাতে তাকে যেদিন শুষ্কমুখে নিরাশ্রয় ভাবে বেড়াইতে দেখিয়াছিল—সেদিনটি হইতে।

…অপুর চমক ভাঙিল—লীলা কখন তাহার বক্ষে মুখ লুকাইয়াছিল তাহার অশ্রু-প্লাবিত পান্ডুর মুখখানি।…

অপু বাহিরে চলিয়া আসিল—সে অনুভব করিতেছিল, লীলার মত সে কাহাকেও ভালবাসে না—সেই গভীর অনুকম্পামিশ্রিত ভালবাসা, যা মানুষকে সব ভুলাইয়া দেয়, আত্মবিসর্জ্জনে প্রণোদিত করে।

লীলাকে যে করিয়া হউক সে সুখী করিবে। লীলাকে এতটুকু কষ্টে পড়িতে দিবে না, নিজেকে ছোট ভাবিতে দিবে না। যাহার ইচ্ছা লীলাকে ছাড়ুক, সে লীলাকে ছাড়িতে পারিবে না। সে লীলাকে কোথাও লইয়া যাইবেই—এ অবস্থায় কলিকাতায় থাকিলে লীলা বাঁচিবে না। বিশ্ব একদিকে—লীলার মুখের অনুরোধ আর একদিকে।

সারাপথ ভাবিতে ভাবিতে ফিরিল।

দিন তিনেক পরে।

বেলা আটটা। অপু সকালে স্নান সারিয়া কাজলকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইবে—এমন সময়ে মিঃ লাহিড়ীর ছোট নাতি অরুণ ঘরে ঢুকিল। এককোণে ডাকিয়া লইয়া চুপি চুপি উত্তেজিত সুরে বলিল—শিগগির আসুন, দিদি কাল রাত্রে বিষ খেয়েছে।

বিষ! সর্ব্বনাশ!—লীলা বিষ খাইয়াছে!

কাজলকে কি করা যায়?—খোকা তুই—বরং—ঘরে থাক একা। আমি একটা কাজে যাচ্ছি। দেরি হবে ফিরতে।

কিন্তু কাজলের চোখে ধূলা দেওয়া অত সহজ নয়। কেন বাবা? কি কাজ? কোথায়? কত দেরি হইতে পারে?…কোনোমতে ভুলাইয়া তাহাকে রাখিয়া দুজনে ট্যাক্সি ধরিয়া লীলার বাসায় আসিল। আরও দুখানা মোটর দাঁড়াইয়া আছে! ঢুকিতেই লীলাদের বাড়ির ডাক্তার

বন্ধু কেদারবাবুর সঙ্গে দেখা। অরুণ ব্যস্তসমস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—কি অবস্থা এখন ?

কেদারবাবু বলিলেন—অবস্থা তেমনি। আর একটা ইন্‌জেক্‌শ্যন করেছি। হিল্‌কক্‌ সাহেব এলে যে বুঝতে পারি। অপুর প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন—বড্ড স্যাড্‌ ব্যাপার - বড্ড স্যাড্‌। জিনিসটা ? মরফিয়া। রাত্রে কখন খেয়েছে, তা তো বোঝা যায় নি, আজ সকালে তাও বেলা হলে তবে টের পাওয়া গেল। কর্ণেল হিল্‌কক্‌কে আনতে লোক গিয়েছে —তিনি না আসা পর্য্যন্ত—

অরুণের সঙ্গে সঙ্গে উপরের সেই ঘরটাতে গেল—মাত্র দিন তিনেক আগে যেটাতে বসিয়া সে লীলাকে গান শুনাইয়া গিয়াছে। প্রথমটা কিন্তু সে ঘরে ঢুকিতে পারিল না, তাহার হাত কাঁপিতেছিল, পা কাঁপিতেছিল। ঘরটা অন্ধকার, জানালার পর্দ্দাগুলো বন্ধ, ঘরে বেশী লোক নাই, কিন্তু বারান্দাতে আট-দশজন লোক। সবাই পদ্মপুকুরের বাড়ির।—সবাই চুপি চুপি কথা কহিতেছে, পা টিপিয়া টিপিয়া হাঁটিতেছে। কিছু বিশেষ অস্বাভাবিক ব্যাপার ঘটিয়াছে এখানে এমন বলিয়া কিন্তু অপুর মনে হইল না। অথচ একজন—যে পৃথিবীর সুখকে এত ভালবাসিত, আকাঙ্ক্ষা করিত, আশা করিত—উপেক্ষায় মুখ বাঁকাইয়া পৃথিবী হইতে ধীরে ধীরে বিদায় লইতেছে।

সেদিনকার সেই জানালার পাশের খাটেই লীলা শুইয়া। সংজ্ঞা নাই, পাণ্ডুর, কেমন যেন বিবর্ণ—ঠোঁট ঈষৎ নীল। একখানা হাত খাটের বাহিরে ঝুলিতেছিল সে তুলিয়া দিল। গায়ে রেশমের বরফি-কাটা বিলাতী লেপ। কি অপূর্ব্ব যে দেখাইতেছে লীলাকে! মরণাহত মৃত্যুপাণ্ডুর মুখের সৌন্দর্য্য যেন এ পৃথিবীর নয়—কিংবা হরিদ্রাভ হাতীর দাঁতের খোদাই মুখ যেন। দেবীর মত সৌন্দর্য্য আরও অপার্থিব হইয়া উঠিয়াছে।

তাহার মনে হইল লীলা ঘামিতেছে। তবে বোধ হয় আর ভয় নাই, বিপদ কাটিয়া গিয়াছে। চুপি চুপি বলিল—ঘামছে কেন ?

ডাক্তারবাবু বলিলেন—ওটা মরফিয়ার সিম্‌টম্‌।

মিনিট-দশ কাটিল। অপু বাহিরের বারান্দাতে আসিয়া দাঁড়াইল। পাশের ঘরে লোকেরা একবার ঢুকিতেছে, আবার বাহির হইতেছে, অনেকেই আসিয়াছে, কেবল মিঃ লাহিড়ী ও লীলার মা নাই। মিঃ লাহিড়ী দার্জ্জিলিং-এ, লীলার মা মাত্র কাল এখান হইতে বর্দ্ধমানে কি কাজে গিয়াছেন। লীলা সত্যই অভাগিনী!

এমন সময় নীচে একটা গোলমাল। একখানা গাড়ির শব্দ উঠিল। ডাক্তার সাহেব আসিয়াছেন—তিনি উপরে উঠিয়া আসিলেন, পিছনে কেদারবাবু ও বিমলেন্দু। অনেকেই ঘরে ঢুকিতে যাইতেছিল, কেদারবাবু নিষেধ করিলেন। মিনিট সাতেক পরে ডাক্তার সাহেব চলিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন—Too late, কোনও আশা নাই।

আরও আধঘণ্টা। এত লোক!—অপু ভাবিল, ইহারা এতকাল কোথায় ছিল ? আজ too late! Too late!

লীলা মারা গেল বেলা দশটায়। অপু তখন খাটের পাশেই দাঁড়াইয়া। এতক্ষণ লীলা চোখ বুজিয়াই ছিল, সে সময়টা হঠাৎ চোখ মেলিয়া চাহিল—তারাগুলা বড় বড়, তাহার দিকেও চাহিল, অপুর দেহে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল—লীলা তাহাকে চিনিয়াছে বোধ হয়। ·· কিন্তু পরক্ষণেই দেখিল—দৃষ্টি অর্থহীন, আভাহীন, উদাসীন, অস্বাভাবিক। তারপরই লীলা যেন চোখ তুলিয়া কড়িকাঠে, সেখান হইতে আরও অস্বাভাবিকভাবে মাথার শিয়রে কার্নিসের বিটের দিকে ইচ্ছা করিয়াই কি দেখিবার জন্য চোখ ঘুরাইল—স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষ ওরকম চোখ ঘুরাইতে পারে না।

তারপরেই সবাই ঘরের বাহির হইয়া আসিল। কেবল বিমলেন্দু ছেলেমানুষের মত

চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

অপুও ফিরিল। হায়রে পাপ, হায় পুণ্য! কে মানদণ্ডে তৌল করিবে? মূর্খ… মূর্খ…মূর্খ…মূর্খ…লীলার বিচার করিবে কে? এই সব মূর্খের দল? দুঃখের মধ্যে তাহার হাসি আসিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

কাজল এই কয়মাসেই বেশ লেখাপড়া শিখিয়াছে। বাড়িতেই পড়ে—অনেক সময় নিজের বই রাখিয়া বাবার বইগুলির পাতা উল্টাইয়া দেখে। আজকাল বাবা কি কাজে প্রায় সর্ব্বদাই বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায়, এই জন্য বাবার কাজও সে অনেক করে।

বাসায় অনেকগুলা বিড়াল জুটিয়াছে। সে যখন প্রথম আসিয়াছিল তখন ছিল একটা মাত্র বিড়াল—এখন জুটিয়াছে আরও গোটা তিন। কাজল খাইতে বসিলেই পাতের কাছে সবগুলা আসিয়া জোটে। তাহারা ভাত খায় না, খায় শুধু মাছ। কাজল প্রথমে ভাবে কাহাকেও সে এক টুকরাও দিবে না--করুক মিউ মিউ। কিন্তু একটু পরে একটা অল্প বয়সের বিড়ালের উপর বড় দয়া হয়। এক টুকরো তাহাকে দিতেই অন্য সবগুলা করুণসুরে ডাক শুরু করে—কাজল ভাবে—আহা, ওরা কি বসে বসে দেখবে—দিই ওদেরও একটু একটু। একে ওকে দিতে কাজলের মাছ প্রায় সব ফুরাইয়া যায়। বাঁড়ুয্যেদের ছেলে অনু একটা বিড়ালছানাকে রাস্তার উপর দিয়া যে ইঞ্জিন যায়, ওরই তলায় ফেলিয়া দিয়াছিল—ভাগ্যে সেটা মরে নাই—যে ইঞ্জিন চালায়, সে ততক্ষণাৎ থামাইয়া ফেলে। কাজল আজকাল একটা কেরোসিন কাঠের বাক্সে বিড়ালগুলির থাকিবার জায়গা করিয়া দিয়াছে।

রাত্রে শুইয়াই কাজল অমনি বলে,—গল্প বল বাবা। আচ্ছা বাবা, ওই যে রাস্তায় ইঞ্জিন চালায় যারা, ওরা কি যখন হয় থামাতে পারে, যেদিকে ইচ্ছে চালাতে পারে? সে মাঝে মাঝে গলির মুখে দাঁড়াইয়া বড় রাস্তার স্টীম রোলার চালাইতে দেখিয়াছে। যে লোকটা চালায় তাহার উপর কাজলের মনে মনে হিংসা হয়। কি মজা ওই কাজ করা! যখন খুশি চালানো, যতদূর হয়, যখন খুশি থামানো। মাঝে মাঝে সিটি দেয়, একটা চাকা বসিয়া বসিয়া ঘোরায়। সব চুপ করিয়া আছে, সামনের একটা ডাণ্ডা যেই টেপে অমনি ঘটাং ঘটাং বিকট শব্দ।

এই সময়ে অপুর হঠাৎ অসুখ হইল। সকালে অন্য দিনের মত আর বিছানা হইতে উঠিতেই পারিল না—বাবা সকালে উঠিয়া মাদুর পাতিয়া বসিয়া তামাক খায়, কাজলের মনে হয় সব ঠিক আছে—কিন্তু আজ বেলা দশটা বাজিল, বাবা এখনও শুইয়া—জগৎটা যেন আর স্থিতিশীল নয়, নিত্য নয়—সব কি যেন হইয়া গিয়াছে। সেই রোদ উঠিয়াছে, কিন্তু রোদের চেহারা অন্য রকম, গলিটার চেহারা অন্য রকম, কিছু ভাল লাগে না, বাবার অসুখ এই প্রথম, বাবাকে আর কখনো সে অসুস্থ দেখে নাই—কাজলের ক্ষুদ্র জগতে সব যেন ওলট-পালট হইয়া গেল। সারা দিনটা কাটিল, বাবার সাড়া নাই, সংজ্ঞা নাই—জ্বরে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া। কাজল পাঁউরুটি কিনিয়া আনিয়া খাইল। সন্ধ্যা কাটিয়া গেল। কাজল পরমানন্দ পানওয়ালার দোকান হইতে তেল পুরিয়া আনিয়া লণ্ঠন জ্বালিল। বাবা তখনও সেই রকমই শুইয়া। কাজল অস্থির হইয়া উঠিল—তাহার কোনও অভিজ্ঞতা নাই এ সব বিষয়ে, কি এখন সে করে? দু-একবার বাবার কাছে গিয়া ডাকিল, জ্বরের ঘোরে বাবা একবার বলিয়া উঠিল—স্টোভটা নিয়ে আয়, ধরাই খোকা—স্টোভটা—

অর্থাৎ সে স্টোভটা ধরাইয়া কাজলকে রাঁধিয়া দিবে।

কাজল ভাবিল, বাবাও তো সারাদিন কিছু খায় নাই—স্টোভ ধরাইয়া বাবাকে সাবু তৈরি করিয়া দিবে। কিন্তু স্টোভ সে ধরাইতে জানে না, কি করে এখন? স্টোভটা ঘরের মেঝেতে লইয়া দেখিল তেল নাই। আবার পরমানন্দের দোকানে গেল। পরমানন্দকে সব কথা খুলিয়া বলিল। পাশেই একজন নতুন-পাশকরা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের ডিস্পেন্সারী। ডাক্তারটি একেবারে নতুন, একা ডাক্তারখানায় বসিয়া কড়ি-বরগা গুণিতেছিলেন, তিনি তাহাদের সঙ্গে বাসায় আসিলেন, অপুকে ডাকিয়া তাহার হাত ও বুক দেখিলেন, কাজলকে ঔষধ লইবার জন্য ডাক্তারখানায় আসিতে বলিলেন। অপু তখন একটু ভাল—সে ব্যস্তসমস্ত হইয়া ক্ষীণস্বরে বলিল—ও পারবে না, রাত্তিরে এখন থাক্, ছেলেমানুষ, এখন থাক্—

এই সবের জন্য বাবার উপর রাগ হয় কাজলের। কোথায় সে ছেলেমানুষ, সে বড় হইয়াছে। কোথায় সে না যাইতে পারে, বাবা পাঠাইয়া দেখুক দিকি সে কেমন পারে না? বিশেষতঃ অপরের সামনে তাহাকে কচি বলিলে, ছেলেমানুষ বলিলে, আদর করিলে বাবার উপর তাহার ভীষণ রাগ হয়।

বাবার সামনে স্টোভ ধরাইতে গেলে কাজল জানে বাবা বারণ করিবে,—বলিবে—'উঁহু, করিস নে খোকা, হাত পুড়িয়ে ফেলবি। সে সরু বারান্দাটার এক কোণে স্টোভটা লইয়া গিয়া কয়েকবার চেষ্টা করিয়াও সেটা জ্বালিতে পারিল না। অপু একবার বলিল—কি কচ্ছিস্ ও খোকা, কোথায় গেলি ও খোকা? আঃ, বাবার জ্বালায় অস্থির!··· ঘরে আসিয়া বলিল—বাবা কি খাবে? মিছরী আর বিস্কুট কিনে আনবো? অপু বলিল—না না, সে তুই পারবি নে। আমি খাবো না কিছু। লক্ষ্মী বাবা, কোথাও যেও না ঘর ছেড়ে, রাত্তিরে কি কোথাও যায়? হারিয়ে যাবি—

হ্যাঁ, সে হারাইয়া যাইবে! ছাড়িয়া দিলে সে সব জায়গায় যাইতে পারে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র একা যাইতে পারে, বাবার কথা শুনিলে তাহার হাসি পায়।

পরদিন সকালে উঠিয়া কাজল প্রথমে ঔষধ আনিল। বাবার জন্য ফুটপাতের দোকান হইতে খেজুর ও কমলালেবু কিনিল। একটু দূরের দুধের দোকান হইতে জ্বাল-দেওয়া গরম দুধও কিনিয়া আনিল। দুধের ঘটি হাতে ছেলে ফিরিলে অপু বলিল—কথা শুনবি নে খোকা? দুধ আনতে গেলি রাস্তা পার হয়ে সেই আমহার্স্ট স্ট্রীটের দোকানে? এখন গাড়ি ঘোড়ার বড় ভিড়—যেও না বাবা···দে বাকী পয়সা।

খুচরা পয়সা না থাকায় ছেলেকে সকালে ঔষধের দামের জন্য একটা টাকা দিয়াছিল, কাজল টাকাটা ভাঙাইয়া এগুলি কিনিয়াছে, নিজে মাত্র এক পয়সার বেগুনি খাইয়াছিল (তেলভাজা খাবারের উপর তাহার বেজায় লোভ), বাকী পয়সা বাবার হাতে ফেরত দিল।

অপু বলিল—একখানা পাঁউরুটি নিয়ে আয়, ওই দুধের আমি অতটা তো খাবো না, তুই অর্দ্ধেকটা রুটি দিয়ে খা—

—না বাবা, এই তো কাছেই হোটেল, আমি ওখানে গিয়ে—

—না, না, সেও তো রাস্তা পার হয়ে, আপিসের সময় এখন মোটরের ভিড়, এ-বেলা ওই খাও বাবা, আমি তোমাকে ওবেলা দুটো রেঁধে দেবো।

কিন্তু দুপুরের পর অপুর আবার খুব জ্বর আসিল। রাত্রের দিকে এত বাড়িল, আর কোনও সংজ্ঞা রহিল না। কাজল দোরে চাবি দিয়া ছুটিয়া আবার ডাক্তারের কাছে গেল। ডাক্তার আবার আসিলেন, মাথায় জলপটির ব্যবস্থা দিলেন, ঔষধও দিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—এখানে আর কেউ থাকে না? তোমরা দুজন মোটে?···অসুখ যদি বাড়ে, তবে বাড়িতে টেলিগ্রাম ক'রে দিতে হবে। দেশে কে আছে?

—দেশে কেউ নেই। আমার মা তো নেই।···আমি আর বাবা শুধু—

—মুশকিল। তুমি ছেলেমানুষ কি করবে? হাসপাতালে দিতে হবে তা হলে, দেখি আজ রাতটা—

কাজলের প্রাণ উড়িয়া গেল। হাসপাতাল! সে শুনিয়াছে সেখানে গেলে মানুষ আর ফেরে না! বাবার অসুখ কি এত বেশী যে, হাসপাতালে পাঠাইতে হইবে?

ডাক্তার চলিয়া গেল। বাবা শুইয়া আছে—শিয়রের কাছে আধভাঙা ডালিম, গোটাকতক লেবুর কোয়া। পালংশাকের গোড়া বাবা খাইতে ভালবাসে, বাজার হইতে সেদিন পালংশাকের গোড়া আনিয়াছিল, ঘরের কোণে চুপড়িতে শুকাইতেছে—বাবা যদি আর না ওঠে? না রাঁধে? কাজলের গলায় কিসের একটা ডেলা ঠেলিয়া উঠিল। চোখ ফাটিয়া জল আসিল—ছোট বারান্দাটার এক কোণে গিয়া সে আকুল হইয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল। ভগবান বাবাকে সারাইয়া তোল, পালংশাকের গোড়া বাবাকে খাইতে না দেখিলে সে বুক ফাটিয়া মরিয়া যাইবে—ভগবান বাবাকে ভাল করিয়া দাও।

মেঝেতে তাহার পড়িবার মাদুরটা পাতিয়া সে শুইয়া পড়িল। ঘরে লণ্ঠনটা জ্বালিয়া রাখিল—একবার নাড়িয়া দেখিল কতটা তেল আছে, সারারাত জ্বলিবে কি না। অন্ধকারে তাহার বড় ভয়—বিশেষ বাবা আর নড়ে না, চড়ে না, কথাও বলে না।

দেয়ালে কিসের সব যেন ছায়া! কাজল চক্ষু বুজিল।

মাস দেড় হইল অপু সারিয়া উঠিয়াছে। হাসপাতালে যাইতে হয় নাই, এই গলিরই মধ্যে বাঁড়ুয্যেরা বেশ সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ, তাঁহাদের এক ছেলে ভাল ডাক্তার। তিনি অপুর বাড়িওয়ালার মুখে সব শুনিয়া নিজে দেখিতে আসেন—ইনজেকশনের ব্যবস্থা করেন, শুশ্রূষার লোক দেন, কাজলকে নিজের বাড়ি হইতে খাওয়াইয়া আনেন। উঁহাদের বাড়ির সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ আলাপ হইয়া গিয়াছে।

চৈত্রের প্রথম। চাকুরি অনেক খুঁজিয়াও মিলিল না। তবে আজকাল লিখিয়া কিছু আয় হয়।

সকালে একদিন অপু মেঝেতে মাদুর পাতিয়া বসিয়া বসিয়া কাজলকে পড়াইতেছে, একজন কুড়ি-বাইশ বছরের চোখে-চশমা ছেলে দোরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আজ্ঞে আসতে পারি?—আপনারই নাম অপূর্ববাবু? নমস্কার—

—আসুন, বসুন বসুন। কোত্থেকে আসছেন?

—আজ্ঞে, আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। আপনার বই পড়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলুম। আমার অনেক বন্ধুবান্ধব সবাই এত মুগ্ধ হয়েছে, তাই আপনার ঠিকানা নিয়ে—

অপু খুব খুশী হইল—বই পড়িয়া এত ভাল লাগিয়াছে যে, বাড়ি খুঁজিয়া দেখা করিতে আসিয়াছে একজন শিক্ষিত তরুণ যুবক! এ তার জীবনে এই প্রথম।

ছেলেটি চারিদিকে চাহিয়া বলিল—আজ্ঞে, ইয়ে, এই ঘরটাতে আপনি থাকেন বুঝি?

অপু একটু সংকুচিত হইয়া পড়িল, ঘরের আসবাবপত্র অতি হীন, ছেঁড়া মাদুরে পিতাপুত্রে বসিয়া পড়িতেছে। খানিকটা আগে কাজল ও সে দুজনে মুড়ি খাইয়াছে, মেঝের খানিকটাতে তার চিহ্ন। সে ছেলের ঘাড়ে সব দোষটা চাপাইয়া দিয়া সলজ্জ সুরে বলিল—তুই এমন দুষ্টু হয়ে উঠেছিস খোকা, রোজ রোজ তোকে বলি খেয়ে অমন করে ছড়াবি নে—তা তোর—আর বাটিটা অমন দোরের গোড়ায়—

কাজল এ অকারণ তিরস্কারের হেতু না বুঝিয়া কাঁদ-কাঁদ মুখে বলিল—আমি কই বাবা, তুমিই তো বাটিটাতে মুড়ি—

—আচ্ছা, আচ্ছা, থাম্, লেখ, বানানগুলো লিখে ফেল।

যুবকটি বলিল—আমাদের মধ্যে আপনার বই নিয়ে খুব আলোচনা—আজ্ঞে হ্যাঁ। ওবেলা বাড়িতে থাকবেন ? 'বিভাবরী' কাগজের এডিটার শ্যামাচরণবাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন, আমি—আরও তিন-চার জন সেই সঙ্গে আসব।—তিনটে ? আচ্ছা, তিনটেতেই ভাল।

আরও খানিক কথাবার্ত্তার পর যুবক বিদায় লইলে অপু ছেলের দিকে চাহিয়া বলিল,—উস্‌-স্‌-স্‌-স্‌, খোকা ?

ছেলে ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল—আমি আর তোমার সঙ্গে কথা কব না বাবা—

—না বাপ আমার, লক্ষ্মী আমার, রাগ ক'রো না। কিন্তু কি করা যায় বল তো ?

—কি বাবা ?

—তুই এক্ষুনি ওঠ, পড়া থাক এবেলা, এই ঘরটা ঝেড়ে বেশ ভাল ক'রে সাজাতে হবে—আর ওই তোর ছেঁড়া জামাটা তক্তপোশের নিচে লুকিয়ে রাখ দিকি !—ওবেলা 'বিভাবরী'র সম্পাদক আসবে

—'বিভাবরী' কি বাবা ?

—'বিভাবরী' কাগজ রে পাগল, কাগজ—দৌড়ে যা তো, পরেশের বাসা থেকে বালতিটা চেয়ে নিয়ে আয় তো !

বৈকালের দিকে ঘরটা একরকম মন্দ দাঁড়াইল না। তিনটার পরে সবাই আসিলেন। শ্যামাচরণবাবু বলিলেন—আপনার বইটার কথা আমার কাগজে যাবে আসছে মাসে। ওটাকে আমিই আবিষ্কার করেছি মশাই ! আপনার লেখা গল্পটল্প ? দিন না।

পরের মাসে 'বিভাবরী' কাগজে তাহার সম্বন্ধে এক নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ বাহির হইল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার গল্পটাও বাহির হইল। শ্যামাচরণবাবু ভদ্রতা করিয়া পঁচিশটা টাকা গল্পের মূল্যস্বরূপ লোক মারফৎ পাঠাইয়া দিয়া আর একটা গল্প চাহিয়া পাঠাইলেন।

অপু ছেলেকে প্রবন্ধটি পড়িতে দিয়া নিজে চোখ বুজিয়া বিছানায় শুইয়া শুনিতে লাগিল। কাজল খানিকটা পড়িয়া বলিল—বাবা, এতে তোমার নাম লিখেছে যে ! অপু হাসিয়া বলিল—দেখেছিস খোকা, লোক কত ভাল বলছে আমাকে ? তোকেও একদিন ওই রকম বলবে, পড়াশুনো করবি ভাল ক'রে, বুঝলি ?

দোকানে গিয়া শুনিল 'বিভাবরী'তে প্রবন্ধ বাহির হইবার পর খুব বই কাটিতেছে—তাহা ছাড়া তিন বিভিন্ন স্থান হইতে তিনখানি পত্র আসিয়াছে। বইখানার অজস্র প্রশংসা !

একদিন কাজল বসিয়া পড়িতেছে, সে ঘরে ঢুকিয়া হাত দুখানা পিছনের দিকে লুকাইয়া বলিল,—খোকা, বল তো হাতে কি ? কথাটা বলিয়াই মনে পড়িয়া গেল, শৈশবে একদিন তাহার বাবা—সেও এমনি বৈকাল বেলাটা· তাহার বাবা এইভাবেই, ঠিক এই কথা বলিয়াই খবরের কাগজের মোড়কটা তাহার হাতে দিয়াছিল ! জীবনের চক্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া কি অদ্ভুত ভাবেই আবর্ত্তিত হইতেছে, চিরযুগ ধরিয়া ! কাজল ছুটিয়া গিয়া বলিল,—কি বাবা, দেখি ? —পরে বাবার হাত হইতে জিনিসটা লইয়া দেখিয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া উঠিল। অজস্র ছবিওয়ালা আরব্য উপন্যাস ! দাদামশায়ের বইয়ে তো এত রঙীন ছবি ছিল না ? নাকের কাছে ধরিয়া দেখিল কিন্তু তেমন পুরনো গন্ধ নাই, সেই এক অভাব।

অনেক দিন পরে হাতে পয়সা হওয়াতে সে নিজের জন্যও একরাশ বই ও ইংরেজী ম্যাগাজিন কিনিয়া আনিয়াছে।

পরদিন সে বৈকালে তাহার এক সাহেব বন্ধুর নিকট হইতে একখানি চিঠি পাইয়া গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে গেল। সাহেবের বাড়ি কানাডায়, চল্লিশ-

বিয়াল্লিশ বয়স, নাম এ্যাশবার্টন। হিমালয়ের জঙ্গলে গাছপালা খুঁজিতে আসিয়াছে, ছবিও আঁকে। ভারতবর্ষে এই দুইবার আসিল। স্টেটস্‌ম্যানে তাহার লেখা হিমালয়ের উচ্ছ্বসিত বর্ণনা পড়িয়া অপু হোটেলে গিয়া মাস-দুই পূর্বে লোকটির সঙ্গে আলাপ করে। এই দু মাসের মধ্যে দুজনের বন্ধুত্ব খুব জমিয়া উঠিয়াছে।

সাহেব তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। ফ্লানেলের ঢিলা সুট পরা, মুখে পাইপ, খুব দীর্ঘাকার, সুশ্রী মুখ, নীল চোখ, কপালের উপরের দিকের চুল খানিকটা উঠিয়া গিয়াছে। অপুকে দেখিয়া হাসিমুখে আগাইয়া আসিল, বলিল—দেখ, কাল একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছিল। ও-রকম কোনদিন হয় নি। কাল একজন বন্ধুর সঙ্গে মোটরে কলকাতার বাইরে বেড়াতে গিয়েছিলুম। একটা জায়গায় গিয়ে বসেছি, কাছে একটা পুকুর, ও-পারে একটা মন্দির, এক্‌সার বাঁশগাছ, আর তালগাছ, এমন সময়ে চাঁদ উঠল, আলো আর ছায়ার কি খেলা! দেখে আর চোখ ফেরাতে পারি নি। মনে হল, Ah, this is the East!··· The eternal East, অমন দেখিনি কখনও।

অপু হাসিয়া বলিল,—and pray, who is the Sun?···

এ্যাশবার্টন হো-হো করিয়া হাসিয়া বলিল,—না, শোন, আমি কাশী যাচ্ছি, তোমাকে না নিয়ে আমি যাব না কিন্তু। আসছে হপ্তাতেই যাওয়া যাক্‌ চলো।

কাশী! সেখানে সে কেমন করিয়া যাইবে! কাশীর মাটিতে সে পা দিতে পারিবে না। শত-সহস্র-স্মৃতি-জড়ানো কাশী, জীবনের ভাণ্ডারের অক্ষয় সঞ্চয়—ও কি যখন-তখন গিয়া নষ্ট করা যায়! সেবার পশ্চিম যাইবার সময় মোগলসরাই দিয়া গেল, কিন্তু কাশী যাইবার অত ইচ্ছা সত্ত্বেও যাইতে পারিল না কেন?···কেন, তাহা অপরকে সে কি করিয়া বুঝায়!···

বন্ধু বলিল, তুমি জাভায় এসো না আমার সঙ্গে? বরোবুদুরের স্কেচ আঁকব, তা ছাড়া মাউন্ট শ্যালাকের বনে যাব। ওয়েস্ট জাভাতে বৃষ্টি কম হয় বলে ট্রপিক্যাল ফরেস্ট তত জমকালো নয়, কিন্তু ইস্ট জাভার বন দেখলে তুমি মুগ্ধ হবে, তুমি তো বন ভালবাস, এস না!···

বন্ধুর কাছে লীলাদের বাড়ি অনেকদিন আগে দেখা বিয়াত্রিচে দান্তের সেই ছবিটা। অপু বলিল—বাতিচেলির, না?

—না। আগে বলত লিওনার্দোর—আজকাল ঠিক হয়েছে আম্ব্রোজো ডা প্রেডিস-এর, বাতিচেলির কে বলল?

লীলা বলিয়াছিল। বেচারী লীলা!

সপ্তাহের শেষে কিন্তু বন্ধুটির আগ্রহ ও অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তাহাকে কাশী রওনা হইতে হইল। কাশীতে পরদিন বেলা বারোটার সময় পৌঁছিয়া বন্ধুকে ক্যান্টন্‌মেন্টের এক সাহেবী হোটেলে তুলিয়া দিল ও নিজে এক্কা করিয়া শহরে ঢুকিয়া গোধুলিয়ার মোড়ের কাছে 'পার্ব্বতী আশ্রমে' আসিয়া উঠিল।

গোধুলিয়ার মোড় হইতে একটু দূরে সেই বালিকা বিদ্যালয়টা আজও আছে। ইহারই একটু দূরে তাহাদের সেই স্কুলটা! কোথায়? একটা গলির মধ্যে ঢুকিল। এখানেই কোথায় যেন ছিল। একটা বাড়ি সে চিনিল। তাহার এক সহপাঠী এই বাড়িতে থাকিত—দু-একবার তাহার সঙ্গে এখানে আসিয়াছিল। বাসা নয়, নিজেদের বাড়ি। একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া শসা কিনিতেছিল—সে জিজ্ঞাসা করিল—এই বাড়িতে প্রসন্ন বলে একটা ছেলে আছে, জানেন?—ভদ্রলোক বিস্ময়ের সুরে বলিলেন—প্রসন্ন? ছেলে?···অপু সামলাইয়া বলিল—ছেলে না, মানে এই আমাদের বয়সী। কথাটা বলিয়া সে অপ্রতিভ

হইল—প্রসন্ন বা সে আজ কেহই ছেলে নয়—আর তাহাদের ছেলে বলা চলে না—একথা মনে ছিল না। প্রসন্নর ছেলে-বয়সের মূর্ত্তিই মনে আছে কি না! প্রসন্ন বাড়ি নাই, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল সে আজকাল চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ের বাপ।

স্কুলটা কোথায় ছিল সে চিনিতে পারিল না। একজন লোককে বলিল—মশায়, এখানে 'শুভংকরী পাঠশালা' বলে একটা স্কুল কোথায় ছিল জানেন?

—শুভংকরী পাঠশালা? কৈ না, আমি তো এই গলিতে দশ বছর আছি—

—তাতে হবে না, সম্ভবত বাইশ-তেইশ বছর আগেকার কথা।

—ও, বসাক মশায়, বসাক মশায়, আসুন একবারটি এদিকে। ওঁকে জিজ্ঞেস করুন, ইনি চল্লিশ বছরের খবর বলতে পারবেন।

বসাক মশায় প্রশ্ন শুনিয়া বলিলেন—বিলক্ষণ! তা আর জানি নে! ঐ হরগোবিন্দ শেঠের বাড়িতে স্কুলটা ছিল। ঢুকেই নিচু-মত তো! দুধারে উঁচু রোয়াক।

অপু বলিল—হাঁ হাঁ ঠিক। সামনে একটা চৌবাচ্চা—

—ঠিক ঠিক—আমাদের আনন্দবাবুর স্কুল। আনন্দবাবু মারাও গিয়েছেন আজ আঠার-উনিশ বছর। স্কুলও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছে। আপনি এসব জানলেন কি করে?

—আমি পড়তুম ছেলেবেলায়। তারপর কাশী থেকে চলে যাই।

একটা বাড়ি খুঁজিয়া বাহির করিল। তাদের বাড়ির মোড়েই। ইহারা তখন শোলার ফুল ও টোপর তৈরী করিয়া বেচিত। অপু বাড়িটার মধ্যে ঢুকিয়া গেল। গৃহিণীকে চিনিল—বলিল, আমায় চিনতে পারেন? ঐ গলির মধ্যে থাকতুম ছেলেবেলায়—আমার বাবা মারা গেলেন?—গৃহিণী চিনিতে পারিলেন। বসিতে দিলেন, বলিলেন—তোমার মা কেমন আছেন?

অপু বলিল—তাহার মা বাঁচিয়া নাই।

—আহা! বড় ভালমানুষ ছিল! তোমার মার হাতে সোডার বোতল খুলতে গিয়ে হাত কেটে গিয়েছিল মনে আছে?

অপু হাসিয়া বলিল—খুব মনে আছে, বাবার অসুখের সময়!

গৃহিণীর ডাকে একটি বত্রিশ-তেত্রিশ বছরের বিধবা মেয়ে আসিল। বলিলেন—একে মনে আছে?···

—আপনার মেয়ে না? উনি কি জন্যে রোজ বিকেলে জানলার ধারে খাটে শুয়ে কাঁদতেন! তা মনে আছে।

—ঠিক বাবা,—তোমার সব মনে আছে দেখছি। আমার প্রথম ছেলে তখন বছরখানেক মারা গিয়েছে—তোমরা যখন এখানে এলে। তার জন্যেই কাঁদত। আহা, সে ছেলে আজ বাঁচলে চল্লিশ বছর বয়েস হ'ত।

একবার মণিকর্ণিকার ঘাটে গেল। পিতার নশ্বর দেহের রেণু-মেশানো পবিত্র মণিকর্ণিকা।

বৈকালে বহুক্ষণ দশাশ্বমেধ ঘাটে বসিয়া কাটাইল।

ঐ সেই শীতলা মন্দির—ওরই সামনে বাবার কথকতা হইত সে-সব দিনে—সঙ্গে সঙ্গে সেই বৃদ্ধ বাঙাল কথক ঠাকুরের কথা মনে হইয়া অপুর মন উদাস হইয়া গেল। কোন্ জাদুবলে তাহার বালকহৃদয়ের দুর্লভ স্নেহটুকু সেই বৃদ্ধ চুরি করিয়াছিল—এখন এতকাল পরেও তাহার উপর অপুর সে স্নেহ অক্ষুণ্ন আছে—আজ তাহা সে বুঝিল।

পরদিন সকালে দশাশ্বমেধ ঘাটে সে স্নান করিতে নামিতেছে, হঠাৎ তাহার চোখে পড়িল

একজন বৃদ্ধা একটা পিতলের ঘটিতে গঙ্গাজল ভর্ত্তি করিয়া লইয়া স্নান সারিয়া উঠিতেছেন —চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়া সে চিনিল—কলিকাতার সেই জ্যাঠাইমা! সুরেশের মা!···বহুকাল সে আর জ্যাঠাইমাদের বাড়ি যায় নাই, সেই নববর্ষের দিনটার অপমানের পর আর কখনও না। সে আগাইয়া গিয়া পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—চিনতে পারেন জ্যাঠাইমা? আপনারা কাশীতে আছেন নাকি আজকাল? —বৃদ্ধা খানিকক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—নিশ্চিন্দিপুরের হরি ঠাকুরপোর ছেলে না? —এসো, এসো, চিরজীবী হও বাবা—আর বাবা চোখেও ভাল দেখি নে—তার ওপর দেখ এই বয়সে একা বিদেশে পড়ে থাকা—ভারী ঘটিটা কি নিয়ে উঠতে পারি? ভাড়াটেদের মেয়ে জলটুকু বয়ে দেয়—তো তার আজ তিনদিন জ্বর—

—ও, আপনিই বুঝি একলা কাশীবাস—সুনীলদাদারা কোথায়?

বৃদ্ধা ভারী ঘটিটা ঘাটের রাণার উপর নামাইয়া বলিলেন—সব কলকাতায়, আমায় দিয়েছে ভেন্ন করে বাবা। ভাল ঘর দেখে বিয়ে দিলুম সুনীলের, গুপ্তিপাড়ার মুখুয্যে—ওমা, বৌ এসে বাবা সংসারের হ'ল কাল—সে সব বলব এখন বাবা—তিন-এর-এক ব্রজেশ্বরের গলি—মন্দিরের ঠিক বাঁ গায়ে—একা থাকি, কারুর সঙ্গে দেখাশুনা হয় না। সুরেশ এসেছিল, পুজোর সময় দু'দিন ছিল। থাকতে পারে না—তুমি এসো বাবা আমার বাসায় আজ বিকেলে, অবিশ্যি, অবিশ্যি।

অপু বলিল—দাঁড়ান জ্যাঠাইমা, চট ক'রে ডুব দিয়ে নি, আপনি ঘটিটা ওখানে রাখুন, পৌঁছে দিচ্ছি।

—না বাবা, থাক, আমিই নিয়ে যাচ্ছি, তুমি বললে এই যথেষ্ট হ'ল—বেঁচে থাকো।

তবুও অপু শুনিল না, স্নান সারিয়া ঘটি হাতে জ্যাঠাইমার সঙ্গে তাঁহার বাসায় গেল। ছোট্ট একতলা ঘরে থাকেন—পশ্চিম দিকের ঘরে জ্যাঠাইমা থাকেন, পাশের ঘরে আর একজন প্রৌঢ়া থাকেন—তাঁহার বাড়ি ঢাকা। অন্য ঘরগুলি একটি বাঙালী গৃহস্থ ভাড়া লইয়াছেন, যাঁদের ছোট মেয়ের কথা জ্যাঠাইমা বলিতেছিলেন।

তিনি বলিলেন—সুনীল আমার তেমন ছেলে না। ঐ যে হাড়হাবাতে ছোটলোকের ঘরের মেয়ে এনেছিলাম, সংসারটা সুদ্ধ উচ্ছন্ন দিলে। কি থেকে শুরু হ'ল শোন। ও বছর শেষ মাসে নবান্ন করেছি, ঠাকুরঘরের বারকোশে নবান্ন মেখে ঠাকুরদের নিবেদন করে রেখে দিইছি। দুই নাতিকে ডাকছি, ভাবলাম ওদের একটু একটু নবান্ন মুখে দি। বৌটা এমন বদমায়েস, ছেলেদের আমার ঘরে আসতে দিলে না—শিখিয়ে দিয়েছে, ও-ঘরে যাস নি, নবান্নর চাল খেলে নাকি ওদের পেট কামড়াবে। তাই আমি বললাম, বলি হ্যাঁ গা বৌমা, আমি কি ওদের নতুন চাল খাইয়ে, মেরে ফেলবার মতলব করছি? তা শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে, সেকেলে লোক ছেলেপিলে মানুষ করার কি বোঝে? আমার ছেলে আমি যা ভাল বুঝব করব, উনি যেন তার ওপর কথা না কইতে আসেন। এই সব নিয়ে ঝগড়া শুরু, তারপর দেখি ছেলেও তো বৌমার হয়ে কথা বলে। তখন আমি বললাম, আমাকে কাশী পাঠিয়ে দাও, আমি আর তোমার সংসারে থাকব না। বৌ রাত্রে কানে কি মন্তর দিয়েছে, ছেলে দেখি তাতেই রাজী। তাহলেই বোঝ বাবা, এত ক'রে মানুষ ক'রে শেষে কিনা আমার কপালে—জ্যাঠাইমার দুই চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

অপু জিজ্ঞাসা করিল—কেন, সুরেশদা কিছু বললেন না?

—আহা, সে আগেই বলি নি? সে শ্বশুরবাড়ির বিষয় পেয়ে সেখানেই বাস করছে, সেই রাজসাহী না দিনাজপুর। সে একখানা পত্তর দিয়েও খোঁজ করে না, মা আছে কি মলো। তবে আর তোমাকে বলছি কি? সুরেশ কলকাতায় থাকলে কি আর কথা ছিল বাবা?

অপুকে খাইতে দিয়া গল্প করিতে করিতে তিনি বলিলেন, ও, ভুলে গিয়েছি তোমাকে বলতে, আমাদের নিশ্চিন্দিপুরের ভুবন মুখুয্যের মেয়ে লীলা যে কাশীতে আছে, জান না ?

অপু বিস্ময়ের সুরে বলিল—লীলাদি ! নিশ্চিন্দিপুরের ? কাশীতে কেন ?

জ্যাঠাইমা বলিলেন—ওর ভাশুর কি চাকরি করে এখানে। বড় কষ্ট মেয়েটার, স্বামী তো আজ ছ'সাত বছর পক্ষাঘাতে পঙ্গু, বড় ছেলেটা কাজ না পেয়ে বসে আছে, আরও চার-পাঁচটি ছেলমেয়ে সবসুদ্ধ, ভাশুরের সংসারে ঘাড় গুঁজে থাকে। যাও না, দেখা ক'রে এসো আজ বিকেলে, কালীতলার গলিতে ঢুকেই বাঁদিকের বাড়িটা।

বাল্যজীবনের সেই রানুদির বোন লীলাদি ! নিশ্চিন্দিপুরের মেয়ে। বৈকাল হইতে অপুর দেরি সহিল না, জ্যাঠাইমার বাড়ি হইতে বাহির হইয়াই সে কালীতলার গলি খুঁজিয়া বাহির করিল—সরু ধরণের তেতলা বাড়িটা। সিঁড়ি যেমন সংকীর্ণ, তেমনি অন্ধকার, এত অন্ধকার যে পকেট হইতে দেশলাই-এর কাঠি বাহির করিয়া না জ্বালাইয়া সে এই বেলা দুইটার সময়ও পথ খুঁজিয়া পাইতেছিল না !

একটা ছোট দুয়ার পার হইয়া সরু একটা দালান। একটি দশ বারো বছরের ছেলের প্রশ্নের উত্তরে সে বলিল, এখানে কি নিশ্চিন্দিপুরের লীলাদি আছেন ? আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি বলো গিয়ে। অপুর কথা শেষ না হইতে পাশের ঘর হইতে নারী-কণ্ঠের প্রশ্ন শোনা গেল, কে রে খোকা ? সঙ্গে সঙ্গে একটি পাতলা গড়নের গৌরবর্ণ মহিলা দরজার চৌকাঠে আসিয়া দাঁড়াইলেন, পরনে আধ-ময়লা শাড়ি, হাতে শাঁখা, বয়স বছর সাঁইত্রিশ, মাথায় একরাশ কালো চুল। অপু চিনিল, কাছে গিয়া পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিয়া হাসিমুখে বলিল, চিনতে পার লীলাদি ?

পরে তাহার মুখের দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে এবং চিনিতে পারে নাই দেখিয়া বলিল, আমার নাম অপু, বাড়ি নিশ্চিন্দিপুরে ছিল আগে—

লীলা তাড়াতাড়ি আনন্দের সুরে বলিয়া উঠিল—ও ! অপু, হরিকাকার ছেলে ! এসো এসো ভাই, এসো। পরে সে অপুর চিবুক স্পর্শ করিয়া আদর করিল এবং কি বলিতে গিয়া ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

অদ্ভুত মুহূর্ত্ত ! এমন সব অপূর্ব্ব সুপবিত্র মুহূর্ত্তও জীবনে আসে ! লীলাদির ঘনিষ্ঠ আদরটুকু অপুর সারা শরীরে একটা স্নিগ্ধ আনন্দের শিহরণ আনিল। গ্রামের মেয়ে, তাহাকে ছোট দেখিয়াছে, সে ছাড়া এত আপনার জনের মত অন্তরঙ্গতা কে দেখাইতে পারে ? লীলাদি ছিল তাহাদের ধনী প্রতিবেশী ভুবন মুখুয্যের মেয়ে, বয়সে তাহার অপেক্ষা অনেক বড়, অল্প বয়সে বিবাহ হইয়াছিল, তারপরেই শ্বশুরবাড়ি চলিয়া আসিয়াছিল ও সেইখানেই থাকিত। শৈশবে অল্পদিন মাত্র উভয়ের সাক্ষাৎ কিন্তু আজ অপুর মনে হইল লীলাদির মত আপনার জন সারা কাশীতে আর কেহ নাই। শৈশব-স্বপ্নের সেই নিশ্চিন্দিপুর, তারই জলে বাতাসে দু'জনের দেহ পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়াছে একদিন।

তারপর লীলা অপুর জন্য আসন আনিয়া পাতিয়া দিল, দালানেই পাতিল, ঘরদোর বেশী নাই, বিশেষ করিয়া পরের সংসার, নিজের নহে। সে নিজে কাছে বসিল, কত খোঁজ-খবর লইল। অপুর বারণ সত্ত্বেও ছেলেকে দিয়া জলখাবার আনাইল, চা করিয়া দিল।

তারপর লীলা নিজের অনেক কথা বলিল। বড় ছেলেটি চৌদ্দ বছরের হইয়া মারা গিয়াছে, তাহার উপর সংসারের এই দুর্দ্দশা। উনি পক্ষাঘাতে পঙ্গু, ভাশুরের সংসারে চোর হইয়া থাকা, ভাশুর লোক মন্দ নন, কিন্তু বড়জা—পায়ে কোটি কোটি দণ্ডবৎ। দুর্দ্দশার একশেষ। সংসারের যত উঞ্ছ কাজ সব তাহার ঘাড়ে, আপন জন কেহ কোথাও নাই, বাপের বাড়িতে এমন কেহ নাই যাহার কাছে দুই দিন গিয়া আশ্রয় লইতে পারে। সতু

মানুষ নয়, লেখাপড়া শেখে নাই, গ্রামে মুদির দোকান করে, পৈতৃক সম্পত্তি একে একে বেচিয়া খাইতেছে—তাহার উপর দুইটি বিবাহ করিয়াছে, একরাশ ছেলেপিলে। তাহার নিজেরই চলে না, লীলা সেখানে আর কি করিয়া থাকে।

অপু বলিল—দুটো বিয়ে কেন ?

—পেটে বিদ্যে না থাকলে যা হয়। প্রথম পক্ষের বৌয়ের বাপের সঙ্গে কি ঝগড়া হ'ল, তাকে জব্দ করার জন্যে আবার বিয়ে করলে। এখন নিজেই জব্দ হচ্ছেন, দুই বৌ ঘাড়ে—তার ওপর দুই বৌয়ের ছেলেপিলে। তার ওপর রাণুও ওখানেই কিনা !

—রাণুদি ? ওখানে কেন ?

—তারও কপাল ভাল নয়। আজ বছর সাত-আট বিধবা হয়েছে, তার আর কোনও উপায় নেই, সতুর সংসারেই আছে। শ্বশুরবাড়িতে এক দেওর আছে, মাঝে মাঝে নিয়ে যায়, বেশির ভাগ নিশ্চিন্দিপুরেই থাকে।

অপু অনেকক্ষণ ধরিয়া রাণুদির কথা জিজ্ঞাসা করিবে ভাবিতেছিল, কিন্তু কেন প্রশ্নটা করিতে পারে নাই সে-ই জানে। লীলার কথায় পরে অপু অন্যমনস্ক হইয়া গেল। হঠাৎ লীলা বলিল—দ্যাখ্ ভাই অপু, নিশ্চিন্দিপুরের সেই বাঁশবাগানের ভিটে এত মিষ্টি লাগে, কি মধু যে মাখানো ছিল তাতে ! ভেবে দ্যাখ্, মা নেই, বাবা নেই, কিছু তো নেই—তবুও তার কথা ভাবি। সেই বাপের ভিটে আজ দেখি নি এগারো বছর। সেবার সতুকে চিঠি লিখলাম, উত্তর দিলে এখানে কোথায় থাকবে, থাকবার ঘরদোর নেই, পুবের দালান ভেঙে পড়ে গিয়েছে, পশ্চিমের কুঠুরী দুটোও নেই, ছেলেপিলে কোথায় থাকবে,—এই সব একরাশ ওজর। বলি থাক তবে, ভগবান যদি মুখ তুলে চান কোনদিন, দেখব—নয় তো বাবা বিশ্বনাথ তো চরণে রেখেইছেন—

আবার লীলা ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

অপু বলিল, ঠিক বলেছ লীলাদি, আমারও গাঁয়ের কথা এত মনে পড়ে। সত্যিই, কি মধুমাখানো ছিল, তাই এখন ভাবি।

লীলা বলিল, পদ্মপাতায় খাবার খাস নি কতদিন বল দিকি ? এ সব দেশে শালপাতায় খাবার খেতে খেতে পদ্মপাতার কথা ভুলেই গিয়েছি, না ? আবার এক একদিন এক একটা দোকানে কাগজে খাবার দেয় ! সেদিন আমার মেজ ছেলে এনেছে, আমি বলি দূর দূর, ফেলে দিয়ে আয়, কাগজে আবার মিষ্টি খাবার কেউ দেয় আমাদের দেশে ?

অপুর সারা দেহ স্মৃতির পুলকে যেন অবশ হইয়া গেল। লীলাদি মেয়েমানুষ কিনা, এত খুঁটিনাটি জিনিসও মনে রাখে। ঠিকই বটে, সেও পদ্মের পাতায় কতকাল খাবার খায় নাই, ভুলিয়াই গিয়াছিল কথাটা। তাহাদের দেশে বড় বড় বিল, পদ্মপাতা সস্তা, শালপাতার রেওয়াজ ছিল না। নিমন্ত্রণ বাড়িতেও পদ্মপাতাতে ব্রাহ্মণভোজন হইত, লীলাদির কথায় আজ আবার সব মনে পড়িয়া গেল।

লীলা চোখ মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—তুই কতদিন যাস নি সেখানে অপু ? তেইশ বছর ? কেন, কেন ? আমি না হয় মেয়েমানুষ—তুই তো ইচ্ছে করলেই যেতে—

—তা নয় লীলাদি, প্রথমে ভাবতুম বড় হয়ে যখন রোজগার করব, মাকে নিয়ে আবার নিশ্চিন্দিপুরের ভিটেতে গিয়ে বাস করব, মার বড় সাধ ছিল। মা মারা যাওয়ার পরেও ভেবেছিলুম, কিন্তু তার পরে—ইয়ে—

স্ত্রীবিয়োগের কথাটা অপু বয়োজ্যেষ্ঠা লীলাদির নিকট প্রথমটা তুলিতে পারিল না। পরে বলিল। লীলা বলিল, বৌ কতদিন বেঁচে ছিলেন ?

অপু লাজুক সুরে বলিল—বছর চারেক—

—তা এ তোমার অন্যায় কাজ ভাই—তোমার এ বয়সে বিয়ে করবে না কেন?… তোমাকে তো এতটুকু দেখেছি, এখনও বেশ মনে হচ্ছে—ছোট্ট, পাতলা টুকটুকে ছেলেটি—একটি কঞ্চি হাতে নিয়ে আমাদের ঘাটের পথের বাঁশতলাটায় বেড়িয়ে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছ—কালকের কথা যেন সব—না না, ও কি, ছিঃ—বিয়ে কর ভাই। খোকাকে কলকাতায় রেখে এলে কেন—দেখতাম একবারটি।

লীলাও উঠিতে দেয় না—অপুও উঠিতে চায় না। লীলার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করিল—ছেলেমেয়েগুলিকে আদর করিল। উঠিবার সময় লীলা বলিল—কাল আসিস অপু, নেমন্তন্ন রইল—এখানে দুপুরে খাবি। পরদিন নেমন্তন্ন রাখিতে গিয়া কিন্তু অপু লীলাদির পরাধীনতা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিল—সকাল হইতে সমুদয় সংসারের রান্নার ভার একা লীলাদির উপর। কৈশোরে লীলাদি দেখিতে ছিল খুব ভাল—এখন কিন্তু সে লাবণ্যের কিছুই অবশিষ্ট নাই—চুল দু-চার গাছা এরই মধ্যে পাকিয়াছে, শীর্ণ মুখ, শিরা-বাহির হওয়া হাত, আধময়লা শাড়ি পরনে, রাঁধিবার আলাদা ঘরদোর নাই, ছোট দালানের অর্দ্ধেকটা দরমার বেড়া দিয়া ঘেরা, তারই ও-ধারে রান্না হয়। লীলাদি সমস্ত রান্না সারিয়া তার জন্য মাছের ডিমের বড়া ভাজিতে বসিল, একবার কড়াখানা উনুন হইতে নামায়, আবার তোলে, আবার নামায়, আবার ভাজে। আগুনের তাতে মুখ তার রাঙা দেখাইতেছিল—অপু ভাবিল কেন এত কষ্ট করছে লীলাদি, আহা রোজ রোজ ওর এই কষ্ট, তার ওপর আমার জন্যে আর কেন কষ্ট করা?

বিদায় লইবার সময় লীলা বলিল—কিছুই করতে পারলুম না ভাই—এলি যদি এত কাল পরে, কি করি বল, পরের ঘরকন্না, পরের সংসার, মাথা নিচু ক'রে থাকা, উদয়াস্ত খাটুনিটা দেখলি তো? কি আর করি, তবুও একটা ধরে আছি। মেয়েটা বড় হয়ে উঠল, বিয়ে তো দিতে হবে? ঐ বটঠাকুর ছাড়া আর ভরসা নাই। সন্ধ্যেবেলাটা বেশ ভাল লাগে—দশাশ্বমেধ ঘাটে সন্ধ্যের সময় বেশ কথা হয়, পাঁচালী হয়, গান হয়—বেশ লাগে! দেখিস্ নি? আসিস না আজ ওবেলা—বেশ জায়গা, আসিস্, দেখিস্ এখন। এসো, এসো, কল্যাণ হোক।—তারপর সে আবার কাঁদিয়া ফেলিল—বলিল—তোদের দেখলে যে কত কথা মনে পড়ে—কি সব দিন ছিল—

এবার অপু অতিকষ্টে চোখের জল চাপিল।

আর একটি কর্ত্তব্য আছে তাহার কাশীতে—লীলার মায়ের সঙ্গে দেখা করা। বাঙালীটোলার নারদ ঘাটে তাঁর নিজেদের বাড়ি আছে—খুঁজিয়া বাড়ি বাহির করিল। মেজ-বৌরানী অপুকে দেখিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন। চোখের জল ফেলিলেন।

কথাবার্ত্তা চলিতেছে এমন সময় ঘরে একটি ছোট মেয়ে ঢুকিল—বয়স ছয়-সাত হইবে, ফ্রকপরা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল—অপু তাহাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিল—লীলার মেয়ে। কি সুন্দর দেখিতে! এত সুন্দরও মানুষ হয়? স্নেহে, স্মৃতিতে, বেদনায় অপুর চোখে জল আসিল—সে ডাক দিল—শোন খুকী মা, শোন তো।

খুকী হাসিয়া পলাইতেছিল, মেজ-বৌরানী ডাকিয়া আনিয়া কাছে বসাইয়া দিলেন। সে তার দিদিমার কাছেই কাশীতে থাকে আজকাল। গত বৈশাখ মাসে তাহার বাবা মারা গিয়াছেন—লীলার মৃত্যুর পূর্ব্বে। কিন্তু লীলাকে সে-সংবাদ জানানো হয় নাই। দেখিতে অবিকল লীলা—এ বয়সে লীলা যা ছিল তাই। কেমন করিয়া অপুর মনে পড়িল শৈশবের একটি দিনে বর্দ্ধমানে লীলাদের বাড়িতে সেই বিবাহ উপলক্ষে মেয়ে-মজলিসের কথা—লীলা যেখানে হাসির কবিতা আবৃত্তি করিয়া সকলকে হাসাইয়াছিল—সে-ই লীলাকে সে প্রথম দেখে এবং লীলা তখন দেখিতে ছিল ঠিক এই খুকীর মত অবিকল।

মেজ-বৌরানী বলিলেন—মেয়ে তো ভাল, কিন্তু বাবা, ওর কি আর বিয়ে দিতে পারব ? ওর মার কথা যখন সকলে শুনবে—আর তা না জানে কে—ওই মেয়ের কি আর বিয়ে হবে বাবা ?

অপুর দুর্দমনীয় ইচ্ছা হইল একটি কথা বলিবার জন্য—সেটা কিন্তু সে চাপিয়া রাখিল। মুখে বলিল—দেখুন, বিয়ের জন্য ভাবচেন কেন ? লেখাপড়া শিখুক, বিয়ে নাই বা হ'ল, তাতে কি ? মনে ভাবিল—এখন সে কথা বলব না, খোকা যদি বাঁচে, মানুষ হয়ে ওঠে—তবে সে কথা তুলব। যাইবার সময় অপু লীলার মেয়েকে আবার কাছে ডাকিল। এবার খুকী তাহার কাছে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া ডাগর ডাগর উৎসুক চোখে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সেদিনের বাকী সময়টুকু অপু বন্ধুর সঙ্গে সারনাথ দেখিয়া কাটাইল। সন্ধ্যার দিকে একবার কালীতলার গলিতে লীলাদির বাসায় বিদায় লইতে গেল—কাল সকালেই এখান হইতে রওনা হইবে। নিশ্চিন্দিপুরের মেয়ে, শৈশব-দিনের এক সুন্দর আনন্দ-মুহূর্তের সঙ্গে লীলাদির নাম জড়ানো—বার বার কথা কহিয়াও যেন তাহার তৃপ্তি হইতেছিল না।

আসিবার সময় অপু মুগ্ধ হইল লীলাদির আন্তরিকতা দেখিয়া। তাহাকে আগাইয়া দিতে আসিয়া সে নিচে নামিয়া আসিল, আবার চিবুক ছুঁইয়া আদর করিল, চোখের জল ফেলিল, যেন মা, কি মায়ের পেটের বড় বোন। কতকগুলো কাঠের খেলনা হাতে দিয়া বলিল—খোকাকে দিস্—তার জন্যে কাল কিনে এনেছি।

অপু ভাবিল—কি চমৎকার মানুষ লীলাদি !···আহা পরের সংসারে কি কষ্টটাই না পাচ্ছে। মুখে কিছু বললুম না—তোমায় আমি বাপের ভিটে দেখাব লীলাদি, এই বছরের মধ্যেই।

ট্রেনে উঠিয়া সারাপথ কত কি কথা তাহার মনে যাওয়া-আসা করিতে লাগিল। রাজঘাটের স্টেশনে ট্রেনে উঠিল আজ কতকাল পরে ! বাল্যকালে এই স্টেশনেই সে প্রথম জলের কল দেখে, কাশী নামিয়াই ছুটিয়া গিয়াছিল আগে জলের কলটার কাছে। চেঁচাইয়া বলিয়াছিল, দেখো দেখো মা, জলের কল।—সে সব কি আজ ?

আজ কতদিন হইতে সে আর একটি অদ্ভুত জিনিস নিজের মনের মধ্যে অনুভব করিতেছে, কি তীব্রভাবেই অনুভব করিতেছে ! আগে তো সে এরকম ছিল না ? অন্ততঃ এ ভাবে তো কই কখনও এর আগে—সেটা হইতেছে ছেলের জন্য মন-কেমন করা।

কত কথাই মনে হইতেছে এই কয়দিনে—পাশের বাড়ির বাঁড়ুয্যে-গৃহিণী কাজলকে বড় ভালবাসে—সেখানেই তাহাকে রাখিয়া আসিয়াছে। কখনও মনে হইতেছে, কাজল যে দুষ্টু ছেলে, হয়ত গলির মোড়ে দাঁড়াইয়া ছিল, কোনও বদ্‌মাইস লোকে ভুলাইয়া কোথায় লইয়া গিয়াছে কিংবা হয়ত চুপ চুপি বাড়ি হইতে বাহির হইয়া রাস্তা পার হইতে যাইতেছিল, মোটর চাপা পড়িয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে কি বাঁড়ুয্যেরা একটা তার করিত না ? হয়ত তার করিয়াছিল, ভুল ঠিকানায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। উহাদের আলিসাবিহীন নেড়া ছাদে ঘুড়ি উড়াইতে উঠিয়া পড়িয়া যায় নাই তো ? কিন্তু কাজল তো কখনও ঘুড়ি ওড়ায় না ? একটু আনাড়ি, ঘুড়ি ওড়ানো কাজ একেবারে পারে না। না—সে উড়াইতে যায় নাই, তবে হয়ত বাঁড়ুয্যেবাড়ির ছেলেদের দলে মিশিয়া উঠিয়াছিল, আশ্চর্য্য কি !

আর্টিস্ট বন্ধুর কথার উত্তরে সে খানিকটা আগে বলিয়াছিল—সে জাভা, বালি, সুমাত্রা দেখিবে, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ দেখিবে, আফ্রিকা দেখিবে—ওদের বিষয় লইয়া উপন্যাস লিখিবে। সাহেবরা দেখিয়াছে তাদের চোখে—সে নিজের চোখে দেখিতে চায়, তার মনের রঙে কোন্ রঙ ধরায়—ইউগাণ্ডার দিক্‌দিশাহীন তৃণভূমি, কেনিয়ার অরণ্য। বুড়ো বেবুন রাত্রে কর্কশ চীৎকার করিবে, হায়েনা পচা জীবজন্তুর গন্ধে উন্মাদের মত আনন্দে হি-হি করিয়া হাসিবে, দুপুরে অগ্নিবর্ষী খররৌদ্রে কম্পমান উত্তাপতরঙ্গ মাঠে প্রান্তরে,

জনহীন বনের ধারে কতকগুলি উঁচুনীচু সদাচঞ্চল বাঁকা রেখার সৃষ্টি করিবে। সিংহেরা দল পাকাইয়া ছোট কণ্টকবৃক্ষের এতটুকু ক্ষুদ্র ছায়ায় গোলাকারে দাঁড়াইয়া অগ্নিবৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করে—পার্ক ন্যাশনাল আলবার্ত wild celery-র বন···

কিন্তু খোকা যে টানিতেছে আজকাল, কোনও জায়গায় যাইতে মন চায় না খোকাকে ফেলিয়া। কাজল, খোকা, কাজল, খোকা, খোকন, ও ঘুড়ি উড়াইতে পারে না, কিছু বুঝিতে পারে না, কিছু পারে না, বড় নির্ব্বোধ। কিন্তু ওর আনাড়ি মুঠাতে বুকের তার আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। টানিতেছে, প্রাণপণে টানিতেছে—ছোট্ট দুর্ব্বল হাত দু'টি নির্দ্দয়ভাবে মুচড়াইয়া সরাইয়া লওয়া? সর্ব্বনাশ! ধামা-চাপা থাকুক বিদেশযাত্রা।

ট্রেন হু-হু চলিতেছে···মাঝে মাঝে আম বন, জলার ধারে লালহাঁস বসিয়া আছে, আখের ক্ষেতে জল দিতেছে, গম কাটিতেছে। রেলের ধারের বস্তিতে উদুখলে শস্য কুটিতেছে, মহিষের পাল চরিয়া ফিরিতেছে। বড় বড় মাঠে দুপুর গড়াইয়া গিয়া ক্রমে রোদ পড়িয়া আসিল। দূরে দূরে চক্রবালসীমায় এক-আধটা পাহাড় ঘন নীল ও কালো হইয়া উঠিতেছে।

কি জানি কেন আজ কত কথাই মনে পড়িতেছে, বিশেষ করিয়া নিশ্চিন্দিপুরের কথা। হয়ত এতকাল পরে লীলাদির সঙ্গে দেখা হওয়ার জন্যই। ঠিক তাই। বহু দূরে আর একটি সম্পূর্ণ অন্য ধরণের জীবন-ধারা, বাঁশবনের আমবনের ছায়ায় পাখির কলকাকলীর মধ্য দিয়া, জানা-অজানা বনপুষ্পের সুবাসের মধ্য দিয়া সুখে-দুঃখে বহুকাল আগে বহিত—এককালে যার সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল তার—আজ তা স্বপ্ন—স্বপ্ন, কতকাল আগে দেখা স্বপ্ন! গোটা নিশ্চিন্দিপুর, তার ছেলেবেলাকার দিদি, মা ও রানুদি, মাঠ বন, ইছামতী সব অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, ধোঁয়া ধোঁয়া মনে হয়, স্বপ্নের মতই অবাস্তব। সেখানকার সব কিছুই অস্পষ্ট স্মৃতিতে মাত্র আসিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

এই তো ফাল্গুন-চৈত্র মাস—সেই বাঁশপাতা ও বাঁশের খোলার রাশি—শৈশবের ভাঙা জানালাটার ধারে বসিয়া বসিয়া কতকাল আগের সে সব কল্পনা, আনন্দপূর্ণ দিনগুলি, শীত-রাত্রির সুখস্পর্শ কাঁথার তলা,—অনন্ত কালসমুদ্রে সে সব ভাসিয়া গিয়াছে, কত কাল আগে।···

কেবল স্বপ্নে, এক একদিন যেন বাল্যের সেই রূপো চৌকিদার গভীর রাত্রের ঘুমের মধ্যে কড়া হাঁক দিয়া যায়—ও রায় ম—শ—য়—য়, সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিন্দিপুর ফিরিয়া আসে, আবার বাড়ির পাশেই সেই পোড়ো ভিটাতে বহুকাল আগের বসন্ত নামে, প্রথম চৈত্রের নানা জানা-অজানা ফুলে বনভূমি ভরিয়া যায়, তাহাদের পুরানো কোঠাবাড়ির ভাঙা জানালার ধারে অতীত দিনের শত সুখদুঃখে পরিচিত পাখির দল কলকণ্ঠে গান গাহিয়া উঠে, ঠাকুরমাদের নারিকেল গাছে কাঠঠোকরার শব্দ বিচিত্র গোপনতায় তন্দ্রারত হইয়া পড়ে···স্বপ্নে দশ বৎসরের শৈশবটি আবার নবীন হইয়া ফিরিয়া আসে···

এতদিন সে বাড়িটা আর নাই···কতকাল আগে ভাঙিয়া-চুরিয়া ইট কাঠ স্তূপাকার হইয়া আছে—তাহাও হয়তো মাটির তলায় চাপা পড়িতে চলিল—সেই শৈশবের জানালাটার কোনও চিহ্ন নাই—দীর্ঘদিনের শেষে সোনালী রোদ যখন বনগাছের ছায়া দীর্ঘতর করিয়া তোলে, ফিঙে-দোয়েল ডাক শুরু করে—তখন আর কোনও মুগ্ধ শিশু জানালার ধারে বসিয়া থাকে না—হাত তুলিয়া অনুযোগের সুরে বলে না—আজ রাত্রে যদি মা ঘরে জল পড়ে, কাল কিন্তু ঠিক রাণুদিদির বাড়ি গিয়ে শোবো—রোজ রোজ রাত জাগতে পারি নে বলে দিচ্ছি।

অপুর একটা কথা মনে হইয়া হাসি পাইল!

গ্রাম ছাড়িয়া আসিবার বছরখানেক আগে অপু একরাশ কড়ি পাইয়াছিল। তাহার বাবা শিষ্যবাড়ি হইতে এগুলি আনেন। এত কড়ি কখনও অপু ছেলেবেলায় একসঙ্গে দেখে নাই। তাহার মনে হইল সে হঠাৎ অত্যন্ত বড়লোক হইয়া গিয়াছে—কড়ি খেলায় সে যতই হারিয়া

ষাক তাহার অফুরন্ত ঐশ্বর্য্যের শেষ হইবে না। একটা গোল বিস্কুটের ঠোঙায় কড়ির রাশি রাখিয়া দিয়াছিল। সে ঠোঙাটা আবার তোলা থাকিত তাদের বনের ধারের দিকের ঘরটায় উঁচু কুলঙ্গিটাতে।

তারপর নানা গোলমালে খেলাধুলোয় অপুর উৎসাহ গেল কমিয়া, তারপরই গ্রাম ছাড়িয়া উঠিয়া আসিবার কথা হইতে লাগিল। অপু আর একদিনও ঠোঙার কড়িগুলি লইয়া খেলা করিল না, এমন কি দেশ ছাড়িয়া চলিয়া আসিবার সময়েও গোলমালে, ব্যস্ততায়, প্রথম দূরে বিদেশে রওনা হইবার উত্তেজনার মুহূর্ত্তে সেটার কথাও মনেও উঠে নাই। অত সাধের কড়ি-ভড়া-ঠোঙাটা সেই কড়িকাঠের নিচেকার বড় কুলুঙ্গিটাতেই রহিয়া গিয়াছিল।

তারপর অনেককাল পরে সে কথা অপুর মনে হয় আবার। তখন অপর্ণা মারা গিয়াছে। একদিন অন্যমনস্কভাবে ইডেন গার্ডেনের কেয়াঝোপে বসিয়া ছিল, গঙ্গার ও-পারের দিকে সূর্য্যাস্ত দেখিতে দেখিতে কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে।

আজও মনে হইল।

কড়ির কৌটা !…একবার সে মনে মনে হাসিল…বহুকাল আগে নিশ্চিন্ত হইয়া লুপ্ত হইয়া যাওয়া ছেলেবেলার বাড়ির উত্তর দিকের ঘরের কুলুঙ্গিতে বসানো সেই টিনের ঠোঙাটা ! —দূরে সেটা যেন শূন্যে কোথায় এখনও ঝুলিতেছে, তাহার শৈশবজীবনের প্রতীকস্বরূপ… অস্পষ্ট, অবাস্তব, স্বপ্নময় ঠোঙাটা সে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে, পয়সায় চার গণ্ডা করিয়া মাকড়সার ডিমের মত সেই যে ছোট ছোট বিস্কুট, তারই ঠোঙাটি—উপরে একটা বিবর্ণ-প্রায় হাঁ-করা রাক্ষসের মুখের ছবি…দূরের কোন্ কুলুঙ্গিতে বসানো আছে…তার পিছনে বাঁশবন, শিমুলবন, তার পিছনে সোনাডাঙার মাঠ, ঘুঘুর ডাক…তাদেরও পিছনে তেইশ বছর আগেকার অপূর্ব্ব মায়ামাখানো নিঝুম চৈত্র-দুপুরের রৌদ্রভরা নীলাকাশ…

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

চৈত্র মাসের প্রথমে একটা বড় পার্টিতে সে নিমন্ত্রিত হইয়া গেল। খুব বড় গাড়িবারান্দা, সামনের 'লনে' ছোট ছোট টেবিল ও চেয়ার পাতা, খানিকটা জায়গা সামিয়ানা টাঙানো। নিমন্ত্রিত পুরুষ মহিলাগণ যাঁহার যেখানে ইচ্ছা বেড়াইতেছেন ! একটা মার্ব্বেলের বড় চৌবাচ্চায় গোটাকতক কুমুদ ফুল, ঠিক মাঝখানে একটা মার্ব্বেলের ফোয়ারা—গৃহকর্ত্রী তাহাকে লইয়া গিয়া জায়গাটা দেখাইলেন, সেটা নাকি তাঁদের 'লিলি পণ্ড'। জয়পুর হইতে ফোয়ারাটা তৈয়ারী করাইয়া আনিতে কত খরচ পড়িয়াছে, তাহাও জানাইলেন।

পার্টির সকল আমোদ-প্রমোদের মধ্যে একটি মেয়ের কণ্ঠ-সঙ্গীত সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দদায়ক মনে হইল। ব্রিজের টেবিলে সে যোগ দিতে পারিল না, কারণ ব্রিজখেলা সে জানে না, গান শেষ হইলে খানিকটা বসিয়া বসিয়া খেলাটা দেখিল। চা, কেক, স্যাণ্ডউইচ, সন্দেশ, রসগোল্লা, গল্প-গুজব, আবার গান ! ফিরিবার সময় মনটা খুব খুশী ছিল। ভাবিল—এদের পার্টিতে নেমন্তন্ন পেয়ে আসা একটা ভাগ্যের কথা। আমি লিখে নাম করেছি, তাই আমার হ'ল। যার তার হোক্ দিকি ? কেমন কাটল সন্ধ্যেটা। আহা, খোকাকে আনলে হ'ত, ঘুমিয়ে পড়বে এই ভয়ে আনতে সাহস হ'ল না যে।—খান-দুই কেক খোকার জন্য চুপিচুপি কাগজে জড়াইয়া পকেটে পুরিয়া রাখিয়াছিল, খুলিয়া দেখিল সেগুলি ঠিক আছে কি না।

খোকা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, ডাকিয়া উঠাইতে গিয়া বলিল, ও খোকা, খোকা, ওঠ, খুব ঘুমুচ্ছিস্ যে—ছি ছি—ওঠ্ রে। কাজলের ঘুম ভাঙিয়া গেল। যখনই সে বোঝে বাবা আদর করিতেছে, মুখে কেমন ধরণের মধুর দুষ্টামির হাসি হাসিয়া ঘাড় কাৎ করিয়া কেমন

এক অদ্ভুত ভঙ্গী করিয়া আদরের প্রতীক্ষায় থাকে, আর এত আদর খাইতেও পারে।

অপু বলিল, শোন্ খোকা গল্প করি,—ঘুমুস্ নে—

কাজল হাসিমুখে বলে, বলো দিকি বাবা একটা অর্থ ?

হাত কন্ কন্ মানিকতলা, এ ধন তুমি পেলে কোথা,
রাজার ভাণ্ডারে নেই, বেনের দোকানে নেই—

অপু মনে মনে ভাবে—খোকা, তুই—তুই আমার সেই বাবা। ছেলেবেলায় চলে গিয়েছিলে, তখন তো কিছু বুঝি নি, বুঝতামও না—শিশু ছিলাম। তাই আবার আমার কোলে আদর কাড়াতে এসেছ বুঝি ? মুখে বলে, কি জানি, জাঁতি বুঝি ?

—আহা-হা, জাঁতি কি আর দোকানে পাওয়া যায় না ! তুমি বাবা কিচ্ছু জান না—

—ভাল কথা, কেক্ এনেছি, দ্যাখ্, বড়লোকের বাড়ির কেক্, ওঠ্,—

—বাবা তোমার নামে একখানা চিঠি এসেছে, ঐ বইখানা তোলো তো।···

আর্টিস্ট বন্ধুটির পত্র। বন্ধু লিখিয়াছে,—সমুদ্রপারের বৃহত্তর ভারতবর্ষ শুধু কুলী-আমদানীর সার্থকতা ঘোষণা করিয়া নীরব থাকিয়া যাইবে ? তোমাদের মত আর্টিস্ট লোকের এখানে আসার যে নিতান্ত দরকার। চোখ থাকিয়াও নাই-শতকরা নিরানব্বই জনের, তাই চক্ষুষ্মান মানুষদের একবার এ-সব স্থানে আসিতে বলি। পত্রপাঠ এসো, ফিজিতে মিশনারীরা স্কুল খুলিতেছে, হিন্দী জানা ভারতীয় শিক্ষক চায়; দিনকতক মাস্টারী তো করো, তারপর একটা কিছু ঠিক হইয়া যাইবে, কারণ চিরদিন মাস্টারী করিবার মত শান্ত ধাত তোমার নয়, তা জানি। আসিতে বিলম্ব করিও না।

পত্র পাঠ শেষ করিয়া সে খানিকক্ষণ কি ভাবিল, ছেলেকে বলিল, আচ্ছা খোকা, আমি তোকে ছেড়ে কোথাও যদি চলে যাই, তুই থাকতে পারবি নে ? যদি তোকে মামার বাড়ি রেখে যাই ?—

কাজল কাঁদ কাঁদ মুখে বলিল, হ্যাঁ তাই যাবে বৈকি ! তুমি ভারী দেরি কর, কাশীতে বলে গেলে তিন দিন হবে, ক'দিন পরে এলে ? না বাবা—

অপু ভাবিল, অবোধ শিশু ! এ কি কাশী ? এ বহুদূরে, দিনের কথা কি এখানে ওঠে ?—থাক, কোথায় যাইবে সে ? কাহার কাছে রাখিয়া যাইবে খোকাকে ? অসম্ভব !

কাজল ঘুমাইয়া পড়িলে ছাদে উঠিয়া সে অনেকক্ষণ একা বসিয়া রহিল।

দূরে বাড়িটার মাথায় সার্কুলার রোডের দিকে ভাঙা চাঁদ উঠিতেছে, রাত্রি বারোটার বেশী—নিচে একটা মোটর লরী ঘস্ ঘস্ আওয়াজ করিতেছে। এই রকম সময়ে এই রকম ভাঙা চাঁদ উঠিত দূরে জঙ্গলের মাথায় পাহাড়ের একটা জায়গায়, যেখানে উটের পিঠের মত ফুলিয়া উঠিয়াই পরে বসিয়া গিয়া একটা খাঁজের সৃষ্টি করিয়াছে—সেই খাঁজটার কাছে, পাহাড়ী ঢালুতে বাদাম গাছের বনে দিনমানে পাকা পাতায় বনশীর্ষ যেখানে রক্তাভ দেখায়। এতক্ষণে বন-মোরগেরা ডাকিয়া উঠিত, কক্, কক্, কক্—

সে মনে মনে কল্পনা করিবার চেষ্টা করিল, সার্কুলার রোড নাই, বাড়িঘর নাই, মোটর লরীর আওয়াজ নাই, ব্রিজের আড্ডা নাই, 'লিলি পণ্ড' নাই, তার ছোট্ট খড়ের বাংলো ঘরখানায় রামচরিত মিশ্র মেজেতে ঘুমাইতেছে, সামনে পিছনে ঘন অরণ্যভূমি, নির্জন, নিস্তব্ধ, আধ-অন্ধকার রাত্রি। ক্রোশের পর ক্রোশ যাও, শুধু উঁচু নীচু ডাঙ্গা, শুকনা ঘাসের বন, সাজা ও আবলুসের বন, শালবন, পাহাড়ী চামেলি ও লোহিয়ার বন—বনফুলের অফুরন্ত জঙ্গল। সঙ্গে সঙ্গে মনে আসিল সেই মুক্তি, সেই রহস্য, সে সব অনুভূতি, ঘোড়ার পিঠে মাঠের পর মাঠ উদ্দাম গতিতে ছুটিয়া চলা, সেই দৃঢ়-পৌরুষ জীবন, আকাশের সঙ্গে, ছায়াপথের সঙ্গে, নক্ষত্রজগতের সঙ্গে প্রতি সন্ধ্যায় প্রতি রাত্রে যে অপূর্ব মানসিক সম্পর্ক।

এই কি জীবন সে যাপন করিতেছে এখানে? প্রতিদিন একই রকম একঘেয়ে নীরস, বৈচিত্র্যহীন—আজ যা, কালও তা। অর্থহীন কোলাহলে ও সার্থকতাহীন ব্রিজের আড্ডার আবহাওয়ায়, টাকা রোজগারের মৃগতৃষ্ণিকায় লুব্ধ জীবন-নদীর স্তব্ধ, সহজ, সাবলীল ধারা যে দিনে দিনে শুকাইয়া আসিতেছে, এ কি সে বুঝিয়াও বুঝিতেছে না?

ঘুমের ঘোরে কাজল বিছানার মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাকে এক পাশে সরাইয়া শোয়াইল। একেই তো সুন্দর, তার উপর কি যে সুন্দর দেখাইতেছে খোকাকে ঘুমন্ত অবস্থায়!

কাশী হইতে ফিরিবার সপ্তাহ খানেকের মধ্যে অপু 'বিভাবরী', ও 'বঙ্গ-সুহৃৎ' দুখানা পত্রিকার তরফ হইতে উপন্যাস লিখিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছিল। দুখানাই প্রসিদ্ধ মাসিক পত্র, দুখানারই গ্রাহক সারা বাংলা জুড়িয়া এবং পৃথিবীর যেখানে যেখানে বাঙালী আছে, সর্ব্বত্র। 'বিভাবরী' তাহাকে সম্প্রতি আগাম কিছু টাকা দিল—'বঙ্গ-সুহৃৎ'-এর নিজেদের বড় প্রেস আছে—তাহারা নিজের খরচে অপুর একখানা ছোট গল্পের বই ছাপাইতে রাজী হইল। অপুর বইখানির বিক্রয়ও হঠাৎ বাড়িয়া গেল, আগে যে সব দোকানে তাহাকে পুছিতও না—সে সব দোকান হইতে বই চাহিয়া পাঠাইতে লাগিল। এই সময়ে একটি বিখ্যাত পুস্তক-প্রকাশক ফার্ম্মের নিকট হইতে একখানা পত্র পাইল, অপু যেন একবার গিয়া দেখা করে।

অপু বৈকালের দিকে দোকানে গেল। তাহারা বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ নিজেদের খরচে ছাপাইতে ইচ্ছুক—অপু কি চায়? অপু ভাবিয়া দেখিল। প্রথম সংস্করণ হু-হু কাটিতেছে—অপর্ণার গহনা বিক্রয় করিয়া বই ছাপাইয়াছিল, লাভটা তার সবই নিজের। ইহাদের দিলে লাভ কমিয়া যাইবে বটে, কিন্তু দোকানে ছুটাছুটি, তাগাদা—এসব হাঙ্গামাও কমিবে। তা ছাড়া নগদ টাকার একটা মোহ আছে, সাত পাঁচ ভাবিয়া সে রাজী হইল। ফার্ম্মের কর্ত্তা তখনই একটা লেখাপড়া করিয়া লইলেন—আপাততঃ ছ'শো টাকায় কথাবার্ত্তা মিটিল, শ'-দুই সে নগদ পাইল।

দু'শো টাকা খুচরা ও নোটে। এক গাদা টাকা। হাতে ধরে না। কি করা যায় এত টাকায়? পুরানো দিন হইলে সে ট্যাক্সি করিয়া খানিকটা বেড়াইত, রেস্টুরেণ্টে খাইত, বায়োস্কোপ দেখিত। কিন্তু আজকাল আগেই খোকার কথা মনে হয়। খোকাকে কি আনন্দ দেওয়া যায় এ টাকায়? মনে হয় লীলার কথা। লীলা কত আনন্দ করিত আজ!

একটা ছোট গলি দিয়া যাইতে যাইতে একটা শরবৎ-এর দোকান। দোকানটাতে পান বিড়ি বিস্কুট বিক্রী হয়, আবার গোটা দুই তিন সিরাপের বোতলও রহিয়াছে। দিনটা খুব গরম, অপু শরবৎ খাওয়ার জন্য দোকানটাতে দাঁড়াইল। অপুর একটু পরেই দু'টি ছেলেমেয়ে সেখানে কি কিনিতে আসিল। গলিরই কোন গরীব ভাড়াটে গৃহস্থ ঘরের ছোট ছেলে মেয়ে—মেয়েটি বছর সাত, ছেলেটি একটু বড়। মেয়েটি আঙুল দিয়া সিরাপের বোতল দেখাইয়া বলিল—ওই দ্যাখ দাদা সবুজ—বেশ ভালো, না? ছেলেটি বলিল—সব মিশিয়ে দ্যায়। বরফ আছে, ওই যে—

—ক' পয়সা নেয়?

—চার পয়সা।

অপুর জন্য দোকানী শরবৎ মিশাইতেছে, বরফ ভাঙিতেছে, ছেলেমেয়ে দু'টি মুগ্ধনেত্রে দেখিতে লাগিল। মেয়েটি অপুর দিকে চাহিয়া বলিল—আপনাকে ওই সবুজ বোতল থেকে দেবে না?

যেন সবুজ বোতলের মধ্যে শচীদেবীর পায়স পোরা আছে।

অপুর মন করুণার্দ্র হইল। ভাবিল—এরা বোধ হয় কখনও কিছু দেখে নি—এই রং-করা

টক চিনির রসকে কি ভাবছে, ভালো সিরাপ কি জানে না। বলিল—খুকী, খোকা, শরবৎ খাবে? খাও না—ওদের দু'গ্লাস শরবৎ দাও তো—

প্রথমটা তারা খাইতে রাজী হয় না, অনেক করিয়া অপু তাহাদের লজ্জা ভাঙিল। অপু বলিল—ভালো সিরাপ তোমার আছে? থাকে তো দাও, আমি দাম দোব। কোন জায়গা থেকে এনে দিতে পার না?

বোতলে যাহা আছে তাহার অপেক্ষা ভাল সিরাপ এ অঞ্চলে নাকি কুত্রাপি মেলা সম্ভব নয়। অবশেষে সেই শরবৎই এক এক বড় গ্লাস দুই ভাই-বোন মহাতৃপ্তি ও আনন্দের সহিত খাইয়া ফেলিল, সবুজ বোতলের সেই টক চিনির রসই।

অপু তাহাদের বিস্কুট ও এক পয়সা মোড়কের বাজে চকলেট্ কিনিয়া দিল—দোকানটাতে ভালো কিছু যদি পাওয়া যায় ছাই। তবুও অপুর মনে হইল পয়সা তার সার্থক হইয়াছে আজ।

বাসায় ফিরিয়া তাহার মনে হইল বড় সাহিত্যের প্রেরণার মূলে এই মানব-বেদনা। ১৮৩৩ সাল পর্য্যন্ত রশিয়ার প্রজাস্বত্ব আইন, 'সার্ফ' নীতি; জার-শাসিত রাশিয়ার সাইবেরিয়া, শীত, অত্যাচার, কুসংস্কার, দারিদ্র্য—গোগোল, ডস্টয়ভ্স্কি, গোর্কি, টলস্টয় ও শেকভের সাহিত্য সম্ভব করিয়াছে। সে বেশ কল্পনা করিতে পারে, দাসব্যবসায়ের দুর্দিনে, আফ্রিকার এক মরুবেষ্টিত পল্লী-কুটির হইতে কোমল-বয়স্ক এক নিগ্রো বালক পিতামাতার স্নেহকোল হইতে নিষ্ঠুরভাবে বিচ্যুত হইয়া বহু দূর বিদেশের দাসের হাটে ক্রীতদাসরূপে বিক্রিত হইল, বহুকাল আর সে বাপ-মাকে দেখিল না, ভাই-বোনদের দেখিল না—দেশে দেশে তাহার অভিনব জীবনধারার দৈন্য, অত্যাচার ও গোপন অশ্রুজলের কাহিনী, তাহার জীবনের সে অপূর্ব ভাবানুভূতির অভিজ্ঞতা সে যদি লিখিয়া রাখিয়া যাইতে পারিত! আফ্রিকার নীরব নৈশ আকাশ তাহাকে প্রেরণা দিত, তাম্রবর্ণ মরুদিগন্তের স্বপ্নমায়া তাহার চোখে অঞ্জন মাখাইয়া দিত; কিন্তু বিশ্বসাহিত্যের দুর্ভাগ্য, তাহারা নীরবে অত্যাচার সহ্য করিয়া বিশ্ব হইতে বিদায় লইল।

দিন-দুই পরে একদিন সন্ধ্যার পর গড়ের মাঠ হইতে একা বেড়াইয়া ফিরিবার মুখে হোয়াইটওয়ে লেড্‌ল'র দোকানের সামনে একটুখানি দাঁড়াইয়াছে—একজন আধাবয়সী লোক কাছে আসিয়া বলিল—বাবু, প্রেমারা খেলবেন? খুব ভাল জায়গা। আমি নিয়ে যাব, এখান থেকে পাঁচ মিনিট। ভদ্র জায়গা, কোন হাঙ্গামায় পড়তে হবে না। আসবেন?

অপু বিস্মিত মুখে লোকটার মুখের দিকে চাহিল। আধময়লা কাপড় পরণে, খোঁচা খোঁচা কড়া দাড়ি-গোঁফ, ময়লা দেশী টুইলের সার্ট, কব্জির বোতাম নাই—পানে ঠোঁট দুটো কালো। দেখিয়াই চিনিল—সে ছাত্র-জীবনের পরিচিত বন্ধু হরেন—সেই যে ছেলেটি একবার তাহাদের কলেজ হইতে বই চুরি করিয়া পালাইতে গিয়া ধরা পড়ে। বহুকাল আর দেখা-সাক্ষাৎ নাই—অপু লেখাপড়া ছাড়িয়া দিবার পর আর কখনো নয়। লোকটাও অপুকে চিনিল, থতমত খাইয়া গেল। অপুও বিস্মিত হইয়াছিল—এইসব ব্যাপারের অভিজ্ঞতা তাহার নাই—জীবনে কখনও না—তবুও সে বুঝিয়াছিল তাহার এই ছাত্রজীবনের বন্ধুটি কোন্ পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে কিছু উত্তর করিবার পূর্বে হরেন আসিয়া তাহার হাত দু'টি ধরিল—বলিল, মাপ কর ভাই, আগে টের পাই নি। বহুকাল পরে দেখা—থাক কোথায়?

অপু বলিল—তুমি থাক কোথায়—এখানেই আছে—কত দিন?···

—এই নিকটেই। তালতলা লেন—আসবে···অনেক কথা আছে—

—আজ আর হবে না, আসছে সোমবার পাঁচটার সময় যাব। নম্বরটা লিখে নিই।

—সে হবে না ভাই—তুমি আর আসবে না—তোমার দেখা আর পাবার ভরসা রাখি নে। আজই চলো।

অতি অপরিচ্ছন্ন বাসা। একটি মাত্র ছোট ঘর।

অপু ঘরে ঢুকিতেই একটা কেমন ভ্যাপ্‌সা গন্ধ তাহার নাকে গেল। ছোট্ট ঘর, জিনিসপত্রে ভর্ত্তি, মেঝেতে বিছানা-পাতা, তাহারই একপাশে হরেন অপুর বসিবার জায়গা করিয়া দিল। ময়লা চাদর, ময়লা কাঁথা, ময়লা বালিশ, ময়লা কাপড়, ছেঁড়া মাদুর—কলাইকরা গ্লাস, থালা, কালি-পড়া হারিকেন লণ্ঠন, কাঁথার আড়াল হইতে তিন-চারিটি শীর্ণ কালো কালো ছোট হাত পা বাহির হইয়া আছে—একটি সাত আট বছরের মেয়ে ওদিকের দালানে দুয়ারের চৌকাঠের উপর বসিয়া। দালানের ওপাশটা রান্নাঘর—হরেনের স্ত্রী সম্ভবতঃ রাঁধিতেছে।

হরেন মেয়েটিকে বলিল—ওরে টেঁপি, তামাক সাজ তো—

অপু বলিল—ছোট ছেলেমেয়েকে দিয়ে তামাক সাজাও কেন? নিজে সাজো—ও শিক্ষা ভালো নয়—

হরেন স্ত্রীর উদ্দেশে চীৎকার করিয়া বলিল—কোথায়-রৈলে গো, এদিকে এসো, ইনি আমার কলেজ-আমলের সকলের চেয়ে বড় বন্ধু, এত বড় বন্ধু আর কেউ ছিল না—এঁর কাছে লজ্জা করতে হবে না—একটু চা-টা খাওয়াও—এসো এদিকে।

তারপর হরেন নিজের কাহিনী পাড়িল। কলেজ ছাড়িয়াই বিবাহ হয়—তারপর এই দুঃখদুর্দ্দশা—বড় জড়াইয়া পড়িয়াছে—বিশেষতঃ এই সব লেণ্ডি-গেণ্ডি। কত রকম করিয়া দেখিয়াছে—কিছুতেই কিছু হয় না। স্কুলমাস্টারী, দোকান, চালানী ব্যবসা, ফটোগ্রাফের কাজ, কিছুই বাকী রাখে নাই—আজকাল যাহা করে তা তো অপু দেখিয়াছে। বাসায় কেহ জানে না—উপায় কি?—এতগুলি মুখে অন্ন তো—এই বাজার ইত্যাদি।

হরেনের কথাবার্ত্তার ধরণ অপুর ভাল লাগিল না। চোখেমুখে কেমন যেন একটা—ঠিক বোঝানো যায় না—অপুর মনে হইল হরেন এই সব নীচ ব্যবসায়ে পোক্ত হইয়া গিয়াছে।

হরেনের স্ত্রীকে দেখিয়া অপুর মন সহানুভূতিতে আর্দ্র হইয়া উঠিল। কালো, শীর্ণ চেহারা, হাতে গাছকতক কাচের চুড়ি। মাথায় সামনের দিকে চুল উঠিয়া যাইতেছে, হাতে কাপড়ে বাটনার হলুদ-মাখা! সে এমন আনন্দ ও ক্ষিপ্রতার সহিত চা আনিয়া দিল যে, সে মনে করে যেন এত দিনে স্বামীর পরমহিতৈষী বন্ধুর সাক্ষাৎ যখন পাওয়া গিয়াছে—দুঃখ বুঝি ঘুচিল। উঠিবার সময় হরেন বলিল—ভাই বাড়ি-ভাড়া কাল না দিলে অপমান হ'ব—পাঁচটা টাকা থাকে তো দাও তো!

অপু টাকাটা দিয়া দিল। বাহির হইতে যাইতেছে, বড় ছেলেটিকে তার মা যেন কি শিখাইয়া দিল, সে দরজার কাছে আসিয়া বলিল—ও কাকাবাবু, আমার দু'খানা ইস্কুলের বই এখনও কেনা হয় নি—কিনে দেবেন? বই না কিনলে মাস্টার মারবে—

হরেন ভানের সুরে বলিল—যা যা আবার' বই—হ্যাঁঃ, ইস্কুলও যত—ফি বছর বই বদলাবে—যা এখন—

অপু তাহাকে বলিল—এখন তো আর কিছুই হাতে নেই খোকা, পকেট একেবারে খালি।

হরেন অনেক দূর পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে আসিল। সে চাষবাস করিবার জন্য উত্তরপাড়ার জমি দেখিয়া আসিয়াছে, দুই হাজার টাকা হইলে হয়—অপূর্ব্ব কি টাকাটা ধার দিতে

পারিবে ? না হয়, আধাআধি বখরা—খুব লাভের ব্যবসা ।

প্রথম দিনের সাক্ষাতেই এ সব ?

কেমন একটা অপ্রীতিকর মনোভাব লইয়া অপু বাসায় ফিরিল। শেষে কিনা জুয়ার দালালী ? প্রথম যৌবনে ছিল চোর, আরও কত কি করিয়াছে, কে খোঁজ রাখে ? এ আর ভাল হইল না !

দিন তিনেক পর একদিন সকালে হরেন আসিয়া হাজির অপুর বাসায়। নানা বাজে কথার পর উত্তরপাড়ার জমি লওয়ার কথা পাড়িল। টিউবওয়েল বসাইতে হইবে। কারণ জলের সুবিধা নাই—অপূর্ব কত টাকা দিতে পারে ? উঠিবার সময় বলিল—ওহে, তুমি মানিককে কি বই কিনে দেবে বলেছিলে, আমায় বলছিল ! অপু ভাবিয়া দেখিল এরূপ কোন কথা মানিককে সে বলে নাই—যাহা হউক, না হয় দিয়া দিবে এখন। মানিককে বইয়ের দরুন টাকা হরেনের হাতে দিয়া দিল।

তাহার পর হইতে হরেনের যাতায়াত শুরু হইল একটু ঘন ঘন। বাবার সঙ্গে মাঝে মাঝে মানিকও আসিতে লাগিল। কখনও সে আসিয়া বলে, তাহারা বায়স্কোপ দেখিতে যাইবে, টাকা দিন কাকাবাবু। কখনও তাহার জুতা নাই, কখনও ছোট খোকার জামা নাই—কখনও তাহার বড় দিদি, ছোট দিদির বায়না। ইহারা আসিলেই দু-তিন টাকার কমে অপুর পার হইবার উপায় নাই। হরেনও নানা ছুতায় টাকা চায়, বাড়ি ভাড়া—স্ত্রীর অসুখ।

একদিন কাজলের একটা সেলুলয়েডের ঘর-সাজানো জাপানী সামুরাই পুতুল খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। তার দিন-দুই আগে মানিকের সঙ্গে তার ছোট বোন টেঁপি আসিয়াছিল—অনেকক্ষণ পুতুলটা নাড়াচাড়া করিতেছিল, কাজল দেখিয়াছে। তারপর দিন-দুই আর সেটার খোঁজ নাই, কাজল আজ দেখিল পুতুলটা নাই। ইহার দিন পনেরো পরে হরেনের বাসায় চায়ের নিমন্ত্রণে গিয়া অপু দেখিল, কাজলের জাপানী পুতুলটা একেবারে সামনেই একটা হ্যারিকেন লণ্ঠনের পাশে বসানো। পাছে ইহারা লজ্জায় পড়ে তাই সেদিকটা পিছু ফিরিয়া বসিল ও যতক্ষণ রহিল, লণ্ঠনটার দিকে আদৌ চাহিল না। ভাবিল—যাক গে, খুকী লোভ সামলাতে না পেরে এনেছে, খোকাকে আর একটা কিনে দেবো।

উঠিয়া আসিবার সময় মানিক বলিল—মা বললেন, তোর কাকাবাবুকে বল—একদিন আমাদের কালীঘাট দেখিয়ে আনতে—সামনের রবিবারে চলুন কাকাবাবু, আমাদের ছুটি আছে, আমিও যাব।

অপুর বেশ কিছু খরচ হইল রবিবারে। ট্যাক্সিভাড়া, জলখাবার, ছেলেপিলেদের খেলনা ক্রয়, এমন কি বড় মেয়েটির একখানা কাপড় পর্যন্ত। কাজলও গিয়াছিল, সে এই প্রথম কালীঘাট দেখিয়া খুব খুশী।

সেদিন নিজের অলক্ষিতে অপুর মনে হইল তাহার কবিরাজ বন্ধুটি ও তাহার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর কথা—তাদের প্রথম জীবনের সেই দারিদ্র্য—সেই পরিশ্রম—কখনও বিশেষ কিছু তো চাহে নাই কোনদিন—বরং কিছু দিতে গেলে ক্ষুণ্ণ হইত। কিন্তু আন্তরিক স্নেহটুকু ছিল তাহার উপর। এখনও ভাবিলে অপুর মন উদাস হইয়া পড়ে।

বাড়ি ফিরিয়া দেখিল, একটি সতের-আঠারো বছরের ছোকরা তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। দেখিতে শুনিতে বেশ, সুন্দর চোখ-মুখ, একটু লাজুক, কথা বলিতে গেলে মুখ রাঙা হইয়া যায়।

অপু তাহাকে চিনিল—চাঁপদানীর পূর্ণ দিঘড়ীর ছেলে রসিকলাল—যাহাকে সে টাইফয়েড হইতে বাঁচাইয়াছিল। অপু বলিল—রসিক, তুমি আমার বাসা জানলে কি ক'রে ?

—আপনার লেখা বেরুচে 'বিভাবরী' কাগজে—তাদের অফিস থেকে নিয়েছি—

—তারপর, অনেককাল পর দেখা—কি খবর বলো ?

—শুনুন, দিদিকে মনে আছে তো ? দিদি আমায় পাঠিয়ে দিয়েচে—বলে দিয়েচে যদি কলকাতায় যাস, তবে মাস্টার মশায়ের সঙ্গে দেখা করিস। আপনার কথা বড্ড বলে, আপনি একবার আসুন না চাঁপদানীতে !

—পটেশ্বরী ? সে এখনও মনে ক'রে রেখেছে আমার কথা ?

রসিক সুর নিচু করিয়া বলিল—আপনার কথা এমন দিন নেই—আপনি চলে এসেচেন আট দশ বছর হ'ল—এই আট দশ বছরের মধ্যে আপনার কথা বলে নি—এমন একটা দিনও বোধ হয় যায় নি। আপনি কি কি খেতে ভালবাসতেন—সে সব দিদির এখন মুখস্থ। কলকাতায় এলেই আমায় বলে মাস্টার মশায়ের খোঁজ করিস না রে ? আমি কোথায় জানব আপনার খোঁজ—কলকাতা শহর কি চাঁপদানী ? দিদি তা বোঝে না। তাই এবার 'বিভাবরী'তে আপনার লেখা—

—পটেশ্বরী কেমন আছে ? আজকাল আর সে সব শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার—

—শাশুড়ী মারা গিয়েচে, আজকাল কোন অত্যাচার নেই, দু'তিনটি ছেলেমেয়ে হয়েছে, —সে-ই আজকাল গিন্নী, তবে সংসারের বড় কষ্ট। আমাকে বলে দেয় বোতলের চাটনি কিনতে—দশ আনা দাম—আমি কোথা থেকে পাব—তাই একটা ছোট বোতল আজ এই দেখুন কিনে নিয়ে যাচ্ছি ছ' আনায়। টেঁপারির আচার। ভালো না ?

—এক কাজ করো। চলো আমি তোমাকে আচার কিনে দিচ্ছি, আমের আচার ভালবাসে ? চলো দেশী চাটনি কিনি। ভিনিগার দেওয়া বিলিতি চাটনি হয়তো পছন্দ করবে না।

—আপনি কবে আসবেন ? আপনার সঙ্গে দেখা হয়েচে অথচ আপনাকে নিয়ে যাই নি শুনলে দিদি আমাকে বাড়িতে তিষ্ঠুতে দেবে না কিন্তু, আজই আসুন না ?—

—সে এখন হবে না, সময় নেই। সুবিধে মত দেখব।

অপু অনেকগুলি ছেলেমেয়ের খেলনা, খাবার চাটনি কিনিয়া দিল। রসিককে স্টেশনে তুলিয়া দিয়া আসিল। রসিক বলিল—আপনি কিন্তু ঠিক যাবেন একদিন এর মধ্যে—নৈলে ওই বললুম যে—

কি চমৎকার নীল আকাশ আজ ! গরম আজ একটু কম।

চৈত্র দুপুরের এই ঘন নীল আকাশের দিকে চাহিলেই আজকাল কেন শৈশবের কথাই তাহার মনে পড়ে ?

একটা জিনিস সে লক্ষ্য করিয়াছে। বাল্যে যখন অন্য কোনও স্থানে সে যায় নাই—যখন যাহা পড়িত—মনে মনে তাহার ঘটনাস্থলের কল্পনা করিতে গিয়া নিশ্চিন্দিপুরেরই বাঁশবন, আমবাগান, নদীর ঘাট, কুঠির মাঠের ছবি মনে ফুটিয়া উঠিত—তাও আবার তাদের পাড়ার ও তাদের বাড়ির আশে-পাশের জায়গার। তাদের বাড়ির পিছনের বাঁশবন তো রামায়ণ মহাভারত মাখানো ছিল—দশরথের রাজপ্রাসাদ ছিল তাদের পাড়ার ফণিমুখুয্যেদের ভাঙা দোতলা বাড়িটা—মাধবীকঙ্কণে পড়া একলিঙ্গের মন্দির ছিল ছিরে পুকুরের পশ্চিমদিকের সীমানার বড় বাঁশঝাড়টার তলায়—বঙ্গবাসীতে পড়া জোয়ান-অব-আর্ক মেষপাল চরাইত নদীপারের দেয়াড়ের কাশবনের চরে, শিমুল গাছের ছায়ায়···তারপর বড় হইয়া কত নতুন স্থানে একে একে গেল, মনের ছবি ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইতে লাগিল—ম্যাপ চিনিল, ভুগোল পড়িল, বড় হইয়া যে সব বই পড়িল তাদের ঘটনা নিশ্চিন্দিপুরের মাঠে, বনে, নদীর

পথেঘাটে নাই, কিন্তু এতকালের পরেও বাল্যের যে ছবিগুলি একবার অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল তা অপরিবর্ত্তিতই আছে—এতকাল পরেও যদি রামায়ণ-মহাভারতের কোনও ঘটনা কল্পনা করে—নিশ্চিন্দিপুরের সেই অস্পষ্ট, বিস্মৃতপ্রায় স্থানগুলিই তার রথীভূমি হইয়া দাঁড়ায়—অনেককাল পর সেদিন আর একবার পুরনো বইয়ের দোকানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মাধবীকঙ্কণ ও জীবনসন্ধ্যা পড়িতেছিল—কি অদ্ভুত!—পাতায় পাতায় নিশ্চিন্দিপুর মাখানো, বাল্যের ছবি এখনও সেই অস্পষ্ট-ভাবে-মনে-হওয়া জঙ্গলে-ভরা পোড়ো পুকুরটার পশ্চিম সীমানার বাঁশঝাড়ের তলায়!…

এবার মাঝে মাঝে দু-একটি পূর্ব্ব-পরিচিত বন্ধুর সঙ্গে অপুর দেখা হইতে লাগিল প্রায়ই। কেহ উকিল, কেহ ডাক্তার—জানকী মফঃস্বলের একটা গবর্ণমেণ্ট স্কুলের হেডমাস্টার, মন্মথ এটর্নির ব্যবসায়ে বেশ উপার্জ্জন করে। দেবব্রত একবার ইতিমধ্যে সস্ত্রীক কলিকাতা আসিয়াছিল, স্ত্রীর পা সারিয়া গিয়াছে, দু'টি মেয়ে হইয়াছে। চাকরিতে সে বেশ নাম করিয়াছে, তবে চেষ্টায় আছে কন্ট্রাক্টারী ব্যবসায় স্বাধীনভাবে আরম্ভ করিতে। দেওয়ানপুরের বাল্যবন্ধু সেই সমীর আজকাল ইন্‌সিওরেন্সের বড় দালাল। সে চিরকাল পয়সা চিনিত, হিসাবী ছিল—আজকাল অবস্থা ফিরাইয়া ফেলিয়াছে। কষ্টদুঃখ করিতে করিতে একবারও সে ইহাদিগকে হিংসা করে না। তারপর এবার জানকীর সঙ্গে একদিন কলিকাতায় দেখা হইল। মোটা হইয়া গিয়াছে বেজায়, মনের তেজ নাই, গৃহস্থালির কথাবার্ত্তা—অপুর মনে হইল সে যেন একটা বন্ধ ঘরের জানালা বন্ধ করিয়া বসিয়া আছে।

তাহার এটর্নি বন্ধু মন্মথ একদিন বলিল—ভাই, সকাল থেকে ব্রিফ নিয়ে বসি, সারাদিনের মধ্যে আর বিশ্রাম নেই—খেয়েই হাইকোর্ট, পাঁচটায় ফিরে একটা জমিদারী এস্টেটের ম্যানেজারী করি ঘণ্টা-তিনেক—তারপর বাড়ি ফিরে আবার কাজ—খবরের কাগজখানা পড়বার সময় পাই নে, কিন্তু এত টাকা রোজগার করি, তবু মনে হয়, ছাত্রজীবনই ছিল ভাল। তখন কোন একটা জিনিস থেকে বেশী আনন্দ পেতুম—এখন মনে হয়, আই হ্যাভ লস্ট দি সস্‌ অফ্‌ লাইফ—

অপু নিজের কথা ভাবিয়া দেখে। কৈ, এত বিরুদ্ধ ঘটনার ভিতর দিয়াও তাহার মনের আনন্দ—কেন নষ্ট হয় নাই? নষ্ট হয় তো নাই-ই, কেন তাহা দিনে দিনে এমন অদ্ভুত ধরণের উচ্ছ্বসিত প্রাচুর্য্যে বাড়িয়া চলিয়াছে? কেন পৃথিবীটা, পৃথিবী নয়—সারা বিশ্বটা, সারা নাক্ষত্রিক বিশ্বটা এক অপরূপ রঙে তাহার কাছে রঙীন? আর দিনে দিনে এ কি গহন গভীর রহস্য তাহাকে মুগ্ধ করিয়া প্রতি বিষয়ে অতি তীব্রভাবে সচেতন করিয়া দিতেছে?…

সে দেখিতে পায় তার ইতিহাস, তার এই মনের আনন্দের প্রগতির ইতিহাস, তার ক্রমবর্দ্ধমান চেতনার ইতিহাস।

এই জগতের পিছনে আর একটা যেন জগৎ আছে। এই দৃশ্যমান আকাশ, পাখির ডাক, এই সমস্ত সংসার-জীবন-যাত্রা—তারই ইঙ্গিত আনে মাত্র—দূরে দিগন্তের বহুদূর ওপারে কোথায় যেন সে জগৎটা—পিঁয়াজের একটা খোসার মধ্যে যেমন আর একটা খোসা তার মধ্যে আর একটা খোসা, সেটাও তেমনি এই আকাশ, বাতাস, সংসারের আবরণে কোথাও যেন ঢাকা আছে, কোন্‌ জীবন-পারের মনের পারের দেশে। স্থির সন্ধ্যায় নির্জ্জনে একা কোথাও বসিয়া ভাবিলেই সেই জগৎটা একটু একটু নজরে আসে।

সেই জগৎটার সঙ্গে যোগ-সেতু প্রথম স্থাপিত হয় তার বাল্যে—দিদি যখন মারা যায়। তারপর অনিল—মা—অপর্ণা—সর্ব্বশেষে লীলা। দুস্তর অশ্রুর পারাবার সারাজীবন ধরিয়া পাড়ি দিয়া আসিয়া আজ যেন বহু দূরে সে দেশের তালীবনরেখা অস্পষ্ট নজরে আসে।

আজ গোলদীঘির বেঞ্চিখানায় বসিয়া তাই সে ভাবিয়া দেখিল, অনেক দিন আগে তার বন্ধু অনিল যে-কথা বলিয়াছিল, এ জেনারেশনের হাত হইতে কাজের ভার লওয়া—আর সবাই তা লইয়াছে, তার সকল সহপাঠীই এখন জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত, দিকে দিকে জীবনের সকল কর্ম্মক্ষেত্রে তারা নামিয়া পড়িয়াছে, কেবল ভবঘুরে হইয়াছে সে ও প্রণব। কিন্তু সত্য কথা সে বলিবে ?···মন তার কি বলে ?

তার মনে হয় সে যাহা পাইয়াছে জীবনে, তাহাতেই তার জীবন হইয়াছে সার্থক। সে চায় না অর্থ, চায় না—কি সে চায় ?

সেটাও তো খুব স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। সে কি অপরূপ জীবন-পুলক এক একদিন দুপুরের রোদে ছাদটাতে সে অনুভব করে, তাকে অভিভুত, উত্তেজিত করিয়া তোলে, আকাশের দিকে উৎসুক চোখে চাহিয়া থাকে, যেন সে দৈব্যবাণীর প্রত্যাশা করিতেছে।···

কাজল কি একটা বই আগ্রহের সঙ্গে পড়িতেছে—অপু ঘরে ঢুকিতেই চোখ তুলিয়া ব্যগ্র উৎসাহের সুরে উজ্জ্বলমুখে বলিল—ওঃ, কি চমৎকার গল্পটা বাবা !—শোনো না বাবা—এখানে বসো—। পরে সে আরও কি সব বলিয়া যাইতে লাগিল। অপু অন্যমনস্ক মনে ভাবিতেছিল—বিদেশে যাওয়ার ভাড়া সে যোগাড় করিতে পারে—কিন্তু খোকা—খোকাকে কোথায় রাখিয়া যায় ?···মামার বাড়ি পাঠাইয়া দিবে ? মন্দ কি ?···কিছু দিন না হয় সেখানেই থাকুক—বছর দুই তিন তারপর সে তো ঘুরিয়া আসিবেই। তাই করিবে ?··· মন্দ কি ?

কাজল অভিমানের সুরে বলিল—তুমি কিচ্ছু শুনচ না বাবা—

—শুনব না কেন রে, সব শুনছি। তুই বলে যা না ?

—ছাই শুনছো, বল দিকি শ্বেতপুরী কোন্ বাগানে আগে গেল ?

অপু বলিল—কোন্ বাগানে ?—আচ্ছা একটু আগে থেকে বল্ তো খোকা—ওটা ভাল মনে নেই ! খোকা অতশত ঘোরপ্যাঁচ বুঝিতে পারে না,—সে আবার গোড়া হইতে গল্প-বলা শুরু করিল—বলিল—এইবার তো রাজকন্যে শেকড় খুঁজতে যাচ্ছে, কেমন না ? মনে আছে তো ?—(অপু এক বর্ণও শোনে নাই) তারপর শোনো বাবা—

কাজলের মাথার চুলের কি সুন্দর ছেলেমানুষি গন্ধ !—দোলা, চুষিকাটি, ঝিনুকবাটি, মায়ের কোল—এই সব মনে করাইয়া দেয়—নিতান্ত কচি। সত্যি ওর দিকে চাহিয়া দেখিলে আর চোখ ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না—কি হাসি, কি চোখ দু'টি—মুখ কি সুন্দর—ঐটুকু এক রত্তি ছেলে—যেন বাস্তব নয়, যেন এ পৃথিবীর নয়—কোন্ সময় জ্যোৎস্নাপরী আসিয়া ওকে যেন উড়াইয়া লইয়া কোনও স্বপ্নপারের দেশে লইয়া যাইবে—দিনরাত কি চঞ্চলতা, কি সব অদ্ভুত খেয়াল ও আব্দার—অথচ কি অবোধ ও অসহায় !—ওকে কি করিয়া প্রতারণা করা যাইবে ?—ও তো একদণ্ড ছাড়িয়া থাকিতে পারে না—ওকে কি বলিয়া ভুলানো যায় ? অপু মনে মনে সেই ফন্দিটাই ভাবিতে লাগিল।

ছেলেকে বলিল—চিনি নিয়ে আয় তো খোকা—একটু হালুয়া করি।

কাজল মিনিট দশেক মাত্র বাহিরে গিয়াছে—এমন সময় গলির বাহিরে রাস্তায় কিসের একটা গোলমাল অপুর কানে গেল। বাহির হইয়া ঘরের দোরে দাঁড়াইল—গলির ভিতর হইতে লোক দৌড়াইয়া বাহিরের দিকে ছুটিতেছে—একজন বলিল—একটা কে লরি চাপা পড়েছে—

অপু দৌড়িয়া গলির মুখে গেল। বেজায় ভিড়, সবাই আগাইতে চায়, সবাই ঠেলাঠেলি করিতেছে। অপুর পা কাঁপিতেছিল, জিভ শুকাইয়া আসিয়াছে। একজন কে বলিল—কে

চাপা পড়েছে মশাই—

—ওই যে ওখানে একটি ছেলে—আহা মশায়, তখনই হয়ে গিয়েছে—মাথাটা আর নেই—

অপু রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল—বয়স কত ?

—বছর নয় হবে—ভদ্রলোকের ছেলে, বেশ ফর্সা দেখতে—আহা !—

অপু এ প্রশ্নটা কিছুতেই মুখ দিয়া বাহির করিতে পারিল না—তাহার গায়ে কি ছিল। কাজল তার নতুন তৈরী খদ্দরের শার্ট পরিয়া এইমাত্র বাহির হইয়া গিয়াছে—

কিন্তু এই সময়ে হঠাৎ অপু হাতে পায়ে অদ্ভুত ধরণের বল পাইল—বোধ হয় যে খুব ভালবাসে, সে ছাড়া এমন বল আর কেহ পায় না এমন সময়ে। খোকার কাছে এখনি যাইতে হবে —যদি একটুও বাঁচিয়া থাকে—সে বোধ হয় জল খাইবে, হয়ত ভয় পাইয়াছে—

ওপারের ফুটপাতে গ্যাসপোস্টের পাশে ট্যাক্সি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, পুলিশ আসিয়াছে—ট্যাক্সিতে ধরাধরি করিয়া দেহটা উঠাইতেছে ! অপু ধাক্কা মারিয়া সামনের লোকজনকে হঠাইয়া খানিকটা জায়গা ফাঁকা করিয়া ফেলিল। কিন্তু ফাঁকায় আসিয়া সামনে ট্যাক্সিটার দিকে চাহিয়াই তাহার মাথাটা ঘুরিয়া উঠিল যে, পাশের লোকের কাঁধে নিজের অজ্ঞাতসারে ভর না দিলে সে হয়তো পড়িয়াই যাইত। ট্যাক্সির সামনে যে ভিড় জমিয়াছে তারই মধ্যে দাঁড়াইয়া ডিঙি মারিয়া কাণ্ডটা দেখিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে—কাজল। অপু ছুটিয়া গিয়া ছেলের হাত ধরিল—কাজল ভীত অথচ কৌতুহলী চোখে মৃতদেহটা দেখিবার চেষ্টা করিতেছিল—অপু তাহাকে হাত ধরিয়া লইয়া আসিল।—কি দেখছিলি ওখানে ?···আয় বাসায়—

অপু অনুভব করিল তাহার মাথা যেন ঝিমঝিম করিতেছে—সারা দেহে যেন এইমাত্র কে ইলেকট্রিক ব্যাটারির শক লাগাইয়া দিয়াছে।

গলির পথে কাজল একটু ইতস্তত করিয়া অপ্রতিভের সুরে বলিল—বাবা, গোলমালে আমায় যে সিকিটা দিয়েছিলে চিনি আনতে, কোথায় পড়ে গিয়েচে খুঁজে পাই নি।

—যাক গে। চিনি নিয়ে চলে আসতে পারতিস কোনকালে—তুই বড় চঞ্চল ছেলে খোকা।

দিন দুই পরে সে কি কাজে হ্যারিসন রোড দিয়ে চিৎপুরের দিকে ট্রামে চড়িয়া যাইতেছিল, মোড়ের কাছে শীলেদের বাড়ির রোকড়নবিশ রামধনবাবুকে ছাতি মাথায় যাইতে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি ট্রাম হইতে নামিল, কাছে গিয়া বলিল, কি রামধনবাবু, চিনতে পারেন ? রামধনবাবু হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন, আরে অপূর্ববাবু যে ? তারপর কোথা থেকে আজ এতকাল পরে ! ওঃ আপনি একটু অন্যরকম দেখতে হয়ে গিয়েছেন, তখন ছিলেন ছোকরা—

অপু হাসিয়া বলিল—তা বটে। এদিকেও চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ হ'ল—কতকাল আর ছোকরা থাকব—আপনি কোথায় চলেছেন ?

—আপিস যাচ্ছি, বেলা প্রায় এগারোটা বাজে—না ? একটু দেরি হয়ে গেল। একদিন আসুন না ? কতদিন তো কাজ করেছেন, আপনার পুরনো আপিস, হঠাৎ চাকরিটা দিলেন ছেড়ে, তা নইলে আজ এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার হ'তে পারতেন, হরিচরণবাবু মারা গিয়েছেন কিনা।

সত্যিই বটে বেলা সাড়ে দশটা। রামধনবাবু পুরনো দিনের মত ছাতি মাথায়, লংক্লথের ময়লা ও হাত-ছেঁড়া পাঞ্জাবি গায়ে, ক্যাম্বিসের জুতা পায়ে দিয়া, অপু দশ বৎসর

পূর্বে যে আপিসটাতে কাজ করিত, সেখানে গুটি গুটি চলিয়াছেন।

অপু জিজ্ঞাসা করিল, রামধনবাবু, কতদিন কাজ হ'ল ওদের ওখানে আপনার সবসুদ্ধ ?

রামধনবাবু পুরনো দিনের মত গর্ব্বিতসুরে বললেন, এই সাঁইত্রিশ বছর যাচ্ছে। কেউ পারবে না বলে দিচ্ছি,—এক কলমে এক সেরেস্তায়। আমার দ্যাখ্‌তায় পাঁচ পাঁচটা ম্যানেজার বদল হ'ল—কত এল, কত গেল—আমি ঠিক বজায় আছি। এ শর্ম্মার চাকরি ওখান থেকে কেউ নড়াতে পারছেন না—যিনিই আসুন। হাসিয়া বলিলেন—এবার মাইনে বেড়েছে, এই পঁয়তাল্লিশ হ'ল।

অপুর মাথা কেমন ঘুরিয়া উঠিল—সাইত্রিশ বছর একই অন্ধকার ঘরে একই হাতবাক্সের উপর ভারী খেরো-বাঁধানো রোকড়ের খাতা খুলিয়া কালি ও স্টিলপেনের সাহায্যে শীলেদের সংসারের চালডালের হিসাব লিখিয়া চলা—চারিধারে সেই একই দোকান-পসার, একই পরিচিত গলি, একই সহকর্ম্মীর দল, একই কথা আলোচনা—বারোমাস, তিনশো তিরিশদিন। —সে ভাবিতে পারে না—এই বদ্ধজল, পঙ্কিল, পচা পানা পুকুরের মত গতিহীন, প্রাণহীন, ক্ষুদ্র জীবনের কথা ভাবিলেও তাহার গা কেমন করিয়া উঠে।

বেচারী রামধনবাবু—দরিদ্র, বৃদ্ধ, ও'র দোষ নাই, তাও সে জানে। কলিকাতার বহু শিক্ষিতসমাজে, আড্ডায়, ক্লাবে সে মিশিয়াছে। বৈচিত্র্যহীন, একঘেয়ে জীবন—অর্থহীন, ছন্দহীন, ঘটনাহীন, দিনগুলি ! শুধু টাকা, টাকা—শুধু খাওয়া, পানাসক্তি, ব্রিজখেলা, ধূমপান, একই তুচ্ছ বিষয়ে একঘেয়ে অসার বকুনি—তরুণ মনের শক্তিকে নষ্ট করিয়া দেয়, আনন্দকে ধ্বংস করে, দৃষ্টিকে সংকীর্ণ করে, শেষে ঘোর কুয়াশা আসিয়া সূর্যালোককে রুদ্ধ করিয়া দেয়—ক্ষুদ্র, পঙ্কিল, অকিঞ্চিৎকর জীবন কোন রকমে খাত বাহিয়া চলে !··সে শক্তিহীন নয়—এই পরিণাম হইতে সে নিজকে বাঁচাইবে।

তারপর সে রামধনবাবুর অনুরোধে ও কতকটা কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া শীলেদের বাড়ি গেল। সেই আপিস, ঘরদোর, লোকের দল বজায় আছে। প্রবোধ মুহুরী বড়লোক হইবার জন্য কোন লটারীতে প্রতি বৎসর একখানি টিকিট কিনিতেন, বলিতেন—ও পাঁচটা টাকা বাজে খরচের সামিল ধরে রেখেছি দাদা। যদি একবার লেগে যায়, তবে সুদে আসলে সব উঠে আসবে। তাহা আজও আসে নাই, কারণ তিনি আজও দেবোত্তর এস্টেটের হিসাব কষিতেছেন।

খুব আদর-অভ্যর্থনা করিল সকলে। মেজবাবু কাছে বসাইয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। বেলা এগারোটা বাজে, তিনি এই মাত্র ঘুম হইতে উঠিয়াছেন—বিলিয়ার্ড ঘরের সামনের বারান্দাতে চাকর তাঁহাকে এখনি তৈল মাখাইবে, বড় রুপার গুড়গুড়িতে রেশমের গলাবন্ধ-ওয়ালা নলে বেহারা তামাক দিয়া গেল।

এ বাড়ির একটি ছেলেকে অপু পূর্বে দিনকতক পড়াইয়াছিল, তখন সে ছোট ছিল, বেশ সুন্দর দেখিতে ছিল—ভারী পবিত্র মুখশ্রী, স্বভাবটিও ছিল ভারী মধুর। সে এখন আঠার উনিশ বছরের ছেলে, কাছে আসিয়া পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল—অপু দেখিয়া ব্যথিত হইল, সে এই সকালেই অন্ততঃ দশটা পান খাইয়াছে—পান খাইয়া খাইয়া ঠোঁট কালো—হাতে রুপার পানের কৌটা—পান জর্দা। এবার টেস্ট পরীক্ষায় ফেল মারিয়াছে, খানিকক্ষণ কেবল নানা ফিল্মের গল্প করিল, বাস্টার কিটনকে মাস্টারমশায়ের কেমন লাগে ?···চার্লি চ্যাপলিন ? নর্মা শিয়ারার—ও সে অদ্ভুত !

ফিরিবার সময় অপুর মনটা বেদনায় পূর্ণ হইয়া গেল। বালক, ওর দোষ কি ? এই আবহাওয়ায় খুব বড় প্রতিভাও শুকাইয়া যায়—ও তো অসহায় বালক—

রামধনবাবু বলিলেন, চললেন অপূর্ববাবু ? নমস্কার। আসবেন মাঝে মাঝে।

গলির বাহিরে সেই পচা খড় বিচালি, পচা আপেলের খোলা, শুঁটকি মাছের গন্ধ

রাত্রিতে অপুর মনে হইল সে একটা বড় অন্যায় করিতেছে, কাজলের প্রতি একটা গুরুতর অবিচার করিতেছে। ওরও তো সেই শৈশব। কাজলের এই অমূল্য শৈশবের দিনগুলিতে সে তাহাকে এই ইট, কংক্রিট, সিমেণ্ট ও বার্ড-কোম্পানীর পেটেণ্ট স্টোনে বাঁধানো কারাগারে আবদ্ধ রাখিয়া দিনের পর দিন তাহার কাঁচা, উৎসুক, স্বপ্নপ্রবণ শিশুমন তুচ্ছ বৈচিত্র্যহীন অনুভূতিতে ভরাইয়া তুলিতেছে—তাহার জীবনে বন-বনানী নাই, নদী-মর্ম্মর নাই, পাখির কলস্বর, মাঠ, জ্যোৎস্না, সঙ্গী-সাথীদের সুখদুঃখ—এসব কিছুই নাই, অথচ কাজল অতি সুন্দর ভাবপ্রবণ বালক—তাহার পরিচয় সে অনেকবার পাইয়াছে।

কাজল দুঃখ জানুক, জানিয়া মানুষ হউক। দুঃখ তার শৈশবের গল্পে পড়া সেই সোনা-করা জাদুকর! ছেঁড়া-খোঁড়া কাপড়, ঝুলি ঘাড়ে বেড়ায়, এই চাপ-দাড়ি, কোণে-কাঁদাড়ে ফেরে, কারুর সঙ্গে কথা কয় না, কেউ পোছে না, সকলে পাগল বলে, দূর দূর করে, রাতদিন হাপর জ্বালায়, রাতদিন হাপর জ্বালায়।

পেতল থেকে, রাং থেকে, সীসে থেকে ও-লোক কিন্তু সোনা করিতে জানে, করিয়াও থাকে।

এই দিনটিতে বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে সর্ব্বপ্রথম এতকাল পরে একটা চিন্তা মনে উদয় হইল। নিশ্চিন্দিপুর একবারটি ফিরিলে কেমন হয়? সেখানে আর কেউ না থাক, শৈশব-সঙ্গিনী রাণুদিদি তো আছে। সে যদি বিদেশে চলিয়া যায়, তার আগে খোকাকে তার পিতামহের ভিটাটা দেখাইয়া আনাও তো একটা কর্ত্তব্য?

পরদিনই সে কাশীতে লীলাদিকে পঁচিশটা টাকা পাঠাইয়া লিখিল, সে খোকাকে লইয়া একবার নিশ্চিন্দিপুর যাইতেছে, খোকাকে পিতামহের গ্রামটা দেখাইয়া আনিবে। পত্রপাঠ যেন লীলাদি তার দেওরকে সঙ্গে লইয়া সোজা নিশ্চিন্দিপুর চলিয়া যায়।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

ট্রেনে উঠিয়াও যেন অপুর বিশ্বাস হইতেছিল না, সে সত্যই নিশ্চিন্দিপুরের মাটিতে আবার পা দিতে পারিবে—নিশ্চিন্দিপুর, সে তো শৈশবের স্বপ্নলোক! সে তো মুছিয়া গিয়াছে, মিলাইয়া গিয়াছে, সে শুধু একটা অনতিস্পষ্ট সুখস্মৃতি মাত্র, কখনও ছিল না, নাই-ও।

মাঝেরপাড়া স্টেশনে ট্রেন আসিল বেলা একটার সময়। খোকা লাফ দিয়া নামিল, কারণ প্লাটফর্ম খুব নিচু। অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে স্টেশনটার, প্লাটফর্মের মাঝখানে জাহাজের মাস্তুলের মত উঁচু যে সিগন্যালটা ছেলেবেলায় তাহাকে তাক লাগাইয়া দিয়াছিল সেটা আর এখন নাই। স্টেশনের বাহিরে পথের উপর একটা বড় জাম গাছ, অপুর মনে আছে এটা আগে ছিল না। ওই সেই বড় মাদার গাছটা, যেটার তলায় অনেককাল আগে তাহাদের এদেশ ছাড়িবার দিনটাতে মা খিচুড়ি রাঁধিয়াছিলেন। গাছের তলায় দুখানা মোটর-বাস যাত্রীর প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া, অপুরা থাকিতে থাকিতে দুখানা পুরনো ফোর্ড ট্যাক্সিও আসিয়া জুটিল। আজকাল নাকি নবাবগঞ্জ পর্য্যন্ত বাস ও ট্যাক্সি হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল—জিনিসটা অপুর কেমন যেন ভাল লাগিল না। কাজল নবীন যুগের মানুষ, সাগ্রহে বলিল—মোটর কার্টে ক'রে যাব বাবা? অপু ছেলেকে জিনিসপত্রসমেত ট্যাক্সিতে উঠাইয়া দিল, বটের ঝুরি দোলানো স্নিগ্ধ ছায়াভরা সেই প্রাচীন দিনের পথটা দিয়া সে নিজে মোটরে চড়িয়া যাইতে পারিবে না কখনই। এ দেশের সঙ্গে পেট্রোল গ্যাসের গন্ধ কি খাপ খায়?

চৈত্রমাসের শেষ। বাংলায় সত্যিকার বসন্ত এই সময়েই নামে। পথ চলিতে চলিতে পথের ধারের ফুলেভরা ঘেঁটুবনের সৌন্দর্যে সে মুগ্ধ হইয়া গেল। এই কম্পমান চৈত্রদুপুরের রৌদ্রের সঙ্গে, আকন্দ ফুলের গন্ধের সঙ্গে শৈশব যেন মিশানো আছে—পশ্চিম বাংলার পল্লীতে এ কমনীয় বসন্তের রূপ সে তো ভুলিয়াই গিয়াছিল।

এই সেই বেত্রবতী! এমন মধুর স্বপ্নভরা নামটি কোন্ নদীর আছে পৃথিবীতে? খেয়া পার হইয়া আবার সেই আষাঢ়ুর বাজার। ভিডোল ডানলপ টায়ারের বিজ্ঞাপন-ওয়ালা পেট্রোলের দোকান নদীর উপরেই। বাজারেরও চেহারা অনেক বদল হইয়া গিয়াছে। তেইশ বছর আগে এত কোঠাবাড়ি ছিল না। আষাঢ়ু হইতে হাঁটিয়া যাওয়া সহজ, মাত্র দু মাইল, জিনিসপত্রের জন্যে একটা মুটে পাওয়া গেল, মোটরবাস ও ট্যাক্সির দরুণ ভাড়াটিয়া গরুর গাড়ি আজকাল নাকি এদেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। মুটে বলিল—ধঞ্চেপলাশগাছির ওই কাঁচা রাস্তাটা দিয়ে যাবেন তো বাবু? ধঞ্চেপলাশগাছি!…নামটাই তো কতকাল শোনে নাই, এতদিন মনেও ছিল না। উঃ, কতকাল পরে এই অতি সুন্দর নামটা সে আবার শুনিতেছে।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে এমন সময়ে পথটা সোনাডাঙ্গা মাঠের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল—পাশেই মধুখালির বিল—পদ্মবনে ভরিয়া আছে। এই সেই অপূর্ব সৌন্দর্যভূমি, সোনাডাঙ্গার স্বপ্নমাখানো মাঠটা—মনে হইল এত জায়গায় তো বেড়াইল, এমন অপরূপ মাঠ ও বন কই কোথাও তো দেখে নাই! সেই বনঝোপ, ঢিবি, বন, ফুলে ভর্তি বাবলা—বৈকালের এ কী অপূর্ব রূপ!

তারপরই দূর হইতে ঠাকুরঝি-পুকুরের সেই ঠ্যাঙাড়ে বটগাছটার উঁচু ঝাঁকড়া মাথাটা নজরে পড়িল—যেন দিক্‌সমুদ্রে ডুবিয়া আছে—ওর পরেই নিশ্চিন্দিপুর।—ক্রমে বটগাছটা পিছনে পড়িল—অপুর বুকের রক্ত চল্‌কাইয়া যেন মাথায় উঠিতে চাহিতেছে, সারা দেহ এক অপূর্ব অনুভূতিতে যেন অবশ হইয়া আসিতেছে। ক্রমে মাঠ শেষ হইল, ঘাটের পথের সেই আমবাগানগুলা—সে রুমাল কুড়াইবার ছলে পথের মাটি একটু তুলিয়া মাথায় ঠেকাইল। ছেলেকে বলিল—এই হ'ল তোমার ঠাকুরদাদার গাঁ, খোকা, ঠাকুরদাদার নামটা মনে আছে তো—বল তো বাবা, কি?

কাজল হাসিয়া বলিল—শ্রীহরিহর রায়, আহা, তা কি আর মনে আছে!

অপু বলিল, শ্রী নয় বাবা, ঈশ্বর বলতে হয়, শিখিয়ে দিলাম যে সেদিন?

রাণুদিদির সঙ্গে দেখা হইল পরদিন বৈকালে।

সাক্ষাতের পূর্ব-ইতিহাসটা কৌতুকপূর্ণ, কথাটা রানীর মুখেই শুনিল।

রানী অপু আসিবার কথা শুনে নাই, নদীর ঘাট হইতে বৈকালে ফিরিতেছে, বাঁশবনের পথে কাজল দাঁড়াইয়া আছে, সে একা গ্রামে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে।

রানী প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল—অনেককাল আগেকার একটি ছবি অস্পষ্ট মনে পড়িল—ছেলেবেলায় ওই ঘাটের ধারের জঙ্গলে-ভরা ভিটাটাতে হরিকাকারা বাস করিত, কোথায় যেন তাহারা উঠিয়া গিয়াছিল তারপরে। তাদের বাড়ির সেই অপু না? ছেলেবেলার সেই অপু? পরক্ষণেই সামলাইয়া লইয়া সে কাছে গিয়া ছেলেটির মুখের দিকে চাহিল—অপুও বটে, নাও বটে। যে বয়সে সে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল তার সে সময়ের চেহারাখানা রানীর মনে আঁকা আছে, কখনও ভুলিবে না—সেই বয়স, সেই চেহারা, অবিকল। রানী বলিল—তুমি কাদের বাড়ি এসেছ খোকা?

কাজল বলিল—গাঙ্গুলীদের বাড়ি—

রানী ভাবিল, গাঙ্গুলীরা বড়লোক, কলিকাতা হইতে কেহ কুটুম্ব আসিয়া থাকিবে, তাদেরই ছেলে। কিন্তু মানুষের মতও মানুষ হয়? বুকের ভিতরটা ছাঁৎ করিয়া উঠিয়াছিল একেবারে। গাঙ্গুলীবাড়ির বড় মেয়ের নাম করিয়া বলিল—তুমি বুঝি কাদুপিসির নাতি?

কাজল লাজুক চোখে চাহিয়া বলিল—কাদুপিসি কে জানি না তো? আমার ঠাকুরদাদার এই গাঁয়ে বাড়ি ছিল—তাঁর নাম ঈশ্বর হরিহর রায়—আমার নাম শ্রীঅমিতাভ রায়।

বিস্ময়ে ও আনন্দে রানীর মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না অনেকক্ষণ। সঙ্গে সঙ্গে একটা অজানা ভয়ও হইল। রুদ্ধনিশ্বাসে বলিল—তোমার বাবা···খোকা?···

কাজল বলিল—বাবার সঙ্গেই তো কাল এলাম! গাঙ্গুলীবাড়িতে এসে উঠলাম রাত্রে। বাবা ওদের বাইরের ঘরে বসে গল্প করচে, মেলা লোক দেখা করতে এসেচে কিনা তাই।···

রানী দুই হাতের তালুর মধ্যে কাজলের সুন্দর মুখখানা লইয়া আদরের সুরে বলিল—খোকন, খোকন, ঠিক বাবার মত দেখতে—চোখ দুটি অবিকল! তোমার বাবাকে এ পাড়ায় ডেকে নিয়ে এস খোকন। বলগে রাণুপিসি ডাকচে।

সন্ধ্যার আগেই ছেলের হাত ধরিয়া অপু রানীদের বাড়ি ঢুকিয়া বলিল—কোথায় গেলে রাণুদি, চিনতে পার?

রাণু ঘরের ভিতর হইতে ছুটিয়া আসিল, অবাক্ হইয়া খানিকক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, বলিল—মনে করে যে এলি এতকাল পরে?—তা ও-পাড়ায় গিয়ে উঠলি কেন? গাঙ্গুলীরা আপনার লোক হ'ল তোর?···পরে লীলাদির মত সেও কাঁদিয়া ফেলিল।

কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! অপুও অবাক্ হইয়া দেখিতেছিল, চৌদ্দ বছরের সে বালিকা রাণুদি কোথায়! বিধবার বেশ, বাল্যের সে লাবণ্যের কোনও চিহ্ন না থাকিলেও রানী এখনও সুন্দরী, কিন্তু এ যেন সম্পূর্ণ অপরিচিত, শৈশবসঙ্গিনী রাণুদির সঙ্গে ইহার মিল কোথায়? এই সেই রাণুদি!···

সে কিন্তু সকলের অপেক্ষা আশ্চর্য্য হইল ইহাদের বাড়িটার পরিবর্ত্তন দেখিয়া। ভুবন মুখুয্যেরা ছিলেন অবস্থাপন্ন গৃহস্থ, ছেলেবেলার সে আট-দশটা গোলা, প্রকাণ্ড চণ্ডীমণ্ডপ, গরুবাছুর, লোকজনের কিছুই নাই। চণ্ডীমণ্ডপের ভিটা মাত্র পড়িয়া আছে, পশ্চিমের কোঠা ভাঙিয়া কাহারা ইট লইয়া গিয়াছে। বাড়িটার ভাঙা, ধ্বসা, ছন্নছাড়া চেহারা, এ কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন!

রানী সজলচোখে বলিল—দেখছিস্ কি, কিছু নেই আর। মা বাবা মারা গেলেন, টুনু, খুড়ীমা এঁরাও গেলেন, সতুর মা-ও মারা গেল, সতু মানুষ হ'ল না তো, এতদিন বিষয় বেচে বেচে চালাচ্ছে। আমারও—

অপু বলিল—হ্যাঁ, লীলাদির কাছে সব শুনলাম সেদিন কাশীতে—

—কাশীতে! দিদির সঙ্গে দেখা হয়েছে তোর? কবে—কবে?···

পরে অপুর মুখে সব শুনিয়া সে ভারী খুশী হইল। দিদি আসিতেছে তাহা হইলে? কতকাল দেখা হয় নাই।

রানী বলিল—বৌ কোথায়? বাসায়—তোর কাছে?

অপু হাসিয়া বলিল—স্বর্গে!

—ও আমার কপাল। কত দিন? বিয়ে করিস নি আর?···

সেই দিনই আবার বৈকালে চড়ক। আর তেমন জাঁকজমক হয় না, চড়ক গাছ পুঁতিয়া কেহ ঘুরপাক খায় না। সে বাল্যমন কোথায়, মেলা দেখার অধীর আনন্দে ছুটিয়া যাওয়া—সে মনটা আর নাই, কেবল সে-সব অর্থহীন আশা, উৎসাহ, অপূর্ব্ব অনুভূতির স্মৃতিটা মাত্র আছে। এখন যেন সে দর্শক আর বিচারক মাত্র, চব্বিশ বৎসরে মনটা কেমন বদলাইয়া গিয়াছে,

বাড়িয়াছে—তাহারই একটা মাপ-কাটি আজ খুঁজিয়া পাইয়া দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। চড়কতলায় পুরানো আমলের কত পরিচিত বন্ধু নাই, নিবারণ গোয়ালা লাঠি খেলিত, ক্ষেত্র কাপালী বহুরূপীর সাজ দিত, হারাণ মাল বাঁশের বাঁশি বাজাইয়া বিক্রয় করিত, ইহারা কেহ আর নাই, কেবল পুরাতনের সঙ্গে একটা যোগ এখনও আছে। চিনিবাস বৈরাগী এখনও তেলে-ভাজা খাবারের দোকান করে।

আজ চল্লিশ বছর আগে এই চড়কের মেলার পরদিনই তারা গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল—তারপর কত ঘটনা, কত দুঃখ বিপদ, কত নতুন বন্ধুবান্ধব সব, গোটা জীবনটাই—কিন্তু কেমন করিয়া এই পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়াও সেই দিনটির অনুভূতিগুলির স্মৃতি এত সজীব, টাট্‌কা, তাজা অবস্থায় আজ আবার ফিরিয়া আসিল।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। চড়কের মেলা দেখিয়া হাসিমুখে ছেলেমেয়েরা ফিরিয়া যাইতেছে, কারও হাতে বাঁশের বাঁশি, কারও হাতে মাটির রং করা ছোবা পালকি। একদল গেল গাঙ্গুলী-পাড়ার দিকে, একদল সোনাডাঙ্গা মাঠের মাটির পথ বাহিয়া, ছাতিমবনের তলায় ধুলজুড়ি মাধবপুরের খেয়াঘাটে—চব্বিশ বছর আগে যাহারা ছিল ছোট, এই রকম মেলা দেখিয়া ভেঁপু বাজাইতে বাজাইতে তেলেভাজা, জিবেগজা হাতে ফিরিয়া গিয়াছিল, তাহারা অনেকদিন বড় হইয়া নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে ঢুকিয়া পড়িয়াছে—কেউ বা মারা গিয়াছে, আজ তাদের ছেলে-মেয়েদের দল ঠিক আবার তাহাই করিতেছে, মনে মনে আজিকার এই নিষ্পাপ, দায়িত্বহীন জীবনকোরকগুলিকে সে আশীর্ব্বাদ করিল।

বৈশাখের প্রথমেই লীলা তার দেওরের সঙ্গে নিশ্চিন্দিপুরে আসিল। দুই বোনে অনেকদিন পরে দেখা, দুই জনে গলা জড়াইয়া কাঁদিতে বসিল। অপুকে লীলা বলিল—তোর মনে যে এত ছিল, তা তখন কি জানি ? তোর কল্যাণেই বাপের ভিটে আবার দেখলুম, কখনও আশা ছিল না যে আবার দেখব। খোকার জন্য কাশী হইতে একরাশ খেলনা ও খাবার আনিয়াছে, মহা খুশীর সহিত পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া সকলের সঙ্গে দেখাশুনা করিল।

অপু বৈকালে ছেলেকে লইয়া নৌকায় খাবরাপোতার ঘাট পর্য্যন্ত বেড়াইতে গেল। তেঁতুলতলার ঘাটের পাশে দক্ষিণদেশের ঝিনুকতোলা বড় নৌকা বাঁধা ছিল, হাওয়ায় আলকাতরা ও গাবের রস মাখানো বড় ডিঙিগুলার শৈশবের সেই অতি পুরাতন বিস্মৃত গন্ধ…নদীর উত্তর পাড়ে ক্রমাগত নলবন, ওক্‌ড়া ও বন্যেবুড়োর গাছ, ঢালু ঘাসের জমি জলের কিনারা ছুঁইয়া আছে, মাঝে মাঝে ঝিঙে পটলের ক্ষেতে উত্তুরে মজুরেরা টোকা মাথায় নিড়ান দেয়, এক এক স্থানে নদীর জল ঘন কালো, নিথর, কলার পাটির মত সমতল—যেন মনে হয়, নদী এখানে গহন, গভীর, অতলস্পর্শ,—ফুলে ভরা উলুখড়ের মাঠ, আকন্দবন, ডাঁশা খেজুরের কাঁদি দুলানো খেজুর গাছ, উইঢিবি, বকের দল, উঁচু শিমুল ডালে চিলের বাসা—সবাইপুরের মাঠের দিক হইতে বড় এক ঝাঁক শামকুট পাখি মধুখালি বিলের দিকে গেল—একটি বাবলাগাছে অজস্র বনধুঁধুল ফল দুলিতে দেখিয়া খোকা আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—ওই দেখ বাবা, ওই যে কলকাতায় আমাদের গলির মোড়ে বিক্রী হয় গায়ে সাবান মাখবার জন্যে, কত ঝুলচে দেখ, ও কি ফল বাবা ?

অপু কিন্তু নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া ছিল। কতকাল সে এ সব দেখে নাই !…পৃথিবীর এই মুক্ত রূপ তাহাকে যে আনন্দ দেয়, সে আনন্দ উগ্রবীর্য্য সুরার মত নেশার ঘোর আনে তাহার শিরায় রক্তে, তাহা অভিভূত করিয়া ফেলে, আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তাহা অবর্ণনীয়। ইহাদের যে গোপন বাণী শুধু তাহারই মনের কানে কানে, মুখে তাহা বলিয়া বুঝাইবে সে কাহাকে ?

দূর গ্রামের জাওয়া-বাঁশের বন অস্ত-আকাশের রাঙা পটে অতিকায় লায়ার পাখির পুচ্ছের মত খাড়া হইয়া আছে, একধারে খুব উঁচু পাড়ে সারিবাঁধা গাঙশালিকের গর্ত্ত, কি অপূর্ব্ব শ্যামলতা, কি সান্ধ্য-শ্রী !

কাজল বলিল—বেশ দেশ বাবা—না ?

—তুই এখানে থাক খোকা—আমি যদি রেখে যাই এখানে, থাকতে পারবি নে ? তোর পিসিমার কাছে থাকবি, কেমন তো ?

কাজল বলিল—হ্যাঁ, ফেলে রেখে যাবে বৈ কি ? আমি তোমার সঙ্গে যাব বাবা।

অপু ভাবিতেছিল শৈশবে এই ইছামতী ছিল তার কাছে কি অপূর্ব্ব কল্পনায় ভরা ! গ্রামের মধ্যের বর্ষাদিনের জলকাদা-ভরা পথঘাট, বাঁশপাতা-পচা আঁটাল মাটির গন্ধ থেকে নিষ্কৃতি পাইয়া সে মুক্ত আকাশের তলে নদীর ধারটিতে আসিয়া বসিত। কত বড় নৌকা ওর ওপর দিয়া দূরে দূর দেশে চলিয়া যাইত। কোথায় ঝালকাটি, কোথায় বরিশাল, কোথায় রায়মঙ্গল—অজানা দেশের অজানা কল্পনায় মুগ্ধ মনে কতদিন সে না ভাবিয়াছে, সেও একদিন ওই রকম নেপাল মাঝির বড় ডিঙিটা করিয়া নিরুদ্দেশ বাণিজ্যযাত্রায় বাহির হইয়া যাইবে।

ইছামতী ছিল পাড়াগাঁয়ের গরীব ঘরের মা। তার তীরের আকাশ-বাতাসের সঙ্গীত মায়ের মুখের ঘুম-পাড়ানি গানের মত শত স্নেহে তার নবমুকুলিত কচি মনকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছিল, তার তীরে সে সময়ের কত আকাঙ্ক্ষা, বৈচিত্র্য, রোমান্স,—তার তীর ছিল দূরের অদেখা বিদেশ, বর্ষার দিনে এক ইছামতীর কুলে-কুলে ভরা ঢলঢল গৈরিক রূপে সে অজানা মহাসমুদ্রের তীরহীন অসীমতার স্বপ্ন দেখিত—ইংরাজি বই-এ পড়া Cape Nun-এর ওদিকের দেশটা···যে দেশ হইতে লোক আর ফেরে না—He who passes Cape Nun, will either return or not—মুগ্ধচোখে কূলছাপানো ইছামতী দেখিয়া তখন সে ভাবিত—ওঃ, কত বড় আমাদের এই গাঙটা ! ··

এখন সে আর বালক নাই, কত বড় বড় নদীর দুকূল-ছাপানো লীলা দেখিয়াছে—গঙ্গা, শোণ, বড়দল, নর্ম্মদা—তাদের অপূর্ব্ব সন্ধ্যা, অপূর্ব্ব বর্ণসম্ভার দেখিয়াছে—সে বৈচিত্র্য, সে প্রখরতা ইছামতীর নাই, এখন তার চোখে ইছামতী ছোট নদী। এখন সে বুঝিয়াছে তার গরীব ঘরের মা উৎসব-দিনের যে বেশভূষায় তার শৈশব-কল্পনাকে মুগ্ধ করিয়া দিত, এসব বনেদী বড় ঘরের মেয়েদের হীরামুক্তার ঘটা, বারানসী শাড়ির রংচং-এর কাছে তার মায়ের সেই কাচের চুড়ি, শাঁখা কিছুই নয়।

কিন্তু তা বলিয়া ইছামতীকে সে কি কখনো ভুলিবে ?

দুপুরে সে ঘরে থাকিতে পারে না। এই চৈত্রদুপুরের রোদের উষ্ণ নিঃশ্বাস কত পরিচিত গন্ধ বহিয়া আনে—শুকনো বাঁশের খোলার, ফুটন্ত ঘেঁটুবনের, ঝরা পাতার, সোঁদা সোঁদা রোদপোড়া মাটির, নিম ফুলের, আরও কত কি কত কি,—বাল্যে এই সব দুপুর তাকে ও তাহার দিদিকে পাগল করিয়া দিয়া টো টো করিয়া শুধু মাঠে, বাগানে, বাঁশতলায়, নদীর ধারে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইত—আজও সেই রকমই পাগল করিয়া দিল। গ্রামসুদ্ধ সবাই দুপুরে ঘুমায়—সে একা একা বাহির হয়—উদ্‌ভ্রান্তের মত মাঠের ঘেঁটুফুলেভরা উঁচু ডাঙায়, পথে পথে নিঝুম দুপুরে বেড়াইয়া ফেরে—কিন্তু তবু মনে হয়, বাল্যের স্মৃতিতে যতটা আনন্দ পাইতেছে, বর্ত্তমানের আসল আনন্দ সে ধরণের নয়—আনন্দ আছে, কিন্তু তাহার প্রকৃতি বদলাইয়া গিয়াছে। তখনকার দিনে দেবদেবীরা নিশ্চিন্দিপুরে বাঁশবনের ছায়ায় এই সব দুপুরে নামিয়া আসিতেন। এক একদিন সে নদীর ধারের সুগন্ধ তৃণ-ভূমিতে চুপ

করিয়া হাতে মাথা রাখিয়া শুইয়া থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কিছুই করে না, রৌদ্রভরা নীল আকাশটার দিকে চাহিয়া শুধু চুপ করিয়া থাকে—কিছু ভাবেও না···সবুজ ঘাসের মধ্যে মুখ ডুবাইয়া মনে মনে বলে—ওগো মাতৃভূমি, তুমি ছেলেবেলায় যে অমৃতদানে মানুষ করেছিলে, সেই অমৃত হ'ল আমার জীবন-পথের পাথেয়—তোমার বনের ছায়ায় আমার সকল স্বপ্ন জন্ম নিয়েছিল একদিন, তুমি আবার শক্তি দাও, হে শক্তিরূপিনী !

দুঃখ হয় কলিকাতার ছাত্রটির জন্য। এদের বাপের বাড়ি বৌবাজারে, মামার বাড়ি পটুয়াটোলায়, পিসির বাড়ি বাগবাজারে—বাংলাদেশকে দেখিল না কখনও। এরা কি মাধবপুর গ্রামের উলুখড়ের মাঠের ও-পারের আকাশে রং-ধরা দেখিল ? স্তব্ধ শরৎ-দুপুরের ঘন বনানীর মধ্যে ঘুঘুর ডাক শুনিয়াছে ? বন-অপরাজিতা ফুলের নীরব মহোৎসব এদের শিশু-আত্মায় তার আনন্দের স্পর্শ দিয়াছে কোনও কালে ? ছোট মাটির ঘরের দাওয়ায় আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া নারিকেল-পত্রশাখায় জ্যোৎস্নার কাঁপন দেখে নাই কখনও—এরা অতি হতভাগ্য।

•

রানীর যত্নে আদরে সে মুগ্ধ হইয়া গেল। সতুদের বাড়ির সে-ই আজকাল কর্ত্রী, নিজের ছেলেমেয়ে হয় নাই, ভাইপোদের মানুষ করে। অপুকে রানী বাড়িতে আনিয়া রাখিল—কাজলকে দু'দিনে এমন আপন করিয়া লইয়া ফেলিয়াছে যে, সে পিসিমা বলিতে অজ্ঞান। রানীর মনে মনে ধারণা, অপু শহরে থাকে যখন, তখন খুব চায়ের ভক্ত,—দু'টি বেলা ঠিক সময়ে চা দিবার জন্য তাহার প্রাণপণ চেষ্টা। চায়ের কোন সরঞ্জাম ছিল না, লুকাইয়া নিজের পয়সায় সতুকে দিয়া নবাবগঞ্জের বাজার হইতে চায়ের ডিস্ পেয়ালা আনাইয়া লইয়াছে—অপু চা তেমন খায় না কখনও, কিন্তু এখানে সে সেকথা বলে না। ভাবে—যত্ন করচে রাণুদি, করুক না। এমন যত্ন আর জুটবে কোথাও ? তুমিও যেমন !

দুপুরে একদিন খাইতে বসিয়া অপু চুপ করিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া আছে। রানীর দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—একটা বড় চমৎকার ব্যাপার হ'ল—দেখো, এই টকে-যাওয়া এঁচড়-চচ্চড়ি কতকাল খাই নি—নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে আর কখনও নয়—তাই মুখে দিয়েই ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল রাণুদি—

রাণুদি বোঝে এসব কথা—তাই রাণুদির কাছে বলিয়াও সুখ।

এ কয়দিন আকাশটা ছিল মেঘ-মেঘ। কিন্তু হঠাৎ কখন মেঘ কাটিয়া গিয়াছে সে জানে না—বৈকালে ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া সে অবাক চোখে চুপ করিয়া বাহিরের রোয়াকে বসিয়া রহিল—বাল্যের সেই অপূর্ব বৈকাল—যাহার জন্য প্রথম প্রথম বিরহী বালক-মন কত হাঁপাইয়াছে বিদেশে, ক্রমে একটা অস্পষ্ট মধুর স্মৃতিমাত্র মনে আঁকিয়া রাখিয়া সেটা কবে মন হইতে বেমালুম অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল—

মনে পড়ে ছেলেবেলায় এই সব সময়ে ঘুম ভাঙিয়া তাহার মনটা কেমন অকারণে খারাপ হইত—এক একদিন কেমন কান্না আসিত, বিছানায় বসিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিত—তাহার মা ঘাট হইতে আসিয়া বলিত—ও-ওই উড়ে গেল—ও-ও-ওই !···কেঁদো না খোকা, বাইরে এসে পাখি দেখসে। আহা হা, তোমার বড় দুখ্খু খোকন—তোমার নাতি মরেছে, পুতি মরেছে, সাত ডিঙে ধন সমুদ্দুরে ডুবে গিয়েছে, তোমার বড় দুখ্খু—কেঁদো না কেঁদো না, আহা হা !···

রানী পাতকুয়া হইতে জল তুলিয়া লইয়া যাইতেছে, অপু বলিল—মনে পড়ে রাণুদি, এই উঠোনে এমন সব বিকেলে বৌ-চুরি খেলা খেলতুম কত, তুমি, আমি, দিদি, সতু, নেড়া—?

রাণু বলিল—আহা, তাই বুঝি ভাবচিস্ বসে বসে ! কত মালা গাঁথতুম মনে আছে

বকুলতলায় ? সারাদিন বকুলতলাতেই পড়ে আছি আমি, দুগ্‌গো—আজকাল ছেলেমেয়েরা আর মালা গাঁথে না, বকুল ফুলও আর তেমন পড়ে থাকে না—কালে কালে সবই যাচ্চে।

কিছু পরে জল লইয়া ফিরিবার সময়ে বলিল—এক কাজ কর না কেন অপু, সতু তো তোদের নীলমণি জ্যাঠার দরুণ জমাটা ছেড়ে দেবে, তুই কেন গিয়ে বাগানটা নিগে যা না ? তোদেরই তো ছিল—ও যা, নিজের জমি-জমাই বিক্রী ক'রে ফেললে সব, তা আবার জমার বাগান রাখবে—নিবি তুই ?

অপু বলিল,—মায়ের বড় ইচ্ছে ছিল, রাণুদি। মরবার কিছুদিন আগেও বলত, বড় হ'লে বাগানখানা নিস অপু। আমার আপত্তি নেই, যা দাম হবে আমি দেব।

প্রতি সন্ধ্যায় সতুদের রোয়াকে মাদুর পাতা হয়, রানী, লীলা, অপু, ছেলেপিলেদের মজলিস বসে। সতুও যোগ দেয়, তবে তামাকের দোকান বন্ধ করিয়া আসিতে তাহার রাত হইয়া যায়। অপু বলে—আচ্ছা আজকাল তোমরা ঘাটের পথে ষাঁড়াতলায় পিঠে দাও না রাণুদি ? কই সেই ষাঁড়াগাছটা তো নেই সেখানে ?

রানী বলে—সেটা মরে গিয়েছে—তার পাশেই একটা চারা, দেখিস নি সিঁদুর দেওয়া আছে ?···

নানা পুরানো কথা হয়। অপু জিজ্ঞাসা করে—ছেলেবেলায় একবার পঙ্গপালের দল এসেছিল, মনে আছে লীলাদি ?···গ্রামের একটি বিধবা যখন নববধূরূপে এ গ্রামে প্রথম আসেন, অপু তখন ছেলেমানুষ। তিনিও সন্ধ্যার পরে এ বাড়িতে আসেন। অপু বলে—খুড়ীমা, আপনি নতুন এসে কোথায় দুধে-আলতার পাথরে দাঁড়িয়েছিলেন মনে আছে আপনার ?

বিধবাটি বললেন—সে সব কি আর এ জন্মের কথা, বাবা ? সে সব কি আর মনে আছে ?

অপু বলে—আমি বলি শুনুন, আপনাদের দক্ষিণের উঠোনে যে নিচু গোয়ালঘরটা ছিল, তারই ঠিক সামনে।

বিধবা মেয়েটি আশ্চর্য্য হইয়া বলেন—ঠিক ঠিক, এখন মনে পড়েছে, এত দিনের কথা তোমার মনে আছে বাবা !

তাঁদেরই বাড়ির আর এক বিবাহে কোথা হইতে তাঁদের এক কুটুম্বিনী আসেন, খুব সুন্দরী—এতকাল পরে তাঁর কথা উঠে। সবাই তাঁকে দেখিয়াছিল সে সময়, কিন্তু নামটা কাহারও মনে নাই এখন। অপু বলে—দাঁড়াও রাণুদি, নাম বলছি—তার নাম সুবাসিনী।

সবাই আশ্চর্য্য হইয়া যায়। লীলা বলে—তোর তখন বয়স আট কি নয়, তোর মনে আছে তার নাম ?—ঠিক, সুবাসিনীই বটে। সবারই মনে পড়ে নামটা।

অপু মৃদু মৃদু হাসিমুখে বলে—আরও বলছি শোনো, ডুরে শাড়ি পরত, রাঙা জমির ওপর ডুরে দেওয়া—না ?

বিধবা বধূটি বলেন,—ধন্যি বাপু যা হোক্, রাঙা ডুরে পরত ঠিকই, বয়েস ছিল বাইশ-তেইশ। তখন তোমার বয়েস বছর আষ্টেক হবে। ছাব্বিশ-সাতাশ বছর আগেকার কথা যে !

অপুর খুব মনে আছে, অত সুন্দরী মেয়ে তাদের গাঁয়ে আসে নাই ছেলেবেলায়। সে বলিল—রাঙা শাড়ি পরে আমাদের উঠোনের কাঁঠালতলায় জল সইতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, ছবিটা দেখতে পাচ্ছি এখনও।

এখানকার বৈকালগুলি সত্যই অপূর্ব্ব। এত জায়গায় তো সে বেড়াইল, মাসখানেক এখানে থাকিয়া মনে হইল এমন বৈকাল সে কোথাও দেখে নাই। বিশেষ করিয়া বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের মেঘহীন এই বৈকালগুলিতে সূর্য্য যেদিন অস্ত যাইবার পথে মেঘাবৃত না হয়, শেষ রাঙা আলোটুকু পর্য্যন্ত বড় গাছের মগডালে, বাঁশঝাড়ের আগায় হাল্‌কা সিঁদুরের রং

মাখাইয়া দেয়, সেদিনের বৈকাল। এমন বিল্বফুলের অপূর্ব্ব সুরভি-মাখানো, এমন পাখি-ডাকা উদাস বৈকাল—কোথায় এর তুলনা? এত বেলগাছও কি এ দেশটায়, ঘাটে, পথে, এ-পাড়া, ও-পাড়া সর্ব্বত্র বিল্বফুলের সুগন্ধ।

একদিন—জ্যৈষ্ঠের প্রথমটা, বৈকালে আকাশ অন্ধকার করিয়া ঈশান কোণ হইতে কালবৈশাখীর মেঘ উঠিল, তার পরেই খুব ঝড়, এ বছরের প্রথম কালবৈশাখী। অপু আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল—তাদের পোড়োভিটার বাঁশবনের মাথার উপরকার দৃশ্যটা কি সুপরিচিত! বাল্যে এই মাথাদুলানো বাঁশঝাড়ের উপরকারের নীলকৃষ্ণ মেঘসজ্জা মনে কেমন সব অনতিস্পষ্ট আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগাইত, কত কথা যেন বলিতে চাহিত, আজও সেই মেঘ, সেই বাঁশবন, সেই বৈকাল সবই আছে, কিন্তু সে অপূর্ব্ব জগৎটা আর নাই। এখন যা আনন্দ সে শুধু স্মৃতির আনন্দ মাত্র। এবার নিশ্চিন্দিপুর ফিরিয়া অবধি সে ইহা লক্ষ্য করিতেছে—এই বন, এই দুপুর, এই গভীর রাত্রে চৌকিদারের হাঁকুনি, কি লক্ষ্মীপেঁচার ডাকের সঙ্গে এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন মাখানো ছিল, দিগন্তরেখার ওপারের এক রহস্যময় কল্পলোক তখন সদাসর্ব্বদা হাতছানি দিয়া আহ্বান করিত—তাদের সন্ধান আর মেলে না।

সে পাখির দল মরিয়া গিয়াছে, তেমন দুপুর আর হয় না; যে চাঁদ এমন বৈশাখীরাত্রে খড়ের ঘরের দাওয়ার ধারের নারিকেল-পত্রশাখায় জ্যোৎস্নার কম্পন আনিয়া এক ক্ষুদ্র কল্পনা-প্রবণ গ্রাম্য বালকের মনে মূল্যহীন, কারণহীন আনন্দের বান ডাকাইত, সে সব চাঁদ নিভিয়া গিয়াছে। সে বালকটিই বা কোথায়? পঁচিশ বৎসর আগেকার এক দুপুরে বাপমায়ের সঙ্গে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল, আর ফেরে নাই, জাওয়া-বাঁশের বনের পথে তার ছোট ছোট পায়ের দাগ অস্পষ্ট হইয়া মুছিয়া গিয়াছে বহুদিন।

তার ও তার দিদির সে সব আশা পূর্ণ হইয়াছিল কি?

হায় অবোধ বালক-বালিকা!

রোজ রোজ বৈকালে মেঘ হয়, ঝড় ওঠে। অপু বলে—রাণুদি, আম কুড়িয়ে আনি? রানী হাসে। অপু ছেলেকে লইয়া নতুন-কেনা বাগানে আসিয়া দাঁড়ায়—সবাইকে আম কুড়াইতে ডাকে, কাহাকেও বাধা দেয় না। বাল্যের সেই পটুলে, তেঁতুলতলী, নেকো, বাঁশতলা,—ঘন মেঘের ছায়ায় জেলেপাড়ার তো আবালবৃদ্ধবনিতা ধামা হাতে আম কুড়াইতে আসে। অপু ভাবে, আহা, জীবনে এই এদের কত আনন্দের কত সার্থকতার জিনিস। চারিধারে চাহিয়া দেখে, সমস্ত বাগানের তলাটা ধাবমান, কৌতুকপর, চীৎকাররত বালক-বালিকাতে ভরিয়া গিয়াছে!

দিদি দুর্গা, ছোট্ট মেয়েটি, এই কাজলের চেয়ে কিছু বড়, পরের বাগানে আম কুড়াইবার অপরাধে বকুনি-খাওয়া কৃত্রিম উল্লাসভরা হাসিমুখে একদিন ওই ফণিমনসার ঝোপের পাশের বেড়াটা গলিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল—বহুকালের কথাটা।

অপু কি করিবে আমবাগানে? এই সব গরীব ঘরের ছেলেমেয়েরা সাধ মিটাইয়া আম কুড়াইবে এ বাগানে, কেহ তাহাদের বারণ করিবার থাকিবে না, বকিবার থাকিবে না, অপমান করিবার থাকিবে না, ফণিমনসার ঝোপের আড়ালে অপমানিতা ছোট্ট খুকীটি ধূলামাখা আঁচল গুছাইয়া লইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু তৃপ্তির হাসি হাসিবে···

এত দিন সে এখানে আসিলেও নিজেদের ভিটাটাতে ঢুকিতে পারে নাই, যদিও বাহির হইতে সেটা প্রতিদিনই দেখিত; কারণ ঘাটের পথটা তার পাশ দিয়াই। বৈকালের দিকে সে একদিন একা চুপি চুপি বনজঙ্গল ঠেলিয়া সেখানে ঢুকিল। বাড়িটা আর নাই, পড়িয়া ইট স্তূপাকার হইয়া আছে—লতাপাতা, শ্যাওড়াবন, বনচালতার গাছ, ছেলেবেলাকার মত কালমেঘের জঙ্গল। পিছনের বাঁশঝাড়গুলা এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বাড়িয়া চারিধারে

ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

কোনও ঘরের চিহ্ন নাই, বন জঙ্গল, রাঙা রোদ বাঁশের মগডালে। পশ্চিমের পাঁচিলের গায়ে সেই কুলুঙ্গিটা আজও আছে, ছেলেবেলায় যে কুলুঙ্গিটাতে সে ভাঁটা, বাতাবীলেবুর বল, কড়ি রাখিত। এত নিচু কুলুঙ্গিটা তখন কত উঁচু বলিয়া মনে হইত, তাহার মাথা ছাড়াইয়া উঁচু ছিল, ডিঙ্গাইয়া দাঁড়াইলে তবে নাগাল পাওয়া যাইত! ঠেসদেওয়ালের গায়ে ছুরি দিয়া ছেলেবেলায় একটা ভুত আঁকিয়াছিল, সেটা এখনও আছে। পাশেই নীলমণি জ্যাঠামশায়ের পোড়োভিটা—সেও ঘন বনে ভরা, চারিধার নিঃশব্দ, নির্জন—এ পাড়াটাই জনহীন হইয়া গিয়াছে, এধার দিয়া লোকজনের যাতায়াত বড় কম। এই সে স্থানটি, কতকাল আগে যেখানে দিদি ও সে একদিন চড়ুইভাতি করিয়াছিল! কণ্টকাকীর্ণ শেঁয়াকুল বনে দুর্গম দুর্ভেদ্য হইয়া পড়িয়াছে সারা জায়গাটা! পোড়ো ভিটার সে বেলগাছটা—একদিন যার তলায় ভীষ্মদেব শরশয্যা পাতিতেন তাহার নয় বৎসরের শৈশবে—সেটা এখনও আছে, পুষ্পিত শাখা-প্রশাখার অপূর্ব সুবাসে অপরাহ্নের বাতাস স্নিগ্ধ করিয়া তুলিয়াছে।

পাঁচিলের ঘুলঘুলিটা কত নিচু বলিয়া মনে হইতেছে, এইটাতেই অপু আশ্চর্য্য হইল—বার বার কথাটা তার মনে হইতেছিল। কত ছোট ছিল সে তখন! খোকার মত অতটুকু বোধ হয়।

কাঁচাকলায়ের ডালের মত সেই কি লতার গন্ধ বাহির হইতেছে! কতদিন গন্ধটা মনে ছিল না, বিদেশে আর সব কথা হয়ত মনে পড়িতে পারে, কিন্তু পুরাতন দিনের গন্ধগুলি তো মনে পড়ে না!

এ অভিজ্ঞতাটা অপুর এতদিন ছিল না। সেদিন বাঁওড়ের ধারে বেড়াইতে গিয়া পাকা বটফলের গন্ধে অনেকদিনের একটা স্মৃতি মনে উদয় হইয়াছিল—ছোট্ট কাচের পরকলা বসানো মোমবাতির সেকেলে লণ্ঠন হাতে তাহার বাবা শশী যোগীর দোকানে আলকাতরা কিনিতে আসিয়াছে—সেও আসিয়াছে বাবার কাঁধে চড়িয়া বাবার সঙ্গে—কাচের লণ্ঠনের ক্ষীণ আলো, আধ-অন্ধকার বাঁশবন, বাঁওড় হইতে নাল ফুল তুলিয়া বাবা তাহার হাতে দিয়াছে—কোন্ শৈশবের অস্পষ্ট ছবিটা, অবাস্তব, ধোঁয়া-ধোঁয়া! পাকা বটফলের গন্ধে কতকাল পরে তাহার সেই অত্যন্ত শৈশবের একটা সন্ধ্যা আবার ফিরিয়ে আসিয়াছিল সেদিন।

পোড়োভিটার সীমানায় প্রকাণ্ড একটা খেজুর গাছে কাঁদি কাঁদি ডাঁশা খেজুর ঝুলিতেছে—এটা সেই চারা খেজুর গাছটা, দিদি যার ডাল কাটারি দিয়া কাটিয়া গোড়ার দিকে দড়ি বাঁধিয়া খেলাঘরের গরু করিত—কত বড় ও উঁচু হইয়া গিয়াছে গাছটা!

এইখানে খিড়কীদোরটা ছিল; চিহ্নও নাই কোনও। এইখানে দাঁড়াইয়া দিদির চুরি-করা সেই সোনার কৌটাটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিল একদিন। কত সুপরিচিত জিনিস এই দীর্ঘ পঁচিশ বছর পরে আজও আছে! রাঙী গাইয়ের বিচালি খাওয়ার মাটির নাদাটা কাঁঠালতলায় বাঁশপাতা ও মাটি বোঝাই হইয়া এখনও পড়িয়া আছে। ছেলেবেলায় ঠেসদেওয়াল গাঁথার জন্য বাবা মজুর দিয়া এক জায়গায় ইট জড় করিয়া রাখিয়াছিলেন···অর্থাভাবে গাঁথা হয় নাই। ইটগুলো এখনও বাঁশবনের ছায়ায় তেমনি পড়িয়া আছে। কতকাল আগে মা তাকের উপর জলদানে-পাওয়া মেটে কলসী তুলিয়া রাখিয়াছিল, সংসারের প্রয়োজনের জন্য—পড়িয়া মাটিতে অর্ধপ্রোথিত হইয়া আছে। সকালের অপেক্ষা সে যেন অবাক হইয়া গেল পাঁচিলের সেই ঘুলঘুলিটা আজও নতুন, অবিকৃত অবস্থায় দেখিয়া—বালিচুন একটুও খসে নাই, যেন কালকের তৈরী—এই জঙ্গল ও ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কি হইবে ও কুলুঙ্গিতে?

খিড়কীদোরের পাশে উঁচু জমিটাতে মায়ের হাতে পোঁতা সজনে গাছ এখনও আছে। যাইবার বছরখানেক আগে মাত্র মা ডালটা পুঁতিয়াছিল—এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে গাছটা

বাড়িয়া বুড়ো হইয়া গিয়াছে—ফল খাইতে আর কেহ আসে নাই—জঙ্গলে ঢাকিয়া পড়িয়া আছে এতকাল—অপরাহ্নের রাঙা রোদ গাছটার গায়ে পড়িয়া কি উদাস, বিষাদমাখা দৃশ্যটা ফুটাইয়াছে যে! ছায়া ঘন হইয়া আছে, কাঁচাকলায়ের ডালের মত সেই লতাটার গন্ধ আরও ঘন হয়—অপুর শরীর যেন শিহরিয়া ওঠে—এ গন্ধ তো শুধু গন্ধ নয়—এই অপরাহ্নে, এই গন্ধের সঙ্গে জড়ানো আছে মায়ের কত রাত্রের আদরের ডাক, দিদির কত কথা, বাবার পদাবলী গানের সুর, বাল্যের ঘরকন্নার সুধাময় দারিদ্র্য—কত কি—কত কি—

ঘন বনে ঘুঘু ডাকে, ঘুঘু—ঘু—

সে অবাক্ চোখে রাঙ্গারোদ-মাখানো সজনে গাছটার দিকে আবার চায়…

মনে হয় এ বন, এ স্তূপাকার ইটের রাশি, এ সব স্বপ্ন—এখনি মা ঘাট হইতে সন্ধ্যায় গা ধুইয়া ফিরিয়া ফরসা কাপড় পরিয়া ভিজা কাপড়খানা উঠানের বাঁশের আলনায় মেলিয়া দিবে, তারপর প্রদীপ হাতে সন্ধ্যা দিতে দিতে তাহাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া বিস্মিত অনুযোগের সুরে বলিয়া উঠিবে—এত সন্ধ্যে ক'রে বাড়ি ফিরলি অপু?

ভিটার চারিদিকে খোলামকুচি, ভাঙা কলসী, কত কি ছড়ানো—ঠাকুরমায়ের পোড়ো-ভিটাতে তো পা রাখিবার স্থান নাই, বৃষ্টির ধোয়াতে কতদিনের ভাঙা খাপ্‌রা খোলামকুচি বাহির হইয়াছে। এগুলি অপুকে বড় মুগ্ধ করিল, সে হাতে করিয়া তুলিয়া দেখিতে লাগিল। কতদিনের গৃহস্থ-জীবনের সুখ-দুঃখ এগুলোর সঙ্গে জড়ানো! মা পিছনের বাঁশবনে এক জায়গায় সংসারের হাঁড়িকুড়ি ফেলিত, সেগুলি এখনও সেইখানেই আছে! একটা আস্কে-পিঠে গড়িবার মাটির মুচি এখনও অভগ্ন অবস্থায় আছে। অপু অবাক হইয়া ভাবে, কোন্ আনন্দ-ভরা শৈশবসন্ধ্যার সঙ্গে ওর সম্বন্ধ ছিল না জানি! উঠানের মাটির খোলামকুচির মধ্যে সবুজ কাচের চুড়ির একটা টুকরা পাওয়া গেল। হয়ত তার দিদির হাতের চুড়ির টুকরা।—এ ধরনের চুড়ি ছোট মেয়েরাই পরে—টুকরাটা সে হাতে তুলিয়া লইল। এক জায়গায় আধখানা বোতল-ভাঙা—ছেলেবেলায় এ ধরনের বোতলে মা নারিকেল তৈল রাখিত—হয়ত সেটাই।

একটা দৃশ্য তাকে বড় মুগ্ধ করিল। তাদের রান্নাঘরের ভিটার ঠিক যে কোণে মা রাঁধিবার হাঁড়িকুড়ি রাখিত—সেখানে একখানা কড়া এখনও বসানো আছে, মরিচা ধরিয়া বিকৃত হইয়া গিয়াছে, আটা খসিয়া গিয়াছে, কিন্তু মাটিতে বসিয়া যাওয়ার দরুন একটুও নড়ে নাই।

তাহারা যেদিন রান্না-খাওয়া সারিয়া এ গাঁ ছাড়িয়া রওনা হইয়াছিল—আজ চব্বিশ বৎসর পূর্বে, মা এঁটো কড়াখানাকে ওইখানেই বসাইয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছিল—কে কোথায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ওখানা ঠিক আছে এখনও।

কত কথা মনে ওঠে। একজন মানুষের অন্তরতম অন্তরের কাহিনী কি অন্য মানুষ বোঝে! বাহিরের মানুষের কাছে একটা জঙ্গলে-ভরা পোড়োভিটা মাত্র—মশার ডিপো। তুচ্ছ জিনিস। কে বুঝিবে চব্বিশ বৎসর পূর্বের এক দরিদ্রঘরের অবোধ বালকের জীবনের আনন্দ-মুহূর্ত্তগুলির সহিত এ জায়গার কত যোগ ছিল?

ত্রিশ, পঞ্চাশ, একশো, হাজার, তিন হাজার বছর কাটিয়া যাইবে—তখন এ গ্রাম লুপ্ত হইবে, ইছামতীই চলিয়া যাইবে, সম্পূর্ণ নতুন ধরনের সভ্যতা, নতুন ধরণের রাজনৈতিক অবস্থা—যাদের বিষয় এখন কল্পনা করিতেও কেহ সাহস করে না, তখন আসিবে জগতে! ইংরেজ জাতির কথা প্রাচীন ইতিহাসের বিষয়ীভূত হইয়া দাঁড়াইবে, বর্ত্তমান বাংলা ভাষাকে তখনও হয়ত আর কেহ বুঝিবে না, একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়া সম্পূর্ণ অন্য ধরণের ভাষা এদেশে প্রচলিত হইবে।

তখনও এই রকম বৈকাল, এই রকম কালবৈশাখী নামিবে তিন হাজার বর্ষ পরের বৈশাখ-

দিনের শেষে ! তখনও এই রকম পাখি ডাকিবে, এই রকম চাঁদ উঠিবে। তখন কি কেহ ভাবিবে তিন হাজার বছর পূর্বের এক বিস্মৃত বৈশাখী বৈকালের এক গ্রাম্য বালকের ক্ষুদ্র জগৎটি এই রকম বৃষ্টির গন্ধে, ঝোড়ো হাওয়ায় কি অপূর্ব আনন্দে দুলিয়া উঠিত—এই স্নিগ্ধ অপরাহ্ণ তার মনে কি আনন্দ, আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিত ! তিন হাজার বছরের প্রাচীন জ্যোৎস্না একদিন কোন্ মায়াস্বপ্ন তাহার শৈশব-মনে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল ? নিঃশব্দে শরৎ-দুপুরে বনপথে ক্রীড়ারত সে ক্ষুদ্র নয় বৎসরের বালকের মনের বিচিত্র অনুভূতিরাজির ইতিহাস কোথায় লেখা থাকিবে ? কোথায় লেখা থাকিবে বিস্মৃত অতীতে তার সে সব আনন্দ-ভরা জীবনযাত্রা, বিদেশ হইতে বহুদিন পরে বাড়ি ফিরিয়া মায়ের হাতে বেলের শরবৎ খাওয়ার সে মধুময় চৈত্র অপরাহ্ণটি, বাঁশবনের ছায়ায় অপরাহ্ণের নিদ্রা ভাঙিয়া পাপিয়ার সে মনমাতানো ডাক, কোথায় লেখা থাকিবে বর্ষাদিনের বৃষ্টি-সিক্ত রাত্রিগুলির সে-সব আনন্দ-কাহিনী !

দূরে ভবিষ্যতের যেসব তরুণ বালকবালিকার মনে এইসব কালবৈশাখী নব আনন্দের বার্তা আনিবে, কোন্ পথে তারা আসিবে ?

বাহির হইয়া আবার সে ফিরিয়া চাহিল।

সারা ভিটার উপর আসন্ন সন্ধ্যা এক অদ্ভুত, করুণামাখা ছায়া ফেলিয়াছে। মনে হয়, বাড়িটার এই অপূর্ব বৈকাল কাহার জন্য বহুকাল অপেক্ষা করিয়া ক্লান্ত, জীর্ণ, অবসন্ন ও অনাসক্ত হইয়া পড়িয়াছে—আর সাড়া দেয় না, প্রাণ আর নাই।

বার বার করিয়া ঘুলঘুলিটার কথাই মনে পড়িতেছিল। ঘুলঘুলি দুটা এত ভাল আছে এখনও, অথচ মানুষেরাই গেল চলিয়া !

সে নিশ্চিন্দিপুরও আর নাই। এখন যদি সে এখানে আবার বাসও করে, সে অপূর্ব আনন্দ আর পাইবে না—এখন সে তুলনা করিতে শিখিয়াছে, সমালোচনা করিতে শিখিয়াছে, ছেলেবেলায় যারা ছিল সাথী—এখন তাদের সঙ্গে আর অপুর কোনোদিকেই মিশ খায় না—তাদের সঙ্গে কথা কহিয়া আর সে সুখ নাই, তারা লেখাপড়া শিখে নাই, এই পঁচিশ বৎসরে গ্রাম ছাড়িয়া অনেকেই কোথাও যায় নাই—সবারই পৈতৃক কিছু জমিজমা আছে, তাহাই হইয়াছে তাদের কাল। তাদের মন, তাদের দৃষ্টি পঁচিশ বৎসর পূর্বের সেই বাল্যকালের কোঠায় আজও নিশ্চল।…কোনদিক হইতেই অপুর আর কোন যোগ নাই তাহাদের সহিত। বাল্যে কিন্তু এসব দৃষ্টি খোলে নাই—সব জিনিসের উপর একটা অপরিসীম নির্ভরতার ভাব ছিল—সব অবস্থাকেই মানিয়া লইত বিনা বিচারে। সত্যকার জীবন তখনই যাপন করিয়াছিল নিশ্চিন্দিপুরে।

তাহা ছাড়া বাল্যের সুপরিচিত ও অতি প্রিয় সাথীদের অনেকে বাঁচিয়া নাই। বোষ্টম দাদু নাই, জ্যাঠাইমা—রাণুদির মা নাই, আশালতাদি বিবাহের পর মরিয়া গিয়াছে, পটু এদেশ হইতে উঠিয়া গিয়া অন্য কোথাও বাস করিতেছে, নেড়া, রাজু রায়, প্রসন্ন গুরুমশায় কেহই আর নাই—স্বামী মারা যাওয়ার পরে গোকুলের বউ খুড়িমাকে তাহার ভাই আসিয়া লইয়া গিয়াছে—দশ-বারো বৎসর তিনি এখানে আসেন নাই, বাঁচিয়া আছেন কিনা কেহ জানে না।

তবু মেয়েদের ভাল লাগে। রাণুদি, ও বাড়ির খুড়িমা, রাজলক্ষ্মী, লীলাদি, এরা স্নেহে, প্রেমে, দুঃখে, শোকে যেন অনেক বাড়িয়াছে, এতকাল পরে অপুকে পাইয়া ইহারা সকলেই খুশী, কথায় কাজে এদের ব্যবহার মধুর ও অকপট। পুরাতন দিনের কথা এদের সহিত কহিয়া সুখ আছে—বহুকালের খুঁটিনাটি কথাও মনে রাখিয়াছে—হয়তো বা জীবনের পরিধি উহাদের সংকীর্ণ বলিয়াই, ক্ষুদ্র বলিয়াই এতটুকু তুচ্ছ জিনিসও আঁকড়াইয়া রাখিয়াছে।

আজ সে একথা বুঝিয়াছে, জীবনে অনবরত বিরুদ্ধ অবস্থার সঙ্গে লড়াই করিয়া চলিতে

হইয়াছিল বলিয়াই আজ সে যাহা পাইয়াছে—এখানে পৈতৃক জমিজমার মালিক হইয়া নির্ভাবনায় বসিয়া থাকিলে তাহা পাইত না। আজ যদি সে বিদেশে যায়, সমুদ্রপারে যায়—যে চোখ লইয়া সে যাইবে, নিশ্চিন্দিপুরে গত পঁচিশ বৎসর নিষ্ক্রিয় জীবন যাপন করিলে সে চোখ খুলিত না। একদিন নিশ্চিন্দিপুরকে যেমন সে সুখ-দুঃখ দ্বারা অর্জন করিয়াছিল—আজ তেমনি সুখ-দুঃখ দিয়া বাহিরকে অর্জন করিয়াছে।

নদীতে গা ধুইতে গিয়া নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় এই সব কথাই সে ভাবিতেছিল। সারাদিনটা আজ গুমট গরম, প্রতিপদ তিথি—কাল গিয়াছে পূর্ণিমা। আজ এখনি জ্যোৎস্না উঠিবে।

এই নদীতে ছেলেবেলায় যে-সব বধূরা জল লইতে আসিত, তারা এখন প্রৌঢ়া, কত নাইও—মরিয়া হাজিয়া গিয়াছে, যে-সব কোকিল সেই ছেলেবেলাকার রামনবমী দিনের পুলক-মুহূর্ত্তগুলি ভরাইয়া দুপুরে কু কু ডাক দিত, কচিপাতা-ওঠা বাঁশবনে তাদের ছেলেমেয়েরা আবার তেমনি গায়।

শুধু তাহার দিদি শুইয়া আছে। রায়পাড়ার ঘাটের ওধারে ওই প্রাচীন ছাতিম গাছটার তলায় তাহাদের গ্রামের শ্মশান, সেখানে। সে-দিদির বয়স আর বাড়ে নাই, মুখের তারুণ্য বিলুপ্ত হয় নাই—তার কাচের চুড়ি, নাটাফলের পুঁটুলি অক্ষয় হইয়া আছে এখনও। প্রাণের গোপন অন্তরে যেখানে অপুর শৈশবকালের কাঁচা শিশুমনটি প্রবৃদ্ধ জীবনের শত জ্ঞান অভিজ্ঞতা, উচ্চাশা ও কর্মস্তুপের নিচে চাপা পড়িয়া মরিয়া আছে—সেখানে সে চিরবালিকা, শৈশব-জীবনের সে সমাধিতে জনহীন অন্ধকার রাত্রে সে-ই আসিয়া নীরবে চোখের জল ফেলে—শিশু প্রাণের সাথীকে আবার খুঁজিয়া ফেরে।

আজ চব্বিশ বৎসর ধরিয়া সাঁঝ-সকালে তার আশ্রয়স্থানটিতে সোনার সূর্য্যকিরণ পড়ে। বর্ষাকালের নিশীথে মেঘ ঝর-ঝর জল ঢালে, ফাল্গুন দিনে ঘেঁটফুল, হেমন্ত দিনে ছাতিমফুল ফোটে। জ্যোৎস্না উঠে। কত পাখি গান গায়। সে এ সবই ভালবাসিত। এ সব ছাড়িয়া যাইতে পারে নাই কোথাও।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে সে একবার কলিকাতায় আসিল—ফিরিতে কুড়ি-পঁচিশ দিন দেরি হইয়া গেল—আষাঢ় মাসের শেষ, বর্ষা ইতিমধ্যে খুব পড়িয়াছিল, সম্প্রতি দু-একদিন একটু ধরণ, কখনও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, দিন ঠাণ্ডা, কোনদিন বা সারাদিন খর রৌদ্র।—

এই ক'দিনে দেশের চেহারা বদলাইয়াছে, গাছপালা আরও ঘন সবুজ, উঁচু গাছের মাথা হইতে কচি মাকাললতা লম্বা হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে—বাল্যের অতীব পরিচিত দৃশ্য, এখনও বউ-কথা-কও ডাকে, কিন্তু কোকিল ও পাপিয়া আর নাই—এখনও বনে সোঁদালি ফুলের ঝাড় অজস্র, কচি পট্‌পটি ফলের থোলো বাঁধিয়াছে গাছে গাছে—কটুগন্ধ ঘেঁটকোল রোজ বেলাশেষে কোন্‌ ঝোপঝাপের অন্ধকারে ফোটে, ঘাটের পথে ফিরিবার সময় মেয়েরা নাকে কাপড় চাপা দেয়—কি পরিচিত, কি অপূর্ব ধরণের পরিচিত সবই, অথচ বেমালুম ভুলিয়া গিয়াছিল সবটা এতদিন। বাহিরের মাঠ সবুজ হইয়াছে নবীন আউশ ধানে—এই সময় একদিন সে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে আর একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা লাভ করিল।

খুব রৌদ্র, দুপুর ঘুরিয়া গিয়াছে, বেলা তিনটার কম নয়, অপু কি কাজে গ্রামের পিছন-দিকের বনের পথ ধরিয়া যাইতেছিল। দুধারে বর্ষার বনঝোপ ঘন সবুজ, বাঁশবনে একটা

কঞ্চি হইতে হলদে পাখি উড়িয়া আর একটা কঞ্চিতে বসিতেছে।

একটা জায়গায় ঘনবনের মধ্যে সঁড়ি পথ, বড়গাছের পাতার ফাঁক দিয়া ঝলমলে পরিপূর্ণ রৌদ্র পড়িয়া কচি, সবুজ পাতার রাশি স্বচ্ছ দেখাইতেছে, কেমন একটা অপূর্ব সুগন্ধ উঠিতেছে বনঝোপ হইতে—সে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল সেদিকে চাহিয়াই।···তাহার সেই অপূর্ব শৈশব-জগৎটা!—

ঠিক এইরকম সঁড়ি বনের পথ বাহিয়া এমনি রৌদ্রালোকিত ঘুঘুডাকা দীর্ঘ শ্রাবণ দিনে, দুপুর ঘুরিয়া বৈকাল আসিবার পূর্ব সময়টিতে সে ও দিদি চৌশালিকের বাসা, পাকা মাকালফল, মিষ্টি রাংচিতার ফল খুঁজিয়া বেড়াইত—দুপুর রোদের গন্ধমাখানো, কত লতা দোলানো, সেই রহস্যভরা, করুণ, মধুর আনন্দলোকটি!···মাইল বাহিয়া এ গতি নয়, সেখানে যাওয়ার যানবাহন নাই—পৃথিবীর কোথায় যেন একটি পথ আছে যাহা সময়ের বীথিতল বাহিয়া মানুষকে লইয়া চলে তার অলক্ষিতে। ঘন ঝোপের ভিতর উঁকি মারিতেই চক্ষের নিমেষে তাহার ছাব্বিশ বৎসর পূর্বের শৈশবলোকটিতে আবার সে ফিরিয়া গেল, যখন এই বন, এই নীল আকাশ, উজ্জ্বল আনন্দভরা এই রৌদ্রমাখানো শ্রাবণ দুপুরটাই ছিল জগতের সবটুকু—বাহিরের বিশ্বটা ছিল অজানা, সে সম্বন্ধে কিছু জানিতও না, ভাবিতও না—রঙে রঙে রঙীন রহস্যঘন সেই তার প্রাচীন দিনের জগৎটা!···

এ যেন নবযৌবনের উৎস-মুখ, মন বার বার এর ধারায় স্নান করিয়া হারানো নবীনত্বকে ফিরিয়া পায়—গাছপালার সবুজ, রৌদ্রলোকের প্রাচুর্য, দুর্গাটুনটুনির অবাধ কাকলী—ঘন সঁড়ি পথের দূরপারে শৈশবসঙ্গিনী দিদির ডাক যেন শোনা যায়।···

কতক্ষণ সে অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—বুঝাইবার ভাষা নাই, এ অনুভূতি মানুষকে বোবা করিয়া দেয়! অপুর চোখ ঝাপ্সা হইয়া আসিল—কোন দেবতা তার প্রার্থনা শুনিয়াছিলেন? তার নিশ্চিন্দিপুর আসা সার্থক হইল।

আজ মনে হইতেছে যৌবন তার স্বর্গের দেবতাদের মত অক্ষয়, অনন্ত সে জগৎটা আছে—তার মধ্যেই আছে। হয়তো কোনও বিশেষ পাখির গানের সুরে, কি কোনও বনফুলের গন্ধে শৈশবের সে হারানো জগৎটা আবার ফিরিবে। অপুর কাছে সেটা একটা আধ্যাত্মিক অনুভূতি, সৌন্দর্য্যের প্লাবন বহাইয়া ও মুক্তির বিচিত্র বার্ত্তা বহন করিয়া তা আসে, যখনই আসে। কিন্তু ধ্যানে তাকে পাইতে হয়, শুধু অনুভূতিতেই সে রহস্য-লোকের সন্ধান মিলে!

তার ছেলে কাজল বর্ত্তমানে সেই জগতের অধিবাসী। এজন্য ওর কল্পনাকে অপু সঞ্জীবিত রাখিতে প্রাণপণ করে—শক ও হূণের মত বৈষয়িকতা ও পাকাবুদ্ধির চাপে সে-সব সোনার স্বপ্নকে রূঢ়হস্তে কেহ পাছে ভাঙিয়া দেয়—তাই সে কাজলকে তার বৈষয়িক শ্বশুর মহাশয়ের নিকট হইতে সরাইয়া আনিয়াছে—নিশ্চিন্দিপুরের বাঁশবনে, মাঠে, ফুলে ভরা বনঝোপে, নদী-তীরের উলুখড়ের নির্জ্জন চরে সেই অদৃশ্য জগৎটার সঙ্গে ওর সেই সংযোগ স্থাপিত হউক—যা একদিন বাল্যে তার নিজের একমাত্র পার্থিব ঐশ্বর্য্য ছিল···

নিশ্চিন্দিপুর
১৭ই আষাঢ়

ভাই প্রণব,

অনেকদিন তোমার কোনো সংবাদ পাই নি, কোনো সন্ধানও জানতুম না, হঠাৎ সেদিন কাগজে দেখলুম তুমি আদালতে কম্যুনিজম নিয়ে এক বক্তৃতা দিয়েছ, তা থেকেই তোমার বর্ত্তমান অবস্থা জানতে পারি।

তুমি জান না বোধ হয় আমি অনেকদিন পর আমার গ্রামে ফিরেছি। অবশ্য দু'দিনের

জন্য, সে-সব কথা পরে লিখব। খোকাকেও এনেছি। সে তোমায় বড় মনে রেখেছে, তুমি ওর মাথায় জল দিয়ে বাতাস করে জ্বর সারিয়েছিলে সে-কথা ও এখনও ভোলে নি।

দেখ প্রণব, আজকাল আমার মনে হয়,—অনুভূতি, আশা, কল্পনা, স্বপ্ন—এসবই জীবন! এবার এখানে এসে জীবনটাকে নতুন চোখে দেখতে পাই, এমন সুবিধে ও অবকাশ আর কোথাও হয় নি—এক নাগপুর ছাড়া! কত আনন্দের দিনের যাওয়া-আসা হ'ল জীবনে। যেদিনটিতে ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে প্রথম কুঠির মাঠ দেখতে যাই সরস্বতী পুজোর বিকেলে—যেদিন আমি ও দিদি রেলরাস্তা দেখতে ছুটে যাই—যেদিন বিয়ের আগের রাত্রে তোমার মামার বাড়ির ছাদটিতে বসে ছিলুম সন্ধ্যায়,—জন্মাষ্টমীর তিমিরভরা বর্ষণসিক্ত রাত জেগে কাটিয়েছিলুম আমি ও অপর্ণা মনসাপোতার খড়ের ঘরে, জীবনের পথে এরাই তো আনন্দের অক্ষয় পাথেয় যে আনন্দ অর্থের উপর নির্ভর করে না, ঐশ্বর্য্যের ওপর নির্ভর করে না, মান-সম্মান বা সাফল্যের উপরও নির্ভর করে না, যা সূর্য্যের কিরণের মত অকৃপণ, অপক্ষপাতী, উদার—ধনী-দরিদ্র বিচার করে না, উপকরণের স্বল্পতা বা বাহুল্যের উপর নির্ভর করে না। বড়-লোকের মেয়েরা নতুন মোটর কিনে যে আনন্দ পায়, মা অবিকল সেই আনন্দই পেতেন যদি নেমন্তন্ন থেকে আমি ভাল ছাঁদা বেঁধে আনতে পারতুম, আমার দিদি সেই আনন্দই পেত যদি বুন্‌ঝোপে কোথাও পাকা ফলে ভরা মাকাললতা কি বৈঁচিগাছের সন্ধান পেত।

জীবনে সর্ব্বপ্রথম যেবার একা বিদেশে গেলুম পিসিমার বাড়ি সিদ্ধেশ্বরী কালীর পুজো দিতে, বছর নয়েক বয়স তখন—হাজার বছর যদি বাঁচি, কে ভুলে যাবে সেদিনের সে আনন্দ ও অনুভূতির কথা? বহু পয়সা খরচ ক'রে মেরু পর্য্যটকেরা তুষারবর্ষী শীতের রাত্রে, উত্তর-হিমকটিবন্ধের বরফ-জমা নদী ও অন্ধকার আরণ্যভূমির নির্জ্জনতার মধ্যে, Northern light জ্বলা আকাশের তলায়, অবাস্তব, হলুদরঙের চাঁদের আলোয়, শুভ্রতুষারাবৃত পাইন ও সিলভার স্প্রুসের অরণ্যে নেকড়ে বাঘের ডাক শুনে সে আনন্দ পান না—আমি সেদিন খালি পায়ে বালুমাটির পথে শিমুল সোঁদালি বনের ছায়ায় ছায়ায় ভিন্‌-গাঁয়ে যেতে যেতে যে আনন্দ পেয়েছিলুম। আমি তো বড় হয়ে জীবনে কত জায়গায় গেলুম, কিন্তু জীবনের ঊষার মুক্তির প্রথম আস্বাদের সে পাগল-করা আনন্দের সাক্ষাৎ আর পাই নি—তাই রেবাতটের সেই বেতস তরুতলেই অবুঝ মন বার বার ছুটে ছুটে যায় যদি, তাকে দোষ দিতে পারি কৈ? ··

আজ একথা বুঝি ভাই যে, সুখ ও দুঃখ দুই-ই অপূর্ব্ব। জীবন খুব বড় একটা রোমান্স—বেঁচে থেকে একে ভোগ করাই রোমান্স—অতি তুচ্ছতম, হীনতম, একঘেয়ে জীবনও রোমান্স। এ বিশ্বাসটা এতদিন আমার ছিল না—ভাবতুম লাফালাফি ক'রে বেড়ালেই বুঝি জীবন সার্থক হয়ে গেল—তা নয়, দেখলুম ভাই।

এর সুখ, দুঃখ, আশা, নিরাশা—আত্মার যে কি বিচিত্র, অমূল্য য়্যাডভেঞ্চার—তা বুঝে দেখতে ধ্যানদৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা আছে, তা আসে এই রহস্যমাখা যাত্রাপথের অমানবীয় সৌন্দর্য্যের ধারণা থেকে।···

শৈশবের গ্রামখানাতে ফিরে এসে জীবনের এই সৌন্দর্য্যরূপটাই শুধু চোখে দেখছি। এতদিনের জীবনটা এক চমকে দেখবার এমন সুযোগ আর হয় নি কখনও। এত বিচিত্র অনুভূতি, এত পরিবর্ত্তন, এত রস—অনেকক্ষণ শুয়ে শুয়ে চারিধারের রৌদ্রদীপ্ত মধ্যাহ্নের অপূর্ব্ব শান্তির মধ্যে কত কথাই মনে আসে, কত বছর আগেকার সে শৈশব-সুরটা যেন কানে বাজে, এক পুরনো শান্ত দুপুরের রহস্যময় সুর···কত দিগন্তব্যাপী মাঠের মধ্যে এই শান্ত দুপুরে কত বটের তলা, রাখালের বাঁশির সুরের ওপারের যে দেশটি অনন্ত তার কথাই মনে ওঠে।

কিছুতেই আমাদের দেশের লোকে বিস্মিত হয় না কেন বলতে পার, প্রণব? বিস্মিত

হবার ক্ষমতা একটা বড় ক্ষমতা। যে মানুষ কোনও কিছু দেখে বিস্মিত হয় না, মুগ্ধ হয় না, সে তো প্রাণহীন। কলকাতায় দেখেছি কি তুচ্ছ জিনিস নিয়েই সেখানকার বড় বড় লোক দিন কাটায়। জীবনকে যাপন করা একটা আর্ট—তা এরা জানে না বলেই অল্প বয়সে আমাদের দেশে জীবনের ব্যবসায়ে দেউলে হয়ে পড়ে।

দিনের মধ্যে খানিকটা অনন্ত নির্জনে বসে একে ভাবতে হয়—উঃ, সে দেখেছিলুম নাগপুরে ভাই—সে কী অবর্ণনীয় আনন্দ পেতুম। বৈকালটিতে যখন কোনো শালবনের ছায়ায় পাথরের ওপর গিয়ে বসতুম—লোকাতীত যে বড় জীবন শত শত জন্মমৃত্যুর দূরে পারে অক্ষুন্ন, তার অস্তিত্বকে মন যেন চিনে নিত···ডি সিটারের, আইনস্টাইনের বিশ্বটার চেয়েও তো বড়।

এখানে এসেও তাই মনে হচ্ছে প্রণব।···এখানে বুঝেছি জগতে কত সামান্য জিনিস থেকে কত গভীর আনন্দ আসতে পারে। তুচ্ছ টাকা, তুচ্ছ যশমান। আমার জীবনে এরাই হোক অক্ষয়। এত ছায়া, এত ডাঁশা খেজুরের আতাফুলের সুগন্ধ, এত স্মৃতির আনন্দ কোথায় আর পাব? হাজার বছর কাটিয়ে দিতে পারি এখানে, তবু এ পুরানো হবে না যেন।

লীলাকে জানতে? আমার মুখে দু'একবার শুনেছ। সে আর নেই। সে সব অনেক কথা। কিন্তু যখনই তার কথা ভাবি, অপর্ণার কথা ভাবি, তখন মনে হয় এদের দু'জনের সঙ্গ পেয়ে আমার জীবন ধন্য হয়ে গিয়েছে—বাইবেলে পড়েছ তো—And I saw a new Heaven and a New Earth—এরা জীবন দিয়ে আমার সে চোখ খুলে দিয়েছে।

হ্যাঁ, তোমায় লিখি। আমি বাইরে যাচ্ছি। খুব সম্ভব যাব ফিজি ও সামোয়া—এক বন্ধুর কাছ থেকে ভরসা পেয়েছি। কাজলকে কোথায় রেখে যাই এই ছিল সমস্যা। তোমার মামার বাড়ি রাখব না—তোমার মেজমামীমা লিখেছেন কাজলের জন্যে তাঁদের মন খারাপ, সে চলে গিয়ে বাড়ি অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। হোক অন্ধকার, সেখানে আর নয়। আমার এক বাল্যসঙ্গিনী এখানে আছেন। তাঁর কাছেই ওকে রেখে যাব। এঁর সন্ধান না পেলে বিদেশে যাওয়া কখনও ঘটে উঠত না, খোকাকে যেখানে-সেখানে ফেলে যেতে পারতুম না তো!

আজ আবার ত্রয়োদশী তিথি, মেঘশূন্য আকাশ সুনীল। খুব জ্যোৎস্না উঠবে—ইচ্ছে হয় তোমায় নিয়ে দেখাই এ-সব, তোমার ঋণ শোধ দিতে পারব না জীবনে ভাই—তুমিই অপর্ণাকে জুটিয়ে দিয়েছিলে—কত বড় দান যে সে জীবনের, তা তুমিও হয়তো বুঝবে না।

তোমারই চিরদিনের বন্ধু
অপূর্ব

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

দুপুরে একদিন রাণু বলিল, অপু তোর কিছু দেনা আছে—

—কি দেনা রাণুদি?

—মনে আছে আমার খাতায় একটা গল্প শেষ করিস নি?

রাণু একটা খাতা বাহির করিয়া আনিল। অপু খাতাটা চিনিতে পারিল না। রাণু বলিল —এতে একটা গল্প আধখানা লিখেছিলি মনে আছে ছেলেবেলায়? শেষ লিখে দে এবার। ···অপু অবাক্ হইয়া গেল। বলিল—রাণুদি, সেই খাতাখানা এতকাল রেখে দিয়েছ তুমি?

রাণু মৃদু মৃদু হাসিল।

—বেশ দাও! এখন আমার লেখা কাগজে বেরুচ্ছে, তোমার খাতাখানায় গল্পটা অর্দ্ধেক রাখব না। কিন্তু কি ভেবে খাতাখানা রেখেছিলে রাণুদি এতদিন?

—শুনবি? একদিন তোর সঙ্গে দেখা হবেই, গল্প শেষ ক'রে দিবিই জানতুম!

অপু মনে ভাবিল—তোমাদের মত বাল্যসঙ্গিনী জন্ম জন্ম যেন পাই রাণুদি। মুখে বলিল—সত্যি? দেখি—দেখি খাতাটা!

খাতা খুলিয়া বাল্যের হাতের লেখাটা দেখিয়া কৌতুক বোধ করিল। রাণীকে দেখাইয়া হাসিয়া বলিল—একটা পাতে সাতটা বানান ভুল ক'রে বসে আছি দ্যাখো।

সে এই মঙ্গলরূপিনী নারীকেই সারাজীবনদেখিয়া আসিয়াছে—এই স্নেহময়ী, করুণাময়ী নারীকে—হয়তো ইহা সম্ভব হইয়াছে এই জন্য যে, নারীর সঙ্গে তার পরিচয় অল্পকালের ও ভাসা ভাসা ধরণের বলিয়া—অপর্ণা দু'দিনের জন্য তার ঘর করিয়াছিল—লীলার সহিত যে পরিচয় তাহা সংসারের শত সুখ দুঃখ ও সদাজাগ্রত স্বার্থদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া নহে—পটেশ্বরী, রাণুদি, নির্ম্মলা, নিরুদি, তেওয়ারী-বধূ—সবাই তাই। তাই যদি হয়, অপু দুঃখিত নয়—তাই ভালো, এই স্রোতের শেওলার মত ভাসিয়া বেড়ানো। ভবঘুরে পথিক-জীবনে সহচর-সহচরীগণের যে কল্যাণপাণি ক্ষুধার সময় তাহাকে অমৃত পরিবেশন করিয়াছে—তাহাতেই সে ধন্য, আরও বেশী মেশামেশি করিয়া তাহাদের দুর্ব্বলতাকে আবিষ্কার করিবার শখ তাহার নাই—সে যাহা পাইয়াছে, চিরকাল সে নারীর নিকট কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিবে ইহার জন্য।

ভাদ্রের শেষে আর একবার কলিকাতায় আসিয়া খবরের কাগজে একদিন পড়িল, ফিজি-প্রত্যাগত কয়েকজন ভারতীয় আর্য্যমিশনে আসিয়া উঠিয়াছেন। তখনই সে আর্য্যমিশনে গেল। নিচে কেহ নাই, জিজ্ঞাসা করিলে একজন উপরের তলায় যাইতে বলিল।

ত্রিশ-বত্রিশ বৎসরের একজন যুবক হিন্দীতে তাহার আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিল। অপু বলিল—আপনারা এসেছেন শুনে দেখা করতে এলুম। ফিজির সব খবর বলবেন দয়া ক'রে? আমার খুব ইচ্ছে সেখানে যেতে।

যুবকটি একজন আর্য্যসমাজী মিশনারী। সে ইস্ট আফ্রিকা, ট্রিনিডাড, মরিশস—নানা স্থানে প্রচার-কার্য্য করিয়াছে। অপুকে ঠিকানা দিল, পোস্ট বক্স ১১৭৫, লউটোকা, ফিজি। বলিল, অযোধ্যা জেলায় আমার বাড়ি—এবার যখন ফিজি যাব একসঙ্গেই যাব।

অপু যখন আর্য্যমিশন হইতে বাহির হইল, বেলা তখন সাড়ে দশটা।

বাসায় আসিয়া টিকিতে পারিল না। কাজল সেখানে নাই, ঘরটার সর্ব্বত্র কাজলের স্মৃতি, ওই জানালাতে কাজল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া রাস্তার লোক দেখিত, দেওয়ালের ঐ পেরেকটা সে-ই পুঁতিয়াছিল একটা টিনের ভেঁপু ঝুলাইয়া রাখিত, ওই কোণটাতে টুলটার উপর বসিয়া পা দুলাইয়া দুলাইয়া মুড়ি খাইত—অপুর যেন হাঁফ ধরে—ঘরটাতে সত্যিই থাকা যায় না।

বৈকালে খানিকটা বেড়াইল। বাকী চারশ' টাকা আদায় হইল। আর কিছুদিন পর কলিকাতা ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে—কত দূর, সপ্তসিন্ধু পারের দেশ!...কে জানে আর ফিরিবে কিনা! ডিটা-লেভু, ত্যানি লেভু, নিউ হেব্রিডিস্‌, সামোয়া!—অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি প্রবালবাঁধে-ঘেরা নিস্তরঙ্গ ঘন নীল উপসাগর, একদিকে সিন্ধু সীমাহারা, অকূল!—দক্ষিণ মেরু পর্য্যন্ত বিস্তৃত—অন্যদিকে ঘরোয়া ছোট্ট পুকুরের মত উপসাগরটির তীরে নারিকেলপত্র নির্ম্মিত ছোট ছোট কুটির—মধ্যে লৌহপ্রস্তরের পাহাড়ের সূক্ষ্মাগ্র নাসা উভয়কে দ্বিধাবিভক্ত করিতেছে—রৌদ্রালোকপ্লাবিত সাগরবেলা। পথিক-জীবনের যাত্রা আবার নতুন দেশের নতুন আকাশতলে শুরু হইবার দিন ঘনাইয়া আসিতেছে!

পুরাতন দিনের সঙ্গে যে-সব জায়গার সম্পর্ক—আর একবারে সে-সব দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইল...

মায়ের মৃত্যুর পূর্ব্বে যে ছোট একতলা ঘরটাতে থাকিত অভয় নিয়োগী লেনের মধ্যে—

সেটার পাশ দিয়াও গেল। বহুকাল এইদিকে আসে নাই।

গলির মুখে একটা গ্যাসপোস্টের কাছে সে চুপ করিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল—

একটি ছিপ্‌ছিপে চেহারার উনিশ কুড়ি বছরের পাড়াগাঁয়ের যুবক সামনের ফুটপাতে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—কিছু মুখচোরা, কিছু নির্বোধ—বোধ হয় নতুন কলিকাতায় আসিয়াছে—বোধ হয় পেট ভরিয়া খাইতে পায় নাই—ক্ষুধাশীর্ণ মুখ—অপু ওকে চেনে—ওর নাম অপূর্ব রায়।—তেরো বছর আগে ও এই গলিটার মধ্যে একতলা বাড়িটাতে থাকিত। এক মুঠো হোটেলের রান্না ভাত-ডালের জন্য হোটেলওয়ালার কত মুখ-নাড়া সহ্য করিত—মায়ের সঙ্গে দেখা করিবার প্রত্যাশায় পাঁচিলের গায়ে দাগ কাটিয়া ছুটির আর কতদিন বাকি হিসাব রাখিত। দাগগুলি জামরুল গাছটার পাশে লোনাধরা পাঁচিলের গায়ে আজও হয় তো আছে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে গ্যাস জ্বলিয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে যুবকের ছবি মিলাইয়া গেল।···

বাসায় নির্জন ছাদে একা আসিয়া বসিল। মনে কি অদ্ভুত ভাব!—কি অদ্ভুত অনুভূতি!—নবমীর জ্যোৎস্না উঠিয়াছে—কেমন সব কথা মনে উঠে—বিচিত্র সব কথা—বসিয়া বসিয়া ভাবে, এই রকম জ্যোৎস্না আজ উঠিয়াছে তাদের মনসাপোতার বাড়িতে, নাগপুরের বনে তার সেই বাংলোর সামনের মাঠে, বাল্যে সেই একটিবার গিয়াছিল লক্ষ্মণ মহাজনের বাড়ি, তাদের উঠানে। পাশে সেই পুকুর-পাড়টাতে, নিশ্চিন্দিপুরের পোড়ো-ভিটাতে, অপর্ণা ও সে শ্বশুরবাড়ির যে ঘরটাতে শুইত—তারই জানালার গায়ে—চাঁপদানীতে পটেশ্বরীদের বাড়ির উঠানে—দেওয়ানপুরের বোর্ডিংয়ের কম্পাউন্ডে, জীবনের সহিত জড়ানো এই সব স্থানের কথা ভাবিতেই জীবনের বিচিত্রতা, প্রগাঢ় রহস্য তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল···

এবার কলিকাতা হইতে বাড়ি ফিরিবার সময় মাঝেরপাড়া স্টেশনে নামিয়া অপু আর হাঁটিয়া বাড়ি যাইতে পারিল না—খোকাকে আজ দেড়মাস দেখে নাই—ছ'ক্রোশ রাস্তা পায়ে হাঁটিয়া বাড়ি পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া যাইবে—খোকার জন্য মন এত অধীর হইয়া উঠিয়াছে যে, এত দেরি করা একেবারে অসম্ভব।—বাবার কথা মনে হইল—বাবাও ঠিক তাকে দেখিবার জন্য, দিদিকে দেখিবার জন্য এমনি ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন—প্রবাস হইতে ফিরিবার পথে, তাদের বাল্যে। আজকাল পিতৃহৃদয়ের এসব কাহিনী সে বুঝিয়াছে—কিন্তু তখন তো হাঁটিয়া যাওয়া ছাড়া পন্থা ছিল না, এখন আর সেদিন নাই, মোটরবাসে এক ঘণ্টার মধ্যেই নিশ্চিন্দিপুর। যা একটু দেরি সে কেবল বেত্রবতীর খেয়াঘাটে।

গ্রামে পৌঁছিতে অপুর প্রায় বেলা তিনটা বাজিয়া গেল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে মাদুর পাতিয়া রাণুদিদের রোয়াকে ছেলেকে লইয়া বসিল। লীলা আসিল, রাণু আসিল, ও-বাড়ির রাজলক্ষ্মী আসিয়া বসিল। রাণুদের বাড়ির চারিধারে হেমন্ত অপরাহ্ণ ঘনাইয়াছে—নানা লতাপাতায় সুগন্ধ উঠিতেছে···

কি অদ্ভুত ধরণের সোনালী রোদ এই হেমন্ত বৈকালের! আকাশ ঘন নীল—তার তলে রাণুদিদের বাড়ির পিছনের বাঁশঝাড়ে সোন্যলী সড়কির মত বাঁশের সুচালো ডগায় রাঙ্গা রোদ মাখানো, কোনটার উপর ফিঙে পাখি বসিয়া আছে—বাদুড়ের দল বাসায় ফিরিতেছে। ···পাঁচিলের পাশের বনে এক-একটা আমড়া গাছে থোলো থোলো কাঁচা আমড়া।

সন্ধ্যার শাঁক বাজিল। জগতের কি অপূর্ব রূপ!···আবার অপুর মনে হয়, এদের পেছনে কোথায় আর একটা অসাধারণ জগৎ আছে—ওই বাঁশবনের মাথার উপরকার সিঁদুরে মেঘভরা আকাশ, বাঁশের সোনালী সড়কির আগায় বসা ফিঙে-পাখির দুলুনি—সেই অপূর্ব, অচিন্ত্য জগৎটার সীমানায় মনকে লইয়া গিয়া ফেলে। সন্ধ্যার শাঁক কি তাদের পোড়ো

ভিটাতেও বাজিল ? পূজার সময় বাবার খরচপত্র আসিত না, মা কত কষ্ট পাইত—দিদির চিকিৎসা হয় নাই।—সে সব কথা মনে আসিল কেন এখন ?

অন্য সবাই উঠিয়া যায়। কাজল পড়িবার বই বাহির করে। রাণু রান্নাঘরে রাঁধে, কুটনো কোটে। অপুকে বলে—এইখানে আয় বসবি, পিঁড়ি পেতে দি—

অপু বলে, তোমার কাছে বেশ থাকি রাণুদি ! গাঁয়ের ছেলেদের কথাবার্ত্তা ভাল লাগে না।

রাণু বলে—দু'টি মুড়ি মেখে দি—খা বসে বসে। দুধটা জ্বাল দিয়েই চা ক'রে দিচ্ছি।

—রাণুদি সেই ছেলেবেলাকার ঘটিটা তোমাদের—না ?

রাণু বলে—আমার ঠাকুরমা জগন্নাথ থেকে এনেছিলেন তাঁর ছেলেবয়সে। আচ্ছা অপু, দুগ্‌গার মুখ তোর মনে পড়ে ?

অপু হাসিয়া বলে—না রাণুদি। একটু যেন আবছায়া—তাও সত্যি কিনা বুঝিনে। রাণু দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আহা ! সব স্বপ্ন হয়ে গেল ! অপু ভাবে, আজ যদি সে মারা যায়, খোকাও বোধ হয় তাহার মুখ এমনি ভুলিয়া যাইবে। রাণুর মেয়ে বলিল—ও মামা, আমাদের বাড়ির ওপর দিয়ে আজ এইলোপেলেন্ গিইল।

কাজল বলিল—হ্যাঁ বাবা, আজ দুপুরে। এই তেঁতুল গাছের ওপর দিয়ে গেল।

অপু বলিল—সত্যি রাণুদি ?

—হ্যাঁ ভাই। কি ইংরেজি বুঝিনে—উড়ো জাহাজ যাকে বলে—কি আওয়াজটা !—

নিশ্চিন্দিপুরের সাত বছরের মেয়ে আজকাল এরোপ্লেন দেখিতে পায় তাহা হইলে ?

পরদিন সন্ধ্যার পর জ্যোৎস্না-রাত্রে অভ্যাস মত নদীর ধারে মাঠে বেড়াইতে গেল।

কতকাল আগে নদীর ধারের ওইখানটিতে একটা সাঁইবাবলাতলায় বসিয়া এইরকম বৈকালে সে মাছ ধরিত—আজকাল সেখানে সাঁইবাবলার বন, ছেলেবেলার সে গাছটা আর চিনিয়া লওয়া যায় না।

ইছামতী এই চঞ্চল জীবনধারার প্রতীক। ওর দু'পাড় ভরিয়া প্রতি চৈত্র বৈশাখে কত বনকুসুম, গাছপালা, পাখি-পাখালী, গাঁয়ে গাঁয়ে গ্রামের হাট—শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া কত ফুল ঝরিয়া পড়ে, কত পাখির দল আসে যায়, ধারে ধারে কত জেলেরা জাল ফেলে, তীরবর্ত্তী গৃহস্থবাড়িতে হাসি-কান্নার লীলাখেলা হয়, কত গৃহস্থ আসে, কত গৃহস্থ যায়—কত হাসিমুখ শিশু মায়ের সঙ্গে নাহিতে নামে, আবার বৃদ্ধাবস্থায় তাহাদের নশ্বর দেহের রেণু কলস্বনা ইছামতীর স্রোতোজলে ভাসিয়া যায়—এমন কত মা, কত ছেলেমেয়ে, তরুণ-তরুণী মহাকালের বীথিপথে আসে যায়—অথচ নদী দেখায় শান্ত, স্নিগ্ধ, ঘরোয়া, নিরীহ।···

আজকাল নির্জ্জনে বসিলেই তাহার মনে হয়, এই পৃথিবীর একটা আধ্যাত্মিক রূপ আছে, এর ফুলফল, আলোছায়ার মধ্যে জন্মগ্রহণ করার দরুন এবং শৈশব হইতে এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের বন্ধনে আবদ্ধ থাকার দরুন, এর প্রকৃত রূপটি আমাদের চোখে পড়ে না। এ আমাদের দর্শন ও শ্রবণগ্রাহ্য জিনিসে গড়া হইলেও আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও ঘোর রহস্যময়, এর প্রতি রেণু যে অসীম জটিলতায় আচ্ছন্ন—যা কিনা মানুষের বুদ্ধি ও কল্পনার অতীত, এ সত্যটা হঠাৎ চোখে পড়ে না। যেমন সাহেব বন্ধুটি বলিত, "ভারতবর্ষের একটা রূপ আছে, সে তোমরা জান না। তোমরা এখানে জন্মেছ কিনা, অতি পরিচয়ের দোষে সে চোখ ফোটে নি তোমাদের।"

আকাশের রং আর এক রকম—দূরের সে গহন হিরাকসের সমুদ্র ঈষৎ কৃষ্ণাভ হইয়া উঠিয়াছে—তার তলায় সারা সবুজ মাঠটা, মাধবপুরের বাঁশবনটা কি অপূর্ব্ব, অদ্ভুত, অপার্থিব ধরণের ছবি ফুটাইয়া তুলিতেছে !···ও যেন পরিচিত পৃথিবীটা নয়, অন্য কোন

অজানা জগতের, কোনও অজ্ঞাত দেবলোকের···

প্রকৃতির একটা যেন নিজস্ব ভাষা আছে। অপু দেখিয়াছে, কতদিন বক্রতোয়ার উপল-ছাওয়া-তটে শাল-ঝাড়ের নিচে ঠিক দুপুরে বসিয়া—দূরে নীল আকাশের পটভূমিতে একটা পত্রশূন্য প্রকাণ্ড কি গাছ—সেদিকে চাহিলেই এমন সব কথা মনে আসিত যা অন্য সময় আসার কল্পনাও করিতে পারিত না—পাহাড়ের নিচে বনফলের জঙ্গলেরও একটা কি বলিবার ছিল যেন। এই ভাষাটা ছবির ভাষা—প্রকৃতি এই ছবির ভাষায় কথা বলেন,—এখানেও সে দেখিল গাছপালায়, উইঢিবির পাশে শুকনো খড়ের ঝোপে, দূরের বাঁশবনের সারিতে—সেই সব কথাই বলে—সেই সব ভাবই মনে আনে। প্রকৃতির এই ছবির ভাষাটা সে বোঝে। তাই নির্জ্জন মাঠে, প্রান্তরে বনের ধারে একা বেড়াইয়া সে যত প্রেরণা পায়—যে পুলক অনুভব করে তা অপূর্ব—সত্যিকারের Joy of life—পায়ের তলায় শুকনো লতা-কাটি, দেয়াড়ের চরে রাঙা-রোদ মাখানো কষাড় ঝোপ, আকন্দের বন, ঘেঁটুবন—তার আত্মাকে এরা ধ্যানের খোরাক যোগায়, এ যেন অদৃশ্য স্বাতী নক্ষত্রের বারি, তারই প্রাণে মুক্তার দানা বাঁধে।

সন্ধ্যার পূরবী কি গৌরীরাগিণীর মত বিষাদ-ভরা আনন্দ, নির্লিপ্ত ও নির্বিকার—বহুদূরের ওই নীল কৃষ্ণাভ মেঘরাশি, ঘন নীল, নিথর, গহন আকাশটা মনে যে ছবি আঁকে, যে চিন্তা যোগায়, তার গতি গোমুখী-গঙ্গার মত অনন্তের দিকে, সে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কথা বলে, মৃত্যুপারের দেশের কথা কয়,—ভালবাসা—বেদনা—ভালবাসিয়া হারানো—বহুদূরের এক প্রীতিভরা পুনর্জ্জন্মের বাণী···

এই সব শান্ত সন্ধ্যায় ইছামতীর তীরের মাঠে বসিলেই রক্তমেঘস্তূপ ও নীলাকাশের দিকে চাহিয়া চারিপাশের সেই অনন্ত বিশ্বের কথাই মনে পড়ে। মনে পড়ে বাল্যে এই কাঁটাভরা সাঁইবাবলার ছায়ায় বসিয়া বসিয়া মাছ ধরিতে ধরিতে সে দূর দেশের স্বপ্ন দেখিত—আজকাল চেতনা তাহার বাল্যের সে ক্ষুদ্র গণ্ডি পার হইয়া ক্রমেই দূর হইতে দূরে আলোকের পাখায় চলিয়াছে। এই ভাবিয়া এক এক সময় সে আনন্দ পায়—কোথাও না যাক্—যে বিশ্বের সে একজন নাগরিক, তা ক্ষুদ্র, দীন বিশ্ব নয়। লক্ষ কোটি আলোক-বর্ষ যার গণনার মাপকাঠি, দিকে দিকে অন্ধকারে ডুবিয়া ডুবিয়া নক্ষত্রপুঞ্জ, নীহারিকাদের দেশ, অদৃশ্য ঈথারের বিশ্ব যেখানে মানুষের চিন্তাতীত, কল্পনাতীত দূরত্বের ক্রমবর্দ্ধমান পরিধিপানে বিস্তৃত—সেই বিশ্বে সে জন্মিয়াছে···

ঐ অসীম শূন্য কত জীবলোকে ভরা—কি তাদের অদ্ভুত ইতিহাস! অজানা নদীতটে প্রণয়ীদের কত অশ্রুভরা আনন্দতীর্থ—সারা শূন্য ভরিয়া আনন্দস্পন্দনের মেলা—ঈথারের নীল সমুদ্র বাহিয়া বহু দূরের বৃহত্তর বিশ্বের সে-সব জীবনধারার ঢেউ প্রাতে, দুপুরে, রাতে, নির্জ্জনে একা বসিলেই তাহার মনের বেলায় আসিয়া লাগে—অসীম আনন্দ ও গভীর অনুভূতিতেই মন ভরিয়া উঠে—পরে সে বুঝিতে পারে শুধু প্রসারতার দিকে নয়—যদিও তা বিপুল ও অপরিমেয়—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চেতনা-স্তরের আর একটা Dimension যেন তার মন খুঁজিয়া পায়—এই নিস্তব্ধ শরত-দুপুর যখন অতীতকালের এমনি এক মধুর মুগ্ধ শৈশব-দুপুরের ছায়াপাতে স্নিগ্ধ ও করুণ হইয়া উঠে তখনই সে বুঝিতে পারে চেতনার এ স্তর বাহিয়া সে বহুদূর যাইতে পারে—হয়ত কোন অজ্ঞাত সৌন্দর্য্যময় রাজ্যে, দৈনন্দিন ঘটনার গতানুগতিক অনুভূতিরাজি ও একঘেয়ে মনোভাব যে রাজ্যের সন্ধান দিতে পারিতই না কোনদিন।···

নদীর ধারে আজিকার এই আসন্ন সন্ধ্যায় মৃত্যুর নব রূপ সে দেখিতে পাইল। মনে হইল যুগে যুগে এ জন্মমৃত্যুচক্র কোন্ বিশাল-আত্মা দেব-শিল্পীর হাতে আবর্ত্তিত হইতেছে—তিনি জানেন কোন্ জীবনের পর কোন্ অবস্থার জীবনে আসিতে হয়, কখনও বা সঙ্গতি,

কখনও বা বৈষম্য—সবটা মিলিয়া অপূর্ব্ব রসসৃষ্টি—বৃহত্তর জীবনসৃষ্টির আর্ট—

ছ'হাজার বছর আগে হয়ত সে জন্মিয়াছিল প্রাচীন ঈজিপ্টে—সেখানে নলখাগড়া প্যাপিরাসের বনে, নীলনদের রৌদ্রদীপ্ত তটে কোন্ দরিদ্রঘরের মা বোন্ বাপ ভাই বন্ধুবান্ধবদের দলে কবে সে এক মধুর শৈশব কাটাইয়া গিয়াছে—আবার হয়ত জন্ম নিয়াছিল রাইন নদীর ধারে—কর্ক-ওক্ বার্চ ও বীচ্ বনের শ্যামল ছায়ায় বনেদী ঘরের প্রাচীন প্রাসাদে, মধ্যযুগের আড়ম্বরপূর্ণ আবহাওয়ায়, সুন্দরমুখ সখীদের দলে। হাজার বছর পর আবার হয়ত সে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবে—তখন কি মনে পড়িবে এবারকারের এই জীবনটা ?—কিংবা কে জানে আর হয়তো এ পৃথিবীতে আসিবে না—ওই যে বটগাছের সারির মাথায় সন্ধ্যার ক্ষীণ প্রথম তারকাটি—ওদের জগতে অজানা জীবন-ধারার মধ্যে হয়ত এবার নবজন্ম ! কতবার যেন সে আসিয়াছে…জন্ম হইতে জন্মান্তরে, মৃত্যু হইতে মৃত্যুর মধ্য দিয়া…বহু, বহু দূরে অতীতে ও ভবিষ্যতে বিস্তৃত সে পথটা যেন বেশ দেখিতে পাইল…কত নিশ্চিন্দিপুর, কত অপর্ণা, কত দুর্গা দিদি—জীবনের ও জন্মমৃত্যুর বীথিপথ বাহিয়া ক্লান্ত ও আনন্দিত আত্মার যে কি অপরূপ অভিযান—শুধু আনন্দে, যৌবনে, জীবনে, পুণ্যে ও দুঃখে, শোকে ও শান্তিতে।…এই সবটা লইয়া যে আসল বৃহত্তর জীবন—পৃথিবীর জীবনটুকু যার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র—তার স্বপ্ন যে শুধুই কল্পনা-বিলাস এ যে হয় না তা কে জানে—বৃহত্তর জীবনচক্র কোন দেবতার হাতে আবর্ত্তিত হয় কে জানে ?…হয়ত এমন সব প্রাণী আছেন যাঁরা মানুষের মত ছবিতে, উপন্যাসে, কবিতায় নিজেদের শিল্পসৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন না—তাঁরা এক এক বিশ্ব সৃষ্টি করেন—তার মানুষের সুখে-দুঃখে উত্থানে-পতনে আত্মপ্রকাশ করাই তাঁদের পদ্ধতি—কোন্ মহান্ বিবর্ত্তনের জীব তাঁর অচিন্তনীয় কলাকুশলতাকে গ্রহে গ্রহে নক্ষত্রে নক্ষত্রে এ-রকম রূপ দিয়াছেন—কে তাঁকে জানে ?…

একটি অবর্ণনীয় আনন্দে, আশায়, অনুভূতিতে, রহস্যে মন ভরিয়া উঠিল। প্রাণবন্ত তার আশা, সে অমর ও অনন্ত জীবনের বাণী বনলতার রৌদ্রদগ্ধ শাখাপত্রের তিক্ত গন্ধ আনে—নীলশূন্যে বালিহাঁসের সাঁই সাঁই রব শোনায়। সে জীবনের অধিকার হইতে তাহাকে কাহারও বঞ্চনা করিবার শক্তি নাই—তার মনে হইল সে দীন নয়, দুঃখী নয়, তুচ্ছ নয়—ওটুকু শেষ নয়, এখানে আরম্ভও নয়। সে জন্মজন্মান্তরের পথিক আত্মা, দূর হইতে কোন্ সুদূরের নিত্য নূতন পথহীন পথে তার গতি, এই বিপুল নীল আকাশ, অগণ্য জ্যোতির্লোক, সপ্তর্ষিমণ্ডল, ছায়াপথ, বিশাল অ্যান্ড্রোমিডা নীহারিকার জগৎ, বহির্ষদ পিতৃলোক—এই শত, সহস্র শতাব্দী তার পায়ে-চলার পথ—তার ও সকলের মৃত্যুদ্বারা অস্পষ্ট যে বিরাট জীবনটা নিউটনের মহাসমুদ্রের মত সকলেরই পুরোভাগে অক্ষুণ্ণভাবে বর্ত্তমান—নিঃসীম সময় বাহিয়া সে গতি সারা মানবের যুগে যুগে বাধাহীন হউক।…

অপু তাহাদের ঘাটের ধারে আসিল। ওইখানটিতে এমন এক সন্ধ্যার অন্ধকারে বনদেবী বিশালাক্ষী স্বরূপ চক্রবর্ত্তীকে দেখা দিয়াছিলেন কতকাল আগে !

আজ যদি আবার তাহাকে দেখা দেন !

—তুমি কে ?

—আমি অপু।

—তুমি বড় ভাল ছেলে। তুমি কি বর চাও ?

—অন্য কিছুই চাই নে, এ গাঁয়ের বনঝোপ, নদী, মাঠ, বাঁশবাগানের ছায়ায়, অবোধ, উদ্গ্রীব, স্বপ্নময় আমার সেই সে দশ বৎসর বয়সের শৈশবটি—তাকে আর একটিবার ফিরিয়ে দেবে দেবী ?

"You enter it by the Ancient way
Through Ivory Gate and Golden"…

ঠিক দুপুর বেলা।

রাণী কাজলকে আটকাইয়া রাখিতে পারে না···বেজায় চঞ্চল। এই আছে, কোথা দিয়া সে কখন বাহির হইয়া গিয়াছে—কেহ বলিতে পারে না।

সে রোজ জিজ্ঞাসা করে—পিসিমা, বাবা কবে আসবে? কতদিন দেরি হবে?

অপু যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছিল—রাণুদি, খোকাকে তোমার হাতে দিয়ে যাচ্ছি, ওকে এখানে রাখবে, ওকে ব'লো না আমি কোথা যাচ্ছি। যদি আমার জন্য কাঁদে, ভুলিয়ে রেখো—তুমি ছাড়া ওকাজ আর কেউ পারবে না।

রাণু চোখ মুছিয়া বলিয়াছিল—ওকে এ-রকম ফাঁকি দিতে তোর মন সরছে? বোকা ছেলে তাই বুঝিয়ে গেলি—যদি চালাক হ'ত?

অপু বলিয়াছিল, দেখ আর একটা কথা বলি। ওই বাঁশবনের জায়গাটা—তোমায় চল দেখিয়ে রাখি—একটা সোনার কৌটো মাটিতে পোঁতা আছে আজ অনেকদিন—মাটি খুঁড়লেই পাবে। আর যদি না ফিরি আর খোকা যদি বাঁচে—বৌমাকে কৌটোটা দিও সিঁদুর রাখতে। খোকাও কষ্ট পেয়ে মানুষ হোক—এত তাড়াতাড়ি স্কুলে ভর্ত্তি করার দরকার নেই। যেখানে যায় যেতে দিও—কেবল যখন ঘাটে যাবে, তুমি নিজে নাইতে নিয়ে যেও——সাঁতার জানে না, ছেলেমানুষ ডুবে যাবে। ও একটু ভীতু আছে, কিন্তু সে ভয় এ-নেই তা-নেই বলে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা ক'রো না—কি আছে কি নেই তা বলতে কেউ পারে না রাণুদি। কোনোদিকেই গোঁড়ামি ভাল নয়—তা ওর ওপর চাপাতে যাওয়ারও দরকার নেই। যা বোঝে বুঝুক, সেই ভাল।

অপু জানিত, কাজল শুধু তার কল্পনা-প্রবণতার জন্য ভীতু। এই কাল্পনিক ভয় সকল আনন্দ রোমান্স ও অজানা কল্পনার উৎস-মুখ। মুক্ত প্রকৃতির তলায় খোকার মনের সব বৈকাল ও রাত্রিগুলি অপূর্ব্ব রহস্যে রঙীন হইয়া উঠুক—মনে প্রাণে এই তাহার আশীর্ব্বাদ।

ভবঘুরে অপু আবার কোথায় চলিয়া গিয়াছে। হয়ত লীলার মুখের শেষ অনুরোধ রাখিতে কোন্ পোর্তো প্লাতার ডুবো জাহাজের সোনার সন্ধানেই বা বাহির হইয়াছে। গিয়াছেও প্রায় ছ'সাত মাস হইল।

সতুও অপুর ছেলেকে ভালবাসে। সে ছেলেবয়সের সেই দুষ্টু সতু আর নাই, এখন সংসারের কাছে ঠেকিয়া সম্পূর্ণ বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। এখন সে আবার খুব হরিভক্ত। গলায় মালা, মাথায় লম্বা চুল। দোকান হইতে ফিরিয়া হাত মুখ ধুইয়া রোয়াকে বসিয়া খোল লইয়া কীর্ত্তন গায়। নীলমণি রায়ের দরুন জমার বাগান বিক্রয় করিয়া অপুর কাছে সত্তর টাকা পাইয়াছিল—তাহা ছাড়া কাঁটিহার তামাকের চালান আনিবার জন্য অপুর নিকট আরও পঞ্চাশটি টাকা ধার স্বরূপ লইয়াছিল। এটা রাণীকে লুকাইয়া—কারণ রাণী জানিতে পারিলে মহা অনর্থ বাধাইত—কখনই টাকা লইতে দিত না।

কাজলের ঝোঁক পাখির উপর। এত পাখি সে কখনও দেখে নাই—তাহার মামার বাড়ির দেশে ঘিঞ্জি বসতি, এত বড় বন, মাঠ নাই—এখানে আসিয়া সে অবাক্ হইয়া গিয়াছে। রাত্রে শুইয়া শুইয়া মনে হয় পিছনের সমস্ত মাঠ, বন রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে দৈত্যদানো, ভূত ও শিয়ালের ভিড়ে ভরিয়া গিয়াছে—পিসিমার কাছে আরও ঘেঁষিয়া শোয়। কিন্তু দিনমানে আর ভয় থাকে না, তখন পাখির ডিম ও বাসা খুঁজিয়া বেড়াইবার খুব সুযোগ। রাণু বারণ করিয়াছে—গাঙের ধারের পাখির গর্ত্তে হাত দিও না কাজল, সাপ থাকে। শোনে না, সেদিনও গিয়াছিল পিসিমাকে লুকাইয়া, কিন্তু অন্ধকার হইয়া গেলেই তার যত ভয়।

দুপুরে সেদিন পিসিমাদের বাড়ির পিছনে বাঁশবনে পাখির বাসা খুঁজিতে বাহির হইয়াছিল। সবে শীতকাল শেষ হইয়া রৌদ্র বেজায় চড়িয়াছে, আকাশে বাতাসে বনে কেমন

গন্ধ। বাবা তাহাকে কত বনের গাছ, পাখি চিনাইয়া দিয়া গিয়াছে, তাই সে জানে কোথায় বনমরিচার লতায় থোকা থোকা সুগন্ধ-ফুল ধরিয়াছে, কেলেকোঁড়ার লতার কচি ডগা ঝোপের মাথায় মাথায় সাপের মত দুলিতেছে।

কখনও সে ঠাকুরদাদার পোড়ো ভিটাটাতে ঢোকে নাই। বাহির হইতে তাহার বাবা তাহাকে দেখাইয়াছিল, বোধ হয় ঘন বন বলিয়া ভিতরে লইয়া যায় নাই। একবার ঢুকিয়া দেখিতে খুব কৌতূহল হইল।

জায়গাটা খুব উঁচু ঢিবিমত। কাজল এদিক ওদিক চাহিদা ঢিবিটার উপরে উঠিল—তার পরে ঘন কুঁচকাঁটা ও শ্যাওড়া বনের বেড়া ঠেলিয়া নিচের উঠানে নামিল। চারিধারে ইট, বাঁশের কঞ্চি, ঝোপঝাপ। পাখি নাই এখানে? এখানে তো কেউ আসে না—কত পাখির বাসা আছে হয়ত—কে বা খোঁজ রাখে?

বসন্তবৌরী ডাকে—টুকুলি, টুকুলি—তাহার বাবা চিনাইয়াছিল, কোথায় বাসাটা? না, এমনি ডালে বসিয়া ডাকিতেছে?

মুখ উঁচু করিয়া খোকা ঝিকড়ে গাছের ঘন ডালপালার দিকে উৎসুক চোখে দেখিতে লাগিল।

এক ঝলক হাওয়া যেন পাশের পোড়ো ঢিবিটার দিক হইতে অভিনন্দন বহন করিয়া আনিল—সঙ্গে সঙ্গে ভিটার মালিক ব্রজ চক্রবর্ত্তী, ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়, ঠাকুরদাদা হরিহর রায়, ঠাকুরমা সর্ব্বজয়া, পিসিমা দুর্গা—জানা অজানা সমস্ত পূর্ব্বপুরুষ দিবসের প্রসন্ন হাসিতে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল—এই যে তুমি—আমাদের হয়ে ফিরে এসেছ, আমাদের সকলের প্রতিনিধি যে আজ তুমি—আমাদের আশীর্ব্বাদ নাও, বংশের উপযুক্ত হও।

আরও হইল। সোঁদালী বনের ছায়া হইতে জল আহরণরত সহদেব, ঠাকুরমাদের বেলতলা হইতে শরশয্যাশায়িত ভীষ্ম, এ ঝোপের ও ঝোপের তলা হইতে বীর কর্ণ, গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন, অভাগিনী ভানুমতী, কপিধ্বজ রথে সারথি শ্রীকৃষ্ণ, পরাজিত রাজপুত্র দুর্যোধন, তমসাতীরের পর্ণকুটিরে প্রীতিমতী, তাপসবধূ বেষ্টিতা অশ্রুমুখী ভগবতী দেবী জানকী, স্বয়ংবর সভায় বরমাল্যহস্তে ভ্রাম্যমাণা আনতবদনা সুন্দরী সুভদ্রা, মধ্যাহ্নের খররৌদ্রের মাঠে মাঠে গোচারণরত সহায়-সম্পদহীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পুত্র ত্রিজট—হাতছানি দিয়া হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল—এই যে তুমি, এই যে আবার ফিরে এসেছ! চেন না আমাদের? কত দুপুরে ভাঙা জানালাটায় বসে বসে আমাদের সঙ্গে মুখোমুখি যে কত পরিচয়! এসো …এসো…এসো…

সঙ্গে সঙ্গে রাণুর গলা শোনা গেল—ও খোকা, ওরে দুষ্টু ছেলে, এই এক গলা বনের মধ্যে ঢুকে তোমার কি হচ্ছে জিজ্ঞেস করি—বেরিয়ে আয় বলছি। খোকা হাসিমুখে বাহির হইয়া আসিল। সে পিসিমাকে মোটেই ভয় করে না। সে জানে পিসিমা তাকে খুব ভালবাসে—দিদিমার পরে এক বাবা ছাড়া তাকে এমন ভাল আর কেউ বাসে নাই।

হঠাৎ সেই সময় রাণুর মনে হইল অপু ঠিক এমনি দুষ্টু মুখের ভঙ্গি করিত ছেলেবেলায় —ঠিক এমনটি।

যুগে যুগে অপরাজিত জীবন-রহস্য কি অপূর্ব্ব মহিমাতেই আবার আত্মপ্রকাশ করে!

খোকার বাবা একটু ভুল করিয়াছিল।

চব্বিশ বৎসরের অনুপস্থিতির পর অবোধ বালক অপু আবার নিশ্চিন্দিপুরে ফিরিয়া আসিয়াছে।

'অপরাজিত' সম্পূর্ণ

আরণ্যক

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রস্তাবনা

সমস্ত দিন আপিসের হাড়ভাঙা খাটুনির পরে গড়ের মাঠে ফোর্টের কাছ ঘেঁষিয়া বসিয়া ছিলাম।

নিকটেই একটা বাদাম গাছ, চুপ করিয়া খানিকটা বসিয়া বাদামগাছের সামনে ফোর্টের পরিখার ঢেউখেলানো জমিটা দেখিয়া হঠাৎ মনে হইল যেন লবটুলিয়ার উত্তর সীমানায় সরস্বতী কুণ্ডীর ধারে সন্ধ্যাবেলায় বসিয়া আছি। পরক্ষণেই পলাশী গেটের পথে মোটর-হর্নের আওয়াজে সে ভ্রম ঘুচিল।

অনেক দিনের কথা হইলেও কালকার বলিয়া মনে হয়।

কলিকাতা শহরের হৈ-চৈ কর্মকোলাহলের মধ্যে অহরহ ডুবিয়া থাকিয়া এখন যখন লবটুলিয়া বইহার কি আজমাবাদের সে অরণ্য-ভূভাগ, সে জ্যোৎস্না, সে তিমিরময়ী স্তব্ধ রাত্রি, ধু-ধু ঝাউবন আর কাশবনের চর, দিগ্বলয়লীন ধূসর শৈলশ্রেণী, গভীর রাত্রে বন্য নীল-গাইয়ের দলের দ্রুত পদধ্বনি, খররৌদ্র-মধ্যাহ্নে সরস্বতী কুণ্ডীর জলের ধারে পিপাসার্ত বন্য মহিষ, সে অপূর্ব মুক্ত শিলাস্তৃত প্রান্তরে রঙিন বনফুলের শোভা, ফুটন্ত রক্তপলাশের ঘন অরণ্যের কথা ভাবি, তখন মনে হয় বুঝি কোন অবসর-দিনের শেষে সন্ধ্যায় ঘুমের ঘোরে এক সৌন্দর্যভরা জগতের স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, পৃথিবীতে তেমন দেশ যেন কোথাও নাই।

শুধু বনপ্রান্তর নয়, কত ধরনের মানুষ দেখিয়াছিলাম।

কুন্তা....মুসম্মত কুন্তার কথা মনে হয়। এখনও যেন সুংঠিয়া বইহারের বিস্তীর্ণ বন্যকুলের জঙ্গলে সে দরিদ্র মেয়েটি তার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে লইয়া বন্যকুল সংগ্রহ করিয়া তাহার দৈনন্দিন সংসার-যাত্রার ব্যবস্থায় ব্যস্ত।

নয়ত জ্যোৎস্না-ভরা গভীর শীতের রাত্রে সে আমার পাতের ভাত লইবার আশায় আজমাবাদ কাছারির প্রাঙ্গণের এক কোণে, ইঁদারাটার কাছে দাঁড়াইয়া আছে।

মনে হয় ধাতুরিয়ার কথা....নাটুয়া বালক ধাতুরিয়া!....

দক্ষিণ দেশে ধরমপুর পরগণার ফসল মারা যাওয়াতে ধাতুরিয়া নাচিয়া গাহিয়া পেটের ভাত জুটাইতে আসিয়াছিল, লবটুলিয়া অঞ্চলের জনবিরল বন্য গ্রামগুলিতে....চীনা ঘাসের দানা ভাজা আর আখের গুড় খাইতে পাইয়া কি খুশির হাসি দেখিয়াছিলাম তার মুখে! কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া চুল, ডাগর চোখ, একটু মেয়েলি ধরনের ভাবভঙ্গী, বছর তের-চৌদ্দ বয়সের সুশ্রী ছেলেটি; সংসারে বাপ নাই, মা নাই, কেহ কোথাও নাই, তাই সেই অল্প বয়সেই তাহাকে নিজের চেষ্টা নিজেকেই দেখিতে হয়... সংসারের স্রোতে কোথায় ভাসিয়া গেল আবার। মনে পড়ে সরল মহাজন ধাওতাল সাহুকে। আমার খড়ের বাংলোর কোণটাতে বসিয়া সে বড় বড় সুপারি জাঁতি দিয়া কাটিতেছে। গভীর জঙ্গলের মধ্যে ছোট কুঁড়েঘরের ধারে বসিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ রাজু পাঁড়ে তিনটি মহিষ চরাইতেছে এবং আপনমনে গাহিতেছে—

দয়া হোই জী—

মহালিখারূপের পাহাড়ের পাদদেশে বিশাল বনপ্রান্তরে বসন্ত নামিয়াছে, লবটুলিয়া বইহারের সর্বত্র হলুদ রঙের গোলগোলি ফুলের মেলা, দ্বিপ্রহরে তাম্রাভ রৌদ্রদগ্ধ দিগন্ত বালির

ঝড়ে ঝাপসা, রাত্রে দূরে মহালিখারূপের পাহাড়ে আগুনের মালা, শালবনে আগুন দিয়াছে, কত অতিদরিদ্র বালক-বালিকা, নরনারী, কত দুর্দান্ত প্রকৃতির মহাজন, গায়ক, কাঠুরে, ভিখারীর বিচিত্র জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল। অন্ধকার প্রান্তরে খড়ের বাংলোয় বসিয়া বসিয়া বন্য শিকারীর মুখে অদ্ভুত গল্প শুনিতাম, মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের মধ্যে গভীর রাত্রিতে বন্যমহিষ শিকার করিতে গিয়া ডালপালা ঢাকা গর্তের ধারে বিরাটকায় বন্য মহিষদের দেবতাকে তারা দেখিয়াছিল।

ইহাদের কথাই বলিব। জগতের যে পথে সভ্য মানুষের চলাচল কম, কত অদ্ভুত জীবনধারার স্রোত আপনমনে উপলবিকীর্ণ অজানা নদীখাত দিয়া ঝিরঝির করিয়া বহিয়া চলে সে পথে, তাহাদের সহিত পরিচয়ের স্মৃতি আজও ভুলিতে পারি নাই।

কিন্তু আমার এ স্মৃতি আনন্দের নয়, দুঃখের। এই স্বচ্ছন্দ প্রকৃতির লীলাভূমি আমার হাতেই বিনষ্ট হইয়াছিল, বনের দেবতারা সেজন্য আমায় কখনও ক্ষমা করিবেন না জানি। নিজের অপরাধের কথা নিজের মুখে বলিলে অপরাধের ভার শুনিয়াছি লঘু হইয়া যায়।

তাই এই কাহিনীর অবতারণা।

প্রথম পরিচ্ছেদ

১

পনের-ষোল বছর আগেকার কথা। বি.এ. পাস করিয়া কলিকাতায় বসিয়া আছি। বহু জায়গায় ঘুরিয়াও চাকুরি মিলিল না।

সরস্বতী-পূজার দিন। মেসে অনেকদিন ধরিয়া আছি তাই নিতান্ত তাড়াইয়া দেয় না, কিন্তু তাগাদার উপর তাগাদা দিয়া মেসের ম্যানেজার অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। মেসে প্রতিমা গড়াইয়া পূজা হইতেছে—ধুমধামও মন্দ নয়, সকালে উঠিয়া ভাবিতেছি আজ সব বন্ধ, দু-একটা জায়গায় একটু আশা দিয়াছিল, তা আজ আর কোথাও যাওয়া কোন কাজের হইবে না, বরং তার চেয়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঠাকুর দেখিয়া বেড়াই।

মেসের চাকর জগন্নাথ এমন সময় একটুকরা কাগজ হাতে দিয়া গেল। পড়িয়া দেখিলাম ম্যানেজারের লেখা তাগাদার চিঠি। আজ মেসে পূজা-উপলক্ষে ভালো খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে, আমার কাছে দু মাসের টাকা বাকি, আমি যেন চাকরের হাতে অন্তত দশটি টাকা দিই। অন্যথা কাল হইতে খাওয়ার জন্য আমাকে অন্যত্র ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কথা খুব ন্যায্য বটে, কিন্তু আমার সম্বল মোটে দুটি টাকা আর কয়েক আনা পয়সা। কোন জবাব না দিয়াই মেস হইতে বাহির হইলাম। পাড়ার নানা স্থানে পূজার বাজনা বাজিতেছে, ছেলেমেয়েরা গলির মোড়ে দাঁড়াইয়া গোলমাল করিতেছে, অভয় ময়রার খাবারের দোকানে অনেক রকম নতুন খাবার থালায় সাজানো—বড়রাস্তার ওপারে কলেজ হোস্টেলের ফটকে নহবৎ বসিয়াছে। বাজার হইতে দলে দলে লোক ফুলের মালা ও পূজার উপকরণ কিনিয়া ফিরিতেছে।

ভাবিলাম কোথায় যাওয়া যায়। আজ এক বছরের উপর হইল জোড়াসাঁকো স্কুলের চাকুরি ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া আছি—অথবা বসিয়া ঠিক নাই, চাকুরির খোঁজে হেন মার্চেন্ট আপিস নাই, হেন স্কুল নাই, হেন খবরের কাগজের আপিস নাই, হেন বড়লোকের বাড়ি নাই—

যেখানে অন্তত দশ বার না হাঁটাহাঁটি করিয়াছি, কিন্তু সকলেরই এক কথা, চাকুরি খালি নাই।

হঠাৎ পথে সতীশের সঙ্গে দেখা। সতীশের সঙ্গে হিন্দু হোস্টেলে একসঙ্গে থাকিতাম। বর্তমানে সে আলিপুরের উকিল, বিশেষ কিছু হয় বলিয়া মনে হয় না, বালিগঞ্জের ওদিকে কোথায় একটা টিউশনি আছে, সেটাই সংসারসমুদ্রে বর্তমানে তাহার পক্ষে ভেলার কাজ করিতেছে। আমার ভেলা তো দূরের কথা, একখানা মাস্তুল-ভাঙা কাঠও নাই, যতদূর হাবুডুবু খাইবার তাহা খাইতেছি—সতীশকে দেখিয়া সে কথা আপাতত ভুলিয়া গেলাম। ভুলিয়া গেলাম তাহার আর একটা কারণ, সতীশ বলিল—এই যে, কোথায় চলেছ সত্যচরণ? চল হিন্দু হোস্টেলের ঠাকুর দেখে আসি—আমাদের পুরনো জায়গাটা। আর ওবেলা বড় জল্‌সা হবে—এসো। ওয়ার্ড সিক্সের সেই অবিনাশকে মনে আছে, সেই যে ময়মনসিংহের কোন্ জমিদারের ছেলে, সে যে আজকাল বড় গায়ক। সে গান গাইবে, আমায় আবার একখানা কার্ড দিয়েছে—তাদের এস্টেটের দু-একটা কাজকর্ম মাঝে মাঝে করি কিনা। এসো, তোমায় দেখলে সে খুশি হবে।

কলেজে পড়িবার সময়, আজ পাঁচ-ছয় বছর আগে, আমোদ পাইলে আর কিছু চাহিতাম না—এখনও সে মনের ভাব কাটে নাই দেখিলাম। হিন্দু হোস্টেলে ঠাকুর দেখিতে গিয়া সেখানে মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ পাইলাম। কারণ আমাদের দেশের অনেক পরিচিত ছেলে এখানে থাকে, তাহারা কিছুতেই আসিতে দিতে চাহিল না। বলিলাম—বিকেলে জল্‌সা হবে, তা এখন কি! মেস থেকে খেয়ে আসব এখন।

তাহারা সে কথায় কর্ণপাত করিল না।

কর্ণপাত করিলে আমাকে সরস্বতী-পূজার দিনটা উপবাসে কাটাইতে হইত। ম্যানেজারের অমন কড়া চিঠির পরে আমি গিয়া মেসের লুচি পায়েসের ভোজ খাইতে পারিতাম না—যখন একটা টাকাও দিই নাই। এ বেশ হইল—পেট ভরিয়া নিমন্ত্রণ খাইয়া বৈকালে জল্‌সার আসরে গিয়া বসিলাম। আবার তিন বৎসর পূর্বের ছাত্র-জীবনের উল্লাস ফিরিয়া আসিল—কে মনে রাখে—যে চাকুরি পাইলাম কি না-পাইলাম, মেসের ম্যানেজার মুখ হাঁড়ি করিয়া বসিয়া আছে কি না-আছে। ঠুংরি ও কীর্তনের সমুদ্রে তলাইয়া গিয়া ভুলিয়া গেলাম যে দেনা মিটাইতে না পারিলে কাল সকাল হইতে বায়ু ভক্ষণের ব্যবস্থা হইবে। জল্‌সা যখন ভাঙিল তখন রাত এগারোটা। অবিনাশের সঙ্গে আলাপ হইল, হিন্দু হোস্টেলে থাকিবার সময় সে আর আমি ডিবেটিং ক্লাবের চাঁই ছিলাম—একবার স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা সভাপতি করিয়াছিলাম। বিষয় ছিল, "স্কুল-কলেজে বাধ্যতামূলক ধর্মশিক্ষা প্রবর্তন করা উচিত"। অবিনাশ প্রস্তাবকর্তা আমি প্রতিবাদী-পক্ষের নায়ক। উভয় পক্ষের তুমুল তর্কের পরে সভাপতি আমাদের পক্ষে মত দিলেন। সেই হইতে অবিনাশের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হইয়া যায়—যদিও কলেজ হইতে বাহির হইয়া এই প্রথম আবার তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ।

অবিনাশ বলিল—চল, আমার গাড়ি রয়েছে—তোমাকে পৌঁছে দিই। কোথায় থাক?

মেসের দরজায় নামাইয়া দিয়া বলিল—শোন, কাল হ্যারিংটন স্ট্রীটে আমার বাড়িতে চা খাবে বিকেল চারটের সময়। ভুলো না যেন। তেত্রিশের দুই। লিখে রাখো তো নোট-বইয়ে।

পরদিন খুঁজিয়া হ্যারিংটন স্ট্রীট বাহির করিলাম, বন্ধুর বাড়িও বাহির করিলাম। বাড়ি খুব বড় নয়, তবে সামনে পিছনে বাগান। গেটে উইস্টারিয়া লতা, নেপালী দারোয়ান, ও পিতলের প্লেট। লাল সুরকির বাঁকা রাস্তা—রাস্তার এক ধারে সবুজ ঘাসের লন, অন্য ধারে বড় বড়

মুচুকুন্দ চাঁপা ও আমগাছ। গাড়িবারান্দায় বড় একখানা মোটর গাড়ি। বড়লোকের বাড়ি নয় বলিয়া ভুল করিবার কোন দিক হইতে কোন উপায় নাই। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়াই বসিবার ঘর। অবিনাশ আসিয়া আদর করিয়া ঘরে বসাইল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পুরাতন দিনের কথাবার্তায় আমরা দু'জনেই মশগুল হইয়া গেলাম। অবিনাশের বাবা ময়মনসিংহের একজন বড় জমিদার, কিন্তু সম্প্রতি কলিকাতার বাড়িতে তাঁহারা কেহই নাই। অবিনাশের এক ভগ্নীর বিবাহ উপলক্ষে গত অগ্রহায়ণ মাসে দেশে গিয়াছিলেন—এখনও কেহই আসেন নাই।

এ-কথা ও-কথার পর অবিনাশ বলিল—এখন কি করছ সত্য?

বলিলাম—জোড়াসাঁকো স্কুলে মাস্টারি করতুম, সম্প্রতি বসেই আছি একরকম। ভাবছি আর মাস্টারি করব না। দেখছি অন্য কোন দিকে যদি—দু-এক জায়গায় আশাও পেয়েছি।

আশা পাওয়ার কথা সত্য নয়, কিন্তু অবিনাশ বড়লোকের ছেলে, মস্তবড় এস্টেট ওদের। তাহার কাছে চাকুরির উমেদারি করিতেছি এটা না দেখায়, তাই কথাটা বলিলাম।

অবিনাশ একটুখানি ভাবিয়া বলিল—তোমার মত একজন উপযুক্ত লোকের চাকুরি পেতে দেরি হবে না অবিশ্যি। আমার একটা কথা আছে, তুমি তো আইনও পড়েছিলে—না?

বলিলাম—পাসও করেছি, কিন্তু ওকালতি করবার মতিগতি নেই।

অবিনাশ বলিল—আমাদের একটা জঙ্গল-মহাল আছে পূর্ণিয়া জেলায়। প্রায় বিশ-ত্রিশ হাজার বিঘে জমি। আমাদের সেখানে নায়েব আছে কিন্তু তার ওপর বিশ্বাস করে অত জমি বন্দোবস্তের ভার দেওয়া চলে না। আমরা একজন উপযুক্ত লোক খুঁজছি। তুমি যাবে?

কান অনেক সময় মানুষকে প্রবঞ্চনা করে জানিতাম। অবিনাশ বলে কি! যে চাকুরির খোঁজে আজ একটি বছর কলিকাতার রাস্তাঘাট চষিয়া বেড়াইতেছি, চায়ের নিমন্ত্রণে সম্পূর্ণ অযাচিতভাবে সেই চাকুরির প্রস্তাব আপনা হইতে সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল?

তবুও মান বজায় রাখিতে হইবে। অত্যন্ত সংযমের সহিত মনের ভাব চাপিয়া উদাসীনের মত বলিলাম—ও! আচ্ছা ভেবে বলব। কাল আছ তো?

অবিনাশ খুব খোলাখুলি ও দিলদরিয়া মেজাজের মানুষ। বলিল—ভাবাভাবি রেখে দাও। আমি বাবাকে আজই পত্র লিখতে বসছি। আমরা একজন বিশ্বাসী লোক খুঁজছি। জমিদারির ঘুণ কর্মচারী আমরা চাই নে—কারণ তারা প্রায়ই চোর। তোমার মত শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান লোকের সেখানে দরকার। জঙ্গল-মহাল আমরা নতুন প্রজার সঙ্গে বন্দোবস্ত করব। ত্রিশ হাজার বিঘের জঙ্গল। অত দায়িত্বপূর্ণ কাজ কি যার-তার হাতে ছেড়ে দেওয়া যায়? তোমার সঙ্গে আজ আলাপ নয়, তোমার নাড়ীনক্ষত্র আমি জানি। তুমি রাজি হয়ে যাও—আমি এখুনি বাবাকে লিখে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আনিয়ে দিচ্ছি।

২

কি করিয়া চাকুরি পাইলাম তাহা বেশি বলিবার আবশ্যক নাই। কারণ এ গল্পের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সংক্ষেপে বলিয়া রাখি—অবিনাশের বাড়ির চায়ের নিমন্ত্রণ খাইবার দুই সপ্তাহ পরে আমি একদিন নিজের জিনিসপত্র লইয়া বি এন্ ডব্লিউ রেলওয়ের একটা ছোট স্টেশনে নামিলাম।

শীতের বৈকাল। বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ঘন ছায়া নামিয়াছে, দূরে বনশ্রেণীর মাথায় মাথায় অল্প অল্প কুয়াশা জমিয়াছে। রেল-লাইনের দু-ধারে মটর-ক্ষেত, শীতল সান্ধ্য-বাতাসে তাজা মটরশাকের স্নিগ্ধ সুগন্ধে কেমন মনে হইল যে-জীবন আরম্ভ করিতে যাইতেছি তাহা বড়

নির্জন হইবে, এই শীতের সন্ধ্যা যেমন নির্জন, যেমন নির্জন এই উদার প্রান্তর আর ওই দূরের নীলবর্ণ বনশ্রেণী, তেমনি।

গরুর গাড়িতে প্রায় পনের-ষোল ক্রোশ চলিলাম সারারাত্রি ধরিয়া—ছইয়ের মধ্যে কলিকাতা হইতে আনীত কম্বল রাগ ইত্যাদি শীতে জল হইয়া গেল—কে জানিত এ-সব অঞ্চলে ভয়ানক শীত! সকালে রৌদ্র যখন উঠিয়াছে, তখনও পথ চলিতেছি। দেখিলাম, জমির প্রকৃতি বদলাইয়া গিয়াছে—প্রাকৃতিক দৃশ্যও অন্য মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে—ক্ষেতখামার নাই, বস্তি লোকালয়ও বড়-একটা দেখা যায় না—কেবল ছোটবড় বন, কোথাও ঘন, কোথাও পাতলা, মাঝে মাঝে মুক্ত প্রান্তর, কিন্তু তাহাতে ফসলের আবাদ নাই।

কাছারিতে পৌঁছিলাম বেলা দশটার সময়। জঙ্গলের মধ্যে প্রায় দশ-পনেরো বিঘা জমি পরিষ্কার করিয়া কতকগুলি খড়ের ঘর, জঙ্গলেরই কাঠ, বাঁশ ও খড় দিয়া তৈরি—ঘরে শুক্‌নো ঘাস ও বন-ঝাউয়ের সরু গুঁড়ির বেড়া, তাহার উপর মাটি দিয়া লেপা।

ঘরগুলি নতুন তৈরি, ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াই টাটকা-কাটা খড়, আধকাঁচা ঘাস ও বাঁশের গন্ধ পাওয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, আগে জঙ্গলের ওদিকে কোথায় কাছারি ছিল, কিন্তু শীতকালে সেখানে জলাভাব হওয়ায় এই ঘর নতুন বাঁধা হইয়াছে, কারণ পাশেই একটা ঝরনা থাকায় এখানে জলের কষ্ট নাই।

৩

জীবনের বেশির ভাগ সময় কলিকাতায় কাটাইয়াছি। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গ, লাইব্রেরি, থিয়েটার, সিনেমা, গানের আড্ডা—এসব ভিন্ন জীবন কল্পনা করিতে পারি না—এ অবস্থায় চাকুরির কয়েকটি টাকার খাতিরে যেখানে আসিয়া পড়িলাম, এত নির্জন স্থানের কল্পনাও কোনদিন করি নাই। দিনের পর দিন যায়, পূর্বাকাশে সূর্যের উদয় দেখি দূরের পাহাড় ও জঙ্গলের মাথায়, আবার সন্ধ্যায় সমগ্র বনঝাউ ও দীর্ঘ ঘাসের বনশীর্ষ সিঁদুরে রঙে রাঙাইয়া সূর্যকে ডুবিয়া যাইতে দেখি—ইহার মধ্যে শীতকালের যে এগার-ঘণ্টা ব্যাপী দিন, তা যেন খাঁ-খাঁ করে শূন্য, কি করিয়া তাহা পুরাইব, প্রথম প্রথম সেইটা আমার পক্ষে হইল মহাসমস্যা। কাজকর্ম করিলে অনেক করা যায় বটে, কিন্তু আমি নিতান্ত নব আগন্তুক, এখনও ভাল করিয়া এখানকার লোকের ভাষা বুঝিতে পারি না, কাজের কোন বিলিব্যবস্থাও করিতে পারি না, নিজের ঘরে বসিয়া বসিয়া, যে কয়খানি বই সঙ্গে আনিয়াছিলাম তাহা পড়িয়াই কোন রকমে দিন কাটাই। কাছারিতে লোকজন যারা আছে তারা নিতান্ত বর্বর, না বোঝে তাহারা আমার কথা, না আমি ভাল বুঝি তাহাদের কথা। প্রথম দিন-দশেক কি কষ্টে যে কাটিল! কতবার মনে হইল চাকুরিতে দরকার নাই, এখানে হাঁপাইয়া মরার চেয়ে আধপেটা খাইয়া কলিকাতায় থাকা ভাল। অবিনাশের অনুরোধে কি ভুলই করিয়াছি এই জনহীন জঙ্গলে আসিয়া, এ-জীবন আমার জন্য নয়।

রাত্রিতে নিজের ঘরে বসিয়া এই সবই ভাবিতেছি, এমন সময় ঘরের দরজা ঠেলিয়া কাছারির বৃদ্ধ মুহুরী গোষ্ঠ চক্রবর্তী প্রবেশ করিলেন। এই একমাত্র লোক যাহার সহিত বাংলা কথা বলিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচি। গোষ্ঠবাবু এখানে আছেন অন্তত সতের-আঠার বছর। বর্ধমান জেলায় বনপাশ স্টেশনের কাছে কোন্ গ্রামে বাড়ি। বলিলাম, বসুন গোষ্ঠবাবু—

গোষ্ঠবাবু অন্য একখানা চেয়ারে বসিলেন। বলিলেন—আপনাকে একটা কথা বলতে এলাম

নিরিবিলি, এখানকার কোনও মানুষকে বিশ্বাস করবেন না। এ বাংলা দেশ নয়। লোকজন সব বড় খারাপ—

—বাংলা দেশের মানুষও সবাই যে খুব ভাল, এমন নয় গোষ্ঠবাবু—

—সে আর আমার জানতে বাকি নেই, ম্যানেজারবাবু। সেই দুঃখে আর ম্যালেরিয়ার তাড়নায় প্রথমে এখানে আসি। প্রথম এসে বড় কষ্ট হত, এ জঙ্গলে মন হাঁপিয়ে উঠত—আজকাল এমন হয়েছে, দেশ তো দূরের কথা, পূর্ণিয়া কি পাটনাতে কাজে গিয়ে দু-দিনের বেশি তিন দিন থাকতে পারি নে।

গোষ্ঠবাবুর মুখের দিকে সকৌতুকে চাহিলাম—বলে কি!

জিজ্ঞাসা করিলাম—থাকতে পারেন না কেন? জঙ্গলের জন্য মন হাঁপায় নাকি?

গোষ্ঠবাবু আমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন। বলিলেন, ঠিক তাই, ম্যানেজারবাবু। আপনিও বুঝবেন। নতুন এসেছেন কলকাতা থেকে, কলকাতার জন্যে মন উড়ুউড়ু করছে, বয়সও আপনার কম। কিছুদিন এখানে থাকুন। তারপর দেখবেন।

—কি দেখব?

—জঙ্গল আপনাকে পেয়ে বসবে। কোন গোলমাল কি লোকের ভিড় ক্রমশ আর ভাল লাগবে না। আমার তাই হয়েছে মশাই। এই গত মাসে মুঙ্গের গিয়েছিলাম মোকদ্দমার কাজে—কেবল মনে হয় কবে এখান থেকে বেরুব।

মনে মনে ভাবিলাম, ভগবান সে দুরবস্থার হাত থেকে আমায় উদ্ধার করুন। তার আগে চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া কোন্‌কালে কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়াছি!

গোষ্ঠবাবু বলিলেন, বন্দুকটা রাত-বেরাত শিয়রে রেখে শোবেন, জায়গা ভাল নয়। এর আগে একবার কাছারিতে ডাকাতি হয়ে গিয়েছে। তবে আজকাল এখানে আর টাকাকড়ি থাকে না, এই যা কথা।

কৌতূহলের সহিত বলিলাম, বলেন কি! কতকাল আগে ডাকাতি হয়েছিল?

—বেশি না। এই বছর আট-নয় আগে। কিছুদিন থাকুন, তখন সব কথা জানতে পারবেন। এ অঞ্চল বড় খারাপ। তা ছাড়া এই ভয়ানক জঙ্গলে ডাকাতি করে মেরে নিলে দেখবেই বা কে?

গোষ্ঠবাবু চলিয়া গেলে একবার ঘরের জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দূরে জঙ্গলের মাথায় চাঁদ উঠিতেছে—আর সেই উদীয়মান চন্দ্রের পটভূমিকায় আঁকাবাঁকা একটা বনঝাউয়ের ডাল ঠিক যেন জাপানী চিত্রকর হকুসাই-অঙ্কিত একখানি ছবি।

চাকুরি করিবার আর জায়গা খুঁজিয়া পাই নাই! এসব বিপজ্জনক স্থান, আগে জানিলে কখনই অবিনাশকে কথা দিতাম না।

দুর্ভাবনা সত্ত্বেও উদীয়মান চন্দ্রের সৌন্দর্য আমাকে বড় মুগ্ধ করিল।

৪

কাছারির অনতিদূরে একটা ছোট পাথরের টিলা, তার উপর প্রাচীন ও সুবৃহৎ একটা বটগাছ। এই বটগাছের নাম গ্র্যান্ট সাহেবের বটগাছ। কেন এই নাম হইল, তখন অনুসন্ধান করিয়াও কিছু জানিতে পারি নাই। একদিন নিস্তব্ধ অপরাহ্ণে বেড়াইতে বেড়াইতে পশ্চিম দিগন্তে সূর্যাস্তের শোভা দেখিতে টিলার উপরে উঠিলাম।

টিলার উপরকার বটতলায় আসন্ন সন্ধ্যার ঘন ছায়ায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কত দূর পর্যন্ত এক চমকে দেখিতে পাইলাম—কলুটোলার মেস, কপালীটোলার সেই ব্রিজের আড্ডাটি, গোলদীঘিতে আমার প্রিয় বেঞ্চখানা—প্রতিদিন এমন সময়ে যাহাতে গিয়া বসিয়া কলেজ স্ট্রীটের বিরামহীন জনস্রোত ও বাস্ মোটরের ভিড় দেখিতাম। হঠাৎ যেন কত দূরে পড়িয়া রহিয়াছে মনে হইল তাহারা। মন হু-হু করিয়া উঠিল—কোথায় আছি! কোথাকার জনহীন অরণ্যে-প্রান্তরে খড়ের চালায় বাস করিতেছি চাকুরির খাতিরে! মানুষ এখানে থাকে? লোক নাই, জন নাই, সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ—একটা কথা কহিবার মানুষ পর্যন্ত নাই। এদেশের এই সব মূর্খ, বর্বর মানুষ, এরা একটা ভাল কথা বলিলে বুঝিতে পারে না—এদেরই সাহচর্যে দিনের পর দিন কাটাইতে হইবে? সেই দূরবিসর্পী দিগন্তব্যাপী জনহীন সন্ধ্যার মধ্যে দাঁড়াইয়া মন উদাস হইয়া গেল, কেমন ভয়ও হইল। তখন সঙ্কল্প করিলাম, এ মাসের আর সামান্য দিনই বাকি, সামনের মাসটা কোনরূপে চোখ বুজিয়া কাটাইব, তার পর অবিনাশকে একখানা লম্বা পত্র লিখিয়া চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া সভ্য বন্ধুবান্ধবদের অভ্যর্থনা পাইয়া, সভ্য খাদ্য খাইয়া, সভ্য সুরের সঙ্গীত শুনিয়া, মানুষের ভিড়ের মধ্যে ঢুকিয়া, বহু মানবের আনন্দ-উল্লাসভরা কণ্ঠস্বর শুনিয়া বাঁচিব।

পূর্বে কি জানিতাম মানুষের মধ্যে থাকিতে এত ভালবাসি! মানুষকে এত ভালবাসি! তাহাদের প্রতি আমার যে কর্তব্য হয়ত সব সময় তাহা করিয়া উঠিতে পারি না,—কিন্তু ভালবাসি তাহাদের নিশ্চয়ই। নতুবা এত কষ্ট পাইব কেন তাহাদের ছাড়িয়া আসিয়া?

প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিঙে বই বিক্রী করে সেই যে বৃদ্ধ মুসলমানটি, কতদিন তাহার দোকানে দাঁড়াইয়া পুরনো বই ও মাসিক পত্রিকার পাতা উল্টাইয়াছি—কেনা উচিত ছিল হয়ত, কিন্তু কেনা হয় নাই—সেও যেন পরম আত্মীয় বলিয়া মনে হইল—তাহাকে আজ কতদিন দেখি নাই।

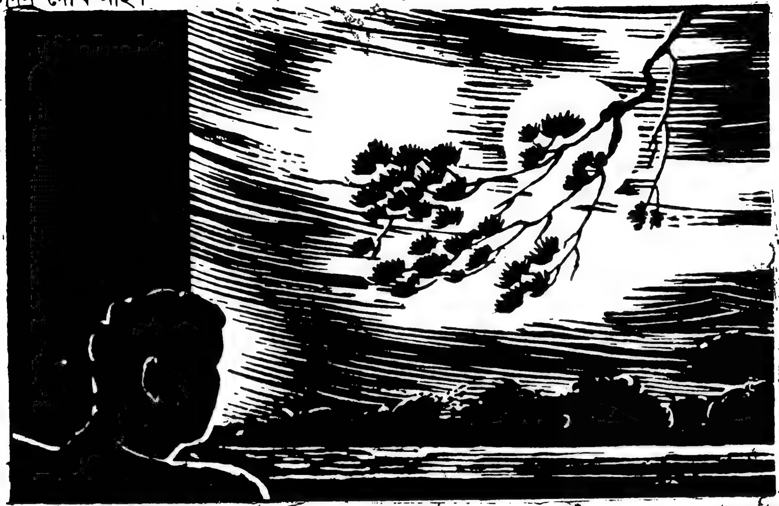

কাছারিতে ফিরিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া টেবিলে আলো জ্বালিয়া একখানা বই লইয়া বসিয়াছি, সিপাহী মুনেশ্বর সিং আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। বলিলাম—কি মুনেশ্বর?

ইতিমধ্যে দেহাতি হিন্দি কিছু কিছু বলিতে শিখিয়াছিলাম।

মুনেশ্বর বলিল—হুজুর, আমায় একখানা লোহার কড়া কিনে দেবার হুকুম যদি দেন মুহুরী বাবুকে।

—কি হবে লোহার কড়া?

মুনেশ্বরের মুখ প্রাপ্তির আশায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বিনীত সুরে বলিল—একখানা লোহার কড়া থাকলে কত সুবিধে হুজুর। যেখানে সেখানে সঙ্গে নিয়ে গেলাম, ভাত রাঁধা যায়, জিনিসপত্র রাখা যায়, ওতে করে ভাত খাওয়া যায়, ভাঙবে না। আমার একখানাও কড়া নেই। কতদিন থেকে ভাবছি একখানা কড়ার কথা—কিন্তু হুজুর, বড় গরীব, একখানা কড়ার দাম ছ-আনা, অত দাম দিয়ে কড়া কিনি কেমন করে? তাই হুজুরের কাছে আসা, অনেক দিনের সাধ একখানা কড়া আমার হয়, হুজুর যদি মঞ্জুর করেন, হুজুর মালিক।

একখানা লোহার কড়াই যে এত গুণের, তাহার জন্য যে এখানে লোক রাত্রে স্বপ্ন দেখে, এ ধরনের কথা এই আমি প্রথম শুনিলাম। এত গরীব লোক পৃথিবীতে আছে যে ছ-আনা দামের একখানা লোহার কড়াই জুটিলে স্বর্গ হাতে পায়? শুনিয়াছিলাম এদেশের লোক বড় গরীব। এত গরীব তাহা জানিতাম না। বড় মায়া হইল।

পরদিন আমার সই করা চিরকুটের জোরে মুনেশ্বর সিং নউগছিয়ার বাজার হইতে একখানা পাঁচ নম্বরের কড়াই কিনিয়া আনিয়া আমার ঘরের মেঝেতে নামাইয়া আমায় সেলাম দিয়া দাঁড়াইল।

—হো গৈল, হুজুরকি কৃপা-সে—কড়াইয়া হো গৈল।

তাহার হর্ষোৎফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া আমার এই একমাসের মধ্যে সর্বপ্রথম আজ মনে হইল—বেশ লোকগুলো! বড় কষ্ট তো এদের!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১

কিছুতেই কিন্তু এখানকার এই জীবনের সঙ্গে নিজেকে আমি খাপ খাওয়াইতে পারিতেছি না। বাংলা দেশ হইতে সদ্য আসিয়াছি, চিরকাল কলিকাতায় কাটাইয়াছি, এই অরণ্যভূমির নির্জনতা যেন পাথরের মত বুকে চাপিয়া আছে বলিয়া মনে হয়।

এক-একদিন বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইয়া অনেক দূর পর্যন্ত যাই। কাছারির কাছে তবুও লোকজনের গলা শুনিতে পাওয়া যায়, রশি দুই-তিন গেলেই কাছারি-ঘরগুলা যেমন দীর্ঘ বনঝাউ ও কাশ জঙ্গলের আড়ালে পড়ে, তখন মনে হয় সমস্ত পৃথিবীতে আমি একাকী। তারপর যত দূর যাওয়া যায়, চওড়া মাঠের দু-ধারে ঘন বনের সারি বহুদূর পর্যন্ত চলিয়াছে, শুধু বন আর ঝোপ, গজারি গাছ, বাবলা, বন্য কাঁটা-বাঁশ, বেত ঝোপ। গাছের ও ঝোপের মাথায় মাথায় অস্তোন্মুখ সূর্য সিঁদুর ছড়াইয়া দিয়াছে—সন্ধ্যার বাতাসে বন্যপুষ্প ও তৃণগুল্মের সুঘ্রাণ, প্রতি ঝোপ পাখির কাকলীতে মুখর, তার মধ্যে হিমালয়ের বনটিয়াও আছে। মুক্ত দূরপ্রসারী তৃণাবৃত প্রান্তর ও শ্যামল বনভূমির মেলা।

এই সময় মাঝে মাঝে মনে হইত যে, এখানে প্রকৃতির যে রূপ দেখিতেছি, এমনটি আর কোথাও দেখি নাই। যতদূর চোখ যায়, এ সব যেন আমার, আমি এখানে একমাত্র মানুষ, আমার নির্জনতা ভঙ্গ করিতে আসিবে না কেউ—মুক্ত আকাশতলে নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় দূর দিগন্তের সীমারেখা পর্যন্ত মনকে ও কল্পনাকে প্রসারিত করিয়া দিই।

কাছারি হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে একটা নাবাল জায়গা আছে, সেখানে ক্ষুদ্র কয়েকটি পাহাড়ী ঝরনা ঝির ঝির করিয়া বহিয়া যাইতেছে, তাহার দু-পারে জলজ লিলির বন, কলিকাতার বাগানে যাহাকে বলে স্পাইডার-লিলি। বন্য স্পাইডার-লিলি কখনও দেখি নাই, জানিতামও না যে, এমন নিভৃত ঝরনার উপল-বিছানো তীরে ফুটন্ত লিলি ফুলের এত শোভা হয় বা বাতাসে তাহারা এত মৃদু কোমল সুবাস বিস্তার করে। কতবার গিয়া এখানটিতে চুপ করিয়া বসিয়া আকাশ, সন্ধ্যা ও নির্জনতা উপভোগ করিয়াছি।

মাঝে মাঝে ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াই। প্রথম প্রথম ভাল চড়িতে পারিতাম না, ক্রমে ভালোই শিখিলাম। শিখিয়াই বুঝিলাম জীবনে এত আনন্দ আর কিছুতেই নাই। যে কখনও এমন নির্জন আকাশতলে দিগন্তব্যাপী বনপ্রান্তরে ইচ্ছামত ঘোড়া ছুটাইয়া না বেড়াইয়াছে, তাহাকে বোঝানো যাইবে না সে কি আনন্দ! কাছারি হইতে দশ পনের মাইল দূরবর্তী স্থানে সার্ভে পার্টি কাজ করিতেছে, প্রায়ই আজকাল সকালে এক পেয়ালা চা খাইয়া ঘোড়ার পিঠে জিন কষিয়া সেই যে ঘোড়ায় উঠি, কোনদিন ফিরি বৈকালে, কোনদিন বা ফিরিবার পথে জঙ্গলের মাথার উপর নক্ষত্র উঠে, বৃহস্পতি জ্বল্ জ্বল্ করে ; জ্যোৎস্নারাতে বনপুষ্পের সুবাস জ্যোৎস্নার সহিত মেশে, শৃগালের রব প্রহর ঘোষণা করে, জঙ্গলের ঝিঁঝিঁ পোকা দল বাঁধিয়া ডাকিতে থাকে।

২

যে কাজে এখানে আসা তার জন্য অনেক চেষ্টা করা যাইতেছে। এত হাজার বিঘা জমি, হঠাৎ বন্দোবস্ত হওয়াও সোজা কথা নয় অবশ্য। আর একটা ব্যাপার এখানে আসিয়া জানিয়াছি, এই জমি আজ ত্রিশ বছর পূর্বে নদীগর্ভে সিকস্তি হইয়া গিয়াছিল—বিশ বছর হইল বাহির হইয়াছে—কিন্তু যাহারা পিতৃপিতামহের জমি গঙ্গায় ভাঙিয়া যাওয়ার পরে অন্যত্র উঠিয়া গিয়া বাস করিয়াছিল, সেই পুরাতন প্রজাদিগকে জমিদার এই সব জমিতে দখল দিতে চাহিতেছেন না। মোটা সেলামী ও বর্ধিত হারে খাজনার লোভে নূতন প্রজাদের সঙ্গেই বন্দোবস্ত করিতে চান। অথচ যে-সব গৃহহীন, আশ্রয়হীন অতিদরিদ্র পুরাতন প্রজাকে তাহাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে তাহারা বার বার অনুরোধ-উপরোধ কান্নাকাটি করিয়াও জমি পাইতেছে না।

আমার কাছেও অনেকে আসিয়াছিল। তাহাদের অবস্থা দেখিলে কষ্ট হয়, কিন্তু জমিদারের হুকুম, কোনও পুরাতন প্রজাকে জমি দেওয়া হইবে না। কারণ একবার চাপিয়া বসিলে তাহাদের পুরাতন স্বত্ব তাহারা আইনত দাবি করিতে পারে। জমিদারের লাঠির জোর বেশি, প্রজারা আজ বিশ বৎসর ভূমিহীন ও গৃহহীন অবস্থায় দেশে দেশে মজুরি করিয়া খায়, কেহ সামান্য চাষবাস করে, অনেকে মরিয়া গিয়াছে, তাহাদের ছেলেপিলেরা নাবালক বা অসহায়—প্রবল জমিদারের বিরুদ্ধে স্রোতের মুখে কুটার মতো ভাসিয়া যাইবে।

এদিকে নূতন প্রজা সংগ্রহ করা যায় কোথা হইতে? মুঙ্গের, পূর্নিয়া, ভাগলপুর, ছাপরা প্রভৃতি নিকটবর্তী জেলা হইতে লোক যাহারা আসে, দর শুনিয়া পিছাইয়া যায়। দু-পাঁচজন কিছু কিছু লইতেছেও। এই রূপ মৃদু গতিতে অগ্রসর হইলে দশ হাজার বিঘা জঙ্গলী জমি প্রজা-বিলি হইতে বিশ-পঁচিশ বৎসর লাগিয়া যাইবে।

আমাদের এক ডিহি কাছারি আছে—সেও ঘোর জঙ্গলময় মহাল—এখান থেকে উনিশ মাইল দূরে। জায়গাটার নাম লবটুলিয়া, কিন্তু এখানেও যেমন জঙ্গল, সেখানেও তেমনি, কেবল

সেখানে কাছারি রাখার উদ্দেশ্য এই যে, সেই জঙ্গলটা প্রতি বছর গোয়ালাদের গরু-মহিষ চরাইবার জন্য খাজনা করিয়া দেওয়া হয়। এ বাদে সেখানে প্রায় দু-তিনশ’ বিঘা জমিতে বন্যকুলের জঙ্গল আছে, লাক্ষা-কীট পুষিবার জন্য লোকে এই কুল-বন জমা লইয়া থাকে। এই টাকাটা আদায় করিবার জন্য সেখানে দশ টাকা মাহিনার একজন পাটোয়ারী ও তাহার একটা ছোট কাছারি আছে।

কুল-বন ইজারা দিবার সময় আসিতেছে, একদিন ঘোড়া করিয়া লবটুলিয়াতে রওনা হইলাম। আমার কাছারি ও লবটুলিয়ার মাঝখানে একটু উঁচু রাঙামাটির ডাঙা প্রায় সাত-আট মাইল লম্বা, এর নাম ‘ফুলকিয়া বইহার’—কত ধরনের গাছপালা ও ঝোপ-জঙ্গলে পরিপূর্ণ। জায়গায় জায়গায় বন এত ঘন যে, ঘোড়ার গায়ে ডালপালা ঠেকে। ফুলকিয়া বইহার যেখানে নামিয়া গিয়া সমতল ভূমির সহিত মিশিল, চানন্ বলিয়া একটি পাহাড়ী নদী সেখানে উপলখণ্ডের উপর দিয়া ঝির্‌ঝির্ করিয়া বহিতেছে, বর্ষাকালে সেখানে জল খুব গভীর—শীতকালে এখন তত জল নাই।

লবটুলিয়ায় এই প্রথম আসিলাম। অতি ক্ষুদ্র এক খড়ের ঘর, তার মেজে জমির সঙ্গে সমতল, ঘরের বেড়া পর্যন্ত শুক্‌নো কাশের, বনঝাউয়ের ডালের পাতা দিয়া বাঁধা। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে সেখানে পৌঁছিলাম—এত শীত যেখানে থাকি সেখানে নাই, শীতে জমিয়া যাইবার উপক্রম হইলাম বেলা না পড়িতেই।

সিপাহীরা বনের ডালপালা জ্বালাইয়া আগুন করিল, সেই আগুনের ধারে ক্যাম্পচেয়ারে বসিলাম, অন্য সবাই গোল হইয়া আগুনের চারিধারে বসিল।

কোথা হইতে সের পাঁচেক একটা রুই মাছ পাটোয়ারী আনিয়াছিল, এখন কথা উঠিল, রান্না করিবে কে? আমি সঙ্গে পাচক আনি নাই। নিজেও রান্না করিতে জানি না। আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য সাত-আটজন লোক লবটুলিয়াতে অপেক্ষা করিতেছিল—তাহাদের মধ্যে কন্টু মিশ্র নামে এক মৈথিল ব্রাহ্মণকে পাটোয়ারী রান্নার জন্য নিযুক্ত করিল।

পাটোয়ারীকে বলিলাম—এ-সব লোকেই কি ইজারা ডাকবে?

পাটোয়ারী বলিল—না হুজুর। ওরা খাবার লোভে এসেছে। আপনার আসবার নাম শুনে আজ দু-দিন ধরে কাছারিতে এসে বসে আছে। এদেশের লোকের ওই রকম অভ্যেস। আরও অনেকে বোধ হয় কাল আসবে।

এমন কথা কখনও শুনি নাই। বলিলাম—সে কি! আমি তো নিমন্ত্রণ করি নি এদের?

—হুজুর, এরা বড় গরিব ; ভাত জিনিসটা খেতে পায় না। কলাইয়ের ছাতু, মকাইয়ের ছাতু, এই এরা বারোমাস খায়। ভাত খেতে পাওয়াটা এরা ভোজের সমান বিবেচনা করে। আপনি আসচেন, ভাত খেতে পাবে এখানে, সেই লোভে সব এসেছে। দেখুন না আরও কত আসে।

বাংলা দেশের লোকে বড় বেশি সভ্য হইয়া গিয়াছে ইহাদের তুলনায়, মনে হইল। কেন জানি না, এই অন্নভোজনলোলুপ সরল ব্যক্তিগুলিকে আমার সে-রাত্রে এত ভাল লাগিল! আগুনের চারিধারে বসিয়া তাহারা নিজেদের মধ্যে গল্প করিতেছিল, আমি শুনিতেছিলাম। প্রথমে তাহারা আমার আগুনে বসিতে চাহে নাই আমার প্রতি সম্মানসূচক দূরত্ব বজায় রাখিবার জন্য—আমি তাহাদের ডাকিয়া আনিলাম। কণ্টু মিশ্র কাছে বসিয়াই আসানকাঠের ডালপালা জ্বালাইয়া মাছ রাঁধিতেছে—ধুনা পুড়াইবার মত সুগন্ধ বাহির হইতেছে ধোঁয়া হইতে—আগুনের কুণ্ডের বাহিরে গেলে মনে হয়, যেন আকাশ হইতে বরফ পড়িতেছে—এত শীত।

খাওয়া-দাওয়া হইতে রাত হইয়া গেল অনেক ; কাছারিতে যত লোক ছিল, সকলেই খাইল। তারপর, আবার আগুনের ধারে গোল হইয়া বসা গেল। শীতে মনে হইতেছে শরীরের রক্ত

পর্যন্ত জমিয়া যাইবে। ফাঁকা বলিয়াই শীত বোধ হয় এত বেশি, কিংবা বোধ হয় হিমালয় বেশি দূর নয় বলিয়া।

আগুনের ধারে আমরা সাত-আটজন লোক, সামনে ছোট ছোট দুখানি খড়ের ঘর। একখানিতে থাকিব আমি, আর একখানিতে বাকি এতগুলি লোক। আমাদের চারিদিকে ঘিরিয়া অন্ধকার বন ও প্রান্তর, মাথার উপরে নক্ষত্র-ছড়ানো দূরপ্রসারী অন্ধকার আকাশ। আমার বড় অদ্ভুত লাগিল, যেন চিরপরিচিত পৃথিবী হইতে নির্বাসিত হইয়া মহাশূন্যে এক গ্রহে অন্য এক অজ্ঞাত রহস্যময় জীবনধারার সহিত জড়িত হইয়া পড়িয়াছি।

একজন ত্রিশ-বত্রিশ বছরের লোক এ-দলের মধ্যে আমার মনোযোগকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। লোকটির নাম গনোরী তেওয়ারী, শ্যামবর্ণ দোহারা চেহারা, মাথায় বড় চুল, কপালে দুটি লম্বা ফোঁটা কাটা, এই শীতে গায়ে একখানা মোটা চাদর ছাড়া আর কিছু নাই, এ-দেশের রীতি অনুযায়ী গায়ে একটা মেরজাই থাকা উচিত ছিল, তা পর্যন্ত নাই। অনেকক্ষণ হইতে আমি লক্ষ্য করিতেছিলাম, সে সকলের দিকে কেমন কুণ্ঠিতভাবে চাহিতেছিল, কারও কথায় কোনও প্রতিবাদ করিতেছিল না, অথচ কথা যে সে কম বলিতেছিল তা নয়।

আমার প্রতি কথার উত্তরে কেবল সে বলে—হুজুর।

এদেশের লোকে যখন কোন মান্য ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির কথা মানিয়া লয়, তখন কেবল মাথা সামনের দিকে অল্প ঝাঁকাইয়া সসম্ভ্রমে বলে—হুজুর।

গনোরীকে বলিলাম—তুমি থাকো কোথায়, তেওয়ারীজি?

আমি যে তাহাকে সরাসরি প্রশ্ন করিব, এতটা সম্মান যেন তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত, এভাবে সে আমার দিকে চাহিল। বলিল—ভীমদাসটোলা, হুজুর।

তারপর সে তাহার জীবনের ইতিহাস বর্ণনা করিয়া গেল, একটানা নয়, আমার প্রশ্নের উত্তরে টুক্‌রা টুক্‌রা ভাবে।

গনোরী তেওয়ারীর বয়স যখন বারো বছর, তার বাপ তখন মারা যায়। এক বৃদ্ধা পিসিমা তাহাকে মানুষ করে, সে পিসিমাও বাপের মৃত্যুর বছর-পাঁচ পরে যখন মারা গেলেন, গনোরী তখন জগতে ভাগ্য অন্বেষণে বাহির হইল। কিন্তু তাহার জগৎ পূর্বে পূর্ণিয়া শহর, পশ্চিমে ভাগলপুর জেলার সীমানা, দক্ষিণে এই নির্জন অরণ্যময় ফুলকিয়া বইহার, উত্তরে কুশী নদী—ইহারই মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইহারই মধ্যে গ্রামে গ্রামে গৃহস্থের দুয়ারে ফিরিয়া কখনও ঠাকুরপূজা করিয়া, কখনও গ্রাম্য পাঠশালায় পণ্ডিতি করিয়া কায়ক্লেশে নিজের আহারের জন্য কলাইয়ের ছাতু ও চীনা ঘাসের দানার রুটির সংস্থান করিয়া আসিয়াছে। সম্প্রতি মাস দুই চাকুরি নাই, পর্বতা গ্রামের পাঠশালা উঠিয়া গিয়াছে, ফুলকিয়া বইহারের দশ হাজার বিঘা অরণ্যময় অঞ্চলে লোকের বসতি নাই—এখানে যে মহিষ-পালকের দল মহিষ চরাইতে আনে জঙ্গলে, তাহাদের বাথানে বাথানে ঘুরিয়া খাদ্যভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছিল—আজ আমার আসিবার খবর পাইয়া অনেকের সঙ্গে এখানে আসিয়াছে।

আসিয়াছে কেন, সে কথা আরও চমৎকার।

—এখানে এত লোক এসেছে কেন তেওয়ারীজি?

—হুজুর, সবাই বললে ফুলকিয়ার কাছারিতে ম্যানেজার এসেছেন, সেখানে গেলে ভাত খেতে পাওয়া যাবে, তাই ওরা এল, ওদের সঙ্গে আমিও এলাম।

—ভাত এখানকার লোকে কি খেতে পায় না?

—কোথায় পাবে হুজুর। নউগচ্ছিয়ায় মাড়োয়ারীরা রোজ ভাত খায়, আমি নিজে আজ ভাত খেলাম বোধ হয় তিন মাস পরে! গত ভাদ্রমাসের সংক্রান্তিতে রাসবিহারী সিং রাজপুতের বাড়ি নেমন্তন্ন ছিল, সে বড়লোক, ভাত খাইয়েছিল। তার পর আর খাই নি।

যতগুলি লোক আসিয়াছিল, এই ভয়ানক শীতে কাহারও গাত্রবস্ত্র নাই, রাত্রে আগুন পোহাইয়া রাত কাটায়। শেষ-রাত্রে শীত যখন বেশি পড়ে, আর ঘুম হয় না শীতের চোটে—আগুনের খুব কাছে ঘেঁষিয়া বসিয়া থাকে ভোর পর্যন্ত।

কেন জানি না, ইহাদের হঠাৎ এত ভাল লাগিল! ইহাদের দারিদ্র্য, ইহাদের সারল্য, কঠোর জীবন-সংগ্রামে ইহাদের যুঝিবার ক্ষমতা—এই অন্ধকার আরণ্যভূমি ও হিমবর্ষী মুক্ত আকাশ বিলাসিতার কোমল পুষ্পাস্তৃত পথে ইহাদের যাইতে দেয় নাই, কিন্তু ইহাদিগকে সত্যকার পুরুষমানুষ করিয়া গড়িয়াছে। দুটি ভাত খাইতে পাওয়ার আনন্দে যারা ভীমদাসটোলা ও পর্বতা হইতে ন'মাইল পথ হাঁটিয়া আসিয়াছে বিনা নিমন্ত্রণে—তাহাদের মনের আনন্দ গ্রহণ করিবার শক্তি কত সতেজ ভাবিয়া বিস্মিত হইলাম।

অনেক রাত্রে কিসের শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল—শীতে মুখ বাহির করাও যেন কষ্টকর, এমন যে শীত এখানে তা না-জানার দরুন উপযুক্ত গরম কাপড় ও লেপ-তোশক আনি নাই। কলিকাতায় যে-কম্বল গায়ে দিতাম সেখানাই আনিয়াছিলাম—শেষরাত্রের শীতে সে যেন ঠাণ্ডা জল হইয়া যায় প্রতিদিন। যে-পাশে শুইয়া থাকি, শরীরের গরমে সে-দিকটা তবুও থাকে এক রকম, অন্য কাতে পাশ ফিরিতে গিয়া দেখি বিছানা কন্‌কন্ করিতেছে সে-পাশে—মনে হয় যেন ঠাণ্ডা পুকুরের জলে পৌষ মাসের রাত্রে ডুব দিলাম। পাশেই জঙ্গলের মধ্যে কিসের যেন সম্মিলিত পদশব্দ—কাহারা যেন দৌড়িতেছে—গাছপালা, শুকনো বনঝাউয়ের গাছ মট্ মট্ শব্দে ভাঙিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িতেছে।

কি ব্যাপারখানা, কিছু বুঝিতে না পারিয়া সিপাহী বিষ্ণুরাম পাঁড়ে ও স্কুলমাস্টার গনোরী তেওয়ারীকে ডাক দিলাম। তাহারা নিদ্রাজড়িত চোখে উঠিয়া বসিল—কাছারির মেঝেতে যে আগুন জ্বালা হইয়াছিল, তাহারই শেষ দীপ্তিটুকুতে ওদের মুখে আলস্য, সম্ভ্রম ও নিদ্রালুতার ভাব ফুটিয়া উঠিল। গনোরী তেওয়ারী কান পাতিয়া একটু শুনিয়াই বলিল—কিছু না হুজুর, নীলগাইয়ের জেরা দৌড়চ্ছে জঙ্গলে—

কথা শেষ করিয়াই সে নিশ্চিন্ত মনে পাশ ফিরিয়া শুইতে যাইতেছিল, জিজ্ঞাসা করিলাম—নীলগাইয়ের দলের হঠাৎ এত রাত্রে অমন দৌড়ুবার কারণ কি?

বিষ্ণুরাম পাঁড়ে আশ্বাস দিবার সুরে বলিল—হয়তো কোনও জানোয়ারে তাড়া করে থাকবে হুজুর—এছাড়া আর কি।

—কি জানোয়ার?

—কি আর জানোয়ার হুজুর, জঙ্গলের জানোয়ার। শের হতে পারে—নয় তো ভালু—

যে ঘরে শুইয়া আছি, নিজের অজ্ঞাতসারে তাহার কাশডাঁটায় বাঁধা আগড়ের দিকে নজর পড়িল। সে আগড়ও এত হালকা যে, বাহির হইতে একটি কুকুরে ঠেলা মারিলেও তাহা ঘরের মধ্যে উল্টাইয়া পড়ে—এমন অবস্থায় ঘরের সামনেই জঙ্গলে নিস্তব্ধ নিশীথরাত্রে বাঘ বা ভালুকে বন্য নীলগাইয়ের দল তাড়া করিয়া লইয়া চলিয়াছে—এ সংবাদটিতে যে বিশেষ আশ্বস্ত হইলাম না, তাহা বলাই বাহুল্য।

একটু পরেই ভোর হইয়া গেল।

৩

দিন যতই যাইতে লাগিল, জঙ্গলের মোহ ততই আমাকে ক্রমে পাইয়া বসিল। এর নির্জনতা ও অপরাহ্নের সিঁদুর-ছড়ানো বনঝাউয়ের জঙ্গলের কি আকর্ষণ আছে বলিতে পারি না—আজকাল ক্রমশ মনে হয় এই দিগন্তব্যাপী বিশাল বনপ্রান্তর ছাড়িয়া, ইহার রোদপোড়া মাটির তাজা সুগন্ধ, এই স্বাধীনতা, এই মুক্তি ছাড়িয়া কলিকাতার গোলমালের মধ্যে আর ফিরিতে পারিব না।

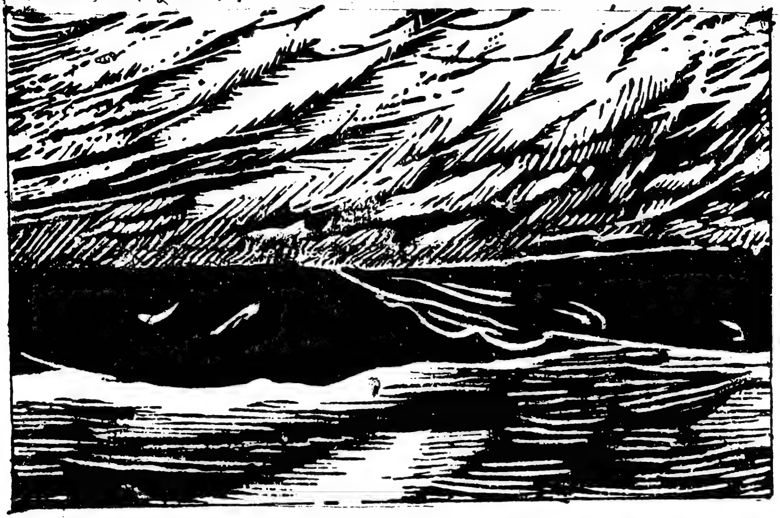

এ মনের ভাব একদিনে হয় নাই। কত রূপে কত সাজেই যে বন্যপ্রকৃতি আমার মুগ্ধ অনভ্যস্ত দৃষ্টির সম্মুখে আসিয়া আমায় ভুলাইল!—কত সন্ধ্যা আসিল অপূর্ব রক্তমেঘের মুকুট মাথায়, দুপুরের খরতর রৌদ্র আসিল উন্মাদিনী ভৈরবীর বেশে, গভীর নিশীথে জ্যোৎস্নাবরণী সুরসুন্দরীর সাজে হিমস্নিগ্ধ বনকুসুমের সুবাস মাখিয়া, আকাশভরা তারার মালা গলায়—অন্ধকার রজনীতে কাল-পুরুষের আগুনের খড়্গ হাতে দিগ্বিদিক ব্যাপিয়া বিরাট কালীমূর্তিতে।

৪

একদিনের কথা জীবনে কখনও ভুলিব না। মনে আছে সেদিন দোল-পূর্ণিমা। কাছারির সিপাহীরা ছুটি চাহিয়া লইয়া সারাদিন ঢোল বাজাইয়া হোলি খেলিয়াছে। সন্ধ্যার সময়েও নাচগানের বিরাম নাই দেখিয়া আমি নিজের ঘরে টেবিলে আলো জ্বালাইয়া অনেক রাত পর্যন্ত হেড আপিসের জন্য চিঠিপত্র লিখিলাম। কাজ শেষ হইতেই ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখি, রাত প্রায় একটা বাজে। শীতে জমিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছি। একটা সিগারেট ধরাইয়া জানালা দিয়া বাহিরের দিকে উঁকি মারিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। যে-জিনিসটা আমাকে মুগ্ধ করিল তাহা পূর্ণিমা-নিশীথিনীর অবর্ণনীয় জ্যোৎস্না।

হয়তো যতদিন আসিয়াছি, শীতকাল বলিয়া গভীর রাত্রে কখনও বাহিরে আসি নাই কিংবা অন্য যে-কোন কারণেই হউক, ফুলকিয়া বইহারের পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না-রাত্রির রূপ এই আমি প্রথম দেখিলাম।

দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। কেহ কোথাও নাই, সিপাহীরা সারাদিন আমোদ-প্রমোদের পরে ক্লান্তদেহে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নিঃশব্দ অরণ্যভূমি, নিস্তব্ধ জনহীন নিশীথরাত্রি। সে জ্যোৎস্না-রাত্রির বর্ণনা নাই। কখনও সে-রকম ছায়াবিহীন জ্যোৎস্না জীবনে দেখি নাই। এখানে খুব বড় বড় গাছ নাই, ছোটখাটো বনঝাউ ও কাশবন—তাহাতে তেমন ছায়া হয় না। চক্চকে সাদা বালি মিশানো জমি ও শীতের রৌদ্রে অর্ধশুষ্ক কাশবনে জ্যোৎস্না পড়িয়া এমন এক অপার্থিব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়াছে, যাহা দেখিলে মনে কেমন ভয় হয়। মনে কেমন যেন একটা উদাস বাঁধনহীন মুক্ত ভাব—মন হু-হু করিয়া ওঠে, চারিধারে চাহিয়া সেই নীরব নিশীথরাত্রে জ্যোৎস্নাভরা আকাশতলে দাঁড়াইয়া মনে হইল এক অজানা পরীরাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি—মানুষের কোন নিয়ম এখানে খাটিবে না। এই সব জনহীন স্থান গভীর রাত্রে জ্যোৎস্নালোকে পরীদের বিচরণভূমিতে পরিণত হয়, আমি অনধিকার প্রবেশ করিয়া ভাল করি নাই।

তাহার পর ফুলকিয়া বইহারের জ্যোৎস্নারাত্রি কতবার দেখিয়াছি—ফাল্গুনের মাঝামাঝি যখন দুধ্‌লি ফুল ফুটিয়া সমস্ত প্রান্তরে যেন রঙিন ফুলের গালিচা বিছাইয়া দেয়, তখন কত জ্যোৎস্নাশুভ্র রাত্রে বাতাসে দুধ্‌লি ফুলের মিষ্ট সুবাস প্রাণ ভরিয়া আঘ্রাণ করিয়াছি—প্রত্যেক বারেই মনে হইয়াছে জ্যোৎস্না যে এত অপরূপ হইতে পারে, মনে এমন ভয়মিশ্রিত উদাস ভাব আনিতে পারে, বাংলা দেশে থাকিতে তাহা তো কোনদিন ভাবিও নাই! ফুলকিয়ার সে জ্যোৎস্না-রাত্রির বর্ণনা দিবার চেষ্টা করিব না, সেরূপ সৌন্দর্যলোকের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় যতদিন না হয় ততদিন শুধু কানে শুনিয়া বা লেখা পড়িয়া তাহা উপলব্ধি করা যাইবে না—করা সম্ভব নয়। অমন মুক্ত আকাশ, অমন নিস্তব্ধতা, অমন নির্জনতা, অমন দিগ্‌দিগন্ত-বিসর্পিত বনানীর মধ্যেই শুধু অমনতর রূপলোক ফুটিয়া উঠে। জীবনে একবারও সে জ্যোৎস্নারাত্রি দেখা উচিত ; যে না দেখিয়াছে, ভগবানের সৃষ্টির একটি অপূর্ব রূপ তাহার নিকট চির-অপরিচিত রহিয়া গেল।

৫

একদিন ডিহি আজমাবাদের সার্ভে-ক্যাম্প হইতে ফিরিবার সময় সন্ধ্যার মুখে বনের মধ্যে পথ হারাইয়া ফেলিলাম। বনের ভূমি সর্বত্র সমতল নয়, কোথাও উঁচু জঙ্গলাবৃত বালিয়াড়ি টিলা, তারপরই দুটি টিলার মধ্যবর্তী ছোটখাটো উপত্যকা। জঙ্গলের কিন্তু কোথাও কোন বিরাম নাই—টিলার মাথায় উঠিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম যদি কোন দিকে কাছারির মহাবীরের ধ্বজার আলো দেখা যায়—কোন দিকে আলোর চিহ্নও নাই—শুধু উঁচুনীচু টিলা ও ঝাউবন আর কাশবন—মাঝে মাঝে শাল ও আসান গাছের বনও আছে। দুই ঘণ্টা ঘুরিয়াও যখন জঙ্গলের কূলকিনারা পাইলাম না, তখন হঠাৎ মনে পড়িল নক্ষত্র দেখিয়া দিক ঠিক করি না কেন? গ্রীষ্মকাল, কালপুরুষ দেখি প্রায় মাথার উপর রহিয়াছে। বুঝিতে পারিলাম না কোন্ দিক হইতে আসিয়া কালপুরুষ মাথার উপর উঠিয়াছে—সপ্তর্ষিমণ্ডল খুঁজিয়া পাইলাম না। সুতরাং নক্ষত্রের সাহায্যে দিক্‌নিরূপণের আশা পরিত্যাগ করিয়া ঘোড়াকে ইচ্ছামত ছাড়িয়া দিলাম। মাইল দুই গিয়া জঙ্গলের মধ্যে একটা আলো দেখা গেল। আলো লক্ষ্য করিয়া সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, জঙ্গলের মধ্যে কুড়ি বর্গহাত আন্দাজ পরিষ্কার স্থানে একটা খুব নিচু

ঘাসের খুপরি। কুঁড়ের সামনে গ্রীষ্মের দিনেও আগুন জ্বালানো। আগুনের নিকট হইতে একটু দূরে একটা লোক বসিয়া কি করিতেছে।

আমার ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনিয়া লোকটি চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—কে? তার পরেই আমায় চিনিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি কাছে আসিল ও আমাকে খুব খাতির করিয়া ঘোড়া হইতে নামাইল।

পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, প্রায় ছ-ঘণ্টা আছি ঘোড়ার উপর, কারণ সার্ভে-ক্যাম্পেও আমিনের পিছু পিছু ঘোড়ায় টো টো করিয়া জঙ্গলের মধ্যে ঘুরিয়াছি। লোকটার প্রদত্ত একটা ঘাসের চেটাইয়ে বসিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—তোমার নাম কি?' লোকটা বলিল—গনু মাহাতো, জাতি গাঙ্গোতা। এ অঞ্চলে গাঙ্গোতা জাতির উপজীবিকা চাষবাস ও পশুপালন, তাহা আমি এতদিনে জানিয়াছিলাম—কিন্তু এ লোকটা এই জনহীন গভীর বনের মধ্যে একা কি করে?

বলিলাম—তুমি এখানে কি করো? তোমার বাড়ি কোথায়?

—হুজুর, মহিষ চরাই। আমার ঘর এখান থেকে দশ ক্রোশ উত্তরে ধরমপুর, লছমনিয়াটোলা।

—নিজের মহিষ? কতগুলো আছে?

লোকটা গর্বের সুরে বলিল—পাঁচটা মহিষ আছে হুজুর।

পাঁচটা মহিষ? দস্তুরমত অবাক হইলাম। দশ ক্রোশ দূরের গ্রাম হইতে পাঁচটা মাত্র মহিষ সম্বল করিয়া লোকটি এই বিজন বনের মধ্যে মহিষচরির খাজনা দিয়া একা খুপরি বাঁধিয়া মহিষ চরায়—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এই ছোট্ট খুপরিটাতে কি করিয়া সময় কাটায়—কলিকাতা হইতে নুতন আসিয়াছি, শহরের থিয়েটার-বায়োস্কোপে লালিত যুবক আমি—বুঝিতে পারিলাম না।

কিন্তু এদেশের অভিজ্ঞতা আরও বেশি হইলে বুঝিয়াছিলাম, কেন গনু মাহাতো ওভাবে থাকে। তাহার অন্য কোন কারণ নাই ইহা ছাড়া যে, গনু মাহাতোর জীবনের ধারণাই এইরূপ। যখন তাহার পাঁচটি মহিষ তখন তাহাদের চরাইতে হইবে, এবং যখন চরাইতে হইবে, তখন জঙ্গলে আছে, কুঁড়ে বাঁধিয়া একা থাকিতেই হইবে। এ অত্যন্ত সাধারণ কথা, ইহার মধ্যে আশ্চর্য হইবার কি আছে।

গনু কাঁচা শালপাতার একটি লম্বা পিকা বা চুরুট তৈরি করিয়া আমার হাতে সসম্ভ্রমে দিয়া আমার অভ্যর্থনা করিল। আগুনের আলোতে উহার মুখ দেখিলাম—বেশ চওড়া কপাল, উঁচু নাক, রং কালো—মুখশ্রী সরল, শান্ত চোখের দৃষ্টি। বয়স ষাটের উপর হইবে, মাথার চুল একটিও কালো নাই। কিন্তু শরীর এমন সুগঠিত যে, এই বয়সেও প্রত্যেকটি মাংসপেশী আলাদা করিয়া গুনিয়া লওয়া যায়।

গনু আগুনে আরও বেশি কাঠ ফেলিয়া দিয়া নিজেও একটি শালপাতার পিকা ধরাইল। আগুনের আভায় খুপরির মধ্যে এক-আধখানা পিতলের বাসন চক্‌ চক্‌ করিতেছে। আগুনের কুণ্ডের মণ্ডলীর বাহিরে ঘোরতর অন্ধকার ও ঘন বন। বলিলাম—গনু, একা এখানে থাক, জন্তু-জানোয়ারের ভয় করে না?

গনু বলিল—ভয় ডর করলে কি আমাদের চলে হুজুর? আমাদের যখন এই ব্যবসা! সেদিন তো রাত্রে আমার খুপরির পেছনে বাঘ এসেছিল। মহিষের দুটো বাচ্চা আছে, ওদের ওপর তাক্‌। শব্দ শুনে রাত্রে উঠে টিন বাজাই, মশাল জ্বালি, চিৎকার করি। রাত্রে আর ঘুম হল না হুজুর ; শীতকালে তো সারারাত এই বনে ফেউ ডাকে।

—খাও কি এখানে? দোকান-টোকান তো নেই, জিনিসপত্র পাও কোথায়? চাল ডাল—

—হুজুর, দোকানে জিনিস কেনবার মত পয়সা কি আমাদের আছে, না আমরা বাঙালী বাবুদের মতো ভাত খেতে পাই? এই জঙ্গলের পেছনে আমার দু-বিঘে খেড়ী ক্ষেত আছে। খেড়ীর দানা সিদ্ধ, আর জঙ্গলে বাথুয়া শাক হয়, তাই সিদ্ধ, আর একটু লুন, এই খাই। ফাগুন মাসে জঙ্গলে গুড়মী ফল ফলে, লুন দিয়ে কাঁচা খেতে বেশ লাগে—লতানে গাছ, ছোট ছোট কাঁকুড়ের মতো ফল হয় ; সে সময় এক মাস এ অঞ্চলের যত গরীব লোক গুড়মী ফল খেয়ে কাটিয়ে দেয়। দলে দলে ছেলেমেয়ে আসবে জঙ্গলের গুড়মী তুলতে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—রোজ রোজ খেড়ীর দানা সিদ্ধ আর বাথুয়া শাক ভাল লাগে?

—কি করব হুজুর, আমরা গরিব লোক, বাঙালী বাবুদের মত ভাত খেতে পাব কোথায়? ভাত এ অঞ্চলের মধ্যে কেবল রাসবিহারী সিং আর নন্দলাল পাঁড়ে খায় দুবেলা। সারাদিন মহিষের পেছনে ভূতের মতন খাটি হুজুর, সন্ধ্যের সময় ফিরি যখন, তখন এত ক্ষিদে পায় যে, যা পাই খেতে তাই ভাল লাগে।

গনুকে বলিলাম—কলকাতা শহর দেখেছ গনু?

—না হুজুর। কানে শুনেছি। ভাগলপুর শহরে একবার গিয়েছি, বড় ভারী শহর। ওখানে হাওয়ার গাড়ি দেখেছি, বড় তাজ্জব চিজ হুজুর। ঘোড়া নেই, কিছু নেই, আপনা-আপনি রাস্তা দিয়ে চলছে।

এই বয়সে উহার স্বাস্থ্য দেখিয়া অবাক হইলাম। সাহসও যে আছে, ইহা মনে মনে স্বীকার করিতে হইল।

গনুর জীবিকানির্বাহের একমাত্র অবলম্বন মহিষ কয়টি। তাদের দুধ অবশ্য এ-জঙ্গলে কে কিনিবে, দুধ হইতে মাখন তুলিয়া ঘি করে ও দু'তিন মাসের ঘি একত্রে জমাইয়া ন-মাইল দূরবর্তী ধরমপুরের বাজারে মাড়োয়ারীদের নিকট বিক্রয় করিয়া আসে। আর থাকিবার মধ্যে ওই দু-বিঘা খেড়ী অর্থাৎ শ্যামাঘাসের ক্ষেত, যার দানা সিদ্ধ এ-অঞ্চলের প্রায় সকল গরিব লোকেরই একটা প্রধান খাদ্য। গনু সে-রাত্রে আমাকে কাছারিতে পৌঁছাইয়া দিল, কিন্তু গনুকে আমার এত ভাল লাগিল যে, কতবার শান্ত বৈকালে তাহার খুপরির সামনে আগুন পোহাইতে পোহাইতে গল্প করিয়া কাটাইয়াছি। ওদেশের নানারূপ তথ্য গনুর কাছে যেরূপ শুনিয়াছিলাম, অত কেউ দিতে পারে নাই।

গনুর মুখে কত অদ্ভুত কথা শুনিতাম। উড়ুক্কু সাপের কথা, জীবন্ত পাথর ও আঁতুড়ে ছেলের হাঁটিয়া বেড়াইবার কথা, ইত্যাদি। ওই নির্জন জঙ্গলের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে গনুর সে-সব গল্প অতি উপাদেয় ও অতি রহস্যময় লাগিত—আমি জানি কলিকাতা শহরে বসিয়া সে-সব গল্প শুনিলে তাহা আজগুবি ও মিথ্যা মনে হইতে বাধ্য। যেখানে-সেখানে যে-কোন গল্প শোনা চলে না, গল্প শুনিবার পটভূমি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর উহার মাধুর্য যে কতখানি নির্ভর করে, তাহা গল্পপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। গনুর সকল অভিজ্ঞতার মধ্যে আমার আশ্চর্য বলিয়া মনে হইয়াছিল বন্যমহিষের দেবতা টাঁড়বারোর কথা।

কিন্তু, যেহেতু এই গল্পের একটি অদ্ভুত উপসংহার আছে—সেজন্য সে-কথা এখন না বলিয়া যথাস্থানে বলিব। এখানে বলিয়া রাখি, গনু আমাকে যে-সব গল্প বলিত—তাহা রূপকথা নহে, তাহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিষয়। গনু জীবনকে দেখিয়াছে তবে অন্যভাবে। অরণ্য-প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আজীবন কাটাইয়া সে অরণ্য-প্রকৃতি সম্বন্ধে একজন রীতিমত

বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। তাহার কথা হঠাৎ উড়াইয়া দেওয়া চলে না। মিথ্যা বানাইয়া বলিবার মত কল্পনাশক্তিও গনুর আছে বলিয়া আমার মনে হয় নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১

গ্রীষ্মকাল পড়িতে গ্র্যান্ট সাহেবের বটগাছের মাথায় পীরপৈঁতি পাহাড়ের দিক হইতে একদল বক উড়িয়া আসিয়া বসিল, দূর হইতে মনে হয় যেন বটগাছের মাথা সাদা থোকা থোকা ফুলে ভরিয়া গিয়াছে।

একদিন অর্ধশুষ্ক কাশের বনের ধারে টেবিল-চেয়ার পাতিয়া কাজ করিতেছি, মুনেশ্বর সিং সিপাহী আসিয়া বলিল—হুজুর, নন্দলাল ওঝা গোলাওয়ালা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

একটু পরে প্রায় পঞ্চাশ বছরের একটি বৃদ্ধ ব্যক্তি আমার সামনে আসিয়া সেলাম করিল ও আমার নির্দেশমতো একটা টুলের উপর বসিল। বসিয়াই সে একটি পশমের থলি বাহির করিল। তাহার পর থলেটির ভিতর হইতে খুব ছোট একখানি জাঁতি ও দুইটি সুপারি বাহির করিয়া সুপারি কাটিতে আরম্ভ করিল। পরে কাটা সুপারি হাতে রাখিয়া দুই হাত একত্র করিয়া আমার সামনে মেলিয়া ধরিয়া সসম্ভ্রমে বলিল—সুপারি লিজিয়ে হুজুর।

সুপারি ও-ভাবে খাওয়া অভ্যাস না থাকিলেও ভদ্রতার খাতিরে লইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—কোথা হতে আসা হচ্ছে, কি কাজ?

তাহার উত্তরে লোকটি বলিল, তাহার নাম নন্দলাল ওঝা, মৈথিল ব্রাহ্মণ। জঙ্গলের উত্তর-পূর্ব কোণে কাছারি হইতে প্রায় এগার মাইল দূরে সুংঠিয়াদিয়ারাতে তাহার বাড়ি। বাড়িতে চাষবাস আছে, কিছু সুদের কারবারও আছে—সে আসিয়াছে তার বাড়িতে আগামী পূর্ণিমার দিন আমায় নিমন্ত্রণ করিতে—আমি কি তাহার বাড়িতে দয়া করিয়া পদধূলি দিতে রাজি আছি? এ সৌভাগ্য কি তাহার হইবে?

এগার মাইল দূরে এই রৌদ্রে নিমন্ত্রণ খাইতে যাইবার লোভ আমার ছিল না—কিন্তু নন্দলাল ওঝা নিতান্ত পীড়াপীড়ি করাতে অগত্যা রাজি হইলাম—তা ছাড়া এদেশের গৃহস্থ-সংসার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিবার লোভও সংবরণ করিতে পারিলাম না।

পূর্ণিমার দিন দুপুরের পরে দীর্ঘ কাশের জঙ্গলের মধ্য দিয়া কাহাদের একটি হাতি আসিতেছে দেখা গেল। হাতি কাছারিতে আসিলে মাহুতের মুখে শুনিলাম হাতিটি নন্দলাল ওঝার নিজের—আমাকে লইয়া যাইতে পাঠাইয়া দিয়াছে। হাতি পাঠাইবার আবশ্যক ছিল না—কারণ আমার নিজের ঘোড়ায় অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে পৌঁছিতে পারিতাম।

যাহাই হউক, হাতিতে চড়িয়াই নন্দলালের বাড়িতে রওনা হইলাম। সবুজ বনশীর্ষ আমার পায়ের তলায়, আকাশ যেন আমার মাথায় ঠেকিয়াছে—দূর, দূর-দিগন্তের নীল শৈলমালার রেখা বনভূমিকে ঘিরিয়া যেন মায়ালোক রচনা করিয়াছে—আমি সে-মায়ালোকের অধিবাসী—বহু দূর স্বর্গের দেবতা। কত মেঘের তলায় তলায় পৃথিবীর কত শ্যামল বনভূমির উপরকার নীল বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া যেন আমার অদৃশ্য যাতায়াত।

পথে চাম্‌টার বিল পড়িল, শীতের শেষেও সিল্লী আর লাল হাঁসের ঝাঁকে ভর্তি। আর একটু গরম পড়িলেই উড়িয়া পলাইবে। মাঝে মাঝে নিতান্ত দরিদ্র পল্লী। ফণীমনসা-ঘেরা তামাকের ক্ষেত ও খোলায় ছাওয়া দীন-কুটীর।

সুংঠিয়া গ্রামে হাতি ঢুকিলে দেখা গেল পথের দু-ধারে সারবন্দী লোক দাঁড়াইয়া আছে আমায় অভ্যর্থনা করিবার জন্য। গ্রামে ঢুকিয়া অল্প দূর পরেই নন্দলালের বাড়ি।

খোলায় ছাওয়া মাটির ঘর আট-দশখানা—সবই পৃথক পৃথক, প্রকাণ্ড উঠানের মধ্যে ইতস্তত ছড়ানো। আমি বাড়িতে ঢুকিতেই দুই বার হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজ হইল। চমকাইয়া গিয়াছি—এমন সময়ে সহাস্যমুখে নন্দলাল ওঝা আসিয়া আমায় অভ্যর্থনা করিয়া বাড়িতে লইয়া গিয়া একটা বড় ঘরের দাওয়ায় চেয়ারে বসাইল। চেয়ারখানি এদেশের শিশুকাঠের তৈয়ারি এবং এদেশের গ্রাম্য মিস্ত্রীর হাতেই গড়া। তাহার পর দশ-এগার বছরের একটি ছোট মেয়ে আসিয়া আমার সামনে একখানা থালা ধরিল—থালায় গোটাকতক আস্ত পান, আস্ত সুপারি, একটা মধুপর্কের মতো ছোট বাটিতে সামান্য একটু আতর, কয়েকটি শুষ্ক খেজুর ;ইহা লইয়া কি করিতে হয় আমার জানা নাই—আমি আনাড়ির মতো হাসিলাম ও বাটি হইতে আঙুলের আগায় একটু আতর তুলিয়া লইলাম মাত্র। মেয়েটিকে দু'একটি ভদ্রতাসূচক মিষ্ট কথাও বলিলাম। মেয়েটি থালা আমার সামনে রাখিয়া চলিয়া গেল।

তারপর খাওয়ানোর ব্যবস্থা। নন্দলাল যে ঘটা করিয়া খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহা আমার ধারণা ছিল না। প্রকাণ্ড কাঠের পিঁড়ির আসন পাতা—সম্মুখে এমন আকারের একখানি পিতলের থালা আসিল, যাহাতে করিয়া আমাদের দেশে দুর্গাপূজার বড় নৈবেদ্য সাজায়। থালায় হাতির কানের মত পুরী, বাথুয়া শাক ভাজা, পাকা শশার রায়তা, কাঁচা তেঁতুলের ঝোল, মহিষের দুধের দই, পেঁড়া। খাবার জিনিসের এমন অদ্ভুত যোগাযোগ কখনও দেখি নাই। আমায় দেখিবার জন্য উঠানে লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে ও আমার দিকে এমন ভাবে চাহিতেছে যে, আমি যেন এক অদৃষ্টপূর্ব জীব। শুনিলাম ইহারা সকলেই নন্দলালের প্রজা।

সন্ধ্যার পূর্বে উঠিয়া আসিবার সময় নন্দলাল একটি ছোট থলি আমার হাতে দিয়া বলিল—হুজুরের নজর। আশ্চর্য হইয়া গেলাম। থলিতে অনেক টাকা, পঞ্চাশের কম নয়। এত টাকা কেহ কাহাকেও নজর দেয় না, তাছাড়া নন্দলাল আমার প্রজাও নয়। নজর প্রত্যাখ্যান করাও গৃহস্থের পক্ষে নাকি অপমানজনক—সুতরাং আমি থলি খুলিয়া একটা টাকা লইয়া থলিটা তাহার হাতে ফিরাইয়া দিয়া বলিলাম—তোমার ছেলেপুলেদের পেঁড়া খাইতে দিও।

নন্দলাল কিছুতেই ছাড়িবে না—আমি সে-কথায় কান না দিয়াই বাহিরে আসিয়া হাতির পিঠে চড়িলাম।

পরদিনই নন্দলাল ওঝা আমার কাছারিতে গেল, সঙ্গে তাহার বড় ছেলে। আমি তাহাদিগকে সমাদর করিলাম—কিন্তু খাইবার প্রস্তাবে তাহারা রাজি হইল না। শুনিলাম মৈথিল ব্রাহ্মণ অন্য ব্রাহ্মণের হস্তের প্রস্তুত কোন খাবারই খাইবে না। অনেক বাজে কথার পরে নন্দলাল একান্তে আমার নিকট কথা পাড়িল, তাহার বড় ছেলে ফুলকিয়া বইহারের তহশীলদারির জন্য উমেদার—তাহাকে আমায় বহাল করিতে হইবে। আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—কিন্তু ফুলকিয়ার তহশীলদার তো আছে—সে পোস্ট তো খালি নেই। তাহার উত্তরে নন্দলাল আমাকে চোখ ঠারিয়া ইশারা করিয়া বলিল, হুজুর, মালিক তো আপনি। আপনি মনে করলে কি না হয়?

আমি আরও অবাক্ হইয়া গেলাম। সে কি রকম কথা! ফুলকিয়ার তহশীলদার ভালই কাজ করিতেছে—তাহাকে ছাড়াইয়া দিব কোন্ অপরাধে?

নন্দলাল বলিল—কত রুপেয়া হুজুরকে পান খেতে দিতে হবে বলুন, আমি আজ সাঁজেই

হুজুরকে পৌঁছে দেব। কিন্তু আমার ছেলেকে তহশীলদারি দিতে হবেই হুজুরের। বলুন কত, হুজুর। পাঁচ-শ?... এতক্ষণে বেশ বুঝিতে পারিলাম, নন্দলাল যে আমাকে কাল নিমন্ত্রণ করিয়াছিল তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি। এদেশের লোক যে এমন ধড়িবাজ, তাহা জানিলে কখনও ওখানে যাই? আচ্ছা বিপদে পড়িয়াছি বটে!

নন্দলালকে স্পষ্ট কথা বলিয়াই বিদায় করিলাম। বুঝিলাম নন্দলাল আশা ছাড়িল না।

আর একদিন দেখি, ঘন বনের ধারে নন্দলাল আমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে।

কি কুক্ষণেই উহার বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছিলাম—দুখানা পুরী খাওয়াইয়া সে যে আমার জীবন এমন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবে—তাহা আগে জানিলে কি উহার ছায়া মাড়াই?

নন্দলাল আমাকে দেখিয়া মিষ্টি মোলায়েম হাসিয়া বলিল—নোমোস্কার হুজুর।

—হুঁ। তার পর এখানে কি মনে করে?

—হুজুর সবই জানেন। আমি আপনাকে বারো-শ’ টাকা নগদ দেব। আমার ছেলেকে কাজে লাগিয়ে দিন।

—তুমি পাগল নন্দলাল? আমি বহাল করবার মালিক নই। যাদের জমিদারি, তাদের কাছে দরখাস্ত করতে পারো। তাছাড়া বর্তমানে যে রয়েছে—তাকে ছাড়াব কোন্ অপরাধে?

বলিয়াই বেশি কথা না বাড়াইয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিলাম।

ক্রমে আমার কড়া ব্যবহারে নন্দলালকে আমি আমার ও স্টেটের মহাশত্রু করিয়া তুলিলাম। তখনও বুঝি নাই, নন্দলাল কিরূপ ভয়ানক প্রকৃতির মানুষ। ইহার ফল আমাকে ভাল করিয়াই ভুগিতে হইয়াছিল।

২

উনিশ মাইল দূরবর্তী ডাকঘর হইতে ডাক আনা এখানকার এক অতি আবশ্যক ঘটনা। অতদূরে প্রতিদিন লোক পাঠানো চলে না বলিয়া সপ্তাহে দুবার মাত্র ডাকঘরে লোক যাইত। মধ্য-এশিয়ার জনহীন, দুস্তর ও ভীষণ টাক্‌লামাকান মরুভূমির তাঁবুতে বসিয়া বিখ্যাত পর্যটক সোয়েন হেডিনও বোধ হয় এমনি আগ্রহে ডাকের প্রতীক্ষা করিতেন। আজ আট-নয় মাস এখানে আসিবার ফলে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত এই জনহীন বন-প্রান্তরে সূর্যাস্ত, নক্ষত্ররাজি, চাঁদের উদয়, জ্যোৎস্না ও বনের মধ্যে নীলগাইয়ের দৌড় দেখিতে দেখিতে যে-বহির্জগতের সঙ্গে সকল যোগ হারাইয়া ফেলিয়াছি—ডাকের চিঠি কয়খানির মধ্য দিয়া আবার তাহার সহিত একটা সংযোগ স্থাপিত হইত।

নির্দিষ্ট দিনে জওয়াহিরলাল সিং ডাক আনিতে গিয়াছে। আজ দুপুরে সে আসিবে। আমি ও বাঙালী মুহুরী বাবুটি ঘন ঘন জঙ্গলের দিকে চাহিতেছি। কাছারি হইতে মাইল দেড় দূরে একটা উঁচু টিবির উপর দিয়া পথ। ওখানে আসিলে জওয়াহিরলাল সিংকে বেশ স্পষ্ট দেখা যায়।

বেলা দুপুর হইয়া গেল। জওয়াহিরলালের দেখা নাই। আমি ঘন ঘন ঘর-বাহির করিতেছি। এখানে আপিসের কাজের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। বিভিন্ন আমিনের রিপোর্ট দেখা, দৈনিক ক্যাশবই সই করা, সদরের চিঠি-পত্রের উত্তর লেখা, পাটোয়ারী ও তহশীলদারদের আদায়ের হিসাব-পরীক্ষা, নানাবিধ দরখাস্তের ডিক্রি ডিস্‌মিস্ করা, পূর্ণিয়া, মুঙ্গের, ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানে নানা আদালতে নানাপ্রকার মামলা ঝুলিতেছে—ঐ সকল স্থানের উকীল ও মামলা-তদ্বিরকারকদের

রিপোর্ট পাঠ ও তার উত্তর দেওয়া—আরও নানা প্রকার বড় ও খুচরা কাজ প্রতিদিন নিয়মমত না করিলে দু-তিনদিনে এত জমিয়া যায় যে, তখন কাজ শেষ করিতে প্রাণান্ত হইয়া উঠে। ডাক আসিবার সঙ্গে সঙ্গে আবার একরাশি কাজ আসিয়া পড়ে। শহরের নানা ধরনের চিঠি, নানা ধরনের আদেশ, অমুক জায়গায় যাও, অমুকের সঙ্গে অমুক মহালের বন্দোবস্ত কর, ইত্যাদি।

বেলা তিনটার সময় জওয়াহিরলালের সাদা পাগড়ি রৌদ্রে চক্‌চক্ করিতেছে দেখা গেল। বাঙালী মুহুরীবাবু হাঁকিলেন—ম্যানেজারবাবু, আসুন, ডাকপেয়াদা আসছে—ঐ যে—

আপিসের বাহিরে আসিলাম। ইতিমধ্যে জওয়াহিরলাল আবার ঢিবি হইতে নামিয়া জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। আমি অপেরাগ্লাস আনাইয়া দেখিলাম, দূরে জঙ্গলের মধ্যে দীর্ঘ দীর্ঘ ঘাসের ও বনঝাউয়ের মধ্যে সে আসিতেছে বটে। আর আপিসের কাজে মন বসিল না। সে কি আকুল প্রতীক্ষা! যে জিনিস যত দুষ্প্রাপ্য, মানুষের মনের কাছে তাহার মূল্য তত বেশি। এ কথা খুবই সত্য যে, এই মূল্য মানুষের মন-গড়া একটি কৃত্রিম মূল্য, প্রার্থিত জিনিসের সত্যকার উৎকর্ষ বা অপকর্ষের সঙ্গে এর কোনও সম্বন্ধ নাই। কিন্তু জগতের অধিকাংশ জিনিসের উপরই একটা কৃত্রিম মূল্য আরোপ করিয়াই তো আমরা তাকে বড় বা ছোট করি।

জওয়াহিরলালকে কাছারির সামনে একটা অপরিসর বালুময় নাবাল জমির ও-পারে দেখা গেল। আমি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলাম। মুহুরীবাবু আগাইয়া গেলেন। জওয়াহিরলাল আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল এবং পকেট হইতে চিঠির তাড়া বাহির করিয়া মুহুরীবাবুর হাতে দিল।

আমারও খান-দুই পত্র আছে—অতি পরিচিত হাতের লেখা। চিঠি পড়িতে পড়িতে চারিপাশের জঙ্গলের দিকে চাহিয়া নিজেই অবাক্ হইয়া গেলাম। কোথায় আছি, কখনও ভাবি নাই আমি এখানে কোনদিন থাকিব, কলিকাতার আড্ডা ছাড়িয়া এমন জায়গায় দিনের পর দিন কাটাইব। একখানা বিলাতী ম্যাগাজিনের গ্রাহক হইয়াছি, আজ সেখানা আসিয়াছে। মোড়কের উপরে লেখা "উড়ো জাহাজের ডাকে"। জনাকীর্ণ কলিকাতা শহরের বুকে বসিয়া বিংশ শতাব্দীর এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সুখ কি বুঝা যাইবে? এখানে—এই নির্জন বন-প্রদেশে—সকল বিষয়েই ভাবিবার ও অবাক হইবার অবকাশ আছে—এখানকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা সে-অনুভূতি আনয়ন করে।

যদি সত্য কথা বলিতে হয়, জীবনে ভাবিয়া দেখিবার শিক্ষা এইখানে আসিয়াই পাইয়াছি। কত কথা মনে জাগে, কত পুরনো কথা মনে হয়—নিজের মনকে এমন করিয়া কখনও উপভোগ করি নাই। এখানে সহস্র প্রকার অসুবিধার মধ্যেও সেই আনন্দ আমাকে যেন একটা নেশার মত পাইয়া বসিতেছে দিন দিন।

অথচ সত্যই আমি প্রশান্ত মহাসমুদ্রের কোনও জনহীন দ্বীপে একা পরিত্যক্ত হই নাই। বোধ হয় ত্রিশ-বত্রিশ মাইলের মধ্যে রেল স্টেশন। সেখানে ট্রেনে চড়িয়া একঘণ্টার মধ্যে পূর্ণিয়া যাইতে পারি—তিন ঘণ্টার মধ্যে মুঙ্গের যাইতে পারি। কিন্তু প্রথম তো রেল-স্টেশনে যাইতেই বেজায় কষ্ট—সেকষ্ট স্বীকার করিতে পারি, যদি পূর্ণিয়া বা মুঙ্গের শহরে গিয়া কিছু লাভ থাকে। এমনি দেখিতেছি কোনও লাভই নাই, না আমাকে সেখানে কেউ চেনে, না আমি কাউকে চিনি। কি হইবে গিয়া?

কলিকাতা হইতে আসিয়া বই আর বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে গল্প ও আলোচনার অভাব এত বেশি অনুভব করি যে কতবার ভাবিয়াছি এ জীবন আমার পক্ষে অসহ্য। কলিকাতাতেই আমার সব, পূর্ণিয়া বা মুঙ্গেরে কে আছে যে সেখানে যাইব? কিন্তু সদর-আপিসের বিনা অনুমতিতে কলিকাতায় যাইতে পারি না—তাছাড়া অর্থব্যয়ও এত বেশি যে দু-পাঁচ দিনের জন্য যাওয়া পোষায় না।

৩

কয়েক মাস সুখে-দুঃখে কাটিবার পর চৈত্র মাসের শেষ হইতে এমন একটা কাণ্ডের সূত্রপাত হইল, যাহা আমার অভিজ্ঞতার মধ্যে কখনও ছিল না। পৌষ মাসে কিছু কিছু বৃষ্টি পড়িয়াছিল, তার পর হইতেই ঘোর অনাবৃষ্টি দেখা দিল। মাঘ মাসে বৃষ্টি নাই, ফাল্গুনে না, চৈত্রে না, বৈশাখে না। সঙ্গে সঙ্গে যেমন অসহ্য গ্রীষ্ম, তেমনি নিদারুণ জলকষ্ট।

সাদা কথায় গ্রীষ্ম বা জলকষ্ট বলিলে এ বিভীষিকাময় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের স্বরূপ কিছুই বোঝানো যাইবে না। উত্তরে আজমাবাদ হইতে দক্ষিণে কিষণপুর—পূর্বে ফুলকিয়া বইহার ও লবটুলিয়া হইতে পশ্চিমে মুঙ্গের জেলার সীমানা পর্যন্ত সারা জঙ্গল মহালের মধ্যে যেখানে যত খাল, ডোবা, কুণ্ডী অর্থাৎ বড় জলাশয় ছিল—সব গেল শুকাইয়া। কুয়া খুঁড়িলে জল পাওয়া যায় না—যদি বা বালির উনুই হইতে কিছু কিছু জল ওঠে, ছোট এক বালতি জল কুয়ায় জমিতে এক ঘণ্টার উপর সময় লাগে। চারিধারে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। পূর্বে একমাত্র কুশী নদী ভরসা—সে আমাদের মহালের পূর্বতম প্রান্ত হইতে সাত আট মাইল দূরে বিখ্যাত মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের ওপারে। আমাদের জমিদারি ও মোহনপুরা অরণ্যের মধ্যে একটা ছোট পাহাড়ী নদী নেপালের তরাই অঞ্চল হইতে বহিয়া আসিতেছে—কিন্তু বর্তমানে শুধু শুষ্ক বালুময় খাতে তাহার উপলঢাকা চরণচিহ্ন বিদ্যমান। বালি খুঁড়িলে যে জলটুকু পাওয়া যায়, তাহারই লোভে কত দূরের গ্রাম হইতে মেয়েরা কলসী লইয়া আসে ও সারা দুপুর বালি-কাদা ছানিয়া আধ-কলসীটাক ঘোলা জল লইয়া বাড়ি ফিরে।

কিন্তু পাহাড়ী নদী—স্থানীয় নাম মিছি নদী—আমাদের কোনও কাজে আসে না—কারণ আমাদের মহাল হইতে বহু দূরে। কাছারিতেও কোন বড় ইঁদারা নাই—ছোট যে বালির পাতকুয়াটি আছে, তাহা হইতে পানীয় জলের সংস্থান হওয়াই বিষম সমস্যার কথা দাঁড়াইল। তিন বাল্‌তি জল সংগ্রহ করিতে দুপুর ঘুরিয়া যায়।

দুপুরে বাহিরে দাঁড়াইয়া তাম্রাভ অগ্নিবর্ষী আকাশ ও অর্ধশুষ্ক বনঝাউ ও লম্বা ঘাসের বন দেখিতে ভয় করে—চারিধার যেন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, মাঝে মাঝে আগুনের হল্‌কার মত তপ্ত বাতাস সর্বাঙ্গ ঝল্‌সাইয়া বহিতেছে—সূর্যের এ রূপ, দ্বিপ্রহরের রৌদ্রের এ ভয়ানক রুদ্র রূপ কখনও দেখি নাই, কল্পনাও করি নাই। এক-এক দিন পশ্চিম দিক হইতে বালির ঝড় বয়—এ সব দেশে চৈত্র-বৈশাখ মাস পশ্চিমে বাতাসের সময়—কাছারি হইতে এক-শ' গজ দূরের জিনিস ঘন বালি ও ধূলিরাশির আড়ালে ঢাকিয়া যায়।

অর্ধেক দিন রামধনিয়া টহলদার আসিয়া জানায়—কুঁয়ামে পানি নেই ছে, হুজুর। কোন-কোন দিন ঘণ্টাখানেক ধরিয়া ছানিয়া ছানিয়া বালির ভিতর হইতে আধ বাল্‌তি তরল কর্দম স্নানের জন্য আমার সামনে আনিয়া ধরে। সে ভয়ানক গ্রীষ্মে তাহাই তখন অমূল্য।

একদিন দুপুরের পরে কাছারির পিছনে একটা হরীতকী গাছের তলায় স্বল্প ছায়ায় দাঁড়াইয়া আছি—হঠাৎ চারিধারে চাহিয়া মনে হইল দুপুরের এমন চেহারা কখনও দেখি তো নাই-ই, এ জায়গা হইতে চলিয়া গেলে আর কোথাও দেখিবও না। আজন্ম বাংলা দেশের দুপুর দেখিয়াছি—জ্যৈষ্ঠ মাসের খররৌদ্রভরা দুপুর দেখিয়াছি—কিন্তু এ রুদ্রমূর্তি তাহার নাই। এ ভীম-ভৈরব রূপ আমাকে মুগ্ধ করিল। সূর্যের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, একটা বিরাট অগ্নিকুণ্ড—

ক্যালসিয়াম পুড়িতেছে, হাইড্রোজেন পুড়িতেছে, লোহা পুড়িতেছে, নিকেল পুড়িতেছে, কোবাল্ট পুড়িতেছে—জানা-অজানা শত শত রকমের গ্যাস ও ধাতু কোটি যোজন ব্যাসযুক্ত দীপ্ত ফার্নেসে একসঙ্গে পুড়িতেছে—তারই ধূ-ধূ আগুনের ঢেউ অসীম শূন্যের ঈথারের স্তর ভেদ করিয়া ফুলকিয়া বইহার ও লোধাইটোলার তৃণভূমিতে বিস্তীর্ণ অরণ্যে আসিয়া লাগিয়া, প্রতি তৃণপত্রের শিরা-উপশিরার সব রসটুকু শুকাইয়া ঝামা করিয়া, দিগ্‌দিগন্ত ঝল্‌সাইয়া পুড়াইয়া শুরু করিয়াছে ধ্বংসের এক তাণ্ডব-লীলা। চাহিয়া দেখিলাম দূরে দূরে প্রান্তরের সর্বত্র কম্পমান তাপ-তরঙ্গ ও তাহার ওধারে তাপজনিত একটি অস্পষ্ট কুয়াশা। গ্রীষ্ম-দুপুরে কখনও এখানে আকাশ নীল দেখিলাম না—তাম্রাভ, কটা—শূন্য, একটি চিল-শকুনিও নাই—পাখির দল দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছে। কি অদ্ভুত সৌন্দর্য ফুটিয়াছে এই দুপুরের! খর উত্তাপকে অগ্রাহ্য করিয়া সেই হরীতকীতলায় দাঁড়াইয়া রহিলাম কতক্ষণ। সাহারা দেখি নাই, সোয়েন হেডিনের বিখ্যাত টাক্‌লামাকান্ মরুভূমি দেখি নাই, গোবি দেখি নাই—কিন্তু এখানে মধ্যাহ্নের এই রুদ্রভৈরব রূপের মধ্যে সে-সব স্থানের অস্পষ্ট আভাস ফুটিয়া উঠিল।

কাছারি হইতে তিন মাইল দূরে একটি বনে-ঘেরা ক্ষুদ্র কুণ্ডীতে সামান্য একটু জল ছিল, কুণ্ডীটাতে গত বর্ষার জলে খুব মাছ হইয়াছিল বলিয়া শুনিয়াছিলাম—খুব গভীর বলিয়া এই অনাবৃষ্টিতেও তাহার জল একেবারে শুকাইয়া যায় নাই। কিন্তু সে জলে কাহারও কোন কাজ হয় নাই—প্রথমত, তার কাছাকাছি অনেক দূর লইয়া কোন মানুষের বসতি নাই—দ্বিতীয়ত, জল ও তীরভূমির মধ্যে কাদা এত গভীর যে, কোমর পর্যন্ত বসিয়া যায়—কলসীতে জল পুরিয়া পুনরায় তীরে উত্তীর্ণ হইবার আশা বড়ই কম। আর একটি কারণ এই যে, জলটা খুব ভাল নয়—স্নান বা পানের আদৌ উপযুক্ত নয়, জলের সঙ্গে কি জিনিস মিশানো আছে জানি না—কিন্তু কেমন একটা অপ্রীতিকর ধাতব গন্ধ।

একদিন সন্ধ্যায় পশ্চিমে বাতাস ও উত্তাপ কম পড়িয়া গেলে ঘোড়ায় বাহির হইয়া ঐ কুণ্ডীটার পাশের উঁচু বালিয়াড়ি ও বন-ঝাউয়ের জঙ্গলের পথে উপস্থিত হইয়াছি। পিছনে গ্র্যান্ট সাহেবের সেই বড় বটগাছের আড়ালে সূর্য অস্ত যাইতেছিল। কাছারির খানিকটা জল বাঁচাইবার জন্য ভাবিলাম, এখানে ঘোড়াটাকে একবার জল খাওয়াইয়া লই। যত কাদা হোক, ঘোড়া ঠিক উঠিতে পারিবে। জঙ্গল পার হইয়া কুণ্ডীর ধারে গিয়া এক অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়িল। কুণ্ডীর চারিধারে কাদার উপর আট-দশটা ছোট বড় সাপ, অন্য দিকে তিনটা প্রকাণ্ড মহিষ একসঙ্গে জল খাইতেছে। সাপগুলি প্রত্যেকটি বিষাক্ত, করাত ও শঙ্খচিতি শ্রেণীর, যাহা এদেশে সাধারণত দেখা যায়।

মহিষ দেখিয়া মনে হইল, এ ধরনের মহিষ আমি আর কখনও দেখি নাই। প্রকাণ্ড এক জোড়া শিং, গায়ে লম্বা লম্বা লোম—বিপুল শরীর। কাছেও কোনো লোকালয় বা মহিষের বাথান নাই—তবে এ মহিষ কোথা হইতে আসিল বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। ভাবিলাম, চরির খাজনা ফাঁকি দিবার উদ্দেশ্যে কেহ লুকাইয়া হয়তো জঙ্গলের মধ্যে কোথাও বা বাথান করিয়া থাকিবে। কাছারির কাছাকাছি আসিয়াছি, মুনেশ্বর সিং চাক্‌লাদারের সহিত দেখা। তাহাকে কথাটা বলিতেই সে চমকিয়া উঠিল—আরে সর্বনাশ! বলেন কি হুজুর! হনুমানজী খুব বাঁচিয়ে দিয়েছেন আজ! ও পোষা ভঁইস্ নয়, ও হ'ল আড়ন, বুনো ভঁইস্ হুজুর, মোহনপুরা জঙ্গল থেকে এসেছে জল খেতে। ও অঞ্চলে কোথাও জল নেই তো! জলকষ্টে পড়ে এসেছে।

কাছারিতে কথাটা তখনই রাষ্ট্র হইয়া গেল। সকলেই এক বাক্যে বলিল—উঃ, হুজুর খুব বেঁচে গিয়েছেন। বাঘের হাতে পড়লে বরং রক্ষা পাওয়া যেতে পারে, বুনো মহিষের হাতে পড়লে নিস্তার নেই। আর এই সন্ধ্যাবেলা ওই নির্জন জায়গায় যদি একবার আপনাকে ওরা তাড়া করত, ঘোড়া ছুটিয়ে বাঁচতে পারতেন না হুজুর।

তারপর হইতে জঙ্গলে-ঘেরা ওই ছোট কুণ্ডীটা বন্য জানোয়ারের জলপানের একটা প্রধান আড্ডা হইয়া দাঁড়াইল। অনাবৃষ্টি যত হইতে লাগিল, রৌদ্রের ক্রমবর্ধমান প্রখরতায় দিক্‌দিগন্তে দাবদাহ যত প্রচণ্ড হইয়া উঠিতে লাগিল, খবর আসিতে লাগিল সেই জঙ্গলের মধ্যে কুণ্ডীতে লোকে বাঘকে জল খাইতে দেখিয়াছে, বন-মহিষকে জল খাইতে দেখিয়াছে, হরিণের পালকে জল খাইতে দেখিয়াছে, নীল গাই ও বুনো শুয়োর তো আছেই—কারণ শেষের দুই প্রকার জানোয়ার এ জঙ্গলে অত্যন্ত বেশী। আমি নিজে আর একদিন জ্যোৎস্না-রাত্রে ঘোড়ায় করিয়া কুণ্ডীতে যাই শিকারের উদ্দেশ্যে—সঙ্গে তিন-চারজন সিপাহী ছিল—দু-তিনটি বন্দুকও ছিল। সে যা দৃশ্য দেখিয়াছিলাম সে রাত্রে, জীবনে ভুলিবার নয়। তাহা বুঝিতে হইলে কল্পনায় ছবি আঁকিয়া লইতে হইবে এক জনহীন জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি ও বিস্তীর্ণ বনপ্রান্তরের। আরও কল্পনা করিয়া লইতে হইবে সারা বনভূমি ব্যাপিয়া এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতার, অভিজ্ঞতা না থাকিলে যদিও সে নিস্তব্ধতা কল্পনা করা প্রায় অসম্ভব।

উষ্ণ বাতাস অর্ধশুষ্ক কাশ-ডাঁটার গন্ধে নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে, লোকালয় হইতে বহুদূরে আসিয়াছি, দিগ্‌বিদিকের জ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছি।

কুণ্ডীতে প্রায় নিঃশব্দে জল খাইতেছে একদিকে দুটি নীল গাই, অন্য দিকে দুটি হায়েনা, নীল গাই দুটি একবার হায়েনাদের দিকে চাহিতেছে, হায়েনারা একবার নীল গাই দুটির দিকে চাহিতেছে—আর দু-দলের মাঝখানে দু-তিন মাস বয়সের এক ছোট নীল গাইয়ের বাচ্চা। অমন করুণ দৃশ্য কখনও দেখি নাই—দেখিয়া পিপাসার্ত বন্য জন্তুদের নিরীহ শরীরে অতর্কিতে গুলি মারিবার প্রবৃত্তি হইল না।

এদিকে বৈশাখও কাটিয়া গেল। কোথাও একফোঁটা জল নাই। আরও এক বিপদ দেখা দিল। এই সুবিস্তীর্ণ বনপ্রান্তরে মাঝে মাঝে লোকে দিক হারাইয়া আগেও পথ ভুলিয়া যাইত—এখন এই সব পথহারা পথিকদের জলাভাবে প্রাণ হারাইবার সমহ আশঙ্কা দাঁড়াইল, কারণ ফুলকিয়া বইহার হইতে গ্র্যান্ট সাহেবের বটগাছ পর্যন্ত বিশাল তৃণভূমির মধ্যে কোথাও একবিন্দু জল নাই। এক-আধটা শুষ্কপ্রায় কুণ্ডী যেখানে আছে, অনভিজ্ঞ দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকদের পক্ষে সে সব খুঁজিয়া পাওয়া সহজ নয়। একদিনের ঘটনা বলি।

৪

সেদিন বেলা চারটার সময় অত্যন্ত গরমে কাজে মন বসাইতে না পারিয়া একখানা কি বই পড়িতেছি, এমন সময় রামবিরিজ সিং আসিয়া এত্তেলা করিল, কাছারির পশ্চিমদিকে উঁচু ডাঙার উপরে একজন কে অদ্ভুত ধরনের পাগলা লোক দেখা যাইতেছে—সে হাত-পা নাড়িয়া দূর হইতে কি যেন বলিতেছে। বাহিরে গিয়া দেখিলাম সত্যই দূরের ডাঙাটার উপরে কে একজন দাঁড়াইয়া—মনে হইল মাতালের মত টলিতে টলিতে এদিকেই আসিতেছে। কাছারিসুদ্ধ লোক জড় হইয়া সেদিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছে দেখিয়া আমি দুজন সিপাহী পাঠাইয়া দিলাম লোকটাকে এখানে আনিতে।

লোকটাকে যখন আনা হইল, দেখিলাম তাহার গায়ে কোন জামা নাই—পরনে মাত্র একখানা ফর্সা ধুতি, চেহারা ভাল, রং গৌরবর্ণ। কিন্তু তাহার মুখের আকৃতি অতি ভীষণ, গালের দুই কশ বাহিয়া ফেনা বাহির হইতেছে, চোখদুটি জবাফুলের মত লাল, চোখে উন্মাদের মত দৃষ্টি। আমার ঘরের দাওয়ায় একটা বালতিতে জল ছিল—তাই দেখিয়া সে পাগলের মত ছুটিয়া বালতির দিকে গেল। মুনেশ্বর সিং চাক্‌লাদার ব্যাপারটা বুঝিয়া তাড়াতাড়ি বালতি সরাইয়া লইল। তাহার পর তাহাকে বসাইয়া হাঁ করাইয়া দেখা গেল জিভ ফুলিয়া বীভৎস ব্যাপার হইয়াছে। অতি কষ্টে জিভটা মুখের একপাশে সরাইয়া একটু একটু করিয়া তাহার মুখে জল দিতে দিতে আধ ঘণ্টা পরে লোকটা কথঞ্চিৎ সুস্থ হইল। কাছারিতে লেবু ছিল, লেবুর রস ও গরম জল এক গ্লাস তাহাকে খাইতে দিলাম। ক্রমে ঘণ্টাখানেক পরে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল। শুনিলাম তার বাড়ি পাটনা। গালার চাষ করিবার উদ্দেশ্যে সে এ-অঞ্চলে কুলের জঙ্গলের অনুসন্ধান করিতে পূর্ণিয়া হইতে রওনা হইয়াছে আজ দুই দিন পূর্বে। তার পর দুপুরের সময় আমাদের মহালে ঢুকিয়াছে, এবং একটু পরে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, কারণ এরকম একঘেয়ে একই ধরনের গাছে-ভরা জঙ্গলে দিক্ ভুল করা খুব সোজা, বিশেষত বিদেশী লোকের পক্ষে। কালকার ভীষণ উত্তাপে ও গরম পশ্চিমা বাতাসের দমকার মধ্যে সারা বৈকাল ঘুরিয়াছে—কোথাও একফোঁটা জল পায় নাই, একটা মানুষের সঙ্গে দেখা হয় নাই—রাত্রে অবসন্ন অবস্থায় এক গাছের তলায় শুইয়াছিল—আজ সকাল হইতে আবার ঘোরা শুরু করিয়াছে—মাথা ঠাণ্ডা রাখিলে সূর্য দেখিয়া দিক্ নির্ণয় করা হয়তো তার পক্ষে খুব কঠিন হইত না—অন্তত পূর্ণিয়ায়ও ফিরিয়া যাইতে পারিত—কিন্তু ভয়ে দিশাহারা হইয়া একবার এদিক একবার ওদিক ছুটাছুটি করিয়াছে আজ সারা দুপুর, তাহার উপর খুব চিৎকার করিয়া লোক ডাকিবার চেষ্টা করিয়াছে। কোথায় লোক? ফুলকিয়া বইহারের কুলের জঙ্গল যেদিকে, সেদিক হইতে লবটুলিয়া পর্যন্ত দশ-বারো বর্গমাইল-ব্যাপী বনপ্রান্তর সম্পূর্ণ জনমানবশূন্য, সুতরাং আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, তাহার চিৎকার কেহ শোনে নাই। আরও তাহার আতঙ্ক হইবার কারণ, সে ভাবিয়াছিল তাহাকে জঙ্গলের মধ্যে জিনপরীতে পাইয়াছে—মারিয়া না ফেলিয়া ছাড়িবে না। তাহার গায়ে একটা জামা ছিল, কিন্তু আজ অসহ্য পিপাসায় দুপুরের পরে এমন গা-জ্বলুনি শুরু হইয়াছিল যে জামাটা খুলিয়া কোথায় ফেলিয়া দিয়াছে। এ অবস্থায় দৈবক্রমে আমাদের কাছারির হনুমানের ধ্বজার লাল নিশানটা দূর হইতে তাহার চোখে না পড়িলে লোকটা আজ বেঘোরে মারা পড়িত।

একদিন এই ঘোর উত্তাপ ও জলকষ্টের দিনে ঠিক দুপুরবেলা সংবাদ পাইলাম, নৈর্ঋত কোণে মাইল-খানেক দূরের জঙ্গলে ভয়ানক আগুন লাগিয়াছে এবং আগুন কাছারির দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। সবাই মিলিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া দেখিলাম প্রচুর ধূমের সঙ্গে রাঙা অগ্নিশিখা লক্‌লক্ করিয়া বহুদূর আকাশে উঠিতেছে। সেদিন আবার দারুণ পশ্চিমে বাতাস, লম্বা লম্বা ঘাস ও বন-ঝাউয়ের জঙ্গল সূর্যতাপে অর্ধশুষ্ক হইয়া বারুদের মত হইয়া আছে, এক-এক স্ফুলিঙ্গ পড়িবামাত্র গোটা ঝাড় জ্বলিয়া উঠিতেছে—সেদিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, ঘন নীলবর্ণ ধূমরাশি ও অগ্নিশিখা—আর চটপট শব্দ। ঝড়ের মুখে পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে বাঁকা আগুনের শিখা ঠিক যেন ডাক-গাড়ির বেগে ছুটিয়া আসিতেছে আমাদের কয়খানা খড়ের বাংলোর দিকেই। সকলেরই মুখ শুকাইয়া গেল, এখানে থাকিলে আপাতত তো বেড়া-আগুনে ঝলসাইয়া মরিতে হয়—দাবানল তো আসিয়া পড়িল!

ভাবিবার সময় নাই। কাছারির দরকারী কাগজপত্র, তহবিলের টাকা, সরকারি দলিল ম্যাপ, সর্বস্ব মজুত—এ বাদে আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত জিনিস যার যার তো আছেই। এ সব তো যায়! সিপাহীরা শুষ্কমুখে ভীতকণ্ঠে বলিল—আগ তো আ গৈল, হুজুর! বলিলাম—সব জিনিস বার কর। সরকারি তহবিল ও কাগজপত্র আগে।

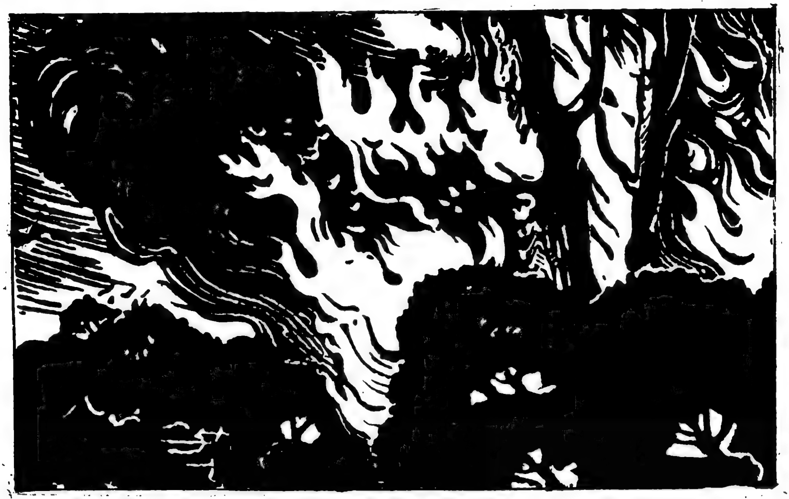

জনকতক লোক লাগিয়া গেল আগুন ও কাছারির মধ্যে যে জঙ্গল পড়ে তাহারই যতটা পারা যায় কাটিয়া পরিষ্কার করিতে। জঙ্গলের মধ্যে বাথান হইতে আগুন দেখিয়া বাথানওয়ালা চরির প্রজা দু-দশ জন ছুটিয়া আসিল কাছারি রক্ষা করিতে, কারণ পশ্চিমা বাতাসের বেগ দেখিয়া তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে কাছারি ঘোর বিপন্ন।

কি অদ্ভুত দৃশ্য! জঙ্গল ভাঙিয়া ছিঁড়িয়া ছুটিয়া পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে নীলগাইয়ের দল প্রাণভয়ে দৌড়িতেছে, শিয়াল দৌড়িতেছে, কান উঁচু করিয়া খরগোশ দৌড়িতেছে, একদল বন্যশূকর তো ছানাপোনা লইয়া কাছারির উঠান দিয়াই দিগ্‌বিদিগ জ্ঞানশূন্য অবস্থায় ছুটিয়া গেল—ও অঞ্চলের বাথান হইতে পোষা মহিষের দল ছাড়া পাইয়া প্রাণপণে ছুটিতেছে, একঝাঁক বনটিয়া মাথার উপর দিয়া সোঁ করিয়া উড়িয়া পলাইল, পিছনে পিছনে একটা বড় ঝাঁক লাল হাঁস। আবার এক ঝাঁক বনটিয়া, গোটাকতক সিল্লি। রামবিরিজ সিং চাকলাদার অবাক হইয়া বলিল—পানি কাঁহা নেই ছে...আরে এ লাল হাঁসকা জেরা কাঁহাসে আয়া, ভাই রামলগন? গোষ্ঠ মুহুরী বিরক্ত হইয়া বলিল—আঃ বাপু রাখ্! এখন প্রাণ নিয়ে টানাটানি, লাল হাঁস কোথা থেকে এল তার কৈফিয়তে কি দরকার?

আগুন বিশ মিনিটের মধ্যে আসিয়া পড়িল। তার পরে দশ-পনেরজন লোক মিলিয়া প্রায় ঘণ্টাখানেক আগুনের সঙ্গে সে কি যুদ্ধ! জল কোথাও নাই—আধকাঁচা গাছের ডাল ও বালি এইমাত্র অস্ত্র। সকলের মুখচোখ আগুনের ও রৌদ্রের তাপে দৈত্যের মত বিভীষণ হইয়া উঠিয়াছে, সর্বাঙ্গে ছাই ও কালি, হাতের শিরা ফুলিয়া উঠিয়াছে, অনেকেরই গায়ে হাতে ফোস্কা—এদিকে কাছারির সব জিনিসপত্র, বাক্স, খাট, দেরাজ, আলমারি তখনও টানাটানি করিয়া বাহির করিয়া বিশৃঙ্খলভাবে উঠানে ফেলা হইতেছে। কোথাকার জিনিস যে কোথায় গেল, কে তার ঠিকানা রাখে! মুহুরীবাবুকে বলিলাম—ক্যাশ আপনার জিম্মায় রাখুন, আর দলিলের বাক্সটা।

কাছারির উঠান ও পরিষ্কৃত স্থানে বাধা পাইয়া আগুনের স্রোত উত্তর ও দক্ষিণ বাহিয়া নিমেষের মধ্যে পূর্বমুখে ছুটিল—কাছারিটা কোনক্রমে রক্ষা পাইয়া গেল এ যাত্রা। জিনিসপত্র আবার ঘরে তোলা হইল, কিন্তু বহুদূরে পূর্বাকাশ লাল করিয়া লোলজিহ্বা প্রলয়ঙ্করী অগ্নিশিখা সারারাত্রি ধরিয়া জ্বলিতে জ্বলিতে সকালের দিকে মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের সীমানায় গিয়া পৌঁছিল।

দু-তিন দিন পরে খবর পাওয়া গেল কারো ও কুশী নদীর তীরবর্তী কর্দমে আট-দশটা বন্য মহিষ, দুটি চিতাবাঘ, কয়েকটি নীলগাই হাবড়ে পড়িয়া পুঁতিয়া রহিয়াছে। ইহারা আগুন দেখিয়া মোহনপুরা জঙ্গল হইতে প্রাণভয়ে নদীর ধার দিয়া ছুটিতে ছুটিতে হাবড়ে পড়িয়া গিয়াছে—যদিও রিজার্ভ ফরেস্ট হইতে কুশী ও কারো নদী প্রায় আট-ন' মাইল দূরে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ কাটিয়া গিয়া আষাঢ় পড়িল। আষাঢ় মাসে প্রথমেই কাছারির পুণ্যাহ উৎসব। এ জায়গায় মানুষের মুখ বড় একটা দেখিতে পাই না বলিয়া আমার একটা শখ ছিল কাছারির পুণ্যাহের দিনে অনেক লোক নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইব। নিকটে কোন গ্রাম না থাকায় আমরা গনোরী তেওয়ারীকে পাঠাইয়া দূরে-দূরের বস্তির লোকদের নিমন্ত্রণ করিলাম। পুণ্যাহের পূর্বদিন হইতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া টিপ টিপ বৃষ্টি পড়িতে শুরু করিয়াছিল, পুণ্যাহের দিন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। এদিকে দুপুর হইতে না হইতে দলে দলে লোক নিমন্ত্রণ খাওয়ার লোভে ধারাবর্ষণ উপেক্ষা করিয়া কাছারিতে পৌঁছিতে লাগিল, এমন মুস্কিল যে, তাহাদের বসিবার জায়গা দিতে পারা যায় না। দলের মধ্যে অনেক মেয়ে ছেলেপুলে লইয়া খাইতে আসিয়াছে, কাছারির দপ্তরখানায় তাহাদের বসিবার ব্যবস্থা করিলাম, পুরুষেরা যে যেখানে পারে আশ্রয় লইল।

এ-দেশে খাওয়ানোর কোন হাঙ্গামা নেই, এত গরীব দেশ যে থাকিতে পারে তাহা আমার জানা ছিল না। বাংলা দেশ যতই গরীব হোক্, এদের দেশের সাধারণ লোকদের তুলনায় বাংলা দেশের গরিব লোকেও অনেক বেশি অবস্থাপন্ন। ইহারা এই মুষলধারে বৃষ্টি মাথায় করিয়া খাইতে আসিয়াছে চীনা ঘাসের দানা, টক দই, ভেলি গুড় ও লাড্ডু। কারণ ইহাই এখানে সাধারণ ভোজের খাদ্য।

দশ-বারো বছরের একটি অচেনা ছোকরা সকাল হইতেই খুব খাটিতেছিল, গরীব লোকের ছেলে, নাম বিশুয়া, দূরের কোন বস্তি হইতে আসিয়া থাকিবে। বেলা দশটার সময় সে কিছু জলখাবার চাহিল। ভাঁড়ারের ভার ছিল লবটুলিয়ার পাটোয়ারীর উপর, সে এক খুঁচি চীনার দানা ও একটু নুন তাহাকে আনিয়া দিল।

আমি পাশেই দাঁড়াইয়া ছিলাম। ছেলেটি কালো কুচকুচে, সুশ্রী মুখটা, যেন পাথরের কৃষ্ণঠাকুর। সে যখন ব্যস্তসমস্ত হইয়া মলিন মোটা মার্কিনী আট-হাতি থান কাপড়ের খুঁট পাতিয়া সেই তুচ্ছ জলখাবার লইল তখন তাহার মুখে সে কি খুশির হাসি! আমি বলিতে পারি অতি গরিব অবস্থারও কোনও বাঙালী ছেলে চীনার দানা কখনও খাইবেই না, খুশি হওয়া তো দূরের কথা। কারণ একবার শখ করিয়া চীনার দানা খাইয়া যে স্বাদ পাইয়াছি, তাহাতে মুখরোচক সুখাদ্য হিসাবে তাহাকে উল্লেখ কখনই করিতে পারিব না।

বৃষ্টির মধ্যে কোনও রকমে তো ব্রাহ্মণভোজন একরকম চুকিয়া গেল। বৈকালের দিকে দেখি ঘোর অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্যে অনেকক্ষণ হইতে তিনটি স্ত্রীলোক উঠোনে পাতা পাতিয়া বসিয়া ভিজিয়া ঝুপসি হইতেছে—সঙ্গে দুটি ছোট ছোট ছেলেমেয়েও। তাহাদের পাতে চীনার দানা আছে, কিন্তু দই বা ভেলি গুড় কেহ দিয়া যায় নাই, তাহারা হাঁ করিয়া কাছারি ঘরের দিকে চাহিয়া আছে। পাটোয়ারীকে ডাকিয়া বলিলাম—এদের কে দিচ্ছে? এরা বসে আছে কেন? আর এদের এই বৃষ্টির মধ্যে উঠোনে বসিয়েছেই বা কে?

পাটোয়ারী বলিল—হুজুর, ওরা জাতে দোষাদ। ওদের ঘরের দাওয়ায় তুললে ঘরের সব জিনিসপত্র ফেলা যাবে, কোনও ব্রাহ্মণ, ছত্রী কি গাঙ্গোতা সে জিনিস খাবে না। আর জায়গাই বা কোথায় আছে বলুন?

ওই গরীব দোষাদদের মেয়ে কয়টির সাম্‌নে আমি গিয়া নিজে বৃষ্টিতে ভিজিয়া দাঁড়াইতে লোকজনেরা ব্যস্ত হইয়া তাহাদের পরিবেশন করিতে লাগিল। সামান্য চীনার দানা, গুড় ও জলো টক দই এক-একজন যে পরিমাণে খাইল, চোখে না দেখিলে তাহা বিশ্বাস করিবার কথা নহে। এই ভোজ খাইবার জন্য এত আগ্রহ দেখিয়া ঠিক করিলাম, দোষাদদের এই মেয়েদের নিমন্ত্রণ করিয়া একদিন খুব ভাল করিয়া সত্যকার সভ্য খাদ্য খাওয়াইব। সপ্তাহখানেক পরেই পাটোয়ারীকে দিয়া দোষাদপাড়ার মেয়ে কয়টি ও তাহাদের ছেলেমেয়েদের নিমন্ত্রণ করিলাম, সেদিন তাহারা যাহা খাইল—লুচি, মাছ, মাংস, ক্ষীর, দই, পায়েস, চাটনি—জীবনে কোনও দিন সেরকম ভোজ খাওয়ার কল্পনাও করে নাই। তাদের বিস্মিত ও আনন্দিত চোখ-মুখের সে হাসি কতদিন আমার মনে ছিল! সেই ভবঘুরে গাঙ্গোতা ছোকরা বিশুয়াও সে দলে ছিল।

২

সার্ভে-ক্যাম্প থেকে একদিন ঘোড়া করিয়া ফিরিতেছি, বনের মধ্যে একটা লোক কাশঘাসের ঝোপের পাশে বসিয়া কলাইয়ের ছাতু মাখিয়া খাইতেছে। পাত্রের অভাবে ময়লা থান কাপড়ের প্রান্তেই ছাতুটা মাখিতেছে—এত বড় একটা তাল যে, একজন লোকে—হলই বা হিন্দুস্থানী, মানুষ তো বটে—কি করিয়া অত ছাতু খাইতে পারে এ আমার বুদ্ধির অগোচর। আমায় দেখিয়া লোকটা সসম্ভ্রমে খাওয়া ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেলাম ঠুকিয়া বলিল—ম্যানেজার সাহেব! থোড়া জলখাই করতে হেঁ হুজুর, মাফ কিজিয়ে।

একজন ব্যক্তি নির্জনে বসিয়া, শান্ত ভাবে জলখাবার খাইতেছে, ইহার মধ্যে মাপ করিবার কি আছে খুঁজিয়া পাইলাম না। বলিলাম—খাও, খাও, তোমায় উঠতে হবে না। নাম কি তোমার?

লোকটা তখনও বসে নাই, দণ্ডায়মান অবস্থাতেই সসম্ভ্রমে বলিল—গরীব কা নাম ধাওতাল সাহু, হুজুর।

চাহিয়া দেখিয়া মনে হইল লোকটার বয়স ষাটের উপর হইবে। রোগা লম্বা চেহারা, গায়ের রং কালো, পরনে অতি মলিন থান ও মেরজাই, পা খালি।

ধাওতাল সাহুর সঙ্গে এই আমার প্রথম আলাপ।

কাছারিতে আসিয়া রামজোত পাটোয়ারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ধাওতাল সাহুকে চেনো?

রামজোত বলিল—জী হুজুর। ধাওতাল সাহুকে এ অঞ্চলে কে না জানে? সে মস্ত বড় মহাজন, লক্ষপতি লোক, এদিকে সবাই তার খাতক। নওগছিয়ায় তার ঘর। পাটোয়ারীর কথা শুনিয়া খুব আশ্চর্য হইয়া গেলাম। লক্ষপতি লোক বনের মধ্যে বসিয়া ময়লা উড়ানির প্রান্তে

এক তাল নিরুপকরণ কলাইয়ের ছাতু খাইতেছে—এ দৃশ্য কোন বাঙালী লক্ষপতির সম্বন্ধে অন্তত কল্পনা করা অতীব কঠিন। ভাবিলাম পাটোয়ারী বাড়াইয়া বলিতেছে, কিন্তু কাছারিতে যাহাকে জিজ্ঞাসা করি, সে-ই ঐ কথা বলে, ধাওতাল সাহু? তার টাকার লেখা-জোখা নেই।

ইহার পরে নিজের কাজে ধাওতাল সাহু অনেকবার কাছারিতে আমার সহিত দেখা করিয়াছে, প্রতিবার একটু একটু করিয়া তাহার সহিত আলাপ জমিয়া উঠিলে বুঝিলাম, একটি অতি অদ্ভুত লোকোত্তর চরিত্রের মানুষের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়াছে। বিংশ শতাব্দীতে এ ধরনের লোক যে আছে, না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না।

ধাওতালের বয়স যাহা আন্দাজ করিয়াছিলাম, প্রায় তেষট্টি-চৌষট্টি। কাছারির পূর্ব-দক্ষিণ দিকের জঙ্গলের প্রান্ত হইতে বারো-তেরো মাইল দূরে নওগছিয়া নামে গ্রামে তাহার বাড়ি। এ অঞ্চলে প্রজা, জোতদার, জমিদার, ব্যবসাদার প্রায় সকলেই ধাওতাল সাহুর খাতক। কিন্তু তাহার মজা এই যে, টাকা ধার দিয়া সে জোর করিয়া কখনও তাগাদা করিতে পারে না। কত লোকে যে কত টাকা তাহার ফাঁকি দিয়াছে! তাহার মত নিরীহ, ভালমানুষ লোকের মহাজন হওয়া উচিত ছিল না, কিন্তু লোকের উপরোধ সে এড়াইতে পারে না। বিশেষত সে বলে, যখন সকলেই মোটা সুদ লিখিয়া দিয়াছে, তখন ব্যবসা হিসাবেও তো টাকা দেওয়া উচিত। একদিন ধাওতাল আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিল, উড়ানিতে বাঁধা এক বাণ্ডিল পুরনো দলিলপত্র। বলিল—হুজুর, মেহেরবানি করে একটু দেখবেন দলিলগুলো?

পরীক্ষা করিয়া দেখি, প্রায় আট-দশ হাজার টাকার দলিল ঠিক সময়ে নালিশ না-করার দরুণ তামাদি হইয়া গিয়াছে।

উড়ানির আর এক মুড়ো খুলিয়া সে আরও কতকগুলি জরাজীর্ণ কাগজ বাহির করিয়া বলিল—এগুলো দেখুন দেখি হুজুর! ভাবি একবার জেলায় গিয়ে উকিলদের দেখাই, তা মামলা কখনো করিনি, করা পোষায় না। তাগাদা করি, দিচ্চি দেব করে টাকা দেয় না অনেকে।

দেখিলাম, সবগুলিই তামাদি দলিল। সবসুদ্ধ জড়াইয়া সেও চার-পাঁচ হাজার টাকা। ভালোমানুষকে সবাই ঠকায়। বলিলাম—সাহুজী, মহাজনী করা তোমার কাজ নয়। এ-অঞ্চলে মহাজনী করতে পারবে রাসবিহারী সিং রাজপুতের মত দুঁদে লোকেরা, যাদের সাত-আটটা লাঠিয়াল আছে, খাতকের ক্ষেতে নিজে ঘোড়া করে গিয়ে লাঠিয়াল মোতায়েন করে আসে, ফসল ক্রোক করে টাকা আর সুদ আদায় করে। তোমার মত ভালমানুষ লোকের টাকা শোধ করবে না কেউ। দিও না কাউকে আর।

ধাওতালকে বুঝাইতে পারিলাম না। সে বলিল—সবাই ফাঁকি দেয় না হুজুর। এখনও চন্দ্র-সূর্য উঠছে, মাথার উপর দীন-দুনিয়ার মালিক এখনও আছেন। টাকা কি বসিয়ে রাখলে চলে, সুদে না বাড়ালে আমাদের চলে না হুজুর। এই আমাদের ব্যবসা।

তাহার এ-যুক্তি আমি বুঝিতে পারিলাম না, সুদের লোভে আসল টাকা নষ্ট হইতে দেওয়া কেমনতর ব্যবসা জানি না। ধাওতাল সাহু আমার সামনেই অম্লান বদনে পনের-ষোল হাজার টাকার তামাদি দলিল ছিঁড়িয়া ফেলিল—এমন ভাবে ছিঁড়িল যেন সেগুলো বাজে কাগজ—অবশ্য বাজে কাগজের পর্যায়েই তাহারা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে বটে। তাহার হাত কাঁপিল না, গলার সুর কাঁপিল না।

বলিল—রাঁইচি আর রেড়ির বীজ বিক্রি করে টাকা করেছিলাম হুজুর, নয়তো আমার পৈতৃক আমলের একটা ঘষা পয়সাও ছিল না। আমি করেছি, আবার আমিই লোকসান দিচ্ছি। ব্যবসা করতে গেলে লাভ-লোকসান আছেই হুজুর।

তা আছে স্বীকার করি, কিন্তু কয়জন লোক এত বড় ক্ষতি এমন শান্তমুখে উদাসীনভাবে সহ্য করিতে পারে, সেই কথাই ভাবিতেছিলাম। তাহার বড়মানুষী গর্ব দেখিলাম মাত্র একটি ব্যাপারে ;একটা লাল কাপড়ের বটুয়া হইতে সে মাঝে মাঝে ছোট্ট একখানা জাঁতি ও সুপারি বাহির করিয়া কাটিয়া মুখে ফেলিয়া দেয়। আমার দিকে চাহিয়া হাসিমুখে একবার বলিয়াছিল—রোজ এক কনোয়া করে সুপুরি খাই বাবুজী। সুপুরির বড় খরচ আমার।

বিত্তে নিস্পৃহতা ও বৃহৎ ক্ষতিকে তাচ্ছিল্য করিবার ক্ষমতা যদি দার্শনিকতা হয়, তবে ধাওতাল সাহুর মত দার্শনিক আমি তো অন্তত দেখি নাই।

৩

ফুলকিয়ার ভিতর দিয়া যাইবার সময় আমি প্রতিবারই জয়পাল কুমারের মকাইয়ের পাতা-ছাওয়া ছোট্ট ঘরখানার সামনে দিয়া যাইতাম। কুমার অর্থে কুম্ভকার নয়, ভুঁইহার বামুন।

খুব বড় একটা প্রাচীন পাকুড় গাছের নীচেই জয়পালের ঘর। সংসারে সে সম্পূর্ণ একা, বয়সেও প্রাচীন, লম্বা রোগা চেহারা, মাথায় লম্বা সাদা চুল। যখনই যাইতাম, তখনই দেখিতাম কুঁড়েঘরের দোরের গোড়ায় সে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। জয়পাল তামাক খাইত না, কখনও তাকে কোন কাজ করিতে দেখিয়াছি বলিয়াও মনে হয় না, গান গাহিতে শুনি নাই—সম্পূর্ণ কর্মশূন্য অবস্থায় মানুষ কি ভাবে যে এমন ঠায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে, জানি না। জয়পালকে দেখিয়া বড় বিস্ময় ও কৌতহল বোধ করিতাম। প্রতিবারই উহার ঘরের সামনে ঘোড়া থামাইয়া উহার সহিত দুটা কথা না বলিয়া যাইতে পারিতাম না।

জিজ্ঞাসা করিলাম—জয়পাল, কি কর বসে?

—এই, বসে আছি হুজুর।

—বয়স কত হল?

—তা হিসেব রাখিনি, তবে যেবার কুশীনদীর পুল হয়, তখন আমি মহিষ চরাতে পারি।

—বিয়ে করেছিলে? ছেলেপুলে ছিল?

—পরিবার মরে গিয়েছে আজ বিশ-পঁচিশ বছর। দুটো মেয়ে ছিল, তারাও মারা গেল। সেও তেরো-চৌদ্দ বছর আগে। এখন একাই আছি।

—আচ্ছা, এই যে একা এখানে থাক, কারও সঙ্গে কথা বলো না, কোথাও যাও না, কিছু করও না—এ ভাল লাগে? একঘেয়ে লাগে না?

জয়পাল অবাক হইয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিত—কেন খারাপ লাগবে হুজুর? বেশ থাকি। কিছু খারাপ লাগে না।

জয়পালের এই কথাটা আমি কিছুতে বুঝিতে পারিতাম না। আমি কলিকাতার কলেজে পড়িয়া মানুষ হইয়াছি, হয় কোন কাজ, নয়তো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা, নয় বই, নয় সিনেমা, নয় বেড়ানো—এ ছাড়া মানুষ কি করিয়া থাকে বুঝি না। ভাবিয়া দেখিতাম, দুনিয়ায় কত কি পরিবর্তন হইয়া গেল, গত বিশ বৎসর জয়পাল কুমার ওর ঘরের দোরটাতে ঠায় চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া তার কতটুকু খবর রাখে? আমি যখন ছেলেবেলায় স্কুলের নীচের ক্লাসে পড়িতাম, তখনও জয়পাল এমনি বসিয়া থাকিত, বি. এ. যখন পাস করিলাম তখনও জয়পাল এমনি করিয়া বসিয়া থাকে। আমার জীবনেরই নানা ছোট বড় ঘটনা যা আমার কাছে পরম

বিস্ময়কর বস্তু, তারই সঙ্গে মিলাইয়া জয়পালের এই বৈচিত্র্যহীন নির্জন জীবনের অতীত দিনগুলির কথা ভাবিতাম।

জয়পালের ঘরখানা গ্রামের একেবারে মাঝখানে হইলেও, কাছে অনেকটা পতিত জমি ও মকাই-খেত, কাজেই আশে-পাশে কোন বসতি নাই। ফুলকিয়া নিতান্ত ক্ষুদ্র গ্রাম, দশ-পনের ঘর লোকের বাস, সকলেই চতুর্দিকব্যাপী জঙ্গল-মহালে মহিষ চরাইয়া দিন গুজরান করে। সারাদিন ভূতের মত খাটে আর সন্ধ্যার সময় কলুইয়ের ভূষির আগুন জ্বালাইয়া তার চারিপাশে পাড়াসুদ্ধ বসিয়া গল্পগুজব করে, খৈনি খায় কিংবা শালপাতার পিকার ধূমপান করে। হুঁকায় তামাক খাওয়ার চলন এদেশে খুবই কম। কিন্তু কখনও কোন লোককে জয়পালের সঙ্গে আড্ডা দিতে দেখি নাই।

প্রাচীন পাকুড় গাছটার মগডালে বকেরা দল বাঁধিয়া বাস করে, দূর হইতে দেখিলে মনে হয়, গাছের মাথায় থোকা থোকা সাদা ফুল ফুটিয়াছে। স্থানটা ঘন ছায়াভরা, নির্জন, আর সেখানটাতে দাঁড়াইয়া যে দিকেই চোখ পড়ে, সেদিকেই নীল নীল পাহাড় দূরদিগন্তে হাত ধরাধরি করিয়া ছোট ছেলেমেয়েদের মত মণ্ডলাকারে দাঁড়াইয়া। আমি পাকুড় গাছের ঘন ছায়ায় দাঁড়াইয়া যখন জয়পালের সঙ্গে কথা বলিতাম, তখন আমার মনে এই সুবৃহৎ বৃক্ষতলের নিবিড় শান্তি ও গৃহস্বামীর অনুদ্বিগ্ন, নিস্পৃহ, ধীর জীবনযাত্রা ধীরে ধীরে কেমন একটা প্রভাব বিস্তার করিত। ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইয়া লাভ কি? কি সুন্দর ছায়া এই শ্যাম বংশী-বটের, কেমন মন্থর যমুনাজল, অতীতের শত শতাব্দী পায়ে পায়ে পার হইয়া সময়ের উজানে চলিয়া যাওয়া কি আরামের!

কিন্তু জয়পালের জীবনযাত্রার প্রভাব ও কিছু চারিধারের বাধা-বন্ধনশূন্য প্রকৃতি আমাকেও ক্রমে ক্রমে যেন ঐ জয়পাল কুমারের মত নির্বিকার, উদাসীন ও নিস্পৃহ করিয়া তুলিতেছে। শুধু তাই নয়, আমার যে চোখ কখনও এর আগে ফুটে নাই সে চোখ যেন ফুটিয়াছে, যে-সব কথা কখনও ভাবি নাই তাহাই ভাবাইতেছে। ফলে এই মুক্ত প্রান্তর ও ঘনশ্যাম অরণ্য-প্রকৃতিকে এত ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি যে, একদিন পূর্ণিয়া কি মুঙ্গের শহরে কার্য উপলক্ষে গেলে মন উড়ু উড়ু করে, মন টিকিতে চায় না। মনে হয়, কতক্ষণে জঙ্গলের মধ্যে ফিরিয়া যাইব, কতক্ষণে আবার সেই ঘন নির্জনতার মধ্যে, অপূর্ব জ্যোৎস্নার মধ্যে, সূর্যাস্তের মধ্যে, দিগন্তব্যাপী কালবৈশাখীর মেঘের মধ্যে, তারাভরা নিদাঘ-নিশীথের মধ্যে ডুব দিব!

ফিরিবার সময় সভ্য লোকালয়কে বহুদূর পিছনে ফেলিয়া, মুকুন্দি চাক্‌লাদারের হাতের বাবলাকাঠের খুঁটির পাশ কাটাইয়া যখন নিজের জঙ্গলের সীমানায় ঢুকি, তখন সুদূরবিসর্পী নিবিড়শ্যাম বনানী, প্রান্তর, শিলাস্তূপ, বনটিয়ার ঝাঁক, নীল গাইয়ের জেরা, সূর্যালোক, ধরণীর মুক্ত প্রসার আমায় একেবারে একমুহূর্তে অভিভূত করিয়া দেয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১

খুব জ্যোৎস্না, তেমনি হাড়কাঁপানো শীত। পৌষ মাসের শেষ। সদর কাছারি হইতে লবটুলিয়াঃ ডিহি কাছারিতে তদারক করিতে গিয়াছি। লবটুলিয়ার কাছারিতে রাত্রে রান্না শেষ হইয়া সকলের আহারাদি হইতে রাত এগারটা বাজিয়া যাইত। একদিন খাওয়া শেষ করিয়া রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দেখি, তত রাত্রে আর সেই কন্‌কনে হিমবর্ষী আকাশের তলায় কে একটি মেয়ে ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় কাছারির কম্পাউন্ডের সীমানায় দাঁড়াইয়া আছে। পাটোয়ারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ওখানে কে দাঁড়িয়ে?

পাটোয়ারী বলিল—ও কুন্তা। আপনার আসবার কথা শুনে আমায় কাল বলছিল—ম্যানেজারবাবু আসবেন, তাঁর পাতের ভাত আমি গিয়ে নিয়ে আসবো। আমার ছেলেপুলের বড় কষ্ট। তাই বলেছিলাম—যাস্।

কথা বলিতেছি, এমন সময় কাছারির টহলদার বলোয়া আমার পাতের ডালমাখা ভাত, ভাঙা মাছের টুকরো, পাতের গোড়ায় ফেলা তরকারি ও ভাত, দুধের বাটির ভুক্তাবশিষ্ট দুধ-ভাত—সব লইয়া গিয়া মেয়েটির আনীত একটা পেতলের কানাউঁচু থালায় ঢালিয়া দিল। মেয়েটি চলিয়া গেল।

আট-দশ দিন সেবার লবটুলিয়া কাছারিতে ছিলাম, প্রতি রাত্রে দেখিতাম ইঁদারার পাড়ে সেই মেয়েটি আমার পাতের ভাতের জন্য সেই গভীর রাত্রে আর সেই ভয়ানক শীতের মধ্যে বাহিরে শুধু আঁচল গায়ে দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। প্রতিদিন দেখিতে দেখিতে একদিন কৌতূহলবশে পাটোয়ারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কুন্তা—যে রোজ ভাত নিয়ে যায়, ও কে, আর জঙ্গলে থাকেই বা কোথায়? দিনে তো কখনও দেখিনে ওকে?

পাটোয়ারী বলিল—বলছি হুজুর।

ঘরের মধ্যে সন্ধ্যা হইতে কাঠের গুঁড়ি জ্বালাইয়া গন্‌গনে আগুন করা হইয়াছে—তারই ধারে চেয়ার পাতিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়া কিস্তির আদায়ী হিসাব মিলাইতেছিলাম। আহারাদি শেষ করিয়া আসিয়া মনে হইল একদিনের পক্ষে কাজ যথেষ্টই করিয়াছি। কাগজপত্র গুটাইয়া পাটোয়ারীর গল্প শুনিতে প্রস্তুত হইলাম।

—শুনুন হুজুর। বছর দশেক আগে এ অঞ্চলে দেবী সিং রাজপুতের বড় রবরবা ছিল। তার ভয়ে যত গাঙ্গোতা আর চাষী ও চরির প্রজা জুজু হয়ে থাকত। দেবী সিং-এর ব্যবসা ছিল খুব চড়া সুদে টাকা ধার দেওয়া এই সব লোককে—আর তার পর লাঠিবাজি করে সুদ ও আসল টাকা আদায় করা। তার তাঁবে আট-ন' জন লাঠিয়াল পাইকই ছিল। এখন যেমন রাসবিহারী সিং রাজপুত এ অঞ্চলের মহাজন, তখন ছিল দেবী সিং।

দেবী সিং জৌনপুর জেলা থেকে এসে পূর্ণিয়ায় বাস করে। তার পর টাকা ধার দিয়ে জোর-জবরদস্তি করে এ দেশের যত ভীতু গাঙ্গোতা প্রজাদের হাতের মুঠোয় পুরে ফেললে। এখানে আসবার বছর কয়েক পরে সে কাশী যায় এবং সেখানে এক বাইজীর বাড়ি গান শুনতে গিয়ে তার চৌদ্দ-পনের বছরের মেয়ের সঙ্গে দেবী সিং-এর খুব ভাব হয়। তার পর তাকে নিয়ে দেবী সিং পালিয়ে এখানে আসে। দেবী সিং-এর বয়স সাতাশ-আটাশ হবে।

এখানে এসে দেবী সিং তাকে বিয়ে করে। কিন্তু বাইজীর মেয়ে বলে সবাই যখন জেনে ফেললে, তখন দেবী সিং-এর নিজের জাতভাই, রাজপুতরা ওর সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে ওকে একঘরে করলে। পয়সার জোরে দেবী সিং সে সব গ্রাহ্য করত না। তার পর বাবুগিরি আর অযথা ব্যয় করে এবং এই রাসবিহারী সিং-এর সঙ্গে মকদ্দমা করতে গিয়ে দেবী সিং সর্বস্বান্ত হয়ে গেল। আজ বছর চারেক হল সে মারা গিয়েছে।

ঐ কুন্তাই দেবী সিং রাজপুতের সেই বিধবা স্ত্রী। এক সময়ে ও লবটুলিয়া থেকে কিংখাবের ঝালর-দেওয়া পালকি চেপে কুশী ও কলবলিয়ার সঙ্গমে স্নান করতে যেত, বিকানীর মিছরী খেয়ে জল খেত—আজ ওর এই দুর্দশা! আরও মুশকিল এই যে, বাইজীর মেয়ে সবাই জানে বলে ওর এখানে জাত নেই, তা কি ওর স্বামীর আত্মীয়বন্ধু রাজপুতদের মধ্যে, কি দেশওয়ালী গাঙ্গোতাদের মধ্যে। ক্ষেত থেকে গম কাটা হয়ে গেলে যে গমের গুঁড়ো শীষ পড়ে থাকে, তাই টুকরি করে ক্ষেতে ক্ষেতে বেড়িয়ে কুড়িয়ে এনে বছরে দু-এক মাস ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আধপেটা খাইয়ে রাখে। কিন্তু কখনও হাত পেতে ভিক্ষে করতে ওকে দেখি নি হুজুর। আপনি এসেছেন জমিদারের ম্যানেজার, রাজার সমান, আপনার এখানে প্রসাদ পেলে ওর তাতে অপমান নেই।

বলিলাম—ওর মা, সেই বাইজী, ওর খোঁজ করে নি তারপর কখনও?

পাটোয়ারী বলিল—দেখি নি তো কখনও হুজুর। কুন্তাও কখনও মায়ের খোঁজ করে নি। ও-ই দুঃখ-ধান্দা করে ছেলেপুলেকে খাওয়াচ্ছে। এখন ওকে কি দেখছেন, ওর এক সময় যা রূপ ছিল, এ অঞ্চলে সে রকম কখনও কেউ দেখে নি। এখন বয়েসও হয়েছে, আর বিধবা হওয়ার পরে দুঃখে-কষ্টে সে-চেহারায় কিছু নেই। বড় ভাল আর শান্ত মেয়ে কুন্তা। কিন্তু এদেশে ওকে কেউ দেখতে পারে না, সবাই নাক সিঁটকে থাকে, নীচু চোখে দেখে, বোধ হয় বাইজীর মেয়ে বলে।

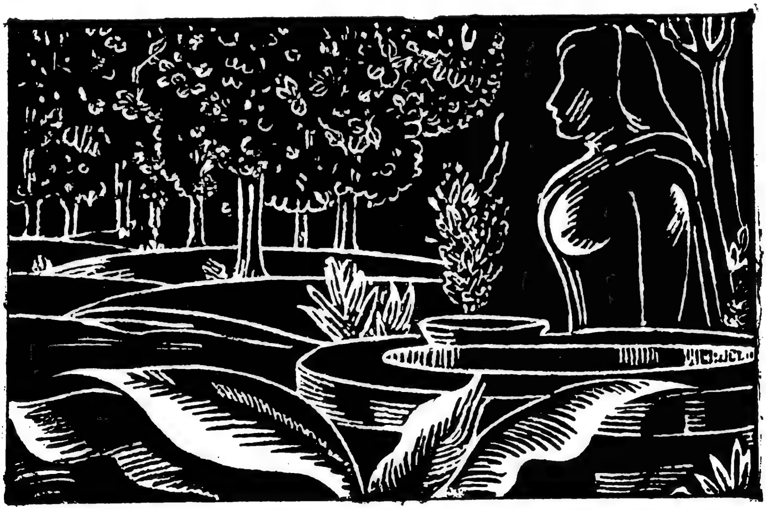

বলিলাম—তা বুঝলাম, কিন্তু এই রাত বারোটার সময় এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ও একা লবটুলিয়া বস্তিতে যাবে—সে তো এখান থেকে প্রায় তিন পোয়া পথ!

—ওর কি ভয় করলে চলে হুজুর? এই জঙ্গলে হরবখত্ ওকে একলা ফিরতে হয়। নইলে কে আছে ওর, যে চালাবে?

তখন ছিল পৌষ মাস, পৌষ-কিস্তির তাগাদা শেষ করিয়াই চলিয়া আসিলাম। মাঘ মাসের মাঝামাঝি আর একবার একটা ক্ষুদ্র চরি মহাল ইজারা দিবার উদ্দেশ্যে লবটুলিয়া যাওয়ার প্রয়োজন হইয়াছিল।

তখন শীত কিছুমাত্র কমে নাই, তার উপরে সারাদিন পশ্চিমাবাতাস বহিবার ফলে প্রত্যহ সন্ধ্যার পরে শীত দ্বিগুণ বাড়িতে লাগিল। একদিন মহালের উত্তর সীমানায় বেড়াইতে বেড়াইতে কাছারি হইতে অনেক দূরে গিয়া পড়িয়াছি—সেদিকটাতে বহুদূর পর্যন্ত শুধু কুলগাছের জঙ্গল। এই সব জঙ্গল জমা লইয়া ছাপরা ও মজঃফরপুর জেলার কালোয়ার-জাতীয় লোকে লাক্ষার চাষ করিয়া বিস্তর পয়সা উপার্জন করে। কুলের জঙ্গলের মধ্যে প্রায় পথ ভুলিবার উপক্রম করিয়াছি, এমন সময় হঠাৎ একটা নারীকণ্ঠে আর্তক্রন্দনের শব্দ, বালক-বালিকার গলার চিৎকার ও কান্না এবং কর্কশ পুরুষ-কণ্ঠে গালিগালাজ শুনিতে পাইলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখি, একটি মেয়েকে লাক্ষার ইজারাদারের চাকরেরা চুলের মুঠি ধরিয়া টানিয়া লইয়া আসিতেছে। মেয়েটির পরনে ছিন্ন মলিন বস্ত্র, সঙ্গে দু'তিনটি ছোট ছোট রোরুদ্যমান বালক-বালিকা, দুজন ছত্রি চাকরের মধ্যে একজনের হাতে একটা ছোট ঝুড়িতে আধঝুড়ি পাকা কুল। আমাকে দেখিয়া ছত্রি দুজন উৎসাহ পাইয়া যাহা বলিল তাহারে অর্থ এই যে, তাহাদের ইজারা করা জঙ্গলে এই গাঙ্গোতীন চুরি করিয়া কুল পাড়িতেছিল বলিয়া তাহাকে কাছারিতে পাটোয়ারীর বিচারার্থ ধরিয়া লইয়া যাইতেছে, হুজুর আসিয়া পড়িয়াছেন, ভালই হইয়াছে।

প্রথমেই ধমক দিয়া মেয়েটিকে তাহাদের হাত হইতে ছাড়াইলাম। মেয়েটি তখন ভয়ে লজ্জায় জড়সড় হইয়া একটি কুলঝোপের আড়ালে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার দুর্দশা দেখিয়া এত কষ্ট হইল!

ইজারাদারের লোকেরা কি সহজে ছাড়িতে চায়? তাহাদের বুঝাইলাম—বাপু, গরিব মেয়েমানুষ যদি ওর ছেলেপুলেকে খাওয়াইবার জন্য আধঝুড়ি টক কুল পাড়িয়াই থাকে, তাহাতে তোমাদের লাক্ষাচাষের বিশেষ কি ক্ষতিটা হইয়াছে! উহাকে বাড়ি যাইতে দাও।

একজন বলিল—জানেন না হুজুর, ওর নাম কুন্তা, এই লবটুলিয়াতে ওর বাড়ি, ওর অভ্যেস চুরি করে কুল পাড়া। আরও একবার আর-বছর হাতে হাতে ধরেছিলাম—ওকে এবার শিক্ষা না দিয়ে দিলে—

প্রায় চমকিয়া উঠিলাম। কুন্তা! তাহাকে তো চিনি নাই? তাহার একটা কারণ, দিনের আলোতে কুন্তাকে তো দেখি নাই, যাহা দেখিয়াছি রাত্রে। ইজারাদারের লোকজনকে তৎক্ষণাৎ শাসাইয়া কুন্তাকে মুক্ত করিলাম। সে লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়া ছেলেপুলেদের লইয়া বাড়ি চলিয়া গেল। যাইবার সময় কুলের ধামাটি ও আঁকশিগাছটা সেখানেই ফেলিয়া গেল। বোধ হয় ভয়ে ও সংকোচে। আমি উপস্থিত লোকগুলির মধ্যে একজনকে সেগুলি কাছারিতে লইয়া যাইতে বলাতে তাহারা খুব খুশি হইয়া ভাবিল ধামা ও আঁকশি সরকারে নিশ্চয়ই বাজেয়াপ্ত হইবে। কাছারিতে আসিয়া পাটোয়ারীকে বলিলাম—তোমাদের দেশের লোক এত নিষ্ঠুর কেন বনোয়ারীলাল?

বনোয়ারী পাটোয়ারী খুব দুঃখিত হইল। বনোয়ারী লোকটা ভাল, এদেশের তুলনায় সত্যিই তার হৃদয়ে দয়ামায়া আছে। কুন্তার ধামা ও আঁকশি সে তখনই পাইক দিয়া লবটুলিয়াতে কুন্তার বাড়ি পাঠাইয়া দিল।

সেই রাত্রি হইতে কুন্তা বোধ হয় লজ্জায় আর কাছারিতেও ভাত লইতে আসে নাই।

২

শীত শেষ হইয়া বসন্ত পড়িয়াছে।

আমাদের এ জঙ্গল-মহালের পূর্ব-দক্ষিণ সীমানা হইতে সাত-আট ক্রোশ দূরে অর্থাৎ সদর কাছারি হইতে প্রায় চোদ্দ-পনের ক্রোশ দূরে ফাল্গুন মাসে হোলির সময় একটা প্রসিদ্ধ গ্রাম্য মেলা বসে, এবার সেখানে যাইবে বলিয়া ঠিক করিয়াছিলাম। বহু লোকের সমাগম অনেকদিন দেখি নাই, এদেশের মেলা কি রকম জানিবার একটা কৌতূহলও ছিল। কিন্তু কাছারির লোকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিল, পথ দুর্গম ও পাহাড়-জঙ্গলে ভর্তি, উপরন্তু গোটা পথটার প্রায় সর্বত্রই বাঘের ও বন্যমহিষের ভয়, মাঝে মাঝে বস্তি আছে বটে, কিন্তু সে বড় দূরে দূরে, বিপদে পড়িলে তাহারা বিশেষ কোন উপকারে আসিবে না, ইত্যাদি।

জীবনে কখনও এতটুকু সাহসের কাজ করিবার অবকাশ পাই নাই, এই সময়ে এই সব জায়গায় যতদিন আছি যাহা করিয়া লইতে পারি, বাংলা দেশে ও কলিকাতায় ফিরিয়া গেলে কোথায় পাইব পাহাড় জঙ্গল, কোথায় পাইব বাঘ ও বন্য মহিষ? ভবিষ্যতের দিনে আমার মুখে গল্পশ্রবণনিরত পৌত্র-পৌত্রীদের মুখ ও উৎসুক তরুণ দৃষ্টি কল্পনা করিয়া মুনেশ্বর মাহাতো, পাটোয়ারী ও নবীনবাবু মুহুরীর সকল আপত্তি উড়াইয়া দিয়া মেলার দিন খুব সকালে ঘোড়া করিয়া রওনা হইলাম। আমাদের মহালের সীমানা ছাড়াইতেই ঘণ্টা-দুই লাগিয়া গেল, কারণ পূর্ব-দক্ষিণ সীমানাতেই আমাদের মহালের জঙ্গল বেশি, পথ নাই বলিলেও চলে, ঘোড়া ভিন্ন অন্য কোন যান-বাহন সে পথে চলা অসম্ভব, যেখানে- সেখানে ছোট-বড় শিলাখণ্ড ছড়ানো, শাল-জঙ্গল, দীর্ঘ কাশ ও বন-ঝাউ-এর বন, সমস্ত পথটা উঁচু-নীচু, মাঝে মাঝে উঁচু বালিয়াড়ি, রাঙা মাটির ডাঙা, ছোট পাহাড়, পাহাড়ের উপর ঘন কাঁটা-গাছের জঙ্গল। আমি যদৃচ্ছাক্রমে কখনও দ্রুত, কখনও ধীরে অশ্বচালনা করিতেছি, ঘোড়াকে কদমচালে ঠিক চালানো সম্ভব হইতেছে না—খারাপ রাস্তা ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত শিলাখণ্ডের দরুণ কিছুদূর অন্তর অন্তর ঘোড়ার চাল ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, কখনও গ্যালপ, কখনও দুলকি, কখনও বা পায়চারি করিবার মত মৃদু গতিতে শুধু হাঁটিয়া যাইতেছে।

আমি কিন্তু কাছারি ছাড়িয়া পর্যন্তই আনন্দে মগ্ন হইয়া আছি, এখানে চাকুরি লইয়া আসার দিনটি হইতে এদেশের এই ধু-ধু মুক্ত প্রান্তর ও বনভূমি আমাকে ক্রমশ দেশ ভুলাইয়া দিতেছে, সভ্য জগতের শত প্রকারের আরামের উপকরণ ও অভ্যাসকে ভুলাইয়া দিতেছে, বন্ধু-বান্ধব পর্যন্ত ভুলাইবার যোগাড় করিয়া তুলিয়াছে। যাক্ না ঘোড়া আস্তে বা জোরে, শৈলসানুতে যতক্ষণ প্রথম বসন্তে প্রস্ফুটিত রাঙা পলাশ ফুলের মেলা বসিয়াছে, পাহাড়ের নীচে, উপরে, মাঠের সর্বত্র ঝুপ্সি গাছের ডাল ঝাড় ঝাড় ধাতুপফুলের ভারে অবনত, গোলগোলি ফুলের নিষ্পত্র দুগ্ধশুভ্র কাণ্ডে হলুদ রঙের বড় বড় সূর্যমুখী ফুলের মত ফুল মধ্যাহ্নের রৌদ্রকে মৃদু সুগন্ধে অলস করিয়া তুলিয়াছে—তখন কতটা পথ চলিল, কে রাখে তাহার হিসাব?

কিন্তু হিসাব খানিকটা যে রাখিতেই হইবে, নতুবা দিগ্‌ভ্রান্ত ও পথভ্রান্ত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, আমাদের জঙ্গলের সীমানা অতিক্রম করিবার পূর্বেই এ সত্যটি ভাল করিয়া বুঝিলাম। কিছুদূর তখন অন্যমনস্ক ভাবে গিয়াছি, হঠাৎ দেখি সম্মুখে বহুদূরে একটা খুব বড় অরণ্যানীর ধূম্রনীল শীর্ষদেশ রেখাকারে দিগ্‌বলয়ের সে-অংশে এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। কোথা হইতে আসিল এত বড় বন এখানে? কাছারিতে কেহ তো একথা বলে নাই যে, মৈষণ্ডির মেলার কাছাকাছি কোথাও অমন বিশাল অরণ্য বর্তমান? পরক্ষণেই ঠাহর করিয়া

বুঝিলাম, পথ হারাইয়াছি, সম্মুখের বনরেখা মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্ট না হইয়া যায় না—যাহা আমাদের কাছারি হইতে খাড়া উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত। এসব দিকে চলতি বাঁধা-পথ বলিয়া কোন জিনিস নাই, লোকজনও কেহ বড় একটা হাঁটে না। তাহার উপর চারিদিক দেখিতে ঠিক একই রকম, সেই এক ধরনের ডাঙা, এক ধরনের পাহাড়, একধরনের গোলগোলি ও ধাতুপ ফুলের বন, সঙ্গে সঙ্গে আছে চড়া রৌদ্রের কম্পমান তাপ-তরঙ্গ। দিক্‌ভুল হইতে বেশিক্ষণ লাগে না আনাড়ি লোকের পক্ষে।

ঘোড়ার মুখ আবার ফিরাইলাম। হুঁশিয়ার হইয়া গন্তব্যস্থানের অবস্থান নির্ণয় করিয়া একটা দিক্‌চিহ্ন দূর হইতে আন্দাজ করিয়া বাছিয়া লইলাম। অকূল সমুদ্রে জাহাজ ঠিক পথে চালনা, অনন্ত আকাশে এরোপ্লেনের পাইলটের কাজ করা, আর এই সব অজানা সুবিশাল পথহীন বনপ্রান্তরে অশ্বচালনা করিয়া তাহাকে গন্তব্যস্থানে লইয়া যাওয়া প্রায় একই শ্রেণীর ব্যাপার। অভিজ্ঞতা যাঁহাদের আছে, তাঁহাদের এ কথার সত্যতা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না।

আবার রৌদ্রদগ্ধ নিষ্পত্র গুল্মরাজি, আবার বনকুসুমের মৃদুমধুর গন্ধ, আবার অনাবৃত শিলাস্তূপসদৃশ প্রতীয়মান গণ্ডশৈলমালা, আবার রক্তপলাশের শোভা। বেলা বেশ চড়িল, জল খাইতে পাইলে ভাল হইত, ইহার মধ্যেই মনে হইল, কারো নদী ছাড়া এ পথে কোথাও জল নাই জানি, এখনও আমাদের জঙ্গলেরই সীমা কতক্ষণে ছাড়াইব ঠিক নাই, কারো নদী তো বহুদূর—এ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তৃষ্ণা যেন হঠাৎ বাড়িয়া উঠিল।

মুকুন্দি চাক্‌লাদারকে বলিয়া দিয়াছিলাম আমাদের মহালের সীমানায় সীমানাজ্ঞাপক বাবলা কাঠের খুঁটি বা মহাবীরের ধ্বজার অনুরূপ যাহা হয় কিছু পুঁতিয়া রাখে। এ সীমানায় কখনও আসি নাই, দেখিয়া বুঝিলাম চাক্‌লাদার সে আদেশ পালন করে নাই ; ভাবিয়াছে, এই জঙ্গল ঠেলিয়া কলিকাতার ম্যানেজারবাবু আর সীমানা পরিদর্শনে আসিয়াছেন, তুমিও যেমন! কে খাটিয়া মরে? যেমন আছে তেমনি থাকুক।

পথের কিছুদূরে আমাদের সীমানা ছাড়াইয়া এক জায়গায় ধোঁয়া উঠিতেছে দেখিয়া সেখানে গেলাম। জঙ্গলের মধ্যে একদল লোক কাঠ পুড়াইয়া কয়লা করিতেছে—এই কয়লা তাহারা গ্রামে গ্রামে শীতকালে বেচিবে। এদেশের শীতে গরিব লোকে মালসায় কয়লার আগুন করিয়া শীত নিবারণ করে ; কাঠকয়লা চার সের পয়সায় বিক্রয় হয়, তাও কিনিবার পয়সা অনেকের জোটে না, আর এত পরিশ্রম করিয়া কাঠকয়লা পুড়াইয়া পয়সায় চার সের দরে বেচিয়া কয়লাওয়ালাদের মজুরিই বা কি ভাবে পোষায়, তাও বুঝি না। এদেশে পয়সা জিনিসটা বাংলা দেশের মত সস্তা নয়, এখানে আসিয়া পর্যন্ত তা দেখিতেছি। শুক্‌নো কাশ ও সাবাই ঘাসের ছোট্ট একটা ছাউনি কেঁদ ও আমলকীর বনে, সেখানে বড় একটা মাটির হাঁড়িতে মকাই সিদ্ধ করিয়া কাঁচা শালপাতায় সকলে একত্রে খাইতে বসিয়াছে, আমি যখন গেলাম। লবণ ছাড়া অন্য কোন উপকরণই নাই। নিকটে বড় বড় গর্তের মধ্যে ডালপালা পুড়িতেছে, একটা ছোকরা সেখানে বসিয়া কাঁচাশালের লম্বা ডাল দিয়া আগুনে ডালপালা উল্টাইয়া দিতেছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—কি ও গর্তের মধ্যে, কি পুড়ছে?

তাহারা খাওয়া ছাড়িয়া সকলে একযোগে দাঁড়াইয়া উঠিয়া ভীতনেত্রে আমার দিকে চাহিয়া থতমত খাইয়া বলিল—লক্‌ড়ি কয়লা হুজুর।

আমার ঘোড়ায় চড়া মূর্তি দেখিয়া লোকগুলা ভয় পাইয়াছে, বুঝিলাম আমাকে বন-বিভাগের লোক ভাবিয়াছে। এসব অঞ্চলের বন গবর্ণমেণ্টের খাসমহলের অন্তর্ভুক্ত, বিনা অনুমতিতে বন কাটা কি কয়লা পোড়ানো বে-আইনী।

তাহাদের আশ্বস্ত করিলাম। আমি বন-বিভাগের কর্মচারী নই, কোন ভয় নাই তাদের, যত ইচ্ছা কয়লা করুক। একটু জল পাওয়া যায় এখানে? খাওয়া ফেলিয়া একজন ছুটিয়া গিয়া মাজা ঝকঝকে জামবাটিতে পরিষ্কার জল আনিয়া দিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, কাছেই বনের মধ্যে ঝরণা আছে, তার জল।

ঝরণা?—আমার কৌতূহল হইল। ঝরণা কোথায়? শুনি নাই তো এখানে ঝরণা আছে!

উহারা বলিল—ঝরণা নাই হুজুর, উনুই! পাথরের গর্তে একটু একটু করে জল জমে, এক ঘণ্টায় আধ সের জল হয়, খুব সাফা পানি, ঠাণ্ডাও বহুৎ।

জায়গাটা দেখিতে গেলাম। কি সুন্দর ঠাণ্ডা বনবীথি! পরীরা বোধ হয় এই নির্জন অরণ্যে শিলাতলে শরৎ বসন্তের দিনে, কি গভীর নিশীথ রাত্রে জলকেলি করিতে নামে। বনের খুব ঘন অংশে বড় বড় পিয়াল ও কেঁদের ডালপালা দিয়া ঘেরা একটা নাবাল জায়গা, তলাটা কালো পাথরের, একখানা খুব বড় প্রস্তর-বেদী যেন কালে ক্ষয় পাইয়া ঢেঁকির গড়ের মত হইয়া গিয়াছে। যেন খুব একটা বড় প্রাকৃতিক পাথরের খোরা। তার উপর সপুষ্প পিয়াল শাখা ঝুপসি হইয়া পড়িয়া ঘন ছায়ার সৃষ্টি করিয়াছে। পিয়াল ও শাল মঞ্জরীর সুগন্ধ বনের ছায়ায় ভুরভুর করিতেছে। পাথরের খোলে বিন্দু বিন্দু জল জমিতেছে, এইমাত্র জল তুলিয়া লইয়া গিয়াছে, এখনও আধ ছটাক জলও জমে নাই।

উহারা বলিল—এ ঝরণার কথা অনেকে জানে না হুজুর, আমরা বনে-জঙ্গলে হরবখ্‌ত্‌ বেড়াই, আমরা জানি।

আরও মাইল-পাঁচেক গিয়া কারো নদী পড়িল, খুব উঁচু বালির পাড় দু-ধারে, অনেকটা খাড়া নীচে নামিয়া গেলে তবে নদীর খাত, বর্তমানে খুব সামান্যই জল আছে, দু-পারে অনেক দূর পর্যন্ত বালুকাময় তীর ধু-ধু করিতেছে। যেন পাহাড় হইতে নামিতেছি মনে হইল; ঘোড়ায় জল পার হইয়া যাইতে যাইতে এক জায়গায় ঘোড়ার জিন পর্যন্ত আসিয়া ঠেকিল, রেকাবদলসুদ্ধ পা মুড়িয়া অতি সন্তর্পণে পার হইলাম। ওপারে ফুটন্ত রক্তপলাশের বন, উঁচু-নীচু রাঙা-রাঙা শিলাখণ্ড, আর শুধুই পলাশ আর পলাশ, সর্বত্র পলাশ ফুলের মেলা। একবার দূরে একটা বুনো মহিষকে ধাতুপফুলের বন হইতে বাহির হইতে দেখিলাম—সেটা পাথরের উপর দাঁড়াইয়া পায়ের খুর দিয়া মাটি খুঁড়িতে লাগিল। ঘোড়ার মুখের লাগাম কষিয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইলাম; ত্রিসীমানায় কোথাও জন-মানব নাই, যদি শিং পাতিয়া তাড়া করিয়া আসে? কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, সেটা আবার পথের পাশের বনের মধ্যে ঢুকিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

নদী ছাড়াইয়া আরও কিছুদূর গিয়া পথের দৃশ্য কি চমৎকার! তবুও তো ঠিক-দুপুর ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, অপরাহ্নের ছায়া নাই, রাত্রির জ্যোৎস্নালোক নাই—কিন্তু সেই নিস্তব্ধ খররৌদ্র-মধ্যাহ্নে বাঁ-দিকে বনাবৃত দীর্ঘ শৈলমালা, দক্ষিণে লৌহপ্রস্তর ও পাইয়োরাইট ছড়ানো উঁচু-নীচু জমিতে শুধুই শুভ্রকাণ্ড গোলগোলি ফুলের গাছ ও রাঙা ধাতুপফুলের জঙ্গল। সেই জায়গাটা সত্যিই একেবারে অদ্ভুত; অমন রুক্ষ অথচ সুন্দর, পুষ্পাকীর্ণ অথচ উদ্দাম ও অতিমাত্রায় বন্য ভূমিশ্রী দেখিই নাই কখনও জীবনে। আর তার উপর ঠিক দুপুরের খাঁ-খাঁ রৌদ্র। মাথার উপরের আকাশ কি ঘন নীল! আকাশে কোথাও একটা পাখী নাই, শূন্য—মাটিতে বন্য-প্রকৃতির বুকে কোথাও একটা মানুষ বা জীবজন্তু নাই—নিঃশব্দ, ভয়ানক নিরালা। চারিদিকে চাহিয়া প্রকৃতির এই বিজন রূপলীলার মধ্যে ডুবিয়া গেলাম—ভারতবর্ষে এমন জায়গা আছে জানিতাম না তো! এ যেন ফিল্‌মে দেখা দক্ষিণ-আমেরিকার আরিজোনা বা নাভাজো মরুভূমি কিংবা হড্‌সনের পুস্তকে বর্ণিত গিলানদীর অববাহিকা অঞ্চল।

মেলায় পৌঁছিতে বেলা একটা বাজিয়া গেল। প্রকাণ্ড মেলা, যে দীর্ঘ শৈলশ্রেণী পথের বাঁ-ধারে আমার সঙ্গে সঙ্গে ক্রোশ-তিনেক ধরিয়া চলিয়া আসিতেছিল, তারই সর্বদক্ষিণ প্রান্তে ছোট্ট একটা গ্রামের মাঠে, পাহাড়ের ঢালুতে চারিদিকে শাল-পলাশের বনের মধ্যে এই মেলা বসিয়াছে। মহিষারডি, কড়ারী-তিনটাঙা, লছমনিয়াটোলা, ভীমদাসটোলা, মহালিখারূপ প্রভৃতি দূরের নিকটের নানাস্থান হইতে লোকজন, প্রধানত মেয়েরা আসিয়াছে। তরুণী বন্য মেয়েরা আসিয়াছে চুলে পিয়াল ফুল কি রাঙা ধাতুপ-ফুল গুঁজিয়া ;কারো কারো মাথায় বাঁকা খোঁপায় কাঠের চিরুনি আটকানো, বেশ সুঠাম, সুললিত, লাবণ্যভরা, দেহের গঠন প্রায় অনেক মেয়েরই—তারা আমোদ করিয়া খেলো পুঁতির দানার মালা, সস্তা জাপানি কি জার্মানির সাবানের বাক্স, বাঁশি, আয়না, অতি বাজে এসেন্স কিনিতেছে, পুরুষেরা এক পয়সায় দশটা কালী সিগারেট কিনিতেছে, ছেলেমেয়েরা তিলুয়া, রেউড়ি, রামদানার লাড্ডু ও তেলে-ভাজা খাজা কিনিয়া খাইতেছে।

হঠাৎ মেয়েমানুষের গলায় আর্ত কান্নার স্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। একটা উঁচু পাহাড়ী ডাঙ্গায় যুবক-যুবতীরা ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া হাসি-খুশি গল্পগুজব আদর-আপ্যায়নে মত্ত ছিল—কান্নাটা উঠিল সেখান হইতেই। ব্যাপার কি? কেহ কি হঠাৎ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল? একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তা নয়, কোনও একটি বধূর সহিত তার পিত্রালয়ের গ্রামের কোনও মেয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছে—এদেশের রীতিই নাকি এইরূপ, গ্রামের মেয়ে বা কোনও প্রবাসিনী সখী, কুটুম্বিনী বা আত্মীয়দের সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা হইলেই উভয়ে উভয়ের গলা জড়াইয়া মড়াকান্না জুড়িয়া দিবে। অনভিজ্ঞ লোকে ভাবিতে পারে উহাদের কেহ মরিয়া গিয়াছে, আসলে ইহা আদর-আপ্যায়নের একটা অঙ্গ। না কাঁদিলে নিন্দা হইবে। মেয়েরা বাপের বাড়ির মানুষ দেখিয়া কাঁদে না—অর্থাৎ তাহা হইলে প্রমাণ হয় যে, স্বামীগৃহে বড় সুখেই আছে—মেয়েমানুষের পক্ষে ইহা নাকি বড়ই লজ্জার কথা।

এক জায়গায় বইয়ের দোকানে চটের থলের উপর বই সাজাইয়া বসিয়াছে—হিন্দী গোলেবকাউলী, লয়লা-মজনু, বেতাল পঁচিশী, প্রেমসাগর ইত্যাদি। প্রবীণ লোকে কেহ কেহ বই উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতেছে—বুঝিলাম বুকস্টলে দণ্ডায়মান পাঠকের অবস্থা আনাতোঁল ফ্রাঁসের প্যারিসেও যেমন, এই বন্য দেশে কড়ারী তিনটাঙায় হোলির মেলাতেও তাহাই। বিনা পয়সায় দাঁড়াইয়া পড়িয়া লইতে পারিলে কেহ বড়-একটা বই কেনে না। দোকানীর ব্যবসাবুদ্ধি কিন্তু বেশ প্রখর, সে জনৈক তন্ময়চিত্ত পাঠককে জিজ্ঞাসা করিল—কেতাব কিনবে কি? না হয় তো রেখে দিয়ে অন্য কাজ দেখ। মেলার স্থান হইতে কিছুদূরে একটা শালবনের ছায়ায় অনেক লোক রাঁধিয়া খাইতেছে—ইহাদের জন্য মেলার এক অংশে তরিতরকারীর বাজার বসিয়াছে, কাঁচা শালপাতার ঠোঙায় শুঁটকি কুচো চিংড়ী ও নালসে পিঁপড়ের ডিম বিক্রয় হইতেছে। লাল পিঁপড়ের ডিম এখানকার একটি প্রিয় সুখাদ্য। তা ছাড়া আছে কাঁচা পেপে, শুকনো কুল, কেঁদ-ফল, পেয়ারা ও বুনো শিম।

হঠাৎ কাহার ডাক কানে গেল—ম্যানেজারবাবু,—

চাহিয়া দেখি ভিড় ঠেলিয়া লবটুলিয়ার পাটোয়ারীর ভাই ব্রহ্মা মাহাতো আগাইয়া আসিতেছে।—হুজুর, আপনি কখন এলেন? সঙ্গে কে?

বলিলাম—ব্রহ্মা, এখানে কি মেলা দেখতে?

—না হুজুর, আমি মেলার ইজারাদার। আসুন, আসুন, আমার তাঁবুতে চলুন, একটু পায়ের ধুলো দেবেন।

মেলার একপাশে ইজারাদারের তাঁবু, সেখানে ব্রহ্মা খুব খাতির করিয়া আমায় লইয়া গিয়া একখানা পুরনো বেন্টউড চেয়ারে বসাইল। সেখানে একজন লোক দেখিলাম, অমন লোক বোধ হয় পৃথিবীতে আর দেখিব না। লোকটি কে জানি না, ব্রহ্মা মাহাতোর কোন কর্মচারী হইবে। বয়স পঞ্চাশ-ষাট বছর, গা খালি, রং কালো, মাথার চুল কাঁচা-পাকায় মেশানো। তাহার হাতে একটা বড় থলিতে এক থলি পয়সা, বগলে একখানা খাতা, সম্ভবত মেলার খাজনা আদায় করিয়া বেড়াইতেছে, ব্রহ্মা মাহাতোকে হিসাব বুঝাইয়া দিবে।

মুগ্ধ হইলাম তাহার চোখের দৃষ্টির ও মুখের অসাধারণ দীন নম্র ভাব দেখিয়া। যেন কিছু ভয়ের ভাবও মেশানো ছিল সে দৃষ্টিতে। ব্রহ্মা মাহাতো রাজা নয়, ম্যাজিস্ট্রেট নয়, কাহারও দণ্ডমুণ্ডের কর্তা নয়, গভর্ণমেন্টের খাসমহলের জনৈক বর্ধিষ্ণু প্রজা মাত্র—লইয়াছেই না হয় মেলার ইজারা,—এত দীন ভাব কেন ও লোকটার তার কাছে? তারও পরে আমি যখন তাঁবুতে গেলাম, স্বয়ং ব্রহ্মা মাহাতো আমাকে অত খাতির করিতেছে দেখিয়া লোকটা আমার দিকে অতিরিক্ত সম্ভ্রম ও দীনতার দৃষ্টিতে ভয়ে ভয়ে এক-আধ বারের বেশি চাহিতে ভরসা পাইল না। ভাবিলাম লোকটার অত দীনহীন দৃষ্টি কেন? খুব কি গরিব? লোকটার মুখে কি যেন ছিল, বার বার আমি চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম, Blessed are the meek for theirs is the Kingdom of Heaven. এমন ধারা সত্যিকার দীন-বিনম্র মুখ কখনও দেখি নাই।

ব্রহ্মা মাহাতোকে লোকটার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তার বাড়ি কড়ারী তিনটাঙা, যে গ্রামে ব্রহ্মা মাহাতোর বাড়ি; নাম গিরিধারীলাল, জাতি গাঙ্গোতা। উহার এক ছোট ছেলে ছাড়া আর সংসারে কেহই নাই। অবস্থা যাহা অনুমান করিয়াছিলাম—অতি গরিব। সম্প্রতি ব্রহ্মা তাহাকে মেলায় দোকানের আদায়কারী কর্মচারী বহাল করিয়াছে—দৈনিক চার আনা বেতন ও খাইতে দিবে।

গিরিধারীলালের সঙ্গে আমার আরও দেখা হইয়াছিল, কিন্তু তাহার সঙ্গে শেষবারের সাক্ষাতের সময়কার অবস্থা বড় করুণ, পরে সে-সব কথা বলিব। অনেক ধরনের মানুষ দেখিয়াছি, কিন্তু গিরিধারীলালের মত সাচ্চা মানুষ কখনও দেখি নাই। কত কাল হইয়া গেল, কত লোককে ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু যাহাদের কথা চিরকাল মনে আঁকা আছে ও থাকিবে, সেই অতি অল্প কয়েকজন লোকের মধ্যে গিরিধারীলাল একজন।

৩

বেলা পড়িয়া আসিতেছে। এখনই রওনা হওয়া দরকার, ব্রহ্মা মাহাতোকে সে কথা বলিয়া বিদায় চাহিলাম। ব্রহ্মা মাহাতো তো একেবারে আকাশ হইতে পড়িল, তাঁবুতে যাহারা উপস্থিত ছিল তাহারা হাঁ করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিল। অসম্ভব! এই ত্রিশ মাইল রাস্তা অবেলায় ফেরা! হুজুর কলিকাতার মানুষ, এ অঞ্চলের পথের খবর জানা নাই তাই একথা বলিতেছেন। দশ মাইল যাইতে সূর্য যাইবে ডুবিয়া, না হয় জ্যোৎস্নারাত্রিই হইল, ঘন পাহাড়-জঙ্গলের পথ, মানুষ-জন কোথাও নাই, বাঘ বাহির হইতে পারে, বুনো মহিষ আছে, বিশেষত পাকা কুলের সময়, এখন ভালুক তো নিশ্চয়ই বাহির হইবে, কারো নদীর ওপারে মহালিখারূপের জঙ্গলে এই তো সেদিনও এক গরুর গাড়ির গাড়োয়ানকে বাঘে লইয়াছে, বেচারী জঙ্গলের পথে একা গাড়ি চালাইয়া আসিতেছিল। অসম্ভব হুজুর। রাত্রে এখানে থাকুন, খাওয়া-দাওয়া করুন, যখন দয়া করিয়া আসিয়াছেন গরীবের ডেরায়। কাল সকালে তখন ধীরে-সুস্থে গেলেই হইবে।

এ বাসন্তী পূর্ণিমার পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নারাত্রে জনহীন পাহাড়-জঙ্গলের পথে একা ঘোড়ায় চড়িয়া যাওয়ার প্রলোভন আমার কাছে দুর্দমনীয় হইয়া উঠিল। জীবনে আর কখনও হইবে না, এই হয়ত শেষ, আর যে অপূর্ব বন-পাহাড়ের দৃশ্য দেখিয়া আসিয়াছি পথে! জ্যোৎস্নারাত্রে—বিশেষত পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় তাহাদের রূপ একবার দেখিব না যদি, তবে এতটা কষ্ট করিয়া আসিবার কি অর্থ হয়?

সকলের সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াইয়া রওনা হইলাম। ব্রহ্মা মাহাতো ঠিকই বলিয়াছিল, কারো নদীতে পৌঁছিবার কিছু পূর্বেই টক্‌টকে লাল সুবৃহৎ সূর্যটা পশ্চিম দিক্‌চক্রবালে একটা অনুচ্চ শৈলমালার পিছনে অস্ত গেল। কারো নদীর তীরের বালিয়াড়ির উপর যখন ঘোড়াসুদ্ধ উঠিয়াছি, এইবার এখান হইতে ঢালু বালির পথে নদীগর্ভে নামিব—হঠাৎ সেই সূর্যাস্তের দৃশ্য এবং ঠিক পূর্বে বহু দূরে কৃষ্ণ রেখার মত পরিদৃশ্যমান মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের মাথায় নবোদিত পূর্ণচন্দ্রের দৃশ্য—যুগপৎ এই অস্ত ও উদয়ের দৃশ্যে থম্‌কিয়া ঘোড়াকে লাগাম কষিয়া দাঁড় করাইলাম। সেই নির্জন অপরিচিত নদীতীরে সমস্তই যেন একটা অবাস্তব ব্যাপারের মত দেখাইতেছে—

পথে সর্বত্র পাহাড়ের ঢালুতে ও ডাঙায় ছাড়া-ছাড়া জঙ্গল, মাঝে মাঝে সরু পথটাকে যেন দুই দিক হইতে চাপিয়া ধরিতেছে, আবার কোথাও কিছুদূরে সরিয়া যাইতেছে। কি ভয়ঙ্কর নির্জন চারিদিক, দিনমানে যা-হয় একরূপ ছিল, জ্যোৎস্না উঠিবার পর মনে হইতেছে যেন অজানা ও অদ্ভুত সৌন্দর্যময় পরীরাজ্যের মধ্য দিয়া চলিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে বাঘের ভয়ও হইল, মনে পড়িল মেলায় ব্রহ্মা মাহাতো এবং কাছারিতে প্রায় সকলেই রাত্রে এপথে একা আসিতে বার বার নিষেধ করিয়াছিল, মনে পড়িল নন্দকিশোর গোসাঁই নামে আমাদের একজন বাথানদার প্রজা আজ মাস দুই-তিন আগে কাছারিতে বসিয়া গল্প করিয়াছিল এই মহালিখারূপের জঙ্গলে সেই সময় কাহাকে বাঘে খাওয়ার ব্যাপার। জঙ্গলের এখানে-ওখানে বড় বড় কুলগাছে কুল পাকিয়া ডাল নত হইয়া আছে—তলায় বিস্তর শুকনো ও পাকা কুল ছড়ানো—সুতরাং ভালুক বাহির হইবারও সম্ভাবনা খুবই। বুনো মহিষ এ বনে না থাকিলেও মোহনপুরা

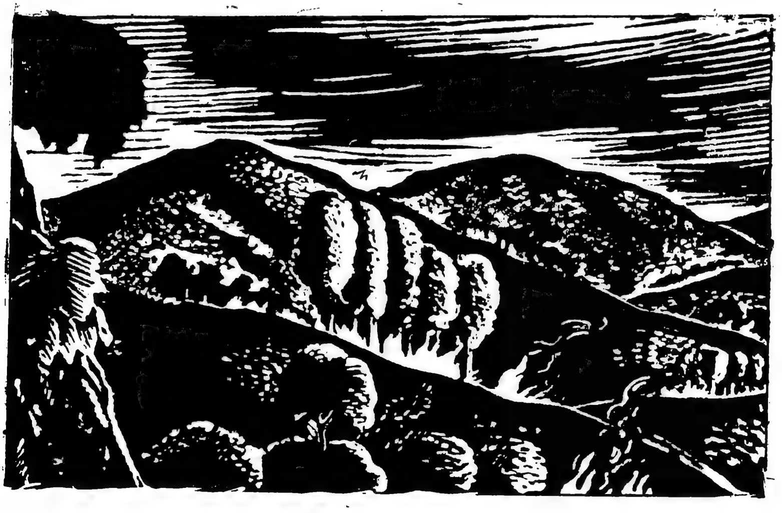

জঙ্গল হইতে ওবেলার মত এক-আধটা ছিটকাইয়া আসিতে কতক্ষণ! সম্মুখে এখনও পনের মাইল নির্জন বনপ্রান্তরের উপর দিয়া পথ।

ভয়ের অনুভূতি চারিপাশের সৌন্দর্যকে যেন আরও বাড়াইয়া তুলিল। এক এক স্থানে পথ দক্ষিণ হইতে খাড়া উত্তরে ও উত্তর হইতে পূর্বে ঘুরিয়া গিয়াছে, পথের খুব কাছে বাম দিকে সর্বত্রই একটানা অনুচ্চ শৈলমালা, তাদের ঢালুতে গোলগোলি ও পলাশের জঙ্গল, উপরের দিকে শাল ও বড় বড় ঘাস। জ্যোৎস্না এবার ফুটফুট করিতেছে, গাছের ছায়া হ্রস্বতম হইয়া উঠিয়াছে, কি একটা বন্য-ফুলের সুবাসে জ্যোৎস্নাশুভ্র প্রান্তর ভরপুর, অনেক দূরে পাহাড়ে সাঁওতালেরা জুম চাষের জন্য আগুন দিয়াছে, সে কি অভিনব দৃশ্য, মনে হইতেছে পাহাড়ে পাহাড়ে আলোর মালা কে যেন সাজাইয়া রাখিয়াছে।

কখনও যদি এসব দিকে না আসিতাম, কেহ বলিলেও বিশ্বাস করিতাম না যে, বাংলা দেশের এত নিকটেই এরূপ সম্পূর্ণ জনহীন অরণ্যপ্রান্তর ও শৈলমালা আছে, যাহা সৌন্দর্যে আরিজোনার পাথুরে মরুদেশ বা রোডেশিয়ার বুশভেল্ডের অপেক্ষা কম নয় কোন অংশে—বিপদের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও এসব অঞ্চল নিতান্ত পুতুপুতু বলা চলে না, সন্ধ্যার পরেই যেখানে বাঘ-ভালুকের ভয়ে লোকে পথ হাঁটে না।

এই মুক্ত জ্যোৎস্নাশুভ্র বনপ্রান্তরের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে ভাবিতেছিলাম, এ এক আলাদা জীবন, যারা ঘরের দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে ভালবাসে না, সংসার করা যাদের রক্তে নাই, সেই সব বারমুখো, খাপছাড়া প্রকৃতির মানুষের পক্ষে এমন জীবনই তো কাম্য। কলিকাতা হইতে প্রথম প্রথম আসিয়া এখানকার এই ভীষণ নির্জনতা ও সম্পূর্ণ বন্য জীবনযাত্রা কি অসহ্য হইয়াছিল, কিন্তু এখন আমার মনে হয় এই ভাল, এই বর্বর রুক্ষ বন্য প্রকৃতি আমাকে তার স্বাধীনতা ও মুক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছে, শহরের খাঁচার মধ্যে আর দাঁড়ে বসিয়া থাকিতে পারিব কি? এই পথহীন প্রান্তরের শিলাখণ্ড ও শালপলাশের বনের মধ্য দিয়া এই রকম মুক্ত আকাশতলে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় হু-হু ঘোড়া ছুটাইয়া চলার আনন্দের সহিত আমি দুনিয়ার কোন সম্পদ বিনিময় করিতে চাহি না।

জ্যোৎস্না আরও ফুটিয়াছে, নক্ষত্রদল জ্যোৎস্নালোকে প্রায় অদৃশ্য, চারিধারে চাহিয়া মনে হয় এ সে পৃথিবী নয় এতদিন যাহাকে জানিতাম, এ স্বপ্নভূমি, এই দিগন্তব্যাপী জ্যোৎস্নায় অপার্থিব জীবেরা এখানে নামে গভীর রাত্রে, তারা তপস্যার বস্তু, কল্পনা ও স্বপ্নের বস্তু, বনের ফুল যারা ভালবাসে না, সুন্দরকে চেনে না, দিগ্বলয়রেখা যাদের কখনও হাতছানি দিয়া ডাকে নাই, তাদের কাছে এ পৃথিবী ধরা দেয় না কোন কালেই।

মহালিখারূপের জঙ্গল শেষ হইতেই মাইল চার গিয়া আমাদের সীমানা শুরু হইল। রাত প্রায় নটার সময়ে কাছারি পৌঁছিলাম।

৪

কাছারিতে ঢোলের শব্দ শুনিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখি একদল লোক কাছারির কম্পাউন্ডে কোথা হইতে আসিয়া ঢোল বাজাইতেছে। ঢোলের শব্দে কাছারির সিপাহী কর্মচারীরা আসিয়া তাহাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কাহাকেও ডাকিয়া ব্যাপারটা কি জিজ্ঞাসা করিব ভাবিতেছি, এমন সময় জমাদার মুক্তিনাথ সিং দরজার কাছে আসিয়া সেলাম করিয়া বলিল—একবার বাইরে আসবেন মেহেরবানি করে?

—কি জমাদার, কি ব্যাপার?

—হুজুর, দক্ষিণ দেশে এবার ধান মরে যাওয়াতে অজন্মা হয়েছে, লোকে চালাতে না পেরে দেশে দেশে নাচের দল নিয়ে বেরিয়েছে। ওরা কাছারিতে হুজুরের সামনে নাচবে বলে এসেছে, যদি হুকুম হয় তবে নাচ দেখায়।

নাচের দল আমার আপিস-ঘরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

মুক্তিনাথ সিং জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ নাচ তাহারা দেখাইতে পারে, দলের মধ্যে একজন ষাট-বাষট্টি বছরের বৃদ্ধ সেলাম করিয়া বিনীতভাবে বলিল—হুজুর, হো হো নাচ। আর ছক্কর-বাজি নাচ।

দলটি দেখিয়া মনে হইল নাচের কিছু জানুক না-জানুক, পেটে দুটি খাইবার আশায় সব ধরনের, সব বয়সের লোক ইহার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহারা নাচিল ও গান গাহিল। বেলা পড়িবার সময় তাহারা আসিয়াছিল, ক্রমে আকাশে জ্যোৎস্না ফুটিল, তখনও তাহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া হাত ধরিয়া নাচিতেছে ও গান গাহিতেছে। অদ্ভুত ধরনের নাচ ও সম্পূর্ণ অপরিচিত সুরের গান। এই মুক্ত প্রকৃতির বিশাল প্রসার ও এই সভ্য জগৎ হইতে বহুদূরে অবস্থিত নিভৃত বন্য আবেষ্টনীর মধ্যে, এই দিগন্তপরিপ্লাবী ছায়াবিহীন জ্যোৎস্নালোকে এই নাচ-গানই চমৎকার খাপ খায়। একটি গানের অর্থ এইরূপ ঃ—

“শিশুকালে বেশ ছিলাম।

আমাদের গ্রামের পিছনে যে পাহাড়, তার মাথায় কেঁদ-বন, সেই বনে কুড়িয়ে বেড়াতাম পাকা ফল, গাঁথতাম পিয়াল ফুলের মালা।

দিন খুব সুখেই কাট্‌ত, ভালবাসা কাকে বলে, তা তখন জানতাম না।

পাঁচ-নহরী ঝরণার ধারে সেদিন কররা পাখী মারতে গিয়েছি।

হাতে আমার বাঁশের নল ও আঠা-কাঠি।

তুমি কুসুম-রঙে ছোপানো শাড়ি পরে এসেছিলে জল ভরতে।

দেখে বললে—ছিঃ, পুরুষমানুষে কি সাত-নলি দিয়ে বনের পাখী মারে!

আমি লজ্জায় ফেলে দিলাম বাঁশের নল, ফেলে দিলাম আঠা-কাঠির তাড়া।

বনের পাখী গেল উড়ে, কিন্তু আমার মন-পাখী তোমার প্রেমের ফাঁদে চিরদিনের মত যে ধরা পড়ে গেল!

আমায় সাত-নলি চেলে পাখী মারতে বারণ করে এ-কি করলে তুমি আমার! কাজটা কি ভাল হল, সখি?”

ওদের ভাষা কিছু বুঝি, কিছু বুঝি না। গানগুলি সেই জন্যই বোধ হয় আমার কাছে আরও অদ্ভুত লাগিল। এই পাহাড় ও পিয়ালবনের সুরে বাঁধা এদের গান, এখানেই ভাল লাগিবে।

ইহাদের দক্ষিণা মাত্র চার আনা পয়সা। কাছারির আমলারা একবাক্যে বলিল—হুজুর, তাই অনেক জায়গায় পায় না, বেশি দিয়ে ওদের লোভ বাড়াবেন না, তাছাড়া বাজার নষ্ট হবে। যা রেট্ তার বেশি দিলে গরিব গেরস্তরা নিজেদের বাড়িতে নাচ করাতে পারবে না হুজুর।

অবাক হইলাম—দু-তিন ঘণ্টা প্রাণপণে খাটিয়াছে, কম্‌সে-কম সতর-আঠারজন লোক—চার আনায় ইহাদের জন-পিছু একটা করিয়া পয়সাও তো পড়িবে না। আমাদের কাছারিতে নাচ দেখাইতে এই জনহীন প্রান্তর ও বন পার হইয়া এতদূর আসিয়াছে। সমস্ত দিনের মধ্যে ইহাই রোজগার। কাছে আর কোনও গ্রাম নাই যেখানে আজ রাত্রে নাচ দেখাইবে।

রাত্রে কাছারিতে তাহাদের খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করিয়া দিলাম। সকালে তাহাদের দলের সর্দারকে ডাকাইয়া দুইটি টাকা দিতে লোকটা অবাক হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নাচ দেখিয়া খাইতে কেহই দেয় না, তাহার উপর আবার দু-টাকা দক্ষিণা!

তাহাদের দলে বারো-তেরো বছরের একটি ছেলে আছে, ছেলেটির চেহারা যাত্রাদলের কৃষ্ণঠাকুরের মত। এক-মাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, ভারি শান্ত, সুন্দর চোখ-মুখ, কুচকুচে কালো গায়ের রং। দলের সামনে দাঁড়াইয়া সে-ই প্রথমে সুর ধরে ও পায়ে ঘুঙুর বাঁধিয়া নাচে যখন—ঠোঁটের কোণে হাসি মিলাইয়া থাকে। সুন্দর ভঙ্গিতে হাত দুলাইয়া মিষ্ট সুরে গায়—

রাজা লিজিয়ে সেলাম ম্যয় পরদেশিঁয়া।

শুধু দুটি খাইবার জন্য ছেলেটি দলের সঙ্গে ঘুরিতেছে। পয়সার ভাগ সে বড় একটা পায় না। তাও সে খাওয়া কি? চীনা ঘাসের দানা, আর নুন। বড়-জোর তার সঙ্গে একটু তরকারি—আলুপটল নয়, জংলী গুড়মি ফল-ভাজা, নয়ত বাথুয়া শাক সিদ্ধ, কিংবা ধুঁধুল ভাজা। এই খাইয়াই মুখে হাসি তার সর্বদা লাগিয়া আছে। দিব্যি স্বাস্থ্য, অপূর্ব লাবণ্য সারা অঙ্গে।

দলের অধিকারীকে বলিলাম, ধাতুরিয়াকে রেখে যাও এখানে। কাছারিতে কাজ করবে, আর থাকবে খাবে।

অধিকারী সেই দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ লোকটি, সে-ও এক অদ্ভুত ধরনের লোক। এই বাষট্টি বছরেও সে একেবারে বালকের মত।

বলিল—ও থাকতে পারবে না হুজুর। গাঁয়ের সব লোকের সঙ্গে একসঙ্গে আছে, তাই ও আছে ভাল। একলা থাকলে মন-কেমন করবে, ছেলেমানুষ কি থাকতে পারে? আবার আপনার সামনে ওকে নিয়ে আসব হুজুর।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১

জঙ্গলের বিভিন্ন অংশ সার্ভে হইতেছিল। কাছারি হইতে তিন ক্রোশ দূরে বোমাইবুরুর জঙ্গলে আমাদের এক আমীন রামচন্দ্র সিং এই উপলক্ষে কিছুদিন ধরিয়া আছে। সকালে খবর পাওয়া গেল রামচন্দ্র সিং হঠাৎ আজ দিন দুই-তিন হইল পাগল হইয়া গিয়াছে।

শুনিয়া তখনই লোকজন লইয়া সেখানে গিয়া পৌঁছিলাম। বোমাইবুরুর জঙ্গল খুব নিবিড় নয়, খুব ফাঁকা উঁচু-নীচু প্রান্তরে মাঝে মাঝে ঘনসন্নিবদ্ধ বনঝোপ। মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ, ডাল হইতে সরু দড়ির মত লতা ঝুলিতেছে, যেন জাহাজের উঁচু মাস্তুলের সঙ্গে দড়াদড়ি বাঁধা। বোমাইবুরুর জঙ্গল সম্পূর্ণরূপে লোকবসতি-শূন্য।

গাছপালার নিবিড়তা হইতে দূরে ফাঁকা মাঠের মধ্যে কাশে-ছাওয়া ছোট্ট দুখানা কুঁড়ে। একখানা একটু বড়, এখানাতে রামচন্দ্র আমীন থাকে, পাশের ছোটখানায় তার পেয়াদা আসরফি টিন্ডেল থাকে। রামচন্দ্র নিজের কাঠের মাচার উপর চোখ বুজিয়া শুইয়াছিল। আমাদের দেখিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—কি হয়েছে রামচন্দ্র? কেমন আছ?

রামচন্দ্র হাতজোড় করিয়া নমস্কার করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

কিন্তু আসরফি টিন্ডেল সে-কথার উত্তর দিল। বলিল—বাবু, একটা বড় আশ্চর্য কথা। আপনি শুনলে বিশ্বাস করবেন না। আমি নিজেই কাছারিতে গিয়ে খবর দিতাম, কিন্তু আমীনবাবুকে ফেলে যাই বা কি করে? ব্যাপারটা এই, আজ ক'দিন থেকে আমীনবাবু বলছেন

একটা কুকুর এসে রাত্রে তাঁকে বড় বিরক্ত করে। আমি শুই এই ছোট ঘরে, আমীনবাবু শুয়ে থাকেন এখানে। দু-তিনদিন এই রকম গেল। রোজই উনি বলেন—আরে, কোত্থেকে একটা সাদা কুকুর আসে রাত্রে। মাচার ওপর বিছানা পেতে শুই, কুকুরটা এসে মাচার নীচে কেঁউ কেঁউ করে। গায়ে ঘেঁষ দিতে আসে। শুনি, বড়-একটা গা করি নে। আজ চারদিন আগে উনি অনেক রাত্রে বললেন—আসরফি, শীগগির এসো বেরিয়ে, কুকুরটা এসেছে। আমি তার লেজ চেপে ধরে রেখেছি। লাঠি নিয়ে এস।

আমি ঘুম ভেঙে উঠে লাঠি আলো নিয়ে ছুটে যেতে যেতে দেখি—বললে বিশ্বাস করবেন না হুজুর, কিন্তু হুজুরের সামনে মিথ্যে বলব এমন সাহস আমার নেই—একটি মেয়ে ঘরের ভিতর থেকে বার হয়ে জঙ্গলের দিকে চলে গেল। আমি প্রথমটা থতমত খেয়ে গেলাম। তারপরে ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখি আমীনবাবু বিছানা হাতড়ে দেশলাই খুঁজছেন। উনি বললেন—কুকুরটা দেখলে?

আমি বললাম—কুকুর কই বাবু, একটা কে মেয়ে তো বার হয়ে গেল।

উনি বললেন—উল্লুক, আমার সঙ্গে বেয়াদবি? মেয়েমানুষ কে আসবে এই জঙ্গলে দুপুর রাতে? আমি কুকুরটার লেজ চেপে ধরেছিলাম, এমন কি তার লম্বা কান আমার গায়ে ঠেকেছে। মাচার নীচে ঢুকে কেঁউ কেঁউ করছিল। নেশা করতে শুরু করেছ বুঝি? রিপোর্ট করে দেবো সদরে।

পরদিন রাত্রে আমি সজাগ হয়ে ছিলাম অনেক রাত পর্যন্ত। যেই একটু ঘুমিয়েছি অমনি আমীনবাবু ডাকলেন। আমি তাড়াতাড়ি ছুটে বেরিয়ে আমার ঘরের দোর পর্যন্ত গিয়েছি, এমন সময় দেখি একটি মেয়ে ওঁর ঘরের উত্তর দিকের বেড়ার গা বেয়ে জঙ্গলের দিকে যাচ্ছে। তখনি হুজুর আমি নিজে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলাম। অতটুকু সময়ের মধ্যে লুকোবে কোথায়, যাবেই বা কত দূর? বিশেষ করে আমরা জঙ্গল জরীপ করি, অন্ধি-সন্ধি সব আমাদের জানা। কত খুঁজলাম বাবু, কোথাও তার চিহ্নটি পাওয়া গেল না। শেষে আমার কেমন সন্দেহ হল, মাটিতে আলো ধরে দেখি কোথাও পায়ের দাগ নেই, আমার নাগরা জুতোর দাগ ছাড়া।

আমীনবাবুকে আমি একথা বললাম না আর সেদিন। একা দুটি প্রাণী থাকি এই ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে হুজুর। ভয়ে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। আর বোমাইবুরু জঙ্গলের একটু দুর্নামও শোনা ছিল। ঠাকুরদাদার মুখে শুনেছি, বোমাইবুরু পাহাড়ের উপর ওই যে বটগাছটা দেখছেন দূরে—একবার তিনি পূর্ণিয়া থেকে কলাই বিক্রির টাকা নিয়ে জ্যোৎস্না-রাত্রে ঘোড়ায় ক'রে জঙ্গলের পথে ফিরছিলেন—ওই বটতলায় এসে দেখেন একদল অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়ে হাত-ধরাধরি করে জ্যোৎস্নার মধ্যে নাচছে। এদেশে বলে ওদের 'ডামাবাণু'—এক ধরনের জীনপরী, নির্জন জঙ্গলের মধ্যে থাকে। মানুষকে বেঘোরে পেলে মেরেও ফেলে।

হুজুর, পরদিন রাত্রে আমি নিজে আমীনবাবুর তাঁবুতে শুয়ে জেগে রইলাম সারারাত। সারারাত জেগে জরীপের থাকবন্দীর হিসেব কষতে লাগলাম। বোধ হয় শেষরাতের দিকে একটু তন্দ্রা এসে থাকবে—হঠাৎ কাছেই একটা কিসের শব্দ শুনে মুখ তুলে চাইলাম—দেখি আমীন সাহেব ঘুমুচ্ছেন ওঁর খাটে, আর খাটের নীচে কি একটা ঢুকেছে। মাথা নীচু করে খাটের নীচে দেখতে গিয়েই চমকে উঠলাম। আধ-আলো আধ-অন্ধকারে প্রথমটা মনে হল, একটি মেয়ে যেন গুটি-সুটি মেরে খাটের তলায় বসে আমার দিকে হাসিমুখে চেয়ে আছে—স্পষ্ট দেখলাম হুজুর, আপনার পায়ে হাত দিয়ে বলতে পারি। এমন কি, তার মাথায় বেশ কালো চুলের গোছা পর্যন্ত স্পষ্ট দেখেছি। লণ্ঠনটা ছিল, যেখানটাতে বসে হিসেব কষছিলাম

সেখানে—হাত ছ'সাত দূরে। আরও ভাল করে দেখব বলে লণ্ঠনটা যেমন আনতে গিয়েছি, কি একটা প্রাণী ছুটে খাটের তলা থেকে বেরিয়ে পালাতে গেল—দোরের কাছে লণ্ঠনের আলোটা বাঁকা ভাবে পড়েছিল, সেই আলোতে দেখলাম একটা বড় কুকুর, কিন্তু তার আগাগোড়া সাদা হুজুর, কালোর চিহ্ন কোথাও নেই তার গায়ে।

আমীন সাহেব জেগে বললেন—কি, কি? বললাম—ও কিছু নয়, একটা শেয়াল কি কুকুর ঘরে ঢুকেছিল। আমীন সাহেব বললেন—কুকুর? কি রকম কুকুর? বললাম—সাদা কুকুর। আমীন সাহেব যেন একটা নিরাশার সুরে বললেন—সাদা ঠিক দেখেছ? না কালো? বললাম—না, সাদাই হুজুর।

আমি একটু বিস্মিত যে না হয়েছিলাম এমন নয়—সাদা না হয়ে কালো হলেই বা আমীনবাবুর কি সুবিধা হবে তাতে বুঝলাম না। উনি ঘুমিয়ে পড়লেন—কিন্তু আমার যে কেমন একটা ভয় ও অস্বস্তি বোধ হল, কিছুতেই চোখের পাতা বোজাতে পারলাম না। খুব সকালে উঠে খাটের নীচেটা একবার কি মনে করে ভাল করে খুঁজতে গিয়ে সেখানে একগাছা কালো চুল পেলাম। এই সে চুলও রেখেছি, হুজুর। মেয়েমানুষের মাথার চুল। কোথা থেকে এল এ চুল? দিব্যি কালো কুচকুচে নরম চুল। কুকুর—বিশেষত সাদা কুকুরের গায়ে এত বড়, নরম কালো চুল হয় না। এ হল গত রবিবার অর্থাৎ আজ তিন দিনের কথা। এই তিন দিন থেকে আমীন সাহেব তো এক রকম উন্মাদ হয়েই উঠেছেন। আমার ভয় করছে হুজুর—এবার আমার পালা কিনা তাই ভাবছি।

গল্পটা বেশ আষাঢ়ে-গোছের বটে। সে চুলগাছি হাতে করিয়া দেখিয়াও কিছু বুঝিতে পারিলাম না। মেয়েমানুষের মাথার চুল, সে-বিষয়ে আমারও কোনো সন্দেহ রহিল না। আসরফি টিন্ডেল ছোকরা মানুষ, সে যে নেশা-ভাঙ করে না, একথা সকলেই একবাক্যে বলিল।

জনমানবশূন্য প্রান্তর ও বনঝোপের মধ্যে একমাত্র তাঁবু এই আমীনের। নিকটতম লোকালয় হইতেছে—লবটুলিয়া—ছয় মাইল দূরে। মেয়েমানুষই বা কোথা হইতে আসিতে পারে অত গভীর রাত্রে—বিশেষ যখন এই সব নির্জন বনপ্রান্তরে বাঘ ও বুনো শুয়োরের ভয়ে সন্ধ্যার পরে আর লোকে পথ চলে না?

যদি আসরফি টিন্ডেলের কথা সত্য বলিয়া ধরিয়া লই, তবে ব্যাপারটা খুব রহস্যময়। অথবা এই পাণ্ডববর্জিত দেশে, এই জনহীন বনজঙ্গল ও ধূ-ধূ প্রান্তরের মধ্যে বিংশ শতাব্দী তো প্রবেশের পথ খুঁজিয়া পায়ই নাই—ঊনবিংশ শতাব্দীও পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অতীত যুগের রহস্যময় অন্ধকারে এখনও এসব অঞ্চল আচ্ছন্ন—এখানে সবই সম্ভব।

সেখানকার তাঁবু উঠাইয়া রামচন্দ্র আমীন ও আসরফি টিন্ডেলকে সদর কাছারিতে লইয়া আসিলাম। রামচন্দ্রের অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতে লাগিল, ক্রমশ সে ঘোর উন্মাদ হইয়া উঠিল। সারারাত্রি চিৎকার করে, বকে, গান গায়। ডাক্তার আনিয়া দেখাইলাম, কিছুতেই কিছু হইল না, অবশেষে তাহার এক দাদা আসিয়া তাহাকে লইয়া গেল।

এই ঘটনার একটা উপসংহার আছে, যদিও তাহা ঘটিয়াছিল বর্তমান ঘটনার সাত-আট মাস পরে, তবুও এখানেই তাহা বলিয়া রাখি।

এ ঘটনার ছ-মাস পরে চৈত্র মাসের দিকে দুটি লোক কাছারিতে আমার সঙ্গে দেখা করিল। একজন বৃদ্ধ, বয়স ষাট-পঁয়ষট্টির কম নয়, অন্যটি তার ছেলে, বয়স কুড়ি-বাইশ। তাদের বাড়ি বালিয়া জেলায়, আমাদের এখানে আসিয়াছে চরি-মহাল ইজারা লইতে, অর্থাৎ আমাদের জঙ্গলে খাজনা দিয়া তাহারা গরু-মহিষ চরাইবে।

অন্য সব চরি-মহাল তখন বিলি হইয়া গিয়াছে, বোমাইবুরুর জঙ্গলটা তখনও খালি পড়িয়া ছিল, সেইটাই বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম। বৃদ্ধ ছেলেকে সঙ্গে লইয়া একদিন মহাল দেখিয়াও আসিল। খুব খুশি, বলিল—খুব বড় বড় ঘাস হুজুর, বহুৎ আচ্ছা জঙ্গল। হুজুরের মেহেরবানি না হলে অমন জঙ্গল মিলত না।

রামচন্দ্র ও আসরফি টিণ্ডেলের কথা তখন আমার মনে ছিল না, থাকিলেও বৃদ্ধের নিকট তাহা হয়ত বলিতাম না। কারণ, ভয় পাইয়া সে ভাগিয়া গেলে জমিদারের লোকসান। স্থানীয় লোকেরা কেহই ও জঙ্গল ইজারা লইতে ঘেঁষে না, রামচন্দ্র আমীনের সেই ব্যাপারের পরে।

মাসখানেক পরে বৈশাখের গোড়ায় একদিন বৃদ্ধ লোকটি কাছারিতে আসিয়া হাজির, মহা রাগত ভাব, তার পিছনে সেই ছেলেটি কাঁচুমাচু ভাবে দাঁড়াইয়া।

বলিলাম—কি ব্যাপার?

বৃদ্ধ রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—এই বাঁদরটাকে নিয়ে এলাম হুজুরের কাছে দরবার করতে। ওকে আপনি পা থেকে খুলে পঁচিশ জুতো মারুন, ও জব্দ হয়ে যাক্।

—কি, হয়েছে কি?

—হুজুরের কাছে বলতে লজ্জা করে। এই বাঁদর, এখানে এসে পর্যন্ত বিগড়ে যাচ্ছে। আমি সাত-আট দিন আজ প্রায়ই লক্ষ্য করছি—লজ্জা করে বলতে হুজুর—প্রায়ই মেয়েমানুষ ঘর থেকে বার হয়ে যায়। একটা মাত্র খুপরি হাত-আষ্টেক লম্বা, ঘাসে ছাওয়া, ও আর আমি দু-জনে শুই। আমার চোখে ধুলো দিতে পারাও সোজা কথা নয়। দু-দিন যখন দেখলাম, তখন ওকে জিজ্ঞেস করলাম, ও একেবারে গাছ থেকে পড়ল হুজুর। বলে—কই, আমি তো কিছুই জানি নে! আরও দু-দিন যখন দেখলাম, তখন একদিন দিলাম আচ্ছা করে ওকে মার। চোখের সামনে বিগড়ে যাবে ছেলে? কিন্তু তার পরেও যখন দেখলাম, এই পরশু রাত্রেই হুজুর—তখন ওকে আমি হুজুরের দরবারে নিয়ে এসেছি, হুজুর শাসন করে দিন।

হঠাৎ রামচন্দ্র আমীনের ব্যাপারটা মনে পড়িয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিলাম—কত রাত্রে দেখেছ?

—প্রায়ই শেষরাত্রের দিকে হুজুর। এই রাতের দু-এক ঘড়ি বাকি থাকতে।

—ঠিক দেখেছ, মেয়েমানুষ?

—হুজুর, আমার চোখের তেজ এখনও তত কম হয়নি। জরুর মেয়েমানুষ, বয়সেও কম, কোনদিন পরনে সাদা ধোয়া শাড়ি, কোনদিন বা লাল, কোনদিন কালো। একদিন মেয়েমানুষটা বেরিয়ে যেতেই আমি পেছন পেছন গেলাম। কাশের জঙ্গলের মধ্যে কোথায় পালিয়ে গেল, টের পেলুম না। ফিরে এসে দেখি, ছেলে আমার যেন খুব ঘুমের ভান করে পড়ে রয়েছে, ডাকতেই ধড়মড় করে ঠেলে উঠল, যেন সদ্য ঘুম ভেঙে উঠল। এ রোগের ওষুধ কাছারি ভিন্ন হবে না বুঝলাম, তাই হুজুরের কাছে—

ছেলেটিকে আড়ালে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—এ সব কি শুনছি তোমার নামে?

ছেলেটি আমার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—আমার কথা বিশ্বাস করুন হুজুর। আমি এর বিন্দুবিসর্গ জানি না। সমস্ত দিন জঙ্গলে মহিষ চরিয়ে বেড়াই—রাতে মড়ার মত ঘুমুই, ভোর হলে তবে ঘুম ভাঙে। ঘরে আগুন লাগলেও আমার হুঁশ থাকে না।

বলিলাম—তুমি কোনদিন কিছু ঘরে ঢুকতে দেখনি?

—না হুজুর। আমার ঘুমুলে হুঁশ থাকে না।

এ-বিষয়ে আর কোন কথা হইল না। বৃদ্ধ খুব খুশি হইল, ভাবিল আমি আড়ালে লইয়া গিয়া ছেলেকে খুব শাসন করিয়া দিয়াছি। দিন-পনের পরে একদিন ছেলেটি আমার কাছে

আসিল। বলিল—হুজুর, একটা কথা আছে। সেবার যখন আমি বাবার সঙ্গে কাছারিতে এসেছিলাম, তখন আপনি ও-কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন কেন যে আমি কোনও কিছু ঘরে ঢুকতে দেখেছি কি না?

—কেন বল তো?

—হুজুর, আমার ঘুম আজকাল খুব সজাগ হয়েছে—বাবা ওই রকম করেন বলে আমার মনে কেমন একটা ভয়ের দরুনই হোক বা যার দরুনই হোক। তাই আজ ক-দিন থেকে দেখছি, রাত্রে একটা সাদা কুকুর কোথা থেকে আসে—অনেক রাত্রে আসে, ঘুম ভেঙে এক-একদিন দেখি সেটা বিছানার কাছেই কোথায় ছিল—আমি জেগে শব্দ করতেই পালিয়ে যায়—কোনও দিন জেগে উঠলেই পালায়। সে কেমন বুঝতে পারে যে, এইবার আমি জেগেছি। এরকম তো ক-দিন দেখলাম—কিন্তু কাল রাতে হুজুর, একটা ব্যাপার ঘটেছে। বাপজী জানে না—আপনাকে চুপি চুপি বলতে এলাম। কাল অনেক রাতে ঘুম ভেঙে দেখি, কুকুরটা ঘরে কখন ঢুকেছিল দেখিনি—আস্তে আস্তে ঘর থেকে বার হয়ে যাচ্ছে। সেদিকের কাশের বেড়ায় জানালার মাপে কাটা ফাঁক। কুকুর বেরিয়ে যাওয়ার পরে—বোধ হয় পলক ফেলতে যতটা দেরি হয়, তার পরেই আমার সামনের জানালা দিয়ে দেখি একটি মেয়েমানুষ জানলার পাশ দিয়ে ঘরের পেছনের জঙ্গলের দিকে চলে গেল। আমি তখুনি বাইরে ছুটে গেলাম—কোথাও কিছু না। বাবাকেও জানাইনি, বুড়ো মানুষ ঘুমুচ্ছে। ব্যাপারটা কি হুজুর বুঝতে পারছিনে।

আমি তাহাকে আশ্বাস দিলাম—ও কিছু নয়, চোখের ভুল। বলিলাম, যদি তাহাদের ওখানে থাকিতে ভয় করে, তাহারা কাছারিতে আসিয়া শুইতে পারে। ছেলেটি নিজের সাহস-হীনতায় বোধ করি কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু আমার অস্বস্তি দূর হইল না, ভাবিলাম এইবার কিছু শুনিলে কাছারি হইতে দুইজন সিপাহী পাঠাইব রাত্রে ওদের কাছে শুইবার জন্য।

তখনও বুঝিতে পারি নাই জিনিসটা কত সঙ্গীন। দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল অতি অকস্মাৎ এবং অতি অপ্রত্যাশিত ভাবে।

দিন-তিনেক পরে।

সকালে সবে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়াছি, খবর পাইলাম কাল রাত্রে বোমাইবুরু জঙ্গলে বৃদ্ধ ইজারাদারের ছেলেটি মারা গিয়াছে। ঘোড়ায় চড়িয়া আমরা তখনই রওনা হইলাম। গিয়া দেখি তাহারা যে ঘরটাতে থাকিত তাহারই পিছনে কাশ ও বনঝাউ জঙ্গলে ছেলেটির মৃতদেহ তখনও পড়িয়া আছে। মুখে তাহার ভীষণ ভয় ও আতঙ্কের চিহ্ন—কি একটা বিভীষিকা দেখিয়া আঁৎকাইয়া যেন মারা গিয়াছে। বৃদ্ধের মুখে শুনিলাম, শেষ রাত্রির দিকে উঠিয়া ছেলেকে সে বিছানায় না দেখিয়া তখনি লণ্ঠন ধরিয়া খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করে—কিন্তু ভোরের পূর্বে তাহার মৃতদেহ দেখিতে পাওয়া যায় নাই। মনে হয়, সে হঠাৎ বিছানা হইতে উঠিয়া কোন-কিছুর অনুসরণ করিয়া বনের মধ্যে ঢোকে—কারণ, মৃতদেহের কাছে একটা মোটা লাঠি ও লণ্ঠন পড়িয়াছিল, কিসের অনুসরণ করিয়া সে বনের মধ্যে রাত্রে একা আসিয়াছিল তাহা বলা শক্ত। কারণ নরম বালিমাটির উপরে ছেলেটির পায়ের দাগ ছাড়া অন্য কোনও পায়ের দাগ নাই—না মানুষ, না জানোয়ারের। মৃতদেহেও কোনরূপ আঘাতের চিহ্ন ছিল না। বোমাইবুরু জঙ্গলের এই রহস্যময় ব্যাপারের কোন মীমাংসাই হয় নাই, পুলিস আসিয়া কিছু করিতে না পারিয়া ফিরিয়া গেল, লোকজনের মনে এমন একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করিল ঘটনাটি যে, সন্ধ্যার বহু পূর্ব হইতে ও-অঞ্চলে আর কেহ যায় না। দিনকতক তো এমন হইল যে, কাছারিতে একলা নিজের ঘরটিতে শুইয়া বাহিরের ধপধপে সাদা, ছায়াহীন, উদাস, নির্জন

জ্যোৎস্নারাত্রির দিকে চাহিয়া কেমন একটা অজানা আতঙ্কে প্রাণ কাঁপিয়া উঠিত, মনে হইত কলিকাতায় পালাই, এ-সব জায়গা ভাল নয়, এর জ্যোৎস্নাভরা নৈশ-প্রকৃতি রূপকথার রাক্ষসী রাণীর মত, তোমাকে ভুলাইয়া বেঘোরে লইয়া গিয়া মারিয়া ফেলিবে। যেন এ-সব স্থান মানুষের বাসভূমি নয় বটে, কিন্তু ভিন্ন লোকের রহস্যময়, অশরীরী প্রাণীদের রাজ্য, বহুকাল ধরিয়া তাহারাই বসবাস করিয়া আসিতেছিল, আজ হঠাৎ তাদের সেই গোপন রাজ্যে মানুষের অনধিকার প্রবেশ তাহারা পছন্দ করে নাই, সুযোগ পাইলেই প্রতিহিংসা লইতে ছাড়িবে না।

২

প্রথম রাজু পাঁড়ের সঙ্গে যেদিন আলাপ হইল, সেদিনটা আমার বেশ মনে হয় আজও। কাছারিতে বসিয়া কাজ করিতেছি, একটি গৌরবর্ণ সুপুরুষ ব্রাহ্মণ আমাকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। তাহার বয়স পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন হইবে, কিন্তু তাহাকে বৃদ্ধ বলিলে ভুল করা হয়, কারণ তাহার মত সুগঠিত দেহ বাংলা দেশে অনেক যুবকেরও নাই। কপালে তিলক, গায়ে একখানি সাদা চাদর, হাতে একটা ছোট পুঁটুলি।

আমার প্রশ্নের উত্তরে লোকটি বলিল, সে বহুদূর হইতে আসিতেছে, এখানে কিছু জমি বন্দোবস্ত লইয়া চাষ করিতে চায়। অতি গরিব, জমির সেলামী দিবার ক্ষমতা তাহার নাই, আমি সামান্য কিছু জমি স্টেটের সঙ্গে আধা বখরায় বন্দোবস্ত দিতে পারি কিনা?

এক ধরনের মানুষ আছে, নিজের সম্বন্ধে বেশি কথা বলিতে জানে না, কিন্তু তাহাদের মুখের ভাব দেখিলেই মনে হয় যে, সত্যই বড় দুঃখী। রাজু পাঁড়েকে দেখিয়া আমার মনে হইল এ অনেক আশা করিয়া ধরমপুর পরগণা হইতে এতদূর আসিয়াছে জমির লোভে, জমি না পাইলে কিছু না বলিয়াই ফিরিয়া যাইবে বটে, কিন্তু বড়ই আশাভঙ্গ ও ভরসাহারা হইয়া ফিরিবে।

রাজুকে দু-বিঘা জমি লবটুলিয়া বইহারের উত্তরে ঘন জঙ্গলের মধ্যে বন্দোবস্ত দিলাম, একরকম বিনামূল্যেই। বলিয়া দিলাম, জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া সে আবাদ করুক, প্রথমে দু বৎসর কিছু লাগিবে না, তৃতীয় বৎসর হইতে চার আনা বিঘাপিছু খাজনা দিতে হইবে। তখনও বুঝি নাই, কি অদ্ভুত ধরনের মানুষকে জমিদারিতে বসাইলাম!

রাজু আসিল ভাদ্র কি আশ্বিন মাসে, জমি পাইয়া চলিয়াও গেল, তাহার কথা বহু কাজের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গেলাম। পর বৎসর শীতের শেষে হঠাৎ একদিন লবটুলিয়া কাছারি হইতে ফিরিতেছি, দেখি একটি গাছতলায় কে বসিয়া কি একখানা বই পড়িতেছে। আমাকে দেখিয়া লোকটি বই মুড়িয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। আমি চিনিলাম, সেই রাজু পাঁড়ে। কিন্তু আর-বছর জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার পর লোকটা একবারও কাছারিমুখো হইল না, এর মানে কি? বলিলাম—কি রাজু পাঁড়ে, তুমি আছ এখানে? আমি ভেবেছি তুমি জমি ছেড়ে-ছুড়ে চলে গিয়েছ বোধ হয়। চাষ কর নি?

দেখিলাম, ভয়ে রাজুর মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। আমতা আমতা করিয়া বলিল—হ্যাঁ, হুজুর, চাষ কিছু—এবার হুজুর—

আমার কেমন রাগ হইয়া গেল। এই সব লোকের মুখ বেশ মিষ্টি, লোক ঠকাইয়া গায়ে হাত বুলাইয়া কাজ আদায় করিতে বেশ পটু। বলিলাম—দেড় বছর তোমার চুলের টিকি তো দেখা যায় নি। দিব্যি স্টেট্‌কে ঠকিয়ে ফসল ঘরে তুলছ—কাছারির ভাগ দেওয়ার যে কথা ছিল, তা বোধ হয় তোমার মনে নেই?

রাজু এবার বিস্ময়পূর্ণ বড় বড় চোখ তুলিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিল—ফসল হুজুর? কিন্তু সে তো ভাগ দেবার কথা আমার মনেই ওঠেনি—সে চীনা ঘাসের দানা—

কথাটা বিশ্বাস হইল না। বলিলাম—চীনার দানা খাচ্ছ এই ছ-মাস? অন্য ফসল নেই? কেন, মকাই কর নি?

—না হুজুর, বড্ড গজার জঙ্গল। একা মানুষ, ভরসা করে উঠতে পারি নি। পনের কাঠা জমি অতিকষ্টে তৈরি করেছি। আসুন না হুজুর, একবার দয়া করে পায়ের ধুলো দিয়ে যান।

রাজুর পিছনে পিছনে গেলাম। এত ঘন জঙ্গল মাঝে মাঝে যে, ঘোড়ার ঢুকিতে কষ্ট হইতেছিল। খানিক দূরে গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে গোলাকার পরিষ্কার জায়গা প্রায় বিঘাখানেক, মাঝখানে জংলী ঘাসেরই তৈরি ছোট নিচু দুখানা খুপরি। একখানাতে রাজু থাকে, আর একখানায় তার ক্ষেতের ফসল জমা আছে। থলে কি বস্তা নাই, মাটির নিচু মেঝেতে রাশীকৃত চীনা ঘাসের দানা স্তূপীকৃত করা। বলিলাম—রাজু, তুমি এত আল্‌সে কুঁড়ে লোক তা তো জানতুম না, দেড় বছরের মধ্যে দু-বিঘের জঙ্গল কাটতে পারলে না?

রাজু ভয়ে ভয়ে বলিল—সময় হুজুর বড় কম যে!

—কেন, কি কর সারাদিন?

রাজু লাজুক মুখে চুপ করিয়া রহিল। রাজুর বাসস্থান খুপরির মধ্যে জিনিসপত্রের বাহুল্য আদৌ নাই। একটা লোটা ছাড়া অন্য তৈজস চোখে পড়িল না। লোটাটা বড়গোছের, তাতেই ভাত রান্না হয়। ভাত নয়, চীনা ঘাসের বীজ। কাঁচা শালপাতায় ঢালিয়া সিদ্ধ চীনার বীজ খাইলে তৈজসপত্রের কি দরকার? জলের জন্য নিকটেই কুণ্ডী অর্থাৎ ক্ষুদ্র জলাশয় আছে। আর কি চাই?

কিন্তু খুপরির একধারে সিঁদুরমাখানো ছোট কালো পাথরের রাধাকৃষ্ণমূর্তি দেখিয়া বুঝিলাম, রাজু ভক্তমানুষ! ক্ষুদ্র পাথরের বেদী বনের ফুলে সাজাইয়া রাখিয়াছে, বেদীর একপাশে দু-একখানা পুঁথি ও বই। অর্থাৎ, তাহার সময় নাই মানে সে সারাদিন পূজা-আচ্চা লইয়াই বোধ হয় ব্যস্ত থাকে। চাষ করে কখন?

এই রাজুকে প্রথম বুঝিলাম।

রাজু পাঁড়ে হিন্দী লেখাপড়া ভাল জানে, সংস্কৃতও সামান্য জানে। তাও সে সর্বদা পড়ে না, মাঝে মাঝে অবসর সময়ে গাছতলায় কি একখানা হিন্দী বই খুলিয়া একটু বসে—অধিকাংশ সময় দূরের আকাশ ও পাহাড়ের দিকে চাহিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকে। একদিন দেখি, একটা ছোট খাতায় খাগের কলমে বসিয়া কি লিখিতেছে। ব্যাপার কি? পাঁড়ে কবিতাও লেখে নাকি? কিন্তু সে এতই লাজুক, নীরব চাপা মানুষটি, তাহার নিকট হইতে কোন কথা বাহির করিয়া লওয়া বড় কঠিন। নিজের সম্বন্ধে সে কিছুই বলিতে চায় না।

একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম—পাঁড়েজী, তোমার বাড়িতে আর কে আছে?

—সবাই আছে হুজুর, আমার তিন ছেলে, দুই লেড়কী, বিধবা বহিন।

—তাদের চলে কিসে?

রাজু আকাশের দিকে হাত তুলিয়া বলিল—ভগবান চালাচ্ছেন। তাদের দু'মুঠো খাওয়ানোর ব্যবস্থা করব বলেই তো হুজুরের আশ্রয়ে এসে জমি নিয়েছি। জমিটা তৈরি করে ফেলতে পারলে—

—কিন্তু দু-বিঘে জমির ফসলে অত বড় একটা সংসার চলবে? আর তাই বা তুমি উঠে-পড়ে চেষ্টা করছ কই?

রাজু কথার জবাব প্রথমটা দিল না। তার পর বলিল—জীবনের সময়টাই বড় কম হুজুর। জঙ্গল কাটতে গিয়ে কত কথা মনে পড়ে, বসে বসে ভাবি। এই যে বন-জঙ্গল দেখছেন, বড় ভাল জায়গা। ফুলের দল কত কাল থেকে ফুটছে আর পাখী ডাকছে, বাতাসের সঙ্গে মিলে দেবতারা পৃথিবীর মাটিতে পা দেন এখানে। টাকার লোভ, পাওনা-দেনার কাজ যেখানে চলে, সেখানকার বাতাস বিষিয়ে ওঠে। সেখানে ওঁরা থাকেন না। কাজেই এখানে দা-কুড়ুল হাতে করলেই দেবতারা এসে হাত থেকে কেড়ে নেন—কানে চুপি চুপি এমন কথা বলেন, যাতে বিষয়-সম্পত্তি থেকে মন অনেক দূরে চলে যায়।

দেখিলাম, রাজু কবি বটে, দার্শনিকও বটে।

বলিলাম—কিন্তু রাজু, দেবতারা এমন কথা বলেন না যে, বাড়িতে খরচ পাঠিও না, ছেলেপুলে উপোস করুক। ওসব কথাই নয় রাজু, কাজে লাগো। নইলে জমি কেড়ে নেব।

আরও কয়েক মাস গেল। রাজুর ওখানে মাঝে মাঝে যাই। ওকে কি ভালোই লাগে। সেই গভীর নির্জন লবটুলিয়া বইহারের জঙ্গলে একা ছোট একটা ঘাসের খুপরিতে সে কেমন করিয়া দিনের পর দিন বাস করে, এ আমি ভাবিয়া উঠিতে পারি না।

সত্যকার সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক রাজু। অন্য কোন ফসল জন্মাইতে পারে নাই, চীনা ঘাসের দানা ছাড়া। সাত-আট মাস হাসিমুখে তাই খাইয়াই চালাইতেছে। কারও সঙ্গে দেখা হয় না, গল্পগুজবের লোক নাই, কিন্তু তাহাতে ওর কিছুই অসুবিধা হয় না, বেশ আছে। দুপুরে যখনই রাজুর জমির উপর দিয়া গিয়াছি, তখনই দুপুর রোদে ওকে জমিতে কাজ করিতে দেখিয়াছি। সন্ধ্যার দিকে ওকে প্রায়ই চুপ করিয়া হরীতকী গাছটার তলে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি—কোনদিন হাতে খাতা থাকে, কোনদিন থাকে না।

একদিন বলিলাম—রাজু, আরও কিছু জমি তোমায় দিচ্ছি, বেশি করে চাষ কর, তোমার বাড়ির লোক না খেয়ে মরবে যে! রাজু অতি শান্ত প্রকৃতির লোক, তাহাকে কোন কিছু বুঝাইতে বেশি বেগ পাইতে হয় না। জমি সে লইল বটে, কিন্তু পরবর্তী পাঁচ-ছ' মাসের মধ্যে জমি পরিষ্কার করিয়া উঠিতে পারিল না। সকালে উঠিয়া তাহার পূজা ও গীতাপাঠ করিতে বেলা দশটা বাজে, তার পর কাজে বার হয়। ঘণ্টা-দুই কাজ করিবার পরে রান্না-খাওয়া করে, সারা দুপুরটা খাটে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত। তারপরই আপন মনে গাছতলায় চুপ করিয়া বসিয়া কি ভাবে। সন্ধ্যার পরে আবার পূজাপাঠ আছে।

সে-বছর রাজু কিছু মকাই করিল, নিজে না খাইয়া সেগুলি সব দেশে পাঠাইয়া দিল, বড় ছেলে আসিয়া লইয়া গেল। কাছারিতে ছেলেটা দেখা করিতে আসিয়াছিল, তাহাকে ধমক দিয়া বলিলাম—বুড়ো বাপকে এই জঙ্গলে একা ফেলে রেখে বাড়িতে বসে দিব্যি ফুর্তি করছ, লজ্জা করে না? নিজেরা রোজগারের চেষ্টা কর না কেন?

৩

সেবার শুয়োরমারি বস্তিতে ভয়ানক কলেরা আরম্ভ হইল, কাছারিতে বসিয়া খবর পাইলাম। শুয়োরমারি আমাদের এলাকার মধ্যে নয়, এখান থেকে আট-দশ ক্রোশ দূরে, কুশী ও কলবলিয়া নদীর ধারে। প্রতিদিন এত লোক মরিতে লাগিল যে, কুশী নদীর জলে সর্বদা মড়া ভাসিয়া যাইতেছে, দাহ করিবার ব্যবস্থা নাই। একদিন শুনিলাম, রাজু পাঁড়ে সেখানে চিকিৎসা করিতে

বাহির হইয়াছে। রাজু পাঁড়ে যে চিকিৎসক তাহা জানিতাম না। তবে আমি কিছুদিন হোমিওপ্যাথি ওষুধ নাড়াচাড়া করিয়াছিলাম বটে, ভাবিলাম এই সব ডাক্তার-কবিরাজশূন্য স্থানে দেখি যদি কিছু উপকার করিতে পারি। কাছারি হইতে আমার সঙ্গে আরও অনেকে গেল। গ্রামে পৌঁছিয়া রাজু পাঁড়ের সঙ্গে দেখা হইল। সে একটা বটুয়াতে শিকর-বাকড় জড়ি-বুটি লইয়া এ-বাড়ি ও-বাড়ি রোগী দেখিয়া বেড়াইতেছে। আমায় নমস্কার করিয়া বলিল—হুজুর, আপনার বড্ড দয়া, আপনি এসেছেন, এবার লোকগুলো যদি বাঁচে।

এমন ভাবটা দেখাইল যেন আমি জেলার সিবিল সার্জন কিংবা ডাক্তার গুডিভ চক্রবর্তী। সে-ই আমাকে সঙ্গে করিয়া গ্রামে রোগীদের বাড়ি বাড়ি ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইল।

রাজু ওষুধ দেয়, সবই দেখিলাম ধারে। সারিয়া উঠিলে দাম দিবে এই নাকি কড়ার হইয়াছে। কি ভয়ানক দারিদ্র্যের মূর্তি কুটীরে কুটীরে। সবই খোলার কিংবা খড়ের বাড়ি, ছোট্ট ছোট্ট ঘর, জানালা নাই, আলো-বাতাস ঢোকে না কোন ঘরে। প্রায় সব ঘরেই দু-একটি রোগী, ঘরের মেঝেতে ময়লা বিছানায় শুইয়া। ডাক্তার নাই, ওষুধ নাই, পথ্য নাই। অবশ্য রাজু সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছে, না ডাকিলেও সব রোগীর কাছে গিয়া তাহার জড়ি-বুটির ওষুধ খাওয়াইয়াছে, একটা ছোট ছেলের রোগশয্যার পাশে বসিয়া কাল নাকি সারা রাত সেবাও করিয়াছে। কিন্তু মড়কের তাহাতে কিছুমাত্র উপশম দেখা যাইতেছে না, বরং বাড়িয়াই চলিয়াছে।

রাজু আমায় ডাকিয়া একটা বাড়িতে লইয়া গেল। একখানা মাত্র খড়ের ঘর, মেঝেতে রোগী তালপাতার চেটাইয়ে শুইয়া, বয়েস পঞ্চাশের কম নয়। সতের-আঠারো বছরের একটি মেয়ে দোরের গোড়ায় বসিয়া হাপুস নয়নে কাঁদিতেছে। রাজু তাহাকে ভরসা দিয়া বলিল—কাঁদিস নে বেটি, হুজুর এসেছেন, আর ভয় নেই, রোগ সেরে যাবে।

বড়ই লজ্জিত হইলাম নিজের অক্ষমতার কথা স্মরণ করিয়া। জিজ্ঞাসা করিলাম—মেয়েটি বুঝি রোগীর মেয়ে?

রাজু বলিল—না হুজুর, ওর বৌ। কেউ নেই সংসারে মেয়েটার, বিধবা মা ছিল, বিয়ে দিয়ে মারা গিয়েছে। একে বাঁচান হুজুর, নইলে মেয়েটা পথে বসবে।

রাজুর কথার উত্তরে কি বলিতে যাইতেছি এমন সময় হঠাৎ চোখ পড়িল রোগীর শিয়রের দিকে দেওয়ালে মেঝে থেকে হাত তিনেক উঁচুতে একটা কাঠের তাকের প্রতি। দেখি তাকের উপর একটা আঢাকা পাথরের খোরায় দুটি পান্তাভাত। ভাতের উপর দু-দশটা মাছি বসিয়া আছে। কি সর্বনাশ! ভীষণ এশিয়াটিক কলেরার রোগী ঘরে, আর রোগীর নিকট হইতে তিন হাতের মধ্যে ঢাকাবিহীন খোরায় ভাত!

সারাদিন রোগীর সেবা করার পরে দরিদ্র ক্ষুধার্ত বালিকা হয়ত পাথরের খোরাটি পাড়িয়া পান্তাভাত দুটি নুন লঙ্কা দিয়া আগ্রহের সহিত খাইতে বসিবে। বিষাক্ত অন্ন, যার প্রতি গ্রাসে নিষ্ঠুর মৃত্যুর বীজ। বালিকার সরল অশ্রুভরা চোখ দুটির দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। রাজুকে বলিলাম—এ ভাত ফেলে দিতে বল ওকে। এ-ঘরে খাবার রাখে!

মেয়েটি ভাত ফেলিয়া দিবার প্রস্তাবে বিস্মিত হইয়া আমাদের মুখের দিকে চাহিল। ভাত ফেলিয়া দিবে কেন? তবে সে খাইবে কি? ওঝাজীদের বাড়ি থেকে কাল রাতে ঐ ভাত দুটি তাহাকে খাইতে দিয়া গিয়াছিল।

আমার মনে পড়িল ভাত এ-দেশে সুখাদ্য বলিয়া গণ্য, আমাদের দেশে যেমন লুচি কি পোলাও। কিন্তু একটু কড়া সুরেই বলিলাম—উঠে এখুনি ভাত ফেলে দাও আগে।

মেয়েটি ভয়ে ভয়ে উঠিয়া খোরার ভাত ফেলিয়া দিল।

তাহার স্বামীকে কিছুতেই বাঁচানো গেল না। সন্ধ্যার পরেই বৃদ্ধ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। মেয়েটির কি কান্না! রাজুও সেই সঙ্গে কাঁদিয়া আকুল।

আর একটি বাড়িতে রাজু আমায় লইয়া গেল। সেটা রাজুর এক দূরসম্পর্কীয় শালার বাড়ি। এখানে প্রথম আসিয়া এই বাড়িতেই রাজু উঠিয়াছিল। খাওয়া-দাওয়া এখানেই করিত। এখানে মা ও ছেলের একসঙ্গে কলেরা, পাশাপাশি ঘরে দুই রোগী থাকে, এ উহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল, ও ইহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল। সাত-আট বছরের ছোট ছেলে।

ছেলে প্রথমে মারা গেল। মাকে জানিতে দেওয়া হইল না। আমার হোমিওপ্যাথি ঔষধে মায়ের অবস্থা ভাল হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল ক্রমশ। মা কেবলই ছেলের খবর নেয়, ও-ঘরে ছেলের সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না কেন? কেমন আছে সে?

আমরা বলি—তাকে ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে—ঘুমোচ্ছে।

চুপি চুপি ছেলের মৃতদেহ ঘর হইতে বাহির করা হইল।

গ্রামের লোক স্বাস্থ্যের নিয়ম একেবারে জানে না। একটি মাত্র পুকুর, সেই পুকুরেই কাপড় কাচে, সেখানেই স্নান করে। স্নান করা আর জল পান করা যে একই কথা নয়, ইহা কিছুতেই তাহাদের বুঝাইতে পারিলাম না। কত লোক কত লোককে ফেলিয়া পলাইয়া গিয়াছে। একটা ঘরের মধ্যে একটা রোগী দেখিলাম, সে বাড়িতে আর লোক নাই। রোগগ্রস্ত লোকটি ঐ বাড়ির ঘর-জামাই, স্ত্রী আর-বছর মারা গিয়াছে। তত্রাচ লোকটার অবস্থা খারাপ বলিয়াই হউক বা যে কারণেই হউক, শ্বশুরবাড়ির লোকে তাহাকে ফেলিয়া পলাইয়াছে। রাজু তাহাকে দিনরাত সেবা করিতে লাগিল। আমি ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করিয়া দিলাম। লোকটা শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়া গেল। বুঝিলাম, শ্বশুরবাড়ির অন্নদাস হিসাবে তাহার অদৃষ্টে এখনও অনেক দুঃখ আছে।

রাজুকে থলি বাহির করিয়া চিকিৎসার মোট উপার্জন গণনা করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—কত হল, রাজু?

রাজু গুনিয়া-গাঁথিয়া বলিল—এক টাকা তিন আনা।

ইহাতেই সে বেশ খুশি হইয়াছে। এদেশের লোক একটা পয়সার মুখ সহজে দেখিতে পায় না, এক টাকা তিন আনা উপার্জন এখানে কম নহে। রাজুকে আজ পনের-ষোল দিন, ডাক্তারকে ডাক্তার, নার্সকে নার্স, কি খাটুনিটাই খাটিতে হইয়াছে।

অনেক রাত্রে গ্রামের মধ্যে কান্নাকাটির রব শোনা গেল। আবার একজন মরিল। রাত্রে ঘুম হইল না। গ্রামের অনেকেই ঘুমায় নাই, ঘরের সামনে বড় বড় কাঠ জ্বালাইয়া আগুন করিয়া গন্ধক পোড়াইতেছে ও আগুনের চারিধারে ঘিরিয়া বসিয়া গল্প-গুজব করিতেছে। রোগের গল্প, মৃত্যুর খবর ছাড়া ইহাদের মুখে অন্য কোন কথা নাই—সকলেরই মুখে একটা ভয়, আতঙ্কের চিহ্ন পরিস্ফুট। কাহার পালা আসে!

দুপুর রাত্রে সংবাদ পাইলাম, ওবেলার সেই সদ্য-বিধবা বালিকাটির কলেরা হইয়াছে। গিয়া দেখিলাম, তাহার স্বামীগৃহের পাশে এক বাড়ির গোয়ালে সে শুইয়া আছে। ভয়ে নিজের ঘরে আসিয়া শুইতে পারে নাই, অথচ তাহাকে কেহ স্থান দেয় নাই সে কলেরার রোগী ছুঁইয়াছিল বলিয়া। গোয়ালের এক পাশে কয়েক আঁটি গমের বিচালির উপর পুরানো চট পাতা, তাতেই বালিকা শুইয়া ছটফট করিতেছে। আমি ও রাজু বহু চেষ্টা করিলাম হতভাগিনীকে বাঁচাইবার। একটি লণ্ঠন, একটু জল কোথাও পাওয়া যায় না। উঁকি মারিয়া কেহ দেখিতে পর্যন্ত আসিল

না। আজকাল এমন আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে যে, কলেরা কাহারও হইলে তাহার ত্রিসীমানায় লোক ঘেঁষে না।

রাত ফরসা হইল।

রাজুর খুব নাড়ীজ্ঞান, হাত দেখিয়া বলিল—এ হুজুর সুবিধে নয় গতিক।

আমি আর কি করিব, নিজে ডাক্তার নয়, স্যালাইন দিতে পারিলে হইত, এ অঞ্চলে তেমন ডাক্তার কোথাও নাই।

সকাল ন'টায় বালিকা মারা গেল।

আমরা না থাকিলে তাহার মৃতদেহ কেহ বাহির করিতে আসিত কিনা সন্দেহ, আমাদের অনেক তদ্বির ও অনুরোধে জন-দুই আহীর চাষী বাঁশ লইয়া আসিয়া মৃতদেহ বাঁশের সাহায্যে ঠেলিতে ঠেলিতে নদীর দিকে লইয়া গেল।

রাজু বলিল—বেঁচে গেল হুজুর। বিধবা বেওয়া অবস্থায়, তাতে ছেলেমানুষ, কি খেত, কে ওকে দেখত!

বলিলাম—তোমাদের দেশ বড় নিষ্ঠুর, রাজু।

আমার মনে কষ্ট রহিয়া গেল যে, আমি তাহাকে তাহার মুখের অত সাধের ভাত দুটি খাইতে দিই নাই।

৪

নিস্তব্ধ দুপুরে দূরে মহালিখারূপের পাহাড় ও জঙ্গল অপূর্ব রহস্যময় দেখাইত। কতবার ভাবিয়াছি একবার গিয়া পাহাড়টা ঘুরিয়া দেখিয়া আসিব, কিন্তু সময় হইয়া উঠে নাই। শুনিতাম মহালিখারূপের পাহাড় দুর্গম বনাকীর্ণ, শঙ্খচূড় সাপের আড্ডা, বনমোরগ, দুষ্প্রাপ্য বন্য চন্দ্রমল্লিকা, বড় বড় ভাল্লুকঝোড়ে ভর্তি। পাহাড়ের উপরে জল নাই বলিয়া, বিশেষত ভীষণ শঙ্খচূড় সাপের ভয়ে, এ অঞ্চলের কাঠুরিয়ারাও কখনও ওখানে যায় না।

দিকচক্রবালে দীর্ঘ নীলরেখার মত পরিদৃশ্যমান এই পাহাড় ও বন দুপুরে, বিকালে, সন্ধ্যায় কত স্বপ্ন আনে মনে। একে তো এদিকের সারা অঞ্চলটাই আজকাল আমার কাছে পরীর দেশ বলিয়া মনে হয়, এর জ্যোৎস্না, এর বন-বনানী, এর নির্জনতা, এর নীরব রহস্য, এর সৌন্দর্য, এর মানুষজন, পাখীর ডাক, বন্য ফুলশোভা—সবই মনে হয় অদ্ভুত, মনে এমন এক গভীর শান্তি ও আনন্দ আনিয়া দেয়, জীবনে যাহা কোথাও কখনও পাই নাই। তার উপরে বেশি করিয়া অদ্ভুত লাগে ওই মহালিখারূপের শৈলমালা ও মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের সীমারেখা। কি রূপলোক যে ইহারা ফুটাইয়া তোলে দুপুরে, বৈকালে, জ্যোৎস্নারাত্রে—কি উদাস চিন্তার সৃষ্টি করে মনে!

একদিন পাহাড় দেখিব বলিয়া বাহির হইলাম। ন'মাইল ঘোড়ায় গিয়া দুই দিকের দুই শৈল-শ্রেণীর মাঝের পথ ধরিয়া চলি। দুই দিকের শৈলসানু বনে ভরা, পথের ধারে দুই দিকের বিচিত্র ঘন বন-ঝোপের মধ্য দিয়া সুঁড়িপথ আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে, কখনও উঁচু-নীচু, মাঝে মাঝে ছোট ছোট পার্বত্য ঝরণা উপলাস্তৃত পথে বহিয়া চলিয়াছে, বন্য চন্দ্রমল্লিকা ফুটিতে দেখি নাই, কারণ তখন শরৎকাল, চন্দ্রমল্লিকা ফুটিবার সময়ও নয়, কিন্তু কি অজস্র বন্য শেফালিবৃক্ষ বনের সর্বত্র, ফুলের খই ছড়াইয়া রাখিয়াছে বৃক্ষতলে, শিলাখণ্ডে, ঝরণার উপলাকীর্ণ তীরে। আরও কত কি বিচিত্র বন্যপুষ্প ফুটিয়াছে বর্ষাশেষে, পুষ্পিত সপ্তপর্ণের বন,

অর্জুন ও পিয়াল, নানাজাতীয় লতা ও অর্কিডের ফুল—বহুপ্রকার পুষ্পের সুগন্ধ একত্র মিলিত হইয়া মৌমাছিদের মত মানুষকেও নেশায় মাতাল করিয়া তুলিতেছে।

এতদিন এখানে আছি, এ সৌন্দর্যভূমি আমার কাছে অজ্ঞাত ছিল। মহালিখারূপের জঙ্গল ও পাহাড়কে দূর হইতে ভয় করিয়া আসিয়াছি, বাঘ আছে, সাপ আছে, ভালুকের নাকি লেখাজোখা নাই—এ পর্যন্ত তো একটা ভালুকঝোড় কোথাও দেখিলাম না। লোকে যতটা বাড়াইয়া বলে, ততটা নয়।

ক্রমে পথটার দু-ধারে বন ঘনাইয়া পথটাকে যেন দু-দিক হইতে চাপিয়া ধরিল। বড় বড় গাছের ডালপালা পথের উপর চন্দ্রাতপের সৃষ্টি করিল। ঘনসন্নিবিষ্ট কালো কালো গাছের গুঁড়ি, তাদের তলায় কেবলই নানাজাতীয় ফার্ন, কোথাও বড় গাছেরই চারা। সামনে চাহিয়া দেখিলাম পথটা উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠিতেছে, বন আরও কৃষ্ণায়মান, সামনে একটা উত্তুঙ্গ শৈলচূড়া, তাহার অনাবৃত শিখরদেশের অল্প নীচেই যে-সব বন্যপাদপ, এত নিচু হইতে সেগুলি দেখাইতেছে যেন ছোট ছোট শেওড়া গাছের ঝোপ। অপূর্ব, গম্ভীর শোভা এই জায়গাটার। পথ বাহিয়া পাহাড়ের উপরে অনেক দূর উঠিলাম, আবার পথটা নামিয়া গড়াইয়া গিয়াছে, কিছুদূর নামিয়া আসিয়া একটা পিয়ালতলায় ঘোড়া বাঁধিয়া শিলাখণ্ডে বসিলাম—উদ্দেশ্য, শ্রান্ত অশ্বকে কিছুক্ষণ বিশ্রামের অবকাশ দেওয়া।

সেই উত্তুঙ্গ শৈলচূড়া হঠাৎ কখন বামদিকে গিয়া পড়িয়াছে ; পার্বত্য অঞ্চলের এই মজার ব্যাপার কতবার লক্ষ্য করিয়াছি, কোথা দিয়া কোনটা ঘুরিয়া গিয়া আধরশি পথের ব্যবধানে দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃশ্যের সৃষ্টি করে, এই যাহাকে ভাবিতেছি খাড়া উত্তরে অবস্থিত, হঠাৎ দু-কদম যাইতে-না-যাইতে সেটা কখন দেখি পশ্চিমে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

চুপ করিয়া কতক্ষণ বসিয়া রহিলাম। কাছেই বনের মধ্যে কোথায় একটা ঝরণার কলমর্মর সেই শৈলমালাবেষ্টিত বনানীর গভীর নিস্তব্ধতাকে আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। আমার চারিধারেই উঁচু উঁচু শৈলচূড়া, তাদের মাথায় শরতের নীল আকাশ। কতকাল হইতে এই বন পাহাড় এই এক রকমই আছে। সুদূর অতীতের আর্যেরা খাইবার গিরিবর্ত্ম পার হইয়া প্রথম যেদিন পঞ্চনদে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এই বন তখনও এই রকমই ছিল, বুদ্ধদেব নববিবাহিতা তরুণী পত্নীকে ছাড়িয়া যে-রাত্রে গোপনে গৃহত্যাগ করেন, সেই অতীত রাত্রিতে এই গিরিচূড়া গভীর রাত্রির চন্দ্রালোকে আজকালের মতই হাসিত, তমসাতীরের পর্ণকুটীরে কবি বাল্মীকি একমনে রামায়ণ লিখিতে লিখিতে কবে চমকিয়া উঠিয়া দেখিয়াছিলেন সূর্য অস্তাচলচূড়াবলম্বী, তমসার কালো জলে রক্তমেঘস্তূপের ছায়া পড়িয়া আসিয়াছে, আশ্রমমৃগ আশ্রমে ফিরিয়াছে, সেদিনটিতেও পশ্চিম দিগন্তের শেষ রাঙা আলোয় মহালিখারূপের শৈলচূড়া ঠিক এমনি অনুরঞ্জিত হইয়াছিল, আজ আমার চোখের সামনে ধীরে ধীরে যেমন হইয়া আসিতেছে। সেই কতকাল আগে যেদিন চন্দ্রগুপ্ত প্রথম সিংহাসনে আরোহণ করেন, গ্রীকরাজ হেলিওডোরাস্ গরুড়ধ্বজ-স্তম্ভ নির্মাণ করেন ; রাজকন্যা সংযুক্তা যেদিন স্বয়ম্বর-সভায় পৃথ্বীরাজের মূর্তির গলায় মাল্যদান করেন ; সামুগড়ের যুদ্ধে হারিয়া হতভাগ্য দারা যে-রাত্রে আগ্রা হইতে গোপনে দিল্লী পলাইলেন ; চৈতন্যদেব যেদিন শ্রীবাসের ঘরে সংকীর্তন করেন ; যেদিনটিতে পলাশীর যুদ্ধ হইল—মহালিখারূপের ঐ শৈলচূড়া, এই বনানী ঠিক এমনি ছিল। তখন কাহারা বাস করিত এই সব জঙ্গলে? জঙ্গলের অনতিদূরে একটা গ্রামে দেখিয়া আসিয়াছিলাম কয়েকখানি মাত্র খড়ের ঘর আছে, মহুয়াবীজ ভাঙিয়া তৈল বাহির করিবার জন্য দু-দণ্ড কাঠের তৈরি একটা

ঢেঁকির মত কি আছে, আর এক বুড়িকে দেখিয়াছিলাম, তাহার বয়স আশি-নব্বুই হইবে, শনের-নুড়ি চুল, গায়ে খড়ি উড়িতেছে, রৌদ্রে বসিয়া বোধ করি মাথার উকুন বাছিতেছিল—ভারতচন্দ্রের জরতীবেশধারিণী অন্নপূর্ণার মত। এখানে বসিয়া সেই বুড়িটার কথা মনে পড়িল—এ অঞ্চলের বন্য সভ্যতার প্রতীক ওই প্রাচীন বৃদ্ধা—পূর্বপুরুষেরা এই বনজঙ্গলে বহু সহস্র বছর ধরিয়া বাস করিয়া আসিতেছে। যীশুখ্রীষ্ট যেদিন ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছিলেন, সেদিনও উহারা মহুয়াবীজ ভাঙিয়া যেরূপ তৈল বাহির করিত, আজ সকালেও সেইরূপ করিয়াছে। হাজার হাজার বছর ধরিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে অতীতের ঘন কুজ্ঝটিকায়, উহারা আজও সাতনলি ও আঠাকাঠি দিয়া সেইরূপই পাখী শিকার করিতেছে—ঈশ্বর সম্বন্ধে, জগৎ সম্বন্ধে উহাদের চিন্তাধারা বিন্দুমাত্র অগ্রসর হয় নাই। ঐ বুড়ির দৈনন্দিন চিন্তাধারা কি জানিবার জন্য আমি আমার এক বছরের উপার্জন দিতে প্রস্তুত আছি।

বুঝি না কেন এক-এক জাতির মধ্যে সভ্যতার কী বীজ লুক্কায়িত থাকে, তাহারা যত দিন যায় তত উন্নতি করে—আবার অন্য জাতি হাজার বছর ধরিয়াও সেই একস্থানে স্থাণুবৎ নিশ্চল হইয়া থাকে কেন? বর্বর আর্যজাতি চার-পাঁচ হাজার বছরের মধ্যে বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, কাব্য, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি, চরক-সুশ্রুত লিখিল, দেশ জয় করিল, সাম্রাজ্য পত্তন করিল, ভেনাস দ্য মিলোর মূর্তি, পার্থেনন, তাজমহল, কোলোঁ ক্যাথিড্রাল গড়িল, দরবারী কানাড়া ও ফিফ্‌থ্‌ সিম্‌ফোনির সৃষ্টি করিল—এরোপ্লেন, জাহাজ, রেলগাড়ি, বেতার, বিদ্যুৎ আবিষ্কার করিল—অথচ পাপুয়া, নিউগিনি, অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা, আমাদের দেশের ওই মুণ্ডা, কোল, নাগা, কুকিগণ যেখানে সেখানেই কেন রহিয়াছে এই পাঁচ হাজার বছর?

অতীত কোন দিনে, এই যেখানে বসিয়া আছি, এখানে ছিল মহাসমুদ্র—প্রাচীন সেই মহাসমুদ্রের ঢেউ আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িত ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের এই বালুময় তীরে—এখন যাহা বিরাট পর্বতে পরিণত হইয়াছে। এই ঘন অরণ্যানীর মধ্যে বসিয়া অতীত যুগের সেই নীল সমুদ্রের স্বপ্ন দেখিলাম।

পুরা যতঃ স্রোতঃ পুলিনমধুনা তত্র সরিতাম্‌।

এই বালু-প্রস্তরের শৈলচূড়ায় সেই বিস্মৃত অতীতের মহাসমুদ্র বিক্ষুব্ধ ঊর্মিমালার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে—অতি স্পষ্ট সে চিহ্ন—ভূতত্ত্ববিদের চোখে ধরা পড়ে। মানুষ তখন ছিল না, এ ধরনের গাছপালাও ছিল না, যে ধরনের গাছপালা জীবজন্তু ছিল, পাথরের বুকে তারা তাদের ছাঁচ রাখিয়া গিয়াছে, যে-কোন মিউজিয়ামে গেলে দেখা যায়।

বৈকালের রোদ রাঙা হইয়া আসিয়াছে মহালিখারূপ পাহাড়ের মাথায়। শেফালিবনের গন্ধভরা বাতাসে হেমন্তের হিমের ঈষৎ আমেজ, আর এখানে বিলম্ব করা উচিত হইবে না, সম্মুখে কৃষ্ণা-একাদশীর অন্ধকার রাত্রি, বনমধ্যে কোথায় একদল শেয়াল ডাকিয়া উঠিল। ভালুক বা বাঘ পথ না আটকায়।

ফিরিবার পথে এইদিন প্রথম বন্য ময়ূর দেখিলাম বনান্তস্থলীতে শিলাখণ্ডের উপর। একজোড়া ছিল, আমার ঘোড়া দেখিয়া ভয় পাইয়া ময়ূরটা উড়িয়া গেল, তাহার সঙ্গিনী কিন্তু নড়িল না। বাঘের ভয়ে আমার তখন দেখিবার অবকাশ ছিল না, তবু একবার সেটার সামনে থমকিয়া দাঁড়াইলাম। বন্য ময়ূর কখনও দেখি নাই, লোকে বলিত এ অঞ্চলে ময়ূর আছে, আমি বিশ্বাস করিতাম না। কিন্তু বেশীক্ষণ বিলম্ব করিতে ভরসা হইল না, কি জানি মহালিখারূপের বাঘের গুজবটাও যদি এরকম সত্য হইয়া যায়!

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১

দেশের জন্য মন কেমন করা একটি অতি চমৎকার অনুভূতি। যারা চিরকাল এক জায়গায় কাটায়, স্বগ্রাম বা তাহার নিকটবর্তী স্থান ছাড়িয়া নড়ে না—তাহারা জানে না ইহার বৈচিত্র্য। দূরপ্রবাসে আত্মীয়-স্বজনশূন্য স্থানে দীর্ঘদিন যে বাস করিয়াছে, সে জানে বাংলা দেশের জন্য, বাঙালীর জন্য, নিজের গ্রামের জন্য, দেশের প্রিয় আত্মীয়স্বজনের জন্য মন কি রকম হু-হু করে, অতি তুচ্ছ পুরাতন ঘটনাও তখন অপূর্ব বলিয়া মনে হয়—মনে হয় যাহা হইয়া গিয়াছে, জীবনে আর তাহা হইবার নহে—পৃথিবী উদাস হইয়া যায়, বাংলা দেশের প্রত্যেক জিনিসটা অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠে।

এখানে বছরের পর বছর কাটাইয়া আমারও ঠিক সেই অবস্থা ঘটিয়াছে। কতবার সদরে ছুটির জন্য চিঠি লিখিব ভাবিয়াছি, কিন্তু কাজ এত বেশি সব সময়েই হাতে আছে যে, ছুটি চাহিতে সংকোচ বোধ হয়। অথচ এই জনশূন্য পাহাড়-জঙ্গলে, বাঘ ভালুক নীলগাইয়ের দেশে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর একা কাটানো যে কি কষ্ট! প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে এক-এক সময়, বাংলা দেশ ভুলিয়া গিয়াছি, কত- কাল দুর্গোৎসব দেখি নাই, চড়কের ঢাক শুনি নাই, দেবালয়ের ধূনাগুগ্‌গুলের সৌরভ পাই নাই, বৈশাখী প্রভাতে পাখীর কলকূজন উপভোগ করি নাই—বাংলার গৃহস্থালির সে শান্ত পূত ঘরকন্না, জলচৌকিতে পিতল-কাঁসার তৈজসপত্র, পিঁড়িতে আলপনা, কুলুঙ্গীতে লক্ষ্মীর কড়ির চুপড়ি—সে সব যেন বিস্মৃত অতীত এক জীবন-স্বপ্ন!

শীত গিয়া যখন বসন্ত পড়িয়াছে তখন আমার এই ভাবটা অত্যন্ত বেশি বাড়িল।

সেই অবস্থায় ঘোড়ায় চড়িয়া সরস্বতী কুণ্ডীর ওদিকে বেড়াইতে গেলাম। একটা নিচু উপত্যকায় ঘোড়া হইতে নামিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইলাম। আমার চারিদিক ঘিরিয়া উঁচু মাটির পাড়, তাহার উপর দীর্ঘ দীর্ঘ কাশ ও বনঝাউয়ের ঘন জঙ্গল। ঠিক আমার মাথার উপরে খানিকটা নীল আকাশ। একটা কণ্টকময় গাছে বেগুনী রঙের ঝাড় ঝাড় ফুল ফুটিয়াছে, বিলাতী কর্নফ্লাওয়ার ফুলের মত দেখিতে। একটা ফুলের বিশেষ কোন শোভা নাই, অজস্র ফুল একত্র দলবদ্ধ হইয়া অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া দেখাইতেছে ঠিক বেগুনী রঙের একখানি শাড়ির মত। বর্ণহীন, বৈচিত্র্যহীন অর্ধশুষ্ক কাশ-জঙ্গলের তলায় ইহারা খানিকটা স্থানে বসন্তোৎসবে মাতিয়াছে—ইহাদের উপরে প্রবীণ, বিরাট বনঝাউয়ের স্তব্ধ রুক্ষ অরণ্য এদের ছেলেমানুষিকে নিতান্ত অবজ্ঞা ও উপেক্ষার চোখে দেখিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া প্রবীণতার ধৈর্যে তাহা সহ্য করিতেছে। সেই বেগুনী রঙের জংলী ফুলগুলিই আমার কানে শুনাইয়া দিল বসন্তের আগমন-বাণী। বাতাবীলেবুর ফুল নয়, ঘেঁটুফুল নয়, আম্রমুকুল নয়, কামিনীফুল নয়, রক্তপলাশ বা শিমুল নয়, কি একটা নামগোত্রহীন রূপহীন নগণ্য জংলী কাঁটাগাছের ফুল। আমার কাছে কিন্তু তাহাই কাননভরা বনভরা বসন্তের কুসুমরাজির প্রতীক হইয়া দেখা দিল। কতক্ষণ সেখানে একমনে দাঁড়াইয়া রহিলাম, বাংলা দেশের ছেলে আমি, কতকগুলি জংলী কাঁটার ফুল যে ডালি সাজাইয়া বসন্তের মান রাখিয়াছে এ দৃশ্য আমার কাছে নূতন। কিন্তু কি গম্ভীর শোভা উঁচু ডাঙার উপরকার অরণ্যের! কি ধ্যানস্তিমিত, উদাসীন, বিলাসহীন, সন্ন্যাসীর মত রুক্ষ বেশ তার, অথচ কি বিরাট! সেই অর্ধশুষ্ক, পুষ্পপত্রহীন বনের নিস্পৃহ আত্মার সহিত ও নিম্নের এই বন্য, বর্বর, তরুণদের বসন্তোৎসবের সকল নিরাড়ম্বর প্রচেষ্টার উচ্ছ্বসিত আনন্দের সহিত আমার মন এক হইয়া গেল।

সে আমার জীবনের এক পরম বিচিত্র মুহূর্ত। কতক্ষণ দাঁড়াইয়া আছি, দু-একটা নক্ষত্র উঠিল মাথার উপরকার সেই নীল আকাশের ফালিটুকুতে, এমন সময় ঘোড়ার পায়ের শব্দে চমকাইয়া উঠিয়া দেখি, আমীন পূরণচাঁদ নাঢ়া বইহারের পশ্চিম সীমানার জরীপের কাজ শেষ করিয়া কাছারি ফিরিতেছে। আমায় দেখিয়া ঘোড়া হইতে নামিয়া বলিল—হুজুর এখানে? তাহাকে বলিলাম, বেড়াইতে আসিয়াছি।

সে বলিল—একা এখানে থাকবেন না সন্ধ্যাবেলা, চলুন কাছারিতে। জায়গাটা ভাল নয়, আমার টিণ্ডেল স্বচক্ষে দেখেছে হুজুর। খুব বড় বাঘ, ওধারের ওই কাশের জঙ্গলে—আসুন হুজুর।

পিছনে অনেক দূরে পূরণচাঁদের টিণ্ডেল গান ধরিয়াছে ঃ—

দয়া হোই জী—

সেই দিন হইতে ঐ কাঁটার ফুল দেখিলেই আমার মন হু হু করিয়া উঠিত বাংলা দেশের জন্য। আর ঠিক কি পূরণচাঁদের টিণ্ডেল ছট্টুলাল প্রতি সন্ধ্যায় নিজের ঘরে রুটি সেঁকিতে সেঁকিতে ঐ গানই গাহিবে—

দয়া হোই জী—

ভাবিতাম, আসন্ন ফাল্গুন-বেলায় আম্রবউলের গন্ধভরা ছায়ায় শিমূল ফুলফোটা নদীচরের এপারে দাঁড়াইয়া কোকিলের কূজন শুনিবার সুযোগ এ জীবনে বুঝি আর মিলিবে না, এই বনেই বেঘোরে বাঘ বা বন্যমহিষের হাতে কোন্‌দিন প্রাণ হারাইতে হইবে।

বনঝাউ-বন তেমনই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত, দূর বনলীন দিগ্বলয় তেমনই ধূসর, উদাসীন দেখাইত।

এমনি এক দেশের জন্য মন-কেমন-করা দিনে রাসবিহারী সিং-এর বাড়ি হইতে হোলির নিমন্ত্রণ পাইলাম। রাসবিহারী সিং এ অঞ্চলের দুর্দান্ত মহাজন, জাতিতে রাজপুত, কারো নদীর তীরবর্তী গবর্নমেন্ট খাসমহালের প্রজা। তাহার গ্রাম কাছারি হইতে বারো-চৌদ্দ মাইল উত্তরপূর্ব কোণে, মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের গায়ে।

নিমন্ত্রণ না রাখিলেও ভাল দেখায় না, কিন্তু রাসবিহারী সিং-এর বাড়িতে যাইতে আমার নিতান্ত অনিচ্ছা। এ-অঞ্চলের যত গরিব গাঙ্গোতা জাতীয় প্রজার মহাজন হইল সে। গরিবকে মারিয়া তাহাদের রক্ত চুষিয়া নিজে বড়লোক হইয়াছে। তাহার কড়া শাসন ও অত্যাচারে কাহারও টুঁ শব্দটি করিবার যো নাই। বেতন বা জমিভোগী লাঠিয়াল পাইকের দল লাঠিহাতে সর্বদা ঘুরিতেছে, ধরিয়া আনিতে বলিলে বাঁধিয়া আনিয়া হাজির করিবে। যদি কোন রকমে রাসবিহারীর মনে হইল অমুক বিষয়ে অমুক তাহাকে যথেষ্ট মর্যাদা দেয় নাই বা তাহার প্রাপ্য সম্মান ক্ষুণ্ণ করিয়াছে, তাহা হইলে সে হতভাগ্যের আর রক্ষা নাই। রাসবিহারী সিং ছলে-বলে-কৌশলে তাহাকে জব্দ করিয়া রীতিমত শিক্ষা দিয়া ছাড়িবেই।

আমি আসিয়া দেখি রাসবিহারী সিং-ই এদেশের রাজা। তাহার কথায় গরিব গৃহস্থ প্রজা থরহরি কাঁপে, অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন লোকেও কিছু বলিতে সাহস করে না, কেননা রাসবিহারীর লাঠিয়াল-দল বিশেষ দুর্দান্ত, মারধর দাঙ্গা-হাঙ্গামায় তাহারা বিশেষ পটু। পুলিসও নাকি রাসবিহারীর হাতে আছে। খাসমহালের সার্কেল অফিসার বা ম্যানেজার আসিয়া রাসবিহারী সিং-এর বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। এ অবস্থায় সে কাহাকে গ্রাহ্য করিবে এ জঙ্গলের মধ্যে?

আমার প্রজার উপর রাসবিহারী সিং প্রভুত্ব জাহির করিবার চেষ্টা করে—তাহাতে আমি বাধা দিই। আমি স্পষ্ট জানাইয়া দিই, তোমাদের নিজেদের এলাকার মধ্যে যা হয় করিও, কিন্তু

আমার মহালের কোনও প্রজার কেশাগ্র স্পর্শ করিলে আমি তাহা সহ্য করিব না। গত বৎসর এই ব্যাপার লইয়া রাসবিহারী সিং-এর লাঠিয়াল-দলের সঙ্গে আমার কাছারির মুকুন্দি চাকলাদার ও গণপৎ তহশিলদারের সিপাহীদের একটা ক্ষুদ্র রকমের মারামারি হইয়া যায়। গত শ্রাবণ মাসেও আবার একটা গোলমাল বাধিয়াছিল। তাহাতে ব্যাপার পুলিস পর্যন্ত গড়ায়। পুলিশের দারোগা আসিয়া সেটা মিটাইয়া দেয়। তাহার পর কয়েক মাস যাবৎ রাসবিহারী সিং আমার মহালের প্রজাদের কিছু বলে না।

সেই রাসবিহারী সিং-এর নিকট হইতে হোলির নিমন্ত্রণ পাইয়া বিস্মিত হইলাম।

গণপৎ তহশিলদারকে ডাকিয়া পরামর্শ করিতে বসি। গণপৎ বলিল—কি জানি হুজুর, ও লোকটাকে বিশ্বাস নেই। ও সব পারে, কি মতলবে আপনাকে নিয়ে যেতে চায় কে জানে? আমার মতে না যাওয়াই ভাল।

আমার কিন্তু এ-মত মনঃপূত হইল না। হোলির নিমন্ত্রণে না গেলে রাসবিহারী অত্যন্ত অপমান বোধ করিবে। কারণ হোলির উৎসব রাজপুতদের একটি প্রধান উৎসব। হয়ত ভাবিতে পারে যে, ভয়ে আমি গেলাম না। তা যদি ভাবে, সে আমার পক্ষে ঘোর অপমানের বিষয়। না, যাইতেই হইবে, যা থাকে অদৃষ্টে।

কাছারির প্রায় সকলেই আমায় নানা-মতে বুঝাইল। বৃদ্ধ মুনেশ্বর সিং বলিল—হুজুর, যাচ্ছেন বটে, কিন্তু আপনি এ-সব দেশের গতিক জানেন না। এখানে হট্ বলতে খুন করে বসে। জাহিল আদমির দেশ, লেখাপড়া-জানা লোক তো নেই। তা ছাড়া রাসবিহারী অতি ভয়ানক মানুষ। কত খুন করেছে জীবনে, তার লেখাজোখা আছে হুজুর? ওর অসাধ্য কাজ নেই—খুন, ঘর-জ্বালানি, মিথ্যে মকদ্দমা খাড়া করা, ও সবতাতেই মজবুত।

ও-সব কথা কানে না তুলিয়াই খাসমহালে রাসবিহারীর বাড়ি গিয়া পৌঁছিলাম। খোলায় ছাওয়া ইটের দেওয়ালওয়ালা ঘর, যেমন এ-দেশে অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ি হইয়া থাকে। বাড়ির সামনে বারান্দা, তাতে কাঠের খুঁটি আলকাতরা-মাখানো। দুখানা দড়ির চারপাই, তাতে জনদুই লোক বসিয়া ফর্সিতে তামাক খাইতেছে।

আমার ঘোড়া উঠানের মাঝখানে গিয়া দাঁড়াইতেই কোথা হইতে গুড়ুম গুড়ুম করিয়া দুটি বন্দুকের আওয়াজ হইল। রাসবিহারী সিং-এর লোক আমায় চেনে, তাহারা স্থানীয় রীতি অনুসারে বন্দুকের আওয়াজ দ্বারা আমাকে অভ্যর্থনা করিল, ইহা বুঝিলাম। কিন্তু গৃহস্বামী কোথায়? গৃহস্বামী না আসিয়া দাঁড়াইলে ঘোড়া হইতে নামিবার প্রথা নাই।

একটু পরে রাসবিহারী সিং-এর বড় ভাই রাসউল্লাস সিং আসিয়া বিনীত সুরে দুই হাত সামনে তুলিয়া বলিল—আইয়ে জনাব, গরীবখানামে তস্‌রিফ লেতে আইয়ে—। আমার মনের অস্বস্তি ঘুচিয়া গেল। রাজপুত জাতি অতিথি বলিয়া স্বীকার করিয়া তাহার অনিষ্ট করে না। কেহ আসিয়া অভ্যর্থনা না করিলে ঘোড়া হইতে না নামিয়া ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া দিতাম কাছারির দিকে।

উঠানে বহু লোক। ইহারা অধিকাংশই গাঙ্গোতা প্রজা। পরনের মলিন ছেঁড়া কাপড় আবীর ও রঙে ছোপানো, নিমন্ত্রণে বা বিনা-নিমন্ত্রণে মহাজনের বাড়ি হোলি খেলিতে আসিয়াছে।

আধ-ঘণ্টা পরে রাসবিহারী সিং আসিল এবং আমায় দেখিয়া যেন অবাক হইয়া গেল। অর্থাৎ আমি যে তাহার বাড়ি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইব, ইহা যেন সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। যাহা হউক, রাসবিহারী আমায় যথেষ্ট খাতির-যত্ন করিল।

পাশের যে-ঘরে সে আমায় লইয়া গেল, সেটায় থাকিবার মধ্যে আছে খান-দুই-তিন সিসম কাঠের দেশী ছুতারের হাতে তৈরি খুব মোটা মোটা পায়া ও হাতলওয়ালা চেয়ার এবং একখানা কাঠের বেঞ্চি। দেওয়ালে সিন্দূর-চন্দন-লিপ্ত একটি গণেশমূর্তি।

একটু পরে একটি বালক একখানা বড় থালা লইয়া আমার সামনে ধরিল। তাহাতে কিছু আবীর, কিছু ফুল, কয়েকটি টাকা, গোটাকতক চিনির এলাচদানা ও মিছরিখণ্ড, একছড়া ফুলের মালা। রাসবিহারী সিং আমার কপালে কিছু আবীর মাখাইয়া দিল, আমিও তাহার কপালে আবীর দিলাম, ফুলের মালাগাছি তুলিয়া লইলাম। আর কি করিতে হইবে না বুঝিতে পারিয়া আনাড়ি ভাবে থালার দিকে চাহিয়া আছি দেখিয়া রাসবিহারী সিং বলিল—আপনার নজর, হুজুর। ও আপনাকে নিতে হবে। আমি পকেট হইতে আর কিছু টাকা বাহির করিয়া থালার টাকার সঙ্গে মিশাইয়া বলিলাম—সকলকে মিষ্টিমুখ করাও এই দিয়ে।

রাসবিহারী সিং তার পর আমাকে তাহার ঐশ্বর্য দেখাইয়া লইয়া বেড়াইল। গোয়ালে প্রায় ষাট-পঁয়ষট্টিটি গরু। সাত-আটটি ঘোড়া আস্তাবলে—দুটি ঘোড়া নাকি অতি সুন্দর নাচিতে পারে, একদিন নাচ আমায় সে দেখাইবে। হাতি নাই কিন্তু শীঘ্র কিনিবার ইচ্ছা আছে। এ-দেশে হাতি না থাকিলে সে সম্ভ্রান্ত লোক হয় না। আট-শ মণ গম চাষে উৎপন্ন হয়, দু-বেলায় আশি-পঁচাশিজন লোক খায়, সে নিজে সকালে নাকি দেড় সের দুধ ও এক সের বিকানীর মিছরি স্নানান্তে জলযোগ করে। বাজারের সাধারণ মিছরি সে কখনও খায় না, বিকানীর মিছরি ছাড়া। মিছরি খাইয়া জলযোগ যে করে, সে এ-দেশে বড়লোক বলিয়া গণ্য হয়—বড়লোকের উহা আর একটি লক্ষণ।

তার পর রাসবিহারী একটা ঘরে আমায় লইয়া গেল, সে ঘরের আড়া হইতে দু-হাজার আড়াই-হাজার ছড়া ভুট্টা ঝুলিতেছে। এগুলি ভুট্টার বীজ, আগামী বৎসরের চাষের জন্য রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। একখানা লোহার কড়া আমায় দেখাইল, লোহার চাদর গুল্-বসানো পেরেক দিয়া জুড়িয়া কড়াখানা তৈরি, তাতে দেড় মণ দুধ একসঙ্গে জ্বাল দেওয়া হয় প্রত্যহ। তাহার সংসারে প্রত্যহই ঐ পরিমাণ দুধ খরচ হয়। একটা ছোট ঘরে লাঠি, ঢাল, সড়কি, বর্শা, টাঙ্গি, তলোয়ার এত অগুন্তি যে সেটাকে রীতিমত অস্ত্রাগার বলিলেও চলে।

রাসবিহারী সিং-এর ছয়জন ছেলে—জ্যেষ্ঠ পুত্রটির বয়স ত্রিশের কম নয়। প্রথম চারটি ছেলে বাপের মতই দীর্ঘকায়, জোয়ান, গোঁফ ও গালপাট্টার বহর এরই মধ্যে বেশ। তাহার ছেলেদের ও তাহার অস্ত্রাগার দেখিয়া মনে হইল দরিদ্র, অনাহারজীর্ণ গাঙ্গোতা প্রজাগণ যে ইহাদের ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া থাকিবে ইহা আর বেশি কথা কি!

রাসবিহারী অত্যন্ত দাম্ভিক ও রাশভারী লোক। তাহার মানের জ্ঞানও বিলক্ষণ সজাগ। পান হইতে চুন খসিলেই রাসবিহারী সিং-এর মান যায়, সুতরাং তাহার সহিত ব্যবহার করিতে গেলে সর্বদা সতর্ক ও সন্ত্রস্ত থাকিতে হয়। গাঙ্গোতা প্রজাগণ তো সর্বদা তটস্থ অবস্থায় আছে, কি জানি কখন মনিবের মানের ত্রুটি ঘটে।

বর্বর প্রাচুর্য বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার জাজ্বল্যমান চিত্র দেখিলাম রাসবিহারীর সংসারে। যথেষ্ট দুধ, যথেষ্ট গম, যথেষ্ট ভুট্টা, যথেষ্ট বিকানীর মিছরি, যথেষ্ট মান, যথেষ্ট লাঠিসোঁটা। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে? ঘরে একখানা ভাল ছবি নাই, ভাল বই নাই, ভাল কৌচ-কেদারা দূরের কথা, ভাল তাকিয়া-বালিশ-সাজানো বিছানাও নাই। দেওয়ালে চুনের দাগ, পানের দাগ, বাড়ির পিছনের নর্দমা অতি কদর্য নোংরা জল ও আবর্জনায় বোজানো, গৃহ-স্থাপত্য অতি কুশ্রী।

ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে না, নিজেদের পরিচ্ছদ ও জুতা অত্যন্ত মোটা ও আধময়লা। গত বৎসর বসন্তরোগে বাড়ির তিন-চারটি ছেলেমেয়ে এক মাসের মধ্যে মারা গিয়াছে। এ বর্বর প্রাচুর্য তবে কোন্ কাজে লাগে? নিরীহ গাঙ্গোতা প্রজা ঠেঙাইয়া এ প্রাচুর্য অর্জন করার ফলে কাহার কি সুবিধা হইতেছে? অবশ্য রাসবিহারী সিং-এর মান বাড়িতেছে।

ভোজ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য দেখিয়া কিন্তু তাক্ লাগিল। এত কি একজনে খাইতে পারে? হাতির কানের মত বৃহদাকার পুরী খান-পনেরো, খুরিতে নানারকম তরকারি, দই, লাড্ডু, মালপোয়া, চাটনি, পাঁপর। আমার তো এ চার-বেলার খোরাক। রাসবিহারী সিং নাকি একা এর দ্বিগুণ আহার্য উদরস্থ করিয়া থাকে একবারে।

আহার শেষ করিয়া যখন বাহিরে আসিলাম, তখন বেলা আর নাই। গাঙ্গোতা প্রজার দল উঠানে পাতা পাতিয়া দই ও চীনা ঘাসের ভাজা দানা মহা আনন্দে খাইতে বসিয়াছে। সকলের কাপড় লাল রঙে রঞ্জিত, সকলের মুখে হাসি। রাসবিহারীর ভাই গাঙ্গোতাদের খাওয়ানোর তদারক করিয়া বেড়াইতেছে। ভোজনের উপকরণ অতি সামান্য, তাতেই ওদের খুশি ধরে না।

অনেক দিন পরে এখানে সেই বালক-নর্তক ধাতুরিয়ার নাচ দেখিলাম। ধাতুরিয়া আর একটু বড় হইয়াছে, নাচেও আগের চেয়ে অনেক ভাল। হোলি-উৎসবে এখানে নাচিবার জন্য তাহাকে বায়না করিয়া আনা হইয়াছে।

ধাতুরিয়াকে কাছে ডাকিয়া বলিলাম—চিনতে পার ধাতুরিয়া?

ধাতুরিয়া হাসিয়া সেলাম করিয়া বলিল—জী হুজুর। আপনি ম্যানেজারবাবু। ভাল আছেন হুজুর?

ভারি সুন্দর হাসি ওর মুখে। আর ওকে দেখিলেই মনে কেমন একটা অনুকম্পা ও করুণার উদ্রেক হয়। সংসারে আপন বলিতে কেহ নাই, এই বয়সে নাচিয়া গাহিয়া পরের মন যোগাইয়া পয়সা রোজগার করিতে হয়, তাও রাসবিহারী সিং-এর মত ধনগর্বিত অরসিকদের গৃহ-প্রাঙ্গণে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—এখানে তো অর্ধেক রাত পর্যন্ত নাচতে গাইতে হবে, মজুরী কি পাবে?

ধাতুরিয়া বলিল—চার আনা পয়সা হুজুর, আর খেতে দেবে পেট ভরে।

—কি খেতে দেবে?

—মাঢ়া, দই, চিনি। লাড্ডুও দেবে বোধ হয়, আর-বছর তো দিয়েছিল।

আসন্ন ভোজ খাইবার লোভে ধাতুরিয়া খুব প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। বলিলাম—সব জায়গায় কি এই মজুরী?

ধাতুরিয়া বলিল—না হুজুর, রাসবিহারী সিং বড়মানুষ, তাই চার আনা দেবে আর খেতেও দেবে। গাঙ্গোতাদের বাড়ি নাচলে দেয় দু আনা, খেতে দেয় না, তবে আধ সের মকাইয়ের ছাতু দেয়।

—এতে চলে?

—বাবু, নাচে কিছু হয় না, আগে হত। এখন লোকের কষ্ট, নাচ দেখবে কে? যখন নাচের বায়না না থাকে, ক্ষেতে-খামারে কাজ করি। আর-বছর গম কেটেছিলাম। কি করি হুজুর, খেতে তো হবে। এত শখ করে ছক্করবাজি নাচ শিখেছিলাম গয়া থেকে—কেউ দেখতে চায় না, ছক্করবাজি নাচের মজুরী বেশি।

ধাতুরিয়াকে আমি কাছারিতে নাচ দেখাইবার নিমন্ত্রণ করিলাম। ধাতুরিয়া শিল্পী লোক—সত্যিকার শিল্পীর নিস্পৃহতা ওর মধ্যে আছে।

পূর্ণিমার জ্যোৎস্না খুব ফুটিলে রাসবিহারী সিং-এর নিকট বিদায় লইলাম। রাসবিহারী সিং পুনরায় দুটি বন্দুকের আওয়াজ করিল, আমার ঘোড়া উহাদের উঠান পার হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমার সম্মানের জন্য।

দোল-পূর্ণিমার রাত্রি। উদার মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে সাদা বালির রাস্তা জ্যোৎস্নাসম্পাতে চিক্‌চিক্ করিতেছে। দূরে একটা সিল্লী পাখী জ্যোৎস্নারাতে কোথায় ডাকিতেছে—যেন এই বিশাল, জনহীন প্রান্তরের মধ্যে পথহারা কোনো বিপন্ন নৈশ-পথিকের আকুল কণ্ঠস্বর!

পিছন হইতে কে ডাকিল—হুজুর, ম্যানেজারবাবু—

চাহিয়া দেখি ধাতুরিয়া আমার ঘোড়ার পিছু পিছু ছুটিতেছে।

ঘোড়া থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—কি ধাতুরিয়া?

ধাতুরিয়া হাঁপাইতেছিল। একটুখানি দাঁড়াইয়া দম লইয়া, একটু ইতস্তত করিয়া পরিশেষে লাজুক মুখে বলিল—একটা কথা বলছিলাম, হুজুর—

তাহাকে সাহস দিবার সুরে বলিলাম—কি, বল না?

—হুজুরের দেশে কলকাতায় আমায় একবার নিয়ে যাবেন?

—কি করবে সেখানে গিয়ে?

—কখনও কলকাতায় যাই নি, শুনেছি সেখানে গাওনা-বাজনা-নাচের বড় আদর। ভাল ভাল নাচ শিখেছিলাম, কিন্তু এখানে দেখবার লোক নেই, তাতে বড় দুঃখ হয়। ছক্করবাজি নাচটা না নেচে ভুলে যেতে বসেছি। উঃ, কি করেই ওই নাচটা শিখি! সে কথা শোনার জিনিস।

গ্রামটা ছাড়াইয়াছিলাম। ধূ-ধূ জ্যোৎস্নালোকিত মাঠ। ভাবে বোধ হইল ধাতুরিয়া লুকাইয়া আমার সহিত দেখা করিতে চায়, রাসবিহারী সিং টের পাইলে শাসন করিবে এই ভয়ে। নিকটেই মাঠের মধ্যে একটা ফুলে-ভর্তি শিমুল-চারা। ধাতুরিয়ার কথা শুনিয়া শিমুল গাছটার তলায় ঘোড়া হইতে নামিয়া একখণ্ড পাথরের উপর বসিলাম। বলিলাম—বল তোমার গল্প।

—সবাই বলত গয়া জেলায় এক গ্রামে ভিটলদাস বলে একজন গুণীলোক আছে, সে ছক্করবাজি নাচের মস্ত ওস্তাদ। আমার ঝোঁক ছিল ছক্করবাজি যে করে হোক শিখবই। গয়া জেলাতে চলে গেলাম, গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরি আর ভিটলদাসের খোঁজ করি। কেউ বলতে পারে না। শেষকালে একদিন সন্ধ্যার সময় একটা আহীরদের মহিষের বাথানে আশ্রয় নিয়েছি, সেখানে শুনলাম ছক্করবাজি নাচ নিয়ে তাদের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছে। অনেক রাত তখন, শীতও খুব। আমি বিচালি পেতে বাথানের এক কোণে শুয়ে ছিলাম, যেমন ছক্করবাজির কথা কানে যাওয়া অমনি লাফিয়ে উঠেছি। ওদের কাছে এসে বসি। কি খুশিই যে হলাম বাবুজী সে আর কি বলব! যেন একটা কি তালুক পেয়ে গিয়েছি। ওদের কাছে ভিটলদাসের সন্ধান পেলাম। ওখান থেকে সতের ক্রোশ রাস্তা তিনটাঙা বলে গ্রামে তাঁর বাড়ি।

বেশ লাগিতেছিল একজন তরুণ শিল্পীর শিল্পশিক্ষার আকুল আগ্রহের গল্প। বলিলাম, তার পর?

—হেঁটে সেখানে গেলাম। ভিটলদাস দেখি বুড়ো মানুষ। একমুখ সাদা দাড়ি। আমায় দেখে বললেন—কি চাই? আমি বললাম—আমি ছক্করবাজি নাচ শিখতে এসেছি। তিনি যেন অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—আজকালকার ছেলেরা এ পছন্দ করে? এ তো লোকে ভুলেই গিয়েছে। আমি তাঁর পায়ে হাত দিয়ে বললাম—আমায় শেখাতে হবে, বহুদূর থেকে আসছি আপনার নাম শুনে। তাঁর চোখ দিয়ে জল এল। বললেন—আমার বংশে সাতপুরুষ ধরে এই

নাচের চর্চা। কিন্তু আমার ছেলে নেই, বাইরের কেউ এসে শিখতেও চায় নি, আমার এত বয়স হয়েছে, এর মধ্যে। আজ তুমি প্রথম এলে। আচ্ছা, তোমায় শেখাব।—তা বুঝলেন হুজুর, এত কষ্ট করে শেখা জিনিস। এখানে গাঙ্গোতাদের দেখিয়ে কি করব? কলকাতায় গুণের আদর আছে। সেখানে নিয়ে যাবেন, হুজুর?

বলিলাম—আমার কাছারিতে একদিন এসো ধাতুরিয়া, এ-সম্বন্ধে কথা বলব।

ধাতুরিয়া আশ্বস্ত হইয়া চলিয়া গেল।

আমার মনে হইল উহার এত কষ্ট করিয়া শেখা গ্রাম্য নাচ কলিকাতায় কে-ই বা দেখিবে, আর ও বেচারী একা সেখানে কি-ই বা করিবে?

অষ্টম পরিচ্ছেদ

১

প্রকৃতি তাঁর নিজের ভক্তদের যা দেন, তা অতি অমূল্য দান। অনেক দিন ধরিয়া প্রকৃতির সেবা না করিলে কিন্তু সে দান মেলে না। আর কি ঈর্ষার স্বভাব প্রকৃতিরাণীর—প্রকৃতিকে যখন চাহিব, তখন প্রকৃতিকে লইয়াই থাকিতে হইবে, অন্য কোনো দিকে মন দিয়াছি যদি, অভিমানিনী কিছুতেই তাঁর অবগুণ্ঠন খুলিবেন না।

কিন্তু অনন্যমনা হইয়া প্রকৃতিকে লইয়া ডুবিয়া থাকো, তাঁর সর্ববিধ আনন্দের বর, সৌন্দর্যের বর, অপূর্ব শান্তির বর তোমার উপর অজস্রধারে এত বর্ষিত হইবে, তুমি দেখিয়া পাগল হইয়া উঠিবে, দিনরাত মোহিনী প্রকৃতিরাণী তোমাকে শতরূপে মুগ্ধ করিবেন, নূতন দৃষ্টি জাগ্রত করিয়া তুলিবেন, মনের আয়ু বাড়াইয়া দিবেন, অমরলোকের আভাসে অমরত্বের প্রান্তে উপনীত করাইবেন।

কয়েক বারের কথা বলি। সে অমূল্য অনুভূতিরাজির কথা বলিতে গেলে লিখিয়া পাতার পর পাতা ফুরাইয়া যায়, কিন্তু তবু বলা শেষ হয় না, যা বলিতে চাহিতেছি তাহার অনেকখানিই বাকি থাকিয়া যায়। এসব শুনিবার লোকও সংখ্যায় অত্যন্ত কম, ক'জন মনে-প্রাণে প্রকৃতিকে ভালবাসে?

অরণ্য-প্রান্তরে লবটুলিয়ার মাঠে মাঠে দুধলি ঘাসের ফুল ফুটাইয়া জানাইয়া দেয় যে বসন্ত পড়িয়াছে। সে ফুলও বড় সুন্দর, দেখিতে নক্ষত্রের মত আকৃতি, রং হলদে, লম্বা লম্বা সরু লতার মত ঘাসের ডাঁটাটা অনেকখানি জমি জুড়িয়া মাটি আঁকড়াইয়া থাকে, নক্ষত্রাকৃতি হলদে ফুল ধরে তার গাঁটে গাঁটে। ভোরে মাঠ, পথের ধার সর্বত্র আলো করিয়া ফুটিয়া থাকিত—কিন্তু সূর্যের তেজ বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সব ফুল কুঁক্ড়াইয়া পুনরায় কুঁড়ির আকার ধারণ করিত—পরদিন সকালে আবার সেই কুঁড়িগুলিই দেখিতাম ফুটিয়া আছে।

রক্তপলাশের বাহার আছে মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টে ও আমাদের সীমানার বাহিরের জঙ্গলে কিংবা মহালিখারূপের শৈলসানুপ্রদেশে। আমাদের মহাল হইতে সে-সব স্থান অনেক দূরে, ঘোড়ায় তিন-চার ঘণ্টা লাগে। সে-সব জায়গায় চৈত্রে শালমঞ্জরীর সুবাসে বাতাস মাতাইয়া রাখে, শিমুলবনে দিগন্তরেখা রাঙাইয়া দেয়, কিন্তু কোকিল, দোয়েল, বৌ-কথা-কও প্রভৃতি গায়ক পাখীরা ডাকে না, এ-সব জনহীন অরণ্য-প্রান্তরের যে ছন্নছাড়া রূপ, বোধহয় তাহারা তাহা পছন্দ করে না।

এক-এক দিন বাংলা দেশে ফিরিবার জন্য মন হাঁপাইয়া উঠিত, বাংলা দেশের পল্লীর সে সুমধুর বসন্ত কল্পনায় দেখিতাম, মনে পড়িত বাঁধানো পুকুরঘাটে স্নানান্তে আর্দ্রবস্ত্রে গমনরতা কোন তরুণী বধূর ছবি, মাঠের ধারে ফুলফোটা ঘেঁটুবন, বাতাবিলেবু ফুলের সুগন্ধে মোহময় ঘনছায়া ভরা অপরাহ্ণ। দেশকে কী ভাল করিয়াই চিনিলাম বিদেশে গিয়া! দেশের জন্য এই মনোবেদনা দেশে থাকিতে কখনও অনুভব করি নাই, জীবনে এ একটা বড় অনুভূতি, যে ইহার আস্বাদ না পাইল, সে হতভাগ্য একটা শ্রেষ্ঠ অনুভূতির সহিত অপরিচিত রহিয়া গেল।

কিন্তু যে-কথাটা বার বার নানা ভাবে বলিবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কোনো বারই ঠিকমত বুঝাইতে পারিতেছি না, সেটা হইতেছে এই প্রকৃতির একটা রহস্যময় অসীমতার, দুরধিগম্যতার, বিরাটত্বের ও ভয়াল গা-ছম-ছম-করানো সৌন্দর্যের দিকটা। না দেখিলে কি করিয়া বুঝাইব সে কী জিনিস!

জনশূন্য বিশাল লবটুলিয়া বইহারের দিগন্তব্যাপী দীর্ঘ বনঝাউ ও কাশের বনে নিস্তব্ধ অপরাহ্ণে একা ঘোড়ার উপর বসিয়া এখানকার প্রকৃতির এই রূপ আমার সারা মনকে অসীম রহস্যানুভূতিতে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে, কখনও তাহা আসিয়াছে ভয়ের রূপে, কখনও আসিয়াছে একটা নিস্পৃহ, উদাস, গম্ভীর মনোভাবের রূপে, কখনও আসিয়াছে কত মধুময় স্বপ্ন, দেশ-বিদেশের নর-নারীর বেদনার রূপে। সে যেন খুব উচ্চদরের নীরব সঙ্গীত—নক্ষত্রের ক্ষীণ আলোর তালে, জ্যোৎস্নারাত্রের অবাস্তবতায়, ঝিল্লীর তানে, ধাবমান উল্কার অগ্নিপুচ্ছের জ্যোতিতে তার লয়-সঙ্গতি।

সে রূপ তাহার না দেখাই ভাল, যাহাকে ঘরদুয়ার বাঁধিয়া সংসার করিতে হইবে। প্রকৃতির সে মোহিনীরূপের মায়া মানুষকে ঘরছাড়া করে, উদাসীন ছন্নছাড়া ভবঘুরে হ্যারি জন্স্টন্, মার্কো পোলো, হাডসন, শ্যাকল্টন করিয়া তোলে—গৃহস্থ সাজিয়া ঘরকন্না করিতে দেয় না—অসম্ভব তাহার পক্ষে ঘরকন্না করা একবার সে-ডাক যে শুনিয়াছে, সে অনবগুণ্ঠিতা মোহিনীকে একবার যে প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

গভীর রাত্রে ঘরের বাহিরে একা আসিয়া দাঁড়াইয়া দেখিয়াছি, অন্ধকার প্রান্তরের অথবা ছায়াহীন ধূ-ধূ জ্যোৎস্না-ভরা রাত্রির রূপ। তার সৌন্দর্যে পাগল হইতে হয়—একটুও বাড়াইয়া বলিতেছি না—আমার মনে হয় দুর্বলচিত্ত মানুষ যাহারা, তাহাদের পক্ষে সে-রূপ না দেখাই ভাল, সর্বনাশী রূপ সে, সকলের পক্ষে তার টাল সামলানো বড় কঠিন।

তবে একথাও ঠিক, প্রকৃতিকে সে-রূপে দেখাও ভাগ্যের ব্যাপার। এমন বিজন বিশাল উন্মুক্ত আরণ্য-প্রান্তর, শৈলমালা, বনঝাউ আর কাশের বন কোথায় যেখানে-সেখানে? তার সঙ্গে যোগ চাই গভীর নিশীথিনীর নীরবতার ও তার অন্ধকার বা জ্যোৎস্নার—এত যোগাযোগ সুলভ হইলে পৃথিবীতে কবি আর পাগলে দেশ ছাইয়া যাইত না?

একদিন প্রকৃতির সে-রূপ কিভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, সে ঘটনা বলি।

পূর্ণিয়া হইতে উকিলের 'তার' পাইলাম পরদিন সকাল দশটার মধ্যে আমায় সেখানে হাজির হইতে হইবে। অন্যথায় স্টেটের একটা বড় মোকদ্দমায় আমাদের হার সুনিশ্চিত।

আমাদের মহাল হইতে পূর্ণিয়া পঞ্চান্ন মাইল দূরে। রাত্রের ট্রেন মাত্র একখানি, যখন 'তার' হস্তগত হইল তখন সতের মাইল দূরবর্তী কাটারিয়া স্টেশনে গিয়া সে-ট্রেন ধরা অসম্ভব।

ঠিক হইল এখনই ঘোড়ায় রওনা হইতে হইবে।

কিন্তু পথ সুদীর্ঘ বটে, বিপদসঙ্কুলও বটে, বিশেষ করিয়া এই রাত্রিকালে, এই আরণ্য-অঞ্চলে। সুতরাং তহশিলদার সুজন সিং আমার সঙ্গে যাইবে ইহাও ঠিক হইল।

সন্ধ্যায় দুজনে ঘোড়া ছাড়িলাম। কাছারি ছাড়িয়া জঙ্গলে পড়িতেই কিছু পরে কৃষ্ণা তৃতীয়ার চাঁদ উঠিল। অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় বন-প্রান্তর আরও অদ্ভুত দেখাইতেছে। পাশাপাশি দু'জনে চলিয়াছি—আমি আর সুজন সিং। পথ কখনও উঁচু, কখনও নিচু, সাদা বালির উপর জ্যোৎস্না পড়িয়া চক্‌চক্ করিতেছে। ঝোপঝাপ মাঝে মাঝে, আর শুধু কাশ আর ঝাউবন চলিয়াছে, সুজন সিং গল্প করিতেছে। জ্যোৎস্না ক্রমেই ফুটিতেছে—বনজঙ্গল, বালুচর ক্রমশ স্পষ্টতর হইতেছে। বহুদূর পর্যন্ত নিচু জঙ্গলের শীর্ষদেশ একটানা সরল রেখায় চলিয়া গিয়াছে—যতদূর দৃষ্টি যায় ধূ-ধূ প্রান্তর একদিকে, অন্যদিকে জঙ্গল। বাঁদিকে দূরে অনুচ্চ শৈলমালা। নির্জন; নীরব, মানুষের বসতি কুত্রাপি নাই, সাড়া নাই, শব্দ নাই, যেন অন্য কোন অজানা গ্রহের মধ্যে নির্জন বনপথে দুটি মাত্র প্রাণী আমরা।

এক জায়গায় সুজন সিং ঘোড়া থামাইল। ব্যাপার কি? পাশের জঙ্গল হইতে একটি ধাড়ি বন্যশূকর একদল ছানাপোনা লইয়া আমাদের পথ পার হইয়া বাঁদিকের জঙ্গলে ঢুকিতেছে। সুজন সিং বলিল—তবুও ভাল হুজুর, ভেবেছিলাম বুনো মহিষ। মোহনপুরা জঙ্গলের কাছে আসিয়া পড়িয়াছি, বুনো মহিষের ভয় এখানে খুব। সেদিনও একজন লোক মারিয়াছে মহিষে।

আরও কিছুদূর গিয়া জ্যোৎস্নায় দূর হইতে কালোমত সত্যই কি একটা দেখা গেল।

সুজন বলিল—ঘোড়া ভয় পাবে হুজুর, ঘোড়া রুখুন।

শেষে দেখা গেল সেটা নড়েও না চড়েও না। একটু একটু করিয়া কাছে গিয়া দেখা গেল, সেটা একটা কাশের খুপরি। আবার ঘোড়া ছুটাইয়া দিলাম। মাঠ-ঘাট-বন, ধূ-ধূ জ্যোৎস্নাভরা বিশ্ব—কি একটা সঙ্গীহারা পাখী আকাশের গায়ে কি বনের মধ্যে কোথায় ডাকিতেছে টি-টি-টি-টি—ঘোড়ার খুরে বড় বালি উঠিতেছে, ঘোড়া এক মুহূর্ত থামাইবার উপায় নাই—উড়াও, উড়াও—

অনেকক্ষণ একভাবে বসিয়া পিঠ টন টন করিতেছে, জিনের বসিবার জায়গাটা গরম হইয়া উঠিয়াছে, ঘোড়া ছাড়তোক ভাঙিয়া দুলকি চাল ধরিয়াছে, আমার ঘোড়াটা আবার বড্ড ভয় পায়, এজন্য সতর্কতার সঙ্গে সামনের পথে অনেক দূর পর্যন্ত নজর রাখিয়া চলিয়াছি—হঠাৎ থমকিয়া ঘোড়া দাঁড়াইয়া গেলে ঘোড়া হইতে ছিটকাইয়া পড়া অনিবার্য।

কাশের মাথায় ঝুঁটি বাঁধিয়া জঙ্গলে পথ ঠিক করিয়া রাখিয়াছে, রাস্তা বলিয়া কিছু নাই, সেই কাশের ঝুঁটি দেখিয়া এই গভীর জঙ্গলে পথ ঠিক করিয়া লইতে হয়। একবার সুজন সিং বলিল—হুজুর, এ-পথটা যেন নয়, পথ ভুলেছি আমরা।

আমি সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখিয়া ধ্রুবতারা ঠিক করিলাম—পূর্ণিয়া আমাদের মহাল হইতে খাড়া উত্তরে, তবে ঠিকই আছি, সুজনকে বুঝাইয়া বলিলাম।

সুজন বলিল—না হুজুর, কুশীনদীর খেয়া পেরুতে হবে যে, খেয়া পার হয়ে তবে সোজা উত্তরে যেতে হবে। এখন উত্তর-পূর্ব কোণ কেটে বেরুতে হবে।

অবশেষে পথ মিলিল।

জ্যোৎস্না আরও ফুটিয়াছে—সে কি জ্যোৎস্না! কি রূপ রাত্রির! নির্জন বালুর চরে, দীর্ঘ বনঝাউয়ের জঙ্গলের পাশের পথে জ্যোৎস্না যাহারা কখনও দেখে নাই, তাহারা বুঝিবে না এ জ্যোৎস্নার কি চেহারা! এমন উন্মুক্ত আকাশতলে ছায়াহীন উদাস গভীর জ্যোৎস্নাভরা রাত্রিতে, বন-পাহাড়-প্রান্তরের পথের জ্যোৎস্না, বালুচরের জ্যোৎস্না—ক'জন দেখিয়াছে? উঃ, সে কি ছুট! পাশাপাশি চলিতে চলিতে দুই ঘোড়াই হাঁপাইতেছে, শীতেও ঘাম দেখা দিয়াছে আমাদের গায়ে।

এক জায়গায় বনের মধ্যে একটা শিমূলগাছের তলায় আমরা ঘোড়া থামাইয়া একটু বিশ্রাম করি, সামান্য মিনিট-দশেক। একটা ছোট নদী বহিয়া গিয়া অদূরে কুশীনদীর সঙ্গে মিশিয়াছে, শিমুলগাছটাতে ফুল ফুটিয়াছে, বনটা সেখানে চারিধার হইতে আসিয়া আমাদের এমন ঘিরিয়াছে যে, পথের চিহ্নমাত্র নাই, অথচ খাটো খাটো গাছপালার বন—শিমুলগাছটাই সেখানে খুব উঁচু—বনের মধ্যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দুজনেরই জল-পিপাসা পাইয়াছে দারুণ।

জ্যোৎস্না ম্লান হইয়া আসে। অন্ধকার বনপথ, পশ্চিম দিগন্তের দূর শৈলমালার পিছনে শেষরাত্রির চন্দ্র ঢলিয়া পড়িয়াছে। ছায়া দীর্ঘ হইয়া আসিল, পাখী-পাখালির শব্দ নাই কোন দিকে, শুধু ছায়া-ছায়া, অন্ধকার মাঠ, অন্ধকার বন। শেষরাত্রির বাতাস বেশ ঠাণ্ডা হইয়া উঠিল। ঘড়িতে রাত প্রায় চারটা। ভয় হয়, শেষরাত্রের অন্ধকার বুনো হাতির দল সামনে না আসে! মধুবনীর জঙ্গলে একপাল বুনো হাতিও আছে।

এবার আশে-পাশে ছোট ছোট পাহাড়, তার মধ্য দিয়া পথ, পাহাড়ের মাথায় নিষ্পত্র শুভ্রকাণ্ড গোলগোলি ফুলের গাছ, কোথাও রক্তপলাশের বন। শেষরাত্রের চাঁদ-ডোবা অন্ধকারে বন-পাহাড় অদ্ভুত দেখায়। পূর্ব দিকে ফর্সা হইয়া আসিল—ভোরের হাওয়া বহিতেছে, পাখীর ডাক কানে গেল। ঘোড়ার সর্বাঙ্গ দিয়া দর-দর-ধারে ঘাম ছুটিতেছে, ছুট্ ছুট্, খুব ভাল ঘোড়া তাই এই পথে সমানে এত ছুটিতে পারে। সন্ধ্যায় কাছারি ছাড়িয়াছি—আর ভোর হইয়া গেল। সম্মুখে এখনও যেন পথের শেষ নাই, সেই একঘেয়ে বন, পাহাড়।

সামনের পাহাড়ের পিছন থেকে টকটকে লাল সিঁদুরের গোলার মত সূর্য উঠিতেছে। পথের ধারে এক গ্রামে ঘোড়া থামাইয়া কিছু দুধ কিনিয়া দুজনে খাইলাম। পরে আরো ঘণ্টা-দুই চলিয়াই পূর্ণিয়া শহর।

পূর্ণিয়ায় স্টেটের কাজ তো শেষ করিলাম, সে যেন নিতান্ত অন্যমনস্কতার সহিত, মন পড়িয়া রহিল পথের দিকে। আমার সঙ্গীর ইচ্ছা, কাজ শেষ করিয়াই বাহির হইয়া পড়ে—আমি তাহাকে বাধা দিলাম, জ্যোৎস্না-রাত্রে এতটা পথ অশ্বারোহণে যাইবার বিচিত্র সৌন্দর্যের পুনরাস্বাদনের লোভে।

গেলামও তাই। পরদিন চাঁদ একটু দেরিতে উঠিলেও ভোর পর্যন্ত জ্যোৎস্না পাওয়া গেল। আর কী সে জ্যোৎস্না! কৃষ্ণপক্ষের স্তিমিতালোক চন্দ্রের জ্যোৎস্না বনে-পাহাড়ে যেন এক শান্ত, স্নিগ্ধ, অথচ এক আশ্চর্য রূপে অপরিচিত স্বপ্নজগতের রচনা করিয়াছে—সেই খাটো খাটো কাশ-জঙ্গল, সেই পাহাড়ের সানুদেশে পীতবর্ণ গোলগোলি ফুল, সেই উঁচু-নিচু পথ—সব মিলিয়া যেন কোন্ বহুদূরের নক্ষত্রলোক—মৃত্যুর পরে অজানা কোন্ অদৃশ্য লোকে অশরীরী হইয়া উড়িয়া চলিয়াছি—ভগবান বুদ্ধের সেই নির্বাণলোকে, যেখানে চন্দ্রের উদয় হয় না, অথচ অন্ধকারও নাই।

অনেক দিন পরে যখন এই মুক্ত জীবন ত্যাগ করিয়া সংসারে প্রবেশ করি, তখন কলিকাতা শহরের ক্ষুদ্র গলির বাসাবাড়িতে বসিয়া স্ত্রীর সেলাইয়ের কল চালনার শব্দ শুনিতে শুনিতে অবসর-দিনের দুপুরে কতবার এই রাত্রির কথা, এই অপূর্ব আনন্দের কথা, এই জ্যোৎস্নামাখা রহস্যময় বনশ্রীর কথা, শেষরাত্রের চাঁদডোবা অন্ধকারে পাহাড়ের উপর শুভ্রকাণ্ড গোলগোলি গাছের কথা, শুক্নো কাশ-জঙ্গলের সোঁদা সোঁদা তাজা গন্ধের কথা ভাবিয়াছি—কতবার কল্পনায় আবার ঘোড়ায় চড়িয়া জ্যোৎস্নারাত্রে পূর্ণিয়া গিয়াছি।

২

চৈত্রমাসের মাঝামাঝি একদিন খবর পাইলাম সীতাপুর গ্রামে রাখালবাবু নামে একজন বাঙালী ডাক্তার ছিলেন, তিনি কাল রাত্রে হঠাৎ মারা গিয়াছেন।

ইঁহার নাম পূর্বে কখনও শুনি নাই। তিনি যে ওখানে ছিলেন, তাহা জানিতাম না। শুনিলাম আজ বিশ-বাইশ বৎসর তিনি সেখানে ছিলেন। ও-অঞ্চলে তাঁহার পসার ছিল, ঘর-বাড়িও নাকি করিয়াছিলেন ঐ গ্রামেই। তাঁহার স্ত্রী-পুত্র সেখানেই থাকে।

এই অবাঙালীর দেশে একজন বাঙালী ভদ্রলোক মারা গিয়াছেন হঠাৎ, তাঁহার স্ত্রী-পুত্রের কি দশা হইতেছে, কে তাঁহাদের দেখাশুনা করিতেছে, তাঁহার সৎকার বা শ্রাদ্ধশান্তির কি ব্যবস্থা হইতেছে, এসব জানিবার জন্য মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। ভাবিলাম আমার প্রথম কর্তব্য হইতেছে সেখানে গিয়া সেই শোকসন্তপ্ত পরিবারের খোঁজখবর লওয়া।

খবর লইয়া জানিলাম গ্রামটি এখান হইতে মাইল-কুড়ি দূরে, কড়ারী খাসমহালের সীমানায়। বৈকালের দিকে সেখানে গিয়া পৌঁছিলাম। লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া রাখালবাবুর বাড়ি খুঁজিয়া বাহির করিলাম। দুখানা বড় বড় খোলার ঘর, খান-তিনেক ছোট ছোট ঘর। বাহিরে এ-দেশের ধরনে একখানা বসিবার ঘর, তার তিন দিকে দেওয়াল নাই। বাঙালীর বাড়ি বলিয়া চিনিবার কোনও উপায় নাই, বসিবার ঘরে দড়ির চারপাই হইতে উঠানের হনুমান-ধ্বজাটি পর্যন্ত সব এদেশী।

আমার ডাকে একটি বারো-তেরো বছরের ছেলে বাহির হইয়া আসিল। আমায় ঠেট্ হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিল—কাকে খুঁজছেন?

তাহার চেহারা দেখিয়া মনে হয় না যে সে বাঙালীর ছেলে। মাথায় লম্বা টিকি, গলায় অবশ্য বর্তমানে কাচা—সবই বুঝিলাম, কিন্তু মুখের ভাব পর্যন্ত হিন্দুস্থানী বালকের মত কি করিয়া হয়?

আমার পরিচয় দিয়া বলিলাম—তোমাদের বাড়িতে এখন বড় লোক কে আছেন, তাঁকে ডাক।

ছেলেটি বলল, সে-ই বড় ছেলে। তার আর দুটি ছোট ছোট ভাই আছে। বাড়িতে আর কোন অভিভাবক নাই।

বলিলাম—তোমার মায়ের সঙ্গে আমি একবার কথা কইতে চাই। জিজ্ঞেস করে এস।

খানিকটা পরে ছেলেটি আসিয়া আমায় বাড়ির মধ্যে লইয়া গেল। রাখালবাবুর স্ত্রীকে দেখিয়া মনে হইল বয়স অল্প, ত্রিশের মধ্যে, সদ্য-বিধবার বেশ, কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু ফুলিয়াছে। ঘরের আসবাবপত্র নিতান্ত দরিদ্রের গৃহস্থালির মত। একদিকে একটা ছোট গোলা, ঘরের দাওয়ায় খান-দুই চারপাই, ছেঁড়া লেপ-কাঁথা, এদেশী পিতলের ঘয়লা, একটা গুড়গুড়ি, পুরনো টিনের তোরঙ্গ। বলিলাম—আমি বাঙালী, আপনার প্রতিবেশী। আমার কানে গেল রাখালবাবুর কথা, তাই এলাম। আমার এখানে একটা কর্তব্য আছে বলে মনে করি। আমার কোনো সাহায্য যদি দরকার হয়, নিঃসংকোচে বলুন। রাখালবাবুর স্ত্রী কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন। আমি বুঝাইয়া শান্ত করিয়া পুনরায় আমার আসিবার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলাম। রাখালবাবুর স্ত্রী এবার আমার সামনে বাহির হইলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে

বলিলেন—আপনি আমার দাদার মত, আমাদের এই ঘোর বিপদের সময় ভগবান আপনাকে পাঠিয়েছেন।

ক্রমে কথায় কথায় জানা গেল, এই বাঙালী পরিবার সম্পূর্ণ নিঃস্ব ও অসহায় এই ঘোর বিদেশে। রাখালবাবু গত এক বৎসরের উপর শয্যাগত ছিলেন। তাঁর চিকিৎসার ও সংসার-খরচে সঞ্চিত অর্থ সব নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে—এখন এমন উপায় নাই যে তাঁর শ্রাদ্ধের যোগাড় হয়।

জিজ্ঞাসা করিলাম—আচ্ছা, রাখালবাবু তো অনেকদিন ধরে এ অঞ্চলে আছেন, কিছু করতে পারেন নি?

রাখালবাবুর স্ত্রীর সংকোচ ও লজ্জা অনেকটা দূর হইয়াছিল। তিনি যেন এই প্রবাসে, এই দুর্দিনে একজন বাঙালীর মুখ দেখিয়া অকূলে কূল পাইয়াছেন, মুখের ভাবে মনে হইল।

বলিলেন—আগে কি রোজগার করতেন জানি নে। আমার বিয়ে হয়েছে এই পনের বছর—আমার সতীন মারা যেতে আমায় বিয়ে করেন। আমি এসে পর্যন্ত দেখছি কোন রকমে সংসার চলে। এখানে ভিজিটের টাকা বড় একটা কেউ দেয় না, গম দেয়, মকাই দেয়। গত বছর মাঘ মাসে উনি অসুখে পড়লেন, সেই থেকে আর একটি পয়সা ছিল না। তবে এদেশের লোক খারাপ নয়, যার কাছে যা পাওনা ছিল, বাড়ি বয়ে সে-সব গম মকাই কলাই দিয়ে গিয়েছে। তাই চলেছে, নয়ত না খেয়ে মরত সবাই।

—আপনার বাপের বাড়ি কোথায়? সেখানে খবর দেওয়া হয়েছে?

রাখালবাবুর স্ত্রী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—খবর দেবার কিছু নেই। আমার বাপের বাড়ি কখনও দেখি নি। শুনেছিলুম ছিল মুর্শিদাবাদ জেলায়। ছেলেবেলা থেকে আমি সাহেবগঞ্জে ভগ্নীপতির বাড়িতে মানুষ। মা-বাবা কেউ ছিলেন না। আমার সে-দিদি আমার বিয়ের পর মারা যান। ভগ্নীপতি আবার বিয়ে করেছেন। তাঁর সঙ্গে আর আমার সম্পর্ক কি?

—রাখালবাবুর কোন আত্মীয়স্বজন কোথাও নেই?

—দেশে জ্ঞাতি ভাইয়েরা আছে শুনতাম বটে, কিন্তু তারা কখনও সংবাদ নেয় নি, উনিও দেশে যাতায়াত করতেন না। তাদের সঙ্গে সদ্ভাবও নেই, তাদের খবর দেওয়া-না-দেওয়া সমান। এক মামাশ্বশুর আছেন আমার শুনতাম, কাশীতে। তা-ও তাঁর ঠিকানা জানিনে।

ভয়ানক অসহায় অবস্থা। আপনার জন কেহ নাই, এই বন্ধুহীন বিদেশে দুই-তিনটি নাবালক ছেলে লইয়া সহায়সম্পদশূন্য বিধবা মহিলাটির দশা ভাবিয়া মন রীতিমত দমিয়া গেল। তখনকার মত যাহা করা উচিত করিয়া আমি কাছারিতে ফিরিয়া আসিলাম, সদরে লিখিয়া স্টেট্ হইতে আপাতত এক শত টাকা সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়া রাখালবাবুর শ্রাদ্ধও কোনরকমে শেষ করিয়া দিলাম।

ইহার পর আরও বারকয়েক রাখালবাবুর বাড়িতে গিয়াছি। স্টেট্ হইতে মাসে দশটি টাকা সাহায্য মঞ্জুর করাইয়া লইয়া প্রথমবারের টাকাটা নিজেই দিতে গিয়াছিলাম। দিদি খুব যত্ন করিতেন, অনেক স্নেহ-আত্মীয়তার কথা বলিতেন। সেই বিদেশে তাঁর স্নেহ-যত্ন আমার বড় ভাল লাগিত। তারই লোভে অবসর পাইলেই সেখানে যাইতাম।

৩

লবটুলিয়ার উত্তর প্রান্ত খুব বড় একটা হ্রদের মত। এরকম জলাশয়কে এদেশে বলে কুণ্ডী। এই হ্রদটার নাম সরস্বতী কুণ্ডী।

সরস্বতী কুণ্ডীর পাড়ের তিনদিকে নিবিড় বন। এ ধরনের বন আমাদের মহালে বা লবটুলিয়াতে নাই। এ বনে বড় বড় বনস্পতিদের নিবিড় সমাবেশ—জলের সান্নিধ্য বশতই হোক বা যে-জন্যই হোক, বনের তলদেশে নানা বিচিত্র লতাপাতা, বন্যপুষ্পের ভিড়। এই বন বিশাল সরস্বতী কুণ্ডীর নীল জলকে তিনদিকে অর্ধচন্দ্রাকারে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, একদিকে ফাঁকা—সেখান হইতে পূর্বদিকে বহুদূর-প্রসারিত নীল আকাশ ও দূরের শৈলমালা চোখে পড়ে। সুতরাং পূর্ব-পশ্চিম কোণের তীরের কোন এক জায়গায় বসিয়া দক্ষিণ ও বাম দিকে চাহিয়া দেখিলে সরস্বতী কুণ্ডীর সৌন্দর্যের অপূর্বতা ঠিক বোঝা যায়। বামে চাহিলে গভীর হইতে গভীরতর বনের মধ্যে দৃষ্টি চলিয়া গিয়া ঘন নিবিড় শ্যামলতার মধ্যে নিজেকে নিজে হারাইয়া ফেলি, দক্ষিণে চাহিলে স্বচ্ছ নীল জলের ওপারে সুদূরবিসর্পী আকাশ ও অস্পষ্ট শৈলমালার ছবি মনকে বেলুনের মত ফুলাইয়া পৃথিবীর মাটি হইতে উড়াইয়া লইয়া চলে।

এখানে একখানা শিলাখণ্ডের উপর কতদিন গিয়া একা বসিয়া থাকিতাম। কখনও বনের মধ্যে দুপুরবেলা আপন মনে বেড়াইতাম। কত বড় বড় গাছের ছায়ায় বসিয়া পাখীর কূজন শুনিতাম। মাঝে মাঝে গাছপালা, বন্যলতার ফুল সংগ্রহ করিতাম। এখানে যত রকমের পাখীর ডাক শোনা যায়, আমাদের মহালে অত পাখী নাই। নানা রকমের বন্য ফল খাইতে পায় বলিয়া এবং সম্ভবত উচ্চ বনস্পতিশিরে বাসা বাঁধিবার সুযোগ ঘটে বলিয়া সরস্বতী কুণ্ডীর তীরের বনে পাখীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। বনে ফুলও অনেক রকমের ফোটে।

হ্রদের তীরের নিবিড় বন প্রায় তিন মাইলের উপর লম্বা, গভীরতায় প্রায় দেড় মাইল। জলের ধার দিয়া বনের মধ্যে গাছপালার ছায়ায় ছায়ায় একটা সুঁড়িপথ বনের শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত আসিয়াছে—এই পথ ধরিয়া বেড়াইতাম। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে সরস্বতীর নীল জল, তার উপর উপুড়-হইয়া-পড়া দূরের আকাশটা এবং দিগন্তলীন শৈলশ্রেণী চোখে পড়িত। ঝির্‌ঝির্ করিয়া স্নিগ্ধ হাওয়া বহিত, পাখী গান গাহিত, বন্য ফুলের সুগন্ধ পাওয়া যাইত।

একদিন একটা গাছের ডালে উঠিয়া বসিলাম। সে-আনন্দের তুলনা হয় না। আমার মাথার উপরে বিশাল বনস্পতিদলের ঘন সবুজ পাতার রাশি, তার ফাঁকে ফাঁকে নীল আকাশের টুক্‌রা, প্রকাণ্ড একটা লতায় থোকা থোকা ফুল দুলিতেছে। পায়ের দিকে অনেক নীচে ভিজা মাটিতে বড় বড় ব্যাঙের ছাতা গজাইয়াছে। এখানে আসিয়া বসিয়া শুধু ভাবিতে ইচ্ছা হয়। কত ধরনের কত নব অনুভূতি মনে আসিয়া জোটে। এক প্রকার অতল-সমাহিত অতিমানস চেতনা ধীরে ধীরে গভীর অন্তস্তল হইতে বাহিরের মনে ফুটিয়া উঠিতে থাকে। এ আসে গভীর আনন্দের মূর্তি ধরিয়া। প্রত্যেক বৃক্ষলতার হৃৎস্পন্দন যেন নিজের বুকের রক্তের শান্ত স্পন্দনের মধ্যে অনুভব করা যায়।

আমাদের যেখানে মহাল, সেখানে পাখীর এত বৈচিত্র্য নাই। সেখানটা যেন অন্য জগৎ, তার গাছপালা জীবজন্তু অন্য ধরনের। পরিচিত জগতে বসন্ত যখন দেখা দিয়াছে, লবটুলিয়ায় তখন একটা কোকিলের ডাক নাই, একটা পরিচিত বসন্তের ফুল নাই। সে যেন রুক্ষ কর্কশ

ভৈরবী মূর্তি ; সৌম্য সুন্দর বটে, কিন্তু মাধুর্যহীন—মনকে অভিভূত করে ইহার বিশালতায়, রুক্ষতায়। কোমল বর্জিত খাড়ব সুর, মালকোষ কিংবা চৌতালের ধ্রুপদ, মিষ্টত্বের কোন পর্দার ধারা মাড়াইয়া চলে না—সুরের গম্ভীর উদাত্ত রূপে মনকে অন্য এক স্তরে লইয়া পৌঁছাইয়া দেয়।

সরস্বতী কুণ্ডী সেখানে ঠুংরী, সুমিষ্ট সুরের মধুর ও কোমল বিলাসিতায় মনকে আর্দ্র ও স্বপ্নময় করিয়া তোলে। স্তব্ধ দুপুরে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে এখানে তীর-তরুর ছায়ায় বসিয়া পাখীর কূজন শুনিতে শুনিতে মন কত দূরে কোথায় চলিয়া যাইত, বন্য নিমগাছের সুগন্ধি নিমফুলের সুবাস ছড়াইত বাতাসে, জলে জলজ লিলির দল ফুটিত। কতক্ষণ বসিয়া থাকিয়া সন্ধ্যার পর সেখান হইতে উঠিয়া আসিতাম।

নাঢ়া বইহার জরীপ হইতেছে প্রজাদের মধ্যে বিলির জন্য, আমীনদের কাজ দেখাইবার জন্য প্রায়ই সেখানে যাইতে হয়। ফিরিবার পথে মাইল দুই পূর্ব-দক্ষিণ দিকে একটু ঘুরিয়া যাই, শুধু সরস্বতী কুণ্ডীর এই বনভূমিতে ঢুকিয়া বনের ছায়ায় খানিকটা বেড়াইবার লোভে।

সেদিন ফিরিতেছিলাম বেলা তিনটার সময়। খর রৌদ্রে বিস্তীর্ণ রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তর পার হইয়া ঘর্মাক্ত কলেবরে বনের মধ্যে ঢুকিয়া ঘন ছায়ায় ছায়ায় জলের ধার পর্যন্ত গেলাম—প্রান্তরসীমা হইতে জলের কিনারা প্রায় দেড় মাইলের কম নয়, কোন কোন স্থানে আরও বেশি। একটা গাছের ডালে ঘোড়া বাঁধিয়া নিবিড় ঝোপের তলায় একখানা অয়েলক্লথ পাতিয়া একেবারে শুইয়া পড়িলাম। ঘন ঝোপের ডালপালা চারিধার হইতে এমন ভাবে আমায় ঢাকিয়াছে যে বাহির হইতে আমায় কেউ দেখিতে পাইবে না। হাত-দুই উপরেই গাছপালা, মোটা মোটা কাঠের মত শক্ত গুঁড়িওয়ালা কি একপ্রকার বন্যলতা জড়াজড়ি করিয়া ছাদ রচনা করিয়াছে—একটা কি গাছ হইতে হাতখানেক লম্বা বড় বড় বনসিমের মত সবুজ সবুজ ফল আমার প্রায় বুকের কাছে দুলিতেছে। আর একটা কি গাছ, তার ডালপালা প্রায় অর্ধেক ঝোপটা জুড়িয়া, তাহাতে কুচো কুচো ফুল ধরিয়াছে, ফুলগুলি এত ছোট যে কাছে না গেলে চোখে পড়ে না—কিন্তু কি ঘন নিবিড় সুবাস সে-ফুলের! ঝোপের নিভৃত তল ভারাক্রান্ত সেই অজানা বনপুষ্পের সুবাসে।

পূর্বেই বলিয়াছি সরস্বতী কুণ্ডীর বন পাখীর আড্ডা। এত পাখীও আছে এখানকার বনে! কত ধরনের, কত রং-বেরঙের পাখী—শ্যামা, শালিক, হরটিট্, বনটিয়া, ফেজান্টক্রো, চড়াই, ছাতারে, ঘুঘু, হরিয়াল। উঁচু গাছের মাথায় বাজবৌরী, চিল, কুল্লো—সরস্বতীর নীল জলে বক, সিল্লী, রাঙাহাঁস, মানিকপাখী, ডাক প্রভৃতি জলচর পাখী—পাখীর কাকলীতে মুখর হইয়া উঠিয়াছে ঝোপের উপরটা, কি বিরক্তই করে তারা, তাদের উল্লাস-ভরা অবাক কূজনে কান পাতা দায়। অনেক সময় মানুষকে গ্রাহ্যই করে না, আমি শুইয়া আছি দেখিতেছে, আমার চারিপাশে হাত-দেড়-দুই দূরে তারা ঝুলন্ত ডালপালায়-লতায় বসিয়া কিচ্ কিচ্ করিতেছে—আমার প্রতি ভ্রূক্ষেপও নাই।

পাখীদের এই অসংকোচ সঞ্চরণ আমার বড় ভাল লাগিত। উঠিয়া বসিয়াও দেখিয়াছি তাহারা ভয় পায় না, একটু উড়িয়া গেল, কিন্তু একেবারে দেশছাড়া হইয়া পলায় না। খানিক পরে নাচিতে নাচিতে বকিতে বকিতে আবার অত্যন্ত কাছে আসিয়া পড়ে।

এখানেই একদিন প্রথম বন্য হরিণ দেখিলাম। জানিতাম বন্য হরিণ আমাদের মহালের জঙ্গলে আছে, কিন্তু এর আগে কখনও চোখে পড়ে নাই। শুইয়া আছি—হঠাৎ কিসের পায়ের শব্দে উঠিয়া বসিয়া মাথার শিয়রের দিকে চাহিয়া দেখি ঝোপের নিভৃততর দুর্গমতর অঞ্চলে

নিবিড় লতাপাতার জড়াজড়ির মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে একটা হরিণ। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখি, বড় হরিণ নয়, হরিণশাবক। সে আমায় দেখিতে পাইয়া অবোধবিস্ময়ে বড় বড় চোখে আমার দিকে চাহিয়া আছে—ভাবিতেছে, এ আবার কোন্ অদ্ভুত জীব!

খানিকক্ষণ কাটিয়া গেল, দুজনেই নির্বাক, নিস্পন্দ।

আধ মিনিট পরে হরিণ-শিশুটা যেন ভাল করিয়া দেখিবার জন্য আবার একটু আগাইয়া আসিল। তার চোখে ঠিক যেন মনুষ্যশিশুর মত সাগ্রহ কৌতূহলের দৃষ্টি। আরও কাছে আসিত কিনা জানি না, আমার ঘোড়াটা সে-সময় হঠাৎ পা নাড়িয়া গা-ঝাড়া দিয়া ওঠাতে হরিণশিশু চকিত ও সন্ত্রস্ত ভাবে ঝোপের মধ্য দিয়া দৌড়াইয়া তাহার মায়ের কাছে সংবাদটা দিতে গেল।

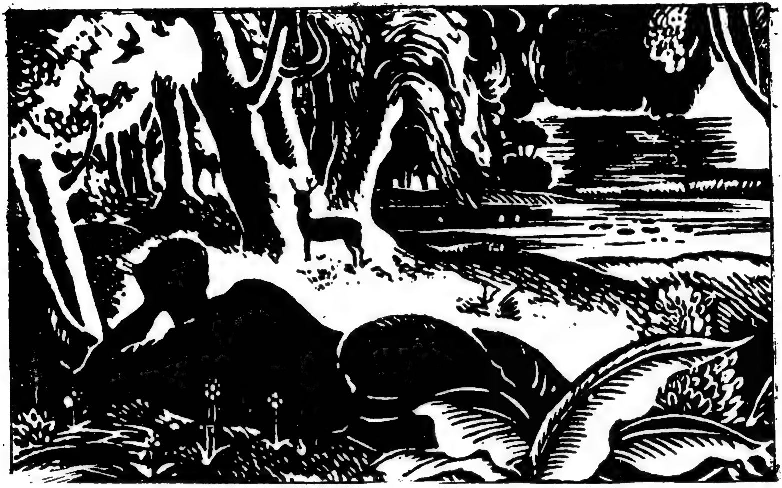

তারপর কতক্ষণ ঝোপের তলায় বসিয়া রহিলাম। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ে সরস্বতী কুণ্ডীর নীল জল অর্ধচন্দ্রাকারে দূর শৈলমালার পাদদেশ পর্যন্ত প্রসারিত, আকাশ নীল, মেঘের লেশ নাই কোন দিকে—কুণ্ডীর জলচর পাখীর দল ঝগড়া, কলরব, তুমুল দাঙ্গা শুরু করিয়াছে—একটা গম্ভীর ও প্রবীণ মানিকপাখী তীরবর্তী এক উচ্চ বনস্পতির শীর্ষে বসিয়া থাকিয়া থাকিয়া তাহার বিরক্তি জ্ঞাপন করিতেছে। জলের ধারে ধারে বড় বড় গাছের মাথায় বকের দল এমন ঝাঁক বাঁধিয়া আছে, দূর হইতে মনে হয় যেন সাদা সাদা থোকা থোকা ফুল ফুটিয়াছে।

রোদ ক্রমশ রাঙা হইয়া আসিল।

ওপারে শৈলচূড়ায় যেন তামার রং ধরিয়াছে। বকের দল ডানা মেলিয়া উড়িতে আরম্ভ করিল। গাছপালার মগডালে রোদ উঠিয়া গেল।

পাখীর কূজন বাড়িল, আর বাড়িল অজানা বনকুসুমের সেই সুঘ্রাণটা। অপরাহ্নের ছায়ায় গন্ধটা যেন আরও ঘন, আরও সুমিষ্ট হইয় উঠিয়াছে। একটা বেজি খানিকদূর হইতে মাথা উঁচু করিয়া আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতেছে।

কি নিভৃত শান্তি! কি অদ্ভুত নির্জনতা! এতক্ষণ তো এখানে আছি, সাড়ে তিন ঘণ্টার কম নয়—বন্য পাখীর কাকলী ছাড়া অন্য কোন শব্দ শুনি নাই, আর পাখীদের পায়ে পায়ে ডালপাতার মচ্‌মচানি, শুষ্কপত্র বা লতার টুকরা পতনের শব্দ। মানুষের চিহ্ন নাই কোন দিকে।

নানা বিচিত্র ও বিভিন্ন গড়ন বনস্পতিদের শীর্ষদেশের। এই সন্ধ্যার সময় রাঙা রোদ পড়িয়া তাদের শোভা হইয়াছে অদ্ভুত। তাদের কত গাছের মগডাল জড়াইয়া লতা উঠিয়াছে, এক ধরনের লতাকে এদেশে বলে ভিঁয়োরা লতা—আমি তাহার নাম দিয়াছি ভোম্‌রা লতা—সে লতা যে গাছের মাথায় উঠিবে, আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াইয়া ধরিয়া থাকে। এই সময় ভোম্‌রা লতায় ফুল ফোটে—ছোট ছোট বনজুঁইয়ের মত সাদা সাদা ফুলে কত বড় বড় গাছের মাথা আলো করিয়া রাখিয়াছে। অতি চমৎকার সুঘ্রাণ, অনেকটা যেন প্রস্ফুটিত সর্ষে ফুলের মত—তবে অতটা উগ্র নয়।

সরস্বতী কুণ্ডীর বনে কত বন্য শিউলি গাছ—শিউলি গাছের প্রাচুর্য এক এক জায়গায় এত বেশি, যেন মনে হয় শিউলির বন। বড় বড় শিলাখণ্ডের উপর শরতের প্রথমে সকালবেলা রাশি রাশি শিউলি ফুল ঝরিয়া পড়িয়াছিল—দীর্ঘ এক রকম কর্কশ ঘাস সেই সব পাথরের আশে-পাশে—বড় বড় ময়না-কাঁটার গাছ তার সঙ্গে জড়াইয়াছে—কাঁটা, ঘাস, শিলাখণ্ড সবতাতেই রাশি রাশি শিউলি ফুল—আর্দ্র ছায়াগহন স্থান, তাই সকালের ফুল এখনও শুকাইয়া যায় নাই।

সরস্বতী হ্রদকে কত রূপেই দেখিলাম! লোকে বলে সরস্বতী কুণ্ডীর জঙ্গলে বাঘ আছে, জ্যোৎস্না-রাত্রে সরস্বতীর বিস্তৃত জলরাশির কৌমুদীস্নাত শোভা দেখিবার লোভে রাসপূর্ণিমার দিন তহশিলদার বনোয়ারীলালের চোখে ধূলা দিয়া আজমাবাদের সদর কাছারি আসিবার ছুতায় লবটুলিয়া ডিহি কাছারি হইতে লুকাইয়া একা ঘোড়ায় এখানে আসিয়াছি।

বাঘ দেখি নাই বটে, কিন্তু সেদিন আমার সত্যই মনে হইয়াছিল এখানে মায়াবিনী বনদেবীরা গভীর রাত্রে জ্যোৎস্নাস্নাত হ্রদের জলে জলকেলি করিতে নামে। চারিধার নীরব নিস্তব্ধ—পূর্ব তীরের ঘন বনে কেবল শৃগালের ডাক শোনা যাইতেছিল—দূরের শৈলমালা ও বনশীর্ষ অস্পষ্ট দেখাইতেছে—জ্যোৎস্নার হিম বাতাসে গাছপালা ও ভোমরা লতার নৈশ-পুষ্পের মৃদু সুবাস...আমার সামনে বন ও পাহাড়ে বেষ্টিত নিস্তরঙ্গ বিস্তীর্ণ হ্রদের বুকে হৈমন্তী পূর্ণিমার থৈ থৈ জ্যোৎস্না...পরিপূর্ণ, ছায়াহীন, জলের উপর পড়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালায় প্রতিফলিত হওয়া অপার্থিব দেবলোকের জ্যোৎস্না... ভোমরা লতার সাদা-ফুলে-ছাওয়া বড় বড় বনস্পতিশীর্ষে জ্যোৎস্না পড়িয়া মনে হইতেছে গাছে গাছে পরীদের শুভ্র বস্ত্র উড়িতেছে...

আর এক ধরনের পোকা একঘেয়ে ডাকিতেছিল—ঝিঁঝিঁ পোকার মতই। দু-একটা পত্র পতনের শব্দ বা খস্ খস্ করিয়া শুষ্ক পত্ররাশির উপর দিয়া বন্য জন্তুর পলায়নের শব্দ....

বনদেবীরা আমরা থাকিতে তো আর আসে না। কত গভীর রাত্রে আসে কে জানে। আমি বেশি রাত পর্যন্ত হিম সহ্য করিতে পারি নাই। ঘণ্টাখানেক থাকিয়াই ফিরি।

সরস্বতী কুণ্ডীর এই পরীদের প্রবাদ এখানেই শুনিয়াছিলাম।

শ্রাবণ মাসে একদিন আমাকে উত্তর সীমানার জরীপের ক্যাম্পে রাত্রি যাপন করিতে হয়। আমার সঙ্গে ছিল আমীন রঘুবর প্রসাদ। সে আগে গবর্ণমেন্টের চাকুরি করিয়াছে, মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্ট ও এ-অঞ্চলের বনের সঙ্গে তার পঁচিশ ত্রিশ বছরের পরিচয়।

তাহার কাছে সরস্বতী কুণ্ডীর কথা তুলিতেই সে বলিল—হুজুর, ও মায়ার কুণ্ডী, ওখানে রাত্রে হুরী-পরীরা নামে ; জ্যোৎস্নারাত্রে তারা কাপড় খুলে রাখে ডাঙায় ঐসব পাথরের ওপর, রেখে জলে নামে। সে-সময় যে তাদের দেখতে পায়, তাকে ভুলিয়ে জলে নামিয়ে ডুবিয়ে মারে। জ্যোৎস্নার মধ্যে দেখা যায় মাঝে মাঝে পরীদের মুখ জলের উপরে পদ্মফুলের মত জেগে আছে। আমি দেখি নি কখনও, হেড সার্ভেয়ার ফতে সিং একদিন দেখেছিলেন। একদিন তারপর তিনি গভীর রাত্রে একা ওই হ্রদের ধারে বনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন সার্ভে-

তাঁবুতে—পরদিন সকালে তাঁর লাস কুণ্ডীর জলে ভাসতে দেখা যায়। বড় মাছে তাঁর একটা কান খেয়ে ফেলেছিল। হুজুর, ওখানে আপনি ও-রকম যাবেন না।

এই সরস্বতী কুণ্ডীর ধারে একদিন দুপুরে এক অদ্ভুত লোকের সন্ধান পাইলাম।

সার্ভে-ক্যাম্প হইতে ফিরিবার পথে একদিন হ্রদের তীরের বনপথ দিয়া আস্তে আস্তে আসিতেছি, বনের মধ্যে দেখি একটি লোক মাটি খুঁড়িয়া কি যেন করিতেছে। প্রথমে ভাবিলাম লোকটা ভুঁই-কুমড়া তুলিতে আসিয়াছে। ভুঁই-কুমড়া লতাজাতীয় উদ্ভিদ, মাটির মধ্যে লতার নীচে চালকুমড়ার আকারের প্রকাণ্ড কন্দ জন্মায়—উপর হইতে বোঝা যায় না। কবিরাজী ঔষধে লাগে বলিয়া বেশ দামে বিক্রয় হয়। কৌতূহলবশত ঘোড়া হইতে নামিয়া কাছে গেলাম, দেখি ভুঁই-কুমড়া নয়, কিছু নয়, লোকটা কিসের যেন বীজ পুঁতিয়া দিতেছে।

আমায় দেখিয়া সে থতমত খাইয়া অপ্রতিভ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিল। বয়স হইয়াছে, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। সঙ্গে একটা চটের থলে, তার ভিতর হইতে ছোট একখানা কোদালের আগাটুকু দেখা যাইতেছে, একটা শাবল পাশে পড়িয়া, ইতস্তত কতকগুলি কাগজের মোড়ক ছড়ানো।

বলিলাম—তুমি কে? এখানে কি করছ?

সে বলিল—হুজুর কি ম্যানেজারবাবু?

—হ্যাঁ। তুমি কে?

—নমস্কার। আমার নাম যুগলপ্রসাদ। আমি আপনাদের লবটুলিয়ার পাটোয়ারী বনোয়ারীলালের চাচাতো ভাই।

তখন আমার মনে পড়িল, বনোয়ারী পাটোয়ারী একবার কথায় কথায় তাহার চাচাতো ভাইয়ের কথা তুলিয়াছিল। উঠাইবার কারণ, আজমাবাদের সদর কাছারিতে—অর্থাৎ আমি যেখানে থাকি—সেখানে একজন মুহুরীর পদ খালি ছিল। বলিয়াছিলাম একটা ভাল লোক দেখিয়া দিতে। বনোয়ারী দুঃখ করিয়া বলিয়াছিল, লোক তো তাহার সাক্ষাৎ চাচাতো ভাই-ই ছিল, কিন্তু লোকটা অদ্ভুত মেজাজের, একরকম খামখেয়ালী উদাসীন ধরনের। নইলে কায়েথী হিন্দীতে অমন হস্তাক্ষর, অমন পড়ালেখার এলেম্ এ-অঞ্চলের বেশি লোকের নাই।

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কেন, সে কি করে?

বনোয়ারী বলিয়াছিল—তার নানা বাতিক হুজুর, এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ানো এক বাতিক। কিছু করে না, বিয়ে-সাদি করেছে, সংসার দেখে না, বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, অথচ সাধু-সন্নিসিও নয়, ঐ এক ধরনের মানুষ।

এই তাহা হইলে বনোয়ারীলালের সেই চাচাতো ভাই?

কৌতূহল বাড়িল, বলিলাম—ও কি পুঁতছ ওখানে?

লোকটা বোধ হয় গোপনে কাজটা করিতেছিল, যেন ধরা পড়িয়া লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইয়া গিয়াছে এমন সুরে বলিল—কিছু না, এই—একটা গাছের বীজ—

আমি আশ্চর্য হইলাম। কি গাছের বীজ? ওর নিজের জমি নয়, এই ঘোর জঙ্গল, ইহার মাটিতে কী গাছের বীজ ছড়াইতেছে—তাহার সার্থকতাই বা কি? কথাটা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম।

বলিল—অনেক রকম বীজ আছে হুজুর, পূর্ণিয়ায় দেখেছিলাম একটা সাহেবের বাগানে ভারি চমৎকার বিলিতি লতা—বেশ রাঙা রাঙা ফুল। তারই বীজ, আরও অনেক রকম বনের ফুলের বীজ আছে, দূর দূর থেকে সংগ্রহ করে এনেছি, এখানকার জঙ্গলে ও-সব লতা-ফুল নেই। তাই পুঁতে দিচ্ছি, গাছ হয়ে দু-বছরের মধ্যে ঝাড় বেঁধে যাবে, বেশ দেখাবে।

লোকটার উদ্দেশ্য বুঝিয়া তাহার উপর আমার শ্রদ্ধা হইল। লোকটা সম্পূর্ণ বিনাস্বার্থে একটা বিস্তৃত বন্যভূমির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিবার জন্য নিজের পয়সা ও সময় ব্যয় করিতেছে, যে বনে তাহার নিজের ভূস্বত্ব কিছুই নাই—কি অদ্ভুত লোকটা!

যুগলপ্রসাদকে ডাকিয়া এক গাছের তলায় দুজনে বসিলাম। সে বলিল—আমি এর আগেও এ কাজ করেছি হুজুর, লবটুলিয়াতে যত বনের ফুল দেখেন, ফুলের লতা দেখেন, ও-সব আমি আজ দশ-বারো বছর আগে কতক পূর্ণিয়ার বন থেকে, কতক দক্ষিণ ভাগলপুরের লছমীপুর স্টেটের পাহাড়ী জঙ্গল থেকে এনে লাগিয়েছিলাম। এখন একেবারে ও-সব ফুলের জঙ্গল বেঁধে গিয়েছে।

—তোমার কি এ কাজ খুব খাল লাগে?

—লবটুলিয়া বইহারের জঙ্গলটা ভারি চমৎকার জায়গা—ওই সব ছোটখাটো পাহাড়ের গায়ে কি এখানকার বনে-ঝোপে নতুন নতুন ফুল ফোটাব, এ আমার বহুদিনের শখ।

—কি ফুল নিয়ে আসতে?

—কি করে আমার এদিকে মন গেল, তা একটু আগে হুজুরকে বলি। আমার বাড়ি ধরমপুর অঞ্চলে। আমাদের দেশে বুনো ভাণ্ডীর ফুল একেবারেই ছিল না। আমি মহিষ চরিয়ে বেড়াতাম ছেলেবেলায় কুশীনদীর ধারে ধারে, আমার গাঁ থেকে দশ-পনেরো ক্রোশ দূরে। সেখানে দেখতাম বনে-জঙ্গলে, মাঠে বুনো ভাণ্ডীর ফুলের বড় শোভা। সেখান থেকে বীজ নিয়ে গিয়ে দেশে লাগাই, এখন আমাদের অঞ্চলের পথের ধারে বনঝোপে কি লোকের বাড়ির পেছনে পোড়ো জমিতে ভাণ্ডীর ফুলের একেবারে জঙ্গল ; সেই থেকে আমার এই দিকে মাথা গেল। যেখানে যে ফুল নেই, সেখানে সেই ফুল গাছ, লতা নিয়ে পুঁতব, এই আমার শখ। সারাজীবন ওই করে ঘুরেছি। এখন আমি ও-কাজে ঘুণ হয়ে গেছি।

যুগলপ্রসাদ দেখিলাম এদেশের বহু বনের ফুল ও সুদৃশ্য বৃক্ষলতার খবর রাখে। এ বিষয়ে সে যে একজন বিশেষজ্ঞ, তাহাতে আমার কোন সন্দেহ রহিল না। বলিলাম—তুমি এরিস্টলোকিয়া লতা চেনো?

তাহাকে ফুলের গড়ন বলিতেই সে বলিল, হংস-লতা? হাঁসের মত চেহারার ফুল হয় তো? ও তো এদেশের গাছ নয়। পাটনায় দেখেছি বাবুদের বাগানে।

তাহার জ্ঞান দেখিয়া আশ্চর্য হইতে হয়। নিছক সৌন্দর্যের এমন পূজারীই বা ক'টা দেখিয়াছি? বনে বনে ভাল ফুল ও লতার বীজ ছড়াইয়া তাহার কোন স্বার্থ নাই, এক পয়সা আয় নাই, নিজে সে নিতান্তই গরিব, অথচ শুধু বনের সৌন্দর্য-সম্পদ বাড়াইবার চেষ্টায় তার এ অক্লান্ত পরিশ্রম ও উদ্বেগ।

আমায় বলিল—সরস্বতী কুণ্ডীর মত চমৎকার বন এ অঞ্চলে কোথাও নেই বাবুজী। কত গাছপালা যে আছে, আর কি দেখেছেন জলের শোভা! আচ্ছা, আপনি কি বিবেচনা করেন এতে পদ্ম হবে পুঁতে দিলে? ধরমপুরের পাড়াগাঁ অঞ্চলে পদ্ম আছে অনেক পুকুরে। ভাবছিলাম গেঁড় এনে পুঁতে দেব।

আমি তাহাকে সাহায্য করিতে মনে মনে সংকল্প করিলাম। দুজনে মিলিয়া এ বনকে নানা নতুন বনের ফুলে, লতায়, গাছে সাজাইব, সেদিন হইতে ইহা আমাকে যেন একটা নেশার মত পাইয়া বসিল। যুগলপ্রসাদ খাইতে পায় না, সংসারে বড় কষ্ট, ইহা আমি জানিতাম। সদরে লিখিয়া তাহাকে দশ টাকা বেতনে একটা মুহুরীর চাকুরি দিলাম আজমাবাদ কাছারিতে।

সেই বছরে আমি কলিকাতা হইতে সাটনের বিদেশী বন্য পুষ্পের বীজ আনিয়া ও ডুয়ার্সের পাহাড় হইতে বন্য জুঁইয়ের লতার কাটিং আনিয়া যথেষ্ট পরিমাণে রোপণ করিলাম

সরস্বতী হ্রদের বনভূমিতে। কি আহ্লাদ ও উৎসাহ যুগলপ্রসাদের! আমি তাহাকে শিখাইয়া দিলাম, এ উৎসাহ ও আনন্দ যেন সে কাছারির লোকের কাছে প্রকাশ না করে। তাহাকে তো লোকে পাগল ভাবিবেই, সেই সঙ্গে আমাকেও বাদ দিবে না। পর বৎসর বর্ষার জলে আমাদের রোপিত গাছ ও লতার ঝাড় অদ্ভুতভাবে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। হ্রদের তীরের জমি অত্যন্ত উর্বর, গাছপালাগুলিও যাহা পুঁতিয়াছিলাম, এদেশের আবহাওয়ার উপযোগী। কেবল সাটনের বীজের প্যাকেট লইয়া গোলমাল বাধিয়াছিল। প্রত্যেক প্যাকেটের উপর তাহারা ফুলের নাম ও কোন কোন স্থলে এক লাইনে ফুলের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাও দিয়াছিল। ভাল রং ও চেহারা বাছিয়া বাছিয়া যে বীজগুলি লাগাইলাম, তাহার মধ্যে 'হোয়াইট বিম' ও 'রেড ক্যাম্পিয়ন' এবং 'স্টিচওয়াট' অসাধারণ উন্নতি দেখাইল। 'ফক্সগ্লাভ' ও 'উড অ্যানিমোন্' মন্দ হইল না। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও 'ডগ রোজ' বা 'হনিসাক্‌ল'-এর চারা বাঁচাইতে পারা গেল না।

হলদে ধুতুরা-জাতীয় এক প্রকার গাছ হ্রদের ধারে ধারে পুঁতিয়াছিলাম। খুব শীঘ্রই তাহার ফুল ফুটিল। যুগলপ্রসাদ পূর্ণিয়ার জঙ্গল হইতে বন্য বয়ড়া লতার বীজ আনিয়াছিল, চারা বাহির হইবার সাত মাসের মধ্যেই দেখি কাছাকাছি অনেক ঝোপের মাথা বয়ড়া লতায় ছাইয়া যাইতেছে। বয়ড়া লতার ফুল যেমন সুদৃশ্য, তেমনি তাহার মৃদু সুবাস।

হেমন্তের প্রথমে একদিন দেখিলাম বয়ড়া লতায় অজস্র কুঁড়ি ধরিয়াছে।

যুগলপ্রসাদকে খবরটা দিতেই সে কলম ফেলিয়া আজমাবাদ কাছারি হইতে সাতমাইল দূরবর্তী সরস্বতী হ্রদের তীরে প্রায় দৌড়িতে দৌড়িতেই আসিল।

আমায় বলিল—লোকে বলেছিল হুজুর, বয়ড়া লতা জন্মাবে, বাড়বেও বটে, কিন্তু ওর ফুল ধরবে না। সব লতায় নাকি ফুল ধরে না। দেখুন কেমন কুঁড়ি এসেছে!

হ্রদের জলে 'ওয়াটার ক্রোফ্‌ট' বলিয়া এক প্রকার জলজ ফুলের গেঁড় পুঁতিয়াছিলাম। সে গাছ হু-হু করিয়া এত বাড়িতে লাগিল যে, যুগলপ্রসাদের ভয় হইল জলে পদ্মের স্থান বুঝি ইহারা বেদখল করিয়া ফেলে!

বোগেনভিলিয়া লতা লাগাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শহরের শৌখিন পার্ক বা উদ্যানের সঙ্গে এতই ওর সম্পর্কটা জড়ানো যে আমার ভয় হইল, সরস্বতী কুণ্ডীর বনে ফুলেভরা বোগেনভিলিয়ার ঝোপ ইহার বন্য আকৃতি নষ্ট করিয়া ফেলিবে। যুগলপ্রসাদেরও এসব বিষয়ে মত আমার ধরনের। সেও বারণ করিল।

অর্থব্যয়ও কম করি নাই। একদিন গনোরী তেওয়ারীর মুখে শুনিলাম, কারো নদীর ওপারে জয়ন্তী পাহাড়ের জঙ্গলে এক প্রকার অদ্ভুত ধরনের বন্যপুষ্প হয়—ওদেশে তার নাম দুধিয়া ফুল। হলুদ গাছের মত পাতা, অত বড়ই গাছ—খুব লম্বা একটা ডাঁটা ঠেলিয়া উঁচু দিকে তিন-চার হাত ওঠে। একটা গাছে চার-পাঁচটা ডাঁটা হয়, প্রত্যেক ডাঁটায় চারটি করিয়া হলদে রঙের ফুল ধরে—দেখিতে খুব ভাল তো বটেই, ভারি সুন্দর তার সুবাস। রাত্রে অনেক দূর পর্যন্ত সুগন্ধ ছড়ায়। সে-ফুলের একটা গাছ যেখানে একবার জন্মায়, দেখিতে দেখিতে এত হু-হু করিয়া বংশবৃদ্ধি হয় যে, দু-তিন বছরে রীতিমত জঙ্গল বাঁধিয়া যায়।

শুনিয়া পর্যন্ত আমার মনের শান্তি নষ্ট হইল। ঐ ফুল আনিতেই হইবে। গনোরী বলিল, বর্ষাকাল ভিন্ন হইবে না ; গাছের গেঁড় আনিয়া পুঁতিতে হয়—জল না পাইলে মরিয়া যাইবে।

পয়সা-কড়ি দিয়া যুগলপ্রসাদকে পাঠাইলাম। সে বহু অনুসন্ধানে জয়ন্তী পাহাড়ের দুর্গম জঙ্গল হইতে দশ-বারো গণ্ডা গেঁড় যোগাড় করিয়া আনিল।

নবম পরিচ্ছেদ

১

প্রায় তিন বছর কাটিয়া গিয়াছে।

এই তিন বছরে আমার অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। লবটুলিয়া ও আজমাবাদের বন্য প্রকৃতি কি মায়া-কাজল লাগাইয়া দিয়াছে আমার চোখে—শহরকে একরকম ভুলিয়া গিয়াছি। নির্জনতার মোহ, নক্ষত্রভরা উদার আকাশের মোহ আমাকে এমনি পাইয়া বসিয়াছে যে, মধ্যে একবার কয়েকদিনের জন্য পাটনায় গিয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলাম কবে পিচ-ঢালা বাঁধ-ধরা রাস্তার গণ্ডি এড়াইয়া চলিয়া যাইব লবটুলিয়া বইহারে—পেয়ালার মত উপুড়করা নীল আকাশের তলে মাঠের পর মাঠ, অরণ্যের পর অরণ্য, যেখানে তৈরি রাজপথ নাই, ইটের ঘরবাড়ি নাই, মোটর-হর্নের আওয়াজ নাই, ঘন ঘুমের ফাঁকে যেখানে কেবল দূর অন্ধকার বনে শেয়ালের দলের প্রহর-ঘোষণা শোনা যায়, নয়তো ধাবমান নীলগাইয়ের দলের সম্মিলিত পদধ্বনি, নয়তো বন্য মহিষের গম্ভীর আওয়াজ।

আমার উপরওয়ালারা ক্রমাগত আমাকে চিঠি লিখিয়া তাগাদা করিতে লাগিলেন, কেন আমি এখানকার জমি প্রজাবিলি করিতেছি না। আমি জানি আমার তাহাই একটি প্রধান কাজ বটে, কিন্তু এখানে প্রজা বসাইয়া প্রকৃতির এমন নিভৃত কুঞ্জবনকে নষ্ট করিতে মন সরে না। যাহারা জমি ইজারা লইবে, তাহারা তো জমিতে গাছপালা বনঝোপ সাজাইয়া রাখিবার জন্য কিনিবে না—কিনিয়াই তাহারা জমি সাফ করিয়া ফেলিবে, ফসল রোপণ করিবে, ঘর-বাড়ি বাঁধিয়া বসবাস শুরু করিবে—এই নির্জন শোভাময় বন্য প্রান্তর, অরণ্য, কুণ্ডী, শৈলমালা জনপদে পরিণত হইবে, লোকের ভিড়ে ভয় পাইয়া বনলক্ষ্মীরা ঊর্দ্ধশ্বাসে পালাইবেন—মানুষ ঢুকিয়া এই মায়াকাননের মায়াও দূর করিবে, সৌন্দর্যও ঘুচাইয়া দিবে।

সে জনপদ আমি মনশ্চক্ষে স্পষ্ট দেখিতে পাই।

পাটনা, পূর্ণিয়া কি মুঙ্গের যাইতে তেমন জনপদ এদেশের সর্বত্র। গায়ে গায়ে কুশ্রী, বেঢপ খোলার একতলা কি দোতলা মাঠকোঠা, চালে চালে বসতি, ফণিমনসার ঝাড়, গোবরস্তূপের আবর্জনার মাঝখানে গরু-মহিষের গোয়াল—ইঁদারা হইতে রহট্‌ দ্বারা জল উঠানো হইতেছে, ময়লা কাপড়-পরা নর-নারীর ভিড়, হনুমানজীর মন্দিরে ধ্বজা উড়িতেছে, রূপার হাঁসুলি গলায় উলঙ্গ বালক-বালিকার দল ধূলা মাখিয়া রাস্তার উপর খেলা করিতেছে।

কিসের বদলে কি পাওয়া যাইবে!

এমন বিশাল ছেদহীন, বাধাবন্ধনহীন, উদ্দাম সৌন্দর্যময়ী আরণ্যভূমি দেশের একটা বড় সম্পদ—অন্য কোন দেশ হইলে আইন করিয়া এখানে ন্যাশনাল পার্ক করিয়া রাখিত। কর্মক্লান্ত শহরের মানুষ মাঝে মাঝে এখানে আসিয়া প্রকৃতির সাহচর্যে নিজেদের অবসন্ন মনকে তাজা করিয়া লইয়া ফিরিত। তাহা হইবার জো নাই, যাহার জমি সে প্রজাবিলি না করিয়া জমি ফেলিয়া রাখিবে কেন?

আমি প্রজা বসাইবার ভার লইয়া এখানে আসিয়াছিলাম—এই আরণ্য-প্রকৃতিকে ধ্বংস করিতে আসিয়া এই অপূর্ব সুন্দরী বন্য নায়িকার প্রেমে পড়িয়া গিয়াছি। এখন আমি ক্রমশ সে-দিন পিছাইয়া দিতেছি—যখন ঘোড়ায় চড়িয়া ছায়াগহন বৈকালে কিংবা মুক্তাশুভ্র

জ্যোৎস্নারাত্রে একা বাহির হই, তখন চারিদিকে চাহিয়া মনে মনে ভাবি, আমার হাতেই ইহা নষ্ট হইবে? জ্যোৎস্নালোকে উদাস আত্মহারা, শিলাস্তৃত ধূ-ধূ নির্জন বন্য প্রান্তর! কি করিয়াই আমার মন ভুলাইয়াছে চতুরা সুন্দরী!

কিন্তু কাজ যখন করিতে আসিয়াছি, করিতেই হইবে। মাঘ মাসের শেষে পাটনা হইতে ছটু সিং নামে এক রাজপুত আসিয়া হাজার বিঘা জমি বন্দোবস্ত লইতে চাহিয়া দরখাস্ত দিতেই আমি বিষম চিন্তায় পড়িলাম—হাজার বিঘা জমি দিলে তো অনেকটা জায়গাই নষ্ট হইয়া যাইবে—কত সুন্দর বনঝোপ, লতাবিতান নির্ম্মমভাবে কাটা পড়িবে যে!

ছটু সিং ঘোরাঘুরি করিতে লাগিল—আমি তাহার দরখাস্ত সদরে পাঠাইয়া দিয়া ধ্বংসলীলাকে কিছু বিলম্বিত করিবার চেষ্টা করিলাম।

২

একদিন লবটুলিয়া জঙ্গলের উত্তরে নাঢ়া বইহারের মুক্ত প্রান্তরের মধ্য দিয়া দুপুরের পরে আসিতেছি— দেখিলাম, একখানা পাথরের উপর কে বসিয়া আছে পথের ধারে।

তাহার কাছে আসিয়া ঘোড়া থামাইলাম। লোকটির বয়স ষাটের কম নয়, পরনে ময়লা কাপড়, একটা ছেঁড়া চাদর গায়ে।

এ জনশূন্য প্রান্তরে লোকটা কি করিতেছে একা বসিয়া?

সে বলিল—আপনি কে বাবু?

বলিলাম—আমি এখানকার কাছারির কর্ম্মচারী।

—আপনি কি ম্যানেজারবাবু?

—কেন বল তো? তোমার কোন দরকার আছে? হ্যাঁ, আমিই ম্যানেজার।

লোকটা উঠিয়া আমার দিকে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে হাত তুলিল। বলিল—হুজুর, আমার নাম মটুকনাথ পাঁড়ে, ব্রাহ্মণ। আপনার কাছেই যাচ্ছি।

—কেন?

—হুজুর, আমি বড় গরিব। অনেক দূর থেকে হেঁটে আসছি হুজুরের নাম শুনে। তিন দিন থেকে হাঁটছি পথে পথে। যদি আপনার কাছে চলাচলতির কোন একটা উপায় হয়—

আমার কৌতূহল হইল, জিজ্ঞাসা করিলাম—এ ক'দিন জঙ্গলের পথে তুমি কি খেয়ে আছ?

মটুকনাথ তাহার মলিন চাদরের একপ্রান্তে বাঁধা পোয়াটাক কলাইয়ের ছাতু দেখাইয়া বলিল—সেরখানেক ছাতু ছিল এতে বাঁধা, এই নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম। তাই ক'দিন খাচ্ছি। রোজগারের চেষ্টায় বেড়াচ্ছি, হুজুর—আজ ছাতু ফুরিয়ে এসেছে, ভগবান জুটিয়ে দেবেন আবার।

আজমাবাদ ও নাঢ়া বইহারের এই জনশূন্য বনপ্রান্তরে উড়ানির খুঁটে ছাতু বাঁধিয়া লোকটা কী রোজগারের প্রত্যাশায় আসিয়াছে বুঝিতে পারিলাম না। বলিলাম—বড় বড় শহর ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, পাটনা, মুঙ্গের ছেড়ে এ জঙ্গলের মধ্যে এলে কেন পাঁড়েজী? এখানে কি হবে? লোক কোথায় এখানে? তোমাকে দেবে কে?

মটুকনাথ আমার মুখের দিকে নৈরাশ্যপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—এখানে কিছু রোজগার

হবে না বাবু? তবে আমি কোথায় যাব? ও-সব বড় শহরে আমি কাউকে চিনি নে, রাস্তাঘাট চিনি নে, আমার ভয় করে। তাই এখানে যাচ্ছিলাম—

লোকটাকে বড় অসহায়, দুঃখী ও ভালমানুষ বলিয়া মনে হইল। সঙ্গে করিয়া কাছারিতে লইয়া আসিলাম।

কয়েকদিন চলিয়া গেল। মটুকনাথকে কোন কাজ করিয়া দিতে পারিলাম না—দেখিলাম, সে কোন কাজ জানে না—কিছু সংস্কৃত পড়িয়াছে, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কাজ করিতে পারে। টোলে ছাত্র পড়াইত, আমার কাছে বসিয়া সময়ে অসময়ে উদ্ভট শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বোধ হয় আমার অবসর-বিনোদনের চেষ্টা করে।

একদিন আমায় বলিল—আমায় কাছারির পাশে একটু জমি দিয়ে একটা টোল খুলিয়ে দিন হুজুর।

বলিলাম—কে পড়বে টোলে পণ্ডিতজী, বুনো মহিষ ও নীলগাইয়ের দল কি ভট্টি বা রঘুবংশ বুঝবে?

মটুকনাথ নিপাট ভালমানুষ—বোধ হয় কিছু না ভাবিয়া দেখিয়াই টোল খুলিবার প্রস্তাব করিয়াছিল। ভাবিলাম, বুঝিবা এবার সে নিরস্ত হইবে। কিন্তু দিন-কতক চুপ করিয়া থাকিয়া আবার সে কথাটা পাড়িল।

বলিল—দিন দয়া ক'রে একটা টোল আমায় খুলে। দেখি না চেষ্টা ক'রে কি হয়। নয়তো আর যাব কোথায় হুজুর?

ভাল বিপদে পড়িয়াছি, লোকটা কি পাগল! ওর মুখের দিকে চাহিলেও দয়া হয়, সংসারের ঘোরপেঁচ বোঝে না, নিতান্ত সরল, নির্বোধ ধরনের মানুষ—অথচ একরাশ নির্ভর ও ভরসা লইয়া আসিয়াছে—কাহার উপর কে জানে?

তাহাকে কত বুঝাইলাম, আমি জমি দিতে রাজী আছি, সে চাষবাস করুক, যেমন রাজু পাঁড়ে করিতেছে। মটুকনাথ মিনতি করিয়া বলিল, তাহারা বংশানুক্রমে শাস্ত্র-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, চাষকাজের সে কিছুই জানে না। জমি লইয়া কি করিবে?

তাহাকে বলিতে পারিতাম, শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিত-মানুষ এখানে মরিতে আসিয়াছে কেন, কিন্তু কোন কঠিন কথা বলিতে মন সরিল না। লোকটাকে বড় ভাল লাগিয়াছিল। অবশেষে তাহার নির্বন্ধাতিশয্যে একটা ঘর বাঁধিয়া দিয়া বলিলাম, এই তোমার টোল, এখন ছাত্র যোগাড় হয় কি না দেখ।

মটুকনাথ পূজার্চনা করিয়া দু-তিনটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া টোল প্রতিষ্ঠা করিল। এ জঙ্গলে কিছুই মেলে না, সে নিজের হাতে মকাইয়ের আটার মোটা মোটা পুরী ভাজিল এবং জংলী ধুঁধুলের তরকারি। বাথান হইতে মহিষের দুধ আনাইয়া দই পাতিয়া রাখিয়াছিল। নিমন্ত্রিতের দলে অবশ্য আমিও ছিলাম।

টোল খুলিয়া কিছুদিন মটুকনাথ বড় মজা করিতে লাগিল।

পৃথিবীতে এমন মানুষও সব থাকে!

সকালে স্নানাহ্নিক সারিয়া সে টোলঘরে একখানা বন্য খেজুরপাতায়-বোনা আসনের উপর গিয়া বসে এবং সম্মুখে মুগ্ধবোধ খুলিয়া সূত্র আবৃত্তি করে, ঠিক যেন কাহাকে পড়াইতেছে। এমন চেঁচাইয়া পড়ে যে, আমি আমার আপিসঘরে বসিয়া কাজ করিতে করিতে শুনিতে পাই।

তহশিলদার সজ্জন সিং বলে—পণ্ডিতজী লোকটা বদ্ধ পাগল! কি করছে দেখুন হুজুর!

মাস-দুই এইভাবে কাটে। শূন্য ঘরে মটুকনাথ সমান উৎসাহে টোল করিয়া চলিয়াছে। একবার সকালে, একবার বৈকালে। ইতিমধ্যে সরস্বতী পূজা আসিল। কাছারিতে দোয়াত-পূজার দ্বারা বাগ্‌দেবীর অর্চনা নিষ্পন্ন করা হয় প্রতি বৎসর, এ জঙ্গলে প্রতিমা কোথায় গড়ানো হইবে? মটুকনাথ তার টোলে শুনিলাম আলাদা পূজা করিবে, নিজের হাতে নাকি প্রতিমা গড়িবে।

ষাট বছরের বৃদ্ধের কি ভরসা, কি উৎসাহ!

নিজের হাতে ছোট প্রতিমা গড়িল মটুকনাথ। টোলে আলাদা পূজা হইল।

বৃদ্ধ হাসিমুখে বলিল—বাবুজী, এ আমাদের পৈতৃক পূজো। আমার বাবা চিরকাল তাঁর টোলে প্রতিমা গড়িয়ে পূজো করে এসেছেন, ছেলেবেলায় দেখেছি। এখন আবার আমার টোলে—

কিন্তু টোল কই?

মটুকনাথকে একথা বলি নাই অবশ্য।

৩

সরস্বতী পূজার দিন-দশ-বারো পরে মটুকনাথ পণ্ডিত আমাকে আসিয়া জানাইল, তাহার টোলে একজন ছাত্র আসিয়া ভর্তি হইয়াছে। আজই সে নাকি কোথা হইতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

মটুকনাথ ছাত্রটিকে আমার সামনে হাজির করাইল। চৌদ্দ-পনেরো বছরের কালো, শীর্ণকায় বালক, মৈথিলী ব্রাহ্মণ, নিতান্ত গরীব, পরনের কাপড়খানি ছাড়া দ্বিতীয় বস্ত্র পর্যন্ত নাই।

মটুকনাথের উৎসাহ দেখে কে! নিজে খাইতে পায় না, সেই মুহূর্তে সে ছাত্রটির ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করিয়া বসিল। ইহাই তাহার কুলপ্রথা, টোলের ছাত্রের সকল প্রকার অভাব-অনটন এতদিন তাহাদের টোল হইতে নির্বাহ হইয়া আসিয়াছে, বিদ্যা শিখিবার আশায় যে আসিয়াছে, তাহাকে সে ফিরাইতে পারিবে না।

মাস দুইয়ের মধ্যে দেখিলাম, আরও দু-তিনটি ছাত্র জুটিল টোলে। ইহারা এক বেলা খায়, এক বেলা খায় না। সিপাহীরা চাঁদা করিয়া মকায়ের ছাতু, আটা, চীনার দানা দেয়, কাছারি হইতে আমিও কিছু সাহায্য করি। জঙ্গল হইতে বাথুয়া শাক তুলিয়া আনে ছাত্রেরা—তাহাই সিদ্ধ করিয়া খাইয়া হয়তো একবেলা কাটাইয়া দেয়। মটুকনাথেরও সেই অবস্থা।

রাত দশটা-এগারোটা পর্যন্ত মটুকনাথ শুনি ছাত্র পড়াইতেছে টোলঘরের সামনে একটা হরীতকী গাছের তলায়। অন্ধকারেই অথবা জ্যোৎস্নালোকে—কারণ আলো জ্বালাইবার তেল জোটে না।

একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য হইয়াছি। মটুকনাথ টোলঘরের জন্য জমি ও ঘর বাঁধিয়া দেওয়ার প্রার্থনা ছাড়া আমার কাছে কোন দিন কোন আর্থিক সাহায্য চায় নাই। কোন দিন বলে নাই, আমার চলে না, একটা উপায় করুন না! কাহাকেও সে কিছু জানায় না, সিপাহীরা নিজের ইচ্ছায় যা দেয়।

বৈশাখ হইতে ভাদ্র মাসের মধ্যে মটুকনাথের টোলের ছাত্রসংখ্যা বেশ বাড়িল। দশ-বারোটি বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানো গরিব বালক বিনা পয়সায় অল্প আয়াসে খাইতে পাইবার লোভে নানা জায়গা হইতে আসিয়া জুটিয়াছে। কারণ এ-সব দেশে কাকের মুখে একথা ছড়ায়। ছাত্রগুলিকে দেখিয়া মনে হইল ইহারা পূর্বে মহিষ চরাইত ; কারও মধ্যে

এতটুকু বুদ্ধির উজ্জ্বলতা নাই—ইহারা পড়িবে কাব্য-ব্যাকরণ? মটুকনাথকে নিরীহ মানুষ পাইয়া পড়িবার ছুতায় তাহার ঘাড়ে বসিয়া খাইতে আসিয়াছে। কিন্তু মটুকনাথের এসব দিকে খেয়াল নাই, সে ছাত্র পাইয়া মহা খুশি।

একদিন শুনিলাম, টোলের ছাত্রগণ কিছু খাইতে না পাইয়া উপবাস করিয়া আছে। সেই সঙ্গে মটুকনাথও।

মটুকনাথকে ডাকাইয়া ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিলাম।

কথাটা ঠিকই। সিপাহীরা চাঁদা করিয়া যে আটা ও ছাতু দিয়াছিল, তাহা ফুরাইয়াছে, কয়েক দিন রাত্রে শুধু বাথুয়া শাক সিদ্ধ আহার করিয়া চলিতেছিল, আজ তাহাও পাওয়া যায় নাই। তাহা ছাড়া উহা খাইয়া অনেকের অসুখ হওয়াতে কেহ খাইতে চাহিতেছে না।

—তা এখন কি করবে পণ্ডিতজী?

—কিছু তো ভেবে পাচ্ছিনে হুজুর। ছোট ছোট ছেলেগুলো না খেয়ে থাকবে—

আমি উহাদের সকলের জন্য সিধা বাহির করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিলাম। দু-তিন দিনের উপযুক্ত চাল, ডাল, ঘি, আটা। বলিলাম—টোল কি ক'রে চালাবে, পণ্ডিতজী? ও উঠিয়ে দাও। খাবে কি, খাওয়াবে কি?

দেখিলাম, আমার কথায় সে আঘাত পাইয়াছে। বলিল—তাও কি হয় হুজুর? তৈরি টোল কি ছাড়তে পারি? ঐ আমার পৈতৃক ব্যবসায়।

মটুকনাথ সদানন্দ লোক। তাহাকে এ-সব বুঝাইয়া ফল নাই। সে ছাত্র কয়টি লইয়া বেশ মনের সুখেই আছে দেখিলাম।

আমার এই বনভূমির একপ্রান্ত যেন সেকালের ঋষিদের আশ্রম হইয়া উঠিয়াছে মটুকনাথের কৃপায়। টোলের ছাত্ররা কলরব করিয়া পড়াশুনা করে, মুগ্ধবোধের সূত্র আওড়ায়, কাছারির লাউ-কুমড়ার মাচা হইতে ফল চুরি করে, ফুলগাছের ডালপাতা ভাঙ্গিয়া ফুল লইয়া যায়, এমন কি মাঝে মাঝে কাছারির লোকজনের জিনিসপত্রও চুরি যাইতে লাগিল—সিপাহীরা বলাবলি করিতে লাগিল, টোলের ছাত্রদের কাজ।

একদিন নায়েবের ক্যাশবাক্স খোলা অবস্থায় তাহার ঘরে পড়িয়া ছিল। কে তাহার মধ্য হইতে কয়েকটি টাকা ও নায়েবের একটি ঘষা মরা-সোনার আংটি চুরি করিল। তাহা লইয়া খুব হৈ হৈ করিল সিপাহীরা। মটুকনাথের এক ছাত্রেরা কাছে কয়েকদিন পরে আংটিটা পাওয়া গেল। সে কোমরের ঘুনসিতে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, কে দেখিতে পাইয়া কাছারিতে আসিয়া বলিয়া দিল। ছাত্র বামাল-সুদ্ধ ধরা পড়িল।

আমি মটুকনাথকে ডাকাইয়া পাঠাইলাম। সে সত্যই নিরীহ লোক, তাহার ভালমানুষির সুযোগ গ্রহণ করিয়া দুর্দান্ত ছাত্রের যাহা খুশি করিতেছে। টোল ভাঙিবার দরকার নাই, অন্তত কয়েকজন ছাত্রকে তাড়াইতেই হইবে। বাকি যাহারা থাকিতে চায়, আমি জমি দিতেছি, উহারা নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জমিতে কিছু কিছু মকাই, চীনাঘাস ও তরকারির চাষ করুক। খাদ্যশস্য যাহা উৎপন্ন হইবে, তাহাতেই উহাদের চলিবে।

মটুকনাথ এ-প্রস্তাব ছাত্রদের কাছে করিল। বারোজন ছাত্রের মধ্যে আটজন শুনিবামাত্র পলাইল। চারজন রহিয়া গেল, তাও আমার মনে হয় বিদ্যানুরাগের জন্য নয়, নিতান্ত কোথাও কোন উপায় নাই বলিয়া। পূর্বে মহিষ চরাইত, এখন না-হয় চাষ করিবে। সেই হইতে মটুকনাথের টোল চলিতেছে মন্দ নয়।

৪

ছট্টু সিং ও অন্যান্য প্রজাদের জমি বিলি হইয়া গিয়াছে। সর্বসুদ্ধ প্রায় দেড় হাজার বিঘা জমি। নাঢ়া বইহারের জমি অত্যন্ত উর্বর বলিয়া ঐ অংশেই দেড় হাজার বিঘা জমি একসঙ্গে উহাদের দিতে হইয়াছে। সেখানকার প্রান্তরসীমার বনানী অতি শোভাময়ী, কতদিন সন্ধ্যাবেলা ঘোড়ায় আসিবার সময়ে সে বন দেখিয়া মনে হইয়াছে, জগতের মধ্যে নাঢ়া বইহারের এই বন একটা বিউটি স্পট—গেল সে বিউটি স্পট!

দূর হইতে দেখিতাম বনে আগুন দিয়াছে, খানিকটা পোড়াইয়া না ফেলিলে ঘন দুর্ভেদ্য জঙ্গল কাটা যায় না। কিন্তু সব জায়গায় তো বন নাই, দিগন্তব্যাপী প্রান্তরের ধারে ধারে নিবিড় বন, হয়ত প্রান্তরের মাঝে মাঝে বনঝোপ, কত কি লতা, কত কি বনকুসুম।....

চট্ চট্ শব্দ করিয়া বন পুড়িতেছে, দূর হইতে শুনি—কত শোভাময় লতাবিতান ধ্বংস হইয়া গেল, বসিয়া বসিয়া ভাবি। কেমন একটা কষ্ট হয় বলিয়া ওদিকে যাই না। দেশের একটা এত বড় সম্পদ, মানুষের মনে যাহা চিরদিন শান্তি ও আনন্দ পরিবেষণ করিতে পারিত—একমুষ্টি গমের বিনিময়ে তাহা বিসর্জন দিতে হইল।

কার্তিক মাসের প্রথমে একদিন জায়গাটা দেখিতে গেলাম। সমস্ত মাঠটাতে সরিষা বপন করা হইয়াছে—মাঝে মাঝে লোকজনেরা ঘর বাঁধিয়া বাস করিতেছে, ইহার মধ্যেই গরু-মহিষ, স্ত্রী-পুত্র আনিয়া গ্রাম বসাইয়া ফেলিয়াছে।

শীতকালের মাঝামাঝি যখন সর্ষেক্ষেত হলুদ ফুলে আলো করিয়াছে, তখন যে দৃশ্য চোখের সম্মুখে উন্মুক্ত হইল, তাহার তুলনা নাই। দেড় হাজার বিঘা ব্যাপী একটা বিরাট প্রান্তর দূর দিগ্বলয়সীমা পর্যন্ত হলুদরঙের গালিচায় ঢাকা—এর মধ্যে ছেদ নাই, বিরাম নাই—উপরে নীল আকাশ, ইন্দ্রনীলমণির মত নীল—তার তলায় হলুদ—হলুদ রঙের ধরণী, যতদূর দৃষ্টি যায়। ভাবিলাম, এও একরকম মন্দ নয়।

একদিন নূতন গ্রামগুলি পরিদর্শন করিতে গেলাম। ছট্টু সিং বাদে সকলেই গরীব প্রজা। তাহাদের জন্য একটা নৈশ স্কুল করিয়া দিব ভাবিলাম—অনেক ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে সর্ষেক্ষেতের ধারে ধারে ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিতে দেখিয়া আমার নৈশ স্কুলের কথা আগে মনে পড়িল।

কিন্তু শীঘ্রই নূতন প্রজারা ভয়ানক গোলমাল বাধাইল। দেখিলাম ইহারা মোটেই শান্তিপ্রিয় নয়। একদিন কাছারিতে বসিয়া আছি, খবর আসিল নাঢ়া বইহারের প্রজারা নিজেদের মধ্যে ভয়ানক দাঙ্গা শুরু করিয়াছে। জমির আল নির্দিষ্ট কিছু না থাকাতেই এই গোলমাল বাধিয়াছে, যাহার পাঁচ-বিঘা জমি সে দশ-বিঘা জমির ফসল দখল করিতে বসিয়াছে। আরও শুনিলাম, সর্ষে পাকিবার কিছুদিন আগে ছট্টু সিং নিজের দেশ হইতে বহু রাজপুত লাঠিয়াল ও সড়কিওয়ালা গোপনে আনিয়া রাখিয়াছিল, তাহার আসল উদ্দেশ্য এখন বোঝা যাইতেছে। নিজের তিন-চার-শ বিঘা আবাদী জমির ফসল বাদে সে লাঠির জোরে সমস্ত নাঢ়া বইহারের দেড় হাজার বিঘা (বা যতটা পারে) জমির ফসল দখল করিতে চায়।

কাছারির আমলারা বলিল—এ-দেশের এই নিয়ম হুজুর। লাঠি যার ফসল তার।

যাহাদের লাঠির জোর নাই, তাহারা কাছারিতে আসিয়া আমার কাছে কাঁদিয়া পড়িল। তাহারা নিরীহ গরিব গাঙ্গোতা প্রজা—সামান্য দু-দশ বিঘা জমি জঙ্গল কাটিয়া চাষ করিয়াছিল,

স্ত্রী-পুত্র আনিয়া জমির ধারেই ঘর-বাড়ি করিয়া বাস করিতেছিল—এখন সারা বছরের পরিশ্রমের ও আশার সামগ্রী প্রবলের অত্যাচারে যাইতে বসিয়াছে!

কাছারির দুইজন সিপাহীকে ঘটনাস্থলে পাঠাইয়াছিলাম ব্যাপার কি দেখিতে। তাহারা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া জানাইল—ভীমদাস টোলার উত্তরসীমায় ভয়ানক দাঙ্গা বাধিয়াছে।

তখনই তহশিলদার সজ্জন সিং ও কাছারির সমস্ত সিপাহীদের লইয়া ঘোড়ায় করিয়া ঘটনাস্থলে রওনা হইলাম। দূর হইতেই একটা হৈ হৈ গোলমাল কানে আসিল। নাঢ়া বইহারের মাঝখান দিয়া একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য নদী বহিয়া গিয়াছে—গোলমালটা যেন সেদিকেই বেশি।

নদীর ধারে গিয়া দেখি নদীর দুই পারেই লোক জড়ো হইয়াছে—প্রায় ষাট-সত্তর জন এপারে, ওপারে ত্রিশ-চল্লিশ জন ছট্টু সিং-এর রাজপুত লাঠিয়াল। ওপারের লোক এপারে আসিতে চায়, এপারের লোকেরা বাধা দিতে দাঁড়াইয়াছে। ইতিমধ্যে জন-দুই লোক জখমও হইয়াছে—তাহারা এপারের দলের। জখম হইয়া নদীর জলে পড়িয়াছিল, সেই সময় ছট্টু সিং-এর লোকেরা টাঙি দিয়া একজনের মাথা কাটিতে চেষ্টা করে—এ-পক্ষ ছিনাইয়া নদী হইতে উঠাইয়া আনিয়াছে। নদীতে অবশ্য পা ডোবে না এমনি জল, পাহাড়ী নদী তার উপর শীতের শেষ।

কাছারির লোকজন দেখিয়া উভয় পক্ষ দাঙ্গা থামাইয়া আমার কাছে আসিল। প্রত্যেক পক্ষ নিজেদের যুধিষ্ঠির এবং অপর পক্ষকে দুর্যোধন বলিয়া অভিহিত করিতে লাগিল। সে হৈ-হৈ কলরবের মধ্যে ন্যায়-অন্যায় নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। উভয় পক্ষকে কাছারিতে আসিতে বলিলাম। আহত লোক দুটির সামান্য লাঠির চোট লাগিয়াছিল, এমন গুরুতর জখম কিছু নয়। তাহাদেরও কাছারিতে লইয়া আসিলাম।

ছট্টু সিং-এর লোকেরা বলিল, দুপুরের পরে তাহারা কাছারিতে আসিয়া দেখা করিবে। ভাবিলাম, সব মিটিয়া গেল। কিন্তু তখনও আমি এদেশের লোক চিনি নাই। দুপুরের অল্প পরেই আবার খবর আসিল নাঢ়া বইহারে ঘোর দাঙ্গা বাধিয়াছে। আমি পুনরায় লোকজন লইয়া ছুটিলাম। একজন ঘোড়সওয়ারকে পনের মাইল দূরবর্তী নওগাছিয়া থানায় রওনা করিয়া দিলাম। গিয়া দেখি ঠিক ও-বেলার মতই ব্যাপার। ছট্টু সিং এবেলা আরও অনেক লোক জড়ো করিয়া আনিয়াছে। শুনিলাম রাসবিহারী সিং রাজপুত ও নন্দলাল ওঝা গোলাওয়ালা ছট্টু সিংকে সাহায্য করিতেছে। ছট্টু সিং ঘটনাস্থলে ছিল না, তাহার ভাই গজাধর সিং ঘোড়ায় চাপিয়া কিছুদূরে দাঁড়াইয়াছিল—আমায় আসিতে দেখিয়া সরিয়া পড়িল। এবার দেখিলাম রাজপুতদলের দুজনের হাতে বন্দুক রহিয়াছে।

ওপার হইতে রাজপুতেরা হাঁকিয়া বলিল—হুজুর, সরে যান আপনি, আমরা একবার এই বাঁদীর বাচ্চা গাঙ্গোতাদের দেখে নিই।

আমার দলবল গিয়া আমার হুকুমে উভয় দলের মাঝখানে দাঁড়াইল। আমি তাহাদিগকে জানাইলাম নওগাছিয়া থানায় খবর গিয়াছে, এতক্ষণ পুলিস অর্ধেক রাস্তা আসিয়া পড়িল। ওসব বন্দুক কার নামে? বন্দুকের আওয়াজ করিলে তার জেল অনিবার্য। আইন ভয়ানক কড়া।

বন্দুকধারী লোক দুজন একটু পিছাইয়া পড়িল।

আমি এপারের গাঙ্গোতা প্রজাদের ডাকিয়া বলিলাম—তাহাদের দাঙ্গা করিবার কোনো দরকার নাই। তাহারা যে যার জায়গায় চলিয়া যাক। আমি এখানে আছি। আমার সমস্ত আমলা ও সিপাহীরা আছে। ফসল লুঠ হয় আমি দায়ী।

গাঙ্গোতা-দলের সর্দার আমার কথার উপর নির্ভর করিয়া নিজের লোকজন হটাইয়া

কিছুদূরে একটা বকাইন গাছের তলায় দাঁড়াইল। আমি বলিলাম—ওখানেও না। একেবারে সোজা বাড়ি গিয়ে ওঠো। পুলিস আসছে।

রাজপুতেরা অত সহজে দমিবার পাত্রই নয়। তাহারা ওপারে দাঁড়াইয়া নিজেদের মধ্যে কি পরামর্শ করিতে লাগিল। তহশিলদারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি ব্যাপার সজ্জন সিং? আমাদের উপর চড়াও হবে নাকি?

তহশিলদার বলিল, হুজুর, ওই যে নন্দলাল ওঝা গোলাওয়ালা জুটেছে, ওকেই ভয় হয়। ও বদ্‌মাশটা আস্ত ডাকাত।

—তাহলে তৈরি হয়ে থাকো। নদী পার কাউকে হতে দেবে না। ঘণ্টা দুই সামলে রাখো, তারপরেই পুলিস এসে পড়বে।

রাজপুতেরা পরামর্শ করিয়া কি ঠিক করিল জানি না, একদল আগাইয়া আসিয়া বলিল—হুজুর, আমরা ওপারে যাব।

বলিলাম, কেন?

—আমাদের কি ওপারে জমি নেই?

—পুলিসের সামনে সে কথা বোলো। পুলিস তো এসে পড়ল। আমি তোমাদের এপারে আসতে দিতে পারিনে।

—কাছারিতে একরাশ টাকা সেলামী দিয়ে জমি বন্দোবস্ত নিয়েছি কি ফসল লোকসান করবার জন্যে? এ আপনার অন্যায় জুলুম।

—সে কথাও পুলিসের সামনে বোলো।

—আমাদের ওপারে যেতে দেবেন না?

—না, পুলিস আসবার আগে নয়। আমার মহালে আমি দাঙ্গা হ'তে দেবো না।

ইতিমধ্যে কাছারির আরও লোকজন আসিয়া পড়িল। ইহারা আসিয়া রব উঠাইয়া দিল, পুলিস আসিতেছে। ছট্টু সিং-এর দল ক্রমশ দু-একজন করিয়া সরিয়া পড়িতে লাগিল। তখনকার মত দাঙ্গা বন্ধ হইল বটে, কিন্তু মারপিট, পুলিস-হাঙ্গামা, খুন-জখমের সেই যে সূত্রপাত হইল, দিন দিন তাহা বাড়িয়া চলিতে লাগিল বই কমিল না। আমি দেখিলাম ছট্টু সিং-এর মত দুর্দান্ত রাজপুতকে একসঙ্গে অতটা জমি বিলি করিবার ফলেই যত গোলমালের সৃষ্টি। ছট্টু সিংকে একদিন ডাকাইলাম। সে বলিল, এসবের বিন্দুবিসর্গ সে জানে না। সে অধিকাংশ সময় ছাপরায় থাকে। তার লোকেরা কি করে না-করে তার জন্য সে কি করিয়া দায়ী?

বুঝিলাম লোকটা পাকা ঘুঘু। সোজা কথায় এখানে কাজ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাকে জব্দ করিতে হইলে অন্য পথ দেখিতে হইবে।

সেই হইতে আমি গাঙ্গোতা প্রজা ভিন্ন অন্য কোন লোককে জমি দেওয়া একেবারে বন্ধ করিয়া দিলাম। কিন্তু যে-ভুল আগেই হইয়া গিয়াছে, তাহার কোন প্রতিকার আর হইল না। নাঢ়া বইহারের শান্তি চিরদিনের জন্য ঘুচিয়া গেল।

৫

আমাদের বারো মাইল দীর্ঘ জংলী-মহালের উত্তর অংশে প্রায় পাঁচ-ছ'শ একর জমিতে প্রজা বসিয়া গিয়াছে। পৌষ মাসের শেষে একদিন সেদিকে যাইবার দরকার হইয়াছিল—গিয়া দেখি এরা এ-অঞ্চলের চেহারা বদলাইয়া দিয়াছে।

ফুলকিয়ার জঙ্গল হইতে হঠাৎ বাহির হইয়া চোখে পড়িল সামনে দিগন্তবিস্তীর্ণ ফুল-ফোটা সর্ষেক্ষেত—যতদূর চোখ যায়, ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে, একটানা হল্‌দে-ফুল-তোলা একখানা সুবিশাল গালিচা কে যেন পাতিয়া গিয়াছে—এর কোথাও বাধা নাই, ছেদ নাই, জঙ্গলের সীমা হইতে একেবারে বহু, বহু দূরের চক্রবাল-রেখায় নীল শৈলমালার কোলে মিশিয়াছে। মাথার উপরে শীতকালের নির্মেঘ নীল আকাশ। এই অপরূপ শস্যক্ষেত্রের মাঝে মাঝে প্রজাদের কাশের খুপরি। স্ত্রী-পুত্র লইয়া এই দুরন্ত শীতে কি করিয়া তাহারা যে এই কাশ-ডাঁটার বেড়া-ঘেরা কুটিরে এই উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে বাস করে!

ফসল পাকিবার সময়ের আর বেশি দেরি নাই। ইহার মধ্যে কাটুনী মজুরের দল নানাদিক হইতে আসিতে শুরু করিয়াছে। ইহাদের জীবন বড় অদ্ভুত—পূর্ণিয়া, তরাই ও জয়ন্তীর পাহাড়-অঞ্চল ও উত্তর ভাগলপুর হইতে স্ত্রী-পুত্র লইয়া ফসল পাকিবার সময় ইহারা আসিয়া ছোট ছোট কুঁড়েঘর নির্মাণ করিয়া বাস করে ও জমির ফসল কাটে—ফসলের একটা অংশ মজুরিস্বরূপ পায়। আবার ফসল কাটা শেষ হইয়া গেলে কুঁড়েঘর ফেলিয়া রাখিয়া স্ত্রী-পুত্র লইয়া চলিয়া যায়। আবার আর বছর আসিবে। ইহাদের মধ্যে নানা জাতি আছে—বেশির ভাগই গাঙ্গোতা কিন্তু ছত্রী, ভূমিহার ব্রাহ্মণ, মৈথিল ব্রাহ্মণ পর্যন্ত আছে।

এ-অঞ্চলের নিয়ম, ফসল কাটিবার সময়ে ক্ষেতে বসিয়া খাজনা আদায় করিতে হয়—নয়তো এত গরিব প্রজা, ফসল ক্ষেত হইতে উঠিয়া গেলে আর খাজনা দিতে পারে না। খাজনা আদায় তদারক করিবার জন্য দিনকতক আমাকে ফুলকিয়া বইহারের দিগন্তবিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রের মধ্যে থাকিবার দরকার হইল।

তহশিলদার বলিল—ওখানে তাহলে ছোট তাঁবুটা খাঁটিয়ে দেব?

—একদিনের মধ্যেই ছোট একটি কাশের খুপরি করে দাও না?

—এই শীতে তাতে কি থাকতে পারবেন, হুজুর?

—খুব। তুমি তাই কর।

তাহাই হইল। পাশাপাশি তিন-চারটা ছোট ছোট কাশের কুটির, একটা আমার শয়নঘর, একটা রান্নাঘর, একটাতে দুজন সিপাহী ও পাটোয়ারী থাকিবে। এ-ধরনের ঘরকে এদেশে বলে 'খুপরি'—দরজা-জানলার বদলে কাশের বেড়ার খানিকটা করিয়া কাটা—বন্ধ করিবার উপায় নাই—হু-হু হিম আসে রাত্রে। এত নীচু যে হামাগুড়ি দিয়া ভিতরে ঢুকিতে হয়। মেঝেতে খুব পুরু করিয়া শুক্‌নো কাশ ও বন-ঝাউয়ের সুঁটি বিছানো—তাহার উপর শতরঞ্জি, তাহার উপর তোশক-চাদর পাতিয়া ফরাস করা। আমার খুপরিটি দৈর্ঘ্যে সাত হাত প্রস্থে তিন হাত। সোজা হইয়া দাঁড়ানো অসম্ভব ঘরের মধ্যে, কারণ উচ্চতায় মাত্র তিন হাত।

কিন্তু বেশ লাগে এই খুপরি। এত আরাম ও আনন্দ কলিকাতায় তিন-চারতলা বাড়িতে থাকিয়াও পাই নাই। তবে বোধ হয় আমি দীর্ঘদিন এখানে থাকিবার ফলে বন্য হইয়া যাইতেছিলাম, আমার রুচি, দৃষ্টিভঙ্গি, ভাল-মন্দ-লাগা সবেরই উপর এই মুক্ত অরণ্য-প্রকৃতির অল্প-বিস্তর প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছিল, তাই এমন হইতেছে কিনা কে জানে?

খুপরিতে ঢুকিয়া প্রথমেই আমার ভাল লাগিল সদ্য-কাটা কাশ-ডাঁটার তাজা সুগন্ধটা, যাহা দিয়া খুপরির বেড়া বাঁধা। তাহার পর ভাল লাগিল আমার মাথার কাছেই এক বর্গহাত পরিমিত ঘুলঘুলিপথে দৃশ্যমান, অর্ধশায়িত অবস্থায় আমার দুটি চোখের দৃষ্টির প্রায় সমতলে অবস্থিত ধূ-ধূ বিস্তীর্ণ সর্ষেক্ষেতের হল্‌দে ফুলরাশি। এ-দৃশ্যটা একেবারে অভিনব, আমি যেন একটা পৃথিবীজোড়া হল্‌দে কার্পেটের উপরে শুইয়া আছি। হু-হু হাওয়ায় তীব্র ঝাঁঝালো সর্ষেফুলের গন্ধ।

শীতও যা পড়িতে হয় পড়িয়াছিল। পশ্চিমে হাওয়ার একদিনও কামাই ছিল না, অমন কড়া রৌদ্র যেন ঠাণ্ডা জল হইয়া যাইত কন্‌কনে পশ্চিমা হাওয়ার প্রাবল্যে। বইহারের বিস্তৃত কুল-জঙ্গলের পাশ দিয়া ঘোড়ায় করিয়া ফিরিবার সময় দেখিতাম দূরে তিরাশী-চৌকার অনুচ্চ নীল পাহাড়-শ্রেণীর ওপারে শীতের সূর্যাস্ত। সারা পশ্চিম আকাশ অগ্নিকোণ হইতে নৈর্ঋত কোণ পর্যন্ত রাঙা হইয়া যায়, তরল আগুনের সমুদ্র, হু-হু করিয়া প্রকাণ্ড অগ্নিগোলকের মত বড় সূর্যটা নামিয়া পড়ে—মনে হয় পৃথিবীর আহ্নিক গতি যেন প্রত্যক্ষ করিতেছি, বিশাল ভূপৃষ্ঠ যেন পশ্চিম দিক হইতে পূর্বে ঘুরিয়া আসিতেছে, অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিলে দৃষ্টিবিভ্রম উপস্থিত হইত, সত্যই মনে হইত যেন পশ্চিম দিক্‌চক্রবাল-প্রান্তের ভূপৃষ্ঠ আমার অবস্থিতি-বিন্দুর দিকে ঘুরিয়া আসিতেছে।

রোদটুকু মিলাইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেজায় শীত পড়িত, আমরাও সারাদিনের গুরুতর পরিশ্রম ও ঘোড়ায় ইতস্তত ছুটাছুটির পরে সন্ধ্যাবেলা প্রতিদিন আমার খুপরির সামনে আগুন জ্বালাইয়া বসিতাম।

সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারাবৃত বনপ্রান্তরের ঊর্ধ্বাকাশে অগণ্য নক্ষত্রলোক কত দূরের বিশ্বরাজির জ্যোতির দূতরূপে পৃথিবীর মানুষের চক্ষুর সম্মুখে দেখা দিত। আকাশে নক্ষত্ররাজি জ্বলিত যেন জ্বলজ্বলে বৈদ্যুতিক বাতির মত—বাংলা দেশে অমন কৃত্তিকা, অমন সপ্তর্ষিমণ্ডল কখনও দেখি নাই। দেখিয়া দেখিয়া তাহাদের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় হইয়া গিয়াছিল। নীচে ঘন অন্ধকার বনানী, নির্জনতা, রহস্যময়ী রাত্রি, মাথার উপরে নিত্যসঙ্গী অগণ্য জ্যোতির্লোক। এক-একদিন এক ফালি অবাস্তব চাঁদ অন্ধকারের সমুদ্রে সুদূর বাতিঘরের আলোর মত দেখাইত। আর সেই ঘনকৃষ্ণ অন্ধকারকে আগুনের তীক্ষ্ণ তীর দিয়া সোজা কাটিয়া এদিকে ওদিকে উল্কা খসিয়া পড়িতেছে। দক্ষিণে, উত্তরে, ঈশানে, নৈর্ঋতে, পূর্বে, পশ্চিমে, সবদিকে। এই একটা, ওই একটা, ওই দুটো, এই আবার একটা—মিনিটে মিনিটে, সেকেন্ডে সেকেন্ডে।

এক-একদিন গনোরী তেওয়ারী ও আরও অনেকে তাঁবুতে আসিয়া জোটে। নানা রকম গল্প হয়। এইখানেই একদিন একটা অদ্ভুত গল্প শুনিলাম। কথায় কথায় সেদিন শিকারের গল্প হইতেছিল। মোহনপুরা জঙ্গলের বন্য-মহিষের কথা উঠিল। দশরথ সিং ঝাণ্ডাওয়ালা নামে এক রাজপুত সেদিন লবটুলিয়া কাছারিতে চরের ইজারা ডাকিতে উপস্থিত ছিল। লোকটা এক সময়ে খুব বনেজঙ্গলে ঘুরিয়াছে, দুঁদে শিকারী বলিয়া তার নাম আছে। দশরথ ঝাণ্ডাওয়ালা বলিল—হুজুর, ওই মোহনপুরা জঙ্গলে বুনো মহিষ শিকার করতে আমি একবার টাঁড়বারো দেখি।

মনে পড়িল, গনু মাহাতো একবার এই টাঁড়বারোর কথা বলিয়াছিল বটে। বলিলাম—ব্যাপারটা কি?

—হুজুর, সে অনেক দিনের কথা। কুশী নদীর পুল তখনও তৈরি হয় নি। কাটারিয়ায় জোড়া খেয়া ছিল, গাড়ির প্যাসেঞ্জার খেয়ায় মালসুদ্ধ পারাপার হত। আমরা তখন ঘোড়ার নাচ নিয়ে খুব উন্মত্ত, আমি আর ছাপরার ছট্টু সিং। ছট্টু সিং হরিহরছত্র মেলা থেকে ঘোড়া নিয়ে আসত, আমরা দুজন সেই সব ঘোড়াকে নাচ শেখাতাম, তারপর বেশি দামে বিক্রী করতাম। ঘোড়ার নাচ দু-রকম, জমৈতি আর ফনৈতি। জমৈতিতে যে-সব ঘোড়ার তালিম বেশি, তারা বেশি দামে বিক্রী হয়। ছট্টু সিং ছিল জমৈতি নাচ শেখাবার ওস্তাদ। দুজনে তিন-চার বছরে অনেক টাকা করেছিলাম।

একবার ছট্টু সিং পরামর্শ দিলে ঢোলবাজ্যা জঙ্গলে লাইসেন্স নিয়ে বুনো মহিষ ধরে ব্যবসা

করতে। সব ঠিকঠাক হল, ঢোলবাজ্যা দ্বারভাঙ্গা মহারাজের রিজার্ভ ফরেস্ট। আমরা কিছু টাকা খাইয়ে বনের আমলাদের কাছ থেকে পারমিট্ আনালাম। তারপর ক'দিন ধরে ঘন জঙ্গলের মধ্যে বুনো মহিষের যাতায়াতের পথের সন্ধান করে বেড়াই। অত বড় বন হুজুর, একটা বুনো মহিষের দেখা যদি কোন দিন মেলে! শেষে এক বুনো সাঁওতাল লাগালাম। সে একটা বাঁশবনের তলা দেখিয়ে বললে, গভীর রাত্রে এই পথ দিয়ে বুনো মহিষের জেরা (দল) জল খেতে যাবে। সেই পথের মধ্যে গভীর খানা কেটে তার ওপর বাঁশ ও মাটি বিছিয়ে ফাঁদ তৈরি করলাম। রাত্রে মহিষের জেরা যেতে গিয়ে গর্তের মধ্যে পড়বে।

সাঁওতালটা দেখে-শুনে বললে—কিন্তু সব করছিস বটে তোরা, একটা কথা আছে। ঢোলবাজ্যা জঙ্গলের বুনো মহিষ তোরা মারতে পারবি নে। এখানে টাঁড়বারো আছে।

আমরা তো অবাক্। টাঁড়বারো কি?

সাঁওতাল বুড়ো বললে—টাঁড়বারো হ'ল বুনো মহিষের দলের দেবতা। সে একটাও বুনো মহিষের ক্ষতি করতে দেবে না।

ছটু সিং বললে—ওসব ঝুট্ কথা। আমার মানি নে। আমরা রাজপুত, সাঁওতাল নই।

তারপর কি হ'ল শুনলে অবাক হয়ে যাবেন হুজুর। এখনও ভাবলে আমার গায়ে কাঁটা দেয়। গহিন রাতে আমরা নিকটেই একটা বাঁশঝাড়ের আড়ালে অন্ধকারে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছি, বুনো মহিষের দলের পায়ের শব্দ শুনলাম, তারা এদিকে আসছে। ক্রমে তারা খুব কাছে এল, গর্ত থেকে পঞ্চাশ হাতের মধ্যে। হঠাৎ দেখি গর্তের ধারে, গর্তের দশ হাত দূরে এক দীর্ঘাকৃতি কালোমত পুরুষ নিঃশব্দে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এত লম্বা সে-মূর্তি, যেন মনে হল বাঁশঝাড়ের আগায় ঠেকেছে। বুনো মহিষের দল তাকে দেখে থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল, তারপর ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক ওদিক পালাল, ফাঁদের ত্রিসীমানাতে এল না একটাও। বিশ্বাস করুন আর না করুন, নিজের চোখে দেখা।

তারপর আরও দু-একজন শিকারীকে কথাটা জিজ্ঞেস করেছি, তারা আমাদের বললে, ও-জঙ্গলে বুনো মহিষ ধরবার আশা ছাড়। টাঁড়বারো একটা মহিষও মারতে ধরতে দেবে না। আমাদের টাকা দিয়ে পারমিট্ আনানো সার হ'ল, একটা বুনো মহিষও সেবার ফাঁদে পড়ল না।

দশরথ ঝাণ্ডাওয়ালার গল্প শেষ হইলে লবটুলিয়ার পাটোয়ারীও বলিল—আমরাও ছেলেবেলা থেকে টাঁড়বারোর গল্প শুনে আসছি। টাঁড়বারো বুনো মহিষের দেবতা—বুনো মহিষের দল বেঘোরে প'ড়ে প্রাণ না হারায়, সেদিকে তাঁর সর্বদা দৃষ্টি।

গল্প সত্য কি মিথ্যা আমার সে-সব দেখিবার আবশ্যক ছিল না, আমি গল্প শুনিতে শুনিতে অন্ধকার আকাশে জ্যোতির্ময় খড়্গধারী কালপুরুষের দিকে চাহিতাম, নিস্তব্ধ ঘন বনানীর উপর অন্ধকার আকাশ উপুড় হইয়া পড়িয়াছে, দূরে কোথায় বনের মধ্যে বন্য কুক্কুট ডাকিয়া উঠিল, অন্ধকার ও নিঃশব্দ আকাশ, অন্ধকার ও নিঃশব্দ পৃথিবী শীতের রাত্রে পরস্পরের কাছাকাছি আসিয়া কি যেন কানাকানি করিতেছে—অনেক দূরে মোহনপুরা অরণ্যের কালো সীমারেখার দিকে চাহিয়া এই অশ্রুতপূর্ব বনদেবতার কথা মনে হইয়া শরীর যেন শিহরিয়া উঠিত। এই সব গল্প শুনিতে ভাল লাগে, এই রকম নির্জন অরণ্যের মাঝখানে ঘন শীতের রাত্রে এই রকম আগুনের ধারেই বসিয়া।

দশম পরিচ্ছেদ

১

পনেরো দিন এখানে একেবারে বন্য-জীবন যাপন করিলাম, যেমন থাকে গাঙ্গোতারা কি গরিব ভুঁইহার বামুনরা। ইচ্ছা করিয়া নয়, অনেকটা বাধ্য হইয়াই থাকিতে হইল এ ভাবে। এ জঙ্গলে কোথা হইতে কি আনাইব? খাই ভাত ও বন-ধুঁধুলের তরকারি, বনের কাঁকরোল কি মিষ্টি আলু তুলিয়া আনে সিপাহীরা, তাই ভাজা বা সিদ্ধ। মাছ দুধ ঘি—কিছু নাই।

অবশ্য বনে সিল্লি ও ময়ূরের অভাব ছিল না, কিন্তু পাখী মারিতে তেমন যেন মন সরে না বলিয়া বন্দুক থাকা সত্ত্বেও নিরামিষই খাইতে হইত।

ফুলকিয়া বইহারে বাঘের ভয় আছে। একদিনের ঘটনা বলি।

হাড়ভাঙা শীত সেদিন। রাত দশটার পরে কাজকর্ম মিটাইয়া সকাল সকাল শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছি, হঠাৎ কত রাত্রে জানি না, লোকজনের চিৎকারে ঘুম ভাঙিল। জঙ্গলের ধারের কোনো জায়গায় অনেকগুলি লোক জড়ো হইয়া চিৎকার করিতেছে। উঠিয়া তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিলাম। আমার সিপাহীরা পাশের খুপরি হইতে বাহির হইয়া আসিল। সবাই মিলিয়া ভাবিতেছি ব্যাপারটা কি, এমন সময়ে একজন লোক ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বলিল—ম্যানেজারবাবু, বন্দুকটা নিয়ে শীগগির চলুন—বাঘে একটা ছোট ছেলে নিয়ে গিয়েছে খুপরি থেকে।

জঙ্গলের ধার হইতে মাত্র দু-শ' হাত দূরে ফসলের ক্ষেতের মধ্যে ডোমন বলিয়া একজন গাঙ্গোতা প্রজার একখানা খুপরি। তাহার স্ত্রী ছ-মাসের শিশু লইয়া খুপরির মধ্যে শুইয়াছিল—অসম্ভব শীতের দরুন খুপরির মধ্যেই আগুন জ্বালানো ছিল এবং ধোঁয়া বাহির করিয়া দিবার জন্য ঝাঁপটা একটু ফাঁক ছিল। সেই পথে বাঘ ঢুকিয়া ছেলেটিকে লইয়া পলাইয়াছে।

কি করিয়া জানা গেল বাঘ? শিয়ালও তো হইতে পারে। কিন্তু ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়া আর কোন সন্দেহ রহিল না, ফসলের ক্ষেতের নরম মাটিতে স্পষ্ট বাঘের থাবার দাগ।

আমার পাটোয়ারী ও সিপাহীরা মহালের অপবাদ রটিতে দিতে চায় না, তাহারা জোর গলায় বলিতে লাগিল—এ আমাদের বাঘ নয় হুজুর, এ মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের বাঘ। দেখুন না কত বড় থাবা!

যাহাদেরই বাঘ হউক, তাহাতে বড় কিছু আসে যায় না। বলিলাম, সব লোক জড়ো কর, মশাল তৈরি কর—চল জঙ্গলের মধ্যে দেখি। সেই রাত্রে অত বড় বাঘের পায়ের সদ্য থাবা দেখিয়া ততক্ষণ সকলেই ভয়ে কাঁপিতে শুরু করিয়াছে—জঙ্গলের মধ্যে কেহ যাইতে রাজী নয়। ধমক ও গালমন্দ দিয়া জন-দশেক লোক জুটাইয়া মশাল-হাতে টিন পিটাইতে পিটাইতে সবাই মিলিয়া জঙ্গলের নানা স্থানে বৃথা অনুসন্ধান করা গেল।

পরদিন বেলা দশটার সময় মাইল-দুই দূরে দক্ষিণপূর্ব কোণের ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটা বড় আসান-গাছের তলায় শিশুটির রক্তাক্ত দেহাবশেষ আবিষ্কৃত হইল।

কৃষ্ণপক্ষের কি ভীষণ অন্ধকার রাত্রিগুলিই নামিল তাহার পরে!

সদর কাছারি হইতে বাঁকে সিং জমাদারকে আনাইলাম। বাঁকে সিং শিকারী, বাঘের গতিবিধির অভ্যাস তার ভালই জানা। সে বলিল, হুজুর, মানুষখেকো বাঘ বড় ধূর্ত হয়। আর ক'টা লোক মরবে। সাবধান হয়ে থাকতে হবে।

ঠিক তিনদিন পরেই বনের ধারে সন্ধ্যার সময় একটা রাখালকে বাঘে লইয়া গেল। ইহার পর লোকে ঘুম বন্ধ করিয়া দিল। রাত্রে এক অপরূপ ব্যাপার! বিস্তীর্ণ বইহারের বিভিন্ন খুপরি হইতে সারা রাত টিনের ক্যানেস্ত্রা পিটাইতেছে, মাঝে মাঝে কাশের ডাঁটার আঁটি জ্বালাইয়া আগুন করিয়াছে, আমি ও বাঁকে সিং প্রহরে প্রহরে বন্দুকের দ্যাওড় করিতেছি। আর শুধুই কি বাঘ? ইহার মধ্যে একদিন মোহনপুরা ফরেস্ট হইতে বন্য মহিষের দল বাহির হইয়া অনেকখানি ক্ষেতের ফসল তচনচ করিয়া দিল।

আমার কাশের খুপরির দরজার কাছেই সিপাহীরা খুব আগুন করিয়া রাখিয়াছে। মাঝে মাঝে উঠিয়া তাহাতে কাঠ ফেলিয়া দিই। পাশের খুপরিতে সিপাহীরা কথাবার্তা বলিতেছে—খুপরির মেঝেতেই শুইয়া আছি, মাথার কাছের ঘুলঘুলি দিয়া দেখা যাইতেছে ঘন অন্ধকারে-ঘেরা বিস্তীর্ণ প্রান্তর, দূরে ক্ষীণ তারার আলোয় পরিদৃশ্যমান জঙ্গলের আবছায়া সীমারেখা। অন্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়া মনে হইল, যেন মৃত নক্ষত্রলোক হইতে তুষারবর্ষী হিমবাতাস তরঙ্গ তুলিয়া ছুটিয়া আসিতেছে পৃথিবীর দিকে—লেপ-তোশক হিমে ঠাণ্ডা জল হইয়া গিয়াছে, আগুন নিবিয়া আসিতেছে, কি দুরন্ত শীত! আর সেই সঙ্গে উন্মুক্ত প্রান্তরের অবাধ হু-হু তুষারশীতল নৈশ হাওয়া!

কিন্তু কি করিয়া থাকে এখানকার লোকেরা এই শীতে, এই আকাশের তলায় সামান্য কাশের খুপরির ঠাণ্ডা মেঝের উপর কি করিয়া রাত্রি কাটায়? তাহার উপর ফসল চৌকি দিবার এই কষ্ট, বন্য মহিষের উপদ্রব, বন্য-শূকরের উপদ্রব কম নয়—বাঘও আছে। আমাদের বাংলা দেশের চাষীরা কি এত কষ্ট করিতে পারে? অত উর্বর জমিতে, অত নিরুপদ্রব গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে ফসল করিয়াও তাহাদের দুঃখ ঘোচে না।

আমার ঘরের দু-তিন-শ হাত দূরে দক্ষিণ ভাগলপুর হইতে আগত জনকতক কাটুনি মজুর স্ত্রী-পুত্র লইয়া ফসল কাটিতে আসিয়াছে। একদিন সন্ধ্যায় তাহাদের খুপরির কাছ দিয়া আসিবার সময় দেখি কুঁড়ের সামনে বসিয়া সবাই আগুন পোহাইতেছে।

এদের জগৎ আমার কাছে অনাবিষ্কৃত, অজ্ঞাত। ভাবিলাম, সেটা দেখি না কেমন!

গিয়া বলিলাম—বাবাজী, কি করা হচ্ছে?

একজন বৃদ্ধ ছিল দলে, তাহাকেই এই সম্বোধন। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমায় সেলাম করিল, বসিয়া আগুন পোহাইতে অনুরোধ করিল। ইহা এদেশের প্রথা। শীতকালে আগুন পোহাইতে আহ্বান করা ভদ্রতার পরিচয়।

গিয়া বসিলাম। খুপরির মধ্যে উঁকি দিয়া দেখি বিছানা বা আসবাবপত্র বলিতে ইহাদের কিছু নাই। কুঁড়েঘরের মেঝেতে মাত্র কিছু শুকনো ঘাস বিছানো। বাসনকোসনের মধ্যে খুব বড় একটা কাঁসার জামবাটি আর একটা লোটা। কাপড় যার যা পরনে আছে—আর এক টুকরা বস্ত্রও বাড়তি নাই। কিন্তু তাহা তো হইল, এই নিদারুণ শীতে ইহাদের লেপ-কাঁথা কই? রাত্রে গায়ে দেয় কি?

কথাটা জিজ্ঞাসা করিলাম।

বৃদ্ধের নাম নক্‌ছেদী ভকত। জাতি গাঙ্গোতা। সে বলিল—কেন, খুপরির কোণে ঐ যে কলাইয়ের ভূষি দেখছেন না রয়েছে টাল করা?

বুঝিতে পারিলাম না। কলাইয়ের ভূষির আগুন করা হয় রাত্রে?

নক্‌ছেদী আমার অজ্ঞতা দেখিয়া হাসিল।

—তা নয় বাবুজী। কলাইয়ের ভূষির মধ্যে ঢুকে ছেলেপিলেরা শুয়ে থাকে, আমরাও কলাইয়ের ভূষি গায়ে চাপা দিয়ে শুই। দেখছেন না, অন্তত পাঁচ মণ ভূষি মজুত রয়েছে। ভারী ওম্ কলাইয়ের ভূষিতে। দুখানা কম্বল গায়ে দিলেও অমন ওম্ হয় না। আর আমরা পাবই বা কোথায় কম্বল বলুন না?

বলিতে বলিতে একটা ছোট ছেলেকে ঘুম পাড়াইয়া তাহার মা খুপরির কোণের ভূষির গাদার মধ্যে তাহার পা হইতে গলা পর্যন্ত ঢুকাইয়া কেবলমাত্র মুখখানা বাহির করিয়া শোওয়াইয়া রাখিয়া আসিল। মনে মনে ভাবিলাম, মানুষে মানুষের খোঁজ রাখে কতটুকু? কখনও কি জানিতাম এসব কথা? আজ যেন সত্যিকার ভারতবর্ষকে চিনিতেছি।

অগ্নিকুণ্ডের অপর পার্শ্বে বসিয়া একটি মেয়ে কি রাঁধিতেছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—ও কি রান্না হচ্ছে?

নক্ছেদী বলিল—ঘাটো।

—ঘাটো কি জিনিস?

এবার বোধ হয় রন্ধনরতা মেয়েটি ভাবিল, এ বাংগালী বাবু সন্ধ্যাবেলা কোথা হইতে আসিয়া জুটিল। এ দেখিতেছি নিতান্ত বাতুল। কিছুই খোঁজ রাখে না দুনিয়ার। সে খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল—ঘাটো জানো না বাবুজী? মকাই-সেদ্ধ। যেমন চাল সেদ্ধ হ'লে বলে ভাত, মকাই সেদ্ধ করলে বলে ঘাটো।

মেয়েটি আমার অজ্ঞতার প্রতি কৃপাবশত কাঠের খুন্তির আগায় উক্ত দ্রব্য একটুখানি হাঁড়ি হইতে তুলিয়া দেখাইল।

—কি দিয়ে খায়?

এবার হইতে যত কথাবার্তা মেয়েটিই বলিল। হাসি-হাসি মুখে বলিল—নুন দিয়ে, শাক দিয়ে—আবার কি দিয়ে খাবে বল না!

—শাক রান্না হয়েছে?

—ঘাটো নামিয়ে শাক চড়াব। মটরশাক তুলে এনেছি।

মেয়েটি খুবই সপ্রতিভ। জিজ্ঞাসা করিল—কলকাতায় থাকো বাবুজী?

—হ্যাঁ।

—কি রকম জায়গা? আচ্ছা, কলকাতায় নাকি গাছ নাই? ওখানকার সব গাছপালা কেটে ফেলেছে?

—কে বললে তোমায়?

—একজন ওখানে কাজ করে আমাদের দেশের। সে একবার বলেছিল। কি রকম জায়গা দেখতে বাবুজী?

এই সরলা বন্য মেয়েটিকে যতদূর সম্ভব বুঝাইবার চেষ্টা পাইলাম আধুনিক যুগের একটা বড় শহরের ব্যাপারখানা কি। কতদূর বুঝিল জানি না, বলিল—কলকাতা শহর দেখতে ইচ্ছে হয়—কে দেখাবে?

তাহার পর আরও অনেক কথা বলিলাম তাহার সঙ্গে। রাত বাড়িয়া গিয়াছে, অন্ধকার ঘন হইয়া আসিল। উহাদের রান্না শেষ হইয়া গেল। খুপরির ভিতর হইতে সেই বড় জামবাটিটা আনিয়া তাহাতে ফেন-ভাতের মত জিনিসটা ঢালিল। উপর উপর একটু নুন ছড়াইয়া বাটিটা মাঝখানে রাখিয়া ছেলেমেয়েরা সবাই মিলিয়া চারিদিকে গোল হইয়া বসিয়া খাইতে আরম্ভ করিল।

আমি বলিলাম—তোমরা এখান থেকে বুঝি দেশে ফিরবে?

নক্‌ছেদী বলিল—দেশে এখন ফিরতে অনেক দেরি। এখান থেকে ধরমপুর অঞ্চলে ধান কাটতে যাব—ধান তো এদেশে হয় না—ওখানে হয়। ধান কাটার কাজ শেষ হ'লে আবার যাব গম কাটতে মুঙ্গের জেলায়। গমের কাজ শেষ হ'তে জ্যৈষ্ঠ মাস এসে পড়বে ; তখন আবার খেড়ী কাটা শুরু হবে আপনাদেরই এখানে। তার পর কিছুদিন ছুটি। শ্রাবণ-ভাদ্রে আবার মকাই ফসলের সময় আসবে। মকাই শেষ হলেই কলাই এবং ধরমপুর-পূর্ণিয়া অঞ্চলে কার্তিকশাল ধান। আমরা সারা বছর এই রকম দেশে দেশেই ঘুরে বেড়াই। যেখানে যে সময়ে যে ফসল, সেখানে যাই। নইলে খাব কি?

—বাড়ি-ঘর বলে তোমাদের কিছু নেই?

এবার মেয়েটি কথা বলিল। মেয়েটির বয়স চব্বিশ-পঁচিশ, খুব স্বাস্থ্যবতী, বার্নিশকরা কালো রং, নিটোল গড়ন। কথাবার্তা বেশ বলিতে পারে, আর গলার সুরটা দক্ষিণ-বিহারের দেহাতী হিন্দীতে বড় চমৎকার শোনায়।

বলিল—কেন থাকবে না বাবুজী? সবই আছে। কিন্তু সেখানে থাকলে আমাদের তো চলে না। সেখানে যাব গরমকালের শেষে, শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত থাকব। তার পর আবার বেরুতে হবে বিদেশে—বিদেশেই যখন আমাদের চাকরি। তা ছাড়া বিদেশে কত কি মজা দেখা যায়—এই দেখবেন ফসল কাটা হয়ে গেলে আপনাদের এখানেই কত দেশ থেকে কত লোক আসবে। কত বাজিয়ে, গাইয়ে, নাচনেওয়ালী, কত বহুরূপী সং—আপনি বোধ হয় দেখেন নি এসব? কি ক'রে দেখবেন, আপনাদের এ অঞ্চলে তো ঘোর জঙ্গল হয়ে প'ড়ে ছিল—সবে এইবার চাষ হয়েছে। এই দেখুন না আসে আর পনের দিনের মধ্যেই। এই তো সবারই রোজগারের সময় আসছে।

চারিদিক নির্জন। দূরের বস্তিতে কারা টিন পিটাইতেছে অন্ধকারের মধ্যে। মনে ভাবিলাম, এই অর্গলহীন কাশডাঁটার বেড়ার আগড়-দেওয়া কুঁড়েতে ইহারা রাত কাটাইবে এই শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের ধারে, ছেলেপুলে লইয়া—সাহসও আছে বলিতে হইবে। এই তো মাত্র দিন-কয়েক আগে এদেরই মত আর একটা খুপরি হইতে বাঘে ছেলে লইয়া গিয়াছে মায়ের কোল হইতে—এদেরই বা ভরসা কিসের? অথচ একটা ব্যাপার দেখিলাম, ইহারা যেন ব্যাপারটা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতেছে না। তত সন্ত্রস্ত ভাবও নাই। এই তো এত রাত পর্যন্ত উন্মুক্ত আকাশের তলায় বসিয়া গল্পগুজব, রান্নাবান্না করিল। বলিলাম—তোমরা একটু সাবধানে থাকবে। মানুষ-খেকো বাঘ বেরিয়েছে, জান তো? মানুষ-খেকো বাঘ বড় ভয়ানক জানোয়ার, আর বড় ধূর্ত। আগুন রাখো খুপরির সামনে, আর ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়। ঐ তো কাছেই বন, রাত-বেরাতের ব্যাপার—

মেয়েটি বলিল—বাবুজী, ও আমাদের সয়ে গিয়েছে। পূর্ণিয়া জেলায় যেখানে ফি-বছর ধান কাটতে যাই, সেখানে পাহাড় থেকে বুনো হাতি নামে। সে জঙ্গল আরও ভয়ানক। ধানের সময় বিশেষ ক'রে বুনো হাতির দল এসে উপদ্রব করে।

মেয়েটি আগুনের মধ্যে আর কিছু শুক্‌নো বনঝাউয়ের ডাল ফেলিয়া দিয়া সামনের দিকে সরিয়া আসিয়া বসিল।

বলিল—সেবার আমরা অখিলকুচা পাহাড়ের নীচে ছিলাম। একদিন রাত্রে এক খুপরির বাইরে রান্না করছি, চেয়ে দেখি পঞ্চাশ হাত দূরে চার-পাঁচটা বুনো হাতি—কালো কালো

পাহাড়ের মতো দেখাচ্ছে অন্ধকারে—যেন আমাদের খুপরির দিকেই আসছে। আমি ছোট ছেলেটাকে বুকে নিয়ে বড় মেয়েটাকে হাত ধরে রান্না ফেলে খুপরির মধ্যে তাদের রেখে এলাম। কাছে আর কোনো লোকজন নেই, বাইরে এসে দেখি তখন হাতি ক'টা একটু থমকে দাঁড়িয়েছে। ভয়ে আমার গলা কাঠ হয়ে গিয়েছে। হাতিতে খুব দেখতে পায় না তাই রক্ষে—ওরা বাতাসে গন্ধ পেয়ে দূরের মানুষ বুঝতে পারে। তখন বোধ হয় বাতাস অন্য দিকে বইছিল, যাই হোক, তারা অন্য দিকে চলে গেল। ওঃ, সেখানেও এমনি বাবুজী সারারাত টিন পেটায় আর আলো জ্বালিয়ে রাখে হাতির ভয়ে। এখানে বুনো মহিষ, সেখানে বুনো হাতি। ওসব গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে।

রাত বেশি হওয়াতে নিজের বাসায় ফিরিলাম।

দিন পনেরোর মধ্যে ফুলকিয়া বইহারের চেহারা বদলাইয়া গেল। সরিষার গাছ শুকাইয়া মাড়িয়া বীজ বাহির করিবার সঙ্গে সঙ্গে কোথা হইতে দলে দলে নানা শ্রেণীর লোক আসিয়া জুটিতে লাগিল। পূর্ণিয়া, মুঙ্গের, ছাপরা প্রভৃতি স্থান হইতে মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা দাঁড়িপাল্লা ও বস্তা লইয়া আসিল মাল কিনিতে। তাহাদের সঙ্গে কুলির ও গাড়োয়ানের কাজ করিতে আসিল এক দল লোক। হালুইকররা আসিয়া অস্থায়ী কাশের ঘর তুলিয়া মিঠাইয়ের দোকান খুলিয়া সতেজে পুরী, কচৌরি, লাড্ডু, কালাকন্দ্ বিক্রয় করিতে লাগিল। ফিরিওয়ালারা নানা রকম সস্তা ও খেলো মনোহারী জিনিস, কাচের বাসন, পুতুল, সিগারেট, ছিটের কাপড়, সাবান ইত্যাদি লইয়া আসিল।

এ বাদে আসিল রং-তামাশা দেখাইয়া পয়সা রোজগার করিতে কত ধরনের লোক। নাচ দেখাইতে, রামসীতা সাজিয়া ভক্তের পূজা পাইতে, হনুমানজীর সিঁদুরমাখা মূর্তি হাতে পাণ্ডাঠাকুর আসিল প্রণামী কুড়াইতে। এসময় সকলেরই দু-পয়সা রোজগারের সময় এসব অঞ্চলে।

আর বছরও যে জনশূন্য ফুলকিয়া বইহারের প্রান্তর ও জঙ্গল দিয়া, বেলা পড়িয়া গেলে ঘোড়ায় যাইতেও ভয় করিত—এ বছর তাহার আনন্দোৎফুল্ল মূর্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। চারিদিকে বালক-বালিকার হাস্যধ্বনি, কলরব, সস্তা টিনের ভেঁপুর পিঁপিঁ বাজনা, ঝুমঝুমির আওয়াজ, নাচিয়েদের ঘুঙুরের ধ্বনি—সমস্ত ফুলকিয়ার বিরাট প্রান্তর জুড়িয়া যেন একটা বিশাল মেলা বসিয়া গিয়াছে।

লোকসংখ্যাও বাড়িয়া গিয়াছে অত্যন্ত বেশি। কত নূতন খুপরি, কাশের লম্বা চালাঘর চারিদিকে রাতারাতি উঠিয়া গেল। ঘর তুলিতে এখানে কোন খরচ নাই, জঙ্গলে আছে কাশ ও বনঝাউ কি কেঁদ-গাছের গুঁড়ি ও ডাল। শুকনো কাশের ডাঁটার খোলা পাকাইয়া এদেশে একরকম ভারি শক্ত রশি তৈরি করে, আর আছে ওদের নিজেদের শারীরিক পরিশ্রম।

ফুলকিয়ার তহশিলদার আসিয়া জানাইল, এই সব বাহিরের লোক, যাহারা এখানে পয়সা রোজগার করিতে আসিয়াছে, ইহাদের কাছে জমিদারের খাজনা আদায় করিতে হইবে।

বলিল—আপনি রীতিমত কাছারি করুন হুজুর, আমি সব লোক একে একে আপনার কাছে হাজির করাই—আপনি ওদের মাথাপিছু একটা খাজনা ধার্য ক'রে দিন।

কত রকমের লোক দেখিবার সুযোগ পাইলাম এই ব্যাপারে!

সকাল হইতে দশটা পর্যন্ত কাছারি করিতাম, বৈকালে আবার তিনটার পর হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত।

তহশিলদার বলিল—এরা বেশি দিন এখানে থাকবে না, ফসল মাড়াই ও বেচাকেনা শেষ হয়ে গেলেই সব পালাবে। এর আগে এদের পাওনা আদায় ক'রে নিতে হবে।

একদিন দেখিলাম একটি খামারে মাড়োয়ারী মহাজনেরা মাল মাপিতেছে। আমার মনে হইল ইহারা ওজনে নিরীহ প্রজাদের ঠকাইতেছে। আমার পাটোয়ারী ও তহশিলদারদের বলিলাম সমস্ত ব্যবসায়ীর কাঁটা ও দাঁড়ি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে। দু-চারজন মহাজনকে ধরিয়া মাঝে মাঝে আমার সামনে আনিতে লাগিল—তাহারা ওজনে ঠকাইয়াছে, কাহারও দাঁড়ির মধ্যে জুয়াচুরি আছে। সে-সব লোককে মহাল হইতে বাহির করিয়া দিলাম। প্রজাদের এত কষ্টের ফসল আমার মহালে অন্তত কেহ ফাঁকি দিয়া লইতে পারিবে না।

দেখিলাম শুধু মহাজনে নয়, নানা শ্রেণীর লোকে ইহাদের অর্থের ভার লাঘব করিবার চেষ্টায় ওৎ পাতিয়া রহিয়াছে।

এখানে নগদ পয়সার কারবার খুব বেশি নাই। ফিরিওয়ালাদের কাছে কোন জিনিস কিনিলে ইহারা পয়সার বদলে সরিষা দেয়, জিনিসের দামের অনুপাতে অনেক বেশি সরিষা দিয়া দেয়—বিশেষত মেয়েরা। তাহারা নিতান্ত নিরীহ ও সরল, যা-তা বুঝাইয়া তাহাদের নিকট হইতে ন্যায্যমূল্যের চতুর্গুণ ফসল আদায় করা খুবই সহজ।

পুরুষেরাও বিশেষ বৈষয়িক নয়।

তাহারা বিলাতী সিগারেট কেনে, জুতা-জামা কেনে। ফসলের টাকা ঘরে আসিলে ইহাদের ও বাড়ির মেয়েদের মাথা ঘুরিয়া যায়—মেয়েরা ফরমাশ করে রঙিন কাপড়ের, কাচের ও এনামেলের বাসনের, হালুইকরের দোকান হইতে ঠোঙা ঠোঙা লাড্ডু-কচৌরী আসে, নাচ দেখিয়া, গান শুনিয়াই কত পয়সা উড়াইয়া দেয়। ইহার উপর রামজী, হনুমানজীর প্রণামী ও পূজা তো আছেই। তাহার উপরেও আছে জমিদার ও মহাজনের পাইক-পেয়াদারা। দুর্দান্ত শীতে রাত জাগিয়া বন্য-শূকর ও বন্য-মহিষের উপদ্রব হইতে কত কষ্টে ফসল বাঁচাইয়া, বাঘের মুখে, সাপের মুখে নিজেদের ফেলিতে দ্বিধা না করিয়া সারা বছরে ইহাদের যাহা উপার্জন,—এই পনেরো দিনের মধ্যে খুশির সহিত তাহা উড়াইয়া দিতে ইহাদের বাধে না দেখিলাম।

কেবল একটা ভালর দিক দেখা গেল, ইহারা কেহ মদ বা তাড়ি খায় না। গাঙ্গোতা বা ভুঁইয়ার ব্রাহ্মণদের মধ্যে এ-সব নেশার রেওয়াজ নাই—সিদ্ধিটা অনেকে খায়, তাও কিনিতে হয় না, বনসিদ্ধির জঙ্গল হইয়া আছে লবটুলিয়া ও ফুলকিয়ার প্রান্তরে, পাতা ছিঁড়িয়া আনিলেই হইল—কে দেখিতেছে?

একদিন মুনেশ্বর সিং আসিয়া জানাইল, একজন লোক জমিদারের খাজনা ফাঁকি দিবার উদ্দেশ্যে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলাইতেছে—হুকুম হয় তো ধরিয়া আনে।

বিস্মিত হইয়া বলিলাম—পালাচ্ছে কি রকম? দৌড়ে পালাচ্ছে?

—ঘোড়ার মত দৌড়ুচ্ছে হুজুর, এতক্ষণে বড় কুণ্ডী পার হয়ে জঙ্গলের ধারে গিয়ে পৌঁছল।

দুর্বৃত্তকে ধরিয়া আনিবার হুকুম দিলাম।

এক ঘণ্টার মধ্যে চার-পাঁচজন সিপাহী পলাতক আসামীকে আমার সামনে আনিয়া হাজির করিল।

লোকটাকে দেখিয়া আমার মুখে কথা সরিল না। তাহার বয়স ষাটের কম কোনমতেই হইবে বলিয়া আমার তো মনে হইল না—মাথার চুল সাদা, গালের চামড়া কুঞ্চিত হইয়া গিয়াছে, চেহারা দেখিয়া মনে হয় সে কতকাল বুভুক্ষু ছিল, এইবার ফুলকিয়া বইহারের খামারে আসিয়া পেট ভরিয়া খাইতে পাইয়াছে।

শুনিলাম সে নাকি 'ননীচোর নাটুয়া' সাজিয়া আজ কয়দিনে বিস্তর পয়সা রোজগার করিয়াছে, গ্র্যান্ট সাহেবের বটগাছের তলায় একটা খুপরিতে থাকিত, আজ কয়দিন ধরিয়া সিপাহীরা তাহার কাছে খাজনার তাগাদা করিতেছে, কারণ এদিকে ফসলের সময়ও ফুরাইয়া আসিল। আজ তাহার খাজনা মিটাইবার কথা ছিল। হঠাৎ দুপুরের পরে সিপাহীরা খবর পায় সে লোকটা তল্পিতল্পা বাঁধিয়া রওয়ানা হইয়াছে। মুনেশ্বর সিং ব্যাপার কি জানিতে গিয়া দেখে যে আসামী বইহার ছাড়িয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে পূর্ণিয়া অভিমুখে—মুনেশ্বরের হাঁক শুনিয়া সে নাকি দৌড়িতে আরম্ভ করিল। তাহার পরই এই অবস্থা।

সিপাহীদের কথার সত্যতা সম্বন্ধে কিন্তু আমার সন্দেহ জন্মিল। প্রথমত, 'ননীচোর নাটুয়া' মানে যদি বালক শ্রীকৃষ্ণ হয়, তবে ইহার সে সাজিবার বয়স আর আছে কি? দ্বিতীয়ত, এ লোকটা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইতেছিল, এ কথাই বা কি করিয়া সম্ভব!

কিন্তু উপস্থিত সকলেই হলফ করিয়া বলিল—উভয় কথাই সত্য।

তাহাকে কড়া সুরে বলিলাম—তোমার এ দুর্বুদ্ধি কেন হল, জমিদারের খাজনা দিতে হয় জান না? তোমার নাম কি?

লোকটা ভয়ে বাতাসের মুখে তালপাতার মত কাঁপিতেছিল। আমার সিপাহীরা একে চায় তো আরে পায়, ধরিয়া আনিতে বলিলে বাঁধিয়া আনে। তাহারা যে এই বৃদ্ধ নটের প্রতি খুব সদয় ও মোলায়েম ব্যবহার করে নাই ইহার অবস্থা দেখিয়া তাহা বুঝিতে দেরি হইল না।

লোকটা কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, তাহার নাম দশরথ।

—কি জাত? বাড়ি কোথায়?

—আমরা ভুঁইয়ার বাভন হুজুর। বাড়ি মুঙ্গের জেলা—সাহেবপুর কামাল।

—পালাচ্ছিলে কেন?

—কই না, পালাব কেন, হুজুর?

—বেশ, খাজনা দাও।

—কিছুই পাই নি, খাজনা দেব কোথা থেকে? নাচ দেখিয়ে সর্ষে পেয়েছিলাম, তা বেচে ক'দিন পেটে খেয়েছি। হনুমানজীর কিরিয়া।

সিপাহীরা বলিল—সব মিথ্যে কথা। শুনবেন না হুজুর। ও অনেক টাকা রোজগার করেছে। ওর কাছেই আছে। হুকুম করেন তো ওর কাপড়চোপড় সন্ধান করি।

লোকটা ভয়ে হাতজোড় করিয়া বলিল—হুজুর, আমি বলছি আমার কাছে কত আছে।

পরে কোমর হইতে একটা গেঁজে বাহির করিয়া উপুড় করিয়া ঢালিয়া বলিল—এই দেখুন হুজুর, তের আনা পয়সা আছে। আমার কেউ নেই, এই বুড়ো বয়সে কে-ই বা আমায় দেবে? আমি নাচ দেখিয়ে এই ফসলের সময় খামারে খামারে বেড়িয়ে যা রোজগার করি। আবার সেই গমের সময় পর্যন্ত এতেই চালাব, তার এখনও তিন মাস দেরি। যা পাই পেটে দুটো খাই, এই পর্যন্ত। সিপাহীরা বলেছে, আমায় নাকি আট আনা খাজনা দিতে হবে—তা হলে আমার আর রইল মোটে পাঁচ আনা। পাঁচ আনায় তিন মাস কি খাব?

বলিলাম—তোমার হাতে ও পোঁটলাতে কি আছে? বার কর।

লোকটা পোঁটলা খুলিয়া দেখাইল তাহাতে আছে ছোট্ট একখানা টিনমোড়া আরশি, একটা রাংতার মুকুট—ময়ূরপাখা সমেত, গালে মাখিবার রং, গলায় পরিবার পুঁতির মালা ইত্যাদি—কৃষ্ণঠাকুর সাজিবার উপকরণ।

বলিল—দেখুন তবুও বাঁশী নেই হুজুর। একটা টিনের বড় বাঁশী আট আনার কম হবে না। এখানে নলখাগড়ার বাঁশীতে কাজ চালিয়েছি। এরা গাঙ্গোতা জাত, এদের ভুলানো সহজ। কিন্তু আমাদের মুঙ্গের জেলার লোক সব বড় এলেমদার। বাঁশী না হলে হাসবে। কেউ পয়সা দেবে না।

আমি বলিলাম—বেশ, তুমি খাজনা দিতে না পারো, নাচ দেখিয়ে যাও, খাজনার বদলে।

বৃদ্ধ হাতে যেন স্বর্গ পাইয়াছে এমন ভাব দেখাইল। তাহার পর গালেমুখে রং মাখিয়া ময়ূরপাখা মাথায় ঐ বয়সে সে যখন বারো বছরের বালকের ভঙ্গিতে হেলিয়া দুলিয়া হাত নাড়িয়া নাচিতে নাচিতে গান ধরিল—তখন হাসিব কি কাঁদিব স্থির করিতে পারিলাম না।

আমার সিপাহীরা তো মুখে কাপড় দিয়া বিদ্রূপের হাসি চাপিতে প্রাণপণ করিতেছে। তাহাদের চক্ষে 'ননীচোর নাটুয়া'র নাচ এক মারাত্মক ব্যাপারে পরিণত হইল। বেচারীরা ম্যানেজারবাবুর সামনে না পারে প্রাণ খুলিয়া হাসিতে, না পারে দুর্দমনীয় হাসির বেগ সামলাইতে।

সে-রকম অদ্ভুত নাচ কখনও দেখি নাই, ষাট বছরের বৃদ্ধ কখনও বালকের মত অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া কাল্পনিক জননী যশোদার নিকট হইতে দূরে চলিয়া আসিতেছে, কখনও একগাল হাসিয়া সঙ্গী রাখাল বালকগণের মধ্যে চোরা-ননী বিতরণ করিতেছে, যশোদা হাত বাঁধিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া কখনও জোড়-হাতে চোখের জল মুছিয়া খুঁৎ খুঁৎ করিয়া বালকের সুরে কাঁদিতেছে। সমস্ত জিনিস দেখিলে হাসিতে হাসিতে পেটের নাড়ি ছিঁড়িয়া যায়। দেখিবার মত বটে।

নাচ শেষ হইল। আমি হাততালি দিয়া যথেষ্ট প্রশংসা করিলাম।

বলিলাম—এমন নাচ কখনও দেখি নি, দশরথ। বড় চমৎকার নাচো। আচ্ছা তোমার খাজনা মাপ করে দিলাম—আর আমার নিজ থেকে এই দু টাকা বখশিশ দিলাম খুশি হয়ে। ভারি চমৎকার নাচ।

আর দিন-দশ-বারোর মধ্যে ফসল কেনাবেচা শেষ হইয়া গেল, বাড়তি লোক সব যে যার দেশে চলিয়া গেল। রহিল মাত্র যাহারা এখানে জমি চষিয়া বাস করিতেছে তাহারাই। দোকান-পসার উঠিয়া গেল, নাচওয়ালা, ফিরিওয়ালা অন্যত্র রোজগারের চেষ্টায় গেল। কাটুনি জনমজুরের দল এখনও পর্যন্ত ছিল শুধু এই সময়ের আমোদ তামাশা দেখিবার জন্য—এইবার তাহারাও বাসা উঠাইবার যোগাড় করিতে লাগিল।

২

একদিন বেড়াইয়া ফিরিবার সময় আমি আমার পরিচিত সেই নক্‌ছেদী ভকতের খুপরিতে দেখা করিতে গেলাম।

সন্ধ্যার বেশি দেরি নাই, দিগন্তব্যাপী ফুলকিয়া বইহারের পশ্চিম প্রান্তে একেবারে সবুজ বনরেখার মধ্যে ডুবিয়া টক্‌টকে রাঙা প্রকাণ্ড বড় সূর্যটা অস্ত যাইতেছে। এখানকার এই সূর্যাস্তগুলি—বিশেষতঃ এই শীতকালে—এত অদ্ভুত সুন্দর যে এই সময়ে মাঝে মাঝে আমি মহালিখারূপের পাহাড়ে সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে উঠিয়া বিস্ময়জনক দৃশ্যের প্রতীক্ষা করি।

নক্‌ছেদী তাড়াতাড়ি উঠিয়া কপালে হাত দিয়া আমায় সেলাম করিল। বলিল—ও মঞ্চী, বাবুজীকে বসবার একটা কিছু পেতে দে।

নক্‌ছেদীর খুপরিতে একজন প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক আছে, সে যে নক্‌ছেদীর স্ত্রী তাহা অনুমান করা কিছু শক্ত নয়। কিন্তু সে প্রায়ই বাহিরের কাজকর্ম অর্থাৎ কাঠ ভাঙা, কাঠ কাটা, দূরবর্তী

ভীমদাসটোলার পাতকূয়া হইতে জল আনা ইত্যাদি লইয়া থাকে। মঞ্চী সেই মেয়েটি, যে আমাকে বুনো হাতির গল্প বলিয়াছিল। সে আসিয়া শুষ্ক কাশের ডাঁটায় বোনা একখানা চেটাই পাতিয়া দিল।

তার সেই দক্ষিণ-বিহারের দেহাতী 'ছিকাছিকি' বুলির সুন্দর টানের সঙ্গে মাথা দুলাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—কেমন দেখলেন বাবুজী বইহারের মেলা? বলেছিলাম না, কত নাচ-তামাশা-আমোদ হবে, কত জিনিস আসবে, দেখলেন তো? অনেক দিন আসেন নি বাবুজী, বসুন। আমরা যে শীগগির চলে যাচ্ছি।

ওদের খুপরির দোরের কাছে লম্বা আধশুকনো ঘাসের উপর চেটাই পাতিয়া বসিলাম, যাহাতে সূর্যাস্তটা ঠিক সামনাসামনি দেখিতে পাই। চারিদিকের জঙ্গলের গায়ে একটা মৃদু রাঙা আভা পড়িয়াছে, একটা অবর্ণনীয় শান্তি ও নীরবতা বিশাল বইহার জুড়িয়া।

মঞ্চীর কথার উত্তর দিতে বোধ হয় একটু দেরি হইল। সে আবার কি একটা প্রশ্ন করিল, কিন্তু ওর 'ছিকাছিকি' বুলি আমি খুব ভাল বুঝি না, কি বলিল না বুঝিতে পারিয়া অন্য একটা প্রশ্ন দ্বারা সেটা চাপা দিবার জন্য বলিলাম—তোমরা কালই যাবে?

—হ্যাঁ, বাবুজী।

—কোথায় যাবে?

—পূর্ণিয়া কিষণগঞ্জ অঞ্চলে যাব।

পরে বলিল—নাচ-তামাশা কেমন দেখলেন বাবু? বেশ ভাল ভাল লোক গাইয়ে এবার এসেছিল। একদিন ঝল্লুটোলায় বড় বকাইন গাছের তলায় একটা লোক মুখে ঢোলক বাজিয়েছিল, শুনেছিলেন? কি চমৎকার বাবুজী! দেখিলাম মঞ্চী নিতান্ত বালিকার মতই নাচ-তামাশায় আমোদ পায়। এবার কত রকম কি দেখিয়াছে, মহা উৎসাহ ও খুশির সুরে তাহারই বর্ণনা করিতে বসিয়া গেল।

নক্‌ছেদী বলিল—নে নে, বাবুজী কলকাতায় থাকেন, তোর চেয়ে অনেক কিছু দেখেছেন। ও এ-সব বড় ভালবাসে বাবুজী, ওরই জন্যে আমরা এতদিন এখানে রয়ে গেলাম। ও বললে—না, দাঁড়াও, খামারের নাচ-তামাশা, লোকজন দেখে তবে যাব। বড্ড ছেলেমানুষ এখনও!

মঞ্চী যে নক্‌ছেদীর কে হয় তাহা এতদিন জিজ্ঞাসা করি নাই, যদিও ভাবিতাম বৃদ্ধের মেয়েই হইবে। আজ ওর কথায় আমার আর কোনো সন্দেহ রহিল না।

বলিলাম—তোমার মেয়ের বিয়ে দিয়েছ কোথায়?

নক্‌ছেদী আশ্চর্য হইয়া বলিল—আমার মেয়ে! কোথায় আমার মেয়ে হুজুর?

—কেন, এই মঞ্চী তোমার মেয়ে নয়?

আমার কথায় সকলের আগে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল মঞ্চী। নক্‌ছেদীর প্রৌঢ়া স্ত্রীও মুখে আঁচল চাপা দিয়া খুপরির ভিতর ঢুকিল।

নক্‌ছেদী অপমানিত হওয়ার সুরে বলিল—মেয়ে কি হুজুর! ও যে আমার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী!

বলিলাম—ও!

অতঃপর খানিকক্ষণ সবাই চুপচাপ। আমি তো এমন অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম যে, কথা খুঁজিয়া পাই না।

মঞ্চী বলিল—আগুন ক'রে দিই, বড্ড শীত।

শীত সত্যই বড় বেশি। সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন হিমালয় পাহাড় নামিয়া আসে। পূর্ব-আকাশের নীচের দিকটা সূর্যাস্তের আভায় রাঙা, উপরটা কৃষ্ণাভ নীল।

খুপরি হইতে কিছু দূরে একটা শুক্‌নো কাশ-ঝাড়ে মঞ্চী আগুন লাগাইয়া দিতে দশ-বারো ফুট দীর্ঘ ঘাস দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। আমরা জ্বলন্ত কাশঝোপের কাছে গিয়া বসিলাম।

নক্‌ছেদী বলিল—বাবুজী, এখনও ও ছেলেমানুষ আছে, ওর জিনিসপত্র কেনার দিকে বেজায় ঝোঁক। ধরুন এবার প্রায় আট-দশ মন সর্ষে মজুরি পাওয়া গিয়েছিল—তার মধ্যে তিন মণ ও খরচ করে ফেলেছে শখের জিনিসপত্র কেনবার জন্যে। আমি বললাম, গতর-খাটানো মজুরির মাল দিয়ে তুই ওসব কেন কিনিস্? তা মেয়েমানুষ শোনে না। কাঁদে, চোখের জল ফেলে। বলি, তবে কেন্।

মনে ভাবিলাম, তরুণী স্ত্রীর বৃদ্ধ স্বামী, না বলিয়াই বা আর কি উপায় ছিল?

মঞ্চী বলিল—কেন, তোমায় তো বলেছি, গম কাটানোর সময় যখন মেলা হবে, তখন আর কিছু কিনব না। ভালো জিনিসগুলো সস্তায় পাওয়া গেল—

নক্‌ছেদী রাগিয়া বলিল—সস্তা! বোকা মেয়েমানুষ পেয়ে ঠকিয়ে নিয়েছে কেঁয়ে দোকানদার আর ফিরিওয়ালা—সস্তা? পাঁচ সের সর্ষে নিয়ে একখানা চিরুনি দিয়েছে, বাবুজী। আর-বছর তিরাশি রতনগঞ্জের গমের খামারে—

মঞ্চী বলিল—আচ্ছা বাবুজী, নিয়ে আসছি জিনিসগুলো, আপনিই বিচার ক'রে বলুন সস্তা কি না—

কথা শেষ করিয়াই মঞ্চী খুপরির দিকে ছুটিল এবং কাশডাঁটায়-বোনা ডালা-আঁটা একটা ঝাঁপি হাতে করিয়া ফিরিল। তারপর সে ডালা তুলিয়া ঝাঁপির ভিতর হইতে জিনিসগুলি একে একে বাহির করিয়া আমার সামনে সাজাইয়া রাখিতে লাগিল।

—এই দেখুন কত বড় কাঁকই, পাঁচ সের সর্ষের কমে এমনিতরো কাঁকই হয়? দেখেছেন কেমন চমৎকার রং! শৌখীন জিনিস না? আর এই দেখুন একখানা সাবান, দেখুন কেমন গন্ধ, এও নিয়েছে পাঁচ সের সর্ষে। সস্তা কি না বলুন বাবুজী?

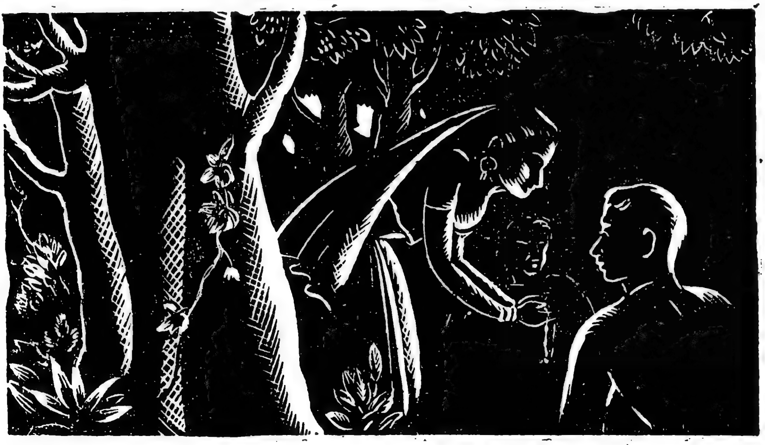

সস্তা মনে করিতে পারিলাম কই? এমন একখানা বাজে সাবানের দাম কলিকাতার বাজারে এক আনার বেশি নয়, পাঁচ সের সর্ষের দাম নয়ালির মুখেও অন্তত সাড়ে-সাত আনা। এই সরলা বন্য মেয়েরা জিনিসপত্রের দাম জানে না, খুবই সহজ এদের ঠকানো।

মঞ্চী আরও অনেক জিনিস দেখাইল। আহ্লাদের সহিত একবার এটা দেখায়, একবার ওটা দেখায়। মাথার কাঁটা, ঝুটো পাথরের আংটি, চীনামাটির পুতুল, এনামেলের ছোট ডিশ, খানিকটা চওড়া লাল ফিতে—এই সব জিনিস। দেখিলাম মেয়েদের প্রিয় জিনিসের তালিকা সব দেশেই সব সমাজেই অনেকটা এক। বন্য মেয়ে মঞ্চী ও তাহার শিক্ষিতা ভগ্নীর মধ্যে বেশি তফাৎ নাই। জিনিসপত্র সংগ্রহ ও অধিকার করার প্রবৃত্তি উভয়েরই প্রকৃতিদত্ত। বুড়ো নক্ছেদী রাগিলে কি হইবে।

কিন্তু সব চেয়ে ভাল জিনিসটি মঞ্চী সর্বশেষে দেখাইবে বলিয়া চাপিয়া রাখিয়া দিয়াছে তাহা কি তখন জানি!

এইবার সে গর্বমিশ্রিত আনন্দের ও আগ্রহের সহিত সেটা বাহির করিয়া আমার সামনে মেলিয়া ধরিল।

একছড়া নীল ও হলদে হিংলাজের মালা।

সত্যি, কি খুশি ও গর্বের হাসি দেখিলাম ওর মুখে! ওর সভ্য বোনেদের মত ও মনের ভাব গোপন করিতে তো শেখে নাই, একটি অনাবিল নির্ভেজাল নারী-আত্মা ওর এই সব সামান্য জিনিসের অধিকারের উচ্ছ্বসিত আনন্দের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে। নারী-মনের এমন স্বচ্ছ প্রকাশ দেখিবার সুযোগ আমাদের সভ্য-সমাজে বড়-একটা ঘটে না।

—বলুন দিকি কেমন জিনিস?

—চমৎকার!

—কত দাম হতে পারে এর বাবুজী? কলকাতায় আপনারা পরেন তো?

কলিকাতায় আমি হিংলাজের মালা পরি না, আমরা কেহই পরি না, তবুও আমার মনে হইল ইহার দাম খুব বেশি হইলেও ছ-আনার বেশি নয়। বলিলাম—কত নিয়েছে বল না?

—সতের সের সর্ষে নিয়েছে। জিতি নি?

বলিয়া লাভ কি যে, সে ভীষণ ঠকিয়াছে। এ-সব জায়গায় এ রকম হইবেই। কেন মিথ্যা আমি নক্ছেদীর কাছে বকুনি খাওয়াইয়া ওর মনের এ অপূর্ব আহ্লাদ নষ্ট করিতে যাইব?

আমারই অনভিজ্ঞতার ফলে এ বছর এমন হইতে পারিয়াছে। আমার উচিত ছিল ফিরিওয়ালাদের জিনিসপত্রের দরের উপর কড়া নজর রাখা। আমি কিন্তু নতুন লোক এখানে, কি করিয়া জানিব এদেশের ব্যাপার? ফসল মাড়িবার সময় মেলা হয়, তাহাই তো জানিতাম না। আগামী বৎসর যাহাতে এমনধারা না ঘটে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পরদিন সকালে নক্ছেদী তাহার দুই-স্ত্রী ও পুত্র-কন্যা লইয়া এখান হইতে চলিয়া গেল। যাইবার পূর্বে আমার খুপরিতে নক্ছেদী খাজনা দিতে আসিল, সঙ্গে আসিল মঞ্চী। দেখি মঞ্চী গলায় সেই হিংলাজের মালাছড়াটি পরিয়া আসিয়াছে। হাসিমুখে বলিল—আবার আসব ভাদ্র মাসে মকাই কাটতে। তখন থাকবেন তো বাবুজী? আমরা জংলী হর্তুকির আচার করি শ্রাবণ মাসে—আপনার জন্যে আনব।

মঞ্চীকে বড় ভাল লাগিয়াছিল, চলিয়া গেলে দুঃখিত হইলাম।

একাদশ পরিচ্ছেদ

১

এবার আমার একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা হইল।

মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের দক্ষিণে মাইল পনেরো-কুড়ি দূরে একটা বিস্তৃত শাল ও বিড়ির পাতার জঙ্গল সেবার কালেক্টরীর নীলামে ডাক হইবে খবর পাওয়া গেল। আমাদের হেড আপিসে তাড়াতাড়ি একটা খবর দিতে তারযোগে আদেশ পাইলাম, বিড়ির পাতার জঙ্গল যেন আমি ডাকিয়া লই।

কিন্তু তাহার পূর্বে জঙ্গলটা একবার আমার নিজের চোখে দেখা আবশ্যক। কি আছে না-আছে না জানিয়া নীলাম ডাকিতে আমি প্রস্তুত নই। এদিকে নীলামের দিনও নিকটবর্তী, 'তার' পাওয়ার পরদিন সকালে রওনা হইলাম।

আমার সঙ্গের লোকজন খুব ভোরে বাক্স-বিছানা ও জিনিসপত্র মাথায় রওনা হইয়াছিল, মোহনপুরা ফরেস্টের সীমানায় কারো নদী পার হইবার সময়ে তাহাদের সহিত দেখা হইল। সঙ্গে ছিল আমাদের পাটোয়ারী বনোয়ারীলাল।

কারো ক্ষীণকায়া পার্বত্য স্রোতস্বিনী—হাঁটুখানেক জল ঝির্‌ঝির্ করিয়া উপলরাশির মধ্য দিয়া প্রবাহিত। আমরা দুজনে ঘোড়া হইতে নামিলাম, নয়ত পিছল পাথরের নুড়িতে ঘোড়া পা হড়কাইয়া পড়িয়া যাইতে পারে। দু-পারে কটা বালির চড়া। সেখানেও ঘোড়ায় চাপা যায় না, হাঁটু পর্যন্ত বালিতে এমনিই ডুবিয়া যায়। অপর পারের কড়ারী জমিতে যখন পৌঁছিলাম, তখন বেলা এগারটা। বনোয়ারী পাটোয়ারী বলিল— এখানে রান্নাবান্না করে নিলে হয় হুজুর, এর পরে জল পাওয়া যায় কি না ঠিক নেই।

নদীর দু-পারেই জনহীন আরণ্যভূমি, তবে বড় জঙ্গল নয়, ছোটখাটো কেঁদ পলাশ ও শালের জঙ্গল—খুব ঘন ও প্রস্তরাকীর্ণ, লোকজনের চিহ্ন কোন দিকে নাই।

আহারাদির কাজ খুব সংক্ষেপে সারিলেও সেখান হইতে রওনা হইতে একটা বাজিয়া গেল।

বেলা যখন যায়-যায়, তখনও জঙ্গলের কূলকিনারা নাই, আমার মনে হইল আর বেশি দূর অগ্রসর না হইয়া একটা বড় গাছের তলায় আশ্রয় লওয়া ভাল। অবশ্য বনের মধ্যে ইহার পূর্বে দুইটি বন্য গ্রাম ছাড়াইয়া আসিয়াছি—একটার নাম কুলপাল, একটার নাম বুরুডি, কিন্তু সে প্রায় বেলা তিনটার সময়। তখন যদি জানা থাকিত যে সন্ধ্যার সময়ও জঙ্গল শেষ হইবে না, তাহা হইলে সেখানেই রাত্রি কাটাইবার ব্যবস্থা করা যাইত।

বিশেষ করিয়া সন্ধ্যার পূর্বে জঙ্গল বড় ঘন হইয়া আসিল। আগে ছিল ফাঁকা জঙ্গল, এখন যেন ক্রমেই চারিদিক হইতে বড় বড় বনস্পতির দল ভিড় করিয়া সরু সুঁড়িপথটা চাপিয়া ধরিতেছে—এখন যেখানে দাঁড়াইয়া আছি, সেখানটাতে তো চারিদিকেই বড় বড় গাছ, আকাশ দেখা যায় না, নৈশ অন্ধকার ইতিমধ্যেই ঘনাইয়া আসিয়াছে।

এক এক জায়গায় ফাঁকা জঙ্গলের দিকে বনের কি অনুপম শোভা! কি এক ধরনের থোকা থোকা সাদা ফুল সারা বনের মাথা আলো করিয়া ফুটিয়া আছে ছায়াগহন অপরাহ্ণের নীল আকাশের তলে। মানুষের চোখের আড়ালে সভ্য জগতের সীমা হইতে বহু দূরে এত সৌন্দর্য

কার জন্য যে সাজানো! বনোয়ারী বলিল—ও বুনো তেউড়ির ফুল, এই সময় জঙ্গলে ফোটে, হুজুর। এক রকমের লতা।

যেদিকে চোখ যায়, সেদিকেই গাছের মাথা, ঝোপের মাথা, ঈষৎ নীলাভ শুভ্র বুনো তেউড়ির ফুল ফুটিয়া আলো করিয়া রহিয়াছে—ঠিক যেন রাশি রাশি পেঁজা নীলাভ কাপাস তুলা কে ছড়াইয়া রাখিয়াছে বনের গাছের মাথায় সর্বত্র। ঘোড়া থামাইয়া মাঝে মাঝে কতক্ষণ ধরিয়া দাঁড়াইয়াছি—এক এক জায়গার শোভা এমনই অদ্ভুত যে সেদিকে চাহিয়া যেন একটা ছন্নছাড়া মনের ভাব হইয়া যায়—যেন মনে হয়, কত দূরে কোথায় আছি, সভ্য জগৎ হইতে বহু দূরে এক জনহীন অজ্ঞাত জগতের উদাস, অপরূপ বন্য সৌন্দর্যের মধ্যে—যে জগতের সঙ্গে মানুষের কোনও সম্পর্ক নাই, প্রবেশের অধিকারও নাই, শুধু বন্য জীবজন্তু, বৃক্ষলতার জগৎ।

বোধ হয় আরও দেরি হইয়া গিয়াছিল আমার এই বার বার জঙ্গলের দৃশ্য হাঁ করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া দেখিবার ফলে। বেচারী বনোয়ারী পাটোয়ারী আমার তাঁবে কাজ করে, সে জোর করিয়া আমায় কিছু বলিতে না পারিলেও মনে মনে নিশ্চয়ই ভাবিতেছে—এ বাঙালী বাবুটির মাথায় নিশ্চয় দোষ আছে! এঁকে দিয়া জমিদারির কাজ আর কত দিন চলিবে? একটি বড় আসান-গাছের তলায় সবাই মিলিয়া আশ্রয় লওয়া গেল। আমরা আছি সবসুদ্ধ আট-দশজন লোক।

বনোয়ারী বলিল—বড় একটা আগুন কর আর সবাই কাছাকাছি ঘেঁষে থাকো। ছড়িয়ে থেকো না, নানা রকম বিপদ এ জঙ্গলে রাত্রিকালে।

গাছের নীচে ক্যাম্প-চেয়ার পাতিয়া বসিয়াছি, মাথার উপর অনেকদূর পর্যন্ত ফাঁকা আকাশ। এখনও অন্ধকার নামে নাই, দূরে নিকটে জঙ্গলের মাথায় বুনো তেউড়ির সাদা ফুল ফুটিয়া আছে রাশি রাশি, অজস্র। আমার ক্যাম্প-চেয়ারের পাশেই দীর্ঘ দীর্ঘ ঘাস আধ-শুকনো, সোনালী রঙের। রোদ-পোড়া মাটির সোঁদা গন্ধ, শুক্‌নো ঘাসের গন্ধ, কি একটা বন-ফুলের গন্ধ, যেন দুর্গা-প্রতিমার রাঙতার ডাকের সাজের গন্ধের মত। মনের মধ্যে এই উন্মুক্ত, বন্য জীবন আনিয়া দিয়াছে একটা মুক্তি ও আনন্দের অনুভূতি—যাহা কোথাও কখনও আসে না, এই রকম বিরাট নির্জন প্রান্তর ও জনহীন অঞ্চল ছাড়া। অভিজ্ঞতা না থাকিলে বলিয়া বোঝানো বড়ই কঠিন সে মুক্ত-জীবনের উল্লাস।

এমন সময় আমাদের এক কুলি আসিয়া পাটোয়ারীর কাছে বলিল, একটু দূরে জঙ্গলের শুষ্ক ডালাপালা কুড়াইতে গিয়া সে একটা কি জিনিস দেখিয়াছে। জায়গাটা ভাল নয়, ভূত বা পরীর আড্ডা, এখানে না তাঁবু ফেলিলেই হইত।

পাটোয়ারী বলিল—চলুন হুজুর, দেখে আসি কি জিনিসটা।

কিছু দূরে জঙ্গলের মধ্যে একটা জায়গা দেখাইয়া কুলিটা বলিল—ঐখানে নিকটে গিয়ে দেখুন হুজুর। আর কাছে যাব না।

বনের মধ্যে কাঁটা-লতা ঝোপ হইতে মাথা উঁচু স্তম্ভের মাথায় একটা বিকট মুখ খোদাই-করা, সন্ধ্যাবেলা দেখিলে ভয় পাইবার কথা বটে।

মানুষের হাতের তৈরি এ-বিষয়ে ভুল নাই, কিন্তু এ জনহীন জঙ্গলের মধ্যে এ স্তম্ভ কোথা হইতে আসিল বুঝিতে পারিলাম না। জিনিসটা কত দিনের প্রাচীন তাহাও বুঝিতে পারিলাম না।

সে-রাত্রি কাটিয়া গেল। সকালে উঠিয়া বেলা ন'টার মধ্যে আমরা গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়া গেলাম।

সেখানে পৌঁছিয়া জঙ্গলের বর্তমান মালিকের জনৈক কর্মচারীর সঙ্গে দেখা হইল। সে আমায় জঙ্গল দেখাইয়া বেড়াইতেছে—হঠাৎ জঙ্গলের মধ্যে একটা শুষ্ক নালার ওপারে ঘন বনের মধ্যে দেখি একটা প্রস্তরস্তম্ভের শীর্ষ জাগিয়া আছে—ঠিক কাল সন্ধ্যাবেলার সেই স্তম্ভটার মত। সেই রকমের বিকট মুখ খোদাই করা।

আমার সঙ্গে বনোয়ারী পাটোয়ারী ছিল, তাহাকেও দেখাইলাম। মালিকের কর্মচারী স্থানীয় লোক, সে বলিল—ও আরও তিন-চারটা আছে এ-অঞ্চলে জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে। এ-দেশে আগে অসভ্য বুনো জাতির রাজ্য ছিল, ও তাদেরই হাতের তৈরি। ওগুলো সীমানার নিশানদিহি খাম্বা।

বলিলাম—খাম্বা কি ক'রে জানলে?

সে বলিল—চিরকাল শুনে আসছি বাবুজী, তা ছাড়া সেই রাজার বংশধর এখনও বর্তমান।

বড় কৌতূহল হইল।

—কোথায়?

লোকটা আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—এই জঙ্গলের উত্তর সীমানায় একটা ছোট বস্তি আছে—সেখানে থাকেন। এ-অঞ্চলে তাঁর বড় খাতির। আমরা শুনেছি উত্তরে হিমালয় পাহাড় আর দক্ষিণে ছোটনাগপুরের সীমানা, পূর্বে কুশী নদী, পশ্চিমে মুঙ্গের—এই সীমানার মধ্যে সমস্ত পাহাড়-জঙ্গলের রাজা ছিল ওঁর পূর্বপুরুষ।

মনে পড়িল, পূর্বেও আমার কাছারিতে একবার গনোরী তেওয়ারী স্কুলমাস্টার গল্প করিয়াছিল বটে যে, এ-অঞ্চলের আদিম-জাতীয় রাজা, তাদের বংশধর এখনও আছে। এ-দিকের যত পাহাড়ী জাতি—তাহাকে এখনও রাজা বলিয়া মানে। এখন সে কথা মনে পড়িল। জঙ্গলের মালিকের সেই কর্মচারীর নাম বুদ্ধু সিং, বেশ বুদ্ধিমান, এখানে অনেককাল চাকুরি করিতেছে, এই সব বন-পাহাড় অঞ্চলের অনেক ইতিহাস সে জানে দেখিলাম।

বুদ্ধু সিং বলিল—মুঘল বাদ্‌শাহের আমলে এরা মুঘল সৈন্যদের সঙ্গে লড়েছে—এই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে তারা যখন বাংলাদেশে যেত—এরা উপদ্রব করত তীর-ধনুক নিয়ে। শেষে রাজমহলে যখন মুঘল সুবাদারেরা থাকতেন, তখন এদের রাজ্য যায়। ভারী বীরের বংশ এরা, এখন আর কিছুই নেই। যা কিছু বাকি ছিল, ১৮৬২ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের পরে সব যায়। সাঁওতাল-বিদ্রোহের নেতা এখনও বেঁচে আছেন। তিনি বর্তমান রাজা। নাম দোবরু পান্না বীরবর্দী। খুব বৃদ্ধ আর খুব গরিব। কিন্তু এ দেশের সকল আদিম জাতি এখনও তাঁকে রাজার সম্মান দেয়। রাজ্য না থাকলেও রাজা বলেই মানে।

রাজার সঙ্গে দেখা করিবার বড়ই ইচ্ছা হইল।

রাজসন্দর্শনে যাইতে হইলে কিছু নজর লইয়া যাওয়া উচিত। যার যা প্রাপ্য সম্মান, তাকে তা না দিলে কর্তব্যের হানি ঘটে।

কিছু ফলমূল, গোটা দুই বড় মুরগী—বেলা একটার মধ্যে নিকটবর্তী বস্তি হইতে কিনিয়া আনিলাম। এ-দিকের কাজ শেষ করিয়া বেলা দুইটার পরে বুদ্ধু সিংকে বলিলাম—চল, রাজার সঙ্গে দেখা করে আসি।

বুদ্ধু সিং তেমন উৎসাহ দেখাইল না! বলিল—আপনি সেখানে কি যাবেন! আপনাদের সঙ্গে দেখা করবার উপযুক্ত নয়। পাহাড়ী অসভ্য জাতদের রাজা, তাই ব'লে কি আর আপনাদের সমান সমান কথা বলবার যোগ্য বাবুজী? সে তেমন কিছু নয়।

তাহার কথা না শুনিয়াই আমি ও বনোয়ারীলাল রাজধানীর দিকে গেলাম। তাহাকেও সঙ্গে লইলাম।

রাজধানীটা খুব ছোট, কুড়ি-পঁচিশ ঘর লোকের বাস।

ছোট ছোট মাটির ঘর, খাপরার চাল—বেশ পরিষ্কার করিয়া লেপাপোঁছা। দেওয়ালের গায়ে মাটির সাপ, পদ্ম, লতা প্রভৃতি গড়া। ছোট ছোট ছেলেরা খেলা করিয়া বেড়াইতেছে, স্ত্রীলোকেরা গৃহকর্ম করিতেছে। কিশোরী ও যুবতী মেয়েদের সুঠাম গড়ন ও নিটোল স্বাস্থ্য, মুখে কেমন সুন্দর একটা লাবণ্য প্রত্যেকেরই। সকলেই আমাদের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

বুদ্ধু সিং একজন স্ত্রীলোককে বলিল—রাজা ছে রে?

স্ত্রীলোকটি বলিল, সে দেখে নাই। তবে কোথায় আর যাইবে, বাড়িতেই আছে।

২

আমরা গ্রামে যেখানে আসিয়া দাঁড়াইলাম, বুদ্ধু সিং-এর ভাবে মনে হইল এইবার রাজপ্রাসাদের সম্মুখে নীত হইয়াছি। অন্য ঘরগুলির সঙ্গে রাজপ্রাসাদের পার্থক্য এই মাত্র লক্ষ করিলাম যে, ইহার চারিপাশ পাথরের পাঁচিলে ঘেরা—বস্তির পিছনেই অনুচ্চ পাহাড়, সেখান হইতেই পাথর আনা হইয়াছে। রাজবাড়িতে ছেলেমেয়ে অনেকগুলি—কতকগুলি খুব ছোট। তাদের গলায় পুঁতির মালা ও নীল ফলের বীজের মালা। দু-একটি ছেলে-মেয়ে দেখিতে বেশ সুশ্রী। ষোল-সতের বছরের একটি মেয়ে বুদ্ধু সিং-এর ডাকে ছুটিয়া বাহিরে আসিয়াই আমাদের দেখিয়া অবাক হইয়া গেল, তাহার চোখের চাহনি দেখিয়া মনে হইল কিছু ভয়ও পাইয়াছে।

বুদ্ধু সিং বলিল—রাজা কোথায়?

—মেয়েটি কে? বুদ্ধু সিংকে জিজ্ঞাসা করিলাম।

বুদ্ধু সিং বলিল—রাজার নাতির মেয়ে।

রাজা বহুদিন জীবিত থাকিয়া নিশ্চয়ই বহু যুবক ও প্রৌঢ়কে রাজসিংহাসনে বসিবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন।

মেয়েটি বলিল—আমার সঙ্গে এস। জ্যাঠামশায় পাহাড়ের নীচে পাথরে বসে আছেন।

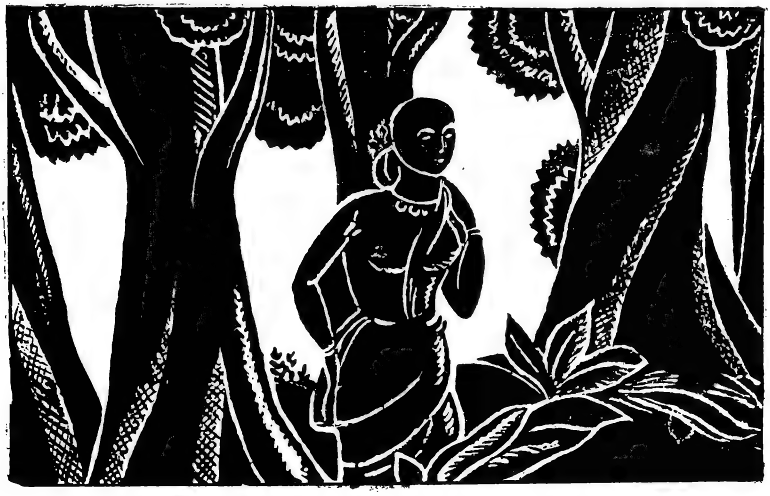

মানি বা নাই মানি, মনে মনে ভাবিলাম যে-মেয়েটি আমাদের পথ দেখাইয়া লইয়া চলিয়াছে, সে সত্যই রাজকন্যা—তাহার পূর্বপুরুষেরা এই আরণ্য-ভূভাগ বহুদিন ধরিয়া শাসন করিয়াছিল—সেই বংশের সে মেয়ে।

বলিলাম—মেয়েটির নাম কি জিজ্ঞেস কর।

বুদ্ধু সিং বলিল—ওর নাম ভান্‌মতী।

বাঃ, বেশ সুন্দর—ভানুমতী! রাজকন্যা ভানুমতী!

ভানুমতী নিটোল স্বাস্থ্যবতী, সুঠাম মেয়ে। লাবণ্যমাখা মুখশ্রী—তবে পরনের কাপড় সভ্যসমাজের শোভনতা রক্ষা করিবার উপযুক্ত প্রমাণ মাপের নয়। মাথায় চুল রুক্ষ, গলায় কড়ি ও পুঁতির দানা। দূর হইতে একটা বড় বকাইন্ গাছ দেখাইয়া দিয়া ভানুমতী বলিল—তোমরা যাও, জ্যাঠামশায় ওই গাছতলায় ব'সে গরু চরাচ্ছেন।

গরু চরাইতেছেন কি রকম! প্রায় চমকিয়া উঠিয়াছিলাম বোধ হয়। এই সমগ্র অঞ্চলের রাজা সাঁওতাল-বিদ্রোহের নেতা দোবরু পান্না বীরবর্দী গরু চরাইতেছেন!

কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই মেয়েটি চলিয়া গেল এবং আমরা আর কিছু অগ্রসর হইয়া বকাইন্ গাছের তলায় এক বৃদ্ধকে কাঁচা শালপাতায় তামাক জড়াইয়া ধূমপানরত দেখিলাম।

বুদ্ধু সিং বলিল—সেলাম, রাজাসাহেব।

রাজা দোবরু পান্না কানে শুনিতে পাইলেও চোখে খুব ভাল দেখিতে পান বলিয়া মনে হইল না।

বলিলেন—কে? বুদ্ধু সিং? সঙ্গে কে?

বুদ্ধু বলিল—একজন বাঙালী বাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। উনি কিছু নজর এনেছেন—আপনাকে নিতে হবে।

আমি নিজে গিয়া বৃদ্ধের সামনে মুরগী ও জিনিস কয়টি নামাইয়া রাখিলাম।

বলিলাম—আপনি দেশের রাজা, আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বহুৎ দূর থেকে এসেছি।

বৃদ্ধের দীর্ঘায়ত চেহারার দিকে চাহিয়া আমার মনে হইল, যৌবনে রাজা দোবরু পান্না খুব সুপুরুষ ছিলেন সন্দেহ নাই। মুখশ্রীতে বুদ্ধির ছাপ সুস্পষ্ট। বৃদ্ধ খুব খুশি হইলেন। আমার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন—কোথায় ঘর?

বলিলাম—কলকাতা।

—উঃ, অনেক দূর। বড় ভারি জায়গা শুনেচি কলকাতা।

—আপনি কখনও যান নি?

—না, আমরা কি শহরে যেতে পারি? এই জঙ্গলেই আমরা থাকি ভাল। বোসো। ভান্‌মতী কোথায় গেল, ও ভান্‌মতী?

মেয়েটি ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বলিল—কি জ্যাঠামশায়?

—এই বাঙালী বাবু ও তাঁর সঙ্গের লোকজন আজ আমার এখানে থাকবেন ও খাওয়া-দাওয়া করবেন।

আমি প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম—না, না, সে কি! আমরা এখুনি চলে যাব, আপনার সঙ্গে দেখা করেই—আমাদের থাকার বিষয়ে—

কিন্তু দোবরু পান্না বলিলেন—না, তা হতে পারে না। ভান্‌মতী, এই জিনিসগুলো নিয়ে যা এখান থেকে।

আমার ইঙ্গিতে বনোয়ারীলাল পাটোয়ারী নিজে জিনিসগুলি বহিয়া অদূরবর্তী রাজার

বাড়িতে লইয়া গেল, ভানুমতীর পিছু পিছু। বৃদ্ধের কথা অমান্য করিতে পারিলাম না, বৃদ্ধের দিকে চাহিয়াই আমার সম্ভ্রমে মন পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সাঁওতাল-বিদ্রোহের নেতা, প্রাচীন অভিজাত-বংশীয় বীর দোবরু পান্না (হইলই বা বন্য আদিম জাতি) আমাকে থাকিতে অনুরোধ করিতেছেন—এ অনুরোধ আদেশেরই সামিল।

রাজা দোবরু পান্না অত্যন্ত দরিদ্র, দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম। তাঁহাকে গরু চরাইতে দেখিয়া প্রথমটা আশ্চর্য হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু পরে মনে ভাবিয়া দেখিলাম, ভারতবর্ষের ইতিহাসে রাজা দোবরু পান্নার অপেক্ষা অনেক বড় রাজা অবস্থাবৈগুণ্যে গোচারণ অপেক্ষাও হীনতর বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

রাজা নিজের হাতে শালপাতার একটা চুরুট গড়িয়া আমার হাতে দিলেন। দেশলাই নাই—গাছের তলায় আগুন করাই আছে—তাহা হইতে একটা পাতা জ্বালাইয়া সম্মুখে ধরিলেন।

বলিলাম—আপনারা এ-দেশের প্রাচীন রাজবংশ, আপনাদের দর্শনে পুণ্য আছে।

দোবরু পান্না বলিলেন—এখন আর কি আছে! আমাদের বংশ সূর্যবংশ। এই পাহাড়-জঙ্গল, সারা পৃথিবী আমাদের রাজ্য ছিল। আমি যৌবন বয়সে কোম্পানির সঙ্গে লড়েছি। এখন আমার বয়স অনেক। যুদ্ধে হেরে গেলাম। তারপর আর কিছু নেই।

এই আরণ্য ভূভাগের বহিঃস্থিত অন্য কোনও পৃথিবীর খবর দোবরু পান্না রাখেন বলিয়া মনে হইল না। তাঁহার কথার উত্তরে কি একটা বলিতে যাইতেছি, এমন সময় একজন যুবক আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল।

রাজা দোবরু বলিলেন—আমার ছোট নাতি, জগরু পান্না। ওর বাবা এখানে নেই, লছমীপুরের রাণী-সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছে। ওরে জগরু, বাবুজীর জন্যে খাওয়ার যোগাড় কর।

যুবক যেন নবীন শালতরু, পেশীবহুল সবল নধর দেহ। সে বলিল—বাবুজী, সজারুর মাংস খান?

পরে তাহার পিতামহের দিকে চাহিয়া বলিল—পাহাড়ের ওপারের বনে ফাঁদ পেতে রেখেছিলাম, কাল রাত্রে দুটো সজারু পড়েছে।

শুনিলাম রাজার তিনটি ছেলে, তাহাদের আট-দশটি ছেলেমেয়ে। এই বৃহৎ রাজপরিবারের সকলেই এই গ্রামে একত্র থাকে। শিকার ও গোচারণ প্রধান উপজীবিকা। এ বাদে বনের পাহাড়ী জাতিদের বিবাদ-বিসংবাদে রাজার কাছে বিচারপ্রার্থী হইয়া আসিলে কিছু কিছু ভেট্ ও নজরানা দিতে হয়—দুধ, মুরগী, ছাগল, পাখীর মাংস বা ফলমূল।

বলিলাম—আপনার চাষবাস আছে?

দোবরু পান্না গর্বের সুরে বলিলেন—ওসব আমাদের বংশে নিয়ম নেই। শিকার করার মান সকলের চেয়ে বড়, তাও এক সময়ে ছিল বর্শা নিয়ে শিকার সব চেয়ে গৌরবের। তীর-ধনুকের শিকার দেবতার কাজে লাগে না, ও বীরের কাজ নয়। তবে এখন সবই চলে। আমার বড় ছেলে মুঙ্গের থেকে একটা বন্দুক কিনে এনেছে, আমি কখনও ছুঁই নি। বর্শা ধ'রে শিকার আসল শিকার।

ভানুমতী আবার আসিয়া একটা পাথরের ভাঁড় আমাদের কাছে রাখিয়া গেল।

রাজা বলিলেন—তেল মাখুন। কাছেই চমৎকার ঝরনা—স্নান করে আসুন সকলে।

আমরা স্নান করিয়া আসিলে রাজা আমাদের রাজবাড়ির একটা ঘরে লইয়া যাইতে বলিলেন।

ভানুমতী একটা ধামায় চাল ও মেটে আলু আনিয়া দিল। জগরু সজারু ছাড়াইয়া মাংস আনিয়া রাখিল কাঁচা শালপাতার পাত্রে।

ভানুমতী আর একবার গিয়া দুধ ও মধু আনিল। আমার সঙ্গে ঠাকুর ছিল না, বনোয়ারী মেটে আলু ছাড়াইতে বসিল, আমি রাঁধিবার চেষ্টায় উনুন ধরাইতে গেলাম। কিন্তু শুধু বড় বড় কাঠের সাহায্যে উনুন ধরানো কষ্টকর। দু-একবার চেষ্টা করিয়া পারিলাম না, তখন ভানুমতী তাড়াতাড়ি একটা পাখীর শুক্‌নো বাসা আনিয়া উনুনের মধ্যে পুরিয়া দিতে আগুন বেশ জ্বলিয়া উঠিল। দিয়াই দূরে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইল। ভানুমতী রাজকন্যা বটে, কিন্তু বেশ অমায়িক স্বভাবের রাজকন্যা। অথচ দিব্য সহজ, সরল মর্যাদাজ্ঞান।

রাজা দোবরু পান্না সব সময় রান্নাঘরের দুয়ারটির কাছে বসিয়া রহিলেন। আতিথ্যের এতটুকু ত্রুটি না ঘটে। আহারাদির পর বলিলেন—আমার তেমন বেশি ঘরদোরও নেই, আপনাদের বড় কষ্ট হল। এই বনের মধ্যে পাহাড়ের উপরে আমার বংশের রাজাদের প্রকাণ্ড বাড়ির চিহ্ন এখনও আছে। আমি বাপ-ঠাকুর্দার কাছে শুনেছি বহু প্রাচীনকালে ওখানে আমার পূর্ব-পুরুষেরা বাস করতেন। সেদিন কি আর এখন আছে! আমাদের পূর্ব-পুরুষদের প্রতিষ্ঠিত দেবতা এখনও সেখানে আছেন।

আমার বড় কৌতূহল হইল, বলিলাম—যদি আমরা একবার দেখতে যাই, তাতে কি কোনও আপত্তি আছে রাজাসাহেব?

—এর আবার আপত্তি কি! তবে দেখবার এখন বিশেষ কিছু নেই। আচ্ছা চলুন, আমি যাব। জগরু, আমাদের সঙ্গে এস।

আমি আপত্তি করিলাম—বিরানব্বই বছরের বৃদ্ধকে আর পাহাড়ে উঠাইবার কষ্ট দিতে মন সরিল না। সে আপত্তি টিকিল না, রাজাসাহেব হাসিয়া বলিলেন—ও পাহাড়ে আমায় তো প্রায়ই উঠতে হয়, ওর গায়েই আমার বংশের সমাধিস্থান। প্রত্যেক পূর্ণিমায় আমায় সেখানে যেতে হয়। চলুন সে-জায়গাও দেখাব।

উত্তর-পূর্ব কোণ হইতে অনুচ্চ শৈলমালা (স্থানীয় নাম ধন্‌ঝরি) এক স্থানে আসিয়া যেন হঠাৎ ঘুরিয়া পূর্বমুখী হওয়ার দরুন একটা খাঁজের সৃষ্টি করিয়াছে, এই খাঁজের নীচে একটা উপত্যকা, শৈলসানুর অরণ্য সারা উপত্যকা ব্যাপিয়া যেন সবুজের ঢেউয়ের মত নামিয়া আসিয়াছে, যেমন ঝরনা নামে পাহাড়ের গা বাহিয়া। অরণ্য এখানে ঘন নয়, ফাঁকা ফাঁকা—বনের গাছের মাথায় মাথায় সুদূর চক্রবালরেখায় নীল শৈলমালা, বোধ হয় গয়া কি রামগড়ের দিকের—যতদূর দৃষ্টি চলে শুধুই বনের শীর্ষ, কোথাও উঁচু, বড় বড় বনস্পতিসঙ্কুল, কোথাও নীচু, চারা শাল ও চারা পলাশ। জঙ্গলের মধ্যে সরু পথ বাহিয়া পাহাড়ের উপর উঠিলাম।

এক জায়গায় খুব বড় পাথরের চাঁই আড়ভাবে পোঁতা, ঠিক যেন একখানা পাথরের কড়ি বা ঢেঁকির আকারের। তার নীচে কুম্ভকারদের হাঁড়ি-কলসী পোড়ানো পণ-এর গর্তের মত কিংবা মাঠের মধ্যে খেঁকশিয়ালী যেমন গর্ত কাটে—ওই ধরনের প্রকাণ্ড একটা বড় গর্তের মুখ। গর্তের মুখে চারা শালের বন।

রাজা দোবরু বলিলেন—এই গর্তের মধ্যে ঢুকতে হবে। আসুন আমার সঙ্গে। কোনো ভয় নেই। জগরু, আগে যাও।

প্রাণ হাতে করিয়া গর্তের মধ্যে ঢুকিলাম। বাঘ-ভালুক তো থাকিতেই পারে, না থাকে সাপ তো আছেই।

গর্তের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়া খানিকদূর গিয়া তবে সোজা হইয়া দাঁড়ানো যায়। ভয়ানক অন্ধকার ভিতরে প্রথমটা মনে হয়, কিন্তু চোখ অন্ধকারে কিছুক্ষণ অভ্যস্ত হইয়া গেলে আর তত অসুবিধা হয় না; জায়গাটা প্রকাণ্ড একটা গুহা, কুড়ি-বাইশ হাত লম্বা, হাত পনের

চওড়া—উত্তর দিকের দেওয়ালের গায়ে আবার একটা খেঁকশিয়ালীর মত গর্ত দিয়া খানিক দূর গেলে দেওয়ালের ওপারে ঠিক এই রকম নাকি আর একটা গুহা আছে—কিন্তু সেটাতে আমরা ঢুকিবার আগ্রহ দেখাইলাম না। গুহার ছাদ বেশি উঁচু নয়, একটা মানুষ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া হাত উঁচু করিলে ছাদ ছুঁইতে পারে। চাম্‌সে ধরনের গন্ধ গুহার মধ্যে—বাদুড়ের আড্ডা—এ ছাড়া ভাম, শৃগাল, বনবিড়াল প্রভৃতি থাকে শোনা গেল। বনোয়ারী পাটোয়ারী চুপি চুপি বলিল—হুজুর, চলুন বাইরে, এখানে আর বেশি দেরি করবেন না।

ইহাই নাকি দোবরু পান্নার পূর্বপুরুষদের দুর্গ-প্রাসাদ।

আসলে ইহা একটি বড় প্রাকৃতিক গুহা—প্রাচীনকালে পাহাড়ের উপরদিকে মুখওয়ালা এ গুহায় আশ্রয় লইলে শত্রুর আক্রমণ হইতে সহজে আত্মরক্ষা করা যাইত।

রাজা বলিলেন—এর আর একটা গুপ্ত মুখ আছে—সে কাউকে বলা নিয়ম নয়। সে কেবল আমার বংশের লোক ছাড়া কেউ জানে না। যদিও এখন এখানে কেউ বাস করে না, তবুও এই নিয়ম চলে আসছে বংশে।

গুহাটা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ধড়ে প্রাণ আসিল।

তারপর আরও খানিকটা উঠিয়া এক জায়গায় প্রায় এক বিঘা জমি জুড়িয়া বড় বড় সরু মোটা ঝুরি নামাইয়া, পাহাড়ের মাথায় অনেকখানি ব্যাপিয়া এক বিশাল বটগাছ।

রাজা দোবরু পান্না বলিলেন—জুতো খুলে চলুন মেহেরবানি করে।

বটগাছতলায় যেন চারিধারে বড় বড় বাটনাবাটা শিলের আকারের পাথর ছড়ানো।

রাজা বলিলেন—ইহাই তাঁহার বংশের সমাধিস্থান। এক-একখানা পাথরের তলায় এক-একটা রাজবংশীয় লোকের সমাধি। বিশাল বটতলার সমস্ত স্থান জুড়িয়া সেই রকম বড় বড় শিলাখণ্ড ছড়ানো —কোনো কোনো সমাধি খুবই প্রাচীন, দু'দিক হইতে ঝুরি নামিয়া যেন সেগুলিকে সাঁড়াশির মত আটকাইয়া ধরিয়াছে, সে-সব ঝুরি আবার গাছের গুঁড়ির মত মোটা হইয়া গিয়াছে—কোনো কোনো শিলাখণ্ড ঝুরির তলায় একেবারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। ইহা হইতে সেগুলির প্রাচীনত্ব অনুমান করা যায়।

রাজা দোবরু বলিলেন—এই বটগাছ আগে এখানে ছিল না। অন্য অন্য গাছের বন ছিল। একটি ছোট বটচারা ক্রমে বেড়ে অন্য অন্য গাছ মেরে ফেলে দিয়েছে। এই বটগাছটাই এত প্রাচীন যে, এর আসল গুঁড়ি নেই। ঝুরি নেমে যে গুঁড়ি হয়েছে, তারাই এখন রয়েছে। গুঁড়ি কেটে উপড়ে ফেললে দেখবেন ওর তলায় কত পাথর চাপা পড়ে আছে। এইবার বুঝুন কত প্রাচীন সমাধিস্থান এটা।

সত্যই বটগাছতলাটায় দাঁড়াইয়া আমার মনে এমন একটা ভাব হইল, যাহা এতক্ষণ কোথাও হয় নাই, রাজাকে দেখিয়াও না (রাজাকে তো মনে হইয়াছে জনৈক বৃদ্ধ সাঁওতাল কুলীর মত), রাজকন্যাকে দেখিয়াও নয় (একজন স্বাস্থ্যবতী হো কিংবা মুণ্ডা তরুণীর সহিত রাজকন্যার কোনো প্রভেদ দেখি নাই), রাজপ্রাসাদ দেখিয়া তো নয়ই (সেটাকে একটা সাপখোপের ও ভূতের আড্ডা বলিয়া মনে হইয়াছে)। কিন্তু পাহাড়ের উপরে এই সুবিশাল, প্রাচীন বটতরুতলে কতকালের এই সমাধিস্থল আমার মনে এক অননুভূত, অপরূপ অনুভূতি জাগাইল।

স্থানটির গাম্ভীর্য, রহস্য ও প্রাচীনত্বের ভাব অবর্ণনীয়। তখন বেলা প্রায় হেলিয়া পড়িয়াছে, হলদে রোদ পত্ররাশির গায়ে, ডাল ও ঝুরির অরণ্যের ধন্‌ঝরির অন্য চূড়ায়, দূর বনের মাথায়। অপরাহ্ণের সেই ঘনায়মান ছায়া এই সুপ্রাচীন রাজ-সমাধিকে যেন আরও গম্ভীর, রহস্যময় সৌন্দর্য দান করিল।

মিশরের প্রাচীন সম্রাটদের সমাধিস্থল থিব্‌স নগরের অদূরবর্তী 'ভ্যালি অব্ দি কিংস' আজ পৃথিবীর টুরিস্টদের লীলাভূমি, পাবলিসিটি ও ঢাক-পিটানোর অনুগ্রহে সেখানকার বড় বড় হোটেলগুলি মরশুমের সময় লোকে গিজগিজ করে—'ভ্যালি অব্ দি কিংস' অতীত কালের কুয়াশায় যত না অন্ধকার হইয়াছিল, তার অপেক্ষাও অন্ধকার হইয়া যায় দামী সিগারেট ও চুরুটের ধোঁয়ায়—কিন্তু তার চেয়ে কোনো অংশে রহস্যে ও স্বপ্রতিষ্ঠিত মহিমায় কম নয় সুদূর অতীতের এই অনার্য নৃপতিদের সমাধিস্থল, ঘন অরণ্যভূমির ছায়ায় শৈলশ্রেণীর অন্তরালে যা চিরকাল আত্মগোপন করিয়া আছে ও থাকিবে। এদের সমাধিস্থলে আড়ম্বর নাই, পালিশ নাই, ঐশ্বর্য নাই মিশরীয় ধনী ফ্যারাওদের কীর্তির মত—কারণ এরা ছিল দরিদ্র, এদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছিল মানুষের আদিম যুগের অশিক্ষিতপটু সভ্যতা ও সংস্কৃতি, নিতান্ত শিশু-মানবের মন লইয়া ইহারা রচনা করিয়াছে ইহাদের গুহানিহিত রাজপ্রাসাদ, রাজসমাধি, সীমানাজ্ঞাপক খুঁটি। সেই অপরাহ্ণের ছায়ায় পাহাড়ের উপরে সে বিশাল তরুতলে দাঁড়াইয়া যেন সর্বব্যাপী শাশ্বত কালের পিছন-দিকে বহুদূরে অন্য এক অভিজ্ঞতার জগৎ দেখিতে পাইলাম—পৌরাণিক ও বৈদিক যুগও যার তুলনায় বর্তমানের পর্যায়ে পড়িয়া যায়।

দেখিতে পাইলাম যাযাবর আর্যগণ উত্তর-পশ্চিম গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া স্রোতের মত অনার্য আদিমজাতি-শাসিত প্রাচীন ভারতে প্রবেশ করিতেছেন...ভারতের পরবর্তী যা কিছু ইতিহাস—এই আর্যসভ্যতার ইতিহাস—বিজিত অনার্য জাতিদের ইতিহাস কোথাও লেখা নাই—কিংবা সে লেখা আছে এই সব গুপ্ত গিরিগুহায়, অরণ্যানীর অন্ধকারে, চূর্ণায়মান অস্থি-কঙ্কালের রেখায়। সে লিপির পাঠোদ্ধার করিতে বিজয়ী আর্যজাতি কখনও ব্যস্ত হয় নাই। আজও বিজিত হতভাগ্য আদিম জাতিগণ তেমনই অবহেলিত, অপমানিত, উপেক্ষিত। সভ্যতাদর্পী আর্যগণ তাহাদের দিকে কখনও ফিরিয়া চাহে নাই, তাহাদের সভ্যতা বুঝিবার চেষ্টা করে নাই, আজও করে না। আমি, বনোয়ারী সেই বিজয়ী জাতির প্রতিনিধি, বৃদ্ধ দোবরু পান্না, তরুণ যুবক জগরু, তরুণী কুমারী ভানুমতী সেই বিজিত, পদদলিত জাতির প্রতিনিধি—উভয় জাতি আমরা এই সন্ধ্যার অন্ধকারে মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছি—সভ্যতার গর্বে উন্নতনাসিক আর্যকান্তির গর্বে আমি প্রাচীন অভিজাতবংশীয় দোবরু পান্নাকে বৃদ্ধ সাঁওতাল ভাবিতেছি, রাজকন্যা ভানুমতীকে মুণ্ডা কুলী-রমণী ভাবিতেছি—তাদের কত আগ্রহের ও গর্বের সহিত প্রদর্শিত রাজপ্রাসাদকে অনার্যসুলভ আলো-বাতাসহীন গুহাবাস, সাপ ও ভূতের আড্ডা বলিয়া ভাবিতেছি। ইতিহাসের এই বিরাট ট্র্যাজেডি যেন আমার চোখের সম্মুখে সেই সন্ধ্যায় অভিনীত হইল—সে নাটকের কুশীলবগণ এক দিকে বিজিত উপেক্ষিত দরিদ্র অনার্য নৃপতি দোবরু পান্না, তরুণী অনার্য রাজকন্যা ভানুমতী, তরুণ রাজপুত্র জগরু পান্না—এক দিকে আমি, আর আমার পাটোয়ারী বনোয়ারীলাল ও আমার পথপ্রদর্শক বুদ্ধু সিং।

ঘনায়মান সন্ধ্যার অন্ধকারে রাজসমাধি ও বটতরুতল আবৃত হইবার পূর্বেই আমরা সেদিন পাহাড় হইতে নামিয়া আসিলাম।

নামিবার পথে একস্থানে জঙ্গলের মধ্যে একখানা খাড়া সিঁদুরমাখা পাথর। আশেপাশে মানুষের হস্তরোপিত গাঁদাফুলের ও সন্ধ্যামণি-ফুলের গাছ। সামনে আর একখানা বড় পাথর, তাতেও সিঁদুর-মাখা। বহুকাল হইতে নাকি এই দেবস্থান এখানে প্রতিষ্ঠিত, রাজবংশের ইনি কুলদেবতা। পূর্বে এখানে নরবলি হইত—সম্মুখের বড় পাথরখানিই যূপ-রূপে ব্যবহৃত হইত। এখন পায়রা ও মুরগী বলি প্রদত্ত হয়।

জিজ্ঞাসা করিলাম—কি ঠাকুর ইনি?

রাজা দোবরু বলিলেন—টাঁড়বারো, বুনো মহিষের দেবতা।

মনে পড়িল গত শীতকালে গনু মাহাতোর মুখে শোনা সেই গল্প।

রাজা দোবরু বলিলেন—টাঁড়বারো বড় জাগ্রত দেবতা। তিনি না থাকলে শিকারীরা চামড়া আর শিঙের লোভে বুনো মহিষের বংশ নির্বংশ করে ছেড়ে দিত। উনি রক্ষা করেন। ফাঁদে পড়বার মুখে তিনি মহিষের দলের সামনে দাঁড়িয়ে হাত তুলে বাধা দেন—কত লোক দেখেছে।

এই অরণ্যচারী আদিম সমাজের দেবতাকে সভ্য জগতে কেউই মানে না, জানেও না—কিন্তু ইহা যে কল্পনা নয়, এবং এই দেবতা যে সত্যই আছেন—তাহা স্বতঃই মনে উদয় হইয়াছিল সেই বিজন বন্যজন্তু-অধ্যুষিত অরণ্য ও পর্বত অঞ্চলের নিবিড় সৌন্দর্য ও রহস্যের মধ্যে বসিয়া।

অনেক দিন পরে কলিকাতায় ফিরিয়া একবার দেখিয়াছিলাম বড়বাজারে, জ্যৈষ্ঠ মাসের ভীষণ গরমের দিনে এক পশ্চিমা গাড়োয়ান বিপুল বোঝাই গাড়ির মহিষ দুটাকে প্রাণপণে চামড়ার পাঁচন দিয়া নির্ম্মমভাবে মারিতেছে—সেই দিন মনে হইয়াছিল, হায় দেব টাঁড়বারো, এ তো ছোটনাগপুর কি মধ্যপ্রদেশের আরণ্যভূমি নয়, এখানে তোমার দয়ালু হস্ত এই নির্যাতিত পশুকে কি করিয়া রক্ষা করিবে? এ বিংশ শতাব্দীর আর্য সভ্যতাদৃপ্ত কলিকাতা। এখানে বিজিত আদিম রাজা দোবরু পান্নার মতই তুমি অসহায়।

আমি নওয়াদা হইতে মোটরবাস ধরিয়া গয়ায় আসিব বলিয়া সন্ধ্যার পরেই রওনা হইলাম। বনোয়ারী আমাদের ঘোড়া লইয়া তাঁবুতে ফিরিল। আসিবার সময় আর একবার রাজকুমারী ভানুমতীর সহিত দেখা হইয়াছিল। সে এক বাটি মহিষের দুধ লইয়া আমাদের জন্য দাঁড়াইয়া ছিল রাজবাড়ির দ্বারে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

১

একদিন রাজু পাঁড়ে কাছারিতে খবর পাঠাইল যে বুনো শূওরের দল তাহার চীনা ফসলের ক্ষেতে প্রতি রাত্রে উপদ্রব করিতেছে, তাদের মধ্যে কয়েকটি দাঁতওয়ালা ধাড়ি শূওরের ভয়ে সে ক্যানেস্ত্রা পিটানো ছাড়া অন্য কিছু করিতে পারে না—কাছারি হইতে ইহার প্রতিকার না করিলে তাহার সমুদয় ফসল নষ্ট হইতে বসিয়াছে।

শুনিয়া নিজেই বৈকালের দিকে বন্দুক লইয়া গেলাম। রাজুর কুটীর ও জমি নাঢ়া-বইহারের ঘন জঙ্গলের মধ্যে। সেদিকে এখনও লোকের বসবাস হয় নাই, ফসলের ক্ষেতের পত্তনও খুব কম হইয়াছে, কাজেই বন্য জন্তুর উপদ্রব বেশি।

দেখি রাজু নিজের ক্ষেতে বসিয়া কাজ করিতেছে। আমায় দেখিয়া কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিল। আমার হাত হইতে ঘোড়ার লাগাম লইয়া নিকটের একটা হরীতকী গাছে ঘোড়া বাঁধিল।

বলিলাম—কই রাজু, তোমায় যে আর দেখি নে, কাছারির দিকে যাও না কেন?

রাজুর খুপরির চারিদিকে দীর্ঘ কাশের জঙ্গল, মাঝে মাঝে কেঁদ ও হরীতকী গাছ। কি করিয়া যে এই জনশূন্য বনে সে একা থাকে! এ জঙ্গলে কাহারও সহিত দিনান্তে একটি কথা বলিবার উপায় নাই—অদ্ভুত লোক বটে!

রাজু বলিল—সময় পাই কই যে কোথাও যাব হুজুর, ক্ষেতের ফসল চৌকি দিতেই প্রাণ বেরিয়ে গেল। তার ওপর মহিষ আছে।

তিনটি মহিষ চরাইতে ও দেড়-বিঘা জমির চাষ করিতে এত কি ব্যস্ত থাকে যে সে লোকালয়ে যাইবার সময় পায় না, একথা জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলাম—কিন্তু রাজু আপনা হইতেই তাহার দৈনন্দিন কার্যের যে তালিকা দিল, তাহাতে দেখিলাম তাহার নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ না থাকার কথা। ক্ষেতখামারের কাজ, মহিষ চড়ানো, দুধ দোয়া, মাখন-তোলা, পূজা-অর্চনা, রামায়ণ পাঠ, রান্না-খাওয়া—শুনিয়া যেন আমারই হাঁপ লাগিল। কাজের লোক বটে রাজু! ইহার উপর নাকি সারারাত জাগিয়া ক্যানেস্ত্রা পিটাইতে হয়।

বলিলাম—শূওর কখন বেরোয়?

—তার তো কিছু ঠিক নেই হুজুর। তবে রাত হলেই বেরোয় বটে। একটু বসুন, দেখবেন কত আসে।

কিন্তু আমার কাছে সর্বাপেক্ষা কৌতূহলের বিষয়—রাজু একা এই জনশূন্য স্থানে কি করিয়া বাস করে। কথাটা জিজ্ঞাসা করিলাম।

রাজু বলিল—অভ্যেস হয়ে গিয়েছে, বাবুজী। বহুদিন এমনি ভাবেই আছি—কষ্ট তো হয়ই না, বরং আপনমনে বেশ আনন্দে থাকি। সারাদিন খাটি, সন্ধ্যাবেলা ভজন গাই, ভগবানের নাম নিই, বেশ দিন কেটে যায়।

রাজু, কি গনু মাহাতো, কি জয়পাল—এ ধরনের মানুষ আরও অনেক আছে জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে—ইহাদের মধ্যে একটি নূতন জগৎ দেখিতাম, যে জগৎ আমার পরিচিত নয়।

আমি জানি রাজুর একটি সাংসারিক বিষয়ে অত্যন্ত আসক্তি আছে, সে চা খাইতে অত্যন্ত ভালবাসে। অথচ এই জঙ্গলের মধ্যে চায়ের উপকরণ সে কোথায় পায়, এই ভাবিয়া আমি নিজে চা ও চিনি লইয়া গিয়াছিলাম। বলিলাম—রাজু, একটু চা করো তো! আমার কাছে সব আছে।

রাজু মহা আনন্দে একটি তিন-সেরী লোটাতে জল চড়াইয়া দিল। চা প্রস্তুত হইল, কিন্তু একটি মাত্র ছোট কাঁসার বাটি ব্যতীত অন্য পাত্র নাই। তাহাতেই আমায় চা দিয়া সে নিজে বড় লোটাটি লইয়া চা খাইতে বসিল।

রাজু হিন্দী লেখাপড়া জানে বটে, কিন্তু বহির্জগৎ সম্বন্ধে তাহার কোনো জ্ঞান নাই। কলিকাতা নামটা শুনিয়াছে, কোন্ দিকে জানে না। বোম্বাই বা দিল্লীর বিষয়ে তার ধারণা চন্দ্রলোকের ধারণার মত সম্পূর্ণ অবাস্তব ও কুয়াশাচ্ছন্ন। শহরের মধ্যে সে দেখিয়াছে পূর্ণিয়া, তাও অনেক বছর আগে এবং মাত্র কয়েক দিনের জন্য সেখানে গিয়াছিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম—মোটরগাড়ি দেখেছ রাজু?

—না হুজুর, শুনেছি বিনা গরুতে বা ঘোড়ায় চলে, খুব ধোঁয়া বেরোয়, আজকাল পূর্ণিয়া শহরে অনেক নাকি এসেছে। আমার তো সেখানে অনেককাল যাওয়া নেই, আমরা গরিব লোক, শহরে গেলেই তো পয়সা চাই।

রাজুকে জিজ্ঞাসা করিলাম সে কলিকাতা যাইতে চায় কিনা। যদি চায়, আমি তাহাকে একবার ঘুরাইয়া আনিব, পয়সা লাগিবে না।

রাজু বলিল—শহর বড় খারাপ জায়গা, চোর গুণ্ডা জুয়াচোরের আড্ডা শুনেছি। সেখানে গেলে শুনেছি যে জাত থাকে না। সব লোক সেখানকার বদ্‌মাইশ। আমার এ-দেশের একজন লোক কোন্ শহরে হাসপাতালে গিয়েছিল, তার পায়ে কি হয়েছিল সেই জন্যে। ডাক্তার ছুরি দিয়ে পা কাটে আর বলে, তুমি আমাকে কত টাকা দেবে? সে বললে—দশ টাকা দেব। তখন ডাক্তার আরও কাটে। আবার বললে—এখনও বল কত টাকা দেবে? সে বললে—আরও পাঁচ

ঢাকা দেব, ডাক্তারসাহেব, আর কেটো না। ডাক্তার বললে—ওতে হবে না—বলে আবার পা কাটতে লাগল। সে গরিব লোক, যত কাঁদে, ডাক্তার ততই ছুরি দিয়ে কাটে—কাটতে কাটতে গোটা পা-খানাই কেটে ফেললে। উঃ, কি কাণ্ড ভাবুন তো হুজুর!

রাজুর কথা শুনিয়া হাস্য সংবরণ করা দায় হইয়া উঠিল। মনে পড়িল এই রাজুই একবার আকাশে রামধনু উঠিতে দেখিয়া আমাকে বলিয়াছিল—রামধনু যে দেখছেন বাবুজী, ও ওঠে উইয়ের ঢিবি থেকে, আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

রাজুর খুপরির সামনের উঠানে একটি বড় খুব উঁচু আসান গাছ আছে, তারই তলায় বসিয়া আমরা চা খাইতেছিলাম—যেদিকে চাই সেদিকেই ঘন বন—কেঁদ, আমলকী, পুষ্পিত বহেড়া লতার ঝোপ, বহেড়া ফুলের একটি মৃদু সুগন্ধ সান্ধ্য-বাতাসকে মিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। আমার মনে হইল এসব স্থানে বসিয়া এমনভাবে চা খাওয়া জীবনের একটা সৌন্দর্যময় অভিজ্ঞতা। কোথায় এমন অরণ্যপ্রান্তর, কোথায় এমন জঙ্গলে-ঘেরা কাশের কুটীর, রাজুর মত মানুষই বা কোথায়? এ অভিজ্ঞতা যেমন বিচিত্র, তেমনই দুষ্প্রাপ্য।

বলিলাম—আচ্ছা রাজু, তোমার স্ত্রীকে নিয়ে এস না কেন? তোমায় আর তা হলে কষ্ট করে রেঁধে খেতে হয় না।

রাজু বলিল—সে বেঁচে নেই হুজুর। আজ সতের-আঠারো বছর মারা গিয়েছে, তারপর থেকে বাড়িতে মন বসাতে পারি নে আর।

রাজুর জীবনে রোমান্স ঘটিয়াছিল, এ ভাবিতে পারাও কঠিন বটে, কিন্তু অতঃপর রাজু যে গল্প করিল, তাহাকে ও-ছাড়া অন্য নামে অভিহিত করা চলে না।

রাজুর স্ত্রীর নাম ছিল সর্জু (অর্থাৎ সরযূ), রাজুর বয়স যখন আঠারো ও সরযূর চোদ্দ—তখন উত্তর-ধরমপুর, শ্যামলালটোলাতে সরযূর বাপের টোলে রাজু দিনকতক ব্যাকরণ পড়িতে যায়।

রাজুকে বলিলাম—কতদিন পড়েছিলে?

—কিছু না বাবুজী, বছরখানেক ছিলাম, কিন্তু পরীক্ষা দিই নি। সেখানে আমাদের প্রথম দেখাশুনো এবং ক্রমে ক্রমে—

আমাকে সমীহ করিয়া রাজু অল্প কাশিয়া চুপ করিল।

আমি উৎসাহ দিবার সুরে বলিলাম—তার পর বলে যাও—

—কিন্তু হুজুর, ওর বাবা আমার অধ্যাপক। আমি কি করে তাঁকে এ-কথা বলি? একদিন কার্তিক মাসে ছট্ পরবের দিন সরযূ ছোপানো হল্‌দে শাড়ি পরে কুশী নদীতে একদল মেয়ের সঙ্গে নাইতে যাচ্ছে, আমি—

রাজু কাশিয়া আবার চুপ করিল।

পুনরায় উৎসাহ দিয়া বলিলাম—বল, বল, তাতে কি?

—ওকে দেখবার জন্যে আমি একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইলাম। এর কারণ এই যে, ইদানীং ওর সঙ্গে আমার আর তত দেখাশুনো হত না—এক জায়গায় ওর বিয়ের কথাবার্তাও চলছিল। যখন দলটি গাইতে গাইতে—আপনি তো জানেন ছট্ পরবের সময় মেয়েরা গান করতে করতে নদীতে ছট্ ভাসাতে যায়!—তারপর যখন ওরা গাইতে গাইতে আমার সামনে এল, ও আমায় দেখতে পেয়েছে গাছের আড়ালে। ও-ও হাসলে, আমিও হাসলাম। আমি হাত নেড়ে ইশারা করলাম, একটু পেছিয়ে পড়—ও হাত নেড়ে বললে, এখন নয়, ফেরবার সময়ে।

রাজুর বাহান্ন বছর বয়সের মুখমণ্ডলে বিংশবর্ষীয় তরুণ প্রেমিকের লাজুকতা ও চোখে একটি স্বপ্নভরা সুদূর দৃষ্টি ফুটিল এ-কথা বলিবার সময়—যেন জীবনের বহু পিছনে প্রথম যৌবনের পুণ্য দিনগুলিতে যে কল্যাণী তরুণী ছিল চতুর্দশ বর্ষদেশে—তাহাকেই খুঁজিতে বাহির হইয়াছে ওর সঙ্গীহারা প্রৌঢ় প্রাণ। এই ঘন জঙ্গলে একা বাস করিয়া সে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। এখন যাহার কথা ভাবিতে তাহার ভাল লাগে, যাহার সাহচর্যের জন্য তার মন উন্মুখ—সে হইল বহু কালের সেই বালিকা সরযূ, পৃথিবীতে যে কোথাও আজ আর নাই।

বেশ লাগিতেছিল ওর গল্প। আগ্রহের সঙ্গে বলিলাম, তার পর?

—তার পর ফেরবার পথে দেখা হ'ল। ও একটু পিছিয়ে পড়ল দলের থেকে। আমি বললাম—সরযূ, আমি বড় কষ্ট পাচ্ছি, তোমার সঙ্গে দেখাশোনাও বন্ধ, আমার লেখাপড়া হবে না জানি, কেন মিছে কষ্ট পাই, ভাবছি টোল ছেড়ে চলে যাব এ মাসের শেষেই। সরযূ কেঁদে ফেললে। বললে—বাবাকে বলো না কেন? সরযূর কান্না দেখে আমি মরীয়া হয়ে উঠলাম। এমনি হয়ত যে কথা কখনও আমার অধ্যাপককে বলতে পারতাম না, তাই ব'লে ফেললাম একদিন।

বিয়ে হওয়ার কোনো বাধা ছিল না, স্বজাতি, স্বঘর। বিয়ে হয়েও গেল।

খুব সহজ ও সাধারণ রোমান্স হয়ত—হয়তো শহরের কোলাহলে বসিয়া শুনিলে এটাকে নিতান্ত ঘরোয়া গ্রাম্য বৈবাহিক ব্যাপার, সামান্য একটু পুতুপুতু ধরনের পূর্বরাগ বলিয়া উড়াইয়া দিতাম। ওখানে ইহার অভিনবত্ব ও সৌন্দর্যে মন মুগ্ধ হইল। দুইটি নরনারী কি করিয়া পরস্পরকে লাভ করিয়াছিল তাহাদের জীবনে, এ-ইতিহাস যে কতখানি রহস্যময়, তাহা বুঝিয়াছিলাম সেদিন।

চা-পান শেষ করিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া আকাশে পাতলা জ্যোৎস্না ফুটিল। ষষ্ঠী কি সপ্তমী তিথি।

আমি বন্দুক লইয়া বলিলাম—চল রাজু, দেখি তোমার ক্ষেতে কোথায় শূওর।

একটা বড় তুঁতুগাছ ক্ষেতের একপাশে। রাজু বলিল—এই গাছের ওপর উঠতে হবে হুজুর। আজ সকালে একটা মাচা বেঁধেছি ওর একটা দো-ডালায়।

আমি দেখিলাম, বিষম মুশকিল। গাছে ওঠা অনেক দিন অভ্যাস নাই। তার উপর এই রাত্রিকালে। কিন্তু রাজু উৎসাহ দিয়া বলিল—কোনো কষ্ট নেই হুজুর। বাঁশ দেওয়া আছে, নীচেই ডালপালা, খুব সহজ ওঠা।

রাজুর হাতে বন্দুক দিয়া ডালে উঠিয়া মাচায় বসিলাম। রাজু অবলীলাক্রমে আমার পিছু পিছু উঠিল। দুজনে জমির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া মাচার উপর বসিয়া রহিলাম পাশাপাশি।

জ্যোৎস্না আরও ফুটিল। তুঁতগাছের দো-ডালা হইতে জ্যোৎস্নালোকে কিছু স্পষ্ট, কিছু অস্পষ্ট জঙ্গলের শীর্ষদেশ ভারি অদ্ভুত ভাব মনে আনিতেছিল। ইহাও জীবনের এক নূতন অভিজ্ঞতা বটে।

একটু পরে চারিপাশের জঙ্গলে শিয়ালের পাল ডাকিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা কালোমত কি জানোয়ার দক্ষিণ দিকের ঘন জঙ্গলের ভিতর হইতে বাহির হইয়া রাজুর ক্ষেতে ঢুকিল।

রাজু বলিল—ঐ দেখুন হুজুর—

আমি বন্দুক বাগাইয়া ধরিলাম, কিন্তু আরও কাছে আসিলে জ্যোৎস্নালোকে দেখা গেল সেটা শূওর নয়, একটা নীলগাই।

নীলগাই মারিবার প্রবৃত্তি হইল না, রাজু মুখে 'দূর দূর' বলিতে সেটা ক্ষিপ্রপদে জঙ্গলের দিকে চলিয়া গেল। আমি একটা ফাঁকা আওয়াজ করিলাম।

ঘণ্টা দুই কাটিয়া গেল। দক্ষিণ দিকের সে জঙ্গলটার মধ্যে বনমোরগ ডাকিয়া উঠিল। ভাবিয়াছিলাম দাঁতওয়ালা ধাড়ি শূওরটা মারিব, কিন্তু একটা ক্ষুদ্র শূকর-শাবকেরও টিকি দেখা গেল না। নীলগাইয়ের পিছনে ফাঁকা আওয়াজ করা অত্যন্ত ভুল হইয়াছে।

রাজু বলিল—নেমে চলুন হুজুর, আপনার আবার ভোজনের ব্যবস্থা করতে হবে।

আমি বলিলাম—কিসের ভোজন? আমি কাছারিতে যাব—রাত এখনও দশটা বাজে নি—থাকবার জো নেই। কাল সকালে সার্ভে ক্যাম্পে কাজ দেখতে বেরুতে হবে।

—খেয়ে যান হুজুর।

—এর পর আর নাঢ়া-বইহারের জঙ্গল দিয়ে একা যাওয়া ঠিক হবে না। এখনই যাই। তুমি কিছু মনে করো না।

ঘোড়ায় উঠিবার সময় বলিলাম—মাঝে মাঝে তোমার এখানে চা খেতে যদি আসি, বিরক্ত হবে না তো?

রাজু বলিল—কি যে বলেন! এই জঙ্গলে একা থাকি, গরিব মানুষ, আমায় ভালবাসেন তাই চা-চিনি এনে তৈরি করিয়ে একসঙ্গে খান। ও কথা বলে আমায় লজ্জা দেবেন না, বাবুজী।

সে-সময় রাজুকে দেখিয়া মনে হইল রাজু এই বয়সেই বেশ দেখিতে, যৌবনে সে যে খুবই সুপুরুষ ছিল, অধ্যাপক-কন্যা সরযূ পিতার তরুণ, সুন্দর ছাত্রটির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া নিজের সুরুচিরই পরিচয় দিয়াছিল।

রাত্রি গভীর। একা প্রান্তর বাহিয়া আসিতেছি। জ্যোৎস্না অস্ত গিয়াছে। কোনো দিকে আলো দেখা যায় না, এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা—এ যেন পৃথিবী হইতে জনহীন কোনো অজানা গ্রহলোকে নির্বাসিত হইয়াছি—দিগন্তরেখায় জ্বলজ্বলে বৃশ্চিকরাশি উদিত হইতেছে, মাথার উপরে অন্ধকার আকাশে অগণিত দ্যুতিলোক, নিম্নে লবটুলিয়া বইহারের নিস্তব্ধ অরণ্য, ক্ষীণ নক্ষত্রালোকে পাতলা অন্ধকারে বনঝাউয়ের শীর্ষ দেখা যাইতেছে—দূরে কোথায় শিয়ালের দল প্রহর ঘোষণা করিল—আরও দূরে মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের সীমারেখা অন্ধকারে দীর্ঘ কালো পাহাড়ের মত দেখাইতেছে—অন্য কোন শব্দ নাই, কেবল একধরনের পতঙ্গের একঘেয়ে একটানা কি-র্-র্-র্ শব্দ ছাড়া ; কান পাতিয়া ভাল করিয়া শুনিলে ঐ শব্দের সঙ্গে মিশানো আরও দু-তিনটি পতঙ্গের আওয়াজ শোনা যাইবে। কি অদ্ভুত রোমান্স এই মুক্ত জীবনে, প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ নিবিড় পরিচয়ের সে কি আনন্দ! সকলের উপর কি একটা অনির্দেশ্য, অব্যক্ত রহস্য মাখানো—কি সে রহস্য জানি না—কিন্তু বেশ জানি সেখান হইতে চলিয়া আসিবার পরে আর কখনও কোথাও সে রহস্যের ভাব মনে আসে নাই।

যেন এই নিস্তব্ধ, নির্জন রাত্রে দেবতারা নক্ষত্ররাজির মধ্যে সৃষ্টির কল্পনায় বিভোর, যে কল্পনায় দূর ভবিষ্যতে নব নব বিশ্বের আবির্ভাব, নব নব সৌন্দর্যের জন্ম, নানা নব প্রাণের বিকাশ বীজরূপে নিহিত। শুধু যে আত্মা নিরলস অবকাশ যাপন করে জ্ঞানের আকুল পিপাসায়, যার প্রাণ বিশ্বের বিরাটত্ব ও ক্ষুদ্রত্বের সম্বন্ধে সচেতন আনন্দে উল্লসিত—জন্মজন্মান্তরের পথ বাহিয়া দূর যাত্রার আশায় যার ক্ষুদ্র, তুচ্ছ বর্তমানের দুঃখ, শোক বিন্দুবৎ মিলাইয়া গিয়াছে—সে-ই তাঁদের সে রহস্যরূপ দেখিতে পায়। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ...

এভারেস্ট শিখরে উঠিয়া যাহারা তুষারপ্রবাহে ও ঝঞ্ঝায় প্রাণ দিয়াছিল, তাহারা বিশ্বদেবতার এই বিরাট রূপকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে...কিংবা কলম্বাস্ যখন আজোরেস্ দ্বীপের উপকূলে দিনের পর দিন সমুদ্রবাহিত কাষ্ঠখণ্ডে মহাসমুদ্রপারের অজানা মহাদেশের বার্তা জানিতে চাহিয়াছিলেন—তখন বিশ্বের এই লীলাশক্তি তাঁর কাছে ধরা দিয়াছিল—ঘরে বসিয়া

তামাক টানিয়া প্রতিবেশীর কন্যার বিবাহ ও ধোপা নাপিত বন্ধ করিয়া যাহারা আসিতেছে—তাহাদের কর্ম নয় ইহার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা।

২

মিছি নদীর উত্তর পাড়ে জঙ্গলের ও পাহাড়ের মধ্যে সার্ভে হইতেছিল। এখানে আজ আট-দশ দিন তাঁবু ফেলিয়া আছি। এখনও দশ-বারো দিন হয়ত থাকিতে হইবে।

স্থানটা আমাদের মহাল হইতে অনেক দূরে, রাজা দোবরু পান্নার রাজত্বের কাছাকাছি। রাজত্ব বলিলাম বটে, কিন্তু রাজা দোবরু তো রাজ্যহীন রাজা—তাঁহার আবাসস্থলের খানিকটা নিকটে পর্যন্ত বলা যায়।

বড় চমৎকার জায়গা। একটা উপত্যকা, মুখের দিকটা বিস্তৃত, পিছনের দিক সংকীর্ণ—পূর্বে পশ্চিমে পাহাড়শ্রেণী—মধ্যে এই অশ্বক্ষুরাকৃতি উপত্যকা—বন্ধুর ও জঙ্গলাকীর্ণ, ছোট বড় পাথর ছড়ানো সর্বত্র, কাঁটা-বাঁশের বন, আরও নানা গাছপালার জঙ্গল। অনেকগুলি পাহাড়ী ঝরনা উত্তর দিক হইতে নামিয়া উপত্যকার মুক্ত প্রান্ত দিয়া বাহিরের দিকে চলিয়াছে। এই সব ঝরনার দু-ধারে বন বড় বেশি ঘন এবং এত দিনের বসবাসের অভিজ্ঞতা হইতে জানি এই সব জায়গাতেই বাঘের ভয়। হরিণ আছে, বন্য মোরগ ডাকিতে শুনিয়াছি দ্বিতীয় প্রহর রাত্রে। ফেউয়ের ডাক শুনিয়াছি বটে, তবে বাঘ দেখি নাই বা আওয়াজও পাই নাই।

পূর্বদিকের পাহাড়ের গায়ে একটা প্রকাণ্ড গুহা। গুহার মুখে প্রাচীন ঝাঁপালো বটগাছ—দিনরাত শন্‌শন্‌ করে। দুপুর রোদে নীল আকাশের তলায় এই জনহীন বন্য উপত্যকা ও গুহা বহু প্রাচীন যুগের ছবি মনে আনে, যে-যুগে আদিম জাতির রাজাদের হয়ত রাজপ্রাসাদ ছিল এই গুহাটা, যেমন রাজা দোবরু পান্নার পূর্বপুরুষদের আবাস-গুহা। গুহার দেওয়ালে একস্থানে কতকগুলো কি খোদাই করা ছিল, সম্ভবত কোনো ছবি—এখন বড়ই অস্পষ্ট, ভালো বোঝা যায় না। কত বন্য আদিম নরনারীর হাস্য-কলধ্বনি, কত সুখদুঃখ—বর্বর সমাজের অত্যাচারের কত নয়নজলের অলিখিত ইতিহাস এই গুহার মাটিতে, বাতাসে, পাষাণপ্রাচীরের মধ্যে লেখা আছে—ভাবিতে বেশ লাগে।

গুহামুখ হইতে রশি-দুই দূরে ঝরনার ধারে বনের মধ্যে ফাঁকা জায়গায় একটি গোঁড়-পরিবার বাস করে। দুখানা খুপরি, একখানা ছোট, একখানা একটু বড়, বনের ডালপালার বেড়া, পাতার ছাউনি। শিলাখণ্ড কুড়াইয়া তাহা দিয়া উনুন তৈয়ারি করিয়াছে আবরণহীন ফাঁকা জায়গায় খুপরির সামনে। বড় একটা বুনো বাদামগাছের ছায়ায় এদের কুটীর। বাদামের পাকা পাতা ঝরিয়া পড়িয়া উঠান প্রায় ছাইয়া রাখিয়াছে।

গোঁড়-পরিবারের দুটি মেয়ে আছে, তাদের একটির ষোল-সতের বছর বয়স, অন্যটির বছর চোদ্দ। রং কালো কুচকুচে বটে, কিন্তু মুখশ্রীতে বেশ একটা সরল সৌন্দর্য মাখানো—নিটোল স্বাস্থ্য। মেয়ে দুটি রোজ সকালে দেখি দু-তিনটি মহিষ লইয়া পাহাড়ে চরাইতে যায়—আবার সন্ধ্যার পূর্বে ফিরিয়া আসে। আমি তাঁবুতে ফিরিয়া যখন চা খাই, তখন দেখি মেয়ে দুটি আমার তাঁবুর সামনে দিয়া মহিষ লইয়া বাড়ি ফিরিতেছে।

একদিন বড় মেয়েটি রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া তার ছোট্ট বোনকে আমার তাঁবুতে পাঠাইয়া দিল। সে আসিয়া বলিল—বাবুজী, সেলাম। বিড়ি আছে? দিদি চাইছে।

—তোমরা বিড়ি খাও?

—আমি খাই নে, দিদি খায়। দাও না বাবুজী, একটা আছে?

—আমার কাছে বিড়ি নেই। চুরুট আছে—কিন্তু সে তোমাদের দেবো না। বড় কড়া, খেতে পারবে না।

মেয়েটি চলিয়া গেল।

আমি একটু পরে ওদের বাড়ি গেলাম। আমাকে দেখিয়া গৃহকর্তা খুব বিস্মিত হইল—খাতির করিয়া বসাইল। মেয়ে দুটি শালপাতায় 'ঘাটো' অর্থাৎ মকাই-সিদ্ধ ঢালিয়া নুন দিয়া খাইতে বসিয়াছে। সম্পূর্ণরূপে নিরূপকরণ মকাইসিদ্ধ। তাদের মা কি একটা জ্বাল দিতেছে উনুনে। দুটি ছোট ছোট বালক-বালিকা খেলা করিতেছে।

গৃহকর্তার বয়স পঞ্চাশের উপর। সুস্থ, সবল চেহারা। আমার প্রশ্নের উত্তরে বলিল—তাদের বাড়ি সিউনি জেলাতে। এখানে এই পাহাড়ে মহিষ চরাইবার ঘাস ও পানীয় জল প্রচুর আছে বলিয়া আজ বছর-খানেক হইতে এখানে আছে। তা ছাড়া এখানকার জঙ্গলের কাঁটা-বাঁশে ধামা চুপড়ি ও মাথায় দিবার টোকা তৈরি করিবার খুব সুবিধা। শিবরাত্রির সময় অখিলকুচার মেলায় বিক্রি করিয়া দু'পয়সা হয়।

জিজ্ঞাসা করিলাম—এখানে কতদিন থাকবে?

—যতদিন মন যায়, বাবুজী। তবে এ-জায়গাটা বড় ভাল লেগেছে, নইলে এক বছর আমরা কোথাও বড় একটানা থাকি না। এখানে একটা বড় সুবিধা আছে, পাহাড়ের ওপর জঙ্গলে এত আতা ফলে—দু-ঝুড়ি ক'রে গাছ-পাকা আতা আশ্বিন মাসে আমার মেয়েরা মহিষ চরাতে গিয়ে পেড়ে আনতো—শুধু আতা খেয়ে আমরা মাস-দুই কাটিয়েছি। আতার লোভেই এখানে থাকা। জিজ্ঞেস করুন না ওদের।

বড় মেয়েটি খাইতে খাইতে উজ্জ্বল মুখে বলিল—উঃ, একটা জায়গা আছে, ওই পূর্বদিকের পাহাড়ের কোণের দিকে কত যে বুনো আতা গাছ, ফল পেকে ফেটে কত মাটিতে পড়ে থাকে, কেউ খায় না। আমরা ঝুড়ি ঝুড়ি তুলে আনতাম।

এমন সময়ে কে একজন ঘন-বনের দিক হইতে আসিয়া খুপরির সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—সীতারাম, সীতারাম, জয় সীতারাম—একটু আগুন দিতে পারো?

গৃহকর্তা বলিল—আসুন বাবাজী, বসুন।

দেখিলাম জটাজূটধারী একজন বৃদ্ধ সাধু। সাধু ইতিমধ্যে আমায় দেখিতে পাইয়া একটু বিস্ময়ের ও বোধ হয় কথঞ্চিৎ ভয়ের সঙ্গেও, একটু সংকুচিত হইয়া একপাশে দাঁড়াইয়া ছিল।

আমি বলিলাম—প্রণাম, সাধু বাবাজী—

সাধু আশীর্বাদ করিল বটে, কিন্তু তখনও যেন তাহার ভয় যায় নাই।

তাহাকে সাহস দিবার জন্য বলিলাম—কোথায় থাকা হয় বাবাজীর?

আমার কথায় উত্তর দিল গৃহস্বামী। বলিল—বড্ড গজাড় জঙ্গলের মধ্যে উনি থাকেন, ওই দুই পাহাড় যেখানে মিশেছে, ওই কোণে। অনেক দিন আছেন এখানে।

বৃদ্ধ সাধু ইতিমধ্যে বসিয়া পড়িয়াছে। আমি সাধুর দিকে চাহিয়া বলিলাম—কতদিন এখানে আছেন?

এবার সাধুর ভয় ভাঙিয়াছে, বলিল—আজ পনেরো-যোল বছর, বাবুসাহেব।

—একা থাকা হয় তো? বাঘ আছে শুনেছি এখানে, ভয় করে না?

—আর কে থাকবে বাবুসাহেব? পরমাত্মার নাম নিই—ভয়ডর করলে চলবে কেন? আমার বয়স কত বল তো বাবুসাহেব?

ভাল করিয়া লক্ষ করিয়া বলিলাম—সত্তর হবে।

সাধু হাসিয়া বলিল—না বাবুসাহেব, নব্বুইয়ের ওপর হয়েছে। গয়ার কাছে এক জঙ্গলে ছিলাম দশ বছর। তারপর ইজারাদার জঙ্গলের গাছ কাটতে লাগল, ক্রমে সেখানে লোকের বাস হয়ে পড়ল। সেখান থেকে পালিয়ে এলাম। লোকালয়ে থাকতে পারি নে।

—সাধু বাবাজী, এখানে একটা গুহা আছে, তুমি সেখানে থাক না কেন?

—একটা কেন বাবুসাহেব, কত গুহা আছে এ-পাহাড়ে। আমি ওদিকে যেখানে থাকি সেটাও ঠিক গুহা না হ'লেও গুহার মত বটে। মানে তার মাথায় ছাদ ও দু-দিকে দেয়াল আছে—সামনেটা কেবল খোলা।

—কি খাও? ভিক্ষা কর?

—কোথাও বেরুই নে বাবুসাহেব। পরমাত্মা আহার জুটিয়ে দেন। বাঁশের কোঁড় সেদ্ধ খাই, বনে এক রকম কন্দ হয় তা ভারি মিষ্টি, লাল আলুর মত খেতে, তা খাই। পাকা আমলকী ও আতা এ-জঙ্গলে খুব পাওয়া যায়। আমলকী খুব খাই, রোজ আমলকী খেলে মানুষ হঠাৎ বুড়ো হয় না, যৌবন ধরে রাখা যায় বহু দিন। গাঁয়ের লোকে মাঝে মাঝে দর্শন করতে এসে দুধ, ছাতু, ভুরা দিয়ে যায়। চলে যাচ্ছে এই সবে একরকম ক'রে।

—বাঘ-ভালুকের সামনে পড়েছ কখনও?

—কখনও না। তবে ভয়ানক এক জাতের অজগর সাপ দেখেছি এই জঙ্গলে—এক জায়গায় অসাড় হয়ে পড়েছিল—তালগাছের মত মোটা, মিশ্ কালো, সবুজ আর রাঙা আঁজি কাটা গায়ে। চোখ আগুনের ভাঁটার মত জ্বলছে। এখনও সেটা এই জঙ্গলেই আছে। তখন সেটা জলের ধারে পড়েছিল, বোধ হয় হরিণ ধরবার লোভে। এখন কোনও গুহাগহ্বরে লুকিয়ে আছে। আচ্ছা যাই বাবুসাহেব, রাত হয়ে গেল।

সাধু আগুন লইয়া চলিয়া গেল। শুনিলাম মাঝে মাঝে সাধুটি এদের এখানে আগুন লইতে আসিয়া কিছুক্ষণ গল্প করিয়া যায়।

অন্ধকার পূর্বেই হইয়াছিল, এখন একটু মেটে মেটে জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। উপত্যকার বনানী অদ্ভুত নীরবতায় ভরিয়া গিয়াছে। কেবল পার্শ্বস্থ পাহাড়ী ঝরনার কুলু কুলু স্রোতের ধ্বনি ও ক্বচিৎ দু-একটা বন্য মোরগের ডাক ছাড়া কোনো শব্দ কানে আসে না।

তাঁবুতে ফিরিলাম। পথে বড় একটা শিমুলগাছে ঝাঁক ঝাঁক জোনাকী জ্বলিতেছে, ঘুরিয়া ঘুরিয়া চক্রাকারে, উপর হইতে নীচু দিকে, নীচু হইতে উপরের দিকে—নানারূপ জ্যামিতির ক্ষেত্র অঙ্কিত করিয়া আলো-আঁধারের পটভূমিতে।

৩

এখানেই একদিন আসিল কবি বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ। লম্বা, রোগা চেহারা, কালো সার্জের কোট গায়ে, আধময়লা ধুতি পরনে, মাথার চুল রুক্ষ ও এলোমেলো, বয়স চল্লিশ ছাড়াইয়াছে।

ভাবিলাম চাকুরির উমেদার। বলিলাম—কি চাই?

সে বলিল—বাবুজীর (হুজুর বলিয়া সম্বোধন করিল না) দর্শনপ্রার্থী হয়ে এসেছি। আমার নাম বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ। বাড়ি বিহার শরীফ, পাটনা জিলা। এখানে চক্‌মকিটোলায় থাকি, তিন মাইল দূর এখান থেকে।

—ও, তা এখানে কি জন্যে?

—বাবুজী যদি দয়া করে অনুমতি করেন, তবে বলি। আপনার সময় নষ্ট করছি নে?

তখন, আমি ভাবিতেছি লোকটা চাকুরির জন্যই আসিয়াছে। কিন্তু 'হুজুর' না বলাতে সে আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। বলিলাম—বসুন, অনেক দূর থেকে হেঁটে এসেছেন এই গরমে।

আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিলাম—লোকটির হিন্দী খুব মার্জিত। সেরকম হিন্দীতে আমি কথা বলিতে পারি না। সিপাহী পিয়াদা ও গ্রাম্য প্রজা লইয়া আমার কারবার, আমার হিন্দী তাহাদের মুখে শেখা দেহাতী বুলির সহিত বাংলা ইডিয়ম মিশ্রিত একটা জগাখিচুড়ী ব্যাপার। এ-ধরনের ভদ্র ও পরিমার্জিত ভব্য হিন্দী কখনও শুনি নাই, তা বলিব কিরূপে, সুতরাং একটু সাবধানের সহিত বলিলাম—কি আপনার আসার উদ্দেশ্য বলুন!

সে বলিল—আমি আপনাকে কয়েকটি কবিতা শুনাতে এসেছি।

দস্তুরমত বিস্মিত হইলাম। এই জঙ্গলে আমাকে কবিতা শোনাইতে আসিবার এমন কি গরজ পড়িয়াছে লোকটির, হইলই বা কবি?

বলিলাম—আপনি একজন কবি? খুব খুশি হলাম। আপনার কবিতা খুব আনন্দের সঙ্গে শুনব। কিন্তু আপনি কি করে আমার সন্ধান পেলেন?

—এই মাইল-তিন দূরে আমার বাড়ি। পাহাড়ের ঠিক ওপারেই। আমাদের গ্রামে সবাই বলছিল কলকাতা থেকে এক বাংগালি বাবু এসেছেন। আপনাদের কাছে বিদ্যার বড় আদর, কারণ আপনারা নিজে বিদ্বান্। কবি বলেছেন—

> বিদ্বৎসু সৎকবিবাচা লভতে প্রকাশং
> ছাত্রেষু কুট্‌মলসমং তৃণবজ্জড়েষু।

বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ আমায় কবিতা শোনাইল। কোনো একটা রেল-লাইনের টিকিট চেকার, বুকিং ক্লার্ক, স্টেশন-মাস্টার, গার্ড প্রভৃতির নামের সঙ্গে জড়াইয়া এক সুদীর্ঘ কবিতা। কবিতা খুব উঁচুদরের বলিয়া মনে হইল না। তবে আমি বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদের প্রতি অবিচার করিতে চাই না। তাহার ভাষা আমি ভাল বুঝি নাই—সত্য কথা বলিতে গেলে, বিশেষ কিছুই বুঝি নাই। তবুও মাঝে মাঝে উৎসাহ ও সমর্থন-সূচক শব্দ উচ্চারণ করিয়া গেলাম।

বহুক্ষণ কাটিয়া গেল। বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ কবিতাপাঠ থামায় না, উঠিবার নাম করা তো দূরের কথা।

ঘণ্টা দুই পরে সে একটু চুপ করিয়া হাসি-হাসি মুখে বলিল—কি রকম লাগলো বাবুজীর?

বলিলাম—চমৎকার। এমন কবিতা খুব কমই শুনেছি। আপনি কোনো পত্রিকায় আপনার কবিতা পাঠান না কেন?

বেঙ্কটেশ্বর দুঃখের সহিত বলিল—বাবুজী, এদেশে আমাকে সবাই পাগল বলে। কবিতা বুঝবার মানুষ এ-সব জায়গায় কি আছে ভেবেছেন? আপনাকে শুনিয়ে আমার আজ তৃপ্তি হ'ল। সমঝদারকে এ-সব শোনাতে হয়। তাই আপনার কথা শুনেই আমি ভেবেছিলাম একদিন সময়মত এসে আপনাকে ধরতে হবে।

সেদিন সে বিদায় লইল কিন্তু পরদিন বৈকালে আসিয়া আমায় পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল তাহাদের গ্রামে তাহাদের বাড়িতে আমায় একবার যাইতে। অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তাহার সহিত পায়ে হাঁটিয়া চক্‌মকিটোলা রওনা হইলাম।

বেলা পড়িয়াছে। সম্মুখে গম-যবের ক্ষেত্রে বহুদূর জুড়িয়া উত্তর দিকের পাহাড়ের ছায়া পড়িয়াছে। কেমন একটা শান্তি চারিধারে, সিল্লী পাখীর ঝাঁক কাঁটা-বাঁশঝাড়ের উপর উড়িয়া

আসিয়া বসিতেছে, গ্রাম্য বালক-বালিকারা এক জায়গায় ঝরনার জলে ছোট ছোট কি মাছ ধরিবার চেষ্টা করিতেছে।

গ্রামের মধ্যে ঠাসাঠাসি বসতি। চালে চালে বাড়ি, অনেক বাড়িতেই উঠান বলিয়া জিনিস নাই। মাঝারিগোছের একখানা খোলা-ছাওয়া বাড়িতে বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ আমায় লইয়া গিয়া তুলিল। রাস্তার ধারেই তার বাড়ির বাইরের ঘর, সেখানে একখানা কাঠের চৌকিতে বসিলাম। একটু পরে কবিগৃহিণীকেও দেখিলাম—তিনি স্বহস্তে দইবড়া ও মকাইভাজা আমার জন্য লইয়া যে চৌকিতে বসিয়াছিলাম তাহারই একপ্রান্তে স্থাপন করিলেন বটে, কিন্তু কথা কহিলেন না, যদিও তিনি অবগুণ্ঠনবতীও ছিলেন না। বয়স চব্বিশ-পঁচিশ হইবে, রং তত ফর্সা না হইলেও মন্দ নয়, মুখশ্রী বেশ শান্ত, সুন্দরী বলা না গেলেও কবিপত্নী কুরূপা নহেন। ধরনধারনের মধ্যে একটি সরল, অনায়াসশিষ্টতা ও শ্রী।

আর একটা জিনিস লক্ষ্য করিলাম—কবিগৃহিণীর স্বাস্থ্য। কি জানি কেন এদেশে যেখানে গিয়াছি, মেয়েদের স্বাস্থ্য সর্বত্র বাংলা দেশের মেয়েদের চেয়ে বহুগুণে ভাল বলিয়া মনে হইয়াছে। মোটা নয়, অথচ বেশ লম্বা, নিটোল, আঁটসাট গড়নের মেয়ে এদেশে যত বেশি, বাংলা দেশে তত দেখি নাই। কবিগৃহিণীও ওই ধরনের মেয়েটি।

একটু পরে তিনি এক বাটি মহিষের দুধের দই খাটিয়ার একপাশে রাখিয়া সরিয়া দরজার কবাটের আড়ালে দাঁড়াইলেন। শিকল নাড়ার শব্দ শুনিয়া বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ উঠিয়া স্ত্রীর নিকটে গেল এবং তখনই হাসিমুখে আসিয়া বলিল—আমার স্ত্রী বলছে আপনি আমাদের বন্ধু হয়েছেন, বন্ধুকে একটু ঠাণ্ডা করতে হয় কিনা তাই দইয়ের সঙ্গে বেশি ক'রে পিপুল শুঁট ও লঙ্কার গুঁড়ো মেশানো রয়েছে।

আমি হাসিয়া বলিলাম—তা যদি হয় তবে আমার একা কেন, সকলের চোখ দিয়ে যাতে জল বের হয় তার জন্য আমি প্রস্তাব করছি এই দই আমরা তিনজনেই খাব। আসুন—।

কবিপত্নী দরজার আড়াল হইতে হাসিলেন। আমি ছাড়িবার পাত্র নই, দই তাঁহাকেও খাওয়াইয়া ছাড়িলাম।

একটু পরে কবিপত্নী বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেলেন এবং একটা থালা হাতে আবার ফিরিয়া আসিয়া খাটিয়ার প্রান্তে থালাটি রাখিলেন, এবার আমার সামনেই চাপা, কৌতুকমিশ্রিত সুরে আমাকে শুনাইয়া বলিলেন—বাবুজীকে বল এইবার ঘরের তৈরি প্যাঁড়া খেয়ে গালের জ্বলুনি থামান।

কি সুন্দর মিষ্টি মেয়েলি ঠেঁট হিন্দী বুলি!

বড় ভাল লাগে এ-অঞ্চলের মেয়েদের মুখে এই হিন্দীর টানটি। নিজে ভাল হিন্দী বলিতে পারি না বলিয়া আমার কথ্য হিন্দীর প্রতি বেজায় আকর্ষণ। বইয়ের হিন্দী নয়—এই সব পল্লীপ্রান্তে, পাহাড়তলীতে, বনদেশের মধ্যে বিস্তীর্ণ শ্যামল যব গম-ক্ষেতের পাশে, চলনশীল চামড়ার রহট্ যেখানে মহিষের দ্বারা ঘূর্ণিত হইয়া ক্ষেতে ক্ষেতে জল সেচন করিতেছে, অস্তসূর্যের ছায়া-ভরা অপরাহ্নে দূরের নীলাভ শৈলশ্রেণীর দিকে উড়ন্ত বালিহাঁস বা সিল্লী বা বকের দল যেখানে একটা দূরবিসর্পী ভূপৃষ্ঠের আভাস বহন করিয়া আনে—সেখানকার সে হঠাৎ-শেষ-হইয়া-যাওয়া, কেমন যেন আধ-আধ, ভাঙা-ভাঙা ক্রিয়াপদযুক্ত এক ধরনের ভাষা, যাহা বিশেষ করিয়া মেয়েদের মুখে সাধারণত শোনা যায়—তাহার প্রতি আমার টান খুব বেশি।

হঠাৎ আমি কবিকে বলিলাম—দয়া ক'রে দু-একটা কবিতা পড়ুন না আপনার?

বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদের মুখ উৎসাহে উজ্জ্বল দেখাইল। একটি গ্রাম্য প্রেম-কাহিনী লইয়া কবিতা

লিখিয়াছে, সেটি পড়িয়া শুনাইল। ছোট্ট একটি খালের এ-পারের মাঠে এক তরুণ যুবক বসিয়া ভুট্টার ক্ষেত পাহারা দিত, খালের ওপারের ঘাটে একটি মেয়ে আসিত নিত্য কলসী-কাঁখে জল ভরিতে। ছেলেটি ভাবিত মেয়েটি বড় সুন্দর। অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া শিস দিয়া গান করিত, ছাগল গরু তাড়াইত, মাঝে মাঝে মেয়েটির দিকে চাহিয়া দেখিত। কত সময়ে দুজনের চোখাচোখি হইয়া গিয়াছে। অমনি লজ্জায় লাল হইয়া কিশোরী চোখ নামাইয়া লইত। ছেলেটি রোজ ভাবিত, কাল সে মেয়েটিকে ডাকিয়া কথা কহিবে। বাড়ি ফিরিয়া সে মেয়েটির কথা ভাবিত। কত কাল কাটিয়া গেল, কত 'কাল' আসিল, কত চলিয়া গেল—মনের কথা আর বলা হইল না। তার পর একদিন মেয়েটি আসিল না, পরদিনও আসিল না ; দিন, সপ্তাহ, মাস কাটিয়া গেল, কোথায় সে প্রতিদিনের সুপরিচিতা কিশোরী? ছেলেটি হতাশ হইয়া রোজ রোজ ফিরিয়া আসে মাঠ হইতে—ভীরু-প্রেমিক সাহস করিয়া কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারে না।....ক্রমে ছেলেটিকে দেশ ছাড়িয়া অন্যত্র চাকুরি লইতে হইল। বহুকাল কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু ছেলেটি সেই নদীর ঘাটের রূপসী বালিকাকে আজও ভুলিতে পারে নাই।

দূরের নীল শৈলমালা ও দিগন্তবিস্তারী শস্যক্ষেত্রের দিকে চোখ রাখিয়া প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যায় এই কবিতাটি শুনিতে শুনিতে কতবার মনে হইল, এ কি বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদেরই নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা? কবি-প্রিয়ার নাম রুক্‌মা, কারণ ঐ নামে কবি একটি কবিতা লিখিয়াছে, পূর্বে আমাকে তাহা শুনাইয়াছিল। ভাবিলাম এমন গুণবতী, সুরূপা রুকমাকে পাইয়াও কি কবির বাল্যের সে দুঃখ আজও দূর হয় নাই?

আমাকে তাঁবুতে পৌঁছিয়া দিবার সময়ে বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ একটি বড় বটগাছ দেখাইয়া বলিল—ঐ যে গাছ দেখছেন বাবুজী, ওর তলায় সেবার সভা হয়েছিল, অনেক কবি মিলে কবিতা পড়েছিল। এদেশে বলে মুসায়েরা। আমারও নিমন্ত্রণ ছিল। আমার কবিতা শুনে পাটনার ঈশ্বরীপ্রসাদ দুবে—চেনেন ঈশ্বরীপ্রসাদকে? ভারি এলেমদার লোক, 'দূত' পত্রিকার সম্পাদক—নিজেও একজন ভাল কবি—আমায় খুব খাতির করেছিলেন।

কথা শুনিয়া মনে হইল বেঙ্কটেশ্বর জীবনে এই একবারই সভ্যসমিতিতে দাঁড়াইয়া নিজের কবিতা আবৃত্তি করিবার নিমন্ত্রণ পাইয়াছিল এবং সেদিনটি তাহার জীবনে একটা খুব বড় ও স্মরণীয় দিন গিয়াছে। এত বড় সম্মান আর কখনও সে পায় নাই।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

১

প্রায় তিনমাস পরে নিজের মহালে ফিরিব। সার্ভের কাজ এতদিনে শেষ হইল।

এগারো ক্রোশ রাস্তা। এই পথেই সেবার সেই পৌষ সংক্রান্তির মেলায় আসিয়াছিলাম—সেই শাল-পলাশের বন, শিলাখণ্ড-ছড়ানো মুক্ত প্রান্তর, উঁচু-নিচু শৈলমালা। ঘণ্টা-দুই চলিয়া আসিবার পরে দূরে দিগ্বলয়ের কোলে একটি ধূসর রেখা দেখা গেল—মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্ট।

এই পরিচিত দিক্‌জ্ঞাপক দৃশ্যটি আজ তিনমাস দেখি নাই। এতদিন এখানে আসিয়া আমাদের লবটুলিয়া ও নাঢ়া-বইহারের উপর এমন একটা টান জন্মিয়া গিয়াছে যেন ইহাদের ছাড়িয়া বেশি দিন কোথাও থাকিলে কষ্ট হয়, মনে হয় দেশ ছাড়িয়া বিদেশে আছি। আজ তিনমাস পরে মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের সীমারেখা দেখিয়া প্রবাসীর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আনন্দ অনুভব করিলাম, যদিচ এখনও লবটুলিয়ার সীমানা এখান হইতে সাত-আট মাইল দূরে হইবে।

ছোট একটা পাহাড়ের নীচে এক জায়গায় অনেকখানি জুড়িয়া জঙ্গল কাটিয়া কুসুম-ফুলের আবাদ করিয়াছিল—এখন পাকিবার সময়, কাটুনি জনেরা ক্ষেতে কাজ করিতেছে।

আমি ক্ষেতের পাশের রাস্তা দিয়া যাইতেছি, হঠাৎ ক্ষেতের দিক হইতে কে আমায় ডাকিল—বাবুজী, ও বাবুজী—বাবুজী—

চাহিয়া দেখি, আর বছরের সেই মঞ্চী। বিস্মিত হইলাম, আনন্দিতও হইলাম। ঘোড়া থামাইতেই মঞ্চী হাসিমুখে কাস্তে-হাতে ছুটিয়া আসিয়া ঘোড়ার পাশে দাঁড়াইল। বলিল—আমি দূর থেকেই ঘোড়া দেখে মালুম করেছি। কোথায় গিয়েছিলেন বাবুজী?

মঞ্চী ঠিক তেমনই আছে দেখিতে—বরং আরও একটু স্বাস্থ্যবতী হইয়াছে। কুসুম-ফুলের পাপড়ির গুঁড়া লাগিয়া তাহার হাতখানা ও পরনের শাড়ির সামনের দিকটা রাঙা।

বলিলাম—বহরাবুরু পাহাড়ের নীচে কাজ পড়েছিল, সেখানে তিনমাস ছিলাম। সেখান থেকে ফিরছি। তোমরা এখানে কি করছ?

—কুসুম-ফুল কাটছি, বাবুজী। বেলা হয়ে গিয়েছে, এবেলা নামুন এখানে। ঐ তো কাছেই খুপরি।

আমার কোনো আপত্তি টিকিল না। মঞ্চী কাজ ফেলিয়া আমাকে তাহাদের খুপরিতে লইয়া চলিল। মঞ্চীর স্বামী নক্‌ছেদী ভকৎ আমার আসার সংবাদ শুনিয়া ক্ষেত হইতে আসিল।

নক্‌ছেদী ভকতের প্রথম পক্ষের স্ত্রী খুপরির মধ্যে রান্নার কাজ করিতেছিল, সেও আমাকে দেখিয়া খুশি হইল।

তবে মঞ্চী সকল কাজে অগ্রণী। সে আমার জন্য গমের খড় পাতিয়া পুরু করিয়া বসিবার আসন করিল। একটি ছোট বাটিতে মহুয়ার তৈল আনিয়া আমাকে স্নান করিয়া আসিতে বলিল।

বলিল—চলুন আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাচ্ছি—ঐ টোলার দক্ষিণে একটা ছোট্ট কুণ্ডী আছে। বেশ জল।

বলিলাম—সে জলে আমি নাইব না মঞ্চী। টোলাসুদ্ধ লোক সেই জলে কাপড় কাচে, মুখ ধোয়, স্নান করে, বাসনও মাজে। সে জল বড় খারাপ হবে। তোমরা কি এখানে সেই জলই খাচ্ছ? তাহলে আমি উঠি। ও জল আমি খাব না।

মঞ্চী ভাবনায় পড়িয়া গেল। বোঝা গেল ইহারাও সেই জল ছাড়া অন্য জল পাইবে কোথায় যে খাইবে না! না খাইয়া উপায় কি?

মঞ্চীর বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া আমার কষ্ট হইল। এই দূষিত জল ইহারা মনের আনন্দে পান করিয়া আসিতেছে, কখনও ভাবে নাই এ-জলে আবার কি থাকিতে পারে, আজ আমি যদি জলের অজুহাতে ইহাদের আতিথ্য গ্রহণ না করিয়া চলিয়া যাই, সরলপ্রাণ মেয়েটি মনে বড় আঘাত পাইবে।

মঞ্চীকে বলিলাম—বেশ, ঐ জল খুব ক'রে ফুটিয়ে নাও—তবে খাব। স্নান করা থাক্ গে।

মঞ্চী বলিল—কেন বাবুজী, আমি আপনাকে এক টিন জল ফুটিয়ে দিচ্ছি, তাতেই আপনি স্নান করুন। এখনও তেমন বেলা হয় নি। আমি জল নিয়ে আসছি, বসুন।

মঞ্চী জল আনিয়া রান্নার যোগাড় করিয়া দিল। বলিল—আমার হাতে তো খাবেন না বাবুজী, আপনি নিজেই রাঁধুন তবে!

—কেন খাব না, তুমি যা পার তাই রাঁধো।

—তা হবে না বাবুজী, আপনিই রাঁধুন। একদিনের জন্যে আপনার জাত কেন মারব? আমার পাপ হবে।

—কিছু হবে না। আমি তোমাকে বলছি, এতে কোনো দোষ হবে না।

অগত্যা মঞ্চী রাঁধিতে বসিল। রাঁধিবার আয়োজন বিশেষ কিছু নয়—খানকতক মোটা মোটা হাতে-গড়া রুটি ও বুনো ধুঁধুলের তরকারি। নক্‌ছেদী কোথা হইতে এক ভাঁড় মহিষের দুধ যোগাড় করিয়া আনিল।

রাঁধিতে বসিয়া মঞ্চী এতদিন কোথায় কোথায় ঘুরিয়াছে, সে গল্প করিতে লাগিল। পাহাড়ের অঞ্চলে কলাই কাটিতে গিয়া একটা রামছাগলের বাচ্চা পুষিয়াছিল, সেটা কি করিয়া হারাইয়া গেল সে-গল্পও আমাকে ঠায় বসিয়া শুনিতে হইল।

আমায় বলিল—বাবুজী, কাঁকোয়াড়া-রাজের জমিদারিতে যে গরম জলের কুণ্ডু আছে, জানেন? আপনি তো কাছাকাছি গিয়েছিলেন, সেখানে যান নি?

আমি বলিলাম, কুণ্ডের কথা শুনিয়াছি, কিন্তু সেখানে যাওয়া আমার ঘটে নাই।

মঞ্চী বলিল—জানেন বাবুজী, আমি সেখানে নাইতে গিয়ে মার খেয়েছিলাম। আমাকে নাইতে দেয় নি।

মঞ্চীর স্বামী বলিল—হ্যাঁ, সে এক কাণ্ড বাবুজী। ভারি বদমাইস সেখানকার পাণ্ডার দল।

বলিলাম—ব্যাপারখানা কি?

মঞ্চী স্বামীকে বলিল—তুমি বল না বাবুজীকে। বাবুজী কলকাতায় থাকেন, উনি লিখে দেবেন। তখন বদমাইশ গুণ্ডারা মজা টের পাবে।

নক্‌ছেদী বলিল—বাবুজী, ওর মধ্যে সূরয-কুণ্ড খুব ভাল জায়গা। যাত্রীরা সেখানে স্নান করে। আমরা আমলাতলীর পাহাড়ের নীচে কলাই কাটছিলাম, পূর্ণিমার যোগ পড়লো কিনা! মঞ্চী নাইতে গেল ক্ষেতের কাজ বন্ধ রেখে। আমার সেদিন জ্বর, আমি নাইবো না। বড়বৌ তুলসীও গেল না, ওর তত ধর্মের বাতিক নেই। মঞ্চী সূরয-কুণ্ডে নামতে যাচ্ছে, পাণ্ডারা বলেছে—এই, ওখানে কেন নামছিস? ও বলেছে—জলে নাইবো। তারা বলেছে—তুই কি জাত? ও বলেছে—গাঙ্গোতা। তখন তারা বলেছে—গাঙ্গোতীনকে আমরা নাইতে দিই নে কুণ্ডের জলে, চলে যা। ও তো জানেন তেজী মেয়ে। ও বলেছে—এ তো পাহাড়ী ঝরনা, যে-সে নাইতে পারে। ঐ তো কত লোক নাইছে। ওরা কি সকলে ব্রাহ্মণ আর ছত্রী? বলে যেমন নামতে গিয়েছে, দুজন ছুটে এসে ওকে টেনে-হিঁচড়ে মারতে মারতে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলে। ও কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এল।

—তার পর কি হ'ল?

—কি হবে বাবুজী? আমরা গরীব গাঙ্গোতা কাট্‌নি মজুর। আমাদের ফরিয়াদ কে শুনবে। আমি বলি, কাঁদিস্ নে, তোকে আমি মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডে নাইয়ে আনবো।

মঞ্চী বলিল—বাবুজী, আপনি একটু লিখে দেবেন তো কথাটা! আপনাদের বাঙালী বাবুদের কলমের খুব জোর। পাজীগুলো জব্দ হয়ে যাবে।

উৎসাহের সহিত বলিলাম—নিশ্চয়ই লিখবো।

তাহার পর মঞ্চী পরম যত্নে আমায় খাওয়াইল। বড় ভাল লাগিল তাহার আগ্রহ ও সেবাযত্ন।

বিদায় লইবার সময় তাহাকে বার-বার বলিলাম—সামনের বৈশাখ মাসে যব গম কাটুনির সময় তারা যেন নিশ্চয়ই আমাদের লবটুলিয়া-বইহারে যায়।

মঞ্চী বলিল—ঠিক যাব বাবুজী। সে কি আপনাকে বলতে হবে!

মঞ্চীর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া চলিয়া আসিবার সময় মনে হইল, আনন্দ, স্বাস্থ্য ও সারল্যের প্রতিমূর্তি যেন সে। এই বনভূমির সে যেন বনলক্ষ্মী, পরিপূর্ণ-যৌবনা, প্রাণময়ী, তেজস্বিনী অথচ মুগ্ধা, অনভিজ্ঞা, বালিকাস্বভাবা।

বাঙালীর কলমের উপর অসীম নির্ভরশীলা এই বন্য মেয়েটির নিকট সেদিন যে অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছিলাম, আজ তাহা পালন করিলাম—জানি না ইহাতে এতকাল পরে তাহার কি উপকার হইবে! এতদিন সে কোথায়, কি ভাবে আছে, বাঁচিয়া আছে কি না, তাহাই বা কে জানে?

২

শ্রাবণ মাস। নবীন মেঘে ঢল নামিয়াছে অনেক দিন, নাঢ়া ও লবটুলিয়া-বইহারে কিংবা গ্র্যাণ্ট সাহেবের বটতলায় দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাও, শুধুই দেখ সবুজের সমুদ্রের মত নবীন কচি কাশবন।

একদিন রাজা দোবরু পান্নার চিঠি পাইয়া শ্রাবণ-পূর্ণিমায় তাঁর ওখানে ঝুলনোৎসবের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে চলিলাম। রাজু ও মটুকনাথ ছাড়িল না, আমার সঙ্গে তাহারাও চলিল। হাঁটিয়া যাইবে বলিয়া উহারা রওনা হইল আমার আগেই।

বেলা দেড়টার সময় ডোঙায় মিছি নদী পার হইলাম। দলের সকলের পার হইতে আড়াইটা বাজিয়া গেল। দলটিকে পিছনে ফেলিয়া তখন ঘোড়া ছুটাইয়া দিলাম।

ঘন মেঘ করিয়া আসিল পশ্চিমে। তার পরেই নামিল ঝম্ ঝম্ বর্ষা।

কি অপূর্ব বর্ষার দৃশ্য দেখিলাম সেই অরণ্য-প্রান্তরে! মেঘে মেঘে দিগন্তের শৈলমালা নীল, থম্‌কানো কালো বিদ্যুৎগর্ভ মেঘে আকাশ ছাইয়া আছে, ক্বচিৎ পথের পাশের শাল কি কেঁদ শাখায় ময়ূর পেখম মেলিয়া নৃত্যপরায়ণ, পাহাড়ী ঝরনার জলে গ্রাম্য বালক-বালিকা মহা উৎসাহে শাল-কাটির ও বন্য বাঁশের ঘুনি পাতিয়া কুচো মাছ ধরিতেছে, ধূসর শিলাখণ্ড ভিজিয়া কালো দেখাইতেছে, তাহার উপর বসিয়া মহিষের রাখাল কাঁচা শালপাতার লম্বা বিড়ি টানিতেছে। শান্ত স্তব্ধ দেশ—অরণ্যের পর অরণ্য, প্রান্তরের পর প্রান্তর, শুধুই ঝরনা, পাহাড়ী গ্রাম, মরুম-ছড়ানো রাঙা মাটির জমি, ক্বচিৎ কোথাও পুষ্পিত কদম্ব বা পিয়াল বৃক্ষ।

সন্ধ্যার পূর্বে আমি রাজা দোবরু পান্নার রাজধানীতে পৌঁছিয়া গেলাম।

সেবারকার সেই খড়ের ঘরখানা অতিথিদের অভ্যর্থনার জন্য চমৎকার করিয়া লেপিয়া পুঁছিয়া রাখা হইয়াছে। দেওয়ালে গিরিমাটির রং, পদ্ম গাছ ও ময়ূর আঁকা, শাল কাঠের খুঁটির গায়ে লতা ও ফুল জড়ানো। আমার বিছানা এখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই, আমি ঘোড়ায় আগেই পৌঁছিয়াছিলাম—কিন্তু তাহাতে কোনো অসুবিধা হইল না। ঘরে নূতন মাদুর পাতাই ছিল, গোটা দুই ফর্সা তাকিয়াও দিয়া গেল।

একটু পরে ভানুমতী একখানা বড় পিতলের সরাতে ফলমূল-কাটা ও একবাটি জ্বাল-দেওয়া দুধ লইয়া ঘরে ঢুকিল, তাহার পিছু পিছু আসিল একখানা কাঁচা শালপাতায় গোটা পান, গোটা সুপারি ও অন্যান্য পানের মশলা সাজাইয়া লইয়া আর একটি তাহার বয়সী মেয়ে।

ভানুমতীর পরনে একখানা জাম-রঙের খাটো শাড়ি হাঁটুর উপর উঠিয়াছে, গলায় সবুজ ও লাল হিংলাজের মালা, খোঁপায় জলজ স্পাইডার লিলি গোঁজা। আরও স্বাস্থ্যবতী ও লাবণ্যময়ী হইয়া উঠিয়াছে ভানুমতী—তাহার নিটোল দেহে যৌবনের উচ্ছলিত লাবণ্যের বান ডাকিয়াছে, চোখের ভাবে কিন্তু যে সরলা বালিকা দেখিয়াছিলাম, সেই সরলা বালিকাই আছে।

বলিলাম—কি ভানুমতী, ভাল আছ?

ভানুমতী নমস্কার করিতে জানে না—আমার কথার উত্তরে সরল হাসি হাসিয়া বলিল—আপনি, বাবুজী?

—আমি ভাল আছি।

—কিছু খান। সারাদিন ঘোড়ায় এসে খিদে পেয়েছে খুব।

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে আমার সামনে মাটির মেঝেতে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল ও পিতলের থালাখানা হইতে দুখানা পেঁপের টুকরা আমার হাতে তুলিয়া দিল।

আমার ভাল লাগিল—ইহার নিঃসংকোচ বন্ধুত্ব। বাংলা দেশের মানুষের কাছে ইহা কি অদ্ভুত ধরনের, অপ্রত্যাশিত ধরনের নূতন, সুন্দর, মধুর। কোনো বাঙালী কুমারী অনাত্মীয়া ষোড়শী এমন ব্যবহার করিত? মেয়েদের সম্পর্কে আমাদের মন কোথায় যেন গুটাইয়া পাকাইয়া জড়সড় হইয়া আছে সর্বদা। তাহাদের সম্বন্ধে না পারি প্রাণ খুলিয়া ভাবিতে, না পারি তাহাদের সঙ্গে মন খুলিয়া মিশিতে।

আরও দেখিয়াছি, এ-দেশের প্রান্তর যেমন উদার, অরণ্যানী, মেঘমালা, শৈলশ্রেণী যেমন মুক্ত ও দূরচ্ছন্দা—ভানুমতীর ব্যবহার তেমনি সঙ্কোচহীন, সরল, বাধাহীন। মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারের মত স্বাভাবিক। এমনি পাইয়াছি মঞ্চীর কাছে ও বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদের স্ত্রীর কাছে। অরণ্য ও পাহাড় এদের মনকে মুক্তি দিয়াছে, দৃষ্টিকে উদার করিয়াছে—এদের ভালবাসাও সে অনুপাতে মুক্ত, দৃঢ়, উদার। মন বড় বলিয়া এদের ভালবাসাও বড়।

কিন্তু ভানুমতীর কাছে বসিয়া হাতে তুলিয়া দিয়া খাওয়ানোর তুলনা হয় না। জীবনে সেদিন সর্বপ্রথম আমি অনুভব করিলাম নারীর নিঃসঙ্কোচ ব্যবহারের মাধুর্য। সে যখন স্নেহ করে, তখন সে কি স্বর্গের দ্বার খুলিয়া দেয় পৃথিবীতে!

ভানুমতীর মধ্যে যে আদিম নারী আছে, সভ্য সমাজে সে-নারীর আত্মা সংস্কারের ও বন্ধনের চাপে মূর্ছিত।

সে-বার যে-রকম ব্যবহার পাইয়াছিলাম, এবারকার ব্যবহার তার চেয়েও আপন, ভানুমতী বুঝিতে পারিয়াছে এ বাঙালী বাবু তাদের পরিবারের বন্ধু, তাদেরই শুভাকাঙ্ক্ষী আপনার লোকদের মধ্যে গণ্য—সুতরাং যে ব্যবহার তাহার নিকট পাইলাম তাহা নিজের স্নেহময়ী ভগ্নীর মতই।

অনেককাল হইয়া গিয়াছে—কিন্তু ভানুমতীর এই সুন্দর প্রীতি ও বন্ধুত্বের কথা আমার স্মৃতিপটে তেমনি সমুজ্জ্বল—বন্য অসভ্যতার এই দানের নিকট সভ্য সমাজের বহু সম্পদ্ আমার মনে নিষ্প্রভ হইয়া আছে।

রাজা দোবরু উৎসবের অন্য আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন, এইবার আসিয়া আমার ঘরে বসিলেন।

আমি বলিলাম—ঝুলন কি আপনাদের এখানে বরাবর হয়?

রাজা দোবরু বলিলেন—আমাদের বংশে বহুদিনের উৎসব এইটি। এ সময়ে অনেক দূর থেকে আত্মীয়স্বজন আসে ঝুলনে নাচতে। আড়াই মণ চাল রান্না হবে কাল।

মটুকনাথ আসিয়াছে পণ্ডিত-বিদায়ের লোভে—ভাবিয়াছিল কত বড় রাজবাড়ি, কি কাণ্ডই আসিয়া দেখিবে! তাহার মুখের ভাবে মনে হইল সে বেশ একটু নিরাশ হইয়াছে। এ রাজবাড়ি অপেক্ষা টোলগৃহ যে অনেক ভাল।

রাজু তো মনের কথা চাপিতে না পারিয়া স্পষ্টই বলিল—রাজা কোথায় হুজুর, এ তো এক সাঁওতাল-সর্দার! আমার যে ক'টা মহিষ আছে, রাজার শুনলাম তাও নেই, হুজুর!

সে ইহারই মধ্যে রাজার পার্থিব সম্পদের বিষয় অনুসন্ধান করিয়াছে—গরু, মহিষ এদেশে সম্পদের বড় মাপকাঠি। যার যত মহিষ, সে তত বড়লোক।

গভীর রাত্রে চতুর্দশীর জ্যোৎস্না বনের বড় বড় গাছপালার আড়ালে উঠিয়া যখন সেই বন্য গ্রামের গৃহস্থবাড়ির প্রাঙ্গণে আলো-আঁধারের জাল বুনিয়াছে, তখন শুনিলাম রাজবাড়িতে বহু নারীকণ্ঠের সম্মিলিত এক অদ্ভুত ধরনের গান। কাল ঝুলন-পূর্ণিমা, রাজবাড়িতে নবাগত কুটুম্বিনী ও রাজকন্যার সহচরীগণ কল্যকার নাচগানের মহলা দিতেছে। সারারাত ধরিয়া তাহাদের গান ও মাদল বাজনা থামিল না।

শুনিতে শুনিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি, ঘুমের মধ্যেও ওদের সেই গান কতবার যেন শুনিতে পাইতেছিলাম।

৩

কিন্তু পরদিন ঝুলনোৎসব দেখিয়া মটুকনাথ, রাজু এমন কি মুনেশ্বর সিং পর্যন্ত মুগ্ধ হইয়া গেল।

পরদিন সকালে উঠিয়া দেখি ভানুমতীর বয়সী কুমারী মেয়েই অন্তত ত্রিশজন চারিপাশের বহু টোলা ও পাহাড়ী বস্তি হইতে উৎসব উপলক্ষে আসিয়া জুটিয়াছে। একটি ভাল প্রথা দেখিলাম, এত নাচগানের মধ্যে ইহাদের কেহই মহুয়ার মদ খায় নাই। রাজা দোবরুকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি হাসিয়া গর্বের সুরে বলিলেন—আমাদের বংশে মেয়েদের মধ্যে ও নিয়ম নেই। তা ছাড়া আমি হুকুম না দিলে কারো সাধ্যি নেই আমার ছেলেমেয়ের সামনে মদ খায়।

মটুকনাথ দুপুরবেলা আমায় চুপি চুপি বলিল—রাজা দেখছি আমার চেয়ে গরীব। রাঁধবার জন্যে দিয়েছে মোটা রাঙা চাল, আর পাকা চালকুমড়ো, আর বুনো ধুঁধুল। এতগুলো লোকের জন্যে কি রাঁধি বলুন তো?

সারা সকাল ভানুমতীর দেখা পাই নাই—খাইতে বসিয়াছি, সে এক বাটি দুধ আনিয়া আমার সামনে বসিল।

বলিলাম—তোমাদের গান কাল রাত্রে বেশ লেগেছিল।

ভানুমতী হাসিমুখে বলিল—আমাদের গান বুঝতে পারেন?

বলিলাম—কেন পারব না? এতদিন তোমাদের সঙ্গে আছি, তোমাদের গান বুঝব না কেন?

—আজ ও-বেলা আপনি ঝুলন দেখতে যাবেন তো?

—সেজন্যেই তো এসেছি। কতদূর যেতে হবে?

ভানুমতী ধন্‌ঝরি পাহাড়শ্রেণীর দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—আপনি তো গিয়েছেন ও-পাহাড়ে। আমাদের সেই মন্দির দেখেন নি?

এই সময় ভানুমতীর বয়সী একদল কিশোরী মেয়ে আমার খাবারঘরের দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, বাঙালীবাবুর ভোজন পরম কৌতূহলের সহিত দেখিতে এবং পরস্পরে কি বলাবলি করিতে লাগিল।

ভানুমতী বলিল—যা সব এখান থেকে, এখানে কি?

একটি মেয়ের সাহস অন্য মেয়েদের চেয়ে বেশি, সে একটু আগাইয়া আসিয়া বলিল,—বাবুজীকে ঝুলনের দিন নুন করমচা খেতে দিস্ নি তো?

তাহার এ কথায় পিছনের সব মেয়ে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া এ উহার গায়ে হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল।

ভানুমতীকে বলিলাম—ওরা হাসছে কেন?

ভানুমতী সলজ্জ মুখে বলিল—ওদের জিজ্ঞেস করুন। আমি কি জানি!

ইতিমধ্যে একটি মেয়ে বড় একটা পাকা কামরাঙা লঙ্কা আনিয়া আমার পাতে দিয়া হাসিয়া বলিল—খান বাবুজী একটু লঙ্কার আচার। ভানুমতী শুধু আপনাকে মিষ্টি খাওয়াচ্ছে, তা তো হবে না! আমরা একটু ঝাল খাওয়াই।

সকলে আবার হাসিয়া উঠিল। এতগুলি তরুণীর মুখের সরল হাসিতে দিনমানেই যেন পূর্ণিমার জ্যোৎস্না ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সন্ধ্যার পূর্বে একদল তরুণ-তরুণী পাহাড়ের দিকে রওনা হইল—তাহাদের পিছু পিছু আমরাও গেলাম—সে এক প্রকাণ্ড শোভাযাত্রা। পূর্বদিকে নওয়াদা-লছমীপুরার সীমানায় ধনঝরি পাহাড়, যে পাহাড়ের নীচে মিছি নদী উত্তরবাহিনী হইয়াছে, সে পাহাড়ের বনশীর্ষে পূর্ণচন্দ্র উঠিতেছে, একদিকে নীচু উপত্যকা, বনে বনে সবুজ, অন্যদিকে ধন্‌ঝরি শৈলমালা। মাইল-খানেক হাঁটিয়া আমরা পাহাড়ের পাদদেশে আসিয়া পৌঁছিলাম। কিছুদূর উঠিতে একটা সমতল স্থান পাহাড়ের মাথায়। জায়গাটার ঠিক মাঝখানে একটা প্রাচীন পিয়াল গাছ—গাছের গুঁড়ি ফুল ও লতায় জড়ানো। রাজা দোবরু বলিলেন—এই গাছ অনেক কালের পুরোনো—আমি ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি এই গাছের তলায় ঝুলনের সময় মেয়েরা নাচে।

আমরা একপাশে তালপাতার চেটাই পাতিয়া বসিলাম, আর সেই পূর্ণিমার জ্যোৎস্না প্লাবিত বনান্তস্থলীতে প্রায় ত্রিশটি কিশোরী তরুণী গাছটাকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিল—পাশে পাশে মাদল বাজাইয়া একদল যুবক তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে। ভানুমতীকে দেখিলাম এই দলের পুরোভাগে। মেয়েদের খোঁপায় ফুলের মালা, গায়ে ফুলের গহনা।

কত রাত পর্যন্ত সমানভাবে নাচ ও গান চলিল—মাঝে মাঝে দলটি একটু বিশ্রাম করিয়া লয়, আবার আরম্ভ করে—মাদলের বোল, জ্যোৎস্না, বর্ষাস্নিগ্ধ বনভূমি, সুঠাম শ্যামা নৃত্যপরায়ণা তরুণীর দল—সব মিলিয়া কোনো বড় শিল্পীর অঙ্কিত একখানি ছবির মত তা সুশ্রী—একটি মধুর সঙ্গীতের মত তার আকুল আবেদন। মনে পড়ে দূর ইতিহাসের সোলাঙ্কি-রাজকন্যা ও তার সহচরীগণের এমনি ঝুলন নাচ ও গানের কথা, মনে পড়ে রাখাল বালক বাপ্পাদিত্যকে খেলার ছলে মাল্যদানের কথা।

আজু কি আনন্দ, আজু কি আনন্দ
ঝুলত ঝুলনে শ্যামর চন্দ্

তার চেয়েও বহু দূরের অতীতে, প্রাচীন যুগের প্রস্তর-যুগের ভারতের রহস্যাচ্ছন্ন ইতিহাসের সকল ঘটনা যেন আমার সম্মুখে অভিনীত হইতে দেখিলাম—আদিম ভারতের সে সংস্কৃতি যেন মূর্তিমতী হইয়া উঠিয়াছে সরলা পর্বতবালা ভানুমতী ও তাহার সখীগণের নৃত্যে—হাজার হাজার বৎসর পূর্বের এমনি কত বন, কত শৈলমালা, এমনিতর কত জ্যোৎস্নারাত্রি, ভানুমতীর মত কত বালিকার নৃত্যচঞ্চল চরণের ছন্দে আকুল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের মুখের সেসব হাসি আজও মরে নাই—এই সব গুপ্ত অরণ্য ও শৈলমালার আড়ালে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তারা তাদের বর্তমান বংশধরগণের রক্তে আজও আনন্দ ও উৎসাহের বাণী পাঠাইয়া দিতেছে।

গভীর রাত্রি, চাঁদ ঢলিয়া পড়িয়াছে পশ্চিম দিকের দূর বনের পিছনে। আমরা সবাই পাহাড় হইতে নামিয়া আসিলাম। সুখের বিষয় আজ আকাশে মেঘ নাই, কিন্তু আর্দ্র বাতাস শেষরাত্রে অত্যন্ত শীতল হইয়া উঠিয়াছে। অত রাত্রেও আমি খাইতে বসিলে ভানুমতী দুধ ও পেঁড়া আনিল।

আমি বলিলাম—বড় চমৎকার নাচ দেখলাম তোমাদের।

সে সলজ্জ হাসিমুখে বলিল—আপনার কি আর ভাল লাগবে বাবুজী—আপনাদের কল্‌কাতায় ওসব কি কেউ দ্যাখে?

পরদিন ভানুমতী ও তাহার প্রপিতামহ রাজা দোবরু আমায় কিছুতেই আসিতে দিবে না। অথচ আমার কাজ ফেলিয়া থাকিলে চলে না, বাধ্য হইয়া চলিয়া আসিলাম। আসিবার সময় ভানুমতী বলিল—বাবুজী, কলকাতা থেকে আমার জন্যে একখানা আয়না এনে দেবেন? আমার আয়না একখানা ছিল, অনেকদিন হল ভেঙে গিয়েছে।

ষোল বছর বয়সের সুশ্রী নবযৌবনা কিশোরীর আয়নার অভাব! তবে আয়নার সৃষ্টি হইয়াছে কাদের জন্যে? এক সপ্তাহের মধ্যেই পূর্ণিয়া হইতে একখানা ভাল আয়না আনাইয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

১

কয়েক মাস পরে। ফাল্গুন মাসের প্রথম। লবটুলিয়া হইতে কাছারি ফিরিতেছি, জঙ্গলের মধ্যে কুণ্ডীর ধারে বাংলা কথাবার্তায় ও হাসির শব্দে ঘোড়া থামাইলাম। যত কাছে যাই, ততই আশ্চর্য হই। মেয়েদের গলাও শোনা যাইতেছে—ব্যাপার কি? জঙ্গলের মধ্যে ঘোড়া ঢুকাইয়া কুণ্ডীর ধারে লইয়া গিয়া দেখি, বনঝাউয়ের ঝোপের ধারে শতরঞ্জি পাতিয়া আট-দশটি বাঙালী ভদ্রলোক বসিয়া গল্পগুজব করিতেছে, পাঁচ-ছয়টি মেয়ে কাছেই রান্না করিতেছে, ছ-সাতটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। কোথা হইতে এতগুলি মেয়ে-পুরুষ এই ঘোর জঙ্গলে ছেলেপুলে লইয়া পিকনিক করিতে আসিল বুঝিতে না পারিয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় সকলেরই চোখ আমার দিকে পড়িল—একজন বাংলায় বলিল—এ ছাতুটা আবার কোথা থেকে এসে জুটল এ জঙ্গলে? আম্‌ব্রেলু?

আমি ঘোড়া হইতে নামিয়া তাহাদের কাছে যাইতে যাইতে বলিলাম—আপনারা বাঙালী দেখছি—এখানে কোথা থেকে এলেন?

তাঁরা খুব আশ্চর্য হইলেন, অপ্রতিভও হইলেন। বলিলেন—ও, মশায় বাঙালী, হেঁ-হেঁ, কিছু মনে করবেন না, আমরা ভেবেছি—হেঁ-হেঁ—

বলিলাম—না না, মনে করবার আছে কি? তা আপনারা কোথা থেকে আসছেন, বিশেষ মেয়েদের নিয়ে—

আলাপ জমিয়া গেল। এই দলের মধ্যে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি একজন রিটায়ার্ড ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, রায় বাহাদুর। বাকী সকলে তাঁর ছেলে, ভাইপো, ভাইঝি, মেয়ে, নাতনী, জামাই, জামাইয়ের বন্ধু ইত্যাদি। রায় বাহাদুর কলিকাতায় থাকিতে একখানি বই পড়িয়া জানিতে পারেন, পূর্ণিয়া জেলায় খুব শিকার মেলে, তাই শিকার করিবার কোনো সুবিধা হয় কিনা দেখিবার জন্য পূর্ণিয়ায় তাঁর ভাই মুন্সেফ, সেখানেই আসিয়াছিলেন। আজ সকালে সেখান হইতে ট্রেনে চাপিয়া বেলা দশটার সময় কাটারিয়া পৌঁছান। সেখানে হইতে নৌকা করিয়া কুশী নদী বাহিয়া এখানে পিক্‌নিক্ করিতে আসিয়াছেন—কারণ সকলের মুখেই নাকি শুনিয়াছেন লবটুলিয়া, বোমাইবুরু ও ফুল্‌কিয়া বইহারের জঙ্গল না দেখিয়া গেলে জঙ্গল

দেখাই হইল না। পিক্‌নিক্ সারিয়াই চার মাইল হাঁটিয়া মোহনপুরা জঙ্গলের নীচে কুশী নদীতে গিয়া নৌকা ধরিবেন—ধরিয়া আজ রাত্রেই কাটারিয়া ফিরিয়া যাইবেন।

আমি সত্যই অবাক হইয়া গেলাম। সম্বলের মধ্যে দেখিলাম ইহাদের সঙ্গে আছে একটা দো-নলা শট্‌-গান্—ইহাই ভরসা করিয়া এ ভীষণ জঙ্গলে ইহারা ছেলেমেয়ে লইয়া পিক্‌নিক্ করিতে আসিয়াছেন। অবশ্য সাহস আছে অস্বীকার করিব না, কিন্তু অভিজ্ঞ রায় বাহাদুরের আর একটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল। মোহনপুরা জঙ্গলের নিকট দিয়া এদেশের জংলী লোকেরাই সন্ধ্যার পূর্বে যাইতে সাহস করে না বন্য মহিষের ভয়ে। বাঘ বার হওয়াও আশ্চর্য নয়। বুনো শূয়োর আর সাপের তো কথাই নাই। ছেলেমেয়ে লইয়া পিক্‌নিক্ করিতে আসিবার জায়গা নয় এটা।

রায় বাহাদুর আমাকে কিছুতেই ছাড়িবেন না। বসিতে হইবে, চা খাইতে হইবে। আমি এ জঙ্গলে কি করি, কি বৃত্তান্ত। আমি কি কাঠের ব্যবসা করি? নিজের ইতিহাস বলিবার পরে তাঁহাদিগকে সবসুদ্ধ কাছারিতে রাত্রিযাপন করিতে অনুরোধ করিলাম। কিন্তু তাঁহারা রাজী হইলেন না। রাত্রি দশটার ট্রেনে কাটারিয়াতে উঠিয়া পূর্ণিয়া আজই রাত বারোটায় পৌঁছিতে হইবে। না ফিরিলে বাড়িতে সকলে ভাবিবে, কাজেই থাকিতে অপারগ ইত্যাদি।

জঙ্গলের মধ্যে ইঁহারা এত দূর কেন পিক্‌নিক্ করিতে আসিয়াছেন তাহা বুঝিলাম না। লবটুলিয়া বইহারের উন্মুক্ত প্রান্তর বনানী ও দূরের পাহাড়রাজির শোভা, সূর্যাস্তের রং, পাখীর ডাক, দশ হাত দূরে বনের মধ্যে ঝোপের মাথায় মাথায় এই বসন্তকালে কত চমৎকার ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে—এসবের দিকে ইঁহাদের নজর নাই দেখিলাম। ইঁহারা কেবল চিৎকার করিতেছেন, গান গাহিতেছেন, ছুটাছুটি করিতেছেন, খাওয়ার তরিবৎ কিসে হয় সে-ব্যবস্থা করিতেছেন। মেয়েদের মধ্যে দুটি কলিকাতায় কলেজে পড়ে, বাকী দু-তিনটি স্কুলে পড়ে। ছেলেগুলির মধ্যে একজন মেডিকেল কলেজের ছাত্র, বাকীগুলি বিভিন্ন স্কুল-কলেজে পড়ে। কিন্তু প্রকৃতির এই অত্যাশ্চর্য সৌন্দর্যময় রাজ্যে দৈবাৎ যদি আসিয়াই পড়িয়াছেন, দেখিবার চোখ নাই আদৌ। প্রকৃতপক্ষে ইঁহারা আসিয়াছিলেন শিকার করিতে—খরগোশ, পাখী, হরিণ—পথের ধারে যেন ইঁহাদের বন্দুকের গুলি খাইবার অপেক্ষায় বসিয়া আছে।

যে মেয়েগুলি আসিয়াছে, এমন কল্পনার-লেশ-পরিশূন্য মেয়ে যদি কখনও দেখিয়াছি। তাহারা ছুটাছুটি করিতেছে, বনের ধার হইতে রান্নার জন্য কাঠ কুড়াইয়া আনিতেছে, মুখে বকুনির বিরাম নাই—কিন্তু একবার কেহ চারিধারে চাহিয়া দেখিল না যে কোথায় বসিয়া তাহারা খিচুড়ি রাঁধিতেছে, কোন্ নিবিড় সৌন্দর্যভরা বনানীপ্রান্তে।

একটি মেয়ে বলিল—'টিন-কাটার্' ঠুকবার বড্ড সুবিধে এখানে, না? কত পাথরের নুড়ি!

আর একটি মেয়ে বলিল—উঃ, কি জায়গা! ভাল চাল কোথাও পাবার জো নেই—কাল সারা টাউন খুঁজে বেড়িয়েছি—কি বিশ্রী মোটা চাল—তোমরা আবার বলছিলে পোলাও হবে!

ইহারা কি জানে, যেখানে বসিয়া তারা রান্না করিতেছে, তার দশ-বিশ হাতের মধ্যে রাত্রের জ্যোৎস্নায় পরীরা খেলা করিয়া বেড়ায়?

ইহারা সিনেমার গল্প শুরু করিয়াছে। পূর্ণিয়ায় কালও রাত্রে তাহারা সিনেমা দেখিয়াছে, তা নাকি যৎপরোনাস্তি বাজে। এই সব গল্প। সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার সিনেমার সঙ্গে তাহার তুলনা করিতেছে। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে, কথা মিথ্যা নয়। বৈকাল পাঁচটার সময় ইহারা চলিয়া গেল।

যাইবার সময় কতকগুলি খালি জমাট দুধের ও জ্যামের টিন ফেলিয়া রাখিয়া গেল। লবটুলিয়া জঙ্গলের গাছপালার তলায় সেগুলি আমার কাছে কি খাপছাড়াই দেখাইতেছিল!

২

বসন্তের শেষ হইতেই এবার লবটুলিয়া বইহারের গম পাকিয়া উঠিল। আমাদের মহালে রাই-সরিষার চাষ ছিল গত বৎসর খুব বেশি। এবার অনেক জমিতে গমের আবাদ, সুতরাং এ বছর এখানে কাটুনি মেলার সময় পড়িল বৈশাখের প্রথমেই।

কাটুনি মজুরদের মাথায় যেন টনক আছে, তাহাদের দল এবার শীতের শেষে আসে নাই, এ সময় দলে দলে আসিয়া জঙ্গলের ধারে, মাঠের মধ্যে সর্বত্র খুপরি বাঁধিয়া বাস করিতে শুরু করিয়াছে। দুই-তিন হাজার বিঘা জমির ফসল কাটা হইবে, সুতরাং মজুরও আসিয়াছে প্রায় তিন-চার হাজারের কম নয়। আরও শুনিলাম আসিতেছে।

আমি সকাল হইলেই ঘোড়ায় বাহির হই, সন্ধ্যায় ঘোড়ার পিঠ হইতে নামি। কত নূতন ধরনের লোক আসিতে আরম্ভ করিয়াছে, ইহাদের মধ্যে কত বদমাইশ, গুণ্ডা, চোর, রোগগ্রস্ত—সকলের উপর নজর না রাখিলে এসব পুলিসবিহীন স্থানে একটা দুর্ঘটনা যখন-তখন ঘটিতে পারে।

দু-একটা ঘটনা বলি।

একদিন দেখি এক জায়গায় দুটি বালক ও একটি বালিকা রাস্তার ধারে বসিয়া কাঁদিতেছে।

ঘোড়া হইতে নামিলাম।

জিজ্ঞাসা করিলাম—কি হয়েছে তোমাদের?

উত্তরে যাহা বলিল উহার মর্ম এইরূপ: উহাদের বাড়ি আমাদের মহালে নয়, নন্দলাল ওঝা গোলাওয়ালার গ্রামে। উহারা সহোদর ভাই-বোন, এখানে কাটুনি মেলা দেখিতে আসিয়াছিল। আজই আসিয়াছে পৌছিয়াছে, এবং কোথায় নাকি লাঠি ও দড়ির ফাঁসের জুয়াখেলা হইতেছিল, বড় ছেলেটি সেখানে জুয়া খেলিতে আরম্ভ করে। একটা লাঠির যে-দিকটা মাটিতে ঠেকিয়া আছে সেই প্রান্তটা দড়ি দিয়া জড়াইয়া দিতে হয়, যদি দড়ি খুলিতে খুলিতে লাঠির আগায় ফাঁস জড়াইয়া যায়, তবে খেলাওয়ালা খেলুড়েকে এক পয়সায় চার পয়সা হিসাবে দেয়।

বড় ভাইয়ের কাছে ছিল দশ আনা পয়সা, সে একবারও লাঠিতে ফাঁস বাধাতেই পারে নাই, সব পয়সা হারিয়া ছোট ভাইয়ের আট আনা ও পরিশেষে ছোট বোনের চার আনা পয়সা পর্যন্ত লইয়া বাজি ধরিয়া সর্বস্বান্ত হইয়াছে। এখন উহাদের খাইবার পয়সা নাই, কিছু কেনা বা দেখাশোনা তো দূরের কথা।

আমি তাহাদের কাঁদিতে বারণ করিয়া তাহাদ্গিকে লইয়া জুয়াখেলার অকুস্থানের দিকে চলিলাম। প্রথমে তাহারা জায়গাই স্থির করিতে পারে না, পরে একটা হরীতকী গাছ দেখাইয়া বলিল—এরই তলায় খেলা হচ্ছিল। জনপ্রাণী নেই সেখানে। কাছারির রূপসিং জমাদারের ভাই সঙ্গে ছিল, সে বলিল—জুয়াচোরেরা কি এক জায়গায় বেশীক্ষণ থাকে হুজুর? লম্বা দিয়েছে কোন্ দিকে।

বিকালের দিকে জুয়াড়ী ধরা পড়িল। সে মাইল তিন দূরে একটি বস্তিতে জুয়া খেলিতেছিল, আমার সিপাহীরা দেখিতে পাইয়া তাহাকে আমার নিকট হাজির করিল। ছেলেমেয়েগুলি দেখিয়াই চিনিল।

লোকটা প্রথমে পয়সা ফেরত দিতে চায় না। বলে, সে তো জোর করিয়া কাড়িয়া লয় নাই, উহারা স্বেচ্ছায় খেলিয়া পয়সা হারিয়াছে, ইহাতে তাহার দোষ কি? অবশেষে তাহাকে ছেলেমেয়েদের সব পয়সা তো ফেরত দিতেই হইল—আমি তাহাকে পুলিসে দিবার আদেশ দিলাম।

সে হাতেপায়ে ধরিতে লাগিল। বলিলাম—তোমার বাড়ি কোথায়?

—বালিয়া জেলা, বাবুজী।

—এ রকম করে লোককে ঠকাও কেন? কত পয়সা ঠকিয়েছ লোকজনের?

—গরিব লোক, হুজুর। আমায় ছেড়ে দিন এবার। তিন দিনে মোটে দু-টাকা তিন আনা রোজগার—

—তিন দিনে খুব বেশি রোজগার হয়েছে মজুরদের তুলনায়।

—হুজুর, সারা বছরে এ-রকম রোজগার ক'বার হয়? বছরে ত্রিশ-চল্লিশ টাকা আয়।

লোকটাকে সেদিন ছাড়িয়া দিয়াছিলাম—কিন্তু আমার মহাল ছাড়িয়া সেদিনই চলিয়া যাইবার কড়ারে। আর তাকে কোনদিন কেউ আমাদের মহালের সীমানার মধ্যে দেখেও নাই।

এবার মঞ্চীকে কাটুনী মজুরদের মধ্যে না দেখিয়া উদ্বেগ ও বিস্ময় দুই-ই অনুভব করিলাম। সে বার বার বলিয়াছিল গম কাটিবার সময়ে নিশ্চয়ই আমাদের মহালে আসিবে। ফসল কাটার মেলা আসিল, চলিয়াও গেল—কেন যে সে আসিল না, কিছুই বুঝিলাম না।

অন্যান্য মজুরদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াও কোনো সন্ধান মিলিল না। মনে ভাবিলাম, এত বিস্তীর্ণ ফসলের মহাল কাছাকাছির মধ্যে আর কোথাও নাই, এক কুশী নদীর দক্ষিণে ইসমাইলপুরের দ্বিয়ারা মহাল ছাড়া। কিন্তু সেখানে কেন সে যাইবে, অত দূরে, যখন মজুরি উভয় স্থানেই একই।

অবশেষে ফসলের মেলার শেষদিকে জনৈক গাঙ্গোতা মজুরের মুখে মঞ্চীর সংবাদ পাওয়া গেল। সে মঞ্চীকে ও তাহার স্বামী নক্‌ছেদী ভকৎকে চেনে। একসঙ্গে বহু জায়গায় কাজ করিয়াছে নাকি। তাহারই মুখে শুনিলাম, গত ফাল্গুন মাসে সে উহাদের আকবরপুর গবর্নমেন্ট খাসমহালে ফসল কাটিতে দেখিয়াছে। তাহার পর তাহারা যে কোথায় গেল, সে জানে না।

ফসলের মেলা শেষ হইয়া গেল জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি, এমন সময় একদিন সদর কাছারির প্রাঙ্গণে নক্‌ছেদী ভকৎকে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। নক্‌ছেদী আমার পা জড়াইয়া হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। আরও বিস্মিত হইয়া পা ছাড়াইয়া লইয়া বলিলাম—কি ব্যাপার? তোমরা এবার ফসলের সময় আস নি কেন? মঞ্চী ভাল আছে তো? কোথায় সে?

উত্তরে নক্‌ছেদী যাহা বলিল তাহার মোট মর্ম এই, মঞ্চী কোথায় তাহা সে জানে না। খাসমহালে কাজ করিবার সময়েই মঞ্চী তাহাদের ফেলিয়া কোথায় পালাইয়া গিয়াছে। অনেক খোঁজ করিয়াও তাহার পাত্তা পাওয়া যায় নাই।

বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলাম। কিন্তু দেখিলাম বৃদ্ধ নক্‌ছেদী ভকতের প্রতি আমার কোনো সহানুভূতি নাই, যা কিছু ভাবনা সবই সেই বন্য মেয়েটির জন্য। কোথায় সে গেল, কে তাহাকে ভুলাইয়া লইয়া গেল, কি অবস্থায় কোথায় বা সে আছে? সস্তা বিলাসদ্রব্যের প্রতি তাহার যে রকম আসক্তি লক্ষ করিয়াছি, সে-সবের লোভ দেখাইয়া তাহাকে ভুলাইয়া লইয়া যাওয়াও কষ্টকর নয়। তাহাই ঘটিয়াছে নিশ্চয়।

জিজ্ঞাসা করিলাম—তার ছেলে কোথায়?

—সে নেই। সে বসন্ত হয়ে মারা গিয়েছে মাঘ মাসে।

অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম শুনিয়া। বেচারী পুত্রশোকেই উদাসী হইয়া যেদিকে দু-চোখ যায়, চলিয়া গিয়াছে নিশ্চয়ই। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম—তুলসী কোথায়?

—সে এখানেই এসেছে। আমার সঙ্গেই আছে। আমায় কিছু জমি দিন হুজুর। নইলে আমরা বুড়োবুড়ি, ফসল কেটে আর চলে না। মঞ্চী ছিল, তার জোরে আমরা বেড়াতাম। সে আমার হাত-পা ভেঙে দিয়ে গিয়েছে।

সন্ধ্যার সময় নক্‌ছেদীর খুপরিতে গিয়া দেখিলাম তুলসী তাহার ছেলেমেয়ে লইয়া চীনার দানা ছাড়াইতেছে। আমায় দেখিয়া তুলসী কাঁদিয়া উঠিল। দেখিলাম মঞ্চী চলিয়া যাওয়াতে সেও যথেষ্ট দুঃখিত। বলিল—হুজুর, সব ঐ বুড়োর দোষ। গোরমিন্টের লোক মাঠে সব টিকে দিতে এল, বুড়ো তাকে চার আনা পয়সা ঘুষ দিয়ে তাড়ালে। কাউকে টিকে নিতে দিলে না। বললে, টিকে নিলে বসন্ত হবে। হুজুর তিন দিন গেল না, মঞ্চীর ছেলেটার বসন্ত হল, মারাও গেল। তার শোকে সে পাগলের মত হয়ে গেল—খায় না, দায় না, শুধু কাঁদে।

—তার পর?

—তার পর হুজুর, খাসমহাল থেকে আমাদের তাড়িয়ে দিলে। বললে—বসন্তে তোমাদের লোক মারা গিয়েছে, এখানে থাকতে দেবো না। এক ছোকরা রাজপুত মঞ্চীর দিকে নজর দিত। যেদিন আমরা খাসমহাল থেকে চলে এলাম, সেই রাত্রেই মঞ্চী নিরুদ্দেশ হ'ল। আমি সেদিন সকালে ঐ ছোকরাটাকে খুপরির কাছে ঘুরতে দেখেছি। ঠিক তার কাজ, হুজুর। ইদানীং মঞ্চী বড় কলকাতা দেখব, কলকাতা দেখব করত। তখনই জানি একটা কিছু ঘটবে।

আমারও মনে পড়িল মঞ্চী আর-বছর কলিকাতা দেখিবার যথেষ্ট আগ্রহ দেখাইয়াছিল বটে। আশ্চর্য নয়, ধূর্ত রাজপুত যুবক সরলা বন্য মেয়েটিকে কলিকাতা দেখাইবার লোভ দেখাইয়া ভুলাইয়া লইয়া যাইবে।

আমি জানি এ অবস্থায় এদেশের মেয়েদের শেষ পরিণতি হয় আসামের চা-বাগানে কুলীগিরিতে। মঞ্চীর অদৃষ্টে কি শেষকালে নির্বান্ধব আসামের পার্বত্য অঞ্চলে দাসত্ব ও নির্বাসন লেখা আছে?

বৃদ্ধ নক্‌ছেদীর উপর খুব রাগ হইল। এই লোকটা যত নষ্টের মূল। বৃদ্ধ বয়সে মঞ্চীকে বিবাহ করিতে গিয়াছিল কেন? দ্বিতীয়, গভর্নমেন্টের টিকাদারকে ঘুষ দিয়া বিদায় করিয়াছিল কেন? যদি উহাকে জমি দিই, সে ওর জন্য নয়, উহার প্রৌঢ়া স্ত্রী তুলসী ও ছেলেমেয়েগুলির মুখের দিকে চাহিয়াই দিব!

দিলামও তাই। নাঢ়া-বইহারে শীঘ্র প্রজা বসাইতে হইবে, সদর আপিসের হুকুম আসিয়াছে। প্রথম প্রজা বসাইলাম নক্‌ছেদীকে।

নাঢ়া-বইহারে ঘোর জঙ্গল। মাত্র দু-চার ঘর প্রজা সামান্য সামান্য জঙ্গল কাটিয়া খুপরি বাঁধিতে শুরু করিয়াছে। নক্‌ছেদী প্রথমে জঙ্গল দেখিয়া পিছাইয়া গিয়াছিল, বলিল—হুজুর, দিনমানেই বাঘে খেয়ে ফেলে দেবে ওখানে—কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে ঘর করি।

তাহাকে স্পষ্ট বলিয়া দিলাম, তার পছন্দ না হয়, সে অন্যত্র চেষ্টা দেখুক।

নিরুপায় হইয়া নক্‌ছেদী নাঢ়া-বইহারের জঙ্গলেই জমি লইল।

৩

সে এখানে আসা পর্যন্ত আমি কখনও তাহার খুপরিতে যাই নাই। তবে সেদিন সন্ধ্যার সময় নাঢ়া-বইহারের জঙ্গলের মধ্য দিয়া আসিতে দেখি ঘন জঙ্গলের মধ্যে খানিকটা ফাঁকা জায়গা— নিকটে কাশের দুটি ছোট খুপরি। একটার ভিতর হইতে আলো বাহির হইতেছে।

সেইটাই যে নক্‌ছেদীর তা আমি জানিতাম না, ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনিয়া যে প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটি খুপরির বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল—দেখিলাম সে তুলসী।

—তোমরা এখানে জমি নিয়েছ? নক্‌ছেদী কোথায়?

তুলসী আমায় দেখিয়া থতমত খাইয়া গিয়াছে। ব্যস্তসমস্ত হইয়া সে গমের ভূষি-ভরা একটা চটের গদি পাতিয়া দিয়া বলিল—নামুন বাবুজী—বসুন একটু। ও গিয়েছে লবটুলিয়া, তেল নুন কিনে আনতে দোকানে। বড় ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে।

—তুমি একা এই ঘন-বনের মধ্যে আছ?

—ও-সব সয়ে গিয়েছে, বাবুজী। ভয়ডর করলে কি আমাদের গরীবদের চলে? একা তো থাকতে হ'ত না—কিন্তু অদৃষ্ট যে খারাপ। মঞ্চী যত দিন ছিল, জলেজঙ্গলে কোথাও ভয় ছিল না। কি সাহস, কি তেজ ছিল তার, বাবুজী!

তুলসী তাহার তরুণী সপত্নীকে ভালবাসিত। তুলসী ইহাও জানে এই বাঙালীবাবু মঞ্চীর কথা শুনিতে পাইলে খুশি হইবে।

তুলসীর মেয়ে সুরতিয়া বলিল—বাবুজী, একটা নীলগাইয়ের বাচ্চা ধরে রেখেছি, দেখবেন? সেদিন আমাদের খুপরির পেছনের জঙ্গলে এসে বিকেলবেলা খস্‌খস্ করছিল— আমি আর ছনিয়া গিয়ে ধরে ফেলেছি। বড় ভাল বাচ্চা।

বলিলাম—কি খায় রে?

সুরতিয়া বলিল—শুধু চীনার দানার ভূষি আর গাছের কচি পাতা। আমি কচি কেঁদ পাতা তুলে এনে দিই।

তুলসী বলিল—দেখা না বাবুজীকে—

সুরতিয়া ক্ষিপ্রপদে হরিণীর মত ছুটিয়া খুপরির পিছনদিকে অদৃশ্য হইল। একটু পরে তাহার বালিকা-কণ্ঠের চিৎকার শোনা গেল—আরে নীলগাইয়া তো ভাগলুয়া হৈ রে ছনিয়া— উধার—ইধার —জল্‌দি পাক্‌ড়া—

দুই বোনে হুটাপুটি করিয়া নীলগাইয়ের বাচ্চা পাক্‌ড়াও করিয়া ফেলিল এবং হাঁপাইতে হাঁপাইতে হাসিমুখে আমার সামনে আনিয়া হাজির করিল।

অন্ধকারে আমার দেখিবার সুবিধার জন্য তুলসী একখানা জ্বলন্ত কাঠ উঁচু করিয়া ধরিল। সুরতিয়া বলিল—কেমন, ভাল না বাবুজী? একে খাবার জন্যে কাল রাত্রে ভালুক এসেছিল। ওই মহুয়া গাছে কাল ভালুক উঠেছিল মহুয়া ফুল খেতে—তখন অনেক রাত—বাপ-মা ঘুমোয়, আমি সব টের পাই—তারপর গাছ থেকে নেমে আমাদের খুপরির পেছনে এসে দাঁড়াল। আমি একে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে শুই রাতে—ভালুকের পায়ের শব্দ পেয়ে ওর মুখ হাত দিয়ে জোর করে চেপে আরও জড়িয়ে ধরে শুয়ে রইলুম—

—ভয় করল না তোর, সুরতিয়া?

—ইস্! ভয় বই কি! ভয় আমি করি নে। কাঠ কুড়ুতে গিয়ে জঙ্গলে কত ভালুক-ঝোড় দেখি—তাতেও ভয় করি নে। ভয় করলে চলে বাবুজী?

সুরতিয়া বিজ্ঞের মত মুখখানা করিল।

বড় বড় কলের চিমনির মত লম্বা, কালো কেঁদ গাছের গুঁড়ি ঠেলিয়া আকাশে উঠিয়াছে খুপরির চারিধারে, যেন কালিফোর্নিয়া রেডউড গাছের জঙ্গল। বাদুড় ও নিশাচর কাঁক পাখীর ডানা-ঝটাপটি ডালে ডালে, ঝোপে ঝোপে অন্ধকারে জোনাকির ঝাঁক জ্বলিতেছে, খুপরির পিছনের বনেই শিয়াল ডাকিতেছে—এই কয়টি ছোট ছেলেমেয়ে লইয়া উহাদের মা যে কেমন করিয়া এই নির্জন বনে-প্রান্তরে থাকে, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। হে বিজ্ঞ, রহস্যময় অরণ্য, আশ্রিতজনের প্রতি তোমার সত্যই বড় কৃপা।

কথায় কথায় বলিলাম—মঞ্চী নিজের জিনিস সব নিয়ে গিয়েছে?

সুরতিয়া বলিল—ছোটমা কোনো জিনিস নিয়ে যায় নি। ওর যে বাক্সটা সেবার দেখেছিলেন—ফেলেই রেখে গিয়েছে দেখবেন? আনছি।

বাক্সটা আনিয়া সে আমার সামনে খুলিল। চিরুনি, ছোট আয়না, পুঁতির মালা, একখানা সবুজ-রঙের খেলো রুমাল—ঠিক যেন ছোট খুকির পুতুল-খেলার বাক্স! সেই হিংলাজের মালাছড়াটা কিন্তু নাই, সেবার লবটুলিয়া খামারের মেলায় সেই যেটা কিনিয়াছিল।

কোথায় চলিয়া গেল নিজের ঘর-সংসার ছাড়িয়া কে বলিবে? ইহারা তো জমি লইয়া এতদিন পরে গৃহস্থালি পাতাইয়া বসবাস শুরু করিয়াছে, ইহাদের দলের মধ্যে সে-ই কেবল যে ভবঘুরে সেই ভবঘুরেই রহিয়া গেল!

ঘোড়ায় উঠিবার সময় সুরতিয়া বলিল—আর একদিন আসবেন বাবুজী—আমরা পাখী ধরি ফাঁদ পেতে। নূতন ফাঁদ বুনেছি। একটা ডাহুক আর একটা গুড়গুড়ি পাখী পুষেছি। এরা ডাকলে বনের পাখী এসে ফাঁদে পড়ে—আজ আর বেলা নেই—নইলে ধরে দেখাতাম—

নাঢ়া-বইহারের বন-প্রান্তরের পথে এত রাত্রে আসিতে ভয়-ভয় করে। বাঁয়ে ছোট একটি পাহাড়ী ঝরনার জলস্রোত কুলকুল করিয়া বহিতেছে, কোথায় কি বনের ফুল ফুটিয়াছে, গন্ধেভরা অন্ধকার এক-এক জায়গায় এত নিবিড় যে ঘোড়ার ঘাড়ের লোম দেখা যায় না, আবার কোথাও নক্ষত্রালোকে পাতলা।

নাঢ়া-বইহার নানাপ্রকার বৃক্ষলতা, বন্যজন্তু ও পাখীদের আশ্রয়স্থান—প্রকৃতি ইহার বনভূমি ও প্রান্তরকে অজস্র সম্পদে সাজাইয়াছে, সরস্বতী কুণ্ডী এই নাঢ়া-বইহারেরই উত্তর সীমানায়। প্রাচীন জরিপের থাক-নক্সায় দেখা যায় সেখানে কুশী নদীর প্রাচীন খাত ছিল—এখন মজিয়া মাত্র ঐ জলটুকু অবশিষ্ট আছে—অন্য দিকে সেই প্রাচীন খাতই ঘন অরণ্যে পরিণত—

পুরা যত্র স্রোতঃ পুলিনমধুনা তত্র সরিতাম্—

কি অবর্ণনীয় শোভা দেখিলাম এই বনভূমির সেই নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রে! কিন্তু মন খারাপ হইয়া গেল যখন বেশ বুঝিলাম নাঢ়া-বইহারের এ বন আর বেশি দিন নয়। এত ভালবাসি ইহাকে অথচ আমার হাতেই ইহা বিনষ্ট হইল। দু-বৎসরের মধ্যেই সমগ্র মহালটি প্রজাবিলি হইয়া কুশ্রী টোলা ও নোংরা বস্তিতে ছাইয়া ফেলিল বলিয়া। প্রকৃতির নিজের হাতে সাজানো তার শত বৎসরের সাধনার ফল এই নাঢ়া-বইহার, ইহার অতুলনীয় বন্য সৌন্দর্য ও দূরবিসর্পী প্রান্তর লইয়া বেমালুম অন্তর্হিত হইবে। অথচ কি পাওয়া যাইবে তাহার বদলে?

কতকগুলি খোলার চালের বিশ্রী ঘর, গোয়াল, মকাই-জনারের ক্ষেত, শনের গাদা, দড়ির

চারপাই, হনুমানজীর ধ্বজা, ফণিমনসার গাছ, যথেষ্ট দোক্তা, যথেষ্ট খৈনী, যথেষ্ট কলেরা ও বসন্তের মড়ক।

হে অরণ্য, হে সুপ্রাচীন, আমায় ক্ষমা করিও।

আর একদিন গেলাম সুরতিয়াদের পাখী-ধরা দেখিতে।

সুরতিয়া ও ছনিয়া দুটি খাঁচা লইয়া আমার সঙ্গে নাঢ়া-বইহারের জঙ্গলের বাহিরে মুক্ত প্রান্তরের দিকে চলিল।

বৈকাল বেলা, নাঢ়া-বইহারের মাঠে সুদীর্ঘ ছায়া ফেলিয়া সূর্য পাহাড়ের আড়ালে নামিয়া পড়িয়াছে।

একটা শিমুলচারার তলায় ঘাসের উপর খাঁচা দুটি নামাইল। একটিতে একটি বড় ডাহুক, অন্যটিতে গুড়গুড়ি। এ দুটি শিক্ষিত পাখী, বন্য পাখীকে আকৃষ্ট করিবার জন্য ডাহুকটি অমনি ডাকিতে আরম্ভ করিল।

গুড়গুড়িটা প্রথমত ডাকে নাই।

সুরতিয়া শিষ দিয়া তুড়ি দিয়া বলিল—বোলো রে বহিনিয়া—তোহর কির—

গুড়গুড়ি অমনি ডাকিয়া উঠিল—গুড়-ড়-ড়-ড়—

নিস্তব্ধ অপরাহ্ণে বিস্তীর্ণ মাঠের নির্জনতার মধ্যে সে অদ্ভুত সুর শুধুই মনে আনিয়া দেয় এমনি দিগন্তবিস্তীর্ণতার ছবি, এমনি মুক্ত দিক্‌চক্রবালের স্বপ্ন, ছায়াহীন জ্যোৎস্নালোক। নিকটেই ঘাসের মধ্যে যেখানে রাশি রাশি হলুদ রঙের দুধলি ফুল ফুটিয়াছে, তারই উপর ছনিয়া ফাঁদ পাতিল—যেন পাখীর খাঁচার বেড়ার মত, বাঁশের তৈরি। সেই বেড়া ক'খানা দিয়া গুড়গুড়ি পাখীর খাঁচাটা ঢাকিয়া রাখিয়া দিল।

সুরতিয়া বলিল—চলুন বাবুজী, লুকিয়ে বসি গে ঝোপের আড়ালে। মানুষ দেখলে চিড়িয়া ভাগবে।—সবাই মিলিয়া আমরা শাল-চারার আড়ালে কতক্ষণ ঘাপটি মারিয়া বসিয়া রহিলাম।

ডাহুকটি মাঝে মাঝে থামিতেছে—গুড়গুড়ির কিন্তু রবের বিরাম নাই—একটানা ডাকিয়াই চলিয়াছে—গুড়-ড়-ড়-ড়—

সে কি মধুর অপার্থিব রব! বলিলাম—সুরতিয়া, তোদের গুড়গুড়িটা বিক্রী করবি? কত দাম?

সুরতিয়া বলিল—চুপ চুপ বাবুজী, কথা বলবেন না—ঐ শুনুন, বুনো পাখী আসছে—

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পরে অন্য একটি সুর মাঠের উত্তর দিকে বনপ্রান্তর হইতে ভাসিয়া আসিল—গুড়-ড়-ড়-ড়।

আমার শরীর শিহরিয়া উঠিল। বনের পাখী খাঁচার পাখীর সুরে সাড়া দিয়াছে!

ক্রমে সে-সুর খাঁচার নিকটবর্তী হইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ ধরিয়া দুইটি পাখীর রব পাশাপাশি শোনা যাইতেছিল, ক্রমে দুইটি সুর যেন মিশিয়া এক হইয়া গেল—হঠাৎ আবার একটা সুর—একটা পাখীই ডাকিতেছে—খাঁচার পাখীটা।

ছনিয়া ও সুরতিয়া ছুটিয়া গেল, ফাঁদে পাখী পড়িয়াছে। আমিও ছুটিয়া গেলাম।

ফাঁদে পা বাধাইয়া পাখীটা ঝট্‌পট্ করিতেছে। ফাঁদে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ডাক বন্ধ হইয়া গিয়াছে—কি আশ্চর্য কাণ্ড! চোখকে যেন বিশ্বাস করা শক্ত।

সুরতিয়া পাখীটা হাতে তুলিয়া দেখাইল—দেখুন বাবুজী, কেমন ফাঁদে পা আটকেছে। দেখলেন?

সুরতিয়াকে বলিলাম—পাখী তোরা কি করিস?

সে বলিল—বাবা তিরাশি-রতনগঞ্জের হাটে বিক্রী করে আসে। এক একটা গুড়গুড়ি দু'পয়সা—একটা ডাহুক সাত পয়সা।

বলিলাম—আমাকে বিক্রি কর, দাম দেব।

সুরতিয়া গুড়গুড়িটা আমায় এমনিই দিয়া দিল—কিছুতেই তাহাকে পয়সা লওয়াইতে পারিলাম না।

৪

আশ্বিন মাস। এই সময় একদিন সকালে পত্র পাইলাম রাজা দোবরু পান্না মারা গিয়াছেন এবং রাজপরিবার খুব বিপন্ন—আমি সময় পাইলে যেন যাই। পত্র দিয়াছে জগরু পান্না, ভানুমতীর দাদা।

তখনি রওনা হইয়া সন্ধ্যার কিছু পূর্বে চক্‌মকিটোলা পৌঁছিয়া গেলাম। রাজার বড় ছেলে ও নাতি আমাকে আগাইয়া লইয়া গেল। শুনিলাম রাজা দোবরু গরু চরাইতে চরাইতে হঠাৎ পড়িয়া গিয়া হাঁটুতে আঘাতপ্রাপ্ত হন, শেষ পর্যন্ত হাঁটুর সেই আঘাতেই তাঁর মৃত্যুর কারণ ঘটে।

রাজার মৃত্যু-সংবাদ পাওয়া মাত্র মহাজন আসিয়া গরু-মহিষ বাঁধিয়া রাখিয়াছে। টাকা না পাইলে সে গরু-মহিষ ছাড়িবে না। এদিকে বিপদের উপর বিপদ, নূতন রাজার অভিষেক-উৎসব আগামী কল্য সম্পন্ন হইবে। তাহাতেও কিছু খরচ আছে। কিন্তু সে টাকা কোথায়? তা ছাড়া গরু-মহিষ মহাজনে যদি লইয়া যায়, তবে রাজপরিবারের অবস্থা খুবই হীন হইয়া পড়িবে—ঐ দুধের ঘি বিক্রয় করিয়া রাজার সংসারের অর্ধেক খরচ চলিত—এখন তাহাদের না খাইয়া মরিতে হইবে।

শুনিয়া আমি মহাজনকে ডাকাইলাম। তার নাম বীরবল সিং। আমার কোনো কথাই সে দেখিলাম শুনিতে প্রস্তুত নয়। টাকা না পাইলে কিছুতেই সে গরু-মহিষ ছাড়িবে না। লোকটা ভাল নয় দেখিলাম।

ভানুমতী আসিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে তাহার জ্যাঠামশায় অর্থাৎ প্রপিতামহকে বড়ই ভালবাসিত—জ্যাঠামশায় থাকিতে তাহারা যেন পাহাড়ের আড়ালে ছিল, যেমনি তিনি চোখ বুজিয়াছেন, আর অমনি এই সব গোলমাল। এই সব কথা বলিতে বলিতে ভানুমতীর চোখের জল কিছুতেই থামে না। বলিল—চলুন বাবুজী, আমার সঙ্গে—জ্যাঠামশায়ের গোর আপনাকে দেখিয়ে আনি পাহাড়ের উপর থেকে। আমার কিছু ভাল লাগছে না বাবুজী, কেবল ইচ্ছে হচ্ছে ওঁর কবরের কাছে বসে থাকি।

বলিলাম—দাঁড়াও, মহাজনের একটা কি ব্যবস্থা করা যায় দেখি। তারপর যাব—কিন্তু মহাজনের কোনো ব্যবস্থা করা আপাতত সম্ভব হইল না। দুর্দান্ত রাজপুত মহাজন কারও অনুরোধ-উপরোধ শুনিবার পাত্র নয়। তবে সামান্য একটু খাতির করিয়া আপাতত গরু-মহিষগুলি এখানেই বাঁধিয়া রাখিতে সম্মত হইল মাত্র, তবে দুধ এক ফোঁটাও লইতে দিবে না। মাস দুই পরে এ দেনা শোধার উপায় হইয়াছিল—সেকথা এখন নয়।

ভানুমতী দেখি একা ওদের বাড়ির সামনে দাঁড়াইয়া। বলিল—বিকেল হয়ে গিয়েছে, এর পর যাওয়া যাবে না, চলুন কবর দেখতে।

ভানুমতী একা যে আমার সঙ্গে পাহাড়ে চলিল ইহাতে বুঝিলাম সরলা পর্বতবালা এখন আমাকে তাহার পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পরমাত্মীয় মনে করে। এই পাহাড়ী বালিকার সরল ব্যবহার ও বন্ধুত্ব আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে।

বৈকালের ছায়া নামিয়াছে সেই বড় উপত্যকাটায়।

ভানুমতী বড় তড়বড় করিয়া চলে, ত্রস্তা হরিণীর মত। বলিলাম—শোন ভানুমতী, একটু আস্তে চল, এখানে শিউলিফুলের গাছ কোথায় আছে?

ভানুমতীদের দেশে শিউলিফুলের নাম সম্পূর্ণ আলাদা। ঠিকমত তাহাকে বুঝাইতে পারিলাম না। পাহাড়ের উপরে উঠিতে উঠিতে অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যাইতেছিল। নীল ধন্ঝরি শৈলমালা ভানুমতীদের দেশকে, রাজ্যহীন রাজা দোবরু পান্নার রাজ্যকে মেখলাকারে ঘেরিয়া আছে, বহুদূর হইতে হু-হু-খোলা হাওয়া বহিয়া আসিতেছে।

ভানুমতী চলিতে চলিতে থামিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিল—বাবুজী, উঠতে কষ্ট হচ্ছে?

—কিছু না। একটু আস্তে চল কেবল—কষ্ট কি?

আর খানিকটা চলিয়া সে বলিল—জ্যাঠামশায় চলে গেল, সংসারে আমার আর কেউ রহিল না, বাবুজী—

ভানুমতী ছেলেমানুষের মত কাঁদ-কাঁদ হইয়া কথাটা বলিল।

উহার কথা শুনিয়া আমার হাসি পাইল। বৃদ্ধ প্রপিতামহই না হয় মারা গিয়াছে, মাও নাই, নতুবা উহার বাবা, ভাই, ঠাকুরমা, ঠাকুরদা সবাই বাঁচিয়া, চারিদিকে জাজ্বল্যমান সংসার। হাজার হোক ভানুমতী স্ত্রীলোক এবং বালিকা, পুরুষের একটু সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার ও মেয়েলী আদর-কাড়ানোর প্রবৃত্তি তার পক্ষে স্বাভাবিক।

ভানুমতী বলিল—আপনি মাঝে মাঝে আসবেন বাবুজী, আমাদের দেখাশুনো করবেন—ভুলে যাবেন না বলুন—

নারী সব জায়গায় সব অবস্থাতেই সমান। বন্য বালিকা ভানুমতীও সেই একই ধাতুতে গড়া।

বলিলাম—কেন ভুলে যাব? মাঝে মাঝে আসব নিশ্চয়ই—

ভানুমতী কেমন একরকম অভিমানের সুরে ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল—হ্যাঁ, বাংলা দেশে গেলে, কলকাতা শহরে গেলে আপনার আবার মনে থাকবে এ পাহাড়ে জংলী দেশের কথা—একটু থামিয়া বলিল—আমাদের কথা—আমার কথা—

স্নেহের সুরে বলিলাম—কেন, মনে ছিল না ভানুমতী? আয়নাখানা পাও নি? মনে ছিল কি ছিল না ভাবো—

ভানুমতী উজ্জ্বল মুখে বলিল—উঃ বাবুজী, বড় চমৎকার আয়না—সত্যি, সে-কথা আপনাকে জানাতে ভুলেই গিয়েছি।

সমাধি-স্থানের সেই বটগাছের তলায় যখন গিয়া দাঁড়াইলাম, তখন বেলা নাই বলিলেও হয়, দূর পাহাড়শ্রেণীর আড়ালে সূর্য লাল হইয়া ঢলিয়া পড়িতেছে, কখন ক্ষীণাঙ্গ চাঁদ উঠিয়া বটতলার অপরাহ্নের এই ঘন ছায়া ও সম্মুখবর্তী প্রদোষের গভীর অন্ধকার দূর করিবে, স্থানটি যেন তাহারই স্তব্ধ প্রতীক্ষায় নীরবে দাঁড়াইয়া আছে।

ভানুমতীকে কিছু বনের ফুল কুড়াইয়া আনিতে বলিলাম, উহার ঠাকুরদাদার কবরের পাথরে ছড়াইবার জন্য। সমাধির উপরে ফুল-ছড়ানো-প্রথা এদের দেশে জানা নাই, আমার উৎসাহে সে নিকটের একটা বুনো শিউলিগাছের তলা হইতে কিছু ফুল সংগ্রহ করিয়া আনিল। তাহার পর ভানুমতী ও আমি দুজনেই ফুল ছড়াইয়া দিলাম রাজা দোবরু পান্নার সমাধির উপরে।

ঠিক সেই সময় ডানা ঝট্‌পট্‌ করিয়া একদল সিল্লি ডাকিতে ডাকিতে উড়িয়া গেল বটগাছটার মগডাল হইতে—যেন ভানুমতী ও রাজা দোবরুর সমস্ত অবহেলিত, অত্যাচারিত প্রাচীন পূর্বপুরুষগণ আমার কাজে তৃপ্তিলাভ করিয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—সাধু! সাধু! কারণ আর্য-জাতির বংশধরের এই বোধ হয় প্রথম সম্মান অনার্য রাজ-সমাধির উদ্দেশে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

১

ধাওতাল সাহু মহাজনের কাছে আমাকে একবার হাত পাতিতে হইল। আদায় সেবার হইল কম, অথচ দশ হাজার টাকা রেভিনিউ দাখিল করিতেই হইবে। তহশিলদার বনোয়ারীলাল পরামর্শ দিল, বাকি টাকাটা ধাওতাল সাহুর কাছে কর্জ করুন। আপনাকে সে নিশ্চয়ই দিতে আপত্তি করিবে না। ধাওতাল সাহু আমার মহালের প্রজা নয়, সে থাকে গভর্নমেন্টের খাসমহালে। আমাদের সঙ্গে তার কোনো প্রকার বাধ্যবাধকতা নাই, এ বিষয়ে সে যে এক কথায় আমাকে ব্যক্তিগতভাবে হাজার-তিনেক টাকা ধার দিবে, এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল।

কিন্তু গরজ বড় বালাই। একদিন বনোয়ারীলালকে সঙ্গে লইয়া গোপনে গেলাম ধাওতাল সাহুর বাড়ি, কারণ কাছারির অপর কাহাকেও জানিতে দিতে চাহি না যে, টাকা কর্জ করিয়া দিতে হইতেছে।

ধাওতাল সাহুর বাড়ি পওসদিয়ার একটি ঘিঞ্জি টোলার মধ্যে। বড় একখানা খোলার চালার সামনে খানকতক দড়ির চারপাই পাতা। ধাওতাল সাহু উঠানের এক পাশের তামাকের ক্ষেত নিড়ানি দিয়া পরিষ্কার করিতেছিল—আমাদের দেখিয়া শশব্যস্তে ছুটিয়া আসিল, কোথায় বসাইবে, কি করিবে ভাবিয়া পায় না, খানিকক্ষণের জন্যে যেন দিশাহারা হইয়া গেল।

—এ কি! হুজুর এসেচেন গরিবের বাড়ি, আসুন আসুন। বসুন হুজুর। আসুন তহশিলদার সাহেব।

ধাওতাল সাহুর বাড়িতে চাকরবাকর দেখিলাম না। তাহার একজন হৃষ্টপুষ্ট নাতি, নাম রামলখিয়া, সে-ই আমাদের জন্য ছুটাছুটি করিতে লাগিল। বাড়িঘর আসবাবপত্র দেখিয়া কে বলিবে ইহা লক্ষপতি মহাজনের বাড়ি।

রামলখিয়া আমার ঘোড়ার পিঠ হইতে জিন খুরপাচ খুলিয়া ঘোড়াকে ছায়ায় বাঁধিল। আমাদের জন্য পা ধুইবার জল আনিল। ধাওতাল সাহু নিজেই একখানা তালের পাখা দিয়া বাতাস করিতে লাগিল। সাহুজীর এক নাতনী তামাক সাজিতে ছুটিল। উহাদের যত্নে বড়ই বিব্রত হইয়া উঠিলাম। বলিলাম—ব্যস্ত হবার দরকার নেই সাহুজী, তামাক আনতে হবে না, আমার কাছে চুরুট আছে।

যত আদর-আপ্যায়নই করুক, আসল ব্যাপার সম্বন্ধে কথা পাড়িতে একটু সমীহ হইতেছিল, কি করিয়া কথাটা পাড়ি?

ধাওতাল সাহু বলিল—ম্যানেজার সাহেব কি এদিকে পাখী মারতে এসেছিলেন?

—না, তোমার কাছেই এসেছিলাম সাহুজী।

—আমার কাছে হুজুর? কি দরকার বলুন তো?

—আমাদের কাছারির সদর খাজনার টাকা কম পড়ে গিয়েছে, সাড়ে তিন হাজার টাকার বড় দরকার, তোমার কাছে সেজন্যেই এসেছিলাম।

মরীয়া হইয়াই কথাটা বলিয়া ফেলিলাম, বলিতেই যখন হইবে।

ধাওতাল সাহু কিছুমাত্র না ভাবিয়া বলিল—তার জন্যে আর ভাবনা কি হুজুর? সে হয়ে যাবে এখন, তবে তার জন্যে কষ্ট করে আপনার আসবার দরকার কি ছিল? একখানা চিরকুট লিখে তহশিলদার সাহেবের হাতে পাঠিয়ে দিলেই আপনার হুকুম তামিল হত।

মনে ভাবিলাম এখন আসল কথাটা বলিতে হইবে। টাকা আমি ব্যক্তিগতভাবে লইব, কারণ জমিদারের নামে টাকা কর্জ করিবার আমমোক্তারনামা আমার নাই। একথা শুনিলেও ধাওতাল কি আমায় টাকা দিবে? বিদেশী লোক আমি। আমার কি সম্পত্তি আছে এখানে যে এতগুলি টাকা বিনা বন্ধকে আমায় দিবে? কথাটা একটু সমীহের উপরই বলিলাম।

—সাহুজী, লেখাপড়াটা কিন্তু আমার নামেই করতে হবে। জমিদারের নামে হবে না।

ধাওতাল সাহু আশ্চর্য হইবার সুরে বলিল—লেখাপড়া কিসের? আপনি আমার বাড়ি ব'য়ে এসেছেন সামান্য টাকার অভাব পড়েছে, তাই নিতে। এ তো আসবার দরকারই ছিল না, হুকুম ক'রে পাঠালেই টাকা দিতাম। তার পর যখন এসেছেনই—তখন লেখাপড়া কিসের? আপনি স্বচ্ছন্দে নিয়ে যান, যখন কাছারিতে আদায় হবে, আমায় পাঠিয়ে দিলেই হবে।

বলিলাম—আমি হ্যান্ডনোট দিচ্ছি, টিকিট সঙ্গে করে এনেছি। কিংবা তোমার পাকা খাতা বার কর, সই করে দিয়ে যাই।

ধাওতাল সাহু হাতজোড় করিয়া বলিল—মাপ করুন হুজুর। ও কথাই তুলবেন না। মনে বড় কষ্ট পাব। কোনো লেখাপড়ার দরকার নেই, টাকা আপনি নিয়ে যান।

আমার পীড়াপীড়িতে ধাওতাল কর্ণপাতও করিল না। ভিতর হইতে আমায় নোটের তাড়া গুনিয়া আনিয়া দিয়া বলিল—হুজুর, একটা কিন্তু অনুরোধ আছে।

—কি?

—এ-বেলা যাওয়া হবে না। সিধা বা'র করে দিই, রান্নাখাওয়া ক'রে তবে যেতে পাবেন।

পুনরায় আপত্তি করিলাম, তাহাও টিকিল না। তহশিলদারকে বলিলাম—বনোয়ারীলাল, রাঁধতে পারবে তো? আমার দ্বারা সুবিধে হবে না।

বনোয়ারী বলিল—তা চলবে না, হুজুর, আপনাকে রাঁধতে হবে। আমার রান্না খেলে এ পাড়াগাঁয়ে আপনার দুর্নাম হবে। আমি দেখিয়ে দেব এখন।

বিরাট এক সিধা বাহির করিয়া দিল ধাওতাল সাহুর নাতি। রন্ধনের সময় নাতি-ঠাকুরদা মিলিয়া নানা রকম উপদেশ-পরামর্শ দিতে লাগিল রন্ধন সম্বন্ধে।

ঠাকুরদাদার অনুপস্থিতিতে নাতি বলিল—বাবুজী, ঐ দেখছেন আমার ঠাকুরদাদা, ওঁর জন্যে সব যাবে। এত লোককে টাকা ধার দিয়েছেন বিনা সুদে, বিনা বন্ধকে, বিনা তমসুকে—এখন আর টাকা আদায় হতে চায় না। সকলকে বিশ্বাস করেন, অথচ লোকে কত ফাঁকিই দিয়েছে। লোকের বাড়ি ব'য়ে টাকা ধার দিয়ে আসেন।

গ্রামের আর একজন লোক বসিয়াছিল, সে বলিল—বিপদে আপদে সাহুজীর কাছে হাত পাতলে ফিরে যেতে কখনো কাউকে দেখি নি বাবুজী। সেকেলে ধরনের লোক, এতবড় মহাজন, কখনো আদালতে মোকদ্দমা করেন নি। আদালতে যেতে ভয় পান। বেজায় ভীতু আর ভালমানুষ।

সেদিন যে-টাকা ধাওতাল সাহুর নিকট হইতে আনিয়াছিলাম, তাহা শোধ দিতে প্রায় ছ'মাস দেরি হইয়া গেল—এই ছ'মাসের মধ্যে ধাওতাল সাহু আমাদের ইসমাইলপুর মহালের ত্রিসীমানা দিয়া হাঁটে নাই, পাছে আমি মনে করি যে সে টাকার তাগাদা করিতে আসিয়াছে। ভদ্রলোক আর কাহাকে বলে!

২

প্রায় বছর-খানেক রাখালবাবুদের বাড়ি যাওয়া হয় নাই, ফসলের মেলার পরে একদিন সেখানে গেলাম। রাখালবাবুর স্ত্রী আমায় দেখিয়া খুব খুশি হইলেন। বলিলেন—আপনি আর আসেন না কেন দাদা, কোনো খোঁজখবর নেন না—এই নির্বান্ধব জায়গায় বাঙালীর মুখ দেখা যে কি—আর আমাদের এই অবস্থায়—

বলিয়া দিদি নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন।

আমি চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। বাড়িঘরের অবস্থা আগের মতই হীন, তবে এবার ততটা যেন বিশৃঙ্খল নয়। রাখালবাবুর বড় ছেলেটি বাড়িতেই টিনের মিস্ত্রীর কাজ করে—সামান্যই উপার্জন—তবু যা হয় সংসার একরকম চলিতেছে।

রাখালবাবুর স্ত্রীকে বলিলাম—ছোট ছেলেটিকে অন্তত ওর মামার কাছে কাশীতে রেখে একটু লেখাপড়া শেখান।

তিনি বলিলেন—আপন-মামা কোথায় দাদা? দু-তিনখানা চিঠি লেখা হয়েছিল এত বড় বিপদের খবর দিয়ে—দশটি টাকা পাঠিয়ে দিয়ে সেই যে চুপ করল—আর এই দেড় বছর সাড়াশব্দ নেই। তার চেয়ে দাদা, ওরা মকাই কাটবে, জনার কাটবে, মহিষ চরাবে—তবুও তেমন মামার দোরে যাবে না।

আমি তখনই ঘোড়ায় ফিরিব—দিদি কিছুতেই আসিতে দিলেন না। সে-বেলা থাকিতে হইবে। তিনি কি-একটা খাবার করিয়া আমায় না খাওয়াইয়া ছাড়িবেন না।

অগত্যা অপেক্ষা করিতে হইল। মকাইয়ের ছাতুর সহিত ঘি ও চিনি মিশাইয়া এক রকমের লাড্ডু বাঁধিয়া ও কিছু হালুয়া তৈরি করিয়া দিদি খাইতে দিলেন। দরিদ্র সংসারে যতটা আদর-অভ্যর্থনা করা যাইতে পারে, তাহার ত্রুটি করিলেন না।

বলিলেন—দাদা, ভাদ্রমাসের মকাই রেখেছিলাম আপনার জন্যে তুলে। আপনি ভুট্টাপোড়া খেতে ভালবাসেন, তাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম—মকাই কোথায় পেলেন? কিনেছিলেন?

—না। ক্ষেতে কুড়ুতে যাই, ফসল কেটে নিয়ে গেলে যে-সব ভাঙা, ঝরা ভুট্টা চাষারা ক্ষেতে রেখে যায়—গাঁয়ের মেয়েরাও যায়, আমিও যাই ওদের সঙ্গে—এক ঝুড়ি দেড় ঝুড়ি ক'রে রোজ কুড়োতাম।

আমি অবাক হইয়া বলিলাম—ক্ষেতে কুড়ুতে যেতেন?

—হ্যাঁ, রাত্রে যেতাম, কেউ টের পেত না। গাঁয়ের কত মেয়েরা তো যায়। তাদের সঙ্গে এই ভাদ্র মাসে কম্‌সে-কম দশ টুক্‌রি ভুট্টা কুড়িয়ে এনেছিলাম।

মনে বড় দুঃখ হইল। এ কাজ গরিব গাঙ্গোতার মেয়েরা করিয়া থাকে—এদেশের ছত্রি বা রাজপুত মেয়েরা গরিব হইলেও ক্ষেতের ফসল কুড়াইতে যায় না। আর একজন বাঙালীর মেয়েকে এ-কাজ করিতে শুনিলে মনে বড়ই লাগে। এই অশিক্ষিত গাঙ্গোতাদের গ্রামে বাস করিয়া দিদি এ-সব হীনবৃত্তি শিখিয়াছেন—সংসারের দারিদ্র্যও যে তাহার একটা প্রধান কারণ সে-বিষয়ে ভুল নাই। মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিলাম না, পাছে মনে কষ্ট দেওয়া হয়। এই নিঃস্ব বাঙালী পরিবার বাংলার কোনো শিক্ষা-সংস্কৃতি পাইল না, বছরকয়েক পরে চাষী গাঙ্গোতায় পরিণত হইবে—ভাষায়, চালচলনে, হাবভাবে। এখন হইতেই সে-পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে।

রেলস্টেশন হইতে বহু-দূরে অজ পল্লীগ্রামে আমি আরও দু-একটি এরকম বাঙালী পরিবার দেখিয়াছি। এই সব পরিবারে মেয়ের বিবাহ দেওয়া যে কি দুঃসাধ্য ব্যাপার! এমনি আর একটি বাঙালী ব্রাহ্মণ পরিবার জানিতাম—দক্ষিণ-বিহারে এক অজ গ্রামে তাঁহারা থাকিতেন। অবস্থা নিতান্তই হীন, বাড়িতে তাঁদের তিনটি মেয়ে ছিল, বড়টির বয়স একুশ-বাইশ বছর, মেজটির কুড়ি, ছোটটিরও সতেরো। ইহাদের বিবাহ হয় নাই, হইবার কোনো উপায়ও নাই—স্বঘর জোটানো, বাঙালী পাত্রের সন্ধান পাওয়া এ-সব অঞ্চলে অত্যন্তই কঠিন।

বাইশ বছরের বড় মেয়েটি দেখিতেও সুশ্রী—এক বর্ণও বাংলা জানে না—আকৃতি-প্রকৃতিতে খাঁটি দেহাতী বিহারী মেয়ে—মাঠ হইতে মাথায় মোট করিয়া কলাই আনে, গমের ভূষি আনে।

এই মেয়েটির নাম ছিল ধ্রুবা। পুরাদস্তুর বিহারী নাম।

তাহার বাবা প্রথমে এই গ্রামে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারি করিতে আসিয়া জমিজমা লইয়া চাষবাসের কাজও আরম্ভ করেন। তারপর তিনি মারা যান, বড় ছেলে একেবারে হিন্দুস্থানী—চাষবাস দেখাশুনা করিত, বয়স্থা ভগ্নীদের বিবাহের যোগাড় সে চেষ্টা করিয়াও করিতে পারে নাই। বিশেষত পণ দিবার ক্ষমতা তাদের আদৌ ছিল না জানি।

ধ্রুবা ছিল একেবারে কপালকুণ্ডলা। আমাকে ভাইয়া অর্থাৎ দাদা বলিয়া ডাকিত। গায়ে অসীম শক্তি, গম পিষিতে, উদুখলে ছাতু কুটিতে, মোট বহিয়া আনিতে, গরু-মহিষ চরাইতে চমৎকার মেয়ে, সংসারের কাজকর্মে ঘুণ। তাহার দাদা এ প্রস্তাবও করিয়াছিলেন যে, এমন যদি কোনো পাত্র পান, তিনটি মেয়েকেই একপাত্রে সম্প্রদান করিবেন। মেয়ে তিনটিরও নাকি অমত ছিল না।

মেজ মেয়ে জবাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—বাংলা দেখতে ইচ্ছে হয়?

জবা বলিয়াছিল—নেই ভেইয়া, উহাকে পানি বড্ডি নরম ছে—

শুনিয়াছিলাম বিবাহ করিতে ধ্রুবারও খুব আগ্রহ। সে নিজে নাকি কাহাকে বলিয়াছিল, তাহাকে যে বিবাহ করিবে, তাহার বাড়িতে গরুর দোহাল বা উদুখলওয়ালী ডাকিতে হইবে না—সে একাই ঘণ্টায় পাঁচ সের গম কুটিয়া ছাতু করিতে পারে।

হায় হতভাগিনী বাঙালী কুমারী! এত বৎসর পরেও সে নিশ্চয় আজও গাঙ্গোতীন সাজিয়া দাদার সংসারে যব কুটিতেছে, কলাইয়ের বোঝা মাথায় করিয়া মাঠ হইতে আনিতেছে, কে আর দরিদ্রা দেহাতী বয়স্থা মেয়েকে বিনাপণে বিবাহ করিয়া পাল্কিতে তুলিয়া ঘরে লইয়া গিয়াছে, মঙ্গলশঙ্খ ও উলুধ্বনির মধ্যে!

শান্ত মুক্ত প্রান্তরে যখন সন্ধ্যা নামে, দূর পাহাড়ের গা বাহিয়া যে সরু পথটি দেখা যায় ঘনবনের মধ্যে চেরা সিঁথির মত, ব্যর্থযৌবনা দরিদ্রা ধ্রুবা হয়তো আজও এত বছরের পরে সেই পথ দিয়া শুকনো কাঠের বোঝা মাথায় করিয়া পাহাড় হইতে নামে—এ ছবি কতবার কল্পনানেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়াছি—তেমনি প্রত্যক্ষ করিয়াছি আমার দিদি, রাখালবাবুর স্ত্রী, হয়তো আজও বৃদ্ধা গাঙ্গোতীনদের মত গভীর রাত্রে চোরের মত লুকাইয়া ক্ষেতে-খামারে শুক্‌নো তলায়-ঝরা ভুট্টা ঝুড়ি করিয়া কুড়াইয়া ফেরেন।

৩

ভানুমতীদের ওখান হইতে ফিরিবার পথে শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি সেবার ঘোর বর্ষা নামিল। দিনরাত অবিশ্রান্ত বৃষ্টি, ঘন কাজল-কালো মেঘপুঞ্জে আকাশ ছাইয়াছে ; নাঢ়া ও ফুলকিয়া

বইহারের দিগন্তরেখা বৃষ্টির ধোঁয়ায় ঝাপসা, মহালিখারূপের পাহাড় মিলাইয়া গিয়াছে—মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের শীর্ষদেশ কখনও ঈষৎ অস্পষ্ট দেখা যায়, কখনও যায় না। শুনিলাম পূর্বে কুশী ও দক্ষিণে কারো নদীতে বন্যা আসিয়াছে।

মাইলের পর মাইল ব্যাপী কাশ ও ঝাউ বন বর্ষার জলে ভিজিতেছে, আমার আপিস ঘরের বারান্দায় চেয়ার পাতিয়া বসিয়া দেখিতাম, আমার সামনে কাশবনের মধ্যে একটা বনঝাউয়ের ডালে একটা সঙ্গীহারা ঘুঘু বসিয়া অঝোরে ভিজিতেছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা একভাবেই বসিয়া আছে—মাঝে মাঝে পালক উস্‌কোখুস্‌কো করিয়া ঝুলাইয়া বৃষ্টির জল আটকাইবার চেষ্টা করে, কখনও এমনিই বসিয়া থাকে।

এমন দিনে আপিস-ঘরে বসিয়া দিন কাটানো আমার পক্ষে কিন্তু অসম্ভব হইয়া উঠিত। ঘোড়ায় জিন কষিয়া বর্ষাতি চাপাইয়া বাহির হইয়া পড়িতাম। সে কি মুক্তি! কি উদ্দাম জীবনানন্দ! আর কি অপরূপ সবুজের সমুদ্র চারিদিকে—বর্ষার জলে নবীন, সতেজ, ঘনসবুজ কাশের বন গজাইয়া উঠিয়াছে—যতদূর দৃষ্টি চলে, এদিকে নাঢ়া বইহারের সীমানা ওদিকে মোহনপুরা অরণ্যের অস্পষ্ট নীল সীমারেখা পর্যন্ত বিস্তৃত থৈ থৈ করিতেছে এই সবুজের সমুদ্র—বর্ষাসজল হাওয়ায় মেঘকজ্জল আকাশের নীচে এই দীর্ঘ মরকতশ্যাম তৃণভূমির মাথায় ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে—আমি যেন একা এ অকূল-সমুদ্রের নাবিক—কোন্ রহস্যময় স্বপ্ন-বন্দরের উদ্দেশে পাড়ি দিয়াছি।

এই বিস্তৃত মেঘছায়াশ্যামল মুক্ত তৃণভূমির মধ্যে ঘোড়া ছুটাইয়া মাইলের পর মাইল যাইতাম—কখনও সরস্বতী কুণ্ডীর বনের মধ্যে ঢুকিয়া দেখিয়াছি—প্রকৃতির এই অপূর্ব নিভৃত সৌন্দর্যভূমি যুগলপ্রসাদের স্বহস্তে রোপিত নানাজাতীয় বন্য ফুলে ও লতায় সজ্জিত হইয়া আরও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে সরস্বতী হ্রদ ও তাহার তীরবর্তী বনানীর মত সৌন্দর্যভূমি খুব বেশি নাই—এ নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। হ্রদের ধারে রেড ক্যাম্পিয়নের মেলা বসিয়াছে এই বর্ষাকালে—হ্রদের জলের ধারের নিকট। জলজ ওয়াটারক্রোফ্‌টের বড় বড় নীলাভ সাদা ফুলে ভরিয়া আছে। যুগলপ্রসাদ সেদিনও কি একটা বন্যলতা আনিয়া লাগাইয়া গিয়াছে জানি। সে আজমাবাদ কাছারিতে মুহুরীর কাজ করে বটে, কিন্তু তাহার মন পড়িয়া থাকে সরস্বতী কুণ্ডীর তীরবর্তী লতাবিতানে ও বনপুষ্পের কুঞ্জে।

সরস্বতী কুণ্ডীর বন হইতে বাহির হইতাম—আবার মুক্ত প্রান্তর, আবার দীর্ঘ তৃণভূমি—বনের মাথায় ঘন নীল বর্ষার মেঘ আসিয়া জমিতেছে, সমগ্র জলভার নামাইয়া রিক্ত হইবার পূর্বেই আবার উড়িয়া আসিতেছে নবমেঘপুঞ্জ—একদিকের আকাশে এক অদ্ভুত ধরনের নীল রং ফুটিয়াছে—তাহার মধ্যে একখণ্ড লঘু মেঘ অস্তদিগন্তের রঙে রঞ্জিত হইয়া বহির্বিশ্বের দিগন্তে কোন্ অজানা পর্বতশিখরের মত দেখা যাইতেছে।

সন্ধ্যার বিলম্ব নাই। দিগন্তহারা ফুলকিয়া বইহারের মধ্যে শিয়াল ডাকিয়া উঠিত—একে মেঘের অন্ধকার, তার উপর সন্ধ্যার অন্ধকার নামিতেছে—ঘোড়ার মুখ কাছারির দিকে ফিরাইতাম।

কতবার এই ক্ষান্তবর্ষণ মেঘ-থমকানো সন্ধ্যায় এই মুক্ত প্রান্তরে সীমাহীনতার মধ্যে কোন্ দেবতার স্বপ্ন যেন দেখিয়াছি—এই মেঘ, এই সন্ধ্যা, এই বন, কোলাহলরত শিয়ালের দল, সরস্বতী হ্রদের জলজ পুষ্প, মঞ্চী, রাজু পাঁড়ে, ভানুমতী, মহালিখারূপের পাহাড়, সেই দরিদ্র গোঁড়-পরিবার, আকাশ, ব্যোম সবই তাঁর সুমহতী কল্পনায় একদিন ছিল বীজরূপে নিহিত—তাঁরই আশীর্বাদ আজিকার এই নবনীলনীরদমালার মতই সমুদয় বিশ্বকে অস্তিত্বের অমৃতধারায় সিক্ত করিতেছে—এই বর্ষা-সন্ধ্যা তাঁরই প্রকাশ, এই মুক্ত জীবনানন্দ তাঁরই বাণী, অন্তরের অন্তরে যে বাণী মানুষকে

সচেতন করিয়া তোলে। সে দেবতাকে ভয় করিবার কিছুই নাই—এই সুবিশাল ফুলকিয়া বইহারের চেয়েও, ঐ বিশাল মেঘভরা আকাশের চেয়েও সীমাহীন, অনন্ত তাঁর প্রেম ও আশীর্বাদ। যে যত হীন, যে যত ছোট, সেই বিরাট দেবতার অদৃশ্য প্রসাদ ও অনুকম্পা তার উপর তত বেশি।

আমার মনে যে দেবতার স্বপ্ন জাগিত, তিনি যে শুধু প্রবীণ বিচারক, ন্যায় ও দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, বিজ্ঞ ও বহুদর্শী কিংবা অব্যয়, অক্ষয় প্রভৃতি দুরূহ দার্শনিকতার আবরণে আবৃত ব্যাপার তাহা নয়—নাঢ়া বইহারের কি আজমাবাদের মুক্ত প্রান্তরে কত গোধূলিবেলায় রক্তমেঘস্তূপের, কত দিগন্তহারা জনহীন জ্যোৎস্নালোকিত প্রান্তরের দিকে চাহিয়া মনে হইত তিনিই প্রেম ও রোমান্স, কবিতা ও সৌন্দর্য, শিল্প ও ভাবুকতা—তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসেন, সুকুমার কলাবৃত্তি দিয়া সৃষ্টি করেন, নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়া দিয়া থাকেন নিঃশেষে প্রিয়জনের প্রীতির জন্য—আবার বিরাট বৈজ্ঞানিকের শক্তি ও দৃষ্টি দিয়া গ্রহ-নক্ষত্র-নীহারিকার সৃষ্টি করেন।

৪

এমনি এক বর্ষামুখর শ্রাবণ-দিনে ধাতুরিয়া ইসমাইলপুর কাছারিতে আসিয়া হাজির।

অনেক দিন পরে উহাকে দেখিয়া খুশি হইলাম।

—কি ব্যাপার, ধাতুরিয়া? ভালো আছিস তো?

যে ছোট পুঁটুলির মধ্যে তাহার সমস্ত জাগতিক সম্পত্তি বাঁধা, সেটা হাত হইতে নামাইয়া আমায় হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া বলিল—বাবুজী, নাচ দেখাতে এলাম। বড় কষ্টে পড়েছি, আজ এক মাস কেউ নাচ দেখেনি। ভাবলাম, কাছারিতে বাবুজীর কাছে যাই, সেখানে গেলে তাঁরা ঠিক দেখবেন। আরো ভাল ভাল নাচ শিখেছি, বাবুজী।

ধাতুরিয়া যেন আরও রোগা হইয়া গিয়াছে। উহাকে দেখিয়া কষ্ট হইল।

—কিছু খাবি ধাতুরিয়া?

ধাতুরিয়া সলজ্জভাবে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সে খাইবে।

আমার ঠাকুরকে ডাকিয়া ধাতুরিয়াকে কিছু খাবার দিতে বলিলাম। তখন ভাত ছিল না, ঠাকুর দুধ ও চিঁড়া আনিয়া দিল। ধাতুরিয়ার খাওয়া দেখিয়া মনে হইল, সে অন্তত দু-দিন কিছু খাইতে পায় নাই।

সন্ধ্যার পূর্বে ধাতুরিয়া নাচ দেখাইল। কাছারির প্রাঙ্গণে সেই বন্য অঞ্চলের অনেক লোক জড়ো হইয়াছিল ধাতুরিয়ার নাচ দেখিবার জন্য। আগের চেয়েও ধাতুরিয়া নাচে অনেক উন্নতি করিয়াছে। ধাতুরিয়ার মধ্যে যথার্থ শিল্পীর দরদ ও সাধনা আছে। আমি নিজে কিছু দিলাম, কাছারির লোক চাঁদা করিয়া কিছু দিল। ইহাতে তাহার কত দিনই বা চলিবে?

ধাতুরিয়া পরদিন সকালে আমার নিকট বিদায় লইতে আসিল।

—বাবুজী, কবে কলকাতা যাবেন?

—কেন বল তো?

—আমায় কলকাতা নিয়ে যাবেন বাবুজী? সেই যে আপনাকে বলেছিলাম?

—তুমি এখন কোথায় যাবে ধাতুরিয়া? খেয়ে তবে যেও।

—না বাবুজী, ঝল্লুটোলাতে একজন ভুঁইয়ার বাভনের বাড়ি, তার মেয়ের বিয়ে হবে, সেখানে হয়তো নাচ দেখতে পারে। সেই চেষ্টাতে যাচ্ছি। এখান থেকে আট ক্রোশ রাস্তা—এখন রওনা হলে বিকেল নাগাদ পৌঁছব।

ধাতুরিয়াকে ছাড়িয়া দিতে মন সরে না। বলিলাম—কাছারিতে যদি কিছু জমি দিই, তবে এখানে থাকতে পারবে? চাষবাস কর, থাক না কেন?

মটুকনাথ পণ্ডিতেরও দেখিলাম খুব ভাল লাগিয়াছে ধাতুরিয়াকে। তাহার ইচ্ছা ধাতুরিয়াকে সে টোলের ছাত্র করিয়া লয়। বলিল—বলুন না ওকে বাবুজী, দু-বছরের মধ্যে মুগ্ধবোধ শেষ করিয়ে দেব। ও থাকুক এখানে।

জমি দেওয়ার কথায় ধাতুরিয়া বলিল—বাবুজী, আপনি আমার বড় ভাইয়ের মত, আপনার বড় দয়া। কিন্তু চাষ-কাজ কি আমায় দিয়ে হবে? ওদিকে আমার মন নেই যে! নাচ দেখাতে পেলে আমার মনটা ভারি খুশি থাকে। আর কিছু তেমন ভাল লাগে না।

—বেশ, মাঝে মাঝে নাচ দেখাবে, চাষ করলে তো জমির সঙ্গে তোমায় কেউ শেকল দিয়ে বেঁধে রাখবে না?

ধাতুরিয়া খুব খুশি হইল। বলিল—আপনি যা বলবেন আমি তা শুনব। আপনাকে বড় ভাল লাগে বাবুজী। আমি ঝল্লুটোলা থেকে ঘুরে আসি—আপনার এখানেই আসব।

মটুকনাথ পণ্ডিত বলিল—আর সেই সময় তোমাকে টোলেও ঢুকিয়ে নেবো। তুমি না হয় রাত্রে এসে পড় আমার কাছে। মূর্খ থাকা কিছু নয়, কিছু ব্যাকরণ, কিছু কাব্য লব্‌জ রাখা দরকার।

ধাতুরিয়া তাহার পর বসিয়া বসিয়া নৃত্যশিল্পের বিষয়ে নানা কথা কি সব বলিল, আমি তত বুঝিলাম না। পূর্ণিয়ার হো-হো নাচের ভঙ্গীর সঙ্গে ধরমপুর অঞ্চলের ঐ শ্রেণীর নাচের কি তফাৎ— সে নিজে নূতন কি একটা হাতের মুদ্রা প্রবর্তন করিয়াছে—এই সব ধরনের কথা।

—বাবুজী, আপনি বালিয়া জেলায় ছট্‌ পরবের সময় মেয়েদের নাচ দেখেছেন? ওর সঙ্গে ছক্করবাজি নাচের বেশ মিল থাকে একটা জায়গায়। আপনাদের দেশে নাচ কেমন হয়?

আমি তাহাকে গত বৎসর ফসলের মেলায় দৃষ্ট 'ননীচোর নাটুয়া'র নাচের কথা বলিলাম। ধাতুরিয়া হাসিয়া বলিল—ও কিছু না বাবুজী, ও মুঙ্গেরের গেঁয়ো নাচ। গাঙ্গোতাদের খুশি করবার নাচ। ওর মধ্যে খাঁটি জিনিস কিছু নেই। ও তো সোজা।

বলিলাম—তুমি জানো? নেচে দেখাও তো?

ধাতুরিয়া দেখিলাম নিজের শাস্ত্রে বেশ অভিজ্ঞ। 'ননীচোর নাটুয়া'র নাচ সত্যই সে চমৎকার নাচিল—সেই খুঁৎ-খুঁৎ করিয়া ছেলেমানুষের মত কান্না, সেই চোরা ননী বিতরণ করিবার ভঙ্গী—সেই সব। তাহাকে আরও মানাইল এই জন্য যে, সে সত্যই বালক।

ধাতুরিয়া বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিল—এত মেহেরবানিই যখন করলেন বাবুজী, একবার কলকাতায় কেন নিয়ে চলুন না? ওখানে নাচের আদর আছে।

এই ধাতুরিয়ার সহিত আমার শেষ দেখা।

মাস-দুই পরে শোনা গেল, বি এন ডব্লিউ রেললাইনের কাটারিয়া স্টেশনের অদূরে লাইনের উপর একটি বালকের মৃতদেহ পাওয়া যায়—নাটুয়া বালক ধাতুরিয়ার মৃতদেহ বলিয়া সকলে চিনিয়াছে। ইহা আত্মহত্যা কি দুর্ঘটনা তাহা বলিতে পারিব না। আত্মহত্যা হইলে, কি দুঃখেই বা সে আত্মহত্যা করিল?

সেই বন্য অঞ্চলে দু-বছর কাটাইবার সময় যতগুলি নরনারীর সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম— তার মধ্যে ধাতুরিয়া ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। তাহার মধ্যে যে একটি নির্লোভ সদাচঞ্চল, সদানন্দ, অবৈষয়িক, খাঁটি শিল্পীমনের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম, শুধু সে বন্য দেশ কেন, সভ্য অঞ্চলের মানুষের মধ্যেও তা সুলভ নয়।

৫

আরও তিন বৎসর কাটিয়া গেল।

নাঢ়া বইহার ও লবটুলিয়ার সমুদয় জঙ্গল-মহাল বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। এখন আর কোথাও পূর্বের মত বন নাই। প্রকৃতি কত বৎসর ধরিয়া নির্জনে নিভৃতে যে কুঞ্জ রচনা করিয়া রাখিয়াছিল, কত কেঁয়োঝাঁকার নিভৃত লতা-বিতান, কত স্বপ্নভূমি—জনমজুরেরা নির্মম হাতে সব কাটিয়া উড়াইয়া দিল, যাহা গড়িয়া উঠিয়াছিল পঞ্চাশ বৎসরে, তাহা গেল এক দিনে। এখন কোথাও আর সে রহস্যময় দূরবিসর্পী প্রান্তর নাই, জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রিতে যেখানে মায়াপরীরা নামিত, মহিষের দেবতা দয়ালু টাঁড়বারো হাত তুলিয়া দাঁড়াইয়া বন্য মহিষদলকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিত।

নাঢ়া বইহারের নাম ঘুচিয়া গিয়াছে, লবটুলিয়া এখন একটি বস্তি মাত্র। যে দিকে চোখ যায়, শুধু চালে চালে লাগানো অপকৃষ্ট খোলার ঘর। কোথাও বা কাশের ঘর। ঘন ঘিঞ্জি বসতি—টোলায় টোলায় ভাগ করা—ফাঁকা জায়গায় শুধুই ফসলের ক্ষেত। এতটুকু ক্ষেতের চারিদিকে ফণিমনসার বেড়া। ধরণীর মুক্তরূপ ইহারা কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া নষ্ট করিয়া দিয়াছে।

আছে কেবল একটি স্থান, সরস্বতী কুণ্ডীর তীরবর্তী বনভূমি।

চাকুরির খাতিরে মনিবের স্বার্থরক্ষার জন্য সব জমিতেই প্রজাবিলি করিয়াছি বটে, কিন্তু যুগলপ্রসাদের হাতে সাজানো সরস্বতী-তীরের অপূর্ব বনকুঞ্জ কিছুতেই প্রাণ ধরিয়া বন্দোবস্ত করিতে পারি নাই। কতবার দলে দলে প্রজারা আসিয়াছে সরস্বতী কুণ্ডীর পাড়ের জমি লইতে—বর্ধিত হারে সেলামী ও খাজনা দিতেও চাহিয়াছে, কারণ একে ঐ জমি খুব উর্বরা, তাহার উপর নিকটে জল থাকায় মকাই প্রভৃতি ফসল ভাল জন্মাইবে ; কিন্তু আমি রাজী হই নাই।

তবে কতদিন আর রাখিতে পারিব? সদর আপিস হইতে মাঝে মাঝে চিঠি আসিতেছে, সরস্বতী কুণ্ডীর জমি আমি কেন বিলি করিতে বিলম্ব করিতেছি? নানা ওজর-আপত্তি তুলিয়া এখনও পর্যন্ত রাখিয়াছি বটে, কিন্তু বেশি দিন পারিব না। মানুষের লোভ বড় বেশি, দুটি ভুট্টার ছড়া আর চীনাঘাসের এক কাঠা দানার জন্য প্রকৃতির অমন স্বপ্নকুঞ্জ ধ্বংস করিতে তাহাদের কিছুমাত্র বাধিবে না, জানি। বিশেষ করিয়া এখানকার মানুষে গাছপালার সৌন্দর্য বোঝে না, রম্য ভূমিশ্রীর মহিমা দেখিবার চোখ নাই, তাহারা জানে পশুর মত পেটে খাইয়া জীবনযাপন করিতে। অন্য দেশ হইলে আইন করিয়া এমন সব স্থান সৌন্দর্যপিপাসু প্রকৃতি-রসিক নরনারীর জন্য সুরক্ষিত করিয়া রাখিত, যেমন আছে কালিফোর্নিয়ায় যোসেমাই ন্যাশনাল পার্ক, দক্ষিণ আফ্রিকায় আছে ক্রুগার ন্যাশনাল পার্ক, বেলজিয়ান কঙ্গোতে আছে পার্ক ন্যাশনাল আলবার্ট। আমার জমিদাররা ও ল্যান্ডস্কেপ বুঝিবে না, বুঝিবে সেলামির টাকা, খাজনার টাকা, আদায় ইরশাল, হস্তবুদ।

এই জন্মান্ধ মানুষের দেশে একজন যুগলপ্রসাদ কি করিয়া জন্মিয়াছিল জানি না—শুধু তাহারই মুখের দিকে চাহিয়া আজও সরস্বতী হ্রদের তীরবর্তী বনানী অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছি।

কিন্তু কতদিন রাখিতে পারিব?

যাক্, আমারও কাজ শেষ হইয়া আসিল বলিয়া।

প্রায় তিন বছর বাংলা দেশে যাই নাই—মাঝে মাঝে বাংলা দেশের জন্য মন বড় উতলা হয়। সারা বাংলা দেশ যেন আমার গৃহ—তরুণী কল্যাণী বধূ যেখানে আপন হাতে সন্ধ্যাপ্রদীপ দেখায় ; এখানকার এমন লক্ষ্মীছাড়া উদাস ধূ-ধূ প্রান্তর ও ঘন বনানী নয়—যেখানে নারীর হাতের স্পর্শ নাই।

কি হইতে যেন মনে অকারণ আনন্দের বান ডাকিল, তাহা জানি না। জ্যোৎস্নারাত্রি—তখনই ঘোড়ায় জিন কষিয়া সরস্বতী কুণ্ডীর দিকে রওনা হইলাম, কারণ তখন নাঢ়া ও লবটুলিয়া বইহারের বনরাজি শেষ হইয়া আসিয়াছে—যাহা কিছু অরণ্য-শোভা ও নির্জনতা আছে তখনও সরস্বতীর তীরেই। আমি মনে মনে বেশ বুঝিলাম, এ আনন্দকে উপভোগ করিবার একমাত্র পটভূমি হইতেছে সরস্বতী হ্রদের তীরবর্তী বনানী।

ঐ সরস্বতীর জল জ্যোৎস্নালোকে চিক্ চিক্ করিতেছে—চিক্ চিক্ করিতেছে কি শুধু? ঢেউয়ে ঢেউয়ে জ্যোৎস্না ভাঙিয়া পড়িতেছে। নির্জন, স্তব্ধ বনানী হ্রদের জলের তিনদিকে বেষ্টন করিয়া, বন্য লাল হাঁসের কাকলী, বন্য শেফালীপুষ্পের সৌরভ—কারণ যদিও জ্যৈষ্ঠ মাস, শেফালী ফুল এখানে বারো মাস ফোটে।

কতক্ষণ হ্রদের তীরে এদিকে ওদিকে ইচ্ছামত ঘোড়া চালাইয়া বেড়াইলাম। হ্রদের জলে পদ্ম ফুটিয়াছে, তীরের দিকে ওয়াটারক্রোফ্‌ট ও যুগলপ্রসাদের আনীত স্পাইডার লিলি ঝাড় বাঁধিয়াছে। দেশে চলিয়াছি কতকাল পরে, এ নির্জন অরণ্যবাস হইতে মুক্তি পাইব, সেখানে বাঙালী মেয়ের হাতে রান্না খাদ্য খাইয়া বাঁচিব, কলিকাতায় এক-আধ দিন থিয়েটার-বায়োস্কোপ দেখিব, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কতকাল পরে আবার দেখা হইবে।

এইবার ধীরে ধীরে সে অননুভূত আনন্দের বন্যা আমার মনের কূল ভাসাইয়া দোলা দিতে লাগিল। যোগাযোগ হইয়াছিল বোধ হয় অদ্ভুত—এতদিন পরে দেশে প্রত্যাবর্তন, সরস্বতী হ্রদের জ্যোৎস্নালোকিত বারিরাশি ও বনফুলের শোভা, বন্য শেফালীর জ্যোৎস্নামাখানো সুবাস, শান্ত স্তব্ধতা—ভাল ঘোড়ার চমৎকার কোণাকুণি ক্যান্টার চাল, হু-হু হাওয়া—সব মিলিয়া স্বপ্ন! স্বপ্ন! আনন্দের ঘন নেশা! আমি যেন যৌবনোন্মত্ত তরুণ দেবতা, বাধাবন্ধনহীন মুক্ত গতিতে সময়ের সীমা পার হইয়া চলিয়াছি—এই চলাই যেন আমার অদৃষ্টের জয়লিপি, আমার সৌভাগ্য, আমার প্রতি কোন্ সুপ্রসন্ন দেবতার পরম আশীর্বাদ!

হয়তো আর ফিরিব না—দেশে ফিরিয়া মরিয়াও তো যাইতে পারি। বিদায়—সরস্বতী কুণ্ডী, বিদায়—তীরতরু-সারি, বিদায়—জ্যোৎস্নালোকিত মুক্ত বনানী। কলিকাতার কোলাহলমুখর রাজপথে দাঁড়াইয়া তোমার কথা মনে পড়িবে, বিস্মৃত জীবনদিনের বীণার অনতিস্পষ্ট ঝঙ্কারের মত—মনে পড়িবে যুগলপ্রসাদের আনা গাছগুলির কথা, জলের ধারে স্পাইডার লিলি ও পদ্মের বন, তোমার বনের নিবিড় ডালপালার মধ্যে স্তব্ধ মধ্যাহ্নে ঘুঘুর ডাক, অস্ত-মেঘের ছায়ায় রাঙা ময়নাকাঁটার গুঁড়ি ও ডাল, তোমার নীল জলের উপরকার নীল আকাশে উড়ন্ত সিল্লি ও লাল হাঁসের সারি—জলের ধারের নরম কাদার উপরে হরিণ-শিশুর পদচিহ্ন...নির্জনতা, সুগভীর নির্জনতা।...বিদায় সরস্বতী কুণ্ডী।

ফিরিবার পথে দেখি সরস্বতী হ্রদের বন হইতে বাহির হইয়া মাইলখানেক দূরে একটা জায়গায় বন কাটিয়া একখানা ঘর বসাইয়া মানুষ বাস করিতেছে—এই জায়গাটার নাম হইয়াছে নয়া লবটুলিয়া—যেমন নিউ সাউথ ওয়েলস্ বা নিউ ইয়র্ক। নূতন গৃহস্থ পরিবার আসিয়া বনের ডালপালা কাটিয়া (নিকটে বড় বন নাই, সুতরাং সরস্বতীর তীরবর্তী বন হইতেই আমদানি নিশ্চয়ই) ঘাসের ছাওয়া তিন-চারখানা নীচু নীচু খুপরি বাঁধিয়াছে। তারই নীচে এখনও পর্যন্ত ভিজা দাওয়ার উপর একটা নারিকেল কিংবা কড়ুয়া তেলের গলা-ভাঙা বোতল, একটি উলঙ্গ হামাগুড়িরত কৃষ্ণকায় শিশু, কয়েকটি সিহোড়া গাছের সরু ডালে বোনা ঝুড়ি, একটি মোটা রূপার অনন্ত-পরা যক্ষের মত কালো আঁটসাঁট গড়নের বউ, খানকয়েক পিতলের

লোটা ও থালা ও কয়েকখানা দা, খোন্তা, কোদাল। ইহাই লইয়া ইহারা প্রায় সবাই সংসার করে। শুধু লবটুলিয়া কেন, ইসমাইলপুর ও নাঢ়া বইহারের সর্বত্রই এইরূপ। কোথা হইতে উঠিয়া আসিয়াছে তাই ভাবি ; ভদ্রাসন নাই, পৈতৃক ভিটা নাই, গ্রামের মায়া নাই, প্রতিবেশীর স্নেহমমতা নাই—আজ ইসমাইলপুরের বনে, কাল মুঙ্গেরের দিয়ারা চরে, পরশু জয়ন্তী পাহাড়ের নীচে তরাই ভূমিতে—সর্বত্রই ইহাদের গতি, সর্বত্রই ইহাদের ঘর।

পরিচিত কণ্ঠের আওয়াজ পাইয়া দেখি রাজু পাঁড়ে এই ধরনের একটি গৃহস্থবাড়িতে বসিয়া ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করিতেছে। উহাকে দেখিয়া ঘোড়া হইতে নামিলাম। আমায় সবাই মিলিয়া খাতির করিয়া বসাইল। রাজুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম সে এখানে কবিরাজি করিতে আসিয়াছিল। ভিজিট পাইয়াছে চারি কাঠা যব এবং নগদ আট পয়সা। ইহাতেই সে মহা খুশি হইয়া ইহাদের সহিত আসর জমাইয়া দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা জুড়িয়া দিয়াছে।

আমায় বলিল—বসুন, একটা কথার মীমাংসা করে দিন তো বাবুজী! আচ্ছা, পৃথিবীর কি শেষ আছে? আমি তো এদের বলছি বাবু, যেমন আকাশের শেষ নেই, পৃথিবীরও তেমনি শেষ নেই। কেমন, তাই না বাবুজী?

বেড়াইতে আসিয়া এমন গুরুতর জটিল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সম্মুখীন হইতে হইবে, তাহা ভাবি নাই।

রাজু পাঁড়ের দার্শনিক মন সর্বদাই জটিল তত্ত্ব লইয়া কারবার করে জানি এবং ইহাও জানি যে ইহাদের সমাধানে সে সর্বদাই মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিয়া আসিতেছে, যেমন রামধনু উইয়ের ঢিবি হইতে জন্মায়, নক্ষত্রদল যমের চর, মানুষ কি পরিমাণে বাড়িতেছে—তাহাই সরেজমিনে তদারক করিবার জন্য যম কর্তৃক উহারা প্রেরিত হয়—ইত্যাদি।

পৃথিবীতত্ত্ব যতটা আমার জানা আছে বুঝাইয়া বলিতে রাজু বলিল—কেন সূর্য পূর্বদিকে ওঠে, পশ্চিমে অস্ত যায়, আচ্ছা কোন্ সাগর থেকে সূর্য উঠছে আর কোন্ সাগরে নামছে—এর কেউ নিরাকরণ করতে পেরেছে? রাজু সংস্কৃত পড়িয়াছে, 'নিরাকরণ' কথাটা ব্যবহার করাতে গাঙ্গোতা গৃহস্থ ও তাহার পরিবারবর্গ সপ্রশংস ও বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে রাজুর দিকে চাহিয়া রহিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ভাবিল ইংরেজীনবিশ বংগালীবাবুকে কবিরাজ মশায় একেবারে কি অথৈ জলে টানিয়া লইয়া ফেলিয়াছে। বংগালীবাবু এবার হাবুডুবু খাইয়া মরিল দেখিতেছি!

বলিলাম—রাজু, তোমার চোখের ভুল, সূর্য কোথাও যায় না, এক জায়গায় স্থির আছে।

রাজু আমার মুখের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। গাঙ্গোতার দল হা-হা করিয়া তাচ্ছিল্যের সুরে হাসিয়া উঠিল। হায় গ্যালিলিও! এই নাস্তিক বিচারমূঢ় পৃথিবীতেই তুমি কারারুদ্ধ হইয়াছিলে!

বিস্ময়ের প্রথম রেশ কাটিয়া গেলে রাজু আমায় বলিল—সূরযনারায়ণও পূর্বে উদয়-পাহাড়ে ওঠেন না বা পশ্চিম-সমুদ্রে অস্ত যান না?

বলিলাম—না।

—এ-কথা ইংরিজি বইতে লিখেছে?

—হ্যাঁ।

জ্ঞান মানুষকে সত্যই সাহসী করে ; যে শান্ত, নিরীহ রাজু পাঁড়ের মুখে কখনও উঁচু সুরে কথা শুনি নাই—সে সতেজে, সদর্পে বলিল—ঝুট্ বাত বাবুজী। উদয়পাহাড়ের যে গুহা থেকে সূরযনারায়ণ রোজ ওঠেন সে গুহা একবার মুঙ্গেরের এক সাধু দেখে এসেছিলেন।

অনেক দূর হেঁটে যেতে হয়, পূর্বদিকের একেবারে সীমানায় সে পাহাড়, গুহার মুখে মস্ত পাথরের দরজা, ওঁর অভ্রের রথ থাকে সেই গুহার মধ্যে। যে-সে কি দেখতে পায় হুজুর! বড় বড় সাধু মহান্ত দেখেন। ঐ সাধু অভ্রের রথের একটা কুচি এনেছিলেন—এই এত বড় চক্‌চকে অভ্র—আমার গুরুভাই কামতাপ্রসাদ স্বচক্ষে দেখেছেন।

কথা শেষ করিয়া রাজু সগর্বে একবার সমবেত গাঙ্গোতাদের মুখের দিকে চক্ষু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া চাহিল।

উদয়-পর্বতের গুহা হইতে সূর্যের উত্থানের এত বড় অকাট্য ও চাক্ষুষ প্রমাণ উত্থাপিত করার পরে আমি সেদিন একেবারে নিশ্চুপ হইয়া গেলাম।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

১

যুগলপ্রসাদকে একদিন বলিলাম—চল, নতুন গাছপালার সন্ধান ক'রে আসি মহালিখারূপের পাহাড়ে।

যুগলপ্রসাদ সোৎসাহে বলিল—একরকম লতানে গাছ আছে ওই পাহাড়ের জঙ্গলে—আর কোথাও নেই। চীহড় ফল বলে এদেশে। চলুন খুঁজে দেখি।

নাঢ়া-বইহারের নূতন বস্তিগুলির মধ্য দিয়া পথ। এরই মধ্যে এক এক পাড়ার সর্দারের নাম অনুসারে টোলার নামকরণ হইয়াছে—ঝল্লুটোলা, রূপদাসটোলা, বেগমটোলা ইত্যাদি। উদুখলে ধুপধাপ যব কোটা হইতেছে, খোলাছাওয়া মাটির ঘর হইতে কুণ্ডলী পাকাইয়া ধোঁয়া উপরে উঠিতেছে—উলঙ্গ কৃষ্ণকায় শিশুর দল পথের ধারে ধূলাবালি ছড়াইয়া খেলা করিতেছে।

নাঢ়া-বইহারের উত্তর সীমানা এখনও ঘন বনভূমি। তবে লবটুলিয়া বইহারে আর এতটুকু বনজঙ্গল বা গাছপালা নাই—নাঢ়া বইহারের শোভাময়ী বনভূমির বারো আনা গিয়াছে, কেবল উত্তর সীমানায় হাজার দুই বিঘা জমি এখনও প্রজাবিলি হয় নাই। দেখিলাম যুগলপ্রসাদ ইহাতে বড় দুঃখিত।

বলিল—গাঙ্গোতার দল ব'সে সব নষ্ট করলে, হুজুর। ওদের ঘরবাড়ি নেই, হাঘরের দল। আজ এখানে, কাল সেখানে। এমন বন নষ্ট করলে!

বলিলাম—ওদের দোষ নেই যুগলপ্রসাদ। জমিদারে জমি ফেলে রাখবে কেন, তারাও তো গভর্নমেন্টের রেভিনিউ দিচ্ছে, চিরকাল ঘর থেকে রেভিনিউ গুনবে? জমিদার ওদের এনেছে, ওদের কি দোষ?

—সরস্বতী কুণ্ডী দেবেন না হুজুর। বড় কষ্টে ওখানে গাছপালা সংগ্রহ করে এনে বসিয়েছি—

—আমার ইচ্ছেয় তো হবে না, যুগল। এতদিন বজায় রেখেছে এই যথেষ্ট, আর কতদিন রাখা যাবে বল। ওদিকে জমি ভাল দেখে প্রজারা সব ঝুঁকছে।

সঙ্গে আমাদের দু-তিনজন সিপাহী ছিল। তারা আমাদের কথাবার্তার গতি বুঝিতে না পারিয়া আমাকে উৎসাহ দিবার জন্য বলিল—কিছু ভাববেন না হুজুর, সামনে চৈতী ফসলের পরে সরস্বতী কুণ্ডীর জমি এক টুকরো পড়ে থাকবে না।

মহালিখারূপের পাহাড় প্রায় নয় মাইল দূরে। আমার আপিসঘরের জানালা হইতে ধোঁয়া-ধোঁয়া দেখা যাইত। পাহাড়ের তলায় পৌঁছিতে বেলা দশটা বাজিয়া গেল।

কি সুন্দর রৌদ্র আর কি অদ্ভুত নীল আকাশ সেদিন। এমন নীল কখনও যেন আকাশে দেখি নাই—কেন যে এক-এক দিন আকাশ এমন গাঢ় নীল হয়, রৌদ্রের কি অপূর্ব রং, নীল আকাশ যেন মদের নেশার মত মনকে আচ্ছন্ন করে। কচি পত্রপল্লবের গায়ে রৌদ্র পড়িয়া স্বচ্ছ দেখায়—আর নাঢ়া বইহারের ও লবটুলিয়ার যত বন্যপক্ষীর ঝাঁক বাসা ভাঙিয়া যাওয়াতে কতক সরস্বতী সরোবরের বনে, কতক এখানে ও মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টে আশ্রয় লইয়াছে—তাহাদের কি অবিশ্রান্ত কূজন!

ঘন বন। এমন ঘন নির্জন আরণ্যভূমিতে মনে একটি অপূর্ব শান্তি ও মুক্ত অবাধ স্বাধীনতার ভাব আনে—কত গাছ, কত ডালপালা, কত বনফুল, কত বড় বড় পাথর ছড়ানো—যেখানে সেখানে বসিয়া থাক, শুইয়া পড়, অলস জীবনমুহূর্ত প্রস্ফুটিত পিয়াল বৃক্ষের নিবিড় ছায়ায় বসিয়া কাটাইয়া দাও—বিশাল নির্জন আরণ্যভূমি তোমার শ্রান্ত স্নায়ুমণ্ডলীকে জুড়াইয়া দিবে।

আমরা পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছি—বড় বড় গাছ মাথার উপরে সূর্যের আলোক আটকাইয়াছে—ছোট বড় ঝরণা কল্ কল্ শব্দে বনের মধ্য দিয়া নামিয়া আসিতেছে—হরীতকী গাছ, কেলিকদম্ব গাছের সেগুন পাতার মত বড় বড় পাতায় বাতাস বাধিয়া শন্ শন্ শব্দ হইতেছে। বনমধ্যে ময়ূরের ডাক শোনা গেল।

আমি বলিলাম—যুগলপ্রসাদ, চীহড় ফলের গাছ কোথায়, খোঁজ।

চীহড় ফলের গাছ পাওয়া গেল আরও অনেক উপরে উঠিয়া। স্থলপদ্মের পাতার মত পাতা, খুব মোটা কাষ্ঠময় লতা, আঁকিয়া বাঁকিয়া অন্য গাছকে আশ্রয় করিয়া উঠিয়াছে। ফলগুলি শিমজাতীয়, তবে শিমের দুখানি খোলা কটকী চটিজুতার মত বড়, অমনই কঠিন ও চওড়া—ভিতরে গোল বীচি। আমরা শুকনো লতাপাতা জ্বালাইয়া বীচি পুড়াইয়া খাইয়াছি—ঠিক যেন গোল আলুর মত আস্বাদ।

অনেকদূর উঠিয়াছি। ওই দূরে মোহনপুরা ফরেস্ট—দক্ষিণে ওই আমাদের মহাল, ওই সরস্বতী কুণ্ডীর তীরবর্তী জঙ্গল অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। ওই নাঢ়া-বইহারের অবশিষ্ট সিকিভাগ বন—ওই দূরে কুশী নদী মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের পূর্ব সীমানা ঘেঁষিয়া প্রবাহিত—নিম্নের সমতলভূমির দৃশ্য যেন ছবির মত!

—ময়ূর! ময়ূর—হুজুর, ঐ দেখুন, ময়ূর!—

প্রকাণ্ড একটা ময়ূর মাথার উপরেই এক গাছের ডালে বসিয়া। একজন সিপাহী বন্দুক লইয়া আসিয়াছিল, সে গুলি করিতে গেল, আমি বারণ করিলাম।

যুগলপ্রসাদ বলিল—বাবুজী, একটা গুহা আছে পাহাড়ের মধ্যে জঙ্গলে কোথায়—তার গায়ে সব ছবি আঁকা আছে—কতকালের কেউ জানে না, সেটাই খুঁজছি।

হয়তো বা প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের হাতে আঁকা বা খোদাই ছবি গুহার কঠিন পাথরের গায়ে! পৃথিবীর ইতিহাসের লক্ষ লক্ষ বৎসরের যবনিকা এক মুহূর্তে অপসারিত হইয়া সময়ের উজানে কোথায় লইয়া গিয়া ফেলিবে আমাদের!

প্রাগৈতিহাসিক যুগের গুহাঙ্কিত ছবি দেখিবার প্রবল আগ্রহে জঙ্গল ঠেলিয়া গুহা খুঁজিয়া বেড়াইলাম—গুহাও মিলিল, কিন্তু যে অন্ধকার তাহার ভিতরে, ঢুকিবার সাহস হইল না। ঢুকিলেই বা অন্ধকারের মধ্যে কি দেখিব? অন্য একদিন তোড়জোড় করিয়া আসিতে হইবে—আজ থাক। অন্ধকারে কি শেষে ভীষণ বিষধর চন্দ্রবোড়া কিংবা শঙ্খচূড় সাপের হাতে প্রাণ দিব? এ সব স্থানে তাহাদের অভাব নাই।

যুগলপ্রসাদকে বলিলাম—এ জঙ্গলে কিছু ডালপালা লাগাও নূতন ধরনের। পাহাড়ের বন কেউ কখনো কাটবে না। লবটুলিয়া তো গেল—সরস্বতী কুণ্ডীর ভরসাও ছাড়—

যুগলপ্রসাদ বলিল—ঠিক বলেছেন হুজুর। কথাটা মনে লেগেছে। কিন্তু আপনি তো আসছেন না, আমাকে একাই করতে হবে।

—আমি মাঝে মাঝে এসে দেখে যাব। তুমি লাগাও।

মহালিখারূপের পাহাড় একটা পাহাড় নয়, একটা নাতিদীর্ঘ অনুচ্চ পাহাড়শ্রেণী, কোথাও দেড় হাজার ফুটের বেশি উঁচু নয়—হিমালয়েরই পাদশৈলের নিম্নতর শাখা, যদিও তরাই প্রদেশের জঙ্গল ও আসল হিমালয় এখান হইতে এক-শ হইতে দেড়-শ মাইল দূরে। মহালিখারূপের পাহাড়ের উপর দাঁড়াইয়া নিম্নের সমতলভূমির দিকে চাহিয়া দেখিলে মনে হয় প্রাচীন যুগের মহাসমুদ্র একসময়ে এই বালুকাময় উচ্চ তটভূমির গায়ে আছড়াইয়া পড়িত, গুহাবাসী মানব তখন ভবিষ্যতের গর্ভে নিদ্রিত এবং মহালিখারূপের পাহাড় তখন সেই সুপ্রাচীন মহাসাগরের বালুকাময় বেলাভূমি।

যুগলপ্রসাদ অন্তত আট-দশ রকমের নূতন গাছ-লতা দেখাইল—সমতলভূমির বনে এগুলি নাই—পাহাড়ের উপরকার বনের প্রকৃতি অন্য ধরনের—গাছপালাও অনেক অন্য রকম।

বেলা পড়িয়া আসিতে লাগিল। কি রকমের বনফুলের গন্ধ খুব পাওয়া যাইতেছিল—বেলা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গন্ধটা যেন নিবিড়তর হইয়া উঠিল। গাছের ডালে ঘুঘু, পাহাড়ী বনটিয়া, হরটিট প্রভৃতি কত কি পক্ষীর কূজন!

বাঘের ভয় বলিয়া সঙ্গীরা পাহাড় হইতে নামিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল, নতুবা এই আসন্ন সন্ধ্যায় নিবিড় ছায়ায় নির্জন শৈলসানুর বনভূমিতে যে শোভা ফুটিয়াছে, তাহা ফেলিয়া আসিতে ইচ্ছা করে না।

মুনেশ্বর সিং বলিল—হুজুর, মোহনপুরা জঙ্গলের চেয়েও এখানে বাঘের ভয় বেশি। বিকেলের পর এখানে যারা কাঠকুটো কাটতে আসে, সব নেমে যায়। আর দল না বেঁধে একা কেউ এ পাহাড়ে আসেও না। বাঘ আছে, শঙ্খচূড় সাপ আছে—দেখছেন না, কি গজাড় জঙ্গল সারা পাহাড়ে!

অগত্যা আমরা নামিতে লাগিলাম। পাহাড়ের জঙ্গলে কেলিকদম্ব গাছের বড় পাতার আড়ালে শুক্র ও বৃহস্পতি জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে।

২

একদিন দেখি এমনি একটি নূতন গৃহস্থের বাড়ির দাওয়ায় বসিয়া গনোরী তেওয়ারী স্কুলমাস্টার শালপাতার ওপর ছাতুর তাল মাখিয়া খাইতেছে।

—হুজুর যে! ভাল আছেন?

—বেশ আছি। তুমি কবে এলে? কোথায় ছিলে? এরা তোমার কেউ হয় নাকি?

—কেউ নয়। এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম, বেলা হয়ে গিয়েছে, ব্রাহ্মণ, এদের এখানে অতিথি হলাম। তাই দুটো খাচ্ছি। চেনাশুনো ছিল না, তবে আজ হল।

গৃহকর্তা আগাইয়া আসিয়া আমাকে নমস্কার করিয়া বলিল—আসুন হুজুর, বসুন উঠে।

—না, বসব না। বেশ আছি। কতদিন জমি নিয়েছ?

—আজ দু-মাস হুজুর। এখনও জমি চষতে পারি নি।

গনোরী তেওয়ারীকে একটি ছোট মেয়ে আসিয়া কয়েকটি কাঁচা লঙ্কা দিয়া গেল। সে খাইতেছে কলাইয়ের ছাতু, নুন ও লঙ্কা। ছাতুর যে বিরাট তাল শীর্ণ গনোরী তেওয়ারীর পেটে কোথায় ধরিবে বোঝা কঠিন। গনোরী খাঁটি ভবঘুরে। যেখানে খাইতে বসিয়াছে, সেই দাওয়ার একপাশে একটি ময়লা কাপড়ের পুঁটুলি, একটি গেলাপ অর্থাৎ পাতলা বালাপোশ-জাতীয় লেপ দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম উহা গনোরীর—এবং উহাই উহার সমগ্র জাগতিক সম্পত্তি। গনোরীকে বলিলাম—ব্যস্ত আছি, তুমি কাছারিতে এসো ওবেলা।

বিকালে গনোরী কাছারিতে আসিল।

বলিলাম—কোথায় ছিলে গনোরী?

—বাবুজী, মুঙ্গের জেলার পাড়াগাঁ অঞ্চলে। বহুৎ পাড়াগাঁয়ে ঘুরেছি।

—কি ক'রে বেড়াতে?

—পাঠশালা করতাম। ছেলে পড়াতাম।

—কোনো পাঠশালা টিক্‌ল না?

—দু-তিন মাসের বেশি নয় হুজুর। ছেলেরা মাইনে দেয় না।

—বিয়ে-থাওয়া করেছ? বয়স কত হল?

—নিজেরই পেট চলে না হুজুর, বিয়ে ক'রে করব কি? বয়স চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হয়েছে।

গনোরীর মত এত দরিদ্র লোক এ অঞ্চলেও বেশি দেখা যায় না। মনে পড়িল, গনোরী একবার বিনা-নিমন্ত্রণে ভাত খাইতে আমার কাছারিতে আসিয়াছিল, প্রথম যেবার এখানে আসি। বর্তমানে বোধ হয় কতকাল সে ভাত খাইতে পায় নাই। গাঙ্গোতা-বাড়িতে অতিথি হইয়া কলাইয়ের ছাতু খাইয়া দিন কাটাইতেছে।

বলিলাম—গনোরী, আজ রাত্রে আমার এখানে খাবে। কণ্টু মিশির রাঁধে, তার হাতে তোমার তো খেতে আপত্তি নেই?

গনোরী বেজায় খুশি হইল। একগাল হাসিয়া বলিল—কণ্টু আমাদেরই ব্রাহ্মণ, ওর হাতে আগেও তো খেয়েছি—আপত্তি কি?

তারপর বলিল—হুজুর, বিয়ের কথা যখন তুললেন তখন বলি। আর বছর শ্রাবণ মাসে একটা গাঁয়ে পাঠশালা খুললাম। গাঁয়ে এক ঘর আমাদেরই ব্রাহ্মণ ছিল। তার বাড়িতে থাকি। ওর মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা সব ঠিকঠাক, এমন কি আমি মুঙ্গের থেকে ভাল মেরজাই একটা কিনে আনলাম—তারপর পাড়ার লোক ভাঙচি দিলে—বললে—ও গরিব স্কুল-মাস্টার, চাল নেই, চুলো নেই, ওকে মেয়ে দিও না। তাই সে বিয়ে ভেঙে গেল। আমি সে গাঁ ছেড়ে চলেও গেলাম।

—মেয়েটিকে দেখেছিলে? দেখতে ভাল?

—দেখি নি? চমৎকার মেয়ে, হুজুর। তা আমাকে কেন দেবে? সত্যিই তো, আমার কি আছে বলুন না?

দেখিলাম গনোরী বেশ দুঃখিত হইয়াছে বিবাহ ফাঁসিয়া যাওয়াতে, মেয়েটিকে মনে ধরিয়াছিল।

তারপর অনেকক্ষণ বসিয়া সে গল্প করিল। তাহার কথা শুনিয়া মনে হইল, জীবন তাহাকে কোনো জিনিস দেয় নাই—গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ফিরিয়াছে, দুটি পেটের ভাতের জন্য। তাও জোটাইতে পারে নাই। গাঙ্গোতাদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়াই অর্ধেক জীবন কাটাইয়া দিল।

বলিল—অনেকদিন পরে তাই লবটুলিয়াতে এলাম। এখানে অনেক নতুন বস্তি হয়েছে শুনেছিলাম। সে জঙ্গল-মহাল আর নেই। এখানে যদি একটা পাঠশালা খুলি—তাই এলাম। চলবে না, কি বলেন হুজুর?

তখনই মনে মনে ভাবিলাম, এখানে একটা পাঠশালা করিয়া দিয়া গনোরীকে রাখিয়া দিব। এতগুলি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আমার মহালে নব আগন্তুক, তাহাদের শিক্ষার একটা ব্যবস্থা করা আমারই কর্তব্য। দেখি কি করা যায়।

৩

অপূর্ব জ্যোৎস্না-রাত। যুগলপ্রসাদ ও রাজু পাঁড়ে গল্প করিতে আসিল। কাছারি হইতে কিছু দূরে একটি ছোট বস্তি বসিয়াছে। সেখানকার একটি লোকও আসিল। আজ চার দিন মাত্র তাহারা ছাপরা জেলা হইতে এখানে আসিয়া বাস করিতেছে।

লোকটি তাহার জীবনের ইতিহাস বলিতেছিল। স্ত্রী-পুত্র লইয়া কত জায়গায় ঘুরিয়াছে, কত চরে-জঙ্গলে বন কাটিয়া কতবার ঘরদোর বাঁধিয়াছে। কোথাও তিন বছর, কোথাও পাঁচ বছর, এক জায়গায় কুশী নদীর ধারে ছিল দশ বছর। কোথাও উন্নতি করিতে পারে নাই। এইবার লবটুলিয়া বইহারে আসিয়াছে উন্নতি করিতে।

এইসব যাযাবর গৃহস্থজীবন বড় বিচিত্র। কথা বলিয়া দেখিয়াছি ইহাদের সঙ্গে, সম্পূর্ণ বন্ধনমুক্ত, ব্রাত্য ইহাদের জীবন—সমাজ নাই, সংসার নাই, ভিটার মায়া নাই, নীল আকাশের নীচে সংসার রচনা করিয়া, বনে, শৈলশ্রেণীর মধ্যস্থ উপত্যকায়, বড় নদীর নির্জন চরে ইহাদের বাস। আজ এখানে, কাল সেখানে।

ইহাদের প্রেম-বিরহ, জীবন-মৃত্যু সবই আমার কাছে নূতন ও অদ্ভুত। কিন্তু সকলের চেয়ে অদ্ভুত লাগিল বর্তমানে এই লোকটির উন্নতির আশা।

এই লবটুলিয়ার জঙ্গলে সামান্য পাঁচ বিঘা কি দশ বিঘা জমিতে গম চাষ করিয়া সে কিরূপ উন্নতির আশা করে বুঝিয়া উঠা কঠিন।

লোকটির বয়স পঞ্চাশ পার হইয়াছে। নাম বলভদ্র সেঙ্গাই, জাতে চাষা কলোয়ার অর্থাৎ কলু। এই বয়সে সে এখনও আশা রাখে জীবনে উন্নতি করিবার।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—বলভদ্র, এর আগে কোথায় ছিলে?

—হুজুর, মুঙ্গের জেলায় এক দিয়ারার চরে। দু-বছর সেখানে ছিলাম—তারপরে অজন্মা হয়ে মকাই ফসল নষ্ট হয়ে গেল। সে-জায়গায় উন্নতি হবার আশা নেই, দেখলাম। হুজুর, সংসারে সবাই উন্নতি করবার জন্যে চেষ্টা পায়। এইবার দেখি হুজুরের আশ্রয়ে—

রাজু পাঁড়ে বলিল—আমার ছ'টা মহিষ ছিল যখন প্রথম এখানে আসি—এখন হয়েছে দশটা। লবটুলিয়া উন্নতির জায়গা—

বলভদ্র বলিল—মহিষ আমায় একজোড়া কিনে দাও পাঁড়েজী। এবার ফসল হোক, সেই টাকা দিয়ে মহিষ কিনতেই হবে—ও ভিন্ন উন্নতি হয় না।

গনোরী ইহাদের কথা শুনিতেছিল। সেও বলিল—ঠিক কথা। আমারও ইচ্ছে আছে মহিষ দু-একটা কিনব। একটু কোথাও বসতে পারলেই—

মহালিখারূপের পাহাড়ের গাছপালা এবং তাহারও পিছনে ধন্‌ঝরি শৈলমালা অস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়াছে জ্যোৎস্নার আলোয়, একটু একটু শীত বলিয়া ছোট একটি অগ্নিকুণ্ড করা

হইয়াছে আমাদের সামনে—এক দিকে রাজু পাঁড়ে ও যুগলপ্রসাদ, অন্য দিকে বলভদ্র ও তিন-চারটি নবাগত প্রজা।

আমার কাছে কি অদ্ভুত ঠেকিতেছিল ইহাদের বৈষয়িক উন্নতির কথা। উন্নতি সম্বন্ধে ইহাদের ধারণা অভাবনীয় ধরনের উচ্চ নয়—ছ'টি মহিষের স্থানে দশটা মহিষ, না-হয় বারোটা মহিষ—এই সুদূর দুর্গম অরণ্য ও শৈলমালা-বেষ্টিত বন্য দেশেও মানুষের মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা কেমন, জানিবার সুযোগ পাইয়া আজকার জ্যোৎস্না-রাতটাই আমার নিকট অপূর্ব রহস্যময় মনে হইল। শুধু জ্যোৎস্না-রাত কেন, মহালিখারূপের ঐ পাহাড়, দূরে ওই ধন্‌ঝরি শৈলমালা, ঐ পাহাড়ের উপরকার ঘন বনশ্রেণী।

কেবল যুগলপ্রসাদ এ-সব বৈষয়িক কথাবার্তায় থাকে না। ও আর এক ধরনের ব্রাত্য মন লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছে—জমি-জমা, গরু-মহিষের আলোচনা করিতে ভালও বাসে না, তাহাতে যোগও দেয় না।

সে বলিল—সরস্বতী কুণ্ডীর পূব পাড়ের জঙ্গলে যতগুলো হংসলতা লাগিয়েছিলাম, সবগুলো কেমন ঝাঁপালো হয়ে উঠেছে দেখেছেন বাবুজী? এবার জলের ধারে স্পাইডার-লিলির বাহারও খুব। চলুন, যাবেন জ্যোৎস্নারাতে বেড়াতে?

দুঃখ হয়, যুগলপ্রসাদের এত সাধের সরস্বতী কুণ্ডীর বনভূমি—কতদিন বা রাখিতে পারিব? কোথায় দূর হইয়া যাইবে হংসলতা আর বন্য শেফালি-বন। তাহার স্থানে দেখা দিবে শীষে-ওঠা মকাই ও জনারের ক্ষেত এবং সারি সারি খোলা-ছাওয়া ঘর, চালে চালে ঠেকানো, সামনে চারপাই পাতা।...কাদা-হাবড় আঙিনায় গরু-মহিষ নাদায় জাব খাইতেছে।

এই সময় মটুকনাথ পণ্ডিত আসিল। আজকাল মটুকনাথের টোলে প্রায় পনেরটি ছাত্র কলাপ ও মুগ্ধবোধ পড়ে। তাহার অবস্থা আজকাল ফিরিয়া গিয়াছে। গত ফসলের সময় যজমানদের ঘর হইতে এত গম ও মকাই পাইয়াছে যে, টোলের উঠানে তাহাকে একটা ছোট গোলা বাঁধিতে হইয়াছে।

অধ্যবসায়ী লোকের উন্নতি যে হইতেই হইবে—মটুকনাথ পণ্ডিত তাহার অকাট্য প্রমাণ।

উন্নতি!—আবার সেই উন্নতির কথা আসিয়া পড়িল।

কিন্তু উন্নতির কথা না আসিয়া উপায় নাই। চোখের উপর দেখিতে পাইতেছি, মটুকনাথ উন্নতি করিয়াছে বলিয়াই তাহার আজকাল খুব খাতির-সম্মান—আমার কাছারির যে-সব সিপাহী ও আমলা মটুকনাথকে পাগল বলিয়া উপেক্ষা করিত—গোলা বাঁধার পর হইতে আমি লক্ষ্য করিতেছি, তাহারা মটুকনাথকে সম্মান ও খাতির করিয়া চলে। সঙ্গে সঙ্গে টোলের ছাত্রসংখ্যাও যেন বাড়িয়া চলিয়াছে। অথচ যুগলপ্রসাদ বা গনোরী তেওয়ারীকে কেউ পোঁছেও না। রাজু-পাঁড়েও নবাগত প্রজাদের মধ্যে খুব খাতির জমাইয়া ফেলিয়াছে—জড়িবুটির পুঁটুলি হাতে তাহাকে প্রায়ই দেখা যায় গৃহস্থবাড়ির ছেলেমেয়েদের নাড়ি টিপিয়া বেড়াইতেছে। তবে রাজু পাঁড়ে পয়সা তেমন বোঝে না, খাতির পাইয়া ও গল্প করিয়াই সন্তুষ্ট।

৪

মাস তিন-চারের মধ্যে মহালিখারূপের পাহাড়ের কোল হইতে লবটুলিয়া ও নাঢ়া বইহারের উত্তর সীমানা পর্যন্ত প্রজা বসিয়া গেল। পূর্বে জমি বিলি হইয়া চাষ আরম্ভ হইয়াছিল বটে, কিন্তু লোকের বাস এত হয় নাই—এ বছর দলে দলে লোক আসিয়া রাতারাতি গ্রাম বসাইয়া ফেলিতে লাগিল।

কত ধরনের পরিবার। শীর্ণ টাট্টু ঘোড়ার পিঠে বিছানাপত্র, বাসন, পিতলের ঘয়লা, কাঠের বোঝা, গৃহদেবতা, তোলা উনুন চাপাইয়া একটি পরিবারকে আসিতে দেখা গেল। মহিষের পিঠে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, হাঁড়ি-কুড়ি, ভাঙা লণ্ঠন, এমন কি চারপাই পর্যন্ত চাপাইয়া আর এক পরিবার আসিল। কোনো কোনো পরিবারে স্বামী-স্ত্রীতে মিলিয়া জিনিসপত্র ও শিশুদের বাঁকের দু-দিকে চাপাইয়া বাঁক কাঁধে বহুদূর হইতে হাঁটিয়া আসিতেছে।

ইহাদের মধ্যে সদাচারী, গর্বিত মৈথিল ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া গাঙ্গোতা ও দোসাদ পর্যন্ত সমাজের সর্বস্তরের লোকই আছে। যুগলপ্রসাদ মুহুরীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—এরা কি এতদিন গৃহহীন অবস্থায় ছিল? এত লোক আসছে কোথা থেকে?

যুগলপ্রসাদের মন ভাল নয়। বলিল—এদেশের লোকই এই রকম। শুনেছে এখানে জমি সস্তায় বিলি হচ্ছে—তাই দলে দলে আসছে। সুবিধে বোঝে থাকবে, নয়তো আবার ডেরা উঠিয়ে অন্য জায়গায় ভাগবে।

—পিতৃপিতামহের ভিটের কোনো মায়া নেই এদের কাছে?

—কিছু না বাবুজী। এদের উপজীবিকাই হচ্ছে নূতন-ওঠা চর বা জঙ্গলমহাল বন্দোবস্ত নিয়ে চাষবাস করা। বাস করাটা আনুষঙ্গিক। যতদিন ফসল ভাল হবে, খাজনা কম থাকবে, ততদিন থাকবে।

—তার পর?

—তারপর খোঁজ নেবে অন্য কোথায় নূতন চর বা জঙ্গল বিলি হচ্ছে, সেখানে চলে যাবে। এদের ব্যবসাই এই।

৫

সেদিন গ্র্যান্ট সাহেবের বটগাছের নীচে জমি মাপিয়া দিতে গিয়াছি, আস্‌রফি টিণ্ডেল জমি মাপিতেছিল, আমি ঘোড়ার উপর বসিয়া দেখিতেছিলাম, এমন সময় কুন্তাকে টোলার পথ ধরিয়া যাইতে দেখিলাম।

কুন্তাকে অনেক দিন দেখি নাই। আস্‌রফিকে বলিলাম—কুন্তা আজকাল কোথায় থাকে, ওকে দেখিনে তো?

আস্‌রফি বলিল—ওর কথা শোনেন নি বাবুজী? ও মধ্যে এখানে ছিল না অনেক দিন—

—কি রকম?

—রাসবিহারী সিং ওকে নিয়ে যায় তার বাড়ি। বলে, তুমি আমাদের জ্ঞাতভাইয়ের স্ত্রী—আমার এখানে এসে থাক—

—বেশ।

—সেখানে কিছুদিন থাকবার পরে—ওর চেহারা দেখেছেন তো বাবুজী, এত দুঃখে-কষ্টে এখনও—তার পর রাসবিহারী সিং কি-সব কথা ওকে বলে—এমন কি ওর ওপর অত্যাচারও করতে যায়—তাই আজ মাসখানেক হ'ল সেখান থেকে পালিয়ে এসে আছে। শুনি রাসবিহারী ছোরা নিয়ে ভয় দেখায়। ও বলেছিল,—মেরে ফেল বাবুজী, জান্ দেগা—ধরম দেগা নেহিন্।

—কোথায় থাকে?

—ঝল্লুটোলায় এক গাঙ্গোতার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের গোয়ালঘরের পাশে একখানা ছোট্ট চালা আছে, সেখানেই থাকে।

—চলে কি করে? ওর তো দু-তিনটে ছেলেমেয়ে?

—ভিক্ষে করে—ক্ষেতের ফসল কুড়োয়। কলাই গম কাটে। বড় ভাল মেয়ে বাবু কুন্তা। বাইজীর মেয়ে ছিল বটে, কিন্তু ভাল ঘরের মেয়ের মত মন-মেজাজ—কোন অসৎ কাজ ওকে দিয়ে হবে না।

জরীপ শেষ হইল। বালিয়া জেলার একটি প্রজা এই জমি বন্দোবস্ত লইয়াছে—কাল হইতে এখানে সে বাড়ি বাঁধিবে। গ্র্যান্ট সাহেবের বটগাছের মহিমাও ধ্বংস হইল।

মহালিখারূপের পাহাড়ের উপরকার বড় বড় গাছপালার মাথায় রোদ রাঙা হইয়া আসিল। সিল্লির দল ঝাঁক বাঁধিয়া সরস্বতী কুণ্ডীর দিকে উড়িয়া চলিয়াছে। সন্ধ্যার আর দেরি নাই।

একটা কথা ভাবিলাম।

এতটুকু জমি কোথাও থাকিবে না। এই বিশাল লবটুলিয়া ও নাঢ়া বইহারে, যেমন দেখিতেছি। দলে দলে অপরিচিত লোক আসিয়া জমি লইয়া ফেলিল—কিন্তু এই আরণ্যভূমিতে যাহারা চিরকাল মানুষ, অথচ যাহারা নিঃস্ব, হতভাগ্য—জমি বন্দোবস্ত লইবার পয়সা নাই বলিয়াই কি তাহারা বঞ্চিত থাকিবে? যাহাদের ভালবাসি, তাহাদের অন্তত এইটুকু উপকার করিবই।

আস্‌রফিকে বলিলাম—আস্‌রফি, কুন্তাকে কাল সকালে কাছারিতে হাজির করতে পারবে? ওকে একটু দরকার আছে।

—হাঁ হুজুর, যখন বলবেন।

পরদিন সকালে কুন্তাকে আস্‌রফি আমার আপিস-ঘরের সামনে বেলা ন'টার সময় লইয়া আসিল।

বলিলাম—কুন্তা, কেমন আছ?

কুন্তা আমায় দুই হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—জী হুজুর, ভাল আছি।

—তোমার ছেলেমেয়েরা?

—ভাল আছে হুজুরের দোয়ায়।

—বড় ছেলেটি কত বড় হল?

—এই আট বছরে পড়েছে, হুজুর।

—মহিষ চরাতে পারে না?

—অতটুকু ছেলেকে কে মহিষ চরাতে দেবে, হুজুর?

কুন্তা সত্যই এখনও দেখিতে বেশ, ওর মুখে অসহায় জীবনের দুঃখকষ্ট যেমন ছাপ মারিয়া দিয়াছে—সাহস ও পবিত্রতাও তেমনি তাদের দুর্লভ জয়চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে।

এই সেই কাশীর বাঈজীর মেয়ে, প্রেমবিহ্বলা কুন্তা। ...প্রেমের উজ্জ্বল বর্তিকা এই দুঃখিনী রমণীর হাতে এখনও সগৌরবে জ্বলিতেছে, তাই ওর এত দুঃখ, দৈন্য, এত হেনস্থা, অপমান। প্রেমের মান রাখিয়াছে কুন্তা।

বলিলাম—কুন্তা, জমি নেবে?

কুন্তা কথাটি ঠিক শুনিয়াছে কিনা যেন বুঝিতে পারিল না। বিস্মিত মুখে বলিল—জমি, হুজুর?

—হ্যাঁ, জমি। নূতন-বিলি জমি।

কুন্তা একটুখানি কি ভাবিল। পরে বলিল—আগে তো আমাদেরই কত জোতজমা ছিল। প্রথম প্রথম এসে দেখেছি। তারপর সব গেল একে একে। এখন আর কি দিয়ে জমি নেব, হুজুর?

—কেন, সেলামীর টাকা দিতে পারবে না?

—কোথা থেকে দেব? রাত্তির ক'রে ক্ষেত থেকে ফসল কুড়োই, পাছে দিনমানে কেউ অপমান করে। আধ টুক্‌রি এক টুক্‌রি কলাই পাই—তাই গুঁড়ো ক'রে ছাতু ক'রে বাছাদের খাওয়াই। নিজে খেতে সব দিন কুলোয় না—

কুন্তা কথা বন্ধ করিয়া চোখ নীচু করিল। দুই চোখ বাহিয়া টস্ টস্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

আস্‌রফি সরিয়া গেল। ছোকরার হৃদয় কোমল, এখনও পরের দুঃখ ভাল রকম সহ্য করিতে পারে না।

আমি বলিলাম—কুন্তা, আচ্ছা ধর যদি সেলামি না লাগে?

কুন্তা চোখ তুলিয়া জলভরা বিস্মিত চোখে আমার মুখের দিকে চাহিল।

আস্‌রফি তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া কুন্তার সামনে হাত নাড়িয়া বলিল—হুজুর তোমায় এমনি জমি দেবেন, এমনি জমি দেবেন—বুঝলে না দাইজী?

আস্‌রফিকে বলিলাম—ওকে জমি দিলে ও চাষ করবে কি করে আস্‌রফি?

আস্‌রফি বলিল—সে বেশি কঠিন কথা নয় হুজুর। ওকে দু-একখানা লাঙ্গল দয়া ক'রে সবাই ভিক্ষে দেবে। এত ঘর গাঙ্গোতা প্রজা, একখানা লাঙল ঘরপিছু দিলেই ওর জমি চাষ হয়ে যাবে। আমি সে ভার নেব, হুজুর।

—আচ্ছা, কত বিঘে হ'লে ওর হয়, আস্‌রফি?

—দিচ্ছেন যখন মেহেরবানি ক'রে হুজুর, দশ বিঘে দিন।

কুন্তাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কুন্তা, কেমন, দশ বিঘে জমি যদি তোমায় বিনা সেলামিতে দেওয়া যায়—তুমি ঠিকমত চাষ ক'রে ফসল তুলে কাছারির খাজনা শোধ করতে পারবে তো? অবিশ্যি প্রথম দু-বছর তোমার খাজনা মাপ। তৃতীয় বছর থেকে খাজনা দিতে হবে।

কুন্তা যেন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে। আমরা তাহাকে লইয়া ঠাট্টা করিতেছি, না সত্য কথা বলিতেছি—ইহাই যেন সে এখনও সম্‌ঝাইয়া উঠিতে পারে নাই।

কতকটা দিশাহারা ভাবে বলিল—জমি! দশ বিঘে জমি!

আস্‌রফি আমার হইয়া বলিল—হাঁ, হুজুর তোমায় দিচ্ছেন! খাজনা এখন দু-বছর মাপ। তীস্‌রা সাল থেকে খাজনা দিও। কেমন, রাজী?

কুন্তা লজ্জাজড়িত মুখে আমার দিকে চাহিয়া বলিল—জী হুজুর মেহেরবান। পরে হঠাৎ বিহ্বলার মত কাঁদিয়া ফেলিল।

আমার ইঙ্গিতে আস্‌রফি তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

১

সন্ধ্যার পরে লবটুলিয়ার নূতন বস্তিগুলি দেখিতে বেশ লাগে। কুয়াশা হইয়াছে বলিয়া জ্যোৎস্না একটু অস্পষ্ট, বিস্তীর্ণ প্রান্তরব্যাপী কৃষিক্ষেত্র, দূরে দূরে দু-পাঁচটা আলো জ্বলিতেছে বিভিন্ন বস্তিতে। কত লোক, কত পরিবার অন্নের সংস্থান করিতে আসিয়াছে আমাদের মহালে—বন কাটিয়া গ্রাম বসাইয়াছে, চাষ আরম্ভ করিয়াছে। আমি সব বস্তির নামও জানি না, সকলকে চিনিও না। কুয়াশাবৃত জ্যোৎস্নালোকে এখানে ওখানে দূরে নিকটে ছড়ানো বস্তিগুলি কেমন রহস্যময় দেখাইতেছে। যে-সব লোক এই সব বস্তিতে বাস করে, তাহাদের

জীবনও আমার কাছে এই কুয়াশাচ্ছন্ন জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রির মত রহস্যাবৃত। ইহাদের কাহারও কাহারও সঙ্গে আলাপ করিয়া দেখিয়াছি—জীবন সম্বন্ধে ইহাদের দৃষ্টিভঙ্গী, ইহাদের জীবনযাত্রা-প্রণালী আমার বড় অদ্ভুত লাগে।

প্রথম ধরা যাক্ ইহাদের খাদ্যের কথা। আমাদের মহালের জমিতে বছরে তিনটি খাদ্যশস্য জন্মায়—ভাদ্র মাসে মকাই, পৌষ মাসে কলাই এবং বৈশাখ মাসে গম। মকাই খুব বেশি হয় না, কারণ ইহার উপযুক্ত জমি বেশি নাই। কলাই ও গম যথেষ্ট উৎপন্ন হয়, কলাই বেশি, গম তাহার অর্দ্ধেক। সুতরাং লোকের প্রধান খাদ্য কলাইয়ের ছাতু।

ধান একেবারেই হয় না—ধানের উপযুক্ত নাবাল-জমি নাই। এ অঞ্চলের কোথাও—এমন কি কড়ারী জমিতে কিংবা গবর্নমেন্ট খাসমহালেও ধান হয় না। ভাত জিনিসটা সুতরাং এখানকার লোকে কালেভদ্রে খাইতে পায়—ভাত খাওয়াটা শখের বা বিলাসিতার ব্যাপার বলিয়া গণ্য। দু-চারজন খাদ্যবিলাসী লোক গম বা কলাই বিক্রয় করিয়া ধান কিনিয়া আনে বটে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা আঙুলে গোনা যায়।

তারপর ধরা যাক্ ইহাদের বাসগৃহের কথা। এই যে আমাদের মহালের দশ হাজার বিঘা জমিতে অগণ্য গ্রাম বসিয়াছে—সব গৃহস্থের বাড়িই জঙ্গলের কাশ ছাওয়া, কাশডাঁটার বেড়া, কেহ কেহ তাহার উপর মাটি লেপিয়াছে, কেহ কেহ তাহা করে নাই। এদেশে বাঁশ গাছ আদৌ নাই, সুতরাং বনের গাছের, বিশেষ করিয়া কেঁদ ও পিয়াল ডালের বাতা, খুঁটি ও আড়া দিয়াছে ঘরে।

ধর্মের কথা বলিয়া কোনো লাভ নাই। ইহারা যদিও হিন্দু, কিন্তু তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে ইহারা হনুমানজীকে কি করিয়া বাছিয়া বাহির করিয়া লইয়াছে জানি না—প্রত্যেক বস্তিতে একটা উঁচু হনুমানজীর ধ্বজা থাকিবেই—এই ধ্বজার রীতিমত পূজা হয়, ধ্বজার গায়ে সিঁদুর লেপা হয়। রাম-সীতার কথা ক্বচিৎ শোনা যায়, তাঁহাদের সেবকের গৌরব তাঁহাদের দেবত্বকে একটু বেশি আড়ালে ফেলিয়াছে। বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেব-দেবীর পূজার প্রচার তত নাই—আদৌ আছে কিনা সন্দেহ, অন্তত আমাদের মহালে তো আমি দেখি নাই।

ভুলিয়া গিয়াছি, একজন শিবভক্ত দেখিয়াছি বটে। তার নাম দ্রোণ মাহাতো, জাতিতে গাঙ্গোতা। কাছারিতে কোথা হইতে কে একটা শিলাখণ্ড আনিয়া আজ নাকি দশ-বারো বছর কাছারির হনুমানজীর ধ্বজার নীচে রাখিয়া দিয়াছে—সিপাহীরা মাঝে মাঝে পাথরখানাতে সিঁদুর মাখায়, এক ঘটি জলও কেউ কেউ দেয়। কিন্তু পাথরখানা বেশির ভাগ অনাদৃত অবস্থাতেই পড়িয়া থাকে।

কাছারির কিছুদূরে একটা নূতন বস্তি আজ মাস-দুই গড়িয়া উঠিয়াছে—দ্রোণ মাহাতো সেখানে আসিয়া ঘর বাঁধিয়াছে। দ্রোণের বয়স সত্তরের বেশি ছাড়া কম নয়—প্রাচীন লোক বলিয়াই তাহার নাম দ্রোণ, আধুনিক কালের ছেলে-ছোকরা হইলে নাকি নাম হইত ডোমন, লোধাই, মহারাজ ইত্যাদি। এসব বাবুগিরি নাম সেকালে বাপ-মায়ে রাখিতে লজ্জাবোধ করিত।

যাহা হউক, বৃদ্ধ দ্রোণ একবার কাছারি আসিয়া হনুমান-ধ্বজার নীচে পাথরখানা লক্ষ্য করিল। তারপর হইতে বৃদ্ধ কল্‌বলিয়া নদীতে প্রাতঃস্নান করিয়া একঘটি জল প্রত্যহ আনিয়া নিয়মিতভাবে পাথরের উপরে ঢালিত ও সাতবার পরম ভক্তিভরে প্রদক্ষিণ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া তবে বাড়ি ফিরিত।

দ্রোণকে বলিয়াছিলাম—কল্‌বলিয়া তো এক ক্রোশ দূর, রোজ যাও সেখানে, তার চেয়ে ছোট কুণ্ডীর জল আনলেই পার—

দ্রোণ বলিল—মহাদেওজী স্রোতের জলে তুষ্ট থাকেন, বাবুজী। আমার জন্ম সার্থক যে ওঁকে রোজ জল দিয়ে স্নান করাতে পাই।

ভক্তও ভগবানকে গড়ে। দ্রোণ মাহাতোর শিবপূজার কাহিনী লোকমুখে বিভিন্ন বস্তিতে ছড়াইয়া পড়িতেই মাঝে মাঝে দেখি দু-পাঁচজন শিবের পূজারী নর-নারী যাতায়াত শুরু করিল। এ অঞ্চলে এক ধরনের সুগন্ধ ঘাস জঙ্গলে উৎপন্ন হয়, ঘাসের পাতা বা ডাঁটা হাতে লইয়া আঘ্রাণ লইলে চমৎকার সুবাস পাওয়া যায়। ঘাস যত শুকায়, গন্ধ তত তীব্র হয়। কে একজন সেই ঘাস আনিয়া শিবঠাকুরের চারিধারে রোপণ করিল। একদিন মটুকনাথ পণ্ডিত আসিয়া বলিল—বাবুজী, একজন গাঙ্গোতা কাছারির শিবের মাথায় জল ঢালে, এটা কি ভাল হচ্ছে?

বলিলাম—পণ্ডিতজী, সেই গাঙ্গোতাই ওই ঠাকুরটিকে লোকসমাজে প্রচার করেছে যতদূর দেখতে পাচ্ছি। কই তুমিও তো ছিলে, এক ঘটি জল তো কোনদিন দিতে দেখি নি তোমায়।

রাগের মাথায় খেই হারাইয়া মটুকনাথ বলিয়া বসিল—ও শিবই নয় বাবুজী। ঠাকুর প্রতিষ্ঠা না করলে পূজো পাওয়ার যোগ্য হয় না। ও তো একখানা পাথরের নুড়ি।

—তবে আর বলছ কেন? পাথরের নুড়িতে জল দিলে তোমার আপত্তি কি?

সেই হইতে দ্রোণ মাহাতো কাছারির শিবলিঙ্গের চার্টার্ড পূজারী হইয়া গেল।

কার্তিক মাসে ছট্-পরব এদেশের বড় উৎসব। বিভিন্ন টোলা হইতে মেয়েরা হলুদ-ছোপানো শাড়ি পরিয়া দলে দলে গান করিতে করিতে কল্‌বলিয়া নদীতে ছট্ ভাসাইতে চলিয়াছে। সারাদিন উৎসবের ধুম। সন্ধ্যায় বস্তিগুলির কাছ দিয়া যাইতে যাইতে ছট্-পরবের পিঠে ভাজার ভরপুর গন্ধ পাওয়া যায়। কত রাত পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের হাসি-কলরব, মেয়েদের গান—যেখানে নীলগাইয়ের জেরা গভীর রাত্রে দৌড়িয়া যাইত, হায়েনার হাসি ও বাঘের কাশি (অভিজ্ঞ ব্যক্তি জানেন, বাঘে অবিকল মানুষের গলায় কাশির মত এক প্রকার শব্দ করে) শোনা যাইত—সেখানে আজ কলহাস্যমুখরিত, গীতিরবপূর্ণ উৎসব-দীপ্ত এক বিস্তীর্ণ জনপদ।

ছট্-পরবের সন্ধ্যায় ঝল্লুটোলায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেলাম। শুধু এই একটি টোলায় নয়—পনেরোটি বিভিন্ন টোলা হইতে ছট্-পরবের নিমন্ত্রণ পাইয়াছে কাছারি-সুদ্ধ সকল আমলা।

ঝল্লুটোলার মোড়ল ঝল্লু মাহাতোর বাড়ি গেলাম প্রথমে।

ঝল্লু মাহাতোর বাড়ির একপাশে দেখি এখনও জঙ্গল কিছু কিছু আছে। ঝল্লু উঠানে এক ছেঁড়া সামিয়ানা টাঙাইয়াছে—তাহারই তলায় আমাদের আদর করিয়া বসাইল। টোলার সকল লোক ফর্সা ধুতি ও মেরজাই পরিয়া সেখানে ঘাসে-বোনা একজাতীয় মাদুরের আসনে বসিয়া আছে। বলিলাম—খাইবার অনুরোধ রাখিতে পারিব না, কারণ অনেক স্থানে যাইতে হইবে।

ঝল্লু বলিল—একটু মিষ্টিমুখ করতেই হবে। মেয়েরা নইলে বড় ক্ষুণ্ণ হবে, আপনি পায়ের ধুলো দেবেন বলে ওরা বড় উৎসাহ ক'রে পিঠে তৈরি করেছে।

উপায় নাই। গোষ্ঠবাবু মুহুরী, আমি ও রাজু পাঁড়ে বসিয়া গেলাম। শালপাতায় কয়েকখানি আটা ও গুড়ের পিঠে আসিল—এক-একখানি পিঠে এক ইঞ্চি পুরু ইটের মত শক্ত, ছুঁড়িয়া মারিলে মানুষ মরিয়া না গেলেও দস্তুর মত জখম হয়। অথচ প্রত্যেকখানা পিঠে ছাঁচেফেলা চন্দ্রপুলির মত বেশ লতাপাতা কাটা। ছাঁচে ফেলিবার পরে তবে ঘিয়ে ভাজা হইয়াছে।

অত যত্নে মেয়েদের হাতে তৈরি পিষ্টকের সদ্ব্যবহার করিতে পারিলাম না। আধখানা অতিকষ্টে খাইয়াছিলাম। না মিষ্টি, না কোনো স্বাদ। বুঝিলাম গাঙ্গোতা মেয়েরা খাবার-দাবার

তৈরি করিতে জানে না। রাজু পাঁড়ে কিন্তু চার-পাঁচখানা সেই বড় বড় পিঠে দেখিতে দেখিতে খাইয়া ফেলিল এবং আমাদের সামনে চক্ষুলজ্জাবশতই বোধ হয় আর চাহিতে পারিল না।

ঝল্লুটোলা হইতে গেলাম লোধাইটোলা। তারপর পর্বতটোলা, ভীমদাসটোলা, আস্রফিটোলা, লছমনিয়াটোলা। প্রত্যেক টোলায় নাচগান, হাসি-বাজনার ধুম। আজ সারারাত ইহারা ঘুমাইবে না। এ-বাড়ি ও-বাড়ি খাওয়া-দাওয়া করিয়া নাচ-গান করিয়াই কাটাইয়া দিবে।

একটি ব্যাপার দেখিয়া আনন্দ হইল, মেয়েরা সব টোলাতেই যত্ন করিয়া নাকি খাবার তৈরি করিয়াছে আমাদের জন্য। ম্যানেজারবাবু নিমন্ত্রণে আসিবেন শুনিয়া তাহারা অত্যন্ত উৎসাহের ও যত্নের সহিত নিজেদের চরম রন্ধন-কৌশল প্রদর্শন করিয়া পিষ্টক গড়িয়াছে। মেয়েদের সহৃদয়তার জন্য মনে মনে যথেষ্ট কৃতজ্ঞ হইলেও তাহাদের রন্ধন-বিদ্যার প্রশংসা করিয়া উঠিতে পারিলাম না, ইহা আমার পক্ষে খুবই দুঃখের বিষয়। ঝল্লুটোলার অপেক্ষা নিকৃষ্টতর পিষ্টকের সহিতও স্থানে স্থানে পরিচয় ঘটিল।

সব জায়গায়ই দেখি রঙিন শাড়ি-পরা মেয়েরা কৌতূহলপূর্ণ চোখে আড়াল হইতে ভোজনরত বাংগালী বাবুদের দিকে চাহিয়া আছে। রাজু পাঁড়ে কাহাকেও মনে কষ্ট দিল না—পিষ্টক ভক্ষণের সীমা অতিক্রম করিয়া রাজু পাঁড়ে ক্রমশ অসীমের দিকে চলিতে লাগিল দেখিয়া আমি গণনার হাল ছাড়িয়া দিলাম—সুতরাং সে কয়খানা পিষ্টক খাইয়াছিল বলিতে পারিব না।

শুধু রাজু কেন—নিমন্ত্রিত গাঙ্গোতাদের মধ্যে সেই ইঁটের মত কঠিন পিষ্টক এক-একজন এক কুড়ি দেড় কুড়ি করিয়া খাইল—চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করা শক্ত যে সেই জিনিস মানুষে অত খাইতে পারে।

নাঢ়া-বইহারের ছনিয়া ও সুরতিয়াদের ওখানেও গেলাম।

সুরতিয়া আমায় দেখিয়া ছুটিয়া আসিল।

—বাবুজী, এত রাত করে ফেললেন? আমি আর মা দুজনে ব'সে আপনার জন্যে আলাদা ক'রে পিঠে গড়েছি—আমরা হাঁ করে বসে আছি আর ভাবছি এত দেরি হচ্ছে কেন—আসুন, বসুন।

নক্‌ছেদী সকলকে খাতির করিয়া বসাইল।

তুলসীকে খুব যত্ন করিয়া খাইবার আসন করিতে দেখিয়া মনে মনে হাসিলাম। ইহাদের এখানে খাইবার অবস্থা কি আর আছে?

সুরতিয়াকে বলিলাম—তোমার মাকে বল পিঠে তুলে নিতে। এত কে খাবে?

সুরতিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিল—ও কি বাবুজী, এই ক'খানা খাবেন না? আমি আর ছনিয়াই তো পনর-ষোলখানা ক'রে খেয়েছি। খান—আপনি খাবেন ব'লে ওর ভেতরে মা কিশমিশ দিয়েছে, দুধ দিয়েছে—ভাল আটা এনেছে বাবা ভীমদাসটোলা থেকে—

খাইব না বলিয়া ভাল করি নাই। সারাবছর এই বালক-বালিকা এ-সব সুখাদ্যের মুখ দেখিতে পায় না। এদের কত কষ্টের, কত আশার জিনিস! ছেলেমানুষকে খুশি করিবার জন্য মরীয়া হইয়া দুইখানা পিষ্টক খাইয়া ফেলিলাম।

সুরতিয়াকে খুশি করিবার জন্য বলিলাম—চমৎকার পিঠে। কিন্তু সব জায়গায় কিছু কিছু খেয়েছি ব'লে খেতে পারলুম না সুরতিয়া। আর একদিন এসে হবে এখন।

রাজু পাঁড়ের হাতে একটা ছোটখাটো বোঁচকা। সে প্রত্যেকের বাড়ি হইতে ছাঁদা বাঁধিয়াছে, এক-একখানি পিষ্টকের ওজন বিবেচনা করিলে রাজুর বোঁচকার ওজন দশ-বারো সেরের কম তো কোনমতেই হইবে না।

রাজু খুব খুশি। বলিল—এ পিঠে হঠাৎ নষ্ট হয় না হুজুর, দু-তিন দিন আর আমায় রাঁধতে হবে না। পিঠে খেয়েই চলবে।

কাছারিতে পরদিন সকালে কুন্তা একখানি পিতলের থালা লইয়া আসিয়া আমার সামনে সসঙ্কোচে স্থাপন করিল। এক টুকরা ফর্সা নেকড়া দিয়া থালাখানা ঢাকা।

বলিলাম—ওতে কি কুন্তা?

কুন্তা সলজ্জ কণ্ঠে বলিল—ছট্-পরবের পিঠে বাবুজী। কাল রাত্রে দু-বার নিয়ে এসে ফিরে গিয়েছি।

বলিলাম—কাল অনেক রাত্রে ফিরেছি, ছট্-পরবের নেমন্তন্ন রাখতে বেরিয়েছিলাম। আচ্ছা রেখে দাও, খাব এখন।

ঢাকা খুলিয়া দেখি, থালায় কয়েকখানি পিষ্টক, কিছু চিনি, দুটি কলা, একখণ্ড ঝুনা নারিকেল, একটা কলম্বা লেবু।

বলিলাম—বাঃ, বেশ পিঠে দেখছি!

কুন্তা পূর্ব্ববৎ মৃদুস্বরে সসংকোচে বলিল—বাবুজী, সবগুলো মেহেরবানি ক'রে খাবেন। আপনি খাবেন বলে আলাদা ক'রে তৈরি করেছি। তবুও আপনাকে গরম খাওয়াতে পারলাম না, বড় দুঃখ রইল।

—কিছু হয় নি তাতে, কুন্তা। আমি সবগুলো খাব। দেখতে বড় চমৎকার দেখাচ্ছে।

কুন্তা প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

২

একদিন মুনেশ্বর সিং সিপাহী আসিয়া বলিল—হুজুর, ওই বনের মধ্যে গাছের নীচে একটা লোক ছেঁড়া কাপড় পেতে শুয়ে আছে—লোকজনে তাকে বস্তিতে ঢুকতে দেয় না—ঢিল ছুঁড়ে মারে, আপনি হুকুম করেন তো তাকে নিয়ে আসি।

কথাটা শুনিয়া আশ্চর্য হইলাম। বৈকাল বেলা, সন্ধ্যার বেশি দেরি নাই, শীত তেমন না হইলেও কার্তিক মাস, রাত্রে যথেষ্ট শিশির পড়ে, শেষরাত্রে বেশ ঠাণ্ডা। এ অবস্থায় একটা লোক বনের মধ্যে গাছের তলায় আশ্রয় লইয়াছে কেন, লোকে তাহাকে ঢিল ছুঁড়িয়াই বা মারে কেন বুঝিতে পারিলাম না।

গিয়া দেখি গ্র্যান্ট সাহেবের বটগাছের ওদিকে (আজ প্রায় ত্রিশ বছর আগে গ্র্যান্ট সাহেব আমীন লবটুলিয়ার বন্য মহাল জরীপ করিতে আসিয়া এই বটতলায় তাঁবু ফেলেন, সেই হইতেই গাছটির এই নাম চলিয়া আসিতেছে) একটা বনঝোপে একটা অর্জুন গাছের তলায় একটা লোক ছেঁড়া ময়লা নেকড়াকানি পাতিয়া শয্যা রচনা করিয়া শুইয়া আছে। ঝোপের অন্ধকারে লোকটিকে ভাল করিয়া দেখিতে না পাইয়া বলিলাম—কে ওখানে? বাড়ি কোথায়? বের হয়ে এস—

লোকটি বাহির হইয়া আসিল—অনেকটা হামাগুড়ি দিয়া, অতি ধীরে ধীরে—বয়স পঞ্চাশের উপর, জীর্ণশীর্ণ চেহারা, মলিন ছেঁড়া কাপড় ও মেরজাই গায়ে—যতক্ষণ সে ঝোপের ভিতর হইতে বাহির হইতেছিল, কি একরকম অদ্ভুত, অসহায় ভাবে শিকারীর তাড়া-খাওয়া পশুর মত ভয়ার্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া ছিল।

ঝোপের অন্ধকার হইতে দিনের আলোয় বাহির হইয়া আসিলে দেখিলাম, তাহার বাম

হাতে ও বাম পায়ে ভীষণ ক্ষত। বোধ হয় সেই জন্য সে একবার বসিলে বা শুইলে হঠাৎ আর সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না।

মুনেশ্বর সিং বলিল—হুজুর, ওর ওই ঘায়ের জন্যেই ওকে বস্তিতে ঢুকতে দেয় না—জল পর্যন্ত চাইলে দেয় না। ঢিল মারে, দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে নেয়—

বোঝা গেল তাই এ লোকটা বনের পশুর মত বনঝোপের মধ্যেই আশ্রয় লইয়াছে এই হেমন্তের শিশিরার্দ্র রাত্রে।

বলিলাম—তোমার নাম কি? বাড়ি কোথায়?

লোকটা আমায় দেখিয়া ভয়ে কেমন হইয়া গিয়াছে—ওর চোখে রোগকাতর ও ভীত, অসহায় দৃষ্টি। তা ছাড়া আমার পিছনে লাঠি হাতে মুনেশ্বর সিং সিপাহী। বোধ হয় সে ভাবিল, সে যে বনে আশ্রয় লইয়াছে তাহাতেও আমাদের আপত্তি আছে—তাহাকে তাড়াইয়া দিতেই আমি সিপাই সঙ্গে করিয়া সেখানে গিয়াছি।

বলিল—আমার নাম?....নাম হুজুর গিরধারীলাল, বাড়ি তিনটাঙা। পরক্ষণেই কেমন একটা অদ্ভুত সুরে—মিনতি, প্রার্থনা এবং বিকারের রোগীর অসঙ্গত আবদারের সুর এই কয়টি মিলাইয়া এক ধরনের সুরে বলিল—একটু জল খাব—জল—

আমি ততক্ষণে লোকটাকে চিনিয়া ফেলিয়াছি। সেবার পৌষমাসের মেলায় ইজারাদার ব্রহ্মা মাহাতোর তাঁবুতে সেই যে দেখিয়াছিলাম—সেই গিরধারীলাল। সেই ভীত দৃষ্টি, সেই নম্র মুখের ভাব—

দরিদ্র, নম্র, ভীরু লোকদেরই কি ভগবান জগতে এত বেশি করিয়া কষ্ট দেন! মুনেশ্বর সিংকে বলিলাম—কাছারি যাও—চার-পাঁচজন লোক আর একটা চারপাই নিয়ে এস—

সে চলিয়া গেল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কি হয়েছে গিরধারীলাল? আমি তোমায় চিনি। তুমি আমায় চিনতে পার নি? সেই যে সেবার ব্রহ্মা মাহাতোর তাঁবুতে মেলার সময় তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল—মনে নেই? কোনো ভয় নেই। কি হয়েছে তোমার?

গিরধারীলাল ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। হাত ও পা নাড়িয়া দেখাইয়া বলিল—হুজুর, কেটে গিয়ে ঘা হয়। কিছুতেই সে ঘা সারে না, যে যা বলে তাই করি—ঘা ক্রমেই বাড়ে। ক্রমে সকলে বললে—তোর কুষ্ঠ হয়েছে। সেই জন্য আজ চার-পাঁচ মাস এই রকম কষ্ট পাচ্ছি। বস্তির মধ্যে ঢুকতে দেয় না। ভিক্ষে করে কোনো রকমে চালাই। রাত্রে কোথাও জায়গা দেয় না—তাই বনের মধ্যে ঢুকে শুয়ে থাকব বলে—

—কোথায় যাচ্ছিলে এদিকে? এখানে কি ক'রে এলে?

গিরধারীলাল এরই মধ্যে হাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। একটু দম লইয়া বলিল—পূর্ণিয়ার হাসপাতালে যাচ্ছিলাম হুজুর—নইলে ঘা তো সারে না।

আশ্চর্য না হইয়া পারিলাম না। মানুষের কি আগ্রহ বাঁচিবার! গিরধারীলাল যেখানে থাকে, পূর্ণিয়া সেখান হইতে চল্লিশ মাইলের কম নয়—মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের মত শ্বাপদসঙ্কুল আরণ্যভূমি সামনে—ক্ষতে অবশ হাত-পা লইয়া সে চলিয়াছে এই দুর্গম পাহাড়-জঙ্গলের পথ ভাঙিয়া পূর্ণিয়ার হাসপাতালে!

চারপাই আসিল। সিপাহীদের বাসার কাছে একটা খালি ঘরে উহাকে লইয়া গিয়া শোয়াইয়া দিলাম। সিপাহীরাও কুষ্ঠ বলিয়া একটু আপত্তি তুলিয়াছিল, পরে বুঝাইয়া দিতে তাহারা বুঝিল।

গিরধারীলাল খুব ক্ষুধার্ত বলিয়া মনে হইল। অনেকদিন সে যেন পেট ভরিয়া খাইতে পায় নাই। কিছু গরম দুধ খাওয়াইয়া দিতে সে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইল।

সন্ধ্যার দিকে তাহার ঘরে গিয়া দেখি সে অঘোরে ঘুমাইতেছে।

পরদিন স্থানীয় বিশিষ্ট চিকিৎসক রাজু পাঁড়েকে ডাকাইলাম। রাজু গম্ভীর মুখে অনেকক্ষণ ধরিয়া রোগীর নাড়ি দেখিল, ঘা দেখিল। রাজুকে বলিলাম—দেখ, তোমার দ্বারা হবে, না পূর্ণিয়ায় পাঠিয়ে দেব?

রাজু আহত অভিমানের সুরে বলিল—আপনার বাপ-মায়ের আশীর্বাদে হুজুর অনেকদিন এই কাজ করছি। পনের দিনের মধ্যে ঘা ভাল হয়ে যাবে।

গিরধারীকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দিলেই ভাল করিতাম, পরে বুঝিলাম। ঘায়ের জন্য নহে, রাজু পাঁড়ের জড়ি-বুটির গুণে পাঁচ-ছয় দিনের মধ্যেই ঘায়ের চেহারা বদলাইয়া গেল—কিন্তু মুশকিল বাধিল তাহার সেবা-শুশ্রূষা লইয়া। তাহাকে কেহ ছুঁইতে চায় না, ঘায়ে ঔষধ লাগাইয়া দিতে চায় না, তাহার খাওয়া জলের ঘটিটা পর্যন্ত মাজিতে আপত্তি করে।

তাহার উপর বেচারীর হইল জ্বর। খুব বেশি জ্বর।

নিরুপায় হইয়া কুন্তাকে ডাকাইলাম। তাহাকে বলিলাম—তুমি বস্তি থেকে একজন গাঙ্গোতার মেয়ে ডেকে দাও, পয়সা দেব—ওকে দেখাশুনো করতে হবে।

কুন্তা কিছুমাত্র না ভাবিয়া তখনই বলিল—আমি করব বাবুজী। পয়সা দিতে হবে না।

কুন্তা রাজপুতের স্ত্রী, সে গাঙ্গোতা রোগীর সেবা করিবে কি করিয়া? ভাবিলাম আমার কথা সে বুঝিতে পারে নাই।

বলিলাম—ওর এঁটো বাসন মাজতে হবে, ওকে খাওয়াতে হবে—ও তো উঠতে পারে না। সে-সব তোমায় দিয়ে কি ক'রে হবে?

কুন্তা বলিল—আপনি হুকুম করলেই আমি সব করব। আমি রাজপুত কোথায় বাবুজী! আমার জাতভাই কেউ এতদিন আমায় কি দেখেছে? আপনি যা বলবেন আমি তাই করব। আমার আবার জাত কি?

রাজু পাঁড়ের জড়ি-বুটির গুণে ও কুন্তার সেবাশুশ্রূষায় মাসখানেকের মধ্যে গিরধারীলাল চাঙ্গা হইয়া উঠিল। কুন্তাকে এজন্য দিতে গেলেও কিছু লইল না। গিরধারীলালকে সে ইতিমধ্যে 'বাবা' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে দেখিলাম। বলিল—আহা, বাবা বড় দুঃখী, বাবার সেবা ক'রে আবার পয়সা নেব? ধরমরাজ মাথার উপর নেই?

জীবনে যে কয়টি সৎ কাজ করিয়াছি, তাহার মধ্যে একটি প্রধান সৎ কাজ নিরীহ ও নিঃস্ব গিরধারীলালকে বিনা সেলামিতে কিছু জমি দিয়া লবটুলিয়াতে বাস করানো।

তাহার খুপরিতে একদিন গিয়াছিলাম।

নিজের বিঘা পাঁচেক জমি সে নিজের হাতেই পরিষ্কার করিয়া গম বুনিয়াছে। খুপরির চারিপাশে কতগুলি গোঁড়ালেবুর চারা পুঁতিয়াছে।

—এত গোঁড়া লেবুর গাছ কি হবে গিরিধারীলাল?

—হুজুর, ওগুলো সরবতী লেবু। আমি বড় খেতে ভালবাসি। চিনি-মিছরি জোটে না আমাদের, ভুরা গুড়ের সরবৎ ক'রে ওই লেবুর রস দিয়ে খেতে ভারি তার!

দেখিলাম আশার আনন্দে গিরধারীলালের নিরীহ চক্ষু দুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

—ভাল কলমের লেবু। এক-একটা হবে এক পোয়া। অনেক দিন থেকে আমার ইচ্ছে, যদি কখনো জমি-জায়গা করতে পারি, তবে ভাল সরবতী লেবুর গাছ লাগাব। পরের দোরে লেবু চাইতে গিয়ে কতবার অপমান হয়েছি হুজুর। সে দুঃখ আর রাখব না।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

১

এখান হইতে চলিয়া যাইবার সময় আসিয়াছে। একবার ভানুমতীর সঙ্গে দেখা করিবার ইচ্ছা প্রবল হইল। ধন্‌ঝরি শৈলমালা একটি সুন্দর স্বপ্নের মত আমার মন অধিকার করিয়া আছে...তাহার বনানী...তাহার জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রি....

সঙ্গে লইলাম যুগলপ্রসাদকে।

তহশিলদার সজ্জন সিং-এর ঘোড়াটাতে যুগলপ্রসাদ চড়িয়াছিল—আমাদের মহালের সীমানা পার হইতে-না-হইতেই বলিল—হুজুর, এ ঘোড়া চলবে না, জঙ্গলের পথে রহল চাল ধরলেই হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে আমারও পা খোঁড়া হবে। বদলে নিয়ে আসি।

তাহাকে আশ্বস্ত করিলাম। সজ্জন সিং ভাল সওয়ার, সে কতবার পূর্ণিয়ায় মোকদ্দমা তদারক করিতে গিয়াছে এই ঘোড়ায়। পূর্ণিয়া যাইতে হইলে কেমন পথে যাইতে হয় যুগলপ্রসাদের তাহা অজ্ঞাত নয় নিশ্চয়ই।

শীঘ্রই কারো নদী পার হইলাম।

তারপর অরণ্য, অরণ্য—সুন্দর, অপূর্ব, ঘন নির্জন অরণ্য! পূর্বেই বলিয়াছি এ-জঙ্গলে মাথার উপরে গাছপালার ডালে ডালে জড়াজড়ি নাই—কেঁদ-চারা, শাল-চারা, পলাশ, মহুয়া, কুলের অরণ্য—প্রস্তরাকীর্ণ রাঙা মাটির ডাঙা, উঁচু-নীচু। মাঝে মাঝে মাটির উপর বন্যহস্তীর পদচিহ্ন। মানুষজন নাই।

হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম লবটুলিয়ার নূতন তৈরি ঘিঞ্জি কুশ্রী টোলা ও বস্তি এবং একঘেয়ে ধূসর, চষা জমি দেখিবার পরে। এ-রকম আরণ্যপ্রদেশ এদিকে আর কোথাও নাই।

এই পথের সেই দুটি বন্য গ্রাম—বুরুডি ও কুলপাল বেলা বারোটার মধ্যেই ছাড়াইলাম। তার পরেই ফাঁকা জঙ্গল পিছনে পড়িয়া রহিল—সম্মুখে বড় বড় বনস্পতির ঘন অরণ্য। কার্তিকের শেষ, বাতাস ঠাণ্ডা—গরমের লেশমাত্রও নাই।

দূরে দূরে ধন্‌ঝরি পাহাড়শ্রেণী বেশ স্পষ্ট হইয়া ফুটিল।

সন্ধ্যার পরে কাছারিতে পৌঁছিলাম। যে বিড়িপাতার জঙ্গল আমাদের স্টেট নীলামে ডাকিয়া লইয়াছিল, এ-কাছারি সেই জঙ্গলের ইজারাদার।

লোকটা মুসলমান, শাহাবাদ জেলায় বাড়ি। নাম আবদুল ওয়াহেদ। খুব খাতির করিয়া রাখিয়া দিল। বলিল—সন্ধ্যের সময় পৌঁচেছেন, ভাল হয়েছে বাবুজী। জঙ্গলে বড় বাঘের ভয় হয়েছে।

নির্জন রাত্রি।

বড় বড় গাছে শন্ শন্ করিয়া বাতাস বাধিতেছে।

কাছারির বারান্দায় বসিবার ভরসা পাইলাম না কথাটা শুনিয়া।

ঘরের মধ্যে জানালা খুলিয়া বসিয়া গল্প করিতেছি—হঠাৎ কি একটা জন্তু ডাকিয়া উঠিল বনের মধ্যে। যুগলকে বলিলাম—কি ও?

যুগল বলিল—ও কিছু না, হুড়াল। অর্থাৎ নেকড়ে বাঘ।

একবার গভীর রাত্রে বনের মধ্যে হায়েনার হাসি শোনা গেল—হঠাৎ শুনিলে বুকের রক্ত জমিয়া যায় ভয়ে, ঠিক যেন কাশরোগীর হাসি, মাঝে মাঝে দম বন্ধ হইয়া যায়, মাঝে মাঝে হাসির উচ্ছ্বাস।

পরদিন ভোরে রওনা হইয়া বেলা ন-টার মধ্যে দোবরু পান্নার রাজধানী চক্‌মকিটোলায় পৌঁছানো গেল। ভানুমতী কী খুশি আমার অপ্রত্যাশিত আগমনে। তার মুখে-চোখে খুশি যেন চাপিতে পারিতেছে না, উপচাইয়া পড়িতেছে।

—আপনার কথা কালও ভেবেছি বাবুজী। এতদিন আসেন নি কেন?

ভানুমতীকে একটু লম্বা দেখাইতেছে, একটু রোগাও বটে। তাছাড়া মুখশ্রী আছে ঠিক তেমনি লাবণ্যভরা, সেই নিটোল গড়ন তেমনি আছে।

—নাইবেন তো ঝরনায়? মহুয়া তেল আনব, না কড়ুয়া তেল? এবার বর্ষায় ঝরনায় কি সুন্দর জল হয়েছে দেখবেন চলুন।

আর একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি—ভানুমতী ভারি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সাধারণ সাঁওতাল মেয়েদের সঙ্গে তার সেদিক দিয়া তুলনাই হয় না—তার বেশভূষা ও প্রসাধনের সহজ সৌন্দর্য ও রুচিবোধই তাহাকে অভিজাতবংশের মেয়ে বলিয়া পরিচয় দেয়।

যে-মাটির ঘরের দাওয়ায় বসিয়া আছি, তাহার উঠানের চারিধারে বড় বড় আসান ও অর্জুন গাছ। এক ঝাঁক সবুজ বনটিয়া সামনের আসান গাছটার ডালে কলরব করিতেছে। হেমন্তের প্রথম, বেলা চড়িলেও বাতাস ঠাণ্ডা। আমার সামনে আধ মাইলেরও কম দূরে ধন্‌ঝরি পাহাড়শ্রেণী, পাহাড়ের গা বাহিয়া নামিয়া আসিয়াছে চেরা সিঁথির মত পথ—একদিকে অনেক দূরে নীল মেঘের মত দৃশ্যমান গয়া জেলার পাহাড়শ্রেণী।

বিড়ির পাতার জঙ্গল ইজারা লইয়া এই শান্ত জনবিরল বন্য প্রদেশের পল্লবপ্রচ্ছায় উপত্যকার কোনো পাহাড়ী ঝরনার তীরে কুটির বাঁধিয়া বাস করিতাম চিরদিন। লবটুলিয়া তো গেল, ভানুমতীর দেশের এ-বন কেহ নষ্ট করিবে না। এ-অঞ্চলে মরুমকাঁকর ও পাইওরাইট্ বেশি মাটিতে, ফসল তেমন হয় না—হইলে এ-বন কোন্ কালে ঘুচিয়া যাইত। তবে যদি তামার খনি বাহির হইয়া পড়ে, সে স্বতন্ত্র কথা।

তামার কারখানা চিমনি, ট্রলি লাইন, সারি সারি কুলি-বস্তি, ময়লা জলের ড্রেন, এঞ্জিন-ঝাড়া কয়লার ছাইয়ের স্তূপ—দোকানঘর, চায়ের দোকান, সস্তা সিনেমায় 'জোয়ানী-হাওয়া' 'শের শমশের' 'প্রণয়ের জের' (ম্যাটিনিতে তিন আনা, পূর্বাহ্নে আসন দখল করুন)—দেশী মদের দোকান, দরজীর দোকান। হোমিও ফার্মেসী (সমাগত দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হয়)। আদি ও অকৃত্রিম আদর্শ হিন্দু হোটেল।

কলের বাঁশিতে তিনটার সিটি বাজিল।

ভানুমতী মাথায় করিয়া এঞ্জিনের ঝাড়া কয়লা বাজারে ফিরি করিতে বাহির হইয়াছে—ক-ই-লা চা-ই-ই—চার পয়সা ঝুড়ি।...

ভানুমতী তেল আনিয়া সামনে দাঁড়াইল। ওদের বাড়ির সবাই আসিয়া আমাকে নমস্কার করিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ভানুমতীর ছোট কাকা নবীন যুবক জগরু একটা গাছের ডাল ছুলিতে ছুলিতে আসিয়া আমার দিকে চাহিয়া হাসিল। এই ছেলেটিকে আমি বড় পছন্দ করি। রাজপুত্রের মত চেহারা ওর, কালোর উপরে কি রূপ। এদের বাড়ির মধ্যে এই যুবক এবং ভানুমতী, এদের দুজনকে দেখিলেই সত্যই যে ইহারা বন্য জাতির মধ্যে অভিজাতবংশ, তা মনে না হইয়া পারে না।

বলিলাম—কি জগরু, শিকার-টিকার কেমন চলছে?

জগরু হাসিয়া বলিল—আপনাকে আজই খাইয়ে দেব বাবুজী, ভাববেন না। বলুন কি খাবেন, সজারু, না হরিয়াল, না বনমোরগ?

স্নান করিয়া আসিলাম। ভানুমতী নিজের সেই আয়নাখানি (সেবার যেখানা পূর্নিয়া হইতে আনাইয়া দিয়াছিলাম) আর একখানা কাঠের কাঁকই চুল আঁচড়াইবার জন্য আনিয়া দিল।

আহারাদির পর বিশ্রাম করিতেছি, বেলা পড়িয়া আসিয়াছে, ভানুমতী প্রস্তাব করিল—বাবুজী চলুন, পাহাড়ে উঠবেন না? আপনি তো ভালবাসেন।

যুগলপ্রসাদ ঘুমাইতেছিল, সে ঘুম ভাঙিয়া উঠিলে আমরা বেড়াইবার জন্য বাহির হইলাম। সঙ্গে রহিল ভানুমতী, ওর খুড়তুতো বোন—জগরু পান্নার মেজ ভাইয়ের মেয়ে, বছর বারো বয়স—আর যুগলপ্রসাদ।

আধ মাইল হাঁটিয়া পাহাড়ের নীচে পৌঁছিলাম।

ধন্‌ঝরির পাদমূলে এই জায়গায় বনের দৃশ্য এত অপূর্ব যে, খানিকটা দাঁড়াইয়া দেখিতে ইচ্ছা করে। যেদিকে চোখ ফিরাই সেদিকেই বড় বড় গাছ, লতা, উপল-বিছানো ঝরণার খাদ, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছোট-বড় শিলাস্তূপ। ধন্‌ঝরির দিকে বন ও পাহাড়ের আড়ালে আকাশটা কেমন সরু হইয়া গিয়াছে, সামনে লাল কাঁকুড়ে মাটির রাস্তা উঁচু হইয়া ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়া পাহাড়ের ও-পারের দিকে উঠিয়াছে, কেমন খট্‌খটে শুক্‌নো ডাঙা মাটি, কোথাও ভিজা নয়, স্যাঁৎসেতে নয়। ঝরণার খাদেও এতটুকু জল নাই।

পাহাড়ের উপরে ঘন বন ঠেলিয়া কিছুদূর উঠিতেই কিসের মধুর সুবাসে মনপ্রাণ মাতিয়া উঠিল, গন্ধটা অত্যন্ত পরিচিত—প্রথমটা ধরিতে পারি নাই, তারপরে চাহিয়া দেখি—ধন্‌ঝরি পাহাড়ে যে এত ছাতিম গাছ তাহা পূর্বে লক্ষ্য করি নাই—এখন প্রথম হেমন্তে ছাতিম গাছে ফুল ধরিয়াছে, তাহারই সুবাস।

সে কি দু-চারটি ছাতিম গাছ! সপ্তপর্ণের বন, সপ্তপর্ণ আর কেলিকদম্ব—কদম্বফুলের গাছ নয়, কেলিকদম্ব ভিন্ন-জাতীয় বৃক্ষ, সেগুনপাতার মত বড় বড় পাতা, চমৎকার আঁকাবাঁকা ডালপালাওয়ালা বনস্পতিশ্রেণীর বৃক্ষ।

হেমন্তের অপরাহ্ণের শীতল বাতাসে পুষ্পিত বন্য সপ্তপর্ণের ঘন বনে দাঁড়াইয়া নিটোল স্বাস্থ্যবতী কিশোরী ভানুমতীর দিকে চাহিয়া মনে হইল, মূর্তিমতী বনদেবীর সঙ্গলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি—কৃষ্ণা বনদেবী! রাজকুমারী তো ও বটেই! এই বনাঞ্চল, এই পাহাড়, ওই মিছি নদী, কারো নদীর উপত্যকা, এদিকে ধনঝরি, ওদিকে নওয়াদার শৈল-শ্রেণী—এই সমস্ত স্থান এক সময়ে যে পরাক্রান্ত রাজবংশের অধীনে ছিল, ও সেই রাজবংশের মেয়ে—আজ ভিন্ন যুগের আবহাওয়ায় ভিন্ন সভ্যতার সংঘাতে যে রাজবংশ বিপর্যস্ত, দরিদ্র, প্রভাবহীন—তাই আজ ভানুমতীকে দেখিতেছি সাঁওতালী মেয়ের মত। ওকে দেখিলেই অলিখিত ভারতবর্ষের ইতিহাসের এই ট্র্যাজিক অধ্যায় আমার চোখের সামনে ফুটিয়া উঠে।

আজকার এই অপরাহ্ণটি আমার জীবনের আরও বহু সুন্দর অপরাহ্ণের সঙ্গে মিলিয়া মধুময় স্মৃতির সমারোহে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—স্বপ্নের মত মধুর, স্বপ্নের মতই অবাস্তব।

ভানুমতী বলিল—চলুন, আরও উঠবেন না?

—কি সুন্দর ফুলের গন্ধ বল তো? একটু বসবে না এখানে? সূর্য অস্ত যাচ্ছে দেখি—

ভানুমতী হাসিমুখে বলিল—আপনার যা মর্জি বাবুজী। বসতে বলেন এখানে বসি। কিন্তু

জ্যাঠামশাইয়ের কবরে ফুল দেবেন না? আপনি সেই শিখিয়ে দিয়েছিলেন, আমি রোজ পাহাড়ে উঠি ফুল দিতে। এখন তো বনে কত ফুল।

দূরে মিছি নদী উত্তরবাহিনী হইয়া পাহাড়ের নীচে দিয়া ঘুরিয়া যাইতেছে। নওয়াদার দিকে যে অস্পষ্ট পাহাড়শ্রেণী, তারই পিছনে সূর্য অস্ত গেল। সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ী হাওয়া আরও শীতল হইল। ছাতিম ফুলের সুবাস আরও ঘন হইয়া উঠিল, ছায়া গাঢ় হইয়া নামিল শৈলসানুর বনস্থলীতে, নিম্নের বনাবৃত উপত্যকায়, মিছি নদীর পরপারে গণ্ড-শৈলমালার গাত্রে।

ভানুমতী একগুচ্ছ ছাতিম ফুল পাড়িয়া খোঁপায় গুঁজিল। বলিল—বসব, না উঠবেন বাবুজী?

আবার উঠিতে আরম্ভ করিলাম। প্রত্যেকের হাতে এক-একটা ছাতিম ফুলের ডাল। একেবারে পাহাড়ের উপরে উঠিয়া গেলাম। সেই প্রাচীন বটগাছটা ও তার তলায় প্রাচীন রাজসমাধি। বড় বড় বাটনা-বাটা শিলের মত পাথর চারিদিকে ছড়ানো। রাজা দোবরু পান্নার কবরের উপর ভানুমতী ও তাহার বোন নিছনী ফুল ছড়াইল, আমি ও যুগলপ্রসাদ ফুল ছড়াইলাম।

ভানুমতী বালিকা তো বটেই, সরলা বালিকার মতই মহা খুশি। বালিকার মত আব্দারের সুরে বলিল—এখানে একটু দাঁড়াই বাবুজী, কেমন? বেশ লাগছে, না?

আমি ভাবিতেছিলাম—এই শেষ। আর এখানে আসিব না। এ পাহাড়ের উপরকার সমাধিস্থান, এ বনাঞ্চল আর দেখিব না। ধন্ঝরির শৈলচূড়ায় পুষ্পিত সপ্তপর্ণের নিকট, ভানুমতীর নিকট, এই আমার চিরবিদায়। ছ-বছরের দীর্ঘ বনবাস সাঙ্গ করিয়া কলকাতা নগরীতে ফিরিব—কিন্তু যাইবার দিন ঘনাইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের কেন এত বেশি করিয়া জড়াইয়া ধরিতেছি।

ভানুমতীকে কথাটা বলিবার ইচ্ছা হইল, ভানুমতী কি বলে আমি আর আসিব না শুনিয়া—জানিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু কি হইবে সরলা বনবালাকে বৃথা ভালবাসার, আদরের কথা বলিয়া?

সন্ধ্যা হইবার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি নূতন সুবাস পাইলাম। আশেপাশের বনের মধ্যে যথেষ্ট শিউলি গাছ আছে। বেলা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে শিউলি ফুলের ঘন সুগন্ধ সান্ধ্য-বাতাসকে সুমিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। ছাতিম বন এখানে নাই—সে আরও নীচে নামিলে তবে। এরই মধ্যে গাছপালার ডালে জোনাকি জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাতাস কি সতেজ, মধুর, প্রাণারাম! এ বাতাস সকালে বিকালে উপভোগ করিলে আয়ু না বাড়িয়া পারে? নামিতে ইচ্ছা করিতেছিল না, কিন্তু বন্য জন্তুর ভয় আছে—তা ছাড়া ভানুমতী সঙ্গে রহিয়াছে। যুগলপ্রসাদ বোধ হয় ভাবিতেছিল, নূতন কোন্ ধরনের গাছপালা এ জঙ্গল হইতে লইয়া গিয়া অন্যত্র রোপণ করিতে পারে। দেখিলাম তাহার সমস্ত মনোযোগ নূতন লতাপাতার ফুল, সুদৃশ্য পাতার গাছ প্রভৃতির দিকে নিবদ্ধ—অন্য দিকে তাহার দৃষ্টি নাই। যুগলপ্রসাদ পাগলই বটে, কিন্তু ঐ এক ধরনের পাগল।

নূরজাহান নাকি পারস্য হইতে চেনার গাছ আনিয়া কাশ্মীরে রোপণ করিয়াছিলেন। এখন নূরজাহান নাই, কিন্তু সারা কাশ্মীর সুদৃশ্য চেনার বৃক্ষে ছাইয়া ফেলিয়াছে। যুগলপ্রসাদ মরিয়া যাইবে, কিন্তু সরস্বতী হ্রদের জলে আজ হইতে শতবর্ষ পরেও হেমন্তে ফুটন্ত স্পাইডার-লিলি বাতাসে সুগন্ধ ছড়াইবে, কিংবা কোন-না-কোন বনঝোপে বন্য হংসলতার হংসাকৃতি নীলফুল দুলিবে, যুগলপ্রসাদই যে সেগুলি নাঢ়া বইহারের জঙ্গলে আমদানি করিয়াছিল একদিন—একথা না-ই বা কেহ বলিল!

ভানুমতী বলিল—বাঁয়ে ওই সেই টাঁড়বারোর গাছ—চিনেছেন?

বন্য-মহিষের রক্ষাকর্তা সদয় দেবতা টাঁড়বারোর গাছ অন্ধকারে চিনিতে পারি নাই। আকাশে চাঁদ নাই, কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি।

অনেকটা নামিয়া আসিয়াছি। এবার সেই ছাতিম বন। কি মিষ্ট মনমাতানো গন্ধ!

ভানুমতীকে বলিলাম—এখানে একটু বসি।

পরে সেই বনপথে অন্ধকারের মধ্যে নামিতে নামিতে ভাবিলাম, লবটুলিয়া গিয়াছে, নাঢ়া ও ফুলকিয়া বইহার গিয়াছে—কিন্তু মহালিখারূপের পাহাড় রহিল—ভানুমতীদের ধন্ঝরি পাহাড়ের বনভূমি রহিল। এমন সময় আসিবে হয়তো দেশে, যখন মানুষে অরণ্য দেখিতে পাইবে না—শুধুই চাষের ক্ষেত আর পাটের কল, কাপড়ের কলের চিমনি চোখে পড়িবে, তখন তাহারা আসিবে এই নিভৃত অরণ্যপ্রদেশে, যেমন লোকে তীর্থে আসে। সেই সব অনাগত দিনের মানুষদের জন্য এ বন অক্ষুণ্ণ থাকুক।

২

রাত্রে বসিয়া জগরু পান্না ও তাহার দাদার মুখে তাহাদের সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা শুনিলাম। মহাজনের দেনা এখনও শোধ হয় নাই, দুইটি মহিষ ধার করিয়া কিনিতে হইয়াছে, না কিনিলে চলে না, গয়ার এক মাড়োয়ারী মহাজন আগে আসিয়া ঘি কিনিয়া লইয়া যাইত—আজ তিন-চার মাস সে আর আসে না। প্রায় আধ মণ ঘি ঘরে মজুত, খরিদ্দার নাই।

ভানুমতী আসিয়া দাওয়ার একধারে বসিল। যুগলপ্রসাদ অত্যন্ত চা-খোর, সে চা-চিনি সঙ্গে আনিয়াছে আমি জানি। কিন্তু লাজুকতাবশত গরম জলের কথা বলিতে পারিতেছে না, তাহাও জানি। বলিলাম—চায়ের জল একটু গরম করার সুবিধে হবে কি ভানুমতী?

রাজকুমারী ভানুমতী চা কখনও করে নাই। চা খাইবার রেওয়াজই নাই এখানে। তাহাকে জলের পরিমাণ বুঝাইয়া দিতে সে মাটির হাঁড়িতে জল গরম করিয়া আনিল। তাহার ছোট বোন কয়েকটি পাথরবাটি আনিল। ভানুমতীকে চা খাইবার অনুরোধ করিলাম, সে খাইতে চাহিল না। জগরু পান্না পাথরের ছোট খোরায় এক খোরা চা শেষ করিয়া আরও খানিকটা চাহিয়া লইল।

চা খাইয়া আর-সকলে উঠিয়া গেল, ভানুমতী গেল না। আমায় বলিল—ক'দিন এখানে আছেন বাবুজী? এবার বড় দেরি করে এসেছেন। কাল তো যেতেই দেব না। চলুন আপনাকে কাল ঝাটি ঝরনা বেড়িয়ে নিয়ে আসি। ঝাটি ঝরনায় আরও ভয়ানক জঙ্গল। ওদিকে বড্ডো বুনো হাতী। অনেক বনময়ূরও আছে দেখতে পাবেন। চমৎকার জায়গা। পৃথিবীর মধ্যে এমন আর নেই।

ভানুমতীর পৃথিবী কতটুকু জানিতে বড় ইচ্ছা হইল। বলিলাম—ভানুমতী, কখনো কোনো শহর দেখেছ?

—না বাবুজী।

—দু-একটা শহরের নাম বল তো?

—গয়া, মুঙ্গের, পাটনা।

—কলকাতার নাম শোন নি?

—হাঁ বাবুজী।

—কোন্ দিকে জানো?

—কি জানি বাবুজী!

—আমরা যে দেশে বাস করি তার নাম জান?

—আমরা গয়া জেলায় বাস করি।

—ভারতবর্ষের নাম শুনেছ?

ভানুমতী মাথা নাড়িয়া জানাইল, সে শোনে নাই। কখনও কোথাও যায় নাই চক্‌মকিটোলা ছাড়িয়া। ভারতবর্ষ কোন্‌দিকে?

একটু পরে বলিল—আমার জ্যাঠামশায় একটা মহিষ এনেছিলেন, সেটা এবেলা তিন সের, ওবেলা তিন সের দুধ দিত। তখন আমাদের এর চেয়ে ভাল অবস্থা ছিল বাবুজী, তখন যদি আপনি আসতেন, আপনাকে রোজ খোয়া খাওয়াতাম। জ্যাঠামশায় নিজের হাতে খোয়া তৈরি করতেন। কি মিষ্টি খোয়া! এখন তেমন দুধই হয় না তার খোয়া। তখন আমাদের খাতিরও ছিল খুব।

পরে হাতখানি একবার তুলিয়া চারিদিকে ঘুরাইয়া গর্বের সহিত বলিল—জানেন বাবুজী, এই সমস্ত দেশ আমাদের রাজ্য ছিল। সারা পৃথিবীটা। বনে যে গোঁড় দেখেন, সাঁওতাল দেখেন, ওরা আমাদের জাত নয়। আমরা রাজগোঁড়। আমাদের প্রজা ওরা, আমাদের রাজা ব'লে মানে।

উহার কথায় দুঃখও হইল, হাসিও পাইল। মহাজনে দেনার দায়ে দুই বেলা যাহাদের মহিষ ধরিয়া লইয়া যায়, সেও রাজবংশের গর্ব করিতে ছাড়ে না।

বলিলাম—আমি জানি ভানুমতী, তোমাদের কত বড় বংশ—

ভানুমতী বলিল—তারপর শুনুন বাবুজী, আমাদের সেই মহিষটা বাঘে নিয়ে গেল। জ্যাঠামশায় যে মহিষটা এনেছিলেন।

—কি ক'রে?

—জ্যাঠামশায় ওই পাহাড়ের নীচে চরাতে নিয়ে গিয়ে একটা গাছতলায় বসেছিলেন, সেখানে বাঘে ধরল।

বলিলাম—তুমি বাঘ দেখেছ কখনও?

ভানুমতী কালো জোড়া-ভুরু দুটি আশ্চর্য হইবার ভঙ্গিতে উপরের দিকে তুলিয়া বলিল—বাঘ দেখিনি বাবুজী! শীতকালে আসবেন চক্‌মকিটোলায়—বাড়ির উঠোন থেকে গরু-বাছুর ধরে নিয়ে যায় বাঘে—

বলিয়াই সে ডাকিল—নিছনি, নিছনি—শোন্—

ছোট বোন আসিলে বলিল—নিছনি, বাবুজীকে শুনিয়ে দে তো আর বছর শীতকালে বাঘ রোজ রাতে আমাদের উঠোনে এসে কি ক'রে বেড়াত। জগরু-কাকা একদিন ফাঁদ পেতেছিল। ধরা পড়ল না।

পরে হঠাৎ বলিল—ভাল কথা বাবুজী, একখানা চিঠি পড়ে দেবেন? কোথা থেকে একখানা চিঠি এসেছিল, কে পড়বে, এমনি তোলা রয়েছে। যা নিছনি, চিঠিখানা নিয়ে আয়, আর জগরু-কাকাকেও ডেকে নিয়ে আয়—

নিছনি চিঠি পাইল না। তখন ভানুমতী নিজে গিয়া অনেক খুঁজিয়া সেখানা বাহির করিয়া আমার হাতে আনিয়া দিল।

বলিলাম—কবে এসেছে এখানা?

ভানুমতী বলিল—মাস ছ-সাত হবে বাবুজী—তুলে রেখে দিইছি, আপনি এলে পড়াবো। আমরা তো কেউ পড়তে পারিনে। ও নিছনি, জগরু-কাকাকে ডেকে নিয়ে আয়। চিঠি পড়া হবে—সবাইকে ডাক দে।

ছ-সাত মাস পূর্বের পুরনো অপঠিত পত্রখানা আমি যুগলপ্রসাদের উনুনের আলোয় পড়িতে বসিলাম—আমার চারিধারে বাড়িসুদ্ধ লোক ঘিরিয়া বসিল চিঠি শুনিবার জন্য। চিঠিখানা কায়েথী-হিন্দীতে লেখা—রাজা দোবরু পান্নার নামে চিঠি। পাটনার জনৈক মহাজন রাজা দোবরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছে, এখানে বিড়িপাতার জঙ্গল আছে কিনা—থাকিলে কি দরে ইজারা বিলি হয়।

এ পত্রের সঙ্গে ইহাদের কোনো সম্পর্ক নাই—ইহাদের অধীনে কোনো বিড়িপাতার জঙ্গল নাই। রাজা দোবরু নামে রাজা ছিলেন, চক্‌মকিটোলার নিজ বসতবাটির বাহিরে তাঁর যে কোথাও এক ছটাক জমিও নাই একথা পাটনার উক্ত পত্রলেখক মহাজন জানিলে ডাকমাশুল খরচ করিয়া বৃথা পত্র দিত না নিশ্চয়ই।

একটু দূরে দাওয়ার ও-পাশে যুগলপ্রসাদ রান্না করিতেছে। তাহার কাঠের উনুনের আলোয় দাওয়ার খানিকটা আলো হইয়াছে। এদিকে দাওয়ার অর্ধেকটায় জ্যোৎস্না পড়িয়াছে, যদিও কৃষ্ণপক্ষের আজ মোটে তৃতীয়া—ধন্‌ঝরি পাহাড়ের আড়াল কাটাইয়া এই কিছুক্ষণ মাত্র চাঁদ ফাঁকা আকাশে দৃশ্যমান হইয়াছে। সামনে কিছুদূরে অর্ধচন্দ্রাকৃতি পাহাড়শ্রেণী—চক্‌মকিটোলার বস্তির ছেলেপুলেদের কথা ও কলরব শোনা যাইতেছে।...কি সুন্দর ও অপূর্ব মনে হইতেছিল এই বন্য গ্রামে যাপিত এই রাত্রিটি! ভানুমতীর তুচ্ছ ও সাধারণ গল্পও কি আনন্দই দিতেছিল! সেদিন বলভদ্রের মুখে শোনা সেই উন্নতি করিবার কথা মনে পড়িল।

মানুষে কি চায়—উন্নতি না আনন্দ? উন্নতি করিয়া কি হইবে যদি তাহাতে আনন্দ না থাকে? আমি এমন কত লোকের কথা জানি, যাহারা জীবনে উন্নতি করিয়াছে বটে, কিন্তু আনন্দকে হারাইয়াছে। অতিরিক্ত ভোগে মনোবৃত্তির ধার ক্ষইয়া ক্ষইয়া ভোঁতা—এখন আর কিছুতেই তেমন আনন্দ পায় না, জীবন তাহাদের নিকট একঘেয়ে, একরঙা, অর্থহীন। মন শান-বাঁধানো—রস ঢুকিতে পায় না।

এখানেই যদি থাকিতে পারিতাম! ভানুমতীকে বিবাহ করিতাম। এই মাটির ঘরের জ্যোৎস্না-ওঠা দাওয়ায় সরলা বন্যবালা রাঁধিতে রাঁধিতে এমনি করিয়া ছেলেমানুষী গল্প করিত—আমি বসিয়া বসিয়া শুনিতাম। আর শুনিতাম বেশি রাত্রে ওই বনে হুড়ালের ডাক, বনমোরগের ডক, বন্য হস্তীর বৃংহিত, হায়েনার হাসি। ভানুমতী কালো বটে, কিন্তু এমন নিটোল স্বাস্থ্যবতী মেয়ে বাংলা দেশে পাওয়া যায় না। আর ওর ওই সতেজ সরল মন! দয়া আছে, মায়া আছে, স্নেহ আছে—তার কত প্রমাণ পাইয়াছি। ....ভাবিতেও বেশ লাগে। কি সুন্দর স্বপ্ন! কি হইবে উন্নতি করিয়া? বলভদ্র সেঙ্গাৎ গিয়া উন্নতি করুক। রাসবিহারী সিং উন্নতি করুক।

যুগলপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিল, রান্না হইয়াছে, চৌকা লাগাইবে কিনা। ভানুমতীদের বাড়িতে আতিথ্যের কোনো ত্রুটি হয় না। এদেশে আনাজ মেলে না, তবুও কোথা হইতে জগরু বেগুন ও আলু আনিয়াছে। মাষকলাইয়ের ডাল, পাখীর মাংস, বাড়িতে তৈরি অতি উৎকৃষ্ট টাটকা ভয়সা ঘি, দুধ। যুগলপ্রসাদের হাতের রান্নাও চমৎকার।

ভানুমতী, জগরু, জগরুর দাদা, নিছনি—সবাই আজ আমাদের এখানে খাইবে—আমি খাইতে বলিয়াছি। কারণ এমন রান্না উহারা কখনও খাইতে পায় না। বলিলাম—একটু দূরে উহারাও একসঙ্গে সবাই বসুক। যুগলপ্রসাদের দেওয়ার সুবিধা হইবে। একত্র খাওয়া যাক।

ওরা রাজী হইল না। আমাদের আগে না খাওয়া হইলে উহারা খাইবে না।

পরদিন আসিবার সময় ভানুমতী এক কাণ্ড করিল।

হঠাৎ আমার হাত ধরিয়া বলিল—আজ যেতে দেব না বাবুজী—

আমি অবাক হইয়া উহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। কষ্ট হইল।

উহার অনুরোধে সকালে রওনা হইতে পারিলাম না—দুপুরের আহারাদির পরে বিদায় লইলাম।

... ...

আবার দুধারে ছায়ানিবিড় বনপথ। পথের ধারে কোথাও রাজকুমারী ভানুমতী যেন দাঁড়াইয়া আছে—বালিকা নয়, যুবতী ভানুমতী—তাহাকে আমি কখনও দেখি নাই। তার সাগ্রহ দৃষ্টি, তার প্রণয়ীর আগমন-পথের দিকে নিবদ্ধ—হয়তো সে পাহাড়ের ওপারের বনে শিকারে গিয়াছে, আসিবার দেরি নাই। তরুণীকে মনে মনে আশীর্বাদ করিলাম। ধন্‌ঝরি পাহাড়ের জোনাকি-জ্বলা নিস্তব্ধ প্রাচীন ছাতিম ফুলের বন ও অপূর্ব দূরছন্দা সন্ধ্যার আড়ালে বনবালার গোপন অভিসার সার্থক হউক।

মহালে ফিরিয়া সপ্তাহখানেকের মধ্যেই সকলের নিকট বিদায় লইয়া লবটুলিয়া ত্যাগ করিলাম।

আসিবার সময় রাজু পাঁড়ে, গনোরী, যুগলপ্রসাদ, আস্‌রফি টিন্ডেল প্রভৃতি পাল্কির চারিধার ঘিরিয়া পাল্কির সঙ্গে সঙ্গে লবটুলিয়ার সীমানার নূতন বস্তি মহারাজটোলা পর্যন্ত আসিল। মটুকনাথ সংস্কৃতে স্বস্তিবাচন উচ্চারণ করিয়া আমায় আশীর্বাদ করিল। রাজু বলিল—হুজুর, আপনি চলে গেলে লবটুলিয়া উদাস হয়ে যাবে।

প্রসঙ্গক্রমে বলি, এদেশে 'উদাস' শব্দের ব্যবহার এবং উহার অর্থের ব্যাপকতা অত্যন্ত বেশি। মকাই-ভাজা খাইতে খারাপ লাগিলে বলে, 'ভাজা উদাস লাগছে।' আমার সম্পর্কে কি অর্থে উহা ব্যবহৃত হইল ঠিক বলিতে পারিব না।

আমার বিদায় লইয়া আসিবার সময় একটি মেয়ে কাঁদিয়াছিল। আজ সকাল হইতে আসিয়া সে কাছারির উঠানে দাঁড়াইয়া ছিল—আমার পাল্কি যখন তোলা হইল, তখন চাহিয়া দেখি সে হাপুস-নয়নে কাঁদিতেছে। মেয়েটি কুন্তা।

নিরাশ্রয় কুন্তাকে জমি দিয়া বসবাস করাইয়াছি, আমার ম্যানেজারী জীবনের ইহা একটি সৎ কাজ। পারিলাম না কিছু করিতে সেই বন্য বালিকা মঞ্চীর। অভাগিনীকে কে কোথায় যে ভুলাইয়া লইয়া গেল! আজ সে যদি থাকিত তাহার নিজের নামে জমি দিতাম বিনা সেলামিতে।

নাঢ়া বইহারের সীমানায় নকছেদীর ঘর দেখিয়াই আরও ওর কথা মনে পড়িল। সুরতিয়া ঘরের বাহিরে কি করিতেছিল, আমার পাল্কি দেখিয়াই বলিয়া উঠিল—বাবুজী, বাবুজী, একটু রাখুন—

পরে সে ছুটিয়া আসিয়া পাল্কির কাছে দাঁড়াইল। ছনিয়াও আসিল পিছু পিছু।

—বাবুজী, কোথায় যাচ্ছেন?

—ভাগলপুরে। তোর বাবা কোথায়?

—ঝল্লুটোলায় গমের বীজ আনতে গিয়েছে। কবে আসবেন?

—আর আসব না।

—ইস! মিথ্যে কথা।....

নাঢ়া বইহারের সীমানা পার হইয়া পাল্কি হইতে মুখ বাড়াইয়া একবার পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলাম।

বহু বস্তি, চালে চালে বসত, লোকজনের কথাবার্তা, বালক-বালিকার কলহাস্য, চি
মহিষ, ফসলের গোলা। ঘন বন কাটিয়া আমিই এই হাস্যদীপ্ত শস্যপূর্ণ জনপদ বসা
নাত বৎসরের মধ্যে। সবাই কাল তাহাই বলিতেছিল—বাবুজী, আপনার কাজ
রা পর্যন্ত অবাক হয়ে গিয়েছি, নাঢ়া লবটুলিয়া কি ছিল আর কি হয়েছে!

কথাটা আমিও ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছি। নাঢ়া লবটুলিয়া কি ছিল আর কি হই
দিগন্তলীন মহালিখারূপের পাহাড় ও মোহনপুরা অরণ্যানীর উদ্দেশে দূর হইতে ন
নাম।

হ অরণ্যানীর আদিম দেবতারা, ক্ষমা করিও আমায়। বিদায়!...

৩

ল কাটিয়া গিয়াছে তারপর—পনেরো-ষোল বছর।

দাম গাছের তলায় বসিয়া এই সব ভাবিতেছিলাম।

বেলা একেবারে পড়িয়া আসিয়াছে।

বিস্মৃতপ্রায় অতীতের যে নাঢ়া ও লবটুলিয়ার আরণ্য-প্রান্তর আমার হাতেই নষ্ট হইয়
তী হ্রদের সে অপূর্ব বনানী, তাহাদের স্মৃতি স্বপ্নের মত আসিয়া মাঝে মাঝে মনকে
। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, কেমন আছে কুন্তা, কত বড় হইয়া উঠিয়াছে সুরতিয়া, মটুকন
আজও আছে কিনা, ভানুমতী তাহাদের সেই শৈলবেষ্টিত আরণ্যভূমিতে কি করি
নবাবুর স্ত্রী, ধ্রুবা, গিরিধারীলাল, কে জানে এতকাল পরে কে কেমন অবস্থায় আ
মার মনে হয় মাঝে মাঝে মঞ্চীর কথা। অনুতপ্তা মঞ্চী কি আবার স্বামীর কাছে ফিরি
সামের চা-বাগানে চায়ের পাতা তুলিতেছে আজও!

তকাল তাহাদের আর খবর রাখি না।

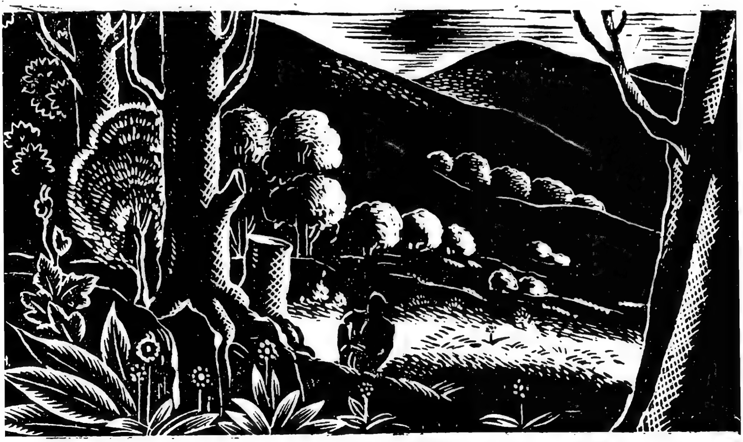

— শেষ —

আদর্শ হিন্দু হোটেল

বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাণাঘাটের রেল-বাজারে বেচু চক্কত্তির হোটেল যে রাণাঘাটের আদি ও অকৃত্রিম হিন্দু-হোটেল এ-কথা হোটেলের সামনে বড় বড় অক্ষরে লেখা না থাকিলেও অনেকেই জানে। কয়েক বছরের মধ্যে রাণাঘাট রেল-বাজারের অসম্ভব রকমের উন্নতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হোটেলটির অবস্থা ফিরিয়া যায়। আজ দশ বৎসরের মধ্যে হোটেলের পাকা বাড়ী হইয়াছে, চারজন রসুয়ে-বামুনে রান্না করিতে করিতে হিম্‌শিম্ খাইয়া যায়, এমন খদ্দেরের ভিড়।

বেচু চক্কত্তি (বয়স পঞ্চাশের ওপর, না-ফর্সা না-কালো দোহারা চেহারা, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল) হোটেলের সামনের ঘরে একটা তক্তপোশে কাঠের হাত-বাক্সের ওপর কনুয়ের ভর দিয়া বসিয়া আছে। বেলা দশটা। বনগাঁ লাইনের ট্রেন এইমাত্র আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিছু কিছু প্যাসেঞ্জার বাহিরের গেট দিয়া রাস্তায় পড়িতে শুরু হইয়াছে।

বেচু চক্কত্তির হোটেলের চাকর মতি রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া হাঁকিতেছে—এই দিকে আসুন বাবু, গরম ভাত তৈরি, মাছের ঝোল, ডাল, তরকারী ভাত—হিন্দু-হোটেল বাবু—

দুইজন লোক বক্তৃতায় ভুলিয়া পাশের যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলের লোকের সাদর আমন্ত্রণ উপেক্ষা করিয়া বেচু চক্কত্তির হোটেলেই ঢুকিল।

—এই যে, বোঁচকা এখানে রাখুন। দাঁড়ান বাবু, টিকিট নিতে হবে এখানে—কোন্ ক্লাসে খাবেন? ফার্স্ট ক্লাস না সেকেন্ ক্লাস—ফার্স্ট ক্লাসে পাঁচ আনা, সেকেন ক্লাসে তিন আনা—

এ হোটেলের নিয়ম, পয়সা দিয়া বেচু চক্কত্তির নিকট হইতে টিকিট (এক টুক্‌রা সাদা কাগজে—নম্বর ও শ্রেণী লেখা) কিনিয়া ভিতরে যাইতে হইবে। সেখানে একজন রসুয়ে-বামুন বসিয়া আছে, খদ্দেরের টিকিট লইয়া তাহাকে নির্দিষ্ট স্থানে বসাইয়া দিবার জন্য। খাইবার জায়গা দরমার বেড়া দিয়া দুই ভাগ করা। এক দিকে ফার্স্ট ক্লাস, অন্য দিকে সেকেন্ ক্লাস। খদ্দের খাইয়া চলিয়া গেলে এই সব টিকিট বেচু চক্কত্তির কাছে জমা দেওয়া হইবে—সেগুলি দেখিয়া তহবিল মিলানো ও উদ্বৃত্ত ভাত তরকারীর পরিমাণ তদারক হইবে, রসুয়ে-বামুনেরা চুরি করিতে না পারে।

চাকর ভিতরে আসিয়া বলিল—মোটে চার জন লোক খদ্দের। দু'জন ওদের ওখানে গেল।

বেচু চক্কত্তি বলিল—যাক্ গে। তুই আর একটু এগিয়ে যা—শান্তিপুর আসবার সময় হ'ল। এই গাড়ীতে দু-পাঁচটা খদ্দের থাকেই। আর ভেতরে বামুনকে বলে আয়, শান্তিপুর আসবার আগে যেন আর ভাত না চড়ায়। এক ডেক্‌চিতে এখন চলুক।

এমন সময় হোটেলের ঝি পদ্ম ঘরে ঢুকিয়া বলিল—পয়সা দেও বাবু, দই নে আসি।

বেচু বলিল—দই কি হবে?

পদ্ম হাসিয়া বলিল—একজন ফাস্টো কেলাসে খাবে। আমায় বলে পাঠিয়েছে। দই চাই, পাকা কলা চাই—

বেচু বলিল—কে বল্ তো? খদ্দের?

—খদ্দের তো বটেই। পয়সা দিয়ে খাবে। এম্‌নি না।। আমার ভাইপো আসবে দেশ থেকে এই শান্তিপুরের গাড়ীতে।

—না—না—তাকে পয়সা দিতে হবে না। সে ছেলেমানুষ, দু-এক দিনের জন্যে আসবে—তার কাছ থেকে পয়সা কিসের? দইয়ের পয়সা নিয়ে যা—

বেচু একথা কখনো কাহাকেও বলে না, কিন্তু পদ্ম ঝিয়ের সম্বন্ধে অন্য কথা। পদ্ম ঝি এ হোটেলে যা বলে তাই হয়। তাহার উপর কথা বলিবার কেহ নাই। সেজন্য দুষ্ট লোকে নানারকম মন্দ কথা বলে। কিন্তু সে-সব কথায় কান দিতে গেলে চলে না।

শান্তিপুরের গাড়ী আসিবার শব্দ পাওয়া গেল।

হোটেলের চাকর খদ্দের আনিতে স্টেশনে যাইতেছিল, বেচু চক্কত্তি বলিল—খদ্দের বেশী ক'রে আনতে না পারলে আর তোমায় রাখা হবে না মনে রেখো—আমার খরচা না পোষালে মিথ্যে চাকর রাখতে যাই কেন? গেল হপ্তাতে তুমি মোটে তেইশটা খদ্দের এনেছ—তাতে হোটেল চলে?

পদ্ম ঝি বলিল—তোমায় পই-পই ক'রে বলে হার মেনে গেলাম; তিন আনা বাড়িয়ে চোদ্দ পয়সা করো, আর ফাস্টো কেলাস্-টেলাস্ তুলে দ্যাও। ক'টা খদ্দের হয় ফাস্টো কেলাসে? যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলে রেট্ কমিয়েছে—শুনে—

বেচু বলিল—চুপ চুপ, একটু আস্তে আস্তে বল্ না। কারও কানে কথা গেলে এখুনি—

এমন সময় ছ'জন খদ্দের সঙ্গে করিয়া মতি চাকর ফিরিয়া আসিল।

বেচু বলিল—আসুন বাবু, পুঁটুলি এখানে রাখুন। কোন্ কেলাসে খাবেন বাবুরা? পাঁচ আনা আর তিন আনা—

একজন বলিল—তোমার সেই বামুন ঠাকুরটি আছে তো? তার হাতের রান্না খেতেই এলাম। আমরা সে-বার খেয়ে গিয়ে আর ভুলতে পারি নে। মাংস হবে?

—না বাবু, মাংস তো রান্না নেই—তবে যদি অর্ডার দেন তো ওবেলা—

লোকটি বলিল—আমরা মোকদ্দমা করতে এসেছি কিনা, যদি জিতি পোড়ামা আর সিদ্ধেশ্বরীর ইচ্ছেয়—তবে হোটেলে আমাদের আজ থাকতেই হবে। কাল উকীলের বাড়ী কাজ আছে—তা হ'লে আজ ওবেলা তিন সের মাংস চাই—কিন্তু সেই বামুন ঠাকুরকে দিয়ে রান্না করানো চাই। নইলে আমরা অন্য জায়গায় যাব।

ইহারা টিকিট কিনিয়া খাইবার ঘরে ঢুকিলে পদ্ম ঝি বলিল—পোড়ারমুখো মিন্‌সে আবার শুন্‌তে না পায়। কি যে ওর রান্নার সুখ্যাত করে লোকে, তা বলতে পারি নে—কি এমন মরণ রান্নার!

বেচু বলিল—টিকিটগুলো নিয়ে আয় তো ভেতর থেকে। এ-বেলার হিসেবটা মিটিয়ে রাখি। আর এখন তো গাড়ী নেই—আবার সেই একটায় মুড়োগাছা লোকাল—

পদ্ম বলিল—কেন আসাম মেল—

—আসাম মেলে আর তেমন খদ্দের আসছে কই? আগে আগে আসাম মেলে আটটা

দশটা খদ্দের ফি দিন পাওয়া যেত—কি যে হয়েছে বাজারের অবস্থা—

পদ্ম ঝি ভিতরে গিয়া রসুয়ে-বামুনের নিকট হইতে টিকিট আনিয়া বলিল—শোনো মজা, ফাস্টো কেলাসের ডাল যা ছিল সব সাবাড়। হাজারি ঠাকুরের কাণ্ড! ইদিকে এই খদ্দের বাবুরা গিয়ে তাকে একেবারে স্বগ্‌গে তুলে দিচ্ছে, তুমি হেনো রাঁধো, তুমি তেনো রাঁধো ব'লে—যত অনাছিষ্টি কাণ্ড, যা দেখতে পারি নে তাই। এখন ডালের কি করবে বলো—

—ডাল কতটা আছে দেখলি ?

—সবশুদ্ধ। আর মেরে-কেটে তিন জনের মত হবে—

—ক'জনের মত ডাল দিইছিলি ?

—দশ জনের মত মুগের ডাল আলাদা ফাস্টো কেলাসের মুড়িঘণ্টের জন্যে দিইছি—সেকেন্‌ কেলাসে ত্রিশ জনের মুসুরি-খেঁসারি মিশেল ডাল--

—হাজারি ঠাকুরকে ডেকে দে—

পদ্ম ঝি হাজারি ঠাকুরকে সঙ্গে করিয়াই আনিল।

লোকটার বয়স পঁয়তাল্লিশ-ছে'চল্লিশ, একহারা চেহারা, রং কালো। দেখিলে মন হয় লোকটা নিপাট ভালমানুষ।

বেচু চক্কত্তি বলিল—হাজারি ঠাকুর, ডাল কম হ'ল কি ক'রে ?

হাজারি ঠাকুর বলিল—তা কি ক'রে বলবো বাবু? রোজ যেমন ডাল খদ্দেরদের দিই, তার বেশী তো দিই নি। কম হ'লে আমি কি করবো বলুন।

পদ্ম ঝি ঝঙ্কার দিয়া বলিল --তোমার হাড়ে হাড়ে বদমাইশি ঠাকুর। আমি পষ্ট দেখেছি তুমি ওই খদ্দের বাবুদের মুখে রান্নার সুখ্যাতি শুনে তাদের পাতে উড়কি উড়কি মুড়িঘণ্ট ঢালছো। পয়সা-কড়িও দিয়েছে বোধ হয় বকশিশ—

হাজারি বলিল—বকশিশ এ হোটেলে কত পাই দেখছো তো পদ্মদিদি। একটা বিড়ি খেতে কেউ দ্যায়—আজ পাঁচ বছর এখানে আছি ? তুমি কেবল বকশিশ পেতে দ্যাখো আমাকে।

পদ্ম বলিল—তুমি মুখে-মুখে তক্কো ক'রো না বলে দিচ্ছি। পদ্ম ঝি কাউকে ভয় ক'রে কথা বলবার মেয়ে নয়। ফাস্টো কেলাসের বাবুরা পুজোর সময় তোমায় গেঞ্জি কিনে দেয় নি ?

—ইস্—ভারী গেঞ্জি একটা—কিনে দিয়েছিল বুঝি, পুরনো গেঞ্জি—

বেচু চক্কত্তি বলিল—যাও যাও, ঠাকুর, বাজে কথা নিয়ে বকো না। বেশী খদ্দের আসে, ডালের দাম তোমার মাইনে থেকে কাটা যাবে।

—কেন বাবু আমার কি দোষ হ'ল এতে। পদ্মদিদি আট জনের ডাল মেপে দিয়েছে, তাতে খেয়েছে এগারো জন—

পদ্ম এবার হাজারি ঠাকুরের সামনে আসিয়া হাত-মুখ নাড়িয়া চোখ পাকাইয়া বলিল—আট জনের ডাল মেপে দিইছি—নচ্ছার, বদমাইশ, গাঁজাখোর কোথাকার—দশ জনের দশের

অর্দ্ধেক পাঁচ পোয়া ডাল তোমায় দিই নি বের ক'রে ?

হাজারি ঠাকুর আর প্রতিবাদ করিতে বোধ হয় সাহস পাইল না।

পদ্ম ঝি অত অল্পে বোধ হয় ছাড়িত না—কিন্তু ইতিমধ্যে খদ্দেররা আসিয়া পড়াতে সে কথা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। হাজারি ঠাকুরও ভিতরে গেল।

বেলা প্রায় আড়াইটা।

আসাম মেল অনেকক্ষণ আসিয়া চলিয়া গিয়াছে।

হাজারি ঠাকুর একা খাওয়ার ঘরে খাইতে বসিল। বড় ডেক্‌চিতে দুটিখানি মাত্র ভাত ও কড়ায় একটুখানি ঘাঁটা তরকারি পড়িয়া আছে। ডাল, মাছ যাহা ছিল, পদ্ম ঝিকে তাহার বড় থালায় বাড়িয়া দিতে হইয়াছে—সে রোজ বেলা দেড়টার সময় রান্নাঘরের উদ্বৃত্ত ডাল তরকারি মাছ নিজের বাসায় লইয়া যায়—রসুয়ে-বামুনদের জন্যে কিছু থাকুক আর না থাকুক।

অন্য রসুয়ে-বামুনটা উড়িয়া। তার নাম রতন ঠাকুর। সে হোটেলে বসিয়া খায় না—তাহারও বাসা নিকটে। সেও ভাত-তরকারি লইয়া যায়।

হাজারির এখানে কেহ নাই। সে হোটেলেই থাকে, হোটেলেই খায়। রোজই তার ভাগ্যে এই রকম। বেলা আড়াইটা পর্য্যন্ত খালি পেটে খাটিয়া দুটি কড়কড়ে ভাত, কোনোদিন সামান্য একটু ডাল, কোনোদিন তাও না—ইহাই তাহার বরাদ্দ। ডেক্‌চিতে বেশী ভাত থাকিলে পদ্ম ঝি বলিবে—অত ভাত খাবে কে ? ও তো তিন জনের খোরাক—আমার থালায় আর দুটো বেশী ক'রে ভাত বেড়ে দিও।

হাজারি ঠাকুর খাইতে বসিয়া রোজ ভাবে—আর দুটো ভাত থাকলে ভাল হোত, না-হয় তেঁতুল দিয়ে খেতাম। পদ্মটা কি সোজা বদমাইশ মাগী—পেট ভ'রে যে কেউ খায়—তাও তার সহ্যি হয় না। যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলে বেলা এগারোটার সময় রাঁধুনি-বামুন একথালা ভাত খেয়ে নেয়, আমাদের এখানে তা হবার জো আছে ? বাব্বাঃ, যেমন কর্ত্তা, তেমনি গিন্নি—(পদ্ম ঝিকে মনে মনে গিন্নি বলিয়া হাজারি ঠাকুর খুব আমোদ উপভোগ করিল—মুখ ফুটিয়া যাহা বলা যায় না, মনে মনে তাহা বলিয়াও সুখ।)

খাওয়ার পরে মাত্র আড়াই ঘণ্টা ছুটি।

আবার ঠিক বেলা পাঁচটায় উনুনে ডেকচি চাপাইতে হইবে।

রতন ঠাকুর এই সময়টা বাসায় গিয়া ঘুমোয়, কিন্তু হাজারি ঠাকুর চূর্ণী নদীর ধারের ঠাকুর-বাড়ীতে, কিংবা রাধাবল্লভ-তলায় নাটমন্দিরে একা বসিয়া কাটায়।

না ঘুমাইয়া একা বসিয়া কাটাইবার মানে আছে।

হাজারি ঠাকুরের এই সময়টা হইতেছে ভাবিবার সময়। এ সময় ছাড়া আর নির্জ্জনে ভাবিবার অবসর পাওয়া যায় না। সন্ধ্যা সাতটা পর্য্যন্ত রান্নার কাজে ব্যস্ত থাকিতে হয়, রাত এগারটা পর্য্যন্ত খদ্দেরদের পরিবেশন, রাত বারোটা পর্য্যন্ত নিজেদের খাওয়া-দাওয়া, তার

পর কর্ত্তার কাছে চাল-ডালের হিসাব মিটানো। রাত একটার এদিকে শুইবার অবসর পাওয়া যায় না, দু-দণ্ড একা বসিয়া ভাবিবার সময় কই ?

চূর্ণী নদীর ধারের জায়গাটি বেশ ভাল লাগে।

ও-পারে শান্তিপুর যাইবার কাঁচা সড়ক। খেয়া নৌকায় লোকজন পারাপার হইতেছে। গ্রামের বাঁশবন, শিমুল গাছ, মাঠ, কলাই ক্ষেত, গাবভেরেণ্ডার বেড়া-ঘেরা গৃহস্থ-বাড়ী।

হাজারি ঠাকুর একটা বিড়ি ধরাইয়া ভাবিতে আরম্ভ করিল।

আজ পাঁচ বছর হইয়া গেল বেচু চক্কত্তির হোটেলে।

প্রথম যেদিন রাণাঘাট আসিয়া হোটেলে ঢোকে, সে-কথা আজও মনে হয়। গাংনাপুর হইতে রাণাঘাট আসিয়া সে প্রথমেই গেল বেচু চক্কত্তির হোটেলে কাজের সন্ধানে।

কর্ত্তা সামনেই বসিয়া ছিলেন। বলিলেন—কি চাই ?

হাজারি বলিল—আজ্ঞে বাবু, রসুয়ে-বামুনের কাজ করি। কাজের চেষ্টায় ঘুরছি, বাবুর হোটেলে কাজ আছে ?

—তোমার নাম কি ?

—আজ্ঞে, হাজারি দেবশর্ম্মা, উপাধি চক্রবর্ত্তী।

এই ভাবে নাম বলিতে হাজারির পিতাঠাকুর তাহাকে শিখাইয়া দিয়াছিলেন।

—বাড়ী কোথায় ?

—গাংনাপুর ইস্টিশানে নেমে যেতে হয় এড়োশোলা গ্রামে।

—রাঁধতে জানো ?

—বাবু একদিন রাঁধিয়ে দেখুন ! মাংস মাছ, যা দেবেন সব পারবো।

—আচ্ছা, তিন দিন এমনি রাঁধতে হবে—তার পর সাত টাকা মাইনে দেবো আর খেতে পাবে। রাজি থাকো আজই কাজে লেগে যাও।

সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত সাত টাকার এক পয়সা মাহিনা বাড়ে নাই। অথচ খদ্দের বাবুরা সকলেই তাহার রান্নার সুখ্যাতি করে, যদিচ পদ্ম ঝিয়ের মুখে একটা সুখ্যাতির কথাও সে কখনো শোনো নাই, ভালো কথা তো দূরের কথা, পদ্ম ঝি তাহাকে আঁশবঁটি পাতিয়া পারে তো কোটে। গরীব লোক, এ বাজারে চাকুরি ছাড়িয়া দিয়া যাইবেই বা কোথায় ? যাক, তাহার জন্য সে তত ভাবে না। তাহার মনে একটা বড় আশা আছে, ভগবান তাহা যদি পূর্ণ করেন কোনোদিন—তবে তাহার সকল খেদ দূর হইয়া যায়।

হোটেলের কাজ সে খুব ভাল শিখিয়া লইয়াছে। সে নিজে একটা হোটেল খুলিবে।

হোটেলের বাহিরে লেখা থাকিবে—

হাজারি চক্রবর্ত্তীর হিন্দু-হোটেল
রাণাঘাট
ভদ্রলোকদের সস্তায় আহার ও বিশ্রামের স্থান।
আসুন ! দেখুন !! পরীক্ষা করুন !!!

কর্ত্তার মত তাকিয়া ঠেস্ দিয়া বসিয়া টিকিট বিক্রয় করিবে। রাঁধুনী-বামুন ও ঝি 'বাবু' বলিয়া ডাকিবে। সে নিজে বাজারে গিয়া মাছ তরকারী কিনিয়া আনিবে, এ হোটেলের মত ঝিয়ের উপর সব ভার ফেলিয়া দিয়া রাখিবে না। খদ্দেরদের ভাল জিনিস খাওয়াইয়া খুশী করিয়া পয়সা লইবে। সে এই কয় বছরে বুঝিয়া দেখিল, লোকে ভাল জিনিস, ভাল রান্না খাইতে পাইলে দু-পয়সা বেশী রেট্ দিতেও আপত্তি করে না।

এ হোটেলের মত জুয়াচুরি সে করিবে না, মুসুরি ডালের সঙ্গে কম দামের খেঁসারি ডাল চালাইবে না, বাজারের কানা পোকাধরা বেগুন, রেল-চালানি বরফ-দেওয়া সস্তা মাছ বাছিয়া বাছিয়া হোটেলের জন্য কিনিবে না।

এখানে খদ্দেরদের বিশ্রামের বন্দোবস্ত নাই—যাহারা নিতান্ত বিশ্রাম করিতে চায়, কর্ত্তার গদিতে বসিয়া এক-আধটা বিড়ি খায়—কিন্তু তাহার মনে হয় বিশ্রামের ভাল ব্যবস্থা থাকিলে সে হোটেলে লোক বেশী আসিবে—অনেকেই খাওয়ার পরে একটু গড়াইয়া লইতে চায়, সে তাহার হোটেলে একটা আলাদা ঘর রাখিবে খুচরা খদ্দেরদের বিশ্রামের জন্য। সেখানে তক্তপোশের ওপর শতরঞ্চি ও চাদর পাতা থাকিবে, বালিশ থাকিবে, তামাক খাইবার বন্দোবস্ত থাকিবে, কেউ একটু ঘুমাইয়া লইতে চাহিলেও অনায়াসে পারিবে। খাও-দাও, বিশ্রাম কর, তামাক খাও, চলিয়া যাও। রাণাঘাটের কোনো হোটেলে এমন ব্যবস্থা নাই, যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলেও না। ব্যবসা ভাল করিয়া চালাইতে হইলে এ-সব ব্যবস্থা দরকার, নইলে রেলগাড়ীর সময়ে ইস্টিশানে গিয়া শুধু 'আসুন বাবু, ভাল হিন্দু-হোটেল' বলিয়া চেঁচাইলে কি আর খদ্দের আসে?

খদ্দেররা খোঁজে আরামে ভাল খাওয়া। যে দিতে পারিবে, তাহার ওখানেই লোক ঝুঁকিবে।

অবশ্য ইহা সে বোঝে, আজ যদি একটা হোটেলে বিশ্রামের ঘর করে, তবে দেখিতে দেখিতে কালই রাণাঘাটের বাজারময় সব হিন্দু-হোটেলেই দেখাদেখি বিশ্রামের ঘর খুলিয়া বসিবে—যদি তাহাতে খদ্দের টানা যায়।

তবুও একবার নাম বাহির করিতে পারিলে, প্রথম যে নাম বাহির করে তাহারই সুবিধা। আরও কত মতলব হাজারির মাথায় আছে, শুধু খদ্দেরের বিশ্রাম ঘর কেন, মোকদ্দমা মামলা যাহারা করিতে আসে, তাহারা সারাদিনের খাটুনির পরে হয়তো খাইয়া-দাইয়া একটু তাস খেলিতে চায়—সে ব্যবস্থা থাকিবে, পান-তামাকের দাম দিতে হইবে না, নিজেরাই সাজিয়া খাও বা হোটেলের চাকরেই সাজিয়া দিক।

চূর্ণী নদীর ধারে বসিয়া একা ভাবিলে এমন সব কত নতুন নতুন মতলব তাহার মনে আসে। কিন্তু কখনো কি তাহা ঘটিবে? তাহার মনের আশা পূর্ণ হইবে? বয়স তো হইয়া গেল ছ'চল্লিশের উপর—সারাজীবন কিছু করিতে পারে নাই, সাত টাকা মাহিনার চাকুরি আজও ঘুচিল না—ছা-পোষা গরীব লোক, কি করিয়া কি হইবে, তাহা সে ভাবিয়া পায় না।

তবু সে কেন ভাবে রোজ এ-সব কথা, এই চূর্ণী নদীর ধারে বসিয়া? ভাবিতে বেশ লাগে, তাই ভাবে।

তবে বয়স হইয়াছে বলিয়া দমিবার পাত্র সে নয়। ছে'চল্লিশ বছর এমন কিছু বয়স নয়। এখনও সে অনেকদিন বাঁচিবে। কাজে উৎসাহ তাহার আছে, হোটেল খুলিতে পারিলে সে দেখাইয়া দিবে কি করিয়া সুনাম করিতে পারা যায়। হোটেল খুলিয়া মরিয়া গেলেও তাহার দুঃখ নাই।

সময় হইয়া গেল। আর বেশীক্ষণ বসিয়া থাকা চলিবে না। পদ্ম ঝি এতক্ষণ উনুনে আঁচ দিয়াছে, দেরি করিয়া গেলে তাহার মুখনাড়া খাইতে হইবে। আর কি লাগানি-ভাঙানি! কর্ত্তার কাছে লাগাইয়াছে সে নাকি গাঁজা খায়—অথচ সে গাঁজা ছোঁয় না কস্মিন্‌কালে।

ফিরিবার পথে ছোট বাজারে রাধাবল্লভ-তলা।

হাজারি ঠাকুর প্রতিদিন এখানে এই সময়ে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া যায়।

—বাবা রাধাবল্লভ, তোমার চরণে পড়ে আছি ঠাকুর! মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো। পদ্ম ঝির ঝাঁটা খেতে আর পারি নে। ওই কর্ত্তাবাবুর হোটেলের পাশে পদ্ম ঝিকে দেখিয়ে দেখিয়ে যেন হোটেল খুলতে পারি।

হোটেলে ফিরিয়া দেখিল রতন ঠাকুর এখনও আসে নাই, পদ্ম ঝি উনুনে আঁচ দিয়া কোথায় গিয়াছে।

বেচু চক্কত্তি দিবানিদ্রা হইতে উঠিয়া বাসা হইতে ফিরিয়াই হাজারিকে ডাক দিলেন।

—শোনো। আজ আমাদের এখানে ক'জন বাবু মাংস খাবেন, ফিষ্টি করবেন, তাঁরা আমায় আগাম দামও দিয়ে গেলেন। যাতে সকাল সকাল চুকে যায় তার ব্যবস্থা করবে। ওঁরা মুর্শিদাবাদের গাড়ীতে আবার চলে যাবেন। মনে থাকবে তো? রতন এখনও আসে নি?

হাজারির দুঃখ হইল, বেচু চক্কত্তি একথা তাহাকে কেন বলিল না যে, তাহার হাতের রান্না খুব ভাল, অতএব সে যেন নিজেই মাংস রাঁধে। কখনো ইহারা তাহার রান্না ভাল বলে না সে জানে। অথচ এই রান্না শিখিতে সে কি পরিশ্রমই না করিয়াছে!

রান্না কি করিয়া ভাল শিখিল, সে এক ইতিহাস।

হাজারির মনে আছে, তাহাদের এঁড়োশোলা গ্রামে একজন সেকালের প্রাচীনা ব্রাহ্মণ বিধবা থাকিতেন, তখন হাজারির বয়স নয়-দশ বছর। রান্নায় তাঁর শুধু সাধারণ ধরণের সুখ্যাতি নয়, অসাধারণ সুনামও ছিল। গ্রামেরও বাহিরেও অনেক জায়গায় লোকে তাঁর নাম জানিত।

হাজারির মা তাঁকে বলিল—খুড়ীমা, আপনার তো বয়েস হয়েছে, কবে চলে যাবেন—আপনার গুণ আমাকে দিয়ে যান। চিরকাল আপনার নাম করবো।

তিনি বলেন—আচ্ছা তোকে বৌ একটা জিনিস দিয়ে যাবো। কি ক'রে নিরিমিষ চচ্চড়ি রাঁধতে হয় সেটাই তোকে দিয়ে যাবো।

সেই বৃদ্ধা হাজারির মাকে ওই একটিমাত্র জিনিস শিখাইয়াছিলেন এবং সেই একটি জিনিস রাঁধিবার গুণেই হাজারির মায়ের নাম ও-দিকের আট-দশখানা গ্রামে প্রসিদ্ধ ছিল। শুনিতে অতি সামান্য জিনিস—নিরিমিষ চচ্চড়ি, ওর মধ্যে আছে কি? কিন্তু এ-কথার জবাব পাইতে হইলে হাজারির মায়ের হাতের নিরিমিষ চচ্চড়ি খাইতে হয়।

দুঃখের বিষয় তিনি আর বাঁচিয়া নাই, ও-বৎসর দেহ রাখিয়াছেন।

হাজারি মায়ের রন্ধন-প্রতিভা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছে—মাংস, মাছ সবই রাঁধে ভাল—কিন্তু তার হাতের নিরিমিষ চচ্চড়ি এত চমৎকার যে, বেচু চক্কত্তির হোটেলে একবার যে খাইয়া যায়, সে আবার ঘুরিয়া সেখানেই আসে। রেল-বাজারে তো অতগুলো হোটেল রহিয়াছে—সে আর কোথাও যাইবে না।

আজও মাংস রান্না রাঁধিবার ভার তাহারই উপর পড়িল। খদ্দেররা মাংস খাইয়া খুব তারিফও করিতে লাগিল। কিন্তু আসলে তাহাতে হাজারির ব্যক্তিগত লাভ বিশেষ কিছুই নাই—খদ্দেরের মুখের প্রশংসা ছাড়া। পদ্ম ঝি তাহাকে একটা উৎসাহের কথাও বলিল না। বেচু চক্কত্তিও তাই।

অনেক রাত্রে সে খাইতে বসিল। এত যে ভাল করিয়া নিজের হাতে রান্না মাংস, তাহার নিজের জন্য তখন আর কিছুই নাই। যাহা ছিল, কর্ত্তাবাবু নিজের বাসায় পাঠাইয়া দিয়াছেন। তার পরেও সামান্য কিছু যা অবশিষ্ট ছিল, পদ্ম ঝি চাটিয়া-পুটিয়া লইয়া গিয়াছে।

খাইবার সময় রোজই এমন মুশকিল ঘটে। তাহার জন্য বিশেষ কিছুই থাকে না, এক-একদিন ভাত পর্য্যন্ত কম পড়িয়া যায়—মাছ, মাংস তো দূরের কথা। বয়স ছে'চল্লিশ হইলেও হাজারি খাইতে পারে ভাল, খাইতে ভালও বাসে—কিন্তু খাইয়া অধিকাংশ দিনই তার পেট ভরে না।

রাত সাড়ে বারোটা। কর্ত্তাবাবু হিসাব মিলাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। হোটেলে সে আর মতি চাকর ছাড়া আর কেহ রাত্রে থাকে না। পদ্ম ঝি অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে—রাত দশটার পরে সে থাকে না কোনোদিনই।

মতি চাকর বলিল—চলো, ছোট বাজারে যাত্রা হচ্চে, শুনতে যাবে বামুনঠাকুর?

—এত রাত্রে যাত্রা? পাগল আর কি! সারাদিন খেটে আবার ও-সব শখ থাকে? আমি যাবো না—তুই যাস্ তো যা। এসে ভাঁড়ার ঘরের জানালায় টোকা মারিস্। দোর খুলে দেবো।

মতি চাকর ছোকরা মানুষ। তাহার শখও বেশী। সে চলিয়া গেল।

মতি যাইবার কিছুক্ষণ পরে কে একজন বাহির হইতে দরজা ঠেলিল। হাজারি উঠিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া পাশের হোটেলের মালিক খোদ যদু বাঁড়ুয্যেকে দরজার বাহিরে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলের সঙ্গে তাহাদের রেষারেষি করিয়া কারবার চলে। তিনি এত রাত্রে এখানে কি মনে করিয়া? কখনো তো আসেন না! হাজারির মন সম্ভ্রমে পূর্ণ হইয়া গেল, যদু বাঁড়ুয্যেও একটা হোটেলের কর্ত্তা, সুতরাং হাজারির

কাছে সেও তার মনিবের সমান দরের লোক, এক রকম মনিবই।

যদু বাঁড়ুয্যে বলিল, আর কে আছে ঘরে?

যদুর আসিবার উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া হাজারি ততক্ষণে মনে মনে আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিল—বিনীত ভাবে বলিল—কেউ নেই বাবু, আমিই আছি। মতি ছিল, ছোট বাজারে যাত্রা—

যদু বাঁড়ুয্যে বলিল—চল ঘরের মধ্যে বসি। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

ঘরের মধ্যে বসিয়া যদু বাঁড়ুয্যে বেচু চক্কত্তির গদিতে বসিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া লইয়া বলিল—তুমি এখানে কত পাও ঠাকুর?

—আজ্ঞে সাত টাকা আর খোরাকী।

—কাপড় চোপড় দেয়?

— আজ্ঞে বছরে দু'খানা কাপড়।

যদু বাঁড়ুয্যে কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন—শোন, আমার হোটেলে তুমি কাজ করতে যাবে? তোমায় দশ টাকা আর খোরাকী দেবো। বছরে তিনখানা কাপড় পাবে। ধোপা-নাপিত, তেল-তামাক। যাবে?

হাজারি দস্তুরমত অবাক হইয়া গিয়াছিল। কিছুক্ষণ সে কথা বলিতে পারিল না। তার পর বলিল—বাবু, এখন তো কিছু বলতে পারি নে। ভেবে বলবো।

—ভেবে বলাবলি আর কি, আমার যে কথা সেই কাজ। তুমি কাল থেকে এ হোটেল ছেড়ে আমার হোটেলে চলো, কাল থেকেই আমি নিতে রাজি। তবে হ্যাঁ, বেচু চক্কত্তির সঙ্গে আমি অসরস্ করতে চাইনে। সেও ব্যবসাদার, আমিও ব্যবসাদার।

হাজারির মাথা যেন ঘুরিয়া উঠিল। কেহ দেখিতেছে না তো? পদ্ম ঝি কোথাও আড়ি পাতিয়া নাই তো? সে তাড়াতাড়ি বলিল—এখন আমি কোন কথা বলতে পারবো না বাবু। কাল ভেবে বলবো। কাল রাত্তিরে এমন সময় আসবেন।

যদু বাঁড়ুয্যে চলিয়া গেল।

হাজারি গাঁজা খায় এ খবর একেবারে মিথ্যা নয়, তবে খায় খুব সঙ্গোপনে এবং খুব কম। আজ এ ব্যাপারের পরে সে এক কলিকা গাঁজা না সাজিয়া পারিল না। সংসারে কেহ এ পর্য্যন্ত তাহাকে ভাল লোক বা ভাল রাঁধে বলিয়া খাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার পুরস্কার দিতে চায় নাই—খদ্দেরর মুখের ফাঁকা কথায় পেট ভরে না তো!

যদুবাবু নিজে বাড়ী বহিয়া আসিয়াছেন, তাহাকে দশ টাকা মাহিনার চাকরি (মায় খোরাকী ধোপা নাপিত) দিতে!

এতদিন রাণাঘাটের বাজারে আছে—কখনও কাহারও সঙ্গে মেশে না সে—মিশিতে ভালও বাসে না। তাহার জীবনের আশা যে-টা, সে-টা দশজনের সঙ্গে মিশিয়া আড্ডা দিয়া গাঁজা খাইয়া বেড়াইলে পূর্ণ হইবে না। তাহাকে খাটিতে হইবে, বাজার বুঝিতে হইবে, হিসাব রাখা শিখিতে হইবে, একটা ভাল হোটেল চালাইবার যাহা কিছু সুলুক সন্ধান সব সংগ্রহ করিতে

হইবে। সংসারে উন্নতি করিতে হইলে, দেশের কাছে বড় মুখ দেখাইতে হইলে, পরের মুখে নিজের নাম শুনিতে হইলে—সেজন্য চেষ্টা চাই, খাটুনি চাই। আড্ডা দিয়া গাঁজা খাইয়া বেড়াইলে কিংবা মতি চাকরের মত ছোট বাজারের বারোয়ারীর যাত্রা শুনিয়া বেড়াইলে কি হইবে ?

রাত অনেক। মাথা গরম হইয়া গিয়াছে। ঘুম আসার নামটি নাই।

দরজায় খটখট শব্দ হইল। হাজারি উঠিয়া দরজা খুলিল—সে আগেই বুঝিয়াছিল মতি চাকর ফিরিয়াছে। মতি ঘরে ঢুকিয়া বলিল—এখনো ঘুমোওনি ঠাকুর ? এখনো জেগে যে !

হাজারি গাঁজার কলিকা লুকাইয়া রাখিয়া তবে মতিকে দরজা খুলিয়া দিতে গিয়াছিল। বলিল—যে গরম, ঘুম আসবে কি, সারাদিন আগুনের তাতে—যাত্রা দেখলি নে ?

মতি বলিল—যাত্রার আসরে জায়গা নেই। লোক ভর্ত্তি। ফিরে এলাম। চল এক জায়গায়, যাবে ঠাকুরমশায় ?

—কোথায় ?

—পাড়ার মধ্যে। চলো না—ঘুম যখন নেই, একটু ঘুরেই না হয় এলে। তোমার তো কোনদিন কোথাও—

হাজারি বলিল—তোরা ছেলে-ছোকরা, আমার বয়স ছে'চল্লিশ। আমি তোর বাপের বয়সের মানুষ, আমার সঙ্গে ও-সব কথা কেন ?···তোর ইচ্ছে, যা বুঝিস্ করগে যা।

—বাবুর কাছে কি পদ্মদিদির কাছে কিছু ব'লো না ঠাকুরমশাই, দোহাই, দুটি পায়ে পড়ি।

আশ্চর্য্য এই যে, মতির এই কথা হাজারির মনে এক নতুন ধরনের ভাবনা আনিয়া দিল। তাহার উচ্চাশা আছে, মতির মত রাত বেড়াইয়া স্ফূর্ত্তি করিয়া সময় নষ্ট করিলে ভগবান তাহাকে দয়া করিবেন না। মতি কি ভাবিয়া আর বাহিরে গেল না, বাসনের ঘরে (হোটেলের পিতল কাঁসার থালা-বাটি রান্নাঘরের পাশে সিন্দুকে থাকে, মাজাঘষার পর রোজ রাত্রে বেচু চক্কত্তি নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সেগুলি গুনিয়া সিন্দুকে তুলিয়া রাখিয়া চাবি নিজে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান) গিয়া শুইয়া পড়িল। হাজারিও বাসনের ঘরে শোয়, আজ সে বাহিরের গদির মেজেতে তাহার পুরোনো মাদুরখানা পাতিয়া শুইল।

না—যদুবাবুর হোটেলে সে যাইবে না। হোটেলের রাঁধুনিগিরি সব জায়গায় সমান। এ হোটেলে আছে পদ্ম, ও হোটেলে হয়তো আবার কে আছে কে জানে ? তা ছাড়া, বেচুবাবু তাহার পাঁচ বছরের অন্নদাতা। লোভে পড়িয়া এতদিনের অন্নদাতাকে ত্যাগ করিয়া যাওয়া ঠিক নয়।

সে নিজে হোটেলে খুলিবে, এই তো তাহার লক্ষ্য। রাঁধুনি-বিত্তি যতদিন করিতে হয়, এই হোটেলেই করিবে। অন্য কোথাও যাইবে না। তাহার পর রাধাবল্লভ দয়া করেন, তখন অন্য কথা।

পরদিন খুব সকালে পদ্ম ঝি আসিয়া ডাকিল—ও ঠাকুর, দোর খোল—এখনও ঘুম—বাবাঃ! কুম্ভকর্ণকে হার মানালে তোমরা!

হাজারি তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া ছেঁড়া মাদুরখানা গুটাইয়া রাখিয়া দোর খুলিয়া দিল। একটু পরেই বেচু চক্কত্তি আসিলেন। দরজায়, গদিতে ও ক্যাশ-বাক্সে গঙ্গা জলের ছিটা দিয়া, ক্যাশ-বাক্সের ডালার উপরটা সামান্য একটু গঙ্গাজল দিয়া মার্জ্জনা করিয়া লইয়া পদ্ম ঝিকে বলিলেন—ধুনো দে—বেলা হয়ে গেল। আজ হাটবার, ব্যাপারীদের ভিড় আছে, শীগ্‌গির ক'রে আঁচ দে—আর সেদিনকার মত পচা দই-টই আনিস্ নে বাপু। ওতে নাম খারাপ হয়ে যায়—শেষকালে স্যানিটারি বাবুর চোখে পড়ে যাবো। দরকার কি?

ব্যাপারীরা সাধারণতঃ পাড়াগাঁয়ের চাষা লোক। তাহারা দই খাইতে পছন্দ করে বলিয়া প্রতি হাটবারে তাহাদের জন্য কয়েক হাঁড়ি দইয়ের বরাদ্দ আছে। এই দই পদ্ম ঝি তাহার নিজের ঘরে পাতিয়া হোটেলে বিক্রয় করিয়া দুই পয়সা লাভ করিয়া থাকে। এবং সে যে প্রথম শ্রেণীর জিনিস সরবরাহ করে না, তাহা বলাই বাহুল্য।

পদ্ম ঝি মুখ ঘুরাইয়া বলিল—বাবু আপনার যত সব অনাছিষ্টি কথা! দই পচা না ঘণ্ট, কে বল্‌চে দই পচা! ওই মুখপোড়া হাজারি ঠাকুর তো? ওর ছেরাদ্দর চাল যদি আজ—

হাজারি ঠাকুর কথাটা বলিয়াছিল বটে—তবে সে দই পচা কি তাজা তাহা বলে নাই—বলিয়াছিল ব্যাপারী খদ্দেররা বলাবলি করিতেছিল এ রকম খারাপ দই খাইতে দিলে তাহারা চোদ্দ পয়সার জায়গায় বারো পয়সার বেশি খোরাকি দিবে না।

পদ্ম ঝি রান্নাঘরের চৌকাঠে পা দিয়া ঝাঁজালো ঝগড়ার সুরে বলিল—বলি, ও ঠাকুর,—দই পচা তোমাকে কে বলেচে?

হাজারি আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল—ওই সাধু মণ্ডল আর তার ভাইপো রোজ হাটেই তো এখানে খায়—ওরাই বলছিল—

—বলছিল! তোমার গলা ধরে বলতে গিয়েছে ওরা। তোমার মত হিংসুক কুচুটে লোক তো কখনো দেখিনি—আমি দই দিই ব'লে তুমি হিংসেয় বুক ফেটে মরে যাচ্চ সে কি আমি বুঝিনে! তোমার শখের কুসুম গয়লানীর ছাপ-বাক্সে পয়সা না উঠলে কি আর তোমার মনে শান্তি আছে!…গাঁজাখোর মড়ুই-পোড়া বামুন কোথাকার!

হাজারি জিভ্ কাটিয়া বলিল—ছি ছি, কি যে বলো পদ্মদিদি তার ঠিক নেই—কুসুমের বাপের বাড়ী আমাদের গাঁয়ে, আমায় জ্যাঠা ব'লে ডাকে, আমি তাকে মেয়ে বলি—তার নামে অমন কথা বল্লে তোমার পাপ হবে না?

ইহার উত্তরে পদ্ম ঝি যাহা বলিল, তাহা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করা যায় না।

হাজারির চোখে প্রায় জল আসিল। কুসুমকে সে সত্যই মেয়ের মত স্নেহ করে—তাহাদের গ্রামের রসিকলাল ঘোষের মেয়ে—রাণাঘাটে তার শ্বশুরবাড়ী—অল্পবয়সে বিধবা হইয়াছে, এখন দুধ বেচিয়া, দই বেচিয়া ছোট ছোট দুইটি ছেলেকে মানুষ করে। এক শাশুড়ী ছাড়া শ্বশুরবাড়ীতে কেহ নাই।

হঠাৎ একদিন পথে দু'জনের দেখা।

—জ্যাঠামশায় যে! দাঁড়ান একটু পায়ের ধুলো দিন। আপনি এখানে কোথায়?

—আরে কুসুম, কোথেকে তুই এখানে?

—এই তো আমার শ্বশুরবাড়ী, ছোট বাজারে মন্দিরের গায়েই। আপনি কি আজ বাড়ী থেকে এসেছেন?

—না রে—আমি রেল-বাজারে হোটেলে কাজ করি। আজ মাস ছ'-সাত আছি।

বিদেশে একই গ্রামের মানুষ দেখিয়া দু'জনেই খুব খুশী হইল। সেই হইতে কুসুম হাজারি ঠাকুরের হোটেলে দুধ দই বেচিতে গিয়াছে। গরীব বলিয়া হাজারি ঠাকুর অনেকবার লুকাইয়া হোটেল হইতে রাঁধা ভাত-তরকারি তাহাকে থালা করিয়া বাড়িয়া দিয়াছে। দুধ দই বেচিয়া ফিরিবার সময় কুণ্ডুদের পাটের আড়তের গলিটায় দাঁড়াইয়া কুসুম থালা লইয়া গিয়াছে। ইহাদের মেলামেশা ও ঘনিষ্ঠতা পদ্ম ঝির চোখ এড়ায় নাই, সুতরাং সে বলিতেই পারে।

দুপুরের পর হাজারি প্রতিদিনের মত চূর্ণীর ধারে যাইতেছে—এমন সময় কুসুমের সঙ্গে দেখা হইল।

কুসুম দুধের ভাঁড় হাতে ঝুলাইয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। তাহার বয়স চব্বিশ-পঁচিশ, বেশ স্বাস্থ্য, রং শ্যামবর্ণ, মুখশ্রী বেশ শান্ত।

হাজারি বলিল—বাড়ী ফিরছিস এত বেলায় যে!

কুসুম বলিল—জ্যাঠামশায়, বড্ড দেরি হয়ে গেল। নিজের তো দুধ নেই—কায়েত পাড়া থেকে দুধ আনি, তবে বিক্রী করি, তবে বাড়ী ফিরি। আসুন না আমাদের বাড়ী।

—না, এখন আর কোথায় যাবো! তুই যা, খাবি-দাবি।

কুসুম কিছুতেই ছাড়ে না, বলিল—আমার খাওয়া-দাওয়া জ্যাঠামশায়, শাশুড়ী রেঁধে রেখে দিয়েচে গিয়ে খাবো; কতক্ষণ লাগবে? আসুন না।

হাজারি অগত্যা গেল। ছ'চালা একখানা বড় ঘর, সেখানেতে কুসুমের শাশুড়ী থাকে—আর একখানা ছোট চারচালা ঘরে কুসুম ছেলে দুটি লইয়া থাকে। শাশুড়ীর সহিত কুসুমের খুব সদ্ভাব নাই।

কুসুম নিজের ঘরে হাজারিকে লইয়া গিয়া বসাইল। ঘরের মধ্যে একখানা তক্তপোশ, পুরু কাঁথা পাতিয়া সুন্দর পরিপাটি বিছানা তাহার উপরে। তক্তপোশের নীচে বালি দেওয়া আর-বছরের আলু। এককোণে কতকগুলি হাঁড়িকুড়ি ও একটা বড় জালা—বাঁশের আল্‌নাতে কতকগুলি লেপ-কাঁথা বাঁধা। একটা জলচৌকিতে থানকতক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঝক্‌ঝকে পিতল কাঁসার বাসন। ঘর দেখিয়া হাজারির মনে হইল—কুসুম বেশ সাজাইয়া রাখিতে জানে জিনিসপত্র।

কুসুম বলিল—পান খাবেন জ্যাঠামশায়?

—দে একটা। আর তুই খেতে যা। বেলা অনেক হয়েচে।

কিন্তু কুসুমের দেখা গেল, খাওয়ার সম্বন্ধে কোনো তাড়া নাই। হাজারিকে পান দিয়া সেই যে হাজারির সামনে মেজেতে বসিয়া গল্প করিতে লাগিল—প্রায় ঘণ্টাখানেক হইয়া গেল। সে নড়িবার নামও করে না দেখিয়া হাজারি ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

বলিল—তুই খেতে যা না। আমি যাই, আবার উনুনে আঁচ দিতে হবে সকাল সকাল।

কুসুম বলিল—যাচ্ছি এবার।

বলিয়া আর যায় না। আরও আধঘণ্টা কাটিয়া গেল।

কুসুম আর যায় নাই। বাবা মারা গিয়াছে, ভাইয়েরা গরীব বলিয়া হউক বা ভাইবৌদের জন্যই হউক—তাহাকে বাপের বাড়ীতে কেহ লইয়া যায় না। নিজে দু-একবার গিয়াছিল, বেশী দিন টিকিতে পারে নাই। ভাইবৌদের ব্যবহার ভাল নয়।

হাজারির সঙ্গে কুসুম সেই সব কাহিনীই বলিতে লাগিল। ছেলেবেলায় গ্রামে কি পথে করিয়াছিল কি, সেই বিষয়ে কথাও তাহার আর ফুরায় না।

—এখানে ছোলার শাক পয়সা দিয়ে কিনতে হয়। আমাদের গাঁয়ের যুগীপাড়ার মাঠে আমরা ছোলার শাক তুলতে যেতাম জ্যাঠামশায়—একবার, তখন আমার বয়েস ন'বছর, আমি আর সাধু কুমোরের মেয়ে আদর, আমরা দুজনে গিয়েছি ছোলার শাক তুলতে—একটা মিন্সে দেখি জ্যাঠামশায় ছোলার ক্ষেতে বসে কচি ছোলা তুলে তুলে খাচ্ছে। আমাদের না দেখে দোড় দোড়, বিষম দোড়! আমরা তো হেসে বাঁচিনে—ভেবেছে বুঝি আমাদের ক্ষেত!

বলিয়া কুসুম মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে হাসিতে গড়াইয়া পড়ে আর কি!

হাজারি দেখিল, ইহার ছেলেমানুষী গল্প শুনিতে গেলে ওদিকে হোটেলে যাইতে বিলম্ব হইবে—পদ্ম ঝি মুখ-নাড়ার চোটে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবে।

সে উঠিতে যাইতেছে, কুসুম বলিল—দাঁড়ান জ্যাঠামশায়, আপনার জন্যে একটা জিনিস করে রেখেছি। সেইটে দেবার জন্যেই আপনাকে নিয়ে এলাম।

বলিয়া একটা কাপড়ের পুঁটুলি খুলিয়া একখানা কাঁথা বাহির করিয়া হাজারির সামনে মেলিয়া ধরিয়া বলিল—কেমন হয়েছে কাঁথাখানা?

—বাঃ, বেশ হয়েছে রে!

কুসুম কাঁথাখানি পাট করিতে করিতে হাসিমুখে বলিল—আপনি এখানা রাত্রে পেতে শোবেন। আপনি শুধু মাদুরের উপর শুয়ে থাকেন হোটেলে,—আমার অনেক দিনের ইচ্ছে একখানা কাঁথা আপনাকে সেলাই ক'রে দেব। তা দু-তিন মাস ধরে একটু একটু ক'রে এখানা আজ দিন পাঁচ-ছয় হ'ল শেষ হয়েছে।

হাজারি ভারি খুশী হইল।

কুসুমের বাবা রসিক ঘোষ প্রায় তাহার সমবয়সী। কুসুম তাহার মেয়ের সমান। একই গাঁয়ের লোক,—তাহা হইলেও কি সবাই করে? গাঁয়ে তো কত লোক আছে!

মুখে বলিল, বেঁচে থাক মা, মেয়ে না হ'লে বাপের জন্যে এত আত্তি দেখায় কে ? ভারী চমৎকার কাঁথা। আমি পেতে শুয়ে বাঁচবো এখন। ভারী চমৎকার কাঁথা। বেশ, বেশ !

কুসুম বলিল—জ্যাঠামশায়, আপনি তো বললেন মেয়ে না হ'লে কে করে—কিন্তু আমিও বলছি, বাবা না হ'লে হোটেল থেকে নিজের মুখের ভাতের থালা কে মেয়েকে দেয় লুকিয়ে—শ্রাবণ মাসের সেই উপঝ্‌রান্ত বাদলায়—

কুসুমের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে সে বাঁ-হাতে আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া চুপ করিয়া মাটির দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল—মাথার ওপর ভগবান জানেন—আর কেউ জানে না—আপনি আমার জন্যে যা করছেন। আপনি ব্রাহ্মণ, দেবতা—আমি ছোট জাতের মেয়ে—আমার ছোট মুখে বড় কথা সাজে না, তবে আমিও বলচি ওপরের দেনেওয়ালা আপনাকে ভাতের থালার বদলে মোহরের থালা যেন দেন। আমিও যেন দেখে মরি।

বলিয়াই সে আসিয়া হাজারির পায়ে গড় হইয়া গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিল।

সেদিন ছিল বেশ বর্ষা।

হাজারি দেখিল, হোটেলে গদির ঘরে অনেকগুলি ভদ্রলোক বসিয়া আছে। অন্যদিন এ ধরনের খদ্দের এ হোটেলে সাধারণতঃ আসে না—হাজারি ইহাদের দেখিয়া একটু বিস্মিত হইল।

বেচু চক্কত্তি ডাকিল—হাজারি ঠাকুর, এদিকে এস—হাজারি গদির ঘরে দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলে ভদ্রলোকদের একজন বলিলেন—এই ঠাকুরটির নাম হাজারি ?

বেচু চক্কত্তি বলিল—হাঁ বাবু, এরই নাম হাজারি।

বাবুটি বলিলেন—এর কথাই শুনেচি। ঠাকুর তুমি আজ বর্ষার দিনে আমাদের মাংস পোলাও রেঁধে ভাল করে খাওয়াতে পারবে ? তোমার আলাদা মজুরী যা হয় দেবো।

বেচু বলিল—ওকে আলাদা মজুরী দেবেন কেন বাবু, আপনাদের আশীর্ব্বাদে আমার হোটেলের নাম অনেক দূর অব্‌ধি লোকে জানে। ও আমারই ঠাকুর, ওকে কিছু দিতে হবে না। আপনারা যা হুকুম করবেন তা ও করবে।

এই সময় পদ্ম ঝি বেচু চক্কত্তির ডাকে ঘরে ঢুকিল।

বেচু চক্কত্তি কিছু বলিবার পূর্ব্বে জনৈক বাবু বলিল—ঝি, আমাদের একটু চা ক'রে খাওয়াও তো এই বর্ষার দিনটাতে। না হয় কোনো দোকান থেকে একটু এনে দাও। বুঝলেন চক্কত্তি মশায় ! আপনার হোটেলের নাম অনেক দূর পর্য্যন্ত যে গিয়েচে বল্লেন—সে কথা মিথ্যা নয়। আমরা যখন আজ শিকারে বেরিয়েছি, তখন আমার পিসতুতো ভাই ব'লে দিয়েছিল, রাণাঘাট যাচ্চ, শিকার ক'রে ফেরবার পথে রেল-বাজারের বেচু চক্কত্তির হোটেলের হাজারি ঠাকুরের হাতে মাংস খেয়ে এসো। তাই আজ সারাদিন জলায় আর বিলে পাখী মেরে বেড়িয়ে বেড়িয়ে ভাবলাম, ফিরবার গাড়ী তো রাত দশটায়। তা এ বর্ষার দিনে গরম

গরম মাংস একটু খেয়েই যাই। মজুরী কেন দেবো না চক্কত্তি মশায়? ও আমাদের রান্না করুক, আমরা ওকে খুশি ক'রে দিয়ে যাবো। ওর জন্যেই তো এখানে আসা। কথা শুনিয়া হাজারি অত্যন্ত খুশি হইয়া উঠিল, আরও সে খুশি হইল এই ভাবিয়া যে, চক্কত্তি মশায়ের কানে কথাগুলি গেল—তাহার চাকুরির উন্নতি হইতে পারে। মনিবের সুনজরে পড়িলে কি না সম্ভব? খুশির চোটে ইহা সে লক্ষ্যই করিল না যে, পদ্ম ঝি তাহার প্রশংসা শুনিয়া এদিকে হিংসায় নীলবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

বাবুরা হোটেলের উপর নির্ভর করিল না—তাহারা জিনিসপত্র নিজেরাই কিনিয়া আনিল। হাজারি ঠাকুর মাংস রাঁধিবার একটি বিশেষ প্রণালী জানে, মাংসে একটুকু জল না দিয়া নেপালী ধরনের মাংস রান্নার কায়দা সে তাহাদের গ্রামের নেপাল-ফেরত ডাক্তার শিবচরণ গাঙ্গুলীর স্ত্রীর নিকট অনেকদিন আগে শিখিয়াছিল। কিন্তু হোটেলে দৈনন্দিন খাদ্য-তালিকার মধ্যে মাংস কোনদিনই থাকে না—তবে বাঁধা খরিদ্দারগণের মনস্তুষ্টির জন্য মাসে একবার বা দুবার মাংস দেওয়ার ব্যবস্থা আছে বটে—সে রান্নার মধ্যে বিশেষ কৌশল দেখাইতে গেলে চলে না, বা হাজারির ইচ্ছাও করে না—যেমন ভাল শ্রোতা না পাইলে গায়কের ভাল গান করিতে ইচ্ছা করে না—তেমনি।

হাজারি ঠিক করিল, পদ্ম ঝি তাহাকে দুই চক্ষু পাড়িয়া যেমন দেখিতে পারে না—তেমনি আজ মাংস রাঁধিয়া সকলের বাহবা লইয়া পদ্ম ঝির চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিবে, তাহাকে যত ছোট মনে করে ও, তত ছোট সে নয়। সেও মানুষ, সে অনেক বড় মানুষ।

ভাল যোগাড় না দিলে ভাল রান্না হয় না। পদ্ম ঝি যোগাড় দিবে না এ জানা কথা। হোটেলের অন্য উড়ে বামুনটিকে বলিতে পারা যায় না—কারণ সে-ই হোটেলের সাধারণ রান্না রাঁধিবে।

একবার ভাবিল—কুসুমকে আনবো?

পরক্ষণেই স্থির করিল, তার দরকার নাই। লোকে কে কি বলিবে, পদ্ম ঝি তো বঁটি পাতিয়া কুটিবে কুসুমকে। যাক্, নিজেই যাহা হয় করিয়া লইবে এখন।

বেলা হইয়াছে। হাজারি বাজার হইতে কেনা তরি-তরকারী, মাংস নিজেই কুটিয়া বাছিয়া লইয়া রান্না চাপাইয়া দিল। বর্ষাও যেন নামিয়াছে হিমালয় পাহাড় ভাঙিয়া। কাঠগুলা ভিজিয়া গিয়াছে—মাংস সে কয়লার জালে রাঁধিবে না। তাহার সে বিশেষ প্রণালীর মাংস রান্না কয়লার জালে হইবে না।

সব রান্না শেষ হইতে বেলা দুইটা বাজিয়া গেল। তারপরে খরিদ্দার বাবুরা খাইতে বসিল। মাংস পরিবেশন করিবার অনেক পূর্বেই ওস্তাদ শিল্পীর গর্ব ও আত্ম-প্রত্যয়ের সহিত হাজারি বুঝিয়াছে, আজ যে ধরনের মাংস রান্না হইয়াছে—ইহাদের ভাল না লাগিয়া উপায় নাই। হইলও তাই।

বাবুরা বেচু চক্কত্তিকে ডাকাইলেন, হাজারি ঠাকুরের সম্বন্ধে এমন সব কথা বলিলেন যে বেচু চক্কত্তিও যেন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল সে কথা শুনিয়া। চাকরকে ছোট

করিয়া রাখিয়া মনিবের সুবিধা আছে, তাহাকে বড় করিলেই সে পাইয়া বসিবে।

যাইবার সময় একজন বাবু হাজারিকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন—তুমি এখানে কত পাও ঠাকুর?

—সাত টাকা আর খাওয়া-পরা।

—এই দুটো টাকা তোমাকে আমরা বক্‌শিশ দিলাম—চমৎকার রান্না তোমার। যখন আবার এদিকে আসবো, তুমি আমাদের রেঁধে খাইও।

হাজারি ভারি খুশি হইল। বক্‌শিশ ইহারা হয়তো কিছু দিবেন সে আশা করিয়াছিল বটে, কিন্তু দু-টাকা দিবেন তা সে ভাবে নাই।

যাইবার সময় বেচু চক্কত্তির সামনে বাবুরা হাজারির রান্নার আর এক দফা প্রশংসা করিয়া গেলেন। আর একবার শীঘ্রই শিকারে আসিবেন এদিকে। তখন এখানে আসিয়া হাজারি ঠাকুরের হাতের মাংস না খাইলে তাঁহাদের চলিবেই না। বেশ হোটেল করেছেন চক্কত্তি মশায়।

বেচু চক্কত্তি বিনীত ভাবে কাঁচুমাচু হইয়া বলিল—আজ্ঞে বাবু মশায়েরা রাজসই লোক, সব দেখতে পাচ্ছেন, সব বুঝতে পাচ্ছেন। এই রাণাঘাট রেল-বাজারে হোটেল আছে অনেকগুলো, কিন্তু আপনাদের মত লোক যখনই আসেন, সকলেই দয়া ক'রে এই গরীবের কুঁড়েতেই পায়ের ধুলো দিয়ে থাকেন। তা আসবেন, যখন আপনাদের ইচ্ছা হয়, আগে থেকে একখানা চিঠি দেবেন, সব মজুদ থাকবে আপনাদের জন্যে; বলবেন কলকাতায় ফিরে দু'চার-জন আলাপী লোককে—যাতে এদিকে এলে তাঁরাও এখানেই এসে ওঠেন। বাবু—তা আমার বামুনের মজুরীটা?…হেঁ-হেঁ—

—কত মজুরী দেবো?

—তা দিন বাবু একবেলার মজুরী আট আনা দিন।

বাবুরা আরও আট আনা পয়সা বেচুর হাতে দিয়া চলিয়া গেলেন।

বেচু হাজারী ঠাকুরকে ডাকিয়া বলিল—ঠাকুর আজ আর বেরিও না কোথাও। বেলা গিয়েচে। উনুনে আঁচ আর একটু পরেই দিতে হবে। পদ্ম কোথায়?

—পদ্মদিদি থালা বাসন বার করচে, ডেকে দেবো?

পদ্ম ঝি আজ যে মুখ ভার করিয়া আছে, হাজারি তাহা বুঝিয়াছিল। আজ হোটেলে সকলের সামনে তাহার প্রশংসা করিয়া গিয়াছে বাবুরা, আজ আর কি তাহার মনে সুখ আছে? পদ্ম ঝির মনস্তুষ্টি করিবার জন্য তাহার ভাতের থালায় হাজারি বেশী করিয়া ভাত তরকারি এবং মাংস দিয়াছিল। পদ্ম ঝি কিছুমাত্র প্রসন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হইল না, মুখ যেমন ভার তেমনিই রহিল।

ভাতের থালা উঠাইয়া লইয়া পদ্ম ঝি হঠাৎ প্রশ্ন করিল—রাঁধা মাংস আর কতটা আছে ঠাকুর?

বলিয়াই ডেক্‌চির দিকে চাহিল। এমন চমৎকার মাংস কুসুমের বাড়ী কিছু দিয়া

আসিবে (সে ব্রাহ্মণের বিধবা নয়, মাছ-মাংস খাইতে তাহার আপত্তি নাই) ভাবিয়া ডেক্‌চিতে দেড় পোয়া আন্দাজ মাংস হাজারি রাখিয়া দিয়াছিল—পদ্ম ঝি কি তাহা দেখিতে পাইল ?

পদ্ম দেখিয়াছে বুঝিয়া হাজারি বলিল—সামান্য একটু আছে।

—কি হবে ওটুকু ? আমায় দাও না—আমার আজ ভাগ্নীজামাই আসবে—তুমি ত মাংস খাও না—

কুসুমের জন্য রাখা মাংস পদ্ম ঝিকে দিতে হইবে—যার মুখ দেখিতে ইচ্ছা করে না হাজারির। হাজারি মাংস খায় না তাহা নয়, হোটেলে মাংস রান্না হইলেই হাজারি নিজের ভাগের মাংস লুকাইয়া কুসুমকে দিয়া আসে—নিজেকে বঞ্চিত করিয়া। পদ্ম ঝি তাহা জানে, জানে বলিয়াই তাহাকে আঘাত করিয়া প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা উহার মনে জাগিয়াছে ইহাও হাজারি বুঝিল।

হাজারি বলিল—তোমায় তো দিলাম পদ্মদিদি, একটুখানি পড়ে আছে ডেক্‌চির তলায়—ওটুকু আর তুমি কি করবে ?

—কি করবো বললুম, তা তোমার কানে গেল না ? ভাগ্নীজামাই এসেছে শুনলে না ? যা দিলে এতটুকুতে কি কুলুবে ? ঢেলে দাও ওটুকু।

হাজারি বিপন্ন মুখে বলিল—আমি একটু রেখে দিইছি, আমার দরকার আছে।

পদ্ম ঝি ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া শ্লেষের সুরে বলিল—কি দরকার ? তুমি তো খাও না—কাকে দেবে শুনি ?

হাজারি বলিল—দেবো—ও একজন একটু চেয়েছে—

—কে একজন ?

—আছে—ও সে তুমি জানো না।

পদ্ম ঝি ভাতের থালা নামাইয়া হাত নাড়িয়া বলিল—না, আমি জানিনে। তা কি আর জানি ? আর সে জানা-জানির আমার দরকার নেই। হোটেলের জিনিস তুমি কাউকে দিতে পারবে না, তোমায় অনেকদিন বলে দিইছি। বেশ তুমি আমায় না দাও, চক্কত্তি মশায়ের শালাও আজ কলকাতা থেকে এসেছে—তার জন্যে মাংস বাটি ক'রে আলাদা রেখে দাও—ওবেলা এসে খাবে এখন। আমি না পেতে পারি, সে হোটেলের মালিকের আপনার লোক, সে তো পেতে পারে ?

বেচু চক্কত্তির এই শালাটিকে হাজারি অনেকবার দেখিয়াছে—মাসের মধ্যে দশ দিন আসিয়া ভগ্নীপতির বাড়ী পড়িয়া থাকে, আর কালাপেড়ে ধুতি পরিয়া টেরি কাটিয়া হোটেলে আসিয়া সকলের উপর কর্তৃত্ব চালায়—কথায় কথায় ঠাকুর-চাকরকে অপমান করে ; চোখ রাঙায়, যেন হোটেলের মালিক নিজেই।

তাহাদের গ্রামের মেয়ে, দরিদ্রা কুসুম ভালটা মন্দটা খাইতে পাওয়া দূরে থাকুক, অনেক সময় পেটের ভাত জুটাইতে পারে না—তাহার জন্য রাখিয়া দেওয়া এত যত্নের মাংস শেষকালে

সেই চালবাজ বার্ডসাই-খোর শালাকে দিয়া খাওয়াইতে হইবে—এ প্রস্তাব হাজারির মোটেই ভাল লাগিল না। কিন্তু সে ভালমানুষ এবং কিছু ভীতু ধরনের লোক, যাহাদের হোটেল, তাহারা যদি খাইতে চায়, হাজারি তাহা না দিয়া পারে কি করিয়া—অগত্যা হাজারিকে পদ্ম ঝিয়ের সামনে বড় জামবাটিতে ডেক্‌চির মাংসটুকু ঢালিয়া রান্নাঘরের কুলুঙ্গিতে রেকাবি চাপা দিয়া রাখিয়া দিতে হইল।

সামান্য একটু বেলা আছে, হাজারি সেটুকু সময়ের মধ্যেই একবার নদীর ধারে ফাঁকা জায়গায় বেড়াইতে গেল।

আজ তাহার মনে আত্মপ্রত্যয় খুব বাড়িয়া গিয়াছে—দুইটি জিনিস আজ বুঝিয়াছে সে। প্রথম, ভাল রান্না সে ভুলিয়া যায় নাই, কলিকাতার বাবুরাও তাহার রান্না খাইয়া তারিফ করেন। দ্বিতীয়, পরের তাঁবে কাজ করিলে মানুষকে মায়া-দয়া বিসর্জ্জন দিতে হয়।

আজ এমন চমৎকার রান্না মাংসটুকু সে কুসুমকে খাওয়াইতে পারিল না, খাওয়াইতে হইল তাহাদের দিয়া, যাহাদের সে দুই চক্ষু পাড়িয়া দেখিতে পারে না। কুসুম যেদিন কাঁথাখানি দিয়াছিল, সেদিন হইতে হাজারির কেমন একটা অদ্ভুত ধরনের স্নেহ পড়িয়াছে কুসুমের ওপর।

বয়সে তো সে মেয়ের সমান বটেই, কাজও করিয়াছে মেয়ের মতই। আজ যদি হাজারির হাতে পয়সা থাকিত, তবে সে বাপের স্নেহ কি করিয়া দেখাইতে হয়, দেখাইয়া দিত। অন্য কিছু দেওয়া তো দূরের কথা, নিজের হাতে অমন রান্না মাংসটুকুই সে কুসুমকে দিতে পারিল না।

ছেলেবেলাকার কথা হাজারির মনে হয়। তাহার মা গঙ্গাসাগর যাইবেন বলিয়া যোগাড়-যন্ত্র করিতেছেন—পাড়ার অনেক বৃদ্ধা ও প্রৌঢ়া বিধবাদের সঙ্গে। হাজারি তখন আট বছরের ছেলে—সেও ভীষণ বায়না ধরিল গঙ্গাসাগর সে না গিয়া ছাড়িবেই না। তাহার ঝুঁকি লইতে কেহই রাজী নয়। সকলেই বলিল—তোমার ও ছেলেকে কে দেখাশুনো করবে বাপু, অত ছোট ছেলে আর সেখানে নানান্ ঝক্কি—তাহ'লে তোমার যাওয়া হয় না।

হাজারির মা ছেলেকে ফেলিয়া গঙ্গাসাগরে যাইতে পারিলেন না বলিয়া তাঁর যাওয়াই হইল না। জীবনে আর কখনোই তাঁর সাগর দেখা হয় নাই, কিন্তু হাজারির মনে মায়ের এই স্বার্থত্যাগের ঘটনাটুকু উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা হইয়া আছে।

হাজারি ভাবিল—যাক গে, যদি কখনো নিজে হোটেল খুলতে পারি, তবে এই রাণাঘাটের বাজারে বসেই পদ্ম ঝিকে দেখাবো—তুই কোথায় আর আমি কোথায়! হাতে পয়সা থাকলে কালই না হোটেল খুলে দিতাম! কুসুমকে রোজ রোজ ভাল জিনিস খাওয়াবো আমার নিজের হোটেল হলে।

কতকগুলি বিষয় সে যে খুব ভাল শিখিয়াছে, সে বেশ বুঝিতে পারে। বাজার-করা হোটেলওয়ালার একটি অত্যন্ত দরকারী কাজ এবং শক্ত কাজ। ভাল বাজার করার উপরে হোটেলের সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে এবং ভাল বাজার করার মানেই হইতেছে সস্তায়

ভাল জিনিস কেনা। ভাল জিনিসের বদলে সস্তা জিনিস—অথচ দেখিলে তাহাকে মোটেই খেলো বলিয়া মনে হইবে না—এমন দ্রব্য খুঁজিয়া বাহির করা। যেমন বাটা মাছ যেদিন বাজারে আক্রা—সেদিন ছ'আনা সের রেল-চালানী রাস্ মাছের পোনা কিনিয়া তাহাকে বাটা বলিয়া চালাইতে হইবে—হঠাৎ ধরা বড় কঠিন, কোনটা বাটার পোনা, কোনটা রাসের পোনা।

পরদিন হাজারি চূর্ণীর ঘাটে গিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। তাহার মন কাল হইতে ভাল নয়। পদ্ম ঝির নিকট ভাল ব্যবহার কখনও সে পায় নাই, পাইবার প্রত্যাশাও করে না। কিন্তু তবুও কাল সামান্য একটু রাঁধা মাংস লইয়া পদ্ম ঝি যে কাণ্ডটি করিল, তাহাতে সে মনোকষ্ট পাইয়াছে খুব বেশী। পরের চাকরি করিতে গেলে এমন হয়। কুসুমকে একটুখানি মাংস না দিতে পারিয়া তাহার কষ্ট হইয়াছে বেশী—অমন ভাল রান্না সে অনেক দিন করে নাই—অত আশার জিনিসটা কুসুমকে দিতে পারিলে তাহার মনটা খুশি হইত।

ভাল কাজ করিলেও চাকুরির উন্নতি তো দূরের কথা, ইহারা সুখ্যাতি পর্য্যন্ত করিতে জানে না। বরঞ্চ পদে পদে হেনস্থা করে। এক একবার ইচ্ছা হয় যদুবাবুর হোটেলে কাজ লইতে। কিন্তু সেখানেও যে এরকম হইবে না তাহার প্রমাণ কিছুই নাই। সেখানেও পদ্ম ঝি জুটিতে বিলম্ব হইবে না। কি করা যায়।

বেলা পড়িয়া আসিতেছে। আর বেশীক্ষণ বসা যায় না। বহু পাপ না করিলে আর কেহ হোটেলের রাঁধুনীগিরি করিতে আসে না। এখনি গিয়া ডেক্‌চি না চড়াইলে পদ্ম ঝি এক ঝুড়ি কথা শুনাইয়া দিবে, এতক্ষণ উনুনে আঁচ দেওয়া হইয়া গিয়াছে।...কিন্তু ফিরিবার পথে সে কি মনে করিয়া কুসুমের বাড়ী গেল!

কুসুম আসন পাতিয়া দিয়া বলিল—বাবাঠাকুর আসুন, বড় সৌভাগ্য অসময়ে আপনার পায়ের ধুলো পড়লো।

হাজারি বলিল—দ্যাখ্‌ কুসুম, তোর সঙ্গে একটা পরামর্শ করতে এলাম।

কুসুম সাগ্রহ-দৃষ্টিতে মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—কি বাবাঠাকুর?

—আমার বয়েস ছে'চল্লিশ হয়েছে বটে, কিন্তু আমার তত বয়েস দেখায় না, কি বলিস কুসুম? আমার এখনও বেশ খাটবার ক্ষমতা আছে, তুই কি বলিস?

হাজারির কথাবার্ত্তার গতি কোন্‌দিকে বুঝিতে না পারিয়া কুসুম কিছু বিস্ময়, কিছু কৌতুকের সুরে বলিল—তা—বাবাঠাকুর, তা তো বটেই। বয়েস আপনার এমন আর কি—কেন বাবাঠাকুর?

কুসুমের মনে একটা কথা উঁকি মারিতে লাগিল—বাবাঠাকুর আবার বিয়ে-টিয়ে করবার কথা ভাবচেন নাকি?

হাজারি বলিল—আমার বড় ইচ্ছে আছে কুসুম, একটা হোটেল করব নিজের নামে। পয়সা যদি হাতে কোনদিন জমাতে পারি, এ আমি নিশ্চয়ই করবো, তুই জানিস! পরের,

ঝাঁটা খেয়ে কাজ করতে আর ইচ্ছে করে না। আমি আজ দশ বছর হোটেলে কাজ করছি, বাজার কি ক'রে করতে হয় ভাল ক'রে শিখে ফেলেছি। চক্কত্তি মশায়ের চেয়েও আমি ভাল বাজার করতে পারি। মাখমপুরের হাট থেকে ফি হাট্‌রা যদি তরিতরকারী কিনে আনি তবে রাণাঘাটের বাজারের চেয়ে টাকায় চার আনা ছ'আনা সস্তা পড়ে। এ ধরো কম লাভ নয় একটা হোটেলের ব্যাপারে। বাজার করবার মধ্যেই হোটেলের কাজের আদ্ধেক লাভ। আমার খুব মনে জোর আছে কুসুম, টাকা পয়সা হাতে যদি কখনো পড়ে, তবে হোটেল যা চালাবো, বাজারের সেরা হোটেলে হবে, তুই দেখে নিস্।

কুসুম হাজারি ঠাকুরের এ দীর্ঘ বক্তৃতা অবাক হইয়া শুনিতেছিল—সে হাজারিকে বাবার মত দেখে বলিয়াই মেয়ের মত বাবার প্রতি সর্ব্বপ্রকার কাল্পনিক গুণ ও জ্ঞানের আরোপ করিয়া আসিতেছে। হোটেলের ব্যাপারের সে বিশেষ কিছু বুঝুক না বুঝুক, বাবাঠাকুর যে বুদ্ধিমান, তাহা সে হাজারির বক্তৃতা হইতে ধারণা করিয়া লইল।

কিছুক্ষণ পরে কি ভাবিয়া সে বলিল—আমার এক জোড়া রুলি ছিল, এক গাছা বিক্রী ক'রে দিয়েছি আমার ছোট ছেলের অসুখের সময় আর বছর। আর এক গাছা আছে। বিক্রী করলে ষাট-সত্তর টাকা হবে। আপনি নেবেন বাবাঠাকুর? ওই টাকা নিয়ে হোটেল খোলা হবে আপনার।

হাজারি হাসিয়া বলিল—দূর পাগলী! ষাট টাকায় হোটেল হবে কি রে?

—কত টাকা হ'লে হয়?

—অন্ততঃ দুশো টাকার কম তো নয়। তাতেও হবে না।

—আচ্ছা, হিসেব ক'রে দেখুন না বাবাঠাকুর।

—হিসেব ক'রে দেখব কি, হিসেব আমার মুখে মুখে। ধরো গিয়ে দুটো বড় ডেকচি, ছোট ডেকচি তিনটে। থালা-বাসন এক প্রস্থ। হাতা, খুন্তি, বেড়ি, চামচে, চায়ের বাসন। বাইরে গদির ঘরের একখানা তক্তপোশ, বিছানা, তাকিয়া। বাক্স, খেরো বাঁধানো খাতা দু'খানা। বালতি, লণ্ঠন, চাকি, বেলুন—এই সব নানান নটখটি জিনিস কিনতেই তো দুশো টাকার ওপর বেরিয়ে যাবে। পাঁচদিনের বাজার খরচ হাতে ক'রে নিয়ে নামতে হবে। চাকর ঠাকুরের দু'মাসের মাইনে হাতে রেখে দিতে হয়—যদি প্রথম দু'মাস না হোলো কিছু, ঠাকুর চাকরের মাইনে আসবে কোথা থেকে? সে-সব যাক্-গে, তা ছাড়া তোর টাকা নেবোই বা কেন?

কুসুম ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল—আমার থাকতো যদি তবে আপনি নিতেন না কেন—ব্রাহ্মণের সেবায় যদি লাগে ও-টাকা, তবে ও-টাকার ভাগ্যি বাবাঠাকুর! সে ভাগ্যি থাকলে তো হবে, আমার অত টাকা যখন নেই, তখন আর সে কথা বলছি কি ক'রে বলুন! যা আছে, ওতে যদি কখনো-সখনো কোন দরকার পড়ে আপনার মেয়েকে জানাবেন।

হাজারি উঠিল। আর এখানে বসিয়া দেরি করিলে চলিবে না। বলিল—না রে কুসুম, ওতে আর কি হবে। আমি যাই এখন।

কুসুম বলিল— একটু কিছু মুখে না দিলে মেয়ের বাড়ী থেকে কি ক'রে উঠবেন বাবাঠাকুর, বসুন আর একটু। আমি আসচি।

কুসুম এত দ্রুত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, যে হাজারি ঠাকুর প্রতিবাদ করিবার অবসর পর্য্যন্ত পাইল না। একটু পরে কুসুম ঘরের মধ্যে একখানা আসন আনিয়া পাতিল এবং মেজের উপর জলের হাত বুলাইয়া লইয়া আবার বাহিরে গেল। কিছুক্ষণ পরে একবাটি দুধ ও একখানা রেকাবিতে পেঁপে কাটা, আমের টিকলি ও দুটি সন্দেশ আনিয়া আসনের সামনে মেজের উপর রাখিয়া বলিল—একটু জল খান, বসুন এসে, আমি খাবার জল আনি। হাজারি আসনের উপর বসিল। কুসুম ঝকঝকে করিয়া মাজা একটা কাঁচের গেলাসে জল আনিয়া রেকাবির পাশে রাখিয়া সামনে দাঁড়াইয়া রহিল।

খাইতে খাইতে হাজারির মনে পড়িল সেদিনকার সেই মাংসের কথা। মেয়ের মত স্নেহ-যত্ন করে কুসুম, তাহারই জন্য তুলিয়া রাখা মাংস কিনা খাওয়াইতে হইল চক্কত্তি মহাশয়ের গাঁজাখোর শালাকে দিয়া শুধু ওই পদ্ম ঝিয়ের জন্যে। দাসত্বের এই তো সুখ!

হাজারি বলিল—তুই আমার মেয়ের মতন কুসুম-মা।

কুসুম হাসিয়া বলিল—মেয়ের মতন কেন বাবাঠাকুর, মেয়েই তো।

—ঠিক, মেয়েই তো। মেয়ে না হোলে বাপের এত যত্ন কে করে?

—যত্ন আর কি করেচি, সে ভাগ্যি ভগবান কি আমায় দিয়েছেন? একে কি যত্ন করা বলে? কাঁথাখানা পেতে শুচ্চেন বাবাঠাকুর?

—তা শুচ্চি বই কি রে। রোজ তোর কথা মনে হয় শোবার সময়। মনে ভাবি কুসুম এখানা দিয়েছে! ছেঁড়া মাদুরের কাটি ফুটে ফুটে পিঠে দাগ হয়ে গিয়েছিল। পেতে শুয়ে বেঁচেছি।

—আহা, কি যে বলেন! না, সন্দেশ দুটোই খেয়ে ফেলুন, পায়ে পড়ি। ও ফেলতে পারবেন না।

—কুসুম, তোর জন্যে না রেখে খেতে পারি কিছু মা? ওটা তোর জন্যে রেখে দিলাম।

কুসুম লজ্জায় চুপ করিয়া রহিল। হাজারি আসন হইতে উঠিয়া পড়িলে বলিল—পান আনি, দাঁড়ান।

তাহার পর সামনে দরজা পর্য্যন্ত আগাইয়া দিতে আসিয়া বলিল—আমার ও রুলি গাছা রইল তোলা আপনার জন্যে, বাবাঠাকুর। যখন দরকার হয়, মেয়ের কাছ থেকে নেবেন কিন্তু।

সেদিন হোটেলে ফিরিয়া হাজারি দেখিল, প্রায় পনেরো সের কি আধ মণ ময়দা চাকর আর পদ্ম ঝি মিলিয়া মাখিতেছে।

ব্যাপার কি! এত লুচির ময়দা কে খাইবে?

পদ্ম ঝি কথার সঙ্গে বেশ খানিকটা ঝাঁজ মিশাইয়া বলিল—হাজারি ঠাকুর, তোমার যা যা রাঁধবার আগে সেরে নাও—তারপর এই লুচিগুলো ভেজে ফেলতে হবে। আচার্য-পাড়ার

মহাদেব ঘোষালের বাড়ীতে খাবার যাবে, তারা অর্ডার দিয়ে গেছে সাড়ে ন'টার মধ্যে চাই, বুঝলে ?

হাজারি ঠাকুর অবাক হইয়া বলিল—সাড়ে ন'টার মধ্যে ওই আধ মণ ময়দা ভেজে পাঠিয়ে দেবো, আবার হোটেলের রান্না রাঁধবো ! কি যে বল পদ্মদিদি, তা কি ক'রে হবে ? রতন ঠাকুরকে বল না লুচি ভেজে দিক, আমি হোটেলের রান্না রাঁধবো।

পদ্ম ঝি চোখ রাঙাইয়া ছাড়া কথা বলে না। সে গরম হইয়া ঝঙ্কার দিয়া বলিল—তোমার ইচ্ছে বা খুশিতে এখানকার কাজ চলবে না। কর্ত্তা মশায়ের হুকুম। আমায় যা বলে গেছেন তোমায় বললাম, তিনি বড় বাজারে বেরিয়ে গেলেন—আসতে রাত হবে। এখন তোমার মজ্জি—করো আর না করো।

অর্থাৎ না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু ইহাদের এই অবিচারে হাজারির চোখে প্রায় জল আসিল। নিছক অবিচার ছাড়া ইহা অন্য কিছু নহে। রতন ঠাকুরকে দিয়া ইহারা সাধারণ রান্না অনায়াসেই করাইতে পারিত, কিন্তু পদ্ম ঝি তাহা হইলে খুশি হইবে না। সে যে কি বিষ-চক্ষে পড়িয়াছে পদ্ম ঝিয়ের ! উহাকে জব্দ করিবার কোনো ফাঁকই পদ্ম ছাড়ে না।

ভীষণ আগুনের তাতের মধ্যে বসিয়া রতন ঠাকুরের সঙ্গে দৈনিক রান্না কার্য্যেতেই প্রায় ন'টা বাজিয়া গেল। পদ্ম ঝি তাহার পর ভীষণ তাগাদা লাগাইল লুচি ভাজাতে হাত দিবার জন্য। পদ্ম নিজে খাটিতে রাজি নয়, সে গেল খরিদ্দারদের খাওয়ার তদারক করিতে। আজ আবার হাটবার, বহু ব্যাপারী খরিদ্দার। রতন ঠাকুর তাহাদের পরিবেশন করিতে লাগিল। হাজারি এক ছিলিম তামাক খাইয়া লইয়াই আবার আগুনের তাতে বসিয়া গেল লুচি ভাজিতে।

আধঘণ্টা পরে—তখন পাঁচ সের ময়দাও ভাজা হয় নাই—পদ্ম আসিয়া বলিল—ও ঠাকুর, লুচি হয়েচে ? ওদের লোক এসেছে নিতে।

হাজারি বলিল—না এখনো হয়নি পদ্মদিদি। একটু ঘুরে আসতে বল।

—ঘুরে আসতে বললে চলবে কেন ? সাড়ে ন'টার মধ্যে ওদের খাবার তৈরি ক'রে রাখতে হবে বলে গেছে। তোমায় বলিনি সেকথা ?

—বল্লে কি হবে পদ্মদিদি ? মন্তরে ভাজা হবে আধ মণ ময়দা ? ন'টার সময় তো উনুনে অজ্জার নেচি ফেলেচি—জিগ্যেস্ করো মতিকে।

—সে সব আমি জানিনে। যদি ওরা অর্ডার ফেরত দেয়, বোঝাপড়া ক'রো কর্ত্তার সঙ্গে, তোমার মাইনে থেকে আধ মন ময়দা আর দশ সের ঘি র দাম একমাসে তো উঠবে না, তিন মাসে ওঠাতে হবে।

হাজারি দেখিল, কথা কাটাকাটি করিয়া লাভ নাই। সে নীরবে লুচি ভাজিয়া যাইতে লাগিল। হাজারি ফাঁকি দেওয়া অভ্যাস করে নাই—কাজ করিতে বসিয়া শুধু ভাবে কাজ করিয়া যাওয়াই তাহার নিয়ম—কেউ দেখুক বা না-ই দেখুক। লুচি ঘিয়ে ডুবাইয়া

তাড়াতাড়ি তুলিয়া ফেলিলে শীঘ্র শীঘ্র কাজ চুকিয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাতে লুচি কাঁচা থাকিয়া যাইবে। এজন্য সে ধীরে ধীরে সময় লইয়া লুচি তুলিতে লাগিল। পদ্ম ঝি একবার বলিল—অত দেরি ক'রে খোলা নামাচ্ছ কেন ঠাকুর? হাত চালাও না—অত লুচি ডুবিয়ে রাখলে কড়া হয়ে যাবে—

হাজারি ভাবিল, একবার সে বলে যে রান্নার কাজ পদ্ম ঝিয়ের কাছে তাহাকে শিখিতে হইবে না, লুচি ডুবাইলে কড়া কি নরম হয় সে ভালই জানে, কিন্তু তখনই সে বুঝিল, পদ্ম ঝি কেন একথা বলিতেছে।

দশ সের ঘি হইতে জল্‌তি বাদে যাহা বাকী থাকিবে পদ্ম ঝিয়ের লাভ। সে বাড়ী লইয়া যাইবে লুকাইয়া। কর্ত্তামশায় পদ্ম ঝিয়ের বেলায় অন্ধ। দেখিয়াও দেখেন না।

হাজারি ভাবিল, এই সব জুয়াচুরির জন্য হোটেলের দুর্নাম হয়। খদ্দেরে পয়সা দেবে, তারা কাঁচা লুচি খাবে কেন? দশ সের ঘিয়ের দাম তো তাদের কাছ থেকে আদায় হয়েচে, তবে তা থেকে বাঁচানোই বা কেন? তাদের জিনিসটা যাতে ভাল হয় তাই তো দেখতে হবে? পদ্ম ঝি বাড়ী নিয়ে যাবে ব'লে তারা দশ সের ঘিয়ের ব্যবস্থা করে নি।

পরক্ষণেই তাহার নিজের স্বপ্নে সে ভোর হইয়া গেল।

এই রেল-বাজারেই সে হোটেল খুলিবে। তাহার নিজের হোটেল। ফাঁকি কাহাকে বলে, তাহার মধ্যে থাকিবে না। খদ্দের যে জিনিসের অর্ডার দিবে, তাহার মধ্যে চুরি সে করিবে না। খদ্দের সন্তুষ্ট করিয়া ব্যবসা। নিজের হাতে রাঁধিবে, খাওয়াইয়া সকলকে সন্তুষ্ট রাখিবে। চুরি-জুয়াচুরির মধ্যে সে নাই।

লুচি ভাজা ঘিয়ের বুদ্‌বুদের মধ্যে হাজারি ঠাকুর যেন সেই ভবিষ্যৎ হোটেলের ছবি দেখিতে পাইতেছে। প্রত্যেক ঘিয়ের বুদ্‌বুদটাতে। পদ্ম ঝি সেখানে নাই, বেচু চক্কত্তির গাঁজাখোর ও মাতাল শালাও নাই। বাহিরে গদির ঘরে দিব্য ফর্সা বিছানা পাতা, খদ্দের যতক্ষণ ইচ্ছা বিশ্রাম করুক, তামাক খাইতে ইচ্ছা করে খাক্‌, বাড়তি পয়সা আর একটিও দিতে হইবে না। দুইটা করিয়া মাছ, হপ্তায় তিন দিন মাংস বাঁধা-খদ্দেরদের। এসব না করিয়া শুধু ইষ্টিশনের প্লাটফর্ম্মে—হি-ই-ইন্দু হোটেল, হি-ই-ই-ন্দু হোটেল, বলিয়া মতি চাকরের মত চেঁচাইয়া গলা ফাটাইলে কি খদ্দের ভিড়িবে?

পদ্ম ঝি আসিয়া বলিল—ও ঠাকুর, তোমার হোল? হাত চালিয়ে নিতে পাচ্ছ না? বাবুদের নোক যে বসে আছে।

বলিয়াই ময়দার বারকোশের দিকে চাহিয়া দেখিল, বেলা লুচি যতগুলি ছিল, হাজারি প্রায় সব খোলায় চাপাইয়া দিয়াছে—খান পনেরো কুড়ির বেশী বারকোশে নাই। মতি চাকর পদ্ম ঝিকে আসিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি হাত চালাইতে লাগিল।

পদ্ম ঝি বলিল—তোমার হাত চলচে না, না? এখনো দশ সের ময়দার তাল ডাঙায়, ওই রকম ক'রে লুচি বেললে কখন কি হবে?

হাজারি বলিল—পদ্মদিদি, রাত এগারোটা বাজবে ওই লুচি বেলতে আর এক হাতে

ভাজতে। তুমি বেলবার লোক দাও।

পদ্ম ঝি মুখ নাড়িয়া বলিল—আমি ভাড়া ক'রে আনি বেলবার লোক তোমার জন্যে। ও আমার বাবু রে! ভাজতে হয় ভাজো, না হয় না ভাজো গে—ফেরত গেলে তখন কর্তামশায় তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া করবেন এখন।

পদ্ম ঝি চলিয়া গেল।

মতি চাকর বলিল—ঠাকুর, তুমি লুচি ভেজে উঠতে পারবে কি ক'রে? লুচি পোড়াবে না। এত ময়দার তাল আমি বেলবো কখন বলো।

হঠাৎ হাজারির মনে হইল, একজন মানুষ এখনি তাহাকে সাহায্য করিতে বসিয়া যাইত—কুসুম! কিন্তু সে গৃহস্থের মেয়ে, গৃহস্থের ঘরের বৌ—তাহাকে তো এখানে আনা যায় না। যদিও ইহা ঠিক, খবর পাঠাইয়া তাহার বিপদ জানাইলে কুসুম এখনি ছুটিয়া আসিত।

তারপর একঘণ্টা হাজারি অন্য কিছু ভাবে নাই, কিছু দেখে নাই—দেখিয়াছে শুধু লুচির কড়া, ফুটন্ত ঘি, ময়দার তাল আর বাখারির সরু আগায় ভাজিয়া তোলা রাঙ্গা রাঙ্গা লুচির গোছা—তাহা হইতে গরম ঘি ঝরিয়া পড়িতেছে। ভীষণ আগুনের তাত, মাজা পিঠ বিষম টন্‌টন্ করিতেছে, ঘাম ঝরিয়া কাপড় ও গামছা ভিজিয়া গিয়াছে, এক ছিলিম তামাক খাইবারও অবকাশ নাই—শুধু কাঁচা লুচি কড়ায় ফেলা এবং ভাজিয়া তুলিয়া ঘি ঝরাইয়া পাশের ধামাতে রাখা।

রাত দশটা।

মুর্শিদাবাদের গাড়ী আসিবার সময় হইল।

মতি চাকর বলিল—আমি একবার ইষ্টিশনে যাই ঠাকুরমশায়। টেরেনের টাইম হয়েচে। খদ্দের না আনলে কাল কর্তামশায়ের কাছে মার খেতে হবে। একটা বিড়ি খেয়ে যাই।

ঠিক কথা, সে খানিকক্ষণ প্লাটফর্মে পায়চারি করিতে করিতে 'হি-ই-ই-ন্দু হোটেল' 'হি-ই-ই-ন্দু হোটেল' বলিয়া চেঁচাইবে। মুর্শিদাবাদের ট্রেন আসিতে আর মিনিট পনেরো বাকী।

হাজারি বলিল—একা আমি বেলবো আর ভাজবো। তুই কি খেপলি মতি? দেখলি তো এদের কাণ্ড। রতনঠাকুর সরে পড়েছে, পদ্মদিদিও বোধ হয় সরে পড়েছে। আমি একা কি করি?

মতি বলিল—তোমাকে পদ্মদিদি দুচোখে দেখতে পারে না। কারো কাছে বোলো না ঠাকুর—এ সব তারই কারসাজি। তোমাকে জব্দ করবার মতলবে এ কাজ করেচে। আমি যাই, নইলে আমার চাকরি থাকবে না।

মতি চলিয়া গেল। অন্ততঃ পাঁচ সের ময়দার তাল তখনও বাকী। লেচি পাকানো সে-ও প্রায় দেড় সের—হাজারি গুণিয়া দেখিল ষোল গণ্ডা লেচি। অসম্ভব! একজন মানুষের দ্বারা কি করিয়া রাত বারোটার কমে বেলা এবং ভাজা দুই কাজ হইতে পারে!

মতি চলিয়া যাইবার সময় যে বিড়িটা দিয়া গিয়াছিল সেটি তখনও ফুরায় নাই—এমন সময়

পদ্ম উঁকি মারিয়া বলিল—কেবল বিড়ি খাওয়া আর কেবল বিড়ি খাওয়া! ওদিকে বাবুর বাড়ী থেকে লোক দুবার ফিরে গেল—তখনি তো বলেচি হাজারি ঠাকুরকে দিয়ে এ কাজ হবে না—বলি বিড়িটা ফেলে কাজে হাত দেও না, রাত কি আর আছে?

হাজারি ঠাকুর সত্যই কিছু অপ্রতিভ হইয়া বিড়ি ফেলিয়া দিল। পদ্ম ঝিয়ের সামনে সে একথা বলিতে পারিল না যে, লুচি বেলিবার লোক নাই। আবার সে লুচি ভাজিতে আরম্ভ করিয়া দিল একাই।

রাত এগারোটার বেশী দেরি নাই। হাজারির এখন মনে হইল যে, সে আর বসিতে পারিতেছে না। কেবলই এই সময়টা মনে আসিতেছিল দুটি মুখ। একটি মুখ তাহার নিজের মেয়ে টেঁপির—বছর বারো বয়স, বাড়ীতে আছে; প্রায় পাঁচ ছ'মাস তার সঙ্গে দেখা হয় নাই—আর একটি মুখ কুসুমের। ওবেলা কুসুমের সেই যত্ন করিয়া বসাইয়া জল খাওয়ানো…তার সেই হাসিমুখ…টেঁপির মুখ আর কুসুমের মুখ এক হইয়া গিয়াছে…লুচি ও ঘিয়ের বুদ্‌বুদে সে তখনও যেন একখানা মুখই দেখিতে পাইতেছে—টেঁপি ও কুসুম দুইয়ে মিলিয়া এক…ওরা আজ যদি দু'জনে এখানে থাকিত। ওদিকে কুসুম বসিয়া হাসিমুখে লুচি বেলিতেছে এদিকে টেঁপি…

—ঠাকুর!

স্বয়ং কর্ত্তামশায়, বেচু চক্কত্তি। পিছনে পদ্ম ঝি। পদ্ম ঝি বলিল—ও গাঁজাখোর ঠাকুরকে দিয়ে হবে না আপনাকে তখুনি বলিনি বাবু? ও গাঁজা খেয়ে বুঁদ হয়ে আছে, দেখচো না? কাজ এগুবে কোথেকে!

হাজারি তটস্থ হইয়া আরও তাড়াতাড়ি লুচি খোলা হইতে তুলিতে লাগিল। বাবুদের লোক আসিয়া বসিয়া ছিল। পদ্ম ঝি যে লুচি ভাজা হইয়াছিল, তাহাদের ওজন করিয়া দিল কর্ত্তাবাবুর সামনে। পাঁচ সের ময়দার লুচি বাকী থাকিলেও তাহারা লইল না, এত রাত্রে লইয়া গিয়া কোনো কাজ হইবে না।

বেচু চক্কত্তি হাজারিকে বলিলেন—ওই ঘি আর ময়দার দাম তোমার মাইনে থেকে কাটা যাবে। গাঁজাখোর মানুষকে দিয়ে কি কাজ হয়?

হাজারি বলিল—আপনার হোটেলে সব উল্টো বন্দোবস্ত বাবু। কেউ তো বেলে দিতে আসেনি এক মতি চাকর ছাড়া। সেও গাড়ীর টাইমে ইষ্টিশনে খদ্দের আনতে গেল, আমি কি করবো বাবু!

বেচু চক্কত্তি বলিলেন—সে সব শুনচি নে ঠাকুর। ওর দাম তুমি দেবে। খদ্দের অর্ডার ফেরত দিলে সে মাল আমি নিজের ঘর থেকে লোকসান দিতে পারিনে, আর মাথা নেচি-কাটা ময়দা।

হাজারি ভাবিল, বেশ, তাহাকে যদি এদের দাম দিতে হয়, লুচি ভাজিয়া সে নিজে লইবে। রাত সাড়ে এগারোটা পর্য্যন্ত খাটিয়া ও মতি চাকরকে কিছু অংশ দিবার জন্য লোভ দেখাইয়া তাহাকে দিয়া লুচি বেলাইয়া সব ময়দা ভাজিয়া তুলিল। মতি তাহার অংশ লইয়া চলিয়া গেল।

এখনও তিন চার ঝুড়ি লুচি মজুত।

পদ্ম ঝি উঁকি মারিয়া বলিল—লুচি ভাজচো এখনও বসে? আমাকে খানকতক দাও দিকি—

বলিয়া নিজেই একখানা গামছা পাতিয়া নিজের হাতে খান পঁচিশ-ত্রিশ গরম লুচি তুলিয়া লইল। হাজারি মুখ ফুটিয়া বারণ করিতে পারিল না। সাহসে কুলাইল না।

অনেক রাত্রে সুপ্তোত্থিতা কুসুম চোখ মুছিতে মুছিতে বাহিরের দরজা খুলিয়া সম্মুখে মস্ত এক পোঁট্‌লা-হাতে-ঝোলানো অবস্থায় হাজারি ঠাকুরকে দেখিয়া বিস্ময়ের সুরে বলিল—কি বাবাঠাকুর, কি মনে ক'রে এত রাত্রে?…

হাজারি বলিল—এতে লুচি আছে মা কুসুম। হোটেলে লুচি ভাজতে দিয়েছিল খদ্দেরে। বেলে দেবার লোক নেই—শেষকালে খদ্দের পাঁচ সের ময়দার লুচি নিলে না, কর্ত্তাবাবু বলেন আমায় তার দাম দিতে হবে। বেশ আমায় দাম দিতে হয় আমিই নিয়ে নিই। তাই তোমার জন্যে বলি নিয়ে যাই, কুসুমকে তো কিছু দেওয়া হয় না কখনো। রাত বড্ড হয়ে গিয়েচে—ঘুমিয়েছিলে বুঝি? ধর তো মা বোঁচকাটা রাখো গে যাও।

কুসুম বোঁচকাটা হাজারির হাত হইতে নামাইয়া লইল। সে একটু অবাক হইয়া গিয়াছে, বাবাঠাকুর পাগল, নতুবা এত রাত্রে—(তাহার এক ঘুম হইয়া গিয়াছে—), এখন আসিয়াছে লুচির বোঁচকা লইয়া।

হাজারি বলিল, আমি যাই মা—লুচি গরম আর টাট্‌কা, এই ভেজে তুলিনি। তুমি খানকতক খেয়ে ফেলো গিয়ে এখনি। কাল সকালে বাসি হয়ে যাবে। আর ছেলেপিলেদের দাও গিয়ে। কত আর রাত হয়েচে—সাড়ে বারোটার বেশী নয়।

হোটেলে ফিরিয়া হাজারি ঠাকুর একটি দুঃসাহসের কাজ করিল।

মতি চাকর পূর্ব্ব হইতেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তাহাকে তুলিয়া বলিল—মতি, আমি রাত তিনটের গাড়ীতে বাড়ী যাচ্চি। এত লুচি কি হবে, বাড়ীতে দিয়ে আসি। তুমি থাকো, আমি কাল সকাল দশটার গাড়ীতে এসে রান্না করবো, কর্ত্তা মশায়কে বলো।

মতি অবাক লইয়া বলিল—এত রাত্রে লুচি নিয়ে বাড়ী রওনা হবে!—

—এত লুচি কি হবে? এখানে থাকলে কাল সকালে বারোভূতে খাবে তো। আমার জিনিস নিজের বাড়ী দিয়ে আসি। আমার বাড়ীতে ছেলেমেয়ে আছে, তারা খেতে পায় না, তাদের দিয়ে আসি! ছ'টা পয়সা তো খরচ।

হাজারি আর ঘুমাইল না। টেঁপির জন্য তার মন-কেমন করিয়া উঠিয়াছে। কুসুম যেমন, টেঁপিও তেমন। আরও দু'টি ছেলে আছে ছোট ছোট। তাদের মুখ বঞ্চিত করিয়া এত লুচি এখানে রাখিয়া পদ্ম ঝি আর কর্ত্তামশায়ের বাড়ীতে খাওয়াইয়া কোন লাভ নাই।

রাত সাড়ে তিনটার সময় গাংনাপুর স্টেশনে নামিয়া হাজারি নিজের গ্রামের পথ ধরিল এবং সাড়ে তিন ক্রোশ পথ হাঁটিয়া ভোর হইবার সঙ্গে সঙ্গে স্বগ্রামে পৌছিল।

এড়োশোলা এক সময়ে বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল—এখন পূর্ব্বের শ্রী নাই। গ্রামের জমিদার কর বাবুরা এখান হইতে উঠিয়া কলিকাতা চলিয়া যাওয়াতে গ্রামের মাইনর স্কুলটির অবস্থা খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। বড় দীঘিটা মজিয়া গিয়াছে, ভদ্রলোকের মধ্যে অনেকে এখান হইতে বাস উঠাইয়া কেহ রানাঘাট, কেহ কলিকাতা চলিয়া গিয়াছেন। নিতান্ত নিরুপায় যারা তারাই গ্রামে পড়িয়া আছে।

হাজারির বাড়ীতে দুখানা খড়ের ঘর। ছোট্ট উঠান, একদিকে কাঁঠাল গাছ, অন্যদিকে একটা সজনে গাছ এবং একটা পেয়ারা গাছ। এই পেয়ারা গাছটা হাজারির মা নিজের হাতে পুঁতিয়াছিলেন—বেশ বড় বড় পেয়ারা হয়, কাশীর পেয়ারার বীজের চারা।

হাজারির ডাকাডাকিতে হাজারির স্ত্রী উঠিয়া দোর খুলিয়া, এ অবস্থায় স্বামীকে দেখিয়া বলিল—এসো, এসো। শেষ রাতের গাড়ীতে এলে কেন গো? এই দুরাস্তর রাস্তা, অন্ধকার রাত—আবার বড্ড সাপের ভয় হয়েছে—সাপের কামড়ে দু-তিনটি মানুষ মরে গিয়েছে এর মধ্যে।

—আমাদের গাঁয়ে?

—আমাদের গাঁয়ে নয়—নতুন কাওয়া পাড়ায় একটা মরেচে আর বামন পাড়ায় শুনচি একটা—অত বড় বোঁচকাতে কি গো?

হাজারি লুচির আসল ইতিহাস কিছু বলিল না। স্ত্রীর আনন্দপূর্ণ সাগ্রহ প্রশ্নের উত্তরে সে কেবল বলিল—পেয়েছি গো পেয়েছি। ভগবান দিয়েছেন, সবাই মিলে খেয়ে নাও মজা ক'রে। টেঁপিকে খুব ক'রে খাওয়াও, ও পেট ভরে খাবে আমি দেখি।

সেদিন সকালের গাড়ীতে হাজারি রাণাঘাটে ফিরিতে পারিল না।

দুপুরের পরে হাজারি কুসুমের বাপের বাড়ী বেড়াইতে গেল।

এই গ্রামেই গোয়ালাপাড়ায় কুসুমের জ্যাঠামশায় হরি ঘোষের অবস্থা এক সময় যথেষ্ট ভাল ছিল, এখনও বাড়ীতে গোহাল-পোরা গরুর মধ্যে আট-দশটি অবশিষ্ট আছে, দুটি ছোট ছোট ধানের গোলাও বজায় আছে।

হাজারিকে হরি ঘোষ খুব খাতির করিয়া খেজুর পাতার চটে বসিতে দিল। বলিল—কবে আলেন বাবাঠাকুর? সব ভালো।

—তোমরা সব ভাল আছ?

—আপনার ছিচরণের আশিব্বাদে এক রকম চলে যাচ্ছে। রাণাঘাটেই কাজ কচ্চেন তো?

—হ্যাঁ। সেখান থেকেই তো এলাম।

—আমাদের কুসুমের সঙ্গে দেখা-টেখা হয়?

হাজারি পাড়াগাঁয়ের লোক, এখানকার লোকের ধাত চেনে। কুসুমের সঙ্গে সর্ব্বদা দেখা-শোনা বা তাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি টানের কোন পরিচয় সে এখানে দিতে চায় না। ইহারা হয়তো সহজ ভাবে সেটা গ্রহণ করিতে পারিবে না। গ্রামে কথাটা রাষ্ট্র হইয়া গেলে লোকে নানারূপ কদর্থ টানিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিবে তাহা হইতে। সুতরাং সে বলিল—হ্যাঁ,—দু-একবার হয়েছিল। ভাল আছে।

—এবার যদি দেখা হয়, একবার আসতে বলবেন ইদিকে। তার গাঁয়ে আসবার দিকে তত টান নেই, শহরে দুধ বেচে চালানো যে কি মিষ্টি লেগেছে!

হাজারি কথার গতি অন্য দিকে ঘুরাইবার উদ্দেশ্যে বলিল—এবার আবাদপত্র কি রকম হোল বল?

—ধানের আবাদ করিচি বারো বিঘে আর বাকী সব তরকারি। কুমড়ো দু-বিঘে, আলু, পেঁয়াজ,—তা এবার আকাশের অবস্থা ভাল না বাবাঠাকুর, ক্ষেতে মাটি ফেটে যাচ্চে!

তরকারির কথায় হাজারির নিজের গোপনীয় উচ্চাশার কথা মনে পড়িল। তরকারি তাহার গ্রাম হইতে কিনিলে রাণাঘাট বাজারের চেয়ে অনেক সুবিধা পাওয়া যায়। এখান হইতেই সে আনাজপত্র লইয়া যাইবে।

হরি ঘোষকে বলিল—আচ্ছা, তোমাদের আলু ক'মণ হ'তে পারে?

—বাবাঠাকুর তার কি কোন ঠিক আছে? তবে ত্রিশ-চল্লিশ মণ খুব হবে।

—তুমি সমস্ত আলু আমায় দিতে পারবে? নগদ দাম দেবো।

হরি ঘোষ কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—বাবাঠাকুর, আজকাল কাঁচামালের ব্যবসা করচেন নাকি?

—ব্যবসা এখনও করিনি, তবে করবো ভাবচি। সে তোমায় বলব একদিন।

গোয়ালপাড়া হইতে আসিবার পথে একটা খুব বড় বাঁশবনের মাঝখান দিয়া পথ। এখানে লোকজন নাই, এড়োশোলা গ্রামেই লোকজনের বসত নাই। আগে ছিল—ম্যালেরিয়ায় মরিয়া হাজিয়া লোকশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। শুধুই বড় বড় আম-কাঁঠালের বাগান ও বাঁশবনের জঙ্গল।

এই বাঁশবনের মধ্যে পুরোনো দিনে পালিত পাড়া ছিল, হাজারি বাল্যকালেও দেখিয়াছে। পালিতেরা বেশ বর্দ্ধিষ্ণু ছিল গ্রামের মধ্যে, পূজাপার্ব্বণ, দোল-দুর্গোৎসব পর্য্যন্ত হইয়াছে রাজেন পালিতের বাড়ী। এখন জঙ্গলের মধ্যে পালিতদের ভিটাটা পড়িয়া আছে এই পর্য্যন্ত। দিনমানেই বোধ হয় বাঘ লুকাইয়া থাকে।

বাঁশঝাড়ে কট-কট করিয়া শুকনো বাঁশের শব্দ হইতেছে—ঘন ছায়া, শুকনো বাঁশপাতার ও সোলার শব্দ। ফিঙ্গে, শালিখ পাখীর কলরব। হাজারির মনে হইল, আজ যেন তার হোটেলের দাসত্ব-জীবন গতে মুক্তির দিন। সেই ভীষণ গরম উনুনের সামনে বসিয়া আজ আর তাকে ডেক্‌চিতে ভাত-ডাল রান্না করিতে হইবে না। পদ্ম ঝিয়ের কড়া তাগাদা ও

মুরুব্বিয়ানা সহ্য করিতে হইবে না। বাঁশবনের ছায়ায় পূর্ণ শান্তিতে সে যদি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া ঘুমায়—তাহা হইলেও কেহ কিছু বলিতে পারিবে না।

এই মুক্তি সে ভাল ভাবেই আস্বাদ করিতে চায় বলিয়াই তো হোটেল খুলিবার কথা এত ভাবে।

সে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে, এইবার কিছু টাকা হইলেই সে রাণাঘাটের বাজারে হোটেল খুলিয়া দিতে পারে।

হাজারি সত্যই চিন্তা করিতে আরম্ভ করিল, টাকা কোথায় ধার পাওয়া যাইতে পারে। এক গ্রামের গোসাঁইরা বড় লোক, কিন্তু তাহারা প্রায় সবাই থাকে কলিকাতায়। এখানে বৃদ্ধ কেশব গোসাঁই থাকেন বটে—কিন্তু লোকটা ভয়ানক কৃপণ—তিনি কি হাজারির মত সামান্য লোককে বিনা বন্ধকে, বিনা জামিনে টাকা ধার দিবেন?

হাজারির জামিন হইবেই বা কে!

তাহার অবস্থা অত্যন্তই খারাপ। দু'খানা মাত্র চালাঘর। রান্নাঘরখানা গত বর্ষায় পড়িয়া গিয়াছে—পয়সা অভাবে সারানো হয় নাই, উঠানের আমতলায় রান্না হয়—বৃষ্টির দিন এখন ক্রমশঃ চলিয়া গেল, এখন তত অসুবিধা হয় না।

বেলা প্রায় পড়িয়া আসিয়াছে।

হাজারি বাড়ী ফিরিয়া দেখিল, তাহার ছোট মেয়ে টেঁপি ঘরের দাওয়ায় বসিয়া উল বুনিতেছে। টেঁপি বাবাকে দেখিয়া বলিল—তোমার জন্য আসন বুনচি বাবা—কাল তুমি যদি থাকো, কালকের মধ্যে হয়ে যাবে। তোমার সঙ্গে দিয়ে দেবো।

হাজারি মনে মনে হাসিল। বেচু চক্কত্তির হোটেলে সে রঙীন পশমের আসন পাতিয়া খাইতে বসিয়াছে—ছবিটি বেশ বটে। পদ্ম ঝি কি মন্তব্য করিবে তাহা হইলে?

মেয়েকে বলিল—দেখি কেমন আসন? বাঃ বেশ হচ্ছে তো, কোথায় শিখলি তুই বুনতে?

টেঁপি বলিল—মুখুয্যে-বাড়ীর নীলা-দি আর অতসী-দি'র কাছে। আমি রোজ যাই দুপুরে, ওরা আমায় গান শেখায়, বোনা শেখায়।

—ওরা এখনও আছে? হরিচরণবাবু চলে যান নি এখনও?

—ওরা নাকি এ মাসটা থাকবে। থাকলে তো আমারই ভাল—আমি কাজটা শিখে নিতে পারি। কি চমৎকার গান গাইতে পারে অতসী-দি! আজ শুনবে বাবা?

—তুই গান শিখলি কিছু?

টেঁপি লাজুক সুরে বলিল—দু-একটা। সে কিছু নয়। তুমি অতসী-দির গান যদি শোনো, তবে বলবে যে কলের গানের রেকর্ড শুনচি। ওদের বাড়ী খুব বড় কলের গানও আছে। রোজ সন্ধ্যের পর বাজায়। কত রকমের গান আছে—যাবে শুনতে সন্ধ্যের পর? অতসী-দি নিজে কল বাজায়। আমিও যাবো তোমার সঙ্গে—অতসী-দিকে বলবো বাবা এসেচে, ভালো ভালো বেছে গান দেবে।

হাজারি বলিল—হ্যাঁরে, হরিচরণবাবুর শরীর সেরেচে জানিস্ ?

—তা তো জানিনে, তবে তিনি বৈঠকখানায় বসে রোজই তো সবার সঙ্গে গল্প করেন। একদিন বৈঠকখানায় কলের গান বাজিয়েছিলেন। কি চমৎকার কীর্ত্তন!

সঙ্গীত-শিল্পের প্রতি বর্ত্তমানে হাজারির তত আগ্রহ নাই, হাজারির উদ্দেশ্য হরিচরণবাবুকে বলিয়া কহিয়া অন্ততঃ শ'দুই টাকা ধার করা যায় কিনা, সেদিকে।

হরিচরণ মুখুয্যে মহাশয় এ গাঁয়ের মধ্যে একমাত্র শিক্ষিত, অবস্থাপন্ন ও সম্ভ্রান্ত লোক। তাঁহারা এ গ্রামের জমিদার—কিন্তু অনেক দিন হইতেই গ্রাম ছাড়িয়াছেন। প্রকাণ্ড তিন-মহলা বাড়ী পড়িয়া আছে, দু-একজন বৃদ্ধা পিসী-মাসী ছাড়া বাড়ীতে আর কেহ এতদিন ছিল না।

আজ মাস চার-পাঁচ হইল হরিচরণ মুখুয্যের একমাত্র পুত্র কলিকাতায় মারা যায় বসন্ত রোগে। পুত্রের মৃত্যুর পর হইতেই আজ প্রায় তিন মাস হইল হরিচরণবাবু সপরিবারে দেশের বাটীতে আসিয়া যে কেন বাস করিতেছেন—সে খবর হাজারি রাখে না। তবে ইহা জানে যে, হরিচরণবাবু গ্রামের উত্তর মাঠে একটি দীঘি খনন করিবার জন্য জেলা বোর্ডের হাতে অনেকগুলি টাকা দান করিয়াছেন এবং পুত্রের নামে একটি ডিস্পেন্সারী করিয়া দিবেন গ্রামে। হরিচরণবাবু কারো বাড়ী যান না। নিজের বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন সব সময়। তাঁর দুই মেয়ে ও স্ত্রী এখানেই, তাছাড়া চাকর-বাকর ও দু'জন দরোয়ান আছে বাড়ীতে।

সন্ধ্যার পর সাহসে ভর করিয়া হাজারি হরিচরণবাবুর পৈতৃক আমলের বৈঠকখানার উঠানে গিয়া দাঁড়াইল। বৈঠকখানা বাড়ীর সামনে বড় বড় থামওয়ালা সাদা মার্ব্বেল পাথর বাঁধানো বারান্দা। বারান্দার সামনে একটা মাঝারি গোছের কামরা, পাশে একটা ছোট কামরা, পূর্ব্বে নবীনবাবু বলিয়া ইহাদের এক সরিক বড় বৈঠকখানার পাশে পৃথক ভাবে নিজের জন্য আর একটি বৈঠকখানা তৈরী করিয়াছিলেন—তিনি আজ পঁচিশ বৎসর হইল নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যাওয়াতে উক্ত বৈঠকখানা ঘর বর্ত্তমানে বিচালি রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

হাজারি টেঁপিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিল। টেঁপি বলিল—বাবা তুমি বোসো, আমি অতসী-দিকে বলিগে তুমি এসেছ কলের গান শুনতে। এখুনি দেবে গান।

বৈঠকখানার সামনে হাজারিকে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া টেঁপি পাশের ছোট্ট দরজা দিয়া বাড়ীর মধ্যে সরিয়া পড়িল।

ঘরের মধ্যে তেলের চৌপায়া লণ্ঠন জ্বলিতেছে। ইহা সাবেকী কালের বন্দোবস্ত, এখনও ঠিক বজায় আছে। হাজারি বারান্দায় দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতেছে ঘরে ঢুকিবে কিনা, এমন সময় ঘরের ভিতর হইতে স্বয়ং হরিচরণবাবু বারান্দায় বাহির হইয়াই সামনে হাজারিকে দেখিয়া বলিলেন—কে ?

হাজারি বিনীত ভাবে হাত জোড় করিয়া মাথা নীচু করিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—বাবু, আমি হাজারি—

—ও, হাজারি! কি মনে করে, এসো এসো। বাইরে দাঁড়িয়ে কেন, ঘরের মধ্যে এসো। মাস-দুই তোমায় দেখিনি। তোমার মেয়ে মাঝে মাঝে আসে বটে, আমার বড় মেয়ে অতসীর সঙ্গে তার বেশ ভাব।

হরিচরণবাবুর বয়স পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন হইবে, গৌরবর্ণ, লম্বা আড়ার চেহারা, বড় বড় চোখ—গলার স্বর গম্ভীর। তিনি খুব শৌখীন লোক ছিলেন। এখনও এই বয়সেও এবং ছেলে মারা যাওয়া সত্ত্বেও বেশ শৌখীনতা ও সুরুচির পরিচয় আছে তাঁর আটপৌরে পোশাকেও।

হাজারি আসলে আসিয়াছে টাকা ধার করিবার কথা বলিতে। কিন্তু বৈঠকখানা ঘরে ঢুকিয়া প্রকাণ্ড বড় সেকেলে প্রমাণ সাইজের আয়নাখানায় নিজের আপাদ-মস্তক দেখিয়াই তাহার সাহসটুকু সব উবিয়া গেল।

হরিচরণবাবুর নির্দ্দেশ মত সে একখানা চেয়ারে বসিল।

হরিচরণবাবু বলিলেন—চা খাবে হাজারি?

হাজারি আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল—আজ্ঞে, চা আমি—থাক্‌গে, সে কেন আবার কষ্ট—

হরিচরণবাবু বলিলেন—বিলক্ষণ! কষ্ট কিসের? আমি তো চা খাবোই এখন, দাঁড়াও আনতে বলি—

এই সময় টেঁপি বৈঠকখানার যে দোর অন্তঃপুরের দিকে, সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। হরিচরণবাবুকে বৈঠকখানার মধ্যে দেখিয়াও সে বেশ সহজ ভাবেই বলিল—বাবা দাঁড়াও, অতসী-দি কলের গান বাজাচ্চে—আমি বলেচি আমার বাবা তোমাদের কলের গান শুনতে এসেচে—

হরিচরণবাবু বলিয়া উঠিলেন—কলের গান শুনতে এসেচ হাজারি! তা আমাকে বলতে হয় এতক্ষণ। শুনতে আসবে এর আর কথা কি? তোমরা দু-পাঁচজন আস-যাও, বড় আনন্দের কথা। গ্রাম তো লোকশূন্য হয়ে পড়েচে। ওরে খুকি, তোর বাবার জন্যে আর আমার জন্যে দু' পেয়ালা চা আনতে বলে দে তোর অতসী-দিদিকে।

হাজারি মনে মনে টেঁপির উপর চটিয়া গেল। হতভাগা মেয়েটা সব দিল মাটি করিয়া। কে তাহাকে বলিয়াছিল কলের গান শুনিতে সে যাইতেছে মুখুয্যে বাড়ীতে? অতঃপর টাকার কথা উত্থাপন করা কি ভালো দেখায়? নাঃ, যত ছেলেমানুষ নিয়া হইয়াছে কারবার!

হরিচরণবাবুর মেয়ে অতসী এই সময় দু' পেয়ালা চা-হাতে ঘরে ঢুকিল। প্রথমে হাজারির সামনে টেবিলে একটি পেয়ালা নামাইয়া অন্য পেয়ালাটি হরিচরণবাবুর হাতে দিল। অতসীর বয়স আঠারো-উনিশ, বেশ ধপ্‌ধপে ফর্সা, সুন্দর মুখশ্রী—ডাগর ডাগর চোখ—এক কথায় অতসী সুন্দরী মেয়ে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অথচ সহজ অনাড়ম্বর সাজগোজ, হাতে কয়েক গাছি সরু সোনার চুড়ি এবং কানে ইয়ারিং ছাড়া অলঙ্কারেরও কোন বাহুল্য নাই।

হরিচরণবাবু বলিলেন—তোমার হাজারি কাকা—প্রণাম কর অতসী।

অতসী আগাইয়া আসিয়া হাজারির সামনে নীচু হইয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলা লইল।

হাজারি সঙ্কুচিত হইয়া বলিল—থাক্ থাক্, এসো মা, রাজরাণী হও মা—এসো, কল্যাণ হোক্।

অতসীকে হরিচরণবাবু বলিলেন—তোমার হাজারি কাকা গান শুনবেন। গ্রামোফোনটা নিয়ে এসো।

অতসীর সঙ্গে টেঁপি খুব ভাব করিয়াছে। টেঁপির বাবাকে অতসী এই প্রথম দেখিল—বন্ধুর পিতা কি রকম দেখিতে, কৌতূহলের সহিত সে চাহিয়া দেখিতেছিল, বাবার কথায় বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে চাকরের হাতে দিয়া গ্রামোফোন রেকর্ডের বাক্স বাহিরে পাঠাইয়া দিল।

হরিচরণবাবু চাকরকে বলিলেন বাজাবে কে? তোর দিদিমণি আসচে না?

—দিদিমণি যে বল্লেন আপনি বাজাবেন—

—আমি ভাল চোখে দেখতে পাব না। তাকেই পাঠিয়ে দিগে যা—। একটু পরে অতসী, টেঁপি এবং পাড়ার আরও দু-তিনটি মেয়ে ঘরে ঢুকিল। কলের গান বাজনা শুরু হইল এবং চলিল ঘণ্টা-দুই। আরও একবার চা দিয়া গেল চাকরে, কিন্তু পরিবেশন করিল অতসী।

সব মিটিয়া চুকিয়া যাইতে রাত্রি প্রায় সাড়ে ন'টা বাজিয়া গেল।

হাজারি ছট্‌ফট করিতেছিল, গান শুনিতে সে এখানে আসে নাই।

গান বন্ধ হইলে অতসী, টেঁপি ও মেয়ের দল যখন বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল, তখন হাজারি সাহসে ভর করিয়া বলিল—আপনার কাছে একটা আজ্জি ছিল বাবু।

হরিচরণবাবু বলিলেন—কি বল?

—আমার কিছু টাকা দরকার, যদি আমায় কিছু ধার দিতেন, তাহলে আমার একটা মস্ত বড় আশার কাজ মিটতো।

—মেয়ের বিয়ে দেবে?

—আজ্ঞে না বাবু, তা নয়, ব্যবসা করবো।

—কি ব্যবসা?

—বাবু আপনি তো জানেন আমি হোটেলে কাজ করি। আপনার কাছে লুকোবো না। আমি নিজে একটা হোটেল খুলতে চাচ্চি এবার। টাকাটা সেজন্যে দরকার।

—কত টাকা দরকার?

—অন্ততঃ দুশো টাকা আমায় যদি দয়া করে দেন বাবু, আমার খালধারের কাঁঠাল বাগান আমি বন্ধক রাখচি আপনার কাছে। এক বছরের মধ্যে টাকাটা শোধ করবো।

হরিচরণবাবু ভাবিয়া বলিলেন—বাগান বন্ধক রেখে টাকা আমি দিতাম না, দিতাম তো তোমাকে এমনি দিতাম, কিন্তু অত টাকা এমন সময় আমার হাতে নগদ নেই।

হাজারি এ-কথার পরে আর কোনো কথা বলিতে পারিল না, বিশেষতঃ সে জানিত হরিচরণবাবু উদার মেজাজের মানুষ, সত্যবাদী লোক। টাকা হাতে থাকিলে, হাতে টাকা না থাকার কথা বলিতেন্ না।

অতসী আসিয়া বলিল—কাকা, আপনি একটু বসুন। টেঁপি খেতে বসেচে, মা ছাড়লে

না। মেয়েরা, যারা গান শুনতে এসেছিল, সবাইকে না খাইয়ে যেতে দেবেন না। একটু দেরি হবে। না হয় আপনি যান, আমি ঝি'র সঙ্গে পাঠিয়ে দেব এখন। হরিচরণবাবু বলিলেন —তোমার যদি বিশেষ কাজ না থাকে, একটু বসে যাও না হাজারি। তোমার সঙ্গে দুটো কথা কই। কেউ বড় একটা আসে না আমার এখানে—। হাজারি বসিল।

—তুমি কোথায় কোন্ হোটেলে কাজ কর ?

—আজ্ঞে রাণাঘাট, বেচু চক্কত্তির হোটেলে, রেল-বাজারের মধ্যে।

—কত মাইনে পাও ?

—বাবু সে আর বলবার কথা নয়, খাওয়া আর সাত টাকা মাসে। তাই ভাবছিলাম পরের তাঁবে থাকবো না। এদিকে বয়স হলো, এইবার একটা হোটেল খুলে নিজে চালাবো।

—হোটেল চালাতে পারবে ?

—তা বাবু আপনার আশীর্ব্বাদে একরকম সবই জানি ও-লাইনের। বাজার আর রান্না, হোটেলের দুটো মস্ত কাজ, এ যে শিখেচে, সে হোটেল খুলে লাভ করতে পারে। আমি অনেকদিন থেকে চেষ্টা ক'রে ও দুটো কাজ শিখে নিইচি—খদ্দের কি চায় তাও জানি। চাকরি করি রাঁধুনীর বটে বাবু কিন্তু আপনার বাপ-মায়ের আশীর্ব্বাদে, আপনার আশীর্ব্বাদে চোখ-কান খুলে কাজ করি।

—বেশ ভাল।

উৎসাহ পাইয়া হাজারি তাহার বহুদিনের আশা ও সাধ একটি 'আদর্শ হিন্দু-হোটেল' প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিল। চূর্ণীনদীর ধারে বসিয়া অবসর মুহূর্ত্তে তাহার সে স্বপ্ন দেখার কথাও গোপন করিল না। তাহার রান্না খাইয়া কলিকাতার বাবুরা কি রকম সুখ্যাতি করিয়াছে, যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলে তাহাকে ভাঙাইয়া লইবার চেষ্টা, কিছুই বাদ দিল না। হরিচরণবাবু বলিলেন—দেখ হাজারি, তোমার কথা শুনে তোমার ওপর আমার হিংসে হয়। তোমার বয়েস হোলে কি হবে, তোমার জীবনে মস্ত বড় আশা রয়েচে একটা কিছু গড়ে তুলবো! এই আশাই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, আমার ছেলেটা মারা যাওয়ার পর আমার জীবনে যেন সব-কিছু ফুরিয়ে গিয়েছে মনে হয়। আর যেন কিছু করবার নেই, ক'রে কি হবে, কার জন্যে করবো এই সব কথা মনে ওঠে। তা ছাড়া জীবনে কখনোই কিছু দরকার হয়নি। বাবার সম্পত্তি ছিল যথেষ্ট—নতুন কিছু গড়ে তুলবো এ ইচ্ছে কোনদিন জাগেনি। তোমার বয়েস হোলে কি হবে, ওই একটা আশাই তোমায় যুবক ক'রে রেখে দেবে যে! আমার মাথায় এত পাকা চুল ছিল না। খোকা মারা যাওয়ার পরে জীবনের উদ্যম, আশা-ভরসা যেমন চলে গেল, অমনি মাথার চুলও পেকে উঠলো। তবে এখন ইচ্ছে আছে খোকার নামে একটা স্কুল ক'রে দেবো। আবার ভাবি, স্কুলে পড়বেই বা কে ? আমাদের এ অঞ্চলে তো লোকের বাস নেই। তার চেয়ে না হয় একটা ডাক্তারখানা ক'রে দিই। উদ্যমই জীবনের সবটুকু, যার জীবনে আশা নেই, যা কিছু করার ছিল সব হয়ে গেছে—তার

জীবন বড় কষ্টকর! যেমন ধরো দাঁড়িয়েচে আমার। খোকা মারা না গেলে আজ আমার ভাবনা হে হাজারি! ভেবেছিলুম কয়লার খনি ইজারা নেবো—কত উৎসাহ ছিল। এখন মনে হয় কার জন্যে করবো? তাই বলছিলুম, তোমায় দেখে হিংসে হয়। তোমার জীবনে উদ্যম আছে, আশা আছে—আমার তা নেই। আর এই দেখ, এই পাড়াগাঁয়ে একলাটি আছি পড়ে, ভালো লাগে কি? ভালো লাগে না। কখনো থাকিনি, কিন্তু বাইরেও আর হৈ-চৈ-এর মধ্যে থাকতে ভাল লাগে না। ওই মেয়েটা আছে, কলের গান এনেচে একটা—বাজায়, আমি শুনি। ওর মায়ের জন্যে বেছে বেছে ভক্তি আর দেহতত্ত্বের গান কিনে দিইচি, যদি তা শুনে তাঁর মনটা একটু ভাল থাকে! মেয়েমানুষ, কষ্টটা লেগেছে তাঁর অনেক বেশী।

হাজারি এই দীর্ঘ বক্তৃতার সবটা তেমন বুঝিল না—কেবল বুঝিল, পুত্রশোকে বৃদ্ধের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে।

সে সহানুভূতিসূচক দু-চার কথা বলিল। বেশী কথা অনেকক্ষণ ধরিয়া গুছাইয়া বলিতে কখনো সে শেখে নাই, তবুও পুত্রশোকাতুর বৃদ্ধের জন্য তাহার সত্যকার দুঃখ হওয়াতে, ভাবিয়া ভাবিয়া মনে মনে বানাইয়া কিছু বলিল।

হরিচরণবাবু বলিলেন—আর একটু চা খাবে?

—আজ্ঞে না। চা খাওয়া আমার তেমন অভ্যাস নেই, আপনি খান বাবু।

এমন সময় টেঁপি আসিয়া বলিল—বাবা, যাবে?

হাজারি হরিচরণবাবুর কাছে বিদায় লইয়া মেয়েকে সঙ্গে করিয়া বাহির হইল। জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, ভড়েদের বাড়ীর উঠানে রাঙাকাঠ কাটিয়াছে—রাঙাকাঠের গন্ধ বাহির হইতেছে। সিধু ভড় দাওয়ায় জাল বুনিতেছিল, বলিল—দা-ঠাকুর কনে ছেলেন এত রাত অব্দি?

হাজারি বলিল—বাবুর বাড়ী। বাবু ছাড়েন না কিছুতে, চা খাও, কলের গান শোন, শেষে তো টেঁপিকে না খাইয়ে ছাড়লেন না গিন্নী মা। হাজারির বড় ভাল লাগিয়াছিল আজ সন্ধ্যাটা। বড় লোকের বৈঠকখানায় এমন ভাবে বসিয়া চা সে কখনো খায় নাই, খাতির করিয়া তাহার সঙ্গে কোনো বড় লোকে মনের কথাও কখনো বলে নাই। কলের গান তো আছেই। মেয়েকে বলিল—টেঁপি কি খেলি রে? টেঁপি একটু ভোজনপ্রিয়! খাইতে ভালবাসে আর গরীবের মেয়ে বলিয়াই অতসীর মা তাহাকে না খাওয়াইয়া ছাড়েন না। বলিল—পরোটা, মাছের ডাল্না, সুজি, পটলভাজা, আলুভাজা—

হাজারির স্ত্রী অনেকক্ষণ রান্না সারিয়া বসিয়া আছে, বলিল—এত রাত্তির পজ্জন্ত ছিলে কোথায় সব? পাড়া বেড়ানো শেষ হয় না যে তোমাদের, বসে বসে কেবল ঘুম আসচে—

টেঁপি বলিল—আমি খেয়ে এসেছি মা, অতসী-দিদির মা ছাড়লেন না কিছুতে। আমি কিছু খাবো না।

—হ্যারে, তুই খেয়ে এলি! ওবেলার সেই বাসি লুচি তোর জন্যে রয়েচে যে! লুচি খাবি না?

অনেকদিন ইহাদের সংসারে এমন সচ্ছলতা হয় নাই যে, লুচি ফেলিয়া ছড়াইয়া ছেলে-

মেয়েরা খাইতে পায়। বলিয়াও সুখ।

টেঁপি বলিল—তুমি খাও মা। আমি খুব খেয়ে এসেচি। সেখানেও তো পরোটা, সুজি, মাছের ডালনা, এই সব খাইয়েচে। আজ দিনটা বেশ কাটল—না মা ? ভাল খাওয়া সকাল থেকে শুরু হয়েচে আর রাত পর্য্যন্ত চলেচে।

আহারাদি শেষ করিয়া হাজারি বাহিরে বসিয়া তামাক খাইতে লাগিল।

হরিচরণবাবুর কথায় তাহার অনেকখানি উৎসাহ আজ বাড়িয়া গিয়াছে।

লুচি! টেঁপি কত লুচি খাইতে পারে, সে তাহার ব্যবস্থা করিবে। তাহার এই সব লোভাতুর ছেলে-মেয়ের মুখে ভাল খাবার-দাবার সে দিতে পারে না—কিন্তু যাতে পারে সে চেষ্টা করিবার জন্যই তো সুযোগ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

হরিচরণবাবুর টাকা আছে বটে, কিন্তু তাহার মত লোভাতুর ছেলে-মেয়ে নাই তাঁহার ঘরে, কাহাদের মুখে সুখাদ্য তুলিয়া দিবার আশায় তিনি খাটিবেন ?

আজ হরিচরণবাবুর নিকট হইতে সে টাকা ধার পায় নাই বটে, কিন্তু এমন একটা জিনিস পাইয়া আসিয়াছে, যাহার মূল্য টাকা-কড়ির চেয়ে বেশী।

তাহার সংসারে ছেলে মেয়ে আছে, টেঁপি আছে, তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার হাতে পায়ে বল আসিবে, মনে জোর পাইবে। হরিচরণবাবুর জীবন শেষ হইয়া গিয়াছে। তাহার বয়স ছে'চল্লিশ হইলে কি হয়, টেঁপি যে ছেলেমানুষ। তাহার নিজের সুখ কিসের ? টেঁপিকে একখানা ভাল শাড়ী কিনিয়া দিলে ওর মুখে যে হাসি ফুটিবে, সেই হাসি তাহাকে অনেক দূরে লইয়া যাইবে কর্ম্মের পথে।

আহা, যদি এমন কখনো হয়।

যদি টেঁপিকে একটা কলের গান কিনিয়া দেওয়া যায় ? গান এত ভালবাসে যখন…

হয়তো স্বপ্ন…কিন্তু ভাবিয়াও তো আনন্দ। দেখা যাক্ না কি হয়।

বাঁশঝাড়ে শন্ শন্ শব্দ হইতেছে। রাত অনেক হইয়াছে। গ্রাম নীরব হইয়া গিয়াছে। এতক্ষণে হাজারি স্ত্রীকে বলিল—ওগো, আমার গামছাখানা বড্ড ময়লা হয়েচে, একটু সোডা দিয়ে ভিজিয়ে দাও তো, কাল খুব সকালে কেচে দিও আমি কাল সকালে উঠেই রাণাঘাট যাবো।

সকালে কেন, এখুনি কেচে দিই। ভিজে গামছা নিয়ে যাবে কি করে, এখন কেচে হাওয়ায় মেলে দিলে রাত্তিরের মধ্যে শুকিয়ে যাবে।

সকালে উঠিয়া হাজারি ঠাকুর রাণাঘাট চলিয়া আসিল।

হোটেলে ঢুকিবার আগে তাহার ভয় করিতে লাগিল। কর্ত্তাবাবু এবং পদ্ম ঝি তাহাকে কি না জানি বলে! একদিন কামাই করিবার জন্য কৈফিয়ৎ দিতে দিতে তাহার প্রাণ যাইবে।

হইলও তাই।

ঢুকিবার পথেই বসিয়া স্বয়ং বেচু চক্কত্তিমশায়—খোদ কর্ত্তা। হাজারিকে দেখিয়া হাতের

হুঁকা নামাইয়া কড়া সুরে বলিলেন—কাল কোথায় ছিলে ঠাকুর? হাজারি মিথ্যা কথা বলিল না। বাড়ীতে কাহারও অসুখ ইত্যাদি ধরনের বানানো মিথ্যা কথা সে কখনও বলে না। বলিল—আজ্ঞে, অনেক দিন পরে বাড়ী গেলাম কর্ত্তামশায়, ছেলে-মেয়ে রয়েছে--তাই একটা দিন —

—না ব'লে-ক'য়ে এভাবে হোটেল থেকে পালিয়ে যাবার মানে কি? কার কাছে ছুটি নিয়ে গিয়েছিলে?

এ কথার জবাব সে দিতে পারিল না। লুচি দিতে গিয়াছিল বাড়ীতে, তাহা বলিতেও বাধে। সে চুপ করিয়া রহিল।

—তোমার হাড়ে হাড়ে বদমাইশি ঠাকুর—পদ্ম ঝি ঠিক কথা বলে—দেখতে ভালমানুষ হোলে কি হবে? তুমি এত বড় একটা হোটেলের রান্নাবান্না ফেলে রেখে একেবারে নিউদ্দিশ হয়ে গেলে কাউকে কিছু না ব'লে? বলি একেবারে নাকের জলে চোখের জলে সবাই মিলে —গাঁজাখোর, নেমকহারাম কোথাকার! চালাকির আর জায়গা পাওনি?

বেচু চক্কত্তির গলার জোর আওয়াজ পাইয়া পদ্ম ঝি ব্যাপার কি দেখিতে আসিল এবং দোরে উঁকি মারিয়া হাজারিকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল—এই যে! কি মনে করে! আবার যে উদয় হ'লে? কাল আমি বলি আর দরকার নেই, ও আপদ বিদেয় ক'রে দেন কর্ত্তা, গাঁজা খেয়ে কোথায় নেশায় বুঁদ হয়ে পড়েছিল--চেহারা দেখচেন না?

হাজারি একটু শঙ্কিত হইয়া উঠিয়া দেওয়ালে টাঙানো গজাল-আঁটা ছোট্ট আয়নাখানায় নিজের মুখখানা দেখিবার চেষ্টা করিল—কি দেখিল পদ্ম ঝি তাহার চেহারাতে! গাঁজা তো দূরের কথা, একটা বিড়ি পর্য্যন্ত সকাল হইতে সে খায় নাই!

—যাও, কাল একটা ঠিকে ঠাকুর আনা হয়েছিল, তার মজুরি এক টাকা, আর জলখাবারের চার আনা তোমার এ মাসের মাইনে থেকে কাটা যাবে। ফের যদি এমন হয়, সেই দিনই বিদেয় ক'রে দেবো মনে থাকে যেন—বেচু চক্কত্তি রায় দিলেন।

হাজারি অপ্রতিভ মুখে রান্নাঘরের মধ্যে গিয়া ঢুকিল—সেখানেও নিস্তার নাই। কর্ত্তার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেও, পদ্ম ঝির হাতে অত সহজে পরিত্রাণ পাওয়া দুষ্কর। পদ্ম ঝি হাজারির পেছন পেছন রান্নাঘরে ঢুকিয়া বলিল-—করবে না তো তোমার কাজ ওরা—কেন করবে?···একা হাঁড়ি ঠেলো আজকে—যেমন বদমাইশ তার তেমনি। একা বড় ডেকচি নামাও, ফেন গালো, ভাত বাড়ো খদ্দেরদের—কাল সব কাজ মুখ বুজে ও-ঠাকুর করেছে একা —নবাবপুত্তুর গাঁজা খেয়ে কোথায় পড়ে আছেন আর ওর জন্যে খেটে মরবে সবাই—উড়ঞ্চুড়ে মড়ুইপোড়া বামুন কোথাকার।

পদ্ম ঝি রাগের মাথায় ভুলিয়া গিয়াছিল, এই মাত্র বেচু চক্কত্তি বলিয়াছেন যে, কাল হাজারির বদলে ঠিকা ঠাকুর রাখা হইয়াছিল যাহার মজুরি হাজারির মাহিনা হইতে কাটা যাইবে।

হাজারি অবাক হইয়া বলিল, একা কি রকম? এই তো ঠিকে ঠাকুর রাখা হয়েছে বল্লেন কর্ত্তাবাবু?

পদ্ম ঝি সামলাইয়া লইবার চেষ্টায় বলিল—হইছিল তো। হয়নি তো কি? কর্ত্তামশায় কি মিথ্যে কথা বলেন তোমার কাছে? যদি না-ই বা পাওয়া যেত ঠাকুর তবে ঠাকুরকে একা খাটতে হোত না? তোমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করবার সময় নেই আমার—মুর্শিদাবাদ আসবার সময় হোল। এখুনি ইষ্টিশানের খদ্দের সব আসবে। ডাল সাঁৎলে ফেলো তাড়াতাড়ি, চচ্চড়িটা চড়িয়ে দ্যাও।

মুর্শিদাবাদ ট্রেন সশব্দে আসিয়া প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াইল। এইবার কিছু খরিদ্দারের ভিড় হইবে।

হাজারি ছোট ডেক্‌চিটার মধ্যে হাত ডুবাইয়া ডাল সাঁৎলাইতেছে, এমন সময় বাহিরে গদির ঘরে বেচু চক্কত্তির চড়া গলার আওয়াজ এবং তর্কবিতর্কের শব্দ শুনিয়া সে রান্নাঘরের দোরের কাছে আসিয়া বাহিরের ঘরের দিকে চাহিল।

যতীশ ভট্‌চাজের সঙ্গে কর্ত্তামশায়ের কথা কাটাকাটি হইতেছে। যতীশ ভট্‌চাজ অনেক দিন হইতে তাহাদের খরিদ্দার—আগে আগে নগদ পয়সা দিয়া খাইয়া যাইত, আজ মাস-ছয় হইতে মাসিক হারে খায়। বয়স পঞ্চাশ-বাহান্ন, ম্যালেরিয়া রোগীর মত চেহারা, মাথার চুল প্রায় পাকিয়া গিয়াছে, রং পূর্বে ফর্সা ছিল, এখন পুড়িয়া আধকালো হইয়া আসিয়াছে প্রায়। পরনে ময়লা ধুতি, গায়ে লংক্লথের ময়লা পাঞ্জাবি, পায়ে বিবর্ণ কেম্বিসের জুতা।

বেচু চক্কত্তি বলিতেছেন—না, আপনি অন্যত্তর চেষ্টা করুন ভট্‌চাজ মশাই। আমি পারবো না সোজা কথা। হোটেল খুলিচি দু'পয়সা রোজগারের চেষ্টায়, অন্নছত্তর তো খুলিনি?

যতীশ ভট্‌চাজ্ বলিতেছে—টাকার জন্যে আপনি ভাববেন না চক্কত্তি মশাই। এ ক' মাসের বাকী আমি এক সঙ্গে দেবো।

—না মশাই—আপনি অন্যত্তর চেষ্টা করুন। যা গিয়েচে, গিয়েচে—আর আপনাকে খাইয়ে আমি জড়াতে রাজী নই।

যতীশ ভট্‌চাজ্ বেশ নরম সুরে বলিল—না না, যাবে কেন? বিলক্ষণ! পাই-পয়সা শোধ ক'রে দেবো। তবে পড়ে গিইচি একটু ফেরে কর্ত্তামশাই, ('খুব খোশামোদ জুড়ে দিয়েচে!') তা এই ক'টা দিন যেমন খাচ্চি তেমনি খেয়ে যাই—সামনের মাসের পয়লা দোস্‌রা—

—না মশাই, সামনের মাসের পয়লা দোস্‌রার এখনো ঢের দেরি। ও-সব আর চলবে না। মাপ করবেন, আপনি অন্যত্তরে দেখুন—

যতীশ ভট্‌চাজের চেহারা দেখিয়া হাজারির মনে হইল, লোকটা খুব ক্ষুধার্ত্ত, সকাল হইতে কিছু খায় নাই। এত বেলায় না খাওয়াইয়া কর্ত্তামশাই তাড়াইয়া দিতেছেন, কাজটা কি ভালো? হয়ত কিছু কষ্টে পড়িয়া থাকিবে, নতুবা দুমুঠা খাইবার জন্য লোকে এত খোশামোদ করে না।

হাজারির ইচ্ছা হইল, একবার সে বলে—কর্ত্তামশাই আমি আজ খাবো না—কাল দেশে

একটা নেমন্তন্ন ছিল খেয়ে শরীর খারাপ আছে। আমার ভাতটা না হয় ভট্‌চাজ্ মশাই খেয়ে যান—কিন্তু কথাটা বলিলে কর্ত্তামশায়ের অপমান করা হইবে, বিশেষ করিয়া পদ্ম তাহা হইলে তাহাকে আস্ত রাখিবে না।

যতীশ ভট্‌চাজ্ শেষ পর্য্যন্ত না খাইয়া চলিয়া গেল।

হাজারি ভাবিল—আহা, পুরোনো খদ্দের—ওকে এক থাল ভাত দিলে কি ক্ষেতি হোত হোটেলের—আমি যদি কখনো হোটেল করি, খেতে এলে কাউকে ফেরাবো না—এতে আমার হোটেল উঠে যায় আর থাকে। একে তো ভাত বেচে পয়সা—তার ওপর খিদের সময় লোককে ফেরাবো?

ট্রেনের প্যাসেঞ্জার খরিদ্দারগণ আসিয়া পড়িয়াছে। খাইবার ঘরে বেশ ভিড়। মতি চাকর আজ দশ-বারোটি লোক জুটাইয়া আনিয়াছে। পদ্ম আসিয়া বলিল—দশ থালা ভাত বাড়ো—দু'থালা নিরিমিস্যি। আলুর ডাল্‌না দিও।

আধঘণ্টা পরে মুর্শিদাবাদ ট্রেনের খরিদ্দার বিদায় হইলে, অপ্রত্যাশিত ভাবে বনগাঁয়ের ট্রেনের সময় কতকগুলি লোক খাইতে আসিল। বেলা দেড়টা, এ সময় নূতন লোক প্রায়ই আসে না, পদ্ম ঝি যখন হাঁকিল, পাঁচ থালা ভাত ঠাকুর—হাজারি তাহাকে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিল—ডাল একেবারেই নেই—দু'জনের মত হবে কি না—

পদ্ম ঝি ডেকচির কাছে আসিয়া নীচু হইয়া দেখিয়া চাপা কণ্ঠে বলিল—ওমা, এ তো একেবারেই নেই বল্লে হয়! এখন খদ্দের খাওয়াবো কি দিয়ে? তোমার দোষ, যখন ডাল কমে আসচে, এখনও দু'খানা টেরেন্ বাকি, তখন একটু ফেন মিশিয়ে সাঁৎলে নিলে না কেন? কতবার তোমায় ব'লে দেওয়া হয়েছে! ফেন আছে?

হাজারি বলিল—আছে।

—আছে তো দু'বাটি ঢ্যাও ডালে ফেলে—দিয়ে একটু নুন দিয়ে গরম ক'রে নাও। হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখচো কি?

হাজারি এ ধরনের কাজ কখনো করে নাই। করিতে তাহার বাধে। সে সত্যই ভাল রাঁধুনী। ইচ্ছা করিয়া হাতের ভাল রান্নাটা নষ্ট করিতে বা এভাবে খরিদ্দার ঠকাইতে তাহার মন সরে না। কিন্তু পদ্ম ঝির হুকুম না মানিয়া উপায় কি? বাধ্য হইয়া ডালে ফেন মিশাইয়া খরিদ্দার বিদায় করিতে হইল।

ছুটি পাইল সেদিন প্রায় বেলা আড়াইটায়।

একটুখানি গড়াইয়া লইয়া রোদ একটু পড়িয়া আসিলে সে চুর্ণীনদীর তীরে তাহার অভ্যাসমত বেড়াইতে চলিল। আজ ক'দিন নদীর ধারে যায় নাই—আর সেই পরিচিত নির্জ্জন নিমগাছটার তলায় বসিয়া গাছের গুঁড়ি ঠেস্ দিয়া ওপারের খেয়াঘাটের দিকে এবং শান্তিপুর যাইবার রাস্তার দিকে চাহিয়া থাকে নাই। বেশ লাগে জায়গাটা।

আর ওখানে গিয়া বসিলেই হাজারির মাথায় হোটেল সংক্রান্ত নানা রকম নতুন কথা আসে, অন্য কোথাও তেমন হয় না।

আজ জায়গাটাতে গিয়া বসিতেই হাজারির প্রথমে মনে হইল, হোটেল চলে রান্নার গুণে। যাহারা পয়সা দিয়া খাইতে আসিবে, তাহারা চায় ভাল জিনিস খাইতে—ফেন-মিশানো ডাল খাইতে তারা আসে না।

পদ্ম ঝিয়ের অনাচারের দরুন বেচু চক্কত্তির হোটেল উঠিয়া যাইবে। তাহার নিজের হোটেল ততদিনে খোলা হইয়া যাইবে। তাহার রান্নার গুণেই হোটেল চলিবে। হঠাৎ হাজারি লক্ষ্য করিল, যতীশ ভট্চাজ্, চূর্ণীর খেয়াঘাটে দাঁড়াইয়া আছে। বোধ হয় পার হইয়া ওপারে যাইবে।

—ও ভট্চাজ্ মশায়—ভট্চাজ্ মশায়—

যতীশ চাহিয়া দেখিয়া উঠিয়া হাজারির কাছে আসিল।

—কোথায় যাবেন ?

—যাচ্ছি একটু ফুলে-নব্লা, আমার ভায়রাভাই থাকে, তারই ওখানে। দেখলে তো হাজারি তোমাদের চক্কত্তি মশায়ের কাণ্ডটা আজ! বলি টাকা কি আমি দিতাম না? দুপুরবেলা না খাইয়ে কি-না বল্লে অন্য জায়গায় চেষ্টা করুন গিয়ে। ভাত-বেচা বামুন যদি ছোটলোক না হয়, তবে আর কে হবে! বিড়ি আছে? দাও তো একটা—

হাজারি নিকট হইতে বিড়ি লইয়া ধরাইয়া বলিল—দুশো ঝাঁটা মারি শহরের মাথায়। আর থাকচি নে। যাচ্ছি ফুলে-নব্লা, আমার বড় ভায়রাভাই পার্ব্বতী চক্কত্তি সেখানে একজন নাম-করা লোক। পার্ব্বতী দাদা একবার বলেছিল ওদের জমিদারী কাছারীতে একটা চাকরি ক'রে দেবে। পালচৌধুরীদের জমিদারী। মস্ত কাছারী। সেখানেই যাচ্ছি। একটা হিল্লে হয়ে যাবেই।

হাজারি বলিল—একটা কথা বলি ভট্চাজ্ মশাই, যদি কিছু মনে না করেন—

যতীশ ভট্চাজ্ বলিল—কি ?—টাকাকড়ি এখন কিছু নেই আমার কাছে তা বলে দিচ্ছি। তবে দেনা আমি রাখবো না—খাওয়ার টাকা আগে শোধ দিয়ে তখন অন্য কথা। সে তুমি বলে দিও চক্কত্তি মশাইকে।

হাজারি বলিল—টাকাকড়ির কথা বলিনি। বলছিলাম, আপনি আহার করেচেন ?

যতীশ ভট্চাজ্ কিছুমাত্র না ভাবিয়া সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিল—না। কোথায় করবো ? অত বেলায় চক্কত্তি মশায়ের হোটেল থেকে ফিরে আর ভাত কে আমার জন্যে নিয়ে বসে ছিল ?

হাজারি খপ্ করিয়া যতীশ ভট্চাজের ডান হাতখানা ধরিয়া বলিল—আমার সঙ্গে চলুন ভট্চাজ্ মশায়—আমি আপনাকে রেঁধে খাওয়াবো আজ। আসুন আমার সঙ্গে—

যতীশ ভট্চাজ্ বলিল—কোথায় ? কোথায় ? আরে না, না হাজারি, আজ ও-সব থাক্, আমি জল-টল খেয়ে—আর এমন অবেলায়—

হাজারি নাছোড়বান্দা। তাদের হোটেলের একজন পুরানো খদ্দের আজ পয়সা নাই

বলিয়া সারাদিন অনাহারে থাকিয়া রাণাঘাট হইতে চলিয়া যাইতেছে—কি জানি কেন, এ ব্যাপারটার জন্য হাজারি যেন নিজেকেই দায়ী করিয়া বসিল।

যতীশ ভট্চাজ্ বলিল—আমি তোমাদের হোটেলে আর যাবো না কিন্তু হাজারি। আচ্ছা তুমি যখন ছাড়চো না তখন বরং একটু জল-টল খাওয়াও।

—হোটেলে নিয়েই বা যাবো কেন? আসুন না জল-টল নয়, ভাত খাওয়াবো রেঁধে। যতীশ ভট্চাজ্ ব্যস্ত হইয়া বলিল, না না, ফুলে-নব্লা যেতে পারবো না আজ তাহলে। আজ সেখানে পৌঁছুতেই হবে।

নিকটেই কুসুমের বাড়ী, একবার হাজারি ভাবিল ভট্চাজ্‌কে সেখানে লইয়া যাইবে কি না। শেষে ভাবিয়া-চিন্তিয়া তাহাই করিল। ভদ্রলোককে নতুবা কোথায় বসাইয়া সে খাওয়ায়?

কুসুমের বাড়ীর দোরে কড়া নাড়িতেই কুসুম আসিয়া দোর খুলিয়া হাজারিকে দেখিয়া হাসিমুখে কি বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ যতীশ ভট্চাজের দিকে দৃষ্টি পড়ায় সে লজ্জিত হইয়া নীচুস্বরে বলিল—বাবাঠাকুর কি মনে করে? উনি কে সঙ্গে?

—ওঁর জন্যেই আসা। উনি বামুন মানুষ, আজ সারাদিন খাওয়া হয়নি। আমার চেনাশুনা—আমাদের হোটেলের পুরোনো খদ্দের। পয়সা ছিল না ব'লে খেতে দেয়নি কর্তামশাই। উনি না খেয়ে শান্তিপুর চলে যাচ্ছিলেন, আমার সঙ্গে দেখা—ধরে আনলুম। ওঁকে কিছু না খাইয়ে তো ছেড়ে দেওয়া যায় না। বাইরের ঘরটা খুলে দাও গিয়ে—

কুসুম ব্যস্ত হইয়া বাহিরের ঘরের দোর খুলিতে গেল। যতীশ ভট্চাজ্ কিছু দূরে দাঁড়াইয়া ছিল—হাজারি তাহাকে ডাক দিয়া বাহিরের ঘরে বসাইল। তাহার পর বাড়ীর ভিতর যাইতেই কুসুম উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলিল—কি করবেন বাবাঠাকুর, রান্না করবেন? সব যোগাড় ক'রে দিই! আর ততক্ষণ ঘরে যা-কিছু আছে, ও বাবাঠাকুরকে দিই, কি বলেন?

হাজারি বলিল—রান্না ক'রে খাওয়াতে গেলে চলবে না কুসুম। উনি থাকতে পারবেন না; ফুলে-নব্লা যাবেন। আমি বাজার থেকে খাবার কিনে আনি—এখানে একটু বসবার জন্যে নিয়ে এলাম।

কুসুম হাসিয়া বলিল—বাবাঠাকুর, আপনি ব্যস্ত হবেন না দিকিনি। আমি সব যোগাড় করচি জলখাবারের। আমার ঘরে সব আছে, ঘরে থাকতে বাজারে যাবেন খাবার আনতে কেন? আমার বাড়ীতে যখন ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলো পড়েচে, তখন আমার ঘরে যা আছে তাই দিয়ে খেতে দেব—কিন্তু বাবাঠাকুর, সেই সঙ্গে আপনিও—মনে থাকে যেন। হাজারি প্রতিবাদ-বাক্য উচ্চারণ করবার পূর্ব্বেই কুসুম ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল—অগত্যা হাজারি বাহিরের ঘরে যতীশ ভট্চাজের কাছে ফিরিয়া আসিল।

যতীশ ভট্চাজ্ বলিল—তোমার কোনো আত্মীয়ের বাড়ী নাকি হে?

—না, আত্মীয় নয়, এরা হোল ঘোষ-গোয়ালা। এই বাড়ীতে আমার ধর্ম্মমেয়ের বিয়ে হয়েছে, ওই যে দোর খুলে দিলে, ওই মেয়েটি!

পনেরো মিনিট আন্দাজ পরে ঝন্ ঝন্ করিয়া শিকল নড়িয়া উঠিতে হাজারি বাহিরের বাড়ীর অন্দরের দিকে দাওয়ায় গিয়া দাঁড়াইল—দাঁড়াইয়া দাওয়ার দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া গেল। দু'খানি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আসন পাতা—দু'বাটি জ্বাল দেওয়া দুধ, দুখানা থালে ফল-মূল কাটা, বড় বাতাসা, ছানা, দুটি মুখ-কাটা ডাব। ঝক্‌ঝকে করিয়া মাজা দুটি কাঁসার গ্লাসে দু'গ্লাস জল।

হাসিমুখে কুসুম বলিল—ওঁকে ডাকুন, সেবা করতে বলুন। যা বাড়ীতে ছিল একটু মুখে দিয়ে নিন্ দু'জনে।

—তা তো হোল—কিন্তু আমি আবার কেন হুকুম?

—মেয়ের বাড়ী যে—না খেয়ে যাবার কি জো আছে? ডাকুন ওঁকে।

যতীশ ভট্‌চাজ্ খাইতে বসিয়া যেরূপ গোগ্রাসে খাইতে লাগিল, দেখিয়া মনে হইল, সে বড়ই ক্ষুধার্ত্ত ছিল। তাহার থালায় একটুও কিছু পড়িয়া রহিল না। কুসুম পান সাজিয়া বাহিরের ঘরে পাঠাইয়া দিল, খাওয়ার পরে। যতীশ ভট্‌চাজ্ বিদায় লইবার সময় বলিল—তোমার মেয়েটিকে একবার ডাকো হাজারি, আশীর্ব্বাদ করে যাই।

কুসুম আসিয়া গলায় কাপড় দিয়া দু'জনকেই প্রণাম করিল। যতীশ ভট্‌চাজ্ বলিল—মা শোনো, সারাদিন সত্যিই খাইনি। ভারি তৃপ্তির সঙ্গে খেলাম তোমার এখানে। তুমি বড় ভাল মেয়ে, ছেলেপিলে নিয়ে সুখে থাকো, আশীর্ব্বাদ করি।

হাজারি যতীশ ভট্‌চাজের সঙ্গে চলিয়া আসিল।

পথে আসিয়া বলিল—ভট্‌চাজ্‌মশাই, একটা হোটেল নিজে খুলবো অনেক দিন থেকে ইচ্ছে আছে। আপনি কি বলেন?

—অনায়াসে করতে পারো। খুব লাভের জিনিস—তোমার হবেও। তোমার মনটা বড় ভালো। কিন্তু পয়সা পাবে কোথায়?

—তাই নিয়েই তো গোলমাল। নইলে এতদিন খুলে দিতাম—দেখি, চেষ্টায় আছি—ছাড়চি নে—ওই যে আমার মেয়ে দেখলেন, ওই কুসুম, ও একবার টাকা দিতে চেয়েছিল। তা কি নেওয়া ভাল? ও গরীব বেওয়া লোক, কেন ওর সামান্য পুঁজি নিতে যাবো? তাই নিই নি। নিলে ও এখুনি দেয়—তবে সে টাকা খুব সামান্য। তাতে হোটেল খোলা হবে না।

যতীশ ভট্‌চাজ্ চূর্ণীর খেয়ার ধারে আসিয়া বলিল—আচ্ছা, চলি হাজারি—তুমি হোটেল খুললে তোমার হোটেলে আমি বাঁধা খদ্দের থাকবো, সে তুমি ধরে নিতে পারো। আর কোথাও যাবো না—তোমার মত রান্না ক'টা ঠাকুর রাঁধতে পারে হে? বেচু চক্কত্তির হোটেলে আমি যে যেতাম শুধু তোমার নিরামিষ রান্না খাওয়ার লোভে! ভাল চলবে তোমার হোটেল। এদিগরে তোমার মত রাঁধতে পারে না কেউ, বলে যাচ্ছি।

যতীশ ভট্‌চাজ্ তো চলিয়া গেল, কিন্তু হাজারির মনে তাহার শেষ কথাগুলি একটা খুব বড় বল ও প্রেরণা দিয়া গেল।

সে জানে, তাহার হাতের রান্না ভাল—কিন্তু খরিদ্দারের মুখে সে কথা শুনিলে তবে না তৃপ্তি। ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণকে খাওয়াইয়াছিল বটে—কিন্তু সে যাইবার সময় যাহা দিয়া গেল হাজারির মনের আনন্দ ও উৎসাহের দিক দিয়া দেখিতে গেলে তাহা খুব মূল্যবান ও সার্থক প্রতিদান।

হাজারি যখন হোটেলে ফিরিল, তখন বেলা বেশী নাই। রতন ঠাকুর ডাল-ভাত চাপাইয়া দিয়াছে, মতি চাকর বা পদ্ম ঝি কেহই নাই। গদির ঘরে বেচু চক্কত্তি কাহাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতেছিল।

হোটেলের রান্নাঘরে ঢুকিলে কিন্তু হাজারির মনে নতুন বলের সঞ্চার হয়। বরং ছুটি পাইয়া বাহিরে গেলেই যত দুর্ভাবনা আসিয়া জোটে—প্রকাণ্ড উনুনের উপরে ফুটন্ত ডেকচির সামনে বসিয়া হাজারি নিজেকে বিজয়ী বীরের মত কল্পনা করে। তখন না মনে থাকে কুসুমের কথা, না মনে থাকে অন্য কোনো কিছু। অবসাদ আসে কাজ হাতে না থাকিলে, এ বরাবর দেখিয়া আসিতেছে সে।

ইতিমধ্যে রতন ঠাকুর ফিরিল।

হাজারিকে চুপি চুপি বলিল—একটি কথা আছে। আমার দেশের একজন লোক এসেছে—আমার কাছে থেকে চাকরি খুঁজবে। বড় গরীব—তাকে বিনি টিকিটে খাওয়ার ঘরে ঢুকিয়ে খেতে দিতে হবে। তোমার যদি মত হয়, তবে তাকে বলি।

হাজারি বলিল—নিয়ে এসো, তার আর কি। গরীব মানুষ খাবে, আমার কোনো অমত নেই। রতন ঠাকুর খুব খুশী হইয়া চলিয়া গেল। রাত্রে তাহার লোক যখন খাইতে আসিল, রতন ঠাকুর হাজারিকে ডাকিয়া ইঙ্গিতে লোকটাকে চিনাইয়া দিতে, হাজারি পরিতোষ করিয়া তাহাকে খাওয়াইল।

পদ্ম ঝিয়ের অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া লোকটা বিনা টিকিটে খাইয়া চলিয়া গেল—কেহ কিছু ধরিতেও পারিল না।

এই রকম চলিল, এক-আধ দিন নয়, দশ-বারো দিন! একদিন আবার তাহার অন্য এক সঙ্গী জুটাইয়া আনিয়াছে, তাহাকে বিনামূল্যে খাইতে দিতে হইল।

ব্যাপারটি সামান্য, হাজারি কিন্তু একটা প্রকাণ্ড শিক্ষা পাইল ইহা হইতে। এত সতর্ক ব্যবস্থার মধ্যেও চুরি তো বেশ চলে! বেচু চক্কত্তির টিকিট ও পয়সাতে ঠিক মিল আছে, সুতরাং তাঁর দিক দিয়া সন্দেহের কোন কারণ নাই—পদ্ম ঝি যে পদ্ম ঝি, সে পর্য্যন্ত বিন্দুবিসর্গ জানিল না ব্যাপারটার। ভাত তরকারি কিছু মাপ থাকে না যে কম পড়িবে। সুতরাং কে ধরিতেছে? কেন? এ ধরনের চুরি ধরিবার কি উপায় নাই কোনো?

কয়দিন ধরিয়া হাজারি চূর্ণীর ঘাটে নির্জ্জনে বসিয়া শুধু এই কথা ভাবে। ঠাকুরে ঠাকুরে ষড়যন্ত্র করিয়া যদি বাহিরের লোক ঢুকাইয়া খাওয়ায়, তবে সে চুরি ধরিবার উপায় কি? অনেক ভাবিয়া একটা উপায় তাহার মাথায় আসিল একদিন বিকালে। থালায়

নম্বর যদি দেওয়া থাকে, আর টিকিটের নম্বরের সঙ্গে যদি তার মিল থাকে, তবে থালা এঁটো হইলেই ধরা পড়িবে অমুক নম্বরের থালার খদ্দের বিনা টিকিটে খাইয়াছে—না পয়সা দিয়া খাইয়াছে।

মাঝে মাঝে তদারক করিলেই জিনিসটা ধরা পড়িবে। তা ছাড়া থালা মাজিবার সময় ঝি বা চাকরের নিকট হইতে এঁটো থালার নম্বরগুলি জানিয়া লইলেই হইবে।

হাজারি খুব খুশী হইল। ঠিক বাহির করিয়াছে বটে—একটা ফাঁক অবিশ্যি আছে, সেও জানে—যদি কলাপাতায় খাইতে দেওয়া হয়। যদি বিনা নম্বরী থালা সেই লোকটা বাহির হইতে আনে—তাহাতে নিস্তার নাই, কারণ ঝি-চাকরের চোখে তখনই ধরা পড়িবে। এঁটো থালা সেই লোকটা কিছু মাজিতে বসিতে পারে না হোটেলের মধ্যেই। কলার পাতায় কেহ খাইতেছে, ইহা চোখে পড়িলে তখনি ঝি-চাকরে সন্দেহ করিবে বলিয়া হঠাৎ কেহ সাহস করিবে না কাহাকেও পাতায় ভাত দিতে।

দুশো-আড়াইশো টাকা যদি যোগাড় করা যায়, তবে এই রেলবাজারেই আপাততঃ হোটেল খুলিয়া দেওয়া যায়। টাকা দেয় কে?

যতীশ ভট্চাজের কথা তাহার মনে পড়িল।

বেচারী বড় কষ্টে পড়িয়াছে! শেষে কিনা ভায়রাভাইয়ের বাড়ী চলিয়াছে আশ্রয় প্রার্থনা করিতে! লোকে কি সোজা কষ্ট পাইলে তবে কুটুম্বস্থানে যায় চাকুরির উমেদার হইয়া!

যদি সে হোটেল খোলে, যতীশ ভট্চাজ্‌কে আনিয়া রাখিবে। বৃদ্ধ মানুষ, দুটি করিয়া খাইতে পারিবে আর কিছু হাত খরচ মিলিবে। ইহার বেশী তাহার আর কিসেরই বা দরকার।

প্রতিদিনের মত আজও বেলা পড়িয়া আসিল। গত দু'বৎসর যেরূপ হইয়া আসিতেছে। সেই একই ঘোড়ানিম গাছ, সেই একই চূর্ণীর খেয়াঘাট, পালেদের সেই একই কয়লার ডিপোতে মুটে ও সরকার বাবুর সঙ্গে ঝগড়া চলিতেছে—সবই পুরাতন।

দিন যায়, কিন্তু তাহার সাধ পূর্ণ হইবার তো কোনো লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। বরং দিন দিন আরও ক্রমে অবস্থা খারাপের দিকেই চলিয়াছে।

সামান্য মাইনে হোটেলের—কি হইবে ইহাতে? বাড়ীতে টেঁপিকে একখানা ভাল শখের কাপড় দেওয়া যায় না, পেট পুরিয়া খাইতে দেওয়া যায় না।

টেঁপির মা গরীব ঘরের মেয়ে। যেমন বাপের বাড়ীতে কখনও সুখের মুখ দেখে নাই, স্বামীর ঘরে আসিয়াও তাই। সংসারে গভীর খাটুনি খাটিয়া ছেলেমেয়ে মানুষ করিতেছে—মুখ ফুটিয়া কোনোদিন স্বামীর কাছে কোনো আদর-আবদার করে নাই—ছেঁড়া কাপড় সেলাই করিয়া পরিতেছে, আধপেটা খাইয়া নিজে, ছেলেমেয়েদের জন্য দু-মুঠা বেশী ভাত জল দিয়া রাখিয়া দিতেছে হাঁড়িতে, তাহারা সকাল বেলা খাইবে। কখনো কোনোদিন সেজন্য বিরক্তি প্রকাশ করে নাই, অদৃষ্টকে নিন্দা করে নাই।

হাজারি সব বোঝে।

তাই তো সে আজকাল সর্ব্বদা একমনে উপায় চিন্তা করে—কি করিয়া সংসারের উন্নতি করা যায়। চক্কত্তি মশায়ের হোটেলে রাঁধুনীবৃত্তি করিলে কখনও যে উন্নতি করা যাইবে না। আর পদ্ম ঝির ঝাঁটা খাইয়া মাঝে পড়িয়া হাড় কালি হইয়া যাইবে।

ভগবান যদি দিন দেন, তবে তাহার আজীবনের সংকল্প সে কার্য্যে পরিণত করিবে। হোটেল একখানা খুলিবে।

কুসুমের সঙ্গে এই যে আলাপ হইয়াছে, হাজারি এটাকে পরম সৌভাগ্য বলিয়া মনে করে। কুসুম চমৎকার মেয়ে—প্রবাস-জীবনে কুসুমের সাহচর্য্য, তাহার মধুর ব্যবহার—হোক্ না সে গোয়ালার মেয়ে—কিন্তু বড় ভাল লাগে, আরও ভাল লাগে এইজন্যে যে ঠিক কুসুমের মত স্নেহ-প্রবণ কোনো আত্মীয়া মেয়ের সংস্পর্শে সে কখনও আসে নাই।

অনেকখানি যে নির্ভর করা যায় কুসুমের ওপর। সব বিষয়ে নির্ভর করা যায়। মনে হয়, এ কাজের ভার কুসুমের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, সে প্রতারণা করিবে তো নাই-ই, বরং প্রাণপণ-যত্নে কাজ উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিবে, যেমন আপনার লোকে করিয়া থাকে।

হাজারি যদি নিজের দিন ফিরাইতে পারে, তবে কুসুমের দিনও সে অমন রাখিবে না।

টেঁপিও তার মেয়ে, কিন্তু টেঁপি বালিকা, কুসুম বুদ্ধিমতী। ও যেন তার বড় মেয়ে—যে বাপের দুঃখকষ্ট সব বোঝে এবং বুঝিয়া তাহা দূর করিবার চেষ্টা করে। মন-প্রাণ দিয়া চেষ্টা করে। মেয়েও বটে, বন্ধুও বটে।

সকালে সেদিন রতন ঠাকুর আসিল না।

পদ্ম ঝি আসিয়া বলিল, ও-ঠাকুর আজ আর আসবে না, কাল ব'লে গিয়েচে; তরকারীগুলো তুমি কুটে নাও, নিয়ে রান্না চাপিয়ে দাও, আমি আঁচ দিয়ে দিচ্চি।

হাজারি প্রমাদ গণিল। আজ হাটবার, দুপুরে অন্ততঃ একশো দেড়শো হাটুরে খরিদ্দার খাইবে; একহাতে তাহাদের রান্না করা এবং খাওয়ানো সোজা কথা নয়।

পদ্ম ঝিয়ের কথামত সে বঁটি পাতিয়া তরকারি কুটিতে বসিয়া গেল—বেলা সাড়ে-আটটার সময় সবে ডাল-ভাত নামিয়াছে—এমন সময় একজন খরিদ্দার টিকিট লইয়া খাইতে আসিল।

হাজারি বলিল—আজ্ঞে বাবু, সবে ডাল-ভাত নেমেছে, কি দিয়ে খাবেন?

লোকটি রাগিয়া বলিল—ন'টা বেজেচে, মোটে ডাল-ভাত? কি রকম ঠাকুর তুমি? যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলে এতক্ষণ তিনটে তরকারি হয়ে গিয়েচে। এ রকম করলেই তোমাদের হোটেল চলেচে?

হাজারি বলিল—ন'টা তো বাজেনি বাবু, সাড়ে-আটটা।

লোকটার মেজাজ রুক্ষ ধরনের। বলিল—আমি বলচি ন'টা, তুমি বলচো সাড়ে-আটটা! আবার মুখে মুখে তর্ক? আমি ঘড়ি দেখতে জানিনে?

—সে কথা তো হয় নি বাবু। ঘড়ি কেন দেখতে জানবেন না, আপনারা বড় লোক। কিন্তু ন'টা বাজলে কেষ্টনগরের গাড়ী আসে। সে গাড়ী তো এখনো আসে নি?

—আবার তর্ক? এক চড় মারবো গালে—

বোধ হয় লোকটা মারিয়াই বসিত, ঠিক সেই সময় পদ্ম ঝি গোলমাল শুনিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বলিল—কি হয়েছে বাবু?

লোকটা পদ্ম ঝিয়ের দিকে ফিরিয়া বলিল—তোমাদের এই অসভ্য ঠাকুরটা আমার সঙ্গে মুখোমুখি তর্ক করচে, কি জানোয়ার। হোটেলের রাঁধুনীগিরি করতে এসে আবার লম্বা লম্বা কথা, আজ দিতাম তোমাকে একটি চড় কষিয়ে, টের পেতে তুমি মজা—

পদ্ম ঝি বলিল—যাক বাবু, আপনি ক্ষ্যামা দেন। ওর কথায় চট্‌লে কি চলে? আসুন, আপনি খাবেন এখানে।

—খাবো কি, তোমাদের ঠাকুর বলচে এখনও কিছু রান্না হয় নি। তাই বলতে গেলাম তো আমার সঙ্গে তর্ক। রান্না হয় নি তো টিকিট বিক্রি করেছিলে কেন তোমরা? দেখাবো তোমাদের মজা! যত বদমায়েশ সব।

পদ্ম ঝি ঝাঁজের সহিত বলিল—ঠাকুর, তুমি কি রকম মানুষ? বাবুর সঙ্গে মুখোমুখি তক্কো করা তোমার কি দরকার ছিল? রান্না কেনই বা হয় না। যা হয়েচে তাই দিয়ে ভাত দাও, আর মাছ ভেজে দাও। যান বাবু আপনি গিয়ে বসুন।

খানিক পরে লোকটা খাওয়া ফেলিয়া বলিল—মাছটা একেবারে পচা। রামো রামো, কেন মরতে এ হোটেলে খেতে এসেছিলুম—ছি ছি—এই ঠাকুর এদিকে এসো—

পদ্ম ঝি হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিল—কি হয়েছে বাবু, কি হয়েছে?

—কি হয়েচে? যত সব ন্যাকামি? মাছ একদম পচা, লোকজনকে মারবার মতলব তোমাদের—না? আজই রিপোর্ট করে দিচ্ছি তোমাদের নামে—

রিপোর্টের কথা শুনিয়া পদ্ম ঝির মুখ শুকাইয়া গেল; সে তাড়াতাড়ি বলিল—বাবু, আপনার পায়ে পড়ি বসুন, না খেয়ে উঠবেন না, আমি দই এনে দিচ্চি। একদিন যা হয়ে গিয়েচে ক্ষ্যামা ঘেন্না করে নিন বড় বাবু।

সে তাড়াতাড়ি দই ও বাতাসা আনিয়া দিল। লোকটি খাইয়া উঠিয়া যাইবার সময় বেচু চক্কত্তি বিনীতস্বরে নিতান্ত কাঁচুমাচু হইয়া বলিল, বাবু একটা কথা আছে, আপনার টিকিটের পয়সাটা ত নিতে পারি নে। আপনার খাওয়াই হোল না। পয়সা ক'আনা আপনি নিয়ে যান।

লোকটা বলিল—না না থাক্। পয়সা দিতে হবে না ফেরত—কিন্তু এরকম আর যেন কখনও না হয়।

বেচু চক্কত্তি জোর করিয়া লোকটার হাতে পয়সা কয়েক আনা গুঁজিয়া দিল।

একটু পরে গদির ঘরে হাজারি ঠাকুরের ডাক পড়িল। হাজারি গিয়া দেখিল সেখানে পদ্ম ঝি দাঁড়াইয়া আছে।

বেচু চক্কত্তি বলিল—ঠাকুর, খদ্দেরদের সঙ্গে ঝগড়া করতে কদ্দিন শিখেচ?

হাজারি অবাক হইয়া বলিল—ঝগড়া? কার সঙ্গে ঝগড়া করলাম বাবু?

পদ্ম ঝি বলিল—ঝগড়া করেছিলে না তুমি ওই বাবুর সঙ্গে? সে মুখোমুখি তক্কো কি! বাবু তো চড় মারবেনই! আমি গিয়ে না পড়লে দিত কষিয়ে দু-চার ঘা। আগে কি বলেচে না বলেচে আমি তো শুনি নি, গিয়ে দেখি বাবু রেগে লাল হয়ে গিয়েচেন। ওর কি কাণ্ডজ্ঞান আছে? তখনও সমানে ঝগড়া চালাচ্চে—

বেচু চক্কত্তি বলিল—খদ্দের যাই কেন বলুক না তাই শুনে যেতে হবে, এ তুমি-বুড়ো হয়ে মরতে চল্লে, আজও শিখলে না তুমি?

—বাবু, আপনি শুনে বিচার করুন। ঝগড়া তো আমি করি নি—উনি বল্লেন ন'টা বেজেচে, আমি বল্লাম সাড়ে-আটটা বেজেচে, এই উনি আমায় বল্লেন, আমি কি ঘড়ি দেখতে জানিনে?

পদ্ম ঝি বলিল—তোমার সব মিথ্যে কথা ঠাকুর। ও কথায় কখনো ভদ্দর লোক চটে না। তুমি বেয়াদপের মত তক্কো করেচো তাই বাবু চটে গিয়েচেন। আমি গিয়ে স্বকর্ণে শুনিচি তুমি যা তা বলচো।

অবশ্য এখানে পদ্ম ঝিয়ের উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই চলিতে পারে না, এ কথা হাজারি ভাল করিয়া জানিত। বেচু চক্কত্তি মহাশয় কাহারও কথা শুনিবেন না, পদ্ম ঝি যাহা বলিবে তাহাই ধ্রুব সত্য বলিয়া মানিয়া লইবেনই। সে অগত্যা চুপ করিয়া রহিল।

বেচু চক্কত্তি বলিল—পচা মাছ কে এনেছিল?

হাজারি উত্তর দেবার পূর্ব্বেই পদ্ম ঝি বলিল—ওই গিয়েছিল বাজারে। ওই এনেচে।

হাজারি বিস্ময়ে কাঠ হইয়া গেল। কি সর্ব্বনেশে মিথ্যে কথা! পদ্ম ঝি খুব ভাল করিয়াই জানে, কাল রাত্রে প্রায় দেড়পোয়া আন্দাজ পোনা মাছ উদ্বৃত্ত হইলে, পদ্ম ঝি-ই তাহাকে বলিয়াছিল, মাছগুলা ঢাকিয়া রাখিতে এবং পরদিন কড়া করিয়া আর একবার ভাজিয়া লইয়া মাছের ঝাল করিতে; তাহা হইলে খরিদ্দার টের পাইবে না যে মাছটা বাসি। বাসি মাছ ভাজা সে খরিদ্দারকে দিতে যায় নাই, পদ্ম ঝি নিজেই ভাজা মাছ দিবার কথা বলিয়াছিল!

কিন্তু এ সব কথা বেচু চক্কত্তিকে বলিয়া কোন লাভ নাই।

বেচু চক্কত্তি বলিল—তোমার আট-আনা জরিমানা হোল। মাইনের সময় কাটা যাবে—যাও।

হাজারি রান্নাঘরে ফিরিয়া আসিল—কিন্তু তাহার চোখ দিয়া যেন জল বাহির হইয়া আসিতে চাহিতেছিল, কি অসহ্য অবিচার! সে বাজারে গিয়াছিল ইহা সত্য, মাছ কিনিয়াছিল তাহাও সত্য, কিন্তু সে মাছ পচা নয়, সে মাছ খরিদ্দারের পাতে দেওয়াই হয় নাই! অথচ পদ্ম ঝি দিব্য তাহার ঘাড়ে সব দোষ চাপাইয়া দিল, আর সেই মিথ্যা অপরাধে তাহার হইল জরিমানা।

পদ্ম দিদি তাহার সঙ্গে যে কেন এমন করিয়া লাগে—কি করিয়াছে সে পদ্ম দিদির?

রতন ঠাকুর আজ নাই, খাটুনি সবই তাহার ওপর। আট-দশজন লোক ইতিমধ্যে টিকিট কিনিয়া খাবার ঘরে ঢুকিল, চাকরে জায়গা করিয়া দিল। হাজারি তাড়াতাড়ি আলু ভাজিয়া

ইহাদের ভাত দিল। তাহারা খুব গোলমাল করিতে লাগিল, শুধু আলুভাজা আর ডাল দিয়া খাওয়া যায়? ইহারা সকলেই রেলের যাত্রী। স্টেশন হইতে তাহাদের হোটেলের চাকর বলিয়া আনিয়াছে যে একমাত্র তাহাদেরই হোটেলে এত সকালে সব হইয়া গিয়াছে—মাছের ঝোল, অম্বল পর্য্যন্ত। এখন দেখা যাইতেছে যে ডাল আর আলুভাজা ছাড়া আর কিছুই হয় নাই, এ কি অন্যায়—ইত্যাদি।

পদ্ম ঝি দরজার কাছে মুখ বাড়াইয়া বলিল—ও ঠাকুর, দাও না মাছ ভেজে, বাবুরা বলচেন শুনতে পাও না? বাবুরা খাবেন কি দিয়ে?

অর্থাৎ সেই পচা মাছ ভাজা আবার দাও। আজকার মাছ এখনও কোটা হয় নাই পদ্ম তাহা জানে।

হাজারি ঠাকুর কিন্তু পচা মাছ আর খরিদ্দারদের পাতে দিবে না। সে বলিল—ভাজা মাছ আর নেই। যা ছিল ফুরিয়ে গিয়েচে।

পদ্ম ঝি বলিল—তবে একটু বসুন বাবুরা, একখানা তরকারী করে দিচ্চে, বসুন আপনারা, উঠবেন না।

শিক্ষামত মতি চাকর আসিয়া বলিল—ও ঠাকুর, বনগাঁয়ের গাড়ী আসবার যে সময় হোল, রান্নাবান্না কিছু হোল না এখন? ঘণ্টা পড়ে গিয়েচে যে।

খরিদ্দারেরা ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া উঠিল। ইহারাও সেই গাড়ীতে কৃষ্ণনগরে যাইবে! একজন বলিল—ঘণ্টা পড়ে গিয়েচে?

মতি চাকর বলিল—হ্যাঁ বাবু, অনেকক্ষণ। গাড়ী গাংনাপুর ছেড়েচে—এল বলে।

মাছভাজা খাওয়া মাথায় থাকুক—তাহারা তাড়াতাড়ি উঠিতে পারিলে বাঁচে। গাড়ী ফেল হইয়া গেলে অনেকক্ষণ আর গাড়ী নাই।

পদ্ম ঝি বলিল—আহা-হা উঠবেন না বাবুরা, ধীরে -সুস্থে খান। মাছ ভেজে দাও ঠাকুর, আমি তাড়াতাড়ি কুটে দিচ্চি। বসুন বাবুরা।

খরিদ্দারেরা উঠিয়া পড়িল—ধীরভাবে বসিয়া খাওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাহারা চলিয়া যাইতেই পদ্ম ঝি বলিল—যাক, এইবার মাছগুলো কুটি। এত সকালে কোন্ হোটেলে রান্না হয়েচে? ছ'খানা মাছের গাদা বেঁচে গেল।

এই জুয়াচুরিগুলা হাজারি পছন্দ করে না।

শুধু এখানে বলিয়া নয়, রেল বাজারের সব হোটেলেই এই ব্যাপার সে দেখিয়া আসিতেছে। খরিদ্দারকে খাওয়াইতে বসাইয়া দিয়া বলে—বাবু, গাড়ীর ঘণ্টা পড়ে গেল। খরিদ্দার আধ-পেটা খাইয়া উঠিয়া যায়, হোটেলের লাভ।

ছিঃ—ন্যায্য পয়সা গুনিয়া লইয়া এ কি জুয়াচুরি?

হাজারি ঠাকুর এতদিন এখানে কাজ করিতেছে, কখনো মুখ দিয়া একথা বাহির করে নাই যে ট্রেনের সময় হইয়া গেল।

অনেক সময় ট্রেনের সময় না হইলেও ইহারা মিথ্যা করিয়া ধুয়া তুলিয়া দেয়, যাহাতে

খরিদ্দার ব্যস্ত হইয়া পড়ে—অধিকাংশই পাড়াগেঁয়ে লোক, রেলের টাইমটেবিল মুখস্থ করিয়া তাহারা বসিয়া নাই, ইহাদের ধাঁধা লাগাইয়া দেওয়া কঠিন কাজ নয়।

মতি চাকরকে শিখানো আছে, সে সময় বুঝিয়া রেল গাড়ীর ধুয়া তুলিয়া দিবে—আজ পাঁচ-বছর হাজারি দেখিয়া আসিতেছে এই ব্যাপার।

নিজের হোটেল যখন সে খুলিবে ব্যবসাতে লাভ করিবার জন্য এসব হীন ও নীচ কৌশল সে অবলম্বন করিবে না। ন্যায্য পয়সা লইবে, ন্যায্যমত পেট ভরিয়া খাইতে দিবে। এই সব নিরীহ পল্লীবাসী রেলযাত্রীদের ঠকাইয়া পয়সা না লইলে যদি তাহার হোটেল না চলে, না হয় না-ই চলিল হোটেল।

ফাঁকি দেওয়া যায় না হাটুরে খরিদ্দারদের!

আজ মদনপুরের হাট—এখানকারও হাট। পাড়াগাঁ হইতে দুধ ও তরিতরকারী লইয়া বহুলোক আসে—তাহারা অনেকে এখানে খায়। বার বার যাতায়াত করিয়া তাহারা চালাক হইয়া গিয়াছে—মতি চাকর প্রথম প্রথম দু-একবার ইহাদের উপর কৌশল খাটাইতে গিয়া বেকুব বনিয়াছে।

তাহারা বলে—হোক্ হোক্ গাড়ীর ঘণ্টা, লাও তুমি। না হয় পরের গাড়ীডায় যাবানি। তা' বলে সারাদিন খাটবার পরে ভাত ফেলে তো উঠতি পারিনে? হ্যাদে লিয়ে এসো আর দু-হাতা ডাল—ও ঠাকুর—

হাটুরে লোকজন খাইতে আসিতে আরম্ভ করিল। বেলা একটা।

ইহাদের জন্য আলাদা বন্দোবস্ত। ইহারা চাষা লোক, খায় খুব বেশী! তা ছাড়া খুব শৌখীন রকমের খাদ্য না পাইলেও ইহাদের ক্ষতি নাই, কিন্তু পেট ভরা চাই।

সাধারণ বাবু-খরিদ্দারদের জন্য যে চাল রান্না হয়, ইহাদের সে চাল নয়। মোটা নাগ্‌রা চালের ভাত ইহাদের জন্য বরাদ্দ। ফেন মিশানো ডাল ও একটা চচ্চড়ি। ইহাদের সাধারণতঃ দেওয়া হয় চিংড়ি মাছ বা কুচা মাছ। পোনা মাছ ইহাদের দিয়া পারা যায় না। কুচো চিংড়ি কিছু বেশী দিতেও গায়ে লাগে না। ইহাদের মধ্যে অনেক সময় হাজারির নিজের গ্রামের লোকও থাকে—তাহাদের মুখে বাড়ীর খবর পাওয়া যায়, কিন্তু আজ তাহার স্বগ্রাম হইতে কেহ আসে নাই।

রতন ঠাকুর নাই—একা হাতে এতগুলি লোকের রান্না ও পরিবেশন করিয়া হাজারি নিতান্ত ক্লান্ত দেহে যখন খাইতে বসিবার যোগাড় করিতেছে তখন বেলা প্রায় তিনটার কম নয়। পদ্ম ঝি অনেকক্ষণ পূর্ব্বেই থালায় ভাত বাড়িয়া লইয়া চলিয়া গিয়াছে, বেচু চক্কত্তি গদিতে বসিয়া এবেলার ক্যাশ মিলাইতেছেন—এই সময় পাশের হোটেলের বংশীধর ঠাকুর আসিয়া বলিল—ও ভাই হাজারি, দুটো ভাত হবে?

বংশীধর মেদিনীপুর জেলার লোক, তবে বহুকাল রাণাঘাটে থাকায় কথার বিশেষ কোন টান লক্ষ্য করা যায় না। সে বলিল, আমার এক ভাগ্নে এসেচে হঠাৎ এখন এই তিনটের গাড়ীতে। আজ হাটবার, হাটুরে খদ্দেরদের দল সব খেয়ে গিয়েচে, আমাদের খাওয়াও

ঢুকেচে, তাই বলে দেখে আসি যদি—

হাজারি বলিল—হ্যাঁ হ্যাঁ পাঠিয়ে দ্যাও গিয়ে, ভাত যা আছে খুব হয়ে যাবে।

বংশীধরের ভাগিনেয় আসিল। চমৎকার চেহারা, আঠারো-উনিশের বেশী বয়স নয়। তাহাকে আসন করিয়া ভাত দিতে গিয়া হাজারি দেখিল ডেক্‌চিতে যা ভাত আছে, তাহাতে দু-জনের কুলায় না। বংশীধরের ভাগিনেয়টি পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যবান ছেলে, নিশ্চয়ই দুটি বেশী ভাত খায়—তাহারই পেট ভরিবে কিনা সন্দেহ।

হাজারি উহাকেই সব ভাতগুলি বাড়িয়া দিল—ডাল তরকারি যাহা ছিল তাহাও দিল, সে খাইতে খাইতে বলিল—মাছ নেই?

—না বাবা, মাছ সব ফুরিয়ে গিয়েচে। আজ এখানকার হাটবার, বড্ড খদ্দেরের ভিড়। মাছের টান, ডাল তরকারির টান, সবেরই টান। তোমার খাওয়ার বড্ড কষ্ট হোল বাবা, তা বোসো দু-পয়সার দই আনিয়ে দিই।

—না না থাক্, আপনার দই আনাতে হবে না।

—না বাবা বসো! বংশীধরের ভাগ্নে যা, আমার ভাগ্নেও তাই। পাশাপাশি হোটেল—এতদিন কাজ করচি।

হাজারি নিজে গিয়া দই আনিয়া দিল। ছেলেটি জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা মামা, এখানে কোন চাকুরি খালি আছে?

—কি চাকুরি বাবা?

—এই ধরুন হোটেলের রাধুনীগিরি কি এম্‌নি। কাজের চেষ্টায় ঘুরচি। এখানে কিছু হবে মামা?

মামা বলিয়া ডাকিতে ছেলেটির উপর হাজারির কেমন স্নেহ হইল। সে একটু ভাবিয়া বলিল—না বাবা, আমার সন্ধানে তো নেই, কিন্তু একটা কথা বলি। হোটেলের রাঁধুনীগিরি করতে যাবে কেন তুমি? দিব্যি সোনার চাঁদ ছেলে। এ লাইনে বড় কষ্ট, এ তোমাদের লাইন নয়। পড়াশুনা কদ্দূর করেচ?

ছেলেটি অপ্রতিভের সুরে বলিল—না মামা, বেশী করি নি। আমাদের গাঁয়ের ছাত্রবৃত্তি ইস্কুলের ফোর্থ ক্লাস পর্য্যন্ত পড়েছিলাম, তারপর বাবা মারা গেলেন, আর লেখাপড়া হোল না।

—তোমার নামটি কি?

—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

হঠাৎ একটা চিন্তা বিদ্যুতের মত হাজারির মনের মধ্যে খেলিয়া গেল, চমৎকার ছেলেটি, ইহার সঙ্গে টেঁপির বিবাহ দিলে বড় সুন্দর মানায়!···

কিন্তু তাহা কি ঘটিবে? ভগবান কি এমন পাত্র টেঁপির ভাগ্যে জুটাইয়া দিবেন!

ছেলেটি খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া বলিল—আপনার খাওয়া হয়েচে মামা?

—এইবার খেতে বসবো বাবা। আমাদের খাওয়া এইরকম। বেলা তিনটের এদ্দিকে বড় একটা মেটে না, সেইজন্যই তো বলচি বাবা এসব ছ্যাঁচ্‌ড়া লাইন, তোমাদের জন্যে নয়

এসব। রান্না কাজ বড় ঝঞ্ঝাটের কাজ।

ছেলেটি একটু হতাশ স্বরে বলিল—তবে কোন্ লাইন ধরবো বলুন মামা? কত জায়গায় ঘুরে বেড়িয়ে দেখলাম। আজ ছ'মাস ধরে ঘুরচি। কোথাও কিছু জোটাতে পারিনি। আপনি বলচেন রাঁধুনীর কাজ—কলকাতায় একটা হোটেলের বাইরে লেখা ছিল—দুজন চাকর চাই। আমি গিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করলাম, বল্লে—কি? আমি বল্লাম—চাকরের কাজ খালি আছে দেখে এসেচি। বল্লে—তুমি ভদ্রলোকের ছেলে, এ কাজ তোমার জন্যে নয়। কত করে বল্লাম, কিছুতেই নিলে না।

হাজারি অবাক হইয়া শুনিতেছিল। বলিল—বলো কি?

—তারপর শুনুন। কোথাও চাকুরি জোটে না। কলকাতায় শেষকালে খেতে পাইনে এমন হোল। দু-একদিন তো না খেয়েই কাটলো। তারপর ভাবলাম, আমার এক মামা রাণাঘাটে হোটেলে কাজ করেন সেখানেই যাই। তাই আজ এলাম—উনি আমার আপন মামা নয়। মায়ের জ্ঞাতি ভাই। তা এখানেও আপনি বলচেন এ লাইন আমার জন্যে নয়—তবে কোথায় যাবো আর কি-ই বা করবো?

ছেলেটির হতাশার সুর এবং তাহার দুঃখ-কষ্টের কাহিনী হাজারির মনে বড় লাগিল। সে তখনও ভাবিতেছিল—আহা, ছেলেমানুষ! আমার বড় ছেলে সন্তু বেঁচে থাকলে এতদিন এত বড়টা হোত। টেঁপির সঙ্গে ভারি মানায়। সোনার চাঁদ হেন ছেলে! টেঁপি কি আর সে অদেষ্ট করেচে! নাই বা হোল চাকুরি! ও গিয়ে টেঁপিকে বিয়ে করে আমার বড় ছেলে হয়ে আমার গাঁয়ের ভিটেতে গিয়ে বসুক—ওকে কোনো কষ্ট করতে হবে না, আমি নিজে রোজগার করে ওদের খাওয়াবো। জমিজমাও তো আছে কিছু।

খাওয়া শেষ করিয়া বংশীধরের ভাগিনেয়টি চলিয়া গেল বটে কিন্তু হাজারির প্রাণে যেন কি এক অনির্দ্দেশ্য নূতন সুরের রেশ লাগাইয়া দিয়া গেল। তরুণ মুখের ভঙ্গি, তরুণ চোখের চাহনি হইতে এত প্রেরণা পাওয়া যায়?··· ··জীবনে এ সব নবীন অভিজ্ঞতা হাজারির।

বৈকালে চূর্ণীর ধারের গাছতলায় নির্জনে বসিয়া সে কত স্বপ্ন দেখিল। নতুন সব স্বপ্ন। টেঁপির সহিত বংশীধরের ভাগিনেয়টির বিবাহ হইতেছে। বাধা কিছুই নাই, তাহাদেরই পালটি ঘর।

টেঁপির ক্ষুদ্র, কোমল হাতখানি নরেনের বলিষ্ঠ হাতে তুলিয়া দিয়াছে···দুই হাত একত্র মিলাইয়া হাজারি মেয়ে-জামাইকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে।···টেঁপির মার চোখ দিয়া আনন্দে জল পড়িতেছে—কি সুন্দর সোনার চাঁদ জামাই!

কেন সে হোটেলে রাঁধুনীগিরি করিতে যাইবে ছেলেবয়সে? হাজারির নিজের হোটেলে জামাই থাকিবে ম্যানেজার, চক্কত্তি মশায়ের মত গদিতে বসিয়া খরিদ্দারকে টিকিট বিক্রয় করিবে—হিসাবপত্র রাখিবে।

দ্বিগুণ খাটিবার উৎসাহ আসিবে হাজারির—জামাইও যা ছেলেও তাই। অত বড় অত

সুন্দর, উপযুক্ত ছেলে। টেঁপির সারাজীবনের আনন্দ ও সাধের জিনিস। ওদের দুজনের মুখের দিকে চাহিয়া সে প্রাণপণে খাটিবে। তিন মাসের মধ্যে হোটেল দাঁড় করাইয়া দিবে।

বেলা পড়িল। চূর্ণীর খেয়ায় লোক পারাপার হইতেছে, যাহারা শহরে কেনা-বেচা করিতে আসিতেছিল—এই সময় তাহারা বাড়ী ফেরে।

একবার কুসুমের সঙ্গে দেখা করিয়া হোটেলে ফিরিতে হইবে—গাছতলায় বসিয়া আর বেশীক্ষণ আকাশ-কুসুম ভাবিলে চলিবে না। রতন ঠাকুর সম্ভব এবেলাও দেখা দিতেছে না, তাহাকে একাই সব কাজ করিতে হইবে।

কিন্তু সত্যই কি আকাশ-কুসুম? হোটেল তাহার হইবে না? টেঁপির সঙ্গে ওই ছেলেটির—

যাক্। বাজে ভাবনায় দরকার নাই। দেরি হইয়া যাইতেছে।

পদ্ম ঝি বৈকালের দিকে হাজারিকে বলিল—বলি, হ্যাগো ঠাকুর, আজ মাছের মুড়োটা কি হ'ল গা? আজ ত কর্ত্তাবাবুর জ্বর। তিনি বেলা এগারোটার মধ্যেই চলে গিয়েছেন—অত বড় মুড়োটার কি একটা টুকরোও চোখে দেখতে পেলাম না—

হাজারি মাছের মুড়োটা লুকাইয়া কুসুমকে দিয়া আসিয়াছিল। বড় মাছের মুড়ো সাধারণতঃ কর্ত্তার বাসায় যায়, কিন্তু আজ কর্ত্তার অসুখ—তিনি বেশীক্ষণ হোটেলে ছিলেন না—মুড়োটা পদ্ম ঝি নিজের বাড়ী লইয়া যাইত—হাজারি কখনও মুড়ো নিজে খায় নাই—রতনঠাকুর খাইয়াছে, পদ্ম ঝি ত প্রায়ই লইয়া যায়—হাজারির দাবি কি থাকিতে পারে না মুড়োর উপর? তাই সে সেটা কুসুমকে দিয়া আসিয়াছিল যখন ছুটি করিয়া চূর্ণীর ঘাটে বেড়াইতে যায় তখন।

পদ্ম ঝিয়ের প্রশ্নের উত্তরে হাজারি বলিল—কেন গা পদ্মদিদি, এতক্ষণ পরে মুড়োর খোঁজ হ'ল?

—এতক্ষণ পরেই হোক আর যতক্ষণ পরেই হোক—কি হ'ল মুড়োটা?

—আমায় কি একদিন খেতে নেই? তোমরা ত সবাই খাও। আমি আজ খেয়েছি।

—কই মুড়োর কাঁটাচোকড়া ত কিছু দেখলাম না? কোথায় বসে খেলে?

হাজারির বিব্রত ভাব পদ্ম ঝিয়ের চোখ এড়াইল না। সে চড়াগলায় বলিল—খাও নি তুমি। খেলে কিছু বলতাম না। তুমি সেটা লুকিয়ে বিক্রী করেছ—কেমন ঠিক কথা কি না? চোর, জুয়াচোর কোথাকার—হোটেলের জিনিস লুকিয়ে লুকিয়ে বিক্রী? আচ্ছা, তোমার চুরির মজা টের পাওয়াচ্ছি—আসুক কর্ত্তা—

হাজারি বলিল—না পদ্ম দিদি, বিক্রী করব কাকে? রাঁধা মুড়ো কে নেবে? সত্যি আমি খেয়েছি।

—আবার মিথ্যে কথা? আমি এতকাল হোটেলে কাজ করে হাতে ঘাটা পড়িয়ে ফেলনু, মাছের মুড়োর কাঁটাচোকড়া আমি চিনিনে—না? অত বড় মুড়োটা চার আনার কম বিক্রী কর নি। জমা দাও সে পয়সা গদিতে, ওবেলা নইলে দেখো কি হাল করি কর্ত্তার সামনে।

—আচ্ছা নিও চার আনা পয়সা—আমি দেব। একটু মুড়ো খেয়ে যদি দাম দিতে হয়—তাও নিও।

পদ্ম ঝি একটুখানি নরম হইয়া বলিল—তা হ'লে বেচেছিলে ঠিক?

—না পদ্ম দিদি।

—তবে কি করলে ঠিক করে বল—

—তোমার ত পয়সা পেলেই হ'ল, সে খোঁজে তোমার কি দরকার?

—দরকার আছে তাই বলছি—কোথায় গেল মুড়োটা? বলো—নইলে কর্ত্তার সামনে তোমার অপমান করব। বল এখনো—

—আমি খেয়েছি।

—আবার? আমার সঙ্গে চালাকি করে তুমি পারবে ঠাকুর? আমি এবার বুঝতে পেরেছি মুড়ো কোথায় গেল।—তোমার সেই—

হাজারি জানে পদ্ম কি বলিতে যাইতেছে—সে পদ্ম ঝিয়ের মুখের কথা চাপা দিবার জন্য তাড়াতাড়ি বলিল—পদ্ম দিদি, তোমাদের ত খেয়ে পরে মানুষ হচ্ছি গরীব বামুন। কেন আর ও সামান্য জিনিস নিয়ে বকাঝকা কর?

এ কথায় পদ্ম ঝি নরম না হইয়া বরং আরও উগ্র হইয়া উঠিল। বলিল—নিজে খেলে কিছু বলতাম না ঠাকুর—কিন্তু হোটেলের জিনিস পর দিয়ে খাওয়ান সহ্যি হয় না। এর একটা বিহিত না করে আমি যদি ছাড়ি তবে আমার নামে কুকুর পুষো, এই বলে দিচ্ছি সোজা কথা।

হাজারি ভয়ে ও উদ্বেগে কাঠ হইয়া গেল—নিজের জন্য নয়, কুসুমের জন্য। পদ্ম ঝিয়ের অসাধ্য কাজ নাই—সে না জানি কি করিয়া বসিবে—কুসুমের শাশুড়ীর কানে—হয়ত কত রকমের কথা উঠাইবে, তাহার উপরে যদি কুসুমের বাপের বাড়ী অর্থাৎ তাহার স্বগ্রামে সে কথা গিয়া পৌঁছায়—তবে উভয়েরই লজ্জায় মুখ দেখানো ভার হইয়া উঠিবে সেখানে। অথচ কুসুম নিরপরাধিনী। পদ্ম ঝি চলিয়া গেল।

হাজারি ভাবিয়া চিন্তিয়া রতনঠাকুরের শরণাপন্ন হইল। তাহার আত্মীয়কে বিনা পয়সায় খাওয়ানর ষড়যন্ত্রের মধ্যে হাজারি ছিল—সুতরাং রতন হাজারির দিকে টানিত। সে বলিল—তুমি কিছু ভেব না হাজারি দা, পদ্ম দিদিকে আমি ঠাণ্ডা করে দেব। মুড়ো বাইরে নিয়ে যাবে, তা আমায় একবারখানি জানালে হ'ত নি? তোমায় কত বুঝিয়ে পারব আমি?

কিছু পরে সন্ধ্যার দিকে বেচু চক্কত্তি আসিলেন। চাকর হুকায় জল ফিরাইয়া তামাক সাজিয়া আনিল। হুকা হাতে লইয়া বেচু চক্কত্তি বলিলেন—ধুনো গঙ্গাজল দে আগে—আর পদ্মকে বাজারের ফর্দ্দ দিতে বলে দে—

কয়লাওয়ালা মহাবীর প্রসাদ বসিয়াছিল পাওনার প্রত্যাশায়—তাহাকে বলিলেন—সন্ধ্যের সময় এখন কি? ওবেলা ত সাড়ে বার আনা নিয়ে গিয়েছ, আবার এবেলা দেওয়া যায়? কাল এসো। তোমার কি?

একটি রোগা কালো মত লোক হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—বাবু সেদিন কুমড়ো দিয়েলাম—তার পয়সা।

—কুমড়ো? কে কুমড়ো নিয়েছে?

—আজ্ঞে, বাবু, আপনাদের হোটেলে দিয়ে গিয়েলাম—ছ'আনা দাম বলেলাম, তা তিনি বললেন—পাঁচগণ্ডা পয়সা হবে। তা বলি, ভদ্দর নোকের কথা—তাই থ্যান। তিনি বললেন—আজ নয়, বুধবারে এসে নিয়ে যেওয়ানে—তাই এ্যালাম—

—ছ'আনা পয়সার কুমড়ো ধারে নিয়েছে কে—খাতায় কি বাজারের ফর্দ্দের মধ্যে ত ধরা নেই, এ ত বাপু আশ্চর্য্য কথা।—আমরা ধারে জিনিসপত্তর খরিদ করি নে। যা কিনি তা নগদ। কে তোমার কাছে কুমড়ো নিলে? আচ্ছা দাঁড়াও, দেখি।

বেচু রতন ও হাজারি ঠাকুরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তাহারা কুমড়ো কেনা ত দূরের কথা—গত পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে কুমড়ার তরকারিই রাঁধে নাই, বলিল—কোন কুমড়া চক্ষেও দেখে নাই এই কয়দিনে।

কথাবার্ত্তার মধ্যে পদ্ম ঝি বাজারের ফর্দ্দ লইয়া ঘরে ঢুকিতেই কুমড়াওয়ালা বলিয়া উঠিল—এই যে! ইনিই তো নিয়েলেন! সেই কুমড়ো মা ঠাকরণ।—বলেলেন বুধবারে আসতি—তাই আজ এলাম। বাবু জিজ্ঞেস করছিলেন কুমড়ো কে নিয়েলেন—

পদ্ম ঝি হঠাৎ যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। বলিল—হ্যাঁ, কুমড়ো নিয়েছিলাম তা কি হবে? পাঁচ আনা পয়সা নিয়ে কি পালিয়ে যাব? দিয়ে দাও ত কর্ত্তাবাবু ওর পয়সা মিটিয়ে—আমি এর পরে—বেচু চক্কত্তি দ্বিরুক্তি না করিয়া কুমড়োওয়ালাকে পয়সা মিটাইয়া দিলেন, সে চলিয়া গেল।

রতনঠাকুর আড়ালে গিয়া হাজারিকে বলিল—হাতে হাতে ধরা পড়ে গেল পদ্মদিদি—কিন্তু কর্ত্তাবাবুর দরদটা একবার দেখেছ ত হাজারি-দা?

—ও আর দেখাদেখি কি, দেখেই আসছি। আমি যদি কুমড়ো নিতাম তবে পদ্মদিদি আজ রসাতল বাধাত—কর্ত্তাবাবুও তাতেই সায় দিত। এ ত আর তুমি আমি নই? এ হোটেলে পদ্মদিদিই মালিক। তুমি এইবার একবার বল পদ্মদিদিকে মুড়োর কথাটা। নইলে ও এখুনি লাগাবে কর্ত্তাকে—

রতন পদ্ম ঝিকে আড়ালে বলিল—ও পদ্মদিদি, গরীব বামুন তোমাদের দোরে করে খাচ্ছে—কেন আর ওকে নিয়ে অমন করো? একটা মুড়ো যদি সে খেয়েই থাকে—এতদিন খাটছে এখানে, তা নিয়ে তাকে অপমান করো না। সবাই ত নেয়—কেউ ত নিতে ছাড়ে না—আমি নিইনে না তুমি নাও না? বেচারীকে কেন বিপদে ফেলবে?

পদ্ম ঝি বলিল—ও খায়নি—ও এখান থেকে বের করে ওর সেই পেয়ারের কুসুমকে দিয়ে এসেছে—আমি কচি খুকী? কিছু বুঝি নে? নচ্ছার বদমাইশ লোক কোথাকার—

রতন হাসিয়া বলিল—যা বোঝে সে করুক গিয়ে পদ্মদিদি—তোমার আমার কি? সে

মুড়ো নিজে খায়,—পরকে দেয়—তোমার তা দেখবার দরকার কি? তুমি কিছু বোল না আজ আর ওকে।

পদ্ম ঝি কুমড়ার ব্যাপার লইয়া কিছু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিল—নতুবা সে রতনের কথা এত সহজে রাখিত না। বলিল—তাহ'লে বারণ করে দিও ওকে—বারদিগর যেন এমন আর না করে। তাহলে আমি অনথ বাধাবো—কারোর কথা শুনবো না।

সে রাত্রে হোটেলের কাজকর্ম্ম চুকাইয়া হাজারি চূর্ণীর ধারে বেড়াইতে গেল। দিব্য জ্যোৎস্না-রাত—প্রায় সাড়ে বারোটা বাজে।

আজ কি সর্ব্বনাশই আর একটু হইলে হইয়াছিল! তাহার নিজের জন্য সে ভাবে না, ভাবে কুসুমের জন্য। কুসুম পাড়াগাঁয়ের মেয়ে—সেখানে তার বদনাম রটিলে উভয়েরই সেখানে মুখ দেখানো চলিবে না। আর তাহার এই বয়সে এই বদনাম রটিলে লোকেই বা বলিবে কি?

কুসুমকে সে মেয়ের মত দেখে—ভগবান জানেন। ওসব খেয়াল তাহার থাকিলে এই রাণাঘাট শহরে সে কত মেয়ে জুটাইতে পারিত। এই রাধাবল্লভতলার মাটি ছুঁইয়া সে বলিতে পারে জীবনে কোনদিন ওসব খেয়াল তার নাই। বিশেষতঃ কুসুম। ছিঃ ছিঃ—টেঁপির সঙ্গে যাহাকে সে অভিন্ন দেখে না—তাহার সম্বন্ধে রতন ঠাকুরের কাছে পদ্ম ঝি যে সব বিশ্রী কথা বলিয়াছে শুনিলে কানে আঙুল দিতে হয়।

রাত প্রায় দেড়টা বাজিয়া গেল। শহর নিযুতি হইয়া গিয়াছে, কেবল কুণ্ডুদের চূর্ণীর ধারের কাঠের আড়তে হিন্দুস্থানী কুলীরা ঢোলক বাজাইয়া বিকট চিৎকার শুরু করিয়াছে—ওই উহাদের নাকি গান! যখন নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেস্ আসিয়া দাঁড়ায় স্টেশনে তখন সে হোটেল হইতে বাহির হইয়াছে—আর এখন স্টেশন পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, কারণ এত রাত্রে কোনো ট্রেন আসে না। রাত চারটা হইতে আবার ট্রেন চলাচল শুরু হইবে।

হোটেলের দরজা বন্ধ। ডাকাডাকি করিয়া মতি চাকরের ঘুম ভাঙাইতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। বড় গরম—স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে না হয় বাকী রাতটুকু কাটাইয়া দেওয়া যাক্। আজ রাত্রে ঘুম আসিতেছে না চোখে।

ভোরে উঠিয়া হোটেলের সামনে আসিয়া হাজারি দেখিল হোটেলের দরজা এখনও বন্ধ। সে একটু আশ্চর্য্য হইল। মতি চাকর তো অনেকক্ষণ উঠিয়া অন্যদিন দরজা খোলে। ডাকাডাকি করিয়াও কাহারো সাড়া পাওয়া গেল না—তারপর গদির ঘরের জানালা দিয়া ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিতে গিয়া হাজারি লক্ষ্য করিল—বাসনের ঘরের মধ্যে অত আলো কেন?

ঘুরিয়া আসিয়া দেখিল বাসনের ঘরের দরজা খোলা। ঘরের মধ্যে কেহই নাই।

মতি চাকরেরও সাড়াশব্দ নাই কোনদিকে। এরকম তো কখনো হয় না।

এমন সময় যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলের চাকর নিমাই গয়লাপাড়া হইতে চায়ের দুধ লইয়া ফিরিতেছে দেখা গেল—যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলে একটা চায়ের স্টলও আছে—খুব সকাল

হইতেই সেখানে চা বিক্রী শুরু হয়।

হাজারির ডাকে নিমাই আসিল। দুজনে ঘরের মধ্যে ঝুঁকিয়া দেখিল মতি চাকর খাবার ঘরে শুইয়া দিব্যি নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। উভয়ের ডাকে মতি ধড়মড় করিয়া উঠিল।

হাজারি বলিল—মতি দোর খোলা কেন?

মতি বলিল—তা তো আমি জানি নে! তুমি রাত্তিরে ছিলে কোথায়? দোর খুললে কে?

তিনজনে ঘরের মধ্যে আসিয়া এদিক ওদিক দেখিল। হঠাৎ মতি বলিয়া উঠিল—হাজারি-দা, সর্ব্বনাশ! থালা বাসন কোথায় গেল? একখানও তো দেখছি নে!

—সে কি!

তিনজনে মিলিয়া তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও কোনো ঘরেই বাসনের সন্ধান পাওয়া গেল না। নিমাই বলিল—চায়ের দুধটা দিয়ে আসি হাজারি-দা, বাসন সব চক্ষুদান দিয়েচে কে। তোমাদের কর্ত্তাকে ডেকে নিয়ে এসো।

ইতিমধ্যে রতন ঠাকুর আসিল। সে-ই গিয়া বেচু চক্কত্তিকে ডাকিয়া আনিল। পদ্ম ঝিও আসিল। চুরি হইয়া গিয়াছে শুনিয়া পাশের হোটেল হইতে যদু বাঁড়ুয্যে আসিলেন, বাজারের লোকজন জড় হইল—থানায় খবর দিতে তখনি, এ. এস. আই নেপালবাবু ও দুজন কনস্টেবল আসিল। হৈ হৈ বাধিয়া গেল। বেচু চক্কত্তি মাথায় হাত দিয়া ততক্ষণ বসিয়া পড়িয়াছেন, প্রায় ষাট-সত্তর টাকার থালা বাসন চুরি গিয়াছে!

বেচু চক্কত্তি বলিলেন—হাজারি রাত্তিরে কোথায় ছিলে?

—ইষ্টিশানের প্ল্যাটফর্ম্মে বাবু। বড্ড গরম হচ্ছিল—তাই ঘাটের ধার থেকে ফিরে ওখানেই রাত কাটালাম।

নেপালবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—কত রাত্রে প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে শুয়েছিলে? কোন্ প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে?

—আজ্ঞে, বনগাঁ লাইনের প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের বেঞ্চির ওপর।

—তোমায় সেখানে কেউ দেখেছিল?

—না বাবু, তখন অনেক রাত।

—কত?

—দেড়টার বেশী।

—এতক্ষণ পর্য্যন্ত কোথায় ছিলে?

—রোজ খাওয়া-দাওয়ার পরে আমি দুবেলাই চূর্ণীর খেয়াঘাটে গিয়ে বসি। কালও সেখানে ছিলাম।

—আর কোনো দিন হোটেল ছেড়ে প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে শুয়েছিলে?

—মাঝে মাঝে শুই, তবে খুব কম।

এই সময় বেচু চক্কত্তিকে পদ্ম ঝি চুপি চুপি কি বলিল। বেচু চক্কত্তি নেপালবাবুকে বলিলেন, দারোগাবাবু, একবার ঘরের মধ্যে একটা কথা শুনে যান দয়া করে—

ঘরের ভিতর হইতে কথা শুনিয়া আসিয়া নেপালবাবু বলিলেন—হাজারি ঠাকুর, তুমি কুসুমকে চেন ?

হাজারির মুখ শুকাইয়া গেল। ইহার মধ্যে ইহারা কুসুমের কথা আনিয়া ফেলিল কেন ? কুসুমের সঙ্গে ইহার কি সম্পর্ক ?

হাজারির মুখের ভাব নেপালবাবু লক্ষ্য করিলেন।

হাজারির উত্তর দিতে একটু দেরি হইতেছিল, নেপালবাবু ধমক দিয়া বলিলেন—কথার জবাব দাও ?

হাজারি থতমত খাইয়া বলিল, আজ্ঞে চিনি।

পদ্ম ঝি দোরের কাছে মুখে আঁচল চাপা দিয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া হাজারি বুঝিল—কুসুমের কথা সে-ই কর্ত্তাকে বলিয়াছে নতুবা তিনি অতশত খোঁজখবর রাখেন না। কর্ত্তামশায় দারোগাকে বলিয়াছেন কথাটা—সে ওই পদ্ম ঝিয়ের উস্‌কানিতে!

—কুসুম থাকে কোথায় ?

—গোয়ালাপাড়ায়, বড় বাজারের ওদিকে।

—সে কি করে ?

—দুধ-দই বেচে। গরীব লোক—

—বয়েস কত ?

—এই চব্বিশ-পঁচিশ—

পদ্ম ঝি একটু মুচ্‌কি হাসিল এই উত্তর শুনিয়া, হাজারির তাহা চোখ এড়াইল না। দারোগাবাবুর প্রশ্নের গতি তখনও সে বুঝিতে পারে নাই—কিন্তু পদ্ম ঝিয়ের মুখের মুচ্‌কি হাসি দেখিয়া সে বুঝিল কেন ইহারা কুসুমের কথা এত করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে।

—তোমার সঙ্গে কুসুমের কত দিনের আলাপ ?

—সে আমার গাঁয়ের মেয়ে। সে যখন ছেলেমানুষ তখন থেকে তাকে জানি। তার বাবা আমার বন্ধুলোক—আমাদের পাড়ার পাশেই—

—কুসুমের সঙ্গে তুমি প্রায়ই দেখাশোনা কর—না ?

—মাঝে মাঝে দেখা করি বৈকি—গাঁয়ের মেয়ে, তার তত্ত্বাবধান করা তো দরকার—

নেপালবাবু হঠাৎ হাসিয়া বলিলেন, নিশ্চয়ই দরকার। এখানে তার শ্বশুরবাড়ী ?

—আজ্ঞে হাঁ।

—স্বামী আছে ?

—না, আজ বছর চার-পাঁচ মারা গিয়েছে—শাশুড়ী আছে বাড়ীতে। এক দেওর-পো আছে।

—তুমি মাঝে মাঝে হোটেলের রান্না জিনিস তাকে দিয়ে আস ?

লজ্জায় ও সঙ্কোচে হাজারি যেন কেমন হইয়া গেল। এসব কথা এখানে কেন ?

পদ্ম ঝি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়াই মুখে আঁচল চাপা দিল। নেপালবাবু ধমক

দিয়া বলিলেন—আঃ, হাসি কিসের ? এটা হাসির জায়গা নয়। চুপ—

কিন্তু দারোগাবাবু ধমক দিলে কি হইবে—পদ্ম ঝিয়ের হাসি সংক্রামক হইয়া উঠিয়া উপস্থিত লোকজন সকলেরই মুখে একটা চাপা হাসির ঢেউ আনিয়া দিল। অন্য লোকের হাসি হাজারি তত লক্ষ্য করে নাই কিন্তু পদ্ম ঝিয়ের হাসিতে সে কিসের একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ঠাওর করিয়া মরীয়া হইয়া বলিয়া উঠিল—দারোগাবাবু, সে গরীব লোক, আমাদের গাঁয়ের মেয়ে, সে আমাকে বাবা বলে ডাকে—আমার সে মেয়ের মত—তাই মাঝে মাঝে কোনদিন একটু-আধটু তরকারী কি রাঁধা মাংস তাকে দিয়ে আসি। কত তো ফেলা-ঝেলা যায়, তাই ভাবি যে একজন গরীব মেয়ে—

—বুঝেছি, থাক্ আর তোমার লেকচার দিতে হবে না। কাল রাত্রে তুমি সেখানে গিয়েছিলে ?

—আজ্ঞে না বাবু।

—আজ সকালে গিয়েছিলে ?

—না বাবু, সকালে প্ল্যাটফর্ম্ম থেকেই হোটেলে এসেছি।

—হুঁ।

দারোগাবাবু অন্য সকলের জবানবন্দী লইয়া ছাড়িয়া দিলেন। কেবল মতি চাকর ও হাজারিকে বলিলেন—আমার সঙ্গে তোমাদের থানায় যেতে হবে। কনস্টেবলদের বলিলেন —এদের ধরে নিয়ে চল।

মতি কান্নাকাটি করিতে লাগিল—একবার বেচু চক্কত্তি, একবার দারোগাবাবুর হাতে পায়ে পড়িতে লাগিল। সে সম্পূর্ণ নির্দোষ—ঘরের মধ্যে ঘুমাইয়া ছিল, তাহাকে থানায় লইয়া গিয়া কি ফল ?—ইত্যাদি।

হাজারির প্রাণ উড়িয়া গেল থানায় ধরিয়া লইয়া যাইবে শুনিয়া।

এ কি বিপদে ভগবান তাহাকে ফেলিলেন ?

থানা-পুলিস বড় ভয়ানক ব্যাপার, মোকর্দ্দমা হইলে উকীল দিবার ক্ষমতা হইবে না তাহার, বিনা কৈফিয়তে জেল খাটিতে হইবে—কত বছর তাই বা কে জানে ? না খাইয়া স্ত্রীপুত্র মারা পড়িবে। জেলখাটা আসামীকে ইহার পর চাকুরিই বা দিবে কে ?

কিন্তু তার চেয়েও ভয়ানক ব্যাপার, যদি ইহারা কুসুমকে ইহার মধ্যে জড়ায় ? জড়াইবেই বোধ হয়। হয়তো কুসুমের বাড়ী খানাতল্লাস করিতে চাহিবে।

নিরপরাধিনী কুসুম! লজ্জায় ঘৃণায় তাহা হইলে সে হয়তো গলায় দড়ি দিবে। আরও কত কি কথা লোকে রটাইবে এই সূত্র ধরিয়া। তাহাদের গ্রামে একথা তো গেলে তাহার নিজেরও আর মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না।

কখনও সে একটা বিড়ি-দেশলাই কাহারও চুরি করে নাই জীবনে—সে করিবে হোটেলের বাসন চুরি! নিজের মুখের জিনিস নিজেকে বঞ্চিত করিয়া সে কুসুমকে মাঝে মাঝে দিয়া আসে বটে—চুরির জিনিস নয় সে সব। সে খাইত, না হয় কুসুম খায়।

থানায় গিয়া প্রায় ঘণ্টা দুই হাজারি ও মতি বসিয়া রহিল। হাজারি শুনিল বেচু চক্কত্তি ও পদ্ম ঝি দু-জনেই বলিয়াছে উহাদের উপরই তাহাদের সন্দেহ হয়। সুতরাং পুলিস তো তাহাদের ধরিবেই।

থানার বড় দারোগা থানায় ছিলেন না—বেলা একটার সময় তিনি আসিয়া চুরির সব বিবরণ শুনিয়া হাজারি ও মতিকে তাঁহার সামনে হাজির করিতে বলিলেন। হাজারি হাত জোড় করিয়া দারোগাবাবুর সামনে দাঁড়াইল। দারোগাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—হোটেলে কতদিন কাজ করচ ?

—আজ্ঞে বাবু, ছ'বছর।

—বাসন চুরি করে কোথায় রেখে দিয়েচ ?

—দোহাই বাবু—আমার বয়েস ছ'চল্লিশ-সাতচল্লিশ হোল—কখনো জীবনে একটা বিড়ি কারো চুরি করিনি—

দারোগাবাবু ধমক দিয়া বলিলেন—ওসব বাজে কথা রাখো। তুমি আর ওই চাকর বেটা দুজনে মিলে যোগসাজসে চুরি করেচ। স্বীকার করো—

—বাবু আমি এর কোনো বার্ত্তা জানি নে ! আমি সে রাত্তিরে হোটেলেই ছিলাম না।

—কোথায় ছিলে ?

—ইষ্টিশানের প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে শুয়ে ছিলাম সারারাত।

—কেন ?

—বাবু, আমি খাওয়া-দাওয়া করে চূর্ণীর ঘাটে বেড়াতে যাই রোজ। বড্ড গরম ছিল বলে সেখানে একটু বেশী রাত পর্য্যন্ত ছিলাম—ফিরে এসে দেখি দরজা বন্ধ, তাই ইষ্টিশানে—

এই সময় নেপালবাবু ইংরাজিতে বড় দারোগাকে কি বলিলেন। বড় দারোগা ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—ও। আচ্ছা—তুমি কুসুম ব'লে কোনো মেয়েমানুষের বাড়ী যাতায়াত করো ?

—বাবু, কুসুম আমার গাঁয়ের মেয়ে। গরীব বিধবা, তাকে আমি মেয়ের মতো দেখি—সেও আমাকে বাবা বলে ডাকে, বাবার মত ভক্তিছেদ্দা করে। যদি সেখানে গিয়ে থাকি, তাহোলে তাতে দোষের কথা কি আছে বাবু আপনিই বিবেচনা করে দেখুন। একথা লাগিয়েচে আমাদের হোটেলের পদ্ম ঝি—সে আমাকে দুচোখ পেড়ে দেখতে পারে না—কুসুমকেও দেখতে পারে না। আমাদের নামে নানারকম বিচ্ছিরি কথা সে-ই রটিয়েচে। আপনিই হাকিম—দেবতা। আর মাথার ওপর চন্দ্র সূয্যি রয়েচেন—আমার পঞ্চাশ বছর বয়েস হোতে গেল—আমার সেদিকে কখনো মতি-বুদ্ধি যায়নি বাবু। আমি তাকে মেয়ের মত দেখি—তাকে এর মধ্যে জড়াবেন না—সে গেরস্তর বৌ—মরে যাবে ঘেন্নায়।

বড় দারোগা অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ লোক। হাজারির চোখমুখের ভাব দেখিয়া তাঁহার মনে হইল লোকটা মিথ্যা বলিতেছে না।

বড় দারোগা মতি চাকরকে অনেকক্ষণ ধরিয়া জেরা করিলেন। তাহার কাছেও বিশেষ

কোনো সদুত্তর পাওয়া গেল না—তাহার সেই এক কথা, ঘরের মধ্যে অঘোরে ঘুমাইতেছিল, সে কিছুই জানে না।

বড় দারোগা বলিলেন—দু-জনকেই হাজতে পুরে রেখে দাও—এম্‌নি এদের কাছে কথা বেরুবে না—কড়া না হোলে চলবে না এদের কাছে।

হাজারি জানে এই কড়া হওয়ার অর্থ কি। অনেক দুঃখ হয়তো সহ্য করিতে হইবে আজ। সব সহ্য করিতে সে প্রস্তুত আছে যদি কুসুমের নাম ইহারা আর না তোলে।

বেলা দুইটার সময় একজন কনস্টেবল আসিয়া কিছু মুড়ি ও ছোলা-ভাজা দিয়া গেল। সকাল হইতে হাজারি কিছুই খায় নাই—সেগুলি সে গোগ্রাসে খাইয়া ফেলিল।

বেলা চারটার সময় রতন ঠাকুর হোটেল হইতে হাজারির জন্য ভাত আনিল।

বলিল—আলাদা করে বেড়ে রেখেছিলাম, লুকিয়ে নিয়ে এলাম হাজারি-দা। কেউ জানে না যে তোমার জন্যে ভাত আনচি।

বড় দারোগার নিকট হইতে অনুমতি লইয়া রতন ঠাকুর হাজতের মধ্যে ভাত লইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু মতির ভাত আনিবার কথা তাহার মনে ছিল না—হাজারি বলিল—ওই ভাত দু-জনে ভাগ করে খাবো এখন।

রতন বলিল—হোটেলে মহাকাণ্ড বেধে গিয়েচে। একটা ঠিকে ঠাকুর আনা হয়েছিল, সে কাজের বহর দেখে এবেলাই পালিয়েচে। খদ্দের অনেক ফিরে গিয়েচে। পদ্ম বলচে তুমি আর মতি দুজনে মিলে এ চুরি করেচ। কুসুমের বাড়ী খানাতল্লাস না করিয়ে পদ্ম ছাড়বে না বলচে। সেখানে বাসন চুরি করে তুমি রেখে এসেচ। কর্তারও তাই মত। তুমি ভেবো না হাজারি-দা—মোকদ্দমা বাধে যদি আমি উকিল দেবো তোমার হয়ে। টাকা যা লাগে আমি দেবো। তুমি এ কাজ করনি আমি তা জানি। আর কেউ না জানুক, আমি জানি তুমি কি ধরণের লোক।

হাজারি রতনের হাত ধরিয়া বলিল—ভাই আর যা হয় হোক্—কুসুমের বাড়ী যেন খানাতল্লাস না হয় এটা তোমাকে করতে হবে। কোনো উকীলের সঙ্গে না হয় কথা বলো, আমার দুমাসের মাইনে পাওনা আছে—আমি না হয় তোমাকে দেবো।

রতন হাসিয়া বলিল—তোমার সেই মাইনে আবার দেবে ভেবেচ কর্তাবাবু? তা নয়—সে তুমি দ্যাও আর নাই দ্যাও—আমি উকীল দেবো তুমি ভেবো না। কত পয়সা রোজগার করলাম জীবনে হাজারি-দা—এক পয়সা তো দাঁড়াল না। সংকাজে দুপয়সা খরচ হোক্।

হাজারি বলিল—মতিকে তাহোলে ভাত দিয়ে এস—সে অন্য ঘরে কোথায় আছে।

রতন বলিল—মতিকে আমার সন্দেহ হয়।

—না বোধ হয়। ও যদি চুরি করবে তো অমন নিশ্চিন্দি হয়ে ঘুমোতে পারে নাক ডাকিয়ে? আর ও সেরকম লোক নয়।

রতন ভাতের থালা লইয়া চলিয়া গেল।

আরও পাঁচ-ছ'দিন হাজারি ও মতি হাজতে আটক থাকিল। পুলিস বহু চেষ্টা করিয়াও ইহাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিল না—সুতরাং চুরির চার্জ্জ-শীট দেওয়া সম্ভব হইল না।

ছ'দিনের দিন দুজনেই খালাস পাইল।

মতি বলিল—হাজারি-দা, এখন কোথায় যাওয়া যায়? হোটেলে কি আমাদের আর নেবে?

হাজারিও জানে হোটেলে তাহাদের চাকুরি গিয়াছে। কিন্তু সেখানে দু'মাসের মাহিনা বাকি—বেচু চক্কত্তির কাছে গিয়া মাহিনা চাহিয়া লইতে হইবে।

বেলা তিনটা। এখন হোটেলে গেলে কর্ত্তা মশাই থাকিবেন না—সুতরাং হাজারি সন্ধ্যার পরে হোটেলে যাইবে ঠিক করিল। কতদিন চূর্ণীর ধারে যায় নাই—রাধাবল্লভতলায় গিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া সে আপন মনে চূর্ণীর ধারে গিয়া বসিল।

কিছুক্ষণ নদীর ধারে বসিয়া হাজারির মনে পড়িল, সে এত বেলা পর্য্যন্ত কিছু খায় নাই। রতন হাজতে রোজ ভাত দিয়া যাইত, আজ দুদিন সে আর আসে নাই—কেন আসে নাই কে জানে, হয়তো পদ্ম জানিতে পারিয়া বারণ করিয়া দিয়াছে—কিংবা হয়তো তাহাদের ভাত আনিয়া দেওয়ার অপরাধে তাহারও চাকুরি গিয়াছে।

একটা পয়সা নাই হাতে যে কিছু কিনিয়া খায়। হাজতের ভাত হাজারি এক দিনও খায় নাই—আজও একজন কনস্টেবল ভাত আনিয়াছিল, সে বলিয়াছিল—তেওয়ারিজি, আমায় দুটি মুড়ি বরং এনে দিতে পারো, আমার জ্বর হয়েছে, ভাত খাবো না।

বেলা বারোটার সময় সামান্য দুটি মুড়ি খাইয়াছিল—আর কিছু পেটে যায় নাই সারাদিন। সন্ধ্যার পরে হোটেলে গিয়া দুটি ভাত খাইবে এখন, সেই ভালো।

হাজারির সন্দেহ হয় বাসন আর কেহ চুরি করে নাই, পদ্ম ঝির নিজেরই কাজ। ক'দিন হাজতে বসিয়া বসিয়া ভাবিয়া তাহার মনে হইয়াছে, পদ্ম অন্য কোন লোকের যোগসাজসে এই কাজ করিয়াছে। ও অতি ভয়ানক চরিত্রের মেয়েমানুষ, সব পারে। গত বৎসর খদ্দেরদের কাপড়ের ব্যাগ যে চুরি হইয়াছিল—সেও পদ্ম ঝিয়ের কাজ—এখন হাজারির ধারণা জন্মিয়াছে।

এরকম ধারণা সে বিদ্বেষবশতঃ করিতেছে না, গত ছ বৎসর হাজারি পদ্ম ঝিয়ের এমন অনেক কাণ্ড দেখিয়াছে যাহা সে প্রথম প্রথম তত বুঝিত না—কিন্তু এখন দুয়ে দুয়ে যোগ দিয়া সে অনেকটাই বুঝিয়াছে।

বৃদ্ধ বেচু চক্কত্তি পদ্ম ঝিয়ের একেবারে হাতের মুঠার মধ্যে—দেখিয়াও দেখেন না, বুঝিয়াও বোঝেন না, হোটেলটির যে কি সর্ব্বনাশ করিতেছে পদ্ম দিদি, তাহা তিনি এখন না বুঝিলেও পরে বুঝিবেন।

রতন ঠাকুরও সেদিন ভাত দিতে আসিয়া অনেক কথা বলিয়া গিয়াছে।

—হাজারিদা, হোটেলের অর্দ্ধেক জিনিস পদ্মদিদির ঘরে—আজকাল বাজারের জিনিস পর্য্যন্ত যেতে আরম্ভ করেচে। সেদিন দেখলে তো কুমড়োর কাণ্ড? চুষে খাবে এমন সাজানো হোটেলটা বলে দিচ্ছি। পদ্ম দিদির কেন অত টান বাড়ীর ওপরে—তাও আমি জানি। তবে বলিনে, যাহোক্ আট টাকা মাইনের চাকরিটা করি—এ বাজারে হঠাৎ চাকরিটা অনথক খোয়াবো?

সন্ধ্যার পরে হাজারি হোটেলের গদিঘর দিয়া ঢুকিতে সাহস না করিয়া রান্নাঘরের দিকের দরজা দিয়া হোটেলে ঢুকিল। ভাবিয়াছিল রান্নাঘরে রতন ঠাকুরকে দেখিতে পাইবে—কিন্তু একজন অপরিচিত উড়িয়া ঠাকুরকে ভাত রাঁধিতে দেখিয়া সে যে-পথে আসিয়াছিল, সেই পথেই বাহির হইয়া যাইবার জন্য পিছন ফিরিয়াছে—এমন সময় খরিদ্দারদের খাবার ঘর হইতে পদ্ম ঝি বলিয়া উঠিল—কে ওখানে? কে যায়?

হাজারি ফিরিয়া বলিল—আমি পদ্মদিদি—

পদ্ম তাড়াতাড়ি ঘরের বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—আমি?—কে আমি?—ও। হাজারি ঠাকুর।...তুমি কি মনে করে? চলে যাচ্চ কোথায় অত তাড়াতাড়ি? ঢুকলেই বা কেন আর বেরুচ্ছই বা কেন?

—আজ হাজত থেকে খালাস পেয়েচি পদ্মদিদি। কোথায় আর যাবো, যাবার তো জায়গা নেই কোথাও—হোটেলেই এলাম, খিদে পেয়েচে—দুটো ভাত খাবো ব'লে। রান্নাঘরে এসে দেখি রতন ঠাকুর নেই, তাই সামনে দিয়ে গদিঘরে যাই—

—তা যাও গদিঘরে। এই খদ্দেরের খাবার ঘর দিয়েই যাও—

হাজারি সঙ্কুচিত অবস্থায় হোটেলের খাবার ঘরের দরজা দিয়া ঢুকিয়া গদির ঘরে গেল। পদ্ম ঝি গেল পিছু পিছু।

বেচু চক্কত্তি বলিলেন—এই যে, হাজারি যে! কি মনে করে?

হাজারি বলিল—আজ্ঞে কর্ত্তামশায়, পুলিসে ছেড়ে দিলে আজ—তাই এলাম। যাবো আর কোথায়? আপনার দরজায় দুটো ক'রে খাই। তা ছেড়ে আর কোথায় যাবো বলুন?

বেচু চক্কত্তি কোনো উত্তর দিবার আগেই পদ্ম ঝি আগাইয়া আসিয়া বেচু চক্কত্তিকে বলিল—ওকে আর একদণ্ড এখানে থাকতে দিও না কর্ত্তাবাবু—এখুনি বিদেয় করো। বাসন ও আর মতি যোগসাজসে নিয়েচে। পাকা চোর, পুলিসে কি করবে ওদের?

হাজারি এবার রাগিল। পদ্ম ঝিকে কখনও সে এ সুরে কথা বলে নাই। বলিল—তুমি দেখেছিলে বাসন নিতে পদ্ম দিদি?

পদ্ম ঝি বলিল—তোমার ও চোখ-রাঙানির ধার ধারে না পদ্ম, তা বলে দিচ্ছি হাজারি ঠাকুর। অমন ভাবে আমার সঙ্গে কথা বলো না—বাসন তোমাকে নিতে দেখলে হাতের দড়ি তোমার খুলতো না তা জেনে রেখো।

হাজারি নিজেকে সামলাইয়া লইয়াছে ততক্ষণ। নীচু হওয়াই তাহার অভ্যাস—যাহারা

বড়, তাহাদের কাছে আজীবন সে ছোট হইয়াই আসিতেছে—আজ চড়া গলায় তাহাদের সঙ্গে কথা কহিবার সাহস তাহার আসিবে কোথা হইতে ?

সেরকম সুরে বলিল—না না, রাগ করচো কেন পদ্ম দিদি—আমি এমনিই বলচি, বাসন নিতে যখন তুমি ছাখোনি—তখন আমি গরীব বামুন, তোমাদের দোরে দুটো ক'রে খাই—কেন আর আমাকে—

এইবার বেচু চক্কত্তি কথা বলিলেন।

একটু নরম সুরে বলিলেন—যাক্, যাক্, কথা কাটাকাটি ক'রে লাভ নেই। আমার বাসন তাতে ফিরবে না। দুজনেই থামো। তারপর তুমি বলচ কি এখন হাজারি ?

—বলচি, কর্ত্তা, আমায় যেমন পায়ে রেখেছিলেন, তেমনি পায়ে রাখুন। নইলে না খেয়ে মারা যাবো। বাবু, চোর আমি নই, চোর যদি হতাম, আপনার সামনে এসে দাঁড়াতে পারতাম না আর।

পদ্ম ঝি বলিল—চোর কিনা সে কথায় দরকার নেই—কিন্তু তোমার এখানে জায়গা আর হবে না। তা হোলে খদ্দের চলে যাবে।

বেচু বলিলেন—তা ঠিক।—খদ্দের চলে গেলে হোটেল চালাবো কি ক'রে আমি ? হাজারি এ যুক্তির অর্থ বুঝিতে পারিল না। হোটেলের ঠাকুর চোর হইলে সে না হয় হোটেলের জিনিস চুরি করিতে পারে, কিন্তু খরিদ্দারদের গায়ের শাল খুলিয়া বা তাহাদের পকেট মারিয়া লইতেছে না তো—তবে খরিদ্দারের আসিতে আপত্তি কি ?

কিন্তু হাজারি এ প্রশ্ন উঠাইতে পারিল না। তাহার জবাব হইয়া গেল। সে কিছু খাইয়াছে কি না এ কথাও কেহ জিজ্ঞাসা করিল না।

অবশেষে সে বলিল—তা হোলে আমার মাইনেটা দিয়ে দিন বাবু, দু'মাসের তো বাকী পড়ে রয়েচে, হাওলাত নেই কিছু। খাতা দেখুন।

বেচু চক্কত্তি বলিলেন—সে এখন হবে না, এর পরে এসো।

পদ্ম একটু বেশী স্পষ্ট কথা বলে। সে বলিল—ওর আশা ছেড়ে দাও, মাইনে পাবে না।

—কেন পাব না ?

পদ্ম ঝাঁঝের সঙ্গে বলিল—সে তক্কো তোমার সঙ্গে করবার সময় নেই এখন। পাবে না মিটে গেল। নালিশ করো গিয়ে—আদালত তো খোলা রয়েচে।

হাজারি চক্ষে অন্ধকার দেখিল।

বেচু চক্কত্তির দিকে চাহিয়া বিনীত সুরে বলিল—কর্ত্তামশায়, আজ আপনার দোরে ছ'বছর খাটচি। আমার হাতে একটিও পয়সা নেই—বাড়ীতে দুমাস খরচ পাঠাতে পারিনি, বাড়ী যাবার রেলভাড়া পর্য্যন্ত আমার হাতে নেই—আমায় কিছু না দিলে না খেয়ে মরতে হবে।

বেচু চক্কত্তি দ্বিরুক্তি না করিয়া ক্যাশবাক্স খুলিয়া একটি আধুলি ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—

—ওই নিয়ে যাও। এখানে ঘ্যান্ ঘ্যান্ কোরো না—খদ্দের আসতে আরম্ভ করচে, বাইরে যাও গিয়ে—

হাজারি আধুলিটা কুড়াইয়া লইয়া চাদরের খুঁটে বাঁধিল। তারপর হাত জোড় করিয়া মাজা হইতে শরীরটা খানিকটা নোয়াইয়া বেচু চক্কত্তিকে প্রণাম করিয়া আবার সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কাঁচুমাচু হইয়া বলিল, তাহোলে বাবু, মাইনের জন্যে কবে আসবো ?

—এসো—এসো এর পরে যখন হয়। সে এখন দেখা যাবে—

ইহা যে অত্যন্ত ছেঁদো কথা হাজারির তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। বরং পদ্ম ঝি যাহা বলিয়াছে তাহাই ঠিক। মাহিনা ইহারা তাহাকে দিবে না। তাহার মাথায় আসিল একবার শেষ চেষ্টা করিবে। মরীয়ার শেষ চেষ্টা। বেচু চক্কত্তির নিকট হইতে বিদায় লইয়া সে পিছন দিয়া হোটেলের রান্নাঘরে আসিল। সেখানে পদ্ম ঝি একটু পরে আসিতেই সে হাত জোড় করিয়া বলিল—পদ্মদিদি, গরীব বামুন—চাকুরি করচি এতকাল, একখানা রেকাবী কোন দিন চুরি করিনি। আমি বড় গরীব। তুমি একটু বলে কর্ত্তামশাইকে আমার মাইনের ব্যবস্থা করে দেও—নইলে বাড়ীতে ছেলেপুলে না খেয়ে মরবে। এই আধুলিটা সম্বল, দোহাই বলছি রাধাবল্লভের—এতে আমি কি খাবো, আর রেলভাড়া কি দেবো, বাড়ীর জন্যেই বা কি নিয়ে যাবো।

—আমি হোটেলের মালিক নই যে তোমায় টাকা দেবো। কর্ত্তামশায় যা বলেচেন তার ওপর আমার কি কথা আছে ?

—দয়া করে পদ্মদিদি তুমি একবার বলো ওঁকে। না খেয়ে মারা যাবে ছেলেপিলে।

—কেন তোমার পেয়ারের কুসুমের কাছে যাও না, পদ্মদিদিকে কি দরকার এর বেলা ?

হাজারির ইচ্ছা হইল আর একদণ্ডও সে এখানে দাঁড়াইবে না। সে চায় না যে এই সব জায়গায় যার-তার মুখে কুসুমের নাম উচ্চারিত হয়, বিশেষতঃ পদ্ম ঝিয়ের মুখে। সে চুপ করিয়া রহিল। পদ্ম রান্নাঘর হইতে চলিয়া গেল।

একটুখানি দাঁড়াইয়া সে চলিয়াই যাইতেছিল, পদ্ম ঝি আসিয়া বলিল—যাচ্ছ যে ? খাওয়া হয়েছে তোমার ?

হাজারি অবাক হইয়া পদ্ম ঝিয়ের মুখের দিকে চাহিল। কখনো সে এমন কথা তাহার মুখে শোনে নাই! আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল—না—খাওয়া—ইয়ে—না হয় নি ধরো।

—তা হোলে বোসো। এখনও মাছটা নামে নি। মাছ নামলে ভাত খেয়ে তবে যাও। দাঁড়িয়ে কেন ? বসো না পিঁড়ি একখানা পেতে।

হাজারি কলের পুতুলের মত বসিল। পদ্মদিদি তাহাকে অবাক্ করিয়া দিয়াছে! পদ্মদিদির দরদ!.........সাত বছরের মধ্যে একদিনও যা দেখে নাই!............আশ্চর্য্য কাণ্ডই বটে!

মাছ নামিলে নতুন ঠাকুর হাজারিকে ভাত বাড়িয়া দিল। পদ্ম ঝিকে আর এদিকে দেখা গেল না—সে এখন খরিদ্দারদের খাওয়ার ঘরে ব্যস্ত আছে। নতুন ঠাকুর যদিও হাজারিকে চেনে না তবুও ইহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া সে বুঝিয়াছিল, হাজারি হোটেলের পুরোনো ঠাকুর—চাকুরিতে জবাব হইয়া চলিয়া যাইতেছে। সে হাজারিকে খুব যত্ন করিয়া খাওয়াইল।

যাইবার সময় হাজারি পদ্মকে ডাকিয়া বলিল—পদ্মদিদি, চললাম তবে। কিছু মনে কোরো না।

পদ্ম ঝি দোরের কাছে আসিয়া বলিল—হ্যাঁ দাঁড়াও ঠাকুর। এই দুটো টাকা রাখো, কর্ত্তামশায় দিয়েচেন মাইনের দরুন। এই শেষ কিন্তু—আর কিছু পাবে না ব'লে দিলেন তিনি।

হাজারি টাকা দুইটি লইয়া আগের আধুলিটির সঙ্গে চাদরের খুঁটে রাখিল কিন্তু সে খুব অবাক্ হইয়া গিয়াছে—সত্যই অবাক্ হইয়া গিয়াছে।

—আচ্ছা, তবে আসি।

—এসো। খাওয়া হয়েচে তো? আচ্ছা।

রাত সাড়ে ন'টার কম নয়।

এত রাত্রে সে কোথায় যায়!

চাকুরি গেল। তবুও হাতে আড়াইটা টাকা আছে।

বাড়ী যাইয়া কি হইবে? চাকুরি খুঁজিতে হইবেই তাহাকে। বাড়ী গিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। চাকুরি চলিয়া যাইবে—একথা হাজারি ভাবে নাই। সত্য সত্যই চাকুরি গেল শেষকালে!

সে জানে রাণাঘাটে কোনো হোটেলে তাহার চাকুরি আর হইবে না। যদু বাঁড়ুয্যে একবার তাহাকে হোটেলে লইতে চাহিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এখন সে চুরির অপবাদে হাজত বাস করিয়া আসিয়াছে, কেহই তাহাকে চাকুরি দিবে না।

হাজারি দেখিল সে নিজের অজ্ঞাতসারে চূর্ণী নদীর ধারে চলিয়াছে—তাহার সেই প্রিয় গাছতলাটিতে গিয়া বসিবে—বসিয়া ভাবিবে। ভাবিবার অনেক কিছু আছে।

কিন্তু প্রায় দুই ঘণ্টা নদীর ধারে বসিয়া থাকিয়াও ভাবনার কোনো মীমাংসা হইল না। আজ রাত্রে অবশ্য স্টেশনের প্ল্যাট্ফর্ম্মে শুইয়া থাকিবে—কিন্তু কাল যায় কোথায়?

আড়াই টাকার মধ্যে দুটি টাকা বাড়ী পাঠাইতে হইবে। টেঁপি—টেঁপির মুখে হয়তো তাহার মা দুটি ভাত দিতে পারিতেছে না।

এ চিন্তা তাহার পক্ষে অসহ্য।

না—কালই টাকা দুটি পাঠাইবে ডাকে। মনি অর্ডার ফি দিবে আধুলিটা হইতে। পুরো দু'টাকা বাড়ী যাওয়া চাই।

স্টেশনের প্ল্যাট্ফর্ম্মে শেষ রাত্রের দিকে সামান্য ঘুম হইল। ফরিদপুর লোকালের শব্দে খুব

ভোরে ঘুম গেল ভাঙিয়া। তবুও সে শুইয়াই রহিল। আজ আর তাড়াতাড়ি বড় উনুনে ডেক্‌চি চাপাইতে হইবে না—উঠিয়া কি হইবে ?

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে শুইয়াই রহিল। ডাউন দার্জ্জিলিং মেল আসিল, চলিয়া গেল। বনগাঁ লাইনের ট্রেন ছাড়িল। রোদ উঠিয়াছে, প্ল্যাট্‌ফর্ম্ম ঝাঁট দিতে আসিয়াছে ঝাড়ুদার। আর একখানা গাড়ীর ডাউন দিয়াছে আড়ংঘাটার দিকে। মুর্শিদাবাদ-লালগোলা প্যাসেঞ্জার।

—এই কোন্ নিদ্ যাতা রে, এই উঠো—হঠ্ যাও—ঝাড়ুদার হাঁকিল। হাজারি উঠিয়া হাই তুলিয়া কলে গিয়া হাতমুখ ধুইল।

সে কোথায় যায়—কি করে ? গত ছ'সাত বছরের মধ্যে এমন নিষ্ক্রিয় জীবন সে কখনো যাপন করে নাই—কাজ, কাজ, উনুনে ডেক্‌চি চাপাও, কর্ত্তামশায়ের চায়ের জল গরম কর আগে, বাজারে আজ কার পালা ? হৈ চৈ—ঝাড়া বকুনি—পদ্ম ঝিয়ের চেঁচামেচি……

বেশ ছিল। পদ্ম ঝিয়ের বকুনিও যেন এখন সুমিষ্ট বলিয়া মনে হইতেছে। পদ্ম খারাপ লোক নয়—কাল রাত্রে খাইতে বলিয়াছিল, টাকা দিয়াছে। রতন ঠাকুরও বড় ভাল লোক। তাহার সেই ভাগিনেয়টিও বড় ভাল। সবাই ভাল লোক। রতনের সেই ভাগিনেয় তাহার টেঁপির উপযুক্ত বর। দুজনে সুন্দর মানাইত। ছেলেটিকে বড় পছন্দ হইয়াছিল। আকাশকুসুম। মিথ্যা আশা, টেঁপিকে খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলে তবে তার বিয়ে।

গত ছ'বছরে হাজারির একটা বড় কুঅভ্যাস হইয়া গিয়াছে—সকালে বিকালে চা খাওয়া।

এখন চা খাইতে হইবে পয়সা খরচ করিয়া—সেজন্য হাজারি চা খাওয়ার ইচ্ছাকে দমন করিল।

হঠাৎ তাহার মনে হইল কুসুমের সঙ্গে একবার দেখা করা একান্ত আবশ্যক। আজ সাত আট দিন কুসুমের সঙ্গে তার দেখা হয় নাই। চুরির জন্য হাজতে যাওয়ার সংবাদ বোধ হয় কুসুম শোনে নাই—কে তাহাকে সে খবর দিয়াছে ? চা ওখানেই খাওয়া চলিতে পারে। কুসুমের সঙ্গে একটা পরামর্শও করা দরকার। তাহার নিজের মাথায় কিছুই আসিতেছে না।

কুসুম কড়া নাড়ার শব্দে দরজা খুলিয়া হাজারিকে দেখিয়া বিস্মিত কণ্ঠে বলিল—আপনি জ্যাঠামশায় ? এমন অসময় যে ! এতদিন আসেন নি কেন ?

—চলো, ভেতরে বসি। অনেক কথা আছে।

কুসুম ঘরের মেঝেতে শতরঞ্জি পাতিয়া দিল। হাজারি বসিয়া বলিল—মা কুসুম, একটু চা খাওয়াবে !

—এখুনি করে দিচ্ছি জ্যাঠামশায়, একটু বসুন আপনি।

চা শুধু নয়—চায়ের সঙ্গে আসিল একখানা রেকাবিতে খানিকটা হালুয়া। হাজারি চা

খাইতে খাইতে বলিল—কুসুম মা, আমার চাকরি গিয়েচে।

কুসুম বিস্ময়ের সুরে বলিল—কেন ?

—চুরি করেছিলাম বলে।

—চুরি করেছিলেন !

—ওরা তাই বলে। পাঁচ-ছ'দিন হাজতে ছিলাম।

—হাজতে ছিলেন ! হ্যাঁ ! মিথ্যে কথা।

কুসুম দাঁড়াইয়া ছিল—হাজারির সামনে মাটির উপর ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িয়া কৌতূহল ও অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে হাজারির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

—না কুসুম, মিথ্যে নয়, সত্যিই হাজতে ছিলাম চুরির আসামী হিসেবে।

—হাজতে থাকতে পারেন জ্যাঠামশায়—কিন্তু চুরি আপনি করেন নি—করতে পারেন না। সেইটেই মিথ্যে কথা, তাই বলচি।

—আমি চুরি করতে পারি নে ?

—কক্ষনো না জ্যাঠামশায়। আপনাকে আমি জানি নে ? চিনি নে ?

—তোমার মা, এত বিশ্বাস আছে আমার ওপর !

কুসুম অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া রহিল। মনে হইল সে কান্না চাপিবার চেষ্টা করিতেছে।

হাজারি বাঁচিল। কুসুম সত্যই তার মেয়ে বটে। তাহার বড় ভয় ছিল কুসুম জিনিসটা কি ভাবে লইবে। যদি বিশ্বাস করিয়া বসে যে সত্যিই সে চোর ! জগতে তাহা হইলে হাজারির একটা অবলম্বন চলিয়া গেল।

—আপনি এখন কোথা থেকে আসচেন জ্যাঠামশায় ?

—কাল রাত্রে স্টেশনে শুয়ে ছিলাম—যাবো আর কোথায় ? সেখান থেকে উঠে আসচি। ভাবলাম তোমার সঙ্গে একবার দেখা করাটা দরকার মা, হয়তো আবার কতদিন—

—কেন, আপনি যাবেন কোথায় ?

—একটা কিছু হিল্লে লাগাতে তো হবে—বসে থাকলে চলবে না বুঝতেই পারো। দেখি কি করা যায়।

—এখানে আর কোনো হোটেলে—

—চুরির অপবাদ রটেচে যখন, তখন এখানকার কোনো হোটেলে নেবে না। দেখি, একবার ভাবচি গোয়াড়ি যাই না হয়—সেখানে অনেক হোটেল আছে, খুঁজে দেখি সেখানে।

কুসুম খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—আচ্ছা, সে যা হয় হবে এখন। আপাতোক্ আপনি নেয়ে আসুন, তেল এনে দিই। তারপর রান্নার যোগাড় ক'রে দিচ্চি, এখানে দু'টি ভাতেভাত চড়িয়ে খান।

—না মা, ওসব হাঙ্গামে আর দরকার নেই—থাক্, খাওয়ার জন্যে কি হয়েচে—আমি

তোমার সঙ্গে দুটো কথা কই ব'সে। ভাবলাম কুসুমের সঙ্গে একবার পরামর্শ করি গিয়ে, তাই এলাম। একটা বুদ্ধি দাও তো মা খুঁজে—একার বুদ্ধিতে কুলোয় না—তারপর বুড়োও হয়ে পড়েচি তো!

কুসুম হাসিয়া বলিল—পরামর্শ হবে এখন। না যদি খান, তবে আমিও আজ সারাদিন দাঁতে কুটো কাটবো না বলে দিচ্চি কিন্তু জ্যাঠামশায়। ওসব শুনবো না—আগে নেয়ে আসুন—তারপর ভাত চাপান, আমিও আপনার প্রসাদ দু'টি পাই। মেয়ের বাড়ী এসেচেন, যতই গরীব হই, আপনাকে না খাইয়ে ছেড়ে দেবো ভেবেচেন বুঝি—ভারি টান তো মেয়ের ওপর?

অগত্যা হাজারি চূর্ণীর ঘাটে স্নান করিতে গেল। ফিরিয়া দেখিল গোয়ালঘরের এক কোণ ইতিমধ্যে কুসুম কখন লেপিয়া পুঁছিয়া পরিষ্কার করিয়া ইট দিয়া উনুন পাতিয়া ফেলিয়াছে।

একটা পেতলের মাজা বোগনো দেখাইয়া বলিল, এতেই হবে জ্যাঠামশায়, না নতুন হাঁড়ি কাড়বেন?

—না নতুন হাঁড়ির দরকার নেই। ওতেই বেশ হবে এখন।

ভাত নামিবার কিছু পূর্ব্বে একটি ছেলে গোয়ালঘরের দোরে আসিয়া উঁকি মারিয়া ইঙ্গিতে কুসুমকে বাহিরে ডাকিল। হাজারি দেখিল, তাহার হাতে একখানা গামছায় বাঁধা হাটবাজার—অন্য হাতে একটা বড় ইলিশ মাছ ঝোলানো।

—একটুখানি দাঁড়ান জ্যাঠামশায়, মাছ কুটে আনি।

হাজারি অত্যন্ত লজ্জিত ও বিপন্ন হইয়া উঠিল কুসুমের কাণ্ড দেখিয়া। পাশের বাড়ীর ছেলেটিকে ডাকিয়া কুসুম কখন বাজার করিতে দিয়াছে থাক্ দিয়াছে দিয়াছে—কুসুম গরীব মানুষ, এত বড় মাছ কিনিতে দেওয়ার কারণ কি ছিল? নাঃ, বড় ছেলেমানুষ এখনও। এদের জ্ঞানকাণ্ড আর হবে কবে?

কুসুম হাজারির তিরস্কারের কোনো জবাব দিল না। মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিল—আপনার রান্না ইলিশ মাছ একদিন খেতে যদি সাধ হয়ে থাকে তবে মেয়েকে অমন করে বকতে নেই জ্যাঠামশায়!

হাজারি অপ্রসন্নমুখে বলিল—নাঃ, যতো সব ছেলেমানুষের ব্যাপার!

আহারাদির পর হাজারির বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া কুসুম খাইতে গেল। গত রাত্রে ভাল ঘুম হয় নাই—ইতিমধ্যে হাজারি কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, যখন ঘুম ভাঙিল তখন প্রায় বিকাল হইয়া গিয়াছে।

কুসুম ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বলিল—কাল ঘুম হয় নি মোটেই ইষ্টিশানের বেঞ্চিতে শুয়ে—তা বুঝতে পেরেচি। ঘুমিয়েচেন ভাল তো? চা ক'রে আনি, উঠে মুখ ধুয়ে নিন।

চায়ের সঙ্গে কোথা হইতে কুসুম গরম জিলিপি আনাইয়া দিল। বলিলেও শোনে না, বলিল—এই তো ওই মোড়ে হারান ময়রার দোকানে এ সময় বেশ গরম জিলিপি ভাজে, চায়ের সঙ্গে বেশ লাগবে—শুধু চা খাবেন?

ইহার উপর আর কত অত্যাচার করা চলিতে পারে। আজই এখান হইতে সরিয়া না পড়িলে উপায় নাই। হাজারি ঠিক করিল চা খাইয়া আর একটু বেলা গেলেই এখান হইতে রওনা হইবে।

কুসুম পান সাজিয়া আনিয়া হাজারির সামনে মেঝেতে বসিল।—তারপর এখন কি করবেন ভেবেচেন ?

—ওই তো বল্লাম গোয়াড়ি গিয়ে চাকরির চেষ্টা করি।

—যদি সেখানে না পান ?

—তবে কলকাতা যাবো। তবে পাড়াগাঁয়ের মানুষ, কলকাতায় যাতায়াত অভ্যাস নেই—অত বড় শহরে থাকাও অভ্যাস নেই—ভয় করে।

—আমার একটা কথা শুনবেন জ্যাঠামশায় ?

—কি ?

—শোনেন তো বলি।

—বল না মা কি বলবে ?

—আমার সেই গহনা বাঁধা দিয়ে কি বিক্রি ক'রে আপনাকে দু'শো টাকা এনে দিই। আপনি তাই নিয়ে হোটেল খুলুন। আপনার রান্নার সুখ্যাতি দেশ জুড়ে। হোটেল খুললে দেখবেন কেমন পসার জমে—এই রাণাঘাটেই খুলুন, ওই চক্কত্তির হোটেলের পাশেই খুলুন। পদ্ম চোখ টাটিয়ে মরুক। মেয়ের পরামর্শ শুনুন জ্যাঠামশায়—আপনার উন্নতি হবে—কোথায় যাবেন এ বয়সে পরের চাকরি করতে।

হাজারির চোখে প্রায় জল আসিল। কি চমৎকার, এই অদ্ভুত মেয়ে কুসুম! মেয়েই বটে তাহার। কিন্তু তাহা হইবার নয়—নানা কারণে। কুসুমের টাকায় রাণাঘাটে হোটেল খুলিলে পাঁচজন পাঁচরকম বদনাম রটাইবে উভয়ের নামে। তাহার উপকার করিয়া নিরপরাধিনী কুসুম কলঙ্ক কুড়াইতে গেল কেন ? ওই পদ্ম ঝি-ই সাতরকম রটাইয়া বেড়াইবে গাত্রদাহের জ্বালায়।

তা ছাড়া যদি লোকসানই হয়, ধরো—(যদিও হাজারির দৃঢ় বিশ্বাস সে হোটেল খুলিলে লোকসান হইবে না) তাহা হইলে কুসুমের টাকাগুলি মারা পড়িবে। না, তার দরকার নাই।

—মা কুসুম, একবার তো তোমাকে বলেছিলাম তোমার ও টাকা নেওয়া হবে না। আবার কেন সে কথা ? আমাকে এই গাড়ীতে গোয়াড়ি যেতে হবে, উঠি।

কুসুম গড় হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—আচ্ছা, কথা দিয়ে যান যদি গোয়াড়িতে চাকুরি না জোটাতে পারেন তবে আবার আমার কাছে ফিরে আসবেন ?

—তোমার কাছে মা ? কেন বলো তো ?

—এসে ওই টাকা নিতে হবে। হোটেল খুলতে হবে। ও টাকা আপনার হোটেলের জন্যে তোলা আছে। শুধু আপনার ভালোর জন্যেই বলচি তা ভাববেন না জ্যাঠামশায়। আমার স্বার্থ আছে। আমার টাকাগুলো আপনার হাতে খাটলে তা থেকে দু'পয়সা আমিও

পাবো তো। গরীব মেয়ের একটা উপকার করলেনই বা ?

হাজারি হাসিয়া বলিল—আচ্ছা কথা দিয়ে গেলাম। তবে আসি মা আজ। এসো, এসো, কল্যাণ হোক।

—মনে রাখবেন মেয়ের কথা।

—তুমিও মনে রেখো তোমার বুড়ো জ্যাঠামশায়ের কথা—

—ইস্! আমার জ্যাঠামশায় বুড়ো বৈকি ?

—না, ছ'চল্লিশ বছর বয়েস হয়েচে—বুড়ো নয় তো কি ?

—দেখায় না তো বুড়োর মত। বয়েস হলেই হোলো? আসবেন আবার কিন্তু তা হোলে।

—আচ্ছা মা।

হাজারি পুঁটুলি লইয়া বাটির বাহির হইল। কুসুম তাহার সঙ্গে সঙ্গে বড় রাস্তা পর্য্যন্ত আসিয়া আগাইয়া দিয়া গেল।

রাণাঘাট হইতে বাহির হইয়া হাজারি হাঁটাপথে চাকদার দিকে রওনা হইল। প্রথমে ডাকঘর হইতে বাড়ীতে দু'টি টাকা মনিঅর্ডার পাঠাইবার ইচ্ছা ছিল—কিন্তু ডাকঘরে গিয়া দেখিল মনিঅর্ডার নেওয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

ডাকঘর খোলা না থাকার জন্য পরে হাজারি ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়াছিল। চাকদা যাইবার মাঝপথে সেগুন-বাগানের মধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকার নামিল। একটা সেগুন গাছের তলায় দু'খানি গরুর গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। লোকজন নামিয়া গাছতলায় রান্না চড়াইয়াছে। হাজারি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, সম্মুখের পূর্ণিমায় কালীগঞ্জে গঙ্গাস্নানের মেলা উপলক্ষ্যে উহারা মেলায় দোকান করিতে যাইতেছে। হাজারি তাহাদের সঙ্গ লইল।

রাত্রে আহারাদির পরে সবাই গাছতলায় শুইয়া রাত্রি কাটাইল—দোকানের মালিকের নাম প্রিয়নাথ ধর, জাতিতে সুবর্ণ বণিক, মনোহা'র দোকান লইয়া ইহারা মেলায় যাইতেছে। হাজারির পরিচয় পাইয়া ধর মহাশয় প্রস্তাব করিল মেলায় কয়দিন তাহারা কেনাবেচা লইয়া ব্যস্ত থাকিবে এই কয়দিন হাজারি যদি রান্না করিয়া সকলকে খাওয়ায়—তবে সে দৈনিক খোরাকি ও মেলা অন্তে কয়দিনের মজুরি স্বরূপ দুই টাকা পাইবে।

প্রিয়নাথ ধরের দোকান তিনখানি—একখানি তার নিজের, অপর দুইখানি তাহার জামাই ও ভ্রাতুষ্পুত্রের। কম মাহিনায় যে ওস্তাদ রাঁধুনী পাইয়াছে, হাজারির প্রথম দিনের রন্ধনেই তাহা সপ্রমাণ হইয়া গেল। সকলেই খুব খুশি।

মেলায় পৌঁছিয়া কিন্তু হাজারি দেখিল, রান্নার চেয়েও অধিকতর লাভের একটি ব্যবসা এই মেলাতেই তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। সে জিনিসপত্র কিনিয়া আনিয়া তেলে-ভাজা কচুরি সিঙ্গাড়ার দোকান খুলিয়া বসিল ধর মহাশয়দের বাসার একপাশে। বিনামূল্যে কচুরি খাইবার লোভে ধর মহাশয় কোন আপত্তি করিলেন না।

কয়দিন দোকানে অসম্ভব রকমের বিক্রি হইল। মূলধন ছিল আগের সেই দুই টাকা—শেষে খরিদ্দারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে হাজারি ধর মহাশয়ের তহবিল হইতে কয়েকটি টাকা ধার লইল।

চতুর্থ দিনের সন্ধ্যাবেলা দোকানপাট উঠানো হইল। মেলা শেষ হইয়া গিয়াছে। ধর মহাশয়ের তহবিলের দেনা শোধ করিয়া ও সকল প্রকার খরচ বাদ দিয়া হাজারি দেখিল সাড়ে তেরো টাকা লাভ দাঁড়াইয়াছে। ইহার উপর ধর মহাশয়ের রান্নার মজুরি দুই টাকা লইয়া মোট হইল সাড়ে পনের টাকা।

প্রিয়নাথ ধর বলিলেন—ঠাকুর মশায়, আপনার রান্না যে এত চমৎকার, তা যখন আপনাকে সেগুন-বাগানে প্রথম কাজে লাগালুম, তখন ভাবি নি। আমি বড়লোক নই, বাড়ীতে মেয়েরাই রাঁধে, না হোলে আপনাকে আমি ছাড়তুম না কিছুতেই।

বাড়ীতে দশটি টাকা পাঠাইয়া দিয়া হাজারির মন খানিকটা সুস্থ হইল। এখন সংসারের ভাবনা সম্বন্ধে মাসখানেকের মত নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে সে। এই এক মাসের মধ্যে নতুন কিছু অবশ্যই জুটিয়া যাইবে।

কালীগঞ্জ হইতে যশোর যাইবার পাকা রাস্তা বাহিয়া হাজারি আবার পথ চলিল। এই পথের দুধারে বনজঙ্গল বড় বেশী—পূর্ব্বে গ্রাম ছিল, ম্যালেরিয়ার অত্যাচারে বহু গ্রাম জনশূন্য হইয়া যাওয়াতে অনাবাদী মাঠ ও বিধ্বস্ত পুরাতন গ্রামগুলি বনে-জঙ্গলে ছাইয়া ফেলিয়াছে।

সকালবেলা কালীগঞ্জ হইতে রওনা হইয়াছে, যখন দুপুর উত্তীর্ণ হয়-হয়, তখন একটা প্রাচীন তেঁতুলগাছের ছায়ায় সে আশ্রয় লইল। অল্প দূরে একখানা ক্ষুদ্র চাষাদের গ্রাম। একটি ছোট ছেলে গরু তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল গ্রামখানার নাম নতুন পাড়া। বেশীর ভাগ গোয়ালাদের বাস।

হাজারি গ্রামের মধ্যে ঢুকিয়া প্রথমেই যে খড়ের বড় আটচালা ঘরখানা দেখিল তাহার উঠানে গিয়া দাঁড়াইল।

বাড়ীর মালিক কাহাকেও দেখিল না। একদিকে বড় গোয়াল, অনেকগুলি বলদ গরু বিচালির জাব খাইতেছে।

একটি ছোট মেয়ে বাহির হইয়া উঠানে দাঁড়াইল। হাজারি তাহাকে ডাকিয়া বলিল—খুকী শোনো—বাড়ীতে কে আছে? মেয়েটি ভয় পাইয়া কোনো উত্তর না দিয়াই বাড়ীর ভিতর ঢুকিল।

প্রায় আধঘণ্টা অপেক্ষা করিবার পরে বাড়ীর মালিক আসিল। তাহার নাম শ্রীচরণ ঘোষ। হাজারিকে সে খুব খাতির করিয়া বসাইল, দুপুর গড়াইয়া গিয়াছে—সুতরাং রান্না-খাওয়া করিতে বলিল। বাড়ীর ভিতর হইতে একখানা জলচৌকি ও এক বালতি জল আনিয়া সামনে রাখিয়া দিল।

ইহারাও গোয়ালঘরের একপাশে রান্নার যোগাড় করিয়া দিয়াছিল। সেখানে বসিয়া

রাঁধিতে রাঁধিতে হঠাৎ তাহার মনে পড়িল কুসুমের কথা। কুসুমও তাহাকে সেদিন গোয়ালঘরেই রাঁধিবার আয়োজন করিয়া দিয়াছিল—কুসুমও গোয়ালার মেয়ে।

বোধ হয় সেই জন্যই—ইহারা গোয়ালা শুনিয়াই—হাজারি ইহাদের বাড়ী আসিয়াছিল—মনের মধ্যের কোন গোপন আকর্ষণ তাহাকে এখানে টানিয়া আনিয়াছিল। হঠাৎ সে আশ্চর্য্য হইয়া গোয়ালঘরের দরজার দিকে চাহিল।

একটি অল্পবয়সী বৌ আধঘোমটা দিয়া গোয়ালঘরে ঢুকিয়া এক চুব্‌ড়ি শাক লইয়া লাজুক ভাবে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতেছে। শাকগুলি সদ্য জল হইতে ধুইয়া আনা—চুব্‌ড়ি দিয়া জল ঝরিয়া গোয়ালঘরের মাটির মেঝে ভিজাইয়া দিতেছে। হাজারি ব্যস্ত হইয়া বলিল—এস মা এস—কি ওতে?

বউটি লাজুক মুখে একটু হাসিয়া বলিল—চাঁপানটে শাক। এখানে রাখি?

বউটি কুসুমের অপেক্ষাও বয়সে ছোট। হঠাৎ একটা অকারণ স্নেহে হাজারির মন ভরিয়া উঠিল। সে বলিল—রাখো মা রাখো—

খানিকটা পরে বউটি আবার ঘরের মধ্যে গোটাকতক কাঁঠাল-বীচি লইয়া ঢুকিল। এবার সে যেন অনেকটা নিঃসংকোচ, পিতার বয়সী এই শান্ত, প্রৌঢ় ব্রাহ্মণের নিকট সংকোচ করিতে তাহার বাধিতেছিল হয়তো।

হাজারিকে বলিল—কাঁঠাল-বীচি খান?

—খাই মা, কিন্তু ওগুলো কুটে দেবে? আমি ডাল চড়িয়েচি, আবার কুটি কখন?

বউটি এক পাথরের বাটিতে কাঁঠাল-বীচি আনিয়াছিল। বাটিটা নামাইয়া ছুটিয়া গিয়া একখানা বঁটি লইয়া আসিল এবং বীচিগুলি কুটিতে আরম্ভ করিল। হাজারির মন তৃষিত ছিল, ইহারা সবাই মেয়ের মত, সবাই ভালবাসে, সেবা করে, মনের দুঃখ বোঝে।

হাজারি কোন কথা বলিবার আগেই বউটি বলিল—আপনার গাঁয়ে আমি কত গিইচি।

হাজারি অবাক হইয়া বলিল—আমার গাঁ কোথায় তুমি কি ক'রে জানলে? তুমি সেখানে কি ক'রে গেলে?

—গঙ্গাধর ঘোষ আমার পিসেমশাই—

—ওহো—তুমি জীবনের ভাইঝি! তা হলে কুসুমকে তো চেনো—

—কুসুমদিদিকে তার বিয়ের আগে অনেকবার দেখেচি, বিয়ের পরে আর কখনও দেখি নি। সে আজকাল কোথায় থাকে জানেন নাকি?

—সে থাকে রাণাঘাটে শ্বশুরবাড়ীতে। তবে তোমাকে মা বলে খুব ভাল করেচি, কুসুম আমার মেয়ে!

বউটি বীচি কোটা বন্ধ রাখিয়া গলায় আঁচল জড়াইয়া দূর হইতেই প্রণাম করিল।

—এসো মা চিরজীবী হও, সাবিত্রী সমান হও।

বউটি হাসিয়া বলিল—আপনি যখন উঠোনে দাঁড়িয়ে, তখনই আপনাকে দেখে আমি

চিনেচি। আমি শাশুড়ীকে গিয়ে বল্লাম আমার পিসিমার গাঁয়ের মানুষ উনি—তখন শাশুড়ী গিয়ে শ্বশুরকে জানালেন।

—বেশ মা বেশ। আসবো যাবো, আমার আর একটি মেয়ে হোল, তার সঙ্গে দেখাশুনা করে যাবো। ভালই হোল।

বউটি সলজ্জভাবে বলিল—আজ কিন্তু আপনাকে যেতে দেবো না—থাকতে হবে এখন এখানে—

—না মা, আমার থাকা হবে না।

—না তা হবে না। যান দিকি কেমন করে যাবেন? আমি জোর করতে পারিনে বুঝি?

—অবিশ্যি পারো মা, কিন্তু আমার মনে শান্তি নেই, আবার সুদিন পেলে এসে দু'দিন থেকে যাবো—

বউটি হাজারির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—কেন, কি হয়েচে আপনার?

হাজারির স্বভাবদুর্ব্বল মন, সহানুভূতির গন্ধ পাইয়া গলিয়া গেল। সে তাহার চাকুরি যাওয়ার আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া গেল—ডাল নামাইয়া চচ্চড়ি রাঁধিবার ফাঁকে ফাঁকে। একটু গর্ব্ব করিবার লোভও সম্বরণ করিতে পারিল না।

—রান্না যা করতে পারি মা, তোমার কাছে গোমর করে বলচি নে, অমন রান্না রাণাঘাটের কোনো হোটেলে কোনো বামুনঠাকুর রাঁধতে পারবে না। হয় না হয় মা এই তোমাদের এখানে এই যে চচ্চড়ি রাঁধচি, তোমাদের সকলকে খাইয়ে দেখাবো; আমি জোর করে বলতে পারি এরকম চচ্চড়ি কখনও খাও নি, আর কখনও খাবে না।

বউটি বিস্ময়ে, সম্ভ্রমে, মুগ্ধ দৃষ্টিতে হাজারির দিকে চাহিয়া কথা শুনিতেছিল। বলিল—তা হোলে আমায় শিখিয়ে দিতে হবে খুড়োমশাই—

—একদিনের কর্ম্ম নয় সে। শেখালেও শিখতে পারা কঠিন হবে—তোমায় ফাঁকি দেওয়া আমার ইচ্ছে নয় মা। এ শেখা এক আধ দিনে হয় কখনো?

—তা আপনি যদি অমন রাঁধুনী, আপনার আবার চাকুরির ভাবনা কি? কত বড়লোকের বাড়ী ভাল মাইনে দিয়ে রাখবে—

—অদৃষ্ট যখন খারাপ হয় মা, কিছুতেই কিছু হয় না। হাতে টাকা থাকে দু'দিন চেষ্টা-চরিত্তির করে বেড়াতে পারি। বেড়াবো কি, রেস্ত ফুরিয়ে এসেচে কি না!

—ক'টাকা লাগবে বলুন।

—কেন, তুমি দেবে নাকি?

—যদি দিই?

—সে আমি নিতে পারি নে। কুসুম দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তা আমি নেবো কেন? তোমরা মেয়েমানুষ, ব্যাঙের আধুলি পুঁজি করে রেখেচ, তা থেকে নিয়ে তোমাদের ক্ষতি করতে চাই নে।

—আচ্ছা, আপনাকে যদি টাকা ধার দিই? আপনাকে বলি শুনুন খুড়োমশায়। আমার মার কাছ থেকে কিছু টাকা এনেছিলাম। এখানে রাখবার জো নেই। একটা কথা বলবো?

এদিক ওদিক চাহিয়া সুর নীচু করিয়া বলিল—ননদ আর জা ভাল লোক নয়। এখুনি যদি টের পায় নিয়ে নেবে। আমি আপনাকে টাকা ধার দিচ্ছি, আপনি সুদ দেবেন কত করে বলুন?

এই কুসীদ-লোভী সরলা মেয়েটির প্রতি হাজারির প্রৌঢ় মন করুণায় ও মমতায় গলিয়া গেল। সে আরও খানিক মজা দেখিতে চাহিল।

—এমনি টাকা দেবে মা? আমায় বিশ্বাস কি?

—তা বিশ্বাস না করলে কি এ কারবার চলে? আর আপনি তো চেনা লোক। আপনার গাঁ চিনি, বাড়ী চিনি।

—চিন্‌লেই হোল? একটা লেখাপড়া করে নেবে না? কত টাকা দিতে চাও?

—আমার কাছে আছে আশি টাকা। সবই দিতে পারি আপনি যদি নেন। সুদ কত দেবেন?

—কত করে চাও?

—আপনি যা দেবেন। টাকায় দুপয়সা করে রেট্, আপনি এক পয়সা দেবেন, কেমন তো? আপনার পায়ে পড়ি খুড়োমশায়, টাকাগুলো আলাদা আমার তোরঙ্গতে তোলা আছে। কেউ জানে না। আপনাকে এনে দিই, টাকাগুলো খাটিয়ে দিন আমায়। কাকে বিশ্বাস করে দেবো, কে নিয়ে আর দেবে না।

—কই, লেখাপড়ার কথা বল্লে না তো?

—আমি লেখাপড়া জানি নে—কি লেখাপড়া করে নেবো। আপনি চান একটা কিছু লিখে দিয়ে যান। কিন্তু তাতে লোক-জানাজানি হবে। সে কাজের দরকার নেই। আপনি নিয়ে যান। আমি দিচ্ছি মিটে গেল। এর আর লেখাপড়া কি?

ইতিমধ্যে রান্নাবান্না শেষ হইয়া গেল। বউটি একঘটি দুধ আনিয়া বলিল—এই উনুনটা পেড়ে দুধটুকু জ্বাল দিয়ে খেতে বসুন—বেলা কি কম হয়েচে?

খাওয়া-দাওয়া মিটিয়া গেল। হাজারির কথা মিথ্যা নয়—গোয়ালাবাড়ীর সকলে একবাক্যে বলিল, এরকম রান্না খাওয়া তো দূরের কথা, সামান্য জিনিস যে খাইতে এমনধারা হয় তাহা শোনেও নাই।

বিকালে বিশ্রাম করিয়া উঠিয়া হাজারি যাইবার জন্য তৈরী হইল। তাহার ইচ্ছা ছিল আর একবার বউটির সঙ্গে দেখা করে। পল্লীগ্রামে মেয়েদের মধ্যে কড়াকড়ি পর্দা নাই সে জানে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ কায়স্থ ভিন্ন অন্য জাতির মেয়েদের মধ্যে। মেয়েটিকে তাহার ভাল লাগিয়াছিল উহার সরলতার জন্য এবং বোধ হয় টাকাকড়ি সম্বন্ধে কথাটা আর একবার বলিতে তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, সে ইতিমধ্যে একটা মতলব মাথায় আনিয়া ফেলিয়াছে।

কুসুম এবং এই মেয়েটি যদি তাহাকে টাকা দেয় তবে সে তাহার চিরদিনের স্বপ্নকে সার্থক করিয়া তুলতে পারিবে। ইহাদের টাকা সে নষ্ট করিবে না—বরং অনেক গুণ বাড়াইয়া ইহাদের হাতে তুলিয়া দিতে পারিবে। খাইতে বসিয়া হাজারি এসব কথা ভাবিয়া দেখিয়াছে।

ইহাদের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া বড় রাস্তায় পড়িতে হইলে একটা পুকুরের ধার দিয়া যাইতে হয়—একটা বড় তেঁতুল গাছ এবং তাহার চারিপাশে অন্যান্য বন্য গাছের ঝোপ জায়গাটাকে এমন ভাবে ঢাকিয়া রাখিয়া দিয়াছে যে বাহির হইতে হঠাৎ সেখানে কেহ থাকিলে তাহাকে দেখা যায় না।

পুকুরের পাড় ছাড়াইয়া হাজারি হঠাৎ দেখিল মেয়েটি তেঁতুলতলার ছায়ায় দাঁড়াইয়া আছে যেন তাহারই অপেক্ষায়।

—চল্লেন খুড়োমশায় ?

—হ্যাঁ যাই, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে ?

—আপনি এই পথ দিয়ে যাবেন জানি, তাই দাঁড়িয়ে আছি। দুটো কথা আপনাকে বলবো। আপনার হাতের রান্না চচ্চড়ি খেয়ে ভাল লেগেছে খুড়োমশায়। আমরাও তো রাঁধি, রান্নার ভাল মন্দ বুঝি। অমন রান্না কখনো খাই নি। আর একটা কথা হচ্ছে আমার টাকাটার কথা মনে আছে তো ? কি করলেন তার ? জানেন তো মেয়েরা শ্বশুরবাড়ীর লোকদের চেয়ে বাপের বাড়ীর লোকদের বেশী বিশ্বাস করে ? এদের হাতে ও টাকা পড়লে দুদিনে উড়ে যাবে।

—টাকা তোমার এখুনি নিতে পারবো না মা। কিন্তু আবার আমি এই পথে আসবো, তোমার সঙ্গে দেখা করবো। তখন হয়তো টাকার দরকার হবে, টাকা তখন হয়তো নিতে হবে।

—কত দিনের মধ্যে আসবেন ?

—তা বলতে পারিনে, ধর মাস দুই। পুজোর পরে কার্ত্তিক-অঘ্রাণ মাসের দিকে তোমার সঙ্গে দেখা করবো।

—কথা রইল তা হোলে ?

—ঠিক রইল। এসো এসো, লক্ষ্মী ছোট্ট মা আমার—সাবিত্রী সমান হও, আশীর্ব্বাদ করি তোমার বাড়-বাড়ন্ত হোক।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। হাজারি আবার পথ চলিতে লাগিল। গোয়ালাবাড়ীর সবাই এবেলা থাকিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল, বউটি তো বিশেষ করিয়া। কিন্তু থাকিবার উপায় নাই, একটা কিছু যোগাড় না করা পর্য্যন্ত তাহার মনে সুখ নাই।

মেয়েটি খুব আশ্চর্য্য ধরণের বটে। নির্ব্বোধ হয় তো—কুসুমের মত বুদ্ধিমতী নয় ঠিকই, তবুও বড় ভাল মেয়ে।

পথের দুধারে বনজঙ্গল ক্রমশঃ ঘন হইয়া উঠিতেছে—পথ নদীয়া জেলা হইতে যত যশোর

জেলার কাছাকাছি আসিয়া পৌছিতেছে এই বন ক্রমশঃ বাড়িতেছে। স্থানে স্থানে বনজঙ্গল এত ঘন যে হাজারির ভয় করিতে লাগিল দিনমানেই বুঝি বাঘের হাতে পড়িতে হয়। লোকের বসতি এসব স্থানে বেশী নাই, ভয় করিবারই কথা।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে বেলের বাজারে আসিয়া পৌছিল। আগে যখন রেল হয় নাই, তখন বেলের বাজার খুব বড় ছিল, হাজারি শুনিয়াছে তাহার গ্রামের বৃদ্ধ লোকদের মুখে। এখনও পূর্ব্ব অঞ্চল হইতে চাকদহের গঙ্গায় শবদাহ করিতে আসে বহুলোক—তাহাদের জন্যই বেলের বাজার এখনও টিঁকিয়া আছে।

হাজারি বেলের বাজার দেখিয়া খুশী হইল ও আগ্রহের সঙ্গে দেখিতে লাগিল। ছেলেবেলা হইতে শুনিয়া আসিয়াছে, কখনও দেখে নাই। চমৎকার জায়গা বটে। এই তাহা হইলে বেলে! তাহার এক মামাতো ভাই যশোর অঞ্চলে বিবাহ করিয়াছিল, তাহার বৃদ্ধা শাশুড়ীর মৃত্যুর পরে শব লইয়া চাকদহে এই পথ বাহিয়া আসিতে আসিতে বেলের বাজারের কাছে ভৌতিক ব্যাপারের সম্মুখীন হয়—এ গল্প উক্ত মামাতো ভাইয়ের মুখেই দু-তিনবার সে শুনিয়াছে।

হাজারি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাজারের দোকানগুলি দেখিতে লাগিল। সর্ব্বসুদ্ধ ন'খানা দোকান ইহারই মধ্যে চাল ডাল মুদিখানার দোকান, কাপড়ের দোকান সব। একজন দোকানদারকে বলিল—একটু তামাক খাওয়াতে পারেন মশায়?

—আপনারা?

—ব্রাহ্মণ।

—পেরণাম হই ঠাকুর মশায়। আসুন, কোথায় যাওয়া হবে?—বসুন, ওরে বামুনের হুঁকোতে জল ফিরিয়ে নিয়ে আয়।

দোকানখানি কিসের তাহা হাজারি বুঝিতে পারিল না। এক পাশে চিটা গুড়ের ক্যানেস্তা চাল পর্য্যন্ত একটার গায়ে একটা উঁচু করিয়া সাজানো আছে—আর এক পাশে বড় বড় বস্তা। দোকানদার বৃদ্ধ, বয়স পঁয়ষট্টি হইতে সত্তর হইবে, রোগা একহারা চেহারা, গলায় মালা।

—নিন্ ঠাকুর মশায়, তামাক ইচ্ছে করুন। কোথায় যাওয়া হবে?

—যাচ্ছি কাজের চেষ্টায়, রাণাঘাট হোটেলে সাত বছর রেঁধেছি, বেচু চক্কত্তির হোটেলে। নাম শুনেছেন বোধ হয়। ভাল রাঁধুনী বলে নাম আছে—কিন্তু চাকুরিটুকু গিয়েছে—এখন যাই তো একবার এই দিক পানে—যদি কোথাও কিছু জোটে।

দোকানদার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্ভ্রমের চোখে হাজারিকে দেখিল। নিতান্ত গ্রাম্য ঠাকুর পূজারী বামুন নয়—রাণাঘাটের মত শহর বাজারের বড় হোটেলে সাত-আট বছর সুখ্যাতির সঙ্গে রান্নার কাজ করিয়াছে, কত দেখিয়াছে, শুনিয়াছে, কত বড় লোকের সঙ্গে মিশিয়াছে—না, লোকটা সে যাহা ভাবিয়াছিল তাহা নয়।

হাজারি বলিল—রাত হয়ে আসচে, একটু থাকার জায়গার কি হয় বলতে পারেন?

দোকানদার অত্যন্ত খুশী হইয়া বলিল—এইখানেই থাকুন, এর আর কি! আমার ওই

পেছন দিকে দিব্যি চালা রয়েচে, একখানা তক্তপোশ রয়েচে। চালায় রান্না করুন, তক্তপোশে শুয়ে থাকুন।

কথায় কথায় হাজারি বলিল—আচ্ছা এখানে গঙ্গাযাত্রী দিন কত যাতায়াত করে ?

—সে দিন আর নেই বেলের বাজারের। আগে আট দশ দল, এক এক দলে দশ-বারো জন করে মানুষ, এ নিত্য যেতো। এখন কোনোদিন মোটেই না, কোনোদিন তিনটে, বড্ড জোর চারটে। আগে লোকের হাতে পয়সা ছিল, মড়া গঙ্গায় দিত—আজকাল হাতে নেই পয়সা—ম'লে নদীর ধারে, খালের ধারে, বিলের ধারে পুড়োয়।

হাজারি ভাবিতেছিল বেলের বাজারে একখানা ছোটখাটো হোটেল চলিতে পারে কিনা। তিন দল গঙ্গাযাত্রীতে ত্রিশটি লোক থাকিলে যদি সকলে খায়, তবে ত্রিশজন খরিদ্দার। ত্রিশজন খরিদ্দার রোজ খাইলে মাসে পঞ্চাশ-ষাট টাকা লাভ থাকে খরচ-খরচা বাদে। সেই জায়গায় কুড়ি জন হোক, দশ জন হোক রোজ—তবুও পরের চাকুরির চেয়ে ভাল। পরের চাকুরি করিয়া পাইতেছে সাত টাকা আর অজস্র অপমান বকুনি। সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে থাকা—দশ জন খরিদ্দার যে হোটেলে রোজ খায়, সেখানে অন্ততঃ বারো-তেরো টাকা মাসে লাভ থাকে।

পরদিন সকালে উঠিয়া সে গোপালনগরের দিকে রওনা হইল। হাতের পয়সা এখনও যথেষ্ট—পাঁচ টাকা আছে, কোনো ভাবনা নাই। কাল রাত্রে দোকানদার চাল ডাল হাঁড়ি কিনিয়া আনিতে চাহিয়াছিল, হাজারি তাহাতে রাজী হয় নাই। নিজে পয়সা খরচ করিয়াছে।

দুপুরের রৌদ্র বড় চড়িল। নির্জ্জন রাস্তা, দুধারে কোথাও ঘন বনজঙ্গল, কোথাও ফাঁকা মাঠ, লোকালয় চোখে পড়ে না, এক-আধখানা চাষাদের গ্রাম ছাড়া। ঘণ্টা দুই হাঁটিবার পরে হাজারির তৃষ্ণা পাইল। কিছুদূরে একটা ছোট পুকুর দেখিয়া তাহার ধারে বসিতে যাইবে এমন সময় একখানা খালি গরুর গাড়ী পুকুরের পাশের মেটে রাস্তা দিয়া নামিতে দেখিল। গাড়োয়ানকে ডাকিয়া বলিল—কাছে কোনো গ্রাম আছে বাপু ? একটু জল খাবো। ব্রাহ্মণ।

গাড়োয়ান বলিল—আমার সঙ্গে আসুন ঠাকুর মশায়, কাছেই ছিনগর-সিম্‌লে আমি বামুন বাড়ী যাবো। তেনাদের গাড়ী—গাড়ীতে আসুন।

হাজারি শ্রীনগর-সিমলে গ্রামের নাম শুনিয়াছিল, গ্রামের মধ্যে গাড়ী ঢুকিতে দেখিল এ তো গ্রাম নয়—বিজন বন। এতখানি বেলা চড়িয়াছে এখনও গ্রামের মধ্যে সূর্য্যের আলো প্রবেশ করে নাই ; শুধু আম-কাঁটালের প্রাচীন বাগান, বাঁশবন, আগাছার জঙ্গল।

একটা গৃহস্থ-বাড়ীর উঠানে গরুর গাড়ী গিয়া থামল। গাড়োয়ানের ডাকে বাড়ীর ভিতর হইতে গৃহস্বামী আসিলেন, ম্যালেরিয়া-শীর্ণ চেহারা, মাথার চুল প্রায় উঠিয়া গিয়াছে, বয়স ত্রিশও হইতে পারে পঞ্চাশও হইতে পারে। তিনি বাহিরে আসিয়াই হাজারিকে দেখিতে পাইয়া গাড়োয়ানকে বলিলেন—কে রে সঙ্গে ?

গাড়োয়ান বলিল—এজ্ঞে উনি পাকা রাস্তায় মুদির পুকুরের ধারে বসে ছিলেন, বল্লেন একটু জল খাবো—তা বল্লাম চলুন আমার সঙ্গে—আমার মনিবেরা ব্রাহ্মণ—সেখানে জল খাবেন, তাই সঙ্গে করে আনলাম।

গৃহস্বামী আগাইয়া আসিয়া হাজারিকে নমস্কার করিয়া বলিলেন—আসুন, আসুন। বসুন, বিশ্রাম করুন। ওরে চণ্ডীমণ্ডপের তক্তপোশে মাদুরটা পেতে দে,—আসুন।

এসব পল্লী অঞ্চলে আতিথ্যের কোনো ত্রুটি হয় না। আধঘণ্টা পরে হাজারি হাত পা ধুইয়া বসিয়া গাছ হইতে সদ্য পাড়া কচি ডাবের জল পান করিয়া সুস্থ ও খোশমেজাজে হুঁকা টানিতে লাগিল।

গৃহস্বামীর নাম বিহারীলাল বাঁড়ুয্যে। চাকুরি জীবনে কখনো করেন নাই, যথেষ্ট ধানের আবাদ আছে, গরু আছে, পুকুরে মাছ আছে, আম-কাঁটালের বাগান আছে। এসব কথা গৃহস্বামীর নিকট হইতেই হাজারি গল্পচ্ছলে শুনিল।

বিহারী বাঁড়ুয্যে বলিতেছিলেন, শ্রীনগর-সিমলে মস্ত গ্রাম ছিল, রাজধানী ছিল কেষ্টনগরের রাজাদের পূর্ব্বপুরুষের। জঙ্গলের মধ্যে রাজার গড়খাই আছে, পুরোনো ইটের গাঁথুনি আছে, দেখাবো এখন ওবেলা। না না, আজ যাবেন কি? ওসব হবে না। দুদিন থাকুন, আমাদের সবই আছে আপনার বাপ-মার আশীর্ব্বাদে, তবে মানুষজনের মুখ দেখতে পাইনে এই যা কষ্ট। ছেলেবেলাতেও দেখেছি গাঁয়ে ত্রিশ-বত্রিশ ঘর ব্রাহ্মণের বাস ছিল, এখন দাঁড়িয়েচে সাত ঘর মোট—তার মধ্যেও দু ঘর আছে বারোমাস বিদেশে। আপনার নিবাস কোথায় বল্লেন?

—আজ্ঞে, এঁড়োশোলা—গাংনাপুর থেকে নেমে যেতে হয়।

—তবে তো আপনি আমাদের এদেশেরই লোক। আসুন না আমাদের গাঁয়ে? জায়গা দিচ্চি, জমি দিচ্চি, ধান করুন, পাট করুন, বাস করুন এখানে। তবুও এক ঘর লোক বাড়ুক গ্রামে। আসুন না?

হাজারি শিহরিয়া উঠিল। সর্ব্বনাশ! এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে সে বাস করিতে আসিবে—সেইটুকু অদৃষ্টে বাকী আছে বটে! শহর বাজারে থাকিয়া সে শহরের কল-কোলাহল কর্ম্মব্যস্ততাকে পছন্দ করিয়া ফেলিয়াছে—এই বনের মধ্যে সমাধিপ্রাপ্ত হইতে হয় যে বৃদ্ধ বয়সে। ছ'চল্লিশ বৎসর বয়স তার—দিন এখনও যায় নাই, এখনও যথেষ্ট উৎসাহ শক্তি তার মনে ও শরীরে। তা ছাড়া সে বোঝে হোটেলের কাজ, একটা হোটেল খুলিতে পারিলে তাহার বয়স দশ বছর কমিয়া যাইবে—নব যৌবন লাভ করিবে সে। চাষবাসের সে কি জানে?

হোটেলের কথা হাজারি এখানে বলিল না। সে জানে হোটেলওয়ালা বামুন বলিলে অনেকে ঘৃণার চক্ষে দেখে—বিশেষতঃ এই সব পাড়াগাঁয়ে।

শ্রীনগরে হাজারির মোটেই মন টিকিতেছিল না—এত বনজঙ্গলের অন্ধকার ও নির্জ্জনতার মধ্যে তাহার যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। সুতরাং বৈকালের দিকেই সে গ্রামের

বাহিরে আসিয়া পথে উঠিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। ভাবিল—বাপরে! কুড়ি বিঘে ধানের জমি দিলেও এ গাঁয়ে নয় রে বাবা! মানুষ থাকে এখানে? মানুষজনের মুখ দেখার যো নেই, কাজ নেই, কর্ম্ম নেই—কুঁড়ের মতো বসে থাকো আর গোলার ধানের ভাত খাও—সর্ব্বনাশ!…আর কি জঙ্গল রে বাবা!…

রাস্তার ধারে একটা লোক কাঠ ভাঙিতেছিল। হাজারি তাহাকে বলিল—সামনে কি বাজার আছে বাপু?

লোকটা একবার হাজারির দিকে নীরবে চাহিয়া দেখিল। পরে বলিল—আপনি কি আলেন সিম্‌লে থে?

—হ্যাঁ।

—ওখানে আপনাদের এত্মা-কুটুম্ব আছেন বুঝি? আপনারা?

—ব্রাহ্মণ।

—পেরণাম হই। কোথায় যাবেন আপুনি?

হাজারি জানে পল্লীগ্রাম-অঞ্চলে এই সব শ্রেণীর লোক তাহাকে অকারণে হাজার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বিরক্ত করিয়া মারিবে। ইহাই ইহাদের স্বভাব। হাজারিও পূর্ব্বে এই রকম ছিল—কিন্তু রাণাঘাট শহরে এতকাল থাকিয়া বুঝিয়াছে অপরিচিত লোককে এসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে নাই বা করিলে লোকে চটে। হাজারি বর্ত্তমান প্রশ্নকর্তার হাত এড়াইবার জন্য সংক্ষেপে দু-একটি কথার উত্তর দিয়া তাহাকে আবার জিজ্ঞাসা করিল—সামনে কি বাজার পড়বে বাপু?

—এজ্ঞে যান, গোপালনগরের বড় বাজার পড়বে—কোশ দুই আর আছেন।

গোপালনগরের নাম হাজারির কাছে অত্যন্ত পরিচিত। এদিকের বড় গঞ্জ গোপালনগর, সকলেই নাম জানে।

মধ্যাহ্নভোজনটা একটু বেশী হইয়া গিয়াছিল, রাত্রে খাইবার আবশ্যক নাই। একটু আশ্রয় পাইলেই হইল। সুতরাং হাজারির মন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিল। এ কয়দিন সে যেন নূতন জীবন যাপন করিতেছে—সকালে উঠিবার তাড়া নাই, পদ্মঝিয়ের মুখনাড়া নাই—বেচু চক্কত্তির কাছে বাজারের হিসাব দিতে যাওয়া নাই—দশ সের কয়লাজ্বলা অগ্নিকুণ্ডের তাতে বসিয়া সকাল হইতে বেলা একটা এবং ওদিকে সন্ধ্যা হইতে রাত বারোটা পর্য্যন্ত হাতাখুন্তি নাড়া নাই, বাঁচিয়াছে সে!

পথের ধারে একটা গাছতলায় পাকা বেল পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া হাজারি সেটা সংগ্রহ করিয়া লইল। কাল সকালে খাওয়া চলিবে।

সব ভাল—কিন্তু তবু হাজারির মনে হয়, এ ধরণের ভবঘুরে জীবন তাহার পছন্দসই নয়। বৃথা ঘুরিয়া বেড়াইয়া কি হইবে? চাকুরি জোটে তো ভাল। নতুবা এ ধরণের জীবন সে কতকাল কাটাইতে পারে?…একমাসও নয়। সে চায় কাজ, পরিশ্রম করিতে সে ভয় পায় না, সে চায় কর্ম্মব্যস্ততা, দু-পয়সা উপার্জ্জন, নাম, উন্নতি। ইহার উহার বাড়ী খাইয়া

বেড়াইয়া, পথে পথে সময় নষ্ট করিয়া লাভ নাই।

গোপালনগর বাজারে পৌছিতে বেলা গেল। বেশ বড় বাজার, অনেকগুলি ছোটবড় দোকান, ভাল ব্যবসার জায়গা বটে। হাজারি একটা বড় কাপড়ের দোকানের সামনের টিউবওয়েলে হাতমুখ ধুইয়া লইল। নিকটে একটা কালীমন্দির—মন্দিরের রোয়াকে বসিয়া সম্ভবতঃ মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণ হুঁকা টানিতেছে দেখিয়া হাজারি তামাক খাইবার জন্য কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—একবার তামাক খাওয়াবেন ?

—আপনারা ?

—ব্রাহ্মণ।

—বসুন, এই নিন।

—আপনি কি মন্দিরে মায়ের পুজো করেন ?

—আজ্ঞে হাঁ। আপনার কোথা থেকে আসা হচ্ছে ?

—আমার বাড়ী গাংনাপুরের সন্নিকট এঁড়োশোলা। রাঁধুনীর কাজ করি—চাকুরির চেষ্টায় বেরিয়েচি। এখানে কেউ রাঁধুনী রাখবে বলতে পারেন ?

—একবার এই বড় কাপড়ের দোকানে গিয়ে খোঁজ করুন। ওঁরা বড়লোক, রাঁধুনী ওঁদের বাড়ীতে থাকেই—বাবুর ছোট ভাইয়ের বিয়ে আছে, যদি এ সময় নতুন লোকের দরকার-টরকার পড়ে—ওঁরা জাতে তিলি, বাজারের সেরা ব্যবসাদার, ধনী লোক।

হাজারি কাপড়ের দোকানে ঢুকিয়া দেখিল একজন শ্যামবর্ণ দোহারা চেহারার লোক গদির উপর বসিয়া আছে। সেই লোকটিই যে দোকানের মালিক, ইহা কেহ বলিয়া না দিলেও বোঝা যায়। হাজারিকে ঢুকিতে দেখিয়া লোকটি বলিল—আসুন, কি চাই ? ওদিকে যান—ওহে, দেখ ইনি কি নেবেন—

বলিয়া লোকটি দোকানের অন্য যে অংশে অনেকগুলি কর্ম্মচারী কাজ-কর্ম্ম ও কেনাবেচা করিতেছে সে দিকটা দেখাইয়া দিল।

হাজারি বলিল—বাবু, দরকার আপনার কাছে। আমি রান্না করি, ব্রাহ্মণ—শুনলাম আপনার বাড়ীতে রাঁধুনী রাখবেন—তাই—

—ও! আপনি রান্না করবেন ? রাঁধতে জানেন ভাল ? কোথায় ছিলেন এর আগে ?

—আজ্ঞে রাণাঘাট হোটেলে ছিলাম সাত বছর।

—হোটেলে ? হোটেলের কাজ আর বাড়ীর কাজ এক নয়। এ খুব ভাল রান্না চাই। আপনি কি তা পারবেন ? কলকাতা থেকে কুটুম্ব আসে প্রায়ই—

হাজারি হাসিয়া ভাবিল—তুমি আর কি রান্না খেয়েছ জীবনে, কাপড়ের দোকান করেই মরেছ বই তো নয়। তেমন রান্না কখনো চোখেও দেখনি।

মুখে বলিল—বাবু, একদিনের জন্যে রেখে দেখুন না হয়। রান্না ভাল না হয়, এমনি চলে যাব। কিছু দিতে হবে না।

দোকানের মালিক পাকা ব্যবসাদার, লোক চেনে। হাজারির কথার ধরণ দেখিয়া

বুঝিল এ বাজে কথা বলিতেছে না। বলিল—আচ্ছা আপনি আমাদের বাড়ী যান। এই সামনের রাস্তা দিয়ে বরাবর গিয়ে বাঁ-দিকে দেখবেন বড় বাড়ী—ওরে নিতাই, তুই বাপু একবার যা তো, ঠাকুর মশায়কে বাড়ীতে শশধরের হাতে তুলে দিয়ে আয়। বলগে, ইনি আজ থেকে রাঁধবেন। বুঝলি? নিয়ে যা—মাইনে-টাইনে কিন্তু, ঠাকুর মশায়, পরে কাজ দেখে ধার্য্য হবে। হ্যাঁ—সে দু-চারদিন পরে তবে—নিয়ে যা।

প্রথম দিনের কাজেই হাজারি নাম কিনিয়া ফেলিল। বাড়ীর কর্ত্তা দশ টাকা বেতন ধার্য্য করিয়া দিলেন। তাঁহার গৃহিণী অসুস্থ প্রায় বারোমাস, উঠিতে বসিতে পারিলেও সংসারের কাজকর্ম্ম বড় একটা দেখেন না—দুটি মেয়ের বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তাহারা থাকে শ্বশুরবাড়ী একটি ষোল-সতেরো বছরের ছেলে স্কুলে পড়ে, আর একটি আট বছরের ছোট মেয়ে।

বাড়ীর সকলেই ভাল লোক—এতদিন চাকুরি করিয়া হাজারির যে খারাপ ধারণা হইয়াছিল পরের চাকুরি সম্বন্ধে, এখানে আসিয়া তাহা চলিয়া গেল। ইহারা জাতিতে গন্ধবণিক, বাড়ীর সকলেই ব্রাহ্মণকে খাতির করিয়া চলে—হাজারির মৃদু স্বভাবের জন্যও সে অল্পদিনের মধ্যে বাড়ীর সকলের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল।

মাসখানেক কাজ করিবার পর হাজারি প্রথম মাসের বেতন পাইয়াই বাড়ী যাইবার ছুটি চাহিল।

অনেকদিন বাড়ী যাওয়া হয় নাই—টেঁপিকে কত কাল দেখে নাই। দোকানের মালিক ছুটিও দিলেন।

গোপালনগর স্টেশনে ট্রেনে চড়িয়া বাড়ী আসিতে প্রায় তিন আনা ট্রেন ভাড়া লাগে। মিছামিছি তিন আনা পয়সা খরচ করিয়া লাভ নাই। হাঁটাপথে মাত্র সাত-আট ক্রোশ হাজারিদের গ্রাম—হাঁটিয়া যাওয়াই ভাল।

বাড়ী পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল।

টেঁপি ছুটিয়া আসিয়া বলিল—বাবা, এসো, এসো। কোথেকে এলে এখন?

তারপর সে ঘরের ভিতর হইতে পাখা আনিয়া বাতাস করিতে বসিয়া গেল। হাজারির মনে হইল তার সারা দেহ-মন জুড়াইয়া গেল টেঁপির হাতের পাখার বাতাসে। টেঁপির জন্য খাটিয়া সুখ—যত কষ্ট যত দুঃখ রানাঘাট হোটেলের—সব সে সহ্য করিয়াছে টেঁপির জন্য। ভবিষ্যতে আরও করিবে।

যদি বংশীধর ঠাকুরের ভাগিনেয় সেই ছেলেটির সঙ্গে—

যাক্ সে সব কথা।

টেঁপি বলিল—বাবা, অতসীদিদি একদিন তোমার কথা বলছিল—

—আমার কথা? হরিচরণবাবুর মেয়ে?

—হ্যাঁ বাবা, বলছিল তুমি অনেকদিন আসো নি। চল না আজ, যাবে? ওখানে গিয়ে চা খাবে এখন। কলের গান শুনবে।

এই সময় টেঁপির মা ঘাট হইতে গা ধুইয়া বাড়ী ফিরিল। হাসিমুখে বলিল—কখন এলে ?

হাজারি—এই তো খানিকক্ষণ। ভাল তো সব ? টাকা পেয়েছিলে ?

—হ্যাঁ। ভাল কথা, ওদের বাড়ীর সতীশ বলছিল রাণাঘাট থেকে পাঠানো নয় টাকা। তুমি এর মধ্যে কোথাও গিয়েছিলে নাকি ?

—রাণাঘাটের চাকরি করিনে তো। এখন আছি গোপালনগরে। বেশ ভাল জায়গায় আছি, বুঝলে ? গন্ধবণিকের বাড়ী, ব্রাহ্মণ বলে ভক্তিছেদ্দা খুব। খাওয়া-দাওয়া ভাল। কাপড়ের মস্ত দোকান, দিব্যি জলখাবার দেয় সকালে বিকেলে।

টেঁপি বলিল—কি জলখাবার দেয় বাবা !

—এই ধরো কোন দিন মুড়ি নারকেল, কোন দিন হালুয়া।

টেঁপির মা বলিল—বোসো, জিরোও ; চা নেই, তা হোলে করে দিতাম। টেঁপি, যাবি মা, সতীশদের বাড়ী চা আছে—(এই কথা বলিবার সময় টেঁপির মা ভুরু দুটি উপরের দিকে তুলিয়া এমন একটি ভঙ্গি করিল, যাহা শুধু নির্ব্বোধ মেয়েরা করিয়া থাকে)—দুটো চেয়ে নিয়ে আয়।

টেঁপি বলিল—দরকার কি মা—আমি নিয়ে যাই না কেন বাবাকে অতসী দিদিদের বাড়ী ? সেখানে চা হবে এখন—জলখাবার হবে এখন—

দু-দু'বার টেঁপি অতসীদের বাড়ী যাইবার কথা বলিয়াছে সুতরাং হাজারি মেয়ের মতে মত না দিয়া থাকিতে পারিল না। টেঁপির ইচ্ছা তাহার নিকট অনেকের হুকুমের অপেক্ষা শক্তিমান।

হরিচরণবাবু বৈঠকখানায় বসিয়া ছিলেন—হাজারিকে যত্ন করিয়া চেয়ারে বসাইলেন।

—এসো এসো হাজারি, কবে এলে ? ও টেঁপি, যা তো অতসীদিদিকে বলগে আমাদের চা দিয়ে যেতে। আমিও এখনো চা খাই নি—

—বাবু, ভাল আছেন ?

—হ্যাঁ। তুমি ভাল ছিলে ? তোমার সেই হোটেলের কি হোল ? রাণাঘাটেই আছ তো ?

হাজারি সংক্ষেপে রাণাঘাটের চাকুরি যাওয়া হইতে গোপালনগরে পুনরায় চাকুরি পাওয়া পর্য্যন্ত বর্ণনা করিল।

এক সময় অতসী ও টেঁপি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া তাহাদের সামনের ছোট গোল টেবিলটাতে চা ও খাবার রাখিল। খাবার মাত্র এক ডিশ—শুধু হাজারির জন্য, হরিচরণবাবু এখন কিছু খাইবেন না।

হাজারি বলিল—বাবু, আপনার খাবার ?

—ও তুমি খাও, তুমি খাও। আমার এখন খেলে অম্বল হয়, আমি শুধু চা খাবো।

হাজারি ভাবিল—এত বড়লোক, এত ভাল জিনিস ঘরে কিন্তু খাইলে অম্বল হয় বলিয়া খাইবার

জো নাই এই বা কেমন দুর্ভাগ্য! বয়স ছ'চল্লিশ হইলে কি হয়, অম্বল কাহাকে বলে সে কখনো জানে না। ভূতের মত খাটুনির কাছে অম্বল-টম্বল দাঁড়াইতে পারে না। তবে খাবার জোটে না এই যা দুঃখ।

অতসী কিন্তু বেশ বড় রেকাবি সাজাইয়া খাবার আনিয়াছে—ঘি দিয়া চিঁড়া ভাজা, নারকেল-কোরা, দুখানা গরম গরম বাড়ীর তৈরী কচুরী ও খানিকটা হালুয়া, বড় পেয়ালায় এক পেয়ালা চা। অতসী এটুকু জানে যে টেঁপির বাবা তাহার বাবার মত অল্পভোজী প্রাণী নয়, খাইতে পারে এবং খাইতে ভালবাসে। অবস্থাও উহাদের যে খুব ভাল, তাহাও নয়। সুতরাং টেঁপির বাবাকে ভাল করিয়াই খাওয়াইতে হইবে।

হরিচরণবাবু বলিলেন—তোমার হাজারিকাকাকে প্রণাম করেছ অতসী!

হাজারি ব্যস্ত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। অতসী তাহার পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিতে সে চিঁড়াভাজা চিবাইতে চিবাইতে কি বলিল ভালো বোঝা গেল না। অতসী কিন্তু চলিয়া গেল না, সে হাজারির সামনে কিছু দূরে দাঁড়াইয়া তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতেছিল। টেঁপি গল্প করিয়াছে তাহার বাবা একজন পাকা রাঁধুনী, অতসীর কৌতূহলের ইহাই প্রধান কারণ।

হরিচরণবাবু বলিলেন—এখন ক'দিন বাড়ীতে আছ?

—আজ্ঞে, পরশু যাবো। পরের চাকরি, থাকলে তো চলে না।

—তোমার সেই হোটেল খোলার কি হোল?

—এখনও কিছু করতে পারি নি বাবু। টাকার যোগাড় না করতে পারলে তো—বুঝতেই পারছেন—

—তা হোলে ইচ্ছে আছে এখনও?

—ইচ্ছে আছে খুব। শীতকালের মধ্যে যা হয় করে ফেলবো।

অতসী বলিল—কাকা গান শুনবেন?

হরিচরণবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—হাঁ হাঁ- আমি ভুলে গিয়েছি একদম। শোন না হাজারি, অনেক নতুন রেকর্ড আনিয়েছি। নিয়ে এসো তো অতসী—শুনিয়ে দাও তোমার হাজারিকাকাকে।

হাজারি ভাবিল, বেশ আছে ইহারা। তাহার মত খাটিয়া খাইতে হয় না, শুধু গান আর খাওয়া-দাওয়া। সন্ধ্যা হইয়াছে, এ সময় উনুনে আঁচ দিয়া ধোঁয়ার মধ্যে ছোট্ট রান্নাঘরে বসিয়া মনিব-গৃহিণীর ফর্দ্দ মত তরকারি কুটিতেছে সে অন্য অন্য দিন। বারো মাসই তাহার এই কাজ। ঘরের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হয় বারো মাস বলিয়াই পথে বাহির হইলেই তাহার আনন্দ হয়। আর আনন্দ হইতেছে আজ, এমন চমৎকার সাজানো বৈঠকখানা, বড় আয়না, বেতমোড়া কেদারায় সে বসিয়া চা খাইতেছে, পাশে টেঁপি, টেঁপির বন্ধু কিশোরী মেয়েটি, কলের গান…যেন সব স্বপ্ন।

কতদিন কুসুমের সঙ্গে দেখা হয় নাই! আজ রাণাঘাট ছাড়িয়াছে প্রায় চারি মাসের উপর, এই চারি মাস কুসুমকে সে দেখে নাই। টেঁপিও মেয়ে, কুসুমও মেয়ে।

আর নতুন পাড়ার সেই বউটি! সে-ও আর এক মেয়ে। আজ কলের গানের সুমধুর সুরের ভাবুকতায় তাহার মন সকলের প্রতি দরদ ও সহানুভূতিতে ভরিয়া গিয়াছে।

অনেকক্ষণ ধরিয়া কলের গান বাজিল। হরিচরণবাবু মধ্যে একবার বাড়ীর ভিতর কি কাজে উঠিয়া গেলেন, তখন রহিল শুধু অতসী আর টেঁপি। বাবার সামনে বোধ হয় অতসী বলিতে সাহস করিতেছিল না, হরিচরণবাবু বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলে হাজারিকে বলিল—কাকাবাবু, আমাকে রান্না শিখিয়ে দেবেন?

হাজারি ব্যস্ত হইয়া বলিল—তা কেন দেব না মা? কিন্তু তুমি রান্না জানো নিশ্চয়। কি কি রাঁধতে পারো?

অতসী বুদ্ধিমতী মেয়ে, সে বুঝিল যাহার সহিত কথা বলিতেছে, রান্নার সম্বন্ধে সে একজন ওস্তাদ শিল্পী। সঙ্গীতের তরুণী ছাত্রী যেমন সঙ্কোচের সহিত তাহার যশস্বী সঙ্গীত শিক্ষকের সহিত রাগরাগিণী সম্বন্ধে কথা বলে—তেমনি সসঙ্কোচে বলিল—তা পারি সব, শুক্তুনি, চচ্চড়ি, ডাল, মাছের ঝোল—মা তো বড় একটা রান্নাঘরে যেতে পারেন না, তাঁর মন খারাপ, আমাকেই সব করতে হয়। টেঁপি বলছিল আপনি নিরিমিষ রান্না বড় চমৎকার করেন, আমায় দেবেন শিখিয়ে কাকাবাবু?

—টেঁপি বুঝি এই সব বলে তোমার কাছে? পাগলী মেয়ে কোথাকার, ওর কথা বাদ দাও—

—না কাকাবাবু, আমি অন্য জায়গাতেও শুনেচি আপনার রান্নার সুখ্যাতি। সবাই তো বলে।

পরে আবদারের সুরে বলিল—আমাকে শেখাতে হবে কাকাবাবু—আমি ছাড়চি নে, আমি টেঁপিকে প্রায়ই জিজ্ঞেস করি, আপনি কবে আসবেন আমি খোঁজ নিই—ও বলেনি আপনাকে? না কাকাবাবু, আমায় শেখান আপনি। আমার বড় শখ ভাল রান্না শিখি।

হাজারি বলিল—ভাল রান্না শেখা একদিনে হয় না মা। মুখে বলে দিলেও হয় না। তোমার পেছনে আমায় লেগে থাকতে হবে অন্ততঃ ঝাড়া দু'মাস তিন মাস। হাত ধরে বলে দিতে হবে—তুমি রাঁধবে। আমি কাছে দাঁড়িয়ে তোমার ভুল ধরে দেবো, এ না হোলে শিক্ষা হয় না। তুমি আমার টেঁপির মত, তোমাকে ছেঁদো কথা বলে ফাঁকি দেবো না মা, ছেলেমানুষ, শিখতে চাইচ শিখিয়ে দিতে আমার অসাধ নয়। কিন্তু কি ক'রে সময় পাবো যে তোমায় শেখাবো মা!

অতসী সপ্রশংস দৃষ্টিতে হাজারির মুখের দিকে চাহিয়া তাহার কথা শুনিতেছিল। বিশেষজ্ঞ ওস্তাদের মুখের কথা। গুরুত্বপূর্ণ কথা—বাজে ছেঁদো কথা নয়, অনভিজ্ঞ, আনাড়ির কথাও নয়। তাহার চোখে হাজারি দরিদ্র রাঁধুনী বামুন পিতা নয়—যে ব্যবসায় সে ধরিয়াছে, সেই ব্যবসায়ে একজন অভিজ্ঞ, ওস্তাদ, পাকা শিল্পী।

হাজারির প্রতি তাহার মন সম্ভ্রমে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

পরদিন হাজারি ঘুম হইতে উঠিয়া তামাক টানিতেছে, এমন সময় হঠাৎ অতসীকে

তাহাদের বাড়ীর মধ্যে ঢুকিতে দেখিয়া সে রীতিমত বিস্মিত হইল। বড়মানুষের মেয়ে অতসী, অসময়ে কি মনে করিয়া তাহার মত গরীব মানুষের বাড়ী আসিল?

টেঁপি বাড়ী ছিল না, টেঁপির মা-ও অতসীকে আসিতে দেখিয়া খুব অবাক হইয়াছিল, সে ছুটিয়া গিয়া তাহার বুদ্ধিতে যতটুকু আসে, সেইভাবে জমিদার-বাটীর মেয়ের অভ্যর্থনা করিল।

অতসী বলিল—কাকাবাবু বাড়ী নেই খুড়ীমা?

টেঁপির মা বলিল—হ্যাঁ মা, এসো আমার সঙ্গে, ঐ কোণের দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্ছে।

—টেঁপি কোথায়?

—সে মূলোর বীজ আনতে গিয়েছে সদগোপ-বাড়ীতে। এল বলে, বসো মা, বসো। দাঁড়াও আসনখানা পেতে—

অতসী টেঁপির মার হাত হইতে আসনখানা ক্ষিপ্র ও চমৎকার ভঙ্গিতে কাড়িয়া লইয়া কেমন একটা সুন্দর ভাবে হাসিয়া বলিল—রাখুন আসন খুড়ীমা, ভারি আমি একেবারে গুরুঠাকুর এলুম কিনা—তা আবার যত্ন করে আসন পেতে দিতে হবে—

এই হাসি ও এই ভঙ্গিতে সুন্দরী মেয়ে অতসীকে কি সুন্দরই দেখাইল!—টেঁপির মা মুগ্ধ-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল অতসীর দিকে। ইতিমধ্যে হাজারি সে স্থানে আসিয়া বলিল—কি মনে করে সকালে লক্ষ্মী-মা?

অতসী হাজারির কাছে গিয়া বলিল—আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।

—কি কথা মা?

—চলুন ওদিকে, একটু আড়ালে বলব।

হাজারি ভাবিয়াই পাইল না, এমন কি গোপনীয় কথা অতসী তাহাকে আড়ালে বলিতে আসিয়াছে এই সকালবেলায়। দাওয়ায় ছাঁচতলার দিকে গিয়া বলিল—কি কথা মা?

অতসী বলিল—কাকাবাবু, আপনি যদি কাউকে না বলেন, তবে বলি—

হাজারি বিস্মিত মুখে বলিল—বলবো না মা, বলো তুমি।

—আপনি হোটেল খুলবেন বলে বাবার কাছে টাকা ধার চেয়েছিলেন?

—হ্যাঁ, কিন্তু সে তো এবার নয়, সেবার। তোমায় কে বললে এসব কথা?

—সে সব কিছু বলব না। আমি আপনাকে টাকা দেবো, আপনি হোটেল খুলুন—

—তুমি কোথায় পাবে?

অতসী হাসিয়া বলিল—আমার কাছে আছে। দু-শো টাকা দিতে পারি—আমি জমিয়ে জমিয়ে করেছি। লুকিয়ে দোবো কিন্তু, বাবা যেন জানতে না পারেন। কেউ জানতে না পারে।

হাজারির চোখে জল আসিল।

এ পর্য্যন্ত তিনটি মেয়ে তাহার জীবনে আসিল, যাহারা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে তাহাকে তাহার উচ্চাশার পথে ঠেলিয়া দিতে চাহিয়াছে—তিনজনেই সমান সরলা, তিনজনেই অনাত্মীয়া—তবে অতসী জমিদারবাড়ীর সুন্দরী, শিক্ষিতা মেয়ে, সে যে এতখানি টান টানিবে ইহা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ধরণের আশ্চর্য্য ঘটনা!

হাজারি বলিল—কিন্তু তুমি একথা শুনলে কোথায় বলতে হবে মা।

অতসী হাসিয়া বলিল—সে কথা বলবো না বলেছি তো।

— তা হোলে টাকাও নেবো না। আগে বলো কে বলেছে?

—আচ্ছা, নাম করলে তাকে কিছু বলবেন না বলুন—

—কাকে কি বলবো বুঝতে পারছি নে তো? বলাবলির কথা কি আছে এর মধ্যে? আচ্ছা, বলবো না। বলো তুমি।

—টেঁপি বলেছিল, বাবার ইচ্ছে একটা হোটেল খোলেন, আমার বাবার কাছে নাকি টাকা চেয়েছিলেন ধার—তা বাবা দিতে পারেন নি। দেখুন কাকাবাবু, দাদা মারা যাওয়ার পরে বাবার মন খুব খারাপ। ওঁকে বলা না বলা দুই সমান। আমি ভাবলাম আমার হাতে তো টাকা আছে—কাকাবাবুকে দিই গে—ওঁদের উপকার হবে। আমার কাছে তো এমনি পড়েই আছে। আপনার হোটেল নিশ্চয়ই খুব ভাল চলবে, আপনারা বড়লোক হয়ে যাবেন। টেঁপিকে আমি বড় ভালবাসি, ওর মনে যদি আহ্লাদ হয় আমার তাতে তৃপ্তি। টাকা বাক্সে তুলে রেখে কি হবে?

—মা, তোমার টাকা তোমার বাবাকে না জানিয়ে আমি নিতে পারি নে।

অতসী যেন বড় দমিয়া গেল। হাজারির সঙ্গে সে অনেকক্ষণ ছেলেমানুষী তর্ক করিল, বাবাকে না জানাইয়া টাকা লইলে দোষ কি!

শেষে বলিল—আমি টেঁপিকে এ টাকা দিচ্ছি।

—তা তুমি দিতে পারো না। তুমি ছেলেমানুষ, টাকা দেওয়ার অধিকার তোমার নেই মা। তুমি তো লেখাপড়া জানো, ভেবে দেখ।

—আচ্ছা, আমায় লাভের অংশ দেবেন তা হোলে?

হাজারির হাসি পাইল। কুসুম, গোয়ালা-বাড়ীর সেই বউটি, অতসী—সবাই এক কথা বলে। ইহারা সকলেই মহাজন হইয়া টাকা ব্যবসায়ে খাটাইতে চায়। মজার ব্যাপার বটে!

—না মা, সে হয় না। তুমি বড় হও, শ্বশুরবাড়ী যাও, আশীর্ব্বাদ করি রাজরাণী হও, তখন তোমার এই বুড়ো কাকাবাবুকে যা খুশি দিও, এখন না।

অতসী দুঃখিত হইয়া চলিয়া গেল।

হাজারির ইচ্ছা হইল টেঁপিকে ডাকিয়া বকিয়া দেয়। এসব কথা অতসীর কাছে বলিবার তাহার কোনো দরকার ছিল না, কিন্তু অতসীর নিকট প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ আছে, টেঁপিকে ইহা লইয়া কিছু বলিলেই অতসীর কানে গিয়া পৌঁছাইবে ভাবিয়া চুপ করিয়া গেল।

. .

সেদিন বিকালে গোয়ালাপাড়ায় বেড়াইতে গিয়া কুসুমের বাপের বাড়ীতে শুনিল রাণাঘাটে কুসুমের অত্যন্ত অসুখ হইয়াছিল, কোনোরূপে এযাত্রা সামলাইয়া গিয়াছে। সে কিছুই জিজ্ঞাসা করে নাই, কথায় কথায় কুসুমের কাকা ঘনশ্যাম ঘোষ বলিল—মধ্যে রানাঘাটে পনেরো দিন ছেলাম দাদাঠাকুর, ছানার কাজ এ মাসটা বড্ড মন্দা।

হাজারি বলিল—পনেরো দিন ছিলে? কেন হঠাৎ এ সময়—

তারপরেই ঘনশ্যাম কুসুমের কথাটা বলিল।

হাজারির কেবল মনে হইতে লাগিল কুসুমের সঙ্গে কতদিন দেখা হয় নাই—একবার তাহার সহিত দেখা করিতে গেলে কেমন হয়? মনটা অস্থির হইয়া উঠিয়াছে তাহার অসুখের খবর শুনিয়া। জীবনে ওই একটি মেয়ের উপর তাহার অসীম স্নেহ ও শ্রদ্ধা।

ইচ্ছা হইল কুসুমের সম্বন্ধে ঘনশ্যামকে সে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু তাহা করা চলিবে না। সে মনের আকুল আগ্রহ মনেই চাপিয়া শুধু কেবল উদাসীন ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—এখন সে আছে কেমন?

—তা এখন আপনার বাপমায়ের আশীর্ব্বাদে সেরে উঠেছে—তবে বড কষ্ট যাচ্ছে সংসারের, দুধ-দই বেচে তো চালাতো, আজ মাসখানেকের ওপর শয্যাগত অবস্থা। ইদিকি আমার সংসারের কাণ্ড তো দেখতেই পাচ্চেন—কোত্থেকে কি করি দাদাঠাকুর—

হাজারি এ সম্বন্ধে আর কিছু বলিল না। যেন কুসুমের সম্বন্ধে তাহার সকল আগ্রহ ফুরাইয়া গেল।

বাড়ী ফিরিবার পথে হাজারি ভাবিল রাণাঘাটে তাহাকে যাইতেই হইবে। কুসুমের অসুখ শুনিয়া সে চুপ করিয়া থাকিতে পারিবে না। কালই একবার সে রাণাঘাট যাইবে।

পথে অতসীর পিতা হরিবাবুর সঙ্গে দেখা।

তিনি মোটা লাঠি হাতে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। হাজারিকে দেখিয়া বলিলেন—এই যে হাজারি, কোথা থেকে ফিরচো? তা এসো আমার ওখানে, চলো চা খাবে।

বৈঠকখানায় হাজারিকে বসাইয়া হরিবাবু বলিলেন—বসো, আমি বাড়ীর ভেতর থেকে আসছি। তারপর দুজনে একসঙ্গে চা খাওয়া যাবে যতদিন বাড়ী আছ, আসা-যাওয়া একটু করো হে, কেউ আসে না, একলাটি সারাদিন বসে বসে আর সময় কাটে না। দাঁড়াও আসছি—

হরিবাবু বাড়ীর মধ্যে চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরে অতসী একখানা রেকাবিতে খানকতক লুচি, বেগুনভাজা এবং একটু আখের গুড় লইয়া আসিল। হাজারির সামনের টেবিলে রেকাবি রাখিয়া বলিল—আপনি ততক্ষণ খান কাকাবাবু, চা দিয়ে যাচ্ছি—

হাজারি বলিল—বাবু আসুন আগে—

—বাবা তো খাবার খাবেন না, তিনি খাবেন শুধু চা। আপনি খাবারটা ততক্ষণ খেয়ে নিন। চা একসঙ্গে দেবো—

অতসী চলিয়া গেল না, কাছেই দাঁড়াইয়া রহিল। হাজারি একটু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল, বলিবার কিছু খুঁজিয়া না পাইয়া বলিল—টেঁপি আজ আসে নি মা?

—না, এ বেলা তো আসে নি।

হাজারি আর কিছু কথা না পাইয়া নীরবে খাইতে লাগিল। খাইতে খাইতে একবার

চোখ তুলিয়া দেখিল অতসী একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। অতসী সুন্দরী মেয়ে, টেঁপির বন্ধু হইলেও বয়সে টেঁপির অপেক্ষা চার-পাঁচ বছরের বড়—এ বয়সের সুন্দরী মেয়ের সহিত নির্জ্জন ঘরে অল্পক্ষণ কাটাইবার অভিজ্ঞতাও হাজারির নাই—সে রীতিমত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

অতসী হঠাৎ বলিল—কাকাবাবু আপনি আমার ওপর রাগ করেন নি?

হাজারি থতমত খাইয়া বলিল—রাগ? রাগ কিসের মা—

—ও-বেলার ব্যাপার নিয়ে?

—না না, এতে আমার রাগ হবার কিছু নেই, বরং তোমারই—

—না শুনুন কাকাবাবু, আমি তারপর ভেবে দেখলাম আপনি আমার টাকা নিলে খুব ভাল করতেন। জানেন, আমার দাদা মারা যাওয়ার পর আমি কেবলই ভাবি দাদা বেঁচে থাকলে বাবার বিষয় আমি পেতাম না, এখন কিন্তু আমি পাবো। কিন্তু ভগবান জানেন কাকাবাবু, আমি এক পয়সা চাইনে বিষয়ের। দাদা বিষয় ভোগ করতো তো করতো—নয় তো বাবা বিষয় যা খুশি করে যান, উড়িয়ে যান, পুড়িয়ে যান, দান করুন—আমার যেন এ না মনে হয় আজ দাদা থাকলে এ বিষয় আমি পেতাম না দাদাই পেতো। বিষয়ের জন্যে যেন দাদার ওপর কোনোদিন—আমার নিজের হাতে যা আছে তাও উড়িয়ে দেবো।

অতসীর চোখ জলে টলটল করিয়া আসিল, সে চুপ করিল।

হাজারি সান্ত্বনার সুরে বলিল - না মা, ও সব কথা কিছু ভেবো না। তোমার বাবা মাকে তুমিই বুঝিয়ে রাখবে, তুমিই ওঁদের একমাত্র বাঁধন—তুমি ওরকম হোলে কি চলে? ছি—মা—

হাজারি সত্যই অবাক হইয়া গেল, ভাবিল—এইটুকু মেয়ে, কি উঁচু মন দ্যাখো একবার! বড় বংশ নইলে আর বলেছে কাকে? এ কি আর বেচুবাবুর হোটেলের পদ্মঝি?

হাজারি বলিল—আচ্ছা মা আমাকে টাকা দেবার তোমার ঝোঁক কেন হোল বল তো? তোমরা মেয়েরা যদি ভাল হও তো খুবই ভাল, আর মন্দ হও তো খুবই মন্দ।—আমায় তুমি বিশ্বাস কর মা?

—আপনি বুঝে দেখুন। না হোলে আপনাকে টাকা দিতে চাইব কেন?

—তোমার বাবাকে না জানিয়ে দেবে?

—বাবাকে জানালে দিতে দেবেন না। অথচ আমার টাকা পড়ে রয়েচে, আপনার উপকার হবে, আমি জানি আপনাদের সংসারের কষ্ট। টেঁপির বিয়ে দিতে হবে। কোথায় পাবেন টাকা, কোথায় পাবেন কি! আপনার রান্নার যেমন সুখ্যাতি, আপনার হোটেল খুব ভাল চলবে। ছ-বছরের মধ্যে আমার টাকা আপনি আমায় ফেরত দিয়ে দেবেন।

হাজারি মুগ্ধ হইয়া গেল অতসীর হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া। বলিল—আচ্ছা তুমি দিও টাকা, আমি নেবো। হোটেল এই মাসেই আমি খুলবো—তোমার মুখ দিয়ে ভগবান এ কথা বলেছেন মা, তোমরা নিষ্পাপ ছেলেমানুষ, তোমাদের মুখেই ভগবান কথা কন।

অতসী হাসিয়া বলিল—তা হোলে নেবেন ঠিক?

—ঠিক বলচি। এবার ঘুরে জায়গা দেখে আসি। রাণাঘাট যাচ্ছি কাল সকালেই, হয় সেখানে, নয় তো গোয়াড়ির বাজারে জায়গা দেখবো। খবর পাবে তুমি, আবার ঘুরে আসচি তিন-চার দিনের মধ্যেই।

অতসী বলিল—বাবার আহ্নিক করা হয়ে গিয়েচে, বাবা আসবেন, আপনি বসুন, আমি আপনাদের চা নিয়ে আসি। শুনুন কাকাবাবু, আপনি যেদিন বাবার কাছে হোটেলের জন্যে টাকা চান, আমি সেদিন বাইরে দাঁড়িয়ে সব শুনেছিলাম। সেই থেকে আমি ঠিক করে রেখেছি আমার যা টাকা জমানো আছে আপনাকে তা দেবো।

—আচ্ছা বল তো মা একটা সত্যি কথা—আমার ওপর তোমার এত দয়া হোল কেন?

—বলবো কাকাবাবু? আপনার দিকে চেয়ে দেখে আমার মনে হোত আপনি খুব সরল লোক আর ভালো লোক। আমার মনে বড় কষ্ট হয় আপনাকে দেখলে সত্যি বলচি—তবে দয়া বলচেন কেন? আমি আপনার মেয়ের মত না?

বলিয়াই অতসী এক প্রকার কুণ্ঠা ও লজ্জা মিশ্রিত হাসি হাসিল।

হাজারি বলিল—তুমি আর জন্মে আমার মা ছিলে তাই দয়ার কথা বলচি। নইলে কি সন্তানের ওপর এত মমতা হয়? তুমি সুখে থাকো, রাজরাণী হও—এই আশীর্ব্বাদ করচি। আমি তোমার গরীব কাকা, এর বেশী আর কি করতে পারি।

অতসী আগাইয়া আসিয়া হঠাৎ নীচু হইয়া হাজারির পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল এবং আর একটুও না দাঁড়াইয়া তৎক্ষণাৎ বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল।

রাত্রে সারারাত্রি হাজারি ঘুমাইতে পারিল না। অতসীর মত বড়ঘরের সুন্দরী মেয়ের স্নেহ আদায় করার মধ্যে একটা নেশা আছে, হাজারিকে সে নেশায় পাইয়া বসিল। তাহার জীবনের এক অদ্ভুত ঘটনা!

সকালে উঠিয়া সে রাণাঘাটে রওনা হইল। বেশী নয় পাঁচ ছ' মাইল রাস্তা, হাঁটিয়া বেলা সাড়ে আটটার সময় স্টেশনের নিকটে সেগুন-বনে গিয়া পৌঁছিল।

রেল-বাজারের মধ্যে ঢুকিতেই তাহার ইচ্ছা হইল একবার তাহার পুরাতন কর্ম্মস্থানে উঁকি মারিয়া দেখিয়া যায়। আজ প্রায় পাঁচ মাস সে রাণাঘাট ছাড়া। দূর হইতে বেচু চক্রবর্ত্তীর হোটেলের সাইনবোর্ড দেখিয়া তাহার মন উত্তেজনায় ও কৌতূহলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। গত ছয় বৎসরের কত স্মৃতি জড়ানো আছে ওই টিনের চালওয়ালা ঘরখানার সঙ্গে।

হোটেলের গদিঘরে ঢুকিয়া প্রথমেই সে বেচু চক্কত্তির সম্মুখে পড়িয়া গেল। বেলা প্রায় সাড়ে দশটা, খরিদ্দার আসিতে আরম্ভ করিয়াছে, বেচু চক্কত্তি পুরোনো দিনের মত গদিঘরে তক্তপোষের উপর হাতবাক্সের সামনে বসিয়া তামাক খাইতেছেন।

হাজারি প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই তিনি বলিলেন—আরে এই যে হাজারিঠাকুর! কি মনে করে? কোথায় আছ আজকাল? ভাল আছ বেশ?

হাজারি এক মুহূর্ত্তে আবার যেন বেচু চক্রবর্ত্তীর বেতনভুক রাঁধুনী বামুনে পরিণত হইল,

তেমনি ভয়, সঙ্কোচ ও মনিবের প্রতি সম্ভ্রমের ভাব তার সারা দেহমনে হঠাৎ কোথা হইতে যেন উড়িয়া আসিয়া ভর করিল।

সে পুরোনো দিনের মত কাঁচুমাচু ভাবে বলিল—আজ্ঞে তা আপনার কৃপায় এক রকম—আজ্ঞে, তা বাবু বেশ ভাল আছেন ?

—আজকাল আছ কোথায় ?

—আজ্ঞে গোপালনগরে কুণ্ডুবাবুদের বাড়ীতে আছি।

—বাড়ীর কাজ ? কদ্দিন আছ ?

—এই চার মাস আছি বাবু।

—তা বেশ, তবে সেখানে মাইনে আর কত পাও ? হোটেলের মত মাইনে কি করে দেবে গেরস্ত ঘরে ?

বেচু চক্কত্তির এই কথার মধ্যে হাজারি এক ধরণের সুরের আঁচ পাইল। ব্যাপার কি ? বেচু চক্কত্তি কি আবার তাহাকে হোটেলে রাখিতে চান ? তাহার কৌতূহল হইল শেষ পর্য্যন্ত দেখাই যাক না কি দাঁড়ায়।

সে বিনীত ভাবে বলিল—ঠিক বলেছেন বাবু, তা তো বেশী নয়। গেরস্তবাড়ী কোথা থেকে বেশী মাইনে দেবে ?

—তারপর কি এখন আমাদের এখানে এসেছ ঠাকুর ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, বাবু।

—কি মনে ক'রে বলো তো ? থাকবে এখানে ?

হাজারি কিছুমাত্র না ভাবিয়াই বলিল—সে বাবুর দয়া।

—তা বেশ বেশ, থাকো না কেন, পুরোনো লোক, বেশ তো। যাও কাজে লেগে যাও। তোমার কাপড়-চোপড় এনেছ ? কই ?

—না বাবু, আগে থেকে কি করে আনি। সে সব গোপালনগরে রয়েছে। চাকুরিতে দয়া করে রাখবেন কি না রাখবেন না জেনে কি ক'রে সে-সব—

—আচ্ছা আচ্ছা, যাও ভেতরে যাও। রতন ঠাকুরের অসুখ করেছে, বংশী একা আছে, তুমি কাজে লাগো এবেলা থেকে। ভাঙা ভাংটো এ মাসের ক'টা দিনের মাইনে তুমি আগাম নিও।

হাজারি কৃতজ্ঞতার সহিত বেচু চক্কত্তিকে আর একবার ঘাড় খুব নীচু করিয়া হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিয়া কলের পুতুলের মত রান্নাঘরের দিকে চলিল।

সামনেই বংশীঠাকুর।

তাহাকে দেখিয়া বংশী অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

হাজারি বলিল—বাবু ডেকে বহাল করলেন যে ফের! ভাল আছ বংশী ? তোমার সেই ভাগ্নেটি ভাল আছে ?

বংশী বলিল—আরে এস এস হাজারি-দা। তোমার কথা প্রায়ই হয়। তুমি বেশ ভাল

আছ? এতদিন ছিলে কোথায়?

—ডেকে কি চাপিয়েছ? সরো, হাতাটা দাও। এখনও মাছ হয়নি বুঝি? যাও, তুমি গিয়ে মাছটা চড়িয়ে দাও! তেলের বরাদ্দ সেই রকমই আছে না বেড়েচে?

বংশী বলিল—একবার টেনে নিও একটু। অনেক দিন পরে যখন এলে। দাঁড়াও ডালটায় নুন দেওয়া হয়নি এখনও—দিয়ে দাও।

বলিয়া সে দরমার আড়ালে গাঁজা সাজিতে গেল।

চুপি চুপি বলিল—তোমায় বহাল করেছে কি আর সাধে? এদিকে তুমি চলে যাওয়াতে হোটেলের ভয়ানক দুর্নাম। সেই কলকাতার বাবুরা দু'তিন দল এসেছিল, যেই শুনলে তুমি এখানে নেই—তারা বল্লে সেই ঠাকুরের রান্না খেতেই এখানে আসা। সে যখন নেই, আমরা রেলের হোটেলে খাবো। হাটুরে খদ্দেরও অনেক ভেঙ্গে গিয়েছে—যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলে। তোমায় বাবু বহাল করলেন কেন জান? যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলে তোমাকে পেলে লুফে নেয় এক্ষুনি। তোমার অনেক খোঁজ করেছে ওরা।

বংশীর হাত হইতে গাঁজার কলিকা লইয়া দম মারিয়া হাজারি কিছুক্ষণ চক্ষু বুজিয়া চুপ করিয়া রহিল। কি হইতে কি হইয়া গেল! চাকুরি লইতে সে তো রাণাঘাট আসে নাই। কিন্তু পুরাতন জায়গায় পুরাতন আবেষ্টনীর মধ্যে আসিয়া সে বুঝিয়াছে এতদিন তাহার মনে সুখ ছিল না। এই বেচু চক্কত্তির হোটেল, এই দরমার বেড়া দেওয়া রান্নাঘর, এই পাথুরে কয়লার স্তূপ, এই হাতাবেড়ি এই তার অতি পরিচিত স্বর্গ। ইহাদের ছাড়িয়া কোথায় সে যাইবে? ভগবান এমন সুখের দিনও মানুষের জীবনে আনিয়া দেন?

বংশীর হাতে কলিকা ফিরাইয়া দিয়া সে খুশির সহিত বলিল—নাও, আর একবার টান দিয়ে নাও। ডালে সম্বরা দিই গে—এবেলা এখনও বাজার আসে নি নাকি?

বংশী বলিল—মাছটা কেবল এসেছে। তরকারীপাতি এল বলে, গোবরা গিয়েছে। গোবরা নতুন চাকর—বেশ লোক, আমার ওপর ভারি ভক্তি। এলে দেখো এখন।

এই সময় তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট লইয়া জন দুই খরিদ্দার খাইবার ঘরে ঢুকিতেই হাজারি অভ্যাস মত পুরাতন দিনের ন্যায় হাঁকিয়া বলিল—বসুন বাবু, জায়গা করাই আছে—নিয়ে যাচ্ছি। বসে পড়ুন। মাছ এখনও হয়নি এত সকালে কিন্তু—শুধু ডাল আর ভাজা—বংশী ভাত নিয়ে এস হে—ডালটায় সম্বরা দিয়ে নিই। বেলাও এদিকে প্রায় দশটা বাজে। কেষ্টনগরের গাড়ী আসবার সময় হোল। আজকাল ইষ্টিশনের খদ্দের আনে কে?

হাজারি যেন দেহে-মনে নতুন বল ও উৎসাহ পাইয়াছে। হাজার হোক্, শহর বাজার জায়গা রাণাঘাট, কত লোকজন, গাড়ী, হৈ হৈ, ব্যস্ততা, রেলগাড়ী, গাড়ী-ঘোড়া—এখানে একবার কাটাইয়া গেলে কি অন্য জায়গা কারো ভালো লাগে? একটা জায়গার মত জায়গা।

এমন সময় একজন কালোমত ছোকরা চাকর তরকারি বোঝাই ঝুড়ি মাথায় রান্নাঘরে নীচু হইয়া ঢুকিল—পিছনে পিছনে পদ্মঝি।

পদ্মঝি বলিতে বলিতে আসিতেছিল—বাবাঃ, বেগুন আর কেনবার জো নেই রাণাঘাটের বাজারে। আট পয়সা করে বেগুনের সের ভূভারতে কে শুনেছে কবে—যত ব্যাটা ফড়ে জুটে বাজার একেবারে আগুন করে রেখেচে—সব চল্লো কলকেতা, সব চল্লো কলকেতা—তা গরীব-গুরবো লোক কেনেই বা কি আর খায়ই বা কি—ও বংশী, ঝুড়িটা ধরে নামাও ওর মাথা থেকে—দরজার চৌকাঠে পা দিয়াই সে সম্মুখে থালায় অন্নপরিবেশনরত হাজারিকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া একেবারে যেন কাঠ হইয়া গেল।

হাজারি পদ্মঝিকে দেখিয়াই থতমত খাইয়া গেল। তাহার পুরাতন ভয় কোথা হইতে সেই মুহূর্ত্তেই আসিয়া জুটিল। সে কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া আম্‌তা আম্‌তা সুরে বলিল—এই যে পদ্মদিদি ভাল আছ বেশ? হেঁ-হেঁ—আমি—

পদ্মঝি বিস্ময়ের ভাবটা সামলাইয়া লইয়া বংশী ঠাকুরের দিকে চাহিয়া বলিল—ঝুড়িটা নামিয়ে নেও না ঠাকুর? ও সঙের মত দাঁড়িয়ে রইল ঝুড়ি মাথায়—মাছ হোল? তারপর হাজারির দিকে তাচ্ছিল্যের ভাবে চাহিয়া বলিল—কখন এলে?

—আজই এলাম পদ্মদিদি।

—আজ এবেলা এখানে থাকবে?

বংশী ঠাকুর বলিল—হাজারিকে যে বাবু বহাল করেছেন আবার। ও এখানে কাজ করবে।

পদ্মঝি কঠিন মুখে বলিল—তা বেশ। রান্নাঘরে আর না দাঁড়াইয়া সে বাহিরে চলিয়া গেল।

বংশী ঠাকুর অহুচ্চস্বরে বলিল—পদ্মদিদি চটেছে—বাবুর সঙ্গে এইবার একচোট বাধবে—

পদ্মকে সারাদুপুর আর রান্নাঘরের দিকে দেখা গেল না। হাজারির মন ছট্‌ফট্ করিতেছিল, কতক্ষণে কাজ সারিয়া কুসুমের সঙ্গে গিয়া দেখা করিবে। সে দেখিল সত্যই হোটেলের খরিদ্দার কমিয়া গিয়াছে—পূর্ব্বে যেখানে বেলা আড়াইটার কমে কাজ মিটিত না, আজ সেখানে বেলা একটার পরে বাহিরের খরিদ্দার আসা বন্ধ হইয়া গেল।

হাজারি বলিল—হ্যাঁ বংশী, থার্ড ক্লাসের টিকিট মোট ত্রিশখানা! আগে যে সত্তর-পচাত্তর খানা একবেলাতেই হোত? এত খদ্দের গেল কোথায়?

বংশী বলিল—তবুও তো আজকাল একটু বেড়েচে। মধ্যে আরও পড়ে গিয়েছিল, কুড়িখানা থার্ড ক্লাসের টিকিট হয়েচে এমন দিনও গিয়েচে। লোক সব যায় যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলে। ওদের এবেলা একশো ওবেলা ষাট-সত্তর খদ্দের। হাটের দিন আরও বেশী। আর খদ্দের থাকে কোথা থেকে বলো! মাছের মুড়ো কোনোদিন খদ্দেররা চেয়েও পাবে না। বড় মাছ কাটা হোলেই মুড়ো নিয়ে যাবেন পদ্মদিদি। আমাদের কিছু বলবার জো নেই। তার ওপর আজকাল যা চুরি শুরু করেছে পদ্মদিদি—সে সব কথা এরপর বলবো এখন। খেয়ে নাও আগে।

হোটেল হইতে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া হাজারি বাহির হইয়া মোড়ের দোকানে এক

পয়সার বিড়ি কিনিয়া ধরাইল। চূর্ণীর ধারে তাহার সেই পরিচিত গাছতলাটায় কতদিন বসা হয় নাই—সেখানে গিয়া আজ বসিতে হইবে। পথে রাধাবল্লভতলায় সে ভক্তিভরে প্রণাম করিল। আজ তাহার মনে যথেষ্ট আনন্দ, রাধাবল্লভ ঠাকুর জাগ্রত দেবতা, এমন দিনও তাহাকে জুটাইয়া দিয়াছেন! আজ ভোরে যখন বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল, সে কি ইহা ভাবিয়াছিল? অস্বপনের স্বপন। চোর বলিয়া বদনাম রটাইয়া যাহারা তাড়াইয়াছিল, আজ তাহারাই কিনা যাচিয়া তাহাকে চাকুরিতে বহাল করিল।

চূর্ণী নদীর ধারে পরিচিত গাছতলাটায় বসিয়া সে বিড়ি টানিতে টানিতে এক পয়সার বিড়ি শেষ করিয়া ফেলিল মনের আনন্দে। কুসুমের বাড়ী এখন সব ঘুমাইতেছে, গৃহস্থ বাড়ীতে দেখাশুনা করিবার এ সময় নয় বেলা কখন পড়িবে? অন্ততঃ চারটা না বাজিলে কুসুমের ওখানে যাওয়া চলে না। এখনও দেড় ঘণ্টা দেরি।

গোপালনগরের কুণ্ডুবাড়ী হইতে তাহার কাপড়ের পুঁটুলিটা একদিন গিয়া আনিতে হইবে। গত মাসের মাহিনা বাকি আছে, দেয় ভালো, না দিলে আর কি করা যাইবে?

আজ একটু রাত থাকিতে উঠিবার দরুন ভাল ঘুম হয় নাই—তাহার উপরে অনেকদিন পরে হোটেলের খাটুনি, পাঁচক্রোশ পায়ে হাঁটা। স্বগ্রাম হইতে রাণাঘাট আসা প্রভৃতির দরুন হাজারির শরীর ক্লান্ত ছিল—গাছতলার ছায়ায় কখন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। যখন ঘুম ভাঙিল তখন সূর্যের দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইল চারিটা বাজিয়া গিয়াছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে সে কুসুমের বাড়ীর দরজায় গিয়া কড়া নাড়িল।

কুসুম নিজে আসিয়াই খিল খুলিল এবং হাজারিকে দেখিয়া অবাক হইয়া বলিল—জ্যাঠামশায়! কোথা থেকে? আসুন—আসুন—

তার পরেই সে নীচু হইয়া হাজারির পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল।

হাজারি হাসিমুখে বলিল—এস এস মা, কল্যাণ হোক। ছেলেপিলে সব ভাল তো? এত রোগা হয়ে গিয়েছ, ইস্। তোমার কাকার মুখে তোমার বড্ড অসুখের কথা শুনলাম।

কুসুম বাড়ীর মধ্যে তাহাকে লইয়া গিয়া ঘরের মেঝেতে শতরঞ্চি পাতিয়া বসাইল। বলিল—ভয় নেই জ্যাঠামশায় মরচি নে অত শীগ্‌গির। আপনি সেই যে গেলেন, আর কোনো খবর নেই। অসুখের সময় আপনার কথা কত ভেবেছি জানেন জ্যাঠামশায়? মরেই যদি যেতাম, দেখা হোত আর? অখদ্দে আপদ না হোলে মরেই তো—

—ছি ছি, মা, ও রকম কথা বলতে আছে?

—কোথায় ছিলেন এতদিন আপনি? আজ কোথা থেকে এলেন?

—এঁড়োশোলা থেকে।

কুসুম ব্যস্ত হইয়া বলিল—হেঁটে এসেছেন বুঝি? খাওয়া হয়নি?

হাজারি হাসিয়া বলিল—ব্যস্ত হয়ো না মা। বলছি সব। সকালে বেরিয়েছিলাম এঁড়োশোলা থেকে, বলি যাই একবার রাণাঘাট, তোমার সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছে খুব হোল।

রেল বাজারে যেমন বাবুর হোটেলে দেখা করতে যাওয়া, অমনি বাবু বহাল করলেন কাজে। সেখানে কাজ সাঙ্গ করে চূর্ণীর ধারে বেড়িয়ে এই আসছি।

—ওমা আমার কি হবে? ওরা আবার আপনাকে ডেকে বহাল করেছে! তবে মিথ্যে চুরির অপবাদ দিয়েছিল কেন? পদ্ম আছে তো?

—পদ্ম নেই তো যাবে কোথায়? আছে বলে আছে! খুব আছে।

পরে গর্ব্বের সুরে বলিল—আমায় না নিলে হোটেল যে ইদিকে চলে না। খদ্দেরপত্তর তো আদ্ধেক ফর্সা। সব উঠেছে গিয়ে বাঁড়ুয্যে মশায়ের হোটেলে।

হাজার হোক, হোটেলের মালিক, সুতরাং তাহার মনিবের সমশ্রেণীর লোক। হাজারি যদু বাঁড়ুয্যের নামটা সমীহ করিয়াই মুখে উচ্চারণ করিল।

কুসুম যেন অবাক হইয়া খানিকটা দাঁড়াইয়া রহিল। পরে হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বলিল—বসুন, জ্যাঠামশায়, আসছি আমি—

—না, না, শোনো। এখন খাওয়া-দাওয়ার জন্যে যেন কিছু কোরো না—

—আপনি বসুন তো। আসছি আমি—

কোনো কথাই খাটিল না। কুসুম কিছুক্ষণ পরে এক বাটি গরম সরদুধ ও দু-খানি বরফি সন্দেশ রেকাবিতে করিয়া আনিয়া হাজারির সামনে রাখিয়া বলিল—একটু জল সেবা করুন।

—ওঃ তো তোমাদের দোষ, বারণ করে দিলেও শোনো না—

কুসুম হাসিমুখে বলিল—কথা শুনবো এখন পরে—দুধটা সেবা করুন সবটা—ভালো দুধ—বাড়ীর গরুর। ঘন করে জ্বাল দিয়েছি, দুপুর থেকে আকার ওপর বসানো ছিল।

—তুমি বড় মুশকিলে ফেললে দেখচি মা!…নাঃ—

হাজারিকে পান সাজিয়া দিয়া কুসুম বলিল—জ্যাঠামশায় হোটেল ভাল লাগছে?

—তা মন্দ লাগছে না। আজ বেশ ভালই লাগলো। তবে ভাবছি কি জানো মা, এই রেল বাজারে আর একটা হোটেল বেশ চলে।

—শুধু বেশ চলে না জ্যাঠামশায়, খুব ভাল চলে। আপনার নিজের নামে হোটেল দিলে সব হোটেল কানা পড়ে যাবে।

—তোমার তাই মনে হয় মা?

—হ্যাঁ, আমার তাই মনে হয়। খুলুন আপনি হোটেল।

—আর একজনও একথা বলেছে কালই। তোমার মত সেও আর এক মেয়ে আমার। আমাদের গাঁয়েরই—

—কে জ্যাঠামশায়?

—হরিবাবুর মেয়ে, অতসী ওর নাম, টেঁপির বন্ধু। খুব ভাব দুজনে। সে আমায় কাল বলছিল—

—আমাদের বাবুর মেয়ে? আমি দেখিনি কখনো। বয়েস কত?

—ওরা নতুন এসেছে গাঁয়ে, কোথা থেকে দেখবে। বয়েস ষোল-সতেরো হবে। বড় ভাল মেয়েটি।

—সবাই যখন বলছে, তাই করুন আপনি। টাকা আমি দেবো—

—অতসীও দবে বলেছে। দু-জনের কাছে টাকা নিলে জাঁকিয়ে হোটেল দেবো। কিন্তু ভয় হয় তোমার ব্যাঙের আধুলি নিয়ে শেষে যদি লোকসান যায়, তবে একূল ওকূল দুকূল গেল। বরং অতসী বড় মানুষের মেয়ে—তার দুশো টাকা গেলে কিছু তার আসে যাবে না—

—না, আমার টাকাও খাটিয়ে দিতে হবে। সে শুনছি নে।

—আমি দুজনের টাকাই নেবো। কাল থেকে জায়গা দেখছি রও। তবে টাকা গেলে আমায় দোষ দিও না।

—জ্যাঠামশায়, আপনি হোটেল খুললে টাকা ডুববে না—আমি বলছি। এর পরেও যদি ডোবে, তবে আর কি হবে। আপনার দোষ দেবো না।

উঠিবার সময় কুসুম বলিল, জ্যাঠামশায়, পরশু সংক্রান্তির দিন বাড়ীতে সত্যনারায়ণের সিন্নি দেবো ভাবছি, আপনি এখানে রাত্রে সেবা করবেন।

—তা কি করে হবে মা? আমি রাতে বারটার কম ছুটি পাবো না।

—তবে তার পর দিন দুপুরে? বেলা একটার সময় আসবেন। আমি লুচি ভেজে রাখবো, আপনি এসে তরকারি করে নেবেন। কথা রইলো, আসতেই হবে কিন্তু জ্যাঠামশায়।

হোটেলে ফিরিয়া সে বড় ডেকে রান্না চাপাইয়া দিল। বংশী ঠাকুর এবেলা এখনো আসে নাই, হাজারি অত্যন্ত খুশির সহিত চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল—সেই অত্যন্ত পরিচিত পুরাতন রান্নাঘর, এমন কি একখানা পুরানো লোহার খুন্তি পাঁচমাস আগে টিনের চালের বাতার গায়ে সেই গুঁজিয়া রাখিয়া গিয়াছিল এখনও সেখানা সেই স্থানেই মরিচা-পড়া অবস্থায় গোঁজাই রহিয়াছে। সেই বংশী, সেই রতন, সেই পদ্মদিদি।

বংশী আসিয়া ঢুকিল। হাজারি বলিল—আজ পেঁপে কুটিয়ে দাও তো বংশী, একবার পেঁপের তরকারী মন দিয়ে রাঁধি অনেক দিন পরে। একদিনে বাঁড়ুজ্যে মশায়ের হোটেল কানা করে দেবো।

গদির ঘরে পদ্মঝিয়ের গলার আওয়াজ পাইয়া বংশী বলিল—ও পদ্মদিদি, শোনো ইদিকে —ও পদ্মদিদি—

পদ্মঝি থার্ডক্লাসের খাওয়ার ঘর পার হইয়া রান্নাঘরের মধ্যে আসিয়া ঢুকিয়া বলিল—কি হয়েছে?

বংশী বলিল—কি কি রান্না হবে এবেলা? হাজারি বলেছে পেঁপের তরকারি রাঁধবে ভাল করে। দু-একটা ভালমন্দ আমাদের দেখাতে হবে আজ থেকে। পেঁপে তো রয়েছে—কি বল?

পদ্মঝি বলিল—না পেঁপে কাল হবে। আজ এবেলা বিলিতি কুমড়ো হোক। আর কুচো মাছের ঝাল করো। সাত আনা সের চিংড়ি ওবেলা গিয়েছে—এবেলা দেখি কি মাছ পাওয়া যায়।

হাজারি বলিল—পদ্মদিদি, আজ একটু মাংস হোক না?

পদ্মঝি এতক্ষণ পর্য্যন্ত হাজারির সঙ্গে সরাসরিভাবে বাক্যালাপ করে নাই। সারাদিনের মধ্যে এই প্রথম তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—মাংস বুধবার হয়ে গিয়েছে। আজ আর হবে না—বরং শনিবার দিনে হবে।

হাজারি অত্যন্ত পুলকিত হইয়া উঠিল পদ্ম তাহার সহিত কথা বলাতে এবং পুলকের প্রথম মুহূর্ত্ত কাটিতে না কাটিতে তাহাকে একেবারে বিস্মিত ও চকিত করিয়া দিয়া পদ্মঝি জিজ্ঞাসা করিল—এতদিন কোথায় ছিলে ঠাকুর?

হাজারি সাগ্রহে বলিল—আমার কথা বলছ পদ্মদিদি?

—হ্যাঁ।

—গোপালনগরে কুণ্ডুবাবুদের বাড়ী। আমি ছুটি নিয়ে বাড়ী এসেছিলাম—তারপর রাণাঘাটে আজ এসেছিলাম বেড়াতে। তা বাবু বল্লেন—

—হুঁ, বেশ থাকো না। তবে বাইরে জিনিসপত্তর নিয়ে যেতে পারবে না বলে দিচ্ছি। ওসব একদম বন্ধ করে দিয়েছেন বাবু। যা পারো এখানে খেও—বুঝলে?—

—না বাইরে নিয়ে যাবো কেন পদ্মদিদি? তা নিয়ে যাবো না।

—তোমার সেই কুসুম কেমন আছে? দেখা করতে যাওনি? পদ্মঝিয়ের কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপ ও শ্লেষের আভাস।

হাজারি লজ্জিত ও অপ্রতিভভাবে উত্তর দিল—কুসুম? হ্যাঁ তা কুসুম—ভালই—

পদ্মঝি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বোধ হয় যেন হাসিল। অন্ততঃ হাজারির তাহাই মনে হইল। পদ্মঝি ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেই বংশী বলিল—যাক্ চাকরি তোমার পাকা হয়ে গেল হাজারিদা—দুপুরের পর আমরা চলে গেলে বোধ হয় কর্ত্তা-গিন্নীতে পরামর্শ হয়েছে—চলো এক ছিলিম সাজা যাক্।

হাজারি হাসিল। সব দিকেই ভালো, কিন্তু পদ্মদিদি কুসুমের কথাটা তুলিল কেন আবার ইহার মধ্যে? ভারি ছোট মন—ছিঃ।

বংশী বাহির হইতে চাপা গলায় ডাকিল—ও হাজারিদা, এসো—টেনে নাও একটান—

গাঁজায় কষিয়া দম মারিয়া হাজারি আসিয়া আবার রান্নাঘরে বসিতেই হঠাৎ অতসীর মুখখানা তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। দুর্গা-প্রতিমার মত মেয়ে অতসী। কি মনটি চমৎকার। তাহার কাকাবাবু গাঁজা খায়, অতসী যদি দেখিত! ওই জন্তেই তো গ্রামে সে কখনো গাঁজা খায় না। ছেলেপিলের সামনে বড় লজ্জার কথা।

অতসী টাকা দিতে চাহিয়াছে, হোটেল তাহাকে খুলিতে হইবেই। কথাটা একবার বংশীকে বলিবে? বংশী ও রতন ভাল লোক দু-জনেই, তাহাদের বিশ্বাস করা যায়।

দুজনেই তাহাকে ভালবাসে।

বংশীকে বলিল—আজকাল রাত্তিরে টক্ হয়?

—সব দিন হয় না। এখন নেবু সস্তা, নেবু দেওয়া হয়। পয়সায় ছ'সাতটা পাতিনেবু।

—একটা কিছু করে দেখাতে হবে তো? বড়ির টক্ করবো ভেবেছিলাম—

—তুমি ভাবলে কি হবে? পদ্মদিদি পাস করলে তবে তো হাঁড়িতে উঠবে। ভুলে গেলে নাকি আইনকানুন, হাজারিদা?

হাজারি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—বংশী, একটু চা করে খেয়ে নিলে হোত না? আছে তোড়জোড়?

বংশী বলিল—খাবে? আমি দিচ্ছি সব ঠিক করে। ডাল চড়িয়ে গরম জল এই ঘটিতে কেটে রেখো হাতা দিয়ে। চিনি আছে, চা আনিয়ে নিচ্ছি—মনে আছে আর বছর আমাদের চা খাওয়া? আদার রস করেও দেবো এখন—

আধঘণ্টার মধ্যে হাজারি ও বংশী মনের আনন্দে কলাইকরা বাটি করিয়া চা খাইতেছিল। ভূতগত খাটুনির মধ্যেও ইহাতেই আনন্দ কি কম? হাজারি একদৃষ্টে আগুনের দিকে চাহিয়া চিন্তিত মুখে বলিল—যেখানেই যার মন টেকে, বুঝলে বংশী। গোপালনগরে সন্দেবেলা রোজ ওদের মন্দিরে ঠাকুরের শেতল হয়—তার সন্দেশ, ফল কাটা, মুগের ডাল ভিজে খেতে দিত আমাকে। চা আমি করে নিতাম উনুনে। কিন্তু তাতে কি এমন মজা ছিল? একা একা বসে রান্নাঘরে চা আর খাবার খেতাম, মন হু হু করতো। খেয়ে সুখ ছিল না—আজ শুধু চা খাচ্ছি, তাই যেন কত মিষ্টি!

রাত হইয়াছে, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে একখানা গাড়ীর আওয়াজ পাইয়া হাজারি বলিল—ও বংশী, কেষ্টনগর এলো যে! ডালে কাঁটা দিয়ে নাও—

সঙ্গে সঙ্গে গোবরা চাকর খাবার ঘর হইতে হাঁকিল—থাড কেলাস দু-থালা—উত্তেজনায় হাজারির সারাদেহ কেমন করিয়া উঠিল। কি কাজের ভিড়, কি লোকজনের হৈ চৈ, কি ব্যস্ততা—ইহার মধ্যেই তো মজা। তা নয়, গোপালনগরের মত পাড়াগাঁ জায়গায় কুণ্ডুদের বৃহৎ নিস্তব্ধ অট্টালিকার মধ্যে নিস্তব্ধ রান্নাঘরের কোণে বসিয়া কড়িকাঠ গুনিতে গুনিতে আর বাড়ীর পিছনের বাগানের তেঁতুল গাছে বাদুড় ঝোলা ডালপালার দিকে চাহিয়া চাহিয়া রান্না করা—সে কি তাহার পোষায়! সে হইল শহরের মানুষ।

সংক্রান্তির পরের দিন কুসুমের বাড়ী বেলা প্রায় বারোটার সময় সে নিমন্ত্রণ রাখিতে গেল। বংশী ঠাকুরকে বলিয়া একটু সকাল সকাল হোটেল হইতে বাহির হইল।

কুসুম গোয়ালঘরের নতুন উনুনে আলাদা করিয়া কপির ডালনা রাঁধিতেছে—একখানা কলার পাতায় খানকতক বেগুন ভাজা ও একটা পাথরের খোরায় ছোলার ডাল। শুদ্ধাচারে সব করিতে হইতেছে বলিয়াই পাথরের খোরা ও কলাপাতা ইত্যাদির ব্যবস্থা—হাজারি দেখিয়া মনে মনে হাসিয়া ভাবিল—কুসুমের কাণ্ড ত্যাখো! থাকি হোটেলে—কত ছোঁয়ালেপা হয়ে

যায় তার নেই ঠিক—ও আবার নেয়ে ধুয়ে ধোয়া কাপড় পরে গুরুঠাকুরের মত যত্ন করে রাঁধতে বসেচে।

কুসুম সলজ্জ হাসিয়া বলিল—জ্যাঠামশায়, এখনও হয়নি। একটু দেরি আছে—আমি কিন্তু তরকারি সব রেঁধেছি—আপনি শুধু বসে যাবেন—

হাজারি বলিল—তুমি তরকারি রাঁধলে যে বড়! সে কথা তো ছিল না। আমি তোমার তরকারি খাবো কেন?

—ঠকাতে পারবেন না জ্যাঠামশাই। কোনো তরকারিতে নুন দিইনি। নুন না দিলে খেতে আপনার আপত্তি কি? ভাবলাম আপনি অত বেলায় এসে তরকারি রাঁধবেন সে বড় কষ্ট হবে—লুচি ভাজা আর কি হাঙ্গামা, দেরি তো হবে তরকারি রাঁধতে। তাই নিয়ে এসে—

—নুন দাওনি। না মা তুমি হাসালে দেখ্‌চি। আলুনি তরকারি খাওয়াবে তোমার বাড়ী?

—আর গোয়ালার মেয়ে হয়ে আমি নিজের হাতের রান্না তরকারি খাইয়ে আপনার জাত মেরে দেবো—নরকে পচ্‌তে হবে না আমাকে তার জন্যে?

হাজারি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, দাও ময়দাট। মেখে নিই ততক্ষণ—

—সব ঠিক আছে জ্যাঠামশাই। কিছু করতে হবে না আপনাকে। আপনি বরং শুধু নেচি কেটে লুচিগুলো বেলে দিন—কিপটা হয়ে গেলেই চাট্‌নি রাঁধব—তারপর লুচি ভেজে গরম গরম—ওতে কি জ্যাঠামশায়?… ও কি?

হাজারি গায়ের চাদরের ভিতর হইতে একটা শালপাতার ঠোঙা বাহির করিতে করিতে আমতা আমতা করিয়া বলিল—এই কিছু নতুন গুড়ের সন্দেশ—আজ পয়লা তারিখে ও মাসের ক'দিনের মাইনেটা দিলে কি না—তাই ভাবলাম একটুখানি মিষ্টি—

কুসুম রাগ করিয়া বলিল—এ আপনার বড্ড অন্যাই কিন্তু জ্যাঠামশায়। আপনার এই সবে চাকুরির মাইনে—আমার জন্যে খরচ করে সন্দেশ না কিনলে আর চলতো না? আপনায় দণ্ড করতে আমার এখানে সেবা করতে বলেছি?…না, এসব কি ছেলেমানুষী আপনার—

হাজারি শালপাতার ঠোঙাটি দাওয়ার প্রান্তে অপরাধীর মত সঙ্কোচের সহিত নামাইয়া রাখিয়া বলিল—আমার কি ইচ্ছে করে না মা, তোমার জন্যে কিছু আনতে? বাবা মেয়েকে খাওয়ায় না বুঝি?

হাজারির রকম-সকম দেখিয়া কুসুমের হাসি পাইলেও সে হাসি চাপিয়া রাগের সুরেই বলিল—না ভারি চটে গিয়েছি—পয়সা হাতে এলেই অমনি খরচ করার জন্যে হাত সুড়সুড় করে বুঝি? ভারী বড়লোক হয়েছেন বুঝি? ও মাসের সাতটা দিন কাজ করে কত মাইনে পেয়েছেন যে এক টাকার সন্দেশ আনলেন অমনি? হাজারি চুপ করিয়া অপ্রতিভ মুখে বসিয়া রহিল।

—আসুন ইদিকে, এই আসনখানায় বসুন, ময়দাটা নেচি করুন এবার—

মা কাহাকে অত বকিতেছে দেখিতে কুসুমের ছেলে মেয়ে কোথা হইতে আসিয়া সামনে উঠানে দাঁড়াইতেই হাজারি ঠোঙা হইতে সন্দেশ লইয়া তাহাদের হাতে কিছু কিছু দিয়া বলিল—যাক, নাতিনাতনী তো আগে থাক্—মেয়ে খায় না খায় বুঝবে পরে—

পরে কুসুমের দিকে ফিরিয়া বলিল—নাও হাত পাতো, আর রাগ করে না—

কুসুম এবার আর হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিল না। বলিল—আমি রাঁধতে রাঁধতে খাব ?

—কেন আলগোছে ?

—না।

—কেন ?

—আমি বুড়ো মাগী, ভোগের আগে পেরসাদ পেয়ে বসে থাকি আর কি!

হাজারি বুঝিল তাহার খাওয়া না হইয়া গেলে কুসুম কিছুই খাইবে না। সে বিনা বাক্যব্যয়ে লুচির ময়দা লইয়া বসিয়া গেল।……

কুসুম বলিল—হোটেল খুলবার কি করলেন ?

—গোপাল ঘোষের তামাকের দোকানের পাশে ওই ঘরখানা ন'টাকা ভাড়া বলে। দেখেচ ঘরখানা ?

কুসুম উৎফুল্ল হইয়া বলিল—কবে খুলবেন ?

—সামনের মাসে। টাকা দেবে তো ?

কুসুম গলার সুর নীচু করিয়া বলিল—আস্তে আস্তে। কেউ শুনবে—

—তোমার শাশুড়ী কই ?

—আমি যেতে পারলাম না বাইরে, তাই দুধ নিয়ে বেরিয়েছে—এল বলে।

—বাত সেরেছে ?

—মরচের মাদুলী নিয়ে এখন ভাল আছে। আগে মধ্যে দিনকতক পঙ্গু হয়ে পড়েছিল—তার চেয়ে ঢের ভাল। আপনার জায়গা করে দিই—ওগুলো ভেজে ফেলুন—গরম গরম দেবো—

হাজারি খাইতে বসিল। কুসুম কাছে বসিয়া কখনও লুচি, কখনও তরকারি দিতে দিতে বলিল—আপনি তরকারিতে বেশী করে নুন মেখে খান—

—রান্না চমৎকার হয়েছে মা—

—থাক আপনার আর—

—হোটেল যেদিন খুলবো, সেদিন তোমায় নিজের হাতে রেঁধে খাওয়াবো—

—না। ও সব করতে দেবো না। বুঝেসুঝে চলতে হবে না ? টাকা নিয়ে ভূতোনন্দি কাণ্ড করবেন ?

—কিছু করবো না! তুমি চেন না আমায়।

—আমার জন্তে এক পয়সা খরচ করতে পাবেন না আপনি বলে দিচ্ছি। তাহ'লে

আপনার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বন্ধ করে দেবো—ঠিক।

পনেরো দিন পরে হাজারি স্বগ্রামে সংসারের খরচপত্র দিতে গেল। বৈকালে হরিবাবুর বাড়ী বেড়াইতে গিয়া দেখিল হরিবাবু বৈঠকখানায় আরও দুটি অপরিচিত ভদ্রলোকের সহিত বসিয়া কথা বলিতেছেন। তাহাকে দেখিয়া বলিলেন—এই যে এস হাজারি, বসো বসো। এঁরা এসেছেন কলকাতা থেকে অতসীকে দেখতে—তুমি এসেছ ভালই হয়েছে। রাত্রে আমার এখানে খেও আজ—

অতসীর তাহা হইলে বিবাহ? যদি ইতিমধ্যে তার বিবাহ হইয়া যায়, সে শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গেলে টাকাকড়ির ব্যাপার চাপা পড়িয়া যাইবে। হাজারি একটু দমিয়া গেল।

আধঘণ্টা পরে হরিবাবু বলিলেন—আমি সন্ধ্যাহ্নিকটা সেরে আসি—আপনাদের ততক্ষণ চা দিয়ে যাক।

ভদ্রলোক দুইজন বলিলেন—তিনি ফিরিয়া আসিলে একত্রে চা খাওয়া যাইবে। তাঁহারা ততক্ষণ একবার নদীর ধারে বেড়াইয়া আসিবেন।

অল্পক্ষণ পরেই অতসী আসিয়া বৈঠকখানায় বাড়ীর ভিতরের দিকের দরজা হইতে একবার সন্তর্পণে উঁকি মারিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল।

—এসো, এসো মা। ভাল আছ?

—আপনি ভাল আছেন কাকাবাবু? গোপালনগর থেকে আসছেন?

—না মা। আমি গোপালনগরে আর নেই তো? রাণাঘাটের সেই হোটেলে কাজ আবার নিয়েছি যে। ওরা ডেকে বহাল করলে।

—করবে না? আপনার মত লোক পাবে কোথায়? আমায় এবার একটা কিছু শিখিয়ে দিয়ে যান, কাকাবাবু। আপনার নাম করবো চিরকাল।

—মা, এ হাতেকলমের জিনিস। বলে দিলে তো হবে না, দেখিয়ে দিতে হবে। তার সুবিধে হবে কি? আমি এর আগেও তোমাকে তো বলেছি একথা।

—কাল আপনার বাড়ী যাবো এখন। টেঁপিকে বলবেন। তাকে নিয়ে এলেন না কেন? তাকে নিয়ে আসবেন, সেও আমাদের এখানে রাত্রে খাবে।

অতসী একটু পরেই চলিয়া গেল, কারণ আগন্তুক ভদ্রলোক দুটির গলার আওয়াজ পাওয়া গেল বাড়ীর বাহিরে রাস্তার দিকে।

পরদিন সকালে টেঁপির মা উঠান্ ঝাঁট দিতেছে এমন সময়ে অতসী বাড়ীর উঠানের মাচাতলা হইতে ডাকিল—টেঁপি, ও টেঁপি—

টেঁপির মা তাড়াতাড়ি হাতের ঝাঁটা ফেলিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। জমিদারের মেয়ে অতসী গ্রামের কাঁহারও বাড়ী বড় একটা যায় না, তাহাদের মত গরীব লোকের বাড়ী যে যাতায়াত করিতেছে—ইহা ভাগ্যের কথাও বটে, গর্ব্ব করিয়া লোকের কাছে পরিচয় দিবার মত কথাও বটে।

হাসিয়া বলিল—টেঁপি বাসন নিয়ে পুকুরে গিয়েছে—এসো বসো মা।

—কাকাবাবু কোথায় ?

হাজারি কাল রাত্রে অতসীদের বাড়ী গুরুতর আহার করিলেও আজ হাঁটিয়া তিন ক্রোশ পথ রাণাঘাট যাইবে, এই ওজুহাতে বড় এক বাটি চালভাজা মুন লঙ্কা সহযোগে ঘরের ওদিকে দাওয়ায় বসিয়া চর্ব্বণ করিতেছিল—অতসী পাছে এদিকে আসিয়া পড়ে এবং তাহার চালভাজা খাওয়া দেখিয়া ফেলে সেই ভয়ে বাটিটা সে তাড়াতাড়ি কোঁচার কাপড় দিয়া চাপা দিল।

অতসী আসিয়া বলিল—কই কাকাবাবু কোন্ দিকে বসে ?

ওঃ, খুব সময়ে চালভাজার বাটি ঢাকিয়া ফেলিয়াছে সে।… অতসী তাহাকে রাক্ষস ভাবিত—রাত্রের ওই ভীষণ খাওয়ার পরে সকাল হইতে না হইতেই—

—এই যে মা—কি মনে করে এত সকালে ?

—আপনি আমাদের বাড়ী দুপুরে খাবেন তাই বলতে বলে দিলেন বাবা—

—না মা আমি এখুনি বেরুচ্ছি রাণাঘাট—ছুটি তো নেই—আর কাল রাতে যে খাওয়া হয়েছে তাতে—

—তবে টেঁপি আর খুড়ীমা খাবেন—ওঁদের নেমন্তন্ন—আমি বলে যাচ্ছি ওঁদের। বলিয়া অতসী দাওয়ায় উঠিয়া নিজেই পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া গেল দেখিয়া হাজারি প্রমাদ গণিল। একে সময় নাই, দশটার মধ্যে হোটেলে পৌঁছিয়া রান্না চাপাইতে হইবে। এক বাটি চালভাজা চিবাইতেও তো সময় লাগে! হতভাগা মেয়েটা সব মাটি করিল!…বাটিটা লুকাইয়া বসিয়া থাকাই বা কতক্ষণ চলে ?

অতসী বলিল—কাকাবাবু, আমার সঙ্গে যদি আপনার আর দেখা না হয় ?

—কেন দেখা হবে না ?

অতসী লাজুক মুখে বলিল—ধরুন যদি আমি—এখান থেকে যদি—

—বুঝেছি মা, ভালই তো, আনন্দের কথাই তো।

—আপনারা তাড়াতে পারলে বাঁচেন তা জানিই। মার মুখেও সেই এক কথা, বাবার মুখেও সেই এক কথা। সে যা হয় হবে আমি তা বলছি নে। আমি বলছি আপনি আজ থেকে যান, আমি যে কথা দিয়েছিলাম আপনার কাছে—সেই টাকা, মনে আছে তো ? আপনাকে তা আজ দিয়ে দিই। যদি বলেন তো এখুনি আনি। আমার মনের ভার কমে যায়, তারপর যেখানে আপনারা আমায় বিদেয় করে দেন দেবেন—

—ওকি মা। বিদেয় তোমায় কেউ করছে না। অমন কথা বলতে নেই।…কিন্তু টাকা নিতান্তই দেবে তা'হলে ?

—যখন বলেছি, তখন আপনি কি ভেবেছিলেন কাকাবাবু আমি মিথ্যে বলছি ?

—তা ভাবিনি—আচ্ছা ধরো এমন তো হতে পারে, আমি হোটেল খুলে লোকসান দিলাম, তখন তোমার টাকা তো শোধ দিতে পারবো না ?

—আমি তো বলেছি, না দিতে পারেন তাই কি ?……আপনি বসুন, আমি টাকা নিয়ে আসি—

আধঘণ্টার মধ্যে অতসী ফিরিল। সন্তর্পণে আঁচলের গেরো খুলিয়া তাহাকে দুইশত টাকার খুচরা নোট গুনিয়া দিতে দিতে বলিল—এই রইল। আমার টাকা ফেরত দিতে হবে না। টেঁপির বিয়ে দেবেন সে টাকায়। আমি যাই, লুকিয়ে চলে এসেছি, বাবা খুঁজবেন আবার।

রাণাঘাট যাইতে সারাপথ হাজারি অন্যমনস্কভাবে চলিল ‥

বেশ মেয়ে অতসী, ভগবান ওর ভাল করুন। তাহার মন বলিতেছে ওর হাত দিয়া যে টাকা আসিয়াছে—সে টাকায় ব্যবসা খুলিলে লোকসান যাইবে না। স্বয়ং লক্ষ্মী যেন তাহার হাতে আসিয়া টাকা গুঁজিয়া দিয়া গেলেন। ‥ …

হোটেলে পৌঁছিয়া সে দেখিল রান্নাঘরে বংশী ঠাকুর ডাল চাপাইয়া একা বসিয়া। তাহাকে দেখিয়া বলিল—আরে এসো হাজারি-দা, বড্ড বেলা করলে যে! বড় ডেকে ভাতটা চাপাও—নেবে নাকি একটু দম দিয়ে ?

—তা নাও না ? সাজো গিয়ে—আমি ডাল দেখছি—

একটু পরে গাঁজার কলিকাটি হাজারির হাতে দিয়া বংশী বলিল—একটা বড় কাজের বায়না এসেচে, নেবে ? আন্দুলের ঘোষেদের বাড়ী রাস হবে—সাতদিনের ঠিকে কাজ। বঁদে ভিয়েন, সন্দেশ ভিয়েন, রান্না এই সব। দু'টাকা মজু'র দিন—খোরাকি বাদে।

হাজারি বলিল—বংশী একটা কথা বল তোমায়। আমি হোটেল খুলছি রাণাঘাটের বাজারে। কাউকে বোলো না কথাটা। তোমাকে আসতে হবে আমার হোটেলে।

কথাটা ঠিক শুনিয়াছে বলিয়া বংশীর যেন মনে হইল না। সে অবাক্ হইয়া উহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—হোটেল খুলবে ? তুমি!

—হাঁ, আমি না কে ? তোমার বেহাই ?

বংশী বলিল—কি পাগলের মত বলছ হাজারি-দা ? কল্কে রাখো, আর টান দিও না। রেলবাজারে একটা হোটেল খুলতে কত টাকা লাগে তুমি জানো ?

—কত টাকা বলে তোমার মনে হয় ?

—পাঁচশো টাকার কম নয়।

—চারশোতে হয় না ?

—আপাততঃ চলবে—কিন্তু কে তোমায় চারশো টাকা—

উত্তরে কোঁচার কাপড়ের গেরো খুলিয়া হাজারি বংশীকে নোটের তাড়া দেখাইয়া বলিল—এই দেখছো তো দুশো টাকা এতে আছে। যোগাড় করে এনেছি। এখন লাগো গাছকোমর বেঁধে—তোমায় অংশ থাকবে যদি প্রাণপণে চালাতে পারো—তোমায় ফাঁকি দেবো না। আজ থেকেই বাড়ী দেখ—পনেরো টাকা পর্য্যন্ত ভাড়া দেবো—আর দুশো টাকাও যোগাড় আছে।

বংশী ঠাকুর মুখের মধ্যে একটা অস্পষ্ট শব্দ করিয়া বলিল—ভ্যালা আমার মানিক রে।

হাজারি-দা, এসো তোমায় কোলে করে নাচি। এক অস্ত্রে বেচু চক্কত্তি বধ, পদ্মদিদি বধ, যদু বাঁড়ুয্যে বধ—

—চুপ, চুপ,—চলো ছুটির পর দুজনে ঘর দেখা যাক্। তামাকের দোকানের পাশে ওই ঘরখানা ন'টাকা ভাড়া বলে। জায়গাটা ভাল। আচ্ছা, বাজার কেমন, বংশী?

—বাজার ভালো। নতুন আলু সস্তা হোলে আরও সুবিধে হবে। নতুন আলু উঠলো বলে। কেবল মাছটা এখনও আক্রা--

—ঘর দেখার পর একটা ফর্দ্দ করে ফেলা যাক এসো। থালা বাসন, বালতি, জালা, শিলনোড়া, বঁটি—

—আজ খাওয়াও হাজারি-দা। মাইরি, একটা কাজের-মত কাজ করলে। আচ্ছা টাকা পেলে কোথায় বল না?

—পরে বলবো সব। তার ঢের সময় আছে। এখন আগেকার কাজ আগে করো।

পদ্মঝি হঠাৎ রান্নাঘরে ঢুকিয়া বলিল—বেশ তো দুটিতে বসে খোসগল্প চলছে। উদিকে মাছ ডাঙায়, তরকারি ডাঙায়—এখুনি লোক খেতে আসবে—

গোবরা চাকর হাঁকিল—থাড্ কেলাস একথালা—

পদ্মঝি বলিল—ওই! এলো তো? এখন মাছ ভাজা পর্য্যন্ত হোল না যে তাই দিয়ে ভাত দেবে। এদিকে গাঁজার ধোঁয়ায় তো রান্নাঘর অন্ধকার—সব তাড়াতে হবে তবে হোটেল চলবে। কর্ত্তার খেয়েদেয়ে নেই কাজ তাই যত হাড়হাভাতে উনপাঁজুরে গাঁজাখোর আবার জুটিয়ে এনে হাতাবেড়ি হাতে দিয়েছে—

বংশী ঠাকুর বলিল—রাগ করো কেন পদ্মদিদি, কাল রাতের বাসি মাছ ভেজে রেখেছি—থাড্ কেলাসের খদ্দের যারা সকালে খায়, তাই চিরকাল খেয়ে আসছে।

হাজারি বংশীর দিকে চাহিয়া বলিল—না বংশী দই এনে দাও সেও ভাল। বাসি মাছ দিও না—ওতে নাম খারাপ হয়ে যায়—ও থাক।

পদ্মঝি ঝাঁজের সহিত বলিল—দইয়ের পয়সা তুমি দিও তবে ঠাকুর। হোটেল থেকে দেওয়া হবে না। তুমি বেলা করে বাড়ী থেকে এলে বলেই মাছ হোল না। বংশী ঠাকুর একা কত দিকে যাবে?

হাজারি চুপ করিয়া রহিল।

হোটেলের ছুটির পর হাজারি চূর্ণীঘাটে যাইবার পথে রাধাবল্লভতলায় বার বার নমস্কার করিয়া গেল। ঠাকুর রাধাবল্লভ এতদিন পরে যেন মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। তাহার সেই প্রিয় গাছটির তলায় বসিয়া হাজারি কত কি কথা ভাবিতে লাগিল। অতসী টাকা দিয়া দিয়াছে, তাহার বাড়ী বহিয়া আসিয়া টাকা দিয়া গিয়াছে—হয়তো সে হোটেল খুলিতে দেরি করিত, কিন্তু আর দেরি করা চলিবে না। অতসী-মায়ের কাছে কথা দিয়াছে, সে কথা রাখিতে হইবেই তাহাকে।

রাণাঘাট বেশ লাগে তাহার, বেচুবাবুর হোটেল তো একমাত্র জায়গা যেখানে তাহার মন

ভাল থাকে, জীবনটা শান্তিতে কাটাইতেছি বলিয়া মনে হয়। এই রাণাঘাটের রেলবাজার ছাড়িয়া সে কোথাও যাইতে পারিবে না। এখানেই হোটেল খুলিবে, অন্যত্র নয়।

বৈকালের দিকে সে কুসুমের বাড়ী গেল। কুসুম বলিল—আজকে এলেন? আসুন, বসুন।

হাজারি হাসিমুখে বলিল—একটা জিনিস রাখতে হবে মা।

—কি?

হাজারি পেট-কোঁচড় হইতে দু'শো টাকার নোট বাহির করিয়া বলিল—রেখে দাও।

কুসুম অবাক হইয়া বলিল—কোথায় পেলেন?

—ভগবান দিয়েছেন। হোটেল খুলবার রেস্ত জুটিয়ে দিয়েছেন এতদিন পরে—এই দু'শো, আর তোমার দু'শো, সামনের মাসেই খুলবো ভাবছি।

—এ টাকা কে দিলে জ্যাঠামশায় বললেন না আমায়?

—তোমার মত আর একটি মা।

—আমি চিনিনে?

—আমাদের গাঁয়ের বাবুর মেয়ে অতসী। বলবো সে সব কথা আর একদিন, আজ বেলা যাচ্ছে, আমি গিয়ে ডেক চাপাই গে—টাকা রেখে দাও এখন।

হোটেলে আসিয়া বংশীকে বলিল—তোমার ভাগ্নেটিকে চিঠি লিখে আনাও বংশী। তাকে গদিতে বসতে হবে। লেখাপড়ার কাজ তো আমায় বা তোমায় দিয়ে হবে না।

বংশী বলিল—সে তো বসেই আছে হাজারি-দা। একটা কাজ পেলে বেঁচে যায়। আমি আজই লিখছি আর ঘর আমি দেখে এসেছি—তামাকের দোকানের পাশে ঘরটা ভাল—ওইটেই নাও। লেগে যাও দুর্গা বলে।

দিন দুই পরে একদিন সকালে পদ্মঝি বলিল—ও ঠাকুর, শুনে রাখো, আজ কোথাও যেও না সব ছুটির পরে। আজ ও-বেলা সত্যনারায়ণের সিন্নি—খদ্দেরদের ভাত দেবার সময় বলে দিও ও-বেলা যেন থাকে—আর তোমরা খেয়ে-দেয়ে আমার সঙ্গে বেরুবে সত্যনারায়ণের বাজার করতে।

বংশী ঠাকুর হাজারির দিকে চাহিয়া হাসিল—অবশ্য পদ্মঝি চলিয়া গেলে।

ব্যাপারটা এই, হোটেলের এই যে সত্যনারায়ণের পূজা, ইহা ইহাদের একটি ব্যবসা। যাহারা মাসিক হিসাবে হোটেলে খায় তাহাদের নিকট হইতে পূজার নাম করিয়া চাঁদা বা প্রণামী আদায় হয়। আদায়ী টাকার সব অংশ ব্যয় করা হয় না বলিয়াই হাজারি বা বংশীর ধারণা। অথচ, সত্যনারায়ণের প্রসাদের লোভ দেখাইয়া দৈনিক নগদ খরিদ্দার যাহারা তাহাদেরও রাত্রে আনিবার চেষ্টা করা হয়—কারণ এমন অনেক নগদ খরিদ্দার আছে, যাহারা একবেলা হোটেলে খাইয়া যায়, দু-বেলা আসে না।

বংশী ঠাকুর পরিবেশনের সময় প্রত্যেক ঠিকা খরিদ্দারকে মোলায়েম হাসি হাসিয়া বলিতে লাগিল—আজ্ঞে বাবু, ও-বেলা সত্যনারাণ হবে হোটেলে, আসবেন ও-বেলা—অবিশ্যি করে আসবেন—

বাহিরে গদির ঘরে বেচু চক্কত্তিও খরিদ্দারদিগকে ঠিক অমনি বলিতে লাগিল।

বংশী ঠাকুর হাজারিকে আড়ালে বলিল—সব ফাঁকির কাজ, এক চিল্‌তে কলার পাতার আগায় এক হাতা করে গুড় গোলা আটা আর তার ওপর দুখানা বাতাসা—হয়ে গেল এর নাম তোমার সত্যনারাণের সিন্নি। চামার কোথাকার—

সন্ধ্যার সময় পূর্ণ ভট্‌চাজ সত্যনারায়ণের পূজা করিতে আসিলেন। বাসনের ঘরে সত্যনারায়ণের পিঁড়ি পাতা হইয়াছে। হোটেলের দুই চাকর মিলিয়া ঘড়ি ও কাঁসর পিটাইতেছে, পদ্মঝি ঘন ঘন শাঁকে ফুঁ পাড়িতেছে—খানিকটা খরিদ্দার আকৃষ্ট করিবার চেষ্টাতেও বটে।

স্টেশনে যে চাকর 'হি-ই-ই-ন্দু হো-টে-ল-ল' বলিয়া চেঁচায়, তাহাকেও বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, সে যাত্রীদের প্রত্যেককে বলিতেছে—'আসুন বাবু, সিন্নি পেরসাদ হচ্চেন হোটেলে, খাওয়ার বড্ড জুৎ আজগে—আসুন বাবু—'

যাহারা নগদ পয়সার খরিদ্দার, তাহারা ভাবিতেছে—অন্য হোটেলেও তো পয়সা দিয়া খাইবে যখন তখন সত্যনারায়ণের প্রসাদ ফাউ যদি পাওয়া যায়, বেচু চক্কত্তির হোটেলেই যাওয়া যাক্ না কেন। ফলে যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলের দৈনিক নগদ খরিদ্দার যাহারা, তাহারাও অনেকে আসিয়া জুটিতেছে এই হোটেলে। এদিকে নগদ খরিদ্দারদের জন্য ব্যবস্থা এই যে, তাহাদের সিন্নি খাইতে দেওয়া হইবে ভাতের পাতে অর্থাৎ টিকিট কিনিয়া ভাত খাইতে ঢুকিলে তবে। নতুবা সিন্নিটুকু খাইয়া লইয়াই যদি খরিদ্দার পালায়?

মাসিক খরিদ্দারের জন্য অন্য প্রকার ব্যবস্থা। তাঁহারা চাঁদা দিয়াছে, বিশেষতঃ তাহাদের খাতির করাও দরকার। পূজা সাঙ্গ হইলে তাহাদের সকলকে একত্র বসাইয়া প্রাসাদ খাইতে দেওয়া হইল—বেচু চক্কত্তি নিজে প্রত্যেকের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন তাহারা আর একটু করিয়া প্রসাদ লইবে কি না।

যখন ওদিকে মাসিক খরিদ্দারগণকে সিন্নি বিতরণ করা হইতেছে, সে সময় হাজারি দেখিল রাস্তার উপর যতীন মজুমদার দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া তাহাদের হোটেলের দিকে চাহিয়া আছে। সেই যতীন…

হাজারির মনে হইল লোকটার অবস্থা আরও খারাপ হইয়া গিয়াছে, কেমন যেন অনাহার-শীর্ণ চেহারা। সে ডাকিয়া বলিল—ও যতীনবাবু, কেমন আছেন?

যতীন মজুমদার অবাক হইয়া বলিল—কে হাজারি নাকি? তুমি আবার কবে এলে এখানে?

—সে অনেক কথা বলবো এখন। আসুন না—আসুন—

যতীন ইতস্ততঃ করিয়া রান্নাঘরের পাশে বেড়ার গায়ের দরজা দিয়া হোটেলে ঢুকিয়া রান্নাঘরের দোরে আসিয়া দাঁড়াইল।

হাজারি দেখিল তাহার পায়ে জুতা নাই, গায়ে অতি মলিন উড়ানি, পরনের ধুতিখানিও তদ্রূপ। আগের চেয়ে রোগাও হইয়া গিয়াছে লোকটা। দারিদ্র্য ও অভাবের ছাপ চোখে মুখে বেশ পরিস্ফুট।

যতীন শান্তহাসি হাসিয়া বলিল—আরে, তোমাদের এখানে বুঝি সত্যনারায়ণ হচ্চে আজগে? আগে আমিও কত এসেচি খেয়েছি—

—তা খাবেন না? আপনি তো ছিলেন বারোমাসের বাঁধা খদ্দের—তা আসুন পেরসাদ খেয়ে যান—

যতীন ভদ্রতা করিয়া বলিল—না না, থাক্ থাক্—তার জন্যে আর কি হয়েছে—

হাজারি একবার এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল কেহ কোনোদিকে নাই। সবাই খাবার ঘরে মাসিক খরিদ্দারের আদর আপ্যায়ন করিতে ব্যস্ত—সে কলার পাত পাতিয়া যতীনকে বসাইল এবং পাশে বাসনের ঘর হইতে বড় বাটির একবাটি সত্যনারায়ণের সিন্নি, একমুঠা বাতাসা ও-দুটি পাকা কলা আনিয়া যতীনের পাতে দিয়া বলিল—একটু পেরসাদ খেয়ে নিন—

যতীন মজুমদার দ্বিরুক্তি না করিয়া সিন্নির সহিত কলাদুটি চটকাইয়া মাখিয়া লইয়া যেভাবে গোগ্রাসে গিলিতে লাগিল, তাহাতে হাজারির মনে হইল লোকটা সত্যই যথেষ্ট ক্ষুধার্ত্ত ছিল, বোধ হয় ওবেলা আহার জোটে নাই। তিন চার গ্রাসে অতখানি সিন্নি সে নিঃশেষে উড়াইয়া দিল।

হাজারি বলিল—আর একটু নেবেন?

যতীন পূর্ব্বের মত ভদ্রতার সুরে বলিল—না না, থাক্ থাক্ আর কেন—

হাজারি আরও এক বাটি সিন্নি আনিয়া পাতে ঢালিয়া দিতে যতীনের মুখচোখ যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

তাহার খাওয়া অর্দ্ধেক হইয়াছে এমন সময় পদ্মঝি রান্নাঘরের দোরে আসিয়া হাজারিকে কি একটা বলিতে গেল এবং গোগ্রাসে ভোজনরত যতীন মজুমদারকে দেখিয়া হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। বলিল—ও কে?

হাজারি হাসিয়া বলিল—ও যতীনবাবু, চিনতে পাচ্ছ না পদ্মদিদি? আমাদের পুরোনো বাবু। যাচ্ছিলেন রাস্তা দিয়ে, তা আমি বল্লাম আজ পুজোর দিনটা একটু পেরসাদ পেয়ে যান বাবু—

পদ্মঝি বলিল—বেশ—বলিয়াই সে ফিরিয়া আবার গিয়া মাসিক খরিদ্দারদের খাবার ঘরে ঢুকিল।

যতীন ততক্ষণ পদ্মঝিকে কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সে কথা বলিবার সুযোগ ঘটিল না তাহার। সে খাওয়া শেষ করিয়া এক ঘটি জল চাহিয়া লইয়া খাইয়া চোরের মত খিড়কি দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরেই গোবরা চাকর আসিয়া বলিল—ঠাকুর, কর্ত্তা তোমাকে ডাকছেন—

হাজারি বুঝিয়াছিল কর্ত্তা কি জন্য তাহাকে জরুরী তলব দিয়াছেন। সে গিয়া বুঝিল তাহার অনুমান সত্য—কারণ পদ্মঝি মুখ ভার করিয়া গদির ঘরে বেচু চক্কত্তির সামনে দাঁড়াইয়া। বেচু চক্কত্তি বলিলেন—হাজারি, তুমি যত্‌নেটাকে হোটেলে ঢুকিয়ে তাকে বসিয়ে সিন্নি খাওয়াচ্ছিলে?

পদ্মঝি হাত নাড়িয়া বলিল—আর খাওয়ানো বলে খাওয়ানো! এক এক গাম্‌লা সিন্নি দিয়েছে তার পাতে—ইচ্ছে ছিল লুকিয়ে খাওয়াবে, ধর্ম্মের ঢাক বাতাসে নড়ে, আমি গিয়ে পড়েছি সেই সময় বড় ভেক্ নামলো কি না তাই দেখতে—আমায় দেখে—

হাজারি বিনীত ভাবে বলিল—সত্যনারাণের পেরসাদ বলেই বাবু দিয়েছিলাম—আমাদের পুরোনো খদ্দের—

বেচু চক্কত্তি দাঁত খিঁচাইয়া বলিলেন—পুরোনো খদ্দের? ভারি আমার পুরোনো খদ্দের রে? হোটেলের একটি মুঠো টাকা ফাঁকি দিয়ে চলে গিয়েছে, ভারি খদ্দের আমার! চার মাস বিনি পয়সায় খেয়ে গেল একটি আধ্‌লা উপুড়-হাত করলে না, পয়লা নম্বরের জুয়াচোর কোথাকার—খদ্দের! তুমি কার হুকুমে তাকে হোটেলে ঢুকতে দিলে শুনি?

পদ্মঝি বলিল—আমি কোনো কথা বল্লেই তো পদ্ম বড় মন্দ। এই হাজারি ঠাকুর কি কম শয়তান নাকি—বাবু? আপনি জানেন না সব কথা, সব কথা আপনার কানে তুলতেও আমার ইচ্ছে করে না। লুকিয়ে লুকিয়ে হোটেলের আদ্ধেক জিনিস ওঠে ওর এয়ার বক্‌শীদের বাড়ী। যত্‌নে ঠাকুর ওর এয়ার, বুঝলেন না আপনি? বহাল করেন লোক, তখন আমি কেউ নই—কিন্তু হাতে হাতে ধরে দেবার বেলা এই জনা না হোলেও দেখি চলে না—এই দেখুন আবার চুরি-চামারি শুরু যদি না হয় হোটেলে, তবে আমার নাম—

বেচু চক্কত্তি বলিলেন—এটা তোমার নিজের হোটেল নয় যে তুমি হাজারি ঠাকুর এখানে যা খুশি করবে। নিজের মত এখানে খাটালে চলবে না জেনো। তোমার আট আনা জরিমানা হোল।

হাজারি বলিল—বেশ বাবু, আপনার বিচারে যদি তাই হয়, করুন জরিমানা। তবে যতীনবাবু আমার এয়ারও নয় বা সে সব কিছুই নয়। এই হোটেলেই ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ—ওঁকে দেখিনিও কতদিন। পদ্মদিদি অনেক অনেয্য কথা লাগায় আপনার কাছে—আমি আসছে মাস থেকে আর এখানে চাকরি করবো না।

পদ্মঝি এ কথায় অনর্থ বাধাইল। হাত পা নাড়িয়া চীৎকার করিয়া বলিল—লাগায়? লাগায় তোমার নামে? তুমি যে বড় লাগাবার যুগ্যি লোক। তাই পদ্ম লাগিয়ে লাগিয়ে বেড়াচ্চে তোমার নামে। যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! তোমার মত লোককে পদ্ম গেরাহ্যির মধ্যে আনে না তা তুমি ভাল করে বুঝো ঠাকুর। যাও না, তুমি আজই চলে যাও। সামনের মাসে কেন, মাইনেপত্তর চুকিয়ে আজই বিদেয় হও না—তোমার মত ঠাকুর রেল-বাজারে গণ্ডায় গণ্ডায় মিলবে—

বেচু চক্কত্তি বলিলেন—চুপ চুপ পদ্ম, চুপ করো। খদ্দেরপত্র আসচে যাচ্চে, ওকথা এখন থাক। পরে হবে—আচ্ছা তুমি যাও এখন হাজারি ঠাকুর—

অনেক রাত্রে হোটেলের কাজ মিটিল।

শুইবার সময় হাজারি বংশীকে বলিল—দেখলে তো কি রকম অপমানটা আমার করলে পদ্মদিদি? তুমিও ছাড়, চল দুজনে বেরিয়ে যাই। ভাখো একটা কথা বংশী, এই হোটেলের

ওপর কেমন একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল, মুখে বলি বটে যাই যাই --কিন্তু যেতে মন সরে না। কতকাল ধরে তুমি আর আমি এখানে আছি ভেবে দ্যাখো তো? এ যেন আপনার ঘর বাড়ী হয়ে গিয়েচে—তাই না? কিন্তু এরা—বিশেষ করে পদ্মদিদি এখানে টিকতে দিলে না—এবার সত্যিই যাবো।

বংশী বলিল—যতীনকে তুমি ডেকে দিলে না ও আপনি এসেছিল?

—আমি ডেকেছিলাম। ওর অবস্থা খারাপ হয়ে গিয়েচে, আজকাল খেতেই পায় না। তাই ডাকলাম। বলি পুরোনো খদ্দের তো, কত লোক খেয়ে যাচ্চে, ও একটু সিন্নি খেয়ে যাক্। এই তো আমার অপরাধ।

পরের মাসের শুভ পয়লা তারিখে রেলবাজারে গোপাল ঘোষের তামাকের দোকানের পাশেই নূতন হোটেলটা খুলিল। টিনের সাইনবোর্ড লেখা আছে—

আদর্শ হিন্দু-হোটেল

হাজারি ঠাকুর নিজের হাতে রান্না করিয়া থাকেন।

ভাত, ডাল, মাছ, মাংস সব রকম প্রস্তুত থাকে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সস্তা।

আসুন! দেখুন!! পরীক্ষা করুন!!!

বেচু চক্কত্তির হোটেলের অনুকরণে সামনেই গদির ঘর। সেখানে বংশী ঠাকুরের ভাগ্নে সেই ছেলেটি কাঠের বাক্সের উপর খাতা ফেলিয়া খরিদ্দারগণের আনাগোনার হিসাব রাখিতেছে। ভিতরে রান্না করিতেছে বংশী ও হাজারি—বেচু চক্কত্তির হোটেলের মতই তিনটি শ্রেণী করা হইয়াছে, সেই রকম টিকিট কিনিয়া ঢুকিতে হয়।

তা নিতান্ত মন্দ নয়। খুলিবার দিন দুপুরের খরিদ্দার হইল ভালই! বংশী খাইবার ঘরে ভাত দিতে আসিয়া ফিরিয়া গিয়া হাজারিকে বলিল—থাড্ কেলাস ত্রিশ খানা। প্রথম দিনের হক্কে যথেষ্ট হয়েচে। ওবেলা মাংস লাগিয়ে দাও।

বহুদিনের বাসনা ঠাকুর রাধাবল্লভ পূর্ণ করিয়াছেন। হাজারি এখন হোটেলের মালিক। বেচু চক্কত্তির সমান দরের লোক সে আজ। অত্যন্ত ইচ্ছা হইল, যত জানাশোনা পরিচিত লোক যে যেখানে আছে—সকলকেই কথাটা বলিয়া বেড়ায়। মনের আনন্দ চাপিতে না পারিয়া বৈকালে কুসুমের বাড়ী গিয়া হাজির হইল। কুসুম বলিল—কেমন চললো হোটেল জ্যাঠামশায়?

—বেশ খদ্দের পাচ্চি। আমার বড্ড ইচ্ছে তুমি একবার এসে দেখে যাও—তুমি তো অংশীদার—

—যাবো এখন! কাল সকালে যাবো। আপনার মনিব কি বল্লে?

—রেগে কাঁই। ও মাসের মাইনে দেয় নি—না দিকৃগে, সত্যিই বলছি কুসুম মা, আমার

বয়েস কে বলে আটচল্লিশ হয়েচে? আমার যেন মনে হচ্চে আমার বয়েস পনের বছর কমে গিয়েচে। হাতপায়ে বল এসেচে কত! তুমি আর আমার অতসী মা—তোমরা আর জন্মে আমার কি ছিলে জানিনে—তোমাদের—

কুসুম বাধা দিয়া বলিল—আবার ওই সব কথা বলচেন জ্যাঠামশায়? আমার টাকা দিইচি সুদ পাবো বলে। এ তো ব্যবসায় টাকা ফেলা—টাকা কি তোরঙ্গের মধ্যে থেকে আমার স্বগ্‌গে পিদিম দিতো? বলি নি আমি আপনাকে? তবে হ্যাঁ, আমাদের বাবুর মেয়ের কথা যা বল্লেন, সে দিয়েচে বটে কোন খাঁই না করে। তার কথা, হাজার বার বলতে পারেন। তার বিয়ের কি হোল?

—সামনের সোমবার বিয়ে। চিঠি পেয়েছি—যাচ্ছি ওদিন সকালে।

—আমার কাকার সঙ্গে যদি দেখা হয় তবে এসব টাকাকড়ির কথা যেন বলবেন না সেখানে।

—তোমাকে শিখিয়ে দিতে হবে না মা, যতবার দেখা হয়েচে তোমার নামটি পর্য্যন্ত কখনো সেখানে ঘুণাক্ষরে করি নি। আমারও বাড়ী এঁড়োশোলা, আমায় তোমার কিছু শেখাতে হবে না।

কথামত পরদিন সকালে কুসুম হোটেল দেখিতে গেল। সে দুধ দই লইয়া অনেক বেলা পর্য্যন্ত পাড়ায় পাড়ায় বেড়ায়—তাহার পক্ষে ইহা আশ্চর্য্যের কথা কিছুই নহে।

হাজারি তাহাকে রান্নাঘরে যত্ন করিয়া বসাইতে গেল—সে কিন্তু দোরের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল, বলিল—আমি গুরুঠাকরুন কিছু আসি নি যে আসন পেতে যত্ন করে বসাতে হবে।

হাজারি বলিল—তোমারও তো হোটেল কুসুম-মা- তুমি এর অংশীদারও বটে, মহাজনও বটে। নিজের জিনিস ভাল করে দেখে শোনো। কি হচ্চে না হচ্চে তদারক করো—এতে লজ্জা কি? বংশী, চিনে রাখো এ একজন অংশীদার।

এ কথায় কুসুম খুব খুশি হইল—মুখে তাহার আহ্লাদের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। এমন একটা হোটেলের সে অংশীদার ও মহাজন—এ একটা নতুন জিনিস তাহার জীবনে। এ ভাবে ব্যাপারটা বোধ হয় ভাবিয়া দেখে নাই। হাজারি বলিল—আজ মাছ রান্না হয়েছে বেশ পাকা রুই। তুমি একটু বোসো মা, মুড়োটা নিয়ে যাও।

—না না জ্যাঠামশায়।—ওসব আপনাকে বারণ করে দিইচি না! সকলের মুখ বঞ্চিত করে আমি মাছের মুড়ো খাবো—বেশ মজার কথা!

—আমি তোমার বুড়ো বাবা, তোমাকে খাইয়ে আমার যদি তৃপ্তি হয়, কেন খাবে না বুঝিয়ে দাও।

হোটেলের চাকর হাঁকিল—থাড্‌ কেলাস তিন থালা—

হাজারি বলিল—খদ্দের আসছে বোসো মা একটু। আমি আসছি, বংশী ভাত বেড়ে ফেলো।

আসিবার সময় কুসুম সলজ্জ সঙ্কোচের সহিত হাজারির দেওয়া এক কাঁসি মাছ তরকারি লইয়া আসিল।

এক বছর কাটিয়া গিয়াছে।

হাজারি এঁড়োশোলা হইতে গরুর গাড়ীতে রাণাঘাট ফিরিতেছে, সঙ্গে টেঁপির মা, টেঁপি ও ছেলেমেয়ে। তাহার হোটেলের কাজ আজকাল খুব বাড়িয়া গিয়াছে। রাণাঘাটে বাসা না করিলে আর চলে না।

টেঁপির মা বলিল—আর কতটা আছে হ্যাঁ গা?

—ওই তো সেগুন বাগান দেখা দিয়েছে—এইবার পৌঁছে যাবো—

টেঁপি বলিল—বাবা, সেখানে নাইবো কোথায়? পুকুর আছে না গাঙ?

—গাঙ আছে, বাসায় টিউব কল আছে।

টেঁপির মা বলিল—তাহোলে জল টানতে হবে না পুকুর থেকে। বেঁচে যাই—

ইহারা কখনো শহরে আসে নাই—টেঁপির মার বাপের বাড়ী এঁড়োশোলার দু ক্রোশ উত্তরে মণিরামপুর গ্রামে। জন্ম সেখানে, বিবাহ এঁড়োশোলায়, শহর দেখিবার একবার সুযোগ হইয়াছিল অনেকদিন আগে, অগ্রহায়ণ মাসে গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে একবার নবদ্বীপে রাস দেখিতে গিয়াছিল।

হোটেলের কাছেই একখানা একতলা বাড়ী পূর্ব্ব হইতে ঠিক করা ছিল। টেঁপির মা বাড়ী দেখিয়া খুব খুশি হইল। চিরকাল খড়ের ঘরে বাস করিয়া অভ্যাস, কোঠাঘরে বাস এই তাহার প্রথম।

—ক'খানা ঘর গা? রান্নাঘর কোন্ দিকে? কই তোমার সেই টিউকল দেখি? জল বেশ ওঠে তো? ওরে টেঁপি, গাড়ীর কাপড়গুলো আলাদা করে রেখে দে—একপাশে। ও-সব নিয়ে ছিষ্টি ছোঁয়ানেপা করো না যেন, বস্তার মধ্যে থেকে একটা ঘটি আগে বের করে দাও না গো, এক ঘটি জল আগে তুলে নিয়ে আসি।

একটু পরে কুসুম আসিয়া ঢুকিয়া বলিল—ও জেঠিমা, এলেন সব? বাসা পছন্দ হয়েছে তো?

টেঁপির মা কুসুমকে চেনে। গ্রামে তাহাকে কুমারী অবস্থা হইতেই দেখিয়াছে। বলিল—এসো মা কুসুম, এসো এসো! ভাল আছ তো? এসো এসো কল্যেণ হোক্।

হোটেলের চাকর রাখাল এই সময় আসিল। তাহার পিছনে মুটের মাথায় এক বস্তা পাথুরে কয়লা। হাজারিকে বলিল—কয়লা কোন্‌দিকে নামাবো বাবু?

হাজারি বলিল—কয়লা আন্‌লি কেন রে? তোকে যে বলে দিলাম কাঠ আনতে? এরা কয়লার আঁচ দিতে জানে না।

কুসুম বলিল—কয়লার উনুন আছে? আমি আঁচ দিয়ে দিচ্ছি। আর শিখে নিতে তো হবে জেঠিমাকে। কয়লা সস্তা পড়বে কাঠের চেয়ে এ শহর-বাজার জায়গায়। আমি

একদিনে শিখিয়ে দেবো জেঠিমাকে।

রাখাল কয়লা নামাইয়া বলিল—বাবু, আর কি করতে হবে এখন ?

হাজারি বলিল—তুই এখন যাস্‌নে—জলটলগুলো তুলে দিয়ে জিনিসপত্তর গুছিয়ে রেখে তবে যাবি। হোটেলের বাজার এসেছে ?

—এসেছে বাবু।

—তা থেকে এবেলার মত মাছ-তরকারি চার-পাঁচ জনের মত নিয়ে আয়। ওবেলা আলাদা বাজার করলেই হবে। আগে জল তুলে দে দিকি।

টেঁপির মা বলিল—ও কে গো ?

—ও আমাদের হোটেলের চাকর। বাসার কাজও ও করবে, বলে দিইছি।

টেঁপির মা অবাক হইল। তাহাদের নিজেদের চাকর, সে আবার হাজারিকে 'বাবু' সম্বোধন করিতেছে—এ সব ব্যাপার এতই অভিনব যে বিশ্বাস করা শক্ত। গ্রামের মধ্যে তাহারা ছিল অতি গরীব গৃহস্থ, বিবাহ হইয়া পর্য্যন্ত বাসন-মাজা, জল-তোলা, ক্ষার-কাচা, এমন কি ধান ভানা পর্য্যন্ত সর্ব্বরকম গৃহকর্ম্ম সে একা করিয়া আসিয়াছে। মাস চার পাঁচ হইল দুটি সচ্ছল অন্নের মুখ সে দেখিয়া আসিতেছে, নতুবা আগে আগে পেট ভরিয়া দুটি ভাত খাইতে পাওয়াও সব সময় ঘটিত না।

আর আজ এ কি ঐশ্বর্য্যের দ্বার হঠাৎ তাহার সম্মুখে উন্মুক্ত হইয়া গেল! কোঠাবাড়ী, চাকর, কলের জল—এ সব স্বপ্ন না সত্য ?

রাখাল আসিয়া বলিল—দেখুন তো মা এই মাছ-তরকারিতে হবে না আর কিছু আনবো ?

বড় বড় পোনা মাছের দাগা দশ-বারো খানা। টেঁপির মা খুশির সহিত বলিল—না বাবা আর আন্‌তে হবে না। রাখো ওখানে।

—ওগুলো কুটে দিই মা ?

মাছ কুটিয়াও দিতে চায় যে! এ সৌভাগ্যও তাহার অদৃষ্টে ছিল।

হাজারি বলিল—আগে জল তুলে দে তারপর কুটবি এখন। আগে সব নেয়ে নিই।

কুসুম কয়লার উনুনে আঁচ দিয়া আসিয়া বলিল—জেঠিমা আপনিও নেয়ে নিন্। ততক্ষণ আঁচ ধরে যাক্। বেলা প্রায় এগারোটা বাজে। রান্না চড়িয়ে দেবার আর দেরি করবার দরকার কি ? আমি এবার যাই।

টেঁপির মা বলিল—তুমি এখানে এবেলা খাবে কুসুম।

কুসুম ব্যস্তভাবে বলিল—না না, আপনারা এলেন তেতেপুড়ে এই দুপুরের সময়। এখন কোনোরকমে দুটো ঝোলভাত বেঁধে আপনারা এবেলা খেয়ে নিন—তার মধ্যে আবার আমার খাওয়ার হাংনামায়—

—কিছু হাংনামা হবে না মা। তুমি না খেয়ে যেতে পারবে না। ভাল বেগুন এনেছি গাঁ থেকে, তোমাদের শহরে তেমন বেগুন মিলবে না—বেগুন পোড়াবো এখন। বাপের বাড়ীর বেগুন খেয়ে যাও আজ। কাল ওটুকে যাবে।

হাজারি স্নান সারিয়া বলিল—আমি একবার হোটেলে চল্লাম। তোমরা রান্না চাপাও। আমি দেখে আসি।

আধঘণ্টা পরে হাজারি ফিরিয়া দেখিল টেঁপি ও টেঁপির মা দুজনে উনুনে পরিত্রাহি ফুঁ পাড়িতেছে। আঁচ নামিয়া গিয়াছে, তখনও মাছের ঝোল বাকি।

টেঁপির মা বিপন্নমুখে বলিল—ওগো, এ আবার কি হোল, উনুন যে নিবে আসছে। কি করি এখন?

কুসুম বাড়ীতে স্নান করিতে গিয়াছে, রাখাল গিয়াছে হোটেলে, কারণ এই সময়টা সেখানে খরিদ্দারের ভিড় অত্যন্ত। এবেলা অন্ততঃ একশত জন খায়। বেচু চক্কত্তি ও যদু বাঁড়ুয্যের হোটেল কানা হইয়া পড়িয়াছে। হাজারি নিজের হাতে রান্না করে, তাহার রান্নার গুণে—রেলবাজারের যত খরিদ্দার সব ঝুঁকিয়াছে তাহার হোটেলে। তিনজন ঠাকুর ও চারিজন চাকরে হিমসিম খাইয়া যায়। ইহারা কেহই কয়লার উনুনে আঁচ দেওয়া দূরের কথা, কয়লার উনুনই দেখে নাই। আঁচ কমিয়া যাইতে বিষম বিপদে পড়িয়া গিয়াছে। ইহাদের অবস্থা দেখিয়া হাজারির হাসি পাইল। বলিল—শেখো, পাড়াগেঁয়ে ভূত হয়ে কতকাল থাকবে? সরো দিকি? ওর ওপর আর চাট্টি কয়লা দিতে হয়—এই দেখিয়ে দিই।

টেঁপির মা বলিল—আর তুমি বড্ড শহুরে মানুষ! তবুও যদি এঁড়োশোলা বাড়ী না হোত!

—আমি? আমি আজ সাত বছর এই রাণাঘাটের রেলবাজারে আছি। আমাকে পাড়াগেঁয়ে বলবে কে? ওকথা তুলে রাখোগে ছিকেয়।

টেঁপি বলিল—বাবা এখানে টকি আছে? তুমি দেখেছ?

হাজারি বিশ হাত জলে পড়িয়া গেল। টকি বাইস্কোপ এখানে আছে বটে কিন্তু বাইস্কোপ দেখার শখ কখনও তাহার হয় নাই। কিন্তু টেঁপি আধুনিকা, এঁড়োশোলায় থাকিলে কি হয়, বাংলার কোন্ পাড়াগাঁয়ে আধুনিকতার ঢেউ যায় নাই?…বিশেষতঃ অতসী তার বন্ধু…অতসীর কাছে অনেক জিনিস সে শুনিয়াছে বা শিখিয়াছে যাহা তাহার বাবা (মা তো নয়ই) জানেও না।

টেঁপির মা বলিল—টাক কি গা?

হাজারি আধুনিক হইবার চেষ্টায় গম্ভীর ভাবে বলিল—ছবিতে কথা কয়, এই! দেখেছি অনেকবার। দেখবো না আর কেন? হুঁ—

বলিয়া তাচ্ছিল্যের ভাবে সবটা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতে গেল—কিন্তু টেঁপি পরক্ষণেই জিজ্ঞাসা করিল—কি পালা দেখেছিলে বাবা?

—পালা! তা কি আর মনে আছে? লক্ষ্মণের শক্তিশেল বোধহয়, হাঁ—লক্ষ্মণের শক্তিশেল।

মনের মধ্যে বহু কষ্টে হাতড়াইয়া ছেলেবেলায় দেখা এক যাত্রার পালার নামটা হাজারি

করিয়া দিল। টেঁপি বলিল—লক্ষ্মণের শক্তিশেল আবার কি পালার নাম? ওরকম নাম তো টকির পালায় থাকে না? তাদের নাম আমি শুনেছি অতসীদির কাছে, সে তো অন্যরকম—

—হাঁ হাঁ—তুই আর অতসীদি ভারি সব জানিস আর কি! যা—সর দিকি—ওই কয়লার ঝুড়িটা—

—ও মামাবাবু, খাওয়া-দাওয়া হোল—বলিয়া বংশীর ভাগ্নে সেই সুন্দর ছেলেটি বাড়ীর মধ্যে ঢুকিতেই টেঁপির মা, পাড়াগেঁয়ে বউ, তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিতে গেল। টেঁপি কিন্তু নবাগত লোকটির দিকে কৌতুহলের দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

হাজারি বলিল—এসো বাবা এসো—ঘোমটা দিচ্ছ কাকে দেখে? ও হোল বংশীর ভাগ্নে। আমার হোটেলে খাতাপত্র রাখে। ছেলেমানুষ—ওকে দেখে আবার ঘোমটা—

বংশীর ভাগিনেয় আসিয়া টেঁপির মার পায়ের-ধুলা লইয়া প্রণাম করিল।

হাজারি মেয়েকে বলিল—তোর নরেন দাদাকে প্রণাম কর টেঁপি। এইটি আমার মেয়ে, বাবা নরেন। ও বেশ লেখাপড়া জানে—সেলাইয়ের কাজটাজ ভাল শিখেছে আমাদের গাঁয়ের বাবুর মেয়ের কাছে।

টেঁপির হঠাৎ কেমন লজ্জা করিতে লাগিল। ছেলেটি দেখিতে যেমন, এমন চেহারার ছেলে সে কখনো দেখে নাই—কেবল ইহার সঙ্গে খানিকটা তুলনা করা যায় অতসীদি'র বরের। অনেকটা মুখের আদল যেন সেই রকম।

বংশীর ভাগ্নেও তাহার স্বচ্ছন্দ হৃদ্যতার ভাব হারাইয়া ফেলিয়াছে। চোখ তুলিয়া ভাল করিয়া চাওয়া যেন একটু কষ্টকর হইয়া উঠিতেছে। টেঁপির দিকে তো তেমন চাহিতেই পারিল না।

হাজারি বলিল—মুর্শিদাবাদের গাড়ী থেকে ক'জন নামলো আজ?

—নেমেছিল জনদশেক, তার মধ্যে তিনজনকে বেচু চক্কত্তির চাকর একরকম হাত ধরে জোর করেই টেনে নিয়ে গেল। বাকি সাতজন আমরা পেয়েছি—আর বনগাঁর ট্রেন থেকে এসেছিল পাঁচজন।

—ইস্টিশানে গিয়েছিল কে?

—ব্রজ ছিল, রাখালও ছিল বনগাঁর গাড়ীর সময়। ব্রজ বল্লে বেচু চক্কত্তির চাকরের সঙ্গে খদ্দের নিয়ে তার হাতাহাতি হয়ে যেতো আজ।

—না না, দরকার নেই বাবা ওসব। হাজার হোক, আমার পুরোনো মনিব। ওদের খেয়েই এতকাল মানুষ—হোটেলের কাজ শিখেছিও ওদের কাছে। শুধু রাঁধতে জানলে তো হোটেল চালানো যায় না বাবা, এ একটা ব্যবসা। কি করে হাট-বাজার করতে হয়, কি করে খদ্দের তুষ্ট করতে হয়, কি করে হিসেবপত্র রাখতে হয়—এও তো জানতে হবে। আমি ছ'বছর ওদের ওখানে থেকে কেবল দেখতাম ওরা কি করে চালাচ্ছে। দেখে দেখে শেখা। এখন সব পারি।

বংশীর ভাগ্নে বলিল—আচ্ছা মামীমা, খাওয়া দাওয়া করুন, আমি আসবো এখন ওবেলা।

হাজারি বলিল—তুমি কাল দুপুরে হোটেলে খেও না—বাসাতে খাবে এখানে। বুঝলে?

বংশীর ভাগ্নে চলিয়া গেলে টেঁপির অনুপস্থিতিতে হাজারি বলিল—কেমন ছেলেটি দেখলে?

—বেশ ভাল। চমৎকার দেখতে।

—ওর সঙ্গে টেঁপির বেশ মানায় না?

—চমৎকার মানায়। তা কি আর হবে! আমাদের অদৃষ্টে কি অমন ছেলে জুটবে?

—জুটবে না কেন, জুটে আছে। ওকে আনিয়ে রেখেচি হোটেলে তবে কি জন্যে? তোমাদের রাণাঘাটের বাসায় আনলাম তবে কি জন্যে?…টেঁপিকে যেন এখন কিছু—বোঝ তো? কাল ওকে একটু যত্ন-আত্যি করো। আমার অনেক দিনের ইচ্ছে ওর সঙ্গে টেঁপির—তা এখন অনেকটা ভরসা পাচ্ছি। ওর বাপের অবস্থা বেশ ভাল, ছেলেটাও ম্যাট্রিক পাস। বিয়ে দিয়ে হোটেলেই বসিয়ে দেবো—থাক্ আমার অংশীদার হয়ে। কাজ শিখে নিক্—টেঁপিও কাছেই রইল আমাদের—বুঝলে না, অনেক মতলব আছে।

টেঁপির মা বোকাসোকা মানুষ—অবাক হইয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার কথা শুনিতে লাগিল।

সন্ধ্যার পরে খবর আসিল স্টেশনে বেচু চক্কত্তির হোটেলের লোকের সঙ্গে হাজারির চাকরের খরিদ্দার লইয়া মারামারি হইয়া গিয়াছে। হাজারির চাকর নাথনি বলিল—বাবু, ওদের হোটেলের চাকর খদ্দেরের হাত ধরে টানাটানি করে—আমাদের খদ্দের, আমাদের হোটেলে আসচে—তার হাত ধরে টানবে আর আমাদের হোটেলের নিন্দে করবে। তাই আমার সঙ্গে হাতাহাতি হয়ে গিয়েচে।

—খদ্দের কোথায় গেল?

—খদ্দের এসেচে আমাদের এখানে। ওদের হোটেলের লোকের আমাদের ওপর আকচ আছে, আমরাই সব খদ্দের পাই, ওরা পায় না--এই নিয়েই ঝগড়া, বাবু। ওদের হোটেলের হয়ে এল, বাবু। একটা গাড়ীতেও খদ্দের পায় না।

রাত আটটার সময়ে হাজারি সবে মাছের ঝোল উনুনে চাপাইয়াছে, এমন সময় বংশী বলিল—হাজারি-দা, জবর খবর আছে। তোমার আগের কর্ত্তা তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন কেন দেখে এসো গে। বোধ হয় মারামারি নিয়ে—

—ঝোলটা তুমি দেখো। আমি এসে মাংস চাপাবো—দেখি কি খবর।

অনেকদিন পরে হাজারি বেচু চক্কত্তির হোটেলের সেই গদির ঘরটিতে গিয়া দাঁড়াইল। সেই পুরোনো দিনের মনের ভাব সেই মুহূর্ত্তেই তাহাকে পাইয়া বসিল যেন ঢুকিবার সঙ্গে সঙ্গেই। যেন সে রাঁধুনী বামুন, বেচু চক্কত্তি আজও মনিব।

বেচু চক্কত্তি তাহাকে দেখিয়া খাতির করিবার সুরে বলিলেন—আরে এস এস হাজারি এস—এখানে বসো।

বলিয়া গদির এক পাশে হাত দিয়া ঝাড়িয়া দিলেন, যদিও ঝাড়িবার কোন আবশ্যক ছিল না। হাজারি দাঁড়াইয়াই রহিল। বলিল—না বাবু, আমি বসবো না। আমায় ডেকেচেন কেন?

—এসো, বসোই এসে আগে। বলচি।

হাজারি জিভ কাটিয়া বলিল—না বাবু, আপনি আমার মনিব ছিলেন এতদিন। আপনার সামনে কি বসতে পারি? বলুন, কি বলবেন—আমি ঠিক আছি।

হাজারির চোখ আপনা-আপনি খাওয়ার ঘরের দিকে গেল। হোটেলের অবস্থা সত্যই খুব খারাপ হইয়া গিয়াছে। রাত ন'টা বাজে, আগে আগে এসময় খরিদ্দারের ভিড়ে ঘরে জায়গা থাকিত না—আর এখন লোক কই? হোটেলের জলুসও আগের চেয়ে অনেক কমিয়া গিয়াছে।

বেচু চক্কত্তি বলিলেন—না, বোসো হাজারি। চা খাও, ওরে কাঙালী, চা নিয়ে আয় আমাদের।

হাজারি তবুও বসিতে চাহিল না। চাকর চা দিয়া গেল, হাজারি আড়ালে গিয়া চা খাইয়া আসিল।

বেচু চক্কত্তি দেখিয়া শুনিয়া খুব খুশ হইলেন। হাজারির মাথা ঘুরিয়া যায় নাই হঠাৎ অবস্থাপন্ন হইয়া। কারণ অবস্থাপন্ন যে হাজারি হইয়া উঠিয়াছে, তাহা তিনি এতদিন হোটেল চালানোর অভিজ্ঞতা হইতে বেশ বুঝিতে পারেন।

হাজারি বলিল—বাবু, আমায় কিছু বলছিলেন?

—হ্যাঁ—বলছিলাম কি জানো, এক জায়গায় ব্যবসা যখন আমাদের তখন তোমার সঙ্গে আমার কোন শত্রুতা নেই তো—তোমার চাকর আজ আমার চাকরকে মেরেচে ইস্টিশানে। এ কেমন কথা?

এই সময় পদ্মঝি দোরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। হোটেলের চাকরও আসিল।

হাজারি বলিল—আমি তো শুনলাম বাবু আপনার চাকরটা আগে আমার চাকরকে মারে। নাথনি খদ্দের নিয়ে আসছিল এমন সময়—

পদ্মঝি বলিল—হ্যাঁ তাই বৈকি! তোমাদের নাথনি আমাদের খদ্দের ভাগাবার চেষ্টা করে—আমাদের হোটেলে আসছিল খদ্দের, তোমাদের হোটেলে যেতে চায় নি—

একথা বিশ্বাস করা যেন বেচু চক্কত্তির পক্ষেও শক্ত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—যাক, ও নিয়ে আর ঝগড়া করে কি হবে হাজারির সঙ্গে। হাজারি তো সেখানে ছিল না, দেখেও নি, তবে তোমায় বল্লাম হাজারি, যাতে আর এমন না হয়—

হাজারি বলিল—বাবু, বেশ আমি রাজী আছি। আপনার হোটেলের সঙ্গে আমার কোনো বিবাদ করলে চলবে না। আপনি আমার পুরোনো মনিব। আসুন, আমরা গাড়ী

ভাগ করে নিই। আপনি যে গাড়ীর সময় ইস্টিশানে চাকর পাঠাবেন, আমার হোটেলের চাকর সে সময় যাবে না।

বেচু চক্কত্তি বিস্মিত হইলেন। ব্যবসা জিনিসটাই রেষারেষির উপর, আড়াআড়ির উপর চলে—তিনি বেশ ভালই জানেন। মাথার চুল পাকাইয়া ফেলিলেন তিনি এই ব্যবসা করিয়া। এস্থলে হাজারির প্রস্তাব যে কতদূর উদার, তাহা বুঝিতে বেচুর বিলম্ব হইল না। তিনি আমতা আমতা করিয়া বলিলেন—না তা কেন, ইস্টিশান তো আমার একলার নয়—

—না বাবু, এখন থেকে ভাগ রইল। মুশিদাবাদ আর বনগাঁর গাড়ীর মধ্যে আপনি কি নেবেন বলুন মুর্শিদাবাদ চান, না বনগাঁ চান? আমি সে সময় চাকর পাঠাবো না ইস্টিশানে।

পদ্মঝি দোর হইতে সরিয়া গেল।

বেচু চক্কত্তি বলিলেন—তা তুমি যেমন বলো। মুর্শিদাবাদখানাই তবে রাখো আমার। তা আর একটু চা খেয়ে যাবে না?—আচ্ছা, এসো তবে।

হাজারি মনিবকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিল।

পদ্মঝি পুনরায় দোরের কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—হাঁ বাবু, কি বলে গেল?

—গাড়ী ভাগ করে নিয়ে গেল। মুর্শিদাবাদখানা আমি রেখেছি। যা কিছু লোক আসে, মুর্শিদাবাদ থেকেই আসে—বনগাঁর গাড়ীতে ক'টা লোক আসে? লোকটা বোকা, লোক মন্দ নয়। দুষ্ট নয়।

—আমি আজ সাত বছর দেখে আসচি আমি জানিনে? গাঁজা খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকে, হোটেলের ছাই দেখাশুনো করে। রেঁধেই মরে, মজা লুটচে বংশী আর বংশীর ভাগ্নে। ক্যাশ তার হাতে। আমি সব খবর নিইচি তলায় তলায়। বংশীকে আবার এখানে আনুন বাবু, ও হোটেল এক দিনে ভুস্মিনাশ হয়ে বসে রয়েচে। বংশীকে ভাঙাবার লোক লাগান আপনি—আর ওর ভাগ্নেটাকেও—

পরদিন দুপুরে বংশীর ভাগ্নে সসঙ্কোচে হাজারির বাসায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিল। হাজারি হোটেল হইতে তাহাকে পাঠাইয়া দিল বটে, কিন্তু নিজে তখন আসিতে পারিল না, অত্যন্ত ভিড় লাগিয়াছে খরিদ্দারের, কারণ সেদিন হাটবার।

মায়ের আদেশে টেঁপিকে অতিথির সামনে অনেকবার বাহির হইতে হইল। কখনও বা আসন পাতা, কখনও জলের গ্লাসে জল দেওয়া ইত্যাদি। টেঁপি খুব চটপটে চালাকচতুর মেয়ে, অতসীর শিষ্যা—কিন্তু হঠাৎ তাহারও কেমন যেন একটু লজ্জা করিতে লাগিল এই সুন্দর ছেলেটির সামনে বার বার বাহির হইতে।

বংশীর ভাগ্নেটিও একটু বিস্মিত হইল। হাজারি-মামারা পাড়াগাঁয়ের লোক সে জানে—অবস্থাও এতদিন বিশেষ ভাল ছিল না। আজই না হয় হোটেলের ব্যবসায়ে দু-পয়সার মুখ দেখিতেছে। কিন্তু হাজারি-মামার মেয়ে তো বেশ দেখিতে, তাহার উপর তার চালচলন

ধরন-ধারণ যেন স্কুলে পড়া আধুনিক মেয়েছেলের মত। সে কাপড় গুছাইয়া পরিতে জানে, সাজিতে গুজিতে জানে, তার কথাবার্ত্তার ভঙ্গিটাও বড় চমৎকার।

তাহার খাওয়া প্রায় শেষ হইয়াছে এমন সময় হাজারি আসিল। বলিল—খাওয়া হয়েছে বাবা, আমি আসতে পারলাম না—আজ আবার ভিড় বড্ড বেশী।

—ও টেঁপি আমায় একটু তেল দে মা, নেয়ে নিই, আর তোর ঐ দাদার শোওয়ার জায়গা করে দে দিকি—পাশের ঘরটাতে একটু গড়িয়ে নাও বাবা।

বংশীর ভাগ্নে গিয়া শুইয়াছে—এমন সময় টেঁপি পান দিতে আসিল। পানের ডিবা নাই, একখানা ছোট রেকাবিতে পান আনিয়াছে। ছেলেটি দেখিল চুন নাই রেকাবিতে। লাজুক মুখে বলিল—একটু চুন দিয়ে যাবেন?

টেঁপির সারা দেহ লজ্জায় আনন্দে কেমন যেন শিহরিয়া উঠিল। তাহার প্রথম কারণ তাহার প্রতি সম্ভ্রমসূচক ক্রিয়াপদের ব্যবহার এই হইল প্রথম। জীবনে ইতিপূর্ব্বে তাহাকে কেহ 'আপনি' 'আজ্ঞে' করিয়া কথা বলে নাই। দ্বিতীয়তঃ কোনও অনাত্মীয় তরুণ যুবকও তাহার সহিত ইতিপূর্ব্বে কথা বলে নাই। বলে নাই কি একেবারে! গাঁয়ের রামু-দা, গোপাল-দা, জহর-দা—ইহারাও তাহার সঙ্গে তো কথা বলিত! কিন্তু তাহাতে এমন আনন্দ তাহার হয় নাই তো কোনোদিন? চুন আনিয়া রেকাবিতে রাখিয়া বলিল—এতে হবে?

—খুব হবে। থাক ওখানেই—ইয়ে, এক গেলাস জল দিয়ে যাবেন?

টেঁপির বেশ লাগিল ছেলেটিকে। কথাবার্ত্তার ধরন যেমন ভাল, গলার সুরটিও তেমনি মিষ্ট। যখন জলের গ্লাস আনিল, তখন ইচ্ছা হইতেছিল ছেলেটি তাহার সঙ্গে আর একবার কিছু বলে। কিন্তু ছেলেটি এবার আর কিছু বলিল না। টেঁপি জলের গ্লাস নামাইয়া রাখিয়া চলিয়া গেল।

বেলা যখন প্রায় পাঁচটা, বৈকাল অনেক দূর গড়াইয়া গিয়াছে—টেঁপি তখন একবার উঁকি মারিয়া দেখিল, ছেলেটি অঘোরে ঘুমাইতেছে।

হঠাৎ টেঁপির কেমন একটা অহেতুক স্নেহ আসিল ছেলেটির প্রতি।

আহা, হোটেলে কত রাত পর্য্যন্ত জাগে। ভাল ঘুম হয় না রাত্রে!

টেঁপি আসিয়া মাকে বলিল—মা সেই লোকটা এখনও ঘুমুচ্ছে। ডেকে দেবো, না ঘুমুবে।

টেঁপির মা বলিল—ঘুমুচ্ছে ঘুমুক না। ডাকবার দরকার কি? চাকরটা কোথায় গেল? ঘুম থেকে উঠলে ওকে কিছু খেতে দিতে হবে। খাবার আনতে দিতাম। উনিও তো বাড়ী নেই।

টেঁপি বলিল—লোকটা চা খায় কিনা জানিনে, তা'হলে ঘুম থেকে উঠলে একটু চা করে দিতে পারলে ভাল হোত।

টেঁপির মা চা নিজে কখনো খায় নাই, করিতেও জানে না। আধুনিকা মেয়ের এ প্রস্তাব তাহার মন্দ লাগিল না।

মেয়েকে বলিল—তুই করে দিতে পারবি তো?

মেয়ে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল—তুমি যে কি বল মা, হেসে প্রাণ বেরিয়ে যায়—পরে কেমন একটি অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে হাত নাড়িয়া নাড়িয়া হাসিভরা মুখের চিবুকখানি বার বার উঠাইয়া-নামাইয়া বলিতে লাগিল—চা কই? চিনি কই? কেটলি কই? চায়ের জল ফুটবে কিসে? ডিস্-পেয়ালা কই? সে সব আছে কিছু?

টেঁপির মায়ের বড় ভাল লাগিল টেঁপির এই ভঙ্গি। সে সস্নেহে মুগ্ধদৃষ্টিতে মেয়ের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। এমন ভাবে এমন সুন্দর ভঙ্গিতে কথা টেঁপি আর কখনও বলে নাই।

এই সময় হাজারি বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল, হোটেলেই ছিল। বলিল—নরেন কোথায়? ঘুমুচ্ছে নাকি?

টেঁপির মা বলিল—তুমি এতক্ষণ ছিলে কোথায়? ওকে একটু খাবার আনিয়ে দিতে হবে। আর টেঁপি বলছে চা করে দিলে হোত।

হাজারির বড় স্নেহ হইল টেঁপির উপর। সে না জানিয়া যাহাকে আজ যত্ন করিয়া চা খাওয়াইতে চাহিতেছে, তাহারই সঙ্গে তাহার বাবা-মা যে বিবাহের ষড়যন্ত্র করিতেছে—বেচারী কি জানে?

বলিল—আমি সব এনে দিচ্ছি। হোটেলেই আছে। হোটেলে বড় ব্যস্ত আছি, কলকাতা থেকে দশ-বারো জন বাবু এসেছে শিকার করতে। ওরা অনেকদিন আগে একবার এসে আমার রান্না মাংস খেয়ে খুব খুশি হয়েছিল। সেই আগের হোটেলে গিয়েছিল, সেখানে নেই শুনে খুঁজে খুঁজে এখানে এসেছে। ওরা রাত্রে মাংস আর পোলাও খাবে। তোমরা এবেলা রান্না কোরো না—আমি হোটেল থেকে আলাদা করে পাঠিয়ে দেবো এখন। নরেনকে যে একবার দরকার, বাবুদের সঙ্গে ইংরিজিতে কথাবার্ত্তা কইতে হবে, সে তো আমি পারবো না, নরেনকে ওঠাই দাঁড়াও—

টেঁপির মা বলিল—ঘুম থেকে উঠিয়ে কিছু না খাইয়ে ছাড়া ভাল দেখায় না। টেঁপি চায়ের কথা বলছিল—তা হোলে সেগুলো আগে পাঠিয়ে দেওগে, এখন জাগিও না।

বৈকালের দিকে নরেন ঘুম ভাঙিয়া উঠিল। অত্যন্ত বেলা গিয়াছে, পাঁচিলের ধারে সজ্‌নে গাছটার গায়ে রোদ হল্‌দে হইয়া আসিয়াছে। নরেনের লজ্জা হইল—পরের বাড়ী কি ঘুমটাই ঘুমাইয়াছে! কে কি—বিশেষ করিয়া হাজারি-মামার মেয়েটি কি মনে করিল। বেশ মেয়েটি। হাজারি-মামার মেয়ে যে এমন চালাক-চতুর, চটপটে, এমন দেখিতে, এমন কাপড়-চোপড় পরিতে জানে তাহা কে ভাবিয়াছিল?

অপ্রতিভ মুখে সে গায়ে জামা পরিয়া বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় টেঁপি আসিয়া বলিল—আপনি উঠেছেন? মুখ ধোবার জল দেবো?

নরেন থতমত খাইয়া বলিল—না, না, থাক্ আমি হোটেলেই—

—মা বললে আপনি চা খেয়ে যাবেন, আমি মাকে বলে আসি—

ইতিমধ্যে হাজারি চায়ের আসবাব হোটেলের চাকর দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিল, টেঁপি নিজেই চা করিতে বসিয়া গেল। তাহার মা জলখাবারের জন্য ফল কটিতে লাগিল।

টেঁপি বলিল—মা চায়ের সঙ্গে শসা-টসা দেয় না। তুমি বরং ঐ নিমকি আর রসগোল্লা দাও রেকাবিতে—

—শসা দেয় না? একটা ডাব কাটবো? বাড়ীর ডাব আছে –

টেঁপি হাসিতে হাসিতে গড়াইয়া পড়ে আর কি। মুখে আঁচল চাপা দিয়া বলিল—ছি ছি, তুমি মা যে কি।...চায়ের সঙ্গে বুঝি ডাব খায়?

টেঁপির মা অপ্রসন্ন মুখে বলিল—কি জানি তোদের একেলে ঢং কিছু বুঝিনে বাপু। যা বোঝো তাই করো। ঘুম থেকে উঠলে তো নতুন জামাইদের ডাব দিতে দেখেছি চিরকাল দেশেঘরে—

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই টেঁপির মা মনে মনে জিভ কাটিয়া চুপ করিয়া গেল। মানুষটা একটু বোকা ধরনের, কি ভাবিয়া কি বলে, সব সময় তলাইয়া দেখিতে জানে না।

টেঁপি আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—নতুন জামাই? কে নতুন জামাই?

—ও কিছু না; দেশে দেখেছি তাই বলছি। তুই নে, চা করা হোল?

টেঁপির মনে কেমন যেন খটকা লাগিল। সে খুব বুদ্ধিমতী, তাহার উপর নিতান্ত ছেলে-মানুষটিও নয়, যখন চা ও খাবার লইয়া পুনরায় ছেলেটির সামনে গেল তখন তাহার কি জানি কেন যে লজ্জা করিতেছে তাহা সে নিজেই ভাল ধরিতে পারিল না।

ছেলেটি তাহাকে দেখিয়া বলিল—ও কি! এই এত খাবার কেন এখন, চা একটু হোলেই—

টেঁপি কোনো রকমে খাবারের রেকাবি লোকটার সামনে রাখিয়া পলাইয়া আসিলে যেন বাঁচে।

ছেলেটি ডাকিয়া বলিল—পান একটা যদি দিয়ে যান—

পান সাজিতে বসিয়া টেঁপি ভাবিল—বাবা খাটিয়ে মারলে আমায়! চা দেও—পান সাজো—আমার যেন যত গরজ পড়েছে, বাবার হোটেলের লোক তা আমার কি?

টেঁপি একটা চায়ের পিরিচে পান রাখিয়া দিতে গেল। ছেলেটি দেখিতে বেশ কিন্তু। কথাবার্ত্তা বেশ, হাসি-হাসি মুখ। কি কাজ করে হোটেলে কে জানে?

পান লইয়া ছেলেটি চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল—মামীমা আমি যাচ্ছি, কষ্ট দিয়ে গেলাম অনেক, কিছু মনে করবেন না। এত ঘুমিয়েছি, বেলা আর নেই আজ।

বেশ ছেলেটি।

নতুন জামাই? কে নতুন জামাই? কাহাদের নতুন জামাই?

মা এক-একটা কথা বলে কি যে, তাহার মানে হয় না।

টেঁপির মা কখনও এত বড় শহর দেখে নাই।

এখানকার কাণ্ডকারখানা দেখিয়া সে অবাক হইয়া গিয়াছে। মোটর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, ইস্টিশানে বিদ্যুতের আলো, লোকজনই বা কত! আর তাদের এড়োঁশোলায় দিনমানেই শেয়াল ডাকে বাড়ীর পিছনকার ঘন বাঁশবনে। সেদিন তো দিনদুপুরে জেলেপাড়ার কেষ্ট জেলের তিন মাসের ছেলেকে শেয়ালে লইয়া গেল।

ইতিমধ্যে কুসুম আসিয়া একদিন উহাদের বেড়াইতে লইয়া গেল। কুসুমের সঙ্গে তাহারা রাধাবল্লভতলা, সিদ্ধেশ্বরীতলা, চূর্ণীর ঘাট, পালচৌধুরীদের বাড়ী—সব ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিল। পালচৌধুরীদের প্রকাণ্ড বাড়ী দেখিয়া টেঁপির মা ও টেঁপি দু-জনেই অবাক। এত বড় বাড়ী জীবনে তাহারা দেখে নাই। অতসীদের বাড়ীটাই এতদিন বড়লোকের বাড়ীর চরম নিদর্শন বলিয়া ভাবিয়া আসিয়াছে যাহারা, তাহাদের পক্ষে অবাক হইবার কথা বটে।

টেঁপির মা বলিল—না, শহর জায়গা বটে কুসুম! গায়ে গায়ে বাড়ী আর সব কোঠাবাড়ী এদেশে। সবাই বড়লোক। ছেলেমেয়েদের কি চেহারা, দেখে চোখ জুড়োয়। হ্যাঁরে, এদের বাড়ী ঠাকুর হয় না? পুজোর সময় একদিন আমাদের এনো মা, ঠাকুর দেখে যাবো।

সে আর ইহার বেশী কিছুই বোঝে না।

একটা বাড়ীর সামনে কত কি বড় বড় ছবি টাঙানো, লোকজন ঢুকিতেছে, রাস্তার ধারে কি কাগজ বিলি করিতেছে। টেঁপির মনে হইল এই বোধ হয় সেই টকি যাকে বলে, তাহাই। কুসুমকে বলিল—কুসুম দি, এই টকি না?

—হ্যাঁ দিদি। একদিন দেখবে?

—একদিন এনো না আমাদের। মা-ও কখনো দেখে নি—সবাই আসবো।

একখানা ধাবমান মোটর গাড়ীর দিকে টেঁপির মা হাঁ করিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল, যতক্ষণ সেখানা রাস্তার মোড় ঘুরিয়া অদৃশ্য না হইয়া গেল।

কুসুম বলিল—আমার বাড়ী একটু পায়ের ধুলো দিন এবার জ্যাঠাইমা—

কুসুমের বাড়ী যাইতে পথের ধারে রেলের লাইন পড়ে। টেঁপির মা বলিল—কুসুম, দাঁড়া মা একখানা রেলের গাড়ী দেখে যাই—

বলিতে বলিতে একখানা প্রকাণ্ড-মালগাড়ী আসিয়া হাজির। টেঁপি ও টেঁপির মা দু-জনেই একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল। গাড়ী চলিয়াছে তো চলিয়াছে—তাহার আর শেষ নাই। উঃ, কি বড় গাড়ীটা!

কুসুম বলিল—জ্যাঠাইমা, রাণাঘাট ভাল লাগচে?

—লাগচে বৈকি, বেশ জায়গা মা।

আসলে কিন্তু এঁড়োশোলার জন্য টেঁপির মায়ের মন কেমন করে। শহরে নিজেকে সে এখনও খাপ খাওয়াইতে পারে নাই। সেখানকার তালপুকুরের ঘাট, সদা বোষ্টমের বাড়ীর পাশ দিয়া যে ছোট নিভৃত পথটি বাঁশবনের মধ্য দিয়া বাঁড়ুয্যে-পাড়ার দিকে গিয়াছে, দুপুর

বেলা তাহাদের বাড়ীর কাছের বড় শিরীষ গাছটায় এই সময় শিরীষের শুঁটি শুকাইয়া ঝুন ঝুন শব্দ করে, তাহাদের উঠানের বড় লাউমাচায় এতদিন কত লাউ ফলিয়াছে, পেঁপে গাছটায় কত পেঁপের ফুল ও জালি দেখিয়া আসিয়াছিল—সে সবের জন্য মন কেমন করে বৈকি।

তবে এখানে যাহা সে পাইয়াছে, টেঁপির মা জীবনে সে রকম সুখের মুখ দেখে নাই। চাকরের ওপর হুকুম চালাইয়া কাজ করাইয়া লওয়া, সকলে মানে, খাতির করে—অমন সুন্দর ছেলেটি তাহাদের হোটেলের মুহুরী—এ ধরনের ব্যাপারের কল্পনাও কখনও সে করিয়াছিল?

কুসুমের বাড়ী সকলে গিয়া পৌঁছিল। কুসুম ভারি খুশি হইয়া উঠিয়াছে—তাহার বাপের বাড়ীর দেশের ব্রাহ্মণ-পরিবারকে এখানে পাইয়া। কুসুমের শাশুড়ী আসিয়া টেঁপির মায়ের পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—আমাদের বড্ড ভাগ্যি মা, আপনাদের চরণ-ধুলো পড়লো এ বাড়ীতে।

টেঁপির মাকে এত খাতির করিয়া কেহ কখনো কথা বলে নাই—এত সুখও তাহার কপালে লেখা ছিল! হায় মা ঝিটকিপোতার বনবিবি, কি জাগ্রত দেবতাই তুমি! সেবার ঝিটকিপোতায় চৈত্র মাসে মেলায় গিয়া টেঁপির মা বনবিবিতলায় স-পাঁচ আনার সিন্নি দিয়া স্বামীপুত্রের মঙ্গলকামনা করিয়াছিল, এখনও যে বছর পার হয় নাই! তবুও লোকে ঠাকুর-দেবতা মানিতে চায় না।

কুসুম সকলকে জলযোগ করাইল। পান সাজিয়া দিল। কুসুমের শাশুড়ী আসিয়া কতক্ষণ গল্পগুজব করিল। কুসুম গ্রামের কথাই কেবল শুনিতে চায়। কতদিন বাপের বাড়ী যায় নাই, বাবা-মা মরিয়া গিয়াছে, জ্যাঠামশায় আছে, কাকারা আছে—তাহারা কোনো দিন খোঁজও নেয় না। খোঁজ করিত অবশ্যই, যদি তাহার নিজের অবস্থা ভাল হইত। গরীব লোকের আদর কে করে?…এই সব অনেক দুঃখ করিল। আরও কিছুক্ষণ বসিবার পরে কুসুম উহাদের বাসায় পৌঁছিয়া দিয়া গেল।

হাজারির হোটেলে রাত্রে এক মজার ব্যাপার ঘটিল সেদিন।

দশ-পনেরোটি লোক একই সঙ্গে খাইতে বসিয়াছে—হঠাৎ একজন বলিয়া উঠিল—ঠাকুর, এই যে ভাতটা দিলে, এ দেখছি ও বেলার বাসি ভাত।

বংশী ঠাকুর ভাত দিতেছিল, সে অবাক হইয়া বলিল—আজ্ঞে বাবু সে কি? আমাদের হোটেলে ওরকম পাবেন না। আধ মণ চাল এক-একবেলা রান্না হয়, তাতেই কুলোয় না—বাসি ভাত থাকবে কোথা থেকে?

—আলবাৎ এ ও-বেলার ভাত। আমি বলছি এ ও-বেলার ভাত—

গোলমাল শুনিয়া হাজারি আসিয়া বলিল—কি হয়েছে বাবু?…বাসি ভাত? কক্ষনো না। আপনি নতুন লোক, কিন্তু এঁরা যাঁরা খাচ্ছেন তাঁরা আমায় জানেন—আমার হোটেল না চলে না চলুক কিন্তু ওসব পিরবিত্তি ভগবান যেন আমায় না দেন—

লোকটা তখন তর্কের মোড় ঘুরাইয়া ফেলিল। সে যেন ঝগড়া করিবার জন্যই তৈরী হইয়া আসিয়াছে। পাত হইতে হাত তুলিয়া চোখ গরম করিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—তবে তুমি কি বলতে চাও আমি মিথ্যে কথা বলছি ?

হাজারি নরম হইয়া বলিল—না বাবু, তা তো আমি বলছি নে। কিন্তু আপনার ভুলও তো হতে পারে। আমি দিব্যি করে বলছি বাবু, বাসি ভাত আমার হোটেলে থাকে না—

—থাকে না? বড্ড নবাবী কথা বলচ যে। বাসি ভাত আবার এ বেলা হাঁড়িতে ফেলে দাও না তুমি ?

—না বাবু।

—পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—আবার তবুও না বলছ ? দেখবে মজা ?

এই সময়ে নরেন ও হোটেলের আরও দু একজন সেখানে আসিয়া পড়িল। নরেন গরম হইয়া বলিল—কি মজা দেখাবেন আপনি ?

—দেখবে ? সরে এসো দেখাচ্ছি—জোচ্চোর সব কোথাকার—

এই কথায় একটা মহা গোলমাল বাধিয়া গেল। পুরানো খরিদ্দাররা সকলেই হাজারির পক্ষ অবলম্বন করিল। লোকটা রাস্তায় দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতে লাগিল—রাস্তার সমবেত জনতার সামনে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল—শুনুন মশাই সব বলি। এই এর হোটেলে বাসি ভাত দিয়েছিল খেতে—ধরে ফেলেছি কিনা তাই এখন আবার আমাকে মারতে আসছে—পুলিশ ডাকবো এখুনি—স্যানিটারি দারোগাকে দিয়ে রিপোর্ট করিয়ে তবে ছাড়বো—জোচ্চোর কোথাকার—লোক মারবার মতলব তোমাদের ?

এই সময় হোটেলের চাকর শশী হাজারিকে ডাকিয়া বলিল—বাবু, এই লোকটাকে যেন আমি বেচু চক্কত্তির হোটেলে দেখেছি। সেখানে যে ঝি থাকে, তার সঙ্গে বাজার করে নিয়ে যেতে দেখেছি—

নরেনের সাহস খুব। সে হোটেলের রোয়াকে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—মশাই, আপনি বেচু চক্কত্তির হোটেলের পদ্মঝিয়ের কে হন ?

তবুও লোকটা ছাড়ে না। সে হাত-পা নাড়িয়া প্রমাণ করিতে গেল পদ্মঝিয়ের নামও সে কোনোদিন শোনে নাই। কিন্তু তাহার প্রতিবাদের তেজ যেন তখন কমিয়া গিয়াছে।

কে একজন বলিয়া উঠিল—এইবার মানে মানে সরে পড় বাবা, কেন মার খেয়ে মরবে।

কিছুক্ষণ পরে লোকটাকে আর দেখা গেল না।

এই ঘটনার পরে অনেক রাত্রে হাজারি বেচু চক্কত্তির হোটেলে গিয়া হাজির হইল। বেচু চক্কত্তি তহবিল মিলাইতেছিল, হাজারিকে দেখিয়া একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—কি, হাজারি যে ? এসো এসো। এত রাত্রে কি মনে করে ?

হাজারি বিনীতভাবে বলিল—বাবু, একটা কথা বলতে এলাম।

—কি—বল ?

—বাবু আপনি আমার অন্নদাতা ছিলেন একসময়ে—আজও আপনাকে তাই বলেই ভাবি। আপনার এখানে কাজ না শিখলে আজ আমি পেটের ভাত করে খেতে পারতাম না। আপনার সঙ্গে আমার কোন শত্রুতা আছে বলে আমি তো ভাবিনে।

—কেন, কেন, একথা কেন?

হাজারি সব ব্যাপার খুলিয়া বলিল। পরে হাত জোড় করিয়া বলিল—বাবু, আপনি ব্রাহ্মণ, আমার মনিব। আমাকে এভাবে বিপদে না ফেলে যদি বলেন হাজারি তুমি হোটেল উঠিয়ে দাও, তাই আমি দেবো। আপনি হুকুম করুন—

বেচু চক্কত্তি আশ্চর্য্য হইবার ভান করিয়া বলিল—আমি তো এর কোনো খবর রাখিনে—আচ্ছা, তুমি যাও আজ, আমি তদন্ত করে দেখে তোমায় কাল জানাবো। আমাদের কোন লোক তোমার হোটেলে যায় নি এ একেবারে নিশ্চয়। কাল জানতে পারবে তুমি।... তারপর হাজারি চলচে-টলচে ভাল?

—একরকম আপনার আশীর্ব্বাদে—

—রোজ কি রকম বিক্রীসিক্রি হচ্ছে? রোজ তবিলে কি রকম থাকে? তুমি কিছু মনে কোরো না—তোমাকে আপনার লোক বলে ভাবি বলেই জিজ্ঞেস করচি।

—এই বাবু পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকা—ধরুন না কেন আজ রাত্তিরের তবিল দেখে এসেছি ছত্রিশ টাকা স'বারো আনা।

বেচু চক্কত্তি আশ্চর্য্য হইলেন মনে মনে। মুখে বলিলেন—বেশ, বেশ। খুব ভালো—শুনে খুশি হলাম। আচ্ছা, তাহলে এসো আজগে। কাল খবর পাবে।

হাজারি চলিয়া গেলে বেচু চক্কত্তি পদ্মঝিকে ডাকাইলেন। পদ্ম আসিয়া বলিল—হাজারি ঠাকুরটা এসেছিল নাকি? কি বলছিল?

বেচু চক্কত্তি বলিলেন—ও পদ্ম, হাজারি যে অবাক করে দিয়ে গেল। রাণাঘাটের বাজারে হোটেল ক'রে পঁয়ত্রিশ টাকা থেকে চল্লিশ টাকা রোজকার দাঁড়া-তবিল, এ তো কখনো শুনি নি। তার মানে বুঝচো? দাঁড়া-তবিলে গড়ে ত্রিশ টাকা থাকলেও সাত-আট টাকা দৈনিক লাভ, ফেলে-ঝেলেও। মাসে হোল আড়াইশো টাকা। দুশো টাকার তো মার নেই—হ্যাঁ পদ্ম?

পদ্মঝি মুখভঙ্গি করিয়া বলিল—গুল্ দিয়ে গেল না তো?

—না, গুল্ দেবার লোক নয় ও। সাদাসিধে মানুষটা—আমায় বড্ড মানে এখনও। ও গুল্ দেবে না, অন্ততঃ আমার কাছে। তা ছাড়া দেখছ না রেলবাজারে কোন হোটেলে আর বিক্রী নেই। সব শুষে নিচ্ছে ওই একলা।

—আজ নৃসিংহ গিয়েছিল বাবু ওর হোটেলে। খুব খানিকটা রাউ করে দিয়েও এসেছে নাকি। খুব চেঁচিয়েছে বাসি ভাত পচা মাছ এই বলে। আর কিছু হোক না হোক লোকে শুনে তো রাখলে?

—যদু বাঁড়ুয্যেরাও আমায় ডেকে পাঠিয়েছিল, ওর হোটেল ভাঙতেই হবে। নইলে

রেলবাজারে কেউ আর টিকবে না। এই কথা যদু বাঁড়ুয্যেও বললে। কিন্তু তাতে কিছু হবে না—ওর এখন সময় যাচ্ছে ভালো। নৃসিংহ আছে?

—না বেরিয়ে গেল। পুলিশে সেই যে খবর দেবার কি হোল?

—দেখ পদ্ম, আমি বলি ওরকম আর পাঠিয়ে দরকার নেই। হাজারি লোকটা ভালো—আজ এসেছিল, এমন হাত জোড় করে নরম হয়ে থাকে যে দেখলে ওর ওপর রাগ থাকে না।

—খ্যাংরা মারি ওর ভালমানুষেতার মুখে—ভিজে বেড়ালটি, মাছ খেতে কিন্তু ঠিক আছে—পুলিশের সেই যে মতলব দিয়েছিল যদুবাবু, তাই তুমি করো এবার। ওর হোটেল না ভাঙলে চলবে না। নয়তো আমাদের পাততাড়ি গুটুতে হবে এই আমি বলে দিলাম—এবেলা তবিল কত?

বেচু চক্কত্তি অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন—মোট ছ'টাকা সাড়ে তিন আনা—

পদ্মঝি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বলিল—দু'মাসের বাড়ীভাড়া বাকী ওদিকে। কাল বলেছে অন্ততঃ একমাসের ভাড়া না দিলে হৈ চৈ বাধাবে। ভাড়া দেবে কোত্থেকে?

—দেখি।

—তারপর কানাই ঠাকুরের মাইনে বাকী পাঁচ মাস। সে বলছে আর কাজ করবে না, তার কি করি?

—বুঝিয়ে রাখো এই মাসটা। দেখি সামনের মাসে কি রকম হয়—

পদ্মঝি রান্নাঘরে গিয়া ঠাকুরকে বলিল—আমার ভাতটা বেড়ে দাও ঠাকুর, রাত হয়েছে অনেক, বাড়ী যাই।

তারপর সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। ছন্নছাড়া অবস্থা, ওই বড় দশ সেরী ডেক্‌চিটা আজ তিন-চার মাস তোলা আছে—দরকার হয় না। আগে পিতলের বালতি করিয়া সরিষার তৈল আসিত, এখন আসে ছোট ভাঁড়ে—বালতি দরকার হয় না। এমন দুরবস্থা সে কখনো দেখে নাই হোটেলের।

তাহার মনটা কেমন করিয়া ওঠে।…

নানারকমে চেষ্টা করিয়া এই হোটেলটা সে আর কর্ত্তা দুজনে গড়িয়া তুলিয়াছিল। এই হোটেলের দৌলতে যথেষ্ট একদিন হইয়াছে। ফুলেনবলা গ্রামের যে পাড়ায় তাহার আদি বাস ছিল, সেখানে তার ভাই এখনও আছে—চাষবাস করিয়া খায়—আর সে এই রাণাঘাটের শহরে সোনাদানাও পরিয়া বেড়াইয়াছে একদিন—এই হোটেলের দৌলতে। এই হোটেল তার বুকের পাঁজর। কিন্তু আজ বড় মুশ্‌কিলের মধ্যে পড়িতে হইয়াছে। কোথা হইতে এক উনপাঁজুরে গাঁজাখোর আসিয়া জুটিল হোটেলে—হোটেলের সুলুকসন্ধান জানিয়া লইয়া এখন তাহাদেরই শীলনোড়ায় তাহাদেরই দাঁতের গোড়া ভাঙিতেছে। এত যত্নের, এত সাধ-আশার জিনিসটা আজ কোথা হইতে কোথায় দাঁড়াইয়াছে! যাহার জন্য আজ হোটেলের এই দুরবস্থা,—ইচ্ছা হয় সেই কুকুরটার গলা টিপিয়া মারে, যদি বাগে পায়। তাহার উপর আবার

দয়া কিসের? কর্ত্তা ওই রকম ভালমানুষ সদাশিব লোক বলিয়াই তো আজ পথের কুকুর সব মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে।…দয়া!

একদিন রাণাঘাটের স্টেশন মাস্টার হাজারিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

হাজারি নিজে যাইতে রাজী নয়—কারণ স্টেশন মাস্টার সাহেব, সে জানে। নরেন যাওয়াই ভাল। অবশেষে তাহাকেই যাইতে হইল। নরেন সঙ্গে গেল।

সাহেব বলিলেন—টোমার নাম হাজারি? হিণ্ডু হোটেল রাখো বাজারে?

—হাঁা হুজুর।

—টুমি প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে কেটার করবে? হিণ্ডু ভাত, ডাল. মাছ, দহি?

হাজারি নরেনের মুখের দিকে চাহিল। সাহেবের কথা সে বুঝিতে পারিল না। নরেন ব্যাপারটা সাহেবের নিকট ভাল করিয়া বুঝিয়া লইয়া হাজারিকে বুঝাইল। রেলযাত্রীর সুবিধার জন্য রেল কোম্পানী স্টেশনের প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে একটা হিন্দু ভাতের হোটেল খুলিতে চায়। সাহেব হাজারির নামডাক শুনিয়া তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছে। আপাততঃ দেড়শো টাকা জমা দিলে উহারা লাইসেন্স মঞ্জুর করিবে এবং রেলের খরচে হোটেলের ঘর বানাইয়া দিবে।

হাজারি সাহেবের কাছে বলিয়া আসিল সে রাজী আছে।

স্টেশন মাস্টার নরেনকে একখানা টেণ্ডার ফর্ম দিয়া ঘরগুলি পুরাইয়া হাজারির নাম সই করিয়া আনিতে বলিয়া দিলেন। স্টেশনের এই হোটেল লইয়া তারপর জোর কমপিটিশন চলিল। নৈহাটির এবং কৃষ্ণনগরের দুইজন ভাটিয়া হোটেলওয়ালা টেণ্ডার দিল এবং ওপর-ওয়ালা কর্ম্মচারীদের নিকট তদ্বিরতাগাদাও শুরু করিল।

নিজ রাণাঘাটের বাজারে এ খবরটা কেহ রাখিত না—শেষের দিকে, অর্থাৎ যখন টেণ্ডারের তারিখ শেষ হইবার অল্প কয়েকদিন মাত্র বাকী, যদু বাঁড়ুয্যে কথাটা শুনিল। স্টেশনের একজন ক্লার্ক যদুর হোটেলে খায়, সেই কি করিয়া জানিতে পারিয়া যদুকে বলিল—একটু চেষ্টা করুন না। আপনি—টেণ্ডার দিন। হয়ে যেতে পারে।

যদু চুপি চুপি টেণ্ডার সই করিয়া পাঁচ টাকা টেণ্ডারের জন্য জমা দিয়া আসিল।

সেদিন বেচু চক্কত্তি সবে হোটেলের গদিতে আসিয়া বসিয়াছে এমন সময় পদ্মঝি ব্যস্তসমস্ত হইয়া আসিয়া বলিল—শুনেছ গো? শুনে এলাম একটা কথা—

—কি?

—ইস্টিশানে ভাতের হোটেল খুলে দেবে রেল কোম্পানি, দরখাস্ত দাও না কর্ত্তা।

—ইস্টিশানে? ছোঃ, ওতে খদ্দের হবে না। দূরের যাত্রীদের মধ্যে কে ভাত খাবে? সব কলকাতা থেকে খেয়ে আসবে—

—তোমার এই সব বসে বসে পরামর্শ আর রাজা-উজীর মারা। সবাই দূরের যাত্রী থাকে না—যারা গাড়ী বদলে খুলনে লাইনে যাবে, তারা খাবে, দুপুরে যে সব গাড়ী কলকাতায় যায়—তারা এখানে ভাত পেলে এখানেই খেয়ে যাবে। শুনলাম বাঁড়ুয্যে মশায় নাকি দর-

খাস্ত দিয়েছে পাঁচ টাকা জমা দিয়ে—

বেচু চক্কত্তির চমক ভাঙিল। যদু বাঁড়ুয্যে যদি দরখাস্ত দিয়া থাকে, তবে এ দুধে সর আছে, কারণ যদু বাঁড়ুয্যে ঘুঘু হোটেলওয়ালা। পয়সা আছে না বুঝিয়া সে টেণ্ডারের পাঁচ টাকা জমা দিত না। বেচু বলিল—যাই, একবার দরখাস্ত দিয়ে আসি তবে—

পদ্মঝি বলিল—কেরানী বাবুদের কিছু খাইয়ে এস—নইলে কাজ হবে না। আমাদের হোটেলে সেই যে শশধরবাবু খেতো, তার শালা ইষ্টিশানের মালবাবু, তার কাছে সুলুকসন্ধান নিও। না করলে চলবে কি করে? এ হোটেলের অবস্থা দেখে দিন দিন হাত-পা পেটের ভেতর সেঁদিয়ে যাচ্ছে।

—কেন ওবেলা খদ্দের তো মন্দ ছিল না?

পদ্মঝি হতাশার সুরে বলিল—ওকে ভাল বলে না কর্ত্তা। সতেরো জন থাড় কেলাসে আর ন'জন বাঁধা খদ্দেরে টাকা দিচ্ছে তবে হোটেল চলছে—নইলে বাজার হোত না। মুদি ধার দেওয়া বন্ধ করবে বলে শাসিয়েছে, তারই বা দোষ কি—একশো টাকার ওপর বাকী।

বেচু বলিল—টেণ্ডারের দরখাস্ত দিতে গেলে এখুনি পাঁচটা টাকা চাই, তবিলে আছে দেখছি এক টাকা সাড়ে তের আনা মোট, ওবেলার দরুন। তার মধ্যে কয়লার দাম দেবো বলা আছে ওবেলা, কয়লাওয়ালা এল বলে। টাকা কোথায়?

পদ্মঝি একটু ভাবিয়া বলিল—ও-থেকে একটা টাকা নাও এখন। আর আমি চার টাকা যোগাড় করে এনে দিচ্ছি। আমার লবঙ্গফুল থাকে এপাড়ায় তার কাছ থেকে। কয়লাওয়ালাকে আমি বুঝিয়ে বলবো—

—বুঝিয়ে রাখবে কি, সে টাকা না পেলে কয়লা বন্ধ করবে বলেছে। তুমি পাঁচ টাকাই এনে দ্যাও—

সন্ধ্যার পূর্ব্বে বেচুও গিয়া টেণ্ডার দিয়া আসিল। পদ্মঝি সাগ্রহে গদির ঘরের দ্বারে অপেক্ষা করিতেছিল, এখনও খরিদ্দার আসা শুরু হয় নাই। বলিল—হয়ে গেল কর্ত্তা? কি শুনে এলে?

—হয়ে যাবে এখন? ছেলের হাতের পিঠে বুঝি? তবে খুব লাভের কাণ্ড যা শুনে এলাম। যদু পাকা লোক—নইলে কি দরখাস্ত দেয়? আমি আগে বুঝতে পারি নি। মোটা লাভের ব্যবসা। ইস্টিশানের ক্ষেত্রবাবু আমার এখানে খেতো মনে আছে? সে আবার বদলি হয়ে এসেছে এখানে। সে-ই বল্লে—যাত্রীরা রেলের বড় আপিসে দরখাস্ত করেছে আমাদের খাওয়ার কষ্ট। তা ছাড়া, রেল কোম্পানী এলেটিক আলো দেবে, পাখা দেবে, ঘর করে দেবে—তার দরুন কিছু নেবে না আপাতোক। রেলের বোর্ড না কি আছে, তাদের অর্ডার। যাত্রীদের সুবিধে আগে করে দিতে হবে। যথেষ্ট লোক খাবে পদ্ম, মোটা পয়সার কাণ্ড যা বুঝে এলাম।

পদ্মঝি বলিল—জোড়া পাঁঠা দিয়ে পূজো দেবো সিদ্ধেশ্বরীতলায়। হয়ে যেন যায়—তুমি কাল আর একবার গিয়ে ওঁদিগের কিছু খাইয়ে এসো—

—বলি যদু বাঁড়ুয্যে টের পেলে কি করে হ্যা ?

—ও সব ঘুঘু লোক। ওদের কথা ছাড়ান দ্যাও।

ক্রমে এ সম্বন্ধে অনেক রকম কথা শোনা গেল। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দেখা গেল রেলের তরফ হইতে একটি চমৎকার ঘর তৈয়ারী করিতেছে—আসবাবপত্র, আলমারি, টেবিল, চেয়ার দিয়া সেটি সাজানো হইবে, সে-সব কোম্পানী দিবে।

এই সময় একদিন যদু বাঁড়ুয্যেকে হঠাৎ তাহাদের গদিঘরে আসিতে দেখিয়া বেচু ও পদ্মঝি উভয়েই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। যদু বাঁড়ুয্যে হোটেলওয়ালাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি—কুলীন ব্রাহ্মণ, মাটিঘরার বিখ্যাত বাঁড়ুয্যে-বংশের ছেলে। কখনও সে কারো দোকানে বা হোটেলে গিয়া হাউ-হাউ করিয়া বকে না—গম্ভীর মেজাজের মানুষটি।

বেচু চক্কত্তি যথেষ্ট খাতির করিয়া বসাইল। তামাক সাজিয়া হাতে দিল।

যদু বাঁড়ুয্যে কিছুক্ষণ তামাক টানিয়া একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল—তারপর এসেছি একটা কাজে, চক্কত্তি মশায়। হোটেল চলছে কেমন ?

বেচু বলিল—আর তেমন নেই, বাঁড়ুয্যে মশায়। ভাবছি, তুলে দিয়ে আর কোথায়ও যাই ! খদ্দেরপত্তর নেই আর—

—আপনার কাছে আমার আসার উদ্দেশ্য বলি। ইস্টিশানে হোটেল হচ্ছে জানেন নিশ্চয়ই। আমি একটা টেণ্ডার দিই। শুনলাম আপনিও নাকি দিয়েছেন ?

—হ্যাঁ—তা—আমিও—

—বেশ। বলি, শুনুন। নৈহাটির একজন ভাটিয়া নাকি বড্ড তদ্বির করছে ওপরে—তারই হয়ে যাবে। মোটা পয়সার কারবার হবে ওই হোটেলটা। আসাম মেল, শান্তিপুর, বনগাঁ, ডাউন চাটগাঁ মেল—এসব প্যাসেঞ্জার খাবে—তা ছাড়া থাউকো লোক খাবে। ভাল পয়সা হবে এতে। আসুন আপনি আর আমি দু'জনে মিলে দরখাস্ত দিই যে রাণাঘাটের আমরা স্থানীয় হোটেলওয়ালা, আমাদের ছেড়ে ভাটিয়াকে কেন দেওয়া হবে হোটেল। স্থানীয় হোটেলওয়ালারা মিলে একসঙ্গে দরখাস্ত করেচে এতে জোর দাঁড়াবে আমাদের খুব।

বেচু বুঝিল নিতান্ত হাতের মুঠার বাহিরে চলিয়া যায় বলিয়াই আজ যদু বাঁড়ুয্যে তাহার গদিতে ছুটিয়া আসিয়াছে—নতুবা ঘুঘু যদু কখনও লাভের ভাগাভাগিতে রাজী হইবার পাত্র নয়। বলিল—বেশ দরখাস্ত লিখিয়ে আনুন—আমি সই করে দেবো এখন।

যদু বাঁড়ুয্যে পকেট হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া বলিল—আরে, সে কি বাকি আছে, সে অশ্বিনী উকীলকে দিয়ে মুসোবিদে করে টাইপ করিয়ে ঠিক করে এনেছি। আপনি এখানটায় সই করুন—

যদু বাঁড়ুয্যে সই লইয়া চলিয়া গেলে পদ্মঝি আসিয়া বলিল—কি গা কর্ত্তা ?

বেচু হাসিয়া বলিল—কারে না পড়লে কি ঘুঘু যদু বাঁড়ুয্যে এখানে আসে কখনো ? সেই হোটেল নিয়ে এসেছিল। শুনবে ?

পদ্ম সব শুনিয়া বলিল—তাও ভালো। বেশী যদি বিক্রী হয়, ভাগাভাগিও ভালো।

এখানে তোমার চলবেই না, যেরকম দাঁড়াচ্চে তার আর কি। হোক্, ইষ্টিশানে আধা বখরাই হোক্।

দিন কুড়ি-বাইশ পরে একদিন যদু বাঁড়ুয্যে বেচুর গদিঘরে ঢুকিয়া যে ভাবে ধপ্ করিয়া হতাশ ভাবে তক্তপোশের এক কোণে বসিয়া পড়িল, তাহাতে পদ্মঝি (সেখানেই ছিল) বুঝিল স্টেশনের হোটেল হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু পরবর্ত্তী সংবাদের জন্য পদ্মঝি প্রস্তুত ছিল না।

যদু বলিল—শুনেছেন, চক্কত্তি মশাই! কাণ্ডটা শোনেন নি?

বেচু চক্কত্তি ওভাবে যদু বাঁড়ুয্যেকে বসিতে দেখিয়া পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিল সংবাদ শুভ নয়। তবুও সে ব্যস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—কি! কি ব্যাপার?

—ইষ্টিশানের থেকে আসচি এই মাত্তর, আজ ওদের হেড অফিস থেকে টেণ্ডার মঞ্জুর করে নোটিশ পাঠিয়েছে—

বেচু একথার উত্তরে কিছু না বলিয়া উদ্বিগ্ন মুখে যদু বাঁড়ুয্যের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

—কার হয়ে গেল জানেন?

—না—সেই ভাটিয়া ব্যাটার বুঝি—

—তা হলেও তো ছিল ভাল। হল হাজারির, তোমাদের হাজারির—

বেচু ও পদ্মঝি দু'জনেই বিস্ময়ে অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল প্রায়।

বেচু চক্কত্তি বলিল—দেখে এলেন?

—নিজের চোখে। ছাপা অক্ষরে। নোটিশ বোর্ডে টাঙিয়ে দিয়েছে—

পদ্মঝি হতবাক হইয়া যদু বাঁড়ুয্যের দিকে চাহিয়া রহিল, বোধ হইল কথাটা যেন সে এখনও বিশ্বাস করে নাই।

বেচু চক্কত্তি বলিল—তা হলে ওরই হল!

এ কথার কোন অর্থ নাই, যদুও বুঝিল, পদ্মঝিও বুঝিল। ইহা শুধু বেচুর মনের গভীর নৈরাশ্য ও ঈর্ষার অভিব্যক্তি মাত্র।

যদু বাঁড়ুয্যে বলিল—ওঃ, লোকটার বরাত খুবই ভাল যাচ্ছে দেখছি। ধুলো মুঠো ধরলে সোনা মুঠো হচ্ছে। আজ একুশ বছর এই রেলবাজারে হোটেল চালাচ্চি, আমরা গেলাম ভেসে, আর ও হাতাবেড়ি ঠেলে আপনার হোটেলে পেট চালাত, তার কিনা—সবই বরাত—

বেচু বলিল—কেন হল, কিছু শুনলেন নাকি? টাকা ঘুষঘাষ দিয়েছিল নিশ্চয়?—

—টাকার ব্যাপার নেই এর মধ্যে। হেড্ অফিসের বোর্ড থেকে নাকি মঞ্জুর করেছে—এখানকার ইষ্টিশান মাষ্টার সাহেব নাকি ওর পক্ষে খুব লিখেছিল। কোন কোন প্যাসেঞ্জার ওর নাম লিখেছে হেড্ অফিসে, খুব ভাল রান্না করে নাকি, এই সব।

আর কিছুক্ষণ থাকিয়া যদু চলিয়া গেলে পদ্মঝি বলিল—বলি এ কি হল, হ্যাঁ কর্ত্তা?

—তাই তো!

—মড়ুই পোড়া বামুনটা বড় বাড় বাড়িয়েচে, আর তো সহ্যি হয় না—

—কি আর করবে বল। আমি ভাবছি—

—কি ?

—কাল একবার হাজারির হোটেলে আমি যাই—

—কেন, কি দুঃখে ?

—ওকে বলি আমার হোটেলে তুমি অংশীদার হও, রেলের হোটেলের অংশ কিছু আমায় দাও—

পদ্মঝি ভাবিয়া বলিল—কথাটা মন্দ নয়। কিন্তু যদি তোমায় না দিতে চায় ?

—আমাকে খুব মানে কিনা তাই বলছি। এ না করলে আর উপায় নেই পদ্ম। হোটেল আর চালাতে পারবো না। একরাশ দেনা—খরচে আয়ে আর কুলোয় না। এ আমায় করতেই হবে।

পদ্মঝিয়ের মুখে বেদনার চিহ্ন পরিস্ফুট হইল। বলিল—যা ভাল বোঝ কর কর্তা। আমি কি বলব বল !

কিছুক্ষণ পরে যদু বাঁড়ুয্যে পুনরায় বেচুর হোটেলে আসিয়া বসিল। বেচু চক্কত্তি খাতির করিয়া তাহাকে চা খাওয়াইল। তামাক সাজিয়া হাতে দিল।

তামাক টানিতে টানিতে যদু বলিল—একটা মতলব মনে এসেছে চক্কত্তি মশায়—তাই আবার এলাম।

বেচু সকৌতুহলে বলিল—কি বলুন তো ?

—আমি পালচৌধুরীদের নায়েব মহেন্দ্রবাবুকে ধরেছিলাম। ওঁরা জমিদার, ওঁদের খাতির করে রেল কোম্পানী। মহেন্দ্রবাবুর চিঠি নিয়ে কাল চলুন, আপনি আর আমি কলকাতা রেল আপিসে একবার আপীল করি গিয়ে।

পদ্মঝি দোরের কাছেই ছিল, সে বলিল—তাই যান গিয়ে কর্তা, আমিও বলি যাতে কক্ষনো ও মড়ুই পোড়া বামুন হোটেল না পায় তা করাই চাই, দু'জনে তাই যান—

বেচু চক্কত্তি ভাবিয়া বলিল—কখন যেতে চান কাল ?

যদু বলিল—সকাল সকাল যাওয়াই ভাল। বড় বাবুকে ধরতে হবে গিয়ে—পালচৌধুরীদের পুকুরে মাছ ধরতে আসেন প্রায়ই। গরফেতে বাড়ী, বড় ভাল লোক। মহেন্দ্রবাবুর চিঠি নিয়ে গিয়ে ধরি।

যদু চলিয়া গেলে বেচু চক্কত্তি পদ্মকে বলিল—কিন্তু তাহলে হাজারির কাছে আমার ওভাবে যাওয়া হয় না। ও সব টের পাবেই যে আমরা আপীল করেছি, ওকেও নোটিশ দেবে কোম্পানী। আপীলের শুনানী হবে। তারপর কি আর ওর কাছে যাওয়া যায় ?

—না হয় না গেলে। ওর দরকার নেই, যাতে ওর উচ্ছেদ হয় তাই কর।

—বেশ, যা বল।

পরদিন যদু বাঁড়ুয্যের সঙ্গে বেচু চক্কত্তি কয়লাঘাটে রেলের বড় আপিসে যাইবে বলিয়া

বাহির হইল এবং সন্ধ্যার পরে পুনরায় রাণাঘাটে ফিরিল। বেচু যখন নিজের হোটেলে ঢুকিল, তখন খাওয়াদাওয়া আরম্ভ হইয়াছে। পদ্মঝি ব্যস্তভাবে বলিল—কি হ'ল কর্ত্তা?

বেচু বলিল—আর কি, মিথ্যে যাতায়াত সার হ'ল, দুটো টাকা বেরিয়ে গেল। তারা বল্লে—এ আমাদের হাতে নেই, টেণ্ডার মঞ্জুর হয়ে বোর্ডের কাছে চলে গিয়েছে। এখন আর আপীল খাটবে না।

—তবে যাও কাল হাজারির কাছেই যাও—

তার দরকার নেই। বাঁড়ুয্যে মশায় আসবার সময় বল্লেন—ওঁর হোটেল আর আমার হোটেল একসঙ্গে মিলিয়ে দিতে। এ ঘর ছেড়ে দিয়ে সামনের মাসে ওঁর ঘরেই—

পদ্মঝি বলিল—এ কিন্তু খুব ভাল কথা। ও ছোটলোকটার কাছে না গিয়ে বাঁড়ুয্যে মশায়ের সঙ্গে কাজ করা ঢের ভাল।

পরবর্ত্তী পনেরো দিনের মধ্যে রাণাঘাট রেলবাজারে দুইটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়া গেল।

স্টেশনের আপ্ প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে নূতন হিন্দু-হোটেল খোলা হইল। শ্বেতপাথরের টেবিল, চেয়ার, ইলেক্‌ট্রিক আলো, পাখা দিয়া সাজানো আধুনিক ধরনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অতি চমৎকার হোটেলটি। হোটেলের মালিকের স্থানে হাজারির নাম দেখিয়া অনেকে আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

আর একটি বিশিষ্ট ঘটনা, বেচু চক্কত্তির পুরানো হোটেলটি উঠিয়া যাইবে এমন একটা গুজব রেলবাজারের সর্ব্বত্র রটিল।

সেদিন বিকালের দিকে হাজারি তাহার পুরানো অভ্যাসমত চূর্ণীর ধার হইতে বেড়াইয়া ফিরিতেছে, এমন সময় পদ্মঝিয়ের সঙ্গে রাস্তায় দেখা।

হাজারিই পদ্মকে ডাকিয়া বলিল—ও পদ্মদিদি, কোথায় যাচ্ছ?

পদ্মঝি দাঁড়াইল। তাহার হাতে একটা ছোট্ট পাথরের বাটি। সম্ভবতঃ কাছেই কোথাও পদ্মঝিয়ের বাসা।

হাজারি বলিল—বাটিতে কি পদ্মদিদি?

—একটু দম্বল, দই পাতবো বলে গোয়ালাবাড়ী থেকে নিয়ে যাচ্ছি।

—তারপর, ভাল আছ?

—তা মন্দ নয়। তুমি ভাল আছ ঠাকুর?

এখানে কাছেই থাকো বুঝি?

এ কথার উত্তরে পদ্মঝি যাহা বলিল হাজারি তাহার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না। বলিল—এস না ঠাকুর, আমার বাড়ীতে একবার এলেই না হয়—

—তা বেশ বেশ, চলো না পদ্মদিদি।

ছোট্ট বাড়ীটা, একপাশে একটা পাতকুয়া, অন্যদিকে টিনের রান্নাঘর এবং গোয়াল। পদ্মঝি রোয়াকটাতে একখানা মাদুর আনিয়া হাজারির জন্য বিছাইয়া দিল। হাজারি

খানিকটা অস্বস্তি ও আড়ষ্ট ভাব বোধ করিতেছিল। পদ্ম যে তাহার মনিব, তাহাদেরই হোটেলে সে একাদিক্রমে সাত বৎসর কাজ করিয়াছে, এ কথাটা এত সহজে কি ভোলা যায়? এমন কি, পদ্মঝিকে সে চিরকাল ভয় করিয়া আসিয়াছে, আজও যেন সেই ভাবটা কোথা হইতে আসিয়া জুটিল।

পদ্মঝি বলিল—পান সাজবো খাবে?

হাজারি আমতা আমতা করিয়া বলিল—তা—তা বরং একটা—

পান সাজিয়া একটা চায়ের পিরিচে আনিয়া হাজারির সামনে রাখিয়া বলিল—তারপর, রেলের হোটেল তো পেয়ে গেলে শুনলাম। ওখানে বসাবে কাকে?

—ওখানে বসাবো ভাবছি বংশীর ভাগ্নে সেই নরেন—নরেনকে মনে আছে? সেই তাকে।

—মাইনে কত দেবে?

—সে সব কথা এখনও ঠিক হয় নি। ও তো আমার এই হোটেলে খাতাপত্র রাখে, দেখাশুনো করে, বড় ভাল ছেলেটি।

—তা ভালো।

—চক্কত্তি মশায়ের শরীর ভাল আছে? ক'দিন ওদিকে আর যেতে পারি নি। হোটেল চলছে কেমন?

—হোটেল চলছে মন্দ নয়। তবে আমি কি বলছিলাম জানো ঠাকুর, কর্ত্তামশায়কে রেলের হোটেলে একটা অংশ দিয়ে রাখো না তুমি? তোমার কাজের সুবিধে হবে।

হাজারি এ প্রস্তাবের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। একটু বিস্ময়ের সুরে বলিল—কর্ত্তা কি করে থাকবেন? ওঁর নিজের হোটেল?

—সেজন্যে ভাবনা হবে না। সে আমি দেখব। কি বল তুমি?

—এখন আমি কোন কথা দিতে পারব না পদ্মদিদি। তবে একটা কথা আমার মনে হচ্ছে তা বলি। রেল-কোম্পানী যখন টেণ্ডার নেয়, তখন যার নাম লেখা থাকে, তার ছাড়া আর কোন লোকের অংশটংশ থাকতে দেবে না হোটেলে। হোটেল ত আমার নয়—হোটেল রেল-কোম্পানীর।

—ঠাকুর একটা কথা বলব? তুমি এখন বড় হোটেলওয়ালা, অনেক পয়সা রোজগার কর শুনি। কিন্তু আমি তোমায় সেই হাজারি ঠাকুরই দেখি। তুমি এস আমাদের হোটেলে আবার।

হাজারি বিস্ময়ের সুরে বলিল—চক্কত্তি মশায়ের হোটেলে? রাঁধতে?

সে মনে মনে ভাবিল—পদ্মদিদির মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? বলে কি?

পদ্ম কিন্তু বেশ দৃঢ় স্বরেই বলিল—সত্যি বলছি ঠাকুর। এস আমাদের ওখানে আবার।

—কেন বল তো পদ্মদিদি? একথা তুললে কেন?

—তবে বলি শোন। তুমি এলে আমাদের হোটেলটা আবার জাঁকবে।

এমন ধরনের কথা হাজারি কখনও পদ্মঝিয়ের মুখে শোনে নাই। সেই পদ্মঝি আজ কি কথা বলিতেছে তাহাকে?

হাজারি গলিয়া গেল। সে ভুলিয়া গেল যে সে একজন বড় হোটেলের মালিক—পদ্মদিদি তাহার মনিবের দরের লোক, তাহার মুখের একথা যেন হাজারির জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। এরই আশায় যেন সে এতদিন রাণাঘাটের রেলবাজারে এত কষ্ট করিয়াছে।

অন্য লোকে হাজার ভাল বলুক, পদ্মদিদির ভাল বলা তাদের চেয়ে অনেক উঁচু, অনেক বেশী মূল্যবান।

কিন্তু পদ্ম যাহা বলিতেছে, তাহা যে হয় না একথা সে পদ্মকে কি করিয়া বুঝাইবে! যখন সে গোপালনগরের চাকুরি ছাড়িয়া পুনরায় চক্কত্তি মশায়ের হোটেলে চাকুরি লইয়াছিল—তখনও উহারা যদি তাহাকে না তাড়াইয়া দিত, তবে তো নিজস্ব হোটেল খুলিবার কল্পনাও তাহার মনে আসিত না। উহাদের হোটেলে পুনরায় চাকুরি পাইয়া সে মহা সৌভাগ্যবান মনে করিয়াছিল নিজেকে—কেন তাহাকে উহারা তাড়াইল!

এখন আর হয় না।

এখন সে নিজের মালিক নয়, কুসুমের টাকা ও অতসীমা'র টাকা হোটেলে খাটিতেছে, তাহার উন্নতি-অবনতির সঙ্গে অনেকগুলি প্রাণীর উন্নতি-অবনতি জড়ানো। নিজের খেয়াল-খুশিতে যা-তা করা এখন আর চলিবে না।

টেঁপির ভবিষ্যৎ দেখিতে হইবে—টেঁপি আর নরেন।

অনেক দূর আগাইয়া আসিয়াছে—আর এখন পিছানো চলে না।

হাজারি পদ্মঝিয়ের মুখের দিকে দুঃখ ও সহানুভূতির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—

—আমার ইচ্ছে করে পদ্মদিদি। কিন্তু এখন যাওয়া হয় কি ক'রে তুমিই বল।

পদ্ম যে কথাটা না বোঝে তা নয়, সে নিতান্ত মরীয়া হইয়াই কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছিল। হাজারির কথার সে কোনো জবাব না দিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল এবং কিছুক্ষণ পরে একটা কাপড়-জড়ানো ছোট্ট পুঁটুলি আনিয়া হাজারির সামনে রাখিয়া বলিল—পড়তে জান তো, পড়ে দেখ না?

হাজারি পড়িতে জানে না তাহা নয়, তবে ও কাজে সে খুব পারদর্শী নয়। তবু পদ্মদিদির সম্মুখে সে কি করিয়া বলে যে সে ভাল পড়িতে পারে না! পুঁটুলি খুলিয়া সে দেখিল খান-কয়েক কাগজ ছাড়া তার মধ্যে আর কিছু নাই।

পদ্মঝি তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিল। সে নিজেই বলিল—ক-খানা হ্যাণ্ডনোট, তা সবসুদ্ধ সাত-শ টাকার হ্যাণ্ডনোট। কর্ত্তাকে আমি টাকা দেই যখনই দরকার হয়েছে তখন। নিজের হাতের চুড়ি বিক্রি করি, কানের মাকড়ি বিক্রি করি—ছিল তো সব, যখন এইস্তিরি ছিলাম, দুখানা সোনাদানা ছিল তো অঙ্গে।

হাজারি বিস্মিত হইয়া বলিল—তুমি টাকা দিয়েছিলে পদ্মদিদি?

—দেই নি তো কার টাকায় হোটেল চলছিল এতদিন? যা কিছু ছিল সব ওর পেছনে খুইয়েছি।

—কিছু টাকা পাও নি?

—পেটে খেয়েছি আমি, আমার বোনঝি, আমার এক দেওর-পো এই পর্য্যন্ত। পয়সা যে একেবারে পাই নি তা নয়—তবে কত আর হবে তা? বোনঝির বিয়েতে কর্ত্তা-মশায় এক-শ টাকা দিয়েছিলেন—সে আজ সাত বছরের আগের কথা। সাত-শ টাকার সুদ ধর কত হয়?

—টাকা অনেক দিন দিয়েছিলে?

—আজ ন-বছরের ওপর হ'ল। ওই এক-শ টাকা ছাড়া একটা পয়সা পাই নি—কর্ত্তা-মশায় কেবলই ব'লে আসছেন একটু অবস্থা ভাল হোক হোটেলের সব হবে, দেব।

—ওঁকে আগে থেকে জানতে নাকি, না রাণাঘাটে আলাপ?

—সে-সব অনেক কথা ঠাকুর। উনি আমাদের গাঁ ফুলে-নব্‌লার চক্কত্তিদের বাড়ীর ছেলে। ওঁর বাবার নাম ছিল তারাচাঁদ চক্কত্তি—বড় ভাল লোক ছিলেন তিনি। অবস্থাও ভাল ছিল তাঁর—আমাদের কর্ত্তা হচ্ছেন তারাচাঁদ চক্কত্তির বড় ছেলে। লেখাপড়া তেমন শেখেন নি, বললেন রাণাঘাটে গিয়ে হোটেল করব, পদ্ম কিছু টাকা দিতে পার? দিলাম টাকা। সে আজ হয়ে গেল—

হাজারি ঠাকুরের মনে কৌতূহল জাগিলেও সে দেখিল আর অন্য কোনো প্রশ্ন পদ্মদিদিকে না করাই ভাল। গ্রামে এত লোক থাকিতে তারাচাঁদ চক্কত্তির বড় ছেলে তাহার কাছেই টাকা চাহিল কেন, সেই বা টাকা দিল কেন, রাণাঘাটে বেচুর হোটেলে তাহার ঝি-গিরি করা নিতান্ত দৈবাধীন যোগাযোগ না পূর্ব্ব হইতেই অবলম্বিত ব্যবস্থার ফল—এসব কথা হাজারি জিজ্ঞাসা করিলে তাহাকে দোষ দেওয়া যাইত না।

কিন্তু হাজারির বয়স হইয়াছে, জীবনে তাহার অভিজ্ঞতা হইয়াছে কম নয়, সে এ-বিষয়ে কোনো প্রশ্ন না করিয়া বলিল—হ্যাণ্ডনোটগুলো তুলে রেখে দাও পদ্মদিদি ভাল ক'রে। সব ঠিক হয়ে যাবে, টাকাও তোমার হয়ে যাবে—এগুলো রেখে দাও।

পদ্ম কি রকম এক ধরনের হাসি হাসিয়া বলিল—ও সব তুলে রেখে কি করব ঠাকুর? ও-সব কোন্ কালে তামাদি হয়ে ভূত হয়ে গিয়েছে। পড়ে দেখ না ঠাকুর—

হাজারি অপ্রতিভ হইয়া শুধু বলিল—ও!

—যা ছিল কিছু নেই ঠাকুর, সব হোটেলের পেছনে দিয়েছি—আর কি আছে এখন হাতে, ছাই বলতে রাইও না।

শেষের কথাগুলি পদ্মঝি যেন আপন মনেই বলিল, বিশেষ কাহাকেও উদ্দেশ করিয়া নহে। হাজারি অত্যন্ত দুঃখিত হইল। পদ্মঝির এমন অবস্থা সে কখনও দেখে নাই—ভিতরের কথা সে জানিত না, মিছামিছি কত রাগ করিয়াছে পদ্মদিদির উপর!

আরও কিছুক্ষণ বসিয়া হাজারি চলিয়া আসিল, সে কিছুই যখন করিতে পারিবে না

আপাততঃ—তখন অপরের দুঃখের কাহিনী শুনিয়া লাভ কি ?…

বাসায় ফিরিতেই সে এমন একটি দৃশ্য দেখিল যাহাতে সে একটি অদ্ভুত ধরনের আনন্দ ও তৃপ্তি অনুভব করিল।

বাহিরের দিকে ছোট ঘরটার মধ্যে টেঁপির গলা। সে বলিতেছে—নরেনদা, চা না খেয়ে কিছুতেই আপনি এখন যেতে পারবেন না। বসুন।

নরেন বলিতেছে—না, একবার এ-হোটেলে যেতে হবে, তুমি বোঝ না আশা, ইষ্টিশানের হোটেল এখন তো বন্ধ—কিন্তু মামাবাবু আসবার আগে এ-হোটেলের সব দেখাশুনো আমার করতে হবে।

টেঁপির ভাল নাম যে আশালতা, হাজারি নিজেই তা প্রায় ভুলিতে বসিয়াছে—নরেন ইতিমধ্যে কোথা হইতে তাহার সন্ধান পাইল!

টেঁপি পুনরায় আবদারের সুরে বলিল—না ওসব কাজটাজ থাকুক, আপনি আমাকে আর মাকে টকি দেখাতে নিয়ে যাবেন বলেছিলেন—আজ নিয়ে যেতেই হবে।

—কি আছে আজ ?

—আনব ? একখানা টকির কাগজ রয়েছে ও ঘরে। ঢাক বাজিয়ে কাগজ বিলি ক'রে যাচ্ছিল ওবেলা, খোকা একখানা এনেছে—

—যাও চট্ করে গিয়ে নিয়ে এস।

হাজারির ইচ্ছা ছিল না উহাদের কথাবার্ত্তায় সে বাধা দেয়। এমন কি সে একপ্রকার নিঃশব্দেই রোয়াক পার হইয়া যেমন উত্তরের ঘরটার মধ্যে ঢুকিয়াছে, অমনি টেঁপি টকির কাগজের সন্ধানে আসিয়া একেবারে বাবার সামনে পড়িয়া গেল।

টেঁপি পাছে কোনপ্রকার লজ্জা পায়—এজন্য হাজারি অন্যদিকে চাহিয়া বলিল—এই যে টেঁপি। তোর মা কোথায় ?

টেঁপি হঠাৎ যেন কেমন একটু জড়সড় হইয়া গেল। মুখে বলিল—কে, বাবা! কখন এলে ? টের পাই নি তো ?

হাজারির কিন্তু মনে হইল টেঁপি তাহাকে দেখিয়া খুব খুশি হয় নাই। যেন ভাবিতেছে, আর একটু পরে বাবা আসিলে ক্ষতিটা কি হইত।

হাজারির বুকের ভিতরটা কোথায় যেন বেদনায় টনটন করিয়া উঠিল। মেয়েসন্তান, আহা বেচারী! সব কথা কি ওরা গুছিয়ে বলতে পারে, না নিজেরাই বুঝিতে পারে ? টেঁপি কি জানে তার নিজের মনের খবর কি ?

হাজারি বলিল—আমি এখুনি হোটেলে বেরিয়ে যাব টেঁপি। বেলা পাঁচটা বেজে গিয়েছে, আর থাকলে চলবে না। এক গ্লাস জল বরং আমায় দে—

ওঘর হইতে নরেন ডাকিয়া বলিল—মামাবাবু কখন এলেন ?

হাজারি যেন পূর্ব্বে নরেনের কথাবার্ত্তা শুনিতে পায় নাই বা এখানে নরেন উপস্থিত আছে সে-বিষয়ে কিছু জানিত না, এমন ভাব দেখাইয়া বলিল—কে নরেন ? কখন এলে বাবাজী ?

—অনেকক্ষণ এসেছি মামাবাবু—চলুন, আমিও হোটেলে বেরিয়েছি—

বলিতে বলিতে নরেন সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

হাজারি বলিল—একটু জলটল খেয়ে যাও না? হোটেলে এখন ধোঁয়ার মধ্যে গিয়েই বা করবে কি? ব'স ব'স বরং। টেঁপি তোর নরেনদা'র জন্য একটু চা—

—না না থাক মামাবাবু, হোটেলে তো চা এমনিই হবে এখন।

—তা হোক, আমার বাসায় যখন এসেছ, তখন এখান থেকেই চা খেয়ে যাও।

বলিয়া হাজারি বাড়ীর মধ্যের ঘরের দিকে সরিয়া গেল। টেঁপির মা তখনও রান্নাঘরের দাওয়ায় একখানা মাদুর বিছাইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে দেখিতে পাইল। বেচারী চিরকাল খাটিয়াই মরিয়াছে এঁড়োশোলা গ্রামে—এখন চাকরে যখন প্রায় সব কাজই করিয়া দেয় তখন সে জীবনটাকে একটু উপভোগ করিয়া লইতে চায়।

হাজারি স্ত্রীকেও জাগাইল না। সবাই মিলিয়া বড় কষ্ট করিয়াছে চিরকাল, এখন সুখের মুখ যখন দেখিতেছে—তখন সে তাহাতে বাদ সাধিবে না। টেঁপির মা ঘুমাইয়া থাকুক।

বাড়ীর বাহির হইতে যাইতেছে, নরেন মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে একটু লাজুক সুরে বলিল—মামাবাবু—এই গিয়ে আশা বলছিল—মামীমাকে নিয়ে আর ওকে নিয়ে একবার টকি দেখিয়ে আনার কথা—তা আপনি কি বলেন?

টেঁপিই যে একথা তাহার কাছে বলিতে নরেনকে অনুরোধ করিয়াছে, এ-বিষয়ে হাজারির সন্দেহ রহিল না। তাহার মনে কৌতুক ও আনন্দ দুই-ই দেখা দিল। ছেলেমানুষ সব, উহাঁরা কি করে না-করে বয়োবৃদ্ধ লোকে সব বুঝিতে পারে, অথচ বেচারীরা ভাবে তাহাদের মনের খবর কেহ কিছু রাখে না।

সে ব্যস্ত হইয়া বলিল—তা যাবে যাও না! আজই যাবে? পয়সা-কড়ি সব তোমার মামীমার কাছে আছে, চেয়ে নাও! কখন ফিরবে?

—রাত আটটা হবে মামাবাবু—আপনি নিজে ইষ্টিশানে যদি গিয়ে বসেন একটু—

—আচ্ছা তা হোক, ইষ্টিশানে আমি যাব এখন, সে তুমি ভেবো না। তুমি ওদের নিয়ে যাও—ও টেঁপি, ডেকে দে তোর মাকে। অবেলায় পড়ে ঘুমুচ্ছে, ডেকে দে। যাস যদি তবে সব তৈরি হয়ে নে—

হাজারি আর বিলম্ব না করিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল। বালকবালিকাদের আমোদের পথে সে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে চায় না। প্রথমে বাজারের হোটেলে আসিয়া এ-বেলার রান্নার সব ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বেলা পড়িলে সে আসিল স্টেশন প্ল্যাট্‌ফর্মের হোটেলে। এখানে সে বড় একটা বসে না। নরেনই এখানকার ম্যানেজার। এ সব সাহেবী ধরনের ব্যবস্থা তাহার যেন কেমন লাগে।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। চাটগাঁ মেল আসিবার বেশী বিলম্ব নাই—বনগ্রামের গাড়ীও এখনি ছাড়িবে। এই সময় হইতে রাত্রি সাড়ে এগারোটা পর্য্যন্ত সিরাজগঞ্জ, ঢাকা মেল,

নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস প্রভৃতি বড় বড় দূরের ট্রেনগুলির ভিড়। যাত্রীরা যাতায়াত করে বহু, অনেকেই খায়। হাজারির আশা ছাড়াইয়া গিয়াছে এখানকার খরিদ্দারের সংখ্যা।

স্টেশনের হোটেলে দুজন নূতন লোক রান্না করে। এখানে বেশীর ভাগ লোকে চায় ভাত আর মাংস—সেজন্য ভাল মাংস রান্না করিতে পারে এরূপ লোক বেশী বেতন দিয়া রাখিতে হইতেছে। পরিবেশন করিবার জন্য আছে তিনজন চাকর—এক-একদিন ভিড় এত বেশী হয় যে, ও হোটেল হইতে পরিবেশনের লোক আনাইতে হয়।

হাজারিকে দেখিয়া পাচক ও ভৃত্যেরা একটু সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। সকলেই জানে হাজারি তাহাদের আসল মনিব, নরেন ম্যানেজার মাত্র। তাহারা ইহাও ভাল জানিয়াছে যে হাজারির পদতলে বসিয়া তাহারা এখন দশ বৎসর রান্না-কাজ শিখিতে পারে—সুতরাং হাজারিকে শুধু তাহারা যে মনিব বলিয়া সমীহ করে তাহা নয়, ওস্তাদ কারিগর বলিয়া শ্রদ্ধা করে।

একজন রাঁধুনীর নাম সতীশ দীঘ্‌ড়ি। বাড়ী হুগলী জেলার কোনো পাড়াগাঁয়ে, রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। খুব ভাল রান্নার কাজ জানে, পূর্ব্বে ভাল ভাল হোটেলে মোটা মাহিনায় কাজ করিয়াছে—এমন কি একবার জাহাজে সিঙ্গাপুর পর্য্যন্ত গিয়াছিল—সেখানে এক শিখ হোটেলেও কিছুদিন কাজ করিয়াছে। সতীশ নিজে ভাল রাঁধুনী বলিয়া হাজারির মর্ম্ম খুব ভাল করিয়াই বোঝে এবং যথেষ্ট সম্মান করিয়া চলে।

হাজারি তাহাকে বলিল—কি দীঘ্‌ড়ি মশাই, রান্না সব তৈরী হোল?

সতীশ বিনীত সুরে বলিল—একবার দয়া করে আসুন কর্ত্তা, মাংসটা একবার দেখুন না?

—ও আমি আর কি দেখব, আপনি যেখানে রয়েছেন—

—অমন কথা বলবেন না কর্ত্তা, অন্য কেউ আপনাকে বোঝে না-বোঝে আমি তো আপনাকে জানি—এসে একবার দেখিয়ে যান—

হাজারি রান্নাঘরে গিয়া কড়ার মাংসের রং দেখিয়া বলিল—রং এরকম কেন দীঘ্‌ড়ি মশায়?

সতীশ উৎফুল্ল হইয়া অপর রাঁধুনীকে বলিল—বলেছিলাম না কার্ত্তিক? কর্ত্তা চোখে দেখলেই ধরে ফেলবেন? কুঁদের মুখে বাঁক থাকে কখনো? কর্ত্তা যদি কিছু মনে না করেন, কি দোষ হয়েছে আপনাকে ধরে দিতে হবে আজ।

হাজারি হাসিয়া বলিল—পরীক্ষা দিতে হবে দীঘ্‌ড়ি মশাই আবার এ বয়সে? লঙ্কার বাটনা হয় নি—পুরনো লঙ্কা, তাতেই রং হয় নি। রং হবে শুধু লঙ্কার গুণে।

—কর্ত্তা মশাই, সাধে কি আপনার পায়ের ধুলো মাথায় নিতে ইচ্ছে করে? কিন্তু আর একটা দোষ হয়েছে সেটাও ধরুন।

হাজারি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মাংসের কড়ার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া বলিল—কষামাংসে যে গরম জল ঢেলেছিলেন, তা ভাল ফোটে নি। সেই জন্যে প্যাঁজা উঠেচে। ওতে মাংস জঠর হয়ে যাবে।

সতীশ অন্য পাচকের দিকে চাহিয়া বলিল—শোন কার্ত্তিক, শোন। আমি বলছিলাম না তোমায় জল ঢালবার সময় যে এতে প্যাঁজা উঠেছে আর মাংস নরম হবে না? আর কর্ত্তা-মশায় না দেখে কি করে বুঝে ফেলেচেন দ্যাখ। ওস্তাদ বটে আপনি কর্ত্তা।

হাজারি হাসিয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় চট্টগ্রাম মেল আসিয়া সশব্দে প্ল্যাটফর্ম্মে ঢুকিতেই কথার সূত্র ছিঁড়িয়া গেল। হোটেলের লোকজন অন্যদিকে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

বেশ ভালো ঘর। বিজলী আলো জ্বলিতেছে। মার্ব্বেল পাথরের টেবিলে বাবু খরিদ্দারেরা খাইতেছে চেয়ারে বসিয়া। ভীষণ ভীড় খরিদ্দারের—ওদিকে বনগাঁ লাইনের ট্রেনও আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কলরব, হৈ-চৈ, ব্যস্ততা, পয়সা গুনিয়া কূল করা যায় না—এই তো জীবন। বেচু চক্কত্তির হোটেলের রান্নাঘরে বসিয়া হাতাবেড়ি নাড়িতে নাড়িতে এই রকম একটা হোটেলের কল্পনা করিতে সে কিন্তু কখনও সাহস করে নাই। এত সুখও তার অদৃষ্টে ছিল! পদ্মদিদির কত অপমান আজ সার্থক হইয়াছে এই অপ্রত্যাশিত কর্ম্মব্যস্ত হোটেল-জীবনের মধ্যে! আজ কাহারও প্রতি তাহার কোন বিদ্বেষ নাই।

হঠাৎ হাজারির মনে পড়িল চাকদহ হইতে হাঁটাপথে গোপালনগরে যাইবার সময় সেই ছোট্ট গ্রামের গোয়ালাদের বাড়ীর বধূটির কথা। হাজারি তাহাকে কথা দিয়াছিল তাহার টাকা হাজারি ব্যবসায়ে খাটাইয়া দিবে। সে কাল যাইবে। গরীব মেয়েটির টাকা খাটাইবার এই ভাল ক্ষেত্র। বিশ্বাস করিয়া দিতে চাহিল হাজারির দুঃসময়ে—সুসময়ে সেই সরলা মেয়েটির দিকে তাহাকে চাহিতে হইবে। নতুবা ধর্ম্ম থাকে না।

পরদিন সকালেই হাজারি নতুন পাড়া রওনা হইল। চাকদা স্টেশন পর্য্যন্ত অবশ্য ট্রেনে আসিল—বাকী পথটুকু হাঁটিয়াই চলিল।

সেই রকম বড় বড় তেঁতুল গাছ ও অন্যান্য গাছের জঙ্গলে দিনমানেই এ পথে অন্ধকার। হাজারির মনে পড়িল সেবার যখন সে এ পথে গিয়াছিল, তখন রাণাঘাট হোটেলের চাকুরি তাহার সবে গিয়াছে—হাতে পয়সা নাই, পথ হাঁটিয়া এই পথে সে চাকুরি খুঁজিতে বাহির হইয়াছিল। আর আজ?

আজ অনেক তফাৎ হইয়া গিয়াছে। এখন সে রাণাঘাটের বাজারে দুটি বড় হোটেলের মালিক। তার অধীনে দশ-বারো জন লোক খাটে। যে মেয়েটির জন্য আজ তার এই উন্নতি, হাজারির সাধ্য নাই তাহার বিন্দুমাত্র প্রত্যুপকার সে করে—অতসী-মা বড়মানুষের মেয়ে, তার উপর সে বিবাহিতা—হাজারি তাহাকে কি দিতে পারে?

কিন্তু তাহার বদলে যে দুটি-একটি সরলা দরিদ্র মেয়ে তাহার সংস্পর্শে আসিয়াছে, সে তাহাদের ভাল করিবার চেষ্টা করিতে পারে। নতুন পাড়ার গোয়ালা-বউটি ইহাদের মধ্যে একজন। নতুন পাড়া পৌছিতে বেলা প্রায় ন'টা বাজিল। গ্রামের মধ্যে হঠাৎ না ঢুকিয়া হাজারি পথের ধারের একটা তেঁতুল গাছের ছায়ায় কাহাদের একখানা গরুর গাড়ী পড়িয়া

আছে, তাহার উপর আসিয়া বসিল। সর্ব্বাঙ্গে ঘাম, এক হাঁটু ধুলা—একটু জিরাইয়া লইয়া ঘাম মরিলে সম্মুখের ক্ষুদ্র ডোবাটার জলে পা ধুইয়া জুতা পায়ে দিয়া ভদ্রলোক সাজিয়া গ্রামে ঢোকাই যুক্তিসঙ্গত।

একটি প্রৌঢ়বয়স্ক পথিক যশোরের দিক হইতে আসিতেছিল, হাজারিকে দেখিয়া সে কাছে গিয়া বলিল—দেশলাই আছে ?

—আছে, বসুন।

—আপনারা ?

—ব্রাহ্মণ।

—প্রণাম হই, একটু পায়ের ধুলো দেন ঠাকুরমশাই।

লোকটির নাম কৃষ্ণলাল, জাতিতে শাঁখারি, বাড়ী পূর্ব্ববঙ্গ অঞ্চলে। কথাবার্ত্তায় বেশ টান আছে পূর্ব্ববঙ্গের। বনগ্রামে ইছামতীর ঘাটে তাহাদের শাঁখার বড় ভড় নোঙর করিয়া আছে, কৃষ্ণলাল পায়ে হাঁটিয়া এ অঞ্চলের গ্রামগুলি এবং ক্রেতার আনুমানিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখিতে বাহির হইয়াছে।

কাজের লোক বেশীক্ষণ বসে না। একটা বিড়ি ধরাইয়া শেষ করিবার পূর্ব্বেই কৃষ্ণলাল উঠিতে চাহিল। হাজারি কথাবার্ত্তায় তাহাকে বসাইয়া রাখিল। বনগাঁ হইতে সতেরো মাইল পথ হাঁটিয়া ব্যবসার খোঁজ লইতে বাহির হইয়াছে যে লোক, তাহার উপর অসীম শ্রদ্ধা হইল হাজারির। ব্যবসা কি করিয়া করিতে হয় লোকটা জানে।

সে বলিল—গাঁজাটাজা চলে ? আমার কাছে আছে—

কৃষ্ণলাল একগাল হাসিয়া বলিল—তা ঠাকুরমশায়—পেরসাদ যদি দেন দয়া ক'রে—তবে তো ভাগ্যি।

—বোসো তবে, এক ছিলিম সাজি।

হাজারি খুব বেশী যে গাঁজা খায়, তা নয়। তবে উপযুক্ত সঙ্গী পাইলে এক-আধ ছিলিম খাইয়া থাকে। আজকাল রাণাঘাটে গাঁজা খাইবার সুবিধা নাই, হোটেলের সকলে খাতির করে, তাহার উপর নরেন আছে—এই সব কারণে হোটেলে ও ব্যাপার চলে না—বাসায় তো নয়ই, সেখানে টেঁপি আছে। আবার যাহার তাহার সঙ্গেও গাঁজা খাওয়া উচিত নয়, তাহাতে মান থাকে না। আজ উপযুক্ত সঙ্গী পাইয়া হাজারি হৃষ্টমনে ভাল করিয়া ছিলিম সাজিল। কলিকাটি ভদ্রতা করিয়া কৃষ্ণলালের হাতে দিতে যাইতেই কৃষ্ণলাল এক হাত জিভ কাটিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল—বাপরে, আপনারা দেবতা। পেরসাদ করে দিন আগে—

কথায় কথায় হাজারি নিজের পরিচয় দিল। কৃষ্ণলাল খুশি হইল, সেও বাজে লোকের সঙ্গে মিশিতে ভালবাসে না—নিজের চেষ্টায় যে রাণাঘাটের বাজারে দুটি বড় বড় হোলেটের মালিক, তাহার সহিত বসিয়া গাঁজা খাওয়া যায় বটে।

হাজারি বলিল—রাণাঘাটে তো যাবে, আমার হোটেলেই উঠো। রেলবাজারে আমার

নাম বললেই সবাই দেখিয়ে দেবে। পয়সা দিও না কিন্তু, আমি সই দিয়ে দিচ্ছি—তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

কৃষ্ণলাল পুনরায় হাতজোড় করিয়া বলিল—আজ্ঞে ওইটি মাপ করতে হবে কর্ত্তা। আপনার হোটেলেই উঠবো—কিন্তু বিনি পয়সায় খেতে পারব না। ব্যবসার নিয়ম তা নয়, নেষ্য নেবে, নেষ্য দেবে। এ না হলে ব্যবসা চলে না। ও হুকুম করবেন না ঠাকুরমশায়।

—বেশ, তা যা ভাল বোঝো।

কৃষ্ণলাল পুনরায় পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া বিদায় লইল।

হাজারি গ্রামের মধ্যে ঢুকিয়া শ্রীচরণ ঘোষের বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিল। শ্রীচরণ ঘোষ বাড়ীতেই ছিল, হাজারিকে দেখিয়া চিনিতে পারিল তখনই। এসব স্থানে কালেভদ্রে লোকজন আসে—কাজেই মানুষের মুখ মনে থাকে অনেক দিন।

বউটি সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিল। গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—বলেছিলেন যে দু-মাসের মধ্যে আসবেন খুড়োমশায়? দু-বছর আড়াই বছর হয়ে গেল যে! মনে পড়ল এতদিন পরে মেয়ে বলে?

—তা তো পড়লো মা। এস সাবিত্রীসমান হও মা, বেশ ভাল আছ?

—আপনি যেরকম রেখেছেন। আপনাদের বাড়ীর সব ভাল খুড়োমশায়?

—তা এখন একরকম ভাল।

—কুসুমদিদির সঙ্গে দেখা হয়েছিল, ভাল আছে?

—হ্যাঁ, ভাল আছে।

—আমার কথা বলেছিলেন?

হাজারি বিপদে পড়িল। ইহার এখান হইতে সেবার সেই যাইবার পরে গোপালনগরে চাকুরি করিল অনেক দিন, তারপর কতদিন পরে রাণাঘাটে গিয়া কুসুমের সহিত দেখা—ইহার কথা তখন কি আর মনে ছিল?

—ইয়ে, ঠিক মনে পড়ছে না বলেছিলাম কিনা। নানা কাজে ব্যস্ত থাকি, সব সময় সব কথা মনেও পড়ে না ছাই। বুড়োও তো হয়েছি মা—

—আহা বুড়ো হয়েচেন না আরও কিছু! আমার পিসেমশায়ের চেয়ে আপনি তো কত ছোট!

—কে গঙ্গাধর? হ্যাঁ, তা গঙ্গাধর আমার চেয়ে অন্ততঃ ষোল-সতেরো বছরের বড়।

—বসুন খুড়োমশায়, আমি আপনার হাত-পা ধোয়ার জল আনি—

শ্রীচরণ ঘোষ তামাক সাজিয়া আনিয়া হাতে দিয়া বলিল—আপনি তো দাঠাকুর বউমার বাপের বাড়ীর গাঁয়ের লোক—সব শুনেচি আমরা সেবার আপনি চলে গেলে। বউমা সব পরিচয় দেলেন।

হাজারি বলিল—সে বউটির বাপের বাড়ীর গাঁয়ের লোক নয়, তবে তাহার পিসিমার

শ্বশুরবাড়ীর গ্রামের লোক বটে এবং বউয়ের পিতৃকুলের সহিত তাহার বহুদিন হইতে জানাশোনা আছে বটে।

শ্রীচরণ বলিল—দাঠাকুর আমরা ছোট জাত, বলতে সাহস হয় না—যখন এবার পায়ের ধুলো দিয়েছেন তখন দু-চার দিন এখানে এবার থাকুন না কেন? বউমারও বড্ড সাধ আপনি দুদিন থাকেন, আমায় বলতি বলেচে আপনাকে।

হাজারি এখানে কুটুম্বিতার নিমন্ত্রণ খাইতে আসে নাই, এমন কি আজ ওবেলা রওনা হইতে পারিলেই ভাল হয়। দুটি বড় হোটেলের কাজ, সে না থাকিলে সব বিশৃঙ্খল হইয়া যাইবে—হাজার কাজ বুঝিলেও নরেন এখনও ছেলেমানুষ। তাহার উপর দুই হোটেলের ক্যাশের দায়িত্ব রাখা ঠিক নয়।

রান্না করিবার সময় বউটিও ঠিক ওই অনুরোধ করিল। এখন দুদিন থাকিয়া যাইতে হইবে, যাইবার তাড়াতাড়ি কিসের? সেবার ভাল করিয়া সেবাযত্ন না করিতে পারিয়া উহাদের মনে কষ্ট আছে, এবার তাহা হইতে দিবে না।

হাজারি হাসিয়া বলিল—মা, সেবার দুদিন থাকলে কোনো ক্ষেতি ছিল না—কিন্তু এবার তা আর ইচ্ছে করলেও হবার জো নেই।

হাজারির কথার ভাবে বউটি অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—কেন খুড়োমশায়? এবার থাকতে পারবেন না কেন? কি হয়েচে?

—সেবার চাকুরি ছিল না বলেছিলাম মনে আছে?

—এবার চাকুরি হয়েচে, তা বুঝতে পেরেচি। ভালই তো—ভগবান ভালই করেচেন। কোথায় খুড়োমশায়?

—গোপালনগরে।

—ও! তাই এ রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্চেন বুঝি?

—ঠিক বুঝেচ মা। মায়ের আমার বড্ড বুদ্ধি!

বধূটি সলজ্জ হাসিয়া বলিল—আহা, এর মধ্যে আবার বুদ্ধির কথা কি আছে খুড়োমশায়?

—বেশ, কিন্তু তুমি বঁটি দেখে কোটো মা। আঙুল কেটে ফেলবে। ঝিঙেগুলো ধুয়ে ফেল এবার—

—গোপালনগরের কোথায় চাকুরি করচেন খুড়োমশায়?

—কুণ্ডুদের বাড়ী।

—খুব বড়লোক বুঝি?

—নিশ্চয়ই। নইলে রাঁধুনী রাখে কখনো পাড়াগাঁয়ে? খুব বড়লোক।

—ওদের বাড়ী পূজো হয় খুড়োমশায়?

—খুব জাঁকের পূজো হয়। মস্ত প্রতিমে। যাত্রা, পাঁচালি—

আমায় নিয়ে দেখিয়ে আনবেন এবার পূজোর সময়? আপনার কোনো হাংনামা পোয়াতে হবে না। আমাদের বাড়ীর গরুর গাড়ী আছে, তাতে উঠে বাপে-ঝিয়ে যাবো।

আবার তার পরদিন দেখেশুনে ফিরবো। কেমন?

—বেশ তো।

—নিয়ে যাবেন তাহলে, কথা রইল কিন্তু। আমি কখনো কোনো জায়গায় যাই নি খুড়োমশায়, বাপের বাড়ীর গাঁ আর শ্বশুরবাড়ীর গাঁ—হয়ে গেল। আমার বড্ড কোনো জায়গায় যেতে দেখতে ইচ্ছে করে। তা কে নিয়ে যাচ্ছে?

হাজারির মনে অত্যন্ত কষ্ট হইল। মেয়েটিকে একটু শহর-বাজারের মুখ তাহাকে দেখাইতেই হইবে। সে বুঝাইয়া বলিল, তাহার দ্বারা যাহা হইবার তাহা সে করিবেই। পাকা কথা থাকিল।

একবার তামাক খাইয়া লইয়া বলিল—মা, সেই টাকার কথা মনে আছে?

—হ্যাঁ খুড়োমশায়। টাকা আপনার দরকার?

—কত দিতে পারবে?

—তখন ছিল আশি টাকা—এই দু-বছরে আর গোটা কুড়ি হয়েছে।

বধূটি লজ্জায় মুখ নিচু করিয়া বলিল—আপনার জামাই লোক ভাল। গত সন তামাক পুঁতে দু-পয়সা লাভ করেছিল, আমায় তা থেকে কুড়িটা টাকা এনে দিয়ে বললে, ছোট বৌ রেখে দাও। এ তোমার রইল।

—বেশ, টাকাটা আমায় দিয়ে দাও সবটা।

—নিয়ে যান। আমি তো বলেছিলামই সেবার—

—ভাল মনে দিচ্ছ তো মা?

বধূ জিভ কাটিয়া বলিল—অমন কথা বলবেন না খুড়োমশায়, আপনি আমার বাপের বয়িসী ব্রাহ্মণ দেবতা—দুটো কানা কড়ি আপনার হাতে দিয়ে অবিশ্বাস করব, এমন মতি যেন ভগবান না দেন।

মেয়েটির সরল বিশ্বাসে হাজারির চোখে জল আসিল। বলিল—বেশ, তাই দিও। সুদ কি রকম নেবে?

—যা আপনি দেবেন। আমাদের গাঁয়ে টাকায় দু-পয়সা রেট্—

—তাই পাবে আমার কাছে।

হাজারি খাইতে বসিয়া কেবলই ভাবিতেছিল মাত্র এক শত টাকার মূলধনে মেয়েটিকে সে এমন কিছু বেশী লাভের অংশ দিতে পারিবে না তো। অংশীদার সে করিয়া লইবে তাহাকে নিশ্চয়ই—কিন্তু এক শত টাকায় কত আর বার্ষিক লভ্যাংশ পড়িবে। হাজারির ইচ্ছা মেয়েটিকে সে আরও কিছু বেশী করিয়া দেয়। রেলওয়ে হোটেলের অংশে যে অন্য কাহারও নাম থাকিবার উপায় নাই—নতুবা ওখানকার আয় বেশী হইত বাজারের হোটেলের চেয়ে।

খাওয়া-দাওয়ার পর অল্পক্ষণ মাত্র বিশ্রাম করিয়াই হাজারি রওনা হইল—যাইবার পূর্ব্বে বৌটি হাজারির নিকট এক শত টাকা গুণিয়া দিল। হাজারি রাণাঘাট হইতেই

একখানা হ্যাণ্ডনোট একেবারে টিকিট মারিয়া আনিয়াছিল, কেবল টাকার অঙ্কটি বসাইয়া নাম সই করিয়া দিল। হাজারির অত্যন্ত মায়া হইল মেয়েটির উপর। যাইবার সময় সে বার বার বলিল—এবার যখন আসবো, শহর ঘুরিয়ে নিয়ে আসবো কিন্তু মনে থাকে যেন মা।

—গোপালনগর ?

—যেখানে বল তুমি।

—আবার কবে আসবেন ?

—দেখি, এবার হয়তো বেশী দেরি হবে না।

এখান হইতে নিকটেই বেলের বাজার—ক্রোশ দুয়ের মধ্যে। হাজারির অত্যন্ত ইচ্ছা হইল বেলের বাজারে সেবার যে মুদীর দোকানে আশ্রয় লইয়াছিল, তাহার সহিত একবার দেখা করে। জ্যোৎস্না রাত আছে, শেষ রাত্রের দিকে বেলের বাজার হইতে বাহির হইলেও বেলা আটটার মধ্যে রাণাঘাট পৌছানো যাইবে।

বেলের বাজারের মুদী হাজারিকে দেখিয়া চিনিল। খুব যত্ন করিয়া থাকিবার জায়গা করিয়া দিল। তামাক সাজিয়া ব্রাহ্মণের হুঁকায় জল ফিরাইয়া হাজারির হাতে দিয়া বলিল—ইচ্ছে করুন, ঠাকুরমশায়। তা এখন আপনার কি করা হয় ? সেবার তো চাকুরির চেষ্টায় বেরিয়ে ছিলেন—

—হ্যাঁ সেবার তো চাকুরি পেয়েওছিলাম—গোপালনগরে কুণ্ডুবাবুদের বাড়ী।

—ও! তা বেশ বেশ। গোপালনগরের কুণ্ডুবাবুরা এদিগরের মধ্যে নাম-করা বড়লোক। লোকও তেনারা শুনিচি বড় ভাল। কত মাইনে দেয় ঠাকুরমশাই ?

—তা দিত দশ টাকা আর খাওয়া-পরা।

—ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়েছিলেন বুঝি ? এখন গোপালনগরেই যাবেন তো ?

—না, আমি আর সেখানে নেই।

মুদী দুঃখিত স্বরে বলিল—আহা! সে চাকুরি নেই ? তবে এখন কি—

হাজারি বসিয়া বসিয়া তাহার হোটেলের ইতিহাস আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিল। দোকানী পাকা ব্যবসাদার; ইহার কাছে এ গল্প করিয়া সুখ আছে, ব্যবসা কাহাকে বলে এ বোঝে।

রাত প্রায় সাড়ে আটটা বাজিল। হাজারির গল্প শুনিয়া মুদী তাহাকে অন্য চোখেই দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে, সম্ভ্রমের সহিত বলিল—ঠাকুরমশাই, রাত হয়েছে, রসুয়ের যোগাড় করে দিই। তবে একটা কথা, আমার দোকানের জিনিসপত্তরের দাম এক পয়সা দিতে পারবেন না—

—সে কি কথা!

—না ঠাকুরমশায়, এখন তো পথ-চলতি খদ্দের নন, আমারই মত ব্যবসাদার, বন্ধু লোক। আমার দোকানে দয়া করে পায়ের ধুলো দিয়েছেন, আমার যা জোটে, দুটি বিদুরের খুদ-খেয়ে

যান। আবার রাণাঘাটে যখন আপনার হোটেলে যাব, তখন আপনি আমায় খাওয়াবেন।

হাজারি জানে এ অঞ্চলের এই রকমই নিয়ম বটে। ব্যবসাদার লোকদের পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট সহানুভূতি ও খাতির এখনও এই সব পাড়াগাঁ অঞ্চলে আছে। রাণাঘাটের মত শহর জায়গায় রেষারেষির আবহাওয়ায় উহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

রাত্রে দোকানী বেশ ভাল খাওয়া-দাওয়ার যোগাড় করিয়া দিল। ঘি ময়দা আনিয়া দিল, লুচি ভাজিয়া খাইতে হইবে, হাজারির কোনো আপত্তিই টিকিল না। ছোট একটা রুই মাছ কোথা হইতে আনিয়া হাজির করিল। টাটকা পটল, বেগুন, প্রায় আধ সের ঘন দুধ, বেলের বাজারের উৎকৃষ্ট কাঁচাগোল্লা সন্দেশ।

হাজারি দস্তুরমত লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। এমন জানিলে সে এখানে আসিত না। মিছামিছি বেচারীর দণ্ড করা, অথচ সে-কথা বলিতে গেলে লোকটি মহা দুঃখিত হইবে। এই ধরনের নিঃস্বার্থ আতিথেয়তা শহর-বাজারে হাজারির চোখে পড়ে নাই—এই সব পল্লী-অঞ্চলেই এখনও ইহা আছে, হয়তো দু-দশ বছর পরে আর থাকিবে না।

পরদিন সকালে হাজারি দোকানীর নিকট বিদায় লইল বটে, কিন্তু রাণাঘাট না আসিয়া হাঁটাপথে গোপালনগর চলিল। তাহার পুরানো মনিব-বাড়ী, সেখানে তাহার একটা কাপড়ের পুঁটুলি আজও পড়িয়া আছে—আনি আনি করিয়া আনা আর হইয়া উঠে নাই।

পথে বেলা চড়িল।

পথের ধারে বনজঙ্গলে ঘেরা ছোট্ট পুকুরটি দেখিয়া হাজারির মনে পড়িল ইহারই কাছে শ্রীনগর সিমলে গ্রাম।

হাজারি গ্রামের মধ্যে ঢুকিল, তাহার বড় ইচ্ছা হইল সেবার যাঁহার বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিল, সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করিয়া তবে যাইবে। অনেক দিন পরে যখন এ পথে আসিয়াছে, তখন তাঁহার সংবাদ লওয়াটা দরকার বটে।

বিহারী বাঁড়ুয্যে মশায় বাড়ীতেই ছিলেন। এই দুই বৎসরে চেহারা তাঁহার আরও ম্যালেরিয়াশীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, মাথার চুল সবগুলি পাকিয়া গিয়াছে, সম্মুখের দু-একটি দাঁত পড়িয়াছে। বাঁড়ুয্যে মশায় হাজারিকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন, গ্রাম্য আতিথেয়তার কোনো ত্রুটি হইল না—তখনই হাত-পা ধুইবার জল আনিয়া দিলেন এবং এ-বেলা অন্ততঃ থাকিয়া আহার না করিয়া তাহার যে যাইবার উপায় নাই এ-কথাটিও হাজারিকে জানাইয়া দিলেন। বাড়ীর সম্মুখস্থ নারিকেল গাছে ডাব পাড়িবার জন্য তখনই লোক উঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

গ্রামে তখনই লোক ছিল না তত, এ দু-বছরে যেন আরও জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে।

বাঁড়ুয্যেমশায়ের বাড়ীর উত্তর দিকের বাঁশবনের ওপারে সেবার একঘর গৃহস্থ ছিল, হাজারির মনে আছে—এবার সেখানে শূন্য ভিটা পড়িয়া আছে। বিহারী বাঁড়ুয্যে বলিলেন—কে, ও দুলাল তো? না ওদের আর কেউ নেই। দুলাল আর তার ভাই নেপাল এক কার্ত্তিক মাসে মারা গেল—দুলালের বৌ বাপের বাড়ী চলে গেল, ছেলেটা মেয়েটার হাত ধরে, আর নেপাল তো বিয়েই করে নি। কাজেই ভিটে সমভূম হয়ে গেল। আর গাঁ সুদ্ধ হয়েছে এই দশা। তা আপনি আসবেন বলেছিলেন আসুন না? ঐ দুলালের ভিটেতে ঘর তুলুন কিংবা চলে আসুন আমার এই রাস্তার ধারের জমি দিচ্ছি আপনাকে। আমাদের গাঁয়ে এখন লোকের দরকার—আপনি আসুন খুব ভাল ধানের জমি দেবো আপনাকে আর আম-কাঁঠালের বাগান। কত চান? বড় বড় আম-কাঁঠালের বাগান পড়ে রয়েছে ঘোর জঙ্গল হয়ে পূব পাড়ায়। লোক নেই মশায়, কে ভোগ করবে আম-কাঁঠালের বাগান? আপনি আসুন, চারখানা বড় বড় বাগান আপনাকে জমা দিয়ে দিচ্ছি। আমাদের গাঁয়ের মত খাদ্যসুখ কোথাও পাবেন না, আর এত সস্তা! দুধ বলুন, ফলফুলুরি বলুন, মাছ বলুন—সব সস্তা।

হাজারি ভাবিল, জিনিস সস্তা না হইয়া উপায় কি? কিনিবার লোক কে আছে? একটা কথা তাহার মনে হওয়াতে সে বিহারী বাঁড়ুয্যেকে জিজ্ঞাসা করিল—গাঁয়ে লোক নেই তো জিনিসপত্তর তৈরী করে কে? এই তরি-তরকারি দুধ?

বাঁড়ুয্যে মশায় বলিলেন—ওই যে—আপনি বুঝতে পারলেন না! ভদ্দরলোক মরে হেজে যাচ্ছে কিন্তু চাষালোকের বাড়বাড়ন্ত খুব। সিমলে গাঁয়ের বাইরে মাঠের মধ্যে দেখবেন একশো ঘর চাষী কাওরী আর বুনোর বাসা। ওদের মধ্যে মশায় ম্যালেরিয়া নেই, যত রোগ বালাই সব কি এই ভদ্দরলোকের পাড়ায় মশায়? পাড়াকে পাড়া উজোড় করে দিলে একেবারে রোগে!

বিহারী বাঁড়ুয্যের চারিটি ছেলে, বড় ছেলেটির বছরখানেক হইল বিবাহ দিয়াছেন, বলিলেন। সে ছেলেটির স্বাস্থ্য এত খারাপ যে হাজারির মনে হইল এ গ্রামে আর দু-তিন বছর এভাবে যদি ছেলেটি কাটায় তবে বাঁড়ুয্যে মশায়ের পুত্রবধূকে কপালের সিঁদুর এবং হাতের নোয়ার মায়া কাটাইতেই হইবে।

কিন্তু সে ছেলেটির বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও যাইবার উপায় নাই, জমিজমা, চাষ-আবাদের সমস্ত কাজই তাহাকে দেখিতে হয়—বৃদ্ধ বাঁড়ুয্যে মশায় একরূপ অশক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। বড় ছেলেটিই একমাত্র ভরসা। তাহার উপর ছেলেটি লেখাপড়া এমন কিছু জানে না যে বিদেশে বাহির হইয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে, তাহার বিদ্যার দৌড় গ্রামের উচ্চ প্রাথমিক পাঠশালা পর্য্যন্ত—শুধু তাহার কেন, অন্য ছেলেগুলিরও তাই।

তবুও হাজারি বলিল—বাঁড়ুয্যেমশায় একটা কথা বলি। আপনি যদি কিছু মনে না করেন। আপনার একটি ছেলেকে আমি রাণাঘাটে নিয়ে গিয়ে হোটেলের কাজে ঢুকিয়ে দিতে পারি—ক্রমে বেশ উন্নতি করতে পারে—

বিহারী বাঁড়ুয্যে বলিলেন—ভাত-বেচা হোটেলে? না, মাপ করবেন। ও-সব আমাদের দ্বারা হবে না। আমাদের বংশে ও-সব কখনো—ও কাজ আমাদের নয়।

হাজারি আর কিছু বলিতে সাহস করিল না।

শ্রীনগর সিমলে হইতে বাহির হইয়া যখন সে আবার বড় রাস্তায় উঠিল তখন সেবারকারের মতই সে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। অমন নিরুপদ্রব নিশ্চিন্ত সুখ মৃত্যুর সামিল—ও সুখ তাহার সহ্য হইবে না।

গোপালনগরে পৌঁছিতে বেলা পাঁচটা বাজিল।

গোপালনগরের কুণ্ডুবাড়ী পৌঁছিতেই হাজারি যথেষ্ট খাতির পাইল। কুণ্ডুদের বড়কর্ত্তা খুশি হইয়া বলিলেন—আরে, হাজারি ঠাকুর যে, কোথায় ছিলেন এতদিন? আসুন—আসুন।

বাড়ীর মেয়েরাও খুশি হইল। হাজারি ঠাকুরের রান্না সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে আজও তাহারা বলাবলি করে। লোকটা যে গুণী এ বিষয়ে বাড়ীর লোকদের মধ্যে মতভেদ নাই। ইহারা হাজারির পুরানো মনিব সুতরাং সে ইহাদের ন্যায্য প্রাপ্য সম্মান দিতে ত্রুটি করিল না। বড়বাবুর স্ত্রী বলিলেন—ঠাকুরমশায়, দু-দিনের ছুটি নিয়ে গেলেন, আর দু-বছর দেখা নেই, ব্যাপার কি বলুন তো? মাইনে বাকী তাও নিলেন না। হয়েছিল কি?

ইহারা ব্রাহ্মণকে যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকে, রসুইয়ে ব্রাহ্মণের প্রতিও সে সম্মান প্রদর্শনের কার্পণ্য নাই। মেজকর্ত্তার মেয়ে নির্ম্মলার সেবার বিবাহ হইয়াছিল—সে শ্বশুরবাড়ীতে থাকিবার সময়েই হাজারি উহাদের চাকুরি ছাড়িয়া দেয়। নির্ম্মলা এখানে সম্প্রতি আসিয়াছে, সে হাজারির পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—বেশ আপনি, শ্বশুরবাড়ী থেকে এসে দেখি আপনি আর নেই! উনি সেই বিয়ের পরদিন আপনার হাতের রান্না খেয়ে গেছলেন, আমায় বললেন—তোমাদের ঠাকুরটি বড় ভাল। ওর হাতের রান্না আর একদিন না খেলে চলবে না, ওমা, এসে দেখি কোথায় কে!—কোথায় ছিলেন এতদিন? সেই রকম মাংস রাঁধুন তো একদিন। এখন থাকবেন তো আমাদের বাড়ী?

হাজারির কষ্ট হইল ইহাদের কাছে প্রকৃত কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে। তবুও বলিতে হইল। নির্ম্মলাকে বলিল—তোমায় আমি মাংস রেঁধে খাইয়ে যাব মা, দু-দিন তোমাদের এখানে থেকে সকলকে নিজের হাতে রসুই ক'রে খাওয়াব, তারপর যাব।

বড়কর্ত্তা শুনিয়া খুশি হইয়া বলিলেন—রাণাঘাটের প্ল্যাটফর্ম্মের সে নতুন হোটেল আপনার? বেশ, বেশ। আমরা ব্যবসাদার মানুষ ঠাকুরমশায়, এইটে বুঝি যে চাকরি করে কেউ কখনও উন্নতি করতে পারে না। উন্নতি আছে ব্যবসাতে, তা সে যে কোন ব্যবসাই হোক। আপনি ভাল রাঁধেন, ওই হোটেলের ব্যবসাই আপনার ঠিক-মত ব্যবসা—যেটা যে বোঝে বা জানে। উন্নতি করবেন আপনি।

আসিবার সময় ইহারা হাজারিকে এক জোড়া ধুতি উড়ানি দিল এবং প্রাপ্য বেতন যাহা বাকী ছিল সব চুকাইয়া দিল। হাজারি বেতন লইতে আসে নাই, কিন্তু উহা তাহার বলা

সাজে না। সম্মানের সহিত হাত পাতিয়া সে টাকা ও কাপড় গ্রহণ করিয়া গোপালনগর হইতে বিদায় লইল।

রাণাঘাট স্টেশনে নামিতেই নরেনের সঙ্গে দেখা। সে বলিল—কোথায় গিয়েছিলেন মামাবাবু? বাড়ীসুদ্ধ সব ভেবে খুন। কাল রেলওয়ে ইন্সপেক্টর এসেছিল, আমাদের হোটেল দেখে খুব খুশি হয়ে গিয়েছে। স্টেশনের রিপোর্ট বইতে বেশ ভাল লিখেছে।

—টেঁপি ভাল আছে?

—হ্যাঁ, কাল আমরা সব টকি দেখতে গেলাম মামাবাবু। মামীমা, আমি আর আশালতা। মামীমা টকি দেখে খুব খুশি।

টেঁপির কথাটা সে মামীমার উপর দিয়াই চালাইয়া দিল।

—আর একটা কথা মামাবাবু—

—কি?

—কাল পদ্মঝি এসে আপনাদের বাসায় মামীমার সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করে গেল। আর কুসুমদিদি একবার আপনাকে দেখা করতে বলেছে। উনিও কাল এসেছিলেন।

হাজারি বাড়ী ঢুকিতেই টেঁপি ওরফে আশালতা এবং তাহার মা দুজনেই টকির গল্পে মুখর হইয়া উঠিল। জীবনে এই প্রথম, তাহারা কখনও ও-জিনিসের কল্পনাই করে নাই—আবার একদিন দেখিতেই হইবে—এইবার কিন্তু টেঁপি বাবাকে সঙ্গে না লইয়া ছাড়িবে না। কাজ তো সব সময়েই আছে, একদিনও কি সময় করিয়া যাইতে নাই?

—কি গান গাইলে! চমৎকার গান, বাবা। আমি দুটো শিখে ফেলেছি।

—কি গান রে?

—একটা হোল 'তোমারি পথ চেয়ে থাকব বসে চিরদিন'—চমৎকার সুর বাবা। শুনবে? বেশ গাইতে পারি এটা—

—থাক এখন আর দরকার নেই। অন্য সময়…এখন একটু কাজ আছে।

টেঁপি মনঃক্ষুণ্ণ হইল। এমন গানটা বাবাকে শোনাইতে পারিলে খুশি হইত। তা নয় বাবার সব সময় কেবল কাজ আর কাজ!

টেঁপির মা বলিল—ওগো, কাল পদ্ম বলে একটা মেয়ে এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে। বেশ লোকটা। ওদের হোটেলে তুমি নাকি কাজ করতে!…

হাজারি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—কি বললে পদ্মদিদি?

—গল্প করলে বসে, পান সেজে দিলাম, খেলে। ওদের সে হোটেল উঠে যাচ্ছে। আর চলে না, এই সব বললে।

হাজারি এখনও পদ্মকে সম্ভ্রমের চোখে দেখে। পদ্মদিদি—সেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ পদ্মদিদি তাহার বাড়ীতে আসিয়াছিল বেড়াইতে—তাহার স্ত্রীর সহিত যাচিয়া আলাপ করিতে—হাজারি নিজেকে অত্যন্ত সম্মানিত বিবেচনা করিল—পদ্মঝি তাহার বাড়ীতে পদধূলি দিয়া যেন তাহাকে

কৃতার্থ করিয়া দিয়া গিয়াছে।

টেঁপি বলিল—বাবা, নরেনদাদাকে আমি নেমন্তন্ন করেছি। নরেন-দা বলেছে আমাকে মাংস রেঁধে খাওয়াতে হবে। তুমি মাংস এনে দাও—

হাজারি এদিকের সব কাজ মিটাইয়া কুসুমের বাড়ী যাইবার জন্য রওনা হইল, পথে হঠাৎ পদ্মঝিয়ের সঙ্গে দেখা। পদ্মঝিয়ের পরনে মলিন বস্ত্র। কখনও হাজারি জীবনে যাহা দেখে নাই।

হাজারি বলিল—হাতে কি পদ্মদিদি? যাচ্ছ কোথায়?

পদ্ম হাজারিকে দেখিয়া দাঁড়াইল, বলিল—ঠাকুরমশায়, কবে ফিরলে? হাতে তেঁতুল, একটু নিয়ে এলাম হোটেল থেকে।

হাজারি মনে মনে হাসিল। হোটেল হইতে লুকাইয়া জিনিস সরাইবার অভ্যাস এখনও যায় নাই পদ্মদিদির!

হাজারি পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পদ্ম বলিল—শোনো, দাঁড়াও না ঠাকুরমশায়! কাল তোমাদের বাসায় গিয়েছিলাম যে! বলে নি বৌদিদি?

—হাঁ৷ হাঁ৷ বলছিল বটে।

—বৌদিদি লোক বড় ভাল, আমার সঙ্গে কত গল্প করলে। আর একদিন যাব।

—বা, যাবে বৈ কি পদ্মদিদি, তোমাদেরই বাড়ী। যখন ইচ্ছে হয় যাবে। হোটেল কেমন চলছে?

—তা মন্দ চলছে না। এককরম চলছে।

—বেশ বেশ। তাহলে এখন আসি পদ্মদিদি—

হাজারি চলিয়া গেল। ভাবিল—একরকম চলছে বললে অথচ কাল বাড়ীতে বসে গল্প করে এসেছে হোটেল আর চলে না, উঠে যাবে। পদ্মদিদি ভাঙে তো মচকায় না!

কুসুমের বাড়ীতে হাজারি অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলিল। কথায়-কথায় নতুন গাঁয়ের বধূটির কথা মনে পড়াতে হাজারি বলিল—ভাল কথা কুসুম মা চেনো? এঁড়োশোলার বনমালীর স্ত্রীর ভাইঝি—তোমাকে দিদি বলে ডাকে একটি মেয়ে, বিয়ে হয়েছে নতুন গাঁ?

কুসুম বলিল—খুব চিনি। ওর নাম তো সুবাসিনী। ওকে কি ক'রে জানলেন জ্যাঠামশায়?

হাজারি বধূটির সম্বন্ধে সব কথা খুলিয়া বলিল, তাহার টাকা লইয়া আসা, হোটেলে তাহাকে অংশীদার করার সঙ্কল্প।

কুসুম বলিল—এ তো বড় খুশির কথা। আপনার হোটেলে টাকা খাটলে ওর ভবিষ্যতে একটা হিল্লে হয়ে রইল।

—কিন্তু যদি আজ মরে যাই মা? তখন কোথায় থাকবে হোটেল?

—ও কথা বলতে নেই জ্যাঠামশায়—ছিঃ—

কুসুমের অবস্থা আজকাল ফিরিয়াছে। হাজারি তাহাকে শুধু মহাজন হিসাবে দেখে না, হোটেলের অংশীদার হিসাবে প্রতি মাসে ত্রিশ-বত্রিশ টাকা দেয়, মাসিক লাভের অংশ-স্বরূপ।

কুসুম বলিল—অমন সব কথা বলেন কেন, ওতে আমার কষ্ট হয়। আপনি ছিলেন তাই আজ রাণাঘাট শহরে মাথা তুলে বেড়াতে পারছি, ছেলেপিলে দু-বেলা দু-মুঠো খেতে পাচ্ছে। এই বাড়ী বাঁধা রেখে গিয়েছিলেন শ্বশুর, আপনাকে বলি নি সে-কথা, এতদিন বাড়ী বিক্রি হয়ে যেতো দেনার দায়ে, যদি হোটেল থেকে টাকা না পেতাম মাস মাস। ওই টাকা দিয়ে দেনা সব শোধ ক'রে ফেলেছি—এখন বাড়ী আমার নামে। আপনার দৌলতেই সব জ্যাঠামশায়—আমার চোখে আপনি দেবতা।

হাজারি বলিল—উঠি আজ মা। একবার ইষ্টিশানের হোটেলটাতে যাব। একদল বড়-লোক টেলিগ্রাম করেছে কলকাতা থেকে, দার্জ্জিলিং মেলের সময় এখানে খানা খাবে। তাদের জন্যে মাংসটা নিজে রাঁধবো। তারে তাই লেখা আছে।

দার্জ্জিলিং মেলে চার-পাঁচটি বাবু নামিয়া হাজারির রেলওয়ে হোটেলে খাইতে আসিল। হাজারি নিজের হাতে মাংস রান্না করিয়াছিল। উহারা খাইয়া অত্যন্ত খুশী হইয়া গেল—হাজারিকে ডাকিয়া আলাপ করিল। উহাদের মধ্যে একজন বলিল—হাজারিবাবু, আপনার নাম কলকাতায় পৌঁচেছে জানেন তো? বড়ঘরে যারা পঞ্চাশ টাকা মাইনের ঠাকুর রাখে, তারা জানে রাণাঘাটের হিন্দু-হোটেলের হাজারি ঠাকুর খুব বড় রাঁধুনী। আমাদের সেইটে পরীক্ষা ক'রে দেখবার জন্যে আজ আপনার এখানে আসা। তারে বলাও ছিল যাতে আপনি নিজে রাঁধেন। বড় খুশি হয়েছি খেয়ে।

ইহার কয়েক দিন পরে একখানা চিঠি আসিল কলিকাতা হইতে। সেদিন যাহারা রেলওয়ে হোটেলে খাইয়া গিয়াছিল তাহারা পুনরায় দেখা করিতে আসিতেছে আজ ওবেলা, বিশেষ জরুরী দরকার আছে! সাড়ে তিনটার কৃষ্ণনগর লোকালে দুইজন ভদ্রলোক নামিল। তাহাদের একজন সেদিনকার সেই লোকটি—যে হাজারির রান্নার অত সুখ্যাতি করিয়া গিয়াছিল। অন্য একজন বাঙালী নয়—কি জাত, হাজারি চিনিতে পারিল না।

পূর্ব্বের ভদ্রলোকটি হাজারির সঙ্গে অবাঙালী ভদ্রলোকটির পরিচয় করাইয়া দিয়া হিন্দীতে বলিল—এর কথাই আপনাকে বলেছিলাম। এই সে হাজারি ঠাকুর।

অবাঙালী ভদ্রলোকটি হাসিমুখে হিন্দীতে কি বলিলেন, হাজারি ভাল বুঝিল না। বিনীত ভাবে বাঙালী বাবুটিকে বলিল যে সে হিন্দী বুঝিতে পারে না।

বাঙালী বাবুটি বলিলেন—শুনুন হাজারিবাবু, কথাটা বলি। আমার বন্ধু ইনি গুজরাটি, বড় ব্যবসাদার, ধুরন্ধর খাড্ডে কোম্পানীর বড় অংশীদার। জি. আই. পি. রেলের সব হিন্দু রেস্টোরাণ্টের কণ্ট্রাক্টর হোল খাড্ডে কোম্পানি। ওরা আপনাকে বলতে এসেছে ওদের সব হোটেলের রান্না দেখাশুনা তদারক করবার জন্যে দেড়শো টাকা মাইনেতে আপনাকে রাখতে চায়। তিন বছরের এগ্রিমেণ্ট। আপনার সব খরচ, রেলের যে কোনো জায়গায়

যাওয়া-আসা, একজন চাকর ওরা দেবে। বম্বেতে ফ্রি কোয়ার্টার দেবে। যদি ওদের নাম দাঁড়িয়ে যায় আপনার রান্নার গুণে আপনাকে একটা অংশও ওরা দেবে। আপনি রাজী ?

হাজারি নরেনকে ডাকিয়া আলোচনা করিল আড়ালে। মন্দ কি ? কাজকর্ম এদিকে যাহা রহিল নরেন দেখাশুনা করিতে পারে। খরচা বাদে মাসে অতিরিক্ত দেড় শত টাকা কম নয়—তা ছাড়া হোটেলের ব্যবসা সম্বন্ধে খুব একটা অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ এটি। এ হাতছাড়া করা উচিত হয় না—নরেনের ইহাই মত।

হাজারি আসিয়া বলিল—আমি রাজী আছি। কবে যেতে হবে বলুন। কিন্তু একটা কথা আছে—হিন্দী তো আমি তত জানিনে! কাজ চালাব কি করে ?

বাঙালী বাবু বলিলেন—সেজন্যে ভাবনা নেই। দুদিন থাকলেই হিন্দী শিখে নেবেন। সই করুন এ কাগজে। এই আপনার কন্ট্রাক্ট ফর্ম, এই এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। দুজন সাক্ষী ডাকুন।

যদু বাঁড়ুয্যেকে ডাকিয়া আনা হইল তাহার হোটেল হইতে, অন্য সাক্ষী নরেন। কাগজপত্রের হাঙ্গামা চুকিয়া গেলে উহারা চা-পানে আপ্যায়িত হইয়া ট্রেনে উঠিল। বাঙালী ভদ্রলোক বলিয়া গেল—যে মাসের পয়লা জয়েন করতে হবে আপনাকে বম্বেতে। আপনার ইণ্টার ক্লাস রেলওয়ে পাস আসছে আর আমাদের লোকে আপনাকে সঙ্গে করে বম্বে পৌঁছে দেবে। তৈরী থাকবেন—আর পনেরো দিন বাকী।

হাজারি স্টেশন হইতে বাহির হইয়াই কুসুমের সঙ্গে একবার দেখা করিবে ভাবিল। এত বড় কথাটা কুসুমকে বলিতেই হইবে আগে। বোম্বাই! সে বোম্বাই যাইতেছে! দেড়শো টাকা মাহিনার! বিশ্বাস হয় না। সব যেন স্বপ্নের মত ঘটিয়া গেল। টাকার জন্য নয়। টাকা এখানে সে মাসে দেড়শো টাকার বেশী ছাড়া কম রোজগার করে না। কিন্তু মানুষের জীবনে টাকাটাই কি সব ? পাঁচটা দেশ দেখিয়া বেড়ানো, পাঁচজনের কাছে মান-খাতির পাওয়া, নূতনতর জীবনযাত্রার আস্বাদ—এ সবই তো আসল।

পিছন হইতে যদু বাঁড়ুয্যে ডাকিল—ও হাজারি-ভায়া, হাজারি-ভায়া শোন, হাজারি-ভায়া—

হাজারি কাছে যাইতেই যদু বাঁড়ুয্যে—রাণাঘাটের হোটেলের মালিকদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সম্রান্ত ব্যক্তি যে—সেই যদু বাঁড়ুয্যে স্বয়ং নীচু হইয়া হাজারির পায়ের ধুলো লইতে গেল। বলিল—ধন্যি, খুব দেখালে ভায়া, হোটেল করে তোমার মত ভাগ্যি কারো ফেরে নি। পায়ের ধুলো দাও, তুমি সাধারণ লোক নও দেখছি—

হাজারি হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল।

—কি করেন বাঁড়ুয্যেমশায়—আমার দাদার সমান আপনি—ওকি—ওকি—আপনাদের বাপমায়ের আশীর্ব্বাদে, আপনাদের আশীর্ব্বাদে—একরকম করে খাচ্ছি—

যদু বাঁড়ুয্যে বলিল—এসো না ভায়া গরীবের হোটেলে একবার এক ছিলিম তামাক খেয়ে যাও—এসো।

যদু বাঁড়ুয্যের অনুরোধ হাজারি এড়াইতে পারিল না। যদু চা খাওয়াইল, ছানার জিলাপি খাওয়াইল, নিজের হাতে তামাক সাজিয়া খাইতে দিল। স্বপ্ন না সত্য? এই যদু বাঁড়ুয্যে একদিন নিজের হোটেলে কাজ করিবার জন্য না ভাঙাইতে গিয়াছিল! তাহার মনিবের দরের মানুষ ছিল তিন বছর আগেও!

না, যথেষ্ট হইল তাহার জীবনে। ইহার বেশী আর সে কিছু চায় না। রাধাবল্লভ ঠাকুর তাহাকে অনেক দিয়াছেন। আশার অতিরিক্ত দিয়াছেন।

কুসুম শুনিয়া প্রথমে ঘোর আপত্তি তুলিয়া বলিল—জ্যাঠামশায় কি ভাবেন, এই বয়সে তাঁহাকে সে অত দূরে যাইতে কখনই দিবে না। জেঠিমাকে দিয়াও বারণ করাইবে। আর টাকার দরকার নাই। সে সাত সমুদ্র তেরো নদী পারের দেশে যাইতে হইবে এমন গরজ কিসের?

হাজারি বলিল—মা বেশীদিন থাকব না সেখানে। চুক্তি সই হয়ে গিয়েছে সাক্ষীদের সামনে। না গেলে ওরা খেসারতের দাবি করে নালিশ করতে পারে। আর একটা উদ্দেশ্য আছে কি জান মা, বড় বড় হোটেল কি ক'রে চালায়, একবার নিজের চোখে দেখে আসি। আমার তো ঐ বাতিক, ব্যবসাতে যখন নেমেছি, তখন ওর মধ্যে যা কিছু আছে শিখে নিয়ে তবে ছাড়ব। বাধা দিও না মা, তুমি বাধা দিলে তো ঠেলবার সাধ্যি নেই আমার।

টেঁপির মা ও টেঁপি কান্নাকাটি করিতে লাগিল। ইহাদের দুজনকে বুঝাইল নরেন। মামাবাবু কি নিরুদ্দেশ যাত্রা করিতেছেন? অত কান্নাকাটি করিবার কি আছে ইহার মধ্যে? বম্বে তো বাড়ীর কাছে, লোকে কত দূর-দূরান্তর যাইতেছে না চাকুরির জন্য?

সেই দিন রাত্রে হাজারি নরেনের মামা বংশীধর ঠাকুরকে ডাকিয়া বলিল—একটা কথা আছে। আমি তো আর দিন পনেরোর মধ্যে বোম্বাই যাচ্ছি। আমার ইচ্ছে যাবার আগে টেঁপির সঙ্গে নরেনের বিয়েটা দিয়ে যাব। নরেন এখানকার কারবার দেখাশুনা করবে—রেলের হোটেলটা ওকে নিজে দেখতে হবে—ওটাতেই মোটা লাভ। এতে তোমার কি মত?

বংশীধর অনেকদিন হইতেই এইরূপ কিছু ঘটিবে আঁচ করিয়া রাখিয়াছিল। বলিল—হাজারিদা, আমি কি বলব, বল। তোমার সঙ্গে পাশাপাশি হোটেলে কাজ করেছি। আমরা সুখের সুখী দুঃখের দুঃখী হয়ে কাটিয়েছি বহুকাল। নরেনও তোমারই আপনার ছেলে। যা বলবে তুমি, তাতে আমার অমত কি? আর ওরও তো কেউ নেই—সবই জান তুমি। যা ভাল বোঝ কর।

দেনাপাওনার মীমাংসা অতি সহজেই মিটিল। হাজারি রেলওয়ে হোটেলটির স্বত্ব টেঁপির নামে লেখাপড়া করিয়া দিবে। তাহার অনুপস্থিতিতে নরেন ম্যানেজার হইয়া উভয় হোটেল

চালাইবে—তবে বাজারের হোটেলের আয় হিসাবমত কুসুমকে ও টেঁপির মাকে ভাগ করিয়া দিতে থাকিবে।

বিবাহের দিন ধার্য্য হইয়া গেল।

টেঁপির মা বলিল—ওগো, তোমার মেয়ে বলছে অতসীকে নেমন্তন্ন করে পাঠাতে। ওর বড় বন্ধু ছিল—তাকে বিয়ের দিন আসতে লেখ না?

হাজারিও সে-কথা ভাবিয়াছে। অতসীর সঙ্গে আজ বহুদিন দেখা হয় নাই। সেই মেয়েটির অযাচিত করুণা আজ তাহাকে ও তাহার পরিবারবর্গকে লোকের চোখে সম্ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। অতসীর শ্বশুরবাড়ীর ঠিকানা হাজারি জানিত না, কেবলমাত্র এইটুকু জানিত অতসীর শ্বশুর বর্দ্ধমান জেলার মূলঘরের জমিদার। হাজারি চিঠিখানা তাঁহাদের গ্রামে অতসীর বাবার ঠিকানায় পাঠাইয়া দিল, কারণ সময় অত্যন্ত সংক্ষেপ। লিখিয়া ঠিকানা আনাইয়া পুনরায় পত্র লিখিবার সময় নাই।

বিবাহের কয়েকদিন পূর্ব্বে হাজারি শ্রীমন্ত কাঁসারির দোকানে দানের বাসন কিনিতে গিয়াছে, শ্রীমন্ত বলিল—আসুন আসুন হাজারিবাবু, বসুন। ওরে বাবুকে তামাক দে রে—

হাজারি নিজের বাসনপত্র কিনিয়া উঠিবার সময় কতকগুলি পুরানো বাসনপত্র, পিতলের বালতি ইত্যাদি নূতন বাসনের দোকানে দেখিয়া বলিল—এগুলো কি হে শ্রীমন্ত? এগুলো তো পুরোনো মাল—চালাই করবে নাকি?

শ্রীমন্ত বলিল—ও-কথা আপনাকে বলব ভেবেছিলাম বাবু। ও আপনাদের পুরোনো হোটেলের পদ্মঝি রেখে গেছে—হয় বন্ধক নয় বিক্রী। আপনি জানেন না কিছু? চক্কত্তি মশায়ের হোটেল যে সীল হবে আজই। মহাজন ও বাড়ীওয়ালার দেনা একরাশ, তারা নালিশ করেছিল। তা বাবু পুরোনো মালগুলো নিন না কেন? আপনাদের হোটেলের কাজে লাগবে—বড় ডেক্‌চি, পেতলের বালতি, বড় গামলা। সস্তা দরে বিক্রী হবে—ও বন্ধকী মালের হ্যাংনামা কে পোয়াবে বাবু, তার চেয়ে বিক্রীই করে দেবো—

হাজারি এত কথা জানিত না। বলিল—পদ্ম নিজে এসেছিল?

শ্রীমন্ত বলিল—হ্যাঁ, ওদের হোটেলের একটা চাকর সঙ্গে নিয়ে। হোটেল সীল হলে কাল একটা জিনিসও বার করা যাবে না ঘর থেকে, তাই রেখে গেল আমার এখানে। বলে গেল এগুলো বন্ধক রেখে কিছু টাকা দিতেই হবে; চক্কত্তি মশায়ের একেবারে নাকি অচল।

বাসনের দোকান হইতে বাহির হইয়া অন্য পাঁচটা কাজ মিটাইয়া হোটেলে ফিরিতে অনেক বেলা হইয়া গেল। একবার বেচু চক্কত্তির হোটেলে যাইবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না।

কুসুম এ কয়দিন এ বাসাতেই বিবাহের আয়োজনের নানারকম বড়, ছোট, খুচরা কাজে সারাদিন লাগিয়া থাকে। হাজারি তাহাকে বাড়ী যাইতে দেয় না, বলে—মা, তুমি তো আমার ঘরের লোক, তুমি থাকলে আমার কত ভরসা। এখানেই থাক এ ক'টা দিন।

বিবাহের পূর্ব্বদিন হাজারি অতসীর চিঠি পাইল। সে কৃষ্ণনগর লোকালে আসিতেছে, স্টেশনে যেন লোক থাকে।

আর কেহ অতসীকে চেনে না, কে তাহাকে স্টেশন হইতে চিনিয়া আনিবে, হাজারি নিজেই বৈকাল পাঁচটার সময় স্টেশনে গেল।

ইন্টার ক্লাস কামরা হইতে অতসী আর তাহার সঙ্গে একটি যুবক নামিল। কিন্তু তাহাদের অভ্যর্থনা করিতে কাছে গিয়া হাজারি যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার মনে হইল পৃথিবীর সমস্ত আলো যেন এক মুহূর্ত্তে মুছিয়া লেপিয়া অন্ধকারে একাকার হইয়া গিয়াছে তাহার চক্ষুর সম্মুখে।

অতসীর বিধবা বেশ।

অতসী হাজারির পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—কাকাবাবু, ভাল আছেন? ইনি কাকাবাবু—সুরেন। এ আমার ভাসুরপো। কলকাতায় পড়ে। অমন ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

—না—মা—ইয়ে, চলো—এস।

—ভাবছেন বুঝি এ আবার ঘাড়ে পড়ল দেখছি। দিয়েছিলাম একরকম বিদেয় ক'রে আবার এসে পড়েছে সাত বোঝা নিয়ে—এই না? বাবা-কাকারা এমন নিষ্ঠুর বটে!

হাজারি হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিল। এক প্ল্যাটফর্ম্ম বিস্মিত জনতার মাঝখানে কি যে তাহার মনে হইতেছে তাহা সে কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে পারিবে না। মনের কোন স্থান যেন হঠাৎ বেদনায় টন্ টন্ করিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে। অতসীই তাহাকে শান্ত করিয়া নিজের আঁচলে তাহার চক্ষু মুছাইয়া প্ল্যাটফর্ম্ম হইতে বাহির করিয়া আনিল। রেলওয়ে হোটেলের কাছে নরেন উহাদের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল। সে হাজারির দিকে চাহিয়া দেখিল হাজারির চোখ রাঙা, কেমন এক ভাব মুখে। অতসীর বিধবা বেশ দেখিয়াও সে বিস্মিত না হইয়া পারিল না, কারণ টেঁপির কাছে অতসীর সব কথাই সে শুনিয়াছিল ইতিমধ্যে—সবে আজ বছর তিন বিবাহ হইয়াছে তাহাও শুনিয়াছিল। অতসীদি বিধবা হইয়াছে এ কথা তো কেহ বলে নাই।

বাড়ী পৌঁছিয়া অতসী টেঁপিকে লইয়া বাড়ীর ছাদে অনেকক্ষণ কাটাইল। দুজনে বহুকাল পরে দেখা—সেই এঁড়োশোলায় আজ প্রায় তিন বছর হইল তাহাদের ছাড়াছাড়ি, কত কথা যে জমা হইয়া আছে!

টেঁপি চোখের জল ফেলিল বাল্যসখীর এ অবস্থা দেখিয়া। অতসী বলিল—তোরা যদি সবাই মিলে কান্নাকাটি করবি, তা হ'লে কিন্তু চলে যাব ঠিক বলছি। এলাম

বাপ-মায়ের কাছে, বোনের কাছে একটু জুড়ুতে, না কেবল কান্না আর কেবল কান্না—সরে আয়, তোর এই দুল জোড়াটা পর তো দেখি কেমন হয়েছে—আর এই ব্রেসলেটটা, দেখি হাত—

টেঁপি হাত ছিনাইয়া লইয়া বলিল—এ তোমার ব্রেসলেট অতসী-দি, এ আমায় দিতে পারবে না—কক্‌খনো না—

—তা হ'লে আমি মাথা কুটবো এই ছাদে, যদি না পরিস্—সত্যি বলছি। আমার সাধ কেন মেটাতে দিবি নে?

টেঁপি আর প্রতিবাদ করিল না। তাহার দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল, ওদিকে অতসী তাহার ডান হাত ধরিয়া তখন ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ব্রেসলেট্ পরাইতেছে।

হাজারি অনেক রাত্রে তামাক খাইতেছে, অতসী আসিয়া নিঃশব্দে পাশে দাঁড়াইয়া বলিল—কাকাবাবু!

হাজারি চমকিয়া উঠিয়া বলিল—অতসী মা? এখনও শোও নি?

—না কাকাবাবু। আজ তো সারাদিন আপনার সঙ্গে একটা কথাও হয় নি, তাই এলাম।

হাজারি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—এমন জানলে তোমায় আনতাম না মা। আমি কিছুই শুনি নি। কতদিন গাঁয়ে যাই নি তো! তোমার এ বেশ চোখে দেখতে কি নিয়ে এলাম মা তোমায়?

অতসী চুপ করিয়া রহিল। হাজারির স্নেহশীল পিতৃহৃদয়ের সান্নিধ্যের নিবিড়তায় সে যেন তাহার দুঃখের সান্ত্বনা পাইতে চায়।

হাজারি সস্নেহে তাহাকে কাছে বসাইল। কিছুক্ষণ কেহই কথা বলিল না। পরে অতসী বলিল—কাকাবাবু, আমি একদিন বলেছিলাম আপনার হোটেলের কাজেই উন্নতি হবে—মনে আছে?

—সব মনে আছে অতসী মা। ভুলি নি কিছুই। আর যা কিছু এখানকার ইটাইপত্র—সব তো তোমার দয়াতেই মা—তুমি দয়া না করলে—

অতসী তিরস্কারের সুরে বলিল—ওকথা বলবেন না কাকাবাবু, ছিঃ—আমি টাকা দিলেও আপনার ক্ষমতা না থাকলে কি সে টাকা বাড়তো? তিন বছরের মধ্যে এত বড় জিনিস করে ফেলতে পারত অন্য কেউ আনাড়ি লোক? আমি কিছুই জানতুম না কাকাবাবু, এখানে এসে সব দেখে শুনে অবাক হয়ে গিয়েছি। আপনি ক্ষমতাবান পুরুষমানুষ কাকাবাবু।

—এখন তুমি এঁড়োশোলায় যাবে মা, না আবার শ্বশুরবাড়ী যাবে?

—এঁড়োশোলাতেই যাবো। বাবা-মা দুঃখে সারা হয়ে আছেন। তাঁদের কাছে গিয়ে কিছুদিন থাকবো। জানেন কাকাবাবু, আমার ইচ্ছে দেশে এমন একটা কিছু করব, যাতে সাধারণের উপকার হয়। বাবার টাকা সব এখন আমিই পাব, শ্বশুরবাড়ী থেকেও

টাকা পাব। কিন্তু এ টাকায় আমার কোন দরকার নেই কাকাবাবু। পাচজনের উপকারের জন্যে খরচ করেই সুখ।

—যা ভাল বোঝ মা করো। আমি তোমায় কি বলব?

—কাকাবাবু, আপনি বম্বে যাচ্ছেন নাকি?

—হ্যাঁ মা।

অতসী ছেলেমানুষের মত আবদারের সুরে বলিল—আমায় নিয়ে যাবেন সঙ্গে করে? বেশ বাপেঝিয়ে থাকবো, আপনাকে রেঁধে দেব—আমার খুব ভালো লাগে দেশ বেড়াতে।

—যেও মা, এবারটা নয়। আমি তিন বছর থাকব সেখানে। দেখি কি রকম সুবিধে অসুবিধে হয়। এর পরে যেও।

—ঠিক কাকাবাবু? কেমন মনে থাকবে তো?

—ঠিক মনে থাকবে। যাও এখন শোও গিয়ে মা, অনেক কষ্ট হয়েছে গাড়িতে, সকাল সকাল বিশ্রাম কর গিয়ে।

পরদিন বিবাহ। টেঁপির নরম হাতখানি নরেনের বলিষ্ঠ পেশীবদ্ধ হাতে স্থাপন করিবার সময় হাজারির চোখে জল আসিল।

কতদিনের সাধ—এতদিনে ঠাকুর রাধাবল্লভ পূর্ণ করিলেন।

বংশীধর ঠাকুর বরকর্ত্তা সাজিয়া বিবাহ-মজলিসে বসিয়া ছিল। সেও সে সময়টা আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—হাজারি-দা!

কাছাকাছি সব হোটেলের রাঁধুনী বামুনেরা তাহাদের আত্মীয়-স্বজন লইয়া বরযাত্রী সাজিয়া আসিয়াছে। এ বিবাহ হোটেলের জগতের, ভিন্ন জগতের কোনো লোকের নিমন্ত্রণ হয় নাই ইহাতে। ইহাদের উচ্চ কলরব, হাসি, ঠাট্টা ও হাঁকডাকে বাড়ী সরগরম হইয়া উঠিল।

বিবাহের পরদিন বর-কনে বিদায় হইয়া গেল। বেশীদূর উহারা যাইবে না। এই রাণাঘাটেরই চূর্ণীর ধারে বংশীধর একখানা বাড়ী ভাড়া করিয়াছে পাচ দিনের জন্য। সেখানে দেশ হইতে বংশীধরের এক দূর-সম্পর্কের বিধবা পিসি (বংশীধরের স্ত্রী মারা গিয়াছে বহুদিন) আসিয়াছেন বিবাহের ব্যাপারে। বৌভাত সেখানেই হইবে।

হাজারি একবার রেলওয়ে হোটেলে কাজ দেখিতে যাইতেছে, বেলা আন্দাজ দশটা, বেচু চক্কত্তির হোটেলের সামনে ভিড় দেখিয়া থামিয়া গেল। কোর্টের পিওন, বেলিফ, ভিড়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে আর আছে রামরতন পালচৌধুরী জমাদার। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল মহাজনের দেনার দায়ে বেচু চক্কত্তির হোটেল সীল হইতেছে।

হাজারি কিছুক্ষণ থমকিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পুরোনো মনিবের হোটেল, এইখানে সে দীর্ঘ সাত বৎসর সুখে-দুঃখে কাটাইয়াছে। এত দিনের হোটেলটা আজ উঠিয়া গেল!

একটু পরে পদ্মঝি দু হাতে দুটি বড় বাল্‌তি লইয়া হোটেলের পিছনের দরজা দিয়া বাহির হইতেই একজন আদালতের পেয়াদা বেলিফের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট করিল। বেলিফ সাক্ষী দুজনকে ডাকিয়া বলিল—এই দেখুন মশায়, ওই মেয়েলোকটা হোটেল থেকে জিনিস নিয়ে যাচ্ছে, এটা বে-আইনী। আমি পেয়াদাদের দিয়ে আটকে দিচ্ছি আপনাদের সামনে।

পেয়াদারা গিয়া বাধা দিয়া বলিল—বাল্‌তি রেখে যাও—

পরে আরও কাছে গিয়া হাঁক দিয়া বলিল—শুধু বাল্‌তি নয় বাবু, বাল্‌তির মধ্যে পেতল কাঁসার বাসন রয়েছে।

পদ্মঝি ততক্ষণে বাল্‌তি দুটা প্রাণপণে জোর করিয়া আঁটিয়া ধরিয়াছে। সে বলিল—এ বাসন আমার নিজের—হোটেল চক্কত্তি মশায়ের, আমার জিনিস উনি নিয়ে এসেছিলেন, এখন আমি নিয়ে যাচ্ছি।

পেয়াদারা ছাড়িবার পাত্র নয়। অবশ্য পদ্মঝিও নয়। উভয় পক্ষে বাক্‌বিতণ্ডা, অবশেষে টানাহেঁচড়া হইবার উপক্রম হইল। মজা দেখিবার লোক জুটিয়া গেল বিস্তর।

একজন মহাজন পাওনাদার বলিল—আমি এই সকলের সামনে বলছি, বাসন নামিয়ে যদি না রাখো তবে আদালতের আইন অমান্য করবার জন্যে আমি তোমাকে পুলিশে দেবো।

একজন সাক্ষী বলিল—তা দেবেন কেমন করে বাপু? ওর নামে তো ডিক্রি নেই আদালতের। ও আদালতের ডিক্রি মানতে যাবে কেন?

বেলিফ্‌ বলিল—তা নয়, ওকে চুরির চার্জ্জে ফেলে পুলিশে দেওয়া চলবে। এ হোটেল এখন মহাজন পাওনাদারের। তার ঘর থেকে অপরের জিনিস নিয়ে যাবার রাইট কি? ওকে জিজ্ঞেস করো ও ভালোয় ভালোয় দেবে কিনা—

পদ্মঝি তা দিতে রাজী নয়। সে আরও জোর করিয়া আঁকড়াইয়া আছে বাল্‌তি দুটি। বেলিফ্‌ বলিল—কেড়ে নাও মাল ওর কাছ থেকে—বদমাইশ মাগী কোথাকার—ভাল কথায় কেউ নয়!

পেয়াদারা এবার বীরদর্পে আসিয়া গেল। পুনরায় একচোট ধস্তাধস্তির সূত্রপাত হইবার উপক্রম হইতেই হাজারি সেখানে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—পদ্মদিদি, বাসন ওদের দিয়ে দাও।

লজ্জায় ও অপমানে পদ্মঝিয়ের চোখে তখন জল আসিয়াছে। জনতার সামনে দাঁড়াইয়া এমন অপমানিত সে কখনো হয় নাই। এই সময় হাজারিকে দেখিয়া সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

—এই দেখো না ঠাকুর মশায়, তুমি তো কতদিন আমাদের হোটেলে ছিলে—এ আমার জিনিস না? বলো না তুমি, এ বাল্‌তি কার?

হাজারি সান্ত্বনার সুরে বলিল—কেঁদো না এমন ক'রে পদ্মদিদি। এ হোল আইন-আদালতের ব্যাপার। বাসন রেখে এসো ঘরের মধ্যে, আমি দেখছি তারপর কি ব্যবস্থা করা যায়—

অবশ্য তখন কিছু করিবার উপায় ছিল না। সে আদালতের বেলিফকে জিজ্ঞাসা করিল—কি করলে এদের হোটেল আবার বজায় থাকে ?

—টাকা চুকিয়ে দিলে। এ অতি সোজা কথা মশাই। সাড়ে সাতশো টাকার দাবীতে নালিশ—এখনও ডিক্রী হয় নি। বিচারের আগে সম্পত্তি সীল্ না করলে দেনাদার ইতিমধ্যে মাল হস্তান্তর করতে পারে, তাই সীল্ করা।

আদালতের পেয়াদারা কাজ শেষ করিয়া চলিয়া গেল। বেচু চক্কত্তিকে একধারে ডাকিয়া হাজারি বলিল—আমার সঙ্গে চলুন না কর্ত্তা মশায় একবার ইষ্টিশনের দিকে—আসুন, কথা আছে।

রেলের হোটেলে নিজের ঘরটিতে বেচু চক্কত্তিকে বসাইয়া হাজারি বলিল—কর্ত্তা একটু চা খাবেন ?

বেচু চক্কত্তির মন খারাপ খুবই। চা খাইতে প্রথমটা চাহে নাই, হাজারি কিছুতেই ছাড়িল না। চা পান ও জলযোগান্তে বেচু বলিল—হাজারি, তুমি তো সাত-আট বছর আমার সঙ্গে ছিলে, জানো তো সবই, হোটেলটা ছিল আমার প্রাণ। আজ বাইশ বছর হোটেল চালাচ্ছি—এখন কোথায় যাই আর কি করি! পৈতৃক জোতজমা ঘরদোর যা ছিল ফুলে-নব্‌লায়, সে এখন আর কিছু নেই, ওই হোটেলই ছিল বাড়ী। এমন কষ্ট হয়েছে, এই বুড়ো বয়সে এখন দাঁড়াই কোথায় ? চালাই কী করে ?

—এমন অবস্থা হোল কি করে কর্ত্তা ? দেনা বাধালেন কী করে ?

—খরচে আয়ে এদানীং কুলোতো না হাজারি। দু-বার বাসন চুরি হয়ে গেল। ছোট হোটেল, আর কত ধাক্কা সইবার জান ছিল ওর! কাবু হয়ে পড়লো। খদ্দের কমে গেল। বাড়ীভাড়া জমতে লাগলো—এসব নানা উৎপাত—

হাজারি বেচু চক্কত্তিকে তামাক সাজিয়া দিয়া বলিল—কর্ত্তা, একটা কথা আছে বলি। আপনি আমার পুরনো মনিব, আমার যদি টাকা এখন থাকতো, আপনার হোটেলের সীল্ আমি খুলিয়ে দিতাম। কিন্তু কাল মেয়ের বিয়ে দিয়ে এখন অত টাকা আমার হাতে নেই। তাই বলছি, যতদিন বম্বে থেকে না ফিরি, আপনি আমার বাজারের হোটেলের ম্যানেজার হয়ে হোটেল চালান। পঁচিশ টাকা করে আপনার খরচ দেবো। (হাজারি মাহিনার কথাটা মনিবকে বলিতে পারিল না।) খাবেন দাবেন হোটেলে, আর পদ্মদিদিও ওখানে থাকবে, মাইনে পাবে, খাবে। কি বলেন আপনি ?

বেচু চক্কত্তির পক্ষে ইহা অস্বপনের স্বপন। এ আশা সে কখনো করে নাই। রেলবাজারের অত বড় কারবারী হোটেলের সে ম্যানেজার হইবে। পদ্মঝিও খবরটা পাইয়াছিল বোধ হয় বেচুর কাছেই, সেদিন সন্ধ্যাবেলা সে কুসুমের বাড়ী গেল। কুসুম উহাকে দেখিয়া কিছু আশ্চর্য্য না হইয়া পারিল না, কারণ জীবনে কোনোদিন পদ্মঝি কুসুমের দোর মাড়ায় নাই।

—এসো পদ্মপিসি বসো। আমার কি ভাগ্যি। এই পিঁড়িখানতে বোসো পিসি। পান-দোক্তা খাও ? বসো পিসি, সেজে আনি—

পদ্মঝি বসিয়া পান খাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কুসুমের সঙ্গে এ-গল্প ও-গল্প করিল। পদ্ম বুঝিতে পারিয়াছে কুসুমও তাহার এক মনিব। ইহাদের সকলকে সন্তুষ্ট রাখিয়া তবে চাকুরি বজায় রাখা। যদিও সে মনে মনে জানে, চাকুরি বেশী দিন তাহাকে করিতে হইবে না। আবার একটা হোটেল নিজেরাই খুলিবে, তবে বিপদের দিনগুলিতে একটা কোনো আশ্রয়ে কিছুদিন মাথা গুঁজিয়া থাকা।

পরদিন পদ্মঝি হোটেলের কাজে ভর্ত্তি হইল। বেচু চক্কত্তিও বসিল গদির ঘরে। ইহারা কেহই যে বিশ্বাসযোগ্য নয় তাহা হাজারি ভাল করিয়াই বুঝিত। তবে কথা এই যে, ক্যাশ থাকিবে নরেনের কাছে। বেচু চক্কত্তি দেখাশোনা করিয়াই খালাস।

হাজারির মনে হইল সে তাহার পুরোনো দিনের হোটেলে আবার কাজ করিতেছে, বেচু চক্কত্তি তাহার মনিব, পদ্মঝিও ছোট মনিব।

পদ্ম যখন আসিয়া সকালে জিজ্ঞাসা করিল—ঠাকুর মশায়, ইলিশ মাছ আনাব এবেলা না পোনা ?—তখন হাজারি পূর্ব্ব অভ্যাসমতই সম্ভ্রমের সঙ্গে উত্তর দিল, যা ভাল মনে করো পদ্মদিদি। পচা না হোলে ইলিশই এনো।

বেচু চক্কত্তি পাকা ব্যবসাদার লোক এবং হোটেলের কাজে তাহার অভিজ্ঞতা হাজারির অপেক্ষা অনেক বেশী। সে হাজারিকে ডাকিয়া বলিল—হাজারি, একটা কথা বলি, তোমার এখানে ফাস্ট আর সেকেন কেলাসের মধ্যে মোট চার পয়সার তফাৎ রেখেচ, এটা ভাল মনে হয় না আমার কাছে। এতে করে সেকেন কেলাসে খদ্দের কম হচ্চে, বেশী লোক ফাস্ট কেলাসে খায় অথচ খরচ যা হয় তাদের পেছনে তেমন লাভ দাঁড়ায় না। গত এক মাসের হিসেব খতিয়ে দেখলাম কিনা! নরেন বাবাজী ছেলেমানুষ, সে হিসেবের কি বোঝে ?

হাজারি কথাটার সত্যতা বুঝিল। বলিল—আপনি কি বলেন কর্ত্তা ?

—আমার মত হচ্ছে এই যে ফাস্ট কেলাস হয় একদম উঠিয়ে দাও, নয়তো আমার হোটেলের মত অন্ততঃ দুআনা তফাৎ রাখো। শীতকালে যখন সব সস্তা, তখন এ থেকে যা লাভ হবে, বর্ষাকালে বা অন্য সময় ফাস্ট কেলাসের খদ্দেরদের পেছনে সেই লাভের খানিকটা খেয়ে গিয়েও যাতে কিছু থাকে, তা করতে হবে। বুঝলে না ?

—তাই করুন কর্ত্তা। আপনি যা বোঝেন, আমি কি আর তত বুঝি ?

বেচু চক্কত্তি খুব সন্তুষ্ট আছেন হাজারির ব্যবহারে। ঠিক সেই পুরোনো দিনের মতই হাজারির নম্র কথাবার্ত্তা—যেন তিনিই মনিব, হাজারি তাঁর চাকর। যদিও পদ্মঝি ও তিনি দুজনেরই দৃঢ় বিশ্বাস হাজারি যা কিছু করিয়া তুলিয়াছে, সবই কপালের গুণে, আসলে তাহার বুদ্ধিসুদ্ধি কিছুই নাই, তবুও দুজনেই এখন মনে ভাবে, বুদ্ধি যত থাক আর না-ই থাক,—বুদ্ধি অবশ্য সকলের থাকে না—লোক হিসাবে হাজারি কিন্তু খুবই ভাল।

সকালে উঠিয়া হাজারি এক কলিকা গাঁজা সাজিবার উদ্যোগ করিতেছে। এই সময়টা

সকলের অগোচরে সে একবার গাঁজা খাইয়া থাকে, হোটেলে গিয়া আজকাল সে-সুবিধা ঘটে না। এমন সময় অতসীকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি গাঁজার কলিকা ও সাজসরঞ্জাম লুকাইয়া ফেলিল।

অতসীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—কি মা ?

—কাকাবাবু, আপনি কবে বম্বে যাচ্ছেন ?

—আসচে মঙ্গলবার যাব, আর চার দিন বাকি।

—আমার বড্ড ইচ্ছে হচ্ছে আপনাকে নিয়ে এঁড়োশোলা যাব, আমাদের বৈঠকখানায় আবার আপনাকে আর বাবাকে চা জলখাবার এনে দেব—যাবেন কাকাবাবু ?

হাজারির চোখে জল আসিল। কিন্তু তুচ্ছ সাধ! মেয়েদের মনের এই সব অতি সামান্য আশা-আকাঙ্ক্ষাই কি সব সময়ে পূর্ণ হয় ? কি করিয়া সে এঁড়োশোলা যাইবে এখন ? ছেলেমানুষ, না হয় বলিয়া খালাস!

মুখে বলিল—মা, সে হয় না। কত কাজ বাকি এদিকে, সে-তো মা জান না। নরেন ছেলেমানুষ, ওকে সব জিনিস দেখিয়ে বুঝিয়ে না দিয়ে—

—আজ চলুন আমায় নিয়ে। গরুর গাড়ীতে আমরা বাপে-মেয়েতে চলে যাই—কাল বিকেলে চলে আসবেন। তা ছাড়া টেঁপিও বলছিল একবার গাঁয়ে যাবার ইচ্ছে হয়েছে। চলুন কাকাবাবু, চলুন—

—তা নিতান্ত যদি না ছাড় মা, তবে পরশু সকালে গিয়ে সেই দিনই সন্ধ্যার পরে ফিরতে হবে। থাকবার একদম উপায় নেই—কারণ তার পরদিনই বিকেলে রওনা হতে হবে আমায়। বোম্বাইয়ের ডাকগাড়ী রাত আটটায় ছাড়ে বলে দিয়েছে।

বৈকালে চূর্ণীর ধারের নিমগাছটার তলায় হাজারি একবার গিয়া বসিল। পাশের চুন-কয়লার আড়তে হিন্দুস্থানী কুলিরা সেই ভাবে সুর করিয়া সমস্বরে ঠেট্ হিন্দীতে গজল গাহিতেছে, চূর্ণীর খেয়াঘাটে ওপারের ফুলে-নবলার হাটের হাটুরে লোক পারাপার হইতেছে—পুরোনো দিনের মতই সব।

সে কি আজও বেচু চক্কত্তির হোটেলে কাজ করিতেছে ? পদ্মঝিয়ের মুখনাড়া খাইয়া তাহাকে কি এখনি সদ্য আঁচ বসানো কয়লার উনুনের ধোঁয়ার মধ্যে বসিয়া ও-বেলার রান্নার ফর্দ্দ বুঝিয়া লইতে হইবে ?

সেই পদ্মদিদি ও সেই বেচু চক্কত্তির সঙ্গে সকালবেলাও তো কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। দাঁড়ি-পাল্লার পাল্লা বদল হইয়াছে, পুরোনো দিনের সম্বন্ধগুলি ছায়াবাজির মত অন্তর্হিত হইল কোথায় ? বোম্বাই…বোম্বাই কত দূরে কে জানে ? টেঁপিকে লইয়া, অতসী বা কুসুমকে লইয়া যদি যাওয়া যাইত! ইহারা যে-কেহ সঙ্গে থাকিলে সে বিলাত পর্য্যন্ত যাইতে পারে—দুনিয়ার যে-কোন জায়গায় বিনা আশঙ্কায়, বিনা দ্বিধায় চলিয়া যাইতে পারে।

তখনকার দিনে সে কি একবারও ভাবিয়াছিল আজকার মত দিন তাহার জীবনে আসিবে ?

নরেনকে যেদিন প্রথম দেখে সেইদিনই মনে হইয়াছিল যে সুন্দর ছবিটি—টেঁপি লাল চেলি পরিয়া নরেনের পাশে দাঁড়াইয়া, মুখে লজ্জা, চোখে চাপা আনন্দের হাসি—তখন মনে হইয়াছিল এসব দুরাশা, এও কি কখনও হয়?

সবই ঠাকুর রাধাবল্লভের দয়া। নতুবা সে আবার কবে ভাবিয়াছিল যে সে বোম্বাই যাইবে দেড়-শ টাকা মাহিনার চাকুরি লইয়া?

পরদিন অতসী আসিয়া আবার বলিল—কবে এঁড়োশোলা যাবেন কাকাবাবু? টেঁপিও যাবে বলছে, কাকীমাও বলছিলেন গাঁয়ে থেকে সেই আজ দু-বছর আড়াই বছর এসেছেন আর কখনও যান নি। ওঁরও যাবার ইচ্ছে। একদিনের জন্যেও চলুন না?

আবার স্বগ্রামে আসিয়া উহাদের গাড়ী ঢুকিল বহুদিন পরে। হাজারিদের বাড়ীটা বাসযোগ্য নাই, খড়ের ঘর এত দিন দেখাশোনার অভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে—ঝড়ে খড় উড়িয়া যাওয়ার দরুন চালের নানা জায়গা দিয়া নীল আকাশ দিব্যি চোখে পড়ে।

অতসী টানাটানি করিতে লাগিল তাহাদের বাড়ীতে সবসুদ্ধ লইয়া যাইবার জন্য, কিন্তু টেঁপির মা রাজী নয়, নিজের ঘরদোরের উপর মেয়েমানুষের চিরকাল টান—ভাঙা ঘরের উঠানের জঙ্গল নিজের হাতে তুলিয়া ফেলিয়া টেঁপির সাহায্যে ঘরের দাওয়া ও ভিতরকার মেজে পরিষ্কার করিয়া নিজের বাড়িতেই সে উঠিল। টেঁপিকে বলিল—তুই বস্ মা, আমি পুকুরে একটা ডুব দিয়ে আসি, পেয়ারাতলার ঘাটে কতদিন নাই নি!

পুকুরের ঘাটে গিয়ে এ-পাড়ার রাধু চাটুজ্জের পুত্রবধূর সঙ্গে প্রথমেই দেখা। সে মেয়েটির বয়স প্রায় টেঁপির মায়ের সমান, দুজনে যথেষ্ট ভাব চিরকাল। টেঁপির মাকে দেখিয়া সে তো একেবারে অবাক বাসন মাজা ফেলিয়া হাসিমুখে ছুটিয়া আসিয়া বলিল—ওমা, দিদি যে! কখন এলে দিদি? আর কি আমাদের কথা মনে থাকবে তোমার? এখন বড়লোক হয়ে গিয়েছ সবাই বলে। গরীবদের কথা কি মনে পড়ে?

দুজনে দুজনকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

কিছুক্ষণ পরে রাধু চাটুজ্জের পুত্রবধূকে সঙ্গে লইয়া টেঁপির মা ঘাট হইতে ফিরিল। মেয়েটি বাড়ী ঢুকিয়া টেঁপিকে বলিল—চিনতে পারিস মা?

—ওমা, কাকীমা যে, আসুন আসুন—

—এস মা, জন্ম-এইস্ত্রী হও, সাবিত্রীর সমান হও। হ্যাঁ গা তা তোমার কেমন আক্কেল? মেয়েকে আনলে, অমনি জামাইকেও আনতে হয়-না? শুনেছি চাঁদের মত জামাই হয়েছে। এ চুড়ি কে দিয়েছে—দেখি মা। ক ভরি! একে কি বলে? পাশা? দেখি দেখি—কখনও শুনিও নি এসব নাম। তা একটা কথা বলি। তোমাদের রান্না এ-বেলা এখানে হওয়ার উপায়ও নেই—আমাদের বাড়ীতে তোমরা সবাই এ-বেলা দুটো ডালভাত—

টেঁপি বলিল—সে হবে না কাকীমা। অতসী-দি এসেছে আমাদের সঙ্গে জানেন না? অতসীদি সবাইকে বলেছে খেতে। সেখানেই নিয়ে গিয়ে তুলছিল আমাদের—মা গেল না,

জানেন তো মার সাত প্রাণ বাঁধা এই ভিটের সঙ্গে—রাণাঘাটের অমন বাড়ী, কলের জল—শহর জায়গা, সেখানে থাকতেও মা শুধু বাড়ী-বাড়ী করে—আহা বাড়ীর কি ছিরি! ফুটো খড়ের চাল, বাড়ী বললেও হয়, গোয়াল বললেও হয়—

—বাপের বাড়ীর নিন্দে করিস নে, যা যা—আজ না হয় বড়লোক শ্বশুর হয়েছে, এই ফুটো খড়ের চালের তলায় তো মানুষ হয়েছ মা :

হাসি-গল্পের মধ্য দিয়া প্রায় ঘণ্টা দুই কখন কাটিয়া গেল। ইহাদের আসিবার খবর পাইয়া এ-পাড়ার ও-পাড়ার মেয়েমহলের সবাই দেখা করিতে আসিল। জামাইকে সঙ্গে করিয়া না আনার দরুন সকলেই অনুযোগ করিল।

টেঁপির মা বলিল—জামাইয়ের আসবার যো নেই যে! রেলের হোটেলের দেখাশুনো করেন, সেখানে একদিন না থাকলে চুরি হবে। উপায় থাকলে আনি নে মা?

অতসীর দুর্ভাগ্যের কথা সকলেই পূর্ব্বে জানিত। গ্রামসুদ্ধ লোক তাহার জন্য দুঃখিত। সবাই একবাক্যে বলে, অমন মেয়ে—দেবীর মত মেয়ে। আর তারই কপালে এই দুঃখ, এই কচি বয়সে!

সন্ধ্যার দেরি নাই। অতসীদের বৈঠকখানায় বসিয়া অতসীর বাবার সঙ্গে হাজারি কথা-বার্ত্তা বলিতেছিল। হরিচরণবাবু কন্যার অকাল-বৈধব্যে বড় বেশী আঘাত পাইয়াছেন। হাজারির মনে হইল যেন এই আড়াই বৎসরের ব্যবধানে তাঁর দশ বৎসর বয়স বাড়িয়া গিয়াছে। মেয়েকে দেখিয়া আজ তবুও একটু সুস্থ হইয়াছেন।

হরিচরণবাবু বলিলেন—এই দেখ তোমার বয়সে আর আমার বয়সে—খুব বেশী তফাৎ হবে না। তোমারও প্রায় পঞ্চাশ হয়েছে—না-হয় এক-আধ বছর বাকি। কিন্তু তোমার জীবনে উদ্যম আছে, আশা আছে, মনে তুমি এখনও যুবক। কাজ করবার শক্তি তোমার অনেক বেশী এখনও। এই বয়সে বম্বে যাচ্ছ, শুনে হিংসে হচ্ছে হাজারি। বাঙালীর মধ্যে তোমার মত লোক যত বাড়বে ঘুমন্ত জাতটা ততই জাগবে। এরা পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে গলায় তুলসীর মালা পরে পরকালের জন্য তৈরী হয়—দেখছ না আমাদের গাঁয়ের দশা? ইহকালই দেখলি নে, ভোগ করলি নে, তোদের পরকালে কি হবে বাপু? সেখানেও সেই ভূতের ভয়। পরকালে নরকে যাবে। তুমি কি ভাবো অকর্ম্মা, অলস, ভীরু লোকদের স্বর্গে জায়গা দেন নাকি ভগবান?

এই সময় পুরানো দিনের মত অতসী আসিয়া উঁহাদের সামনে টেবিলে জলখাবারের রেকাবি রাখিয়া বলিল—খান কাকাবাবু, চা আনি, বাবা তুমিও খাও, খেতে হবে। সন্ধ্যের এখনও অনেক দেরি—

কিছুক্ষণ পরে চা লইয়া অতসী আবার ঢুকিল। পিছনে আসিল টেঁপি। সেই পুরোনো দিনের মত সবই—তবুও কত তফাৎ! অতসীর মুখের দিকে চাহিলে হাজারির বুকের ভিতরটা বেদনায় টনটন করে। তবুও তো মা বাপের সামনে অতসী বিধবার বেশ যতদূর সম্ভব বর্জ্জন করিয়াছে। মা বাপের চোখের সামনে সে বিধবার বেশে ঘুরিতে-ফিরিতে পারিবে না।

ইহাতে পাপ হয় হইবে।

হরিচরণবাবু সন্ধ্যাহ্নিক করিতে বাড়ীর মধ্যে গেলেন।

অতসীর দিকে চাহিয়া হাজারি বলিল—কেমন মা, তোমার সাধ যা ছিল, মিটেছে?

—নিশ্চয়ই কাকাবাবু। টেঁপি কি বলিস্? কতদিন ভাবতুম গাঁয়ে তো যাবো, সেখানে টেঁপিও নেই, কাকাবাবুও নেই। কাদের সঙ্গে দুটো কথা বলবো?

—কাল আমার সঙ্গে রাণাঘাট যেতে হবে কিন্তু মা।

—বাঃ, সে আমি বাবা-মাকে বলে রেখেছি। আপনাকে উঠিয়ে দিতে যাব না কি রকম? কাকাবাবু, টেঁপি এখন দিনকতক আমার কাছে এখানে থাক্ না? তাহলে আপনাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসবার সময় ওকে সঙ্গে করে আনি। নরেনবাবু মাঝে মাঝে এখানে আসবেন এখন।

নরেনের কথা বলাতে টেঁপি বাপের অলক্ষিতে অতসীকে এক রাম-চিমটি কাটিল।

—কাকাবাবু পুজোর সময় আসবেন তো! এবার আমাদের গাঁয়ে আমরা ঠাকুর পুজো করব।

—পুজোর তো অনেক দেরি এখন মা। যদি সম্ভব হয় আসবো বই কি। তবে তুমি যদি পুজো করো তবে আসবার চেষ্টা করব।

টেঁপি বলিল—তোমাকে আসতেই হবে বাবা। মা বলেচে এবার প্রতিমা গড়িয়ে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা করবে। এখনও তিন-চার মাস দেরি পুজোর—সে-সময় ছুটি নিয়ে আসবে বাবা, কেমন তো?

রাধু মুখুয্যের পুত্রবধূ নাছোড়বান্দা হইয়া পড়িয়াছিল, রাত্রে তাহাদের বাড়ীতে সকলকে খাইতে হইবেই। টেঁপির মা সন্ধ্যাবেলা হইতেই রাধু মুখুয্যের বাড়ী গিয়া জুটিয়াছে, মোচা কুটিয়া, দেশী কুমড়া কুটিয়া তাহাদের সাহায্য করিতেছে। সে সরলা গ্রাম্য মেয়ে, শহরের জীবনযাত্রার চেয়ে পাড়াগাঁয়ের এ জীবন তাহার অনেক ভাল লাগে। সে বলিতেছিল—ভাই, শহরে-টহরে কি আমাদের পোষায়? এই যে কুমড়োর ডাঁটাটুকু, এই এক পয়সা। এই এতটুকু করে কুমড়োর ফালি এক পয়সা। সে ফালি কাটতে বোধ হয় পোড়ারমুখো মিন্সেদের হাত কেটে গিয়েছে। আমার ইচ্ছে কি জান ভাই, উনি চলে গেলে আমি তিন-চার দিনের মধ্যে আবার গাঁয়ে আসব, পুজো পর্য্যন্ত এখানেই থাকব। মেয়ে-জামাই থাকল রাণাঘাটের বাসায়, ওরাই সব দেখাশুনো করুক, ওদেরই জিনিস। আমার সেখানে ভাল লাগে না।

স্বামীকে কথাটা বলিতে হাজারি বলিল—তোমার ইচ্ছে যা হয় করো—কিন্তু তার আগে ঘরখানা তো সারানো দরকার। ঘরে জল পড়ে ভেসে যায়, থাকবে কিসে?

টেঁপির মা বলিল—সে ভাবনায় তোমার দরকার নেই। আমি অতসীদের বাড়ী থেকে কি ওই মুখুয্যেদের বাড়ী থেকে ঘর সারিয়ে নেব। জামাইকে বলে যেও খরচ যা লাগে যেন দেয়।

রাধু মুখুয্যের বাড়ী রাত্রে আহারের আয়োজন ছিল যথেষ্ট—খিচুড়ি, ভাজাভুজি, মাছ, ডিমের ডালনা, বড়াভাজা, টক, দই, আম, সন্দেশ। অতসীকেও খাইতে বলা হইয়াছিল কিন্তু সে আসে নাই। টেঁপি ডাকিতে গেলে কিন্তু অতসী বলিল, তাহার মাথা ভয়ানক ধরিয়াছে, সে যাইতে পারিবে না।

শেষরাত্রে দুখানা গাড়ী করিয়া সকলে আবার রাণাঘাট আসিল। দুপুরের পর হাজারি একটু ঘুমাইয়া লইল। ট্রেন নাকি সারারাত চলিবে, কখনও সে অতদূর যায় নাই, অতক্ষণ গাড়ীতেও থাকে নাই। ঘুম হইবে না কখনই। যাইবার সময়ে টেঁপির মা ও টেঁপি কাঁদিতে লাগিল। কুসুমও ইহাদের সঙ্গে যোগ দিল।

অতসী সকলকে বুঝাইতে লাগিল—ছিঃ, কাঁদে না, ওকি কাকীমা? বিদেশে যাচ্ছেন একটা মঙ্গলের কাজ, ছিঃ টেঁপি, অমন চোখের জল ফেলো না ভাই।

হাজারি ঘরের বাহির হইয়াছে, সামনেই পদ্মঝি।

পদ্মঝি বলিল—এখন এই গাড়ীতে যাবেন ঠাকুর মশায়?

—হ্যাঁ, পদ্মদিদি এবেলা খদ্দের কত?

—তা চল্লিশ জনের ওপর। সেকেন কেলাস বেশী।

—ইলিশ মাছ নিয়ে এসেছিলে তো?

পদ্মঝি হাসিয়া বলিল—ওমা, তা আর বলতে হবে? যতদিন বাজারে পাই, ততদিন ইলিশের বন্দোবস্ত। আষাঢ় থেকে আশ্বিন—দেখেছিলাম তো ও হোটেলে!

—হ্যাঁ সে তোমাকে আর আমি কি শেখাবো? তুমি হোলে গিয়ে পুরোনো লোক! বেশ হুঁশিয়ার থেকো পদ্মদিদি। ভেবো তোমার নিজেরই হোটেল।

পদ্মঝি এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটাইল। হঠাৎ ঝুঁকিয়া নীচু হইয়া বলিল—দাঁড়ান ঠাকুর মশাই, পায়ের ধুলোটা দেন একটু—

হাজারি অবাক, স্তম্ভিত। চক্ষুকে বিশ্বাস করা শক্ত। এ কি হইয়া গেল! পদ্মদিদি তাহার পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া পায়ের ধুলা লইতেছে; এমন একটা দৃশ্য কল্পনা করিবার দুঃসাহসও কখনো তাহার হয় নাই। কোন্ সৌভাগ্যটা বাকী রহিল তাহার জীবনে?

স্টেশনে তুলিয়া দিতে আসিল দুই হোটেলের কর্ম্মচারীরা প্রায় সকলে—তা ছাড়া অতসী, টেঁপি, নরেন। বাহিরের লোকের মধ্যে যদু বাঁড়ুয্যে। যদু বাঁড়ুয্যে সত্যই আজকাল হাজারিকে যথেষ্ট মানিয়া চলে। তাহার ধারণা হোটেলের কাজে হাজারি এখনও অনেক বেশী উন্নতি দেখাইবে, এই তো সবে শুরু।

অতসী পায়ের ধুলা লইয়া বলিল—আসবেন কিন্তু পূজোর সময় কাকাবাবু, মেয়ের বাড়ীর নেমন্তন্ন রইল। ঠিক আসবেন—

টেঁপি চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল—খাবারের পুঁটুলিটা ওপরের তাক থেকে নামিয়ে কাছে রাখো বাবা, নামাতে ভুলে যাবে, তোমার তো হুঁশ থাকে না কিছু। আজ রাত্তিরেই খেও,

ভুলো না যেন। কাল বাসি হয়ে যাবে, পথেঘাটে বাসি খাবার খবরদার খাবে না। মনে থাকবে? তোমার চিঠি পেলে মা বলেচে রাধাবল্লভতলায় পূজো দেবো

চলন্ত ট্রেনের জানালার ধারে বসিয়া হাজারির কেবলই মনে হইতেছিল পদ্মদিদি যে আজ তাহার পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল এ সৌভাগ্য হাজারির সকল সৌভাগ্যকে ছাপাইয়া ছাড়াইয়া গিয়াছে।

সেই পদ্মদিদি।

ঠাকুর রাধাবল্লভ, জাগ্রত দেবতা তুমি, কোটি কোটি প্রণাম তোমার চরণে। তুমিই আছ। আর কেহ নাই। থাকিলেও জানি না।

দৃষ্টিপ্রদীপ

বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

জ্যাঠামশায়দের রান্নাঘরে খেতে বসেছিলাম আমি আর দাদা। ছোট কাকীমা ডাল দিয়ে গেলেন, একটু পরে কি একটা চচ্চড়িও নিয়ে এলেন। শুধু তাই দিয়ে খেয়ে আমরা দু'জনে ভাত প্রায় শেষ ক'রে এনেছি এমন সময় ছোট কাকীমা আবার এলেন। দাদা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—কাকীমা, আজ মাছ ছিল যে, মাছ কই ?

আমি অবাক হয়ে দাদার মুখের দিকে চাইলাম, লজ্জা ও অস্বস্তিতে আমার মুখ রাঙা হয়ে উঠল। দাদা যেন কি ! এমন বোকা ছেলে যদি কখনো দেখে থাকি ! আমার অনুমানই ঠিক হ'ল, কাকীমা একটু অপ্রতিভের সুরে বললেন—মাছ যা ছিল, আগেই উঠে গেছে বাবা, ওই দিয়ে খেয়ে নাও। আর একটু ডাল নিয়ে আসবো ?

দাদার মুখ দেখে বুঝলাম, দাদা যেন হতাশ হয়েচে। মাছ খাবার আশা করেছিল, তাই না পেয়ে। মনটায় আমার কষ্ট হ'ল। দাদা দেখেও দেখে না, বুঝেও বুঝে না—দেখছে এখানে আমরা কি অবস্থায় চোরের মত আছি, পরের বাড়ি, তাদের হাত-তোলা দু মুঠো ভাতে কটি ভাইবোন কোনরকমে দিন কাটিয়ে যাচ্চি, এখানে আমাদের না আছে জোর, না আছে কোন দাবি—তবুও দাদার চৈতন্য হয় না, সে আশা ক'রে বসে থাকে যে এই বাড়ির অন্যান্য ছেলেদের মত সেও যত্ন পাবে, খাবার সময়ে ভাগের মাছ পাবে, বাটি-ভরা দুধ পাবে, মিষ্টি পাবে। তা পায়ও না, না পেয়ে আবার হতাশ হয়ে পড়ে, আশাভঙ্গের দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক চায়—এতে আমার ভারি কষ্ট হয়, অথচ দাদাকেও আসল অবস্থাটা খুলে বলতে পারিনে তাতেও কষ্ট হয়।

দাদা বাইরে এসে বললে—মাছ তো কম কেনা হয়নি, তার ওপর আবার মাঠের পুকুর থেকে মাছ এসেছিল—এত মাছ সব হারু আর ভুন্টিয়া খেয়ে ফেলেচে ! বাবারে, রাক্কোস্ সব এক-একটি ! একখানা মাছও খেতে পেলাম না।

দাদাকে ভগবান এমন বোকা ক'রে গড়েছিলেন কেন তাই ভাবি।

সীতা এ-সব বিষয়ে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। এই সে-দিনও তো দেখেচি সীতা রান্নাঘরে খেতে বসেচে—সামনেই জ্যাঠাইমাও খেতে বসলেন। জ্যাঠাইমাকে ভুবনের মা এক কাঁসি মাছের তরকারি দিয়ে গেল, বড় বড় দাগা মাছ আট-দশখানা তাতে—আর সীতাকে দিলে তার বরাদ্দমত একটুক্রো—জ্যাঠাইমা মাছ যত পারলেন খেলেন, বাকীটা কাঁসিতেই রেখে দিলেন, সেই পাতে তাঁর ভাগ্নে-বৌ বসবে। সীতার পাতে তো একখানা মাছও নিজের পাত থেকে দিতে পারতেন ! কিন্তু কই, তা নিয়ে সীতা তো কখনো কিছু বলে না, দুঃখ করে না, নালিশ করে না ! আমি জানতে পারলাম এই জন্যে যে, আমি সে-সময় নিতাইকাকার জন্যে আগুন আনতে রান্নাঘরে গিয়েছিলাম—সীতা কোন কথা আমায় বলেনি। এ বাড়ির কাণ্ডই এ রকম, আজ এক বছরের ওপর তো দেখে আসচি। অবিশ্যি নিজের জন্য আমি গ্রাহ্যও করিনে, আমার দুঃখ হয় ওদের জন্যে।

মায়ের দুঃখও এ বাড়িতে কম নয়। অত খাটুনির অভ্যেস মায়ের ছিল না কোন কালে। এই শীতকালে মাকে গোছা গোছা বাসন নিয়ে ভোরে পুকুরের জলে নামতে হয়, মা'কে আর সীতাকে। খিড়কি পুকুরের জল সকালে থাকে ঠাণ্ডা বরফ, রোদ তো পড়ে না জলে কোন

কালেই, চারিধারে বড় বড় আম আর সুপুরির বাগান। একটুকু রোদ আসে না ঘাটে, সেই কন্‌কনে হিমজলে বসে বাসন মাজা, যেমন তেমন ক'রে মাজলে তো এ বাড়িতে চলবে না, কোথাও দাগ থাকবার জো নেই একটু, জ্যাঠাইমা দেখে নেবেন নিজে। সে যে কি কষ্ট হয় মায়ের, মা মুখ বুজে কাজ করে যান, বলেন না কিছু, আমি তো বুঝতে পারি! ও-সব কাজ কি মা করেছেন কখনো?

সকলের চেয়ে কাজ বাড়ে পুজো-আচ্চার দিনে—এ বাড়িতে বারো মাসের বারোটা পূর্ণিমাতে নিয়মিত ভাবে সত্যনারায়ণের সিন্নি হয়। গৃহদেবতা শালগ্রামের নিত্যপূজা তো আছেই। তা ছাড়া লক্ষ্মীপূজা মাসে একটা লেগেই থাকে। এ-সব দিনে সংসারের দৈনিক বাসন বাদে পুজোর বাসন বেরোয় ঝুড়িখানেক। এঁদের সংসার অত্যন্ত সাত্ত্বিক গোঁড়া হিন্দুর সংসার—পুজো-আচ্চার ব্যাপারে পান থেকে চুন খসবার জো নেই। সে ব্যাপারের দেখাশুনো করেন জ্যাঠাইমা স্বয়ং। ফলে ঠাকুরঘরের কাজ নিয়ে যাঁরা খাটাখাটুনি করেন, তাঁদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে।

পুজোর বাসন যে-দিন বেরোয়, মা সে-দিন সীতাকে সঙ্গে নিয়ে যান ঘাটে। সে যতটা পারে মাকে সাহায্য করে বটে, কিন্তু একে সে ছেলেমানুষ, তাতে ও-সব কাজ তার অভ্যেস নেই একেবারেই। জ্যাঠাইমার পছন্দমত পুজোর বাসন মাজতে সক্ষম হওয়া মানে অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া—বরং বোধ হয় শেষেরটাই কিছু সহজ। জ্যাঠাইমা বলবেন,—কোষাকুষি মাজবার ছিরি কি তোমার সেজোবৌ? কতদিন ব'লে দিইচি তামার পাত্তরে তেঁতুল নেবু না দিলে ম্যাড়ম্যাড় করবেই—শুধু বালি দিয়ে ঘষলে কি আর—ঠাকুরদেবতার কাজগুলোও তো একটু ছেদ্দা ক'রে লোকে করে? সবতাতেই খিরিস্টানি—

মা জবাব খুঁজে পান না। যদি তিনি বলতে যান—"না বড়দি, নেবু ঘষেই তো ঠাকুরঘরের তামার বাসন বরাবরই—"

জ্যাঠাইমা বাধা দিয়ে বলবেন,—আমার চোখে তো এখনো ঢ্যালা বেরোয়নি সেজবৌ? অম্বলতা দিয়ে বাসন মাজলে অমনি ছিরি হয় বাসনের? কা'কে শেখাতে এসেচ? কি বলব, ভুবনের মা হেঁসেলের কাজ সেরে সময় করতে পারে না, নইলে বাসন-মাজা কা'কে বলে—

জ্যাঠাইমা নিজের কথার প্রতিবাদ সহ্য করতে পারেন না, আর কেনই বা পারবেন, তিনিই যখন এ বাড়ির কর্ত্রী, এ বাড়ির সর্ব্বেসর্ব্বা, পুত্রবধূরা, জায়েরা, ভাগ্নেবৌ, মাসীর দল, পিসির দল, সবাই যখন মেনে চলে—ভয় করে।

আমার ইস্কুলের পড়াটা শেষ হয়ে গেলে বাঁচি, এদের হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে অন্য কোথাও চলে যাই তা'হলে।

ভুবনের মা সকালে আমাকে ডেকে বলল, জিতু, তুমি যখন ইস্কুলে যাও, ভুবনকেও নিয়ে যেও না? ওর লেখাপড়া তো হ'ল না কিছু, আমি মাসে মাসে আট আনা মাইনে দিতে পারি, জিজ্ঞেস করে এসো তো ইস্কুলে, তাতে হয় কিনা?

আমি বললাম—দেবেন কাকীমা, ওতেই হয়ে যাবে, ওর তো নিচু ক্লাসের পড়া, আট আনায় খুব হবে।

ভুবনের মা আঁচল থেকে একটা আধুলি বের ক'রে আমায় দিতে গেল। বললে—তাহ'লে নিয়ে রেখে দাও, আর আজ ভাত খাওয়ার সময়ে ভুবনকে ডেকে খেতে বসিও। ও আমার কথা শোনে না—তুমি একবার ইস্কুলে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে গিয়ে ভর্ত্তি ক'রে দিলে তারপর

থেকে ভয়ে ভয়ে আপনি যাবে। মাথার ওপর কেউ নেই, বেজায় বেয়াড়া হয়ে উঠচে দিন দিন।

তারপর আমার হাত দুখানা খপ করে ধরে ফেলে মিনতির সুরে বললে, এই উব্‌গারটুকু তোমাকে করতে হবে বাবা জিতু—আমার কেউ নেই, কাউকে বলতে পারি নে, বৌ মানুষ, কপালই না হয় পুড়েচে, কিন্তু কি ব'লে যার-তার সঙ্গে কথা কই বলো তো বাবা? ব'লো একটু ভুবনকে বুঝিয়ে।

এই ভুবনের মা এ বাড়িতে কি রকমে ঢুকলো, মার মুখে সে কথা আমি শুনেচি। এই গাঁয়েই ওর বাড়ি। ওর এক সতীন আছে, স্বামী মারা যাওয়ার পরে সম্পত্তির অর্দ্ধেক ভাগ পাছে দখল করতে না পেরে ওঠে, এই ভয়ে জ্যাঠামশায়ের নামে বুঝি লেখাপড়া ক'রে দেয়। কথা থাকে, এরা ওদের দুজনকে চিরকাল খেতে পরতে দেবে। কিন্তু এ বাড়িতে ভুবনের মা আছে চাকরানীরও অধম হয়ে। রাঁধুনীকে রাঁধুনী, চাকরানীকে চাকরানী। আর এত হেনস্থাও সবাই মিলে করে ওকে!

ভুবনের মা হয়েচে এ সংসারে অমঙ্গলের থার্মোমিটার। অর্থাৎ মঙ্গল যখন আসে, তখন ভুবনের মায়ের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই—অমঙ্গল এলেই কিন্তু ভুবনের মায়ের দোষ। জ্যাঠাইমা অমনি বলবেন—যেদিন থেকে ও আমার বাড়ি ঢুকেচে, সেইদিন থেকেই জানি এ বাড়ির আর ভাস্যি নেই। সাত কুল খেয়ে যে আসে, তার কি আর—তখুনি কর্ত্তাকে বলেছিলাম ও পাপ ঢুকিও না সংসারে, তা কাঙালের কথা বাসি হ'লে মিষ্টি লাগে!

আমি নিজের কানে কতদিন এ ধরনের কথা শুনেচি। মা বলেন, ভুবনের মায়ের মত বোকা লোক তিনি কখনো দেখেননি।

চৈত্র মাসের গোড়ার দিকে মেজকাকার ছেলে সলিল বললে—জানো জিতুদা, মঙ্গলবারে আমাদের বাড়িতে গোপীনাথ জীউ ঠাকুর আসবেন? ও-পাড়ায় মেজ-জ্যাঠামশায়দের বাড়ি ঠাকুর এখন আছেন, মঙ্গলবারে আসবেন, দু-মাস থাকবেন, তারপর আবার হরিপুরের বৃন্দাবন মুখুয্যের বাড়ি থেকে তারা নিতে আসবে। বছরে এই দু-মাস আমাদের পালা।

দাদাও সেখানে ছিল, বললে,—খুব খাওয়ান-দাওয়ান হবে?

সলিল বললে—যে-দিন আসবেন, সে-দিন তো গাঁয়ের সব ব্রাহ্মণের নেমন্তন্ন, তা ছাড়াও রোজ বিকেলে শেতল হবে, রাত্তিরে ভোগ—সে ভারি খাওয়ার মজা।

দাদা ও আমি দু-জনেই খুশী হয়ে উঠি। মঙ্গলবার সকাল থেকে বাড়িতে বিরাট হৈ-চৈ পড়ে গেল, ঠাকুরঘর ধোওয়া শুরু হ'ল, বাসন-কোসন কাল বিকেল থেকেই মাজাঘষা চলচে, ভুবনের মা রাত থাকতে উঠে রান্নাঘরে ঢুকেচে, পাড়ার অনেক ঝি-বৌ অবিশ্যি যথেষ্ট কাজে সাহায্য করচে, একটি দল তো কাল রাত থেকে তরকারি কুটচে একরাশ।

কাকীমারা কাল বিকেল থেকে ক্ষীরের সন্দেশ ও নারকেলের নাড়ু গড়তে ব্যস্ত আছেন। ঝিটকিপোতার গোলাবাড়ি থেকে গাড়িখানেক আখ, শশা, কলা, নারকোল এসেচে, সেগুলো কাটা, ছাড়ানো ব্যাপারে বাড়ির ছোট ছোট মেয়েদের নাইয়ে ধুইয়ে ধোওয়া কাপড় পরিয়ে লাগানো হয়েচে।

বাড়ির ছেলেমেয়েরা সকাল সকাল স্নান সেরে ধোয়া ধুতি-চাদর গায়ে ঠাকুর আনতে গেল কর্ত্তাদের সঙ্গে, তাঁরাও গরদের জোড় পরে আগে আগে চলেচেন। ছেলেরা কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে বেলা দশটার সময় তাঁদের সঙ্গে ঠাকুর নিয়ে ফিরলো। জ্যাঠাইমা জলের ঝারা দিতে

দিতে দরজা থেকে এগিয়ে গিয়ে ঠাকুরকে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে এলেন। মেয়েরা শাঁখ বাজাতে লাগলেন। ধূপধুনোর ধোঁয়ায় ঠাকুরঘরের বারান্দা অন্ধকার হয়ে গেল। আমি এ-দৃশ্য কখনো দেখিনি—আমার ভারি আনন্দ হ'ল, ইচ্ছে হ'ল আর একটু এগিয়ে গিয়ে ঠাকুরঘরের দোরে দাঁড়িয়ে দেখি, কিন্তু ভয় হ'ল পাছে জ্যাঠাইমা বকুনি দেন, বলেন—তুই এখানে দাঁড়িয়ে কেন? কি কাপড়ে আছিস্ তার নেই ঠিক, যা সরে যা।

এমন অনেকবার বলেচেন—তাই ভয় হয়।

বেলা একটা পর্য্যন্ত আমাদের পেটে কিছু গেল না। বাড়ির অন্যান্য ছেলেমেয়েদের কথা স্বতন্ত্র—তাদেরই বাড়ি, তাদেরই ঘরদোর। তারা যেখানে যেতে পারে, আমরা তিন ভাই-বোনেই লাজুক, সেখানে আমরা যেতে সাহস করি না, কারুর কাছে খাবার চেয়েও খেতে পারিনে। মা ব্যস্ত আছেন নানা কাজে, অবিশ্যি হেঁসেলের কাজে তাঁকে লাগানো হয় না এ বাড়িতে, তা আমি জানি। কিন্তু ঝিয়ের কাজ করতে তো দোষ নেই! বাড়ির অন্যান্য মেয়েরা কোনদিনই আমাদের খাওয়াদাওয়ার খোঁজ করেন না, আজ তো সকলেই মহাব্যস্ত।

বেলা যখন দেড়টা আন্দাজ, রান্নাঘরের দিকে একটা গোলমাল ও জ্যাঠাইমার গলার চীৎকার শুনে ব্যাপার কি দেখতে গেলাম ছুটে। গিয়ে দেখি, রান্নাঘরের কোণে ছেঁচ্‌তলার কাছে দাদা একটা লাউপাতা হাতে দাঁড়িয়ে। জ্যাঠাইমা বকচেন—ওই ঝাড় তো, আর কত ভাল হবে তোমাদের? এখনো বামুন-ভোজন হ'ল না, দেবতার ভোগ রইল পড়ে, উনি এসেছেন ভোগের আগে পেরসাদ পেতে,—দেবতা নেই, বামুন নেই, ওর শুয়োর-পেট পোরালেই আমার স্বগ্‌গে ঘণ্টা বাজবে যে! বুড়ো দামড়া কোথাকার—ও-সব খিরিস্টান চাল এ বাড়িতে চলবে না বোলে দিচ্ছি, মুড়ো ঝাঁটা মেরে বাড়ি থেকে বিদেয় ক'রে দেবো জানো না? আমার বাড়ি বসে ও সব অনাচার হবার জো নেই, যখন করেচ তখন করেচ।

মা কোথায় ছিলেন আমি জানিনে। পাছে তিনি শুনতে পান এই ভয়ে দাদাকে আমি সঙ্গে করে বাইরে নিয়ে এলাম। দাদা লাউপাতাটা হাতে নিয়েই বাইরে চলে এল। আমি বললাম—ওখানে কি কচ্ছিলে?

দাদা বললে—কি আবার করবো? ভুবনের মা কাকীমার কাছে দুখানা তিলপিটুলি ভাজা চাইছিলাম—বড্ড খিদে পেয়েচে তাই। জ্যাঠাইমা শুনতে পেয়ে কি বকুনিটাই—

ব'লেই লজ্জা ও অপমান ঢাকবার চেষ্টায় কেমন এক ধরনের হাসলে। হয়তো বাড়ির কোন ছেলেই এখনো খায়নি, কিন্তু আমরা জানি দাদা খিদে মোটে সহ্য করতে পারে না, চা-বাগানে থাকতেও ভাত নামতে-না-নামতে সকলের আগে ও পিঁড়ি পেতে রান্নাঘরে খেতে বসে যেত। বয়সে বড় হ'লে কি হবে, ও আমাদের সকলের চেয়ে ছেলেমানুষ।

আজকার সমস্ত অনুষ্ঠানের উপর আমার বিতৃষ্ণা হ'ল। এদের দয়ামায়া নেই, এই যে ঠাকুর-পূজোর ধুমধাম, এর যেন কোথায় গলদ আছে। কোথায়—তা বোঝা আমার বুদ্ধিতে কুলোয় না, কিন্তু গোটা ব্যাপারটাই যেন কেমন মনের সঙ্গে খাপ খেলো না আদৌ।

আর কিছুদিন পরে একটু বয়স হলে আমি বুঝেছিলাম যে, এদের ভক্তির উৎসের মূলে এদের বিষয়-বুদ্ধি ও সাংসারিক উন্নতি। ভগবান এদের উন্নতি করেচেন, ফসল বাড়াচ্চেন, মান খাতির বাড়াচ্চেন—এঁরাও ভগবানকে তোয়াজ করচেন—ভবিষ্যতে আরও যাতে বাড়ে। প্রতি পূর্ণিমায় ঘরে সত্যনারায়ণ পূজো হয়, সংক্রান্তিতে সংক্রান্তিতে দুটি ব্রাহ্মণ খাওয়ানো হয়, শুধু তাই নয়—একটি গরিব ছাত্রকে জ্যাঠাইমা বছরে একটি টাকা দিয়ে থাকেন বই কেনার জন্যে। শ্রাবণ মাসে তাঁদের আবাদ থেকে বছরের ধান, জালাভরা কই মাছ, বাজরাভরা

হাঁসের ডিম, তিল, আকের গুড়, আরও অনেক জিনিস নৌকো বোঝাই হয়ে আসতো। ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে তাঁরা প্রতিবার এই সময় পাঁঠাবলি দিয়ে মনসা পূজো করতেন ও গ্রামের ব্রাহ্মণ খাওয়াতেন। এদের সত্যনারায়ণ পূজো ঘরের স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি করার জন্যে, লক্ষ্মীপূজো ধনধান্য বৃদ্ধির জন্যে, গৃহ-দেবতার পূজো, গোপীনাথ জীউর পূজো—সবারই মূলে—হে ঠাকুর, ধনেপুত্রে যেন লক্ষ্মীলাভ হয় অর্থাৎ তা হ'লে তোমাকেও খুশী রাখবো।

বাবার মুখে শুনেছি, এ সমস্ত বাড়িঘর আমার ঠাকুরদাদা গোবিন্দলাল মুখুয্যের তৈরি। ঠাকুরদাদা যখন মারা যান, বাবার তখন বয়স বেশী নয়। তিনি মামার বাড়িতে মানুষ হন এবং তারপর চাকরি নিয়ে বিদেশে বার হয়ে যান। জ্যাঠামশাইয়ের বাবা নন্দলাল মুখুয্যে নায়েবী কাজে বিস্তর পয়সা রোজগার করেছিলেন এবং আবাদ অঞ্চলে একশো বিঘে ধানের জমি কিনে রেখে যান। আবাদ-অঞ্চল মানে কি, আমি এতদিনেও জানতাম না, এই সেদিন জ্যাঠামশাইদের আড়তের মুহুরী যদু বিশ্বাসকে জিজ্ঞেস ক'রে জেনেছি।

জ্যাঠামশাই পাটের ব্যবসা ক'রে খুব উন্নতি করেছে। এঁদের বর্ত্তমান উন্নতির মূলেই এঁদের পাটের ও ধানের কারবার। জ্যাঠামশাইরা তিন ভাই—সবাই এই আড়তের কাজেই লেগে আছেন দেখতে পাই। এঁরা বাবার খুড়তুত ভাই, বাবাই ঠাকুরদাদার একমাত্র ছেলে ছিলেন। বাবা কোনো কালেই এ-গাঁয়ে বাস করেননি, জমিজমা যা ছিল তাও এখন আর নেই, বাবা বেঁচে থাকতে জ্যাঠামশায়কে বলতে শুনেছিলাম যে, সব নাকি রোডসেস্ নীলামে বিক্রি হয়ে গেছে। সে-সব কি ব্যাপার যত বুঝি আর না বুঝি, এটুকু আজকাল বুঝেছি যে, এখানে আমাদের দাবি কিছু নেই এবং জ্যাঠামশাইদের দয়ায় তাঁদের সংসারে মাথা গুঁজে আমরা আছি।

জ্যাঠাইমাকে আমার নতুন নতুন ভারি ভাল লাগতো, কিন্তু এতদিন আমরা এ বাড়িতে এসেচি, একদিনের জন্যও আমাদের সঙ্গে তিনি ভাল ব্যবহার করেননি—আমাকে ও দাদাকে তো নখে ফেলে কাটেন এমনি অবস্থা। অনবরত জ্যাঠাইমার কাছ থেকে গালমন্দ অপমান খেয়ে খেয়ে আমারও মন বিরূপ হয়ে উঠেচে। আজকাল আমি তো জ্যাঠাইমাকে এড়িয়ে চলি, সীতাও তাই, দাদা ভালমন্দ কিছু তেমন বোঝে না, ও নবান্নের দিন বাটি হাতে জ্যাঠাইমায়ের কাছে নবান্ন চাইতে গিয়ে বকুনি খেয়ে ফিরে আসবে—পুকুরের ঘাটে নাকি জ্যাঠাইমা নেয়ে উঠে আসছিলেন, ও সে-সময় ঝাঁপিয়ে জলে পড়ার দরুন জল ছিটিয়ে তাঁর গায়ে লাগে, সেজন্যে মার খাবে—বাসি কাপড়ে জ্যাঠাইমার ঘরে ঢুকে এই সে-দিনও মার খেতে খেতে বেঁচে গিয়েচে। কেন বাপু যাওয়া?

কিন্তু না গেলেই যে বিপদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তা নয়, এক সংসারে থাকতে গেলে ছোঁয়াছুঁয়ি ঠেকাঠেকি না হয়ে তো পারে না, অথচ হ'লেই আর রক্ষে নেই।

জ্যাঠাইমাদের রোয়াকে বসে আমি আর ভুবন খেলছি—এমন সময় জ্যাঠাইমা ওপরের দালান থেকে ঝিণ্টু, বাদল, ঊষা, কাতু—ওদের ডাক দিলেন। ডাকলেন কেন, আমি তা জানি, খাবার খাওয়ার জন্যে—আমি আর ভুবন যে সেখানে আছি, তা দেখেও দেখলেন না। আমি ভুবনকে বসতে ব'লে মায়ের কাছ থেকে বড় এক বাটি মুড়ি নিয়ে এসে দু'জনে খেতে লাগলাম। কাতু ফিরে এলে বললাম—ভাই, এক ঘটি জল নিয়ে আয় না খাবো! খাবার খাওয়া সেরে আমরা আবার খেলা করচি, এমন সময়ে জ্যাঠাইমা সেখানে এলেন কাপড় তুলতে। রোয়াকের ধারে আমাদের মুড়ির বাটিটার দিকে চেয়ে বললেন—এ বাটিতে হাত ধুয়েচে কে?

এ ঠিক জিতুর কাজ, নইলে এমন মেলেচ্ছো এ বাড়ির মধ্যে তো আর কেউ নেই।

কি ক'রে ফেলেচি না জানি! ভয়ে ভয়ে বললাম—কি হয়েচে জ্যাঠাইমা?

জ্যাঠাইমা মারমুখী হয়ে বললেন—কি হয়েচে দেখতে পাচ্চো না? দুকুরবেলা কাপড়খানা কেচে আলনায় রেখে গিইচি, কাচা কাপড়খানা জল ছিঁটিয়ে এঁটো ক'রে বসে আছো?

মেজকাকীমার এক পিসি না মাসী এ বাড়িতে থাকে, বুড়ী ভারি ঝগড়াটে আর জ্যাঠাইমার খোশামুদে। বয়স পঞ্চাশ ষাট হবে, কালো, একহারা দড়িপাকানো গড়ন—সীতা আর আমি আড়ালে বলি—তাড়কা রাক্কুসী। নানা ছুতোনাতায় মাকে অনেকবার বকুনি খাইয়েচে জ্যাঠাইমা-কাকীমাদের কাছে। ওকে দু-চক্ষে আমরা দেখতে পারিনে। জ্যাঠাইমার গলার স্বর শুনে রান্নাঘরের উঠোন থেকে বুড়ী ছুটে এল।—কি হয়েচে বৌমা, কি হয়েচে?

জ্যাঠাইমা বললেন—সন্দেবেলা আহ্নিক ক'রবো বলে কাপড়খানা কেচে আল্নায় দিয়ে রেখেচি মাসী—আর বুড়ো ধাড়ী ছোঁড়া করেচে কি, এখেনে মুড়ি খেয়ে সেই বাটিতেই জল দিয়ে হাত ধুয়েচে, আর এই রোয়াকের ধারেই তো কাপড়—তুমি কি বলতে চাও কাপড়ে লাগেনি জলের ছিটে?

বুড়ী অবাক হয়ে ভান ক'রে বললে—ওমা সে কি কথা! লাগেনি আবার, একশো বার লেগেচে।

আমি ভাবলাম, বারে! এতে আর হয়েচে কি? জল যদি লেগেই থাকে, দু-চার ফোঁটা লেগেচে বই তো নয়? জ্যাঠাইমাকে বললাম—জল তো ওতে লাগেনি জ্যাঠাইমা, আর যদিও একটু লেগে থাকে, এখনও রোদ রয়েচে, এক্ষুনি শুকিয়ে যাবে'খন।

বুড়ী বললে—শোন কথা; ও ছোঁড়ার জ্ঞান-কাণ্ড একেবারেই নেই—একেবারেই মেলেচ্ছো—ওর মাও তাই। হিঁদুয়ানি তো শেখেনি কোনোদিন—

—তোমরা শোন মাসী, আমি শুনে শুনে হদ্দ হয়ে গিয়েচি। ঘরে ঠাকুর রয়েচেন, আর এই সব অনাচার কি ক'রে বরদাস্ত করি বল তো তুমি? আমার কোনো ছেলেমেয়ে ওরকম করবে? অত বড় ধাড়ী ছেলে হ'ল, মুড়ির বাটিতে জল ঢাললে যে সকড়ি হয় সেও জানে না! শুনবে কোথা থেকে, মেলেচ্ছো খিরিস্টানের মধ্যে এতকাল কাটিয়ে এসেচে, ভালো শিক্ষে দিয়েচে কে? হিঁদুর বাড়িতে কি এ সব পোষায়? বল তো তুমি—

বুড়ী বললে—ওর মা জানে না তো ও জানবে কোথা থেকে? সেদিন ওর মা করেচে কি, পুকুরঘাটে তো বড় নৈবিদ্যির বারকোশখানা ধুতে নিয়ে গিয়েচে—যেদিন ঠাকুর এলেন (বুড়ী দু-হাত জোড় ক'রে নমস্কার করলে) তার পরের দিন—আমি দাঁড়িয়ে ঘাটে, কাপড় কেচে যখন উঠলি তখন ধোওয়া বারকোশখানা আর একবার জলে ডুবো—না ডুবিয়েই অমনি উঠিয়ে নিয়ে যাচ্চে। আমি দেখে বলি, ও কি কাণ্ড বউ? ভাগ্যিস দেখে ফেললাম তাই তো—

মায়ের দোষ দেওয়াতেই হোক, বা আমাকে আগের ওই-সব কথা বলাতেই হোক, আমার রাগ হ'ল। তা ছাড়া আমার মন বললে এতে কোন দোষ হয়নি—মুড়ির বাটিতে জল ঢালার দরুনে মুড়ির বাটি অপবিত্র হবে কেন? মা বারকোশ ধুয়ে জলের ধারে রেখে স্নান সেরে উঠে যদি সে বারকোশ নিয়ে এসে থাকেন, তাতে মা কোন অন্যায় কাজ করেননি। বললাম—ওতে দোষ কি জ্যাঠাইমা, মুড়িও খাবার জিনিস, জলও খাবার জিনিস—দুটোতে মেশালে খারাপ হবে কেন, ছুঁতে থাকবেই বা না কেন?

জ্যাঠাইমা অগ্নিমূর্ত্তি হয়ে উঠলেন—তোর কাছে শাস্তর শুনতে আসিনি, ফাজিল ছোঁড়া কোথাকার—তোরা তো খিরিস্টান, হিঁদুর আচারব্যাভার তোরা জানিস কি, তোর মা-ই বা

জানে কি? ওইটুকু ছেলে গলা টিপলে দুধ বেরোয়, উনি আবার আমায় শাস্তর বোঝাতে আসেন! শিখবি কোত্থেকে, তোর মা তোদের কি কিছু শিখিয়েচে, না কিছু জানে? পয়সা রোজগার করেচে আর দু-হাতে উড়িয়েচে তোর বাবা—মদ খেয়ে খিরিস্টানি কোরে—

বুড়ী বললে—মোলোও সেই রকম। যেমন-যেমন কম্মফল তেমন-তেমন মিত্যু! দশেধম্মে দেখলে সবাই, যে কম্মের যে শাস্তি—ঘর থেকে মড়া বেরোয় না, ও-পাড়ার হরিদাস না এসে পড়লে ঘরের মধ্যেই পড়ে থাকতো—

বাবার মৃত্যু সম্পর্কে এ কথা বলাতে আমার রাগ হ'ল। তাঁর মরণের পরে এখন তাঁর কথা ভেবে আমার কষ্ট হয়, যদিও সে কথা কাউকে বলিনে। বললাম—ভাল মরণ আর মন্দ মরণ নিয়ে বাহাদুরি কি দিদিমা? এই তো মাঘ মাসে ওই তেঁতুলতলায় যাদের বাড়ি, ওই বাড়ির সেই বুড়ো গাঙ্গুলীমশায় মারা গেলেন, তিনি তো খুব ভালমানুষ ছিলেন সবাই বলে, পুকুরের ঘাটে এক বেলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আহ্নিক করতেন, তবে তিনি পেন্‌সন্ আনতে গিয়ে ও-রকম ক'রে সেখানে মারা গেলেন কেন? সেখানে কে তাঁর মুখে জল দিয়েচে, কে মড়া ছুঁয়েচে, কোথায় ছিল ছেলেমেয়ে, ও-রকম হ'ল কেন?

আমার বোকামি, আমি ভেবেছিলাম ঠিকমত যুক্তি দেখিয়ে বুড়ীকে তর্কে হারাবো, কিন্তু তার ধরনের ঝগড়ায় মজবুত পাড়াগাঁয়ের মেয়ে যে অত সহজে হার মেনে নেবে, এ ধারণা করাই আমার ভুল হয়েছিল। সে যুক্তির পথে গেলই না।

—মরুক বুড়ো গাঙ্গুলী, তবুও খবর পেয়ে তার ছেলেজামাই গিয়ে তাকে এনে গঙ্গায় দিয়েছিল, তোর বাবার মত দোগেছের মাঠে ডোবার জলে আধ-পোড়া ক'রে ফেলে রেখে আসেনি! আমি সব জানি, আমায় ঘাঁটাসনে, অনেক আস্তিনাড়ির কথা বেরিয়ে যাবে। কাঠ জোটেনি, খেজুরের ডাল দিয়ে পুড়িয়েছিল, সব শুনেচি আমি। দোগেছের মাঠে সন্দের পর লোক যায় না, সবাই বলে এখনও ভূত হয়ে—

কথা সবই স'ত্যি, শেষেরটুকু ছাড়া। ঐটুকুর ওপরই জোর দিয়ে বললাম—মিথ্যে কথা, বাবা কখ্‌খনো,—তার যুক্তির অকাট্যতা প্রমাণ করবার জন্যে এমন একটা কথা ব'লে ফেললাম যা কখনো কারুর কাছে বলিনি বা খুব রেগে মরীয়া না হয়ে উঠলে বলতামও না এদের কাছে। বললাম—জানেন, আমি ভূত দেখতে পাই, অনেক দেখেছি, বাবাকে তা হলে নিশ্চয়ই দেখতে পেতাম, জানেন? চা-বাগানে থাকতে আমি কত—

এই পর্য্যন্ত বলেই আমি চুপ করে গেলাম। দিদিমা খিল খিল ক'রে হেসেই খুন।—হি হি, এ ছোঁড়াও পাগল ওর বাপের মত—হি হি—শুনেচো বউমা, হি হি—কি বলে শুনেচো একবার—

জ্যাঠাইমা বললেন—যা এখান থেকে এই মুড়ির বাটি তুলে ধুয়ে নিয়ে আয় পুকুর থেকে এখানটা গাড়ুর জল দিয়ে ধুয়ে দে। আমার কাপড়খানাও কেচে নিয়ে আয় অমনি, তোর সঙ্গে কে এখন সন্দে অবধি তক্কো করে? তবে ব'লে দিচ্ছি, হিঁদুর ঘরে হিঁদুর মত ব্যাভার না করলে এ বাড়িতে জায়গা হবে না। পষ্ট কথায় কষ্ট নেই। কই আমাদের বুলু, ভুন্টি, হাবু কি সতীশ তো কখনো এমন করে না, যা বলি তখুনি তাই তো শোনে, কই এক দিনের জন্যেও তো—

দিদিমা বললেন—ওমা; বুলু, হাবু, সতীশের কথা ব'লো না, তারা আমার বেঁচে থাক, সোনার চাঁদ ছেলেমেয়ে সব। তারা হিঁদুয়ানির যা জানে ওর মা তা জানে না তো ও! সে দিন সতীশকে বলচি, সতু দাদাভাই, তেলের ভাঁড়টা বাইরের উঠোনে নিমু কলুকে দিয়ে এসো

তো ? তো বলচে—আমার বিছানার কাপড়, আমি তো ভাঁড় ছোঁব না। আমি মনে মনে ভাবলাম যে, দ্যাখো শিক্ষের গুণ দ্যাখো—কেমন ঘরে মানুষ তারা। আহা বেঁচে থাক্—সব বেঁচে থাক্—

মনে মনে সতীশের প্রশংসা করতে চেষ্টা করলাম। সতীশ যে স্বীকার করেচে তার কাপড় বাসি, এটা অবিশ্যি প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু বাসি কাপড়ে কিছু ছোঁয়া যে খারাপ কাজ, এ বিশ্বাস যার নেই, তাকেই বা দোষ দেওয়া যায় কি ক'রে, এ আমি বুঝতে পারিনে। যেমন এখনই আমার মনে একটা প্রশ্ন এসেছে যে, নিমু কলু কি কাচা, ধোয়া, শুদ্ধ গরদের জোড় প'রে তেল বেচতে এসেছিল ? সতীশের ভেবে দেখবার ক্ষমতা ও বুদ্ধির চেয়ে যদি কারুর বুদ্ধি ও বুঝবার শক্তি বেশী থাকে, তার জন্যে তাকে কি নরকে পচে মরতে হবে ?

॥ ২ ॥

তিন বছর এখনও হয়নি, আমরা এ গাঁয়ে এসেছি। তার আগে ছিলাম কার্সিয়ঙের কাছে একটা চা-বাগানে, বাবা সেখানে চাকরি করতেন। সেখানেই আমি ও সীতা জন্মেছি, (কেবল দাদা নয়, দাদা জন্মেছে হনুমান-নগরে, বাবা তখন সেখানে রেলে কাজ করতেন) সেখানেই আমরা বড় হয়েছি, এখানে আসবার আগে এত বড় সমতলভূমি কখনো দেখিনি। আমরা জানতাম চা-ঝোপ, ওক আর পাইনের বন, ধুরা গাছের বন, পাহাড়ী ডালিয়ার বন, ঝর্ণা, কন্‌কনে শীত, দূরে বরফে ঢাকা বড় বড় পাহাড়-পর্ব্বতের চূড়া, মেঘ, কুয়াশা, বৃষ্টি। এখানে প্রায়ই মাঝে মাঝে চা-বাগানের কথা, আমাদের নেপালী চাকর থাপার কথা, উম্‌প্লাঙের ডাক-রানার খড়্গা সিং যে আমাদের বাংলোতে মাঝে মাঝে ভাত খেতে আসতো—তার কথা, মিস নর্টনের কথা, পচাং বাগানের মাসীমার কথা, আমাদের বাগানের নীচের সেই অদ্ভুত রাস্তাটার কথা, মনে হয়।

সেই সব দিনই আমাদের সুখে কেটেচে। দুঃখের শুরু হয়েছে যে-দিন বাংলা দেশে পা দিয়েছি। এই জন্যে এই তিন বছরেও বাংলা দেশকে ভাল লাগলো না—মন ছুটে যায় আবার সেই সব জায়গায়, চা-বাগানে, শেওলা-ঝোলা বড় বড় ওকের বনে, উম্‌প্লাঙের মিশন হাউসের মাঠে—যেখানে আমি, সীতা, দাদা কতদিন সকালে ফুল তুলতে যেতাম, বড়দিনের সময় ছবির কার্ড আনতে যেতাম, কেমন মিষ্টি কথা বলতো, ভালবাসতো মিস নর্টন। ভাবতে বসলে এক একটা দিনের কথা এমন চমৎকার মনে আসে !···

শীতের সকাল।

বাড়ির বার হয়েই দেখি চারিধারে বনে জঙ্গলে পাহাড়ের ঢালুর গায়ে পাইন গাছের ফাঁকে বেশ রোদ। আমি উঠতাম খুব সকালেই, সীতা ও দাদা তখন লেপের তলায়, চা না পেলে এই হাড়কাঁপানো শীতে উঠতে কেউ রাজী নয়।

শীতও পড়েছে দস্তুরমত। আমাদের বাগানের দক্ষিণে কিছু দূরে যে বড় চা-বাগানটা নতুন হয়েছে, যার বাংলোগুলোর লাল টালির ঢালু ছাদ আমাদের এখান থেকে দেখা যায় পাইন গাছের ফাঁকে, আজ তাদের লোকজনেরা চায়ের চারাগাছ খড়ের পালুটি দিয়ে ঢেকে দিচ্ছে বোধ হয় বরফ পড়বার ভয়ে। আকাশ পরিষ্কার, সুনীল, কোনোদিকে এতটুকু কুয়াশা

নেই ; বরফ পড়বার দিন বটে।

একটু পরে সীতা উঠল। সে রোগা, ফর্সা, ছিপছিপে। সে ও দাদা খুব ফর্সা, তবে অত ছিপছিপে আর কেউ নয়। সীতা বললে, থাপা কোথায় গেল দাদা? আজ ও সোনাদা যাবে? বাজার থেকে একটা জিনিস আনতে দেবো।

আমি বললাম—কি জিনিস রে?

সীতা দুষ্টুমের হাসি হেসে বললে, বলবো কেন? তোমরা যে কত জিনিস আনাও, আমায় বলো?

একটু পরে থাপা এল। সে হপ্তায় দু-দিন সোনাদা বাজারে যায় তরকারি আর মাংস আনতে। সীতা চুপি চুপি তাকে কি আনতে ব'লে দিলে, আড়ালে থাপাকে জিজ্ঞেস ক'রে জানলাম জিনিসটা একপাতা সেফটিপিন্। এরই জন্যে এতো!

একটু বেলায় বরফ পড়তে শুরু হ'ল। দেখতে দেখতে বাড়ির ছাদ, গাছপালার মাথা, পথঘাট যেন নরম থোকা থোকা পেঁজা কার্পাস তুলোতে ঢেকে গেল। এই সময়টা ভারি ভাল লাগে, আগুনের আংটাতে গনগনে আগুন—হাড়কাঁপানো শীতের মধ্যে আগুনের চারিধারে বসে আমি দাদা ও সীতা লুডো খেলতে শুরু ক'রে দিলাম।

এই সময় বাবা এলেন আপিস থেকে। ম্যানেজারের কুঠীর পাশেই আপিস-ঘর, আমাদের বাংলো থেকে প্রায় মাইলখানেক, কি তার একটু বেশী। বাবা বেলা এগারোটার সময় ফিরে খাওয়া-দাওয়া ক'রে একটু বিশ্রাম করেন, তিনটের পরে বেরোন, ওদিকে রাত আটটা-ন'টায় আসেন।

বাবা আমাদের সকলকে নিয়ে খেতে ভালবাসতেন। সীতাকে ডেকে বললেন—খুকী, থাপাকে বলে দে নাইবার জন্যে জল গরম করতে—আর তোরা সব আজ আমার সঙ্গে খাবি—নিতুকে বলিস নইলে সে আগেই খাবে।

মা রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিলেন। সীতা গিয়ে বললে—মা, দাদাকে আগে ভাত দিও না, আমরা সবাই বাবার সঙ্গে খাবো।

সীতার কথা শেষ না হ'তে দাদা গিয়ে রান্নাঘরে হাজির। দাদা খিদে মোটে সহ্য করতে পারে না—তাই আমাদের সকলের আগে মা তাকে খেতে দিতেন। এদিকে আমাদের ক' ভাই-বোনের মধ্যে বাবা সকলের চেয়ে ভালবাসতেন দাদাকে ও সীতাকে। দাদাকে খাওয়ার সময়ে কাছে বসে না খেতে দেখলে তিনি কেমন একটু নিরাশ হতেন, যেন অনেকক্ষণ ধরে যেটা চাইছিলেন সেটা হ'ল না।

সীতা বললে—দাদা তুমি খেও না, বাবা আজ সকলকে নিয়ে খাবেন। বাবা নাইচেন, এক্ষুনি আমরা খেতে বসবো—

দাদা কড়া থেকে মাকে একটুকরো মাংস তুলে দিতে বললে এবং গরম টুকরোটা মুখে পুরে দিয়ে আবার তখুনি তাড়াতাড়ি বার ক'রে ফেলে বার-দুই ফুঁ দিয়ে আবার মুখে পুরে নাচতে নাচতে চলে গেল। দাদাকে আমরা সবাই ভালোবাসি, দাদা বয়সে সকলের চেয়ে বড় হলেও এখনো সকলের চেয়ে ছেলেমানুষ। ও সকলের আগে খাবে, সকলের আগে ঘুমিয়ে পড়বে। ঘুরিয়ে কথা বললে বুঝবে না, অন্ধকারে একলা ঘরে শুতে পারবে না—ওর বয়স যদিও বছর চোদ্দ হ'ল, কিন্তু এখনও আমাদের চেয়ে ও ছেলেমানুষ, প্রথম সন্তান ব'লে বাপ-মায়ের বেশী আদর ওরই ওপর।

আমরা সবাই একসঙ্গে খেতে বসলাম। বাবা সীতাকে একপাশে ও দাদাকে আর একপাশে

নিয়ে খেতে বসেচেন। মাংসের বাটি থেকে চর্ব্বি বেছে বেছে ফেলে দিতেই সীতা বললে—বাবা আমি খাবো—

দাদা বললে—তুই সব খাস্‌নে, আমাকে দু'খানা দে সীতা—

বাবা অত চর্ব্বি ওদের খেতে দিলেন না। ওদের এক এক টুকরো দিয়ে বাকি টুকরোগুলো বেড়ালদের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। আমায় বললেন—জিতু, গায়ের মাপটা দিস তো তোর, ওবেলা সায়েবের দর্জ্জি আসবে, তার কাছে তোর জামা করতে দেবো—

সীতা বললে—আমার আর একটা জামা দরকার বাবা—

—তবে তুইও দিস গায়ের মাপটা,—ওই সঙ্গেই দিস—

মা বললেন—তার দরকার কি, তুমি তাকে বাসায় পাঠিয়ে দিও না। আমি সব দেখে-শুনে দেবো—আরও করবার জিনিস রয়েচে—নিতুর মোটে দুটো জামা, ওর ওভারকোটটা পুরনো হয়ে ছিঁড়ে গিয়েছে—যেমন শীত পড়েছে এবার, ওর একটা ওভারকোট করে দাও—

বিকেলে মেমেরা মাকে পড়াতে এল।

মাইল দুই দূরে মিশনারীদের একটা আড্ডা আছে। আমি একবার মেমসাহেবের সঙ্গে সেখানে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে খোসালডি চা-বাগানে যে রাস্তাটা পাহাড়ের ঢালু বেয়ে নেমেচে—তারই ধারে ওদের বাংলো। অনেকগুলো লাল টালির ছোট বড় ঘর, বাঁশের জাফ্‌রির বেড়ায় ঘেরা কম্পাউণ্ড, এই শীতকালে অজস্র ডালিয়া ফোটে, বড় বড় ম্যাগ্‌নোলিয়া গাছ। আমাদের বাগানে ও বড় সাহেবের বাংলোতে ম্যাগ্‌নোলিয়া গাছ আছে।

এরা মাকে পড়ায়, সীতাকেও পড়ায়। মিস্ নর্টন দিনাজপুরে ছিল, বেশ বাংলা বলতে পারে। নানা ধরনের ছবিওয়ালা কার্ড, লাল সবুজ রঙের ছোট ছোট ছাপানো কাগজ, তাতে অনেক মজার গল্প থাকে। দাদার পড়াশুনোয় তত ঝোঁক নেই, আমি ও সীতা পড়ি। একবার একখানা বই দিয়েছিল—একটা গল্পের বই—'স্বুবর্ণবণিক পুত্র'। এ কথায় আমি বুঝেছিলাম বণিকপুত্র সোনা দিয়ে গড়া অর্থাৎ সোনার মত ভালো। পাপের পথ থেকে উক্ত বণিকপুত্র কি করে ফিরে এসে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করলে, তারই গল্প। অনেক কথা বুঝতে পারতাম না, কিন্তু বইখানা ভালো লাগতো!···

মেম আসতো দু-জন। একজনের বয়স বেশী—মায়ের চেয়েও বেশী। আর একজনের বয়স খুব কম। অল্পবয়সী মেমটির নাম মিস্ নর্টন—একে আমার খুব ভালো লাগতো—নীল চোখ, সোনালী চুল, আমার কাছে মিস্ নর্টনের মুখ এত সুন্দর লাগতো, বার বার ওর মুখের দিকে চাইতে ইচ্ছে করত, কিন্তু কেমন লজ্জা হ'ত—ভালো করে চাইতে পারতাম না—অনেক সময় সে অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে থাকবার সময় লুকিয়ে এক চমক দেখে নিতাম। তখনি ভয় হ'ত হয়ত সীতা দেখছে—সীতা হয়ত এ নিয়ে ঠাট্টা করবে। ওরা আসতো বুধবারে ও শনিবারে। সপ্তাহের অন্য দিনগুলো যেন কাটতে চাইতো না, দিন গুনতাম কবে বুধবার আসবে, কবে শনিবার হবে। মিস্ নর্টনের মত সুন্দরী মেয়ে আমি কখনো দেখিনি—আমার এই এগারো-বারো বছরের জীবনে।

কিন্তু মাঝে মাঝে এমনি হতাশ হ'তে হ'ত! দিন গুনে গুনে বুধবার এল, কিন্তু প্রৌঢ়া মেমটি হয়তো সেদিন এল একা, সঙ্গে মিস্ নর্টন নেই—সারা দিনটা বিস্বাদ হয়ে যেতো, মিস্ নর্টনের ওপর মনে মনে অভিমান হ'ত, অথচ কেন আজ মিস্ নর্টন এল না সে কথা কাউকে জিজ্ঞেস করতে লজ্জা হ'ত।

মেমেরা এক-একদিন আমাদের ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে শেখাতো। মা তখন

থাকতেন না। আমি, সীতা ও দাদা চোখ বুজতাম—মিস্ নর্টন ও তার সঙ্গিনী চোখ বুজতো। 'হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা সদাপ্রভু'—সবাই একসঙ্গে গম্ভীর সুরে আরম্ভ করলুম। হঠাৎ চোখ চেয়ে দেখতাম সবাই চোখ বুজে আছে, কেবল সীতা চোখ খুলে একবার জিব বার করেই আমার দিকে চেয়ে একটু দুষ্টুমির হাসি হাসলে—পরক্ষণেই আবার প্রার্থনায় যোগ দিলে।

সীতা ঐ রকম, ও কিছু মানে না, নিজের খেয়াল-খুশীতে থাকে, যাকে পছন্দ করবে তাকে খুবই পছন্দ করবে, আবার যাকে দেখতে পারবে না তার কিছুই ভাল দেখবে না। ওর সাহসও খুব, দাদা যা করতে সাহস করে না, এমন কি আমিও যা অনেক সময় করতে ইতস্ততঃ করি—ও তা নির্ব্বিচারে করে। আমাদের বাংলো থেকে খানিকটা দূরে বনের মধ্যে একটা দেবস্থান আছে—পাহাড়ীদের ঠাকুর থাকে। একটা বড় সরল গাছের তলায় কতকগুলো পাথর—ওরা সেখানে মুরগী বলি দেয়, ঢাক বাজায়। সবাই বলে ওখানে ভূত আছে, জায়গাটা যেমন অন্ধকার তেমনি নির্জ্জন—একবার দাদা তর্ক তুলে বললে আমরা কখনোই ওখানে একা যেতে পারবো না। আমি ভেবে উত্তর দেওয়ার আগেই সীতা বাংলোর বার হয়ে চ'লে গেল একাই—কোনো উত্তর না দিয়েই ছুট দিলে পাহাড়ীদের সেই নির্জ্জন ঠাকুরতলার দিকে।...ওই রকম ওর মেজাজ।...

মিস্ নর্টন সীতাকে খুব ভালবাসে। মাঝে মাঝে সীতাকে সঙ্গে নিয়ে যায় ওদের মিশন বাড়িতে, ওকে ছবির বই, পুতুল, কেক, বিস্কুট কত কি দেয়—ছবি আঁকতে শেখায়, বুনতে শেখায়—এরই মধ্যে সীতা বেশ পশমের ফুল তুলতে পারে, মানুষের মুখ, কুকুর আঁকতে পারে। ওরা আমাকেও অনেক বই দিয়েচে—মথি-লিখিত সুসমাচার, লুক-লিখিত সুসমাচার, যোহন-লিখিত সুসমাচার, সদাপ্রভুর কাহিনী—আরো অনেক সব। যীশু একটুকরো মাছ ও আধখানা রুটিতে হাজার লোককে ভোজন করালেন—গল্পটা পড়ে একবার আমার হঠাৎ মাছ ও রুটি খাবার সাধ হ'ল। কিন্তু মাছ এখানে মেলে না—মা ভরসা দিলেন খাওয়াবেন, কিন্তু দু মাসের মধ্যেও সেবার মাছ পাওয়া গেল না; আমার শখও ক্রমে ক্রমে উবে গেল।

বাবার বন্ধু দু-একজন বাঙালী মাঝে মাঝে আমাদের এখানে এসে দু-একদিন থাকেন। মেমেরা মাকে পড়াতে আসে, এ ব্যাপারটা তাঁদের মনঃপূত নয়। বাবাকে তাঁরা কেউ কেউ বলেছেনও এ নিয়ে। কিন্তু বাবা বলেন—ওরা আসে, এজন্যে এক পয়সা নেয় না—অথচ সীতাকে ছবি আঁকা, সেলাইয়ের কাজ শেখাচ্ছে—কি ক'রে ওদের বলি তোমরা আর এসো না? তা ছাড়া ওরা এলে মেয়েদের সময়ও ভালোই কাটে, ওদের কেউ সঙ্গী নেই, এই নির্জ্জন চা-বাগানের একপাশে পড়ে থাকে—একটা লোকের মুখ দেখতে পায় না, কথা বলবার মানুষ পায় না—ওরা যদি আসেই তাতে লাভ ছাড়া ক্ষতি কি?

মায়ের মনের একটা গোপন ইচ্ছা ছিল, সেটা কিন্তু পূর্ণ হয়নি। বাবা অত্যন্ত মদ খান—এবং যেদিন খুব বেশী ক'রে খেয়ে আসেন, সেদিন আমাদের বাংলো ছেড়ে পালাতে হয়। নইলে সবাইকে অত্যন্ত মারধোর করেন। সে সময়ে তাঁকে আমরা যমের মত ভয় করি—এক সীতা ছাড়া। সীতা আমাদের মত পালায় না—চা-ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে চায় না। সে বাংলোতে থাকে, বলে—মারবে বাবা?... না হয় মরে যাবো—তা কি হবে? রোজ এ রকম ছুটোছুটি করার চেয়ে মরে যাওয়া ভালো। বাবার এই ব্যাপারের জন্যে আমাদের সংসারে শান্তি নেই—অথচ বাবা যখন প্রকৃতিস্থ থাকেন, তখন তাঁর মত মানুষ খুঁজে পাওয়া ভার—এত শান্ত মেজাজ। যখন যা চাই এনে দেন, কাছে ডেকে আদর করেন, নিয়ে খেলা করেন, বেড়াতে যান—কিন্তু মদ খেলেই একেবারে বদলে গিয়ে অন্য মূর্ত্তি ধরেন, তখন বাংলো থেকে

পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর আমাদের অন্য উপায় থাকে না।

মা'র ইচ্ছে ছিল মেয়েদের ধর্ম্মের এই বই পড়ে যদি বাবার মতিগতি ফেরে। মেয়েরা মদ্যপানের কুফলের বর্ণনাসূচক ছোট ছোট বই দিয়ে যেতে—মা সেগুলো বাবার বিছানায় রেখে দিতেন—কে জানে বাবা পড়তেন কিনা—কিন্তু এই দেড় বৎসরের মধ্যে আমাদের মাসের মধ্যে তিন-চারবার চা-ঝোপের আড়ালে লুকনো বন্ধ হয়নি।

প্রায়ই আমি আর সীতা কার্ট রোড ধরে বেড়াতে বেরুই। আমাদের বাগান থেকে মাইল দুই দূরে একটা ছোট ঘর আছে, আগে এখানে পোস্ট আপিস ছিল, এখন উঠে যাওয়াতে শুধু ঘরটা পড়ে আছে—উম্‌প্লাঙের ডাক-রানার ঝড়-বৃষ্টি বা বরফপাতের সময়ে এখানে মাঝে মাঝে আশ্রয় নেয়। এই ঘরটা আমাদের ভ্রমণপথের শেষসীমা, এর ওদিকে আমরা যাই না যে তা নয়, কিন্তু সে কালেভদ্রে, কারণ ওখান থেকে উম্‌প্লাং পর্য্যন্ত খাড়া উৎরাই নাকি এক মাইলের মধ্যে প্রায় এগারো শ ফুট নেমে গিয়েচে, মিস্ নর্টনের মুখে শুনেচি—যদিও বুঝি নে তার মানে কি। আমাদের অত দূরে যাওয়ার প্রয়োজনও ছিল না, যা আমরা চাই তা পোস্ট আপিসের ভাঙা ঘর পর্য্যন্ত গেলেই যথেষ্ট পেতাম—দু-ধারে ঘন নির্জ্জন বন। আমাদের বাগানের নীচে গেলে আর সরল গাছ নেই—বনের তলা আর পরিষ্কার নেই, পাইন বন নেই, সে বন অনেক গভীর, অনেক নিবিড়, যেমন দুষ্প্রবেশ্য তেমনি অন্ধকার, কিন্তু আমাদের এত ভাল লাগে! বনে ফুলের অন্ত নেই—শীতে ফোটে বুনো গোলাপ, গ্রীষ্মকালে রডোডেণ্ড্রন বনের মাথায় পাহাড়ের দেওয়ালে লাল আগুনের বন্যা আনে, গায়ক পাখীরা মার্চ মাসের মাঝামাঝি থেকে চারিধারের নির্জ্জন বনানী গানে মুখরিত ক'রে তোলে। ঝর্ণা শুকিয়ে গেলে আমরা শুকনো ঝর্ণার পাশের পথে পাথর ধ'রে ধ'রে নীচের নদীতে নামতাম—অতি সন্তর্পণে পাহাড়ের দেওয়াল ধ'রে ধ'রে, সীতা পেছনে, আমি আগে। দাদাও এক-একদিন আসতো, তবে সাধারণত সে আমাদের এই সব ব্যাপারে যোগ দিতে ভালবাসে না।

এক-একদিন আমি একাই আসি। নদীর খাতটা অনেক নীচে—তার পথ পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে নীচে নেমে গিয়েছে—যেমন পিছল তেমনি দুর্গম—নদীর খাতে একবার পা দিলে মনে হয় যেন একটা অন্ধকার পিপের মধ্যে ঢুকে গিয়েচি। দু-ধারে খাড়া পাহাড়ের দেওয়াল উঠেচে—জল তাদের গা বেয়ে ঝরে পড়ছে জায়গায় জায়গায়—কোথাও অনাবৃত, কোথাও গাছপালা, বনফুল, লতা—মাথার ওপরে আকাশটা যেন নীল কার্ট রোড—ঠিক অতটুকু চওড়া, ঐ রকম লম্বা, এদিকে-ওদিকে চলে গিয়েচে, মাঝে মাঝে টুকরো মেঘ কার্ট রোড বেয়ে চলেচে, কখনও বা পাহাড়ের এ-দেওয়াল ও-দেওয়াল পার হয়ে চলে যাচ্ছে—মেঘের ঐ খেলা দেখতে আমার বড় ভাল লাগত। নদী-খাতের ধারে একখানা শেওলা ঢাকা ঠাণ্ডা পাথরের ওপর ব'সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুখ উঁচু ক'রে চেয়ে চেয়ে দেখতাম—বাড়ি ফিরবার কথা মনেই থাকত না।

মাঝে মাঝে আমার কি একটা ব্যাপার হ'ত। ওই রকম নির্জ্জন জায়গায় কতবার একটা জিনিস দেখেচি।···

হয়তো দুপুরে চা-বাগানের কুলীরা কাজ সেরে সরল গাছের তলায় খেতে বসেচে—বাবা ম্যানেজারের বাংলোতে গিয়েচেন, সীতা ও দাদা ঘুমুচ্ছে—আমি কাউকে না জানিয়ে চুপি চুপি বেরিয়ে কার্ট রোড ধ'রে অনেক দূরে চলে যেতাম—আমাদের বাসা থেকে অনেক দূরে উম্‌প্লাঙের সেই পোড়ো পোস্ট আপিস ছাড়িয়েও চলে যেতাম—পথ ক্রমে যত নীচে নেমেচে, বনজঙ্গল ততই ঘন, ততই অন্ধকার, লতাপাতায় জড়াজড়ি ততই বেশী—বেতের বন, বাঁশের বন শুরু হ'ত—ডালে ডালে পরগাছা ও অর্কিড ততই ঘন, পাখী ডাকত—সেই ধরনের একটা

নিস্তব্ধ স্থানে একা গিয়ে বসতাম।

চুপ ক'রে বসে থাকতে থাকতে দেখেচি অনেক দূরে পাহাড়ের ও বনানীর মাথার ওপরে নীলাকাশ বেয়ে যেন আর একটা পথ—আর একটা পাহাড়শ্রেণী—সব যেন মৃদু হলুদ রঙের আলো দিয়ে তৈরি—সে অন্য দেশ, সেখানেও এমনি গাছপালা, এমনি ফুল ফুটে আছে, হলুদ আলোর বিশাল জ্যোতির্ম্ময় পথটা এই পৃথিবীর পর্ব্বতশ্রেণীর ওপর দিয়ে শূন্য ভেদ ক'রে মেঘরাজ্যের ওদিকে কোথায় চলে গিয়েছে—দূরে আর একটা অজানা লোকালয়ের বাড়িঘর, তাদের লোকজনও দেখেচি, তারা আমাদের মত মানুষ না—তাদের মুখ ভাল দেখতে পেতাম না—কিন্তু তারাও আমাদের মত ব্যস্ত, হলুদ রঙের পথটা তাদের যাতায়াতের পথ। ভাল করে চেয়ে চেয়ে দেখেছি সে-সব মেঘ নয়, মেঘের ওপর পাহাড়ী রঙের খেলার ধাঁধা নয়—সে-সব সত্যি, আমাদের এই পৃথিবীর মতই তাদের বাড়িঘর, তাদের অধিবাসী, তাদের বনপর্ব্বত, সত্যি—আমার চোখের ভুল যে নয় এ আমি মনে মনে বুঝতাম, কিন্তু কাউকে বলতে সাহস হ'ত না—মাকে না, এমন কি সীতাকেও না—পাছে তারা হেসে উঠে সব উড়িয়ে দেয়।

এ রকম একবার নয়, কতবার দেখেছি। আগে আগে আমার মনে হ'ত আমি যেমন দেখি, সবাই বোধ হয় ওরকম দেখে। কিন্তু সেবার আমার ভুল ভেঙে যায়। আমি একদিন মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—আচ্ছা মা, পাহাড়ের ওদিকে আকাশের গায়ে ও-সব কি দেখা যায়?…

মা বললেন—কোথায় রে?

—ওই কার্ট রোডের ধারে বেড়াতে গিয়ে এক জায়গায় বসেছিলাম, তাই দেখলাম আকাশের গায়ে একটা নদী—আমাদের মত ছোট নদী হয়—সে খুব বড়, কত গাছপালা—দেখনি মা?

—দূর পাগ্‌লা—ও মেঘ, বিকেলে ওরকম দেখায়।

—না মা, মেঘ নয়, মেঘ আমি চিনিনে? ও আর একটা দেশের মত, তাদের লোকজন স্পষ্ট দেখেচি যে—তুমি দেখনি কখনও?

—আমার ওসব দেখবার সময় নেই, ঘরকন্না তাই ঠেলে উঠতে পারিনে, নিতুটার আবার আজ প'ড়ে পা ভেঙে গিয়েচে—আমার মরবার অবসর নেই—ও-সব তুমি দেখগে বাবা।

বুঝলাম মা আমার কথা অবিশ্বাস করলেন। সীতাকেও একবার বলেছিলাম—সে কথাটা বুঝতেই পারলে না। দাদাকে কখনো কিছু বলিনি।

আমার মনে অনেকদিন ধ'রে এটা একটা গোপন রহস্যের মত ছিল—যেন আমার একটা কি কঠিন রোগ হয়েছে—সেটা যাদের কাছে বলছি, কেউ বুঝতে পারছে না, ধরতে পারছে না, সবাই হেসে উড়িয়ে দিচ্ছে। এখন আমার সয়ে গিয়েছে। বুঝতে পেরেছি—ও সবাই দেখে না—যারা দেখে, চুপ ক'রে থাকাই তাদের পক্ষে সব চেয়ে ভালো।

আমাদের বাসা থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা সব সময়ই চোখে পড়ে। জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত দেখে আসচি বহুদূর দিক্‌চক্রবালের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্য্যন্ত তুষারমৌলি গিরিচূড়ার সারি—বাগানের চারিধারের পাহাড়শ্রেণীর যেন একটুখানি ওপরে ব'লে মনে হ'ত—তখনো পর্য্যন্ত বুঝিনি যে ও-গুলো কত উঁচু। কাঞ্চনজঙ্ঘা নামটা অনেকদিন পর্য্যন্ত জানতাম না, আমাদের চাকর থাপাকে জিজ্ঞেস করলে বলত, ও সিকিমের পাহাড়। সেবার বাবা আমাদের সবাইকে (সীতা বাদে) দার্জ্জিলিং নিয়ে গিয়েছিলেন বেড়াতে—বাবার পরিচিত এক হিন্দুস্থানী চায়ের এজেন্ট ওখানে থাকে, তার বাসায় গিয়ে দু-দিন আমরা মহা আদর-যত্নে কাটিয়েছিলাম—তখন বাবার

মুখে প্রথম শুনবার সুযোগ হ'ল যে ওর নাম কাঞ্চনজঙ্ঘা। সীতার সেবার যাওয়া হয়নি, ওকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বাবা বাজার থেকে ওর জন্যে রঙীন গার্টার, উল আর উল বুনবার কাঁটা কিনে এনেছিলেন।

এই কাঞ্চনজঙ্ঘার সম্পর্কে আমার একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আছে।···

সেদিনটা আমাদের বাগানের কলকাতা আপিসের বড় সাহেব আসবেন বাগান দেখতে। তাঁর নাম লিণ্টন সাহেব। বাবা ও ছোট সাহেব তাকে আনতে গিয়েচেন সোনাদা স্টেশনে—আমাদের বাগান থেকে প্রায় তিন-চার ঘণ্টার পথ। ঘোড়া ও কুলী সঙ্গে গিয়েছে। তখন মেমেরা পড়াতে আসত না, বিকেলে আমরা ভাইবোনে মিলে বাংলোর উঠোনে লাট্টু খেলছিলাম। সূর্য্য অস্ত যাবার বেশী দেরি নেই—মা রান্নাঘরে কাপড় কাচবার জন্যে সোডা সাবান জলে ফোটাচ্ছিলেন, থাপা লণ্ঠন পরিষ্কার কাজে খুব ব্যস্ত—এমন সময় আমার হঠাৎ চোখে পড়ল কাঞ্চনজঙ্ঘার দূর শিখররাজির ওপর আর একটা বড় পর্ব্বত, স্পষ্ট দেখতে পেলাম তাদের ঢালুতে ছোট-বড় ঘরবাড়ি, সমস্ত ঢালুটা বনে ঢাকা, দেবমন্দিরের মত সরু সরু ঘরবাড়ির চূড়া ও গম্বুজগুলো অদ্ভুত রঙের আলোয় রঙীন—অস্তসূর্য্যের মায়াময় আলো যা কাঞ্চনজঙ্ঘার গায়ে পড়েছে তা নয়—তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও সম্পূর্ণ অপূর্ব্ব ধরনের। সে-দেশ ও ঘরবাড়ি যেন একটা বিস্তীর্ণ মহাসাগরের তীরে—কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথার ওপর থেকে সে মহাসাগর কতদূর চলে গিয়েছে, আমাদের এদিকেও এসেছে, ভুটানের দিকে গিয়েছে। তার কূলকিনারা নেই; যদি কাউকে দেখাতাম সে হয়তো বলত আকাশ ওই রকম দেখায়, আমায় বোকা বলত। কিন্তু আমি বেশ জানি যা দেখচি তা মেঘ নয়, আকাশ নয়—সে সত্যিই সমুদ্র। আমি সমুদ্র কখনো দেখিনি, তাই কি, সমুদ্র কি রকম তা আমি জানি। বাবার মুখে গল্প শুনে আমি যে রকম ধারণা করেছিলাম সমুদ্রের, কাঞ্চনজঙ্ঘার উপরকার সমুদ্রটা ঠিক সেই ধরনের। এর বছর দুই পরে মেমেরা আমাদের বাড়ি পড়াতে আসে, তারা দাদাকে একখানা ছবিওয়ালা ইংরেজী গল্পের বই দিয়েছিল, বইখানার নাম রবিন্‌সন ক্রুশো—তাতে নীল সাগরের রঙীন ছবি দেখেই হঠাৎ আমার মনে প'ড়ে গেল, এ আমি দেখেছি, জানি—আরও ছেলেবেলায় কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথার ওপর এক সন্ধ্যায় এই ধরনের সমুদ্র আমি দেখেছিলাম—কূলকিনারা নেই, অপার···ভুটানের দিকে চলে গিয়েছে···

মিস নর্টনকে এ-সব কথা বলবার আমার ইচ্ছে ছিল। অনেকদিন মিস্ নর্টন আমায় কাছে ডেকে আদর করেছে, আমার কানের পাশের চুল তুলে দিয়ে আমার মুখ দু-হাতের তেলোর মধ্যে নিয়ে কত কি মিষ্টি কথা বলেছে, হয়তো অনেক সময়—তখন বুড়ী মেম ছাড়া ঘরের মধ্যে কেউ ছিল না—অনেকবার ভেবেছি এইবার বলব—কিন্তু বলি-বলি ক'রেও আমার সে গোপন কথা মিস্ নর্টনকে বলা হয়নি। কথা বলা তো দূরের কথা, আমি সে-সময়ে মিস্ নর্টনের মুখের দিকে লজ্জায় চাইতে পারতাম না—আমার মুখ লাল হয়ে উঠত, কপাল ঘেমে উঠত···সারা শরীরের সঙ্গে জীবও যেন অবশ হয়ে থাকত···চেষ্টা করেও আমি মুখ দিয়ে কথা বার করতে পারতাম না। অথচ আমার মনে হ'ত এবং এখনো মনে হয় যদি কেউ আমার কথা বোঝে, তবে মিস্ নর্টনই বুঝবে।

মাস দুই আগে আমাদের বাড়িতে এক নেপালী সন্ন্যাসী এসেছিল। পচাং বাগানের বড়বাবু বাবার বন্ধু, তিনিই বাবার ঠিকানা দেওয়াতে সন্ন্যাসীটি সোনাদা স্টেশনে যাবার পথে আমাদের

বাসায় আসে। সে একবেলা আমাদের এখানে ছিল, যাবার সময় বাবা টাকা দিতে গিয়েছিলেন, সে নেয়নি। সন্ন্যাসী আমায় দেখেই কেমন একটু বিস্মিত হ'ল, কাছে ডেকে তার পাশে বসালে, আমার মুখের পানে বার বার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইতে লাগল—আমি কেমন একটু অস্বস্তি বোধ করলাম, তখন সেখানে আর কেউ ছিল না। তারপর সে আমার হাত দেখলে, কপাল দেখলে, ঘাড়ে কি দাগ দেখলে। দেখা শেষ ক'রে সে চুপ ক'রে রইল, কিন্তু চলে যাবার সময় বাবাকে নেপালী ভাষায় বললে—তোমার এই ছেলে সুলক্ষণযুক্ত, এ জন্মেছে কোথায়?

বাবা বললেন—এই চা-বাগানেই।

সন্ন্যাসী আর কিছু না ব'লেই চলে যাচ্ছিলেন, বাবা এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—ওর হাত কেমন দেখলেন?

সন্ন্যাসী কিছু জবাব দিল না, ফিরলও না, চলে গেল।

আমি কিছু বুঝতে পেরেছিলাম। আমি মাঝে মাঝে নির্জ্জনে যে নানা অদ্ভুত জিনিস দেখি সন্ন্যাসী সেই সম্বন্ধেই বলেছিলেন। সে যে আর কেউই বুঝবে না, আমি তা জানতাম। সেই জন্যেই তো আজকাল কাউকে ও-সব কথা বলিওনে।

পচাং চা-বাগানের কেরানীবাবু ছিলেন বাঙালী। তাঁর স্ত্রীকে আমরা মাসীমা ব'লে ডাকতাম। তিনি তাঁর বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন রংপুরে, সোনাদা স্টেশন থেকে ফিরবার পথে মাসীমা আমাদের বাসায় মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। মা না খাইয়ে তাঁদের ছাড়লেন না, খেতেদেতে বেলা দুপুর গড়িয়ে গেল। আমাদের বাসা থেকে পচাং বাগান তিন মাইল দূরে, ঘন জঙ্গলের মধ্যবর্ত্তী সরু পথ বেয়ে যেতে হয়, মাঝে মাঝে চড়াই উৎরাই। আমি সীতা ও দাদা তাঁদের সঙ্গে এগিয়ে দিতে গেলাম—পচাং পৌঁছতে বেলা তিনটে বাজল। আমরা তখনই সবাই চলে আসছিলাম, কিন্তু মাসীমা ছাড়লেন না, তিনি ময়দা মেখে পরোটা ভেজে, চা তৈরি করে আমাদের খাওয়ালেন; রাত্রে থাকবার জন্যেও অনেক অনুরোধ করলেন, কিন্তু আমাদের ভয় হ'ল বাবাকে না বলে আসা হয়েছে—বাড়ি না ফিরলে বাবা আমাদেরও বকবেন, মাও বকুনি খাবেন। বনজঙ্গলের পথ হ'লেও আরো অনেকবার আমরা মাসীমার এখানে এসেচি। আমি একাই কতবার এসেচি গিয়েচি। আমরা যখন রওনা হই তখন বেলা খুব কম আছে। অন্ধকার এরই মধ্যে নেমে আসছে—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, ঝড়বৃষ্টির খুব সম্ভাবনা। পচাং বাগান থেকে আধ মাইল যেতেই ঘন জঙ্গল—বড় বড় ওক্ আর পাইন—আবার উৎরাইয়ের পথে নামলেই জঙ্গল অন্য ধরনের, আরো নিবিড় গাছের ডালে পুরু কম্বলের মত শেওলা ঝুলছে, ঠিক যেন অন্ধকারে অসংখ্য ভূত-প্রেত ডালে নিঃশব্দে দোল খাচ্ছে। সীতা খুশির সুরে বললে—দাদা, যদি আমাদের সামনে ভালুক পড়ে?...হি হি—

সীতার ওপর আমাদের ভারি রাগ হ'ল, সবাই জানে এ পথে ভালুকের ভয় কিন্তু সে কথা ওর মনে করিয়ে দেওয়ার দরকার কি ছিল? বাহাদুরি দেখাবার বুঝি সময় অসময় নেই?

অন্ধকার ক্রমেই খুব ঘন হয়ে এল, আর খানিকটা গিয়ে সরু পায়ে-চলার পথটা বনের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হল—তেমনি কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া। শীতে হাত-পা জমে যাওয়ার উপক্রম হ'ল। গাছের ডালে শেওলা বৃষ্টিতে ভিজে এক ধরনের গন্ধ বার হয় এ আমরা সকলেই জানতাম, কিন্তু সীতা বার বার জোর ক'রে বলতে লাগল ও ভালুকের গায়ের গন্ধ।—দাদা আমাদের আগে আগে যাচ্ছিল, মাঝখানে সীতা, পেছনে আমি—হঠাৎ দাদা থমকে দাঁড়িয়ে গেল। সামনে একটা ঝর্ণা—তার ওপরটায় কাঠের গুঁড়ির পুল ছিল—পুলটা ভেঙে গিয়েছে। সেটার তোড় যেমন বেশী, চওড়াও তেমনি। পার হ'তে

সাহস করা যায় না। দাদা বললে—কি হবে জিতু!···চল পচাঙে মাসিমার কাছে ফিরে যাই। সীতা বললে—বাবা পিঠের ছাল তুলবে আজ না ফিরে গেলে বাসায়। না দাদা, বাড়িই চলো।

দাদা ভেবে বললে—এক কাজ করতে পারবি? পাকদণ্ডীর পথে ওপরে উঠতে যদি পারিস—ওখান দিয়ে লিণ্টন বাগানের রাস্তা। আমি চিনি, ওপরে জঙ্গলও কম। যাবি?

দাদা তা হ'লে খুব ভীতু তো নয়!

পাকদণ্ডীর সে পথটা তেমনি দুর্গম, সারা পথ শুধু বন জঙ্গল ঠেলে ঠেলে উঠতে হবে, পা একটু পিছলে গেলেই, কি বড় পাথরের চাঁই আল্‌গা হয়ে খসে পড়লে আটশ' কি হাজার ফুট নীচে প'ড়ে চুরমার হ'তে হবে। অবশেষে ঘন বনের বৃষ্টিভেজা পাতা-লতা, পাথরের পাশের ছোট ফার্নের ঝোপ ঠেলে আমরা ওপরে ওঠাই শুরু করলাম—অন্য কোনো উপায় ছিল না। কাপড়-চোপড় মাথার চুল বৃষ্টিতে ভিজে একাকার হয়ে গেল—রক্ত জমে হাত-পা নীল হয়ে উঠল। পাকদণ্ডীর পথ খুব সরু, দুজন মানুষে কোনোগতিকে পাশাপাশি যেতে পারে, বাঁয়ে হাজার ফুট খাদ, ডাইনে ঈষৎ ঢালু পাহাড়ের দেওয়াল খাড়া উঠেছে তাও হাজার-বারোশ ফুটের কম নয়। বৃষ্টিতে পথ পিছল, কাজেই আমরা ডাইনের দেওয়াল ঘেঁষে-ঘেঁষেই উঠচি। পথ মানুষের কেটে তৈরি করা নয় ব'লেই হোক, কিংবা এ-পথে যাতায়াত নেই বলেই হোক—ছোটখাটো গাছপালার জঙ্গল খুব বেশী। ডাইনের পাহাড়ের গায়ে বড় গাছের ডালপালাতে সারা পথটা ঝুপ্‌সি করে রেখেছে, মাঝে মাঝে সেগুলো এত নিবিড় যে সামনে কি আছে দেখা যায় না।

হঠাৎ একটা শব্দ শুনে আমরা ক'জনেই থমকে দাঁড়ালুম। সবাই চুপ ক'রে গেলাম। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম শব্দটা কিসের। ভয়ে আমাদের বুকের স্পন্দন বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হ'ল। সীতাকে আমি জড়িয়ে ধ'রে কাছে নিয়ে এলুম। অন্ধকারে আমরা কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না বটে, কিন্তু আমরা জানতাম ভালুক যে পথে আসে পথের ছোটখাটো গাছপালা ভাঙতে ভাঙতে আসে। একটা কোনো ভারী জানোয়ারের অস্পষ্ট পায়ের শব্দের সঙ্গে কাটকুটো ভাঙার শব্দে আমাদের সন্দেহ রইল না যে, আমরা যে-পথ দিয়ে এইমাত্র উঠে এসেছি, সেই পথেই ভালুক উঠে আসছে আমাদের পেছনে পেছনে। আমরা প্রাণপণে পাহাড় ঘেঁষে দাঁড়ালাম, ভরসা যদি অন্ধকারে না দেখতে পেয়ে সামনের পথ দিয়ে চলে যায়···আমরা কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছি, নিশ্বাঃস পড়ে কি না-পড়ে—এমন সময়ে পাকদণ্ডীর মোড়ে একটা প্রকাণ্ড কালো জমাট অন্ধকারের স্তূপ দেখা গেল—স্তূপটা একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে বেঁকে বেঁকে আসছে—যতটা ডাইনে, ততটা বাঁয়ে নয়—আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে দশ গজের মধ্যে এল—তার ঘন ঘন হাঁপানোর ধরনের নিঃশ্বাসও শুনতে পাওয়া গেল—আমাদের নিজেদের নিঃশ্বাস তখন আর বইছে না·· কিন্তু মিনিটখানেকের জন্য—একটু পরেই আর স্তূপটাকে দেখতে পেলাম না—যদিও শব্দ শুনে বুঝলাম সেটা পাকদণ্ডীর ওপরকার পাহাড়ী ঢালুর পথে উঠে যাচ্ছে। আরো দশ মিনিট আমরা নড়লাম না, তারপর বাকী পথটা উঠে এসে লিণ্টন বাগানের রাস্তা পাওয়া গেল। আধ মাইল চলে আসবার পরে উম্‌প্লাঙের বাজার। এই বাজারের অমৃত সাউ মিঠাই দেয় আমাদের বাসায় আমরা জানতাম—দাদা তার দোকানটাও চিনত। দোরে ধাক্কা দিয়ে ওঠাতে সে বাইরে এসে আমাদের দেখে অবাক হয়ে গেল। আমাদের তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে আগুনের চারিধারে বসিয়ে দিলে—আগুনে বেশী কাঠ দিলে ও বড় একটা পেতলের লোটায় চায়ের জল চড়ালে। তার বৌ উঠে আমাদের শুকনো কাপড় দিলে পরবার ও ময়দা মাখতে বসল। রাত তখন দশটার কম নয়। আমরা বাসায় ফিরবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়েছি—বললাম—আমরা কিছু খাব না, আমরা এবার যাই। অমৃত সাউ একা আমাদের

ছেড়ে দিলে না, তার ভাইকে সঙ্গে পাঠালে। রাত প্রায় সাড়ে এগারোটার সময় বাগানে ফিরে এসে দেখি হৈ হৈ কাণ্ড। বাবা বাসার নেই, তিনি সেদিন খুব মদ খেয়েছিলেন; ফেরেননি, তার ওপরে আমরাও ফিরিনি, মা পচাওে লোক পাঠিয়েছিলেন, সে লোক ফিরে এসে বলেছে ছেলেমেয়েরা তো সন্ধ্যের আগেই সেখান থেকে রওনা হয়েছে! এদিকে নাকি খুব ঝড় হয়ে গিয়েছে, আমরা আরও উঁচুতে থাকবার জন্যে ঝড় পাইনি—নীচে নাকি অনেক গাছপালা ভেঙে পড়েছে। এই সব ব্যাপারে মা ব্যস্ত হয়ে সাহেবের বাংলোয় খবর পাঠান—ছোট সাহেব চারিধারে আমাদের খুঁজতে লোক পাঠিয়েছে। মা এতক্ষণ কাঁদেননি, আমাদের দেখেই আমাদের জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলেন—সে এক ব্যাপার আর কি!

কিন্তু পরদিন যে ঘটনা ঘটল তা আরও গুরুতর। পরদিন চা-বাগানে বাবার চাকরি গেল। কেন গেল তা জানি না। অনেক দিন থেকেই সাহেবরা নাকি বাবার ওপর সন্তুষ্ট ছিল না, সেল মাস্টার বাগান দেখতে এসে বাবার নামে কোম্পানীর কাছে কয়েকবার রিপোর্টও করেছিল, বাবা মদ খেয়ে ইদানীং কাজকর্ম্ম নাকি ভাল ক'রে করতে পারতেন না, এই সব জন্যে। আমরা যে-রাত্রে পথ হারিয়ে যাই, সে-রাত্রে বাবা মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে কুলী লাইনের কোথায় পড়ে ছিলেন—বড় সাহেব সেজন্যে ভারি বিরক্ত হয়। আরো কি ব্যাপার হয়েছিল না হয়েছিল আমরা সে-সব কিছু শুনিনি।

বাবা যখন সহজ অবস্থায় থাকতেন, তখন তিনি দেবতুল্য মানুষ। তখন তিনি আমাদের ওপর অত্যন্ত স্নেহশীল, অত ভালোবাসতে মাও বোধ হয় পারতেন না। আমরা যা চাইতাম বাবা দার্জ্জিলিং কি শিলিগুড়ি থেকে আনিয়ে দিতেন। আমাদের চোখছাড়া করতে চাইতেন না। আমাদের নাওয়ানো-খাওয়ানো গোলমাল বা এতটুকু ব্যতিক্রম হ'লে মাকে বকুনি খেতে হ'ত। কিন্তু মদ খেলেই একেবারে বদলে যেতেন, সামান্য ছল-ছুতোয় আমাদের মারধর করতেন। হয়তো আমায় বললেন—এক্সারসাইজ করিস্ নে কেন? বলেই ঠাস্ ক'রে এক চড়। তারপর বললেন—উঠবস্ কর। আমি ভয়ে ভয়ে একবার উঠি আবার বসি—হয়তো ত্রিশ-চল্লিশ বার ক'রে ক'রে পায়ে খিল ধ'রে গেল—বাবার সেদিকে খেয়াল নেই। মা থাকতে না পেরে এসে আমাদের সাম্‌লাতেন। সেইজন্যে ইদানীং বাবা সহজ অবস্থায় না থাকলেই আমরা বাসা থেকে পালিয়ে যাই—কে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাবে?

এই সবের দরুন আমরাও বাবাকে ভয় যতটা করি ততটা ভালোবাসিনে।

দু-চারদিন ধরে বাবা-মায়ে পরামর্শ চলল, কি করা যাবে এ অবস্থায়। আমরা বাইরে বাইরে বেড়াই কিন্তু সীতা সব খবর রাখে। একদিন সীতাই চুপিচুপি আমায় বললে—শোনো দাদা, আমরা আমাদের দেশে ফিরে যাব বাবা বলেছে। বাবার হাতে এখন টাকাকড়ি নেই কিনা—তাই দেশে ফিরে দেশের বাড়িতে থেকে চাকরির চেষ্টা করবে। শীগগির যাব আমরা—বেশ মজা হবে দাদা—না?…দেশে চিঠি লেখা হয়েছে—

আমরা কেউ বাংলা দেশ দেখিনি, আমাদের জন্ম এখানেই। দাদা খুব ছেলেবেলায় একবার দেশে গিয়েছিল মা-বাবার সঙ্গে, তখন ওর বয়স বছর তিনেক—সে-কথা ওর মনে নেই। আমরা তো আজন্ম এই পর্ব্বত, বনজঙ্গল, শীত, কুয়াশা, বরফ-পড়া দেখে আসছি—কল্পনাই করতে পারিনে এ-সব ছাড়া আবার দেশ থাকা সম্ভব। তা ছাড়া সমাজের মধ্যে কোনো দিন মানুষ হইনি ব'লে আমরা কোনো বন্ধনে অভ্যস্ত ছিলাম না, সামাজিক নিয়ম-কানুনও ছিল আমাদের সম্পূর্ণ অজানা। মানুষ হয়েছি এরই মধ্যে, যেখানে খুশী গিয়েছি, যা খুশী করেছি। কাজেই বাংলা দেশে ফিরে যাওয়ার কথা যখন উঠল, তখন একদিকে যেমন

অজানা জায়গা দেখবার কৌতূহলে বুক ঢিপ্ ঢিপ্ ক'রে উঠল, অন্যদিকে মনটা যেন একটু দমেও গেল।

থাপাকে বিদায় দেওয়া হ'ল। সে আমাদের মানুষ করেছিল, বিশেষ ক'রে সীতাকে। তাকে এক মাসের বেশী মাইনে, দুখানা কাপড় আর বাবার একটা পুরোনো কোট দেওয়া হ'ল। থাপা বেশ সহজ ভাবেই বিদায় নিলে, কিন্তু বিকালে আবার ফিরে এসে বললে সে আমাদের যাওয়ার দিন শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত নামিয়ে দিয়ে তবে নিজের গাঁয়ে ফিরে যাবে। শিলিগুড়ি স্টেশনে সে আমাদের সবাইকে সন্দেশ কিনে খাওয়ালে—ওর মাইনের টাকা থেকেই বোধ হয়। মা রাঁধলেন, সে সব যোগাড় ক'রে দিলে। ট্রেন যখন ছাড়ল তখনও থাপা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে বোকার মত হাসছে।

কাঞ্চনজঙ্ঘাকে ভালবাসি, সে যে আমাদের ছেলেবেলা থেকে সাথী, এই বিরাট পর্ব্বত-প্রাচীর, ওক্-পাইনের বন, অর্কিড, শেওলা, ঝর্ণা, পাহাড়ী নদী ; মেঘ-রোদ-কুয়াশার খেলা—এরই মধ্যে আমরা জন্মেছি—এদের সঙ্গে আমাদের বত্রিশ নাড়ীর যোগ।…তখন এপ্রিল মাস, আবার পাহাড়ের ঢালুতে রডোডেণ্ড্রন ফুলের বন্যা এসেছে—সারা পথ দাদা বলতে বলতে এল চুপিচুপি—কেন বাবা অত মদ খেতেন, তা নাহ'লে তো আর চাকরি যেত না—বাবারই তো দোষ!

॥ ৩ ॥

আমাদের দেশের গ্রামে পৌঁছলাম পরদিন বেলা ন'টার সময়ে। বাবার মুখে শুনেছিলাম গ্রামের নাম আটঘরা, স্টেশন থেকে মাইল দুই আড়াই দূরে, জেলা চব্বিশ পরগণা। এত বাঙালী পরিবারের বাস একসঙ্গে দেখে বড় আনন্দ হ'ল। আমরা কখনো ফসলের ক্ষেত দেখিনি, বাবা চিনিয়ে দিলেন পাটের ক্ষেত কোন্‌টা, ধানের ক্ষেত কোন্‌টা। এ ধরণের সমতলভূমি আমরা দেখিনি কখনো—রেলে আসবার সময় মনের অভ্যাসে কেবলই ভাবছিলাম এই বড় মাঠটা ছাড়ালেই বুঝি পাহাড় আরম্ভ হবে। সেটা পার হয়ে গেলে মনে হচ্ছিল এইবার নিশ্চয়ই পাহাড়। কিন্তু পাহাড় তো কোথাও নেই, জমি উঁচু-নীচুও নয়, কি অদ্ভুত সমতল! যতদূর এলাম শিলিগুড়ি থেকে সবটা সমতল—ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে, সবদিকে সমতল, এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। দাদা এর আগে সমতল ভূমি দেখেছে, কারণ সে জন্মেছিল হনুমান নগরে, নতুন অভিজ্ঞতা হ'ল আমার ও সীতার।

আমাদের বাড়ীটা বেশ বড়, দোতলা, কিছু পুরনো ধরনের। বাড়ির পেছনে বাগান, ছোট একটা পুকুর। আমরা যখন গাড়ি থেকে নামলাম—বাড়ির মেয়েরা কেউ কেউ দোরের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তার মধ্যে জ্যাঠাইমা, কাকীমারাও ছিলেন। মা বললেন, প্রণাম করো। পাড়ার অনেক মেয়ে দেখতে এসেছিলেন, তাঁরা সীতাকে দেখে বলাবলি করতে লাগলেন, কি চমৎকার মেয়ে দেখেছ? এমন রঙ আমাদের দেশে হয় না, পাহাড়ের দেশে ব'লে হয়েছে। দাদাকে নিয়েও তারা খুব বলাবলি করলে, দাদার ও সীতার রঙ নাকি 'দুধে-আলতা'—আমার মুখের চেয়ে দাদার মুখ সুন্দর, এ-সব কথা এই আমরা শুনলাম। চা-বাগানে এ-সব কথা কেউ বলেনি। আর একটা লক্ষ্য করলাম আমাদের গাঁয়ের মেয়েরা প্রায়ই কালো, চা-বাগানের অনেক কুলীমেয়ে এর চেয়ে ফর্সা।

আমাদের থাকবার ঘর দেখে তো আমরা অবাক্। এত বড় বাড়িতে এ-ঘরটা ছাড়া তো আরো কত ঘর রয়েছে! নীচের একটা ঘর, ঘরের ছাদে মাটির নীচের কড়িকাঠ ঝুলে পড়েছে ব'লে খুঁটির ঠেকনো। কেন ওপরে দোতলায় তো কত ঘর, এত বড় বাড়ি তো! অন্য ঘরে জায়গা হবে না কেন? এই খারাপ ঘরটাতে আমরা থাকবো কেন?

দেখলাম বাবা মা বিনা প্রতিবাদে সেই ঘরটাতেই আমাদের জিনিসপত্র তুললেন।

দিন-চারেক পরে জ্যাঠাইমা একদিন আমায় জিজ্ঞেস করলেন—হ্যাঁ রে, তোর মাকে নাকি সেখানে মেমে পড়াতো?

আমি বললাম, হ্যাঁ, জ্যাঠাইমা।

গর্ব্বের সুরে বললাম—আমাকে, দাদাকে, সীতাকেও পড়াতো।

জ্যাঠাইমা বললেন—তাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া ছিল নাকি তোদের?

আমি বাহাদুরি ক'রে বললাম—তারা এসে চা খেত আমাদের বাড়ি। আমাদের বিস্কুট দিত, কেক্ দিত খেতে তাদের ওখানে গেলে—চা খাওয়াতো—

জ্যাঠাইমা টানা-টানা সুরে বললেন—মাগো মা! কি হবে, আমাদের ঘরে-দোরে তো যখন-তখন উঠছে, হিঁদুর ঘরের জাতজন্ম আর রইল না।

আমি তখন বুঝতে পারিনি কেন জ্যাঠাইমা এ রকম বলছেন। কিন্তু শুধু এ কথা নয়—আমি ছেলেমানুষ, অনেক কথাই তখন জানতাম না। জানতাম না যে এই বাড়িতে আমার বাবার অংশটুকু অনেক দিন বিক্রী হয়ে গিয়েছে, এখন যে এঁদো ঘরে আমরা আছি, সে-ঘরে কোনো ন্যায্য অধিকার আমাদের নেই—জ্ঞাতি জ্যাঠামশাইরা অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞার সঙ্গে থাকতে দিয়েছেন মাত্র। জানতাম না যে, আমার বাবা বর্ত্তমানে অর্থহীন, অসুস্থ ও চাকুরিহীন, সরিকের বাড়িতে আশ্রয়প্রার্থী। আরো জানতাম না যে, বাবা বিদেশে থাকেন, ইংরেজী জানেন ও ভাল চাকুরি করেন ব'লে এঁদের চিরদিন ছিল হিংসে—আজ এ অবস্থায় হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে তাঁরা যে এতদিনের সঞ্চিত গায়ের ঝাল মেটাতে ব্যগ্র হয়ে উঠবেন সেটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত। চাকুরির অবস্থায় মাকে নিয়ে বাবা কয়েকবার এখানে এসে চাল দেখিয়ে গিয়েছিলেন, এরা সে-কথা ভোলেনি। ছেলেমানুষ বলেই এত কথা তখন বুঝতাম না।

আমরা কখনো দোতলা বাড়ি দেখিনি—গাঁয়ে ঘুরে ঘুরে দোতলা কোঠা বাড়ি দেখতে আমাদের ভারি ভালো লাগতো, বিশেষ ক'রে সীতার। সীতা আজ এসে হয়তো বলে—কাল যেও আমার সঙ্গে দাদা, ও-পাড়ার বাঁড়ুয্যে-বাড়ি কত বড় দেখে এসো—দোতলার ওপরে আবার একটা ছোট ঘর, সত্যি দাদা!

আমাদের গ্রামে খুব লোকের বাস—এক এক পাড়াতেই ষাট-সত্তর ঘর ব্রাহ্মণ। এত ঘন বসতি কখনো দেখিনি—কেমন নতুনতর মনে হয়, কিন্তু ভাল লাগে না। এতে যেন মন হাত পা ছড়াবার জায়গা পায় না। সদাই কেমন অস্বস্তি বোধ হয়—রাস্তায় বেজায় ধুলো, পুরনো নোনাধরা ইটের বাড়িই অধিকাংশ, বিশেষ কোনো শ্রীছাঁদ নেই—পথের ধারে মাঝে মাঝে গাছপালা, সে-সব গাছপালা আমি চিনি নে, নামও জানি নে, কেবল চিনি কচুগাছ ও লালবিছুটি। এদের হিমালয়ে দেখেছি ব'লে নয়, কচুর ডাঁটার তরকারি এখানে এসে খেয়েছি বলে। আর আমার খুড়তুতো ভাই বিশু একদিন সীতাকে বিছুটির পাতা দেখিয়ে বলেছিল—এর পাতা তুলে গায়ে ঘষতে পারিস?…বেচারী সীতা জানত না কিছু, সে বাহাদুরি দেখিয়ে একমুঠো পাতা তুলে বাঁ-হাতে আচ্ছা ক'রে ঘষেছিল—তারপর আর যায় কোথা!

এ-সব জায়গা আমার চোখে অত্যন্ত কুশ্রী মনে হয়, মন ভরে ওঠে এমন একটা দৃশ্য এর কোনো দিকেই নেই—ঝর্ণা নেই, বরফে মোড়া পর্ব্বত-পাহাড় নেই—আরো কত কি নেই। সীতারও তাই, একদিন সে চুপিচুপি বললে—এখানে থাকতে তোমার ইচ্ছে হয় দাদা? আমায় যদি এখুনি কেউ বলে চা-বাগানে চল, আমি বেঁচে যাই। আর একটা কথা শোনো দাদা—জ্যাঠাইমা কি খুড়ীমার ঘরে অত যেও না যেন। ওরা আমাদের দেখতে পারে না। ওদের বিছানায় গিয়ে বসেছিলে কেন দুপুরবেলা? তুমি উঠে গেলে কাকীমা তোমায় বললে, অসভ্য পাহাড়ী ভূত, আচার নেই বিচের নেই, যখন-তখন বিছানা ছোঁয়! যেও না ওদের ঘরে যখন-তখন, বুঝলে?

ছোট বোনের পরামর্শ বা উপদেশ নিতে আমার অগ্রজগর্ব্ব সঙ্কুচিত হয়ে গেল, বললাম—যা যা, তোকে শেখাতে হবে না। কাকীমা মন্দ ভেবে কিছুই বলেননি, আমায় ডেকে তার পরে কত বুঝিয়ে দিলেন পাছে আমি রাগ করি। জানিস তা?

বলা বাহুল্য আমায় ডেকে কাকীমার কৈফিয়ত দেওয়ার কথাটা আমার কল্পনাপ্রসূত। আমাদের জীবনের যে অভিজ্ঞতা এই চার মাসের মধ্যেই সঞ্চয় করেছি, তা বোধ হয় সারা জীবনেও ভুলবো না। আমরা সত্যই জানতাম যে, সংসারের মধ্যে এত সব খারাপ জিনিস আছে, মানুষ মানুষের প্রতি এত নিষ্ঠুর হ'তে পারে, যাদের কাছে জেঠিমা, কাকীমা, দিদি ব'লে হাসিমুখে ছুটে গিয়েছি, তারা এতটা হৃদয়হীন ব্যবহার সত্যিই করতে পারে! কি ক'রে জানবই বা এ সব?

মুশকিল এই যে এত সাবধানে চললেও পদে পদে আমরা জ্যাঠাইমাদের কাকীমাদের কাছে অপরাধী হয়ে পড়ি। আমরা লোকালয়ে কখনো বসবাস করিনি বলেই হোক্ বা এদের এখানকার নিয়ম-কানুন জানিনে বলেই হোক্, বুঝতে পারিনে যে কোথায় আমাদের অপরাধ ঘটছে বা ঘটতে পারে। রাত্রে যে কাপড়খানা প'রে শুয়ে থাকি, সেইখানা পরনে থাকলে সকালে যে আল্না ছুঁতে নেই, তার দরুন আল্নাসুদ্ধ কাচা কাপড় সব নোংরা হয়ে যায়, বা বাড়ির আশপাশের খানিকটা সুনির্দিষ্ট অংশ পবিত্র, কিন্তু সীমানা পেরিয়ে গেলেই হাত-পা না ধুয়ে বা গঙ্গাজল মাথায় না দিয়ে ঘরদোরে ঢুকতে নেই—এ-সব কথা আমরা জানিনে, শুনিওনি—যুক্তির দিক দিয়েও বুঝতে পারিনে। আমাদের বাড়ির খিড়কিতে খানিকটা বন, একদিন বিকেলে আমি, সীতা ও দাদা সেখানে কুঁড়েঘর বাঁধবার জন্যে নোনাগাছের ডাল কাটছি—কাকীমা দেখতে পেয়ে বললেন, ওখানে গিয়ে জুটেছ সব? ভাগ্যিস চোখে পড়ল! এক্ষুনি তো ওই সব নিয়ে উঠতে এসে দোতলার দালানে!···মা গো মা, মেলেচ্ছ খিরিস্টানের মত ব্যাভার, আঁস্তাকুড় ঘেঁটে খেলা হচ্ছে দ্যাখো!

সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখলাম, আঁস্তাকুড়ের অন্য কোনো লক্ষণ তো নেই! দিব্যি পরিষ্কার জায়গা, ঘাসের জমি আর বনের গাছপালা। আমি অবাক হয়ে বললাম—কাকীমা, এখানে তো কিচ্ছু নোংরা নেই? এসে দেখুন বরং কেমন পরিষ্কার—

কাকীমার মুখ দিয়ে খানিকক্ষণ কথা বার হ'ল না—তিনি এমন কথা জীবনে কখনো শোনেননি। তারপর বললেন—চোখে কি ঢ্যালা বেরিয়েছে নাকি? এঁটো হাঁড়িকলসী ফেলা রয়েছে দেখছ না সামনে?···কাচা কাপড় প'রে কোন্ ছেলেমেয়েটা এই বিকেলে পথ থেকে অত দূরে বনজঙ্গলের মধ্যে যায়? ওটা আঁস্তাকুড় হ'ল না? আবার সমানে তক্কো!

তারপর খুড়ীমা হুকুম দিলেন আমাদের সবাইকে এক্ষুনি নাইতে হবে। আমরা অবাক হয়ে গেলাম—নাইতে হবে কেন?

সামনে হাত তিন-চার দূরে গোটাকতক ভাঙা হাঁড়িকুড়ি পড়ে আছে বটে, কিন্তু তার দরুন গোটা বনটা অপরিষ্কার কেন হবে তা বুঝতে পারলাম না আমরা তিনজনে কেউ। বিশেষ ক'রে এটা আরো বুঝতে পারলাম না যে, পথ থেকে দূরে বনের মধ্যে বিকেলে কাপড় প'রে যেতে দোষটা কিসের! চা-বাগানে থাকতে তো কত দূর দূর আমরা চলে যেতাম, কার্ট রোড, পচাঙের বাজার; এখানেই বা কি বন, সেখানকার সেই সুনিবিড় বনানী পদচিহ্নহীন, নির্জ্জন, আধ-অন্ধকার—কতদূরে, যেখানে যেখানে গিয়েছি কাপড় প'রেই তো গিয়েছি—

দাদা একটু ভীতু, সে ভয়ে নাইতে রাজী হ'ল। আমি বললাম—সীতা, তুই আর আমি নাইবো না, কখ্খনো না।

আমি যা বলি তাই শোনা সীতার স্বভাব—সে বললে, খুড়ীমা খুন ক'রে ফেললেও আমি নাইবো না দাদা।

খুড়ীমা আমাদের সাধ্যমত নির্য্যাতনের কোনো ত্রুটি করলেন না। বাড়ি ঢুকতে দিলেন না, তাঁর বড় ছেলে হারুদাকে বলে দিলেন আমাদের শাসন করতে, মাকে বললেন—তোমার ওই ডাকাত মেয়ে আর ডাকাত ছেলেকে আজ কি দশা করি তা টেরই পাবে—আমার সঙ্গে সমানে তক্কো তো করলেই আবার আমার কথার ওপর একগুঁয়েমি!

মা ওঁদের বাড়িতে এখন এসে রয়েছেন, ভয়ে কিছু বলতে পারলেন না। আমি সীতাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি থেকে চলে গেলাম। ও-পাড়ায় পথের ধারে শ্যাম বাগচীদের পোড়ো বাড়ি, পেছনে তাদের বাগান, সেও পোড়ো। সারাক্ষণ আমরা সেখানে কাটালাম, সন্ধ্যার সময় দাদা গিয়ে ডেকে আনলে। বাড়িতে ঢুকতে যাব কাকা দোতলা থেকে বললেন—ওদের বাড়ি ঢুকতে দিও না বলছি—ওরা যেন খবরদার আমার বাড়ি না মাড়ায়, সাবধান!—যেখানে হয় যাক্, এত বড় আস্পদ্দা সব—

মা কিছু বলতে সাহস করলেন না, বৌমানুষ! বাবা বাড়ি ছিলেন না, চাকরির চেষ্টায় আজকাল তিনি বড় এখানে ওখানে ঘোরেন, কিছু পান না বোধ হয়—দু-একদিন পরে শুকনো মুখে ফিরে আসেন—সংসার একেবারে অচল। আমরা এক প্রহর রাত পর্য্যন্ত দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম। জ্যাঠাইমা, খুড়ীমা, জ্যাঠামশাই, দিদিরা কেউ একটা কথাও বললেন না। তারপর যখন ওদের দোতলায় খাওয়া-দাওয়া সারা হ'ল, আলো নিবল, মা চুপিচুপি আমাদের বাড়িতে ঢুকিয়ে নিলেন, বললেন—জিতু, খুড়ীমার কথা শুনলি নে কেন? ছি—

আমি বললাম—উনি যে কথা বলেন মা, তার কোনো মানে হয় না। আচ্ছা মা, তুমিই বলো আমরা সেখানে বনে বনে বেড়াতাম না? আমরা কি নাইতুম? আর বন কি আঁস্তাকুড়? অন্যায় কথা ওঁর কখ্খনো শুনব না মা। এতে উনি মারুন আর খুনই করুন—

মা অতি কষ্টে কান্না সামলাচ্চেন মনে হ'ল। বললেন—তুই যদি এরকম করিস তা হ'লে এ বাড়িতে ওরা আমাদের থাকতে দেবে না। আমাদের কি চেঁচিয়ে কথা বলবার জো আছে এখানে? ছি বাবা জিতু, ওরা যা বলে শুনবি। ওরা লোক ভাল না—আগে জানলে ভিক্ষে ক'রে খেতাম তবুও এখানে আসতাম না। তোর বাবার যে একটা কিছু হ'লে হয়।

বাবা কলকাতা থেকে দুপুরে বাড়ি ফিরলেন। কাপড়-জামা এত ময়লা কখনো বাবার গায়ে দেখিনি। আমায় কাছে ডেকে বললেন—শোন্ জিতু, এই পুঁটলিটা তোর মাকে দিয়ে আয়, আমি একবার ও-পাড়া থেকে আসি। ভটচাযি্যদের নন্তির কারখানায় একটা লোকের নামে চিঠি দিয়েছে—ওদের দিয়ে আসি।

আমি বললাম—এখন যেও না বাবা। চিঠি আমি দিয়ে আসব'খন, তুমি বসে চা-টা খাও। বাবা শুনলেন না, চলে গেলেন। বাবার মুখ শুকনো, দেখে বুঝলাম যেজন্যে গিয়েছেন তার কোনো যোগাড় হয়নি, অর্থাৎ চাকরি। চাকরি না হ'লেও আর এদিকে চলে না।

হাতের টাকা ক্রমশ ফুরিয়ে এসেছে। আমরা নীচের যে ঘরে থাকি, গোরুবাছুরেরও সেখানে থাকতে কষ্ট হয়। আমরা এসেছি প্রায় মাস-চারেক হ'ল, এই চার মাসেই যা দেখেছি শুনেছি তা বোধ করি সারা জীবনেও ভুলব না। যাদের কাছে জেঠিমা, কাকীমা, দিদি ব'লে হাসিমুখে ছুটে যাই, তাঁরা যে কেন আমাদের ওপর এমন বিরূপ, কেন তাঁদের ব্যবহার এত নিষ্ঠুর, ভেবেই পাইনে এর কোনো কারণ। আমরা তো আলাদা থাকি, আমাদের খরচে আমাদের রান্না হয়, ওঁদের তো কোনোই অসুবিধের মধ্যে আমরা ফেলিনি, তবু কেন বাড়িসুদ্ধ লোকের আমাদের ওপর এত রাগ?

আমার বাবার আপন ভাই নেই, ওঁরা হ'লেন খুড়তুত-জাঠতুত ভাই। জ্যাঠামশায়ের অবস্থা খুবই ভালো—পাটের বড় ব্যবসা আছে, দুই ছেলে গদিতে কাজ দেখে, ছোট একটি ছেলে এখানকার স্কুলে পড়ে, আর একটি মেয়ে ছিল, সে আমাদের আসবার আগে বসন্ত হয়ে মারা গিয়েছে। মেজকাকার তিন মেয়ে—ছেলে হয়নি, বড় মেয়ের বিয়ে হয়েচে—আর দুই মেয়ে ছোট। ছোটকাকার বিয়ে হয়েছে বেশী দিন নয়—বৌও এখানে নেই। ছোটকাকা অত্যন্ত রাগী লোক, বাড়িতে সর্ব্বদা ঝগড়াঝাঁটি করেন, গানবাজনার ভক্ত, ওপরের ঘরে সকাল নেই সন্ধ্যে নেই হারমোনিয়াম বাজাচ্ছেন।

জ্যাঠাইমার বয়স মায়ের চেয়ে বেশী, কিন্তু বেশ সুন্দরী—একটু বেশী মোটাসোটা। গায়ে ভারী ভারী সোনার গহনা। এঁর বিয়ের আগে নাকি জ্যাঠামশায়ের অবস্থা ছিল খারাপ—তারপর জ্যাঠাইমা এ বাড়িতে বধূরূপে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংসারে উন্নতিরও সূত্রপাত। প্রতিবেশীরা খোশামোদ ক'রে বলে—আমার সামনেই আমি কতবার শুনেছি—তোমার মত ভাগ্যিমানী ক'জন আছে বড়-বৌ? এদের কি-ই বা ছিল, তুমি এলে আর সংসার সব দিক থেকে উথলে উঠলো, কপাল বলে একেই বটে! সামনে বলা নয়—এমন মন আজকাল ক'জনের বা আছে? দেওয়ায়-থোওয়ায়, খাওয়ানোয়-মাখানোয়—আমার কাছে বাপু হক্ কথা।

মেজখুড়ীমা ওর মধ্যে ভালো লোক। কিন্তু তিনি কারুর সপক্ষে কথা বলতে সাহস করেন না, তাঁর ভাল করবার ক্ষমতা নেই, মন্দ করবারও না। মেজকাকা তেমন কিছু রোজগার করেন না, কাজেই মেজখুড়ীমার কোনো কথা এ বাড়িতে খাটে না।

বছরখানেক কেটে গেল। বাবা কোথাও চাকরি পেলেন না। কত জায়গায় হাঁটাহাঁটি করলেন, শুকনো মুখে কতবার বাড়ি ফিরলেন। হাতে যা পয়সা ছিল ক্রমে ক্রমে ফুরিয়ে এল।

সকালে আমরা বাড়ির সামনে বেলতলায় খেলছিলাম। সীতা বাড়ির ভেতর থেকে বার হয়ে এল, আমি বললুম—চা হয়েছে সীতা?

সীতা মুখ গম্ভীর ক'রে বললে—চা আর হবে না। মা বলেছে চা-চিনির পয়সা কোথায় যে চা হবে?

কথাটা আমার বিশ্বাস হ'ল না, সীতার চালাকি আমি যেন ধরে ফেলেছি, এইরকম সুরে তার দিকে চেয়ে হাসিমুখে বললুম—যাঃ, তুই বুঝি খেয়ে এলি!

চা-বাগানে আমাদের জন্ম, সকালে উঠে চা খাওয়ার অভ্যাস আমাদের জন্মগত, চা না খেতে পাওয়ার অবস্থা আমরা কল্পনাই করতে পারিনে।

সীতা বললে—না দাদা, সত্যি, তুমি দেখে এসো—চা হচ্চে না। তারপরে বিজ্ঞের সুরে বললে—বাবার যে চাকরি হচ্চে না, মা বলছিল দু-দিন পরে আমাদের ভাতই জুটবে না তো চা!…আমরা এখন গরিব হয়ে গিয়েছি যে।

সীতার কথায় আমাদের দারিদ্র্যের রূপটি নূতনতর মূর্ত্তিতে আমার চোখের সামনে ফুটল। জানতুম যে আমরা গরিব হয়ে গিয়েছি, পরের বাড়িতে পরের মুখ চেয়ে থাকি, ময়লা বিছানায় শুই, জলখাবার খেতে পাইনে, আমাদের কারুর কাছে মান নেই সবই জানি। কিন্তু এ সবেও নিজের দারিদ্র্যের স্বরূপটি তেমন ক'রে বুঝিনি, আজ সকালে চা না খেতে পেয়ে সেটা যেমন ক'রে বুঝলুম।

বিকেলের দিকে বাবা দেখি পথ বেয়ে কোথা থেকে বাড়িতে আসছেন। আমায় দেখে বললেন—শোন্ জিতু, চল্ শিমূলের তুলো কুড়িয়ে আনিগে—

আমি শিমূল তুলোর গাছ এই দেশে এসে প্রথম দেখেছি—গাছে তুলো হয় বইয়ে পড়লেও চোখে দেখেছি এখানে এসে এই বৈশাখ মাসে। আমার ভারি মজা লাগল—উৎসাহ ও খুশির সুরে বললুম—শিমূল তুলো? কোথায় বাবা?…চলো যাই—সীতাকে ডাকবো?

বাবা বললেন—ডাক ডাক, সবাইকে ডাক—চল্ আমরা যাই—

বাবাও আমার পেছনে পেছনে বাড়ি ঢুকলেন। পরের দিন ষষ্ঠী ও দাদার জন্মবার। মা কোথা থেকে খানিকটা দুধ যোগাড় ক'রে রান্নাঘরের দাওয়ায় উনুনে বসে বসে ক্ষীরের পুতুল গড়ছিলেন—বাবার স্বর শুনেই মুখ তুলে চেয়ে এক চমক বাবার দিকে দেখেই একবার চকিত দৃষ্টিতে ওপরে জ্যাঠাইমাদের বারান্দার দিকে কি জন্যে চাইলেন—তারপর পুতুল-গড়া ফেলে তাড়াতাড়ি উঠে এসে বাবার হাত ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন। আমার দিকে ফিরে বললেন—যা জিতু, বাইরে খেলা করগে যা—

আমি অবাক হয়ে গেলুম। বলতে যাচ্ছিলাম, মা, বাবা যে শিমূল তুলো কুড়োবার—, কিন্তু মার মুখের দিকে চেয়ে আমার মুখ দিয়ে কথা বার হ'ল না। একটা কিছু হয়েছে যেন—কিন্তু কি হয়েছে আমি বুঝলাম না। বাবা মদ খেয়ে আসেননি নিশ্চয়—মদ খেলে আমরা বুঝতে পারি—খুব ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি, দেখলেই বুঝি। তবে বাবার কি হ'ল?

অবাক হয়ে বাইরে চলে এলুম।

এখানকার স্কুলে আমি ভর্ত্তি হয়েছি, কিন্তু দাদা আর পড়তে চাইতে না ব'লে তাকে ভর্ত্তি করা হয়নি। প্রথম কয় মাস মাইনের জন্যে মাস্টার মশায়ের তাগাদার চোটে আমার চোখে জল আসত—সাড়ে ন' আনা পয়সা মাইনে—তাও বাড়িতে চাইলে কারুর কাছে পাইনে, বাবার মুখের দিকে চেয়ে বাবার কাছে তাগাদা করতে মন সরে না।

শনিবার, সকালে স্কুলের ছুটি হবে। স্কুলের কেরানী রামবাবু একখানা খাতা নিয়ে আমাদের ক্লাসে ঢুকে মাইনের তাগাদা শুরু করলেন। আমার মাইনে বাকি দু-মাসের—আমার ক্লাস থেকে উঠিয়ে দিয়ে বললেন—বাড়ি গিয়ে মাইনে নিয়ে এসো খোকা, নইলে আর ক্লাসে বসতে দেবো না কাল থেকে। আমার ভারি লজ্জা হ'ল—দুঃখ তো হ'লই। আড়ালে ডেকে বললেই তো পারতেন রামবাবু, ক্লাসে সকলের সামনে—ভারি—

দুপুরে রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করছে। স্কুলের বাইরে একটা নিমগাছ। ভারি সুন্দর নিমফুলের ঘন গন্ধটা। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলুম কি করা যায়। মাকে বলব বাড়ি গিয়ে? কিন্তু জানি মায়ের হাতে কিছু নেই, এখুনি পাড়ায় ধার করতে বেরুবে, পাবে কি না পাবে, ছোট মুখ

ক'রে বাড়ি ফিরবে—ওতে আমার মনে বড় লাগে।

হঠাৎ আমি অবাক্ হয়ে পথের ওপারে চেয়ে রইলুম—ওপারে সামু নাপিতের মুদিখানার দোকানটা আর নেই, পাশেই সে ফিতে-ঘুন্সির দোকানটাও নেই, তার পাশের জামার দোকানটাও নেই—একটা খুব বড় মাঠ, মাঠের ধারে বড় বড় বাঁশগাছের মত কি গাছের সারি, কিন্তু বাঁশগাছ নয়। দুপুরবেলা নয়, বোধ হয় যেন রাত্রি—জ্যোৎস্না রাত্রি—দূরে সাদা রঙের একটা অদ্ভুত গড়নের বাড়ি, মন্দিরও হতে পারে।

নিমগাছের গুঁড়িটাতে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলুম, সাগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকে ভাল দেখতে পাওয়া গেল, তখনো তাই আছে জ্যোৎস্নাভরা একটা মাঠ, কি গাছের সারি—দূরের সাদা বাড়িটা। দু মিনিট···পাঁচ মিনিট। তাড়াতাড়ি চোখ মুছলাম, আবার চাইলুম—এখনও অবিকল তাই। একেবারে এত স্পষ্ট, গাছের পাতাগুলো যেন গুনতে পারি, পাখিদের ডানার সব রঙ বেশ ধরতে পারি।

তার পরেই আবার কিছু নেই, খানিকক্ষণ সব শূন্য—তার পরেই সামু নাপিতের দোকান, পাশেই ফিতে-ঘুন্সির দোকান।

বাড়ি চলে এলুম। যখনই আমি এই রকম দেখি, তখন আমার গা কেমন করে—হাতে পায়ে যেন জোর নেই এমনি হয়। মাথা যেন হালকা মনে হয়। কেন এমন হয় আমার? কেন আমি এ-সব দেখি? কাউকে এ কথা বলতে পারিনে, মা, বাবা, দাদা, সীতা, কাউকে নয়। আমার এমন কোনো বন্ধু বা সহপাঠী নেই, যাকে আমি বিশ্বাস ক'রে সব কথা খুলে বলি। আমার মনে মনে যেন কে বলে—এরা এ-সব বুঝবে না। বন্ধুরা হয়ত হেসে উঠবে, কি ওই নিয়ে ঠাট্টা করবে।

ওবেলা খেয়ে যাইনি। রান্নাঘরে ভাত খেতে গিয়ে দেখি শুধু সিমভাতে আর কুমড়োর ডাঁটাচচ্চড়ি। আমি ডাঁটা খাইনে—সিম যদি বা খাই সিমভাতে একেবারেই মুখে ভাল লাগে না। মাকে রাগ ক'রে বললুম—ও দিয়ে ভাত খাবো কি করে? সিমভাতে দিলে কেন? সিমভাতে আমি খাই কখনও?

কিন্তু মাকে যখন আমি বকছিলুম আমার মনে তখন মায়ের ওপর রাগ ছিল না। আমি জানি আমাদের ভালো খাওয়াতে মায়ের যত্নের ত্রুটি কোনো দিন নেই, কিন্তু এখন মা অক্ষম, অসহায়—হাতে পয়সা নেই, ইচ্ছে থাকলেও নিরুপায়। মায়ের এই বর্ত্তমান অক্ষমতার দরুন মায়ের ওপর যে করুণা সেটাই দেখা দিল রাগে পরিবর্ত্তিত হয়ে। চেয়ে দেখি মায়ের চোখে জল। মনে হ'ল এ সেই মা—চা-বাগানে থাকতে মিস্ নর্টনের কাছ থেকে আমাদের খাওয়ানোর জন্যে কেক্ তৈরি করবার নিয়ম শিখে বাজার থেকে ঘি ময়দা কিশমিশ ডিম চিনি সব আনিয়ে সারা বিকেল ধরে পরিশ্রম ক'রে কতকগুলো স্বাদগন্ধহীন নিরেট ময়দার ঢিপি বানিয়ে বাবার কাছে ও পরদিন মিস্ নর্টনের কাছে হাস্যাস্পদ হয়েছিলেন! তার পর অবিশ্যি মিস্ নর্টন ভাল ক'রে হাতে ধরে শেখায় এবং মা ইদানীং খুব ভাল কেকই গড়তে পারতেন।

মা বাংলা দেশের পাড়াগাঁয়ের ধরণ-ধারণ, রান্না, আচার-ব্যবহার ভাল জানতেন না—অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে চা-বাগানে চলে গিয়েছিলেন, সেখানে একা একা কাটিয়েছেন চিরকাল সমাজের বাইরে—পাড়াগাঁয়ের ব্রত-নেম্ পুজো আচ্চা আচার এ-সব তেমন জানা ছিল না। এদের এই ঘোর আচারী সংসারে এসে পড়ে আলাদা থাকলেও মাকে কথা সহ্য করতে হয়েছে কম নয়। পয়সা থাকলে যেটা হয়ে দাঁড়াত গুণ—হাত খালি থাকাতে সেটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল

ঠাট্টা, বিদ্রূপ, শ্লেষের ব্যাপার—জংলীপনা খিরিস্টানি বা বিবিয়ানা। মার সহ্যগুণ ছিল অসাধারণ, মুখ বুজে সব সহ্য করতেন, কোনোদিন কথাটিও বলেননি। ভয়ে ভয়ে ওদের চালচলন, আচার-ব্যবহার শিখবার চেষ্টা করতেন—নকল করতে যেতেন—তাতে ফল অনেক সময়ে হ'ত উল্টো।

আরও মাসকতক কেটে গেল। সেই ক-মাসে আমাদের যা অবস্থা হয়ে দাঁড়ালো, জীবনে ভাবিওনি কোনো দিন যে অত কষ্টের মধ্যে পড়তে হবে। দু-বেলা ভাত খেতে আমরা ভুলে গেলাম। স্কুল থেকে এসে বেলা তিনটের সময় খেয়ে রাত্রে কিছু খাওয়ার ইচ্ছেও হত না। ভাত খেয়ে স্কুলে যাওয়া ঘটত না প্রায়ই, অত সকালে মা চালের যোগাড় করতে পারতেন না, সেটা প্রায়ই ধার ক'রে নিয়ে আসতে হ'ত। সব সময় হাতে পয়সা থাকত না—এর মানে আমাদের চা-বাগানের শৌখিন জিনিসপত্র, দেরাজ, বাক্স—এই সব বেচে চলছিল—সব সময়ে তার খদ্দের জুটত না। মা বৌমানুষ, বিশেষতঃ এটা অপরিচিত স্থান, নিজের শ্বশুরবাড়ি হলেও এর সঙ্গে এত কাল কোনো সম্পর্কই ছিল না—কিন্তু মা ও সব মানতেন না, লজ্জা ক'রে বাড়ি বসে থাকলে তাঁর চলত না, যেদিন ঘরে কিছু নেই, পাড়ায় বেরিয়ে যেতেন, দু-একটা জিনিস বেচবার কি বন্ধক দেবার চেষ্টা করতেন পাড়ার মেয়েদের কাছে। প্রায়ই শৌখীন জিনিস, হয়ত একটা ভাল কাচের পুতুল, কি গালার খেলনা, চন্দনকাঠের হাতপাখা এই সব—সেলাইয়ের কলটা ছোট কাকীমা সিকি দামে কিনেছিলেন। বাবার গায়ের ভারি পুরু পশমী ওভার-কোটটা সরকাররা কিনে নিয়েছিল আট টাকায়। মোটে এক বছর আগে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বাবা সেটা তৈরি করেছিলেন।

চাল না হয় একরকম ক'রে জুটলো, কিন্তু আমাদের পরনের কাপড়ের দুর্দশা ক্রমেই বেড়ে উঠছিল। আমাদের সবারই একখানা ক'রে কাপড়ে এসে ঠেকেছে—তাও ছেঁড়া, আমার কাপড়খানা তো তিন জায়গায় সেলাই। সীতা বলত, তুই বড় কাপড় ছিঁড়িস দাদা! কিন্তু আমার দোষ কি? পুরোনো কাপড়, একটু জোরে লাফালাফি করলেই ছিঁড়ে যেত, মা অমনি সেলাই করতে বসে যেতেন।

বাবা আজকাল কেমন হয়ে গেছেন, তেমনি কথাবার্ত্তা বলেন না—বাড়িতেও থাকেন না প্রায়ই। তাঁকে পাওয়াই যায় না যে কাপড়ের কথা বলি। তা ছাড়া বাবার মুখের দিকে চেয়ে কোনো কথা বলতেও ইচ্ছে যায় না। তিনি সব সময়ই চাকরির চেষ্টায় এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ান, কিন্তু কোথাও এ পর্য্যন্ত কিছু জোটেনি। মাস-দুই একটা গোলদারি দোকানে খাতাপত্র লেখবার চাকরি পেয়েছিলেন, কিন্তু এখন আর সে চাকরি নেই—সেজ জ্যাঠামশায়ের ছেলে নবীন বলছিল, নাকি মদ খেয়ে গেছে। কিন্তু এখানে এসে বাবা একদিনও মদ খেয়েছেন ব'লে আমার মনে হয় না, বাবা মদ খেলেই উৎপাত করেন আমরা ভাল করেই জানি, কিন্তু এখানে এসে পর্য্যন্ত দেখছি বাবার মত শান্ত মানুষটি আর পৃথিবীতে নেই। এত শান্ত, এত ভাল মানুষ স্নেহময় লোকটি মদ খেলে কি হয়েই যেতেন! চা-বাগানের সে-সব রাতের কীর্ত্তি মনে হলেও ভয় করে।

রবিবার। আমার স্কুল নেই, আমি সারাদিন বসে বসে ম্যাজেণ্টা গুলে রঙ তৈরি করেছি, দু-তিনটে শিশিতে ভর্তি করে রেখেছি, সীতার পাঁচ-ছখানা পুতুলের কাপড় রঙে ছুপিয়ে দিয়েছি—ক্লাসের একটা ছেলের কাছ থেকে অনেকখানি ম্যাজেণ্টার গুঁড়ো চেয়ে নিয়েছিলুম।

সন্ধ্যার একটু পরেই খেয়ে শুয়েচি। কত রাত্রে যেন ঘুম ভেঙে গেল—একটু অবাক হয়ে চেয়ে দেখি আমাদের ঘরের দোরে জ্যাঠাইমা আমার খুড়তুতো জাঠতুতো ভাইবোনের দল, ছোটকাকা—সবাই দাঁড়িয়ে। মা কাঁদচেন—সীতা বিছানায় সবে ঘুম ভেঙে উঠে বসে চোখ

মুছছে। আমার জাঠতুতো ভাই হেসে বললে—ঐ ভাখ্‌ তোর বাবা কি করচে! চেয়ে দেখি ঘরের কোণে খাটে বাবা তিনটে বালিশের তুলো ছিঁড়ে পুঁটলি বাঁধচেন। তুলোতে বাবার চোখমুখ, মাথার চুল, সারা গা এক অদ্ভুত রকম হয়েছে দেখতে। আমি অবাক্‌ হয়ে জিজ্ঞেস করলুম—কি হয়েচে বাবা?

বাবা বললেন—চা-বাগানে আবার চাকরি পেয়েছি—ছোট সাহেব তার করেচে; সকালের গাড়িতে যাব কিনা তাই পুঁটুলিগুলো বেঁধেছেঁদে এখন না রাখলে—কটা বাজল রে খোকা?

আমার বয়স কম হলেও আমার বুঝতে দেরি হ'ল না যে এবার বাবা মাতাল হননি। এ অন্য জিনিস। তার চেয়েও গুরুতর কিছু। ঘরের দৃশ্যটা আমার মনে চিরকালের মতো একটা ছাপ দিয়ে গিয়েছিলে—জীবনে কখনও ভুলিনি—চোখ বুজলেই উত্তরজীবনে আবার সে-রাত্রির দৃশ্যটা মনে এসেছে। একটা মাত্র কেরোসিনের টেমি জ্বলচে ঘরে—তারই রাঙা ক্ষীণ আলোর ঘরের কোণে বাবার তুলো-মাখা চেহারা—মাথায় মুখে কানে পিঠে সর্ব্বাঙ্গে ছেঁড়া বালিশের লালচে পুরানো বিচিওয়ালা তুলো, মেঝেতে বসে মা কাঁদচেন—দরজার কাছে কৌতুক দেখতে খুড়ীমা জ্যাঠাইমারা জড় হয়েচেন—খুড়তুতো ভাই-বোনেরা হাসচে।···দাদাকে ঘরের মধ্যে দেখতে পেলাম না, বোধ হয় বাইরে কোথাও গিয়ে থাকবে।

পরদিন সকালে আমাদের ঘরের সামনে উঠানে দলে দলে লোক জড় হ'তে লাগল। এদের মুখে শুনে প্রথম বুঝলাম বাবা পাগল হয়ে গিয়েছেন। সংসারের কষ্ট, মেয়ের বিয়ের ভাবনা, পরের বাড়ির এই যন্ত্রণা—এই সব দিনরাত ভেবে ভেবে বাবার মাথা গিয়েছে বিগ্‌ড়ে। অবিশ্যি এ-সব কারণ অনুমান করেছিলুম বড় হ'লে, অনেক পরে।

বেলা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকের ভিড় বাড়তে লাগল, যারা কোনো দিন এর আগে বাবার সঙ্গে মৌখিক ভদ্র আলাপটা করতেও আসেনি তারা মজা দেখতে আসতে লাগল দলে দলে।

বাবার মূর্তি হয়েছে দেখতে অদ্ভুত। রাত্রে না ঘুমিয়ে চোখ বসে গিয়েছে—চোখের কোণে কালি মেড়ে দিয়েছে যেন। সর্ব্বাঙ্গে তুলো মেখে বাবা সেই রাতের বিছানার ওপরেই বসে আপন মনে কত কি বকছেন। ছেলেপিলের দল এপাড়া-ওপাড়া থেকে এসেছে। তারা ঘরের দোরে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে। কেউ বা উঁকি মেরে দেখচে—হাসাহাসি করচে। আমাদের সঙ্গে পড়ে এই পাড়ার নবীন বাঁড়ুয্যের ছেলে শাণ্টু—সে একবার উঁকি মেরে দেখতেই বাবা তাকে কি একটা ধমক্‌ দিয়ে উঠলেন। সে ভান-করা ভয়ের সুরে ব'লে উঠল—ও বাবা! মারবে নাকি? বলেই পিছিয়ে এল। ছেলের দলের মধ্যে একটা হাসির ঢেউ পড়ে গেল।

একজন বললে—আবার কি রকম ইংরিজি বলছে ভাখ্‌—

আমি ও সীতা কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছি। আমরা কেউ কোন কথা বলচি নে।

আর একটু বেলা হ'লে জ্যাঠামশায় কি পরামর্শ করলেন সব লোকজনের সঙ্গে—আমার মাকে উদ্দেশ করে বললেন—বৌমা, সবই তো দেখতে পাচ্চ—তোমাদের কপাল ছাড়া আর কি বলব। ভূষণকে এখন বেঁধে রাখতে হবে—সেই মতই সবাই করেছেন। ছেলেপিলের বাড়ি—পাড়ার ভেতরকার কাণ্ড—ওরকম অবস্থায় কখন কি ক'রে বসে, তা বলা যায় না···তা তোমায় একবার বলাটা দরকার তাই—

আমার মনে বড় কষ্ট হ'ল—বাবাকে বাঁধবে কেন? বাবা তো এক বকুনি ছাড়া আর কারুর কিছু অনিষ্ট করতে যাচ্ছেন না—কেন তবে—

আমার মনের ভাষা বাক্য খুঁজে পেল না প্রকাশের—মনেই রয়ে গেল। বাবাকে সবাই মিলে বাঁধলে! আহা, কি কষে কষেই বাঁধলে। অন্য দড়ি কোথাও পাওয়া গেল না বা ছিল না—জ্যাঠামশায়দের খিড়কি-পুকুর ধারের গোয়াল-বাড়ি থেকে গরু বাঁধবার দড়ি নিয়ে এল—তাই দিয়ে বাঁধা হ'ল।

আমার মনে হ'ল অতটা জোর ক'রে বাবাকে বাঁধবার দরকার কি! বাবার হাতের শির দড়ির মত ফুলে উঠেছে যে। সেজ কাকাকে চুপিচুপি বললুম—কাকাবাবু, বাবার হাতে লাগচে, অত ক'রে বেঁধেচে কেন? বলুন না ওদের?

কাকা সে কথা জ্যাঠামশায়কে ও নিতাইয়ের বাবাকে বলতে তাঁরা বললেন—তুমিও কি খেপলে নাকি রমেশ? হাত আলগা থাকবে পাগলের?···তা হলে পা খুলতে, কতক্ষণ—তার পরে আমার দিকে চেয়ে জ্যাঠামশায় বললেন—যাও জিতু বাবা—তুমি বাড়ির ভেতরে যাও——নয়তো এখন বাইরে গিয়ে বসো।

আবার বাবার হাতের দিকে চেয়ে দেখলুম—দড়ির দাগ কেটে বসে গিয়েছে বাবার হাতে। সেই রকম তুলোমাখা অদ্ভুত মূর্ত্তি!···

বাইরে গিয়ে আমি একা গাঁয়ের পেছনের মাঠের দিকে চ'লে গেলুম—একটা বড় তেঁতুল গাছের তলায় সারা দুপুর ও বিকেল চুপ ক'রে বসে রইলুম।

দিন কতক এই ভাবে কাটল। তারপর পাড়ার দু-পাঁচজন লোক এসে জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে কি পরামর্শ করলে। বাবাকে কোথায় তারা নিয়ে গেল, সবাই বললে কলকাতায় হাসপাতালে নিয়ে গেছে। তারা ফিরেও এল, শুনলুম, বাবাকে নাকি হাসপাতালে ভর্ত্তি করে নিয়েছে। শীগ্‌গীরই সেরে বাড়ি ফিরবেন। আমরা আশ্বস্ত হলুম।

দশ-বারো দিন পরে একদিন বিকেলের দিকে আমি ও সীতা পথে খেলা করচি, এমন সময় সীতা বললে—ঐ যে বাবা!···দূরে পথের দিকে চেয়ে দেখি বাবাই বটে। ছুটে আমরা বাড়িতে মাকে খবর দিতে গেলুম। একটু পরে বাবা বাড়ি ঢুকলেন—এক হাঁটু ধুলো, রুক্ষ চুল। ওপর থেকে জ্যাঠাইমা নেমে এলেন, কাকারা এলেন। বাবাকে দেখে সবাই চটে গেলেন। সবাই বুঝতে পারলে বাবা এখনও সারেন নি, তবে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে আসার কি দরকার?

বাবা একটু বসে থেকে বললেন, ভাত আছে? কাল ঐ দিকের একটা গাঁয়ে দুপুরে দুটো খেতে দিয়েছিল, আর কিছু খাই নি সারাদিন, খিদে পেয়েছে। কলকাতা থেকে পায়ে হেঁটে আসচি—ছেলেপিলে ছেড়ে থাকতে পারলাম না—চলে এলাম।

একটু পরেই বোঝা গেল বাবা হাসপাতাল থেকে পালিয়ে এসেছেন এবং যেমন পাগল তেমনি আছেন। এবার আমাদের রাগ হ'ল—মায়ের কথা বলতে পারিনে, কারণ তাঁকে রাগ প্রকাশ করতে কখনও দেখিনি—কিন্তু আমি সীতা দাদা তিন ভাইবোনে খুব চটলাম।

আমাদের চটবার কারণও আছে—খুব সঙ্গত কারণই আছে। আমাদের প্রাণ এখানে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। বাবা আবার পুরোমাত্রায় পাগল হয়ে উঠলেন—তিনি দিনরাত বসে বসে বকেন আর কেবল খেতে চান। মা দুটি বাসি মুড়ি, কোনো দিন বা ভিজে চাল, কোনো দিন শুধু একটু গুড়—এই খেতে দেন। তাও সব দিন বা সব সময় জোটানো কষ্টকর। আমরা দুপুরে খাই তো রাতে আর কিছু খেতে পাইনে—নয়ত সারাদিন পরে হয়ত সন্ধ্যার সময় খাই। মা কোথা থেকে চাল যোগাড় করে আনেন আমরা জানিনে—কখনও জিজ্ঞেসও করিনি। কিন্তু বাড়িতে আর আমাদের তিষ্ঠবার জো নেই। বাড়িসুদ্ধ লোক আমাদের

ওপর বিদ্রূপ—দু-বেলা তাদের অনাদর আর মুখনাড়া সহ্য করা আমাদের অসহ্য হয়ে উঠেছে। চা-বাগানের দিনগুলোর কথা মনে হয়, সেখানে আমাদের কোনো কষ্ট ছিল না—অবস্থা ছিল অত্যন্ত সচ্ছল, ছেলেবেলায় সীতাকে ভুটিয়া চাকরে নিয়ে বেড়াত আর থাপা মানুষ করেছিল আমাদের। ছ-বছর বয়স পর্যন্ত আমি থাপার কাঁধে উঠে বেড়াতাম মনে আছে। আমাদের এই বর্ত্তমান দুরবস্থার জন্য বাবাকে আমরা মনে মনে দায়ী করেছি। বাবা কেন আবার ভাল হয়ে সেরে উঠুন না? তা হ'লে আর আমাদের কোনো দুঃখই থাকে না। কেন বাবা ওরকম পাগলামি করেন? ওতে লজ্জায় যে ঘরে বাইরে আমাদের মুখ দেখাবার জো নেই।

সেদিন সকালে সেজ খুড়ীমা এসে আমাদের সঙ্গে খুব ঝগড়া বাধালেন। মেজ খুড়ীমাও এসে যোগ দিলেন। তাঁদের বাগানে বাতাবি নেবু গাছ থেকে চার-পাঁচটা পাকা নেবু চুরি গিয়েছে। খুড়ীমা এসে মাকে বললেন—এ আমাদেরই কাজ—আমরা খেতে পাইনে, আমরাই নেবু চুরি ক'রে ঘরে রেখেছি। তাঁরা সবাই মিলে আমাদের ঘর খানাতল্লাসী করতে চাইলেন। মা বললেন—এসে দেখে যান মেজদি, আমার ঘরে তো লোহার সিন্দুক নেই যে সেখানে আমার ছেলেমেয়েরা নেবু লুকিয়ে রেখেছে···এসে দেখুন—

শেষ পর্য্যন্ত বাবা ঘরে আছেন ব'লে তাঁরা ঘরে ঢুকতে পারলেন না, কিন্তু সবাই ধরে নিলে যে নেবু আমাদের ঘরে আছে, খানাতল্লাসী করলেই বেরিয়ে পড়ত। খুব ঝগড়াঝাঁটি হ'ল—তবে সেটা হ'ল একতরফা, কারণ এ পক্ষ থেকে তার জবাব কেউ দিল না।

জ্যাঠাইমা এ বাড়ির কর্ত্রী, তাঁকে সবাই মেনে চলে, ভয়ও করে। তিনি এসে বললেন—হয় তোমরা বাড়ি থেকে চলে যাও, নয়ত ঘরের ভাড়া দাও।

সীতা এসে আমাকে বলল—জ্যাঠাইমা এবার বাড়িতে আর থাকতে দেবে না, না দেবে না দেবে, আমরা কোথাও চলে যাই চল দাদা।

দিন-দুই পরে জ্যাঠামশাইদের সঙ্গে কি একটা মিটমাট হ'ল। ঠিক হ'ল যে দাদা চাকরির যোগাড় করতে কলকাতায় যাবে, ঘরে আমরা আপাততঃ কিছুকাল থাকতে পাব। কিন্তু বাড়ির ও পাড়ার সবাই বললে পাগলটাকে আর বাড়ি রেখে দরকার নেই, ওকে জলে-জঙ্গলে কোথাও ছেড়ে দিয়ে আয়।

সত্যি কথা বলতে গেলে বাবার উপর আমাদের কারুর আর মমতা ছিল না। বাবার চেহারাও হয়ে উঠেছে অদ্ভুত। একমাথা লম্বা চুল জটা পাকিয়ে গিয়েছে—আগে আগে মা নাইয়ে দিতেন, আজকাল বাবা কিছুতেই নাইতে চান না, কাছে যেতে দেন না, কাপড় ছাড়েন না···গায়ের গন্ধে ঘরে থাকা অসম্ভব! মা একদিনও রাত্রে ঘুমুতে পারেন না—বাবা কেবলই ফাই-ফরমাশ করেন—জল দাও পান দাও আর কেবলই বলেন খিদে পেয়েছে। কখনও বলেন চা ক'রে দাও। না পেলেই তিনি আরও ক্ষেপে ওঠেন—এক মা ছাড়া তখন আর কেউ সামলে রাখতে পারে না—আমরা তখন ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাই, মা বুঝিয়ে-সুজিয়ে শান্ত ক'রে চুপ করিয়ে রাখেন, নয়ত জোর ক'রে বালিশে শুইয়ে দিয়ে বাতাস করেন, পা টিপে দেন—কিন্তু তাতে বাবা সাময়িক চুপ করে থাকেন বটে, ঘুমোন না। পাগল হয়ে পর্য্যন্ত বোধ হয় একদিনও বাবার ঘুম হয় নি। নিজেও ঘুমুবেন না; কাউকে ঘুমুতেও দেবেন না—সারারাত চীৎকার, বকুনি, ইংরেজি বক্তৃতা, গান—এই সব করবেন। সবাই বলে, ঘুমুলে নাকি বাবার রোগ সেরে যেত।

শেষ পর্য্যন্ত হয়ত মা মত দিয়েছিলেন, হয়ত বলেছিলেন,—তোমরা যা ভাল বোঝ করো

* *

বাঁপু। মোটের ওপর একদিন স্কুলে দাদা এসে বললে—সকাল সকাল বাড়ি চল আজ জিতু—আজ বাবাকে আড়াগাঁয়ে জলার ধারে ছেড়ে দিয়ে আসতে হবে—তুই, আমি, নিতাই, সিধু আর মেজকাকা যাব।

একটু পরে আমি ছুটি নিয়ে বেরুলাম। গিয়ে দেখি মা দালানে বসে কাঁদচেন, আমরা যাবার আগেই নিতাই এসে বাবাকে নিয়ে গিয়েছে। আমরা খানিক দূরে গিয়ে ওদের নাগাল পেলাম—পাড়ার চার-পাঁচজন ছেলে সঙ্গে আছে, মধ্যিখানে বাবা। ওরা বাবার সঙ্গে বাজে বকছে—শিকারের গল্প করচে, বাবাও খুব বকচেন। নিতাই আমাকে বাবার সামনে যেতে বারণ করাতে আমি আর দাদা পেছনেই রইলাম। ওরা মাঠের রাস্তা ধরে অনেক দূর গেল, একটা বড় বাগান পার হ'ল, বিকেলের পড়ন্ত রোদে ঘেমে আমরা সবাই নেয়ে উঠলাম। রোদ যখন পড়ে গিয়েছে তখন একটা বড় বিলের ধারে সবাই এসে পৌছলাম। নিতাই বললে—এই তো আড়াগাঁয়ের জলা—চল, বিলের ওপারে নিয়ে যাই—ওই হোগলা বনের মধ্যে ছেড়ে দিলে আর পথ খুঁজে পাবে না রাত্তিরে। আমরা কেউ ওপারে গেলুম না—গেল শুধু সিধু আর নিতাই। খানিকটা পরে ওরা ফিরে এসে বললে, চল্ পালাই—তোর বাবাকে একটা সিগারেট খেতে দিয়ে এসেছি—বসে বসে টানচে। চল্ ছুটে পালাই—

সবাই মিলে দৌড় দিলাম। দাদা তেমন ছুটতে পারে না, কেবলই পেছনে পড়তে লাগল। সন্ধ্যার ঘোরে জলা আর জঙ্গলের মধ্যে পথ খুঁজে পাওয়া যায় না—এক প্রহর রাত হয়ে গেল বাড়িতে পৌছুতে। কিন্তু তিন দিনের দিন বাবা আবার বাড়ি এসে হাজির। চেহারার দিকে তাকানো যায় না—কাদামাখা ধুলোমাখা অতি বিকট চেহারা। বেল না কি ভেঙে খেয়েছেন—সারা মুখে, গালে বেলের আঠা ও শাঁস মাখানো। মা নাইয়ে ধুইয়ে ভাত খেতে দিলেন, বাবা খাওয়া-দাওয়ার পর সেই যে বিছানা নিলেন, ছু' দিন চার দিন ক'রে ক্রমে পনের দিন কেটে গেল, বাবা আর বিছানা থেকে উঠলেন না। লোকটা যে কেন বিছানা ছেড়ে ওঠেন না—তার কি হয়েছে—এ কথা কেউ কোনদিন জিজ্ঞেসও করলে না। মা যেদিন যা জোটে খেতে দেন, মাঝে মাঝে নাইয়ে দেন—পাড়ার কোন লোকে উঁকি মেরেও দেখে গেল না।

জ্যাঠামশাইরা হতাশ হয়ে গিয়েছেন। তাঁরা আর আমাদের সঙ্গে কথা কন না, তাঁদের ঘরে-দোরে ওঠা আমাদের বন্ধ। আমরা কথা বলি চুপি চুপি, চলি পা টিপে টিপে চোরের মত, বেড়াই মহা অপরাধীর মত—পাছে ওঁরা রাগ করেন, বিরক্ত হন, আবার ঘর থেকে তাড়িয়ে দিতে আসেন।

একদিন না খেয়ে স্কুলে পড়তে গিয়েছি—অন্য দিনের মত টিফিনের সময় সীতা খাবার জন্যে ডাকতে এল না। প্রায়ই আমি না খেয়ে স্কুলে আসতাম, কারণ অত সকালে মা রান্না করতে পারতেন না—রান্না শুধু করলেই হ'ল না, তার যোগাড় করাও তো চাই। মা কোথা থেকে কি যোগাড় করতেন, কি ক'রে সংসার চালাতেন, তিনিই জানেন। আমি কখনও তা নিয়ে ভাবি নি। আমি ক্ষুধাতুর অবস্থায় বেলা একটা পর্যন্ত ক্লাসের কাজ ক'রে যেতাম আর ঘন ঘন পথের দিকে চাইতাম এবং রোজই একটায় টিফিনের সময় সীতা এসে ডাক দিত—দাদা, ভাত হয়েচে খাবে এসো।

এ-দিন কিন্তু একটা বেজে গেল, ছুটো বেজে গেল, সীতা এল না। ক্লাসের কাজে আমার আর মন নেই—আমি জানলা দিয়ে ঘন ঘন বাইরে পথের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখচি। আরও আধ ঘণ্টা কেটে গেল, বেলা আড়াইটা। এমন সময় কলুদের দোকানঘরের কাছে সীতাকে

আসতে দেখতে পেলাম। আমার ভারি রাগ হ'ল, অভিমানও হ'ল। নিজেরা সব খেয়ে-দেয়ে পেট ঠাণ্ডা ক'রে এখন আসছেন।

মাস্টারের কাছে ছুটি নিয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে গেলাম। সীতার দিকে চেয়ে দূর থেকে বললাম—বেশ দেখচি—আমার বুঝি আর ক্ষিদে-তেষ্টা পায় না? কটা বেজেছে জানিস?

সীতা বললে—বাড়ি এস ছোড়দা, তোমার বইদপ্তর নিয়ে ছুটি ক'রে এস গে—

আমি বললাম—কেন রে?

সীতা বললে—এস না, ছুটির আর দেরি বা কত? তিনটে বেজেচে।

আমার মনে হ'ল একটা কি যেন হয়েচে। স্কুল থেকে বেরিয়ে একটু দূর এসেই সীতা বললে—বাবা মারা গিয়েচে ছোড়দা।

আমি থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম—সীতার মুখের দিকে চেয়ে সে যে মিথ্যে কথা বলছে এমন মনে হ'ল না। বললাম—কখন?

সীতা বললে—বেলা একটার সময়—

নিজের অজ্ঞাতসারে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—নিয়ে গিয়েচে তো?

অর্থাৎ গিয়ে মৃতদেহ দেখতে না হয়। কিন্তু সীতা বললে—না, নিয়ে এখনও কেউ যায় নি। মা একা কি করবে?···জ্যাঠামশাই বাড়ি নেই—ছোট কাকা একবার এসে দেখে চলে গেলেন—আর আসেন নি। মেজ কাকা পাড়ার লোক ডাকতে গেছেন।

বাড়িতে ঢুকতেই মা বললেন—ঘরের মধ্যে আয়—মড়া ছুঁয়ে বসে থাকতে হবে, বোস্ এখানে।

কেউই কাঁদছে না। আমারও কান্না পেল না—বরং একটা ভয় এল—একা মড়ার কাছে কেমন ক'রে কতক্ষণ বসে থাকব না জানি!

অনেকক্ষণ পরে শুনতে পেলুম আমাদের পাড়ার কেউ মৃতদেহ নিতে যেতে রাজী নয়, বাবা কি রোগে মারা গেছেন কেউ জানে না, তাঁর প্রায়শ্চিত্ত করানো হয় নি মৃত্যুর পূর্বে—এ অবস্থায় কেউ সৎকার করতে রাজী নয়। প্রায়শ্চিত্ত এখন না করালে কেউ ও মড়া ছোঁবে না।

প্রায়শ্চিত্ত করাতে পাঁচ-ছ টাকা নাকি খরচ। আমাদের হাতে অত তো নেই—মা বললেন। কে যেন বললে—তা এ অবস্থায় হাতে না থাকলে লোকের কাছে চেয়ে-চিন্তে আনতে হয়, কি আর করবে?

দাদাকে মা ও-পাড়ার কাছে পাঠালেন টাকার জন্যে। খানিকটা পরে ও-পাড়া থেকে জনকতক ষণ্ডামত লোক এল—শুনলাম তারা গালাগালি দিতে দিতে বাড়িতে ঢুকছে—এমন ছোটলোকের পাড়াও তো কখনো দেখি নি? কোথায় পাবে এরা যে প্রাচিত্তির করাবে? প্রাচিত্তির না হ'লে মড়া কি সারা দিনরাত ঘরেই পড়ে থাকবে? যত ছোটলোক সব—কোনো ভয় নেই, দেখি মড়া বার হয় কিনা।

আমি উত্তেজনার মাথায় মড়া ছুঁয়ে বসে থাকার কথা ভুলে গিয়ে তাড়াতাড়ি দোরের কাছে এসে দাঁড়ালাম। এদের মধ্যে আমি একজনকে কেবল চিনি। মাঠবাড়ির ফুটবল খেলার ময়দানে দেখেছিলাম।

ওরা নিজেরাই কোথা থেকে বাঁশ কেটে নিয়ে এল—পাট নিয়ে এসে দড়ি পাকালে, তারপর বাবাকে বার ক'রে নিয়ে গেল—দাদা গেল সঙ্গে সঙ্গে শ্মশানে। একটু পরে সন্ধ্যা হ'ল।

সেজ খুড়ীমা এসে বললেন—মুড়ি খাবি জিতু? আমি ও সীতা মুড়ি খেয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

তিন বছর আগেকার কথা এসব। তার পর থেকে এ বাড়িতেই আছি। জ্যাঠামশাইরা প্রথমে রাজি হন নি, দাদা ষষ্ঠীতলায় বটগাছের নীচে মুদিখানার দোকান করেছিল—সামান্য পুঁজি, আড়াই সের চিনি, পাঁচ সের ডাল, পাঁচ সের আটা, পাঁচ পোয়া ঝাল-মশলা—এই নিয়ে দোকান কতদিন চলে? দাদা ছেলেমানুষ, তা ছাড়া ঘোরপেঁচ কিছু বোঝে না, একদিক থেকে সব ধারে বিক্রী করচে, যে ধারে নিয়েচে সে আর ফিরে দোকানের পথ মাড়ায় নি। দোকান উঠে যাওয়ার পরে দাদা চাকরির চেষ্টায় বেরুলো, সে তার ছোট মাথায় আমাদের সংসারের সমস্ত ভাবনা-ভার তুলে নিয়ে বাবার প্রতিনিধি রূপে আমাদের খাওয়া-পরানোর দুশ্চিন্তায় রাতে ঘুমুতো না, সারা দিন চাকরি খুঁজে বেড়াত। নস্তির কারখানায় একটা সাত টাকা মাইনের চাকরিও পেল—কিন্তু বেশীদিন রইল না, মাস-দুই পরে তারা বললে—ব্যবসার অবস্থা খারাপ, এখন লোক দরকার নেই।

সুতরাং জ্যাঠামশায়দের সংসারে মাথা গুঁজে থাকা ছাড়া আমাদের উপায় বা কি? নিতান্ত লোকে কি বলবে এই ভেবে এঁরা রাজী হয়েছেন। কিন্তু এখানে আমাদের খাপ খায় না—এখানে মাত্র যে শুধু এ বাড়িতে তা নয়, এ দেশটার সঙ্গেই খাপ খায় না। বাংলা দেশ আমাদের কারও ভাল লাগে না—আমার না, দাদার না, সীতার না, মায়েরও না। না দেশটা দেখতে ভাল, না এখানকার লোকেরা ভাল। আমাদের চোখে এ দেশ বড় নিচু, আঁটাসাঁটা, ছোট ব'লে মনে হয়—যে-দিকেই চাই চোখ বেধে যায়, হয় ঘরবাড়িতে, না হয় বাঁশবনে আমবনে। কোথাও উঁচুনীচু নেই, একঘেয়ে সমতলভূমি, গাছপালারও বৈচিত্র্য নেই। আমাদের এ গাঁয়ের যত গাছপালা আছে, তার বেশীর ভাগ এক ধরনের ছোট ছোট গাছ, এর নাম বলে আশশেওড়া, তাদের পাতায় এত ধুলো যে সবুজ রঙ দিনরাত চাপা পড়ে থাকে। এখানে সব যেন দীনহীন, সব যেন ছোট মাপকাঠির মাপে গড়া।

আমাদের দিক থেকে তো গেল এই ব্যাপার। ওঁদের দিক থেকে ওঁরা আমাদের পর ক'রে রেখেছেন এই তিন-চার বছর ধরেই। ওঁদের আপনার দলের লোক ব'লে ওঁরা আমাদের ভাবেন না। আমরা খিরিস্টান, আচার জানিনে, হিঁদুয়ানী জানিনে—জংলী জানোয়ারের সামিল, গারো পাহাড়ী অসভ্য মানুষদের সামিল। পাহাড়ী জাতিদের সম্বন্ধে ওঁরা যে খুব বেশী জানেন তা নয়—এবং জানেন না বলেই তাদের সম্বন্ধে ওঁদের ধারণা অদ্ভুত ও আজগুবী ধরনের।

এদেশে শীতকাল নেই—মাস দুই-তিন একটু ঠাণ্ডা পড়ে। তা ছাড়া সারা বছর ধ'রে গরম লেগেই আছে—আর সে কি সাংঘাতিক গরম! সে গরমের ধারণা ছিল না কোন কালে আমাদের। রাতের পর রাত ঘুম হয় না, দিনমানেও ঘামে বিছানা ভিজে যায় ব'লে ঘুম হয় না। গা জ্বলে, মাথার মধ্যে কেমন করে, রাত্রে যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে এক-একদিন। তার ওপরে মশা। কি সুখেই লোকে এ-সব দেশে বাস করে!

॥ ৪ ॥

জ্যাঠামশাইদের বাড়ির শালগ্রামশিলার ওপর আমার ভক্তি ছিল না। ওঁদের জাঁকজমক ও পূজার সময়কার আড়ম্বরের ঘটা দেখে মন আরও বিরূপ হয়ে উঠল। আগেই বলেছি আমার মনে হ'ত ওঁদের এই পূজা-অর্চনার ঘটার মূলে রয়েছে বৈষয়িক উন্নতির জন্যে ঠাকুরের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখানো ও ভবিষ্যতে যাতে আরও টাকাকড়ি বাড়ে সে উদ্দেশ্যে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানানো। তাঁকে প্রসন্ন রাখলেই এঁদের আয় বাড়বে, দেশে খাতির বাড়বে—আমার জ্যাঠাইমাকে সবাই বলবে ভাল, সংসারের লক্ষ্মী, ভাগ্যবতী—তাঁর পয়েতে এ-সব হচ্ছে, সবাই খোশামোদ করবে, মন যুগিয়ে চলবে। পাশাপাশি অমনি আমার মায়ের ছবি মনে আসে। মা কোন্ গুণে জ্যাঠাইমার চেয়ে কম? মাকে চা-বাগানে দেখেছি কল্যাণী মূর্ত্তিতে—লোকজনকে খাওয়ানো-মাখানো, কুলীদের ছেলেমেয়েদের পুঁতির মালা কিনে দেওয়া, আদর-যত্ন করা, আমাদের একটু অসুখে রাত জেগে বিছানায় বসে থাকা। কাছাকাছি কোন চা-বাগানের বাঙালীবাবু সোনাদায় নেমে যখন বাগানে যেত আমাদের বাসায় না খেয়ে যাবার উপায় ছিল না। আর সে-ই মা এখানে এঁদের সংসারের দাসী, পরনে ছেঁড়া ময়লা কাপড়, কাজ করতে পারলে সুখ্যাতি নেই, না পারলে বকুনি আছে, গালাগাল আছে—সবাই হেনস্থা করে, কারও কাছে এতটুকু মান নেই, মাথা তুলে বেড়াবার মুখ নেই। কেন, ঠাকুরকে ঘুষ দিতে পারেন না ব'লে? আমার মনে হ'ত জ্যাঠাইমাদের শালগ্রামশিলা এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছেন, তিনি ষোড়শোপচারে পূজো পেয়ে জ্যাঠাইমাকে বড় ক'রে দিয়েছেন, অন্য সকলের উপর জ্যাঠাইমা যে অত্যাচার অবিচার করছেন, তা চেয়েও দেখছেন না ঠাকুর।

একদিন সন্ধ্যাবেলা ঠাকুরঘরে আরতি শুরু হয়েছে; নরু, সীতা, সেজ কাকার ছেলে পুলিন আর আমি দেখতে গেছি। পুরুতঠাকুর ওদের সবারই হাতে একটা করে রুপোবাঁধানো চামর দিলে—আরতির সময় তারা চামর ঢুলুতে লাগল। আমার ও সীতার হাতে দিলে না। সীতা চাইতে গেল, তাও দিলে না। একটু পরে ধূপধুনোর ধোঁয়ায় ও সুগন্ধে দালান ভরে গিয়েছে, বুলু ও ফেণী কাঁসর বাজাচ্ছে, পুরুতঠাকুরের ছোট ভাই রাম ঘড়ি পিট্‌চে, পুরুতঠাকুর তন্ময় হয়ে পঞ্চপ্রদীপে ঘিয়ের বাতি জ্বেলে আরতি করছে—আমি ও সীতা ছিটের দোলাইমোড়া ঠাকুরের আসনের দিকে চেয়ে আছি—এমন সময় আমার মনে হ'ল এ দালানে শুধু আমরা এই ক'জন উপস্থিত নেই, আরো অনেক লোক উপস্থিত আছে, তাদের দেখা যাচ্ছে না, তারা সবাই অদৃশ্য। আমার গা ঘুরতে লাগল, আর কানের পেছনে মাথার মধ্যে একটা জায়গায় যেন কতকগুলো পিঁপড়ে বাসা ভেঙে বেরিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে গেল। আমি জানি, এ আমার চেনা, জানা, বহুপরিচিত লক্ষণ, অদৃশ্য কিছু দেখবার আগেকার অবস্থা—চা-বাগানে এ-রকম কতবার হয়েছে। শরীরের মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তি হয়—সে ঠিক ব'লে বোঝানো যায় না, জ্বর আসবার আগে যেমন লোক বুঝতে পারে এইবার জ্বর আসবে, এও ঠিক তেমনি। আমি সীতাকে কি বলতে গেলাম, পিছু হটে গিয়ে দালানের থাম ঠেস দিয়ে দাঁড়ালাম, গা বমি-বমি ক'রে উঠলে লোকে যেমন ক'রে সে ভাবটা কাটাবার চেষ্টা করে, আমিও সেই রকম স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলাম—কিছুতেই কিছু হ'ল না, ধীরে ধীরে পূজার দালানের তিনধারের দেওয়াল আমার সামনে থেকে অনেক দূরে···অনেক দূরে সরে যেতে লাগল···কাঁসর ঘড়ির আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে এল···কতকগুলো বেগুনি ও রাঙা রঙের আলোর চাকা যেন একটা আর একটার পিছনে তাড়া করছে···সারি সারি বেগুনি ও রাঙা আলোর চাকার খুব

লম্বা সারি আমার চোখের সামনে দিয়ে খেলে যাচ্ছে—তারপর আমার বাঁয়ে অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটা বড় নদী, ওপারেরও সুন্দর গাছপালা, নীল আকাশ—এপারেও অনেক ঝোপ বন—কিন্তু যেন মনে হ'ল সব জিনিসটা আমি ঝাড়লণ্ঠনের তেকোণা কাচ দিয়ে দেখচি—নানা রঙের গাছপালা ও নদীর জলের ঢেউয়ের নানা রঙ—ওপারটায় লোকজনে ভরা, মেয়েও আছে, পুরুষও আছে—গাছপালার মধ্যে দিয়ে একটা মন্দিরের সরু চূড়া ঠেলে আকাশে উঠেছে···আর ফুল যে কত রঙের আর কত চমৎকার তা মুখে বলতে পারিনে, গাছের সারা গুঁড়ি ভ'রে যেন রঙিন ও উজ্জ্বল থোকা থোকা ফুল···হঠাৎ সেই নদীর একপাশে জলের ওপর ভাসমান অবস্থায় জ্যাঠামশায়ের ঠাকুর-ঘরটা একটু একটু ফুটে উঠল, তার চারিদিকে নদী, কড়িকাঠের কাছে কাছে সে নদীর ধারের ডাল তার থোকা থোকা ফুলসুদ্ধ হাওয়ায় দুলছে···ওদের সেই দেশটা যেন আমাদের ঠাকুরঘরের চারিপাশ ঘিরে···মধ্যে, ওপরে, নীচে, ডাইনে, বাঁয়ে আমার মন আনন্দে ভরে গেল···কান্না আসতে চাইল···কি জানি কোন্ ঠাকুরের ওপর ভক্তিতে—আমার ঘোঁর কাটল একটা চেঁচামেচির শব্দে। আমায় সবাই মিলে ঠেলচে। সীতা আমার ডান হাত জোর ক'রে ধরে দাঁড়িয়ে আছে—পুরুতঠাকুর ও পুলিন রেগে আমায় কি বলচে—চেয়ে দেখি আমি ভোগের লুচির থালার অত্যন্ত কাছে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি—আমার কোঁচা লুটুচ্ছে উঁচু ক'রে সাজানো ফুলকো লুচির রাশির ওপরে। তারপর যা ঘটল! পুরুতঠাকুর গালে চার-পাচটা চড় কষিয়ে দিলেন—মেজকাকা এসে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন। জ্যাঠাইমা এসে নরু-পুলিনদের ওপর আগুন হয়ে বলতে লাগলেন, সবাই জানে আমি পাগল, আমার মাথার রোগ আছে, আমায় তারা কেন ঠাকুরদালানে নিয়ে গিয়েছিল আরতির সময়—

মেজকাকার মারের ভয়ে অন্ধকার রাত্রে জ্যাঠামশায়দের খিড়কীপুকুরের মাদার-তলায় একা এসে দাঁড়ালাম। সীতা গোলমালে টের পায় নি আমি কোথায় গিয়েছি। আমার গা কাঁপছিল ভয়ে—এ আমার কি হ'ল? আমার এমন হয় কেন? এ কি খুব শক্ত ব্যারাম? ঠাকুরের ভোগ আমি তো ইচ্ছে ক'রে ছুঁই নি? তবে ওরা বুঝলে না কেন? এখন আমি কি করি?

আমি হিন্দু দেবদেবী জানতাম না, সে-শিক্ষা আজন্ম আমাদের কেউ দেয় নি। কিন্তু মিশনারী মেমদের কাছে জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত যা শিখে এসেছি, সেই শিক্ষা অনুসারে অন্ধকারে মাদারগাছের গুঁড়ির কাছে মাটির ওপর হাঁটু গেড়ে হাতজোড় ক'রে মনে মনে বললাম—হে প্রভু যীশু, হে সদাপ্রভু, তুমি জান আমি নির্দ্দোষ—আমি ইচ্ছে ক'রে করি নি কিছু, তুমি আমার এই রোগ সারিয়ে দাও, আমার যেন এ-রকম আর কখনও না হয়। তোমার জয় হোক, তোমার রাজত্ব আসুক, আমেন্।

সকালে স্নান ক'রে এসে দেখি সীতা আমাদের ঘরের বারান্দাতে এক কোণে খুঁটি হেলান দিয়ে বসে কি পড়ছে। আমি কাছে গিয়ে বললাম—দেখি কি পড়ছিস সীতা? সীতা এমন একমনে বই পড়ছে যে বই থেকে চোখ না তুলেই বললে—ও-পাড়ার বৌদিদির কাছ থেকে এনেছি—প্রফুল্লবালা—গোড়াটা একটু পড়ে দ্যাখো কেমন চমৎকার বই দাদা—

আমি বইখানা হাতে নিয়ে দেখলাম, নামটা 'প্রফুল্লবালা' বটে। আমি বই পড়তে ভালবাসিনে, বইখানা ওর হাতে ফেরত দিয়ে বললাম—তুই এত বাজে বই পড়তে পারিস!

সীতা বললে—বাজে বই নয় দাদা, প'ড়ে দেখো এখন। জমিদারের ছেলে সতীশের সঙ্গে এক গরিব ভট্টাচায্যি বামুনের মেয়ে প্রফুল্লবালার দেখা হয়েছে। ওদের বোধ হয় বিয়ে হবে।

সীতা দেখতে ভাল বটে, কিন্তু যেমন্ সাধারণতঃ ভাইয়েরা বোনেদের চেয়ে দেখতে ভাল

হয়, আমাদের বেলাতেও তাই হয়েছে। আমাদের মধ্যে দাদা সকলের চেয়ে সুন্দর—যেমন রঙ, তেমনই চোখমুখ, তেমনই চুল—তারপর সীতা, তারপর আমি। দাদা যে সুন্দর, এ-কথা শত্রুতেও স্বীকার করে—সে আগে থেকে ভাল চোখ, ভাল মুখ, ভাল রঙ দখল ক'রে বসেছে—আমার ও সীতার জন্যে বিশেষ কিছু রাখে নি। তা হলেও সীতা দেখতে ভাল। তা ছাড়া আবার শৌখীন—সর্ব্বদা ঘ'ষে মেজে, খোঁপাটি বেঁধে, টিপটি প'রে বেড়ানো তার স্বভাব। কথা বলতে বলতে দশবার খোঁপায় হাত দিয়ে দেখছে খোঁপা ঠিক আছে কি-না। এ নিয়ে এ-বাড়িতে তাকে কম কথা সহ্য করতে হয় নি। কিন্তু সীতা বিশেষ কিছু গায়ে মাখে না, কারুর কথা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না—চিরকালের একগুঁয়ে স্বভাব তার।

আমার মনে মাঝে মাঝে কষ্ট হয়, আমাদের তো পয়সা নেই, সীতাকে তেমন ভাল ঘরে বিয়ে দিতে পারব না—এই সব পাড়াগাঁয়ে আমার জ্যাঠামশায়দের মত বাড়িতে, আমার জ্যাঠাইমার মত শাশুড়ীর হাতে পড়বে—কি দুর্দ্দশাটাই যে ওর হবে! ওর এত বই পড়ার ঝোঁক যে, এ-পাড়ার ও-পাড়ার বৌ-ঝিদের বাক্সে যত বই আছে চেয়ে-চিন্তে এনে এ-সংসারের কঠিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে সব পড়ে ফেলে দিয়েচে। জ্যাঠাইমা তো এমনিই বলেন, "ও-সব অলুক্ষণে কাণ্ড বাপু—মেয়ে-মানুষের আবার অত বই পড়ার শখ, অত সাজগোজের ঘটা কেন? পড়বে তেমন শাশুড়ীর হাতে, ঝাঁটার আগায় বই পড়া ঘুচিয়ে দেবে তিন দিনে।"

সীতার বুদ্ধি খুব। 'শতগল্প' ব'লে একখানা বই ও কোথা থেকে এনেছিল, তাতে 'সোনামুখী ও ছাইমুখী' ব'লে একটা গল্প আছে, সৎমার সংসারে গুণবতী লক্ষ্মীমেয়ে সোনামুখী ঝাঁটা লাথি খেয়ে মানুষ হ'ত—তারপর কোন্ দেশের রাজকুমারের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেল ভগবানের দয়ায়—সীতা দেখি গল্পটার পাতা মুড়ে রেখেছে। ও-গল্পটার সঙ্গে ওর জীবনের মিল আছে, এই হয়ত ভেবেছে। কিন্তু সীতা একটি কথাও মুখ ফুটে বলে না কোন দিন। ভারি চাপা।

সীতা বই থেকে চোখ তুলে পথের দিকে চেয়ে বললে—ঐ হীরুঠাকুর আসচে দাদা, আমি পালাই—

আমি বললাম—বোস্, হীরুঠাকুর কিছু বলবে না। ও ঠিক আজ এখানে খাবার কথা বলবে দ্যাখ্।

হীরুঠাকুরকে এ-গাঁয়ে আসা পর্য্যন্ত দেখছি। রোগা কালো চেহারা, খোঁচা খোঁচা একমুখ কাঁচা-পাকা দাড়ি, পরনে থাকে আধময়লা থান, খালি পা, কাঁধে ময়লা চাদর, তার ওপরে একখানা ময়লা গামছা ফেলা। নিজের ঘরদোর নেই, লোকের বাড়ি বাড়ি খেয়ে বেড়ানো তার ব্যবসা। আমরা যখন এখানে নতুন এলাম, তখন কতদিন হীরুঠাকুর এসে আমাকে বলেছে, "তোমার মাকে বল খোকা, আমি এখানে আজ দুটো খাবো।" মাকে বলতেই তখুনি তিনি রাজী হতেন—মা চিরকাল এমন ছিলেন না, লোককে খাওয়াতে-মাখাতে চিরদিনই তিনি ভালবাসেন।

আমার কথাই ঠিক হ'ল। হীরুঠাকুর এসে বললে—"শোন খোকা, তোমার মাকে বলো আমি এখানে আজ দুপুরে চাট্টি ভাত খাবো।" সীতা বই মুখে দিয়ে খিল্ খিল্ ক'রে হেসেই খুন। আমি বললাম, "হীরু-জ্যাঠা, আজকাল তো আমরা আলাদা খাইনে। জ্যাঠামশায়দের বাড়িতে খাই, বাবা মারা গিয়ে পর্য্যন্ত। আপনি সেজকাকাকে বলুন গিয়ে। সেজকাকা কাঁটালতলায় নাপিতের কাছে দাড়ি কামাচ্ছেন।"

সেজকাকা লোক ভাল। হীরুঠাকুর আশ্বাস পেয়ে আমাদেরই ঘরের বারান্দায় বসল।

সীতা উঠে একটা কম্বল পেতে দিলে। হীরুঠাকুর বললে, "তোমার দাদা কোথায়?" দাদার সঙ্গে ওর বড় ভাব। হীরুঠাকুরের গল্প দাদা শুনতে ভালবাসে, হীরুঠাকুরের কষ্ট দেখে দাদার দুঃখ খুব, হীরুঠাকুর না খেতে পেলে দাদা বাড়ি থেকে চাল চুরি ক'রে দিয়ে আসে। এখানে যখন খেতে আসত তখুনি প্রথম দাদার সঙ্গে ওর আলাপ হয়, এই বারান্দায় বসেই। হীরুঠাকুরের কেউ নেই—একটা ছেলে ছিল, সে নাকি আজ অনেক দিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। হীরু ঠাকুরের এখনও বিশ্বাস, ছেলে একদিন ফিরে আসবেই এবং অনেক টাকাকড়ি আনবে, তখন তার দুঃখ ঘুচবে। দাদা হীরুর ওই-সব গল্প মন দিয়ে বসে বসে শোনে। অমন শ্রোতা এ-গাঁয়ে বোধ হয় হীরুঠাকুর আর কখনও পায় নি।

খেতে বসে হীরুঠাকুর এক মহা গোলমাল বাধিয়ে বসল। জ্যাঠামশায়ের ছোট মেয়ে সরিকে ডেকে বললে, (হীরু কারুর নাম মনে রাখতে পারে না) "খুকী শোন, বাড়ির মধ্যে জিজ্ঞেস কর তো ডালের বাটিতে তাঁরা কি কিছু মিশিয়ে দিয়েছেন? আমার গা যেন ঘুরচে।" সবাই জানে হীরুঠাকুরের মাথা খারাপ, সে ওরকম একবার আমাদের বাড়ি খেতে বসেও বলেছিল, কিন্তু বাড়িসুদ্ধ মেয়েরা বেজায় চটল এতে। চটবারই কথা। জ্যাঠাইমা বললেন—"সেজঠাকুরপোর খেয়ে-দেয়ে তো আর কাজ নেই, ও আপদ মাসের মধ্যে দশ দিন আসে এখানে খেতে। তার ওপর আবার বলে কি-না ডালে বিষ মিশিয়ে দিইচি আমরা। আ মরণ মড়ুইপোড়া বামুন, তোকে বিষ খাইয়ে মেরে কি তোর লাখো টাকার তালুক হাত করব? আজ থেকে বলে দাও সেজঠাকুরপো, এ-বাড়ির দোর বন্ধ হয়ে গেল, কোনো দিন সদরের চৌকাঠ মাড়ালে ঝাঁটা মেরে তাড়াবো।"

হীরু তখন খাওয়া শেষ করেছিল। জ্যাঠাইমার গালাগালি শুনে মুখখানা কাঁচুমাচু ক'রে উঠে গেল। দাদা এ-সময় বাড়ি ছিল না—আমাদের মুখে এর পর শুনে বললে—আহা, ও পাগল, ছেলের শোকে পাগল হয়েছে। ও কি বলে না-বলে তা কি ধরতে আছে? ছিঃ, খাবার সময় জ্যাঠাইমার গালমন্দ করা ভাল হয়নি। আহা!

সীতা বললে—গালাগাল দেওয়া ভাল হয় নি কেন, খুব ভাল হয়েছে। খামোকা বলবে যে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে? লোকে কি মনে করবে?

দাদা আর কিছু বললে না, চুপ ক'রে রইল। সে কারুর সঙ্গে তর্ক করতে পারে না, সীতার সঙ্গে তো নয়ই। একবার কেবল আমায় জিজ্ঞেস করলে—হীরুজ্যাঠা কোন্ দিকে গেল রে জিতু? আমি বললাম আমি জানিনে।

এর মাস দুই-তিন পরে, মাঘ মাসের শেষ, বিকেল বেলা। আমাদের ঘরের সামনে একটুখানি পড়ন্ত রোদে পিঠ দিয়ে স্কুলের অঙ্ক কষচি—এমন সময় দেখি হীরুঠাকুরকে সন্তর্পণে আস্তে আস্তে ধরে নিয়ে আসছে দাদা।

হীরুঠাকুরের চেহারা শীর্ণ, মাথার চুল আরও উস্‌কোখুস্‌কো, মুখ প্যাডাস্—জ্বরে যেমনি কাঁপচে, তেমনি কাশচে। শুনলাম আজ না-কি চার পাঁচ দিন অসুখ অবস্থায় আমাদেরই পাড়ায় ভট্টাচায্যিদের পুজোর দালানে শুয়ে ছিল। অসুখে কাশ-থুথু ফেলে ঘর অপরিষ্কার করে দেখে তারা এই অবস্থায় বলেছে সেখানে জায়গা হবে না। হীরুঠাকুর চলতে পারে না, যেমন দুর্ব্বল, তেমনি জ্বর আর সে কি ভয়ানক কাশি! কোথায় যায়, তাই দাদা তাকে নিয়ে এসেছে জ্যাঠামশায়দের বাড়ি। ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে গেল। দাদার কি এতটুকু বুদ্ধি দেননি ভগবান! এটা কি নিজেদের বাড়ি যে এখানে যা খুশি করা চলবে? কোন্

ভরসায় দাদা ওকে এখানে নিয়ে এল ছ্যাখো তো ?

যা ভয় করেছি, তাই হ'ল। হীরুকে অসুখ গায়ে হাত ধ'রে বাড়িতে এনেছে দাদা, এ কথা বিদ্যুদ্‌বেগে বাড়ির মধ্যে প্রচার হয়ে যেতেই আমার খুড়তুতো জাঠতুতো ভাইবোনেরা সব মজা দেখতে বাইরের উঠোনে ছুটে এল, সেজকাকা এসে বললেন—"না না—এখানে কে নিয়ে এল ওকে ? এখানে জায়গা কোথায় যে রাখা হবে ?" কিন্তু ততক্ষণে জ্যাঠামশায়দের চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ার হীরু শুয়ে ধুঁকছে, দাদা চণ্ডীমণ্ডপের পুরোনো সপ্‌টা তাকে পেতে দিয়েছে। তখনি একটা ও-অবস্থার রোগীকে কোথায় বা সরানো যায় ? বাধ্য হয়ে তখনকার মত জায়গা দিতেই হ'ল।

কিন্তু এর জন্যে কি অপমানটাই সহ্য করতে হ'ল দাদাকে। এই জন্যেই বলচি দিনটা কখনো ভুলবো না। দাদাকে আমরা সবাই ভালবাসি, আমি সীতা দুজনেই। আমরা জানি সে বোকা, তার বুদ্ধি নেই, সে এখনও আমাদের চেয়েও ছেলেমানুষ, সংসারের ভালমন্দ সে কিছু বোঝে না, তাকে বাঁচিয়ে আড়াল ক'রে বেরিয়ে আমরা চলি। দাদাকে কেউ একটু বকলে আমরা সহ্য করতে পারিনে, আর সেই দাদাকে বাড়ির মধ্যে ডেকে নিয়ে গিয়ে প্রথমে সেজকাকা আথালিপাথালি চড়চাপড় মারলেন। বললেন, বুড়ো ধাড়ী কোথাকার, ওই হাঁপ-কাশের রুগী বাড়ি নিয়ে এলে তুমি কার হুকুমে ? তোমার বাবার বাড়ি এটা ? এতটুকু জ্ঞান হয় নি তোমার ? সাহসও তো বলিহারি, জিজ্ঞেস না বাদ না কাউকে, একটা কঠিন রুগী বাড়ি নিয়ে এসে তুললে কোন্ সাহসে ? নবাব হয়েছ না ধিঙ্গী হয়েছ ? না তোমার চা-বাগান পেয়েছ ?

এর চেয়ে বেশী কষ্ট হ'ল যখন জ্যাঠাইমা অনেক গালিগালাজের পর রোয়াকে দাঁড়িয়ে হুকুম জারি করলেন, "যাও, রুগী ছুঁয়ে ঘরে দোরে উঠতে পাবে না, পুকুর থেকে গায়ের ও-কোটসুদ্ধ ডুব দিয়ে এস গিয়ে।"

মাঘ মাসের শীতের সন্ধ্যা আর সেই কন্‌কনে ঠাণ্ডা পুকুরের জল—তার ওপর চা-বাগানের আমলের ওই ছেঁড়া গরম কোটটা ছাড়া দাদার গায়ে দেবার আর কিছু নেই, দাদা গায়ে দেবে কি নেয়ে উঠে ? সীতা ছুটে গিয়ে শুকনো কাপড় নিয়ে এসে পুকুরের ধারে দাঁড়িয়ে রইল। মাও এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি ভালমানুষ, দাদাকে একটা কথাও বললেন না, কেবল ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপতে কাঁপতে জল থেকে সে যখন উঠে এল তখন নিজের হাতে গামছা দিয়ে তার মাথা মুছিয়ে দিলেন, সীতা শুকনো কাপড় এগিয়ে দিলে, আমি গায়ের কোটটা খুলে পরতে দিলাম। রাত্রে মা সাবু ক'রে দিলেন আমাদের ঘরের উনুনে—দাদা গিয়ে হীরুঠাকুরকে খাইয়ে এল।

সকালবেলা সেজকাকা ও জ্যাঠামশাই দত্তদের কাঁটালবাগানের ধারে পোড়ো জমিতে বাড়ির কৃষাণকে দিয়ে খেজুরপাতার একটা কুঁড়ে বাঁধালেন এবং লোকজন ডাকিয়ে হীরুকে ধরাধরি ক'রে সেখানে নিয়ে গেলেন। দাদা চুপিচুপি একবাটি সাবু মা'র কাছ থেকে ক'রে নিয়ে দিয়ে এল। দিন-দুই এই অবস্থায় কাটলো। মুখুজ্জে-বাড়ির বড়মেয়ে নলিনীদি রাত্রে একবাটি বার্লি দিয়ে আসতো আর সকালবেলা যাবার সময় বাটিটা ফিরিয়ে নিয়ে যেত।

একদিন রাতে দাদা বললে—"চল্ জিতু, আজ হীরুজ্যাঠার ওখানে রাতে থাকবি ? রামগতিকাকা দেখে বলেছে অবস্থা খারাপ। চল্ আগুন জ্বালাবো এখন, বড্ড শীত নইলে।"

রাত দশটার পর আমি ও দাদা দুজনে গেলাম। আমরা যাওয়ার পর নলিনীদি সাবু নিয়ে এল। বললে, "কি রকম আছে রে হীরুকাকা ?" তারপর সে চলে গেল। নারকোলের

মালা দু'তিনটে শিয়রের কাছে পাতা, তাতে কাশ থুথু ফেলেচে রুগী। আমার গা কেমন বমি-বমি করতে লাগল। আর কি কন্‌কনে ঠাণ্ডা! খেজুরের পাতার ঝাঁপে কি মাঘ মাসের শীত আটকায়? দত্তদের কাঁটালবাগান থেকে শুকনো কাঁটালপাতা নিয়ে এসে দাদা আগুন জ্বাললে। একটু পরে দুজনেই ঘুমিয়ে পড়লাম। কত রাত্রে জানি না, আমার মনে হ'ল হীরুজ্যাঠা আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। হীরুজ্যাঠা আর কাশচে না, তার রোগ যেন সেরে গিয়েছে! আমার দিকে চেয়ে হেসে বললে, "জিতু, আমি বাঁশবেড়ে যাচ্ছি গঙ্গা নাইতে। আমায় বড় কষ্ট দিয়েছে হরিবল্লভ (আমার জ্যাঠামশাই), আমি বলে যাচ্ছি, নির্ব্বংশ হবে, নির্ব্বংশ হবে। তোমরা বাড়ি গিয়ে শোও গে যাও।"

আমার গা শিউরে উঠলো—এত স্পষ্ট কথাগুলো কানে গেল, এত স্পষ্ট হীরুজ্যাঠাকে দেখলাম যে বুঝে উঠতে পারলাম না প্রত্যক্ষ দেখছি, না স্বপ্ন দেখছি। ঘুম কিন্তু ভেঙে গিয়েছিল, দাদা দেখি তখনও কুঁকড়ি হয়ে শীতে ঘুমুচ্ছে, কাঁটালপাতার আগুন নিভে জল হয়ে গিয়েছে, হীরুজ্যাঠাও ঘুমুচ্ছে মনে হ'ল। বাইরে দেখি ভোর হয়ে গিয়েছে।

দাদাকে উঠিয়ে নলিনীদিদির বাবা রামগতি মুখুজ্জেকে ডাকিয়ে আনলাম। তিনি এসে দেখেই বললেন, "ও তো শেষ হয়ে গিয়েছে। কতক্ষণ হ'ল? তোরা কি রাত্রে ছিলি নাকি এখানে?"

হীরুঠাকুরের মৃত্যুতে চোখের জল এক দাদা ছাড়া বোধ হয় আর কেউ ফেলে নি।

অনেক দিন পরে শুনেছিলাম, হীরুঠাকুর পৈতৃক কি জমিজমা ও দুখানা আম-কাঁটালের বাগান বন্ধক রেখে জ্যাঠামশায়ের কাছে কিছু টাকা ধার করে এবং শেষ পর্য্যন্ত হীরুঠাকুর সে টাকা শোধ না করার দরুন জ্যাঠামশায় নালিশ ক'রে নিলামে সব বন্ধকী বিষয় নিজেই কিনে রাখেন। এর পর হীরুঠাকুর আপসে কিছু টাকা দিয়ে সম্পত্তিটা ফিরিয়ে নিতে চেয়েছিল—জ্যাঠামশায় রাজী হন নি। কেবল বলেছিলেন ব্রাহ্মণের ভিটে আমি চাইনে—ওটা তোমায় ফিরিয়ে দিলাম। হীরু তা নেয় নি, বলেছিল, সব যে পথে গিয়েছে, ও ভিটেও সে পথে যাক। এর কিছুকাল পরেই তার মাথা খারাপ হয়ে যায়।

বিষয় বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে জ্যাঠামশায়ের দান-ধ্যান-ধর্ম্মানুষ্ঠানও বেড়ে চলেছিল। প্রতি পূর্ণিমায় তাঁদের ঘরে সত্যনারায়ণের পূজা হয় যে তা নয় শুধু—একটি গরিব ছাত্রকে জ্যাঠাইমা বছরে একটি টাকা দিতেন বই কেনবার জন্যে। শ্রাবণ মাসে তাঁদের আবাদ থেকে নৌকা আসে নানা জিনিসপত্র বোঝাই হয়ে—বছরের ধান, জালাভরা কইমাছ, বাজরাভরা হাঁসের ডিম, তিল, আকের গুড় আরও অনেক জিনিস। প্রতি বছরই সেই নৌকায় দুটি একটি হরিণ আসে। ধনধান্যপূর্ণ ডিঙা নিরাপদে দেশে পৌঁচেছে এবং তার জিনিসপত্র নির্ব্বিঘ্নে ভাঁড়ার-ঘরে উঠল এই আনন্দে তাঁরা প্রতিবার শ্রাবণ মাসে পাঁঠা বলি দিয়ে মনসাপূজা করতেন ও গ্রামের ব্রাহ্মণ খাওয়াতেন। বৈশাখ মাসে গৃহদেবতা গোপীনাথ জীউর পূজোর পালা পড়ল ওঁদের। জ্যাঠামশায় গরদের জোড় প'রে লোকজন ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে কাঁসরঘণ্টা, ঢাকঢোল বাজিয়ে ঠাকুর নিয়ে এলেন ও-পাড়ার জ্ঞাতিদের বাড়ি থেকে—জ্যাঠাইমা খুড়ীমারা বাড়ির দোরে দাঁড়িয়ে ছিলেন—প্রকাণ্ড পেতলের সিংহাসনে বসানো শালগ্রাম বয়ে আনছিলেন জ্যাঠামশায় নিজে—তিনি বাড়ি ঢুকবার সময়ে জ্যাঠাইমা জলের ঝারা দিতে দিতে ঠাকুর অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে গেলেন। মেয়েরা শাঁক বাজাতে লাগলেন, উলু দিলেন। আমি, সীতা ও দাদা আমাদের ঘরের বারান্দা থেকে দেখছিলাম—অত্যন্ত কৌতূহল হলেও কাছে যেতে

সাহস হ'ল না। মাকে মেমে পড়াত সে-কথা ওঁদের কানে যাওয়া থেকে মানুষের ধারা থেকে আমরা নেমে গিয়েছি ওঁদের চোখে—আমরা খৃষ্টান, আমরা নাস্তিক, পাহাড়ী জানোয়ার—ঘরদোরে ঢুকবার যোগ্য নই। বৈশাখ মাসের প্রতিদিন কত কি খাবার তৈরি হ'তে লাগল ঠাকুরের ভোগের জন্যে—ওঁরা পাড়ার ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ ক'রে প্রায়ই খাওয়াতেন, রাত্রে শীতলের লুচি ও ফল-মিষ্টান্ন পাড়ার ছেলেমেয়েদের ডেকে দিতে দেখেছি তবুও সীতার হাতে একখানা চন্দ্রপুলি ভেঙে আধখানিও কোন দিন দেন নি।

জ্যাঠাইমা এ সংসারের কর্ত্রী, কারণ জ্যাঠামশাই রোজগার করেন বেশি। ফর্সা মোটা-সোটা এক-গা গহনা, অলঙ্কারে পরিপূর্ণ—এই হলেন জ্যাঠাইমা। এ-বাড়িতে নববধূরূপে তিনি আসবার পর থেকেই সংসারের অবস্থা ফিরে যায়, তার আগে এঁদের অবস্থা খুব ভাল ছিল না—তাই তিনি নিজেকে ভাবেন ভাগ্যবতী। এ-বাড়িতে তাঁর উপর কথা বলবার ক্ষমতা নেই কারও। তাঁর বিনা হুকুমে কোন কাজ হয় না। এই জ্যৈষ্ঠ মাসে এত আম বাড়িতে, বৌদের নিয়ে খাবার ক্ষমতা নেই, যখন বলবেন খাও গে, তখন খেতে পাবে। জ্যাঠামশায়ের বড় ও মেজ ছেলে, শীতলদা ও সলিলদার বিয়ে হয়েছে, যদিও তাদের বয়েস খুব বেশী নয় এবং তাদের বৌয়েদের বয়েস আরও কম—দুই ছেলের এই দুই বৌ, ও বাড়িতে গলগ্রহ হয়ে আছে এক ভাগ্নেবৌ তার ছেলেমেয়ে নিয়ে, আর আমার মা আমাদের নিয়ে—এ ছাড়া ভুবনের মা আছে, কাকীমারা আছেন—এর মধ্যে এক ছোট কাকীমা বাদে আর সব জ্যাঠাইমার সেবাদাসী। ছোট কাকীমা বাদে এইজন্যে যে তিনি বড়মানুষের মেয়ে—তাঁর উপর জ্যাঠাইমার প্রভুত্ব বেশি খাটে না।

প্রতিদিন খাওয়ার সময় কি নির্লজ্জ কাণ্ডটাই হয়! রোজ রোজ দেখে সয়ে গিয়েছে যদিও, তবুও এখনও চোখে কেমন ঠেকে। রান্নাঘরে একসঙ্গে ভাগ্নে, জামাই, ছেলেরা খেতে বসে। ছেলেদের পাতে, জামাইয়ের পাতে বড় বড় জামবাটিতে ঘন দুধ, ভাগ্নেদের পাতে হাতা ক'রে দুধ। মেয়েদের খাবার সময় সীতা, ভাগ্নেবৌ এরা সবাই কলায়ের ডাল মেখে ভাত খেয়ে উঠে গেল—নিজেদের দল, দুই বৌ, মেয়ে নলিনীদি, নিজের জন্যে বাটিতে বাটিতে দুধ আম বাতাসা। নলিনীদি আবার মধু দিয়ে আম দুধ খেতে ভালবাসে—মধুর অভাব নেই, জ্যাঠামশাই প্রতি বৎসর আবাদ থেকে ছোট জালার একজালা মধু নিয়ে আসেন—নলিনীদি দুধ দিয়ে ভাত মেখেই বলবে, মা আমায় একটু মধু দিতে বল না সদুর মাকে। কালেভদ্রে হয়ত জ্যাঠাইমার দয়া হ'ল—তিনি সীতার পাতে দুটো আম দিতে বললেন কি এক হাতা দুধ দিতে বললেন—নয়তো ওরা ওই কলায়ের ডাল মেখে ভাত খেয়েই উঠে গেল। সীতা সে-রকম মেয়ে নয় যে মুখ ফুটে কোন দিন কিছু বলবে, কিন্তু সেও তো ছেলেমানুষ, তারও তো খাবার ইচ্ছে হয়? আমি এই কথা বলি, যদি খাবার জিনিসের বেলায় কাউকে দেবে, কাউকে বঞ্চিত করবে, তবে একসঙ্গে সকলকে খেতে না বসালেই তো সব চেয়ে ভাল?

একদিন কেবল সীতা বলেছিল আমার কাছে—দাদা, জ্যাঠাইমারা কি রকম লোক বল দিকি? মা তাল তাল বাটনা বাটবে, বাসন মাজবে, রাজ্যির বাসি কাপড় কাচবে, কিন্তু এত ডাবের ছড়াছড়ি এ বাড়িতে, গাছেরই তো ডাব, একাদশীর পরদিন মাকে কোনো দিন বলেও না যে একটা ডাব নিয়ে খাও।

আমি মুখে মুখে বানিয়ে কথা বলতে ভালবাসি। আপন মনে কখনও বাড়ির কর্ত্তার মত কথা বলি, কখনও চাকরের মত কথা বলি। সীতাকে কত শুনিয়েছি, একদিন মাকেও শুনিয়েছিলাম। একদিন ও-পাড়ার মুখুজ্জেবাড়িতে বীরুর মা, কাকীমা, দিদি এরা সব ধ'রে

পড়ল আমাকে বানিয়ে বানিয়ে কিছু বলতে হবে।

ওদের রান্নাবাড়ির উঠোনে, মেয়েরা সব রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকটা ভাবলাম কি বলব? সেখানে একটা বাঁশের ঘেরা পাঁচিলের গায়ে ঠেসানো ছিল। সেইটের দিকে চেয়ে আমার মাথায় বুদ্ধি এসে গেল। ওই বাঁশের ঘেরাটা হবে যেন আমার স্ত্রী, আমি যেন চাকরি করে বাড়ি আসছি, হাতে অনেক জিনিসপত্র। ঘরে যেন সবে ঢুকেছি, এমন ভাব ক'রে বললাম—"ওগো কই, কোথায় গেলে, ফুলকপিগুলো নামিয়ে নাও না? ছেলেটার জ্বর আজ কেমন আছে?" মেয়েরা সব হেসে এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ল।

আমার উৎসাহ গেল আরও বেড়ে। আমি বিরক্তির সুরে বললাম, "আঃ, ঐ তো তোমার দোষ! কুইনিন দেওয়া আজ খুব উচিত ছিল। তোমার দোষেই ওর অসুখ যাচ্ছে না। খেতে দিয়েছ কি?"

আমার স্ত্রী অপ্রতিভ হয়ে খুব নরম সুরে কি একটা জবাব দিতেই রাগ পড়ে গেল আমার। বললাম—"ওই পুঁটলিটা খোলো, তোমার একজোড়া কাপড় আছে আর একটা তরল আলতা—", মেয়েরা আবার খিল খিল করে হেসে উঠল।

বীরুর ছোট বৌদিদি মুখে কাপড় গুঁজে হাসতে লাগলো। আমি বললাম—"ইয়ে করো, আগে হাত-পা ধোয়ার জল দিয়ে একটু চায়ের জল চড়াও দিকি? সেই কখন ট্রেনে উঠেচি—ঝাঁকুনির চোটে আর এই দু-কোশ হেঁটে খিদে পেয়ে গিয়েছে—আর সেই সঙ্গে একটু হালুয়া—কাগজের ঠোঙা খুলে দেখে কিশমিশ এনেছি কিনে, বেশ ভাল কাবুলী—"

বীরুর কাকীমা তো ডাক ছেড়ে হেসে উঠলেন। বীরুর মা বললেন—"ছোঁড়া পাগল! কেমন সব বলচে দেখ, মাগো মা, উঃ—আর হেসে পারিনে!"

বীরুর ছোট বৌদিদির দম বন্ধ হয়ে যাবে বোধ হয় হাসতে হাসতে। বললে—"ওঃ মা, আমি যাব কোথায়! ওর মনে মনে ওই সব শখ আছে, ওর ইচ্ছে ওর বিয়ে হয়, বৌ নিয়ে অমনি সংসার করে—উঃ মা রে!"

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আমি রান্নাঘরে বসে স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করচি। রান্না এখনও শেষ হয় নি। আমি বললাম—"চিংড়ি মাছটা কেমন দেখলে, খুব পচেনি তো? কালিয়াটায় ঝাল একটু বেশি করে দিও।"

বীরুর কাকীমা বললেন, "হাঁ রে তুই কি কেবল খাওয়া-দাওয়ার কথা বলবি বৌয়ের সঙ্গে?" কিন্তু আর কি ধরনের কথা বলব খুঁজে পাইনে। ভাবলাম খানিকক্ষণ, আর কি কথা বলা উচিত? আমি এই ধরনের কথা সকলকে বলতে শুনেছি স্ত্রীর কাছে। ভেবে ভেবে বললাম—"খুকীর জন্যে জামাটা আনবো, কাল ওর গায়ের মাপ দিও তো। আর জিজ্ঞেস করো কি রঙ ওর পছন্দ—না, না—এখন আর ঘুম ভাঙিয়ে জিজ্ঞেস করবার দরকার নেই, ছেলেমানুষ ঘুমুচ্ছে, থাক। কাল সকালেই—" খুব গম্ভীর মুখে এ-কথা বলতেই মেয়েরা আবার হেসে উঠল দেখে আমি ভারি খুশি হয়ে উঠলাম। আরও বাহাদুরি নেবার ইচ্ছায় উৎসাহের সুরে বললাম—"আমি নেপালী নাচ জানি—চা-বাগানে থাকতে আমি দেখে দেখে শিখেছি।"

মেয়েরা সবাই বলে উঠলো, "তাও জানিস নাকি? বা রে! তা তো তুই বলিস নি কোনো দিন? দেখি—দেখি—"

"কিন্তু আর একজন লোক দরকার যে? আমার সঙ্গে আর কে আসবে? সীতা থাকলে ভাল হ'ত। সেও জানে। আপনাদের বীণা কোথায় গেল? সে হলেও হয়।"

এ কথায় মেয়েরা কেন যে এত হেসে উঠল হঠাৎ, তা আমি বুঝতে পারলাম না। বীণা

বীরুর মেজ বোন, আমার চেয়ে কিছু ছোট, দেখতে বেশ ভাল। সে ওখানে ছিল না তখন—একা একা নেপালী নাচ হয় না বলে বেশী বাহাদুরিটা আমার আর নেওয়া হয়নি সে-দিন।

সীতার বই পড়ার ব্যাপার নিয়ে জ্যাঠাইমা সকল সময় সীতাকে মুখনাড়া দেন। সীতা যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ফিটফাট থাকতে ভালবাসে এটাও জ্যাঠাইমা বা কাকীমারা দেখতে পারেন না। সীতা চিরকাল ওই রকম থেকে এসেছে চা-বাগানে। একটিমাত্র মেয়ে, মা তাকে সব সময় সাজিয়ে-গুজিয়ে রাখতে ভালবাসতেন, কতকটা আবার গড়ে উঠেছিল মিস্ নর্টনের দরুন। মিস্ নর্টন মাকে পড়াতে এসে নিজের হাতে সীতার চুল আঁচড়ে দিত, চুলে লাল ফিতে বেঁধে দিত, হাত ও মুখ পরিষ্কার রাখতে শেখাত। এখানে এসে সীতার দুখানার বেঁশি তিনখানা কাপড় জোটেনি কোন সময়—জামা তো নেই-ই। (জ্যাঠাইমা বলেন, মেয়েমানুষের আবার জামা গায়ে কিসের?) কিন্তু ওরই মধ্যে সীতা ফরসা কাপড়খানি প'রে থাকে, চুলটি টান টান করে বেঁধে পেছনে গোল খোঁপা বেঁধে বেড়ায়, কপালে টিপ প'রে—এ গাঁয়ের এক পাল অসভ্য অপরিষ্কার ছেলেমেয়ের মধ্যে ওকে সম্পূর্ণ অন্য রকমের দেখায়, যে-কেউ দেখলেই বলতে পারে ও এ-গাঁয়ের নয়, এ অঞ্চলের না—ও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

দুটো জিনিস সীতা খুব ভালবাসে ছেলেবেলা থেকে—সাবান আর বই। আর এখানে এসে পর্য্যন্ত ঠিক ওই দুটো জিনিসই মেলে না—এ-বাড়িতে সাবান কেউ ব্যবহার করে না, কাকীমাদের বাক্সে সাবান হয়ত আছে কিন্তু সে বাক্স-সাজানো হিসাবে আছে, যেমন তাঁদের বাক্সে কাঁচের পুতুল আছে, চীনেমাটির হরিণ, খোকা পুতুল, উট আছে,—তেমনি। তবুও সাবান বরং খুঁজলে মেলে বাড়িতে—কেউ ব্যবহার করুক আর নাই করুক—বই খুঁজলেও মেলে না—দুখানা বই ছাড়া—নতুন পাঁজি আর সত্যনারায়ণের পুঁথি। আমরা তো চা-বাগানে থাকতাম, সে তো বাংলা দেশেই নয়—তবুও আমাদের বাক্সে অনেক বাংলা বই ছিল। নানারকমের ছবিওয়ালা বাংলা বই—যীশুর গল্প, পরিত্রাণের কথা, জবের গল্প, সুবর্ণবণিকপুত্রের কাহিনী আরও কত কি। এর মধ্যে মিশনারি মেমেরা অনেক দিয়েছিল, আবার বাবাও কলকাতা থেকে ডাকে আনাতেন—সীতার জন্যে এনে দিয়েছিলেন কঙ্কাবতী, হাতেম তাই, হিতোপদেশের গল্প, আমার জন্যে একখানা 'ভূগোল-পরিচয়' ব'লে বই আর একখানা 'ঠাকুরদাদার ঝুলি'। আমি গল্পের বই পড়তে তত ভালবাসিনে, দু-তিনটে গল্প পড়ে আমার বইখানা আমি সীতাকে দিয়ে দিয়েছিলাম।

আমার ভালো লাগে যীশুখৃষ্টের কথা পড়তে। পর্ব্বতে যীশুর উপদেশ, যীশুর পুনরুত্থান, অপব্যয়ী পুত্রের প্রত্যাবর্ত্তন। এ সব আমার বেশ লাগে। এখানে ও সব বই পাওয়া যায় না ব'লে পড়িনে। যীশুর কথা এখানে কেউ বলেও না। একখানা খৃষ্টের রঙীন ছবি আমার কাছে আছে—মিস্ নর্টন দিয়েছিল—সেখানা আমার বড় প্রিয়। মাঝে মাঝে বার ক'রে দেখি।

হিন্দু দেবতার কোন মূর্ত্তি আমি দেখিনি, জ্যাঠামশায়ের বাড়িতে যা পূজো করেন, তা গোলমত পাথরের নুড়ি। এ-গ্রামে দুর্গাপূজা হয় না, ছবিতে দুর্গামূর্ত্তি দেখেছি, ভাল বুঝতে পারিনে, কিন্তু একটা ব্যাপার হয়েছে এর মধ্যে। চৌধুরীপাড়ায় বড় পুকুরের ধারের পাকুড়গাছের তলায় কালো পাথরের একটা দেবমূর্ত্তি গাছের গুঁড়িতে ঠেসানো আছে—আমি একদিন দুপুরে পাকুড়তলা দিয়ে যাচ্ছি. বাবা তখন বেঁচে আছেন কিন্তু তাঁর খুব অসুখ—ওই সময় মূর্ত্তিটা আমি প্রথম দেখি—জায়গাটা নির্জ্জন, পাকুড়গাছের ডালপালার পিছনে অনেকখানি নীল আকাশ,

মেঘের একটা পাহাড় দেখাচ্ছে ঠিক যেন বরফে মোড়া কাঞ্চনজঙ্ঘা—একটা হাত ভাঙা যদিও কিন্তু কি সুন্দর যে মুখ মূর্ত্তিটার, কি অপূর্ব্ব গড়ন—আমার হঠাৎ মনে হ'ল ওই পাথরের মূর্ত্তির পবিত্র মুখের সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ যীশুখৃষ্টের মুখের মিল আছে—কেউ ছিল না তাই দেখেনি—আমার চোখে জল এল, আমি একদৃষ্টিতে মূর্ত্তিটার মুখের দিকে চেয়েই আছি—ভাবলাম জ্যাঠামশায়রা পাথরের নুড়ি পূজো করে কেন, এমন সুন্দর মূর্ত্তির দেবতা কেন নিয়ে গিয়ে পূজো করে না? তারপরে শুনেছি ঐ দীঘি খুঁড়বার সময়ে আজ প্রায় পঁচিশ বছর আগে মূর্ত্তিটা হাতভাঙা অবস্থাতেই মাটির তলায় পাওয়া যায়। সীতাকে নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছিলাম একবার—একবার সীতা জবা, আকন্দ, ঝুমকো ফুলের একছড়া মালা গেঁথে মূর্ত্তির গলায় পরিয়ে দিয়েছিল। অমন সুন্দর দেবতাকে আজ পঁচিশ বছর অনাদরে গ্রামের বাইরের পুকুরপাড়ে অমন ক'রে কেন যে ফেলে দিয়েছে এরা!

একবার একখানা বই পড়লাম—বইখানার নাম চৈতন্যচরিতামৃত। এক জায়গায় একটি কথা পড়ে আমার ভারি আনন্দ হ'ল। চৈতন্যদেব ছেলেবেলায় একবার আঁস্তাকুড়ে, এঁটো হাঁড়ি-কুড়ি যেখানে ফেলে, সেখানে গিয়েছিলেন ব'লে তাঁর মা শচীদেবী খুব বকেন। চৈতন্যদেব বললেন—মা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ঈশ্বর আছেন, এই আঁস্তাকুড়েও আছেন। ঈশ্বর যেখানে আছেন, সে-জায়গা অপবিত্র হবে কি ক'রে?

ভাবলাম জ্যাঠাইমার বিরুদ্ধে চমৎকার যুক্তি পেয়েছি ওঁদের ধর্ম্মের বইয়ে, চৈতন্যদেব অবতার, তাঁরই মুখে। জ্যাঠাইমাকে একদিন বললাম কথাটা। বললাম—জ্যাঠাইমা, আপনি যে বাড়ির পিছনে বাঁশবনে গেলে কি শেওড়া গাছে কাপড় ঠেকলে হাত-পা না ধুয়ে, কাপড় না ছেড়ে ঘরে ঢুকতে দেন না, চৈতন্যচরিতামৃতে কি লিখেছে জানেন?

চৈতন্যদেবের সে কথাটা বলবার সময়ে আনন্দে মন আমার ভ'রে উঠল—এমন নতুন কথা, এত সুন্দর কথা আমি কখনও শুনিনি। ভাবলাম জ্যাঠাইমা বই পড়েন না ব'লে এত সুন্দর কথা যে ওঁদের ধর্ম্মের বইয়ে আছে তা জানেন না—আমার মুখে শুনে জেনে নিশ্চয়ই নিজের ভুল বুঝে খুব অপ্রতিভ হয়ে যাবেন।

জ্যাঠাইমা বললেন—তোমাকে আর আমায় শাস্তর শেখাতে হবে না। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেচে, উনি এসেচেন আমাকে শাস্তর শেখাতে! হিঁদুর আচার-ব্যবহার তোরা জানবি কোত্থেকে রে ডেঁপো ছোঁড়া। তুই তো তুই, তোর মা বড় জানে, তোর বাবা বড় জানতো—

আমি অবাক হয়ে গেলাম। জ্যাঠাইমা এমন সুন্দর কথা শুনে চটলেন কেন? তা ছাড়া আমি নিজে কিছু বলেছি কি?

আগ্রহের সুরে বললাম—আমার কথা নয় জ্যাঠাইমা, চৈতন্যদেব বলেছিলেন তাঁর মা শচী-দেবীকে—চৈতন্যচরিতামৃতে লেখা আছে—দেখাবো বইখানা?

খুব তক্কোবাজ হয়েচ? থাক্, আর বই দেখাতে হবে না। তোমার কাছে আমি গুরু-মন্তর নিতে যাচ্ছিনে—এখন যাও আমার সামনে থেকে, আমার কাজ আছে—তোমার তক্কো শুনবার সময় নেই।

বা রে, তর্কবাজির কি হ'ল এতে? মনে কষ্ট হ'ল আমার। সেই থেকে জ্যাঠাইমাকে আর কোন কথা বলিনি।

সীতা ইতিমধ্যে এক কাণ্ড ক'রে বসল। জ্যাঠামশাইদের বাড়ির পাশে যদু অধিকারীর

বাড়ি। তারা বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। তাদের বাড়িতে যদু অধিকারীর বড় মেয়ের বিয়ের জন্যে দেখতে এল চার-পাঁচজন ভদ্রলোক কলকাতা থেকে। সীতা সে-সময় সেখানে উপস্থিত ছিল।

যদু অধিকারীর বাড়ির মেয়েরা তাকে নাকি জিজ্ঞেস করেছে—শোন্ সীতা, আচ্ছা উমার যদি বিয়ে না হয় ওখানে, তোর বিয়ে দিয়ে যদি দিই, তোর পছন্দ হয় কা'কে বল্ তো?

সীতা বুঝতে পারেনি যে তাকে নিয়ে ঠাট্টা করচে—বলেচে নাকি, চোখে-চশমা কে একজন এসেছিল তাকে।

ওরা সে কথা নিয়ে হাসাহাসি করেচে। জ্যাঠাইমার কানেও গিয়েছে কথাটা। জ্যাঠাইমা ও সেজকাকীমা মিলে সীতাকে বেহায়া, বোকা, বদ্‌মাইশ, জ্যাঠা মেয়ে, যা তা বলে গালাগালি আরম্ভ করলেন। আরও এমন কথা সব বললেন যা ওঁদের মুখ দিয়ে বেরুলো কি ক'রে আমি বুঝতে পারিনি। আমি সীতাকে বকলাম, মাও বকলেন—তুই যাস্ কেন যেখানে সেখানে, আর না বুঝে যা তা বলিসই বা কেন? এ-সব জায়গার ধরন তুই কি বুঝিস?

সীতার চোখ ছল্ ছল্ ক'রে উঠল। সে অতশত বোঝেনি, কে জানে ওরা আবার এখানে বলে দেবে! সে মনে যা এসেচে, মুখে সত্যি কথাই বলেচে। এ নিয়ে এত কথা উঠবে তা বুঝতেই পারেনি।

॥ ৫ ॥

পৌষ মাসের শেষে আমাদের বাড়ি সরগরম হয়ে উঠল—শুনলাম ওঁদের গুরুদেব আসবেন ব'লে চিঠি লিখেচেন।

এই গুরুদেবের কথা আমি এঁদের বাড়িতে এর আগে অনেক শুনেচি—জ্যাঠামশায়ের ঘরে তাঁর একটা বড় বাঁধানো ফটোগ্রাফ দেখেছিলাম—গুরুদেব চেয়ারে বসে আছেন, জ্যাঠামশায় ও জ্যাঠাইমা দুজন দু-দিকে মাটিতে ব'সে তাঁর পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিচ্চেন। অনেক দিন থেকে ছবিখানা দেখে গুরুদেব সম্বন্ধে আমার মনে একটা কৌতূহল হয়েছিল—কিরকম লোক একবার দেখবার বড় ইচ্ছে হ'ত।

স্টেশনে তাঁকে আনতে লোক গিয়েছিল—একটু বেলা হ'লে দেখি দাদা এক ভারী মোট বয়ে আগে আগে আসচে—পেছনে ব্যাগ হাতে জ্যাঠামশায়দের কৃষাণ নিমু গোয়ালা। গুরুদেব হেঁটে আসচেন, রং কালো, মাথার সামনের দিকে টাক—গায়ে চাদর, পায়ে চটি। আমার জাঠতুতো, খুড়তুতো ভাইবোনেরা দরজার কাছে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছিল—পায়ের ধুলো নেওয়ার জন্যে তাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। আমি এগিয়েও গেলাম না, পায়ের ধুলোও নিলাম না। জ্যাঠাইমা গুরুদেবের পা নিজের হাতে ধুইয়ে আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিলেন, খুড়ীমারা বাতাস করতে লাগলেন—ছেলে-মেয়েরা তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল, তিনি সেজ-খুড়ীমাকে জিজ্ঞেস করলেন—বৌমা, ছেলের তোতলামিটা সেরেচে? মেজখুড়ীমাকে বললেন—গোষ্ঠ (মেজকাকার নাম) আজকাল কি বাদার কাছারী থেকে গরমের সময় একদম আসে না?···কতদিন আগে এসেছিল বললে?

বাড়ির ছেলেমেয়েদের একে ওকে ডেকে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলেন, দুএকটা কথা জিজ্ঞেসও করলেন—কিন্তু দাদা যে অত বড় ভারী মোট বয়ে আনলে স্টেশন থেকে, সে-ও

সেইখানে দাঁড়িয়ে—তাকে একটা মিষ্টি কথাও বললেন না। আমার রাগ হ'ল, তিনি কি ভেবেচেন দাদা বাড়ির চাকর? তাও ভাবা অসম্ভব এই জন্তে যে, ওখানে যতগুলো ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে ভিড় ক'রে আছে, তাদের মধ্যে দাদার রূপ সকলের আগে চোখকে আকৃষ্ট করে—এ গাঁয়ে দাদার মত রূপবান বালক নেই, শুধু এ বাড়ি তো দূরের কথা। আশা করে দাঁড়িয়ে আছে, একটা ভাল কথাও তো বলতে হয় তার সঙ্গে?

গুরুদেবের জন্তে বিকেলে বাড়িতে কত কি খাবার তৈরি হ'ল—মেজখুড়ীমা, সতুর মা, জ্যাঠাইমা—সবাই মিলে ক্ষীরের, নারিকেলের, ছানার কি সব গড়লেন। মাকে এ-সব কাজে ডাক পড়ে না, কিন্তু দেখে একটু অবাক হ'লাম সতুর মাকে ওঁরা এতে ডেকেচেন! মা আর সতুর মার ওপর যত উঞ্ছ কাজের ভার এ বাড়ির। সতুর মা'র অদৃষ্ট ভাল হয়েচে দেখচি।

গুরুদেব সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে বাইরে এলে তাঁকে যখন খাবার দেওয়া হ'ল, তখন সেখানে বাড়ির ছেলেমেয়ে সবাই ছিল—আমরাও ছিলাম। কিন্তু হিরণদিদি ও সেজকাকীমা সকলকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলেন। গুরুদেব বললেন—কেন ওদের যেতে বলচ বৌমা, থাক্ না, ছেলেপিলেরা গোলমাল করেই থাকে—

গুরুদেব তিন-চারদিন রইলেন। তাঁর জন্তে সকালে বিকালে নিত্যনূতন কি খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাই যে হ'ল! পিঠে, পায়েস, সন্দেশ, ছানার পায়েস, ক্ষীরের ছাঁচ, চন্দ্রপুলি, লুচি—তিনি তো খেতে পারতেন না—আমরা বাদে বাড়ির অন্ত ছেলেমেয়েরা তাঁর পাতের প্রসাদ পেত। তিনি জলখাবার খেয়ে উঠলে তাঁর রেকাবিতে বা থালায় যা পড়ে থাকত, কাকীমারা ডেকে ছেলেমেয়েদের দিতেন—আমরা সেখানে থাকতাম না—কারণ প্রথম দিকে ছেলেমেয়েরা সেখানে থাকলে কাকীমা বকতেন—তার পর গুরুদেবের খাওয়া হয়ে গেলে যখন তাদের ডাক পড়ত, তখন বাড়ির ছেলেরা কাছে কাছেই থাকতো ব'লে তারাই যেত—আমি কারুর পাতের জিনিস খেতে পারিনে, এই জন্তে আমি যেতাম না। ওঁরা ডেকেও কোনো খাবার জিনিস আমাদের কোনো দিন দিলেন না—কিন্তু মনে মনে আমি হতাশ হলাম—আমি একেবারে যে আশা করিনি তা নয়, ভেবেছিলাম গুরুদেব এলে আমরা সবাই ভাল খাওয়ার ভাগ পাব কিছু কিছু।

সন্ধ্যাবেলা। বেশ শীত পড়েচে। গুরুদেব আমলকীতলায় কাঠের জলচৌকিতে কম্বল পেতে বসে আছেন। পায়ে সবুজ পাড়-বসানো বালাপোশ—ছেলেমেয়েরা সব ঘিরে আছে, যেমন সর্ব্বদাই থাকে; একটু পরে জ্যাঠাইমা, মেজকাকীমা, সতুর মা, হিরণদিদি এলেন।

গুরুদেবের খুব কাছে আমি কোনো দিন যাইনি—আমি গোয়ালঘরের কাছে দাঁড়িয়ে আছি, ছেলেমেয়েরা গল্প শুনচে গুরুদেবের কাছে, আমার কিন্তু গল্পের দিকে মন নেই, আমার জানবার জন্তে ভয়ানক কৌতূহল যে গুরুদেব কি ধরনের লোক, তাঁর অত খাতির, যত্ন, আদর এরা কেন করে, তাঁর পায়ে জ্যাঠাইমা ও জ্যাঠামশায় পুষ্পাঞ্জলি দেনই বা কেন, তাঁর ফটো বাঁধিয়েই বা ঘরে রাখা আছে কেন? এসবের দরুন গুরুদেব সম্বন্ধে আমার মনে এমন একটা অদ্ভুত আগ্রহ ও কৌতূহল জন্মে গিয়েচে যে, তিনি যেখানেই থাকুন, আমি কাছে কাছে আছি সর্ব্বদাই—অথচ খুব নিকটে যাইনে!

গুরুদেব মুখে মুখে ধর্ম্মের কথা বলতে লাগলেন। আমি আর একটু এগিয়ে গেলাম ভাল ক'রে শোনবার জন্ত। এ-সব কথা শুনতে আমার বড় ভাল লাগে।

একবার কি একটা যোগ উপস্থিত—গঙ্গাস্নানে মহাপুণ্য, সকল পাপ ক্ষয় হয়ে যাবে, স্নান করলেই মুক্তি। পার্ব্বতী শিবকে বললেন—আচ্ছা প্রভু, আজ এই যে লক্ষ লক্ষ লোক কাশীতে

স্নান করবে, সকলেই মুক্তি পাবে ? শিব বললেন, তা নয় পার্ব্বতী। চলো তোমায় দেখাব। দুজনে কাশীতে এলেন মণিকর্ণিকার ঘাটে। শিব বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের শব সেজে ঘাটের ধারে পড়ে রইলেন। পার্ব্বতী তাঁর স্ত্রী সেজে পাশে বসে কাঁদতে লাগলেন। যারা এল, তাদের বললেন আমার বৃদ্ধ স্বামী মারা গিয়েচেন, এর সৎকার করার ব্যবস্থা আপনারা করুন। কিন্তু একটা মুশকিল আছে, শব যিনি স্পর্শ করবেন, তাঁর সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হওয়া চাই, নইলে শব-স্পর্শেই মৃত্যু ঘটবে।

এ-কথা শুনে সাহস ক'রে কেউ এগোয় না। সবাই ভাবে পাপ তো কতই করেচি। প্রাণ দিতে যাবে কে ? সারাদিন কাটলো। সন্ধ্যা নামে-নামে। একজন চণ্ডাল ঘাটের ধারে অশ্রুমুখী ব্রাহ্মণপত্নীকে দেখে কি হয়েচে জিজ্ঞাসা করলে। পার্ব্বতী সকলকে যা ব'লে এসেচেন তাকেও তাই বললেন। চণ্ডাল শুনে ভেবে বললে—তার জন্য ভাবনা কি মা ? আজ গঙ্গা-স্নান করলে তো নিষ্পাপ হবোই, এত বড় যোগ যখন, এ জন্ম তো দূরের কথা শত জন্মের পাপ ক্ষয় হয়ে যাবে পাঁজিতে লিখেচে। তা দাঁড়ান, আমি ডুবটা দিয়ে আসি এবং একটু পরেই ডুব দিয়ে উঠে এসে বললে—মা ধরুন ওদিক, আমি পায়ের দিকটা ধরচি—চলুন নিয়ে যাই।

শিব নিজমূর্ত্তি ধারণ করে চণ্ডালকে বর দিলেন। পার্ব্বতীকে বললেন—পার্ব্বতী দেখলে ? এই লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে এই লোকটি মাত্র আজকার যোগের ফল লাভ করবে। মুক্তি যদি কেউ পায় এই চণ্ডালই পাবে।

গল্পটা আমার ভারি ভাল লাগল। সে-দিনকার চৈতন্যচরিতামৃতে পড়া সেই কথাটা মনে পড়ল—জ্যাঠাইমাকে বলেছিলাম, জ্যাঠাইমা বিশ্বাস করেন নি। ওঁদের শাস্ত্রের কথাতেই ওঁর বিশ্বাস নেই। অথচ মুখে হিঁদুয়ানি তো খুব দেখান! আর আমাকে, মাকে, সীতাকে, দাদাকে বলেন খিরিস্টান।

আজকার গুরুদেবের এই গল্পটা কি জ্যাঠাইমা কাকীমারা বুঝতে পারলেন ? চণ্ডালের ওপর আমার ভক্তি হ'ল। আমি যেন মনে মনে কাশী চলে গিয়েচি, আমি যেন মণিকর্ণিকার ঘাটে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশী শিব ও ক্রন্দনরতা পার্ব্বতীকে প্রত্যক্ষ করেচি।

ও-বছর বড়দিনের সময় মিশনারী মেয়েরা আমাদের রঙীন কার্ড দিয়েছিল, ছোট একখানা ছবিওয়ালা বই দিয়েছিল। তা'তে একটি কথা সোনার জলে বড় বড় ক'রে লেখা আছে মনে পড়ল—তাহারা ধন্য যাহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। কারণ তাহারা জীবনমুকুট প্রাপ্ত হইবে।

তার পরদিন সন্ধ্যাবেলাতেও গুরুদেব আমলকীতলায় আসন পেতে বসে গল্প বলছিলেন ছেলেমেয়েদের। একবার উঠে আহ্নিক করতে গেলেন, আবার এসে বসলেন। মেয়েরাও এলেন।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ আমার দিকে আঙুল দিয়ে বললেন—ও ছেলেটি কে ? রোজ রোজ দেখি দাঁড়িয়ে থাকে। এস, এস বাবা, এদিকে এস।

প্রথমটা আমার বড় লজ্জা হ'ল কিন্তু কেমন একটা আনন্দও হ'ল। একটু এগিয়ে গেলাম। জ্যাঠাইমা বললেন—ও আমার এক খুড়তুতো দেওরের ছেলে। ওরা এখানে থাকতো না, চা-বাগানে ওর বাবা কাজ করতো। এখানে এসে অসুখ হয়ে মারা গেল ; আর তো কেউ নেই, ওরা এ বাড়িতে থাকে।

গুরুদেব বললেন—এস দেখি বাবা, হাতটা দেখি, সরে এস।

তারপর জ্যাঠাইমাদের দিকে চেয়ে বললেন—খুব লক্ষণযুক্ত ছেলে। এর বয়স কত ?

আমায় লক্ষণযুক্ত বলাতে—বিশেষতঃ অত ছেলের মাঝ থেকে—জ্যাঠাইমা কাকীমারা নিশ্চয়ই খুব খুশি হননি। জ্যাঠাইমা প্রমাণ করবার চেষ্টা করলেন আমার বয়স নাকি পনেরো বছর—আমি ওঁর ছেলে হাবুর চেয়েও দেড় বছরের বড়। আসলে আমার বয়স তেরো—জ্যাঠাইমার বড় ছেলে হাবুকে আমরা হাবুদা বলে ডাকি, সে আমাদের সবার চেয়ে দু-বছরের বড়। স্কুলে তার বয়েস লেখানো আছে, তাই ধরে বলচি।

তারপর গুরুদেব আমায় জিজ্ঞেস করলেন—কি পড় বাবা ?

আমি কোন্ ক্লাসে পড়ি বললাম।

ধাতুরূপ কতদূর পড়েচ ? লুঙ, লিট্ বোঝ ? এই শোনো একটি শ্লোক—

সোধ্যৈষ্ট বেদাংস্ত্রিদশানযষ্ট
পিতৃনতার্প্সীৎ সমমংস্ত বন্ধুন্
ব্যজৈষ্ট ষড়বর্গমরংস্ত নীতৌ
সমূলঘাতংন্যবধীদরীংশ্চ।

হেসে বললেন—কত রকম ধাতুর ব্যবহার দেখেচ ? এ হল ভট্টিকাব্যের শ্লোক।

আমার বেশ ভাল লাগলো, গুরুদেবকেও এবং তাঁর শ্লোককেও। আমি এর আগে সংস্কৃত শ্লোক বেশি শুনিনি। চা-বাগানে কেউ বলতো না। শ্লোকটা আমি মুখস্থ ক'রে নিলাম।

একদিন তিনি বাড়ির পাশের মাঠে শুকনো পাতা দিয়ে আগুন জ্বেলেচেন। আমায় দেখে বললেন—এসো জিতু—

আমি বললাম—কি করবেন আগুন জ্বেলে ?…

—তামাক পোড়াবো—

আমি বললাম, আমি পুড়িয়ে দিচ্চি।

গুরুদেব অনেক সংস্কৃত শ্লোক আমাকে শোনালেন। কুবেরের শাপে এক যক্ষ গৃহ থেকে বহুদূরে কোন্ পর্ব্বতে নির্ব্বাসিত হয়েছিল, বাড়ির জন্যে ভেবে ভেবে তার হাতের সোনার বালা ঢল হয়ে গিয়েছিল, তারপর আষাঢ় মাসের প্রথম দিনে সেই পাহাড়ের মাথায় বর্ষার নতুন কালো মেঘ নামল—এই রকম একটা, শ্লোকের মানে। আমি তো সংস্কৃত পড়ি মোটে ঋজুপাঠ, কিন্তু আমাকেই তিনি আগ্রহের সঙ্গে এমনি ভাল ভাল অনেক শ্লোক শোনাতে লাগলেন—যেন আমি কত বুঝি !

এবার মনে হ'ল আমার নিজের কথা যা কাউকে কখনও বলিনি এ পর্য্যন্ত—তাঁর কাছে খুলে বলি, আমার মনের সন্দেহ, আমার ঐসব অদ্ভুত জিনিস দেখার ব্যাপার, জ্যাঠাইমাদের সঙ্গে আচার-ব্যবহার নিয়ে আমার মত না মেলা,—সকলের ওপর ঠাকুরদেবতা সম্বন্ধে আমার অবিশ্বাস—এসব খুলে ব'লে তিনি কি বলেন শুনি। তাঁর ওপর এমন একটা শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল আমার ! যেন মনে হ'ল এঁর কাছে বললে ইনি সব বুঝিয়ে দিতে পারবেন আমাকে। এত বড় লোক ইনি, এত পণ্ডিত, কত কথা জানেন।

কিন্তু সুবিধে হ'ল না। বলি-বলি করেও বলতে আমার কেমন লজ্জা হ'ল। তিন দিন এমনি কেটে গেল, তারপর তিনি চলে গেলেন।

আমার কিন্তু বলতে পারলেই ভাল হ'ত। একজন ভাল লোককে আমার সব কথা বলা দরকার। অথচ এখানে তেমন কোন লোককে আমি বিশ্বাস করিনে—কারুর ওপর আমার ভক্তি হয় না।

আমি আজকাল নির্জ্জনে বসলেই অদ্ভুত সব জিনিস দেখি। যখন তখন, তার সময় নেই

অসময় নেই, রাত নেই দিন নেই। এই তো সেদিন বসে আছি জ্যাঠাইমাদের পুকুরধারের বাগানে একলাটি—হঠাৎ দেখি পুকুরপাড়ের আমগাছগুলোর ওপরকার নীল আকাশে একটা মন্দিরের চূড়ো—প্রকাণ্ড মন্দির, রোদ লেগে ঝক্‌মক্ করচে—সোনা না কি দিয়ে বাঁধানো যেন। মন্দিরের চারিপাশে বাগান, চমৎকার গাছপালা, ফুল ফুটে আছে, অপূর্ব্ব দেখতে—ঠিক যেন আমাদের সোনাদা চা-বাগানের ধারে বনের গাছের ডালে ডালে ফোটা নীল অর্কিডের ফুল! আর একদিন দেখেছিলাম ঠিক ওই জায়গায় বসেই আকাশ বেয়ে সন্ধ্যার সময় তিনটি সুন্দরী মেয়ে, পরনে যেন শ্বেতচমরীর লোমে বোনা সাদা চকচকে লুটিয়ে-পড়া কাপড়—তারা উড়ে যাচ্ছে এক সারিতে, বোধ হয় পুরো পাঁচ মিনিট ধরে তাদের দেখেচি। তারপর রোদ চক্‌চক্ করতে লাগল, আর তাদের স্পষ্ট দেখা গেল না—ওপরের দিকে যেতে যেতে মিলিয়ে গেল। এরকম নতুন নয়, কতবার দেখেছি, প্রায়ই দেখি, দু-পাঁচদিন অন্তর দেখি, দেখে দেখে আমার সয়ে গিয়েচে, আগের মত ভয় হয় না। কিন্তু এক-একবার ভাবি, এ আমার এক রকম রোগ—না চোখ খারাপ হয়ে গিয়েচে, না কি?

আমার কারুর সঙ্গে মিশতে সাহস হয় না এইজন্যে যে, হয়ত কোন্ সময় আবার অন্য ভাব এসে যাবে, আর কে সঙ্গে থাকবে সে আমায় ভাববে পাগল। হয়ত হাসবে, হয়ত লোককে ব'লে দেবে। এমনিও এ-বাড়িতে জ্যাঠাইমা, কাকীমা, কাকা, এঁরা আমায় পাগলই ভাবেন। কি করবো। আমি যা দেখি, ওঁরা তা দেখতে পান না, এই আমার অপরাধ। একটা উদাহরণ দিই—

ফাল্গুন মাসে ছোটকাকার মেয়ে পানী অসুখে পড়ল। একদিন দু'দিন গেল, অসুখ আর সারে না। জ্বর লেগেই আছে। সাতদিন কেটে গেল—জ্বর একই ভাব। দশ দিনের দিন অসুখ এমনি বাড়ল, নৈহাটি থেকে বড় ডাক্তার আনবার কথা হ'ল।

পানীকে আমার এ-বাড়ির ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাল লাগে। তার বয়স বছর সাত-আট, ঝাঁকড়া চুল মাথায়, চোখ কটা, সাহেবদের ছেলেমেয়েদের মত। এ-বাড়ির ছেলেমেয়েদের মুখে যেমন খারাপ কথা আর গালাগালি লেগেই আছে—পানীর কিন্তু তা নয়। তার একটা কারণ, সে এতদিন মামার বাড়িতে তার দিদিমার কাছে ছিল, গঙ্গার ওপারে ভদ্রেশ্বরে। সে বেশ মেয়ে, বেশ গান করতে পারে, প্রাণে তার দয়ামায়া আছে। পানীর অসুখ হয়ে পর্য্যন্ত আমার মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল—আমার ইচ্ছে হয়েছিল ওর কাছে গিয়ে ব'সে গায়ে হাত বুলিয়ে দিই—কিন্তু কাকীমা তো আমায় বিছানা ছুঁতে দেবে না, সেই ভয়ে পারতাম না।

পানীর তখন সতেরো দিন জ্বর চলছে—বুড়ো গোবিন্দ ডাক্তার ঘোড়ার গাড়ি ক'রে স্টেশন থেকে এল—দালানে বসে মশলার কৌটো বের ক'রে মশলা খেলে, ভাজা মশলার গন্ধে দালান ভুর ভুর করতে লাগল—চা ক'রে দেওয়া হ'ল, চা খেলে, তার পর ওষুধ লিখে দিয়ে ভিজিটের টাকা মেজকাকার হাত থেকে নিয়ে না দেখেই পকেটে পুরলে—তার পর রোগীকে বার বার গরম জল খাওয়ানোর কথা ব'লে গাড়ি ক'রে চলে গেল।

একটু একটু অন্ধকার হয়েচে কিন্তু এখনও বাড়িতে সন্ধ্যার শাঁখ বাজেনি, কি আলো জ্বালা হয়নি—হয়ত ডাক্তার আসবার জন্যে সকলে ব্যস্ত ছিল বলেই। আমি রোগীর ঘরে দোরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, কিন্তু পানীর বিছানায়—পানীর শিয়রে যে বসে আছে তাকে চিনতে পারলাম না। লালপাড় শাড়ী পরনে আধঘোমটা দেওয়া কে একজন, জ্যাঠাইমার মত দেখতে বটে কিন্তু জ্যাঠাইমা তো নয়! ঘরের মধ্যে আর কেউ নেই—এইমাত্র কাকীমা বাইরে গেছেন ডাক্তারে কি ব'লে গেল তাই জানতে ছোটকাকার কাছে। আমি ভাবচি লোকটা কে, এমন

সময় তিনি মুখ তুলে আমার দিকে চেয়ে বললেন—জিতু, নির্ম্মলাকে বোলো পানীকে আমি নিয়ে যাব, আমি ওকে ফেলে থাকতে পারবো না—ও আমার কাছে ভাল থাকবে, নির্ম্মলা যেন দুঃখ না করে। আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম—কে নির্ম্মলা আমি চিনি নে, যিনি বলচেন তিনিই বা কে, কোথা থেকে এসেচেন, কই এ বাড়িতে তো কোনদিন দেখিনি তাঁকে, পানীকে তিনি এই অসুস্থ শরীরে কোথায় নিয়ে যাবেন, এসব কথা ভাববার আগেই ছোটকাকীমা ঘরে ঢুকলেন —কিন্তু আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বিছানার পাশে যিনি বসে আছেন, ছোটকাকীমা যে তাঁকে দেখতে পাচ্চেন, এমন কোনো ভাব দেখলুম না।

বিছানায় যিনি বসে ছিলেন তিনি আমায় বললেন—জিতু, নির্ম্মলাকে বল এইবার—আমি চলে যাচ্ছি।

আমি কিছু না ভেবে কলের পুতুলের মত চেয়ে বললাম—নির্ম্মলা কে ?

ছোট কাকীমা আমার দিকে কটমট ক'রে চেয়ে বললে—কেন, সে খোঁজে কি দরকার ? তিনি ভাবলেন আমি বুঝি তাঁকেই জিজ্ঞেস করচি। অন্য মহিলাটি বিছানা থেকে নেমে ওদিকের দরজা দিয়ে বার হয়ে চ'লে গেলেন, যাবার সময় আমাকে বললেন—এই তো নির্ম্মলা ঘরে এসেচে।

আমি বললাম—আপনি কেন বলুন না নিজে ?

ততক্ষণ তিনি বার হয়ে চলে গিয়েছেন।

ছোটকাকীমা আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছেন। বললেন—কি বকচিস পাগলের মত ? ওদিকে চেয়ে কার সঙ্গে কথা বলচিস ? নির্ম্মলা কে সে খোঁজে তোমার কি দরকার শুনি ?

জ্যাঠাইমা ঘরে ঢুকলেন সেই সময়ই। তিনি বললেন, কি হয়েচে, কি বলচে ও ?

ছোটকাকীমা বললেন—আপন মনে কি বকচে ত্থাখো না দিদি—ও এ ঘর থেকে চলে যাক। আমার ভয় করে, ও ছেলের মাথার ঠিক নেই—আমার নাম ক'রে কি বলচে।

জ্যাঠাইমা বললেন—কি বলছিলি কাকীমার নাম করে ?

আমার বিস্ময় তখনো কাটেনি—আমি তখন কেমন হয়ে গিয়েচি। ছোটকাকীমার নাম যে নির্ম্মলা আমি তা কখনও শুনিনি—ঐ মেয়েটি যে চলে গেল, আমার সঙ্গে কথা বলে গেল—ছোটকাকীমা তাঁকে দেখতে পেলেন না, তাঁর কথাও শুনতে পেলেন না এই বা কেমন! জ্যাঠাইমার কথার কোনো জবাব আমার মুখ দিয়ে বেরুলো না, আমার মাথা ঘুরে উঠল। তারপর কি যে ঘটল আমি তা জানি না।

জ্ঞান হলে দেখি মা আমার মাথা কোলে নিয়ে বসে কাঁদচেন। আমি দালানেই শুয়ে আছি। চারিপাশে বাড়ির অনেক মেয়ে জড় হয়েচে, সবাই বললে আমার মৃগীরোগ আছে। ভাবলাম হয়ত হবে, একেই বোধ হয় মৃগীরোগ বলে। আমার বড় ভয় হ'ল, বাবা মারা গিয়েচেন পাগল হয়ে, এ-বাড়ির অনেকের মুখে শুনেছি আমরাও পাগল হ'তে পারি। তার মধ্যে আমার নাকি পাগলের লক্ষণ আছে অনেক।

সে-সন্ধ্যার কথা কখনও ভুলব না। জীবনে এত ভয় আমার কোনদিন হয়নি—এই ভেবে ভয় হ'ল যে আমার সত্যিই কোন কঠিন রোগ হয়েচে। কিন্তু কাউকে বলবার উপায় নেই রোগটা কি। মৃগীরোগই হয়ত হয়েচে, নয়তো বাবার মত পাগলই হয়ে যাব হয়ত—না, কি হবে!

যে রাত্রে বাবা পাগল হয়ে গিয়ে বালিশের তুলো ছিঁড়ে ঘরময় ছড়িয়ে দিলেন, কেরোসিনের

টেমির মিটমিটে অস্পষ্ট আলোয় রাতদুপুরে তাঁর সেই অদ্ভুত সারা গায়ে, মুখে, মাথায় তুলোমাখা মূর্ত্তি বার বার মনে আসতে লাগল—আমার মনে সে-রাত্রি, সে-মূর্ত্তি চিরদিনের জন্ত আঁকা হয়ে আছে। ঐ রকম কি আমারও হবে!

মাকে আঁকড়ে ধরে শুয়ে রইলাম সারারাত। মনে মনে কতবার আকুল আগ্রহে প্রার্থনা করলাম—প্রভু যীশু, তুমি দেবতা, তুমি আমার এ রোগ সারিয়ে দাও, আমায় পাগল হ'তে দিও না। আমায় বাঁচাও।

সকালে একটু বেলায় রোদ উঠলে পানী মারা গেল।

জ্যাঠাইমা সকালে উঠে বৌদের কুটনো কুটবার উপদেশ দেবেন, কি কি রান্না হবে তা ঠিক ক'রে দেবেন—এ বাড়িতে ভাগ্নে-বৌ ছাড়া কেউ গাই দুইতে পারে না—এদিকের কাজ সেরে জ্যাঠাইমা তাকে সঙ্গে নিয়ে গোয়ালে নিজের চোখের সামনে দুধ দোয়াবেন—সীতা বলে, পাছে ভাগ্নে-বৌ নিজের ছেলেমেয়েদের জন্যে কিছু সরিয়ে রাখে বোধ হয় এই ভয়ে। তারপর তিনি স্নান ক'রে গরদের কাপড় প'রে ঠাকুরঘরে ঢুকবেন—সেখানে আহ্নিক চলবে বেলা এগারোটা পর্য্যন্ত, সে-সময়ে ঠাকুরঘরের দোরে কারুর গিয়ে উঁকি দেবার পর্য্যন্ত হুকুম নেই। সবাই বলে জ্যাঠাইমা বড় পুণ্যবতী। পুণ্যবতীই তো! একদিন যে-ছবি দেখেছিলাম, ভুলিনি কোনদিন। জ্যাঠাইমা ঠাকুরঘর থেকে বার হয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়েচেন, পরনে গরদের শাড়ী, কপালে সিঁদুর, চন্দনের টিপ, টকটকে চেহারা—এমন সময় আমার মা একরাশ বাসি কাপড় নিয়ে গোবরছড়ার বালতি হাতে পুকুরের ঘাটে যাচ্চেন, পরনের ময়লা কাপড়ের জায়গায় জায়গায় কাদা গোবরের ছাপ, রুক্ষ চুল; বেলা বারোটার কম নয়; সকাল থেকে মার মুখে এক ফোঁটা জল পড়েনি—

জ্যাঠাইমা ডেকে বললেন—বৌ, রান্নাঘরের ছোট জালার জল কি কাল তুমি তুলেছিলে? আমি না কতবার তোমায় বারণ করেচি ছোট জালায় তুমি জল ঢালবে না? বড় জালায় বেশী না পার তো তিন কলসী ক'রে ঢেলেও তো বেগার শোধ দিলে পার?

ছোট জালার জল জ্যাঠামশায়, জ্যাঠাইমা বা কাকারা খান। জ্যাঠাইমার এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, মা গুরুমন্ত্র নেননি, মায়ের হাতের জল অতএব শুদ্ধ নয়, সে জল ওঁরা খাবেন কি ক'রে?

সত্যিই তো জ্যাঠাইমা পুণ্যবতী। নইলে তিনি ঠাকুরঘরে পবিত্র দেহে পবিত্র মনে এতক্ষণ জপ-আহ্নিক করছিলেন, আর মা মরছিলেন বেলা বারোটা পর্য্যন্ত গোয়াল-আঁস্তাকুড় ঘেঁটে—মা নাস্তিক মাতাল কেরানীর স্ত্রী, তার ওপর আবার মেমের কাছে লেখাপড়া শিখে জাত খুইয়েচেন, কেন ওঁরা জল খেতে যাবেন মার হাতের?

আমার মনে হ'ল ঠাকুরও শুধু বড়মানুষের, পুণ্যিও বড়মানুষের জন্যে—নইলে মায়ের, ভাগ্নেবৌয়ের, ভুবনের মায়ের সময় কোথায় তারা নিশ্চিন্ত মনে, শুচি হয়ে, গরদ প'রে তাঁর পায়ে ফুলতুলসী দেবে?

বোধ হয় এই সব নানা কারণে জ্যাঠাইমাদের বাড়ির গৃহদেবতার প্রতি আমি অনেকটা চেষ্টা করেও কোনো ভক্তি আনতে পারতাম না। এক-একবার ভেবেচি হয়ত সেটা আমারই দোষ, আমার শিক্ষা হয়েচে অন্যভাবে, অন্য ধর্মাবলম্বী লোকেদের মধ্যে, তাদের কাছে যে দয়া মমতা পেয়েছি, আর কোথাও তা পাইনি বলেই। ছেলেবেলা থেকে যীশুখৃষ্টের কথা পড়ে আসচি, তাঁর করুণার কথা শুনেচি, তাঁর কত ছবি দেখেচি। আমার কাছে একখানা ছবি

আছে খৃষ্টের, মেমেরা বড়দিনের সময় আমায় দিয়েছিল—বকের পালকের মত ধবধবে সাদা দীর্ঘ ঢিলে আলখাল্লা-পরা যীশু হাসি-হাসি মুখে দাঁড়িয়ে—চারিধারে তাঁর ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা ভিড় করেচে, একটি ক্ষুদ্র শিশু তাঁর পা ধরে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করচে, আর তিনি তাকে ধরে তুলতে যাচ্চেন নিচু হয়ে—মুখে কি অপূর্ব জ্যোতি, কি সুন্দর চাউনি—আমি এ ছবিখানা বইয়ের ভেতর রেখে দিই, রোজ একবার দেখি—এত ভালো লাগে !

কিন্তু যীশুখৃষ্টের সম্বন্ধে কোনো ভাল বই পাইনে—আমার আরও জানবার ইচ্ছে হয় তাঁর কথা—মাকে যে মেমেরা পড়াত চা-বাগানে, তারা একখানা মথি-লিখিত সুসমাচার ও খানকতক ছাপানো কাগজ বিলি করেছিল, সেইগুলো কতবার পড়া হয়ে গিয়েচে, তা ছাড়া আর কোনো বই নেই। এখানে এসে পর্য্যন্ত আর কোনো নতুন বই আমার চোখে পড়েনি।

আমাদের স্কুলে একটা ছেলে নতুন এসে ভর্ত্তি হয়েচে আমাদেরই ক্লাসে। তার নাম বনমালী, জাতে সদ্‌গোপ, রঙ খুব কালো, কিন্তু মুখের চেহারা বেশ, বয়সে আমার চেয়ে কিছু বড়। সে অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে, এখানে একটা ঘর ভাড়া করে থাকে, বামুনে রাঁধে। অনেক দূরের পাড়াগাঁয়ে তার বাড়ি, সেখানে লেখাপড়া শেখার কোনো সুবিধে নেই, তাই ওকে ওর বাপ-মা এই গাঁয়ে পাঠিয়েচে। কিন্তু লেখাপড়ার দিকে বনমালীর মন নেই, সে বাসার উঠোনে এক তুলসীচারা পুঁতে বাঁধিয়েচে, দিনরাত জপ করে, একবেলা খায় মাছমাংস ছোঁয় না, শ্রীকৃষ্ণ নাম তার সামনে উচ্চারণ করার জো নেই, তা হ'লেই তার চোখ দিয়ে জল পড়বে। রাত্রে জপের ব্যাঘাত হয় ব'লে বিকেলবেলা স্কুল থেকে গিয়ে খেয়েদেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বামুন ঠাকুরকে ছুটি দেয়—তার পর ব'সে ব'সে অনেক রাত পর্য্যন্ত জপ করে, হরিনাম করে। সে সময় কেউ কাছে গেলে সে ভারি চটে। অদ্ভুত ধরনের ছেলে ব'লে তাকে সকলে ভারি খেপায়—স্কুলের ছেলেরা তার সামনে 'কিষ্ট' 'কিষ্ট' বলে চেঁচায় তার চোখে জল বেরোয় কি না দেখবার জন্যে, ওই নিয়ে মাস্টারেরা পর্য্যন্ত খিঁচুনি দিতে বাকী রাখে না। সেদিন তো এ্যাল্‌জেব্রার আঁক না পারার দরুন আমাদের সামনে সেকেণ্ড মাস্টার ওকে বললে—তুমি তো শুনিচি কেষ্ট নাম শুনলে কেঁদে ফেল—তা যাও, পয়সা আছে বাপের, মঠ বানাও, মচ্ছব দেও, লেখাপড়া করবার শখ কেন ? এ-সব তোমার হবে না বাপু।

আমি একদিন বনমালীর কাছে সন্ধ্যার সময় গিয়েছি। ও তখন একটা টুলের ওপর ব'সে একমনে দেওয়ালের দিকে চেয়ে বোধ হয় জপ করচে—আমায় দেখে উঠে দোর খুলে দিলে, হেসে বসতে বললে। ওকে অদ্ভুত মনে হয়, সেজন্যেই দেখা করতে গিয়েছিলাম যে তা নয়—আমার মনে হয়েছিল ও যে-রকম ছেলে, ও বোধ হয় আমার নিজের ব্যাপারগুলোর একটা মীমাংসা ক'রে দিতে পারবে। তা ছাড়া ওকে আমার ভাল লাগে খুব, ওকে ভাল মানুষ পেয়ে সবাই খেপায়, অথচ ও প্রতিবাদ করে না, অনেক সময় বোঝে না যে তারা খেপাচ্ছে, এতে আমার বড় মায়া হয় ওর ওপর।

বনমালীকে জিজ্ঞেস করলাম সে কিছু দেখে কিনা। সে আমার কথা বুঝতে পারলে না, বলল—কি দেখবো ?

তাকে বুঝিয়ে বললাম। না,—সে কিছু দেখে না।

তারপর একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। ঘরে একখানা ছবি ছিল, আমি সেদিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললাম—ওখানা কি তোমার ঠাকুরের ছবি ?

বনমালীর গলার সুর বদলে গেল, চোখের চাউনি অন্য রকম হয়ে গেল। সে বললে—ঠিক বলেচ ভাই, আমার ঠাকুরের ছবি, চমৎকার কথা বলেচ ভাই—ওই তো আমার সব,

আমার ঠাকুর শুধু কেন, তোমার ঠাকুর সবারই ঠাকুর—

বলতে বলতে দর দর করে তার চোখে জল পড়তে লাগল।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। কিন্তু একটু পরে বনমালীর কান্নার বেগ থামলে গর্ব্বের সুরে বললাম—খুব গোপনীয় কথা বললাম ওকে—কারও কাছে এ পর্য্যন্ত মুখ ফুটে কথাটা বলিনি। বললাম—আমার ঠাকুর অন্য কেউ নয়, আমার ঠাকুর যীশুখ্রীষ্ট—আমার কাছেও ছবি আছে—

বনমালী হাঁ ক'রে আমার দিকে চেয়ে রইল—তারপর অপ্রতিভভাবে বললে—ও তোমরা খৃষ্টান?

আমি চুপ ক'রে রইলাম।

বনমালী ভেবে বললে—তাঁর কাছে সব সমান—

আমি বললাম—কার কাছে?

—শ্রীহরির কাছে ভাই, আবার কার কাছে? তাঁর কাছে কি আর হিন্দু, মোছলমান, খৃষ্টান আছে? তিনি যে পতিতপাবন—অধমের ঠাকুর—

আমার মনে ব্যথা লাগল এই ভেবে, বনমালী আমাকে অধম মনে করেচে। যীশুখৃষ্টকে ও ছোট করতে চায়। আমি বললাম—যীশুর কাছেও সব সমান। পাপীদের জন্যে তিনি প্রাণ দিয়েছিলেন—জান? মথিলিখিত সুসমাচারে লিখেচে, যে তাহাতে বিশ্বাস করে সে অনন্ত জীবন—

মথি-লিখিত সুসমাচারের বাইরে আমার আর কিছু জানা নেই। বনমালী কিন্তু সংস্কৃতে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান আবৃত্তি ক'রে আমায় শ্রীকৃষ্ণের রূপ বুঝিয়ে দিলে—আরও অনেক কথা বললে। আমি দু-তিন দিন তার কাছে গেলাম, তার ঠাকুর সম্বন্ধে শুনবার জন্যে। জ্যাঠাইমাদের বাড়ির সকলের চেয়ে ও বেশী জানে ওদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে—এ আমার মনে হ'ল। কিন্তু বনমালী আমার খ্রীষ্টভক্তি ভাল চোখে দেখলে না, বললে—হিন্দু হয়ে ভাই এ তোমার ভারি অদ্ভুত কাণ্ড যে তুমি অপরের দেবতাকে ভক্তি করো। গীতায় বলেচে, স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ—অর্থাৎ নিজের ধর্ম্মে—

আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম, হিন্দু আমি কখনই না। আমরা যেখানে যে-অবস্থায় মানুষ হয়েচি সেখানে হিন্দুধর্ম্মের কথা কিছু শুনিনি কোনো দিন; কেউ বলত না। যা বলত, তাই শুনেচি, তাই বিশ্বাস করেচি—তা মনে লেগেচে। এতে আমার কি কোনো দোষ হয়েচে ভাই?

সেদিন সন্ধ্যার সময় আমাদের দালানে আমি ব'সে পড়চি, এমন সময় কার পায়ের শব্দ শুনে চেয়ে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম—ছোটকাকীমা দাঁড়িয়ে! ছোটকাকীমা বড়মানুষের মেয়ে, তিনি তো কস্মিন্‌কালে আমাদের ভাঙা দালানে পা দেননি—বিশেষ ক'রে আমাদের দু-চোখে তিনি দেখতে পারেন না কোনো কালে—বরং মেজকাকীমা সময়ে অসময়ে নরম হন, ছোট কাকীমার মুখে মিষ্টি কথা কোনো দিন শুনিওনি। আমাদের ঘরে আর কেউ নেই—দাদা এখনও ফেরেনি—সীতা ও মা জ্যাঠাইমাদের অন্দরে। আমি দাঁড়িয়ে উঠে থতমত খেয়ে বললাম—কি কাকীমা?

ছোটকাকীমা এদিক-ওদিক চেয়ে নীচু সুরে বললেন—তোর সঙ্গে কথা আছে জিতু।

আমি বললাম—কি বলুন?

কাকীমা বললেন—পানী যে-রাতে মারা যায়, সেদিন তুই আমায় কি বলছিলি মনে আছে?

আমার ভয় হ'ল,—বললাম—না, কাকীমা।

ছোটকাকীমা হঠাৎ আমার হাত দুটো তাঁর দু'হাতের মধ্যে নিয়ে বললেন—বল্ বাবা জিতু, সেদিন তোর কথা সবাই উড়িয়ে দিয়েছিল, আমি কিন্তু তারপর সব বুঝেছিলাম, কাউকে বলিনি। পানী ছেড়ে গিয়ে আমায় পাগল ক'রে রেখে গিয়েচে—তুই বল্ জিতু। আমার মাকে তুই দেখেছিলি সে-রাত্রে, তিনি পানীকে ভালবাসতেন, তাই নিতে এসেছিলেন—মরে গিয়েও তাঁর পানীর কথা—

আমি জানতাম না যে পানীর দিদিমা মারা গিয়েচেন। আমি বিস্ময়ের সুরে জিজ্ঞেস করলাম—আপনার মা বেঁচে নেই?

—না, পানী তাঁর কাছ থেকে ফাল্গুন মাসে এল, তিনি আষাঢ় মাসে তো মারা গেলেন। তুই পানীকে দেখতে পাস্ জিতু? তোকে সেদিন সবাই পাগল বললে, কিন্তু আমি তারপর ভেবে দেখলাম তোর কথার একটুও পাগলামি নয়—সব সত্যি। তুই আমার মাকে দেখতে পেয়েছিলি—সত্যি বল্ না জিতু বাবা, পানীকে দেখিস্?

আমার চোখেও জল এল। ছোট কাকীমাকে এত কাতর দেখিনি কখনও—তা ছাড়া পানীকে আমিও বড় ভালবাসতাম এ বাড়ির ছেলেমেয়েদের মধ্যে। বললাম—না কাকীমা, পানীকে আমি কোনো দিন দেখিনি—আপনার পা ছুঁয়ে বলতে পারি—

ছোটকাকীমা আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন, মেজকাকার গলার স্বর শুনে তিনি পালিয়ে গেলেন। ছোটকাকীমার কথা শুনে আমি কিন্তু আকাশ-পাতাল ভাবতে বসলাম। আমি সেদিন সত্যি সত্যি কাউকে দেখেছিলাম তবে? সে যেই হোক্, পানীর দিদিমাই হোক, মরাই হোক্ বা জীবন্তই হোক্! এটা তা হ'লে আমার রোগ নয়? আর কেউ তবে দেখে না কেন?

কিংবা হয়ত ছোটকাকীমা মেয়ের শোকে বুদ্ধি হারিয়েছেন, কি বলচেন না-বলচেন, উনিই জানেন না। ওঁর কথার উপর বিশ্বাস কি?

॥ ৬ ॥

জ্যাঠামশায়দের বাড়ি আরও বছর দুই কেটে গেল এই ভাবেই। যত বছর কেটে যায়, এদের এখানে থাকা আমার পক্ষে তত বেশি কঠিন হয়ে পড়তে লাগল। আমার বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে অনেক জিনিস আমি বুঝতে পারি আজকাল, আগে আগে অত বুঝতাম না। এ বাড়িতে থাকা আমার পক্ষে আরও কঠিন হয়ে উঠেছিল এইজন্যে যে, আমি চেষ্টা করেও জ্যাঠাইমাদের ধর্ম্ম ও আচারের সঙ্গে নিজেকে কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পেরে উঠলাম না।

এরা খুব ঘটা ক'রে যেটা ধর্ম্ম ব'লে আচরণ করেন, আমার মনের সঙ্গে সেটা তো আদৌ মেলে না—আমি মনে যা বলি, বাইরে তাই করি—কিন্তু ওঁরা তাতে চটেন। ওঁদের ধর্ম্মের যেটা আমার ভাল লাগে—সেটাকে ওঁরা ধর্ম্ম বলেন না।

কিন্তু একটা ব্যাপার হয়েচে এই, আগে ভাবতাম শুধু জ্যাঠাইমাদের বাড়িতেই বুঝি এই রকম, এখন বয়স বাড়বার সঙ্গে বুঝতে পেরেছি—এ গ্রামের অধিকাংশই এই রকম—জ্যাঠাই-

মায়েরা একটু বেশী মাত্র।

এতেই আমার সন্দেহ হ'ল বোধ হয় আমার মধ্যেই কোনো দোষ আছে, যার ফলে আমি এঁদের শিক্ষা নিতে পারচি নে। ভাবলাম আমার যে ভাল লাগে না, সে বোধ হয় আমি বুঝতে পারি না বলেই—হয়ত চা-বাগানে থাকার দরুন ওদের ধর্ম্ম আমরা শেখবার সুযোগ পাইনি, যে আবহাওয়ার মধ্যে ছেলেবেলা থেকে মানুষ হয়েচি, সেটাই এখন ভাল লাগে।

ম্যাট্রিক পাস ক'রে শ্রীরামপুর কলেজে ভর্ত্তি হলাম। জ্যাঠামশায়দের গ্রাম আটঘরার নবীন চৌধুরী—যার বড় ছেলে ননী ভাল ফুটবল খেলতে পারে এবং যে প্রায়শ্চিত্তের বাধা-বিঘ্ন না মেনে বাবার সৎকারের সময়ে দলবল জুটিয়ে এনেছিল—তারই ভগ্নীপতির বাড়ি অর্থাৎ নবীন চৌধুরীর বড় মেয়ে শৈলবালার শ্বশুরবাড়ি শ্রীরামপুরে। ননীর যোগাড়যন্ত্রে তাদের শ্বশুরবাড়িতে আমার থাকবার ব্যবস্থা হ'ল।

এসে দেখি এদেরও বেশ বড় সংসার, অনেক লোক। শৈলদিদির স্বামীরা ছ'ভাই, তার মধ্যে চার ভাইয়ের বিয়ে হয়েচে, আর একটি আমার বয়েসী, ফার্স্ট ইয়ারেই ভর্ত্তি হ'ল আমার সঙ্গে। সকলের ছোট ভাই স্কুলে পড়ে। শৈলদি বাড়ির বড়বৌ, আমি তাঁর দেশের লোক, সবাই আমাকে খুব আদরযত্ন করলে। এখানে কিছুদিন থাকবার পরে বুঝলাম যে, সংসারে সবাই জ্যাঠামশায়দের বাড়ির ছাঁচে গড়া নয়। চা-বাগান থেকে এসে বাংলা দেশ সম্বন্ধে যে একটা হীন ধারণা আমার হয়েছিল, সেটা এখানে দু-চার মাস থাকতে থাকতে চলে গেল। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম যে এ বাড়ির মেয়েরা কেউ কারও বড় একটা অধীন নয়। কোন একজনকে সকলের ভয় ক'রে চলতে হয় না বা কোন একজনের কথায় সকলকে উঠতে বসতে হয় না।

আমি থাকি বাইরের একটা ঘরে, কিন্তু অল্পদিনেই আমি বাড়ির ছেলে হয়ে পড়লাম। শৈলদিদি খুব ভাল, আমাকে ভাইয়ের মত দেখে। কিন্তু এতবড় সংসারের কাজকর্ম্ম নিয়ে সে বড় ব্যস্ত থাকে—সব সময় দেখাশুনো করতে পারে না। শৈলদিদির বয়স আমার মেজকাকীমার চেয়ে কিছু ছোট হবে—তিন-চারটি ছেলেমেয়ের মা। আটঘরায় থাকতে খুব বেশী আলাপ ছিল না, দু-একবার জ্যাঠামশায়দের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে মায়ের সঙ্গে আলাপ করে এসেছিল, তারপর ননী কথাটা পাড়তেই তখনি রাজী হয়ে যায় আমায় এখানে রাখবার সম্বন্ধে। শৈলদিদির স্বামী তার কোনো কথা ফেলতে পারে না।

বাড়ির সকলের সঙ্গে খুব আলাপ হয়ে গেল। বাড়ির মধ্যে সর্ব্বত্র যাই—জ্যাঠামশায়দের বাড়ির মত এটা ছুঁয়ো না, ওটা ছুঁয়ো না—কেউ করে না। সব ঘরে যাই, সব বিছানাতেই বসি—সবাই আদরযত্ন করে, পছন্দ করে। এখন বয়স হয়েচে বুঝতে পেরেচি, আটঘরায় যতটা বাঁধাবাঁধি, এসব শহর-বাজারে অত নেই এদের। কষ্ট হয় মার জন্যে, সীতার জন্যে—তারা এখনও জ্যাঠাইমার কঠিন শাসনের বাঁধনে আবদ্ধ হয়ে ক্রীতদাসীর মত উদয়াস্ত খাটচে। দাদার জন্যেও কষ্ট হয়। সে লেখাপড়া শিখলে না—চাকুরি করবে সংসারের দুঃখ ঘুচোবে বলে—কিন্তু চাকুরি পায় না, ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, আজ বারো টাকা মাইনের চাকুরি করে, কাল জবাব হয়ে যায়, আবার আর এক জায়গায় ষোল টাকা মাইনের চাকুরি জোটায়। এত সামান্য মাইনেতে বিদেশে খেয়ে পরে কোন মাসে পাঁচ টাকা, কোন মাসে তিন টাকার বেশী মাকে পাঠাতে পারে না, তাতে কি দুঃখ ঘুচবে? অথচ না শিখলে লেখাপড়া, না করতে পারলে কিছু।

কলেজের ছুটির পরে গঙ্গার ধারে একখানা বেঞ্চির ওপর বসে এই সব কথাই ভাবছিলাম।

মাঝে মাঝে ভয়ানক ইচ্ছে হয় আবার একবার চা-বাগানের দিকে যাই, আর একবার হিমালয় দেখি। কতকাল রডোডেনড্রন ফুল দেখিনি, পাইন-বন দেখিনি, কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখিনি—সে রকম শীত আর পাইনি কোনোদিন,—এদের সবাইকে দেখাতে ইচ্ছে হয় সে দেশ। স্কুলে যখন প্রবন্ধ লিখতে দিত, আমি হিমালয় নিয়ে লিখতাম—আমার লেখা সকলের চেয়ে ভাল হ'ত—কারণ বাল্যের স্বপ্ন-মাখানো সে ওক পাইন বন, ঝর্ণা, তুষারমণ্ডিত কাঞ্চনজঙ্ঘা, কুয়াশা, মেঘ আমার কাছে পুরনো হবে না কোনো দিন, তাদের কথা লিখতে গেলে নতুনতর ভাব ও ভাষা কোথা থেকে এসে জোটে, মনে হয় আরও লিখি, এখনও সব বলা হয়নি। লেখা অপরে ভাল বললেও আমার মন তৃপ্ত হ'ত না, মনে হ'ত যা দেখেচি তার অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও আঁকতে পারলাম না—অপরে ভাল বললে কি হবে, তারা তো আর দেখেনি ?

ওপারে ব্যারাকপুরে সাদা বাড়িগুলো যেন সবুজের সমুদ্রে ডুবে আছে। ঠিক যেন চা-ঝোপের আড়ালে ম্যানেজার সাহেবের কুঠী—লাল টালির ছাদ থাকলেই একেবারে চা-বাগান। ওই দিকে চেয়েই তো রোজ বিকেলে আমার মনে হয় বাল্যের চা-বাগানের সেই দিনগুলো।

বাড়ি ফিরে গেলাম সন্ধ্যার পরে। চাকরকে ডেকে বললাম, লুলু আলো দিয়ে যা। এমন সময়ে ভবেশ এল। ভবেশ সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে, খুব বুদ্ধিমান ছেলে, স্কলারশিপ্ নিয়ে পাস করেচে—প্রথম দিনেই কলেজে এর সঙ্গে আলাপ হয়।

ভবেশের দৈনন্দিন কাজ—রোজ এসে আমার কাছে খৃষ্টান ধর্ম্মের নিন্দা করা। আমাকেও খৃষ্টান ধর্ম্মের কবল থেকে উদ্ধার ক'রে নাকি হিন্দু করবেই। আজও সে আরম্ভ করলে, বাইবেলটা নিতান্ত বাজে, আজগুবী গল্প। খৃষ্টান ইউরোপ এই সেদিনও রক্তে সারা দুনিয়া ভাসিয়ে দিলে গ্রেট ওয়ারে। কিসে তুমি ভুলেচ ? রোজ যাও পিকারিং সাহেবের কাছে ধর্ম্মের উপদেশ নিতে। ওরা তো তোমাকে খৃষ্টান করতে পারলে বাঁচে। তা ছাড়া আজ হিন্দুদের বলবৃদ্ধি করা আমাদের সবার কর্ত্তব্য—এটা কি তোমার মনে হয় না ?

আমি বললাম—তুমি ভুল বুঝেছ ভবেশ, তোমাকে এক দিনও বোঝাতে পারলাম না যে আমি খৃষ্টান নই ; খৃষ্টান ধর্ম্ম কি জিনিস আমি জানিনে—জানবার কৌতূহল হয় তাই পিকারিং সাহেবের কাছে জানতে চাই। আমি যীশুখৃষ্টের ভক্ত, তাঁকে আমি মহাপুরুষ বলে মনে করি। তাঁর কথা আমার শুনতে ভাল লাগে। তাঁর জীবন আমাকে মুগ্ধ করে। এতে দোষ কিসের আমি তো বুঝি নে।

—ও বটে ! বুদ্ধ, চৈতন্য, কৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ, এঁরা সব ভেসে গেলেন—যীশুখৃষ্ট হ'ল তোমার দেবতা ! এঁরা কিসে ছোট তোমার যীশুর কাছে জিজ্ঞেস করি ?

—কে বলেছে তাঁরা ছোট ? ছোট কি বড় সে কথা তো উঠছে না এখানে ? আমি তাঁদের কথা বেশী জানি নে। যতটুকু জানি তাতে তাঁদের শ্রদ্ধা করি। কিন্তু এও ত হয় কেউ একজনকে বেশি ভালবাসে আর একজনকে কম ভালবাসে ?

—তুমি যতই বোঝাও জিতেন, আমার ও ভাল লাগে না। দেশের মাটির সঙ্গে যোগ নেই ওর। তোমার মত চমৎকার ছেলে যে কেন বিপথে পা দিলে ভেবে ঠিক করতে পারিনে। তোমার লজ্জা করে না একথা বলতে যে, রামকৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্যের কথা কিছু জান না, তাঁদের কথা জানতে আগ্রহও দেখাও না, অথচ রোজ যাও যীশুখৃষ্টের বিষয় শুনতে ? একশোবার বলবো তুমি বিপথে পা দিয়ে দাঁড়িয়েচ। কই, একদিন গীতা পড়েচ ? অথচ গস্‌পেল পড়তে যাও পিকারিঙের কাছে—তোমাকে বন্ধু বলি তাই কষ্ট হয়, নইলে তুমি উচ্ছন্ন যাও না, আমি

বলতে যাব কেন ?

ভবেশ চলে গেলে অনেক রাত পর্য্যন্ত কথাটা ভাবলাম। খৃষ্টকে আমি ভক্তি করি, খৃষ্টের কথা বলতে ভাল লাগে, শুনতে ভাল লাগে। এতে দোষ আছে কিছু? মহাপুরুষের কি দেশ-বিদেশ আছে ?

রাত্রে বাড়ির মধ্যে খেতে গিয়ে দেখি আর সকলের খাওয়া হয়ে গিয়েচে। ছোট বউ অর্থাৎ শৈলদিদির ছোট জায়ের রান্নার পালা ছিল এবেলা—তিনি হাঁড়িকুঁড়ি নিয়ে বসে আছেন। আমি খেতে বসলাম কিন্তু কেমন অস্বস্তি বোধ হ'তে লাগল—শৈলদিদির এই ছোট জাকে আমি কি জানি কেন পছন্দ করিনে। মেজবউ, সেজবউকে যেমন মেজদি, সেজদি ব'লে ডাকি—ছোটবউকে আমি এ পর্য্যন্ত কোন কিছু ব'লে ডাকিনি। অথচ তিনি আমার সামনে বেরোন বা আমার সঙ্গে কথা বলেন। ছোটবউয়ের বয়স আমার সমান হবে, এই সতেরো আঠারো—আমি যদিও 'আপনি' ব'লে কথা বলি। বাড়ির সব মেয়েরা ও বৌয়েরা জানে যে ছোটবউয়ের সঙ্গে আমার তেমন সদ্ভাব নেই। কেন আমি তাকে ছোটদিদি ব'লে ডাকিনে, শৈলদি আমায় এ নিয়ে কতবার বলেচে। কিন্তু আমার যা ভাল লাগে না, তা আমি কখনও করিনে।

সেদিন এক ব্যাপার হয়েচে। খেয়ে উঠে অভ্যাসমত পান চেয়েচি—কাউকে বিশেষ ক'রে সম্বোধন ক'রে নয়, যেন দেওয়ালকে বলচি এই ভাবে। ছোটবউ আধ-ঘোমটা দিয়ে এসে পান আমার হাতে দিতে গেলেন—আমার কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হ'ল কেন জানিনে, অন্য কারুর বেলা আমার তো এমনি অস্বস্তি বোধ হয় না? পান দেবার সময় তাঁর আঙুলটা আমার হাতে সামান্য ঠেকে গেল—আমি তাড়াতাড়ি হাত টেনে নিলাম। আমার সারা গা কেমন শিউরে উঠল, লজ্জা ও অস্বস্তিতে মনে হ'ল, পান আর কখনও এমনভাবে চাইব না। মেজদি কি শৈলদির কাছে গিয়ে চেয়ে নেবো।

সেইদিন থেকে ছোটবউকে আমি এড়িয়ে চলি।

মাস-কয়েক কেটে গেল। শীত পড়ে গিয়েচে।

আমি দোতলার ছাদে একটা নিরিবিলি জায়গায় রোদে পিঠ দিয়ে বসে জ্যামিতির আঁক কষচি।

সেজদি হাসতে হাসতে ছাদে এসে বললেন—জিতু এস, তোমায় ওরা ডাকচে।

আমি বললুম—কে ডাকচে সেজদি ?

সেজদির মুখ দেখে মনে হ'ল একটা কি মজা আছে। উৎসাহ ও কৌতূহলের সঙ্গে পেছনে পেছনে গেলাম। দোতলার ওদিকের বারান্দাতে সব মেয়েরা জড়ো হয়ে হাসাহাসি করচে। আমায় সবাই এসে ঘিরে দাঁড়াল, বললে—এস ঘরের মধ্যে।

তাদের পেছনে ঘরে ঢুকতেই সেজদি বিছানার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন—ওই লেপটা তোল তো দেখি কেমন বাহাদুরি।

বিছানাটার উপর আগাগোড়া লেপ-ঢাকা কে একজন শুয়ে আছে লেপ মুড়ি দিয়ে। সবাই বললে—তোল তো লেপটা !

আমি হাসিমুখে বললাম—কি বলুন না সেজদি, কি হয়েচে কি ?

ভাবলুম বোধ হয় শৈলদির ছোট দেওর অজয়কে এরা একটা কিছু সাজিয়েচে বা ঐ রকম কিছু। তাড়াতাড়ি লেপটা টেনে নিয়েই চমকে উঠলাম। লেপের তলায় ছোটবৌঠাকুরুন,

মুখে হাসি টিপে চোখ বুজে শুয়ে।

সবাই খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল। আমি লজ্জায় লাল হয়ে তাড়াতাড়ি ঘরের বার হয়ে গেলাম। বা রে, এ কি কাণ্ড ওদের? কেন আমায় নিয়ে এ রকম করা? তা ছাড়া—ছিঃ—না, ওকি কাণ্ড? ছোটবৌঠাক্‌রুন স্বেচ্ছায় এ ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছেন নিশ্চয়। আমার রাগ হ'ল তাঁর ওপরে।

এর দিন-দুই পরে আমি আমার নিজের ঘরে একা বসে আছি, এমন সময় হঠাৎ ছোটবৌঠাক্‌রুনকে দোরের কাছে দেখে অবাক হয়ে গেলাম—তিনি আমার ঘরে কখনও আসেননি এ পর্য্যন্ত। কিন্তু তিনি যেমনি এলেন, তেমনি চলে গেলেন, একটু দাঁড়ালেন না, যাবার আগে ঘরের মধ্যে কি একটা ফেলে দিয়ে গেলেন।

আমি বিস্মিত হয়ে তুলে দেখলাম একখানা ভাঁজ করা ছোট কাগজ—একখানা চিঠি! ছোট্ট চিঠি, দু-কথায়—

"সেদিন যা ক'রে ফেলেচি, সেজন্য আপনার কাছে মাপ চাই। আমি নিজের ইচ্ছেতে কিছু করিনি। দলে পড়ে করেচি, ক'দিন ধ'রে ভাবচি আপনার কাছে মাপ চাইব—কিন্তু লজ্জায় পারিনি! আমি জানি আপনার মন অনেক বড়, আপনি ক্ষমা করবেন।"

পত্রে কোন নাম নেই। আমি সেখানা বার বার পড়লাম—তারপর টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেললাম—কিন্তু টুকরোগুলো ফেলে দিতে গিয়ে কি ভেবে আমার একটা ছোট মনি-ব্যাগ ছিল, তার মধ্যে রেখে দিলাম।

সেদিন থেকে আমার কি হ'ল, আমি একা থাকলেই ছোটবৌঠাকরুনের কথা ভাবি। কিছুতেই মন থেকে আমি তাঁর চিন্তা ছাড়াতে পারিনে। দু-পাঁচদিন ক'রে হপ্তাখানেক কেটে গেল। আমি বাড়ির মধ্যে তেমন আর যাইনে—অত্যন্ত ভয়, পাছে একা আছি এমন অবস্থায় ছোটবৌঠাক্‌রুনের সঙ্গে দেখা হয়ে পড়ে। ছোটবৌয়ের রান্নার পালার দিন আমি সকাল সকাল খেয়ে নি, যখন অনেক লোক রান্নাঘরে থাকে। যা যখন দরকার হয়, শৈলদি কি সেজদির কাছে চাই—ওদের গলা না শুনতে পেলে বাড়ির মধ্যে যেতে সাহস হয় না।

সেজদি একদিন বললেন,—জিতু, তুমি কলেজ থেকে এসে খাবার খাওয়া ছেড়ে দিলে নাকি? বিকেলে তো বাড়ির মধ্যে থাকই না, আসই না, কোথাও থেকে খেয়ে আস বুঝি?

আমি জানি বিকেলের চা-খাবার প্রায়ই ছোটবৌ তৈরি করেন—আর সে সময় বড় একটা কেউ সেখানে থাকে না। যে যার খেয়ে চলে যায়। ইচ্ছা ক'রেই বিকেলে চা খেতে যাই নে। পয়সা যেদিন থাকে, স্টেশনের দোকান থেকে খেয়ে আসি।

শীত কেটে গেল, বসন্ত যায়-যায়। আমার ঘরে জানলার ধারে বসে পড়চি, হঠাৎ জানলার পাশের দরজা দিয়ে ছোটবৌঠাক্‌রুন কোথা থেকে বেড়িয়ে এসে বাড়ি ঢুকচেন, সঙ্গে শৈলদির ছেলে কালো। তিনি আমায় দেখতে পাননি। আমি অপলকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলাম তাঁর দিকে। তাঁকে যেন নতুন রূপে দেখলাম—আরো কতবার দেখেচি, কিন্তু আজ দেখে মনে হ'ল এ-চোখে আর কখনও দেখিনি তাঁকে। তাঁর কপালের অমন সুন্দর গড়ন, পাশের দিক থেকে তাঁর মুখ যে অমন সুশ্রী দেখায়, ভুরুর ও চোখের অমন ভঙ্গি—এ-সব আগে তো লক্ষ্য করিনি? যখন কেউ দেখে না, তখন তাঁর মুখের কি অদ্ভুত ধরনের ভাব হয়! তিনি বাড়ির মধ্যে ঢুকে যেতেই আমার চমক ভাঙলো। বই খুলে রেখে দিলাম—পড়ায় আর মন

বসল না, সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম। কি একটা কষ্ট হ'তে লাগল বুকের মধ্যে—যেন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস আটকে আসচে। মনে হ'ল চুপ ক'রে বসে থাকতে পারব না, এক্ষুনি ছুটে মুক্ত বাতাসে বেরুতে হবে।

সেই রাত্রে আমি তাঁকে চিঠি লিখতে বসলাম—চিঠি লিখে ছিঁড়ে ফেললাম। আমার লিখে আবার ছিঁড়লাম। সেদিন থেকে তাঁকে উদ্দেশ ক'রে চিঠি লেখা যেন আমার কলেজের টাস্কের সামিল হয়ে দাঁড়ালো—কিন্তু লিখি আর ছিঁড়ে ফেলি।

দিন-পনের পরে ঠিক করলাম, আজ চিঠি দেবই। সেদিন বেলা দেড়টার মধ্যে কলেজ থেকে ফিরে এলাম—গ্রীষ্মের দুপুর, সবাই ঘুমুচ্চে। আমি বাড়ির মধ্যে ঢুকলাম, সিঁড়ির পাশে দোতলায় তাঁর ঘর, তিনি ঘরে বসে সেলাই করছিলেন—আমি সাহস ক'রে ঘরে ঢুকে চিঠি দিতে পারলাম না, চলে আসছিলাম, এমন সময় তিনি মুখ তুলেই আমায় দেখতে পেলেন, আমি লজ্জায় ও ভয়ে অভিভূত হয়ে সেখান থেকে সরে গেলাম, ছুটে নীচে এলাম—পত্র দেওয়া হ'ল না; সাহসই হ'ল না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথে পথে উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়ালাম লক্ষ্যহীন ভাবে। সারাদিন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে অনেক রাত্রে বাড়ি যখন ফিরি, রাত তখন বারোটা। বাড়িতে আবার সেদিন লক্ষ্মীপূজা ছিল। খেতে গিয়ে দেখি রান্নাঘরের সামনের বারান্দায় আমার খাবার ঢাকা আছে, শৈলদি ঢুলচেন রান্নাঘরের চৌকাঠে বসে। মনে মনে অনুতাপ হ'ল, সারা বিকেল খাটুনির পরে শৈলদি বেচারী কোথায় একটু ঘুমুবে, আর আমি কি না এভাবে বসিয়ে রেখেচি!

আমাকে দেখে শৈলদি বললে—বেশ, কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

কথার উত্তর দিতে গেলে মুশকিল, চুপচাপ খেতে বসলাম—শৈলদি বললে—না খেয়ে ঢন্ ঢন্ করে বেড়িয়ে বেড়িয়ে কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে গিয়েচে। চা খেতেও আসিস্ নে বাড়ির মধ্যে, কালোকে দিয়ে বাইরের ঘরে খাবার পাঠিয়ে দিলেও পাওয়া যায় না···থাকিস্ কোথায়?

খানিকক্ষণ পরে পাতের দিকে চেয়ে বললে—ও কি, ভাল ক'রে ভাত মাখ। ঐ ক'টি খেয়ে মানুষ বাঁচে ভাই? তোরা এখন ছেলেমানুষ, খাবার বয়স। লুচি আছে ভোগের, দেবো? পায়েস তুই ভালবাসিস, এক বাটি পায়েস আলাদা করা আছে। কই মাছের মুড়ো ফেললি কেন, চুষে চুষে খা। আহা, কি ছিরি হচ্ছে চেহারার!

পরদিন কিসের ছুটি। আমি দোতলার ছাদে কালোকে ডাকতে গিয়েচি তার প্রাইভেট টিউটর নীচে পড়াতে এসেচে ব'লে। সন্ধ্যার অন্ধকার হয়েছে। ওপরে উঠেই আমি একেবারে ছোটবৌঠাকুরুনের সামনে পড়ে গেলাম। তাঁর কোলে মেজদির দেড় বছরের খুকী মিণ্টু—সে খুব ফুটফুটে ফর্সা ব'লে বাড়ির সকলের প্রিয়, সবাই তাকে কোলে পাবার জন্যে ব্যগ্র। ছোটবৌঠাকরুন হঠাৎ আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন খুকীকে কোলে ক'রে। আমি বিস্মিত হ'লাম, কপালে ঘাম দেখা দিল। খুকী আমায় চেনে, সে আমার কোলে ঝাঁপিয়ে আসতে চায়। ছোটবৌঠাকুরুন আমার আরও কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন—খুকীকে আমার কোলে দিলেন। তাঁর পায়ের আঙুল আমার পায়ের আঙুলে ঠেকল। আমি তখন লাল হয়ে উঠেচি, শরীর যেন ঝিম্ ঝিম্ করচে। কেউ কোন দিকে নেই।

ছোটবৌঠাকুরুন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে স্বর নিচু ক'রে বললেন—আপনি আর বাড়ির মধ্যে আসেন না কেন আজকাল? আমার ওপর রাগ এখনও যায়নি?

আমি অতি কষ্টে বললাম—রাগ করব কেন?

—তবে সেদিন ও-ঘরে এলেন, আমার সঙ্গে কথা বললেন না তো! চলে গেলেন কেন?

মরীয়া হয়ে বললাম—আপনাকে সেদিন চিঠি দেবো ব'লে এসেছিলাম, কিন্তু পাছে কিছু মনে করেন, সেজন্যে দেওয়া হয়নি। পাছে কিছু মনে করেন ভেবেই বাড়ির মধ্যে আসিনে।

তিনি খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। তার পর মৃদুস্বরে বললেন—মাথা ঠাণ্ডা ক'রে লেখাপড়া করুন। কেন ও-রকম করেন? আর বাড়ির মধ্যে আসেন না কেন? ওতে আমার মনে ভারি কষ্ট হয়। যেমন আসতেন তেমনি আসবেন বলুন? আমায় ভাবনার মধ্যে ফেলবেন না ও রকম।

আমার শরীরে যেন নতুন ধরনের অনুভূতির বিদ্যুৎ খেলে গেল। সেখানে আর দাঁড়াতে পারলাম না—মুখে যা এল, একটা জবাব দিয়ে নীচে নেমে এলাম। সারারাত্র আর ঘুমুতে পারিনে। আমার জন্যে একজন ভাবে এ চিন্তার বাস্তবতা আমার জীবনে একেবারে নতুন। নতুন নেশার মত এ অনুভূতি আমার সারা দেহমন অভিভূত ক'রে তুললে।

কি অপূর্ব্ব ধরনের আনন্দ-বেদনায় মাখানো দিন, সপ্তাহ, পক্ষ, মাস! দিন রাতে সব সময়ই আমার ওই এক চিন্তা। নির্জ্জনে কাটাই, কিছু ভাল লাগে না, অথচ যাঁর চিন্তা শয়নে-স্বপনে সর্ব্বদাই করি, পাছে তাঁর সামনে পড়ি এই ভয়ে সতর্ক হয়ে চলাফেরা করি। লেখাপড়া, খাওয়া, ঘুম সব গেল।

বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি ছোটবৌঠাকুরুনের হ'ল অসুখ। অসুখ ক্রমে বাড়াবাড়ি ধরনের হ'ল। চাতরা থেকে যদু ডাক্তার দেখতে এল। তাঁর বাপের বাড়ি থেকে লোকজন এসে পড়ল—বাড়িসুদ্ধ লোকের মুখে উদ্বেগের চিহ্ন। আমি ডাক্তার ডাকা, ওষুধ আনা এ সব করি বাড়ির ছেলেদের সঙ্গে, কিন্তু একদিনও রোগীর ঘরে যেতে পারলাম না—কিছুতেই না। একদিন ঘরের দোরের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম—কিন্তু চৌকাঠের ওপারে যাইনি।

ক্রমে তিনি সেরে উঠলেন। একদিন আমার 'চয়নিকা'-খানা তিনি চেয়ে পাঠালেন—দিন-দুই পরে কালো বই ফিরিয়ে দিয়ে গেল। চার-পাঁচ দিন পরে 'চয়নিকা'-খানা কি জন্যে খুলতে গিয়েচি, তার মধ্যে একখানা চিঠি, ছোটবৌঠাকুরুনের হাতে লেখা।

নাম নেই কারুর। লেখা আছে···

"আমার অসুখের সময় সবাই এল, আপনি এলেন না কেন? আমি কত আশা করেছিলাম যে আপনি দেখতে আসবেন, জানেন তা? আমার মরে যাওয়াই ভাল। কেন যে আবার সেরে উঠলাম। অসুখ থেকে উঠে মন ও শরীর ভেঙে গেছে। কালোর মুখে শুনেচি, আপনি ঘরে টাঙিয়ে রেখেচেন যীশুখৃষ্টের ছবি, তিনি হিন্দুর দেবতা নন—কিন্তু আপনি যাকে ভক্তি করেন—আমি তাঁকে অবহেলা করতে পারিনে। আমার জন্যে তাঁর কাছে প্রার্থনা করবেন! আর-একটা কথা—একটিবার দেখতে কি আসবেন না?"

যীশুখৃষ্টের ছবির দিকে চাইলাম। সম্প্রতি একখানা বুদ্ধের ছবি, আর একখানা চৈতন্যের ছবিও এনে টাঙিয়েছিলাম। রোগশীর্ণা পত্রলেখিকার করুণ আকৃতি ওদের চরণে পৌঁছে দেবার ভার আমার ওপর পড়েচে। কিন্তু আমি কি পারব? অনুকম্পায় মমতায় আমার মন তখন ভরে উঠেচে। যে প্রার্থনা ওদের কাছে জানালাম, তা ভাষাহীন, বাক্যহীন। আমি এ-ছাড়া আর কিছু করতে পারিনে। সামনে হঠাৎ যেতে পারব না তাঁর। এ-বাড়িতেও আর বেশিদিন থাকা হবে না আমার। চলে যাব এখান থেকে।

টেস্ট পরীক্ষা দিয়েই আটঘরায় পালাবো, ঠিক করলাম। সেখানে যাইনি অনেক দিন।

মা চিঠি লিখেছেন, দেখবার জন্য ব্যস্ত হয়েচেন। আমার সেখানে যেতে ইচ্ছে হয় না শুধু জ্যাঠাইমাদের ব্যবহারের জন্য। গেলেই মায়ের দুঃখ দেখতে হবে। দাদা এক বাতাসার কারখানায় চাকরি পেয়েচে, মাসে কিছু টাকা অতি কষ্টে পাঠায়। সীতা বড় হয়ে উঠল—তারই বা কি করা যায়? দাদা একাই বা কি করবে!

পিকারিং সাহেব আমার হাতে গীতা দেখে একদিন বললেন—তুমি এ-সব পড় নাকি? বাইবেল কি তোমার সকল আধ্যাত্মিক অভাব পূর্ণ করে না?

আমি বললাম—পড়ে দেখতে কি দোষ আছে সাহেব? তাছাড়া আমি তো খৃষ্টান নই, আমি এখনও হিন্দু।

—দু-নৌকাতে পা দেওয়া যায় না, মাই বয়। তুমি খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত হও—নয়তো তুমি বাইবেল পড় কেন?

—সাহেব, যদি বলি ইংরেজী ভাষা ভাল ক'রে শেখবার জন্যে?

পিকারিং সাহেব হো হো ক'রে হেসে উঠল। বললে—তোমার আত্মার পরিত্রাণ তার চেয়েও বেশি দরকারী। যীশুতে বিশ্বাস না করলে আত্মার ত্রাণ নেই। তিনি আমাদের সকলের পাপের ভার নিজে নিয়ে ক্রুশের নিষ্ঠুর মৃত্যু বরণ করেছিলেন। যীশুর ধর্ম্মে দীক্ষিত হও, তোমার পাপ তাঁর রক্তে ধুয়ে যাবে। এস, আমার সঙ্গে গান কর।

তারপর সাহেব নিজেই গান ধরল।—

Nothing but the Blood of Jesus
Oh, precious is the flow.
That can make me white as snow,
No other fount I know
Nothing but the Blood of Jesus.

পিকারিং সাহেবকে আমার খুব ভাল লাগে। খুব সরল, ধর্ম্মপ্রাণ লোক। স্ত্রী মারা গিয়েচে আজ দশ-বারো বছর, আর বিয়ে করেনি,—টেবিলের ওপর নিকেলের ফ্রেমে বাঁধানো স্ত্রীর ফটো সর্ব্বদা থাকে। মাঝে মাঝে আমায় জিজ্ঞেস করে—আমার স্ত্রী দেখতে কেমন ছিল, ভাল না? ফটো দেখে মিসেস্ পিকারিংকে সুন্দরী মনে হয়নি আমার, তবু বলি খুব চমৎকার।

পিকারিং সাহেবের ধর্ম্মমত আমার কাছে কিন্তু অনুদার ঠেকে—কিছুদিন এদের সঙ্গে থেকে আমার মনে হয় জ্যাঠাইমারা যেমন গোঁড়া হিন্দু—খৃষ্টানদের মধ্যেও তেমনি গোঁড়া খৃষ্টান আছে। এরা নিজের ধর্ম্মটি ছাড়া আর কারুর ধর্ম্ম ভাল দেখে না। এদের সমাজে সংকীর্ণতা আছে—এদেরও আচার আছে—বিশেষতঃ একটা নির্দ্দিষ্ট ধরনে ঈশ্বরের উপাসনা না করলে উপাসনা ব্যর্থ হ'ল এদের মতে। একখানা কি বইয়ে একবার অনন্ত নরকের গল্প পড়লাম। শেষ বিচারের দিন পর্য্যন্ত পাপীরা সেই অনন্ত নরকের অনন্ত আগুনের মধ্যে জ্বলবে পুড়বে, খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হবার আগেই যদি কোন শিশু মারা যায়—তাদের আত্মাও যাবে অনন্ত নরকে। এসব কথা প্রথম যেদিন শুনেছিলাম, আমাকে ভয়ানক ভাবিয়ে তুলেছিল। তারপর মনে হ'ল, কেন যীশু কি এতই নিষ্ঠুর? তিনি পরিত্রাণের দেবতা, তিনি সকল পাপীকেই কেন পরিত্রাণ করবেন না? যে তাঁকে জানে, যে তাঁকে না জানে—সবাইকে সমান চোখে তিনি কেন না দেখবেন? তাঁর কাছে খৃষ্টান ও অখৃষ্টানে প্রভেদ থাকবে কেন? বরং যে অজ্ঞানান্ধ তার প্রতি তাঁর অনুকম্পা বেশী হবে—আমার মনের সঙ্গে এই খৃষ্টের ছবি খাপ খায়। তিনি

প্রেমময় মুক্ত মহাপুরুষ, তাঁর কাছেও ধর্ম্মের দলাদলি থাকে কখনো? যে দেশের, যে ধর্ম্মের, যে জাতিরই হোক তিনি সবারই—যে তাঁকে জানে, তিনি তাঁর, যে না জানে, তিনি তারও।

একদিন গঙ্গার ধারে বেঞ্চির ওপরে বসে জনকতক লোক গল্প করচে—শুনলাম বরানগরে কুঠির ঘাটের কাছে একটা বাগান-বাড়িতে একজন বড় সাধু এসেচেন, সবাই দেখতে যাচ্চে। দু-এক দিনের মধ্যে একটা ছুটি পড়ল, বেলুড়ে নেমে গঙ্গা পার হয়ে কুঠির ঘাটের বাগান-বাড়ি খোঁজ করে বার করলাম। বাগান-বাড়িতে লোকে লোকারণ্য, সকলেই সাধুজীর শিষ্য, মেয়েরাও আছে। ফটকেব কাছে একজন দাড়িওয়ালা লোক দাঁড়িয়েছিল, আমি ফটকের কাছে গিয়ে আমার আসার উদ্দেশ্য বলতেই লোকটা দু-হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে বললে—ভাই, এস এস, তোমাকে নেওয়ার জন্যেই যে আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি।

আমি পছন্দ করিনে যে কেউ আমার গলা জড়িয়ে ধরে—আমি ভদ্রভাবে গলা ছাড়িয়ে নিলাম। লোকটা আমায় বাগানের মধ্যে নিয়ে গেল। আমি কৌতূহল ও আগ্রহের সঙ্গে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম। বাঁ-দিকের রোয়াকে একদল মেয়ে ব'সে একরাশ তরকারি কুটছে—একটা বড় গামলায় প্রায় দশ সের ময়দা মাখা হচ্চে,—যেদিকে চাই, খাওয়ার আয়োজন।

—সাধুর দেখা পাবো এখন?

—তিনি এখন ধ্যান করচেন। তাঁর প্রধান শিষ্য জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী ও-ঘরে আছেন, চল ভাই তোমায় নিয়ে যাই।

কথা বলচি এমন সময় একজন ভদ্রলোক এলেন, সঙ্গে একটি মহিলা—ফটকের কাছে তাঁরা মোটর থেকে নামলেন। একজন বালক-শিষ্যকে ভদ্রলোকটি কি জিজ্ঞেস করলেন—সে তাঁদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে এল আমার সঙ্গের দাড়িওয়ালা লোকটির কাছে। ভদ্রলোকটি তাকে বললেন—স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে এসেচি, তিনি কোথায়?

—কোথা থেকে আসচেন আপনারা?

—ভবানীপুর, এলগিন রোড থেকে। আমার নাম বিনয়ভূষণ মল্লিক।

দাড়িওয়ালা লোকটির শরীরের ইস্ক্রুপ কব্জা যেন সব ঢিলে হয়ে গেল হঠাৎ—সে তিন ভাগে ভেঙে হাত কচলে বললে—আজ্ঞে আসুন, আসুন, বুঝতে পেরেচি, আসুন। এই সিঁড়ি দিয়ে আসুন—আসুন মা-লক্ষ্মী—

আমি বিস্মিত হ'লাম। এই যে বললে সাধুজী ধ্যানে বসেচেন—তবে ওঁরা গেলেন যে! লোকটি ওঁদের ওপরে দিয়ে আবার নেমে এল। আমায় একটা হলঘরে নিয়ে গেল। সেখানে জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারীর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলে। জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারীর পরনে গেরুয়া আলখাল্লা, রং ফর্সা—আমার সঙ্গে বেশ ভালো ব্যবহার করলেন। তিনি আপিসের কাজে দেড়শো টাকা মাইনে পেতেন—ছেড়ে স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। স্বামীজী বলেচেন তিনি তিনটে মহাদেশ উদ্ধার করবেন, সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেই বেরিয়ে পড়বেন সে উদ্দেশ্যে। স্বামীজীর দেওয়া মন্ত্র জপ ক'রে তিনি অদ্ভুত ফল পেয়েচেন নিজে—এই সব গল্প সমবেত দর্শকের কাছে করছিলেন। আমি কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম—কি ফল পেয়েচেন মন্ত্রের? তিনি বললেন—মন্ত্র জপ করতে করতে মনে হয় যেন কোথায় পাহাড়ের উপরে বসে আছি। স্বামীজী বলেন—এ একটা উচ্চ অবস্থা। আমি আরও আগ্রহের সুরে বললাম—আর কিছু দেখেন? তিনি বললেন, জ্যোতিঃদর্শন হয় মাঝে মাঝে।

—সে কি রকম?

—দুই ভুরুর মাঝখানে একটা আগুনের শিখার মত দীপ্তি দেখতে পাই।

আমি হতাশ হ'লাম। আমি নিজে তো কত কি দেখি! এরা তো সে-সব কিছু দেখে ব'লে মনে হয় না। এরা আর কতটুকু দেখেচে তা হ'লে? পাহাড়ের ওপর বসে আছি এই দেখলেই বা কি হ'ল? ভুরুর মধ্যে আগুনের শিখা দেখলেই বা কি?

শুনলাম বেলা ছ'টার পরে স্বামীজীর দেখা পাওয়া যাবে। পাশের একটা ঘরে বসে রইলাম খানিকক্ষণ। আরও একজন বৃদ্ধ সেখানে ছিলেন। কথায় কথায় তিনি বললেন—দেখ তো বাবা—এই তোমরাও তো ছেলে। আর আমার হতচ্ছাড়া ছেলেটা পালিয়ে এসে বাড়ি থেকে এই সন্নিসির দলে যোগ দিয়েচে। এখানে তো এই খাওয়া এই থাকা। যাত্রার দলের মত এক ঘরে একশো লোক শোয়। ছেলেটার হাড়ির হাল হয়েচে—আগে একবার ফিরিয়ে নিতে এসেছিলাম—তা যায়নি। এবার আমি আসচি শুনে কোথায় পালিয়েচে হতভাগা। আহা কোথায় খাচ্চে, কি হচ্চে—এদিকে বাড়িতে ওর মা অন্নজল ছেড়েছে। এই সন্নিসির দলই তাকে সরিয়ে রেখেচে কোথায়। আজ তিন দিন এখানে বসে আছি, তা ছোঁড়া এল না। এরা তলায় তলায় তাকে খবর দিচ্চে। আবার আমার ওপর এদের রাগ কি? বলচে ছেলে তোমার মুক্তির পথে গিয়েচে, বিষয়ের কীট হয়ে আছ তুমি, আবার ছেলেটাকে কেন তার মধ্যে ঢোকাবে? শোন কথা। ওদের এখানে বিনি পয়সার চাকর হাতছাড়া হয়ে যায় তা হ'লে যে! আমায় এই মারে তো এই মারে। দু-বেলা অপমান করছে।

—কোথা থেকে আপনার ছেলে এদের দলে এল?

—এই সন্নিসির দল গেছল আমাদের মাদারিপুরে। খুব কীর্ত্তন ক'রে ভিক্ষে ক'রে শিষ্য-সেবক তৈরি ক'রে বেড়াল ক'দিন। সেখান থেকে ছেলেটাকে ফুস্‌লে নিয়ে এসেচে। পয়সা হাতে থাকত আমার তো ব্যাটারা খ্যাতির করত। এখানে খেতে দেয় না; ওই বাজারের হোটেল থেকে খেয়ে আসি। একটু এই দালানটাতে রাত্রে শুয়ে থাকি; তাও দু-বেলা বলচে —বেরো এখান থেকে। ছোঁড়াটা ফিরে আসবে, সেই আশায় আছি।

স্বামীজীর সঙ্গে দেখা হ'ল না। দেখার ইচ্ছেও আর ছিল না।

সন্ধ্যার পরে স্টীমারে পার হয়ে বেলুড়ে এলাম; মনে কত আশা নিয়ে গিয়েছিলাম ওবেলা। মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার যেখানে ভাল নয়, সেই জ্যাঠাইমাদের বাড়ির গোপীনাথ জিউএর পূজোর সময় যা দেখেচি, হীরুঠাকুরের প্রতি তাদের ব্যবহার যা দেখেচি—সেই সব একই যেন।

দিন দুই পরে ছোটবৌঠাক্‌রুনের বাপের বাড়ি থেকে বড় ভাই তাকে নিতে এল। আমার সঙ্গে দশ-পনের দিন দেখা হয়নি, ভাবলুম যাবার সময় একবার দেখা করবই। দুপুরের পরে ঘোড়ার গাড়িতে জিনিসপত্র ওঠানো হচ্চে, আমি নিজের ঘরের জানলা দিয়ে দেখচি আর ভাবচি ওঠবার সময় গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াব, না ওপরে গিয়ে দেখা ক'রে আসব?

পায়ের শব্দে পেছনে চেয়ে দেখি ছোটবৌঠাক্‌রুন দোরের কাছে দাঁড়িয়ে, রোগশীর্ণ মুখে, হাতায় লালপাড় বসানো ব্লাউজ গায়ে, পরনে লালপাড় শাড়ী। আমি থতমত খেয়ে বললাম —আপনি! আসুন, এই টুলটাতে—

তিনি মৃদু, সহজ সুরে বললেন—খুব তো এলেন দেখা করতে!

—আমি এখুনি যাচ্ছিলাম, আপনি এলেন তাই, নইলে—

ছোটবৌঠাক্‌রুন ম্লান হেসে বললেন—না, নিজেই এলাম। আর আপনার সঙ্গে কি দেখা হবে? আপনি তো পরীক্ষা দিয়ে চলে যাবেন। বি. এ পড়বেন না?

আমি একটু ইতস্তত ক'রে বললাম—ঠিক নেই, এখানে হয়ত আর আসব না।

তিনি বললেন—কেন আর এখানে আসবেন না?

আমি কোন কথা বললাম না। দুজনেই খানিকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর তিনি আমার কাছে এগিয়ে এসে মৃদু অনুযোগের সুরে বললেন—আপনার মত ছেলে যদি কখনও দেখেচি! আগে যদি জানতাম তবে সেবার আপনাকে নিয়ে যে ওরা ঠাট্টা করেছিল, আমি তার মধ্যে যাই? এখন সে-কথা মনে হ'লে লজ্জায় ইচ্ছে হয় গলায় বঁটি দিয়ে মরি।

তারপর গভীর স্নেহের সুরে বললেন—না, ও-সব পাগলামি করে না, আসবেন এখানে, কেন আসবেন না, ছিঃ—

দরজার কাছে গিয়ে বললেন—না এলে বুঝবো আমায় খুব ঘেন্না করেন, তাই এলেন না।

॥ ৭ ॥

দাদা কালীগঞ্জে একটা বাতাসার কারখানায় কাজ করে। অনেক দিন তার সঙ্গে দেখা হয়নি, কিছু টাকার দরকারও ছিল, কারণ কলেজের কিছু বাকী মাইনে ও পরীক্ষার ফি-এর টাকার অভাব হওয়াতে শৈলদি লুকিয়ে ষোলটা টাকা দিয়েছিল। যাওয়ার আগে সে টাকাটা তাকে দিয়ে যাওয়া দরকার, যদিও সে চায়নি। বাঁশবেড়ের ঘাটে গঙ্গা পার হয়ে ওপারে যাব, খেয়ার নৌকো আসতে দেরি হচ্চে, আমি প্রকাণ্ড একটা পুরোনো বাঁধাঘাটের সিঁড়িতে বসে অপেক্ষা করচি। ঘাটের ওপরে একটা জীর্ণ প্রাচীন শিবমন্দির, তার ফাটলে ফাটলে বট-অশ্বত্থের গাছ, মন্দিরের চূড়ার ত্রিশূলটা পশ্চিমে হেলে-পড়া সন্ধ্যার সূর্য্যের আলোয় মনে হচ্চে যেন সোনার। ভারি ভাল লাগছিল মন্দিরটা, আর এই জনবিরল বাঁধাঘাট। ওই মন্দিরে যদি আরতি হ'ত এই সন্ধ্যায়, বন্দনারত নরনারীর দল ওই ভাঙা চাতালে দাঁড়িয়ে রইত, তবে আমার আরও ভাল লাগত। কথাটা ভাবচি, এমন সময় আমার শরীরটা যেন কেমন ক'রে উঠল, কানের পাশটা শির্‌শির্ করতে লাগলো। হঠাৎ আমার মনে হ'ল এই ঘাটের এই মন্দিরে খুব বড় একজন সাধুপুরুষ আছেন, তাঁর দীর্ঘ চেহারা, মাথায় বড় বড় চুল, প্রসন্ন হাসিমাখানো মুখ। আমি তাঁকে দেখতে পেলাম না। কিন্তু তাঁর উপস্থিতি অনুভব করলাম। তিনি এখানে অনেকদিন আছেন, ভাঙা ঘাটের রানায় ব'সে ওপারের উদীয়মান পূর্ণচন্দ্রের দিকে চেয়ে এই সন্ধ্যায় তিনি উপাসনা করেন—এবং তিনি কারও ওপর রাগেন না। কত লোক না বুঝে ঘাটের নির্জ্জনতা ভঙ্গ করে, তিনি সদাই প্রসন্ন, সকলের ওপরে সদাই স্নেহশীল।

এ-রকম যখন হয়, তখন আমার শরীর যেন আমার নিজের থাকে না—নয়ত আমার সাধারণ অবস্থা থাকলে জিজ্ঞেস করতুম অনেক কথাই তাঁকে। একটু পরে খেয়া নৌকো এল —অনিচ্ছার সঙ্গে ঘাট ছেড়ে নৌকোতে উঠলাম। জায়গাটা পবিত্র প্রভাবে ভরা—এমন একটা প্রভাব, যা সে-দিন বরানগরের বাগান-বাড়ির সেই সাধুর কাছে গিয়ে অনুভব করিনি।

দাদা আমায় দেখে খুব খুশী হ'ল। ওর চেহারা বড় খারাপ হয়ে গিয়েছে, ছেলেবেলাকার দুধে-আল্‌তা রঙের সেই সুশ্রী বালককে দাদার মধ্যে আর চিনে নেওয়া যায় না। একে লেখাপড়া শিখলে না, তার ওপরে এই সব পাড়াগাঁয়ে চাকরি ক'রে বেড়ায়—চেহারায়, বেশ-

ভূষায়, কথাবার্ত্তায় দাদা হয়ে গিয়েচে যেন কেমন! তেমনি ধরনের লোকের সমাজে সর্ব্বদা চলে ফেরে।

রাত তখন প্রায় নটা, দাদা ফিরে এসে রান্না চড়ালে। কি বিশ্রী জায়গাতেই থাকে। বাতাসার কারখানাটা একটা প্রকাণ্ড লম্বা চালাঘর—ছ-সাতটা বড় বড় উনুনে দিনরাত গন্‌গনে আগুন—বড় বড় কড়ায় গুড়ের রস আর চিনির রস তৈরি হচ্ছে। এই কারখানায় অত আগুনের তাতে থাকা কি দাদার অভ্যেস আছে কোনকালে!

দাদা নিজেই রান্না চড়ালে। আমায় বললে—খিচুড়ি খাবি জিতু? বেশ ভাল মুগের ডাল আছে—ভাঁড়ে দেখি ঘি আছে বোধ হয় একটু—

দাদার বাসা ছোট একখানা চালাঘর। মেঝের ওপর শোয়, বিছানা পাতাই থাকে, কোনকালে' তোলা হয় না, তবে খুব ময়লা নয়—আমরা ক' ভাইবোন ময়লা জিনিসপত্র মোটেই ব্যবহার করতে পারি নে, ছেলেবেলা থেকেই অভ্যেস। বিছানার ওপরকার কুলুঙ্গিতে খবরের কাগজ পাতা, একখানা ভাঙা পারা বার-হওয়া আর্শি, আর একখানা শিঙের চিরুনি।

দাদা ছিল আমাদের মধ্যে সব চেয়ে ছেলেমানুষ, সব চেয়ে আনাড়ি, তাকে এখন নিজে রান্না ক'রে খেতে হচ্ছে! অথচ কি-ই বা জানে ও সংসারের, কি কাজই বা পারে?

রান্না চড়িয়ে দাদা বললে—ভাল কথা, দাঁড়া জিতু, তোর জন্যে একখানা ইংরিজি বই রেখে দিইচি—বের করে দিই—

টিনের ছোট তোরঙ্গ খুলে একখানা মোটা ইংরিজি বই আমার হাতে দিয়ে বললে—এখানে সাতুবাবু কণ্ট্র্যকটর আসে বাতাসা নিতে, সে ফেলে গিয়েছিল আর ফিরে আসেনি। আমি তুলে রেখে দিইচি, ভাবলাম জিতু পড়বে—

পাতা উল্টে দেখি একটা বিলিতি স্টীল কোম্পানীর মূল্যতালিকা—খুব চমৎকার পাতা, চমৎকার ছাপা, বাড়িঘর, রেলের পুল, কড়িবরগার ছবিতে ভর্ত্তি। দাদার ওপরে দুঃখ হ'ল, বেচারি এ সব পড়তে পারে না, বুঝতেও পারে না—ভেবেচে কি অপূর্ব্ব বই-ই না জানি।

আমি কিছু না বলে বইখানা আমার পুঁটুলিতে বেঁধে নিলাম। দাদা ততক্ষণে তোরঙ্গ হাতড়ে আর একখানা ছোট ছেলেদের গল্পের বই বার ক'রে বললে—আর এই দ্যাখ্ একখানা বই, ভারি মজার মজার গল্প—আমি খেয়েদেয়ে রোজ একটুখানি করে পড়ি—'খোঁড়া শিকারী'র গল্পটা পড়ছিলাম, পড় দেখি শুনি?

এ-সব গল্প ইংরিজিতে কতবার পড়েচি, আমার কাছে এর নতুনত্ব নেই কোথাও। তবুও দাদাকে পড়ে পড়ে শোনাতে লাগলাম, দাদা মাঝে মাঝে খিচুড়িতে কাঠি দিয়ে দেখে, আর হাঁটু দুটো দু-হাতে জড়িয়ে একটুখানি পেছনে হেলান দিয়ে ব'সে আমার মুখের দিকে আগ্রহের সঙ্গে চেয়ে চেয়ে শোনে। আমার এমন কষ্ট হ'ল! এ-সব গল্প যে ইংরিজি স্কুলের নীচের ক্লাসের ছেলেরাও জানে। আহা, দাদা বড় অভাগা, অল্প বয়সে সংসারের চাপ ঘাড়ে পড়ে সারাজীবনটা ওর নষ্ট হয়ে গেল।

টাকার কথাটা দাদাকে বলতে মন চাইল না। ওর কত কষ্টে রোজগার করা পয়সা; একটা আধটা নয়, ষোলটা টাকা—এগারো টাকা মাসে মাইনে পায়—ওর দেড় মাসের রোজগার কোথা থেকে দেবে ও? শৈলদির টাকা আমি এর পরে যে ক'রে হয় শোধ দেবো।

দাদা নিজেই বললে—বাড়ি যাবি তো জিতু, গোটা দশেক টাকা নিয়ে যা। আমার বড্ড ইচ্ছে সীতাকে একছড়া হার গড়িয়ে দিই—কিন্তু টাকাই জমে না হাতে। তোর টাকার যদি

দরকার থাকে, তবে আলাদা-করা হারের জন্য কুড়িটা টাকা তোলা আছে—তাই থেকে নিয়ে যা, দেবো এখন। হার এর পর দেখব।—সাত-পাচ ভেবে টাকা নেওয়াই ঠিক করলাম। শৈলদির ওপর বড় জুলুম করা হয়, নইলে শৈলদিকে মনে হয় না যে সে পর। এত আপনার মত ক'জন আপনার লোকই বা দেখে? মায়ের পরেই শৈলদিকে ভক্তি করি। সে লুকিয়ে টাকা দিয়েচে—তাকে আর বিপন্ন ক'রবো না।

যে দাদা সকাল আটটার কমে বিছানা থেকে উঠত না, তাকে ভোর পাচটার সময় উঠে কারখানায় গিয়ে কাজে লাগতে হয়। আমিও দাদার সঙ্গে গেলাম। কারখানার মালিকের নাম মতিলাল দাস, বয়েস পঞ্চাশের ওপর, তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী আছে সংসারে, আর দ্বিতীয় পক্ষের ছেলেমেয়ে। দাদা মতিলালের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীকে মাসীমা ব'লে ডাকে। মতিলাল আমায় দেখে বললে—তুমি নিতাই ঠাকুরের ভাই? বেশ, বেশ। আজকাল কি বই পড়ায় তোমাদের?

তার প্রশ্ন শুনে আমার হাসি পেল। আমি জবাব দেবার আগেই মতিলাল বললে—আমাদের সময়ে যে-সব বই পড়ানো হ'ত, আজকাল কি আর সে-সব বই আছে? এই ধর পদ্যপাঠ, তৃতীয় ভাগ, যদুবাবুর। আহা!

কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জদেহ উষ্ট্র সারি সারি
কি আশ্চর্য্য শোভাময় যাই বলিহারি

কি সব শব্দ লাগিয়েচে দেখেচ একবার। ভাষার জ্ঞান হ'ত কত পড়লে! বলো দিকি ন্যুব্জদেহ মানে কি? আমাদের হরিশ পণ্ডিত পড়াত কালনার স্কুলে, আমি তখন ছাত্রবৃত্তি পড়ি। তখন ছাত্রবৃত্তি পড়লে মোক্তার হ'ত, দারোগা হ'ত। এখন হয়েচে তো সব ছেলেখেলা।

আমি এসেছি শুনে মতিলালের স্ত্রী দুপুরে খেতে বললে। আমায় দেখে বললে—এস বাবা, তুমি নিতাইয়ের ভাই? তুমিও মাসীমা ব'লে ডেকো। কাছে দাঁড়িয়ে থেকে মাসীমা দাদাকে রান্না দেখিয়ে দিতে লাগল, কারণ আমরা খেতে চাইলেও ওরা রেঁধে আমাদের খেতে দেবে কেন?

মাসীমা সংসারে নিতান্ত একা। মতিলালের ও-পক্ষের ছেলেমেয়েরা বাপের তৃতীয় পক্ষের পরিবারকে দু-চোখ পেড়ে দেখতে পারে না, বা এখানে থাকেও না কেউ। অথচ মাসীমার ইচ্ছে তাদের নিয়ে মিলেমিশে সংসার করা। আমরা খেতে বসলে কত দুঃখ করতে লাগল।

—এই দ্যাখো বাবা, কেষ্টকে বলি বৌমাকে নিয়ে এখানে এস, এসে দিব্যি থাক। বৌমাটি বড় চমৎকার হয়েচে। তা যদি আসে! সেই নিয়ে রেখেচে শ্বশুরবাড়ি, কালনার কাছে দাঁইহাট—সেখানেই থাকে। আমার নিজের পেটে তো হ'ল না কিছু, ওরাই আমার সব—তা এমুখো হয় না কেউ। বড় মেয়ে দুটি শ্বশুরবাড়ি আছে, আনতে পাঠালে বলে, সৎমায়ের আর অত আত্যিস্যিরো দেখাতে হবে না। শোন কথা। আমায় মা বলে কেউ ডাকেও না। ডাকলে তাদের মান যাবে।

মাসীমাকে খুশী করবার জন্যে আমি কারণে-অকারণে খুব 'মাসীমা' 'মাসীমা' ব'লে ডাকতে লাগলাম। আমাদের পাতে আবার মাসীমা খেতে বসলেন, বললেন—ব্রাহ্মণের পেরসাদ পাবো, ওতে কি আর ছোট বড় আছে বাবা?

আমার মনে অস্বস্তি হ'ল; আমি তো এঁদের এসব মানিনে, ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম পালন করিনে, সে কথা তো ইনি জানেন না। অথচ খুলে বললে মাসীমার মনে কষ্ট দেওয়া হবে হয়ত।

দাদার কাছ থেকে আটঘরায় এলাম। আসবার সময় সীতার জন্যে ভাল সাবান কিনে নিয়ে এলাম, বই পড়তে ভালবাসে ব'লে দু-তিনখানা বাংলা বইও আনলাম। সীতা বড় হয়ে উঠেচে—মাথায় খুব লম্বা হয়েচে, দেখতে সুন্দর হয়েচে আরও।

আমার হাত থেকে সাবান নিয়ে হেসে বললে—দেখি দাদা কেমন সাবান···আমার একখানাও আস্ত সাবান ছিল না। একখানা সানলাইট সাবান আনিয়েছিলুম বাজার থেকে—সে আধখানা হয়ে গিয়েচে।

সীতার সে পুরোনো অভ্যাস এখনও আছে, কথা বলতে বলতে হঠাৎ খোঁপায় হাত দিয়ে দেখে ঠিক আছে কি-না। লম্বা ঢেঙা, চওড়া নক্সা-পাড় কাপড় পরনে, খোঁপার ধরনও সেকেলে। আজকাল শহরে দেখে এসেচি ও-রকম খোঁপা উঠে গিয়েচে। ও-ধরনের কাপড় পরলে সেখানে লোকে হাসবে, বেচারী সীতা! লেখাপড়া শেখবার, বই পড়বার ওর কত আগ্রহ! অথচ এই পাড়াগাঁয়ে পরের বাড়ি দাসীবৃত্তি ক'রেই ওর জীবন কাটল। না হ'ল লেখাপড়া শেখা, না মিটল কোন সাধ। অথচ ওর বুদ্ধি ছিল এত চমৎকার, মিশনারী মেয়েরা কত প্রশংসা করত, ওকে কি ভালই বাসত মিস্ নর্টন। কিন্তু কি হ'ল ওর? এখন, সেই কত কাল আগেকার পুরোনো বইগুলোই পড়চে, কিছুই শেখেনি, কিছুই দেখেনি।

সীতা বললে—দাদা পাস করেচ?

—পাসের খবর এখনও বেরোয় নি। পাস করবো ঠিকই।

—পাস হ'লে আমায় জানিও দাদা। আমি তোমাকে একটা জিনিস প্রাইজ দেবো!

—কি জিনিস রে?

—একটা মনিব্যাগ বুনচি লাল উলের। তোমার জন্যে একটা, বড়দার জন্যে একটা। তোমাদের নাম লিখে দেবো। মিস্ নর্টন আমাদের দিত কত কি প্রাইজ—না?

—মিস্ নর্টনকে তোর মনে আছে সীতা? তুই তো তখন খুব ছোট।

—খুব মনে আছে, তার দেওয়া জিনিস আমার বাক্সে এখনও রয়েচে। দেখলেই তাদের কথা মনে পড়ে।

জ্যাঠামশায় আমায় ডেকে বললেন—জিতু শোনো। এখন তুমি বড় হয়েচ, তোমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কাজ করাই ভাল। সীতার বিয়ে না দিলে নয়। ওর পনের-ষোল বছর হ'ল, আর ঘরে রাখা যায় না। কিন্তু এদিকে টাকাকড়ি খরচ করবে কে? হাজার টাকার কমে আজকাল ভদ্রলোকের ঘরের বিয়ের কথাই তোলা যায় না। দেখে এসেচ তো শহর-বাজারে? তা আমি এক জায়গায় ঠিক করেচি; পাত্রটির বাপ আমার এখানে এসেছিল। জমিজমা আছে, চাষা গেরস্ত, খেতে পরতে কষ্ট পাবে না। আখের চাষই আছে অমন বিশ-বাইশ বিঘে। পাত্রটি চাষবাস দেখে, রং একটু কালো—তা হোক, পুরুষ মানুষের রঙে কি আসে যায়, তবে বংশ ভাল, কামদেব পণ্ডিতের সন্তান, সবে তিন পুরুষে ভঙ্গ, আমাদেরই স্বঘর।

আমি বললাম—লেখাপড়া কতদূর করেচে?

—লেখাপড়া কি আর এম-এ, বি-এ পাস করেচে? তবে বাংলা ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়েচে, দিব্যি হাতের লেখা। হ্যাঁ, একটা কথা ভুলে যাচ্ছি,—অল্পদিন হ'ল পাত্রটির প্রথম পক্ষের স্ত্রী মারা গিয়েচে—তবে সে কিছু নয়, বয়েস কমই। একটি বুঝি ছেলে আছে ও-পক্ষের।

ছাত্রবৃত্তির কথায় আমার মতিলালের উটের কবিতাটি মনে পড়ল। আমি বললাম—আচ্ছা আমি ভেবে বলব জ্যাঠামশাই। লেখাপড়া জানে না আর তাতে দোজবরে, এতে বিয়ে দেওয়া আমার মন সরে না। সীতার মত মেয়ে, আপনি বলুন না জ্যাঠামশাই?

জ্যাঠামশাই নিজের কথার প্রতিবাদ সহ্য করতে পারেন না—তিনি এ অঞ্চলের মানী ব্যক্তি, আগের চেয়ে বিষয়-আশয় টাকাকড়ি এখন তাঁর আরও বেশী, এদিকের সব লোক তাঁকে খাতির করে চলে, কেনই বা তিনি প্রতিবাদ সহ্য করবেন? সে জানি এ গাঁয়ের রাম বাঁড়ুয্যের ব্যাপারে। রাম বাঁড়ুয্যে কি জন্যে রাত্রে আফিম খেয়ে শুয়েছিল—সকালে উঠে খবর পেয়ে জ্যাঠামশায় গেলেন। রাম বাঁড়ুয্যে ছিল জ্যাঠামশায়ের খাতক। জ্যাঠামশায় গিয়ে কড়া সুরে বললেন—কি হয়েচে রাম? রাম বাঁড়ুয্যে তখন কথা বলতে পারচে না—জ্যাঠামশায়ের কথার উত্তর সে দিতে পারল না। জ্যাঠামশায় ভাবলেন, বাঁড়ুয্যে তাঁর প্রতি অসম্মান দেখিয়ে ইচ্ছে করেই কথার উত্তর দিচ্চে না। বললেন—ভাল ক'রে কথার উত্তর দাও—কার সামনে কথা বলচ জান না? সঙ্গের সব লোক বললে—হাঁ, কর্ত্তা যা বলচেন, জবাব দাও ওঁর কথার। কিন্তু রাম বাঁড়ুয্যে জ্যাঠামশায়ের চোখরাঙানির চৌহদ্দি পার হয়ে চলে গেল ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যেই—কি জন্যে সে আফিম খেয়েছিল কেউ জানে না—তার মৃত্যুর পরে জ্যাঠামশায় তার ভিটেমাটি বিক্রী ক'রে নিয়ে নিলেন—তার বিধবা স্ত্রী নাবালক একটি মাত্র মেয়ের হাত ধরে ভাইদের দোরে গিয়ে পড়লো। আমি যেবার ম্যাট্রিক দিই, সে বছরের কথা।

আমার কথার উত্তরে জ্যাঠামশায় আমায় অনেকগুলো কথা শুনিয়ে দিলেন। আমাদের এদিক নেই, ওদিক আছে। রাজামহারাজাদের ঘরে বোনের বিয়ে দেবার ইচ্ছে থাকলেই তো হয় না, পয়সা চাই। পনের-ষোল বছরের মেয়ে গ্রামে সমাজের মধ্যে বাস করতে গেলে আর ঘরে রাখা চলে না। তা ছাড়া তিনি কথা দিয়ে ফেলেচেন—তাঁর কথার মূল্য আছে ইত্যাদি।

জ্যাঠামশায়দের বাড়ির জীবনযাত্রার ধারা সেই পুরোনো দিনের মতই চলেচে। এখানে এলেই বুঝি, এদের মন নানা দিক থেকে কত ভাবে শৃঙ্খলিত। বাড়িতে এতটা জমি রয়েচে, ঠাকুরপূজার উপযোগী ছোট্ট একখানা গাঁদা ও করবী ফুলের বাগান ছাড়া আর কোথাও একটা ফুলের গাছ নেই। উঠোনের কোন জায়গায় এরা কোথাও একটু সবুজ ঘাস রাখবে না—মেজকাকার কাজ হচ্চে এতটুকু কোথাও ঘাস গজালে তখনি নিজের হাতে নিড়েন ধরে উঠিয়ে ফেলা। প্রকাণ্ড উঠোন চাঁচাছোলা, সাদা মাটি বার করা, সবুজের লেশ নেই। ব'লে দেখেচি এরা তা বোঝে না। সামনের উঠোনটা লাউ-মাচা, পুঁই-মাচায় ভরা—প্রত্যেক জায়গাটুকুতেই তরকারি লাগিয়েচে, নয়ত মান-কচুর ঝাড়।

একদিন জ্যাঠামশায়ের ছেলে হারুদাকে বললাম—আমি শ্রীরামপুর থেকে ভাল মরসুমী বীজ এনে দেবো আর এক রকম লতা আছে আমাদের কলেজে, চমৎকার নীল ফুল ফোটে। বাড়ির সামনেটা বাগান করো আর চণ্ডীমণ্ডপের চালে সেই লতা উঠিয়ে দাও—

হারুদা বললে—তোমার যেমন বুদ্ধি, ফুলগাছে কি দুধ দেবে শুনি? মিছিমিছি জায়গা জোড়া—চণ্ডীমণ্ডপের চালে কি বছর ত্রিশ-চল্লিশখানা চালকুমড়া হয় জানিস্ তা?

অর্থাৎ আহারের আয়োজন হ'লেই হ'ল, আর কিছু দরকার নেই এদের।

মেজকাকার ঘরে একদিন শুয়েছিলাম, কাকীমা এখানে নেই—মেজকাকার আবার একলা শুতে ভয় করে, তাই আমাকে শুতে বলেছিলেন। সারাদিন গরমের পরে অনেক রাত্রে এক পশলা বৃষ্টি হ'ল—কি সুন্দর ভিজেমাটির গন্ধ আসতে লাগল—মেজকাকা দেখি উঠে তাড়াতাড়ি জানলা বন্ধ করচেন।

আমি বললাম—বন্ধ করচেন কেন মেজকাকা, বেশ ভিজে হাওয়া আসচে—

মেজকাকা বললেন—উঁহু, উঁহু—ঠাণ্ডা লাগবে—শেষরাতের বিষ্টির হাওয়া বড় খারাপ, কাল সর্দ্দি ধরবে—আমার ধাতই একে সর্দ্দির!

দুপুরে সীতার সম্বন্ধে মাকে বললাম। মায়ের ইচ্ছে নয় ওখানে সীতার বিয়ে দেওয়া, তবে মা নিরুপায়, এ বাড়িতে তাঁর কোন কথা খাটে না। আমি বললাম—আমি কোথাও চাকরি খুঁজে নিই মা। সীতার বিয়ে নিজে থেকে দেব।

মা বললেন—শোন কথা ছেলের। তুই লেখা-পড়া ছেড়ে এখন করবি কি? তোদের মুখের দিকে চেয়ে এখানে কষ্ট করে পড়ে থাকি। নিতুর তো কিছু হ'ল না, তুই বি-এটা পাস্ কর্। সীতার কপালে যা থাকে হবে। তুই এখন চাকরিতে কত টাকা পাবি যে সীতার বিয়ে দিবি নিজে? মাঝে পড়ে তোর পড়াটা হবে না। আর শোন্, এ নিয়ে কোন কথা যেন বলিস নে কারুর সঙ্গে। তোর জ্যাঠাইমা শুনতে পেলে রক্ষে রাখবে না।

মা এত ভয় করেও চলেন ওদের! প্রথম জীবনে কোন কষ্ট পান নি, তারপর চা-বাগান থেকে এসে দুঃখের মধ্যে পড়ে গিয়ে এমন ভীতু হয়ে উঠেচেন। সদাই ওঁর ভয় থাকে জ্যাঠাইমা ওঁদের দু-জনকে এ বাড়িতে জায়গা দিতে না চাইলে, আমার লেখাপড়া না হয়, সীতার বিয়ে নিয়ে দাদা জড়িয়ে পড়ে—এই সব।

সীতাকে জলে ফেলে দিতে পারব না, মা যাই বলুন।

জ্যাঠামশায়দের বাড়িতে বেশীক্ষণ আমার থাকলে হাঁপ লাগে। গাঁয়ের বাইরে নির্জ্জন মাঠে গিয়ে বসে ভাবি সীতার সম্বন্ধে কি করা যায়। কিন্তু হঠাৎ কেমন ক'রে অন্য চিন্তা এসে পড়ে। এই রৌদ্রালোকিত দুপুরে একা বসলেই তাঁর কথা আমার মনে পড়ে। মন থেকে দূর করতে পারিনে। প্যালেস্টাইনের ঊষর, পর্ব্বতময় মরুদেশের রৌদ্র—সারা গায়ে ঘাম ঝরচে তাঁর, রোদে মুখ রাঙা, নিজের ভারী ক্রুশটা নিজেই বয়ে চলেছেন বধ্যভূমিতে। পিছনের অন্ধ জনতা জানে না যে ঝড়ে গ্যালিলির সমুদ্রের নোনা জলে দুকূল ছাপিয়ে মাঝে মাঝে যে তরঙ্গ ওঠায়, তাও তুচ্ছ হয়ে যাবে সে বৃহত্তর তুফানের কাছে, আজকার দিনটি জগতে যে তুফান তুলবে। তারা জানে না যে মানুষের মনে ব্যথা না দেওয়ার চেয়ে বড় আচার নেই, প্রেমের চেয়ে বড় ধর্ম্ম নেই। তাঁর আবির্ভাব কে ব্যর্থ করবে?—ঐ বজ্র-বিদ্যুতের মত শক্তিমান তাঁর বাণী। বিষ্ণুর সুদর্শন যে শক্তির প্রতীক। নিত্যকালের দেবতা তাঁরা, দেশের অতীত, কালের অতীত, সকল দেশের, সকল অবতারের স্বগোত্র।

তারপর আমি যেন কোথায় চলে গিয়েচি। সেখানে নদী, মাঠ, বন সবই আছে, কিন্তু সবই যেন ঝাড়লণ্ঠনের কাঁচের পরকলার মধ্যে দিয়ে দেখচি। রাত কি দিন বুঝতে পারলাম না, মাথার ওপরকার আকাশে তারা নেই। অথচ সূর্য্যও দেখলাম না আকাশে। আমি যেন সেখানে বেশ সহজ অবস্থাতেই আছি। একটু পরেই মনে হ'ল সে জায়গাটাতে আমি অনেক বার গিয়েচি, নতুন নয়, ছেলেবেলা থেকে কতবার গিয়েচি। একটা বাড়ি আছে সেখানে, বাড়িতে যারা আছে তারা আমার সঙ্গে গল্প করে, কত কথা বলে—স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে যেন মনে হয় তারা আমার খুব পরিচিত। কতবার তাদের দেখেচি। সেখানে গেলেই আমার মনে পড়ে যায় সেখানকার পথ-ঘাট, ওইখানে মাঠের মধ্যে একটা পুরোনো বাড়ি আছে, ওরও পাশে সেই বনটা। সেখানে যেমনি যাই, মজা এই যে অমনি মনে হয় এ তো নতুন নয়, সেই যে একবার ছেলেবেলায় চা-বাগানে থাকতে এসেছিলাম! কিন্তু সে দেশটা যেন অন্য রকম, যখন সেখানে থাকি তখন স্বাভাবিক মনে হ'লেও, পরে মনে হয় সেটা এই পৃথিবীর মত নয়।

সেখানে আমি কতক্ষণ ছিলাম জানি না—উঠে দেখি গাছে ঠেস্ দিয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু এত ঘুম ঘুমিয়েচি—উঠে চোখ মুছে চারিদিকে চেয়ে দেখি প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেচে। কেবল এইটুকু আমার মনে ছিল, স্বপ্নের দেশে কাকে যেন জিজ্ঞেস করেছিলুম—

বটগাছের নীচে একটা সুন্দর ঠাকুর আছেন, শুনেচি বিষ্ণুমূর্ত্তি, আমার বড় ভাল লাগে—জ্যাঠাইমারা পূজো করেন না কেন? ঘুম কি সত্যি, কিছুই বুঝতে পারলুম না। মনের সে আনন্দটা কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে ছিল।

জ্যাঠামশায়রা কি একটা মোকদ্দমার সাক্ষীসাবুদ দু-তিন দিন ধরে চণ্ডীমণ্ডপে তালিম দিয়ে শেখালেন। যে কেউ শুনলে বুঝতে পারতো যে এরা সে-সব জায়গায় যায় নি কস্মিন-কালেও—সে-সব ঘটনা দেখেও নি—এঁদের খামার-সংক্রান্ত কি একটা দখলের মামলা।

একদিন শুনলাম মামলায় এঁরা জিতেচেন—আবার সেই ব্যাপার দেখলুম বাড়িতে। গৃহদেবতার প্রতি ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে উঠলেন সবাই—মহাসমারোহে পূজা হ'ল, সপক্ষের যারা সাক্ষী ছিল, তাদের পরম যত্নে তোয়াজ ক'রে খাওয়ালেন। খাওয়ান তাতে ক্ষতি নেই—কিন্তু দেবতাকে এর মধ্যে জড়ান কেন?

এঁরা ভাবেন কি যে দেবতা তাঁদেরই বাঁধা, হাতধরা—ওঁদের মিথ্যাকে অবিচারকেও সমর্থন করবেন তিনি ভোগ নৈবিদ্যের লোভে?

জ্যাঠাইমা যখন ব্যস্ত হয়ে গরদের শাড়ি প'রে পূজার আয়োজনে ছুটোছুটি করছিলেন, তখন আমার ভারি রাগ হ'ল—আজকাল এসব মূঢ়তা আমার আদৌ সহ্য হয় না, ছেলেবেলার মত ভয়ও করি না আর জ্যাঠাইমাকে—ভাবলুম এ নিয়ে খুব তর্ক করি, দু-কথা শুনিয়ে দেবো, তাতে ওঁদের উপকারই হবে—দেবতাকে নিয়ে ছেলেখেলা বন্ধ হবে—কিন্তু সীতা ও মায়ের কথা ভেবে চুপ ক'রে রইলুম।

॥ ৮ ॥

মাস দুই হ'ল চাকুরি পেয়েছি কলকাতায়। এ চাকুরি পাওয়ার জন্যেও আমি শৈলদির কাছে কৃতজ্ঞ। শৈলদির স্বামীর এক বন্ধুর যোগাযোগে এটা ঘটেচে। যাদের বাড়ি চাকরি করি, এরা বেশ বড় লোক।

বাড়ির কর্ত্তা নীলাম্বর রায় হাওড়া জেলার কি একটা গ্রামের জমিদার এবং সেখানকার তাঁদেরই পূর্ব্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত এক মঠের বর্ত্তমান মালিক—এঁদের মঠের অধীনে একটা ধর্ম্মসম্প্রদায় গ'ড়ে উঠেচে গত ষাট-সত্তর বছরে এবং এঁরাই সেই সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগুরু। বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম এই তিন জেলাতে এই সম্প্রদায়ের লোক যত বেশী, অন্য জেলাতে তত নয়। ওঁদের কাগজপত্র ও দেশের নায়েবের সঙ্গে ওঁদের যে চিঠিপত্র লেখালেখি হয়েচে—তা থেকেই আমি এ-সব সংবাদ জানতে পারলাম অল্পদিনের মধ্যেই। এঁদের প্রধান আয় বৈশাখ মাসে মঠবাড়ির মহোৎসব থেকে—নানা অঞ্চল থেকে শিষ্যসেবকের দল জড় হয়ে সেই সময় বার্ষিক প্রণামী, পূজা, মানত শোধ দেয়, তা ছাড়া বিবাহ ও অন্নপ্রাশনের সময়ও মঠের গদিতে প্রত্যেক শিষ্যের কিছু প্রণামী পাঠিয়ে দেওয়া নিয়ম।

নীলাম্বরবাবুর তিন ছেলেই ঘোর শৌখিন ও উগ্র ধরনের শহুরে বাবু। বড় ছেলে অজয়বাবু এঞ্জিনিয়ারীং পড়েছিলেন কিন্তু পাস করেন নি—মেজ ছেলে নবীনবাবু এম-এ পাস, ছোট ছেলে অমরনাথ এখনও ছাত্র—প্রেসিডেন্সি কলেজে থার্ড-ইয়ারে পড়ে। অজয়বাবুর বয়স পঞ্চাশের কম নয়, কিন্তু পোশাক-পরিচ্ছদে কুড়ি বছরের ছোকরাও হার মানে তাঁর শৌখিনতার কাছে—নবীনবাবুর বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশ, লম্বা, ফর্সা, সুপুরুষ—পেছনের ঘাড় একদম ক্ষুর

দিয়ে সাদা বার-করা, চোখে চশমা—প্রায়ই পরনে সাহেবী পোশাক থাকে। বাঙালী পোশাক পরলে পরেন হাত-গিলে-করা মিহি আদ্দির পাঞ্জাবি ও কোঁচানো কাঁচি ধুতি, পায়ে কালো এ্যাল্‌বার্ট জুতো।

কর্ত্তা নীলাম্বর রায়কে আমি বেশী দেখিনি। তিনি তাঁর তাকিয়া-বালিশ, গড়গড়া, পিকদানী নিয়ে দোতলাতে থাকেন। কালেভদ্রে তাঁর কাছে আমার যাওয়া দরকার হয়। বড় ছেলে অজয়বাবুই কাজকর্ম্ম দেখাশুনা করেন—তাঁর সঙ্গেই আমার পরিচয় বেশী। অজয়বাবু লোক মন্দ নন—কিন্তু নবীনবাবু ও অমরনাথের মুখে প্রথম দিনেই একটা উগ্র দাম্ভিকতার ছাপ লক্ষ্য করলুম। আমি এ ধরনের লোকের সংস্পর্শে জীবনে এ পর্য্যন্ত আসি নি—কি জানি আমার কোন্ ব্যবহারে এঁরা কি দোষ ধ'রে ফেলেন—সেই চিন্তা আমায় সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত ক'রে তুললে।

ওদের বাড়ি হরি ঘোষের স্ট্রীটে ; বাড়িটার পূর্ব্ব দিকে একটা ছোট গলি—কিন্তু সেই দিকেই বাড়ির সদর। হরি ঘোষের স্ট্রীটের দিকটা রেলিং-বসানো লম্বা বারান্দা—বারান্দায় উঠবার সিঁড়ি নেই সেদিকে। রাস্তার ওপরের ছোট ঘরটাতেই আমার থাকবার জায়গা নির্দ্দিষ্ট হ'ল। এই ঘরে আমি যে একলা থাকি তা নয়, পাশাপাশি নীচু চার-পাঁচটা তক্তাপোশের ওপর ঢালা ফরাস পাতা, তার ওপরে রাত্রে যে কত লোক শোয় তার হিসেব রাখা শক্ত ; এদের দেশের কাছারীর নায়েব কুঞ্জ বসু প্রায়ই আসে কলকাতায়, সে আমার পাশেই বিছানা পাতে, তার সঙ্গে একজন মুহুরী আসে, সে নায়েবের পাশে শোয়। বাড়ির দুজন চাকর শোয় ওদিকটাতে। ওস্তাদজী ব'লে একজন গানের মাস্টার বাড়ির ছেলেমেয়েদের গান ও হারমোনিয়ম বাজাতে শেখায়—সে আর তার একজন ভাইপো শোয় চাকরদের ও আমাদের মধ্যে। এতগুলো অপরিচিত লোকের সঙ্গে একসঙ্গে শোয়া কখনো অভ্যেস নেই—প্রথম দিনেই এদের গল্পগুজব, হাসি-কাশি, তামাকের ধোঁয়া আমাকে অতিষ্ঠ ক'রে তুললে। সীতার মুখ মনে ক'রে সব অসুবিধাকে সহ্য করবার জন্যে প্রস্তুত হই।

একদিন আমি সেরেস্তা-ঘরে বসে কাজ করচি—হঠাৎ দেখি মেজবাবু ঘরে ঢুকেচেন। আমি মেজবাবুকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম। মেজবাবু চারদিকের দেওয়ালের দিকে চোখ তুলে চেয়ে বললেন—এ ঘরের এই ছবিগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্চে, তুমি নজর রাখো না ?

মেজবাবুর সামনাসামনি হওয়া এই আমার প্রথম। আমাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করতে আমি মনে আঘাত পেলাম এবং আমার ভয়ও হ'ল। তা ছাড়া ছবি নষ্ট হওয়ার কৈফিয়ত আমি কি দেবো বুঝতে না পেরে চুপ ক'রে আছি, এমন সময় মেজবাবু বাজখাঁই আওয়াজে ডাকলেন—দৈতারী—

দৈতারী সেরেস্তার কালির বোতল গুনে গুনে আলমারিতে তুলছিল পাশের ঘরে, সে ঘরের পাশে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে বললে—হুজুর—

—এই উল্লুক, তুমি দেখতে পাও না ঘরের ছবিগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ?

দৈতারী ঘরের দেওয়ালের দিকে বিপন্ন মুখে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মেজবাবু হঠাৎ আমার ডেস্ক থেকে রুলটা তুলে নিয়ে তাকে হাতে পিঠে ঘা-কতক বসিয়ে দিয়ে বললেন—স্টুপিড পাজি, বসে বসে শুধু মাইনে খাবে ? এক ডজন চাকর বাড়িতে মাইনে দিয়ে রাখা হয়েচে শুধু ফাঁকি দেবার জন্যে ? পাড়ো ছবিগুলো এক-একখানা ক'রে—পাড়ো আমার সামনে—

দৈতারীর সে রুলের ঘা যেন আমার পিঠেই পড়ল। আমি ভয়ে ভয়ে দৈতারীকে ছবি পাড়তে সাহায্য করতে লাগলুম। আমি সামান্য মাইনের চাকুরি করি—মেজবাবু আমাকেও

ঠেস্ দিয়ে কথাটা বললেন। তারপর আধঘণ্টা তিনি ঘরে দাঁড়িয়ে রইলেন—আমি ও দৈতারী তাঁর সামনে সমস্ত ছবিগুলো একে একে পেড়ে পরিষ্কার করলাম। সাহস ক'রে যেন মাথা তুলে চাইতে পারলাম না, যেন আমি নিজেই ছবির তদারক না ক'রে প্রকাণ্ড অপরাধ ক'রে ফেলেচি।

সেইদিন প্রথম বুঝলাম আমার মত সামান্য মাইনের লোকের কি খাতির—আর কি মান এঁদের কাছে। সীতার বিয়ের একটা বন্দোবস্ত করতে পারি তবে আবার পড়বো। ছোট বৌঠাকৃরুনের কথা এই সময় মনে হ'ল—শৈলদির কথাও মনে পড়ল। কত ধরনের মানুষই আছে সংসারে! অমরনাথবাবুর বৈঠকখানা আমাদের ঘরের সামনে। খুব শৌখীন জিনিস-পত্র সাজানো এবং প্রত্যেক দিনই কোন-না-কোন শৌখীন জিনিস কেনা লেগেই আছে। সে-ঘরে রোজ সন্ধ্যার পর বন্ধুবান্ধবেরা এসে গানের আড্ডা বসায়—কেউ ডুগি-তবলা, কেউ হারমোনিয়ম বাজায়—গান-বাজনায় অমরবাবুর খুব ঝোঁক। সে-দিন আড়াইশো টাকার একটা গানের যন্ত্র রাখবার কাঁচের আলমারি কেনা হ'ল। তিনি কলেজের ছাত্র বটে, কিন্তু আমি পড়াশুনা করতে একদিনও দেখিনি তাঁকে। একদিন বেলা দশটার সময় অমরনাথবাবু ঘরে ঢুকে বললেন—ওহে, পাঁচটা টাকা দাও তো, আছে তোমার কাছে?

আমি প্রথমটা অবাক্ হয়ে গেলাম। আমার কাছে টাকা চাইতে এসেচেন ছোটবাবু! ব্যস্তভাবে আমার বাক্সটা খুলে টাকা বার ক'রে সসম্ভ্রমে তাঁর হাতে দিলাম। দিনকতক কেটে গেল, আর একদিন তিনটে টাকা চাইলেন। মাইনের টাকা সব এখনও পাইনি—দশটা টাকা মোটে পেয়েছিলাম—তা থেকে দিয়ে দিলুম আট টাকা। দু-তিন মাসে ছোটবাবু আমার কাছে পঁচিশ টাকা নিলেন—বাড়ির ও আমার হাতখরচ বাদে যা-কিছু বাড়তি ছিল, সবই তাঁর হাতে তুলে দিলাম।

একদিন দাদা চিঠি লিখলে—তার বিশেষ দরকার। পনেরটা টাকা যেন আমি পাঠিয়ে দিই। আমার হাতে তখন মোটেই টাকা নেই। ভাবলুম, ছোটবাবুর টাকাটা তো দেওয়ার কথা এতদিনে—দিচ্চেন না কেন! বড়মানুষের ছেলে, সামান্য টাকা খুচরো কিছু কিছু ক'রে নেওয়া, সে ওর মনেই নেই বোধ হয়। লজ্জায় চাইতেও পারলাম না। অগত্যা বারোটা টাকা আগাম পাওয়ার জন্যে একটা দরখাস্ত করলুম। সে-দিন আপিসে আবার বসেচেন মেজবাবু। দরখাস্ত পড়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন—কি হবে তোমার আগাম টাকা?

মেজবাবুকে আমার বড় ভয় হয়। বললুম—দাদা চেয়ে পাঠিয়েচেন, হাতে আমার কিছু নেই তাই।

মেজবাবু বললেন—তুমি কতদিন সেরেস্তায় কাজ করচ? চার মাস মোটে? না, এত কম দিনের লোককে এ্যাডভ্যান্স দেওয়া স্টেটের নিয়ম নেই—তা ছাড়া তুমি তো এখনও পাকা বহাল হওনি—এখনও প্রোবেশনে আছ।

কই, চাকুরিতে ঢোকবার সময় সে-কথা তো কেউ বলেনি যে আমি প্রোবেশনে বাহাল হচ্চি বা কিছু। যাই হোক্ দরখাস্ত ফিরিয়ে নিয়ে এলাম; দাদাকে টাকা পাঠানো হ'লই না, এদিকে ছোটবাবুও টাকা দিলেন না, ভুলেই গিয়েচেন দেখচি সে-কথা। প্রথমে আসবার সময় ভেবেছিলাম এঁরা কোন দেবস্থানের সেবায়েত, সাধু-মোহান্ত মানুষ হবেন—ধর্ম্মের একটা দিক এঁদের কাছে জানা যাবে—কিন্তু এঁরা ঘোর বিলাসী ও বিষয়ী, এখন তা বুঝচি। মেজবাবু এই চার মাসের মধ্যে এটর্নির বাড়ি পাঠিয়েচেন আমায় যে কতদিন, কোথায় জমি নিয়ে ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের সঙ্গে প্রকাণ্ড মোকদ্দমা চলচে—এ বাদে কুঞ্জ নায়েব তো প্রায়ই দেশ

থেকে আপীলের কেস্ আনচেন। মেজবাবু মামলা-মোকদ্দমা নাকি খুব ভাল বোঝেন, কুঞ্জ নায়েব সেদিন বল্‌ছিল।

অপরে কি ক'রে ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তারা কি মানে, কি বিশ্বাস করে, এসব দেখে বেড়াতে আমার বড় ভাল লাগে।

একদিন হাওড়া পুলের ওপারে হেঁটে অনেক দূর বেড়াতে গেলুম। এক জায়গায় একটা ছোট মন্দির, জায়গাটা পাড়াগাঁ-মত, অনেক মেয়েরা জড় হয়েচে, কি পূজো হচ্চে। আমি মন্দির দেখে সেখানে দাঁড়িয়ে গেলাম—দেবতার স্থানে পূজা-অর্চ্চনা হ'তে দেখলে আমার বড় কৌতূহল হয় দেখবার ও জানবার জন্যে। একটা বড় বটগাছের তলায় ছোট্ট মন্দিরটা, বটের ঝুরি ও শেকড়ের দৃঢ় বন্ধনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা—মন্দিরের মধ্যে সিঁদুর-মাখানো গোল গোল পাথর, ছোট একটা পেতলের মূর্ত্তিও আছে। শুনলাম ষষ্ঠীদেবীর মূর্ত্তি। বাড়ি থেকে মেয়েরা নৈবিদ্যি সাজিয়ে এনেচে, পুরুত ঠাকুর পূজো ক'রে সকলকে ফুলবেলপাতা নির্ম্মাল্য দিলেন—ছেলেমেয়েদের মাথায় শান্তিজল ছিটিয়ে দিলেন। সবাই সাধ্যানুসারে কিছু কিছু দক্ষিণা দিলে পুরুত ঠাকুরকে, তারপর নিজের নিজের ছেলেমেয়েদের নিয়ে, নৈবিদ্যির খালি থালা হাতে সবাই বাড়ি চলে গেল। কাছেই একটা পুকুর, পুরুত ঠাকুর আমার হাতেও দুখানা বাতাসা ও ফুলবেলপাতা দিয়েছিলেন—বাতাসা দুখানা খেয়ে পুকুরে জল খেলাম—ফুলবেলপাতা পকেটে রেখে দিলাম। ছোট্ট গ্রামখানা—দূরে রেলের লাইন, ভাঙা পুকুরের ঘাটটা নির্জ্জন, চারিধারেই বড় বড় গাছে ঘেরা—শান্ত, স্তব্ধ অপরাহ্ণ—অনেক দিন পরে এই পূজোর ব্যাপারটা, বিশেষ ক'রে মেয়েদের মুখে একটা ভক্তির ভাব, পূজোর মধ্যে একটা অনাড়ম্বর সারল্য আমার ভাল লাগল।

হাওড়া-পুল পার হয়েচি, এক জায়গায় একজন ভিখারিণী আধ-অন্ধকারের মধ্যে চেঁচিয়ে কার সঙ্গে ঝগড়া করচে আর কাঁদচে। কাছে গিয়ে দেখলাম ভিখারিণী অন্ধ, বেশ ফর্সা রং, হিন্দুস্থানী—বৃদ্ধা না হ'লেও প্রৌঢ়া বটে। তার সামনে একখানা ময়লা ন্যাকড়া পাতা—সেটাতে একটা পয়সাও নেই—গোটা-দুই টিনের কালো তোবড়া মগ, একটা ময়লা পুঁটুলি, একটা ভাঁড়—এই নিয়ে তার কারবার। সে একটা সাত-আট বছরের মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া করচে—হিন্দীতে বলচে—তুই অমন ক'রে মারবি কেন? তোকে আমি ভিক্ষে ক'রে খাইয়ে এত বড়টা করলাম আর তুই আমাকেই মার দিতে শুরু করলি—আমার কপাল পোড়া, নইলে নিজের পেটের সন্তান এমন বদ হবে কেন? ছাখ দেখি কি দিয়ে মারলি, কপালটা কেটে গেছে—

মেয়েটা হি-হি ক'রে হাসচে এবং কৌতুকের সঙ্গে রাস্তা থেকে ধুলো বালি খোয়া কুড়িয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মাকে মারছে।

আমি মেয়েটাকে একটা কড়া ধমক দিয়ে বললাম—ফের মাকে যদি অমন করবি, তবে পুলিসে ধরিয়ে দেবো। পকেটে হাত দিয়ে দেখি, আনা সাতেক পয়সা আছে—সেগুলো সব তার ময়লা নেকড়াখানায় রেখে দিয়ে বললুম—তুমি কেঁদো না বাছা—আমি কাল এসে তোমায় আরও পয়সা দেবো। তোমার মেয়ে আর মারবে না। যদি মারে তো বলে দিও, কাল আমি দেখে নেবো—

এমন ছন্নছাড়া করুণ দুরবস্থার রূপ জীবনে কোনদিন দেখিনি। পরদিন হাওড়া-পুলে গিয়েছিলাম কিন্তু সেদিন বা আর কোনদিন সেই অন্ধ ভিখারিণীর দেখা পাইনি। তাকে কত খুঁজেছি, ভগবান জানেন। প্রতিদিন শোবার আগে তার কথা আমার মনে হয়।

মনে মনে বলি, আটঘরার বটতলায় তোমায় প্রথম দেখেছিলুম ঠাকুর, তোমার মুখে অত

করুণা মাখানো, মানুষকে এত কষ্ট দাও কেন? তা হবে না, তার ভাল করতেই হবে তোমায়, তোমার আশীর্ব্বাদের পুণ্যধারায় তার সকল দুঃখ ধুয়ে ফেলতে হবে তোমাকে।

এর মধ্যে একদিন কালীঘাটের মন্দিরে গেলুম।

সেদিন বেজায় ভিড়—কি একটা তিথি উপলক্ষে মেলা যাত্রী এসেচে। মেয়েরা পিষে যাচ্ছে ভিড়ের মধ্যে, অথচ কেউ এদের সুবিধে-অসুবিধে দেখবার নেই। আমার সামনেই একটি তরুণী বধূ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল—আমি একজন প্রৌঢ়া বিধবাকে বললাম—গেল, গেল, ও মেয়েটির হাত ধরে তুলুন—। কাদামাখা কাপড়ে বধূটি দিশাহারা ভাবে উঠে দাঁড়াল, আমি তার সঙ্গের লোকদের খোঁজ নিয়ে ভিড়ের ভেতর থেকে অতিকষ্টে খুঁজে বার করলাম—ভিড়ের দ্বারা চালিত হয়ে তারা অনেক দূর গিয়ে পড়েছিল। এত করেও অনেকেরই দেবদর্শন ঘটল না, পাণ্ডারা সকলকে মন্দিরে ঢুকতে দিচ্ছে না শুনলুম, কেন তা জানিনে। মেয়েদের দুঃখ দেখে আমার নিজের ঠাকুর দেখার ইচ্ছে আর রইল না।

আষাঢ় মাসের শেষ দিন। বৈকালের দিকটা মেজবাবু মোটরে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, বেলা পাঁচটার সময় ফিরে এসে আমার হিসেবের খাতা দেখাতে ডেকে পাঠালেন। রোজ তিনি দুপুরের পরে আপিসে বসে খাতা সই করেন, আজ তিনি ছিলেন না। মেজবাবুকে খাতা দেখানো বড় মুশকিলের ব্যাপার, আবার মেজবাবুকে আমার একটু ভয় হয়, তার ওপরে তিনি প্রত্যেক খরচের খুঁটিনাটি কৈফিয়ত চাইবেন। খাতা দেখতে দেখতে মুখ না তুলেই বললেন—তামাকওয়ালার ভাউচার কোথায়?

আমি বললাম—তামাকওয়ালা ভাউচার দেয়নি। খুচরো দোকান—ওরা ভাউচার রাখে না—

মেজবাবু ভ্রূ কুঁচকে বললেন—কেন, নবীন মুহুরী তো ভাউচার আনতো?

তাঁর মুখ দেখে মনে হ'ল তিনি আমায় অবিশ্বাস করচেন। আমি জানি নবীন মুহুরী যেখানে ভাউচার পেলে না—মনিবকে বুঝিয়ে দেবার জন্যে সেখানে ভাউচার নিজেই বানাতো। আমি সে মিথ্যার আশ্রয় নিই না। বললাম—আপনি জেনে দেখবেন ওরা ভাউচার কখনো দেয় না। আমি এসে পর্য্যন্ত তো দেখছি—

আমি যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলচি, তার সামনেই বড় জানালা—তার ঠিক ওপরে—মেজবাবুর অফিসের সামনাসামনি একটা শানবাঁধানো চাতাল। অন্দরমহলের একটা দোর দিয়ে চাতালটায় আসা যায় ব'লে জানলায় প্রায়ই পরদা টাঙানো থাকে। আজ সেটা গোটানো ছিল।

আমি একবার মুখ তুলতেই জানালা দিয়ে নজর পড়ল, অন্দরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কাদের ছোট্ট একটি খোকা, নিতান্ত ছোট, বছর দুই বয়স হবে। বোধ হ'ল যেন দরজা খোলা না পেয়ে চুপ ক'রে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি ভাবচি, বেশ খোকাটি তো, কাদের খোকা? এ বাড়িতে যতদূর জানি অত ছোট ছেলে কারুর তো নেই? এ ওখানে এল কার সঙ্গে?

মেজবাবু বললেন—এদিকে মন দাও, ওদিকে কি দেখচ?

আমি বললাম—কাদের খোকা দাঁড়িয়ে রয়েচে ওখানে—আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললাম—ওই যে দাঁড়িয়ে রয়েচে চাতালের দরজায়, বাড়িতে ঢুকতে পাচ্চে না বোধ হয়।

মেজবাবু সেদিকে চেয়ে বললেন—কই? কোথায় কে?

ঠিক সেই সময় অন্দরের দরজা খুলে মেজবাবুর স্ত্রী (তাঁকে অনেকবার মোটরে উঠতে-

নামতে দেখেছি) বার হয়ে এলেন এবং খোকাকে কোলে তুলে নিলেন। আমি চোখ নামিয়ে নিলাম। মেজবাবু বললেন—কোথায় তোমার খোকা না কি ?

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম—বা রে, ওই তো উনি খোকাকে কোলে নিলেন !

চোখ তুলে চাতালের দিকে চেয়ে মেজবাবুর স্ত্রীকে আর দেখতে পেলাম না, অন্দরের দরজাও বন্ধ, নিয়ে বোধ হয় বাড়ির মধ্যে চলে গিয়েচেন। মেজবাবু বললেন—কে নিয়ে গেলেন ? উনি মানে কি ? কি বকচ পাগলের মত !···

মেজবাবু আমার দিকে কেমন এক ধরনে চেয়ে রয়েছেন দেখলাম। আমি তাঁর সে দৃষ্টির সামনে থতমত খেয়ে গেলাম—আমার মনে হ'ল মেজবাবু সন্দেহ করচেন আমার মাথা খারাপ আছে নাকি ? সঙ্গে সঙ্গে বিস্মিত হলুম একথা ভেবে যে এই ওঁর স্ত্রী দরজা খুলে এলেন, খোকাকে কোলে তুলে নিলেন, এই তো দিনমানে আর এই ত্রিশ হাতের মধ্যে চাতাল, এ উনি দেখতে পেলেন না কেন ? পরক্ষণেই চট ক'রে আমার সন্দেহ হ'ল আমার সেই পুরানো রোগের ব্যাপার এর মধ্যে কিছু আছে নাকি ? এত সাধারণ ও স্বাভাবিক ঘটনার মধ্যে যে অন্য কিছু আছে বা হতে পারে, এ এতক্ষণ আমার মনেই ওঠেনি। তা হ'লে কোন কথা কি বলতাম ? এক্ষুনি চাকুরি থেকে ছাড়িয়ে দিতে পারে। বলতেই পারে, এর মাথা খারাপ, একে দিয়ে চলবে না।

কিন্তু আমার বড় কৌতূহল হ'ল। সন্ধ্যার সময় মোহিনী ঝি আমার বারান্দার সামনে দিয়ে যাচ্চে, তাকে জিজ্ঞেস করলুম—শোন, আচ্ছা বাড়িতে দেড়-বছর দু'বছরের খোকা কার আছে বল তো ? ঝি বললে—এত ছোট খোকা তো কারুর নেই !

সেইদিন রাত বারোটায় খুব হৈ-চৈ। মেজবাবুর স্ত্রীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন, লোক ছুটলো ডাক্তার আনতে। মেজবাবুর স্ত্রী যে অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন বা সন্ধ্যার পর থেকে পাস-করা ধাত্রী এসে বসে আছে এ-সব কথা তখন আমি শুনলাম। কারণ সবাই বলাবলি করচে। শেষরাত্রে শুনলাম তাঁর একটি পুত্রসন্তান হয়েচে।

মনে মনে বিস্মিত হ'লেও কারও কাছে এ নিয়ে আর কোন কথা বললাম না। নিজেই দেখি, অথচ নিজেই বুঝিনে এ-সবের মানে কি। চুপচাপ থাকাই আমার পক্ষে ভাল।

এই ঘটনার পরে আমার ভয় হ'ল আমার সেই রোগ আবার আরম্ভ হবে। ও যখন আসে তখন উপরি-উপরি অনেকবার হয়—তার পর দিনকতকের জন্যে আবার একেবারেই বন্ধ থাকে। এইবার বেশী ক'রে শুরু হ'লে আমার চাকুরি ঘুচে যাবে—সীতার কোন কিনারাই করতে পারব না।

মেজবাবু হিসেবের খাতা লেখার কাজ দিলেন নবীন মুহুরীকে। তার ফলে আমার কাজ বেজায় বেড়ে গেল—ঘুরে ঘুরে এঁদের কাজে খিদিরপুর, বরানগর, কালীঘাট করতে হয়—আর দিনের মধ্যে সতের বার দোকানে বাজারে যেতে হয় চাকরকে সঙ্গে নিয়ে। খাওয়া-দাওয়ার নির্দ্দিষ্ট সময় নেই, দিনে রাতে শুধু ছুটোছুটি কাজ। এই দোকানের হিসেব নবীন মুহুরীকে বুঝিয়ে দেওয়া একটা ঝঞ্ঝাট—রোজ সে আমাকে অপমান করে ছুতোয়-নাতায়, আমার কথা বিশ্বাস করে না, চাকরদের জিজ্ঞেস করে আড়ালে সত্যি সত্যি কি দরে জিনিসটা এনেচি। সীতার মুখ মনে ক'রে সবই সহ্য ক'রে থাকি।

কার্ত্তিক মাসে ওদের দেশের সেই মহোৎসব হবে—আমাদের সকলকে দেশে পাঠানো হ'ল। আমি অনেক আগে থেকেই শুনে আসচি—অত্যন্ত কৌতূহল ছিল দেখবো ওদের

সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মানুষ্ঠান কি রকম।

গ্রামে এঁদের প্রকাণ্ড বাড়ি, বাগান, দীঘি, এঁরাই গ্রামের জমিদার। তবে বছরে এই একবার ছাড়া আর কখনও দেশে আসেন না। কুঞ্জ নায়েব বাকী দশ মাস এখানকার মালিক।

একটা খুব বড় ফাঁকা মাঠে মেলা বসেচে—এখানকার দোকান-পসারই বেশী। অনেকগুলো খাবারের দোকান, মাটির খেলনার দোকান, মাদুরের দোকান।

একটা বড় বটগাছের তলাটা বাঁধানো, সেটাই নাকি পীঠস্থান। লোকে এসে সেইখানে পুজো দেয়—আর বটগাছটার ডালে ও ঝুরিতে ইঁট বাঁধা ও লাল নীল নেকড়া বাঁধা। লোকে মানত করার সময় ওই সব গাছের গায়ে বেঁধে রেখে যায়, মানত শোধ দেওয়ার সময় এসে খুলে দিয়ে পুজো দেয়। বটতলায় সারি সারি লোক ধর্ণা দিয়ে শুয়ে আছে, মেয়েদের ও পুরুষদের ধর্ণা দেওয়ার জায়গা আলাদা আলাদা।

বড়বাবু ও মেজবাবুতে মোহন্তের গদিতে বসেন—কর্ত্তা নীলাম্বর রায় আসেননি, তাঁর শরীর সুস্থ নয়। এঁদের বেদীর ওপরে আশপাশে তাকিয়া, ফুল দিয়ে সাজানো, সামনে ঝক্‌ঝকে প্রকাণ্ড রূপোর থালাতে দিন-রাত প্রণামী পড়চে। দুটো থালা আছে—একটাতে মোহন্তের নজর, আর একটাতে মানত ও পুজোর প্রণামী।

নবীন মুহুরী, বেচারাম ও আমার কাজ হচ্চে এই সব টাকাকড়ির হিসেব রাখা। এর আবার নানা রকম রেট বাঁধা আছে, যেমন—পাঁচ সিকার মানত থাকলে গদীর নজর এক টাকা, তিন টাকার মানতে দু টাকা ইত্যাদি। কেউ কম না দেয় সেটা মুহুরীদের দেখে নিতে হবে, কারণ মোহন্তরা টাকাকড়ির সম্বন্ধে কথা বলবেন না।

কাজের ফাঁকে আমি বেড়িয়ে দেখতে লাগলাম চারিধার। সবারই সঙ্গে মিশে এদের ধর্ম্মমতটা ভাল ক'রে বুঝবার আগ্রহে যাদের ভাল লাগে তাদেরই নানা কথা জিজ্ঞেস করি, আলাপ ক'রে তাদের জীবনটা বুঝবার চেষ্টা করি।

কি অদ্ভুত ধর্ম্মবিশ্বাস মানুষের তাই ভেবে অবাক হয়ে যাই। কতদূর থেকে যে লোক এসেচে পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে, ছেলেমেয়ে সঙ্গে নিয়েও এসেচে অনেকে। এখানে থাকবার জায়গা নেই, বড় একটা মাঠে লোকে এখানে-ওখানে এই কার্ত্তিক মাসের হিমে চট, শতরঞ্জি, হোগলা, মাদুর যে যা সংগ্রহ করতে পেরেছে তাই দিয়ে থাকবার জায়গা তৈরি ক'রে তারই তলায় আছে—কেউ বা আছে শুধু গাছতলাতে। যে যেখানে পারে মাটি খুঁড়ে কি মাটির ঢেলা দিয়ে উনুন বানিয়ে রান্না করচে। একটা সজ্‌নে-গাছতলায় এক বুড়ী রান্না করছিল—সে একাই এসেচে হুগলী জেলার কোন্ গাঁ থেকে। তার এক নাতি হুগলীর এক উকিলের বাসার চাকর, তার ছুটি নেই, বুড়ী প্রতি বছর একা আসে।

আমায় বললে—বড্ড জাগ্রত ঠাকুর গো বটতলার গোসাঁই। মোর মাল্‌সি গাছে ক্যাঁটাল মোটে ধরতো নি, জালি পড়ে আর খসে খসে যায়। তাই বম্ম্‌ বাবার থানে ক্যাঁটাল দিয়ে আসবো, হে ঠাকুর ক্যাঁটাল যেন হয়। বললে না পেত্যয় যাবে ছোটয়-বড়য় এ-বছর সতেরো গণ্ডা এঁচড় ধরেচে গোসাঁইয়ের কিরপায়।

আর এক জায়গায় খেজুরডালের কুঁড়েতে একটি বৌ ব'সে রাঁধচে। আর তার স্বামী কুঁড়ের বাইরে ব'সে খোল বাজিয়ে গান করচে। কাছে যেতেই বসতে বললে। তারা জাতে কৈবর্ত্ত, বাড়ি খুলনা জেলায়, পুরুষটির বয়স বছর চল্লিশ হবে। তাদের ছোট্ট একটি ছেলে মায়ের কাছে ব'সে আছে, তারই মাথার চুল দিতে এসেচে।

পুরুষটির নাম নিমচাঁদ মণ্ডল। স্বামী-স্ত্রী দু-জনেই বড় ভক্ত। নিমচাঁদ আমার হাতে

একখানা বই দিয়ে বললে—পড়ে শোনাও তো বাবু, দু-আনা দিয়ে মেলা থেকে কাল কেনলাম একখানা। বইখানার নাম 'বটতলার কীর্ত্তন'। স্থানীয় ঠাকুরের মাহাত্ম্যসূচক তাতে অনেকগুলো ছড়া। বটতলার গোসাঁই ব্রহ্মার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে এখানে এসে আস্তানা বেঁধেচেন, কলিরাজ ভয়ে তাঁর সঙ্গে এই সন্ধি করলে যে বটতলার হাওয়া যত দূর যাবে ততদূর পর্য্যন্ত কলির অধিকার থাকবে না। বটতলার গোসাঁই পাপীর মুক্তিদাতা, সর্ব্ব জীবের আশ্রয়, সাক্ষাৎ শ্রীহরির একাদশ অবতার।

কলিতে নতুন রূপ শুন মন দিয়া
বটতলে স্থিতি হৈল ভক্তদল নিয়া
খেদে কহে কলিরাজ, এ বড় বিষম কাজ
মোর দশা কি হবে গোসাঁই ?
ঠাকুর কহিলা হেসে, মনে না করিহ ক্লেশে
থান ত্যজি কোথাও না যাই।
শ্রীদাম সুবল সনে হেথায় আসিব
বটমূলে বৃন্দাবন সৃষ্টি করি নিব।

নিমচাঁদ শুনতে শুনতে ভক্তিগদ্‌গদ্‌কণ্ঠে বললে—আহা! আহা! বাবার কত লীলাখেলা!

তার স্ত্রীও কুঁড়ের দোরগোড়ায় এসে বসে শুনচে। মানে বুঝলাম এরা নিজেরা পড়তে পারে না, বইপড়া শোনার আনন্দ এদের কাছে বড্ড নতুন, তা আবার যাঁর ওরা ভক্ত, সেই বটতলার গোসাঁই সম্বন্ধে বই।

নিমচাঁদ বললে—আচ্ছা, বটতলার হাওয়া কত দূর যায় দা-ঠাকুর ?

—কেন বল তো ?

—এই যে বলচে কলির অধিকার নেই ওর মধ্যি, তা কত দূর তাই শুধুচ্চি।

—কত দূর আর, তা আধ ক্রোশ, বড়জোর—

নিমচাঁদ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কি ভেবে বললে—কি করবো দা-ঠাকুর, দেশে লাঙল-গরু ক'রে ফেলেচি, কুড়ো-দুই জমিতে এবার বাগুন রুইয়ে রেখে এসেচি—নয়ত এ বাবার থান ত বিন্দাবন, আপনি পড়লেন—এ স্বগ্‌গো ছেড়ে বিলির মোষের মত বিলি ফিরে যাই দা-ঠাকুর ? কি বলিস্ রে তুই, সরে আয় না এদিকে, দা-ঠাকুরকে লজ্জা কি, উনি তো ছেলেমানুষ।

নিমচাঁদের স্ত্রী গলার সুরকে খুব সংযত ও মিষ্টি ক'রে, অপরিচিত পুরুষ মানুষের সামনে কথা বলতে গেলে মেয়েরা যেমন সুরে কথা বলে তেমনি ভাবে বললে—হ্যাঁ ঠিকই তো। বাবার চরণের তলা ছেড়ে কোথাও কি যেতে ইচ্ছে ক'রে ?

নিমচাঁদ বললে—দু-মণ কোষ্টা ছিল ঘরে, তা বলি বিক্রী ক'রে চল বাবার থানে বাবার ছিচরণ দর্শন ক'রে আসি আর অমনি গঙ্গাছেনটাও সারবো। টাকা বাবা যোগাবেন, সেজন্য ভাবিনে। ওরে শোন্, কাল তুই তো ধন্না দিবি সকালে, আজ রাতে ভাতে জল দিয়ে রেখে দিস—

জিজ্ঞেস ক'রে জানলাম ছেলের অসুখের জন্যে ধর্ণা দেবার ইচ্ছে আছে ওদের।

নিমচাঁদের বৌ বললে—বুঝলেন দাদাঠাকুর, খোকার মামা ওর মুখ দেখে তিনটে টাকা দিলে খোকার হাতে। তখন পয়সার বড় কষ্ট যাচ্চে, কোষ্টা তখন জলে, কাচলি তো পয়সা ঘরে আসবে ? তো বলি, না, এ টাকা খরচ করা হবে না। এ রইল তোলা বাবার থানের

জন্যি। মোহন্ত বাবার গদীতে দিয়ে আসব।

সেই দিন বিকেলে নিমচাঁদ ও তার বৌ পূজো দিতে এল গদীতে। নবীন মুহুরী তাদের কাছে রেট-মত প্রণামী ও পূজোর খরচ আদায় করলে অবিশ্যি—তা ছাড়া নিমচাঁদের বৌ নিজের হাতে সেই তিনটে টাকা বড়বাবুর সামনের রূপোর থালায় রেখে দিয়ে বড়বাবুর পায়ের ধুলো নিয়ে কোলের খোকার মাথায় মুখে দিয়ে দিলে।

তার পর সে একবার চোখ তুলে মোহন্তদের দিকে চাইলে এবং এদের ঐশ্বর্য্যের ঘটাতেই সম্ভবত অবাক হয়ে গেল—বুদ্ধিহীন চোখে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সঙ্গে টাকা-পয়সাতে পরিপূর্ণ ঝকঝকে রূপোর থালাটার দিকে বার-কতক চাইলে, রঙীন শালু ও গাঁদাফুলের মালায় মোড়া থামগুলোর দিকে চাইলে—জীবনে এই প্রথম সে গোসাঁইয়ের থানে এসেচে, সব দেখেশুনে লোকের ভিড়ে, মোহন্ত মহারাজের আড়ম্বরে, অনবরত বর্ষণরত প্রণামীর ঝম্‌ঝমানি আওয়াজে সে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল। কতক্ষণ হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল, বাইরে থেকে ক্রমাগত লোক ঢুকচে, তাকে ক্রমশঃ ঠেলে একধারে সরিয়ে দিচ্চে, তবুও সে দাঁড়িয়েই আছে।

ওকে কে একজন ঠেলা দিয়ে এগিয়ে আসতে গেল, আমি ওর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারিনি। ওর মুখচোখের মুগ্ধ ভক্তিস্তব্ধ দৃষ্টি আমায়ও মুগ্ধ করেচে—এ এক নতুন অভিজ্ঞতা আমার জীবনের, এই বাজে শালুর বাহার আর লোকের হৈ চৈ আর মেজবাবু, বড়বাবুর চশমা-মণ্ডিত দাম্ভিক মুখ দেখে এত ভাব ও ভক্তি আসে!—যে ঠেলা দিয়ে এদিকে আসছিল, আমি তাকে ধমক দিলুম। তার পর ওর চমক ভাঙতে ফিরে বাইরে বেরিয়ে গেল।

ওরা চলে গেলে একটি বৃদ্ধা এল, তার বয়স অনেক হয়েচে, বয়সে গলার সুর কেঁপে গিয়েচে, হাত কাঁপচে, সে তার আঁচল থেকে একটি আধুলি খুলে থালায় দিতে গেল। নবীল মুহুরী বললে—রও গো, রাখ—আধুলি কিসের?

বুড়ী বললে—এই-ই ঠাকুরের মানত শোধের পেরণামী—

নবীন মুহুরী বললে—পাঁচ সিকের কমে ভোগের পূজো নেই—পাঁচ সিকিতে এক টাকা গদীর নজর—

বুড়ী শুনতে পায় না, বললে—কত?

নবীন আঙুল দেখিয়ে চেঁচিয়ে বললে—এক টাকা—

বুড়ী বললে—আর নে-ই, মাদুর কিনেলাম ছআনার, আর—

নবীন মুহুরী আধুলি ফেরত দিয়ে বললে—নিয়ে যাও, হবে না। আর আট আনা নিয়ে এস—

বড়বাবু একটা কথাও বললেন না। বুড়ী কাঁপতে কাঁপতে ফিরে গেল এবং ঘণ্টাখানেক পর সিকিতে, দুআনিতে, পয়সাতে একটা টাকা নিয়ে এসে প্রণামীর থালায় রাখলে।

ওরা চলে গেলে আমার মনে হ'ল এই সরল, পরম বিশ্বাসী পল্লীবধূ, এই বৃদ্ধা ওদের কষ্টার্জ্জিত অর্থ কাকে দিয়ে গেল—মেজবাবুকে, বড়বাবুকে? এই এত লোক এখানে এসেছে, এরা সবাই চাষী গরীব গৃহস্থ, কি বিশ্বাসে এখানে এসেছে জানি নে—কিন্তু অম্লানবদনে খুশীর সঙ্গে এদের টাকা দিয়ে যাচ্চে কেন? এই টাকায় কলকাতায় ওঁদের স্ত্রীরা গহনা পরবেন, মোটরে চড়বেন, থিয়েটার দেখবেন, ওঁরা মামলা করবেন, বড়মানুষি, সাহেবিয়ানা করবেন—ছোটবাবু বন্ধুবান্ধব নিয়ে গানবাজনার মজলিসে চপ-কাটলেট ওড়াবেন, সেই জন্যে?

পরদিন সকালে দেখলাম নিমচাঁদের স্ত্রী পুকুরে স্নান ক'রে সারাপথ সাষ্টাঙ্গ নমস্কার করতে করতে ধুলোকাদা-মাখা গায়ে বটতলায় ধর্ণা দিতে চলেচে—আর নিমচাঁদ ছেলে কোলে নিয়ে

ছলছল চোখে তার পাশে পাশে চলেচে।

সেই দিন রাত্রে শুনলাম মেলায় কলেরা দেখা দিয়েচে। পরদিন দুপুরবেলা দেখি বটতলার সামনের মাঠটা প্রায় ফাঁকা হয়ে গিয়েচে, অনেকেই পালিয়েচে। নিমচাঁদের কুঁড়েঘরের কাছে এসে দেখি নিমচাঁদের স্ত্রী বসে—আমায় দেখে কেঁদে উঠল। নিমচাঁদের কলেরা হয়েচে কাল রাত্রে—মেলার যারা তদারক করে, তারা ওকে কোথায় নাকি নিয়ে যেতে চেয়েচে, মাঠের ওদিকে কোথায়। আমি ঘরে ঢুকে দেখি নিমচাঁদ ছটফট করচে, খুব ঘামচে।

নিমচাঁদের স্ত্রী কেঁদে বললে—কি করি দাদাঠাকুর, হাতে শুধু যাবার ভাড়াটা আছে—কি করি কোথা থেকে—

মেজবাবুকে কথাটা বললাম গিয়ে—তিনি বললেন—লোক পাঠিয়ে দিচ্চি, ওকে সিগ্রিগেশন ক্যাম্পে নিয়ে যাও—মেলার ডাক্তার আছে সে দেখবে—

নিমচাঁদের বৌ-এর কি কান্না ওকে নিয়ে যাবার সময়। আমরা বোঝালুম অনেক। ডাক্তার ইন্‌জেক্‌শন দিলে। মাঠের মধ্যে মাতুর দিয়ে সিগ্রিগেশন্ ক্যাম্প করা হয়েছে—অতি নোংরা বন্দোবস্ত। সেখানে সেবাশুশ্রূষার কোন ব্যবস্থাই নেই। ভাবলুম চাকুরি যায় যাবে, ওকে বাঁচিয়ে তুলব, অন্ততঃ বিনা তদারকে ওকে মরতে দেবো না। সারারাত জেগে রোগীকে দেখা-শুনা করলুম একা। সিগ্রিগেশন্ ক্যাম্পে আরও চারটি রোগী এল—তিনটে সন্ধ্যার মধ্যেই মরে গেল। মেলার ডাক্তার অবিশ্যি নিয়মমত দেখলে। এদের পয়সা নিয়ে যারা বড়-মানুষ, তারা চোখে এসে দেখেও গেল না কাউকে। রাত্রিটা কোন রকমে কাটিয়ে বেলা উঠলে নিমচাঁদও মারা গেল। সে এক অতি করুণ ব্যাপার! ওদের দেশের লোক খুঁজে বার ক'রে নিমচাঁদের সৎকারের ব্যবস্থা করা গেল। নিমচাঁদের স্ত্রীর দিকে আমি আর চাইতে পারি নে—বটতলায় ধর্ণা দেওয়ার দিন থেকে সেই যে সে উপবাস ক'রে আছে, গোলমালে আর তার খাওয়াই হয়নি। রুক্ষ চুল একমাথা, সেই ধূলিধূসরিত কাপড়—খবর পেয়ে সে ধর্ণা ফেলে বটতলা থেকে উঠে এসেছে—চোখ কেঁদে কেঁদে লাল হয়েছে, যেন পাগলীর মত দৃষ্টি চোখে। এখন আর সে কাঁদচে না, শুধু কাঠের মত বসে আছে, কথাও বলে না, কোনো দিকে চায় না।

মেজবাবুকে বলাতে তিনি ওকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার খরচ দু-টাকা মঞ্জুর করলেন। কিন্তু সে আমি যথেষ্ট বললাম ও অনুরোধ করলাম ব'লে। আরও কত যাত্রী এ-রকম মরে গেল বা তাদের কি ব্যবস্থা হ'ল এ-সব দেখবার দায়িত্ব এঁদেরই তো। ওঁরাই রইলেন নির্ব্বিকার ভাবে ব'সে। আমার কাছে কিছু ছিল, যাবার সময় নিমচাঁদের স্ত্রীর হাতে দিলুম। চোখের জল রাখতে পারি নে, যখন সে চলে গেল।

দিন-দুই পরে রাত্রে বসে আমি ও নবীন মুহুরী হিসেব মেলাচ্চি মেলার দেনা-পাওনার। বেশ জ্যোৎস্না রাত, কার্ত্তিকের সংক্রান্তিতে পরশু মেলা শেষ হয়ে গিয়েছে, বেশ শীত আজ রাত্রে।

এমন সময় হঠাৎ আমার কি হ'ল বলতে পারিনে—দেখতে দেখতে নবীন মুহুরী, মেলার আটচালা ঘর, সব যেন মিলিয়ে গেল—আমি যেন এক বিবাহ-সভায় উপস্থিত হয়েচি—অবাক হয়ে চেয়ে দেখি সীতার বিবাহ-সভা। জ্যাঠামশায় কন্যাসম্প্রদান করতে বসেছেন, খুব বেশী লোকজনের নিমন্ত্রণ হয়নি, বরপক্ষেও বরযাত্রী বেশী নেই। দাদাকেও দেখলুম—দাদা ব'সে ময়দা ঠাসচে।·· আরও সব কি কি···ঘষা কাঁচের মধ্যে দিয়ে যেন সবটা দেখচি—খানিকটা স্পষ্ট, খানিকটা অস্পষ্ট।

চমক ভাঙলে দেখি নবীন মুহুরী আমার মাথায় জল দিচ্চে। বললে—কি হয়েচে তোমার, মাঝে মাঝে ফিট্ হয় নাকি?

আমি চোখ মুছে বললুম—না। ও কিছু না—

আমার তখন কথা বলতে ভাল লাগচে না। সীতার বিবাহ নিশ্চয়ই হচ্ছে, আজ এখুনি হচ্ছে। আমি ওকে বড় ভালবাসি—আমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে জ্যাঠামশায় ওর বিবাহ দিতে পারবেন না। আমি সব দেখেচি।

নবীন মুহুরীকে বললাম—তুমি আমাকে ছুটি দাও আজ, শরীরটা ভাল নেই, একটু শোব।

পরদিন বড়বাবুর চাকর কলকাতা থেকে এল। মায়ের একখানা চিঠি কলকাতার ঠিকানায় এসে পড়েছিল, মায়ের জবানি জ্যাঠামশায়ের লেখা আসলে। ২রা অগ্রহায়ণ সীতার বিয়ে, সেই জ্যাঠামশায়ের ঠিক করা পাত্রের সঙ্গেই। তিনি কথা দিয়েচেন, কথা খোয়াতে পারেন না। বিশেষ অত বড় মেয়ে ঘরে রেখে পাঁচজনের কথা সহ্য করতে প্রস্তুত নন। আমরা কোন্ কালে কি করব তার আশায় তিনি কতকাল বসে থাকেন—ইত্যাদি।

বেচারী সীতা! ওর সাবান মাখা, চুলবাঁধা, মিথ্যে শৌখীনতার অক্ষম চেষ্টা মনে পড়ল। কত ক'রে ওর মুখের দিকে চেয়ে এতকাল কিছু গ্রাহ্য করিনি। বেশ দেখতে পেলাম ওর ঘন কালো চুলের সিঁতিপাটি ব্যর্থ হয়ে গেল—ওর শুভ্র, নিষ্পাপ জীবন নিয়ে সবাই ছিনিমিনি খেললে।

॥ ৯ ॥

এখান থেকে কলকাতায় যাবার সময় হয়ে এল। বিকেলে আমি বটতলার পুকুরের ঘাটে বসে মাছ ধরা দেখচি, নবীন মুহুরী এসে বললে—তোমায় ডাকচেন মেজবাবু।

ওর মুখ দেখে আমার মনে হ'ল গুরুতর একটা কিছু ঘটেছে কিংবা ও-ই আমার নামে কি লাগিয়েচে। নবীন মুহুরী এ-রকম বার-কয়েক আমার নামে লাগিয়েচে এর আগেও। কারণ তার চুরির বেজায় অসুবিধে ঘটচে আমি থাকার দরুণ।

মেজবাবু চেয়ারে বসে, কুঞ্জ নায়েবও সেখানে দাঁড়িয়ে।

মেজবাবু আমাকে মানুষ বলেই কোনো দিন ভাবেননি। এ পর্য্যন্ত আমি পারতপক্ষে তাঁকে এড়িয়েই চলে এসেচি। লোকটার মুখের উগ্র দাম্ভিকতা আমাকে ওঁর সামনে যেতে উৎসাহিত করে না। আমায় দেখে বললেন—শোন এদিকে। কলকাতায় গিয়ে তুমি অন্য জায়গায় চাকুরির চেষ্টা করবে। তোমাকে এক মাসের নোটিশ দিলাম।

—কেন, কি হয়েচে?

—তোমার মাথা ভাল না, এ আমিও জানি, নবীনও দেখেচে বলচে। হিসেব-পত্রে প্রায়ই গোলমাল হয়। এ-রকম লোক দিয়ে আমার কাজ চলবে না। স্টেটের কাজ তো ছেলেখেলা নয়!

নবীন এবার আমায় শুনিয়েই বললে—এই তো সেদিন আমার সামনেই হিসেব মেলাতে মেলাতে মৃগীরোগের মত হয়ে গেল—আমি তো ভয়েই অস্থির—

মেজবাবুকে বিদ্বান ব'লে আমি সম্ভ্রমের চোখেও দেখতাম—বললাম—দেখুন, তা নয়। আপনি তো সব বোঝেন, আপনাকে বলচি। মাঝে মাঝে আমার কেমন একটা অবস্থা হয় শরীরের ও মনের, সেটা ব'লে বোঝাতে পারি নে—কিন্তু তখন এমন সব জিনিস দেখি, সহজ অবস্থায় তা দেখা যায় না। ছেলেবেলায় আরও অনেক দেখতুম, এখন কমে গিয়েচে। তখন বুঝতাম না, মনে ভয় হ'ত, ভাবতাম এ-সব মিথ্যে, আমার বুঝি কি রোগ হয়েচে। কিন্তু এখন

বুঝেচি ওর মধ্যে সত্যি আছে অনেক।

মেজবাবু কৌতুক ও বিদ্রূপ মিশ্রিত হাসি-মুখে আমার কথা শুনছিলেন—কথা শেষ হ'লে তিনি কুঞ্জ নায়েবের দিকে চেয়ে হাসলেন। নবীন মুহুরীর দিকে চাইলেন না, কারণ সে অনেক কম দরের মানুষ। স্টেটের নায়েবের সঙ্গে তবুও দৃষ্টি-বিনিময় করা চলে। আমার দিকে চেয়ে বললেন—কতদূর পড়াশুনা করেচ তুমি ?

—আই-এ পাস করেছিলাম শ্রীরামপুর কলেজ থেকে—

—তাহ'লে তোমায় বোঝানো আমার মুশকিল হবে। মোটের ওপর ও-সব কিছু না। নিউরোটিক যারা—নিউরোটিক বোঝ ? যাদের স্নায়ু দুর্ব্বল তাদের ওই রকম হয়। রোগই বইকি, ও এক রকম রোগ—

আমি বললাম—মিথ্যে নয় যে তা আমি জানি। আমি নিজের জীবনে অনেকবার দেখেচি—ও-সব সত্যি হয়েচে। তবে কেন হয় এইটেই জানি নে, সেই জন্যেই আপনাকে জিজ্ঞেস করচি। আমি সেণ্ট ফ্রান্সিস্ অফ্ আসিসির লাইফ-এ পড়েচি তিনিও এ-রকম দেখতেন—

মেজবাবু ব্যঙ্গের সুরে বললেন—তুমি তাহ'লে—তুমি সেণ্ট হয়ে গিয়েচ দেখচি ? পাগল কি আর গাছে ফলে ?

নবীন ও কুঞ্জ দুজনেই মেজবাবুর প্রতি সম্ভ্রম বজায় রেখে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসতে লাগল।

আমি নানাদিক থেকে খোঁচা খেয়ে মরীয়া হয়ে উঠলাম। বললাম—আর শুধু ওই দেখি যে তা নয়, অনেক সময় মরে গিয়েচে এমন মানুষের আত্মার সঙ্গে কথা বলেচি, তাদের দেখতে পেয়েচি।

নবীন মুহুরীর বুদ্ধিহীন মুখে একটা অদ্ভুত ধরনের অবিশ্বাস ও ব্যঙ্গের ছাপ ফুটে উঠল, কিন্তু নিজের বুদ্ধির ওপর তার বোধ হয় বিশেষ আস্থা না থাকাতে সে মেজবাবুর মুখের দিকে চাইলে। মেজবাবু এমন ভাব দেখালেন যে, এ বদ্ধ উন্মাদের সঙ্গে আর কথা ব'লে লাভ কি আছে! তিনি কুঞ্জ নায়েবের দিকে এভাবে চাইলেন যে, একে আর এখানে কেন ? পাগলামি চড়ে বসলেই একটা কি ক'রে ফেলবে এক্ষুনি!

আমি আরও মরীয়া হয়ে বললাম—আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন তাতে যে-জিনিস সত্যি তা মিথ্যে হয়ে যাবে না। আমার মনে হয়, আপনি আমার কথা বুঝতেও পারেননি। যার নিজের অভিজ্ঞতা না হয়েচে, সে এ-সব বুঝতে পারবে না, এ-কথা এতদিনে আমি বুঝেচি। খুব বেশী লেখাপড়া শিখলেই বা খুব বুদ্ধি থাকলেই যে বোঝা যায় তা নয়। আচ্ছা, একটা কথা আপনাকে বলি, আমি যে-ঘরটাতে থাকি, ওর ওপাশে যে ছোট্ট বাড়িটা আছে, ভাঙা রোয়াক যার সামনে—ওখানে আমি একজন বড়োমানুষের অস্তিত্ব অনুভব করতে পেরেচি—কি করে পেরেচি, সে আমি নিজেই জানি নে—খুব তামাক খেতেন, বয়স অনেক হয়েছিল, খুব রাগী লোক ছিলেন, তিনি মারা গিয়েচেন কি বেঁচে আছেন তা আমি জানি নে। ওই জায়গাটায় গেলেই এই ধরনের লোকের কথা আমার মনে হয়। বলুন তো ওখানে কেউ ছিলেন এ-রকম ?

কুঞ্জ নায়েবের সঙ্গে মেজবাবুর অর্থসূচক দৃষ্টি-বিনিময় হ'ল। মেজবাবু শ্লেষের সঙ্গে বললেন—তোমাকে যতটা সিম্পল্ ভেবেছিলাম তুমি তা নও দেখচি। তোমার মধ্যে ভণ্ডামিও বেশ আছে—তুমি বলতে চাও তুমি এত দিন এখানে এসেচ, তুমি কারও কাছে শোননি ওখানে কে থাকতো ?

—আপনি বিশ্বাস করুন, আমি তা শুনিনি। কে আমায় বলেচে আপনি খোঁজ নিন্?

—ওখানে আমাদের আগেকার নায়েব ছিল, ওটা তার কোয়ার্টার ছিল, সে বছর-চারেক আগে মারা গিয়েছে, শোননি এ-কথা?

—না আমি শুনিনি। আরও কথা বলি শুনুন, আপনার ছেলে হওয়ার আগের দিন কলকাতায় আপিসে আপনাকে কি বলেছিলুম মনে আছে? বলেছিলুম একটি খোকা দাঁড়িয়ে আছে—দরজা খুলে মেজবৌরাণী এসে তাকে নিয়ে গেলেন—এ-কথা বলেছিলুম কিনা? মনে ক'রে দেখুন।

—হ্যাঁ, আমার খুব মনে আছে। সেও তুমি জানতে না যে আমার স্ত্রী আসন্ন-প্রসবা ছিল? যদি আমি বলি তুমি একটা বেশ চাল চেলেছিলে—যে কোনো একটি সন্তান তো হ'তই—তুমি অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়েছিলে, দৈবাৎ লেগে গিয়েছিল। শার্লাটান্‌রা ও-রকম বুজরুকি করে—আমি কি বিশ্বাস করি ওসব ভেবেচ?

—বুজরুকি কিসের বলুন? আমি কি তার জন্যে আপনার কাছে কিছু চেয়েছিলুম? বা আর কোনোদিন সে-কথার কোনো উল্লেখ করেছিলুম? আমি জানি আমার এ একটা ক্ষমতা—ছেলেবেলায় দার্জ্জিলিঙের চা-বাগানে আমরা ছিলাম, তখন থেকে আমার এ ক্ষমতা আছে। কিন্তু এ দেখিয়ে আমি কখনও টাকা রোজগারের চেষ্টা তো করিনি কারোর কাছে? বরং বলিই নে—

মেজবাবু অসহিষ্ণুভাবে বললেন—অল্ ফিড্‌ল্‌স্টিক্—মনের ব্যাপার তুমি কিছু জানো না। তোমাকে বোঝাবার উপায় আমার নেই। ইট্ প্লেজ্ কুইয়ার ট্রিক্‌স্ উইথ্ আস্—যদি ধরে নিই তুমি মিথ্যাবাদী নও—ইউ মে বি এ সেল্‌ফ্ ডিলিউডেড্ ফুল্ এবং আমার মনে হয় তুমি তাই-ই। আর কিছু নয়। যাও এখন—

আমি চলে এলাম। নবীন মুহুরী আমার পিছু পিছু এসে বললে—তোমার সাহস আছে বলতে হবে—মেজবাবুর সঙ্গে অমন ক'রে তর্ক আজ পর্য্যন্ত কেউ করেনি। না! যা হোক্, তোমার সাহস আছে। আমার তো ভয় হচ্ছিল এই বুঝি মেজবাবু রেগে ওঠেন—

আমি জানি নবীনই আমার নামে লাগিয়েছিল, কিন্তু এ নিয়ে ওর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করবার প্রবৃত্তি আমার হ'ল না। কেবল একটা কথা ওকে বললাম—দেখ নবীন-দা, চাকুরির ভয় আমি আর করি নে। যে-জন্যে চাকুরি করছিলাম, সে কাজ মিটে গিয়েচে। এখন আমার চাকুরি করলেও হয় না-করলেও হয়। ভেবো না, আমি নিজেই শীগ্‌গির চলে যাবো ভাই।

ক-দিন ধরে একটা কথা ভাবছিলাম। এই যে এতগুলো পাড়াগেঁয়ে গরীব চাষীলোক এখানে পুজো দিতে এসেছিল—এরা সকলেই মূর্খ, ভগবানকে এরা সে ভাবে জানে না, এরা চেনে বটতলার গোসাঁইকে। কে বটতলার গোসাঁই? হয়ত একজন ভক্ত বৈষ্ণব, গ্রাম্য লোক, বছর পঞ্চাশ আগে থাকত ওই বটতলায়। সেই থেকে লৌকিক প্রবাদ এবং বোধ হয় মেজবাবুদের অর্থগৃধ্নুতা দুটোতে মিলে বটতলাকে করেচে পরম তীর্থস্থান। কোথায় ভগবান, কোথায় প্রথিতযশা ঐতিহাসিক অবতারের দল—এই বিপুল জনসঙ্ঘ তাঁদের সন্ধানই রাখে না হয়ত। এদের এ কি ধর্ম্ম? ধর্ম্মের নামে ছেলেখেলা।

কিন্তু নিমচাঁদকে দেখেচি। তার সরল ভক্তি, তাদের ত্যাগ। তার স্ত্রীর চোখে যে অপূর্ব্ব ভাবদৃষ্টি, যা সকল ধর্ম্মবিশ্বাসের উৎসমুখ—এ-সব কি মূল্যহীন, ভিত্তিহীন, জলজ শেওলার মত মিথ্যার মহাসমুদ্রে ভাসমান? এ রকম কত নিমচাঁদ এসেছিল মেলায়। জ্যাঠাইমাদের আচারের শেকলে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা ঐশ্বর্য্যের ঘটা দেখানো দেবার্চ্চনার চেয়ে এ আমার ভাল

লেগেচে। ঘুসুড়ির সেই ষষ্ঠীমন্দিরের মত।

কোন্ দেবতার কাছে নিমচাঁদের তিনটে টাকার ভোগ অর্ঘ্য গিয়ে পৌঁছুলো, জীবনের শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে পরম ত্যাগে সে যা নিবেদন করলে?

আর একটা কথা বুঝেচি। কাউকে কোন কথা ব'লে বুঝিয়ে বিশ্বাস করানো যায় না। মনের ধর্ম্ম মেজবাবু আমায় কি শেখাবেন, আমি এটুকু জেনেচি নিজের জীবনে—মানুষের মন কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না সে জিনিসকে, যা ধরা-ছোঁয়ার বাইরের। আমি যা নিজের চোখে কতবার দেখলুম, বাস্তব ব'লে জানি—ঘরে-বাইরে সব লোক বললে ও মিথ্যে। পণ্ডিত ও মূর্খ এখানে সমান—ধরা-ছোঁয়ার গণ্ডীর সীমানা পার হয়ে কারুর মন অন্তত অজানার দিকে পাড়ি দিতে চায় না। যা সত্যি তা কি মিথ্যে হয়ে যাবে?

কলকাতায় ফিরে এলাম বড়বাবুর মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে। জামাইকে বিয়ের রাত্রে বেবি অস্টিন্ গাড়ি যৌতুক দেওয়া হ'ল—বিবাহ মণ্ডপের মেরাপ বাঁধতে ও ফুল দিয়ে সাজাতেই ব্যয় হ'ল আটশ টাকা। বিয়ের পরে ফুলশয্যার তত্ত্ব সাজাতে আট-দশজন লোক হিমসিম খেয়ে গেল। ছোটবাবুর বন্ধুবান্ধবদের একদিন পৃথক ভোজ হ'ল, সেদিন শখের থিয়েটারে হাজার টাকা গেল এক রাত্রে। তবুও তো শুনলাম এ তেমন কিছু নয়—এরা পাড়াগাঁয়ের গৃহস্থ জমিদার মাত্র, খুব বড়মানুষি করবে কোথা থেকে।

ফুলশয্যার তত্ত্ব সাজাতে খুব খাটুনি হ'ল। দু মণ দই, আধ মণ ক্ষীর, এক মণ মাছ, লরি-বোঝাই তরিতরকারি, চল্লিশখানা সাজানো থালায় নানা ধরনের তত্ত্বের জিনিস—সব বন্দোবস্ত ক'রে তত্ত্ব বার ক'রে ঝি-চাকরের সারি সাজাতে ও তাদের রওনা করতে—সে এক রাজসূয় ব্যাপার।

ওদের রঙীন কাপড়-পরা ঝি-চাকরের লম্বা সারির দিকে চেয়ে মনে হ'ল এই বড়মানুষির খরচের দরুণ নিমচাঁদের স্ত্রী তিনটে টাকা দিয়েচে। অথচ এই হিমবর্ষী অগ্রহায়ণ মাসের রাত্রে হয়ত সে অনাথা বিধবার খেজুরডালের ঝাঁপে শীত আটকাচ্চে না, সেই যে বুড়ী যার গলা কাঁপছিল, তার সেই ধার-করে দেওয়া আট আনা পয়সা এর মধ্যে আছে। ধর্ম্মের নামে এরা নিয়েচে, ওরা স্বেচ্ছায় হাসিমুখে দিয়েচে।

সব মিথ্যে। ধর্ম্মের নামে এরা করেচে ঘোর অধর্ম্ম ও অবিচারের প্রতিষ্ঠা। বটতলার গোসাঁই এদের কাছে ভোগ পেয়ে এদের বড়মানুষ ক'রে দিয়েচে, লক্ষ গরীব লোককে মেরে—জ্যাঠামশায়দের গৃহদেবতা যেমন তাদের বড় ক'রে রেখেছিল, মাকে, সীতাকে ও ভুবনের মাকে করেছিল ওদের ক্রীতদাসী।

সত্যিকার ধর্ম্ম কোথায় আছে? কি ভীষণ মোহ, অনাচার ও মিথ্যের কুহকে ঢাকা পড়ে গেছে দেবতার সত্য রূপ সেদিন, যেদিন থেকে এরা হৃদয়ের ধর্ম্মকে তুলে অর্থহীন অনুষ্ঠানকে ধর্ম্মের আসনে বসিয়েছে।

দাদার একখানা চিঠি পেয়ে অবাক হয়ে গেলাম। দাদা যেখানে কাজ করে, সেখানে এক গরীব ব্রাহ্মণের একটি মাত্র মেয়ে ছিল, ওখানকার সবাই মিলে ধরে-পড়ে মেয়েটির সঙ্গে দাদার বিয়ে দিয়েচে। দাদা নিতান্ত ভালমানুষ, যে যা বলে কারও কথা ঠেলতে পারে না। কাউকে জানানো হয়নি, পাছে কেউ বাধা দেয়, তারাই জানাতে দেয়নি। এদিকে জ্যাঠামশায়ের ভয়ে বাড়িতে বৌ নিয়ে যেতে সাহস করচে না, আমায় লিখেচে, সে বড় বিপদে পড়েচে, এখন সে কি করবে? চিঠির বাকী অংশটা নববধূর রূপগুণের উচ্ছ্বসিত সুখ্যাতিতে ভর্ত্তি।

"জিতু, আমার বড় মনে কষ্ট, বিয়ের সময় তোকে খবর দিতে পারিনি। তুই একবার অবিশ্যি অবিশ্যি আসবি, তোর বউদিদির বড় ইচ্ছে তুই একবার আসিস্। মায়ের সম্বন্ধে কি করি আমায় লিখবি। সেখানে তোর বউদিকে নিয়ে যেতে আমার সাহসে কুলোয় না। ওরা ঠিক কুলীন ব্রাহ্মণ নয়, আমাদের স্বঘরও নয়, অত্যন্ত গরিব, আমি বিয়ে না করলে মেয়েটি পার হবে না সবাই বললে, তাই বিয়ে করেচি। কিন্তু তোর বৌদিদি বড় ভাল মেয়ে, ওকে যদি জ্যাঠামশায় ঘরে নিতে না চান, কি অপমান করেন, সে আমার সহ্য হবে না ··"

পত্র পড়ে বিস্ময় ও আনন্দ দুই-ই হ'ল। দাদা সংসারে বড একা ছিল, ছেলেবেলা থেকে আমাদের জন্যে খাটচে, জীবনটাই নষ্ট করলে, সেজন্যে অথচ ওর দ্বারা না হ'ল বিশেষ কোনো উপকার মায়ের ও সীতার, না হ'ল ওর নিজের। ভালই হয়েচে ওর মত স্নেহপ্রবণ, ত্যাগী ছেলে যে একটি আশ্রয়নীড় পেয়েছে, ভালবাসার ও ভালবাসা পাবার পাত্র পেয়েচে, এতে ওর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হলুম। কত রাত্রে শুয়ে শুয়ে দাদার দুঃখের কথা ভেবেচি!

মাকে কাছে নিয়ে আসতে পত্র লিখে দিলাম দাদাকে। জ্যাঠামশায়ের বাড়িতে রাখবার আর দরকার নেই। আমি শীগগিরই গিয়ে দেখা করবো।

•

মাঘ মাসের প্রথমে আমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। মনে কেমন একটা উদাস ভাব, কিসের একটা অদম্য পিপাসা। আমার মনের সঙ্গে যা খাপ খায় না, তা আমার ধর্ম্ম নয়। ছেলেবেলা থেকে আমি যে অদৃশ্য জগতের বার বার সম্মুখীন হয়েচি, অথচ যাকে কখনও চিনিনি, বুঝিনি—তার সঙ্গে যে ধর্ম্ম খাপ খায় না, সেও আমার ধর্ম্ম নয়।

অথচ চারদিকে দেখচি সবাই তাই। তারা সৌন্দর্য্যকে চেনে না, সত্যকে ভালবাসে না, কল্পনা এদের এত পঙ্গু যে, যে-খোঁটায় বদ্ধ হয়ে ঘাসজল খাচ্চে গরুর মত—তার বাইরে ঊর্দ্ধের নীলাকাশের দেবতার যে-সৃষ্টি বিপুল ও অপরিমেয় এরা তাকে চেনে না।

বছরখানেক ঘুরে বেড়ালুম নানা জায়গায়। কতবার ভেবেচি একটা চাকরি দেখে নেবো, কিন্তু শুধু ঘুরে বেড়ানো ছাড়া আর কিছু ভাল লাগতো না। যেখানে শুনতাম কোনো নতুন ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে, কি সাধু-সন্ন্যাসী আছে, সেখানে যেন আমায় যেতেই হবে, এমন হয়েছিল।

কাল্‌নার পথে গঙ্গার ধারে একদিন সন্ধ্যা হয়ে গেল। কাছেই একটা ছোট গ্রাম, চাষী-কৈবর্ত্তের বাস। ওখানেই আশ্রয় নেবো ভাবলাম। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন খড়ের ঘর, বেশ নিকানো পুছোনো, উঠোন পর্য্যন্ত এমন পরিষ্কার যে সিঁদুর পড়লে উঠিয়ে নেওয়া যায়। সকলের ঘরেই ধানের ছোটবড় গোলা, বাড়ির সাম্‌নে-পিছনে ক্ষেত-খামার। ক্ষেতের বেড়ায় মটরশুঁটির ঝাড়ে সাদা গোলাপী ফুল ফুটে মিষ্টি সুগন্ধে সন্ধ্যার অন্ধকার ভরিয়ে রেখেচে।

একজন লোক গোয়ালঘরে গরু বাঁধছিলো। তাকে বললাম—এখানে থাকবার জায়গা কোথায় পাওয়া যাবে? সে বললে—কোত্থেকে আসা হচ্চে? আপনারা?

'ব্রাহ্মণ' শুনে নমস্কার ক'রে বললে—ওই দিকে একটু এগিয়ে যান—আমাদের অধিকারী মশাই থাকেন, তিনি ব্রাহ্মণ, তাঁর ওখানে দিব্বি থাকার জায়গা আছে।

একটু দূরে গিয়ে অধিকারীর ঘর। উঠোনের এক পাশে একটা লেবুগাছ। বড় আটচালা ঘর, উঁচু মাটির দাওয়া। একটি ছোট ছেলে বললে, অধিকারী বাড়ি নেই, হলুদপুকুরে কীর্ত্তনের বায়না নিয়ে গাইতে গিয়েচে—কাল আসবে।

আমি চলে যাচ্ছি এমন সময় একটি মেয়ে ঘরের ভেতর থেকে বললে—চলে কেন যাবেন? পায়ের ধুলো দিয়েছেন যদি রাতে এখানে থাকুন না কেনে?

কথার মধ্যে রাঢ় দেশের টান। মেয়েটি তারপর এসে দাওয়ার দাঁড়াল। বয়স সাতাশ-আটাশ হবে, রং ফর্সা, হাতে টেমির আলোয় কপালের উল্কি দেখা যাচ্চে।

মেয়েটি দাওয়ায় একটা মাদুর বিছিয়ে দিয়ে দিলে, এক ঘটি জল নিয়ে এল। আমি হাত পা ধুয়ে সুস্থ হয়ে বসলে মেয়েটি বললে—রান্নার কি যোগাড় ক'রে দেবো ঠাকুর ?

আমি বললাম—আপনারা যা রাঁধবেন, তাই খাবো।

রাত্রে দাওয়ায় শুয়ে রইলাম। পরদিন দুপুরের পরে অধিকারী মশাই এল। পেছনে জনতিনেক লোক, একজনের পিঠে একটা খোল বাঁধা। তামাক খেতে খেতে আমার পরিচয় নিলে, খুব খুশী হ'ল আমি এসেচি বলে।

বিকেলে উল্কি-পরা স্ত্রীলোকটির সঙ্গে কি নিয়ে তার ঝগড়া বেধে গেল। স্ত্রীলোকটি বলচে শুনলাম—এমন যদি করবি মিন্সে, তবে আমি বলরামপুরে চলে যাব। কে তোর মুখনাড়ার ধার ধারে ? একটা পেট চলে যাবে ঢের, সেজন্যে তোর তোয়াক্কা রাখি ভেবেচিস্ তুই !

আগুনে জল পড়ার মত অধিকারীর রাগ একদম শান্ত হয়ে গেল। রাত্রে ওদের উঠোনে প্রকাণ্ড কীর্ত্তনের আসর বসল। রাত তিনটে পর্য্যন্ত কীর্ত্তন হ'ল। আসরসুদ্ধ সবাই হাত তুলে নাচতে শুরু করলে হঠাৎ। দু-তিন ঘণ্টা উদ্দণ্ড নৃত্যের পরে ক্লান্ত হয়ে পড়ার দরুনই হোক বা বেশী রাত হওয়ার জন্যেই হোক, তারা কীর্ত্তন বন্ধ করলে।

আমি যেতে চাই, ওরা—বিশেষ ক'রে সেই স্ত্রীলোকটি—আমায় যেতে দেয় না। কি যত্ন সে করলে ! আরো একটা দেখলাম, অধিকারীকেও সেবা করে ঠিক ক্রীতদাসীর মত—মুখে এদিকে যখন-তখন যা-তা শুনিয়ে দেয়, তার মুখের কাছে দাঁড়াবার সাধ্যি নেই অধিকারীর।

যাবার সময়ে মেয়েটি দিব্যি করিয়ে নিলে যে আমি আবার আসবো। বললে—তুমি তো ছেলেমানুষ, যখন খুশী আসবে। মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে যাবে। তোমার খাওয়ার কষ্ট হচ্চে এখানে—মাছ মিলে না, মাংস মিলে না। বোশেখ মাসে এস, আম দিয়ে দুধ দিয়ে খাওয়াবো।

কী সুন্দর লাগল ওর স্নেহ !

আমার সেই দর্শনের ক্ষমতাটা ক্রমেই যেন চলে যাচ্চে। এই দীর্ঘ এক বছরের মধ্যে মাত্র একটিবার জিনিসটা ঘটেছিল।

ব্যাপারটা যেন স্বপ্নের মত। তারই ফলে আটঘরায় ফিরে আসতে হচ্চে। সেদিন দুপুরের পরে একটি গ্রাম্য ডাক্তারের ডিস্‌পেন্সারী-ঘরে বেঞ্চিতে শুয়ে বিশ্রাম করচি—ডাক্তারবাবু জাতিতে মাহিষ্য, সর্ব্বদা ধর্ম্মকথা বলতে ও শুনতে ভালবাসে ব'লে আমায় ছাড়তে চাইত না, সব সময় কেবল ঘ্যান্ ঘ্যান্ ক'রে ওই সব কথা পেড়ে আমার প্রাণ অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছিল—আমি ধর্ম্মের কথা বলতেও ভালবাসি না, শুনতেও ভালবাসি না—ভাবছি শুয়ে শুয়ে কাল সকালে এর এখান থেকে চলে যাব—এমন সময় একটু তন্দ্রা-মত এল। তন্দ্রাঘোরে মনে হ'ল আমি একটা ছোট্ট ঘরের কুলুঙ্গি থেকে বেদানা ভেঙে কার হাতে দিচ্চি, যার হাতে দিচ্চি সে তার রোগজীর্ণ হাত অতিকষ্টে একটু ক'রে তুলে বেদানা নিচ্চে, আমি যেন ভাল দেখতে পাচ্চি নে, ঘরটার মধ্যে ধোঁয়া-ধোঁয়া কুয়াশা—বারকতক এই রকম বেদানা দেওয়া-নেওয়ার পরে মনে হ'ল রোগীর মুখ আর আমার মায়ের মুখ এক। তন্দ্রা ভেঙে মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠল এবং সেই দিনই সেখান থেকে আঠারো মাইল হেঁটে এসে ফুলসরা ঘাটে স্টীমার ধরে পরদিন বেলা দশটায় কলকাতা পৌঁছুলাম। মায়ের নিশ্চয়ই কোনো অসুখ করেচে, আটঘরা যেতেই হবে।

শেয়ালদ' স্টেশনের কাছে একটা দোকান থেকে আঙুর কিনে নেবো ভাবলাম, পকেটেও বেশী পয়সা নেই। পয়সা গুনচি দাঁড়িয়ে, এমন সময় দূর থেকে মেয়েদের বিশ্রাম ঘরের সামনে

দণ্ডায়মানা একটি নারীমূর্ত্তির দিকে চেয়ে আমার মনে হ'ল দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা আমার পরিচিত। কিন্তু এগিয়ে গিয়ে দেখতে পারলাম না—আঙুর কিনতে চলে গেলাম। ফিরবার সময় দেখি ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডের কাছে একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের যুবকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে শ্রীরামপুরের ছোট বৌঠাকৃরুন। আমি কাছে যেতেই বৌঠাকরুণ চমকে উঠলেন প্রায়। বললেন—আপনি! কোত্থেকে আসচেন? এমন চেহারা?

আমি বললুম—আপনি একটু আগে মেয়েদের ওয়েটিং-রুমের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন?

—হ্যাঁ, এই যে আমরা এখন এলাম যোগবাণীর গাড়িতে—আমরা শ্রীরামপুরে যাচ্চি। ইনি মেজদা, এঁকে দেখেন কি কখনও?

যুবকটি আমায় বললে—আপনি তা হ'লে একটু দাঁড়ান দয়া ক'রে—আমি একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আসি—এখানে দরে বনচে না—

সে চলে গেল। ছোট বৌঠাকৃরুন বললেন—মাগো কি কালীমূর্ত্তি চেহারা হয়েচে! বড়দি বলছিল আপনি নাকি কোথায় চলে গিয়েছিলেন, খোঁজ নেই—সত্যি?

—নিতান্ত মিথ্যে কি ক'রে বলি! তবে সম্প্রতি দেশে যাচ্চি।

ছোট বৌঠাকৃরুন হাসিমুখে চুপ ক'রে রইলেন একটু, তার পর বললেন—আপনার মত লোক যদি কখনও দেখে থাকি! আপনার পক্ষে সবই সম্ভব। জানেন, আপনি চলে আসবার পর বড়দির কাছ থেকে আপনার সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞেস ক'রে ক'রে শুনেচি। তখন কি অত জানতাম? বড়দি বাপের বাড়ি গিয়েচে আশ্বিন মাসে—আপনার সঙ্গে দেখা হবে'খন। আচ্ছা, আর শ্রীরামপুরে গেলেন না কেন? এত ক'রে বললাম, রাখলেন না কথা? আমার ওপর রাগ এখনও যায়নি বুঝি?

—রাগ কিসের? আপনি কি সত্যি ভাবেন আমি আপনার ওপর রাগ করেছিলাম?

ছোট বৌঠাকৃরুন নত মুখে চুপ ক'রে রইলেন।

—বলুন!

ছোট বৌঠাকৃরুন নতমুখেই বললেন—ও কথা যাক্। আপনি এ-রকম ক'রে বেড়াচ্চেন কেন? পড়াশুনো করলেন না কেন?

—সে সব অনেক কথা। সময় পাই তো বলব একদিন।

—আসুন না আজ আমাদের সঙ্গে শ্রীরামপুরে? দিনকতক থেকে যান, কি চেহারা হয়ে গিয়েচে আপনার! সত্যি, আসুন আজ।

—না, আজ নয়, দেশে যাচ্চি, খুব সম্ভব মায়ের বড় অসুখ—

ছোট বৌঠাকৃরুন বিস্ময়ের সুরে বললেন—কই, সে কথা তো এতক্ষণ বলেননি! সম্ভব মানে কি, চিঠি পেয়েচেন তো, কি অসুখ?

একটু হেসে বললাম—না, চিঠি পাইনি। আমার ঠিকানা কেউ জানতো না। স্বপ্নে দেখেছি—

ছোট বৌঠাকৃরুন একটু চুপ ক'রে থেকে মৃদু শান্ত সুরে বললেন—আমি জানি। তখন জানতাম না আপনাকে, তখন তো বয়সও আমার কম ছিল। বড়দি তার পর বলেছিল। একটা কথা রাখবেন? চিঠি দেবেন একখানা? অন্ততঃ একখানা লিখে খবর জানাবেন?—

ছোট বৌঠাকৃরুন আগের চেয়ে সামান্য একটু মোটা হয়েছেন, আর চোখে সে বালিকা-সুলভ তরল ও চপল দৃষ্টি নেই, মুখের ভাব আগের চেয়ে গম্ভীর। আমি হেসে বললাম—আমি চিঠি না দিলেও, শৈলদির কাছ থেকেই তো জানতে পারবেন খবর—

এই সময় ওঁর মেজদাদা ট্যাক্সিতে চড়ে এসে হাজির হ'লেন। আমি বিদায় নিলুম।

সন্ধ্যার সময় আটঘরা পৌছে দেখি সত্যিই মায়ের অসুখ। আমাদের ঘরখানায় মেঝের ওপর পাতা বিছানায় মা শুয়ে। অন্ধকারে আমায় চিনতে না পেরে ক্ষীণস্বরে বললে—কে ওখানে, হারু ?

তারপর আমায় দেখে কেঁদে উঠে বললেন—কে জিতু, আয় বাবা আয়, এতদিন পরে মাকে মনে পড়লো তোর ? আয় এই বালিশের কাছে আয়—ওমা, এ কি হয়ে গিয়েছিস্ রে ! রোগা কালো চেহারা—ওরা সত্যিই বলত তো !

মা একটি ঘরে শুয়ে—জনপ্রাণী কেউ কাছে নেই। সন্ধ্যা হব-হব, ঘরে একটা আলো পর্য্যন্ত কেউ জ্বালেনি। এমনিই বাড়ি বটে ! কেন, এত ছেলে মেয়ে বৌ বাড়িতে, একজন কাছে থাকতে নেই ? অথচ—, কিন্তু পরের দোষ দিয়ে লাভ কি, আমিই বা কোথায় ছিলুম এতদিন ?

বললাম—মা, দাদা কোথায় ? সীতা আসেনি ?

মা নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলেন। বললেন—ওরা কেউ চিঠি দেয় না, ব'লে ব'লে আজ বুঝি হারু একখানা পত্র দিয়েচে সীতাকে।

—ক'দিন অসুখ হয়েচে তোমার, মা ? ওরা কেউ দেখে না ? জ্যাঠাইমা কাকীমারা আসে না ?

—ভুবনের মা মাঝে মাঝে আসে। এই বিকেলে সাবু দিয়ে গেল—তা সাবু কি খেতে পারি, ওই রয়েচে বাটিতে। ছোটবৌ এসেছিল বিকেলবেলা। বট্ঠাকুর বাড়ি নেই বুঝি—আর কেউ এদিকে মাড়ায় না।

তারপর আমার গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন—হ্যাঁরে জিতু, তুই নাকি সন্নিসী হয়ে গিয়েচিস —দিদি, হারু, মেজবৌ, ঠাকুরপোরা সবাই বলে—সত্যি ? বলে সে আর আসবে না, সে কোন্ দিকে বেরিয়ে চলে গিয়েচে, তার ঠিকানা কেউ জানে না। আমি ভাবি জিতু আমায় ভুলে যাবে এমনি হবে ? আবার ভাবি আমার কপাল খারাপ, নইলে এ-সব হবেই বা কেন—ভেবে ভেবে রাতে জেগে বসে থাকি।

—কেঁদো না, কেঁদো না, ছিঃ। ওসব মিথ্যে কথা। কে বলেচে সন্নিসী হয়ে গেছি ! এই ছাখ না সাদা কাপড় পরনে, সন্নিসী কি সাদা কাপড় পরে ?

মনে বড় অনুতাপ হ'ল—কি অন্যায় কাজ করেচি এতদিন এভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে ! আর এদেরও কি অন্যায়, সবাই মিলে মাকে এমন ক'রে ভয় দেখানোই বা কেন, মা সরল মানুষ, সকলের কথা বিশ্বাস করেন। কিন্তু আমার দোষ ছিল না, আমি ভেবেছিলাম মা আছেন দাদার কাছে। নিশ্চিন্ত ছিলুম অনেকটা সেজন্যে। জিজ্ঞেস করলাম—মা, দাদা তোমায় নিয়ে যায়নি ?

—সে অনেক কথা। নিতু নিতেও এসেছিল, বট্ঠাকুর বললেন—যাও, কিন্তু আমার এখানে আর আসতে পাবে না। সীতার শ্বশুরবাড়ির লোক ভাল না এখন দেখচি—তারাও বট্ঠাকুরের হাতের লোক; বললে, তা হ'লে মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘুচে যাবে। মেয়ে তারা আর পাঠাবে না। বৌমাকেও এখনও দেখিনি, এমনি আমার কপাল। বট্ঠাকুর সে বউকে এ-বাড়ি নাকি ঢুকতে দেবেন না। তা নিতু আমায় লিখলে, মা, এই কটা মাস যাক—কোথায় নাকি ভাল চাকরি পাবে—এখানে পাড়াগাঁয়ে বাসাও পাওয়া যায় না। আমি আবার গিয়ে ওর শ্বশুরবাড়ি উঠবো সেটা ভাল দেখাবে না। মাঘ মাসে একেবারে নিয়ে যাবে এখান

থেকে। এই তো নিতু ও মাসেও এসেছিল। আহা, বাছাকে কি অপমান করলে সবাই মিলে। আমার কপালে কেবল চারদিকে অপমান ছাড়া আর কিছু জোটে না—

কেন চাকরি ছেড়ে দিলাম? কেন এভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়াই? এখন দেখতে পাচ্চি সীতার বিবাহ হয়ে গেলেই আমার কর্ত্তব্য শেষ হয়েচে ভাবা উচিত ছিল না। মাকে আমি উপেক্ষা করে এসেচি এতদিন, দাদা সাধ্যমত অবিশ্যি করেচে—কিন্তু আমি কিছুই করিনি। কেন আমার এমনধারা মতিগতি হ'ল? কোথায় আমার কর্ত্তব্য, সে সম্বন্ধে আমি অন্ধ ছিলাম কেন?

লজ্জিত ও অনুতপ্ত স্বরে বললাম—মা, আঙুর খাবে?···আঙুর এনেছি, ভাল আঙুর শেয়ালদ' থেকে—

—ভূতোকে বললাম, একটা আলো দিয়ে আয়, তা দেয় নি দেখচি—বলতে বলতে ছোটকাকীমা ঘরের দোরের কাছে এসে আমায় দেখে থমকে দাঁড়িয়ে বললেন—কে বসে ওখানে?

আমি অপরাধীর মত কুণ্ঠিত স্বরে বললাম—আমি কাকীমা।

এগিয়ে এসে বললেন—কে, নিতু?

—না, আমি।

কাকীমা অবাক হয়ে বললেন—ওমা, জিতু যে দেখচি, কোত্থেকে, কি ভাগ্যি তোমার মায়ের? তারপর, কি মনে ক'রে?

আমি মাথা হেঁট ক'রে বসে রইলাম, কি আর বলব।

কাকীমা বললেন—তোমার কাণ্ডজ্ঞান যে কবে হবে, তা ভেবেই পাই নে। একেবারে এ-কটা বছর নিরুদ্দেশ নিখোঁজ।—আর এই এ-ভাবে মাকে ফেলে রেখে! তোমাদের একটু জ্ঞান নেই যে এটা কার বাড়ি? এখানে কে ছাখে তোমার মাকে? সবই তো জান—বয়েস হয়েচে, এখনও বুদ্ধি হ'ল না? বট্‌ঠাকুর বাড়ি নেই, একটা ডাক্তার-বদ্যি কে দেখায় তার নেই ঠিক। হরি ডাক্তারকে একবার আনতে হয়—টাকাকড়ি কি আছে? নেই বোধ হয়, সে দেখেই বুঝিচি—নেই। আচ্ছা, টাকা আমি দেব এখন, ভেবো না, ডাক্তার আনো।

ছোটকাকীমার পায়ের ধুলো নেবার ইচ্ছা হ'ল। এ বাড়িতে সবাই পশু, সবাই অমানুষ—সত্যিকার মেয়ে বটে ছোটকাকীমা।

রাত্রেই ডাক্তার এল। ওষুধপত্রও হ'ল। দাদাকে পত্র দিলাম পরদিন সকালে।

আমায় নিয়ে খুব হৈ-চৈ হ'ল। জ্যাঠাইমা আমায় রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে খেতে দেবেন না—আমি জাতবিচার মানি নে, বাগ্‌দি দুলে সবার হাতে খেয়ে বেড়াই, এ-সব কথা কে এসে গাঁয়ে বলেচে। নানা রকম অলঙ্কার দিয়ে কথাটা রাষ্ট্র হয়েচে গাঁয়ে।

মায়ের অবস্থা শেষরাত থেকে বড় খারাপ হ'ল। সকালে আমাকে আর চিনতে পারেন না—ভুল বকতেও লাগলেন।

সন্ধ্যার সময় একটা মিটমিটে টেমি জ্বলচে ঘরের মেঝেতে—আমি একা বসে আছি মায়ের শিয়রে, এমন সময় বাইরে উঠোনে একখানা গরুর গাড়ি এসে দাঁড়াবার শব্দ হ'ল। একটু পরেই ব্যস্তসমস্ত ভাবে মাটিতে আঁচল লুটোতে লুটোতে সীতা ঘরে ঢুকল। আমায় দেখে বললে, ছোড়দা? মা কেমন আছেন ছোড়দা?

আমি ওর দিকে চেয়ে রইলাম। সীতা একেবারে বদলে গিয়েচে, মাথায় কত বড় হয়েচে, দেখতেও কি সুন্দর হয়েচে—ওকে চেনা যায় না আর।

মাকে বললাম—মা, ওমা, সীতা এসেচে,—

মা চাইলেন, কি বললেন বোঝা গেল না। বোধ হয় বুঝতে পারলেন না যে সীতা

এসেচে।

সীতা খুব শক্ত মেয়ে। সে কেঁদেকেটে আকুল হয়ে পড়লো না। আমায় বললে—ছোড়দা, আমার বালাজোড়াটা দিচ্চি, তাই দিয়ে ভাল ডাক্তার নিয়ে এস। এখানকার হরি ডাক্তার তো? তার কাজ নয়।

আমি অক্ষমতার লজ্জায় কুণ্ঠিত সুরে বললাম—তার পর তোর শ্বশুরবাড়ির লোকে তোকে বকবে। সে কি ক'রে হয়—

সীতা বললে—ইস্! বক্‌বে কিসের জন্যে, বালা কি ওদের? মায়ের বালা, মা দিয়েছিলেন বিয়ের সময়। বাবা গড়িয়ে দিয়েছিলেন মাকে। তুমি বালা নিয়ে যাও, তারপর ওরা যা বলে বলবে—

এই সময় সীতার স্বামী ঘরে ঢুকল। আমি যে-রকম চেহারা কল্পনা করছিলাম, লোকটা তার চেয়েও খারাপ। কালো তো বটেই, পেটমোটা, বোধ হয় পিলে আছে, কাঠখোট্টা গড়ন, চোয়ালের হাড় উঁচু—গায়ে একটা ছেলেমানুষের মত ছিটের জামা, একটা রাঙা আলোয়ান, পায়ে কেম্বিসের জুতো! আমায় দেখে দাঁত বার করে হেসে বললে—এই যে, ছোটবাবু না? কখন আসা হ'ল? বড়বাবু বুঝি এখনও আসবার ফুরসুৎ পাননি—তার পর অসুখটা কি?… এখন কেমন আছেন?

তারপর সে খানিকক্ষণ বসে থেকে বললে—বসো তোমরা। আমি জ্যাঠাইমাদের সঙ্গে দেখা করে আসি—একটু চায়ের চেষ্টাও দেখা যাক্, গরুর গাড়িতে গা-হাত ব্যথা হয়ে গিয়েচে।

ওর কথার ভঙ্গিতে একটা চাষাড়ে ভাব মাখানো। এই লোকটা সীতার স্বামী! সীতার মত মেয়ের! সীতাকেও আমরা সবাই মিলে উপেক্ষা করেচি।

এই সময় হঠাৎ শৈলদিদির কথা আমার মনে পড়ল। শেয়ালদ' স্টেশনে ছোট বৌঠাকরুন বলেছিলেন শৈলদি এখানেই আছে। সীতার বালাজোড়াটা নেব না—ওকে তার জন্যে অনেক দুঃখ পোয়াতে হবে সেখানে। ও যে-রকম চাপা মেয়ে, কোন অভিযোগ করবে না কখনও কারু কাছে। শৈলদিদির কাছ থেকে টাকা ধার নেবো, মায়ের অসুখের পরে যে ক'রে হোক্ দেনা শোধ হবেই।

একবার বাড়ির মধ্যে গিয়ে দেখি সীতার স্বামী ওদের রান্নাঘরে বসে হুঁকো হাতে তামাক খেতে খেতে খুব গল্প জমিয়েচে—আমার খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভায়েদের সকলেরই প্রায় বিয়ে হয়ে গিয়েচে এবং বৌয়েরা সকলেই ওর শালাজ—তাদের সঙ্গে।

রাত দশটার সময় শৈলদিদি এসে হাজির। আমায় দেখে বললে—এই যে সন্নিসী-ঠাকুর, ফিরে এসেচ দেখচি। এই যে সীতা—এস এস, সাবিত্রীসমান হও, কখন এলে ভাই? আমি শুনলাম এই খানিকটা আগে, আমাদের ও-পাড়ায় কে খবর দেবে বল।

আমি আর সীতা শুধু ঘরে মায়ের পাশে বসে। সীতার স্বামী খেয়ে-দেয়ে শুয়েচে, অবিশ্যি সে বসে থাকতে চেয়েছিল—আমি বলেছিলাম, তার দরকার নেই, তুমি খেয়ে একটু বিশ্রাম কর—দরকার হলে ডাকব রাত্রে।

শৈলদিদিও রাত্রে থাকতে চাইলে, বললে—আজ রাতে লোকের দরকার। তোরা দুটিতে মোটে বসে আছিস। আমি খেয়ে আসি, আমিও থাকব।

আমি বললাম—না শৈলদি, আমরা দুজন আছি, ভগ্নীপতি এসেচে—তোমায় আর কষ্ট করতে হবে না।

তারপর বাইরে ডেকে টাকার কথা বললাম। শৈলদি বললে—কত টাকা?

—গোটাকুড়ি দাও গিয়ে এখন। কাল সকালেই আমি তা হ'লে চলে যাই ডাক্তার আনতে—

—তা হ'লে কাল সকালে যাবার সময় আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবি। ওখান দিয়েই তো পথ—কেমন তো?

ছোটকাকীমা এই সময় এলেন। শৈলদিকে দেখে বললেন—জিতুর মাকে নিয়ে বেজায় মুশকিল হয়েচে ভাই—ওরা ছেলেমানুষ, কি বা বোঝে—নিতু এখনও তো এল না। হঠাৎ চার পাঁচ দিনের জ্বরে যে মানুষ এমন হয়ে পড়বে তা কি ক'রেই বা জানবো। তবুও তো জিতু কোথা থেকে ঠিক সময়ে এসে পড়েছিল তাই রক্ষে।

রাতে জ্যাঠাইমাও এসে খানিকটা বসে রইলেন। অনেক রাত্রে সবাই চলে গেল, আমি সীতাকে বললাম—তুই ঘুমিয়ে নে সীতা। আমি জেগে থাকি। রাতে কোন ভয় নেই।

সকাল বেলা আটটা-নটার পর থেকে মা'র অবস্থা খুব খারাপ হ'ল। দশটার পর দাদা এল—সঙ্গে বৌদিদি ও দাদার খোকা। বৌদিদিকে প্রথম দেখেই মনে হ'ল শান্ত, সরল, সহিষ্ণু মেয়ে। তবে খুব বুদ্ধিমতী নয়, একটু অগোছালো, আনাড়ি ধরনের। নিতান্ত পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, বাইরে কোথাও বেরোয়নি বিশেষ, এই বোধ হয় প্রথম, কিছু তেমন দেখেও নি। গরম জলের বোতল পায়ে সেঁক করতে হবে শুনে ব্যাপারটা না বুঝতে পেরে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বিপন্ন মুখে সীতার দিকে চেয়ে রইল। কাপড়-চোপড় পরবার ধরনও অগোছালো—আজকালকার মত নয়। বৌদিদি যেন বনে-ফোটা শুভ্র কাঠমল্লিকা ফুল, তুলে এনে তোড়া বেঁধে ফুলের দোকানে সাজিয়ে রাখবার জিনিস নয়। আর একেবারে অদ্ভুত ধরনের মেয়েলী, ওর সবটুকুই নারীত্বের কমনীয়তা মাখানো।

সীতা আমায় আড়ালে বললে—চমৎকার বৌদি হয়েচে, ছোড়দা। আহা, মা যদি একটি-বারও চোখ মেলে দেখতেন। আমাদের কপাল!

বেলা তিনটের সময় মা মারা গেলেন। যে মায়ের কথা তেমন ক'রে কোন দিন ভাবি নি, আমাদের কাজকর্ম্মে, উদ্যমে, আশায়, আকাঙ্ক্ষায়, উচ্চাভিলাষে মায়ের কোন স্থান ছিল না, সবাই মিলে যাকে উপেক্ষা ক'রে ক'রে এসেচি এত দিন—আজ সেই মা কত দূরে কোথায় চলে গেল—সেই মায়ের অভাবে হঠাৎ আমরা অনুভব করলাম অনেকখানি খালি হয়ে গিয়েচে জীবনের। ঘরের মধ্যে যেমন প্রকাণ্ড ঘরজোড়া খাট থাকে, আজন্ম তার ওপর শুয়েচি, বসেচি, খেলেচি, ঘুমিয়েচি, সর্ব্বদা কে ভাবে তার অস্তিত্ব, আছে তো আছে। হঠাৎ একদিন খাটখানা ঘরে নেই—ঘরের পরিচিত চেহারা একেবারে বদলে গিয়েচে—সে ঘরই যেন নয়, একদিন সে ঘরের নিবিড় সুপরিচিত নিজস্বতা কোথায় হারিয়ে গেল, তখন বোঝা যায় ঘরের কতখানি জায়গা জুড়ে কি গভীর আত্মীয়তায় ওর সঙ্গে আবদ্ধ ছিল সেই চিরপরিচিত একঘেয়ে সেকেলে খাটখানা—ঘরের বিরাট ফাঁকা আর কিছু দিয়েই পূর্ণ হবার নয়।

সীতার ধৈর্য্যের বাঁধ এবার ভাঙলো। সে ছোট মেয়ের মত কেঁদে আবদার ক'রে যেন মাকে জড়িয়ে থাকতে চায়। মা আর সে দুজনে মিলে এই সংসারে সকালে-সন্ধ্যায় দু-বেলা খেটে দুঃখের মধ্যে দিয়ে পরস্পরের অনেক কাছাকাছি এসেছিল—সে-সব দিনের দুঃখের সঙ্গিনী হিসাবে মা আমাদের চেয়েও ওর কাছে বেশী আপন, বেশী ঘনিষ্ঠ—অভাগী এত দিনে সত্যি সত্যি নিঃসঙ্গ হ'ল সংসারে। ওর স্বামী যে ওর কেউ নয়, সে আমার বুঝতে দেরি হয় নি এতটুকু। কিন্তু ও হয়ত এখনও তা বোঝেনি।

দিন দুই পরে বৌদিদি দুপুরবেলা ওদের রান্নাঘরে একটা ঘড়া আনতে গিয়েচেন। জ্যাঠাইমা বলেচেন—ওখানে দাঁড়াও, দাওয়াটাতে—অমনি হুট্ ক'রে ঘরে ঢুকলে যে ?

বৌদিদি অবাক হয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েচেন, জ্যাঠাইমা ঘড়া বার ক'রে দিয়েচেন দাওয়াতে। বৌদিদি নিয়ে এসেচে। কিন্তু বুঝতে পারেনি ব্যাপারটা কি, বুদ্ধিমতী মেয়ে হ'লে তখনই বুঝত।

এ-কথা তখন সে কাউকে বলেনি।

পরদিন মেজকাকা আমায় ডেকে বললেন—একটা কথা আছে, শোন। তোমার মায়ের কাজটা এখানে না ক'রে অন্য জায়গায় গিয়ে করো। মানে তোমার দাদার বৌয়ের এখানে তো পাকস্পর্শ হয়নি, বড়দাদাও নেই বাড়ি—এ অবস্থায় শ্রাদ্ধের সময় কেউ খেতে আসবে না। তোমার দাদার বৌকে আমরা সে-ভাবে ঘরে তো নিইনি। এই বুঝে যা হয় ব্যবস্থা করো। বলো তোমার দাদাকে।

তলায় তলায় এঁরা সীতার স্বামী গোপেশ্বরকে কি পরামর্শ দিয়েচেন জানি নে, সে হঠাৎ বেঁকে দাঁড়িয়ে বললে চতুর্থীর শ্রাদ্ধ সীতাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে করবে—অথচ আগে ঠিক হয়েছিল চতুর্থীর শ্রাদ্ধ এখানেই হবে। কালই শ্রাদ্ধের দিন, সুতরাং আজই সে সীতাকে নিয়ে যেতে প্রস্তুত হ'ল। এর কোনও দরকার ছিল না, সীতা এখানে শ্রাদ্ধ করলে তাতে কোন দোষ সমাজের মতেও হবার কথা নয়—কিন্তু সে কিছুতেই কথা শুনলে না; এই অবস্থায় বৌদিদিকে পেয়ে সীতা অনেকটা সান্ত্বনা পেয়েছিল—কিন্তু সে ওদের সইল না। বৌদিদির সঙ্গে সীতার বেশী মেশামেশিটা যেন গোড়া থেকেই আমার ভগ্নীপতি পছন্দ করে নি। নিজেই হোক্ আর ওদের পরামর্শেই হোক্।

যাবার সময় সীতা বৌদিদির গলা জড়িয়ে কাঁদতে লাগল। আমায় আড়ালে বললে—ছোড়দা, আমায় বনবাসে ফেলে রেখে ভুলে থেকো না যেন, মাঝে মাঝে আসবে বল ? আর শোনো, বৌদি বড্ড ভালমানুষ, ও এখনও জানে না যে ওর জন্যেই মায়ের কাজ এখানে করতে দিচ্চে না ওরা। এ কথা যেন বৌদিদির কানে না যায়, ব'লে দিও দাদাকে।

বৌদিদিকে বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল এখানে শ্রাদ্ধ করতে খরচ বেশী পড়বে, কারণ জ্যেঠামশায়দের নাম বেশী, লোকজন নিমন্ত্রণ করতে হয় অনেক। গঙ্গাতীরে শ্রাদ্ধের কাজ করলে অনেক কম খরচ হবে। বৌদিদি তাই বুঝে গেল।

যাবার সময় আমাদের ঘরের চাবিটা ছোটকাকীমার হাতে দিয়ে বললুম—এ বাড়িতে আর কাউকে আপন ব'লে জানি নে, কাকীমা। সীতার খোঁজখবর মাঝে মাঝে একটু নিও—ওর তো এ বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক একরকম মিটেই গেল।

ছোটকাকীমার চোখে জল এল। বললেন—আমার কোন ক্ষমতা নেই, নইলে নিতুর বৌকে এ বাড়ি থেকে আজকে অন্য জায়গায় যেতে বলে ?

আমি বললুম—সে কথা ব'লো না কাকীমা। আমরা এখানে এসেছিলাম প্রার্থী হয়ে, পরের দয়ার ওপর নির্ভর করে। এখানে কোন অধিকার নেই আমাদের।

কাকীমা বললেন—তুই ও কি কথা বলচিস জিতু ? এ তোদের যে সাতপুরুষের ভিটে। জায়গা-জমি আর দুখানা ইট থাকলেই বা কি, আর গেলেই বা কি ? এ ভিটেতে হারুর কি যোগেশের যে অধিকার, তোদের দু-ভায়ের তার চেয়ে এক চুল কম নয়।

ছোটকাকীমার এক মূর্ত্তি দেখেছিলাম বাল্যে, এ আর এক মূর্ত্তি। এই একজনই এ-বাড়ির মধ্যে বদলে গিয়েচে একেবারে। গাড়িতে যেতে যেতে সেই কথাটা বার বার মনে হলচ্ছি।

॥ ১০ ॥

মাস পাঁচ-ছয় পরে ঘুরতে ঘুরতে একবার গেলাম দাদার বাড়িতে।

দাদা ছিল না বাড়ি, বৌদিদি বাটনা-মাখা হাতে ছুটে বার হয়ে এল—আমার হাত থেকে পুঁটুলিটা নিয়ে বললে—এস এস ঠাকুরপো, রদ্দুরে মুখ রাঙা হয়ে গিয়েচে একেবারে। কই, আসবে ব'লে চিঠি দেও নি তো! তা হ'লে একখানা গরুর গাড়ি স্টেশনে যেত।

তখনই বৌদিদি চিনি ভিজিয়ে শরবৎ ক'রে নিয়ে এল। বললে—ঠাকুরপো, তোমার মায়া নেই শরীরে। এত দেরি ক'রে আসতে হয়? উনি কেবল বলেন তোমার কথা।

বিকেলে দাদা এল। আমায় পেয়ে যেন হাতে স্বর্গ পেলে। কিসে আমার সুখ-সুবিধে হবে, কিসে আমায় বড় মাছ, ভালটা-মন্দটা খাওয়ানো যাবে, এই যোগাড়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

এরা বেশ সুখে আছে। দাদা যা চাইত, তা সে পেয়েচে। সে চিরকালই সংসারী মানুষ, ছেলেপুলে গৃহস্থালী নিয়েই ও সুখী, তাই নিয়েই ও থাকতে ভালবাসে। ছেলেবেলা থেকে দাদাকে দেখে এসেচি, সংসার কিসে গোছালো হবে, কিসে সংসারের দুঃখ ঘুচবে, এই নিয়েই সে ব্যস্ত থাকত। লেখাপড়াই ছেড়ে দিলে আমাদের দু-পয়সা এনে খাওয়াবার জন্যে। কিন্তু পরের বাড়িতে পরের তৈরী ব্যবস্থার গণ্ডীর মধ্যে সেখানে তো কোন স্বাধীনতা ছিল না, কাজেই দাদার সে সাধ তখন আর মেটে নি। যার জন্যে ওর মন চিরকাল পিপাসিত ছিল, এত দিনে তার সন্ধান মিলেচে, তাই দাদা সুখী। দাদা ও বৌদিদি একই ধরনের মানুষ। নীড় বাঁধবার আগ্রহ ওদের রক্তে মেশানো রয়েছে। বৌদিদির বাপের বাড়ির অবস্থা খারাপই। একান্নবর্ত্তী প্রকাণ্ড পরিবারের মেয়ে সে। তার বাপের বাড়িতে সবাই একসঙ্গে কষ্ট পায়, সবাই ছেঁড়া কাপড় পরে, এক ঘরে পুরানো লেপকাঁথা পেতে শীতের রাতে তুলো বেরুনো, ওয়াড়-হীন ময়লা লেপ টানাটানি ক'রে ছেলেপুলেরা রাত কাটায়—সব জিনিসই সকলের, নিজের বলে বিশেষ কোন ঘরদোরও নেই, তৈজসপত্রও নেই—সেই রকম ঘরে বৌদিদি মানুষ হয়েচে। এতকাল পরে সে এমন কিছু পেয়েছে যাকে সে বলতে পারে এ আমার। এ আমার স্বামী, আমার ছেলে, আমার ঘরদোর—আর কারও ভাগ নেই এতে। এ অনুভূতি বৌদিদির জীবনে একেবারে নতুন।

দাদা আমায় তার পরদিন সকালে ওর কপির ক্ষেত, শাকের ক্ষেত দেখিয়ে বেড়ালে। বৌদিদি বললে—শুধু ওদিক দেখলে হবে না ঠাকুরপো, তুমি আমার গোয়াল দেখে যাও ভাই এদিকে। এই দ্যাখো এই হচ্চে মুংলী। মঙ্গলবারে সন্দেবেলা ও হয়, ওই সজনেগাছতলায় তখন গোয়াল ছিল। ও হ'ল, সেই রাতেই বিষম ঝড় ভাই। গোয়ালের চালা তো গেল উড়ে। তারপর এই নতুন গোয়াল হয়েচে এই বোশেখ মাসে—বৌদিদি বাছুরের গলায় হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে বললে—বড্ড পয়মন্ত বাছুর, যে-মাসে হ'ল সেই মাসেই ওঁর সেই মনিব আমায় শাঁখা-শাড়ি পাঠিয়ে দিলে, ওর দু-টাকা মাইনে বাড়ালে।

দিনকতক যাবার পরে বৌদিদির একটা গুণ দেখলাম, লোককে খাওয়াতে বড় ভালবাসে। অসময়ে কোন ফকির বৈষ্ণব, কি চুড়িওয়ালী বাড়িতে এসে খেতে চাইলে নিজের মুখের ভাত তাদের খাওয়াবে। নিজে সে-বেলাটা হয়ত মুড়ি খেয়ে কাটিয়ে দিলে।

এক দিন একটা ছোকরা কোথা থেকে একখানা ভাঙা খোল ঘাড়ে ক'রে এসে জুটলো। তার মুখে ও গালে কিসের ঘা, কাপড়-চোপড় অতি নোংরা, মাথায় লম্বা লম্বা চুল। ছ-সাত দিন রইল, দাদাও কিছু বলে না, বৌদিদিও না। আমি একদিন বৌদিদিকে বললাম—বৌদি,

দেখচো না ওর মুখে কিসের ঘা। বাড়ির থালা গেলাসে ওকে খেতে দিও না। ও ভাল ঘা নয়, ছেলেপুলের বাড়ি, ওকে পাতা কেটে আনতে বললেই তো হয়, তাতেই খাবে। আট দিন পর ছোকরা চলে গেল। বোধ হয় আরো আট দিন থাকলে দাদা বৌদিদি আপত্তি করত না।

বৌদিদি খাটতে পারে ভূতের মত। ঝি নেই, চাকর নেই, এক হাতে কচি ছেলে মানুষ করা থেকে শুরু করে ধানসেদ্ধ, কাপড়-কাচা, বাসন-মাজা, জল-তোলা—সমস্ত কাজই করতে হয়। কোনদিন ব্যাজার হ'তে দেখলাম না সেজন্যে বৌদিদিকে।

এদের মায়ায় আমিও যেন দিনকতক জড়িয়ে গেলাম। এরকম শান্তির সংসার কতকাল ভোগ করি নি—বোধ হয় চা-বাগানেও না, কারণ সেখানে বাবা মাতাল হয়ে রাত্রে ফিরবেন, সে ভয় ছিল। ভেবে দেখলাম সত্যিকার শান্তি ও আনন্দভরা জীবন আমরা কাকে বলে কোনদিন জানি নি—স্রোতের শেওলার মত বাবা স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এ চা-বাগানে ও চা-বাগানে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন, শেষকালে না-হয় কিছুদিন উমপ্লাং বাগানে ছিলেন—এতে মন আমাদের এক জায়গায় বসতে না বসতেই আবার অন্য জায়গায় উঠে যেতে হ'ত—এই সব নানা কারণে নিজের ঘর, নিজের দেশ, এমন কি নিজের জাতি ব'লে কোন জিনিস আমাদের ছিল না। তার অভাব যদিও আমরা কোনদিন অনুভব করি নি—অত অল্পবয়সে করবার কথাও নয়—বিশেষ ক'রে যখন হিমালয় আমাদের সকল অভাবই পূর্ণ করেছিল আমাদের ছেলেবেলাতে।

এখানে সকলের চেয়ে আমার ভাল লেগেচে বৌদিকে। আমি বৌদিদির ধরনের মেয়ে কখনও দেখি নি। যা তা জিনিস দিয়ে বৌদিকে খুশী করা যায়, যে-কোন ব্যাপার যত অসম্ভবই হোক না কেন—বৌদিদিকে বিশ্বাস করানো যায়, খুব অল্পেই ভয় দেখানো যায়—ঠকিয়ে কোন জিনিস বৌদিদির কাছ থেকে আদায় করা মোটেই কঠিন নয়। অথচ একটি সহজাত বুদ্ধির সাহায্যে বৌদিদি ঘরকন্না ও সংসার সম্বন্ধে দাদার চেয়েও ভাল বোঝে, বড় কিছু একটা আশা কখনও করে না, ভারি গোছালো, নিজের ধরনে ঠাকুরদেবতার ওপর ভক্তিমতী। কেবল একটা দোষ আমার চোখে বড় লাগে—নিজে যে-সব কুসংস্কার মানে, অপরকে সেই সব মানতে বাধ্য করবে। অনেক ব্যাপারে দেখলাম ভাবটা এই রকম, আমার সংসারে যতক্ষণ আছ ততক্ষণ তোমায় মানতেই হবে, তার পর বাইরে গিয়ে হয় মেনো না-হয় না-মেনো—কড়া কথা ব'লে নয়, মিনতি অনুরোধ ক'রে মানাব। কড়া কথা বলতে বৌদিদি জানে না—টকের ঝাঁজ নেই কোথাও বৌদিদির স্বভাবে, সবটাই মিষ্টি।

সপ্তাহ দুই পরে ওদের ওখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। আসবার সময়ে দাদা বললে—শোন্ জিতু, আটঘরার বাড়ি সম্বন্ধে কি করা যাবে, তুই একটা মত দিস্। ছোটকাকীমা ঠিকই বলেচেন—ও বাড়ি আমরা ছাড়বো না। আর একটা কথা শোন্, একটা চাকরি দেখে নে, এরকম ক'রে বেড়াস নে। তোর বৌদিদি বলছিল এই বছরই তোর একটা বিয়ে দিয়ে দিতে। তার পর দু-ভায়ে মিলে ঘরবাড়ি করি আয়, দুজনে মিলে টাকা আনলে ভাবনা কিসের সংসার চালাবার ? সংসারটা বেশ গড়ে তুলতে পারবো এখন। আর ছাখ্, পয়সা রোজগার করতে না পারলে, ঘরবাড়ি না থাকলে কি কেউ মানে ? নিজের বাড়ি কোথাও একখানা থাকা চাই, নইলে লোকে বড় তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে।

দাদার শুধু সংসার আর সংসার। আর লোকে আমার সম্বন্ধে কি ভাবলে না-ভাবলে তাতেই বা আমার কি ? লেখাপড়া শিখলে না কিছু না, দাদা যেন কেমন হয়ে গিয়েচে। লোকে কি বলবে সেই ভাবনাতেই আকুল। দাদার ওই সব ছাপোষা গেরস্তালী-ধরনের কথাবার্তায় আমার হাসি পায়, দাদার ওপর কেমন একটা মায়াও হয়।

ভাবলুম, কোথায় যাওয়া যায়? কলকাতায় গিয়ে একটা চাকুরি দেখে নেবো? দাদা যদি তাতেই সুখী হয়, তাই না-হয় করা যাক। আমি নিজে বিয়ে করি আর না-করি, ওদের সংসারে কিছু কিছু সাহায্য করা তো যাবে! নৈহাটির কাছে অনেক পাটের কল আছে, কলকাতায় না গিয়ে সেখানে গেলে কেমন হয়? পাটের কলে শুনেচি চাকুরি জোটানো সহজ।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কলকাতাতেই এলাম। মাস দুই কাটল, একটা মেসে থাকি আর নানা জায়গায় চাকুরির চেষ্টা করি। কোন জায়গাতেই কিছু সুবিধে হয় না।

একদিন রবিবারে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে বেড়াতে বেড়াতে অনেক দূর চলে গেছি, দমদমাও প্রায় ছাড়িয়েচি, হঠাৎ ঝড় বৃষ্টি এল। দৌড়ে একটা বাগানবাড়ির ঘরে আশ্রয় নিলাম। ঘরটাতে বোধ হ'ল বহুদিন কেউ বাস করে নি, ছাদ ভাঙা, মেজের সিমেণ্ট উঠে গিয়েচে। বাগানটাতেও জঙ্গল হয়ে গিয়েচে।

একটা লোক সেই ভাঙা ঘরের বারান্দাটাতে শুয়ে ছিল, বোধ হয় ক'দিন থেকে সেখানে সে বাস করচে, একটা দড়ির আল্‌নায় তার কাপড়-চোপড় টাঙানো। আমায় দেখে লোকটা উঠে বসল—এসো, বসো বাবা। বেশ ভিজেচ দেখচি বৃষ্টিতে! বসো।

লোকটার বয়স পঞ্চাশের ওপর, পরনে গেরুয়া আলখাল্লা, দাড়ি-গোঁফ কামানো। আমায় জিজ্ঞেস করলে—তোমার নাম কি বাবা? বাড়ি এই কাছাকাছি বুঝি?

নাম বললাম, সংক্ষেপে পরিচয় দিলাম।

বললে—বাবা, ভগবান তোমায় এখানে পাঠিয়েচেন আজ। তুমি বসো, তুমি আমার অতিথি। একটু মিষ্টি খেয়ে জল খাও—

আমি খেতে না চাইলেও লোকটা পীড়াপীড়ি করতে লাগল। তারপর কথা বলতে বলতে হঠাৎ ডান হাতটা শূন্যে একবার নেড়েই হাত পেতে বললে—এই নাও—

হাতে একটা সন্দেশ।···

আমি ওর দিকে অবাক্ হয়ে আছি দেখে বললে—আর একটা খাবে? এই নাও।

হাত যখন ওঠালে, আমি তখন ভাল ক'রে চেয়ে ছিলাম, হাতে কিছু ছিল না। শূন্যে হাতখানা বার দুই নেড়ে আমার সামনে যখন পাতলে তখন হাতে আর একটা সন্দেশ। অদ্ভুত ক্ষমতা তো লোকটার! আমার অত্যন্ত কৌতূহল হ'ল, বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল কিন্তু আমি আর নড়লাম না সেখান থেকে।

লোকটা অনেক গল্প করলে। বললে—আমি গুরুর দর্শন পাই কাশীতে। সে অনেক কথা বাবা। তোমার কাছে বলতে কি, আমি বাঘ হ'তে পারি, কুমীর হ'তে পারি। মন্ত্রপড়া জল রেখে দেবো, তারপর আমার গায়ে ছিটিয়ে দিলে বাঘ কি কুমীর হয়ে যাব—আর একটা পাত্রে জল থাকবে, সেটা ছিটিয়ে দিলে আবার মানুষ হবো। সাতক্ষীরেতে ক'রে দেখিয়েছিলাম, হাকিম উকিল মোক্তার সব উপস্থিত সেখানে—গিয়ে জিজ্ঞেস ক'রে আসতে পার সত্যি না মিথ্যে। আমার নাম চৌধুরী-ঠাকুর—গিয়ে নাম করো।

আমি অবাক হয়ে চৌধুরী-ঠাকুরের কথা শুনছিলাম। এসব কথা আমার অবিশ্বাস হ'ত যদি না এইমাত্র ওকে খালি-হাতে সন্দেশ আনতে দেখতুম। জিজ্ঞেস করলাম—আপনি এখন কি কলকাতায় যাচ্ছেন?

—না বাবা, মুর্শিদাবাদ জেলার একটা গাঁয়ে একটা চাঁড়ালের মেয়ে আছে, তার অদ্ভুত সব ক্ষমতা। খাগ্‌ড়াঘাট থেকে কোশ-দুই তফাতে। তার সঙ্গে দেখা করবো ব'লে বেরিয়েচি।

আমি চাকরি-বাকরি খুঁজে নেওয়ার কথা সব ভুলে গেলাম। বললাম—আমায় নিয়ে যাবেন? অবিশ্যি যদি আপনার কোন অসুবিধা না হয়।

চৌধুরী-ঠাকুর কি সহজে রাজী হন, অতি কষ্টে মত করালুম। তারপর মেসে ফিরে জিনিস-পত্র নিয়ে এলাম। চৌধুরী-ঠাকুর বললেন—এক কাজ করা যাক এস বাবা। আমার হাতে রেলভাড়ার টাকা নেই, এস হাঁটা যাক।

আমি বললাম—তা কেন? আমার কাছে টাকা আছে, দু'জনের রেলভাড়া হয়ে যাবে।

চাঁড়াল মেয়েটির কি ক্ষমতা আছে দেখবার আগ্রহে আমি অধীর হয়ে উঠেচি।

খাগ্ড়াঘাট স্টেশনে পৌছতে বেলা গেল। স্টেশন থেকে এক মাইল দূরে একটা ছোট মুদির দোকান। সেখানে যখন পৌছেচি, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ প্রায়। দোকানের সামনে বট-তলায় আমি আশ্রয় নিলাম। রাত্রে শোবার সময় চৌধুরী-ঠাকুর বললেন, আমার এই দুটো টাকা রেখে দাও গে তোমার কাছে। আজকাল আবার হয়েচে চোর-ছেঁচড়ের উৎপাত। তোমার নিজের টাকা সাবধানে রেখেচ তো?

চৌধুরী-ঠাকুরের ভয় দেখে আমার কৌতুক হ'ল। পাড়াগাঁয়ের মানুষ তো হাজার হোক্, পথে বেরুলেই ভয়ে অস্থির। বললাম—কোন ভয় নেই, দিন আমাকে। এই দেখুন ঘড়ির পকেটে আমার টাকা রেখেচি, বাইরে থেকে বোঝাও যাবে না, এখানে রাখা সবচেয়ে সেফ্—

সকালে একটু বেলায় ঘুম ভাঙল। উঠে দেখি চৌধুরী-ঠাকুর নেই, ঘড়ির পকেটে হাত দিয়ে দেখি আমার টাকাও নেই, চৌধুরী-ঠাকুরের গচ্ছিত দুটো টাকাও নেই, নীচের পকেটে পাঁচ-ছ আনার খুচরা পয়সা ছিল তাও নেই।

মানুষকে বিশ্বাস করাও দেখচি বিষম মুশকিল। ঘণ্টাখানেক কাটল, আমি সেই বটতলাতে বসেই আছি। হাতে নেই একটি পয়সা, আচ্ছা বিপদে তো ফেলে গেল লোকটা! মুদিটি আমার অবস্থাটা দেখেশুনে বললে—আমি চাল ডাল দিচ্ছি, আপনি রেঁধে খান বাবু। ভদ্রলোকের ছেলে, এমন জুয়াচোরের পাল্লায় পড়লেন কি ক'রে? দামের জন্যে ভাববেন না, হাতে হ'লে পাঠিয়ে দেবেন। মানুষ দেখলে চিনতে দেরি হয় না, আপনি যা দরকার নিন্ এখান থেকে। ভাগ্যিস আপনার সুটকেস্টা নিয়ে যায় নি!

দুপুরের পরে সেখান থেকে রওনা হয়ে পশ্চিমমুখে চললাম। আমার সুটকেসে একটা ভাল টর্চলাইট ছিল, মুদিকে ওর চাল-ডালের বদলে দিতে গেলাম, কিছুতেই নিলে না।

পথে হাঁটি, একেবারে নিঃসম্বল অবস্থা। সন্ধ্যার কিছু আগে একটা বড় পাকুড়গাছের তলায় পথের ধারে জনকয়েক লোক দেখে সেখানে গেলাম। চারজন পুরুষমানুষ ও একটি ত্রিশ-বত্রিশ বছরের স্ত্রীলোক—তারা গাছতলায় উনুন জেলে রাঁধবার উদ্যোগ করছে।

একজন বললে—কনে থেকে আসছেন বাবু?

—খাগড়াঘাট থেকে—তোমরা আসচ কোথা থেকে?

—আমরা আসতেছি তো বড় দূর থেকে। যাব কেঁদুলির মেলায়।

একজন তামাক সেজে নিয়ে এসে বললে—তামাক ইচ্ছে করুন বাবু। ও জুড়ন, বাবুকে বসবার কিছু দে।

—আমি তামাক খাইনে, তোমরা খাও। তোমরা দেশ থেকে বেরিয়েচ কতদিন?

জুড়ন বৈরাগী এগিয়ে এসে সঙ্গীর হাত থেকে হুঁকোটা নিয়ে বললে—বাবু বড় কষ্ট, আর পুন্নিমেতে বাড়ির বার হওয়া হয়েছে। রাস্তায় কি অনাবিষ্টি! তিনদিন ধরে আর থামে না, জিনিসপত্তর ভিজে একশা, প্রায় পঞ্চাশ ষাট কোশ এখান থেকে—নওদা চেনেন? সেই

নওদার সন্নিপত্য আমাদের বাড়ি, হাতীবাঁধা গ্রাম, যশোর জেলা।

গল্পগুজবে আধঘণ্টা কাটলো। জুড়ন বললে—দাদাঠাকুরের খাওয়াদাওয়ার কি হবে? এক কাজ করুন দাদাঠাকুর, আমাদের সঙ্গে সবই আছে, রসুই করুন, আমরা পেরসাদ পাব এখন। ব্রাহ্মণের পাতের অন্ন কতকাল খাই নি। ও কাপাসীর মা, পুকুর থেকে জলডা নিয়ে এস, আর রাত কোরো না।

আমি বিশেষ কোন আপত্তি করলাম না। এদের সঙ্গ আমার বড় ভাল লাগছিল, ওই রাত্রে তা ছাড়া যাবই বা কোথায়? রান্না চড়িয়ে দিলাম। কাপাসীর মা আলু বেগুন ছাড়াতে বসলো। ওদের মধ্যে একজনের নাম বাবুরাম—সে পুকুরে চাল ধুতে গেল। জুড়ন শুকনো কাঠকুঠো কুড়িয়ে আনতে গেল।

পথের ধারে এই দরিদ্র, সরল মানুষগুলির সঙ্গে গাছতলায় রাত্রিযাপন, জীবনের এক নতুন অভিজ্ঞতা। রাতটিও বেশ, কি রকম সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে! নির্জ্জন মাঠে জ্যোৎস্নায় অনেক দূর দেখা যাচ্ছে।

এই জ্যোৎস্নারাতে আমার কেবল মনে হয় আমি আর সে সব জিনিস দেখি নে। কতদিন দেখি নি। যখন চিনতে শিখি নি, তখন রোগ ভেবে যাকে ভয় করেছি কত, এখন তা হারিয়ে বুঝেছি কি অমূল্য সম্পদ ছিল তা জীবনের। বোধ হয় মাঠের ধারের এই সবুজ দুর্ব্বাঘাসের শয্যায় শুয়ে চোখ বুজে ভাবলে আবার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাই—এই সব বিজন মাঠে শেষ প্রহরের জ্যোৎস্নাভরা রাত্রে মুখ উঁচু ক'রে চেয়ে থাকলে অনন্তপথের যাত্রীদের দেখা যায়…ওপর আকাশের জ্যোৎস্নামাখা বায়ুস্তর তাদের গমন পথে পথে দেহগন্ধে সুরভিত হয়—পরের দুঃখে কোনো দয়ালু আত্মা যে চোখের জল ফেলে, নদী-সমুদ্রে ঝিনুকের মধ্যে পড়লে তা মুক্তা হয়, বিল-বাঁওড়ের পদ্মফুলে পড়লে পদ্মমধু সৃষ্টি করে…আমার নিবে-যাওয়া দৃষ্টি-প্রদীপে আলো জ্বেলে দিতে যদি কেউ পারে তো সে ওরাই পারবে।

সীতার কথা মনে হয়। আচ্ছা, এই রাত্রে এতক্ষণ সে কি করছে? যে জীবনের মধ্যে সে আছে, সে জীবনের জন্যে সে তৈরী হয় নি। হয়ত রান্নাঘরে বসে এতক্ষণে এইরকম রাঁধচে, ও অত বই পড়তে ভালবাসে, তাদের ঘরে একখানাও বই নেই, বই পড়া হয়ত সেখানে ঘোর অপরাধ—যেমন ছিল জ্যাঠাইমার কাছে। জীবনের যে-কোনো আনন্দভরা অভিজ্ঞতার সময়েই সীতার ব্যর্থ জীবনের কথা আমার মনে না এসে পারে না।

সবাই মিলে খেতে বসলাম। রান্না হ'ল বড়ির ঝোল, আলুভাতে, পটলভাজা। কাপাসীর মা অবিশ্যি দেখিয়ে দিল। কাল ঠিক এই সময়ে খাগড়াঘাটের পথে বটতলায় চৌধুরী-ঠাকুর ভজন গাইচে। কি খারাপ লোকটা! টাকার দরকার ছিল, আমায় বললে তো আমি দিতামই। চুরি ক'রে কি হ'ল!

জুড়ন বৈরাগী খাওয়া-দাওয়ার পরে গল্প করতে লাগল। বললে—শুনুন দাদাঠাকুর, এই যে কাপাসীর মা দেখচেন, এর বাবা অনেক টাকা জমিয়ে মারা গিয়েছিল। খেতো না, শুধু টাকা জমাতো। মরবার সময় ভাইকে বললে, অমুক জায়গায় মালসায় টাকা পোঁতা আছে, নিয়ে এসে আমায় দেখা। তা এই পানচালার কোণে ভাঙা উনুনের মধ্যি মালসা পোঁতা ছিল—কেউ জানতো না। মরবার সময় তাই টাকার মাল্‌সা সামনে নিয়ে খোলে। টাকা দেখতি দেখতি মরে গেল।

—সে টাকা কে পেলে তার পর?

—তারপর বুড়ো তো মরে গেল। তার ভাই সটালে মাল্‌সাসুদ্ধ টাকা সেই রাত্তি

গোলমালে চুরি হয়েচে। এমন কি টাকার অভাবে বুড়োর ছেরাদ্দটাও হ'ল না। পেটের ওপর বাণিজ্য ক'রে টাকা জমিয়ে গেল, নিজের ভোগে তো লাগলোই না—একটিমাত্তর মেয়ে এই কাপাসীর মা, তার ভোগেও হ'ল না। টাকার মাল্‌গা রাতারাতি কে যে কোথায় সরিয়ে ফেলল—

কাপাসীর মা ঝাঁজের সঙ্গে বলে উঠল—হ্যাঁগো হ্যাঁ, সরিয়ে ফেলতে এসেছিল পাড়ার লোক! যে নেবার সে নিয়েছে। আমি কি আর কিছু জানি নে, না বুঝি নে? ধম্ম আছেন মাথার ওপর—তিনি দেখবেন। ছ-মাসের মেয়ে নিয়ে বিধবা হয়ে লোকের দোর দোর ঘুরিচি দুটো ভাতের জন্যি—আমায় যিনি বাপের ধনে—

বাবুরাম বললে—আর শাপমন্যি করো না বাপু। তোমার অদেষ্টে থাকত, পেতে। বাদ দেও ওসব কথা। উনুনে আগুন আছে কিনা দেখো তো, আর একবার কল্‌কেটা ধরাই।

ওদের মধ্যে আর একজন বললে—ও জুড়নখুড়ো, স্বরূপগঞ্জের বাজারে কাল দুপুরের আগে পৌঁছানো যাবে না?

—দুটোর কম হবে না। ছ'ডী কোশ, তার আগে খাওয়া-দাওয়া ক'রে নেওয়া যাবে।

বাবুরাম বললে—এবাঁর কেঁদুলির মেলায় লোক যাচ্ছে কই তেমন জুড়নখুড়ো···সে-বছর দেখেছিলে তো? পথে সারারাতই লোক হাঁটতো।

অদ্ভুত লাগছিল এ রাতটি আমার কাছে। এত কথাও মনে এনে দেয়! ঘুম আর আসে না। ভাবছিলাম মানুষ এত অল্পেও সুখী হয়? আর সুখ জিনিসটা কি অনির্দ্দেশ্য রহস্যময় ব্যাপার—এই নির্জ্জন রাত্রে মুক্ত অপরিচিত প্রান্তরের মধ্যে তারাখচিত আকাশের নীচে শুয়ে সবাই সুখের স্বপ্ন দেখছে—কিন্তু একজনের সুখের ধারণার সঙ্গে অন্য আর একজনের ধারণার কি বিষম পার্থক্য!

সকালে ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পশ্চিম মুখেই হাঁটি। রাঢ় দেশের বড় বড় মাঠের ওপর দিয়ে পথ। রাঙা বালি, দিগন্তে তালবনের সারি। হয়ত মাঠের মাঝে প্রাচীন কালের প্রকাণ্ড দীঘি, তালবনে ঘেরা। কি ফাঁকা জায়গা এ-সব! মনে হ'ত যেন সীমাহারা দিক্‌সমুদ্রে ভেলা ভাসিয়ে চলেছি, কোন্ অজ্ঞাত দিগন্তের বননীল উপকূলে গিয়ে ভিড়বো, কোনখানে তমালতরুনিকরে বনভূমি শ্যামায়মান, সেখানে গন্ধভরা অন্ধকার বীথিপথ বেয়ে অভিসারিকারা চিরদিন পা টিপে টিপে হাঁটে; বৃন্দাবনের দিন ফুরিয়ে গেল, মহাভারতের যুগ কেটে গেল, যমুনার তটে কেলিকদম্বের ছায়া কালের অন্ধকারে লুকিয়েছে, তবুও ওদের ও যাওয়ার শেষ হবে না, আমারও না।

মাঠের পথের প্রথমটায় কেঁদুলি মেলার লোকজনের সঙ্গে দেখা হ'ত। পরে আর তেমন লোক দেখি নি, এত বড় মাঠের মধ্যে অনেক সময় আমি একাই পথিক। এই ধূ-ধূ সীমাহীন প্রান্তরে সূর্য্যাস্তের কি মূর্ত্তি! আমাদের অঞ্চলে কোনোদিন তা দেখি নি। অন্ধকার হ'লে মাঠের মধ্যেই কতদিন রাত কাটিয়েছি। ছেলেবেলায় চা-বাগানে কাটিয়ে এই শিক্ষা পেয়েছিলাম, রাত্রিতে যে কোথাও আশ্রয় নিতে হবে, একথা মনেই ওঠে না। শীতের দেশ নয়, ঘন হিমারণ্যের হিংস্র শ্বাপদ নেই এখানে—নিতান্ত নিরীহ, নিরাপদ দেশ—এখানে নক্ষত্রভরা মুক্ত আকাশের চাঁদোয়ার তলায় মাটির ওপর যা-হয় একটা কিছু পেতে রাত কাটানোর মত আনন্দ খাট-পালঙ্কে শুয়ে পাই নি।

একদিন এই অবস্থায় একটি অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হ'ল। একটা অপূর্ব্ব নাম-না-জানা অনুভূতির

অভিজ্ঞতা। মুখে সে কথা বলা যায় না, বোঝানো যায় না, শুধু সে-ই বোঝে যার এ রকম হয়েছে।

সকালে বামুনহাটি ব'লে একটা গ্রামে এক গ্রাম্য হাতুড়ে কবিরাজের অতিথি হয়েছিলুম সেদিন; তার স্ত্রী একটি রণচণ্ডী—যতক্ষণ সেখানে ছিলাম, তাঁর গালবাদ্যের বিরাম ছিল না। আমি গিয়ে সবে বসেছি, তিনি দোরের আড়াল থেকে স্বামীর উদ্দেশ্যে আরম্ভ করলেন—ও অলপ্পেয়ে মিন্‌সে, আমার সঙ্গে তোমার এত শত্তুরতা কিসের বল দিকি? রান্নাঘরের রোয়াকে চালা তুলতে তোমায় বলেছে কে? গরমে একে ঘরের মধ্যে টেঁকা যায় না উনুন জ্বললে, যাও বা একটু হাওয়া আসতো, চালা তুললে হাওয়া আসবে তো, ও ড্যাক্‌রা? ওই অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে তোমার পিণ্ডি রাঁধবো খেও।

স্ত্রী চলে গেলে কবিরাজ-মশায় বললেন—আর বলেন কেন মশাই, হাড় ভাজা-ভাজা হয়ে গেল। শুনলেন তো দাঁতের বাদ্যি—ওই রকম সদাসর্ব্বদা চলছে। আর ঘোর শুচিবাই, দুনিয়ার সব জিনিস সব অশুদ্ধ। দিনের মধ্যে সাতবার নাইছে, নিমুনিয়া হয়ে যদি না মরে তবে কি বলেছি। আজ এক বছর ধরে ওই গোয়ালের একপাশে তক্তপোশ পেতে শোয় আলাদা—ঘরের জিনিস সব অশুদ্ধ যে, সেখানে কি শোয়া যায়? ওরকম ছিল না মশায়, ছেলেটা মরে গিয়ে অব্‌দি ওই রকম—

তারপর যে কথা বলছিলাম। বামুনহাটি থেকে বিকেলে বার হয়ে ক্রোশতিনেক যেতে-না-যেতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। মাঠের মধ্যে একটা ছোট নদী, রাস্তা থেকে একটু দূরে। নদী এত ছোট যে তাকে আমাদের দেশ হ'লে বলতো খাল। দু-পাড়ে রাঙা কাঁকর বিছানো, ধারে ধারে কাঁটাঝোপ আর তালগাছ। সেখানে রাত্রিযাপন করবো বলে মাটির ওপর ছোট শতরঞ্চিখানা পেতে তার ওপরে বসলাম। কোনদিকে জনপ্রাণী নেই।

খালের ওপারে একটা তালগাছের মাথায় শুক্‌নো পাতা হাওয়ায় খড় খড় শব্দ করছে—এই অন্ধকার প্রদোষে তালগাছের মাথার ওপরকার আকাশে নিঃসঙ্গ একটি তারা—আমি একবার তারাটির দিকে চাইছি, একবার চারদিকের নিস্তব্ধ, পাতলা অন্ধকারের দিকে চাইছি। হঠাৎ আমার মনে কেমন একটা আনন্দ হ'ল। সে আনন্দ এত অদ্ভুত যে বেদনা থেকে তা বেশী পৃথক নয়, সে পুলক চোখে জল এনে দিল, মনে কেমন একটা অনির্দ্দেশ্য অভাবের অনুভূতি জাগিয়ে তুলেছে যেন।

কিছুক্ষণ আগেও যে জগতে ছিলাম, এ যেন সে-জগৎ নয়!

এ জগৎ যুগযুগের তুচ্ছ জনকোলাহল কত গভীর মাটির স্তরের নীচে চাপা পড়ে যাওয়ার জগৎ। ফুল ফুটে নির্জ্জনে ঝড়ে-পড়ার জগৎ···অজানা কত বনপ্রান্তের কত অশ্রুভরা আনন্দ-তীর্থের জগৎ···কত স্বপ্ন ভেঙে যাওয়া···কত আশার হাসি মিলিয়ে যাওয়া···

শুধু নির্জ্জনে চূতবীথির তালীবনরেখার মাথার ওপর শ্যামলতার পাড়টানা সীমাহীন নীল শূন্যে বহুদূরের কোন ক্ষীণরশ্মি নক্ষত্রের সঙ্গে এ জগৎ এক···শতাব্দীতে শতাব্দীতে কত লক্ষ মনের আনন্দ, আশা, গর্ব্ব, হাসি, দৃষ্টি-ক্ষমতার বাহাদুরি কোথায় মুছিয়ে নিয়ে ফেলে দেয়, ক্ষীণ দুর্ব্বল হাত প্রিয়কে নির্ম্মম জীবনের গ্রাস থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে, না বুঝে হাসে, খুশী হয়, আশার স্বপ্নজাল বোনে···

অন্ধকারে কোন্ খনিগর্ভে চুনাপাথর হয়ে যায় তাদের হাড়···

আবার নবীন বুকে নবীন আনন্দ জেগে ওঠে। আবার হাসি, আবার খুশী হওয়া, আবার আশার স্বপ্ন-জাল বোনা···অথচ সব সময় তাদের মাথার ওপর দিয়ে অনন্ত কালের প্রবাহ ছুটে

চলে, পুরোনো পাতা ঝরে পড়ে, নতুন গান পুরোনো হয়ে যায়। গ্রহে গ্রহে, নক্ষত্রে নক্ষত্রে কত দৃশ্য-অদৃশ্য লোকে, কত অজানা জীবজগতেও এরকম বেদনা, দীনতা দুঃখ। দূরের সে-সব অজানালোকে ক্ষুদ্র গ্রাম্য নদী দীর্ঘ বটগাছের ছায়ায় বয়ে যায়, তাদের শান্ত বন-বীথির মূলে প্রিয়জনের, বহুদিন-হারা প্রিয়জনের কথা ভাবে—নদীর স্রোতে শেওলা-দাম-ভাসা জলে অনন্তের স্বপ্ন দেখে···যে অনন্ত তার চারধার ঘিরে আছে সব সময়, তার নিঃশ্বাসে, তার বুকের অদম্য প্রাণস্রোতে, তার মনের খুশীতে, নাক্ষত্রিক শূন্যপারের মিটমিটে তারার আলোয়। দূরের ওই দিগ্বলয় যেখানে চুপি চুপি পৃথিবীর পানে মুখ নামিয়ে কথা কইছে, শূন্যপথে অদৃশ্য চরণে দেবদেবীরা যেন এই সন্ধ্যায় ওখানে নেমে আসেন। যখন নদীজল শেষ-রৌদ্রে চিক্ চিক্ করে, কূলে কূলে অন্ধকার ফিরে আসে, পানকলস শেওলার ফুল কালো জলে সন্ধ্যার ছায়ায় ঢাকা পড়ে যায়—তখনই। আমার মনে সব ওলট-পালট হয়ে গেল, এমন এক দেবতার ছায়া মনে নামে—যেন জ্যাঠাইমাদের শালগ্রামশিলার চেয়ে বড়, আটঘরার বটতলার সেই পাথরের প্রাচীন মূর্ত্তিটির চেয়ে বড়, মহাপুরুষ খ্রীষ্টের চেয়েও বড়—চক্রবালরেখায় দূরের স্বপ্নরূপে সেই দেবতারই ছায়া, এই বিশাল প্রান্তরে ম্লান সন্ধ্যার রূপে মাথার ওপর উড়ে-যাওয়া বালিহাঁসের সাঁই সাঁই পাখার ডাকে। সেই দেবতা আমায় পথ দেখিয়ে দিন। আমি যা হারিয়েছি তা আর চাই নে, আমি চাই আজকার সন্ধ্যার মত আনন্দ, এবং যে নতুন দৃষ্টিতে এই এক মুহূর্ত্তের জন্যে গজৎটাকে দেখেছি সে দৃষ্টি হারিয়ে যাবে জানি, সে আনন্দ জীবনে অক্ষয় হবে না জানি—কিন্তু আর একবারও যেন অন্ততঃ তারা আসে আমার জীবনে।

॥ ১১ ॥

পরদিন দুপুরে সন্ধান মিলল ক্রোশ-চারেক দূরে দ্বারবাসিনী গ্রামে একটি প্রসিদ্ধ আখড়াবাড়ি আছে, সেখানে মাঝে মাঝে ভাল ভাল বৈষ্ণব সাধু আসেন। গাঁয়ের বাইরে আখড়াবাড়ি, সেখানে থাকবার জায়গাও মেলে।

সন্ধ্যার সামান্য আগে দ্বারবাসিনীর আখড়াবাড়িতে পৌঁছলাম। গ্রামের প্রান্তে একটা পুকুরের ধারে অনেকগুলো গাছপালা—ছায়াশূন্য, কাঁকরভরা, ঊষর ধূ-ধূ মাঠের মধ্যে এক জায়গায় টলটলে স্বচ্ছ জলে ভরা পুকুর। পুকুরপাড়ে বকুল, বেল, অশোক, তমাল, নিম গাছের ছায়াভরা ঘনকুঞ্জ, দু-চারটে পাখীর সান্ধ্যকাকলি—মরুর বুকে শ্যামল মরুদ্বীপের মত মনে হ'ল। এ অঞ্চলে এর নাম লোচনদাসের আখড়া। আমি যেতেই একজন প্রৌঢ় বৈষ্ণব, গলায় তুলসীর মালা, পরনে মোটা তসরের বহির্ব্বাস, উঠে এসে জিজ্ঞেস করলে,—কোথেকে আসা হচ্চে বাবুর? তারপর তালপাতার ছোট চাটাই পেতে দিলে বসতে, হাত-মুখ ধোয়ার জল নিজেই এনে দিলে। গোলমত উঠোনের চারিধারে রাঙা মাটির দেওয়াল-তোলা ঘর, সব ঘরের দাওয়াতেই দুটি-তিনটি বৈষ্ণব, খুব সম্ভবতঃ আমার মতই পথিক, রাত্রের জন্য আশ্রয় নিয়েছে।

সন্ধ্যার পরে আমি তালপাতার চাটাইয়ে বসে একটি বৃদ্ধ বৈষ্ণবের একতারা বাজনা ও গান শুনচি—এমন সময় একটি মেয়ে আমার উঠোনে এসে জিজ্ঞেস করলে—আপনি রাত্তিরে কি খাবেন—?

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম—আমায় বলচেন?

মেয়েটি শান্ত সুরে বললে—হ্যাঁ। রাত্তিরে কি ভাত খান?

আমি থতমত খেয়ে বললাম—যা হয়, ভাতই খাবো। আপনাদের যাতে সুবিধে।

মেয়েটি বললে—আমাদের সুবিধে নিয়ে নয়—এখানে আপনার যা ইচ্ছে হবে খেতে তাই বলবেন। চা খান কি আপনি ?

এ পর্য্যন্ত কোন জায়গায় এমন কথা শুনি নি, কোন মন্দিরে বা বৈষ্ণবের আখড়াতেই নয়। ডেকে কেউ জিজ্ঞেস করে নি আমি কি খেতে চাই। বললাম—চা খাওয়া অভ্যেস আছে, তবে সুবিধে না হ'লে—

মেয়েটি আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই চলে গেল এবং মিনিট কুড়ি পরে এক পেয়ালা চা নিয়ে এসে নিঃসঙ্কোচে আমার হাতেই দিলে। বললে—চিনি ঠিক হয়েছে কি না দেখুন।

আবার তাকে দেখলাম রাত্রে খাবার সময়ে। লম্বা দাওয়ায় সারি দিয়ে সাত-আট জন লোক খেতে বসেছে, মেয়েটি নিজের হাতে সবাইকে পরিবেশন করলে। প্রকাণ্ড বড় ভাতের ডেকচি নিজে দু-হাতে ধরে নিয়ে এসে আমাদের সামনে রাখলে—তা থেকে থালা ক'রে ভাত নিয়ে সকলকে দিতে লাগল। আমার পাশের লোকটিকে বললে—ও কি শ্যামাকাকা, নাউয়ের ঘণ্ট দিয়ে আর দুটো খান। ওবেলা তো খাওয়াই হয় নি !

সে সসম্ভ্রমে বললে—না দিদিঠাকৃরুন, আমাকে বলতে হবে না আপনার। পেটে জায়গা নেই। তেঁতুল মেখে বরং দুটো খাবো—

—হ্যাঁ কাসছেন, তেঁতুল না খেলে চলবে কেন ? দুধ দিচ্ছি—

তারপর আমার সামনে এসে বললে—আপনার বোধ হয় ওবেলা খাওয়াই হয় নি ? আপনাকেও দুধ দিচ্ছি।

এতগুলো লোক খেতে বসেছে, দুধ দেওয়া হ'ল মোটে তিনজনকে—কিন্তু সে ব্যক্তিগত প্রয়োজন বিশেষে এবং তার বিচারকর্ত্রী ওই মেয়েটিই। আমার কৌতুক হ'ল ভারি।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবলাম চমৎকার মেয়েটি তো ! দেখতে সুশ্রী বটে, তবে খুব সুন্দরী নয়। কিন্তু আমি ওরকম মুখের গড়ন কখনও দেখি নি, প্রথমে সন্ধ্যাবেলায় ওকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল একথা। বার বার চেয়ে দেখতে ইচ্ছে হয়—সে ওর সুন্দর ডাগর চোখ দুটির জন্যে, না ওর মুখের একটি বিশিষ্ট ধরনের লাবণ্যময় গড়নের জন্যে, রাত্রে তা ভাল বুঝতে পারি নি। মেয়েটি কে ? নিতান্ত ছেলেমানুষ তো নয়—সারাদেহে যৌবনশ্রী ফুটে উঠেচে পরিপূর্ণ ভাবেই—এখানে ওভাবে থাকে কেন। আখড়ার সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক ? নানা প্রশ্ন মনে উঠে ঘুম আর আসে না।

পরদিন সকালে মেয়েটির সঙ্গে অনেকবার দেখা হ'ল। অতিথিদের কারও অযত্ন না হয় সেদিকে দেখলাম ওর বেশ দৃষ্টি আছে। এ অঞ্চলে চালে কাঁকর ব'লে সে নিজে সকালে কুলো নিয়ে বসে প্রায় আধমণ চাল ঝাড়লে। বেলা ন'টার সময় হঠাৎ এসে আমায় বললে—আপনার ময়লা জামা-কাপড় যদি পুঁটলিতে থাকে তো দিন, কেচে দেবো। আপনার গায়ের জামাটাও ময়লা হয়ে গিয়েছে, খুলে দিন। খুব রোদ, দুপুরের মধ্যে শুকিয়ে যাবে।

আমি প্রথমটা একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিলাম। তার পর দেখলাম সে সকলকেই জিজ্ঞেস করছে কারও ময়লা কাপড়-চোপড় কিছু আছে কিনা। একজন বৃদ্ধ বাউলের গেরুয়া আলখাল্লা ময়লা হয়েছিল ব'লে খুলিয়ে নিয়ে গেল। পরে শুনলাম মেয়েটি ওরকম প্রায়ই করে, আখড়াতে ময়লা-কাপড়ে থাকবার জো নেই।

এখানে দিন দুই কাটাবার পরে আর একটা জিনিস আমার বিশেষ ক'রে চোখে পড়ল যে, মেয়েটির মধ্যে কোন মিথ্যে সঙ্কোচ নেই, সহজ সিধে ব্যবহার, কি কাজে, কি কথাবার্ত্তায়। সজীব ও দীপ্তিময়ী, যেন সঞ্চারিণী দীপশিখা, যদি শ্যামাঙ্গী মেয়েকে দীপশিখার সঙ্গে তুলনা করা

যায়। তৃতীয় দিন বিকেলে এসে বললে—পুকুরপাড়ের বাগান দেখেছেন? আসুন দেখিয়ে নিয়ে আসি।

এই কথাটা আমার বড় ভাল লাগল—এ পর্য্যন্ত আমি কোন মেয়ে দেখি নি যে বাগান ভালবাসে, দেখবার জিনিস ব'লে মনে করে।

ওর সঙ্গে গেলাম। অনেক গাছ আমাকে সে চিনিয়ে দিলে। কাঞ্চন ফুলের গাছ এই প্রথম চিনলাম। এক কোণে একটা বড় তমাল গাছের তলায় ইটের তুলসীমঞ্চ ও বেদী দেখিয়ে বললে—বাবা এখানে বসে জপ করতেন।

জিজ্ঞেস করলাম—আপনার বাবা এখন কোথায়?

মেয়েটি কেমন যেন একটা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বললে—বাবা তো নেই, এই চার বছর হ'ল মারা গিয়েছেন। এই যে পুকুরটা, বাবা কাটিয়েছিলেন, আর এই বকুলগাছের ওপাশে বিষ্ণুমন্দির তুলছিলেন, শেষ ক'রে যেতে পারেন নি।

এই কথায় সূত্র খুঁজে পেলাম ওর সম্পূর্ণ পরিচয় জিজ্ঞেস করবার। এ দু-দিন কাউকে ওর সম্বন্ধে কোন কথা বলি নি, পাছে কেউ কিছু মনে করে। কৌতূহলের সঙ্গে বললাম—আপনার বাবার নামেই বুঝি এই আখড়া?

—কি, লোচনদাসের আখড়া? তা নয়, আমরা ব্রাহ্মণ, আমার বাবার নাম ছিল কাশীশ্বর মুখুয্যে। লোচনদাস এই আখড়া বসান, কিন্তু মরবার সময়ে বাবার হাতে এর ভার দিয়ে যান। তারপর বাবা আট-ন' বছর আখড়া চালান। আখড়ার নামে যত ধানের জমি, সব বাবার। আসুন, বিষ্ণুমন্দির দেখবেন না?

মনে ভাবি বিষ্ণুমন্দির তুচ্ছ, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত আমি সঙ্গে যেতে রাজী আছি। পুকুরপাড়ের একটা বকুলগাছের পাশে একটা আধ-তৈরি ইটের ঘর। মেয়েটি বললে—গাঁথা শেষ হয় নি তো, হঠাৎ বাবা—তাইতে আদ্দেক হয়ে আছে। কাঁচা গাঁথুনি, আর-বছরের বর্ষায় ওদিকের দেওয়ালের খানিকটা আবার ভেঙে পড়ে গিয়েছে।

বকুলগাছে কি লতা উঠেচে, দেখিয়ে বললাম—বেশ ফুল ফুটেছে তো, কি লতা এটা?

ও বললে—মালতী লতা।

একটু চুপ ক'রে থেকে হেসে বললে—জানেন? আমার নাম—

ওর কথার ভঙ্গিতে মনে হ'ল এ এখনও ছেলেমানুষ। বললাম—আপনার নাম মালতীলতা? ও! কাল উদ্ধবদাস বাবাজী রুনি বলে ডাকছিলেন আপনাকে, তাই ভাবলাম বোধ হয়—

ও সলজ্জ মুখে বললে—লতা নয়, মালা।

দু'জনেই আখড়াবাড়ির নাটমন্দিরে ফিরে এলাম। তার পর মালতীকে আর দেখতে পেলাম না, সেই যে সে রান্নাঘরে কি কাজ নিয়ে ঢুকল রাত দশটা পর্য্যন্ত আর সেখান থেকে বেরুল না।

সকালে ঘুম ভেঙে উঠে মনে কেমন এক ধরনের মধুর অনুভূতি। মালতীকে যেন স্বপ্নে দেখেছি—ওর প্রকৃতপক্ষে কোন পার্থিব অস্তিত্ব যেন নেই। স্বপ্ন ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে তার কথা মনে পড়ল, বকুলতলায় তার সঙ্গে দাঁড়িয়েছি, সে হাসিমুখে নিজের নাম বলেছে, তার চোখ-মুখের সেই সচেতন নারীত্বের সলজ্জতা অথচ বালিকার প্রগল্ভ কৌতুক-প্রিয়তা—তার সারা দেহের সুঠাম লাবণ্য, এ-সব যেন অবাস্তব স্বপ্নজগৎ থেকে সংগ্রহ করা স্মৃতি। কিন্তু মনে সে বেদনা অনুভব করলাম না, যা আসে এই কথা ভেবে যে স্বপ্নে যা দেখেচি ও সব মিথ্যে, মায়া, মায়া—ও আর পাব না, ও ছায়ালোকের রচা স্বর্গ, ওর চন্দ্রালোকিত নির্জ্জন পর্ব্বতশিখরও

মিথ্যে, ও দিব্যাঙ্গনারাও মিথ্যে। মালতী এইখানেই আছে, কাছে কাছেই আছে, তাকে আরও কতবার দেখবো। মালতী আসবে তো?

মালতী সকালে একরাশ তুলো পিঁজতে বসল। বেলা এগারটা পর্য্যন্ত সে আর কোনো কাজে গেল না। প্রথম এখানে এসে যে প্রৌঢ় বৈষ্ণবটিকে দেখেছিলাম, তার নাম উদ্ধবদাস—সেই লোকটিই মালতীর অভিভাবক, কার্য্যতঃ কিন্তু মালতীর খেয়ালে তাকে চলতে হয়। সেও মালতীর কাছে বসে তুলো পিঁজতে ব্যস্ত আছে, মালতীর কথা ঠেলবার সাধ্য তার নেই।

মালতীর ইতিহাস উদ্ধবদাসের মুখে একদিন ইতিমধ্যে শুনলুম। উদ্ধব বাবাজীকে একদিন আখড়ার বাইরের মাঠে নিয়ে গিয়ে কৌশলে ঘুরিয়ে মালতীর কথা জিজ্ঞেস করতেই ও বললে—ওর বাবা আমার পাঠশালার পোড়ো বন্ধু। ওরা ব্রাহ্মণ, এ দেশের সমাজে কুলীন। মালতীর ঠাকুরদাদা শ্রীধর মুখুটি বেশ নামকরা কীর্ত্তন-গাইয়ে ছিলেন। নিজের দল ছিল। দু-পয়সা হাতে করেছিলেনও। একদিন রাত্তিরে বাইরে বেরুচ্চেন, দরজার চৌকাঠের কাছে বাড়ির বেড়ালটা যেন কিসের সঙ্গে খেলা করছে। ফুটফুট করছে অনন্তচতুর্দ্দশীর রাত, ভাদ্র মাস···যেমন বাইরে পা দিতে গিয়েছে অমনি সাপে ছোবল দিয়েছে পায়ে। সাপ ছিল চৌকাঠের বাইরে, আলো-আঁধারে লেগে বুড়ো তা টের পায় নি। ' ঘরে তখন ছেলের বৌ মালতীর মা, মালতীর বাবা বাড়ি নেই। চেঁচিয়ে বললেন—বৌমা, শীগ্‌গির আলো জ্বালো, আমায় একগাছা দড়ি দাও শীগ্‌গির। দড়ি নিয়ে বাঁধন দিয়ে উঠোনে গিয়ে বসলো। বললে—আমায় আর ঘরে যেতে হবে না বৌমা, তলব পড়েছে। লোকজন এল, ঝাড়ানো হ'ল—কিছুতেই কিছু হ'ল না, ভোররাত্রে মারা গেল।

মালতীর বাবা পৈতৃক কিছু হাতে পেয়ে একটা লবণ-কলায়ের দোকান করলে। তার মত অতিথিসেবার বাতিক আমি কখনও কারও দেখি নি। দোকান তো ছাই, বাড়ি হয়ে উঠল একটা মস্ত বড় অতিথিশালা। যত লোকই বাড়িতে আসুক, ফিরতো না। একবার রাত-দুপুরের সময় পঁচিশজন সাধু এসে হাজির, গঙ্গাসাগর যাচ্চে, অনেক দূর থেকে শুনে এসেছে এখানে জায়গা পাবে। দোকানের জিনিসপত্র ভাঙিয়ে পঁচিশমূর্ত্তি সাধুর সেবা হ'ল। সকালে তারা বললে, আমাদের জনপিছু দু-টাকা প্রণামী দাও। অত টাকা নগদ কোথায় পাবে? সাধুরা বললে—না দাও তো অভিসম্পাত দেবো। আমি বললাম—মিতে, অভিসম্পাত দেয় দিক, টাকা দিও না ওদের। ওরা লোক ভাল না। সে বললে—অভিসম্পাতের ভয় করি নে, তবে আমার কাছে চেয়েছে, আমি যেখান থেকে পাই, নিয়ে এসে দেবোই। মালতীর মায়ের কানের মাকড়ী আর ফাঁদি নথ শ্রীমন্তপুরের বাজারে বিক্রী ক'রে টাকা নিয়ে এল। তাতেও কুলোয় না, আমি বাকী সাতটা টাকা দিলাম—তবে সাধুরা বিদেয় হয়।

মালতী তখন ছোট, একদিন হঠাৎ স্ত্রীকে এসে বললে—আর শার সংসারে থাকবো না। স্ত্রীও বললে—আমায় সঙ্গে নাও। স্ত্রীকে বললে—বাঁশবাগানে ওই হাঁড়িটা পড়ে আছে, নিয়ে এসে ধুয়ে ওতে ভাত রাঁধো। খেয়ে চলো। লবণ-কলাইয়ের দোকান বিলিয়ে দিলে। ডোমপাড়া থেকে সবাইকে ডেকে নিয়ে এসে বললে—যার যা খুশী নিয়ে যাও। দশ মিনিটের মধ্যে দোকান সাফ্। সবাই বললে—পাগল হয়ে গিয়েছে। তার পর বৌ আর মেয়ের হাত ধরে কোথায় চলে গেল। বছর দুই পরে এসে এই লোচনদাস বাবাজীর আখড়ায় উঠলো। বাবাজী তখন বুড়ো হয়েছেন, বড় ভালবাসতেন, তিনি বললেন—বাবা, মহাপ্রভু তোমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন, আমার আখড়ার ভার তোমায় নিতে হবে, আমি আর বেশী দিন নয়। পরের বছর বাবাজী দেহ রাখলেন, ওই পুকুরপাড়ের তমালতলায় তাঁকে সমাধি

দেওয়া হ'ল।

ক্রমে মালতীর বাবার নাম দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। গোসাঁইজী বলতো সবাই। গোসাঁইজীকে দেবতা ব'লে জানতো এ-দেশের লোক। এমন নির্লোভ, অমন অমায়িক লোক কেউ কখনও দেখে নি। শরীরে অহঙ্কার ব'লে পদার্থ ছিল না। আর অমন মুক্ত মানুষ হয় না—কোন বাঁধন, কোন নিয়মগণ্ডীর ধার ধারত না। আমাদের বোষ্টমের সমাজেও অনেক আইন-কানুন আছে, মেনে না চললে সমাজে নিন্দে হয়, বড় বড় মচ্ছবের সময় নেমন্তন্ন পাওয়া যায় না। সে গ্রাহ্যও করতো না, একেবারে আপনভোলা, সদানন্দ, মুক্তপুরুষ ছিল। দ্বারবাসিনী কামারদের গাড়ির কাজ আছে কলকাতায়, একবার তাদের বাড়ি কাঙালীভোজন হচ্ছে, বেশ বড়লোক তারা। কামারদের মেজকর্ত্তা রতনবাবু দাঁড়িয়ে তদারক করছেন—এমন সময় দেখেন গোসাঁইজী কাঙালীদের সারিতে পাতা পেতে বসে খাচ্ছেন। পাছে কেউ টের পায় ব'লে থামের আড়ালে বসেছেন। হৈ হৈ কাণ্ড, বাড়িসুদ্ধ এসে হাতজোড় করে দাঁড়ালো। এ কি কাণ্ড গোসাঁইজী, আমাদের অকল্যাণ হবে যে! লোকটা এত সরল—কোনো লম্বা চওড়া কথা নয়, কোনো উপদেশ নয়, অবাক হয়ে বললে, তাতে দোষ কি? আমি শুনলাম কাঙালীভোজন হবে, ভাল-মন্দ খেতে পাওয়া যাবে, তাই এসেছি, এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম। সে জাত মানতো না, সমাজ মানতো না, আপন-পর বুঝতো না, নিয়ম-কানুনের ধার ধারতো না। কত লোক মন্ত্র নিয়ে আসতো। বলতো—মন্ত্র কি দেবো? আপনাকে ভাববে সবাইয়ের চাকর, ব্যস, এই মন্ত্র। মালতীর মা আগেই মারা গিয়েছিল। গোসাঁইজীর নিজের মরণও হ'ল স্ত্রীর মৃত্যুর তিন বছর পরে। একদিন কোথা থেকে বৃষ্টি মাথায় ভিজে আখড়ায় এলেন। তার পরদিন সকালে আমায় বললেন—উদ্ধব, কাল আমার বড় ঠাণ্ডা লেগেছে, একটু যেন জ্বর-মত হয়েছে; আজ আর ভাত খাব না, কি বলো? দু-দিন পর জ্বর নিমোনিয়ায় দাঁড়ালো। বুঝতে পেরেছিলেন বাঁচবেন না, মেয়েকে মরণের আগের দিন ডেকে বলে গেলেন—মালতী মা, তোর বিয়ে দিয়ে যেতে পারলাম না, তা আমার বলা রইলো যাকে তোর মন চায়, তাকেই বিয়ে করিস্। তিনি তো চলে গেলেন, মালতীকে একেবারে নিঃসম্বল অসহায় ফেলে রেখে। হাতে পয়সা রাখতে জানতেন না। ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবতেন না—সেটা আমি গুণ বলি নে, দোষই বলি—বিশেষ ক'রে অত বড় মেয়ে—আর ওর কেউ নেই ত্রিসংসারে। বাপ নেই, মা নেই, পয়সা নেই, বাড়ি নেই, ঘরবাড়ি এই আখড়া। মালতীও যে দেখছেন—ও মেয়েও পাগল, ও বাপের ধারায় গিয়েছে। লোকজনকে খাওয়াচ্ছে, সেবা করছে—ওই নিয়েই থাকে। কিছু মানে না, ভয় করে না। অন্য মেয়ে হ'লে এই সব পাড়াগাঁয়ে কত বদ্‌নাম রটত—গোসাঁইজীর মেয়ে বলে সবাই মানে, তাই কেউ কিছু বলে না।

দিন পনেরো কেটে গেল।

মালতীর বাবার ইতিহাস শুনে বুঝেছি আমি এখানে ছ-মাস থাকলেও এরা আমায় চলে যেতে বলবে না—বিশেষ ক'রে মালতী তো বলবেই না। কিন্তু আমার পক্ষে থাকাও যেমন অসম্ভব হয়ে উঠছে, চলে যাওয়া তার চেয়েও অসম্ভব যে! মালতীকে নতুন চোখে দেখতে শিখেছি ওর বাবার পরিচয় শুনে পর্য্যন্ত। মালতীর বাবার মত লোকের সন্ধানে কত ঘুরেছি, এতদিন পরে সন্ধান মিলেছে, কিন্তু চাক্ষুষ দেখা হ'ল না। জগতের সকল নিঃস্বার্থ নির্ম্মৎসর লোক পরস্পরের সগোত্র—তা সে লোক গঙ্গাতীরে নবদ্বীপের আকাশেই প্রথম দিনের আলো দেখুন কিংবা দেখুন কপিলাবস্তু বা প্যালেস্টাইন বা আসিসির ওপরকার ইতালীর ইন্দ্রনীল

আকাশের তলে।

মালতীকে কত কথা বলবার আছে, ভাবি কিন্তু ওর সঙ্গে আর আমার তেমন নির্জ্জনে দেখা হয় না। আমি দেখি মালতীর আশাতেই আমি সারাদিন বসে থাকি—ও কখন আসবে। ও থাকে সারাদিন নিজের কাজে ব্যস্ত—হয়ত দেখলাম ঘর থেকে ও বার হ'ল, ভাবি আমার কাছে আসছে বুঝি—কিন্তু তা না এসে থালা হাতে কাকে ভাত দিতে গেল। নয়ত আল্‌নাতে কাপড় টাঙাতে ব্যস্ত আছে। হয়ত একবার থাকতে না পেরে ডেকে বলি—ও মালতী—

মালতী বললে—আসছি।

আমি বসেই আছি, বেলা তুপুর গড়িয়ে গেল। ও এল কই?

দিনগুলো প্রায়ই এই রকম। তা ছাড়া আমার ওপর ওর কোন বিশেষ পক্ষপাত আছে ব'লে আমার মনে হয় না। প্রথম দিনকতক যে সে রকম ধারণা না হয়েছিল এমন নয়। কিন্তু এখন সে ভুল ভেঙেছে। সকলকে যেমন যত্ন করে, আমাকেও তেমনি করে।

একদিন ব'সে উদ্ধবদাসের একতারা মেরামত করছি—মালতী দেখতে পেয়ে উঠোনের ওকোণ থেকে চঞ্চলপদে এসে সামনে দাঁড়াল। সকৌতুক সুরে বললে—ও! কাকার সেই একতারাটা? আপনি সারাচ্ছেন নাকি? কি জানেন আপনি একতারা সারানোর?

আমি অপ্রতিভ না হয়ে বললাম—জানাজানির কি আছে এতে? খানিকটা তার হাতে এসেছিল—তাই পরিয়ে দিচ্ছি। কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে হাসিমুখে চোখ তুলে চাইতেই ওর সঙ্গে চোখাচোখি হ'ল। সেই মুহূর্ত্তে হঠাৎ আমার মনে হ'ল মালতীকে এখানে একা নিঃসহায়, নির্ব্বান্ধব, রিক্ত অবস্থায় ফেলে আমি কোথাও যেতে পারব না। ওর এখানে কে আছে? একপাল অনাত্মীয়, অশিক্ষিত গেঁয়ো বৈষ্ণবের মেলার মধ্যে ওকে ফেলে রেখে যাব কি ক'রে? তারা ওর কেউ নয়। তারা ওকে বুঝবে না। তার চেয়ে আমার মনের দেশে ও আমার অনেক আপন, আমার নিকটতম প্রতিবেশী।

ভাবলাম মালতীকে সব কথা বলি। বলি, মালতী, সংসারে তোমারও কেউ নেই, আমারও কেউ নেই। তুমি সাধু বাপের সতী মেয়ে, তোমার সংসার-বিরাগী আপন-ভোলা বাপের আশীর্ব্বাদ ওই শ্যামসুন্দর তমালতরু ছায়ার মত তোমাকে ঘিরে রেখেছে জানি, কিন্তু আমিও যে-সন্ধানে বেরিয়েছি, সে-সন্ধান সফল হবে না তুমি যদি পাশে এসে না দাঁড়াও।

কিন্তু তার বদলে বললাম—ভাল কথা মালতী, তোমাকে অনেকদিন থেকে বলব ভাবচি। উদ্ধব বাবাজীকে ব'লে আমায় এখানে একটা পাঠশালা করার ব্যবস্থা ক'রে দিতে পার? আমার কিছু হয় তা থেকে।

মালতী এসে দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে বসল। ওর মুখের পাশটা দেখা যাচ্ছে, একটা সুকুমার লাবণ্য যেন ওর মুখের চারিপাশ ঘিরে আছে—এক ধরনের সুন্দর মুখ আছে, মনে হয় যেন তাদের মুখের চারিপাশে একটা অদৃশ্য সৌন্দর্য্যজালের বেষ্টনী রয়েছে, যখন কথা না বলে চুপ ক'রে থাকে, তখন তাদের মুখের এই ভাবটা সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে—মালতীর মুখ সেই ধরনের। আমার কথায় ওর মুখচোখ চিন্তাকুল হয়ে উঠল, যেন কি একটা বিষম সমস্যা তার ঘাড়ে আমি চাপিয়ে দিয়েছি। বললে—কিন্তু এখানে যা ভেবে করবেন, তার কিছু হবে না। এখানে মাইনে দেবে না কেউ। এখানে ভদ্রলোক নেই। দ্বারবাসিনীতে কামারেরা আছে, ওদের কলকাতায় গাড়ির কারখানা, সেইখানেই থাকে। সরকারেরা তিন বছর পরে এসেছিল পূজোর সময় দেশে।—তারপর হেসে ছেলেমানুষের মত ঘাড় দুলিয়ে বললে—ধান নিয়ে ছেলে পড়াতে

পারবেন ? এদেশে মাইনের বদলে ধান দেয়। না:, সে-সব আপনার কাজ নয়। তা আপনি তো এখানে জলে পড়ে নেই ? হাতে কিছু নেই, একদিন হবেই। যতদিন না হয়, এখানে থাকুন। আপনাকে এ অবস্থায় কোথাও যেতে দেব না। এখানে থাকতে কষ্ট হচ্ছে বোধ হয়, না ? সত্যি কথা বলুন।

—সত্যি কথা কি সব সময় বলা যায় মালতী ?

—কেন, বলুন না কি বলবেন ?

—এখন থাক্‌, আমার কাজ আছে। শোন, উদ্ধবদাসের একতারাটা এখানে রইল, ব'লো তাকে। তোমার জন্যে সারানো হ'ল না।

মালতী অবাক হয়ে চেয়ে থেকে বললে—কোথায় যাবেন ? শুনুন। বা রে, অদ্ভুত মানুষ কিন্তু আপনি !

বাইরের মাঠে এসে দাঁড়িয়ে মনে হ'ল আকাশ-বাতাসের রূপ ও রং যেন এই এক মুহূর্ত্তের মধ্যে বদলে গেছে আমার চোখে। মালতী ও-কথা বললে কেন যে, আপনাকে এ অবস্থায় কোথাও যেতে দিতে পারব না ?—এই সেই মাঠ, সেই নীলাকাশ, মাঠের মধ্যে দ্বারবাসিনীর কামারদের কাটানো বড় দীঘিটা, সবই সেই আছে—কিন্তু মালতীর মুখের একটি কথায় সব এত সুন্দর, এত অপরূপ, এত মধুময় হয়ে উঠল কেন ?

ঠিক সেই অদ্ভুত রাত্রিটির মত—মাঠের মধ্যে নির্জ্জন নদীর ধারে শুয়ে যেমন হয়েছিল সেদিন। অনুভূতি হিসেবে দুই-ই এক। কোন প্রভেদ নেই দেখলুম। কোথায় সেই বিরাট দেবতা, আর কোথায় এই মালতী !

তারপর দিন-কতক ধরে মালতীর সঙ্গে কি জানি কেন আমার প্রায়ই দেখা হয়। সময়ে অসময়ে, কারণে-অকারণে ও আমার সামনে যখনই এসে পড়ে কিংবা কাছ দিয়ে যায়, দাঁড়িয়ে দুটো কথা না ব'লে যায় না। হয়ত অতি তুচ্ছ কথা—বসে আছি, সামনে দিয়ে যাবার সময় ব'লে গেল—বসে আছেন ? এ-কথা বলবার কোন প্রয়োজন নেই—কিন্তু সারাদিনের এই টুক্‌রো টুকরো অকারণ কথা, একটুখানি হাসি, কৃত্রিম শ্লেষ, কখন-বা শুধু চাহনি···এর মধ্যে দিয়ে ওর কাছে আমি অনেকটা এগিয়ে যাই—ও আমার কাছে এগিয়ে আসে। এত ক'রে বুঝি ও আমার অস্তিত্বকে উপেক্ষা ক'রে চলতে পারে না—ও আমার সঙ্গে কথা ব'লে আনন্দ পায়।

বিকেলে যখন ওর সঙ্গে এক-এক দিন গল্প করি, তখন দেখি ওর মনের চমৎকার একটা সজীবতা আছে। নিজে বেশী কথা বলতে ভালবাসে না—কিন্তু শ্রোতা হিসেবে সে একেবারে প্রথম শ্রেণীর। যে-কোন বিষয়ে ওর কৌতূহল জাগানো যায়—মনের দিক থেকে সেটা বড় একটা গুণ। এমনভাবে সকৌতূহল ডাগর চোখ দুটি তুলে একমনে সে শুনবে—তাতে যে বলছে তার মনে আরও নতুন নতুন কথা যোগায়, ওকে আরও বিস্মিত করবার ইচ্ছে হয়।

মালতী বড় চাপা মেয়ে কিন্তু—এতদিন পরে হঠাৎ সেদিন উদ্ধবের মুখে শুনলাম যে ও বেশ সংস্কৃত জানে। ওর বাবার এক বন্ধু ত্রিগুণাচরণ কাব্যতীর্থ নাকি শেষ বয়সে এই আখড়ায় ছিলেন, এইখানেই মারা যান। তাঁর কেউ ছিল না—মালতীর বাবা তখন বেঁচে—তিনিই এখানে তাঁকে আশ্রয় দেন। ত্রিগুণা-পণ্ডিতেরই কাছে মালতী তিন-চার বছর সংস্কৃত পড়েছিল। মালতীকে জিজ্ঞেস করতেই মালতী বললে—এখন আর ওসব চর্চ্চা নেই, ভুলে গিয়েছি। সামান্য একটা ধাতুর রূপও মনে নেই। তবে রঘুর শ্লোক অনেক মুখস্থ আছে, যা যা ভাল লেগেছিল তাই কিছু কিছু মুখস্থ করেছিলাম, সেইগুলো ভুলিনি। তবে সহজ ভাষা যদি হয়, পড়লে মানেটা খানিকটা বুঝতে পারি। সে এমন কিছু হাতী-ঘোড়া নয়! উদ্ধব-

জ্যাঠা আবার তাই আপনাকে গিয়েছে বলতে—উদ্ধব-জ্যাঠার যা কাণ্ড!

বৈষ্ণব-ধর্ম্মের আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছে বটে, কিন্তু ও নিজে যেন কিছুই মানে না—এই ভাবের। কখনও কোনও পূজা-অর্চ্চনা ওকে করতে দেখি নি, এক ওর বাবার বিষ্ণুমন্দিরে প্রদীপ দেখানো ছাড়া। আখড়ায় প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের পূজার যোগাড় করে উদ্ধব নিজে, মালতীকে সেদিকে বড় একটা ঘেঁষতে দেখি নি। তা ব'লে ওর মন ওর বাপের মত সংস্কার-মুক্তও নয়। ছোটখাটো বাছ-বিচার এত মানে যে, আখড়ার লোকে অতিষ্ঠ। সন্ধ্যাবেলা ঝিঙে তুলেছিল ব'লে একটি বাবাজীকে মালতীর কাছে কড়া কথা শুনতে হয়েছিল। ছোঁয়া-ছুঁয়ির বালাই বড়-একটা নেই—মুচির ছেলেকেও ঘরের দাওয়ায় বসিয়ে খাওয়াচ্ছে, কাওড়া পাড়ায় অসুখ হলে সাবু ক'রে নিয়ে গিয়ে নিজের হাতে খাইয়ে আসতে দেখেছি।

একদিন বিকেলে আখড়ার সামনে মাঠে পাঠশালা করছি, মালতী এসে বললে—দিন আজ ওদের ছুটি। আসুন একটা জিনিস দেখিয়ে আনি।

আখড়ার পাশে ছোট একটা মাঠ পেরিয়ে একটা রাঙা মাটির টিলা। তার ওপর শাল-পলাশের বন – টিলার নীচে ঘন বনসিদ্ধির জঙ্গল। টিলার ওপারে পলাশবনের আড়ালে একটা ছোট মন্দির। মালতী বললে—এই দেখাতে আনলাম আপনাকে। নন্দিকেশ্বর শিবের মন্দির—বড় জাগ্রত ঠাকুর—খৃষ্টান হ'লেও মাথাটা নোয়ান—দোষ হবে না।

মন্দিরের পূজারী দু'খানা বাতাসা দিয়ে আমাদের জল দিলে। সে উড়িষ্যার ব্রাহ্মণ, উপাধি মহান্তি, বহুকাল এদেশে আছে, বাংলা জানে ভাল। মালতীকে ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছে।

তারপর আমরা তিনজনেই মন্দিরের পশ্চিম দিকের রোয়াকে বসলুম। মালতী বললে—মহান্তি কাকা, বলুন তো এই মন্দির-প্রতিষ্ঠার কথাটা এঁকে। ইনি আবার খৃষ্টান কিনা, ওসব মানেন না।

আমি বললুম—আঃ, কেন বাজে বকছ মালতী? কি মানি না-মানি—মানে প্রত্যেক মানুষের—

মালতী আমার কথাটা শেষ করতে দিলে না। বললে—আপনার বক্তৃতা রাখুন। শুনুন, এটা খুব আশ্চর্য্য কথা—বলুন তো মহান্তি-কাকা?

মহান্তি বললে—এইখানে আগে গোয়ালাদের বাগান ছিল, বছর-পঞ্চাশ আগেকার কথা। রোজ তাদের দুধ চুরি যেত। দু-তিনটে গরু সকালে একদম দুধ দিত না। একদিন তারা রাত জেগে রইল। গভীর নিষুতি রাতে দেখে টিলার নীচের ওই বনসিদ্ধির জঙ্গল থেকে কে এক ছোকরা বার হয়ে গরুর বাঁটে মুখ দিয়ে দুধ খাচ্ছে। যে-সব গরু বাছুর ভিন্ন পানায় না, তারাও বেশ দুধ দিচ্ছে। ছোকরার রূপ দেখে ওরা কি জানি কি বুঝলে, কোন গোলমাল করলে না; ছোকরাও দুধ খেয়ে ওই জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। পরের দিন সকালে বনে খোঁজ ক'রে দেখে কিছুই না। খুঁজতে খুঁজতে এক শিবলিঙ্গ পাওয়া গেল। ওই যে শিবলিঙ্গ দেখছেন মন্দিরের মধ্যে। মাঘ মাসে মেলা হয়—ভারি জাগ্রত ঠাকুর।

মালতী গর্ব্বের দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বললে—শুনলেন পাদ্রিমশাই? মানেন না যে বড় কিছু?

আমি বললাম—আমি বেড়াতে বেড়াতে অনেক জায়গায় এ-রকম দেখেছি। কত গাঁয়ে প্রাচীন বটতলায় নুড়ি, ষষ্ঠীদেবী, ওলাদেবী, কালিমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠার মূলে এই ধরনের প্রবাদ আছে। লোকে কত দূর থেকে এসে পুজো দেয়, তাদের মধ্যে সত্যিকার ভক্তি দেখেছি। এক

পাড়াগাঁয়ের বোষ্টমের আখড়ায় একখানা পাথর দেখেছিলাম—তার ওপরে পায়ের চিহ্ন খোদাই করা, আখড়ার অধিকারী পয়সার লোভে যাত্রীদের বলতো ওটা খোদ শ্রীকৃষ্ণের পায়ের দাগ, সে বৃন্দাবন থেকে সংগ্রহ ক'রে এনেছে পাথরখানা। আমি দেখেছি একটি তরুণী ভক্তিমতী পল্লীবধূকে চোখের জলে আকুল হয়ে পাথরটা গঙ্গাজলে ধুয়ে নিজের মাথার লম্বা চুল দিয়ে মুছিয়ে দিতে। কি জানি কোথায় পৌঁছল ওর প্রণাম। কোন্ ঊর্দ্ধমূল অধোশাখ দেবতা ওর সেবা গ্রহণ করতে সেদিন বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তাঁর বহুপল্লবিত বাহু?

কি অপূর্ব্ব সূর্য্যাস্ত হচ্ছে বিশাল পশ্চিম দিগন্তে! দূরের তালগাছের মাথাগুলো যেন বাঁধাকপির মত ছোট দেখাচ্ছে, গুঁড়িগুলো দেখাচ্ছে যেন সরু সরু নলখাগড়ার ডাঁটা—আর তার ওপরকার নীলাকাশে রঙীন মেঘলোকে পিঙ্গলবর্ণের পাহাড়, সমুদ্র, কোন্ স্বপ্নসাগরের অজানা বেলাভূমি।…পায়ের নীচের মাটি সারাদিন রোদে পুড়েছে—বাতাসে তারই সুগন্ধ।

মালতী বললে—বিষ্ণুমন্দিরে সাঁজ জ্বলে নি এখনও। প্রদীপ দিইগে চলুন—

সেখানে ওর বাবার মন্দিরে প্রদীপ দেওয়া হয়ে গেল। আমি পুকুরপাড়ের তেঁতুলগাছের মোটা শেকড়ে বসলুম, ও দাঁড়িয়ে রইল। বললাম—আমায় তুমি যে খৃষ্টান বল, তুমি আমার কথা কিছু জান না। তার পর ওকে আমার বাল্যজীবন, মিসনারী মেমদের কথা, আমাদের দারিদ্র্য, মা, সীতা ও দাদার কথা সব বললাম। বিশেষ ক'রে উল্লেখ করলাম আমার সেই দৃষ্টিশক্তির কথাটা—যা এখন হারিয়েছি। ছেলেবেলার ঘটনা আমার এখন আর তেমন মনে নেই—তবুও বললাম যা মনে ছিল—যেমন চা-বাগানের দু-একটা ঘটনা, বাল্যে পানীর মৃত্যু-দিনের ব্যাপার, হীরু রায়ের মৃত্যুর কথা, মেজবাবুর পুত্রসন্তান হওয়া সংক্রান্ত ব্যাপার।

বললাম—যীশুখৃষ্টকে ভক্তি করি ব'লে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করেছি জীবনে। কিন্তু সে আমার দোষ নয়, ছেলেবেলার শিক্ষা। ওই আবহাওয়াতে মানুষ হয়েছিলাম। আমি এখনও তাঁর ভক্ত। তুমি তাঁর কথা কিছু জান না—বুদ্ধ চৈতন্য যেমনি মহাপুরুষ, তিনিও তেমনি। মহাপুরুষদের কি জাত আছে মালতী? কর আদায় করতো লেভি, ইহুদীসমাজে সে ছিল নীচ, পতিত, সমাজের ঘৃণ্য। সবাই তাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে চলে যেত। যীশু তাকে বললেন—লেভি, তুমি নীচ কে বলে? তুমি ভগবানের সন্তান। লেভি আনন্দে কেঁদে ফেললে। সমাজের যত হেয় লোককে তিনি কোল দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে বেশ্যা ছিল, জালজীবী ছিল, কুষ্ঠী ছিল। তাঁকে সবাই বলতো পাগল, ধর্ম্মহীন, আচারভ্রষ্ট। তাঁর বাপ, মা, ভাই আপনার জনও তাঁকে বলতো পাগল—তারা জানতো না ঈশ্বরকে যে জেনেছে, তার বাইরের আচারের প্রয়োজন নেই। তাঁর ধর্ম্ম সেবার ধর্ম্ম।

তার পর আমি ওকে সেদিনকার অভিজ্ঞতার কথা বললাম। পুকুরের ওপারে দূরবিসর্পিত আকাশের দিকে চোখ রেখে আমার মনে এল যে রাঢ়দেশের এই সীমাহীন রাঙামাটির মাঠের মধ্যে সেদিন আমি অন্য এক দেবতার স্বপ্ন দেখেছি। সে কি বিরাট রূপ! ওই রাঙা গোধূলির মেঘে, বর্ণে, আকাশে তাঁর ছবি। তাঁর আসন সর্ব্বত্র—তালের সারিতে, তমাল-নিকুঞ্জে, পুকুরে-ফোটা মৃণালদলে, দুঃখে শোকে, মানুষের মুখের লাবণ্যে, শিশুর হাসিতে…সে এক অদ্ভুত দেবতা! কিন্তু কতটুকুই বা সে অনুভূতি হ'ল! যেমন আসা অমনি মিলিয়ে যাওয়া!…

মালতী, আগেই বলেছি, অদ্ভুত শ্রোতা। সে কি একান্ত মনোযোগের সঙ্গে শুনলে যখন আমি বকে গেলুম! চুপ ক'রে রইল অনেকক্ষণ, যেন কি ভাবছে।

তারপর হঠাৎ বললে—আচ্ছা, আপনাকে একটা কথা বলি। প্রেম ও সেবার ধর্ম্ম কি শুধু যীশুখৃষ্টের দেওয়া? আমাদের দেশে ওসব বুঝি বলে নি? আমাদের আখড়ায় লোচনদাস

বাবাজী ছিলেন, ঠ্যাং-ভাঙা কুকুর পথ থেকে বুকে ক'রে তুলে আনতেন। একবার একটা ষাঁড়ের শিং ভেঙে গিয়েছিল, ঘায়ে পোকা থুক্ থুক্ করছে, গন্ধে কাছে যাওয়া যায় না। লোচনজ্যাঠা তাকে জোর ক'রে পেড়ে ফেলে ঘা থেকে লম্বা লম্বা পোকা বার ক'রে ফিনাইল দিয়ে দিতেন ন্যাকড়া ক'রে। তাতেই এক মাস পরে ঘা সারলো।

—এ-সব কথা বলার দরকার করে না, মালতী। আমি তোমাকে বলেছি তো ধর্ম্মের দেশকাল নেই, মহাপুরুষদের জাত নেই। যখন শুনি তোমার বাবা গরিব প্রতিবেশীদের মেয়ের বিয়েতে নিজের বাড়ি থেকে দানসামগ্রীর বাসন বার ক'রে দিতেন—দিতে দিতে পৈতৃক আমলের বাসনের বড় সিন্দুক খালি ক'রে ফেলেছিলেন—তখনই আমি বুঝেছি ভগবান সব দেশেই অদৃশ্যলোক থেকে তাঁর বাণী প্রচার করেছেন, কোন বিশেষ দেশ বা জাতের ওপর তাঁর পক্ষপাত নেই। মানুষের বুকের মধ্যে বসে তিনি কথা কন, আর যার কান আছে, সে শুনতে পায়।

ওর বাবার কথায় ওর চোখে জল ভরে এল। অন্যমনস্ক হয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। দেখেছি মালতী শুষ্ক চোখে কখনও ওর বাপের কথা শুনতে পারে না। সন্ধ্যা হয়েছে। উঠছি এমন সময় তমালছায়ায় বিষ্ণুমন্দিরের দিকে আর একবার চোখ পড়তেই আমাদের গ্রামের পুকুরপাড়ের বটতলার সেই হাতভাঙা পরিত্যক্ত সুন্দর বিষ্ণুমূর্ত্তির কথা আমার কেমন ক'রে মনে এল। মনে এল ছেলেবেলায় সীতা আর আমি কত ফুলের মালা গেঁথে মূর্ত্তির গলায় পরিয়েছি—তার পর কতদিন সেদিকে যাই নি, কি জানি মূর্ত্তিটার আজকাল কি দশা হয়েছে, সেইখানে আছে কিনা? কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলুম যেন, মালতী কি একটা কথা বললে তা আমার কানেই গেল না ভাল ক'রে। বা রে, পুকুরপাড়ের সে ভাঙা দেবমূর্ত্তির সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক?

বিষ্ণুমন্দির থেকে দু'জনে যখন ফিরছি, আখড়ায় তখন আরতি আরম্ভ হয়েছে। দিগন্তপ্রসারী মাঠের প্রান্তে গাছপালার অন্তরালবর্ত্তী এই নিভৃত ছোট দেবালয়টির সন্ধ্যারতি প্রতিদিনই আমায় কেমন একটা অপূর্ব্ব ভাবে অনুপ্রাণিত করত—আজ কিন্তু আমার আনন্দ যেন হাজার গুণে বেড়ে গেল। তার ওপর আজ একজন পথিক বৈষ্ণব জীবগোস্বামীর সংস্কৃত পদাবলী একতারায় অতি সুস্বরে গাইলে—আমার মানসবৃন্দাবনের বংশীবটমূলে কিশোর হরি চিরকাল বাঁশী বাজান, আমার প্রাণের গোষ্ঠে তাঁর ধেনুদল চরে; সেখানে তাঁর খেলাধুলো চলে রাখালবালকদের নিয়ে দীর্ঘ সারাদিন, দীর্ঘ সারারাত।

কেন এত আনন্দ আমার মনে এল কে বলবে? আমি যেন অন্য জন্ম গ্রহণ করেছি। ঘুম আর আসে না—সে গভীর রাত্রে তমালশাখার আড়ালে চাঁদ অস্ত গেলে আমি আখড়ার সামনের মাঠে গাছের তলায় এসে বসলুম।

আকাশের অন্ধকার দূর করেছে শুধু জলজলে শুকতারার আলোয়। কে জানে হয়ত ওই শুকতারার দেশের নদীতীরে, জ্যোৎস্নামাখা বনপ্রান্তরে, উপবনে মৃত্যুহীন জরাহীন দেবকন্যারা মন্দারবীথির ঘন ছায়ায় প্রণয়ীজনের সঙ্গে গোপন মিলনে সারারাত্রি কাটায়···তৃপ্তিহীন অমর প্রেম তাদের চোখের জ্যোৎস্নায় জেগে থাকে, লজ্জাভরা হাসিতে ধরা দেয়। পীত সূর্য্যাস্তের আলোয় করুণ সুর বহুদূরের শূন্য বেয়ে সেখানে ভেসে এসে সান্ধ্য আকাশকে আরও মধুর ক'রে তোলে—কোথা থেকে সে সুর আসে কেউ জানে না···কেউ বলে বহু দূরের কোন নক্ষত্রলোকে এক বিরহী দেবতা একা বসে বসে এমনি তাঁর বীণা বাজান, সেই সুর ভেসে আসে প্রতি সন্ধ্যায় ···ঠিক কেউ বলতে পারে না···কেবল আধ-আলো আধ-ছায়ায় পুষ্পবীথিতে লুকিয়ে সুখী

প্রেমিক-প্রেমিকা হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে···তাদের চোখে অকারণে জল এসে পড়ে···অবাক হয়ে তারা পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

হঠাৎ আমার সামনে অস্পষ্ট অন্ধকারে একজন তরুণ যুবক হাসিমুখে এসে দাঁড়িয়ে বললে —এস আমার সঙ্গে—

তার গেরুয়া উত্তরীয় আমার গায়ে এসে পড়ছে উড়ে। আমি বলি—কোথায় যাব? কে আপনি?

নবীন বৈষ্ণব বললে—আমি জীবগোস্বামী—আমারই পদাবলী তুমি সন্দেবেলা শুনেচ যে। এত শীগ্‌গির ভুলে যাও কেন হে ছোক্‌রা? এস আমি বৃন্দাবনে যাব। শ্রীকৃষ্ণকে আমার পাওয়া চাই।

—আপনি তো মারা গিয়েছেন আজ তিন-শো বছরের ওপর। আপনি আবার কোথায়?

—পাগল! কে বললে আমি মরেছি। আর মলেই কি আমার যাওয়া ফুরিয়েছে নাকি? এসো···এসো—আমি সংসার ছেড়েছি, সব ছেড়েছি, তাঁর জন্যে। দেখছ না পাগল হয়ে পথে পথে বেড়াচ্ছি?

এমন ভাবে কথাগুলো সে বললে আমি যেন শিউরে উঠলুম। বললাম—তা তো দেখতে পাচ্ছি, পাগলের আর বাকী কি? আপনি যান, আমি যীশুখৃষ্টের ভক্ত, আমি বৃন্দাবনে যাব না। তাছাড়া মালতীকে ফেলে এক পা-ও এখান থেকে নড়ছি নে আমি।

তরুণ বাউল হেসে একতারা বাজাতে বাজাতে চলে গেল—পথের মাঝে নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে যেতে যেতে দূরের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল···অন্ধকারের মধ্যে থেকে তার গলার মিষ্টি সুর তখনও যেন ভেসে আসছে···

মধু রিপুরূপমুদারম্
মধু রিপুরূপমুদারম্
সুখদং সুখদং ভবসারম্

হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে শেষ রাতের ঠাণ্ডায় কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম কে জানে—শিশিরে কাপড়-চোপড় ভিজে গিয়েছে। ফরসা হবার আর দেরি নেই।

॥ ১২ ॥

দেখতে দেখতে এখানে ছ-সাত মাস হয়ে গেল। এখানে সময় কাটে কোথা দিয়ে বুঝতে পারি নে। সকালে আখড়ার কাজ করি, বিকেলে গোটাকতক ছেলে নিয়ে একটা পাঠশালা করি, তাতে যা পাই উদ্ধব বাবাজীর হাতে তুলে দিই। একদিন মালতী আমায় বললে—ছেলে পড়িয়ে যা পান, তা আপনি উদ্ধব-জ্যাঠার হাতে দেন কেন? থাকা-খাওয়ার দরুন টাকা নেওয়া তো এখানে নিয়ম নেই, ও-টাকা আপনি নিজে রেখে দেবেন, আপনারও তো নিজের টাকার দরকার আছে। আমি বললাম—তা কি ক'রে হয় মালতী, আমি এমনি খেতে পারি নে। আর আমি তো খাওয়া থাকা ব'লে টাকা দিই নে, বিগ্রহের সেবার জন্যে দিই। এতে দোষ কি?

সেদিন মালতী আর কিছু বললে না। দিন-চারেক পরে আবার এক দিন ওই কথাই তুললে। টাকা আমি কেন দিই? আখড়া তো হোটেলখানা নয় যে এখানে টাকা দিয়ে খেতে হবে? ওতে তার মনে বাধে। তা ছাড়া আমার তো টাকার দরকার আছে। আমি তাকে

বুঝিয়ে বলি, টাকা না দিতে দিলে আমার এখানে থাকা হবে না। চলে যেতে হবে।

সেদিন থেকে মালতী এ নিয়ে আর কিছু বলে নি।

পাড়াগাঁয়ের দিনগুলো অদ্ভুত কাটে।—দীঘির পাড়ে রাঙামাটির উঁচু বাঁধে এ-সময়ে এক-রকম ফুল ফোটে, ছায়া প'ড়ে এলে মাঝে মাঝে একা গিয়ে বসি। বাগ্‌দীদের মেয়েরা হাঁটু পর্য্যন্ত কাপড় তুলে মাছ ধরে, আখড়ার গোয়াল থেকে সাঁজালের ধোঁয়া ঘুরে ঘুরে ওঠে—তালের দীর্ঘসারির ফাঁক দিয়ে এই সন্ধ্যায় কতদূর দেখতে পাই—দাদার দোকান, দাদার বাতাসার কারখানা, সীতার শ্বশুরবাড়ি, তুষারাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘা, নিমচাঁদের বৌ, শৈলদি।…

মালতীর স্বভাব কি মধুর! কি খাটুনিটা খাটে আখড়ায়—এক দিন উঁচু কথা শুনি নি ওর মুখে—কারও ওপর রাগ দেখি নি—বাপের মেয়ে বটে!

আখড়ায় ছোট একটা অশ্বত্থ-চারা আছে, উদ্ধব দাস রোজ স্নান ক'রে এসে গাছটা প্রদক্ষিণ করে, গাছটাকে জল দেয়। এ তার রোজ করাই চাই। একদিন মালতীকে ডেকে বলি—তোমার উদ্ধব-জ্যাঠা পাগল নাকি? ও-গাছটার চারিপাশে ঘোরার মানে কি? মালতী বললে—কেন ঘুরবে না; সবাই তো আর আপনার মত নাস্তিক না। অশ্বত্থগাছ নারায়ণ—ওর সেবা করলে নারায়ণের সেবা করা হয়—জানেন কিছু?

আমি বললুম—তা'হলে তুমিও সেবাটা শুরু ক'রে পুণ্যি কিছু ক'রে নাও না সময় থাকতে?

মালতী শাসনের সুরে বললে—আচ্ছা আচ্ছা, থাক্। আপনি ও-রকম পরের জিনিস নিয়ে টিটকিরি দেন কেন? ওদের ওই ভাল লাগে, করে। আপনার ভাল লাগে না, করবেন না। তা নয়, সারাদিন কেবল এর খুঁত ওর খুঁত—ছিঃ, আপনার এ স্বভাব সারবে কবে?

বললাম—তোমার মত উপদেশ দেওয়ার মানুষের দেখা পেতাম যদি তাহ'লে এত দিন কি আর স্বভাব সারে না? তা সবই অদৃষ্ট!

কথা শেষ ক'রে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতেই মালতী রাগ ক'রে আমার সামনে থেকে উঠে গেল।

বিকেলে কিন্তু ওকে আমার কাছেই আসতে হ'ল আবার। নিকটে নকাশিপাড়া গাঁয়ে একটা যাত্রার দল ছিল, তাদের অধিকারী এসে উদ্ধব দাসকে বলে—বাবাজী, তিন মাস ব'সে আছি, বায়না-পত্তর একদম বন্ধ। দল তো আর চলে না। কাল্‌না থেকে ভাল বাজিয়ে এনেছিলাম—ঢোলকে যখন হাত দেবে, আঃ, যেন মেঘ ডাকচে, বাবাজী! তা আপনাদের আখড়ায় এক দিন শ্যামসুন্দরজীউকে শুনিয়ে দিই। কিছু খরচ দিতে হবে না, তেল তামাক আর কিছু জলখাবার—

—জলখাবার-টাবার হবে না পাল-মশায়। তা ছাড়া আসর-খাটানো ওসব কে করে? এখন থাক্।

মালতী আমায় এসে বললে—উদ্ধব-জ্যাঠাকে বলুন, যাতে যাত্রাটা হয়। আমি জলখাবার দেব, জ্যাঠাকে সেজন্যে ভাবতে হবে না। আপনাকে কিন্তু আসরের ভার নিতে হবে।

আমি বললাম—আমার দ্বারা ওসব হবে না। আমি পারব না।

মালতী মিনতির সুরে বললে—লক্ষ্মীটি, নিতেই হবে। যাত্রা যে আমি কতকাল শুনি নি! দেশের দলটা উৎসাহ না পেলে নষ্ট হয়ে যাবে। আপনি আসরের ভার নিলেই আমি ওদের ব'লে পাঠাই।

—না, আমি পারবো না, সোজা কথা। তুমি ওবেলা ও-রকম রাগ ক'রে চলে গেলে কেন?

—তাই রাগ হয়েছে বুঝি? কথায় কথায় রাগ।

—রাগ জিনিসটা তোমার একচেটে যে! আর কারও কি রাগ হ'তে আছে?

—আচ্ছা, আমি আর কখনও ও-রকম করব না। আপনি বলুন ওদের, কেমন তো?

যাত্রা হয়ে গেল—মালতী ওদের ছানা খাওয়ালে পেট ভ'রে। বললে—বাবা রাস্তা থেকে লোক ডেকে এনে খাওয়াতেন আর আমরা মুখ ফুটে যারা খেতে চাইছে, তাদের খাওয়াব না? দলে ছোট ছোট ছেলেরা আছে, রাগ জেগে চেঁচিয়ে শুধু-মুখে ফিরে যাবে, এ কখনও হয়?

মালতী অনেক বৈষ্ণব-গ্রন্থ পড়েছে। সময় পেলেই বিকেলে আমার কাছে বই নিয়ে আসে, দু'জনে পুকুরপাড়ে গাছের ছায়ায় গিয়ে বসি। আমার হয়েছে কি, সব সময় ওকে পেতে ইচ্ছে করে, নানা কথাবার্ত্তার ছল-ছুতোয় ওকে বেশীক্ষণ কাছে রাখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু বিকেলের দিকে ছাড়া সারাদিন ওর দেখা পাওয়া ভার। ওর কাছে বুদ্ধের কথা বলি, সেণ্ট্ ফ্রান্সিসের কথা বলি। ও আমাকে শ্রীচৈতন্যের কথা, শ্রীকৃষ্ণের কথা শোনায়।

এক দিন হঠাৎ আবিষ্কার করা গেল মালতী বই লেখে। কি কাজে পুকুরের ঘাটে গিয়েছি দুপুরের পরে, দেখি বাঁধানো সিঁড়ির ওপর জামগাছের ছায়ায় একখানা খাতা পড়ে আছে—পাশেই দোয়াত কলম—খাতাখানা উল্টে দেখি মালতীর হাতের লেখা। এখানে ব'সে লিখতে লিখতে হঠাৎ উঠে গিয়েছে। অত্যন্ত কৌতূহল হ'ল—না দেখে পারলাম না, প্রথমেই ওর গোটা গোটা মুক্তার ছাঁদে একটা সংস্কৃত শ্লোক লেখা :—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ

*　　*　　*

সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ

তার পরে রাধাকৃষ্ণের লীলা-বর্ণনা, বৃন্দাবনের প্রকৃতি বর্ণনা মাঝে মাঝে। খাতার ওপরে লেখা আছে—"পাষণ্ডদলন-গ্রন্থের অনুকরণে লিখিত।"

দেখছি এমন সময় মালতী কোথা থেকে ফিরে এসে আমার হাতে খাতা দেখে মহাব্যস্ত হয়ে বললে—ও কি? ও দেখছেন কেন? দিন আমার খাতা—

আমি অপ্রতিভ হয়ে বললাম—এইখানে পড়ে ছিল, তাই দেখছিলাম কার খাতা—

—না, দিন—ও দেখবার জো নেই।

—যখন দেখে ফেলেছি তখন তার চারা নেই। কে জানতো তুমি কবি! এ শ্লোকটা কিসের?

মালতী সলজ্জ সুরে বললে—চৈতন্যচরিতামৃতের। কেন দেখছেন, দিন—

—শোনো মালতী—লিখেছ এ বেশ ভাল কথাই। কিন্তু তোমার এ লেখা সেকেলে ধরনের। পাষণ্ডদলনের অনুকরণে বই লিখলে একালে কে পড়বে? তুমি আজকালকার কবিতার বই কিছু পড় নি বোধ হয়?

মালতী আগ্রহের সুরে বললে—কোথায় পাওয়া যায়, আমায় দেবেন আনিয়ে! আমি তো জানি নে আজকালকার কবিতার কি বই আছে—আনিয়ে দেবেন। আমি দাম দেবো।

দাম দেওয়ার কথা বলাতে আমার মনে ঘা লাগল। মালতী কাছে থেকেও যেন দূরে। বড় অদ্ভুত ধরনের মেয়ে, ও একালেরও নয়, সেকালেরও নয়। এই পাড়াগাঁয়ে মানুষ হয়েছে, যেখানে কোন আধুনিকতার ঢেউ এসে পৌঁছয় নি, কিন্তু বুদ্ধিমতী এমন যে আধুনিকতাকে বুঝতে ওর দেরি হয় না। এমন সুন্দর চা করে, শ্রীরামপুরের শৈলদিরা অমন চা করতে পারত না। নিজে মাছমাংস খায় না কিন্তু আমার জন্যে এক দিন মাংস রাঁধলে রান্নাঘরের উনুনেই। আমায় প্রায়ই বলে—আপনার যখন যা খেতে ইচ্ছে হবে বলবেন। আপনি তো আর বৈষ্ণব হন নি যে মাছমাংস খাবেন না! আমায় বলবেন, আমি রেঁধে দেব এখন।

মালতী উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী বটে, কিন্তু বেশ সুশ্রী। ওর টান ক'রে বাঁধা চুল ও ছেলেমানুষের মত মুখশ্রীর একটা নবীন, সতেজ সুকুমার লাবণ্য—বিশেষ ক'রে যখন মুখে ওর বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দেয়, কিংবা একটা অদ্ভুত ভঙ্গীতে মুখ উঁচু ক'রে হাসে—তখন সে বিজয়িনী, তখন সে পুরুষের সমস্ত দেহ, আত্মাকে সুন্দরী মৎস্যনারীর মত মুগ্ধ ক'রে কূলের কাছের অগভীর জল থেকে টেনে বহুদূরের অথৈ জলে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু ওর সে-রূপ যখন-তখন দেখা যায় না। কালেভদ্রে দৈবাৎ হয়ত একবার চোখে পড়তে পারে। আমি একবার মাত্র দেখছিলুম।

সেদিন সন্ধ্যার পরে সারাদিন খররৌদ্র ও গুমটের পরে উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে মেঘ উঠে সারা আকাশ জুড়ে ফেললে এবং হঠাৎ ভীষণ ঝড় উঠল। আখড়ার বাইরের মাঠে কাঠ, ধান, ছোলা, তুলো সব রোদে দেওয়া ছিল। কেউ তোলে নি, আখড়ায় আবার ঠিক সেই সন্ধ্যার সময়টাতে লোকজন কেউ নেই। আমিও ছিলাম না। মাঠের মধ্যে বেড়াচ্ছিলাম—ঝড় উঠতেই ছুটে এসে দেখি মালতী একা মহাব্যস্ত অবস্থায় জিনিসপত্র তুলছে। আমায় দেখে বললে—দৌড়ে আলোটা জ্বেলে আনুন, অন্ধকারে কিছু কি ছাই টের পাচ্ছি—সব উড়ে গেল—

সঙ্গে সঙ্গে এল বৃষ্টি ··

ওকে দেখলাম নতুন চোখে। কোমরে কাপড় জড়িয়ে সে একবার এখানে একবার ওখানে বিদ্যুতের বেগে ছুটোছুটি করতে লাগল—অদ্ভুত কাজ করবার শক্তি—দেখতে দেখতে সেই ঘোর অন্ধকার আর ঝড়বৃষ্টির মধ্যে ক্ষিপ্র নিপুণতার সঙ্গে অর্দ্ধেক জিনিস তুলে দাওয়ায় নিয়ে এসে ফেললে। এদিকে আমি অন্ধকারে দেশলাই খুঁজে পাচ্ছি নে দেখে ছুটে এসে বললে—কোথায় দেশলাই রেখেছিলেন মনে আছে? কোথা থেকে হাতড়ে দেশলাই বার করলে—তার পরে সেই ঝড়ের ঝাপটার মধ্যে আলো জ্বালা—সে এক কাণ্ড! অন্ধকারে দুজনে মিলে অনেক চেষ্টার পরে শেষে ওরই ক্ষিপ্রতা ও কৌশলে আলো জ্বলল।

আলো জ্বেলে আমার হাতে দেশলাই দিয়ে আমার মুখের অসহায় ভঙ্গীর দিকে চেয়ে গলা কেমন এক ধরনের উঁচু ক'রে হেসে উঠল—ছুটোছুটির ফলে কানের পাশের চুল আলুথালু হয়ে মুখের দু-পাশে পড়েছে, ফুল্ল শ্রমোজ্জ্বল গণ্ডদেশে বিন্দু বিন্দু ঘাম। চোখে উজ্জ্বল কৌতুকের হাসি—দুজনে মিলে আলো ধরাচ্ছি, ওর মুখ আমার মুখের অত্যন্ত কাছে—সেই মুহূর্ত্তে আমি ওর দিকে চাইলাম—আমার মনে হ'ল মালতীকে এতদিন ঠিক দেখি নি, আমি ওকে নতুন রূপে দেখলাম, ওর বিজয়িনী নারী রূপে। মনে হ'ল মালতী সত্যিই সুন্দরী, অপূর্ব্ব সুন্দরী। —কিন্তু বেশীক্ষণ দেখার অবকাশ পেলাম না ওর সে রূপ। আলো জ্বেলেই ও আবার ছুটল এবং আমার আনাড়ি-সাহায্যের অপেক্ষা না ক'রেই বাকী জিনিস আধ-ভেজা, আধ-শুকনো অবস্থায় অল্প সময়ের মধ্যে দাওয়ায় এনে জড় করলে।···

এক দিন পুকুরে সকালের দিকে ঘড়া বুকে দিয়ে সাঁতার দিতে দিতে মালতী গিয়ে পড়েছে গভীর জলে। সেই সময় আমিও জলে নেমেছি। আমি জানতাম না যে ও এ-সময়ে নাইতে এসেছে, কারণ সাধারণতঃ ও স্নান করে অনেক বেলায়, আখড়ার কাজকর্ম্ম মিটিয়ে। নাইতে নাইতে একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনে চেয়ে দেখি মালতী নেই, তার ঘড়াও নেই। আমি প্রথমে ভাবলাম মাঝপুকুরে ইচ্ছে ক'রে ডুব দিয়েছে বোধ হয়। বিশেষতঃ সে সাঁতার জানে—কিন্তু খানিক পরে যখন ও উঠল না, তখন আমার ভয় হ'ল, আমি তাড়াতাড়ি সেখানটাতে সাঁতার দিয়ে গেলাম, হাতড়ে দেখি মালতী নেই, ডুব দিয়ে এদিক-ওদিক খুঁজতে খুঁজতে ওকে পেলাম—চুলে কাপড় জড়িয়ে গিয়েছে কেমন বেকায়দায়, অতি কষ্টে তাকে ভাসিয়ে নিজে ডুবে জল

খেতে খেতে ডাঙার কাছে নিয়ে এলুম। মালতী তখন অর্দ্ধ-অচৈতন্য, আমার ডাক শুনে আখড়া থেকে সবাই ছুটে এল—মিনিট পাঁচ-ছয় পরে ওর শরীর সুস্থ হ'ল। উদ্ধব বাবাজী বকলে, আমি বকলাম, সবাই বকলে।

এই দিনটা থেকে ওর ওপর আমার একটা কি যেন মায়া পড়ে গেল। সেদিন সন্ধ্যাবেলা কেবলই মনে হতে লাগল ও এখানে নিঃসহায়, একেবারে একা। ও সবার জন্যে খেটে মরে। ওর বাপের ধানের জমির উপস্বত্ব আখড়াসুদ্ধ বৈষ্ণব বাবাজীরা ভোগ করছে, কিন্তু ওর মুখের দিকে চাইবার কেউ নেই। ও সকলের ময়লা জামাকাপড় কেচে বেড়াবে, ভাত রেঁধে খাওয়াবে—সর্ব্বরকমে সেবা করবে, ওকে ছেলেমানুষ পেয়ে সবাই ওকে মুখের মিষ্টি তোষামোদে নাচিয়ে নিজেদের স্বার্থ ষোল আনার ওপর সতের আনা বজায় রাখছে, কিন্তু ওর সুখদুঃখ কেউ দেখছে? এই যে আজ পুকুরের ঘাটে ডুবে মরে যাচ্ছিল আর একটু হলে—আমি যদি না থাকতাম!

ভগবান আমাকে এ কিসের মধ্যে এনে ফেললেন, এ কি জালে দিন-দিন জড়িয়ে পড়ছি আমি! এদের আখড়াতে যে বিগ্রহ আছেন, তাঁকে এরা মানুষের মত সেবা করে। সকালবেলা তাঁকে বাল্যভোগ দেওয়া হয়, দুপুরের ভোগ তো আছেই। ভোগের পর দুপুরে বিগ্রহকে খাটে শুইয়ে মশারি টাঙিয়ে দেওয়া হয়। বৈকালে বৈকালিক ভোগ দেওয়া হয়—ফল, মিষ্টান্ন। রাত্রে আবার খাটে শুইয়ে মশারি টাঙিয়ে দেয়—শীতের রাত্রে বিগ্রহের গায়ে লেপ, আশেপাশে বালিশ। উদ্ধবদাস বাবাজী সেদিন লাল শালু কাপড়ের ভাল লেপ করে এনেচে বিগ্রহের ব্যবহারের জন্যে—আগের লেপটা অব্যবহার্য্য হয়ে গিয়েছিল।

এ-সব পুতুল-খেলা দেখলে আমার হাসি পায়। সেদিন সন্ধ্যার সময় একা পেয়ে মালতীকে বললাম—তোমাদের এতদিন হুঁশ ছিল না মালতী? ছেঁড়া লেপটা এই শীতে কি বলে দিতে ঠাকুরকে? যদি অসুখ-বিসুখ হ'ত, এই তেপান্তরের মাঠে না ডাক্তার, না কবিরাজ, দেখত কে তখন? ছিঃ ছিঃ, কি কাণ্ড তোমাদের?

মালতী রাগে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল। ও এ-সব কথা আর কাউকে ব'লে দেয় না ভাগ্যে, নইলে উদ্ধবদাস আখড়া থেকে আমায় বিদেয় দিতে এক বেলাও দেরি করত না। অনেক কথা আমি বলি ওদের আখড়া সম্বন্ধে, উদ্ধবদাস সম্বন্ধে—যা অপরের কানে উঠলে আমায় অপমানিত হয়ে বিদায় হ'তে হ'ত, কিন্তু মালতী কোন কথা প্রকাশ করে নি কোনদিন। আজকাল মালতী আমার দিকে একটু টেনে চলে বলে সেটা অনেকের চক্ষুশূলের ব্যাপার হয়ে উঠেছে—আমি তা বুঝি।

॥ ১৩ ॥

শ্রাবণ মাসের প্রথমে আমার পাঠশালা গেল উঠে। আর আমার এখানে শুধু-হাতে থাকা অসম্ভব। মালতীকে একদিন বললাম—শোন, আমি চলে যাচ্ছি মালতী—

সে অবাক হয়ে বললে—কেন চলে যাবেন?

—কতদিন এসেছি ভাবো তো এখানে? প্রায় দশ মাস হ'ল—

মালতী চুপ ক'রে থেকে বললে—ঘুরে আবার আসবেন কবে?

—ভগবান জানেন। না-ও আসতে পারি।

মালতীর মুখের স্বাভাবিক হাসি-হাসি ভাবটা যেন হঠাৎ নিবে গেল। বললে—কেন আসবেন না? আখড়ার কত কাজ বাকি আছে মনে নেই?

ওর মুখ দেখে আমার আবার মনে হ'ল,—ওর কেউ নেই, এখানে ও একেবারে একা। ওকে বুঝবার মানুষ এই গ্রাম্য অশিক্ষিত বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের মধ্যে কে আছে? আমার কাছেই ওর যা-কিছু অভিমান আবদার খাটে—ওর মধ্যে যে লীলাময়ী কিশোরী আছে, সে তার নারীত্বের দর্প, গর্ব্ব ও অভিমান প্রকাশ ক'রে সুখ পায় একমাত্র আমার কাছে—আমি তা জানি। তা ছাড়া, ও এখনও বালিকা, ওর ওপর আমার মনে কি যে একটা অনুকম্পা জাগে···ওকে সকল দুঃখ, বিপদ থেকে আড়াল ক'রে রাখি ইচ্ছা হয়। শ্রাবণ মাসে নীল মেঘের রাশি দ্বারবাসিনীর চারিধারের দিগন্তবিস্তৃত তালীবন-শোভা মাঠের ওপর দিয়ে উড়ে যায় রোজ···আমি দীঘির ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি, দেখে দেখে মনে কত কি অনির্দ্দিষ্ট অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষা জাগে—মনে হয় ছোট্ট কোন কলস্বনা গ্রাম্য নদীতীরে খড়ের ঘরে মালতীকে নিয়ে ছোট্ট সংসার পাতবো···আমরা দুজনে এমনি সব বর্ষা-মেদুর শ্রাবণ-দিনে ব'সে ব'সে কত কথা বলব, কত আলোচনা করব। ওকে রাঁধতে দেব না, কাজ করতে দেব না, আমার কাছ থেকে উঠতে দেব না—কত বিশ্বাসের কথা, ভক্তির কথা, জ্ঞানের কথা, সাধু-মোহন্তের কথা, আকাশের তারাদের কথা—ও আমায় বোঝাবে, আমি ওকে বোঝাবো।···কিন্তু তা হবার নয়। মালতী ওর বাপের আখড়া ছেড়ে কোথাও যেতে পারবে না—আমি অনেকবার ঘুরিয়ে প্রশ্ন ক'রে ওর মনের এ ইচ্ছা বুঝেছি। আমি ওকে চাই একান্ত আমার নিজস্ব-ভাবে—এখানে থাকলে ও দিনে রাতে কাজে এত ব্যস্ত থাকে যে ওকে সে-ভাবে পাওয়া অসম্ভব। এই আখড়াই হয়েছে ওর আর আমার মধ্যে ব্যবধান। আমি এখান থেকে ওকে নিয়ে যেতে চাই। আমিও এখানে থাকতে পারব না চিরকাল। মালতীকে ভালবাসি, কিন্তু ওকে বিবাহ ক'রে এই রাঢ়-অঞ্চলের এক গ্রাম্য আখড়ায় চিরকাল কি ক'রে কাটাবো বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী সেজে? আমি ওকে নিয়ে যাব এখান থেকে।

এক দিনের ব্যাপারে মালতীকে আরও ভাল ক'রে চিনলুম। দ্বারবাসিনী গ্রামের বৃদ্ধ শম্ভু বাঁড়ুয্যে চার-পাঁচ দিনের জ্বরে মারা গেলেন। তিনি এখানকার সমাজের কাছে একঘরে ছিলেন—এটা আমি আগেই জানতাম। তাঁর একমাত্র বিধবা কন্যাকে নিয়ে কি-সব কথা নাকি উঠেছিল—তাই থেকে গ্রামে শম্ভু বাঁড়ুয্যে একঘরে হন। শম্ভু বাঁড়ুয্যে কোথাও যেতেন না, কারও সঙ্গে মিশতেন না, তাঁর হাতেও দু-পয়সা ছিল—সবাই বলত টাকার গুমর।

বেলা পাঁচটার সময় মালতী এসে বললে—শুনেছেন ব্যাপার? শম্ভু বাঁড়ুয্যেকে এখনও বের করা হয় নি—আমি এতক্ষণ ছিলাম সেখানে। সেই দুপুর থেকে একজন লোকও ওদের বাড়ির উঠোন মাড়ায় নি। মড়া কোলে মেয়েটা দুপুর থেকে ব'সে আছে—ওর মা তো বাতে পঙ্গু, উঠতে পারে না। আপনি আসুন, দু-জনে মড়া তো দোতলা থেকে নামাই—তার পর উদ্ধব-জ্যাঠাকে বলেছি আখড়ার লোকজন নিয়ে আমাদের সঙ্গে যাবে—ব্রাহ্মণের মড়া অপর জাতে ছুঁলে ওদের কষ্ট হবে—তাই চলুন আপনি আর আমি আগে নামাই—তার পর আমাদেরই নিয়ে যেতে হবে অজয়ের ধারে—পারবেন তো?

তিনজনে ধরাধরি ক'রে সেই ঘোরানো ও সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে মড়া নামানো—ওঃ, সে এক কাণ্ড আর কি! মালতী আর শম্ভু বাঁড়ুয্যের মেয়ে নীরদা এক দিকে—আমি অন্য দিকে। নীরদা দেখলুম খুব শক্ত মেয়ে—বয়সে মালতীর চেয়ে বড়—বছর বাইশ হবে ওর বয়েস, মালতীর মত মেয়েলী গড়নের মেয়ে নয়, শক্ত, জোয়ালো হাত-পা, একটু পুরুষ-ধরনের; মালতী খুব

ছুটোছুটি করতে পারে বটে, কিন্তু ওর গায়ে তেমন শক্তি নেই। নীরদার সাহায্য না পেলে সেদিন শুধু মালতীকে দিয়ে মড়া নামানো সম্ভব হ'ত ব'লে মনে হয় না। শেষ পর্য্যন্ত গাঁয়ের লোক এল এবং তারাই মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে গেল। আমিও সঙ্গে গেলুম, মেয়েদের যেতে হ'ল না, মালতী রইল নীরদার কাছে। নীরদা আমায় বললে—দাদা, শ্রাদ্ধের সময় কিন্তু আপনাকে সব ভার নিতে হবে। আর কারও হাতে দিয়ে আমার বিশ্বাস হবে না। রুণি তো আছেই, আপনাকে অন্য কিছু খাটাবো না, ভাঁড়ারের ভার আপনাকে হাতে নিতে হবে, নইলে এ-সব পাড়াগাঁয়ের ব্যাপার আপনি জানেন না।

বেশ ঘটা ক'রেই শ্রাদ্ধ হ'ল। মালতী বুক দিয়ে পড়ে কি খাটুনিটাই খাটলে! মালতী, তুমি আমার চোখ খুলে দিলে। ঘুম নেই, নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, বসা নেই—কিসে কাজ সর্বাঙ্গসুন্দর হবে, কেউ নিন্দে করবে না ওদের, কোন জিনিস অপচয় না হয় ওদের, সে-ই একমাত্র লক্ষ্য। পরের কাজে এমনি ক'রে নিজেকে ঢেলে দিতে তুমি পার তোমার বাবার রক্ত তোমার গায়ে বইছে বলে।

নীরদাকেও চিনলুম সেদিন।

রাত দশটা। রান্নাঘরের দরজার কাছে শূন্য ডালের গামলা, লুচির ধামা, ডাল্‌নার বাল্‌তির মধ্যে নীরদা দাঁড়িয়ে আছে। সারাদিন কি খাটুনিই খেটেছে সে! চর্‌কির পাক ঘুরেছে মালতীর সঙ্গে সমানে সেই সকাল থেকে—এর মধ্যে আবার পীড়িতা মায়ের দেখাশুনা করেছে ওপরে গিয়ে। ঘামে ও শ্রমে মুখ রাঙা, (নীরদার রং বেশ ফর্সা) চুল আলুথালু হয়ে মুখের পাশে কপালে পড়েছে।

আমি বাইরের ক-জন লোককে খাওয়াব ব'লে কি আছে না-আছে দেখতে রান্নাঘরে ঢুকেছি। নীরদা বললে—দাদা, কিছু নেই আর ; ক-জন লোক ? আচ্ছা দাঁড়ান, ময়দা মাখছি, দিচ্ছি ভেজে।

আমি বললুম—আর তুমি আগুনের তাতে যেও না নীরদা। তোমার চেহারা যা হয়েছে ! আচ্ছা দাঁড়াও—মালতীকে বলি একটু মিছরির শরবৎ তোমায় বরং দিতে—

নীরদা বললে—দাঁড়ান, দাঁড়ান দাদা। রুণি কতবার খাওয়াতে এসেছিল—সে কি চুপ ক'রে থাকবার মেয়ে ?

তারপর হেসে বললে—আজ যে একাদশী, দাদা।

আমার চোখে জল এল। আর কিছু বললাম না। মেয়েমানুষের মত সহ্য করতে পারে কোন্ জাত ? অনেক শিখলাম এদের কাছে এই ক-মাসে।

মাকে দেখেছি, বৌদিদিকে দেখেছি, সীতাকে দেখেছি, শৈলদিকে দেখেছি, এদেরও দেখলাম। অথচ এই নীরদাকে ভেবেছিলুম অশিক্ষিতা গ্রাম্য মেয়ে, ওর কথাবার্তায় রাঢ় দেশের টান বড় বেশী ব'লে।

মালতী আখড়ায় ফিরে এসে আমায় বললে—অনেকগুলো সন্দেশ এনেছি, খান—নীরদা-দিদি জোর ক'রে দিলে। ভাল সন্দেশ, দ্বারবাসিনীতে এ-রকম করতে পারে না, সিউড়ি থেকে আনানো।

তার পর কেমন এক ধরনের ভঙ্গি ক'রে হাসতে হাসতে বললে—বসুন, ঠাঁই ক'রে দিই আপনাকে। ও-বেলার লুচি আছে, দই আছে,—নীরদাদিদি একরাশ খাবার দিয়েছে বেঁধে—

ওকে এত ছেলেমানুষ মনে হয় এই-সব সময়ে !

ঘরে কেউ নেই, নিঃসঙ্কোচে আমার কাছে ব'সে ও আমায় খাওয়ালে—খেতে খেতে একবার ওর মুখের দিকে চাইলাম। কি অপূর্ব্ব স্নেহ-মমতামাখা দৃষ্টি ওর চোখে! মালতীর কাছে এত ঘনিষ্ঠ যত্ন এই কিন্তু প্রথম। বললে—আমি কি আর দেখি নি যে আজ সারাদিন আপনি শুধু খেটেছেন আর পরিবেশন করেছেন, খাওয়া যা হয়েছিল ও-বেলায় আপনার, তার আমি সন্ধান রাখি নি ভেবেছেন? খান,—না—ও লুচি ক-খানা খেতেই হবে।

খাবো কি, লুচি গলায় আটকে যেতে লাগল—সে কি অপূর্ব্ব উল্লাস, আমার সারাদেহে কিসের যেন শিহরণ! আজ সারাদিনের ভূতগত খাটুনির মধ্যেও মালতী দৃষ্টি রেখেছিল আমি কি খেয়েছি না-খেয়েছি তার ওপর!

ঘন বর্ষা নামল। সারা মাঠ আঁধার ক'রে মেঘ ঝুপ্‌সি হয়ে উপুড় হয়ে আছে। এইসব দিনে মালতীকে সর্ব্বদা কাছে পেতে ইচ্ছে করে—ইচ্ছে করে ঘরের কোণে বসে ওর সঙ্গে সারা দিনমান বাজে বকি। কিন্তু ও আসে না, এমনই সব বর্ষার দিনে আখড়ার যত সব খুচরো কাজে ও ব্যস্ত থাকে।

দু-একবার যখন দেখা হয় তখন বলি—মালতী, আস না কেন?

মালতী বলে সে আসবে। তার পর এক ঘণ্টা, দু ঘণ্টা কেটে যায়, ও আসে না। আমার রাগ হয়, অভিমান হয়। ও যদি আমার জন্যে একটুও ভাবত, তাহ'লে কি আর না এসে পারত? ওর কাছে কাজই বড়, আমি কেউ নই। কিন্তু হয়ত অপ্রত্যাশিত ভাবে হঠাৎ মালতী এসে পড়ে। প্রায়ই বিকেলের দিকে, এমন কি সন্ধ্যার সময়। চুলটি টান-টান ক'রে বেঁধে, পান খেয়ে ফুল্ল ওষ্ঠাধর রাঙা ক'রে হাসিমুখে আমার দাওয়ার সামনে এসে বলে—কি করছেন?

—এস মালতী, সারাদিন দেখি নি যে?

—আপনার কেবল—সারাদিন দেখি নি, আর, এই তখন ডাকলুম এলে না কেন, আর, কেন আস না—এই-সব বাজে কথা। আসি কখন? দেখছেন তো। খেয়ে উঠেছি এই তো ঘণ্টাখানেক আগে। কাজ ছিল।

—কি কাজ ছিল আমি আর জানিনে মালতী? উদ্ধব-বাবাজীর কোণের ঘরে মেঝেতে চাটাই পেতে ব'সে তোমার সেই কবিতার বই লিখছিলে—আমি দেখি নি বুঝি?

—বেশ, দেখেছেন তো দেখেছেন। আসুন বিষ্ণুমন্দিরে সন্দে দেখিয়ে আসি—একা ভয় করে।

বাস্তবিকই আমি ওকে একমনে বই লিখতে দেখেছিলাম। প্রায়ই দেখি। মালতী ঠিক পাগল, আচ্ছা, পাষণ্ডদলনের অনুকরণে লেখা ওর বই কে পড়বে যে রাত নেই দিন নেই বই লিখছে! ওর মুখ দেখলে আমার কষ্ট হয়। ওই এক খেয়াল ওর। মালতীর সঙ্গে বিষ্ণুমন্দিরে গেলাম। মালতীর এই এক গুণ, ও যখন মেশে তখন মেশে নিঃসঙ্কোচে, উদার ভাবে। সে-সম্বন্ধে কোনো বাধা বা সংস্কার ও মানে না। কেন এই সন্ধ্যাতে আমার সঙ্গে একা যাবে পুকুরপাড়ের বিষ্ণুমন্দিরে—এ-সব নিয়ে সঙ্কোচ নেই ওর। মন্দিরের পথে যেতে যেতে মনে হ'ল মালতীকে পেয়ে আমার এই বর্ষাসন্ধ্যাটি সার্থক হ'ল। ওকে ছেড়ে আর কিছু চাই নে। কাঞ্চনফুলতলায় গিয়ে বললাম—সেই গানটা গাও না, সেদিন গাইছিলে গুনগুন করে!

মালতী ছেলেমানুষের মত ভঙ্গিতে বললে—উদ্ধব-জ্যাঠা যে শুনতে পাবেন?

—তা পাবেন, পাবেন।

—তবে আসুন পুকুরের ঘাটে গিয়ে বসি।

মালতীর মুখে গানটা বেশ লাগে—দু-তিনবার শুনলাম।

আমার নয়নে কৃষ্ণ নয়নতারা হৃদয়ে মোর রাধা-প্যারী
আমার বুকের কোমল ছায়ায় লুকিয়ে খেলে বনবিহারী।

গান শেষ হ'লে বললাম—শোন একটা কথা বলি মালতী, তুমি আস না কেন? তোমাকে না দেখলে আমার বড় কষ্ট হয়। আজ সারাদিন বসেছিলুম ঘরের দাওয়াতে, এমন বর্ষা গেল—তুমি চৌষট্টিবার আমার ঘরের সামনে দিয়ে যাও, একবার তো এলে পারতে? তোমার সে-সব নেই। শুধু কাজ আর কাজ। এই যে তোমাকে পেয়েছি, আর আমার যেন সব ভুল হয়ে গিয়েছে—সত্যি বলছি মালতী।

মালতী মুখ নীচু ক'রে হাসি-হাসি মুখে চুপ ক'রে রইল।

আমি বললাম—হাসলে চলবে না মালতী। কথার আমার উত্তর দাও। তুমি কি ভাবো আমি তোমাদের এখানে পড়ে আছি খেতে পাই নে বলে তাই? তা নয়।

—কে বলেছে আপনাকে যে না খেতে পেয়ে এখানে আছেন? আমি আপনাকে বলেছি নাকি?

—যাক ওসব বাজে কথা। আমার কথার উত্তর দাও।

মালতী আবার ছেলেমানুষি আরম্ভ করল। মুখ নীচু ক'রে হাঁটুর কাছে ঠেকিয়ে মৃদু মৃদু হাসিমুখে হাত দিয়ে শানের ওপর কি আঁকজোক কাটতে লাগল, কখনই ওর কাছে আমার কথার সোজা জবাব পেলাম না।

এক দিন বেড়াতে গিয়ে বাঁধের ওপর ব'সে আমার অবস্থাটা ভেবে দেখলুম। আমি এমন জড়িয়ে পড়েছি যে নড়বার সাধ্য নেই এতটুকু। ও আমার সব কিছু ভুলিয়ে দিয়েছে—যে উদ্দেশ্যে এই দু-বছর পথে পথে ঘুরেছি সে উদ্দেশ্য এখন হয়ে পড়েছে গৌণ। এখন মালতীই সব, মালতীই আমার বিশ্বের কেন্দ্র, ও যখন আসে তখন জীবনে আর কিছু চাইবার থাকে না, ও যেদিন আসে, যেদিন হেসে কথা বলে—আমার মত সুখী লোক সেদিন জগতে আর কেউ থাকে না, মাঠের ওপর সূর্য্যাস্ত সেদিন নতুন রঙে রঙীন হয়, বিচালি-বোঝাই গাড়িগুলো দ্বারবাসিনীর হাটের দিকে যায়, তাদের চাকার শব্দও ভাল লাগে, আখড়ার বাবাজীরা নিম-গাছে উঠে নিমপাতা পাড়ে—সে-ই যেন এক নতুন দৃশ্য। মালতী যেদিন আসে না, কি ভাল ক'রে কথা বলে না, সারাদিন আমার মনে শান্তি থাকে না, ওরই কথা ভাবি সারাক্ষণ—কতক্ষণে দেখা হবে, কতক্ষণে কথা বলবো। মালতী আমায় এমন জালেও জড়িয়ে ফেলেছে!

হয়ত আমি এখান থেকে যেতাম না—হয়ত শেষ পর্য্যন্ত থেকেই যেতে হ'ত—কিন্তু যেদিন মালতী আমার কাছে ব'সে পুকুরঘাটে গান গাইলে তার পরদিনই দুপুরের পরে উদ্ধব-বাবাজী আমায় ডেকে বললে—একটা কথা বলি আপনাকে—কিছু মনে করবেন না। আপনার এখানে অনেক দিন হয়ে গেল, আমাদের আখড়ার নিয়ম অনুসারে তিন দিন মাত্র এখানে অতিথ্-বোষ্টমের থাকবার কথা। আপনার প্রায় এগারো মাস হ'ল—

আমি চুপ ক'রে বসে রইলাম, কারণ ওর মুখ দেখেই আমার মনে হ'ল এটা কথার ভূমিকা—আসল কথাটা এখনও বলে নি। ঘটলও তাই। একটু ইতস্ততঃ ক'রে উদ্ধব বললে—তাতেও কিছু না—কি জানেন, আপনার ভগ্নির সঙ্গে এই মেলামেশাটা ভাল দেখাচ্ছে না। আপনার কাছে ব'সে পুকুরঘাটে বিকেলে ও গান গেয়েছিল—একথা নিয়ে সবাই—বুঝলেন না, মেয়ে-মানুষের নামে দুর্নাম রটতে দেরি লাগে না। আমি ওর অভিভাবক—এসব যাতে না হয়

আমার দেখা উচিত ব'লেই আপনাকে জানাচ্ছি এ-কথা। রুণি-মা সেরকম মেয়ে নয়। আমি সেটা খুবই জানি, কিন্তু লোকে তো—রাগ করবেন না, ভেবে দেখুন। লোকে যদি ওর নামে পাঁচটা কথা ওঠায় বা বলে—সেটা আমার উচিত হতে না দেওয়া—নয় কি?

আমি বললাম—সেটা আমার অন্যায় হয়েছে স্বীকার করি। কিন্তু আমি ওকে বিয়ে করতে চাই; আপনি তো বলেছিলেন, মালতীর যদি ইচ্ছা হয়—ওর বাবার ওর ওপর আদেশ আছে—

—কিন্তু ওর বাবা কণ্ঠীধারী বৈষ্ণব ছিলেন—আপনি ব্রাহ্মণ বটে, বৈষ্ণব নন, তার ওপর আপনি খৃষ্টানী মতের লোক, আপনার সঙ্গে কি ক'রে ওর বিয়ে হ'তে পারে? ও বৈষ্ণবের মেয়ে, বৈষ্ণবের সঙ্গেই ওর বিয়ে হবে। তবে মালতীর এতে কি ইচ্ছে জানুন, সে যদি বলে, আমার আপত্তি নেই। ওর বাবা ওরই ওপর সে ভার দিয়েছিলেন।

সেদিনই সন্ধ্যার সময় ওকে নির্জ্জনে পেলাম। ওকে বললাম—একটা কথা বলব মালতী? তুমি অভয় দেবে?

মালতী কৌতুকের সুরে বললে—উঃ মাগো—যাত্রার দলের মত কথা শুনে আর বাঁচি নে। কি বলবেন বলুন না?

—তুমি কি চিরকাল এই ভাবে জীবন কাটাবে? না, হাসিখুশী না—দরকারী কথা। সবতাতেই হাস কেন—ভেবে দেখ আমি কি বলছি—

—কেন এ জায়গা কি খারাপ? এমন চমৎকার মাঠ, দীঘি—আপনি সেদিন কি কবিতাটা বলছিলেন—

মালতী কথা শেষ না ক'রেই ছেলেমানুষি হাসি শুরু করলে। আমি বললাম—না মালতী, লক্ষ্মীটি ওভাবে কথা উড়িয়ে দিও না। আমি তোমায় চাই। তোমায় বিয়ে ক'রে এখান থেকে নিয়ে যেতে চাই। কি বল তুমি?

মালতীর মুখের হাসি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল—সে কেমন বিস্ময়বিহ্বল-দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলে—তার পরেই তার মুখেচোখে ঘনিয়ে এল লজ্জা। ওর এ ধরনের লজ্জা আমি কখনও দেখি নি।

বেশ খানিকক্ষণ কেটে গেল। মালতীর মুখে উত্তর নেই। বললাম—ভেবে উত্তর দিও। এখুনি চাইনে তোমার উত্তর। তাড়াতাড়ি কিছু না বলাই ভাল।

মালতী এতক্ষণ মুখ নীচু ক'রে ছিল—এইবার মুখ তুলে কিন্তু অন্যদিকে চেয়ে বললে—কিন্তু এ জায়গা ছেড়ে যেতে হবে কেন?

—ছেড়ে যেতে হবে এই জন্যে মালতী যে, আমি তো তোমাকে এখানে আখড়ায় থাকতে দিতে পারব না। আমিও এখানে চিরদিন কাটাতে পারি নে।

মালতীর মুখের ভাবে আমার মনে হ'ল আমার মুখে এ-কথা যেন ওর পক্ষে অপ্রত্যাশিত। ও কি ভেবেছে আমিও চিরকাল এই আখড়াতেই থেকে যাব? ওর মুখ দেখে মনে হ'ল আমার এ কথায় ও মনে বেদনা পেয়েছে। আমি কথাটা যতদূর সম্ভব নরম করতে পারা যায় ক'রে বললাম—তুমি এখনও ছেলেমানুষ! নিজের সম্বন্ধে বিচার ক'রে দেখতে পাবার ক্ষমতা এখনও হয় নি। তুমি একা এখানে কি করবে বল? উদ্ধব-বাবাজীও চিরকাল থাকবেন না। এই মাঠের মধ্যে আখড়ায় চিরজীবন কাটাবে একা একা?

মালতী মুখ নীচু ক'রেই আস্তে আস্তে নরম সুরে বললে—বাবা মরণকালে এর ভার সঁপে দিয়েছিলেন উদ্ধব-জ্যাঠার ওপর নয়, আমারই ওপর। বাবার বিষ্ণুমন্দির আমার শেষ ক'রে

তুলতে হবে। উদ্ধব বাবাজী চিরদিন থাকবেন না বলেই তো আমার এখানে আরও থাকা দরকার। বাবার ধানের জমি পাঁচজনে লুটেপুটে খাবে অথচ আখড়ার দোর থেকে অতিথ্-বোষ্টম গরীব লোকে ফিরে যাবে খেতে না পেয়ে, এ আমি বেঁচে থেকে দেখতে পারব না। তাতে কোথাও গিয়ে আমার শান্তি হবে ?

মালতীর মুখে এ ধরনের গম্ভীর কথা—বিশেষ করে ওর নিজের জীবন নিয়ে—এই প্রথম শুনলাম। সব জিনিস নিয়ে ও হালকা হাসি-ঠাট্টা ক'রে উড়িয়ে দেয়, এই ওর স্বভাব। ও এ ধরনের কথা বলতে পারে তা আমি ভাবি নি। বললাম—মালতী, এটা কি তোমার মনের কথা ? জীবনটা এই ক'রে কাটাবে ? এতেই শান্তি পাবে ? আমি যে প্রস্তাব করেচি, তাতে তুমি ত্া'হলে রাজী নও ? কারণ আমি এখানে থাকতে পারব না চিরকাল এটা নিশ্চয়।

শেষ কথাটা বলতে আমার বুক বেদনায় টনটন ক'রে উঠল, তবুও বলতে হ'ল।

মালতী অনেকক্ষণ বিমুখী হয়ে ব'সে রইল। কাপড়ের একটা আঁচল পাকিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে ছেলেমানুষের মত সেটা নিয়ে নাড়া-চাড়া করলে অনেকক্ষণ। আমার মনে হ'ল ও হয়ত কাঁদছে, নয়ত কান্না চেপে রাখবার চেষ্টা করছে।

তার পরে আমার দিকে একবার চেয়েই আবার মুখ ফিরিয়ে বললে—কি করব বলুন, আমার অদৃষ্টে ভগবান এই লিখেছেন, এই আমায় করতে হবে।

আমার কেমন একটা অভিমান হ'ল, বললাম—এই তাহ'লে তোমার শেষ কথা ? বেশ মালতী।

মালতী সে কথার উত্তর না দিয়ে চুপ ক'রে রইল মাথা নীচু ক'রে। আবার আমার মনে হ'ল ও কাঁদছে, কিম্বা কান্না চেপে রাখবার চেষ্টা করছে—একবার মনে হ'ল ওর ডাগর চোখ দুটি জলে ভ'রে এসেছে—কিন্তু অভিমানের আবেগে আমি সেদিকে ফিরেও চাইলাম না।

রাত্রে বাইরে ব'সে ভাবলুম। সারারাত্রিই ভাবলুম।

মালতীকে ছেড়েই যেতে হ'ল শেষ পর্য্যন্ত ?

ও না এক দিন আমায় বলেছিল···আখড়ায় কত কাজ বাকী আছে মনে নেই ?

আমার ওপর কিসের দাবিতে এ কথা বলেছিল ও ?

সে দাবি অগ্রাহ্য করে নিষ্ঠুর ভাবে যাব চলে ?

যদি না যাই—তবে এখানে আখড়ার মোহন্ত সেজে চিরকাল থাকতে হবে। এই গ্রাম্য বৈষ্ণবদের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ও আচার-সংস্কারের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে হবে।

নিস্তব্ধ তারাভরা রাত্রি। দীঘির পার থেকে হু-হু হাওয়া বইছে।

নীল আকাশের দেবতা, যাঁর ছবি এই বিশাল মাঠের মধ্যে সন্ধ্যার মেঘে, কালবৈশাখীর ঝোড়ো হাওয়ায়, এই রকম তারাভরা অন্ধকার আকাশের তলে কতবার আমার মনে এসেছে, তাঁকে পাওয়া আমার হঠাৎ ফুরিয়ে না যায়···যে দেবতা সকল ধর্ম্মের অতীত, দেশকালের অতীত ···যার বেদী যেমন এই পৃথিবীতে মানুষের বুকে, তেমনি ওই শাশ্বত নীলাকাশে অনন্ত নক্ষত্র-দলের মধ্যে···মর্ত্তে ও অমর্ত্তে তাঁর বীণার দুই তার···আমার মনে হোমের আগুন তিনি প্রজ্বলিত রাখুন সুদীর্ঘ যুগসমূহের মধ্যে···শাশ্বত সময় ব্যেপে। আমার যা-কিছু মনের শক্তি, যা-কিছু বড়, তাই দিয়ে তাঁকে বুঝতে চাই। গণ্ডীর মধ্যে তিনি থাকেন না।

পরদিন খুব ভোরে—আখড়ার কেউ তখনও বিছানা থেকে ওঠে নি—কাউকে কিছু না জানিয়ে আমি দ্বারবাসিনীর আখড়া থেকে বেরিয়ে পড়লুম। কিসের সন্ধানে বেরিয়েছি তা আমি জানি নে—আমার সে সন্ধানের আশা আলেয়ার মত হয়ত আমাকে পথভ্রান্ত ক'রে পথ

থেকে বিপথে নিয়ে গিয়ে ফেলবে—শুধু আমি এইটুকু বুঝি যে, যে কোন গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকলে আমার চোখের অস্বচ্ছ দৃষ্টির সামনে তার প্রবুদ্ধমান রূপ ক্ষীণ হয়ে আসবে—আমার কাছে সেই সন্ধানই সত্য—আর সব মিথ্যে, সব ছায়া।

লোচনদাসের আখড়া ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। কোন্ দিকে যাব তার কিছুই ঠিক নেই। বর্ষাকাল কেটে গিয়েছে, আকাশ নির্ম্মল, শরতের সাদা লঘু মেঘখণ্ড নীল আকাশ বেয়ে উড়ে চলেছে, মণিহারী ঘাটের কাছে গঙ্গা পার হবার সময় দেখলুম গঙ্গার চরের কাশ-বনে কি অজস্র কাশফুলের মেলা! খানিকটা রেলে খানিকটা পায়ে হেঁটে এলাম কহলগাঁয়ে। গঙ্গার ধারে নির্জ্জন স্থানটি বড় ভাল লাগল। স্টেশনের কাছেই পাহাড়, সামনে যে পাহাড়টা, তার ওপরে ডাক-বাংলো—এখানে একটা রাত কাটালাম। ডাক-বাংলোর কাছে কি চমৎকার এক প্রকার বন্যফুল ফুটেছে, জ্যোৎস্নারাত্রে তার সুগন্ধে ডাক-বাংলোর বারান্দা আমোদ ক'রে রেখেছে।

এক দিন কহলগাঁয়ের খেয়াঘাটে শুনলাম ক্রোশখানেক দূরে গঙ্গার ধারে বটেশ্বরনাথ পাহাড়ে একজন সাধু থাকেন। একখানা নৌকা ভাড়া ক'রে বেরিয়ে পড়লাম। বটেশ্বরনাথ পাহাড় দূর থেকে দেখেই আমার মনে হ'ল এমন সুন্দর জায়গা আমি কমই দেখেছি, এখানে শান্তি ও আনন্দ পাব। গঙ্গার ধারে অনুচ্চ ছোট পাহাড়, পাহাড়ের মাথায় জঙ্গল, নানা ধরনের বুনো গাছ, এক ধরনের হলদে-পাপড়ি বড় বড় ফুল ফুটেছে পেয়ারাগাছের মত গাছে, নাম জানিনে। একটা বড় গুহা আছে পাহাড়ের দক্ষিণ দিকের ঢালুতে জঙ্গলের মধ্যে। গুহার মুখের কাছে প্রাচীন একটা বটগাছ, বড় বড় ঝুরি নেমেছে, ঘন ছায়া, পাকা বটফল তলায় প'ড়ে আছে রাশি রাশি। সাধুটির সঙ্গে আলাপ হ'ল, বাড়ি ছিল তাঁর মাদ্রাজে, কিন্তু কথাবার্ত্তায় চেহারায় হিন্দুস্থানী। সাধুটি খুব ভাল লোক, লম্বাচওড়া কথা নেই মুখে, বাঙালী বাবু দেখে খুব খাতির করলেন। নিজে কাঠ কুড়িয়ে এনে চা ক'রে খাওয়ালেন, আমার সম্বন্ধে দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করলেন। বললেন—আপনি এখানে যতদিন ইচ্ছে থাকুন, এখানে খরচ খুব কম। আমি এর আগে মুঙ্গেরে কষ্টহারিণীর ঘাটে ছিলাম, শহর বাজার জায়গা, এত খরচ পড়ত যে টিকতে পারলাম না। তাও বটে, আর দেখুন বাবুজী, সাধুরা চিড়িয়ার জাত, আজ এখানে, কাল ওখানে—এক জায়গায় কি ভাল লাগে বেশী দিন ?

লোকজন বিশেষ নেই, স্থানটি অতিশয় নির্জ্জন, কথা বলবার লোক নেই, তার প্রয়োজনও বোধ করি নেই বর্ত্তমানে—সারাদিনের মধ্যে সন্ধ্যার সময় সাধুজীর সঙ্গে ব'সে একটু আলাপ করি। এতদিন কোথাও যে-শান্তি পাই নি, এখানে তার দেখা মিলেছে, একদিন পাহাড়ের ওপরে বেড়াতে বেড়াতে জঙ্গলের মধ্যে একটা সুঁড়ি-পথ পেলাম। পাহাড়ের গা কেটে পথটা করা হয়েছে, ডাইনে উঁচু পাহাড়ের দেওয়ালটা, বাঁয়ে অনেক নীচে গঙ্গা, ঢাল্‌টাতে চামেলীর বন, একটা প্রাচীন পুষ্পিত বকাইন গাছ পথের ধারে। কিছুদূর গিয়ে দেখি, পাহাড়ের গায়ে খোদাই-করা কতকগুলো বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তি—গবর্ণমেণ্টের নোটিশ টাঙানো আছে এই মূর্ত্তিগুলো কেউ নষ্ট করতে পারবে না ইত্যাদি। আমি জানতাম না এদের অস্তিত্ব। জায়গাটা অতি চমৎকার, সূর্য্যাস্তের সময় সেদিন পীরপৈঁতির অনুচ্চ শৈলমালার ওপরের আকাশটা লাল হয়ে উঠল, গঙ্গার বুকে আকাশজোড়া রঙীন মেঘমালার ছায়া, খোদাই-করা দেবদেবীর মূর্ত্তি গোধূলির চাপা আলোয় কেমন একটা অনির্দ্দেশ্য শ্রী ধারণ করেছে—সে শ্রী বড় অদ্ভুত, কোন মূর্ত্তির নাক ভাঙা, কোনটার নাক নেই, বেশীর ভাগ মূর্ত্তিরই মুখ খসে গিয়েছে—কিন্তু গোধূলির রক্ত-পিঙ্গল আকাশের ছায়ায় যক্ষিণী যেন জীবন্ত

হয়ে উঠল ; পাথরে কাটা পীন স্তনযুগল যেন রক্তমাংসের ব'লে মনে হ'ল, লুম্বিনী উদ্যানের ছায়াতরুমূলে শায়িতা আসন্নপ্রসবা মায়াদেবীর চোখের পলক যেন পড়ে পড়ে, তারপর চামেলীর বন কালো হয়ে গেল, গঙ্গার বুকে নোঙর করা বড় বড় কিস্তির মাঝিরা হনুমানজীর ভজন গাইতে শুরু ক'রে দিলে, পাহাড়ের পূর্ব্বদিকে ছোট্ট কেওলিন খনিটাতে মজুরদের ছুটির ঘণ্টা পড়ল—আমি তখনও অবাক হয়ে দাঁড়িয়েই আছি।...রাঢ় দেশের মাঠে সেই খালের ধারের তালবনে সেদিন যে অদ্ভুত ধরনের শান্তি ও আনন্দ পেয়েছিলুম, সেটা আবার পাবার আশায় কতক্ষণ অপেক্ষা করলুম—কিন্তু পেলাম কই ? তার বদলে একটা ছবি মনে এল।

আমি জানি এ-সব কথা বলে কি কিছু বোঝানো যায় ? যার না হয়েছে, সে কি পরের লেখা পড়ে কিছু বুঝতে পারবে, না আমিই বোঝাতে পারবো ? মনে হ'ল কোথায় যেন একজন পথিক আছেন, ঐ নীল আকাশ, ঐ রঙীন মেঘমালা, এই কলরবপূর্ণ জীবনধারার পেছনে তিনি চলেছেন...চলেছেন কোথায় চলেছেন নিজেই হয়ত জানেন না। তাঁর কোন সঙ্গী নেই, তাঁকে কেউ বোঝে না, তাঁকে ভালবাসে না। অনাদি অনন্তকাল ধরে তিনি একা একা পথ চলেছেন। এই দৃশ্যমান বিশ্ব, এদের সমস্ত সৌন্দর্য্য—তিনি আছেন বলেই আছে।

আমি তাঁকে ছোট ক'রে দেখতে চাইনে। তাঁকে নিয়ে পুতুলখেলার বিরুদ্ধে ছোটবেলা থেকে আমি বিদ্রোহ ক'রে আসছি। তিনি বিরাট, মানুষে দশ হাজার বছরে তাঁকে যত বুঝে এসেছে আগামী দশ হাজার বছরে তাঁকে আরও ভাল ক'রে বুঝবে। এক-আধ জন মানুষে কি করবে ? সমগ্র মানব জাতি যুগে যুগে তাঁকে উপলব্ধির পথে চলেছে। আমি তাঁকে হঠাৎ বুঝে শেষ করতে চাই নে—কোটী যোজন দূরের তারার আলো যেমন লক্ষ বৎসর পৃথিবীতে আসছে...আসছে...তেমনি তাঁর আলোও আমার প্রাণে আসছে...হয়ত সিকি পথও এখনও এসে পৌছয় নি—কত যুগ, কত শতাব্দী, এখনও দেরি আছে পৌছবার। এই তো আমার মনে আসল য়্যাড্‌ভেঞ্চার (adventure), এ যেন আমার হঠাৎ ফুরিয়ে না যায়। আমি খুঁজে বেড়াবো...এই খোঁজাই আমার প্রাণ, বুদ্ধি, হৃদয়কে সঞ্জীবিত রাখবে, আমার দৃষ্টিকে চিরনবীন রাখবে।

আমি হয়ত এজন্মে তাঁকে বুঝবো না, হয়ত বহু জন্মেও বুঝবো না—এতেই আনন্দ পাব আমি, যদি তিনি আমার মনের বেদীতে হোমের আগুন কখনও নিভে যেতে না দেন, শাশ্বত যুগসমূহের মধ্যে, সুদীর্ঘ অনাগত কাল ব্যেপে। আমি চাই ওই নীল আকাশ, ওই সবুজ চর, কলনাদিনী গঙ্গা, দূরের নীহারিকাপুঞ্জ, মানুষের মনোরাজ্য, ওই হলদে-ডানা প্রজাপতি, এই শোভা, এই আনন্দের মধ্যে দিয়ে তাঁকে পেতে।

লোচনদাসের আখড়াতেই সবাই বললে, আমি নাস্তিক, কারণ আমি বলতাম নাম-জপ করা কেন ? ঈশ্বরের নাম দিতে পেরেছে কে ? শেষ পর্য্যন্ত উদ্ধব-বাবাজী আমাকে আখড়া ছাড়িয়ে দিল এই জন্যে বোধ হয়।

একদিন বৈকালে গঙ্গায় নাইতে নেমেছি—কাটারিয়ার ওপারের বহুদূর দিক্‌চক্রবালের প্রান্ত থেকে কালো মেঘ ক'রে ঝড় এল, গঙ্গার বুকে বড় বড় ঢেউ উঠল, আমার মুখে কপালে মাথায় বুকে ঢেউ ভেঙে পড়ছে, ওপারে চরের উপর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, জলের সুঘ্রাণ পাচ্ছি—এরকম কত ঝটিকাময় অপরাহ্ণ ও কত নীরন্ধ্র অন্ধকারময়ী রাত্রির কথা মনে এল—আমারই জীবনের কত সুখদুঃখময় মুহূর্ত্তের কথা মনে এল—

মনে কেমন একটা অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হ'ল, তাকে আনন্দও বলতে পারি, প্রেমও বলতে পারি, ভক্তিও বলতে পারি। তার মধ্যে ও তিনটেই আছে। বটেশ্বরনাথের পাহাড়টার ঠিক

ধূসর স্তূপের দিকে চেয়ে, দূর, বহুদূর দিগন্তের দিকে চেয়ে যেখানে বাংলা দেশ, যেখানে মালতী আছে, যেখানে এমন কত সুন্দর বর্ষার সন্ধ্যা মধুর আনন্দে কাটিয়েছি, কত জ্যোৎস্নারাত্রে শুকনো মকাইঝোলানো চালাঘরের দাওয়ার তলায় ব'সে দুজনে কত গল্প করেছি, তার মুখে জ্যোৎস্নার আলো এসে পড়েছে···কতবার অপ্রত্যাশিত মুহূর্ত্তে সে এসেছে—আবার কতবার ডাকলেও আসে নি, কতবার চোখাচোখি হ'লেই হেসে ফেলেছে—এ কথা মনে হয়ে আমার মনে কেমন একটা উন্মাদনা, আনন্দ, প্রেম, ভক্তি আরও কত কি ভাবের উদয় হ'ল একটা বড় ভাবের মধ্যে দিয়ে। ওই একটার মধ্যেই সবটা ছিল। তাদের আলাদা আলাদা করা যায় না—কিন্তু তারই প্রেরণায় আমার আঙুল আপনা-আপনি বেঁকে গেল, গঙ্গার জলে মা, বাবা, হীরু-জ্যাঠার নামে তর্পণ করলুম, ভগবানের নামে সমস্ত দেহ-মন নুয়ে এল, জলের ওপরই মাথা নত ক'রে তাঁর উদ্দেশে প্রণাম করলুম। সীতার জন্যে করুণ সহানুভূতিতে চোখে জল এল। হঠাৎ ঘোর বৈষয়িকতার জন্যে জ্যাঠামশায়ের প্রতি অনুকম্পা হ'ল—আবার সেই সৃষ্টিছাড়া অপরূপ মুহূর্ত্তেই দেখলুম মালতীকে কি ভালই বাসি, মালতীর সহায়হীন, সম্পদহীন ছন্নছাড়া মূর্ত্তি মনে ক'রে একটা মধুর স্নেহে তাকে সংসারের দুঃখকষ্ট থেকে বাঁচাবার আগ্রহে, তাকে রক্ষা করবার, আশ্রয় দেবার, ভালবাসার, ভাল করবার, তার মনে আনন্দ দেবার, তার সঙ্গে কথা বলবার আকুল আগ্রহে সমস্ত মন ভরে উঠল—কি জানি সে মুহূর্ত্ত কি ক'রে এল, সেই মেঘান্ধকার বর্ষণমুখর সন্ধ্যাটিতে সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি যেন সেই মহামুহূর্ত্তে আমার মধ্যে দিয়ে তার সমস্ত পুলকের, গৌরবের, অনুভূতির সঞ্চয়হীন বিপুল আত্মপ্রকাশ করলে। সেদিন দেখলুম ঈশ্বরের প্রতি সত্যিকার ভক্তির প্রকৃতি মালতীর প্রতি আমার ভালবাসার চেয়ে পৃথক নয়। ও একই ধরনের, একই জাতীয়। যেখানে হৃদয়ের সহানুভূতি নেই, ভালবাসা নেই, সেখানে ঈশ্বরও নেই। ভগবানের প্রতি সেদিন যে-ভক্তি আমার এল—তা এল একটা অপূর্ব্ব আনন্দের রূপে—সত্যিকার ভক্তি একটা joy of life···আত্মা, দেহ, মন সেখানে আনন্দে মাধুর্য্যে আপ্লুত হয়ে যায়।

ঠিক মালতী আমাকে ভালবেসেছে বা আমি মালতীকে ভালবেসেছি এই ভেবে যেমন হয় তেমনি। কোন পার্থক্য নেই। একই অনুভূতি—দুটো আলাদা আলাদা নাম মাত্র। এতেও মন অবশ হয়ে যায় আনন্দে—ওতেও।

উপলব্ধি ক'রে বুঝলুম যদি কেউ আমাকে আগে এ-সব কথা বলত, আমার কখনই বিশ্বাস হ'ত না। হওয়া সম্ভবও নয়।

সাধুজী সন্ধ্যাবেলা রোজ ধর্ম্মকথা পড়েন। আমি মনে মনে বলি—সাধুজী, আপনি জীবন দেখেন নি। ভালবেসেছেন কখনও জীবনে? প্রাণ ঢেলে ভালবেসেছেন? যে কখনও নরুণ হাতে নিতে সাহস করে নি, সে যাবে তলোয়ার খেলতে। শুকনো বেদান্তের কথার মধ্যে ঈশ্বর নেই—যেখানে ভাব নেই, ভালবাসা নেই, হৃদয়ের দেওয়া-নেওয়া নেই, আপনাকে হারিয়ে ফেলা, বিলিয়ে দেওয়া নেই—সেখানে ভগবান নেই, নেই, নেই। হৃদয়ের খেলা যে আস্বাদ করেছে, ও-রস কি জিনিস যে বোঝে—ভগবানকে ভালবাসার প্রথম সোপানে সে উঠেছে।

আমি মালতীর কথা এত ভাবি কেন? সে আমাকে এত অভিভূত ক'রে রেখেছে কেন দিন, রাত, সকাল, সন্ধ্যা?···এই বিক্রমশিলা বিহারের পাহাড়মালা, বন-শ্রেণী পাদমূলে প্রবাহিতা পুণ্যস্রোতা নদী, সন্ধ্যার পটে রাঙা সূর্য্যাস্ত, বনচামেলীর উগ্র উদাস গন্ধ—এ-সবের মধ্যে সে আছে, তার হাসি নিয়ে, তার মুখভঙ্গি নিয়ে, তার গলার সুর নিয়ে, তার শতসহস্র টুকরো কথা নিয়ে, তার ছেলেমানুষি ভঙ্গি নিয়ে। কেন তাকে ভুলি নি, কেন তার জন্য আমার মন সর্ব্বদাই উদাস, উন্মুখ, ব্যাকুল, বেদনায় ভরা, স্মৃতির মাধুর্য্যে আপ্লুত, নিরাশায়

যন্ত্রণাময়—হঠাৎ তাকে এত ভালবাসলুম কেন ? তার কথা মনে যখন আসে, তখন কেওলিন খনির উপরকার পাহাড়চূড়াটায় একটা বকাইন গাছের গুঁড়িতে ঠেস্ দিয়ে সারাদিন তার কথা ভাবি—খাওয়া-দাওয়ার কথা মনে থাকে না, ভালও লাগে না—তার মুখের হাসির স্মৃতিতেই যেন আমার শান্তিময় নিভৃত গৃহকোণ, তার কথার সুর দূরের ব্যবধান ঘুচিয়ে, মাঠ নদী বন পাহাড় পার হয়ে ভেসে এসে আমার প্রদীপ-জ্বালানো শান্ত আঙিনায় ছোট্ট খড়ের রান্নাঘরের একপাশে উপবিষ্ট নিরীহ গৃহস্থ সাজায়—জীবনে তাই যেন চেয়ে এসেছি, সব দুরাশা, সব-কিছু ভুলিয়ে দেয়, অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ একাকার হয়ে যায়···এদিকে রোদ চড়ে ওঠে কিংবা সূর্য্য চলে পড়ে, বটেশ্বরনাথের পাহাড় রঙে রঙে রাঙা হয়, পাখীর গান হঠাৎ যায় থেমে—সাধুজীর চেলা বর্ম্মানারায়ণ আমাকে খুঁজতে আসে চা খাবার জন্যে···তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠতে হয়···গাঁজার ধোঁয়ায় অন্ধকার সাধু-বাবাজীর গুহার সামনে ব'সে দুধবিহীন কড়া চা খেতে খেতে হনুমান-চরিত শুনতে হয়।

সাধুজী আমাকে ভালবাসেন। এই জন্যে ওঁর এখানে আছি। এখানে পয়সার খরচ নেই বললেই হয়। বারোটা টাকা এনেছিলুম, সাধুজীর হাতে তুলে দিয়েছি—নিতে চান নি—আমি পীড়াপীড়ি ক'রে দিয়েছি। একবেলা খাই মকাইয়ের ছাতু, একবেলা রুটি আর ঢেঁড়সের তরকারি। অন্য কিছু এখানে মেলে না। কেওলিন খনির ম্যানেজার মাঝে মাঝে কহলগাঁও থেকে মাছ আনায়, সেদিন ওর বাংলোতে আমায় খেতে বলে—কারণ সাধুর এখানে ওসব করবার হবার জো নেই।

মালতীর সঙ্গে আবার দেখা হবে না ? কিন্তু কি ক'রে হবে তা তো বুঝি নে। আমি আবার সেখানে কোন্ ছুতোয় যাবো ? উদ্ধবদাস-বাবাজী আমায় ভাল চোখে দেখতো না। দু-একবার অসন্তোষ প্রকাশও করেছিল, মালতীর সঙ্গে যখন বড় মিশছি—তখন দু-একবার আমায় এমন আভাসও দিয়েছিল যে এখানে বেশী দিন থাকলে ভাল হবে না। ও-সবে আমি ভয় করি নে। সপ্তসিন্ধুপারের দেশ থেকে মালতীকে আমি ছিনিয়ে আনতে পারি, যদি আমি জানতাম যে মালতীও আমায় চায়। কিন্তু তাতে আমার সন্দেহ আছে। সেই সন্দেহের জন্যেই যত বেদনা, যা-কিছু যন্ত্রণা! কি জানি, বুঝতে পারি নে সবখানি। রহস্যময়ী মালতীর মনের খবর পুরো এক বছরেও পাই নি।

এক-একবার কিন্তু আমার মনের গভীর গোপন তল থেকে কে বলে, অত সন্দেহ কেন তোমার মনে ? তোমার চোখ ছিল কোথায় ? মালতীকে বোঝ নি এক বছরেও ?

মালতী—কি মাধুর্য্যের রূপ ধরেই সে মনে আসে! তার কথা যখনই ভাবি, অস্ত-আকাশের অপরূপ শোভায় পাহাড়ের ধূসর ছায়ায় গঙ্গার কলতানের মধ্যে ওপারের খাসমহলের চরে কলাইওয়ালী মাথায় কলায়ের বোঝা নিয়ে ঘরে যখন ফেরে, যখন সাদা পাল তুলে বড় বড় কিস্তি কহলগাঁয়ের ঘাট থেকে বাংলা দেশের দিকে যায়···কিংবা যখন গঙ্গার জলে রঙীন মেঘের ছায়া পড়ে, খেয়ার মাঝিরা নিজেদের নৌকোতে বসে বিকট চীৎকার ক'রে ঠেট্ হিন্দীতে ভজন গায়—সমস্ত পৃথিবী, আকাশ, পাহাড় একটা নতুন রঙে রঙীন হয়ে ওঠে আমার মনে—ওই দূর বাংলা দেশের এক নিভৃত গ্রামের কোণে মালতী আছে, যখন আবার বর্ষা নামে, খুব ঝড় ওঠে, কিংবা পুকুরের ঘাটে একা গা ধুতে যায়, কি বিষ্ণুমন্দিরে প্রদীপ দেখায় সন্ধ্যায়—আমার কথা তার মনে পড়ে না ? আমার তো পড়ে—সব সময়ই পড়ে, তার কি মনে পড়ে না ?

মালতীকে নিয়ে মনে কত ভাঙা-গড়া করি, কত অবস্থায় দুজনকে ফেলি মনে মনে, কত বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করি, আমার অসুখ হয়, সে আমার পাশে ব'সে না ঘুমিয়ে সারারাত

কাটায়—কত অর্থকষ্টের মধ্যে দিয়ে দু-জনে সংসার করি—সে বলে—ভেবো না লক্ষ্মীটি, মদনমোহন আবার সব ঠিক ক'রে দেবেন! তার ছোটখাটো সুখদুঃখ, আখড়ার বিগ্রহের ওপর গভীর ভক্তি ও বিশ্বাস, তার সেবা—আমার ভাল লাগে। মনে হয় কত মেয়ে দেখেছি, সবারই খুঁত আছে, মালতীর খুঁত নেই। আবার মেয়েরা যেখানে বেশী রূপসী, সেখানে মনে হয়েছে এত রূপ কি ভাল? মালতীর স্নিগ্ধ শ্যামল সুকুমার মুখের তুলনায় এদের এত নিখুঁত রূপ কি উগ্র ঠেকে! মোটের ওপর যেদিক দিয়েই যাই—সেই মালতী।

এক-একবার মনকে বোঝাই মালতীর জন্যে অত ব্যস্ত হওয়া দুঃখ বাড়ানো ছাড়া আর কি? তাকে আর দেখতেই পাব না। তাদের আখড়াতে আর যাওয়া ঘটবে না। স্বপ্নকে আঁকড়ে থাকি কেন? কিন্তু মন যদি অত সহজে বুঝতো!

মালতী একটা মধুর স্বপ্নের মত, বেদনার মত, কত দিন কানে-শোনা গানের সুরের মত উদয় হয়। তখন সবই সুন্দর হয়ে যায়, সবাইকে ভালবাসতে ইচ্ছে করে, সাধুর বকুনি, পাণ্ডাঠাকুরের জ্ঞাতি-বিরোধের কাহিনী—অর্থাৎ কি করে ওর জ্যাঠতুতো ভাই ওকে ঠকিয়ে এতদিন বটেশ্বর শিবের পাণ্ডাগিরি থেকে ওকে বঞ্চিত রেখেছিল তার সুদীর্ঘ ইতিহাস—সব ভাল লাগে। কিন্তু কোন কথা বলতে ইচ্ছে করে না তখন, ইচ্ছে হয় শুধু বসে ভাবি, ভাবি—সারা দীর্ঘ দিনমান ওরই কথা ভাবি।

বটেশ্বরনাথ পাহাড়ের দিনগুলো মনে আমার অক্ষয় হয়ে থাকবে। রূপে, বেদনায়, স্মৃতিতে, অনুভূতিতে কানায় কানায় ভরা কি সে-সব অপূর্ব্ব দিন! অনেক দিন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু প্রেমের অমর মধু-মুহূর্ত্তগুলির ছায়াপাতে তাদের স্মৃতি আমার কাছে চিরশ্যামল। শরতের দুপুরে নিভৃত বননিবিড় অধিত্যকায় চুপ ক'রে ঝরা পাহাড়ী-কুরচি-ফুলের শয্যায় ব'সে চারি দিকে রৌদ্রদীপ্ত পাহাড়শ্রেণীর রূপ ও শরতের আকাশের সাদা সাদা মেঘখণ্ডের দিকে চেয়ে চেয়ে মালতীর ভাবনাতে সারাদিন কাটিয়ে দিতাম। তিনটাঙার মাঠে বটগাছের সবুজ মগডালে সাদা সাদা বকের সারি ব'সে আছে, যেন সাদা সাদা অজস্র ফুল ফুটে আছে—কত কি রং, প্রথমে মাটির ধূসর রং, তার পর কালো সবুজ গাছপালা, তার ওপরের পর্দ্দায় নীলকৃষ্ণ পাহাড়, তার ওপরে সুনীল ও সাদা মেঘস্তূপ, সকলের নীচে কূলে কূলে ভরা গৈরিক জলরাশি। কিসে যেন পড়েছিলুম ছেলেবেলায় মনে পড়ে—

অলসে বহে তটিনী নীর,
বুঝি দূরে—অতি দূরে সাগর,
তাই গতি মন্থর,
শ্রান্ত, শান্ত পদসঞ্চার ধীর!

আগে প্রেম কা'কে বলে তা জানতাম না, জীবনে তা কি দিতে পারে, তা ভাবিও নি কোন দিন। এখন মনে হয় প্রেমই জীবনের সবটুকু। স্বর্গ কবির কল্পনা নয়—স্বর্গ এই পিয়ালতলায়, স্বর্গ তার স্মৃতিতে। নয়তো কি এত রূপ হয় এই শিলাস্তৃত অধিত্যকার, ওই উচ্চ মেঘপদবীর, ওই পুণ্যসলিলা নদীর, ওই বননীল দিগন্তরেখার!

দিনে রাতে মালতী আমার ছাড়ে কখন? সব সময় সে আমার মনে আছে। এই দুপুর, এখন সে আখাড়ার দাওয়ায় পরিবেশন করছে। এই বিকেল, এখন সে কাপড় সেলাই করছে, নয় তো মুগকলাই ঝাড়ছে। এই সন্ধ্যা, এখন সে টান-টান ক'রে তার অভ্যস্ত ধরনে চুলটি বেঁধে, ফুল্লাধরে মৃদু হেসে বিষ্ণুমন্দিরে প্রদীপ দেখাতে চলেছে। আজ মঙ্গলবার, সারাদিন সে

উপবাস ক'রে আছে, আরতির পরে দুধ ও ফল খাবে। সেই নিঃসঙ্কোচে পুকুরের ঘাটে বসে বসে আমাকে গান-শোনানো, আমার সঙ্গে শিবের মন্দিরে যাওয়া—খাতা পড়ে শোনানো—সকলের ওপরে তার হাসি, তরে মুখের সে অপূর্ব্ব হাসি! কত কথাই মনে এসে নির্জ্জনে যাপিত প্রতি প্রহরটি আনন্দবেদনায় অলস ক'রে দিত।

দূরের গিরি-সানুর গায়ে ক্রীড়ারত শুভ্র মেঘরাজির মধ্যে এমন কি কোন দয়ালু মেঘ নেই যে এই কুটজ-কুসুমাস্তীর্ণ নিভৃত অধিত্যকার ওপর দিয়ে যেতে যেতে পিয়ালতলার এই নির্ব্বাসিত যক্ষের বিরহবার্ত্তাটি শুনে জেনে নিয়ে বাংলা দেশের প্রান্তরমধ্যবর্ত্তী অলকাপুরীতে পৌঁছে দেয় তার কানে?

কতবার মনে অনুশোচনা হয়েছে এই ভেবে যে কেন চলে আসতে গিয়েছিলুম অমন চুপি চুপি? তখন কি বুঝেছিলুম মালতী আমায় এত ভাবাবে! কি বুঝে আখড়া ছেড়ে এলাম পাগলের মত! এমনধারা খামখেয়ালী স্বভাব আমার কেন যে চিরকাল, তাই ভাবি। আমার মাথার ঠিক নেই সবাই বলে, সত্যিই বলে। এখন বুঝেছি কি ভুলই করেছি মালতীকে ছেড়ে এসে! ওকে বাদ দিয়ে জীবন কল্পনা করতে পারছি নে—এও যেমন ঠিক, আবার এও তেমনি ঠিক যে আর সেখানে আমার ফেরা হবে না।

না—মালতী, আর ফিরে যাব না। কাছে পেয়ে তুমি যদি অনাদর কর সইতে পারব না। তোমার খামখেয়ালী স্বভাবকে আমার ভয় হয়। তার চেয়ে এই-ই ভাল। আমার জীবনে তুমি পুকুরের ঘাটের কত জ্যোৎস্নারাত্রি অক্ষয় ক'রে দিয়েছ, সেই সব জ্যোৎস্নারাত্রির স্মৃতি, তোমার বাবার বিষ্ণুমন্দিরে কত সন্ধ্যায় প্রদীপ দেওয়ার স্মৃতি—তোমার সে সব আদরের স্মৃতি মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে থাক।

॥ ১৪ ॥

এক বছর কেটে গেল, আবার শ্রাবণ মাস।

হঠাৎ দাদার শালার একখানা চিঠি পেলাম কলকাতা থেকে। দাদার বড় অসুখ, চিকিৎসার জন্যে তাকে আনা হয়েছে ক্যাম্বেল হাসপাতালে।

পত্র পেয়ে প্রাণ উড়ে গেল। সাধুজীর কাছে বিদায় নিয়ে কলকাতায় এলাম। হাসপাতালে দাদার সঙ্গে দেখা করলাম। সামান্য ব্রণ থেকে দাদার মুখে হয়েছে ইরিসিপ্লাস, আজ সকালে অস্ত্রও করা হয়ে গিয়েছে। দাদা আমায় দেখে শরীরে যেন নতুন বল পেল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত হাসপাতালে বসে রইলাম দাদার কাছে। দাদা বললে—এখানে বেশ খেতে দেয় জিতু। রোজ প্রতিবেলায় একখানা বড় পাঁউরুটি আর আধ সের করে দুধ দিয়ে যায়। দেখিস এখন, এখুনি আনবে। খাবি রুটি একখানা?

পরদিন সকালে আবার গেলাম হাসপাতালে। আঙুর কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম বৌবাজারের মোড় থেকে, দাদাকে ব'সে ব'সে খাওয়ালাম। দুপুরের আগে চলে আসছি, দোর পর্য্যন্ত এসেছি, দাদা পেছু ডাকলে—জিতু, শোন্।

দাদা বিছানার ওপর উঠে বসেছে—তার চোখ দুটিতে যেন গভীর হতাশা ও বিষাদ মাখানো। বললে—জিতু, তোর বৌদিদি একেবারে নিপাট ভালমানুষ, সংসারের কিছু বোঝে না। ওকে দেখিস—

আমি বিস্ময়ের সঙ্গে বললাম—ও কি কথা দাদা! তুমি সেরে ওঠ, তোমায় বাড়ি নিয়ে যাব, তোমার সংসার তুমি দেখবে।

দাদা চুপ ক'রে রইল।

বিকেলে দাদার ওয়ার্ডে ঢুকবার আগে মনে হ'ল দাদা তো বিছানাতে বসে নেই! গিয়ে দেখি দাদা আগাগোড়া কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। মাথার কাছে চার্টে দেখি জ্বর উঠেছে ১০৪ ডিগ্রীর ঘরে। পাশের বিছানার রোগী বললে—আপনি চলে যাবার পরে খুব জ্বর এসেছে। কোন কথা বলতে পারেন নি, আপনি আসবার আগে ডেকেছিলাম, সাড়া পাই নি।

সেদিন সারাদিন তেমনি ভাবে কেটে গেল। পরদিনও তাই, দাদার জ্ঞান আর ফিরে এল না—জ্বরও কমল না, পরদিন রাত্রে আমি রোগীর কাছে রইলাম।

ওঃ, কি বর্ষা সে রাত্রে! ঘনকৃষ্ণ শ্রাবণের মেঘপুঞ্জে আকাশ ছেয়ে গিয়েছে, নির্নিরীক্ষ্য অন্ধকারে কোথাও একটা তারা চোখে পড়ে না। একখানা বই পড়ছিলাম দাদার বিছানার ধারে ব'সে। রাত বারোটায় একবার নার্স এল। আমি তাকে বললাম—রোগীর অবস্থা খারাপ—একবার রেসিডেণ্ট মেডিকেল অফিসারকে ডাকাও। ডাক্তার এল, চলেও গেল। রাত তখন দেড়টা। বাইরে কি ভীষণ মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে। আকাশ ভেঙে পড়বে বুঝি পৃথিবীর ওপরে—সৃষ্টি বুঝি ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

একজন ছাত্র এসে রোগী দেখে বললে—ইন্‌জেক্‌শন্ দিতে হবে।

আমি বললাম—বেশ দিন—

তারপর আমি বাইরে এসে দাঁড়ালুম। ঘন মেঘে মেঘে আকাশ অন্ধকার। হাসপাতালের বারান্দাতে কুলিরা ঘুমুচ্ছে। টিটেনাস্ ওয়ার্ড থেকে অনেকক্ষণ ধরে আর্ত্ত পশুর মত চীৎকার শোনা যাচ্ছে—একবার সেটা থামছে, আবার জোরে জোরে হচ্ছে। সামনের ওয়ার্ডে মেম নার্সটা ঘুরে বেড়াচ্ছে বারান্দাতে।

বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে হেড্ লাইট জ্বালিয়ে একখানা মোটর এসে ওয়ার্ডের সামনে দাঁড়াল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তদারক করতে এসেছেন। দাদাকে তিনি দেখলেন। নার্সকে কি বললেন। ছাত্রটিকে ডেকে কি জিজ্ঞেস করলেন। ছাত্রটি আর একটা ইন্‌জেক্‌শন্ দিলে।

রাত আড়াইটে। বৃষ্টি আবার শুরু হয়েছে। হাসপাতালের বারান্দার ওদিকের আলোগুলো নিবিয়ে দিয়েছে—অনেকটা অন্ধকার।

দাদার সঙ্গে অনেক কথা বলবার ইচ্ছে হচ্ছিল। ছেলেবেলাকার কথা, দার্জ্জিলিঙের কথা। সেই আমরা কার্ট রোড ধ'রে উম্‌প্রাঙের মিশন-হাউস্ পর্য্যন্ত বেড়াতে যেতুম, মনে আছে দাদা? একদিন থাপা তোমাকে কাদার পুতুল গড়িয়ে দিয়েছিল! মুরগীর ঘরে লুকিয়ে তুমি আর আমি মিছরি চুরি ক'রে শরবৎ খেতুম? তুমি দোকান করলে আটঘরাতে বাবা মারা যাওয়ার পরে পাঁচ সের নুন, আড়াই সের আটা, পাঁচ পোয়া চিনি নিয়ে—সবাই ধার নিয়ে দোকান উঠিয়ে দিলে। বৌদিদিকে কি বলব দাদা?

এবার এসে দাদার খাটের পাশে বসে রইলাম। একটানা বৃষ্টি-পতনের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। মাঝে মাঝে কেবল টিটেনাস্ ওয়ার্ড থেকে বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়েও সেই আর্ত্ত চীৎকারটা শোনা যাচ্ছে। একটা ছোট ছেলের টন্‌সিল কাটা হয়েছিল—সে একবার ঘুম ভেঙে উঠে খাবার চাইলে। কুলিটা উঠে তাকে জল দিলে।

এই কুলিগুলো ওই বুড়ো মেথরটা, নার্সেরা—এরা ঘুমোয় কখন? সারারাত জেগে জেগে

রোগীদের ফাইফরমাশ খাটছে। দাদার অবস্থা খারাপ ব'লে সবাই এসে একবার ক'রে দেখে যাচ্ছে। নার্স যে কতবার এল! সবাই তটস্থ···দাদাকে বাঁচাবার জন্তে সবারই যেন প্রাণপণ চেষ্টা। বাঁচলে সবাই খুশী হয়। নার্স একবার আমায় বললে—তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও বাবু। সারারাত জেগে ব'সে থাকলে অসুখ করবে তোমার।

হাতপাতালটিকে আমার মনে হ'ল যেন স্বর্গ। আর্ত্তের সেবা যেখানকার মানুষে মনপ্রাণ দিয়ে করে, সে স্বর্গই। ওই বুড়ো মেথরটা এখানকার দেবদূত। যেদিন কয়েক শতাব্দী আগে শ্রীচৈতন্ত গৃহত্যাগ করেছিলেন, কিংবা শঙ্করাচার্য্য সংসারের অসারত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করেছিলেন—তাঁদের স্বপ্নে এই স্বর্গের কল্পনা ছিল। চৈতন্তদেবের সংকীর্ত্তনের দলে নবদ্বীপের গঙ্গার তীরে এই বুড়ো মেথরটা যোগদান করতে পারত, তিনি ওকে কোল দিতেন, ঝাড়খণ্ডের পথে শ্রীক্ষেত্র রওনা হবার সময়ে ওকে পার্শ্বচর ক'রে নিতেন। ···রাত সাড়ে তিনটে। রাত আজ কি পোয়াবে না? বৃষ্টি একটু থেমেছে। আকাশ কিন্তু মেঘে মেঘে কালো।

এই সময়ে দাদার নাভিশ্বাস উপস্থিত হ'ল। কলের ঘোলা জল দাদার মুখে দিলাম। কানের কাছে গঙ্গানারায়ণব্রহ্ম নাম উচ্চারণ করলাম। এই বিপদের সময় কি জানি কেন মালতীর কথা মনে পড়ল। মালতী যদি এখানে থাকত! আটঘরার অশ্বত্থতলার সেই বিষ্ণুমূর্ত্তির কথা মনে পড়ল—হে দেব, দাদার যাওয়ার পথ আপনি সুগম ক'রে দিন। আপনার আশীর্ব্বাদে তার জীবনের সকল ত্রুটি, সকল গ্লানি ধুয়ে মুছে পবিত্র হোক্, যে সমুদ্র আপনার অনন্ত শয্যা, যে লোকালোক পর্ব্বত আপনার মেখলা—সে-সব পার হয়েও বহুদূরের যে পথে দাদার আজ যাত্রা, আপনার কৃপায় সে পথ তার বাধাশূন্ত হোক্, নির্ভয় হোক্, মঙ্গলময় হোক্।

পাশের বিছানার রোগী বললে—একবার মেডিকেল অফিসারকে ডাকান না!

আমি বললাম—আর মিথ্যে কেন?

তার পর আরও ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। আমার ঘুম এসেছে, ভয়ানক ঘুম। কিছুতেই আর চোখ খুলে রাখতে পারি নে। মধ্যে নার্স দুবার এল, আমি তা ঘুমের ঘোরেই জানি—আমায় জাগালে না। পা টিপে টিপে এল, পা টিপেই চলে গেল।

হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। ভোর হবার দেরি নেই, হাসপাতালের আলো নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে—কিন্তু ঘন কালো মেঘে আকাশ ঢাকা, দিনের আলো যদিও একটু থাকে, বোঝা যাচ্ছে না। দাদার খাটের দিকে চেয়ে আমি বিস্ময়ে কেমন হয়ে গেলাম। এখনও ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি নাকি? দাদার খাটের চারি পাশে অনেক লোক দাঁড়িয়ে। অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ওরা দাদার খাটটাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। শিয়রের কাছে মা, ডানদিকে বাবা, বাবার পাশেই আটঘরার সেই হীরু রায়—স্যালাইনের টিনটা যেখানে ঝোলানো, সেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের চা-বাগানের নেপালী চাকর থাপা, ছেলেবেলায় দাদাকে যে কোলেপিঠে ক'রে মানুষ করেছিল। তার পরই আমার চোখ পড়ল খাটের বাঁ দিকে, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে ছোট কাকীমার মেয়ে পানী। এদের মূর্ত্তি এত সুস্পষ্ট ও বাস্তব যে একবার আমার মনে হ'ল ওদের সকলেই দেখছে বোধ হয়। পাশের খাটের রোগীর দিকে চেয়ে দেখলুম, সে যদিও জেগে আছে এবং মাঝে মাঝে দাদার খাটের দিকে চাইছে—কিন্তু তার মুখ-চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল মুমূর্ষু দাদাকে ছাড়া সে আর কিছু দেখছে না। অথচ কেন দেখতে পাচ্ছে না, এত স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, সজীব মানুষগুলোকে কেন যে ওরা দেখে না—এ ভেবে ছেলেবেলা থেকে আমার বিস্ময়ের অন্ত নেই।

আমি জানি এসব কথা লোককে বিশ্বাস করানো শক্ত। মানুষ চোখে যা দেখে না,

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় যা পারে না—তা বিশ্বাস করতে সহজে রাজী হয় না। এই জন্যে হাসপাতালের এই রাত্রিটির কথা আমি একটি প্রাণীকেও বলি নি কোনদিন।

দু-তিন মিনিট কেটে গেল। ওরা এখনও রয়েছে। আমি চোখ মুছলাম, এদিক-ওদিক চাইলাম—চোখে জল দিলাম উঠে। এখনও ওরা রয়েছে। ওদের সবারই চোখ দাদার খাটের দিকে। আমি ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে পানীর কাছে দাঁড়ালাম। ওরা সবাই হাসিমুখে আমার দিকে চাইলে। কত কথা বলব ভাবলাম মাকে, বাবাকে, পানীকে—থাপা কবে মারা গিয়েছে জানি নে—সে এখনও তাহ'লে আমাদের ভোলে নি? তাকে কি বলব ভাবলাম—কিন্তু মুখ দিয়ে আমার কথা বেরুল না। এই সময়ে নার্স এল। আমি আশ্চর্য্য হয়ে ভাবছি নার্স কি এদের দেখতে পাবে না? এই তো সবাই এরা এখানে দাঁড়িয়ে। নার্স কিন্তু এমন ভাবে এল যেন আমি ছাড়া সেখানে আর কেউ নেই। দাদার মুখের দিকে চেয়ে বললে—এ তো হয়ে গিয়েচে—এ কুলি, কুলি—

কুলি খাটটাকে ঘেরাটোপ দিয়ে ঢেকে দিতে এল।

তখনও ওরা রয়েছে।···

তার পর আমার একটা অবসন্ন ভাব হ'ল—আমার সেই সুপরিচিত অবসন্ন ভাবটা। যখনই এ-রকম আগে দেখতাম, তখনই এ-রকম হ'ত। মনে পড়ল কত দিন পরে আবার দেখলাম আজ—বহুকাল পরে এই জিনিসটা পেয়েছি—হারিয়ে গিয়েছিল, সন্ধান পাই নি অনেক দিন, ভেবেছিলুম আর বোধ হয় পাব না—আজ দাদার শেষশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে তা ফিরে পেয়েছি। আমার গা যেন ঘুরে উঠল—পাশের চেয়ারে ধপ্‌ ক'রে ব'সে পড়লাম।

নার্স আমার দিকে চেয়ে বললে—পুওর বয়!

জীবনে নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন কাজ একেবারে করি নি তা নয়, কিন্তু বৌদিদিকে দাদার মৃত্যু-সংবাদটা দেওয়ার মত নিষ্ঠুর কাজ আর যে কখনও করি নি, একথা শপথ ক'রে বলতে পারি। বেলা দুটোর সময় দাদার বাড়ি গিয়ে পৌঁছলাম। পথে দাদার শ্বশুরবাড়ির এক সরিকের সঙ্গে দেখা। আমার মুখে খবর শুনেই সে গিয়ে নিজের বাড়িতে অবিলম্বে খবরটি জানালে। বোধ হয় যেন বৌদিদির ওপর আড়ি করেই ওদের বাড়ির মেয়েরা—যারা দাদার অসুখের সময় কখনও চোখের দেখাও দেখতে আসে নি—চীৎকার করে কান্না জুড়ে দিলে। বৌদিদি তখন অত বেলায় দুটো রেঁধে ছেলেমেয়েকে খাইয়ে আঁচিয়ে দিচ্ছে। নিজে তখনও খায় নি। পাশের বাড়িতে কান্নার রোল শুনে বৌদিদি বিস্ময়ের সুরে জিজ্ঞেস করছে—হ্যাঁ রে বিনু, ওরা কাঁদছে কেন রে? কি খবর এল ওদের? কারও কি অসুখ-বিসুখ?

এমন সময়ে আমি বাড়ি ঢুকলাম। আমায় দেখে বৌদিদির মুখ শুকিয়ে গেল। বললে—ঠাকুরপো! তোমার দাদা কোথায়?

আমি বললাম—দাদা নেই, কাল মারা গিয়েছে।

বৌদিদি কাঁদলে না। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল আমার মুখের দিকে চেয়ে।

পাশের বাড়িতে তখন ইনিয়ে-বিনিয়ে নানা ছন্দে ও সুরে শোক-প্রকাশের ঘটা কি! পাড়ার অনেক মেয়ে এলেন সান্ত্বনা দিতে বৌদিদিকে। কিন্তু একটু পরে যখন বৌদিদি পুকুরের ঘাটে নাইতে গেল, সঙ্গে একজন যাওয়া দরকার নিয়মমত—তখন—এক একটা অজুহাতে যে যার বাড়িতে চলে গেল। আমি বিস্মিত হলাম এই ভেবে যে এরা তো বৌদিদির বাপের বাড়িরই লোক! তার একটু পরে বৌদিদি খানিকটা কাঁদলে। হঠাৎ কান্না থামিয়ে

বললে শেষকালে জ্ঞান ছিল ঠাকুরপো ? সেই তো মরেই গেল—হাসপাতালে না নিয়ে গেলেই হ'ত ! তবু আপনার জন কাছে থাকত !

আমি বললাম—বৌদিদি, তুমি ভেবো না, এখানে যে রকম গতিক দেখছি তাতে এখানে থাকলে দাদার চিকিৎসাই হ'ত না। এখানে কেউ তোমায় তো দেখে না দেখছি। হাসপাতালের লোকে যথেষ্ট করেছে। বাড়িতে সে রকম হয় না। আমাদের অবস্থার লোকের পক্ষে হাসপাতালই ভাল।

বৌদিদির বাবা মা কেউ নেই—মা আগেই মারা গিয়েছিলেন—বাবা মারা গিয়েছেন আর বছর। এ কথা কলকাতাতেই বৌদিদির ভায়ের মুখে শুনেছিলাম। বৌদিদির সে ভাইটিকে দেখে আমার মনে হয়েছিল এ নিতান্ত অপদার্থ—তার ওপর নিতান্ত গরীব, বর্ত্তমানে কপর্দ্দকহীন বেকার—তার কিছু করবার ক্ষমতা নেই। বয়সও অল্প, সে কলকাতা ছেড়ে আসে নি, সেখানে চাকুরির চেষ্টা করছে।

ভেবে দেখলাম এদের সংসারের ভার এখন আমিই না নিলে এতগুলি প্রাণী না খেয়ে মরবে। দাদা এদের একেবারে পথে বসিয়ে রেখে গেছে। কাল কি করে চলবে সে সংস্থানও নেই এদের। তার উপর দাদার অসুখের সময় কিছু দেনাও হয়েছে।

এদের ছেড়ে কোথাও নড়তে পারলুম না শেষ পর্য্যন্ত। কালীগঞ্জেই থাকতে হ'ল। এখান থেকে দাদার সংসার অন্য স্থানে নিয়ে গেলাম না, কারণ আটঘরাতে এদের নিয়ে যাবার যো নেই, অন্য জায়গায় আমার নিজের রোজগারের সুবিধা না হওয়া পর্য্যন্ত বাড়ি-ভাড়া দিই কি ক'রে ?

এ সময়ে সাহায্য সত্যি সত্যিই পেলুম দাদার সেই মাসীমার কাছ থেকে—সেই যে বাতাসার কারখানার মালিক কুণ্ডু মশায়ের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী—সেবার যিনি আমাদের নিমন্ত্রণ ক'রে খাইয়েছিলেন। এই বিপদের সময় আমাদের কোন ব্রাহ্মণ প্রতিবেশীর কাছ থেকে সে-রকম সাহায্য আসে নি।

ক্রমে মাসের পর মাস যেতে লাগল।

সংসার কখনো করি নি, করবো না ভেবেছিলাম। কিন্তু যখন এ-ভাবে দাদার ভার আমার ওপর পড়ল, তখন দেখলাম এ এক শিক্ষা—মানুষের দৈনন্দিন অভাব-অনটনের মধ্যে দিয়ে, ছোটখাটো ত্যাগ স্বীকারের মধ্যে দিয়ে, পরের জন্যে খাটুনি ও ভাবনার মধ্যে দিয়ে, তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর পারিপার্শ্বিকের মধ্যে দিয়ে এই যে এতগুলি প্রাণীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও জীবন-যাত্রার গুরুভার নিজের ওপর নিয়ে সংসার-পথে চলার দুঃখ—এই দুঃখের একটা সার্থকতা আছে। আমার জীবন এর আগে চলেছিল শুধু নিজেকে কেন্দ্র ক'রে, পরকে সুখী ক'রে নিজেকে পরিপূর্ণ করার শিক্ষা আমায় দিয়েছে মালতী। পথে বেরিয়ে অনেক শিক্ষার মধ্যে এটিই আমার জীবনে সবচেয়ে বড় শিক্ষা।

কত জায়গায় চাকুরি খুঁজলাম। আমি যে লেখাপড়া জানি বাজারে তার দাম কানাকড়িও না। হাতের কোন কাজও জানি নে, সবতাতেই আনাড়ি। কুণ্ডু মহাশয়ের স্ত্রীর সুপারিশ ধরে বাতাসার কারখানাতেই খাতা লেখার কাজ যোগাড় করলাম—এ কাজটা জানতাম, কলকাতায় চাকুরির সময় মেজবাবুদের জমিদারী সেরেস্তায় শিখেছিলাম তাই রক্ষে। কিন্তু তাতে ক'টাকা আসে ? বৌদিদির মত গৃহিণী, তাই ওই সামান্য টাকার মধ্যে সংসার চালানো সম্ভব হয়েছে।

ফাল্গুন মাস পড়ে গেল। গাংনাপুরের হাটে আমি কাজে বেরিয়েছি গরুর গাড়ি ক'রে। মাইল-বারো দূর হবে, বেগুন পটলের বাজরার ওপরে চটের থলে পেতে নিয়ে আমি আর তনু চৌধুরী ব'সে। তনু চৌধুরীর বাড়ি নদীয়া মেহেরপুরে, এখানকার বাজারের সাহেবের পাটের গদির গোমস্তা গাংনাপুরে খরিদ্দারের কাছে মাল দেখাতে যাচ্ছে।

গল্প করতে করতে তনু চৌধুরী ঘুমিয়ে পড়ল বাজরার উপরেই। আমি চুপ ক'রে ব'সে আছি। পথের ধারে গাছে গাছে কচি পাতা গজিয়েছে, ঘেঁটুফুলের ঝাড় পথের পাশে মাঠের মধ্যে সর্ব্বত্র।

শেষরাত্রে বেরিয়েছিলুম, ভোর হবার দেরি নেই, কি সুন্দর ঝিরঝিরে ভোরের হাওয়া, পূব আকাশে জ্বলজ্বলে বৃশ্চিক রাশির নক্ষত্রগুলো বাঁশবনের মাথায় ঝুঁকে পড়েছে—যেন ওই দ্যুতিমান তারার মণ্ডলী পৃথিবীর সকল সুখদুঃখের বাস্তবতার বন্ধনের সঙ্গে ঊর্দ্ধ আকাশের সীমাহীন উদার মুক্তির একটা যোগ-সেতু নির্ম্মাণ করেছে—যেন আমাদের জীবনের ভারক্লিষ্ট যাত্রাপথের সংকীর্ণ পরিসরের প্রতি নক্ষত্র-জগৎ দয়াপরবশ হয়ে জ্যোতির দূত পাঠিয়েছে আমাদের আশার বাণী শোনাতে—যে কেউ উঁচু দিকে চেয়ে দেখবে চলতে চলতে, সে-ই দেখতে পাবে তার শাশ্বত মৃত্যুহীন রূপ। যে চিনবে, যে বলবে আমার সঙ্গে তোমার আধ্যাত্মিক যোগ আছে—আমি জানি আমি বিশ্বের সকল সম্পদের, সকল সৌন্দর্য্যের, সকল কল্যাণের উত্তরাধিকারী—তার কাছেই ওর বাণী সার্থকতা লাভ করবে।

এই প্রস্ফুট বন-কুসুম-গন্ধ আমার মনে মাঝে মাঝে কেমন একটা বেদনা জাগায়, যেন কি পেয়েছিলুম, হারিয়ে ফেলেছি। এই উদীয়মান সূর্য্যের অরুণ রাগ অতীত দিনের কত কথা মনে এনে দেয়। সব সময় আমি সে-সব কথা মনে স্থান দিতে রাজী হই নে, অতীতকে আঁকড়ে ধরে বসে থাকা আমার রীতি নয়। তাতে দুঃখ বাড়ে বই কমে না। হঠাৎ দেখি অন্যমনস্ক হয়ে কখন ভাবছি, দ্বারবাসিনীর আখড়া থেকে সেই ভোরে যে আমি চুপি চুপি পালিয়ে এসেছিলাম —কাউকে না জানিয়ে, মালতীকে তো একবার জানালে পারতাম—মালতীর ওপর এতটা নিষ্ঠুর আমি হয়েছিলুম কেমন ক'রে!

ওকথা চেপে যাই—মন থেকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করি। আগে যতটা কষ্ট হ'ত এসব চিন্তায়—এখন আর ততটা হয় না, এটা বেশ বুঝতে পারি। মালতীকে ভুলে যেতে থাকি —কিছুদিন পরে আরও যাব। এক সময়ে যে এত কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল সে আজ সপ্তসিন্ধু-পারের দেশের রাজকন্যার মত অবাস্তব হয়ে আসছে। হয়ত একদিন একেবারেই ভুলে যাব। জীবন চলে নিজের পথে নিজের মর্জ্জিমত—কারও জন্যে সে অপেক্ষা করে না। মাঝে মাঝে মনে আনন্দ আসে—যখন ভাবি বহুদিন আগে রাঢ়ের বননীল-দিগ্বলয়ে-ঘেরা মাঠের মধ্যে যে দেবতার স্বপ্ন দেখেছিলুম তিনি আমায় ভুলে যান নি। তাঁরই সন্ধানে বেরিয়েছিলাম, তিনি পথও দেখিয়েছিলেন। এই অনুদার রুদ্ধগতি জীবনেও তিনি আমার মনে আনন্দের বাণী পাঠিয়েছেন।

এতেও ঠিক বলা হ'ল না। সে আনন্দ যখন আসে তখন আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলি, তখন কি করি, কি বলি কিছু জ্ঞান থাকে না—সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। আজও ঠিক তাই হ'ল। আমি হঠাৎ পথের ধারে একটা ঝোপের ছায়ায় নেমে পড়লুম গাড়ি থেকে। তনু চৌধুরী বললে—ও কি, উঠে এস। তনু চৌধুরী জানে না আমার কি হয় মনের মধ্যে এসব সময়ে, কারও সাহচর্য্য এসব সময়ে আমার অসহ্য হয়, কারও কথায় কান দিতে পারি নে— আমার সকল ইন্দ্রিয় একটা অনুভূতির কেন্দ্রে আবদ্ধ হয়ে পড়ে—একবার চাই শালিখের ছানা-

গুলো খাদ্যকণা খুঁটে খাচ্ছে যেদিকে, তাদের অসহায় পক্ষ-ভঙ্গিতে কি যেন লেখা আছে—একবার চাই তিসির ফুলের রঙের আকাশের পানে—ঝলমল প্রভাতের সূর্য্যকিরণের পানে, শস্যশ্যামল পৃথিবীর পানে—কি রূপ! এই আনন্দের মধ্যে দিয়ে আমার দ্বিজত্ব, এক গৌরব-সমৃদ্ধ পবিত্র নবজন্ম।

মনে মনে বলি, আপনি আমায় এ-রকম করে দেবেন না, আমায় সংসার করতে দিন ঠাকুর। দাদার ছেলেমেয়েরা, বৌদিদি আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে ওদের অন্নের জন্যে, ওদের আমি তো ফেলে দিতে পারব না! এখন আমায় এ-রকম নাচাবেন না।

বৈকালের দিকে পায়ে হেঁটে গাংনাপুরের হাটে পৌছলাম। তনু চৌধুরী আগে থেকে ঠিক করেছে আমার মাথা খারাপ। রাস্তার মধ্যে নেমে পড়লাম কেন ও-রকম?

ফিরবার পথে সন্ধ্যার রাঙা মেঘের দিকে চেয়ে কেবলই মনে হ'ল ভগবানের পথ ঐ পিঙ্গল ও পাটল বর্ণের মেঘপর্ব্বতের ওপারে কোনো অজানা নক্ষত্রপুরীর দিকে নয়, তাঁর পথ আমি যেখান দিয়ে হাঁটছি, ওই কালু-গাড়োয়ান যে পথ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—এ পথেও! আমার এই পথে আমার সঙ্গে পা ফেলে তিনি চলেছেন এই মুহূর্ত্তে—আমি আছি তাই তিনি আছেন। যেখানে আমার অসাফল্য সেখানে তাঁরও অসাফল্য, আমার যেখানে জয়, সেখানে তাঁরও জয়। আমি যখন সুন্দরের স্বপ্ন দেখি, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আদর করি, পরের জন্য খাটি—তখন বুঝি ভগবানের বিরাট শক্তির সপক্ষে আমি দাঁড়িয়েছি—বিপক্ষে নয়। এই নীল আকাশ, অগ্নিকেতন উল্কাপুঞ্জ, বিদ্যুৎ আমায় সাহায্য করবে। বিশ্ব যেন সব সময় প্রাণপণে চেষ্টা করছে শিব ও সুন্দরের মধ্যে নিজের সার্থকতাকে খুঁজতে, কিন্তু পদে পদে সে বাধা পাচ্ছে কি ভীষণ! বিশ্বের দেবতা তবুও হাল ছাড়েন নি—তিনি অনন্ত ধৈর্য্যে পথ চেয়ে আছেন। নীরব সেবাব্রত সূর্য্য ও চন্দ্র আশায় আশায় আছে, সমগ্র অদৃশ্যলোক চেয়ে আছে—আমিও ওদের পক্ষে থাকব। বিশ্বের দেবতার মনে দুঃখ দিতে পারব না। জীবনে মানুষ ততক্ষণ ঠিক শেখে না অনেক জিনিসই, যতক্ষণ সে দুঃখের সম্মুখীন না হয়। আগে স্রোতের শেওলার মত ভেসে ভেসে কত বেড়িয়েছি জীবন-নদীর ঘাটে ঘাটে—তটপ্রান্তবর্ত্তী যে মহীরুহটি শত স্মৃতিতে তিলে তিলে বর্দ্ধিত হয়ে স্নানার্থিনীদের ছায়াশীতল আশ্রয় দান করেছে—সে হয়ত বৈচিত্র্য চায় নি তার জীবনে—কিন্তু একটি পরিপূর্ণ শতাব্দীর সূর্য্য তার মাথায় কিরণ বর্ষণ করেছে, তার শাখা-প্রশাখায় ঋতুতে ঋতুতে বনবিহঙ্গদের কৌতুক বিলাস কলকাকলী নিজের আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে—তার মৃদু ও ধীর, পরার্থমুখী গম্ভীর জীবন-ধারা নীল আকাশের অদৃশ্য আশীর্ব্বাদতলে এই একটি শতাব্দী ধরে বয়ে এসেছে—বৈচিত্র্য যেখানে হয়ত আসে নি—গভীরতায় সেখানে করেছে বৈচিত্র্যের ক্ষতিপূরণ। প্রতিদিনের সূর্য্য শুকতারার আলোকোজ্জ্বল রাজপথে রাঙা ধূলি উড়িয়ে রজনীর অন্ধকারে অদৃশ্য হন—প্রতিদিনই সেই সন্ধ্যায় আমার মনে কেমন এক প্রকার আনন্দ আসে—দেখি যে পুকুরের ধারে বর্ষার ব্যাঙের ছাতা সূর্য্যের অমৃত কিরণে বড় হয়ে পুষ্ট হয়ে উঠেছে—দেখি উইয়ের ঢিবিতে নতুন পাখা ওঠা উইয়ের দল অজানা বায়ুলোক ভেদ ক'রে হয়েছে মরণের যাত্রী, শরতের কাশবন জীবন-সৃষ্টির বীজ দূরে দূরে, দিকে দিগন্তে ছড়িয়ে দিয়ে রিক্ততার মধ্যেই পরম কাম্য সার্থকতাকে লাভ করেছে—দারিদ্র্য বা কষ্ট তুচ্ছ, পৃথিবীর সমস্ত বিলাস-লালসাও তুচ্ছ, আমি কিছুই গ্রাহ্য করি নে যদি এই জাগ্রত চেতনাকে কখনও না হারাই—যদি হে বিশ্বদেবতা, বাল্যে তুষারাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘাকে যেমন সকালবেলাকার সূর্য্যের আলোয় সোনার রঙে রঞ্জিত হ'তে দেখতুম—তেমনি যদি আপনি আপনার ভালবাসার রঙে আমার প্রাণ রাঙিয়ে তোলেন—আমিও আপনাকে ভালবাসি যদি—তবে সকল সংকীর্ণতাকে, দুঃখকে

জয় ক'রে আমি আমার বিরাট চেতনার রথচক্র চালিয়ে দিই শতাব্দীর পথে, জন্মকে অতিক্রম ক'রে মৃত্যুর পানে, মৃত্যুকে অতিক্রম ক'রে আবার আনন্দ-ভরা নবজন্মের কোন অজানা রহস্যের আশায়।

॥ ১৫ ॥

দাদার মৃত্যুর মাস তিনেক পরে বাতাসার কারখানার কুণ্ডুমশায় হঠাৎ মারা গেলেন। এতে আমাকে বিপদে পড়তে হ'ল। কুণ্ডুমশায়ের প্রথম পক্ষের ছেলেরা এসে কারখানা ও বাড়িঘর দখল করলে। কুণ্ডুমশায়ের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীকে নিতান্ত ভালমানুষ পেয়ে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে তার হাতের হাজার দুই নগদ টাকা বার ক'রে নিলে। টাকাগুলো হাতে না আসা পর্য্যন্ত ছেলেরা বৌয়েরা সৎশাশুড়ীকে খুব সেবাযত্ন করেছিল, টাকা হস্তগত হওয়ার পরে ক্রমে ক্রমে তাদের মূর্ত্তি গেল বদলে। যা দুর্দ্দশা তার শুরু করলে ওরা! বাড়ির চাকরাণীর মত খাটাতে লাগল, গালমন্দ দেয়, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে। আমি একদিন গোপনে বললাম—মাসীমা, পঞ্চুকে ডাকঘরের পাস-বই দিও না বা কোন সই চাইলেও দিও না। তুমি অত বোকা কেন তাই ভাবি! আগের টাকাগুলো ওদের হাতে দিয়ে বসলেই বা কি বুঝে?

ডাকঘরের পাস-বইয়ের জন্যে পঞ্চু অনেক পীড়াপীড়ি করেছিল। শেষ পর্য্যন্ত হয়ত মাসীমা দিয়েই দিত—আমি সেখানা নিজের কাছে এনে রাখলাম গোপনে। কত টাকা ডাকঘরে আছে না জানতে পেরে পঞ্চু আরও ক্ষেপে উঠল। বেচারীর দুর্দ্দশার একশেষ ক'রে তুললে। কুণ্ডুমশায়ের স্ত্রীর বড় সাধ ছিল সৎছেলেরা তাকে মা ব'লে ডাকে, সে সাধ তারা ভাল করেই মেটালে! একদিন আমার চোখের সামনে সৎমাকে ঝগড়া ক'রে খিড়কীদোর দিয়ে বাড়ির বার ক'রে দিলে। আমি মাসীমাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলাম, চিঠি লিখে তার এক দূর-সম্পর্কের ভাইকে আনালাম—সে এসে মাসীমাকে নিয়ে গেল। আমার অসাক্ষাতে মাসীমা আবার বৌদিদির হাতে একখানা একশো টাকার নোট গুঁজে দিয়ে ব'লে গেল যাবার সময়—জিতু মাসীমা বলেছিল, আমি তিলির মেয়ে, কিন্তু বেঁচে থাক সে, ছেলের কাজ করেছে। আমার জন্যেই তার কারখানার চাকরিটা গেল, যত দিন অন্য কিছু না হয়, এতে চালিয়ে নিও, বৌমা। আমি দিচ্ছি এতে কিছু মনে ক'রো না, আমার তিন কুলে কেউ নেই, নিতুর বৌয়ের হাতে দিয়ে সুখ যদি পাই, তা থেকে আমায় নিরাশ ক'রো না।

পঞ্চু কারখানা থেকে আমায় ছাড়িয়ে দিলেও আমি আর একটা দোকানে চাকরি পেলাম সেই মাসেই। সৎমায়ের সঙ্গে ওরকম ব্যবহার করার দরুন কালীগঞ্জে কেউই ওদের ওপর সন্তুষ্ট ছিল না, মাসীমার অমায়িক ব্যবহারে সবাই তাকে ভালবাসত। তবে পঞ্চুদের টাকার জোর ছিল, সব মানিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে একদিন সীতার শ্বশুরবাড়ি গেলাম সীতাকে দেখতে। দাদা মারা যাওয়ার পরে ওর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি, কারণ এক বেলার জন্যেও ওরা সীতাকে পাঠাতে রাজী হয় নি। সীতা দাদার নাম ক'রে অনেক চোখের জল ফেললে। দাদার সঙ্গে ওর শেষ দেখা মায়ের মৃত্যুর সময়ে। তার পর আমার নিজের কথা অনেক জিজ্ঞেস করলে। সন্ধ্যাবেলায় ও রান্নাঘরে বসে রাঁধছিল, আমি কাছে বসে গল্প করছিলাম। ওর শ্বশুরবাড়ির অবস্থা ভাল না, বসতবাটিটা বেশ বড়ই বটে, কিন্তু বাস করবার উপযুক্ত কুঠুরী মাত্র চারটি, তাদেরও নিতান্ত জীর্ণ অবস্থা,

চুনবালি-খসা দেওয়াল, কার্নিসের ফাটলে বট অশ্বথের গাছ। রান্নাঘরের এক দিকের ভাঙা দেওয়াল বাঁশের চাঁচ দিয়ে বন্ধ, কার্ত্তিক মাসের হিম তাতে আটকাচ্ছে না। সীতার বড়-জা ওদিকে আর একটা উনুনে মাটির খুলিতে টাটকা খেজুররস জ্বাল দিচ্ছিলেন, তিনি বললেন—যা হবার হয়ে গেল ভাই, এইবার তুমি একটা বিয়ে কর দিকি? এই গাঁয়েই বাঁড়ুয্যেবাড়িতে ভাল মেয়ে আছে, যদি মত দাও কালই মেয়ে দেখিয়ে দিই।

সীতা চুপ ক'রে রইল। আমি বললাম—একটা সংসার ঘাড়ে পড়েছে, তাই অতি কষ্টে চালাই, আবার একটা সংসার চালাব কোথা থেকে দিদি?

সীতা বললে—বিয়ে আর কাউকে করতে বলি নে মেজদা, এ অবস্থায় বড়দারও বিয়ে করা উচিত হয় নি। তোমারও হবে না। তার চেয়ে তুমি সন্নিসি হয়ে বেড়াচ্ছিলে, ঢের ভাল করেছিলে। আচ্ছা মেজদা, তুমি নাকি খুব ধার্ম্মিক হয়ে উঠেছ সবাই বলে?

আমি হেসে বললাম—অপরের কথা বিশ্বাস করিস্ নাকি তুই? পাগল! ধার্ম্মিক হলেই হ'ল অমনি—না? আমি কি ছিলাম, না-ছিলাম তুই তো সব জানিস সীতা। আমার ধাতে ধার্ম্মিক হওয়া সয় না, তবে আমার জীবনের আর একটা কথা তুই জানিস নে, তোকে বলি শোন্।

ওদের মালতীর কথা বললুম, দু-জনেই একমনে শুনলে। ওর বড়-জা বললে—এই তো ভাই মনের মত মানুষ তো পেয়েছিলে—ওরকম ছেড়ে এলে কেন?

আমি বললাম—এক তরফা। তাতে দুঃখই বাড়ে, আনন্দ পাওয়া যায় না। সীতা তো সব শুনলি, তোর কি মনে হয়।

সীতা মুখ টিপে হেসে বললে—এক তরফা ব'লে মনে হয় না। তোমার সঙ্গে অত মিশত না তা হ'লে—বা তোমার সঙ্গে কোথাও যেত না।

একটু চুপ ক'রে থেকে বললে—তুমি আর একবার সেখানে যাও, মেজদা। আমি ঠিক বলছি তুমি চলে আসবার পরেই সে বুঝতে পেরেছে তার আখড়া নিয়ে থাকা ফাঁকা কাজ। ছেলেমানুষ, নিজের মন বুঝতে দেরি হয়। এইবার একবার যাও, গিয়ে তাকে নিয়ে এস তো?

সীতা নিজের কথা বিশেষ কিছু বলে না, কিন্তু ওর ওই শান্ত মৌনতার মধ্যে ওর জীবনের ট্র্যাজেডি লেখা রয়েছে। ওর স্বামী সত্যিই অপদার্থ, সংসারে যথেষ্ট দারিদ্র্য, কখনও বাড়ি থেকে বেরিয়ে দু-পয়সা আনবার চেষ্টা করবে না। এক ধরনের নিষ্কর্ম্মা লোকেরা মনের আলস্য ও দুর্ব্বলতা প্রসূত ভয় থেকে পূজা-আচ্চার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে, সীতার স্বামীও তাই। সকালে উঠে ফুল তুলে পূজো করবে, স্নানের সময় ভুল সংস্কৃতে স্তবপাঠ করবে, সব বিষয়ে বিধান দেবে, উপদেশ দেবে। একটু আদা-চা খেতে চাইলাম—সীতাকে বারণ ক'রে ব'লে দিলে—রবিবারে আদা খেতে নেই! দুপুরে খেয়ে উঠেই বিছানায় গিয়ে শোবে, বিকেল চারটে পর্য্যন্ত ঘুমুবে—এত ঘুমুতেও পারে! এদিকে আবার ন'টা বাজতে না বাজতে রাত্রে বিছানা নেবে। সীতা বই পড়ে ব'লে তাকে যথেষ্ট অপমান সহ্য করতে হয়। বই পড়লে মেয়েরা কুলটা হয়, শাস্ত্রে নাকি লেখা আছে!

দেখলাম লোকটা অত্যন্ত দুর্ম্মুখও বটে। কথায় কথায় আমার মুখে একবার যীশুখৃষ্টের নাম শুনে নিতান্ত অসহিষ্ণু ও অভদ্র ভাবে বলে উঠল—ওসব ম্লেচ্ছ ঠাকুর দেবতার নাম ক'রো না এখানে, এটা হিন্দুর বাড়ি, ওসব নাম এখানে চলবে না।

সীতার মুখের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে রইলাম, নইলে এ কথার পর আমি এ বাড়িতে আর জলস্পর্শ করতাম না। সীতা ওবেলা পায়েস পিঠে খাওয়াবার আয়োজন করছে আমি জানি,

তার আদরকে প্রত্যাখ্যান করতে কিছুতেই মন সরল না। আমি রাগ ক'রে চলে গেলে ওর বুকে বড় বিঁধবে। ওকে একেবারেই আমরা জলে ভাসিয়ে দিয়েছি সবাই মিলে। সীতা একটাও অনুযোগের কথা উচ্চারণ করলে না। কারুর বিরুদ্ধেই না। বৌদিদিকে ব'সে ব'সে একখানা লম্বা চিঠি লিখলে, আসবার সময় আমার হাতে দিয়ে বললে—আমায় পাঠাবে না কালীগঞ্জে, তুমি মিছে ব'লে কেন মুখ নষ্ট করবে মেজদা! দরকার নেই। তার পর জল-ভরা হাসি-হাসি চোখে বললে—আবার কবে আসবে? ভুলে থেকো না মেজদা, শীগগির আবার এসো।

পথে আসতে আসতে দুপুরের রোদে একটা গাছের ছায়ায় বসে ওর কথাই ভাবতে লাগলুম। উম্‌প্লাঙের মিশন-বাড়ির কথা মনে পড়ল, মেমেরা সীতাকে কত কি ছুঁচের কাজ, উল-বোনার কাজ শিখিয়েছিল যত্ন ক'রে! কার্ট রোডের ধারে নদীখাতের মধ্যে বসে আমি আর সীতা কত ভবিষ্যতের উজ্জ্বল ছবি এঁকেছি ছেলেমানুষী মনে—কোথায় কি হয়ে গেল সব! মেয়েরাই ধরা পড়ে বেশী, জগতের দুঃখের বোঝা ওদেরই বইতে হয় বেশী ক'রে। সীতার দশা যখনই ভাবি, তখনই তাই আমার মনে হয়।

মনটাতে আমার খুব কষ্ট হয়েছে সীতার স্বামীর একটা কথায়। 'সে আমায় লক্ষ্য ক'রে একটা শ্লোক বললে কাল রাত্রে। তার ভাবার্থ এই—গাছে অনেক লাউ ফলে, কোন লাউয়ের খোলে কৃষ্ণনাম গাইবার একতারা হয়, কোন লাউ আবার বাবুর্চ্চি র'াধে গোমাংসের সঙ্গে।

তার বলবার উদ্দেশ্য, আমি হচ্ছি শেষোক্ত শ্রেণীর লাউ। কেন না, আমি ব্রাহ্মণ হয়ে ব্রাহ্মণের আচার মানি নে, দেবদেবীর পূজো-আচ্চা করি নে ওর মত। ওই সব কারণে ও আমাকে অত্যন্ত কৃপার চক্ষে দেখে বুঝলাম এবং বোধ হয় নিজেকে মনে মনে হরিনামের একতারা বলেই ভাবে।

ভাবুক, তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তার মতের সঙ্গে মিল না হ'লেই সে যদি আমায় ঘৃণা করে তবে আমি নিতান্ত নাচার। কোন্ অপরাধে আমি বাবুর্চ্চির হাতে-র'াধা লাউ? ছেলেবেলায় হিমালয়ের ওক্ পাইন বনে তপস্যাস্তব্ধ কাঞ্চনজঙ্ঘার মূর্ত্তিতে ভগবানের অন্য রূপ দেখেছিলাম, তাই? রাঢ়দেশের নির্জ্জন মাঠের মধ্যে সন্ধ্যায় সেবার সেই এক অপরূপ দেবতার ছবি মনে এঁকে গিয়েছে, তাই? সেই অজানা নামহীন দেবতাকে উদ্দেশ ক'রে বলি—যে যা বলে বলুক, আমি আচার মানি নে, অনুষ্ঠান মানি নে, সম্প্রদায় মানি নে, কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমত মানি নে, গোঁড়ামি মানি নে,—আমি আপনাকে মানি। আপনাকে ভালবাসি। আপনার এই বননীল দিগন্তের রূপকে ভালবাসি, বিশ্বের এই পথিক রূপকে ভালবাসি। আমার এই চোখ, এই মন জন্মজন্মান্তরেও এই রকম রেখে দেবেন। কখনও যেন ছোট ক'রে আপনাকে দেখতে শিখি নে। আর আমার উপাসনার মন্দির এই মুক্ত আকাশের তলায় যেন চিরযুগ অটুট থাকে। এই ধর্ম্মই আমার ভাল।

বাড়ি ফিরে দেখি বৌদিদি অত্যন্ত অসুখে পড়েছে।

মহাবিপদে পড়ে গেলাম। কারও সাহায্য পাই নে, ছেলেমেয়েরা ছোট ছোট—দাদার বড় মেয়েটি আট বছরের হ'ল, সে সমস্ত কাজ করে, আমি র'াধি আবার বৌদিদির সেবা-শুশ্রূষা করি। রোগিণীর ঠিকমত সেবা পুরুষের দ্বারা সম্ভব নয়, তবুও আমি আর খুকীতে মিলে যতটা পারি করি।

বৌদিদির অসুখ দিন-দিন বেড়ে উঠতে লাগল। সংসারে বিশৃঙ্খলার একশেষ—বৌদিদি

অচৈতন্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে, ছেলেমেয়েরা যা খুশী তাই করচে, ঘরের জিনিসপত্র ভাঙছে, ফেলছে, ছড়াচ্ছে—এখানে নোংরা, ওখানে অপরিষ্কার—কোন্ জিনিস কোথায় থাকে কেউ বলতে পারে না, হঠাৎ অসময়ে আবিষ্কার করি, ঘড়ায় খাবার জল নেই, কি লণ্ঠন জ্বালাবার তেল নেই। বাজার নিকটে নয়, অন্ততঃ দেড় মাইল দূরে এবং বাজারে যেতে হবে আমাকেই। সুতরাং বেশ বোঝা যাবে অসময়ে এসব আবিষ্কারের অর্থ কি।

প্রায় এক মাস এই ভাবে কাটল। এই এক মাসের কথা ভাবলে আমার ভয় হয়। আমি জানতুম না কখনও যে জগতে এত দুঃখ আছে বা সংসারের দায়িত্ব এত বেশী। রাত দিন কখন কাটে ভুলে গেলাম, দিন, বার, তারিখের হিসেব হারিয়ে ফেলেছিলুম—কলের পুতুলের মত ডাক্তারের কাছে যাই, রোগীর সেবা করি, চাকরি করি, ছেলেমেয়েদের দেখা-শুনো করি। এই দুঃসময়ে দাদার আট বছরের মেয়েটা আমাকে অদ্ভুত সাহায্য করলে। সে নিজে রাঁধে, মায়ের পথ্য তৈয়ারী করে, মায়ের কাছে বসে থাকে—আমি যখন কাজে বেরিয়ে যাই ওকে ব'লে যাই ঠিক সময় ওষুধ খাওয়াতে, কি পথ্য দিতে।

মেজাজ আমার কেমন খারাপ হয়ে গিয়েছিল বোধ হয়, একদিন কোথা থেকে এসে দেখি রোগিণীর সামনের ওষুধের গ্লাসে ওষুধ রয়েছে। খুকীকে ব'লে গিয়েছি খাওয়াতে কিন্তু সে ওষুধ গ্লাসে ঢেলে মায়ের পাশে রেখে দিয়ে কোথায় চলে গিয়েছে। দেখে হঠাৎ রাগে আমার আপাদমস্তক জ্বলে উঠল আর ঠিক সেই সময় খুকী আঁচলে কি বেঁধে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকল। আমি রুক্ষ স্বরে বললাম—খুকী, এদিকে এস—

আমার গলার সুর শুনে খুকীর মুখ শুকিয়ে গেল ভয়ে। সে ভয়ে ভয়ে দু-এক পা এগিয়ে আসতে লাগল, বরাবর আমার চোখের দিকে চোখ রেখে। আমি বললাম—তোর মাকে ওষুধ খাওয়াস নি কেন? কোথায় বেরিয়েছিলি বাড়ি থেকে?

সে কোন জবাব দিতে পারল না—ভয়ে নীলবর্ণ হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ কি যে রাগ হ'ল চণ্ডালের মত! তাকে পাখার বাঁট দিয়ে আথালি-পাথালি মারতে লাগলাম—প্রথম ভয়ে মার খেয়েও সে কিছু বললে না, তার পরে আমার মারের বহর দেখে সে ভয়ে কেঁদে উঠে বললে—ও কাকাবাবু, আপনার পায়ে পড়ি, আমায় আর মারবেন না, আর কখনও এমন করবো না—

তার হাতের মুঠো আল্‌গা হয়ে আঁচলের প্রান্ত থেকে দুটো মুড়ি পড়ে গেল মেঝেতে। সে মুড়ি কিনতে গিয়েছিল এক পয়সার, খিদে পেয়েছিল ব'লে। ভয়ে তাও যেন তার মনে হচ্ছে কি অপরাধই সে ক'রে ফেলেছে!

আমার জ্ঞান হঠাৎ ফিরে এল। মুড়ি ক'টা মেঝেতে পড়ে যাওয়ার ঐ দৃশ্যে বোধ হয়। নিজেকে সামলে নিয়ে ঘর থেকে বার হয়ে গেলাম। সমস্ত দিন ভাবলাম—ছি, এ কি ক'রে বসলাম! আট বছরের কচি মেয়েটা সারাদিন ধরে খাটছে, এক পয়সার মুড়ি কিনতে গিয়েছে আর তাকে এমনি ক'রে নির্ম্মমভাবে প্রহার করলাম কোন্ প্রাণে?

জীবনে কত লোকের কত বিচার করেছি তাদের দোষগুণের জন্যে—দেখলাম কাউকে বিচার করা চলে না—কোন্ অবস্থার মধ্যে প'ড়ে কে কি করে সে কথা কি কেউ বুঝে দেখে?

বৌদিদির অসুখ ক্রমে অত্যন্ত বেড়ে উঠল। দিন-দিন বিছানার সঙ্গে মিশে যেতে লাগল দেখে ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে যাচ্ছে। এদিকে এক মহা দুশ্চিন্তা এসে জুটল, যদি বৌদিদি না-ই বাঁচে—এই ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি কি করব? বিশেষ ক'রে কোলের মেয়েটাকে নিয়ে কি করি? ছোট্ট খুকী যোটে এই দশ মাসের—কি সুন্দর গড়ন,

মুখ, কি চমৎকার মিষ্টি হাসি! এই দেড় মাস তার অযত্নের একশেষ হচ্ছে—উঠোনের নারকোলতলায় চটের থলে পেতে তাকে রোদ্দুরে শুইয়ে রাখা হয়—বড় খুকী সব সময় তাকে দেখতে পারে না—কাঁদলে দেখবার লোক নেই, মাতৃস্তন্য বন্ধ এই দেড় মাস—হর্লিক্স্ খাইয়ে অতি কষ্টে চলছে। রাত্রে আমার পাশে তাকে শুইয়ে রাখি, মাঝরাত্রে উঠে এমন কান্না শুরু করে মাঝে মাঝে—ঘুমের ঘোরে উঠে তাকে চাপড়ে চাপড়ে ঘুম পাড়াই—বড় খুকীকে আর ওঠাই নে। রাত্রে তো প্রায়ই ঘুম হয় না, রোগীকে দেখা-শুনো করতেই রাত কাটে—মাঝে মাঝে একটু ঘুমিয়ে পড়ি। পাড়ায় এত বৌ-ঝি আছে—দেখে বিস্মিত হয়ে গেলাম কেউ কোনদিন বলে না খুকীকে নিয়ে গিয়ে একবার মাইয়ের দুধ দিই। আমি একা কত দিকে যাব—তা ছাড়া আমার হাতের পয়সাও ফুরিয়েছে। এই দেড় মাসের মধ্যে সংসারের রূপ একেবারে বদলে গিয়েছে আমার চোখে—আমি ক্রমেই আবিষ্কার করলাম মানুষ মানুষকে বিনাস্বার্থে কখনও সাহায্য করে না—আমি দরিদ্র, আমার কাছে কারুর কোন স্বার্থের প্রত্যাশা নেই, কাজেই আমার বিপদে কেউ উঁকি মেরেও দেখতে এল না। না আসুক, কিন্তু কোলের খুকীটাকে নিয়ে যে বড় মুশকিলে পড়ে গেলাম! ও দিন-দিন আমার চোখের সামনে রোগা হয়ে যাচ্ছে, ওর অমন কাঁচা সোনার রঙের ননীর পুতুলের মত ক্ষুদে দেহটিকে যেন কালি মেড়ে দিচ্ছে দিন-দিন—কি করবো ভেবে পাই নে, আমি একেবারেই নিরুপায়! স্তন্যদুগ্ধ আমি ওকে দিতে তো পারি নে!

কিন্তু এর মধ্যে আবার মুশকিল এই হ'ল যে স্তন্যদুগ্ধ তো দূরের কথা, গরুর দুধও গ্রামে পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠল। গোয়ালারা ছানা তৈরি ক'রে কলকাতায় চালান দেয়, দুধ কেউ বিক্রী করে না। একজন গোয়ালার বাড়িতে দুধের বন্দোবস্ত করলাম—সে বেলা বারোটা-একটার এদিকে দুধ দিত না। খুকী ক্ষিদেতে ছট্‌ফট্ করত, কিন্তু চুপ ক'রে থাকত—একটুও কাঁদত না। আমার বুড়ো-আঙুলটা ধরে তার মুখের কাছে সে সময় ধরলেই সে কচি অসহায় হাত দুটি দিয়ে আমার আঙুলটা ধরে তার মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে ব্যগ্র, ক্ষুধার্ত ভাবে চুষত—তা থেকেই বুঝতাম মাতৃস্তন্য-বঞ্চিত এই হতভাগ্য শিশুর স্তন্যক্ষুধার পরিমাণ।

ওকে কেউ দেখতে পারে না—দু-একটি পাড়ার মেয়ে যারা বেড়াতে আসত, তারা ওকে দেখে নানা রকম মন্তব্য করত। ওর অপরাধ এই যে ও জন্মাতেই ওর বাবা মারা গেল, ওর মা শক্ত অসুখে পড়ল। খুকীর একটা অভ্যাস যখন-তখন হাসা—কেউ দেখুক আর না-ই দেখুক, সে আপন মনে ঘরের আড়ার দিকে চেয়ে ফিক্ ক'রে একগাল হাসবে। তার সে ক্ষুধাশীর্ণ মুখের পবিত্র, সুন্দর হাসি কতবার দেখেছি—কিন্তু সবাই বলত, আহা কি হাসে, আর হাসতে হবে না, কে তোমার হাসি দেখছে? উঠোনের নারকোলতলায় চট পেতে রৌদ্রে তাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে, কত দিন দেখেছি নীল আকাশের দিকে চোখ দুটি তুলে সে আপন মনে অবোধ হাসি হাসছে। সে অকারণ, অপার্থিব হাসি কি অপূর্ব্ব অর্থহীন খুশিতে ভরা! ছোট্ট দেহটি দিন-দিন হাড়সার হয়ে যাচ্ছে, অমন সোনার রং কালো হয়ে গেল, তবুও ওর মুখে সেই হাসি দেখছি মাঝে মাঝে—কেন হাসে, কি দেখে হাসে কে বলবে?

এক এক দিন রাত্রে ঘুম ভেঙে দেখি ও খুব চেঁচিয়ে কাঁদছে। মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে আবার ঘুমিয়ে পড়ত। বড় খুকীকে বলতাম—একটু দুধ দে তো গরম ক'রে, হয়ত খিদেয় কাঁদছে। সব দিন আবার রাত্রে দুধ থাকত না। সেদিন আঙুল চুষিয়ে অনেক কষ্টে ঘুম পাড়াতে হ'ত। একদিন সকালে ওর কান্না দেখে আর থাকতে পারলাম না—রোগীর সেবা ফেলে দু-ক্রোশ তফাতের একটা গ্রাম থেকে নগদ পয়সা দিয়ে আধসের দুধ যোগাড় ক'রে নিয়ে

এসে ওকে খাওয়ালুম। গোয়ালাকে কত খোশামোদ করেও বেলা বারোটার আগে কিছুতেই দুধ দেওয়ানো গেল না।

মানুষ যদি বিবেচনাহীন হয়, নির্ব্বোধ হয়, তবে বাইরে থেকে তাকে পশুর চেয়েও নিষ্ঠুর মনে করা দোষের নয়। যখন খুকীর দুধের জন্যে আমি সারা গ্রামখানার প্রত্যেক গোয়ালা-বাড়ি খুঁজে বেড়িয়েছি, যদি সকালের দিকে কেউ একটু দুধ দিতে পারে—যে বলেছে হয়ত ওখানে গেলে পাওয়া যাবে সেখানেই ছুটে গিয়েছি, আগাম টাকা দিতে চেয়েছি কিন্তু প্রতিবারই বিফল হয়ে ফিরে এসেছি—সে সময় ঠিক আমার বাড়ির পাশেই সুরপতি মুখুয্যের বাড়িতে দেড় সের ক'রে দুধ হ'ত। সুরপতি সস্ত্রীক বিদেশে থাকেন, বাড়িতে থাকেন তাঁর বিধবা ভাজ নিজের একমাত্র বিধবা মেয়ে নিয়ে। এঁদের অবস্থা ভাল, দোতলা কোঠা বাড়ি, ছ-সাতটা গরু, জমিজমা, ধানভরা গোলা। সকালে মায়ে-ঝিয়ের চা খাবার জন্যে দুধ দোয়া হ'ত, মেয়েটা নিজেই গাই দুইতে জানে, সকালে আধ সের দুধ হয়, দুপুরে বাকী এক সের। ওঁরা জানেন যে দুধের জন্যে খুকীর কি কষ্ট যাচ্ছে, তাঁদের সঙ্গে আমার এ সম্বন্ধে কথাও হয়েছে অনেকবার। আমায় অনেকবার প্রৌঢ়া মহিলাটি জিজ্ঞেসও করেছেন আমি দুধের কোন সুবিধে করতে পারলাম কি না—দু-চার দিন সকালে ডেকে আমায় চা-ও খাইয়েছেন, কিন্তু কখনও বলেন নি, এই দুধটুকু নিয়ে গিয়ে খুকীকে খাওয়াও ততক্ষণ। আমিও কখনও তাঁদের বলি নি এ নিয়ে, প্রথমতঃ আমার বাধ-বাধ ঠেকেছে, দ্বিতীয়তঃ আমার মনে হয়েছে, এঁরা সব জেনেও যখন নিজে থেকে দুধের কথা বলেন নি, তখন আমি বললেও এঁরা ছলছুতো তুলে দুধ দেবেন না। তবুও আমি এঁদের নিষ্ঠুর বা স্বার্থপর ভাবতে পারি নে—বিবেচনাহীনতা ও কল্পনাশক্তির অভাব এঁদের এরকম ক'রে তুলেছে।

কতবার ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছি—"ওর কষ্ট আমি আর দেখতে পারি নে, আপনি ওকে একটু দুধ দিন।"

ওর মুখের সে অবোধ উল্লাসের হাসি প্রতিবার ছুরির মত আমার বুকে বিঁধেছে। কতবার মনে মনে ভেবেছি আমি যদি দেশের ডিক্‌টেটর হতাম, তবে আইন ক'রে দিতাম শিশুদের দুধ না দিয়ে কেউ আর কোন কাজে দুধকে লাগাতে পারবে না।

কতবার ভেবেছি বৌদিদি যদি না বাঁচে, এই কচি শিশুকে আমি কি ক'রে মানুষ করব? স্তন্যদুগ্ধ একে কেউ দেবে না এই পাড়াগাঁয়ে, বিলিয়ে দিলেও মেয়েসন্তান কেউ নিতে চাইবে না—নিতান্ত নীচু জাত ছাড়া। আটঘরাতে থাকতে ছেলেবেলায় এরকম একটা ব্যাপার শুনেছিলুম—গ্রামের শশীপদ ভট্‌চাজের কেউ ছিল না—এদিকে শিশু দুটিই মেয়ে, অবশেষে যদু মুচির বৌ এসে মেয়ে দুটিকে নিয়ে গিয়েছিল।

এই সোনার খুকীকে সেই রকম বিলিয়ে দিতে হবে পরের হাতে? কত বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছি ঘুমন্ত শিশুর মুখের দিকে চেয়ে এই ভাবনায়। এই বিপদে আমার প্রায়ই মনে হয়েছে মালতীর কথা। মালতী আমায় এ বিপদ থেকে উদ্ধার করবে, সে কোন উপায় বার করবেই, যদি খুকীকে বুকে নিয়ে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াই। সে চুপ ক'রে থাকতে পারবে না। তার ওপর অভিমান ক'রে চলে এসেছিলাম, দেখা পর্য্যন্ত ক'রে আসি নি আসার সময়—আর তার পর এতদিন কোন খোঁজখবর নিই নি—একখানা চিঠি পর্য্যন্ত দিই নি, আমার বিপদের সময় সে আমার সব দোষ ক্ষমা ক'রে নেবে!

কিন্তু খুকী আমার সব চিন্তা থেকে মুক্ত করে দিলে। তার যে হাসি কেউ দেখতে চাইত না, একদিন শেষরাত্রি থেকে সে হাসি চিরকালের জন্য মিলিয়ে গেল। অল্পদিনের জন্যে এসেছিল

কিন্তু বড় কষ্ট পেয়ে গেল। কিছুই সে চায় নি, শুধু একটু মাতৃস্তন্য, কি লোলুপ হয়ে উঠেছিল তার জন্যে, তার ক্ষুদে ক্ষুদে হাত দুটি দিয়ে ব্যগ্রভাবে আমার আঙুলটা আঁকড়ে ধরে কি অধীর আগ্রহে সেটা চুষত মাতৃস্তন ভেবে! আমারও কি কম কষ্ট গিয়েছে অবোধ শিশুকে এই প্রতারণা করতে? জগতে কত লোক কত সঙ্গত অসঙ্গত খেয়াল পরিতৃপ্ত করবার সুযোগ ও সুবিধা পাচ্ছে, আর একটি ক্ষুদ্র অস্ফুটবাক্ শিশুর নিতান্ত ন্যায্য একটা সাধ অপূর্ণ রয়ে গেল কেন তাই ভাবি।

॥ ১৬ ॥

বৌদিদি ক্রমে সেরে উঠলেন। কিছুদিন পরে আমার হঠাৎ একদিন জ্বর হ'ল। ক্রমে জ্বর বেঁকে দাঁড়াল, আমি অজ্ঞান-অচৈতন্য হয়ে পড়লাম। দিনের পর দিন যায়, জ্বর ছাড়ে না। একুশ দিন কেটে গেল। দিনের রাতের জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি যেন, কখন রাত কখন দিন বুঝতে পারি নে সব সময়। মাঝে মাঝে চোখ মেলে দেখি বাইরের রোদ একটু একটু ঘরে এসেছে, তখন বুঝি এটা দিন। বিছানার ওপাশটা ক্রমশঃ হয়ে গেল বহুদূরের দেশ, আফ্রিকা কি জাপান, ওখানে পৌঁছনো আমার শরীর ও মনের শক্তির বাইরে। অধিকাংশ সময়ই ঘোর-ঘোর ভাবে কাটে—সে অবস্থায় যেন কত দেশ বেড়াই, কত জায়গায় যাই। যখন যাই তখন যেন আর আমার অসুখ থাকে না, সম্পূর্ণ সুস্থ, আনন্দে মন ভরে ওঠে, রোগশয্যা স্বপ্ন ব'লে মনে হয়। ছেলেবেলাকার সব জায়গাগুলোতে গেলাম যেন, আটঘরার বাড়িও বাদ গেলো না। হঠাৎ ঘোর কেটে যায়, দেখি কুলদা ডাক্তার বুকে নল বসিয়ে পরীক্ষা করছে।

একবার মনে হ'ল দুপুর ঝাঁ-ঝাঁ করছে, আমি দ্বারবাসিনীতে যাচ্ছি খুকীকে কোলে নিয়ে। দুর্গাপুরের ডাঙা পার হয়ে গেলাম, আবার সেই কাঁদোড় নদী, সেই তালবন, রাঙামাটির পথ। মালতী বড় ঘরের দাওয়ায় বসে কি কাজ করছে। উদ্ধবদাস আমায় দেখে চিনলে, কাছে এসে বললে—বাবু যে—কি মনে ক'রে এতদিন পরে? আপনার কোলে ও কে? মালতী কাজ ফেলে মুখ তুলে দেখতে গেল উদ্ধবদাস কার সঙ্গে কথাবার্তা কইছে। তারপর আমায় চিনতে পেরে অবাক ও আড়ষ্ট হয়ে সেইখানেই বসে রইল। আমি এগিয়ে দাওয়ার ধারে গিয়ে বললাম—তুমি কি ভাববে জানিনে মালতী, কিন্তু আমি বড় বিপদে পড়েই এসেছি। এই ছোট খুকী আমার দাদার মেয়ে, এর মা সম্প্রতি মারা গিয়েছে। একে বাঁচিয়ে রাখবার কোন ব্যবস্থা আমার মাথায় আসে নি। আর আমার কেউ নেই—একমাত্র তোমার কথাই মনে হ'ল, তাই একে নিয়ে তোমার কাছে এসেছি। একে নাও, এর সব ভার আজ থেকে তোমার ওপর। তুমি ছাড়া আর কারও হাতে একে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারব না।

মালতী তাড়াতাড়ি খুকীকে আমার কোল থেকে তুলে নিলে। তারপর আমার রুক্ষ চুল ও উদ্ভ্রান্ত চেহারার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। পরক্ষণেই সে দাওয়া থেকে নেমে এসে বললে—আপনি আসুন, উঠে এসে বসুন।

আখড়ায় আর যেন কেউ নেই। উদ্ধবদাসকে আর দেখলাম না। শুধু মালতী আর আমি। ও ঠিক সেই রকমই আছে—সেই হাসি, সেই মুখ, সেই ঘাড় বাঁকিয়ে কথা বলার ভঙ্গি। হেসে বললে—তারপর?

আমি বললাম—তারপর আর কি? এই এলাম।

—এতদিন কোথায় ছিলেন ?

—নানা দেশে। তারপর দাদা মারা গেলেন, আমার ওপরে ওদের সংসারের ভার।

—উঃ, কি নিষ্ঠুর আপনি !

তার পর সে বললে—আপনি বসুন, খুকীর সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা তো করতে হবে। একবার নীরদা-দিদিকে ডাকি।

আমি বললাম—আমি কিন্তু এখনই যাব মালতী। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ফেলে রেখে এসেছি পরের বাড়িতে। আমাকে যেতেই হবে।

মালতী আশ্চর্য্য হয়ে বললে—আজই ?

আমি বললাম—আমার কাজ আমি শেষ করেছি, এখন তুমি যা করবে কর খুকীকে নিয়ে। আমি থেকে কি করব ? আমি যাই।

মালতী স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বলল—আমায় নিয়ে যান তবে।

আমি অবাক হয়ে বললাম—সে কি মালতী ? তুমি যাবে আমার সঙ্গে ? তোমার এই আখড়া ?

মালতীর সঙ্গে যেদিন ছাড়াছাড়ি হয়েছিল, সেদিনটি যেমন ও চোখ নামিয়ে কথা বলেছিল —ঠিক তেমনই ভঙ্গিতে চোখ মাটির দিকে রেখে স্পষ্ট ও দৃঢ় স্বরে বললে—আপনি আমায় নিয়ে চলুন সঙ্গে যেখানে আপনি যাবেন। এবার আপনাকে একলা যেতে দেব না।

একচল্লিশ দিনে জ্বর ছেড়ে গেল। সেরে উঠলে বৌদিদি একদিন বললেন—জ্বরের ঘোরে 'মালতী' 'মালতী' ব'লে ডাকতে কাকে, মালতী কে ঠাকুরপো ?

আমি বললাম—ও একটি মেয়ে। বাদ দাও ও-কথা। রোজ বলতাম ? কত দিন বলেছি ?

এই অসুখ-বিসুখে মাসীমার দেওয়া সেই একশো টাকা তো গেলই, বৌদির গায়ের সামান্য যা দু-একখানা গহনা ছিল তা-ও গেল। নতুন চাকুরিটাও সঙ্গে সঙ্গে গেল।

এখান থেকে তিন ক্রোশ দূরে কামালপুর ব'লে একটা গ্রাম আছে। নিতান্ত পাড়াগাঁ এবং জঙ্গলে ভরা। সেখানকার দু-একজন জানাশোনা ভদ্রলোকের পরামর্শে সেখানে একটা পাঠশালা খুললাম। বৌদিদিদের আপাততঃ কালীগঞ্জে রেখে আমি চলে গেলাম কামালপুরে। একটা বাড়ির বাইরের ঘরে বাসা নিলাম—বাড়ির মালিক চাকুরির স্থানে থাকেন, বাড়িটাতে অনেকদিন কেউ ছিল না। বাড়ির পিছনে একটা আম-কাঁঠালের বাগান।

পাঠশালায় অনেক ছেলে জুটল—কতকগুলি ছোট মেয়েও এল। যা আয় হয়, সংসার একরকমে চলে যায়।

সময় বড় মনের দাগ মুছে দেবার মন্ত্র জানে। আবার নতুন মন, নতুন উৎসাহ পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে জীবনের একটা নতুন অধ্যায় কি রকমে শুরু হ'ল তাই এখানে বলব।

পাঠশালা খুলবার পরে প্রায় দু-বছর কেটে গিয়েছে। ভাদ্র মাস। বেশ শরতের রোদ ফুটেছে। বর্ষার মেঘ আকাশে আর দেখা যায় না। একদিন আমি পাঠশালায় গিয়েছি, একটা ছোট মেয়ে বলছে—মাস্টার মশায়, পেনো হিরণদিদির হাত আঁচড়ে কামড়ে দিয়েছে, ওই দেখুন ওর হাতে রক্ত পড়ছে।

যে মেয়েটির হাত আঁচড়ে দিয়েছে তার নাম হিরণ্ময়ী, বয়স হবে বছর চৌদ্দ, পাঠশালার কাছেই ওদের বাড়ি—কিন্তু মেয়েটি আমার পাঠশালায় ভর্ত্তি হয়েছে বেশী দিন নয়। ওর বাবার নাম কালীনাথ গাঙ্গুলী, তিনি কোথাকার আবাদের নায়েব, সেইখানেই থাকেন, বাড়িতে

খুব কমই আসেন।

আমি লক্ষ্য করেছি এই মেয়েটি সকলের চেয়ে সজীব, বুদ্ধিমতী, অত্যন্ত চঞ্চলা। সকলের চেয়ে সে বয়সে বড, সকলের চেয়ে সভ্য ও শৌখীন। কিন্তু তার একটা দোষ, কেমন একটু উদ্ধত স্বভাবের মেয়ে।

একদিন কি একটা অঙ্ক ওকে দিলাম, সবাইকে দিলাম। ওর অঙ্কটা ভুল গেল। বললাম—তুমি অঙ্কটা ভুল করলে হিরণ?

অঙ্কটা ভুল গিয়েছে শুনে বোধ হয় ওর রাগ হ'ল—আর দেখেছি সব সময়, অপর কারোর সামনে বকুনি খেলে ক্ষেপে ওঠে। খুব সম্ভব সেই জন্যই ও রাগের সুরে বললে—কোথায় ভুল? কিসের ভুল ব'লে দিন না?

আমি বললাম—কাছে এস, অত দূর থেকে কি দেখিয়ে দেওয়া যায়?

আমি দেখে আসছি যে কদিন ও এসেছে, আমার কাছ থেকে দূরে বসে।

ও উদ্ধতভাবে বললে—কেন ওখান থেকেই বলুন না? আপনার কাছে কেন যাব?

আমার মনে হ'ল ও বড মেয়ে ব'লে আমার কাছে আসতে বোধ হয় সঙ্কোচ অনুভব করে। কিন্তু তার জন্যে ওরকম উদ্ধত সুর কেন? বললাম—কাছে এসে আঁক দেখে নিতে দোষ আছে কিছু?

ও বললে—সে-সব কথার কি দরকার আছে? আপনি দিন অঙ্ক ওখান থেকেই বুঝিয়ে।

রাগে ও বিরক্তিতে আমার মন ভ'রে উঠল। আচ্ছা মেয়ে তো? মাস্টারদের সঙ্গে কথাবার্ত্তার এই কি ধরন? আর আমায় যখন এত অবিশ্বাস তখন আমার স্কুলে না এলেই তো হয়? সেদিন আমি ওর সঙ্গে আর কোন কথাই বললাম না। পরদিনও তাই, স্কুলে এল, নিজে ব'সে ব'সে কি লিখলে বই দেখে, একটা কথাও কইলাম না। ছুটির কিছু আগে আমায় বললে—আমার ইংরিজিটা একবার ধরুন না?

আমি ওর পড়াটা নিয়ে তারপর শান্তভাবে বললাম—হিরণ, তোমার বাড়িতে ব'লো, আমি তোমাকে পড়াতে পারব না। অন্য অবস্থা করতে ব'লো কাল থেকে।

হিরণ্ময়ীর মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল, বললে—কেন?

আমি বললাম—না—তুমি বড় মেয়ে, এখানে তোমার সুবিধে হবে না।

ও বললে—রাগ করছেন নাকি? কি করেছি আমি?

আমি বললাম—কাল তোমার ও-কথাটা কি আমার বলা উচিত হয়েছে, হিরণ? কি ব'লে তুমি বললে, আপনার কাছে কেন যাব?···ওখান থেকেই বলুন না? তুমি আমার কাছে তবে পড়তে এসেছ কেন?

হিরণ্ময়ী হেসে বললে—এই! তা কি এমন বলেছি আমি? তা যখন আপনি বলছেন দোষ হয়েছে বলাতে, তখন দোষ নিশ্চয়ই হয়েছে।

—কেন তুমি বললে ও রকম? তোমার দুঃখিত হওয়া উচিত ও কথা বলার জন্যে, তা জান?

হিরণ্ময়ী বললে—হাঁ, হয়েছি। হ'ল তো? এখন নিন।

তারপর যখন ওর অঙ্ক দেখছি, তখন হঠাৎ আমার মুখের দিকে কেমন একটা বুঝতে না পারার দৃষ্টিতে চেয়ে বললে—উঃ, আপনার এত রাগ?···আগে তো কখনও রাগ দেখি নি এরকম?···তখনও সে আমার মুখের দিকে সেইরকম দৃষ্টিতে চেয়ে কি যেন বুঝবার চেষ্টা করছে। ওর রকম-সকম দেখে আমি হাসি চাপতে পারলাম না—সঙ্গে সঙ্গে সেই মুহূর্ত্তে হিরণ্ময়ীকে নতুন চোখে দেখলাম। দেখলাম হিরণ্ময়ী অত্যন্ত লাবণ্যময়ী, ওর চোখ দুটি অত্যন্ত

ডাগর, টানা-টানা জোড়া ভুরু দুটি কালো সরু রেখার মত, কপালের গড়ন ভারী সুন্দর, চাঁচা, ছোট, অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি। মাথায় একরাশ ঘন কালো চুল।

ও তখনও আমার দিকে সেই ভাবেই চেয়ে আছে। এক মিনিটের ব্যাপারও নয় সবটা মিলে।

পরদিন থেকে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলাম, হিরণ্ময়ী আমার কাছ থেকে তত দূরে আর বসে না—আর না ডাকলেও কাছে এসে দাঁড়ায়।

একদিন আমায় বললে—জানেন মাস্টার মশায়, আমার সব দল এরা—আমায় এরা ভয় করে।

অবাক্ হয়ে বললুম—কারা ?

হাত দিয়ে পাঠশালার সব ছাত্রছাত্রীদের দেখিয়ে দিয়ে বললে—এরা। আমার কথা না শুনে কেউ চলতে পারে না।

—ভয় করে কেন ?

—এমনি করে। আমি যা বলব ওদের শুনতেই হবে।

পাঠশালার সকলেরই ওপর সে হুকুম ও প্রভুত্ব চালায়, এটা এতদিন আমার চোখে পড়ে নি—সেদিন থেকে সেটা লক্ষ্য করলাম। তবে পেনো যে সেদিন ওর হাত আঁচড়ে দিয়েছিল সে আলাদা কথা। দেশের রাজার বিরুদ্ধেও তো তাঁর প্রজারা বিদ্রোহী হয় !

রোজ রাত্রে বাসায় এসে সন্ধ্যাবেলা পরোটা গড়ি। দু-একদিন পরে সন্ধ্যাবেলা ময়দা মাখছি একা রান্নাঘরে বসে, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার বেশী নয়, একটা হ্যারিকেন-লণ্ঠন জলছে ঘরে। কার পায়ের শব্দে মুখ তুলে দেখি ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে হিরণ্ময়ী। শশব্যস্তে উঠে বিস্মিত মুখে বললাম—হিরণ! এস, এস, কি মনে ক'রে ?

হিরণ্ময়ীর একটা স্বভাব গোড়া থেকে লক্ষ্য করেছি, কখনই প্রশ্নের ঠিক জবাবটি দেবে না। আমার কথার কোন উত্তর না দিয়ে বললে—ময়দা মাখেন বুঝি নিজে রোজ ? ওই বুঝি ময়দা মাখা হচ্ছে ?

আমি বিপন্ন হয়ে পড়লুম—চোদ্দ বছরের মেয়েকে পাড়াগাঁয়ে বড়ই বলে। আমার কাছে এ রকম অবস্থায় আসাটা কি ঠিক হ'ল ওর ? এসব জায়গার গতিক আমি জানি তো।

বললাম—তুমি যাও হিরণ, পড় গে।

হিরণ্ময়ী হেসে বললে—তাড়িয়ে দিচ্ছেন কেন ? আমি যাব না—এই বসলাম।

বেজায় একগুঁয়ে মেয়ে, আমি তো জানি ওকে। বললে—একটা অঙ্ক কষে দেবেন ? না —থাক, একটা গল্প বলুন না!···ও, আপনি বুঝি ময়দা মাখবেন এখন! সরুন, সরুন দিকি। আমি মেখে বেলে দিচ্ছি। কি হবে, রুটি না লুচি ?···আপনি এই পিঁড়িটাতে বসে শুধু গল্প করুন।

সেই থেকে হিরণ্ময়ীর রোজ সন্ধ্যাবেলা আমাকে সাহায্য করতে আসা চাই-ই। মৃদু প্রদীপের আলোতে হাসি-হাসি মুখে সে তার খাতাখানা খুলে নামে অঙ্ক কষে—কাজে কিন্তু সে আমার রুটি-পরোটা তৈরী ক'রে দেয়। কিছুতেই আমার বারণ শোনে না—ওর সঙ্গে পারব না ব'লে আমিও কিছু আর বলি নে। ওর মায়ের বারণও শোনে না, একদিন কথাটা আমার কানে গেল।

শুনলাম একদিন মাকে বলছে ওদের বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে—কেন, যাই তাই কি ? আমি অঙ্ক কষতে যাই। বেশ করি—যাও।

হিরণ্ময়ীকে বললাম—শোন হিরণ, আমার এখানে সন্ধ্যাবেলা আর এস না, যখন তোমার মা বকেন। মার কথাটা অন্ততঃ তোমার মানা উচিত। বুঝলে ?

পরদিন হিরণ্ময়ী সত্যিই আর এল না। আমার সন্ধ্যাটা কেমন যেন ফাঁকা হয়ে গিয়েছে ওর না আসাতে, সেদিন প্রথম লক্ষ্য করলাম। সাত-আট দিন কেটে গেল—হিরণ্ময়ী পাঠশালাতে রোজই আসে। তাকে জিজ্ঞাসা করি না অবিশ্যি কেন সে সন্ধ্যাবেলা আসে না।

একদিন সে পাঠশালাতেও এল না। দু-তিন দিন পরে জিজ্ঞেস ক'রে জানলাম সে মামার বাড়ি গিয়েছে তার মায়ের সঙ্গে।

দেখে আশ্চর্য্য হলাম যে আমার পাঠশালা আর সে পাঠশালা নেই—আমার সন্ধ্যাও আর কাটে না। হিরণের বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে ওর মামার বাড়ি থেকে, মেয়ে দেখাতে নিয়ে গিয়েছে —বরপক্ষ ওখানে মেয়েকে আশীর্ব্বাদ করবে।

মানুষের মন কি অদ্ভুত ধরনের বিচিত্র! হঠাৎ কথাটা শুনেই মনে হ'ল ও গাঁয়ের পাঠশালা উঠিয়ে দেব, অন্যত্র চেষ্টা দেখতে হবে। কেন, যখন প্রথম পাঠশালা খুলেছিলাম এ গাঁয়ে, তখন তো হিরণের অপেক্ষায় এখানে আসি নি, তবে সে থাকলো বা গেল—আমার তাতে কি আসে যায় ?

মাসখানেক কেটে গিয়েছে। আমি কলের মত কাজ করে যাই, একদিন সামান্য একটু বাদলা মত হয়েছে—পাঠশালার ছুটি দিয়ে সকাল-সকাল রান্না সেরে নেব ব'লে রান্নাঘরে ঢুকেছি, বেলা তখনও আছে। এমন সময় দোরের কাছে দেখি হিরণ্ময়ী এসে হাসি-হাসি মুখে দাঁড়িয়েছে। আমি বিস্ময়মিশ্রিত খুশীর সুরে ব'লে উঠলাম—এস, এস হিরণ,—কখন এলে তুমি ? ব'সো।

হিরণ্ময়ী বললে—কেমন আছেন আপনি ? তার পর সে এগিয়ে এসে সলজ্জ আড়ষ্টতার সঙ্গে ঝপ্ ক'রে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম ক'রে আবার সোজা হয়ে দোরের কাছে দাঁড়ালো।

আমি এত খুশী হয়েছি তখন, ওকে কি বলবো ভেবে পাইনে যেন। বললাম—ব'সো হিরণ, দাঁড়িয়ে কেন ?

হিরণ্ময়ী বোধ হয় একটু সঙ্কোচের সঙ্গেই এসেছিল, আমি ওর আসাটা কি চোখে দেখি—এ নিয়ে। আমার কথা শুনে—হাজার হোক নিতান্ত ছেলেমানুষ তো—ও যেন ভরসা পেল। ঘরের মধ্যে ঢুকে একটা পিঁড়ি পেতে বসল। আমার মুখের দিয়ে চেয়ে বললে—কি সেই শিখিয়ে দিলেন, 'নয় পরিত্যাগ-প্রণালী' না কি ? সব ভুলে গিয়েছি—হি-হি—

দেখলাম ওর বিয়ে হয় নি।—ওকে আর কোন কথা বলি নি অবিশ্যি তা নিয়ে। দেনা-পাওনার ব্যাপার নিয়ে সে-সম্বন্ধ ভেঙে গিয়েছে—দু-চার দিনে অপরের মুখে শুনলাম। আবার হিরণ্ময়ী আমার পাঠশালাতে নিত্য আসে যায়—সন্ধ্যাবেলাতেও রোজ আসে—ঝড় হোক, বৃষ্টি হোক, তার সন্ধ্যায় আসা কামাই যাবে না। কেন তার মা এবার তাকে বকেন না—সে কথা আমি জানি নে—তবে বকেন না যে, এটা আমি জানি।

বরং একদিন হিরণ্ময়ী বললে—আজ আলো জেলে একটা বই পড়ছি, মা বললে আজ যে তুই তোর মাস্টারের কাছে গেলিনে বড় ? তাই এলুম মাস্টার মশায়।

আমি বললাম—তা বেশ তো, গল্পের বই পড়লেই পারতে। মা না ব'লে দিলে তো আজ আসতে না ?

কথাটা বলতে গিয়ে নিজের অলক্ষিতে একটা অভিমানের সুর বার হয়ে গেল—হিরণ্ময়ী

সেটা বুঝতে পেরেছে অমনি। এমন বুদ্ধিমতী মেয়ে এইটুকু বয়সে! বললে—নিন্, আর রাগ করে না। ভেবে দেখুন, আপনি না আমায় এখানে এলে তাড়িয়ে দিতেন আগে আগে?

দুঃখিত ভাবে বললাম—ছিঃ, ও-কথা ব'লো না হিরণ, তাড়িয়ে আবার তোমায় দিয়েছি কবে? ও-কথাতে আমার মনে কষ্ট দেওয়া হয়।

হিরণ্ময়ী মুখে কাপড় দিয়ে খিল্ খিল্ ক'রে উচ্ছ্বসিত ছেলেমানুষি হাসির বন্যা এনে দিলে। ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে বলতে লাগল—না—না দেন নি? বটে? একদিন—সেই—তাড়ালেন না! আজ আবার বলা হচ্ছে—। পরে আমার সুরের নকল করতে চেষ্টা করে—'ওতে আমার মনে কষ্ট দেওয়া হয়'—কি মানুষ আপনি! হি-হি-হি-হি—

আমি মুগ্ধদৃষ্টিতে ওর হাসিতে উদ্ভাসিত সুকুমার লাবণ্যভরা মুখের দিকে চেয়ে রইলাম—চোখ ফেরাতে পারি নে—কি অপূর্ব্ব হাসি! কি অপূর্ব্ব চোখমুখের শ্রী!

যখন চোখ নামিয়ে নিলাম তখন সে আমার বেলুনটা তুলে নিয়ে রুটি বেলতে ব'সে গিয়েছে। সেদিন ও যখন চলে যায়, ঝোঁকের মাথায় অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই ওকে আবার বললাম—এ রকম আর এস না, হিরণ। না, সত্যি বলছি তুমি আর এস না।

মনকে খুব দৃঢ় ক'রে নিয়ে কথাটা ব'লে ফেলেই ওর মুখের দিকে চেয়ে আমার বুকের মধ্যে যেন একটা তীক্ষ্ণ তীর খচ্ করে বিঁধলো। দেখলাম ও বুঝতে পারে নি আমি কেন একথা বলছি—কি বোধ হয় দোষ করে ফেলেছে ভেবে ওর মুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে উদ্বেগ ও ভয়ে।

আমার মুখের দিকে একটুখানি চেয়ে রইল—যদি মুখের ভাবে কারণ কিছু বুঝতে পারে। না বুঝতে পেরে যাবার সময় দেখলাম শুষ্ক বিবর্ণ মুখে বললে—আমায় তাড়িয়ে দিলেন তো? এই দেখুন—তাড়ালেন কি না।

দুঃখে আমার বুক কেটে যেতে লাগল। নিমগাছটার তলা দিয়ে ও ওই যাচ্ছে, এখনও বেশী দূর যায় নি, ডেকে দুটো মিষ্টি কথা বলব? ছেলেমানুষকে একটু সান্ত্বনা দেব?

ডাকলুম শেষটা না পেরে।—শোনো ও হিরণ—শোনো—

ও দাঁড়াল না—শুনেও শুনলে না। হন্ হন্ ক'রে হেঁটে বাড়ি চলে গেল। পরদিন খুব সকালে উঠে বারান্দাতে ব'সে ব্রাউনিঙের A Soul's Tragedy পড়ছি—হিরণ এসে দাঁড়িয়ে বললে—কি কচ্ছেন?

—এস এস হিরণ। কাল তোমাকে ডাকলাম রাত্রে, এলে না কেন? তুমি বড় একগুঁয়ে মেয়ে—একবার শোনা উচিত ছিল না কি বলছি?

মুখরা বালিকা তখন নিজমূর্ত্তি ধরলে। বললে—আমি কি কুকুর নাকি, দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবেন, আবার তু ক'রে ডাকলেই ছুটে আসব? আপনি বুঝি মনে ভাবেন আমার শরীরে ঘেন্না নেই, অপমান নেই—না? আমি বলতে এলাম সকালবেলা যে আপনার পাঠশালায় আমি পড়তে আসব না।—মা অনেক দিন আগেই বারণ করেছিল—তবুও আসতাম, তাদের কথা না শুনে। কিন্তু যখন আপনি কুকুর-শেয়ালের মত দূর ক'রে তাড়িয়ে—

ওর চোখে জল ছাপিয়ে এসেছে—অথচ কি তেজ ও দর্পের সঙ্গে কথাগুলো সে বললে! আমি বাধা দিয়ে বললাম—আমায় ভুল বুঝো না, ছিঃ হিরণ—আচ্ছা, চেঁচিও না বেশী, কেউ শুনলে কি ভাববে। আমার কথা শোন—রাগ করে না, ছিঃ।

হিরণ দাঁড়াল না এক মুহূর্ত্তও। অতটুকু মেয়ের রাগ দেখে যেমন কৌতুক হ'ল, মনে তেমনই অত্যন্ত কষ্টও হ'ল। কেন মিথ্যে ওর মনে কষ্ট দিয়েছি কাল? আহা, বেচারী বড় দুঃখ ও আঘাত পেয়েছে। আমার জ্ঞান আর হবে কবে? ছেলেমানুষকে ও-কথাটা ও-ভাবে

বলা আমার আদৌ উচিত হয় নি।

মন অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেল—ভাবলাম, এ গ্রামের পাঠশালা তুলে দিয়ে অন্যত্র যাবই। এদিকে হিরণ্ময়ীও আর আমার পাঠশালাতে আসে না। মাসের বাকি আটটা দিন পড়িয়ে নিয়ে পাঠশালা তুলে দেব ঠিক ক'রে ফেললাম। সবাইকে বলেও রাখলাম কথাটা। আগে থেকে যাতে সবাই অন্য ব্যবস্থা ক'রে নিতে পারে।

যাবার দু-দিন আগে জিনিসপত্র গোছাচ্ছি—হঠাৎ হিরণ্ময়ী নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে এসে কখন দাঁড়িয়েছে। মুখ তুলে ওর দিকে চাইতেই হেসে ফেললে। বললে—আপনি নাকি চলে যাবেন এখান থেকে?

আমি বললাম—যাবই তো। তার পর, এত দিন পরে কি মনে করে?

হিরণ্ময়ী তার অভ্যাসমত আমার প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে বললে—কবে যাবেন?

—বুধবার বিকেলে গাড়ি ঠিক করা আছে, চাকদাতে গিয়ে উঠবো।

হিরণ্ময়ী একবার ঘরের চারিধারে চেয়ে দেখলে। বললে—আপনার সে বড় বাক্সটা কই?

সেটা কানুর বাবার কাছে বিক্রী ক'রে ফেলে দিয়েছি। অত বড় বাক্স কি হবে, তা ছাড়া সঙ্গে টেনে টেনে নিয়ে বেড়ানোও মুশকিল।

হঠাৎ হিরণ্ময়ী ঝপ্ ক'রে মেজেতে বসে পড়ল—কর্ত্তৃত্ব ও আত্মপ্রত্যয়ের সুরে বললে—না, আপনি যেতে পারবেন না। দেখি দিকি কেমন যান?

আমার হাসি পেল ওর রকম দেখে। খুব আনন্দও হ'ল—একটা অদ্ভুত ধরনের আনন্দ হ'ল। বললাম—তোমার তাতে কি, আমি যাই আর না-যাই? তুমি তো আর এতদিন উঁকি মেরেও দেখতে আস নি হিরণ, তুমি আমার পাঠশালা পর্য্যন্ত যাওয়া ছেড়েছ।

—ইস্! তাই বই কি?

—তুমি ভেবে দেখ তাই কি না। উড়িয়ে দিলে চলবে না হিরণ, আমি যাবই ঠিক করেছি, তুমি আমায় আটকাতে পারবে না। কারুর জন্যে কারুর আট্‌কায় না—এ তুমি নিজেই আমায় একদিন বলেছিলে।

হিরণ্ময়ী বালিকাসুলভ হাসিতে ঘর ভরিয়ে ফেলে বললে—ওই! কথা যদি একবার শুরু ক'রে দিলেন তো কি আর আপনার মুখের বিরাম আছে? কারুর জন্যে কারুর আট্‌কায় না, হেন না তেন না—মাগো—কথার ঝুড়ি একেবারে!

—সে যাই হোক, আমি যাবই।

—কক্‌খনো না। ইঃ, বললেই হ'ল যাব!

আমি চুপ করে রইলাম—ছেলেমানুষের সঙ্গে তর্ক করে লাভ কি?

দেখি যে বিকেলে পাঠশালায় হিরণ্ময়ী বইখাতা নিয়ে হাজির হয়েছে। সে এসে সব ছেলেমেয়েকে বলে দিলে আমার পাঠশালা উঠবে না, আমি কোথাও যাব না, সবাই যেন ঠিকমত আসে। এমন সুরে বললে যে সে যেন আমার দণ্ডমুণ্ডের মালিক। বললে—এই হাঁদু, মাস্টার মশায় তোমায় বলেছিলেন না ধারাপাত আনতে—কেন আন নি ধারাপাত? এই সোমবারের হাট থেকে আনতে ব'লে দেবে। বুঝলে?

হাঁদু বোকার মত দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে বললে—মাস্টার মশাই যে সোমবারে চলে যাবেন এখান থেকে।

হিরণ্ময়ী তাকে এক তাড়া দিয়ে বললে—কে বলেছে চলে যাবেন? মেরে হাড় ভেঙে দেব ছোঁড়ার! যা যা বলছি তা শোন্। বাঁদর কোথাকার—

আমি বললাম—কেন ওকে মিথ্যে বকছ হিরণ, ছেলেমানুষকে—ওর দোষ কি, আমি যাবই, কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না।

হিরণ্ময়ী ঝঙ্কার দিয়ে বললে—আচ্ছা আচ্ছা হবে। যাবেন তো যাবেন।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা অনেকদিন পরে ও রান্নাঘরে এসে ঢুকল। বললে—গুড়ের ভাঁড়টা কই!

—সেটা তিনকড়িদের দিয়ে দিইছি। দু-দিনের মত খানিকটা গুড় ওই বাটিতে রেখেছি—দুটো দিন ওতেই চলে যাবে।

হিরণ্ময়ী অন্য দিনের মত বসল না, দাঁড়িয়ে রইল। একবার বাইরে যাবার সময় ও সরে দরজার কপাটের আর দেওয়ালের মধ্যের যে জায়গাটুকু, সেখানটাতে দেখি জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বলতে গেলাম—ওখানে না, ওখানে না,—কাপড়ে কালিটালি লেগে যাবে কি না—বার হয়ে এস—

ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখি ওর ডাগর চোখ দুটি জলে ভ'রে টল্ টল্ করছে। হিরণ্ময়ীর চোখে জল! অবাক্, এ দৃশ্য তো কখনও দেখি নি! ও জল-ভরা ধরা-গলায় বললে—আপনি বলুন, যাবেন না মাস্টার মশায়। আমি তখন পাঠশালায় বলতে পারলাম না ওদের সামনে। ওরা হাসবে তা'হলে। আর কেউ নয়—আর সবাই আমায় ভয় করে, কেবল ওই মণ্টুটা বড় দুষ্টু!

তারপর আমার দিকে চোখের জল আর হাসি-মিশানো এক অপূর্ব্ব দৃষ্টিতে চেয়ে বললে—যাবেন না, কেমন?

হিরণ্ময়ী এই প্রথম দুর্ব্বলতা প্রকাশ করলে—এর আগে কখনও দেখি নি। ছেলেমানুষ, ও কথা তো তেমন জানে না, কিন্তু ওর ডাগর সজল চোখের মিনতিপূর্ণ দৃষ্টি ওর ভাষার দৈন্য ঘুচিয়ে দিয়ে এমন কিছু প্রকাশ করলে—এক জাহাজ কথাতে তা প্রকাশ করা যেত না।

আমার মনে অনুতাপ হ'ল—কেন ওকে মিথ্যে কাঁদালাম সন্ধ্যাবেলাটিতে?

জীবনের এই-সব মুহূর্ত্তেই না মানুষে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করে? ব্রাউনিঙের 'পলিন্' কবিতার সেই সর্ব্বহারা লোকটির মত আমার মনও ব'লে উঠল:—I believe in God and Truth and Love!···

ওর হাতটি ধ'রে দরজার কপাটের ফাঁক থেকে বার ক'রে এনে আস্তে আস্তে পিঁড়ির ওপর বসিয়ে দিয়ে বললাম—ওখানে সন্ধ্যাবেলা দাঁড়াতে নেই। বিছেটিছে বেরুতে পারে—এখানে বোস। রুটিগুলো বেলে দাও দিকি, লক্ষ্মী মেয়ে। আমি যাব না—বলছ তুমি যখন, তখন আর যাব না। চোখের জল ফেলতে আছে অবেলায়? ছিঃ—

তার পরই রুটি তৈরী করতে ব'সে যে হিরণ্ময়ী সেই হিরণ্ময়ী—সেই মুখরা বালিকা, যে সকল কথা এমন কর্ত্তৃত্বের সুরে বলে যেন ওর কথা না মেনে চললে ও ভয়ঙ্কর একটা কিছু শাস্তির ব্যবস্থা করবে, সেটা আবার খুব কৌতুকপ্রদ এবং ভেবে দেখলে করুণ বলেই মনে হয়, যখন বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে যে মুখের বুলিটুকু ছাড়া ওর হুকুমের পেছনে ওর কোন জোর খাটাবার নেই—নিতান্ত অসহায় ও নিরুপায়।

প্রেম আসে এই সব সামান্য তুচ্ছ খুঁটিনাটি সূত্র ধ'রে। বড় বড় ঘটনাকে এড়ানো সহজ, কিন্তু এই সব ছোট জিনিস প্রাণে গেঁথে থাকে—ফলুই মাছের সরু চুল-চুল কাঁটার মত। গায়ের জোরে সে কাঁটা তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে গেলে, বিপদের সম্ভাবনা বাড়ে বই কমে না।

পুরুষমানুষ প্রেমের ব্যাপারে আত্মরক্ষা ক'রে চলতে পারে না যেটা অনেক সময় মেয়েরা পারে। যেখানে যা হবার নয়, পাবার নয়, সেখানেও তারা বোকার মত ধরা দিয়ে বসে থাকে—

এবং নাকাল তার জন্যে যথেষ্ট হয়। কিন্তু পুরুষমানুষই আবার বেগতিক বুঝলে যত সত্বর হাবুডুবু খেতে খেতেও সাঁতরে তীরের কাছে আসতে পারে—মেয়েরা গভীর জলে একবার গিয়ে পড়লে অত সহজে নিজেদের সামলে নিতে পারে না।

তবুও আমি হিরণ্ময়ীকে দূরে রাখবার চেষ্টাই করলাম।

একদিন দুপুরের পরে হিরণ্ময়ীদের বাড়িতে পুলিস এসেছে শুনলাম। পুলিস কিসের? একে ওকে জিজ্ঞেস করি কেউ সঠিক উত্তর দেয় না অথচ মনে হ'ল ব্যাপারটা সবাই জানে। এগিয়ে গেলুম—ওদের বাড়ির সামনের তেঁতুলতলায় বড় দারোগা চেয়ার পেতে ব'সে—পাড়ার লোকদের সাক্ষ্য নেওয়া চলেছে। দেখলাম গ্রামে ওদের মিত্র বড় কেউ নেই। আমি আগেও যে একথা না জানতাম এমন নয়—তবে পাড়াগাঁয়ের কানাঘুষোতে কান দিই নি।

বিকেলের দিকে হিরণ্ময়ীর মা আর বিধবা দিদিকে থানায় ধ'রে নিয়ে গেল। কাছারির মুহুরী সাতকড়ি মুখুয্যে আমার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে বললে—ও মেয়েটার তত দোষ দিই নে—মা-ই যত নষ্টের গুরুমশাই। ওই তো ওকে শিখিয়েছে। নইলে মেয়েটার সাধ্যি কি,—কিন্তু মাগী কি ডাকাত! মেয়েটার প্রাণের আশঙ্কা করলি নে একবারও?

ব্যাপারটা বুঝতে আমার দেরি হ'ল না। সাতকড়ি আরও বলল—কালীনাথ গাঙ্গুলী কি গ্রাম ত্যাগ করেছে সাধে? এইজন্যেই সে বাড়িমুখো হয় না, ওদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে না।

এত কথা আমি কিন্তু জানতাম না—এই নতুন শুনলাম। আমি মুশকিলে পড়ে গেলাম—আমি এখন কি করি? হিরণ্ময়ীর মা আর দিদি দোষী কি দোষী নয়—সে বিচারের ভার আছে অন্য বিচারকের ওপর—সাতকড়ি মুখয্যের ওপর নয়। কিন্তু এদের মোকদ্দমা উঠলে উকীল নিযুক্ত কে করে, এদের স্বার্থ বা কে দেখে, এদের জন্যে পয়সা খরচই বা কে করে?

এদিকে আর এক মুশকিল। ওর মা আর দিদিকে যখন ধ'রে নিয়ে গেল, হিরণ্ময়ী তখন ওদের বাড়ির সামনে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে। সামনে অন্ধকার রাত, সেরাত্রে সে একাই বা বাড়িতে থাকে কেমন ক'রে, বাড়িতে আর যখন কেউই নেই—অথচ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেউ তাকে নিজের বাড়িতে ডাকলে না। সন্ধ্যার সময় ও-পাড়ার কৈলাস মজুমদারের স্ত্রী এসে ওকে ও-অবস্থায় দেখে বললেন—ওমা, এ মেয়েটা এখানে একা দাঁড়িয়ে আছে যে! ছেলেমানুষ, বাড়িতে একা থাকবেই বা কি ক'রে? ওর মা দিদি কি করেছে জানি নে—কিন্তু ওকে আমি চিনি। ও পাগলী, আনন্দময়ী। এস তো মা হিরণ, তোমাদের হারিকেনটা বাড়ির ভিতর থেকে নিয়ে ঘরে চাবি দিয়ে এস। ওকে জায়গা দিলে যদি জাত না থাকে—তবে না থাকল তেমন জাত!

মজুমদার-গিন্নী যদি কোন কথা না ব'লে নিঃশব্দে হিরণ্ময়ীকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতেন তবে হয়ত কোনই গোলযোগ বাধতো না—কিন্তু শেষের কথাটি ব'লে ফেলে তিনি নিতান্ত নির্ব্বোধের মত কাজ ক'রে বসলেন। কাছেই গ্রামের সমাজপতি আচার্য্যি-মশায়ের বাড়ি। তাদের সঙ্গে বাধল তুমুল ঝগড়া। শশধর আচার্য্যের স্ত্রী অনেকক্ষণ নিজের মনে একতরফা গেয়ে যাবার পর উপসংহারে বললেন—ও বড় ভাল মেয়ে—না? মুখ খুললেই অনেক কথা বেরিয়ে পড়বে। সব জানি, সব বুঝি। চুপ করে থাকি মুখ বুজে—বলি মাথার ওপর একজন আছেন, তিনিই দেখবেন সব—আমি কেন বলতে যাই?

মজুমদার-গিন্নী বললেন—যা কর ন-বৌ, আবার এ মেয়েটার নামে কেন যা তা বলছ? সেটাই কি ভগবান সইবেন?

আচার্য্যি-মশায়ের স্ত্রী বারুদের মত জ্বলে উঠলেন—আরও দ্বিগুণ চেঁচিয়ে বললেন—ধর্ম্ম

দেখিও না বলে দিচ্ছি, ভাল হবে না। ওই রয়েছে মুখুয্যেরা, ভট্‌চাযিরা, জিজ্ঞেস কর গিয়ে। ওই মেয়ে ওই পাঠশালার মাস্টার-ছোকরার কাছে রাত বারোটা অব্‌ধি কাটিয়ে আসে—রোজ তিনশ তিরিশ দিন। সারা রাত্তিরও থাকে এক এক দিন। বলুক ও মেয়েই বলুক, সত্যি না মিথ্যে। ভেবেছিলুম কিছু বলব না—মরুক গে, যার আঁস্তাকুড়, সেই গিয়ে ঘাঁটুক, না ব'লে পারলাম না। কে ও মেয়েকে ঘরে জায়গা দিয়ে কালকে আবার একটা হাঙ্গামা বাধাতে যাবে?

আমি এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিলুম, কথা বলি নি—কোন পুরুষমানুষ উপস্থিত ছিল না ব'লে। চেঁচামেচি শুনে আচার্যি-মশায়, সাতকড়ি ও সনাতন রায় ঘটনাস্থলে এসে দাঁড়াতেই আমি এগিয়ে গিয়ে বললুম—আপনারা আমার মায়ের মত—আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ, হিরণকে এ ঝগড়ার মধ্যে মিথ্যে আনবেন না। ও আমার ছাত্রী, ছেলেমানুষ, আমার কাছে যায় সন্ধ্যেবেলা গল্প শুনতে—কোনদিন পড়েও। রাত নটা বাজতেই চলে আসে। একটা নিষ্পাপ নিরপরাধ মেয়ের নাম এ-সবের সঙ্গে না জড়ানোই ভাল। মা, আপনি ওকে বাড়িতে নিয়ে যান।

এতে ফল হ'ল উল্‌টো। ঝগড়া না থেমে বরং বেড়ে উঠল। মজুমদার মশায়ের দুই ছেলে ও ছোট ভাই এসে মজুমদার-গিন্নীকে বকাবকি করতে লাগল—তিনি কেন ওপাড়া থেকে এসে এই-সব ছেঁড়া ল্যাঠার মধ্যে নিজেকে জড়াতে যান? এ বয়সেও তাঁর জ্ঞান যদি না হয় তবে আর কবে হবে···তিনি চলে আসুন বাড়ি। এ-পাড়ার ব্যবস্থা এ-পাড়ার লোকে বুঝবে, তিনি কেন মাথাব্যথা করতে যান—ইত্যাদি।

যাকে নিয়ে এত গোলমাল, সে ভয়ে ও লজ্জায় কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েই আছে ওদের বাড়ির সদর দরজায়। ওর চোখে একটা দিশেহারা ভাব, লজ্জার চেয়ে চোখের চাউনিতে ভয়ের চিহ্নই বেশী। ওর সেই কথাটা মনে পড়ল—জানেন মাস্টার মশায়, আমায় সবাই ভয় করে, সবাই মানে এ পাড়ায়—আমার সঙ্গে লাগতে এলে দেখিয়ে দেব না মজা?

বেচারী মুখরা হিরণ্ময়ী!

শেষ পর্য্যন্ত কৈলাস মজুমদারের স্ত্রী ওকে না নিয়েই চলে গেলেন। তাঁর দেওর ও ছেলেরা একরকম জোর করেই তাঁকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

আমি তখন এগিয়ে গিয়ে বললুম—হিরণ, তুমি কিছু ভেবো না। আমি এতক্ষণ দেখছিলাম এরা কি করে। যে ভয়ে তোমাকে ডাকতে পারি নি, সে ভয় আমার কেটে গিয়েছে। তুমি একটু একলা থাক—আমি কাওরাপাড়া থেকে মোহিনী কাওরাণীকে ডেকে আনছি। সে তোমার ঘরের বারান্দাতে শোবে রাত্রে। তাহ'লে তোমার রাত্রে একা থাকবার সমস্যা মিটে গেল। আর এক কথা—তুমি রান্না চড়িয়ে দাও; চাল-ডাল সব আছে তো?

কাওরাপাড়া থেকে ফিরে আসতে আধ ঘণ্টার বেশী লাগল। মোহিনী বুড়ীকে চার আনা পয়সা দিয়ে রাত্রে হিরণদের বাড়িতে শোবার জন্য রাজী করিয়ে এলুম। ফিরে এসে দেখি দালানের চৌকাঠে বসে হিরণ্ময়ী হাপুস নয়নে কাঁদছে। অনেক ক'রে বোঝালুম। বড় কষ্ট হ'ল ওকে এ অবস্থায় দেখে। বললে—মার আর দিদির কি হবে মাস্টার মশায়? আপনি কালই বাবাকে একটা চিঠি লিখে দিন। ওদের ফাঁসি হবে না তো?

হেসে সান্ত্বনা দিলাম। বললাম—রাঁধ হিরণ। খাওয়াদাওয়া কর। কিছু ভেবো না—আমি কাল রাণাঘাট যাব। ভাল উকীল দিয়ে জামিনে খালাস ক'রে নিয়ে আসবার চেষ্টা করব, ভয় কি?

হিরণ কিছুতেই রাঁধতে চায় না—শেষে বললে—আপনিও এখানে খাবেন কিন্তু। ঠিক

তো ?

ও রাঁধছে ব'সে, আমাকে রান্নাঘরেই বসে থাকতে হ'ল—ও যেতে দেয় না, ছেলেমানুষ, ভয় করে। কেবল জিজ্ঞেস করে, মা আর দিদির কি হবে !

রান্না হয়ে গেল, ঠাঁই ক'রে আমায় ভাত বেড়ে দিলে। এদিকে হিরণ বড় অগোছালো, কুটনো-বাটনা, এঁটো-কাঁটা, ভাতের ফেন, আনাজের খোসাতে রান্নাঘর এমন নোংরা ক'রে তুলেছে ! ভাত বাড়তে গিয়ে উনুনের পাড়ে আঁচল লুটিয়ে পড়েছে—নিতান্ত আনাড়ি।

বললাম—দিনমানে কোন রকমে একা থেকো। আমি সন্ধ্যের আগেই রাণাঘাট থেকে ফিরবো। রেঁধে খেও কিন্তু। না হ'লে বড় রাগ করব।

মোহিনী কাওরাণী এল রাত ন'টার পরে। তার পরে আমি আমার বাসায় চলে এলুম।

পরদিন রাণাঘাটে গিয়ে দেখি কেস্ ওঠে নি আদালতে। উকীল ঠিক ক'রে তার সঙ্গে জামিনের কথাবার্ত্তা ব'লে এলুম। ফিরবার সময় হিরণ্ময়ীর জন্যে দু-একটা জিনিস কিনে নিলুম ওকে একটু আনন্দ দেবার জন্যে। ফিরে দেখি ও ব'সে ব'সে আবার কাঁদছে কালকের মত। সারাদিন বোধ হয় রাঁধে নি, কিছু খায় নি। স্নানও করে নি, দু-এক গাছা রুক্ষ চুল মুখের আশেপাশে উড়ছে। মহা বিপদে প'ড়ে গেলুম ওকে নিয়ে। কি করি এখন ? ওর বাবাকে আজ রাণাঘাটে পৌছেই টেলিগ্রাম করেছি, যদি তা পেয়ে থাকেন, তবে কাল তিনি এসে পৌছলেও তো বাঁচি। নইলে হিরণ্ময়ীকে ভাবছি কালীগঞ্জে বৌদিদির কাছে রেখে আসব। কারণ, এসে শুনলুম মোহিনী বুড়ী ব'লে গিয়েছে সে রাত্রে এখানে আর শুতে আসতে পারবে না।

ও আমায় দেখেই ছুটে এসে বললে—মাকে দিদিকে দেখে এলেন মাস্টার মশাই ? তারা কেমন আছে ? খালাস পেলে না ?

আমি ওদের নিজে দেখতে যাই নি, উকীলের মুখে হিরণ্ময়ীর সংবাদ পাঠিয়ে বলেছিলুম হিরণ্ময়ীর জন্যে যেন তারা কিছু না ভাবে। বললাম সেকথা।

তার পর হিরণ্ময়ী আমাকে বালতি ক'রে জল তুলে দিলে স্নানের জন্যে—ঘরে প্রদীপ জেলে উনুন ধরিয়ে চায়ের জল চড়ালে। রাণাঘাট থেকে ওর জন্যে কিছু খাবার এনেছিলুম, তার বেশী অর্দ্ধেক আমায় রেকাবি ক'রে চায়ের সঙ্গে জোর ক'রে খাওয়ালে—তার পর রান্না চাপিয়ে দিলে। ওর মনে সুখ নেই, কেমন যেন মুষড়ে পড়েচে, ছেলেমানুষ, নইলে ওর মত হাস্যময়ী আনন্দময়ী চঞ্চলা মেয়ে এতক্ষণ কত কথা বলত, হাসি-খুশীতে ঘর ভরিয়ে তুলত।

একবার জিজ্ঞেস করলে—রাণাঘাটে নাকি সার্কাস এসেছে সবাই বলে ? দেখেছেন আপনি ? এত দুঃখের মধ্যেও ওর ছেলেমানুষি মন সার্কাসের সম্বন্ধে কৌতূহলী না হয়ে পারে নি ভেবে আমার হাসি পেল।

এ রাত্রে মোহিনী বুড়ী এল না—আমি ওকে ঘরের মধ্যে রেখে বাইরের বারান্দাতে শুয়ে রইলাম। বারান্দায় বিছানা পাতছি, ও আবার এত সরলা নিষ্কলুষ—আমায় অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে, আপনি বাইরে শোবেন কেন ?

কোন নীতিবাদের সঙ্কোচ এনে ফেলে ওর নিষ্পাপ মনে দাগ দিতে আমার বাধল। বললাম —দেখছ না কি রকম গরম আজ ? বাইরে শোওয়াই আমার অভ্যেস, তা ছাড়া—।

সারারাত দু-জনে গল্প ক'রে কাটালুম। ও ঘর থেকে কথা বলে, আমি বারান্দা থেকে তার উত্তর দিই।—বাবা বোধ হয় কাল আসবেন, না ? মা, দিদি কবে আসবে ? সার্কাসওয়ালা কোথায় তাঁবু ফেলেছে ? কলকাতায় কখনও যাই নি—একবার যাবার ইচ্ছে আছে। কলকাতার থিয়েটার দেখতে কেমন ? চৌধুরীরা বোধ হয় মোহিনী বুড়ীকে বারণ ক'রে দিয়েছে এখানে

আসতে। আমার শীত করছে কিনা। রাত বেশী, ঠাণ্ডা পড়েছে, গায়ে দেবার একটা মোটা চাদর দেবো? আরব্য-উপন্যাসের মত গল্প আর নেই। আচ্ছা, অঙ্ক কতদূর শেখা যায়? বিস্তার শেষ নেই—না? এম-এ পাস করে আরও পড়া যায়, পড়বার আছে?

ওর বাবা এলেন পরদিন সকাল দশটার সময়। তাঁর মুখে শুনলুম পুলিস থেকে তাঁকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে শীঘ্র বাড়ি এসে মেয়ের ভার নিতে। তিনি অত্যন্ত বদ্‌মেজাজী লোক, দু-একটা কথা শুনেই বুঝতে দেরি হ'ল না। আমার ওপর আদৌ তিনি প্রসন্ন হ'তে পারলেন না—তাঁর মেয়ের তত্ত্বাবধান করার জন্যে একটা ধন্যবাদ দেওয়া তো দূরের কথা, সেটাকেই তিনি আমার একটা অপরাধ ব'লে গণ্য ক'রে নিলেন এবং যে মুখুয্যে ও চৌধুরীরা পরশু সন্ধ্যেবেলা হিরণ্ময়ীকে বাড়িতে জায়গা দিতে চায় নি, তাদেরই বাড়িতে খোশামোদ ক'রে তাদের সঙ্গে এ বিপদে পরামর্শ চাইতে গেলেন।

আরও একটা ব্যাপার দেখলুম, তিনি হিরণ্ময়ীকে আদৌ দেখতে পারেন না। আমার সামনেই তো তাকে তাড়না, তর্জ্জন-গর্জ্জন যথেষ্ট করলেন এ নিয়ে যে সেরাত্রে চৌধুরী-গিন্নীর পায়ে পড়ে কেন অনুরোধ করে নি তাকে জায়গা দেবার জন্যে। কারণ, তারা দেখলুম লাগিয়েছে যে তাদের কি আর ইচ্ছে ছিল না ওকে জায়গা দেবার? ও মেয়ের তা ইচ্ছে নয়। হিরণের অপরাধ সে মুখ ফুটে কারও কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে নি। এ ওরা বুঝল না যে হিরণের বয়সের মেয়েরা মুখে কোন নাটুকে-ধরনের কথা বলে আশ্রয় চাইতে পারে না পরের কাছে—বিশেষ ক'রে হিরণ্ময়ীর মত একটু তেজী মেয়েরা।

আমি হিরণ্ময়ীর ভার থেকে মুক্ত হয়ে কালীগঞ্জে চলে এলুম পরদিন সকালেই। শুনেছিলুম হিরণ্ময়ীর মা ও দিদি রাণাঘাট থেকে প্রমাণাভাবে খালাস পেয়ে এসেছেন।

কালীগঞ্জে এসে বসলুম বটে, কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলুম, মনের কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হয়েছে। হিরণ্ময়ীর সেই শুকনো মুখখানা কেবলই মনে পড়ে, সেদিন সন্ধ্যার সময় ওর যে মুখ দেখেছিলাম, যেদিন ওর মাকে আর দিদিকে থানায় নিয়ে গেল। হিরণ্ময়ীর ব্যথা,… হিরণ্ময়ীর দুঃখ,…ওই রকম বাড়িতে, ওই গাঁয়ের আবহাওয়ায় হিরণ্ময়ীর মত মেয়ে শুকিয়ে ঝরে পড়বে। কে-ই বা দেখবে, বুঝবে ওকে? একদিন মালতীর সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই ভাবতুম। কত ভেবেছি। এখন বুঝি কি দুর্জ্জয় অভিমান করেই চলে এসেছিলাম ওর কাছ থেকে! কিছুতেই সে অভিমান ভাঙলো না। তার পর দাদা মারা গেলেন, দাদার সংসার পড়ল ঘাড়ে, নইলে হয়ত আবার এতদিনে ফিরে যেতাম। কিন্তু বৌদিদিদের নিয়ে তো দ্বারবাসিনীর আখড়াতে গিয়ে উঠতে পারি নে? একসময় যার ভাবনায় কত বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছি বটেশ্বরনাথ পাহাড়ে, সেই মালতী এখন আমার মনে ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে আসছে—হয়ে এসেছে। আর তো তাকে চোখে দেখলুম না? ক্রমে তাই সে দূরে গিয়ে পড়ল। কি করব, মনের ওপর জোর নেই—নইলে আমি কি বুঝতে পারি নে কত বড় ট্র্যাজেডি এটা মানুষের জীবনের? শ্রীরামপুরের ছোট-বৌঠাকরুণ আজ কোথায়? কে বলবে কেন এমন হয়!

॥ ১৭ ॥

একদিন আবার হিরণ্ময়ীকে দেখবার ইচ্ছে হ'ল। তখন মাস দুই কেটে গিয়েছে, কামালপুরে আর যাই নি, সেখানে আমার বাসায় জিনিসপত্র এখনও রয়েছে—সেগুলো আনবার ছুতো

করেই গেলুম সেখানে। মাস দুই পরে, গ্রাম ঠাণ্ডা হয়েছে, কেবল শুনলুম হিরন্ময়ীরা একঘরে হয়ে আছে। হিরণ্ময়ী আগের মতই ছুটে এল আমি এসেছি শুনে। এখানে ওর চরিত্রের একটা দিক আমার চোখে পড়ল—লোকে কি বলবে এ ভয় ও করে না—এখানে মালতীর সঙ্গে ওর মিল আছে। কিন্তু মালতীর সঙ্গে ওর তফাৎও আমি বুঝতে পারি। হিরণ্ময়ী যেখানে যাবে, সেখানে পেছন ফিরে আর চায় না—মালতীর নানা পিছুটান। সবাই সমান ভালোবাসতেও পারে না। প্রেমের ক্ষেত্রেও প্রতিভার প্রয়োজন আছে। খুব বড় শিল্পী, কি খুব বড় গায়ক যেমন পথেঘাটে মেলে না—খুব বড় প্রেমিক বা প্রেমিকাও তেমনি পথেঘাটে মেলে না। ও প্রতিভা যে যে-কোন বড় সৃজনী-প্রতিভার মতই দুর্লভ। এ কথা সবাই জানে না, তাই যার কাছে যা পাবার নয়, তার কাছে তাই আশা করতে গিয়ে পদে পদে ঘা খায় আর ভাবে অন্য সবারই ভাগ্যে ঠিকমত জুটছে, সে-ই কেবল বঞ্চিত হয়ে রইল জীবনে। নয়ত ভাবে তার রূপগুণ কম, তাই তেমন ক'রে বাঁধতে পারে নি।

হিরণ্ময়ীর তনুলতায় প্রথম যৌবনের মঞ্জরী দেখা দিয়েছে। হঠাৎ যেন বেড়ে উঠেছে এই দু মাসের মধ্যে। আমায় বললে—কখন এলেন ? আসুন আমাদের বাড়িতে। মা বলে দিলেন আপনাকে ডেকে নিয়ে যেতে। কতদিনের ছুটি দিয়েছিলেন পাঠশালাতে, দেড় মাস পরে খুললো ?

—ভাল আছ হিরণ ? উঃ, মাথায় কত বেড়ে গিয়েছ ?

—এতদিন কোথায় ছিলেন ? বেশ তো লোক। সেই গেলেন আর আসবার নামটি নেই ?

হয়ত দু-বছর আগেও এ কথা কেউ বললে বেদনাতুর হয়ে ভাবতাম, আহা, দ্বারবাসিনীতে ফিরলে মালতীও আমায় এ-রকম বলত। কিন্তু সময়ের বিচিত্র লীলা। এ সম্পর্কে মালতীর কথা আমার মনেই এল না।

দু-দিন কামালপুরে রইলাম। হিরণ্ময়ী একথা ভাবে নি যে, আমি আমার জিনিসপত্র আনতে গিয়েছি ওখানে, সে ভেবেছিল আমি আবার পাঠশালা খুলব। ওখানেই থাকব। এবার কিন্তু সে আসবার সময় তর্ক, ঝগড়া করলে না, যেমন ক'রে থাকে। শুধু শুকনো মুখে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল আমার যাওয়া। ওর সে আগেকার ছেলেমানুষি যেন চলে গিয়ে একটু অন্য রকম হয়েছে। তবুও কত অনুরোধ করলে ওখানে থাকবার জন্যে—গাঁ এখন ভাল হয়ে গিয়েছে, কেন আমি যাচ্ছি, গাঁয়ের ছেলেরা তবে পড়বে কোথায় ?

কামালপুর গাঁ পিছু ফেলেছি, মাঠের রাস্তা, গরুর গাড়ি আস্তে আস্তে চলেছে। কি মন খারাপ যে হয়ে গেল! মাঠের মধ্যে কচি মটর-শাক, খেঁসারি-শাকের শ্যামল সৌন্দর্য্য, শিরীষগাছের কাঁচা শুঁটি ঝুলছে। বাসুদেবপুরের মরগাঙের ভাগাড়ে নতুন ঘাসের ওপর গরুর দল চ'রে বেড়াচ্ছে। হিরণ্ময়ীর নিরাশার দৃষ্টি বুকে যেন কোথায় বিঁধে রয়েছে, খচ্ খচ্ ক'রে বাজছে। বেলা যায়-যায়, চাকদার বাজার থেকে গুড়ের গাড়ির সারি ফিরছে, বোধ হয় বেলে কি চুয়াডাঙ্গার বাজারে রাত কাটাবে। জীবনটা কি যেন হয়ে গেল, এক ভাবি আর হয় এক, কোথায় চলেছি আমিই জানি নে। কেনই বা অপরের মনে এত কষ্ট দিই ? এই রাঙা রোদমাখানো মটর-মুসুরির মাঠ যেন বটেশ্বরনাথের দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয়। এই সন্ধ্যায় গঙ্গার বুকে বড় বড় পাল তুলে নৌকোর সারি মুঙ্গেরের দিকে যেত, আমি মালতীর স্বপ্নে বিভোর হয়ে পাষাণ-বাঁধানো ঘাটের ওপর বসে বসে অন্যমনস্ক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতুম। সব মিথ্যে, সব স্বপ্ন। ঐ মরগাঙের ওপারে জমা সন্ধ্যার কুয়াশার মত—ফাঁকা, দু-দিনের জিনিস। এখানে ফল পাকে না। জেরুসালেম পাথরের দেশ।

এর কিছুদিন পরে হিরণ্ময়ীর বাবা আমার কাছে এলেন কালীগঞ্জে। আমায় একবার তাঁদের ওখানে যেতে হবে, হিরণ্ময়ী বিশেষ ক'রে বলে দিয়েছে। আর একটা কথা, মেয়ের বিয়ে নিয়ে তিনি বড় বিপদে পড়েছেন। তিনি গরীব, অবস্থা আমি সবই জানি, গ্রামের সমাজে একঘরেও বটে। দু-তিন জায়গা থেকে সম্বন্ধ এসেছিল, নানা কানাঘুষো শুনে তারা পেছিয়ে গিয়েছে। মেয়েও বেজায় একগুঁয়ে, তাকে দেখতে আসছে শুনলেই সে বাড়ি থেকে পালায়। অত বড় মেয়ে, এখনও জ্ঞান-কাণ্ড হ'ল না, চিরকাল কি ছেলেমানুষি করলে মানায়? সুতরাং তিনি বড় বিপদে পড়েছেন, আমি যদি ব্রাহ্মণের এ দায় উদ্ধার না করি তবে তিনি, কালীকান্ত গাঙ্গুলী, সম্পূর্ণ নিরুপায়। আমার কি মত?

আমি আর কিছুই ভাবলাম না, ভাবলাম কেবল হিরণ্ময়ীর আশাভাঙা চোখের চাউনি আর তার শুকনো মুখ, সেদিন যখন জিনিসপত্র বাঁধছি সেই সময়কারের।

একদিন হিরণ্ময়ী বললে—একটা কথা শোন। যেদিন তুমি প্রথম পাঠশালাতে পড়াতে এলে, আমি তোমার কাছে গেলাম, সেদিন থেকে তোমায় দেখে আমার কেমন লজ্জা করত। সেই জন্যে কাছে বসতে চাইতাম না। তার পর তুমি একদিন রাগ করলে, তাতে আমারও খুব রাগ হ'ল। তুমি তার পর বললে—আমাদের গাঁ ছেড়ে চলে যাবে। সেদিন ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে গেল। এত কান্না আসতে লাগল, কান্না চাপতে পারি নে, পাছে কেউ টের পায়, ছুটে পেছনের সজ্‌নেতলায় চলে গেলাম। সব যেন ফাঁকা হয়ে গেল মনের মধ্যে। উঃ মাগো, সে যে কি দিন গিয়েছে!

হিরণ্ময়ী গুছিয়ে কথা বলতে শেখে নি এখনও।

ভগবান জানেন বিয়ের সময় কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলুম। সপ্তসমুদ্র পারের কোন্ দেশে অনেক দূরে এই সব সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে একটি হাস্যমুখী তন্বী কিশোরী প্রদীপ হাতে ভাঙা বিষ্ণুমন্দিরে সন্ধ্যা দেখাতে যেত কত যুগ আগে···পুকুরপাড়ের তমালবনের আড়ালে তার সঙ্গে সেই যে সব কত সুখ-দুঃখের কাহিনী, কত ঠাকুর-দেবতার কথা, সে সব সত্যি ঘটেছিল, না স্বপ্ন? কোথায় গেল সে মেয়েটি? আর তাকে তেমন ক'রে তো চাই না? যেন কত দূর-জন্মে তার সঙ্গে সে পরিচয়ের দিনগুলো কালের কুয়াশায় অস্পষ্ট হয়ে এসেছে—তাকে যেন চিনি, চিনি, চিনি না। কেন তার স্মৃতিতে মন আর নেচে ওঠে না? কোথায় গেল সে-সব দিন, সে-সব প্রদীপ-দেখানো সন্ধ্যা?

বছরখানেক পরে একদিন রাণাঘাট স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছি। মুর্শিদাবাদের ট্রেন থেকে অনেকগুলো বৈষ্ণব নামলো। তারা যাবে খুলনার গাড়িতে। তাদের মধ্যে একজনকে পরিচিত ব'লে মনে হ'ল। কাছে গিয়ে দেখি দ্বারবাসিনীর আখড়ার সেই নরহরি বৈরাগী—যে একবার জীবগোস্বামীর পদাবলী গেয়েছিল। সে পয়লা নম্বরের ভবঘুরে, মাঝে মাঝে আখড়ায় আসত, আবার কোথায় চলে যেত। নরহরিও আমায় চিনলে, প্রণাম ক'রে বললে—এখানে কোথায় বাবু? এটা কি দেশ নাকি? আপনি তো অনেক দিন দ্বারবাসিনী যান নি? আর যাবেনই বা কি, সব শুনেছেন বোধ হয়, আখড়া আর সে আখড়া নেই। দিদিঠাকরুণ মারা যাওয়ার পরে—

—কে?

—কেন আপনি জানেন না? মালতী দিদিঠাকৃরুণ তো আজ বছর চারেক মারা গিয়েছেন।

আমি ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলুম। নরহরি আপন মনেই ব'লে যেতে লাগল—এখন উদ্ধবদাসের এক ভাইপো তার সেবাদাসী নিয়ে কোথা থেকে এসে জুটেছে। সে-ই এখন কর্ত্তা। উদ্ধবদাস তো বুড়ো হয়েছে, সে কিছু দেখে-শোনে না। এখন অতিথি-বোষ্টম গেলে আর জায়গা হয় না। মালতী দিদিঠাকৃরুণ তো মানুষ ছিলেন না, স্বর্গের দেবী ছিলেন, কি বাপের মেয়ে! তিনি স্বর্গে চ'লে গিয়েছেন, এখন তাঁর অত সাধের আখড়ার কি দশা হয়েছে এই চার বছরে, দেখে চোখে জল আসে বাবু। তাই বড়-একটা সেখানে যাই নে।

ওরা চলে গেলে আমি স্টেশনের বাইরে সেগুনবাগানে গিয়ে কতক্ষণ ব'সে রইলাম। কতক্ষণ···কতক্ষণ। হিসেব ক'রে দেখলাম আমি যখন বটেশ্বরনাথ পাহাড়ে তখনই সে মারা গিয়েছে। অর্থাৎ আমি আখড়া ছেড়ে আসবার এক বছর পরেই।

আজ হঠাৎ মনে হ'ল তার ওপর কি সুবিচার করেছিলুম? অভিমান ভাঙবার সুযোগও তাকে আর একবার দিই নি। আমার জীবনে সে মরে গিয়েছে অনেক দিন, যদিও খবরটা আজ পেলাম! আমার মন অলক্ষিতে আত্মরক্ষা করেছে, বেদনার স্থানে শক্ত আবরণ গড়ে তুলেছে—শামুক যেমন আত্মরক্ষার জন্যে খোলা তৈরি করে। আজ সে খোলা হয়ে পড়েছে শক্ত অনুভূতিহীন—অন্ততঃ এতদিন তাই ভাবতাম। কিন্তু খোলার আবরণের তলায় ব্যথার জায়গাটা আজ মনে হচ্ছে একেবারে সম্পূর্ণরূপে সারে নি।

কে আজ উত্তর দেবে—আমি চলে এলে গোপনে একটুখানি চোখের জলও কি ফেলে নি সে কোনদিন? বিষ্ণুমন্দিরে প্রদীপ দিতে গিয়ে কখনো একদিনও কি অন্যমনস্ক হয় নি? দিনের কাজ মিটে গেলে সে যখন 'পাষণ্ড-দলনের অনুকরণে' বই লেখবার উদ্দেশ্য নিয়ে তার সেই খাতাখানা খুলে বসত, একদিনও কি আমার কথা মনে পড়ে নি?···কত ঠাট্টা যে করতুম তার সেই বই লেখা নিয়ে! আমার যদি আজ দশ হাজার টাকা থাকত, আমি চাইলেই সব টাকাই দিয়ে দিতে পারতাম, যদি এই খবরগুলো আমায় কেউ দিতে পারতো। টাকার মায়া করতুম না—করি নি কোনদিন। এই খবরের বদলে আমি কি না দিতে পারি!

পাগলের মত কি ভাবছি যা'তা বসে! লাভ কি আজ এ-সব ভাবনার? ভালই হয়েছে মালতী, তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হয় নি। সুন্দর জ্যোৎস্নারাতে পল্লীপ্রান্তের বনে মরুচে-লতায় ফুল ফোটে, সুবাসে পথচারীদের মন আনন্দে ভরিয়ে তোলে কিন্তু কতদিন তার আয়ু? জ্যোৎস্না লুকিয়ে আঁধার পক্ষ নামে, বনফুল ঝরে যায়, পুষ্পসুরভি হিমের রাত্রির ঘন কুয়াশায় চাপা পড়ে, নয়ত অকাল বর্ষার বারিধারায় ধুয়ে মুছে যায়। মানুষের অনেক সেবা তুমি করেছিলে, মানুষের মনে তোমার রূপ ভগবান ম্লান হ'তে দিলেন না। ফুলের সুবাস চলে গেলে বনলতা পাছে অনাদৃতা হয়! তোমার বেলা ভগবান তা সহ্য করবেন না।

সেগুনবাগান থেকে উঠে এলুম, তখন রাত হয়ে গিয়েছে।

একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ল। একবার মালতীকে বলেছিলুম—আমাদের গাঁয়ে একটা হাতভাঙা বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে। ছেলেবেলায় তাঁকে বড় ভালবাসতুম। ভগবান যদি দিন দেন, তাঁকে নিয়ে এসে তোমার বাবার মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করব।

দেখতে দেখতে কত দিন হয়ে গেল।

তার পর সাত-আট বছর কেটে গিয়েছে।···

আমার সে অল্প বয়সের ভবঘুরে জীবনের পূর্ণচ্ছেদ পড়েছে অনেক দিন। তবু সে-সব

দিনের ছন্নছাড়া মুহূর্ত্তগুলোর জন্যে এখনও মাঝে মাঝে মন কেমন ক'রে ওঠে, যদিও এখন বুঝেছি হারানো-বসন্তের জন্যে আক্ষেপ ক'রে কোন লাভ নেই। মহাকালের বীথিপথ অনাগত দিনের শত বসন্তের পাখির কাকলীতে মুখর, যা পেলুম তাই সত্য, আবার পাব, আবার ফুরিয়ে যাবে··· তার চলমান রূপের মধ্যেই তার সার্থকতা।

মালতীও চলে গিয়েছে কত দিন হ'ল, পৃথিবী ছেড়ে কোন্ প্রেমের লোকে, নক্ষত্রদের দেশে, নক্ষত্রদের মতই বয়সহীন হয়ে গিয়েছে।

কেবল মাঝে মাঝে গভীর ঘুমের মধ্যে তার সঙ্গে দেখা হয়। সে যেন মাথার শিয়রে ব'সে থাকে। ঘুমের মধ্যেই শুনি, সে গাইছে :—

মুক্ত আমার প্রাণের মাঠে
ধেনু চরায় রাখাল কিশোর
প্রিয়জনে লয় সে হরি
ননী খায় সে ননীচোর।

সেই আমার প্রিয় গানটা···যা ওর মুখে শুনতে ভালবাসতুম।

চোখোচোখি হ'লেই হাসি হাসি মুখে পুরনো দিনের মত তার সেই ছেলেমানুষি ভঙ্গিতে ঘাড় দুলিয়ে বলছে—পালিয়ে এসে যে বড় লুকিয়ে আছো? আখড়ার কত কাজ বাকী আছে মনে নেই?

তখন আমার মনে হয় ওকে আমি খুব কাছে পেয়েছি। দ্বারবাসিনীর পুকুরপাড়ের কাঞ্চনফুল-তলার দিনগুলোতে তাকে যেমনটি পেতুম, তার চেয়েও কাছে। গভীর সুষুপ্তির মধ্যেই তন্দ্রাঘোরে বলি—সব মনে আছে, ভুলি নি মালতী। তোমার ব্যথা দিয়ে, ব্যর্থতা দিয়ে তুমি আমাকে জয় করেছ। সে কি ভোলবার?

দেবযান

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১

সর্ব্বাজীবে সর্ব্বসংস্থে বৃহন্তে
অস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে…

—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ

২

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥

—ভগবদ্গীতা

৩

But Mind, Life and Matter, the lower trilogy, are also indispensable to all cosmic beings not necessarily in the form or with the action and conditions which we know upon earth or in this material universe, but in some kind of action however luminous, however puissant, however subtle. For Mind is essentially that faculty of super-mind which measures and limits, which fixes a particular centre and views from that the cosmic movement.

SRI AUROBINDO'S
The Life Divine, Vol.I.

৪

Beyond these subtle physical planes of experience and the life-worlds there are also mental planes to which the soul seems to have an internatal access...but it is not likely to live consciously there if there has not been a sufficient mental or soul development in this life...

৫

We know that he creates images of these superior planes which are often mental translations of certain elements in them and erects his images into a system, a form in actual worlds; he builds up also desire-worlds of many kinds to which he attaches a strong sense of inner reality.

Vol. III. p. 77.

৬

We arrive then necessarily at this conclusion that human birth is a term at which the soul must arrive in a long succession of rebirths and that it has had for its previous and preparatory terms in the succession the lower forms of life upon earth...

৭

"God is Love and object of Love. Divine Love is not a thing of God : it is God Himself. God needs us just as we need God. This universe is the mere visible tangible aspect of Love and of the need of love."

HENRI BERGSON

কুড়ুলে-বিনোদপুরের বিখ্যাত বস্ত্রব্যবসায়ী রায়সাহেব ভরসারাম কুণ্ডুর একমাত্র কন্যার আজ বিবাহ। বরপক্ষের নিবাস কলকাতা, আজই বেলা তিনটের সময় মোটরে ও রিজার্ভ বাসে কলকাতা থেকে বর ও বরযাত্রীরা এসেচে। অমন ফুল দিয়ে সাজানো মোটর গাড়ী এদেশের লোক কখনো দেখেনি। পুকুরের ধারে নহবৎ-মঞ্চে নহবৎ বসেচে, রং-বেরঙের কাপড় ও শালু দিয়ে হোগলার আসর সাজানো হয়েচে। খুব জাঁকের বিয়ে।

রাত সাড়ে ন'টা। রায়সাহেবের বাড়ীর বড় নাটমন্দিরে বরযাত্রীদের খেতে বসিয়ে দেওয়া হয়েচে। তারা সকলেই কলকাতার বাবু, কুড়ুলে-বিনোদপুরের মত অজ-পাড়াগাঁয়ে যে তাঁদের শুভাগমন ঘটেছে, এতে রায়সাহেব কৃতার্থ হয়ে গিয়েচেন, বার বার বিনীতভাবে বরযাত্রীদের সামনে এই কথাই তিনি জানাচ্ছিলেন। সভামণ্ডপ থেকে নানারকম শব্দ উত্থিত হচ্ছিল।

—ও কি পালমশায়, না-না—মাছের মুড়োটা ফেললে চলবে না—

—ওরে এদিকে একবার ভাতের বালতিটা (অর্থাৎ পোলাওএর বালতি—পোলাওকে ভাত বলাই নিয়ম, তাতে সভ্যতা, সুরুচি ও বড়মানুষী চালের বিশিষ্ট পরিচয় দেওয়া হয়) নিয়ে আয় না—এঁদের পাত যে একেবারেই খালি—সন্দেশ আর দুটো নিতেই হবে—আজ্ঞে না, তা শুনবো না—বাটাছানার না হলেও পাড়াগাঁয়ের জিনিসটা একবার চেখে দেখুন দয়া করে—

ওদিকে যখন সবাই বরযাত্রীদের নিয়ে ব্যস্ত, নাটমন্দিরের সামনের উঠানে একপাশে বিভিন্ন গ্রামের কতকগুলি সাধারণ লোক খেতে বসেচে। তাদের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ, কিন্তু অত্যন্ত দরিদ্র—সে অন্য লোকদের সঙ্গে নিজের পার্থক্য বজায় রেখে একটু কোণ মেরে বসেচে। বসলে কি হবে, এদের দিকে পরিবেশনের মানুষ আদৌ নেই—ফলে এরা হাত তুলে খালি-পাত কোলে বসে আছে।

ব্রাহ্মণযুবকের নাম যতীন। পাশের গ্রামের বেশ সৎ বংশের ছেলে। বয়েস তার পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ হবে। লোকটি বড়ই হতভাগ্য। বেশ সুন্দর চেহারা, লেখাপড়া ভালই জানে, এম্-এ পর্যন্ত পড়ে গান্ধীজীর নন্-কো-অপারেশনের সময় কলেজ ছেড়ে বাড়ী আছে। বিবাহ করেছিল, কয়েকটি ছেলেমেয়েও আছে, আজ কয়েক বৎসর তার স্ত্রী তার সঙ্গে ঝগড়া করে ছেলেমেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ী গিয়ে উঠেচে। এখানে নিজেও আসে না, ছেলেমেয়েদেরও আসতে দেয় না। যতীনের বাপ-মা কেউ জীবিত নন—সুতরাং বড় বাড়ীর মধ্যে ওকে নিতান্তই একা থাকতে হয়, তার ওপর ঘোর দারিদ্র্যের কষ্ট। একজনের খরচ, তাই চলে না।

ভরসারাম কুণ্ডুর ছোটভাই ওদের পাতের সামনে দিয়ে যেতে যেতে ওকে দেখতে পেয়ে বলে উঠলো—আরে এই যে যতীন, পাচ্চ-টাচ্চ তো সব ? ওরে কে আছিস্ এদিকে পাতে লুচি দিয়ে যা—

যতীনের মনটা খুশি হোল। এতক্ষণ সত্যিই তাদের এখানে দেখবার লোক ছিল না।

আয়োজন খুব বড় বটে কিন্তু পরিবেশন করবার ও দেখাশুনো করবার লোকের অভাবে সাধারণ নিমন্ত্রিতদের অদৃষ্টে বিশেষ কিছু জুটচে না।

আহারাদি শেষ হয়ে গেল। এখুনি পুকুরের ধারে বাজি পোড়ানো হবে, কলকাতা থেকে বরপক্ষ ভাল বাজি এনেচে, এসব পাড়াগাঁয়ে অমন কেউ দেখেনি। বাজি দেখবার জন্যে পুকুরের ধারে লোকে লোকারণ্য হয়েচে। যতীনও তাদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালো।

হুস্ শব্দে একটা হাউই আকাশে উঠে গিয়ে প্রায় নক্ষত্রের গায়ে ঠেকে ঠেকে তারপর লাল নীল সবুজ ফুল কেটে আস্তে আস্তে নিচের দিকে নামতে লাগল।

দলের অনেকে চীৎকার করে উঠলো, আগুন লাগবে। আগুন লাগবে।

দু-চারবার এ রকম তারাবাজি উঠলো নামলো, কারো ঘরের চালে আগুন লাগলো না দেখে উদ্বিগ্ন লোকদের মন শান্ত হোল।

তারাবাজি একটার গায়ে একটা হুস্ করে আকাশে উঠছিল, আর যতীন আশ্চর্য হয়ে সে দিকে দেয়ে দেখছিল একদৃষ্টে ঊর্ধ্বমুখে। বহুদিন ধরে সে পাড়াগাঁয়ে নিতান্ত দুরবস্থায় পড়ে আছে, অনেকদিন ভাল কিছু দেখে নি। কলকাতার সে ছাত্রজীবন এখন আর মনে পড়ে না যেন—সে সব যেন গত জন্মের কাহিনী।

সুতোরগাছির মেঘনাথ চক্কত্তি ওকে দেখে বল্লে—এই যে যতীন। আজ রায়সাহেবের বাড়ী খেলে নাকি? তোমার নেমন্তন্ন ছিল; তা তোমাদের বলতে সাহস করে—কই আমাদের বলুক দিকি? ছোট জাত তিলি-তামলি, না হয় দুটো টাকাই হয়েচে, তা বলে ব্রাহ্মণদের নেমন্তন্ন করে খাওয়াবে বাড়ীতে!…তোমরা গিয়ে গিয়ে নিজেদের মান খুইয়েচ তাই তোমাদের বলতে সাহস করে…ছিঃ—

যতীন যখন বাড়ী পৌছলো তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর।

বাঁশবনের মধ্যে সুঁড়ি পথ পেরিয়ে ওর পৈতৃক আমলের কোঠা। অনেকগুলো ঘরদোর, বাইরে চণ্ডীমণ্ডপ, তবে এখন সবই শ্রীহীন। একটা ধানের বড় গোলা ছিল, অর্থকষ্টে পড়ে গত মাঘমাসে সে সাড়ে সাত টাকায় গোলাটা বিক্রী করে ফেলেচে। গোলার ইটে-গাঁথুনি-সিঁড়ি ক'খানা মাত্র বর্তমান আছে।

আলো জ্বেলে নিজের বিছানাটা পেতে নিয়েই সে আলোটা নিভিয়ে দিলে—তেলের পয়সা জোটে কোথা থেকে যে আলো জ্বালিয়ে রাখবে। অন্ধকার শূন্য বাড়ীতে একা বসলেই মনে পড়ে আশালতার কথা।

আশালতা কি করে এত নিষ্ঠুর হতে পারলে? বিয়ের পরে প্রথম পাঁচ বছরের কথা মনে হোলে তার বুকের মধ্যে কেমন করে ওঠে। এই ধরনের কত শ্রাবণ-রাত্রিতে ঐ ছাদে সে কত নিভৃত আনন্দ-মুহূর্তের কাহিনী এই বাড়ীর বাতাসে আজও বাজে, কত মিষ্টি কথা, কত চাপা হাসি, কত সপ্রেম চাহনি।

মনে পড়ে তারা দুজনে একসঙ্গে তারকেশ্বর গিয়েছিল একবার, তখন যতীনের বড় ছেলেটি

আট মাসের শিশু। যাবার আগের দিন রাত্রে আশা রাত একটা পর্যন্ত জেগে খাবার তৈরী করলে। বল্লে, তোমায় কোথাও বাজারের খাবার খেতে দেবো না। নানারকম অসুখ করে যা-তা খাবার খেলে। তার চেয়ে তৈরী করে নিলুম, সস্তাও হবে কেনা খাবারের চেয়ে। ওখানে গিয়ে বাবার প্রসাদ খেলেই চলবে, পথে এই যা করে নিলুম এতেই কুলিয়ে যাবে।

পথে দুষ্টুমি করে যতীন সব খাবার খেয়ে ফেলেছিল নৈহাটি যাবার আগেই, আশাকে ঠকাবার জন্যে। নৈহাটি স্টেশনে খাবার খেতে চাইলে আশা অপ্রতিভ হয়ে পড়লো, খাবার একটুকরোও নেই। যতীন হেসে বল্লে—কেমন, বাজারের খাবার কিনতে হবে না যে বড়! এখন কি হয়?

হয়তো অতি তুচ্ছ ঘটনা। কিন্তু এই তুচ্ছ ঘটনাই পরের পাঁচ ছ'মাস তাদের দুজনকে অফুরন্ত হাসির ফোয়ারা জুগিয়েছিল।—মনে আছে সেই নৈহাটি স্টেশনের কথা? কি হয়েছিল বল তো?

—যাও যাও, পেটুক গণেশ কোথাকার! আমি কি করে জানবো যে—ইত্যাদি ইত্যাদি…

আহা, প্রথম যৌবনের স্বপ্নে রঙীন্ রাগ-সাগরের লীলাচঞ্চল বীচিমালার সে কত চপল নৃত্য! কোথায় মিলিয়ে গিয়েচে, মিশিয়ে গিয়েচে, অতলতলে তলিয়ে গিয়েচে সে সব দিন—তার ঠিকানা নেই, খোঁজ নেই, খবর নেই।

সেই আশালতা আছে তার বাপের বাড়ীতে। আজ পাঁচ বছরের মধ্যে একখানা চিঠি দেয়নি যে তার স্বামী বেঁচে আছে না মরেচে। সেও শ্বশুরবাড়ী যায় না; একবার বছর-তিনেক আগে গিয়েছিল, নিতান্ত না-থাকতে পেরে। আগে থেকে একখানা চিঠি গিয়েছিল যে সে যাচ্চে।

দুপুরের আগে সে গিয়ে পৌঁছুলো। অনেক আগ্রহ করে দিয়েছিল। শাশুড়ীঠাকরুণ রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে কুটনো কুটছিলেন, তাকে দেখে যেন ভূত দেখলেন। যতীন গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিতেই তিনি উদাসীন স্বরে বল্লেন—থাক্ থাক্ হয়েচে, তারপর, এখন কি মনে করে এখানে?

—এই সব দেখাশুনো করতে এলাম। ছেলেমেয়ে সব ভাল আছে? কোথায় সব?

—ঐ যে বাইরের দিকে খেলা করচে—ডেকে দিচ্চি।

যতীন স্ত্রীর কথাটা লজ্জায় উল্লেখ করতে পারলে না।

ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দেখা করলে। তাদের মায়ের কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে যতীনের মনে হোল তারা কি একটা যেন ঢাকচে। ছেলেমেয়েও সব পর হয়ে গিয়েচে, ওর কাছে বড় একটা ঘেঁষতে চায় না আর। ছোট মেয়েটা তো তাকে দেখে নি বল্লেই হয়, আশা যখন চলে এসেছিল তখন খুকীর বয়েস এক বছর মাত্র।

খাওয়া-দাওয়ার সময়েও আশাকে দেখা গেল না। তার ঘরেও নয়। ওর মনে ভয় হোল, আশা বেঁচে আছে তো? লজ্জা ও সঙ্কোচ কাটিয়ে শাশুড়ীকে জিজ্ঞেস করলে—ওদের মা কোথায়? দেখচি নে যে?

শাশুড়ী তাড়াতাড়ি বল্লেন—সে এখানে নেই বাপু। সে আজ দিন-দশেক হোল গিয়েচে তার

দিদির শ্বশুরবাড়ী বারাসতে। তারা অনেকদিন থেকে নিয়ে যাবে নিয়ে যাবে করছিল, তা আমি বলি যাক বাপু দুদিন একটু বেড়িয়ে আসুক। জীবনে তো তার সুখের সীমে নেই।

যতীন ভীষণ নিরাশ হোল। সে যে কত কি মনে ভেবে এসেচে, আশাকে বলবে—চল আশা, যা হবার তা হয়ে গিয়েচে—ঘরের লক্ষ্মী ঘরে চলো। কাকে নিয়ে কাটাই বলো তো তুমি যদি এমন করে থাকবে?

তারপর শাশুড়ীকে জিজ্ঞেস করলে—কবে আসবে?

—আসা-আসির এখন ঠিক নেই। এ মাসে তো নয়ই, পুজোর সময় পর্যন্তও থাকতে পারে। এখানে রাঁধবার লোক নেই, বুড়োমানুষ এতগুলো লোকের ভাতজল করচি দুবেলা, প্রাণ বেরিয়ে গেল।

শেষের কথাটি যে তাকে চলে যাবার ইঙ্গিত, যতীনের তা বুঝতে দেরি হোল না। বিকেলের দিকেই সে ভগ্নমনে বাড়ীর দিকে রওনা হোল। পথে তার খুড়তুতো শালী আন্না, দশ বছরের মেয়ে, অশত্থ-তলায় দাঁড়িয়ে ছিল। ওকে দেখে কাছে এসে বল্লে—দাদাবাবু, আজই এলেন, আজই চল্লেন যে! রইলেন না?

—না, সব দেখাশুনো করে গেলুম। তা ছাড়া তোর দিদি তো এখানে নেই, অনেকদিন পরে এলুম, প্রায় বছর দুই পরে, দেখাটা হোল না।

আন্না কেমন এক অদ্ভুত ভাবে ওর দিকে চাইলে—তারপরে এদিক ওদিক চেয়ে স্বর নিচু করে বল্লে—একটা কথা বলবো দাদাবাবু, কাউকে বলবেন না আগে বলুন!

যতীন বল্লে—না, বলছি নে। কি কথা রে আন্না?

—দিদি এখানেই আছে, কোথাও যায় নি। আপনার আসবার খবর পেয়ে চৌধুরীদের বাড়ী ওর সই-মার কাছে লুকিয়ে আছে। জ্যাঠাইমা আমাদের শিখিয়ে দিয়েছে আপনার কাছে এসব কথা না বলতে।

যতীন বিস্মিত হয়ে বল্লে—ঠিক বলচিস্ আন্না!

পরেই বালিকার সরল চোখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারলে এ প্রশ্ন নিরর্থক। সে দৃষ্টিতে মিথ্যার ভাঁজ ছিল না।

যতীন চলে আসচে, আন্না বল্লে—আজ থেকে গেলেন না কেন দাদাবাবু?

—না, থাকা হবে না আন্না। বাড়ীতে কাজকর্ম ফেলে এসেচি বুঝলি নে?

আন্না আবার বল্লে—দিদিকে একবার চুপি চুপি বলে আসবো যে আপনি চলে যাচ্ছেন, যদি দেখা করে? যাবো দাদাবাবু?

বালিকার স্বরে করুণা ও সহানুভূতি মাখানো। সে ছেলেমানুষ হলেও বুঝেছিল যতীনের প্রতি তার শ্বশুরবাড়ীর আচরণের রূঢ়তা। বিশেষ করে তার নিজের স্ত্রীর।

যতীন অবিশ্যি রইল না, চলেই এল।

চলে এল বটে, কিন্তু যে যতীন গিয়েছিল, সে যতীন আর আসে নি। মনভাঙা দেহটা কোনো রকমে বাড়ীতে টেনে এনেছিল মাত্র।

তারপর দীর্ঘ তিন বছর কেটে গিয়েচে। একথা ঠিক যে, সে রকম বেদনা তার মনে এখন আর নেই, থাকলে সে পাগল হয়ে যেতো। সময় তার ক্ষতে অনেকখানি প্রলেপ বুলিয়ে জ্বালা জুড়িয়ে এনেচে। কিন্তু এমন দিন, এমন রাত্রি আসে যখন স্মৃতির দংশন অসহ্য হয়ে ওঠে।...

তবুও নীরবে সহ্য করতে হয়। তা ছাড়া আর উপায় কিছু তো নেই। এই ক'বছরের মানসিক যন্ত্রণায় ওর শরীর গিয়েচে, মন গিয়েচে, উৎসাহ নেই, আগ্রহ নেই, অর্থ উপার্জনের স্পৃহা নেই, মান-অপমান বোধ নেই।

যে যা বলে বলুক, দিন কোনো রকমে কেটে গেলেই হোল। কিসে কি এসে যায়? তেলি-তামলির বাড়ী নেমন্তন্ন খেলেই বা কি, রবাহূত অনাহূত গেলেই বা কি, লোকে নিন্দে করলেই বা কি, প্রশংসা করলেই বা কি। কিছু ভাল লাগে না--কিছু ভাল লাগে না।

২

যতীনের পৈতৃক বাড়ীটা নিতান্ত ছোট নয়। পূর্বপুরুষেরা এক সময়ে মনের আনন্দে ঘরদোর করে গিয়েচেন। এখন এমন দাঁড়িয়েচে যে সেগুলো মেরামত করবার পয়সা জোটে না। পূর্বদিকের আলসেটা কাঁঠালের ডাল পড়ে জখম হয়ে গিয়েচে বছর দুই হোল। মিস্ত্রী লাগানোর খরচ হাতে আসে নি বলে তেমনি অবস্থাতেই পড়ে রয়েচে।

গত ত্রিশ বৎসরের কত পদচিহ্ন এই বাড়ীর উঠানে। বাবা···মা···বউদিদি···মেজদিদি··· পিসিমা···দুই ছোট ভাই···আশা খোকা-খুকীরা···

কত ভালবাসতো সবাই···সব স্বপ্ন হয়ে গেল···কেউ নেই আজ···

সে শিক্ষিত বলে আগে গ্রামের লোক তাকে খুব মেনে চলতো। এখন তারা দেখেচে যে শিক্ষিত হয়েও তার এক পয়সা উপার্জন করবার শক্তি নেই, এতে এখন সবাই তাকে ঘৃণা করে। তার নামে যা-তা বলে।

আশা যখন প্রথম প্রথম বাপের বাড়ী গিয়েছিল, তখন লজ্জা ও অপমান ঢাকবার জন্যে যতীন গাঁয়ে সকলের কাছে বলে বেড়াতো—শাশুড়ী-ঠাকরুণের হাতে অনেক টাকা আছে—কোন্ দিন মরে যাবেন, বয়েস তো হয়েচে। এদিকে বড় মেয়ে প্রায়ই মার কাছে থাকে, পাছে টাকার সবটাই বেহাত হয়ে যায় তাই ও বল্লে—দ্যাখো, এই সময়টা কিছুদিন মার কাছে গিয়ে থাকি গে। নইলে কিছু পাবো না।

এই কৈফিয়ৎ প্রথম প্রথম খুব কার্যকরী হয়েছিল বটে। তারপর বছরের পর বছর কেটে গেল, এখন লোকে নানারকম ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে। কেউ বলে, অনেকদিন হয়ে গেল, এইবার গিয়ে বৌকে নিয়ে এসো গে যতীন। শাশুড়ীর টাকার মায়া ছেড়ে দাও, বুড়ী সহজে মরবে না।

পিছনে কেউ বলে—এই মোটর গাড়ীর শব্দ ওঠে দ্যাখো না! যতীনের বৌ টাকার পুঁটুলি নিয়ে মোটর থেকে নেমে বলবে—এই নাও পাঁচ হাজার টাকা। তোমার টাকা তুমি রাখো। কি করবে করো—আমি খালাস হই তো আগে! এই ধরো পুঁটুলিটা।

তা ছাড়া আরও কত রকমের কথা বলে—সে সব এখানে ব্যক্ত করবার নয়।

এই সমস্ত ব্যঙ্গ-অপমান যতীনকে বেমালুম হজম করে ফেলতে হয়। সয়ে গিয়েচে, আর লাগে না—মাঝে মাঝে কষ্ট হয় মানুষের নিষ্ঠুরতা বর্বরতা দেখে। একটা সহানুভূতির কথা কেউ বলে না, কেউ এতটুকু দরদ দেখায় না—কি মেয়ে, কি পুরুষ। সংসার যে কি ভয়ানক জায়গা, দুঃখে কষ্টে না পড়লে বোঝা যায় না। দুঃখীকে কেউ দয়া করে না, সবাই ঘৃণা করে।

মানুষ হয়ে মানুষকে এত কষ্ট দিতে পারতো না যদি একটু ভেবে দেখতো। কিন্তু অধিকাংশ মানুষের চিন্তার বালাই নেই তো!

এসব ভেবে কষ্ট হয় বটে, কিন্তু এসব সে গায়ে মাখে না। গা-সওয়া হয়ে গিয়েচে মানুষের নিষ্ঠুরতা, মানুষের অপমান। এর পরেও সে লোকের বাড়ীতে ভাত চেয়ে খায়। কোনদিন লোকে দেয়, কোনদিন দেয় না—বলে, বাড়ীতে অসুখ, রাঁধবার লোক নেই—বড়ই লজ্জিত হোলাম ভাই···ইত্যাদি।

যতীনের বাড়ীর পেছনে খিড়কির বাইরে ছোট্ট একটু বাগান আছে, তাতে একটা বড় পাতিলেবুর গাছ আছে। যেদিন কোথাও কিছু না মেলে, গাছের লেবু তুলে সে বিনোদপুরের হাটে বিক্রী করতে নিয়ে যায়, আম কাঁঠালের সময় গাছের আম কাঁঠাল মাথায় করে হাটে নিয়ে যায়। এতেও লোকে নিন্দে করে—শিক্ষিত লোক হয়ে ভদ্রসমাজের মুখ হাসাচ্চে। রায়সাহেব ভরসারাম কুণ্ডু কেন তার বাড়ীর কাজকর্মে ব্রাহ্মণদের নেমন্তন্ন করতে সাহস না করবে?

এক সময়ে বড্ড বই পড়তে ভালবাসতো সে। অনেক ভাল ভাল ইংরিজি বই ছিল, সংস্কৃত বই ছিল তার ঘরে—কতক নষ্ট হয়ে গিয়েচে, কতক সে-ই বিক্রী করে ফেলেচে অভাবে পড়ে। এইসব নির্জন রাত্রে বইগুলোর জন্যে সত্যি মনে কষ্ট হয়।

এইরকম নির্জন রাত্রে বহুদিন আগেকার আর একজনের কথা মনে পড়ে। সে স্বপ্ন হয়ে গিয়েচে অনেকদিন। ভুলেও তাকে গিয়েছিল, কিন্তু আশা চলে যাওয়ার পরে তার কথা ধীরে ধীরে জেগে উঠেচে।

গত পাচ বছরে যতীন অনেক শিখেচে। মানুষের দুঃখ বুঝতে শিখেচে, নিজের দুঃখে উদাসীন হয়ে থাকতে শিখেচে, জীবনের বহু অনাবশ্যক উপকরণ ও আবর্জনাকে বাদ দিয়ে সহজ অনাড়ম্বর সত্যকে গ্রহণ করতে শিখেচে।

বর্ষার শেষে যতীন পড়ল অসুখে। একা থাকতে হয়, এক ঘটি জল দেবার মানুষ নেই। মাথার কাছে একটা কলসী রেখে দিত—যতক্ষণ শক্তি থাকতো নিজেই জল গড়িয়ে খেত—যখন না থাকতো শুয়ে চিঁ চিঁ করত। গাঁয়ের লোক একেবারেই যে দেখেনি তা নয়, কিন্তু সে নিতান্ত দায়সারা গোছের দেখা। তারা দোরের কাছে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখে যেতো—হয়তো ছেলেমেয়ের হাতে দিয়ে কচিৎ এক বাটি সাবুও পাঠিয়ে দিতো—সেও দায়সারা গোছের। সে দেওয়ার মধ্যে স্নেহ ভালবাসার স্পর্শ থাকতো না।

অনেকে পরামর্শ দিত—ওহে, বৌমাকে এইবার একখানা পত্র দাও। তিনি আসুন—না

এলে এই অবস্থায় কে দেখে, কে শোনে, কে একটু জল মুখে দেয়। আমাদের তো সব সময় আসা ঘটে ওঠে না, বুঝতেই তো পারো, নানারকম ধান্ধাতে ঘুরতে হয়। নইলে ইচ্ছে তো করে, তা কি আর করে না?…ইত্যাদি।

এ কথার কোনো উত্তর সে দিত না।

৩

আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি যতীন সেরে উঠলো। যার কেউ নেই, ভগবান তাকে বোধ হয় বেশিদিন যন্ত্রণা ভোগ করান না। হয় সারান, নয় সারাবার ব্যবস্থা করেন। বৈকালের দিকে নদীর ধারের মাঠে সে বেড়াতে গেল। একটা বড় জায়গায় একটা বড় বাবলা কাঠের গুঁড়ি পড়ে। চারিদিক ঘিরে সেখানে বনঝোপ। পড়ন্ত বেলায় পাখীর দল কিচ্ কিচ্ করচে, কেলে-কোঁড়া লতায় শরতের প্রথমে সুস্নিগ্ধ ফুল ফুটেচে, নির্মেঘ আকাশ অদ্ভুত ধরনের নীল।

গাছের গুঁড়িটার ওপর সে দেহ এলিয়ে দিয়ে আধ-শোওয়া অবস্থায় রইল। শরীর দুর্বল, বেশিক্ষণ দাঁড়াতে বা বসতে কষ্ট বোধ হয়।

ওর মনে একটা ভয়ানক কষ্ট…বিশেষ করে এই অসুখটা থেকে ওঠবার পরে। মনটা কেমন দুর্বল হয়ে গিয়েচে রোগে পড়ে থেকে। নইলে যে আশালতা অত নিষ্ঠুর ব্যবহার করেচে তার সঙ্গে, রোগশয্যায় পড়ে সেই আশালতার কথাই অনবরত মনে পড়বে কেন। শুধু আশালতা… আশালতা…

না, চিঠি সে দেবে না—দেয়ও নি। মরে যাবে তবুও চিঠি দেবে না। মিথ্যে অপমান কুড়িয়ে লাভ কি, আশালতা আসবে না। যদি না আসে, তার বুকে বড় বাজবে, পূর্বের ব্যবহার সে খানিকটা এখন ভুলেচে, স্বেচ্ছায় নতুন দুঃখ বরণ করার নির্বুদ্ধিতা তার না হয়। সে অনেক দুঃখ পেয়েচে, আর নয়।

সব মিথ্যে… সব ভুল…প্রেম, ভালবাসা সব দুদিনের মোহ। মূর্খ মানুষ যখন মজে, হাবুডুবু খায়, তখন শত রঙীন কল্পনা তাতে আরোপ ক'রে প্রেমাস্পদকে ও মনের ভাবকে মহনীয় করে তোলে। মোহ যখন ছুটে যায়, অপস্রিয়মাণ ভাঁটার জল তাকে শুষ্ক বালুর চড়ায় একা ফেলে রেখে কোন্ দিক দিয়ে অন্তর্হিত হয় তার হিসেব কেউ রাখে না।

এই নিভৃত লতাবিতানে, এই বৈকালের নীল আকাশের তলে বসে সে অনুভব করলে জগতের কত দেশে, কত নগরীতে, কত পল্লীতে কত নরনারী, কত তরুণ, কত নবযৌবনা বালিকা প্রেমের ব্যবসায়ে দেউলে হয়ে আজ এই মুহূর্তে কত যন্ত্রণা সহ্য করচে। নিরুপায় অসহায় নিতান্ত দুঃখী তারা। অর্থ দিয়ে সাহায্য ক'রে তাদের দুঃখ দূর করা যায় না। কেউ তাদের দুঃখ দূর করতে পারে না। এই সব দুঃখীদলের সেও একজন। আজ পৃথিবীর সকল দুঃখীর সঙ্গে সে যেন একটা অদৃশ্য যোগ অনুভব করলে নিজের ব্যথার মধ্যে দিয়ে।

দারিদ্র্যকে সে কষ্ট বলে মনে করে না। কেউ তাকে ভালবাসে না, এই কষ্টই তাকে যন্ত্রণা

দিয়েচে সকলের চেয়ে বেশি। আশা যদি আবার আজ ফিরে আসে—পুরোনো দিনের আশা হয়ে ফিরে আসে—সে নতুন মানুষ হয়ে যায় আজ এই মুহূর্তে। দশটি বছর বয়েস কমে যায় তার।

যাক, আশার কথা আর ভাববে না। দিনরাত ঐ একই চিন্তা অসহ্য হয়ে উঠেচে। সে পাগল হয়ে যাবে নাকি?

হঠাৎ সে দেখলে হাউ হাউ করে কাঁদচে।

একি ব্যাপার! ছিঃ ছিঃ—নাঃ, সে সত্যিই পাগল হবে দেখচি। যতীন কাঠের গুঁড়িটা থেকে তাড়াতাড়ি উঠে ব্যস্তভাবে পায়চারি করতে লাগলো। নিজেকে সে সংযত করে নিয়েচে—আর সে ও কথাই ভাববে না। যে গিয়েচে, ইচ্ছে করে যে চলে গিয়েচে, তাকে মন থেকে কেটে বাদ দিতে হবে—হবেই। কেটে বাদই দেবে সে।

যতীন বাড়ী ফিরে এল। অন্ধকার বাড়ী, অন্ধকার দোর। ভাঙা তক্তাপোশের ওপর তার রাজশয্যা তো পাতাই আছে। সে কেউ ঝাড়েও না, পাতেও না, তোলেও না। অন্ধকারের মধ্যে শয্যায় দেহ প্রসারিত করে শোবার সময় একবার তার মনে হোল—সেই আশা কেমন করে এমন নিষ্ঠুর হতে পারলে!

সেই রাত্রেই যতীনের আবার খুব জ্বর হোল। হয়তো এতখানি পথ যাতায়াত করা, এত ঠাণ্ডা লাগানো দুর্বল শরীরে তার উচিত হয় নি। পরদিন দুপুর পর্যন্ত সে অঘোর অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইল—কেউ খোঁজখবর নিলে না। দুপুরের পর বোষ্টমদের বৌ ওদের উঠোনে তাদের পোষা ছাগল খুঁজতে এসে অত বেলা পর্যন্ত ঘরের দোর বন্ধ দেখে বাড়ী গিয়ে খবর দিলে। সে সকালের দিকে আরও দুবার এদিকে কি কাজে এসে দোর বন্ধ দেখে গিয়েছিল।

বিকেলের দিকে সন্ধ্যার কিছু আগে তার জ্বর কমলে সে নিজেই দোর খুললে। কিন্তু এক পাও বাইরে আসতে পারলে না। বিছানায় গিয়েই শুয়ে পড়লো। তৃষ্ণায় তার জিব শুকিয়ে গিয়েচে। কাছাকাছি কারো বাড়ী নেই যে, ডাকলে শুনতে পাবে। বেশি চেঁচানোরও শক্তি নেই।

সকালে কেউ দেখতে এল না। এর একটা কারণ ছিল। যতীনের বাড়ী ইদানীং বড় একটা কেউ আসতো না। এক ছিলিম তামাকও যেখানে খেতে না পাওয়া যাবে, পাড়াগাঁয়ে সে-সব জায়গায় লোক বড় যাতায়াত করে না। কাজেই দুদিন কেটে গেল, যতীনের ঘরের দোর বন্ধ রইল, কেন লোকটা দোর খুলছে না, এ দেখবার লোক জুটলো না। পরের দিন অনেক বেলায় বোষ্টম-বৌ আবার ছাগল খুঁজতে এসে অত বেলায় যতীনের দোর বন্ধ দেখে ভাবলে—যতীন ঠাকুর কত বেলা পর্যন্ত ঘুমুচ্চে আজকে!...বেলা দশটা বাজে এখনও সাড়া-শব্দ নেই! বেলা বারোটার সময় একবার কি ভেবে আবার এসে দেখলে তখনও দোর বন্ধ। ব্যাপারটা সে বুঝতে পারলে না। পাড়ার মধ্যে খবরটা বল্লে।

পাড়ার দু-চারটা ষণ্ডাগুণ্ডা গোছের যুবক এসে ডাকাডাকি করতে লাগলো।

—ও যতীন-দা, এত বেলায় ঘুম কি, দোর খুলুন—ও যতীন-দা—

কেউ সাড়া দিলে না। আরও লোকজন জড় হোল—দোর ভাঙা হোল।

যতীন বিছানায় মরে কাঠ হয়ে আছে। কতক্ষণ মরেচে কে জানে, দুঘণ্টাও হতে পারে, দশঘণ্টাও হতে পারে।

তখন সকলে খুব দুঃখ করতে লাগলো। বাস্তবিকই কারো দোষ ছিল না। যতীন লোকটা আজকাল কেমন হয়ে গিয়েছিল, লোকজনের সঙ্গে তেমন করে মিশতো না, কথাবার্তা বলতো না বলে লোকেও এদিকে বড় একটা আসতো না। সুতরাং যতীনের আবার অসুখ হয়েচে, এ খবরও কেউ রাখে না।

নবীন বাঁড়ুয্যে বল্লেন—আহা, ভবতারণ-দা'র ছেলে! ওর বাবার সঙ্গে একসঙ্গে পাশা খেলেচি আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে বসে। লোকটা বেঘোরে মারা গেল। তাই-কি আমি জানি ছাই যে এমনি একটা অসুখ হয়েচে (বাস্তবিকই তিনি জানতেন না), আমার স্ত্রী আর আমি এসে রাত জাগতাম। আর সে বৌটিরই বা কি আক্কেল—ছ'বছরের মধ্যে একবার চোখের দেখা দেখলে না গা—হ্যাঁ?

সকলে একবাক্যে যতীনের বৌ-এর উদ্দেশে বহু গালাগালি করলে।

যতীনের মৃতদেহ যখন শ্মশানে সৎকারের জন্যে নিয়ে যাওয়া হোল, তখন বেলা দুটোর কম নয়।

৪

যতীন হঠাৎ দেখতে পেলে তার খাটের পাশে পুষ্প দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসচে।...

পুষ্প! এক সময় পুষ্পের চেয়ে তার জীবনে প্রিয়তর কে ছিল?

দুজনে—

নৈহাটির ঘাটে
বসে পৈঠার পাটে
কত খেলেচি ফুল ভাসায়ে জলে—

সেই পুষ্প।

নৈহাটির ঘাট নয়—সাগঞ্জ-কেওটার বুড়োশিবতলার ঘাট। নৈহাটির আরপারে। সেখানে ছেলেবেলায় তার মাসীমার জীবদ্দশায় সে কতবার গিয়েচে। এক এক সময় ছ'মাস আটমাস মাসীমার-কাছেই সে থাকতো। মাসীমার ছেলেপুলে ছিল না, যতীন ছিল তার চক্ষের মণি। তারপর মাসীমা মারা গেলে, মেসোমশায় দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করলেন, সাগঞ্জ-কেওটাতে মাসীমার বাড়ীর দরজা চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে গেল ওর কাছে।

বুড়োশিবতলায় পুরোনো মন্দিরের কাছে ছিল ওর মাসীমার বাড়ী আর রাস্তার ওপাশেই ছিল পুষ্পদের বাড়ী। পুষ্পর বাবা শ্যামলাল মুখুয্যে বাঁশবেড়ের বাবুদের জমিদারিতে কি কাজ করতেন। পুষ্প ছিল ভারি সুন্দরী মেয়ে—তার হাসি—সে হাসি কেবল পুষ্পই হাসতে পারতো।

দোষের মধ্যে পুষ্প ছিল অত্যন্ত গর্বিত মেয়ে। তার বিশ্বাস ছিল তার মত সুন্দরী মেয়ে এবং তার বাবার মত সম্ভ্রান্ত লোক গঙ্গার ওপারে কোথাও নেই।

ধীরে ধীরে পুষ্পের সঙ্গে ওর আলাপ হয়, ধীরে ধীরে সে আলাপ জমে। ও তখন তেরো বছরের ছেলে, পুষ্প তেরো বছরের মেয়ে। সমান বয়স হোলে কি হবে, বাচাল ও বুদ্ধিমতী পুষ্পের কাছে যতীন ভেসে যেত। পুষ্প চোখে-মুখে কথা কইতো, যতীন সপ্রশংস দৃষ্টিতে তার গর্বিত সুন্দর মুখের দিকে নীরবে চেয়ে রইত। মস্ত অশ্বত্থগাছ যে পুরোনো ঘাটটার ওপরে, যেটার নাম সেকালে ছিল বুড়োশিবতলার ঘাট, ওই ঘাটে কতদিন সে ও পুষ্প একা বসে গল্প করেচে, জগদ্ধাত্রী পুজোর ভাসানের দিন পাঁপরভাজা কিনে ঘাটের রানার ওপর বসে দুজনে ভাগ করে খেয়েচে। কেমন করে যে সেই রূপ-গর্বিতা বালিকা তার মত সাদাসিধে ধরনের বালককে অত পছন্দ করেছিল, অত দিনরাত মিশতো, নিত্য তাদের বাড়ী না গেলে অনুযোগ করতো— এ সব কথা যতীন জানে না, সে সব বোঝবার বয়েস তখন ওর হয়নি।

দু-দশ দিন নয়, দেড় বছর দুবছর ধরে দুজনে কত খেলা করেচে, কত গল্প করেচে, কত ঝগড়া করেচে, পরস্পরের নামে পরস্পরের গুরুজনের কাছে কত লাগিয়েচে, আবার দুজনে পরস্পরে যেচে সেধে ভাব করেচে—সে কথা লিখতে গেলে একখানা ইতিহাসের বই হয়ে পড়ে।

মাসীমার মৃত্যুর পরে কেওটার পথ বন্ধ হোল। বছরখানেকের মধ্যে পুষ্পও বসন্ত হয়ে মারা গেল। দেশে থাকতে পুষ্পর মৃত্যুসংবাদ মেসোমশায়ের চিঠিতে সে জেনেছিল। তারপর তেরো বছর কেটে যাওয়ার পরে ছাব্বিশ বছর বয়সে যতীন বিবাহ করে। বাল্যের তেরো বছর —বহুদিন। পুষ্প তখন ক্ষীণ স্মৃতিতে পর্যবসিত হয়েচে। তারপর আশালতার সঙ্গে নবীন অনুরাগের রঙীন দিনগুলিতে পুষ্প একেবারে চাপা পড়ে গেল। কিন্তু চাপা পড়ে যাওয়া আর ভুলে যাওয়া এক জিনিস নয়। মানুষের মনের মন্দিরে অনেক কক্ষ, এক এক কক্ষে এক এক প্রিয় অতিথির বাস। সে কক্ষ সেই অতিথির হাসিকান্নার সৌরভে ভরা, আর কেউ সেখানে ঢুকতে পারে না। প্রেমের এ অতিথিশালা বড় অদ্ভুত, অতিথি যখন দূরে থাকে তখনও যে কক্ষ সে একবার অধিকার করেছে সে তারই এবং তারই চিরকাল। আর কেউ সে কক্ষে কোনো দিন কোনো কালে ঢুকতে পারে না। সে যদি আর ফিরেও না আসে কখনো, চিরদিনের জন্যই চলে যায়—এবং জানিয়ে দিয়েও যায় যে সে ইহজীবনের মতই চলে যাচ্ছে—তখন তার সকল স্মৃতির সৌরভ সুদ্ধ সে ঘরের কবাট বন্ধ করে দেওয়া হয়—তারই নাম লেখা থাকে সে দোরের বাইরে। তার নামেই উৎসর্গীকৃত সে ঘর আর-কারো অধিকার থাকে না দখল করবার।

পুষ্পের ঘরের কবাট বন্ধ ছিল—চাবি দেওয়া, বাইরে ছিল পুষ্পের নাম লেখা। হয়তো চাবিতে মরচে পড়েছিল, হয়তো কবাটের গায়ে ধুলো মাকড়সার জাল জমেছিল, হয়তো এ ঘরের সামনে অনেক দিন কেউ আসে নি, কিন্তু সে ঘর দখল করে কার সাধ্য? আশালতা সে ঘরে ঢোকেনি—আশালতার ঘর আলাদা।

সেই পুষ্প।

যতীন অবাক্ দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইল। প্রথমেই যে কথাটা ওর মনে উঠলো সেটা এই যে, পুষ্পের সঙ্গে শেষবার দেখা হওয়ার পরে যে বহু বছর কেটে গিয়েচে—তেরো বছর পরে সে বিয়ে করে আশাকে, বিয়ে করেচেও আজ দশ বছর—এই দীর্ঘ, দীর্ঘ তেইশ বছর পরে কেওটার বুড়ো.শবতলার ঘাটের সেই রূপসী মেয়ে বালিকা পুষ্প কোথা থেকে এল? যে বয়সে তারা দুজনে—

নৈহাটির ঘাটে
বসে পৈঠার পাটে
খেলা করেছিল ফুল ভাসায়ে জলে—!

বুড়োশিবতলার ঘাটের প্রাচীন সোপানশ্রেণীর ওপরে বাঁকাভাবে অস্তসূর্যের আলো এসে পড়েচে—ঘাটের রানায় শেওলা জমেচে, ঠিক ওপারে হালিসহরে শ্যামাসুন্দরী ঘাটের মন্দিরেও পড়েচে রাঙা আলো, কিন্তু সেটা পড়েচে পশ্চিমদিক থেকে সোজাভাবে গিয়ে, এখনও সেই প্রাচীন পাখীর দল ডাকচে বড় অশ্বত্থগাছটার ডালে ডালে, সাদা পাল তুলে ইলিশ মাছ ধরা পুরোনো জেলেডিঙির সারি চলেছে ত্রিবেণীর দিকে…যতীন বসে পুষ্পের সঙ্গে গত বারোয়ারীতে যাত্রায় দেখা কি একটা পালার গল্প করচে তেইশ বছর পরেও পুষ্প এখনও সেই রকমটি দেখতে রয়েচে কেমন করে?

কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হোল—পুষ্প তো নেই! সে তো বহুকাল মরে গিয়েচে। ব্যাপার কি, সে স্বপ্ন দেখচে না কি? পুষ্প কিন্তু এগিয়ে এসে হাসিমুখে বল্লে—অবাক্ হয়ে চেয়ে দেখচো কি? চিনতে পেরেচ? বল তো আমি কে?

যতীন তখনও হাঁ করে চেয়েই আছে। বল্লে—খুব চিনেচি। কিন্তু তুই কোথা থেকে এলি পুষ্প? তুই তো কত কাল হোল—

পুষ্প খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে বল্লে—মরে গিয়েচি, অর্থাৎ তোমার হাড় জুড়িয়েছিল—এই তো? কিন্তু তুমিও যে মরে গিয়েচ যতুদা? নইলে তোমার আমার দেখা হবে কেমন করে? তুমিও পৃথিবীর মায়া কাটিয়েচ অর্থাৎ পটল তুলেচ।

যতীনের হঠাৎ বড় ভয় হোল। এ সব কি ব্যাপার? তার জ্বর হয়েছিল খুব, সে কথা মনে আছে। তারপর মধ্যে কি হয়েছিল তার জানা নেই। বর্তমানে বোধ হয় তার জ্বরের ঘোর খুব বেড়েচে, জরের ঘোরে আবোল-তাবোল স্বপ্ন দেখছে। তবুও সে এতকাল পরে পুষ্পকে দেখতে পেয়ে ভারি খুশি হোল। স্বপ্নই বটে, বড় মধুর স্বপ্ন কিন্তু!

পুষ্প কিন্তু ওকে ভাববার অবকাশ দিলে না। বল্লে—পুরোনো দিনের মত দুষ্টুমি কোরো না যতুদা। এখন তুমি ছেলেমানুষটি নেই। এখানে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসচে, থাকতে পারচি না—এখন এসো আমার সঙ্গে।

সে হঠাৎ পাগল হয়ে গেল নাকি? সে তো কিছুই বুঝতে পারচে না। যাবে কোথায় চলে সে? পুষ্পই বা আসে কোথা থেকে? অথচ সে তো এই তার পুরোনো ঘরেই রয়েচে, ঐ তো

চূণবালি খসা দেওয়াল, ঐ তো উঠোনের পেঁপে গাছটি, ঐ পৈতৃক আমলের গোলার ভাঙা সিঁড়ি।

পুষ্পকে সে বল্লে—তুই কি করে জানলি আমার অসুখ করেচে? প্রশ্ন করলে বটে, অথচ যতীন সঙ্গে সঙ্গে ভাবলে, আশ্চর্য! কাকে একথা জিজ্ঞেস করচি? পুষ্প, যে তেইশ বছর আগে মারা গিয়েচে, তাকে? অদ্ভুত স্বপ্ন তো! এমনধারা স্বপ্ন তো সত্যিই জীবনে কোনদিন দেখি নি!

পুষ্প বল্লে—কি করে জানলুম? বেশ কথাটি বল্লে তো যতুদা! তোমার এই ঘরে তোমার কাছে আমি বসে নেই পরশু তোমার জ্বর হওয়ার দিন থেকে? দিন রাতে অনবরতই তো তোমার শিয়রে বসে।

—বলিস্ কি পুষ্প! আমার শিয়রে তুই বসে আছিস দুদিন থেকে? পুষ্প, একটা কথা বল্ তো—আমি পাগল হয়ে যাই নি তো জ্বরের ঘোরে?

—সবাই ও-রকম কথা বলে যতুদা। প্রথম প্রথম যারা আসে, তাদের বারোআনা ওই কথাই বলে। তারা বুঝতে পারে না তাদের কি হয়েচে। তুমিও জ্বালালে যতুদা।

কথা শেষ করে পুষ্প এসে হাত ধরে খাট থেকে নামিয়ে নিতেই যতীন বেশ সুস্থ ও হাল্কা অনুভব করলে নিজেকে। তারপর কি মনে করে খাটের দিকে একবার চাইতেই সে বিস্ময়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। খাটের ওপর তার মত একটা দেহ নির্জীব অবস্থায় পড়ে। ঠিক তার মত চোখ মুখ - সবই তার মত।

পুষ্প বল্লে—দাঁড়িও না যতুদা—এসো আমার সঙ্গে। কেমন, এখন বোধ হয় বিশ্বাস হয়েচে? বুঝলে এখন?

পুষ্প তো ঘরের দরজা খুললে না? তবে তারা ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালো কি করে! এখনও রাত আছে। অন্ধকার রয়েচে, মাথার ওপরে অগণ্য তারা জ্বলচে, নবীন বাঁড়ুয্যের বাড়ীর দিকে একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করচে। অথচ এই ঘন অন্ধকার রাত্রে সে চলেচে কোথায়? কার সঙ্গেই বা চলেচে? এখনও কি সে স্বপ্ন দেখচে?

পুষ্প বল্লে—এখন বিশ্বাস হোল যতুদা? দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে বার হয়ে এলাম দেখলে না?

—কি করে এলাম?

—ইটের দেওয়াল এখন তোমার আমার কাছে ধোঁয়ার মত। আমাদের এ শরীরে পৃথিবীর জড় পদার্থের স্পর্শ লাগবে না। আর একটা মজা তোমায় দেখাবো, পায়ে হেঁটে যেও না, মনে ভাবো যে উড়ে যাচ্চি—

যতীন মনে মনে তাই ভাবলে। অমনি সে দেখলে তার দেহ রবারের বেলুনের মত আকাশ দিয়ে উড়ে চলেচে। দুজনে চল্‌লো, পুষ্প আগে, যতীন তার পেছনে। কোথায় যাচ্ছে, যতীন কিছুই জানে না।

সে অনেক কথা ভাবছিল যেতে যেতে। এত অদ্ভুত ঘটনা তার জীবনে আর কখনো হয়নি।

স্বপ্নে কি এমন সব ব্যাপার ঘটে? স্বপ্ন যদি না হয় তবে কি সে পাগল হয়ে গেল? তাই বা কেমন করে হয়, তবে পুষ্প আসে কোথা থেকে? কিম্বা সবটাই মনের ধাঁধা—hallucination?

না—একেই বলে মৃত্যু?

এরই নাম যদি মৃত্যু হয় তবে লোকে এত ভয় করে কেন? কেউ তো কখনো তাকে বলেনি যে মৃত্যুর পরে মানুষ জীবিত থাকে—বরং তার মনে হচ্চে সে আরও বেশি জীবন্ত হয়েচে—বেঁচেই বরং রোগের যন্ত্রণায় দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

হঠাৎ যতীন দেখলে যে সে এক নতুন দেশে এসেচে—দেশটা পৃথিবীর মতই। তাঁর পায়ের তলায় নদী, গাছপালা, মাঠ, সবই আছে—কিন্তু তাদের সৌন্দর্য অনেক বেশি। আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে, সূর্য দেখা যায় না—অথচ অন্ধকারও নেই—ভারি চমৎকার এক ধরনের অপার্থিব মৃদু আলোকে সমগ্র দেশটা উদ্ভাসিত। গাছপালার পাতা ঘন সবুজ, নানাধরনের ফুল, সেগুলো যেন আলো দিয়ে তৈরী।

এক জায়গায় এসে পুষ্প থামলো।

একি! এ তো সেই পুরোনো দিনের কেওটা-সাগঞ্জের বুড়োশিবতলার ঘাট। ঐ গঙ্গা। ঐ সেই প্রাচীন অশ্বথ গাছটা। ঐ তো বুড়োশিবের ভাঙা মন্দিরটা। পৃথিবীতে মাঝে মাঝে গোধূলির সময় মেঘলা আকাশে যেমন একটা অদ্ভুত হল্‌দে আলো হয়, ঠিক তেমনি একটা মৃদু, তাপহীন, চাপা আলো গাছপালায়, গঙ্গার জলে, বুড়োশিবের মন্দিরের চুড়োয়। ওকে ঘাটের সোপানে একা বসিয়ে পুষ্প কোথায় চলে গেল। যতীন চুপ করে বসে অদ্ভুত আলোকে রঙীন গঙ্গাবক্ষের দিকে চেয়ে রইল। বাল্যের শত সুখের, শত আনন্দস্মৃতির রঙ্গস্থল সেই পুরোনো জায়গা—ঐ তো ওপারে শ্যামাসুন্দরীর ঘাট, শ্যামাসুন্দরীর মন্দির। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, কোনো দিকে আর কোনো লোকজন নেই। এতখানি সুবিস্তীর্ণ স্থান একেবারে নির্জন। কেউ কোথাও নেই সে ছাড়া!

এমন সময়ে অশ্বথ গাছের তলায় সেই প্রাচীন পথটা দিয়ে পুষ্পকে আসতে দেখা গেল। তাঁর খোঁপায় কি একটা ফুলের মালা জড়ানো।

যতীন বল্লে—এ কোথায় আন্‌লি পুষ্প? বুড়োশিবতলার ঘাট না? এ কি সাগঞ্জ-কেওটা?

পুষ্প যে সত্যিই দেবী, যতীন তার দিকে চেয়ে সেটা এবার ভালভাবেই বুঝতে পারলে। এমন গাঢ়যৌবনা, শান্ত আনন্দময়ী মূর্তি মানবীর হয় না—কি রূপই তার ফুটেচে। কি জ্যোতির্ময় মুখশ্রী! যতীন অবাক্ হয়ে ওর দিকে চেয়ে রইল।

পুষ্প বল্লে—না যতুদা—এ স্বর্গ। সকলের স্বর্গ তো এক নয়!..

তারপর মৃদু হেসে সলজ্জ সুরে ওর মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—এ আমাদের স্বর্গ—তোমার আর আমার স্বর্গ।

যতীনকে পুষ্প একটা ছোটখাটো সুন্দর বাড়ীতে নিয়ে গেল। সে বাড়ী ইট-কাটের তৈরী নয়, যেন মনে হোল এক ধরনের মার্বেল পাথরে তৈরী, কিন্তু মার্বেল পাথরও নয় সে জিনিস। বাড়ীর চারিধারে ফুলের বাগান, সবুজ ঘাসের মাঠ। দূরে গঙ্গা দেখা যাচ্ছে। পুষ্প বল্লে—এসব আমার তৈরী। জানো আমি এদেশে এসেচি আজ আঠারো বছর, তোমার অপেক্ষায় ঘর সাজিয়ে বসে আছি। পৃথিবীতে কেওটার গঙ্গার ঘাটের চেয়ে প্রিয়তর আমার আর কিছু ছিল না। এখানে এসে কল্পনায় তাই সৃষ্টি করেচি। এখানে যার যা ইচ্ছে কল্পনায় গড়ে নিতে পারে। এই বাড়ীও আমার কল্পনায় তৈরী।

যতীন বল্লে—কেমন করে হয়?

—এদেশের বস্তুর ওপর চিন্তার শক্তি খুঁব বেশী! পৃথিবীর বস্তুর মত এখানকার বস্তু নয়। আরও অনেক সূক্ষ্ম—অন্য ধরণের, সে পরে নিজেই টের পাবে। চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করতে তোমাকেও শিখতে হবে—সৃষ্টি করতে হোলে পৃথিবীতেও যেম্‌নি চিন্তার দরকার, এখানে তার চেয়েও বেশি দরকার। চিন্তার শক্তিকে যে বাড়াতে পেরেছে, ইচ্ছামত চালাতে পারে, সে এদেশের বড় কারিগর। কিন্তু এও যে বস্তু, সে বিষয়ে ভুল নেই; পৃথিবীর মানুষ যাকে চেনে, সে বস্তু নয়—তা হোলেও বস্তুই।

—আমার বাবা-মা কোথায় পুষ্প?

—এখনই আসবেন। অসুখের সময় তোমার মা আর আমি তোমার শিয়রে বসে থাকতাম। তাঁরা অন্য জায়গায় থাকেন। পৃথিবী থেকে তোমাকে আনতে যাচ্ছিলেন কিন্তু সন্তানের মরণের দৃশ্য তাঁদের দেখতে কষ্ট হবে ভেবে আমিই তাঁদের যেতে বারণ করি। তোমার পৃথিবীর দেহটা বড্ড খারাপ দেখতে হয়ে গিয়েছিল মরণের আগে—মা গো, ভাবলে ভয় করে।

যতীন বল্লে—আর তোমাদের দেখলে আমার ভয় হচ্চে না? তোমরা যে ভূত, সেটা খেয়াল আছে?

পুষ্প বল্লে—সে তো তুমিও।

যতীন বল্লে—এদেশে আর সব লোক গেল কোথায় পুষ্প? এখানে কি তুমি আর আমি দুটি প্রাণী? তোমার বাবা-মা কোথায়?

পুষ্প হেসে বল্লে—এটা তৃতীয় স্তরের ওপরের অঞ্চল। তুমি জীবনে অনেক কষ্ট পেয়েচ বলে এখানে আসতে পেরেচ—আর এসেচ আমি এখানে তোমায় ডেকেচি, ভগবানের কাছে কত প্রার্থনা করেচি তোমার দুঃখের দিনের অবসানের জন্যে। সে সব কথা তুমি কি জানো? নইলে সাধারণ লোক মরার পরে এ জায়গায় আসতে পারে না। আমার বাবা এখনও মরেন নি, খুব বুড়ো হয়েচেন, কালনায় আছেন, আমাদের দেশে। মা অনেক বছর স্বর্গে এসেচেন বটে, কিন্তু তিনি অন্য জায়গায় আছেন। এ স্তরের নিয়ম এই যে তুমি যদি ইচ্ছে করো তুমি

কাউকে দেখতে পাবে না, কেউ তোমাকে দেখতে পাবে না। তুমি আমি এখন নির্জ্জনে খানিকটা থাকতে চাই—কতকাল তোমায় দেখিনি, তোমার সঙ্গে কথা বলিনি—আমি চাইনে যে এখানে এখন কেউ আসে।

কথা শেষ করে পুষ্প একদৃষ্টে গঙ্গার দিকে চেয়ে কি যেন দেখলে। তারপর বল্লে—চলো তোমায় পৃথিবীতে একবার নিয়ে যাই। তোমার মৃতদেহটা শ্মশানে দাহ করচে। তোমার দেখা দরকার।

পুষ্প যতীনের হাত ধরলে, পরক্ষণেই স্বর্গ গেল মিলিয়ে। তাদের গ্রামের শ্মশানে যতীন দেখলে সে আর পুষ্প দাঁড়িয়ে আছে। চিতার ধূম জিউলি গাছটার মাথা পর্যন্ত ঠেলে উঠেচে।

যতীন হেসে বল্লে—দেখচিস্ পুষ্প, পুণ্যাত্মার চিতার ধোঁয়া কতদূর উঠেচে!

পুষ্প বল্লে—আমি না থাকলে পুণ্যাত্মাগিরি বেরিয়ে যেত।

তাদের পাড়ার ছেলে-ছোক্‌রার দল মৃতদেহ এনেচে। বুড়োদের মধ্যে এসেচেন নবীন বাঁড়ুয্যে। তিনিই মুখাগ্নি করেচেন। সকলেই আশালতাকে কি ক'রে খবরটা দেওয়া যায় সেই আলোচনা করচে।

যতীন হঠাৎ বলে উঠলো—পুষ্প, আশালতাকে একবার দেখবো। নিয়ে যাবি? ওর বড্ড সর্বনাশ করে গেলাম, ওর জন্যে ভারি মন কেমন করচে।

পুষ্প বল্লে—ভাবো যে তুমি আশালতাদের বাড়ী গিয়েচ। বেশ মনকে শক্ত করে ভাবো।

আশালতা স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ কিছুই জানে না, সে দুপুরে খাওয়ার পরে আঁচল পেতে ঘুমুচ্ছে। তাকে সে অবস্থায় নিশ্চিন্ত-মনে মাটির ওপর ঘুমুতে দেখে দুঃখে ও সহানুভূতিতে যতীনের মন পূর্ণ হয়ে গেল। আহা, হিন্দুর মেয়ে, স্বামী অভাবে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে দুটিকে নিয়ে কি অসহায় অবস্থাতেই পড়লো! আজ হয়তো বুঝতে পারবে না—কিন্তু একদিন বুঝতেই হবে। মায়ের পাশে ছোট মেয়েটি ঘুমুচ্ছিল, খোকা পাড়ায় কোথায় খেলতে গিয়েচে। এই বয়সে পিতৃহীন হোল—সত্যি, কি দুর্ভাগা ওরা!

পুষ্প ওসব ভাবনা যতীনকে ভাবতে দিলে না। বল্লে—চলো যাই, পৃথিবীতে বেশিক্ষণ থাকা নিয়ম না।

আশালতাকে আঁচল পেতে মাটিতে ঘুমুতে দেখে পর্যন্ত যতীন যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল। তার আদৌ ইচ্ছা নেই স্বর্গে যেতে। তার মন আর কোথাও যেতে চায় না। পুষ্প বল্লে—যতীনদা, তুমি এত ভালবাসো আশাকে! ওর মত হতভাগিনী মেয়েও দেখিনি, ও তোমাকে বুঝলো না। সত্যি কষ্ট হয় ওর জন্যে, কিন্তু তুমি এখানে থেকে ওর কোনো সাহায্য করতে পারবে না। চলো যাই।

গতির বেগে পৃথিবীটা কোথায় মিলিয়ে গেল। শুধু মেঘ—সাদা মেঘ চারিদিকে। ওদের পায়ের তলায় বহুদূরে কোথায় অভাগিনী আশালতা মেঝেতে আঁচল পেতে নিশ্চিন্তমনে ঘুমুতে লাগলো।

যতীন বাড়ী ফিরে এসে দেখলে একটি মহিলা তার জন্যে অপেক্ষা করচেন। প্রথমে দূর থেকে তার মনে হোল এঁকে কোথায় সে দেখেচে—কিন্তু মহিলাটি যখন ছুটে এসে তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন, তখন তার চমক ভাঙ্‌লো।

—বাবা মণ্টু, বাবা আমার! আমার মানিক!…

—মা, তুমি?

যতীন মায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে। মায়ের মুখের দিকে চেয়ে সে অবাক হয়ে গেল। বাহান্ন বছর বয়সে তার মায়ের মৃত্যু হয়, কিন্তু এখন তাঁর মুখে বার্ধক্যের চিহ্নমাত্র নেই। তাই বোধহয় সে মাকে চিনতে পারেনি প্রথমটা।

—বাবা কোথায় মা?

যতীন কথা শেষ করে ঘরের দোরের দিকে চাইতেই বাবাকে দেখতে পেলে। পঞ্চাশ বছর বয়সে যতীনের বাবা মারা গিয়েছিলেন—এ চেহারা তত বয়সের নয়। এ দেশে প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ লোক নেই? যতীন বাবাকে প্রণাম করতেই তিনি এগিয়ে এসে ওকে আশীর্বাদ করলেন। বল্লেন—তোমার এখনও আসবার বয়েস হয়নি বাবা, আর কিছুদিন থাকলে বিষয়-সম্পত্তিগুলোর একটা গতি করতে পারতে। মাখন রায়ের জমিটা কত শখ করে খরিদ করেছিলাম কাছারীর নীলেমে, সেটা রাখতে পারলে না বাবা? আর বেচ্‌লে বেচ্‌লে ওই শশধর চক্কত্তি ছাড়া আর কি লোক পেলে না?

যতীনের মা বল্লেন—আহা বাছা এল পৃথিবী থেকে এত কষ্ট পেয়ে, তোমার এখন সময় হোল পোড়া বিষয়ের কথা নিয়ে ওকে বক্‌তে? কি হবে বিষয় এখানে? কি কাজে লাগবে মাখন রায়ের জমি এখানে আমায় বুঝিয়ে বলো তো শুনি?

যতীনের বাবা বল্লেন—তুমি মেয়েমানুষ, বিষয়ের কি বোঝ? তুমি সব কথার ওপর কথা বলতে আসো কেন? মাখন রায়ের জমা—

পুষ্প ঘরে ঢুকতে যতীনের বাবা কথা বন্ধ করে বেরিয়ে গেলেন। যতীনের মা বল্লেন—পুষ্পকে চিনতে পেরেছিলি তো মণ্টু?

যতীন বল্লে—খুব।

—ওর মত তোকে ভালবাসতে আর কাউকে দেখলুম না। এই আঠারো-উনিশ বছর ও এখানে এসেচে, এই বাড়ীঘর সাজিয়ে তৈরী করে তোরই অপেক্ষায় বসে আছে। পুষ্প তোকে এনেচে বলেই তৃতীয় স্তরে আসতে পেরেচিস, নইলে হোত না। আর উনি এখনও দ্বিতীয় স্তরে পড়ে রইলেন। বিষয়-সম্পত্তিই ওঁর কাল হয়েচে। এসেচেন আজ ষোল বছর, বিষয়ের কথা ভুলতে পারলেন না, সেই ভাবনা সর্বদা। এত করে বোঝাই, এত ভাল কথা বলি, ওঁর চোখ সেই পৃথিবীর জমিজমার দিকে। কাজেই ওপরে উঠতে পারচেন না কিছুতেই—

যতীনের মা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে খানিকটা চুপ করে রইলেন। তারপর স্নেহের দৃষ্টিতে পুষ্পের দিকে চেয়ে বল্লেন, উন্নতি করেচে আমার পুষ্প মা। এ রকম কেউ পারে না। এত অল্প দিনে ও যেখানে আছে এখানে আসা যায় না। ওর পবিত্র একনিষ্ঠ ভালবাসা এখানে এনেচে ওকে।

কত উঁচু জাতির লোকের সঙ্গে ওর আলাপ আছে, দেখিস্ এখন। তাঁরা যখন আসেন, আমি থাকতে পারিনে তাঁদের সামনে।

যতীন বল্লে—মা, তুমি কোন্ স্তরে আছ?

—আমি ওঁর সঙ্গে দ্বিতীয় স্তরে থাকি। ওঁকে ছেড়ে আসি কেমন করে? ওঁকে এত করে বলি, কানে কথা যায় না। ঐ দেখলে না, এখানে বেশিক্ষণ থাকতে পারলেন না, বিশেষত পুষ্পের সামনে উনি দাঁড়াতে পারেন না, ওর তেজ উনি সহ্য করতে পারেন না।

পুষ্প লজ্জায় রাঙা হয়ে বল্লে—কি যে বল মা!...তারপর সে ঘরের বাইরে চলে গেল। যতীনের মা বল্লেন, না মণ্টু, সত্যি বলচি শোন। তুমি নতুন এসেচ, তোমার পক্ষে এখন বোঝা অসম্ভব যে পুষ্প কত উঁচুদরের আত্মা। ও যে-সব উচ্চস্তরে যায়, সেখানে যাওয়ার কল্পনাও করতে পারে না সাধারণ মানুষ পৃথিবী থেকে এসে। তোমার জন্যে ও এখানে কষ্ট করে থাকে, নইলে এর অনেক উঁচুতে ওর জায়গা। আর কী ভালবাসার প্রাণ ওর, সেই কবে ছেলেবেলায় সাগঞ্জ-কেওটাতে থাকতে তোকে ভাল লেগেছিল, জীবনে সেই ওর ধ্যান জ্ঞান। তোকে আর ভুলতে পারলে না। তুই বৌমার ব্যাপারে পৃথিবীতে কষ্ট পেতিস, পুষ্পর এখানে কি কান্না! ওর মত আত্মার পৃথিবীতে যেতে কষ্ট হয়, কিন্তু তোমার জন্যে সদাসর্বদা ও সেখানে যেতো। ওকে দেখতে পাওয়া পুণ্যের কাজ।

সম্মুখের এই সুন্দর আকাশ, ঐ কলস্বনা ভাগীরথী, অদ্ভুত রঙের বনানী, অপরিচিত বনলতার সর্বাঙ্গ ছেয়ে সে সব অপরিচিত বনপুষ্পরাজি, এই শান্তি, এই রূপ—এও যেমন স্বপ্ন—পুষ্পের কথা, পুষ্পের ভালবাসাও তেমনি স্বপ্ন। তার জীবনে সে শুধু নিজেকে ভুলিয়ে এসেচে সুখ পেয়েচে বলে, কিন্তু সত্যিই কোনো জিনিস পায়নি কখনো—আজ মৃত্যুপারের দেশে এসে তার সারাজীবনের স্বপ্ন সার্থক হতে চলেচে একথা তার বিশ্বাস হয় না। কোন্‌টা স্বপ্ন, কোন্‌টা বাস্তব, তার কুড়ুলে-বিনোদপুরের বাড়ী, না এই স্বপ্নলোক?...আশালতা, না পুষ্প?...

যতীনের মা বল্লেন—তাঁরা ওকে বড় ভালবাসেন, মাঝে মাঝে অনেক ওপরে নিয়ে যান, তাঁদের রাজ্যে। আমি ওর মুখে সে সব গল্প শুনেচি, ইচ্ছে হয় এখুনি যাই, কিন্তু আমাদের অনেক বছর কেটে যাবে সে রাজ্যে পৌঁছুতে, তবুও পৌঁছুতে পারবো না। সাধারণ মানুষ পৃথিবী থেকে যারা আসে তারা এত নিম্নস্তরের জীব যে, এই তুমি যে দেশে আছ, এ-ই তাদের কাছে উচ্চ স্বর্গ। অন্য সব উচ্চস্তরের কথা বাদই দাও।

একটা আশ্চর্য চাপা আলো আকাশের এক কোণ থেকে এসে পড়লো। সমস্ত স্থানটা অল্পক্ষণের জন্যে নীল আলোয় আলো হয়ে উঠলো—আবার তখনি সেটা মিলিয়ে গেল। একটা ঠাণ্ডা, নীলোজ্জ্বল আলোর সার্চলাইট যেন দু-সেকেণ্ডের জন্যে কে ঘুরিয়ে দিলে।

যতীন বল্লে—ও কিসের আলো মা?

—আমি কিছু বলতে পারবো না বাবা। এ সব দেশের ব্যাপার ভারি অদ্ভুত, চন্দ্র-সূর্যির দেশ এ নয়। আমি মূর্খ মেয়েমানুষ, আমি কি করে জানবো কিসে থেকে কি হয়। দেখি চোখে এই পর্যন্ত। কেন ঘটে, কিসের থেকে ঘটে, সে সব যদি জানবো তবে তো জ্ঞানী

আত্মা হয়ে যাবো। পুষ্পও জানে না, পুষ্প মেয়েমানুষ, ও ভালবাসায় বড় হয়ে এখানে এসেচে, জ্ঞানে নয়। ও-সব কথার উত্তর সে দিতে পারবে না। আচ্ছা, এখন আসি মণ্টু। নতুন সবে কাল এসেচ, ক্রমে কত কি অদ্ভুত ব্যাপার দেখবে, কত কি নিজেই জানতে পারবে। সময় ফুরিয়ে যাবে না, সময় এখানে অফুরন্ত, অনন্ত।

যতীনের মা চলে গেলেন।

৬

যতীন একদিন পুষ্পকে বল্লে—কত দিন হয়ে গেল এখানে এসেচি বলতে পারিস পুষ্প? এখানে তো দিনরাত্রির কোনো হিসেব পাইনে।

পুষ্প বল্লে—পৃথিবীর অভ্যেস দূর হতে এখনও তোমার অনেক দিন লাগবে যতুদা। এখানে দিনরাত্রির কোনো দরকার যখন নেই, তখন ঘাড় দেখা অভ্যেসটা ছেড়ে দাও। সময় যে অফুরন্ত, অনন্ত, যতদিন সেটা অনুভব না করবে, ততদিন মুক্তি হবে না। মনের দ্বিধা, সংকীর্ণ ভাব দূর না হোলে মুক্তি সম্ভব নয়, যতুদা।

—কি ধরনের মুক্তি?

—কি জানি, আমি এ সব বড় বড় কথা জানিনে, তোমায় আবার আমি কি বোঝাবো যতুদা, তুমি আমার চেয়ে কম বোঝো?

—বাজে কথা বলে আমায় ভোলাতে চাস্ নে পুষ্প। আমি অনেক কিছু জানতে চাই, আমাকে শেখানোর ব্যবস্থা করে দিবি? কত কি যে জানতে চাই তার ঠিক নেই। কে আমায় বলে দেবে বল্ তো!

—আছে, লোক আছে। তোমায় নিয়ে যাবো একদিন সেখানে। খুব উঁচু এক আত্মা আমায় বড় স্নেহ করেন। আমার স্তরে আসতে তাঁর কষ্ট হয়। তাই আমিই যাই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তুমি যাবে একদিন? আমি গুরুদেব বলি তাঁকে। বৈষ্ণব সাধু।

—কিন্তু আমি সে সব উচ্চস্তরে কি করে যাবো পুষ্প? মোটে সেদিন পৃথিবী থেকে এসেচি —তোমার দয়ায় তাই এত উঁচু স্তরে আছি, এর চেয়েও উঁচুতে কি ভাবে যাবো?

—যাওয়া ঠিক কঠিন নয়, কিন্তু থাকতে পারবে না বেশিক্ষণ। যাতে যেতে পারো তার ব্যবস্থা আমি করবো।

—আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করি পুষ্প, আমার এখনও একটা সন্দেহ হয়, এ সব স্বপ্ন নয় তো?

—যাও, পাগলামি কোরো না যতুদা। তোমার একথার উত্তর অন্তত একশো বার না দিয়েচি তুমি আসা পর্যন্ত? দেখবে আর একটা জিনিস, দেখাবো? অবশ্যি তোমায় সেখানে আজ যেতেই হবে।

—কি সেটা?

—আজ তোমার শ্রাদ্ধের দিন। তোমার ছেলে নিন্টু কাছা গলায় দিয়ে শ্রাদ্ধ করচে। পিণ্ডদানের সময় তোমায় গিয়ে হাত পেতে পিণ্ড নিতে হবে।

ছেলের কথা শুনে যতীন অন্যমনস্ক ও বিষণ্ণ হয়ে গেল। নিন্টু, আহা দুধের বালক, তাকে কাছা গলায় দিয়ে শ্রাদ্ধ করতে হচ্চে!...সে যে বড় করুণ দৃশ্য!

যতীন বল্লে—আমি যাবো না সেখানে।

পুষ্প হেসে বল্লে—ঐ যে বলছিলাম, তুমি এ জগতের ব্যাপার কিছুই জানো না। সে ছেলেমানুষ, যখন কচি হাতে ছলছল চোখে তোমার নামে পিণ্ড দেবে, সে এমনি আকর্ষণ, তোমাকে টেনে নিয়ে যাবে। তোমার সাধ্য কি তুমি না গিয়ে থাকো? খুব ভালবেসে যে টানবে, তার টান এ জগতে এড়ানো যায় না। পৃথিবীর স্থূল দেহে স্থূল মন বাস করে—এখানে তা নয়। এখানে মন আপনা-আপনি বুঝতে পারবে কোন্‌টা সত্যিকার ভালবাসা, বুঝে সেখানে যাবে। আচ্ছা তুমি ব'সো, আমি একবার দেখে আসি ওদিকে কি হচ্চে।

পৃথিবীর হিসাবে মিনিট-দুই সময়ও তারপর চলে যায় নি, পুষ্প হঠাৎ কোথায় চলে গেল এবং ফিরে এসে বল্লে—ওখানে এখন সকাল সাতটা। শ্রাদ্ধের আয়োজন শুরু হয়েচে। নিন্টু কিন্তু এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। যতীনের আগ্রহ হোল জিজ্ঞেস করে—আশা কি করচে। সে ভয়ানক ব্যাকুল হয়েচে আশার খবর জানবার জন্যে। কত দিন খবর পায় নি। আশা কেঁদেছিল, চোখের জল ফেলেছিল তার মৃত্যুসংবাদে?

জানবার জন্যে সে মরে যাচ্চে, কিন্তু লজ্জা করে পুষ্পকে এসব কথা বলতে। যতীন বুড়োশিবতলার ঘাটের রানায় চুপ করে বসে রইল। সামনে কুলু-কুলু-বাহিনী গঙ্গা, নীল আকাশের তলা দিয়ে একদল পাখী উড়ে এপার থেকে ওপারে যাচ্চে। ঘাটের ওপরে বৃদ্ধ বটের শাখার নিবিড় আশ্রয়ে একটা অজানা গায়ক-পাখী অতি মধুর স্বরে ডাকচে। যতীনের মন আজ অত্যন্ত বিষণ্ণ। আশা খুব কেঁদেছিল? আশাকে সে বড় নিঃসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে এসেচে—স্বামীর কর্তব্য স্ত্রীপুত্রকে সুখে রাখা, তার অভাবে তারা কষ্ট না পায় তার ব্যবস্থা করা। সে অকর্মণ্য স্বামী; নিজের কর্তব্য পালন করার শক্তি তার ছিল না। আশাকে সে সুখী করতে পারেনি একদিনও।

পুষ্প এসে বল্লে—বৌদিদির কথা ভেবে যে সারা হোলে, যতুদা!

তারপর সুস্নেহে ওর পাশে এসে দাঁড়িয়ে বল্লে—চল তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাই। বৌদির কাছে নিয়ে যেতাম—কিন্তু পৃথিবীর সঙ্গে বেশি যোগাযোগ এখন তোমার পক্ষে ভাল নয়। তা ছাড়া তুমি তার কোনো উপকারও করতে পারব না এ-অবস্থায়।

—কোথায় নিয়ে যাবি পুষ্প?

—অনেক উঁচু এক স্বর্গে। নতুন এসেচ পৃথিবী থেকে, তোমরা বুঝতে পারবে না। মনে করলেই সেখানে যাওয়া যায় না। তোমার যাওয়া সম্ভব হবে শুধু আমি নিয়ে যাবো বলে। তুমি কিন্তু পৃথিবী সম্বন্ধে সকল রকম চিন্তা মন থেকে তাড়াও।

—তা আমি পারব না পুষ্প। তোর বৌদি বড় অভাগিনী, তার কথা ভুলতে পারবো না।

—দয়া বা সহানুভূতি তোমায় নামাবে না, ওপরে ওঠাবে। তাই ভেবো যতুদা, কিন্তু সাবধান, বিষয়-সম্পত্তির কথা যেন ভেবো না—ত্রিশঙ্কুর অবস্থা হবে। এসো আমার সঙ্গে।

দুজনে শূন্যপথে নীলাভ শূন্য-সমুদ্রের বুকের ওপর দিয়ে উড়ে চললো। ডাইনে বাঁয়ে অগণিত তারালোকে, মৃদু নক্ষত্রজ্যোৎস্নায় ভাসানো জীবনপুলক ওদের মুক্ত দেহে এনেচে শিহরণ, প্রাণে মুক্তির আনন্দ—দূর…দূর…বহুদূর তারা চললো…কত নতুন অজানা দেবলোক…

ক্রমে আর একটা নতুন লোকের ওরা সমীপবর্তী হতে লাগলো…দূর থেকে তার সৌন্দর্যে যতীনের সমস্ত জৈবিক চেতনা অবশ হয়ে এল—বিলুপ্তপ্রায় চেতনার মধ্যে দিয়ে তার মনে হোল বহু কদম্বদ্রুম যেন কোথায় মুকুলিত, লতানিকর বিকশিত, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত গিরিগ্রামে বহু বিহগকণ্ঠের কাকলী, প্রেম স্নেহ…সুগভীর স্নেহের নিঃস্বার্থ আত্মবলি…আরও কত কি… কত কি সে সবের স্পষ্ট ধারণা ওর নেই…ওর চেতনা রইল না…পুষ্প বিব্রত হয়ে পড়লো—যতীন অতি উচ্চ স্তরে যে সচেতন থাকবে না, পুষ্পের এ ভয় হয়েছিল, তবুও তার আশা ছিল চেষ্টা করলে নিয়ে যাওয়া কি এতই অসম্ভব…একবার সে দেখবে।

না, যতীন সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললে। যতীনের দেহটাকে নিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু ওর মন থাকবে নিদ্রিত। কিছুই দেখবে না, জানবে না, শুনবে না। নিয়ে গিয়ে লাভ কি?

পুষ্প ডাকতে লাগলো—ও যতুদা…চেয়ে থাকো, কোথায় যাচ্চ ভেবে দেখো…আমি পুষ্প, ও যতুদা…চোখ চাও…

নিকটেই একটা বেগুনি রঙের শৈলশৃঙ্গ…বন্য লতাপাতার আড়ালে একটা শিলাখণ্ডে যতীনকে সে শোওয়ালে। সংজ্ঞা হারিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যতীনের গতি বন্ধ হয়ে গিয়েচে …নিকটের ঝরণা থেকে জল এনে ওর মুখে দিয়ে পুষ্প আঁচল দিয়ে ওকে বাতাস করতে লাগলো। পরে নিজের দেহের চৌম্বক শক্তি আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে ওর দেহে সঞ্চালিত করতে লাগলো।

এমন সময়ে পুষ্পের দৃষ্টি হঠাৎ আকৃষ্ট হলো ওই উচ্চ শিখরটার প্রান্তদেশে। সেখানে পরম সুন্দর এক তরুণ দেবতা বহুদূরে মহাশূন্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে আছেন আনমনে। কোনো দিকে তাঁর খেয়াল নেই, কি যেন ভাবচেন। তাঁর অঙ্গের নীলাভ জ্যোতি দেখে বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফলে পুষ্প বুঝলে এ অতি উচ্চ শ্রেণীর আত্মা, দেবতা-গোত্রে চলে গিয়েচেন—মানুষের কোনো পর্যায়ে ইনি এখন আর পড়েন না।

পুষ্প জানতো এ জগতে যে যত পবিত্র, উচ্চ, সে দেখতে তত রূপবান, তত তরুণ। তারুণ্য এখানে নির্ভর করে না জন্মের তারিখের দূরত্ব বা নিকটত্বের ওপরে। এখানে দেহের নবীনতা ও সৌন্দর্য একমাত্র নির্ভর করে আধ্যাত্মিক প্রগতির ওপরে। এঁর রূপ ও নবীনতা পৃথিবীর হিসেবে ষোলো-সতর বছরের অতি রূপবান কিশোর বালকের মত—অত্যন্ত উচ্চ স্তরের দেবতা ভিন্ন এ রকম হয় না।

দেবতার ধ্যানভঙ্গ করতে পুষ্পের সাহস হোল না। সে এত উঁচু আত্মা কখনও দেখেনি। কি করবে ভাবচে, এমন সময় দেবতার অন্যমনস্ক চক্ষু অল্পক্ষণের জন্যে ওদের দিকে পড়লো।

পরক্ষণেই তিনি অতীব জ্যোতিষ্মান দুটি চোখ দিয়ে ভাল করে চেয়ে দেখলেন। একটু বিস্ময়ের সুরে বল্লেন, কে তোমরা ?

পুষ্প প্রণাম করে বল্লে—সবই তো বুঝচেন, দেব।

এইবার যেন দেবতার অন্যমনস্ক একাগ্রতা কিছু ভগ্ন হোল—বর্তমান সম্বন্ধে তিনি সচেতন হয়ে উঠলেন। বল্লেন—কি বলো তো ? আমার যোগ নেই এ স্তরের সঙ্গে। বুঝতে পারবো না।

পুষ্প নিজেদের পরিচয় দিয়ে তার গন্তব্যস্থানের কথা ও যতীনের অবস্থা সব বললে।

আত্মা বল্লেন—ওকে যেখানে এনে ফেলেচ, এখানেও তো ওর চৈতন্য হবে না—ওর পক্ষে এও তো অতি উচ্চ স্থান ; নিচে নামিয়ে নিয়ে যাও ওকে।

পুষ্প বল্লে—আপনি কে বলুন দেবতা, আমার কত শুভদিন আজ, আপনাকে দেখলাম। এতকাল তো আছি এ জগতে, আপনার মত আত্মা কখনও দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নি। আপনি কে দেব ?

আত্মা অতি মধুর প্রসন্ন হাসি হেসে বল্লেন—তুমি অত জানতে চাও কেন ? তুমি ভারতবর্ষের কন্যা, ভক্তি তোমার জন্মগত। বিশ্বাস কর, এই মাত্র। তুমিও খুব উচ্চ স্তরের আত্মা, নইলে আমায় দেখতে পেতে না। তোমার সঙ্গীকে যদি আমি জাগিয়েও দিই, ও আমায় দেখতে পাবে না। যাও ওকে নামিয়ে নিয়ে যাও।

তবু পুষ্প সাহসে নির্ভর করে বল্লে—আপনি কে দেব ?…পাহাড়ের চূড়োতে বসে ছিলেন কেন ? এ স্তর তো আপনার নয়।

কথাটা শেষ করেই পুষ্প বুঝলে আত্মা তখনই বড় হয়, যখন প্রেমে সে বড় হয়। সামান্য পৃথিবীর মেয়ের এই প্রগল্‌ভ কথায় আত্মা চটে তো গেলেনই না, কৌতুকমিশ্রিত গভীর স্নেহে তাঁর সুশ্রী বিশাল জ্যোতির্ময় চোখ দুটি স্নিগ্ধ হয়ে এল। বল্লেন—দেখবে কি দেখছিলাম ? এসো এখানে। তোমায় দেখাবো, তুমি তার উপযুক্ত হয়েচো।

পুষ্প আগ্রহের সঙ্গে এগিয়ে গেল। আত্মা শৈলশৃঙ্গের প্রান্তসীমার দিকে দাঁড় করিয়ে হাত দিয়ে ওকে স্পর্শ করে বল্লেন—দেখচ ?

পুষ্পের সারাদেহ শিউরে উঠলো। সামনে এ এক অন্য পৃথিবী, বিশাল জলাভূমিতে বড় বড় অতিকায় জীবজন্তু কর্দমে ওলট-পালট খাচ্ছে—গাছপালার একটিও পরিচিত নয়। বাতাসে অস্বাচ্ছন্দ্যকর গরম জলীয় বাষ্প—সূর্যের তেজ অতিশয় প্রখর…তারপর ছবির পর ছবি…কত দেশ, কত যুদ্ধ, কত সৈন্যদল…কত প্রাচীন দেশের বেশভূষা পরা লোকজন…প্রশস্ত রাজপথ, প্রাচীন দিনের শহর…পচা ডোবা খানা শহরের রাজপথের পাশেই…ঘোর মহামারীতে দলে দলে লোক মরচে, কী বীভৎস দৃশ্য !

আত্মা বল্লেন—বহু দূর অতীতে ফিরে চাইছিলাম। কত কল্প আগেকার আমারই বহু পূর্ব জন্মে। কত লোককে হারিয়েচি, কত মধুর হৃদয়—আর কখনো খুঁজে পাইনি। বিশ্বের দূর প্রান্তের মোহনায় বসে তাদের কথা মনে পড়ছিল। যা দেখলে, সব আমার জীবনের বিভিন্ন অঙ্কের রঙ্গভূমি। লক্ষ্মী মেয়েটি, এখন তোমার সঙ্গী ছেলেটিকে নিয়ে নেমে যাও।

পুষ্প তাঁকে প্রণাম করে বিনীতভাবে বল্লে—আপনার দেখা আবার কবে পাবো ?

—যখন স্মরণ করবে। একমনে স্মরণ করলেই আসবো—কিন্তু যখন তখন আমায় কষ্ট দিও না। আমার নানা কাজ, কোথায় কখন থাকি। কল্প-পর্বতে সঙ্গীত যেদিন বাজবে, চুম্বকের ঢেউ কম থাকবে, সেদিন আমায় ডেকো।

কল্প-পর্বতের সঙ্গীত কি, পুষ্প তা জানতো। চতুর্থ স্তরে একটি সুনির্জন পাহাড়ে বহু শতাব্দী ধরে এক নির্দিষ্ট সময়ে আপনা-আপনি অতি মধুর অপার্থিব সঙ্গীতধ্বনি ওঠে। কত কাল পূর্বে জনৈক পবিত্র আত্মা ঐ স্থানটিতে বসে নূতন সুর সৃষ্টি করতেন—কোনো বড় সুরশিল্পী হবেন। ওপরের স্বর্গে উঠে গিয়েচেন বহুকাল, কেউ তাঁকে এখন আর দেখে না—কিন্তু সেই নির্দিষ্ট সময়ে এখনও তাঁর সৃষ্ট সুরপুঞ্জে স্বর্গমণ্ডলের অজ্ঞাত কোণটি ছেয়ে যায়।

দেবতা বিদায় নিলেন—বহুদূরব্যাপী নভোমণ্ডল জ্যোতির্ময় হয়ে উঠলো তাঁর দেহ-জ্যোতিতে। তিনি অদৃশ্য হয়ে যাবার পরেও যেন খানিকক্ষণ আকাশটা আলো হয়ে রইল।

পুষ্প অবাক্ হয়ে সেদিকে চেয়ে রইল। এত বড় দেবতা এতদিন এখানে থেকেও কখনো সে দেখে নি।

৭

যতীনের চেতনা ফিরে এল বাড়ীতে ফিরবার পথেই।

পুষ্পকে বল্লে—এ কোথায় যাচ্ছি আমরা, এখনও পৌঁছুই নি ?

পুষ্প বল্লে—না, চলো বাড়ী ফিরে যাই। সেখানে এখন তোমার যাওয়া চলবে না। তুমি পথে এমন হয়ে পড়লে! চতুর্থ স্তর পার হতে না হতেই তোমার সংজ্ঞা চলে গেল। পঞ্চম স্তরে নিয়ে যাই কি করে ? উঃ, একটা অদ্ভুত জিনিস তুমি দেখলে না!

তারপর পুষ্প সবিস্তারে উন্নত আত্মাটির সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার বৃত্তান্ত বর্ণনা করলে। বল্লে—আমার বড় ইচ্ছে ছিল তুমি দেখতে পাও, কিন্তু বুঝলুম তিনি এখন তোমায় দেখা দিতে ইচ্ছুক নন। তুমি দেখতে পাবেও না।

যতীনের মনে পড়লো তার মায়ের সঙ্গে যেদিন কথা বলছিল আকাশের দূর প্রান্তে অমনি একটা অদৃষ্টপূর্ব জ্যোতির্লেখা দেখা গিয়েছিল, পুষ্প যেমন বর্ণনা করলে তেমনি। পুষ্পকে সে কথা বল্লে। পুষ্পকে বল্লে—আমি জানি, ও আলো সব সময়ই উচ্চ আত্মাদের, যাঁদের আমরা দেবতা বলি, তাঁদের গতিবিধির পথে দেখা যায়। উল্কার মত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তাঁদের পথ, যখন তাঁরা যান। অত শুদ্ধ আত্মা কিন্তু আমাদের স্তরে কমই আসেন, খুব কমই দেখা যায়।

—দেখ পুষ্প, আমি তোমার এখানে এসে ভাবতুম কত উঁচু স্তরেই এসেচি! আজ আমার সে অহঙ্কার ভেঙে গেল। অত সব উঁচু স্তর আছে, তা কি জানতাম!

পুষ্প হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি। বল্লে—এ কথা তো কখনো শুনিনি! তুমি ভাবতে আমাদের এই বুঝি বৈকুণ্ঠধাম ? তবে তুমি নতুন এসেচ পৃথিবী থেকে, তোমার দোষ কি, যারা

এখানে অনেকদিন আছে তারাও জানে না। আমি শুনেছিলাম এক শুদ্ধ আত্মার কাছে, যাঁর কাছে তোমায় নিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি বলেন সপ্তম স্তর পর্যন্ত আছে, যেখানে পৃথিবীর মানুষ যেতে পারে। তার ওপরেও অসংখ্য স্তর আছে, তবে সে সব অঞ্চলের খবর তিনিও জানেন না। সে সব পৃথিবীর মানুষের জন্য নয়।

—আর আমি চতুর্থ স্তর ছাড়িয়েই অজ্ঞান হয়ে পড়লাম!

—তা যদি না হোত, আমি বৌদিকে এনে তোমার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতাম।

যতীন আগ্রহের সঙ্গে কিন্তু কিছু অবিশ্বাসের সুরে বল্লে, আশাকে? কি করে?

—সে ঘুমিয়ে পড়লে তার সূক্ষ্ম দেহ স্থূল দেহ থেকে বার করে। এ রকম করা যায়, আমি করতেও জানি। কিন্তু বৌদিদির কোন জ্ঞান থাকবে না, যখন তাঁকে এখানে আনা হবে। তোমার মত অচৈতন্য হয়ে যাবে, দ্বিতীয় স্তরপার না হতেই। এই এ জগতের নিয়ম। যে স্তরের যে উপযুক্ত নয়, সে স্তরে পৌছুলে তার চেতনা লোপ পায়। কার সঙ্গে কথা কইবে যতুদা?

—কোনো উপায় নেই পুষ্প? আমরা পৃথিবীতে গিয়ে দেখা দিতে পারি নে?

—প্রথমত, তা পারা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। আর যদিও বা পারা যায়, তাতেও কোনো ফল হবে না। বৌদিদি পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত মেয়ে, মানুষ মরে কোথায় যায়, তাদের কি অবস্থা হয়, এসব সম্বন্ধে কিছু জানে না। মন কুসংস্কারে পূর্ণ। তোমায় দেখে সে এমনি ভয় পাবে যে তোমার যে জন্যে যাওয়া বা দেখা দেওয়া, তা হবে না।

যতীন কিছুতেই ছাড়ে না। তার সনির্বন্ধ অনুরোধে পুষ্প অবশেষে ওকে আশার কাছে নিয়ে গিয়ে চেষ্টা করে দেখতে রাজী হোল। যতীন বল্লে, আজই চলো।

পুষ্প ঘাড় নেড়ে বল্লে—এখন শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নারাত্রি পৃথিবীতে। ওর আলোর ঢেউ আমাদের দেহ ধারণ করে দেখা দেওয়ার পক্ষে বড় বাধা। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিতে অনেক সহজ হবে। ক'টা দিন সবুর করো না!

তারপর একদিন ওরা কৃষ্ণাসপ্তমী তিথিতে দুজনে পৃথিবীতে নেমে গেল। যতীন নতুন পৃথিবী থেকে গিয়েচে, সে স্পষ্টই সব দেখতে লাগলো, কিন্তু পুষ্প অনেক দিন উচ্চস্তরে কাটানোর ফলে ওর সব ঝাপ্‌সা, অস্পষ্ট কুয়াসার মত ঠেকচে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে তার কষ্ট হতে লাগলো।

ওরা বেশি রাত্রে আসে নি, কারণ আশা তখন ঘুমিয়ে পড়বে, ওদের দেখবে কি করে?

পুষ্প বল্লে—খুব ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করো। খুব জোর করে ভাবো যে আমি আশাকে দেখা দেবো, দেবো, দেবো। তুমি বেশিদিন পৃথিবী ছেড়ে যাওনি, তোমার দেহ স্থূলচোখে দেখা যাবে তা হোলে।

পৃথিবীর হিসেবে দুঘণ্টা প্রাণপণে চেষ্টা করেও যতীন নিজের দেহ কিছুতেই আশার চোখে দৃশ্যমান করতে পারলে না। আশা রান্নাঘরে যাচ্ছে আসচে, ছেলেদের খাইয়ে আঁচিয়ে দিলে, ঘরে গিয়ে বাবার জন্যে পান সাজলে, দোতলার ঘরে একা গিয়ে ছেলেমেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এল। যতীন সব সময় ওর পাশে পাশে সামনে, রোয়াকে, ঘরে, দোতলায় উঠবার সিঁড়িতে

দাঁড়িয়ে থেকেও কিছুতেই কিছু করতে পারলে না। কতবার ডাকলে—আশা, ও আশা, এই যে আমি, ও আশা—আশা? আমি এসেচি তোমার সঙ্গে দেখা করতে।

আশা ওকে টেরও পেলে না। এমন কি মনেও কিছু অনুভব করলে না। পুষ্প বল্লে, আচ্ছা, এখন থাক। ওর মন এখন চঞ্চল অবস্থায় রয়েচে। যখন বিছানায় এসে শোবে, প্রথম তন্দ্রা আসবে, তখন মন হবে শান্ত, স্থির, একাগ্র। সেই সময়ে সামনে দাঁড়িও।

যতীন বল্লে—উঁহু, সে হবে না। ওর হ্যারিকেন লণ্ঠন ঘরে সারারাত জালিয়ে ঘুমুনো অভ্যেস। সে আলোতে তো কোনো কাজই হবে না!

—আচ্ছা সে হবে এখন। তুমি সেজন্যে ব্যস্ত হয়ো না। আমি চেষ্টা করবো এখন।

ততক্ষণ যতীন পুষ্পকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ীর বাইরে গেল। এই তার শ্বশুরবাড়ীর দেশ। প্রথমে সে যখন এখানে আসে তখন ওই মজুমদারের বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে আরও পাড়ার পাঁচজন নতুন জামাইয়ের সঙ্গে পাশা খেলে তাস খেলে কত দুপুর সন্ধ্যা কাটিয়েছে। ওই সেই যদু ভড়ের পুকুর, যেখানে মস্ত বড় রুইমাছ ধরেছিল ছিপে, সেই প্রথম ও সেই শেষ। ওঃ, মাছটা ঘাটের ঐ পৈঠাটার ওপর পড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল জলে, ওরই বড় শালা, আশার ভাই ছেনি জাল দিয়ে মাছটা ধরে ফেলে। সে সব এক দিন গিয়েচে।

হঠাৎ পিছন থেকে কে বলে উঠলো—ওখানে কে দাঁড়িয়ে?

ওরা দুজনেই ফিরে চাইলে। যদু ভড়ের ছেলে শ্রীশ ভড় গাড়ু হাতে পুকুরের ঘাটে নামতে গিয়ে হাঁ করে অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে আছে—হাত কুড়ি-পঁচিশ দূরে।

পুষ্প বল্লে—তুমি পৃথিবীর ভাবনা খুব একমনে ভাবছিলে, তোমায় দেখতে পেয়েচে। পরক্ষণেই দেখা গেল শ্রীশ গাড়ু ঘাটে রেখে ওর দিকে এগিয়ে আসচে, সে যে পুষ্পকে দেখতে পাচ্চে না—সেটা বেশ বোঝাই গেল। তার বিস্মিত দৃষ্টি শুধু যতীনের দিকে নিবদ্ধ। পরক্ষণেই কিন্তু সে থমকে দাঁড়িয়ে ভয়ে চীৎকার করে উঠলো। যতীন তো অবাক্! ভয়ে চীৎকার করে কেন? সে বাঘ না ভালুক?

শ্রীশ ভড়ের গলার আওয়াজ পেয়ে ততক্ষণ তাদের বাড়ীর মধ্যে থেকে, পাশের নিমাই ভড়ের বাড়ী থেকে, ওর জ্যাঠামশাই নন্দ ভড়ের বাড়ী থেকে অনেক লোক ছেলেবুড়ো বেরিয়ে এল। সকলের সমবেত ভত্র প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ হাঁপাতে হাঁপাতে বল্লে—উঃ কি কাণ্ড! এমন তো কখনো দেখিনি!

সবাই বল্লে—কি, কি, কি দেখলি রে?

—ওইখানে দাঁড়িয়ে ছিল সাদামত দিব্যি একজন মানুষ্। যেমন ডেকেচি, অমনি মিলিয়ে গেল। বাপ্...না রে বাপু, স্পষ্ট নিজের চোখে দেখলাম, 'তোমরা বলচো চোখের ভুল! আমি কি গাঁজা খাই যে চোখের ভুল?

সবাই গোলমাল করতে লাগলো, দু-একজন সাহসী লোক এগিয়ে দেখতে এল লেবুগাছের আড়ালে কেউ লুকিয়ে আছে কিনা, যতীনের আশেপাশে যাতায়াত করচে অথচ সে আর পুষ্প সেইখানেই দাঁড়িয়ে।

যতীন কৌতুকের হাসি হেসে বল্লে—লোকগুলো কানা নাকি? খুঁজচে যাকে, সে তো এখানেই দাঁড়িয়ে।

পুষ্প খিল্ খিল্ করে হেসে বল্লে—যাক্, ভালই হয়েচে তোমায় চিনতে পারে নি। চিনতে পারলে বলতো, মুখুয্যেদের বাড়ীর জামাই ভূত হয়ে লোকের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বৌদিদি শুনলে কষ্ট পেতো। লোকে বলতো গতি হয় নি। কেমন, শখ মিটলো তো? নিরীহ লোককে আর ভয় দেখিয়ে দরকার কি, চলো পালাই।

৮

বুড়োশিবতলার ঘাটে অশ্বত্থতলায়, যতীন অন্যমনস্ক হয়ে বসে ছিল।

পুষ্প মাঝে মাঝে কোথায় যায়, আজও বেরিয়েচে। তার নানা কাজ, কোথায় কখন ঘোরে। পুষ্পকে যতীন খানিকটা বোঝে, খানিকটা বোঝে না। পুষ্পের ভালবাসায় সেবাযত্নে তার বহুদিনের বুভুক্ষু প্রাণ তৃপ্ত হয়েচে বটে কিন্তু সঙ্গিনী হিসাবে যতীনের মনে হয় পুষ্প অনেক অনেক উঁচু। সে পুষ্পকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, এমন কি কিছু কিছু ভয়ও করে। তার সঙ্গে কিন্তু মন খুলে কথা বলা যায় না, বলতে চাইলেও মুখে অনেকটা আটকে যায়। এমন সুখ, শান্তি, আনন্দের মধ্যেও যতীন নিজেকে খানিকটা একা মনে না করে পারে না।

আশা, আজ যদি আশা···

এই সব সুন্দর দিনে, সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে বসে আশার কথাই মনে হয়। আরও মনে হয় সে বড় হতভাগিনী, তার এত ভালবাসা আশা বোঝেনি; আশা যদি বুঝতো, তার মূল্য দিত, হতভাগিনী নিজেই কত তৃপ্তি পেতো।

তার ইচ্ছা হয় যখন তখন আশার কাছে যায়। কিন্তু পুষ্প তাকে যেতে দেয় না। এর কারণ যতীন জানতো না। আশার জীবনের অনেক ব্যাপার পুষ্প যা জানে যতীন তা জানে না। পাছে সে সব দেখলে যতীনের মানসিক যন্ত্রণা বেড়ে যায়, সেজন্যে পুষ্প প্রাণপণে সে সব জিনিস ওর দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রাখতে চায়। যার কোনো প্রতিকার করবার ক্ষমতা নেই, তা ওকে জানতে দিয়ে কোনো লাভ নেই।

যতীন জানতো আশা খেয়ালের বশে অভিমান করে বাপের বাড়ী গিয়ে উঠেছিল এবং অভিমানের দরুনই তার সঙ্গে দেখা করে নি। তার নিষ্ঠুরতা, সেও অভিমানপ্রসূত। আশার চরিত্রের আসল দিক পুষ্প কত কৌশলে ঢেকে রেখেচে যতীনের কাছে তা একমাত্র জানতেন যতীনের মা। পাছে ওর চোখেও সে সব ধরা পড়ে যায়, এই ভয়ে নিজে সঙ্গে না নিয়ে যতীনকে একা আশার কাছে যেতে দিত না। যতীনের একা যাবার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও একা পৃথিবীতে যেতে সে তেমন সাহস পায় না—একদিন যাবার চেষ্টা করে খানিকটা গিয়েছিলও, হঠাৎ মধ্যপথে কে যেন ওকে চৌকো কাঠের বাক্সের আকারের ঘর তৈরী করে তার মধ্যে বন্দী করবার চেষ্টা করতে লাগলো। ও এগিয়ে যায়, একটা ঘর ফুঁড়ে বার হয়, আবার

সামনে ঐ রকম কিউব দিয়ে সাজানো ঘর আর একটি তৈরী হয়—সেটা অতি কষ্টে পার হয়, তো আর একটা। দ্বিতীয় স্তরের অপেক্ষাকৃত স্থূল অথচ অত্যন্ত নমনীয় বস্তুপুঞ্জের ওপর ওর নিজের চিন্তাশক্তি কায ক'রে আপনা-আপনিই এই রকম কিউব সাজানো দেওয়ালের বেড়াজাল সৃষ্টি হচ্ছিল—চিন্তার সংযম বা পবিত্রতা অভ্যাস না করলে এই সব নিম্নস্তরে যে ও রকম হয় তা যতীনের জানা ছিল না—যতীন যত ভয় পায়, ততই তার মনের বল কমে যায়—ততই সে নিজের সৃষ্ট কিউবরাশির মধ্যে নিজেই বন্দী হয়। জনৈক উচ্চস্তরের পথিক-আত্মা তাকে সে বিপদ থেকে সেদিন উদ্ধার করেন। সেই থেকে একা পৃথিবীতে আসতে ওর ভরসা হয় না।

আজও বসে ভাবতে ভাবতে আশার জন্যে সহানুভূতি ও দুঃখে ওর মন পূর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু কি করবার আছে তার, অশরীরী অবস্থায় আশার কোনো উপায়ই সে করতে পারে না—অন্তত করবার উপায় তার জানা নেই।

হঠাৎ তার প্রবল আগ্রহ হোল আর একবার সে আশার কাছে যাবার চেষ্টা করবে। এলোমেলো চিন্তা মন থেকে সে দূর করবে— ভেবে ভেবে চণ্ডীর একটা শ্লোক তার মনে পড়লো…

যা দেবী সর্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ।।

এই শ্লোকটা একমনে আবৃত্তি করতে করতে সে ইচ্ছা করলে যে পৃথিবীতে যাবে—আশাদের বাড়ীতে—আশার কাছে! পরক্ষণেই সে অনুভব করলে সে মহাশূন্যে মহাবেগে কোথায় নীত হচ্চে, গতির বেগে তার শরীরে শিহরণ এনে দিলে, মন মাঝে মাঝে অন্যদিকে যায়, আবার ফিরিয়ে এনে জোর করে চণ্ডীর শ্লোকের প্রতি নিবদ্ধ করে।

এই তো তার শ্বশুরবাড়ীর পুকুর। ঐ তো সামনেই বাড়ী। বড় মজার ব্যাপার। এটা এখনও যতীন বুঝতে পারে না, কি করে সে চিন্তা করা-মাত্রেই ঠিক জায়গায় এসে পৌঁছে গেল। এরোপ্লেন যারা চালায়, তাদের তো দিক্‌ভুল হয়, কত বিপাকে বেঘোরে কষ্ট পায়- কিন্তু কি নিয়ম আছে এ জগতে যে, জনৈক অজ্ঞ আত্মা শুধু মাত্র চিন্তা দ্বারা গন্তব্য স্থানে এসে পৌঁছয়।

রাত্রি…আশা দোতলার ঘরে ঘুমুচ্চে, ও গিয়ে তার শিয়রে বসলো। খানিকটা পরে দেখলে আশার দেহের মধ্যে দিয়ে ঠিক আশার মত আর একটি মূর্তি বার হচ্চে। যতীন শুনেছিল গভীর নিদ্রার সময় মানুষের সূক্ষ্মদেহ তার স্থূলদেহ থেকে সাময়িক ভাবে বার হয়ে ভুবর্লোকে বিচরণ করে। কিন্তু আশার এই সূক্ষ্মদেহ দেখে যতীন বিস্মিত ও ব্যথিত হয়ে গেল। কি জ্যোতি-হীন, শ্রীহীন, অপ্রীতিকর মেটে সিঁদুরের মত লাল রঙের দেহটা! চোখ অর্ধনিমীলিত, ভাবলেশহীন, বুদ্ধিলেশহীন…একটু পরে সে দেহের চক্ষুদুটির দৃষ্টি যতীনের দিকে স্থাপিত হোল—কিন্তু সে দৃষ্টিতে এমন কোনো লক্ষণ নেই, যাতে যতীন বুঝতে পারে যে আশা ওকে চিনেচে বা ওর অস্তিত্ব সম্বন্ধে ও সচেতন হয়েচে। যেন মুমূর্ষু লোকের চোখের চাউনি—যা কিছু বোঝে কিছু বোঝে না, চেয়ে থাকে অথচ দেখে না। যতীন ভুবর্লোকের অল্পদিন-সঞ্জাত সামান্য অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারলে, আশার সূক্ষ্মদেহ অত্যন্ত অপরিণত এবং আদৌ উচ্চতর স্তরের উপযুক্ত নয়। সে জিজ্ঞেস করলে—আশা, কেমন আছ? আমায় চিনতে পারো?

আশার চোখে-মুখে এতটুকু চৈতন্য জাগলো না, সে যেন ঘুমুচ্চে। যতীন চতুর্থ স্তরে যেমন অবস্থায় পড়েছিল, আশার ভুবর্লোকে অতি নিম্নস্তরেই সেই অবস্থা; এখন ও যদি পৃথিবীর স্থুল দেহটা হারায়, এ লোকে এসে মহাকষ্ট পাবে, কারণ যে দেহটা নিয়ে এ লোকের সঙ্গে কারবার সে দেহটাই ওর তৈরী হয় নি। সদ্যপ্রসূত অন্ধ বিড়াল ইঁদুর ধরবে কেমন করে?

অর্থাৎ আশা অতি নিম্নশ্রেণীর আত্মা। যতীন আরও কয়েকবার নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আশাকে সচেতন করবার বৃথা চেষ্টা করে ব্যথিত মনে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলে।

সেদিনই বুড়োশিবতলার ঘাটে গঙ্গার ধারে এক ব্যাপার ঘটলো।

৯

পুষ্প ও যতীন দুজনে নিজেদের বাড়ীর সামনে বাগানে বসে গল্প করচে। যতীন পুষ্পকে পৃথিবীতে যাওয়ার কথা কিছুই বলে নি। তবুও পুষ্প সব ব্যাপার জানে। পাছে মনে কষ্ট পায় এই জন্যে যতীনকে সে বলে নি যে সে জানে। হঠাৎ আকাশের এক কোণে নীল উজ্জ্বল আলো দেখা গেল—গঙ্গার এপার ওপার, ওদের বাড়ী, ঘর, বাগান, বুড়োশিবতলার ঘাট, এমন কি ওপারের শ্যামাসুন্দরীর ঘাট পর্যন্ত সে আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। পুষ্প শশব্যস্তে দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে—ছাখো, ছাখো, কোনো দেবতা যাচ্চেন—চেয়ে ছাখো—

পরক্ষণেই যতীনের মনে হোল একটা বিরাট প্রজ্বলন্ত উল্কা তাদের বাড়ীর অদূরে উন্মুক্ত বনজ লিলির ঝোপের ধারে এত প্রখর আলো বিকাশ ক'রে এসে পড়লো যে, দুজনেরই চোখ ধাঁধিয়ে গেল তার তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল তীব্রতায়।

ওরা আশ্চর্য হয়ে ছুটে গিয়ে দেখলে যে এক মহাজ্যোতির্ময়দেহধারী পুরুষ ঝোপের ধারে বসে পড়েচেন। অমন মহিমময় শ্রী যে পৃথিবীর মানুষের হয় না—তা দুবার দেখে বুঝতে হয় না।

দুজনেই বিস্ময়ে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে দূরে থেকে চেয়ে দেখচে, এমন সময় দেবতার নিকট থেকে পুষ্পের নিকট পর্যন্ত একটা ম্যাজেণ্টা রঙের আলোয় চওড়া শিখা সাপের মত কুটিল বক্র আকৃতি ধরে একবার খেলে গেল। একটা বড় দশ ব্যাটারির টর্চের আলো কে যেন একবার টিপে তখনি বন্ধ করলে।

পুষ্প বুঝলে এটা কি। অতি উচ্চশ্রেণীর দেবতাদের বিদ্যুতের ভাষা!

পঞ্চম স্তরের সেই আত্মার কাছে পুষ্প একথা শুনেছিল।

তিনি বলেছিলেন, উর্ধ্বতন লোকে—নবম বা দশম স্তরের ওপরেও যে সব উচ্চ স্তর, সেখানে দেববিবর্তনের জীবেরা বাস করেন। মানুষের সর্বপ্রকার ধারণার অতীত তাঁদের ক্রিয়াকলাপ—তাঁদের সে বিরাট জীবনের সম্বন্ধে পৃথিবীর লোকই বা কি, সাধারণ প্রেতলোকের আত্মারাই বা কি, কোনো খবর জানে না। মুখের ভাষায় তাঁরা কথা বলেন না—তাঁদের প্রকাশের ভঙ্গি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আগুনের বা বিদ্যুতের ভাষায় চলে তাঁদের কথাবার্তা।

পুষ্প হাতজোড় করে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। পুনরায় মহাব্যস্ত ও ক্ষিপ্র আর একটা তীব্র

বিদ্যুৎ-শিখা ওকে এসে স্পর্শ করতেই ওর মনের মধ্যের চিন্তায় এই প্রশ্ন জাগলো—আমি কোথায়…?

দেবতাকে দেখা যায় না। তাঁর স্থানে শুধু একটা আলোর মণ্ডলী পরিদৃশ্যমান। পুষ্প বল্লে—দেব, আপনি পৃথিবীর আত্মিক লোকে।

আবার বিদ্যুতের শিখা। পুষ্পের মনে পুনরায় প্রশ্ন জাগলো—পৃথিবী কি?

পুষ্প বল্লে—পৃথিবী একটা ক্ষুদ্র গ্রহ, সূর্যের চারিদিকে ঘোরে।

পুষ্পের এ কথাগুলো কি ভাবে দেবতা বুঝলেন, পুষ্প জানে না। বোধ হয় এ উত্তরগুলো চিন্তারূপে দেবতার নিজের মনে জাগছিল। পৃথিবীর ভাষায় অনুবাদ করলে দুজনের কথাবার্তা খানিকটা নিম্নোক্তরূপ দাঁড়ায়। পুনরায় প্রশ্ন হোল—

—বিশ্বের কোন্ অংশে?

পুষ্প বিপদে পড়ে একমনে সেদিনকার সেই দেবতাকে স্মরণ করলে। এ সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তার সাধ্যের অতীত।

আশ্চর্যের উপর আশ্চর্য! সেদিনকার সেই শৈলশিখরারূঢ় দেবতা তখনই তার সম্মুখে তাঁর জ্যোতির্ময় দেহ নিয়ে আবির্ভূত হোলেন। পুষ্প প্রণাম করে বল্লে—দেব, আমি সামান্যা মানবী। উনি যে প্রশ্ন করছেন, আমি তার কি উত্তর দেবো? আমায় বিপদ থেকে উদ্ধার করুন। তারপর সে দ্বিতীয় দেবতাটির পানে কৃতজ্ঞতা ও বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। তিনি সেদিন বলেছিলেন বটে 'স্মরণ করলেই আমি আসবো', পুষ্প একথা বিশ্বাস করেনি। সে মহা অপরাধী দেবতার কাছে—ছি ছি, কি অবিশ্বাসী তার আত্মা!

কিন্তু এ চিন্তা চাপা পড়ে গেল আর এক আশ্চর্য ব্যাপারে। দুই দেবতার মধ্যে যেন তীব্র বিদ্যুৎশিখার ক্ষিপ্র আদানপ্রদান চলচে—পৃথিবীর কোনো ঘটনার উপমাদ্বারাই তার স্বরূপ বোঝানো যাবে না। দুখানা বড় যুদ্ধজাহাজ যেন পরস্পর পরস্পরের ওপর তীব্র অক্সি-হাইড্রোজেন আলোর সার্চলাইট্ বিক্ষেপ করচে! দুই বিরাট দেবতার কথাবার্তা চলছিল। পরে এই কথাবার্তা পৃথিবীর ভাষায় অনুবাদ করে পুষ্পের দেবতা-বন্ধু তাকে যা বলেছিলেন, তা এইরূপ—

পুষ্পের দেবতাবন্ধু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আপনি কে দেব?

আগন্তুক দেবতা বল্লেন—আমি কোথায় আগে বলুন।

—পৃথিবীর আত্মিক লোকে।

—পৃথিবী কি?

—একটা ক্ষুদ্র গ্রহ, সূর্য নামে একটা নক্ষত্রের চারিধারে ঘোরে।

—বিশ্বের কোন্ অংশে?

—এ প্রশ্নের কি জবাব দেবো? ছায়াপথ দ্বারা সীমাবদ্ধ যে নক্ষত্রজগৎ তারই এক অংশে। আপনি কোন্ অংশের অধিবাসী?

এর উত্তরে আগন্তুক দেবতা বল্লেন—আমার কথা শুনে হয়তো আপনি বিশ্বাস করবেন না। আমি বহু, বহু দূরের অন্য এক নক্ষত্রজগতের অধিবাসী। আমি বহু কোটি বৎসর পূর্বে ভ্রমণে এবং নতুন দেশ আবিষ্কারে বেরিয়েছিলাম। আমার চৈতন্য যতদিন হয়েচে আমার মনে এক অদম্য পিপাসা ছিল বিশ্বের প্রত্যন্ততম সীমা আবিষ্কার করবো। কি কি নতুন দেশ এতে আছে দেখবো। এতকাল ধরে বেগমান বিদ্যুতের অপেক্ষাও দ্রুততর গতিতে শুধু শূন্যে বেড়িয়ে বেড়াচ্চি। সম্প্রতি নক্ষত্রের, গ্রহের, নানা জগতের ও বিভিন্ন লোকের গোলকধাঁধার অরণ্যে দিশাহারা হয়ে এখানে শক্তিহীন, অবসন্ন ও বিমূঢ় অবস্থায় এসে পড়েচি। নক্ষত্র ও বস্তুজগৎ এখানে এত বেশী কেন? এ দুটি প্রাণী কোথাকার লোক?

—এই দুই জীব পৃথিবীর তৃতীয় স্তরের অধিবাসী। পুরুষটি সম্প্রতি বস্তু-স্তর থেকে আত্মিক স্তরে এসেচে। ওরা নিতান্ত নিরীহ, অজ্ঞ। মেয়েটি কিছু উন্নত—তাও জ্ঞানে নয়, প্রেমে।

যতীন এতক্ষণ শ্রদ্ধায় ভয়ে ও গভীর বিস্ময়ে আড়ষ্ট হয়ে পিছন দিকে দাঁড়িয়ে ছিল। সে এই কথাবার্তার বিন্দুবিসর্গও বুঝছিল না—তার মনে অত উচ্চ দেবাত্মাদের চিন্তা প্রতিফলিত হবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। পুষ্প ওর দিকে চেয়ে কথা বলতে সে বুঝলে যে তার সম্বন্ধে কোনো কথা বলা হচ্চে। সে এগিয়ে এসে প্রণাম করে চুপ করে রইল। এত বড় জ্যোতির্ময় আত্মা সে আর কখনো দেখেনি। দেবতা বল্লেন—উঃ, কোথায় এসে পড়েচি। বিশ্বের কোন্ অংশে যে আছি তা কিছুই বুঝতে পারচি নে। তুমি কোন্ একটা গ্রহের নাম করলে? যে নক্ষত্রটার চারিধারে ঘোরে সেটা আমি নতুন দেখলাম। নক্ষত্রটা খুব বড় নক্ষত্রের দলে পড়ে না। এবং ওর আলোও পরিবর্তনশীল, আমি বার কয়েক ওর আলো-কে বাড়তে-কমতে দেখেচি। ওর নাম কি বল্লে—সূর্য!

পুষ্প তার নিজের চিন্তার কিছু অংশ এবার যতীনের মনে চালনা করলে। সে বেচারা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, বুঝচে না কোন্ ভীষণ মহাপুরুষের সামনে দাঁড়িয়ে পুষ্প পোড়ারমুখী কথা বলচে। জানুক ও বুঝুক কিছু।

পুষ্পের মনের মধ্যে দিয়ে ওদের কথাবার্তা যতীন বুঝতে পারলে এবং বুঝে অবাক হয়ে গেল। পুষ্প ভাবছিল—এ আবার কত উচ্চস্তরের, কি ধরনের লোক রে বাবা, যে সূর্যের নামটাই শোনে নি কখনো, পৃথিবী তো দূরের কথা।

কথাটা মনে হয়ে তার বড় হাসি পেল। ছিঃ—হাসি সামলে নিয়ে সে বল্লে—আপনার কথা শুনতে বড় আগ্রহ হচ্চে। আপনি আমাদের বাড়ীতে বসে একটু বিশ্রাম করুন। আর দয়া করে বলবেন কি, কি দেখলেন এতকাল ধরে?

আগন্তুক ওদের বাড়ীর বাইরে পাথরের বেঞ্চিতে এসে বসলেন।

যতীন সম্রমে উদ্‌ভ্রান্ত ও দিশেহারা হয়ে হঠাৎ বিনীতভাবে বলে বসলো, একটু চা খাবেন কি সার?

পুষ্প মুখে আঁচল চাপা দিয়ে অতিকষ্টে হাসি দমন করে বল্লে—কি যে তুমি করো যতুদা! পৃথিবীর অভ্যেস্ তোমার এখনও গেল না। চা খাবে কে? আর 'সার' বলচো কাকে?

যতীন অপ্রতিভ হয়ে অধিকতর বিনীত ভাব ধারণ করলে।

এই দুই নবদৃষ্ট আত্মার কাণ্ড দেখে আগন্তুক দেবতার মন কৌতুকে ও আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠলো। কোথাকার জীব এরা, অথচ দ্যাখো কি সুন্দর হাসে! মহামহেশ্বরের বিচিত্র সৃষ্টি শুধু বিরাটতার দিক থেকেই নয়, আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যেও এর কি রহস্যময় মূর্তি। এরা কেন হাসচে, কি নিয়ে কথা বলচে তা তিনি বুঝতে পারছিলেন না। আর একটা কথাও তিনি বোঝেন নি, তাই এখন পুষ্পকে প্রশ্ন করলেন—গ্রহের জড়লোক আর আত্মিকলোক কি বলচো, বুঝতে পারলাম না তো? কি সেটা?

পুষ্প বল্লে—প্রভু, আমরা যখন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করি, তখন আমাদের দেহ অন্য পদার্থ দিয়ে তৈরী হয়। সে দেহ স্থূল, সেখানকার সব জিনিসই সেই ধরণের স্থূল পদার্থে গড়া। তারপর একটা সময় আসে, যখন সেই স্থূল দেহটা নষ্ট হয়ে যায়—তখন আমরা এই আত্মিক লোকে আসি। কেন, প্রভু, আপনি কি এ জানেন না?

দেবতা বল্লেন—শুনেচি বটে এমন হয় কোনো কোনো গ্রহের জীবের ক্ষেত্রে, আমার অভিজ্ঞতা নেই। আমায় সেখানে একবার নিয়ে যাবে—তোমাদের এই পৃথিবী গ্রহের জড়লোকে?

—কিন্তু সেখানে আপনি যেতে পারবেন দেব অত স্থূল রাজ্যে?

দেবতা হেসে বল্লেন—আমি পথিক। কত বিরুদ্ধ ভাবের মধ্যে দিয়ে চলা অভ্যেস্ করতে হয়েচে আমাকে, তবে বিশ্বভ্রমণ করা সম্ভব হয়েচে। নইলে তোমাদের এই যে যাকে বলচো আত্মিকলোক, এখানেই কি আমি আসতে পারতাম? জড়বস্তুর নিবিড় প্রকাশ আত্মার ক্ষেত্রে আমি দেখেচি অন্য অনেক গ্রহে। চল, যাই।

একটু পরে ওরা তিনজনে পৃথিবীর দিকে চললো। পৃথিবীর নিকটে এসে দেবতা বল্লেন—উঃ, মেঘের মত কি সব বিশ্রী চিন্তার ধোঁয়া চারদিকে! তোমরা দেখতে পাচ্চ না?

যতীন তো কিছুই দেখতে পায় না—পুষ্প জানে, পৃথিবীর মানুষের পাপের ও দুঃখের নানারকম চিন্তার মেঘ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে জমা হয়ে মাঝে মাঝে পৃথিবীতে যাতায়াতের সময় তাকে কষ্ট দিয়েচে। তবুও সে পৃথিবীরই জীব, তার ততটা কষ্ট হয় না, যতটা ইনি পাবেন।

যেখানে ওরা গিয়ে নামলো সেটা ভারতবর্ষের বিহার অঞ্চলের একটা ছোট গ্রাম। মহিষদল মাঠে চরাচ্চে রাখালরা। তিনজন মেয়েমানুষ একটা ভুট্টাক্ষেতের ধারে দাঁড়িয়ে ঝগড়া করচে পৃথিবীতে ভাদ্রমাস। শরতের বেশ পরিষ্কার নীল আকাশ, বন্যার জল এসে নেমে গিয়েচে, গ্রামের মধ্যে গৃহস্থবাড়ীর উঠানে পচা কাদা। একটা বাড়ীতে মকাই-এর মরাই-এর মধ্যে জল ঢুকে মকাই-এর দানা পচিয়ে ফেলেচে বলে বাড়ীর মেয়েরা মকাইগুলো নামিয়ে ঝাড়চে।

দেবতা বল্লেন—কি আশ্চর্য। এদের গতি এতটুকু জায়গায় সীমাবদ্ধ! এর চেয়ে দ্রুত যেতে পারে না?

কাটিহার থেকে মুঙ্গেরগামী একখানা ট্রেন এসে পড়লো। দেবতা বিস্ময়ের সুরে বল্লেন—ও ব্যাপারটা কি?

—মানুষে ওই গাড়ীটা তৈরী করেচে। ওকে বলে রেলগাড়ী। খুব জোরে মানুষকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যায়, প্রভু।

দেবতা কৌতুকের দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লেন—ওই কি দ্রুত যাওয়ার নমুনা? নমুনা দেখে তো খুব আশা হয় না এদের দ্রুতগামিতার ভবিষ্যৎ ইতিহাস সম্বন্ধে। ওর নাম কি জোরে যাওয়া?

এক জায়গায় দুটি ছোট ছেলেমেয়ে ভুট্টাক্ষেত থেকে ভুট্টা চুরি করে খেতে গিয়ে ক্ষেত্রস্বামীর হাতে পড়ে খুব মার খাচ্চে দেখে দেবতা বল্লেন—আহা, কচি ছেলেমেয়ে দুটিকে অমন করে মারচে কেন? পরে তিনি ক্ষেত্রস্বামীর মনে সদয় চিন্তা বিক্ষেপ করতে চেষ্টা করলেন। স্থূল দেহের স্থূল মনে প্রথমেই কোনো কার্যকরী হোল না—কিন্তু অসাধারণ শক্তিশালী দেবতার মনের জোরে তাকে সৎ চিন্তার প্রেরণা স্পর্শ করলে। সে ছেলেমেয়ে দুটিকে ছেড়ে দিয়ে বল্লে—আচ্ছা, যা নিয়েচিস্ যা, তা এবারকার মত নিয়ে যা—আর কখনো আসিসনে।

দেবতা বল্লেন—আহা, এদের তো বড় কষ্ট! কি অদ্ভুত এই সৃষ্টি! যত দেখচি ততই এর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে যাচ্চি। আমার কি ইচ্ছে হচ্চে জানো—এদের মধ্যে মানুষ হয়ে থাকি। এদের দুঃখ দূর করবার চেষ্টা করি।

পুষ্প বল্লে—দেব, নিকটের এই পাহাড়ের চূড়াটাতে বসে আপনার ভ্রমণের গল্প একটু করবেন দয়া করে? শুনবার বড় ইচ্ছে হচ্চে।

ভাদ্র মাসের গঙ্গা কূলে কূলে ভরা। বিকেল হয়েচে। পশ্চিম দিগন্তে জামালপুরের পাহাড়ের পিছনে রঙীন্ মেঘস্তূপের আড়ালে সূর্য্য অস্ত যাচ্চে।

পাহাড়ের মাথায় ছোট ছোট জঙ্গল। একটা ফাঁকা জায়গায় বন্য হরীতকী গাছের তলায় ওরা বসলো। নীচে গঙ্গার ধারে একটা পাট-বোঝাই ভড়ের মাঝিমাল্লারা রান্নাবান্নার উদ্যোগ করছিল। যতীন ভাবছিল—এই তো বৃহত্তর জীবন, মৃত্যুর পরে যা সে লাভ করেচে। কোথায় বাংলাদেশের এক ছোট্ট গ্রামে সে ছিল বন্দী, সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেল তার জীবন—পৃথিবীর অতীত কত লোকে কত স্তরে এমনি কত নিস্তব্ধ শরৎ দুপুরে, অপরাহ্নে, কত বসন্তদিনের আসন্ন বেলায়, কত জ্যোৎস্নারাত্রিতে তার ইচ্ছামত অভিযান ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে জমা রয়েছে! এমন সব সুখের দিনে শুধু মনে হয় সেই হতভাগী—

দেবতা তাঁর ভ্রমণের কাহিনী বলতে লাগলেন।

সে ভারি চমৎকার কথা। তাঁর সব কথা পুষ্প বা যতীন বুঝতে পারছিল না। তবুও তারা মুগ্ধ হয়ে গেল তাঁর উৎসাহদীপ্ত মুখের ভঙ্গীতে, কথার সুরে। কত লক্ষ বৎসর পূর্বে তিনি বেরিয়েচেন বিশ্বভ্রমণে। কত গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্রজগৎ, কত ছায়াপথ, নীহারিকাপুঞ্জ মানসগতিতে ভ্রমণ করেচেন। আলো বা বিদ্যুতের যেখানে পৌঁছুতে লক্ষ লক্ষ বৎসর লাগে—সে

সব সুন্দর নক্ষত্রমণ্ডলী পার হয়েও লক্ষ আলোকবর্ষ দূরের অঞ্চলে চলে গিয়েছেন। তখনও দেখেন বহু দূরে আর এক অজানা বিশ্বের সীমা মহাশূন্যের প্রান্তে আবছায়া দেখা যায়। আবার সে বিশ্বেও পৌঁছেছেন, আবার অগণিত নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ নীহারিকারাজির মধ্যে দিয়ে দেবতার অমিত গতিতে বহু শত বৎসর ধরে ছুটে গিয়ে যেমন তার সীমা ছাড়িয়েছেন, আবার দূরে দেখতে পেয়েছেন আর এক রহস্যময় অজ্ঞাত বিশ্বের ক্ষীণ সীমান্তবর্তী ক্ষীণালোক তারকামণ্ডলী। কত প্রজলন্ত নক্ষত্র, কত স্বয়ম্প্রভ বাষ্পমণ্ডলী লক্ষ লক্ষ যোজন বিস্তৃত হয়ে রয়েচে শূন্যের দিগন্ত থেকে দূর দিগন্তে···অবশেষে এই বর্তমান বিশ্বটায় পৌঁছে গ্রহনক্ষত্রের গোলকধাঁধার মধ্যে কিছু দিশাহারা হয়ে পড়েছিলেন।···

পুষ্প বল্লে—আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন?

দেবতা বল্লে—তা অসম্ভব। এই গ্রহের বিভিন্ন আত্মিক স্তর ছেড়ে তোমরা কোথাও যেতে পারবে না। এর আকর্ষণে টেনে রাখবে। সে দেহ তোমাদের তৈরী হয় নি। তবে আর কিছুকাল অপেক্ষা কর। কাচাকাছি বহু অদ্ভুত জগৎ আছে, সেখানে তোমাদের নিয়ে যাবো; আমায় স্মরণ ক'রো না—তাতে আমি আসবো না। যখন তোমরা তার উপযুক্ত হয়েচ বুঝবো—আমি নিজেই আসবো। এখন আমি যাই। আর একটা বিষয়ে সাবধান থেকো, তোমরা দেখতে পাচ্চ না, আমি পাচ্চি, তোমাদের এই গ্রহটার চারিদিক ঘিরে একটা বিরাট শক্তিশালী চৌম্বক ঢেউ বইচে, সেটা সব সময় তোমাদের ঐ পৃথিবীর দিকে টানচে। এই ঢেউ-এ পড়লে ঘুরিয়ে নিয়ে এসে ঐ পৃথিবীর জড়লোকে তোমাদের ফেলে পুনরায় জড়দেহ ধারণ করাতে বাধ্য করবে। এটাকে পুনর্জন্মের ঢেউ বলা যেতে পারে। খুব সাবধান। বিশ্বের সীমা আবিষ্কার করবার যার আগ্রহ, সে যেন ক্ষুদ্র গ্রহের স্থূলস্তরে আবার স্থূল জড়দেহ ধারণ না করে।

পুষ্প ও যতীন দুজনে প্রণাম করলে। পুষ্প বল্লে—আবার যেন আপনার দেখা পাই, দেব।

পর মুহূর্তে দেবতা অন্তর্হিত হলেন।

পুষ্প বল্লে—দেখলে তো? শুনলে? ওই সেই চুম্বকের ঢেউ। আমাকে এক দেবতা বলেছিলেন অনেক দিন আগে। তোমাকে একবার পঞ্চম স্তরে নিয়ে যেতে যেতে বিপদে পড়েছিলুম, তুমি অজ্ঞান হয়েছিলে—মনে আছে? সেইবার তাঁর সঙ্গে দেখা।

১০

একদিন গঙ্গার ঘাটে বসে থাকার সময় যতীন দেখে অবাক হয়ে গেল যে দিব্যি চমৎকার জ্যোৎস্না উঠলো। একেবারে পৃথিবীর পূর্ণিমার জ্যোৎস্না। তার শুভ্র আলোর ঢেউ পড়লো গঙ্গাবক্ষে, পড়লো গিয়ে ওপারের শ্যামাসুন্দরী মন্দিরের সর্বাঙ্গে, তীরের প্রাচীন বটের মাথায় ডালের ফাঁকে ফাঁকে।

যতীন ভাবলে—এ আবার কি? জ্যোৎস্না তো কখনো এখানে দেখিনি! এখানে রাত্রিই বা কি, দিনই বা কি!

এমন সময়ে পুষ্প হাসতে হাসতে পাশে বসে বল্লে—কেমন জ্যোৎস্না হয়েচে দেখ; মনে পড়ে তুমি আর আমি কেওটার বুড়োশিবতলার ঘাটে এমনি জ্যোৎস্নারাতে কত বসে ইলিশমাছ ধরা দেখতাম?

—কিন্তু জ্যোৎস্না উঠলো কোথা থেকে? চাঁদ এল কি করে?

—তৈরী করলুম জ্যোৎস্নাটা। ভাবলুম তোমার সঙ্গে একদিন জ্যোৎস্নারাত্রে ঘাটে বসা যাক। কেমন, বেশ হয় নি?

—আচ্ছা পুষ্প, যে কোনো ঋতু, যে কোনো সময়কে তৈরী করতে পারো? এ তো অদ্ভুত!

—সময় এখানে মনের দ্বারা সৃষ্টি করা যায়, যেমন অন্য সব জিনিস করা যায়। সে তো তুমি চোখের ওপর দুবেলা দেখচো। আচ্ছা যতুদা, সাগঞ্জ-কেওটার কথা মনে পড়ে?

—খুব পড়ে পুষ্প। সেই একবার আমি গাছ থেকে পড়ে গিয়েছিলাম, মনে আছে? তোর কি কান্না! সত্যি আমি এক একবার ভাবি জীবনে কি পুণ্য না জানি করেছিলুম যে তোর মত মেয়ের সঙ্গ পেয়ে ধন্য হয়েছি। আমার এখনও মনে হয় এ সব স্বপ্নই বা!

পুষ্প লজ্জিত সুরে বল্লে—আহা!

পুষ্প বুঝতে পারে যে, যতীন আশার কথা ভাবচে, ঘাটে এসে বসেই তার কথা ওর মনে হয়েছে। যত উচ্চ স্তরের আত্মাই হোক, পুষ্প মেয়েমানুষ, তার মনটা হু হু করে ওঠে। যতুদাকে সে আবাল্য ভালবাসে, প্রাণ দিয়ে ভালবাসে কিন্তু যতুদা তার চেয়ে যে আশাবৌদিকে বেশী ভালবাসে, একথা সে জেনেও মনে স্থান দেয় না বেশীক্ষণ। উপায় কি? এই তার অদৃষ্টলিপি, নইলে সে ছেলেবেলায় পৃথিবী ছেড়ে, যতুদাকে ছেড়ে আসবে কেন? যতীনের গত তেরো বছরের জীবনে পুষ্প ছিল না, ছিল আশা—এ অবস্থায় আশার সঙ্গেই যতীনের মনের যোগ অনেক গাঢ়বদ্ধ। কারো কোনো দোষ নেই।

পুষ্পের মনে দুঃখের ছায়া এসে পড়তেই বাইরের জ্যোৎস্না ক্রমশ ম্লান হয়ে এল। মন প্রফুল্ল না থাকলে মানসিক সৃষ্টি ক্ষুণ্ণ হবেই।

হঠাৎ পুষ্প যতীনের দিকে চেয়ে বলে—একটা কথা ভুলে গিয়েছিলুম যতুদা। আজ কল্প-পর্বতের গান বাজবার দিন। চল তোমাকে শুনিয়ে আনি। সে এক অদ্ভুত জিনিস।

ওদের স্বর্গ থেকে বেরিয়ে ওরা শূন্য বেয়ে চললো। বহুদূরে একটা সবুজ নক্ষত্রের দিকে আঙুল দেখিয়ে পুষ্প বল্লে—ওইখানে আমাদের যেতে হবে। ওই দিকে একদৃষ্টে চোখ রেখে ভাবো যে আমরা ওখানে যাবো।

নক্ষত্রটা যেন ক্রমে বড় হচ্চে, যতীনের মনে হোল সে সবেগে ওর দিকে নীত হচ্চে। কি অদ্ভুত এ যাত্রা। যতীন অবাক হয়ে চেয়ে দেখছিল অনেক দূরে অন্ধকারের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড গ্রহ ডুবে ডুবে ঘুরচে।

পুষ্প বল্লে—এই হচ্চে শুক্রগ্রহ—সন্ধ্যাবেলা সেটাকে পশ্চিম আকাশে দেখা যায়।

আকাশের রং এখানে নীল নয়, অনেকটা ধূসরমিশ্রিত বেগুনী। শূন্যপথে অনেক আত্মা তাদের মতই যাওয়া আসা করচে, তবে তাদের মধ্যে কেউই উচ্চশ্রেণীর নয়, ওদের রং দেখে

শ্রেণী ঠিক করতে শিখে গিয়েচে যতীন। এ সব আত্মার রং খানিকটা খানিকটা মেটে সিঁদুরের মত লাল। খুব সাধারণ শ্রেণীর আত্মা। তবে নিম্ন শ্রেণীর আত্মা এখানে আসে না। তাদের দ্বিতীয় স্তরের নিম্ন পর্যায় ছাড়িয়ে ওঠবার সাধ্যই নেই।

হঠাৎ যতীন বল্লে—সে পাহাড় তো চতুর্থ স্তরে, সেখানে পৌছে আবার অজ্ঞান হয়ে পড়বো না পুষ্প?

পুষ্প হেসে বল্লে—তাহলে তোমায় কি আনতুম যতুদা? সেবার তুমি সেখানে অজ্ঞান হয়েছিলে, সেটা চতুর্থ স্তরের ঊর্ধ্বলোক। চতুর্থ স্তরে ঠিকই ছিলে। চতুর্থ স্তরে সেই নীল হ্রদ দেখেছিলে, যেখানে দেবদেবীরা স্নান করছিলেন।

যতীন বল্লে—কই, কোথায় দেবদেবীরা স্নান করছিলেন আমি তো দেখিনি? তখন থেকেই আমার জ্ঞান চলে যাচ্ছিল তাহলে।

ওদের কথা শেষ হতে না হতেই যতীন দেখলে তারা একটা অত্যন্ত সুন্দর দেশে এসে পৌছেচে।

দেশটার চারিদিকেই চক্রবাল রেখার কূলে কূলে নীল পাহাড়। গাছপালা সেখানে আদৌ তৃতীয় স্তরের মত নয়—কোনোটার রং নীল, কোনোটার বেগুনী, কোনোটার সোনালী; ফুলফল যেন রঙীন আলো দিয়ে গড়া। পাহাড়ের মাথায় মাথায় যেন জ্বলন্ত রঙীন্ আলোর মেলা। পুষ্প একটা গাছের ফুল তুলে ওকে দেখালে, তুলবা মাত্র বোঁটায় আর একটা ফুল কোথা থেকে এসে শূন্যস্থান পূর্ণ করলে। আরও একটা আশ্চর্য ব্যাপার, প্রান্তরের ও শৈলসানুর সব ফুল মুহূর্তে মুহূর্তে স্পন্দিত হচ্ছে, যেন চারিদিকে রাশি রাশি লক্ষ লক্ষ নানা বিচিত্র বর্ণের জোনাকি নিবচে জ্বলচে। পাখীগুলো যখন আকাশে উড়চে, তাদের ডানায় যেন সাতরঙা রামধনুর খেলা। এদেশে বাতাসে একটু অদ্ভুত শান্তি ও আনন্দের বার্তা—একটা বিচিত্র জীবন-উল্লাসের ইঙ্গিত।

যতীন একটা জিনিস লক্ষ্য করলে, এখানকার দৃশ্য যে রকম, পৃথিবীতে এ দৃশ্য কল্পনাও করা যায় না। এর কোনো জিনিস পৃথিবীতে নেই।

পুষ্পকে সে কথাটা বল্লে।

—পৃথিবীর সঙ্গে খুবই কমই মিল এ দেশের, না পুষ্প?

পুষ্প বল্লে—যতুদা, এর একটা সহজ কারণ আছে। দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের আত্মারা পৃথিবী থেকে সদ্য এসেচে। পৃথিবীর স্মৃতি তখনও তাদের কাছে ম্লান হয়নি। যখন তারা মানসলোক সৃষ্টি করে, পৃথিবীর সেই স্মৃতি তাদের অনেকখানিই সাহায্য করে। কাজেই তাদের তৈরী স্বর্গ হয় পৃথিবীরই অবিকল নকল। কিন্তু এই সব স্তরের আত্মিকদের মনে পৃথিবীর স্মৃতি অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে এসেচে—অনেকের নেই বল্লেই হয়। কাজেই তারা যখন গড়ে—নিজেদের কল্পলোক নিজেদের কল্পনা থেকে গড়ে। তাই সব হয় নতুন, সবই হয় আজগুবী। এ সবই যা দেখচো এ স্তরের অধিবাসীদের সৃষ্টি—ওই পাহাড়পর্বত, গাছপালা, ফুল, পাখী, সাধারণ দৃশ্য—সব।

—কিন্তু তোমার মানুষজন কই? একজনেরও তো সাক্ষাৎ নেই।

—তাঁরা ইচ্ছে না করলে এ স্তরের আত্মাকে তুমি সহজে দেখতে পাবে না যতুদা। কল্পপর্বতের কাছে যাকে আমরা চুম্বকশক্তির ঢেউ বলি—তা অত্যন্ত প্রবল। সেখানে গেলে তোমার দেহ শক্তিমান হবে, তখন খুব উচ্চ স্তরের আত্মাকেও অল্পক্ষণের জন্যে—মানে মাত্র যতক্ষণ সেই পর্বতের কাছে থাকবে ততক্ষণের জন্যে—দেখতে পাবে।

অল্প পরেই একটা অনুচ্চ পর্বত সামনে দেখা গেল, তার ওপরটা অনেকখানি সমতল। সেই সমতল জমিটুকুর ওপর যে দৃশ্য চোখে পড়ল যতীনের, তাতে সে বিস্মিত, মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হয়ে গেল।

সেখানে বহু দেবদেবী একত্র হয়েচেন। তাঁদের অঙ্গের জ্যোতি ও রূপে সমস্ত ভূমিশ্রী আলোকিত হয়ে উঠেচে, সমগ্র বায়ুমণ্ডল (যদি এখানে বায়ুমণ্ডল বলে কোনো কিছু থাকে) তাঁদের দেহনিঃসৃত উচ্চ বৈদ্যুতিক শক্তির স্পন্দনে মৃত্যুঞ্জয়ী অমৃতের নির্ঝর হয়ে উঠেচে যেন, দেহগন্ধের সুরভিতে বহুদূর পর্যন্ত আমোদিত।

যতীন এ পর্যন্ত এত উচ্চ জীবের একত্র সমাবেশ কখনো দেখেনি। সে চুপি চুপি বল্লে—এ যে ওঁদের দস্তুরমত ভিড় লেগে গিয়েচে দেখচি, পুষ্প! উঃ—

সবাই যেন কিসের অপেক্ষা করচে। সকলের চোখ বাঁ দিকের একটা খুব উঁচু পাহাড়ের দিকে নিবদ্ধ। যতীন বল্লে—ও পুষ্প, এ যেন ফোর্টের র‍্যামপার্টে দাঁড়িয়ে মোহনবাগানের ম্যাচ দেখতে এসেচে সব—আহা, টিকিট কিনতে পায়নি বেচারীরা!

পুষ্প তিরস্কারের সুরে বল্লে—নাঃ, তুমি জ্বালালে যতুদা—চুপ করে থাকো না কেন ছাই।

যতীন কি বলতে গিয়ে হঠাৎ চুপ করে গেল।

বাঁ ধারের সেই পাহাড়ের চূড়া থেকে এক অপূর্ব মধুর, শব্দের ঢেউ উত্থিত হোল। দেবদেবীরা সকলে অবনত মস্তকে শুনতে লাগলেন। কেউ কেউ পাহাড়ের ঢালুর রঙীন স্বয়ম্প্রভ তৃণদলে শুয়ে পড়লেন অলসভাবে। কেউ বসে দুহাতে মুখ ঢাকলেন। বেশীর ভাগই কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলেন।

সে মধুর শব্দ কণ্ঠসঙ্গীত নয়, যন্ত্রসঙ্গীতের মত শব্দটা। কিন্তু পরিচিত কোনো যন্ত্রে বাদিত সঙ্গীত নয়। অত্যন্ত রহস্যময় তার উৎপত্তিস্থল। যেন গঙ্গার ধারা,—কোন্ উচ্চ পর্বতের তুষারপ্রবাহে তার জন্ম, কেউ খবর রাখে না। যতীনের সর্বাঙ্গ বার বার শিউরে উঠতে লাগলো।

শুনতে শুনতে যতীনের মনে হোল সে আর পৃথিবীতে বদ্ধ আত্মা নয়—সে উচ্চ অমৃতের অধিকারী দেবতা হয়ে গিয়েচে, সে মুক্ত, সে বিরাট—তার আত্মা সারা বিশ্বকে ব্যেপে সচেতন হতে চায়, তার বিরাট হৃদয়ে সকল পাপী তাপী, মূর্খ ও নিন্দুকের স্থান আছে, পতিতের উদ্ধার করতে যুগে যুগে পৃথিবীতে জন্মেচে, তাদের দুঃখে যুগে যুগে করেচে মৃত্যুবরণ। বিশ্বের মহাদেবতার প্রেমিক পার্শ্বচর সে—সে নৃত্যশীল গ্রহনক্ষত্রের বিচিত্র নৃত্যচ্ছন্দে লীলাময়, পবিত্র, প্রেমিক, মুক্ত দেবতা। এ কি আনন্দ! এ কি শিল্পমাধুর্য! এ কি অভিনব অননুভূতপূর্ব অমরতা!

কোনো দিকে কেউ আর দাঁড়িয়ে নেই··· সবাই বসে পড়েচে···নিস্তব্ধ চারিদিক ··মধুর

অশরীরী রহস্যময় মোহিনী সঙ্গীতলহরী কখনও উচ্চে, কখনও মৃদুস্বরে একটানা বয়ে চলেচে··· বিরাম নেই···বিরতি নেই, পৃথিবীর কোনো ভাষাতেই তার বর্ণনা নেই ··কতক্ষণ সময় কেটে গেল তার লেখাজোখা নেই—অনন্তকাল ধরে অমন সঙ্গীতপ্রবাহিণী গোমুখী-নির্গত ভাগীরথী-ধারার মত বয়ে চলেচে···চলেচে। যতীনের মনের কোন্ গুপ্ত কক্ষের গভীর অনুভূতির দ্বার খুলে গেল। সে দেখতে পেলে তার পৃথিবীতে যাপিত আরও অনেক পূর্ব জীবন···এই অনন্ত জীবনপ্রবাহে সে যুগযুগান্তর ধরে ভাবের ও প্রেমের স্রোতে বয়ে আসচে···আশা কি এক জন্মের আশা, না পুষ্প এক জন্মের পুষ্প? কত যুগ ধরে ওরা যে ওর নিত্যসঙ্গিনী, ওর জীবনে ছন্দে গাঁথা ওদের জীবন—কতবার কত বিরহ-মিলন হাসি-অশ্রুর মধ্যে দিয়ে ওদের সঙ্গে কতবার দেখাশোনা, কতবার আবার ছাড়াছাড়ি—কত বিস্মৃত মরুদ্বীপে, কত শ্যামল পল্লীর কুঞ্জে কুঞ্জে, কত ক্ষুদ্র গ্রাম্য নদীর তীরের কুটীরে, কত পাহাড়ের নীচেকার আদিম কালের গুহায়···কত রাজার রাজপ্রাসাদে···কত দশার্ণ গ্রামে ব্যাধরূপে, কত শারদ্বীপে ক্রৌঞ্চমিথুন রূপে, কত কুরুক্ষেত্রে বেদগায়ক ব্রাহ্মণরূপে···

যতীন দেখলে পুষ্প কাঁদচে···ও নীরবে পুষ্পের হাতে হাত দিয়ে তাকে নিজের কাছে সস্নেহে নিয়ে এল···

তারপর কখন সে অপূর্ব সঙ্গীত থেমে গিয়েচে, বিচিত্ররূপী জ্যোতির্ময় জীবেরা মহাশূন্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েচেন···কখন জ্যোৎস্নার আলোতে সারা দেশ ভরে গিয়েচে যতীনের খেয়াল নেই···জ্যোৎস্না, জ্যোৎস্না·· বহু পূর্ণিমার সম্মিলিত জ্যোৎস্নালোক চারিদিকে···

যতীন বল্লে—পুষ্প, চল ওঠো।

১১

ওরা কিছু দূরে মাত্র এসেচে· এক জায়গায় দেখলে মাটির বুকে যেন চাঁদ খসে পড়েচে।

দুজনে কাছে গিয়ে দেখলে, পরমরূপসী এক দেবী ঘাসের ওপর বসে হাপুস নয়নে কাঁদচেন। ওরা অবাক হয়ে গেল। এত উচ্চস্তরের দেবীর দুঃখ কিসের?

যতীন জিজ্ঞেস্ করলে—মা, আপনার কোনো সাহায্য করতে পারি?

দেবী ওদের দিকে চাইলেন। যতীনের মনে হোল দেবী কি সাধে হয়? এত রূপ এত জ্যোতি এত মহিমা—অথচ কি মমতা, করুণা, দীনতায় ভরা দৃষ্টি!

বল্লেন—পারবে?

দুজনেই বলে উঠলো—হুকুম করুন, আপনার আশীর্বাদে পারবো।

দেবী বল্লেন—কল্পপর্বত থেকে ফিরচো? তোমরা কোথায় থাকো?

- আজ্ঞে হ্যাঁ। আমরা এর নীচের স্বর্গে থাকি, তৃতীয় স্তরে।

—কি মধুর সঙ্গীত! শুনলে?

যতীন বল্লে—শুনলাম, মা! আমি বেশীদিন পৃথিবী ছেড়ে আসিনি। এই ব্যাপারটা কি

আমায় একটু বলবেন দয়া করে ?

দেবী বল্লেন—বলবো এর পরে। এখন বলি শোনো। আমি থাকি অন্য নক্ষত্রলোকে। পৃথিবীর এক জায়গায় মানুষের ভয়ানক কষ্ট। আমি সে দেশে জন্মেছিলুম হাজার হাজার বছর আগে। তাদের দুঃখে, আর আজ কল্পপর্বতের সঙ্গীত শুনে, আমার মন বড় ব্যাকুল হয়েচে। চলো যাই পৃথিবীতে, দেখি কি করা যায়—কিন্তু মুশকিল হয়েচে এই যে আমি এতকাল আগে পৃথিবী থেকে চলে এসেচি, জড় জগতের সঙ্গে সম্পর্ক এতকাল হারিয়েচি যে সরাসরি ভাবে কোনো কাজই সে জগতে করতে পারি নে। মধ্যবর্তী স্তরের আত্মার সাহায্য ভিন্ন আমি পৃথিবীতে গিয়ে কি করবো ? তোমরা যদি যাও—

ওরা বলে উঠলো, নিশ্চয়ই যাবো মা !

দেবী বল্লেন—একটু অপেক্ষা কর। আমার এক সঙ্গী আছেন—তিনি আমার লোকেই থাকেন, উচ্চ স্তরের জীব, পৃথিবীতে গিয়ে শুধু আঁকুপাঁকু করেন, কিছু করতে পারেন না কাজে। পৃথিবীর জড়স্তরে আমরা সংস্পর্শ স্থাপন করতে পারি নে। তিনি প্রাচীন যুগের একজন বড় কবি ছিলেন। তাঁকে নিয়ে যাই চলো। এসো আমার সঙ্গে।

আবার নীল শূন্যে যাত্রা।…বহু দূরে একটা ক্ষীণ নক্ষত্র জ্বলছিল। দেবী সেই নক্ষত্র লক্ষ্য করে চললেন। পরক্ষণেই কি সুন্দর উপবন। এক ক্ষুদ্র নদী বয়ে যাচ্চে উপবনের মধ্য দিয়ে - লতাপাতা কিন্তু পৃথিবীর মত শ্যামল—পৃথিবীরই যেন এক শান্ত প্রাচীনকালীন তপোবন। মৃগকুল নির্ভয়ে খেলা করে বেড়াচ্চে, লতায় লতায় বিচিত্র বন্য পুষ্প প্রস্ফুটিত। এক সৌম্যমূর্তি জ্যোতির্ময় আত্মা লতাবিতানে বসে কি যেন লিখচেন। দেবী ওদের নিয়ে গিয়ে সামনে দাঁড় করালেন। মুখ তুলে চাইতেই যতীন ও পুষ্প এগিয়ে গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে।

দেবী বল্লেন—কল্পপর্বতের পথে এদের সঙ্গে দেখা। পৃথিবীতে নিয়ে যাবো তাই সঙ্গে করে আনলাম।

যতীন ও পুষ্পের দিকে চেয়ে দেবী বল্লেন—রামায়ণ-রচয়িতা কবি বাল্মীকি তোমাদের সামনে।

ওরা দুজনেই চমকে উঠলো। মহাকবি বাল্মীকি !

দেবতা স্মিতহাস্যে ওদের বসতে বল্লেন। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বল্লেন—এই আমার আশ্রম। ওই পাশেই তমসা নদী। ওই আমার গৃহ। পৃথিবীতে যা আমার প্রিয় ছিল এখানে তাই সৃষ্টি করেচি, ওই আমার স্বর্গ। আর তোমাদের সামনে ইনি আমার মানস-দুহিতা—সীতা, যিনি তোমাদের সঙ্গে করে এনেচেন।

পুষ্প, যতীন বিস্মিত, স্তব্ধ। ভারতবর্ষের ছেলেমেয়ে তারা। সীতার নামে ওদের সর্ব শরীরে বিদ্যুতের ঢেউ বয়ে গেল। কত যুগ ধরে ভারতের আকাশ বাতাস যে পুণ্য নামে মুখরিত, সেখানকার বনের পাখীও যে নামে গান গায়, সেই ভগবতী দেবী জানকী তাদের সম্মুখে ! এ কি

স্বপ্ন, না মায়া, না মতিভ্রম?

বাল্মীকি বল্লেন—তোমরা বিস্মিত হয়েচ। বোধ হয় এ লোকে বেশী দিন আসনি। সীতাকে আমি সৃষ্টি করেচি। যা ছিলেন পৃথিবীতে আমার কল্পনার মধ্যে—এ লোকে তা মূর্তিমতী হয়েচেন।

যতীন বল্লে—বুঝতে পারলাম না, দেব।

—এ লোকে চিন্তার দ্বারা জীবের সৃষ্টি করা যায়। শুধু যে বাড়ীঘর করা যায় তাই নয়, স্থানের ও সময়েরও সৃষ্টি করা যায়।…আমার আশ্রমের সময় কি দেখচো?

—আজ্ঞে সন্ধ্যা গোধূলি।

—আমার সময় সন্ধ্যা গোধূলি। আমি ভালবাসি গোধূলি। আমার কল্পনা এই সময় জাগ্রত হয়। তাই আমার আশ্রমে সব সময় গোধূলি।

—আচ্ছা দেব, শ্রীরামচন্দ্র তবে কোথায়?

—সীতাকে যত আন্তরিক আগ্রহ নিয়ে সৃষ্টি করেছিলাম, রামচন্দ্রকে তত সহানুভূতি নিয়ে গড়িনি। তাই আমার স্বর্গে আমার প্রিয়তম সৃষ্টি সীতাই আছেন, রামচন্দ্র নেই। লক্ষ্মণ নেই, ভরত নেই,—কেউ নেই।

—তবে কি, দেব, সীতা বা রামচন্দ্র সত্যি সত্যি কেউ ছিলেন না?

—হয়তো ছিলেন। আমি তাঁদের জানি না। আমার কাব্যের রাম, আমার কাব্যের সীতা—আমারই সৃষ্ট জীব। ও প্রায়ই আমার এখানে আসে। নানা কাজে সারা জগৎ ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু আমায় ভোলে না।

করুণা দেবী বল্লেন—বাবা, ওসব এখন রাখো। পৃথিবীতে যাবে?

বাল্মীকি বল্লেন—তুই তো জানিস, পৃথিবীতে গিয়ে আমি কিছু করতে পারি নে। বহুকাল আগে ভবভূতিকে প্রভাবান্বিত করে একখানা কাব্য লিখিয়েছিলাম—চমৎকার কাব্য হয়েছিল। আর বাংলাদেশের মধুসূদনকে দিয়ে আর একখানা কাব্য লেখাতে গিয়েছিলুম—কিন্তু বেশী প্রভাবান্বিত করতে পারি নি—গিয়ে দেখি কয়েকটি ভিন্নদেশীয় কবি তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েচেন। তাঁদের প্রভাবই তার ওপর বেশী কাজের হোল। আমি গিয়ে ফিরে এলাম। তুই একাই যা মা—এদের নিয়ে যা—এই ছেলেমেয়ে দুটিকে। এরা নতুন পৃথিবী থেকে এসেচে—এদের দিয়ে কাজ ভাল হবে।

পুষ্প বল্লে—চলুন দয়া করে, যেখানে আমাদের নিয়ে যান যাবো।

ওরা কিছুক্ষণ পরে পৃথিবীতে এসে পৌঁছলো। পৃথিবীতে তখন সকাল দশটা, কিন্তু দেশটা খুব শীতের দেশ। রৌদ্রের মুখ দেখা যায় না। কুয়াসায় চারিদিক ঘেরা। প্রথমে একটা গ্রামে ওরা গিয়ে পৌঁছলো—সেখানে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়েচে। প্রত্যেক বাড়ীতে অনাহারে-জীর্ণ বাপ মা ছেলে মেয়ে—পথের ধারে অনাহারে মৃত মানুষের দেহ। পাশাপাশি অধিকাংশ গ্রামেরই সেই অবস্থা। নিকটবর্তী একটা গ্রামে মোটরভ্যান এসেচে মৃতদেহ কুড়িয়ে ফেলবার জন্যে।

পুলিশের লোক জেলের কয়েদীদের দিয়ে মৃতদেহ বহন করাচ্চে। তারা রাস্তার ধার থেকে ঘরের মধ্যে থেকে মৃতদেহের ঠ্যাং ধরে হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে মোটরভ্যান বোঝাই করচে। গাড়ীটা ময়লা ফেলা গাড়ীর মত বোঝাই হয়ে গিয়েচে মৃতদেহের স্তূপে। তার মধ্যে বালক, বৃদ্ধ, যুবা, শিশু সকলের মৃতদেহই আছে। পচা মড়ার গন্ধে চারিদিক নিশ্চয়ই পূর্ণ, কারণ যে সব জেলকয়েদী মুর্দাফরাসের কাজ করচে, তাদের নাকে মুখে কাপড় বাঁধা। বীভৎস দৃশ্য।

রোগজীর্ণ ও অনাহারশীর্ণ লোক দলে দলে শহরের দিকে চলেচে—সকলের ভাগ্যে শহরে পৌঁছনো ঘটবে না, পথেই অর্ধেক লোক মরবে। তারপর আছে পুলিশের মোটরভ্যান ও জেলকয়েদী মুর্দাফরাসের দল। যারা শহরে পৌঁছুচ্চে, তারা অনেকে সেখানে দুর্বল শরীরে দুরন্ত শীতের আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে পেভমেণ্টের ওপর ল্যাম্প-পোস্টের তলায় মরে পড়ে থাকবে। বেচারারা ল্যাম্প-পোস্টের তলায় আশ্রয় নিচ্চে ওপরের আলোটা থেকে এতটুকু উত্তাপ পাবার মিথ্যা আশায়। তারপর তাদেরও জন্যে রয়েচে পুলিশের মোটরভ্যান ও সেই জেলকয়েদী শ্মশানবন্ধুর দল।

পথের ধারে বসে এক জায়গায় দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট আট বছর বয়সের বড় ভাই পাঁচ বছর বয়েসের শীর্ণকায় কঙ্কালসার ছোটভাইকে একটা ভাঙা তোবড়ানো, রাস্তার ধারে কুড়োনো টিনের মধ্যে করে মুসুরির ডালসিদ্ধ মুখে তুলে খাওয়াচ্চে। এই সব অসহায় ছেলেমেয়ের কষ্ট সকলের চেয়ে বেশী—দেবীর চোখে জল এল এদের কষ্টে। অধিকাংশ ছেলেমেয়ের বাপ-মা তাদের শহরে ছেড়ে দিয়ে পুলিশের ভয়ে পালিয়ে গিয়েচে—এই আশায় যে, শহরে থাকলে তবু তাদের পাঁচজনে দয়া করবে, একেবারে না খেয়ে মরবে না, কোনো কোনো ছেলেমেয়ের বাপ-মা অনাহারে ও রোগের কষ্টে পথের ধারেই ইহলীলা সংবরণ করে লাসবোঝাই মোটরভ্যানে নিরুদ্দেশযাত্রা করেচে—

আরও কয়েকটি আত্মা এদের মধ্যে কাজ করচে দেখা গেল।

দেবীকে দেখে একটি মেয়ে এগিয়ে এলেন। এঁর দেহ অতি সুন্দর, স্বচ্ছ, সুনীল জ্যোতি-মণ্ডিত—দেখেই বোঝা যায় খুব উচ্চ শ্রেণীর আত্মা।

এ'দের কাজ দেখে মনে হোল দুর্ভিক্ষে মৃত ব্যক্তিদের আত্মা যাতে আত্মিকলোকে এসে দিশাহারা হয়ে কষ্ট না পায়—সেই দেখতেই এ'রা সমবেত হয়েচেন।

দেবী সেই মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করলেন। মেয়েটি বল্লে—আমার এই দেশ। বহু দিন আগে ভল্গা নদীর ধারে একটি গ্রামে এক কৃষকপরিবারে আমি জন্ম নিয়েছিলাম—জার আইভ্যানের রাজত্বকালে। রাশিয়ার কৃষকেরা চিরদিনই দুঃখী—সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের আমলে এদের ক্ষেত্রের ফসলের ভাগ দিতে হয় কারখানার শ্রমিকদের ও শহরের সুবিধাপ্রাপ্ত নাগরিক শ্রেণীর জন্যে। এদের জন্যে যা থাকে, তাতে এদের কুলোয় না। তাই এই ঘোর দুর্ভিক্ষ। এদের ছেড়ে আমি যেতে পারিনে—তাই এদের সঙ্গে সঙ্গে থাকি। আর একজন লোকের সঙ্গে আপনাদের আলাপ করিয়ে দিই আসুন।

একজন অতি সুন্দর সুশ্রী যুবক কিছু দূরে একদল দুর্ভিক্ষপীড়িত বালক-বালিকার মধ্যে

দাঁড়িয়ে কি করছিলেন।

মেয়েটি বল্লেন—ইনি ডাক্তার আমেণ্ডো। রাশিয়ার কৃষকদের জন্যে ইনি সারা জীবন খেটেচেন পৃথিবীতে থাকতে। গবর্ণমেণ্টের কুদৃষ্টিতে পড়ে লণ্ডনে পালিয়ে গিয়েছিলেন মহাযুদ্ধের পূর্বে। সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের সময়েও ফিরে এসে অনেক দুর্দশা ভোগ করেচেন। স্ট্যালিনের সুনজরে বড় একটা ছিলেন না। এঁর জীবনের একমাত্র কাম্য হচ্চে গরীব ও দুঃখী লোকের দুঃখ দূর করা। সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের অনেক জিনিস ইনি সুদৃষ্টিতে দেখতেন না, তারাও এঁকে সুনজরে দেখতো না। আজ মাত্র পাঁচ বছর হোল আত্মিক লোকে এসেচেন; তাও সেই গরীবদেরই কাজে প্রাণ দিয়ে। আমাশা রোগে আক্রান্ত পল্লীতে ডাক্তারি করতে গিয়ে নিজে সংক্রামক আমাশা রোগেই প্রাণ হারান। এত বড় নিঃস্বার্থ দয়ালু আত্মা এ যুগে খুব কমই জন্মেচে। মরণের পরে এ লোকে এসেও সেই রাশিয়ার গরীব লোকদের নিয়েই থাকেন। যেখানে দুর্ভিক্ষ, যেখানে রোগ-শোক সেখানেই ছুটে আসচেন। চতুর্থ স্তরের আত্মা, কিন্তু পৃথিবী ছেড়ে যেতে চান না কোথাও।

ডাক্তার আমেণ্ডো এদের সামনে এসে হাসিমুখে দাঁড়ালেন। বল্লেন—আপনারা ভারতবর্ষের লোক ছিলেন না? দেখলেই বোঝা যায়। এরা ভগবানকে খেদিয়ে দিচ্চে দেশ থেকে, যেন ইটপাথরের তৈরী গির্জা ভাঙলেই ভগবানকে তাড়ানো যায়! রাশিয়াতে উচ্চ শ্রেণীর ভারতীয় মুক্তাত্মা যদি দয়া করে আসেন, তবে কিছু কাজ করা যায়।

মেয়েটি বল্লেন সে দু-একজনের কাজ নয়, ডাক্তার। অনেক আত্মার সমবেত চেষ্টার ফলে যদি চিন্তার চৌম্বক ঢেউ এর সৃষ্টি করা যায়- খুব শক্তিশালী ঢেউ, তবে হয়তো কিছু হতে পারে। তোমার আমার দ্বারা তা হবে না।

ডাক্তার আমেণ্ডো বল্লেন—আর একটা ব্যাপার। পৃথিবীতে এসে এখন দেখচি আমরা বড় অসহায় হয়ে পড়ি। দ্বিতীয় তৃতীয় স্তরের আত্মার সাহায্য না নিয়ে কিছু করতে পারিনে। জনকতক দ্বিতীয় স্তরের লোক আমরা যোগাড় করে এনেচি কিন্তু ওরা মন দিয়ে কাজ করছে না।

পুষ্প বল্লে—আমাদের দুজনকে নিন্ দয়া করে আপনার দলে। আমাদের দিয়ে যা সাহায্য হয় পাবেন। একটা কথা, আমাদের ভারতবর্ষেও দুর্ভিক্ষে আর বন্যায় বড় কষ্ট পায় লোকে। সেখানকার জন্যেও আপনারা সাহায্য করবেন—তারা বড় দুঃখী।

ডাঃ আমেণ্ডো বল্লেন—সে আপনি ভাববেন না। যেখানেই লোকে দুঃখ পাচ্চে, সেখানেই আমরা থাকবো। দেশ, জাতি, ধর্মের গণ্ডি নেই আমাদের কাছে। সারা পৃথিবী আমাদের দেশ। তবে কি জানেন, এই রাশিয়া আমাদের জন্মভূমি। এখানকার লোকের দুঃখ আমাদের প্রাণকে বড় স্পর্শ করে। ভারতবর্ষেও যখন যেতে বলবেন, তখনই আমরা যাবো। আমাদের দলে অনেক লোক আছেন—সবাইকে নিয়ে যাবো।

যতীন বল্লে—আরও উচ্চস্তরের কোনো লোক আসেন না কেন? পঞ্চম বা ষষ্ঠ কি তারও ওপরের স্তরের কাউকে তো দেখতে পাইনে।

ডাঃ আমেণ্ডো বল্লেন—তাঁরা কাজ করেন আমাদের মধ্যে দিয়ে। তাঁরা এলেও আপনি তাঁদের চোখে দেখতে পাবেন না। পৃথিবীতে এলে তাঁরা আমাদের চেয়েও অসহায় হয়ে পড়েন। পৃথিবীর স্থূললোকের স্থূল মনের ওপর তাঁদের প্রভাব আদৌ কাযকর হয় না। তাঁরা উৎসাহ ও প্রেরণা দেন আমাদের—আমরা কাজ করি।

মেয়েটি বল্লেন—এর মধ্যে আরও কথা আছে। বড় বড় দুর্ভিক্ষ, মড়ক, বন্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতি যাতে দেশকে দেশ বা জাতিকে জাতি কষ্ট পায়—এ সবের মূলে অতি উচ্চ দেবতা—যাঁরা গ্রহদেব প্ল্যানেটরি স্পিরিট—তাঁদের হাত রয়েচে। তাঁদের উদ্দেশ্য বা কর্মপ্রণালী আমরা বুঝিনে। কিন্তু ঐ সব উচ্চস্তরের বড় বড় লোকে তা বুঝতে পারেন। এর হয়তো কোথাও বড় একটা উদ্দেশ্য রয়েচে। আমাদের দৃষ্টি তত দূর পৌঁছোয় না—তাঁরা সেটা দেখতে পান, কাজেই গ্রহদেবদের কাজে হস্তক্ষেপ করতে যান না। আপনি কিছুদিন আমাদের সঙ্গে থাকুন, ঘোরাফেরা করুন, অনেক কিছু দেখতে বা জানতে পারবেন। এ লোকের কাণ্ডকারখানা এত বিরাট ও জটিল যে নতুন পৃথিবী থেকে এসে মানুষে হতভম্ব হয়ে পড়ে—কিছুই ধারণা করতে পারে না।

যতীন বল্লে—কিন্তু জানবার আগ্রহ আমার অত্যন্ত বেশী, দেবী। আমি জানতে চাই কি করে এই বিরাট আত্মিকমণ্ডলী কাজকর্ম চালাচ্চেন—এঁরা কি করেন, এঁদেরই বা কে চালাচ্চে, গ্রহদেব যাঁদের বলচেন, তাঁরাই বা কে, কোথায় থাকেন, কত উচ্চস্তরের আত্মা তাঁদের দেখতে পাওয়া যায় না কেন,—কোথা থেকে তাঁরা এলেন—এ সব না জানলে আমার মনে শান্তি নেই।

মেয়েটি বল্লেন—জানবার ইচ্ছে থাকলেই ক্রমে ক্রমে সব জানতে পারবেন। এই আগ্রহই আসল। বেশীর ভাগ মানুষ পৃথিবী থেকে এখানে এসে কিছুই জানে না, বোঝে না, বোঝবার চেষ্টাও করে না। জানবেন, জ্ঞান ভিন্ন উন্নতি নেই। এ লোকে আরও শক্ত নিয়ম। সেবা বলুন, ধর্ম বলুন, প্রেম বলুন—ততদিন উর্দ্ধলোকে আপনার ঠাঁই হবে না, যতদিন জ্ঞানের আলো আপনার মনের অন্ধতা দূর না করচে।

ডাক্তার আমেণ্ডো বল্লেন পৃথিবীতে কি জানেন, নানা মুনির নানা মতে সেখানে সত্যের সমাধিলাভ ঘটেচে। এখনও পৃথিবীর মন আপনার যায় নি। এ জীবনের বিরাট প্রসারতা এখনও আপনি দেখতে পান নি। আপনি অজর, অমর, আপনার জীবন শাশ্বত অফুরন্ত। আপনার জন্মগত অধিকার এই জীবনের অমৃতপানে। আপনি তৃতীয় স্তরের মানুষ, আপনি কি ছোট? আপনিও মুক্তাত্মা, আপনার সঙ্গে এই মহীয়সী মহিলা তো সাক্ষাৎ দেবী। এই সব পৃথিবীর হতভাগ্যদের ভরসার স্থল আপনারা। এরা যখন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে, সে প্রার্থনা যাঁর কাছে পৌঁছোয়, তিনি আপনাদের মত পবিত্র মুক্তাত্মাদের মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে এদের সাহায্য করেন। তিনি শক্তি বিকীর্ণ করচেন, আপনারা যন্ত্ররূপে সেই শক্তিকে ধরচেন, ধরে কাজে লাগাচ্চেন। বেতারের ঢেউএর আপনারা রিসিভার। যন্ত্র যত উঁচুদরের, যত নিখুঁৎ—তাঁর বাণীর প্রকাশ সেখানে তত সুস্পষ্ট, সুন্দর।

যতীন অদ্ভুত প্রেরণা পেলে, ডাক্তার আমেণ্ডোর মত এত বড় আত্মার প্রশংসাতে। কিছু

লজ্জিতও হোল। এতখানি প্রশংসার উপযুক্ত সে নয় তা সে জানে। তবে হবার চেষ্টা আজ থেকে তাকে করতেই হবে।

কিছু পরে পুষ্প ও যতীনের পায়ের তলায় বিশাল ভল্‌গা একটা সরু রৌপ্যসূত্রের মত হয়ে ক্রমশঃ অদৃশ্য হয়ে গেল। সেদিনের মত ওরা বিদায় নিলে।

পুষ্পদের বুড়োশিবতলার বাড়ীতে আজকাল দেবী প্রায়ই আসেন। এঁকে আমরা করুণাদেবী বলে পরিচয় দেবো। করুণাদেবী অতি উচ্চস্তরের নীলজ্যোতিবিশিষ্ট আত্মা—কিন্তু পৃথিবীর কাছাকাছি তিনি থাকতে ভালবাসেন, কারণ পৃথিবীর আর্ত জীবকুল ছেড়ে উর্ধ্বে স্বর্গে গিয়ে তিনি শান্তি পান না। এঁর চরিত্রের মাধুর্যে ও সুন্দর ব্যবহারের কথা শুনে পুষ্প ও যতীন এঁর প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল।

যখনই তিনি আসতেন, একরাশ ফুল ও ফল নিয়ে আসতেন ওপরের স্বর্গ থেকে। সে ফুল যেন স্পন্দনশীল আলোর তৈরী—খাওয়া যায়, খুব সুস্বাদু এবং ভারি চমৎকার ভুরভুরে সুগন্ধ তার। সে ফল খেলে মনে শক্তি ও পবিত্রতা আসে, এই তার গুণ। কিন্তু এই নিম্নতর তৃতীয় স্বর্গে সে ফল বেশী সময় থাকতো না—কিছুক্ষণ পরেই ঠিক কর্পূরের দলার মত উবে যেত। দেবী বলতেন, ওপরকার জগতের এই সব ফল পৃথিবীর ন্যায় স্থূল দেহের সৃষ্টির জন্যে জন্মায় না, মনের আধ্যাত্মিক পুষ্টির খোরাক যোগানোই এদের কাজ।

সেদিন তখন ওদের বাড়ীতে সকালবেলা করে রেখেছে পুষ্প। ঠিক যেন পৃথিবীর সকাল, লতাপাতায় শিশির, পাখী ডাকচে ও গঙ্গার ওপারে সূর্য উদয় হচ্চে, পুষ্প সবে গঙ্গাস্নান করে শিবমন্দিরে পূজো করতে যাচ্চে, এমন সময় করুণাদেবী এলেন। পুষ্পকে বল্লেন—বেশ সকালটি করে রেখেচ তো! পূজো সেরে নাও, চল তুমি আর যতীন আমার সঙ্গে এক জায়গায় যাবে!

যতীন ঘরের মধ্যে বসে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে ছিল।

দেবীকে বসবার আসন দিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল। করুণাদেবী বল্লেন—তুমি পূজো কর না?

—ওতে আমার বিশ্বাস নেই। আমার মনে হয় পৃথিবীতে দেবতা ও ভগবান সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা গড়ে ওঠে, এখানে এসে তার আমূল সংস্কারের প্রয়োজন আছে। সে ভাবের দেবতা কই এখানে? সে ভাবের ভগবানই বা কোথায়? পুষ্প মেয়েমানুষ, ওর মনে ভক্তি ও পূজার্চনার প্রবৃত্তি কোনো প্রশ্ন ওঠায় না। বিনা দ্বিধায় বিনা প্রশ্নে সে পূজার ফুল তার মন-গড়া ইষ্টদেবের পায়ে দেয়। আমি তা পারি না। আমার মনে হয়—

করুণাদেবী বল্লেন—তোমার এ কথার মধ্যে ভুল রয়েচে, যতীন। তুমি ভেবো না ভগবান সম্বন্ধে তুমি কোনো ধারণা কখনো করে উঠতে পারবে। তুমি কোথায়, আর সেই বিরাট বস্তু, যাঁকে পৃথিবীতে বলে ভগবান, তিনিই বা কোথায়? অতএব ভক্তি ও অর্চনা-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে হোলে তোমায় মনের মত ভগবান তোমাকে গড়ে নিতে হবে। তোমার সেই মন-গড়া দেবতার মধ্যে দিয়েই অর্ঘ্য পৌছোবে সেই বিশ্বদেবের পায়ে। তুমি তৃতীয়-স্বর্গবাসী জীব, এর বেশী কি করতে পারো?

যতীন ছাড়তো না তর্ক করতো, এমন সময়ে পুজো শেষ করে পুষ্প ফিরে এল। দেবী ওদের দুজনকে নিয়ে পৃথিবীতে এলেন।

যে জায়গাটিতে তাঁরা এলেন, সেখানটা একটা নির্জন স্থান। ছোট্ট একটা নদী, তার ধারে অনেকদূরব্যাপী ঘন জঙ্গল।

যতীন বল্লে—এটা কোন্ দেশ ?

দেবী বল্লেন—বাংলাদেশ, চিনতে পারচ না কেন ? মধুমতী নদী, এইখানে ছিল বড় গঞ্জ নকীবপুর, রাজা সীতারাম রায়ের আমলে। ধ্বংস হয়ে জঙ্গল হয়ে রয়েচে। বাংলাদেশ ছাড়া তোমাদের আনতাম না—কারণ যে কাজ করতে হবে তাতে বাঙলা ভাষা বলা দরকার হবে। চল দেখাচ্চি।

নদীর ধারে জঙ্গলের মধ্যে এক জায়গায় ছোট একখানা খড়ের বাড়ী। কিন্তু বাড়ীখানা দেখেই যতীন অবাক্ হয়ে গেল। ঘরখানা পৃথিবীর বস্তু দিয়ে তৈরী নয়। আত্মিকলোকের চিন্তাশক্তিতে সৃষ্ট আত্মিকলোকের সূক্ষ্ম পদার্থে তৈরী ঘর। পৃথিবীতে এমন ঘর কি করে এল, যতীন জিজ্ঞাসা করতে যাচ্চে—এমন সময় একটি বৃদ্ধ এক বোঝা কঞ্চি বয়ে নিয়ে ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো।

যতীন আরও অবাক্ হয়ে গেল।

বৃদ্ধটি পার্থিব স্থূল দেহধারী মানুষ নয়—খুব নিম্নস্তরের আত্মা—পৃথিবীতে যাকে বলে প্রেত! তার হাতের কঞ্চির বোঝাও সত্যিকার কঞ্চির বোঝা নয়, সেটা চিন্তাশক্তিতে গড়া, আত্মিকলোকের বস্তু দিয়ে তৈরী।

বৃদ্ধের ভাব দেখে মনে হোল সে তাদের কাউকে দেখতে পায়নি।

যতীন বিস্মিতভাবে বল্লে—ব্যাপার কি? এ তো মানুষ নয়। এখানে এ ভাবে কি করচে ?

করুণাদেবী বল্লেন—সেই কথা বলবো বলেই তোমাদের আজ এনেচি। বড় করুণ ইতিহাস লোকটির। ওর নাম দীনু পাড়ুই। স্ত্রীকে সন্দেহ হয় বলে খুন করে নিরুদ্দেশ হয়—দেশ থেকে পালিয়ে পুলিশের ভয়ে নাম ভাঁড়িয়ে নকীবপুরের এই জঙ্গলে অনেক দিন ঘর বেঁধে ছিল। আট দশ বছর পরে ওর নিমোনিয়া হয়, তাতেই মারা পড়ে। মৃত্যুর পরে হয়ে গিয়েচে আজ ত্রিশ বছর। এই ত্রিশ বছরেও ও বুঝতে পারেনি যে ও মরে গিয়েচে। ভাবে, ওর কি অসুখ করেচে, তাই ওকে কেউ দেখতে পায় না। জঙ্গলের মধ্যে খুব কমই লোক আসে, কাজেই জীবন্ত মানুষের সঙ্গে ওর পার্থক্য কি, বুঝবার সুযোগ ঘটেনি। নিজেও পুলিশের ভয়ে জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। অথচ এত স্থূল ধরনের মন, এত নিম্নস্তরের আত্মা যে, আমি কতবার চেষ্টা করেও কিছু করতে পারিনি। আমাকে ও দেখতেও পায় না। ওর নিজের লোক যারা মারা গিয়েচে, কখনো কেউ আসে না। তাই তোমাদের এনেচি আজ।

যতীন বল্লে—আশ্চর্য!

দেবী বল্লেন—মরে গিয়ে বুঝতে না পারা আত্মিক লোকের এক রকম রোগ। পুরোনো হয়ে গেলে এ রোগ সারানো বড় কঠিন, কারণ মৃত্যুর প্রকৃত স্বরূপ কখনো না জানার দরুন এই

সব অজ্ঞ নিম্ন আত্মারা বেঁচে থাকার সঙ্গে মৃত্যুর পরের অবস্থার সূক্ষ্ম পার্থক্যটুকু আদৌ বুঝতে পারে না। এমন কি, বুঝিয়ে না দিলে ষাট, সত্তর, একশো, দুশো বছর এ রকম কাটিয়ে দেয়, এমন ব্যাপারও বিচিত্র নয়।

যতীন এমন ব্যাপার কখনো শোনেনি। সঙ্গে সঙ্গে এই হতভাগ্য, বন্ধুহীন, স্বজনহীন, অসহায় বৃদ্ধের ওপর তার সহানুভূতি হোল। করুণাদেবী সত্যই করুণাময়ী বটে, পৃথিবীর এই সব হতভাগ্যদের খুঁজে খুঁজে বার করে তাদের সাহায্য করা তাঁর কাজ, তিনি যদি দেবী না হবেন, তবে কে হবে?

যতীন ধল্লে—আচ্ছা এই খড়ের ঘরটা—

এবার উত্তর দিলে পুষ্প। বল্লে—বুঝলে না? ওর আসল পৃথিবীর ঘরখানা কোন্ কালে পড়ে ভূমিসাৎ হয়ে গিয়েচে। কিন্তু সেই ঘরখানার ছবি ওর মনে তো আছে—ওর চিন্তা সেই ছবির সাহায্যে ঘরটা গড়েচে—যেমন আমার তৈরী গঙ্গা আর কেওটার বুড়োশিবতলার ঘাট। এ লোকে তো ও তৈরী করা কঠিন নয়। অনেক সময় আপনা-আপনি হয়।

দেবী বল্লেন—পুষ্পকে আর আমাকে ও তো দেখতে পাবেই না। যতীন এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াও তো ওর সামনে।

সন্ধ্যা হয়ে গেল। জঙ্গলের মধ্যে ঘন অন্ধকারে ঝোপেঝাড়ে জোনাকি পোকা জ্বলে উঠলো। যতীন গিয়ে বুড়োর সামনে দাঁড়ালো, কিন্তু ফল হলো উল্টো। বৃদ্ধ ওকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে ভয় পেয়ে চাৎকার করে উঠলো এবং ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলো। দেবী বল্লেন, ও তোমাকে দেখতে পেয়েচে, কিন্তু ভাবচে তুমি ভূত।

পুষ্প ভাবলে, কি মজার কাণ্ড খ্যাখো! ভূত হয়ে ভূতের ভয় করচে!

দেবী বল্লেন—ওর সঙ্গে কথা বলো—

যতীন বল্লে—ভয় কি বুড়োকর্তা! ভয় পাচ্চ কেন?

বৃদ্ধ ভয়ে কাঁপচে আর রাম রাম বলচে। যতীনের হাসি পেল কিন্তু দেবী সামনে রয়েচেন বলে সে অতি কষ্টে চেপে গেল।

যতীন আবার বল্লে—বুড়োকর্তা, ভয় কিসের, তুমি এখানে একলা আছ কেন? এবার বোধ হয় বৃদ্ধের কিছু সাহস হোল। সে বল্লে—আজ্ঞে কর্তা, আপনি কে?

—আমার এখানেই বাড়ী। কাছেই থাকি। তুমি কতদিন এখানে আছ? একলা থাকো কেন? তোমার কেউ নেই?

বৃদ্ধ এইবার একটু ভিজল। বল্লে—বাবু, আপনি পুলিশের লোক নয়? আমায় ধরিয়ে দেবেন না?

যতীন বল্লে—না, কেন ধরিয়ে দেবো? কি করেছ তুমি? তা ছাড়া তোমার যা অবস্থা তাতে পুলিশে তোমাকে এখন আর কিছু করতে পারবে না।

বৃদ্ধ উৎকণ্ঠিত স্বরে বল্লে—কি হয়েছে বলুন তো বাবু আমার? আপনি কি ডাক্তার? সত্যি বাবু, আমিও বুঝতে পারিনে যে আমার এ কি হোল। একবার অনেককাল আগে আমার

শক্ত অসুখ হয়—তারপর অসুখ সেরে গেল, কিন্তু সেই থেকে আমার কি হয়েচে আমার কথা কেউ শুনতে পায় না, লোককে ডেকে দেখেচি আমার ডাক না শুনে তারা চলে যায়। মামুদপুরের হাটে যাই, কেউ আমার সঙ্গে কথা বলে না। আমার শরীরে যেন খিদে তেষ্টা চলে গিয়েচে। আগে ভাত খেতাম, এখন খিদে হয় না বলে বহুকাল খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। শরীরটা কেমন হাল্‌কা মনে হয়, যেন তুলোর মত হাল্‌কা—মনে হয় যেন আকাশে উড়ে যাবো। তেষ্টা নেই শরীরে। আর একটা জিনিস বাবু, কোনো কিছুতে হাত দিলে আগের মত আর আঁকড়ে ধরতে পারিনে। হাত গলিয়ে চলে যায়। এ কি রকম রোগ বাবুমশাই? পুলিশের ভয়ে কোথাও যেতে পারি নে, নইলে নলদীর সরকারী ডাক্তারখানায় গিয়ে একবার ডাক্তারবাবুকে দেখাবো ভেবেছিলাম।

যতীন বল্লে—বল্‌ছি সব কথা। কিন্তু পুলিশের ভয় কর কেন? কি করেছিলে?

বৃদ্ধ সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে বল্লে—কেন বাবু?

—বল না। আমি কাউকে বলবো না। আমার অবস্থা বুঝতে পারচ না? আমিও তোমার দলের একজন। আমিও মানুষজনের সঙ্গে মিশতে পারিনে।

কথাটার মধ্যে দুরকম অর্থ ছিল। বৃদ্ধ সোজাটাই বুঝলে। বুঝে বল্লে—আপনার নামেও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে নাকি বাবু? কি করেছিলেন আপনি?

—আমি আমার স্ত্রীকে খেতে দিতাম না। বাপের বাড়ী ফেলে রেখেছিলাম। তার সঙ্গে আমার ঝগড়া হোত প্রায়ই। তারপর একদিন—

বৃদ্ধ বল্লে—বাবু মশাই, আপনি পুলিশের লোক। আমি বুঝতে পেরেচি। আপনি সব জানেন দেখচি। তা ধরুন আমায়, যে আমার রোগ হয়েচে, বোধ হয় বেশীদিন বাঁচবো না। এ রকম জ্যান্ত মরা হয়ে থাকার চেয়ে ফাঁসি যাই যাবো। এতদিনে আমার ভুল বুঝতে পেরেচি বাবু মশাই। আমার বৌ-এর কোনো দোষ ছিল না, সতীলক্ষ্মী ছিল সে। আমার মনে মিথ্যে ধুকুবুক ছিল, কালীগয়লার ছোট ভাইটার সঙ্গে বড় হাসিঠাট্টা করতো। বারণও করে দেলাম অনেকবার, তাও শুনতো না। তাই একদিন রাগের মাথায়—কিন্তু দোহাই দারোগাবাবু, খুন করবো বলে মারিনি। মাঠ থেকে সবে এসে পা দিইচি বাড়ীতে, দেখি কালীগয়লার ভাই ছিচরণ খিড়কী দোর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্চে; চাষার রাগ—বল্লাম—ও কেন বাড়ীর মধ্যে ঢুকেছিল? বউ উত্তর দেবার আগেই রাগের মাথায় তার মাথায় এক ঘা—

বৃদ্ধ হঠাৎ কেঁদে ফেললে। বল্লে—তারপর আমি সব বুঝতে পেরেছিলাম দারোগাবাবু। ছিচরণকে বউ ভাই-এর মত দেখতো। ছিচরণ হাসির গল্প বলতে পারতো, বউ তাই শুনতে ভালবাসতো। বৌ-এর কোনো দোষ ছিল না। সেই পাপের ফলে আজ আমার এই ভয়ানক রোগ জন্মেচে শরীরে। আজ আমার জীবনের মায়া নেই, সর্বদা বউডার কথা ভাবি আজকাল। অনেক দিন থেকেই ভাবি। একা একা এই জঙ্গলে এই রোগ নিয়ে আর কাটাতে পারিনে, দারোগাবাবু। জেলে গেলে তবুও পাঁচটা মানুষের সঙ্গে কথা বলে বাঁচবো।

দেবা বল্লেন—ওকে জিজ্ঞেস কর, ও কি বৌ-এর সঙ্গে দেখা করতে চায়?

যতীন বৃদ্ধকে কথাটা জিজ্ঞেস্ করতেই সে অবাক্ হয়ে ওর দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে বল্লে —তবে কি বাবু বৌ হাসপাতালে গিয়ে বেঁচে গিয়েছিল ?

যতীন বল্লে—তা নয়, তুমিও আর বেঁচে নেই। তুমিও মরে গিয়েচ, তোমার বৌও মরে গিয়েচে। আমিও মরে গিয়েচি। সবাই আমরা পরলোকে আছি এখন। তোমাকে উদ্ধার করতে আর দু'জন দেবী এখানে এসেচেন, তুমি তাদের দেখতে পাচ্চ না। এখানেই তাঁরা আছেন। তোমার এ অবস্থা দেখে তাঁদের দয়া হয়েছে। এবার তোমার ভাবনা নেই, তোমার স্ত্রীর সঙ্গেও আমরা দেখা করিয়ে দেব।

বৃদ্ধ কিন্তু এসব কথা বিশ্বাস করলে না। সে সন্দিগ্ধ সুরে বল্লে তবে আমার এই রোগটা হোল কেন ? এটা সারাবার একটা ব্যবস্থা করে দিন দয়া করে। বৌ-এর সঙ্গে দেখা করে কি হবে বাবু ? হাসপাতাল থেকে সে যদি সেরে থাকে, তবে তো ভালই। তার ভাইএর বাড়ী আছে বুঝি ? তা থাক্, দেখা করে আর কি হবে বাবুমশাই, এ রোগ নিয়ে আর কারু সঙ্গে দেখা করতে চাইনে বাবু।

যতীন ওর কাছে পরলোক ও মৃত্যুর প্রকৃতি বর্ণনা করলে খানিকক্ষণ। করুণাদেবী বল্লেন—ওসব বলো না যতীন ওর কাছে। ওতে কোনো উপকার হবে না। ও কি বুঝবে ওসব কথা ? দেখচো না কত নিম্ন স্তরের আত্মা ? বুদ্ধি বলে জিনিস নেই ওর মধ্যে। ওকে বোঝাতে হোলে অন্যপথে যেতে হবে। ওর স্ত্রীকে আনতে হবে খুঁজেপেতে কোনরকমে, তার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে হবে। কিন্তু ওর তো দেখচি ভালবাসার কোনো বন্ধন নেই স্ত্রীর সঙ্গে। এ অবস্থায় দুজনের যোগস্থাপন করানোই কঠিন কাজ। এ লোকে যার সঙ্গে যার ভালবাসা বা স্নেহ নেই, তার সঙ্গে তার কোনো যোগই যে সম্ভব নয়।

আরও কয়েকবার যাতায়াত ও অনবরত চেষ্টা করলে ওরা। বৃদ্ধ কিছু বোঝেই না। তাকে তার অবস্থা বোঝানো সাংঘাতিক কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। তাকে কিছুতেই বোঝানো যায় না যে সে মরে গিয়েছে। কারো ওপর তার টান নেই—না স্ত্রী, না ছেলেমেয়ে, না অন্য কারো ওপর।

করুণাদেবী বল্লেন—শুধু বুদ্ধিহীন বলে নয়, এমন একটি অদ্ভুতধরনের হৃদয়হীন প্রেমহীন আত্মা আমি খুব কমই দেখেচি। মনে প্রেম ভালবাসা স্নেহ এসব যদি থাকতো তা হলেও ওর উদ্ধার এত কঠিন হোত না। কি যে করি এখন !

কিন্তু কি অপূর্ব নিঃস্বার্থ দরদ করুণাদেবীর! পতিত হতভাগ্যদের ওপর কি তাঁর মায়ের মত গভীর সহানুভূতি ! কত কষ্ট করে তিনি নিম্নস্তরের বহু জায়গা খুঁজেপেতে একদিন এক স্ত্রীলোককে এনে হাজির করলেন ওর সামনে। যতীন আর পুষ্প সব সময়েই ওঁকে সাহায্য করতো, ওঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকতো। কারণ অত নিম্নস্তরে দেবী সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য পুষ্পও তাই—যতীনের বিনা সাহায্যে কোনো কাজই সেখানে হবার উপায় ছিল না। স্ত্রীলোকটিরও তেমন বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই, মনে প্রেম-ভালবাসাও তথৈবচ। ধূসরমিশ্রিত লাল রঙের দেহধারী আত্মা। তবে সে সক্রিয় ধরনের বা অনিষ্টকারী চরিত্রের মেয়ে নয়—মোটামুটি ভালমানুষ এবং ওর

স্বামীর মতই প্রেম ভালবাসার ধার ধারে না।

খুব এমন কিছু উঁচুদরের আত্মা না হোলেও বৃদ্ধের অপেক্ষা কিছু উঁচু। কিন্তু হঠাৎ খুন হয়ে মৃত হওয়ার ফলে অনেকদিন পর্যন্ত তার এ লোকে ভাল জ্ঞান হয় নি। সম্প্রতি কিছু কিছু বুঝতে আরম্ভ করেচে।

যতীন বৃদ্ধকে বল্লে—চিনতে পারো? এগিয়ে এসে দ্যাখো তো—

বৃদ্ধ চমকে উঠলো, বল্লে—বড় বৌ যে!

ওর স্ত্রী হেসে বল্লে—হ্যাঁ, মুগুরের বাড়ি মাথায় দিয়ে ভেবেছিলি হাত থেকে বুঝি এড়ালি। তা আর হোল কৈ?

বৃদ্ধ অবাক হয়ে বল্লে—বড় বৌ, তুই তাহলে বেঁচে আছিস্?

বড় বৌ বল্লে—তুইও যা আমিও তাই। দুজনেই মরে ভূত হয়ে গিয়েছি। আজ এঁরা সব এসেচেন তাই এঁদের দয়ায় উদ্ধার হয়ে গেল। নে এঁদের গড় কর্ পায়ে।

পুলিশের দারোগাবাবুকে?

—যমের অরুচি—পুলিশের দারোগা আবার কে এর মধ্যে? মরচেন কেবল পুলিশ পুলিশ করে, অত যদি পুলিশের ভয় তবে রাগের সময় কাণ্ডজ্ঞান ছিল না কেন রে মুখপোড়া? এঁকে প্রণাম কর্, আর দুজন আছেন, তাঁদের দেখবার ভাগ্যি তোর এখনও হয়নি, এই পিটুলি গাছের তলায় মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম কর্। চল্ আমার সঙ্গে, তোকে সব বুঝিয়ে দিচ্চি—এখন কিছু বুঝবিনে।

বৃদ্ধ যতীনের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। স্ত্রীর কথায় পিটুলি গাছের তলায় মাথা নীচু করে অদৃশ্য পুষ্প ও দেবার উদ্দেশে প্রণাম করলে। স্ত্রীলোকটিও সকলকে প্রণাম করলে—তারপর বৃদ্ধকে সঙ্গে করে নিয়ে চলে গেল।

ফেরবার পথে করুণাদেবী বল্লেন—যারা কিছুই বোঝে না, তাদের দিয়ে না হয় নিজের উপকার না হয় পরের উপকার। দেখলে তো চোখের সামনে? যারা এই বিরাট বিশ্বরহস্যের কিছুই বোঝে না, তারা নিজেদের মহান্ অদৃষ্টলিপি, আত্মার বিরাট ভবিষ্যৎ কি বুঝবে? এসব লোকের এখনও কতবার পৃথিবীতে জন্মাতে হবে, তবে এরা উচ্চস্তরের উপযুক্ত হবে। এদের নিয়ে ভাবনায় পড়তে হয় এমন।

যতীন মনে মনে ভাবলে—পতিতের ওপর এমন দয়া না থাকলে সাধে কি আর দেবী হওয়া যায়!

পৃথিবী থেকে ফেরবার পথে এক জায়গায় শূন্যপথে ক্ষুদ্র একটি জগৎ মহাশূন্য-সমুদ্রের মধ্যে নির্জন দ্বীপের মত দেখা যাচ্চে। তার কিছু ওপর দিয়ে যাবার সময় একটি দৃশ্য দেখে যতীন আর পুষ্প দুজনেই থেমে গেল। ঐ জগতে এসে পর্যন্ত ওরা অনেক উন্নত স্তরের জ্যোতির্ময়ী মহিমময়ী রূপসী দেবীদের দেখেচে, যেমন একজন করুণাদেবী তাদের সঙ্গেই রয়েচেন। কিন্তু এই নির্জন ক্ষুদ্র জগৎটির একস্থানে প্রান্তরের মধ্যে শিলাখণ্ডের ওপর যে নারীকে ওরা বসে থাকতে দেখলে, তাঁর শ্রী ও মহিমার কোনো তুলনা দেওয়া চলে না। কি তেজ, কি দীপ্তি, কি প্রজ্বলন্ত

রূপ—অথচ মুখে কেমন একটা দুঃখ ও বিষাদের ছায়া—তাতে মুখশ্রী আরও সুন্দর হয়েছে দেখতে। স্বচ্ছ নীল আভা তাঁর সর্বাঙ্গ দিয়ে বার হয়ে শিলাখণ্ডটাকে পর্যন্ত যেন দামী পান্নায় পরিণত করেচে।

করুণাদেবীও সেদিকে চেয়ে চমকে থেমে গেলেন। বল্লেন—ওঁকে চেন না? বহু সৌভাগ্যে দেখা পেলে। বহু উচ্চস্তরের দেবী, চল, দেখা করিয়ে দিই। তোমাদের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিলে উনি বিশেষ খুশি হবেন এই জন্যে যে, উনি প্রেমের দেবী। ওঁর কাজ পৃথিবীতে শুধু চলে না, বহু গ্রহে উপগ্রহে, স্থূল ও আত্মিক জগতে, বিশ্বের বহু দূর দূর নক্ষত্রের মধ্যে যেখানেই জীব বাস করে—সেই সব স্থানেই দুটি প্রেমিক আত্মার মিলন সংঘটন করিয়ে বেড়ান। উনি একা নন, ওঁর দলবল খুব বড়। অনেক সঙ্গিনী আছে ওঁর। উনি অসীমশক্তিময়ী দেবী, আলাপ হোলে হঠাৎ কিছু বুঝতে পারবে না। অত বড় প্রাণ, অত উদার প্রেম-ভালবাসা ভরা আত্মা তোমরা কখনো দেখনি। খুব সৌভাগ্য তোমাদের যে চোখে ওঁকে দেখতে পেয়েচ আজ, এর একমাত্র কারণ আজ তোমরা পৃথিবীতে ওই আত্মাটির উদ্ধারের সাহায্য করেচ, সেই পুণ্যে এই মহাদেবীকে চোখে দেখার সৌভাগ্য লাভ করলে। নইলে সাধ্য কি তোমাদের ওঁকে দেখতে পাও? এসো আমার সঙ্গে, আলাপ করিয়ে দিই।

ওরা এসে সেই দেবীর সামনে প্রণাম করে দাঁড়িয়ে রইল।

—আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেচে—করুণাদেবী বল্লেন—এরা পৃথিবীর লোক, মেয়েটি একে ভালবাসতো বড়। বাল্যপ্রেম। মেয়েটি আগে মারা যায়, তারপর এ লোকে সে বহুদিন প্রতীক্ষায় ছিল। সম্প্রতি মিলন হয়েচে।

প্রণয়দেবী স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে ওদের দিকে চেয়ে হাসিমুখে বল্লেন—আমি জানি, সখী। এর নাম পুষ্প, ওর নাম যতীন। আমি ওদের ওপরে দৃষ্টি রাখিনি ভেবেচ? এই একটি সত্যিকার প্রেমের উদাহরণ। যেখানেই সত্যিকার জিনিস, সেখানেই আমি আছি। চেষ্টা করি তাদের মিলিয়ে দিতে, কিন্তু সব সময় পারিনে। আরও ওপরে রয়েচেন কর্মের দেবতারা—লিপিকদের দল। তাঁদের প্যাঁচ ছাড়ানো কত কঠিন তোমার তো জানতে বাকী নেই! এদের পূর্বজন্মের কর্ম ছিল ভাল, তাও এই ছেলেটির গোলমাল রয়েছে এখনও, পরে দেখতে পাবে। তা এনে ভালই করেচ। আমার মণ্ডলীতে এরা আসুক, কারণ এরা আমারই দলের উপযুক্ত লোক।

পুষ্প ও যতীন উল্লসিত হয়ে উঠল।

প্রেমের ব্যাপারে কি সাহায্য তাদের দিয়ে হবে তারা জানে না, কিন্তু একথা তাদের প্রাণের কথা যে তারা নিজেদের জীবন ধন্য মনে করবে যদি পৃথিবীর একটি ব্যর্থ প্রণয়ীর জীবনেও তারা সার্থকতার আলো জ্বালাতে পারে। এই তাদের অন্তরের কথা। যারা যে দলের, এতদিন পরে যতীন ও পুষ্প যেন সগোত্র আত্মার আত্মীয়মণ্ডলীকে আবিষ্কার করলে।

যতীন আশ্চর্য হয়ে ভাবছিল, বিশ্বের কি অদ্ভুত কার্যপ্রণালী! অদৃশ্য জগতের কি বিরাট সংঘরাজি, কি বিরাট কর্মপ্রবাহ। পুষ্প ভাবছিল—কিন্তু করুণাদেবীকে ছেড়ে ওরা কি করে যাবে? তাঁকে যে ওরা বড় ভালবাসে—কিন্তু তাঁর মনে কষ্ট দেওয়া হবে যে!...করুণাদেবী

যেন ওর মনের কথা বুঝেই বল্লেন—তোমাদের প্রকৃত স্থান এঁর মণ্ডলীতে। আমার দেখা সর্বদাই পাবে, যখন চাইবে তখনই দেখা দেবো, সেজন্য ভেবো না। তোমরা যাও এঁর সঙ্গে।

প্রণয়দেবী বল্লেন—উনি আর আমি পৃথক্ নই। উনি যেখানে, সেখানে আমি আছি; আমি যেখানে, সেখানে উনিও থাকেন। প্রেম আর করুণা পরস্পর ফুল আর সুতোর মত এক-সঙ্গে আছে। সুতোকে ফেলে মালা গাঁথা যায় না, ফুলকে বাদ দিয়ে সুতো নিয়ে মালা হয় না।

—কেন, বিনি সুতোয় মালা হয় না সখী?

—বড় সন্তর্পণে গলায় দিতে হয়। বড় ঠুন্‌কো হয়। বড় অল্পে মরে বাঁচে। করুণা প্রেমকে সাহায্য না করলে, প্রেম হয় ঠুন্‌কো। এদিকে প্রেম পেছনে না থাকলে করুণা রক্তাল্পতা রোগে মারা পড়ে। ছলনা কেন করচো সখী, তুমি নাকি এ জান না!

আবার নীল শূন্যপথে, আবার বাধাহীন তড়িৎ-অভিযান! যতীন ও পুষ্প বুড়োশিবতলার ঘাটে পৌঁছে গেল।

১২

যদিও তৃতীয় স্বর্গে দিন নেই রাত নেই, সময় অবিভাজ্য ও মাত্রাস্পর্শহীন তবুও যতীনের সুবিধার জন্যে পুষ্প বুড়োশিবতলার ঘাটে পৃথিবীর মতই দিনরাত্রি সৃষ্টি করতো। ঘুমের আবশ্যক না থাকলেও নিজের সৃষ্ট রাতে ঘুমোতো।

দিন কয়েক পরে।

পুষ্প ঘুম ভেঙ্গে উঠেচে। ওর শয়নকক্ষের বাইরের প্রকাণ্ড মুচুকুন্দ চাঁপার গাছটাতে পাখীরা কিচ্ কিচ্ করচে। ও দেখলে জানালা দিয়ে নতুন-ওঠা প্রভাত-সূর্যের আলোর রং কেমন অদ্ভুত ধরনের সবুজ ও গোলাপী। আরও বিস্মিত হোল দেখে যে সেই রঙীন আলোর মৃদু জ্যোতিটা বাষ্পাকারে তার খাটটা ঘিরে রয়েচে যেন। যতীন বুঝতে পারতো না ব্যাপারটা। পুষ্প বুঝলে ওপরের স্বর্গ থেকে কোনো উচ্চতর আত্মা তাকে স্মরণ করেচেন।

যতীনকে কথাটা বলতেই সে বল্লে—চল আমিও যাই।

পুষ্প দুঃখিত স্বরে বল্লে—পারবে না যতুদা, নইলে তোমায় ফেলে যেতে কি আমার সাধ? আমার মনে হচ্চে ইনি সেদিনকার সেই দেবী, করুণাদেবী যাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। তা যদি হয়, সে স্বর্গে যাওয়া তোমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। তুমি থাকো, আমি যাই, কাজ শেষ হলেই চলে আসবো।

গোলাপী আলোর সরল জ্যোতিরেখা অনুসরণ করে সে মহাশূন্যপথে উঠলো। পুষ্প চতুর্থ-স্তরের আত্মা, তার শক্তির গতিবেগ যতীনের চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু যতীন সঙ্গে থাকলে পুষ্প নিজেকে সংযত করে চলে ওর সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে। নইলে লক্ষ লক্ষ মাইল চোখের নিমিষে অতিক্রম করবার শক্তি ধরে সে।

পুষ্প যে স্বর্গে পৌঁছুল, পৃথিবীর ভাষায় তার হয়তো বাইরের রূপের অনেকখানিই বর্ণনা

করা যায়, কেবল করা যায় না তার অন্তঃপ্রবিষ্ট সুগভীর শান্তি ও বহুগুণে বর্ধিত সুখদুঃখের অনুভূতির স্পন্দমান তীব্রতার। সে কি ভয়ানক জীবনছন্দ! সেখানকার মাটিতে পা দিলেই মনের সুখ, দুঃখ, শোক, স্নেহ, প্রেম কল্পনা সব শতগুণ বেড়ে যায়। অনুভূতির তীব্রতা যারা সহ্য না করতে পারে, তারা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে সেই মুহূর্তেই। বলহীন মন স্বর্গলাভ করতে পারে না।

পুষ্প শক্তিময়ী, পুষ্প চতুর্থ স্তরের উচ্চ থাকের আত্মা—তাকেও রীতিমত চেষ্টা করতে হোল প্রাণপণে, সংজ্ঞা বজায় রাখবার জন্যে।

চারিপাশের অদৃশ্য ইথারের তরঙ্গ যেন তার দেহের কোন্ অজানা ইন্দ্রিয়কে স্পর্শ করে তাকে সক্রিয় করে তুলেচে। সে অজ্ঞাত ইন্দ্রিয়ের কাজ যে অনুভূতিরাজিকে মনের মুকুরে প্রতিভাত করা—পৃথিবীতে, এমন কি নিম্নতর স্বর্গগুলিতেও, সে সব অনুভূতির সঙ্গে পরিচয় ঘটে না।

অথচ প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই তারা থাকতে পারে এবং আছেও, কেবল আস্বাদ করবার ইন্দ্রিয় ঘুমিয়ে আছে। উচ্চ জগতের তীব্রতর স্পন্দন-তরঙ্গ তাকে জাগিয়ে তুলতে পারে—কিন্তু যেমন গঙ্গা যখন মর্তে অবতরণ করেন, তখন কেউ তার তাল সামলাতে পারেনি, ঐরাবত পর্যন্ত ভেসে গিয়েছিল—উচ্চ স্বর্গের দেবতা মহাদেব নেমে এসে জটাজাল বিস্তার করে না দাঁড়ালে কারো সাধ্য ছিল না সে বেগবতী স্রোতোধারার মুখে দাঁড়ায়—ঐ সব অনুভূতির বেগ তেমনি সহ্য করতে পারে একমাত্র উচ্চস্তরের দেবতারাই। চারিদিকে ফুল ফুটে আছে, সে সব ফুলের রঙই বা কত রকম, কিন্তু আলোর মত কি একটা অজানা পদার্থে সে সব গাছ, সে সব ফুল তৈরী—একটা ছিঁড়ে নিলে তার জায়গায় তখনি আর একটা ঐরকম ফুল গজাবে। বড় বড় জলাশয় আছে, তার নীলাভ নিস্তরঙ্গ বক্ষের উপর দিয়ে লোকেরা হেঁটে যাতায়াত করচে, যেমন মাটির ওপর দিয়ে পৃথিবীর লোক যায়। অথচ সেখানে নৌকাও আছে যাদের ইচ্ছে, নৌকা করেও বেড়াতে পারে।

এক জায়গায় স্ফটিক প্রস্তরের মত স্বচ্ছ কোনো পদার্থে তৈরী একটা বাড়ীর সামনে গিয়ে ঐ রঙীন জ্যোতিরেখা বাড়ীর মধ্যে ঢুকে গিয়েচে। পুষ্প সেখানে ঢুকে দেখলে প্রণয়দেবী একটা বড় জানালার ধারে দাঁড়িয়ে কি যেন দেখচেন।

পুষ্প ঘরে ঢুকতেই ওর দিকে চেয়ে বল্লেন—তোমায় ডেকেচি বড় বিপদে পড়ে। আমায় একটু সাহায্য করো।

পুষ্প বল্লে—বলুন কি করতে হবে!

দেবী বল্লেন—বোসো। পৃথিবীতে গিয়ে কাজ করতে পারি, এমন লোকই চাইছিলাম। তুমি ভিন্ন আর কারো কথা মনে উঠলো না। যতীন কোথায়, তাকে আনলে না কেন?

পুষ্প সলজ্জস্বরে বল্লে—যতুদা এখানে আসতে পারবে না। আসতে চেয়েছিল, আমি আনিনি।

দেবী প্রসন্ন সহাস্য মুখে বল্লেন—আচ্ছা, এবার থেকে আমি তাকে নিয়ে আসবো।

—আপনি পারেন, আমার শক্তি কতটুকু, আমার কাজ নয়। একবার পঞ্চম স্বর্গে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলুম, চতুর্থস্তরেই অজ্ঞান হয়ে পড়লো। আর আমি চেষ্টা করিনি।

পুষ্প একটা জিনিস লক্ষ্য করলে।

প্রথমদিন সে প্রণয়দেবীকে যে মূর্তিতে দেখেছিল এ ঠিক সে মূর্তি নয়। প্রণয়দেবীকে আরও তরুণী দেখাচ্ছে, মুখশ্রী আরও সুন্দর। শরীর স্বচ্ছ, সুন্দর, নীলাভ শুভ্র।

দেবী বল্লেন—কি ভাবচ?

—আপনি জানেন কি ভাবচি।

—আমার চেহারা এখন যে রকম দেখচো, তখন অন্যরকম দেখেছিলে—তাই তো?

পুষ্প কথাটা জানতো। সে শুনেছিল বহু উচ্চ স্বর্গে অধিবাসীদের কোনো নির্দিষ্ট রূপ নেই। অধিকাংশ সময়েই তাঁরা একটা ডিম্বাকৃতি সোনালী আলোর মত - যখন কারো সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন হয় না বা মূর্তি গ্রহণ করবার বিশেষ কোনো আবশ্যক থাকে না—তখন তাঁরা শুধু একটা চৈতন্য-বিন্দুতে পর্যাবসিত হয়ে এই ডিম্বাকৃতি আলোর মূর্তিতে অবস্থান করেন। কিন্তু প্রয়োজন উপস্থিত হোলে তাঁরা যে কোন মূর্তি ইচ্ছামত ধারণ করতে পারেন—অতি সুন্দর তরুণের রূপ বা মহিমময় গম্ভীর বয়স্ক লোকের রূপ বা পৃথিবী-প্রচলিত নানা শাস্ত্র ও ধর্ম-গ্রন্থাদিতে বর্ণিত দেব, দেবী, দেবদূত প্রভৃতির রূপ—যাতে মানুষেরা স্বজাতীয় ও ও স্বদেশীয় ট্র্যাডিশন অনুযায়ী মূর্তিতে তাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারে, প্রাণে বল ও উৎসাহ পেতে পারে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

তবুও ভাল করে দেবীর মুখে শোনবার জন্যে তার কৌতূহল হোল। প্রণয়দেবী বল্লেন—দেখ, পৃথিবীতেও এই একই ব্যাপার হয়। আত্মার অবস্থার সঙ্গে বাইরের আকৃতি বদলায়। সাধুর একরকম চেহারা, নিম্নস্তরের লোকের আর একরকম। কিন্তু পৃথিবীর স্থূল পদার্থের ওপর আত্মার প্রভাব তত কার্যকর হয় না। এখানে তা নয়। এমন কি এবেলা ওবেলা রূপের পরিবর্তন হয় এখানে। খুব প্রেম বা সহানুভূতির সময় এখানে মুখশ্রী দেখতে দেখতে অপূর্ব সুন্দর হয়ে ওঠে, ঠিক পৃথিবীর খুব ভাবপ্রবণ, কল্পনাময়ী, অপরূপ রূপসী কিশোরীর মত। আবার অন্য অবস্থায় অন্য রূপ ফুটে ওঠে মুখে। ইচ্ছামত যেমন পৃথিবীতে পোশাক বদলায়, এখানে তেমনি মূর্তি বদলানো যায়—

পুষ্প সকৌতুকে ভাবলে—অর্থাৎ কিনা আটপৌরে গেরস্থালি মূর্তি, পোশাকী মূর্তি, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করার মূর্তি, প্রিয়ের সঙ্গে মিলনের মূর্তি, ভক্তের কাছে পূজো নেওয়ার মূর্তি—এরা আছে বেশ মজায়!

প্রণয়দেবী পৃথিবীর এই প্রগল্‌ভা বালিকার চিন্তা বুঝতে পেরে স্নেহের হাসি হাসলেন। বল্লেন—আমি পৃথিবীতে এখন যেতে পারচি নে। তুমি যাও, যতীনকে সঙ্গে নিয়ে যাও। এখানে সরে এসো, যে ব্যাপারের জন্যে পাঠাচ্ছি এখানে এসে দেখ দাঁড়িয়ে।

ওদিকের যে প্রকাণ্ড বড় ফরাসী বে-উইণ্ডোর মত জানালার ধারে তিনি পুষ্প আসবার আগে দাঁড়িয়ে কি দেখছিলেন, পুষ্প গিয়ে সেখানে দাঁড়ালো।

দাঁড়াবামাত্র তার দৃষ্টিশক্তি যেন সহস্রগুণে বেড়ে গেল। লক্ষ কোটি যোজন দূরবর্তী এক অতি ক্ষুদ্র গ্রহ—পৃথিবীর এক ক্ষুদ্র গ্রাম ওর নয়নপথে পতিত হোল। দেখেই বুঝলে, বাংলা দেশ। সন্ধ্যা নেমে আসচে।

নারিকেল সুপারি গাছে ঘেরা ছোট্ট একটা একতলা কোঠাবাড়ী। বাড়ীতে বিবাহ হচ্চে। উঠোনে ক্ষুদ্র শামিয়ানা টাঙানো, বাইরের বৈঠকখানায় ফরাস বিছানো, বরযাত্রীরা এখনও আসে নি, কন্যাপক্ষ ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করচে। সকলের একটা ব্যস্ততা ও উৎসাহের ভাব। কিন্তু সরুপাড় ধুতি পরনে একটি সতেরো আঠারো বছরের কিশোরী নিরানন্দ মুখে ঘরের এক কোণে চুপ করে বসে আছে। যেন আজকের উৎসবের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই—মাঝে মাঝে চোখের উদ্‌গত অশ্রু আঁচল দিয়ে মুছে ফেলে ভয়ে ভয়ে চকিত-দৃষ্টিতে চারিদিকে চাইচে, কেউ দেখতে না পায়।

দেবী বল্লেন—ওই যে মেয়েটা দেখচো, ওর নাম সুধা, বিয়ে ওর ছোট বোনের। ওই মেয়েটার দুঃখে আমি এত কষ্ট পাচ্ছি যে স্বর্গে থাকা আমার দায় হয়ে উঠেচে। ও অত্যন্ত প্রেমিকা মেয়ে—অত অল্প বয়সে অত ভাবপ্রবণ প্রেম-পাগলিনী মেয়ে বড় একটা দেখা যায় না। ও আজ বছর-দুই বিধবা হয়েচে—তেরো বছরে বিবাহ হয়েছিল। স্বামী বেঁচে ছিল বছর-দুই। এই দু-বছরে স্বামীকে ও প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল। রোজ রোজ লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে। আজ ওর ছোট বোনের বিয়ে। ওর কেবলই মনে হচ্চে ওর বিয়ের দিনটির কথা। আজ সারাদিন লুকিয়ে কাঁদচে পাছে মা বাবা মনে কষ্ট পায়। আমার আর সহ্য হয় না ওর দুঃখ—কি যে করি! তার চেয়েও করুণ ব্যাপার হচ্চে এই যে, মেয়েটিকে আমি তিনজন্ম ধরে লক্ষ্য করচি, তিন জন্মই ওর এই অবস্থা, বিয়ের অল্পদিন পরেই বিধবা হচ্চে। অথচ কি ভালবাসার পিপাসা ওর! কি প্রেমপ্রবণ হৃদয়!···আর দেখচো তো, গরীব ঘরের মেয়ে!

পুষ্পের হৃদয় গলে গেল অভাগী বালিকার জীবনের ইতিহাস শুনে। চোখে জল এল। সে বল্লে—কিন্তু আপনার তো অসীম শক্তি, আপনি তো ইচ্ছে করলেই ওর উপায় হয়।

দেবী বিষণ্ন মুখে বল্লেন—তা হয় না, পুষ্প। কেন হয় না, চল তোমায় দেখাবো। তুমি আগে যাও—আমি কিছু পরেই যাবো। যতীনকে নিয়ে তুমি চলে যাও।

লক্ষ লক্ষ মাইল চোখের পলকে অতিক্রম করে পুষ্প এল ওদের বুড়োশিবতলার বাড়ীতে। যতীনকে সঙ্গে নিয়ে তারপর সে চলে এল সুধাদের বাড়ী। সুধাদের বাড়ী তখন বর এসেচে। মেয়েরা হুলু দিয়ে শাঁক বাজিয়ে বরকে এগিয়ে নিয়ে এল। সুধার সেখানে যাবার উপায় নেই। বাড়ীর বিধবা মেয়ে, মাঙ্গলিক কোনো অনুষ্ঠানে আজ তার সামনে থাকবার জো নেই। তবুও সে কৌতূহলদৃষ্টিতে ঘরের জানালার গরাদে ধরে উঠোনের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে বর দেখচে। কৌতূহল অল্পদিনের জন্য তার শোককে জয় করেচে।

পুষ্প এসে সুধার পাশে দাঁড়ালো। সুধা যে আত্মা হিসেবে উচ্চশ্রেণীর তা তখনি বুঝলে পুষ্প, কারণ পুষ্পের প্রভাব সে তখনি নিজের মনের মধ্যে অনুভব করলে। তার ভারী মনটা তখনি হালকা হয়ে গেল। জীবনে সব যেন শেষ হয়ে যায় নি, আরও অনেক কিছু আছে,

জীবনের তো সবে শুরু, বহুদূরের পথে কোথায় কোন্ বাঁকে নক্ষত্রের মত সারারাত জেগে আছে বনফুলের দল, চাঁদের আলোয় জ্যোৎস্নাময় হয়ে আছে সে জায়গা—আবার আশা ফুটে ওঠে মনে—অতীত বাসররাত্রির স্মৃতির আনন্দের মত পবিত্র অনুভূতিতে মন ভরে ওঠে।

যতীন দেখলে একটি আত্মা অনেকক্ষণ থেকে বিবাহসভার এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করচে। যতীনকে দেখে সে কাছে এল। বল্লে—আপনি কে? আপনি এখানে কেন?

যতীন বল্লে—আপনি কে?

—আমি এই বিধবা মেয়েটির স্বামী।

—ওকে একটু সান্ত্বনা দিন আজ।

—আমি চেষ্টা করচি কিন্তু পারচি নে। আপনাকে দেখে বুঝেচি আপনি উচ্চ স্বর্গের মানুষ, আপনি যা পারবেন, তা আমি পারবো না। তাই আপনাকে জিজ্ঞেস করছিলাম আপনি এখানে কেন।

—এই মেয়েটির দুঃখে একটি দেবীর মন গলে গিয়েছে। তিনি পাঠিয়েচেন এখানে আমাদের।

—কই, আর কেউ তো নেই এখানে? আপনি তো একা—

যতীন পুষ্পের পাশেই ছিল, সুধার স্বামী খুব উঁচুদরের আত্মা নয়, ওরা দেখেই বুঝেছিল, সে দেখতে পেলে না পুষ্পকে।

যতীন বল্লে কথাটা। সুধার স্বামী বিনীতভাবে তাকে এবং উদ্দেশে পুষ্পকে প্রণাম করলে। বল্লে—আমি বড় কষ্ট পাচ্চি ওর জন্যে। কিন্তু কিছু করবার নেই, ও যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন ওকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করি—কিন্তু আমার চেয়ে ওর অবস্থা উন্নত, আমার ক্ষমতা নেই কিছু করবার—

যতীন বল্লে—উচ্চস্বর্গের একজন দেবী আপনার স্ত্রীর ওপর কৃপাদৃষ্টি রেখেচেন—তিনি আমাদের এখানে পাঠিয়েচেন। তিনি নিজে এখুনি আসবেন—

পুষ্প বল্লে—তিনি এসেচেন, এই তো এলেন—

সুধার স্বামী পুষ্পের কথা শুনতে পেলে না, যতীন প্রণয়দেবীকে দেখতে পেলে না। কিন্তু প্রণয়দেবীর শান্ত কোমল প্রভাব সে মনের মধ্যে অনুভব করতে পারলে। প্রণয়দেবী নিজে সব সময় সুধার পাশে এসে দাঁড়িয়ে রইলেন, বল্লেন—এদের ফেলে আমার কোথাও থেকে সুখ নেই। এবারও এদের ওই রকম ভুগতে হবে, সুধার স্বামী তত উচ্চ অবস্থার নয়—তা ছাড়া কেন এরা এ রকম ভুগচে তা আমি ঠিক জানি না। জগতে এইসব ঘটে যে অদৃশ্য বিরাট শক্তির নির্দেশ অনুসারে, সে শক্তি বড় রহস্যময়। তার কর্মপ্রণালী বা প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছুই বুঝি না, জানি-ও না।

পুষ্প বল্লে—তিনিই তো ভগবান?

প্রণয়দেবী চমকে উঠে বল্লেন—ও নাম কানে গেলে মন অন্যরকম হয়ে যায়। যখন তখন ও নাম নিও না। ভগবান যে কি, তা আমরা জানিনি এখনও। যে শক্তির কথা বলচি,

হয়তো তাকেই তোমরা ওই নামে ডাকো।

সুধার বোনের বিয়ে হয়ে গেল, বরকনে বাসরঘরে চলে গিয়েচে এই মাত্র। গরীবের ঘরের বিয়ে, তবুও উঠানে ছোট্ট শামিয়ানা টাঙানো হয়েচে প্রতিবেশীর বাড়ী থেকে চেয়ে এনে, আধমণটাক ময়দার লুচি ভাজা হয়েচে বরযাত্রী ও প্রতিবেশীদের খাওয়ানোর জন্যে, তারা খেতেও বসেচে। গ্রামের বৌ-ঝির দল সেজেগুজে বাসরঘরে ঢুকে বরের চারিপাশে ভিড় জমিয়ে তুলচে। প্রণয়দেবী ঘরে ঢুকে এক কোণে দাঁড়িয়ে প্রসন্নদৃষ্টিতে চারিদিকে চাইলেন, যেন মনে মনে সকলকে আশীর্বাদ করলেন। আজকার দিন এবং সময় তাঁর চরণপাতের শুভ সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়ে গেল।

কিন্তু যতীন বিষণ্ণ মনে এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিল—আজকার বিবাহ-উৎসবের দৃশ্যে তার মনে হচ্ছিল, আশার সঙ্গে এমনি এক উৎসবের মধ্যে তার বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু আজ কোথায় সে আর কোথায় আশা! সুধার মত আজ সে বিধবা, জীবনের সব সাধ তারও আজ ফুরিয়ে গিয়েচে পরের সংসারে পরের হাততোলা খেয়ে—

পুষ্প ধমক দিয়ে বল্লে- যতীন-দা!

এই সময় প্রণয়দেবী বল্লেন—সুধা রান্নাঘরের কোণে বসে কাঁদচে, একটু ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াও পুষ্প।

পুষ্প এসে দেখলে সুধার স্বামীও সেখানে উপস্থিত। তারও চোখে জল। মরণের যবনিকার আড়ালে প্রেমের এই লীলা পুষ্পকে মুগ্ধ করলে। প্রেম মরণজয়ী, এই সত্যটা এই দৃশ্যে যেন পুষ্পের মনে ভাল করে অঙ্কিত হয়ে গেল।

একটু পরে প্রণয়দেবী নিজে সেখানে এসে দাঁড়ালেন। সুধার মাথায় তাঁর হাত রেখে বল্লেন—কোনো দুঃখ কোরো না। আমি মিলন করিয়ে দেবো। তোর মত মেয়ে লক্ষ লক্ষ রয়েচে আমার পৃথিবীতে—তাদের ছেড়ে স্বর্গেও যেতে পারি নে।

পুষ্প বল্লে—আপনার মত দেবী ইচ্ছে করলে সুধার কোনো উপকার হয় না?

—আমি সেবা করতে পারি, বিশ্বের শক্তি নিয়ন্ত্রণ করবার আমি কে? আমার মত হাজার হাজার আছেন দেবদেবী। তা ছাড়া পৃথিবীর মানুষদের নিয়ে আমার কারবার। অগণ্য জীবলোক রয়েচে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে—তাদের জন্যে অন্য সব দেবদেবী আছেন।

—তাঁদের আপনি জানেন?

—জানি তারা আছেন—পরিচয় সকলের সঙ্গে নেই। আমাদের শক্তি মানুষের চেয়ে হয়তো বেশী, তবুও সীমাবদ্ধ। চলো আমরা এখান থেকে চলে যাই।

সেদিন যতীন বুড়োশিবতলার ঘাটে একা বসে অন্যমনস্কভাবে আশালতার কথা ভাবলে অনেকক্ষণ। পুষ্প ওকে সব কথা বলেচে, প্রণয়দেবীর মুখে যা কিছু শুনেছিল। তিনিই যখন অদৃষ্টকে উল্টে দিতে পারেন না, সে তো অতি তুচ্ছ ওঁর কাছে—কি করতে পারে সে? আশাকে তার নিজের ভাগ্যের পথে চলতে হবে।

পশ্চিমাকাশে অস্তসূর্যের রাঙা আভা। গঙ্গার বুকে পাল তুলে ছোট বড় নৌকার দল চলেচে। দু-একটা মাছরাঙা পাখী ছোঁ মেরে মাছ ধরচে ডাঙা থেকে অনতিদূরে। নৈহাটির গঙ্গা, কেওটা-সাগঞ্জের গঙ্গা।

কতক্ষণ সে এরকম বসে ছিল জানে না, হঠাৎ সে চমকে উঠে দেখলে একজন জ্যোতির্ময় পুরুষ তার সামনে দাঁড়িয়ে। যতীন শশব্যস্তে উঠে তাঁকে প্রণাম করলে।

আগন্তুক বল্লেন—বেশ করে রেখেচ হে তুমি! পৃথিবী থেকে অল্পদিন এসেচ?

—আজ্ঞে হাঁ।

—তাই দেখচি। হুগলী জেলায় বাড়ী ছিল? তাই গঙ্গার ধার-টার ঠিক এই রকম করেচ। এ সব মায়া। জগৎ বা বিশ্বটাও তেমনি মায়া—সেই এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ছাড়া সব মায়া। কোনো কিছুর মধ্যে বাস্তবতা নেই।

যতীন মনের মধ্যে হাৎড়াতে লাগলো। এ ধরণের একটা মতের কথা সে শুনেছিল, একবার একটা বইএও পড়েছিল যেন। মনে এনে বল্লে—অদ্বৈতমত বলচেন?

মহাপুরুষ যেন একটু বিস্ময়ের ভাবে বল্লেন—অদ্বৈত বেদান্ত সম্বন্ধে তুমি জানো? তবে বই পড়লে কি হয়? প্রত্যক্ষ অনুভূতি চাই। অখণ্ড সচ্চিদানন্দের অনুভূতি চাই। তুমি মরে এখানে এসেচ, কিন্তু জ্ঞান জন্মায়নি ভেতরে। এখানে হুগলী জেলার গঙ্গার ঘাট তৈরী করে রেখেচ। এমনি করেচে অনেকেই এখানে। সব মায়া। আবার পৃথিবীতে জন্ম নিতে হবে গিয়ে—অন্তবান্দশতাত্তেবা আজই হোক, দুশো বছর কি হাজার বছর পরেই হোক। অখণ্ড সচ্চিদানন্দের অনুভূতি ভিন্ন মুক্তি নেই।

যতীন ভয়ে ভয়ে বল্লে—আজ্ঞে, মুক্তি মানে কি?

—ভগবানের সঙ্গে একাত্মবোধ। যোগসাধনা ভিন্ন তা সম্ভব নয়। উপনিষদে দুটি পাখীর রূপক বর্ণনা আছে। একটি গাছের দুটি ডালে ওপরে নীচে দুটি পাখী বসে রয়েচে। নীচের পাখীটা মিষ্ট ফল খাচ্চে, কটু ফল খাচ্চে, ওপরের পাখী নির্বিকার অবস্থায় বসে আছে, সুখ-দুঃখে উদাসীন, নিজ মহিমায় মগ্ন। একটি পরমাত্মা, অপর পাখীটি ইন্দ্রিয়সুখমগ্ন জীবাত্মা। নীচের পাখীটি যখন ওপরে উঠে ওপরের পাখীটির সঙ্গে মিশে এক হয়ে যাবে—তখনই তার মুক্তি।

তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি—

যতীন এমন কথা কখনো শোনেনি। বিস্ময়মুগ্ধের মত চেয়ে রইল সন্ন্যাসীর দিকে। সে ভেবেছিল মরণের পর যখন বেঁচে আছে, তখন তার আর ভাবনা কি? কিন্তু এখন ওর মনে হোল কোথায় যেন কি গলদ রয়ে গিয়েচে। সে বিনীতভাবে বল্লে—আজ্ঞে তবে আমাদের উপায়? আমাদের কে যোগ-শিক্ষা দেবে, কি হবে—শুনেচি সে বড় খটমট ব্যাপার—ওসব কি আমাদের জন্যে?

সন্ন্যাসী হেসে বল্লেন—খুব সোজা নয়, শক্তও নয়। আমি পৃথিবীতে তোমারই মত মানুষ ছিলাম। যৌবনে স্ত্রী-বিয়োগ হোল, সংসার মিথ্যা মনে হোল। তবুও পাঁচ বছর সংসারেই

রয়ে গেলাম। তারপর সন্ন্যাস গ্রহণ করলাম। সদ্‌গুরুর সন্ধান পেলাম। আসামের এক জঙ্গলে পনের বছর যোগ অভ্যাস করবার পর একদিন গুরুর কৃপায় নির্বিকল্প সমাধি হোল।

যতীন রুদ্ধনিঃশ্বাসে বল্লে—তারপর?

সন্ন্যাসী হেসে বল্লেন—তারপর? তারপর আর কিছুই না। মুখে সে অবস্থার কথা বলা যায় কি? সে তুমি কি বুঝবে? এখনও তুমি ছেলেমানুষ মাত্র। বড় উচ্চ অবস্থার কথা সে সব। তুমি আর নির্গুণ ব্রহ্ম এক। মায়া তোমার স্বরূপ আবরণ করে বসেচে। তুমি কেন, পৃথিবীর সব কিছু। ছোট কেউ নও। তোমরা সবাই অজর অমর, শাশ্বত আত্মা—তুমিই এ জগতের কর্তা, এ জগৎকে সৃষ্টি করেচ—তবে ছোট হয়ে আছ কেন? এই লোকে এসেচ—এও উপাধির লোক। এর আরও ওপরে উচ্চতর লোক আছে—মহা জ্যোতির্ময় লোক, দেব-দেবীরা সেখানে বাস করেন। তোমার মত লোক তার ধারণা করতে পারবে না। জগৎকে সৃষ্টি ও লয় করতে তাঁরা সমর্থ। কিন্তু সেও অনিত্য। সেও উপাধি ও স্বগুণস্তরের জগৎ। তারও ওপরে নিরুপাধি নির্গুণ ব্রহ্ম বিরাজ করেন। সেখানে পৌঁছুনো মানুষের আগ্রহ থাকলেই হয়। আসলে তোমার সঙ্গে তার অভিন্নতা কোথায়? এ জগতে দুঃখ নেই, পাপ নেই, শোক নেই, ভয় নেই, মৃত্যু নেই সে তো দেখেই নিলে, ক্ষুদ্রত্ব নেই, এসব কিছু নেই—আছে শুধু আনন্দ, অমরত্ব, বিরাটত্ব। আর তুমিই তার অধিকারী। অতএব ওঠো, জাগো—তৎ ত্বমসি—তুমিই সেই।

সন্ন্যাসীর সর্বদেহ দিয়ে একপ্রকার নীল বিদ্যুতের মত জ্যোতি যেন ঠিকরে বেরুচ্চে—তাঁর দিকে চাওয়া যায় না। যতীন তাঁর পদস্পর্শ করবার জন্যে মাথা নীচু করতেই তিনি বল্লেন—উঁহু—ছোট ভেবে আমার পা ছুঁয়ে তোমার কি হবে? ছোট তুমি নও। তুমিই দেব, তুমিই দেবী, তুমিই সগুণ ঈশ্বর—তুমিই জগৎকারণ নিরুপাধি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ—একই আছে, আর কিছু নেই জগতে—একম্ এব, অদ্বিতীয়—পৃথিবী বা পরলোক সব দুদিনের খেলা, আবার জন্ম, আবার মৃত্যু—বার বার আসা-যাওয়া—সব অনিত্য—জেগে ওঠো—ঘুম ভেঙে জেগে ওঠো।

সন্ন্যাসী এত জোরে জোরে কথাগুলো বল্লেন—যতীনের মনে হোল তার সমস্ত শরীরে হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ খেলে গেল—সন্ন্যাসীর দেহ থেকেই যেন সে বিদ্যুৎতরঙ্গ ছুটে এল তার দেহে। সে চোখের সামনে কতকগুলো গোল গোল জড়ানো জড়ানো গোলকধাঁধাঁ খেলার মত কি দেখলে—তারপর আর তার জ্ঞান রইল না। যেন হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুমের মধ্যে সে যেন কোথায় চলেচে।

নীল আকাশ, সোম-সূর্য-তারকাচিহ্নিত—তার আশেপাশে ঊর্ধ্বে, নামোতে। বহু দূরে নীল সমুদ্রে ডুবে একটা কুণ্ডলীকৃত নীহারিকা পাক খাচ্চে—লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি নক্ষত্র, সূর্য,—কুয়াসার ঢেউ-এর মত উল্কাপিণ্ডদল বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের বহির্দেশে ভ্রাম্যমাণ—লক্ষ লক্ষ জীবজগৎ, কোটি কোটি জীবজগৎ, লক্ষ কোটি লক্ষ কোটি আত্মিক লোক—কত লীলা, কত খেলা, কত সুখদুঃখের অনন্ত প্রবাহ—অনন্ত জীবজগৎ……

এ সবও ছাড়িয়ে এক জ্যোতির্ময় রাজ্যের প্রান্তে গিয়ে একটি অপূর্ব শান্তির অনুভূতি সে অনুভব করলে…সুগভীর আনন্দ ও শান্তি, আর যেন মনে কোনো আশা নেই, কোনো তৃষ্ণা নেই, সুখ নেই, দুঃখ নেই, পাপের ভয় নেই, পুণ্যের স্পৃহা নেই, স্বর্গভোগের আকাঙ্ক্ষা নেই, পুষ্পের প্রতি প্রেম নেই, আশালতার প্রতি অনুকম্পা নেই—মনই নেই—যেন শুধু আছে 'আমি আছি' এই অনুভূতি, আর আছে তার সঙ্গে মিশে এক অতি উচ্চস্তরের আনন্দ, শান্তি মহা উচ্চ জ্ঞান ও স্বয়ম্ভু স্বপ্রতিষ্ঠ অস্তিত্বের গভীর অনির্বচনীয় আনন্দ।

যতীনের মনে হোল সেই সন্ন্যাসী যেন কোথায় তার আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন…কখনও তাঁর জ্যোতির্ময় দেহ দেখা যায়, কখনও যায় না।

তারপর সেই জ্যোতির্ময় দেশের অপূর্ব শান্তি ও আনন্দময় আবেষ্টনীর মধ্যে সে প্রবেশ করলে…সঙ্গে সঙ্গে সেই সুগভীর পুলকে তার মন আবার ভরে উঠলো—উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় দেহধারী দেবদেবীরা সে রাজ্যের মণ্ডলে বিচরণ করচেন, তাঁরা যে আসনপীঠে ঠাকুর সেজে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছেন তা নয়, তাঁরা যেন সে জগতের সাধারণ অধিবাসী, নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত আছেন, তাই কেউ আকাশপথে বায়ুভরে চলেচেন, সমতল ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল পৃথিবীর মানুষের মত নন তাঁরা—ঊর্ধ্বে, নিম্নে—সবদিকে সমান গতি তাঁদের…দু'একজনকে কাছে থেকে দেখবারও অবসর সে পেলে…পৃথিবীর মানুষের মত দেহ বটে, কিন্তু যেন বিদ্যুৎ দিয়ে গড়া, দেবীদের মুখের সৌন্দর্য অতুলনীয়, তাদের পৃথিবীর বাড়ীতে ছেলেবেলায় একটি প্রাচীন পটুয়ার আঁকা রাজরাজেশ্বরী মূর্তি ছিল দেওয়ালে টাঙানো, তার বৃদ্ধা ঠাকুরমা রোজ স্নান সেরে সেই পটের পুজো করতেন, খানিকক্ষণের জন্যে যেন পটের মুখ হাসতো—এতদিনের মধ্যে জীবনে সে সেই পটে আঁকা রাজরাজেশ্বরীর মুখশ্রীর মত সুন্দর ও কমনীয় মুখশ্রী আর দেখেনি…এখানে সে দু-একটি দেবীর মুখ যা দেখবার সুযোগ পেলে, পটের সে ছবির মুখের চেয়ে অনেক, অনেকগুণে সুশ্রী, আরও মহিমময়ী, বক্র চাহনির মধ্যে ত্রিভুবন-বিজয়ী শক্তি… অথচ মুখে অনন্ত করুণার বাণীমূর্তি

কোথায় যেন রাশি রাশি বনপুষ্প ফুটেচে, নির্বাত ব্যোম তাদের সম্মিলিত সুবাসে ভরপুর…

এসবও ছাড়িয়ে চললো সে…মহাবিদ্যুতের মত তার গতি, কোথাও অনন্ত ব্যোমে, মহাশূন্যের সুদূরতম প্রান্তে, অনন্তের জ্যোতি-বাতায়ন যেখানে চারিদিকে উন্মুক্ত…দেবদেবীর বাসস্থান এ সব মহাদেশও যেন আপেক্ষিক চৈতন্যের রাজ্য ; বাসনার রাজ্য…এদেরও দূর, বহুদূর পারে, সব আকাশ ও সময়ের পারে, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যেখানে এক হয়ে মিলিয়ে গিয়েচে—সোম সূর্য নেই, তারকা নেই, অন্ধকার নেই, আলোও নেই—সেই এক বহুদূর দেশে সে গিয়ে পৌঁছেচে…এদেশ আকারধারী জীব বা দেবযানীর রাজ্য নয়, সর্ববিধ আকার এখানে জ্যোতিতে লোপ পেয়েচে, অথচ এ জ্যোতিও দৃশ্যমান আলোকের জ্যোতি নয়, আগুন নয়, বিদ্যুৎ নয়—কি তা সে জানে না…তার সর্বদিকে, তাকে চারিধার থেকে ঘিরে এই জ্যোতি…আর কি একটা বিচিত্র, অনির্বচনীয় অনুভূতি…ওর মন লোপ পেয়েচে অনেকক্ষণ, চৈতন্যও যেন লোপ পেতে বসেচে…অথচ যতীনের মনে হোল এই তার আপন স্থান, এতদিনে আপন স্থানে সে ফিরে

এসেচে···এই তার বহুপরিচিত স্বদেশ— যুগ-যুগান্ত, কত মহাযুগ ধরে সে এখানে আবার ফেরবার অপেক্ষায় ছিল। মহাব্যোমে আর কেউ নেই, আশালতা না, পুষ্প না, তার যতীনও না, সন্ন্যাসী না, তাদের এ লোকে বাঁধা কত সাধের ঘর বা বুড়োশিবতলার ঘাট না, দেব না, দেবী না পরলোক না, এমন কি ঈশ্বরও না···

মহাব্যোমের মহাশূন্যে অনাদি, অনন্ত, স্বয়ম্ভু, স্বপ্রকাশ, নির্বিকার, নির্বিকল্প সে শুধু আছে—পাপহীন, পুণ্যহীন, মঙ্গলহীন, অমঙ্গলহীন, সুখহীন, দুঃখহীন সর্বপ্রকার উপাধিহীন···

সে-ই আছে মাত্র একা।

নিঃসঙ্গ মহাব্যোমে আর কোথাও কিছু নেই, কেউ নেই!

সে-ই সব।

এমন কি, এ মহাব্যোমও তার সৃষ্টি··সৃষ্টি নয়--সে নিজেই।

যতীন আর কিছু জানে না।

যখন ওর চৈতন্য হোল তখন সে দেখলে সেই মহাসন্ন্যাসী পাশেই বুড়োশিবতলার ঘাটের রাণাতে বসে আছেন---সে তাঁর এপাশে বসে। যেন সে ঘুম ভেঙে উঠেচে এইমাত্র।

সন্ন্যাসী হেসে বল্লেন—কি হোল? দেখলে?

যতীন মূঢ় ও অভিভূতের মত তার মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—কি দেখলাম বলুন দিকি?

—আমি চললাম। যা দেখলে, দেখলে। মুখে কি বোঝাবো? মন নিম্নস্তরের ইন্দ্রিয় মাত্র, ওর চেয়ে বড় অনুভূতির দরজা যেদিন খুলবে, সেদিন আমায় বোঝাতে হবে না, নিজেই বুঝবে। তোমার সে অবস্থার এখনও বহু বিলম্ব। দু-চার জন্মে হবে না। অনেকবার এখনও পৃথিবীতে যাতায়াত করতে হবে।

তিনি যাবার উদ্যোগ করচেন দেখে যতীন ব্যাকুলভাবে বল্লে—প্রভু, যাবেন না, যাবেন না। পুষ্প বলে একটি মেয়ে আছে, তাকে একবার দেখা দিয়ে যাবেন দয়া করে?

সন্ন্যাসী হেসে বল্লেন—সময় হোলে দুজনেই দেখা পাবে আবার। তবে স্ত্রীলোকের পথ ভক্তির, জ্ঞানের নয়। আমি তোমাদের দুজনকেই জানি, গত তিন জন্ম তোমরা আমার দেখা পেয়েচ, তোমাদের ভালবাসি। কিন্তু তাতে কি হবে? সময় হয়নি। চক্রপথে ঘুরতে হবে অনেকদিন। আমি আছি তোমাদের পেছনে। নতুবা আমার দেখা পেতে না।

সন্ন্যাসী অন্তর্হিত হোলেন।

একটু পরে পুষ্প এল। বল্লে—কি করছিলে ?

যতীন তার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লে—পুষ্প, তুমি মায়া ? মিথ্যে ?

—সে কি যতীন-দা ? ব্যাপার কি ?

—এ সব ভেল্কি ? তুমি ভুল বুঝিয়েচ পরলোক-টরলোক। আমরা মরে ভূত হয়ে আছি। চক্রপথে এখনো আমাদের অনেক ঘুরতে হবে।

পুষ্প খিল খিল করে হেসে বল্লে—এ তত্ত্ব তুমি জানলে কোথায় ? নতুন কথা তোমার মুখে !

—হাসি নয়। আমার মনে শান্তি নেই। এক মহাপুরুষ এসে অদ্ভুত দর্শন করিয়ে গেলেন আমার গা ছুঁয়ে। এখন বুঝেচি সব মিথ্যে।

—কিছুই বোঝোনি। বুঝতে অনেক দেরি ! ভগবানের দয়া যেদিন হবে সেদিন বুঝবে। এ আমি অনেকদিন জানি। কিন্তু তাতে কি ? এতেই আনন্দ। যুগে যুগে আসবো যাবো, এর শোক-দুঃখেও আনন্দ খুঁজে নেবো। লীলাসঙ্গী হয়ে থাকবো তাঁর। তিনিই খেলা করচেন, খেলুড়ে না পেলে খেলা করবেন কাকে নিয়ে ? সবাই ব্রহ্ম হয়ে বসে থাকলে সব শূন্য, নিরাকার। তুমি নেই, আমি নেই, জগৎ নেই—ইহলোক নেই, পরলোক নেই। সত্যি কথা। কিছুই নেই—আবার সবই আছে। খেলা করো না দুদিন, যতদিন তিনি খেলাবেন।

—তারপর ?

—তারপর সকলের যা গতি, তোমারও তাই। তাঁতে ভক্তি রাখো, সব হবে। তুমি তো তুমি, আমি তো আমি—লক্ষ লক্ষ বছর ধরে অতি উচ্চ স্তরের আত্মা, যাঁরা দেব-দেবী হয়ে গেছেন—তাঁরাও তাই।…সব অনিত্য।

—তুমি এসব কি করে জানলে ?

—করুণাদেবী সেদিন বলেচেন। ও নিয়ে মন খারাপ কোরো না। ও শেষ অবস্থার কথা। যখন সে অবস্থা আসবে, তখন আর বসে ভাবতে হবে না। তিনিই পথ দেখিয়ে দেবেন। এখন চলো, আশাবৌদির বড় বিপদ, কিছু করতে পারি কিনা দেখা যাক্—

যতীন ব্যস্ত হয়ে বল্লে—কি-কি-কি বিপদ ? আশার ? কি হয়েচে ?

পুষ্প কৌতুকের হাসিতে ভেঙে পড়লো যেন। বল্লে—ঐ ! এত বাসনা এত মায়া যার মধ্যে এখনও, তিনি জগৎকে উড়িয়ে দিয়ে ভগবানে মিশে যেতে চান ! সন্ন্যাসি ভেল্কি দেখালে কি হবে, ও অবস্থা তোমার-আমার জন্যে নয়। পৃথিবী ছেড়ে এসে এখনও তার বাঁধন কাটাতে পারেন না, উনি বড় বড় বুলি ঝাড়েন !

—সন্ন্যাসী তাই বলছিলেন, সময় হয় নি।

—সময় শুধু হয়নি যে তা নয়—হোতে ঢের দেরি। ও নিয়ে মাথা ঘামাবে না বলে দিচ্চি।

তাঁর লীলাসঙ্গী হয়ে থাকো, মনে মনে সর্বদা তাঁকে ভক্তি করে ডাকো। তিনিই আলো জ্বালবার কর্তা। করুণাদেবী কি কম উঁচু স্তরের জীব? কিন্তু উনি বলেন, আমি মনে-প্রাণে মেয়েমানুষ—সুখদুঃখ স্নেহভালবাসা নিয়ে থাকতে ভালবাসি। তাঁর সঙ্গে মিশে যেতে চাই নে, লীলাসহচরী হয়ে থাকি তাঁর সৃষ্টিতে। তাকে ভালবাসি মনেপ্রাণে, তাঁর জীবদের সেবা করি যুগে যুগে। এই আমার তপস্যা। মুক্তি চাইনে।

—সত্যি, এমন না হলে আর দেবী! দেবী কি—সাক্ষাৎ মা! জগতের করুণাময়ী মা। আমাকে একবার দেখা দিতে বোলো, পায়ের ধুলো নেবো—না ভুল হোলো, ধুলো আর এখানে কোথায়? তা ছাড়া ওঁদের পায়ে কি ধুলো লাগে। এত উচ্চ জ্ঞান তাঁর এ আমি জানতাম না।

—আচ্ছা আর অত বিচার করতে হবে না তোমায়। আমি বলবো তোমায় দেখা দিতে। ওঁরাই তো দেবী। পৃথিবীতে ওঁদেরই তো মন্দির প্রতিষ্ঠা করে পূজো করা হয়। ওঁরাই দুর্গা, ওঁরাই কালী, ওঁরাই সরস্বতী। নামে কি আসে যায়? অন্য দেশে হয়তো অন্য নামে পূজো করে।

—এখন কিছু কিছু বুঝচি। আগে এ সব কথাই শুনিনি কখনো পুষ্প—সত্যি বলচি।

—সময় না হোলে শুনতেও পায় না কেউ। অবধূত তোমায় কি দেখালেন বলো না?

যতীন বর্ণনা করলে। বর্ণনা করবার সময় তার সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠলো। সেই অপূর্ব অনুভূতি ও পুলকের স্মৃতি এখনও ওর মনে খুব জাগ্রত—তাই বর্ণনা করতে গিয়ে এখনও তার কিছুটা যেন আবার সজাগ হয়ে উঠলো মনে।

আবার সেই অতীন্দ্রিয় জগৎ, যেখানে সংকল্পও নেই, বিকল্পও নেই, মনের পারের সেই অনির্দেশ্য রাজ্য, ক্ষণকালের জন্যও যার মধ্যে প্রবেশের অধিকার সে পেয়েছিল মহাপুরুষ অবধূতের কৃপায়--সে জগতের বর্ণনা মুখে সে কি ক'রে দেবে? কথা তার জড়িয়ে যেতে লাগলো, ঘন ঘন রোমাঞ্চ হতে লাগলো সে অবস্থার স্মরণে। পুষ্প সব শুনে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

পরে হাত জোড় করে উদ্দেশে প্রণাম করে বল্লে—তাঁর চরণে প্রণাম করো যতীন-দা। বড় ভাগ্যে তাঁর সাক্ষাৎ পেয়েচ। সাক্ষাৎ ঈশ্বরের সমান ওঁরা। কি পুণ্য না জানি ছিল তোমার।

দুজনে পৃথিবীতে নেমে এসেচে।

সন্ধ্যার কিছু পরে। যতীন কবি নয়, কিন্তু পৃথিবীর এ সন্ধ্যা, কি যে ভাল লাগলো ওর। পৃথিবীতে বৈশাখ মাসের প্রথম, আম্রনিকুঞ্জের নিভৃত অন্তরালে কোকিলের ডাক, সন্ধ্যা হওয়ায় প্রস্ফুটিত বিল্বপুষ্পের ঘন সুবাস, একটি জামগাছে কচি সবুজ থোলো থোলো জাম ধরেচে, রাঘবপুরের হাট সেরে হাটুরে গোরুর গাড়ীর সারি চুয়াডাঙার কাঁচা সড়ক ধরে চলচে আম-কাঁঠাল বাগানের তলায় তলায়, মাঠে মাঠে আউশ ধানের ক্ষেতে সবুজ ধানের জাওলা।

আশাদের পুকুরের ধারের তেঁতুল গাছের তলায় ওরা বসলো। যতীনের মনে হোল, কি সুন্দর পৃথিবীর বসন্ত! সেই বহুপরিচিত প্রিয় পৃথিবী, কত দুঃখ-সুখ, আশা-আনন্দের স্মৃতিতে ভরা। সে পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়ে ভাল আছে কি মন্দ আছে জানে না, কিন্তু পৃথিবীতে এলেই মন সরে না এখান থেকে যেতে। এই বৈশাখে কচি আমের ঝোল, বেলের পানা, ঐ

অদূরবর্তী চূর্ণী নদীতে এই গরমের দিনে অবগাহন স্নান, হাট থেকে পাকা তরমুজ কিনে আনা …নাঃ, পৃথিবীই ভালো। কোথায় এ সব সুখ ? মাটির পথে চলার ছোটখাটো কত আনন্দ, কত স্মৃতি…হাসি অশ্রু ‥

পুষ্প হঠাৎ বল্লে—কি ভাবচো যতীন-দা ? ব্রহ্মজ্ঞান পেতে গিয়েছিলে না ?

—না পুষ্প, বড় ভাল লাগচে। অনেকদিন পরে এসে—

—পৃথিবীর বাতাসে বাসনা কামনা ভাসচে, এজন্য বড় বড আত্মারা পৃথিবীতে আসতে চান না। ছেলেবেলায় যাত্রা হয়েছিল একটা গান শুনেছিলে নৈহাটিতে ? 'এ বাঁধন বিধির সৃজন, মানব কি তায় খুলতে পারে'—পৃথিবীতে ফিরে এসে বেশীক্ষণ এই জন্যে থাকতে নেই। ঐ ছোটখাটো সুখদুঃখের সোনার শেকলে বাঁধা পডতে সাধ যায়। 'পঞ্চভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে'—তুমি তো তুমি !

—যা বলেচ পুষ্প, তুমি দেখছি অনেক কিছু জানো—

—সত্যি যতীন-দা। আমার কি হয় না ? এখনই হচ্চে। বড় বড় আত্মা পর্যন্ত অনেক সময় পৃথিবীতে কিছুক্ষণের জন্যে ফিরে পুনর্জন্ম গ্রহণের কামনা করেন। নিম্নস্তরের দুর্বল আত্মার তো কথাই নেই। খুঁৎ খুঁৎ করে পৃথিবীর কাছাকাছি ঘোরে। নয়তো ফট্ করে আবার জন্ম নিয়ে বসে। তাদের ঘন ঘন পৃথিবীতে আসা বারণ !

যতীন হেসে বল্লে—যেমন আমি—

—তুমি কেন, অনেক মহারথীর এই দশা হয়। কিন্তু তাই যদি হবে, তবে মানুষ এগিয়ে চলবে কবে ? ভগবানের তা ইচ্ছে নয়। এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো—এক জায়গায় বাঁধা পড়ে থাকলে চলবে না। পথ অফুরন্ত, পথের পাশে ফুলের সুগন্ধে গাছতলায় ঘুমিয়ে পডতে ভালো লাগে বটে কিন্তু তা আমাদের গতি আটকে দেবে। অভীঃ, ভয় নেই—এগিয়ে চলো, অভীঃ—

—ওঃ, তুমি এত কথা জানলে কবে পুষ্প ?

—করুণাদেবীর সঙ্গে কি এমনি এমনি বেড়াই। তা ছাড়া আমি তোমার কত আগে এখানে এসেচি জানো তো ? দয়া করে ওঁরা আমায় শিখিয়েচেন। ভগবানের মহাশক্তিই এগিয়ে নিয়ে চলেচে সবাইকে—

হঠাৎ পুষ্প পুকুরপাডের ওদিকে চেয়ে বল্লে—ঐ ত্যাখো যতীন-দা—

যতীন চেয়ে দেখলে পুকুরপাড়ের আমবাগানের তলায় চুপি চুপি চোরের মত একটি লোক এসে দাঁড়ালো। একটু পরেই ওদের বাড়ীর খিড়কিদোর খুলে আশা বের হয়ে এল এবং গাছতলায় লোকটির সঙ্গে যোগ দিলে। যতীন সর্বশরীরে কেমন একটা জ্বালা অনুভব করলে। সংস্কারের প্রভাব, জ্বালা তো দেহের নয়, আসলে মনের।

সে আপন মনে বলে উঠলো—যদু মুখুয্যের ছেলে নেত্যনারান—

পুষ্প বল্লে—চেন ওকে ?

—কেন চিনবো না ? শ্বশুরবাড়ীর এ পাড়াতেই ওদের বাড়ী, ও কলকাতায় কি চাকরি

করতো জানি, বি-এ পর্যন্ত পড়েছিল তাও জানি। আশা বলতো প্রায়ই, আমাদের গাঁয়ের নেত্যদা এবার বি-এ পাশ দেবে। উঃ, আশা যে এতদূর নেমে যাবে—! এখনও আমি দুবছর মরিনি—এর মধ্যেই—পাপীয়সী!

—যাত্রাদলের ভীমের মত কথা শুরু করে দিলে যে যতীনদা! আশা-বৌদির বয়সের কথা ভেবো। জড়দেহ থাকলেই তার কামনা বাসনা আছে। বড় বড় হাতী তলিয়ে যাচ্চে তো মূর্খ আশা-বৌদি।

যতীন বিরক্ত হয়ে বল্লে—লেকচার রাখো। এই দেখাতে নিয়ে এলে! উঃ, ইচ্ছে হচ্চে ছোকরার ঘাড়টা মট্‌কাই—পারি কই? হাত পা যে হাওয়া!

—অত অধৈর্য হয়ো না। খুন করবার প্রবৃত্তি জাগলো কেন? একটা কিছু করতে হবে। সে কিন্তু ওভাবে নয়। একটা ছোকরাকে মারলে আরও অনেক ছোকরা জুটবে। মন নীচু দিকে নামলে জলের মত গড়িয়েই চলে। আশা-বৌদির অদৃষ্ট ভাল না। এখনও অনেক দুঃখ, অনেক অপমান আছে ওর ভাগ্যে, তুমি আমি কি করবো? কর্মফল ওর। বেচারী! এখন ওরা যা করচে, তাতে বাধা দিতে তুমি আমি কেউ নই! মানুষ স্বাধীন, সে পুতুলখেলার পুতুল নয়। বাসনানদী পাপের পথেও বয়, পুণ্যের পথেও বয়। চলো, এক কাজ করি।

যতীন কিন্তু এগিয়ে গেল পুকুরের ওপাড়ের দিকে। আশার পরনে সরু কালোপাড় ধুতি, হাতে ক'গাছা সোনার চুড়ি, যতীন চিনতে পারলে তাদের গ্রামের মহেন্দ্র সেকরার দোকান থেকে বিয়ের পরের বছর গড়া। আশা বসে পড়েচে গাছের গুঁড়ির আড়ালে, নেত্যনারান কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে।

আশা বলচে—বাড়ী করে দিলে গাঁয়ের লোক যদি কিছু বলে?

নেত্য হাত নেড়ে বল্লে—থোড়াই কেয়ার। এ শর্মা আর কাউকে ভয় করে না। তুমি ঠিক থাকলেই হোল। তুমি বলবে, বাপের বাড়ীর সংসার আর দুদিন পরে ভাইয়েদের সংসার হবে। আমার শ্বশুরবাড়ীর টাকায় আমি বাড়ী করচি। মিটে গেল, কার কি বলবার আছে?

—ও জমিটা তা হোলে কিনতে হবে তো?

—সে লেখাপড়া আমি করে দেবো। বেশ হবে, ইটের দেওয়াল আর খড়ের চালা করে দিই। তুমি ওখানে চলে যাও। পাড়ার বাইরে ঘর হবে, একটু বেশী রাত করে চলে যাবো, শেষ রাতে উঠে চলে আসবো। এমন বনে-জঙ্গলে ভয়ে ভয়ে আর দেখা করতে হবে না। সারারাত্রি মজা করো, কি বলো?

—তুমি যা বোঝো। আমার কিন্তু হাতে মাত্র পঞ্চাশটি জমানো টাকা আছে, আর কিছু নেই বলে দিচ্চি—দু'এক কুঁচো গহনা-ভাঙা সোনা হয়তো আছে। বাড়ী করবার খরচ কিন্তু তোমায় দিতে হবে।

নেত্য হাসিমুখে বল্লে—দেখি মুখখানা? ও মুখ দেখে বাড়ী তো বাড়ী, পয়সা থাকলে মটোর গাড়ী কিনে দিতে পারতাম। কিন্তু বলে দিচ্চি, ও শম্ভু চক্কত্তিটার সঙ্গে আর কথা বলতেও পাবে না কোনো দিন।

আশা হেসে বল্লে—আহা! শম্ভুদা'র ওপর তোমার অত হিংসে কেন? আমি কবে কি করচি তার সঙ্গে? সে আসে যায়, পাশের বাড়ীর ছেলে তাড়িয়ে তো দিতে পারিনে?

—আচ্ছা, ভালো কথা। নিজের বাড়ী হোলে সে তো আর পাশের বাড়ীর ছেলে থাকবে না, তখন নতুন বাড়ীতে না ঢোকে যেন।

আশা একটু ভেবে বল্লে—হ্যাঁগো, এতে গাঁয়ে কোনো কথা উঠবে না তো? আমি মেয়েমানুষ, কি বুঝি বলো। তুমি রাগ কোরো না—আমার ভয় করে।

—কোনো ভয় নেই। নেত্য মুখুয্যে যে কাজে হাত দেবে, তাতে কিছু গোলমাল হবে না। কিছু ভেবো না।

কথা শেষ করে নেত্য আশার পাশে বসে পড়ে তার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বল্লে—আমায় ভালোবাসো আশা?

আশা এদিক ওদিক চেয়ে মৃদুস্বরে বল্লে—নিশ্চয়ই।

—সত্যি বলচো?

—কেন, সন্দেহ আছে নাকি?

—তোমাদের যে মতিস্থির নেই কিনা, তাই বলচি। কাল সারাদুপুর শম্ভু চক্কত্তির সঙ্গে গল্প করেচ।

—আহা! মা সেখানে সব সময়ে বসে। শম্ভুদা একটা কবিতার বই পড়ে শোনাচ্ছিল।

—কি কবিতা?

—তা জানি নে। কিন্তু সেজন্যে তুমি ভাবো কেন? আমার একটা উপায় যেখানে হয়, সেখানেই আমি থাকবো। মা বুড়ো হয়েচেন, আমার নিজের হাতে সম্বল নেই। ভাইবৌরা এসে যদি জ্বালা দেয়, দুকথা শোনায়, সে সংসারে থাকা আমার পোষাবে না। যদি অদৃষ্ট মন্দ না হবে, তবে এত শীগ্‌গির কপাল পুড়বে কেন আমার?

আশা মুখ নীচু করে আঁচলে চোখের জল মুছলে। যতীনের মন করুণা ও সহানুভূতিতে ভরে উঠলো ওর ওপরে। তাহলে জীবনের এসব সঙ্কটময় মুহূর্তেও আশা তার কথা মনে করে! এখনও তাকে সে ভোলেনি! পুষ্প ওর পাশে এসে মৃদুস্বরে বল্লে—চলে এসো যতীনদা, এখানে থেকে কিছু করতে পারবে না।

গভীর রাত্রি।

আশা তাদের বাড়ীর ছোট্ট ঘরে ময়লা বালিশ মাথায় দিয়ে মেজেতে মাদুর পেতে শুয়ে আছে। গরমের দরুন শিয়রের জানালাটা খোলা। পুকুরপাড়ের অভিসার থেকে ফিরে সে দুটি মুড়ি খেয়ে শয্যা আশ্রয় করেচে। গরীবের ঘরের বিধবা, রাত্রে লুচি পরোটা জোটে না।

যতীন বল্লে—আহা, কি খেলে দেখলে তো পুষ্প? পেট পুরে খেতেও পায় না।

—তা তো হোল, কিন্তু এখনও ঘুমোয়নি ভালো। গরমে ঘুমুতে পারচে না। আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। এখন সামনে যেও না। এই রকম আধ-তন্দ্রা অবস্থায় তোমাকে ও

দেখতে পেতে পারে। তোমার দেহও এখনও তেমন সূক্ষ্ম হয়নি। তাতে ফল হবে উল্টো! ও আঁক-পাঁক করে উঠবে ভূত দেখচে বলে, সেবারে সেই জানো তো?

যতীন বাইরের রোয়াকে গিয়ে দাঁড়ালো। যতীনের বৃদ্ধা শাশুড়ী পাশের ঘরে অঘোরে ঘুমুচ্ছেন। যতীনের মনে পড়লো, আশার সঙ্গে প্রথম বিয়ের পরে এই ঘরে তাদের বাসর হয়। তারপরে জামাইষষ্ঠীতে শ্বশুরবাড়ীতে এসে সে এই ঘরে নববিবাহিতা বধূর সঙ্গে রাত্রিযাপন করেচে। কোথায় গেল সে সব দিন! তার ইচ্ছে নেই অন্য কোথাও যাবার। আশা বিপন্না, সে এখানে আশার কাছেই থাকবে। স্বর্গ-টর্গ তার জন্যে নয়। ঐ সেই কুলুঙ্গি, আশার জন্যে এক শিশি গন্ধতেল কিনে এনেছিল একবার, ঐ কুলুঙ্গিটাতে থাকত, দুজনে মাখতো। তার মাথায় জোর করে বেশি তেল ঢেলে দিয়ে আশা নিজের হাতে মাখিয়ে দিত। কাড়াকাড়ি করে মাখতো দুজনে।

সেই আশা কেন এমন হয়ে গেল?

পুষ্প এসে বল্লে—এসো যতীন-দা। আশাবৌদি ঘুমিয়ে পড়েচে।

আশা খানিকক্ষণ আগে ঘুমিয়েচে। ময়লা বালিশটা মাথায় দিয়ে ছেঁড়া মাদুরে শরীর এলিয়ে দিয়েচে। যতীনের মন করুণায় ভরে উঠলো। মেয়ে-মানুষ অসহায়, ওদের কি দোষ। সংসারে বহুলোক ওৎ পেতে আছে ওদের বিভ্রান্ত করে ভুল পথে নিয়ে যাবার জন্যে। একটু আশ্রয়ের আশায় ওরা না বুঝে না ভেবে দেখে সে পথে ছোটে। যতীন কাছে গিয়ে ডাকলে —আশা?

পুষ্প বল্লে—দাঁড়াও, শুধু ডাকলে হবে না, লেক্চারের কাজ নয়। ওর মনে তোমাদের কোনো একটা সুখের রাত্রির ছবি আঁকো। যেমন ধরো তোমাদের ফুলশয্যার রাত্রি, তোমাদের গাঁয়ের ভিটেতে।

—সে কি করে করব?

—সেদিনের কথা একমনে চিন্তা করো—

একটু পরে আশার সূক্ষ্ম শরীর ওর দেহ থেকে বের হয়ে মূঢ়, অভিভূতের মত চারিদিকে চাইলে। কিন্তু পুষ্প দেখেই বুঝলে সে দেহ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল জগতের উর্ধ্বের অতি নিম্নস্তরেও নিজের চৈতন্য পূর্ণ প্রকাশ করতে অসমর্থ।

পুষ্প বল্লে—ওকে ছবি দেখাও যতীনদা—

—ছবি দেখবে কে? ওর তো এ লোকে জ্ঞান নেই দেখচি—

—ছবি দেখাও, তা হোলে একটু চাঙ্গা হয়ে উঠবে—

—ফুলশয্যার রাত্তিরের?

—বা যে কোনো একটা সুখের দিনের। পারবে তো? আমার দ্বারা তো হবে না। তোমার নিজের ছবি তোমাকে দেখাতে হবে।

যতীন একমনে ভেবে সত্যিই একটা ছবি তৈরি করতে সমর্থ হোল। এ স্তরে চিন্তার শক্তি ক্ষণস্থায়ী আকার নির্মাণ করতে সমর্থ—একটা পুরোনো কোঠার ঘর আশাকে এবং ওদের

সকলকেই যেন চারিদিক থেকে ঘিরে ফেললে। কাঁঠাল-কাঠের পুরোনো তক্তপোশে লেপ তোশক পাতা বিছানা যতীনের পৈতৃক, জানালার বাইরে মনসাতলার আমগাছটা, ঘরে জল-চৌকির ওপর ঝক্‌ঝকে পুরোনো পেতল কাঁসা, যতীনের মায়ের হাতে মাজা। যতীনের শোবার সেই ঘরটি এমন বাস্তব হয়ে উঠলো যে আশার ঘরবাড়ী মিলিয়ে গেল। যতীনও যেন অবাক হয়ে গেল তার চিন্তাশক্তির কার্য দেখে। আশা তার শ্বশুরবাড়ীর ঘরটাতে শুয়ে আছে—প্রায় নিখুত শ্বশুরবাড়ীর ঘর, দেওয়ালে টাঙানো কাঠের আর্শিটা পর্যন্ত। আশার সূক্ষ্ম দেহ তখনও অর্ধ-সচেতন। যতীন স্নেহপূর্ণ স্বরে ডাকলে—আশা, ও আশা—

আশা যেন ঘুম ভেঙে উঠে চারিদিকে চাইলে এবং কি দেখে একটু অবাক হয়ে গেল। যতীন আবার ডাকলে—আশা, ও আশা—

আশা যতীনের মুখের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে দেখল, যেন কিছু বুঝতে পারলে না।

—আশা, ভাল আছ ?

পুষ্প বল্লে—অমন ধরনের কথা বোলো না। ছবির সঙ্গে খাপ খাইয়ে পুরোনো দিনের মত কথা বলো।

যতীন বল্লে—আশা, কাল সকালে উঠে কাপাসডাঙায় যাবো কাজে। ভোরে একটু চা করে দিতে পারবে ?

আশা উত্তর দিলে—খুব ভোরে যাবে ? কত ভোরে ?

—সাতটার মধ্যে।

আশার চোখের মূঢ় দৃষ্টি তখনও কাটেনি। সে বল্লে—আমি কোথায় ?

যতীন বল্লে—কেন, তোমার শ্বশুরবাড়ীতে—চিনতে পারচো না ? কি হয়েচে তোমার ? চা দেবে করে ?

—হ্যাঁ।

—খাবার দেবে না ?

—কি খাবে ? চিঁড়ে দিয়ে ঘোল দিয়ে খেও এখন।

একদিন আশা সত্যিই এই কথা বলেছিল। যতীনের চোখে জল এল আবেগে। সে আবার তার পুরোনো পৈতৃক বাড়ীর বিস্মৃত দিনে ফিরে গিয়েচে নববিবাহিতা আশার পাশে। যতীনে অনুভূতির তীব্রতার সঙ্গে সঙ্গে তার তৈরি ছবি আরও স্পষ্ট নিখুঁত হয়ে উঠলো। আশা এবার আরও সজাগ হয়ে উঠে চারিদিকে চাইলে, কিন্তু তার বিস্ময়ের দৃষ্টি এখনও কাটেনি।

যতীন বল্লে—তাহলে তাই। আমায় তুমি ভালবাসো আশা ?

কথা বলেই নেত্য চক্কত্তির মত সে আশার হাতখানা নিয়ে নিজের হাতের মধ্যে রাখলে। তারপর পেছনে চেয়ে দেখলে পুষ্প সেখানে নেই। মেয়েমানুষ, যত উচ্চস্তরের হোক না কেন, প্রেমাস্পদ অন্যকে ভালবাসচে, এতে মন স্থির রাখতে পারে না।

আশা বল্লে—হ্যাঁগা, তুমি কখন এলে ?

—কোথা থেকে আসবো ?

—যেন তুমি অনেকদিন বাড়ী ছিলে না !

—নিশ্চয়ই ছিলাম। কোথায় আমি যাবো ? খেপলে নাকি আশা ?

আশা প্রবোধপ্রাপ্ত ছোট মেয়ের স্বরে বল্লে—যাওনি তাহলে ?

—না আশা— কোথায় যাবো ?

—আমার জন্যে একজোড়া শাড়ী এনে দিও কাল। আটপৌরে শাড়ী নেই।

—ক' হাত ?

—এগারো হাত দিও, দশহাতে ঘোমটা দিতে পারিনে মার সামনে, লজ্জা করে।

—বেশ।

তারপর আশা ভেবে ভেবে বল্লে—আচ্ছা, আমার কি একটা হয়েছিল বলো তো, কিছুতেই যেন মনে নিয়ে আসতে পারচি নে।

—কি আবার হবে, কিছুই না।

—ও! তবে বোধহয় স্বপ্ন দেখেছিলাম। না ?

—তাই হবে। লক্ষ্মীটি, ও সব ভাবতে নেই। তুমি আমায় ভালবাসো ?

আশা সলজ্জ স্বরে বল্লে—হুঁ-উ—

যতীন ভাবলে, কোন্ জগৎ সত্য ? এই ছবিতে গড়া স্বপ্নের জগৎ, না বাস্তব জগৎ ? না কি সবই স্বপ্ন ? সেদিন সেই অবধূত যা বলে গিয়েছিল। জগৎটাই জাগ্রত স্বপ্ন ছাড়া আর কি ? কোথাকার আশা, কি সে দেখচে, কে তাকে কি ভাবাচ্ছে। অথচ আশা ভাবচে এই বুঝি সত্য। ভগবান কি জীবকে ছবি দেখাচ্ছেন না তাঁর সৃষ্ট জগতের মধ্যে দিয়ে, যেমন সে এখন দেখাচ্চে আশাকে ?

সে সস্নেহ স্বরে বল্লে—তা হলে তুমি ঘুমিয়ে পড় আশা, রাত হয়েচে—

—আজ বড্ড গরম, না ? ঘুম হচ্চে না। একটা মশারি এনে দিও—বড্ড মশা—

—তা হবে। সকালে সকালে উঠে চা করে দিও তাহলে ?

—আচ্ছা।

পুষ্প বাইরে থেকে বল্লে—চলো, যতীনদা। একদিনে এর বেশি আর কিছু তুমি করতে পার না।

ওরা চলে যাওয়ার একটু পরে আশার ঘুমও ভেঙে গেল। সে ধড়মড় করে বিছানা থেকে উঠে চারিদিকে দেখলে। এ কোথায় সে আছে ? এমন স্পষ্ট স্বপ্ন সে আর কখনো দেখেনি। কতদিন পরে সে তার স্বামীকে এত স্পষ্ট ভাবে দেখেচে, এইমাত্র যেন তিনি পাশে বসে ছিলেন। কতক্ষণ স্বপ্নের কথা সে ভাবলে। সব কথা তার মনে নেই, এইটুকু মনে আছে, তিনি যেন বলচেন—একটু চা করে দিতে পারো ? চা খাবো—

সেই পুরোনো হাসি, পুরোনো আমলের স্নেহদৃষ্টি স্বামীর চোখে। আশা উদ্‌ভ্রান্তের মত জানালার বাইরে চেয়ে রইল। কোথায় আজ সেই স্বামী, কোথায় তার সেই শ্বশুরবাড়ী ! নিজের প্রতি করুণায় তার মন ভরে গেল, চোখে জল এল।

সেদিন পুষ্প বল্লে – যতীনদা, মন খারাপ করে বসে আছ নাকি? চলো করুণাদেবীর কাছে যাবে।

—আমি সেখানে যেতে পারবো না। অত উঁচুতে উঠলে আমার চৈতন্য থাকে না জানো—সব সময় তাঁকে দেখতেও পাইনে। কি করবো বলো। তা ছাড়া আমার অন্য অনেক রকম ভাবনা—

—ভাবনা তো জানি। ও ভেবে কোনো লাভ আছে? যার যেমন অদৃষ্টে আছে, তেমনি হবে। চেষ্টা তো করলে অনেক। ওর কর্মফল ওকে ওই পথে নিয়ে যাচ্ছে, তুমি আমি কি করবো বলো।

আরও কয়েক মাস কেটে গিয়েচে। আশালতার মনের অবস্থা দিনকয়েকের জন্য একটু ভাল হয়েছিল বটে, কিন্তু স্থায়ী কোনো ফল তাতে হয়নি। নেত্য তাকে গ্রামের প্রান্তে আলাদা বাড়ী করেও দেয়নি। ভুলিয়ে তার কতকগুলো সোনার গহনা হাত করে সেই টাকায় ওকে কলকাতায় এনে রেখেচে। যতীন রোজ সেখানে যায় রাত্রে, একটা লম্বা ব্যারাকমত পুরনো বাড়ীর একটা ঘরের সংকীর্ণ রোয়াকে আশা বসে রাঁধে, এখানে সে পাশের ভাড়াটেদের সামনে সামাজিকতা বজায় রাখার জন্যে বিধবার বেশ ঘুচিয়ে নেত্যর স্ত্রী সেজেচে, হাতে চুড়ি পরে, কপালে সিঁদুর দেয়। প্রথমে যেদিন নেত্যই তার কাছে এ প্রস্তাব করে যতীন সেখানে উপস্থিত ছিল।

নেত্য বল্লে—রাস্তা থেকেই তোমাকে এটি করতে হবে আশা। যেখানে যাবে, সেখানে আশ-পাশের ঘরে অনেক ফ্যামিলি বাস করে। তাদের সামনে কি বলে দাঁড়াবে, কি পরিচয় দেবে? বাড়ীওয়ালাই বা জায়গা দেবে কেন?

আশা বল্লে—সে আমি পারবো না। ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা হয়ে আবার পেড়ে কাপড় পরবো, সিঁদুর পরবো,—এ হবে না আমায় দিয়ে নেত্যদা—

নেত্য শ্লেষের সুরে বল্লে—নাও নাও আর ন্যাকামি করতে হবে না। ব্রাহ্মণের বিধবার তো সব রাখলে, এখন যার সঙ্গে বেরিয়ে এলে তার কথামত চলো।

আশা বিস্ময়ের সুরে বল্লে—বেরিয়ে এলাম!

—আহা-হা নেকু! বেরিয়ে আসার কি হাতীঘোড়া আছে নাকি? আবার তুমি ঘরে ফিরে যাও তো মানিক। এতক্ষণ গাঁয়ে ঢি-ঢি পড়ে গিয়েচে দ্যাখো গে যাও—

- বা-রে, তুমি বল্লে আমাকে কলকাতায় আলাদা বাসা করে দেবে। আমি আমার গহনা বিক্রি করে চালাবো—তারপর মাকে সেখানে নিয়ে এসে রাখা হবে। বলো নি?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ। এখনও তো তাই বলচি, বলচি নে? আমার হাত ধরে যে-মাত্তর বাড়ীর বাইরে পা দিয়েচ, সেই মাত্তরেই তুমি বেরিয়ে এসেচ। ওকেই বলে বেরিয়ে আসা। এখন

আর ফেরবার পথ নেই—যা বলি সেই রকমই করো। তোমার ভালোর জন্তেই তো বলচি। দেখো কত সুবিধে হবে, কলকাতায় বড় বড় লোকের সঙ্গে আলাপ হবে। আখেরে ভালো হয় কিনা দেখে নিও।

যতীন সেদিন ফিরে এসে পুষ্পকে সব বলেছিল। পুষ্প বলে—আশাদি বড় নির্বোধ, নেত্য লোকটা ওকে ভুলিয়ে এই কাণ্ডটা ঘটাচ্চে। কিন্তু কিছু করবার নেই।

—কেন পুষ্প? এক অবলা মেয়েকে সর্বনাশের পথ থেকে বাঁচাতে পারো না তোমরা?

—কই পারি। যে যার কর্মফলের পথে চলে, কে কাকে সামলায়?

এরপর প্রায় তিন মাস কেটেচে। আশা ও নেত্য বাসাবাড়ীতে বেশ পাকাপোক্ত হয়ে বসে স্বামী-স্ত্রীর মত সংসার করচে। নেত্য বাজার করে নিয়ে আসে, আশার সামনে বসে গল্প করে, দুবার সিনেমা দেখাতে নিয়ে গিয়েচে, একবার পাশের ঘরের ভাড়াটেদের সঙ্গে আশা কালীঘাটেও ঘুরে এসেচে।

পুষ্প কত চেষ্টা করেচে যতীনকে ওখান থেকে আনবার। কিন্তু যতীন শোনে না, পুষ্পকে লুকিয়ে সে আজকাল প্রায়ই আশার বাসায় যায়। একদিন রাত্রে একটা স্বপ্নও দেখিয়েছিল, কিন্তু পুষ্পের সাহায্য না পাওয়ায় সে স্বপ্ন হয় বড় অস্পষ্ট, তাতে ঘুম ভেঙে উঠে আশা সারা সকালটা মন ভার করে থেকে নেত্যর কাছে বকুনি খায়।

পুষ্প বল্লে—চলো আজ করুণাদেবীর কাছে গিয়ে বলি—

—এইখানেই তাঁকে আনো। আমি কোথাও যাবো না।

—পৃথিবীর মধ্যে ভূত হয়ে ঘুরে বেড়াবে এই রকম?

—কি করি বলো। আমরা তো খুব উঁচুদরের মানুষ নই তোমাদের মত, এই আমাদের পরিণাম। কর্মফল!

যতীনের ঠেস দেওয়া কথায় পুষ্প মনে আঘাত পেলেও মুখে কিছু বল্লে না। সে বেশ বুঝেছে যতীনদাকে এ পথ থেকে নিবৃত্ত না করলে ওর উন্নতি হবে না। যতদিন আশা বাঁচবে, তার পেছনে অস্থানে কুস্থানে ও ঘুরে ঘুরে বেড়াবে—তাতে কোনো পক্ষেরই কোনো সুবিধে হবে না।

ইতিমধ্যে একদিন একটা ব্যাপার ঘটে গেল আশাদের বাসায়। আশার গ্রামের শম্ভু চক্কত্তি বলে সেই ছেলেটি অনেক খোঁজাখুঁজির পরে আশার সন্ধান পেয়ে সেখানে এল। আশা তখন রান্না করচে। শম্ভুকে ঢুকতে দেখে ওর মুখ শুকিয়ে গেল। শম্ভু এসে বল্লে—কি আশাদি, চিনতে পারো?

আশা শুকনো মুখে ভয়ের সুরে বল্লে—এসো বোসো শম্ভুদা—কি করে চিনলে ঠিকানা?

—নেত্য স্কাউণ্ড্রেলটা কোথায়? আমি একবার তাকে দেখে নিতাম। তারপর, কি মনে করে এখানে এসে আছ?

—কারু দোষ নেই শম্ভুদা, আমি নিজের ইচ্ছেতেই এসেচি।

—গাঁয়ে কি রকম হৈ-চৈ পড়ে গিয়েচে তুমি জানো না। কেন তুমি এরকম ক'রে এলে? কতদূর খারাপ করেচ তা তুমি বুঝেচ?

—গাঁয়ে থেকেই বা কি করতাম শভুদা। এ বেশ আছি। আমাদের মত মানুষের আবার গাঁ আর অগাঁ কি? কি ছিল জীবনে? মা মরলে কোথায় দাঁড়াতাম? এখানে খারাপ নেই কিছু। ফিরে যখন যেতে পারবো না, তখন সেকথা ভেবে আর কি হবে!

—আমি তোকে বোনের মত ভালবাসি আশা, চল্ তোকে এখান থেকে নিয়ে অন্য জায়গায় রেখে দেবো।

আশা কি একটা জবাব দিতে যাচ্চে এমন সময়ে নেত্য এসে হাজির। শভুকে ওখানে দেখে সে খুব চটে গেল মনে মনে, তখন কিছু বল্লে না, কিন্তু তারপর আশাকে যথেষ্ট তিরস্কার ও অপমান করলে। তার ধারণা আশাই শভুকে লুকিয়ে খবর দিয়ে এনেছিল।

যতীন সব দেখলে দাঁড়িয়ে। আজকাল সে সন্দেহ করে এই নেত্যর জন্যেই আশা শ্বশুরবাড়ী যেতে চাইত না। পুষ্প সব জানে কিন্তু তাকে কখনো কিছু বলেনি। তবুও রাগ হয় না আশার ওপর—গভীর একটা অনুকম্পা, সে দ্বিতীয় স্তরের প্রেত যদি হোত, তবে নেত্যকে একদিন এমন বিভীষিকা দেখাতো যে মরে কাঠ হয়ে যেতো নেত্য, কেমন নেত্য সে দেখে নিত!

করুণাদেবীর কাছে এইজন্যেই সে গেল পুষ্পকে নিয়ে। একটা ক্ষুদ্র দ্বীপের মত স্থান অসীম ব্যোমসমুদ্রে, চারিদিকে উপবন, কুসুমিত বন্যলতা, কিছুদূরে একটা ঝর্ণা পড়চে পাহাড়ের মাথা থেকে। বনানীর বন্য সৌন্দর্য ও উপবনের শোভা এক হয়ে মিলেচে। একটা প্রাচীন বৃক্ষতলে ঝরা পাতার রাশির ওপর দেবী এলিয়ে শুয়ে পড়েচেন। কেউ কোথাও নেই, শূন্য দ্বীপ, শূন্য ব্যোমতল। দেবীর অপরূপ রূপে সেই প্রাচীন বনস্থলী উজ্জ্বল হয়ে উঠেচে। যতীন ভাবলে, এই তো স্বর্গ। এত সৌন্দর্য দিয়ে গড়া যে ছবি তা স্বর্গ ছাড়া আর কিছু নয়। পৃথিবীতে এমন বনবনানীর সমাবেশ কই, যদি বা থাকে এমন রূপসী মেয়ে কই, তাও যদি থাকে, এত নির্জনতা কই—যদি বা থাকে, এ তিনের অদ্ভুত সমাবেশ কোথায়? দেবীর মাথায় কি এই তৈরি হয়েচে? হয়তো তাই। এতটুকু একটা গ্রহ বা উপগ্রহ, শুধু বনবনানীতে ঘেরা, সেখানে আবার অন্য কেউ নেই উনি ছাড়া, আবার দিব্যি পাখীর ডাকও আছে! করুণাদেবীর মুখশ্রী কি সুন্দর! আর কি সহানুভূতি ও করুণায় ঈষৎ বিষাদমাখা। মাতৃমূর্তির এমন অপূর্ব মহিমময় জীবন্ত আলেখ্য তার সামনে থাকতেও যদি সে ঈশ্বরের দয়ায় কি দেবদেবীতে বিশ্বাস না করে, তবে সে নিতান্ত নির্বোধ। শুধু পুষ্পের জন্যই সে এখানে আশতে পারচে বা দেবীকে পাচ্চে—নইলে ওঁর দর্শন পাওয়া তার পক্ষে কি সহজ হোত?

যতীনের বক্তব্য পুষ্পই বল্লে—আশাবৌদি কলকাতার বাসাবাড়ীতে কাল রাত্রে মার পর্যন্ত খেয়েচে—সারারাত কেঁদেচে, যতীনের মনে বড় কষ্ট। এই আকর্ষণ তাকে সর্বদা পৃথিবীতে টানচে, এখন কি করা যায়?

করুণাদেবী সব শুনে বল্লেন—এতে কিছু করবার নেই। কন্যা যতদিন ঠেকে না শিখবে, তার জ্ঞান হবে না।

যতীন ভাবলে—এ কি কথা হোল! এত বড় দেবীর মুখে এ কি সাধারণ পৃথিবীর মানুষের মত কথাবার্তা! এ কথা তো পৃথিবীতে যে কোন জমিদারগিন্নী কি দারোগা ইন্‌সপেক্টরের বৌ

শুনেই বলতো।

সে বল্লে—আপনি মন করলে কি ওকে দয়া করতে পারেন না?

করুণাদেবী হেসে বল্লেন—আমি খেটেই মরি, ভেবেই মরি। দয়া কি করতে পারি সে-ভাবে বাছা? এদের যেদিন ভালো হবে, সেদিন আমারও ছুটি। এ সব অতি নিম্নদরের আত্মা, কেউ ওদের ইচ্ছে করে কষ্ট দিচ্চে না, নিজের কর্মফলে কষ্ট পাচ্ছে। ভগবান প্রত্যেক লোককে বড় দেখতে চান, সৎ, সুন্দর, নির্মল দেখতে চান, উচ্চ প্রকৃতি জাগলো কিনা দেখতে চান—যেমন ধরো সেবা, স্বার্থত্যাগ, দয়া, ভক্তি, ভালবাসা। এ যাদের মধ্যে নেই বা জাগেনি, তাদের সেগুলো জাগিয়ে দেবার কৌশল তাঁর জানা আছে। কষ্ট দিয়ে, শোকের বোঝা রোগের বোঝা দিয়ে যে করেই হোক ও-লোকে কি এ-লোকে তার চোখ ফোটানোর চেষ্টা হয়ই, তাও যাদের না হয়, অন্য গ্রহে তাদের জন্মগ্রহণের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়, যে গ্রহ পৃথিবীর চেয়েও ধীর গতিতে চলে। সেখানে লোকে আস্তে আস্তে অনেক সময় নিয়ে সব জিনিস শেখে। জড়বুদ্ধি জীবেরা তাড়াতাড়ি শিখতে পারে না—সেটা তাদের উপযুক্ত পাঠশালা। এ-লোকেও নরকের মত যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা আছে, অতি নিম্নস্তরের পাপী জীবেরা সেখানে ঠেকে শিখে মানুষ হচ্চে। এ একটা মস্ত বড় বিদ্যালয়। দেখতে চাও? একবার নিয়ে যাবো—

পুষ্প জিজ্ঞেস করলে—তাহলে আশা বৌদির কি হবে বলুন—

—আমি দেখি একটু ভেবে, দাঁড়াও।

পরে তিনি চোখ বুজে খানিকক্ষণ কি ভাবলেন। চোখ চেয়ে ওদের দিকে চেয়ে বল্লেন—এখনও তিন জন্ম। ওর হৃদয়ে প্রেম নেই। সব স্বার্থ। যে কোনো লোককে ভালবাসলেও তো বুঝতাম। এখন যার সঙ্গে আছে, তাকেও তেমন ভালবাসে না। সাংসারিক স্বার্থ। বুড়ো মার সেবা না করে তাকে ছেড়ে এসেচে। যতীনের মনে ভালবাসা আছে, তাই সেখানে যায়। কিন্তু ওর স্ত্রীর কোনো উপকার আপাতত কিছু হবে না।

যতীন বল্লে—ওর জন্যে মন বড় খারাপ, ওর কষ্ট দেখে—

—তুমি যাকে ভাবচো কষ্ট বা পাপ, ও তাকে ভাবচে সুখ, সাংসারিক সুবিধা। ও যেদিন পাপ ভেবে ত্যাগ করবে, সেদিনই না ওর উন্নতি। তোমার ভাবনায় কি হবে?

—আমি কি ওর কোনো উপকার করতে পারিনে? আপনি যদি দয়া করে ওকে পাপী ভেবে ওকে সাহায্য করেন—

—পাপ বলে যে না বুঝেচে, অনুতাপ যার না হয়েচে, পাপকেই যে আনন্দের পথ বলে ভাবচে, যার মনে ত্যাগ নেই, কর্তব্যবুদ্ধি নেই, কোনো উঁচু ভাব নেই—আনবার চেষ্টাও নেই—তাকে শুধু দয়া করলেই ভালো করা যাবে না। ওর ভার আছে যাঁদের হাতে তাঁরা অসীম জ্ঞানের প্রভাবে জানেন, এই সব নিম্নশ্রেণীর মনকে কি ভাবে সংশোধন করতে হয়। সেই পথ দিয়ে ওরা উঠবে। কোনো আত্মার প্রভাব ওর মনে রেখাপাত করবে না।

পুষ্প বল্লে—যদি আমরা রোজ ওর মনে ভাল ভাব দেবার চেষ্টা করি?

—উষর মরুভূমিতে বীজ বুনলে কি হয়? যে চায়, সে পায়। যে কেঁদে বলে, ভগবান আমায় ক্ষমা করো, আমায় পথ দেখিয়ে দাও, সে পাপপুণ্য বুঝেচে। তখন তাকে আমরা সাহায্য করতে ছুটে যাই। যে যা চায়, সে তা পায়। যে জ্ঞান চায় তাকে জ্ঞানের পথ দেওয়া হয়। যে ভগবানের প্রতি ভক্তি চায়, তাকে সাধুজনের সঙ্গে মিসিয়ে দেওয়া হয়, মনে ভক্তির সঞ্চার করে দেওয়া হয়।

—যে বলে আমি ভগবানকে দেখবো?

—ভগবান তাঁকে দেখা দেন।

যতীন বিস্ময়ের সুরে বল্লে—তিনি দেখা দেন?

—অবিশ্বাস করবার কি আছে বলো। সে যে-ভাবে চায় সেই রূপ ধরে তাকে দেখা দেন। ভগবানের বিরাট রূপের ধারণা কে করতে পারে। ইষ্ট মূর্তিতে দেখতে চায়, যার যা ইষ্ট, যে রূপ যে ভালবাসে, তাকে তিনি সেইরূপেই দেখা দেন। তিনি করুণার সাগর, কত বড় করুণা তাঁর—তা তুমি জানো না, বুঝতেও পারবে না। ক্ষুদ্র বুদ্ধির গম্য হয়ে ক্ষুদ্র সম্বন্ধ পাতিয়ে মা, ভাই, বোন, সন্তান, বন্ধু সেজে দেখা দেন।

—আমার প্রতি একটা আদেশ করুন দেবী, আপনার কাছে এসেচি অনেক আশা নিয়ে, শুধু হাতে ফিরে যাবো?

—আমি যা করতে পারি, এখন তা করবো না। সময় বুঝলে পৃথিবীর যে কোনো ভ্রান্ত ছেলেমেয়ের সাহায্যে আমিই সকলের আগে ছুটে যাবো, বাছা। আশালতার কথা আমার মনে রইল। কিন্তু এখনও অনেক বাকি, অনেক দেরি, যতদূর বুঝচি। তুমি পৃথিবীতে বেশি যাতায়াত কোরো না। পৃথিবীতে গেলে এমন সব বাসনা কামনা জাগবে যা তোমাকে কষ্ট দেবে শুধু—কারণ পৃথিবীর মানুষের মত দেহ না থাকলে সে সব বাসনা পরিতৃপ্ত হয় না। তখন হয়তো তোমার ইচ্ছে হবে আবার মানুষ হয়ে জন্ম নিই। প্রবল ইচ্ছাই তোমাকে আবার পুনর্জন্ম গ্রহণ করাবে। অথচ এখন পুনর্জন্ম নিয়ে কি করবে? গত জন্মে যা করে এসেচ তাই আবার করবে। সেই একই খেলা আবার খেলবে। তাতে তোমার উন্নতি হবে না। অথচ যার জন্যে করতে যাচ্চ, তারও কিছু করতে পারবে না। কারণ ও সব ভালমন্দ করবার কর্তা তুমি নও। যে যার পথে চলেচে, তোমার পথ তোমার, তার পথ তার। পর্বতকে টলাতে পারবে না, বিশ্বজগতের নিয়ম বড় কড়া, একচুল এদিক-ওদিক করবার শক্তি নেই কারো।

—আপনারও না?

করুণাদেবী হেসে বল্লেন—তুমি এখনও ছেলেমানুষ। আমি তো আমি, পৃথিবীর গ্রহদেব স্বয়ং পারেন না। তিনি তো অসাধারণ শক্তিধর দেবতা, ভগবানের ঐশ্বর্য রয়েচে তাঁর মধ্যে। তবে আমরা যেখানে যাই, সময় হয়েচে বুঝে যাই। যেখানে সাহায্য করলে সত্যকার উপকার হবে আত্মার, এ আমি মনে মনে বুঝতে পারি। সে ক্ষমতা আছে আমাদের। সেখানেই যাই শুধু। ঐ যে বল্লাম, পাপ বুঝে যে সে পথ থেকে ফিরতে চায়, ভগবানকে মনেপ্রাণে ডাকে,

বলে, আমি ভুল বুঝেচি, আমায় ক্ষমা করো, দয়া করে পথ দেখিয়ে দাও—ভগবান সেখানে আগে ছুটে যান—তাঁর কতবড় করুণা, কত প্রেম জীবের প্রতি—তা ক'জন মানুষে বোঝে? সবাই পৃথিবীতে টাকা নিয়ে যশ নিয়ে মান নিয়ে উন্মত্ত—

যতীন ও পুষ্প তাঁকে প্রণাম করে চলে আসতে উদ্যত হোলে তিনি ওদের দিকে চেয়ে প্রসন্ন সুন্দর হেসে বালিকার মত ছেলেমানুষী স্বরে বল্লেন—আমার এ জায়গাটা তোমাদের কেমন লাগে?

দুইজনেই বল্লে, ভারি চমৎকার স্থান, এমন তারা কখনো দেখেনি।

দেবী বালিকার মত খুশি হোলেন ওদের কথা শুনে। বল্লেন—মাঝে মাঝে এখানটাতে বিশ্রাম করি। তোমরা মাঝে মাঝে এসো। একাই থাকি।

যতীন বিনীত স্বরে বল্লে—গ্রহদেব বৈশ্রবণকে দেখাবেন একবার?

করুণাদেবী হেসে বল্লেন—তোমার দেখচি বড্ড বড় সাধ।

যতীন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল, ফেরবার পথে সে পুষ্পকে বল্লে—এমন না হোলে দেবী! কি সরলতা! জায়গাটা সম্বন্ধে আমাদের সার্টিফিকেট পেয়ে খুশি হয়ে গেলেন!

উচ্চ স্বর্গে আজ পুষ্পকে নিয়ে গেলেন প্রেমের দেবী। বহু বিচিত্র বর্ণের মেঘের মধ্যে দিয়ে সে অপূর্ব যাত্রা। অন্তরের জ্যোতি-বাতায়ন খুলে গিয়েচে যেন, সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েচে সে আলো।

দেবী বল্লেন—সারা পৃথিবীতে প্রেমের জন্য এত দুঃখও পাচ্চে মানুষে! ইচ্ছে হয় সব মিলিয়ে দিই।

—দেন না কেন দেবি?

—দিই তো। কাজই ওই। আমার যা ক্ষমতা তা করি। তবে আমাদের ক্ষমতারও সীমা আছে—দেখচো তো সুধার কিছুই করতে পারচি নি। সুধার মত লক্ষ লক্ষ নরনারী পৃথিবীতে—তবে আমরা আঁকুপাঁকু করি নে তোমাদের মত। সময় অনন্ত, সুযোগ অনন্ত—তোমরা ভাবো অমুক দিন মরে যাবো, কবে আর কাজ করবো? আমরা জগৎকে দেখি অন্য চোখে—

পুষ্প হেসে বল্লে—মরেচি তো অনেকদিন, তবে আর কেন এ অনুযোগ দেবি?

প্রণয়দেবী হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বলেন—আহা! আজ একাদশী। সুধা শুয়ে আছে ঘরে দোর দিয়ে—দেখো এখানে এসে।

একটা আলোকের পথ যেন তৈরী হয়ে গিয়েচে এই অসীম ব্যোমের বুক চিরে। পৃথিবীর একটা ক্ষুদ্র গ্রামের ক্ষুদ্র ভাঙা কোঠার ভাঙা ঘরকে তার নোনাধরা চুন-বালি-খসা দেওয়ালের ব্যবধান ঘুচিয়ে যুক্ত করচে অনন্ত তারালোক-খচিত মহাকাশের সঙ্গে, দেবযানের পথে।

পুষ্পের সারাদেহ আনন্দে ও সত্যের অনুভূতিতে শিউরে উঠলো—যেখানে প্রেম, যেখানে সত্য, যেখানে গভীর রসানুভূতি বা দুঃখবোধ, সেখানে স্বর্গের সঙ্গে মর্ত্যের যোগ ক্ষণে ক্ষণে

নিবিড় হয়ে ওঠে—অথচ সে অদৃশ্য যোগের বার্তা পৃথিবীর মানুষে জানেও না, বিশ্বাসও করে না।

কোকিল ডাকে বৈশাখের অপরাহ্ণে, ছায়াভরা মাঠে, নদীতীরে। সে সুরের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর বনঝোপ যুক্ত হয় সুরলোকের আনন্দবীণার ঝঙ্কারের সঙ্গে। কে জানে সে কথা।

—আর একটি দেখবে? এদিকে চেয়ে দেখ—

পুষ্প কিন্তু সে দেশ চিনতে পারলে না। খুব ফর্সা মেয়েটি, বয়স নিতান্ত কম নয়—দেখেই বোধ হয় আধ্যাত্মিক উন্নত অবস্থার মেয়ে। একটা পুরোনো সোফায় বসে বসে কি পরিষ্কার করচে। জিনিসটা পুষ্প কখনো দেখেনি, বুঝতে পারলে না।

দেবী বল্লেন—ওর স্বামী ছিল শিকারী, কার্পেথিয়ান পর্বতে শিকার করতে গিয়ে বুনো শূওরের হাতে মারা পড়ে। সে আজ সতেরো-আঠারো বছরের কথা—স্বামীর তামাক খাবার নলটা যত্ন করে রোজ পরিষ্কার করে, ফুল দিয়ে সাজায়। সুন্দরী ছিল, বিধবা বিবাহ করবার জন্যে কত লোক ঝুঁকেছিল—কারো দিকে ফিরেও চায় নি। দুঃখ কষ্ট কত পেয়ে আসচে, খেতে পায় না—তবুও স্বামী ধ্যান, স্বামী জ্ঞান।

পুষ্প কি ভেবে বল্লে—বিবাহিত স্বামী যদি না হয়, তবে কি আপনাদের দৃষ্টি সেদিকে পড়ে না?

প্রণয়দেবী হেসে বল্লেন—পুষ্প!

পুষ্প সলজ্জ ভাবে চোখ নিচু করলে।

—আমাদের অবিশ্বাস ক'রো না, ছিঃ—আমি তোমাকে কতদিন থেকে দেখছি জানো, যতদিন তুমি পৃথিবী থেকে প্রথম এখানে এলে। যতীনের সঙ্গে আমিই তোমাকে মিলিয়ে দিয়েচি—নইলে তুমি ওর দেখা পেতে না। প্রেমের আকর্ষণ না থাকলে পৃথিবী ছেড়ে এসে সকলের সঙ্গে দেখা নাও হতে পারে।

—এমন হয়?

—কেন হবে না? সেই তো বেশি হয়। একটি মেয়েকে জানি, সে পৃথিবী থেকে এসেচে আজ তিনশো বছর। তার স্বামী এসেচে তার আসবার পঁচিশ বছর পরেই। কিন্তু তাদের সঙ্গে দেখা হয়নি আজও—এই তিনশো বছর। কারণ প্রেম নেই। প্রেম না থাকলে আমরা মিলিয়ে দিই না। তাতে পরস্পরের আত্মার ক্ষতি বই লাভ হবে না কিছু।

পুষ্প বিস্মিত হয়ে বল্লে—উঃ! তিনশো বছর স্বামী-স্ত্রীর দেখা হয় নি?

দেবী বল্লেন—মানে, আর হবেও না। তারা কেউ নয় পরস্পরের। এতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই। সত্যিকার প্রেম দুটি আত্মাকে পরস্পর সংযুক্ত করে। যে-প্রেম যত কামনা-বাসনাশূন্য সে প্রেম তত উঁচু। এই ধরনের প্রেমের জন্যই আমাদের কত খাটুনি।

পুষ্প ফিরে এসে দেখলে যতীন নেই, আবার পৃথিবীতে চলে গিয়েচে আশার কাছে। পুষ্পের মনে কেমন একটা ব্যথা জাগলো—এত করেও যতীনদা আপনার হোল না! পরক্ষণেই

সে নিজের দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে দিলে। পৃথিবীর সম্পর্কে আশা বৌদিদির অধিকার তার চেয়ে অনেক বড়, অনেক ন্যায্য। ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে তাকে।

যতীন কলকাতার সেই ছোট্ট বাসাবাড়ীতে আবার এসে দাঁড়িয়েচে। নেত্য বাসাতে উপস্থিত আছে বটে কিন্তু ঘুমুচ্চে। আশা বসে বসে পরদিন রান্নার জন্যে মোচা কুটচে। যতীনের মনে হোল এমনি একদিন সে কুড়ুলে বিনোদপুরের বাড়ীর রোয়াকে বসে আশাকে মোচা কুটতে দেখেছিল, যতীনের মা তখন বেঁচে, পাশেই তিনিও ছিলেন বসে সেদিন। যতীন কোথা থেকে এসে হঠাৎ এ দৃশ্য দেখে বড় আনন্দ পেয়েছিল। পল্লীসংসারের সেই শান্ত পরিচিত পরিবেশ! এখনও তাই, সেই ছবিটিই অবিকল, কিন্তু কি অবস্থায়! কোথায় মা, কোথায় কুড়ুলে বিনোদপুরের সেই যত্নে পাতানো সংসার—কোথায় সে।

কোথায় যেন কি অবাস্তবতা লুকিয়ে ছিল আপাতপ্রতীয়মান বাস্তবতার পেছনে। আসল রূপটি চিনতে দেয়নি সংসারের। ছেলেবেলায় শোনা যাত্রার পালার সেই গান মনে পড়লো—

কেবা কার পর, কে কার আপন,
কালশয্যা 'পরে মোহতন্দ্রা ঘোরে,
দেখি পরস্পরে অসার আশার স্বপন।

সব মিথ্যে। সেই সন্ন্যাসীর দেখানো নির্বিকল্প সমাধির অবস্থা মনে পড়লো। কেউ কারো নয়। সব স্বপ্ন, সব মায়া, সব অনিত্য।

পুষ্প এসে পাশে দাঁড়াতেই যতীনের চমক ভাঙলো। এ তো এসেচে, একে কিন্তু মিথ্যা বলে মনে হয় না তো? 'নৈহাটির ঘাটে, বসে পৈঠার পাটে'—সেই পুষ্প কি অখণ্ডসত্যরূপে বিরাজ করচে চিরদিন এই খণ্ডিতসত্য খণ্ডিতসত্তা জীবনের আপাতপ্রতীয়মান স্থায়িত্বের মধ্যে?

আশা মোচা কুটে উঠে নেত্যকে ডাকতে লাগলো—ওগো, ওঠো—ভাত বাড়ি?

নেত্য জড়িতস্বরে কি বল্লে, তারপর চোখ মুছতে মুছতে উঠে বসলো বিছানায়। বল্লে—কি? বাবাঃ, এতক্ষণ বসে বসে মোচা কুটলে? রাত কত?

—তা কি করে জানবো?

—দেখে এসো চৌধুরী মশায়ের ঘরে।

—হ্যাঁ, এখন বুড়ো খেটেখুটে এসে শুয়েচে, আমি গিয়ে ওঠাই—

—শম্ভু চক্কত্তি আজ এসেছিল?

—আমি জানিনে অতশত খোঁজ। এখন উঠে দয়া করে খেয়ে আমার হাত অবসর করে দাও—

এ কথার উত্তরে নেত্য আবার সটান্ বিছানায় শুয়ে পড়ে একটা অশ্লীল কথা উচ্চারণ করে চোখ বুজলে।

পুষ্প বল্লে—যতীনদা, তুমি চলে এসো, এখানে থেকো না।

—পুষ্প, তুমি চলে যাও, আমি আর একটু থাকি।

যতীনের মুখের ও চোখের ভাব যেন কেমন। ও মোহগ্রস্ত হয়ে উঠেচে পৃথিবীর স্থূল

আবহাওয়ায়। এ সব জায়গায় বেশিক্ষণ থাকা ওর পক্ষে ভালো না। চুম্বকের মত আকর্ষণ করে পৃথিবীর যত বাসনা কামনা আত্মিক লোকের জীবকে। টেনে এনে বেঁধে রাখবার চেষ্টা করে—ওপরে উঠতে দেয় না। অবিশ্যি যে বাসনা কামনা বিসর্জন দিয়েচে, সে কামচর, স্বাধীন, মুক্ত। শত পৃথিবী তাকে বাঁধতে পারে না। কিন্তু যতীনের মত আত্মার পক্ষে এমন ঘন ঘন যাতায়াত বড় বিপজ্জনক।

পুষ্প কিছু বলবার আগেই যতীন আবার বল্লে—আমার বড় ইচ্ছে, করুণাদেবীকে আর একবার আশার বিষয় বলি। তোমার কি মত?

—যতীনদা, তাতে ফল হবে না। আশা বৌদির কর্ম ওকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চে। কেউ কিছু করতে পারবে না। নইলে চেষ্টা তুমি আমি কম করি নি। ওর মন ওকে টানচে নিচের দিকে—অধঃপতনের পথে। বাধা দেবার সাধ্য কার! এক যদি ভগবান সাহায্য করেন, কৃপা করেন—

কথাটা যতীনের মনঃপূত হোল না। সে বল্লে—ভগবান সাহায্য করলে এই অবস্থায় এসে ও দাঁড়ায় আজ? তিনি চোখ বুজে আছেন।

পুষ্প বল্লে—ভুলে যাচ্চ যতীনদা, ভগবান তাকেই সাহায্য করেন, যে অকপটে সৎ হবার চেষ্টা করচে, তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। যেচে তিনি সাহায্য করতে গেলে তাতে কোনো ফল হবে না বলেই তাঁর কাছ থেকে সাহায্য আসে না।

—কেন?

—যে ভগবানকে চেনে না, তাঁকে স্বীকার করে না, তার হোল আচ্ছাদিত চেতন। তার চেয়ে যে ভালো, তাকে বলে সঙ্কুচিত চেতন। এই দুই ধরনের লোককে ভগবৎকথা শোনালে উল্টো উৎপত্তি হয়। আশা বৌদির আচ্ছাদিত চেতন। আলো জ্বাললে কি হবে? ঢাকনির মধ্যে আলো সেঁধোবে না। এদের ওপরে মুকুলিত চেতন, তাদের মনে ভগবানের জ্ঞান জাগতে শুরু করেচে। তারও ওপরে বিকচিত চেতন, সবার ওপরে পূর্ণ বিকচিত চেতন—যেমন বড় বড় ভক্ত কি সাধকেরা। কত নিচে পড়ে আছে আশা বৌদি আর নেত্যর দল ভাবো।

যতীন কৌতুকের সুরে বল্লে—ও বাবা, তোমার পেটে এত! নবদ্বীপের ভট্টাচায্যিদের মত শাস্তর কথা শুরু করলে যে। তোমার কী চেতন পুষ্প, বিকচিত না পূর্ণ বিকচিত? আর আমিও বোধহয় আচ্ছাদিত চেতন—না, কি বলো?

পুষ্প খিল্ খিল্‌ করে হেসে বল্লে—আলবৎ। নইলে তুমি কি ভাবো তুমি খুব উন্নতি করেচ?

—না, তাই জেনে নিচ্চি তোমার কাছে।

—জেনে নিতে হবে কেন, নিজে বুঝতে পারচো না, না? কখনো ভগবানকে ডেকেচ? তাঁর দিকে মন দিয়েচ জীবনে? তাঁকে বোঝবার চেষ্টা তো দূরের কথা। আমার কথা বাদ দাও যতীনদা, আমি তুচ্ছাদপি তুচ্ছ, কিন্তু বড় বড় বিদ্বান, জ্ঞানী, গুণী লোকের মধ্যেও অনেকে মুকুলিত চেতনও নয়। পূর্ণ বিকচিত তো ছেড়ে দাও, বিকচিত চেতনই বা ক'জন? পৃথিবীতে বা এই লোকে কোথাও জিনিসটা পথেঘাটে মেলে না। তবে নেই তা নয়, আছে।

—একজন তেমন লোকের কাছে একদিন নিয়ে যাবে ?

—আমার কি সাধ্যি যতীনদা ? তাঁদের দেখা পাওয়া কঠিন, ধরা দিতে চান না সহজে। আচ্ছা একজন মানুষকে আমি জানি—যাবে সেখানে ? চলো, একটুখানি দেখিয়ে দিই, সেখানে গিয়ে দেখে চলে আসবে, কোনো কথাবার্তা বোলো না। আশা বৌদিকে ছেড়ে একটু চলো দিকি। পৃথিবীর এ সব আবহাওয়া তোমার পক্ষে যে কত খারাপ তা তুমি বুঝতে পারবে না।

যতীন হেসে বল্লে—কেন, ম্যালেরিয়া ধরবে ?

—আত্মারও ম্যালেরিয়া আছে। দেহ থেকে মুক্ত হয়েচ বলে গুমর কোরো না। এমন ম্যালেরিয়া ধরে যাবে মনের আত্মার যে কেঁদে কূল পাবে না যতীনদা। তখন ডাক্তার দেখাতে হোলে এই ছাই-ফেলতে-ভাঙা-কুলো পুষ্প হতভাগীকেই দরকার হবে।

পৃথিবী দেখতে দেখতে নিচে মিলিয়ে গিয়েচে ততক্ষণ। সাদা সাদা মেঘ, অনন্ত আকাশ। সূর্যের আলোর রং আরও সাদা। মানুষের স্থূল চোখ হোলে ধাঁধিয়ে যেতো। যতীন ভাবলে, এই তো রাত দেখে এলাম কলকাতা সহরে, এখানে চোখ-ধাঁধানো সূর্যের আলো ! জগতে সব ভেল্‌কিবাজি, অথচ পৃথিবীতে বসে কিছু বোঝবার জো নেই।

ভুবর্লোকের বিশাল আলোর সরণী দিক থেকে দিগন্তরে প্রসপিত তাদের সামনে। বহু লোক যাতায়াত করচে, কেউ ধূসর বর্ণের, কেউ লাল মেটে সিঁদুরের রং, কচিৎ কেউ নীল রঙের। পুষ্পকে যতীন বল্লে—দ্যাখো বেশির ভাগ আত্মাই কিন্তু ছাই রঙের আর লাল রঙের। নীলবর্ণের আত্মা পথে ঘাটে কত কম।

পুষ্প হেসে বল্লে—তুমিও ওদের দলে। ভেবো না তুমি নীলবর্ণের দেহধারী আত্মা। অনেক উঁচু জীব তারা। পথে-ঘাটে তাঁদের কি ভাবে দেখবে ? ও যা দেখচো, ওরাও তেমন উঁচু স্তরের নয়। পঞ্চম স্বর্গের লোকের দেহ উজ্জ্বল নীল, দামী নীল রঙের হীরের মত। সে বড় একটা দেখতে পাবে না।

—তারও ওপরে ?

—উজ্জ্বল সাদা। ষষ্ঠ সপ্তম স্বর্গের আত্মারা দেবদেবী, তাঁদের দিকে চাইলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

—তোমার মত ?

হঠাৎ যতীন লক্ষ্য করলে সে এমন এক স্থানে এসে পড়েচে যেখানকার বায়ুমণ্ডলে একটি অদ্ভুত নিস্তব্ধতা ও পবিত্রতা আত্মার চিরযৌবন নির্দেশ করচে যেন। কিসের সুগন্ধ সর্বত্র, সেই গন্ধে ভরা বনপথের আবছায়া অন্ধকারে শত শত চিরযৌবনা অভিসারিকা যেন চলেচে তাদের পরমপ্রিয়ের মিলন আকাঙ্ক্ষায়, কত যুগের কত রাজ্য-সাম্রাজ্যের অতীত কাহিনীর দুঃখবেদনা যেন এর পরিবেশকে কোমল করুণ করে রেখেচে—মুখে ঠিক বোঝানো যায় না, কিন্তু যতীন যেন হঠাৎ বুঝলে মনে সে অনন্তকালের শাশ্বত অধিবাসী, চিরযৌবন, অমর আত্মা—অনাদ্যন্ত বিশ্বের লীলাসহচর, সে ছোট নয়, পাপী নয়, পরমুখাপেক্ষী নয়—ভগবানের চিহ্নিত

শিশু, অন্ধ হতভাগ্য আত্মাকে টেনে তোলবার জন্যে তার জন্মমৃত্যুর আবর্ত-পথে সুখ-দুঃখময় পরিভ্রমণ।

অদূরে একটি সাদা পাথরের মন্দির, মন্দিরের চুড়োটা তার গুম্বুজের তুলনায় একটু যেন বেশি লম্বা বলে মনে হোল যতীনের। কিন্তু আশ্চর্য রকমের দুগ্ধ-ধবল কী পাথরের তৈরী, না মার্বেল, না এলাবেস্টাস, যেন স্বয়ংপ্রভ পালিশ করা স্ফটিক প্রস্তরে ওর বিমান ও জঙ্ঘা গাঁথা।

পুষ্প বল্লে—খুব বড় একজন ভক্ত সাধকের আশ্রমে তোমায় এনেচি।

মন্দিরের চারিপাশে খুব বড় বাগান। প্রায় সবই ফুলের গাছ, কিন্তু অত সুন্দর ও সুগন্ধি ফুল এ পর্যন্ত যতীনের চোখে পড়ে নি। খুব বড় উদ্যানশিল্পীর রচনার পরিচয় সেখানকার প্রতিটি ফুলগাছের সারিতে, লতাবিতানের সমাবেশে। যতীন ভাবলে—এ স্তরেও বাগান থাকে? এসব করে কে? কে গাছ পোঁতে না জানি! পৃথিবীর মত কোদাল দিয়ে মাটি কোপাতে হয় নাকি?

পুষ্প একটি নিভৃত লতাবিতানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল যতীনকে সঙ্গে করে।

ভেতর থেকে কে বল্লে—এসো মা, তোমার অপেক্ষা করচি—

পুষ্প ও যতীন দুজনে লতাকুঞ্জের মধ্যে ঢুকে দেখলে একজন জ্যোতির্ময়দেহ সুশ্রী বৃদ্ধ পাথরের বেদীতে বসে। দুজনে পাদস্পর্শ করে প্রণাম করলে।

ভুর ভুর করচে চন্দন ও ফুলের সুবাস লতাবিতানে, অথচ শৌখিন বিলাসলালসার কথা মনে হয় না সে সুগন্ধে, মনে জাগে অতীতকালের ভক্তদের প্রেমোচ্ছল অনুভূতি, মনে জাগে ভগবানের নৈকট্য, শান্ত পবিত্রতার আনন্দময় মর্মকেন্দ্র। দিগন্তে বিলীন প্রেমভক্তির মধুর বেণুরব কান পেতে শোনো এখানে বসে বসে, শুনে নবজন্ম লাভ করো।

বৃদ্ধ বল্লেন—আগে গোপাল দর্শন করে এসো—

মন্দিরের কাছে গিয়ে ওরা দেখলে নীল রঙের পাথরের অতি সুশ্রী একটি গোপালমূর্তি, যেন হাসচে—এত জীবন্ত। নানা রঙের ফুল দিয়ে বিগ্রহের পাদপীঠ সাজানো, গলায় বনফুলের মালা। পুষ্প করজোড়ে কতক্ষণ ভাবে তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল—যতীন ভক্ত-টক্ত নয়, সে একটু অধীর ভাবেই পুষ্পের ভাব ভাঙবার প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

যতীন অবশেষে পুষ্পকে বল্লে—ইনি কে?

—ইনি কে আমি জানিনে। সেকালের একজন বড় বৈষ্ণব আচার্য—পৃথিবীতে নাকি এখনও এঁর আবির্ভাবের তিরোভাবের উৎসব হয়। বহুদিন পৃথিবী ছেড়ে এসেচেন।

বৈষ্ণব সাধু জিজ্ঞেস করলেন—বিগ্রহ দর্শন করলে?

যতীন বল্লে—দেখেচি, অতি চমৎকার। প্রভু, আপনি কতদিন পৃথিবী থেকে এসেচেন?

—অনেককাল। এখানে ওসব হিসেব রাখবার মন হয় নি, কি হবেই বা পৃথিবীর হিসেব রেখে?

যতীনের মনে অনেক সংশয় উঁকি মারছিল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বল্লে—প্রভু, এখানেও বিগ্রহ?

—কেন বল তো? কি আপত্তি তোমার?

—এ তো স্বর্গ। ভগবানের সাক্ষাৎ এখানে পাওয়া যাবে। কাঠ পাথরের মূর্তি পৃথিবীতে দরকার হতে পারে, এখানে কেন?

বৈষ্ণব ভক্তটি হেসে বল্লেন—ভগবানের সাক্ষাৎ তুমি যেভাবে বলচো ওভাবে পাওয়া যায় কিনা জানিনে। আমি পৃথিবীতে এই বিগ্রহের পূজারী ছিলাম, বড় ভালবাসি ওঁকে, ছেড়ে থাকতে পারিনে—তাই এখানে এসে এই মন্দির স্থাপন করে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেচি, ওঁরই সেবা-আরাধনায় দিন কাটে বড় আনন্দে। মন্দির আর বাগান সবই মানসী কল্পনায় সৃষ্টি করেচি, এ স্বর্গে তা করা যায় তা নিশ্চয়ই জানো।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তা এর নিচের স্বর্গেও দেখেচি।

—আমার দেবতা শুধু পাথরের নয়, জীবন্তও বটে। কিন্তু তোমাকে তো দেখাতে পারবো না। আমার মা দেখতে পারেন। দেখেচেনও একবার।

পুষ্প আবদারের সুরে বল্লে—আপনি দয়া করলে ইনিও দেখতে পারেন, বাবা।

সাধু হেসে বল্লেন—ইনি দেখতে পারেন না। ইনি ভাবেন, ভগবানকে নিয়ে আমি এভাবে পুতুলখেলা করচি। বালগোপাল বড় লাজুক, এঁর সামনে বার হবেন না। যে তাঁকে মন অর্পণ করে ভাল না বেসেচে, বিশ্বাস না করেচে—তিনি যেচে অপমান কুড়ুতে যাবেন সেখানে? ভগবান যখন ইষ্টদেবের বেশে লীলা করেন কৃষ্ণ সেজে, কালী সেজে,—তখন তিনি মানুষের বা দেবদেবীদের মনোভাব—যেমন রাগ, লজ্জা, মান, অভিমান, এমন কি ভয় পর্যন্ত পান! এই তো লীলা—এরই নাম লীলা। বিরাট ঐশী শক্তি যা বিশ্বচরাচর নিয়ন্ত্রণ করচে, তাকে কে ভালবাসতে পারে আপনার ভেবে? শত শত নক্ষত্র, শত শত সূর্য যার ইঙ্গিতে লয় হয়, যে পলকে সৃষ্টি, পলকে স্থিতি, পলকে প্রলয় করতে পারে—তাকে কে ভক্তি করতে পারে, যদি তিনি—

মন্দির থেকে চঞ্চল, মধুর, সজীব কণ্ঠে কে বলে উঠলো—ওখানে বসে বক্‌বক্ না করে এখানে এসে আমায় একবার জল খাইয়ে যাও না বাপু? তেষ্টায় মলুম—

সাধু চমকে উঠলেন, পুষ্প ও যতীন চমকে উঠলো।

পুষ্প হেসে বল্লে—যান, যান, জল খাইয়ে আসুন—

যতীন অবাক হয়ে বল্লে—কে ছেলেটি?

সাধু যতীনের মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন—বুঝতে পারলে না? ঐ তো বালগোপাল। তোমার খুব ভাগ্য তোমাকে গলার স্বর শুনিয়ে দিলেন। আমার পুষ্প মায়ের ভাগ্য। যাই আমি—

সাধুর মুখে স্নেহ বাৎসল্যের রেখা ফুটে উঠলো, তৃষ্ণার্ত সন্তানকে পানীয় জল দেবার ব্যাকুলতা নিয়ে তিনি মন্দিরের দিকে অদৃশ্য হোলেন।

যতীন ভাবলে, এও পুতুলখেলা, নয় আবার!

পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিলে। সাধু অন্তর্যামী, সবার মনের কথা বুঝতে পারেন,

অন্তত তার তো মনের অন্ধিসন্ধি খুঁজে বার করেচেন। এখানে কিছু ভাবা হবে না।

পুষ্প হঠাৎ বলে উঠলো—মনে পড়েচে, ইনি বৈষ্ণব আচার্য রঘুনাথ দাস।

বেলা পড়ে যেন অপরাহ্ণ হয়ে এসেচে। অপূর্ব পুষ্প-সুবাসে আশ্রম আমোদিত। বৈষ্ণব সাধু বল্লেন—বিকেল বড় ভাল লাগে, তাই সৃষ্টি করি। নইলে এখানে আর সকাল বিকেল কি? সূর্য নেই, চন্দ্র নেই, অন্ধকারও নেই। হ্যাঁ, কি সংশয় তোমার, যতীন? এখনও যায়নি, অন্ধকার বড় একগুঁয়ে। তাড়ানো যায় না।

—প্রভু কি করি বলুন। আপনি বৈষ্ণব আচার্য, কতদিনের লোক আপনি?

—মহাপ্রভুর সমসাময়িক। সপ্তগ্রামের নাম শুনেছিলে? সেই সপ্তগ্রামে বাড়ী ছিল আমার।

—আপনি এখানে কেন? আর সব কোথায় আপনার দলের? সাড়ে তিনশো বছর ধরে এ পুতুলখেলা নিয়ে—

—তোমার মন এখনও কাঁচা। আমি তোমাকে তো বলেচি, মুক্তি চাইনি। সপ্তগ্রামে হরিদাস শিক্ষা দিয়েছিল ভক্ত চায় ভগবানের প্রতি ভক্তি তাঁর প্রতি যেন মন থাকে। আমাদের তাতেই আনন্দ। তাঁর ভজন আরাধনা নিয়েই আছি। খুব সুখে আছি। মহাপ্রভু ভগবানে মিলিয়ে গিয়েচেন, তিনি নারায়ণের অংশ, মাঝে মাঝে আমাদের আহ্বানে প্রকট হন, এই আশ্রমে আসেন। তাঁর পৃথিবী থেকে এখানে আসার দিনে আশ্রমে উৎসব হয়, সে উপলক্ষে বড় বড় বৈষ্ণব আচার্য এমন কি জীবগোস্বামী মীরাবাঈ পর্যন্ত আসেন। ওঁরা আরও উচ্চ লোকে আছেন। অনেকে জীবকে শিক্ষা দিতে দু-একবার ইতিমধ্যে পৃথিবীতে নেমেছিলেনও।

—আর একটা কথা আপনাকে—

—বুঝেছি। তুমি যা জিজ্ঞেস্ করবে তার মুখে উত্তর চাও, না সে জগৎ দেখতে চাও? অর্থাৎ তুমি জানতে চাইচ, পৃথিবী ছাড়া অন্য জীবলোক আছে কি না।—কেমন তো? বহু বহু আছে। বিশ্বের অধিদেবতার ভাণ্ডার অনন্ত। কোনো কোনো জগৎ পৃথিবী থেকেও তরুণ, সজীব। সেখানে সব মানুষ অত্যন্ত বেশি তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে, তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে মরে যায়। আবার বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত জগৎ আছে—সেখানে মানুষ পৃথিবীর চেয়ে অনেক দীর্ঘজীবী, ধীরেসুস্থে জীবনের কাজ করে। পৃথিবীর হিসেবে যার বয়স পঁচিশ বছর, সেও বালক। ষাট বছর যার বয়স, সে নব্যযুবক। যাদের উন্নতি হতে দেরি হবে জানা যাচ্চে পৃথিবীতে, এমন সব আত্মাকে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে দেওয়া হয় না, দিলে সে পূর্ব জন্মের জীবদেরই পুনরাবৃত্তি করবে মাত্র। সুতরাং তাদের এই সব ধীর সানন্দ প্রৌঢ় পৃথিবীতে পাঠানো হয়। অনেকদিন সময় পায় বলে শেখবার ও শোধরাবার অবকাশ ও সুযোগ পায়। বিশ্বের দেবতার এমন আইন, সকলকেই অনন্ত মঙ্গলের পথে যেতে হবে—যে সহজে না যাবে, তাকে দুঃখ দিয়ে পীড়ন করে চোখ ফোটাবেনই। সেসব পৃথিবীতেও জীবশিক্ষার জন্যে উচ্চস্তরের আত্মারা নেমে যান দেহ গ্রহণ করে। পৃথিবী থেকেও বেশি কষ্ট পেতে হয় তাঁদের সে সবখানে। কিন্তু

ভগবানের কাজ যাঁরা করেন, তাঁরা জানেন, দুদিনের দেহ, দুদিনের কষ্ট, দুদিনের অপমান। শাশ্বত-আত্মায় কোনো বিকার স্পর্শ করে না, তার জরা নেই, মৃত্যু নেই।

যতীন মুগ্ধ হয়ে শুনছিল মহাপুরুষের কথা, এর মধ্যে অবিশ্বাস এনে লাভ নেই। আজ তার অত্যন্ত সুদিন, এমন একজন লোকের দর্শনলাভ করেচে সে।

বৈষ্ণব সাধু আবৃত্তি করচেন—

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ !

যতীনের দিকে চেয়ে বল্লেন—তোমাকে যা কিছু বলেচি, সব তাঁর কৃপা। শ্রীধর স্বামীর ঐ শ্লোক তো শুনলে? তিনিই, মূক যে, তাকে করেন বাচাল। গোপালের এমনি কৃপা, এমনি শক্তি। তাঁর বিশ্ব, তিনি যা কিছু করতে পারেন।

যতীন বল্লে—এ ভাবে কত কাল থাকবেন আর ?

—অনন্ত কাল থাকতে পারি, যদি তাঁর ইচ্ছা হয়।

হঠাৎ তিনি উৎকর্ণ হয়ে বল্লেন—বৃন্দাবনে গোবিন্দ বিগ্রহের আরতি হচ্চে, চলো দেখে আসি—

পুষ্প খুশি হয়ে বল্লে—আমাদের নিয়ে যাবেন ! আপনার বড় কৃপা—

বৈষ্ণব সাধুর জ্যোতির্ময় ঈষৎ নীলাভ দেহ ব্যোমপথে ওদের আগে আগে উড়ে চলেচে, ওরা তাঁর পেছন পেছন চলেচে। নভোচারী দু-একটি আরও অন্য আত্মাকে ওরা পরে দেখতে পেলে। যতীন কখনো বৃন্দাবন দেখেনি, তাই বৈষ্ণব সাধু ওকে চার-পাঁচটি বড় বড় গাছের ক্ষুদ্র বাগান দেখিয়ে বল্লেন—ওই দেখ চীরঘাট, ওখানে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য স্নান করে উঠে গোপালের দেখা পেয়েছিলেন। বড় পুণ্যস্থান, প্রণাম করো।

তার পরেই একটা বড় মন্দিরের গর্ভগৃহে সেকালের ঝুলোনো প্রদীপের আলোয় একটি সুন্দর বিগ্রহের সামনে ওরা গিয়ে দাঁড়ালে। অনেক লোক আরতি দর্শন করচে। একটা আশ্চর্য দৃশ্য যতীন এখানে প্রত্যক্ষ করে স্বর্গ-মর্তের অপূর্ব সম্বন্ধ দেখে অবাক হয়ে গেল। দেহধারী দর্শকদের মধ্যে বহু অশরীরী দর্শক এসে দাঁড়িয়ে বিগ্রহের আরতি দর্শন করচেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকটি আত্মার দিব্য জ্যোতির্ময় দেহ দেখে যতীন বুঝলে ওঁরা উচ্চ শ্রেণীর ভক্ত সাধক।

যতীনের সঙ্গী বৈষ্ণব সাধু একজনকে দেখিয়ে বল্লেন—কবি ক্ষেমদাস। উনি বৃন্দাবনের বড় ভক্ত, এর মন্দির, এর কুঞ্জবন ছেড়ে থাকতে পারেন না।

যতীন বল্লে—একটা কথা শুনেছিলাম, আত্মিক লোক থেকে বার বার এলে নাকি আত্মার অনিষ্ট হয় ?

সাধু বল্লেন—এসো, কবিকে প্রশ্নটা করি।

সাধু ও ক্ষেমদাস পরস্পরকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন। সাধুর প্রশ্ন শুনে কবি ক্ষেমদাস হেসে বল্লেন—শ্রীরূপগোস্বামীর উজ্জ্বল নীলমণিতে গোপীদের বিরহের দশদশার বর্ণনা আছে—চিন্তা, উদ্বেগ, প্রলাপ, এমন কি মৃত্যুদশা, উন্মাদ রোগ পর্যন্ত। আমার এমন এক সময় ছিল

বৃন্দাবনের যমুনাতট না দেখলে প্রায় তেমনি অবস্থা-প্রাপ্তি ঘটতো। বৃন্দাবনের মত স্থানে এলে অনিষ্ট হয় না, কৃষ্ণে আসক্তি তো আত্মার ইষ্টই করে, উর্ধ্বলোকে নিয়ে যায়।

বৈষ্ণব সাধু বল্লেন—কৃষ্ণে আসক্তি কৃষ্ণপদে মতি এনে দেয়। হরিদাস স্বামী কি বলেছিলেন সপ্তগ্রামে মনে নেই?

ক্ষেমদাস বল্লেন—শুনেচি বটে। তবে মনে রাখবেন, আমি কবি ছিলাম, ভক্ত ছিলাম না আপনাদের মত। আপনারা ছিলেন শ্রীচৈতন্যের পার্শ্বচর, অপেনাদের মত ভাগ্য আমি করি নি। আমার কৃষ্ণ বিশ্বের বনে বাঁশি বাজিয়ে বেড়ান, বালকস্বভাব—উদাস; কেউ যদি ডাকে তার কাছে যান, না ডাকলে আপন মনেই একা একা থাকেন। অনাদিকাল থেকে এমনি। তাঁকে যদি ভালবেসে কেউ ডাকে, তবে তিনি সঙ্গী পেয়ে খুশি হন—তিনি করুণস্বভাব, ভালবাসার বশ।

পুষ্প বল্লে—কেন একা থাকেন? রাধা কোথায়?

—ও সব কল্পনা। এই সব ভক্তপ্রভুরা বানিয়েছেন। কে রাধা? যে নারী ভালবাসে তাঁকে, সে-ই রাধা। সে-ই তাঁর নিত্যলীলার সহচরী। মীরাবাঈ যেমন।

—মীরাবাঈ আছেন?

—আছেন। তাঁরা নিত্যলীলার সহচরী ভগবানের—যাবেন কোথায়? বহু পুণ্যে তাঁদের দর্শন মেলে। বহু উর্ধ্বলোকে ওঁদের অবস্থিতি। আবার বিশ্ব ব্যেপে ওঁদের অবস্থান, তাও বলতে পারো। পৃথিবীর ব্যক্তিত্ব তাঁর নষ্ট হয়ে গিয়েচে বহুকাল, ও তো স্থূল দেহ ধরে লীলা করবার জন্যে যাওয়া। ওটা কিছু নয়। পৃথিবীর সেই মীরাবাঈকে কোথাও পাবে না। আছেন খাঁটি তিনি—অর্থাৎ যে শুদ্ধ, বুদ্ধ, চৈতন্যস্বরূপ আত্মা মীরাবাঈ সেজে অবতীর্ণ হয়েছিলেন দুদিনের জন্যে, তিনি আছেন।

যতীন বলে উঠলো—তাই আপনার মত একজন কবি বলেচেন—**All the world's a atage, and the men and women merely players**—অর্থাৎ—

ক্ষেমদাস মৃদু হেসে বল্লেন—বুঝেচি। গভীর সত্যবাণী। নানাদিক থেকে সত্য—নানাভাবে।

যতীন একটু বিস্ময়ের সুরে বল্লে—আপনি কি ইংরিজি জানেন?

—ভাষার সাহায্যে বুঝিনি, তোমার মনের চিন্তা থেকে ও উক্তির অর্থ বুঝেচি। ওঁর সঙ্গে আমার দেখাও হয়েছে। পঞ্চম স্তরে কবি-সম্মেলন হয়, সেখানে পৃথিবীর সব দেশের বড় বড় কবি আসেন—

যতীন ব্যাকুল আগ্রহের সুরে বল্লে, আপনি কালিদাসকে দেখেছেন? ভবভূতি?

—সে সৌভাগ্য আমার হয়েচে। পৃথিবীর সে কালিদাস নয়—যে নিত্য মুক্ত কবিআত্মা কালিদাসরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সেই আত্মার সঙ্গে আমার পরিচয়। একবার নয়, অনেকবার নানা দেশে নানা প্রাকৃত দেহ ধারণ করে তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু আসলে তিনি অপ্রাকৃত দেহধারী চিদানন্দময় আত্মা; আজ নাম কালিদাস, কাল নাম চণ্ডীদাস, পরে ক্ষেমদাস—তাতে কি?

—কবি-সম্মেলন হয় কোন্ সময় ?

ক্ষেমদাস জিজ্ঞেস করলেন—তুমি বুঝি নতুন এসেচ পৃথিবী থেকে ? তোমার কথাতে মনে হচ্ছে। এখানে সময়ের কি মাপ ? কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ—অনন্তকাল বায়ুর মত শন্ শন্ বইচে। বিদগ্ধমাধবে শ্রীরূপগোস্বামী বলেচেন তাই—অনর্পিতচরীং চিরাৎ—রূপগোস্বামীও কবি, তিনিও আসেন। আর তুমি জানো না, যাঁর সঙ্গে এসেচ এই আচার্য রঘুনাথ দাসও কবি ? এঁর রচিত চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষ কি পড়ে থাকবে ? পড়েচ বলে মনে হচ্ছে না। শোনো তবে—

ক্বচিন্মিশ্রাবাসে ব্রজপতিসুতস্যোরুবিরহাৎ
শ্লথাৎ শ্রীসন্ধিত্বাদ্দধতি দৈর্ঘ্যং ভুজপদোঃ।

কেমন ছন্দ ? কেমন লাগচে ওঁর শ্লোক ?

যতীন বিষণ্ণমুখে বল্লে—আজ্ঞে বেশ !

বৃন্দাবনের গোবিন্দ-মন্দিরের আরতি বহুক্ষণ থেমে গিয়েচে। পাশের রাজপথ দিয়ে দু'একখানা গাড়ী যাতায়াত করচে, মন্দিরের বড় বড় দরজায় আলো জ্বলচে, কোথা থেকে উগ্র বকুল ফুলের গন্ধ ভেসে আসচে বাতাসে, মন্দিরের সামনে একটা হিন্দুস্থানী টাঙ্গাওয়ালা যাত্রীর সঙ্গে ভাড়া নিয়ে কি বকাবকি করচে। যতীন ভাবলে, স্বর্গ-মর্তের কি অদ্ভুত সম্বন্ধ ! অথচ বেঁচে থাকতে পৃথিবীর লোকে কেউ এ রহস্য জানে না। মৃত্যুভয়ে ভীত হয়, এত বড় জীবনের খবর যদি কেউ রাখতো, প্রেম-ভক্তির এ সম্পর্ক যদি রাখতে জানতে ভগবানের সঙ্গে—তবে কি তুচ্ছ বিষয়-আশয়, টাকা-কড়ি, জমিদারী নিয়ে ব্যস্ত থাকে ? এইমাত্র যে লোকটা সামনের রাস্তা দিয়ে মোটর চড়ে গেল ও হয়তো একজন মাড়োয়ারী মহাজন, সারাজীবন ব্যাঙ্কে টাকা মজুত করে এসেচে—জীবনের অন্য কোনো অর্থ ওর জানা নেই, কেবল তেজীমন্দী, লাভ-লোকসান এই বুঝেচে। জয়পুর শহরে হয়তো ওর সাততলা অট্টালিকা। কিন্তু হয়তো ছেলেগুলো অবাধ্য, বেশ্যাসক্ত, স্ত্রী কুচরিত্রা। মনে সুখ নেই—অথচ ও কি জানে, এই পাশেই মদনমোহনের মন্দিরে এই গভীর রাত্রে ভিন্ন ভিন্ন লোকের কবি সাধুরা আজ সমবেত হয়েচেন, সেখানে পুষ্পের মত নারীর স্নেহ, কত শতাব্দীর পার থেকে ভেসে আসা অমর মহাপুরুষদের বাণী, বকুলপুষ্পের সুবাস, ভগবানে অর্পিত মধুর প্রেমভক্তির পরিবেশ—এইখানেই স্বর্গ-মর্ত্যের বিশাল ব্যবধান রচনা করেচে। হায় অন্ধ পৃথিবীর মানুষ!

১৫

পৃথিবীর হিসেবে দীর্ঘ দু বছর কেটে গেল।

সেদিন পুষ্প ও যতীন বসে কথা বলচে বুড়োশিবতলার ঘাটে, এমন সময় পুষ্প হঠাৎ চীৎকার করে বল্লে—এই ! থামো—থামো—খবরদার—

পরক্ষণেই সে ব্যাকুল, উদ্বিগ্ন মুখে বহুদূর আকাশের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বল্লে—যতীনদা, যতীনদা—

যতীন বিস্মিত সুরে বল্লে—কি হোল? পুষ্প বল্লে—কিছু না। যতীন নাছোড়বান্দা, সে বার বার বলতে লাগলে—কি হোল বল না পুষ্প? বলবে না?

অবশেষে পুষ্প বল্লে—আশা-বৌদিকে খুন করতে যাচ্চে তার সেই উপপতি নেত্য—

—সে কি!

—ঐ যে, দেখতে পাচ্চ না?

যতীন ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বলে—চলো চলো ছুটে যাই, সামলাই গিয়ে—আমি তো কোনো দিকে কিছু দেখচি নে—ওঠো।

বিস্মিত যতীন পুষ্পের দিকে চেয়ে দেখলে যে তার যাবার কোন ব্যস্ততা নেই। সে চুপ করে বসেই রইল, কিছুক্ষণ পরে পুষ্পের বিশাল আয়ত চোখ দুটি বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো।

যতীন বল্লে—কি হয়েচে, চলো চলো—

—গিয়ে কি হবে। এ যাত্রা রক্ষা হোল গিয়ে—

—বেঁচে গিয়েচে?

—আপাতত বটে। আহা, কি দুঃখ আশা-বৌদির!

—আমি সেখানে যাবো পুষ্প। চলো দেখা যাক—

—না।

—তোমার ওই সব কথা আমার ভাল লাগে না পুষ্প, সত্যি বলচি। আমি আলবৎ যাবো সেখানে। আমার মন কেমন হচ্চে বল তো?

—সেজন্যেই তোমার আরও যাওয়া উচিত নয়। দেখে কষ্ট পাবে খুব।

—চলো পুষ্প, তোমার পায়ে পড়ি, আচ্ছা তুমি বোঝো সব, অথচ মাঝে মাঝে—

অগত্যা পুষ্প ওকে নিয়ে কলকাতায় আশার বাসায় এসে উপস্থিত হোল। তখন যতীন বুঝতে পারলে কেন পুষ্প এখানে তাকে আসতে চায় নি। নেত্য আজকাল মদ খায়, মাতাল অবস্থায় এসে দিন-দুপুরে সে আশাকে এমন মার দিয়েচে যে, সে ঘরের মেঝেতে পড়ে ভয়ার্ত চোখে দুর্দান্ত মাতালটার দিকে চেয়ে আছে। দরজার চৌকাঠের এপারে একখানা নেপালী কুক্‌রি পড়ে, সম্ভবত নেত্যর হাত থেকে ঠিকরে পড়ে থাকবে। ওদের দোরের বাইরে আশ-পাশের ঘরের ভাড়াটেরা জড়ো হয়ে উঁকি মেরে মজা দেখচে। নেত্য মত্ত অবস্থায় টলচে ও হাত নেড়ে নেড়ে জোর গলায় আস্ফালন করচে—ওকে আমি আজ খুন করে ফেলবো—আচ্ছা পাল মশায়, আপনি বিচার করুন, ওকে কে খেতে দিচ্চে, পরতে দিচ্চে? ও দেশে না খেয়ে মরছিল কিনা ওকে জিজ্ঞেস করুন না? আমি মশাই হক্ কথা হক্ কাজ বড় ভালবাসি। আমি আনলাম ওকে এখানে, খাওয়াই পরাই, অথচ সেই শত্তু ব্যাটা এসে তলায় তলায় ফুর্তি মারে। কত দিন পই পই করে বারণ করিচি—করি নি? তেমন পুরুষ বাপে নেত্যনারাণের জন্ম দেয় নি—আজ তোকে খুন করে ফাঁসি যাবো, সেও থোড়াই কেয়ার করে এই শর্মা। এত বড় তোর বদমাইসি! কম করেচি আমি তোর জন্যে? তোর নিজের বিয়ে করা ভাতার কোনো দিন তোকে খেতে দেয়নি, আর আমি কিনা···দিয়েচে কোনো দিন সেই যতীন?

এই সময় আশা আধ-বসা অবস্থায় উঠে ঝাঁঝের সঙ্গে বল্লে—খবরদার ! তিনি স্বগ্‌গে গিয়েচেন, তাঁর নামে কিছু বোলো না—

নেত্য বিদ্রূপের সুরে বল্লে—ওরে আমার স্বামী-সোহাগী সতী রে ! মারো মুখে ঝাঁটা, বলতে লজ্জাও করে না ? আমি বলচি, না তুই বলতিস্ সেই যত্‌নেটা বেঁচে থাকতে ? আবার স্বামী-সোহাগ দেখাতে এসেচেন, মরণ নেই ? ভারি স্বামী ছিল মুরোদের, সব জানি, বিয়ে করে একখানা কাপড় কিনে দেবার, এক মুঠো অন্ন দেবার ক্ষমতা হয় নি—

আশা আবার উঠে বল্লে—আবার ওই কথা ! তিনি মরে স্বগ্‌গে গিয়েচেন, তাঁর নামে কেন বলবে তুমি ?

নেত্য হঠাৎ তেড়ে এসে আশার কাঁধে এক লাথি মেরে বল্লে—স্বামীর সোহাগ উথলে উঠলো বদমায়েশ মাগীর, যে বেরিয়ে এসেচে তার মুখে আবার—গলায় দড়ি দিগে যা—

আশার চেহারা আগের চেয়ে খুব খারাপ হয়ে গিয়েচে, গায়ের রঙেরও আগের মত জলুস নেই, লাথি খেয়ে সে কিন্তু এবার ঠেলে উঠলো। বল্লে—তাই দেবো, গলায় দড়ি দিয়ে তোমায় পুলিশের হাতে যদি তুলে না দিই—

—চুপ—পুলিশ তোর বাবা হয় !

—আবার মুখে ওই সব কথা ?

এইবার একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক এগিয়ে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালো। বল্লে—এসব আপনাদের কি কাণ্ড ? আপনারা না ভদ্দর লোক ? আশপাশের বাড়ীতে গেরস্তর ঝি-বউ সব রয়েচে, এখানে মদ খেয়ে চেঁচামেচি চলবে না। হ্যাংগামা করতে হয়, ন্যাক্‌রা করতে হয়, সরকারী রাস্তা পড়ে রয়েচে। আমার বাড়ী ওসব করলে পুলিশে খবর দিতে হবে—

পালমশায় এবার বোধ হয় সাহস পেয়ে এগিয়ে এসে বল্লেন—আমিও তাই বন্নু। বলি এখানে ওসব কোরোনি—তা মাতালের সামনে এগোতে কি সাহস হয় !

প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটি আশাকে ধরে ঘরের বাইরে আনতে আনতে বল্লে—মাতালের সামনে তক্কো কত্তে আছে, ছিঃ মা—দেখচো না ওর এখন কি ঘটে জ্ঞান আছে ? এসো আমার ঘরে—

আশা চলে যায় দেখে নেত্য জড়িত কণ্ঠে বাজখাঁই আওয়াজে বল্লে—এই, কোথাও যাবিনি বলে দিচ্চি—হাড় ভাঙবো মেরে—খবরদার ! এই ! আমি এখন চা আর ডিমভাজা খাবো—করে না দিয়ে যদি নড়বি—নিয়ে যেও না মাসী—

প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটি যেতে যেতেই বল্লে—আচ্ছা, চা করে ডিম ভেজে আমার ঘর থেকে পাঠিয়ে দিচ্চি বাবা—আপনি একটু শান্ত হয়ে শুয়ে থাকুন—

পালমশায় উপস্থিত লোকজনদের দিকে চেয়ে বল্লে—চলো সব, চলো, কি দেখতে এসেচো সব ? দুটো হাত পা বেরিয়েচে কারো, না ঠাকুর উঠেচে ? বন্নু তখন ওখানে যেওনি, যে যার ঘরে যা খুশি করুক না, তোমার কি ? আসুক দিকি আমার নিজের ঘরে। দেখি কত বড় কে বাপের ব্যাটা !

শেষের কথা ক'টি পৌরুষগর্বে উচ্চারণ করবার সময় তিনি নেত্যনারায়ণদের ঘর থেকে বেশ একটু দূরে বারান্দার প্রায় ওপাশে চলে গিয়েচেন যদিও, তবুও চলতে চলতে একবার পেছন ফিরে দেখে নিলেন, দুর্দান্ত মাতালটা তাঁর কথা শুনলো কিনা।

যতীন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লে—এতদূর নেমেচে ওর অবস্থা! এ আমি ভাবিনি—

পুষ্প বল্লে—ভাবা উচিত ছিল, এ সব জিনিসের এই কিন্তু পরিণাম—এখান থেকে চলো যাই—

যতীন চুপ করে বসে ছিল, আশার দুর্দশা তার মনে গভীর রেখাপাত করেচে। সে দুঃখিত ভাবে বল্লে—তুমি কেবলই এসে চলে যেতে চাও, কিন্তু আমি কোথায় গিয়ে শান্তি পাবো পুষ্প? আমার কর্তব্য পালন করিনি বলেই আজ ওর এই দুর্দশা। আমি যদি স্বামীর কর্তব্য পালন করতাম, যদি আশার জন্যে তেমন টাকাকড়ি রেখে যেতে পারতাম, তাহোলে—

—তোমার ভুল এখনো গেল না।

—কেন, ঠিক কথা বলচি কি না? ভুলটা কোথায়?

পুষ্প মৃদু হেসে ওর পাশে এসে বল্লে—তোমাকে এত ভাল ভাল জায়গায় নিয়ে গেলাম, তোমার বুদ্ধিটা যেমন স্থূল তেমনই রইল—

—কেন?

—আশা বৌদি নিজের কর্ম-ফলে এখনও অনেকদিন এই রকম ভুগবে। তুমি ওর কর্মের বন্ধন কাটাতে পারো সাধ্যি কি? টাকা রেখে যেতে, টাকা সুদ্ধু চলে যেতো। বড়লোকের ছেলেদের তো অনেক টাকা দিয়ে বাপ-মা মরে যায়—তারা উচ্ছন্ন যায় কেন?

—আমি এখানে থাকবো পুষ্প। ওকে ফেলে যেতে পারবো না এ ভাবে—

—তুমি কেন, দরকার হোলে আমিও থাকবো। এখানে থাকতে আমার রীতিমত কষ্ট হয়—তবুও আমি তোমার জন্যে, যদি আশা বৌদির এতটুকুও উপকার করতে পারতাম তবে এখানে থাকতে কিছু আপত্তি করতাম না। কিন্তু তুমি এখনও অনেক জিনিস বোঝো নি। এসব নিষ্ফল চেষ্টা। করুণাদেবীর মুখে শুনেচি করুণার পাত্র মেলানো বড় দুর্ঘট। নয়তো করুণাদেবীর মত শক্তিশালিনী দেবী আশা বৌদিকে এখান থেকে উদ্ধার করতে পারেন না? এক্ষুনি পারেন—কিন্তু তাঁরা জানেন, তা হয় না। জীব নিজের চেষ্টায় উন্নতি করবে, বাঁশ দিয়ে ঠেলে উঁচু করে দিলে জীব উন্নতি করে না! নয়তো ভগবান এক পলকে সব পাপী উদ্ধার করতে পারতেন। তাঁর উদ্দেশ্য বুঝে কাজ করতে হয়। সে তুমি আমি বুঝিনে, কিন্তু করুণাদেবী, প্রেমদেবীর মত দেবদেবীরা অনেকখানি বোঝেন—তাই তাঁরা অপাত্রে—

—আমি না বুঝতে পারি, কিন্তু তুমি ঠিক বোঝো। তোমার দেখবার ক্ষমতা আমার চেয়ে অনেক বেশি। তবুও তোমার সঙ্গে এখানে ওখানে গিয়ে আমার অনেক উন্নতি হয়েচে আগেকার চেয়ে—এখন বুঝিয়ে বল্লে বুঝি। তোমার সেই সন্ন্যাসীর মতে এখন বোধ হয় আমার মুকুলিত চেতন—নয়তো বুঝিয়ে বল্লেও বুঝতাম না, মনে সংশয় জাগতো, অবিশ্বাস জন্মাতো, তা হোলে সে সব তত্ত্ব আমার কোনো কাজে লাগতো না।

এই সময় নেত্যনারাণ ডাকতে লাগলো চেঁচিয়ে—ও আশা, শোনো এদিকে—এই আশা--

প্রৌঢ়া বাড়ীওয়ালী বারান্দায় বার হয়ে বল্লে—একটু চা খাচ্চে, আপনাকেও পাঠিয়ে দিচ্ছি তৈরী হোলে। আশা এখন যেতে পারবে না।

নেত্য গরম মেজাজে বল্লে- কেন যেতে পারবে না—শুনতে পাই কি ? ও আমার মেয়েমানুষ, আমি যখন ডাকবো, আলবৎ আসবে—ওর বাবা আসবে—

এই কথাটা যতীনের বুকে যেন গরম শূলের মত বিঁধলো। আশা তার স্ত্রী, বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে যার সঙ্গে সে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েচে--সেই আশা অপরের 'মেয়েমানুষ' ? নেত্যর হুকুমে তাকে চলতে হবে ? যতীনের মাথা যেন ঘুরে উঠলো। এক মুহূর্তে সমস্ত দুনিয়া বিস্বাদ, মিথ্যে, জোলো হয়ে দাঁড়ালো—মস্ত একটা ফাঁকি, মস্ত একটা ধাপ্পাবাজির মধ্যে পড়ে গিয়েচে সে। পুষ্প-টুষ্প, সন্নিসি-টন্নিসি সব এই মস্ত জুয়োচুরির অন্তর্গত ব্যাপার। নইলে অগ্নিসাক্ষী করে, হোম করে, বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে যাকে সে সহধর্মিণী করেছিল—

কিংবা এই হয়তো নরক !

সে হয়তো নরক ভোগ করচে—স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য করেনি, জোর করে তাকে শ্বশুরবাড়ী থেকে এনে কাছে রেখে সংশোধনের চেষ্টা করে নি, ক্লীবের মত নিশ্চেষ্ট হয়ে ছিল, সেও তমোগুণ। তার জন্যেই এই দারুণ নরক তাকে স্বচক্ষে দেখতে হচ্চে, কে যেন টেনে নিয়ে আসচে এখানে, এই শোচনীয় দৃশ্য দেখতে কে যেন তাকে বাধ্য করচে, নিয়তির মত নিষ্ঠুর সে আকর্ষণ, রেহাই দেবে না তাকে।

পুষ্প বল্লে—চলো যতীনদা, আর এখানে থেকে কষ্ট পেয়ো না—

যতীন দুঃখমিশ্রিত হতাশার সুরে বল্লে - তুমি অতি করুণাময়ী। তুমি জানো যে এ আমার কর্মফলের ভোগ, এ নরক। তুমি দয়া করে তাই কেবল এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইচ, আমি সব বুঝতে পেরেচি এবার। কিন্তু পুষ্প দয়াময়ী, আমার সাধ্যি কি, আমি যাই ? চুম্বক যেমন লোহাকে টানে, আশার ভাগ্য ও আমার কর্মফল পরস্পরকে তেমনি টানচে। টেনে আনচে কোথায় তোমাদের সেই তৃতীয় স্তর থেকে—আমায় সে টানে আসতেই হবে এবং আমি কোথাও যেতেও পারবো না।

পুষ্প দৃঢ়স্বরে বল্লে—তুমি দুর্বল হয়ে হাল ছেড়ে বসে থেকো না, সেও কি পুরুষের কাজ, বীরের কাজ ? তা ছাড়া তোমাকে এই বন্ধন থেকে বাঁচাবো আমি। নইলে তুমি বুঝতে পারচো না কি বিপদ তোমার সামনে—

কিন্তু যতীন কিছুতেই না যেতে চাইতে পুষ্প কিছুক্ষণের জন্যে পৃথিবীতে থেকে চলে গেল, বল্লে—পৃথিবীর ভোরের দিকে সে আবার ফিরে আসবে। কিন্তু রাত দুটোর পর নেত্য মদ্যপানের অবসাদে ঘুমিয়ে পড়াতে যতীন ভাবলে এবার সে স্বস্থানে ফিরতে পারে। আশা বাড়ীওয়ালীর ঘরে ঘুমুচ্চে, সুতরাং এখন আর কোনো ভয় নেই, উদ্বেগ নেই। যেন ভয় বা উদ্বেগ থাকলেই সে ভয়ানক কিছু সাহায্য করতে পারতো !

পৃথিবী ছেড়ে বাইরের আকাশের তলায় এসে সে দেখলে শূন্যপথের সাধারণ চলাচলের মার্গগুলি একেবারে জনশূন্য। কেউ কোথাও নেই। যতীন একটু বিস্মিত হয়ে গেল। পৃথিবীর লোক না দেখতে পাক, কিন্তু অসীম ব্যোমের নানা স্থান দিয়ে বিশেষত ভূপৃষ্ঠ থেকে একশো দেড়শো গজের ওপর থেকেই মেঘপদবীর সমান্তরালে বা তদূর্ধ্বে বহু পথ সীমা-সংখ্যাহীন অনন্তের দিকে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেচে। এই সব পথ কোনো বাঁধাধরা সুরকি সিমেণ্টের তৈরী রাস্তা নয়—আত্মিক জীব, দেব দেবী, উচ্চ জীবগণের গমনাগমন দ্বারা সুনির্দিষ্ট একটা অদৃশ্য জ্যোতিরেখা মাত্র।

সাধারণত বিশ্বের এই রাজমার্গগুলিতে আত্মিক পুরুষেরা সর্বদা যাতায়াত করেন, কিন্তু আজ সেখানে একেবারে কেউ নেই—আরও ওপরে এসে যে স্থান ধূসরবর্ণ আত্মাদিগের অধিষ্ঠানভূমি, সেও জনহীন।

যতীন বুঝতে পারলে না, এরকম ব্যাপারের কারণ কি। আজ এত বছর সে এসেচে আত্মিকলোকের তৃতীয় স্তরে—কিন্তু এমন অবস্থা সে দেখেনি কখনো। তার মনে যেন কেমন ভয়ের সঞ্চার হোল। অথচ কিসের ভয় সে নিজেই জানে না। যে একবার মরেচে, সে আর মরবে না, তবে ভয়টা কিসের?

হঠাৎ যতীন দেখলে একটি লোক যেন আতঙ্কে চারিদিকে চাইতে চাইতে ঝড়ের বেগে উড়ে দ্বিতীয় স্তরের আত্মিক লোক থেকে আরো উর্ধ্বলোকের দিকে পালাচ্চে। পৃথিবী হোলে বলা চলতো লোকটা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাচ্চে। ব্যাপার কি? এর নিশ্চয় কোনো গুরুতর কারণ আছে।

যতীন তাকে কিছু বলতে গেল, কিন্তু তার পূর্বেই লোকটা অন্তর্হিত হোল—মনে হোল পলায়মান ব্যক্তি যেন হাতের ইঙ্গিতে তাকে কি বল্লে—কি বিষয়ে সাবধান করতে গেল।

লোকটি অদৃশ্য হবার কিছু পরেই যতীনের মনে হোল কী এক ভীষণ টানে তাকে নীচের দিকে যেন টেনে নিয়ে যাচ্চে। অতি ভীষণ সে টানের বেগ, তিমির-প্রসারক যেন কোন্ বিশাল চৌম্বক শক্তি জগৎব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ করে তার জাল বিস্তার করেচে—যতীনের সামনে, পাশে, দূরে, চারিদিকে ঝড়ের মত কোথা থেকে সেই ভীষণ শক্তির লীলা এক মুহূর্তে ব্যাপ্ত হয়ে গেল। যতীন যেন ভীম আবর্তে তলাতল পাতালের অভিমুখে কোথায় চলেচে…তার জ্ঞান লোপ পেয়ে আসচে…কেবল এইটুকু সে লক্ষ্য করলে, শুধু সে নয়, ঝড়ের মুখে তার মত বহু জীবাত্মা কুটোর মত কোথায় চলেচে বিষম ঘূর্ণিপাকের টানে!…তারপর একটা আর্ত চীৎকার স্বর, এক কি বহু সম্মিলিত কণ্ঠের আর্তনাদ, যতীন ঠিক বুঝতে পারচে না, তার সংজ্ঞা নেই, অতিপ্রাকৃত কী এক বিষম শক্তির অমোঘ আকর্ষণ তাকে খেলার পুতুলে পরিণত করেচে…

ভয়ানক অন্ধকার তার চারিদিকে, এই কি তলাতল পাতাল? পৃথিবী কোথায়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, চন্দ্র সূর্য কোথায়, পুষ্প কোথায়? করুণাদেবী কোথায়, হতভাগিনী আশা কোথায়—সব লুপ্ত, একেবারে! কোন্ রসাতলে সে চলেচে দুর্লঙ্ঘ্য আকর্ষণে।

অনেকক্ষণ…অনেক যুগ যেন কেটে গিয়েছে…জ্ঞান নেই যতীনের। অন্ধকার ছাড়া আর কোনদিকে কিছু নেই। বহুদিন সে কী এক গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে ছিল। সব অন্ধকার…বিস্মৃতি ‥

পুষ্পের ডাকে তার চৈতন্য হোল। পুষ্প তাকে ডাকচে, ও যতীনদা, যতীনদা, বেরিয়ে এসো।

পুষ্প ও আর একজন তাকে প্রাণপণে ডাক দিচ্চে, যেন কতদূর থেকে…

যতীন বলে উঠলো—অ্যাঁ!—

—শীগগির চলে এসো—ওঁ কৃষ্ণ, ওঁ কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করো—ওঁ কৃষ্ণ, ওঁ কৃষ্ণ, ওঁ কৃষ্ণ—পুষ্প, পুষ্প ডাকচে!

যতীনের জ্ঞান একটু একটু ফিরে এসেচে—এ কোন্ স্থান!

কে যেন ওর হাত ধরলে এসে। পুষ্পের কণ্ঠস্বর ওর কানে গেল আবার। পুষ্প যেন কাকে বলচে—এবার যতীনদা বেঁচে গেল। তবে এখনও ঠিক জ্ঞান হয়নি—,

আবার আত্মিকলোকের নির্মল বায়ুস্তরে ওর নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস সহজ ও আনন্দময় হয়ে আসচে। যতীন জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখলে, সামনে পুষ্প ও পুষ্পের মা। সে বিস্ময়ে ওদের দিকে চেয়ে বল্লে—কি হয়েছিল বল তো? এ কি কাণ্ড! এমন তো কখনো—

তারপর সে চারিদিকে চেয়ে দেখে আরও অবাক হয়ে গেল। সে পৃথিবীর এক গরীব গৃহস্থের পুরোনো কোঠাঘরের মধ্যে। পৃথিবীতে রাত্রিকাল, সম্ভবত গভীর রাত্রি। বর্ষাকাল। বাইরে ঘোর অন্ধকার, টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়চে বাড়ীর পেছনের বাঁশবনে। ঘরের এক কোণে কিছু পেতল কাঁসার বাসন একটা জলচৌকির ওপরে, একটা পুরোনো তক্তপোশ, দুতিনটি বস্তা—একটার ওপর আর একটা সাজানো—সম্ভবত ধান। ঘরের মেঝের একপাশে একটা জলের বালতি, ওদের ঠিক সামনে মেঝের ওপর মলিন কাঁথা পাতা একটা বিছানার একপাশে ছোট ছোট বালিশ পাতা—আর একটা ছোট্ট বিছানা, কিন্তু সে ছোট বিছানাটা খালি। আর বিছানার সামনে মেঝের ওপরেই মলিন শাড়ী পরনে একটি মেয়ে বসে অঝোরে কাঁদচে, মেয়েটির কোলে একটি মৃত শিশু, সম্ভবত ছ'সাত মাসের। ঘরের দরজার কাছে একটা পুরোনো হ্যারিকেন লণ্ঠনে বোধ হয় লাল তেল জলছে, কারণ আলোর চেয়ে ধোঁয়া বেশি হয়ে লণ্ঠনের কাঁচের একটা দিক কালো করে ফেলেচে। ঘরের মধ্যে আরও দু'তিনটি মেয়ে ও পুরুষমানুষ সবাই ক্রন্দনরতা মেয়েটিকে ঘিরে নিঃশব্দে বসে।

মেয়েটি কাঁদচে আর বিলাপ করচে—ও আমার ধনমণি, ও আমার সোনা, হাসো, দেয়ালা করো, আমার মানিক, চোখ চাও—আমার কোল খালি করে পালিও না আমার সোনা—কোথায় যাবা আমায় ফেলে?

যতীন বিস্ময়ের দৃষ্টিতে পুষ্পের ও পুষ্পের মার দিকে চেয়ে বল্লে—এ সব কি ব্যাপার! এরা কারা? আমি কোথায়?

মেয়েটি একমনে বিলাপ করেই চলেচে কোলের মৃত শিশুর দিকে চোখ রেখে।

—কাল থেকে তুমি একবারও মাইএ মুখ গুাওনি যে বাবা আমার! মাই খাবা? মায়ের মাইএ মুখ দেবা না, ও মানিক আমার? আর মুখ দেবা না? চোখ চাও দিনি—

মেয়েটির আকুল ক্রন্দনে যতীনের মনের মধ্যে এক অদ্ভুত ধরণের চঞ্চলতা দেখা দিল, পরের কান্না শুনে এমন কখনো তার হয়নি—সম্পূর্ণ অননুভূত কোন্ অনুভূতিতে ওর চোখে জল এসে পড়লো।

পুষ্প বল্লে—চলে এস যতীনদা, চলো সব বল্‌চি। তুমি পুনর্জন্মের টানে পড়ে পৃথিবীতে জন্মেছিলে আজ ছ'সাত মাস। ওই তোমার মা। আজ আবার দেহ থেকে মুক্তি পেলে। ওই মৃত শিশুই তুমি—কি বিপদেই ফেলেছিলে আমাদের।

যতীন অবাক হয়ে বল্লে—পুনর্জন্মের টান! সে কি! আমি এই বাড়ীতে—

—এই ঘরেই জন্মেছিলে। এরা ব্রাহ্মণ, গ্রামের নাম কোলা-বলরামপুর, জেলা যশোর। ভগবানের কাছে বহু ডাক ডেকে আর করুণাদেবীর দয়ায় আজ উদ্ধার পেলে—নতুবা দেহ ধরে এই সব অজ পাড়াগাঁয়ে এখন বহুকাল কাটাতে হোত—পুনর্জন্মের ঠ্যালা বুঝতে পারতে। বার বার পৃথিবীতে যাওয়া-আসার কুফল এখন বুঝতে পারচো তো? কতবার না বারণ করেছি?

যতীনের মন তখন কিন্তু পুষ্পের ওসব আধ্যাত্মিক তিরস্কারের দিকে ছিল না। তার সামনে বসে এই তার পৃথিবীর মা, গরীব ঘরের মা, তারই বিয়োগব্যথায় আকুলা, অশ্রুমুখী। গত ছ'মাসের শৈশবস্মৃতি কোনো দাগই কাটেনি তার শিশু-মস্তিষ্কে। কিন্তু কত বিনিদ্র রজনী যাপনের মৌন ইতিহাস ওই দরিদ্রা জননীর তরুণ মুখে! তারই মা, তারই নবজন্মের দুঃখিনী জননী, যাঁর বত্রিশ নাড়ী ছিঁড়ে ছ'মাস পূর্বে এই দরিদ্র গৃহে কত আশা আনন্দের ঢেউ তুলে একদিন সে পুনরায় ধরণীর মাটিতে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। কি অদ্ভুত মোহ, কি আশ্চর্য মায়ার বাঁধন, মনে হচ্চে, স্বর্গ চাইনে, করুণাদেবীকে চাইনে, পুষ্পকে চাইনে, আশাকে চাইনে, আধ্যাত্মিক উন্নতি-টুন্নতি চাইনে—এই পৃথিবীর মাটিতে পৃথিবীর এই মায়ের কোলে সুখদুঃখে সে আবার মানুষ হয়! এই টিপ্ টিপ্ বৃষ্টিধারা, এই বর্ষার রাত্রিটি, এই গরীব মায়ের তারই জন্যে এ আকুল বুকফাটা বিলাপ—এ সব জীবনস্বপ্নের কোন্ গভীর রহস্যময় অঙ্ক অভিনয়ের দৃশ্যপট? ভগবান হিরণ্যগর্ভের অধিষ্ঠিত স্বপ্ন।

ওর মনে পড়ল যাত্রায় শোনা গানের দুটো লাইন—

এ নাটকের এ অঙ্কে পেয়েছি স্থান তোর অঙ্কে,
হয়তো যাবো পর অঙ্কে পর অঙ্কে পুত্র সেজে।

ওদের মধ্যে একজন প্রৌঢ়া বল্লে—আর কেঁদো না বৌ, যা হবার হয়ে গেল, এখন উঠে বুক বাঁধো—মনে করো ও তোমার ছেলে নয়—ভারত করতে যদি ও আসতো তা হোলে কোলজোড়া হয়ে থাকতো, তা ভারত করতে তো আসে নি—কেঁদো না—

একজন আধবুড়ো গোছের লোক বল্লে - বিষ্টি মাথায় এখন আর কোথায় যাবো—সকালের আর বেশি দেরি নেই, সাধন আর হরিচরণকে নিয়ে আমি যাবো এখন—

প্রৌঢ়া বল্লে—বিষ্টিরও বাপু কামাই নেই—সেই যে আরম্ভ করেচে বিকেলবেলা, আর

সারারাত -

কথা বলতে বলতে কাক কোকিল ডেকে রাত ফর্সা হয়ে গেল। পুষ্পের বার বার আহ্বানেও যতীন সেখান থেকে নড়তে পারলে না। পুত্রহারা জননীর আকুল কান্না ও আছাড়ি-বিছাড়ির মধ্যে সেই আধ-বুড়ো লোকটি আর দুজন ছোকরা মৃত শিশুদেহ নিয়ে বৃষ্টিধারা মাথায় বাঁশবনের পথে চললো। যতীন, পুষ্প ও পুষ্পের মা গেল ওদের সঙ্গে। বাড়ী থেকে দু রশি আন্দাজ দূরে ছোট্ট একটা নদী, কচুরিপানার দামে আধ-বোজা; ওরা শাবল দিয়ে গর্ত খুঁড়ে মৃতদেহটা নদীর ধারে পুঁতে ফেললে। তখনও ভাল করে দিনের আলো ফোটেনি, বৃষ্টিধারায় চারিধার ঝাপসা। পথে-ঘাটে লোকজন নেই কোথাও—বর্ষাকালের ধারামুখর প্রভাতকাল।

১৬

পুষ্প যতীনকে সঙ্গে নিয়ে পৃথিবীর বৃষ্টিধারা-মুখর ঝাপসা আকাশে ঊর্ধ্বে এক সু-উচ্চ পর্বত-চূড়ায় এসে বসলো। পুষ্পের মা বল্লে, আমি যাই মা পুষ্প, বসো তোমরা।

নিম্নে পৃথিবীর চারিদিকে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎগর্ভ মেঘপুঞ্জ থেকে বিদ্যুৎ খেলচে, দিক্‌চক্রবালে সুনীল আকাশে সূর্যোদয় হচ্চে, অনেক দূর পর্যন্ত আকাশ রাঙা। ওরা যেন পার্থিব বাসনা কামনার বহু ঊর্ধ্বের কোনো নির্মল দেবলোক থেকে পৃথিবীর দিকে চেয়ে আছে। বাংলা দেশের উত্তরে এ বোধ হয় হিমালয় পর্বতের চূড়া। দূরে নিকটে তুষাররাশি সূর্যালোকে ঝক্‌মক্ করচে। যতীনের মনে হচ্ছিল এই সবই মায়া, ভেল্‌কিবাজি, ভগবানের ভেল্‌কিবাজি। মৃত্যুর অসত্যতা সে ভাল ভাবে বুঝেচে। মৃত্যু বল্লে তাহোলে কোনো জিনিস নেই; এই তো সে যশোর জেলায়ই কোলা-বলরামপুর গ্রামে মরে গেল শেষ রাত্রে, অথচ এখানে সে পর্বতশিখরে বাহাল-তবিয়তে সমাসীন। মরণ নেই, বিচ্ছেদ নেই, দুঃখ নেই, আমরা অমর—জীবনমরণের সঙ্গে, সুখদুঃখের সঙ্গে—সনাতন, নিত্য, অনশ্বর আমাদের এ ক্ষণিক লীলাখেলা।···

পুষ্প যতীনের মনের ভাব বুঝতে পারলে। হাজার হোক, যতীনদা পুরুষমানুষ, ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিল, জিনিসগুলো চট্ করে ধরতে পারে। পেটে একেবারে বিদ্যে না থাকলে অন্ধকার ঘোচে? সে গম্ভীর মুখে বল্লে, এবার বেঁচে গেলে বটে, কিন্তু বার বার আশা বৌদির কাছে যাতায়াতের ফলে তোমার এই বিপদ। অনেকবার তোমায় সাবধান করেছিলাম, শোনো নি। পুনর্জন্মের আবর্ত মাঝে মাঝে আত্মিক স্তরে ঝড়ের মত এসে পৌঁছয়, কোথা থেকে আসে তা জানিনে, ক'টা ব্যাপারই বা বুঝি জগতের! সেই সময় যে'কেউ সামনে পড়ে, তাকে নিয়ে এসে পৃথিবীতে ফেলে ঘুরিয়ে। ও থেকে রেহাই নেই। তাই এসে জন্মেছিলে পৃথিবীতে—

—আমার মনে আছে সে ভীষণ টানের কথা—জ্ঞান ছিল না আমার।

—তোমার উচিত হয় নি আশাদের বাসায় অতক্ষণ থাকা। ও একটা ঝড়ের মত, ভূমিকম্পের মত বিপর্যয়; তবে তৃতীয় স্তরের নীচের অঞ্চলেই ও আবর্তের সৃষ্টি, চতুর্থ স্তরের

আত্মারা তত বিপদগ্রস্ত হন না ওতে—যদিও পালিয়ে যান সকলেই ; ও একটা অন্ধশক্তি—ওকে বিশ্বাস নেই। কোথায় ঘুরিয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলে পুনর্জন্ম ঘটাবে পৃথিবীতে। অনেকেই পৃথিবীতে জন্ম নিতে চায় না, সকলেই ওটাকে ভয় করে।

—তুমি আমাকে কোনোদিন এই ব্যাপারটার কথা বলো নি তো ?

—ভূমিকম্পের কথা পৃথিবীতে সবাইকে সবাই বলে বেড়ায় ? হয়তো জীবনেই ঘটলো না, নয় তো এসে সব ওলটপালট করে দিয়ে গেল—এও তেমনি। পৃথিবীর বাসনা কামনা আসক্তি যখন মনের মধ্যে বেশি হয় বা যখন তৃতীয় স্তরের নীচেকার আত্মিক লোকে থাকে—তখনই ওই আবর্ত বড় বিপজ্জনক। সেইজন্যেই তোমায় বার বার বারণ করতাম। একা আর তোমাকে বেরুতে দেবো না—

—তুমি জানতে পারলে কখন ?

—তখুনি। আমি তখন জপে বসেচি—

লজ্জায় পুষ্প নিজেকে হঠাৎ সামলে নিলে, সে জপ-ধ্যান করে লুকিয়ে, যতীনদার সামনে সে মস্ত বড় কোনো যোগিনী সাজতে চায় না।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—তারপর ?

—তারপর তখুনি বুঝলুম, তুমি মাতৃগর্ভে ঢুকে গিয়েচ। সঙ্গে সঙ্গে তোমার তো সব বিস্মৃতি এসে গেল, আমি মরি ছুটোছুটি করে। ছুটি করুণাদেবীর কাছে, আমার গুরুদেবের কাছে ছুটি। করুণাদেবী বল্লেন, মার মনে দুঃখ দিয়ে তোমাকে বাঁচাতে পারবেন না—

যতীন হেসে বল্লে পৃথিবীতে মরে গেলুম, আজ তোমাদের এখানকার ভাষায় বেঁচে গেলুম, এ বেশ মজার কথা বলচো কিন্তু পুষ্প। আরও দুবার এর আগে এমনি বলেচ 'বেঁচে গেলে যতীনদা'—আরে, মরেই তো গিয়েচি আজ সকালে পৃথিবীতে ?

পুষ্প হেসে বল্লে—তারপর শোনো। করুণাদেবী মাকে কাঁদাতে পারবেন না—গুরুদেব বল্লেন—তোমাকে মাতৃগর্ভে দশমাস দশদিন থাকতে হবে—তারপর ভূমিষ্ঠ হতে হবে, তবে তিনি চেষ্টা করবেন—

—কি চেষ্টা করবেন—শিশুহত্যার ?

—তোমার অজ্ঞান অন্ধকার কাটেনি দেখচি এখনও—

—না, আমার মনে খট্‌কা লেগেচে। পুষ্প, আমায়—তোমাদের ভাষায়—'বাঁচিয়ে' খুব ভাল করেচ, কিন্তু ওই মেয়েটির কান্না—আমার মায়ের ওই কান্না—

যতীনের চোখে জল এসে পড়লো।

পুষ্প হেসে বল্লে—চলো, গুরুদেবের কাছে নিয়ে যাই। এতদিন তোমায় বলিনি তাঁর কথা—তোমার মন আজ ভাল না, চলো আমার সঙ্গে—

—সে কতদূর ?

—পঞ্চম স্বর্গের দ্বিতীয় স্তরে—তোমাকে আবরণ দিয়ে শক্তি দিয়ে নিয়ে যাবো, নইলে তোমার জ্ঞান থাকবে না অত ওপরে। কিছু দেখতেই পাবে না—

যতীন খানিকক্ষণ কি ভাবলে, তারপর বল্লে—বোসো পুষ্প, দেখে আসি মা কি করচেন—

পুষ্প ধমক দিয়ে বল্লে—কে মা? কিসের মা? বৈষ্ণবী মায়ায় ভুলো না। অনন্ত পথে কত মা, কত বাবা, কত ছেলে, কত স্ত্রী। প্রত্যেকেই অ-বিনাশী আত্মা, প্রত্যেকেই লীলা করচে। চলো—

—না পুষ্প, আমার সত্যিই এখনো তোমার মত জ্ঞান জন্মায় নি মনে। এখনো মায়া-দয়া মন থেকে একেবারে বিসর্জন দিতে পারিনি। তোমাদের ব্রহ্মজ্ঞান নিয়ে তোমরা থাকো—আমি ওর মধ্যে নেই, সত্যি বলচি। আমাকে যেতেই হবে মাকে দেখতে। আজ সকালে মার সেই বুকফাটা কান্না আমারই জন্যে, সে আমি ছেলে হয়ে কি করে ভুলি?

পুষ্প মৃদু হেসে একটু ধীরভাবে বল্লে—উঃ, কি বাঁধন, তাই দেখচি! মায়ার শক্তি আছে বটে! এড়ানো বল্লেই কি এড়ানো যায়? মানুষকে নিয়ে পৃথিবীর লীলা তা হোলে হয় কি করে!

পরে সে হঠাৎ সুস্বরে গেয়ে উঠলো দুটো মাত্র কলি—

'এ বাঁধন বিধির সৃজন, মানব কি তায় খুলতে পারে?
কারাগার ভাঙতে কি পারো, ও যে মায়ার পাঁচিল আছে ঘিরে!'

যতীন ব্যঙ্গের সুরে বল্লে—থাক্, থাক্, ব্রহ্মবিদ্যে এখন তুলে রেখে দাও, ওসব সইবে না ধাতে।

পুষ্প হেসে বল্লে—কেমন গলা, যতীনদা?

—চমৎকার!

—তা এখন মার কাছে না গিয়ে এর পরে যেও।

—আমি একবার দেখে আসি, বোসো—.

আবার সেই কোলা-বলরামপুর গ্রাম। বেলা দুপুর। বৃষ্টি থেমেচে, কিন্তু আকাশ মেঘ-মেদুর। সজল বর্ষার বাতাস বইচে, সারারাত্রি বর্ষণের ফলে পথে-ঘাটে জল দাঁড়িয়েচে। বৃষ্টি-সিক্ত লতাঝোপের পত্রপুঞ্জ থেকে টুপটাপ বৃষ্টির জল ঝরে পড়চে এখনও।

রান্নাঘরের দাওয়ায় মেয়েটি খেতে বসেচে। কলাইয়ের দাল, মোচা ছেঁচকি আর কাঁচকলা ভাজা। সকালবেলার সেই প্রৌঢ়াও পাশে বসে খাচ্চে। সে খেতে খেতে বল্লে—একটু ভাল দেবো বৌ?

—না, আমি আর কিছু খাবো না মাসী। যা খেয়েচি সকালবেলা, পেট ভরে গিয়েচে—

—ছিঃ, অমন কথা বলতে নেই বৌ, আবার কোলজোড়া ছেলে পাবে, হাতের নোয়া সিঁথির সিঁদুর বজায় থাক্।

মেয়েটি ভাত খাওয়া ছেড়ে হাত তুলে বল্লে—কি মুখ চোখের ছিরি, মাসী—ও যে বাঁচবে না সে আমি জানি—আমার কপালে কি অমন ছেলে বাঁচে। সেবার কিসে কামড়ালো রাত্তিরে, ছেলে ককিয়ে কেঁদে উঠলো, আমি তাড়াতাড়ি টেমি জেলে দেখি ছেলের কাঁথার তলায়

এতবড় কাঁকড়া বিছে ! সেই রাত্তিরে কাঁটানটের শেকড় বেটে, জলপড়া এনে নাপিতবাড়ী থেকে দিই। আহা, আশ্বিন মাসে একবার এমন কাশি হোল যে বাছা দম আটকে বুঝি যায়—কি যে বল্লে শিবু ডাক্তার, হুপিং কাশি না কি—যে ক'দিন ছিল, কষ্টই পেয়ে গিয়েচে বাছা আমার !

প্রৌঢ়া বল্লে—কেঁদো না বৌ, ছিঃ—ভাতের থালা সামনে কাঁদতে নেই দুপুর বেলা। অলক্ষণ।

মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বল্লে—আর আমার লক্ষণ অলক্ষণ সব হয়ে গিয়েচে মাসী—এখন তোমরা বলো আমিও তার সঙ্গে চলে গিয়ে হাড় জুড়ুই। আমি কি করে খোকার মুখ না দেখে থাকবো, ও মাসী !

মেয়েটি এবার ডুকরে কেঁদে উঠলো ডাল ভাত মাখা হাত তুলে হাঁটুর ওপর রেখে।

—ছিঃ বৌ, ওকি ! খাও, খাও, আরে অমন করে না। তুমি তো অবুঝ নও, আবার হবে, এই-স্ত্রী মানুষ, ভাবনা কি ? কোল জুড়ে আবার পাবে—

যতীনকে নিয়ে টেনে বার করাই কঠিন সেখান থেকে। পুষ্প অনেক কষ্টে তাকে কোলা-বলরামপুরের বাঁড়ুয্যে-বাড়ী থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এল বুড়োশিবতলায়।

বল্লে—খুব মন কেমন করচে মার জন্যে ?

—সত্যিই, এত কষ্ট দিয়ে এসে অপরের মনে, আমার কোনো সুখ হবে না এ স্বর্গে। এ যেন পানসে হয়ে গিয়েচে। জগতে যখন এত কষ্ট—তখন আমি সুখে থেকে কি করবো পুষ্প। পৃথিবীই আমার ভাল, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সেখানে জমি চাষ করি, স্ত্রীপুত্রকে খাওয়াই, মাকে খাওয়াই। দেখলে না মায়ের খাওয়া গেল ? আমি সেই মায়াবাদী সন্নিসিকে পেলে একবার জিজ্ঞেস করি, সবাই যদি সমাধি লাভ করে ব্রহ্মে লয় পাবে, তবে জগৎসংসার চলবে কাদের নিয়ে ? সব নিয়েই তো সংসার। চাষা যদি লাঙল না চষবে, তাঁতি কাপড় না বুনবে, মজুর যদি তোমার আমার হয়ে না খাটবে—তবে একদিন সংসার চলে কেমন চলুক তো ? তুমি তো বলচো সব মিথ্যে, সব ভুল—

—এ কথার উত্তর আমি তোমায় এখুনি দিতে পারি, কিন্তু তুমি বিশ্বাস করবে না আমার মুখ থেকে শুনলে। তাই এর জবাব দিলাম না।

—জবাবে দরকারও নেই। তুমি কেন আমাকে নিয়ে এলে পৃথিবী থেকে ?

—কেন নিয়ে এলুম ! শুনবে তবে ? আমি আনিনি। তোমার অদৃষ্ট তোমাকে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়েছিল, অদৃষ্টই আবার এনেচে। পৃথিবীতে পুনর্জন্মের সময় তোমার আসেনি—দৈবদুর্বিপাকে পুনর্জন্মের টানে জন্মাতে বাধ্য হয়েছিলে। ও একটা দুর্ঘটনা—যেমন ভূমিকম্প। ও থেকে তোমার কর্মফল তোমাকে মুক্ত করে আনতো—এনেওচে। আমি কে ? আমি সাহায্য করেচি মাত্র। পুনর্জন্মের জন্যে অত ভেবো না—ও যখন হবে, তখন কেউ রুখতে পারবে না।

—আমার ভাল লাগে না…পৃথিবীতে এত কষ্ট ! এখানে নির্ঝঞ্ঝাটে কোন্ প্রাণে…ওদিকে

আশা, এদিকে আমার মা—

—পৃথিবীর মানুষ তুমি এখন আর নও এই কথাটা ভুলে যাচ্চ। পৃথিবীর মানুষ যখন ছিলে, তখন যে কথা বলচো তা বল্লে মানাতো। বিধাতার নিয়মই এই, পৃথিবীর জীবন থেকে এখানে আসতে হয়। সকলের জন্যে কষ্ট করবো বল্লেই তোমার শুনচে কে? নিয়মের অধীনে তোমাকে চলতে হবে। ভগবান তোমার আমার চেয়ে ভাল বোঝেন। তাঁর আইন মেনে নিতেই হবে। কেন এরকম হোল, এর জবাব তিনিই দিতে পারেন। আমার সেই গুরুদেবের কাছে যাবে? তিনি তোমায় বোঝাতে পারবেন।

— না, আমার গুরু-টুরুতে দরকার নেই পুষ্প, তুমি ক্ষ্যামা দাও—ঢের হয়েচে। আমার বড় ইচ্ছে সেই মায়াবাদী সমাধিবাজ সন্নিসিটার সঙ্গে—

মহাপুরুষদের সম্পর্কে তোমার মুখের ভাষাগুলো একটু ভদ্র করো যতীনদা—

এমন সময়ে বুড়োশিবতলার ঘাটে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটলো।

হঠাৎ দুজনেই আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইলো, পশ্চিম দিকের আকাশ যেন প্রজ্বলন্ত উল্কার মত কোন্ আলোতে আলোকিত হয়ে উঠেচে বহুদূর পর্যন্ত। আরও একটু পরে ওরা দেখতে পেলে, বহুদিন আগেকার দেখা সেই পথিক দেবতা শূন্যপথে চলেচেন। মনে হোল যেন তিনি ওদের দিকেই আসচেন, সেই রকম একটা নীল আলো ওদের সাগঞ্জ-কেওটার ঘাট অবধি এসে পড়লো, কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর পথ গেল বদলে। তিনি আরও দূরের কোন্ গ্রহলোকের দিকে যাত্রা করলেন। যতীন প্রথমটা চিনতে পারেনি। বল্লে—উনি কে পুষ্প?

—চিনতে পারলে না যতীনদা? উনি সেই পথিক দেবতা, এককল্প পূর্ব থেকে যাত্রা করেচেন এই বিশ্বের শেষ দেখবেন বলে কিন্তু এখনও এর একাংশও দেখে উঠতে পারেননি—কত নীহারিকা, কত নক্ষত্রলোক, কত গ্রহলোক তিনি ঘুরেচেন, এমন কত লক্ষ লক্ষ পৃথিবী—তবু এর কোনো হদিস তিনি পাননি। মনে নেই, সেই এখানে ক্লান্ত হয়ে এসে পড়েছিলেন? পৃথিবী শুনে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সেটা আবার কোন্ গ্রহ! সূর্য কোন্‌টা চিনতে পারেননি।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েচে।

পুষ্প একটু প্রচ্ছন্ন তিরস্কারের সুরে বল্লে, তাই তো বলচি যতীনদা, এই সামান্য সৌরজগতের এই ক্ষুদ্র গ্রহ পৃথিবীর মায়া তুমি কাটাতে পারচো না, অথচ দেখ তুমি যে লোকে এসেচো সেখানে একটু সাধনা করলেই তুমি অমনি কত লক্ষ লক্ষ সৌরজগৎ, তার কোটি কোটি গ্রহের জীবনযাত্রা দেখতে পাবে! কত দেখবার আছে, কত জানবার আছে যতীনদা, সে সব তোমার দেখতে জানতে ইচ্ছে করে না?

যতীন তখনই কোন জবাব দিতে পারলে না, কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো। তারপর সহসা উত্তেজিত সুরে বল্লে—আমি সব দেখব, বুঝবো পুষ্প। আমার চোখ উনি অনেকখানি যেন খুলে দিয়ে গেলেন। চলো করুণাদেবীর কাছে—

—এখুনি?

—এতটুকু দেরি নয়।

আবার সেই উচ্চ আত্মিকলোকের বায়ুস্তর, চক্ষের নিমেষে পুষ্পের সাহায্যে যতীন শত শত যোজন, যোজনের পর যোজন পার হয়ে চললো। করুণাদেবার আশ্রম সেই ক্ষুদ্র গ্রহটিতে ওরা পৌঁছে দেখলে কেউ কোথাও নেই। সেই কুসুমিত উপবন, সেই প্রাচীন বৃক্ষতল যেখানে রাজরাজেশ্বরীর মত রূপসী দেবী সেদিন এলিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন, আজ সে স্থান জনশূন্য।

যতীন হতাশার সুরে বল্লে—তাই তো! এ যে দেখচি—

—জগৎ-সংসারের কাজে সর্বদা ঘুরচেন, কি জানি কোথায় গিয়েচেন –

—কিন্তু কি সুন্দর দেশ এটা! আমার ইচ্ছে করে এখানেই থাকি। বুড়োশিবতলার ঘাট এমন করে নেওয়া যায় না?

—অনেক বেশি শক্তি দরকার এমন দেশ গড়তে, আমার তা নেই যতীনদা। এদেশ শুধু বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্য নিয়ে সুন্দর হয় নি, মনের ওপর এর প্রভাব বুঝতে পারচো নিশ্চয়ই। আমরা যেন অনেক উঁচু জীব হয়ে গিয়েচি. শ্রান্তি নেই; ক্লান্তি নেই, দেহমন কত উঁচু ধরনের হয়ে গিয়েচে।

এমন সময় একটি বিস্ময়কর আবির্ভাবের মত করুণাদেবা হঠাৎ যেন জ্যোতিঃপদ্মের মত ফুটে উঠলেন সেই বনস্থলীর প্রান্তে। স্নেহ ও প্রসন্নতা দেবীর বিশাল চক্ষু দুটির ঘননীল তারকায়। হেসে বল্লেন—আমি তোমাদের দেখে এক জায়গা থেকে ফিরে এলাম —

পুষ্প লজ্জিত ও অপ্রতিভের সুরে বল্লে—আপনার কাজে বাধা দিলাম দেবী?

করুণাদেবী হেসে বল্লেন—না। আমিও ইচ্ছে করেছিলাম তোমরা আজ এখানে আসবে —বসো, এসো এই গাছের তলায়।

যতীন ও পুষ্প গাছের তলায় ওঁর পাশে বসে পথিক দেবতার অদ্ভুত আবির্ভাবের ব্যাপার বল্লে। করুণাদেবী সব শুনে বল্লেন—ভগবান বা ব্রহ্মের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী কোনো নাস্তিক দেবতা, তবে মহাশক্তিধর বটে। আমার জানা নেই।

যতীন বল্লে—এত যিনি দেখে বেড়াচ্চেন তিনি নাস্তিক?

—ওঁরা অন্য বিবর্তনের প্রাণী।

—পৃথিবীর নয়?

—না, অন্য কল্পের। সে শুনবে এখন। চলো, যেখানকার কাজ ফেলে এখানে এসেচি, সেখানে তোমাদের নিয়ে যাই।

দুজনেই চোখ বোজে। যতীনের জ্ঞান যাতে থাকে, তার ব্যবস্থা করতে হবে, নয়তো সে উচ্চস্তরে গিয়েও কিছু দেখতে পাবে না, বুঝতে পারবে না। এক মুহূর্তে ওরা অনুভব করলে খুব অদ্ভুত এক জায়গায় এসেচে। ওরা এক নিমেষে যেন বিরাট আত্মা হয়ে গিয়েচে, বাধাবন্ধনহীন সর্বসংস্কারমুক্ত দেবাত্মা। দেশ ও কাল উপন্যাসের কাহিনী যেন,—এই ছিল কোথায়, এই এল কোথায়। দেশ অতিক্রম করতে হোল না, কালের ব্যবধান অনুভূত হোল কই?

সেও এক বিচিত্র দেশ। বাতাসে যেন নব প্রস্ফুটিতা মৃণালিনীর সুগন্ধ; এক বিশাল সুনীল সমুদ্রের ঢেউ তটশিলায় এসে আছড়ে পড়চে; সমুদ্রের মাঝে মাঝে ম্যাজেণ্টা রঙের,

ধূসর কৃষ্ণ রঙের ছোট-বড় পাহাড় ইতস্তত ছড়িয়ে। সমুদ্রের তীরে একটি অরণ্যবৃক্ষের তলে এক রূপবান জ্যোতির্ময় তরুণ দেবতা বসে একমনে চিন্তা করচেন।

যতীন এমন দৃশ্য কখনো দেখেনি, এমন অপূর্ব রূপবান মহাজ্যোতিষ্মান দেবমূর্তি। সে শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে চেয়ে রইল।

পুষ্প তাঁকে দেখে কিন্তু অবাক হয়ে গেল অন্য কারণে। এঁকে সে অনেক বছর আগে দেখেছিল, যেদিন সে যতীনকে পঞ্চম স্তরে নিয়ে যেতে যেতে তার সংজ্ঞাহীন দেহ দ্বারা বিপদগ্রস্ত হয়েছিল। সেই তরুণ দেবতা, যিনি সেদিন শৈলশিখরে বসেছিলেন।

দেবতা করুণাদেবীর দিকে চেয়ে বল্লেন—এরা কে?

পুষ্প বল্লে—দেব, আপনি আমাকে দেখেচেন এর আগে—সেই একদিন—

করুণাদেবী বল্লেন—এদের কথা তোমাকে বলেছিলাম। এর নাম পুষ্প, ওর নাম যতীন, তোমার পৃথিবীরই নাম বাপু—

দেবতা প্রসন্ন দৃষ্টিতে ওদের দিকে চেয়ে বল্লেন—ও, বুঝেচি।

পরে যতীনের দিকে চেয়ে বল্লেন—কিন্তু এঁকে নিয়ে এসে ভাল করলে না। এর এখনো অনেক দেরি। পার্থিব তৃষ্ণা এর এখনও যায় নি। এত উঁচু স্বর্গে একে আনলে এর ফল হবে এই, আগামী জন্মে এর স্মৃতি ওকে কষ্ট দেবে—কোন কিছুতেই মন বসাতে পারবে না। তুমি তো জানো, তৃতীয় স্তরের কোনো লোককে এখানে আনা সেই ব্যক্তির পক্ষেই ক্ষতিকর।

করুণাদেবী ঝগড়া করার সুরে বল্লেন—বেশ করেচি, যাও। তুমি ওর সব স্মৃতি মুছে দিও, নয়তো আমি দেবো। দেখাতে নিয়ে আসিনি শুধু, ওর অনেক প্রশ্ন আছে, জানতে ইচ্ছে হয়েচে।

যতীন ভাবছিল তার কি মহাপুণ্য ছিল, আজই এমন দুটি জ্যোতির্ময় দেবতার দর্শনলাভের সৌভাগ্য তার ঘটলো! কি অদ্ভুত রূপ!

সে বিনীত সুরে বল্লে—যদি দেখার সৌভাগ্যই ঘটলো, তবে দেবতা, আমায় এমন করে দিন, যাতে এখানে বার বার আসতে পারি বা আপনার দেখা পেতে পারি তার ব্যবস্থা করে দিন।

তরুণ দেবতা করুণাদেবীর দিকে চেয়ে হেসে বল্লেন—ওই দেখলে তো কি বলচে? এদের অজ্ঞানতা ঘুচতে অনেক বিলম্ব।

পুষ্প হাত জোড় করে বল্লে—আপনি ওঁকে দয়া করে ক্ষমা করুন। উনি নতুন এ স্তরে এসেচেন, এখানকার কিছুই জানেন না।

যতীন অপ্রতিভ না হয়ে বল্লে—আপনি দয়া করলেই সব হবে। কিছুক্ষণ আগে আমাদের ওদিকে একজন কে এসেছিলেন, তাঁর কথা যা শুনলাম তাতে আমি অবাক্ হয়ে গিয়েচি। আমার সব জানবার ইচ্ছে হয়েচে, তিনি কত গ্রহনক্ষত্র বেড়িয়ে এসেচেন—আমায় এর আগে বলেছিলেন সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন—

দেবতা বল্লেন—কে?

করুণাদেবী বল্লেন—পথিক কেউ হবে। দেশে দেশে বেড়িয়ে বেড়ানোই তাঁর কাজ বলে মনে হোল। নাস্তিক দেবতা।

তরুণ দেবতা একটুখানি চুপ করে থেকে বল্লেন—নাস্তিক কি? মনে হয় না। ওদের উপাসনাই ওই। বিশ্বে-ব্রহ্মাণ্ডে এমন অনেক আবিষ্কারক আছে, এদের শক্তি যথেষ্ট, তেজ অসীম। তাদের মধ্যে কেউ হবে। আচ্ছা, তোমরা আমার সঙ্গে চলো, আর একটা জায়গা দেখিয়ে আনি—

যতীন বল্লে—দেবতা, আপনার কথা আমি ওই মেয়েটির মুখে আগে শুনেচি। তবে আপনাকে দেখবার সৌভাগ্য হয়নি আমার।

—না, কি করে দেখবে। পুষ্প আর তুমি এক স্তরের লোক নও—

পুষ্প বল্লে—উনি এক বিপদে পড়েছিলেন—চুম্বকের ঢেউএ পড়ে পৃথিবীতে গিয়ে জন্ম নিয়েছিলেন—সবে এসেচেন সেখান থেকে।

দেবতা ধীরভাবে বল্লেন—তা সম্পূর্ণ সম্ভব। খুব সাবধানে চলাফেরা কোরো। ওই যে পথিক দেবতার কথা বলছিলে, ওঁরা এ কল্পের জীব নন। পূর্ব কল্পে ওঁদের দেবত্বপ্রাপ্তি হয়েচে—মুক্ত আত্মা হয়ে বহু উর্ধ্বে উঠে বহু তেজ সঞ্চয় করেচেন, কিন্তু ওঁরাও পুনর্জন্মের আকর্ষণকে ভয় করে চলেন। তবে এই লোকটির এখনও অনেক জন্ম বাকি—একে পৃথিবীতে জন্মাতে হবে অনেকবার।

যতীন বার বার ওই এক কথা শুনে একটু বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। সে বিরক্তি না চাপতে পেরে বলে উঠলো—দেব, তার জন্যে আমি দুঃখিত নই। পৃথিবীতে জন্ম নিলে কষ্টটা কি?

—আমি জানি। যে জানে সে ও বিশ্বের সব কিছু এবং বিশ্বদেব একবস্তু এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই—তার পক্ষে পৃথিবী বা স্বর্গ সমান হয়ে গিয়েচে। যে জানে পৃথিবীর সব কিছুই তিনি, তার কাছে পৃথিবী ও স্বর্গ একই সুরে বাঁধা মোহন সঙ্গীতে। তোমাদের জ্ঞানী লোকেরা তাই তোমাদের শ্রীকৃষ্ণকে বংশীধারী কল্পনা করেচেন। কিন্তু এ চোখে পৃথিবীর সবাই দেখে কি? সাধারণ মানুষ কর্ম অনুসারে প্রথম তিন স্তরে গতাগতি করে, মরে ভূলোক থেকে ভুবর্লোকে আসে, সেখান থেকে উন্নতি করে স্বর্গলোকে আসে—আবার সেখান থেকে জন্মায় পৃথিবীতে, আবার মরে, আবার জন্মায়, আবার মরে। এ'কে বলে মানব-আবর্ত। চাকার মত ঘুরচে এই আবর্ত—চলো, একটা ব্যাপার তোমায় দেখাই, পৃথিবীতেই চলো, সেখানে তোমরা সহজ ও স্বচ্ছন্দ অবস্থায় থাকবে? চলো তোমাদের দেশেই নিয়ে যাই—

মহাশূন্যের পথহীন পথে করুণাদেবী ওদের নিয়ে আগে আগে চল্লেন। দূরে একটা কি বিশাল গ্রহ নিরন্ধ্র অন্ধকার সমুদ্রে পাক খেয়ে ঘুরচে। হু-হু করে নেমে এল—একটু পরে পৃথিবীর এক তুষারাবৃত পর্বতশিখর ডিঙিয়ে ওরা এক নদীর ওপরকার শূন্যে এসে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

দেবতা পিছনে পিছনেই আসছিলেন। বল্লেন—এটা চিনতে পারচো কী নদী?

যতীন বল্লে—না দেব, ঘোর অন্ধকার পৃথিবীতে—কিছু দেখতে পাচ্ছিনে—এখন বোধ হয় রাতদুপুর।

করুণাদেবী হেসে বল্লেন—এত বড় নদী বাংলাদেশে ক'টা আছে। আন্দাজ করে বলো।

—আজ্ঞে, হয় গঙ্গা, নয় পদ্মা।

—ওই রকমই, এটা গঙ্গা।

দেবতা হেসে বল্লেন—তুমিও ঠিক ভাল বলতে পারলে না, গঙ্গা তো বটে। মুর্শিদাবাদ জেলার গঙ্গা—

যতীন বিস্ময়ের সুরে বল্লে—আপনি বাংলাদেশের খবর সব জানেন দেখচি।

করুণাদেবী মৃদু সস্নেহ হাস্যে ওকে নেপথ্যে বল্লেন—ও রকম বোলো না। উনি কে তা তোমরা জানো না। পরে বলবো।

একটা ছোট্ট খাল। একটা আমবাগান। মুর্শিদাবাদ জেলা, সুতরাং বনবাগান বেশি নেই, মস্ত বড় মাঠ একদিকে, একদিকে ছোট্ট একটি গ্রাম! যতীন বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলে সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যেই গ্রামের ঘরের আনাচে-কানাচে অনেকগুলি নিম্নস্তরের ধূসর ও মেটে সিঁদুরের রঙের আত্মা ঘুরে বেড়াচ্চে—কেউ এ-বাড়ী, কেউ ও-বাড়ী। তারা যদি মানুষ হোত তবে আনাচে-কানাচে এদের এমনতর গতিবিধি দেখে সন্দেহ হোত এরা নিশ্চয়ই চোর বা ডাকাত।

যতীন অবাক হয়ে বল্লে—তাই তো, এরা কি করচে এখানে?

পুষ্প হাসিমুখে বল্লে—আমি বুঝতে পেরেচি অনেকটা, যদি তাই হয়, যা ভেবেচি—

যতীন বল্লে—কি পুষ্প?

তরুণ দেবতা বল্লেন—পুষ্প বুঝেচে। ওরা পৃথিবীতে জন্ম নেবার জন্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে। প্রতি রাত্রেই এমনি লোকের বাড়ীর আশে-পাশে ঘোরে। কিন্তু ভিড় বেশি—সবাই সুবিধে পায় না। তৃষ্ণাই পুনর্জন্ম গ্রহণ করায়। ভুবর্লোকে ওদের ভাল লাগচে না, সেখানে পৃথিবীর স্থূল বাসনা কামনার পরিতৃপ্ত হয় না—সুতরাং ওরা চাইচে আবার দেহ ধরতে। কিন্তু তার প্রার্থী অনেক। ওদেরই মত। সুতরাং জন্ম নিতে চাইলেও জন্ম নেওয়া হয় না। উচ্চতর আত্মারা বংশ দেখে, পিতামাতা দেখে জন্ম নেওয়ার সময়ে। এদের সে সব নেই, যে কোন বংশ, জাত, কুল হোলেই হোল। দেহ ধারণ নিয়ে কথা।

যতীন বল্লে—দেব, এরা কতদিন ধরে এমন ঘোরে?

—পৃথিবীর হিসেবে কেউ কেউ দশ বছর পর্যন্ত ঘোরে। এই এক যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা—এই অবস্থাকে প্রেতত্ব বলো তোমরা। কারো স্বাধীন কাজে আমরা কোনো বাধা দিই না—জীব যখন নিজের ভ্রম বুঝবে তখন সে নিবৃত্ত হবে। যতদিন তৃষ্ণা, ততদিন তাকে বাধা দিয়ে ফল হবে না। সে ভুবর্লোকে ঘোর অসুখী অবস্থায় থাকবে—তার চেয়ে যাও বাপু, পৃথিবীতেই গিয়ে সুখী হও। চলো, এখানে কষ্ট হচ্চে—আর নয়—

ওরা যেখানে এসে বসলো, সেটা একটা পর্বতশিখর, বড় চমৎকার পাইন এবং দেওদার গাছের নির্জন অরণ্যানী। গাছের ডালে ডালে অগণিত পরগাছায় রং-বেরঙের ফুল। পায়ের নীচে পৃথিবী অন্ধকারে ডুবে আছে, গভীর রাত্রি। আকাশের মাঝখানে চওড়া জলজ্বলে

ছায়াপথ, অসংখ্য ঝক্‌ঝকে তারকারাজি। ব্রহ্মাণ্ডের বিরাটত্বের সঙ্কেত।

তরুণ দেবতা বল্লেন—এই হোল হিমালয়। বাংলাদেশের ওপরেই—ওই ত্যাখো দূরে একটা নদী নেমেচে পাহাড় থেকে—

যতীন বল্লে—তা হলে বোধ হয় তিস্তা—

—তুমি দেখলে তো মানুষের অবস্থা?

—আশ্চর্য লাগলো, এমন হয় তা জানতাম না, দেব। আপনি যাকে মানব-আবর্ত বল্লেন, ওর উচ্চতর অবস্থা কি?

—উচ্চতর সাধনা মানুষকে দেবযান-পথে উচ্চতর লোকে নিয়ে যায়। স্বঃ, জনঃ, মহঃ, তপঃ ও সত্যলোক বলেচেন ভারতবর্ষের জ্ঞানী লোকেরা। এত কল্পকাল সেখানে থাকে উচ্চতর জীবাত্মা।

—কল্প কি?

—প্রত্যেকবার স্মৃষ্টির পরে প্রলয়, প্রলয়ের পরে আবার সৃষ্টি। এই কালব্যাপ্তির নাম কল্প। কল্পান্তে উচ্চতর জীবাত্মারও পতন হয়। তবে সত্যলোকেরও দূরপারে ব্রহ্মাণ্ডের বহিঃস্থিত যে ব্রহ্মলোক, সেখানে যাঁরা যান ভগবানের সঙ্গে তাঁরা এক হয়ে যান। মানব-আবর্তে তাঁরা আর ফিরে আসেন না।

—এরই নাম মুক্তি?

—একেই ভারতবর্ষের ঋষিরা মুক্তি বলেচেন। চলো তোমাকে একটি ভারতবর্ষের প্রাচীন কবির কাছে নিয়ে যাবো। উপনিষদ বলে দার্শনিক কবিতা ভারতবর্ষের, তিনিও তার একজন রচয়িতা। ভ্রাম্যমান কবি, সব সময় পাহাড়ে সমুদ্রতীরে বনানীর নির্জনতায় কাল কাটান। পৃথিবীর মধ্যে এই হিমালয় এবং আরও অনেক উচ্চতর পর্বতের বনে বৃক্ষলতায় প্রায়ই মাঝে মাঝে রূপের ধ্যানে মগ্ন থাকেন। আর মিশর দেশের এক উচ্চ আত্মার সঙ্গে পরিচয় করাবো।

—তা হোলে তো, দেব, পৃথিবীর আসক্তি তাঁর এখনও যায় নি? অর্থাৎ আমি উপনিষদের সেই কবির কথা বলচি—

—তাঁর আসক্তি বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের ধ্যান। কোনো পার্থিব তৃষ্ণা নয়। তাই জনলোকের অধিবাসী, নিজের আনন্দের জন্যে নেমে আসেন পৃথিবীতে। তাঁর আগমনে পৃথিবীর অনেক উপকার। বহু লেখক ও কবিকে অদৃশ্যভাবে প্রেরণা দান করেন, সেইজন্যেই তিনি পৃথিবীতে আসতে ভালবাসেন। পৃথিবীর হিসেবে বলতে গেলে বহু শতাব্দী ধরে পৃথিবীতে এ কাজ তিনি করেচেন—তাঁর কাজই ওই। আমার সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট বন্ধুত্ব। আমার নিজের কাজে তিনি যথেষ্ট সাহায্য করেন আমায়।

এবার পুষ্প বিনীতভাবে বল্লে—দেব, একদিন আমাদের কুটিরে পদার্পণ করবেন দয়া করে? আপনার বন্ধু সেই তাঁকেও নিয়ে? পরে দেবীকে দেখিয়ে বল্লে—ইনিও যাবেন আমায় বলেচেন দয়া করে।

তরুণ দেবতা বল্লেন—যাবো।

পুষ্প তাঁর পাদস্পর্শ বরে প্রণাম করে বল্লে—আমাদের ওপর আপনার এ করুণার জন্য ধন্যবাদ।

যতীন বল্লে—প্রভু, আমার সঙ্গে এক মায়াবাদী সন্ন্যাসীর দেখা হয়েছিল, তিনি তাঁর নিজের শক্তি আমার মধ্যে সঞ্চারিত করে আমায় নির্বিকল্প সমাধিলাভ করিয়েছিলেন, সে এক অপূর্ব অনুভূতি। সে কথা আমি এখনও ভুলিনি—

—তিনি কোনো যোগী সাধক হবেন। ব্রহ্মে লীন হওয়ার আস্বাদ ইচ্ছামত ভোগ করেন—মুক্ত পুরুষ। তাঁরা ইচ্ছামত কায়াব্যূহ রচনা করে যে কোনো দেহে অনুপ্রবেশ করতে পারেন। সমস্ত ঐশ্বর্য ওঁদের সংকল্প মাত্রেই উপস্থিত হয়—

—প্রভু, ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কোনো দেশে এই ব্যাপারের চর্চা ছিল?

—নিশ্চয়ই। যে কোনো দেশে যে কোনো সৎ, ঈশ্বরে ভক্তিমান লোক মানব-আবর্তকে জয় করতে পারেন। বিশ্বের যিনি কর্তা, তিনি কোনো বিশেষ দেশ বা বিশেষ জাতিকে কৃপা করেন না।

—আচ্ছা আমাদের দেশে যাঁরা বলেন, ভগবানের নাম জপ করলে মুক্তি, যেমন ধরুন বৈষ্ণব সম্প্রদায়, তাঁদের মত কি সত্য?

—ভক্তি দ্বারা তাঁরা ভগবানে আত্মস্থ হয়ে দেবযান প্রাপ্ত হন। জীব মাত্রেই ব্রহ্মের অংশ জানবে। উপাধি ও নামরূপ ত্যাগ করে পরব্রহ্মে লীন হওয়ার নামই মুক্তি। বিভিন্ন পথ, বিভিন্ন মত। কিন্তু জ্ঞানী লোক ধ্যানদৃষ্টি দ্বারা সেই একই সত্যকে উপলব্ধি করচেন বহু প্রাচীন যুগ থেকে। শুধু এ কল্প নয়, পূর্ব পূর্ব কল্পেও তাই হয়েছিল। পূর্ব পূর্ব কল্পের মুক্ত পুরুষেরা এ কল্পে পৃথিবীতে দেহ ধরে তাঁদের পূর্ব জীবনের সাধনলব্ধ জ্ঞান প্রচার করতে নামেন। তাঁরাই তোমাদের শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, শঙ্কর, চৈতন্য, বাল্মীকি, কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ইত্যাদি—

এই পর্যন্ত বলেই তিনি চুপ করে গেলেন। হঠাৎ পূর্বদিগন্তে অরুণ সূর্যোদয় দূরদূরান্তরের তুষারাবৃত শৈলশিখর অনুরঞ্জিত করে অপূর্ব মহিমায় স্বপ্রকাশিত হোল এক মুহূর্তে। পলকে পলকে শিখর থেকে শিখরান্তরে বর্ণসমুদ্রের বিভিন্ন রঙের ঢেউ গেল ছড়িয়ে। সকলে অবাক হয়ে চেয়ে রইল সে মহিমময় সৌন্দর্যের দিকে।

করুণাদেবী বলে উঠলেন সাগ্রহে—চলো মানস-সরোবরে—চলো, চলো—

তখনি ঠিক পটপরিবর্তনের মত একটা ব্যাপার ঘটে গেল। এই ছিল অরুণরাগে রঞ্জিত শৈলশিখর ও অরণ্যানী, তখনি যতীন ও পুষ্প বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলে তাদের সামনে কোনো বিশাল জলাশয়ের নীল জলরাশি বিস্তৃত।

অপরকূলে তুষারাবৃত শৈলচূড়া, সবে প্রভাত হয়েচে, কিন্তু সেই তুষারময় মেরুবৎ প্রদেশে কোনো বিহঙ্গকাকলী নেই কোনোদিকে। সমগ্র পার্বত্যহ্রদের গম্ভীর সৌন্দর্য যতীন ও পুষ্পকে মুগ্ধ করলে।

করুণাদেবী বল্লেন—ওই দূরে রাবণহ্রদ, সামনে এটা মানস-সরোবর।

তরুণদেবতা বল্লেন—সামনের ওই পাহাড়ের চূড়া গুরলা মান্ধাতা আর ওই দূরে কৈলাস—

পুষ্পের মনে পড়ে গেল কৈলাস পর্বতে অনেক সিদ্ধ মহাপুরুষ লোকচক্ষুর অগোচরে বাস করেন—ওঁদের কাউকে দেখবার ইচ্ছা অনেকদিন থেকেই আছে তার। করুণাদেবীর কাছে সেকথা তুলতেই তিনি তরুণদেবতাকে পুষ্পের বাসনা জানালেন।

তিনি বল্লেন—একজন জীবন্মুক্ত সাধু ওখানে আছেন, আমি দু-একবার তাঁকে সাহায্য করেছিলাম কোনো কাজে। তবে তিনি আমাকে দেখেননি—চলো নিয়ে যাই।

কৈলাসপর্বত ও সম্মুখবর্তী গুরলা মান্ধাতা চূড়ার মধ্যে বরফের বিশাল ক্ষেত্র—যতীন কথনো গ্লেসিয়ার বা তুষারপ্রবাহ দেখেনি, ওর মনে কথাটা উঠলো, যা সামনে দেখচে, সেটাই বোধ হয় গ্লেসিয়ার। তরুণদেবতা ওর মনের ভাব বুঝে বল্লেন—তুমি যা ভাবচো, তা এ নয়। চলো এখান থেকে তোমায় শতপন্থ বরফস্রোত দেখিয়ে আনবো—

ওরা কৈলাসপর্বতে গিয়ে দেখলে কৈলাস একটি সম্পূর্ণ আলাদা পর্বত, তার তুষারমণ্ডিত পিনাকসদৃশ শিখরের নিম্নভাগে অনেকগুলি গুহা সাধু যোগীদের আবাস। একটি গুহায় একজন শীর্ণকায় সাধুকে দেখিয়ে দেবতা বল্লেন—এঁর কথা বলছিলাম। উনি এখন স্থূলদেহের স্থূলচক্ষে আমাদের দেখতে পাবেন না—নির্বিকল্প সমাধিস্থ অবস্থায় ইনি ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যান, তখন আমাদেরও অনেক ওপরে চলে যান উনি। তবে স্থূল দেহে ওঁরা সাধারণ মানুষের সমান।

যতীন বল্লে—আচ্ছা, এঁরা একা আছেন কেন?

—নির্জনতা আত্মার উন্নতির একটি প্রধান উপায়। নিম্নজগতের কোনো প্রভাব এই উত্তুঙ্গ জনহীন পর্বতচূড়ায় এঁদের দেহমন স্পর্শ করে না। নির্জনতায় এঁরা শক্তি অর্জন করেন—ব্রহ্মজ্যোতিঃ এঁদের মনে প্রবেশ করে ধীরে ধীরে এ অবস্থায়।

—আমি এঁর সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে পারি?

—কি করে? তুমি স্থূল দেহ ত্যাগ করেচ, উনি এখন দেহে অবস্থান করচেন। তা সম্ভব নয়।

—আচ্ছা, ওই যে একজন তিব্বতী লোক মানস-সরোবরের ধারে বেড়াচ্ছিল তখন, ওরা কি অবস্থায় আছে? ওদের মুক্তি বা উন্নতি—

দেবতা হেসে বল্লেন—ওদের থাক্ আলাদা। ওরা নিম্নস্তরের চৈতন্য নিয়ে জন্মেচে—সঙ্কুচিত চেতন। ওরা মরবে, অমনি অল্পদিন পরেই আবার দেহ নিয়ে পৃথিবীতে জন্মাবে, কারণ ভুবর্লোকে ওদের চৈতন্য মোটেই থাকে না। যদিও থাকে, খুব কম। দেহ না নিলে উপায় হয় না—সুতরাং দীর্ঘ সময় ধরে ওদের প্রায় স্থূলদেহেই বর্তমান থাকতে হয়—পৃথিবীর কামনা বাসনার উর্ধ্বে ওদের উঠতে অনেক দেরি। সভ্য সমাজেও এমন অনেক আছে—খুনী, দস্যু, অলস, চোর, পরপীড়ক ইত্যাদি।

করুণাদেবী হেসে দেবতার দিকে বক্রদৃষ্টিতে চেয়ে বল্লেন—এ তুমি খুব ভালই জানো কারণ তোমার হাতের কাজ এটা, কে কতদিন ভুবর্লোকে বাস করবে কি নতুন জন্ম নেবে। উঃ, দু-একটা ব্যাপার এমন নিষ্ঠুর আর করুণ হয়ে ওঠে তখন আমি অনুরোধ করতে বাধ্য হই—

তরুণদেবতা হাসলেন মাত্র—সে হাসির মধ্যে অসীম দয়া, অনন্ত জ্ঞান ও গভীর শক্তির

আভাস।

পুষ্প চুপি চুপি দেবীকে জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা, উনি কে? এই অদ্ভুত দেবতা?

—উনি?

পরে হেসে দেবতার দিকে চেয়ে বল্লেন—এইবার ওদের বলি?

বলেই চুপ করে গেলেন।

পুষ্প বিস্ময়ের সঙ্গে বল্লে—আমাদের সঙ্গে এমন ভাবে মিশচেন! এত বড় উনি! অথচ—

দেবতা এবার হেসে এগিয়ে এসে বল্লেন—মানুষ কি কীট? তোমরাও তিনি। তোমাদের ঋষিরাই বলেচেন—কিঙ্করাহং ন তু ত্বাং ভৃত্যবৎ যাচে, যোহসৌ আদিত্যমণ্ডলস্থো ব্যাহৃতাবয়বঃ পুরুষঃ সোহহং ভবামি—আমি ভৃত্যভাবে তোমার সাক্ষাৎকার যাচ্ঞা করচিনে—সবিতৃমণ্ডলে যে ওঙ্কারময় পুরুষ, আমিই সেই। তুমি আমি ভিন্ন কোথায়? ছোট ভাবো কেন, তাই তো ছোট হয়ে থাকো। বড় হও, বীর্যবান হও। সচেতন হয়ে যদি তোমরা আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও দাঁড়াও বিদ্রোহের পথে—সেও ভাল। তার দ্বারা শক্তি অর্জন করবে। যে দুর্বল, তার দ্বারা কি কাজ হবে? যে শক্তিমান, অথচ বিদ্রোহী—তাকে ঠিক পথে নিয়ে আসতে আমরা জানি।

যতীন কৌতূহলের সঙ্গে বল্লে—এই যে যুদ্ধ, জাতিতে জাতিতে রক্তারক্তি,...এও কি আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী?

—তুমি বুঝতে পারলে না। প্রত্যেক ঘটনা মানুষকে উন্নতির পথে নিয়ে যায়। যুদ্ধে জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ—এর দ্বারা জাতি শক্তিমান হয়। কি হয় যুদ্ধে? মানুষ মারা যায়। মানুষের আরামের ব্যাঘাত ঘটে। এই তো? কিন্তু মৃত্যুর অসত্যতা এতদিনে তুমি নিশ্চয় বুঝেছ। আরামের অত্যন্ত সুযোগ মানুষকে অলস, পশুবৎ করে তোলে। আমার পৃথিবী কতকগুলি আরামপ্রিয়, রোমন্থনকারী, নিজের অবস্থায় মহাপরিতুষ্ট গোরুর দলে ভ'রে তুলতে আমি চাইনে। শক্তিমান হয়ে উঠুক সব। কে কা'কে মারচে? সব মিথ্যে। দুদিনের আরাম কিসের? অনন্ত বিশ্ব তোমাদের পায়ের তলায়। সংকল্পাদেব তৎশ্রুতেঃ, যা যখন ভাববে, মুক্ত পুরুষে তাই তখন পায়। পৃথিবীর স্থূল বাসনা কামনাকে জয় করো—আরামের ইচ্ছা মন থেকে তাড়াও। নয়তো ঘুমিয়ে পড়বে।

করুণাদেবী বল্লেন—এদের বৃহস্পতি গ্রহের দুই উপগ্রহে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দাও না?

—দেখাবো। সে দুটো ধীরগামী জগৎ, যারা পৃথিবীতে সুবিধেমত উন্নতি করতে পারচে না, আমরা তাদের ওই সব মন্থরগতি জগতে পাঠিয়ে দিই জন্ম নিতে। সেখানে গেলে আশ্চর্য ব্যাপার দেখবে।

করুণাদেবী বল্লেন—ওদের এখুনি নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দিই—

আবার মানস-সরোবর ও হিমালয় ওদের পায়ের তলায় দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল। আবার অসীম ব্যোম—অন্ধকারে ডুবে পৃথিবী দিগন্তহীন আকাশে অদৃশ্য হোল। আকাশের অদ্ভুত দৃশ্য, দিনমানে সব দিক নক্ষত্রযুক্ত।

তারপরে নক্ষত্রজ্যোৎস্নায় প্লাবিত আকাশপথে এক বিশাল মহাগ্রহ ওদের দিকে যেন দ্রুত ছুটে আসচে। করুণাদেবী বল্লেন—বৃহস্পতি!

কিন্তু বৃহস্পতি খুব বড় মশালের আলোর মত ওদের দক্ষিণে দূরে পড়ে রইল। ওরা অন্য একটি ক্ষুদ্র পৃথিবীর খুব নিকটে এসে তার বায়ুমণ্ডলে ঢুকে পড়লো।

যতীন বল্লে—কিসে যেন পড়েছিলুম, পৃথিবী ছাড়া সোলার সিস্টেমের অন্য কোনো কিছুতে মানুষ নেই।

গ্রহদেব বল্লেন—সে সব কথা এখন থাক্। এই পৃথিবীটা দেখে নাও আগে—

পৃথিবীর মত অবিকল সে স্থান, খুব বেশি ফুল, ছোট বড় নদী। বসন্তের হাওয়া বইচে, বিহঙ্গের সুস্বর সর্বত্র, নির্মল জলাশয়। গ্রহটির একদিকে রাত্রির অন্ধকার, অন্যদিকে দিবসের আলো। যে অংশে ওরা গেল সেখানে মানুষের কর্মব্যস্ততা নেই, নিশ্চিন্ত মনে সকলে নিজের নিজের বাড়ীতে বসে আছে। গৃহস্থাপত্য অতি সুন্দর, সব রকম শিল্পকলার অদ্ভুত উন্নতি হয়েচে সেখানে, দেখেই মনে হোল, সর্বত্র সঙ্গীত, বাদ্য নৃত্য। অত্যন্ত সুন্দরী মেয়েরা বনে উপবনে ভ্রমণ করে বেড়াচ্চে পরম নিশ্চিন্ত মনে, যেন তাদের হাতে অতি সুদীর্ঘ অবকাশ, যেন সারা দিনমান শুধু কমলের বনে অলস পাদচারণ জীবনের সব মুহূর্তগুলি ভরে দেবে অমৃতে। শান্ত ও অপরূপ সৌন্দর্যের রূপায়তন সে পৃথিবীর সুশ্যামল প্রান্তরে, ফুলফোটা বনে ঝোপে গন্ধে ভরা কুঞ্জতলে। বৃহস্পতির আলো পড়ে যে অংশে রাত্রির অন্ধকার, সে অংশের শোভাও চমৎকার—তবে সমগ্র পৃথিবীটি একটি নিশ্চিন্ত, নিরুপদ্রব শান্তির গভীরতায়, ব্যস্ততাহীন জীবনমুহূর্তগুলির পুঞ্জীভূত ভারে যেন ঘুমিয়ে আছে, এলিয়ে আছে, কিসের অলীক স্বপ্নে দিনরাত্রি বিভোর।

করুণাদেবী বল্লেন—এই দেখ যে পৃথিবীর কথা তোমায় বলেছিলাম।

—স্লো—মানে ধীরগামী পৃথিবী?

করুণাদেবী হেসে ফেলতেই যতীন অপ্রতিভ হয়ে বল্লে—না, ইংরিজিটা আপনি হয় তো জানেন কি না—মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—ও ভাষা কি আপনারা—মানে ম্লেচ্ছ ভাষা—

গ্রহদেব বল্লেন—তুমি এখনও বুঝলে না। আমাদের কোনো ভাষা নেই, যখন যে পৃথিবীতে, যে মানুষের সঙ্গে কথা কই—তাদের ভাষাই আমাদের ভাষা। পৃথিবীতে প্রচলিত যে কোনো ভাষাই হোক—তা আমাদের আপন। ইটালী দেশের কোনো লোকের সঙ্গে কথা বলবার সময় তাদের ভাষাতেই বলবো—

—আপনাদের মধ্যে কথাবার্তা তা হোলে কি ভাষায়—কেন, বাংলাতেই তো আপনাদের মধ্যে বলছিলেন?

করুণাদেবী বল্লেন—মুখ দিয়ে কথা বলার দরকার হয় না কোনো স্বর্গেই—চতুর্থ স্তরের ওপরে কোথাও। মনের মধ্যে পরস্পরের কথা ফুটে ওঠে—আরও ওপরে স্বর্গে রঙীন্ আলোর বিদ্যুৎশিখার মত আলোর ভাষায় আদানপ্রদানে কথাবার্তা চলে। আমাদের ভাষা তোমাদের মত "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো" তা হয় না। মরমেই আগে পশে—কান শুনতেই পায় না—শোনবার দরকার হয় না। কিন্তু তোমাদের সঙ্গে ব্যবহার করতে হচ্চে বলেই আমরা মুখের

ভাষা ব্যবহার করি।

পুষ্প বল্লে—এই পৃথিবী কিন্তু আমার বেশ লাগচে। একটু বেড়ানো গেলে মন্দ কি?

বৈশ্রবণ বল্লেন—বেশ তো, ভাল করেই দেখতে পারো।

এক হ্রদে কতগুলি সুসজ্জিতা নরনারী নৌকাতে প্রমোদবিহার করছিল। দেবতা সেখানে গিয়ে বল্লেন—ক'বছর এরা এমনিধারা জল-বিহার করচে জানো? তোমাদের পৃথিবীর মাপে তিনটি বছর। তাড়াতাড়ি নেই কিছু এদের।

যতীন সবিস্ময়ে বল্লে—তিনটি বছর!

—ঐ যে বল্লাম, ধীরেসুস্থে এখানে সব হয়। নৌকাতে জলবিহার চলচে তো চলচেই। ওদের গিয়ে বল যদি, বিস্মিত হবে।

যতীনের মনে পড়ে গেল বাল্যে কলেজের ক্লাসে পড়া টেনিসনের কবিতার সেই মৃণাল-ভোজীর দেশ বা **Land of Lotus-eaters**!···সেখানেও সব লোক—

পরে কার সঙ্গে কথা বলতে যাচ্চে ভেবে সে লজ্জায় চুপ করে গেল।''

দেবতা বল্লেন—চলো আরও দেখবে।

এক পাহাড়ের শ্যাম সানুতে বনপুষ্পবিকশিত নির্জন অঞ্চলে সে দেশের কবিকুলের মজলিস বসেচে। সেখানে সুদীর্ঘসময়-ব্যাপী গোধূলিতে তারা আরামে কাব্য আলোচনা করচে, পরস্পর পরস্পরকে আবৃত্তি করে শোনাচ্চে নৈসর্গিক শোভা, বনপুষ্পের লাবণ্য সম্বন্ধে নানা কবিতা। নারীপ্রেম নিয়ে কত সঙ্গীত রচনা করে বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে অতি সুকুমার মাধুর্যের সঙ্গে ললিত স্বরে গাইচে—যেন জীবন অনন্ত, সময় অনন্ত। সে সঙ্গীতের ঘুমপাড়ানি মাধুর্য সত্যিই চোখে ঘুম নিয়ে আসে, শুনে যতীনের সত্যিই মনে হচ্ছিল দিগন্তের পাণ্ডুর শোভা শৈলসানুতটে যে শান্তি ও শ্রী বিস্তার করচে তাতে সব ভুলিয়ে দেয়, জীবনের যুদ্ধ অবাস্তব কাহিনী—জীবন শুধু এমনি নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব গোধূলি দিয়ে ভরা—আর কোথাও ছুটোছুটি করে কি হবে, এখানেই ঘুমিয়ে পড়া যাক্ দিব্যি।

যতীন বল্লে—আমাদের পৃথিবীতেও এরকম নেই কি দেব?

—আছে, সে অন্য রকম। এরা এদেশের বসন্তকাল ব্যেপে এরকম উৎসব চালাচ্চে। এদের বসন্তের স্থায়িত্ব কত জানো? ন'বছর পৃথিবীর হিসেবে।

যতীন হাঁ করে অবাক হয়ে চেয়ে রইল দেবতার মুখের দিকে।

করুণাদেবী ওর বিস্ময় দেখে কৌতুক অনুভব করলেন। বল্লেন—নইলে তোমার ভাষায় স্লো ওয়ার্ল্ড হবে কি করে?···

ও আরও অবাক হয়ে বল্লে—বা রে, আপনি যে ইংরিজি—

—সব ভাষাতেই কথা বলতে পারি আমরা, বল্লাম যে। ভাষা কিছুই নয় আমাদের কাছে। তারপর শোনো, এদের বছর কতদিনে জানো? পৃথিবীর ষাট বছরে এদের দেশের এক বছর। ঐ দেখ বৃহস্পতি গ্রহ ঘুরচে কত আস্তে আস্তে। সূর্য থেকে যে গ্রহ যত দূরে, তার আবর্তন তেতমা। আবার এই উপগ্রহের একটা নিজস্ব আবর্তন আছে নিজের কক্ষে—সব মিলিয়ে দীর্ঘ

দিন, দীর্ঘ রাত্রি, দীর্ঘ পথ, দীর্ঘ বছর এখানে। মানুষও ধীর গতিতে চলে, বহু সময় নিয়ে কাজ করে, বহু সময় নিয়ে আমোদ করে, বদলায় অনেক সময় নিয়ে। পৃথিবীর মত তাড়াহুড়ো নেই, ব্যস্ততা নেই।

—এদের আয়ু?

—তিনশো বছর প্রায়, তোমার পৃথিবীর হিসেবে। ধীরগামী আত্মা, পৃথিবীর পঞ্চাশ-ষাট বছর বয়সে যারা উন্নতি করতে পারবে না, কিছু বুঝতে পারবে না—এখানে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়ে দেওয়া হয়। এখানে তারা যাতে ঘুমিয়ে না পড়ে তার ব্যবস্থা আছে।

—কি রকম ব্যবস্থা বড় জানতে ইচ্ছে হচ্চে—

দেবতা হেসে বল্লেন—রুদ্র ব্যবস্থা কিছু নেই. পৃথিবীতে যেমন আছে যুদ্ধ-বিগ্রহ, ব্যাধি, মহামারী, বিপ্লব, দুর্ভিক্ষ। এখানকার মানুষেরা একটু অলস, একটু ধীর-বুদ্ধি—এদের ওপর দয়া করতে হয় অনেকখানি। সবই তাঁর ব্যবস্থা (এখানে গ্রহদেবের মুখশ্রী শ্রদ্ধায়, সম্ভ্রমে, ভক্তিতে কোমল হয়ে এল), তিনি তাঁর অসীম করুণায় এ ব্যবস্থা করেচেন—আমরা তাঁর নিয়োজিত ভৃত্য মাত্র। এ কি দেখচো। এর চেয়েও ধীরগামী জগৎ আছে, তবে এ সৌরমণ্ডলে নয়। তিনিই এই সব অলস জড়বুদ্ধি জীবের জগতে উচ্চস্তরের দেবদূত পাঠিয়ে দেন, তাঁরা দেহধারণ করে আসেন এদের শিক্ষা দিতে। তাঁরাই এ সকল পৃথিবীর শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, শ্রীচৈতন্য, শঙ্কর, ব্যাস, দ্বৈপায়ন—সবাইকে তাঁর লীলাসহচর না করে নিলে তাঁর সুখ নেই। তাঁর অপার অনন্ত করুণার কথা তোমরা কি জানো? কেবল দুঃখ হয় মানুষে তাঁকে আগাগোড়া ভুল বুঝছে। কে তাঁকে জানে বা জানবার চেষ্টা করে? মানুষ যদি এক পা এগিয়ে যায়, তিনি তিন পা এগিয়ে আসেন মানুষের দিকে। অথচ সবাই নিজেকে নিয়ে উন্মত্ত, পৃথিবীর সুখ নিয়ে দিশাহারা—তিনি উদাসীন, কেউ তাঁকে চায় না দেখে অপেক্ষা করে করে দোর থেকে চলে যান। কেউ গ্রাহ্যও করে না। জগৎজোড়া বনফুলের মালা তাঁর গলায়—অথচ—

পুষ্পের চোখে জল এসে গেল গ্রহদেবের অপূর্ব কণ্ঠস্বরে। সে হাত জোড় করে বল্লে—প্রভু, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

গ্রহদেব তখনও আত্মস্থ বিভোর অবস্থায় বলেই চলেচেন আগের কথার জের টেনে—

—দেখ, তোমরা পৃথিবীর ছেলেমেয়ে। আমি তোমাদের ভালবাসি, কারণ তোমাদের জন্ম-জন্মান্তর নিজের হাতে গড়ে তুলেচি। তাঁর জ্যোতির্বাতায়ন অসীম শূন্যে খোলা রয়েচে, আশ্চর্যের বিষয় সেদিকে কেউ চায় না। সবাই অন্ধ। নরক থেকে বাঁচাতে চাই, কিন্তু পারিনে। অন্ধের মত ছুটে যায় সেদিকে। ওঁকে দেখ—উনি সত্যলোকেরও উর্ধ্বতন স্তরের দেবী কিন্তু নিজের সুখ চান না। পৃথিবীর ছেলেমেয়েদের দুঃখে প্রাণ কাঁদে বলে কোনো উর্ধ্ব লোকেই থাকতে পারেন না। উনি সৌরমণ্ডলের সমস্ত জগতের মা। তোমরা কি আমাদের দেখা পেতে? আমাদের দেখার মত চোখ পেয়েচ শুধু ওঁর কৃপায়। নইলে ওঁর নিজের স্তবে উনি জনঃ, মহঃ, তপঃ লোকের জীবের অদৃশ্য। এখানে কোনো লোকের অধিবাসী তাদের উর্ধ্ব লোকের অধিবাসীকে দেখতে পায় না—দেখা সম্ভব নয়। ওই মেয়েটিকে ভালবাসেন বলে আজ

তোমাদের এই সব সৌভাগ্য। উনি আমারও ঊর্ধ্ব লোকের দেবী, দয়া করে আমায়—

করুণাদেবী সলজ্জ স্বরে বল্লেন—পুষ্প, শোনো তবে—উনি কে জানো? উনি গ্রহদেব বৈশ্রবণ। তোমাদের পৃথিবীর সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কর্তা। যুগযুগান্তর থেকে তাঁর নির্দেশমত উনি তোমাদের পৃথিবী পরিচালনা করচেন। পূর্ব কল্পের দেবতা উনি। তার পূর্ব কল্পে উনি দেবযান-পথে জন্মমৃত্যুর আবর্ত অতিক্রম করেন—বহুদূর পথের যাত্রী উনি। ওঁর স্বরূপে ওঁকে সত্যলোকের জীবেরাও দেখতে পায় না—চোখ ঝলসে যায় ওঁর তেজে। দয়া করে তোমাদের দৃষ্টির উপযুক্ত কায়া ধারণ করে দেখা দিলেন তাই দেখতে পাচ্চ।

সম্ভ্রমে, বিস্ময়ে, ভয়ে ও ভক্তিতে ক্ষুদ্র পৃথিবীর ছেলে-মেয়ে পুষ্প ও যতীন একেবারে নির্বাক্ হয়ে রইল। পুষ্প কি প্রশ্ন করতে চেয়েছিল তা ভুলেই গিয়েছিল, এই সময় মনে আসতে সে আবার হাতজোড় করে বল্লে—প্রভু, আমাদের জন্মান্তরে কত সৌভাগ্য ছিল যে আপনাদের সাক্ষাৎ···একটা প্রশ্ন আমার আছে—

বৈশ্রবণ বল্লেন—আমাকে ধন্যবাদ দিও না পুষ্প। কৃতজ্ঞতা জানাও সেই মহামহেশ্বর, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অধিদেবতা যিনি, তাঁকে। আমরা তাঁর ভৃত্যদের নির্দেশে চলি—তাঁর দাসানুদাস। এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড তাঁর ইঙ্গিতে চলে—অথচ কে জানে তাঁকে? তোমাদের পৃথিবীর জ্ঞানী লোকেরা জানতেন—তাই বলে গিয়েচেন—অস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য সমন্ততঃ স্থিতান্যতাদৃশান্যনন্তকোটি-ব্রহ্মাণ্ডানি সাবরণানি জ্বলন্তি—এই ব্রহ্মাণ্ডের আশেপাশে এই রকম অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড আবরণের সহিত প্রজ্বলন্ত অবস্থায় অবস্থিত। সে সব ব্রহ্মাণ্ড আমিও দেখিনি। তুমি যে পথিকদেবতার সাক্ষাৎ পেয়েছিলে, তাঁর মত বিরাট দুর্দ্ধর্ষ আত্মারা তাঁর কৃপায় বহু সৌরমণ্ডল, বহু নীহারিকা, নক্ষত্রজগৎ অতিক্রম করে এই অনন্ত বিশ্বে ঘুরে বেড়াবার অধিকার ও শক্তি পেয়েচেন। বিগত কল্পে আর একজন এমন দেবদূতকে আমি জানতাম—তিনি পৃথিবীর এক আবর্তকাল অর্থাৎ প্রায় বাইশ হাজার বছর ধরে বিদ্যুতের অপেক্ষাও দ্রুতগতিতে পরিভ্রমণ করেও শুধু আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডটার কূলকিনারা পান নি। তা ছাড়াও তো অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডানি সাবরণানি জ্বলন্তি - কোথায় তার ঠিকানা, কোথায় তার কূলকিনারা, কোথায় তাদের সীমা! এখন ভাবো, এই সমুদয় বিশ্ব যাঁর ইঙ্গিতে চলেচে—পৃথিবীর ছেলেদের খেলবার ক্রীড়নকের মত বন্ বন্ করে ঘুরচে—তাঁকে কে জানতো যদি তিনি নিজের দয়ায় কৃপা করে—

পুষ্প অনেকক্ষণ থেকে যে প্রশ্ন করতে চাইছিল, এবার তার সুযোগ পেয়ে মরীয়ার স্বরে বল্লে—প্রভু, আমিও ঐ প্রশ্ন করতে চেয়েছিলুম—আপনি অন্তর্যামী, বুঝতে পেরেই তার উত্তর দিলেন। আমিও জানতে চাইছিলুম ভগবানকে আপনি কি দেখেচেন? দয়া করে আমার এই কৌতুহল—

করুণাদেবী এবার উত্তর দিলেন, কারণ গ্রহদেব তখন আপন ভাবে বিভোর। বিশ্বের ভগবানের কথা মনে ওঠাতে অন্য প্রশ্নের দিকে তাঁর মন ছিল না, যদি মন নামক অতি ক্ষুদ্র মানুষী ইন্দ্রিয় তাঁর মত বিরাট দেবতাতে আরোপ করা চলে। বল্লেন—না পুষ্প, উনি দেখেন নি। আমিও দেখি নি। অথচ তাঁকে অনুভব করেচি। তিনি কোথায় নেই? বিশ্বের প্রতি বাষ্প-

কণায়, জ্যোতিঃকণায়, পৃথিবীসমূহের প্রতি তৃণে প্রতি ধূলিকণায় তিনি। তিনি আছেন তাই আমরা আছি, তোমরা আছ, বিশ্ব আছে। তিনি সকলেরই। তুমি চাও, তোমার—আমি চাই, আমার।

গ্রহদেব বল্লেন—পুষ্প, বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে বুঝতে যেও না। পারা যায় না। সে ইন্দ্রিয় তোমাদের নেই—তবে শুধু তাঁকে ভালবাসা দ্বারা মন ও বুদ্ধিকে অতিক্রম করে এমন তুমি লাভ করা যায় যে-ভূমি থেকে তাঁকে অনুভব করা যায়। নয়তো যার সে ক্ষমতা নেই—সেও যদি আকুল হয়ে ডাকে—তার মন ও বুদ্ধির গম্য হয়ে নিজেকে খুব ছোট করে সে ভক্তকে তিনি দেখা দেন। পৃথিবাতে কত লোক ইষ্টরূপে তাঁকে ভজনা করে। ছোটর কাছে ছোট হয়ে দেখা দেন তিনি—কত কৃপা তাঁর। কিন্তু যে রূপ তাঁর নিজের—সে রূপে তাঁকে কে দেখতে পায়—

—প্রভু, কেউ কি পায় না?

—ব্রহ্মলোকের বহু উর্ধ্বে তাঁর নিজের লোক। দেখি নি, তবে জ্ঞান দ্বারা অনুভব করতে পারি। সেখানে হাজার হাজার কল্পের পূর্বেকার মুক্ত আত্মারা আছেন—কখনও দেখিনি তাঁদের। তাঁরা মহাশক্তিধর, বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয় করবার ক্ষমতা রাখেন। তাঁরাই তাঁকে স্বরূপে হয়তো দেখেন। কিন্তু মানুষের রূপে দেখতে চাও, তুমিও পাবে। ভক্তিভরে চাও। অত বড়ও কেউ নেই, আবার অত ছোটও কেউ নেই।

যতীন বল্লে—প্রভু, এই পৃথিবীর মানুষে ভগবানকে জানে?

—সব পৃথিবীর অবস্থাই সমান। সত্য জানতে চায় ক'জন? এখানে তো দেখচো, ইন্দ্রিয়জ সুখ নিয়ে সবাই মত্ত। সেই বিরাট মহাশক্তির ধারণা করা এদের পক্ষে সহজ নয়। অবশ্য এরা পৃথিবীর জীবের চেয়ে অধিকতর জড়বুদ্ধিসম্পন্ন। বহুকাল যুগ-যুগান্ত কেটে যাবে এদের সমস্ত জড়তা, মনের মালিন্য দূর করে সে ধারণা উদ্বুদ্ধ করতে। কিন্তু বিশ্বের ভগবানের অসীম ধৈর্য। কাউকে তিনি অবহেলা করেন না। তবে অনেক দেরি হয়ে যাবে। যারা নিরলস আত্মা, আধ্যাত্মিক জ্যোতি যাদের মধ্যে জ্বলচে স্বয়ম্প্রভ মহিমায়, তারা এক জন্মেই ঘুম ভেঙে চেয়ে দেখে। যেমন বলেছিলেন তোমাদের গ্রহের এক প্রাচীন কবি—বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ—আমি অন্ধকারের ওপারের সেই আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষকে জেনেচি—ওগো শোনো সবাই শোনো—শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। কত আনন্দ! আনন্দের ভাগ সবাইকে না দিলে যেন চলচে না। কিন্তু ভাবো, ক'জন সেজন্যে ব্যগ্র? আদিত্যবর্ণ পুরুষকে না জানলেও তাদের জন্মের পর জন্ম, যুগের পর যুগ, এমন কি কল্পের পর কল্প পরম আরামে অন্ধের মত কেটে যাচ্চে চির-অন্ধকারে। তার ওপারে কি আছে কে সন্ধান রাখে?

যতীনের মনে একটা প্রশ্ন জাগলো। প্রশ্নটা সে করলে—তাঁদের মত অসীম শক্তিধর দেবতা কৃপা করলে তো একদিনে সে উদ্ধার হয়! সত্যের প্রচার করে দিলেই তো হয়।

দেবতার মুখে অনুকম্পার হাসি ফুটে উঠলো। বল্লেন—তা কি হয়? যে পৃথিবী যে সত্যের জন্যে প্রস্তুত নয়, যে মানুষকে যে কথা বল্লে সে বুঝবে না—সেখানে সে সত্য প্রচার করা হয়

না—সে মানুষকে সে কথা জোর করে শোনানো হয় না। স্বাতী নক্ষত্রের জল ঝিনুকে পড়লে মুক্তা হয়—কিন্তু ধুলোয় পড়লে ?···ভগবান মহাজ্ঞানী। যা হয় না, তা তিনি করেন না।

পুষ্প বল্লে—তবে মানুষের মুক্তি কেমন করে হবে ?

—মানুষ যখন স্বেচ্ছায় এগিয়ে যাবে। তাঁর প্রতি উন্মুখ যে মন, সে মনের সকল ভ্রান্তি তিনি ঘুচিয়ে দিয়ে সত্যের প্রদীপ জ্বালিয়ে দেন।

—দেব, সহজ কথায় বলুন আমরা কি করবো ? আমাদের কি কর্তব্য ?

—তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি—তাঁকে জেনেই মৃত্যুকে অতিক্রম করতে হবে।

—কি ভাবে প্রভু ? মৃত্যুকে অতিক্রম করা মানে কি ?

—সাধারণ মানুষে মরচে, আবার জন্মাচ্চে, আবার মরচে। একে বলে মানব-আবর্ত। একে জয় করাই মৃত্যুকে অতিক্রম করা। তাঁকে না জানলে কিছুতেই এ আবর্ত এড়ানো যায় না। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়—আর দ্বিতীয় কোনো পথ নেই।

—পথ বলে দিন দেবতা—আমরা শরণাগত।

গ্রহদেব গম্ভীর মুখে বল্লেন—তাঁকে ডাকো, তাঁর কাছে আলো ভিক্ষা চাও। তাঁর কাছে প্রার্থনা কর সর্বদা। পরকে ভালবাসো। যেখানে প্রেম, ভক্তি, স্নেহ, ক্ষমা—সেখানে তিনি। তিনিই তাঁকে বুঝবার শক্তি দেবেন। তাঁর জন্যে যে সর্বত্যাগী, তাকে হাত ধরে তিনিই নিয়ে যান। পরের জন্যে যে সর্বত্যাগী, তাকে হাত ধরে তিনিই নিয়ে যান।

—এই মানুষের ধর্ম ?

—এর চেয়ে বড় ধর্ম নেই পৃথিবীর মানুষের। যারা নিরলস হয়ে তাঁকে ডাকে, ভালবাসে—পরের সেবা করে, এক অমানব পুরুষ তাদের হাত ধরে দেবযান-পথে জন্মমৃত্যুর দুস্তর অকূল মহাসমুদ্র পার করে নিয়ে যান। ভগবান নিজেই সেই অমানব পুরুষ, অপার করুণায় যিনি নিজেই এগিয়ে এসে হাত ধরেন অসহায়ের, শরণাগতের। পৃথিবীর সৃষ্টির আদিকালের বাণী এ। কারণ যা সত্য, তা চিরযুগেই সত্য—এই একই বার্তা যুগে যুগে পৃথিবীতে প্রচার করা হয়েচে, দূতের পর দূত এসেচে গিয়েচে, 'অন্ধ জাগো !' না—কিবা রাত্রি কিবা দিন! চোখ আছে, কেউ দেখে না ; কান আছে, কেউ শোনে না!

ওরা সে পৃথিবীর একটি সুরম্য হ্রদ-মত জলাশয়ের ধারে বসেচে। যতীন চেয়ে চেয়ে দেখছিল, ওদের দক্ষিণে পৃথিবীর দেবদারুজাতীয় বৃক্ষের মত এক প্রকার ঘন সবুজ বৃক্ষের সারি, কিন্তু তাতে থাবা-দোপাটির মত রঙীন ফুল এত ফুটেছে যে, বড় বড় শাখাপ্রশাখা নির্মল স্ফটিকের মত জলরাশির কূলে কূলে নুয়ে পড়েচে। বেলা উত্তীর্ণ হয়েচে, নীলকৃষ্ণ দিগন্তরেখার দিকে চেয়ে হঠাৎ সে দেখলে বিশালকায় এক দশমী কি একাদশীর চন্দ্র উদয় হচ্চে। অত বড় চন্দ্র। আকাশের এক দিক জুড়ে আলোয় আলো করে তুলেচে সারা দিক্‌চক্রবাল।

সে অবাক্ হয়ে বল্লে—ও কি রকম চাঁদের মত ওটা—অত বড়—

করুণাদেবী হেসে বল্লেন—বৃহস্পতি। ওর জ্যোৎস্না পড়বে এখুনি। পৃথিবীর জ্যোৎস্নার চেয়ে অনেক বেশি জ্যোৎস্না আর অদ্ভুত শোভা। আর একটা ব্যাপার, তোমাদের পৃথিবীর

মত অমাবস্যা এখানে নেই, উপগ্রহের ক্ষুদ্র দেহ অতবড় বৃহস্পতি গ্রহকে ঢাকতে পারে না, সুতরাং সপ্তমী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত কলা হয়—কিন্তু দু'বৎসর ধরে শুক্লা রাত্রি চলে।

সে মুগ্ধ হয়ে গেল এই সুদূরতর পৃথিবীর অদ্ভুত জ্যোৎস্নাময় রজনীর শোভায়। হ্রদের ওদিকে জলজ ঘাসের আড়ালে তরুদলের ভ্রষ্ট কুসুমরাশি পদদলিত করে একদল পরমা রূপসী নারী জলে নামলো স্নান করতে। কে জানতো আবার এমন সব স্থান আছে, সেখানেও মানুষ আছে! ভগবানের যে কথা গ্রহদেব কিছু আগে বলছিলেন, তাতে তার মন ভরে আছে। যে আদিত্যবর্ণ পুরুষের মানস থেকে এই সব পৃথিবী, এই জ্যোৎস্না, পাহাড় পর্বত, বেণু-বীণার ঝঙ্কারের মত সুস্বরা ওই সুন্দরীদের উৎপত্তি, তাঁতেই লয় কল্পান্তে, সৃষ্টি আর প্রলয় যাঁর নিঃশ্বাস আর প্রশ্বাস—তিনি কোথায়? কে তাঁকে জানে? কি ভাবে তাঁকে জানা যায়? কে দেখিয়ে দেবে তাঁকে?

হঠাৎ চমক ভেঙে সে দেখলে তারা তিনজনে মাত্র আছে। গ্রহদেব বৈশ্রবণ কখন অন্তর্হিত হয়েচেন। করুণাদেবী বল্লেন—উনি এ সব পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে বেশিক্ষণ থাকতে পারেন না।

পুষ্প বল্লে—আমাদের বড় সৌভাগ্য যে ওঁর দেখা পেয়েচি—অবিশ্যি আপনার দয়ায়।

ফেরবার পথে আকাশে উঠে পুষ্পকে দেবী দেখালেন, পৃথিবীটার চারিদিকে আকাশে কুয়াশার মত, মেঘের মত পিঙ্গল প্রভায় আবেষ্টিত করে রেখেছে কি সব। বল্লেন—পৃথিবীর তাবৎ অধিবাসীদের বাসনা কামনা মেঘের মত জমা হয়েচে ও বায়ুমণ্ডলে। ওদের কাছে অদৃশ্য, যেমন আমরা ওদের কাছে অদৃশ্য। তোমাদের পৃথিবীতেও আছে এই রকম—এর চেয়েও বেশি। এই সব ঠেলে আমাদের যাতায়াত বড় কষ্টকর—তোমাদের পৃথিবীর শহরগুলোতে তো আরও বেশি। টাকার নেশা, সুরার নেশা, রূপের নেশা—ওর আকাশ ধূসর বাষ্পে ছেয়ে রেখেচে—তাতে বিষ আছে, আমাদের পক্ষে সে ঠেলে যাওয়া কত কষ্ট! কি করি, পৃথিবীর মত স্থূল দেহের আবরণ তৈরি করে যেতে হয়। কিন্তু গেলে কি হবে, আমাদের পর্যন্ত বুদ্ধি আচ্ছন্ন করে ফেলে, ভালভাবে কিছু দেখতে পাইনে, নিজের স্বরূপ আবৃত করে গিয়েও কিছু করতে পারিনে। যাও তোমরা তাহলে···

ওদের পায়ের তলায় বুড়োশিবতলার ঘাটে দেখা গেল দিব্যি দুপুরবেলা। দূর পৃথিবীর জ্যোৎস্না ছায়াবাজির মত গিয়েছে মিলিয়ে, তার অপরূপ রূপসী জলকেলিরতা নারীদের নিয়ে।

যতীন বল্লে—নাঃ, এতদিনে বুঝলুম জগৎটা মায়া!

পুষ্প কৌতুকের সুরে বল্লে—অত বড় দীর্ঘনিঃশ্বাসটা ফেল্লে যে? ওটা কি দার্শনিক দীর্ঘশ্বাস, না সেখানকার ওই সুন্দরীদের অদর্শনে—

—যাও, ওসব ভাল লাগচে না। মন বড় চঞ্চল—আমি এখুনি যাবো। আমার মা কাঁদচেন আমার জন্যে।

—কোন্ মা?

—আরে, কোন্ মা আবার? পৃথিবীর এই সেদিনের—

পুষ্প খিল্ খিল্ করে হেসে বল্লে—জগৎটা মায়া বলছিলে না যতীনদা?

যতীন বিরক্তির সুরে বল্লে—সব তাতেই তোমার ঠাট্টা। আমার ব্যথা আমিই জানি।

—বেশ ভালই। যাও, গিয়ে দেখে শুনে এসো, মায়ের বাছা— আহা!

—তুমিও চলো। পথে নানা বিপদ, চুম্বকের ঢেউ—ঢেউ কখন কি রকম হবে, ওসব আমি বুঝতে পারিনে। শেষকালে আবার কোথায় গিয়ে ঠেলে উঠবো জন্ম নিয়ে, বিশ্বাস কিছু নেই। তার চেয়ে চলো সঙ্গে।

কোলা-বলরামপুর গ্রামে ঝাঁ ঝাঁ করচে শরতের দ্বিপ্রহর। নিবিড় বাঁশবনে ঘুঘু ডাকচে উদাস-মধ্যাহ্নবেলায়, বনে বনে তিৎপল্লার হলুদ ফুল ফুটেছে। যতীন অনেকদিন পরে বাংলার শরতের এ সুপরিচিত দৃশ্যগুলি দেখলে। বাঁশঝাড়ে সোনার সড়কির মত নতুন বাঁশের চারা ঠেলে উঠেছে, বনশিমতলায় বেগুনী ফুল ফুটে ঝোপের মাথা আলো করচে—বর্ষার শেষে জল সরে যাচ্চে ডোবায়, পুকুরে নদীতে—তীরের টাটকা কাদায় সাদা বক গেঁড়ি গুগ্‌লি খুঁজে বেড়াচ্চে, জলের ধারেই কাশফুলের ঝাড় থেকে হাওয়ায় কাশফুলের সাদা তুলোর মত পাপড়ি উড়চে।

যতীন বল্লে—কি চমৎকার, পুষ্প! বাংলার সব পাড়াগাঁয়েই এমন। মন খারাপ হয়ে গেল। এর সঙ্গে জীবনের কত স্মৃতি জড়ানো! ছেলেবেলায় এম্‌নি শরতে পূজোর ছুটিতে স্কুল-বোর্ডিং থেকে বাড়ী আসতুম···ছাখো ছাখো এই গেরস্তর বাড়ীটিতে কি শিউলি ফুলটা তলায় পড়ে রয়েচে! আহা!

পুষ্প বল্লে—দুপুরের রোদে এখনও শুকোয় নি—ঘন ছায়া কিনা!

যতীন স্বপ্নালস চোখে বল্লে—কতকাল পরে যেন নিজের মাটির ঘরটিতে ফিরে এলুম পুষ্প। এমনি স্নিগ্ধ, এমনি আপন। চলো—

ঘরের মধ্যে বিছানা পাতা—তাতে যতীনের সেই তরুণী মা আধময়লা লেপকাঁথা গায়ে শুয়ে ম্যালেরিয়ায় ভুগচে। শুধু এখানে নয়, পাশের বাড়ীতেও তাই—জানলার কাছে ছোট তক্তপোশে আর একটি বৌ শুয়ে জ্বরে এপাশ-ওপাশ করচে, তার পাশে দুটি ছোট ছোট ছেলে—জ্বরে ধুঁকচে তারাও। রান্নাঘরে একটি বৃদ্ধা কলাই-এর ডালে সম্বরা দিয়েচেন, তারই সুগন্ধ জ্বরাক্রান্ত বাড়ীর বাতাসে। পাশের বাড়ীর বৌটি চিঁচিঁ করে বলচে—একটু জল দিয়ে যাও পিসিমা।

বৃদ্ধা বলচে—একা মানুষ কতদিকে যাবো, ক'টা হাত পা? কাল গিয়েচে একাদশী, আর এই খাটুনি। একটু সবুর করো। গোরু দুটো সেই কোন্ সকালে বেঁধে দিয়ে এসেচি নদীর ধারের বাচ্‌ড়ায়, একটু জল দেখিয়ে আসবার সময় পাইনি এত বেলা হোল।

যতীন এসে ওর নতুন মায়ের বিছানার পাশে দাঁড়ালো। একটু আগে ওর মা ওর কথা মনে করে কেঁদেচে জ্বরের ঘোরে। এই তো গত বর্ষায় ও মায়ের কোল ছেড়ে গিয়েচে, সে স্মৃতি ওর মায়ের মনে এখনও অতি স্পষ্ট। চোখের জল গড়িয়ে পড়েচে বালিশের গায়ে। মাতৃহৃদয়ের নিঃশব্দ ব্যথার অভিব্যক্তি। যতীন বুঝলে, মায়ের এই চোখের জল, বুকের চাপা

কান্নাই তাকে আজ সপ্তস্বর্গের পার থেকে টেনে এনেচে এখানে। মাতৃশক্তির আকর্ষণ অদম্য, কেউ তাকে তুচ্ছ করতে পারে না, হোলই বা মাটির ঘরের দুঃদিনের মা। সব মা-ই তো দুঃদিনের।

পুষ্প বল্লে -যা ভাবচো তা নয় যতীনদা। মায়া বলে উড়িয়ে দিতে চেও না পৃথিবীকে, পৃথিবীর স্নেহ-ভালবাসাকে। তোমার সাধ্যি কি এই মাতৃশক্তিকে অবহেলা কর? নিজের নিজের জায়গায় কারো শক্তি কম নয়।

যতীন কৃত্রিম রাগের সুরে বল্লে—ওঃ, এখন যদি সেই সমাধিবাজ সন্নিসিটাকে পেতাম—বুঝিয়ে দিতাম তাকে—

—মহাপুরুষদের নামে অমন বোলো না, ছিঃ! তিনি যে ভূমিতে উঠে জগৎকে মায়া দেখেচেন, তোমার সে জ্ঞান কোথায়? যে অবস্থা যার, তাই তার কাছে সত্যি আর সহজ। তোমার কাছে এই সত্যি। বদ্ধ জীব তুমি।

—তাহোলেই পুষ্প, জগৎটা কি কতকটা ভেল্কির মত লাগচে না? বদ্ধ জীব বলে গালাগালি তো দিচ্চ—

—আবার তোমার বোঝবার ভুল। যাক্ ওসব বড় বড় কথা। তিনি যখন বোঝাবেন তখন বুঝো। এখন তোমার মায়ের সেবা করো—আমি যাই পাশের বাড়ীর বৌটির কাছে—জ্বরের ঘোরে বমি করচে ওই শোনো— আহা!

—তার ওপর বাড়ীতে তো দেখচি এক থাণ্ডার পিস্‌শাশুড়ী ছাড়া মুখে জল দেবার কেউ নেই—

যতীন বসে মায়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ঘরের চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো। অতি দরিদ্রের ঘরকন্না, ময়লা কাঁথা, ছেঁড়া মাদুর আর মাটির হাঁড়িকুঁড়ির গেরস্থালি। খানিক আগে পাশের ঘরের মেজেতে কে পান্তাভাত খেয়ে এঁটো থালা-বাসন ফেলে রেখেচে—একটা বেড়ালছানা থালার আশেপাশে ঘুরচে। হয়তো তার মা জ্বর আসবার আগে পান্তাভাত ক'টা খেয়ে থাকবেন, গরীবের ঘরে জ্বরের উপযুক্ত পথ্য জোটে নি। কেন তাকে পুষ্প নিয়ে গেল এখান থেকে? এই ঘরে মায়ের কোলটি জুড়ে সে বেশ থাকতো। তারপর একদিন সুখেদুঃখে বড়ো হয়ে উঠতো, ভাল চাকুরি করে এই দরিদ্রের ঘরণী মায়ের সেবা করতো। ভাঙা বাড়ী সারাতো, মাকে ভালো ভালো শাড়ী, কানের দুল, হাতের বালা চুড়ি কিনে দিতো, ম্যালেরিয়ার সময় এখান থেকে নিয়ে যেতো দেওঘর মধুপুরে। ওইখানে সজনেতলায় বড় রান্নাঘর তৈরি করে দিত, সানাই বাজনার মধ্যে একদিন বিয়ে করে বৌ এনে মায়ের বুকে সুখের ঢেউ তুলতো, নানা দিক দিয়ে মায়ের শত সাধ পূর্ণ করতো। আজ এই যে অসহায়া অশিক্ষিতা পল্লীবধূ জ্বরের ঘোরে তাকেই স্মরণ করে কিছুক্ষণ আগেও কেঁদেচে—কি অপূর্ব! স্নেহের অমৃতই ওর বুকে জমা রয়েচে তার জন্যে। এর জন্যে তার মন পিসাসিত—কি হোল তার স্বর্গে গিয়ে? স্বর্গ তো পালাচ্ছিল না?

এই সময় ডাকপিওন বাইরের উঠোনে এসে দাঁড়িয়ে বল্লে—মনিঅর্ডার আছে।

বাড়ীতে আর কেউ নেই, যতীনের মা ধড়মড় করে উঠে বল্লে—ও শৈল, শৈল—কোথায় গেলি? মাগো, আমায় সবাই মিলে খেলে। কেউ যদি বাড়ী থাকবে—ও শৈল—

রোগিণীর আহ্বানে কোথা থেকে আট দশ বৎসরের একটি বালক ছুটতে ছুটতে এসে বল্লে—কি কাকীমা—কি হয়েচে?

—আমার মাথামুণ্ডু হয়েচে। দুপুর বেলা বেরোয় কোথায় সব, বাড়ীতে কেউ নেই—মনিঅর্ডার এসেচে, নে পিওনের কাছ থেকে; আমার এমন জ্বর এয়েচে যে মাথা তুলতে পারচিনে—শৈল কোথায়?

—দিদি তাস খেলচে পাঁচুদের বাড়ী—

বালক মনিঅর্ডারের ফর্মখানা হাতে নিয়ে আবার ঘরে ঢুকলো। ওর কাকীমা বল্লে—ক'টাকা?

বালক ঘাড় নেড়ে বল্লে—সে জানে না। বাইরে থেকে পিওন চেঁচিয়ে বল্লে—সাত টাকা মা ঠাকরুণ—সইটা করে দেন—

পিওন ফর্ম সই করিয়ে টাকা দিয়ে চলে গেল। বালক টাকা নিয়ে এসে রোগিণীর হাতে দিতে রোগিণী তিন চার বার গুনে গুনে বালিশের পাশে রেখে দিলে। যে ভাবে বৌটি আদরে যত্নে সতর্কতার সঙ্গে টাকা কয়টি বার বার গুনলে তাতেই যতীনের মনে হোল এই দরিদ্র সংসারে গৃহলক্ষ্মীর কাছে ওই সাতটি টাকা সাতটি মোহর। সে যদি বড় হয়ে মায়ের হাতে থলিভর্তি টাকা এনে দিতে পারতো! আজ সত্যিই তার মনে হোল, পুষ্প তাকে যতই টানুক, উচ্চ স্বর্গের উপযুক্ত নয় সে। মাটির পৃথিবী তাকে স্নেহময়ী মায়ের মত আঁকড়ে ধরে রাখতে চায় শত বন্ধনে, তার মনে অনুভূতি জাগায় এই সংসারের ছোটখাটো সুখদুঃখ, আশাহত অসহায় নরনারীর ব্যথা। তার এই মাকে একলা ফেলে, আশালতাকে নিষ্ঠুর ভাগ্যের হাতে সঁপে দিয়ে সে কোন্ স্বর্গে গিয়ে সুখ পাবে?

যতীনের অদৃশ্য উপস্থিতি ও স্পর্শহীন স্পর্শ ওর মাকে কথঞ্চিৎ সুস্থ করে তুললে। পুষ্প এসে বল্লে—তোমার মাকে ছবি দেখাবো যতীনদা? যেন এক অদৃশ্য দেবতা ওঁর ছেলের মত এসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্চে—মিষ্টি কথা বলচে—দেখাবো?

—পাশের বাড়ীর বৌটি কেমন?

—ঘুম পাড়িয়ে এলুম। মাথা ধরেছিল, সারিয়ে দিয়ে এলুম।

—ওর পিস্শাশুড়ী কি করচে? বুড়িটা?

পুষ্প হেসে বল্লে—পিস্শাশুড়ীর অত দোষ দিও না। বৌটির চরিত্র ভাল না।

যতীনের মনে পড়লো আশালতার কথা—সে একটু তিক্তস্বরে বল্লে—মেয়েমানুষ কিনা, তাই অপর মেয়েমানুষের চরিত্রের দিকটাতে আগে নজর পড়ে। কই আমাদের তো পড়ে না? দেখেই বুঝে ফেল্লে?

পুষ্প বল্লে—তা নয়, ওর মনে সব কথা লেখা রয়েচে আমি পড়ে এলুম। ও চিন্তা করচে ওর একজন প্রণয়ীকে, নাম তার হরিপদ, এই দুপুরে নদার ঘাটে গিয়ে তার সঙ্গে লুকিয়ে দেখা

করার কথা ছিল, জ্বর এসেচে ঠেসে দুপুরের আগেই।

—যেতে পারেননি বলে ভাবচেন বুঝি? আহা!

—হঠাৎ অত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে উঠলে যে ওর ওপর? এত দরদই বা এল কোথা থেকে? জানো, যতীনদা—আমার একটা ব্যাপার হয়েচে আজকাল, লোকের কাছে কিছুক্ষণ বসলে বা থাকলে আমি তার মনের চিন্তা সব বুঝতে পারি। ও বৌটির পাশে গিয়ে বসে দেখি ও শুধু কে হরিপদ, তার কথাই ভাবচে। যাক্ গে, তোমার মা কেমন?

—এখন একটু ভালো। মায়ের মনিঅর্ডার এসেচে সাত টাকা কোথা থেকে। দেখতে যদি মায়ের আনন্দ! পুষ্প, কেন আমাকে নিয়ে গেলে? এ দরিদ্র সংসারের উপকার করতে পারতাম বেঁচে থাকলে। আমি হয়তো চাকরি করে—

—আমি নিয়ে যাই সাধ্যি কি আমার? যিনি দীনদুনিয়ার মালিক তাঁর ইচ্ছে না থাকলে—

—তুমি কি দীনদুনিয়ার মালিকের সঙ্গে পরামর্শ করে এ কাজ করেছিলে পুষ্প?

এই সময় যতীনের মা বিছানা থেকে উঠে বাইরের রোয়াকে রোদ্দুরে গিয়ে বসলেন। ম্যালেরিয়া-রোগীর ভাল লাগে রোদ্দুরে বসতে। দুটি প্রতিবেশিনী এসে উঠোনে দাঁড়িয়ে গল্প করতে লাগলো যতীনের মায়ের সঙ্গে। একজন বলচে—জ্বরটা কখন এল আজ বৌ?

—দুটো ভাত খেয়ে উঠেচি, থালা তুলিনি—অমনি সে কি ভূতোনন্দি জ্বর। কিন্তু এখন যেন ভালো মনে হচ্চে। হঠাৎ জ্বরটা আজ যেন কমে গেল।

—হ্যাঁরে, আজ নাকি টাকা এসেচে তোর? ক'টাকা এল?

—হ্যাঁ দিদি, সাত টাকা।

—বাঁচা গেল! ক'দিন তো একরকম না খেয়ে ছিসি। বট্‌ঠাকুর টাকা পাঠাতে অত দেরি করেন কেন? সামনে পুজো—অত দেরি করেই যখন পাঠালেন তখন আরও কিছু—

—কোথায় পাবে দিদি যে পাঠাবে। এই তো সেদিন বাড়ী থেকে গেল। পনেরো টাকা তো মোটে মাইনে—মনিব যে উন্‌পাজুরে লোক, দু-এক টাকা আগাম চাইলে তা দেবে না। ওরও তো শরীর ভাল না, সবই জানো। সেবার সেই বড় অসুখের পরে আর শরীর ভাল সারলো না। ওই মানুষকে একা পাঠিয়ে যে কত অশান্তিতে ঘরে থাকি—তার উপর আমার খোকা যাওয়ার পর উনি একেবারে—

যতীনের মা নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলেন। প্রতিবেশিনীরা সান্ত্বনার কথা বলতে লাগলো। একজন বল্লে—যাও বৌ, রোদ্দুরে বোসো না, বমি হবে। ঘরে শোওগে। কি করবে বলো, সবই অদেষ্ট।

যতীনের মা চোখের জলে ভেজা সুরে বল্লেন—তোমরা আশীর্বাদ করো দিদি, উনি ভালো থাকুন। ওই সাত টাকাই আমার সাত মোহর। পুজোর সময় আসতে পারবেন না বলে লিখেচেন কুপনে—সেই কি কম কষ্ট আমার। পোড়ারমুখো মনিব মহালে পাঠাবে খাজনা আদায় করতে—ছুটি পাবেন না—

পুষ্প হঠাৎ বলে উঠলো—আমি বলচি তিনি বাড়ী আসবেন, আসবেন !

যতীন অবাক হয়ে পুষ্পের দিকে চেয়ে রইল। পুষ্পের মুখে এক অদ্ভুত জ্যোতি ফুটে উঠেছে, ওর কণ্ঠস্বর যেন দৈববাণীর মত শক্তিমান্ ও অমোঘ।…

কথা শেষ করে যখন পুষ্প ওর দিকে চাইলে তখন পুষ্পের চোখে জল।

যতীন বল্লে—কি হোল তোমার, পুষ্প ?

পুষ্প তখনও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেনি। বল্লে—সতীলক্ষ্মী উনি—জয় হোক ওঁর। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করো মাকে।

তারপর দুজনে আরও অনেকক্ষণ সেখানে রইল। যতীনের মায়ের জ্বর ছেড়ে যায় নি, তিনি আবার শয্যায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন, কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করে তিনি জ্বর কমবার সঙ্গে সঙ্গে নির্জীবভাবে ঘুমিয়ে পড়লেন।

যতীন বল্লে- ভালো কথা, মাকে এবার সেই ছবিটি দেখাও না ? যেন এক দেববালক ওঁর মাথার শিয়রে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্চে—এই অবস্থার স্বপ্ন বেশ স্পষ্ট হবে।

পুষ্প বল্লে—না। কি জানো যতীনদা, ভেবে দেখেচি তারপর। ওসব ছবি যে দেখে সে সংসার করতে পারে না। মন চঞ্চল হয়ে যায়। পৃথিবীর মন একরকম, ভুবর্লোকের মন আলাদা। এর সঙ্গে ওকে জড়াতে নেই। ওসব দর্শন হয় কাদের, যারা আধ্যাত্মিক জীবন শুরু করবে। সংসারী লোকদের অমন ছবি দেখাতে নেই। আমি দেখাতে পারি, তোমার মা জেগে উঠে কাঁদবেন, উদাস হয়ে থাকবেন দিনকতক, সংসারের কিছু ভাল লাগবে না। প্রতিদিনের সাংসারিক জীবনে মন দিতে পারবেন না। কি দরকার সুস্থ শরীর ব্যস্ত করে।

যতীন আগ্রহের সুরে বল্লে—নয়তো মাকে একবার ঘুমের মধ্যে ভুবর্লোকে নিয়ে যাই না কেন ? বেড়িয়ে দেখে আসুন।

—উনি এখনও তার উপযুক্ত হন নি। কিছু বুঝতে পারবেন না, হয়তো ওঁর সূক্ষ্ম শরীর অজ্ঞান হয়ে পড়বে সেখানে। সব এক আজগুবী স্বপ্ন বলে ভাববেন। বৃথা পরিশ্রম। চলো যাই, বেলা গেল।

নিকটেই এক ঝোপে তিৎপল্লার হলুদ ফুলে রঙীন প্রজাপতির ঝাঁক উড়তে দেখে ওরা সেখানে গিয়ে দাঁড়ালো। পুষ্প বল্লে—কি সুন্দর, না ? শুঁয়োপোকা থেকে কেমন চমৎকার রঙীন জীব তৈরি হয়েচে দ্যাখো। শুঁয়োপোকা মরে যায়, গুটি কেটে প্রজাপতি উড়ে বেরোয় ! মাটিতে কত আস্তে চলে শুঁয়োপোকা—আর কেমন দ্যাখো প্রজাপতি নীল আকাশের তলায় ফুলে ফুলে উড়ে বেড়াচ্চে। শুঁয়োপোকা কল্পনা করতে পারে মরবার পরে সে প্রজাপতি হবে ?

যতীন হেসে বল্লে--মানুষ কল্পনা করতে পারে মৃত্যুর পর সে বিশ্বের নীল আকাশের তলায় বিদ্যুদ্গতিতে উড়ে বেড়াতে পারবে ? শুঁয়োপোকার মন অন্ধ, মানুষও তেমনি অন্ধ।

প্রদোষালোকে ম্লানায়মান ধরণী গতির বেগে ওদের পায়ের নীচে কোথায় অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে গেল ! সেই ধরণীর এক প্রান্তে যতীনের দরিদ্রা জননী গভীর ঘুমে অচেতন রইলেন, জানতেও পারলেন না তাঁর ভাঙা ঘরে এ অদ্ভুত আত্মিক আবির্ভাবের রহস্য।

সেদিন পুষ্পই প্রথম তাঁকে দেখলে। সেদিন ওরা বুড়োশিবতলার ঘাটে ফিরে আসছিল পৃথিবী থেকে—ফেরবার পথে একটা ক্ষুদ্র পাহাড়ের ওপর বসেচে—হঠাৎ আকাশে বিদ্যুৎ-লেখার মত উজ্জ্বল জ্যোতি দর্শন করে পুষ্প বল্লে—দ্যাখো দ্যাখো—কোন্ দেবতা আসচেন! যতীনও দেখতে পেলে। একটা বিশাল উল্কা যেন আগুনের অক্ষরে শূন্যের গায়ে তার বার্তা ঘোষণা করচে।

চক্ষের পলকে সেই পথিক দেবতা কায়া ধারণ করে ওদের সামনে আবির্ভূত হোলেন। পুষ্প ও যতীন উভয়েই চিনলে—যে দেবতা একবার মহাশূন্যে পথ হারিয়ে ওদের কুটির-প্রাঙ্গণে বিভ্রান্ত অবস্থায় এসে পড়েছিলেন, সেই ভ্রাম্যমাণ আবিষ্কারক দেবতা।

দেবতা বল্লেন—তোমাদের কথা স্মরণে রেখেচি। আবার দেখা করবো বলেছিলাম, মনে আছে কন্যা?

পুষ্প ও যতীন দেবতার পাদবন্দনা করলে। পুষ্প বল্লে—দেব, আপনি ভ্রমণের গল্প করুন।

যতীন বল্লে—একটা কথা, দেব। আমাদের পৃথিবীর পণ্ডিতরা অনুমান করচেন আমাদের এই সৌর-জগতের বাইরে অন্য কোনো নক্ষত্রে কোনো গ্রহ নেই। একথা কি সত্য?

দেবতা হেসে বল্লেন—ভুল কথা। বিশ্বের এই অঞ্চলেই বিভিন্ন নক্ষত্রে লক্ষ লক্ষ গ্রহ বর্তমান। বহু শ্রেণীর জীব তাতে বাস করচে। তোমাদের পৃথিবী যতটুকু এর চেয়ে অনেক বৃহত্তর ও সুন্দরতর গ্রহ বিশ্বের এই অঞ্চলে বহু নক্ষত্রে বর্তমান।

যতীন বল্লে—দেব, বিশ্বের এই অঞ্চল বলে আপনি কতটুকু জিনিসের কথা বলচেন?

—বিদ্যুতের বেগে যদি যাও, তবে এক কোটি বৎসর লাগবে তোমাদের এই নক্ষত্রমণ্ডল পার হতে। এ রকম লক্ষ লক্ষ নাক্ষত্রিক বিশ্ব ছড়ানো রয়েচে চারিধারে। আমি বিশ্বের এ অঞ্চল বলতে তোমাদের ছায়াপথের নিকটবর্তী অঞ্চলের কথা বলচি।

পুষ্প বল্লে—আমাদের একবার নিয়ে যাবেন বলেছিলেন ওই সব দূর দেশে?

—চক্ষু মুদ্রিত কর। গতির প্রচণ্ড তেজ তোমরা সহ্য করতে অভ্যস্ত নও—জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। দুজনেই চক্ষু মুদ্রিত করো—প্রস্তুত হও—মধ্যপথের অন্য কোনো নক্ষত্র বা গ্রহলোক তোমাদের দৃষ্টিগোচর হবে না।

গতির কোনো অনুভূতিই ওদের হোল না, চক্ষের পলক ফেলতে যত বিলম্ব হয়, ততটুকুও বোধ হয়নি—পথিক দেবতা বল্লেন—চোখ চেয়ে দেখতে পারো—

পুষ্প ও যতীন সম্মুখের দৃশ্য দেখে চমকে উঠলো। তারা এ কোথায় এসেচে—এক বিরাট অগ্নিমণ্ডল তাদের সামনে—সে অগ্নিমণ্ডলের মধ্যে বহুলক্ষ বিশালকায় কটাহে যেন লক্ষ কোটি মণ ধাতু বিগলিত হচ্চে একসঙ্গে—লক্ষ লক্ষ মাইল ঊর্ধ্বে উঠচে রক্তবর্ণ স্বয়ম্প্রভ বাষ্পশিখা—রক্ত-আগুনের শিখার মত। বাল্যকালে জলস্তম্ভের ছবি দেখেছিল যতীন পৃথিবীর পাঠশালার কোনো পুস্তকে—এখন ওর চোখের সামনে ধারণার অতীত বিশালকায় অগ্নি ও প্রজ্বলন্ত বাষ্পের খাড়া সোজা উঁচু স্তম্ভ চক্ষের নিমেষে উঠে যাচ্ছে যেন দশ হাজার মাইল, যেদিকে চাওয়া যায়

দাউ দাউ করচে শুধু আগুন—অথচ পৃথিবীর আগুনের মত নয় ঠিক—জ্বলন্ত বাষ্পরাশি হয়তো। অগ্নিমণ্ডলের চারিদিকে শুভ্র- ও রক্ত-আগুনের ছটা—গ্রহণ যোগে দৃশ্যমান সূর্যের চারিপাশে দৃষ্ট সৌরকিরীটের (corona) মত। কোন্ রুদ্র ভৈরবের প্রচণ্ড আবির্ভাব এ! এখানে না আছে নারী, না আছে শিশু, না আছে বনকুসুমের শোভা, না আছে জীবের জীবনস্বরূপ বারি। কিন্তু এই রুদ্রের বামমুখ প্রত্যক্ষভাবে দেখবার সুযোগ ঘটে না কারো—এ ভয়ঙ্কর মূর্তিকে দেখতে পেয়ে অন্তরাত্মা যেমন থর থর কেঁপে উঠলো ওদের, তেমনি ওদের মনে হোল, এই অদ্ভুত ভয়ঙ্করের আবির্ভাবের ও অস্তিত্বের সামনে তাদের সকল ক্ষুদ্রত্ব ও সংকীর্ণতা এখানকার বাষ্পমণ্ডলের কটাহে বিগলিত বহু লৌহ, তাম্র, নিকেল, এলুমিনিয়ম, কোবাল্ট, প্রস্তর, স্বর্ণ, রৌপ্যের মতই দ্রবীভূত হয়ে নয় শুধু, বাষ্পীভূত হয়ে যায়—যেমন যাচ্চে ঐ সব ধাতু নিমেষে তাদের দৃষ্টির সম্মুখে।

দেবতা বল্লেন—এ একটা নক্ষত্র। কিন্তু কামচারী বা বিদ্যুৎচারী না হোলে তোমরা এর বিরাটত্ব কিছুই বুঝতে পারবে না। তোমাদের জড়জগতের অবস্থানকালের কোনো মাপকাঠি ব্যবহার করে এ নক্ষত্রের সীমা পাবে না। চেষ্টা করো—চলো—

পুষ্প ও যতীন যে বেগে যেতে ইচ্ছা করলে, তাকে পৃথিবীতে রেলগাড়ীর বেগ বলা যেতে পারে। দেবতা গতির বেগ কমিয়ে ওদের সঙ্গে চলেছেন। ওরা সবেগে যেন উড়ে চলেচে একটা অগ্নির মহাসমুদ্রের ওপর দিয়ে ও একটা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের অগ্নিশিখার মধ্যে দিয়ে—ওদের চারিপাশে ঘিরে অগ্নি-দেবতার রক্ত-চক্ষু। বহুক্ষণ ওরা গেল, পৃথিবীর হিসেবে দশ বারো ঘণ্টা। ওদেরও ক্লান্তি নেই, যাত্রাপথেরও শেষ নেই—মহা অগ্নিসমুদ্রেরও কূলকিনারা নেই।

দেবতা বল্লেন—তোমরা যদি জড়বস্তুর উপাদানে তৈরি হতে এই জ্বলন্ত নক্ষত্রের বহুদূর থেকে তোমাদের দেহ জ্বলে পুড়ে বাষ্প হয়ে উড়ে যেতো- আকর্ষণের বলে সে বাষ্পটুকু এই বৃহত্তর বাষ্পমণ্ডলে প্রজ্বলন্ত অবস্থায় প্রবেশ করে মিশিয়ে যেতো···

পুষ্প বল্লে—আর সহ্য করতে পারবো না—আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে চলুন দেব দয়া করে।

দেবতা প্রসন্ন হেসে বল্লেন—বিশাল বিশ্বের রূপ সবাই সহ্য করতে পারে না, দেখতে চায়ও না। শক্তিমতী হও। ভগবান তাকেই এসব দেখান, যে তাঁর বিশ্বের বিরাটত্ব দেখে ভয় পাবে না। আমি সুদীর্ঘ জন্ম-জন্মান্তর ধরে এ সাধনা করেছিলাম—তারপর জড়জগৎ থেকে এসে বহুকাল ধরে শুধু বিশ্বভ্রমণ করে বেড়াচ্চি। এই আমার সাধনা—এতে আমি সিদ্ধিলাভ করেচি। কিন্তু আমিই দিশাহারা হয়ে যাই সময় সময়। তোমরা কী দেখেচ, এক কণিকাও নয়।

পুষ্প বল্লে—আর কী দেখাবেন বলুন দেব, এ আগুনের দৃশ্য আমার আর সহ্য হচ্চে না—

—তোমাকে এর চেয়েও বৃহত্তর নক্ষত্রের অগ্নিমণ্ডলে নিয়ে যাবো চলো। শক্তিমতী হও। এবার চোখ চেয়ে চলো। তোমাকে চোখ তখন মুদ্রিত করতে বলেছিলাম কেন জানো? তোমাদের জড়জগতের অতি নিম্ন স্তর অতিক্রম করতে হবে আসবার পথে। সে অতি কুশ্রী স্তর। তোমরা দেখলে ভয় পেতে—তাই দেখাই নি।

যতীন আগ্রহের সুরে বল্লে—নরক? সে দেখতে বড় ইচ্ছে, দেব! দয়া করে—

দেবতা গম্ভীর স্বরে বল্লেন—প্রত্যেক জড়জগতের অমনি নিম্নতর আত্মিক স্তর আছে। জড়জগতের অপুষ্ট আত্মা ওখানে আসে। পৃথিবীর নরক তবুও ভালো, কারণ গ্রহ হিসাবে পৃথিবীর জীবদের আধ্যাত্মিক প্রগতি অনেক বেশি। তোমাদের দেখে তা মনে হচ্চে। এমন গ্রহ তোমাদের দেখাতে পারি যেখানকার জীবের চৈতন্য নিম্ন স্তরের। তোমাদের পৃথিবীতে তেমন শ্রেণীর জীব নেই।

ওরা অনন্ত ব্যোমের যে অংশ দিয়ে যাচ্ছিল, যতীন তার চারিদিকে চেয়ে কোনো পরিচিত নক্ষত্রমণ্ডল দেখতে পেলে না—সপ্তর্ষিমণ্ডল, কালপুরুষ, ধ্রুবনক্ষত্র, এমন কি বৃশ্চিক পর্যন্ত না! অসীম বিশ্বের কোন্ সুন্দর অংশে তারা এসে পড়েচে যেখান থেকে সপ্তর্ষিমণ্ডল বা বৃশ্চিক কিংবা ক্যাসিওপিয়া দেখা যায় না। প্রশ্নটা সে পথপ্রদর্শক দেবতাকে করলে।

দেবতা হেসে বল্লেন—আমি তোমাদের ওসব নক্ষত্র চিনি না। তোমাদের জড়জগৎ থেকে চিরকাল দেখে আসচো বলে ওগুলো পৃথিবীর জীবের কাছে সুপরিচিত। বিশ্বের পথিক আমি, আমার কাছে ও-রকম লক্ষকোটি ধ্রুব আর সপ্তর্ষি অগণ্য জ্যোতির্লোকের ভিড়ে মিশিয়ে গিয়েচে।

পুষ্প অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছিল আকাশের ওপরদিকে বকের পালকের মত বহুদূরব্যাপী রঙীন মেঘরাশি এক জায়গায় স্থির ছবির মত দৃশ্যমান।

পুষ্প কৌতূহলী হয়ে বল্লে—ওই মেঘের মত কী ওগুলো দেব?

—আমি জানি কিন্তু কখনো দেখিনি। ওগুলো বহু উচ্চ স্তরের জীবলোক।

—জড়দেহধারী জীব?

—না। তোমরা যাকে বলবে আত্মিক লোক—

—অনেক উঁচু স্তরের আত্মা?

—খুব উঁচু।

যতীন ওদের কথা শুনছিল—সাগ্রহে বল্লে, একটা প্রশ্ন করবো যদি কিছু মনে না করেন স্যার—আই মিন্—মানে, দেব।

পুষ্প ভ্রূকুটি করে বল্লে—তোমার এখনও পৃথিবীর সংস্কার গেল না যতীনদা?

দেবতা ওদের মনোবৃত্তি অনেক সময় ঠিক বুঝতে পারেন না; রাগ, অশ্রদ্ধা, হিংসা প্রভৃতি মনোভাবের বহু উর্ধ্বে তাঁরা। তিনি অনেক পরিমাণে সরল বালকের মত। পুষ্প লক্ষ্য করচে—করুণাদেবীও অনেক সময় বারো বৎসরের পার্থিব বালিকার মত কথা বলেন, ব্যবহার করেন। উচ্চতর দেবচরিত্রের এদিকটা আজকাল বেশি করে ওদের দুজনেরই চোখে পড়চে।

যতীন আরও বিনয়ের সঙ্গে বল্লে—একটা প্রশ্ন ছিল—আপনি ওখানে যান নি কেন?

দেবতা বল্লেন—এর উত্তর খুব সোজা। ওসব লোক আমার নিকট অদৃশ্য।

পুষ্প ও যতীন দুজনেই বিস্ময়ে স্তব্ধ। পুষ্প বল্লে—আপনার কাছেও অদৃশ্য? দেব, ঠিক বুঝতে পারলুম না।

এইবার সামনে বহুদূর থেকে ওরা দেখতে পেলে সারা আকাশ জুড়ে একটা বিশাল অগ্নিক্ষেত্র

ওদের দিকে যেন ছুটে আসচে। ঘোর শুভ্রবর্ণ মহাপ্রজ্বলন্ত বাষ্পপরিবেশ, মাঝে মাঝে তা থেকে সহস্র যোজনব্যাপী বাষ্পাগ্নি বহু উর্ধ্বে উঠে মহারুদ্রের মত সর্বধ্বংসকারী প্রলয়ের হুঙ্কার ছাড়চে। সে দৃশ্য দেখে পুষ্পের চেতনা লোপ পাবার মত হোল।

যতীন সেই কালাগ্নির ভৈরব দৃশ্যের দিকে পেছন ফিরে বল্লে—ভীষণ ব্যাপার, আমাদের পক্ষে এ দৃশ্য না দেখাই ভালো। ভয় করে প্রভু।

দেবতা হেসে বল্লেন—শুধু বিশ্বদেবের মোহনমূর্তিই দেখবে, তাঁর করাল, রুদ্র রূপ দেখলে ভয় পাবে কেন? ধ্বংসদেবের বিষাণ-ধ্বনি শোনাবো তোমাদের। আত্মার দুর্বলতা দূর কর।

—কিন্তু আপনার শিষ্যা যে অচেতন হয়ে পড়েচে! ও মেয়েমানুষ, ওকে ও রূপ আর নাই বা দেখালেন প্রভু?

সেই বিরাট কালাগ্নিবেষ্টিত মহাদেশ তখন ওদের অদূরে। যতীনের দেখে মনে হোল একটা প্রজ্বলন্ত বিশ্বপৃথিবী তার সামনে। অল্প পরেই দেবতার অদ্ভুত শক্তিবলে ওরা দুজনেই সেই বিরাট অগ্নিমণ্ডলের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালো। ওদের চারিধারে শুধু শুভ্র জ্বলন্ত হিলিয়াম ও ক্যালসিয়াম বাষ্পরাশি মহাবেগে ঘূর্ণ্যমান, কোথাও রাঙা শিখা নেই—শুধুই শ্বেতশুভ্র—আবার বহুদূর অগ্নিময় দিগন্তে লক্‌লকে রাঙা হাইড্রোজেনশিখা অজগরের মত ফুঁসে গর্জে তেড়ে উঠচে চক্ষের পলকে লক্ষ লক্ষ মাইল। ধ্বংসদেবের বিষাণ-ধ্বনির মত ভৈরব হুঙ্কার সে কালাগ্নিমণ্ডলের চারিদিক থেকে একসঙ্গে অনবরত শোনা যাচ্চে। একটা গোটা ব্রহ্মাণ্ড যেন দাউ দাউ করে জ্বলচে! অতি ভীষণ, রৌদ্ররূপ প্রকৃতির।

ভয়ে, বিস্ময়ে যতীন আড়ষ্ট হয়ে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখলে। রৌরব নরকের বর্ণনা সে কিসে যেন পড়েছিল তার পৃথিবীর বাল্যজীবনে। এই কি সেই রৌরব নরক? কোন্ দেবতার তাণ্ডবনৃত্যের পদচিহ্ন এর প্রতি অগ্নিশিখাটির গায়ে আঁকা, উদ্ধত ও ভয়াবহ মৃত্যুদহন এর কালাগ্নিপরিবেশের প্রতি অণু প্রতি পরমাণুর মর্মস্থলে?

দেবতা বল্লেন—ভয় পেয়ো না। এই থেকেই সৃষ্টি। দাঁড়িয়ে দেখ।

শুধু অন্ধবেগে ধাবমান অণুপরমাণুপুঞ্জের সংঘর্ষে উৎপন্ন এই বিশাল অগ্নিময় মহাদেশ যেন চারিদিক থেকে ওদের ঘিরেচে—এর শেষ কোথায়? অতি নীলাভ শুভ্র অগ্নিগর্ভ বাষ্পপুঞ্জ, উর্ধ্বে, নিম্নে, দক্ষিণে, বামে—ভীমবেগে সঞ্চরণশীল, আলোড়নে ও আক্ষেপে উন্মাদ সে বহ্নিমান ব্রহ্মাণ্ড ধরার মানুষ সহ্য করতে পারে না। যতীন অনুভব করলে সেও উন্মাদ হয়ে যাবে এ দৃশ্য বেশিক্ষণ দেখলে। মনে পড়লো গ্রহদেবের সেদিনকার কথা, সেই অদ্ভুত সত্য কথা—অস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য সমন্ততঃ স্থিতান্যেতাদৃশান্যনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডানি সাবরণানি জ্বলন্তি—পৃথিবীর প্রাচীন দিনের জ্ঞানীরা যে বাণী উচ্চারণ করে গিয়েছিলেন তপস্যা দ্বারা সত্যকে অনুভব করে।

হঠাৎ পথিক দেবতা যেন ভাববেগে সমাধিস্থ হয়ে নিস্পন্দ হয়ে গেলেন ক্ষণকালের জন্যে। সুন্দর চক্ষুদুটি মুদ্রিত করে সেই অগ্নিশিখার মধ্যে তিনি স্থির প্রশান্ত বদনে দাঁড়িয়ে আপন মনে অস্ফুট স্বরে বলতে লাগলেন—হে অনল, হে সর্বেশ্বর, হে পরাবরস্বরূপ, কারণে তুমি বর্তমান, কার্যেও তুমি বর্তমান, তুমিই ধন্য—ধ্বংসের মধ্যে তোমার সৃষ্টি সার্থক হোক। জয় হোক

তোমার !

ওদের দিকে ফিরে বল্লেন—চলো। কন্যা এখনও অচেতন ? এই নক্ষত্রের অগ্নিমণ্ডল ছাড়িয়ে গেলেই জ্ঞান ফিরে পাবে।

যতীন সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে ছিল দেবতার সেই ধ্যানপ্রশান্ত গম্ভীর রূপের দিকে। অদ্ভুত এ মূর্তি। সাক্ষাৎ সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্তী জ্যোতির্ময় নারায়ণ যেন তার সম্মুখে। সে মুখে অনায়াস করুণা ও গভীর মৈত্রীর চিহ্ন, ব্রহ্মাণ্ডের জরামরণচক্রে বদ্ধ জীবকুলকে যেন অভয় দান করচে। কে বলেছিল এঁকে নাস্তিক ?

দেবতা বল্লেন—জানো, প্রত্যেক গ্রহ বা নক্ষত্র, প্রত্যেক জড় বা বাষ্পপিণ্ড যা আকাশে ছড়ানো আছে—তোমাদের সূর্য নামক সেই ক্ষুদ্র নক্ষত্রও এর মধ্যে—প্রত্যেকটি এক এক চুম্বক। এরা পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করচে। সমস্ত ব্যোম ব্যেপে এই বিরাট চৌম্বক ক্ষেত্রে—কোনো জড়দেহধারী জীবের সাধ্য নেই এই বিশাল চৌম্বকক্ষেত্রের আকর্ষণশক্তিকে জয় করে স্বেচ্ছায় অগ্রসর হয়।

যতীন বল্লে—দেব, আমাদের সূর্যও বড় চুম্বক ? পৃথিবীও ?

—তোমাদের পৃথিবীও। সূর্য তো বটেই। প্রত্যেক নক্ষত্রও।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ওরা বহুদূর চলে এল নক্ষত্রটা থেকে—ওদের মাথার ওপরে বহুদূরে সেটি একটি বিশাল বহ্নিগোলকের মত জ্বলচে তখনও।

হঠাৎ যতীনের মনে পড়লো সেই পূর্বের কথাটি।

সে বল্লে—দেব, আপনি তখন বলেছিলেন ওই সব মেঘের মত দেখা যাচ্চে যা, ওগুলো আপনার কাছেও অদৃশ্য জীবলোক ?

দেবতা বল্লেন—জীবলোক বলিনি—স্থূলদেহধারী জীব নেই ওতে। আত্মিকলোক বলেচি।

পুষ্পের এবার জ্ঞান হয়েচে। সে বিস্ময়ের সঙ্গে ওদের দিকে চেয়ে চোখ খুলে বল্লে—এ কোথায় চলেচি ?

যতীন হেসে বল্লে—তার চেয়ে কোথা থেকে আসচি বল্লে প্রশ্নটা সুষ্ঠু হোতো। আমরা আসচি বহুদূরের নক্ষত্রলোক দেখে।

—আমি কোথায় ছিলাম ?

—অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলে।

পুষ্পের এবার জ্ঞান সম্পূর্ণ ফিরে এল। সে বল্লে—মনে পড়েচে এবার। দূর থেকে যা দেখেচি, তাই যথেষ্ট। উনি দেবতা—তা বলে আমরা সামান্য মানুষ—ও সহ্য করতে পারা কি—

যতীন প্রতিবাদ করে বল্লে—আমরা এখনও সামান্য মানুষ ? এতকাল স্থূলদেহ ছেড়ে এসে এখনও সামান্য মানুষ ?

পথিক দেবতা হেসে বল্লেন—তোমার পূর্ব প্রশ্নের উত্তর আর এ প্রশ্নের উত্তর একসঙ্গেই দিচ্চি শোনো। ওই যে সব মেঘের মত দেখা যাচ্চে বহুদূরে, ওগুলো বহু উচ্চ স্তরের আত্মিক

লোক। ওতে যাঁরা বাস করেন তাঁরা এবং তাঁদের বাসভূমি দুই-ই আমার কাছে সম্পূর্ণ অদৃশ্য। অথচ আমি কতকাল ধরে শুধু ভ্রমণ করেই বেড়াচ্ছি—কত যুগ যুগ এসেচি আত্মিক লোকে—আর তোমরা দুদিন এসেই—

যতীন বিস্ময়ে কেমন হয়ে গেল। এই মহান্ দেবতা—ইনিও ছোট? তাহোলে তারা কোথায় আছে? কীটস্য কীট—তাই বুঝি অত অহংকার? কিন্তু কি বিশাল, অনন্ত সময় এ ব্রহ্মাণ্ড—কত অসংখ্য জীবলোক, আত্মিক লোক, অনাদি, অনন্ত সময় ব্যেপে কি অনন্ত বিবর্তন! তাদের সবারই ওপর সেই বিশ্বনিয়ন্তা। সত্যিই ভগবানের নাগাল কে পাবে? তিনি কোথায় আর তারা কোথায়!

যতীন বল্লে—আপনি শুধু ঘুরে ঘুরে বেড়ান কেন, দেব?

—কেন বলো তো?

—আজ আপনাকে যে চোখে দেখলাম—অনুগ্রহ করে কিছু মনে করবেন না স্যার—মানে—মানে—

পুষ্পের ভ্রূকুটি ওকে নির্বাক করে দিলে।

দেবতা নিজেই বোধ হয় ওর মন বুঝে জবাব দিলেন।

—এই ভ্রমণই আমার উপাসনা। কত সৌন্দর্য দেখেছি, কত ভয়ানক রূপ দেখেছি তাঁর—যেমন তোমরা আজ দেখলে। এও কিছু নয়—এর চেয়ে অতি ভীষণ রূপ আছে সৃষ্টির। সে সব সহ্য করতে পারবে না তোমরা। আমি এর মধ্যেই তাঁকে দেখি।

যতীনের চেয়ে পুষ্পের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা বেশি, সে বল্লে—প্রভু, আপনি তাঁকে দেখেচেন?

ওরা একটা অপরিচিত গ্রহের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল, আকাশপথ থেকে তার বিচিত্র ধরনের গাছপালা, পাহাড়-পর্বত সব দেখা যাচ্ছিল। গ্রহে তখন রাত্রি গভীর। লোকালয় বড় কম তাতে, কেবলই ভীষণ অরণ্যানীসমাচ্ছন্ন শৈলমালা ও উপত্যকা। ওর একটা সাথী উপগ্রহ থেকে নীল জ্যোৎস্না পড়ে সে সব এমন একটা সৌন্দর্যে ভূষিত করেচে—পৃথিবীতে কেন, এ পর্যন্ত স্বর্গলোকেও সে রকমটা দেখেনি ওরা। অপার্থিব তো বটেই, অদৈবও বটে। বনে বনে নীল জ্যোৎস্না—মুগ্ধ হয়ে গেল ওরা সে গ্রহের গভীর রাত্রির নীলজ্যোৎস্নাস্নাত গভীর উত্তুঙ্গ শৈলারণ্যের রূপে।

দেবতা বল্লেন—কি দেখচো? এ একটা জীবজগৎ। খুব উঁচু স্তরের জীব এতে বাস করে। চলো, এর বনের মধ্যে বসি। তোমাদের পরিচিত স্থূল জগৎ থেকে বহু জন্মের পর যখন লোকের মন তাঁর দিকে যায়, তখন তারা এখানে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। শুধু তোমাদের পৃথিবী থেকে নয়—ওই ধরনের আরও অনেক নিম্ন স্তরের স্থূল জগৎ থেকে। আত্মার সেই বিশেষ অবস্থা না হোলে এই সব গ্রহে আসা চলে না। এখানে কর্মবন্ধন কম। ভগবানে যারা আত্মসমর্পণ করেচে, তাদের মন বুঝে অন্তর্যামী বিশ্ব-দেবতা এখানে—এবং আরও এর মত বহু গ্রহ আছে, সেই সব লোকে—জন্মগ্রহণ নির্দেশ করেন। দেখচো না এখানে জীবের বসতি কম। ভিড় নেই। জীবনের যুদ্ধ সরল ও সহজ। সব রকম ভ্রম, কুসংস্কার, অজ্ঞানতার বাঁধন যারা

কাটিয়েচে, তারাই এখানে আসে শেষ জন্মের জন্যে। আর স্থূল শরীর গ্রহণ করতে হয় না তাদের এখানকার মৃত্যুর পর।

—তাহোলে পৃথিবীর লোকে পুনর্জন্ম গ্রহণ ক'রে শুধু যে পৃথিবীতেই ফিরে আসবে তা নয়?

—পৃথিবীর সঙ্গে আমার পরিচয় কম—তবুও আমি জানি, কোনো জীবাত্মা পুনর্জন্মের সময় সে যে-স্থূলজগৎ থেকে এসেছিল, সেখানেই জন্মাবে—তার কি মানে আছে! অবস্থা অনুসারে জীবের গতাগতি নির্দিষ্ট হয়। যেখানে পাঠালে যে উন্নতি করতে পারবে, তাকে সেখানেই পাঠানো হয়। অনন্ত উন্নতিতে জীবাত্মার অধিকার তিনিই দিয়েচেন, যিনি এই বিশ্ব রচনা করেচেন। কে বুঝবে তাঁর করুণা ও মৈত্রী! খুব উচ্চ অবস্থার আত্মা না হোলে বোঝা যায় না।

ছায়াশীতল শিলাতট ঘন বনশ্রেণীতে ঘেরা। ওরা এসে সেখানে বসেচে। যতীন আর পুষ্প চেয়ে চেয়ে দেখলে এসব গাছপালা তাদের চেনা নেই, পৃথিবীতে এত বড়, এত অদ্ভুত চমৎকার তরুশ্রেণীর সমাবেশ কোথায়? উগ্র লোভ এখানকার বন নষ্ট করেনি, ব্যবসাতে টাকা উপার্জনের জন্যে। বনকুসুমের সুগন্ধ, ঝর্ণার কলধ্বনি, পক্ষী-কূজন, অব্যাহত শান্তি ও পবিত্রতা—সব মিলিয়ে জায়গাটা যেন তপোবনের মত মনে হচ্ছে। উনি যা বলচেন সে হিসেবে দেখলে সমগ্র গ্রহটাই তাহোলে একটা সুবিশাল তপোবন। পুষ্প সময় বুঝে আগের প্রশ্নটি এখানে আবার করলে। বল্লে—আপনি তাঁকে দেখেচেন প্রভু?

পথিক দেবতার মুখ সহসা সম্ভ্রমে ও ভক্তিতে কোমল হয়ে এল। তিনি বালকের মত সরল স্বরে বল্লেন—না।

—আপনিও দেখেন নি তাঁকে!

পুষ্পের স্বরে বিস্ময় ফুটে উঠেচে।

—আমি তাঁর রূপ দেখেচি তাঁর বিশ্ব-সৃষ্টির মধ্যে। তাঁকে চোখে দেখা যায় আমি জানি। কিন্তু আমি তপস্যা করিনি তাঁকে সে ভাবে পেতে। আমি ভবঘুরে, তাঁকে দেখে বেড়াতে চাই তাঁরই সৃষ্ট লোক-লোকান্তরে। ভ্রাম্যমাণ আত্মা হয়েই আমার আনন্দ। তাই অনেকে আমাকে নাস্তিক বলে।

যতীনের হঠাৎ মনে পড়লো করুণাদেবীর কথা। তিনিও তাই বলেছিলেন।

পুষ্প বল্লে—প্রভু, এই গ্রহে স্ত্রীলোক আছে?

—কেন থাকবে না? নারী বিশ্বে শক্তির অংশ। এসো—দেখবে। গ্রহে এ অংশটাতে রাত্রি। অন্য অংশে দিনমান—এদের ঘর সংসার দেখাবো—খুব শান্ত জীবন-যাত্রা এদের। বহু প্রবৃত্তি ও বাসনার সঙ্গে, বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করে জয়ী হয়ে অভিজ্ঞ হয়ে এ জন্মে পূর্ব-জন্মের জ্ঞান ও সংযমের প্রভাবে এরা সমাহিত ও আত্মস্থ হয়েচে।

—এদের সমাজ কেমন? ইচ্ছে করে প্রভু—জানি—

—এই গ্রহের কথা আমি ঠিক জানি না—তবে বিশ্বের এই অঞ্চলে এ রকম বহু আছে।

সব উচ্চ স্তরের জীবজগৎ। জীবে জীবে যুদ্ধ রক্তপাত নেই এই সব গ্রহে। অত্যন্ত পরার্থপর এখানকার মানুষ। পরের জন্যে প্রাণ দেবে। অনেক জাতি নেই, ভেদবুদ্ধি অত্যন্ত কম। সহজে খাদ্য মেলে স্থূল-দেহ ধারণের উপযুক্ত। আয়ু দীর্ঘ নয় কিন্তু, অল্প সময়ের মধ্যে বেশি কাজ করতে হয়—কাজেই আলস্যের স্থান নেই। অসার বস্তুতে লোভ নেই—যেমন অত্যন্ত খাদ্যসঞ্চয়, বড় আবাসবাটী, উজ্জ্বল পরিচ্ছদ—মান, যশ—অহঙ্কার, অভিমান।

যতীন বল্লে—কিন্তু নারী রয়েচে যে প্রভু, ওরা থাকলেই—

পুষ্প ভ্রূকুটি করে বল্লে—কি রকম যতীনদা?

দেবতা হেসে পিতার ন্যায় সস্নেহে পুষ্পের পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করে বল্লেন—কন্যার মনে আঘাত দিও না—ও ঠিক বলেচে। ওরা থাকলেই হয় না গোলমাল। বাসনা থেকে পাপ, গোলমাল। এখানকার জীব বাসনা ক্ষয় করে এসেচে বহু জন্ম ধরে। এদের নিম্ন স্তরের বাসনা জাগে না তীব্রভাবে। উচ্চ জ্ঞানের, শিল্পের, সংগীতের সাধনা বা ভগবৎসাধনা নিয়ে এরা থাকে। ভগবানের জ্ঞান বা প্রত্যক্ষ-দর্শন এদের অনেকের হয়েচে। সুতরাং যে সব জিনিস জীবনে স্বপ্নের মত অস্থায়ী তাদের অসারত্ব এরা বুঝেচে। অত্যন্ত সাধু, নিস্পৃহ, সরল উচ্চ স্তরের জীবন এখানকার—মানে, এই সব গ্রহের।

যতীন বল্লে—বাঃ, চমৎকার জীবন তো এখানকার—ইচ্ছে হয় জন্ম নিই—

দেবতা ওর দিকে চেয়ে বল্লেন—তোমাকে এখানে একদিন তো জন্ম নিতেই হবে। কারণ এই স্বর্গলোক, যেখানে তোমরা আছ, এও মায়ার অধীন। হয়তো বহুকাল এখানে থাকবে, স্তর থেকে স্তরান্তরে যাবে—কিন্তু স্বর্গও দুদিনের। ব্রহ্মচক্রে জন্ম-মৃত্যু আবর্তিত হচ্চে, মানুষ আবার জন্মাবে, আবার মরবে, আবার জন্মাবে—যতদিন বাসনার শেষ না হয়, অসত্য থেকে সত্যে, মৃত্যু থেকে অমৃতে, অন্ধকার থেকে জ্যোতিতে না যায়। ভগবানকে জানলে জীব নিজেকে জানতে পারবে—তখন ছুটি। স্থূল দেহে শেষ জন্ম সাধারণত এই সব গ্রহে হয়—এখানে আত্মদর্শনের ও সাধনার সুযোগ ও সময় অনেক বেশি। দয়া করে বিশ্বের অধিদেবতা জ্ঞানী ও মুমুক্ষু জীবদের পুনর্জন্ম গ্রহণ করান।

—দেব, আপনি ঘুরে ঘুরে বেড়ান কেন? আপনি এত উচ্চ—

—ঐ রজনীর তারালোকের ব্যাপ্তির মধ্যে, বনপুষ্পের সুবাস ও এই সব অদ্ভুত গ্রহের বনানীর নির্জনতা ও বনবিহঙ্গের কূজনের মধ্যে, বিশ্বের রহস্যের মধ্যে আমি তাঁর নিত্যসঙ্গী হয়ে থাকবার প্রার্থনা জানিয়েছিলাম মনে মনে। তিনি অসীম করুণায় সে প্রার্থনা মঞ্জুর করেচেন। নইলে সাধ্য কি এই অগণ্য লোকালোকে ভ্রমণ করি? এ শক্তি তো সকলের হয় না। আমি দেখচি এভাবে তাঁর লীলা-সৌন্দর্য দেখে বেড়ানোর বাসনা কারো নেই, এ নেশা আর কারো দেখিনি, কেবল বহুকাল আগে আর একটি আত্মার সঙ্গে দেখা হয়েছিল—দুটি নক্ষত্রের বিরাট সংঘর্ষের দৃশ্য দেখেছিলাম দুজনে—তা থেকে তৃতীয় একটি নূতন প্রজ্জলন্ত তারকার সৃষ্টি হোল। ওঃ, সে সব দৃশ্য তোমাদের শক্তি নেই সহ্য করো। আমাকে তিনি ভ্রমণের শক্তি দিয়েচেন, সুপর্ণের মত বিরাট পাখা দিয়েচেন লোকে লোকান্তরে উড়তে—এই আমার তাঁকে উপাসনা। জয় হোক তাঁর।

পুষ্প হঠাৎ হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো, দেখাদেখি যতীনও। এই মনোরম জগতের নৈশ সৌন্দর্যের মধ্যে উচ্চ স্তরের এই পথিক দেবতার বাণী স্বয়ং ভগবানের প্রতিনিধির বাণী বলে মনে হোল হঠাৎ ওদের মনে। সুস্পষ্ট সত্য বাণী—চন্দ্রমা অস্তমিত হোলে, বাক্ শান্ত হোলে, পৃথিবীর ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের আশ্রমে যেমন একদিন বাণী উচ্চারিত হয়েছিল।

পুষ্প মাথা নীচু করে বল্লে—আশীর্বাদ করুন দেব—

ওর অশ্রুপ্লাবিত চোখ দুটির দৃষ্টি নতুন গ্রহের মৃত্তিকার দিকে আবদ্ধ রইল।

দেবতা বল্লেন—আশীর্বাদ করচি কন্যা, তুমি আমার অপেক্ষা অনেক উচ্চস্তরের দেব-আত্মার সাক্ষাৎ পাবে। আমি ভবঘুরে মাত্র। সত্যিকার জ্ঞানীর দর্শন পাবে। তবে তোমার ভাগ্যে এখনও অনেক সংগ্রাম আছে। কিন্তু তুমি বিশ্বদেবের করুণা লাভ করবে। আমি যাদের পাদস্পর্শ করবার যোগ্য নই, এমন আত্মার দর্শন পেয়ে ধন্য হবে।

এমন সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে এল সেখানকার বনে-বনানীতে। আকাশের নক্ষত্ররাজি ম্লান হয়ে এল—সাথী তারার নীল জ্যোৎস্না মিলিয়ে অস্পষ্ট হয়ে এল। পক্ষী-কূজন জেগে উঠলো বনভূমির বুকে।

পুষ্প ভাবছিল, কোনো এক সুদূর জন্মান্তরে এই গ্রহলোকে যদি সে জন্ম নেয়, সাথী তারার নীল জ্যোৎস্নায় এরই শৈলারণ্যে, উপত্যকায়, গিরিসানুদেশে, শান্ত উপত্যকায় সে হাত-ধরাধরি করে বেড়াবে যতীনদার সঙ্গে—দুজনে মিলে ভগবানের উপাসনা করবে সারাজীবন এই তপোবনসম গ্রহলোকের পবিত্র আশ্রয়ে, কোনো গিরিনির্ঝরিণীর কূলে কুটীর বেঁধে। জগতের বিশাল পথে ঘুরতে ঘুরতে কবে এখানে এসে হয়তো পড়তে হবে, তা কেউ জানে কি? মহাপুরুষের আশীর্বাদ বৃথা যাবে না।

দেবতা বল্লেন—চলো, এখুনি লোকে জেগে উঠবে। এরা আমাদের হয়তো দেখতে পাবে—এদের ক্ষমতা বেশি। তোমাদের তো নিশ্চয় দেখতে পাবে। সরে পড়ি তার আগে।

ওদের বুড়োশিবতলার ঘাটে পৌছে দিয়ে পথিক দেবতা পুষ্পের চোখের জলের মধ্যে অদৃশ্য হোলেন। তার অনুনয় ও অনুরোধের উত্তরে বলে গেলেন, সময়ে আবার দর্শন দেবেন।

১৭

বুড়োশিবতলার ঘাটে আজ দীপান্বিতা অমাবস্যা। ওপারে হালিসহরের শ্যামাসুন্দরীর ঘাটে মন্দিরে মন্দিরে ছাদে ছাদে প্রদীপ দিয়েচে মেয়েরা। এদের প্রাচীন ঘাটের রানায় পুষ্প নিজের হাতে ছোট ছোট মাটির প্রদীপ জ্বেলেচে। গঙ্গাবক্ষ অন্ধকার, দু-একটা নৌকোর ক্ষীণ আলো দেখা যাচ্চে—ছপ্ ছপ্ দাঁড়ের শব্দও পাওয়া যাচ্চে।

পুষ্প বল্লে—এসো যতীনদা, আমরা আমাদের ছেলেবেলার কথা ভাবি বসে বসে। মনে পড়ে কেওটা-সাগঞ্জের দিন? আমি পিদিম দিচ্চি, তুমি এক পয়সার কুচো গজা কিনে আনলে—

—কুচো গজা না জিবে গজা—

—না, কুচো গজা। বেশ মনে আছে, ময়রা বুড়ীর দোকান থেকে। নিতাইএর ঠাকুরমা, মনে আছে?

—খুব। বটতলায় দোকান ছিল। আহা, সে তো কতদিন মরে এসেচে এখানে—তাকে কখনো দেখিনি।

—তারপর সেদিন দুজনেই মার খেলুম বাড়ী ফিরে। অত রাত পর্যন্ত তুমি আর আমি ঘাটে বসে ছিলুম পিদিম দেওয়ার পরে। মনে পড়ে যতীনদা?

—খুব। আমি মার খাইনি। মাসীমা তোকে মারলেন। আমিই বরং উত্তরের কোঠায়

—যতীন হঠাৎ খাড়া হয়ে উঠে বসলো। বল্লে—পুষ্প, আমি এখুনি কলকাতায় যাবো—

পুষ্প বিস্মিত হয়ে বল্লে—কেন?

—তোর বৌদিদির কিছু হয়েচে। একটা আর্তনাদ শুনলাম তার গলার। দেখে আসি—পুষ্প, সত্যি বলচি, ও আমায় শান্তি দিলে না। তুই যতই চেষ্টা করিস, আমার ভাগ্য ওর সঙ্গে বাঁধা। চল্লুম আমি—

—বা-রে, আমিও বুঝি বসে থাকবো? দাঁড়াও—

মনে মনে পুষ্প বড় হতাশ হোল। তারও জীবন যেন কেমন। কিছুতেই কি কিছু সুরাহা হয় না? সব সময় দেওয়ালের ওপর দিয়ে কোন বিকটমূর্তি কঙ্কাল উঁকি মারে, অমঙ্গল ভরা দৃষ্টিতে সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এত কষ্ট করে আজ সে দীপান্বিতা অমাবস্যার সন্ধ্যাটিকে প্রাণপণে সাজালে—সব বৃথা!

নামবার পথে পুষ্প বল্লে—কলকাতায় আসতে পারিনে, কষ্ট হয়। উঃ, দেখেচ কেমন কালো কালো কুয়াশার মতো জিনিস! মানুষের অর্থলোভ, বিলাসিতা—নানারকম খারাপ চিন্তা—সকলের ওপর লোভ—এই সব এক ধরনের কালো কুয়াশা সৃষ্টি করেচে। ওর মধ্যে দিয়ে আসতে দম বন্ধ হয়ে যায় যেন—সব বড় শহরেই এরকম দেখেচি—এখানে মানুষ সব ভুলে শুধু ভোগ নিয়ে আছে।

সেই বাসাবাড়ী—যতীন এর আগেও দুবার লুকিয়ে এসে দেখে গিয়েছিল আশাকে। পুষ্প তা জেনেও কিছু বলেনি। যতীনদা ভাবে, পুষ্প পোড়ারমুখীকে লুকিয়ে কোনো কিছু করা যায়! যতীনদার বয়স হয়েছে বটে কিন্তু এখনও ছেলেমানুষি ঘোচেনি।

আশার অবস্থা ভাল নয়। নেত্যনারায়ণ ওকে ফেলে আজ মাস চার পাঁচ হোল চলে গিয়েচে দেশে। নিজের গ্রামে গিয়ে সে মুদির দোকান খুলেচে—কিন্তু আশার ফেরবার মুখ নেই। বাড়ীওয়ালীর দয়ায় এবং হাতের দু'একগাছি সোনার চুড়ি বিক্রির টাকায় এতদিন যা হয় চললো। কিন্তু তার মধ্যে বাড়ীওয়ালী নানারকম উপার্জনের ইঙ্গিত করেচে। এক মারোয়াড়ী লোহাওয়ালা তাকে দেখেচে দোতলার ছাদ থেকে—আশা যখন ওদের বাসার তেতলার ছাদে কাপড় তুলতে গিয়েছিল। বেলঘরে না সোদপুরে তার বাগানবাড়ী, মস্ত বাগান—ইত্যাদি।

তাকে সদুপদেশও দিয়েচে—এই তো বয়েসখানা চলে যাচ্চে গো—আর দুটো বছর। তার পর কেউ ফিরে চাইবে? না বাপু। বলে, মেয়েমানুষের রূপ আর জোয়ারের জল। হ্যাঁ,

দেমাক থাকতো যদি সোয়ামী পুত্তুর থাকতো। নিজের চেহারাটা আয়নায় দেখেচ একবার?

আশা একা ঘরে ছেঁড়া মাদুরে শুয়ে আছে—তার মনে যে নিরাশার অন্ধকার ছেয়েচে, কোনোদিন তা ফুটে আলো বেরুবার সম্ভাবনা আছে কি? হাতের পয়সা ফুরিয়েচে, আর বড় জোর দশটা দিন। তারপর?

গভীর রাত্রি কলকাতায়। আশা এখনও ঘুমোয়নি—দুশ্চিন্তায় ঘুম নেই চোখে।

যতীন আকুল হয়ে ওর শিয়রে বসে ডাকলে—আশা আশা, লক্ষ্মীটি—আমি এসেচি আশা—

পুষ্পও বসলো পাশে। পুষ্প যে ভবিষ্যৎ দেখচে, যতীন তা দেখবার শক্তি রাখে না। পুষ্প খুব দুঃখিত হোল। কর্মের অচ্ছেদ্য বন্ধনে আশা-বৌদির সঙ্গে যতীনদার গাঁটছড়া বজ্র-আঁটুনিতে আঁটা। দুঃখ হয়, কিন্তু সে জানে, কিছু করবার নেই তার। সে এখানে গাড়ীর পঞ্চম চক্রের মত অনাবশ্যক। সে না থাকলেও কর্মের রথ দিব্যি চলবে।

যতীন বল্লে—পুষ্প, আমায় সাহায্য করো—

—ভাবচি—

—কি ভাবচো?

—ভাবচি তোমার অদৃষ্ট যতীনদা—

—এখন কি হেঁয়ালি উচ্চারণ করবার সময় পুষ্প?

হায়! সে যা বলতে চাইচে, যতীনদাকে যদি কেউ তা বুঝিয়ে দিতে পারতো! যতীনদা চিরকাল তাকে ভুল বুঝে আসচে, এখনও বুঝবে তা সে জানে। কিন্তু কি করবে সে, এ তারও অদৃষ্টলিপি।

পুষ্প দুঃখিত সুরে বল্লে—তা বলিনি। তুমি বল্লে বুঝবে না আমার কথা। আশা-বৌদির এ অবস্থা দেখে—আমি মেয়েমানুষ—আমার কষ্ট হচ্চে না তুমি বলতে চাও? কিন্তু কিছু সাহায্য করতে পারবো না তুমি আমি। আশা-বৌদিদির কর্মফল—এক ভগবান যদি বাঁধন কাটেন তবেই কাটে। তোমার আমার দ্বারা হবে না।

—এই রকম অবস্থায় ফেলে রেখে যাই কি করে তোর বৌদিদিকে—বল্ পুষ্প—তা পারি? যতীনের কাতর উক্তিতে পুষ্পের চক্ষুদুটি অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো—আশালতার দুরবস্থার জন্যে নয়, অন্য কারণে। সে বল্লে—পৃথিবীতে থাকলে উপকার করতে পারতে। এ অবস্থায় আমি তো কোনো উপায় দেখচিনে। আচ্ছা—দেখি—একটু ভাবতে দাও—

পুষ্প একটু পরে বল্লে—এখানে থাকবে না। চলো যতীনদা। এখান থেকে যেতেই হবে। নইলে তোমার আসন্ন বিপদ।

যতীন বল্লে—তুমি বড় ভয় দেখাও, পুষ্প। চলো করুণাদেবীর কাছে যাই, তাঁকে সব বলি।

—বলবে কি, তিনি অন্তরের কথা জানতে পারেন। ওঁরা হোলেন উচ্চ স্বর্গের দেবদেবী। স্মরণ করলেই বুঝতে পারেন—কিন্তু সময় না হোলে আসেন না। বৃথা দেখা দেন না। তা ছাড়া কলকাতার এই বিশ্রী পাড়ায় তাঁকে আমি এনে এর সঙ্গে জড়াতে চাইনে।

সারারাত যতীন ও পুষ্প আশার শিয়রে বসে রইল। পাশের একটা বাড়ীর খোলা জানালা দেখিয়ে বল্লে—ঢ্যাখো যতীনদা, ওখানে ওরা কি করচে! দেখে এসো না?

—কি?

—তুমি গিয়ে দেখে এসো, অমন জায়গায় যাবো না। দম বন্ধ হয়ে আসে।

যতীনের কৌতূহল হোল, সে গিয়ে দেখলে, কয়েকটি ভদ্রলোক, সাজে পোশাকে বেশ অবস্থাপন্ন বলেই মনে হয় একটি ঘরে বসে তাসের জুয়ো খেলচে। পাশের টেবিলে একটি বোতল, কয়েকটি গ্লাস—এক টিন সিগারেট, দু-চারটি শূন্য চায়ের কাপ ডিস—একটা বড় প্লেটে খানকতক অর্ধভুক্ত পরোটা ও অন্য একটা পাত্রে কিছু ডালমুট। সিগারেটের ছাই ও ডালমুট ঘরের মেজের দামী কার্পেটের ওপর ছড়ানো—যদিও সিগারেটের ছাই ফেলবার পাত্র টেবিলের ওপর রয়েচে কিন্তু আধপোড়া সিগারেট আর সিগারেটের ছাইতে পাত্রটা বোঝাই। ওরা ছোট ছোট তাকিয়া পাশে রেখে একমনে খেলেই চলেচে। বিছানার পাশে রাশীকৃত দশটাকার নোট একটার পর আর একটা হিসেবে সাজানো, ওপরে একটা পেপারওয়েট্ চাপানো। ওরা মাঝে মাঝে বোতল থেকে ঢেলে মদ খাচ্চে, সিগারেট ধরাচ্চে, মাঝে মাঝে একখানা কাগজে পেন্সিল দিয়ে হারজিৎ-সূচক হিসেব রাখচে। এদের মধ্যে একজনের বয়স পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হয়েচে, দেখলেই বোঝা যায়, মাথার চুলে কালো রং খুঁজে বের করা কঠিন। ফুলফোর্সে মাথার ওপর ইলেকট্রিক পাখা ঘুরচে, দেওয়ালের ঘড়িতে রাত দেড়টা বাজে।

একজন ডেকে বল্লে—ও প্রমীলা,—টুনু—খাবার দিয়ে যাও।

দু'তিনবার ডাকের পর একটি সুন্দরী রমণী ঘুম-ঢুলুঢুলু চোখে একটা বড় প্লেটে কতকগুলো কাটলেট নিয়ে টেবিলের ওপর রেখে বল্লে—নাও সব—রাত কম হয়নি, আমার ঘুম পেয়েচে—কাল আবার হাসপাতালের ডিউটি সকাল থেকে শুরু—

একজন বল্লে—সোডা ফুরিয়েচে—টুনু। লক্ষ্মীটি, একটা সোডা আমাদের যদি দিয়ে যাও—

আর একজন বল্লে—অমনি ওই সঙ্গে গোটাকতক পান—

সুন্দরী মেয়েটি রূপে ঘর আলো করেচে, ওর পরনে দামী সিল্কের শাড়ী, কাজকরা ব্লাউজ, অনাবৃত কণ্ঠদেশ ও বক্ষঃস্থলে জড়োয়ার কাজ করা নেকলেস্ চিক্ চিক্ করচে। সে যেতে যেতে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কৌতুক-মিশ্রিত সুরে বল্লে—পারবো না এত রাত্রে পান সাজতে বসতে—

পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সের সেই লোকটি কপট মিনতির সুরে বল্লে—আমার দু'হাত বন্ধ, মুখের সিগারেটটা ধরিয়ে যদি দিয়ে যেতে টুনু—

যতীন সেখানে আর দাঁড়ালো না। পুষ্পকে এসে বল্লে—তাস খেলচে। তাসের জুয়ো—টাকা জিত্‌চে।

পুষ্প বল্লে—একবার দেখে এসেচি জানালা দিয়ে। ওরা অবস্থাপন্ন ভদ্রলোক—দেখে মনে হয় টাকার ভাবনা নেই—অথচ টাকার এমন নেশা?

—তুমি এসব বুঝবে না পুষ্প। টাকার নেশা নয়, জুয়োর নেশা—

—ঐ হোল। ওই মেয়েটি কে?

—মেয়েটি টুনু। ভাল নাম যেন প্রমীলা—

পুষ্প হেসে বল্লে—তা তো বুঝলাম, ওদের কে? কি সম্বন্ধ ও বাড়ীর সংসারে?

যতীন কিছু বল্লে না, সরলা পুষ্প কত কথা জানে না সংসারে। ওর নিষ্পাপ মনে—দরকার কি?

পুষ্প আপন মনেই যেন বল্লে—কিন্তু ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি ওর মধ্যে কেন? ওঁকে দেখে কষ্ট হয়। এখনও ভোগের নেশা এত! পরকালের চিন্তা করবার সময় হয়নি আজও?

—তোমার মত সবাই হবে? বাদ দাও না, বাজে কথা বলো কেন?

পুষ্প দুঃখিত কণ্ঠে বল্লে—আমার বাবার মত দেখতে। সত্যিই কষ্ট হোল। ভগবানের দিকে মন দেবার ওঁর সময় যে পার হয়ে গেল।

—তোমার তাতে কি? বড্ড বাজে কথা তোমার পুষ্প—

—আশাবৌদি ঘুমিয়ে পড়চে।

—কি হবে ওর পুষ্প? সত্যি কথা বল্। তুই আমার চেয়ে অনেক বেশি দেখতে পাস্।

—দেখতে পাই কে বলেচে?

—আমি সব জানি—

পুষ্প গম্ভীর স্বরে বল্লে—কেউ কিছু নয়। মানুষের মিথ্যে অভিমান। তিনি যা করবেন, তাই হবে। তাঁর কাছে প্রার্থনা করি এসো দুজনে।

—এখানে?

—এখানেই। তাঁর নামে সব পবিত্র হয়ে যাবে। তিনি এখানেই কি নেই? কে বলেচেন নেই? তিনি তাঁর অসীম কৃপা ও করুণায় এই হতভাগিনী আশাবৌদির মঙ্গল করুন।

করুণাদেবীর বিনা সাহায্যেও আজকাল পুষ্প মহর্লোকের সর্বত্র যাতায়াত করতে পারে, এমন কি আরও উর্ধ্বতর লোক পর্যন্ত। যতীনকে অত উচ্চস্তরে কোনো শক্তিমান আত্মার বিনা সাহায্যে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় বলে পুষ্প অনিচ্ছাসত্ত্বেও একাই মাঝে মাঝে যায়। সে বলে এতে অনেক কিছু সে দেখে, শোনে ও শেখে। অনেক ভাল ভাল আত্মার সংস্পর্শে এসে মানসিক ও আত্মিক শক্তির প্রসার হয়।

সেদিন যতীন ছাড়লে না, বল্লে—আমি যদি উচ্চ স্তরে অজ্ঞান হয়ে পড়ি—তুমি সেখানে আমাকে ফেলে যেও। যতদূর জ্ঞান থাকে ততদূর নিয়ে যাও না? আমিও বেড়িয়ে দেখতে, জানতে ভালবাসি না কি ভাবচো? রেলভাড়ার টিকিট তো লাগচে না।

—ছাখো যতু-দা, এখনও পৃথিবীর ওই উপমা ও চিন্তার ধরনটা ছেড়ে দাও। তোমায় এই জন্যেই বারণ করি বার বার পৃথিবীতে যেতে। ওখানে নানা আসক্তি, ইচ্ছা, ভোগপ্রবৃত্তি সর্বত্র ছড়ানো রয়েচে পৃথিবীর আকাশে বাতাসে। স্থূল দেহ ভিন্ন ওই সব ইচ্ছা পূরণ করা যায় না।

স্থুল জগতের স্থুল প্রবৃত্তি সূক্ষ্ম দেহে কি করে চরিতার্থ করবে? কাজেই ওই সব আসক্তি যেমন তোমার মনে আসন গেড়ে বসবে, তখনই তোমাকে স্থুল দেহ ধারণ করতে বাধ্য করবে। সুতরাং আবার পুনর্জন্ম।

—তাতে আমার কোনো দুঃখ নেই তোমার মত।

—সে আমি জানি। সেজন্যেই তো তোমার জন্যে ভয় হয়—চলো তোমাকে মহর্লোকে নিয়ে যাই—

ওরা ব্যোমপথে অনেক উর্ধ্বে এমন এক স্থানে এল, যেখানে উচ্চলোকের জ্যোতির্ময় অধিবাসীদের যাতায়াতের পথ। তার পরেই এক অদ্ভুত সুন্দর দেশ; অতি চমৎকার বন-পর্বতের মেলা, বনকুসুমের অজস্রতা। অথচ এখানে কোনো অধিবাসী নেই, অনেকদূর গিয়ে একটা নীল হ্রদ, চারিদিক পাহাড়ে ঘেরা। পুষ্প বল্লে—চলো যতু-দা, ওই হ্রদের ধারে বনের মধ্যে একটি গ্রাম আছে, অনেক জ্ঞানী মেয়ে-পুরুষ একসঙ্গে বাস করেন—তোমায় দেখিয়ে আনি।

বনবীথির অন্তরালে শুভ্র স্ফটিকসদৃশ কোনো উপাদানে তৈরী একটি বাড়ী, দেখতে অনেকটা গ্রীক মন্দিরের মত। হ্রদের নীলজলের এক প্রান্তে কুসুমিত লতাবেষ্টিত এই সুন্দর গৃহটি যতীনের এত ভাল লাগলো! এমন সুন্দর পরিবেশ আর্টিস্টের কল্পনায় ছাড়া যতীন অন্তত পৃথিবীতে কোথাও দেখেনি। আপন মনেই সে বলে উঠলো—কি সুন্দর!

একজন সৌম্যমূর্তি পুরুষ ঘরের মধ্যে বসে। কিন্তু ঘরের আসবাবপত্র সবই অপরিচিত ধরনের। পৃথিবীতে ব্যবহৃত কোনো আসবাব সে ঘরে যতীন দেখলে না। লোকটিকে দেখেই মনে হোল অনেক উচ্চ অবস্থার আত্মা ইনি। ওদের অভ্যর্থনা করে বসিয়ে তিনি বল্লেন—তোমরা কোথা থেকে আসচো?

যতীন বল্লে—ভুবর্লোকের সপ্তম স্তর থেকে।

তিনি বিস্মিত হয়ে বল্লেন—না, তা কেমন করে হবে? তা হোলে তো আমাদের এই জনপদ, এই ঘরবাড়ী বা আমাকে কিছুই দেখতে পেতে না? নিশ্চয় তোমরা উচ্চতর স্তরের অধিবাসী।

যতীন বল্লে—এটা কোন্ লোক?

—মহর্লোকের প্রথম স্তর। ভুবর্লোকের অধিবাসীদের পক্ষে এখানকার বাড়ীঘর, মানুষ, বন, পর্বত সব অদৃশ্য। আমার অবস্থার আত্মা না হোলে আমার এ গৃহে আমাকে পাবেই না। মহর্লোক কোনো একটা স্থানও বটে, বিশেষ একটা অবস্থাও বটে। স্থান ও অবস্থার একত্র যোগ না ঘটলে এ লোকে চৈতন্য জাগরিতই হবে না যে। তা নয়, তোমাদের মধ্যে একজন কেউ উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েচ, নইলে এখানে আসতে পারতে না।

—সে এই মেয়েটি। আমি নই—

পুরুষটি হেসে বল্লেন—আমিও তা অনুমান করেচি।

পুষ্প সলজ্জ প্রতিবাদের সুরে বল্লে—আমি কি-ই বা—ওঁর জন্যেই—

যতীন বিনীত ভাবে জিজ্ঞেস করলে—আপনি পৃথিবী চেনেন তো স্যার ?

—আমি আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে পৃথিবীর অধিবাসী ছিলাম। সেই আমার শেষ জন্ম। সেবার ছিলাম গ্রীসে, তার পূর্বে দুই জন্ম ভারতবর্ষে ও এক জন্ম সুপ্রাচীন মিশরে কাটাই।

—তার পূর্বে ?

—তার পূর্বে পৃথিবীতে ছিলাম না। অন্য গ্রহে সৌর-জগতে বহু জন্ম নিয়েচি। কত অদ্ভুত গ্রহ আছে, অদ্ভুত জীবকুল আছে! বিচিত্র লীলা ভগবানের।

হঠাৎ পুষ্প বল্লে—আপনি ভগবানকে দেখেচেন, দেব ?

—না।

—আপনি বিশ্বাস করেন তিনি দেখা দেন ?

—না।

—আশ্চর্য! ভগবানে বিশ্বাস করেন না ?

—তাঁর কোনো রূপে আমার বিশ্বাস নেই, এই কথা বলচি। ভগবানকে তোমরা যে চোখে ছ্যাখো, আমরা সম্পূর্ণ অন্য চোখে দেখি। তিনি অচিন্ত্যনীয় মহাশক্তি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র বিরাজমান। দেহধারী হয়ে দেখাও দেন, আমার এই গ্রামের একটি মেয়ে প্রায়ই তাঁর দেখা পায়।

পুষ্প আশ্চর্য হয়ে বল্লে—তবুও আপনি বিশ্বাস করেন না ?

—যে যেভাবে কল্পনা করে, তাকে সেইভাবেই তিনি দেখা দেন। এতে আমি বুঝি, এই তোমরাই আমার ভগবান হতে পার। নিত্যমূর্তি কি আছে তাঁর ? সবই তাঁর মূর্তি—এই গাছপালা, এই বনভূমি, এই তুমি মেয়েটি—ঐ অনন্ত আকাশ, ব্রহ্মাণ্ডকুল—

কথা বলতে বলতে ভক্তি, জ্ঞান ও পবিত্রতার জ্যোতিতে তাঁর মুখের শ্রী হোল অপূর্ব ; তীক্ষ্ণ নীল আলোক বড় বড় চোখ দিয়ে কখনো ঠিকরে বেরুতে লাগলো—কখনো শান্ত হয়ে আসতে লাগলো। ভগবানের কথায় তাঁর কণ্ঠস্বর ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে এল।

পুষ্প তার ভুল বুঝে বল্লে—আমায় ক্ষমা করুন দেব, আমি বুঝতে পারিনি আপনাকে। আপনি তাঁকে ভক্তি করেন।

যতীন বল্লে—পৃথিবীতে বহুদিন যান নি ?

—পৃথিবীর বসন্তকালে পাহাড়ে পাহাড়ে বনে বনে ফুল ফোটে, সেই সময় পৃথিবীর মহা-অরণ্যে পর্বত-সানুতে নদীতীরে বেড়িয়ে দেখে আসি। কখনো কোনো অসহায়া নারীর দুঃখ দেখি কোনো জনপদে, তার দুঃখ মোচন করবার চেষ্টা করি। নীলনদীর জ্যোৎস্নারাত্রে নির্জন-তটে বসে ভগবানের ধ্যান করি। শুধু পৃথিবী নয়, বহু গ্রহে এমনি আমাদের যাতায়াত।

—আপনি যা করচেন, শুধু আপনাদের মত উচ্চলোকের অধিবাসীরাই তা করতে পারেন। আচ্ছা, পৃথিবীর মানুষের কর্তব্য কি ?

—প্রেম—এক ওর মধ্যেই সব।

—আপনি একথা পৃথিবীতে প্রচার করেন না কেন ?

—কতবার প্রচার করা হয়েচে। আমার চেয়ে উচ্চতর ও শক্তিধর দেবতারা মানুষের দুঃখে পৃথিবীর শত কষ্টের মধ্যেও দেহ ধরে একথা বলতে গিয়েছিলেন। স্বয়ং ভগবান অবতার গ্রহণ করে নেমে গিয়েচেন বলতে। প্রেম—একটি কথা। কেউ শোনেনি।

—তাহোলে কি আপনারা হাল ছেড়ে দেবেন ?

—অদ্ভুত চরিত্র ভগবানের। বার বার সুযোগ দেন। বিরক্ত হন না। অপূর্ব তাঁর ধৈর্য, অপূর্ব তাঁর ক্ষমা। অন্য কেউ হোলে আর সুযোগ দিত না—কিন্তু নাছোড়বান্দা তিনি। আবার লোক পাঠান অদ্ভুত ধৈর্যের সঙ্গে। তোমাদের পৃথিবীতে ভগবানের তুল্য অবহেলিত প্রাণী আর কে ? কেউ তাঁর কথা ভাবে না।

এই পর্যন্ত বলেই অপূর্ব ঈশ্বরীয় প্রেমে মহাপুরুষের চোখ দুটি নক্ষত্রের মত জ্বলজ্বল করতে লাগলো। পুষ্প শ্রদ্ধায় ও উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে বল্লে—আপনি ঠিক বলেচেন দেব, পৃথিবীতে কেউ ভাবে না ভগবানের কথা। যে ভাবে সেও টাকা চায়, যশ চায়, সাংসারিক সুখ চায়। প্রেমভক্তি দুর্লভ হয়ে পড়েচে।

মহাপুরুষ বল্লেন—প্রেমভক্তি ছেড়ে দাও। ও অনেক উঁচু কথা। অতি সাধারণ ভাবেও ক'জন ভগবানের চিন্তা করচে। আমি পৃথিবীতে যাই, জনপদে বা তোমাদের বড় বড় নগরে যাই না। দুর্নিবার লোভ, অর্থাসক্তি, ঐশ্বর্য-কামনা, নারী, সুরা, কাম, হিংসা-দ্বেষ বাতাসে ছড়ানো ঘন ধোঁয়ার মত। ভাই ভাইএর বুকে ছুরি বসাচ্চে। সত্য বিদায় নিয়েচে। পৃথিবীর এখনকার দর্শন হচ্চে খাওয়া-পরার দর্শন। কিসে ভাল খাবো, ভাল পরবো। আমি আপন মনে মরুভূমিতে বেড়াই জ্যোৎস্নারাত্রে, হিমালয় কি অন্য কোনো পর্বতচূড়ায় বসে থাকি, নীলনদ বড় ভালবাসি তার তীরে একা বসে থাকি। অথচ এক কথা—প্রেম, এই যদি ওরা শিখতো—জীবে প্রেম, ভগবানে প্রেম !

তিনি এই পর্যন্ত বলে চুপ করতে পুষ্প বল্লে—বলুন দেব, অমৃতের মত বাণী আপনার।

—আমার ? আমার কিসের কন্যা ? এ বাণী স্বয়ং ভগবানের। তিনি অনেক উঁচু, তাই মানুষের দেহ ধরে পৃথিবীতে গিয়ে একথা বলে এসেছিলেন। কেননা মানুষের দেহ ধরে না গেলে মানুষের সাধ্য কি যে অসীমকে গ্রহণ করে ? একবার নয়, বার বার গিয়েছিলেন। ক্লান্তিহীন তাঁর আশীর্বাদ। কিন্তু কে শুনচে ? ধনজনের মোহে, লোভের মোহে, বিলাসের মোহে—স্থূল ভোগের মোহে সবাই উন্মত্ত। একবারও যদি নির্জনে উচ্চতর সত্যের ধ্যান করতো মানুষে !

যতীন মুগ্ধ হয়ে শুনছিল। আজ এখানে আসা তার সার্থক হয়েচে বটে। সে বল্লে—তবে কি তাদের উদ্ধার নেই, দেব ?

—একটা কথা মনে রেখো। জোর করে মানুষের ওপর কোনো সত্য, কোনো বাণী চাপানো যায় না। মানুষে তৈরী না হওয়া পর্যন্ত ভগবানের বাণী অন্তরালে ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করে। বুদ্ধিহীন বা স্থূলবুদ্ধি ভোগাসক্ত মন হঠাৎ ভগবানকে গ্রহণ করতে পারে না। পারলেই যে মুক্তি—যে ভগবানকে ভালবাসে, সে ভগবানের সমান হয়ে যায়। এত সহজে তা

হবে কোথা থেকে? কাজেই মহাযুগ মন্বন্তর চলে যায় স্বাভাবিক নিয়মে মানুষের মুক্তি পেতে। স্বারোচিষ মন্বন্তরে যারা মানুষ হয়ে জন্মেছিল পৃথিবীতে সর্বপ্রথম—এইবার তারা মানব-আবর্ত কাটিয়ে দেবযান-পথে মহর্লোকে যেতে শুরু করচে। ওদের এতদিন পরে পৃথিবীতে গতাগতি শেষ হোল।

—এর চেয়ে আগেও হয়?

—তুমি বুঝলে না—এ তো হোল স্বাভাবিক নিয়মে, লক্ষ বৎসর পরে। এক জন্মেই মুক্তি হয়—যদি সত্যের জন্যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগে, ভগবৎপ্রেমে বহ্নিশিখা জ্বলে ওঠে মনে। এদের জন্যে ভগবান কত সাহায্যের ব্যবস্থা করেচেন, তা যদি জানতে! যে সত্যকে জানতে চায়, ভগবান তাকে জানবার সব রকম সুযোগ দেন। চলো তোমাদের একটা জিনিস দেখিয়ে আনি—ক'দিন থেকে আমি দেখছি তোমাদের পৃথিবীতে—

যতীন ও পুষ্পকে নিয়ে সেই উচ্চলোকের পুরুষটি চক্ষের নিমিষে পৃথিবীতে নেমে এলেন। সুন্দর জ্যোৎস্নারাত্রি পৃথিবীতে, ভারতবর্ষে। যে নদীতীরে এসে ওঁরা দাঁড়ালো, সে নদীটি খরস্রোতা, তীরে শস্যক্ষেতের মধ্যে এক জায়গায় বড় একটা গাছ। পুষ্প ও যতীন নদীটি চিনতে পারলে না। বৃক্ষের তলে একটি তরুণ যুবক ধ্যানমগ্ন। যুবকের রং টকটকে গৌর, মুখের চেহারা লালিত্যপূর্ণ, বেশ বড় বড় চোখ—কিন্তু এই অল্প বয়সেই সে দাড়ি রেখেচে—রেশমের মত নরম, চকচকে দাড়ি। যতীনের মনে হোল যীশুখ্রীষ্টের ছবির মত মুখখানা ওর দেখতে।

পুষ্প জিজ্ঞেস করলে—এ কি নদী দেব?

—এ রাভি নদী। এটি ভারতবর্ষের পাঞ্জাব প্রদেশ। ছেলেটির বাড়ী ওই জনপদে, সবাই ঘুমুলে গভীর রাত্রে নদীতীরে বৃক্ষতলে ও রোজ একা এসে ভগবানের চিন্তা করে, গান করে আপন মনে। ওই ছাখো ওর মা খাবার দিয়ে যায় এ সময়—আসচে—

একটি মেয়ে—মেয়েটি প্রৌঢ়া বটে, কিন্তু সুন্দরী—দূরের গ্রাম থেকে একটা পাত্রে খাবার নিয়ে এসে ছেলেটির সামনে রাখলে। জিজ্ঞেস করলে—বাড়ী যাবি?

ছেলেটি বল্লে—তুমি যাও মা, আমি এক ঘণ্টা পরে যাবো।

—ঠাণ্ডা লাগাস্‌নে বেশি, বাচ্চা।

ওর মা সস্নেহে ছেলের দিকে দু'তিন বার চেয়ে যে-পথে এসেছিল সেই পথে চলে গেল এবং অতি অল্পক্ষণ পরে এক অপূর্ব দৃশ্য চোখে পড়লো যতীন ও পুষ্পর। আকাশপথ আলো হয়ে উঠলো ক্ষণকালের জন্যে এবং সেই আলোর রেখা ধরে এক দিব্য জ্যোতির্ময় পুরুষ নেমে এসে ওই ধ্যানরত যুবকের পাশে দাঁড়ালেন। আগন্তুক দেবতার রূপে ও দেহজ্যোতিতে স্থানটি যেন আলো হয়ে উঠলো, যদিও যুবকটি তার কিছুই বুঝতে পারলে না।

পুষ্প ও যতীন সবিস্ময়ে বল্লে—উনি কে?

—উনি সত্যলোকের প্রাণী। পৃথিবীতে ওঁর তো দূরের কথা, আমাদেরই আসতে কষ্ট হয়, অথচ ছাখো ওই সত্যপ্রিয় ভগবদ্ভক্ত যুবকটিকে প্রেরণা দিতে নিজে এসেচেন। যেখানে ভগবানের নামগান হয় সেখানে ভগবান স্বয়ং আসেন—এ তোমরা অবিশ্বাস ক'রো না।

তারপরে ওরা তিনজনেই দূর থেকে সত্যলোকের সেই মহাপুরুষকে প্রণাম করলে। তিনি ওদের দিকে চেয়ে সদয় হাস্য করলেন ও দুটি আঙুল ওপর দিকে তোলার ভঙ্গিতে আশীর্বাদ করলেন। পুষ্পর চোখে জল এল। কি সুন্দর রূপ দেবতার।

পরক্ষণেই তিনি অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

পুষ্পদের সঙ্গী পুরুষটি বল্লেন— দেখলে? নীলনদের তীরে বহু হাজার বৎসর পূর্বে যাপিত আমার একটি গোপন রাত্রির কথা আজও আমার মনে হয়। একা ছিলাম সে রাত্রে। বসন্তকাল ছিল, পুষ্পিত হয়ে ছিল নদীতলের ওষধি ও বনতরুরাজি—ক্ষুদ্র একটি পর্বতের চূড়ায় নদীর অপর পারে আমি জ্যোতির্ময় আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করি। আমার সারাজীবন পরিবর্তিত হয়ে যায়—দশ জন্মের প্রগতি একজন্মে সাধিত হয়। ভগবানের কৃপা নইলে হয় কি? কিন্তু তার জন্য ক্ষেত্র তৈরী হওয়া দরকার। পরকে ভালবাসো, জীবকে সেবা করো। আসক্তি ত্যাগ করো। ভগবানে মন দাও। মনের কুয়াশা না কাটলে সত্যের আলোকপাত কি হয়?

—আপনারা দয়া করুন পৃথিবীর জীবকে—তাহোলেই হবে।

—আমার ইচ্ছা আছে, আর একবার পৃথিবীতে দেহধারণ করবো। যা পারি প্রচার করে করে আসি।

—পৃথিবীতে গিয়ে ভুলে যাবেন না?

—দেহ ধরলেই বিস্মৃতি আসে। তবে তার ব্যবস্থা আছে। অন্য দিব্য পুরুষেরা গিয়ে আমায় বাল্যে ও যৌবনে নানাভাবে মনে করিয়ে দেবেন। ওঁরা দেখা দিতে পারেন আমায় স্বপ্নে কিংবা রাত্রিকালে, নয়তো ঘটনার এমন যোগাযোগ ঘটাবেন যে আমার আত্মা ক্রমশ জেগে উঠে বুঝতে পারবে পৃথিবীতে সে কেন এসেচে; ভোজ খেতে, নারী ও সুরা নিয়ে আমোদ করতে আসেনি। ভগবানের বিশ্বে এসবের ব্যবস্থা আছে—যে ভাল কাজ করতে চায়, তাকে সাহায্য দেওয়া হয়। তিনি যে বিরাট মহাশক্তি, সেই শক্তিকে তুষ্ট করতে পারলে জীব পলকে প্রলয় করতে পারে, অসাধ্য সাধন করতে পারে, মহাশক্তির সদয় সাহায্য সে পায়। এ রহস্য কে বোঝে? পৃথিবীতে সবাই অর্থ নিয়ে ব্যস্ত, সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট এই করুণাময়ী মহাশক্তির রহস্যভেদ করতে ব্যস্ত ক'জন?

পুষ্প বল্লে—প্রভু, আপনি বলছিলেন আপনার গ্রামে একটি মেয়ে ভগবানের দেখা পায়— সে কি রকম?

—সে উচ্চ অবস্থার মেয়ে। তার শেষ জন্ম হয় পৃথিবীতে, সাতশো বছর পূর্বে। মানব-আবর্ত কাটিয়েচে। স্বামী-ভাবে ভগবানকে চিন্তা করে। ভগবানের দেখা পায় সেইভাবে। আমি জানি ভগবানের এসব মায়িক রূপ। তাঁর রূপের কি কোনো সীমা আছে? ভগবানকে যে আন্তরিকভাবে ডাকে, তিনি তার কাছে যাবেনই। যে রূপে চায়, সে রূপেই যাবেন। এ একটা অমোঘ নিয়ম। যেমন চুম্বকের কাছে লোহা ছুটে যাবেই—তেমনি। ভগবান যাবেনই ভক্তরূপ চুম্বকের কাছে। তাঁকে টেনে নেবে আকর্ষণ ক'রে। ভগবান লোহা, ভক্ত চুম্বক। এ ওকে টানচে ও একে টানচে। পৃথিবীর লোককে এসকল কথা বিশ্বাস করানো কঠিন।

বিশ্বাস করলে তো মানুষ আর মানুষ থাকে না, ভগবান হয়ে যায়।

ওরা সব মহর্লোকের সেই গ্রামটিতে ফিরে এল। তারপর তিনি ওদের সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন আবাস-বাটী দেখালেন জনপদের। পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে নানা রঙের ফুল, কোনো স্থানে কোনো অপার্থিব পশুর মূর্তি, স্ফটিকে তৈরি। কোথাও বড় বড় বৃক্ষশ্রেণী, কোথাও সরোবর। দুরে দূরে এইসব বনবীথি ও উদ্যানের মধ্যে মধ্যে অতি সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ ও অট্টালিকা। শুভ্র স্ফটিক প্রস্তর ছাড়া অন্য কোনো উপাদান এই প্রাসাদ নির্মাণে ব্যবহৃত হয়নি। গাছে গাছে কুসুমিত লতা মালার আকারে জড়িয়ে, আরতির পঞ্চপ্রদীপের শিখার মত কোনো কোনো রক্তবর্ণ পুষ্প ঊর্ধ্বমুখী হয়ে ফুটে আছে। জনপদের কিছুদুরে নিভৃত অরণ্য শিলাবাঁধানো পথের দুপাশে, অথচ সে সব অরণ্যে জুঁই, গোলাপ, কাঞ্চন ফুলের মত দেখতে আলোর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলীর আকারের সুগন্ধি বনকুসুম অজস্র ফুটে আছে। পাহাড়ের কোলে গুহা ও প্রস্তরনির্মিত মন্দির—যেন বহুকালের বলে মনে হয়।

ওদের সঙ্গী বল্লেন—ওই সব গুহাতে মহর্লোকের প্রাচীন সাধুরা ভগবানের চিন্তাতে নিমগ্ন থাকতেন। এখন বহুদূর পথে, অনেক ঊর্ধ্বলোকে তাঁরা চলে গিয়েচেন, পৃথিবীর হিসেবে হাজার হাজার বছর আগেকার কথা। এখন ওগুলি তীর্থস্থান হিসেবে বিদ্যমান আছে, তবে ওই বনস্থলী, নিভৃত গিরিগুহা ও মন্দিরগুলিতে বসলেই আত্মা স্বভাবত অন্তর্মুখী ও আবৃতচক্ষু হয়ে নিজের হৃদয়কন্দরের অন্ধকার গহনে ডুব দিয়ে নিজের স্বরূপ বুঝতে উন্মুখ হয়ে ওঠে।

যতীন বল্লে—আচ্ছা, আপনাদেরও কি ধ্যানধারণা সাধনার প্রয়োজন হয়?

আমরা তো অনেক নিম্নলোকের জীব! সত্যলোকের ঊর্ধ্বস্তরের দিব্য মহাজ্যোতির্ময় ব্রহ্মস্বরূপ জীবেরাও ধ্যান ও সাধনা দ্বারা আত্মশক্তি উদ্বুদ্ধ করেন। ভগবানের সঙ্গে নিজেদের যোগাযোগ সাধিত করেন। আমরা ধ্যান-ধারণা দ্বারা জন, তপঃ ও সত্য লোকের অধিবাসীদের সঙ্গে আদানপ্রদান চালাই। তাঁদের অদৃশ্য সাহায্য প্রার্থনা করি।

—তাঁরা কি আপনাদের কাছেও অদৃশ্য?

—সম্পূর্ণ। বিনা ধ্যান-ধারণায় তাঁদের মত উচ্চ জীবদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ সম্ভব নয়। আমাদের চোখে তাঁরা সম্পূর্ণ অদৃশ্য।

—তাঁদেরও ঊর্ধ্বে লোক আছে?

—আছে, অনেক আছে। সত্যলোকেরই ঊর্ধ্বতন স্তরের জীবেরা ঐ লোকের নিম্ন স্তরের জীবদের নিকট অদৃশ্য। তার ঊর্ধ্বে ব্রহ্মলোক তার ঊর্ধ্বে সর্বলোকাতীত পরব্রহ্মলোক বা গোলক। তারও ঊর্ধ্বে নির্গুণ ব্রহ্মলোক—কিন্তু সেখানকার খবর কেউ দিতে পারে না—কেউ জানে না। এসব লোকের তত্ত্ব অত্যন্ত গুহ্য—সাধারন জীবেরা এর খবর রাখে না বা তাদের কোনো আবশ্যকও নেই এসবে। তবে আমারও এইসব লোক সম্বন্ধে কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই—কারো থাকে না। ঊর্ধ্বলোকের কোনো কোনো দেবতা দয়া করে দেখা দিয়ে যেমন বলেচেন, তেমনি জানি।

—গ্রাম নগর বেঁধে বাস করেন কেন?

—আমরা বহুযুগ পূর্বের আত্মা। আমাদের সমসাময়িক আত্মা এ লোকে আর নেই। আমরা পরস্পরের সাহায্যে পরস্পরে উন্নতিলাভ করচি। নিজেদের মনের সাহায্যে এই জনপদ নির্মাণ করে একত্র বাস করি, ভগবানের উপাসনা ধ্যানধারণা করি—সাধ্যমত পৃথিবীতে বা অন্য গ্রহে গিয়ে স্থূল জগতের জীবদের উপকার করবার চেষ্টা করি। পৃথিবীতে যেমন গ্রাম জনপদ, সূক্ষ্ম জগতের এই সব জনপদ, বনবীথি, উদ্যানেরই প্রতিচ্ছায়া মাত্র সে সব। তাদের বিকার আছে, এদের বিকার নেই।

পুষ্প বল্লে—ভগবানকে স্বামী রূপে পেয়েচে সেই মেয়েটিকে একবার দেখাবেন না? ওঁর ভাগ্য অদ্ভুত তো!

দেবতা হেসে বল্লেন—ও সব হোল নারীর সাধনা। প্রেমভক্তির সাধনা—ভগবানের মায়িক রূপে দেখা পায়। তুমিও দেখা পেতে পারো কন্যা, যদি তোমার প্রেম জন্মে থাকে তাঁর প্রতি। ভগবান কল্পতরু-স্বরূপ, যথার্থ পিপাসু ও আকুল ব্যক্তিকে নিরাশ করেন না। তবে আমি ওগুলোকে পুতুলখেলা বলে বিবেচনা করি। নারীর ধর্ম, পুরুষের নয়। পুরুষ হবে জ্ঞানী, বীর, ত্যাগী।

পুষ্প বল্লে—কিন্তু মনে রাখবেন দেব, ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণ এই প্রেমভক্তির সাধনা শিখিয়েচেন—

—জ্ঞানেরও, কর্মেরও। তাঁতে তিনেরই অপূর্ব সমন্বয়।

—শ্রীকৃষ্ণকে আপনি যাই বলুন, তিনি প্রেমের দেবতা। প্রেমময়, ভাবময়, সৌন্দর্যময়—এই তাঁর আসল রূপ।

—তুমি নারী, তোমার পক্ষে ওই ভাবই স্বাভাবিক বটে। তবে জেনে রেখো, জগতের বহু গ্রহে বহু জীবকুল বাস করে। ভগবান্ প্রত্যেক গ্রহে অসীম বিশ্বের সমস্ত জীবকুলের সম্মুখে তাদের ভাবানুযায়ী মায়িক রূপ নিয়ে দেখা দেন। তিনি অসীম, অনন্তরূপী, তাঁর কোনো শেষ নেই। কত লক্ষ শ্রীকৃষ্ণ আছেন, কত লক্ষ রামচন্দ্র আছেন তোমাদের পৃথিবীর তাঁর মধ্যে—একথা মনে রেখো।

—তাতে কি। সসীম মানুষ তাঁর কোটি কোটি মায়িক রূপ ধারণা করতে পারবে না। একটিমাত্র সুন্দর রূপের ধ্যানে সিদ্ধিলাভ করুক। তাহোলেই তাঁকে পাবে তো?

—নিশ্চয়। এ তো হোল সহজ পথ। ভক্তির পথ সহজ পথ, নারীর পথ। জ্ঞানের পথ বীরের পথ, পুরুষের পথ—সে কথা তোমাকে তো আগেই বলেচি। ভগবানকে পাবে—ও পথেও, এ পথেও।

পুষ্প বল্লে—সেই সহজ সুন্দর পথের সহজ সুন্দর দেবতা শ্রীকৃষ্ণ যদি আমার মনের গোপন মন্দিরে বিরাজ করেন, তবে আমার জন্মমরণ ধন্য হবে, দেব। জীবনের এপারে বা ওপারে আর কিছুই চাইনে।

এই সময়ে একটি সুন্দরী নারী সেখানে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখ অপূর্ব দিব্যভাবপরিপূর্ণ। অঙ্গকান্তি তরল জ্যোৎস্নার মত, বড় বড় চোখ দুটিতে অসীম সারল্য ও অন্তর্মুখিতা। মহাপুরুষ

পুষ্পের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বল্লেন—এই সেই কন্যা। এর নাম সুমেধা—ভারতবর্ষেরই কন্যা।

পুষ্প প্রণাম করে বল্লে—দেবি, ভগবানের সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল—

নারী হেসে বল্লেন—আমি সব শুনেচি—তাঁর স্বরূপ কি শুনবে? আমি খুব ভাল করে দেখেচি। তিনি বালকস্বভাব, পথের বাঁকে বসে থাকেন উৎসুক হয়ে, ধরা দেবার জন্যে। কিন্তু তাঁর পেছনে ছুটতে গেলে তিনি বালকের মত হেসে ছুটে দূরে পালিয়ে যান—

যতীন অভিভূত ও মুগ্ধভাবে বলে উঠলো—বাঃ মা, বাঃ, কি সুন্দর অনুভূতির কথা!

পুষ্পও মুগ্ধদৃষ্টিতে সেই অনিন্দ্যসুন্দরী লাবণ্যময়ী ভাবময়ী নারীর দিকে চেয়ে রইল। রুদ্ধনিঃশ্বাসে বল্লে—তারপর? তারপর?

—তারপর কি জানো? সেই সময় যদি তুমি হতাশ হয়ে ছুট দেওয়া বন্ধ করো—তবে ভগবান নিরাশ হবেন, দাঁড়িয়ে যাবেন, বালকের মত। তিনি চান জীব তাঁর পেছনে পেছনে খানিক ছোটে, হাঁপায়। ভগবান জীবের সঙ্গে বালকের মত খেলা করেই মহাখুশি। না থেমে তবুও ছুটলে ভগবান শেষে অকারণেই আবার ফিরে আসবেন, হাসতে হাসতে ধরা দেবেন। অতএব ভগবানকে নিরাশ করো না, তাঁকে একটু জীবকে নিয়ে খেলা করতে দাও· তিনি বড্ড একা—

দেবীর চোখ স্নেহে ও প্রেমে ছলছল করে উঠলো।

পুষ্প বল্লে—চমৎকার! আজ অতি সুন্দরভাবে বুঝলাম। সহজভাবে বুঝলাম। আপনার অনুভূতি সহজ বলেই সহজভাবে বুঝেচেন তাঁকে।

যতীনের মন পুষ্পের এ কথায় সায় দিলে।

ওদের সঙ্গী কিন্তু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ছিলেন উদাসীনের মত—যেন তিনি এসব ভাবালুতার বহু উর্ধ্বে, জ্ঞান ও তপস্যার দৃঢ়ভূমির উপর স্বপ্রতিষ্ঠ।

যতীন ও পুষ্প তাঁকেও প্রণাম করে বিদায় প্রার্থনা করলে।

মেয়েটি ওদের হাসিমুখে বল্লে—আবার এসো তোমরা। আমি এখানে শীগগির উৎসব করবো—বনকুসুম-উৎসব। জনলোকের অনেক নারীপুরুষ আসে, সবাই বনফুলের মালা দেন আমার বিগ্রহের গলায়। আমি তোমাদের নিমন্ত্রণ পাঠাবো।

পুষ্প বল্লে—দেবি, কল্প-পর্বতের সঙ্গীত শুনতে যান না আপনি? আবার তো সেদিন আসচে। আপনার সঙ্গে দেখা হবে?

—আমি প্রতিবারই যাই। আমাদের গ্রামের সকলেই যায়। ভগবানের প্রতি অনুরাগ জন্মায় ওই সঙ্গীত শুনলে—অত্যন্ত সূক্ষ্ম অনুভূতির দরজা খুলে যায় বলে অনেক উচ্চ স্তরের নরনারী আসেন সেদিন। যেও সেখানে—আমিও যাবো।

[illegible] গ্রামের প্রান্তে বনবীথির অন্তরালে একটি শুভ্র স্ফটিকের মন্দিরে মেয়েটি ওদের দুজনকেই নিয়ে গেল। সেখানে পা দিয়েই পুষ্প বুঝতে পারলে এ অতি পবিত্র স্থান দেবতার আবির্ভাব দ্বারা এর অণু-পরমাণু ধন্য ও কৃতার্থ হয়ে গিয়েচে, এখানে এসেই তারমনে হোল এখানে

নির্জনে বসে ভগবানের চিন্তা ও ধ্যান করি। রঘুনাথদাসের আশ্রমের মত এর পুণ্যময় প্রভাব।

মেয়েটি হঠাৎ বল্লে—সমুদ্র দেখবে ভাই?

পুষ্প অবাক হয়ে বল্লে—কোথায়?

—ওই দ্যাখো—

পুষ্প সত্যই দেখলে, সেই বনবীথির ওপারে বিশাল সুনীল মহাসাগর ঢেউএর ওপর ঢেউ তুলে বহুদূরে দিগন্তে মিশে গিয়েচে—কোনো কূল নেই, কিনারা নেই। তার অনন্ত জলরাশির ওপর নীল মহাব্যোমের প্রতিচ্ছায়া—সে এক অদ্ভুত দৃশ্য, সমুদ্রতীরে এক শিলাখণ্ডে বিশাল বৃক্ষতলে মেয়েটি ওর হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বসালে। পুষ্পের মনে হোল ওর সমস্ত সত্তা এই অনন্ত মহাসমুদ্রের কূলরেখা ধরে বহুদূর অনন্তে বিলীন হয়ে যাচ্চে, জগৎস্বপ্ন যেন লয় হয়ে যাচ্চে স্বসংবেদ্য আত্মানুভূতির শান্ত গভীরতায়। মেয়েটি খিল খিল করে হেসে উঠলো মুখে আঁচল দিয়ে। কি মধুর হাসি তার সুন্দর মুখের। বল্লে—কেমন ঠকিয়েচি ভাই?

পুষ্প বল্লে—সমুদ্র কোথা থেকে এল এখানে? আমিও তাই ভাবচি।

—সমুদ্রতীরে এই গাছতলায় বসলে তাঁর কথা বড় মনে হয়—তাই তৈরি করে রেখেচি।

—সব সময় থাকে?

—সব সময়। তবে অন্য কেউ আমার মনের ভূমিতে না পৌছুলে দেখতে পায় না। আমার কাছে সর্বদাই সত্যি -অন্যের কাছে অবাস্তব।

—এ গ্রামের অন্য লোকের কাছেও?

—আমি ছাড়া আর কেউ দেখতে পায় না। তুমি ভাই ভালবাসবে বলে তোমাকে আমার ভূমিতে নিয়ে এসে দেখালাম। বলো ভালো?

—আপনাকে আমি কি বলে ধন্যবাদ দেবো জানিনে দেবী। কত ভালো যে লাগচে এই বন, এই পাথরের বেদী, এই নীল সমুদ্র—এখানে ভগবানের আসাযাওয়ার পায়ের চিহ্ন আছে।

—আছেই তো। উনি যে আসেন লুকিয়ে আমার কাছে। জানো না ভাই?

মেয়েটির গলার সুরে পুষ্পের মমতা জাগলো। শ্রদ্ধাও। এই শিলাস্তৃত সমুদ্রবেলায় দেবতার শুভঙ্কর আবির্ভাবের কথা লেখা রয়েচে। পুতুলখেলা হয়তো। হোক্ পুতুলখেলা। সে নারী, এই তার ভাল লাগে।

সে হঠাৎ একটা প্রশ্ন করলে—আচ্ছা, একটা কথা বলুন। মেয়েরা কি খারাপ? পৃথিবীতে কেন একথা সাধু-মহাজন বলে এসেচেন?

—মেয়েরা সাধনপথের বিঘ্ন, তাই।

—কেন?

—বিভ্রান্ত করে দেয় পুরুষের মন। প্রকৃতির কাজ করবার জন্যে মায়ার সৃষ্টি করে। পুরুষেরা মজে অতি সহজেই। সখি, তোমার এই মুখখানি নিয়ে এই মহর্লোকেই একবার পরীক্ষা করে ভাখো না?

—সত্যি আমরা কি এতই হেয়?

—হেয় বা খারাপ এমনি হয়তো কিছু না, বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া। যে ভগবানকে পেতে চায়, যে জ্ঞানের সাধনা করতে চায়, ভক্তির সাধনা করতে চায়—সে নারী থেকে দূরে থাকবে, এই বিধান। অন্য লোকে যত খুশি মিশুক—কে বারণ করচে? সাধনার পথের পথিক যারা নয় তাদের কি বাধা আছে নারীসঙ্গের? নারী প্রেমের সাধিকা হয় অতি সহজে, পুরুষে তা পারে না। নারী পাপের পথেও নিয়ে যায়, কল্যাণের পথেও নিয়ে যায়। কারণ, চিত্তনদী উভয়তোমুখী, বহতি পাপায়, বহতি কল্যাণায়। খুব সাবধানে না চললে সর্বনাশ আসে ওদের থেকে। সাপ খেলাতে সবাই জানে না। আনাড়ী সাপুড়ে সাপের হাতে মরে।

—স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ কি চিরকালের?

—যেখানে প্রেম থাকে। নয়তো কিসের সম্বন্ধ? যেখানে প্রেম আছে, প্রেমের দেবী মিলিয়ে দেন। স্বামী-স্ত্রী না হোলেই বা কি। প্রেম নিয়ে বিষয়—কিন্তু এ ধরনের প্রেম সাধনা-লব্ধ বস্তু। দেহের বা রূপের মোহ এ প্রেমের জন্ম দিতে পারে না। রূপজ প্রেম দিয়ে প্রকৃতি তার কাজ করিয়ে নেয় মাত্র।

—আপনি কি করে এসব জানলেন?

মেয়েটি হেসে বল্লে—কত যে ঠকেচি ভাই কত শত জন্ম ধরে। কত নেমে গিয়েছিলাম, কত ভুগেছিলাম—জন্ম-জন্মান্তরের সে সব স্মৃতি ও সংস্কার আমাকে জ্ঞানী করেচে। একজন্মে দুজন্মে সাধু হওয়া যায় না ভাই—মহর্লোকেও আসা যায় না।

—আবার আপনি জন্মাবেন?

—পৃথিবীতে আমার শেষ জন্ম হয় বহুকাল আগে—পৃথিবীর সে হিসেব ভুলে গিয়েচি। আর সেখানে যাবো না। ভগবান আমায় দয়া করেচেন।

—যদি আপনার মত মেয়ের দরকার হয় পৃথিবীতে জন্ম নেওয়ার?

—সে অবস্থায় ভগবানের নির্দেশ পাবো। জীবের সেবা করবার ভার—সৌভাগ্যের কথা সে। তিনি যদি আমায় না ছাড়েন ভাই, নরকে যেতেই বা কি? উনি হাত ধরে নিয়ে গেলে নরক আর বলি কোথায়! কিসের স্বর্গ কিসের নরক? থাকুন তো উনি আমার সঙ্গে'!

মেয়েটির চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো দর-দর ধারে।

পুষ্প অবাক হোল ওঁর অনুভূতির তীব্রতায়। শ্রদ্ধায় ভক্তিতে ভ'রে উঠলো তার মন।

মেয়েটি আবার বল্লে—ভগবান এই আলোর কমল বিশ্বজগৎ হয়ে ফুটে আছেন। তাঁর করুণার আলো। কাউকে তিনি ভোলেন-না, অবহেলা করেন না ভাই—তাঁর মত প্রেমিক কে? যে ডাকে, যে তাঁর শরণ নেয়, তিনি তারই দোরে ছুটে যান, পাপী-পতিত মানেন না। কিন্তু ভাই, কেউ কি তাঁকে চায়?

সমুদ্রতীরের বিশাল বৃক্ষতলে নীল উর্মিমালার দিকে চেয়ে ওরা দুজন দাঁড়িয়ে। মেয়েটি সুন্দর ভঙ্গিতে হাত তুলে দূরে দেখিয়ে বল্লে—ওই মহাসমুদ্রের মত অন্তহীন তাঁর করুণা! কেউ বুঝতে পারে না, বলে তাঁকে নিষ্ঠুর। তিনি দু'তিন জন্মের মঙ্গল করেন একজন্মের কর্মক্ষয় ক'রে। পৃথিবীর লোকে সদ্য সদ্য ফল চায়। বোঝে না তিনি কি করতে চাইচেন। ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে

অনেক সময় আসে তাঁর করুণা। কাজেই অবুঝের গালাগালি তাঁকে সহ্য করতে হয়।

পুষ্প বল্লে—আপনি দেবী, কি আনন্দ হোল আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে। আমার সঙ্গী মহর্লোকে বেশিক্ষণ থাকতে পারবেন না, জ্ঞান হারিয়ে ফেলবেন। আজ আমি যাই—

—আবার এসো ভাই, আসবে ঠিক? আমার পায়ে হাত দেওয়া কি ভাই? তুমিও তো কম নও। আমি তোমাকে চাই। এসো—আনন্দে থাকো ভাই।

মেয়েটির অব্যর্থ আশীর্বাদ। সত্যিই এক অপূর্ব আনন্দের প্রসন্ন হিল্লোল বয়ে গেল পুষ্পের মনে। এ জগতে ভয় নেই, অমঙ্গল নেই—মেয়েটি বলেচে, ভগবানের আশীর্বাদ রয়েচে বিশ্বের ওপরে।

ফিরে এসে বুড়োশিবতলার ঘাটে বসে সেদিন সন্ধ্যায় পুষ্প যতীনকে ওই অদ্ভুত মেয়েটির গল্প শোনালে।

সেদিন ফিরে আসবার পর আরও কিছুকাল কাটলো। বুড়োশিবতলার ঘাটে যে সংসার পেতেছিল পুষ্প, তাতে যেন ভাঙন ধরেচে। আজ সাত বছর আগে প্রথম যেদিন যতীন এখানে আসে, সেদিনটি থেকে পুষ্পের কত সাধ, কত আনন্দ, ছেলেবেলার সেই প্রিয় সাথীকে নিয়ে এখানে সংসার পাতবে। তাই অনেক আশা করে সাজিয়েছিল বুড়োশিবতলার ঘাটের সংসার।

ওপারের শ্যামাসুন্দরীর মন্দিরে আরতি-ঘণ্টাধ্বনি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুষ্প আগে নিজেদের ঘরে প্রদীপ দেখায়, গৃহদেবতার সামনে সুগন্ধি ধূপ জ্বালিয়ে ফলফুলের অর্ঘ্য নিবেদন করে, মনে মনে দেবদেবীকে স্মরণ করে। রঘুনাথদাস ওকে একটি সুন্দর স্ফটিক-বিগ্রহ এনে দিয়েচেন, তিনি বলেন একজন শিল্পী মননশক্তি দ্বারা ভুবর্লোকের পদার্থে ইচ্ছামত রূপান্তর ঘটিয়ে এই সব দেব-দেবীর মূর্তি তৈরি করেন—এই লোকেরই চতুর্থ স্তরে কোথায় তিনি থাকেন। পুষ্প বলেছিল একদিন সেখানে গিয়ে দেখে আসবে।

কিন্তু কি জানি পুষ্পের ভাগ্যে কোথায় যেন কি গোলমাল আছে। সব মিথ্যে হয়ে যায় কেন? হঠাৎ আশা-বৌদিদি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেচে।

সেই মুহূর্তেই পুষ্প টের পেয়ে গেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যতীন তার কিছুই জানে না। যতীনের মুখের দিকে চেয়ে ওর কষ্ট হোল। আশা প্রারব্ধ কর্মের ফলে ভুবর্লোকের কোনো নিম্নস্তরে হয়তো ঘুরচে—যতীনদার সঙ্গে দেখা হওয়া সম্ভব নয় এ অবস্থায়, পুষ্প এ সত্য বুঝেচে।

সুতরাং মিছিমিছি কেন যতীনদাকে আশার মরণের কথা জানিয়ে কষ্ট দেওয়া। পৃথিবীতে থাকলেও তারা যেমন কোনো সাহায্য করতে পারেনি, এখানেও ঠিক তেমনি অবস্থা দাঁড়াবে। এ-লোকেও নিম্ন স্তরের অধিবাসী আশার কাছে সে ও যতীনদা যেমনি অদৃশ্য ছিল পৃথিবীতে থাকতে, তেমনিই থাকবে।

কিন্তু আশা কোথায় আছে একবার দেখা দরকার।

সেদিন সে রঘুনাথদাসের কাছে গেল, যতীনকে কিছু না জানিয়ে। দেখা পাবে কিনা সন্দেহ ছিল, কারণ এ সব মহাপুরুষ নিজের খেয়ালে থাকেন, আজ আশ্রম আছে, কাল নেই। সর্বপ্রকার

মায়াবন্ধনের অতীত এঁরা। ভগবানের দেহে লয় না হয়ে ভক্তিসেবার জন্যে চিন্ময় আশ্রমে চিন্ময় বিগ্রহ স্থাপন ক'রে সেবামৃত আস্বাদ করচেন মাত্র। আজ আছেন, কাল হয়তো নাস্তি। দেখাই যাক্।

রঘুনাথদাস আচার্যকে তার বড় ভাল লাগে। প্রেমে স্নেহে বালকস্বভাব বৃদ্ধ সাধু ঠিক যেন তার বাবার মত। আজ তার মনে হোল এ বিপদে এঁরই আশ্রয় নিতে হবে। অতি উচ্চ স্তরে সাধুর আশ্রম, সেখানে পৌছোনো তার পক্ষে সব সময় সহজ নয়—তবে ভগবানের কৃপা ভরসা।

আশ্রমটি একটি বিশেষ মণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত। সাধুর আবাসস্থানের মাহাত্ম্যে দূর থেকেই পুষ্পের মনে এক অদ্ভুত ভাবের উদয় হোল—এ ভাব সে পূর্বেও এখানে আসবার সময় গাঢ় ভাবেই অনুভব করেচে। সে অপূর্ব আনন্দরস···বার বার জন্মমৃত্যুর আবর্ত থেকে মুক্ত, কোন্ লীলাময়ের অনন্ত লীলারাজ্যে সে নিত্য অভিসারিকা চিরযৌবনা প্রেমিকা···জগন্মণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভের পার্শ্বচারিণী।

সেই শ্বেত স্ফটিকের দুগ্ধধবল গোপাল-মন্দিরটি দূর থেকে দেখেই পুষ্প উদ্দেশে প্রণাম করলে। মন্দিরের চারিপাশের পুষ্পবাটিকাতে কত ধরনের ফুল ফুটে আছে, পূর্ব-পরিচিত এই সুন্দর লতাকুঞ্জটিতে রঘুনাথদাস বসে নামগান করচেন। এবার তিনি একা নন, দুটি বালক ও দুটি উদ্ভিন্নযৌবনা সুন্দরী কুমারী সেখানে বসে তাঁর সঙ্গে হাততালি দিয়ে গানে যোগ দিয়েচে। কেমন চমৎকার সুগন্ধ এখানকার! সেবারও এখানে আসতেই পুষ্প পেয়েছিল—অগুরু, চন্দন, সুগন্ধি ধূপের ধোঁয়া, কত কি ফুলের সুবাস মিলে এই স্বর্গীয় সুগন্ধটার সৃষ্টি করেচে। আশ্চর্য, কোনো পার্থিব ধরনের বাসনা একেবারে থাকে না এই সুমধুর গন্ধময়, নিস্তব্ধ, চিরশান্তিময় পরিবেশের মধ্যে।

ওকে দেখে রঘুনাথদাস বল্লেন—এসো মা। আমি তোমার কথা ভাবছিলাম, বোসো।

পুষ্প ওঁকে প্রণাম করতেই আচার্য বল্লেন—অপুনর্ভব হও।

বিস্ময়ে পুষ্প শিউরে উঠে বল্লে—কি বল্লেন আচার্যদেব! ওকি কথা?···জানেন—

তিনি হেসে বল্লেন—ঠিক বলেচি মা।

—আপনি তো জানেন, আমার বাসনা কামনা কিছুই এখনো যায়নি, পৃথিবীতে আমার যাতায়াত বন্ধ হোলে কি করে চলবে? বলুন আপনি। জন্ম এখন থেকেই বন্ধ হবে?

রঘুনাথদাস পুষ্পের গায়ে সস্নেহে হাত বুলিয়ে অনেকটা যেন আপনমনে সুর করে বল্লেন—

কিয়ে মানুষ,জনমিয়ে পশুপাখী, অথবা কীটপতঙ্গে
করমবিপাকে গতাগতি পুনপুন মতি রহুঁ তুয়া পরসঙ্গে।

এমন দিব্য মধুর সুরের সে গান, বিদ্যাপতির বাণী যেন মূর্ত হয়ে উঠলো সুগায়ক রঘুনাথদাসের কণ্ঠস্বরের মধ্যে দিয়ে।

তারপর পুষ্পকে বল্লেন—যাও, গোপালকে দেখা দিয়ে এসো। বড় অভিমানী—সামলে রাখতে হয়।

পুষ্প হেসে বল্লে—ওসব আপনার সঙ্গে, কই আমাদের সঙ্গে তো কোনোদিন একটা কথাও—

—হবে। দেখতে পাচ্চি মা, দেখতে পাচ্চি। গোপালের চিহ্নিতা সেবিকা তুমি। সাধে কি বলেচি অপুনর্ভব হও? আমার মুখ দিয়ে মিথ্যা বার হয়নি।

—আপনি বুড়ো দাদু হয়ে বসে আছেন, দিন দিন ছেলেমানুষ হচ্চেন কেন? ও রকম বল্লে মেয়ের অপরাধ হয় না?

বৃদ্ধ প্রসন্নমুখে বল্লেন—ঠিক মা ঠিক। যাও দেখে এসো—

একটু পরে পুষ্প আবার এসে তাঁর কাছে বসলো। এখানে সে কিজন্যে এসেছিল তা যেন ভুলে গিয়েচে। এ পবিত্র আশ্রমে বসে কি করে ঐ সব কথা বলবে! হয়তো শেষ পর্যন্ত বলতে পারতো না, কিন্তু রঘুনাথদাসই বল্লেন—তোমাকে অন্যমনস্ক বলে মনে হচ্চে কেন?

—আপনি অন্তর্যামী, সব জানেন। লজ্জা করে আপনাকে মুখে বলতে—

রঘুনাথ কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বসে রইলেন চোখ বুজে। তারপর গম্ভীরভাবে বল্লেন—কি চাও মা?

—সেই হতভাগীর সঙ্গে দেখা করতে বড় ইচ্ছে হয়। কি ভাবে আছে,—যদি কোনো উপকার করতে পারি।

—সেই মেয়েটি প্রেতলোকে রয়েচে। তার চোখ খোলেনি, মনও অপরিণত। তার ওপর আত্মহত্যা-রূপ মহাপাপের ফলে প্রকৃতি একটা প্রতিশোধ নেবে।

—একবার দেখা হয় না?

—সে কোথায় আছে জানি না। ভুবর্লোকের নিম্নস্তর, যাকে সাধারণত নরক বলে থাকে পৃথিবীর ভাষায়—সে অনেক বড় জায়গা। তারও আবার অনেক স্তর আছে—চলো দেখি—

—প্রভু, আমার সঙ্গে তার একভাবে খানিকটা যোগ আছে, সুতরাং আমি গেলে তাকে বার করা সহজ হবে।

—ওসব না। সে মেয়েটি পৃথিবীর যে গ্রাম থেকে এসেচে—তারই নিকটবর্তী কোনো নিম্নলোকে ভ্রাম্যমানা। স্থূল ধরনের বাসনা-কামনা নিয়ে পৃথিবীর আকর্ষণ ছেড়ে ঊর্ধ্বলোকে ওঠা অসম্ভব।

একটু পরে পুষ্প রঘুনাথদাসকে নিয়ে প্রথমে এল কুড়ুলে-বিনোদপুর, সেখানে কোনো সন্ধান না পেয়ে গেল আশার বাপের গ্রাম রসুলপুরে। কয়েকটি নিম্ন শ্রেণীর ধূসরবর্ণের আত্মা গ্রামের বাঁশবনে, তেঁতুলগাছের ডালে, মাঠের মধ্যে বাবলা গাছে পা ঝুলিয়ে বসে হাওয়া খাচ্চে। একটি দুষ্ট আত্মা গ্রামস্থ ব্রাহ্মণপাড়ার পুকুরপাড়ের এক নোনা গাছে বসে স্নানরতা স্ত্রীলোকদের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। প্রায় তুরীয় অবস্থায়। পুষ্প মনে মনে হেসে বল্লে—দ্যাখো পোড়ার-মুখোর কাণ্ড! ইচ্ছে হয় গালে এক চড় বসিয়ে দিয়ে আসি—হাঁ করে যেন কি গিলচে—হি হি—

অবিশ্যি ওই সব নিম্ন স্তরের আত্মার কাছে তারা অদৃশ্যই রইলো।

রঘুনাথদাস বল্লেন—চলো, এখানকার কাছাকাছি নিম্নলোকে—এখানেই আছে।

অল্প পরেই ওরা এক বিস্তীর্ণ মরুপ্রান্তরের ন্যায় উষর স্থানে এসে পড়লো। তার চতুর্দিকের চক্রবাল-রেখা ধূমবাষ্পে সমাচ্ছন্ন—যেন মনে হয় কাঁচা বনে লতাপাতা পুড়িয়ে অজস্র ধূম সৃষ্টি করে দাবানল জ্বলছে। অথচ অগ্নিশিখা দৃশ্যমান নয়—শুধুই মরুময় ধূ ধূ প্রান্তর, মাঝে মাঝে বৃক্ষলতাহীন প্রস্তরস্তূপ। ওরা সেই জনহীন মরুদেশের ওপর দিয়ে শূন্যপথে ধীরগতিতে যেতে যেতে দেখলে সে রাজ্য সম্পূর্ণরূপে জনহীন, বৃক্ষলতাহীন। সেখানকার আকাশ নীল নয়, ঘোলাটে ঘোলাটে শুভ্র লঘু বাষ্পে ঢাকা। পুষ্পের মনে হোল ভাদ্র মাসের গুমটের দিনে পৃথিবীর আকাশে যেমন সাদা মেঘ জমে থাকে—অনেকটা তেমনি।

পুষ্প বল্লে—এই জায়গাটা যেন কেমন বিশ্রী—

রঘুনাথদাস বল্লেন—এই সব ভুবর্লোকের নীচু স্তর, পৃথিবীতে যাকে নরক বলে। এ অনেক দূর ব্যেপে রয়েচে—হাজার হাজার ক্রোশ চলে যাও, পৃথিবীর ঠিক ওপরে পৃথিবীর চারিপাশ ঘিরে এ রাজ্য বর্তমান। অথচ পৃথিবীর লোকের কাছে সম্পূর্ণ অদৃশ্য। এখানকার বাসিন্দারা আবার ভুবর্লোকের কোনো উচ্চ স্তর দেখতে পায় না।

—হাজার হাজার ক্রোশ! এমন জনহীন!

—তারও বেশি। যতদূর চলে যাও, এ অদ্ভুত লোকের আদি অন্ত পাবে না। বহু হাজার ক্রোশ চলে যাও, এমনি। এ কোনো বাইরের অবস্থা নয়। এখানকার বাসিন্দাদের মানসিক-অবস্থা-প্রসূত। এরাও অনেক সময় যতদূর যায়—এ জনহীন মরু-পাথরের দেশের আদি-অন্ত পায় না খুঁজে, অন্য কোনো প্রাণীকেও দেখতে পায় না। চন্দ্র নেই, সূর্য নেই, তারা নেই—এই রকম চাপা আলো—কখনো কালো হয়ে আসে, ঘোর কালো, পৃথিবীর অমাবস্যার মত। উপনিষদে এ লোকের কথা বলে গিয়েচে—অসূর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতা—এই সে ভীষণ অন্ধ-তমিস্রা লোক—একশো বছর পর্যন্ত হয়তো টিকে যায় সেই অন্ধকার কোনো কোনো পাপী আত্মার কাছে। সে হতভাগ্য আশ্রয় ও আলো খুঁজে, সঙ্গী খুঁজে হয়রান হয়ে পড়ে।

পুষ্প শিউরে উঠলো। অস্পষ্ট স্বরে বল্লে—একশো বছর ধরে অমাবস্যা!

রঘুনাথদাস হেসে বল্লেন—কন্যা, জন্ম-মরণ-ভীতি-ভ্রংশী শ্রীকৃষ্ণমুরারির শরণ নাও—যেন এখানে কোনোদিন আসতে না হয়। এ হোল হিরণ্যগর্ভদেবের রাজ্য, তিনি এখানে শাসক ও পালক।

—তিনি কে?

—ব্রহ্মের তিন রূপ—স্থূলরূপে বিরাট, সূক্ষ্মরূপে হিরণ্যগর্ভ, কারণ-স্বরূপ ঈশ্বর।

—প্রভু, পৃথিবীর গ্রহদেব বৈশ্রবণ কে?

—তিনি পূর্বকল্পের মহাপুরুষ। পৃথিবীর প্রজাপতি।

—তবে আপনার গোপাল কে?

রঘুনাথদাস প্রসন্ন হাস্যে বল্লেন—গোপাল সব। আমি ওকেই জানি। ওই ব্রহ্ম, ওই আত্মা, ওই ভগবান। আমি আর কারো খবর রাখিনে। ব্রহ্মের সাকার রূপ, জ্ঞানচক্ষে দেখলে মায়িক রূপ বটে। কিন্তু আমার চোখে গোপাল ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ করে রেখেচে। আমার আর

কোনো তত্ত্বে দরকার কি। ভক্তির চোখে ভাবের চোখে দেখতে শেখো ভগবানকে। তাঁর ঐশ্বর্য ভুলে যাও। তাঁকে বন্ধু ভাবো পুত্র ভাবো পতি ভাবো—এমন কি দাস ভাবো।

পুষ্প বিস্মিত হয়ে বল্লে—দাস ভাববো? কি বলেন ঠাকুর!

রঘুনাথ চাৎকার করে বল্লেন—কেন ভাববে না? দাবি করে ভাবো। প্রেমের সঙ্গে দাবি করে ভাবো। তিনি ভক্তের দাসত্ব করেচেন—করেন নি? তিনি যে প্রেমের কাঙাল—তাঁকে যেভাবেই ডাকো, ডাকলেই সাড়া দেবেন। তবে প্রেমের সঙ্গে ডাকা চাই। ভয় করে ডেকো না। ভয় করবার কিছু নেই তাঁকে।

পুষ্প মেয়েমানুষ, এ সব কথায় ওর চোখ দিয়ে দরদর ধারে জল গড়িয়ে পড়লো। যুক্ত করে নমস্কার করে বল্লে—আপনার আশীর্বাদ, ঠাকুর। নরকে এ কথা বল্লেন, নরক যে পুণ্যস্থান হয়ে উঠলো!

এমন সময় পুষ্প দেখতে পেলে আশাকে। একটা কালো পাথরের অনুর্বর টিলার ওপর সে মলিনমুখে চুপ করে বসে আছে।

রঘুনাথদাস বল্লেন—তুমি যাও মা। আমি এখানে থাকি।

—কিন্তু আমাকে যে ও দেখতে পাবে না?

—পাবে, যাও। কিন্তু একটা কথা মা—

—কি?

—ওই কন্যাটির এখনও জ্ঞান হয়নি।

পুষ্প বিস্মিত হয়ে বল্লে—সে কি প্রভু! ও তো দিব্যি জেগেই বসে আছে।

—ও মেয়েটি ধূম্রযান দক্ষিণমার্গের পথিক। ওর গতির পথ বেঁকে আছে ধনুকের মত পৃথিবীর দিকে। তুমি দেখতে পাচ্চ না মা! ও অল্পদিন হোল পৃথিবী থেকে এসেচে—তার ওপর স্বাভাবিক নিয়মে মৃত্যু হয়নি। আত্মহত্যা করেচে। ওর মৃত্যু সম্বন্ধে ধারণাই হয়নি। যাও, কাছে গিয়ে বুঝতে পারবে।

পুষ্প কাছে যেতেই আশা বল্লে—তুমি আবার কে গো? হ্যাগো, এটা কি আলিপুরের বাগান?

পুষ্প সস্নেহে বল্লে—কেন বৌদি? এটা কি বলে মনে হচ্চে?

—বাড়ীওয়ালী মাসী বলেছিল আলিপুরের বাগান দেখাতে নিয়ে যাবে। সেখানে একটি কোন্ বাবুর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেবে। আমি বলি, ছি ছি, কি ঘেন্না, বলি—নেত্যদার সঙ্গে চলে এসেছিলাম সে আলাদা কথা। অল্প বয়েসে বিধবা হয়েছিলাম, কে খেতে পরতে দেয় সংসারে …না হ্যাঁ, সত্যি কথা বোলবো। মা বুড়ো হয়েচেন, তাঁর ঘাড়ে আমার আর একটি বিধবা দিদি …আচ্ছা, মাহেশের রথতলা এখান থেকে কত দূর? তুমি কে?

পুষ্প ওর পাশে গিয়ে বসলো। ওর দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লে—আমি তোমাকে চিনি। তুমি আমার বৌদিদি হও।

—তা এখানে কি মানুষ নেই? এটা কোন্ জায়গা? খিদে-তেষ্টা পেয়েচে কিন্তু একখানা খাবারের দোকান নেই। মাহেশের রথতলাতে আমার এক দূর সম্পর্কের ভগ্নীপতি থাকে। সেখানে যাবার খুব ইচ্ছে হয়। কিন্তু এই অবস্থায় যেতে লজ্জাও করে—

—তুমি এখানে এলে কার সঙ্গে?

—এলাম কার সঙ্গে তা মনেই পড়ে না। একদিন বাড়ীওয়ালী মাসী বল্লে—তোমায় আলিপুরের বাগানে নিয়ে যাবো—সেখানে একটি বাবু তোমার সঙ্গে দেখা করে কথা বলতে চায়। ঘরে সেদিন কিছু খাবার নেই। বাড়ীভাড়া কুড়ি টাকার জন্যে তাগাদা করে করে বাড়ীওয়ালী তো আমার মাথা ধরিয়ে দিতে লাগলো। রাত্রে ঘরে খিল দিয়ে শুলাম, তারপর যে কি হোল, আমার ভাল মনে হচ্ছে না।

—বাড়ীওয়ালী তোমায় আলিপুরে নিয়ে গিয়েছিল?

—কি জানি ভাই, তারপর আমার আর কিছু মনে নেই। এখানে আজ ক'দিন আছি তাও মনে নেই। খিদে-তেষ্টা পেয়েচে—অথচ খাবার পাইনে। না আছে একটা লোক, না আছে একটা দোকান-পসার। আচ্ছা, এর বাজারটা কোন্ দিকে?

পুষ্প কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লে—আশা বৌদি, যতীনদাকে মনে পড়ে?

আশা কেমন যেন চম্‌কে উঠে, ওর দিকে অল্পক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে বল্লে—তুমি তাঁকে কি করে জানলে?

—জানি আমি। দেশের লোক যে গো! একগাঁয়ে বাড়ী।

আশার দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। হাত দিয়ে মুছে বল্লে—তিনি স্বর্গে চলে গিয়েচেন, তাঁর কথা আর আমার মুখে বলে কি লাভ?

—সে কথা বলচিনে বৌদি, সত্যি কথা বলো তো আমার কাছে, তাঁর কথা তোমার মনে হয় কি না?

আশা চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে বল্লে—হয়। যখন হয় তখন বুকের মধ্যে কেমন করে ওঠে—

—কেন বৌদি?

—আমি হতভাগী তাঁকে একদিনও সুখ দিইনি। তখন ছেলেমানুষ ছিলাম, বুঝতাম না—কেবলই বাপের বাড়ী এসে থাকতাম শ্বশুরবাড়ী থেকে—

—কেন?

—শ্বশুরবাড়ীতে খাওয়া-দাওয়ার বড় কষ্ট পেতাম। ছেলেমানুষ তখন—

—তোমার একথা সত্যি নয় বৌদি। আমার কাছে সব খুলে বলো না ভাই?

আশা চুপ করে নথ খুঁটতে লাগলো। এ কথার কোনো জবাব দিলে না। পুষ্প বল্লে—বলবে না ভাই?

আশা বল্লে—কি হবে শুনে সে সব কথা। আমার বুদ্ধির দোষেই যা কিছু সব হয়েচে। আমি আমাদের গ্রামের মজুমদার-পাড়ার একটা ছেলেকে ভালবাসতাম।

—বিয়ের আগে থেকে, না বিয়ের পরে ?

—বিয়ের আগে নয়, কিছুদিন পরে।

—বিয়ের পরে অন্য কারো সঙ্গে ভাব করতে গেলে কেন ? এটা খুব অন্যায় হয়েচে তোমার বৌদিদি। হিন্দুর মেয়ে, দ্বিচারিণীর ধর্ম কে শেখালে তোমায় ?

আশা চুপ করে রইল। পুষ্পের কড়াসুরে বোধহয় একটু ভয় খেয়েই গেল।

—কথার উত্তর দিলে না যে ?

—আমার অদেষ্ট ভাই। ও কথার কি উত্তর দেবো ?

—কিন্তু আমি তোমায় বলচি তুমি এখনও সেই লোকটাকেই ভালবাসো। যতীনদার ওপর তোমার কোনো টান নেই। আমি সব বুঝতে পারি ভাই। আচ্ছা, তোমার ঘেন্না হয় না ? যার জন্যে এত কষ্ট, যে তোমাকে ফেলে চলে গেল, যার জন্যে তোমাকে আফিং খেয়ে মরতে হোল, আবার সেই ইতর লোকটার জন্যে এখনও ভাবনা ? যতীনদা দেবতার মত স্বামী তোমার, তাকে একদিন দেখলে না মরবার সময়ে, তার কুলে কালি দিয়ে ঘর ছেড়ে চলে এলে—

আশার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। সে বল্লে—আফিং খাওয়ার কথা তো কেউ জানে না—তুমি কি করে জানলে ? আমি তো—

—আফিং খেয়ে তুমি মারা গিয়েচ বৌদি। তুমি বেঁচে নেই—মরে প্রেতলোকে এসে কষ্ট পাচ্চ—

আশা এবার যেন খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে। এটা তাহলে ঠাট্টা ! তবুও আফিং খাওয়ার কথা এ কি ভাবে জানলে ! পরক্ষণেই একথা ওর মনে হোল—কে এ মেয়েটা, গায়ে পড়ে আলাপ করতে এসেচে ? এত হাঁড়ির খবরে ওর কি-ই বা দরকার ? ওর গলা ধরে কে কাঁদতে গিয়েচে তা তো জানি নে। সে যা খুশি করেচে, তার জন্যে ওর কাছে এত কৈফিয়ৎ দেবার বা কি গরজ। শ্বশুরবাড়ীর লোক বোধ হয়, ওই গাঁয়েরই মেয়ে—তাই এত গায়ে ঝাল।

মুখে এসে বল্লে—তা যাই বলো ভাই—মরে ভূত হওয়াই বই কি এক রকম—

পুষ্প দৃঢ়কণ্ঠে বল্লে—তা নয়। আমি ঠাট্টা করিনি। মারা তুমি গিয়েচ। আফিং খেয়ে ঘরে খিল দিয়ে শুয়ে ছিলে কলকাতার বাসায়, মনে নেই ? তারপর তুমি মরে যাও, মরে এই প্রেতলোকে এসেচ।

আশার মুখে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস ও সন্দিগ্ধতার চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখে ও বল্লে—এখনও বিশ্বাস হোল না বৌদি ? আচ্ছা, তোমায় বিশ্বাস করাবো। চলো—তোমাদের গাঁয়ে তোমাদের বাড়ী যাবে ?

আশা কিছু না ভেবেই ঝোঁকের মুখে বল্লে—সেখানে আর কি মুখ নিয়ে যাবো—

—গেলেও কেউ টের পাবে না। সত্যি-মিথ্যে চলো চট্ করে পরীক্ষা করে নিয়ে আসি। তোমার প্রেতদেহ হয়েচে। এ দেহ পৃথিবীর মানুষের চোখে অদৃশ্য।

পুষ্পের কথার ভাবে ও সুরে আশা কি বুঝলে যেন, ওর হঠাৎ ভয়ানক আতঙ্ক হোল। কি সব কথা বলে এ ! যদি সত্যিই তাই হয় ? সে যদি সত্যিই মরেই গিয়ে থাকে ?

ঠিক সেই সময় একটি নিম্নশ্রেণীর প্রেত দুটি অল্পবয়সী মেয়েকে একাকী দেখে পূর্বসংস্কারবশত ওদের দিকে ছুটে এল। মুখে দু-একটি অশ্লীল কথাও উচ্চারণ করলে, ঘোর কামাসক্তিতে তার চোখ ও মুখের অবস্থা উন্মত্ত পশুর মত।

ওর বিকট হাবভাব দেখে আশা ভয়ে পুষ্পকে জড়িয়ে ধরে চীৎকার করে বল্লে—এই দ্যাখো ভাই কে একটা আসচে—মাগো—

পুষ্পও ভয় পেয়েছিল, সেও প্রথমটা আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল—কিন্তু হঠাৎ একটা আশ্চর্য কাণ্ড ঘটলো, লোকটা ওদের কাছে এসে পড়ে পুষ্পের দিকে চেয়েই জড়সড় হয়ে কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেল। তারপর দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞানশূন্য ভাবে ছুট দিলে সোজা।

হঠাৎ আশা ভয়ে ও বিস্ময়ে পুষ্পের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে বল্লে—ওকি! তোমার কপাল দিয়ে আগুন বেরুচ্চে যে!…এ কি! ওমা—কি সর্বনাশ!

পুষ্প অবাক হয়ে নিজের কপালে হাত দিয়ে দেখতে গেল। সে আবার কি। পরক্ষণেই ওর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো দরদর করে। সে হাত দিয়ে মুছে বল্লে—ভাই বৌদি—

আশার ভয় ও বিস্ময় তখনও যায়নি। সে দূর থেকেই আপন মনে বললে—বাবাঃ—কি এ! আর দেখা যাচ্চে না। কি আগুন!…

তারপর সে ছুটে এসে পুষ্পের পা দুখানা জড়িয়ে ধরে বল্লে—কে আপনি? আমায় বলুন কে আপনি? আপনি তো সহজ কেউ নয়। স্বগ্‌গো থেকে দেবি এসেচেন আমায় দয়া করতে?

আশার মুখ দিয়ে অজ্ঞাতসারে একটা বড় সত্য কথা বেরুলো।…

যতীন সব শুনলে। আশার এই পরিণতি। সেই আশা! কি জানি কেন শুধুই মনে পড়ে ওদের কাঁটালগাছের দিকের ঘরের সেই ফুলশয্যার বৃষ্টিধারামুখর রাত্রিটি, সেই সব দিনের কথা আজও যেন মনে হয় কাল ঘটে গেল। কেন এমন অসারতা সংসারে, কেন এমন মিথ্যার উৎপাত! যা ভালো বলে মনে হয়, জীবন যাতে পরিপূর্ণ হোল মনে হয়—তা কেন দুদিনও টেকে না? অমৃত বলে যা মনে হয়, তা থেকে বিষ ওঠে কেন?…

এই ঘোর বিষাদের দুর্দিনে যতীন সবদিক থেকে সব আলো একেবারে হারিয়ে ফেললে। কালো কালিতে সব লেপে একাকার হয়ে গেল। কেবল পুষ্প তাকে কত করে বুঝিয়ে রাখতো।

যতীন বল্লে—জীবনে আর কি রইল আমার? ওর সঙ্গে দেখাটা করিয়ে দাও—

—তোমাকে ও দেখতে পাবে না।

—তবে তোকে দেখতে পেলে যে?

—সে রঘুনাথদাস ঠাকুরের মহিমায়। তুমি কষ্ট পাবে। বৌদির সে কষ্ট তুমি কি করে দেখবে?

তখনকার মত যতীন বুঝে গেল। পুষ্পও কিছু নিশ্চিন্ত হোল। একটা অন্য ঘটনাতেও যতীনের মন একটু অন্যদিকে চলে গেল। ওদের গ্রাম কুড়ুলে-বিনোদপুরের রায় সাহেব

ভরসারাম কুণ্ডুর বড় ছেলে রামলাল কুণ্ডুকে একদিন ও খুব বিষণ্ণ অবস্থায় দ্বিতীয় স্তরে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে দেখলে। একটা গাছের তলায় সে বসে আছে গালে হাত দিয়ে, যতীন দেখে ওকে চিনতে পেরে তখনই ওকে দেখা দেওয়ার দৃঢ় ইচ্ছা প্রকাশ করলে—নয়তো ওর দেহ রামলালের নিকট অদৃশ্যই থাকবে।

রামলাল ওকে দেখতে পেয়ে আশ্চর্য হয়ে হাঁ করে ওর দিকে চেয়ে রইল। বল্লে—যতীন না?

—হ্যাঁ। তুমি কবে এলে?

—আসা-আসি বুঝিনে, এ জিনিসটা কি বল তো? বাড়ী যাই, সবাইকে দেখি—বাবা, মা, বৌ—কেউ কথা বলে না। আমি মরে গিয়েচি বলে আমার নাম নিয়ে সবাই কাঁদচে!

—ঐ তো তুমি মরে এখানে এসেচ! এ জিনিসটাই মৃত্যু।

—আমারও সন্দেহ হয়েছিল, বুঝলে? কিন্তু ভাল বুঝতে পারিনি।

—কেন, তোমাকে কেউ নিয়ে আসেনি?

—আমার ঠাকুরদাদা এসেছিল, এখনও মাঝে মাঝে আসে। বড় বক্ বক্ করে, আমার পছন্দ হয় না।

রামলাল যতীনের বয়সী, বড়লোকের ছেলে। সুরা ও নারীর পেছনে গত দশ বছরে লাখখানেক টাকা উড়িয়ে দিয়েচে। অত বড় ব্যবসা ওদের, কখনো কিছু দেখতো না, বৃদ্ধ বাপ দোকান আগলে বসে থাকতো, রামলাল দোকান বা আড়তের ধারেও যেতো না। যতীন এসব জানে।

তারপর রামলাল হি-হি করে হেসে বল্লে—ঠাকুরদাদা কি করে জানো? রোজ দোকানে গিয়ে বাবার পাশে বসে থাকে, বেচাকেনা দেখে। বাবা হাত-বাক্সের সামনে যেখানে বসে না, ঠিক ওর পাশে রোজ ঠাকুরদা গিয়ে দুঘণ্টা তিনঘণ্টা করে বসে। মানে, ঠাকুরদাদার নিজের হাতে গড়া আড়তটা, ওর মায়া বড় বেশি।

—বলো কি! উনি তো মারা গিয়েচেন আজ কুড়ি বাইশ বছর। তখন আমি কলেজে পড়ি, বেশ মনে আছে। এখনও রোজ তোমাদের আড়তে গিয়ে বসেন?

রামলাল আবার হি-হি করে হাসতে লাগলো। বল্লে—আচ্ছা ভাই, সেকথা যাক্‌গে। এখানে কেমন করে মানুষ থাকে বলতে পারো? আজ কতদিন এসেচি ঠিক মনে নেই, তবে মাস দুইএর বেশি হবে না। একটা মেয়েমানুষের মুখ দেখতে পাইনি এর মধ্যে। এক ফোঁটা মাল পেটে যায়নি—ফুর্তি করবার কিছু নেই। ছ্যাঃ, নিরিমিষ জায়গা বাপু, যা বলো। মানুষ এখানে ট্যাঁকে?

পরে চোখ টিপে বল্লে—বলি, সন্ধানে-টন্ধানে আছে?

যতীন ওর পাশে বসলো। মনে মনে ভাবলে—A wasted life! আমার নষ্ট হচ্চে যেজন্যে, তা আমার নিজের দোষ নয়, কিন্তু এ নিজে জীবনটাকে বিলিয়ে দিয়ে এসেচে নিজের হাতে।

রামলাল বল্লে—আছ কোথায় ?

—এখানেই ।

—মাঝে মাঝে এসো। বড্ড একা পড়ে গিয়েচি। আচ্ছা, হরিমতিকে দেখতে পাও ? বুঝতে পেরেচ ? গাঙু গোসাঁই-এর মেয়ে হরিমতি। তাকে এসে পর্যন্ত খুঁজচি—এক সময়ে তার সঙ্গে ছিল কিনা !

যতীন একটু অবাক হয়ে গেল। গাঙু গোসাঁইএর যে মেয়ের কথা এ বলচে, তাকে নিষ্ঠাবতী বৈষ্ণবী হিসেবে সে জানতো। তবে সে যুবতী এবং সুন্দরী ছিল বটে। আশালতা যেবার বাপের বাড়ী চলে গেল, সেই বছর সে কি জানি কেন গলায় দড়ি দিয়ে মারা যায়। হরিমতির চরিত্র ভালো ছিল বলেই তার ধারণা আছে এ পর্যন্ত।

যতীন বল্লে—না, ওসব দেখিনি। তুমি এখন ওসব ছাড়। মরে চলে এসেচ পৃথিবী ছেড়ে। মদ মেয়েমানুষ এখানে কি কাজে লাগবে তোমার ? হরিমতিকে তা হোলে তুমিই নষ্ট করেছিলে, তোমারি জন্যে তাকে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে হয় ?

—না ভাই। তোমার পা ছুঁয়ে বলতে পারি। সে ভালো চরিত্রের মেয়ে গোড়া থেকেই ছিল না। অঘোর কুণ্ডুর সঙ্গে তার গোলমাল হয় তা আমি জানি। জানাজানি পাছে হয় তাতেই সে গলায় দড়ি দিয়ে মরে। আমায় অত খারাপ ভেবো না। ফুর্তিটুর্তি করতাম বটে, তা বলে—

—বেশ, তবে ও পথ একেবারে ছেড়ে দাও, নইলে যেমন কষ্ট পাচ্ছ এমনি কষ্ট পাবে।

যতীন সেইদিন থেকে প্রায়ই রামলালের স্তরে গিয়ে তাকে বোঝাতো। রামলাল বাড়ীঘর পায়নি, গাছতলাই তার আশ্রয়স্থান। যতীন তাকে উপরের স্বর্গের কথা বলতো, ভগবানের কথা বলতো—কিন্তু রামলাল নিম্নস্তরের আত্মা, অতি স্থূল আসক্তিতে ওর মন বাঁধা। সে সব ও কিছুই বোঝে না, ভালও লাগে না।

একদিন রামলালের ঠাকুরদাদা ৺কেবলরাম কুণ্ডুর সঙ্গে দেখা। কেবলরাম ঘুঘু ব্যবসাদার, সামান্য অবস্থা থেকে বিখ্যাত ধনী ও আড়তদার হয়েছিল। ওকে দেখে বল্লে—আরে, তুমি ভবতারণের ছেলে ! খুব মনে আছে তোমায়। আহা-হা, অল্প বয়সে তোমরা সব চলে এলে, বড্ড দুঃখের কথা। আমার নাতির দেখো না, ভরসারাম মরে গেলে অত বড় ব্যবসাটা গেল। কে দেখবে ? এই তো সন্দে পর্যন্ত আড়তে বসে ছিলাম। রোজ গিয়ে দেখি। বড্ড মায়া ঐ আড়তটার ওপর। ভরসারাম তো বাঁধা আসরে গাইলে। কষ্ট কাকে বলে তা তো জানলে না। এক লক্ষ আশি হাজার টাকা ক্যাশ রেখে আসি ব্যাঙ্কে, উইলে দুভাইকে সমান ভাগে ভাগ করে—

যতীন বল্লে—কুণ্ডু মশাই, এখন ওসব ছেড়ে দিন। আপনি আজ কুড়ি বছর এসেছেন, আজও দোকান আড়ত নিয়ে আছেন কেন ? আপনি না গলায় তুলসীর মালা দিতেন ? হরিনাম করতেন ?

—সে এখনও করি। তা বলে—

—আচার্য রঘুনাথদাসের নাম জানেন ?

কুণ্ডু মশাই দুহাত জোড় করে প্রণাম করে বল্লে—কে তাঁর নাম না জানে ? আমরা তাঁর দাসানুদাস—

—আপনি যদি আড়ত দোকানে যাওয়া ছেড়ে দিতে পারেন, তবে সেখানে নিয়ে যাবো। তাঁর কাছে।

কেবলরাম কথাটা বিশ্বাস করলে না। ভাবলে এ একটা কথার কথা বুঝি। উচ্চ স্বর্গের অনেক কথা যতীন সুতরাং ওকে বোঝাতে বসলো। পুষ্পের সঙ্গে একদিন দেখা করিয়ে দিলে। কেবলরাম হাত জোড় করে প্রণাম করে বল্লে—তুমি কে মা ?

পুষ্প হেসে বল্লে—তোমার নাতনী, দাদু—

কেবলরাম কেঁদে ফেললে। বল্লে—আমি পাপী, নরাধম। আমার সে ভাগ্যি কি আছে মা ?

—মা নয়, আমায় দিদি বলে ডাকো দাদু—পুষ্প আবদারের সুরে বল্লে।

কেবলরাম সেদিন থেকে পুষ্পের ক্রীতদাস হয়ে গেল। পুষ্প ম্যাজিক জানে নাকি ? যতীন এক এক সময়ে ভাবে। পুষ্প কেবলরামকে ভরসা দিলে, একদিন উচ্চ স্বর্গের বৈষ্ণব ভক্তদের লোকে ওকে নিয়ে যাবে। কেবলরাম মানুষটা সরল। বলে—দিদি, তুমিই তো দেবী, তুমি কম নও। ব্রাহ্মণের মেয়ে, তার ওপর আগুনের মতো আভা তোমার রূপের। আমি আর কোথাও যেতে চাইনে—তুমি দাদু বলে ডাকলে এই আমার স্বর্গ হয়ে গেল ! আমরা কীটস্য কীট।

আত্মা ওঠে ভালবাসায়। ভালবেসে, ভালবাসা পেয়ে। পুষ্প পিতামহের সমান বৃদ্ধ কেবলরামকে পৌত্রীর মত ভালবেসে ওকে তোলবার চেষ্টা করচে—যতীন বুঝতে পারলে। যতীনের শত লেকচারেও এ কাজ হোত না। যতীন ভাবে—নাঃ, এসব কাজ পুষ্প পারে। পতিত-উদ্ধার কাজ আমার নয়। আমার নিজের কুকুর পথ্যি করে কোথায় তার ঠিক নেই।

কিন্তু রামলালের সাহায্য পুষ্পকে দিয়ে হবে না। পুষ্প অতি সুন্দরী নারী। রামলালের আসক্তি এখনও নিম্নমুখী, মোহে পড়ে যাবে, রামলালের মন গড়ে উঠতে অনেক দেরি। অন্যভাবে ওকে সাহায্য করতে লাগলো যতীন।

রামলালের দেখা পেয়ে যতীনের খানিকটা ভাল লাগে। হাজার হোক দেশের লোক, সমবয়সীও বটে। দুটো পৃথিবীর কথাবার্তা বলা যায়। দেবদেবীদের মধ্যে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেচে। শুধু বড় বড় কথা আর কাঁহাতক শোনা যায়—পুষ্পের মুখেই, কি, বা অন্য যেখানে মাঝে দু-দশবার গিয়েচে, সেখানেই কি ! পুষ্প বোঝে সব, বুঝে দুঃখিত হয়। রামলালের সঙ্গে অত মেলামেশা সে পছন্দ করে না।

যতীন রামলালের কাছে এসে বলে—রামলাল-দা, কি তোমার ইচ্ছে করে ?

—একটা ইচ্ছে আছে, অন্য কিছু হোক না হোক, একটা সিগারেট যদি খেতে পারতাম, একেবারে কিছু নেই—ছ্যাঃ, এখানে মানুষ থাকে কি করে ?

—তোমার স্ত্রীকে তো রেখে এসেচ, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করে না ?

রামলাল ইতস্তত করে বল্লে—হ্যাঁ—তা—হ্যাঁ—সে তো প্রায়ই দেখচি।

—যাও সেখানে ?

—হ্যাঁ, তা—যাই। যাবে—চলো না গাঁয়ে একবার।

যতীন গেল কুড়ুলে-বিনোদপুরে। পুষ্পের বারণ আছে এসব জায়গায় আসবার। এলেই পার্থিব আসক্তি ও তৃষ্ণা আত্মাকে পুনরায় জড়িয়ে ধরে। রামলাল ওর নিজের বাড়ীর দিকে চলে গেল, যতীন নিজের বাড়ী এল ; ওর ছেলেমেয়ে আছে শ্বশুরবাড়ীতে, কিন্তু তাদের ওপর এতদিন যতীনের কোনো বিশেষ মায়া ছিল না, এখানে এসে তাদের জন্যেও মন কেমন করে উঠলো। ওদের বাড়ীটা একদম ভেঙেচুরে জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে এই সাত আট বছরে। ঐখানে ঐ ঘরে সে আর আশা থাকতো, আশার হাতের চুনের দাগ এখনও ইঁট-বের-করা দেওয়ালের গায়ে এক জায়গায়। ওখানে বসে আশা পান সাজতো, ষোল বছর আগের চুনের দাগ, কি তারও আগের হবে।

বিয়ের পরে প্রথমে আশা খুব পান খেতো এবং ওইখানটিতে বসে রোজ সকালে এক বাটা পান সাজতো সমস্ত দিনের মত। গুজব উঠলো এই সময়, পানে একরকম পোকা হয়েচে, অনেক লোক মারা যাচ্চে পোকা-ধরা পান খেয়ে, যতীন আর বাজার থেকে পান আনতো না পাঁচ ছ' মাস। আশা বলতো—তুমি না খাও, আমার জন্যে এনো, না হয় মরে যাবো পান খেয়ে, তোমার আবার বিয়ে বাকি থাকবে না। পান না খেয়ে থাকতে পারিনে—লক্ষ্মীটি—

কাল যেন ঘটে গিয়েচে সে সব দিন। আশা, আশালতা। স্বপ্ন· ···বহুদূর অতীতের স্বপ্ন আশালতা।

সন্ধ্যা হয়েচে। বোষ্টম বৌ ছাগল নিয়ে যাচ্ছে বাড়ীতে তাড়িয়ে—আহা, বুড়ো হয়ে পড়েচে বোষ্টম বৌ। তা তো হবেই, আট বছর হয়ে গেল। আচ্ছা তাকে যদি এখন দেখে বোষ্টম বৌ তো কি না জানি ভাবে!

হঠাৎ পেছন থেকে কে বলে উঠলো—তুমি কখন এলে গো?

যতীনের অন্তরাত্মা পর্যন্ত বিস্ময়ে শিউরে চমকে উঠলো সে পরিচিত কণ্ঠের ডাকে। সে পেছন ফিরে চাইলে, আশা দাঁড়িয়ে আছে ঠিক তার পেছনে। পরনে লালপাড় শাড়ী; ঠিক যেমনটি পরতো কুড়ুলে-বিনোদপুরের এ ঘরে ; বয়েস তেমনি, চোখে না বুঝতে পারার বিস্ময়ের মূঢ় দৃষ্টি।

—আশা! তুমি এখানে! কি করে এলে।

আশা অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে আছে। যেন এখনো ভাল করে বিশ্বাস করতে পারচে না।

যতীন ওর দিকে এগিয়ে গেল হাত বাড়িয়ে। বল্লে—আশা, চিনতে পারচো না আমায়?

আশা ওর মুখের দিকে তখনও চোখ রেখে বল্লে—খু-উ-ব।

—তুমি কোথা থেকে এলে ?

—কি জানি কোথা থেকে যে এলুম। আজকাল কেমন হয়েচে আমার, সবই যেন কি মনে হয়। কোন্‌টা সত্যি কোন্‌টা স্বপ্ন বুঝতে পারিনে। সব ওলট-পালট হয়ে গিয়েচে কেমনতর।

হ্যাগো, তুমি ঠিক তো ?…

পরে ব্যস্ত হয়ে বল্লে—দাঁড়াও, একটা প্রণাম করে নিই তোমায়—

প্রণাম করে উঠে বল্লে—কতকাল দেখিনি। ছিলে কোথায় ? সংসার যে ছারেখারে গেল, বাড়ী ঘরদোরের অবস্থা এ কি হয়েচে ! আমি এতকাল আসিনি। বাপের বাড়ী থেকে আমাকে আনলেও না। নিজেও ভবঘুরে হয়ে বেড়াচ্চ। ছেলেমেয়ে দুটোর কথাও তো ভাবতে হয়।

যতীন সস্নেহ কণ্ঠে বল্লে ঠিক, ঠিক। তুমি ভাল আছ আশা ?

—আমি ভাল নেই।

—কেন, কি হয়েচে ? আশা, আমায় খুলে বলো সব—

—মাথার মধ্যে সব গোলমাল। কিছু বুঝতে পারিনে। সব স্বপ্ন বলে মনে হয়। কত কি যে ঘটে গেল জীবনে, বুঝিনে কোন্‌টা স্বপ্ন কোন্‌টা সত্যি। এই তুমি দাঁড়িয়ে আছ সামনে, আমার যেন কেমন মনে হচ্চে। যেন মনে হচ্চে কে বলেছিল, তুমি—না ছিঃ, সে কথা বলতে নেই।

—আশা, আবার ঘর সংসার পাতাই এসো—

—পাততেই হবে। আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েচে—এক জায়গায় ছিলাম, মরুভূমি আর পাহাড়, লোক নেই জন নেই, কি ভয়ানক জায়গা। সেখানে যেন এক দেবীর সঙ্গে দেখা হোল, তাঁর কপাল দিয়ে আগুনের মত হল্‌কা বেরুচ্চে। কি তেজ ! বাবাঃ—কি রকম সব ব্যাপার। ও সব স্বপ্ন, কি বলো ?

—নিশ্চয়ই, আশা।

—তুমি এলে ভালই হোল। ঘরদোর ঝাঁটপাট দিই। উনুনগুলো ভেঙে জঙ্গল হয়ে গিয়েচে। চড়ুই পাখীর বাসা হয়েছে কড়িকাঠে। হাটবাজার করে এনে দাও। সেই মরুভূমির মত জায়গা থেকে কে যেন আমায় এখানে টেনে নিয়ে এল। থাকতে পারলাম না।

পরে কাছে এসে অপরাধীর স্বরে বল্লে—হ্যাগো, আমায় বাপের বাড়ীতে ফেলে রেখেছিলে কেন এতদিন ? রাগ করেছিলে বুঝি ?

যতীন স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইল, সে দৃষ্টিতে গভীর অনুকম্পা, অতলস্পর্শ অনুকম্পা—সর্ববাসনাশূন্য উদার ক্ষমা…কোনো কথা বল্লে না।

আশা মুগ্ধদৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে হাসি-হাসি মুখে বল্লে—বেশ চেহারা হয়েচে তোমার।

হঠাৎ আশা চীৎকার করে উঠলো—একি ! ওমা, একি হোল ! কোথায় গেলে গো ? এই যে ছিলে ? ওমা এ সব কি !

যতীন বুঝলে সে অদৃশ্য হয়ে গিয়েচে আশার কাছে। পৃথিবীতে কতক্ষণ সে থাকবে, পৃথিবীর আসক্তি ও চিন্তায় তার দেহ স্থূলস্তরের দর্শনযোগ্য হয়েছিল অল্প সময়ের জন্যে, ওর চিন্তার প্রবল আকর্ষণ নরক থেকে আশাকে এনেছিল এখানে। আশাও আর থাকতে পারবে না। এখুনি ওকে চলে যেতে হবে। উভয় স্তরে জীবের কোন যোগাযোগ নেই।

রামলাল পর্যন্ত এসে যতীনকে আর দেখতে পেলে না। যতীনের দেহ আবার তৃতীয়

স্তরের মত হয়ে গিয়েচে।

রামলাল বল্লে—কোথায় গেলে, যতীনদা ? থাকো থাকো, যাও কোথায় ? ও যতীনদা—

ততক্ষণে নরকের প্রবল আকর্ষণে আশাও তার নিজের স্তরে নীত হয়েচে।

যতীন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে। এ জগতের এই নিয়ম।

আশা সত্যিই বলেচে, কোন্‌টা স্বপ্ন কোন্‌টা আসল তা বোঝবার যো নেই।

সে কোন্ দেবতা, যাঁর শরণ সে নিতে চায়, এ স্বপ্নের শেষ করতে চায়। করুণাময় এমন কে মহাদেবতা আছেন, যাঁর কৃপাকটাক্ষে আশা তো আশা, কত মহাপাপী উদ্ধার হয়ে যায় চোখের এক পলকে, মহারুদ্রের জ্যোতিস্ত্রিশূলের এক চমকে অনন্ত ব্যোম ঝলমল করে ওঠে পুণ্যের আলোয়, পাপতাপ পুড়ে হয় ছারখার, অবাস্তব স্বপ্নের অবসানে। হে অনন্তশয়নশায়ী নিদ্রিত মহাদেবতা, জাগো, জাগো!

ওদের বাড়ীর পেছনের বাঁশবনে কর্কশ স্বরে পেঁচা ডাকচে। শীতকালে রাধালতায় থোকা থোকা ফুল ফুটেচে বেড়ার ঝোপজঙ্গলে। ঝিঁঝিঁ ডাকচে ডোবার ধারে। মনে হয় চাঁদ উঠচে পূর্বদিকের আকাশে। আকাশে নক্ষত্রদল পাৎলা হয়ে এসেচে। বোধহয় পৃথিবীর কৃষ্ণা প্রতিপদ কিংবা দ্বিতীয়া তিথি।

পুষ্প করুণাদেবীর দেখা পায়নি বহুদিন।

তিনি নানা ধরনের কাজে সর্বদা ব্যস্ত থাকেন, পুষ্প সেজন্যে তাঁকে তেমন ডাকে না। আজ অনেক দিন পরে পুষ্পের মনে হোল করুণাদেবীর একবার খোঁজ করা দরকার। সে ওঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যে উচ্চ স্বর্গে উঠে গেল, তাঁর সেই ক্ষুদ্র গ্রহটিতে, সেই কুসুমিত উপবনে। যখনই সে এখানে আসে তখন কি এক বিস্ময়কর আবির্ভাবের আশায় সর্বদা সে থাকে, কি সৌন্দর্য ও শান্তির লীলাভূমি এই পবিত্র দেবায়তন। সুগন্ধ কিসের সে জানে না, কোন্ ফুলের সে সুগন্ধ তাও জানে না—কিন্তু অন্তরাত্মা তৃপ্ত হয়, সারা মন খুশি হয়ে ওঠে হঠাৎ।

মহারূপসী দেবী ওকে হাসিমুখে হাত ধরে একটি বিশাল বনস্পতিতলে স্ফটিকবেদীতে নিয়ে গিয়ে বসালেন। পুষ্প চেয়ে চেয়ে অবাক হয়ে ভাবলে—এ গাছ তো এত বড় দেখিনি, এত বড় গাছই তো ছিল না।

করুণাদেবী মৃদু হেসে বল্লেন—কি ভাবচ, গাছটার কথা ? ও তৈরি করেচি। বনস্পতিতে ভগবানের প্রত্যক্ষ আবির্ভাব। তাই দেখি সারা সময় চোখের সামনে।

—কি গাছ ?

—পৃথিবীতে ছিল না কোনোদিন, নাম নেই।

—আমি আপনার কাছে কোনো অপরাধ করেছিলাম কি ? দেখা দেননি কতদিন। আমার কষ্ট তো জানেন সব। আপনি একবার চলুন, যতীনদা বড় কাতর হয়ে পড়েচে, আশা-বৌদি নরকে। আত্মহত্যা করেছিল।

করুণাদেবী অদ্ভুত ধরনের হাসি হাসলেন। বল্লেন—সব জানি। আমার পৃথিবীর ছেলে-

মেয়েদের সন্ধান রাখিনে আমি! আমিই যতীনের ব্যাকুলতা দেখে তার সঙ্গে ওর স্ত্রীর দেখা করিয়ে দিই। নইলে নরক থেকে পৃথিবীতে গিয়ে দেখতে পেতো না যতীনকে। এই দেখাতে আশার উপকার হবে—

—যতীনদা সেই থেকে কিন্তু পাগলের মত হয়েচে—

—যতীন অজ্ঞান।

—আপনি ভাল বোঝেন সব, দেবী। আপনি যতীনদা'কে সুখী করুন। ওর কষ্ট দেখতে পারিনে। আশা-বৌদির ভাল হয় কিসে?

করুণাদেবী ওকে কাছে টেনে নিয়ে ছোট্ট মেয়েটির মত ওর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে ওর গালে হাত বুলিয়ে অতি ধীর শান্ত সুরে বলতে লাগলেন—পুষ্প, তোকে ভালবাসি বড়। মনে আছে সব। ভাল হবে শেষে, কিন্তু—লক্ষ্মী পুষ্প—

—কি দেবী?

করুণাদেবীর চোখে জল! পুষ্প অবাক হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে কেমন মায়া হোল এই রাজ-রাজেশ্বরীর মত রূপবতী মহাশক্তিধারিণী দেবীর ওপর, কোলে শায়িতা ছোট্ট খুকী যেন, তার মেয়েটির মত। ভগবান এমন ভাবেই বোধ হয় মানুষের কাছে ধরা দেন ঐশ্বর্য লুকিয়ে। সে নিজের অজ্ঞাতসারে অসীম স্নেহে করুণাদেবীর চোখের জল মুছিয়ে দিলে নিজের বস্ত্রাঞ্চলে।

দেবী বল্লেন—তোকে বড় দুঃখ পেতে হবে—

পুষ্পের বুকের মধ্যে দুরু দুরু করে উঠলো। কেন, কিসের দুঃখ? কি কথা বলতে চাইচেন দেবী?

দেবী আবার বল্লেন—যতীন ও তোমাকে এক জায়গায় যেতে হবে আমার সঙ্গে। তার দরকার আছে। তুই চলে যা পুষ্প, আমি যাবো তোরই বাড়ীতে একটু পরে। তারপর আমার সঙ্গে তোদের পৃথিবীতে একবার যেতে হবে।

—দেবী, গ্রহদেবের দেখা পাবো?

—সময়ে পাবে পুষ্প। তিনি কিছু পূর্বে এখানে ছিলেন।

উচ্চ স্বর্গে দেবলোকের প্রেমিক-প্রেমিকা। পুষ্প যতই এঁদের দুজনকে দেখে, ততই আনন্দে ও শান্তিতে মন পূর্ণ হয়ে ওঠে।

পুষ্প ও যতীনকে সঙ্গে নিয়ে করুণাদেবী একটি পুরাতন শহরে এলেন।

বাড়ীঘর সব পুরোনো ধরনের, পাশ দিয়ে একটি নদী বয়ে চলেচে, রাস্তাঘাট সেকালের ধরনের সরু সরু। একটা পুরানো বাড়ী গলির মধ্যে, সেই বাড়ীর পাশে ছোট্ট একটা বাগান। বেলা গিয়েচে, সন্ধ্যার কিছু আগে। বাড়ীটার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে পুষ্প ও যতীন দুজনেরই মনে হোল, এখানে ওরা যেন এর আগে এসেচে। যেন কতকাল আগে, ঠিক মনে করতে পারচে না।

হঠাৎ যতীন বল্লে—এটা কোন্ জায়গা দেবী, আমি এ বাড়ী চিনি বলে মনে হচ্চে—

তার মন আজ আনন্দে পূর্ণ, কারণ বহুদিন পরে আজ সে করুণাদেবীর দেখা পেয়েচে। এ

যে কত সৌভাগ্যের কথা, এতদিন এখানে থেকে সে ভাল বুঝেচে।

দেবী বল্লেন—বেশ, বাড়ীর ভেতর যাও—

যতীনের মনে হোল এ বাড়ীর ভেতরের উঠোনে একটা পেয়ারার গাছ আছে, সে কতকাল আগে সেই গাছ থেকে পেয়ারা পেড়ে খেতো। বাড়ীর মধ্যে ঢুকতেই একটি ছোট ঘর। একটা কুলুঙ্গির দিকে চাইতেই যেন বহু পুরোনো দিনের সৌরভের মত কোথাকার কত হারানো দিনের বহু অস্পষ্ট স্মৃতির সৌরভ এল কুলুঙ্গিটা থেকে। এক সুন্দরী নববধূর মুখ যেন মনে পড়ে, ঐ কুলুঙ্গিতে সে তার মাথার কাঁটা রাখতো শোবার আগে, এই ঘরের সঙ্গে যেন এক সময়ে কত সম্পর্ক ছিল ওর। বাড়ীটাতে অনেক ছেলেমেয়ে চলাফেরা করচে, দুটি মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক রান্নাঘরে কাজকর্ম করচে। ঐ তো সেই পেয়ারা গাছটা। ওর তলায় বসে সে কত খেলা করেচে একটি মেয়ের সঙ্গে—মেয়েটিকে সে বড় ভালবাসতো। আজও যেন তার মুখ মনে পড়ে—কোথায় যেন চলে গিয়েছিল মেয়েটি।

পুষ্প ওর পেছনে পেছনে এসে বাড়ীর মধ্যে ঢুকচে। সে বল্লে—যতীনদা, ওই সেই পেয়ারা গাছ—

—কোন্ পেয়ারা গাছ—

—মনে পড়চে ওর তলায় তুমি আর আমি খেলা করতাম, অনেক কাল আগে—স্পষ্ট মনে হচ্চে—

—তুই তবে সেই মেয়ে পুষ্প—আমারও সব মনে পড়েচে। তুই মরে গিয়েছিলি আমার আগে। সে সব দিনের দুঃখুও যেন মনে আসচে।

—তুমি মারা গিয়েছিলে যতীনদা। আমায় ওই বলে গালাগালি দিও না, বালাই ষাট, আমি মরবো কেন?

—দেবী সঙ্গে নেই তাই তোর বাড় হয়েচে, তুই যা তা বলচিস আমায় পুষ্প! আচ্ছা, বল্ তো, এক জায়গায় এ বাড়ীতে এক বুড়ো লোক বসে থাকতো, তার কি যেন হয়েছিল, বসেই থাকতো। মনে পড়চে তোর?

—মনে হয়েচে, দেওয়ালের গায়ে বালিশ ঠেস্ দিয়ে।

যতীনের মনে হচ্ছিল যেন সে একটি সুপরিচিত স্থানে বহু, বহু কাল পরে আবার এল। এ বাড়ীর সব ঘরদোর সে চেনে, অনেক কাল আগে এ বাড়ীতে সে বেড়িয়েচে প্রত্যেক ঘরদোরে। বহু প্রিয়জনের দূরাগত স্মৃতি যেন একটি গুরুভার বেদনার মত বুকে চেপে বসেচে।

বাড়ীর ছেলেমেয়েরা রান্নাঘরে খেতে বসেচে। খুব গোলমাল করচে নিজেদের মধ্যে। ওদের প্রতি এমন একটি স্নেহ হয়েচে যতীনের, ওরা অতি আপনার জন, কতদিনের সম্বন্ধ এদের সঙ্গে। যতীন দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো। ছেলেমেয়েদের খাওয়া হয়ে গেল, ওদের মা এবার হাতায় করে দুধ পাতে পাতে দিচ্চে। অনেক পুরোনো হয়ে গিয়েচে বাড়ীটা, তার জানা বাড়ী এর চেয়ে ভাল, নতুন ছিল। সে সব বুঝতে পেরেচে, করুণাদেবী তাদের কেন এখানে এনেচেন।

পুষ্প বল্লে—যতুদা, আমাদের পূর্বজন্মের দেশ। কোন্ গ্রাম এটা বলতে পারো? তুমি আমি

এখানে জন্মেছিলাম।

—তুই মরে গিয়েছিলি আমার আগে—রাগ করিস্‌নি বলচি বলে।

—আমার মনে পড়েচে।

—গত জন্মেও তাই। এই রকমই হচ্চে জন্মে জন্মে। তুই মারা যাচ্চিস, আমি তোর পেছনে যাচ্চি। কিন্তু আর একটি মেয়ের কথা বড় মনে পড়চে। তাতে আমাতে কিছুদিন এখানে ছিলাম। তারপর সেও কোথায় গেল চলে।

ওরা বাইরে এল। করুণাদেবী বল্লেন—মনে পড়লো?

কিন্তু এ যে অদ্ভুত মনে পড়া। কত নিবিড় বর্ষারাতের টিপ টিপ জলপতনের সঙ্গে, কত বসন্তের প্রথম রোদে পোড়া মাটির গন্ধের সঙ্গে জীবনের মস্ত বড় যাত্রাপথ একসুরে বাঁধা, আনন্দের নিবিড় স্মৃতি সেখানে বেদনার সঙ্গে এক হয়ে গিয়েচে—গভীর বেদনা, যা শুধু জন্ম-জন্মান্তরের হারানো প্রিয়জনের বার্তা বহন করে আনে অন্তরতম অন্তরে। মনে হয়, সবই কি তবে মিথ্যে, সবই স্বপ্ন?

যতীনের দিশেহারা বিষণ্ণ দৃষ্টিতে ওর মনের কথা পরিস্ফুট হোল। করুণাদেবী বল্লেন ওই জন্যে তোমাদের এনেচি। এখানে তোমাদের ঠিক এবারকার জন্মের আগের জন্মভূমি।

পুষ্প বল্লে—এ কোন্ গ্রাম দেবী? নাম মনে নেই।

—ত্রিবেণী। গঙ্গার তীরে। ঐ গঙ্গা—

—তা হোলে গত দুই জন্মে আমরা কাছাকাছিই ছিলাম, গঙ্গারই ধারে। এবার তো হালিসহরের এ পার সাগঞ্জ-কেওটায়।

—স্থানের আকর্ষণ অনেক সময় এমন হয় যে গত জন্মের ভূমিতে কোনো না কোনো সময় আসতেই হবে। তবে জন্মান্তরীণ স্মৃতি সব আত্মার থাকে না পৃথিবীর স্থূল দেহে। কখনো কেউ জাতিস্মর হয়। জাতিস্মর হওয়া উচ্চ অবস্থার লক্ষণ।

যতীন এতক্ষণ চুপ করে ছিল। তার মন ভাল নেই। জগৎ ও জীবন দেখচি সব ভেল্‌কির মত। কোন্‌টা সত্যি? কোন্‌টা মিথ্যে? বাজে জিনিস সব। বাঁচা মরা কিছুরই মধ্যে কিছু নেই। কেন এ বিড়ম্বনা?

সে জিজ্ঞেস করলে—দেবী, এরা আমার কে? এখন যারা আছে?

—তোমার পৌত্রের পৌত্র।

—আর পুষ্পের?

—পুষ্প অবিবাহিত অবস্থায় মারা যায়। আশা এ বাড়ীতে তোমার প্রথমা স্ত্রী ছিল। সে অল্পবয়সে তোমায় ছেড়ে চলে যায় এবারের মত। আমিই তোমাদের মিলিয়ে দিয়েছিলুম তিনজনকে আবার এ জন্মে। কিন্তু কর্মের ফল আমি খণ্ডন করতে পারিনি তোমাদের—চেষ্টা করলাম, কিন্তু কর্মশক্তি নিজের পথ ধরল ঠিক।

যতীন হতাশ সুরে বল্লে—আপনি যখন পারলেন না, তখন আর কি উপায় দেবী। আপনি স্বয়ং যখন—

করুণাদেবী বল্লেন—কর্মের বন্ধন স্বয়ং ভগবান কাটতে পারেন চোখের পলকে। তিনি ছাড়া আর কে পারে।

—আমি কি করেছিলাম দেবী, কেন আমার এ দুর্ভাগ্য দুই জন্ম ধরে?

—এরও আগের জন্ম দেখবে? কিন্তু ছবি দেখাবো। সামনের আকাশে চাও—সে স্থান এখন আর নেই, প্রাচীন গৌড়ের নিকটবর্তী ক্ষুদ্র গ্রাম। সে জন্মে প্রথমা স্ত্রীর মনে কষ্ট দিয়ে দুবার বিবাহ করেছিলে। সে তোমায় বড় ভালবাসতো। সেজন্যে তাকে আর আপনার করে পেলে না পর পর দু'জন্মেও। সতীলক্ষ্মীর মনে বড় কষ্ট দিয়ে ত্যাগ করেছিলে।

—সেও কি আশা?

—না।

—তবে সে কে দেবী? বলুন দয়া করে—সে কি অন্যত্র চলে গিয়েচে?

—সে এই তোমার পাশেই দাঁড়িয়ে। সতীলক্ষ্মী তোমায় ছাড়েনি, কিন্তু তোমার কর্মফলে তুমি ওকে পাচ্ছ না। আমি পর পর দু'জন্ম চেষ্টা করচি, কিন্তু পেরে উঠচি কই!

পুষ্প অবাক হয়ে দেবীর মুখের দিকে চেয়ে রইল। এ সব কথা তার মনে নেই।

করুণাদেবী বল্লেন—তারও পূর্ব জন্মে তোমার কর্ম আরও খারাপ। যাক্ এ সব কথা। তোমাকে তিন জন্মের কথা জানতেই হবে, এর কারণ আছে। পুষ্প, তুই কষ্ট পাবি আমি জানি। আমি চেষ্টা করবো সে দুঃখ দূর করতে। যতীনকে ওর পূর্বজন্ম দেখালাম, কারণ ওর আত্মার প্রয়োজন হয়েচে।

পুষ্প বিবর্ণ মুখে বল্লে—কেন দেবী?

করুণাদেবী ওর দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে চেয়ে বল্লেন—যতীনকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হবে।

পুষ্প জানে। সে জানে তার প্রশ্ন নিরর্থক। সে অনেকদিন থেকে বুঝতে পেরেচে। এই ভয়ই তার মন করছিল।

যতীন চমকে উঠলো। এত অল্পদিনে আবার পুনর্জন্ম কেন? কোথায় রইল আশা, কোথায় রইল পুষ্প—কার কাছে যাবে সে পৃথিবীতে?

তখনি তার মন বলে উঠলো—কেন, মায়ের কাছে। যার কোল আঁধার করে সে চলে এসেচে।

করুণাদেবী বল্লেন—যতীন, তোমার অন্তরাত্মা চাইচে ঐ দুঃখিনী মায়ের কোলে আবার ফিরে যেতে। তোমার মায়ের অন্তরাত্মা কাঁদচে তোমার জন্যে। সেখানে যেতে হবে তোমাকে। এ বাঁধন এড়াবার যো নেই। মাতৃশক্তি জগতের মধ্যে খুব বড়। তা ছাড়া আশার জন্যে তোমাকে যেতে হবে ভূলোকে। ভুবর্লোকের কোনো উচ্চ স্তরে ও যেতে পারবে না—বেচারী! গ্রহদেবকে আমি বলেচি, আশার অন্তরাত্মা কাঁদচে, অনুতাপে সব পাপ মোচন হয়। আশাকেও আবার পৃথিবীতে পাঠাবো—তুমি জন্মগ্রহণের কিছু পরে। এই পাঁচ ছ' বছর ওকে নরকেই থাকতে হবে। তার আত্মা তাতে উন্নতি করবে। নিজের ভুল ক্রমশ বুঝবে। এই জন্মে আমি আবার তোমাদের মিলিয়ে দেবো। বোধ হয় তোমাদের প্রারব্ধ ও জন্মে কেটে যাবে।

পুষ্প পাষাণমূর্তির মত দাঁড়িয়ে সব শুনলে। আকাশ পৃথিবী তার কাছে অন্ধকার হয়ে গিয়েচে ততক্ষণে। জন্ম-জন্মান্তর যে জীবনের মাস, ঋতু ও বৎসর মাত্র, তাও যে শূন্য, অন্ধকার। ভূমা নয়, অল্পেই তার সুখ ছিল।

করুণাদেবী সব জানেন। পুষ্পকে তিনি বুঝিয়ে বল্লেন। আশার জন্যও স্বার্থত্যাগ তাকে করতে হবে, যতীনের জন্যেও। এই জন্যে আশার সব ভুল মুছে দেওয়ার চেষ্টা তিনি করবেন। আচার্য রঘুনাথদাস আশার আত্মার জন্যে তাঁর ইষ্টদেবকে জানিয়েছিলেন।

ভক্তের ক্ষমতা বড় তুচ্ছ নয়। গ্রহদেবের আসন টলেচে।

পুষ্প বল্লে—বুঝেচি। তিনি মহাপুরুষ, সেদিন যখন নরকে নিয়ে গেলেন আমায়, তখনই আমার মনে হোল নরক পবিত্র হোল। আপনারও আসন টললো—আমি ডাকলে আপনি ছাই আসেন।

করুণাদেবী বালিকার মত সকৌতুকে খিল্ খিল্ করে হাসলেন। বল্লেন—তুই আমার ওপর রাগ করলি বুঝি? ছিঃ—লক্ষ্মী দিদি—

পুষ্পের অভিমান তখনও যায়নি। সে দুষ্টু মেয়ের মত ঘাড় বেঁকিয়ে চুপ করে রইল।

দেবী বল্লেন—তোকে আমার কাছে নিয়ে যাবো পুষ্প—

—না। আমাকেও পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিন না, দিন না দয়া করে। সত্যি বলচি। স্বর্গে আমার দরকার নেই।

—পৃথিবীতে পাঠিয়ে কি হবে? এবার যে চেষ্টা করবো ওদের দুজনকে মিলিয়ে দিতে। পৃথিবীর মিলন না হোলে আশার প্রারব্ধ কিছুতেই কাটবে না। এ আত্মত্যাগ তুই করতে পারবি আমি জানি। ওরা জন্ম নিলেই তো সব ভুলে যাবে, কোনো কথা মনে থাকবে না এ জন্মের। আমি আবার দেখা করিয়ে দিই, যে যাকে চায় মিলিয়ে দিই। নতুবা জীবের কি সাধ্য?

পুষ্প বল্লে—আমাকেও পাঠিয়ে দিন, সব ভুলে থাকি।

করুণাদেবী ওকে কাছে নিয়ে এলেন আদর করে। পুষ্পের দেহ শিউরে উঠলো, কি অপূর্ব সুগন্ধ দেবীর সারাদেহে, কি অপূর্ব স্পর্শসুখ! সে মেয়েমানুষ, তবুও এই রূপসী দেবীর স্নিগ্ধস্পর্শে ওর সারাদেহে যেন তড়িৎসঞ্চার হোল। অমৃতস্পর্শে আত্মা যেন নিজের অমরত্ব, অনন্তত্ব অনুভব করলে এক মুহূর্তে।

সস্নেহে বল্লেন—পুষ্প, তোকে পৃথিবীতে আর জন্ম নিতে হবে না। শুক্লা গতির পথে তোর অনাবৃত্তি লাভ ঘটেচে। ওরা এখনও অপরিণত, শেখবার বাকি আছে, কর্ম এবার নষ্ট হয়ে যাবে হয়তো। পৃথিবীর জীবন বেশিদিনের নয়। আত্মার পক্ষে চোখের পলক মাত্র। আমি এবার যাই পুষ্প।

পুষ্প বল্লে—আমায় পৌঁছে দিয়ে যান—

—নিশ্চয়, চল যাই।

যাবার সময় করুণাদেবী বলে গেলেন, তাঁকে স্মরণ করলেই তিনি আসবেন।

যতীন একা বসে ছিল বাড়ীতে। পৃথিবীতে আবার জন্ম নিতে হবে। শত সুখদুঃখের বন্ধনে আবার জড়ানো, মন্দ কি? সেই গরীব ঘরের বৌটির কোল আলো করে আবার শিশু হয়ে কত বাল্যলীলা করবে, নতুন আস্বাদ, আবার আসবে আশা--হতভাগিনী আশা—নববধূরূপে তার ঘরে, আবার কত বর্ষারাত্রি, কত বসন্তপ্রভাত ওর সাহচর্যে কাটবে। পৃথিবীতে যেতে তার কষ্ট নেই, মধুর সেখানকার শৈশব, মধুর কৈশোর, মধুর যৌবন। চিরযৌবনের হাওয়া যেন বয় তার অমর আত্মায়, পৃথিবীতে মাস যাবে মাস আসবে, নতুন ধানের গন্ধ বেরুবে ক্ষেতে ক্ষেতে, ক্ষুধায় বনের মেটে আলু তুলে নুন দিয়ে পুড়িয়ে খাবে, তার মা যখন বৃদ্ধা হয়ে যাবে তাকে খাওয়াবে, আশা সংসার পাতবে নতুন লক্ষীর হাঁড়িতে ধান দিয়ে।……

কেবল কষ্ট হয় পুষ্পের জন্যে। এতদিন ওর সঙ্গে থেকে কি মায়াই হয়েচে ওর ওপরে। কেন এমন বিচ্ছেদ? কি কষ্ট পাবে পুষ্প, তা সে জানে। আশা যদি কষ্ট না পেতো, যতীন কিছুতেই যেতো না।

পুষ্প এসে ওর হাত ধরে বল্লে—যতীনদা!

--কি পুষ্প?

—আমায় ভুলো না।

—আচ্ছা, পুষ্প—তুই বলতে পারিস, কেন আমাদের জীবনে এ দুর্ভাগ্য, কেন বার বার তোকে হারাচ্ছি? তোর বৌদিদিকে হারাচ্ছি?

—আমায় নিয়ে যাও সঙ্গে—

—ছিঃ, পুষ্প। দেবী যা বলেন তাই তোমার আমার পক্ষে শুভ। ওঁর কথা শোনো।

—আমি কারো কথা শুনবো না, আমি যাবো।

—কি, এবারও একসঙ্গে খেলা করবি পুষ্প? তেমনিধারা সাগঞ্জ-কেওটার ঘাটে? বেশ—অদ্ভুত সে সব দিন।

যতীন চোখ বুজে ভাবতে লাগলো। পুষ্প ওর হাত ধরে বসে রইল, বল্লে—তাই তো সাগঞ্জ-কেওটার বুড়োশিবতলার ঘাট এ লোকেও ভুলতে পারিনি। জন্মান্তরের স্মৃতিতেও অক্ষয় যেন হয়। তোমার যাওয়ার পথে দেবতারা ফুল ফেলুন যতুদা—আমি হতভাগিনী চিরকাল একাই থাকবো। এই আমার ভাগ্য।

যতীন ওর মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—আমার মুক্তিতে দরকার নেই, কোনো কিছুর দরকার নেই। সমাধি-টমাধি, দেবী-টেবী সব বাজে। তোকে ছেড়ে যাবো না।

—আশা?

—তার অদৃষ্টে যা হয় হবে পুষ্প।

—ঠিক কথা যতুদা?

—প্রাণের সত্য কথা বল্লাম। এখন আমার অন্তর যা বলচে। সব তুচ্ছ হয়ে গিয়েচে আমার কাছে—তুই থাক্ পুষ্প আমার!

—জগতের, বিশ্বের বহুদূর সীমানায় চলে যাও যতুদা, তোমায় মুক্তি দিলাম। ভালবেসো,

ভুলো না।

—ওসব থিয়েটারী ধরনের কথা কোথায় শিখলি রে? তোদের দোহাই, মুক্তি-টুক্তির কথা আমায় শোনাস্‌নে। চল্‌ তুই আর আমি পৃথিবীতে যাই, ছোট্ট নদীর ধারে কুঁড়েঘরে সংসার পাতবো। সেই আমাদের স্বর্গ, সেই আমাদের সব।

পুষ্পের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো ঝরঝর করে। সে কোনো কথা বল্লে না।

সেদিনই যতীনের মনে হোল কে যেন কোথায় তাকে ডাকচে···সব সময় তার প্রাণের মধ্যে কিসে যেন মোচড় দিচ্চে···আশা, অভাগিনী আশা, ভুবর্লোকের নীচের স্তরে অসহায়া, একাকিনী পড়ে আছে, কেউ নেই তাকে দেখবার।

সত্যি আশা তাকে ডাকচে। তার অন্তরাত্মা শুনতে পেয়েচে অভাগিনীর ডাক।

সে পুষ্পকে কথাটা বল্লে। —তোর বৌদিদি বড্ড কাঁদচে পুষ্প। সেদিন কুড়ুলে-বিনোদপুরের বাড়ীতে হঠাৎ দেখা হওয়ার পর থেকে ওর ডাক প্রায়ই শুনি।

—আমি যাই সেখানে যতুদা, তুমি যেও না। দেখে আসি।

—কিছু ভাল লাগে না ওর জন্যে।

—কেন তোমাকে যেতে বারণ করি, ও সব নীচের স্তরে তোমায় যেতে দিতে আমার মন সরে না।

—তুই তো যাস্‌ দিব্যি।

—আমি গিয়েছিলাম আচার্য রঘুনাথের কৃপায়। মহাপুরুষদের বিশেষ দয়ায় বিশেষ শক্তি হয়। নয় তো ওই সব স্তরে নানান রকমের নিম্নশ্রেণীর শক্তি খেলা করচে সর্বদা, মহাপুরুষদের কৃপায় বিশেষ শক্তি লাভ করে সেখানে গেলে ওই সব দুষ্ট শক্তি কোনো অনিষ্ট করতে পারে না। নয়তো বিপদ পদে পদে—এই জন্যেই তোমাকে ওখানে যেতে দিতে চাইনে যতুদা। চলো দেখি কি উপায় হয়।

রঘুনাথদাসের আশ্রমে যাবার পথে কবি ক্ষেমদাসের সঙ্গে দেখা। তিনি আপন মনে একটি বৃক্ষতলায় চুপ করে বসে; অতি সুন্দর নির্জন স্থানটি, বনপুষ্প ফুটে আছে ঝর্ণার ধারে। ওরা কাছে গিয়ে দেখলে পৃথিবীর দিকে তিনি একদৃষ্টে চেয়ে কি যেন দেখছেন। ওদের দেখে সস্মিত মুখে সম্ভাষণ করলেন। যতীন ও পুষ্প দুজনেই ওঁকে প্রণাম করে পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

ক্ষেমদাস বল্লেন—কোথায় যাচ্চ তোমরা?

পুষ্প বল্লে—রঘুনাথদাসের আশ্রমে। বড় বিপদে পড়ে যাচ্ছি। আপনিও শুনুন দেব—যদি কিছু উপায় হয়। তারপর সে আশার কাহিনী সব খুলে বল্লে।

ক্ষেমদাস সব শুনে ধীরভাবে বল্লেন—এই দুঃখ সনাতন। আত্মা নিরন্তর সাধনা করচে নিজেকে জানবার। আমার নিজের জীবনেও এমনি হয়েছিল। আমি তাই এখানে বসে বসে ভাবছিলাম, আবার পৃথিবীতে পূর্ণিমার জ্যোৎস্না উঠচে যেমন উঠতো পাঁচশো বছর আগে, অনাদ্যন্ত মহাকাল নিজের কাজ করে চলেচে যেমন করতো হাজার বছর কি দু-হাজার বছর

আগে—আমি পৃথিবীতে একটি মেয়েকে কত ভালবাসতাম, আমাদের গ্রামের সদানন্দী মঠের ফুলবাগানে কত বেড়াতাম দুজনে এমনি জ্যোৎস্নারাত্রে—লুকিয়ে লুকিয়ে,—এখন সে কোথায় ?

অনেকটা অন্যমনস্ক ভাবেই কবি মাথা দুলিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লেন—সত্যি তাই ভাবি, কোথায় সে ?

পুষ্প অবাক হয়ে বল্লে—কেন, আপনি তাঁর দেখা পাননি আর ?

—না। এ বিশ্বের ভিড়ে কোথায় হারিয়ে গেল। দ্যাখো, আমরা কবি, জগতে রূপরসের উপাসক। এ'কেই বড় করেচি জীবনে। যাঁরা বলেন সব মায়া, তাঁদের কথা বুঝি না। মায়া লয় হোলে এই রূপরসের জগৎটাও লয় হয়। তা আমরা চাইনে—তাই দুঃখ পাই, কিন্তু দুঃখের মধ্যেও জানি ভগবানই সৃষ্টি করেচেন এই জগৎ। সবই তিনি। কষ্ট পেলেও জানি তাঁর হাতে কষ্ট পাচ্ছি। প্রেমময়ের তাড়নায় কষ্ট কি ? সব মুখ বুজে সহ্য করি। এটাও মানি, এই রূপরসের সাধনার মধ্যেই আমাদের সিদ্ধি। এ পথেও তাঁকে পাওয়া যায়। চলো, নরকে আমি নিজে যাবো, খুঁজে বার করি তোমাদের সেই মেয়েটিকে। তার দুঃখ আমি কবি আমি বুঝি—

যতীন বল্লে—প্রভু, আমার পুনর্জন্ম ঠিক হয়ে গিয়েচে সেই মেয়েটিকে নিয়ে। করুণাদেবী জানিয়েচেন—

ক্ষেমদাস বল্লেন—তিনি যা করেচেন, তোমাদের মঙ্গলের জন্যেই। তিনি পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী মহাদেবী—তাঁকে তোমরা করুণাদেবী বল, সীতা বল, দুর্গা বল, লক্ষ্মী বল, সরস্বতী বল—সবই এক। তবে এখন মেয়েটির কাছে যাবার কোনো প্রয়োজন নেই। উপায় হয়ে গিয়েচে।

যতীন আশ্চর্য হয়ে গেল শুনে। অত বড় বড় পৌরাণিক দেবীর সঙ্গে সে করুণাদেবীকে এক আসনে বসায়নি। উনি যদি দুর্গা হন, কালী হন, সীতা হন, লক্ষ্মী হন—তবে তার আর জন্মমরণের ভয় কিসের ? আশারই বা ভয় কিসের ? হাসিমুখে সে মহাগৌরবে নরকে যেতেও প্রস্তুত।

ক্ষেমদাস ওর মনের ভাব বুঝে বল্লেন—জন্ম নিতে দুঃখ কিসের ? পৃথিবীর রূপরস আবার আস্বাদ করে এসো। সেই জ্যোৎস্না, সেই বনবিতান, কোকিলের কুহুতান, সেই মায়ের কোলে যাপিত একান্তনির্ভরতার শৈশব, প্রথম যৌবনে প্রিয়ার প্রথম দর্শন—যাও যাও, ওরই মধ্যে ভগবানে মন রেখো—কর্ম যতদিন না কাটে।

> কিয়ে মানুষ জনমিয়ে পশুপাখী অথবা কীটপতঙ্গে
> করমবিপাকে গতাগতি পুন-পুন মতি রহুঁ তুয়া পরসঙ্গে।

মেয়েটির কাছে যাবার কোনো দরকার নেই। দেবী যখন তার ব্যবস্থা করেচেন, তখন আমাদের সেখানে যাওয়া ধৃষ্টতা হবে। দেবী সর্বমঙ্গলা তাকে শ্রেয়ের পথে চালিত করবেন।

ঠিক সেই সময় একজন জ্যোতির্ময় মহাপুরুষের আবির্ভাব হোল বৃক্ষতলে। যতীন তাঁর দিকে চেয়েই চমকে উঠলো, ইনি সেই সন্ন্যাসী, যিনি একদিন স্পর্শদ্বারা তার মধ্যে সবিকল্প সমাধির অভিজ্ঞতা সঞ্চার করেছিলেন! সেই যোগী পুরুষই—নীল বিদ্যুতের মত আভা বেরুচ্ছে, সারাদেহ থেকে ওঁর।

যতীনের দিকে চেয়ে তিনি মৃদু হেসে বল্লেন—মনে আছে ?

যতীন তাড়াতাড়ি পায়ের ধুলো নিলে, পুষ্পও তাই করলে। ক্ষেমদাস চুপ করে বসে রইলেন।

তিনি আবার বল্লেন—মনে আছে? বলেছিলাম সময় পেলে দেখা দেবো। এই সেই মেয়েটি বুঝি? এঁর তো খুব উচ্চ অবস্থা দেখচি। ক্ষেমদাসের দিকে চেয়ে বল্লেন—কবি যে! কি করচ বসে বসে?

ক্ষেমদাস বল্লেন—তোমাদের মত সমাধির চেষ্টায় আছি—

—ও তোমাদের অনেক দূর। মায়িক-জগতের বন্ধন তোমাদের এখনও কাটেনি। আবার এদেরও মাথা খাচ্চ কেন ও কথা বলে?

—আমিও ঠিক ওই কথাই তোমায় বলতে পারি। অদ্বৈত-ব্রহ্মজ্ঞান-ট্যান এই সব কচি কচি ছেলেদের মাথায় ঢোকাচ্চ কেন?

সন্ন্যাসী হেসে ক্ষেমদাসের কাছে এসে দাঁড়িয়ে সস্নেহ স্বরে বল্লেন—তুমিও ঐ দলেরই একজন। কবি কিনা, মিথ্যা কল্পনার রাজ্যে বাস করো।

পুষ্প সময় বুঝে বল্লে—প্রভু, জানেন এঁর প্রতি পুনর্জন্মের আদেশ হয়েচে!

সন্ন্যাসী বল্লেন—নয়তো কি ভেবেচ ইনি মায়ার অতীত হয়ে যাতায়াতের চক্রপথ এড়িয়ে ব্রহ্মত্ব লাভ করেচেন? আত্মানং বিদ্ধি—আত্মাকে জানো—আত্মাকে না জানলে যাতায়াত বন্ধ হবে না—

ক্ষেমদাস বলে উঠলেন—বয়েই গেল। ক্ষতিটা কি?

—বাজে কথা বলো না কবি। তোমার ক্ষতি না হতে পারে। তোমার মত চোখ আর মন নিয়ে ক'জন পৃথিবীতে যাবে? সাধারণ লোক গিয়ে অর্থ, যশ, মান, নারী নিয়ে উন্মত্ত থাকবে। প্রকৃতির সৌন্দর্য মায়ার খেলা হোক—তবুও স্বীকার করি, দেখতে জানলে তা দেখেও সৃষ্টিকর্তা হিরণ্যগর্ভের প্রতি মানুষের মন পৌঁছতে পারে। ও যে একটা সোপান। কিন্তু তা ক'জনের চোখ থাকে দেখবার? আর্তের সেবা করে ক'জন? কাজেই মানুষের দুঃখ যায় না। মনে আনন্দ পায় না; ভোগ করতে করতে একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করে জরার অধিকার শুরু হয়েছে! তখন মৃত্যুভয়ে বলির পশুর মত জড়সড় হয়ে থাকে। তা ছাড়া আছে শোক, বিচ্ছেদ, বিত্তনাশ, অপমান, আশাভঙ্গের যন্ত্রণা। কোথায় সুখ বলো?

—দুঃখের মধ্যেই আনন্দ হে সন্ন্যাসী—দুঃখ ভোগ করতে করতেই আত্মা বড় হয়ে ওঠে, বীতস্পৃহ হয়, বীতমন্যু হয়, বীতশোক হয়। ভগবানের দিকে মন যায়। জন্মে জন্মে আত্মা বললাভ করে, জন্ম-জন্মান্তরের চিতার আগুনে পুড়ে সে ক্রমশ নির্মল, শুদ্ধ, জ্ঞানী হয়ে ওঠে। ভগবানেরই এই অবস্থা—এ তুমি অস্বীকার করতে পারো? ক'জন তোমার মত নর্মদাতীরে সারাজীবন তপস্যা করে ভগবানের দর্শন পেয়েচে? বহু ভুগে, বহু ঠকে, বহু নারী, সুরা, অর্থ বিত্ত ভোগ করে মানুষ ক্রমশ বিষয়ভোগ থেকে নিবৃত্ত হয়ে আসে—বহু জন্ম ধরে এমন চলে —তখন জন্ম-জন্মান্তরীণ স্মৃতি তাকে বলে আবার কোনো নতুন জন্মে—ও থেকে নিবৃত্ত হও,

ও পথ তো দেখলে গত কত শত জন্ম ধরে, আবার সেই একই ফাঁদে পড়ো, সেই রকম কষ্ট পাবে। ভোগের দ্বারা আত্মাও তখন অনেকটা বীতস্পৃহ হয়ে উঠেচে—তখন সে ভোগ ছেড়ে ত্যাগের পথ খোঁজে।

—হ্যাঁ, তোমার কথা কাটি কি করে? তুমি কবি, অন্য পথে গিয়ে সত্যদৃষ্টি লাভ করেচ। কিন্তু একটা কথা বোঝো—যদি একজন্মেই হয় তবে ভগবানের ওপর বোঝা চাপিয়ে শত শত জন্ম ধরে এ অনাগত চক্রে ঘোরাঘুরি কেন?…

ক্ষেমদাস সুকণ্ঠে গেয়ে উঠলেন হাত দুটি সুন্দর ভঙ্গিতে নেড়ে নেড়ে—

কিয়ে মানুষ জনমিয়ে পশুপাখী অথবা কীটপতঙ্গে
করমবিপাকে গতাগতি পুন-পুন মতি রহুঁ তুয়া পরসঙ্গে—

সন্ন্যাসী বিরক্তির সুরে বল্লেন—আঃ, ও সব ভাবুকতা রাখো। আমার কথার উত্তর দাও।

ক্ষেমদাস বল্লেন—কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ—কলিতে বহু দোষ, কিন্তু একটা গুণ এই যে, কৃষ্ণনাম কীর্তন করলেই পরামুক্তি। তাই বলেচে—

এই পর্যন্ত বলেই আবার সুর করে কি বলতে যাচ্ছিলেন, সন্ন্যাসী ধমক দিয়ে বল্লেন—আবার ওই সব! গান আসচে কিসে এর মধ্যে? তা ছাড়া আমি তোমাদের ওই কৃষ্ণটৃষ্ণ মানিনে জানো? ওসব মায়িক কল্পনা—ভগবানের আবার রূপ কি!

—তুমি শুষ্ক পথে ভগবানের সঙ্গে নিজের সত্তা মিলিয়ে অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করেচ। ভক্তিপথের কিছুই জানো না। প্রেমভক্তি এখনও বাকি তোমার।

—মরুক গে। আমার কথার উত্তর দাও—

—উত্তর কি দেব? ভোগ না হোলে নিবৃত্তি হয় না। ভগবান তা জানেন, তাই শত জন্মের মধ্যে দিয়ে জীবকে তিনি ভোগ আস্বাদ করিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন। সবারই হবে, তবে বিলম্বে।

সন্ন্যাসী শান্তভাবে বল্লেন—হাঁ, ঠিক।

—তুমি মেনে নিলে?

—নিলাম। কিন্তু তুমি আমার কথার ঠিক উত্তর দিলে কৈ? যদি একজন্মে হয় তবে হাজার জন্মের মধ্যে দিয়ে দিশাহারা হয়ে ছুটি কেন?

ক্ষেমদাস হেসে বল্লেন—তার কারণ, সবাই তোমার মত মুক্তিকামী নয়, তোমার মত জ্ঞানী নয়—গতজন্মে তুমি যে উচ্চ অবস্থা নিয়ে জন্মেছিলে, যে জন্ম-জন্মান্তরীণ স্মৃতির ফলে তোমার মন মুমুক্ষু হয়েছিল, সংসারের আসক্তির বন্ধন কাটিয়েছিল—তুমিই বলো না, সে কি তুমি একজন্মে লাভ করেছিলে? তুমি তো ষড়ৈশ্বর্যশালী—মুক্তপুরুষ—তোমার অজানা তো কিছুই নেই—বলো তুমি?

সন্ন্যাসী মৃদু হেসে বল্লেন—তা ঠিক। গতজন্মের পূর্ব তিনজন্মেও আমি যোগী ছিলাম। আমার সে সময়ের গুরুভ্রাতা এখনও হিমালয়ের দুর্গম শিখরে তুষারাবৃত গুহায় দেহধারী হয়ে বাস করচেন। প্রায় আটশো বছর বয়েস হোল। লোকালয়ের কিছুই জানেন না। গত সাতশো

বছরের মধ্যে তিনবার নীচে নেমে গিয়েছিলেন ভারতের লোকালয়ে। একবার নেমে শুনলেন শঙ্করাচার্য ব্রাহ্মণ্যধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করচেন। দ্বিতীয়বার নামলেন অনেকদিন পরে; নামতে নামতে শুনলেন যবনেরা ভারতে প্রবেশ করেচে—শুনে আর না নেমে গিয়ে উঠে নিজের আসনে চলে গেলেন, অনেকদিন আর নামেন নি।

পুষ্প ও যতীন রুদ্ধকণ্ঠে শুনছিল। পুষ্প অধীর কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলে—আর একবার কখন নেমেছিলেন?

—আমি তখন এ জন্মের পরেও দেহত্যাগ করেচি—এই সেদিন, পৃথিবীর হিসেবে বড়জোর সত্তর আশি বছর হবে। বড় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল ভারতব্যাপী, আমরা অনেকে দলবদ্ধ হয়ে নেমে যাই ভারতে যদি কোন প্রতিকার করতে পারি। ওঁকেও নিয়েছিলাম আমাদের সঙ্গে। কুম্ভমেলা সেবার প্রয়াগে। উনি মেলা দর্শন করে দশদিন থেকে ওপরে উঠে যান—সেই শেষ, আর লোকালয়ে যান নি।

ক্ষেমদাস প্রশ্ন করলেন—এখনও দেহে রয়েচেন কেন?

—যোগ-প্রক্রিয়ায় দেহ দীর্ঘস্থায়ী হয়ে গিয়েচে, তাই দেহ ধারণ করেই আছেন। বাসনা-কামনা-শূন্য মুক্তপুরুষ তিনি, দেহে থাকাও যা, দেহে না থাকলেও তা। তাঁর পক্ষে সব সমান। স্বেচ্ছাক্রমে বিশ্বের সর্বত্র তাঁর অবাধ গতি, ব্রহ্মলোক পর্যন্ত। আমিও তাঁকে বলেছিলাম—আর দেহে কেন? উনি বল্লেন—হাম্ তো আত্মানন্দ আত্মারাম, হামারা ওয়াস্তে যো হ্যায় ব্রহ্মলোক, সো মেরা হিমবান, মেরা আসন। এহি পর পরমাত্মা বিরাজমান হ্যায়। লোকালোক তো মায়া—

ক্ষেমদাস বল্লেন—হ্যাঁ, ওসব অনেক উচ্চ অবস্থার কথা। আমাদের জন্যে নয় ওসব। আমরা ভগবানের সৃষ্টির মধ্যে আনন্দ পাই, এই অপূর্ব সৌন্দর্যরসের আস্বাদ করবে কে আমরা ছাড়া? তোমরা তো ব্রহ্ম হয়ে বুড়ি ছুঁয়ে বুড়ি হয়ে বসে আছ।

পুষ্প কুণ্ঠার সঙ্গে প্রশ্ন করলে—প্রভু, আমাদের একবার সেই সাধুর কাছে নিয়ে গিয়ে দেখাবেন?

সন্ন্যাসী বল্লেন—না মা। তিনি লোকের ভিড় পছন্দ করেন না। তবে চলো আমার পূর্বজন্মের আর একটি গুরুভগ্নীর কাছে তোমায় নিয়ে যাবো—তিনিও আজ পর্যন্ত দেহে আছেন। গভীর বনের মধ্যে গুপ্তভাবে থাকেন—প্রায় সময়ই সমাধিস্থ থাকেন। চলো হে কবি, সমাধি দেখলে তোমার জাত যাবে না—

ক্ষেমদাস বল্লেন—না হে, আমি যাবো না। তুমি এদের নিয়ে যাও—আমার ও ধর্ম নয়। কবির ধর্ম স্বতন্ত্র।

সন্ন্যাসী হেসে এসে ক্ষেমদাসের হাত ধরে বল্লেন—ভগবানের মহিমা সর্বত্র। কেন যাবে না? চলো—

—বেশ, তাহলে তুমি কথা দাও আমার সঙ্গে ভক্ত বৈষ্ণবের আশ্রমে যাবে? যদি শ্রীকৃষ্ণকে দেখাতে পারি সেখানে? প্রেমভক্তি নেবে?

সন্ন্যাসী পুনরায় হেসে বল্লেন—হবে, হবে। আচ্ছা যাবো, কথা দিলাম। প্রেমভক্তি নিই না নিই স্বতন্ত্র কথা। তোমাকেও তো আমি ষট্‌চক্র ভেদ করে অদ্বৈতজ্ঞান পাইয়ে দিচ্চি না জোর করে?

কিছুক্ষণ পরে ওরা সবাই সন্ন্যাসীর পিছু পিছু পৃথিবীর একস্থানে নেমে এল। স্থানটি দেখেই ওরা বুঝলে, লোকালয় থেকে বহু দূরে কোনো এক নিবিড় অরণ্যের মধ্যে ওরা দাঁড়িয়ে। সম্মুখে একটি পার্বত্য নদী, কিন্তু নদীগর্ভে কোথাও মাটি বা বালি নেই—সমস্তটা পাষাণময়, চওড়া সমতল, মসৃণ। প্রায় একশো হাত পরিমিত স্থান কি তার চেয়ে বেশি এমনি আপনা-আপনি পাথর বাঁধানো। তারই মধ্যভাগ বেয়ে ক্ষুদ্র নদীটি ক্ষুদ্র একটি জলপ্রপাতের সৃষ্টি করে মর্মর কলতানে বয়ে চলেচে। উভয় তীরে নিবিড় জঙ্গল, মোটা মোটা লতা এ-গাছ থেকে ও-গাছে দুলচে; গভীর নিশীথকাল পৃথিবীতে, আকাশে ঠিক মাথার ওপরে চাঁদ, গভীর নিঃশব্দতার মধ্যে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নালোকে সমস্ত অরণ্যভূমি মায়াময় হয়ে উঠেচে।

ওরা মুগ্ধ হয়ে সে অপূর্ব অরণ্য-দৃশ্য দেখচে, এমন সময়ে বনের মধ্যে বাঘের গর্জন শোনা গেল, দ্বিতীয়বার শোনা গেল আরও নিকটে। যতীন সভয়ে বলে উঠলো—ওই! চলুন পালাই—

অল্প পরেই ওপারের বনের লতাপাতা নিঃশব্দে সরিয়ে প্রকাণ্ড রয়েল বেঙ্গল টাইগারের হাঁড়ির মত মুখ করে নদীজলে নামতে দেখা গেল এবং তার জল খাওয়ার 'চক্ চক্' শব্দ বনের ঝিল্লী-রবের সঙ্গে মিলে এই গম্ভীর রহস্যময় রজনীর নৈঃশব্দ মুখর করে তুলতে লাগলো।

পুষ্প বল্লে—ভয় কি যতীনদা তোমার এখন বাঘের?

ক্ষেমদাস মুগ্ধ দৃষ্টিতে এই অপূর্ব শোভাময় জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নির্জন বনকান্তারের দৃশ্য উপভোগ করছিলেন। দুহাত জুড়ে নমস্কার করে বল্লেন—সুন্দর। সুন্দর! নমস্কার হে ভগবান, ধন্য তুমি, আদি কবি তুমি জগৎস্রষ্টা! কর্ণামৃতে ঠিকই বলেচে :—মধুগন্ধি···

সন্ন্যাসী বল্লেন—ব্রহ্মই জগৎ হয়ে রয়েচেন, য ওষধিষু যো বনস্পতিষু—তিনিই সর্বত্র। সামনে যা দেখচো এও তিনি, তাঁর বিশ্বরূপের এক রূপ—তবে অত ভাবুকতা আমাদের আসে না, ইনিয়ে-বিনিয়ে বর্ণনা করা আসে না।

ক্ষেমদাস হেসে বল্লেন—আসবে কি হে! তাহোলে তো তুমি উপনিষদ তৈরী করে বসতে। তোমাদের সঙ্গে উপনিষদের কবিদের তফাৎ তো সেইখানে। তাঁরা ব্রহ্মজ্ঞ ছিলেন, আবার কবিও ছিলেন। তোমার মত নীরস ব্রহ্মবিৎ ছিলেন না। ভগবানও কবি। উপনিষদে কি বলেনি তাঁকে, কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ?

সন্ন্যাসী বল্লেন—চলো চলো, যে জন্যে এসেচি। উপনিষদে কবি বলেচে যিনি দ্রষ্টা তাঁকে। যিনি প্রজ্ঞার আলোকে এক চমকে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান দর্শন করেন, চিন্তা দ্বারা যাঁকে বুঝতে হয় না, তিনিই কবি।

যতীন বল্লে—প্রভু, এ কোন্ জায়গা পৃথিবীর?

—এ হোল বাস্তার রাজ্য, মধ্যভারতের। এই নদীর নাম মহানদী, উড়িষ্যার মধ্য দিয়ে সমুদ্রে পড়েচে। এখানে নদীর শৈশবাবস্থা দেখচ, সবে বেরিয়েচে অদূরবর্তী পাহাড়শ্রেণী

থেকে। এখন এসো আমার সঙ্গে—

নদীর ওপারে কিছুদূরে ঘন বনে একটি পর্ণ-কুটীরের কাছে ওরা যেতেই একটি সন্ন্যাসিনী তাড়াতাড়ি বার হয়ে এসে ওঁদের অভ্যর্থনা করলেন। বল্লেন—আসুন আপনারা। আমার বড় সৌভাগ্য আজ—

যতীন ও পুষ্পের মনে হোল ইনি যেন ওদের অপেক্ষাতেই ছিলেন। সন্ন্যাসিনীকে দেখে যতীন অবাক হয়ে গেল, সন্ন্যাসী বলেচেন ওঁর পূর্বজন্মের গুরুভগিনী—অথচ ইনি তো কুড়ি বৎসরের তরুণীর মত সুঠাম, সুরূপা, তন্বী। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, রূপ যেন ফেটে পড়চে, মাথায় একঢাল কালো চুলের রাশ।

সন্ন্যাসী বল্লেন—ভাল আছ ভগ্নী?

সন্ন্যাসিনী হেসে হিন্দীতে বল্লেন—পরমাত্মা যেমন রেখেচেন। এঁরাও তো দেখচি বিদেহী আত্মা। এঁদের এনেচ কেন?

পুষ্প ও যতীন সন্ন্যাসিনীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। ক্ষেমদাস যুক্তকরে নমস্কার করলেন।

সন্ন্যাসী বল্লেন—এঁরা এসেচেন তোমায় দেখতে। ইনি বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি ক্ষেমদাস—

সন্ন্যাসিনী বল্লেন—আইয়ে মহারাজ, আপকা চরণধুলিসে হামারা আশ্রম পবিত্র হো গিয়া—পরমাত্মাকি কৃপা।

ক্ষেমদাস বল্লেন—মা, আপনি দেবী, আপনার দর্শনে আমরা পুণ্যলাভ করলাম।

সন্ন্যাসিনীর সুন্দর মুখের লাবণ্যময় হাসি অরণ্যভূমির জ্যোৎস্নাস্নাত সৌন্দর্যকে যেন আরও বাড়িয়ে তুলেচে। কুটীরের দ্বারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বল্লেন—এহি নদীমে আজ পূর্ণিমাকী রাতমে স্বর্গসে উতার কর্ অপ্সরীলোগ্ নহ্‌তে থেঁ। হাম বহুৎ বরষসে দেখতে হেঁ। আপকো মালুম হ্যায়?

ক্ষেমদাস বল্লেন—না মা, আমরা তো জানি না। আমাদের দেখাবেন?

—আপ দেখনে মাংতা?

—হাঁ মা, দেখালেই দেখি।

সন্ন্যাসী বল্লেন—এঁর বয়েস কত বল তো যতীন?

যতীন সঙ্কুচিত ভাবে বল্লে—আমি কি বলবো? দেখে তো মনে হয় কুড়ি-বাইশ।

সন্ন্যাসিনী খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলেন বালিকার মত।

সন্ন্যাসী বল্লেন—তুমি তোমার জ্ঞান-মত বলেচ, তোমার দোষ নেই। তোমার ধারণা নেই এ বিষয়ে।

সন্ন্যাসিনী বল্লেন—তুম ক্যা বোলতা হ্যায় রে বাচ্চা? হামারা তো এহি আসন পর পচিশ বরষ বীত গিয়া—ইনকা পহ্‌লে পঞ্জাবমে রাভি নদীকী তীরমে করিব সত্তর বরষ আসন থা। গুরুজীকা অনুজ্ঞাপর এহি বনমে মহানদীকে কিনারপর আশ্রম বনায়া।

যতীন মনে মনে হিসেব করে বল্লে—তা হোলে আমার প্রপিতামহীর চেয়েও আপনি বড়—

সন্ন্যাসী বল্লেন—ওঁর বয়েস দেড়শো বছরের কাছাকাছি—বরং কিছু বেশী হবে তো কম নয়।

ক্ষেমদাস বল্লেন—মা, দেহধারী হয়ে আছেন যে এখনো?

সন্ন্যাসিনী হেসে বল্লেন—বহুৎ নেতি ধৌতি কিয়া -ইসিসে শরীর বন্ গিয়া। আভি ধ্বংস নেহি হোগা কোই পান্ ছ'শো বরষ। কোই হরজ নেই, রহে তো রহে।

যতীন আপন মনে ভাবলে—বাবাঃ, এই দুর্গম বনের মধ্যে উনি একা কি করে থাকেন! বাঘের ভয় করে না? এ তো বাঘের আড্ডা দেখে এলাম।

সন্ন্যাসিনী ওর মন বুঝেই যেন বল্লেন—যখন সমাধিতে থাকি তখন বাঘ আসে, বিষাক্ত সাপ এসে মাথায় ওঠে। গায়ে বেড়ায়। সমাধি ভাঙলে ওদের যাতায়াতের চিহ্ন দেখে বুঝতে পারি।

সন্ন্যাসী বল্লেন—আজকাল কি আহার ছেড়েচ?

—না। কন্দমূল খাই, বেলগাছ আছে আশ্রমের পেছনে অনেক, বেল খাই। সামান্যই আহার।

ক্ষেমদাস বল্লেন--মা, তুমিও কি প্রেমভক্তির বিপক্ষে? তুমিও নীরস অদ্বৈতবাদী?

সন্ন্যাসিনী হেসে বল্লেন—মাৎ পুছিয়ে। প্রেমভক্তি বহুৎ কৃপাসে লাভ হোতা হ্যায়—হামারা তো তিন যুগ গুজার গিয়া, ও বস্তু নেহি মিলা। কাঁহা মিলেগা বাৎলাইয়ে মহাত্মা কৃপা কর্। আপ দিজিয়ে হামকো!

ক্ষেমদাস বল্লেন—আমার শক্তি নেই মা। আমি কবি, এই পর্যন্ত। ও সব দেওয়া নেওয়ার মধ্যে আমি নেই। তবে তোমাকে আমি উধ্বর্লোকে বৈষ্ণবাচার্যদেবের আশ্রমে নিয়ে যেতে পারি, তাঁদের কাছে উপদেশ পেতে পারো। তবে দরকার কি মা? তোমরা তো প্রতিক্ষণে সমাধি-অবস্থায় ব্রহ্মকে আস্বাদ করচো—কি হবে প্রেমভক্তি?

—আমার কাছে গৃহস্থদের নানা দেবদেবী আসেন, নানা দেশ থেকে আসেন—একা থাকি বলে মাঝে মাঝে সঙ্গ দিতে আসেন। লম্বদামোদর, গোপাল, উগ্রতারা, মৃন্ময়ী, শ্যামরায়, অষ্টভুজা—আরও কত কি নাম। এসে গল্পগুজব করেন, সুখদুঃখের কথা বলেন। সেদিন এক ঠাকুর এসে হাজির আপনাদের বাংলাদেশের মুরশিবাবাদ জেলার কি গ্রাম থেকে—নাম শ্যামসুন্দর। আমায় এসে ছলছল চোখে বল্লেন—যে গ্রামে আছেন, সেখানে নাকি গৃহস্থেরা অনাদর করচে, ঠিকমত ভোগ দিচ্চে না, খেতে পান না—এই সব। তা আমি বল্লাম—আমার কাছে কেন তুমি? আমি তোমাদের মানিনে। যারা মানে তাদের কাছে গিয়ে প্রকট হও, তোমার নালিশ জানাও, আমাকে বলে কি হবে? বালক বিগ্রহ, ওর চোখে জল দেখে কষ্ট হোল—পাষণ্ডী গৃহস্থেরা কেন সেবা করে না কি জানি। ওই সব দেখে আমার মন-কেমন করে, মনে হয় প্রেমভক্তি হোলে এঁদের নিয়ে আনন্দ করতাম।

সন্ন্যাসী হেসে বল্লেন—মায়া, মায়া, নির্বিকল্প ভূমি থেকে নেমে এসে তুমি আবার ঐসব মায়িক ঠাকুরদেবতার সঙ্গে সম্বন্ধ পাততে চাও?

ক্ষেমদাস বল্লেন—মা, তোমাকে প্রেমভক্তি দেবার জন্যই ওই সব দেবদেবী আসেন—আরও আসেন তুমি মেয়েমানুষ বলে—হাজার অদ্বৈতবাদী হোলেও এখন তোমাদের মন এই এঁদের মত কঠোর, নীরস, শুষ্ক হয়ে ওঠেনি। তাই তোমার কাছে আসেন, কই এঁর কাছে তো আসেন না? এলে আমল পাবেন না বলেই আসেন না। ভগবানও প্রেমভক্তির কাঙাল, যে ভক্ত তারই কাছে লোভীর মত ঘোরেন। যে প্রেমভক্তি দিতে পারবে না, তার কাছে তো তিনি—

সন্ন্যাসী বাধা দিয়ে বিরক্তির সুরে বল্লেন—আঃ, তোমার ওই সব অসার, ফাঁকা ভাবুকতাগুলো রাখবে দয়া করে? ওতে আমার গা ঘিন্ ঘিন্ করে সত্যি বলচি। যত খুশি প্রেমভক্তি বিলোও গিয়ে তোমার সেই বৈষ্ণবাচার্যের আখড়ায়—আমাদের আর শুনিও না—যত খুশি কাব্যরচনা কর বৃন্দাবন আর চাঁদের আলো আর কদম্বমূল নিয়ে সেখানে বসে।

ক্ষেমদাস বল্লেন—তোমাকেও একদিন ভক্তির ক্ষুরে মাথা মুড়ুতে হবে হে কঠোর জ্ঞান-মার্গী সন্ন্যাসী। আমার নাম যদি ক্ষেমদাস হয়—

সন্ন্যাসী বল্লেন—আচ্ছা, এখন বন্ধ করো। তুমি আমাকে বলচো নীরস। তোমাকে আমি এমন এক জ্ঞানীর কাছে নিয়ে যাবো যিনি সম্পূর্ণ নাস্তিক, জড়বাদী। পঞ্চভূতের বিকারে এই বিশ্ব সৃষ্টি হয়েচে বলেন। ঈশ্বর মানেন না, সৃষ্টিকর্তা মানেন না; আত্মাকে বলেন পঞ্চভূতের বিকার, জড়ের ধর্মে আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়েচে, আপনা-আপনিই একদিন লয় হবে—এই মত পোষণ করেন।

—কে? লোকায়ত দর্শনের কর্তা চার্বাক?

—চার্বাক নন, তাঁর প্রভাবান্বিত কোনো শিষ্য।

—কি অবস্থা লাভ করেচেন?

—স্থাণুবৎ অচলাবস্থা। খুব উচ্চ স্তরেই আছেন, পুরুষকারের বলে উন্নত ভূমি লাভ করেচেন, কিন্তু মুক্তি হয়নি। এর মধ্যে দুবার পৃথিবী ঘুরে এসেছেন। বলেন, এও জড়ের ধর্ম! মুক্তি বলে কিছু নেই। ঈশ্বর মিথ্যা! কাকে তিনি উপাসনা করবেন? পুনর্জন্মে দুঃখিত নন। জন্মান্তরীণ স্মৃতি জলজল করচে মনে।

—কি অবলম্বনে আছেন?

—জড়ের ধর্ম পরীক্ষা করেন। তরুণ শিষ্যদের মধ্যে প্রচার করেন। পৃথিবীতে বহু তরুণদলকে যুগে যুগে প্রভাবান্বিত করচেন জড়ধর্মের একচ্ছত্রত্ব প্রতিপাদনের জন্যে। ব্যাসক্তি-শূন্য, উদার পুরুষ।

—মৃত্যুর পরে দেহধ্বংসে আত্মা থাকে দেখেও জড়বাদী?

—হাঁ। বলেন, ওটাও জড়ের ধর্ম। গুটিপোকা দেহত্যাগ করে প্রজাপতি হচ্চে এও তো দেখা যায়। আবশ্যক কি ঈশ্বরকে টেনে আনবার?

ক্ষেমদাস কানে আঙুল দিয়ে বল্লেন—ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু, শুনতে নেই এসব কথা।

—কেন শুনতে নেই? এই দ্যাখো তোমাদের অনুদারত্ব। আমরা বলি, ব্রহ্মই জগতের সব হয়ে আছেন। নাস্তিক যিনি তিনি ব্রহ্মের বাইরে নন। ব্রহ্মের মধ্যে থেকে তিনি একথা

বলচেন। এমন একদিন আসবে, ব্রহ্মজ্ঞান তিনি লাভ করবেন। বাদ পড়বেন না।

সন্ন্যাসিনী বল্লেন—আমারও তাই মত।

ক্ষেমদাস অধীরভাবে বল্লেন—বেশ, বেশ। ওসব আলোচনা এখন থাক। চলো যাওয়া যাক্। রাত্রি প্রভাত হয়ে এল—জ্যোৎস্না ম্লান হয়ে আসচে। ওই শোনো ময়ূর ডাকচে বনে।

সন্ন্যাসিনীকে পুনরায় বন্দনা করে সকলে সেই গভীর বন পরিত্যাগ করলেন। কুটীরের আশেপাশে অনেক বন্য দেবকাঞ্চন ফুল ফুটে আছে ম্লান জ্যোৎস্নালোকে। অদূরের শৈলচূড়া শেষরাত্রের হিমবাষ্পে অস্পষ্ট দেখাচ্চে। বন্য কুক্কুটের রব রজনীর শেষ যাম ঘোষণা করচে।

ক্ষেমদাস আকাশপথে বল্লেন—কি সন্ন্যাসী, যাবে তো রঘুনাথদাসের আশ্রমে ?

সন্ন্যাসী রাজী হওয়াতে ওরা চক্ষের নিমেষে বৈষ্ণবাচার্যের আশ্রমের সামনে এসে পড়লো। ওরা সকলে রঘুনাথদাসের আসনের দিকে গেল—পুষ্প গেল গোপাল-বিগ্রহ দেখতে ও তার প্রাণের ব্যথা গোপালের পায়ে নিবেদন করতে। নীল স্ফটিকের অপূর্ব বিগ্রহের মুখে যেন করুণার হাসি লেগেই আছে। পুষ্প বাইরে এসে দাঁড়ালো, ঐ বিরাট অনন্ত বিশ্ব, আকাশের পটে কোটি কোটি নক্ষত্ররাজি (বৈষ্ণবাচার্যের আশ্রমে এখন রজনীর প্রথম যাম)—সেই যে সেদিন মহাপুরুষ উপনিষদের বাক্য উচ্চারণ করে শুনিয়েছিলেন—অস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য সমন্ততঃ স্থিতানি এতাদৃশান্যনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডানি সাবরণানি জলন্তি—এই ব্রহ্মাণ্ডের আশেপাশে আরও অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড জ্বলচে—সব ব্রহ্মাণ্ডের যিনি অধীশ্বর, সেই বিরাট দেবতা কেন এখানে ক্ষুদ্র বিগ্রহে নিজেকে আবদ্ধ রেখেচেন কিসের টানে কে বলবে ?

পুষ্প প্রণাম করলে সাষ্টাঙ্গে। সে বিরাটের কতটুকু ধারণা করতে পারে, মেয়েমানুষ সে। সে অতি ক্ষুদ্র নারী মাত্র। দয়া করে মধুররূপে ধরা না দিলে সে ক্ষীরোদসাগরশায়ী মহাবিষ্ণুর কিংবা তাঁর চেয়েও এককাটি সরেশ নিরাকার পরব্রহ্মের কি ধারণা করতে সমর্থ ? মন্দিরে প্রণাম করে উঠে ব্যাকুল কণ্ঠে প্রার্থনা করলে—হে ঠাকুর, আশা-বৌদিদিকে কৃপা কর। এবার যতীনদা ও আশার জন্ম তোমার আশীর্বাদে যেন সার্থক হয়ে ওঠে। আর যেন আশার কুপথে মতি না হয় হে ঠাকুর। ওর প্রারব্ধ কর্ম এবার যেন ক্ষয় হয়। ওকে দয়া কর।

মন্দিরের নিভৃত কুঞ্জতলে অপূর্ব পুষ্পসুবাস। যেন বহু জাতী, যূথী, মালতী, হেনা, নাগকেশর একসঙ্গে প্রস্ফুটিত হয়েচে। সন্ন্যাসী ও ক্ষেমদাস শ্বেতপ্রস্তরের চত্বরে বৃক্ষতলে বসে রঘুনাথদাসের সঙ্গে আলোচনা করচেন।

রঘুনাথদাস বলচেন—আপনি আমার বিগ্রহটি দর্শন করে আসুন। আপনার ভক্তি হবে। উনি ভক্তি আকর্ষণ করেন। আপনার আগমনে আমার আশ্রম আজ ধন্য হয়ে গেল। কিছুকাল এখানে থাকুন।

সন্ন্যাসী বল্লেন—আপনি মহাপুরুষ, আপনার নিকটে থাকবো এ তো পরম সৌভাগ্য। তবে এবার নয়, আমি ঘুরে আসবো। বিগ্রহ দর্শন করে আসি।

বিগ্রহ দর্শন করে একটু পরেই ফিরলেন। বল্লেন—আপনার বিগ্রহ দেখচি বড় বিপজ্জনক বস্তু—সত্যিই আমাকে উনি আকর্ষণ করচেন। আমায় বল্লেন—আমায় কেমন লাগচে ? আমি

বল্লাম—আমি তোমাকে মানি না। একরকম জোর করে চলে এসেচি—

বলে আপন মনেই হাসতে লাগলেন।

রঘুনাথদাস বল্লেন—আমার গোপাল আপনার ভক্তি আকর্ষণ করতে চাইচেন। আপনি দেবেন না?

—ক্ষমা করবেন আচার্যদেব। আমার সংশয় যেদিন ছিন্ন হবে সেদিন এসে আপনার আশ্রমে দীক্ষা নেবো প্রেমভক্তির। এখন ওসব আমি পুতুল-পুজোর সমান মনে করি।

রঘুনাথদাসের প্রশান্ত মুখমণ্ডলে মৃদুমন্দ হাসি ফুটলো। ঈষৎ দর্পভরে বল্লেন—আমার গোপালের ক্ষমতা থাকে, আপনাকে তিনি ভজাবেন। পুতুল কি কথা বলে? আপনি ব্রহ্মবিৎ, ভেবে দেখুন। আপনার মত ভক্ত উনি চাইচেন। ব্রহ্মভূমি থেকে নেমে এসে ভগবানের লীলাসঙ্গী হয়ে থাকুন।

—আপাতত আমার একটি গুরুভগ্নী প্রেমভক্তির জন্যে ব্যাকুলা। তাকে দিন দয়া করে।

—কোথায়?

—সম্প্রতি দেহে বর্তমান আছেন, মহানদীর তীরের বনমধ্যে তাঁর আসন। পরমাত্মার দর্শন পেয়ে ধন্য হয়েচেন। বহুকাল থেকে দেহধারিণী। আপনি আহ্বান করলে তিনি এখানেই আসবেন।

—আমি অকিঞ্চন। আমার কি সাধ্য প্রেমভক্তি দিই। গোপাল দেবেন—

পুষ্প এই সময়েই হঠাৎ জানু পেতে বসে করজোড়ে বিনীত কণ্ঠে বল্লে—ওই সঙ্গে আমাকেও দিন আচার্যদেব। আমার একমাত্র অবলম্বন।

ক্ষেমদাস উৎসাহে হাততালি দিয়ে বলে উঠলেন - সাধু! সাধু!

রঘুনাথ পুষ্পের মাথায় হাত দিয়ে বল্লেন—আমি কে মা? গোপালের কাছে চাও। আমি আশীর্বাদ করি তুমি পাবে।

পুষ্প যতীনকে দেখিয়ে বল্লে—এঁকে আশীর্বাদ করুন। ইনি শীঘ্র পুনর্জন্ম গ্রহণ করবেন। আদেশ হয়ে গেছে।

রঘুনাথ যতীনের দিকে ভাল করে চেয়ে বল্লেন—পুনর্জন্ম হচ্চে? খুব ভাল। ভগবানে মন যেন থাকে আশীর্বাদ করচি। পুনর্জন্মে ভয় কি, যদি কৃষ্ণপদে মতি থাকে।

যতীন পুষ্প ভিন্ন উপস্থিত সকলের পাদস্পর্শ করে প্রণাম করলে।

পুষ্প বল্লে—প্রভু, আবার আপনাদের দেখা ইনি পাবেন?

সন্ন্যাসী বল্লেন—নিশ্চয়, দেহ অন্তে। আমরা আর কোথায় যাচ্চি।

রঘুনাথ বল্লেন—ইচ্ছা করে প্রভু, আর একবার পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে ভক্তিধর্ম প্রচার করে আসি। জীবের বড় কষ্ট। দেখে শুনে বড় কষ্ট পাই। জীবের মঙ্গলের জন্য প্রয়োজন বুঝলে একবার ছেড়ে শতবার যেতে প্রস্তুত আছি। সেদিন মহাপ্রভুকে বলেছিলাম, উনি বল্লেন—এখন পৃথিবীতে অন্য সময় এসেচে, লোকজনের অন্যপ্রকার মতি। এখন আমাদের পূর্বতন পন্থায় কাজ হবে না। গ্রহদেব বৈশ্রবণ এ বিষয়ে সেদিন মহাপ্রভু ও আরও ঊর্ধ্ব

লোকের কয়েকটি মহাপুরুষের সঙ্গে পরামর্শ করেচেন। তাঁরা বল্লেন, পৃথিবী এখনও তৈরী হয়নি। গ্রহদেব বৈশ্রবণ কয়েকজন শক্তিমান আত্মা পাঠাচ্চেন পৃথিবীতে, এঁরা ধ্বংস ও দুর্দৈব আনবেন পৃথিবীতে গিয়ে। পৃথিবী আলোড়িত হবে—লোকের দৃষ্টি উর্দ্ধমুখী হবে। ভোগবাদ ও জড়বাদের অবসান না হোলে জীবের মঙ্গল নেই। ঢেলে সাজাতে হবে গোটা পৃথিবীটাকে। আপনিই তো ইচ্ছা করলে করতে পারেন।

সন্ন্যাসী মৃদু হেসে চুপ করে রইলেন।

যতীন অসতর্ক মুহূর্তে সবিস্ময়ে বলে উঠল—কে? ইনি!

ক্ষেমদাস বল্লেন—হাঁ, ইনি। অসাধারণ শক্তিশালী পুরুষ, ওঁরা গ্রহদেবের সমান। ইচ্ছামাত্র সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ঘটাতে পারেন। ব্রহ্মসূত্রে বলেচে—সংকল্পাদেব তৎশ্রুতেঃ। মুক্তপুরুষের সমস্ত ঐশ্বর্য সংকল্পমাত্র উদয় হয়।

সন্ন্যাসী হেসে বল্লেন—ঝোঁকের মাথায় একটু বেশি বল্লে কবি। ভোগমাত্রমেষাম্ অনাদি-সিদ্ধেনেশ্বরেণ সমানম্—শঙ্করাচার্য কি বলেচেন প্রণিধান কর। মুক্তের ভোগ ঈশ্বরের সমান হয়, শক্তি কি তাঁর সমান হয়?

—আমি ঈশ্বরের কথা বলিনি, গ্রহদেবের কথা বলেচি।

—গ্রহদেব শক্তিমান বটে কিন্তু ঈশ্বরের বিনা অনুজ্ঞায় তিনি কিছুই করতে পারেন না।

—সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করতে সমর্থ কিনা?

—হ্যাঁ। কিন্তু ঈশ্বরের অনুমতিক্রমে।

—আপনি?

—না। আমার ওপর সে ভার ন্যস্ত নেই। আমি আদার ব্যাপারী, সৃষ্টি স্থিতির খোঁজে আমার দরকার কি? সৃষ্টি বলচোই বা কাকে? নির্গুণ ব্রহ্ম যখন দেশ ও কালের সীমার মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করেন, তখন তাকে বলে সৃষ্টি—উর্ণনাভ যেমন নিজের দেহনিঃসৃত রস তন্তু-রূপে প্রসারিত করে।

রঘুনাথদাস বল্লেন—মহাপুরুষ, ক্ষেমদাস ঠিকই বলেচেন। আপনি পারেন সব, অসাধারণ শক্তি আপনাদের। সেই শক্তি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় কোনো কাজে আসচে না। ভগবানের দাসভাবে ভক্তভাবে তাঁকে সেবা করে সেই শক্তির সদ্ব্যবহার করুন। কিংবা পৃথিবীর বা অন্য গ্রহলোকের জীবকুলের সেবা করুন। জীবের সেবায় স্বয়ং ভগবান তাঁর পার্শ্বচরদের নিয়ে সর্বদা নিযুক্ত। আপনি মহাজ্ঞানী, আপনাকে আমি কি উপদেশ দেব?

সন্ন্যাসী বিনীতভাবে নমস্কার করে বল্লেন—আপনার আদেশ শিরোধার্য।

যতীন অবাক হয়ে ভাবলে, এত বড় লোক, কিন্তু কি অদ্ভুত বিনয় এদের। সত্যি, বড় ভাল লাগচে।

ক্ষেমদাস হঠাৎ বলে উঠলেন—বৃন্দাবনে আরতি হচ্চে গোপাল-মন্দিরে। আমি আর থাকতে পারবো না। চল।

আজও পৃথিবীতে সুন্দর জ্যোৎস্না। বৃন্দাবনের বনপথে আলোছায়ার খেলা দেখে ওরা সবাই

মুগ্ধ। শহরে ইলেকট্রিক আলো জ্বলচে, মোটর যাচ্চে ধুলো উড়িয়ে, লোক গিজ্‌গিজ্‌ করচে। চানাচুরওয়ালা সুর করে মোড়ে দাঁড়িয়ে সওদা ফিরি করচে। গোপালের মন্দিরের আরতির সময়ে কত অশরীরী ভক্ত, কত জ্যোতির্ময় আত্মা সেদিনকার মত মন্দিরের মধ্যে উপস্থিত। অনেকে স্বর্গীয় পুষ্প বিগ্রহের অঙ্গে বর্ষণ করতে লাগলেন আরতির সময়ে।

পুষ্প চেয়ে দেখতে দেখতে ওঁদের মধ্যে করুণাদেবীকে দেখে চমকে উঠলো। আরও একটি দেবী আছেন ওঁর সঙ্গে। দুজনে মন্দিরের এক কোণে সাধারণ গৃহস্থঘরের নারীদের মত শান্তভাবে দাঁড়িয়ে আরতি দর্শন করচেন। পুষ্পকে তাঁরা ডাকতেই সে কাছে গেল। পুষ্প দেখলে, অপরা দেবীটি তারই পূর্বপরিচিতা প্রণয়দেবী।

প্রণয়দেবী বল্লেন—অনেকদিন তোমায় দেখিনি। আরতি শেষ হয়ে যাক্, বাইরে চলো, কথা আছে।

সঙ্গে সঙ্গে পুষ্পের মনে পড়লো কেবলরাম কুণ্ডুর কথা। প্রণয়দেবীর 'অনেকদিন দেখিনি' এই কথাতে ওর মনে পড়লো। সেই নিম্নস্তরের বিষয়াসক্ত আত্মাকে সে দাদু বলে ডেকেচে। অথচ অনেকদিন তার কাছে যাওয়া হয়নি বটে। তাকে আজ এখুনি বৃন্দাবনে এনে গোপালমন্দিরে আরতি দেখাতে হবে। ধন্য হয়ে যাবে কেবলরাম—স্বর্গ-মর্তের মিলনদৃশ্য এভাবে দেখার সৌভাগ্য আর তার হবে না।

আচ্ছা, আশা-বৌদিকে আনলে হয় না? ধন্য হয়ে যায়, উদ্ধার হয়ে যায় একদিনে সে।

করুণাদেবীকে সে কথাটা জিজ্ঞেস করলে। দেবী বল্লেন—আশার আধ্যাত্মিক বুদ্ধি এখনও সুপ্ত। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন সে, দেখেও দেখবে না এ সব। অত সহজে পাপী উদ্ধার হয় না পুষ্প, তাহোলে আমরা বসে থাকতাম না—নরক উজাড় করে পাপী হাজারে হাজারে নিয়ে এসে ফেলতাম।

পুষ্প লজ্জিত হোল।

প্রণয়দেবী বল্লেন—তোমাদের তিনজনের ওপর আমার দৃষ্টি বহু জন্ম আগে থেকে রেখেচি। এখনও অনেক গতাগতি বাকি ওদের দুজনের। পুনর্জন্ম ভিন্ন আশার আত্মা কিছুতেই কর্মক্ষয় করতে পারবে না। তুমি ব্যস্ত হয়ো না পুষ্প, যা করবার তিনিই করবেন। আমরা তাঁর দাসী মাত্র।

পুষ্প ওঁদের অনুমতি নিয়ে চক্ষের নিমেষে কেবলরামের স্তরে এসে দেখলে, বৃদ্ধ সেখানে নেই। তবে বোধহয় আবার কুড়ুলে-বিনোদপুরে ওর ছেলেদের আড়তে গিয়ে বসেচে। কিন্তু একা যেতে পুষ্পের বড় ভয় করে। পৃথিবীর স্থূল স্তরে নিম্নশ্রেণীর দুষ্ট আত্মাদের উপদ্রব বড় বেশি, এরা অনেক সময় দেহধারী ও বিদেহী সকলকেই বিপদে ফেলবার চেষ্টা করে। বৃন্দাবনে ছিল এতক্ষণ, পৃথিবীর হোলেও সে একটা পবিত্র দেবস্থান, ওখানে প্রেতযোনির উপদ্রব খুব কম।

ভগবানের নাম স্মরণ করে সে কুড়ুলে-বিনোদপুরে কুণ্ডুদের গদিতে এসে দেখে বৃদ্ধ কেবলরাম তার বড় ছেলে বিনোদের পাশে হাতবাক্স সামলে বসে আছে। সন্ধ্যার সময়, হাটুরে খরিদ্দারের

ভিড় দোকানে। বিনোদের দুই কর্মচারী হেঁকে বলচে—দুজোড়া ফুলন শাড়ী, ছ' নং—

বিনোদ খাতায় টুকতে টুকতে মাথা তুলে বলচে—টাকা না লোট্?

খরিদদার বলচে—আজ্ঞে লোট্ কুণ্ডু মশায়। দু'মণ পাট ব্যাচ্‌লাম রাম তেলির আড়তে—সব লোট্ দেলে। লোট্ এখন ক'নে ভাঙাতি যাই আপনাদের দোকান ছাড়া? বাবু, কিছু কম নেন্ দামটা।

বিনোদের কিছু বলবার পূর্বেই তার পার্শ্বোপবিষ্ট কেবলরাম বলে উঠলো—ওতে লাভ নেই এক পয়সাও। তুমি পুরোনো খদ্দের বলে শুধু কেনা-দামে দেওয়া।

পুষ্প বুঝতে পারলে, এ অতি কপট কথা। বৃদ্ধের মন বলচে জোড়াপিছু দেড় টাকা লাভ হয়েচে এই পাড়াগাঁয়ে মূর্খ খদ্দেরের কাছে। এই সময় বিনোদ বল্লে—যাও, দু'আনা কম দাওগে জোড়ায়, তুমি পুরোনো খদ্দের, তোমার সঙ্গে অন্যরকম।

কেবলরাম পুত্রের ওপর চটে উঠে বল্লে—তবেই তুমি ব্যবসা করেচ! খদ্দেরের এক কথায় অমনি জোড়ায় দু' আনা ছাড়!

অবিশ্যি ওর কথা দোকানদার বা খরিদ্দার কেউ শুনতে পেল না। পুষ্প ওর পাশে গিয়ে ডাকলে—ও দাদু! পুষ্পের কণ্ঠস্বর শুনে বৃদ্ধ চমকে উঠে ওর দিকে চাইলে। পুষ্প হাসিমুখে বল্লে—আচ্ছা, কেন এই সন্ধেবেলা বসে বসে মিথ্যে কথাগুলো বেমালুম কইচ দাদু? ছিঃ—

কেবলরাম অপরাধীর ন্যায় উঠে দাঁড়ালো। পুষ্প বল্লে—আবার তুমি এই দোকানে এসে বসে আছ। পৃথিবীর আসক্তি তোমার গেল না? কি হবে তোমার দোকানপসার আর খদ্দেরে? টাকার লাভলোকসানেই বা তোমার কি হবে?

কেবলরাম বিষণ্নভাবে বল্লে—যাই কোথায় দিদি বলো? এই গদি আর আড়ত ছাড়া গত পঞ্চাশ বছর আর কিছু চিনিনি। কোথাও ভাল লাগে না। এখানটাতে এলে পুরানো অভ্যেসের বশে আড়তের কাজ করে যাই। নইলে কি করি বলো? তুমিই তো দিদি দর্শন দাওনি কতদিন!

—আচ্ছা এখুনি চলো আমার সঙ্গে—দেরি ক'য়ো না, বেরিয়ে এসো।

মুহূর্তের মধ্যে কেবলরামকে নিয়ে পুষ্প গোপাল-মন্দিরে এল। ধূপধুনার সুগন্ধি ধূমে মন্দিরের গর্ভগৃহ ভরে গিয়েচে, আরতি তখনও পূর্ববৎ চলচে—পাঁচমিনিটের জন্য মাত্র পুষ্প অনুপস্থিত ছিল। কেবলরাম পুষ্পের কৃপায় সজ্ঞান অবস্থায় আছে, জ্যোতির্ময় মহাপুরুষদেরও সে দেখে ভয়ে সম্ভ্রমে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েচে। সন্ন্যাসীর তেজঃপুঞ্জ দেহকান্তির দিকে আড়ে আড়ে চেয়ে দেখলে। আরতির শেষে যখন সবাই মন্দির-দ্বারপথে বেরিয়ে আসচে, তখন একজন বিদেহী ভক্ত ক্ষেমদাসকে জিজ্ঞেস করলে—প্রভু, শুনেচি বৃন্দাবনে যমুনাতীরে জ্যোৎস্নারাত্রে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা হয়—আমি কি দেখতে পাবো? আমি এখানে নতুন এসেচি।

ক্ষেমদাস বল্লেন—আপনি গিয়ে দেখতে পারেন। লোকে দেখে অনেকে, ভাগ্যবান ভক্ত হওয়া চাই।

কেবলরাম অবাক্ হয়ে পুষ্পকে বল্লে—এটা কোন্ জায়গা দিদি?

ক্ষেমদাস বল্লেন—তুমি চিনতে পারলে না ? এটা বৃন্দাবন, গোপাল-মন্দির।

পুষ্প বল্লে—আর ইনি বৈষ্ণব কবি ক্ষেমদাস—

কেবলরাম থতমত খেয়ে ক্ষেমদাসের পায়ে সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করলে। তারপর করুণাদেবীর সামনে ওকে এনে ফেলতেই ও আরও আড়ষ্ট ও কাঁচুমাচু হয়ে গেল। করুণাদেবী রহস্য করে বল্লেন—তোমার নাতনীর দৌলতে স্বর্গ পাবে তুমি।

কেবলরামের চোখ ধাঁধিয়ে গেল এই দুই দেবীর অপরূপ রূপের জ্যোতিতে। সে হাতজোড় করে বল্লে—স্বর্গ তো এখানে। আমার মত পাপী যে বৃন্দাবনে এসে আরতি দেখেচে, আপনাদের মত দেবী, এঁদের মত মহাপুরুষের দেখা পেয়েচে—আর তো কিছু বাকি নেই স্বর্গের।

পুষ্প ধমক দিয়ে বল্লে—এখন ছেড়ে দিলে আবার কুড়ুলে-বিনোদপুরের দোকানে গিয়ে বসবে তো ? আর মিথ্যে কথা বলবে !

কেবলরাম জিভ কেটে বল্লে—আর না।

—ঠিক ?

—হঠাৎ ছাড়তে পারবো না—মিথ্যে কথা বলে কি হবে। কোথায় যাই বলো তো সন্দেবেলাটা !

—কেন, এই গোপাল-মন্দিরে এসে আরতি দেখবে রোজ। কবি ক্ষেমদাস রোজ এখানে এ-সময় থাকেন, তোমায় যত্ন করবেন দাদু।

—কেউ কিছু বলবে না ?

—না, দেবমন্দিরে সবারই অধিকার। যখনই তোমার দেবদর্শনে স্পৃহা জেগেচে, বুঝতে হবে, তখনই তুমি উচ্চতর স্তরের জীব হয়ে যাবে ! ইচ্ছা মাত্রেই সিদ্ধি। চলো যমুনার ধারে দাঁড়িয়ে দেখো—

ওরা চীরঘাটের কাছে যমুনার তীরে এসে জ্যোৎস্নালোকে কিছুক্ষণ বসলো। ওদের সঙ্গে সঙ্গে করুণাদেবী ও প্রণয়দেবীও এলেন। কেবলরাম সরল লোক, ওর মনে কেমন এক ধরনের ভক্তির উদয় হোল। যমুনার দিকে চেয়ে ওর দুচোখ বেয়ে জল পড়তে লাগলো। করুণাদেবীকে বল্লে—মা, আমার কি পুণ্য ছিল পূর্বজন্মের ? বৃন্দাবন, যমুনার তীর, আপনাদের মত দেবীর দেখা পাওয়া—আজ আমার হোল কি তাই ভাবচি।

করুণাদেবী বল্লেন—কেবলরামকে রেখে এস পুষ্প, তারপর আমাদের পৌছে দেবে—

পুষ্প হেসে বক্রদৃষ্টিতে অদ্ভুতভাবে চেয়ে বল্লে—আমি পৌছে দেবো আপনাদের ! কেন ঠাট্টা করেন বলুন তো !

ফেরবার পথে কেবলরাম বল্লে—তোমায় কি যে বলি দিদি। তুমি সাক্ষাৎ দেবী, নইলে এত দয়া ! যেখানে নিয়ে গিয়েছিলে, আমার চৌদ্দপুরুষের ভাগ্যি নেই সেখানে যাই। একটা কথা দিদি বলচি। আমার নাতি রামলাল আজ দু বছর হোল এখানে এসেচে পৃথিবী থেকে। তোমায় বলতে লজ্জা হয়, সম্প্রতি রসুলপুরের এক বাগদী মাগীর পিছু পিছু ঘুরচে ছ'মাস। সে যদি জল আনতে যায়, ও তার পিছু পিছু যায়; সে যদি রান্নাঘরে রাঁধে, ও পাশে বসে

থাকে। অন্য সময় সেই মাগীর বাড়ীর উঠোনে এক তেঁতুলগাছে আখো দিনরাত বসে। কত ধমক দিলাম—কথা শোনে না। একটা উপায় করো তুমি লক্ষ্মীটি। সে মাগী ওকে দেখতেও পায় না, ওর ঘুরেই সুখ। এ কি বন্ধন বলো দিকি, দিদি? ওই তো নরক। তুমি দেবী, ওকে তুমি বাঁচাও এ নরক থেকে।

গভীর রাত্রিকাল। পুষ্প একা সন্ন্যাসিনীর আশ্রমে দেখা করতে গেল। ওঁকে দেখা পর্যন্ত কি এক অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করচে ওঁর প্রতি। না দেখা করে যেন ও থাকতে পারচে না। সন্ন্যাসিনী ওকে দেখে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করলেন। বল্লেন আপনি সেদিন এসেছিলেন না?

—হ্যাঁ, মা। আপনার দর্শনে পুণ্য, তাই দেখতে এলাম।

সন্ন্যাসিনীর প্রজ্ঞানেত্র উদ্ভাসিত, সুতরাং পুষ্পকে স্থূল আবরণে নিজ দেহকে আবৃত করতে হয়নি। সন্ন্যাসিনী বল্লেন—আপনি বিদেহী, পৃথিবীর ফলমূল নিয়ে অতিথি-সৎকার করতে পারলাম না। ত্রুটি মার্জনা করবেন।

পুষ্প লজ্জিত হয়ে বল্লে—ওকথা বলে আমায় অপরাধী করবেন না মা। আমি কত ক্ষুদ্র।

সন্ন্যাসিনী হেসে বল্লেন—আপনি ক্ষুদ্র কে বল্লে—আপনি এখানে আসবেন আমি সমাধিতে জেনেচি। আপনি আমার প্রেমভক্তি শিক্ষার উপায় করবেন।

পুষ্প সবিস্ময়ে বল্লে—আমি!

—বিশ্বের ভগবান কাকে দিয়ে কি কাজ করান, তা তো বলা যায় না।

—মা, আপনার বাড়ী কোথায় ছিল? পিতামাতা কে ছিলেন? জানবার বড় কৌতূহল হচ্চে।

—আমার দেশ ছিল পাঞ্জাবে। অল্পবয়সে আমি দীক্ষা নিই, বিবাহ হয়নি, চিরকুমারী। নানাস্থানে ঘুরে অযোধ্যায় আসি। সেখানে সে সময়ে মাঠের মধ্যে গাছের তলায় এক সিদ্ধ মহাপুরুষ বাস করতেন—সকলে তাঁকে পাগলা বাবা বলতো। পাগলের মত থাকতেন। তিনি আমায় দয়া করে যোগদীক্ষা দেন। যে সন্ন্যাসীর সঙ্গে সেদিন আপনারা এসেছিলেন, ওঁরও গুরু তিনি।

—তিনি আছেন কোথায় এখন?

—প্রায় পঞ্চাশ ষাট বছর হোল তিনি দেহ রেখেচেন। তিনি যে কত কালের লোক কেউ জানতো না। আমি কখনো সে প্রশ্ন করিনি। এখন বিদেহী অবস্থায় ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েচেন। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ ছিলেন। মাঝে মাঝে এখনও দেখা দেন। তিনিই বলেছিলেন, তুমি নারী, তোমাকে প্রেমভক্তি শিখতে হবে। অদ্বৈতভূমি থেকে নেমে তোমাকে লীলারস আস্বাদ করতে হবে। তাই অপেক্ষায় আছি। আপনি যে আসবেন তাও তিনি বল্লেছিলেন।

পুষ্পের চোখ বেয়ে দরদরধারে জল পড়লো। মনে মনে ভাবলে—ভগবানের কি খেলা! আমার মত নিতান্ত দীনহীনা, অতি সামান্য মেয়েমানুষের ওপর তাঁর কি অসীম অনুগ্রহ। এ

কি অদ্ভুত কাণ্ড, কখনো তো এমনি ভাবিনি।

ও বল্লে—আপনার কাছে সেই ঠাকুরেরা আর এসেছিলেন ?

—হ্যাঁ দেখুন, ওই এক কাণ্ড। কেন আমার কাছে ? মৃন্ময়ী বলে এক দেবী সেদিন এসেছিলেন, কোন্ গ্রামে ভাঙা মন্দিরে থাকেন—কতক্ষণ গল্প করে গেলেন। তাঁর সাধ নতুন মন্দিরে কেউ প্রতিষ্ঠিত করে। আমি বল্লাম, কোনো ধনী গৃহস্থকে স্বপ্ন দিন। আমার কি হাত ? আমি কি করতে পারি ?

—ওদের কি আপনি এমনি স্থূলচক্ষে দেখেন ?

—না, সমাধি অবস্থায় দেখা দেন। আমি বলি, আমি তোমাদের মানি না, চলে যাও। ততই আমার কাছে ভিড়। দেখুন তো মুশকিল !

—এও ভগবানের কৌশল আপনাকে প্রেমভক্তি শিক্ষা দেওয়ার। নীরস অদ্বৈতজ্ঞানী মনকে সরস করবার আয়োজন।

—আমি ওসব মানি না।

—তবে প্রেমভক্তি কি করে লাভ হবে ?

—সাকার উপাসনা মায়িক। যে মৃন্ময়ী দেবীর পূজা করবে, সে দেবীকে নিয়েই মশগুল থাকবে ; যে শ্যামসুন্দরের পূজা করবে, সে তাঁর দর্শন পেয়েই খুশি থাকবে। ও সব এক প্রকারের বন্ধন। ওতে বদ্ধ হয়ে থাকলে আরও উচ্চ ভূমিতে উঠে ব্রহ্মদর্শন তার হবে না, নিজের আত্মাকে ব্রহ্মে সে লীন করতেও পারবে না। মায়া তাকে আবদ্ধ করবে।

—আপনি যা জানেন, আমি তা জানিনে দেবী। তবে আমি এইটুকু জানি প্রকৃত ভক্ত যে, সে মুক্তি চায় না, ব্রহ্মত্ব চায় না। ভগবানের দাস হয়ে থাকতে চায়, রস আস্বাদ করতে চায়। ভক্তির পথেই সে সমাধি লাভ করে, ব্রহ্মদর্শনও তার হয়। তবে এসব আমার শোনা কথা—আমি অজ্ঞান, কি জানি বলুন। আমার সঙ্গে বৃন্দাবনে চলুন, গোবিন্দ-মন্দিরে আরতির সময় কত ভক্তের দর্শন পাবেন। তাঁরা সব বলে দেবেন।

—যাবো, আমায় নিয়ে যাবেন। একটি গৃহস্থের বৌ আছে, বড় উচ্চ অবস্থা। একপাল ছেলেমেয়ে - ছেলেকে কোলে নিয়ে হয়তো আদর করচে—অমনি সমাধিস্থ হয়ে পড়ে। সেদিন আমার কাছে সূক্ষ্মদেহে এসেছিল। সেও প্রেমভক্তি চায়—তাকেও নিয়ে যাবো।

—কি করে বিনা দীক্ষায় এমন উচ্চ অবস্থা পেলে সংসার থেকে ?

—পূর্বজন্মের অবস্থা ভাল ছিল। কর্মবন্ধনে আটকে পড়ে এ জন্মে সংসার করতে হয়েচে। সামান্য কর্ম ছিল, এ জন্মে শেষ হয়ে যাবে। তার বাড়ী এই জঙ্গলের বাইরে এক লোকালয়ে। আহীর জাতের মেয়ে। ওর অবস্থা দেখে আমি পর্যন্ত অবাক হয়ে গেছি। আমার কাছে এসে কত কাঁদে।

পুষ্প বিদায় নিয়ে চলে এল। মানুষেই দেবতা হয়ে গিয়েচে এ যে সে কত প্রত্যক্ষ করলে এই জগতে এসে ! যে মূল বাসনা আসক্তি ত্যাগ করে শুদ্ধ মুক্ত হয়েচে—সে-ই দেবত্ব প্রাপ্ত

হয়েচে, ভগবান তাকেই কৃপা করেচেন। দৃষ্টি উদার ও স্বচ্ছ না হোলে কেউই উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হয় না, অথচ মানুষকে দেবত্বে নিয়ে যাবার জন্যে ঊর্ধ্বলোকে কত ব্যবস্থা, কত আগ্রহ। তবুও কেন অন্ধত্ব ঘোচে না মানুষের, কেন রামলালের মত আশা-বৌদিদির মত জীবেরা ভুবর্লোকের অতি স্থূল আসক্তির বন্ধনে দেবত্বের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত আছে?

বুড়োশিবতলার ঘাটে যতীন একা চুপ করে বসে ছিল। পুষ্পকে দেখে খুব খুশি হোল। বল্লে—যত দেখছি, আমিও অবাক হয়ে যাচ্চি, পুষ্প। আমার চোখ খুলে যাচ্চে। তুই কিছু ভাবিসনে, পৃথিবীতে জন্ম নেবো কত বছরের জন্যে? ষাট সত্তর কি আশি? অনন্ত জীবনের তুলনায় ক'দিন? কিসের জন্ম মৃত্যু? সব ছায়া, মায়া—একমাত্র আমি অমর, অনন্ত, শাশ্বত। আমাকে কেউ কোনদিন ধ্বংস করতে পারবে না। আজকাল তোর সংসর্গে থেকে আমার চোখ খুলে গিয়েচে।

পুষ্প ওকে রামলালের কথা বল্লে। যতীন সব শুনে হাসতে লাগলো। আজকাল এই শ্রেণীর লোকের জন্যে তার গভীর অনুকম্পা জাগে। পথ দেখিয়ে দেবার কেউ নেই তাই এমনি হয়েচে—ওদের দোষ নেই।

পুষ্প বল্লে—তুমি ওর জন্যে কিছু করো। আমি সেখানে যাবো না, গেলেও তার উপকার হবে না। এক মোহ থেকে আর এক মোহে পড়ে যাবে—

—তোর সাহায্য ছাড়া হবে না পুষ্প, আমি অবিশ্যি গিয়ে দেখচি।

যতীন রামলালকে খুঁজে বার করলে। সে একটি নীচজাতীয়া মেয়ের বাড়ীর উঠানে বসেছিল। মেয়েটি ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে ধান ভানচে। তার বয়স ত্রিশ-বত্রিশের কম নয়, কালো ও অত্যন্ত কৃশকায়। সম্ভবত মাঝে মাঝে ম্যালেরিয়াতে ভোগে। মুখখানা নিতান্ত মন্দ নয়, চোখ দুটো বড় বড়—সমস্ত দেহের মধ্যে চোখ দুটোই ভালো।

রামলাল যতীনকে দেখে বল্লে—যতীনদা যে! তোমাকে কে সন্ধান দিলে হে? বুড়োটা নিশ্চয়ই। বেঁচে থাকতে জ্বালিয়েচে আবার মরেও যে একটু ফুর্তি করবো তার যো নেই। হাড় ভাজা ভাজা করলে। সেদিন এসেছিল, আমি হাঁকিয়ে দিয়েচি। বল্লাম—আমি যা ইচ্ছে করবো, তোমার বিষয়ের ভাগ তো পিত্যেশ করিনে যে তোমায় ভয় করবো। এখন আমি স্বাধীন।

যতীন হেসে বল্লে—বুড়োর দোষ নেই। সে তোমার ভালোর জন্যেই সন্ধান দিয়েচে। এই ভাবে বাঁশগাছে তেঁতুলগাছে কতদিন কাটাবে?

—দিব্যি আছি। দোহাই তোমার, তুমি আর লেকচার ঝেড়ো না।

—কিন্তু এতে তোমার লাভটা কি? কেন এর পেছনে পেছনে ঘুরচো—

—আমার দেখেই সুখ। ওর নাম সোনামণি। সোনামণি ধান ভানে, আমি ঐ খুঁটির পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি; আমতলার পুকুরঘাটে নাইতে যায় একা একা—আমি সঙ্গে যাই, যতক্ষণ না নাওয়া হয়, আমি নোনাগাছে বসে বসে দেখি। রাত্রে ও রাঁধে—আমি রান্নাঘরের কোণে চুপ করে বসে থাকি। বেশ চমৎকার দেখতে সোনা, অমন চেহারা ভদ্দরলোকের ঘরে

হয় না। শরীরের বাঁধুনি কি!···আমি তো কোনো অনিষ্ট করচিনে কারো, বসে থাকি এই মাত্র।

—নিজের অনিষ্ট নিজেই করচো। ওপরে উঠতে পারবে না। পৃথিবীর বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে।

—থাকি থাকবো। বেশ ফুর্তিতেই আছি—আমি ওপরে উঠতে চাইনে, নীচেও নামতে চাইনে। স্বর্গে-টর্গে তোমরা থাকো গিয়ে! আর ওই বুড়োটা যে দোকানের গদিতে বসে আছে দিনরাত, তাতে বুঝি দোষ হয় না? ওটাকে পারো তো তোমাদের স্বর্গে নিয়ে যাও টেনে। আমাকে ছেড়ে দিয়ে যাও এখানে, বেশ আছি। কেন আর জ্বালাও দাদা, বেঁচে থেকে এমন আনন্দে থাকিনি। বেঁচে থাকতে এমন করলে আমায় ওর স্বামী লাঠি নিয়ে তাড়া করতো—এ বেশ আছি, কেউ টের পায় না।

—চলো আমার সঙ্গে এক জায়গায়, তোমায় নিয়ে যাবো—

—আমায় মাপ করো ভাই। সোনামণিকে ফেলে আমি পাদমেকং ন গচ্ছতি—

—থাক্, আর দেবভাষাকে ধ্বংস করে লাভ নেই! এখন আমার সঙ্গে চলো—যাবে?

রামলাল যতীনের ইঙ্গিতে সোনা বাগ্‌দিনীর বাড়ীর উঠোন থেকে অল্পদূরে একটা বাঁশঝাড়ের তলায় গিয়ে দাঁড়ালো। কতদিন পরে শীতের দিনে ঝরা শুকনো বাঁশপাতার ধুলোভরা গন্ধ আজ যতীনের নাকে এসে লাগচে। যেন সে দেহেই বেঁচে আছে—পৃথিবী মায়ের বুকের দুলাল। বনমূলোর গাছ কুচি কুচি সাদা ফুলে ভর্তি—দু'চারটে বাঁশঝাড়ের পরেই দিগন্তব্যাপী ধানের ক্ষেত, সবে ধান কাটা হয়ে গিয়েচে অঘ্রাণের শেষে। শুকনো ধানের গোড়া এখনো ক্ষেতের সর্বত্র।

যতীন বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, রামলাল অধীর ভাবে বল্লে—কি বলচো বলো যতীনদা।

যতীন বল্লে -ও কি? আবার ওপাড়ার পুকুরঘাটের দিকে চাইচো কেন? কে আছে ওখানে?

রামলাল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লে—নাঃ—বামুনের মেয়ে।

—আবার কি?

—ওই যে সাদা কোঠাবাড়ীটা—ওই বাড়ী থেকে রোজ বেরিয়ে পুকুরঘাটে নায়। বামুনবাড়ী।

—তাই হয়েচে কি?

—ষোল সতেরো বছর বয়েস। দেখবে? এসো, এসো—এতক্ষণ নামচে জলে। নামটি বেশ, সন্ধ্যারাণী। ফর্সা, একরাশ চুল, একটু পরে ভিজে কাপড়ে নেয়ে বাড়ী ফিরবে। মুখখানি বড় চমৎকার। ছিপছিপে লিকলিকে সরু বেতের মত হেলে পড়ে পড়ে। মুক্তোর মত ঝক্‌ঝক্ করে দাঁতগুলো যখন হাসে। সর্বদাই হাসচে।

—তাতে তোমার কি?

—আমার কিছু না। বামুনের মেয়ে। ওরা মুখুয্যে।

—মরে গিয়েচ, এখন আবার বামুন-শুদ্দুরই বা কি? ওতে কি তোমার লাভ?

রামলাল জিভ্ কেটে দু'হাত তুলে নমস্কার করে বল্লে—বাপ্‌রে! ও কথা বলতে নেই। বামুন জাত! আমরা হলাম তেলি তাম্‌লী। আমি শুধু চোখে দেখেই খুঁশি। আমার ও সব উঁচু নজর নেই দাদা। সোনামণির হেঁসেলে বসেই আমার সব। ওকে পেয়েই আমার বেশ চলে যাচ্ছে।

—পেলে আর কি করে তা তো বুঝলাম না।

—ওরই নাম পাওয়া। দেহে নেই, কি করবো বলো। সত্যি, একটা কথা দাদা। পৃথিবীতে জন্মাবার কৌশলটা বলে দিতে পারো? দেহ না ধরলে কোনো সুখ নেই। মেয়েদের ভালো করে পাইনি জীবনে। ওদের না পেয়ে জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে গিয়েচে আমার।

—কেন, তুমি তো বিয়ে করেছিলে?

রামলাল বিরক্তির সঙ্গে মুখ খিঁচিয়ে বল্লে—আরে দূর, বিয়ে!—সে ওই বুড়োটার পাল্লায় পড়ে। নাতবৌএর মুখ না দেখে নাকি মরবে না! আমার ঘাড়ে যা তা একটা চাপিয়ে দিয়ে বুড়ো তো পটল তুললো। আজকাল কেমন সব স্কুলে কলেজে পড়া মেয়ে দেখিচি কলকাতায়। তাদের শাড়ী পরবার কায়দাই আলাদা। কথাবার্তার ধরনই আলাদা।—না সত্যি যতীনদা, তুমি আমার যথার্থ উপকার করবে, আমায় জন্ম নেওয়ার কৌশলটুকু বলে দাও দাদা। মেয়েমানুষের সঙ্গে দুদিন প্রাণভরে ভালবাসা করে মিলেমিশে আসি দুনিয়াতে ফিরে। আমার বুকের ভেতরটা সর্বদা হু হু করে দাদা। ও জিনিসটা আমি জানিনি—সত্যিকার মেয়েমানুষ পাইনি। স্বগ্‌গে-টগ্‌গে তোমরা যাও—আমি তো কারো কোনো অনিষ্ট করতে চাইচিনে ভাই। আমার নেয্য অধিকার চাইচি। সবাই দিব্যি কত ফুর্তি করচে—আমি অল্পবয়সে মরে গেলুম, যে বয়সে ভোগ করার কথা সেই বয়সে। আমার একটা হিল্লে করো, তোমার পায়ে পড়ি দাদা। মেয়েমানুষ না পেলে স্বগ্‌গে গিয়ে আমার কোনো সুখ হবে না। বুড়োটার সঙ্গে দেখা হোলে তাকেও বোলো। তিনি এখন আসেন আমায় উপদেশ দিতে! তুমি জানো, বিয়ের আগে বঙ্কু পালের মেয়ে সরলার সঙ্গে আমার একটু ভাব হয়েছিল। মেয়েটা কেষ্টনগরে মেয়ে-ইস্কুলে পড়তো। দুবার আমার সঙ্গে লুকিয়ে আলাপ করেছিল। টাকা পাবে না বলে ঐ বুড়ো সেখানে আমার বিয়ে দিতে চাইলে না। সেও দিব্যি মেয়ে ছিল।

—এখন সে কোথায়?

—কেষ্টনগরে বিয়ে হয়েচে। শ্বশুরবাড়ী থাকে। আমি সেদিন গিয়ে একবার দেখে এসেচি। কষ্ট হয় বলে যাইনে। তার চেয়ে আমার সোনামণিই ভালো। কি চমৎকার একটি তিল ওর নাকের বাঁ-দিকে—দেখনি?…চল্লে? তাহলে—শোনো শোনো—তোমাদের তো অন্তর্ধান হোতে সময় লাগে না একমিনিটও। এই আছো এই নেই। তোমরা হোলে স্বগ্‌গের মানুষ। তাহলে—আমার একটা উপায়—

যতীন ততক্ষণে বুড়োশিবতলার ঘাটে এসে পৌঁছেচে। পুষ্পের প্রশ্নের উত্তরে বল্লে—হোল না। একেবারে বুভুক্ষু আত্মা। ওকে পুনর্জন্মে পাঠাবার ব্যবস্থা করো পুষ্প। মেয়েমানুষের

কথা বলতে অজ্ঞান। ভোগ না করলে ওর নারীতে আসক্তি যাবে না।

পুষ্প হেসে বিজয়িনীর মত দর্পিত সুরে গ্রীবা বাঁকিয়ে বল্লে—স্বর্গে মেয়েমানুষের অভাব? যদি বলো আজই তাকে দেখিয়ে দিয়ে আসি কাকে মেয়েমানুষ বলে! করুণাদেবীকেও নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দিই—মূর্ছা হয়ে পড়ে যাবে তক্ষুনি।

যতীন মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওর বিদ্যুল্লতার মত অপূর্ব কান্তির দিকে চেয়ে বল্লে তুমিই যথেষ্ট! আর তাঁকে নিয়ে যেতে হবে কেন। মূর্ছা তো দূরের কথা, একদম পাগল হয়ে ক্ষেপে যাবে। কিন্তু তার দরকার নেই। বিভ্রান্তই করে দেওয়া হবে, উপকার কিছু হবে না তাতে।

পুষ্প কৃত্রিম রাগের সুরের রেশ তখনও টেনেই বল্লে—না, আমার রাগ হয়েচে শুনে যে, সে মূর্খ বলে স্বর্গে নারী নেই! নারীকে খুঁজতে যেতে হবে পৃথিবীতে!

—তোমরা চোখ ধাঁধিয়ে বেচারীকে পাগল করেই দিতে পারো, কিন্তু সে যা চায় তা দেবে কোথা থেকে? ওকে পাঠিয়ে দাও পৃথিবীতে। একজোড়া আগ্রহভরা কালো ভ্রমরচোখের চাউনি ওর দরকার হয়েচে।

—আচ্ছা, যতুদা, আমি যদি ওকে একেবারে আজন্ম ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী করে দিতে পারি?

—জন্ম নেওয়ার পরে?

পুষ্প হাসি-হাসি মুখে বল্লে—হ্যাঁ। নয়তো কি এখানে?

—কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো দরকার কি? আত্মাকে তার স্বাভাবিক পথে তার স্বাভাবিক গতিতে যেতে দাও।

—এই কথাটিই আশা-বৌদির বেলা তুমি এতদিন বুঝতে চাইতে না যতুদা। অপরের বেলাতে বেশ বুঝলে।

যতীন চুপ করে রইল।

ওপারের হালিসহরের শ্যামাসুন্দরীর মন্দিরে সন্ধ্যার আরতিধ্বনি শোনা গেল। গঙ্গার বুকে সান্ধ্য আকাশের প্রতিচ্ছবি।

সেদিন আশা একা পাথরের ওপরে বসে খুব কাঁদছিল।

একজন বিকটাকৃতি সাধুপুরুষের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল একদিন এই মরুভূমির ও পাহাড়ের দেশে। তিনি ওকে বলেচেন—পৃথিবীর মৃত্যুর পরে সাত লোক, প্রত্যেক লোকে আবার সাতটা স্তর। প্রত্যেক বার মানুষকে মরে নতুন দেহ ধরে নতুন স্তরে জন্ম নিতে হয়—ইত্যাদি। আশার মাথায় ওসব জটিলতা ঢোকে না—এক এক সময়ে সে বেশ বুঝতে পারে সে মরেই গিয়েচে বটে। কিন্তু মরেও তো নিস্তার নেই, দুবার তো মরা যায় না—না হয় আবার চেষ্টা করে দেখতো। কোথায় গেল মা, বাবা, স্বামী, ছেলেমেয়ে—এ কি বিশ্রী জীবন, না আছে আশার আলো, না আছে আনন্দ, না আছে ভালবাসা, স্নেহ, দয়া। কেন মিছে বেঁচে থাকা? অথচ মরতেও তো পারে না। এ কি বন্ধন!

সেই যে একদিন স্বামীকে সে দেখলে, যেন তার পুরোনো শ্বশুরবাড়ীর ঘরে সে গেল—

কথাবার্তা বল্লে স্বামীর সঙ্গে। কি অদ্ভুত আনন্দে দিনটা কেটেছিল—যত অল্প সময়ের জন্যেই দেখা হোক না কেন। নাঃ—কোথায় কি যে সব হয়ে গেল ওলটপালট। সংসার গেল ভেঙে। সে হোল অল্পবয়সে বিধবা। কত আশার স্বপ্ন দেখেছিল সে বিয়ের রাত্রে—সব মেয়েই দেখে। কেন তার ভাগ্যে এমন হোল! এই এক জায়গা—এমন ভয়ঙ্কর স্থান সে কখনো দেখেনি। মাঝে মাঝে ওর চারিধারে অন্ধকার ঘিরে আসে, মাঝে মাঝে আলো হয়। গাছ নেই পালা নেই—পাথর আর বালি। চারিধারে উঁচু উঁচু পাথরের ঢিবিমত। যতদূর যাও, কেবল এমনি। মানুষ নেই, জন নেই।

মাঝে মাঝে কিন্তু অতি বিকট আকারের দু-একজন লোক দেখা যায়। অসহায় স্ত্রীলোককে একা পেয়ে তাদের মধ্যে দুবার দুজন আক্রমণ করতে ছুটে এসেছিল। একবার কে এক দেবী (কোথা থেকে এসেছিলেন, তাঁর নাম পুষ্প—বৌদিদি বলে ডেকেছিলেন তার মত সামান্য মেয়েকে) তাকে উদ্ধার করেন। আর একবার কেউ রক্ষা করতে আসেনি—একা ছুটতে ছুটতে সে এক পাহাড়ের গুহায় ঢুকে গেল। আশ্চর্যের বিষয়, যে তার পিছু পিছু ছুটে আসছিল—সে তাকে আর খুঁজে পেলে না।

গৃহস্থের মেয়ে, গৃহস্থঘরের বৌ—এ কি উৎপাত তার জীবনে!

কি জানি, সেদিন শ্বশুরবাড়ীতে কি ভাবে যে সে স্বামীকে দেখেছিল ··সেই থেকে তার মন অন্যরকম হয়ে গিয়েচে। কেবলই সাধ হয় আবার সেই শ্বশুরবাড়ীর ভাঙা কোঠার ঘরে সে তার ছোট্ট সংসার পাতবে, বাঁশবাগানের দিকের রান্নাঘরটিতে বসে বসে কত কি রান্না করবে। ডাল, মোচার ঘণ্ট, সুক্তনি (উনি সুক্তনি বড় ভালবাসেন), কই মাছের ঝোল মানকচু দিয়ে···

উনি এসে বলবেন—কি গো বৌ, রান্না কি হয়ে গেল?

—এসো···হয়েচে। হাত পা ধুয়ে নাও—জল গরম করে রেখেচি। বড্ড শীত আজ।

মাটির প্রদীপ জলচে রান্নাঘরের মেজেতে কাঠের পিলসুজে। তালপাতার চেটাই পেতে স্বামীকে আশা বসতে দিলে। মুখ দেখে মনে হোল উনি খুব ক্ষুধার্ত।—হ্যাগা, একটু চা করে দেবো?

—তা দাও, বড্ডই শীত।

—কাপগুলো সব ভেঙে ফেলেচে খোকা। কাঁসার গেলাসে খাও—ওবেলা দুটো কাপ কিনে নিয়ে এসো না গা কুড়ুলের বাজার থেকে!···চা খেতে খেতে উনি কত রকম মজার গল্প করচেন। সে বসে বসে শুনচে একমনে। সুন্দর দিনগুলি স্বপ্নের মত নেমেছিল তার জীবনে। আনন্দ···অফুরন্ত আনন্দ···সে সতী, পবিত্র, সাধ্বী। স্বামী ছাড়া কাউকে জানে না।

হঠাৎ আশা চমকে উঠলো। সে কার মুখের দিয়ে চেয়ে আছে? কে তার সামনে বসে চা খেতে খেতে গল্প করচে? তার স্বামী নয়—এ তো নেত্যনারাণ! কুড়ুলে বিনোদপুরের বাড়ী নয়—এ কলকাতার মানিকতলার সেই বাড়ীউলি মাসীর বাড়ী, সেই রান্নাঘর, তাদের ছোট্ট কুঠুরিটার সামনে ফালিমত রান্নাঘরটা। ওই তো রান্নাঘরে, তার হাতে তৈরী সেই দড়ির শিকে, হাঁড়িকুড়ি ঝুলিয়ে রাখবার জন্যে সে নিজের হাতে ওটা বুনেছিল মনে আছে। ওই তো

সেই তাদের ঘরখানা, জানালা দিয়ে একটুখানি দেখা যাচ্ছে, মুগের ডালের হাঁড়ি, বিছানার কোণটা।…উঃ! বিছানাটা দেখে ওর গা কেমন ঘিন্ ঘিন্ করে উঠলো। এই যে খানিকটা মাত্র আগে সে নিজেকে সতী সাধ্বী, স্বামী-অনুরক্তা, পরম পবিত্রা, আনন্দময়ী রূপে বর্ণনা করে মধুর আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিল, কোথায় গেল ওর সে আত্মপ্রসাদের পবিত্রতা ও নির্ভরশীলতা! সে ঐ বিছানায় একসঙ্গে শোয়নি নেত্যদার সঙ্গে? এই পুরু ঠোঁটওয়ালা, চোখের কোণে কালি ইন্দ্রিয়াসক্ত নেত্যদা, যার মুখ দিয়ে এই মুহূর্তে এখনি মদের গন্ধ বার হচ্চে…যার অত্যাচারে তাকে আফিং খেয়ে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে মরতে হয়েছিল। ওই তো সেই তক্তাপোশ, যার ওপরে সে ছট্‌ফট্ করেছিল আফিং খেয়ে।

আশা চমকে শিউরে উঠতেই নেত্যনারাণ দাঁত বার করে বল্লে—বলি, আর একটু চা দেবে, না একেবারে গরম গরম ভাতই বাড়বে? বড় রাত হয়ে গেছে। খেয়ে-দেয়ে চলো শুয়ে পড়া যাক্। যে শীত পড়েচে!

আশা কাঠ হয়ে বসে রইল। এ কোথা থেকে কোথায় সে এসে পড়ল। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস এ!

নেত্যনারাণ বল্লে—সত্যি, আমিও যে দিনকতক তোমায় খুঁজে খুঁজে বেড়িয়েচি কত! তারপর—

আশার মুখ দিয়ে আপনা-আপনিই বেরুলো—কি তারপর?

—তারপর কে যেন টেনে নিয়ে এল আমায় এখানে। উঃ, সে কি আকর্ষণ! আমি বলি কোথায় যাচ্চি—তারপরেই দেখি আমি একেবারে বাড়ীউলি মাসীর বাড়ীতে মানিকতলায়। একেবারে তোমার কাছে। চল গিয়ে শুইগে যাই। রাত হোল অনেক।

বিরক্তি, ভয়, হতাশা ও অপবিত্রতার অনুভূতিতে আশার সর্বশরীর যেন জলে উঠলো আগুনের মত। সে যে এইমাত্র তার শ্বশুরবাড়ীর সেই পবিত্র কোঠাবাড়ীতে তার স্বামীর সঙ্গে ছিল—প্রথম বিবাহিত জীবনের সেই স্মৃতিমধুর রাত্রির ছায়ায়; কেন এই অপবিত্র কলঙ্কিত শয্যাপ্রান্তে তার আহ্বান? এ কি নিষ্ঠুরতা।

ও বলে উঠলো—আমি যাবো না। তুমি তো আমায় ফেলে বাড়ী পালিয়ে ছিলে? কেন আবার এলে তবে? আমায় ছেড়ে দাও। আমি যাবো না ঘরে।

নেত্যনারাণ ঝাঁঝালো সুরে বল্লে—যাবে না শুতে? তবে কি সারারাত এখানে বসে থাকতে হবে নাকি?

—আমি আর মানিকতলায় নেই—আমরা মরে গিয়েচি। তুমি আর আমি দুজনেই। চলে যাও তুমি আমার কাছ থেকে—তুমিও মরে গিয়েচো।

নেত্যনারাণ অবাক হয়ে বল্লে—কি যে বলো তুমি। ঠাট্টা করচো নাকি? এই দ্যাখো সেই মানিকতলায় আমাদের ঘর, চিনতে পারচো না? যাবে কোথায় নিজেদের আস্তানা ছেড়ে? ক্ষেপলে নাকি? চলো—চলো—

আশা কলের পুতুলের মত ঘরের মধ্যে গিয়ে বিছানাটিতে শুয়ে পড়লো। ওর সর্বশরীর

ঘৃণায় রি রি করচে, বমি হয়ে যাবে যেন এখনি। সমস্ত দেহ মন যেন অপবিত্র হয়ে গিয়েচে ওর, সকালে উঠে গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে না এলে এ ভাব যেন যাবে না। যাবে সে গঙ্গাস্নানে—ভোরে উঠেই যাবে বাড়ীউলি মাসীকে নিয়ে।

নেত্যনারাণ ঘরে ঢুকে দোরে খিল বন্ধ করে দিলে।

আশা অসহায় আর্ত্ত স্বরে বলে উঠলো—ও কি! খিল দিলে যে?

নেত্য ওর দিকে চেয়ে কড়া, নীরস কণ্ঠে বলে উঠলো—কী ন্যাকামি করচো সন্দে থেকে! সরে শোও, ওপাশে যাও!

আশা বিদ্রোহিণীর ভঙ্গিতে বিছানাতে উঠে বসে বল্লে—খিল খুলে দাও বলচি। আমি থাকবো না এ ঘরে। আমি তোমার সঙ্গে থাকবো না এক ঘরে—বাড়ীউলি মাসীর সঙ্গে শোবো—

নেত্যনারাণ ভীষণ রেগে আশার চুলের মুঠি ধরে বিছানায় ঘুরিয়ে ফেলে দিয়ে বাজখাঁই স্বরে বল্লে—তোর মেয়েমানুষের না নিকুচি করেচে—ভালো কথায় কেউ নও তুমি। যত বলচি রাত হয়েচে শুয়ে পড়। তোমার হাড় ভেঙে চূর্ণ করবো বেশি নেকুগিরি যদি করবি। ভুলে গিইচিস্ নেত্যনারাণকে—হাত ধরে একদিন বেরিয়ে এসেছিলি মনে নেই? সেদিন কে আশ্রয় দিত তোকে, আমি যদি না এখানে আনতাম! কোন্ বাবা ছিল তোর সেদিন?

—খবরদার, বাবা তুলো না বলচি—আমি চলে যেতে চাই এখান থেকে।

—তবে রে বেইমান মাগি—তোকে মজা না দেখালে—

কথা শেষ না করেই নেত্যনারাণ আশাকে আথালি-পাথালি কিলচড় মারতে লাগলো। খাট থেকে মেজের ওপর ফেলে দিলে তলপেটে লাথি মেরে।…

কেউ নেই কোনো দিকে। আশা মেজের ওপর গড়িয়ে পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠলো, আর্ত্ত অসহায় স্বরে—ওর বেদনার্ত্ত পশুর মত চাপা রুদ্ধ চীৎকারে মানিকতলার বাড়ীউলি মাসীর বাড়ীটা কেঁপে কেঁপে উঠেছিল যেন। কেন এমন হোল? সে যে ভাল হোতে চেয়েছিল, সে যে সব ভুলতে চেয়েছিল, সে যে শ্বশুরবাড়ীতে গিয়েছিল প্রথমযৌবনের বিবাহিত দিনের স্মৃতিমধুর অবকাশে…সেই মাধবী রাত্রির শুভ আহ্বান কেন এ কলঙ্কিত বাড়ীর কলঙ্কিত শয্যাপ্রান্তে উপপতির নিষ্ঠুর আহ্বানে পরিণত হোল? হা ভগবান।

পরদিন সকালে উঠে আশা ছুট্ দিলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে।

কেউ ওঠেনি বাড়ীতে। বাড়ীউলি মাসী ঘুমুচ্ছে, পাশের ঘরে পাল মশাই এরা ঘুমুচ্চে…এই ফাঁকে খিল খুলে আশা পালাচ্চে সুপ্ত কলকাতা শহরের রাস্তা দিয়ে। সে কোথায় যাচ্ছে, কি বৃত্তান্ত কিছুই জানে না। গতরাত্রির অপবিত্র স্মৃতিতে ওর গা ঘিন ঘিন করচে…না, আর এসব নয়। তাকে ভালো হতে হবে। সে চায় না এ পাপ সঙ্গ। উপপতির আসঙ্গলিপ্সা তার মন থেকে মুছে ধুয়ে গিয়েচে কবে, বমি হয় সে কথা ভাবলে, মরার পরেও যেন গা বমি বমি করে। যতদূর হয় চলে যাবে, গঙ্গাস্নান করে শুদ্ধ হবে, এ পাপপুরীর ত্রিসীমানায় আর সে আসবে না। ভগবান তাকে রক্ষা করুন। সে বেঁচে নেই, যেখানে খুশি সে যেতে পারে।

কলকাতা শহর অনেকদূরে মিলিয়ে গেল।

পৃথিবীর পাপস্মৃতি আর তাকে কষ্ট দেবে না। অনেকদূর সে চলে এসেচে বাড়ীউলি মাসীর কাছ থেকে। এ তার শৈশবের নিষ্পাপ দিনগুলিতে সে ফিরে গিয়েচে।

সে যেন তাদের গ্রামে মুখুয্যেদের পুকুরপাড়ে নিতাই ভড়দের বাড়ী নিতাই ভড়ের মেয়ে সুবির সঙ্গে খেলা করতে গিয়েচে। ঐ তাদের পাড়ার পুকুরপাড়ের সেই বড় তেঁতুলগাছটা। ওই নিতাই ভড়ের বাড়ীর উঠোনের ধানের গোলা। নিষ্পাপ, সুন্দর শৈশবকাল। এখানে শুধু তার মাকে সে জানে, কোনো স্মৃতি তার মনে নেই—হেমন্তের প্রথম শিশিরাদ্র গ্রাম্য মাঠে নব ধান্যগুচ্ছের আন্দোলনের মত তার জীবনের আনন্দে চঞ্চল, ঝরা শিউলিফুলের সুবাস-সুরভিত জীবনের অতি মধুর প্রভাত···

—সুবি—ও সুবি—খেলবিনে আজ, বাইরে আয় ভাই—

সুবি বাইরে এসে বল্লে হাসিমুখে—আশাদি, কোথায় ছিলি, রে? ক'দিন খেলতে আসিসনি—

আশা খুশি হোল। এ তার সত্যিকার শৈশব। সে বেঁচে গেল। এই তার সুন্দর, মধুর আশ্রয়। তার মা—এখুনি তার মা ডাকতে আসবে তাকে। খুশির সুরে পরম নির্ভরতার সঙ্গে আশা ডাকলে সুবিকে। সুবি ছুটে এল, ওর হাতে একটা পেঁপের ডাল।

—কি হবে রে পেঁপের ডাল?

—বাজাবো। এই ছাখ্—

সুবি পেঁপের ডালের ফুটোতে মুখ দিয়ে পোঁ পোঁ করে বাজাতে লাগলো।

আশা হাততালি দিয়ে হেসে উঠলো খুশি হয়ে। কি মজা! কি মজা!

সুবি বললে— চল, মুখুয্যেদের নন্দিনী দিদি শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেচে—দেখে আসি।

—না ভাই, মা বকবে।

—বাড়ীতে বলে আয় না? নন্দিনী দিদিকে দেখেই চলে আসবো—

—চল্ তবে। কিন্তু ভাই দেরি করা হবে না—

ওরা কত জায়গায় খেলা করে বেড়ালে। বনমূলো-ফুলের বড়া ভেজে খাওয়ার অভিনয় করলে।

শৈশবের অতিপরিচিত সব খেলার জায়গা। নন্দিনী দিতি কত বড়, ওদের মায়ের বয়সী, ওদের দুজনের আর কি বয়সটা? নদীর ওপর মেঘ আসচে, কতদূর থেকে অকালবর্ষার মেঘ ভেসে আসচে আকাশ ভরে। হেমন্তে কাশ ফুলের শোভা।

সুবি বল্লে—বেলা বেশি হয়েচে—বাড়ী ফিরি—

—হ্যাঁ চল্ ভাই—মা বকবে—

মা তাকে বকবে সে জানে। টক কাঁচা তেঁতুল খাওয়ার জন্যে বকবে, এতক্ষণ বাইরে থাকার জন্যে বকবে। তারপর রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে ওকে খাইয়ে দেবে। উত্তরের ঘরে ওর জন্যে মাদুর পেতে অন্নপূর্ণা দিদি ছেলেমেয়ে নিয়ে শুয়ে আছে। খেয়ে গিয়ে অন্নপূর্ণা দিদির

পাশে ও শুয়ে ঘুমিয়ে পড়বে।

সুবি বল্লে—আমাদের বাড়ী দুটি ভাত খাবি আশা ?

—দূর, তোরা জেলে। জেলের বাড়ী বুঝি বামুনের মেয়ে খায় ?

—লুকিয়ে ?

সুবি হাসলে। ওর বড্ড বন্ধু সুবি। কষ্ট হয় সুবির মনে দুঃখু দিতে। তবু সে বল্লে—না ভাই সুবি, কিছু মনে করিস্ নি। আমার বাড়ীতে ভাত তো হয়েইচে—

—বড়ি-ভাতে তাত খাবিনি আমার সঙ্গে ? মা নতুন বড়ি দিয়েচে—

—দূর, বড়ি বুঝি এখন দেয় ? বড়ি দেয় সেই মাঘ মাসে। নতুন কুমড়ো নতুন কলাই-এর ডাল উঠলে। মিথ্যে কথা বলিস্নি সুবি।

—মিথ্যে বলিনি। পুরোনো ডালের বুঝি বড়ি হয় না ? চল্ আমার সঙ্গে—

আশা বাড়ী ফিরচে। বেলা অনেক হয়ে গিয়েচে। মুখুয্যেদের পুকুরঘাটে আর কেউ নাইচে না, সবাই নেয়ে বাড়ী চলে গিয়েচে। তেঁতুলের ডালে মোটা মোটা কাঁচা তেঁতুল ঝুলছে দেখে ওর জিবে জল এল।

দুটো তেঁতুল পাড়লে হোত। কিন্তু কি করে পাড়ে ? সুবিকে বল্লে হোত, সে অনেক রকম বুদ্ধি ধরে, একটা কিছু উপায় করতে পারতো।

পুকুরপাড়ের সরু রাস্তা ধরে খানিকদূর গিয়ে ওদের বাড়ী। সারি সারি পেঁপে গাছ। একটা ধানের গোলা। তাদের মুচিপাড়ার ধানের ক্ষেত থেকে বছরের ধান এসে গোলা ভর্তি হয়। এখুনি সব চোখে পড়বে।

কিন্তু একটু যেন অন্যরকম।

পেঁপে গাছের সারি নেই। ধানের গোলা নেই। তাদের বাড়ীর চটা-ওঠা ভাঙা পাঁচিলটা নেই। এ কোথায় সে যাচ্ছে ? তাদের বাড়ীটা নয়। আতঙ্কে ওর বুকের মধ্যে যেন ঢেঁকির পাড় দিতে লাগলো। বাড়ীউলি মাসীর বাড়ীর সেই দোরটা। মানিকতলার বাড়ীউলি মাসী। আশা চীৎকার করে পেছনে ফিরে পালাবার চেষ্টা করতেই নেত্যনারাণ দোর খুলে বের হয়ে এসে বল্লে—কোথায় ছিলে এতক্ষণ চাঁদ ? কাল দু'এক ঘা দিয়েছিলাম বলে রাগ হয়েচে বুঝি ?

তারপরেই সে আশার মুখের কাছে হাত নেড়ে নেড়ে ইতরের ভঙ্গিতে গাইলে তুড়ি দিতে দিতে—

দুটো কথা কি তোমার প্রাণে সয় না ?
একঘরে ঘর করতে গেলে ঝগড়া কি, প্রাণ, হয় না ?
দুটো কথা কি—

এসো এসো শোবে এসো—বেলা হয়ে গিয়েচে।

ব্যাধবিদ্ধা হরিণীর মত আশা ছট্‌ফট করতে লাগলো নেত্যনারাণের হাতে।

তারপর সে দুম দুম করে নিষ্ঠুরভাবে মাথা কুটতে লাগলো ঘরের চৌকাঠে। সে আজ মরে যাবে। এ কলঙ্কিত জীবন সে রাখতে চায় না। ব্যথা লাগচে, রক্তারক্তি হচ্চে—কিন্তু সে মরতে

পারবে না। সে অমর। অনন্ত কাল ধরে সে মাথা কুটলেও মরবে না।

নেত্যনারাণ তাকে হাত ধরে ওঠাতে লাগলো। বলতে লাগলো—কি পাগলামি করো, ক্ষেপলে নাকি? চলো শুই গিয়ে—

সন্ধ্যাবেলা উনুনে আঁচ দিয়েচে ঘরে ঘরে। নেত্যনারাণ বাড়ী নেই, কোথায় গিয়েচে। ও এসে বাড়ীউলি মাসীর দরজায় দাঁড়ালো। কোথায় সে পালাবে তাই ভাবচে। এ কি ভয়ানক নাগপাশের বন্ধনে তাকে পড়তে হয়েচে। আর সে এ বাড়ীতে থাকতে পারবে না। ঐ ঘরে কত রাত্রে কুলবধূর জীবন কলঙ্কিত হয়েচে। তারপর ঐ ঘরের ঐ তক্তপোশে বিষ খেয়ে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করতে করতে তার সে শোচনীয় মৃত্যু! আবার সে বেরিয়ে পড়লো।

এই কলকাতা শহরের সর্বত্র তার স্মৃতির বিষ ছড়ানো। কালীঘাট? কালীঘাটে কি করে যাবে, নেত্যদা সেখানেও একবার তাকে নিয়ে গিয়ে সেখানে বিষ ছড়িয়ে এসেচে। আবার সে ছুটে চলে যাবে কুড়ুলে-বিনোদপুরে স্বামীর ঘরে। সেখানে যেতে পারলে সে বাঁচে।

কিন্তু একদিন কেমন করে হঠাৎ গিয়ে পড়েছিল—সেইদিন গিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখাও হয়েছিল। কিন্তু সেখানে যাবার পথ সে জানে না। চিনে আজ আর যেতে পারবে না। ভুলে গিয়েচে সে পথটা।

তার এক সইএর বাড়ী আছে সুবর্ণপুরে। সেখানকার রজনী ডাক্তারের মেয়ে। কুমারী-জীবনের বন্ধু। রজনী ডাক্তারের বাড়ীর পাশে ছিল ওর বড়দিদির শ্বশুরবাড়ী, যে বড়দিদি বিধবা হয়ে ইদানীং ওদের সংসারে ছিলেন। জামাইবাবুর সঙ্গে একবার দিদির ওখানে বেড়াতে গিয়ে সুবর্ণপুরে রজনী ডাক্তারের মেয়ে বীণার সঙ্গে আলাপ হয়।

তাদের কাঁটালতলায় দুর্গাপিঁড়ি পাতা দেখে আশা বলতো—ভাই সই, কাঁটালতলায় দুর্গাপিঁড়ি কেন?

বীণা বলতো—দুর্গাপিঁড়ি ঘরে তুলতে নেই আমাদের। বাপঠাকুরদার আমল থেকে কাঁটালতলাতেই থাকে—

সইএর বিয়ে হয়েছিল কাঁচরাপাড়ার কাছে বাগ বলে গ্রামে। বাগের দত্তদের বাড়ী, তারা ওখানকার নাম-করা জমিদার। সই যদি তাকে আশ্রয় দেয়, সেই পবিত্র কুমারী-জীবনে সে লুকুতে পারে। কলকাতার বাড়ীউলি মাসীর বাড়ী থেকে সে চলে যাবে সোজা—সুবর্ণপুর গ্রামের সেই কাঁটালতলায়, যেখানে সইদের দুর্গাপিঁড়ি পাতা থাকে সারা বছর।

উনুনের আঁচের ধোঁয়ায় অন্ধকারে অস্পষ্ট সিঁড়ির পথ বেয়ে সে নেমে এল রাস্তায়। কি জানি কেন, বাড়ীটা থেকে সামান্য একটু দূরে চলে এলেও ও নিজেকে পবিত্র মনে করে। মনের সব গ্লানি কেটে যায়···সে নির্মল, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ আত্মা··· এতটুকু পাপের বা মলিনতার ছোঁয়াচ লাগেনি তার সারা দেহমনে।

হঠাৎ কেমন করে সে রজনী ডাক্তারের কোঠাবাড়ীটার উঠোনে নিজেকে দেখতে পেলে। সেই কাঁটালতলায়।

—ও সই!

—ও মা—কত কাল পরে এলি তুই ? ভাল আছিস্ সই ?

বীণার বিয়ে হয়নি, সিঁথিতে সিঁদুর নেই। বীণা এসে ওকে জড়িয়ে ধরলে কত আদরে।

আশা আনন্দে ও উৎসাহে অধীর হয়ে উঠলো। বীণাকে বল্লে—সই, তুই আমাকে ধরে রাখ্ ভাই। কোথাও যেতে দিস্ নি।

—না, থাক্ এখানে। কোথাও যেতে দেবো না—

—ভাই, এ সত্য না স্বপ্ন ?

—কেন রে ?

—আজকাল আমার কি যে হয়েচে, কোন্টা স্বপ্ন, কোন্টা সত্যি বুঝতে পারিনে। দুটোতে কেমন যেন জড়িয়ে গিয়েচে।

—না ভাই। ওই সেই দুর্গাপিঁড়ি-পাতা কাঁটালতলা। আমাদের ইতুপূজোর ঘট ওখানে সাজানো আছে। এখন সন্দেহ গেল রাজকুমারী ?

—ঠাট্টা করিস্ নি। আমার ভয়-ভয় করে সর্বদা। কি হয়েচে আমার বলতে পারিস্ ?

—তোর মাথা হয়েচে। নে, আয় দুটো মুড়ি আর ফুট্-কলাই ভাজা খা। তুই ভালবাসিস্ —মনে আছে ?

—খুব।

সারাদিন দুই সইএ কত গল্পগুজব কতকাল পরে। সব ভুলে গিয়েচে আশা—সে পবিত্র, পবিত্র। সামনে তার সুদীর্ঘ জীবন পড়ে আছে। সইএর সঙ্গে গল্পে কত ভবিষ্যৎ জীবনের রঙীন স্বপ্ন আঁকে সে রজনী ডাক্তারের বাগানের বাতাবীলেবুতলার ছায়ায় বসে। শ্বশুরবাড়ী হবে পাড়াগাঁয়ে বড় গেরস্থ ঘরে, আট-দশটা ধানের গোলা থাকবে বাড়ীতে, সে বাড়ীর বৌ হিসেবে সন্ধ্যাপ্রদীপ দেখাবে গোলার সামনে বেদীতে ধান মেপে মেপে গোলায় তুলবে। স্বামী হবে উকিল বা ডাক্তার। সারাদিন পরে খেটেখুটে এসে বলবে—ও বড়-বৌ—আলো দেখাও—

বীণা হাসে। সেও তার মনের কথা বলে।

গ্রামের একটি ছেলেকে সে ভালবাসে। যদি তার সঙ্গে বিয়ে হয়—

ওসব কথা কেন ? ও কথা সে শুনতে আসেনি। তবুও সে জিজ্ঞেস্ করলে—কে ভাই ছেলেটি ?

—ব্রাহ্মণ। সত্যনারাণ চাটুয্যের মেজছেলে। তাকে দেখাবো একদিন।

যতক্ষণ সে সইএর বাড়ী রইল, সে হয়ে গেল একেবারে ঠিক তেরো চোদ্দ বছরের সরলা মেয়েটি। কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে এল। কাঁটালতলায় ছায়া পড়লো, রাঙা রোদ একটু একটু দেখা যায় গাছের তলায়। এ সময়ে আশাকে বাড়ী ফিরতে হবেই।

সইকে বল্লে—আমার সঙ্গে একটু এগিয়ে চল্ না আমাদের বাড়ী পর্যন্ত সই ?

—চল্ এগিয়ে দিয়ে আসি—

বাঁশবাগানের তলা দিয়ে অন্ধকার সন্ধ্যার পথে দুই সই-এ চলেচে। ওই জামাইবাবুদের বাড়ীটা। বড়দি এতক্ষণ চা করে নিয়ে বসে আছে ওর জন্যে।

বীণা বল্লে—ওই তোদের বাড়ীর দরজাটা—আমি চলি সই। এর পরে একলা যেতে পারবো না—

বীণা চলে গেল অন্ধকার বাঁশবনের পথটা দিয়ে একা একা। আশা সই-এর অপস্রিয়মাণ মূর্তির দিকে চেয়ে রইল—তারপর যখন আর দেখা গেল না তখন সামনের দিকে চেয়েই ভয়ে ওর বুক কেঁপে উঠলো কি ওখানে?

ও চীৎকার করে ডাক দিলে—ও সই—ও বড়দি—

ওর সামনে বাড়ীউলি মাসীর দরজা, যে দরজাটা খুলে সকালে আজই পালিয়ে গিয়েছিল লুকিয়ে। ওর চীৎকার শুনে দরজাটা খুলে নেত্যনারাণ দু'পাটি দাঁত বের করে এগিয়ে এসে বল্লে - বাপরে! কি তোমার কাণ্ড! কোথায় গিয়েছিলে সারাদিন?…

তার পর ওর হাত ধরে টানতে টানতে বল্লে—চলো, চলো, রাত হয়ে গিয়েচে—শোবে এসো, শোবে এসো…

কতকাল যে কেটে গেল মানিকতলার বাড়ীউলি মাসীর সেই বাড়ীটাতে। তার কোন হিসেব নেই, কোনো লেখাজোখা নেই—আশার মনে হয় বাল্যকাল থেকে তার বিবাহের সময়, তারপর তার সমস্ত বিবাহিত জীবন নিয়ে যতটা সময়ের অভিজ্ঞতা তার আছে—তেমনি কত বাল্যজীবন, কত বিবাহিত জীবন, কত বৈধব্যজীবন এবং কত মানিকতলার জীবন তার কেটে গেল—সে কিন্তু সেই এক ভাবেই রইল একই জায়গায় স্থাণুবৎ অচল।

নেত্যদা তাকে ছাড়ে না। কতবার সে পালিয়ে গিয়েচে—জীবনের কত জানা অজানা কোণে। কত বছরের ব্যবধান রচনা করেচে সে বর্তমান জীবনের ও সেই সব অতীত দিনের শান্তি ও পবিত্রতামণ্ডিত অবকাশের।

কিন্তু কোনো ব্যবধান টেঁকে না।

সব এসে মিশে যায় বর্তমানের এই কলকাতা মানিকতলার বাড়ীউলি মাসীর বাড়ীর দরজায় এই ঘরটাতে, ওই তক্তপোশটাতে।

এখন যেন তার মনে হয়—এসব যা ঘটেচে, এ আসল নয়, সব যেন অবাস্তব, স্বপ্নবৎ…এ সব ছায়াবাজি…জীবনটাই যেন একটা মস্ত ছায়াবাজি হয়ে গেল তার…

সই, মা, ভাই, বোন, স্বামী, ছেলে-মেয়ে কিছুই নিত্য নয় তার জীবনে…আসে আবার চলে যায় ··বাড়ীউলি মাসীর এ বাড়ীটাই কি এদের মধ্যে একমাত্র সত্যি? আর নেত্যদা, আর এই সরু রান্নাঘরটা…আর ওই ছোট ঘরের ছোট তক্তপোশটা? এর কি কোনো শেষ হবে না, এ দিনের এই সব টিঁকে থেকে যাবে চিরকাল?

কোন্‌টা সত্যি, কোন্‌টা স্বপ্ন আজকাল সে বুঝতে পারে না। যেটাকে সত্যি ভেবে হয়তো আঁকড়াতে যায়—সেটাই মিথ্যে হয়ে স্বপ্ন হয়ে যায়। তার কি কোনো রোগ হোল? এমন সাধের, এমন আদরের, এমন আশা-আনন্দের জীবনের শেষকালে এ কি ঘটলো? কোথায় চলে গেল স্বামী, কোথায় গেল বাপের ভিটে, শ্বশুরের ভিটে? এ কি-ভাবে পাগল বা বুদ্ধিহীন কিংবা

রোগগ্রস্ত অবস্থায় সে পড়ে রইল?

নেত্যনারাণ এসে বল্লে—রান্না করবে না আজ? বসে আছ যে—

—আমি জানিনে। তুমি আমায় বিরক্ত করতে এসো না—

—কেন, আজ আবার রাজরাণীর কি মেজাজ হোল?

—তুমি চলে যাও এখান থেকে—

নেত্যনারাণ ওর কাছে এসে বল্লে—বড্ড ঠাট্টা কর তুমি মাঝে মাঝে। কোথায় যাই বল তো? এখন আমি চলে গেলে তুমি খাবে কি? রূপের ব্যবসা যে খুলবে, সে আর হবে না। আয়নাতে চেহারাখানা দেখেচো এদানীং?

আবার কি-সব যাচ্ছেতাই কথা। অনবরত অপবিত্র অশ্লীল ধরনের এই সব কথা কেন তাকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সর্বদা শুনতে হয়। ও ভেবে ভেবে বল্লে—আমরা তো মরে গিয়েচি—খাবার আর দরকার কি?

নেত্যনারাণ ওর দিকে চেয়ে বল্লে—মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? তবে খাচ্চ কেন? রোজ রোজ রান্নাবান্না করচো কেন? বাজার করচি কেন?

—কেউ খাচ্চে না। কেউ বাজার করচে না। সব মিথ্যে, সব স্বপ্ন।

কিন্তু নেত্যনারাণের চোখের বিস্ময়ের দৃষ্টি এত অকপট যে, নিজের বিবেচনার ওপর আশা আস্থা হারালে। নিজে যা বলতে চাইছিল, শেষ করতে পারলে না। মিনতির সুরে বল্লে—আচ্ছা নেত্যদা, তোমার কি মনে হয়? এমন কেন হচ্চে বলতে পারো? এ সব কি সত্যি, না স্বপ্ন?

—তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

—তাই বলে কি তোমার বিশ্বাস?

—নইলে আবোল-তাবোল বকবে কেন? স্বপ্ন কিসের? আমি রইচি, আমি হাটবাজার করচি, খাচ্চি দাচ্চি—সব স্বপ্ন হোল কি ভাবে? এই ঘরবাড়ী দেখতে পাচ্চ না?—বাড়ীউলি মাসী, ও বাড়ীউলি মাসী—শুনে যাও এদিকে। কি বলচে শোনো ও!

বাড়ীউলি মাসী বল্লে—কি গা?

—ও বলচে এ সব নাকি মিথ্যে। তুমি, ঘড়বাড়ী, এই বিছানা—সব স্বপ্ন।

—কি জানি বাপু, ও সব তোমরা বসে বসে ভাবো। আমাদের খেটে খেতে হয়, শখের ভাবনা ভাববার সময় নেই। বেলা হোল দুপুর, উনুনে আঁচ পড়েনি। পালেদের বৌ সেই কোন্ সকালে একবাটি চা খাইয়েছিল ডেকে। যাই—

নেত্য ওর দিকে চেয়ে বল্লে—শুনলে?

আশা বোকার মত শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে হতাশ হয়ে বল্লে—কি জানি বাপু! আমার যেন এক এক সময় মনে হয় এ সব স্বপ্ন দেখচি তুমি আর আমি। এ ঘর নেই, বাড়ী নেই, খাট নেই, বিছানা নেই—ওই রাস্তা, লোকচলাচল সব মিথ্যে, সব স্বপ্ন। কেবল তুমি আর আমি আছি—আর এই যে সব দেখচি সব স্বপ্ন দেখচি আমরা দুজনে।

—বা রে, বাড়ীউলি মাসি এলো, কথা বলে গেল, ও-ও কিছু নয় ?

পরে বিভ্রান্তকে বোঝাবার সুরে সদয়ভাবে বল্লে—ও সব তোমার মাথার ভুল। সব সত্যি — দেখচো না বাড়ীউলি মাসী এসে কি বলে গেল। একবার তোমাকে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খাওয়াতে হবে। রাত্তিরে ভাল ঘুম হচ্চে না, না কি ?

আশা বল্লে—তবে মাঝে মাঝে পাই আবার হারাই কেন ?

অনেকটা অন্যমনস্ক সুরে কথাটা বলে ফেলেই ও চাপতে চেষ্টা করলে। বল্লে—কি জানি, যা বলচো, তাই বোধ হয় হবে। আচ্ছা আমরা এখানে কতকাল থাকবো ? কবে চলে যাবো এখান থেকে ?

—কেন যাবো ? বেশ আছি।

—আমাকে আমার গাঁয়ে রেখে এসো—লক্ষ্মীটি !···

নেত্য রেগে উঠে বল্লে—মেরে হাড় গুঁড়ো করবো। সেই শম্ভু বাঁদরটার জন্যে মন-কেমন করচে বুঝি ? আমি সব জানি।

—না না, সত্যি না নেত্যদা। তোমার দুটি পায়ে পড়ি। আমার এখানে থাকতে ভাল লাগচে না। ভয় হচ্চে। মনে হচ্চে যেন একটা জায়গায় এসে পড়েচি, এখান থেকে বেরুবার পথ নেই। এই ছোট্ট ঘরটা, ওই তক্তপোশটা···এ বাড়ীর যেন চারিদিকে দেয়াল দিয়ে আমাদের কে আটকেচে। এখান থেকে কেউ বেরুতে দেবে না। এ সবও সত্যি নয়, এ সব মিথ্যে, সব ছায়াবাজি। যা এই সব দেখচি না ?···সব ভুল।

নেত্য ব্যঙ্গের সুরে বল্লে- আবার আবোল-তাবোল বকুনি ? মাথা কি একেবারে গেল ?

আশা আপন মনেই বলে যাচ্ছিল—এ থেকে তোমার আমার কোনোদিন উদ্ধার নেই। জানো, আমি অনেক চেষ্টা করেচি পালাবার, বাইরে যাবার। কিন্তু পারিনি—কে আবার এই সবের মধ্যে আমায় এনে ফেলেচে। অথচ আমি চাই উদ্ধার পেতে এ সব থেকে, এখান থেকে অনেক দূরে চলে যেতে—যেখানে এসব নেই। কেন পারিনে জানো ? অনেক চেষ্টা করেচি আমি পালাবার—পারিনি।

আশা অসহায় কান্নায় ভেঙে পড়লো। নেত্য না-বোঝার দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইল উদ্বিগ্ন ভাবে।

নেত্য নানারকম অত্যাচার শুরু করলো ক্রমে ক্রমে আশার ওপর। ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখে, মারধোর তো করেই। বাড়ীউলি মাসী যোগ দিয়েচে নেত্যদার দিকে। ওকে বলে—বল্লুম এক মাড়োয়ারী বাবু জুটিয়ে দিচ্ছি—তা হোল না। লোকে কি যার সঙ্গে বেরিয়ে আসে, তার সঙ্গেই ঘর করে চিরকাল ? কত দেখনু আমার এ বয়সে। ওই যে পাশের বাড়ীর বিন্দি, আপন দেওরের সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল, তা কই এখন ? কোথায় গেল সে রসের নাগর দেওর ? নোয়াওলা খোট্টা বাবু রাখেনি ওকে ? কেমন ছাপর খাট, গদি, এক পিরুস্তুত রূপোর বাসন ! দু'পয়সা গুছিয়েচে—

কি ঝকমারি করেচে আশা। এই কথাবার্তা তার গায়ে ছুঁচের মত বেঁধে আজকাল। কেউ ভাল কথা যদি বলতো দুটো এখানে। কালি ঢেলে ঢেলে তার সারা গায়ে কালি মাখিয়ে দেয় এরা।

কিন্তু কাটলো বহুকাল। অনেক দিন, বৎসর, মাস—অনেক জীবন, জন্ম মৃত্যু যেন জড়িয়ে এক হয়ে গিয়েচে। সত্যিতে স্বপ্নতে জড়িয়ে এক হয়ে গিয়েচে। এমন শক্ত হয়ে পাক জড়িয়ে গিয়েচে এবং আরও যাচ্চে দিন দিন যে, কেউ খুলতে পারবে না। একদিন সে আফিং আনিয়ে নিল পালেদের ছেলের হাত দিয়ে। সেদিন নেত্যনারাণ কোথায় বেরিয়েচে—ভালোই হয়েচে, একেবারে সব যন্ত্রণার অবসান সে আজ করবে। ঘরে খিল দিয়ে শুয়ে রইল আফিং খেয়ে—তারপর ক্রমে ঝিমিয়ে পড়লো। পেটে কোথায় যেন ভীষণ বেদনা করচে… সব যন্ত্রণার আজ একেবার শেষ হবে। সকলের মুখে অশ্লীল কথা শুনতে হবে না। কিন্তু কোথা থেকে নেত্যনারাণ ফিরে এসে ওর ঘরের দোর ভেঙে খিল খুলে ওর মাথার চুল ধরে সারা বারান্দা হাঁটিয়ে বেড়াতে লাগলো। কিছুতেই ওকে বসতে দেয় না, গালে চড় মারে—বলে—বসতে চাও? ন্যাঁকামি করে আবার আফিং খাওয়া হয়েচে ওঠো বেঁচে, তারপর তোমার হাড় আর মাস—

বাড়ীউলি মাসী কোন্ ফাঁকে কাছে এসে চুপি চুপি বল্লে—বন্ন্ বাপু, দিব্যি মাড়োয়ারী বাবু জুটিয়ে দিচ্চি। অমন কত হচ্চে আজকাল। কেন মিছিমিছি আফিং খেয়ে কষ্ট পাওয়া। …দিব্যি সুখে থাকবে; ওই পাশের বাড়ীর বিন্দি। ছাপর খাট, কলের গান বাসনকোসন। ও যে আপন দেওরের সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল—

ওর মন আর পারে না। অবসন্ন, ক্লান্ত মন যেন বলে ওঠে—ভগবান, আমি আর পারিনে। আমায় বাঁচাও—এ থেকে উদ্ধার করো—

কে যেন ওর কথা শোনে। আশার স্বপ্নাচ্ছন্ন, অবসন্ন মন বোঝে না কে সে। অনেক দূরের, অনেক আকাশের পারের কোন্ দেশ থেকে সে যেন উড়ে আসে পাখায় ভর করে। একবার আশার মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে যেন এক অনিন্দ্যসুন্দরী, মহিমময়ী দেবীমূর্তি ভেসে ওঠে। বরাভয়করা, স্মিতহাস্যমধুরা…অপরূপ রূপসী জ্যোতির্ময়ী নারী। আর মনে আছে এক সাদা বড় পাহাড়ের ছবি, সবাই মিলে তাকে ছুঁড়ে যেন সেই সাদা পাহাড় থেকে বহুদূরে নীচের দিকে ফেলে দিচ্চে।

দেবী যেন হাসিমুখে বল্লেন—যাও, ভাল হও—ভুল আর কোরো না।

কে যেন প্রশ্ন করলে—আশা-বৌদি স্বামীর সঙ্গে মিলবে কি করে? ও তো সব ভুলে যাবে।

দেবী বল্লেন—আমি সব মিলিয়ে দিই। ওরা তো নতুন মানুষ হয়ে চললো, ওদের সাধ্য কি?

তারপর গভীর অতলস্পর্শ অন্ধকার ও বিস্মৃতি। অন্ধকার…অন্ধকার।

পুষ্প একদিন সেই নির্জন গ্রহটিতে একা গেল। ওর বড় কৌতূহল হয়েছিল বনকান্তার, অরণ্যানী ও শৈলমালায় পরিপূর্ণ ওই ছায়াভরা গ্রহের জীবনযাত্রা দেখতে।

এবারও রাত্রি নেমেচে গ্রহটিতে।

জীবকুল সুপ্ত। অপূর্ব সুন্দর দেশ। বোধহয় ঐ গ্রহে তখন বসন্ত ঋতু। সেই দিক্‌দিশাহীন অরণ্যে কান্তারে নাম-না-জানা কত কি বন-কুসুম-সুবাস। বনে বনে ছাওয়া সারা দেশ। বনের গাছপালার মধ্যে দিয়ে বেঁকে এসে ওর সাথী তারার নীল জ্যোৎস্না পড়েচে। নৈশ পক্ষীকুলে ক্বচিৎ পক্ষ-বিধুনন।

গ্রহের দিকবিদিক সে চেনে না। পৃথিবীতে গেলে তবে উত্তর দক্ষিণ দিক বুঝতে পারে। এ গ্রহের লোকে কাকে কোন্ দিক বলে কে জানে? কিন্তু এর মাঝামাঝি থেকে একটু বাঁ দিকে ঘেঁষে এক উত্তুঙ্গ শৈলশ্রেণী বহুদূর ব্যেপে চলে গিয়েচে, অনেক ছোট বড় নদী এই শৈলগাত্র থেকে নেমে চলেচে নীচেকার বনাবৃত উপত্যকায়। দু'একটি বড় জলপ্রপাত বনের মধ্যে।

ওর আকাশে বাতাসে বনে বনানীতে কেমন একটি শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ আনন্দ। এর বাতাসে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস যে নেবে, সে-ই যেন হয়ে উঠবে আনন্দময় ব্রহ্মদর্শী ভক্ত, ধীর ও নির্লোভ, তৃষ্ণাহীন ও উদার। এর বনতলে জীবের অমরত্বের কথা লেখা আছে, লেখা আছে এ বাণী যে এই বনতলে তাঁর আসন পাতা। উচ্চ জগৎ বটে।

হঠাৎ ও দেখলে একটি বনপাদপের তলে শিলাসনে স্বয়ং কবি ক্ষেমদাস বসে।

ও দেখে বড় খুশি হয়ে কাছে গেল। ক্ষেমদাস বল্লেন—এসো এসো, যিনি আদি কবি, বিশ্বস্রষ্টা, তাঁর বিস্ময়ে আমি কবিতা রচনা করচি।

—আপনি এ গ্রহ জানেন?

—কেন জানবো না? এ রকম একটা নয়—দীর্ঘ বনফুলের মালার মত একসারি গ্রহ আছে বিশ্বের এ অংশে। আমি জানি। তবে এখানে আসতে হয় যখন এ গ্রহে রাত্রি।

—কেন?

—এখানকার লোক উচ্চশ্রেণীর জীব। ওরা আমাদের দেখতে পাবে দিনের আলোয়। এখন ওরা সুপ্ত। ব'সো ওই শিলাসনে। বেশ লাগে এখানে। লোকালয় এ গ্রহে খুব কম। বনে হিংস্র জন্তু নেই। কেমন নীল জ্যোৎস্না পড়েচে দেখেচো? বড় ভালবাসি এ দেশ।

—আপনি এখানে আসেন কেন?

—একটি তরুণ কবি আছে এ গ্রহে, তাকে প্রেরণা দিই। ভগবদ্ভক্ত। এই শিলাসনেই সে খানিক আগেও বসে ছিল। প্রতি রাত্রে নির্জনে এসে বসে। সৃষ্টির এ সৌন্দর্যের স্তবগান রচনা করে। ওই তার উপাসনা। তুমি জানো আমারও ওই পথ। তাই তার পাশে এসে দাঁড়াই।

—তিনি দেখতে পান আপনাকে?

—না। আমাকে বা তোমাকে দেখতে পাবে না। তোমার সঙ্গী যতীনকে দেখতে পেতো। সে এখন কত বড় ছেলে?

পুষ্প সলজ্জভাবে বল্লে—ন'বছরের বালক।

ক্ষেমদাস হেসে বল্লেন—আবার নব জন্মলীলা। বেশ লাগে আমার। আবার মাতৃক্রোড়ে যাপিত শৈশব। চমৎকার!

পুষ্প হেসে বল্লে—সন্ন্যাসী এখানে উপস্থিত থাকলে আপনার কথা মেনে নিতেন?

—জানি, সে বলে বার বার দেহ ধারণ করা মুক্তির পথে বাধা। সে বলে, ও থেকে উদ্ধার নেই। সেই একই জীবনের পুনরাবৃত্তি, চক্রপথে উদ্দেশ্যহীন গতাগতি। সেই একই লোভ, তৃষ্ণা, অহঙ্কার নিয়ে বার বার অসার জন্ম ও মরণ। এই তো?

—কথাটা কি মিথ্যে?

—না। মানি। কিন্তু সে কাদের পক্ষে? যারা জীবনের উদ্দেশ্যকে খুঁজে পায়নি বা ভগবানের দিকে চৈতন্য প্রসারিত করেনি তাদের পক্ষে। যারা জানে না স্থূল দেহের পরিণাম ধূমভস্ম নয়, জন্মের পূর্বেও সে ছিল, মৃত্যুর পরেও সে থাকবে, ভূলোকে শুধু নয়, ব্রহ্ম থেকে জীবে নেমে আসতে যে সাতটি চৈতন্যের স্তর আছে, এই সাত স্তরের প্রত্যেকটি স্তরে এক একটি লোক, সে এই সব লোকেরই উত্তরাধিকারী, ভগবানের সে লীলা-সহচর। যারা এ কথা জানে না, জানবার চেষ্টা করে না, জেনেও গ্রহণ করে না বিষয়ের মোহে—তাদের পক্ষে সন্ন্যাসীর কথা পরম সত্য। কিন্তু আমার পক্ষে নয়।

পুষ্প একমনে শুনছিল। এই পবিত্র গ্রহের তপোবনসদৃশ অরণ্যকান্তারে এ দেশের ঋষি-কবিরা যেখানে নিদ্রাহীন গভীর রাত্রে ভগবানের স্তবগাথা রচনা করেন—এ গ্রহের উপনিষদ জন্মলাভ করে তাঁদের হাতে—এই স্থানই ক্ষেমদাসের উপদেশ উচ্চারিত হবার উপযুক্ত বটে। পুষ্প ব্যগ্রস্বরে বল্লে—বলুন, দেব, বলুন—

ক্ষেমদাস আবার বল্লেন—তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি—যে তাঁকে জেনেচে সে দেহধারণ করেও মুক্ত, যেমন দেখেছিলে সন্ন্যাসীর গুরুভ্রাতাকে, বন-মধ্যস্থ সেই সন্ন্যাসীকে। যাঁদের চৈতন্য জাগ্রত হয়েচে, দেহ থেকেও তাঁরা জীবন্মুক্ত। ভগবানকে যাঁরা ভালবাসেন মনপ্রাণ দিয়ে, দেহধারণ করেও তাঁরা জীবন্মুক্ত। তাঁরা জানেন এই বিশ্বের সমস্ত গ্রহ, সব তারা, সব বসন্ত, সব জীবলোক আমার। আমি এদের মাধুর্য উপভোগ করবো। তাঁর সৌন্দর্যের স্তবগান রচনা করে যাবো। আমি তাঁর চারণ-কবি। আমি ছাড়া কে গান গাইবে এই বিশ্বদেবের অনন্ত সৌন্দর্য-শিল্পের? তাঁর গান গেয়েই যুগে যুগে অমর অজর হয়ে আমি বেঁচে থাকবো। শত জন্মের মধ্যেও যদি তাঁর সেবা করে যাই আর আসি আমার তাতে ক্ষতি কিসের?

ক্ষেমদাস চুপ করলেন।

পুষ্প বল্লে—এ দেশের সেই কবিকে দেখা যায় না?

—এতক্ষণ সে ছিল এখানেই। সেও ভগবানের চারণ-কবি। এই প্রকৃতির সৌন্দর্যের সে স্তবগীতি রচনা করে। সে এখন ঘুমিয়েচে।

—বিবাহিত?

—এ দেশের নিয়ম বুঝি না। স্ত্রীলোকদের অদ্ভুত স্বাধীনতা এখানে। তারা যার ঘরে যতদিন ইচ্ছা থাকে। আবার যেখানে সত্যকার প্রেম আছে, সেখানে পৃথিবীর স্বামী-স্ত্রীর মত আজীবন বাস করে। আমাদের কবির সঙ্গে তিন-চারটি নারী থাকে—কিন্তু তারা কেউই পৃথিবীর তুলনায় সুন্দরী নয়। এদেশের মেয়েরা সুশ্রী নয়। অবশ্য নারী তিনটির সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক জানি না। এদেশে হয়তো তাতে দোষ হয় না। যে দেশের যে নিয়ম।

ওরা কিছুদূর গিয়ে দেখতে পেলে বনের মধ্যে গাছতলাতে দু-তিনটি লোক নিদ্রিত। ক্ষেমদাস বল্লেন—ঐ দ্যাখো কবি শুয়ে। ঐ পাশেই তিনটি নারী।

পুষ্প আশ্চর্য হয়ে বল্লে—গাছতলাতে কেন সবাই ?

—এখানে লোকের ঘরবাড়ী নেই পৃথিবীর মত। ওদের দেহ অন্য ভাবে তৈরী। রোগ নেই এখানে, হিংস্র জন্তু বা সর্প নেই। দেহের কোনো ক্ষতি হয় না। অল্প আয়ু বলে ঘরবাড়ী করে না কেউ।

—তবে মরে কিসে ?

—এদের স্বেচ্ছামৃত্যু। জ্ঞানী ও নিস্পৃহ আত্মা কিনা! নির্দিষ্ট সময় অন্তে যেদিন হয় এরা মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হবে। মন যেদিন এদের তৈরী হবে সেদিন স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করবে। মৃত্যুতে এরা শোক করে না। এরা জানে মৃত্যু দেহের পরিবর্তন মাত্র।

—পুনর্জন্ম ?

—এখানে যারা জন্ম নেয়, তারা অনেক জন্ম ঘুরে এসেচে। পৃথিবীতে বহু জন্ম কেটেচে এদের। শেষ জন্ম এখানে কাটায়। তার পরেই মহর্লোকে চলে যায় একেবারে, আর ফেরে না। কিন্তু তুমি একটা কথা বোধ হয় জানো না—পৃথিবীর চেয়ে নিকৃষ্টতর গ্রহও অনেক আছে। নিম্ন-শ্রেণীর আত্মাদের পুনর্জন্ম অনেক সময় ওই সব নিকৃষ্টতর লোকে হয়।

—সে সব স্থান কি রকম ?

—একটাতে তোমাকে এখুনি নিয়ে যেতে পারি। চোখেই দেখবে, না কানে শুনবে ? তবে একটা কথা। সে সব দেখে কষ্ট পাবে। মেয়েমানুষ তুমি, সে সব গ্রহলোক দেখলে তোমার মনে হবে ভগবান বড় নিষ্ঠুর।

চক্ষের পলকে ওরা একস্থানে এসে পৌঁছলো। সে স্থানটির সর্বত্র উষর মরুভূমি ও কৃষ্ণবর্ণ বস্তুর স্তূপ। কিন্তু সে স্তূপ প্রস্তর নয়—তা কি, পুষ্প জানে না। উলঙ্গ বিকটদর্শন অর্ধমনুষ্যাকৃতি জীব দু'একজনকে সেই কৃষ্ণবস্তু স্তূপের ওপর বসে থাকতে দেখা গেল। মাঝে মাঝে তারা উঠে মাটির মধ্যে হাত দিয়ে গর্ত খুঁড়ে কি বার করচে ও পরম লোলুপতার সঙ্গে মুখে পুরচে।

ক্ষেমদাস বল্লেন—চলো এখান থেকে। ওরা কীটপতঙ্গ খুঁজে খাচ্চে। ওই ওদের আহার। ওই ওদের আহার সংগ্রহ রীতি। একজনের বস্তুস্তূপে আর একটি জীব যদি আসে, তবে দুই জীবে মারামারি করবে। এ ওকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করবে। এ জগতে স্নেহ, প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা, দয়া, সেবা, ন্যায়বিচার, শিক্ষা, সংগীত কিছু নেই। আছে কেবল দুর্দান্ত আহার-প্রচেষ্টা। জীবে জীবে কলহ।

পুষ্প বল্লে—চলুন এখান থেকে। হাঁপ লাগচে। কি জড়পদার্থে গড়া এ দেশ, প্রাণ যেন কেমন করে উঠলো। এও কি ভগবানের রাজ্য ? উঃ—

ক্ষেমদাস হেসে বল্লেন—এখনও দেখোনি। চলো আরও দেখাই—এর চেয়েও ভয়ানক স্থান দেখবে। যেখানে পিতামাতা পুত্রকন্যার সম্বন্ধ পর্যন্ত নেই। যেখানে—না সে তোমাকে বলব না!

পুষ্প অধীর ভাবে বল্লে—কেন আমাকে এখানে নিয়ে এলেন ? উঃ—বলেই সে ঝরঝর করে

কেঁদে ফেললে। হাত জোড় করে বল্লে—আমার একমাত্র সম্বল ভগবানে ভক্তি, আর আমার কিছু নেই জীবনে। দেব, দয়া করে সেটুকুও আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবেন না—কৃপা করুন—আমি নিতান্ত অভাগিনী।

ক্ষেমদাস হেসে বল্লেন—পাগল! সেই অনন্ত মহাশক্তির এক দিকই কেবল দেখবে? রুদ্রদেবের বাম মুখ দেখলেই ভক্তি চটে যাবে অত ঠুনকো ভক্তি তোমার অন্তত সাজে না। তুমি আমি তাঁর উদ্দেশ্যের কতটুকু বুঝি? চলো ফিরি। ওই জন্য আনতে চাইনি তোমাকে এখানে। এতেই এই, এর চেয়েও নিকৃষ্ট লোকে নিয়ে গেলে—

—না দেব। আমায় পৃথিবীতে অন্তত নিয়ে চলুন। আমাদের পৃথিবীতে—চলুন গঙ্গাতীরে—

মহাশূন্য বেয়ে সেই মুহূর্তে ওরা এসে পৃথিবীতে একস্থানে বৃক্ষতলে দাঁড়ালো। বর্ষাকাল পৃথিবীতে, ভীষণ বৃষ্টি হচ্চে। স্থানটা পাহাড়ে ঘেরা, পাহাড় ঝাপ্‌সা হয়ে গিয়েচে বৃষ্টির ধারায়।

ক্ষেমদাস বল্লেন—নিয়ে এলাম গঙ্গাতীরে। ওই অদূরে গঙ্গা—

—এটা কোন্ স্থান?

—হরিদ্বার।

পুষ্পের চোখ জুড়িয়ে গেল ধারামুখর অপরাহ্নের বহুপরিচিত, অতি প্রিয় শোভায়। তার মন বলে উঠলো—এই তো আমাদের পৃথিবী, আমাদের স্বর্গ। ভগবান এখানে কত ফুলে ফলে নিজেকে ধরা দেন, কত জ্যোৎস্নার আলোয়, কত অসহায় শিশুর হাসিতে। আজ চিনলাম তোমায় ভাল করে, আমাদের মাটির স্বর্গকে, আর চিনলাম মানুষকে। মানুষই মাটি দিয়ে গড়া দেবতা—দুদিন পরে সত্যিকার দেবতা হয়ে যাবে। জয় নীলারণ্য-কুন্তলা অতল-সাগর-মেখলা চিরন্তনী সুন্দরী পৃথিবীর। জয় জয় মানুষের। জয় বেণুরব-শিহরিতা দিগন্তলীন-প্রান্তর-শোভিতা ভূতধাত্রী মাতার।

ক্ষেমদাস বল্লেন—এবার তোমার মন শান্ত হয়েচে। বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। এখন একটা কথা বলি। কি দেখে অস্থির হয়ে উঠলে?

পুষ্প সলজ্জ হেসে চুপ করে রইল। ক্ষেমদাস বল্লেন—না, বলো, বলতেই হবে। ভগবান কি নিষ্ঠুর—এই ভেবেছিলে। না?

—হাঁ।

—তিনি কি নিষ্ঠুর—ওঃ! এই তো?

পুষ্প হাসি-হাসি মুখে নির্বাক।

ক্ষেমদাস বল্লেন—তোমার মত মেয়েরও বিস্মৃতি? তোমারও ভুল? এ'কেই বলে মোহিনী মায়া। মায়ায় কে না ভোলে? 'ব্রহ্মা বিষ্ণু তলিয়ে যান।

—কেন দেব, বলুন!

—না, তাই দেখচি। নতুবা তোমারও ভুল!

—থাক্ আমার ব্যাখ্যা। আমি তৃণের চেয়েও হীন। আপনি কি উপদেশ করচেন, তাই করুন না?

ক্ষেমদাস হাসিমুখে বল্লেন--ভগবান কার উপর নিষ্ঠুর হবেন? সবই তো তিনি। নিজেই নিজের লীলায় তন্ময় হয়ে আছেন বিভিন্ন রূপে। তিনিই সব। সে জ্ঞান যেদিন হবে সেদিন ওই নিকৃষ্ট লোকের নিকৃষ্ট জীব দেখেও বলে উঠবে আনন্দে—তেজো যৎ তে কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি, যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি—

ক্ষেমদাস চলে গেলেন। যাবার সময় বল্লেন—বৃন্দাবন থেকে ঘুরে আসি। তোমার সঙ্গে আবার শীঘ্রই দেখা করবো—একদিন চলো সেই সন্ন্যাসিনীর কাছে যাবো।

পুষ্প স্থির ভাবে বসে রইল শৈলশিখরে। এখানে তার যতুদা আছে, কত জন্মের প্রিয় সাথী সে। তাকে ফেলে কোথায় কোন্ লোকে গিয়ে সুখ পাবে সে? একটি গোয়ালার মেয়ে দুধ দুয়ে নিয়ে আসচে বাজারে। নরনারী প্রদীপ ভাসাচ্ছে গঙ্গাবক্ষে। দূর থেকে আলো দেখা যাচ্চে জলের ওপর।

বুড়োশিবতলার পুরানো ঘাটের সামনে গঙ্গাবক্ষে পালতোলা নৌকোর দল চলেচে। গোধূলির আব্ছায়া আকাশে শুভ্রপক্ষ বকের দল উড়ে চলেচে ওপারে হালিসহরের শ্যামাসুন্দরীর ঘাটের দিকে। প্রাচীন দেউলমন্দিরের চূড়া সান্ধ্য দিগন্তের বননীলরেখায় এখানে ওখানে যেন মিশে আছে।

পুষ্প ঘাটের রানায় বসে ক্ষেমদাসের সঙ্গে কথা বলছিল।

ক্ষেমদাস বৃন্দাবন থেকে এইমাত্র ফিরেচেন। জ্যোৎস্নারাত্রে যমুনাতীরে কিছুক্ষণ বসে ছিলেন চীরঘাটের কাছে। আরতি দর্শন করবার পরে। মন ভূমানন্দে বিভোর।

পুষ্প বল্লে—কবি, স্ফটিকের কথা কি বলছিলেন?

ক্ষেমদাস গঙ্গার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বল্লেন—ওই দ্যাখো, রাঙা আকাশের ছায়া পড়েচে জলে। জল যদি ঘোলা হোত, আকাশের ছায়া পড়তো না। স্ফটিককে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও নির্মল হতে হবে, তবে আলো তার মধ্যে দিয়ে আসবে।

—অর্থাৎ?

—অর্থাৎ আত্মাতে যদি এতটুকু ত্রুটি থাকে কোথাও, তবে ভগবানের আলো তার মনে নামে না। সম্পূর্ণ নির্মল স্ফটিক হওয়া চাই, এতটুকু খুঁৎ থাকলে চলবে না।

—ভগবানের দাবি এত বেশি কেন?

—উপায় নেই। ভগবানের আলো যদি মনের দর্পণে ঠিক অখণ্ড ভাবে পেতে কেউ চায়, তার জন্যে এই ব্যবস্থা। লোকে মুখে বলে সাধুতা ও পবিত্রতার কথা। কিন্তু জেনো এ দুটি বস্তু অতি ভীষণ, ভয়ঙ্কর।

পুষ্প বল্লে—বুঝতে পারচি কিছু কিছু। নিজের জীবনে দেখচিনে কি? তবুও বলুন।

—সাধুতা, পবিত্রতা—শুনতে খুব ভালো। কিন্তু এদের আবির্ভাব বিষয়ী লোকের পক্ষে কষ্টকর। কামনাকলুষিত আধারে ভগবানের জ্যোতি অবতরণ করবে কি ভাবে? এ জন্যে আধার-শুদ্ধির প্রয়োজন। যাকে ভগবান কৃপা করেন, শুদ্ধ আধার করে নিতে তার সব কিছু

ভোগ কামনার জিনিস ধ্বংস করে তাকে নিঃস্ব, রিক্ত করে দেন। ভগবানের কৃপা সেখানে বজ্রের মত কঠোর, নির্মম, ভয়ঙ্কর। সর্বনাশের মূর্তি ধরে তা আসে জীবনে, ধ্বংসের মূর্তিতে নামে। সে রকম কৃপার বেগ সামলাতে পারে ক'জন?

পুষ্প চুপ করে রইল। এর সত্যতা সে নিজের জীবনে বুঝেচে।

ক্ষেমদাস বল্লেন—দ্যাখো, আমি ভক্তিপথের পথিক, তুমি জানো। সন্ন্যাসী যে নির্গুণ ব্রহ্মের কথা বলে, তাঁকে বুঝতে হোলে জ্ঞানের পথ দরকার। জ্ঞান ভিন্ন ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা যায় না। আমি সাকারের উপাসক, মধুর ভাবে মধুর মূর্তিতে তাঁকে পেতে চাই—তাই আমি বৃন্দাবনে গিয়ে সেই রস আস্বাদ করি। সন্ন্যাসী বলে, ও অপ্রাকৃত মূর্তির উপাসনা কর কেন? আমি বলি, তোমার নিয়ে তুমি থাকো, আমার নিয়ে আমি থাকি। ও বলে, ব্রহ্ম আবরিত হতে হতে জীব হয়েচে, জীব হয়ে স্বরূপ ভুলে গিয়েচে। ব্রহ্ম দেশ-কালের মধ্যে ধরা দিয়ে জীব হয়েচে। কেন হয়েচে? লীলা। আমি বলি, বেশ, এক যখন বহু হয়েচেন লীলার আনন্দকে আস্বাদন করতে, তখন আমিও তাঁর লীলাসহচর তো? আমাকে বাদ দিয়ে তাঁর লীলা চলে না। এই তো প্রেমভক্তি এসে গেল। কেমন?

পুষ্প বল্লে—বনের সেই সন্ন্যাসিনী কিন্তু প্রেমভক্তির কাঙাল। আমি সেবার রঘুনাথদাসের আশ্রমে নিয়ে গিয়েছিলাম, বৃন্দাবনে নিয়ে গিয়েছিলাম—সেই থেকে গোপাল-বিগ্রহের ভক্ত হয়ে উঠেচেন।

—সে যে মেয়েমানুষ। শুষ্ক জ্ঞানপথে সে তৃপ্তি পায় না—লীলারস আস্বাদ করতে চায়। আমি চল্লাম খুকি, তুমি আজ তো বৃন্দাবনে গেলে না, কাল এসে নিয়ে যাবো। সন্ন্যাসী তোমাকেও কি বলেছিল না?

—বলেছিলেন, এখনও অপ্রাকৃত লোক আঁকড়ে আছ কেন? তোমার তো উচ্চ অবস্থা, উচ্চ স্তরে চলো।

পৃথিবীর হিসেবে আজ কয়েক বছর হোল পুষ্প এই স্বরচিত বুড়োশিবতলার ঘাটে সম্পূর্ণ একা। করুণাদেবীও ওকে উচ্চতর স্তরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তত উচ্চ স্তরে গমন করলে আর সে পৃথিবীতে যাতায়াত করতে পারবে না বলেই এই গঙ্গার ঘাট আঁকড়ে পড়ে আছে। এই তার পরম তীর্থ—তার মহর্লোক, জন-লোক, তপোলোক, সত্যলোক, ব্রহ্মলোক—লোকাতীত পরমকারণ পরব্রহ্মলোক। কোথাও পোষাবে না তার। কত সহস্র স্মৃতিতে ভরা এই প্রাচীন ভাঙা ঘাটটি।

কেউ নেই আজ এখানে।

যতীনদা চলে গিয়েচে আজ দশটি বছর।…

ঊর্ধ্বে যতদূর দৃষ্টি যায়—আজ এতকাল পরে তার কাছে শূন্য অর্থহীন!

এক এক সময়ে মনে হয় সেই ভ্রাম্যমাণ বহূদক দেবতা যদি আসেন! তাঁর মুখে বহু জগতের, বহু নক্ষত্রলোকের, বহু বিশ্বের গল্প শোনে। নিজে তিনি বেড়িয়ে দেখেচেন, এখনও

দেখচেন—শেষ করতে পারেন নি।

সন্ন্যাসী এসে প্রায়ই বলেন—মহর্লোকে তোমার আসন, এখানে কি নিয়ে পড়ে আছ কন্যে? সেই পৃথিবীর গঙ্গা, পৃথিবীর হালিসহর সাগঞ্জ, নৌকো—এসব মায়িক কল্পনা তোমার সাজে না। ছি ছি—

পুষ্প সকৌতুকে বলেছিল—নিয়ে যান না তার চেয়েও উচ্চতর লোকে, যাচ্চি এখনি।

সন্ন্যাসী বলেন—জ্ঞান থাকবে না বেশিক্ষণ। কারণ এসব লোক আত্মিক অবস্থা মাত্র। কোনো স্থান নয়। সে উচ্চতর চৈতন্য জাগ্রত হোলে পৃথিবীতে জড়দেহধারী হলেও তুমি সত্যলোকের অধিবাসী। যেমন দেখেছিলে আমার সেই গুরুভ্রাতাকে। চিদানন্দময় আত্মা সেখানে আপনার অস্তিত্বের আনন্দে বিশ্বের সঙ্গে এক সুরে গাঁথা। মুখে বলা যায় না সে অনুভূতির কথা।

পুষ্প বল্লে—বুঝবার ক্ষমতা নেই আমার দেব। তবে শুনলাম বটে। আপনার দয়া।

—বিধাতৃপুরুষদেরও উচ্চ স্তরের দেবতাদের দেখা পাওয়ার জন্যে তপস্যা করতে হয় জানো তো? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাতজন বিধাতৃপুরুষ আছেন, এঁদের ওপর ঈশ্বর। বিধাতৃপুরুষেরা ইচ্ছা করলেই ভগবানের লোকে যেতে পারেন না—গেলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। এজন্যে তপস্যা দ্বারা শক্তি অর্জন করতে হয়—তবে সেই সাময়িক তপস্যার সাময়িক শক্তি নিয়ে ঈশ্বর সমীপে যেতে পারেন। অথচ বিধাতৃপুরুষেরা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করচেন।

—ভগবান তবে কি করচেন, তিনি কি ঠুঁটো জগন্নাথ?

—তাঁর ইচ্ছাতেই সব হচ্চে, কন্যে। একটা তৃণও নড়ে না তাঁর ইচ্ছা না হোলে।

—তিনি দয়ালু? ডাকলে সাড়া দেন?

—এখনও এ সন্দেহ? এইজন্যে আমি বলি, প্রার্থনা ক'রো না তাঁর কাছে কিছু। প্রার্থনা করলেই তিনি মঞ্জুর করেন। তিনি পরম করুণাময়। জীবের দুঃখ দেখে থাকতে পারেন না। হয়তো এমন অসঙ্গত প্রার্থনা করে বসলে, যা মঞ্জুর হোলে তোমার আত্মার অমঙ্গল। এইজন্যে কিছু চাইতে নেই তাঁর কাছে—তিনি আমাদের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রেখে সব কিছু করে যাচ্চেন বা বিধাতৃপুরুষদের কর্মে সম্মতি দিয়ে যাচ্ছেন। এইজন্যে অনেক সময় ভগবানকে নিষ্ঠুর বলে মনে হয়। জীবের কল্যাণের জন্যে তিনি ব্যবস্থা করচেন, আমাদের তা মনঃপূত হচ্চে না।

—ক্ষেমদাস তাই বলেন।

—কে? আমাদের কবি? ওর কথা বাদ দাও। আজ এত বছরেও ওর ভাবালুতা ওকে ছেলেবেলার ওপরে উঠতে দিলে না! গোপাল আর বৃন্দাবন, আর আরতি, আর চোখের জল—আর চাঁদের আলো···

সন্ন্যাসী সেদিন বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। পুষ্পের হাসি পায় ওঁর সব কথা ভেবে। মেয়েমানুষের মনের কথা এরা কি করে জানবে? শুদ্ধ, বুদ্ধ আত্মা ওরা—ব্রহ্মের মত হয়ে গিয়েচে। শত স্নেহ প্রেম প্রীতির বাঁধনে যে মেয়েমানুষের মন বাঁধা। এও সেই বিধাতৃপুরুষদেরই গড়া নিয়ম তো, সৃষ্টিছাড়া কিছু নয়।

পৃথিবীতে কি সন্ধ্যা হয়ে এসেচে?

পুষ্প একবার নীচের দিকে চেয়ে দেখলে, তারপর পৃথিবীর সন্ধ্যায় দেহ মিলিয়ে নেমে এল কোলা-বলরামপুর গ্রামে। যতীনের মা রান্নাঘরের মধ্যে ভাত চড়িয়ে উনুনের পাশে বসে আলু-বেগুন কুটচে। সে আর ঠিক তরুণী নয় এখন, বিগত-যৌবনের চিহ্ন সারা দেহে পরিস্ফুট। নতুন ধান এসেচে সামনের উঠানে, শীতের সন্ধ্যা, পাশের বাড়ীর আমতলায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আগুন জ্বেলে পোয়াচ্চে।

যতীনের মা রান্নাঘর থেকে বল্লে—ও অভয়—কোথায় গেলি ?

পাশের বাড়ীর আমতলায় যে সব ছেলেমেয়ে আগুন পোয়াচ্চে, তাদের ভেতর থেকে একটি আট-ন' বছরের বালক উত্তর দিলে—কেন, কি হয়েচে ?

—ঠাণ্ডা লাগাস্ নি বাইরে। ঘরের মধ্যে আয়।

বালকের এখন সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সমবয়সীদের মজলিস ছেড়ে এসে রান্নাঘরে ঢুকতে। সে বল্লে—আমি বাইরে বসে ধান চৌকি দিচ্চি যে—

—না, তোমায় ধানচৌকি দিতে হবে না। চলে আয় ঘরে। এই উনুনের পাড়ে বসে আগুন পোয়া। ছেলের লেগেই আছে সর্দি কাসি—আবার রাত পজ্জুন্ত বাইরে বসে থাকা—

আর একটি ছেলে ওকে বল্লে—যা, কাকিমা বকবে—

অভয় মুখ ভার করে মায়ের কাছে উনুনের পাশে এসে বসলো। ওর মা বল্লে—সেই গরম জামাটা আজ গায়ে দিস্ নি ?

—আহা-হা—সে তো ছেঁড়া !

—তা হোক, নিয়ে আয়, বড্ড শীত পড়েচে।

—না মা।

অভয়ের মা ছেলের গালে এক চড় কষিয়ে দিয়ে বল্লে—তোমার একগুঁয়েমিগিরি ঘুচিয়ে দেবো আমি একেবারে। দুষ্টু ছেলে—এখুনি বলবেন, মা আমার জ্বর এয়েচে—তখন নিয়ে এসো সাবু, নিয়ে এসো ওষুধ—যা নিয়ে আয় জামা, মাঝের ঘরের আলনায় আছে—

পুষ্প খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে বল্লে—ও যতুদা, কেমন মজা ? এ আম নয় যে একগুঁয়েমি করে নিস্তার পাবে—

পুষ্প এই সময়টা মাঝে মাঝে এখানে এসে কাটায়। অভয়ের মা ছেলেকে খাওয়ায়, কাছে বসে পড়ায়—প্রথমভাগ, ধারাপাত—পুষ্প বসে বসে দেখে। বেশ লাগে ওর।

স্বপ্নের মত মনে হয় সংসারের জীবন মৃত্যু···সন্ন্যাসীট জ্ঞানী, সব মায়া আর স্বপ্ন।

আশা-বৌদিকেও একদিন সে দেখে এসেচে। সে এখন বহুদূর মুরশিদাবাদ জেলায় এক মাঝারি গোছের গেরস্তবাড়ীর ছোট একবছরের খুকি।

সে করুণাদেবীকে বলেছিল সেদিন—এরা মিলবে কি করে দেবী ? কি করে জানবে এরা ?

দেবী হেসে উত্তর দিয়েছিলেন—ওদের সাধ্য কি ? আমরা সে যোগাযোগ ঘটিয়ে দেবো সময় এলে। দেখতেই পাবি, পুষ্প।

অভয়ের মা ছেলেকে খাইয়ে দাইয়ে পাশের ঘরে ঘুমুতে পাঠায়। পুষ্প এসে সেই সময়

খোকার শিয়রে এসে বল্লে—খোকা ঘুমুল পাড়া জুড়ুল, ঘুমোও যতুদা, ঘুমোও—দুষ্টুমি করলে মায়ের হাতের চড় মনে আছে তো ?

অভয় ঘুমিয়ে পড়লে, হয়তো এক একদিন কোনো রূপসী দেবীর স্বপ্ন দেখে, মায়ের মত স্নেহে তার শিয়রে বসে ঘুম পাড়াচ্চে। মায়ের মতই বলে মনে হয় তাকে।

নৈশ আকাশ দিয়ে তারপর পুষ্প উড়ে চলে যায় তার নিজ লোকে। অগণ্য জ্যোতির্মণ্ডল, অগণ্য ব্রহ্মাণ্ড মহাব্যোমে সর্বত্র ছড়িয়ে,—অগণ্য জীবকুল, অগণ্য জীবনমৃত্যুর প্রবাহ।

পুষ্পের মন বলে ওঠে—কোথায় আছ হে কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু, মহাদেবতা, মুখের আবরণ অপসারণ কর—অপাবৃণু, অপাবৃণু, আমরা তোমার স্বরূপ দেখি—ধন্য কর আমাদের জন্মমরণ, দয়ালু দেবতা !

স্বর্গ ও মর্ত্যের সেই মোহনায় পুষ্প এসে দাঁড়ালো।

ওর কিছুদূরে নীল শূন্যে আগুনের লেখা এঁকে বিরাট এক ধূমকেতু অগ্নিপুচ্ছ দুলিয়ে নিজের গোঁ-ভরে চলে গেল।—সে মুহূর্তের হিসেব নেই। ওদের পায়ের তলায় কোন গ্রহের এক নদীতীর, হয়তো বা পৃথিবীরই—শান্ত অপরাহ্ন, একদল সাদা বক মেঘের কোলে কোলে উড়চে নলখাগড়া বনের উর্ধ্বে আকাশে।

আজ পুষ্প যেন দেখতে পেলে সেই দেবতাকে—নক্ষত্রজ্যোৎস্নায় ভাসানো এই অপূর্ব জীবন-উল্লাসের স্রোতে সে জন্ম থেকে জন্মান্তরে ভেসে চলেচে যে মহাদেবতার ইঙ্গিতে। কোথায় যেন তিনি মহাসুপ্তিমগ্ন, তাঁর অপূর্ব সুন্দর মুখখানি, সুন্দর চোখ দুটি ঘুমে অচেতন। কি সুন্দর দেখাচ্চে সেই স্বপ্নালসনিমীলিত আয়ত চোখ দুটি ! পুষ্প বল্লে—উনি উঠবেন কখন ? চরণ বন্দনা করি।

পুষ্পের মনের মধ্যে থেকেই প্রশ্নের উত্তর এল—উনি ওঠেন না। অনন্ত শয্যায় অনন্ত নিদ্রায় মগ্ন উনি। এক এক নিঃশ্বাসে যুগযুগান্ত কেটে যায়। তুমি ওঁর চরণ বন্দনা করবে ? ওঁর উপাসনা হয় না। কে করতে পারে ওঁর উপাসনা ? উনি কাউকে দেখেন না, কারো উপাসনা গ্রহণ করেন না। বিশ্বজগৎ ওঁর স্বপ্ন—উনি ঘুম ভেঙে জেগে উঠলে জগৎস্বপ্ন লয় হয়ে যাবে যে ! সৃষ্টি অন্তর্হিত হবে। কিন্তু তা হয় না—সৃষ্টিও অনন্ত, ওঁর সুপ্তিও অনন্ত। উনিই বিশ্বের আদি কারণ—সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। ক্ষীরোদশয়নশায়ী মহাদেবতা ব্রহ্মাণ্ডের। তুমি আমি, স্বর্গ নরক, জন্ম মরণ, দেব দেবী, ঈশ্বর, পাপ পুণ্য, দেশ ও কাল—সবই তাঁর স্বপ্ন। সব তিনি। তিনি ছাড়া আর কিছু নেই—কে কার উপাসনা করবে ? ওঁর স্বপ্ন ছাড়া আর উনি ছাড়া আর কি আছে ?

ভক্তিভরে প্রণাম করলে পুষ্প। উপাসনা হয় না তো হয় না।

ঘন ঘুমে অচেতন সেই দেবদেবের সুন্দর চোখ দুটি, স্বর্গ ও মর্ত্যের দূরতম প্রান্তে, শুকতারার অস্তপথে, ছায়াছবির মত মিলিয়ে গেল।

বিপিনের সংসার

বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১

বিপিন সকালে উঠিয়া কলাই-চটা পেয়ালাটায় সবে এক পেয়ালা চা লইয়া বসিয়াছে, এমন সময়ে দেখা গেল তেঁতুলতলার পথে লাঠিহাতে লম্বা চেহারার কে যেন হন হন করিয়া উহাদের বাড়ীর দিকেই চলিয়া আসিতেছে।

বিপিনের স্ত্রী মনোরমা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বলিল, দেখ তো কে একটা মিন্সে এদিকে আসছে!

বিপিন বলিল, জমিদার-বাড়ীর দরওয়ান গো—আমি বুঝতে পেরেছি—ডাকের ওপর ডাক, চিঠি দিয়ে ডাক, আবার লোক পাঠিয়ে ডাক।

মনোরমা বলিল, তা এসেছ তো ধর আজ দিন কুড়ি। ডাক দেওয়ার আর দোষ কি?

বিপিনের বড় ভ্রাতৃবধূ এই সময় ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, পলাশপুর থেকে বোধ হয় লোক আসছে—এগিয়ে যাও তো ঠাকুরপো।

বিপিন বিরক্তমুখে চায়ের পেয়ালাটায় চুমুক দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া উঠানে গিয়া দাঁড়াইল এবং আগন্তুক লোকটির সঙ্গে দুই একটি কথা বলিয়া তাহাকে বিদায় দিয়া একখানি চিঠি-হাতে সোজা রান্নাঘরে গিয়া মাকে বলিল, এই দেখ মা, ওরা আবার চিঠি লিখেছে—দুদিন যে জিরোব তার উপায় নেই।

বিপিনের মা বলিলেন, তা তো এয়েছ বাপু, কুড়ি-বাইশ দিন কি তার বেশি। তাদের কাজের সুবিধের জন্যেই তো তোমায় রেখেছে? এখানে তুমি ব'সে থাকলে তাদের চলে?

সকলের মুখেই ওই এক কথা। যেমনই মা, তেমনই স্ত্রী। কাহারও নিকটে একটু সহানুভূতি পাইবার উপায় নাই। কেবল 'যাও—যাও' শব্দ, টাকা রোজগার করিতে পার—সবাই খুশি। তোমার সুখ-দুঃখ কেহই দেখিবে না।

বিরক্তির মাথায় বিপিন স্ত্রীকে বলিল, আর একটু চা দাও দিকি।

মনোরমা বলিল, চা আর হবে কি দিয়ে? দুধ যা ছিল সবটুকু দিয়ে দিলাম।

বিপিন বলিল, র চা খাব। তাই করে দাও।

—চিনিও তো নেই, র চা-ই বা কেমন ক'রে খাবে?

—মাকে বল, ওঁর গুড়ের নাগরি থেকে একটু গুড় বের ক'রে দিতে—তাই দিয়ে কর।

মনোরমা ঝাঁঝের সঙ্গে বলিল, মাকে তুমি বল গিয়ে। বুড়ো মানুষ; দশমী আছে, দোয়াদশী আছে—ঐ তো একখানা গুড়ের নাগরি, তাও চা খেয়ে খেয়ে আদ্ধেক খালি হয়ে গিয়েছে। এখনও তিন মাস চললে তবে নতুন গুড় উঠবে—ওঁর চলবে কিসে? এদিকে তো নতুন এক নাগরি আখের গুড় কিনে দেবার কড়ি জুটবে না সংসারে। মায়ের কাছ থেকে রোজ রোজ গুড় চাইতে লজ্জা করে না?

বিপিন আর কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া গেল। তাহার মনটা আজ কয়দিন হইতেই ভাল নয়। প্রথম তো সংসারে দারুণ অনটন, তার উপর স্ত্রীর যা মিষ্টি বুলি! বেশ, সে পলাশপুরই যাইবে। আজই যাইবে। আর বাড়ী থাকিয়া লাভ কি? বাড়ীর কেহই তেমন পছন্দ করে না যে, সে বাড়ী থাকে।

এমন সময় বাহির হইতে গ্রামের কৃষ্ণলাল চক্রবর্ত্তী ডাকিয়া বলিলেন, বিপিন, বাড়ী আছ হে?

বিপিন পাশের ঘরের উদ্দেশ্যে বলিল, কেষ্ট কাকা আসছেন, স'রে যাও। পরে অপেক্ষাকৃত স্বর চড়াইয়া বলিল, আসুন কাকা আসুন, এই ঘরেই আসুন।

কৃষ্ণলালের বয়স চুয়াল্লিশ বছর, কিন্তু চুল বেশি পাকিয়া যাওয়ায় ও অর্দ্ধেক দাঁত পড়িয়া যাওয়ার দরুন, দেখায় যেন ষাট বছরের বৃদ্ধ। তিনি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বলিলেন, ও কে এসেছিল হে, তোমার বাড়ী একজন খোট্টা-মত?

—ও পলাশপুর থেকে এসেছিল। আমায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

—বেশ তো, যাও না। এখানে ব'সে মিছে কষ্ট পাওয়া—

—আহা, সেজন্যে না কেষ্টকাকা। পলাশপুরে বাবা যখন চাকরি করতেন, সে একদিন গিয়েছে। এখন প্রজা ঠেঙিয়ে খাজনা আদায় করার দিন নেই। অথচ টাকা না আদায় করতে পারলে জমিদারের মুখ ভার। আমি ধোপাখালির কাছারিতে থাকি; আর পলাশপুর থেকে ক্রমাগত লোক আসছে; ক্রমাগত লোক আসছে,—ক্রমাগত টাকা পাঠাও, টাকা পাঠাও—এই বুলি। বলুন দিকি, আদায় না হ'লে আমি বাপের বিষয় বন্ধক দিয়ে এনে তোমাদের টাকা যোগাব মশায়?

কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী বলিলেন, তোমার বাবার আমলের সেই পুরোনো মনিবই আছে তো? তারা তো জানে তুমি বিনোদ চাটুজ্জের ছেলে—তোমার বাপের দাপটে—

—জানে ব'লেই তো আরো মুশকিল। বাবা যে ভাবে খাজনা আদায় করতেন, এখনকার আমলে তা চলে না, কাকা,—অসম্ভব। দিনের হাওয়া বদলেছে, এখন চোখ কান ফুটেছে সবারই। সত্যি কথা বলছি, আমার ও কাজ ভাল লাগে না। প্রজা ঠেঙাবার জন্যেও না—তাতে আমার তত ইয়ে হয় না, কিন্তু জমিদার আর জমিদারগিন্নী ঘুণ একেবারে। কেবল 'দাও দাও' বুলি। না দিলেই মুখ ভার।

—তা আর কি করবে বল! পরের চাকরি করার তো কোন দরকার ছিল না তোমার, বিনোদদাদা যা ক'রে রেখে গিয়েছিলেন—পায়ের ওপরে পা দিয়ে বসে খেতে পারতে—সবই যে উড়িয়ে দিলে! বিনোদদাদাও চোখ বুজলেন, তোমরাও ওড়াতে শুরু করলে! এখন আর হা-হুতাশ করলে কি হবে, বল?

এ সব কথা বিপিনের তেমন ভাল লাগিতেছিল না। স্পষ্ট কথা কাহারও ভাল লাগে না। সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, সে যাক কাকা, আমায় একটা শশার চারা দিতে পারেন? আছে বাড়ীতে?

এই সময় বিপিনের বিধবা বোন বীণা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, দাদা, মা ডাকছে, একবার রান্নাঘরের দিকে শুনে যাও।

ইহার অর্থ সে বোঝে। সংসারে হেন নাই, তেন নাই—লম্বা ফর্দ্দ শুনিতে হইবে—মা নয়, স্ত্রীর নিকট হইতে। কৃষ্ণলাল বসিয়া থাকার দরুন মায়ের নাম দিয়া ডাক আসিতেছে।

বিপিন বলিল, বসুন কাকা, আসছি।

কৃষ্ণলাল উঠিয়া পড়িলেন, সকালবেলা বসিয়া থাকিলে তাঁর চলিবে না, অনেক কাজ তাঁর।

মনোরমা দালানের দোরে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। বলিল, কেষ্টকাকার সঙ্গে বসে গল্প করলে চলবে তোমার?

—ঘুরিয়ে না ব'লে সোজা ভাবেই কথাটা বল না কেন? কি নেই?

—কিচ্ছু নেই। এক দানা চাল নেই, তেল নেই, ডাল নেই, একটি আলু নেই। হাঁড়ি চড়বে না এ বেলা।

বিপিন ঝাঁঝের সঙ্গে বলিল, না চড়ে না চড়ুক, রোজ রোজ পারি নে। এক বেলা উপোস ক'রে সব প'ড়ে থাক।

মনোরমা কড়াসুরে জবাব দিল, লজ্জা করে না এ কথা বলতে? আমি আমার নিজের জন্যে বলি নি। মা কাল একাদশীর উপোস ক'রে রয়েছেন, উনিও কি আজও উপোস ক'রে পড়ে থাকবেন? সব কি আমার জন্যে সংসারে আসে? ওই বীণারও গিয়েছে কাল একাদশী—ও ছেলেমানুষ, কপালই না হয় পুড়েছে, খিদেতেষ্টা তো পালায় নি তা ব'লে?

মনোরমার যুক্তি নিষ্ঠুর……অকাট্য।

বিপিন বাড়ী হইতে বাহির হইয়া তেমাথার মোড়ের বড় তেঁতুলতলায় ছায়ায় একখানা যে কাঠের গুঁড়ি পড়িয়া আছে, তাহারই উপর আসিয়া বসিল।

চাল নাই, ডাল নাই, এ নাই, ও নাই—সে তো চুরি করিতে পারে না? একটি পয়সা নাই হাতে। বাজারের কোন দোকানে ধার দিবে না। বহু জায়গায় দেনা। উপায় কি এখন?

না, পলাশপুরেই যাওয়া স্থির। বাড়ীর এ নরকযন্ত্রণার চেয়ে সে ভাল, দিনরাত মনোরমার মধুর বাক্যি আর কেবল 'নাই নাই' বুলি তো শুনিতে হইবে না? প্রজা ঠেঙানোর অনিচ্ছা ইত্যাদি বাজে ওজর, ও কিছু না, সে বিনোদ চাটুজ্জের ছেলে, প্রজা ঠেঙাইতে পিছপাও না; কিন্তু আর একটা কথাও আছে তাহার সেখানে যাইবার অনিচ্ছার মূলে।

ধোপাখালি কাছারির তহবিল হইতে সে জমিদারদের না জানাইয়া চল্লিশটি টাকা ধার করিয়াছিল, তাহা আর শোধ দেওয়া হয় নাই। বিপিনের ভয় আছে, হয়তো এই ব্যাপারটা ধরা পড়িয়া গিয়াছে, সেই জন্যই জমিদারের এত ঘন ঘন তাগাদা তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য।

বিপিনের ছোট ভাই বলাই আজ চার-পাঁচ মাস অসুস্থ। তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্যই টাকা কয়টির নিতান্ত দরকার ছিল। বলাইকে রাণাঘাটে লইয়া গিয়া বড় ডাক্তারকে দেখানো হইয়াছে এবং এখন আগের চেয়ে সে অনেকটা সারিয়া উঠিয়াছে বলিয়া ডাক্তার আশ্বাস দিয়াছেন। বলাই বর্ত্তমানে রাণাঘাটেই মিশনারি হাসপাতালে আছে।

২

পরদিন পলাশপুরে যাওয়ার পথে বিপিন রাণাঘাট হাসপাতালে গেল। স্টেশন থেকে হাসপাতাল প্রায় মাইলখানেক দূরে। বেশ ফাঁকা মাঠের মধ্যে। বলাই দাদাকে দেখিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

—দাদা, আমায় এখানে এরা না খেতে দিয়ে মেরে ফেললে, আমায় বাড়ী নিয়ে যাবে কবে? আমি তো সেরে গেছি, না খেয়ে মলাম; তোমার পায়ে পড়ি দাদা, বাড়ী কবে নিয়ে যাবে বল।

—খেতে দেয় না তোর অসুখ ব'লেই তো। আচ্ছা, আচ্ছা, পলাশপুর থেকে ফিরবার পথে তোকে নিয়ে যাব ঠিক। কি খেতে ইচ্ছে হয়?

—মাংস খাই নি কতদিন। মাংস খেতে ইচ্ছে হয়—বৌদিদির হাতে রান্না মাংস—

—আচ্ছা হবে হবে। এই মাসেই নিয়ে যাব।

বিপিন আড়ালে নার্সকে জিজ্ঞাসা করিল, আমার ভাই মাংস খেতে চাইছে—একটু আধটু—

নার্স এদেশী খ্রীষ্টান, পূর্ব্বে কৈবর্ত্ত ছিল, গোলগাল, দোহারা, বেশি বয়েস নয়—ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, মাংস খেয়ে মরবে যে! নেফ্রাইটিসের রুগী, অত্যন্ত ধরাকাঠের মধ্যে না রাখলে যা একটু সেরে আসছে, তাও যাবে। মাংস!

বৈকালের দিকে পাঁচ মাইল পথ হাঁটিয়া বিপিন পলাশপুরে পৌঁছিল।

বিপিনের বাবা ৺বিনোদ চাটুজ্জে এখানে কাজ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং বিপিনের জমিদার-বাড়ীর সর্ব্বত্র অবাধ গতি। সে অন্দরে ঢুকিতেই জমিদার-গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন, আরে এস এস বিপিন, কখন এলে? তারপর, তোমার ভাই এখনও সেই হাসপাতালেই রয়েছে? কেমন আছে আজকাল?

জমিদার অনাদি চৌধুরী বিপিনের গলার স্বর শুনিয়া দোতলা হইতে ডাক দিয়া বলিলেন, ও কে? বিপিন না? এলে এতদিন পরে? দশ দিনের ছুটি নিয়ে বাড়ী গিয়ে করলে দুমাস। এ রকম ক'রে কাজ চলবে? দাঁড়াও, আমি আসছি—

বিপিন জমিদার-গৃহিণীকে প্রণাম করিল। গৃহিণীর বয়স চল্লিশ ছাড়াইয়াছে, রং ফর্সা,

মোটাসোটা চেহারা, পরনে চওড়া লাল পাড় শাড়ি, হাতে দুই গাছা সোনার বালা ছাড়া অন্য কোন গহনা নাই। তিনি বলিলেন, এস এস, বেঁচে থাক। তোমাকে ডাকার আরও বিশেষ দরকার, খুকীকে নিয়ে জামাই আসছেন বুধবারে। ঘরে একটা পয়সা নেই। ধোপাখালির কাছারি আজ দুমাস বন্ধ। তাগাদাপত্র না করলে জামাই এলে একেবারে মুশকিলে প'ড়ে যেতে হবে। সেইজন্যে কর্ত্তা তোমার ওখানে কাল লোক পাঠিয়েছিলেন তোমায় নিয়ে আসতে।

অনাদি চৌধুরী ইতিমধ্যে নামিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁর বয়স ষাটের উপর, বর্ত্তমান গৃহিণী তাঁর দ্বিতীয় পক্ষ। বাতের রোগী বলিয়া খুব বেশি নড়াচড়া করিতে পারেন না, যদিও শরীর এখনও বেশ বলিষ্ঠ। এক সময়ে দুর্দ্দান্ত জমিদার বলিয়া ইহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।

অনাদি চৌধুরী বলিলেন, খুকী আসছে বুধবারে। এদিকে ধোপাখালি কাছারি আজ দুমাস বন্ধ। একটি পয়সা আদায়-তশিল নেই। তোমার কাণ্ডজ্ঞানটা যে কি, তাও তো বুঝি নে! তোমার বাবার আমলে এই মহল থেকে তিনশো টাকা ফি মাসে আদায় ছিল আর এখন সেই জায়গায় পঞ্চাশ-ষাট টাকা আদায় হয় না। তুমি কাল সকালেই চ'লে যাও কাছারিতে। মঙ্গলবার রাতের মধ্যে আমার চল্লিশটা টাকা চাইই, নইলে মান যাবে, জামাই আসছে এতকাল পরে, কি মনে করবে? আদর-যত্ন করবো কি দিয়ে?

জমিদার-গৃহিণী বলিলেন, আর আসবার সময় কিছু কুমড়ো, বেগুন, থোড় কিংবা মোচা আর যদি পার ভাল মাছ একটা রঘুদের পুকুর থেকে, আর কিছু শাকসব্জি আনবে। ঘানি-ভাঙানো সর্ষে তেল এনো আড়াই সের, আর এক ভাঁড় আখের গুড় যদি পাও—

বিপিন মনে মনে হাসিল। জমিদার-গৃহিণী যে এই সমস্ত আনিতে বলিতেছেন, সবই বিনা মূল্যে প্রজা ঠেঙাইয়া। নতুবা পয়সা ফেলিলে জিনিসের অভাব কি? 'যদি পাও' কথার মানেই হইল 'যদি বিনামূল্যে পাও'—এমন ছোট নজর, আর এমন কৃপণ স্বভাব! পরের জিনিস এমনই যোগাইতে পার, খুব খুশি। দায় পড়িয়াছে বিপিনের পরের শাপমন্যি কুড়াইয়া তাঁহাদের জন্যে বেসাতি আনিবার, এমনই তো ছোট ভাইটা হাসপাতালে পড়িয়া ভুগিতেছে। এই সব জন্যই এখানকার চাকুরির অন্ন তাহার গলা দিয়া নামে না।

৩

পলাশপুর হইতে ধোপাখালির কাছারি আট ক্রোশ। নায়েবের জন্য গাড়ী ব্যবস্থা করিবেন তেমন পাত্র নন অনাদি চৌধুরী—সুতরাং সারা পথ হাঁটিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে বিপিন কাছারি পৌঁছিল। কাছারি-ঘরে ক্যানেস্ত্র-কাটা টিনের দেওয়াল, চাল খড়ের। স্থানীয় জনৈক নাপিতের পুত্র মাসিক বারো আনা বেতনে কাছারিতে ঝাঁটপাটের কাজকর্ম্ম করে। বিপিন তাহাকে সংবাদ দিয়া আনাইল, সে ঘর খুলিয়া ঝাঁট দিয়া কাছারি-ঘরটাকে রাত্রিবাসের কতকটা

উপযোগী করিয়া তুলিল বটে, কিন্তু বিপিনের ভয় হইতেছিল, মেঝেতে যে রকম বড় বড় চার-পাচটা ইঁদুরের গর্ত্ত হইয়াছে রাত্রিবেলা সাপখোপ না বাহির হয়!

চাকর ছোকরা একটি কাচভাঙা হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বালিয়া ঘরের মেঝেতে রাখিয়া বলিল, নায়েববাবু রাত্রে কি খাবা ?

—কিছু খাব না। তুই যা।

—সে কি বাবু! তা কখনও হ'তি পারে ? খাবা না কিছু, রাত কাটাবা কেমন ক'রে ? একটু দুধ দেখে আসি পাড়ার মধ্যে, আপনি বসেন বাবু।

এই ছোকরা চাকর যে যত্ন করে, দরদ দেখায়, বিপিন অনেক আপনার লোকের কাছেও তেমন ব্যবহার পায় নাই, একথা তাহার মনে হইল।

অন্ধকার রাত্রি।

কাছারির সামনে একটু ফাঁকা মাঠ, অন্য সব দিকে ঘন বাঁশবন, এক কোণে একটা বড় বাদাম গাছ। অনাদি চৌধুরীর বাবা ৺হরিনাথ চৌধুরী কাছারি-বাড়ীতে এটি শখ করিয়া পুঁতিয়াছিলেন, ফলের জন্য নয়, বাহার ও ছায়ার জন্য। বাঁশবনে অন্ধকার রাত্রে ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকি ঘুরিয়া ঘুরিয়া চক্রাকারে উড়িতেছে, ঝিঁঝিঁ ডাকিতেছে, মশা বিন্ বিন্ করিতেছে কানের কাছে—কাছারির কাছাকাছি লোকজনের বাস নাই—ভারী নির্জ্জন।

বিপিন একা বসিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল। কত কথাই মনে আসে! বাড়ী হইতে আসিয়া মন ভাল নয়, হাসপাতালে ছোট ভাইটার রোগশীর্ণ মুখ মনে পড়িল। মনোরমার ঝাঁঝালো টক্ টক্ কথাবার্ত্তা। সংসারের ঘোর অনটন। বাজারে হেন দোকান নাই, যেখানে দেনা নাই। আজ শনিবার, সামনের বুধবারে মহল হইতে চল্লিশটা টাকা ও একগাদা ফল, তরকারিপত্র, মাছ, দই জমিদার-বাড়ী লইয়া যাইতে হইবে জামাইয়ের অভ্যর্থনার যোগাড় করিতে। তিন দিনের মধ্যে এ গরীব গাঁয়ে চল্লিশ টাকা আদায় হওয়া দূরের কথা, দশটি টাকা হয় কিনা সন্দেহ—অথচ জমিদার বা জমিদার-গিন্নী তা বুঝিবেন না—দিতে না পারিলেই মুখ ভারী হইবে তাঁদের! কি বিষম মুশকিলেই সে পড়িয়াছে। অথচ চিরকাল তাহাদের এমন অবস্থা ছিল না। বিপিনের বাবা এই কাছারিতে এক কলমে উনিশ বছর কাটাইয়া গিয়াছেন, এই জমিদারদের কাজে! যথেষ্ট অর্থ রোজগার করিতেন, বাড়ীতে লাঙল রাখিয়া চাষবাস করাইতেন, গ্রামের মধ্যে যথেষ্ট নামডাক, প্রতিপত্তি ছিল।

বাবা চক্ষু বুজিবার সঙ্গে সঙ্গে সব গেল। কতক গেল দেনার দায়ে, কতক গেল তাহারই বদ্‌খেয়ালিতে। অল্প বয়সে কাঁচা টাকা হাতে পাইয়া কুসঙ্গীর দলে ভিড়িয়া স্ফূর্তি করিতে গিয়া টাকা তো উড়িলই, ক্রমে জমিজমা বাঁধা পড়িতে লাগিল।

তারপর বিবাহ। সে এক মজার ব্যাপার।

তখনও পর্য্যন্ত যতটুকু নামডাক ছিল পৈতৃক আমলের, তাহারই ফলে এক অবস্থাপন্ন বড় গৃহস্থের ঘরের মেয়ের সহিত হইল বিবাহ। মেয়ের বাবা নাই, কাকা বড় চাকুরি করেন, শালাশালীরা সব কলেজে-পড়া, বিপিন ইংরাজীতে কোনও রকমে নাম সই করিতে পারে

মাত্র। মনোরমা শ্বশুরবাড়ী আসিয়াই বুঝিল বাহির হইতে যত নামডাকই থাকুক, এখানকার ভিতরের অবস্থা অন্তঃসারশূন্য। সে বড় বংশের মেয়ে, মন গেল তার সম্পূর্ণ বিরূপ হইয়া; স্বামীর সহিত সদ্ভাব জমিতে পাইল না যে, ইহাতে বিপিন মনেপ্রাণে স্ত্রীকে অপরাধিনী করিতে পারে কই?

—এই যে নায়েববাবু কখন আলেন? দণ্ডবৎ হই।

বিপিনের চমক ভাঙিল, আগন্তুক এই গ্রামেরই একজন বড় প্রজা, নরহরি দাশ, জাততে মুচি, শুওরের ব্যবসা করিয়া হাতে দুপয়সা করিয়াছে।

বিপিন বলিল, এস নরহরি, বড় মুশকিলে পড়েছি, বুধবারের মধ্যে চল্লিশটি টাকার যোগাড় কি ক'রে করি বল তো? বাবুর জামাই-মেয়ে আসবেন, টাকার বড্ড দরকার। আমি তো এলাম দুমাস পরে। টাকা যোগাড় না করতে পারলে আমার তো মান থাকে না—কি করি, ভারী ভাবনায় পড়ে গেলাম যে!

নরহরি বলিল, এসব কথা এখন নয় বাবু। খাওয়া-দাওয়া করুন, কাল বেন্‌বেলা আমি আসপো কাছারিতে—তখন হবে।

ইতিমধ্যে কাছারির ছোকরা চাকর একটা ঘটিতে কিছু দুধ ও কোঁচড়ে কিছু মুড়ি লইয়া ফিরিল। নরহরি বলিল, আপনি সেবা করুন নায়েববাবু, আজ আসি। কাল কথাবার্ত্তা হবে। কাছারি-ঘরের দোরটা একটু ভাল ক'রে আগড় বন্ধ ক'রে শোবেন রাতে—বড্ড বাঘের ভয় হয়েছে আজ কডা দিন।

বিপিন সকালে একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া বাঁচিল। তহবিলের টাকার ঘাটতি ইহারা টের পায় নাই। তবুও টাকাটা এবার তহবিলে শোধ করিয়া দিতে হইবে, জমিদার হিসাব তলব করিতে পারেন, এতদিন পরে যখন সে আসিয়াছে। তাহা হইলে অন্ততঃ আশি টাকার আপাততঃ দরকার, এই তিনদিনের মধ্যে।

তিনটি দিন বাকী মোটে। এখন কোন ফসলের সময় নয়, আশি টাকা আদায় হইবে কোথা হইতে? পাইক গিয়া প্রজাপত্র ডাকাইয়া আনিল, সকলের মুখেই এক বুলি, এখন টাকা তারা দেয় কি করিয়া?

নরহরি দাশ পনরটি টাকা দিল। ইহার বেশি তাহার গলা কাটিয়া ফেলিলেও হইবে না। বিপিন নিজে প্রজাদের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া আরও দশটি টাকা আদায় করিল দুইদিনে। ইহার বেশি হওয়া বর্ত্তমানে অসম্ভব।

বিপিন একবার কামিনী গোয়ালিনীকে ডাকাইল।

এ অঞ্চলে অনেকে জানে যে, বিপিনের বাবা বিনোদ চাটুজ্জের সঙ্গে কামিনীর নাকি বেশ একটু ঘনিষ্ঠতা ছিল। এখন কামিনীর বয়স পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন, একহারা, শ্যামবর্ণ—হাতে মোটা সোনার অনন্ত। সে বিপিনকে স্নেহের চক্ষে দেখে, বিপিন যখন দশ-বারো বছরের বালক, বাবার সঙ্গে কাছারিতে আসিত তখন হইতেই সে বিপিনকে জানে। বিপিনও তাহাকে সমীহ করিয়া চলে।

কামিনী প্রথমে আসিয়াই বিপিনের ছোট ভাইয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিল।

বাবা, তারে তুমি কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বড় একটা ডাক্তার-টাক্তার দেখাও—ওখানে বাঁচবে না। রাণাঘাটের হাসপাতালে কি হবে? ছোঁড়াডাকে তোমরা সবাই মেলে মেরে ফেলবা দেখছি।

—করি কি মাসীমা, জান তো অবস্থা। বাবা মারা যাওয়ার পরে সংসারে আগের মত জুত নেই। বাবার দেনা শোধ দিয়ে—

কামিনী ঝাঁঝিয়া উঠিয়া বলিল, কর্ত্তার দেনার জন্যে যায় নি—গিয়েছে তোমার উড়ঞ্চুড়ে স্বভাবের জন্যে—আমি জানি নে কিছু? কর্ত্তা যা রেখে গিয়েছিলেন ক'রে, তাতে তোমাদের দুই ভায়ের ভাতের ভাবনা হ'ত না। বিষয়-আশয়, গোলাপালা, তোমার পৈতের সময় হাজার লোক পাত পেড়ে ব'সে খেয়েছিল—কম বিষয়ডা ক'রে গিয়েছিলেন কর্ত্তা? তোমরা বাবা সব ঘুচুলে। তাঁর মত লোক তোমরা হ'লে তো!

বিপিন দেখিল সে ভুল করিয়াছে। বাবার কোন ত্রুটির উল্লেখ ইহার সামনে করা উচিত হয় নাই—সে বরাবর দেখিয়া আসিয়াছে কামিনী মাসী তাহা সহ্য করিতে পারে না। ইহার কাছে কিছু টাকা আদায় করিতে হইবে, রাগাইয়া লাভ নাই। সুর বেশ মোলায়েম করিয়া বলিল, ও কথা যাক মাসীমা, কিছু টাকা দিতে পার, এই গোটা চল্লিশ টাকা। কিস্তির সময় আদায় ক'রে আবার দেব।

কামিনী পূর্ব্ববৎ ঝাঁঝের সঙ্গেই বলিল, টাকা, টাকা! টাকার গাছ দেখেছ কিনা আমার? সেবার এক কাঁড়ি টাকা যে নিলে আর উপুড়-হাত করলে না, আর একবার দেলাম কুড়ি টাকা পূজোর সময়; তোমার কেবল টাকার দরকার হ'লেই—মাসী মাসী। বাতে যে পঙ্গু হয়ে পড়ে ছিলাম কুড়ি-পঁচিশ দিন—খোঁজ করেছিলে মাসীমা বলে?

বিপিন কামিনী মাসীকে কি করিয়া চালাইতে হয় জানে! তরুণ-তরুণীদের কাছে প্রৌঢ় বা প্রৌঢ়াদের দুর্ব্বলতা ধরা পড়িতে বেশিক্ষণ লাগে না। তাহারা জানে উহাদের কি করিয়া হাতে রাখিতে হয়। সুতরাং বিপিন হাসিয়া বলিল, খোকার ভাতের সময় তোমায় নিয়ে যাব ব'লে সব ঠিক মাসী, এমন সময় বলাইটা অসুখে পড়ল; তোমার টাকাকড়িও সব তো এতদিন শোধ হয়ে যেত, ওর অসুখটা যদি না হ'ত।

কামিনী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিল, তারপর হঠাৎ জবাব দিল, আচ্ছা, হয়েছে ঢের, আর বলার কাজ নেই বাপু। বেলা হয়েছে, চললাম আমি। কদিন আছ এখানে?

—মঙ্গলবার সন্দেবেলা কি বুধবার সকালে যাব। মাসীমা, যা বললাম কথাটা মনে রেখ। টাকাটা যদি যোগাড় ক'রে দিতে পারতে, তবে বড্ড উপকার হ'ত। তোমার কাছে না চাইব তো কার কাছে চাইব, বল!

কামিনী সে কথায় তত কান না দিয়া আপন মনে চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, তোমার পাইককে কি ওই নটবরের ছেলেটাকে আমার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিও, পেঁপে পেকেছে সঙ্গে দেব।

মঙ্গলবার বৈকালে কামিনীর কাছে পাওয়া গেল পঁচিশটি টাকা। খোপাখালির হাট হইতে জমিদার-গিন্নীর ফরমাশমত জিনিসপত্র কিনিয়া বিপিন বুধবার শেষ রাত্রির দিকে গরুর গাড়ী করিয়া রওনা হইল এবং বেলা দশটার সময় পলাশপুর আসিয়া পৌঁছিল।

জমিদার-বাড়ী পৌঁছিবার পূর্ব্বে শুনিল, জামাইবাবু কাল রাত্রে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। জমিদারবাবুর অবস্থা এখন তত ভাল নয় বলিয়া তেমন বড় পাত্রে মেয়েকে দিতে পারেন নাই। জামাই আইন পাস করিয়া আলিপুর কোর্টে ওকালতি করেন। কলিকাতায় বাড়ী আছে—পৈতৃক বাড়ী, যদিও দেশ এই পলাশপুরের কাছেই নোনাপাড়া।

তরিতরকারির ধামা গরুর গাড়ী হইতে নামাইতে দেখিয়া জমিদার-গৃহিণী খুশি হইয়া বলিলেন, ওই দেখ, বিপিন মহল থেকে কত জিনিসপত্র এনেছে! কুমড়োটা কে দিলে বিপিন? কি চমৎকার কুমড়োটি!

বিপিন বলিল, দেবে আবার কে? কাল হাটে কেনা।

—আর এই পটল, ঝিঙে, শাকের ডাঁটা?

—ও সব হাটে কেনা। দেবে কে বলুন, কার দোরেই বা আমি চাইতে যাব?

—ওমা, সব হাটে কেনা! তা এত জিনিস পয়সা খরচ ক'রে না আনলেই হ'ত। মহল থেকে আগে তো দেখেছি কত জিনিসপত্র আসত, তোমার বাবাই আনতেন, আর আজকাল ছাই বলতে রাইও তো কখনও দেখি নে। ওটা কি, মাছ দেখছি যে, বেশ মাছ! ওটাও কেনা নাকি?

—আড়াই সের, সাত আনা দরে, সাড়ে সতেরো আনায় নগদ কেনা।

জমিদার-গিন্নী বিরক্তির মুখে বলিলেন, কে বাপু তোমায় বলেছিল নগদ পয়সা ফেলে আড়াই সের মাছ কিনে আনতে? মহলে নেই এক পয়সা আদায়, এর ওপর তরিতরকারি মাছে দু' টাকার ওপর খরচ ক'রে ফেলতে কে বলেছিল, জিগ্যেস করি।

বিপিন বলিল, দু' টাকার ওপর কি বলছেন? সাড়ে তিন টাকা খরচ হয়েছে। আপনি সেই এক নাগরি আখের গুড় আনতে বলেছিলেন, তাও এনেছি। সাড়ে সাত সের নাগরি, তিন আনা ক'রে সের হিসেবে—

জমিদার-গিন্নী রাগিয়া বলিলেন, থাক, আর হিসেব দেখাতে হবে না। তোমাকে আমি ওসব কিনে আনতে কি বলেছিলাম যে আমার কাছে হিসেব দেখাচ্ছ?

বিপিন খুশির সহিত ভাবিল, বেশ হয়েছে, মরছেন জ্ব'লে পয়সা খরচ হয়েছে ব'লে। কি কঞ্জুস আর কি ছোট নজর রে বাবা!

মুখে সে কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

৪

জামাইটির সঙ্গে তাহার দেখা হইল বিকালের দিকে। বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ বছর, একটু হৃষ্টপুষ্ট, চোখে চশমা, গম্ভীর মুখ—বৈঠকখানায় বসিয়া কি ইংরেজী কাগজ পড়িতেছিলেন। বিপিন বার কয়েক বৈঠকখানায় যাওয়া-আসা করিল বটে, কিন্তু জামাইবাবু বোধ করি তাহার অস্তিত্বের প্রতি বিশেষ কিছু মনোযোগ না দিয়াই একমনে খবরের কাগজ পড়িয়া যাইতে লাগিলেন।

বিপিনের রাগ হইল। তখনই সে সংকল্প করিল, সেও দেখাইবে, বড়লোকের জামাইকে সে গ্রাহ্যও করে না। তুমি আছ বড়লোকের জামাই, তা আমার কি?

বিপিন বৈঠকখানা-ঘরে ঢুকিয়া ফরাশ বিছানো চৌকির এক পাশে বসিয়া রহিল খানিকক্ষণ নিঃশব্দে। দশ মিনিট কাটিয়া গেল, জামাইবাবু তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না বা একটা কথাও বলিলেন না।

বিপিন পকেট হইতে বিড়ি বাহির করিয়া ধরাইল এবং ইচ্ছা করিয়াই ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল এমন ভাবে যাহাতে জামাইয়ের চোখে পড়ে।

জামাইবাবু বোধ হয় এবার ধূম্র হইতে বহ্নিমান পর্ব্বতের অস্তিত্ব অনুমান করিয়া খবরের কাগজ চোখের সম্মুখ হইতে নামাইলেন। বিপিনকে তিনি চেনেন, বিবাহের পর দুই তিন বার দেখিয়াছেন, শ্বশুরের জমিদারির জনৈক কর্ম্মচারী বলিয়া জানেন। তাহাকে এরূপ নির্ব্বিকার ও বেপরোয়া ভাবে তাঁহার সম্মুখে বিড়ি ধরাইয়া খাইতে দেখিয়া তিনি বিস্মিত তো হইলেনই, লোকটার বেয়াদবিতে একটু রাগও হইল।

কিন্তু সে বেয়াদবি সীমা অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণ নির্ব্বাক করিয়া দিল, যখন সেই লোকটা দাঁত বাহির করিয়া একগাল হাসিয়া বলিল, জামাইবাবু, কেমন আছেন? চিনতে পারেন? বিড়ি-টিড়ি খান নাকি? নিন না, আমার কাছে আছে।

কথা শেষ করিয়া লোকটা একটা দেশলাই ও বিড়ি তাঁহার দিকে আগাইয়া দিতে আসিল। নিতান্ত বেয়াদব ও অসভ্য।

জামাইবাবু বিপিনের দিকে না চাহিয়া গম্ভীর মুখে সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, থাক, আছে আমার কাছে।—বলিয়া পকেট হইতে রৌপ্যনির্ম্মিত সিগারেটের কেস বাহির করিয়া একটি সিগারেট ধরাইলেন। বিপিন ইহাতে অপমানিত মনে করিল। প্রতিশোধ লইবার জন্য পাল্টা অপমানের অন্য কোন ফাঁক খুঁজিয়া না পাইয়া সে বলিয়া উঠিল, জামাইবাবুর ও কি সিগারেট? একটা এদিকে দিন দিকি!

বাড়ীর গোমস্তা জমিদারবাবুর জামাইয়ের নিকট সিগারেট চায়, ইহার অপেক্ষা বেয়াদবি ও অপমান আর কি হইতে পারে? বিপিন সিগারেটের জন্য গ্রাহ্যও করে না; কিন্তু লোকটাকে অপমান করিয়াই তাহার সুখ।

জামাইবাবু কিন্তু রৌপ্যনির্ম্মিত সিগারেট-কেস হইতে একটা সিগারেট বাহির করিয়া

তাহার দিকে ছুড়িয়া দিলেন, কোন কথা বলিলেন না।

বিপিন সিগারেট ধরাইয়া বলিল, তারপর জামাইবাবু কবে এলেন?

—কাল রাত্রে।

—বাড়ীর সব ভাল তো?

—হুঁ।

—আপনি এখন সেই আলিপুরেই ওকালতি করছেন?

—হুঁ।

—বেশ বেশ। দিদিমণি আর ছেলেপুলেদের সব এখানে এনেছেন নাকি?

—হুঁ।

এতগুলি কথার উত্তর দিতে গিয়া জামাইবাবু একবারও তাহার দিকে চাহিলেন না বা খবরের কাগজ সেই যে আবার চোখের সামনে ধরিয়া আছেন তাহা হইতে চোখও নামাইলেন না।

বিপিনের ইচ্ছা হইল, আরও একটু শিক্ষা দেয় এই শহুরে চালবাজ লোকটাকে। অন্য কোনও উপায় না ঠাওরাইতে পারিয়া বলিল, মানীর শরীর বেশ ভাল আছে তো?

মানী জমিদারবাবুর মেয়ে সুলতার ডাকনাম। ডাকনামে গ্রামের মেয়েকে ডাকা এমন কিছু আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়, যদি বিপিনের বয়স বেশি হইত। কিন্তু তাহার বয়স জামাইয়ের চেয়ে এমন কিছু বেশি নয়, বা সুলতাও নিতান্ত বালিকা নয়, কম করিয়া ধরিলেও সুলতা বাইশ বছরে পড়িয়াছে গত জ্যৈষ্ঠ মাসে।

এইবার প্রত্যাশিত ফল ফলিল বোধ হয়, জামাইবাবু হঠাৎ মুখ হইতে খবরের কাগজ নামাইয়া বিপিনের দিকে চাহিয়া একটু কড়া গম্ভীর সুরে প্রশ্ন করিলেন, মানী কে?

অর্থাৎ মানী কে তিনি ভাল রকমেই জানেন, কিন্তু জমিদার-বাড়ীর মেয়েকে 'মানী' বলিয়া সম্বোধন করিবার বেয়াদবি তোমার কি করিয়া হইল—ভাবখানা এইরূপ।

বিপিন বলিল, মানী মানে দিদিমণি—বাবুর মেয়ে, আমরা মানী ব'লেই জানি কিনা। আমাদের চোখের সামনে মানুষ—

ঠিক এই সময়ে চা ও জলযোগের জন্য অন্দর-বাড়ী হইতে জামাইবাবুর ডাক পড়িল।

বিপিন বসিয়া আর একটি বিড়ি ধরাইল, শহুরে জামাইবাবুর চালবাজি সে ভাঙিয়া দিয়াছে। বিপিনকে এখনও ও চেনে নাই। চাকুরির পরোয়া সে করে না, আর কেহ যে তাহার সামনে চাল দেখাইয়া তাহাকে ছোট করিয়া রাখিবে—তাহার ইহা অসহ্য।

ঝি আসিয়া বলিল, নায়েববাবু, মা-ঠাকরুন বললেন, আপনি কি এখন জল-টল কিছু খাবেন?

রাগে বিপিনের গা জ্বলিয়া গেল। এইভাবে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলে অতি বড় নির্লজ্জ লোকও কি বলিতে পারে যে সে খাইবে? ইহাই ইহাদের বলিয়া পাঠাইবার ধরন। সাধে কি সে এখানে থাকিতে নারাজ!

রাত্রে খাওয়ার সময়েও এই ধরনের ব্যাপার অন্য রূপ লইয়া দেখা দিল।

দালানের একপাশে জামাইবাবু ও তাহার খাবার জায়গা হইয়াছে। জামাইয়ের পাতের চারিদিকে আঠারোটা বাটি, তাহাকে দিবার সময় সব জিনিসই পাতে দিয়া যাইতেছে। তাহার পরে দেখা গেল, জামাইবাবুর পাতে পড়িল পোলাও, তাহার পাতে সাদা ভাত। অথচ বিপিন বিকাল হইতেই খুশির সহিত ভাবিয়াছে, রাত্রে পোলাও খাওয়া যাইবে। পোলাও রান্নার কথা সে জানিত।

কি ভাগ্য, জামাইয়ের পাতে লুচি দেওয়ার সময় জমিদার-গিন্নী তাহার পাতেও খান চার লুচি দিলেন।

বিপিন খাইয়ে লোক, চারখানি লুচি শেষ করিয়া বসিয়া আছে দেখিয়া জমিদার-গিন্নী বলিলেন, বিপিনকে লুচি দেব!

ইহা জিজ্ঞাসা নয়, দিব্য পরিস্ফুট স্বগত উক্তি। অর্থাৎ ইহা শুনিয়া যদি বিপিন লুচি আনিতে বারণ করিয়া দেয়। কিন্তু বিপিন তরুণ যুবক, ক্ষুধাও তাহার যথেষ্ট। চক্ষুলজ্জা করিলে তাহার চলে না। সে চুপ করিয়া রহিল। জমিদার-গিন্নী আবার চারখানা গরম লুচি আনিয়া তাহার পাতে দিলেন, বিপিন সে কখানা শেষ করিতে এবার কিছু বিলম্ব করিল চক্ষুলজ্জায় পড়িয়া। কারণ, ওদিকে জামাইবাবু হাত গুটাইয়াছেন। জমিদার-গিন্নী ঘরের দোরে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। বলিলেন, বিপিনকে লুচি দেব!

ইহাও জিজ্ঞাসা নয়, পূর্ব্ববৎ স্বগত উক্তি, তবে বিপিনকে শুনাইয়া বটে। বিপিন ভাবিল, ভাল মুশ্‌কিলে পড়া গেল! লুচি দেব, লুচি দেব! দেবার ইচ্ছে হয় দিয়ে ফেললেই তো হয়, মুখে অমন বলার কি দরকার?

জমিদার-গৃহিণী যদি ভাবিয়া থাকেন যে, বিপিন আর লুচি আনিতে বারণ করিবে, তবে তাঁহাকে নিরাশ হইতে হইল, বিপিন কোন কথা কহিল না। আবার চারখানা লুচি আসিল।

চারখানি করিয়া ফুলকো লুচিতে বিপিনের কি হইবে? সে পাড়াগাঁয়ের ছেলে, খাইতে পারে, ওরকম এক ধামা লুচি হইলে তবে তাহার কুলায়। কাজেই সে বলিল, না মাসীমা, লুচি খাওয়া অভ্যেস নেই, ভাত না হ'লে যেন খেয়ে তৃপ্তি হয় না।

জমিদার-গিন্নী ভাত আনিয়া দিলেন, মনে হইল তিনি নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছেন। বিপিন মনে মনে হাসিল।

খাওয়া শেষ করিয়া সে বাহিরের ঘরে যাইতেছে, রোয়াকের কোণের ঘরের জানালার কাছ দিয়া যাইবার সময় তাহাকে কে ডাকিল, ও বিপিনদা!

বিপিন চাহিয়া দেখিল, জানালার গরাদে ধরিয়া ঘরের ভিতরে জমিদারবাবুর মেয়ে মানী দাঁড়াইয়া আছে।

মানী দেখিতে বেশ সুশ্রী, রংও ওর মায়ের মত ফর্সা, এখনও একহারা চেহারা আছে, তবে বয়স হইলে মায়ের মত মোটা হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। মানী বুদ্ধিমতী মেয়ে, বেশভূষার প্রতি চিরকালই তাহার সযত্ন দৃষ্টি, এখনও যে ধরণের একখানি রঙিন শাড়ি ও

হাফহাতা ব্লাউজ পরিয়া আছে, পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা তেমন আটপৌরে সাজ করিবার কল্পনাও করিতে পারে না, একথা বিপিনের মনে হইল।

বিপিনের বাবা বিনোদ চাটুজ্জে যখন এঁদের স্টেটে নায়েব ছিলেন, বিপিন বাপের সঙ্গে বাল্যকালে কত আসিত এঁদের বাড়ীতে, মানীর তখন নয়-দশ বছর বয়স। মানীর সঙ্গে সে কত খেলা করিয়াছে, মানীর সাহায্যে উপরের ঘরের ভাঁড়ার হইতে আমসত্ত্ব ও কুলের আচার চুরি করিয়া দুইজনে সিঁড়ির ঘরে লুকাইয়া দাঁড়াইয়া খাইয়াছে, মানীর পড়া বলিয়া দিয়াছে। বিপিনের পৈতা হইবার পর মানী একবার বিপিনের ভাতের থালায় নিজের পাত হইতে কি একটা তুলিয়া দিয়া বিপিনের খাওয়া নষ্ট করার জন্য মায়ের নিকট হইতে খুব বকুনি খায়। সেই মানী, কত বড় হইয়া গিয়াছে! ওর দিকে যেন আর তাকানো যায় না।

বিপিন বলিল, মানী, কেমন আছ?

—ভাল আছি। তুমি কেমন আছ বিপিনদা?

বিপিনের মনে হইল, তাহার সহিত কথা বলিবার জন্যই মানী এই জানালার ধারে অনেকক্ষণ হইতে দাঁড়াইয়া আছে।

মানীকে এক সময় বিপিন যথেষ্ট স্নেহের চক্ষে দেখিত, ভালবাসা হয়তো তখনও ঠিক জন্মায় নাই; কিন্তু বিপিনের সন্দেহ হয়, মানী তাহাকে যে চক্ষে দেখিত তাহাকে শুধু 'স্নেহ' বা 'শ্রদ্ধা' বলিলে ভুল হইবে, তাহা আরও বড়, ভালবাসা ছাড়া তাহার অন্য কোন নাম দেওয়া বোধ হয় চলে না।

মানীর কথা বিপিন অনেকবার ভাবিয়াছে। এক সময়ে মানী ছিল তাহার চোখে নারী-সৌন্দর্য্যের আদর্শ। মনোরমাকে বিবাহ করিবার সময় বাসরঘরে মানীর মুখ কতবার মনে আসিয়াছে। তবে সে আজ ছয়-সাত বছরের কথা, তাহার নিজের বয়সই হইতে চলিল সাতাশ-আটাশ।

বিপিন বলিল, খুব ভাল আছি। তুমি যে মাথায় খুব বড় হয়ে গিয়েছ মানী?

—বিপিনদা, ওরকম ক'রে কথা বলছ কেন? আমি কি নতুন লোক এলাম?

বিপিনের মনে পড়িল, মানীকে সে কখনো 'তুমি' বলে নাই, চিরকাল 'তুই' বলিয়া আসিয়াছে; এখন অনেক দিন পরে দেখা, প্রথমটা একটু সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল, বলিল, কলকাতার লোক এখন তোরা, তুই কি আর সেই পাড়াগেঁয়ের ছোট্ট মানীটি আছিস?

—তুমি কি আমাদের কাছারিতে কাজে ঢুকেছ?

—হ্যাঁ। না ঢুকে করি কি, সংসার একেবারে অচল। তোর কাছে বলতে কোনও দোষ নেই মানী, যেদিন এখানে এলুম এবার, না হাতে একটি পয়সা, না ঘরে একমুঠো চাল। আর ধর লেখাপড়াই বা কি জানি, কিছুই না।

—কিন্তু তুমি এখানে টিকতে পারবে না বিপিনদা। তুমি ঘোর খামখেয়ালী মানুষ, তোমায় আর আমি চিনি নে? বিনোদকাকা যে রকম ক'রে কাজ ক'রে টিকে থেকে গিয়েছেন, তুমি কি তেমন পারবে? আজই কি সব করেছ, দু তিন টাকা খরচ ক'রে দিয়েছ—মা

বলছিলেন বাবাকে। বলিয়া মানী হাসিল।

বিপিন বলিল, যদি খরচই ক'রে থাকি, সে তো তোদেরই জন্যে। তুই এসেছিস্ এতকাল পরে, একটু ভাল মাছ না খেতে পেলে তুইই বা কি ভাববি?

মানী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, মহাল থেকে মাছ আনলে না কেন?

—কে মাছ দেবে বিনি পয়সায় তোদের মহালে? বাবার আমলের সে ব্যাপার আর আছে নাকি? এখন লোক হয়ে গিয়েছে চালাক, তাদের চোখ কান ফুটেছে। তোর মা কি সে খবর রাখেন?

—তা নয়, বিনোদকাকার মত ডানপিটে দুঁদেও তো তুমি নও বিপিনদা। তুমি ভালমানুষ ধরনের লোক, জমিদারির কাজ করা তোমার দ্বারা হবে না।

শেষ কথাগুলি মানী যথেষ্ট গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বলিল।

বিপিন হাসিয়া উঠিয়া বলিল, তাই তো রে মানী, একেই না বলে জমিদারের মেয়ে! দস্তুরমত জমিদার চালের কথাবার্ত্তা হচ্ছে যে!

মানী বলিল, কেন হবে না, বল? আমি জমিদারের মেয়ে তো বটেই, সংস্কৃত তো পড় নি বিপিনদা, সংস্কৃতে একটা শ্লোক আছে—সিংহের বাচ্চা জন্মেই হাতীর মুণ্ডু খায় আর—

—থাক্ থাক্, তোর আর সংস্কৃত বিদ্যে দেখাতে হবে না, ও সবের ধার মাড়াই নি কখনও। আচ্ছা, আসি মানী, রাত হয়ে যাচ্ছে।

মানী বলিল, শোন শোন, যেও না, রাত এখন তো ভারী! আচ্ছা বিপিনদা, ভারী দুঃখ হয় আমার, লেখাপড়াটা কেন ভাল ক'রে শিখলে না? তোমার চেহারা ভাল, লেখাপড়া শিখলে চাকরিতে তোমায় যেচে আদর করে নিত—এ আমি বলতে পারি।

বিপিন বলিল, আচ্ছা মানী, একবার তুই আর আমি ভাঁড়ারঘর থেকে কুলচুর চুরি ক'রে খেয়েছিলাম, মনে পড়ে? সিঁড়ির ঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেয়েছিলুম?

মানী বলিল, তা আর মনে নেই! সে সব একদিন গিয়েছে! কিন্তু আমার কথা ওভাবে চাপা দিলে চলবে না। লেখাপড়া শিখলে না কেন, বল?

বিপিন হাসিয়া বলিল, উঃ, কি আমার কৈফিয়ৎ তলবকারিণী রে!

পরে ঈষৎ গম্ভীর মুখে বলিল, সে অনেক কথা। সে কথা তোর শুনে দরকারও নেই। তবে তোর কাছে মিথ্যে কথা বলব না। হ'ল কি জানিস? বাবা মারা গেলেন বিস্তর বিষয়সম্পত্তি ও কাঁচা টাকা রেখে। আমি তখন সবে কুড়ি বছরে পা দিয়েছি, মাথার ওপর কেউ নেই। টাকা উড়ুতে আরম্ভ ক'রে দিলাম, পড়াশুনো ছাড়লাম, বিষয়সম্পত্তি নগদ টাকা পেয়ে কম দরে মৌরসী বিলি করতে লাগলাম। বদখেয়ালের পরামর্শ দেবারও লোক জুটে গেল অনেক। কতদূর যে নেমে গেলাম—

মানী একমনে শুনিতেছিল, শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, বল কি বিপিনদা!

—তোর কাছে বলতে আমার কোনও সঙ্কোচ নেই, সঙ্কোচ হ'লেও কোনও কথা লুকোব না। আজ এত দুঃখু পাব কেন মানী, এখানে চাকরি করতে আসব কেন?

কিন্তু এখন বয়স হয়ে বুঝেছি, কি ক'রেই হাতের লক্ষ্মী ইচ্ছে ক'রে বিসর্জ্জন দিয়েছিলাম তখন !

—তারপর ?

—তারপর ওই যে বলছিলাম, নানা রকম বদখেয়ালে টাকাগুলো এবং বিষয়-আশয় জলাঞ্জলি দিয়ে শেষে পড়লাম ঘোর দুর্দ্দশায়। খেতে পাই নে—এমন দশায় এসে পৌঁছুলাম।

মানীর মুখ দিয়া এক ধরণের অস্ফুট বিস্ময় ও সহানুভূতির স্বর বাহির হইল, বোধ হয় তাহার নিজেরও অজ্ঞাতসারে। বিপিনের বড় ভালো লাগিল মানীর এই দরদ ও তাহার সতেজ সহজ সজীব সহানুভূতি।

—সে সব কথাগুলো তোর কাছে বলব না। মিছে তোর মনে কষ্ট দেওয়া হবে। এই রকমে দেড় বছর কেটে গেল, তারপর তোর বাবার কাছে এলুম চাকরির চেষ্টায়, চাকরি পেয়েও গেলাম। এই হ'ল আমার ইতিহাস। তবে এ চাকরি পোষাবে না, সত্যি বলছি। এ আমার অদৃষ্টে টিকবে না। দেখি, অন্য কোথাও ভাগ্য পরীক্ষা ক'রে—

মানী অত্যন্ত একমনে কথাগুলি শুনিতেছিল। গম্ভীর মুখে বলিল, একটা কথা আমার শুনবে ?

—কি ?

—আমায় না জানিয়ে তুমি এ চাকরি ছাড়বে না, বল ?

—সে কথা দেওয়া শক্ত মানী। সত্যি বলছি, তুই এসেছিস এখানে তাই, নইলে বোধ হয় এবার বাড়ী থেকে আসতাম না। তবে যে কদিন তুই আছিস, সে কদিন আমিও থাকব। তারপর কি হয় বলতে পারছি নে।

—চিরকালটা তোমার একভাবে গেল বিপিনদা। নিজের গোঁ ও বুদ্ধিতে কষ্ট পেলে চিরদিন। আমার কথা একটিবার রাখ বিপিনদা, তেজ দেখানোটা একবারের জন্যে বন্ধ রাখ। আমায় না জানিয়ে চাকরি ছেড়ো না, আমি তোমার ভালোর চেষ্টাই করব।

বিপিন হাস্যমিশ্রিত ব্যঙ্গের সুরে বলিল, উঃ, মানী পরের উপকারে মন দিয়েছে দেখছি। এমন মূর্ত্তিতে তো তোকে কখনও দেখেছি ব'লে মনে হচ্ছে না মানী ?

মানী রাগতভাবে বলিল, আবার !

—না না, আচ্ছা তোর কথাই শুনব, যা। রাগ করিস নে।

—কথা দিলে ?

এই সময় ঘরের মধ্যে মানীর ছোট ভাই সুধীর আসিয়া পড়াতে মানী পিছন ফিরিয়া চাহিল। বিপিন তাড়াতাড়ি বলিল, চলি মানী, শুইগে, রাত হয়েছে। শরীর ক্লান্ত আছে খুব, সারাদিন মহালে ঘুরেছি টো টো ক'রে রদ্দুরে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১

রাত্রে বিপিনের ভাল ঘুম হইল না। মানীর সঙ্গে দেখা হওয়াতে তাহার মনের মধ্যে কেমন যেন সব গোলমাল হইয়া গিয়াছে। মানী তাহার সঙ্গে কথা বলিবার জন্যই জানালার ধারে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহা হইলে সে আজও মনে রাখিয়াছে!

—তবে যে বলে, বিয়ে হলেই মেয়েরা সব ভুলে যায়!

বিপিনের পৌরুষগর্ব্ব একটু তৃপ্ত হইয়াছে। মানী জমিদারের মেয়ে, সে গরিব, লেখাপড়া এমন কিছু জানে না, দেখিতেও খুব ভাল নয়, তবু তো মানী তাহারই সঙ্গেই নির্জ্জনে কথা বলিবার জন্য লুকাইয়া জানালায় দাঁড়াইয়া ছিল।

দুই-তিন দিনের মধ্যে মানীর সঙ্গে আর দেখা হইল না। অনাদিবাবু তাহাকে লইয়া হিসাবপত্র দেখিতে বসেন, রোকড় আজ দুই মাস লেখা হয় নাই, খতিয়ান তৈয়ারি নাই, মাসকাবারি হিসাবের তো কাগজই কাটা হয় নাই। খাইবার সময় বাড়ীর মধ্যে যায়, খাইয়া আসিয়াই কাছারি-বাড়ীতে গিয়া জমিদারবাবুর সামনে বসিয়া কাজ করিতে হয়।

অনাদিবাবু লোক খারাপ নন, তবে গম্ভীর প্রকৃতির লোক, কথাবার্ত্তা বেশি বলেন না। জমিদারির কাজ খুব ভাল বোঝেন, তিনি আসনে বসিয়া থাকিলে কাজে ফাঁকি দেওয়া শক্ত।

—বিপিন, গত মাসের প্রজাওয়ারী হিসেবটা একবার দেখি!

বিপিন ফাঁপরে পড়িল। সে-খাতায় গত তিন মাসের মধ্যে সে হাতই দেয় নাই।

—ও খাতা এখন তৈরি নেই।

—তৈরি নেই, তৈরি কর। কিস্তির আর দেরি কি? এখনও যদি তোমার সে হিসেব তৈরি না থাকে—

তারপরে আছে নানা ঝঞ্ঝাট। জেলেরা কোমড়-জাল ফেলিয়াছিল পুঁটিখালির বাঁওড়ে, বিপিনই জাল পিছু পাঁচ টাকা হিসাবে তাহাদের বন্দোবস্ত দিয়াছিল; আজ চার মাস হইয়া গেল, কেহ একটি পয়সা আদায় দেয় নাই। সেজন্যও জমিদারবাবুর কাছে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে প্রাণ গেল।

আজই অনাদিবাবু বলিলেন, তুমি খেয়ে-দেয়ে বীরু হাড়ীকে সঙ্গে নিয়ে নিজেই একবার ঘোষপুরে যাও, আজ কিছু বেটাদের কাছ থেকে আনতেই হবে। মেয়ে জামাই এখানে রয়েছে, খরচের অন্ত নেই। আজ অন্তত কুড়িটি টাকা নিয়ে এস।

এই রৌদ্রে খাইয়া উঠিয়াই ঘোষপুরে ছুটিতে হইবে। নায়েব গোমস্তা প্রজাবাড়ী তাগাদা করিতে দৌড়ায় কোন জমিদারিতে? ইহাদের এখানে এমনই ব্যবস্থা। পাইক-পেয়াদার মধ্যে বীরু হাড়ী এক হইয়াও বহু এবং বহু হইয়াও এক। বাজে পয়সা

খরচ ইঁহারা করিবেন না, সুতরাং আদায়ের অবস্থাও তথৈবচ।

সন্ধ্যার সময় ঘোষপুর হইতে সে ফিরিল।

জেলেদের পাড়ায় আজ দুই তিন মাস হইতে ঘোর ম্যালেরিয়া লাগিয়াছে। কেহ কাজে বাহির হইতে পারে নাই। কোমড়-জাল যেমন তেমনই জলে ফেলা রহিয়াছে। তবুও সে নিজে গিয়াছিল বলিয়া তাহার খাতিরে টাকা চারেক মাত্র আদায় হইয়াছে।

২

রাত্রে অনাদিবাবু ডাকিয়া পাঠাইলেন বাড়ীর মধ্যে। গিন্নীও সেখানে ছিলেন।

—কত আদায় করলে বিপিন ?

বিপিন মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, চার টাকা।

অনাদিবাবু গুড়গুড়ির নল ফেলিয়া তাকিয়া ছাড়িয়া সোজা হইয়া বসিলেন। চার টাকা মোটে! বল কি ? এঃ, এর নাম আদায় ? তবেই তুমি মহালের কাজ করেছ!

গিন্নী বলিয়া উঠিলেন, জেলেদের মহালে গেলে বাপু, এক-আধটা বড় মাছই না হয় নিয়ে এস! মেয়ে-জামাই এখানে রয়েছে, তা তোমার কি সে হুঁশ-পবন আছে ? সেদিন বললাম ধোপাখালির হাট থেকে মাছ আনতে, না আড়াই সের এক কাৎলা মাছ পয়সা দিয়ে কিনে এনে হাজির!

বিপিনের ভয়ানক রাগ হইল। একবার ভাবিল, সে বলে, বেশ, এমন লোক রাখুন, যে প্রজা ঠেঙিয়ে বিনি-পয়সায় মাছ আপনাদের এনে দিতে পারবে। আমি চললুম, আমার মাইনে যা বাকি পড়েছে আজই চুকিয়ে দিন। কিন্তু অনেক কষ্টে সামলাইয়া গেল। কেবল বলিল, মাছ কেউ এখন ধরচে না মাসীমা। সবাই মরছে ম্যালেরিয়ায়, মাছ ধরবার একটা লোকও নেই।…বিপিন সামলাইয়া গেল মানীর কথা মনে করিয়া। মানী এখানে থাকিতে তাহার বাপ-মায়ের সঙ্গে সে অপ্রীতিকর কিছু করিতে পারিবে না।

জমিদার-গিন্নী বলিলেন, আর বার-বাড়ীতে যাচ্ছ কেন, একেবারে খেয়ে যাও।

ইঁহাদের বাড়ীতে রাঁধুনী আছে—এক বৃদ্ধা বামুনের মেয়ে। সে রাত্রে চোখে দেখিতে পায় না বলিয়া গিন্নী নিজেই পরিবেশন করেন। জামাইবাবুও একসঙ্গেই বসিয়া খান, তবে তিনি নরলোকের সঙ্গে বড় একটা কথাবার্ত্তা বলেন না। আজও বিপিন দেখিল, একই জায়গায় খাইতে বসিয়া জামাইয়ের পাতে পড়িল মিষ্টি পোলাও, তাহার পাতে দেওয়া হইল সাদা ভাত। তবে একসঙ্গে বসাইবার মানে কি ? সেদিনও ঠিক এমন হইয়াছে সে জানে, ইঁহারা কৃপণের একশেষ, জামাইয়ের জন্য কোনও রকমে ক্ষুদ্র হাঁড়ির এক কোণে দুটি পোলাও রাঁধিয়াছেন, তাহা হইতে তাহাকে দিতে গেলে চলিবে কেন ? তবু রোজ পোলাওয়ের ব্যবস্থা করিয়া বড়মানুষি দেখানো চাই! খাওয়ার পরে সে চলিয়া আসিতেছে বাহির-বাড়ীতে, জানালায় মানী দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকিল, ও বিপিনদা!

—এই যে মানী, কদিন দেখি নি ?

—তুমি কখন যাও, কখন খাও, তোমার নিজেরই হিসেব আছে ? আজ পোলাও কেমন খেলে ?

—বেশ।

—না, সত্যি বল না ? ভাল হয়েছিল ?

—কেন বল্ তো ?

—আগে বল না, কেমন হয়েছিল ?

—বললুম তো, বেশ হয়েছিল।

—আমি রেঁধেছি। তুমি মিষ্টি পোলাও খেতে ভালবাসতে, মনে আছে ?

—খুব মনে আছে। আচ্ছা, আমি যাই মানী, রাত হয়ে গেল খুব।

মানী একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, মা তোমাকে পেট ভ'রে খেতে দিয়েছিল তো পোলাও? আমি ওখানে যেতাম, কিন্তু—

বিপিন বুঝিতে পারিল, মানীর স্বামীও সেখানে, এ অবস্থায় মায়ের সামনে পল্লীগ্রামের রীতি অনুসারে মানীর যাওয়াটা অশোভন।

—হ্যাঁ, সে সব ঠিক হয়েছিল। আমি যাই।

মানী বুদ্ধিমতী মেয়ে। মায়ের হাত সে খুব ভাল রকমই জানে, জানে বলিয়াই সে এ প্রশ্ন বিপিনকে করিল। কিন্তু বিপিনের উড়ু-উড়ু ভাব দেখিয়া সে একটু বিস্মিত না হইয়া পারিল না। বিপিনদা তো কখনও তাহার সঙ্গে কথা বলিবার সময় এমন যাই যাই করে না! হয়তো ঘুম পাইয়াছে, রাত কম হয় নাই বটে।

ইহার পর দুই দিন সে জমিদারবাবুর হুকুমে জেলেদের খাজনার তাগাদা করিতে ঘোষপুর গিয়া রহিল। ওখানকার মাতব্বর প্রজা রাইচরণ ঘোষের চণ্ডীমণ্ডপে ইহার পূর্ব্বেও সে কিস্তির সময় কয়েকদিন ছিল। নিজেই রাঁধিয়া খাইতে হয়, তবে আদর-যত্ন যথেষ্ট। সঙ্গতিপন্ন গোয়ালাবাড়ী, দুধ-দই-ঘিয়ের অভাব নাই। জমিদারের ব্রাহ্মণ নায়েব বাড়ীতে অতিথি। বাড়ীর সকলে হাতজোড়, তটস্থ।

কিন্তু বিপিন মনে মনে ভাবে, এতে কি জমিদারের মান থাকে ? এমন হয়েছেন আমাদের জমিদার, যে একখানা কাছারি-ঘর করবেন না। অথচ এই মহলে সালিয়ানা আড়াই হাজার টাকা আদায়। একখানা দো-চালা ঘর তুলে রাখলেও তো হয় ; কিন্তু তাতে যে পয়সা খরচ হয়ে যাবে! ওরে বাবা রে !

তিন দিনের দিন রাত্রে বিপিন জমিদার-বাড়ী ফিরিল। যাহা আদায়-পত্র হইয়াছে অনাদিবাবুকে তাহার হিসাব বুঝাইয়া দিয়া একটু বেশি রাত্রে বাড়ীর ভিতর হইতে খাইয়া ফিরিতেছে, জানালায় দাঁড়াইয়া মানী ডাকিল, বিপিনদা!

—এই যে মানী, কেমন ? তোর নাকি মাথা ধরেছিল শুনলুম, মাসীমার মুখে ?

মানী সে কথার কোনও উত্তর দিল না। বলিল, দাঁড়াও, একটা কথা বলি।

—কি রে ?

—তুমি সেদিন মিথ্যে কেন ব'লে গেলে আমার কাছে ? তুমি পোলাও খেয়েছিলে সেদিন ?

মেয়েমানুষ তুচ্ছ কথা এতও মনে করিয়া রাখিতে পারে! বাসী কাসুন্দি ঘাঁটা ওদের স্বভাব। দুই দিনের আদায়পত্রের ভিড়ের মধ্যে, কাছারির কাজের চাপে তাহার কি মনে আছে, সেদিন কি খাইয়াছিল, না খাইয়াছিল! মানীর যেমন পাগলামি!

বিপিন মৃদু হাসিয়া বলিল, কেন ? খাই নি, তাতে কি ?

মানী বিপিনের কথার সুরে কৌতুকের আভাস পাইয়া ঝাঁঝালো সুরে বলিয়া উঠিল, তাতে কিছু না। কিন্তু তুমি মিথ্যে কথা কেন ব'লে গেলে ? বললেই হ'ত, খাই নি। আমি তোমায় ফাঁসি দিতাম ?

বিপিন পুনরায় মৃদু হাসিমুখে বলিল, সেইটেই কি ভাল হ'ত ? তোর মনে কষ্ট দেওয়া হ'ত না ?

মানী সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া জানালা হইতে সরিয়া গেল।

বিপিন হতবুদ্ধির মত কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, ও মানী, রাগ করবার কি আছে এতে ? শোন না, ও মানী!

কোনও সাড়াশব্দ না পাইয়া বিপিন বাহির-বাড়ীর দিকে চলিল। মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে চলিল, মেয়েমানুষ সব সমান—যেমন মনোরমা, তেমনিই মানী। আচ্ছা, কি করলাম, বল তো ? দোষটা কি আমার ?

মনে মনে, কি জানি কেন, বিপিন কিন্তু শান্তি পাইল না। মানীটা কেন যে তাহার উপর রাগ করিল ? করাই বা যায় কি ? মানী তাহার প্রতি এতটা টানে, তাহা বিপিন কি জানিত ? জানিয়া মনে মনে যেমন একটু বিস্মিতও হইল, সঙ্গে সঙ্গে খুশি না হইয়াও পারিল না।

৩

পরের দিন সকালে বিপিন বাড়ীর মধ্যে খাইতে বসিয়াছে, জমিদার-গিন্নী আসিয়া বলিলেন, হ্যাঁ বাবা বিপিন, সেদিন আমি তোমাকে কি পোলাও দিই নি ?

বিপিন আকাশ হইতে পড়িয়া বলিল, কোন্ দিন ?

—সেই যেদিন রাত্রে তুমি আর সুধাংশু একসঙ্গে খেলে ?

—কেন বলুন তো ?

—মেয়ে তো আমায় খেয়ে ফেলছে কাল থেকে, একসঙ্গে খেতে বসেছিলে দুজনে, তোমায় পোলাও দিই নি কেন, তাই নিয়ে। তোমায় কি পোলাও দিই নি, বল তো বাবা ?

—কেন দেবেন না ? আমার তো মনে হচ্ছে, আপনি দু হাতা, আমার ঠিক মনে হচ্ছে

না মাসীমা, একমনে খেয়ে যাই, কত কাজ মাথায়, অতশত কি মনে থাকে? কিন্তু আপনি যেন দু হাতা কি তিন হাতা—

জমিদার-গৃহিণী রান্নাঘরের দোরের কাছে সরিয়া গিয়া ঘরের ভিতর কাহার দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, ঐ শোন, নিজের কানে শোন। ও খেয়ে তো মিথ্যে কথা বলবে না? কার মুখে কি শুনিস, আর তোর অমনিই মহাভারতের মত বিশ্বাস হয়ে গেল। আর এত লাগানি-ভাঙানিও এ বাড়ীতে হয়েছে! এ রকম করলে সংসার করি কি ক'রে?

সেদিন রাত্রে খাইবার সময় বিপিন সবিস্ময়ে দেখিল, ভাতের পরিবর্তে মিষ্টি পোলাও পাতে দেওয়া হইয়াছে। ভোজনের আয়োজনও প্রচুর। এবেলা জামাই সঙ্গেই খাইতে বসিয়াছে। বিপিন কোন কিছু জিজ্ঞাসা করা সঙ্গত মনে করিল না। তাহার ইহাও মনে হইল, জমিদার-গৃহিণী যে ওবেলা মানীর রাগের কথা তুলিয়াছিলেন, সে কেবল সেখানে জামাই ছিল না বলিয়াই।

জামাই প্রতিদিনই আগে খাইয়া দোতলায় চলিয়া যায়। বিপিন একটু ধীরে ধীরে খায় বলিয়া রোজই তাহার দেরি হয় খাইতে। বিপিন খাওয়া শেষ করিয়া বহির্বাটিতে যাইবার সময় দেখিল, মানী তাহারই অপেক্ষায় যেন জানালার ধারে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া হাসিমুখে বলিল, কেমন হ'ল, বিপিনদা?

—চমৎকার হয়েছে! সত্যি, সুন্দর পোলাও হয়েছিল! খুব খাওয়া গেল! কে রেঁধেছিল, তুই?

মানী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, বল না, কে?

—তুই!

—ঠিক ধরেছ। তা হ'লে আজ খুশি তো? মনে কোনও কষ্ট থাকে তো বল।

—খুশি বইকি, সেদিন যে কাঁদতে কাঁদতে যাচ্ছিলুম পোলাও না খেতে পেয়ে! তবে কষ্ট একটা আছে।

—কি, বল না?

—কাল তুই অত রাগ করলি কেন আমার ওপরে হঠাৎ? আমার কি দোষ ছিল?

মানী স্থিরদৃষ্টিতে বিপিনের দিকে চাহিয়া বলিল, বলব? বলতাম না, কিন্তু যখন বলতে বললে, তখন বলি। আমার কাছে কখনও কোনও কথা গোপন করতে না বিপিনদা, মনে ভেবে দেখ। বাবার হাত-বাক্স থেকে চাকু-ছুরি প'ড়ে গিয়েছিল, তুমি কুড়িয়ে পেয়ে কাউকে বল নি, শুধু আমায় বলেছিলে, মনে আছে?

—উঃ, সে কতকালের কথা! তোর মনে আছে এখনও?

মানী সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া বলিয়াই চলিল, সেই তুমি জীবনে এই প্রথম আমার কাছে কথা গোপন করলে! এতে আমায় যে কত কষ্ট দিলে তা বুঝতে পার? তুমি দূরে রেখে চলতে পারলে যেন বাঁচ।

—ভুল কথা মানী। সেজন্যে নয়, কথাটা তোমার মার বিরুদ্ধে বলা হ'ত নয় কি?

ছেলেমানুষি ক'রো না, অন্য কথা গোপনে আর এ কথা গোপনে তফাৎ নেই ?

মানী হাসিমুখে কৃত্রিম বিদ্রূপের সুরে বলিল, বেশ গো ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির, বেশ। এখন যা বলি, তাই শোন।

এই সময়ে ভেতরের রোয়াকে জমিদার-গৃহিণীর সাড়া পাইয়া বিপিন চট করিয়া জানালার ধার হইতে সরিয়া গেল।

৪

পরদিনই বিপিনকে খোপাখালির কাছারিতে ফিরিতে হইল।

আজকাল বেশ লাগে পলাশপুরে জমিদার-বাড়ী থাকিতে, বিশেষত মানীর সঙ্গে পুনরায় আলাপ জমিবার পর হইতে সত্যই বেশ লাগে।

কিন্তু সেখানে বসিয়া থাকিবার জন্য অনাদি চৌধুরী তাহাকে মাহিনা দিয়া নায়েব নিযুক্ত করেন নাই।

সমস্ত দিন মহালের কাজে টো টো করিয়া ঘুরিয়া সন্ধ্যাবেলা বিপিন কাছারি ফিরিয়া একা বসিয়া থাকে। ভারী নির্জ্জন বোধ হয় এই সময়টা। পৃথিবীতে যেন কেহ কোথাও নাই। কাছারির ভৃত্যটি রান্নার যোগাড় করিতে বাহির হয়, কাঠ কাটে, কখনও বা দোকানে তেল-নুন কিনিতে যায়। সুতরাং বিপিনকে থাকিতে হয় একেবারে একা।

এই সময় আজকাল মানীর কথা অত্যন্ত মনে হয়।

সেদিন পোলাও খাওয়ানোর পর হইতেই বিপিন মানীর কথা ভাবে। এমন একদিন ছিল, যখন মানী ছিল তাহার খেলার সাথী। সে কিন্তু অনেক দিনের কথা। যৌবনের প্রথমে বদখেয়ালের ঝোঁকে অন্ধকার রাত্রে পথের ধারে ঘাসের উপর অর্দ্ধচেতন অবস্থায় শুইয়া মানীর মুখ কতবার মনে পড়িত!

আর একবার মনে পড়িয়াছিল বিবাহের দিন। উঃ, বড় বেশি মনে পড়িয়াছিল। নববধূর মুখ দেখিয়া বিপিন ভাবিয়াছিল, মানীর মুখের কাছে এর মুখ! কিসের সঙ্গে কি!

এ কথা সত্য, মানীর ষোল বছরের সে লাবণ্যভরা মুখশ্রী আর নাই। এবার কয়েকদিন পরে মানীকে দেখিয়া বুঝিল যে মেয়েদের মুখে পরিবর্ত্তন যত শীঘ্র আসে, বয়স তাহার বিজয়-অভিযানের দৃপ্ত রথচক্ররেখা যত শীঘ্র আঁকিয়া রাখিয়া যায় মেয়েদের মুখে, পুরুষদের মুখে তত শীঘ্র পারে না।

কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না, সেই মানী তো বটে।

বিপিন ভালই জানিত, জমিদারের মেয়ে মানীর সঙ্গে তাহার বিবাহ হইতে পারে না, সে জিনিসটা সম্পূর্ণ অসম্ভব ; তবুও মানীর বিবাহের সংবাদে সে যেন কেমন নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিল, আজও তাহা মনে আছে।

তখন বিপিনের বাবা বাঁচিয়া ছিলেন। মনিবের মেয়ের বিবাহের জন্য তিনি গ্রামের গোয়ালপাড়া হইতে ঘি কিনিয়া টিনে ভর্তি করিতেছিলেন। গাওয়া ঘি বিপিনদের গ্রামে খুব সস্তা, এজন্য অনাদিবাবু নায়েবকে ঘি যোগাড় করিবার ভার দিয়াছিলেন। বিবাহের পূর্ব্বদিন বৈকালের ট্রেনে বিপিনের বাবা তিন টিন গাওয়া ঘি, তিন টিন ঘানি-ভাঙ্গা সরিষার তৈল, তরিতরকারি, কয়েক হাঁড়ি দই লইয়া জমিদার-বাড়ী রওনা হইলেন। বিপিন কিছুতেই যাইতে চাহিল না দেখিয়া তাহার বাবা ও মা কিছু আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। বিপিন তখন গ্রামের মাইনর স্কুলে তৃতীয় পণ্ডিতের পদে সবে ঢুকিয়াছে, মাত্র কুড়ি বছর বয়স।

তারপর সব একরকম চুকিয়া গিয়াছিল। আজ সাত বছর আর মানীর সঙ্গে তাহার দেখাশুনা হয় নাই। তারপর কত কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল তাহার নিজের জীবনে! তাহার বাবা মারা গেলেন, কুসঙ্গে পড়িয়া সে কি বদখেয়ালিটাই না করিল! বাবার সঞ্চিত কাঁচা পয়সা হাতে পাইয়া দিনকতক সে ধরাকে সরা দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল। তারপর তাহার নিজের বিবাহ হইল, বিবাহের বছরখানেক পরে বিপিন হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করিল যে সে সম্পূর্ণরূপে নিঃস্ব, না আছে হাতে পয়সা, না আছে তেমন কিছু জমিজমা। সে কি ভয়ানক অভাব-অনটনের দিন আসিল তারপরে!

সচ্ছল গৃহস্থের ছেলে বিপিন, তেমন অভাব কখনও কল্পনা করে নাই। ধাক্কা খাইয়া বিপিন প্রথম বুঝিল যে, সংসারে একটি টাকা খরচ করা যত সহজ, সেই টাকাটি উপার্জ্জন করা তত সহজ নয়। টাকা যেখানে-সেখানে পড়িয়া নাই, আয় করিয়া তবে ঘরে আনিতে হয়।

কিছুকাল কষ্টভোগের পর বিপিন প্রতিবেশীদের পরামর্শে বাবার পুরানো চাকুরিস্থলে গিয়া উমেদার হইল। অনাদিবাবু বিপিনের বাবাকে যথেষ্ট ভালবাসিতেন, এক কথায় বিপিনকে চাকুরি দিলেন।

আজ প্রায় এক বছরের উপর বিপিন এখানে চাকুরি করিতেছে। কিন্তু তাহার এ চাকুরি আদৌ ভাল লাগে না। যত দিন যাইতেছে, ততই বিপিনের বিতৃষ্ণা বাড়িতেছে চাকুরির উপর। ইহার অনেক কারণ আছে,—প্রথম ও প্রধান কারণ, অনাদিবাবু ও তাঁহার স্ত্রীর টাকার তাগাদায় তাহার রাত্রে ঘুম হয় না। রোজ টাকা আদায় হয় না—ছোট জমিদারি, তেমন কিছু আয়ের সম্পত্তি নয়, অথচ তাঁহাদের প্রতিদিনের বাজার খরচের জন্যও নায়েবকে টাকা পাঠাইতে হইবে। কেবল টাকা পাঠাও, টাকা পাঠাও—এই বুলি।

রাত্রে ঘুমাইয়া সুখ হয় না, কাল সকালেই হয়তো অনাদিবাবুর চিরকুট লইয়া বীরু হাড়ী পলাশপুর হইতে আসিয়া হাজির হইবে। খাইয়া ভাত হজম হয় না উদ্বেগে।

আর একটি কারণ, ধোপাখালির এই কাছারিতে একা বারো মাস থাকা তাহার পক্ষে ভীষণ কষ্টকর।

বিপিন এখনও যুবক, চার-পাঁচ বছর আগেও সে বাপের পয়সা হাতে পাইয়া যথেষ্ট স্ফূর্তি করিয়াছে; সে আমোদের রেশ এখনও মন হইতে যায় নাই। বন্ধুবান্ধব লইয়া আড্ডা

দেওয়ার সুখ সে ভালই বোঝে, যদিও পয়সার অভাবে আজ অনেক দিন হইল সে সব বন্ধ আছে, তবুও গল্পগুজব করিতেও তো মন চায়, তাহাতে তো পয়সা লাগে না। বাড়ীতে থাকিতে বাড়ীতেই দুই বেলা কত লোক আসিত, গল্প করিত। এই দুরবস্থার উপরও বিপিন তাহাদিগকে চা খাওয়ায়, তামাক খাওয়ায়, বন্ধুবান্ধবদের পান খাওয়ানোর জন্য প্রতি হাটে তাহার এক গোছ পান লাগে। অত পান সাজিতে হয় বলিয়া মনোরমা কত বিরক্তি প্রকাশ করে; কিন্তু বিপিন মানুষ-জনের যাতায়াত বড় ভালবাসে, তাহাদের আদর-আপ্যায়ন করিতে ভালবাসে। দুরবস্থায় পড়িলেও তাহার নজর ছোট হয় নাই, জমিদারবাবু ও তাঁহার গৃহিণীর মত।

ধোপাখালি গ্রামে ভদ্রলোকের বাস নাই, যত মুচি, গোয়ালা, জেলে প্রভৃতি লইয়া কারবার। তাহাদের সঙ্গে যতক্ষণ কাজ থাকে, ততক্ষণই ভাল লাগে। কাজ ফুরাইয়া গেলে তাহাদের সঙ্গ বিপিনের আর এতটুকুও সহ্য হয় না। অথচ একা থাকাও তাহার অভ্যাস নাই। নির্জ্জন কাছারি-ঘরে সন্ধ্যাবেলা একা বসিয়া থাকিতে মন হাঁপাইয়া উঠে। এমন একটা লোক নাই, যাহার সঙ্গে একটু গল্প-গুজব করা যায়। আজকাল এই সময়ে মানীর কথাই বেশি করিয়া মনে পড়ে। কাছারির চাকর ছোকরা ফিরিয়া আসে, কোন কোন দিন তাহার সঙ্গে সামান্য একটু গল্প-গুজব হয়। তারপর সে রান্নার যোগাড় করিয়া দেয়, বিপিন রাঁধিতে বসে। কাছারির বাদাম গাছটার পাতায় বাতাস লাগিয়া কেমন একটা শব্দ হয়, ঝোপে-ঝাড়ে জোনাকি জ্বলে, জেলে-পাড়ায় গদাধর পাড়ুইয়ের বাড়ীতে রোজ রাত্রে পাড়ার লোক জুটিয়া হরিনাম করে, তাহাদের খোল-করতালের আওয়াজ পাওয়া যায়, ততক্ষণ রান্না-বান্না সারিয়া বিপিন খাইতে বসে।

৫

এক একদিন এই সময় হঠাৎ কামিনী আসিয়া উপস্থিত হয়। হাতে একবাটি দুধ। রান্নাঘরে উঁকি মারিয়া বলে, খেতে বসলে নাকি বাবা?

—এস মাসী, এস। এই সবে বসলাম খেতে।

—এই একটু দুধ আনলাম। ওরে শম্ভু, বাবুকে বাটিটা এগিয়ে দে দিকি। আমি আর রান্নাঘরের ভেতর যাব না।

—না, কেন আসবে না মাসী? এস তুমি। ব'স এখানে, খেতে খেতে গল্প করি।

কামিনী কিন্তু দরজার চৌকাঠ পার হইয়া আর বেশি দূর এগোয় না। সেখান হইতে গলা বাড়াইয়া বিপিনের ভাতের থালার দিকে চাহিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়া বলে, কি রাঁধলে আজ এবেলা?

—আলু ভাতে, আর ওবেলার মাছ ছিল।

—ওই দিয়ে কি মানুষ খেতে পারে? না খেয়ে-খেয়ে তোমার শরীর ঐরকম রোগাকাঠি। একটু ভাল না খেলে-দেলে শরীর সারবে কেমন ক'রে? তোমার বাবার আমলে দুধ-ঘিয়ের সোত ব'য়ে গিয়েছে কাছারিতে। এই বড় বড় মাছ! তরিতরকারির তো কথাই—

বিপিন জানে, কামিনী মাসী বাবার কথা একবার উঠাইবেই কথাবার্ত্তার মাঝখানে। সে কথা না উঠাইয়া বুড়ী যেন পারে না। সময়ের স্রোত বিনোদ চাটুজ্জে নায়েবের পর হইতেই বন্ধ হইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে, কামিনী মাসীর পক্ষে তাহা আর এতটুকু অগ্রসর হয় নাই।

পৃথিবী নবীন ছিল, জীবনে আনন্দ ছিল, আকাশ, বাতাসের রং অন্য রকমই ছিল, দুধ ঘি অপর্য্যাপ্ত ছিল, কাছারির দাপট ছিল, ধোপাখালিতে সত্যযুগ ছিল—৺বিনোদ চাটুজ্জে নায়েবের আমলে।

সেসব দিন আর কেহ ফিরাইয়া আনিতে পারিবে না। বিনোদ চাটুজ্জের সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ হইয়া গিয়াছে।

ভোজনের উপকরণের স্বল্পতার জন্য কামিনী মাসীর অনুযোগ এক প্রকার নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। তাহা ছাড়া, কামিনী মাসী প্রায়ই দুধটুকু, ঘিটুকু, কোন দিন বা এক ছড়া পাকা কলা খাইবার সময় লইয়া হাজির হইবেই।

খানিকটা আপন মনে পুরানো আমলের কাহিনীর বর্ণনা করিয়া বৃদ্ধা উঠিয়া চলিয়া যায়। সে বর্ণনা প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যায় বিপিন শুনিয়া আসিতেছে আজ এক বছর। তবুও আবার শুনিতে হয়, তাহারই পরলোকগত পিতার সম্বন্ধে কথা, না শুনিয়া উপায় কি?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১

দিন দশেক পরে বিপিন বাড়ী হইতে স্ত্রীর চিঠি পাইয়া জানিল, তাহার ভাই বলাই রাণাঘাট হাসপাতালে আর থাকিতে চাহিতেছে না। বউদিদিকে অনবরত চিঠি লিখিতেছে, দাদাকে বলো বউদিদি, আমায় এখান থেকে বাড়ী নিয়ে যেতে। আমার অসুখ সেরে গিয়েছে, আর এখানে থাকতে ভাল লাগে না।

স্ত্রীর চিঠি পাইয়া বিপিন খুব খুশি হইল না। ইহাতে শুধু কয়েকটি মাত্র সাংসারিক কাজের কথা ছাড়া আর কিছুই নাই। এমন কিছু বেশি দিন তাহাদের বিবাহ হয় নাই যে, দুই একটি ভালবাসার কথা চিঠিতে সে স্ত্রীর নিকট হইতে আশা করিতে পারে না.

আজ বলিয়াই বা কেন, মনোরমা কবেই বা চিঠিতে মধু ঢালিয়াছিল? অবশ্য এ কথা খানিকটা সত্য যে, এতদিন সে বাড়ীতেই ছিল, মনোরমার কোনও প্রয়োজন ঘটে নাই

তাহাকে চিঠি লিখিবার। তবুও তো সে এক বৎসর পলাশপুরে চাকুরি করিতেছে, তাহার এই প্রথম স্ত্রীর নিকট হইতে দূরে বিদেশে প্রবাসযাপন, অন্য অন্য স্ত্রীরা কি তাহাদের স্বামীদের নিকট এ অবস্থায় এই রকম কাঠখোট্টা চিঠি লেখে?

বিপিন জানে না, এ অবস্থায় স্ত্রীরা স্বামীদের কি রকম চিঠি লেখে। কিন্তু তাহার বিশ্বাস, বিরহিণী স্ত্রীরা বিরহবেদনায় অস্থির হইয়া প্রবাসী স্বামীদের নিকট কত রকমে তাহাদের মনের ব্যথা জানায়, বার বার মাথার দিব্য দিয়া বাড়ী আসিতে অনুরোধ করে। নাটক-নভেলে সে এইরূপ পড়িয়াছেও বটে। প্রথম কথা, মনোরমা তাহাকে চিঠিই কয়খানা লিখিয়াছে এক বছরের মধ্যে? পাঁচ-ছয়খানার বেশি নয়। অবশ্য তাহার একটা কারণ বিপিন জানে, সংসারে পয়সার অনটন। একখানা খামের দাম চার পয়সা, সংসারের খরচ বাঁচাইয়া জোটানো মনোরমার পক্ষে সহজ নন। সে যাক, কিন্তু সেই চার-পাঁচখানা চিঠিতেও কি দুই একটা ভাল কথা লেখা চলিত না? মনোরমার চিঠি আসে, টাকা পাঠাও, চাল নাই, তেল নাই, অমুকের কাপড় নাই, তুমি কেমন আছ, আমরা ভাল আছি। কখনও এ কথা থাকে না, একবার বাড়ী এস, তোমাকে অনেকদিন দেখি নাই, দেখিতে ইচ্ছা করে।

বিপিন চিঠি পাইয়া বাড়ী যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল, স্ত্রীকে দেখিবার জন্য নয়, বলাইকে হাসপাতাল হইতে বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য। ছোট ভাইটিকে সে বড় ভালবাসে। রাণাঘাটের হাসপাতালে পড়িয়া থাকিতে তাহার কষ্ট হইতেছে, বাড়ী যাইতে চায়, ভরসা করিয়া দাদাকে লিখিতে পারে নাই, পাছে দাদা বকে। তাহাকে বাড়ী লইয়া যাইতেই হইবে। সে পলাশপুর রওনা হইল।

তিন দিনের ছুটি চাহিতেই জমিদারবাবু বলিলেন, এই তো সেদিন এলে হে বাড়ী থেকে, আবার এখুনি বাড়ী কেন?

বিপিন জমিদারকে সমীহ করিয়া স্ত্রীর চিঠির কথা পূর্ব্বে বলে নাই, এখন বলিল। ভাইকে হাসপাতাল হইতে লইয়া যাইবার কথাও বলিল।

অনাদিবাবু অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন, যাও, কিন্তু তুমি বাড়ী গেলে আর আসতে চাও না। জামাই চ'লে গিয়েছেন, মানী এখানে রয়েছে, সামনের শনিবারে আবার জামাই আসবেন। রোজ দু তিন টাকা খরচ। তুমি মহাল থেকে চ'লে এলে আদায়-পত্তর হবে না, আমি প'ড়ে যাব বিষম বিপদে; তিন দিনের বেশি আর এক দিনও যেন না হয়, ব'লে দিলাম।

মানীর সঙ্গে দেখা করিবার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও বিপিন দেখিল, তাহা একরূপ অসম্ভব। সে থাকে বাড়ীর মধ্যে, তাহাকে ডাকিয়া দেখা করিতে গেলে হয়তো মানীর মা সেটা পছন্দ করিবেন না।

যাইবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে কিন্তু বিপিন ইচ্ছাটা কিছুতেই দমন করিতে পারিল না। একটিমাত্র ছুতা ছিল, বিপিন সেইটাই অবলম্বন করিল। সে যাইবার পূর্ব্বে একবার জমিদার-গৃহিণীর নিকট বিদায় লইতে গেল।

—ও মাসীমা, কোথায় গেলেন, ও মাসীমা ?

ঝি বলিল, মা ওপরে পূজোয় বসেছেন, দেরি হবে নামতে, এই বসলেন।

বিপিন একবার ভাবিয়া একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, তাই তো! বসবার তো সময় নেই। রাণাঘাট হাসপাতালে যেতে হবে। একটা কথা ছিল, আচ্ছা আর কেউ আছে ? কথাটা না হয় বলে যেতাম।

—দিদিমণিকে ডেকে দোব ? দিদিমণি রান্না-বাড়ীতে রয়েছে, দেখব ?

—তা মন্দ নয়। তাই না হয় দাও, কথাটা ব'লেই যাই।

ঝি বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল এবং একটু পরে মানী বাহিরের রোয়াকে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, এই যে বিপিনদা! কখন এলে ?

—এসেছি ঘণ্টা দুই হ'ল। কর্ত্তার কাছে কাজ ছিল, আমি তিন দিনের ছুটি নিয়ে বাড়ী যাচ্ছি।

ঝি তখনও রোয়াকে দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া মানী বলিল, যা তো হিমি, ওপরে আমার ঘর থেকে কর্পূরের শিশিটা নিয়ে বামুন-ঠাকরুনকে রান্নাঘরে দিয়ে আয়।

ঝি চলিয়া গেল।

মানী বিপিনের দিকে চাহিয়া বলিল, দু'ঘণ্টা এসেছ বাইরে ? কই, আমি তো শুনি নি! চা খেয়েছ ?

—না।

—তুমি কখন যাবে ? কেন, এখন হঠাৎ বাড়ী যাচ্ছ যে ?

বিপিন এদিক ওদিক চাহিয়া নিম্নকণ্ঠে বলিল, সে কৈফিয়ৎ তোমার বাবার কাছে দিতে হয়েছে একদফা, তোমার কাছেও আবার দিতে হবে নাকি ?

—নিশ্চয় দিতে হবে। আমি তো জমিদারের মেয়ে, দেবে না কেন ?

—তবে দিচ্ছি। আমার ভাই বলাইকে তোর মনে আছে ? সে একবার কেবল বাবার সঙ্গে এখানে এসেছিল, তখন সে ছেলেমানুষ। সে রাণাঘাট হাসপাতালে—

তারপর বিপিন সংক্ষেপে বলাইয়ের অসুখের ব্যাপারটা বলিয়া গেল।

মানী বলিল, চা খেয়ে যাও। ব'স, আমি ক'রে আনি।

বিপিন রাজী হইল না। বলিল, থাক মানী, আমায় অনেকটা পথ যেতে হবে এই অবেলায়। একটা কথা জিজ্ঞেস করি—যদি আমার আসতে দু-এক দিন দেরি হয় কর্ত্তাবাবুকে ব'লে ছুটি মঞ্জুর করিয়ে দিতে পারবি ?

মানী বরাভয় দানের ভঙ্গিতে হাত তুলিয়া চাপা হাসিমুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সুরে বলিল, নির্ভয়ে চ'লে যাও, বিপিনদা। অভয় দিচ্ছি, দিন তিনের জায়গায় সাত দিন থেকে এস। বাবাকে শান্ত করবার ভার আমার ওপর রইল।

বিপিন হাসিয়া বলিল, বেশ, বাঁচলাম। দেবী যখন অভয় দিলে, তখন আর কাকে ডরাই ? চলি তবে।

—না, একটু দাঁড়াও। কিছু না খেয়ে যেতে পারবে না। কোন্ সকালে ধোপাখালি থেকে খেয়ে বেরিয়েছ, একটু জল খেয়ে যেতেই হবে। আমি আসছি।

মানী উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল এবং একটু পরে একখানা আসন আনিয়া রোয়াকের একপাশে পাতিয়া দিয়া বলিল, এস, ব'স উঠে।—বলিয়াই সে আবার ক্ষিপ্রপদে অদৃশ্য হইল।

মানীর আগ্রহ দেখিয়া বিপিন মনে কেমন এক ধরণের অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিল। এ অনুভূতি তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন, এমন কি সেদিন পোলাও খাওয়ানোর দিনও হয় নাই। সেদিন সে সে-ব্যাপারটাকে খানিকটা সাধারণ ভদ্রতা, খানিকটা মানীর রাঁধিবার বাহাদুরি দেখানোর আগ্রহের ফল বলিয়া ভাবিয়াছিল। কিন্তু আজ মনে হইল, মানীর এ টান আন্তরিক, মানী তাহার সুখদুঃখ বোঝে। বিপিনের সত্যই ক্ষুধা পাইয়াছে। ভাবিয়াছিল, রাণাঘাটের বাজারে কিছু খাইয়া লইয়া তবে মিশন হাসপাতালে যাইবে। আচ্ছা, মানী কি করিয়া তাহা বুঝিল?

একটা থালায় মানী খাবার আনিয়া বিপিনের সামনে রাখিয়া বলিল, খেয়ে নাও। আমি চায়ের জল বসিয়ে এসেছি, দৌড়ে চা ক'রে আনি।

থালার দিকে চাহিয়া বিপিনের মনে হইল, বাড়ীতে এমন কিছু খাবার ছিল না, তেমন কৃপণই বটে জমিদার-গিন্নী! মানী বেচারী হাতের কাছে তাড়াতাড়ি যাহা পাইয়াছে—কিছু মুড়ি, এক থাবা দুধের সর, খানিকটা গুড়, এরই মধ্যে আবার দুইখানা থিন্ এরারুট বিস্কুট—তাহাই আনিয়া ধরিয়া দিয়াছে।

মানী ইতিমধ্যে একমালা নারিকেল ও একখানা দা হাতে ব্যস্তভাবে আসিয়া হাজির হইল। কোথা হইতে নারিকেল মালাটি খুঁজিয়া টানিয়া বাহির করিয়াছে এইমাত্র।

—নারকোল খাবে বিপিনদা? দাঁড়াও একটু নারকোল কেটে দিই। কুরুনিখানা খুঁজে পেলাম না। তোমার আবার দেরি হয়ে যাবে, কেটেই দিই, খাও। মুড়ি দিয়ে সর দিয়ে গুড় দিয়ে মাখ না। আস্তে আস্তে ব'সে খাও, আবার কখন খাবে তার ঠিক নেইকো। চা আনি।

একটু পরে চা হাতে যখন মানী আসিয়া দাঁড়াইল, তখন বিপিন যেন নূতন চোখে মানীকে দেখিল।

মানী যেন তাহার কাছে এক অননুভূতপূর্ব্ব বিস্ময় ও তৃপ্তির বার্ত্তা বহন করিয়া আনিল। এই আগ্রহভরা আন্তরিকতা, এই যত্ন বিপিন কখনও মনোরমার নিকট হইতে পায় নাই। মনোরমা যে তাহাকে তাচ্ছিল্য করিয়া থাকে, ভালবাসে না—তাহা নয়। সে অন্য ধরণের মেয়ে, গোটা সংসারটার দিকে তাহার দৃষ্টি—মা, বীণা, ছেলেমেয়ে, এমন কি বাড়ীর কৃষাণের দিকে পর্য্যন্ত। একা বিপিনের সুখদুঃখ দেখিবার অবকাশ তাহার নাই, বিপিন নিজের সংসারে পাঁচজনের মধ্যে একজন হইয়া মনোরমার যৌথ সেবার কিছু অংশ পাইয়া আসিয়াছে এতদিন। তাহাতে এমন তৃপ্তি কোন দিন সে পায় নাই।

চা পান শেষ করিয়া বিপিন উঠিল। বলিল, মাসিমার সঙ্গে দেখা হ'ল না, বলিস আমার কথা মানী, চললুম।

—এস। কিন্তু বেশি দিন দেরি করলে চাকরির দায়ী আমি নয়, মনে থাকে যেন।

—খানিকটা আগে অভয় দিয়েছ দেবী, মনে আছে?

—দুমাস দেরি করলেও কি অভয় দেওয়া বহাল রইল? বাঃ রে, আমি বলেছি তিন দিনের জায়গায় সাত দিন, না হয় ধর দশ দিন।

—না হয় ধর এক মাস।

—না হয় ধর তিন মাস। সে সব হবে না, সোজা কথা শোন বিপিনদা। আমার তো বাবার কাছে বলবার মুখ থাকা চাই।

পরে গম্ভীরমুখে বলিল, কথা দিয়ে যাও, কদিনে আসবে। না, সত্যি, তোমার কথা আমার বিশ্বাস হয় না, আমি কি বলেছিলুম প্রথম দিন, মনে আছে?

বিপিন কৃত্রিম ব্যঙ্গের সুরে বলিল, হ্যাঁ, বলেছিলে, চাকরিতে টিকে থাকলে তুমি আমার ভালর চেষ্টা করবে।

মানী হাসিয়া বলিল, মনে আছে তা হ'লে? বেশ, এখন এস তা হ'লে—বেলা গেল।

পথে উঠিয়াই মানীর কথা মনে করিয়া বিপিনের দুঃখ হইল। বেচারী ছেলেমানুষ, সংসারের কি জানে! জমিদারির যা অবস্থা, মানী কি উন্নতি করিয়া দিবে তাহার! দেনা ইতিমধ্যে প্রায় পাঁচ-ছয় হাজারে দাঁড়াইয়াছে রাণাঘাটের গোবিন্দ পালের গদিতে। সদর খাজনা দিবার সময় প্রতি বৎসর তাহার নিকট হ্যাণ্ডনোট কাটিতে হয়। ইহা অবশ্য বিপিন এখানে চাকুরিতে ভর্ত্তি হইবার পূর্ব্বের ঘটনা, খাতাপত্র দেখিয়া বিপিন জানিতে পারিয়াছে। গোবিন্দ পাল নালিশ ঠুকিলেই জমিদারি নীলামে চড়িবে।

মানী মেয়েমানুষ, বিষয়-সম্পত্তির কি বোঝে! ভাবিতেছে, সে মস্ত জমিদারের মেয়ে, চেষ্টা করিলেই বিপিনদাদার বিশেষ উন্নতি করিয়া দিতে পারিবে। বিপিনের হাসি পাইল, দুঃখও হইল। বেচারী মানী!

২

রাণাঘাট হাতপাতালে বিপিন ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করিল। বলাই তাহাকে দেখিয়া কান্নাকাটি করিতে লাগিল বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য। কিন্তু বিপিনের মনে হইল, ভাই যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে তাহা নয়, এ অবস্থায় তাহাকে লইয়া যাওয়া কি উচিত হইবে?

বিপিন কৈবর্ত্তের মেয়ে সেই নার্সটিকে আড়ালে ডাকিয়া বলিল, আমার ভাই বাড়ী যেতে চাইছে, কান্নাকাটি করছে, ওকে এখন নিয়ে যেতে পারি?

নার্স বলিল, নিয়ে যাও বাবু, তোমার ভাই আমাকে পর্য্যন্ত জ্বালাতন করে তুলেছে বাড়ী যাব বাড়ী যাব ক'রে। নেফ্রাইটিসের রুগী, যা সেরেছে, ওর বেশি আর সারবে না। কেন এখানে মিথ্যে রেখে কষ্ট দেবে!

তাহার মনে হইল, নার্স যেন কি চাপিয়া যাইতেছে। সে বলিল, ও কি বাঁচবে না?

নার্স ইতস্তত করিয়া বলিল, না, তা কেন, তবে শক্ত রোগ। বাড়ী নিয়ে গিয়ে একটু সাবধানে রাখতে হবে। নিয়েই যাও বাড়ী, এখন তো অনেকটা সেরেছে।

বিপিনের মনটা খারাপ হইয়া গেল। সে গিয়া মিশনের বড় ডাক্তার আর্চার সাহেবের [illegible] দেখা করিল।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। আর্চার সাহেব নিজের বাংলোর বারান্দায় ইজি-চেয়ারে চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন। বয়স প্রায় পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন, দীর্ঘাকৃতি, সবল চেহারা। মাথার সামনে টাক পড়িয়া গিয়াছে। আজ ত্রিশ বৎসর এখানে আছেন, বড় ভাল লোক, এ অঞ্চলের সকলে আর্চার সাহেবকে ভালবাসে।

বিপিন গিয়া বলিল, নমস্কার, ডাক্তার সাহেব।

আর্চার সাহেব বিপিনকে চেনেন না, বলিলেন, এস, আপনি কি বলছেন?

আর্চার সাহেব বাংলা বলেন বটে, তবে একটু ভাবিয়া, একটু ধীরে ধীরে, যেখানে জোর দেওয়া উচিত সেখানে জোর না দিয়া এবং যেখানে জোর দেওয়া উচিত নয় সেখানে জোর দিয়া।

বিপিন বলিল, আমার ভাই বলাই চাটুজ্জে ছ নম্বর ওয়ার্ডে আছে, নেফ্রাইটিসের অসুখ, তাকে বাড়ী নিয়ে যেতে পারি? সে বড় ব্যস্ত হয়েছে বাড়ী যাবার জন্যে।

—হাঁ হাঁ, ওই ওয়ার্ডের ছোক্‌রা রুগী! নিয়ে যান।

—সাহেব, ও কি সেরেছে?

—সে পূর্ব্বের অপেক্ষা সেরেছে। কঠিন রোগ, একেবারে ভাল ভাবে সারতে এক বছর লাগবে। বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে যত্ন করবেন, মাংস খেতে দেবেন না।

—তা হ'লে কাল সকালে নিয়ে যাব।

—আপনি রাত্রে কোথায় থাকবেন? আমার বাড়ীতে থাকুন। আমার এখানে ডিনার খাবেন। মুকুন্দ, ও মুকুন্দ!

—আমার এখানে আত্মীয় আছেন সাহেব, তাদের বাড়ী বলে এসেছি, সেখানেই থাকব। আমার জন্যে ব্যস্ত হবেন না।

বিপিন রাত্রে বাজারের নিকট তাহার এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের বাড়ী থাকিয়া, পরদিন সকালে ঘোড়ার গাড়ী ডাকিয়া আনিয়া ভাইকে লইয়া স্টেশনে গেল।

বলাইয়ের বয়স বেশি নয়—কুড়ি-একুশ। রোগ হওয়ার পূর্ব্বে তার শরীর খুব ভাল ছিল, বিপিনের সংসারের ক্ষেতখামারের অনেক কাজ সে একাই করিত।

মধ্যে যখন বিপিনের বদখেয়ালিতে পৈতৃক অর্থ সব উড়িয়া গেল, সংসারের ভয়ানক কষ্ট, সংসার একেবারে অচল, তখন বলাই আঠারো বছরের ছেলে। বলাই দেখিল, দাদার মতিবুদ্ধি তাহাদের অনাহারের ও দারিদ্র্যের পথে লইয়া চলিয়াছে, যদি বাঁচিতে হয় তাহাকে লেখাপড়া ছাড়িতে হইবে এবং বুক দিয়া খাটিতে হইবে।

নদীর ধারের কাঁঠাল-বাগান বাঁধা দিয়া সেই টাকায় সে এক জোড়া বলদ কিনিয়া গরুর গাড়ী চালাইতে লাগিল নিজেই। লোকের জিনিসপত্র গাড়ী বোঝাই দিয়া অন্যত্র লইয়া যাইবার ভাড়া খাটিত, স্টেশনে সওয়ারী লইয়া যাইত। অনেকে নিন্দা করিতে লাগিল। একদিন বৃদ্ধ বদ্দু মুস্তফি ডাকিয়া বলিলেন, হ্যাঁ হে বলাই, তুমি নাকি গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানি কর?

বলাই একটু ভয়ে ভয়ে বলিল, হ্যাঁ, জ্যাঠামশাই।

—সেটা কি রকম হ'ল? বিনোদ চাটুজ্জের ছেলে হয়ে অমন বংশের নাম ডোবাবে তুমি। কাল শুনলাম, বাজারের নিবারণ সাহার বাড়ী তৈরি হচ্ছে, সেখানে আট-দশ গাড়ী বালি বয়েছ নদীর ঘাট থেকে সারাদিন। এতে মান থাকবে?

বলাই একটু ভীতু ধরণের ছেলে। বংশে বড় ভারিক্কি মুস্তফি মহাশয়কে তাহার বাবা বিনোদ চাটুজ্জে পর্য্যন্ত সমীহ করিয়া চলিতেন। সেখানে সে আঠারো বছরের ছেলে কি তর্ক করিবে! তবুও সে বলিল, জ্যাঠামশাই, এ না করলে যে সংসার চলে না, মা বোন না খেয়ে মরে। দাদা তো ওই কাণ্ড করছে, দাদার ওপর আমি কিছু বলতে তো পারি না, মাঠের জমি, খাস জমি সব দাদা বিক্রি করছে আর মৌরুসী দিচ্ছে, মার হাতে একটা পয়সা রাখেনি—সব নেশাভাঙে উড়িয়ে দিয়েছে। আমরা কি খেয়ে বাঁচবো বলুন তো? এতে তবুও দিন এক টাকা গড়ে আয় হচ্ছে। বালির গাড়ী ছ আনা ক'রে ভাড়া নদীর ঘাট থেকে বাজার পর্য্যন্ত। কাল সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত এগারো গাড়ী বালি বয়েছি—ছেষট্টি আনা—চার টাকা দু আনা একদিনের রোজগার। এ অন্য ভাবে আমায় কে দিচ্ছে বলুন?

সে দুর্দ্দিনে বলাই মান-অপমান বিসর্জ্জন দিয়া বুক দিয়া না পড়িলে সংসার অচল হইত। বলাই গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানি করিয়া লাঙ্গল করিল, জমি চাষ করিয়া ধান বুনিল, আটির মাঠে কুমড়া করিল এবং সেই কুমড়া কলিকাতায় চালান দিয়া সেবার প্রায় ত্রিশ-বত্রিশ টাকা লাভ করিল।

বিপিনকে বলিল, দাদা, বাগদী-পাড়ার নন্দ বাগদীর গোলাটা কিনে আনছি, এবার ধান রাখবার জায়গা চাই, ধান হবে ভাল।

বিপিন বলিল, নন্দ বাগদীর অত বড় গোলা এনে কি করবি, আমাদের তিন বিঘে জমির ধান এমন কি হবে যে, তার জন্যে অত বড় গোলার দরকার। দামও তো বেশি চাইবে।

বলাই বলিয়াছিল, বারণ ক'র না দাদা। বড় গোলাটা বাড়ী থাকলে লক্ষ্মীশ্রী। আমার ওই গোলা দেখলে কাজে উৎসাহ হবে যে, ওটা পুরিয়ে দিতেই হবে আসছে বছর। ওটাই আনি, কি বল দাদা?

সংসারের জন্য অনিয়মিত খাটিয়া খাটিয়া বলাই পড়িয়া গেল শক্ত অসুখে। কিছুদিন দেশেই রাখিয়া চিকিৎসা চলিল। সে চিকিৎসাও এমন বিশেষ কিছু নয়, গ্রাম্য হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার শরৎ দাঁ দিন পনরো সাদা শিশিতে কি ঔষধ দিতেন, তাহাতে কিছু না হওয়ায় গ্রামের অনেকের পরামর্শে বলাইকে রাণাঘাটের হাসপাতালে আনা হয়।

বলাই এখনও ছেলেমানুষ, তাহার উপর অনেক দিন রোগশয্যায় শুইয়া থাকিবার পরে আজ দাদার সঙ্গে বাড়ী ফিরিয়া যাইবার আনন্দে সে অধীর হইয়া উঠিয়াছে। রেলগাড়ীতে উঠিয়া একবার এ জানালায় একবার ও জানালায় ছুটাছুটি করিতেছে, কত কাল পরে আবার সে নীরোগ হইয়া মুক্ত স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করিতে পাইয়াছে। নার্সের কথামত আর ভয়ে ভয়ে চলিতে হইবে না। হাসপাতালের রান্না কি বিশ্রী! মাছের ঝোল না ছাই! মায়ের হাতের, বউদিদির হাতের রান্না আজ প্রায় চার মাস খায় নাই, বউদিদির হাতের সুক্তুনির তুলনা আছে?

পাঁচিলের পশ্চিম কোণে বড় মানকচুটা সে নিজের হাতে পুঁতিয়াছিল। এখন না জানি কত বড় হইয়াছে। ভগবান যদি দিন দেন এবং তাহাকে খাটিতে দেন, তবে গাঙের ধারে কদমতলার বাঁকে ভাল জমি খাজনা করিয়া লইবে, এবং তাহাতে শসা, বরবটি এবং পালংশাক করিবে।

হাসপাতালে থাকিতে নার্সের মুখে শুনিয়াছে পালংশাক ও বরবটি নাকি খুব ভাল তরকারি। কলিকাতায় দামে বিক্রয় হয়।

বিপিনকে জিজ্ঞাসা করিল, দাদা, কাপালীপাড়ায় রাইচরণের পিসীর কাছে বলা ছিল, ওদের ঝাল হ'লে আমাদের সূর্য্যমুখী ঝালের বীজ দিয়ে যাবে। তুমি দেখ নি সে ঝাল রাঙা টুকটুক করছে, এক একটা এত বড়—বীজ দিয়ে গিয়েছিল, জান? আমি এবার চাট্টি ঝাল পুঁতে দেব আমড়াতলায় নাবাল জমিটাতে।

দাদার চাকুরি হওয়াতে বলাই খুব খুশি।

তখন সে একা খাটিয়া সংসার চালাইত। আজকাল দাদার মতিবুদ্ধি ফিরিয়াছে, দাদা আবার পুরানো জমিদার-ঘরে বাবার সেই পুরানো চাকুরি করিতেছে, ইহার অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে!

দুই ভাইয়ে মিলিয়া খাটিলে সংসারের উন্নতি হইতে কত দেরি লাগিবে? সে নিজে বিবাহ করে নাই, করিবেও না। মা, বউদিদি, ভানু, বীণা—এরা সুখী হইলেই তাহার সুখ। গোলা দেখিলে মায়ের চোখ দিয়া জল পড়ে। মা বলে, কর্তার আমলে এর চেয়েও বড় গোলা ছিল বাড়ীতে, আজকাল দুটো লক্ষ্মীর চিঁড়ে কোটার ধান পাই না।

মায়ের চোখের জল সে ঘুচাইবে। বাবার গোলা ছিল পনরো হাতের বেড়, সে গোলা বাঁধিবে আঠারো হাতের বেড়।

৩

বেলা এগারটার সময় বিপিন ও বলাই বাড়ী পৌঁছিল।

ইহাদের আজই বাড়ী আসিবার কোন সংবাদ দেওয়া ছিল না। বিশেষতঃ বলাইকে আসিতে দেখিয়া বিপিনের মা ছুটিয়া গিয়া রুগ্ন ছেলেকে জড়াইয়া ধরিলেন। বীণা, মনোরমা, ভানু, টুনি—সকলেই বাহির হইয়া আসিয়া রোয়াকে দাঁড়াইল।

উঃ, সেই রাণাঘাটের হাসপাতাল, আর এই বাড়ীর তাহার প্রিয়জন সব—বউদিদি, মা, দিদি, খোকা, খুকী! বলাই আনন্দে কাঁদিয়াই ফেলিল ছেলেমানুষের মত।

ভানু টুনিও খুশিতে আটখানা। কাকাকে তাহারা ভালবাসে। এতদিন পরে কাকাকে ফিরিতে দেখিয়া তাহাদেরও আনন্দের সীমা নাই। কাকার গলা জড়াইয়া পিঠের উপর পড়িয়া তাহারা তাহাদের পুরাতন কাকাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে চাহিতেছে।

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বিপিন পুঁটুলি নামাইয়া রাখিতেছে, মনোরমা আসিয়া হাসিমুখে বলিল, তা হ'লে আমার চিঠি পেয়েছিলে? কই, উত্তর তো দিলে না?

বিপিন বলিল, উত্তর আর কি দোব? এলাম তো চ'লে বলাইকে নিয়ে।

—ভালই করেছ। ঠাকুরপো তোমায় লিখতে সাহস করত না, কেবল আমায় চিঠি লিখত—আমায় বাড়ী নিয়ে যাও, আমায় বাড়ী নিয়ে যাও। আহা, ও কি সেখানে থাকতে পারে! ছেলেমানুষ, তাতে ওর প্রাণ পড়ে থাকে সংসারের ওপর। হ্যাঁ গা, ওর অসুখ কেমন? ডাক্তারে কি বললে?

—বললে তো, এখন ভালই। তবে সাবধানে রাখতে হবে। ওকে বেশি খেতে দেবে না। মাকে ব'লে দিও, যেন যা তা ওকে না খেতে দেয়। মাংস খেতে একেবারে বারণ কিন্তু।

—তবেই হয়েছে। যা মাংস খেতে ভালবাসে ঠাকুরপো, ওকে ঠেকিয়ে রাখা ভীষণ কঠিন। আর কি জান, বাড়ী এসেছে, এখন ওর আবদারের জ্বালায় ওকে মাংস না দিয়ে পারা যাবে? তুমি যে কদিন বাড়ী আছ, তারপর ও কি কারও কথা মানবে? নিজেই পাড়া থেকে খাসি কাটিয়ে ভাগাভাগি ক'রে বিলি ক'রে দিয়ে নিজের ভাগে দেড় সের মাংস নিয়ে এসে ফেলবে।

—না না, তা হ'তে দিও না, দিলেই অসুখ বাড়বে। ভয় দেখাবে যে, তোমার দাদাকে চিঠি লিখব, ওসব ছেলেমানুষি চলবে না।—বউদিদিকে দেখছি না?

—দিদি তো এখানে নেই। তাঁকে উলোর পিসীমা নিয়ে গেছেন আজ দিন পনেরো হ'ল। তিনি এসেছিলেন গঙ্গাচ্চান করতে কালীগঞ্জে, আমাদের এখানেও এলেন, সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলেন যাবার সময়ে।

বিপিন এ সংবাদে খুব খুশি হইল না। বলিল, নিয়ে গেলেন মানে তো তাঁর সংসারে দাসীবৃত্তি করার জন্যে নিয়ে যাওয়া। ওসব আমি পছন্দ করি না।

মনোরমা বলিল, পছন্দ তো কর না, কিন্তু এখানে খায় কি তা তো দেখতে হবে। তুমি চ'লে গেলে পলাশপুরে, আমাদের হাতে তো একটি পয়সা দিয়ে গেলে না। একদিন এমন হ'ল—দুটিখানি পান্তা-ভাত ছিল, ভানু-টুনিকে দিয়ে আমরা সবাই উপোস ক'রে রইলাম। কাউকে কিছু বলতেও পারি না, জাত যায়। পাড়ায় রোজ রোজ কে ধার চাইতে গেলে দেয় বল দিকি? আমি তো বললুম, উপোস ক'রে মরি সেও ভাল, কারও বাড়ী, কি রায়-গিন্নীর কাছে, কি দুলুর মার কাছে, কি লালু চক্কত্তির মার কাছে চাইতে যেতে আমি পারব না।

কথাগুলি ন্যায্য এবং মনোরমা যে মিথ্যা বলিতেছে না, বিপিন তাহা বুঝিল। বুঝিলেও কিন্তু এসব কথা বিপিনের আদৌ ভাল লাগিল না।

যেমনই বাড়ীতে পা দিয়াছে, অমনই সতরো গণ্ডা অভাব-অভিযোগের কাহিনী সাজাইয়া মনোরমা বসিয়া আছে। এও তো এক ধরণের তিরস্কার। সে কেন খালি হাতে সকলকে রাখিয়া গিয়াছিল, কেন একশো টাকার থলি মনোরমার হাতে দিয়া বাড়ীর বাহির হয় নাই? স্ত্রীর মুখে তিক্ত তিরস্কার শুনিতে শুনিতেই তাহার জীবন গেল। স্ত্রী কি একটুও বুঝিবে না? স্বামীর অক্ষমতার প্রতি কি সে এতটুকু অনুকম্পা দেখাইতে পারে না?

৪

বৈকালে বিপিন গ্রামের উত্তরে মাঠের দিকে বেড়াইতে গেল। মাঠের ওপারেই একটি ছোট মুসলমান গ্রাম, নাম বেলতা। সন্ধ্যার এখনও অনেক দেরি আছে দেখিয়া সে ভাবিল, না হয় এক কাজ করি, আইনদ্দি চাচার বাড়ী ঘুরে যাই। অত বড় গুণী লোকটা, বলাইয়ের অসুখ সম্বন্ধে একটা পরামর্শ ক'রে দেখি, যদি কিছু করতে পারি। অনেক মন্তরতন্তর জানে কিনা।

আইনদ্দি বাড়ীর সামনে বাঁশতলায় বসিয়া মাছ-ধরা ঘুণির বাখারি চাঁচিতেছিল। চোখে সে ভাল দেখে না, বিপিনের গলার স্বর শুনিয়া চিনিতে পারিয়া বলিল, আসুন বাবাঠাকুর, আসুন। কবে আলেন বাড়ী? এইখানা নিয়ে বসুন।—বলিয়া একখানা খেজুরপাতার চেটাই

আগাইয়া দিল।

বিপিন বলিল, চাচা, তোমাকে তো কক্ষণও বিনি কাজে থাকতে দেখি না? চোখে ঠাওর হয়?

—না বাবাঠাকুর, ভাল আর কনে! হ্যাদে, একখানা চশমা এনে দিতি পার? চশমা ন'লি আর চকি ভাল ঠাওর পাই নে ঝে!

—বয়েস তোমার তো কম হ'ল না চাচা, চোখের আর দোষ কি বল!

—তা একশো হয়েছে। যেবার মাৎলার রেলের পুল হয়, তখন আমি গরু চরাতি পারি। আপনি এখন হিসেব ক'রে দেখ।

এ দেশে সবাই বলে আইনদ্দির বয়স একশো। আইনদ্দি নিজেও তাই বলে। আবার কেহ কেহ অবিশ্বাস করে। বলে, মেরে কেটে নব্বুই বিয়েনব্বুই। একশো! বললেই হ'ল বুঝি।

মাৎলার পুল কত সালে হয় বিপিন তাহা জানে না, সুতরাং আইনদ্দির বয়সের হিসাব তাহার দ্বারা হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া সে অন্য কথা পাড়িল। বলিল, চাচা, তুমি অনেক রকম মন্তরতন্তর জান, এ কথাটা তো শুনে আসছি বহুদিন।

বিপিন এই একই কথা অন্তত বিশ বার আইনদ্দিকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছে গত দশ বৎসরের মধ্যে। আইনদ্দিও প্রত্যেক বারেই একই উত্তর দেয়, একই ভাবে হাত পা নাড়িয়া। আজও সে সেই ভাবেই বেশ একটু গর্ব্বের সহিত বলিল, মন্তর? তা বেশি কথা কি বলব, আপনাদের বাপ-মার আশীর্ব্বাদে মন্তর সব রকম জানা ছেল। সেসব কথা ব'লে কি হবে, এদিগরের কোন্ লোকটা জানে না আমার নাম? তবে এই শোন। শমুন্ডরে যাব, আগুন খাব, কাটামুণ্ডু জোড়া দেব—

বিপিন এ কথা আইনদ্দির মুখে অনেকবার শুনিয়াছে, তবুও বৃদ্ধকে ঘাঁটাইয়া এ সব কথা শুনিতে তাহার ভাল লাগে। বিপিনের হাসি পায় এ কথা শুনিলে, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, আইনদ্দির উপর শ্রদ্ধা তাহাতে কিন্তু কমে না। বিপিন যুবক, এই শতবর্ষজীবী বৃদ্ধের প্রত্যেক কথা হাবভাব তাহার কাছে এত অদ্ভুত রহস্যময় ঠেকে! এইজন্যই সে বাড়ী থাকিলে মাঝে মাঝে ইহার নিকট আসিয়া খানিকক্ষণ কাটাইয়া যায়। এ যে জগতের কথা বলে, বিপিনের পক্ষে তাহা অতীত কালের জগৎ। বিপিনের সঙ্গে সে জগতের পরিচয় নাই। নাই বলিয়াই তাহা রহস্যময়।

আইনদ্দি তামাক সাজিয়া হাতখানেক লম্বা এক খণ্ড সোলার নীচের দিকে বাঁশের সরু শলার সাহায্যে একটা ফুটা করিয়া বিপিনের হাতে দিয়া বলিল, তামাক সেবা কর বাবাঠাকুর।

বিপিন বলিল, চাচা, তুমি কানসোনার কুঠী দেখেছ?

—খুব। তখন তো আমার অনুরাগ বয়েস। কুঠীর মাঠে নীলের চাষ দেখিছি। এই শোনবা? আমার সম্বন্ধির ছেলে জহিরদ্দি তখন জন্মায়, তিনি বড় চাকরি করত, এখন কুড়ি টাকা ক'রে পেন্সিল খাচ্ছে। তা ভাব তবে সে কত দিনির কথা।

বিপিন বলিল, কি চাকরি করত?

—কি চাকরি আমি জানি বাবাঠাকুর? পেন্সিল খাচ্ছে যখন, তখন বড় চাকরিই হবে।

—চাচা, একটা কবিতা বল তো শুনি? মনে আছে?

আইনদ্দি একগাল হাসিয়া বলিল, আ আমার কপাল! কবিতা শোনবা? রামায়ণ মহাভারত মুখস্থ ছেল। এখন আর কি মনে থাকে সব কথা বাবাঠাকুর? এই শোন—

সূর্য্য যায় অস্তগিরি আইসে যামিনী।
হেনকালে তথা এক আইল মালিনী॥
কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।
দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম॥
গালভরা গুয়াপান পাকি মালা গলে।
কানে কড়ে কড়ে রাঁড়ী কথা কত ছলে॥
চূড়াবান্ধা চুল পরিধান সাদা শাড়ী
ফুলের চুপড়ী কাঁখে ফিরে বাড়ী বাড়ী॥

বিপিন বাংলা সাহিত্যের তেমন খবর না রাখিলেও এটুকু বুঝিল যে, ইহা বিদ্যাসুন্দরের কবিতা। বলিল, এ কবিতা তোমার মুখে কখনও শুনিনি তো চাচা? রামায়ণ-মহাভারতের কবিতাই তো বল। এ কোথায় শিখলে?

—আমার যখন অনুরাগ বয়েস, তখন বিদ্যেসুন্দরের ভারী দিন ছেল যে! বিদ্যেসুন্দরের যাত্রা হ'ত, গোপাল উড়ের নাম শুনিছিলে? সেই গাইত বিদ্যেসুন্দর। আমরা সমবয়সী কজন পরামর্শ ক'রে বিদ্যেসুন্দরের বই আনালাম। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কবিওয়ালার বই। বড় ভাল লেগে গেল। তারপর আনালাম অন্নদামঙ্গল। বিদ্যেসুন্দর বই ভাল, তবে বড্ড হে-পানা—

—কি পানা চাচা?

—বড্ড হে-পানা; আপনাদের কাছে আর কি বলব? ছেলেছোকরা মানুষ তোমরা, আপনাদের কাল হতি দেখলাম, সে আর আপনি শুনে কি করবা? ওই বিদ্যে ব'লে এক রাজকন্যে, তার সঙ্গে সুন্দর ব'লে এক রাজপুত্তুরের আসনাই হয়—এই সব কথা। প'ড়ে দেখো। বিদ্যের রূপ শোনবা কেমন ছেল?

বিনানিয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়।
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়॥
কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা॥
কি ছার মিছার কাম ধনুরাগে ফুলে।
ভুরুর সমান কোথা ভুরুভঙ্গে ভুলে॥
কাড়ি নিল মৃগমদ নয়নহিল্লোলে।
কাঁদেরে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ করি কোলে।

কবিবর ভারতচন্দ্র স্বর্গ হইতে যদি দেখিতে পাইতেন, তবে এই বিংশ শতাব্দীতে কত নবীন প্রতিভার প্রভাবের মধ্যেও তাঁহার এইরূপ একজন মুগ্ধ ভক্তের মুখে তাঁহার নিজের কবিতার উৎসাহপূর্ণ আবৃত্তি শুনিয়া নিশ্চয়ই খুব খুশি হইতেন।

বিপিনের এ কথা অবশ্য মনে হইল না, কারণ সে সাহিত্যরসিক নয়, বা কি প্রাচীন, কি আধুনিক কোনও বাংলা কবির সহিতই তাহার পরিচয় নাই। কিন্তু বিদ্যার রূপের বর্ণনা শুনিয়া তাহার কেন যে মানীর কথা মনে হইল হঠাৎ, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না। বিদ্যা তো নয়—মানী। কবি যেন তাহাকে চক্ষের সামনে রাখিয়াই এ বর্ণনা লিখিয়াছেন। মানী কাছে আসিলে তাহাকে খুব সুন্দরী বলিয়া বিপিনের মনে হয় নাই, কিন্তু দূরে গেলেই মানীকে সর্ব্বসৌন্দর্য্যের আকর বলিয়া মনে হয়। তাহার চোখ যতটা ডাগর, তাহার চেয়েও ডাগর বলিয়া মনে হয়, রঙ যতটা ফর্সা তাহার চেয়েও ফর্সা বলিয়া মনে হয়, মুখশ্রী যতটা সুন্দর, তাহার চেয়েও অনেক বেশি সুন্দর বলিয়া মনে হয়।

আইনদ্দির বাড়ীর পশ্চিমে বেলতার মাঠ, অনেক দূর পর্য্যন্ত ফাঁকা, মাঠের ওপারে হরিদাসপুর গ্রামের বাঁশবন। সূর্য্য পশ্চিমে হেলিয়া পড়িলেও এখনও বেলা আছে, মাঠের মধ্যে ফুলে ভরা বাবলা গাছের ডালে ডালে শালিক ও ছাতারে পাখীর দল কলরব করিতেছে। নিকটে চাঁদমারির বিল থাকাতে বৈকালের হাওয়া বেশ ঠাণ্ডা।

বিপিনের মন কেমন উদাস হইয়া গেল।

জীবনে তাহার সুখ নাই, একমাত্র সুখের মুখ সে সম্প্রতি দেখিতে পাইয়াছে, অকস্মাৎ এক ঝলক-স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার মত মানীর গত কয় দিনের কার্য্যকলাপ তাহার অন্ধকার জীবনে আলো আনিয়া দিয়াছে।

কিন্তু মানী তাহার কে?

কেহই নয়, অথচ সে-ই যেন সব বলিয়া আজ মনে হইতেছে।

অথচ মানী অপরের স্ত্রী—বিপিনের কি অধিকার আছে সেখানে? ইচ্ছা করিলেই কি তাহার সঙ্গে যখন-তখন দেখা করিবার উপায় আছে?

মানী কেন দুই দিনের যত্ন দেখাইয়া তাহাকে এমন ভাবে বাঁধিল!

আইনদ্দি বলিল, একখানা কুমড়ো খাবে তো চল আমার সঙ্গে। বিলির ধারে জলি ধানের ক্যাতে আমার নাতি ব'সে পাখী তাড়াচ্ছে, সেখানথে দেব এখন। ডাঙার ওপারেই কুমড়োর ভুঁই।

চাঁদমারির বিলের ধারে ধারে দীর্ঘ জলজ পাতিঘাসের মধ্য দিয়া সুঁড়িপথ। পড়ন্ত বেলার আধশুকনো ঘাসের রোদপোড়া গন্ধের সঙ্গে বিলের জলের পদ্মফুলের গন্ধ মিশিয়াছে। বিলের এপারে সবটাই জলি ধানের ক্ষেত। মাঝে মাঝে ছোট ছোট বাঁশের মাচায় বসিয়া লোকে টিনের কানেস্তারা বাজাইয়া বাবুই পাখী তাড়াইতেছে।

আইনদ্দির নাতির নাম মাখন। এ দেশের মুসলমানদের এ রকম নাম অনেক আছে—এমন কি ভুবন, নিবারণ, যজ্ঞেশ্বর পর্য্যন্ত আছে।

মাখনের বয়স চল্লিশের কম নয়, চুলে পাক ধরিয়াছে। তাহার বাবার বয়স প্রায় বাহাত্তর-তিয়াত্তর। মাখন বেশ জোয়ান লোক, শুধু জোয়ান নয়, এ অঞ্চলের মধ্যে একজন ভাল গায়ক বলিয়া তাহার খ্যাতি আছে।

ঠাকুরদাদাকে আসিতে দেখিয়া মাখন বলিল, মোর জলপান কনে, হ্যাঁ দাদা ?

পিছনে বিপিনকে আসিতে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি মাচা হইতে নামিয়া আসিয়া বলিল, দাদাবাবু যে! কখন আলেন ? আপনি সেই কোথায় নায়েবী করচ শুনেলাম, তাই ইদিকি বড় একটা যাওয়া আসা কর না বুঝি ?

আইনদ্দি বলিল, বাবাঠাকুরকে একটা বড় দেখে কুমড়ো এনে দে দিকি। ওই পুবির বেড়ার গায়ে যে কটা বড কুমড়ো আছে, তা থেকে একটা আন।

—হ্যাদে, দূর দূর, ওই দেখ বাবাঠাকুর, এক ঝাঁক বাবুই এসে জুটল আবার! সুমুন্দির পাখীগুনো তো বড্ড জালালে দেখচি!—বলিয়া আইনদ্দি নিজেই টিনের কানেস্তারা বাজাইতে লাগিল।

বেলা পড়িয়া রাঙা রোদ কতক জলি ধানের বিস্তীর্ণ ক্ষেতে, কতক বিলের বাবলা-বনে পড়িয়াছে, আইনদ্দির নাতি বিলের উপরের ডাঙায় কুমড়ো-ক্ষেত হইতে সুকণ্ঠে গাহিতেছে—

যখন ক্ষ্যাতে ক্ষ্যাতে ব'সে ধান কাটি
ও মোর মনে জাগে তার নয়ান দুটি—

বাবুইপাখীর ঝাঁক বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছে বৃদ্ধ আইনদ্দি তাহাদের কিছুই করিতে পারিবে না; সুতরাং তাহারা নির্ব্বিবাদে আবার আসিয়া জুটিতে লাগিল।

আইনদ্দির নাতির গানের কয়টি চরণ শুনিয়াই বিপিন আবার অন্যমনস্ক হইয়া গেল। সেই দিগন্তবিস্তীর্ণ মাঠ, বিল ও বিলের ধারে ধারে সবুজ জলি ধানের ক্ষেত, উপরে এবং নীচে নাচের ধরনে উড্ডীয়মান বাবুইপাখীর ঝাঁক, বিলের ধারের জলে সোলাগাছের হলদে ফুলের রাশি, হরিদাসপুরের বাঁশবনের মাথায় হেলিয়া-পড়া অস্তমান সূর্য্য, সব মিলিয়া তাহার মনে এক অপূর্ব্ব ব্যথাভরা অনুভূতির সৃষ্টি করিল।

যেন মনে হইল, মানীকে এ জগতে বুঝিবার ভালবাসিবার লোক নাই। মানী যাহার হাতে পড়িয়াছে, সে মানীর মূল্য বোঝে নাই। মানীর জীবনকে ব্যর্থতার পথ হইতে যদি কেহ রক্ষা করিতে পারে, তাহার মুখে সত্যকার আনন্দের হাসি ফুটাইতে পারে, তবে সে বিপিন নিজেই। বিস্তীর্ণ সংসারে মানী হয়তো বড় একা, যেমন সে নিজেও আজ একা।

বিপিন কখনও প্রেমে পড়ে নাই জীবনে। প্রেমে পড়িবার অভিজ্ঞতা তাহার কখনও হয় নাই, মানীর সঙ্গে এই কয়দিনের ঘটনাবলীর পূর্ব্বে। এখন সে বুঝিয়াছে, আজ মানী তাহার যতটা কাছে অতটা কাছে কেহ কখনও আসে নাই! বিপিন লেখাপড়া মোটামুটি জানিলেও এমন কিছু বেশী নভেল নাটক বা কবিতা পড়ে নাই, প্রেমের কি লক্ষণ কবি ঔপন্যাসিকেরা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা সে জানে না; কিন্তু সে মাত্র এইটুকু অনুভব করিল, মানী ছাড়া জগতে আর কেহ আজ যদি তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়ায় তাহার মনের এ শূন্যতা

পূর্ণ হইবার নয়।

ইহাকেই কি বলে ভালবাসা?

হয়তো হইবে।

যে কোন কথাই সেই একটি মাত্র মানুষের কথা মনে আনিয়া দেয়—বিপিনের জীবনে ইহা একেবারে নূতন।

সে যে ভাইয়ের অসুখের সম্বন্ধে আইনদ্দির সঙ্গে পরামর্শ করিতে গিয়াছিল, এ কথা বেমালুম ভুলিয়া গিয়া কুমড়াটি হাতে লইয়া বিপিন সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১

বিপিনের একজন বন্ধু আছে এখান হইতে দুই ক্রোশ দূরে ভাসানপোতা গ্রামে। বন্ধুটির নাম জয়কৃষ্ণ মুখুজ্জে। বয়সে জয়কৃষ্ণ বিপিনের চেয়ে বছর ছয়-সাতের বড়। কিন্তু ভাসানপোতার মাইনর স্কুলে উহারা দুইজনে এক ক্লাসে পড়িয়াছিল। জয়কৃষ্ণ বর্ত্তমানে উক্ত গ্রামের সেই স্কুলেই হেড-মাস্টারের কাজ করে। বি. এ. পর্য্যন্ত পড়াশোনা করিয়াছিল।

এমন একজন লোক এখন বিপিনের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, যাহার কাছে সব কথা খুলিয়া বলা যায়। না বলিলে আর চলে না।—বিপিন মনের মধ্যে এসব আর চাপিয়া রাখিতে পারে না।

তাই পরদিন সে ভাসানপোতায় বন্ধুর বাড়ী গিয়া হাজির হইল। জয়কৃষ্ণ এ গ্রামের বাসিন্দা নয়, তবে বর্ত্তমানে কর্ম্ম উপলক্ষে এই গ্রামের সতীশ কর্ম্মকারের পোড়ো বাড়ীতে বাহিরের দুইটি ঘর লইয়া বাস করিতেছে।

স্কুলের ছুটির পর জয়কৃষ্ণ নিজের ঘরে ফিরিয়া উনুন জ্বালাইয়া চা তৈয়ারির যোগাড় করিতেছে, বিপিনকে হঠাৎ এ সময়ে দেখিয়া বলিল, আরে বিপ্‌নে যে! আয় আয়, ব'স। কবে এলি রে বাড়ীতে?

বিপিন দেখিল, জয়কৃষ্ণ একা নাই—ঘরের মধ্যে বসিয়া আছে মাইনর স্কুলের দ্বিতীয় পণ্ডিত বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী। বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তীর বয়স প্রায় সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ, এ গ্রামের স্কুলে আজ প্রায় আট দশ বছর মাস্টারি করিতেছে, থাকে জয়কৃষ্ণের বাসায় অন্য ঘরটিতে, কারণ জয়কৃষ্ণ স্ত্রীপুত্র লইয়া এখানে বাস করে না; বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তীই উপরওয়ালা হেড-মাস্টারের এক রকম পাচক ও ভৃত্য উভয়ের কাজই করে। বিনিময়ে জয়কৃষ্ণ তাহাকে খাইতে দেয়।

এসব কথা বিপিন জানিত, কারণ সে আরও বহুবার ভাসানপোতায় আসিয়াছে জয়কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করিতে। বলা বাহুল্য, বিপিন ও জয়কৃষ্ণ যখন এই স্কুলের ছাত্র, বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী

তখন স্কুলের মাস্টার ছিল না, উহারা পাস করিয়া বাহির হইয়া যাইবার অনেক পরে সে আসিয়া চাকুরিতে ঢোকে।

চা পান শেষ করিয়া বিপিন জয়কৃষ্ণকে ডাকিয়া ঘরের বাহিরে লইয়া গিয়া মানীর কথা তাহাকে বলিতে লাগিল। বেশ সবিস্তারেই বলিতে লাগিল।

বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী একটু দূরে বসিয়া উৎকর্ণ হইয়া ইহাদের কথা শুনিবার চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া বিপিন গলার সুর আরও একটু নীচু করিল।

বিশ্বেশ্বর দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, আমরা কি শুনতে পাব না কথাটা, ও বিপিনবাবু?

—এ আমাদের একটা প্রাইভেট কথা হচ্ছে।

—প্রাইভেট আর কি। কোন মেয়েমানুষের কথা তো? বলুন না, একটু শুনি।

বিশ্বেশ্বর অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে কথাগুলি বলিল দেখিয়া বিপিন একটু মজা করিবার জন্য কহিল, আসুন না এদিকে, বলছি।

তারপর সে এক কাল্পনিক মেয়ের সঙ্গে তাহার কাল্পনিক প্রেম-কাহিনী সবিস্তারে শুরু করিল। একবার ট্রেনে একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তাহার আলাপ হয়। মেয়েটির নাম বিজলী। তাহার বাবা ও মায়ের সঙ্গে সে কলকাতায় মামার বাসায় যাইতেছিল। বিজলী কলিকাতায় মামার বাসার ঠিকানা দিয়া তাহাকে যাইতে বলে। বিপিন অনেকবার সেখানে গিয়াছিল, বিজলী কি আদরযত্ন করিত! বার বার আসিতে বলিত। একদিন বিপিন তাহার বাপ-মাকে বলিয়া বিজলীকে আলিপুর চিড়িয়াখানা দেখাইতে লইয়া যায়। সেখানে বিজলী মুখ ফুটিয়া বলে, বিপিনকে সে ভালবাসে।

বিশ্বেশ্বর সাগ্রহে বলিল, এ কতদিনের কথা?

—তা ধরুন না কেন, বছর ছ-সাত আগের ব্যাপার হবে।

—এখন সে মেয়েটি কোথায়?

—এখন তার বিয়ে হয়ে গেছে। শ্বশুরবাড়ী থাকে।

—আপনার সঙ্গে আলাপ আছে?

—আলাপ আবার নেই! দেখা হয় মাঝে মাঝে তার সেই মামার বাসায়, তখন ভারী যত্ন করে।

—কি রকম যত্ন করে?

—এই গল্পগুজব করে, উঠতে দেয় না, বলে, বসুন বসুন। খুব খাওয়ায়। এর নাম যত্ন আর কি। আমায় কত চিঠি লিখেছে লুকিয়ে।

—বলেন কি! চিঠিপত্র লিখেছে!

বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল। ইহা সে কল্পনাও করিতে পারে না। মেয়েমানুষ লুকাইয়া যে চিঠি লেখে—সে চিঠি যে পায়, তাহার কি সৌভাগ্য না জানি! বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তীর অত্যন্ত ইচ্ছা হইল, সেসব চিঠিতে কি লেখা আছে জিজ্ঞাসা করে; কিন্তু

নিতান্ত ভদ্রতাবিরুদ্ধ হয় বলিয়া, বিশেষত যখন বিপিনের সঙ্গে তাহার খুব বেশি ঘনিষ্ঠতা নাই, সেকথা বলিতে পারিল না। শুধু বিস্ময়ের দৃষ্টিতে বিপিনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

জয়কৃষ্ণ বলিল, বিশ্বেশ্বরবাবু, আপনার জীবনে এ রকম কখনো কিছু নিশ্চয় হয়েছে, বলুন না শুনি।

বিশ্বেশ্বর নিতান্ত হতাশ ও দুঃখিত ভাবে খানিকটা আপনমনেই বলিল, আমাদের এ রকম কখনও কেউ চিঠি লেখে নি, চিঠি লেখা তো দূরের কথা, কখনও কোন মেয়ে কিছু বলেও নি, সাহস ক'রে কাউকে কখনও কিছু বলতেও পারি নি মাস্টারবাবু, সত্যি বলছি, এই এত বয়স হ'ল।

—বিয়েও তো করলেন না।

—বিয়ে কি ক'রে করব মাস্টারবাবু, দেখতেই পাচ্ছেন সব। পঁচিশ টাকা মাইনে লিখি স্কুলের খাতায়, পাই পনরো টাকা। ন মাতা ন পিতা, মামার বাড়ী মানুষ হয়েছি দুঃখে-কষ্টে। তেমন লেখাপড়াও শিখিনি। মামাদের দোরে তাদের চাকরগিরি ক'রে, হাটবাজার ক'রে অতিকষ্টে ছাত্রবৃত্তি পাস করি।

জয়কৃষ্ণ বলিল, বিয়ে করলে আপনার লোক পেতেন বিশ্বেশ্বরবাবু। এর পরে দেখবেন, একজন মানুষ অভাবে কি কষ্ট হয়!

বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী বলিল, এর পর কেন, এখনই হয়। সত্যি বলছি মাস্টারবাবু, একটা ভাল কথা কখনও কেউ বলে নি, বড় দুঃখে এ কথা বলছি, কিছু মনে করবেন না, কারও মুখে একটা ভালবাসার কথা, এই উনি যেমন বলছেন, এ তো কখনও শুনিই নি, কাকে বলে জানিও না। তাই এক এক সময় ভাবি, জীবনটা বৃথায় গেল মাস্টারবাবু, কিছুই পেলাম না।

বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী এমন হতাশ সুরে এ কথা বলিল যে, সে যে অকপটে সত্য কথা বলিতেছে, এ বিষয়ে বিপিনের কিছুমাত্র সন্দেহ হইল না। সে যে কিছুদিন আগেও ভাবিত, তাহার তুল্য অসুখী মানুষ দুনিয়ায় কেহ নাই, ইহার বৃত্তান্ত শুনিয়া বিপিনের সে ধারণা দূর হইল।

এই ভাগ্যহত দরিদ্র স্কুল-মাস্টারের উপর তাহার যেন একটা অহেতুক ভালবাসা জন্মিল।

হঠাৎ মনে হইল, জয়কৃষ্ণ তাহার এতদিনের বন্ধু বটে, কিন্তু জয়কৃষ্ণের চেয়েও এই অর্দ্ধ-পরিচিত বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী যেন তাহার অনেক আপন। ইহা দরিদ্রের প্রতি দরিদ্রের সমবেদনা নয়, দরিদ্রের প্রতি ধনীর করুণা।

কারণ বিপিন এখন ধনী। আজই এইমাত্র বিপিন ভাল করিয়া বুঝিয়াছে যে, সে কত বড় ধনী।

২

বাড়ীতে আসিয়া প্রথম দিন পাচ-ছয় বলাই বেশ ভাল ছিল। বিপিন চাকুরিস্থলে চলিয়া গেলে সে একদিন গ্রামের নবীন রায় মহাশয়ের বাড়ীতে বসিয়া আছে—নবীন রায়ের ছেলে বিষ্ণু বলিল, বলাইদা, মাংসের ভাগ নেবে? আমরা উত্তরপাড়া থেকে ভাল খাসি আনিয়েছি, এবেলা কাটা হবে। সাত আনা ক'রে সের পড়তা হচ্ছে।

বলাই অতিরিক্ত মাংস খাওয়ার ফলেই অসুখ বাধাইয়াছিল। মাংস খাওয়া তাহার বারণ আছে, এবং দাদা বাড়ী থাকার জন্যই সে বিশেষ কিছু বলিতেও সাহস করে নাই। কিন্তু এখন আর সে ভয় নাই।

মনোরমা বারণ করিয়াছিল। বলাই বৌদিদিকে তত আমল দেয় না, ফলে তাহার মাংস খাওয়া কেহ বন্ধ করিতে পারিল না।

দুই তিন দিনের মধ্যে বলাই আবার অসুস্থ হইয়া পড়িল। বিপিন অসুখের খবর পাইয়াও বাড়ী আসিতে পারিল না, জমিদার অনাদিবাবু কিস্তির সময় ছুটি দিতে চাহিলেন না।

দিন কুড়ি পরে বিপিন বাড়ী আসিয়া দেখিল, বলাই একটু সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। বলাই বাড়ীর সকলের হাতে পায়ে ধরিয়া দাদাকে মাংস খাওয়ার কথা বলিতে বারণ করিয়া দিয়াছিল। সুতরাং বিপিনের কানে সে কথা কেহ তুলিল না।

বিপিন এক দিন থাকিয়াই চলিয়া গেল। বলাই আবার কুপথ্য শুরু করিয়া দিল। কখনও লুকাইয়া কখনও বা বাড়ীর লোকের কাছে কান্নাকাটি করিয়া, আবদার ধরিয়া।

মাস দুই এইভাবে কাটিবার পরে বিপিন পাচ ছয় দিনের ছুটি লইয়া বাড়ী আসিল। তাহার বাড়ী আসিবার প্রধান কারণ, পৈতৃক আমলের ভাঙা চণ্ডীমণ্ডপটি এবার খড় তুলিয়া ভাল করিয়া ছাইয়া লইবে। এ সময় ভিন্ন খড় কিনিতে পাওয়া যাইবে না পাড়াগাঁয়ে।

বাড়ী আসিয়া প্রথমেই বলাইকে দেখিয়া বিপিনের বাড়ী আসিবার আনন্দ-উৎসাহ এক মুহূর্ত্তে নিবিয়া গেল। একি চেহারা হইয়াছে বলাইয়ের! চোখ মুখ ফুলিয়াছে, রঙ হলদে, পায়ের পাতাও যেন ফুলিয়াছে মনে হইল; অথচ নেফ্রাইটিসের রোগী দিব্য মনের আনন্দে নির্ব্বিচারে পথ্য-অপথ্য খাইয়া চলিয়াছে।

বিপিন কাহাকেও কিছু বলিল না, তাহার মন ভয়ানক খারাপ হইয়া গেল ভাইটার অবস্থা দেখিয়া। সেবার কিছু সুস্থ দেখিয়া গিয়াছিল, কোথায় সে ভাবিতেছে, এবার গিয়া দেখিবে, ভাইটি বেশ সারিয়া সামলাইয়া উঠিয়াছে! সারিয়া ওঠা তো দূরের কথা, রাণাঘাট হাসপাতালে সেবার লইয়া যাওয়ার পূর্ব্বে যা চেহারা ছিল তাহার চেয়েও খারাপ হইয়া গিয়াছে।

দুই দিন পরে বিপিন নদীর ধারে মাছ ধরিতে যাইবে, বলাই বলিল, দাদা, আমিও যাব তোমার সঙ্গে? বল তো যুগীপাড়া থেকে আর দুখানা ছিপ নিয়ে আসি।

বলাই উঠিয়া হাটিয়া খাইয়া-দাইয়া বেড়াইত বলিয়া বাড়ীর লোকে হয়তো ভাবে, তবে অসুখ এমন কঠিন আর কি! কারণ পাড়াগাঁয়ের ব্যাপার এই যে, শয্যাশায়ী এবং উত্থান-

শক্তিরহিত না হওয়া পর্য্যন্ত কাহাকেও অসুস্থ বলিয়া ধারণা করিবার মত বুদ্ধি সেখানে খুব কম লোকেরই আছে।

মাছ ধরিতে গিয়া দুইজনে নদীর ওপারে গিয়া বসিল, কারণ এপারে জলে শেওলার দাম বড় বেশি।

চার করিয়া ছিপ ফেলিয়া বিপিন বলিল, বলাই একটু তামাক সাজ তো কল্কেটায়। আর মাঠ থেকে একটু গোবর কুড়িয়ে নিয়ে আয়, বড্ড চিংড়িমাছে জ্বালাচ্ছে, একটু ছড়িয়ে দিই।

বলাই বলিল, দাদা, গোবর দিলে চিংড়ি মাছ বেশি ক'রে আসবে।

—তুই তো সব জানিস, দে আগে তামাকটা সেজে!

বেলা পড়িতে বেশি দেরি নাই। অনেকক্ষণ বিপিন ছিপ ফেলিয়া একমনে বসিয়া আছে, বলাইও তাহার পাশেই কিছু দূরে ছিপ ফেলিয়াছে। উভয়ের ছিপের ফাতনা নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের মত স্তব্ধ। হঠাৎ বিপিন মুখ তুলিয়া ভাইয়ের দিকে চাহিতেই দেখিল, বলাইয়ের চোখ ছিপের ফাতনার দিকে নাই। সে গভীর মনোযোগের সঙ্গে একদৃষ্টে ওপারের দিকে চাহিয়া আছে। চাহিয়া চাহিয়া কি যেন দেখিতেছে।

কি দেখিতেছে বলাই?

বিপিন কৌতূহলী হইয়া ভাইয়ের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া ওপারের দিকে চাহিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার বুকের মধ্যে ছাৎ করিয়া উঠিল।

সে এতক্ষণ লক্ষ্য করে নাই, ওপারেই চটকাতলার শ্মশান। ওপারের জঙ্গলের বহু গাছ-পালার মধ্যে বিপিন লক্ষ্যই করে নাই যে, তাহারা শ্মশানতলীর বুড়ো চটকাগাছটার ঠিক এপারে আসিয়া বসিয়াছে, সেদিকে মন দিবার কোনও কারণও ছিল না এতক্ষণ।

কিন্তু বলাই ওদিকে অমন ভাবে চাহিয়া আছে কেন?

বলাই যেন উদাস, অন্যমনস্ক। দাদা যে তাহার দিকে চাহিয়া দেখিতেছে, এ খেয়ালও তাহার নাই।

বিপিন বলিল, ওদিকে অমন ক'রে কি দেখছিস রে?

বলাই চকিতে ওপারের দিক হইতে চোখ ফিরাইয়া লইয়া ব'লল, না, কিছু না, এমনই।

বিপিন যেন খানিকটা আশ্বস্ত হইল, অথচ কেন যে আশ্বস্ত হইল, কি ভয়ই বা করিতেছিল, তাহা তাহার নিজের নিকট খুব যে স্পষ্ট হইয়া উঠিল, তাহা নহে। তবুও মনে মনে ভাবিল, কিছু না, এমনই চেয়ে ছিল।

কিন্তু কিছুক্ষণ ছিপের ফাতনার দিকে লক্ষ্য রাখিবার পরে ভাইয়ের দিকে আর একবার চোখ ফেলিতেই সে দেখিল, বলাই আবার পূর্ব্ববৎ অন্যমনস্কভাবে ওপারের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে।

বিপিন উদ্বিগ্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, কি রে? কি দেখছিস বল্ তো?

বলাই বলিল, না, কিছু দেখছি না।—বলিয়াই সে যেন দাদার কাছে ধরা পড়িয়া যাওয়াটা ঢাকিয়া লইবার আগ্রহে অত্যন্ত উৎসাহের সহিত ছিপ তুলিয়া বঁড়শিতে নূতন কেঁচোর টোপ

গাঁথিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

আবার খানিকক্ষণ কাটিয়া গেল। বেলা একদম পড়িয়া গিয়াছে। ওপারের বড় বড় শিমূল, শিরীষ বা তেঁতুল গাছের মগডালে পর্য্যন্ত একটুও রাঙা রোদের আভা নাই। মাঠের যেখানে তাহারা বসিয়াছে, তাহার আশেপাশে চিচ্চিড়ে ফলের বনে সারাদিনের রোদ পাইয়া রোদ-পোড়া ফলের শুঁটিগুলি পিড়িক পিড়িক শব্দ করিয়া ফাটিতেছে। এই সময়টা মাছ খায়, সুতরাং বিপিন ভাবিল, অন্তত আর আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া যাইবে।

হঠাৎ তাহাদের সামনে জলের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড কচ্ছপ নিঃশব্দে ভাসিয়া উঠিয়া চার পা নাড়িয়া সাঁতার দিতে দিতে বলাইয়ের ছিপের দিকে লক্ষ্য করিয়াই যেন আসিতে লাগিল।

বিপিন বলাইকে কথাটা বলিতে গিয়া মুখ ফিরাইতেই দেখিল কচ্ছপটা যে ভাসিয়া উঠিয়াছে বা তাহারই ছিপের দিকে সাঁতরাইয়া আসিতেছে, বলাইয়ের সেদিকে দৃষ্টিই নাই; সে আবার সেই ভাবে ওপারের দিকে চাহিয়া আছে।

বিপিন ধমক দিয়া বলিল, এই! কি দেখছিস ওদিকে অমন ক'রে? ওদিকে তাকাস নে।

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই বিপিনের মনে হইল, এ কথা বলাইকে এ ভাবে বলা ভাল হয় নাই। সঙ্গে সঙ্গে যে সন্দেহটা অমূলক বা অস্পষ্ট ছিল, সেটা যেন আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

বিপিনের হাতে পায়ে যেন বল কমিয়া গেল, মন বেজায় দমিয়া গেল। প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যায় ওপারের চটকাতলার শ্মশানের মড়ার বাঁশ ও ফুটা কলসীগুলা যেন কি ভয়ানক অমঙ্গলের বার্ত্তা প্রচার করিতেছে! ভাসমান কচ্ছপটাও। সে তাড়াতাড়ি ছিপ গুটাইয়া ভাইকে বলিল, নে, চল্ বাড়ী চল্। সন্ধ্যে হ'ল। আমি ছিপগুলো বেঁধে নিই। তুই ততক্ষণ বাঁশতলার ঘাটে গিয়ে পারের নৌকো ডাক দে।

অসুস্থ ভাইটাকে শ্মশানের সান্নিধ্য হইতে যত তাড়াতাড়ি হয় সরাইতে পারিলে সে যেন বাঁচে।

বিপিনের মন কয়দিন যেমন হাল্কা ছিল, সর্ব্বদা যেমন কি এক ধরণের আনন্দে ভরপুর ছিল, আজ আর তেমন অনুভব করিল না। কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে ভাল লাগিল না, সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সারিয়া সে নিজের ঘরে ঢুকিল।

পৈতৃক আমলের কুঠরির মেঝেতে সিমেন্ট চটিয়া উঠিয়া গিয়াছে বহুকাল, জানালার কবাট আলগা, ছেঁড়া নেকড়া ও কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি দিয়া উত্তরের জানালাটা আটকানো। জানালায় ঠেসানো আছে এক গাদা শাবল, কুড়ুল, গোটা দুই পুরানো হুঁকো, একটা পুরানো টিনের তোরঙ্গ, সেজন্য ওদিকের জানালা খোলাই যায় না।

ঘরে খাট নাই, যে কয়খানা খাট ছিল, পূর্ব্ববৎসর দারিদ্র্যের দায়ে বিপিন সস্তা দরে বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছিল। মায়ের ঘরে একখানা মাত্র জাম কাঠের সেকেলে তক্তাপোশ ছিল, সম্প্রতি বলাইয়ের অসুখ বাড়বার পর হইতে সেখানা বলাইয়ের জন্য দালানে পাতিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং বিপিন নিজের ঘরে মেঝের উপর বিছানা পাতিয়াই শোয় আজ তিন বৎসর।

এক দিকে মাদুরের উপর কাঁথা পাতিয়া বিছানা করা, মনোরমা সেখানে খোকাখুকীকে লইয়া শোয়। ঘরের অন্য দিকে একখানা পুরানো তুলো-বার-হওয়া তোশক পাতিয়া বিপিনের জন্য বিছানা করা হইয়াছে; মশারি নাই, এতদিন অর্থাভাবে কেনা যায় নাই, চাকুরি হওয়ার পর হইতেও এমন কিছু বিপিন থোক টাকা কোনদিন হাতে করিয়া বাড়ী আসে নাই, যাহা হইতে সংসার-খরচ চালাইয়া আবার মশারি কেনা যাইতে পারে।

সমস্ত রাত্রি মশায় ছিঁড়িয়া খায় বলিয়া মনোরমা সন্ধ্যাবেলা ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া ঘুঁটের ও তুষের ধোঁয়ার সাঁজাল দেয়, যেমন গোহালে দেওয়া হয় তেমনই। আজও দিয়াছিল, এখনও ঘুঁটের মালসা ঘরের মেঝেতে বসানো, অল্প অল্প ধোঁয়া বাহির হইতেছে।

বিপিন শৌখিন মেজাজের লোক, ঘরে ঢুকিয়া ঘুঁটের মালসা দেখিয়াই চটিয়া গেল। অপর বিছানায় ভানু শুইয়া ছিল, তাহাকে ডাকিয়া বলিল, তোর মাকে ডেকে নিয়ে আয়।

মনোরমা ঘরে ঢুকিতেই বিরক্তির সুরে বলিল, এত রাত পর্য্যন্ত ঘুঁটের মালসা ঘরে? বলি এখানে মানুষ শোবে না এটা গোয়াল? নিয়ে যাও সরিয়ে।

মনোরমা বলিল, তা কি করব বল। ও দিলে তবুও মশা একটু কমে, নইলে শোয়া যায়! একদিন ধোঁয়া না দিলে মশায় টেনে নিয়ে যায় যে! অন্য কি উপায় আছে দেখিয়ে দাও না।

স্ত্রীর এই কথার মধ্যে তাহার মশারি কিনিবার অক্ষমতার প্রতি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতের অস্তিত্ব অনুমান করিয়া বিপিন জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, উপায় কি আছে, না আছে, এখন দেখবার সময় নয়। তুমি দয়া ক'রে মালসাটা সরিয়ে নিয়ে যাবে?

মনোরমা আর বাক্যব্যয় না করিয়া বিবাদের হেতুভূত দ্রব্যটিকে ঘরের বাহিরে লইয়া গেল। সে একটা ব্যাপার আজ কয়েকদিন ধরিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে। পলাশপুরে চাকরি হইবার পর হইতেই স্বামীর কেমন যেন রুক্ষ মেজাজ, আগে তাহার নানারকম বদখেয়াল ছিল, নেশাভাঙ করিত; বিষয়-আশয় উড়াইয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু মনোরমা যখন তিরস্কার করিত, তখন সে শুনিয়া যাইত, মৃদু প্রতিবাদ করিত, দোষক্ষালনের চেষ্টা করিত, কিন্তু রাগত না, বরং ভয়ে ভয়ে থাকিত।

আজকাল হইয়াছে উল্টা। মনোরমা কিছু করিলেও দোষ, না করিলেও দোষ। বিপিন যেন তাহার সব কিছুতেই দোষ দেখে। সামান্য ছুতা ধরিয়া যা-তা বলে। কেন যে এমন হইল, তাহা মনোরমা ভাবিয়া পায় না।

৬

মনোরমা আর এক বিপদে পড়িয়াছে।

বীণা-ঠাকুরঝি বয়সে তাহার অপেক্ষা দুই বছরের ছোট। বিধবা হওয়ার পরে এই সংসারেই আছে, শ্বশুরবাড়ী যায় না, কারণ শ্বশুরবাড়ীতে এমন কেহ আপনার জন নাই যে তাহাকে লইয়া যায়। উনিশ বছর বয়সে বিধবা হয়, এখন বছর একুশ-বাইশ বয়স। মনোরমার নিজের বয়স চব্বিশ।

সে কথা যাক।

এখন বিপদ হইয়াছে এই, আজ প্রায় ছয় সাত মাস ধরিয়া মনোরমা লক্ষ্য করিতেছে, গ্রামের তারক চাটুজ্জের ছেলে পটল যখন তখন ছুতা-নাতায় এ বাড়ীতে যাতায়াত করে এবং বীণার সঙ্গে মেলামেশা করে।

ইহাতে মনোরমা প্রথমে কিছু মনে করে নাই, সে শহর-বাজারের মেয়ে, তাহার বাপের বাড়ীতেও বিশেষ গোঁড়ামি নাই ও-বিষয়ে। ছেলে আর মেয়ে একসঙ্গে মিশিলেই যে খারাপ হইয়া যাইবে, সে বিশ্বাস তাহার জ্যাঠামশায়ের নাই সে জানে। মনোরমা বাবাকে দেখে নাই, জ্যাঠামশায়ই তাহাকে মানুষ করিয়াছেন।

কিন্তু এ ঠিক সে রকমের নয়।

সন্দেহ একদিনে হয় নাই। একটু একটু করিয়া বহুদিনে হইয়াছে।

বিবাহ হইবার পরে এ বাড়ীতে আসিয়া মনোরমা পটলকে এ বাড়ীতে তত আসতে দেখিত না, যত সে দেখিতেছে আজ প্রায় বছরখানেক। তাহার মধ্যে ছয়-সাত মাস বাড়াবাড়ি। বীণা-ঠাকুরঝিও আজকাল যেন পটল আসিলে কি রকম চঞ্চল হইয়া উঠে। রাঁধিতে বসিয়াছে, হয়তো পটলের গলার স্বর শোনা গেল দালানে, শাশুড়ীর সঙ্গে কথা কহিতেছে। এদিকে বীণা হয়তো এক ঘণ্টার মধ্যে রান্নাঘর হইতে বাহির হয় নাই, কোনও না কোনও ছুতা খুঁজিয়া সে রান্নাঘর হইতে বাহির হইবেই। দালানে যাইয়া পটলের সঙ্গে খানিকটা কথা কহিয়া আসিবেই। এ মাত্র একটা উদাহরণ, এ রকম অনেক আছে।

ইহাও না হয় মনোরমা না ধরিল।

একদিন সিঁড়ির পাশে অন্ধকারে সন্ধ্যাবেলায় দাঁড়াইয়া সে দুইজনকে চুপি চুপি কি কথা-বার্ত্তা বলিতে দেখিয়াছে। শাশুড়ী সন্ধ্যার পর চোখে ভাল দেখেন না, নিজের ঘরে খিল দিয়া জপ-আহ্নিক করেন ঘণ্টাখানেক কি তাহারও বেশি, সে নিজেও এই সময়টা ছেলেমেয়ের তদারক করিতে, রাত্রের রান্নার যোগাড় করিতে ব্যস্ত থাকে, আর ঠিক কিনা সেই সময়েই ওই পোড়ারমুখো পটল চাটুজ্জে!

বীণা-ঠাকুরঝিও যেন লুকাইয়া দেখা করিতে আগ্রহ দেখায়, ইহার প্রমাণ সে পাইয়াছে। অথচ পটলের বয়স ত্রিশ-বত্রিশ কি তারও বেশি; পটল বিবাহিত, তার ছেলেমেয়ে চার-পাচটি। তাহার কেন এত ঘন ঘন যাওয়া-আসা এখানে, একজন অল্পবয়সী বিধবার সঙ্গে এত

কথাবার্ত্তাই বা তাহার কিসের ? বিশেষ যখন বাড়ীতে কোন পুরুষমানুষ আজকাল থাকে না। বলাই তো এতদিন হাসপাতালেই ছিল, শাশুড়ী চোখে দেখেন না, তাঁহার থাকা না-থাকা দুই সমান।

বীণা-ঠাকুরঝির সঙ্গে এ কথা কহিয়া কোন লাভ নাই। মেয়েমানুষের মন দিয়া মনোরমা তাহা বুঝিয়াছে। বীণা কথাটা উড়াইয়া দিবে, অস্বীকার করিবে, পরে রাগ করিবে, ঝগড়া করিবে।

শাশুড়ীকে বলিয়াও কোন লাভ নাই তিনি অত্যন্ত সরল, বিশ্বাস করিবেন না, বিশেষ করিয়া তিনি নিরেট ভালমানুষ, তাঁহার কথা ঠাকুরঝি শুনিবেও না। বরং বউদিদির কথা শুনিলেও শুনিতে পারে, কিন্তু মার কথা সে গায়ে মাখিবে না।

অতিরিক্ত আদর দিয়া শাশুড়ী বীণা-ঠাকুরঝির মাথাটি খাইয়াছেন।

মনোরমার ইচ্ছা ছিল বিপিনকে কথাটা বলিবার। কিন্তু স্বামীর মেজাজ আজকাল যেন সর্ব্বদাই চটা, এ কথা বলিলে যদি আরও চটিয়া যায়, মনোরমাকেই গালাগালি করে, এজন্য তাহার ভয় করে কথাটা পাড়িতে।

মনোরমা সংসারী ধরনের মেয়ে। তাহার সমস্ত মনপ্রাণ সংসারে পড়িয়া থাকে। জ্যাঠামশায় যখন তাহার বিবাহ দেন এ বাড়ীতে তখন ইহাদের অবস্থা সচ্ছল ছিল। শ্বশুর চোখ বুজিতেই সব গেল। স্বামীকে বুঝাইয়া বলিবার বয়স তখন হয় নাই মনোরমার। স্বামী বিষয়-আশয় উড়াইয়া দিয়া এমন অবস্থা করিল সংসারের যে, অমন দুর্দশার অভিজ্ঞতা কখনও ছিল না অবস্থাপন্ন গৃহস্থের মেয়ে মনোরমার। তাহার জ্যাঠামশায় একজন অবসরপ্রাপ্ত সাবজজ, জাঠতুতো ভাইয়েরা কেহ উকিল, কেহ ডাক্তার। জ্যাঠামশায় যখন বারাসতের মুন্সেফ তখন এখানে তাহার বিবাহ দেন। সে শুধু বিনোদ চাটুজ্জের নামডাকের জোরে। তখন ভাবিয়াছিলেন, পাড়াগাঁয়ের সচ্ছল গৃহস্থের ঘর, ভাইঝি সুখেই থাকিবে। মনোরমার গায়ে গহনা কম দেন নাই জ্যাঠামশায় বিবাহের সময়, তাহার কিছুই অবশিষ্ট নাই, দুইগাছা রুলি ছাড়া। পাছে কেহ কিছু মনে করে বলিয়া মনোরমা বাপের বাড়ী যাওয়াই ছাড়িয়া দিয়াছে। এত করিয়াও স্বামীর মন পাইবার জো নাই। সবই তাহার অদৃষ্ট !

শাশুড়ীর বাতের বেদনা আছে। খাওয়া-দাওয়া সারিয়া সে শাশুড়ীর ঘরে তাপ-সেক করিতে লাগিল। বিপিনের মা পুত্রবধূকে অত্যন্ত ভালবাসেন। মনোরমা যে ভাবে শাশুড়ীর সেবা করে, বীণার নিকট হইতেও তিনি তাহা পান না ; যদিও এ কথা বলা চলে না যে, বীণা মায়ের সম্বন্ধে উদাসীন। বীণা নিজের ধরনে মায়ের যত্ন করে। সে সংসার তেমন করিয়া কখনও করে নাই, অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছে, ছেলেপুলে নাই ; মনেপ্রাণে সে যেন এখনও অবিবাহিতা বালিকা। তাহার ধরনধারণ বালিকার মতই, গোছালো-গাছালো সংসারী ধরনের মেয়ে সে কোনও কালেই নয়, হইবেও না। মেয়ের উপর বিপিনের মায়ের অত্যন্ত দরদ—ছোট মেয়ের উপর মায়ের যেমন স্নেহ থাকে তেমনই। বিপিনের মা বোঝেন, বীণার জীবনের শূন্যস্থান তিনি কোন কিছু দিয়াই পুরাইতে পারিবেন না ; এখনও সে ছেলেমানুষ,

ঠিকমত হয়তো বোঝে না তাহার কি হইয়াছে, কিন্তু যত বয়স বাড়িবে, মা চলিয়া যাইবে, মুখের দিকে চাহিবার কেহ থাকিবে না, তখন সে নিজের স্বামী-পুত্রহীন জীবনের শূন্যতা উপলব্ধি করিবে। তারপর যতদিন বাঁচিবে, সম্মুখে আশাহীন, আনন্দহীন, ধু ধু মরুভূমি। তাহার মধ্যবয়সের সে শূন্যতা পুরিবে কিসে? তবুও যে দুইদিন হতভাগী নিজের অবস্থা বুঝিতে না পারে, সে দুইদিনই ভাল। তা ছাড়া কি সুখের মধ্যেই বা সে এখন আছে?

মা মধ্যে মধ্যে তাহাও ভাবেন।

বীণা শ্বশুরবাড়ী হইতে আনিয়াছিল খানকতক সোনার গহনা ও নগদ দেড় শো টাকা। বিপিন ব্যবসা করিবে বলিয়া বোনের টাকাগুলি চাহিয়া লইল, অবশ্য তাহার উদ্দেশ্য ভালই ছিল, কিন্তু টাকা বাকি পড়িয়া ক্ষুদ্র মুদিখানার দোকান ডুবিয়া গেল। বীণার টাকাগুলিও ডুবিল সেই সঙ্গে।

ইহার পরও বীণার দুইখানা গহনা বিপিন চাহিয়া লইয়া বিক্রয় করিয়া বলাইকে লাঙল গরু কিনিয়া দিয়াছিল চাষবাসের জন্য। তখন সংসারের ভয়ানক দুরবস্থা যাইতেছিল, সকলে পরামর্শ দিল, জমি এখনও যাহা আছে, নিজেরা লাঙল রাখিয়া চাষ করিলে ভাতের ভাবনা হইবে না। বলাইও ধরিল, দাদা আমাকে লাঙল গরু ক'রে দাও, সংসারের ভার আমি নিচ্ছি।

বিপিন স্ত্রীকে বলিল, ওগো, শোন একটা কথা। বীণাকে বল না ওর হারগাছটা দিতে। আমি এখন বেচে বলাইকে গরু কিনে দিই, তারপর বীণাকে আবার গড়িয়ে দোব।

মনোরমা বলিল, তুমি বেশ মজার মানুষ তো! একবার ওর দেড় শো টাকা নিলে আর উপুড়-হাত করলে না, আবার চাইছ গলার হার! ওর ওই সামান্য ব্যাঙের আধুলি পুঁজি, শেষে ওকে কি পথে দাঁড় করাবে? আমি ও কথা বলতে পারব না।

অগত্যা বিপিনই গিয়া বীণাকে কথাটা বলিল।

—তোর কোনও ভাবনা নেই আমি যতদিন আছি। বলাইকে লাঙল গরু কিনে দিই ওই হারগাছটা বেচে, তারপর তোকে গড়িয়ে দোব এর পরে। তোর আগের টাকাও আস্তে আস্তে শোধ দোব। কিছু ভাবিস নি তুই।

বীণা বলিল, আমার আবার ভাবাভাবি কি, হার দরকার হয় নাও না, তবে ব'লে দিচ্ছি, বাবার আমলে যেমন গোলা ছিল অমনই গোলা তুলতে হবে কিন্তু বাইরের উঠোনে। গোলা চ'লে গিয়ে চণ্ডীমণ্ডপের সামনের উঠোনটা ফাঁকা ফাঁকা দেখাচ্ছে। আর আমি, বৌদি, মা, তুমি, বলাই—সবাই মিলে নৌকো ক'রে একদিন কালীতলায় বেড়াতে যাব। কেমন তো?

দিনকতক চাষবাস চলিয়াছিল ভাল। বলাই নিজে দেখিত শুনিত, গরুর গাড়ী নিজে হাঁকাইত। হঠাৎ বলাইয়ের অসুখ হইয়া সে সব গেল। চিকিৎসার জন্য গরু-জোড়া বিক্রয় করিতে হইল। সুতরাং বীণার হারছড়াটাও গেল।

তারপর এই দুর্দ্দশার সংসারে বীণা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, ছেঁড়া কাপড় সেলাই করিয়া পরে, রাত্রে একমুঠা চাল চিবাইয়া জল খাইয়া সারারাত কাটায়। ছেলেমানুষ—একটা সাধ নাই, আহ্লাদ নাই, মা হইয়া তিনি সবই তো দেখিতেছেন।

বীণা টাকা বা গহনার জন্য কখনও দাদাকে কিছু বলে নাই, তেমন মেয়ে সে নয়। এখনও গাছকতক চুড়ি অবশিষ্ট আছে, দাদা চাহিলে সে দিতে আপত্তি করিত না, কিন্তু বিপিন লজ্জায় পড়িয়াই বোধ হয় চাহিতে পারে নাই।

বীণার কি হইবে ভাবিয়া তাঁহার রাত্রে ঘুম হয় না। তিনি নিজের ঘরে নিজের বিছানায় বীণাকে বুকে করিয়া শুইয়া থাকেন। বীণা যে এখনও কত ছেলেমানুষ আছে, ইহা তিনি ভিন্ন আর কে বোঝে? স্বামীর ঘর কয়দিন করিয়াছিল সে? তখন তাহার বয়সই বা কত?

এক এক দিন তিনি একটু আধটু রামায়ণ মহাভারত শুনিতে চান। নিজে চোখে আজকাল তেমন দেখিতে পান না রাত্রে, মনোরমা যদি অবসর পায়, সে-ই আসিয়া পড়িয়া শোনায়, নয় তো বীণাকে বলেন, বউমা আজ ব্যস্ত আছে, একটুখানি বই পড় তো বীণা।

বীণা একটু অনিচ্ছার সহিত বই লইয়া বসে। সে পড়িতে পারে ভালই, কিন্তু পড়িয়া শুনাইতে তাহার ভাল লাগে না। মনে মনে নিজে পড়িতে ভালবাসে। আধ ঘণ্টাটাক পড়িয়া শুনাইবার পরে বই হঠাৎ সশব্দে বন্ধ করিয়া বলে, আজ থাক মা, আমার ঘুম 'পাচ্ছে।

আজকাল, বিপিনের চাকুরি হওয়া পর্য্যন্ত, রাত্রে এক পোয়া আটার রুটি হয় বীণার জন্য। আগে এমন একদিনও গিয়াছে বীণা কিছু না খাইয়া রাত কাটাইয়াছে, আটা ময়দা কিনিবার পয়সা তো দূরের কথা, বাড়ীতে এক মুঠো চাল থাকিত না যে ভাজিয়া খায়। আজকাল মনোরমাই এ বন্দোবস্ত করিয়াছে, একসঙ্গে আটা আনিয়া রাখে, বীণার যাহাতে এক সপ্তাহ চলে। শাশুড়ী রাত্রে একটু দুধ ছাড়া কিছু খান না, সহ্য হয় না। বীণা রাত্রে না খাইয়া কষ্ট পাইত, মনোরমা তাহা সহ্য করিতে পারিত না। সে অত্যন্ত গোছালো সংসারী মানুষ, তাহার সংসারে কেহ কষ্ট পায়, ইহা সে দেখিতে পারে না। তবে আজকাল আবার বলাইয়ের অসুখ হইয়া মুশকিল বাধিয়াছে, বীণার জন্য তোলা আটায় তাহাকেও রুটি করিয়া দিতে হয় রাত্রে। অথচ বেশি করিয়া আনিবার পয়সা নাই। বিপিন যে টাকা পাঠায় তাহাতে সব-দিকে সঙ্কুলান হওয়া দুষ্কর। বেশি পয়সা চাহিলেও বিপিন দিতে পারে না।

মনোরমা যে ভাবে সংসার গুছাইয়া রাখিতে চায়, নানা কারণে তাহা ঘটিয়া উঠে না। সবাই সুখে থাকুক, মনোরমার সেদিকে অত্যন্ত নজর। পটলের সহিত বীণার মেলামেশা ঠিক এই কারণেই তাহার মনে উদ্বেগের সৃষ্টি করিয়াছে। কি হইতে কি হইবে, সংসারটি ওলট-পালট হইয়া যাইবে মাঝে পড়িয়া, এসব পাড়াগাঁয়ে একটুখানি কোন কথা লোকের কানে গেলে ঢি ঢি পড়িয়া যাইবে, সে তাহা খুব ভালই বোঝে। এখন কি করা যায়, তাহাই

হইয়া উঠিয়াছে মনোরমার মস্ত সমস্যা। আজ সাহস করিয়া মনোরমা কথাটা বিপিনের কাছে পাড়িবে ভাবিয়া বলিল, শোন, একটা কথা বলি।

বিপিনের মেজাজ ভাল ছিল না। বিরক্তির সুরে বলিল, কি কথা?

মনোরমা ভয় পাইল। বিপিনের মেজাজ সে খুব ভালই বোঝে। আজ এইমাত্র সন্ধ্যাবেলা তো আগুনের মালসা লইয়া একপালা হইয়া গিয়াছে, থাক গে, কাল কি পরশু কি আর একদিন—এত তাড়াতাড়ি কথাটা স্বামীকে শুনাইবার কোনও কারণ উপস্থিত হয় নাই। আজ অন্তত দরকার নাই।

৪

কিন্তু পরদিনই একটা ঘটনায় মনোরমার সন্দেহ বাড়িয়া গেল। সন্ধ্যার কিছু পরে তাহার হঠাৎ মনে পড়িল, ছাদে একখানা কাঁথা রোদে দিয়াছিল, তুলিতে ভুলিয়াছে। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার সময়ে সিঁড়ির পাশের ঘুলঘুলি দিয়া দেখিল, বাড়ীর পাশে কাঁঠালতলায় কে যেন দাঁড়াইয়া আছে। চোখের ভুল ভাবিয়া সে সরাসরি উপরে উঠিয়া গেল এবং ছাদের আলিসা হইতে কাঁথাখানা লইয়া যখন নীচে নামিতেছে, তখন মনে হইল, চিলে-কোঠার আড়ালে যেন কিসের শব্দ হইল। মনোরমা ঘুরিয়া গিয়া দেখিল, চিলে-কোঠার আড়ালে তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে বীণা, এবং যেন নীচে বাগানের দিকে চাহিয়া আছে। বউদিদির পায়ের শব্দে বীণা চমকিয়া পিছন দিকে চাহিল। মনোরমা বলিল, বীণা-ঠাকুরঝি এখানে দাঁড়িয়ে একলাটি?

বীণা নীরস সুরে বলিল, হ্যাঁ, এমনিই দাঁড়িয়ে আছি।

—এস নীচে নেমে। অন্ধকার সিঁড়ি, এর পর নামতে পারবে না।

—খুব পারব। তুমি যাও, বড্ড অন্ধকার এখনও হয় নি। যাচ্ছি আমি।

মনোরমা সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে ঘুলঘুলি দিয়া কি জানি কেন একবার চাহিয়া দেখিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার চোখে পড়িল, বাড়ীর বাহিরের দিকের দেওয়াল ঘেঁষিয়া কে একজন আসশেওড়ার ঝোপের মধ্যে গুঁড়ি মারিয়া বসিয়া আছে।

মনোরমার ভয় হইল। চোর বা কোন বদমাইশ লোক নিশ্চয়ই। সে কাঠের মত আড়ষ্ট হইয়া লোকটার দিকে চাহিয়া আছে, এমন সময় লোকটা উঠিয়া দাঁড়াইল। মনোরমা দেখিল, সে পটল চাটুজ্জে! পটল টের পায় নাই যে মনোরমা ঘুলঘুলি দিয়া চাহিয়া আছে, সে ছাদের দিকে চোখ তুলিয়া একবার হাসিয়া নিম্নস্বরে বলিল, চললাম আজ, সন্ধ্যে হয়ে গেল। কাল যেন দেখা পাই, কথা আছে।

মনোরমার মাথা ঘুরিয়া গেল। এমন কি কাণ্ড। পটল চাটুজ্জের এরকম লুকাইয়া দেখা করিবার হেতু কি? সন্ধ্যার অন্ধকারে মশার কামড়ের মধ্যে শেওড়াবনে গুঁড়ি মারিয়া লুকাইয়া

বীণা-ঠাকুরঝির সঙ্গে কথা বলিবার কোন কারণ নাই, যখন সে সোজা বাড়ীর মধ্যে আসিয়া প্রকাশ্যভাবেই বীণার সঙ্গে আলাপ করিতে পারে, তাহাকে তো কেউ বাড়ী ঢুকিতে নিষেধ করে নাই!

সেই রাত্রেই মনোরমা বিপিনকে কথাটা বলিবে ঠিক করিল। কিন্তু হঠাৎ রাত দশটার সময় বলাইয়ের অসুখ বড় বাড়িল। ঠিক যখন সকলে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া শুইতে যাইবে, সেই সময়। বলাই রোগের যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে লাগিল আর কেবলই বলিতে লাগিল, সর্ব্বশরীর জ্ব'লে গেল, ও মা!...পাড়ার প্রবীণ লোক গোবর্দ্ধন চাটুজ্জে আসিলেন। পাশের বিপিনদের জ্ঞাতি ও সরিক ধনপতি চাটুজ্জে আসিলেন। পাড়ার ছেলেছোকরা এবং মেয়েরা কেহ কেহ আসিল। প্রকৃত সাহায্য পাওয়া গেল গোবর্দ্ধন চাটুজ্জের কাছে। তিনি পুরানো তেঁতুলের সঙ্গে কি একটা মিশাইয়া বলাইয়ের সারা গায়ে লেপিয়া দিতে বলিলেন। তাহাতেই দেখা গেল, যন্ত্রণার কিছু উপশম ঘটিল। সারারাত বিপিনের মা রোগীর বিছানায় বসিয়া তাহাকে পাখার বাতাস দিতে লাগিলেন। বীণা রাত একটা পর্য্যন্ত জাগিয়া রোগীর কাছে বসিয়া ছিল, তাহার মায়ের বারবার অনুরোধে অবশেষে সে শুইতে গেল।

মনোরমা প্রথমটা এ ঘরে বসিয়া ছিল, কিন্তু তাহার ছোট ছোট ছেলেমেয়ে মায়ের কাছ-ছাড়া হইলেই রাত্রে কাঁদে, বিশেষ করিয়া ভানুটা। বিপিনের মা বলিলেন, বউমা, তুমি ছেলেদের নিয়ে শোও গে, তবুও ওরা একটু চুপ ক'রে থাকবে। সবাই মিলে চেঁচালে বাড়ীতে তিষ্ঠুনো যাবে না। তুমি উঠে যাও।

বিপিন একবার করিয়া একটু শোয়, আবার একটু রোগীর কাছে বসে; এই ভাবে রাত কাটিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১

দিন দুই পরে বলাই একটু সুস্থ হইলে বিপিন বাড়ী হইতে রওনা হইয়া পলাশপুরে আসিল। জমিদার অনাদিবাবু বেশ বিরক্ত হইয়াছেন মনে হইল; কারণ প্রায় পনরো দিন কামাই হইয়া গিয়াছে বিপিনের। বাহিরের ঘরে বসিয়া তিনি বিপিনকে জমিদারি সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন। প্রজাদের নিকট হইতে কিস্তিখেলাপী সুদ আদায় কি ভাবে করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। বলিলেন, নালিশ মামলা করতে পিছুলে চলবে না। এবার গিয়ে কয়েক নম্বর মামলা রুজু ক'রে দাও, দেখি টাকা আদায় হয় কি না।

বিপিন বলিল, নালিশ করতে গেলেই তো টাকার দরকার। এখন মহলের যেমন অবস্থা, তাতে আপনাদের খরচের টাকাই দিয়ে উঠতে পারি না, তার ওপর মামলার

অনাদিবাবু কাহারও প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারেন না। বলিলেন, তা বললে জমিদারির কাজ চলে না। টাকা যেখান থেকে পাবে যোগাড় করবে। তোমাকে তবে গোমস্তা রেখেছি কি মুখ দেখতে। সে সব আমি জানি না। টাকা চাই।

বিপিনও বিনোদ চাটুজ্জের ছেলে। সে কাহারও কথা শুনিবার পাত্র নয়; বলিল, আজ্ঞে, আপনাকে আগেও বলেছি, এখনও বলছি, ওভাবে টাকা আদায় আমায় দিয়ে হবে না। এতে যদি আপনার অসুবিধে হয়, তা হ'লে আপনি অন্য ব্যবস্থা করুন।

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই ভাবিল, এই সংসারের দুরবস্থায়, বলাইয়ের অসুখের সময়, এ কি কাজ করিল সে? ইহার ফলে এখনই চাকুরি যাইবে।

অনাদিবাবু কিন্তু তখনই তেমন কোন কথা বলিলেন না। নিঃশব্দে বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলেন। বিপিন সেখানে বসিয়াই রহিল।

কিছুক্ষণ পরে রাগটা কাটিয়া গিয়া তাহার মাথা একটু ঠাণ্ডা হইল। অনাদিবাবুর মুখে মুখে অমনতর জবাব দেওয়া তাহার উচিত হয় নাই। চাকুরি গেলে বাড়ী গিয়া খাইবে কি? তবে ইহাও ঠিক, সে সুর নরম করিয়া ছোট হইতে পারিবে না, ইহাতে চাকুরি যায় আর থাকে! এদিকে আর এক মুশকিল। বেলা এগারোটা বাজে। স্নান-আহারের সময় উপস্থিত। যাহাদের চাকুরি একরূপ ছাড়িয়াই দিল এখনই, তাহাদের বাড়ী আহারাদি করিবেই বা কি করিয়া? না, তাহা আর চলে না। খাওয়ার দরকার নাই। এখনই সে রাণাঘাট হইয়া বাড়ী চলিয়া যাইবে। বাহিরে বসিয়া থাকিলে অনাদিবাবু ভাবিতে পারেন যে, সে ক্ষমা প্রার্থনা করিবার সুযোগ খুঁজিতেছে।

নিজের ছোট ক্যাম্বিসের ব্যাগটা হাতে ঝুলাইয়া বিপিন বৈঠকখানা-ঘরের বাহির হইয়া রাস্তায় পড়িল। অল্পদূর গিয়া পথের মোড় ঘুরিতেছে হঠাৎ অনাদিবাবুদের খিড়কি-দোর হইতে যে ছোট পথটা আসিয়া এই পথের সঙ্গে মিশিয়াছে, সেই পথের মাথায় গাব গাছটার তলায় মানীকে তাহারই দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল। মানী এখানে আছে তাহা সে ভাবে নাই।

মানীদের খিড়কি-দোর খোলা। এইমাত্র কে যেন দোর খুলিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে।

বিপিন কিছু বলিবার আগেই মানী বলিল, কোথায় যাচ্ছ বিপিনদা?

তারপর আগাইয়া আসিয়া বিপিনের সামনে দাঁড়াইয়া আদেশের সুরে বলিল, যাও, গিয়ে বৈঠকখানায় ব'স। আমি তেল পাঠিয়ে দিচ্ছি, বেলা হয়েছে বারোটা। নাওয়া-খাওয়া করতে হবে না, কতক্ষণ হাঁড়ি নিয়ে বসে থাকবে লোকে?

প্রায় কুড়ি-বাইশ দিন পরে মানীর সঙ্গে এই প্রথম দেখা। মানীর কথার প্রতিবাদ করিবার শক্তি যোগাইল না তাহার। সে কোনও কথাই বলিতে পারিল না, শুধু চুপ করিয়া মানীর দিকে চাহিয়া রহিল।

মানী বলিল, আবার দাঁড়িয়ে কেন, বেলা হয় নি?

এতক্ষণে বিপিন বাক্‌শক্তি ফিরিয়া পাইল। অপ্রতিভের সুরে আমতা আমতা করিয়া বলিল, কিন্তু—আমি গিয়ে—বাড়ী যাচ্ছি যে।

মানী পূর্ব্ববৎ সুরেই বলিল, তোমার পায়ে আমি মাথা খুঁড়ে খুনোখুনি হব এই দুপুরবেলা বিপিনদা? জ্ঞান বুদ্ধি আর কবে হবে তোমার? যাও ফিরে বৈঠকখানায়।

বিপিন অবাক হইল মানীর চোখমুখের ভাব দেখিয়া। কতটা টান থাকিলে মেয়েরা এমন জোরের সঙ্গে কথা বলিতে পারে, বিপিনের তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না; কিন্তু অনেক কথা বলিবার থাকিলেও সে দেখিল, খিড়কি-দোরের দিকের প্রকাশ্য পথের উপর দাঁড়াইয়া মানীর সঙ্গে বেশি কিছু কথাবার্ত্তা বলা উচিত হইবে না এই সব পল্লীগ্রাম জায়গায়। দ্বিরুক্তি না করিয়া সে ব্যাগ হাতে আবার আসিয়া অনাদিবাবুদের বৈঠকখানায় উঠিল।

বৈঠকখানায় কেহই নাই। অনাদিবাবু সম্ভবত বাড়ীর মধ্যে স্নান করিতেছেন। সে যে বৈঠকখানা হইতে ব্যাগ হাতে বাহির হইয়া চলিয়া যাইতেছিল, ইহা মানী কি করিয়া জানিল বিপিন ভাবিয়া পাইল না।

একটু পরে চাকর এক বাটি তেল ও একখানা গামছা আনিয়া বলিল, নায়েববাবু, নেয়ে নিন মা ব'লে দিলেন।

বিপিন বলিল, কে তোকে তেল আনতে বললে?

—মা বললেন, নায়েববাবুর জন্যে তেল দিয়ে আয় বাইরে। দিদিমণি গিয়ে রান্নাঘরে মাকে বললেন, আপনি বাইরে ব'সে আছেন, তেল পাঠিয়ে দিতে। আমি মাছ কুটছেলাম, আমায় বললেন, দিয়ে আয়। আপনি যে কখন এয়েলেন, তা দেখি নি কি না তাই জানি নে নইলে আমি নিজেই তেল দিয়ে যাতাম। নায়েববাবু কি আজ আলেন? ভাল তো সব বাড়ীর?

এই একমাত্র চাকর জমিদার-বাড়ীর, সে তো তাহার যাতায়াতের কোন খবরই রাখে না, তবে মানী কি করিয়া জানিল, সে ব্যাগ হাতে চলিয়া যাইতেছে এবং রাগ করিয়াই যাইতেছে?

খাইবার সময় মানীর আঁচলের ডগাও দেখা গেল না কোন দিকে, কারণ রান্নাঘরের বারান্দায় অনাদিবাবুর সঙ্গেই তাহার খাবার জায়গা হইয়াছে। অনাদিবাবু উপস্থিত থাকিলে মানী বিপিনের সামনে বড় একটা বাহির হয় না।

অনাদিবাবু খাইতে বসিয়া এমন ভাব দেখাইলেন যে, বিপিনের সঙ্গে তাঁহার যেন কোনও অপ্রীতিকর কথাবার্ত্তা হয় নাই। জমিদারিসংক্রান্ত কোন কথাই উঠাইলেন না—বিপিনের দেশে মাছের দর আজকাল কি, ম্যালেরিয়া কমিয়াছে না বাড়িয়াছে, রাণাঘাটের বাজারে কাহার একখানা দোকান আগুন লাগিয়া পুড়িয়া গিয়াছে ইত্যাদি প্রসঙ্গ উঠাইয়া তাহাদের আলোচনার মধ্যেই আহার শেষ করিলেন।

রাণাঘাট হইতে হাঁটিয়া আসিয়া বিপিনের শরীর ক্লান্ত ছিল। অনাদিবাবু বেলা তিনটার আগে বৈঠকখানায় আসিবেন না, মধ্যাহ্নে উপরের ঘরে খানিকক্ষণ নিদ্রা যাওয়া তাঁর অভ্যাস,

বিপিন জানে ; সুতরাং সে নিজেও এই অবসরে একটু বিশ্রাম করিয়া লইবে। চাকরকে ডাকিয়া বলিল, শ্যামহরি, ও শ্যামহরি, বাবু নামবার আগে আমায় ডেকে দিস যদি ঘুমিয়ে পড়ি, বুঝলি ? আর একটু তামাক সেজে নিয়ে আয়।

২

একটু পরে মানীকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া বিপিন আশ্চর্য্য হইয়া গেল। বাহিরের ঘরে মানীকে সে আসিতে দেখে নাই কখনও।

মানী বলিল, বিপিনদা, রাগ পড়েছে ?

বিপিন মানীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, আচ্ছা, তুই কি ক'রে জানলি আমি চ'লে যাচ্ছি। কেউ তো জানে না। শ্যামহরি চাকরকে জিজ্ঞেস ক'রে জানলাম, আমি কখন এসেছি তা পর্য্যন্ত সে খবর রাখে না।

মানী হাসিতে হাসিতে বলিল, আমার টনক আছে মাথায় বিপিনদা; আমি জানতে পারি।

—কি ক'রে বল্ না মানী, সত্যি, আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম তোকে দেখে।

মানী তবুও হাসিতে লাগিল। কৌতুক পাইলে সে সহজে ছাড়িবার পাত্র নয়, বিপিন তাহা ছেলেবেলা হইতে দেখিয়া আসিতেছে, এবং ইহাও একটা কারণ যে জন্য মানীকে তাহার বড় ভাল লাগে।

—আচ্ছা, হাসি এখন একটু বন্ধ থাক গে। কথার উত্তর দে।

মানী দোরের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, দরজার শিকলটা দুই হাতে ধরিয়া তাহার হাসিবার ভঙ্গি দেখিয়া বিপিনের মনে হইতেছিল, মানী এখনও যেন তেমনই ছেলেমানুষ আছে, শিকল ছাড়িয়া মানী দরজার পাশে একখানা চেয়ারে বসিল। গম্ভীর মুখে বলিল, আচ্ছা, তুমি কি রকম মানুষ বিপিনদা! এসেছ কখন, তা জানি না। একবার দেখা পর্য্যন্ত করলে না। তারপর বাবা বুড়ো মানুষ কি বলেছেন না বলেছেন, তুমি অমনই চ'টে গেলে, আর এই ঠিক দুপুরবেলা, খাওয়া না দাওয়া না, কাউকে কিছু না ব'লে পালিয়ে যাওয়া হচ্ছিল পুঁটুলি হাতে!

—তুই জানলি কি ক'রে ?

—আমি জানব কি ক'রে ? বাবা রান্নাঘরে গিয়ে মা'র কাছে বললেন যে, তোমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়েছে কি নিয়ে। মাকে বললেন, শ্যামহরিকে দিয়ে তোমার নাইবার তেল পাঠিয়ে দিতে। বাবার মুখে তাই শুনে আমার ভয় হ'ল, আমি তো তোমায় চিনি। তাড়াতাড়ি বাইরের ঘরের দরজা পর্য্যন্ত এসে দেখি, তুমি ওই বাতাবি-নেবুতলা পর্য্যন্ত চ'লে গিয়েছ। চেঁচিয়ে ডাকতে পারি না তো আর। তখনই ছুটে খিড়কি-দোরে গেলুম, রাস্তার বাঁকে তোমায় আসতেই হবে। বাপ রে, কি রাগ!

—রাগ নয়, মনের দুঃখু তো হতে পারে।

—কি দুঃখু? তুমিই বলেছ বাবাকে যে, না পোষায় আপনি অন্য লোক রাখুন। বাবা তোমাকে তো কিছুই বলেন নি!

বিপিন চুপ করিয়া রহিল। এ কথার জবাব দিতে গেলে অনাদিবাবুর বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিতে হয়, তাহা সে মানীকে বলিতে চায় না।

মানী বলিল, বিপিনদা, আমার কাছে তুমি কি বলেছিলে, মনে আছে?

—কি কথা?

—এরই মধ্যে ভুলে গেলে? বলেছিলে না, আমায় না জিজ্ঞেস ক'রে চাকরি ছাড়বে না? কথা দিয়েছিলে মনে আছে?

—মনে ছিল না, এখন মনে পড়ছে বটে।

—তা নয়, রাগের সময় তোমার জ্ঞান ছিল না, এই হ'ল আসল কথা। উঃ, কি জোর বেরিয়ে যাওয়া হ'ল। দেখতে না দেখতে একেবারে বাতাবিনেবুর গাছের কাছে। ভাগ্যিস আমি ছুটে গেলুম খিড়কির দোরে? নইলে এতক্ষণ রাণাঘাটের অদ্ধেক রাস্তা—

—কিন্তু এতক্ষণ পরে একটা কথা বলি মানী, তুই যে এসেছিস বা এখানে আছিস এ কথা আমি কিন্তু কিচ্ছু জানি না। আমি তোকে খিড়কি-দোরের পথে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

—বাবা কিছু বলেন নি?

—উনি তোর কথা আমার কাছে কি বলবেন? কখনও বলেন, না আমিই জিজ্ঞেস করি?

—তা নয়। আমি থাকলেই তো খরচ বাড়ে, খরচ বাড়লেই জমিদারির তাগাদা জোর ক'রে করবার ভার পড়ে তোমার ওপর। আমি ভেবেছিলুম, বাবা সে কথা তুলেছেন বুঝি; আমি আছি সুতরাং টাকা চাই, এমন কথা যদি বলে থাকেন।

—না, সে কথা ওঠে নি। তুই চ'লে যাবি শিগ্‌গির এ তো জেনেই গিয়েছিলুম, আবার এর মধ্যে আসবি তা ভাবি নি।

—তা ভাববে কেন? দেখতে পেলে বুঝি গা জ্বালা করে? দূরে রাখলেই বাঁচ বুঝি?

—বলেছি কোন দিন?

মানী ঘাড় দুলাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, তোমায় রাগাচ্ছি বিপিনদা, রাগাচ্ছি। সেই সব তোমার ছেলেবেলার মত এখনও আছে, কিছু বদলায় নি। আচ্ছা, একটা কবিতা বলব শুনবে?

বিপিন হাত নাড়িয়া যেন মশা তাড়াইবার ভঙ্গি করিয়া বলিল, রক্ষে কর। ওসব ভাল লাগে না আমার, বুঝি-সুঝি না। বাদ দাও, জান তো আমার বিদ্যে!

মানী গম্ভীর হইয়া বলিল, বিপিনদা, আমার আর একটা কথা রাখতে হবে। তোমায় পড়াশুনা করতে হবে। তোমায় কতকগুলো ভাল বই দোব, সেগুলো কাছারিতে গিয়ে

পড়বে, প'ড়ে ফেরত দেবে, আমি আবার দোব। বইয়ের আমার অভাব নেই, যত চাও দোব।

বিপিন তাচ্ছিল্যের স্বরে বলিল, বই আমি অনেক পড়েছি, তুই যা। বুড়ো বয়েসে আবার বই পড়তে যাই, আর উনি আমার মাস্টারনী হয়ে এসেছেন!

মানী রাগিয়া বলিল, এসেছিই তো মাস্টারনী হয়ে। পড়তে হবে তোমায়। বই দিচ্ছি, নিয়ে যাও যদি ভাল চাও। এঃ, একেবারে ধিঙ্গি হয়ে উঠেছেন আর কি! পড়াশুনো শিকেয় তুলেছেন!

বিপিন হাসিতে লাগিল।

মানী বলিল, সত্যিই বলছি বিপিনদা, নিজের জীবনটা তুমি ইচ্ছে ক'রে গোল্লায় দিলে। নইলে আজ আমার বাবার বাড়ী চাকরি করতে আসবে কেন তুমি? লেখাপড়া শিখলে কাঁকুড়, তোমায় ভাল চাকরি দেবে কে বল তো? আবার তেজ ক'রে চ'লে যাওয়া হয়! যাও, বই দিচ্ছি, নিয়ে পড় গে, আর একখানা ডাক্তার বই দিচ্ছি, সেখানা যদি ভাল ক'রে পড়তে পার, তবে আর চাকরি করতে হবে না।

ডাক্তারি বইয়ের কথায় বিপিন উৎসাহিত হইয়া উঠিল। নতুবা এতক্ষণ মানীর গুরুমহাশয়গিরিতে তাহার হাসি আর থামিতেছিল না। বলিল, বেশ, ভালই তো। কি বই পড়তে হবে এনে দিও, দেখি চেষ্টা ক'রে।

—মানুষ হও বিপিনদা, আমার বড্ড ইচ্ছে। তোমার বুদ্ধি আছে, কিছু কাজে লাগালে না তাকে। ডাক্তারি যদি শিখতে পার, ভেবে দেখ, কারও চাকরি তোমায় করতে হবে না। আমার এক দেওর ডাক্তারি পাস করেছে, বীজপুরে ডাক্তারখানা খুলে বসেছে, দেড়শো টাকার কম কোনও মাসে পায় না।

—সে সব পাস-করা ডাক্তারের কথা ছেড়ে দে। আচ্ছা, বাংলা বই প'ড়ে ডাক্তার হওয়া যায়?

—কেন হওয়া যাবে না? খু-উ-ব যায়। তোমায় বই আমি আরও দোব। তারপর আমার সেই দেওরকে ব'লে দোব, তার কাছে ছ মাস থেকে শিখলে তুমি পাকা ডাক্তার হয়ে যাবে। সে কথা পরে হবে, এখন তোমায় বই এনে দিই। সেগুলো নিয়ে কাছারি যেও, আর রোজ প'ড়ো। কবে যাবে সেখানে?

—কাল সকালেই যেতে হবে, দেরি আর করা চলবে না।

—আচ্ছা, ব'স, আমি বই বেছে বেছে নিয়ে আসি।

মানী বিপিনের দিকে চাহিয়া কেমন একপ্রকার হাসিয়া চলিয়া গেল। মানীর এ হাসি বিপিনের পরিচিত। ছেলেবেলা হইতে দেখিয়া আসিতেছে।

মনে মনে ভাবিল, মানীটা বড় ভাল মেয়ে। এতটুকু ঠ্যাকার নেই, বেশ মনটি। তবে মাথায় একটু ছিট আছে, নইলে আমায় এ বয়েসে লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করে!

মানী একরাশ বই লইয়া ঘরে ঢুকিয়া বিপিনের সামনে বইয়ের বোঝা নামাইয়া বলিল,

দেখে ভয় হচ্ছে নাকি ? কিছু ভয় নেই। এর মধ্যে দুখানা শরৎবাবুর নভেল আছে, 'শ্রীকান্ত' আর 'দত্তা' প'ড়ে দেখো, কি চমৎকার !

—উঃ, তুই দেখছি আমায় রাতারাতি পণ্ডিত না ক'রে ছাড়বি না মানী !

মানী আর একখানা মোটা বই হাতে লইয়া বিপিনের হাতে দিয়া বলিল, এইখানা সেই ডাক্তারি বই। এ আমার শ্বশুরবাড়ীর জিনিস। তোমায় দিলাম। এ থেকে তুমি ক'রে খেতে পারবে।

বিপিন পড়িয়া দেখিল, বইখানির নাম 'সরল চিকিৎসা-বিজ্ঞান'। গ্রন্থকারের নাম ব্যোমকেশ চট্টোপাধ্যায় এল. এম. এস.।

মানীর দিকে চাহিয়া বলিল, বেশ ভাল বই ?

মানী ঘাড় নাড়িয়া আশ্বাস দেওয়ার সুরে বলিল, খুব ভাল বই। এতে সব আছে ডাক্তারি ব্যাপারের। বাকিটুকু হয়ে যাবে এখন, আমার সেই দেওরের কাছে থেকে কিছুদিন শিখলে। আমি সব ঠিক ক'রে দোব এখন।

—আর ওগুলো কি বই ?

—এখানা শরৎবাবুর 'দত্তা', বললুম যে ! চমৎকার বই, প'ড়ে দেখো— উপন্যাস। উপন্যাস পড় নি কখনও ?

—আমাদের বাড়ীতে ছিল বাবার আমলের 'ভুবনমোহিনী' ব'লে একখানা উপন্যাস। সেখানা পড়েছি।

—ওসব বাজে বই, ভাল বই তুমি কিছুই পড় নি, খোঁজও রাখ না বিপিনদা। আজকাল মেয়েরা যা জানে, তুমি তাও জান না। দুঃখু হয় তোমার জন্যে।

—শরৎবাবু ভাল লেখক ? নাম শুনি নি তো ?

—তুমি কার নাম শুনেছ ? বঙ্কিমবাবুর নাম জান ? রবি ঠাকুরের নাম জান ?

—নাম শুনেছি ওই পর্য্যন্ত। পড়ি নি কোনও বই। আছে তাঁদের বই ?

—এগুলো আগে প'ড়ে শেষ কর। পরে দোব। শোন, আমি শ্যামহরি চাকরকে ব'লে দিচ্ছি, তোমার পুঁটুলি আর বই দত্তপাড়ায় কাছারিতে পৌছে দিয়ে আসবে। নইলে তুমি নিয়ে যাবে কি করে ?

—ওতে দরকার নেই মানী, তোমার বাবা কি মনে করবেন ! আমার মোট বইবার জন্যে চাকরকে বলবার কি দরকার !

—সে ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না। আমি বললে বাবা কিছু বলবেন না। আজই যাবে ?

—এখুনি বেরুব। অনাদিবাবু ঘুম থেকে উঠলেই তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রেই বেরিয়ে পড়ব।

—বাবা ঘুম থেকে উঠলেই আমি চাকরের হাতে চা পাঠিয়ে দোব এখন, চা খেয়ে যেও।

মানী চলিয়া যায় বিপিনের ইচ্ছা নয়। অনাদিবাবুর এখনও উঠিবার সময় হয় নাই, মানী আরও কিছুক্ষণ থাকুক না।

বিপিন কহিল, তোর সঙ্গে একটা পরামর্শ করি মানী, নইলে আর কার সঙ্গেই বা করব! বলাইকে নিয়ে বড় বিপদে প'ড়ে গিয়েছি, ওর অসুখ আবার বেড়েছে, এদিকে এই তো অবস্থা, বাড়ীতে থাকলে কুপথ্যি করে, কারও কথা শোনে না। কি করি বল্ তো, এমন দুর্ভাবনা হয়েছে ওর জন্যে! এই যে আসতে দেরি হয়ে গেল বাড়ী থেকে, সে ওরই অসুখ বাড়ল ব'লে। নইলে তোর কাছে যা কথা দিয়ে গিয়েছিলাম, তার আগেই আসতাম।

বলাইয়ের অসুখের ভাবনা বিপিনের মনে যেন পাথরের বোঝা চাপাইয়া রাখিয়া দিয়াছে সব সময়, মানীর কাছে সে বোঝা কিছুক্ষণের জন্য নামাইয়াও সুখ! মানীকে সে মনে মনে বুদ্ধিমতী শিক্ষিতা মেয়ে বলিয়া শ্রদ্ধা করে, অন্তত সে মানীর চেয়ে বেশী বুদ্ধিমতী ও শিক্ষিতা মেয়ে কখনও দেখে নাই, সেইজন্য মানী কি পরামর্শ দেয় জানবার নিমিত্ত বিপিন উৎসুক হইল।

মানী বলিল, ওকে তো সেবার হাসপাতাল থেকে নিয়ে গেলে, হাসপাতালে আবার নিয়ে এস না।

—হাসপাতালের বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছিলুম, তারা ওকে হাসপাতালে রাখতে চায় না। বলে, ও রুগী হাসপাতালে রেখে উপকার হবে না।

মানী একটু ভাবিয়া বলিল, তা হ'লে কি জান, আমার দেওরকে না হয় একখানা চিঠি লিখি। বীজপুরে রেলের হাসপাতাল আছে, সেখানে যদি কোন বন্দোবস্ত করা যায়, দেওর তো ওখানে ডাক্তার। কালই চিঠি লিখব।

এই সময় বাড়ীর মধ্যে অনাদিবাবুর গলা শোনা গেল।

তিনি ঘুম হইতে উঠিয়া দোতলার বারান্দায় কাহার সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

মানী বলিল, ওই বাবা উঠেছেন, আমি আসি, চা এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি, আর বইগুলো পড়তে হবে আর আমাকে বলতে হবে সব কথা, যেন ভুলে যেও না।

বিপিন হাসিয়া ব্যঙ্গের সুরে বলিল, ওরে আমার মাস্টারনী রে!

—বাজে কথা ব'ল না বিপিনদা, ব'লে দিচ্ছি। আর ডাক্তারি বইখানার কথা যেন খুব ক'রে মনে থাকে। জীবনে উন্নতি করবার চেষ্টা ক'র বিপিনদা, কেন চিরকাল পরের দাসত্ব করবে?

মানীর কথায় বিপিনের হাসি পাইল। কি মুরুব্বিই হইয়া উঠিয়াছে মানী এই অল্প বয়সে! কথার খই ফুটিতেছে মুখে। বলিল, দাড়া মানী, একটা কথা, তুই ব্রেহ্মসমাজের মত বক্তৃতা দিবি নাকি? কলকাতায় গিয়ে দেখছি মানুষ হয়ে গেলি।

—আবার বাজে কথা! চুপ। কি কথা বলছিলে বলবে? এই বাজে কথা, না আর কোন কথা আছে?

—ইয়ে, তুই আর কতদিন আছিস এখানে?

—ঠিক নেই। যতদিন ওরা রাখে—ওদের মর্জি। কেন?

বিপিন একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, এবার এলে তোর সঙ্গে দেখা হবে কি না তাই বলছিলাম।

—খুব দেখা হবে। কতদিনের মধ্যে আসছ? বেশিদিন দেরি না-ই বা করলে?

—খুব দেরি করা না-করা আমার হাত নয়। যদি আদায় হয় চট ক'রে এই হপ্তাতেই আসতে পারি, নয়তো পনরো বিশ দিন দেরিও হতে পারে।

মানী বলিল, আচ্ছা, যাই!

মানী চলিয়া যায় বিপিনের ইচ্ছা নয়, কিন্তু অনাদিবাবু উঠিয়া হয়তো ওপরের বারান্দায় পায়চারি করিতেছেন, এ অবস্থায় তাহাকে আর ধরিয়া রাখাও উচিত নয়। সুতরাং সে বলিল, আচ্ছা, এস, তোমার বাবা আসছেন বাইরে।

কিন্তু মানী চলিয়া যাইবামাত্র বিপিনের মনে হইল মানীর শেষ কথাটি—'আচ্ছা, যাই!'

মানী যখন চোখের সামনে থাকে, তখন বিপিন মানীর সব কথা ভাবিয়া দেখিবার, বুঝিবার, উপভোগ করিবার অবকাশ পায় না। এখন বিপিন হঠাৎ দেখিল, মানী এ কথা তাহাকে আর কখনও বলে নাই, অর্থাৎ বলিবার প্রয়োজন হয় নাই। কি জানি কেন, মানীর এ কথা বিপিনের ভারী ভাল লাগিল।

একটু পরে শ্যামহরি চাকর চা আনিয়া দিল, আর আনিল ছোট একটা রেকাবিতে খানকতক পেঁপের টুকরা ও একটা সন্দেশ।

এ মানীর কাজ ছাড়া আর কারও নয়, বিপিন তাহা জানে। এ বাড়ীতে মানী যখন ছিল না, বাহিরের ঘরে এক আধ পেয়ালা চা যদি বা কালেভদ্রে আসিয়াছে, খাবার কখনও যে আসে নাই, এ কথা সে হলপ করিয়া বলিতে পারে।

৩

কাছারি-ঘরে একা বসিয়া সন্ধ্যার সময় বিপিনের আজকাল বড়ই খারাপ লাগে।

ধোপাখালিতে সে আসিয়াছে আজ প্রায় দেড় মাস পরে। এতদিন দেশে ছিল নিজের পরিবারের মধ্যে, নির্জ্জনে বসিয়া আকাশের তারা গুনিবার বিড়ম্বনা সেখানে ভোগ করিতে হয় নাই।

বিশেষ করিয়া মানীর সঙ্গে দেখা হইবার পরে দিনকতক এই নির্জ্জনতা যেন একেবারে অসহ্য হইয়া পড়ে। আবার কিছুদিন পরে সহিয়া যায়।

কাছারির উঠানের সেই বাদাম গাছটার ডালপালার মধ্যে কেমন একপ্রকার শব্দ হয়, বিপিন দাওয়ায় বসিয়া চুপ করিয়া রাত্রির অন্ধকারের দিকে চাহিয়া থাকে।

মানী যে বলিয়াছিল, 'জীবনে উন্নতি ক'র বিপিনদা'—কথাটা বিপিনের বড় মনে লাগিয়াছে। তখন হাসি পাইলে কি হইবে, এখন সে বুঝিয়াছে, মানীর এই কথাটা তাহার মনে অনেকখানি আনন্দ ও উৎসাহ আনিয়া দিয়াছে।

জীবনে উন্নতি তাহাকে করিতেই হইবে।

সন্ধ্যার পরে কাছারির চাকরটা আলো জ্বালাইয়া রান্নার যোগাড় করিতে রান্নাঘরে ঢোকে। কিন্তু বিপিন এবেলা বড় একটা রান্নাবান্নার হাঙ্গামাতে যায় না। ওবেলার বাসি তরকারি থাকে, চাকরকে দিয়া খানকতক রুটি করাইয়া লয় মাত্র। খাইয়া আসিয়া মানীর দেওয়া বইগুলি পড়িতে বসে। এ সময়টা একরকম মন্দ কাটে না।

বইগুলি একবার আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না, মানী সত্যিই বলিয়াছিল।

ডাক্তারি বইখানা প্রথম প্রথম সে ভাল বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু ক্রমে এই বইখানাই তাহার গাঢ় মনোযোগ আকৃষ্ট করিল। মানুষের শরীরের মধ্যে এত সব ব্যাপার আছে, সে কোন দিন ভাবে নাই। দেহের নানা রকম যন্ত্রের ছবি বইয়ের গোড়ার দিকে দেওয়া আছে, বিভিন্ন যন্ত্রের কার্য্য বর্ণিত হইয়াছে, উপন্যাসের চেয়েও বিপিনের কাছে সে সব বেশি চমকপ্রদ মনে হইল।

তিন চার দিন বইখানা পড়িবার পরেই বিপিন ঠিক করিয়া ফেলিল, ডাক্তারি সে শিখিবেই। এতদিন পরে তাহার জীবনের উদ্দেশ্য সে খুঁজিয়া পাইয়াছে। এতদিন সে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, মানীর কাছে সে কৃতজ্ঞ থাকিবে পথ দেখাইয়া লক্ষ্য স্থির করিয়া দিবার জন্য।

দিন পনেরো লাগিল বইখানা শেষ করিতে।

শেষ করিয়া একটা কথা তাহার মনে হইল, কি অন্যায় সে করিয়াছে পৈতৃক অর্থের অপব্যয় করিয়া! আজ যদি হাতে টাকা থাকিত, সে চাকুরি ছাড়িয়া কলিকাতায় কোন ডাক্তারি স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া কিছুদিন পড়াশুনা করিত। বাংলা ভাষায় ডাক্তারি ব্যবসায় শেখানো হয়, এমন স্কুল কলিকাতায় আছে—এই বইখানার মধ্যেই সে স্কুলের বিজ্ঞাপন আছে শেষের পাতায়।

তাহার মনে হইল মানী মেয়েমানুষ, কিছু তেমন জানে না, তাই সে বলিয়াছিল বীজপুরে তাহার দেওরের কাছে ছয় মাস থাকিলে বিপিন ডাক্তারি-শাস্ত্রে পটু হইয়া যাইবে। বেচারী মানী!

এ সে জিনিস নয়, বইখানা আগাগোড়া পড়িবার পরে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, ডাক্তারি শেখা ছয় মাস এক বছরের কর্ম্ম নয়। ভাল ডাক্তার হইতে হইলে কোনও ভাল স্কুলে অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের কাছে না পড়িলে কিছুই হইবে না। বহু ব্যাপার শিখিবার আছে, এ বিষয়ে মানীর দেওর কি শিখাইবে?

বিপিনের আরও মনে হইল, ডাক্তারি সে ভাল পারিবে। তাহার মন বলিতেছে, এই কাজে নামিয়া পড়িলে যশ অর্জ্জন করিবে সে। এই একখানা মাত্র বই পড়িয়া সে অনেক কিছু বুঝিয়াছে, বইতে যা বলে নাই, তাহার চেয়ে বেশি বুঝিয়াছে।

মানীর সঙ্গে দেখা করিয়া এসব কথা তাহাকে বলিতে হইবে। মানীর সঙ্গেই পরামর্শ করিতে হইবে, ডাক্তারি শিখিবার আর কি উপায় স্থির করা যাইতে পারে! তাহার ভাল মন্দ মানী যেমন বোঝে, সে নিজেও যেন তেমন বোঝে না।

৪

বিপিন পাচ ছয় টাকা খরচ করিয়া রাণাঘাট হইতে কুইনাইন, লাইকার আর্সেনিক, লাইকার অ্যামোনিয়া, এসিড এন. এম. ডিল. প্রভৃতি কয়েকটি ঔষধ আনাইল, যাহা সাধারণ ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রেস্‌ক্রিপশনে লাগে বলিয়া বইতে লিখিয়াছে। অ্যাল্‌ক্যালি-মিক্‌শ্চারের উপকরণও ওই সঙ্গে কিছু আনাইল।

আনাইবার পরদিনই কামিনীর প্রতিবেশিনী হাবু ঘোষের দিদিমা আসিয়া বলিল, ও নায়েববাবু, কামিনীর বড় অসুখ হয়েছে আজ তিন চার দিন হ'ল, একবার আপনারে যেতে বলেছে।

বিপিন ব্যস্ত হইয়া তাহার প্রথম রোগী দেখিতে ছুটিল। যদিও হাবুর দিদিমা ডাক্তার হিসাবে তাহাকে আহ্বান করে নাই, সে যে ডাক্তারি বই পড়িয়া ভিতরে ভিতরে ডাক্তার হইয়া উঠিয়াছে, এ খবর কেহ রাখে না।

বিপিন এবার যখন কাছারিতে আসে, আজ দিন কুড়ি আগের কথা, কামিনী সেই দিনই গিয়া বিপিনের সঙ্গে দেখা করিয়াছিল। তারপর দুপুরের পরে প্রায়ই বুড়ী কাছারিতে আসিয়া কিছুক্ষণ গল্পগুজব করিয়া চলিয়া যাইত। তাহার অভ্যাসমত কয়দিন দুধ ও ফলমূলও নিজে লইয়া আসিয়াছে। আজ সাত আট দিন হইল কামিনী কাছারিতে আসে নাই, বিপিনের এখন মনে পড়িল। সে নিজেকে লইয়া এমন মশগুল যে, বুড়ী কেন আজকাল কাছারিতে আসিতেছে না—এ প্রশ্ন তাহার মনে উঠে নাই।

গোয়ালাপাড়ার মধ্যেই কামিনীর বাড়ী।

দুইখানা বড় চালাঘর, মাটির দেওয়াল। খুব পরিষ্কার করিয়া লেপা-পোঁছা। এক দিকে গোহাল, আগে অনেকগুলি গরু ছিল। বিপিন ছেলেবেলায় কামিনীর বাড়ীতে আসিয়াছে, কামিনী কাছারি গিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী আনিত এবং ওই বড় ঘরের দাওয়ায় বসাইয়া কত গল্প করিত, খাবার খাইতে দিত, সে কথা বিপিনের আজও মনে আছে। তবে সে কামিনীর বাড়ীতে আসে নাই আর কখনও সেই বাল্যদিনগুলির পরে, আসিবার আবশ্যকও হয় নাই।

কামিনী ঘরের মেঝেতে বিছানার উপর শুইয়া আছে।

বিছানাপত্রের অবস্থা দেখিয়া বিপিন বুঝিল, কামিনীর সচ্ছল দিন আর নাই। এক সময়ে এই ঘরের মধ্যে এক হাত পুরু গদির উপরে তোশক ও ধপধপে চাদর পাতা চওড়া বিছানা সে নিজের চোখে দেখিয়াছে। ঘরে নানা রকম ছবি টাঙানো থাকিত, এখনও অতীতের স্মৃতি বহন করিয়া দুইচারখানা ছবি ঝুল কালি মাখানো অবস্থায় দেওয়ালে ঝুলিতেছে—কালী, দশমহাবিদ্যা, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রঙিন ছবি, গোষ্ঠবিহার।

কামিনী ময়লা কাঁথার ভিতর হইতে মুখ বাহির করিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিল, এস বাবা,

এস, ওই পিঁড়িখানা পেতে দে তো ভাই।

হাবুর দিদিমা পিঁড়ি পাতিয়া দিল। সে-ই সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে বিপিনকে।

বিপিন বলিল, দেখি হাতখানা, জ্বর হয়েছে, তা আমায় আগে জানাও নি কেন? আজ গিয়ে হাবুর দিদিমা বললে, তাই জানতে পারলাম।

—তুমি ব'স ব'স, ভাল হয়ে ব'স। আমার কথা বাদ দাও, অসুখ লেগেই আছে। বয়েস হয়েছে, এখন এই রকম ক'রে যে কদিন যায়।

বিপিন হাত দেখিয়া বুঝিল, জ্বর খুব বেশি। মনে মনে ভাবিল, কি ভুলই হয়েছে! একটা থার্মোমিটার না পেলে কি জ্বর দেখা যায়? একদিন রাণাঘাট গিয়ে একটা থার্মোমিটার আনতেই হবে, নইলে রোগী দেখা চলবে না।

বিপিন হাবুর দিদিমাকে বলিল, একটা শিশি নিয়ে চল, ওযুধ দিচ্ছি।

কামিনী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, তুমি ওযুধ দেবে কোথা থেকে?

বিপিন হাসিয়া বলিল, বা রে, তুমি বুঝি জান না, আমি ডাক্তারি করি যে আজকাল।

কামিনী কথাটা বিশ্বাস করিল না। বলিল, আহা, কেবল পাগলামি আর খেয়াল!

হাবুর দিদিমা শিশি ধুইতে বাহিরে গিয়াছিল, এই সুযোগে কামিনী বলিল, স'রে এসে ব'স কাছে।

বিপিন মলিন কাঁথা-পাতা বিছানার একপাশে বসিল।

কামিনী সস্নেহে তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল, চিরকালটা একরকম গেল। কামিনী আড়ালে আবডালে যে তাহার সহিত মাতৃবৎ ব্যবহার করে, ইহা বিপিনের অনেকদিন হইতেই জানা আছে। সেও হাসিয়া বলিল, না, সত্যি বলছি, আমি ডাক্তারি শিখছি। শুনবে তবে, কে আমায় ডাক্তারি শেখাচ্ছে? আমাদের জমিদারের মেয়ে।

কামিনী অবাক হইয়া বলিল, আমাদের বাবুর মেয়ে! সে আর কতটুকু, আমি তাকে দেখি নি যেন! কর্ত্তা থাকতে একবার দোলের সময় জমিদারবাবুদের বাড়ী গিয়েছিলাম, তখন সে খুকীকে দেখেছি, কর্ত্তামশায় তাকে দেখিয়ে বললেন, এই দেখ, আমাদের বাবুর মেয়ে। ওই এক মেয়েই তো! কর্ত্তা বলতেন—। আচ্ছা, কর্ত্তা ইদানীং একটু চোখে কম দেখতেন, না?

বিপিন দেখিল, বুড়ী তাহার বাবার কথা আনিয়া ফেলিয়াছে, হঠাৎ থামিবে না, এখন বাবার সম্বন্ধে বুড়ীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিবার মত মনের অবস্থা তাহার নাই। সে হাসিয়া বলিল, তুমি সে কতকাল আগে দেখেছিলে, তোমার খেয়াল আছে? সে মেয়ে কি চিরকাল তেমনই খুকী থাকবে? এখন তার বয়েস কুড়ি বাইশ। অনাদিবাবুদের বাড়ী দোল হ'ত আজকের কথা নয়, আমার ছেলেবেলার কথা।

—বাবুর মেয়ের বিয়ে হয়েছে কোথায়?

—কলকাতায় এক উকিলের সঙ্গে।

—তা সে মেয়ে তোমায় ডাক্তারি শেখাচ্ছে কেমন কথা? সে ডাক্তারি জানলে কোথা থেকে?

বিপিনের ইচ্ছা, মানীর সম্বন্ধে কথা বলে। অনেকদিন মানীর বিষয়ে সে কথা বলে নাই, তাহাকে দেখেও নাই, তাহার মনটা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, অন্তত মানীর বিষয় লইয়া কিছু বলিয়াও সুখ। কিন্তু ধোপাখালির প্রজাদের নিকট তো আর জমিদারবাবুর মেয়ের সম্বন্ধে আলোচনা করা চলে না!

কামিনীর কথার উত্তরে বিপিন যাহা বলিয়া গেল, তাহা বৃদ্ধার প্রশ্নের সঠিক উত্তর নয়, মানীর রূপগুণের একটি দীর্ঘ বর্ণনা।

কামিনী চুপ করিয়া শুনিতেছিল, বিপিনের কথা শেষ হইয়া গেলে বলিল, বেশ মেয়ে। তোমার সামনে বেরোয়?

—কেন বেরুবে না? ছেলেবেলায় একসঙ্গে খেলা করেছি, আমার সামনে বেরুবে না?

—একটা কথা বলি, তার বিয়ে হয়ে গিয়েছে, তোমারও ঘরে সোনার পিরতিমের মত বউ। আমার একটা কথা শোন বাবা। তুমি তার সঙ্গে আর দেখাশুনো ক'র না। তুমি কালকের ছেলে; কি জান আর কিই বা বোঝ! তোমার মাথায় এখনও অনেক রকম পাগলামি ঢুকে আছে। তোমায় জানতে আমার বাকি নেই বাবা, কর্তামশায়ের তো ছেলে! তুমি ও-মেয়ের ত্রিসীমানায় ঘেঁষো না, নিজে কষ্ট পাবে, তাকেও কষ্ট দেবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১

আরও দুই দিন কাটিয়া গেল।

দুপুরের পরে বিপিন কাছারিতে বসিয়া হিসাবপত্র দেখিতেছে, নিবারণ গোয়ালার ছেলে পাঁচু আসিয়া বলিল, নায়েববাবু, কামিনী পিসী একবার আপনাকে ডেকেছে।

বিপিন গিয়া দেখিল, কামিনীর অসুখ বাড়িয়াছে। গায়ের উত্তাপ খুব বেশি, জ্বরের ধমকে বৃদ্ধা যেন হাঁপাইতেছে, বেশি কথা বলিবার শক্তি নাই।

বিপিন বলিল, কি খেয়েছ?

কামিনী ক্ষীণস্বরে বলিল, নিবারণের বউ একটু জলসাবু ক'রে দিয়ে গেল, দুপুরের আগে তাই একচুমুক—মুখে ভাল লাগে না কিছু।

—আচ্ছা, আচ্ছা, চুপ করে শুয়ে থাক।

—তুমি আমায় আজ দেখতে আস নি কেন?

কথাটা কেমন যেন গোঙাইয়া গোঙাইয়া বলিল; বেশ একটু অভিমানের সুরও বটে।

বিপিন মনে মনে অনুতপ্ত হইল। দেখিতে আসা খুব উচিত ছিল; সকালে কাছারিতে

জনকতক প্রজার সঙ্গে গোলমাল মিটাইতে দেরি হইয়া গেল, নতুবা ঠিক আসিত। কামিনীর কেহ নাই, বৃদ্ধা হয়তো আশা করে, বিপিন তাহার অসময়ে পুত্রবৎ দেখাশোনা করিবে ; যদিও বিপিন কামিনীর মনের এত কথা বুঝিতে পারে না, নিজেকে লইয়াই ব্যস্ত, অপরের দিকে চাহিবার অবসর তাহার কোথায় ?

কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিবার পরে বিপিন বলিল, এখন যাই, প্রজাপত্তর আসবে, আর আমায় একবার গদাধরপুর যেতে হবে একটা জমির মীমাংসা করতে। সন্ধ্যের পর আবার আসব।

কামিনী উঠতে দেয় না, হাত বাড়াইয়া টানিয়া টানিয়া বলিল, যেও না, যেও না, ও বাবা বিপিন, যেও না, ব'স, ব'স।

বিপিনের কষ্ট হইল বৃদ্ধাকে এভাবে ফেলিয়া যাইতে। কিন্তু সত্যই তাহার থাকিবার উপায় নাই। গদাধরপুরে কয়েকঘর জেলে প্রজা আছে, তাহারা স্থানীয় বাঁওড়ের দখল লইয়া নিজেদের মধ্যে বিবাদ করার ফলে কাছারির খাজনা আদায় হইতেছে না। বিপিন নিজে গিয়া এ ব্যাপারের মীমাংসা করিয়া দিলে তাহারা মানিয়া লইবে, এরূপ প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছে। সুতরাং যাইতেই হইবে তাহাকে। অনাদিবাবুর কানে যদি কথা যায়, তবে এতদিন সে যায় নাই কেন, এজন্য কৈফিয়ৎ তলব করিয়া পাঠাইবেন।

আড়ালে পাঁচুকে ডাকিয়া বলিল, পাঁচু, তোমার মাকে বল এখানে একটু থাকতে। আমি আবার আসব এখন, একবার কাজে যাব গদাধরপুরে। আর একবার একটু সাবু ক'রে খাইয়ে দিতে ব'ল তোমার মাকে। খরচপত্তর যা হবে, সব আমার। আমি সব দোব। আচ্ছা, একটা লোক দিতে পার, রাণাঘাট থেকে কমলালেবু আর বেদানা কিনে আনবে ?

বিপিন কাছারির নায়েব বটে, কিন্তু সে ভালমানুষ নায়েব। লোকে সেজন্য তাহাকে তত ভয় করে না। বিপিনের বাবার আমলে প্রশ্নের প্রয়োজন ছিল না, মুখের কথা খসাইয়া হুকুম করিলেই চলিত।

পাঁচু বলিল, আচ্ছা বাবু, আমি দেখছি যদি হাবুল যায়, ব'লে দেখছি।

—এই আট আনা পয়সা রাখ। হাবুলকে পাও বা যাকে পাও, দিয়ে ব'ল ভাল বেদানা আর কমলালেবু আনতে ; আর যে যাবে তার জলখাবার আর মজুরি এই নাও চার আনা।

বিপিন কাছারি আসিয়া গদাধরপুর যাইবার জন্য বাহির হইয়াছে, এমন সময় পাঁচু আসিয়া বলিল, কেউ গেল না নায়েববাবু, আমি নিজেই চললাম রাণাঘাট। ফিরতে কিন্তু আমার রাত হবে, তা ব'লে যাচ্ছি।

বিপিন বুঝিল, মজুরি ও জলখাবারের দরুন চারি আনা পয়সার লোভ সম্বরণ করা পাঁচুর পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে ; তারপর বাকি আট আনার ভিতর হইতে অন্তত চার ছয় পয়সা উপরিই বা কোন্ না হইবে ?

বেলা প্রায় সাড়ে তিনটা।

গদাধরপুর এখান হইতে তিন চার মাইল পথ। বিপিন জোরে হাঁটিতে লাগিল। বজরাপুর পর্য্যন্ত সে ও পাঁচু একসঙ্গে গেল। তারপর রাণাঘাটের রাস্তা বাঁকিয়া পশ্চিমদিকে ঘুরিয়া

গিয়াছে। পাঁচু সেই রাস্তায় চলিয়া গেল। গদাধরপুর যাইবার কোনও বাঁধা-ধরা পথ নাই। মাঠের উপর দিয়া সরু পায়ে-চলার পথ, কখনও বা ফুরাইয়া যায়, কিছু দূরে গিয়া অন্য একটা পথ মেলে। মাঠে লোকজনও নাই যে, পথ জিজ্ঞাসা করা যায়। নানা সরু সরু পথ নানাদিকে গিয়াছে, কোন্ পথ যে ধরিতে হইবে জানা নাই। বিপিন এক প্রকার আন্দাজে চলিল।

বেলা পড়িয়া আসিল। রোদের তেজ কমিয়া গেল।

মাঠের মধ্যে ঝাড় ঝাড় আকন্দগাছে ফুল ফুটিয়াছে। সোঁদা, রোদপোড়া মাটি ও শুকনো কাশঝোপের গন্ধ বাহির হইতেছে। ফাঁকা মাঠ, গাছপালাও বেশি নাই, কোথাও হয়তো বা একটা নিমগাছ, মাঝে মাঝে খেজুরগাছ।

অবশেষে দূর হইতে জলাশয় দেখিয়া বিপিন বুঝিল, এই গদাধরপুরের বাঁওড়, সুতরাং সে ঠিক পথেই আসিয়াছে।

গদাধরপুরের প্রজারা বিপিনকে খাতির করিয়া বসাইল। গ্রামের মধ্যে একটা কলু-বাড়ীর বড় দাওয়ায় নূতন মাদুর পাতিয়া দিল বিপিনের জন্য। এ গ্রাম অনাদিবাবুর খাস তালুকের অন্তর্গত, গোটা গ্রামখানার সব লোকই কাছারির প্রজা।

বাঁওড়ের দখলের মীমাংসা করিতে প্রায় সন্ধ্যা হইল।

দুই তিনজন প্রজা বলিল, নায়েববাবু, বলতে আমাদের বাধ-বাধ ঠেকে, কিন্তু আপনার একটু জল মুখে দিলে হ'ত।

বিপিন বলিল, না, সে থাক। এখনও অনেক কাজ বাকি। আমাকে আবার সব কাজ সেরে ফিরতে হবে এতখানি রাস্তা।

প্রজারা ছাড়িল না, শেষ পর্য্যন্ত বিপিনকে একটা ডাব খাইতে হইল।

একটি চাষাদের বউ কি মেয়ে এক কাঠা ধান হাতে কলুবাড়ীর উঠানে আসিয়া বলিল, হ্যাদে, ইদিকি এস। তেল দ্যাও আধপোয়া আর এক ছটাক নুন, আধপয়সার ঝাল—

সে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কি ধান দিয়ে জিনিস কেনো?

মেয়েটি বলিল, হ্যাঁ বাবু, কনে পয়সা পাব? শীতকাল গেল, একখানা বস্তর নেই যে গায়ে দিই। যে ক'বিশ ধান পেয়েলাম, সব মহাজনের ঘরে তুলে দিয়ে খাবার ধান চাট্টি ঘরে ছেল। তাই দিয়ে তেল নুন হবে সারা বছরের, আর খাওয়াও হবে।

—এতে কুলোবে সারা বছর?

—তা কি কুলোয় বাবু? আষাঢ় শ্রাবণ মাসের দিকি আবার মহাজনের গোলায় ধামা হাতে যাতি হবে। ধান কর্জ্জ না করলি আর চলবে না তারপর।

কলু-বাড়ীতে একটা ছোট মুদীর দোকানও আছে। আরও কয়েকটি লোক জিনিসপত্র কিনিতে আসিল। মেয়েটি তেল নুন কিনিয়া যাইবার সময় বলিল, মুস্থুরি নেবা?

হরি কলু বলিল, নতুন মুস্থুরি? কাল নিয়ে এস।

—মুস্থুরির বদলে কিন্তু চাল দিতি হবে।

বিপিন বলিল, তোমার ঘরে ধান আছে তো চাল নিয়ে কি করবে ?

মেয়েটি উঠানে দাঁড়াইয়া গল্প করিতে লাগিল। তাহার ভাই জন খাটিয়া খায়, কিন্তু তাহার হাঁপানির অসুখ, দশ দিন খাটে তো পনরো দিন পড়িয়া থাকে। সংসারের বড় কষ্ট, সাত জন লোক এক এক বেলায় খায়, দু বেলায় চোদ্দ জন। যে কয়টি ধান আছে, তাহাতে কয় মাস যাইবে? সামান্য কিছু মুসুরি ছিল, তাহার বদলে চাল না লইলে চলে কি করিয়া ?

এই সব প্রজা। ইহাদের নিকট খাজনা আদায় করিয়া তাহাকে চাকুরি বজায় রাখিতে হইবে। অনাদিবাবুর চাকরি লইয়া সে মস্ত বড় ভুল করিয়াছে। এ সব জিনিস তাহার ধাতে নাই। বাবা কি করিয়া কাজ চালাইতেন সে জানে না, কিন্তু তাহার পক্ষে অসম্ভব।

মানী ঠিক পরামর্শ দিয়াছে।

ডাক্তারি শিখিতেই হইবে তাহাকে। ডাক্তারি শিখিলে এই সব গরীব লোকের অনেকখানি উপকার করিতেও তো পারিবে।

এখানকার আর একজন প্রজার কাছে অনেকগুলি টাকা খাজনা বাকি। বিপিন সন্ধ্যার পরে তাহার বাড়ী তাগাদা দিতে গেল। গিয়া দেখিল, খড়ের ঘরের দাওয়ায় লোকটা শয্যাগত, মলিন লেপ কাঁথা গায়ে দিয়া শুইয়া আছে। তিন-চারটি পাড়ার লোক নায়েববাবুর আগমন-সংবাদ শুনিয়া বাড়ীর উঠানে আসিয়া উপস্থিত হইল। রোগীর বিছানার পাশে দুইটি স্ত্রীলোক বসিয়া ছিল, বিপিনকে দেখিয়া ঘোমটা টানিয়া দিল।

লোকটির নাম বিশু ঘোষ, জাতিতে কৈবর্ত্ত। বিপিনকে সে অনেকবার দেখিয়াছে, কিন্তু বিপিন দাওয়ায় উঠিয়া বসিতেই তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, কে ? ছিরাম ? তামাক দে, ছিরাম খুড়োকে তামাক দে।

বিপিন তো অবাক! পরে রোগীর চোখের দিকে চাহিয়া দেখিল, চোখ দুইটা জবাফুলের মত লাল। ঘোর বিকার। রোগী মানুষ চিনিতে পারিতেছে না। বিপিন বলিল, ওর মাথায় জল দাও! দেখছে কে ?

একজন উত্তর দিল, ফকির সায়েব দেখছেন।

—কোথাকার ফকির সায়েব? ডাক্তার ?

—আজ্ঞে না, তিনি ঝাড়ফুঁক করেন খুব ভাল। তিনি বলেছেন, উপরিভাব হয়েছে।

বিপিন বুঝিতে না পারিয়া বলিল, উপরিভাব কি ব্যাপার ?

দুই তিন জনে বুঝাইয়া দিবার উৎসাহে একসঙ্গে বলিল, আজ্ঞে, এই দৃষ্টি হয়েছে আর কি, অপদেবতার দৃষ্টি হয়েছে।

—ভূতে পেয়েছে ?

—ভূতে পাওয়া না ঠিক। দিষ্টি হয়েছে আর কি।

বিপিনের যতটুকু ডাক্তারি-বিদ্যা এই কয়দিন বই পড়িয়া হইয়াছে, তাহারই বলে সে

বলিল, ওর ঘোর জর বিকার হয়েছে। লোক চিনতে পারছে না, চোখ লাল, মাথায় জল ঢাল। উপরিভাব-টাব বাজে, ওকে ডাক্তার দেখাও, নইলে বাঁচবে না। ফকিরের কর্ম্ম নয় এ সব।

উহাদের মধ্যে একজন বলিল, এ দিগরে বরাবর থেকে ফকির সায়েব ঝাড়ান-ফাড়ান, তেলপড়া দিয়েই রোগ সারান বাবু। ডাক্তার কোথায় এখানে? ডাক্তার আছে সেই রামনগরের হাটে, নয়তো সেই চাকদার বাজারে। আর এক আছে রাণাঘাটে। দু কোশ রাস্তা। এক মুঠো টাকা খরচ ক'রে কি গরীবগুরবো লোকে ডাক্তার আনতি পারে?

২

গদাধরপুর হইতে বিপিন যখন বাহির হইয়া ফাঁকা মাঠে পড়িল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। অন্ধকার রাত্রি, একটু পরেই চাঁদ উঠিবে। চাঁদ ওঠার জন্যই সে এতক্ষণ অপেক্ষা করিতেছিল।

মাঠে জনপ্রাণী নাই। অপূর্ব্ব তারাভরা রাত্রি। আকাশের দিকে বিপিনের নজর পড়িত না, যদি চাঁদ কখন ওঠে, ইহা দেখিবার প্রয়োজন তাহার না হইত। কিন্তু আকাশের দিকে চাহিয়া নক্ষত্রভরা অন্ধকার আকাশের দৃশ্য দেখিয়া জীবনে এই বোধ হয় প্রথম বিপিনের বড় ভাল লাগিল।

কেমন নিস্তব্ধতা, কেমন একটা রহস্যময় ভাব রাত্রির এই নিস্তব্ধতায়! এত ভাল লাগিবার প্রধান কারণ, এই সময় মানীর কথা তাহার মনে পড়িল।

আজ যে এই সব দরিদ্র রোগপীড়িত মানুষদের সে চোখের উপর অজ্ঞতার ফলে মরণের পথে অগ্রসর হইতে দেখিয়া আসিল, মানীই তাহাকে পথ দেখাইয়া বলিয়া দিয়াছে, ইহাদিগকে মৃত্যুর হাত হইতে কি করিয়া বাঁচাইতে হইবে। ডাক্তার নাই, ঔষধ নাই, সৎপরামর্শ দিবার মানুষ নাই, কঠিন সান্নিপাতিক বিকারের রোগী, সম্পূর্ণ অসহায়। জলপড়া, তেলপড়ার চিকিৎসা চলিতেছে। ওদিকে কামিনী-মাসীর ওই অবস্থা, তাহার ভাইয়ের ওই অবস্থা।

মানী তাহাকে পথ দেখাইয়া দিয়াছে, যে পথে গেলে অর্থ ও পুণ্য দুইই মিলিবে।

গরীব প্রজাদের প্রতি অত্যাচার করিয়া, তাহাদের রক্ত চুষিয়া তাহার বাবা এবং মানীর বাবা দুইজনেই ফুলিয়া ফাঁপিয়া মোটা হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের ছেলেমেয়েরা সে পাপ পথে চলিবে তো নাইই, বরং পিতৃদেবের কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করিবে নিজেদের দিয়া।

মানী তাহাকে জীবনে আলো দেখাইয়াছে।

একটি অদ্ভুত মনের ভাবের সহিত বিপিনের পরিচয় ঘটিল আজ হঠাৎ এই মাঠের মধ্যে।

মানীর সঙ্গে ভালবাসার যে সম্পর্ক তাহার গড়িয়া উঠিয়াছে, এতদিন অন্ততঃ বিপিনের মনের দিক হইতে তাহা দেহসম্পর্কহীন ছিল না, মনে মনে মানীর দেহকে সে বাদ দিতে পারে নাই। বিপিনের স্বভাবই তা নয়, সূক্ষ্ম মানসিক স্তরের আদানপ্রদান তাহার ধাতুগত নয়। মানীর সম্বন্ধে এ আশা বিপিন কখনও ছাড়ে নাই যে, একদিন না একদিন সে মানীকে নামাইবে তাহার নিজস্ব নিম্নস্তরে। সুবিধা সুযোগ এখন নাই বলিয়া ভবিষ্যতেও কি ঘটিবে না?

আজ হঠাৎ তাহার মনে হইল, মানীর সহিত তাহার সম্বন্ধ অন্য ধরণের। মানী তাহাকে যে স্তরে লইয়া গিয়াছে, বিপিনের মন তাহার সহিত পরিচিত ছিল না। অনেক মেয়ের সঙ্গে বিপিন মিশিয়াছে পূর্ব্বে অন্যভাবে। মন বলিয়া জিনিসের কারবার ছিল না সেখানে। হয়তো মন জিনিসটাই ছিল না সে ধরণের মেয়েদের।

কিন্তু মনোরমা? বিপিন জানে না। মনোরমার মন সম্বন্ধে বিপিনের কখনও কৌতূহল জাগে নাই। তেমন ভাবে মনোরমা কখনও বিপিনের সঙ্গে মিশে নাই। হয়তো সেটা বিপিনের দোষ, মনোরমার মনকে বিপিন সে ভাবে চাহিয়াছে কবে? যে সোনার কাঠির স্পর্শে মনোরমার মনের ঘুম ভাঙিত, বিপিনের কাছে সে সোনার কাঠি ছিল না।

বিপিনের মনের ঘুম ভাঙাইয়াছে মানী। সে সোনার কাঠি ছিল মানীর কাছে।

দূর মাঠের প্রান্তে চাঁদ উঠিতেছে। বিপিন একটা খেজুরগাছের তলায় ঘাসের উপর বসিয়া পড়িল। ভারী ভাল লাগিতেছিল, কি যে হইয়াছে তাহার, কেন আজ এত ভাল লাগিতেছে—এই আধ-অন্ধকার মাঠ, পূব-আকাশে উদীয়মান চন্দ্র, মাঠের মধ্যে ঝাড় ঝাড় সাদা আকন্দফুল, হু হু হাওয়া—কখনও তেমন ভাবে বিপিন এদিকে আকৃষ্ট হয় নাই, আজ যেন কি হইয়াছে তাহার।

বলিতে লজ্জা করিলেও বলিতে হইবে, তাহাদের গ্রামের দোকানে সে সন্ধ্যার পর গোপনে তাড়ি পর্য্যন্ত খাইয়া দেখিয়াছে—কি রকম মজা হয়! এই বছর পাঁচ আগেও। বাবা তখন অল্পদিন মারা গিয়াছেন। হাতে কাঁচা পয়সা, বিপিন তখন খুব উড়িতেছে। অবশ্য কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়াই খাইয়াছিল। খানিকটা বাহাদুরিও বটে। ভোলা ছুতারের ছেলে হাবুলের সহিত বাজি ফেলা হইয়াছিল।

এ সব কথা বিপিনের আজ এমন করিয়া কেন মনে হইতেছে?

সে মানীর বন্ধুত্বের উপযুক্ত নয়। নিজেকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া বিপিনের তাহাই মনে হইল। নিজেকে সে কলঙ্কিত করিয়াছে নানা ভাবে। মানী নিষ্পাপ নির্ম্মল।

বিপিন উঠিয়া পথ চলিতে লাগিল। বোধ হয় সে অপেক্ষা করিতেছিল চাঁদ ভাল করিয়া উঠিবার জন্য।

একটা নীচু খেজুরগাছে এক ভাঁড় খেজুর রস দেখিয়া সে ভাঁড় পাড়িয়া রস খাইল, সন্ধ্যার টাটকা রস সাধারণত মেলে না। ভাঁড়টা আবার গাছে টাঙাইয়া রাখিবার সময় সে ভাঁড়টার মধ্যে দুইটি পয়সা রাখিয়া দিল। পল্লীগ্রামে এত ধার্ম্মিক কেহ হয় না, কিন্তু আজ বিপিনের

মনে হইল, চুরি সে করিতে পারিবে না। মানীর কাছে দাঁড়াইতে হইবে তাহাকে, চোরের বিবেক লইয়া দাঁড়াইতে পারিবে সেখানে ?

কাছারি ফিরিয়া দেখিল, ছোকরা চাকরটা তাহার জন্য বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছে।

বিপিন বলিল, এই ওঠ, উনুন ধরাগে যা। দুধ দিয়ে গিয়েছে এবেলা ?

চাকরটা চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, বাবা। কত রাত ক'রে আলেন নায়েববাবু ? আমি বলি রাত্তিরি বুঝি থাকবেন সেখানে।

—কামিনী-মাসী কেমন আছে রে ? রাণাঘাট থেকে লেবু নিয়ে ফিরেছে কিনা জানিস ?

—জানি নে বাবু।

৩

বিপিন আহারাদি শেষ করিয়া কামিনীকে দেখিতে গেল।

বেশ জ্যোৎস্নাভরা রাত। কিন্তু গাঁয়ের লোক প্রায় সব ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, গোয়ালাপাড়ার মধ্যে কাহারও বড় একটা সাড়াশব্দ নাই।

কামিনীর ঘরের দোর ভেজানো ছিল, ঠেলিতে খুলিয়া গেল। ঘরের মেঝেতে একটা পিলসুজের উপরে মাটির পিদিম টিম টিম জ্বলিতেছে, বোধ হয় পাঁচুর মা জ্বালিয়া রাখিয়া দিয়া গিয়াছে। রোগী কাঁথামুড়ি দিয়া একলাটি শুইয়া বোধ হয় ঘুমাইতেছে।

বিপিন ডাকিল, ও মাসী, কেমন আছ, ও মাসী ?

সাড়াশব্দ নাই।

বিপিন বিছানার পাশে গিয়া বসিয়া বৃদ্ধার গায়ে হাত দিয়া দেখিল। নাড়ী দেখিয়া মনে হইল, নাড়ীর গতি খুব ক্ষীণ। খুব ঘাম হইতেছে, বিছানা ভিজিয়া গিয়াছে ঘামে। বৃদ্ধা ঘুমাইতেছে, না ক্রমশ অবস্থা খারাপ হওয়ার দরুন জ্ঞানহারা হইয়া পড়িয়াছে, বোঝাও কঠিন।

যাই হোক, অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিবার পরে কামিনী চোখ মেলিয়া বিপিনের দিকে চাহিল। কি যেন বলিল, বোঝা গেল না, ঠোঁট যেন নড়িল।

বিপিন বলিল, কি মাসী, কেমন আছ ? বলছ কিছু ?

কামিনীর জ্ঞান নাই। সে দৃষ্টিহীন নেত্রে বিপিনের দিকে চাহিল, ঘরের বাঁশের আড়ার দিকে চাহিল, আলনায় বাঁধা পুরানো লেপকাঁথার দিকে চাহিল। বৃদ্ধার এই ঘরে ৺বিনোদ চাটুজ্জে নিয়মিত আসিতেন, কামিনী তখন দেখিতে বেশ ফর্সা ও দোহারা চেহারার স্ত্রীলোক ছিল, কালাপেড়ে কাপড় পরিত, পান খাইয়া ঠোঁট রাঙা করিয়া রাখিত, হাতে সোনার বালা ও অনন্ত পরিত, কালো চুলে খোঁপা বাঁধিত, এ কথা বিপিনের অল্প অল্প মনে আছে। বাইশ

তেইশ বছর আগের কথা। এই যে বৃদ্ধা বিছানার সঙ্গে মিশিয়া শুইয়া আছে, মাথায় পাকা চুল, গায়ের রং হাজিয়া আধকালো, দাঁত পড়িয়া গালে টোল খাইয়া গিয়াছে, বিশেষত জ্বরে ভুগিয়া বর্তমানে তাড়কা রাক্ষসীর মত চেহারা হইয়া উঠিয়াছে যাহার, এই যে সেই একদিনের হাস্যলাস্যময়ী সুন্দরী কামিনী, যাহার চটুল চাহনিতে দোর্দণ্ডপ্রতাপ বিনোদ চাটুজ্জে নায়েব মহাশয়ের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল, ইহাকে দেখিয়া কে বলিবে সে কথা?

প্রথম যৌবনে দুইজনের দেখাশোনা হয়। কামিনী ছিল গোয়ালার মেয়ে—বালবিধবা, সুন্দরী। বিনোদ চাটুজ্জেও ছিলেন লম্বা-চওড়া জোয়ান, বড় বড় চোখ, গলার স্বর গম্ভীর ও ভারী--পুরুষের মত শক্ত-সমর্থ চেহারা। তা ছাড়া ছিল অসম্ভব দাপট। পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর আগের কথা, তখন নায়েববাবুই ছিলেন এ অঞ্চলের দারোগা, নায়েববাবুই ম্যাজিস্ট্রেট।

কামিনী বিনোদ চাটুজ্জেকে ভালবাসিবে, এ বিচিত্র কথা কি?

সারাজীবন একসঙ্গে যাহার সহিত কাটাইয়া, নিজের উজ্জ্বল যৌবন যাহাকে দান করিয়া কামিনী নারীজন্মের সার্থকতাকে বুঝিয়াছিল, সেই বিনোদ চাটুজ্জের অভাবে তাহার জীবন শূন্য হইয়া পড়িবে ইহাও বিচিত্র কথা নয়।

হয়তো এইমাত্র জ্বরঘোরে অজ্ঞান অচৈতন্য কামিনীর মন ঘুরিয়া ফিরিতেছিল তাহার প্রথম যৌবনের সেই পাখী-ডাকা, ফুল-ফোটা, আলো-মাখা মাধবী রাত্রির প্রহরগুলি অনুসন্ধান করিয়া, আবার মনে মনে সেখানে বাস করিয়া, হারানো রাত্রির শিশিরসিক্ত স্মৃতির পুনরুদ্বোধন করিয়া।

হয়তো মনে পড়িতেছিল প্রথম দিনের সেই ছবিটি।

ষোড়শী বালিকা তাহাদের বাড়ীর সামনের বেগুন ক্ষেত হইতে ছোট্ট চুপড়ি করিয়া বেগুন তুলিয়া ফিরিতেছিল।

পথে আসিতেছিল যুবক বিনোদ চাটুজ্জে, ধোপাখালি কাছারির নায়েব, ধোপাখালি গ্রামের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। সবাই বলাবলি করিত, নায়েববাবুর কাছে গেলে সব জব্দ হয়ে যাবে এখন! নায়েব এসেছে যা জবর! কোন ট্যাঁ-ফোঁ খাটবে না সেখানে। নায়েবের মত নায়েব।

সে কৌতূহলের সহিত চাহিয়া দেখিল। বেশ মনে আছে, বেগুনের ক্ষেতের কঞ্চি-বাঁধা আগড়ের কাছে দাঁড়াইয়া।

লম্বা, সুপুরুষ, টকটকে ফর্সা, মাথায় ঢেউ-খেলানো কালো চুল—তবে বয়স খুব কম নয়। ত্রিশ-বত্রিশ হইবে, কিংবা তারও কিছু বেশি।

নায়েববাবু যখন কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছেন, তাহার তখন বড় লজ্জা হইল। বাঁ হাতে বেগুনের চুপড়িটা, ডান হাতে কঞ্চির আগড়টা শক্ত করিয়া ধরিয়া রহিল।

হঠাৎ বিনোদ চাটুজ্জে তাহারই দিকে মুখ ফিরাইয়া চাহিলেন।

—বেগুন ওতে? এ কাদের ক্ষেত?

সে লজ্জায় সঙ্কোচে বেড়ার সহিত মিশিয়া কোন রকমে উত্তর দিল, আমাদের ক্ষেত।

—তুমি কি রসিক ঘোষের মেয়ে?

—হ্যাঁ।

—বেগুন কি বিক্রি কর তোমরা?

—না, এ খাবার বেগুন।

—তোমার বাবা কোথায়?

—চিলেমারি দুধ আনতে গেছে।

—ও।

নায়েববাবু চলিয়া গেলেন।

তাহার বুক ঢিপ ঢিপ করিতেছিল। কপাল ঘামিয়া উঠিয়াছে। ভয় না লজ্জা, কে জানে। বাড়ী আসিয়া দিদিমাকে (মা তাহার আগের বছর মারা গিয়াছিল) বলিল, আইমা ওই বুঝি কাছারির নতুন নায়েব? যাচ্ছিলেন এখান দিয়ে, আমার কাছে বেগুন দেখে বললেন, বেগুন বিক্রির? কি জাত, আইমা?

তাহার দিদিমা বলিল, বামুন যে, তাও জান না পোড়ারমুখ মেয়ে! চাইলেন কিনতে, বেগুন কটা দিয়ে দিলেই হ'ত। আমার তো মনে থাকে না, তোর বাবাকে বেগুন দিয়ে আসতে বলিস কাছারিতে। বামুন মানুষ।

এক চুপড়ি ভাল কচি বেগুন ও এক ঘটি দুধ সে-ই কাছারিতে দিয়া আসিয়াছিল। পরদিন বিকেলবেলা বাবার সঙ্গে গিয়াছিল।

কিন্তু হায়! সে প্রেমমুগ্ধা তরুণী পল্লীবালিকা আর নাই, সে সুপুরুষ বিনোদ চাটুজ্জে নায়েববাবুও আর নাই।

অনেক কালের কথা এ সব। সেকালের কথা।

* * * *

বিপিন পড়িল মহা মুশকিলে।

কামিনী যখন মারা গেল, তখন রাত দেড়টার কম নয়। মৃতদেহ ফেলিয়াই বা কোথায় সে যায় এখন? বাধ্য হইয়া ভোর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেই হইল। বৃদ্ধার মৃতদেহ এ ভাবে ফেলিয়া সে যাইতে পারিবে না, মনে মনে সে মায়ের মতই ভালবাসিত কামিনীকে। ভোর হইল। কাক কোকিল ডাকিয়া উঠিতেই বিপিন গিয়া হাঁকডাক করিয়া লোকজন উঠাইল। পাঁচু কাল অনেক রাত্রে রাণাঘাট হইতে কমলালেবু লইয়া ফিরিয়াছিল, সকালে দিতে আসিতেছিল, পথে দেখা। তাহাকে পাঠাইয়া ওপাড়া হইতে গোয়ালার পুরোহিত বামনদাস চক্রবর্ত্তিকে আনাইল। এ সব পাড়াগাঁয়ে 'প্রাচিত্তির' না করাইলে মড়া কেহ ছুঁইবে না, বিপিন জানে। কামিনীর আপনার বলিতে কেহ ছিল না, দূর সম্পর্কের এক বোনপো আছে রাণাঘাটে, তাহাকে খবর দিবার জন্য লোক পাঠাইল। তাহাকে দিয়াই শ্রাদ্ধ করাইতে হইবে। সব কাজ শেষ করাইয়া দাহ করিতে বেলা একটা বাজিল।

কাছারি ফিরিয়া দেখিল, পলাশপুর হইতে জমিদারবাবুর পত্র লইয়া লোক আসিয়া বসিয়া আছে। নানা রকমের কাজের তাগাদা চিঠির মধ্যে, বিশেষ করিয়া টাকার তাগাদা—ত্রিশটি টাকা এই লোকের হাতে যেন আজই পাঠানো হয়।

লোকটাকে বিপিন বলিল, আজ কাছারিতে থাক। এখন টাকা অবেলায় কোথায় পাব? কাল যাবে। দেখি, নরহরি দাসকে ব'লে।

লোকটা আর একখানি ক্ষুদ্র খামের চিঠি বাহির করিয়া বিপিনের হাতে দিয়া বলিল, মনে ছেল না নায়েববাবু, দিদিমণি এই চিঠিখানা আপনাকে দিতে বলেছেলেন। আমি যখন আসি, খিড়কি-দোরের পথে এসে দিয়ে গেলেন।

মানীর চিঠি! কখনও তো সে বিপিনকে চিঠি দেয় নাই! কি লিখিয়াছে মানী? বিপিন নিজেকে সামলাইয়া লইয়া যতদূর সম্ভব উদাসীন মুখে বলিল, ও, বোধ হয় বড় মাছ চাই! বাবাকে লুকিয়ে মাঝে মাঝে মাছ চেয়ে পাঠায় বটে। আচ্ছা, তুমি ততক্ষণ বিশ্রাম কর।

বাদামতলায় দাঁড়াইয়া মানীর চিঠি খুলিয়া পড়িল। ছোট্ট চিঠি। লেখা আছে—

“বিপিনদা,

প্রণাম নেবে। অনেকদিন গিয়েছ, আদায়পত্র কেমন হচ্ছে। নায়েবি কাজের যেন গলদ না হয়, তাগাদাপত্র ঠিকমত হচ্ছে তো? নইলে কৈফিয়ৎ তলব করব, মনে থাকে যেন। আমিও জমিদারের মেয়ে।

আর একটি বিশেষ কথা। আমি এই মাসেই চ'লে যাব, আমার ছোট দেওরের বিয়ের হঠাৎ ঠিক হয়েছে। যাবার আগে তুমি অবিশ্যি একবার এসে আমার সঙ্গে দেখা করে যাবে। একবার এসেই না হয় চ'লে যেও, কিন্তু আসাই চাই। আবার কবে আসব, তার ঠিকানা নেই। চিঠির কথা কাউকে ব'ল না। ইতি—

মানী”

৪

পরদিন অনাদিবাবুর লোক বিপিনের একখানা চিঠি লইয়া চলিয়া গেল, তাহাতে বিপিন লিখিল, টাকা আদায় হইলেই কাল কিংবা পরশু নাগাত সে নিজে লইয়া যাইতেছে। মানীর সঙ্গে দেখা করিবার এই উত্তম সুযোগ।

সন্ধ্যা হইল। বাদামগাছের পাতায় হাওয়া লাগিয়া একপ্রকার শব্দ হইতেছে। অন্ধকার রাত্রি, জ্যোৎস্না উঠিবার দেরি আছে।

কামিনীর মৃত্যু বিপিনের মনে বিষাদের রেখাপাত করিয়াছে, পুরাতন দিনের সঙ্গে ঐ একটি যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল চিরকালের জন্য।

আজ তাহার মনে হইল, এই প্রবাসে বৃদ্ধা তাহার সুখদুঃখ যত বুঝিত, এত আর কে বুঝিত? তাহার খাওয়ায় কষ্ট, শোওয়ায় কষ্ট হইলে কামিনীর মনে তাহা বাজিত, সাধ্যমত চেষ্টা করিত সে কষ্ট দূর করিতে। টাকার দরকার হইলে বিপিন যদি হাত পাতিত, কামিনী তাহাকে বিমুখ করিত না কখনও। গতবার যে পঞ্চাশটি টাকা সে ধার দিয়াছিল বিপিন একবার দুইবার চাওয়ামাত্র, সে দেনা বিপিন শোধ করে নাই। পুত্রহীনা বৃদ্ধা তাহাকে সন্তানের মতই স্নেহ করিত।

তাহার বাবার কথা উঠিলে বৃদ্ধা আর কোনও কথা বলিতে ভালবাসিত না। কতবার এ ব্যাপার বিপিন লক্ষ্য করিয়াছে। তরুণ মনের স্পর্দ্ধিত ঔদাসীন্যে হয়তো বিপিন এই ব্যাপারে কৌতুকই অনুভব করিয়া আসিয়াছে বরাবর, আজ তাহার মনে হইতেছে, বৃদ্ধা কি ভালই বাসিত তাহার স্বর্গগত পিতা বিনোদ চাটুজ্জেকে! আগে যাহা সে বুঝিত না, আজকাল তাহা সে ভাল করিয়াই বোঝে। মানী তাহার চোখ খুলিয়া দিয়াছে নানা দিকে।

অথচ আশ্চর্য্য এই যে, মানীকে সে কখনও এ ভাবে দেখে নাই। এই কয় মাসে যে মানীকে সে দেখিতেছে, সে কোন্ মানী? ছেলেবেলার সাথী সেই মানী কিন্তু এ নয়। বালক-বালিকা হিসাবে সে খেলা তো বিপিন অনেক মেয়ের সঙ্গেই করিয়াছে; অন্য পাচটা ছেলেবেলার সঙ্গিনী মেয়ের সহিত যেমন ভাব হয়, মানীর সহিত তাহার বেশি কিছু হয় নাই, এ কথা বিপিন বেশ জানে।

মধ্যে সে হইয়া গিয়াছিল জমিদার অনাদিবাবুর মেয়ে সুলতা।

তখন কলিকাতায় থাকিয়া কোন মেয়ে-স্কুলে মানী পড়িত। খুব সম্ভব ম্যাট্রিক পাসও করিয়াছিল—সে কথা বিপিন ঠিকমত জানে না; বাবা মারা গিয়াছেন তখন, বিপিন আর পলাশপুরে জমিদারবাটিতে আসে নাই।

তবে সুলতার কথা মাঝে মাঝে বিপিনের মনে পড়িত—বাল্যপ্রীতির দিক দিয়া নয়, সুলতা সুন্দরী মেয়ে এইজন্য। না জানি সে এতদিনে কেমন সুন্দরী হইয়া উঠিয়াছে! সেই সুন্দরী সুলতা আবার 'মানী' হইয়া দেখা দিল তো সেদিন!

টাকা যোগাড় করিতে পারিলেই পলাশপুর জমিদারের বাড়ী যাওয়া যায়। কিন্তু এখনও এমন টাকা যোগাড় হয় নাই, যাহা হাতে করিয়া সেখানে যাওয়া চলে। এদিকে বেশি দেরী হইলে যদি মানী চলিয়া যায়!

কামিনী মাসী থাকিলে এসব সময়ে সাহায্য করিত।

উপায় অন্য কিছু না দেখিয়া নরহরি মুচিকে সন্ধ্যার পর ডাকিয়া পাঠাইল। নরহরি আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, নায়েব মশাই, কি জন্যি ডেকেচ? দণ্ডবৎ হই।

—এস নরহরি, ব'স। গোটা কুড়ি টাকা কাল যেখান থেকে পার দিতে হবেই। জমিদারবাবু চেয়েছেন, নিয়ে যেতে হবে।

নরহরি চিন্তিত মুখে বলিল, তাই তো, বিষম হ্যাঙ্গনামায় ফ্যাললেন যে! কুড়ি টাকা এখন কোথায় পাই? আচ্ছা দেখি। কাল বেন্‌বেলা এস্তক যদি যোগাড়যন্তর করতে পারি,

তবে সে কথা বলব। হ্যাঁ, একটা কথা বলি লায়েব মশাই—

—কি ?

—কামিনী পিসীর কিছু টাকা ছেল। সিন্দুক-প্যাটরা খুলে দেখেছেলেন ? ওর বেশ টাকা ছেল হাতে, আমরা যদ্দুর জানি। আপনি তো সে রাত্তিরি ওর কাছে ছেলেন, আপনাকে কিছু ব'লে যায় নি ?

বিপিনের এ কথা বাস্তবিকই মনে হয় না। কামিনীর টাকা ছিল, সে শুনিয়াছে বটে ; কিন্তু তাহার মৃত্যুর সময়ে বা তাহার পরে এ কথা বিপিনের মনে উদয় হয় নাই যে, তাহার টাকাগুলি কোথায় রহিল বা সে টাকার কি ব্যবস্থা কামিনী করিতে চায়।

আর যদি থাকেই টাকা, তাহাতেই বা বিপিনের কি ? কামিনী বিপিনের নামে উইল করিয়া দিয়া যায় নাই, সুতরাং অত গরজ নাই বিপিনের কামিনীর টাকা কোথায় গেল তাহা জানিতে। মুখে বলিল, ছিল ব'লে জানতাম বটে, তবে আমায় কিছু ব'লে যায় নি। কেন বল তো ?

কথাটা বলিয়াই বুঝিল নরহরি যে প্রশ্ন করিয়াছে, তাহার বিশেষ অর্থ আছে। নরহরি বৃদ্ধ ব্যক্তি, তাহার বাবার সঙ্গে কামিনীর সম্পর্ক যে কি ছিল, এ গ্রামের বৃদ্ধ লোকেরা সবাই জানে, কামিনীর টাকার যদি কেহ ন্যায্য ওয়ারিশন থাকে, তবে সে বিপিন। সেই বিপিন কামিনীর মৃত্যুর সময়ে উপস্থিত ছিল অথচ টাকার কথা সে কিছু জানে না, পাড়াগাঁয়ে ইহা কে বিশ্বাস করিবে ?

—কামিনীর বাড়ীতায় ভাল চাবিতালা লাগিয়ে দেবেন, লায়েব মশাই। রাতবিরেতের কাণ্ড, পাড়াগাঁ জায়গা। কখন কি হয়, কার মনে কি আছে, বলা তো যায় না। আচ্ছা, কাল আসব বেন্‌বেলা। এখন যাই।

নরহরি চলিয়া গেলে বিপিন কথাটা ভাবিল। সিন্দুক তোরঙ্গ একবার ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখিবে। টাকাকড়ি এ সময় পাইলে কিছু সুবিধা ছিল বটে। কিন্তু বাক্স ভাঙিয়া টাকা হাতড়াইতে গেলে শেষে কি একটা হাঙ্গামায় পড়িয়া যাইবে! যদি কামিনীর কোন দূর সম্পর্কের ভাসুরপো বাহির হইয়া পড়ে, তখন ? না, সে দরকার নাই। বরং মানীর সঙ্গে পরামর্শ করা যাইবে। তার কি মত জানিয়া তবে যাহা হয় করিলে চলিবে।

সন্ধ্যাবেলা একা বসিয়া একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল বিপিনের জীবনে।

বিপিন কখনও কাহারো জন্ম চোখের জল ফেলে নাই। সে এই দিক দিয়া বেশ একটু কঠোর প্রকৃতির মানুষ, কথায় কথায় চোখের জল ফেলিবার মত নরম মন নয় তাহার। আজ হঠাৎ একা বসিয়া কামিনীর কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার অজ্ঞাতসারে চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। মনে মনে সে একটু লজ্জিত হইয়া উঠিয়া কোঁচার কাপড় দিয়া জল মুছিয়া ফেলিল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহা ভাবিয়াও আশ্চর্য্য হইল, কামিনী মাসীকে সে এতখানি ভালবাসিত!

আজ সে স্নেহময়ী বৃদ্ধা নাই, যে দুধের বাটি, কি লাউটা শসাটা হাতে আসিয়া তাহাকে

খাওয়াইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিবে, দুটা মিষ্ট কথা বলিবে।

নিঃসঙ্গ ঘরের রোগশয্যায় একা মরিল, কেহ আপনার জন ছিল না যে একটু মুখে জল দেয়।

কে জানে, তাহার পিতা স্বর্গগত বিনোদ চাটুজ্জে পুরাতন বন্ধুর মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে অদৃশ্য চরণে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন কি না?

বুড়ী ভালবাসা কাহাকে বলে জানিত। বিনোদ চাটুজ্জে মহাশয় পরলোকগমন করিলে পর আর সে ভাল করিয়া হাসে নাই, ভাল করিয়া আনন্দ পায় নাই জীবনে।

তাহাকে ছুটিয়া দেখিতে আসিত এইজন্য যে, তাহার মুখে-চোখে হাবে-ভাবে স্বর্গীয় নায়েব মহাশয়ের অনেকখানি ফুটিয়া বাহির হয়। কর্তা মহাশয়েরই ছেলে, কর্তা মহাশয়ের তরুণ প্রতিনিধি। তাহার সঙ্গে দুইটা কথা কহিয়াও সুখ।

আজ সে বোঝে, এই যে মানীর সম্বন্ধে কথা বলিতে তাহার ইচ্ছা হয়, কাহারও সঙ্গে অন্তত কিছুক্ষণ সেকথা বলিয়াও সুখ, না বলিলে মন হাঁপাইয়া উঠে, দেখা তো হইতেছেই না, তাহার উপর তাহার সম্বন্ধে কথা না বলিলে কি করিয়া টিকিয়া থাকা যায়—এ রকম তো কামিনী মাসীরও হইত তাহার বাবার সম্বন্ধে!

অভাগিনী যে আনন্দ হয়তো পায় নাই প্রথম জীবনে, ৺বিনোদ চাটুজ্জে নায়েব মহাশয়ের সাহচর্য্যে তাহা সে পাইয়াছিল। তাহার বঞ্চিতা নারী-হৃদয়ের সবটুকু কৃতজ্ঞতা প্রেমের আকারে ঢালিয়া দিয়াছিল তাই নায়েব মহাশয়ের চরণযুগলে। কি পাইয়াছিল, কি না পাইয়াছিল, আজ তাহা কে বুঝিবে? ত্রিশ বছর পরে কে বুঝিবে মানী তাহার জীবনে কি অমৃত পরিবেশন করিয়াছিল একদিন?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১

বেলা পড়িলে বিপিন পলাশপুরে পৌঁছিল।

বাহিরের বৈঠকখানায় শ্যামহরি চাকর ঝাঁট দিতেছিল, বিপিন বলিল, বাবু কোথায় রে?

—রাণাঘাট গিয়েছেন আজ সকালবেলা। সন্দের সময় আসবেন ব'লে গিয়েছেন।

—রাণাঘাটে কেন?

—উকিলবাবু পত্তর দিয়েছেন, বলছিলেন গিন্নীমাকে—কি মামলার কথা আছে। আপনার কথাও হচ্ছিল।

—আমার কথা?

—হ্যাঁ, বাবু বলছিলেন, ধোপাখালির কাছারি থেকে আপনি টাকা নিয়ে এলি আপনাকে রাণাঘাট পাঠাবেন। টাকার বড্ড দরকার নাকি—

—বাড়ীতে কে কে আছেন ?

—গিন্নীমা আছেন, দিদিমণি আছেন। দিদিমণিকে নিতে আসবেন কিনা জামাইবাবু, তাই বাবু বলছিলেন আপনার নাম ক'রে, আপনি এই সময় টাকা নিয়ে এসে পড়লে ভাল হয়, খরচপত্তর আছে।

—ও। তা এর মধ্যে আসবেন বুঝি ?

—আজ্ঞে, পরশু বুধবারে তো শুনছিলাম আসবেন।

—বেশ বেশ, খুব ভাল কথা। জামাইবাবুর সঙ্গে দেখাটা হয়ে যাবে এখন এই সময় তা হ'লে। তুই যা দিকি বাড়ীর মধ্যে। গিন্নীমাকে বল, আমি এসেছি। আর আমার সঙ্গে টাকা রয়েছে কিনা। সেগুলো কি তাঁর হাতে দোব, না বাবু এলে বাবুকে দোব, জিজ্ঞেস ক'রে আয়।

শ্যামহরি বাড়ীর মধ্যে ঢুকিবার একটু পরেই স্থানীয় পুরোহিত বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য আসিয়া হাজির হইলেন। তিনি বৈঠকখানায় উঁকি দিয়া বলিলেন, কে ব'সে ? বিপিন ? বাবু কোথায় ?

বিপিন আশা করিতেছিল এই সময় অনাদিবাবু বাড়ী নাই, মানী তাহার আসিবার খবর শুনিয়া বৈঠকখানায় আসিতে পারে। কিন্তু মানীর পরিবর্ত্তে বৃদ্ধ বটুক ভটচাজকে দেখিয়া বিপিনের সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া গেল।

মুখে বলিল, আসুন ভটচাজ মশাই, বাবু নেই, রাণাঘাটে গিয়েছেন মামলার তদারক করতে। কখন আসবেন ঠিক নেই, আজ বোধ হয় আসবেন না।

এই উত্তর শুনিয়া বুড়া চলিয়া যাইবে এই আশা করাই স্বাভাবিক, কিন্তু তাহা না গিয়া সে দিব্য জাঁকিয়া বসিয়া গেল। বিপিন প্রমাদ গণিল, বৃদ্ধ অত্যন্ত বকবক করে সে জানে, বকুনি পাইলে উঠিতে চায় না—মাটি করিল দেখিতেছি! বাহিরের ঘরে অন্য লোকের গলার আওয়াজ পাইলে মানী সেখানে পা দিবে না। অনাদিবাবু বাড়ী নাই—এমন ঘটনা ক্বচিৎ ঘটে, সাধারণত তিনি কোথাও বাহির হন না। মানীও চলিয়া যাইতেছে, এমন একটা সুবর্ণ-সুযোগ যদি বা ঘটিল তাহার সহিত নির্জ্জনে দুইটা কথা বলিবার, তাহাও যাইতে বসিয়াছে। বটুক ভটচাজ বলিল, মামলা ? কিসের মামলা ?

বিপিন উদাস নিস্পৃহ সুরে বলিল, আজ্ঞে তা ঠিক বলতে পারছি না। শুনলাম, উকিল সুরেনবাবু চিঠি লিখেছিলেন।

—সুরেন উকিল ? কোন্ সুরেন ? সুরেন মুখুজ্জে ?

—আজ্ঞে না, সুরেন তরফদার।

—কালী তরফদারের ছেলে ? সুরেন আবার কি হে! ওকে আমরা পটলা ব'লে জানি। ছেলেবেলা থেকে ওদের বাড়ীতে আমার যাতায়াত, অবিশ্যি আমি ক্রিয়াকর্ম্ম কখনও করি নি ওদের বাড়ী। শূদ্রযাজক হতে পারতাম যদি, তা হ'লে আজ এ দুর্দ্দশা ঘটত না। কিন্তু আমার কর্ত্তা মশায়ের নিষেধ আছে। তিনি মরবার সময় ব'লে গিয়েছিলেন,

বটুক, না খেয়ে কষ্ট যদি পাও, সেও ভাল, কিন্তু নারায়ণ-শিলা হাতে শুদ্দুরের বাড়ী কখনও ঢুকো না। আমাদের বংশে ও কাজ কখনও কেউ করে নি, বুঝলে?

বিপিন বলিল, হুঁ।

—তা সেই পটলা আজ উকিল হয়েছে, কালী তরফদার মারা যাওয়ার পর হাতে কিছু টাকাও আজকাল পেয়েছে শুনেছি। তা ছাড়া টাকা জমাতে কি করে হয়, তা ওরা জানে। হাড় কঞ্জুষ ছিল সেই কালী তরফদার, তার ছেলে তো? ওদের আদি বাড়ী শান্তিপুর, তা জান তো? ওর জ্যাঠামশায় এখনও শান্তিপুরের বাড়ীতেই থাকে। জমিজমা আছে শান্তিপুরে। বেশ বড় বাড়ী, দোমহলা।

—ও।

—অনেকদিন আগে একবার শান্তিপুর গিয়েছি রাস দেখতে, ভারি যত্ন-আত্যি করলে আমাদের। শান্তিপুরের রাস দেখেছ কখনও? দেখবার মত জিনিস; অত বড় মেলা এ দিগরে হয় না কোথাও।

—ও।

—এখানে তামাক-টামাক দেবার কেউ নেই? বল না একটু ডেকে। আর একটু চা যদি হয়, কাউকে ব'লে পাঠাও না। আমি এসেছি শুনলেই বউমা চা পাঠিয়ে দেবেন। তবে শোন, একটা রাসের মেলার গল্প করি। সেবার হ'ল কি জান—ওই যে চাকরটা যাচ্ছে—ও শ্যামহরি, শোন্ একবার এদিকে বাবা, বাড়ীর মধ্যে যা তো, বলগে, ভটচাজ্যি মশাই একটু চা খেতে চাইছেন, আর একবার এক কলকে তামাক দিয়ে যা তো বাবা। বিপিন চা খাবে কি? ও কি, উঠছ কোথায়? ব'স, ব'স।

—আজ্ঞে, আপনি ব'সে চা খান। আমি একটু তাগাদায় যাব ওপাড়ায়, বাবু ব'লে গিয়েছেন, কিছু টাকা পাওয়া যাবে, এখন না গেলে হবে না; সন্ধ্যে হয়ে এল। আমি আসি।

বিপিন বাহির হইয়া পড়িল। বটুক ভটচাজের সঙ্গে বসিয়া গল্প করা বর্তমানে তাহার মনের অবস্থায় সম্ভব নয়।

সব নষ্ট হইয়া গেল। অনাদিবাবু সন্ধ্যার পরই আসিয়া পড়িবেন। তাহাকে তাঁহার সঙ্গে বসিয়া মুখ বুজিয়া খাইতে হইবে; তাহার পর বৈঠকখানায় আসিয়া চুপচাপ শুইয়া পড়িতে হইবে। হয়তো সে সময়ে অনাদিবাবু গড়গড়া হাতে বাহিরে আসিয়া তাহাকে জমিদারী সংক্রান্ত কিছু উপদেশ দিবেন, তাহাও শুনিতে হইবে। তারপর কাল সকালে আর সে কোন্ ছুতায় পলাশপুরে বসিয়া থাকিবে? তাহার তো আসার কথাই ছিল না। টাকা আনিবার ছুতায় সে আসিয়াছে। টাকা ইরশালে ধরা হইয়া গিয়াছে, তাহার কাজও শেষ হইয়াছে। যাও চলিয়া ধোপাখালির কাছারি। মিটিয়া গেল।

বিপিন উদ্‌ভ্রান্তের মত কিছুক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় পায়চারি করিয়া বেড়াইল। সন্ধ্যার বেশি দেরি নাই। হয়তো এতক্ষণ অনাদিবাবু আসিয়া পড়িয়াছেন। আচ্ছা, সে একটু দেরি করিয়াই যাইবে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘোর-ঘোর হইতে বিপিন ফিরিল। উঁকি মারিয়া দেখিল, বটুক ভটচাজ বৈঠকখানায় বসিয়া আছে কিনা। না, কেহই নাই। অনাদিবাবুও আসেন নাই, কারণ উঠানে তাহা হইলে গরুর গাড়ী থাকিত। বাড়ীর গরুর গাড়ী করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই ফিরিবেন্।

গাড়ী উঠানে না দেখিয়া বিপিন যে খুব আশ্বস্ত হইল, তাহা নয়। আসেন নাই বটে, কিন্তু আসিলেন বলিয়া। আর বেশি দেরি হইবার কথা নয়, দুই ক্রোশ পথ গরুর গাড়ী আসিতে।

বিপিন বৈঠকখানায় ঢুকিয়া গায়ের জামাটা খুলিবার আগে একটুখানি বিশ্রাম করিতেছে, এমন সময় অন্দরের দিকের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল—মানী।

বিপিনের সারা দেহে যেন বিদ্যুতের মত কি একটা খেলিয়া গেল। সে কিছু বলিবার পূর্ব্বেই মানী বলিল, আচ্ছা, কি কাণ্ড বল তো বিপিনদা? এলে সেই ধোপাখালি থেকে তেতে-পুড়ে—শ্যামহরি চাকর গিয়ে বললে—চা ক'রে নিয়ে আসছি, এসে দেখি ভটচাজ জ্যাঠা-মশাই ব'সে আছেন, তুমি নেই। ভটচাজ জ্যাঠামশাই বললেন, কোথায় তাগাদায় বেরুলে এইমাত্র। তারপর দুবার এসে খুঁজে গেলাম—কোথায় কে? এলে—চা খাও, জিরোও. তারপর তাগাদায় গেলে হ'ত না কি? প্রজারা পালিয়ে যাচ্ছে না তো।

বিপিনের মাথার মধ্যে সব কেমন গোলমাল হইয়া গিয়াছিল মানীকে দেখিয়া, আমতা আমতা করিয়া বলিল, না, সে জন্যে নয়—তা বেশ ভাল—মেসোমশাই কি রাণাঘাটে—

মানী বলিল, দাঁড়াও, আগে তোমার চা আর খাবার আনি।

মানী কথাটা ভাল করিয়া শেষ না করিয়াই চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

বিপিন দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল, মানী, শোন শোন, যাস নি, দুটো কথা বলি আগে দাঁড়া।

মানী বলিল, দাঁড়াচ্ছি চা-টা আনি আগে। কতক্ষণ লাগবে? স্টোভ ধরাব আর করব। আগে যে চা ক'রেছিলুম, তা তো জুড়িয়ে জল হয়ে গেল।

আবার সে চলিয়া যায়। এদিকে অনাদিবাবুও আসিয়া পড়িলেন বলিয়া। হঠাৎ বিপিন বেদনাপূর্ণ আকুল মিনতির সুরে বলিল, মানী, চা আমি খাব না। তুই যাস নি. একবার আমার কথা শোন্। তুই চা আনতে যাস নি।

মানী বিস্মিত হইয়া বিপিনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কেন বিপিনদা? চা খাবে না কেন? কি হয়েছে তোমার? অমন করছ কেন?

বিপিন লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়িল, সত্যই তাহার কণ্ঠস্বরটা তাহার নিজের কানেই স্বাভাবিক শোনায় নাই কিন্তু সে কি করিবে। মেয়েমানুষ কি কথা শোনে? চা আনিবার ঝোঁক যখন করিয়াছে, তখন চা সে আনিবেই। ধোপাখালি হইতে পথ হাঁটিয়া বিপিন এখানে চা খাইতে আসিয়াছিল?

নিজেকে খানিকটা সংযত করিয়া লইয়া বলিল, মানী, যাস নি।

মানী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

—অনেকদিন তোকে দেখি নি, কথাও বলি নি, এলি আর চ'লে যাবি চা করতে? চা কি এত ভাল জিনিস যে, না খেলে দিন যাবে না। আমি যেতে দোব না তোকে। এখানে দাঁড়িয়ে থাক।

মানী শান্তস্বরে মৃদু হাসিমুখে বলিল, বিপিনদা, মেয়েমানুষের একটা কর্তব্য আছে। তুমি তেতে-পুড়ে এসেছ রাস্তা হেঁটে, আর আমি তোমার মুখে একটু জল দেবার ব্যবস্থা না ক'রে সঙের মত তোমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকব—এ হয় না। তুমি একটু ব'স, আমি আগে চা আনি, খেয়ে যত খুশি গল্প ক'র। আমি পালিয়ে যাচ্ছি না। আমারও কি ইচ্ছে নয় তোমার সঙ্গে দুটো কথা কইবার?

মিনিট পনরো—প্রত্যেক মিনিট এক একটি দীর্ঘ ঘণ্টা—কাটিয়া গেল। মানীর তবুও দেখা নাই।

অনাদিবাবু কি আসিলেন? বাহিরে গরুর গাড়ীর শব্দ হইল না? না, কিছু নয়। অন্য গরুর গাড়ী রাস্তা দিয়া যাইতেছে।

প্রায় পঁচিশ মিনিট পরে মানী আসিল। একটা থালায় খানকতক পরোটা, একটু আলু-চচ্চড়ি, একটু গুড়। বিপিনের সামনে থালা রাখিয়া বলিল, ততক্ষণ খাও, আমি চা আনি। কতক্ষণ লাগল? এই তো গিয়ে ময়দা মেখে বেলে ভেজে নিয়ে এলুম। চায়ের জল ফুটছে, এখুনি আনছি ক'রে। সব কখানা কিন্তু খাবে, নইলে রাগ করব, আস্তে আস্তে খাও।

বিপিনের সত্যই অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছিল। পরোটা কখানা সে গোগ্রাসে খাইতে লাগিল।

অনাদিবাবু বুঝি আসিলেন? গরুর গাড়ীর শব্দ না?

চা করিতে এত সময় লাগে? কত যুগ ধরিয়া মানী কেটলিতে চায়ের জল ফুটাইতেছে—যুগ-যুগান্তর ধরিয়া চায়ের জল ফুটিতেছে।

মানী আসিল। এক পেয়ালা চা এক হাতে, অন্য হাতে একটি ছোট খাগড়াই কাঁসার রেকাবে পান।

—কই, দেখি কেমন সব খেয়েছে? বেশ লক্ষ্মী ছেলে। এই-নাও চা, এই-নাও পান।

বিপিন হাসিয়া বলিল, ভারী খিদে পেয়েছিল, সত্যি বলছি। আঃ, চা-টুকু যে কি চমৎকার লাগছে?

মানী বলিল, মুখ দেখে বুঝতে পারি বিপিনদা। তোমার যে অনেকক্ষণ খাওয়া হয়নি, তা যদি তোমার মুখ দেখে বুঝতে না পারলুম, তবে আবার মেয়েমানুষ কি?

—দাঁড়িয়ে কেন, ব'স ওই চেয়ারখানায়। ভাল কথা, মেসোমশাই তো এখনও এলেন না?

—বাবা ব'লে গিয়েছিলেন কাজ সারতে পারলে আজ আসবেন নয়তো কাল আসবেন। বোধ হয় আজ এলেন না, এলে এতক্ষণ আসতেন।

ওঃ, এত কথা মানীর পেটে ছিল! মানী জানিত যে বাবা আজ ফিরিবেন না, তাই সে নিশ্চিন্ত মনে চা ও খাবার করিতে গিয়াছিল! আর মূর্খ সে ছটফট করিয়া মরিতেছে!

সে বলিল, মানী, তুই অমন ভাবে চিঠি আর আমায় পাঠাসনে। পাড়াগাঁ জায়গার ভাব তুমি জান না, থাক কলকাতায়, যদি কেউ দেখে ফেলে বা জানতে পারে, তাতে নানা রকম কথা ওঠাবে। তোমার সুনাম বজায় থাকে এটা আমি চাই। কেউ কোন কথা তোমাকে এই নিয়ে বললে আমি তা সহ্য করতে পারব না মানী।

মানী বলিল, আমাদের চাকরের হাতে দিয়েছিলুম, সে নিজে চিঠি পড়তে পারে না। তার কাছ থেকে নিয়েই বা কে পড়বে পরের চিঠি, আর তাতে ছিলই বা কি ?

—তুমি আমায় আসতে বলছ এ কথাও আছে। যদি কেউ সে চিঠি দেখত, ওর অনেক রকম মানে বার করত! দরকার কি সে গোলমালের মধ্যে গিয়ে ?

মানী চুপ করিয়া শুনিল, তারপর গম্ভীর মুখে বলিল, শোন বিপিন-দা, আমিও একটা কথা বলি। যদি কেউ সে চিঠি দেখত, তার কি মানে বার করত আমি জানি। তারা বলত, আমি তোমায় দেখতে চেয়েছি, তোমায় নিশ্চয়ই ভালবাসি তবে। এই তো ?

বিপিন অবাক হইয়া মানীর মুখের দিকে চাহিল। মানী এমন কথা মুখ ফুটিয়া কোন দিন বলে নাই। কোন মেয়ে কখন বলে না। 'তোমাকে ভালবাসি' অতি সংক্ষিপ্ত, অতি সামান্য কয়েকটি কথা, কিন্তু এই কথা কয়টির কি অদ্ভুত শক্তি, বিশেষত যখন সেই মেয়েটির মুখ হইতে এ কথা বাহির হয়, যাহাকে মনে মনে ভাল লাগে। প্রণয়পাত্রীর মুখে এই স্পষ্ট সহজ উক্তিটি শুনিবার আশ্চর্য্য ও দুর্ল্লভ অভিজ্ঞতা বিপিনের জীবনে এই প্রথম হইল।

মানীর উপরে সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত ধরনের স্নেহ ও মায়াও হইল। এতদিন যেন সেটা মনের কোণেই প্রচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু বাহিরে ফুটিয়া প্রকাশ পায় নাই। ওগো কল্যাণী, এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতা তোমারই দান, বিপিন সেজন্য চিরদিন তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকিবে।

মানী বলিল, বিপিনদা, কথা বললে না যে ? ভাবছ বোধ হয়, মানীটা বড্ড বেহায়া হয়ে উঠেছে দেখছি, না ?

বিপিন তখনও চুপ করিয়া রহিল। সে অন্য কথা ভাবিতেছিল, মানীর বিবাহিত জীবন কি খুব সুখের নয় ? স্বামীকে কি তাহার মনে ধরে নাই ?

খুব সম্ভব। বেচারী মানী! অনাদিবাবু বড় ঘরে বিবাহ দিতে গিয়া মানীর ভাল লাগা-না-লাগার দিকে আদৌ লক্ষ্য করেন নাই, মেয়েকে ভাসাইয়া দিয়াছেন হয়তো ধনীর সহিত কুটুম্বিতার লোভে।

মানী মৃদু হাসিমুখে বলিল, রাগ করলে বিপিনদা ?

বিপিন বলিল, রাগের কথা কি হয়েছে যে রাগ করব ? কিন্তু আমি ভাবছি মানী, তোর মত মেয়ে আমার ওপর—ইয়ে—একটুও স্নেহ দেখাতে পারে, এর মানে কি ? আমার কোন্ কথা তোর কাছে না বলেছি। কি চরিত্রের মানুষ আমি ছিলাম,

তুই তো সব জানিস। সে হীনচরিত্রের লোককে তোর মত একটা শিক্ষিতা ভদ্র মেয়ে যে এতটুকু ভাল চোখে দেখতে পারে, সেইটেই আমার কাছে বড় আশ্চর্য্য মনে হয়।

মানী বলিল, থাক ও কথা বিপিনদা।

বিপিনের যেন ঝোঁক চাপিয়া গিয়াছিল, আপন মনে বলিয়াই চলিল, না মানী, আমার মনে হয়, আমার সব কথা তুই জানিসনে। কি ক'রেই বা জানবি, ছেলেবেলার পর আর তো দেখা হয়নি! তোকে সব কথা বলি। শুনেও যদি মনে হয়, আমি তোর স্নেহের উপযুক্ত, তবে স্নেহ করিস, ধন্য হয়ে যাব। আর যদি—

মানী বলিল, আমি শুনতে চাইছি বিপিনদা?

—না, তোকে শুনতে হবে। তুমি আমাকে ভারী সাধুপুরুষ ভেবে রেখেছ, সেটা আমি বরদাস্ত করতে পারব না। রাণাঘাটে বা বনগাঁয়ে এমন কোন কুস্থান নেই, যেখানে আমি যাতায়াত করিনি। মদ খেয়ে বাবার বিষয় উড়িয়েছি, স্ত্রীর গায়ের গহনা বন্ধক দিয়ে অন্য মেয়েমানুষের আবদার রেখেছি। যখন সব গেল, মদ জোটেনি, তাড়ি খেয়েছি, হয়তো চুরি পর্য্যন্ত করতাম, কিন্তু নিতান্ত ভদ্রবংশের রক্ত ছিল ব'লেই হোক বা যাই হোক, শেষ পর্য্যন্ত করা হয়নি! তাও অন্য কিছু চুরি নয়, একখানা শাড়ি। শামকুড় পোস্ট-আপিসের বারান্দায় শাড়িখানা শুকুতে দেওয়া ছিল, বোধ হয় পোস্ট-মাস্টারের স্ত্রীর। আমার হাতে পয়সা নেই, শাড়িখানা নতুন আর বেশ ভাল, একজনকে দিতে হবে। সে চেয়েছিল, কিন্তু কিনে দেবার ক্ষমতা নেই। চুরি করবার জন্যে অনেকক্ষণ ধ'রে ঘুরলাম, পাড়াগাঁয়ের ব্রাঞ্চ পোস্ট-আপিস, পোস্ট-মাস্টার আপিস বন্ধ ক'রে ছেলে পড়াতে গিয়েছে। কেউ কোন দিকে নেই। একবার গিয়ে এক দিকের গেরো খুললাম—

মানী চুপ করিয়া শুনিতেছিল, এইবার অধীরভাবে বলিয়া উঠিল, তুমি চুপ করবে, না আমি এখান থেকে চ'লে যাব?

—না শোন, ঠিক সেই সময় একটা ছোট মেয়ে সেখানে এসে দাঁড়াল। সামনেই একটা বাঁধানো পুকুরঘাট। মেয়েটাকে দেখে আমি ডাকঘরের রোয়াক থেকে নেমে বাঁধাঘাটে গিয়ে বসলাম। মেয়েটা চলে গেল, আমি আবার গিয়ে উঠলাম রোয়াকে। এবারে কাপড় নেবোই এই রকম ইচ্ছে। হঠাৎ মনে হল, ছিঃ, আমি না বিনোদ চাটুজ্জের ছেলে? আমার বাবা কত গরীব দুঃখী লোককে কাপড় বিলিয়েছেন আর আমি কিনা একখানা অপরের পরনের কাপড় চুরি করছি? তখন যেন ঘাড় থেকে ভূত নেমে গেল, ঠিক সেই সময় বাড়ীর মধ্যে থেকে একটা ছেলে বার হয়ে এসে বললে, কাকে চান? বললাম, খাম কিনতে এসেছি। খাম পাব? ছেলেটা বললে, না, ডাকঘর বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তখন চ'লে এলাম সেখান থেকে।

মানী বলিল, বেশ করেছিলে, খুব বাহাদুরি করেছিলে। নিজে আর নিজের গুণ ব্যাখ্যায় দরকার নেই, থাক। আমার দেওয়া বইগুলো পড়েছিলে?

—ওই যে বললাম, সব পড়া হয় নি। 'দত্তা'খানা পড়েছি, বেশ চমৎকার লেগেছে।

—'শ্রীকান্ত' পড়নি ?

—সময় পাইনি। সেখানা আনিওনি সঙ্গে, এর পর পড়ব ব'লে রেখে এসেছি কাছারিতে। 'দত্তা'খানা ফেরত এনেছি।

—তোমার কাছে সবই রেখে দাও না, মাঝে মাঝে প'ড়। একলাটি থাক কাছারিতে। আমার সঙ্গে আরও যে সব বই আছে, যাবার সময় তোমার কাছে রেখে যাব। তুমি সেখানে প'ড় ব'সে। আচ্ছা, বল তো বিজয়া কে ?

বিপিন হাসিয়া বলিল, ও! এক্জামিন করা হচ্ছে বুঝি ? মাস্টারনী এলেন আমার।

মানী কৃত্রিম রাগের সুরে অথচ ঈষৎ লাজুক ভাবে বলিল, আবার! উত্তর দাও আমার কথার।

—বিজয়া তোমার মত একটি জমিদারের মেয়ে।

—তারপর ?

—তারপর আবার কি ? নরেনের সঙ্গে তার ভালবাসা হ'ল।—কথাটা বলিয়াই বিপিনের মনে হইল মানী পাছে কি ভাবে, কথাটা বলা উচিত হয় নাই, মানীও তো জমিদারের মেয়ে! 'তোমার মত' কথাটা না বলিলেই চলিত। কিন্তু মানীর মুখ দেখিয়া বোঝা গেল না। সে বেশ সহজ ভাবেই বলিল, মনে হচ্ছে, পড়েছ। ভাল, পড়লে মানুষ হয়ে যাবে। এইবার রবি ঠাকুরের 'চয়নিকা' ব'লে কবিতার বই আছে, সেখানা থেকে কবিতা মুখস্থ ক'র। খুব ভাল ভাল কবিতা।

বিপিন খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল, কবিতা আবার মুখস্থও করতে হবে। উঃ, তুই হাসালি মানী, পাঠশালায় ইস্কুলে যা কখনও হ'ল না, উঃ, এই বুড়ো বয়সে বলে কি না, হি-হি, বলে কি না—

—হাঁ, মুখস্থ করতে হবে। আমার হুকুম। শুনতে বাধ্য তুমি। মানুষ বলে যদি পরিচয় দিতে চাও তবে তা দরকার। যা বলি তাই শোন, হাসিখুশি তুলে রাখ এখন—

কিন্তু অত্যন্ত কৌতুকের প্রাবল্যে বিপিনের হাসি তখনও থামিতে চায় না। মানী মাস্টারনী সাজিয়া তাহাকে কবিতা মুখস্থ করাইতেছে—এই ছবিটা তাহার কাছে এতই আমোদজনক মনে হইল যে, সে হাসির বেগ তখনও থামাইতেই পারিল না।

এবার মানীও হাসিয়া ফেলিল। বলিল, বড্ড হাসির কথাটা কি যে হ'ল তা তো বুঝিনে। আমার কথাগুলো কানে গেল, না গেল না ?

—খুব গিয়েছে। আচ্ছা, তোর কবিতা মুখস্থ আছে ?

—আছেই তো। 'চয়নিকা'র আদ্ধেক কবিতা মুখস্থ আছে।

—সত্যি ? একটা বল না ?

—এখন কবিতা বলবার সময় নয়। আর বললেই বা তুমি বুঝবে কি ক'রে. হয়েছে কি না ? তুমি তো জান ঢেঁকি, কি ক'রে ধরবে ?

—তাতেই তো তোর সুবিধে, যা খুশি বলবি, ধরবার লোক নেই।

মানী মুখে কাপড় দিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল, ওমা, কি দুষ্টু বুদ্ধি!

—তা বল একটা শুনি।

—শুনবে? তবে শোন। দাঁড়াও, কেউ আসছে কি না দেখে আসি, আবার বাইরের ঘরে দাঁড়িয়ে কবিতা বলছি শুনলে কে কি মনে করবে!

একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া মানী স্কুলের ছাত্রীর কবিতা আবৃত্তির ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া শুরু করিল—

'অত চুপি চুপি কেন কথা কও, ও গো মরণ হে মোর মরণ!'

বিপিন হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে আর কি! মানীর কি চোখ মুখের ভাব, কি হাত-পা নাড়ার কায়দা! যেন থিয়েটারের অ্যাক্‌টো করিতেছে। অথচ হাসিবার জো নাই, মুখ বুজিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে শান্ত ছেলেটির মত। এমন বিপদেও মানুষ পড়ে! মানীটা চিরদিনই একটু ছিটগ্রস্ত।

কিন্তু খানিকটা পরে মানীর আবৃত্তি বিপিনের বড় অদ্ভুত লাগিতে লাগিল।—

'যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন, ও গো মরণ হে মোর মরণ!'

এই জায়গাটাতে যখন মানী আসিয়া পৌছিয়াছে, তখন বিপিনের হাসিবার প্রবৃত্তি আর নাই, সে তখন আগ্রহের সঙ্গে মানীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বাঃ, বেশ লাগিতেছে তো পদ্যটা! মানী কি চমৎকার বলিতেছে! অল্পক্ষণের জন্য মানী বদলাইয়া গিয়াছে, তাহার চোখে মুখে অন্য এক রকমের ভাব। কবিতা যে এমন ভাবে বলা যাইতে পারে, তাহা সে জানিত না, কখনও শোনে নাই।

—বাঃ, বেশ, খাসা। চমৎকার বলতে পারিস তো?

মানী যেন একটু হাঁপাইতেছে। নিশ্বাস ঘন ঘন পড়িতেছে, বড় কষ্ট হয় পদ্য আবৃত্তি করিতে, বিশেষত অমনি হাত-পা নাড়িয়া। ভারী সুন্দর দেখাইতেছে মানীকে। মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমিয়াছে, একটু রাঙা হইয়াছে মুখ, বুক ঈষৎ উঠিতেছে নামিতেছে। এ যেন মানীর অন্য রূপ, এ রূপে কখনও সে মানীকে দেখে নাই।

—নেবু খাবে বিপিনদা?

—কি নেবু?

—কমলানেবু, সেদিন কলকাতা থেকে এক টুকরি এসেছে। দাঁড়াও, নিয়ে আসি।

—যাস নি মানী, তুই চ'লে গেলে আমার নেবু ভাল লাগবে না।

মানী যাইতে উদ্যত হইয়াছিল, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বাজে কথা ব'ল না বিপিনদা।

বিপিন হতবুদ্ধি হইয়া বলিল, বাজে কথা কি বললাম?

—বাজে কথা ছাড়া কি? যাক, দাঁড়াও, নেবু আনি।

মানী একটু পরে দুইটি বড় বড় কমলালেবু ছাড়াইয়া একটা চায়ের পিরিচে আনিয়া যখন

হাজির করিল, বিপিনের তখন লেবু খাইবার প্রবৃত্তি আদৌ নাই, অভিমানে তাহার মন বিমুখ হইয়া উঠিয়াছে।

সে শুষ্ককণ্ঠে বলিল, নেবু আমি খাব না। নিয়ে যা।

—কি, রাগ হ'ল অমনিই? তোমার তো পান থেকে চুন খসবার জো নেই, হ'ল কি?

—না না, কিছু হয় নি, তুই যা। মিটে গেল গণ্ডগোল।

—কেন, কি হয়েছে বল না?

—আমার সব কথা বাজে। আমার কথা তোর কি শুনতে ভাল লাগে? আমি যখন বাজে লোক তখন তো বাজে কথা বলবই। তবে ডেকে এনে অপমান করা কেন?

মানী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। পরে গম্ভীরস্বরে বলিল, দেখ বিপিনদা, আমি যা ভেবে বলেছি, তা যদি তুমি বুঝতে পারতে, তবে এমন কথা ভাবতে না বা বলতেও না। তোমার কথাকে কেন বাজে কথা বলেছি, তা বুঝবার মত সূক্ষ্ম বুদ্ধি তোমার ঘটে থাকলে কথায় কথায় অত রাগও আসত না।

বিপিন চুপ করিয়া থাকিবার পাত্র নয়, বলিল, জানিস তো আমার মোটা বুদ্ধি, তবে আর—

মানী পূর্ব্ববৎ গম্ভীরস্বরে বলিল, তোমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করবার সময় নেই এখন আমার, তুমি ব'স। কমলানেবু এই রইল, খাও তো খেও, না খাও রেখে দিও, শ্যামহরি এসে নিয়ে যাবে, আমি চললুম।

কথা শেষ করিয়া মানী এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াইল না।

২

বিপিন কিছুক্ষণ গুম হইয়া বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বের তাহার মনের সে আনন্দ আর নাই, জগৎটা যেন এক মুহূর্ত্তে বিস্বাদ হইয়া গেল। মানী এমন ধরণের কথা কখনও তাহাকে বলে নাই। মেয়েমানুষ সবই সমান, যেমন মানী তেমনই মনোরমা। মিছামিছি মনোরমার প্রতি মনে মনে সে অবিচার করিয়াছে। মানীও রাগী কম নয়, এখন দেখা যাইতেছে। স্বরূপ কি আর দুই একদিনে প্রকাশ হয়, ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হয়। যাক্। ওসব কথায় দরকার নাই। সে আজই—এখনই ধোপাখালি কাছারিতে ফিরিবে। কত রাত আর হইয়াছে। সাতটা হয়তো। দুইঘণ্টা জোর হাঁটিলে রাত নয়টার মধ্যে খুব কাছারি পৌছানো যাইবে। কমলালেবু খাওয়ার দরকার নাই আর।

কিন্তু একটা মুশ্‌কিল হইয়াছে এই, অনাদিবাবু এখনও রাণাঘাট হইতে ফিরিলেন না। সঙ্গে যে টাকা আছে, তাহা ইরশাল না করিয়া কি ভাবে যাওয়া যায়? সে আসিয়া কেন চলিয়া গেল হঠাৎ, না খাইয়া রাত্রিবেলাতেই চলিয়া গেল, একথা যদি অনাদিবাবু

জিজ্ঞাসা করেন, তখন সে কি জবাব দিবে? তাঁহার মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া চলিয়া আসিয়াছে—একথা বলিতে পারিবে না!

বিপিন ঠিক করিল, আর একটু অপেক্ষা করিয়া সে দেখিবে অনাদিবাবু আসেন কিনা। দেখিয়া যাওয়াই ভাল। বাড়ীর মধ্যে মানীর মায়ের কাছে টাকা দেওয়া চলে না, তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন এত রাত্রে সে না খাইয়া কেন কাছারি ফিরিবে। যাইতে দিবেন না, পীড়াপীড়ি করিবেন। সব দিকেই বিপদ।

মানী কেন ও কথা বলিল? বড্ড হেঁয়ালির ধরণের কথাবার্ত্তা বলে আজকাল। কি গূঢ় অর্থ না জানি উহার মধ্যে নিহিত আছে! আছে থাকুক, গূঢ় অর্থ মাথায় থাকুক, সে এখন চলিয়া যাইতে পারিলে বাঁচে।

কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও অনাদিবাবু আসিলেন না। রাত নয়টা বাজিয়া গেল, পল্লীগ্রামে ইহারই মধ্যে খাওয়া-দাওয়া চুকিয়া যায়। একবার শ্যামহরি চাকর আসিয়া বলিল, মা ব'লে পাঠালেন আপনি একা খেয়ে নেবেন, না বাবু এলে খাবেন?

বিশিন বলিল, বলগে বাবু এলে খাব এখন একসঙ্গে। কিন্তু রাত দশটা বাজিয়া গেল, তখনও অনাদিবাবুর দেখা নাই। অগত্যা সে বাড়ীর মধ্যে একাই খাইতে গেল।

মানীর মা পরিবেশন করিতেছিলেন, মানী সেখানে নাই। বিপিনের মন ভাল ছিল না, সে অন্যমনস্কভাবে তাড়াতাড়ি খাইতে লাগিল। যেন খাওয়া শেষ করিতে পারিলে বাঁচে।

মানীর মা বলিলেন, বিপিন, টাকাকড়ি কিছু এনেছ নাকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ মাসিমা, মেসোমশাই তো এলেন না রাণাঘাট থেকে, আমি কাল খুব ভোরে চ'লে যাব ধোপাখালি কাছারি। টাকা আপনি নিয়ে রাখুন। খেয়ে উঠে আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

—কাল সকালেই কাছারি যাবে কেন? কর্ত্তার সঙ্গে দেখা ক'রে যাবে না? তিনি ব'লেই গিয়েছিলেন, আজ যদি না আসেন, কাল নিশ্চয়ই আসবেন সকাল আটটার মধ্যে।

—আমার থাকা হবে না মাসিমা, কাজ আছে।

—কাল জামাই আসবেন মানীকে নিতে, এদিকে দেখ বাবা, মেয়ে কি হয়েছে সন্ধ্যের পর থেকে। ওপরে শুয়ে আছে, খায়নি দায়নি। ওর আবার কি যে হ'ল! এদিকে কর্ত্তা নেই বাড়ী, তুমি যাচ্ছ চ'লে, আমি আথান্তরে প'ড়ে যাব তা হ'লে।

বিপিন ভাতের গ্রাস হাতে তুলিয়াছিল, মুখে না দিয়া সেই অবস্থাতেই মানীর মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া কথাটা শুনিতেছিল। কথা শেষ হইতে বলিল, কি হয়েছে মানীর?

—কি হয়েছে কি জানি বাবা। দুবার ওপরে গেলাম, বালিশে মুখ গুঁজে প'ড়ে আছে, উঠলও না। বললে, আমার শরীর ভাল না, রাত্তিরে খাব না কিছু। বললুম, একটু গরম দুধ খাবি? বললে তাও খাবে না। কি জানি বাবা, কিছুই বুঝলুম না। একালের ধাতের মেয়ে, ওদের কথা আদ্ধেক থাকে পেটে, আদ্ধেক মুখে, কি হয়েছে না হয় বল, তাও বলবে না।

বিপিন আহারাদি শেষ করিয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিল বটে, কিন্তু নিদ্রা যাইবার এতটুকু ইচ্ছা মনে জাগিল না। মানীর মনে নিশ্চয়ই সে কষ্ট দিয়াছে, মানীর অসুখবিসুখ কিছুই নয়, বাহিরের ঘর হইতে গিয়াই সে উপরের ঘরে শুইয়া পড়িয়াছে। কেন? কি বলিয়াছিল সে মানীকে? সে চলিয়া গেলে লেবু ভাল লাগিবে না—এই কথার মধ্যে প্রেমনিবেদনের গন্ধ পাইয়া কি মানী নিজেকে অপমানিতা মনে করিয়াছে? কিন্তু এ ধরণের কথা সে তো ইতিপূর্ব্বে আরও কয়েকবার মানীকে বলিয়াছে, তাহাতে তো মানী চটে নাই!

বিপিনের মন বলিল এ কারণ আসল কারণ নয়। অন্য কোনও ব্যাপার আছে ইহার মধ্যে। তা ছাড়া মানীর অত যত্নে দেওয়া লেবু সে খাইতে চাহে নাই, রাগের মাথায় অত্যন্ত রূঢ়ভাবে মানীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়াছিল। ছিঃ ছিঃ, কি অন্যায় সে করিয়া বসিয়াছে! মানীর মত তাহার শুভাকাঙ্ক্ষিণী জগতে খুব বেশি আছে কি?

রাত তিনটে পর্য্যন্ত বিপিনের ঘুম হইল না। মানীর সঙ্গে যদি এখনই একবার দেখা হইত! সত্যই, সে বড় আঘাত দিয়াছে মানীর মনে। মানীর নিকট ক্ষমা না চাহিয়া সে ধোপাখালি যাইতে পারিবে না। কে জানে হয়তো এই মানীর সঙ্গে শেষ দেখা। এ চাকুরি কবে আছে, কবে নাই। আজ সে অনাদিবাবুর নায়েব, কালই সে অন্যত্র চলিয়া যাইতে পারে। মানী হয়তো কতদিন এখন আর আসিবে না। অনুতাপের কাঁটা চিরদিনই ফুটিয়া থাকিবে বিপিনের মনে।

সকাল হইলে যে-কোন ছুতায় মানীর সঙ্গে দেখা করিতেই হইবে। না হয়, দুপুরে আহারাদি করিয়া কাছারি রওনা হইলেই চলিবে এখন। মানীর মনের কষ্ট না মুছাইয়া সে এ স্থান ত্যাগ করিবে না।

৩

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। শেষরাত্রের দিকে বিপিনের ঘুম আসিয়াছিল, কাহাদের ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকিতে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। চোখ মুছিতে মুছিতে উঠানের দিকে চাহিয়া দেখিল, একখানা গরুর গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে, গাড়োয়ান একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন উঁচু করিয়া হাঁকডাক করিতেছে, অনাদিবাবু ছইয়ের ভিতর হইতে নামিতেছেন।

শ্যামহরি চাকরও বৈঠকখানায় শোয়, বিপিন তাহাকে জাগাইয়া তুলিল। অনাদিবাবু বিপিনকে দেখিয়া বলিলেন, এই যে বিপিন! তোমার কথাই ভাবছিলাম। বড্ড জরুরি কাজে রাণাঘাট যেতে হবে তোমাকে কাল সকালেই। আজ রাত্রেই তোমায় কাগজপত্র দিয়ে দিই, কাল বেলা আটটার মধ্যে উকিল-বাড়ী দাখিল ক'রে দিতে হবে। ভাবছিলাম কাকে দিয়ে পাঠাই। তুমি এ সময়ে এসে পড়েছ, খুব ভাল হয়েছে। ব'স, আমি আসছি

ভেতর থেকে। সেখান থেকে বেরিয়েছি রাত দশটার পরে। নতুন গরু, চলতে পারে না পথে, এখন রাত তো প্রায়—। আঃ, কি কষ্টই গিয়েছে সারারাত!

বাড়ীর ভিতর হইতে তখনই ফিরিয়া অনাদিবাবু বিপিনকে কাগজপত্র বুঝাইয়া দিলেন। বলিলেন, আমি গিয়ে শুয়ে পড়ি, তুমিও শোও। এখনও ঘণ্টা দুই রাত আছে। ভোরে উঠে চ'লে যেও। যদি উকিলবাবু ছেড়ে দেন, তবে কালই ওখানে খাওয়াদাওয়া ক'রে বিকেল নাগাৎ এখানে চ'লে এস। কাল আবার আমার মেয়েকে নিতে জামাই আসছেন কলকাতা থেকে, পার তো কিছু মিষ্টি এন সাধুচরণ ময়রার দোকান থেকে। এই একটা টাকা নিয়ে যাও।

খুব ভোরে উঠিয়া বিপিন রাণাঘাট রওনা হইল। যাইবার সময় সারাপথ দেখিল, খুব ভোরে উঠিয়া চাষারা জমি নিড়াইতেছে। এবার বৈশাখের প্রথমে বৃষ্টি হইয়া ফসল বুনিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছিল, এখন বৃষ্টি আদৌ নাই, জমিতে জমিতে নিড়ানি দেওয়া চলিতেছে। হয়তো এবার জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি বর্ষা নামিবে—এই ভয়ে চাষারা শীঘ্র শীঘ্র ছাঁটার কাজ শেষ করিতে চায়। সারাপথ দুইধারে মাঠে ধান-পাটের ক্ষেতে চাষারা জমি নিড়াইতেছে।

ভোরের অতি সুন্দর মিষ্টি বাতাস। মাঠে ও পথের ধারে ছোট বড় গাছে সোঁদালি ফুলের ঝাড় ঝুলিতেছে, বিশেষ করিয়া কানসোনার মাঠে। রেলের ফটক পার হইয়া আবাদ তত নাই, ফাঁকা মাঠের মধ্যে চারিধারে শুধুই সোঁদালি ফুলের গাছ।

কলাধরপুরের বিশ্বাসদের বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে বিপিন একবার তামাক খাইবার জন্য বসিল। প্রতিবার রাণাঘাট হইতে যাতায়াতের পথে এইটা তাহার বিশ্রামের স্থান। বিশ্বাসদের বাড়ীর সকলেই বিপিনকে চেনে। বিশ্বাসদের বড়কর্ত্তা রাম বিশ্বাস চণ্ডীমণ্ডপের সামনে পাটের দড়ি পাকাইতে ব্যস্ত ছিলেন। বিপিনকে দেখিয়া বলিলেন, এই যে আসুন চাটুজ্জে মশায়, প্রণাম হই। আজ যে বড্ড সকালে রাণাঘাট চলেছেন, মোকদ্দমা আছে না কি? উঠে বসুন ভাল হয়ে। একটু চা ক'রে দিক?

—না না, চায়ের দরকার নেই। একটু তামাক খাই বরং।

—আরে, তামাক তো খাবেনই, চা একটু খান। অত সকালে তো চা খেয়ে বেরোননি? এখন সাতটা বাজে, আমিও তো চা খাব। বসুন, চার ক্রোশ রাস্তা হেঁটেছেন এর মধ্যে, কষ্ট কম হয়েছে? একটু জিরোন।

মানীর সঙ্গে ফিরিয়া আজ দেখা হইবে কি? আর দেখা হওয়া সম্ভবও নয়। দেখা হইলেও কথাবার্ত্তা তেমন ভাবে হইবে না। জামাইবাবু আসিবেন, কর্ত্তা বাড়ী রহিয়াছেন। তবুও একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে।

বিশ্বাস মহাশয় চা ও মুড়ি আনিয়া দিলেন। বিপিন খাইতে খাইতে বলিল, এবার পাট ক'বিঘে বুনলেন বিশ্বেস মশায়?

—তা ধরুন, প্রায় বারো-চোদ্দ বিঘে হবে। বুনলে কি হবে, খরচা পোষায় না, দশ টাকা করে দুটো কিষাণ, তা বাদে জন-মজুর তো আছেই। পাটের দর তো উঠল না। ওই

দেখুন ছত্রিশ সালে পাটের দর ভাল পেয়ে উত্তরের পোতায় বড় ঘরখানা তুলতে গিয়েছিলাম, আদ্ধেক গাঁথুনি হয়ে দেখুন প'ড়ে আছে, আর দর পেলাম না, তা কি হবে?

—আপনার বড়ছেলে কোথায়?

—সে ওই বীজপুরে কারখানায় ত্রিশ টাকা মাইনেয় ঢুকেছে, রং মিস্ত্রী। আমি বলি, ও কেন, বাড়ীতে এসে ফলাও ক'রে চাষ-বাস লাগা। মেসে খায়, একটু দুধ ঘি পেটে যায় না, শরীর মাটি। ওমাসে বাড়ী এসেছিল, আমার স্ত্রী এক বোতল ঘরের গাওয়া ঘি সঙ্গে পাঠিয়ে দিলে আবার। ঐ খাটুনি, দুধ ঘি না খেলে শরীর থাকে? উঠলেন? ফিরবার পথে পায়ের ধুলো দিয়ে যাবেন। না হয় এখানেই ফিরবার সময় দুটো স্বপাকে আহার ক'রে যাবেন এখন।

—না না, আমি সেখানেই খাব। উকিলের কাজ মিটতে বেলা এগারোটা বাজবে। তারপর হয়তো একবার কোর্টেও যেতে হবে স্ট্যাম্পভেণ্ডারের কাছে। ফিরতে তো তিনটের কম হবে না। আচ্ছা, আসি।

—আজ্ঞে আসুন, প্রণাম হই।

রাণাঘাট কোর্টে বিপিনের স্বগ্রামের নিবারণ মুখুজ্জের সঙ্গে দেখা। নিবারণ মুখুজ্জে বিপিনকে দূর হইতে দেখিয়া কাছে আসিলেন, বিপিন প্রথমে তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই।

—কে বিপিন? কোর্টে কাজে এসেছিলে বুঝি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, কাকা। আপনি?

—আমিও এসেছিলাম একবার একটা কাগজের নকল নিতে। আমার আবার একটু ব্রহ্মোত্তর জমি নদীয়ার এলাকায় পড়ে কিনা? সেজন্যে রাণাঘাট ছুটোছুটি করতে হয়। হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে বাবা। দেখা হ'ল ভালই হ'ল। একটু আড়ালের দিকে চল যাই, গোপনীয় কথা।

বিপিন একটু কৌতূহলী হইয়া নিবারণ মুখুজ্জের সহিত লোকজন হইতে একটু দূরে গেল।

—বাবা, কথাটা খুব গুরুতর। তোমার বাড়ীর সম্বন্ধেই কথা। তুমি থাক বার মাস বিদেশে, নিশ্চয়ই তোমার কানে এখনও ওঠেনি। বড্ড গুরুতর কথা আর বড় দুঃখের কথা।

বিপিন আশঙ্কায় উদ্বেগে কাঠ হইয়া গেল। বাড়ীর সম্বন্ধে কি গুরুতর, আর কি দুঃখের কথা! প্রথমেই তাহার মুখ দিয়া আপনা আপনি বাহির হইয়া গেল—কাকাবাবু, বেঁচে আছে তো?

তাহার বুকের মধ্যে কেমন ধড়াস ধড়াস করিতেছে, জজের মুখে ফাঁসির হুকুম শুনিবার ভঙ্গিতে সে আকুল ও শঙ্কিত দৃষ্টিতে নিবারণ মুখুজ্জের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

নিবারণ মুখুজ্জে বলিলেন, না না, সে সব কিছু নয়। ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। বলেই ফেলি। এই গিয়ে তোমার বোনকে নিয়ে গাঁয়ে কথা উঠেছে - মানে ওপাড়ার পটলের সঙ্গে সর্ব্বদাই মেলামেশা করে আসছে তো অনেকদিন থেকেই—সম্প্রতি একদিন নাকি সন্দেবেলা তোমাদের বাড়ীর পেছনে বাগানে কাঁটালতলায় দুজনকে একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল

—যে দেখেছিল সে-ই বলেছে। এই নিয়ে গাঁয়ে খুব কথা চলছে। এই সময় তোমার একবার যাওয়া খুব দরকার বলে মনে করি।

বিপিন শুনিয়া অবাক হইয়া গেল—তাহার বোন অসঙ্গত কিছু করিতে পারে ইহা তাহার মাথায় আসে না। তাহাকে বিপিন নিতান্ত ছেলেমানুষ বলিয়া জানে—আচ্ছা, যদি পটলের সঙ্গে কথাই ব'লিয়া থাকে তাহাতে দোষ বা কি আছে ?

পরক্ষণেই তাহার মনে হইল বাড়ী যাওয়াটা খুব দরকার বটে এসময়। পলাশপুরে এমন কোনো জরুরী দরকার নাই, যে আজ না ফিরিলেই চলিবে না। বরং একবার বাড়ী ঘুরিয়া আসা যাক্।

৪

বৈকালের দিকে বিপিন গ্রামে পৌঁছিল। বাড়ী ঢুকিতেই প্রথমে মনোরমার সঙ্গে দেখা। স্বামীকে হঠাৎ এভাবে আসিতে দেখিয়া সে যেন একটু অবাক হইয়া গেল। বলিল—কখন এলে, কোন্ গাড়ীতে ? চিঠি তো দাও নি ? ভাল আছ তো ?

বিপিন পুঁটুলিটা স্ত্রীর হাতে দিয়া বলিল—ধরো এটা। মার জন্যে বাতাসা আছে, ভেঙ্গে না যায় দেখো। নেবেঞ্চুস্ আছে, ছেলেপিলেদের ডেকে দাও। তোমরা কেমন আছ ? বলাই কোথায় ?

—বলাই গিয়েছে মাছ ধরতে।

—কেমন আছে সে ?

মনোরমা চুপ করিয়া রহিল।

—কেমন আছে বলাই ?

—ভালো না। আমার কথা কেউ তো শোনে না, যা পাচ্চে তা খাচ্চে, রোজ নদীর ধারে মাছ ধরতে গিয়ে জলের হাওয়ায় বসে থাকে। জর হয় রোজ রাত্তিরে—তার ওপর খায়-দায়। ওষুধবিষুধ কিছুই না।

—মুখ হাত পা কেমন আছে ?

—বেজায় ফোলা। এলেই দেখে বুঝতে পারবে। আর একটা কথা শুনেচ ?

—হ্যাঁ, নিবারণ কাকার মুখে শুনলাম রাণাঘাটে। কি ব্যাপার বলো তো ?

—যা শুনেছ, সব সত্যি। আমার কথা ঠাকুরঝি একেবারে শোনে না—কতদিন বারণ করেছি। মাকেও বলে দিইছি, মা শুনেও শোনেন না। এখন গাঁয়ে ঢি ঢি পড়ে গিয়েছে—এখন আমার কথা হয় তো তোমাদের ভাল লাগলেও লাগতে পারে। দাসী-বাঁদীর মত এ বাড়ীতে আছি বই তো নয় ?

বিপিন বিরক্ত হইয়া বলিল—আঃ, যা জিজ্ঞেস করছি তার উত্তর দাও না আগে। তুমি

নিজের চোখে কিছু দেখেছ ?

—কত দিন। তোমাকে বললেই তুমি রেগে যাবে বলে কিছু বলিনি—মাকে বলে কি হবে—বলা না বলা দুই সমান।

—আচ্ছা থাক্। বীণাকে একবার ডেকে দাও—আমি তাকে দুএকটা কথা বলি। তুমি এ ঘর থেকে যাও।

কিন্তু মনোরমা ঘর হইতে চলিয়া গেলেও বীণার আসিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। এ ব্যাপার লইয়া সে কি বলিবে ? বীণা তাহার ছোট বোন। কখনও তাহাকে সে রূঢ় কথা জীবনে বলে নাই—বিশেষ করিয়া বীণা বিধবা হইবার পরে বিপিন সাধ্যমত চেষ্টা করে ছেলেমানুষ বীণাকে কি করিয়া একটুখানি সুখী করা যায়। বিপিন ভাবিতে লাগিল—বীণার দোষ কি ? অল্প বয়সে বিধবা! ওর মনের কোন্ সাধই বা পুরেছে ? পটলকে হয়তো ওর চোখে ভাল লেগেছে—সম্পূর্ণ সম্ভব। ছেলেবেলা থেকেই পটলের সঙ্গে ওর ভাব ছিল, আর কেউ না জানুক, আমি জানি। যদি পটলের সঙ্গে দুটো কথা কয়ে ওর তৃপ্তি হয়—তা আমি বারণ করি বা কি ভাবে!…তবে বীণা ছেলেমানুষ, সংসারের কি-ই বা জানে! কত বিপদ আছে কত দিকে, সে কি তার খবর রাখে ? না—আমার কাজ নয়। মনোরমাকে দিয়ে বলাতে হবে।

হঠাৎ তাহার মনে আসিল মানীর কথা।

সেও তো এই রকম ছেলেবেলার বন্ধুত্ব। মানী বিবাহিতা, তার স্বামী শিক্ষিত, মার্জ্জিত, ভদ্র যুবক। তবে মানী কেন তাহার সহিত কথা বলিতে আসে ? কেন তাহাকে দেখিবার জন্য মানীর এত আগ্রহ ?

এসব কথার কোন মীমাংসা নাই। মীমাংসা হয় না। এই যে সে আজ বাড়ী আসিয়াছে—সারা পথ. সারা ট্রেনে কাহার কথা সে ভাবিয়াছে ?

নিজের মনকে চোখ ঠারা চলে না। ছেলেমানুষ বীণাকে সে কি দোষ দিবে ? তাহার বাবা কি করিয়াছিলেন ?

যাক ওসব কথা। মনোরমাকে দিয়া বীণাকে বলাইতে হইবে। গ্রামে কোন কুৎসা রটে বীণার নামে—তাহা কখনই হইতে দেওয়া চলিবে না। আবশ্যক হইলে বীণাকে এখান হইতে সরাইয়া ধোপাখালি কাছারিতে নিজের কাছে কিছুদিন না হয় রাখিবে।

এই সময় বীণা ঘরে ঢুকিয়া বলিল—ডাকছিলে দাদা ?

বিপিন চোখ তুলিয়া বীণার দিকে চাহিল। অনেক দিন ভাল করিয়া সে বীণাকে দেখে নাই। বীণার মুখশ্রী আজকাল এত সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে! কি সুন্দর দেখিতে হইয়াছে বীণা! চোখ দুটি যেমন ডাগর. তেমনি স্নিগ্ধ। মুখখানি এখনও ছেলেমানুষের মতই। এ চোখে ও মুখে কোন পাপ থাকিতে পারে ?

বিপিন বলিল—বলাই কোথায় ?

—ছোড়দা মাছ ধরতে গিয়েছে।

—তোর শরীর ভাল আছে তো?

—হ্যাঁ। তুমি হঠাৎ চলে এলে যে?

—এম্‌নি। রাণাঘাটে এসেছিলাম কাজে—ভাবলুম একবার বাড়ী ঘুরে যাই। হ্যাঁ, মা কোথায়?

—মা বড়ির ডাল ধুতে গিয়েছেন পুকুরের ঘাটে। ডেকে আনবো?

—থাক এখন ডাকার দরকার নেই, তোর সঙ্গে একটা কথা ছিল।

—কি বল না?

—তুই পটলের সঙ্গে বেশ মেলামেশা করিস্ নে। গাঁয়ে ওতে পাঁচরকম কথা উঠছে—আমরা গরীব লোক, আমাদের পক্ষে সেটা ভাল নয়।

বিপিন কথাটা মরীয়া হইয়া বলিয়াই ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও লক্ষ্য না করিয়া পারিল না, পটলের কথা বলিতেই বীণার চোখ মুখের ভাব যেন কেমন হইয়া গেল—যে ভাব সে বীণার মুখে-চোখে কখনও দেখে নাই।

মনোরমার কথা তাহা হইলে মিথ্যা নয়—নিবারণ মুখুজ্জেও বাজে কথা বলেন নাই। পূর্ব্বে হইলে হয় তো বিপিন বীণার এ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিত না—কিন্তু গত কয়েক মাসের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে বিপিন এসব লক্ষণ বুঝিতে পারে এখন।

বীণা কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নিজেকে যেন সামলাইয়া লইয়া সহজ ভাবেই বলিল—যা বলো দাদা। পটল-দা আসে, কথাবার্ত্তা বলে—তাই বলি। না হয় আর বলবো না।

বিপিন বুঝিল ইহা মিথ্যা আশ্বাস। বীণা ছলনা করিতেছে—পটলের সঙ্গে তাহার কিছুই নাই, ইহা সে দেখাইতে চায়—আর একটি খারাপ লক্ষণ। ছেলেমানুষ বীণা ভাবিয়াছে ইহাতেই দাদার চোখে ধূলা দেওয়া যাইবে - যাইতও যদি মানীর সঙ্গে পলাশপুরের বাড়ীতে তাহার দেখা না হইত।

ইহা ঠিকই যে বীণা মিথ্যা কথা বলিতেছে। পটলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা সে বন্ধ করিবে না। লুকাইয়া দেখা করিবার চেষ্টা করিবে। বিপিন বুঝিল, সে বীণা আর নাই, তাহার ছোট বোন সরলা ছেলেমানুষ বীণা এ নয়, এ প্রেমমুগ্ধা তরুণী নারী, প্রেমিকের সহিত মিশিবার সুবিধা খুঁজিতে সব রকম ছলনা এ অবলম্বন করিবে। সহোদরা বটে, কিন্তু বীণাকে আর বিশ্বাস নাই। বীণা দূরে সরিয়া গিয়াছে।

বিপিন তবুও হাল ছাড়িল না। বীণাকে কাছে বসাইয়া তাহাদের বংশের পূর্ব্ব গৌরব সবিস্তারে বর্ণনা করিল। গ্রাম্য কুৎসা যে ভয়ানক জিনিস, তাহাতে একটি গৃহস্থের ভবিষ্যৎ কি ভাবে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, দু একটা কাল্পনিক দৃষ্টান্ত দিয়া তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিল। বীণা খানিকক্ষণ মন দিয়া শুনিল - কিন্তু ক্রমশঃ সে যেন অধীর হইয়া পড়িতেছে, দু একবার উঠিবার চেষ্টা করিয়াও সে সাহস পাইতেছে না—দাদার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাইতে পারিলে যেন বাঁচে—এরূপ ভাব তাহার চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

৫

এই সময়ে বলাই আসিয়া পড়াতে বিপিনের বক্তৃতা আপনা আপনিই বন্ধ হইয়া গেল। বলাই ঘরে ঢুকিয়া বলিল—দাদা, কখন এলে? মাছ ধরে এনেছি দেখবে এস—মস্ত একটা শোল মাছ আর দুটো ছোট ছোট বান—

বিপিন বলাইয়ের চেহারা দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। মুখ আরও ফুলিয়াছে, শরীরে রক্ত নাই—পায়ের পাতা বেরিবেরি রোগীর মত দেখিতে, চোখের কোণ সাদা। অথচ এই চেহারা লইয়া বলাই দিব্য মনের আনন্দে মাছ ধরিয়া বেড়াইতেছে, খাওয়া-দাওয়া করিতেছে।

ভগবান এ কি করিলেন? চারিদিক হইতে তাহার জীবনে বিপদ ঘনাইয়া আসিতেছে, তাহা বুঝিতে বাকি নাই। বলাই বাঁচিবে না। নেফ্রাইটিসের রোগীর শেষ অবস্থা তাহার চেহারায় পরিস্ফুট—অথচ সে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত আছে তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে।

বিপিন বলাইকে কিছু বলিল না। বলিয়া কোন ফল নাই—যেমন বীণাকে বলিয়া কোন ফল নাই। কেহই তাহার কথা শুনিবে না। সে চাকুরি করিতে বাহির হইলেই উহারা যাহা খুশী তাহাই করিবে। এ জগতে কেহ কাহারও কথা শোনে না—সবাই স্বার্থপর, যাহার যাহা ভাল লাগে—সে তাহাই করে, অন্য কারো মুখের দিকে চাহিবার অবসর তখন তাহাদের বড় একটা থাকে না। সে নিজে সারাজীবন তাহাই করিয়া আসিয়াছে—এখনও করিতেছে—অপরের দোষ দিয়া লাভ কি?

দুপুরের পর সে নিজের ঘরে বিশ্রাম করিতেছে, মনোরমা ঘরে ঢুকিয়া বলিল—ঘুমুলে নাকি?

—না ঘুমুই নি। বসো।

মনোরমা বিছানার এক কোণে বিপিনের মাথার কাছে বসিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—বীণাকে বল্লে কিছু নাকি?

—বলেছি।

—ও কি বল্লে?

—বল্লে, পটলের সঙ্গে আর কথা বলবে না।

—একটা কথা বলি শোন। ওরকম করলে হবে না কিছু। বীণা ঠাকুরঝি যাই বলুক, পটলের সঙ্গে দেখা না করে পারবে না। তুমি বাড়ী থেকে বেরুতে যা দেরি। তার চেয়ে এক কাজ করো, পটলকে একবার বলে যাও কথাটা। ওকে ভয় দেখাও, বাড়ী আসতে বারণ করে যাও—তাতে কাজ হবে। বুঝলে আমার কথা?

বিপিন মনে মনে মনোরমার বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া পারিল না। মেয়েমানুষের মন সে অনেক বেশি বোঝে তাহার নিজের চেয়ে।

মনোরমা আবার বলিল—না হয় পাড়ার পাঁচজনকে ডেকে তাদের সামনে পটলকে দুকথা বল। এ বাড়ী আসতে মানা করে দাও। তাতে দুকাজই হবে। গাঁয়ের লোক

জানুক তুমি বাড়ী এসে দুজনকেই শাসন করে দিয়েছ—পটলেরও একটা ভয় আর লজ্জা হবে—সে হঠাৎ এ বাড়ীতে আসতে পারবে না।

—কিন্তু তাতে একটা বিপদ আছে। গাঁয়ের লোকের কথা আমিই বা অনর্থক গায়ে মেখে নিতে যাই কেন? তাতে উল্টো উৎপত্তি হবে না?

—কিছু উল্টো উৎপত্তি হবে না। বেশ, ভয় দেখিয়ে, না হয় মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে বলো পটলকে। যখন এরকম একটা কথা উঠেছে—তখন ভাই আমাদের বাড়ী আর তোমার যাওয়া-আসাটা ভাল দেখায় না—এই ভাবে বল।

—তাই তবে করি। এদিকে আর একটা কথা বলি শোনো। বলাইয়ের অবস্থা ভাল নয়। আজ দেখে বুঝলাম ও আর বেশী দিন নয়।

—বল কি গো? অমন বলতে নেই।

—আর বলতে নেই! মনোরমা, সামনে আমার অনেক বিপদ আসছে আমি বুঝতে পেরেছি। এই বীণার ব্যাপার, বলাইয়ের চেহারা—এ সব দেখে তোমারই বা কি মনে হয়? আমার এখন পলাশপুরে যাওয়া হয় না।……

সেই রাত্রেই বিপিনের আশঙ্কা বাস্তবে পরিণত হইল। শেষ রাত্রি হইতে বলাই হঠাৎ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িল, মাঝে মাঝে চিৎকার করে, মাঝে মাঝে ছুটিয়া বাহির হইতে যায়। প্রতিবেশীরা অনেকে দেখিতে আসিলেন—নানারকম টোটকা ওষুধের ব্যবস্থা করিলেন—কিছুতেই কিছু হইল না। যত বেলা বাড়িতে লাগিল, বলাইএর মুখের বুলিই হইল—জলে গেল, জলে গেল! ……যন্ত্রণায় বলাই যেন পাগলের মত হইয়া উঠিল, মুখে যাহা আসে বকে, হাত-পা ছোঁড়ে, আর কেবলই ছুটিয়া বাহির হইতে যায়।

তিন দিন তিন রাত্রি একই ভাবে কাটিল। কত রকম তেল-পড়া, জল-পড়া, ঝাড়-ফুঁক যে যাহা বলে তাহাই করা হইল। কিছুতেই কিছু হইল না। চতুর্থ দিন সকাল আটটার সময় হইতে বলাইয়ের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইয়া আসিতে লাগিল।

বিপিন স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিল—কি করচো?

মনোরমার চক্ষু রাত জাগিয়া লাল, চোখের নীচে কালি পড়িয়াছে—বৃদ্ধা শাশুড়ী রাত জাগিতে পারেন না—বিপিনও আয়েসী লোক, রাত একটা পর্য্যন্ত কায়ক্লেশে জাগিয়া থাকে—তারপর গিয়া শুইয়া পড়ে। মনোরমা সারারাত জাগিয়া থাকে রোগীর পাশে - আর থাকে বীণা।

মনোরমা বলিল—গোয়ালে আজ চারদিন ঝাঁট পড়েনি, গোয়ালটা একটু ঝাঁট দিচ্ছি।

বিপিন বলিল—গোয়াল ঝাঁট থাকুক। সকাল সকাল নেয়ে এসে দুটো যা হয় রেঁধে ছেলেপিলেদের খাইয়ে দাইয়ে নাও—বীণাকে আর মাকে খাইয়ে দাও। বলাইয়ের অবস্থা দেখে বুঝতে পারছ না?

মনোরমা স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, কেন গো—ঠাকুরপোর অবস্থা খারাপ?

—তা দেখে বুঝতে পারছ না? আজই হয়ে যাবে। আর দেরি নেই। শীগ্‌গির করে ঘাটে যাও।

মনোরমা নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল। বিপিন বলিল—কেঁদে কি হবে, এখন যা করবার আছে করে ফেল। মায়ের সামনে যেন কেঁদো না, ঘাটে যাও চলে।

মনোরমার একটা অভ্যাস সংসারের মধ্যে যে যে আছে তাহাদের সকলকেই সে ভালবাসে, স্নেহ করে—মা, বীণা ঠাকুরঝি, ঠাকুরপো,—সকলেরই সুখসুবিধা দেখা তাহার চিরকালের অভ্যাস। এই সাজানো সংসারের মধ্য হইতে বলাই ঠাকুরপো চলিয়া গেলে সংসারের কতখানি চলিয়া যাইবে!··· সে চিন্তা মনোরমার পক্ষে অসহ্য।

বিপিন ভাইয়ের সামনে গিয়া বসিল। বীণাকে বলিল—যা বীণা, ঘাটে যা—আমি আছি বসে। মাকে নিয়ে যা।

সত্যি, এতটুকু মেয়ে বীণা কয়দিন কি অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছে, সমানে রাত জাগিতেছে—মা ও উহার বৌদিদির সঙ্গে। দেবীর মত সেবা করিতেছে ভাইয়ের, অথচ কি অভাগিনী! জীবনে সে কখনো যাহা পায় নাই—অথচ যার জন্য তার বালিকা মন বুভুক্ষু, অপরের নিকট হইতে তারই এককণা পাইবার নিমিত্ত অভাগিনীর কি ব্যর্থ আগ্রহ! নিজেকে দিয়া বিপিন বোঝে এ নিদারুণ বুভুক্ষা।

সকলে আহারাদি শেষ করিয়া লইয়া বলাইয়ের কাছে বসিল। বলাইয়ের গত দুই দিন কোনো জ্ঞান ছিল না—যন্ত্রণায় চীৎকার করে মাঝে মাঝে কিন্তু মানুষ চিনিতে পারে না। বিপিনের মা খুব শক্ত মেয়ে—তিনি সবই বুঝিয়াছিলেন, অথচ এ পর্য্যন্ত তাঁহার চোখে জল পড়ে নাই—বরং বীণা ও মনোরমা কাঁদিলে তিনি কালও বুঝাইয়াছেন। আজ কিন্তু দুপুরের পর হইতে তিনি অনবরত কাঁদিতেছেন। বীণা ডোবার ধারে বাসন লইয়া গিয় ছিল।

ডোবার ওপারের ঘাটে রায়-বৌ ও নিবারণ মুখুজ্জের বড়মেয়ে নলিনী কথা বলিতেছিল। নলিনী হাত পা নাড়িয়া বলিতেছে—তা হবে না ওরকম? বাড়ীতে বিধবা মেয়ের ওই রকম অনাচার ভগবান সহ্যি করেন! জলজ্যান্ত ভাইটা ধড়ফড় করে মরলো চোখের সামনে। এখনও চন্দ্র সূর্য্য আছেন—অনাচার ঢুকলে সে সংসারে মঙ্গল হয় কখনো!

বীণা জলে নামিতে পারিল না—জলের ধারে কাঠের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

উহারা বীণাকে দেখিতে পায় নাই—বীণা কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বাসন লইয়া চলিয়া আসিল—চোখের জল সামলাইতে পারিল না ফিরিবার সময়। পটলদা'র সঙ্গে কথা বলা অনাচার! এ ছাড়া আর কি অনাচার সে করিয়াছে? ভগবান তো সব জানেন। তাহারই পাপে ছোড়দা মরিতে বসিয়াছে—একথা যদি সত্য হয়—সে পিতল-কাঁসা হাতে শপথ করিয়া বলিতেছে, আর কোন দিন সে পটলদার মুখ দেখিবে না। ভগবান ছোড়দাকে বাঁচাইয়া দিন।

কিন্তু ভগবান তাহার অনুরোধ রাখিলেন না। বৈকাল পাঁচটার সময় বলাই মারা গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

১

বলাইয়ের দাহকার্য্য সম্পাদন করিয়া বিপিন রাত্রি দুপুরের পর বাড়ী আসিল। বাড়ীসুদ্ধ সবাই চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—ওপাড়া হইতে কৃষ্ণলাল চক্রবর্ত্তী আসিয়া অনেকক্ষণ হইতে বসিয়া ছিলেন, বিপিনের মাকে নানারকম বুঝাইতেছিলেন—তিনি বুঝিলেন, এ সময় সান্ত্বনা দেওয়া বৃথা, সুতরাং হুঁকা হাতে রোয়াকের এক পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন।

বিপিন বলিল, কাকা, কখন এলেন? তামাক পেয়েছেন?

—আর বাবা তামাক! তামাক তো আছেই। এখন যে বিপদে পড়ে গেলে তা থেকে সামলে উঠলেই বাঁচি। বৌদিদিকে বোঝাচ্ছি সেই সন্দে থেকে, উনি মা, ওঁর কষ্ট তো চোখে দেখা যায় না—এসো বাবা—পরে বিপিনের চোখে জল পড়িতে দেখিয়া বলিলেন—আহা হা, তুমি অধৈর্য্য হোলে চলবে কেন বাবা? এদের এখন তোমাকেই ঠাণ্ডা করতে হবে—বোঝাতে হবে—বৌদিদি, বৌমা, বীণা—তোমাকে দেখে ওরা বুক বাঁধবে—তোমার চোখের জল পড়লে কি চলে? ··

এমন সময় আরও দু-পাঁচজন প্রতিবেশী আসিয়া উঠানে দাঁড়াইলেন। একজন ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বিপিনের মাকে বোঝাইতে গেলেন। একজন বিপিনের হাত ধরিয়া পাশের ঘরে লইয়া গিয়া বসাইলেন।

—রাত অনেক হয়েছে, শুয়ে পড়ো সব। সকলেরই শরীর খারাপ, কেঁদেকেটে আর কি হবে বলো বাবা, যা হবার তা হয়ে গেল। সবই তাঁর খেলা, দুনিয়াটাই এইরকম বাবা, আজ আমার, কাল আর একজনের পালা—শুয়ে পড়ো—

কৃষ্ণলাল চক্রবর্ত্তী রাত্রি এখানেই কাটাইবেন। ইহারা একা থাকিবে তাহা হয় না। আজ রাত্রে অন্ততঃ বাড়ীতে অন্য কেহ থাকা খুব দরকার। বিপিন সারারাত্রি ঘুমাইতে পারিল না, কৃষ্ণলালের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় রাত কাটিয়া গেল।

কৃষ্ণলাল বলিলেন—তুমি ক'দিনের ছুটি নিয়ে এসেচ বাবাজি?

—আজ্ঞে ছুটি তো নয়। রাণাঘাট কোর্টে এসেছিলাম কাজে- সেখান থেকে বাড়ী এলাম একদিনের জন্যে। তারপর তো বলাইয়ের অসুখ ক্রমেই বেড়ে উঠলো আর যাই কি করে—আটকে পড়লাম। তবে জমিদার বাবুকে চিঠি লিখে সব জানিয়েছি—এ কথাও লিখে দেবো কাল। এখন ধরুন এদের ফেলে হঠাৎ কি করে বাড়ী থেকে যাই? মায়ের ওই অবস্থা, আমি কাছে থাকলেও একটা সান্ত্বনা, তারপর ছোঁড়াটার শ্রাদ্ধশান্তির একটা ব্যবস্থাও আমি না থাকলে কি করে হয় বলুন?

—শ্রাদ্ধশান্তি আর কি, তিলকাঞ্চন করে দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ খাইয়ে দাও—এ তো জাঁকিয়ে শ্রাদ্ধ করার কিছু নেই। কোনরকমে শুদ্ধ হওয়া।

সকালের দিকে মা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন দেখিয়া বিপিন বাড়ী হইতে বাহির

হইয়া গেল। গ্রামের মধ্যে কাহারও বাড়ীতে যাইতে ভাল লাগে না—সকলে সহানুভূতি দেখাইবে, 'আহা' 'উঁহুঁ' করিবে—বর্ত্তমান অবস্থায় বিপিনের তাহা অসহ্য মনে হইতে লাগিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া সে আইনদ্দির বাড়ীতে গেল, পাশের গ্রামে। আইনদ্দির বয়স একশত বছর হইলেও (অন্ততঃ সে বলে) বসিয়া থাকিবার পাত্র সে নয়। বাড়ীর উঠানে একটা আমড়া-গাছের ছায়ায় বসিয়া বৃদ্ধ জালের সুতা পাকাইতেছিল।

—বাবাঠাকুর সকালে কি মনে করে? বোসো—তামাক খাবা? সাজি দাঁড়াও। আইনদ্দির সঙ্গেই তামাক খাইবার সরঞ্জাম মজুত। সে চকমকি ঠুকিয়া সোলা ধরাইয়া হাতে করিয়া সোলার টুকরাটি কয়েকবার দোলাইয়া লইয়া কলিকায় কাঠকয়লার উপর চাপিয়া ধরিল।

বিপিন বলিল—চাচা, দেশলাই বুঝি কখনো জ্বালও না?

—ও সব আজকাল উঠেছে বাবাঠাকুর—ও সব তোমাদের মত ছেলেছোকরারা কেনে। সোলা চকমকির মত জিনিস আর আছে? আপনি ভাল হয়ে বোসো। সেকালের দু একটা গল্প করি শোনো। ওই যে ন্যাথ্‌চো অশথ গাছ, ওর পাশের জমিটার নাম ছেল ফাঁসিতলার মাঠ। নীলকুঠীর আমলে ওখানে লোকের ফাঁসি হোত। আমার জ্ঞানে আমি ফাঁসি হতে দেখেছি। তুমি আজ বলচো দিশলায়ের কথা—দিশলাই ছেল কোথায় তখন? তুঁষের আর ঘুঁটের আগুন মাগীন্‌রা মালসা পুরে রেখে দিত ঘরে—আর পাঁকাটির মুখে গন্ধক মাখিয়ে এক আঁটি করে রেখে দিত মাল্‌সার পাশে। এই ছেল সেকালের দিশলাই বাবাঠাকুর—তবে তামাক খাতি সোলা চকমকির রেওয়াজ ছেল। চাঁদমারির বিলি সোলার জঙ্গল—এক বোঝা তুলে এনে শুকিয়ে রাখো, ভোর বছর তামাক খাও। একটা পয়সা খরচ নেই··আর এখন? একটা দিশলাই এক পয়সা, একটা দিশলাই দেড় পয়সা—হুঁ—

কথা শেষ করিয়া অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে আইনদ্দি একবার চারিদিকে চাহিয়া লইয়া জোরে জোরে তামাক টানিতে লাগিল।

বিপিন বলিল—আচ্ছা চাচা, তুমি তো অনেক মন্তরতন্তর জানো—মানুষ ম'লে তাকে এনে দেখাতে পারো?

আইনদ্দি বিপিনের হাতে কলিকা দিয়া বলিল—ধরো, একটা সোলা ফুটো করে তোমায় হুঁকো বানিয়ে দিই। মন্তরতন্তর অনেক জানি বাবাঠাকুর তোমার বাপ-মায়ের আশীর্ব্বাদে। শূ'ন্য ভরে উড়ে যাবো, আগুন খাবো, কাটা মুণ্ডু জোড়া দেবো—

বিপিন এই কথা অন্ততঃ ত্রিশবার শুনিয়াছে বৃদ্ধের মুখে।

—কিন্তু মরা মানুষ আনতে পারো চাচা?

—মলে কি মানুষ ফেরে বাবাঠাকুর? আসমানে তারা হয়ে ফুটে থাকে—নয়তো শেয়াল কুকুর হয়ে জন্মায়। তবে একটা গল্প বলি শোনো—

ইহার পর আইনদ্দি একটা খুব বড় আজগুবি গল্প ফাঁদিল—কিন্তু বিপিনের সে দিকে মন

ছিল না—সে আইনদ্দির বাড়ীর উত্তরে সুবিস্তৃত বেল্তার মাঠ ও চাঁদমারির বিলের ধারের সবুজ পাতি ঘাসের বনের দিকে চাহিয়া অন্যমনস্ক হইয়া গেল। যখনই এখানটিতে আসিয়া বসে, তখনই তাহার মনে কেমন অদ্ভুত ধরণের সব ভাব আসিয়া জোটে।

বলাই চলিয়া গেল!…কতদূরে, কোথায় কে জানে? সে-ও একদিন যাইবে, বীণাও যাইবে, মনোরমাও যাইবে…মানী…মানীও যাইবে।

কেন খাটিয়া মরা? কেন দুমুঠা অন্নের জন্য অনর্থক লোকপীড়ন করিয়া পরের অভিশাপ কুড়ানো? আজ গেল বলাই…কাল তাহার পালা।

একটা জিনিস তাহার মনে হইতেছে। মানী তাহার মাথায় ঢুকাইয়া দিয়াছিল…মানীর নিকট এজন্য সে আজীবন কৃতজ্ঞ থাকিবে।

বলাই বিনা চিকিৎসায় মারা গেল। গরীব লোক এমনি কত আছে এই সব পাড়াগাঁয়ে—যাহারা অর্থের অভাবে রোগের চিকিৎসা করাইতে পারে না। সে ডাক্তারি বই পড়িয়া কিছু শিখিয়াছে, বাকিটা না হয় মানীকে বলিয়া, তাহার দেওর বীজপুরে ডাক্তারি করে, তাহার অধীনে কিছুদিন থাকিয়া শিখিয়া লইবে। ডাক্তারিই সে করিবে—প্রজাপীড়ন কার্য্য তাহার দ্বারা আর চলিবে না।

তাহার বাপ বিনোদ চাটুজ্জে প্রজাপীড়ন করিয়া যথেষ্ট জমিজমা করিয়াছিলেন—যথেষ্ট পসার প্রতিপত্তি, যথেষ্ট খাতির। আজ সে সব কোথায় গেল? বিনোদ চাটুজ্জে আজ মাত্র সতেরো আঠারো বছর মারা গিয়েছেন—ইহার মধ্যেই তাঁহার পুত্রবধূ খাইতে পায় না—পুত্র বিনা চিকিৎসায় মারা যায়—বিধবা কন্যার সম্বন্ধে গ্রামে নানা বদনাম ওঠে। অসৎ উপায়ে উপার্জনের পয়সাই বা আজ কোথায়—কোথায় বা জমিজমা।

মানী তাহার চক্ষু ফুটাইয়া দিয়াছে নানাদিক দিয়া।

জীবনে মানীকে সে গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতে চায় বহুবার, বহুবার। সারাজীবন ধরিয়া।

বিপিন উঠিল। আইনদ্দি বলিল—কি নিয়ে যাবা হাতে করে বাবাঠাকুর? দুটো মুরগীর আণ্ডা নিয়ে যাবা? না, তোমরা বুঝি ও খাও না। তবে দুটো শাকের ডাঁটা নিয়ে যাও। ভাল শাকের ডাঁটা হয়েল বাবাঠাকুর, সুমুন্দিদের গরুর জন্যি বাড়তি পারলো না। ও মাখন—হ্যাদে ও মাখন—

বিপিন প্রভাতের রৌদ্রদীপ্ত সুবিস্তীর্ণ বেল্তার মাঠের দিকে চাহিয়া ছিল। চমৎকার জীবন! এই রকম বাঁশতলার ছায়ায়…এই রকম সকালের বাতাসে বসিয়া চুপ করিয়া মানীর কথা ভাবা…

কিন্তু ইহা জীবন নয়। ইহা পুরুষমানুষের জীবন নয়। ৺বিনোদ চাটুজ্জে পুরুষমানুষ ছিলেন—তিনি পৌরুষদীপ্ত জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন—হৈ হৈ, হল্লা, কঠিন কাজ, মামলা, মোকদ্দমা, জমিদারী শাসন, দাঙ্গাহাঙ্গামা—বিপিন জানে সে এই সব কাজের উপযুক্ত নয়। সে শাসন করিতে পারে না তাহা নয়—সে দুর্ব্বল বা ভীরু নয়—কিন্তু তাহার ধাতে সহ্য হয়

না ওসব। বিশেষতঃ মানীর সংস্পর্শে আসিয়া সে আরো ভাল করিয়া এসব বুঝিয়াছে। জীবনে অনেক ভাল জিনিস আছে—ভাল বই, ভাল গান, ভাল কথা—খাওয়া-দাওয়ার কথা মামলা মোকদ্দমা বা পরচর্চ্চা ছাড়াও আরও ভাল কথা জগতে আছে, মানী তাহাকে দেখাইয়াছে।

জমিদারী শাসন ছাড়াও পুরুষমানুষের জীবন আছে—রোগের সঙ্গে, মৃত্যুর সঙ্গে নিজের দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া বড় হইতে চেষ্টা পাওয়াও পুরুষমানুষের কাজ। একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেই সে।

২

তিন মাস কাটিয়া গিয়াছে।

এই তিন মাসের মধ্যে অনেক কিছু ঘটিয়া গেল। বিপিনকে বলাইয়ের শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত বাড়ী থাকিতে হইল। বীণার ব্যাপার একটু আশঙ্কাজনক বলিয়া মনে হইল বিপিনের কাছে। মনোরমা প্রায়ই বলে, দুজনে গোপনে দেখাশোনা এখনও করে—মনোরমা স্বচক্ষে দেখিয়াছে। বীণাকে বিপিন এজন্য তিরস্কার করিয়াছে, কড়া কথা শোনাইয়াছে, বীণা কাঁদিয়া ফেলে ছেলেমানুষের মত, বলে—ও সব মিছে কথা দাদা। আমি তোমার পায়ে হাত দিয়ে বলতে পারি, আমি পটলদার সঙ্গে আর দেখাই করিনে।

কথার মধ্যে খানিকটা সত্য ছিল।

বলাইয়ের মৃত্যুর পর বীণার ধারণা হইল, পটল-দার সঙ্গে গোপনে কথা বলিবার এ লোভ ভাল নয়, এ সব অনাচার, বিধবা মানুষের করা উচিত নয় যাহা, তাহা সে করিতেছে বলিয়াই আজ ভাইটা মরিয়া গেল।

বলাই মারা যাওয়ার ছ'দিন পরে পটল একদিন তাহাদের বাড়ীতে আসিল। বীণার মা বাহিরের রোয়াকে বসিয়া তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিল—বলাইয়ের মৃত্যু-সংক্রান্ত কথাই বেশী। বীণা লক্ষ্য করিল কথা বলিতে বলিতে পটল-দা জানালার দিকে আগ্রহ-দৃষ্টিতে চাহিতেছে। অন্য অন্য বার এতক্ষণ বীণা মায়ের কাছে গিয়া দাঁড়ায়, পটলের সঙ্গে কথা শুরু করে—কিন্তু আজ সে ইচ্ছা করিয়াই যায় নাই। আর কখনো সে পটলদার সামনে বাহির হইবে না। বেড়াইতে আসিয়াছ, ভালোই, মায়ের সঙ্গে গল্পগুজব করো, চলিয়া যাও—আমার সঙ্গে তোমার কি? বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে তোমার কি?

প্রায় এক ঘণ্টা থাকিয়া পটল যেন নিরাশ মনে চলিয়া গেল। পটল যেমন বাড়ীর বাহির হইল—বীণার তখন মনে পড়িল ছাদের উপর ওবেলা বৌদিদির রাঙা পাড় শাড়ীটা রৌদ্রে দেওয়া হইয়াছিল—তুলিয়া আনা হয় নাই। ছাদে উঠিয়া কাপড় তুলিতে তুলিতে সে নিজের অজ্ঞাতসারে পথের দিকে চাহিয়া রহিল। ওই তো পটলদা চলিয়া যাইতেছে···তেঁতুল

গাছটার কাছে গিয়াছে···সে ছাদের উপরে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে···যদি পটল-দা হঠাৎ ফিরিয়া চায়? বীণা কি লজ্জায় পড়িয়া যাইবে! পটল-দাকে একটা পান সাজিয়া দিলে ভাল হইত—দেওয়া উচিত ছিল, মা যেন কি! লোক বাড়ীতে আসিলে তাহাকে শুধু মুখে বিদায় করিতে নাই। ইহা ভদ্রতা। তাহাকে ডাকিয়া পান সাজিয়া দিতে বলিলেই সে পান দিত।

কাপড় তুলিয়া বীণা নামিয়া আসিল। তাহার মন খুব হালকা—ভালই হইয়াছে, আজ সে বুঝিয়াছে—পটলের সঙ্গে দেখা না-করা এমন কঠিন কাজ নয়, ইচ্ছা করিলেই হয়। একটা কঠিন কর্ত্তব্য সে সম্পন্ন করিয়াছে।

বলাইয়ের শ্রাদ্ধ মিটিয়া গেলে পটল আর একদিন আসিল। বীণা উঠান ঝাঁট দিতেছিল, মুখ তুলিয়া কে আসিতেছে দেখিয়াই সে হাতের ঝাঁটা ফেলিয়া ছুটিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল। তাহার বুকের মধ্যে যেন ঢেঁকির পাড় পড়িতেছে। মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়াই মনে হইল, ছিঃ, অমন করিয়া ছুটিয়া পলাইয়া আসা উচিত হয় নাই।—পটলদা কি দেখিতে পাইয়াছে? বোধ হয় পায় নাই, কারণ তখনও সে তেঁতুলতলার মোড়ে; তেঁতুলগাছের গুঁড়িটার আড়ালে। যাহা হউক, পটল-দা তো বাঘ নয়, ভালুকও নয়—অমনভাবে ছুটিয়া পলাইবার মানে হয় না। সহজভাবে মায়ের সামনে গিয়া কথা বলাই তো ভালো। ব্যাপারটাকে সহজ করিয়া তোলাই ভালো।

কিন্তু বীণা একদিনও বাহিরে আসিল না—এমন কি যখন পটল জল খাইতে চাহিল—বীণার মা বলিলেন, ওমা বীণা, তোর পটলদাদাকে এক গেলাস জল দিয়ে যা—বীণা নিজে না গিয়া বিপিনের বড়ছেলে টুনুর হাতে দিয়া জলের গ্লাস পাঠাইয়া দিল।

তাহার হাসি পাইতেছিল। মনে মনে ভাবিল—সব দুষ্টুমি পটল-দার। জলতেষ্টা না ছাই পেয়েছে! আমি আর বুঝিনে ও সব যেন!

সে যাইবে না, কখনও যাইবে না। জীবনে আর কখনো পটল-দার সঙ্গে দেখা করিবে না। শেষ, সব শেষ হইয়া গিয়াছে।

৩

ইহার পাচ ছ'দিন পরে বীণা একদিন সন্ধ্যার সময় ছাদে শুকাইতে দেওয়া মুসুরির ডাল তুলিতে গিয়াছে—ছাদের আলিসার কাছে আসিতেই দেখিতে পাইল, পটল-দা নীচে বাগানের কাঁঠালতলায় দাঁড়াইয়া ওপরের দিকে চাহিয়া আছে।

বীণার সমস্ত শরীর দিয়া যেন কি একটা বহিয়া গেল! হঠাৎ পটল-দাকে এ ভাবে দেখিবে তাহা সে ভাবে নাই। কিন্তু আজ কয়দিন বীণা দুপুরে ও বিকালের দিকে নির্জ্জনে থাকিলেই ভাবিয়াছে পটল-দার কথা। অন্য কিছু নয়, সে শুধু ভাবিয়াছে এই কথা—আচ্ছা

এই যে দু'দিন সে পটল-দার সঙ্গে ইচ্ছা করিয়াই দেখা করিল না, পটল-দা কি ভাবে লইয়াছে জিনিসটা? খুব চটিয়াছে কি? কিংবা হয়ত তাহার কথা লইয়া পটল-দা আর মাথা ঘামায় না। তাহাকে মন হইতে দূর করিয়া দিয়াছে। দিয়া যদি থাকে, খুব বুদ্ধিমানের মত কাজ করিয়াছে। পটল-দা কষ্ট পায়, তাহা বীণা চায় না। ভুলিয়া যাক্, সেই ভালো। মনে রাখিয়া যখন কষ্ট পাওয়া, ভুলিয়া যাওয়াই ভালো।

দুপুরে এ কথা ভাবিয়া বীণা দেখিয়াছে বেলা যত পড়ে সেই কথাই মনের মধ্যে কেমন একটা—ঠিক বেদনা বা কষ্ট বলা হয়তো চলিবে না—কিন্তু কেমন একটা কি হয় ঠিক বলিয়া বোঝানো কঠিন—কি বলিয়া বুঝাইবে সে ভাবটা?··· যাহোক, যখন সেটা হয়, বিশেষতঃ সন্ধ্যার দিকে, যখন বড় তেঁতুল গাছটায় কালো কালো বাদুড়ের দল ঝাঁক বাঁধিয়া ফেরে, সন্তদের নারকেল গাছটার মাথায় একটা নক্ষত্র ওঠে, বৌদি সাঁজালের মালসা হাতে গোয়ালঘরে সাঁজাল দিতে ঢোকে, একটু পরেই ঘুঁটের ধোঁয়ায় উঠানের পাতিলেবুতলাটা অন্ধকার হইয়া যায়,—তখন ছাদের ওপর একা দাঁড়াইয়া বাঁশঝাড়ের মাথার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বীণার যেন কান্না আসে···কোথাও কিছু যেন নাই কোথাও কিছু নাই···

এ ভাবটা সে বেশীক্ষণ মনে থাকিতে দেয় না—তখনি তাড়াতাড়ি ছাদ হইতে নীচে নামিয়া আসে। নিজের কান্নাতে নিজে লজ্জিত হয়, ভীত হয়।

অথচ কাহাকেও কিছু বলিবার উপায় নাই। কাহারও নিকট একটু সান্ত্বনা পাইবার উপায় নাই। মা নয়, বৌদিদি নয়। কাহারও কাছে কিছু বলা চলিবে না, বীণা বোঝে। এ তার নিজস্ব কষ্ট, অত্যন্ত গোপন জিনিস—গোপনেই সহ্য করিতে হইবে।

হঠাৎ এ সময় পটলদাকে এ ভাবে দেখিয়া বীণা যেন কেমন হইয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। পটল গাছের গুঁড়িটার দিকে আর একটু হটিয়া গেল। বীণার দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিল- বীণা, আমার ওপর তোমার রাগ কিসের?

বীণা এবার কথা খুঁজিয়া পাইল। বলিল—রাগ কে বল্লে?

—দুদিন তোমাদের বাড়ী গেলাম, বাইরে এলে না, দেখা করলে না—রাগ নয়তো কি?

—রাগ নয় এমনি। কাজে ব্যস্ত ছিলাম।

— মিথ্যে কথা। কাজে ব্যস্ত থাকলেও একটু বাইরে আসা যায় না কি? না সত্যি বলো লক্ষ্মীটি, আমি কি দোষ করেছি?

—তুমি পাগল নাকি পটল-দা? আচ্ছা, সন্ধ্যাবেলায় এখানে এসেছ আবার, লোকে দেখলে কি মনে করবে—তোমায় একদিন বারণ করে দিইছি মনে নেই! যাও বাড়ী যাও—

বীণা কথাটা বলিল বটে—কিন্তু তাহার মনের মধ্যে হঠাৎ একটা অদ্ভুত ধরণের আনন্দ আসিয়া জুটিয়াছে—সন্ধ্যার অন্ধকার অদ্ভুত হইয়া উঠিয়াছে, জোনাকীজ্বলা অন্ধকার, সাঁজালের ঘুঁটের চোখ-আলা-করা ধোঁয়ায় ঘনীভূত অন্ধকার।···

তাকে কেহ চায় নাই জীবনে এমন করিয়া—সে কথা কহে নাই বলিয়া ছুটিয়া আশসেওড়া

বিছুটিবনের আগাছায় জঙ্গলের মধ্যে, সাপে খায় কি ব্যাঙে খায়, সন্ধ্যার অন্ধকারে ভূতের মত দাঁড়াইয়া থাকে নাই কখনো—কাঙালের মত, একটুখানি মিষ্ট কথার প্রত্যাশী হইয়া—বিশেষ করিয়া যখন সে তাচ্ছিল্য দেখাইয়াছে, সামনে বাহির হয় নাই, কথা কয় নাই—তাহার পরেও,—এক পটল-দা ছাড়া।

পটল মিনতির সুরে বলিল—কেন এমন করে তাড়িয়ে দেবে, বীণা? আমি কি করেছি বলো—

—তুমি কিছু করোনি। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার কথাবার্তা আর চলবে না—

—কেন চলবে না বীণা?

—কেউ পছন্দ করে না।

- কেউ মানে কে কে, শুনতে পাবো না?

—না—তা শুনে কি হবে? ধরো আমার বাড়ীর লোক। আমি তো স্বাধীন নই—তাঁরা যদি বারণ করেন, অসন্তুষ্ট হন, আমার তা করা উচিত নয়।

—তুমি আমায় ভালবাসো না?

বীণা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

—আমার কথার উত্তর দাও, বীণা!

—আচ্ছা পটল-দা, ও কথার উত্তর শুনে লাভই বা কি? আমার আর তোমার সঙ্গে দেখা করা চলবে না। তুমি কিছু মনে কোরো না পটল-দা, এখন বাড়ী যাও, লোকে কি মনে করবে বলো তো। সন্ধ্যেবেলা এখানে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে কথা বলছ দেখলে বৌদি এখুনি ছাদের ওপর আসবে, তুমি যাও এখন।

—আচ্ছা এখন যাচ্ছি, কাল আসবো?

—না।

—পরশু আসব?

—না।

—কবে আসবো, আচ্ছা তুমিই বল বীণা।

—কোনোদিন না। কেন আমায় এসব কথা বলাচ্ছ পটল-দা? আমি এক কথার মানুষ—যা বলেছি, তা বলেছি। এখন যাও।

—তাড়াবার জন্যে অত ব্যস্ত কেন বীণা, যাবোই তো, থাকতে আসিনি। বেশ তাই যদি তোমার ইচ্ছে হয় তবে চল্লাম—এ-ও বলে রাখছি, জীবনে আর কখনও আমায় দেখতে পাবে না।

—না পাই না পাবো, তা আর কি হবে? না পটল-দা, আর বকিও না, কথায় কথা বাড়ে, আমি নীচে নেবে যাই, বৌদিদি কি মনে করবে—কতক্ষণ ছাদের ওপর এসেছি।

পটল আর কোনো কথা না বলিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু বীণা যেমন সিঁড়ির মুখে নামিতে যাইবে দেখিল অন্ধকারের মধ্যে মনোরমা দাঁড়াইয়া আছে। বৌদিদির ভাব দেখিয়া

বীণার মনে হইল সে বেশীক্ষণ আসে নাই—এবং সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া তাহাদের শেষ কথা শুনিয়াছে।

আসলে মনোরমা কিছুই শুনিতে পায় নাই—কিন্তু ছাদে উঠিবার সময় বীণা কাহার সঙ্গে সন্ধ্যাবেলা কথা কহিতেছে জানিবার জন্য সিঁড়ির মুখে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া ছিল। এবং অল্প কিছুক্ষণ দাঁড়াইবার পরেই বীণা কথা বন্ধ করিয়া তাহার সঙ্গে ধাক্কা খাইল।

মনোরমা বলিল—কার সঙ্গে কথা বলছিলে ঠাকুরঝি ?

বীণা ঝাঁজের সঙ্গে বলিল—জানিনে—সরো—রাস্তা দাও—উঠে এসে দাঁড়িয়ে তো আছ দিব্যি অন্ধকারে! বাবারে, সবাই মিলে পাও আমাকে—খেয়ে ফেল—বলিয়া সে তরতর করিয়া নামিয়া গিয়া মায়ের ঘরে একখানা ছেঁড়া মাদুর এককোণে পাতিয়া সোজাসুজি শুইয়া পড়িল।

মনোরমা মনে মনে বড় অস্বস্তি বোধ করিল। বীণা আবার গোপনে পটলের সঙ্গে দেখাশুনা করিতেছে তাহা হইলে! নিশ্চয়ই পটল ও—আর কাহার সঙ্গে সন্ধ্যাবেলা ছাদ হইতে চাপাস্বরে কথাবার্ত্তা বলিবে সে! ঠাকুরঝির রাগের কারণই বা কি আছে তাহা সে বুঝিয়া পাইল না! সে আড়ি পাতিয়া কাহারো কথা শুনিতে যায় নাই সিঁড়ির ঘরে। কি কথা হইতেছিল, কাহার সহিত কথা হইতেছিল তাহাও সে জানে না—তবে আন্দাজ করিয়াছিল বটে। দুশ্চিন্তায় মনোরমার রাত্রে ভাল ঘুম হইল না। ঠাকুরঝি দিনকতক পটলের সামনে বাহির হইত না, তাহাতে মনোরমা খুব খুশী হইয়াছিল মনে মনে। কিন্তু এত বলার পরেও আবার যখন শুরু করিল তাও আবার লুকাইয়া, তখন ফল ভাল হইবে না।

কি করা যায়, কি করিয়া সংসারে শান্তি আনা যায় ? তাহাদের বাড়ীটাকে যেন অলক্ষ্মীতে পাইয়া বসিয়াছে। দারিদ্র্য, রোগ, মৃত্যু···অনাচার···কুৎসা কলঙ্ক ··বীণা ঠাকুরঝি যে রাগ করে, নতুবা কাল দুপুরবেলা রান্নাঘরে বসিয়া সে বেশ করিয়া বুঝাইয়া সুঝাইয়া বলিতে পারে। বলিতে পারে যে, এসব ব্যাপারের ফল কখনও ভাল হয় না। পটল বিবাহিত লোক, তাহার স্ত্রীপুত্র বর্ত্তমান, বীণাকে লইয়া নাচানো ছাড়া তাহার আর কি ভাল উদ্দেশ্য থাকিতে পারে ? সমাজে থাকিতে হইলে সমাজ মানিয়া চলিতে হয়—বীণা বিধবা, বিশেষত ছেলেমানুষ, অনেক বুঝিয়া তাহাকে এখন সংসারে চলিতে হইবে।···কিন্তু বীণা শুনিবে কি তাহার হিতোপদেশ ?

ইহার পর পটল আর একদিন আসিল। অমনি সন্ধ্যাবেলা, অমনি ভাবে লুকাইয়া। কিন্তু এদিন বীণা গৃহকর্মে ব্যস্ত ছিল, ছাদে যাইবার প্রয়োজন ছিল না বলিয়া যায় নাই। ছাদে গিয়াছিল মনোরমা। সিঁড়ির মুখে নামিবার সময় দেখিতে পাইল পটল কাঁটালতলায় দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়াই পটল গুঁড়ির আড়ালে সরিয়া যাইবার উপক্রম করিল, একটু থতমত খাইয়া গেল—তাহাকেই বীণা বলিয়া ভুল করিয়াছিল সন্ধ্যার অন্ধকারে নাকি? মনোরমার হাসিও পাইল। ভাবিল—পোড়ার মুখো ড্যাকরার কাণ্ড ছ্যাখো। জঙ্গলের মধ্যে এই ভর্ সন্দেবেলা দাঁড়িয়ে মরছেন মশার কামড় খেয়ে। খ্যাংরা মারো মুখে—। বীণাকে সে কিছুই বলিল না নীচে নামিয়া। তাহাকে চোখে চোখে রাখিল, বীণা চুপি চুপি ছাদে যায় কিনা। ওদের মধ্যে নিশ্চয় পূর্ব হইতে বলা-কওয়া ছিল।

রাত্রে শুইবার সময় সে কৌশল করিয়া বীণাকে কথাটা বলিল।

—আজ হয়েছে কি জানো ঠাকুরঝি, ওপরে তো ছাদে গিয়েছি সন্ধ্যের সময়—দেখি কে একজন কাঁটালতলায় দাঁড়িয়ে—ভাল করে চেয়ে দেখি—

বীণার মুখ শুকাইয়া গেল। বলিল—পটল-দা?

মনোরমা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। হাসির ধমকে কথা উচ্চারণ করিতে না পারিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, "পটল-ই বটে।"

—আমি তোমার পা ছুঁয়ে বলতে পারি বৌদি, আমি কিছুই জানি নে।

বীণা কিন্তু একথা কিছুতেই বলিতে পারিল না যে সে পটল-দাকে সেদিনই আসিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছে। সেকথা তাহার আর পটল-দার মধ্যে গুপ্ত থাকিবে—বাহিরের লোককে তাহা জানাইলে পটল-দার অপমান হইবে। লোকের সামনে পটল-দা'কে সে ছোট করিতে চায় না। তাহার মন তাহাতে সায় দেয় না।

কিন্তু আশ্চর্য্য, এত বলার পরও পটল-দা আবার আসিয়াছিল! রাত্রে শুইয়া শুইয়া কতবার পটলের উপর রাগ করিবার…দারুণ রাগ করিবার চেষ্টা করিল। ভারি অন্যায় পটল-দা'র, যখন সে বারণ করিয়া দিয়াছে, তখন কেন আবার দেখা করিবার চেষ্টা পাওয়া? ছিঃ ছিঃ, বৌদিদি না দেখিয়া যদি অন্য লোক দেখিত? পটল-দা লোক ভাল নয়। ভাল লোক নয়। খারাপ চরিত্রের লোক। ভাল চরিত্রের লোক যারা তারা এমন করে না।

আচ্ছা, একটা কথা—তাহারই সঙ্গে বা পটল-দা দেখা করিবার অত আগ্রহ কেন দেখায়? আরও তো কত মেয়ে আছে। এই অন্ধকারে·· আগাছার জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়াইয়া—সত্যি যদি সাপে কামড়াইত? কথাটা মনে করিবার সঙ্গে সঙ্গে পটলের উপর এক প্রকার অদ্ভুত ধরনের সহানুভূতি আসিয়া জুটিল বীণার মনে। মাগো, পটল-দাকে সাপে কামড়াইত! না, ভাবিতেও কষ্ট হয়। তাহারই জন্য পটল-দাকে সাপে কামড়াইত তো? আর কেহ তো তাহার

জন্য ভাবে না, তাহার মুখের কথা শুনিবার অত আগ্রহ দেখায় না, সংসারে কে তাহার জন্য ভাবিয়া মরিতেছে ? কোন্ আলো আছে তাহার জীবনে ?···

এই শূন্য, অন্ধকার জীবনের মধ্যে তবুও পটল-দা তাহার সঙ্গে একটু কথা কহিবার ব্যাকুল আগ্রহে রাত্রি, অন্ধকার, সাপের ভয়, মশার কামড়, লোকনিন্দা অগ্রাহ্য করিয়া চোরের মত দাঁড়াইয়া থাকে, ভাঙা কোঠার পাশের জঙ্গলের মধ্যে—যেখানে বিছুটি জঙ্গল এমন ঘন যে দিনমানেই যাওয়া যায় না! তাও দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বৃথা ফিরিয়া গেল। চোখের দেখাও তো তাহাকে দেখিতে পায় নাই।

নিজের স্বামীকে বীণা মনে করিতে পারে—খুব সামান্য, অস্পষ্টভাবে। এগার বৎসর বয়সে বীণার বিবাহ হয়। এক বৎসর পরে বাপের বাড়ী থাকিতেই একদিন সে শুনিল স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। মনে আছে, বেশ ছেলেটি। খুব অল্পদিন দেখাশোনা হইয়াছিল। কোথায় স্কুলে পড়িত, শ্বশুরশাশুড়ী তাহাকে বাড়ী বেশীদিন থাকিতে দিতেন না—স্কুল-বোর্ডিং-এ পাঠাইয়া দিতেন।

সে-সব আজকার কথা নয় -বীণার বয়স এখন তেইশ চব্বিশ—বারো বছর আগের কথা, স্বপ্ন হইয়া গিয়াছে।

হঠাৎ বীণা দেখিল সে কাঁদিতেছে—হাপুস নয়নে কাঁদিতেছে, বালিশের একটা ধার একেবারে ভিজিয়া গিয়াছে চোখের জলে।

৫

দেনা জড়াইয়া গিয়াছে একরাশ। কোনো দোকানে আর ধার পাইবার জো নাই।

কৃষ্ণলাল চক্রবর্ত্তী সংসারের বন্ধু, দুবেলাই যাতায়াত করেন, খোঁজ খবর যা লইবার, তিনিই লইয়া থাকেন, অন্য লোকে বড় একটা ইহাদের লইয়া মাথা ঘামায় না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা রোয়াকে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে কৃষ্ণলাল বলিলেন, পলাশপুর যাবার তোমার আর দেরি কিসের হে বিপিন ? বেরিয়ে পড়, চলে যাও এবার। তোমার দোষ একবার বাড়ী এসে চেপে বসলে তুমি নড়তে চাও না।

—আপনার কাছে আর লুকোব না কাকা, চাকুরি গিয়েছে আজ মাস খানেক হোল, অনাদিবাবু চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যদি আমি এক হপ্তার মধ্যে না ফিরি, তিনি অন্য লোক রাখতে বাধ্য হবেন। সে চিঠির উত্তর দিই নি।

—চিঠির উত্তর দাও নি? না খেতে পেয়ে কষ্ট পাচ্চ সে ভালো খুব, না? তোমার উপায় যে কি হবে আমি কিছু বুঝি নে বাপু! না, শোনো, আমার মনে হয় তোমার চাকুরি এখনও যায় নি। নতুন লোক খুঁজে পাওয়া শক্তও বটে, আর বিশ্বাস যাকে তাকে করাও যায় না বটে। তুমি যাও, কাল সকালেই দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়।

—বেরিয়ে পড়্‌বো কাকা, তবে সে দিকে নয়। আমি ডাক্তারি করবো ভেবে রেখেচি অনেক দিন। ওই সোনাতনপুর, কামার গাঁ, পিপ্‌লিপাড়া এ সব অঞ্চলে ডাক্তার নেই। কে যাবে ওসব অজ পাড়াগাঁয়ে মরতে? আমি সোনাতনপুরে বসবো ভেবেচি। সোনাতনপুরের রামনিধি দত্ত ওখানকার মধ্যে একজন বিশিষ্ট লোক, সেখানে গিয়ে বাবার পরিচয় দিয়ে ওই গাঁয়েই বসবো। দেখি কি হয়। জমিদারী শাসন আর প্রজা ঠ্যাঙানো, ও আর রুচি নে কাকা। বলাই মারা যাওয়ার পর আমি বুঝতে পেরেচি ও কাজে সুখ নেই। আর আমি ওপথে—

কৃষ্ণলাল অবাক হইয়া বলিলেন, ডাক্তারি করবে! ডাক্তারি শিখলে কোথায় তুমি যে ডাক্তারি করবে! যত বদ্‌খেয়াল কি তোমার মাথায় আসে!

—ডাক্তারি আমি করেচি এর আগেও। ধোপাখালির কাছারিতে বসে। আর শেখার কথা বলচেন, কেন বই পড়ে বুঝি শেখা যায় না? জমিদার বাবুর মেয়ে আমাকে কতকগুলো ডাক্তারি বই দিয়েছিল, তাই পড়ে শিখেচি। সেই আমায় ডাক্তারি করতে পরামর্শ দেয়, কাকা। বলেছিল, তার এক দেওর বীজপুরে ডাক্তারি করে, তার কাছে গিয়ে শেখার ব্যবস্থা করে দেবে—ও-ই বলেছিল। বেশ চমৎকার মেয়ে, মনটিও খুব ভাল, আমায় বলেছিল—

হঠাৎ বিপিন দেখিল মানীর কথা একবার আসিয়া পড়িয়াছে যখন, তখন ওর কথাই বলিবার ঝোঁক তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। ডাক্তারির কথা গৌণ, মুখ্য কাজ মানীর সম্বন্ধে কথা বলা। কৃষ্ণকাকার সামনে!

বিপিন চুপ করিল।

কৃষ্ণলাল বলিলেন, জমিদার বাবুর মেয়ে? বিয়ে হয়েছে? তোমার সঙ্গে কি ভাবে আলাপ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, বিয়ে হয়েছে বৈকি। বাইশ তেইশ বছর বয়েস। আমার সঙ্গে তো ছেলেবেলা থেকেই আলাপ ছিল কি না! বাবার সঙ্গে ওদের বাড়ী ছেলেবেলায় যেতাম, তখন থেকেই আলাপ। একসঙ্গে খেলা করেচি। এখনও আমাকে যত্নআত্যি করে বড্ড, আর কিসে আমার ভাল হয় সর্ব্বদা ওর সেদিকে—

বিপিনের গলার সুরে কৃষ্ণলাল একটু আশ্চর্য্য হইয়া উহার দিকে চাহিয়া ছিলেন, বিপিন আবার দেখিল সে মানীর সম্বন্ধে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলিয়া ফেলিতেছে। কি যেন অদ্ভুত নেশা! মানীর সম্বন্ধে কতকাল কাহারও কাছে কোনো কথা বলে নাই। আজ যখন ঘটনাক্রমে তাহার কথা আসিয়া পড়িয়াছে, তখন আর থামিতে ইচ্ছা করে না কেন? অনবরত তাহার কথা বলিতে ইচ্ছা করে কেন?

বিপিন আবার চুপ করিয়া রহিল।

কৃষ্ণলাল বলিলেন, তা বেশ। তোমার সঙ্গে এবার বুঝি দেখাশুনো হয়েছিল? শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছিল বুঝি?

না, বিপিন আর কিছু বলিবে না। সে সামলাইয়া লইয়াছে নিজেকে। কৃষ্ণলালের প্রশ্নের উত্তরে সংক্ষেপে বলিল, হ্যাঁ। তাহার বুকের মধ্যে ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছে, কেমন এক প্রকারের উত্তেজনা। মানীর কথা এতদিন কাহারও সহিত হয় নাই, অনেক জিনিস চাপা পড়িয়াছিল। হঠাৎ অনেক কথা, অনেক ছবি তাহার মনে পড়িয়া গেল মানীর সম্বন্ধে। কান দুটা যেন গরম হইয়া উঠিয়াছে, লাল হইয়া উঠিয়াছে কি দেখিতে? কৃষ্ণলাল কি দেখিতে পাইতেছেন?

৬

দিন পনেরো পরে।

রাত্রে একদিন মনোরমা বলিল, তোমায় তো কোনো কথা বললেই চটে যাও। কিন্তু আমার হয়েচে যত গোলমাল, ঝক্কি পোয়াচ্ছি আমি। তিন দিন কাঠা হাতে করে এর-ওর বাড়ী থেকে চাল ধার করে আনি, তবে হাঁড়ি চড়ে। আমি মেয়েমানুষ, ক'দিন বা আমাকে লোকে দেয়? পাড়ায় আর ধার পাওয়া যাবে না, এবার বে-পাড়ায় বেরুতে হবে কাল থেকে। তা আর কি করি, কাল থেকে তাই করবো! ছেলেগুলো উপোস করবে, মা উপোস করবেন, এ তো চোখে দেখতে পারবো না!

মনোরমার কথাগুলি খুব ন্যায্য বলিয়াই বোধ হয় বিপিনের কাছে তিক্ত লাগে। সে ঝাঁজের সহিত বলিল, তা এখন তোমাদের জন্যে চুরি করতে পারবো না তো। না পোষায়, ভাইকে চিঠি লিখো, দিনকতক গিয়ে বাপের বাড়ী ঘুরে এসো। সোজা কথা আমার কাছে।

মনোরমা কাঁদিতে লাগিল।

নাঃ, বিপিনের আর সহ্য হয় না। কি যে সে করে! চাকুরি তাহার নিজের দোষে যায় নাই। বলাইয়ের অসুখ, বলাইয়ের মৃত্যু, বীণার ব্যাপার, নানা গোলযোগ। সে ইচ্ছা করিয়া চাকুরি ছাড়িয়া আসে নাই। অথচ স্ত্রী দেখিতেছে সবটাই তাহার দোষ।

রাত্রি অনেক হইয়াছে। পল্লীগ্রামের লোক সকালে সকালেই শুইয়া পড়ে। কোনো দিকে কোনো শব্দ নাই। উত্তর দিকের ভাঙা জানালাটার ধারেই তক্তপোশখানা পাতা। বিপিন উঠিয়া দালান হইতে তামাক সাজিয়া আনিয়া তক্তপোশের উপর বসিয়া জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া হুঁকা টানিতে লাগিল। জানালার বাহিরের কোঠার গায়ে লাগানো ছোট্ট তরকারীর ক্ষেত, বলাই গত চৈত্র মাসে কুমড়া পুঁতিয়াছিল। এখন খুব বড় গাছ হইয়া অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া লইয়াছে বাগানে। তরকারীর ক্ষেতের পর তাহাদের কাঁঠাল গাছ, তারপর রাস্তা, রাস্তার ওপারে নবীন বাঁড়ুয্যের বাঁশঝাড় ও গোহাল। ঘন ঠাস্-বুনানি কালো অন্ধকার বাঁশঝাড়ের সর্বাঙ্গে অসংখ্য জোনাকি জ্বলিতেছে।

মনোরমার উপর তাহার সহানুভূতি হইল। বেচারী অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ঘরের মেয়ে,

তাহাদের বাড়ীতে অনেক আশা করিয়াই উহার জ্যাঠামশাই বিবাহ দিয়াছিলেন। এখন খাইতে পায় না পেট ভরিয়া ছবেলা। পাড়ায় কোথাও সে বাহির হয় না, সমবয়সী বৌ-ঝিয়ের সঙ্গে কমই মেশে, কারণ গরীব বলিয়াও বটে এবং বীণার ব্যাপার লইয়াও বটে, নানা অপ্রীতিকর কথা শুনিতে হয় বলিয়া সে কোথাও বড় একটা যায় না। ঘরের কাজ লইয়াই থাকে।

বিপিন বলিল, কেঁদো না, বলি শোনো।

মনোরমা কথা কহিল না, আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে লাগিল। আধ-ময়লা শাড়ীর আঁচলটা মাছুর হইতে খানিকটা মেঝের উপর লুটাইতেছে। সত্যই কষ্ট হয় দেখিলে।

—শোনো, আমি কাল কি পরশু বাড়ী থেকে যাই। পিপলিপাড়া গিয়ে ডাক্তারি করবো ভেবেছি। তুমি কি বলো? পিপলিপাড়া বেশ গাঁ, চাষীবাসী লোক অনেক। হয়তো কিছু কিছু পাবো। তুমি কি বলো?

স্বামী তাহার মতামত চাহিতেছে, ইহা মনোরমার কাছে এক নূতন জিনিস বটে। সে একটু আশ্চর্য্য হইল, খুশীও হইল। চোখের জল মুছিয়া বিপিনের দিকে চাহিয়া বলিল, তুমি ডাক্তারি জানো?

—জানিই তো। ধোপাখালি থাকতে রুগী দেখতাম।

—কোথা থেকে শিখলে ডাক্তারি?

—বই পেয়েছিলাম জমিদার-বাড়ীর ইয়ে মানে লাইব্রারি থেকে। বেশ বড় লাইব্রারি আছে কিনা ওঁদের বাড়ী;

মনোবমার পিতৃগৃহ গোয়াড়ি কৃষ্ণনগর। সে বলিল, লাইব্রারি আবার কি? লাইব্রেরি তো বলে! আমাদের পাড়ায় মস্ত লাইব্রেরি আছে গোয়াড়িতে। জেঠীমা বই আনাতেন, আমরা ছপুরবেলা পড়তাম।

—ওই হোলো, হোলো। তা আমি বলছিলাম কি, দিনকতকের জন্যে একবার ঘুরে এসো না কেন সেখানে? আমি একটু সামলে নিই। যদি পিপলিপাড়ায় লেগে যায়, তবে পূজোর পরেই নিয়ে আসবো এখন। কি বলো?

মনোরমা বলিল, সেখানে যাব কোন্ মুখ নিয়ে? নিজের বাবা মা থাকলে অন্য কথা ছিল। জ্যাঠামশায় বিয়ের সময় যা দিয়েছিলেন, তুমি তা ঘুচিয়েছ। শুধু গায়ে শুধু হাতে তাদের সেখানে গিয়ে দাঁড়াব যে, তারা হল বড়লোক, ছুই জ্যাঠতুতো বোন ইস্কুল কলেজে পড়ে, বউদিদিরা বড়লোকের মেয়ে, তারা মুখে কিছু না বললেও মনে মনে হাসে। তার চেয়ে না খেয়ে এখানে পচে মরি সেও ভাল।

যুক্তি অকাট্য। ইহার উপর বিপিন কিছু বলিতে পারিল না। বলিল, তা নয় মনোরমা, আমি ডাক্তারিতে বসলেই আজই যে হুড়্ হুড়্ করে টাকা ঘরে আসবে তা তো নয়। ছুদিন একটু আমায় নির্ভাবনায় থাকতে না দিলে আমি তোমাদের বেম্মডাঙায় ফেলে রেখে গিয়ে কি সোয়াস্তি পাব? তাই বলছিলাম।

মনোরমা বলিল, তুমি এস গিয়ে, আমাদের ভাবনা আমরা ভাব্‌বো।

—ঠিক? সে ভার নেবে তো?

—না নিয়ে উপায় কি বল।

দিন চার পাঁচ পরে বিপিন ছোট্ট একটি টিনের সুটকেস্ হাতে করিয়া পিপলিপাড়া রামনিধি দত্ত মহাশয়ের বহির্ব্বাটিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বেলা প্রায় বারোটা বাজে। সকালে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া হাঁটিতে হাঁটিতে আসিয়াছে। পায়ে এক পা ধূলা, গায়ের কামিজটি ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে।

রামনিধি দত্তের বাড়ী দেখিয়া সে কিছু হতাশ হইল। ভাঙা পুরানো কোঠাবাড়ী, বহুকাল মেরামত হয় নাই, কার্নিসে স্থানে স্থানে বট অশ্বত্থের চারা গজাইয়াছে। আর কি ভয়ানক জঙ্গল গ্রামটিতে! শুধু আমের বাগান আর ঘন নিবিড় বাঁশবন।

দত্ত মহাশয়কে পূর্ব্বে সে একখানা চিঠি লিখিয়াছিল, তিনি বিপিনকে আসিতেও লিখিয়াছিলেন; তবুও নতুন অচেনা জায়গায় আসিয়া বিপিনের কেমন বাধা বাধা ঠেকিতে লাগিল, বাহিরবাটী চণ্ডীমণ্ডপে উঠিয়া সে সুটকেস্‌টি নামাইয়া একখানা হাতল-ভাঙা চেয়ারের উপর বসিয়া চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিল। চণ্ডীমণ্ডপটি সেকালের, দেখিলেই বোঝা যায়। নিম কাঠের বড় কড়ি হইতে একটা কাঠের বিড়াল ঝুলিতেছে, সেকালের অনেক চণ্ডীমণ্ডপে এ রকম বিড়াল কিংবা বাঁদর ঝুলিতে বিপিন দেখিয়াছে। একদিকে রাশীকৃত বিচালি, অন্যদিকে একখানা তক্তপোশের উপর একটা পুরানো শপ্ বিছানো। ঘরের মেঝেতে একস্থানে তামাক খাইবার উপকরণ—টিকে, তামাক, হুঁকা, কলিকা। ইহা ব্যতীত অন্য কোন আসবাব চণ্ডীমণ্ডপে নাই।

রামনিধি দত্ত খবর পাইয়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন—আপনিই ডাক্তারবাবু? ব্রাহ্মণের চরণে প্রণাম। আসুন আসুন। বড় কষ্ট হয়েছে এই রোদ্দুরে?

বৃদ্ধ বিবেচক লোক, অল্প কিছুক্ষণ কথা বলিবার পর তিনি বলিলেন, আপনি বসুন, আমি জল পাঠিয়ে দিই হাত পা ধোবার। জামা খুলে একটু বিশ্রাম করুন, তারপরে পাশেই নদী, ওই বাঁশ-ঝাড়টার পাশ দিয়ে রাস্তা। নেয়ে আসবেন এখন। তেল পাঠিয়ে দিচ্ছি।

স্নান করিতে গিয়া নদীর অবস্থা দেখিয়া বিপিন প্রমাদ গণিল। কচুরীপানার দামে স্নানের ঘাটের জল পর্য্যন্ত এমন ছাইয়া ফেলিয়াছে যে, জল দেখাই যায় না। জল রাঙা, স্নান করিয়া উঠিলে গা চুলকায়। কোনরকমে স্নান সারিয়া সে ফিরিল।

বৃদ্ধ বলিলেন, এত বেলায় রান্না করতে গেলে আপনার যদি কষ্ট হয় তবে বলুন চিঁড়ে আছে, দুধ আছে, ভাল কলা আছে, নারকোলকোরা আছে, আনিয়ে দিই। ওবেলা বরং সকাল সকাল রান্নার ব্যবস্থা করে দেব এখন।

ইতিমধ্যে দশ-এগারো বছরের একটি ছেলে একখানা রেকাবিতে একপাশে খানিকটা নারিকেলকোরা আর এক পাশে একটু গুড় লইয়া আসিল। বৃদ্ধ বলিলেন, জল খেয়ে

নিন্, সেই কখন বেরিয়েছেন, ব্রাহ্মণ দেবতা, স্নান-আহ্নিক না হলে তো জল খাবেন না, কষ্ট কি কম হয়েছে! ওরে, জল আনলি নে? খাবার জল ঘটি করে নিয়ে আয়, সন্ধ্যে-আহ্নিক হয়েছে কি?

বিপিন দেখিল দত্ত মহাশয় গোঁড়া হিন্দু। এখানে যদি সুনাম অর্জন করিতে হয়, তবে তাহাকে সব নিয়মকানুন মানিয়া আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণসন্তান সাজিয়া থাকিতে হইবে। সুতরাং সে বলিল, সন্ধ্যে-আহ্নিক নদী থেকে সারব ভেবেছিলাম কিন্তু তা তো হোল না, এখানেই একটু—

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি সব পাঠিয়ে দিচ্ছি। এখানেই সেরে নিন।

ওঃ ভাগ্যে সে বাড়ীতে পা দিয়াই একঘটি জল চাহিয়া লইয়া খায় নাই! তাহা হইলে এ বাড়ীতে তাহার মান থাকিত না। অবস্থা-বিপর্য্যয় ঘটিলে কি কষ্টেই পড়িতে হয় মানুষকে।

—তা হলে রান্নার ব্যবস্থা করে দেব, না চিঁড়ে খাবেন এ বেলা?

—না না, রান্না আর এত বেলায় করতে পারব না। এ বেলা যা হয়—

দত্ত মহাশয় মহাব্যস্ত হইয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

১

বিপিন থাকে দত্ত মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপে, পাশের একখানা ছোট চালাঘরে রাঁধিয়া খায়। দত্ত মহাশয় বাড়ী হইতেই প্রতিদিন চালডাল দেন, বিপিনের তাহা লইতে বাধ বাধ ঠেকিলেও উপায় নাই, বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিতে হয়।

একদিন রোগী দেখিয়া সে একটি টাকা পাইল। দত্ত মহাশয়ের নাতিকে ডাকিয়া বলিল, হীরু, আজ তোমার মাকে বল, আজ আর আমায় সিধে পাঠাতে হবে না। রুগী দেখে কিছু পেয়েছি, তা থেকে জিনিসপত্র কিনে আনব।

এখানে কিছুদিন থাকিয়া সে দেখিল একটা ডাক্তারখানা না খুলিলে ব্যবসা ভাল করিয়া চলিবে না। পাশের গ্রামের নাম কাপাসডাঙ্গা, সেখানে সপ্তাহে দুইবার হাট বসে, আট দশখানি গ্রামের লোক একত্র হয়। দত্ত মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া সেখানে হাটতলায় এক চালাঘরে টিনের উপর আলকাতরা দিয়া নিজের নাম লিখিয়া ঝুলাইল। একটা কেরোসিন কাঠের টেবিলে অনেকগুলি পুরানো শিশি বোতল সাজাইয়া দত্ত মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপ-হইতে সেই হাতলভাঙ্গা চেয়ারখানা চাহিয়া আনিয়া টেবিলের সামনে পাতিয়া রীতিমত ডিস্পেনসারি খুলিয়া বসিল।

এ গ্রামেও লোক নাই, যেখানে সে থাকে সেখানেও লোক নাই। তাহার উপর নিবিড় জঙ্গল দুই গ্রামেই। দিনমানেই বাঘ বাহির হয় এমন অবস্থা। কথা কহিবার মানুষ নাই। সকালে উঠিয়া সে এখানে আসিয়া ডাক্তারখানায় বসে, দুপুরে ফিরিয়া স্নান ও রান্নাবান্না করে। আহারান্তে কিছু বিশ্রাম করিয়া আবার হাটতলায় আসিয়া ডাক্তারখানা খোলে। চুপ করিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বসিয়া থাকে, তারপর অন্ধকার ভাল করিয়া হইবার পূর্ব্বেই দত্তবাড়ী ফিরিয়া যায়, কারণ পথের দুধারের বনে বাঘের ভয় আছে।

রোগী বিশেষ আসে না। এসব অজ পাড়াগাঁয়ে লোকে চিকিৎসা করাইতে শেখে নাই, ঝাড়-ফুঁক শিকড়-বাকড়েই কাজ চালায়। বিপিন তাহা জানে, কিন্তু জানিয়া উপায় কি? তাহার মত হাতুড়ে ডাক্তারের কোন্ শহরে স্থান হইবে?

বাড়ীতে তাহার বাবার একজোড়া পুরানো চশমা পড়িয়া ছিল, সেটা সে সঙ্গে আনিয়াছিল, ডাক্তারখানায় বসিবার বা দৈবাৎপ্রাপ্ত কোন রোগীর বাড়ী যাইবার সময়ে সেই চশমা চোখে লাগায়। কিন্তু সব সময় চোখে রাখা যায় না, সে চশমার কাচের ভিতর দিয়া সব যেন ঝাপসা দেখায়, যুবকের চোখের উপযুক্ত চশমা নয়, কাজেই অধিকাংশ সময়েই চশমা চোখ হইতে খুলিয়া পুঁছিবার ছুতা করিয়া হাতে ধরিয়া রাখিতে হয়।

আশপাশের গ্রাম হইত মাঝে মাঝে লোক হাটবারে আসিয়া ডিস্‌পেন্‌সারিতে বসে। তাহারা প্রায়ই নিরক্ষর চাষী, চশমা-পরা ডাক্তারবাবুকে দেখিয়া সম্ভ্রমের সহিত বলে, ছালাম ডাক্তারবাবু, ভাল আছ? আপনার ডিস্‌পিনসিল ভাল চলছেন?

নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, বড্ড ডাক্তার গো। ভাল জায়গার ছাওয়াল, হাতের পানি খালি' ব্যামো সারে। চেহারাখানা দ্যাখচ না চাচা?

কিন্তু ওই পর্য্যন্ত। পসার যে খুব বেশী জমে, তা নয়। ইহারা নিতান্ত গরীব, পয়সা দিবার ক্ষমতা ইহাদের নাই।

২

একদিন একজন লোক তাহাকে আসিয়া বলল, ডাক্তারবাবু, আপনাকে একটু দয়া করে যাতি হবে, রুগীর অবস্থা খুব সঙ্গীন। নরোত্তমপুরের যদু ডাক্তার এয়েছেন, আপনার নাম শুনে বললেন আপনারে ডাকৃতি। সলাপলামর্শ করবার জন্যি।

বিপিন গতিক সুবিধা বুঝিল না। যদু ডাক্তারের নাম সে শুনিয়াছে, তাহারই মত হাতুড়ে বটে তবে অভিজ্ঞ ব্যক্তি, অনেক দিন ধরিয়া নাকি এ কাজ করিতেছে আর সে একেবারে নূতন, যদি বিদ্যা ধরা পড়িয়া যায় তবে পসার একেবারে মাটি হইবে। বিপিন লোকটাকে তাড়াইবার উদ্দেশ্যে গম্ভীর মুখে কহিল, ওসব কনসাল্ট করার ফি আলাদা। সে আপনি দিতে পারবেন?

—কত লাগবে বাবু? যদুবাবু যা বলে দেবেন তাই দেব।

—যদুবাবুর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক? তিনটাকা ফি দিতে পারবে?

—হাঁ বাবু, চলুন, তিনডে টাকাই দেবানু। মনিষ্যি আগে, না টাকা আগে?

এত সহজে লোকটা রাজী হইবে, বিপিন ভাবে নাই। বিপদ তো ঘাড়ে চাপিয়া বসিল দেখা যাইতেছে। বলিল, গাড়ী নিয়ে আসতে হবে কিন্তু। হেঁটে যাব না।

রোগীর বাড়ী পৌছিয়া বিপিন দেখিল বাহিরের ঘরে একজন রোগা মত প্রৌঢ় লোক বসিয়া বিড়ি টানিতেছে, গায়ে কালো সার্জ্জের কোট ও সাদা চাদর, পায়ে কেম্বিসের ফিতা-আঁটা জুতা। বুঝিল ইনিই যদু ডাক্তার। বিপিনের বুকের মধ্যে টিপ টিপ করিতে লাগিল।

প্রৌঢ় লোকটি হাসিয়া কালো দাঁতগুলি বাহির করিয়া বলিল, আসুন ডাক্তারবাবু, আসুন, নমস্কার। এসেছেন এ দেশে যখন তখন দেখা একদিন না একদিন হবেই ভেবে রেখেছি। বসুন।

বিপিন নমস্কার করিয়া বসিল। পাড়াগাঁয়ের চাষী লোকের বাহিরের ঘর, অন্তঃপুর যেদিকে, সেদিকে কেবল মাটির দেওয়াল, অন্য কোন দিকে দেওয়াল নাই। নতুন ডাক্তারবাবুকে দেখিবার জন্য বহু ছেলেমেয়ে ও কৌতূহলী লোক উঠানে জড় হইয়াছে।

এতগুলি লোকের কৌতূহলী দৃষ্টির কেন্দ্রস্বরূপ হওয়াতে বিপিন রীতিমত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু ইহাও সে বুঝিল আজ যদি সে জয়ী হইয়া ফেরে, তবে তাহার নাম ও পসার আজ হইতেই এ অঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে। জিতিতেই হইবে তাহাকে যে করিয়াই হউক।

যদু ডাক্তার বলিল, আপনার পড়াশুনা কোথায়?

বিপিন একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়াছিল যদু ডাক্তার সম্পর্কে, লোকটা শিক্ষিত নয়। বিপিন মামলা মোকদ্দমা সম্পর্কে রাণাঘাটে অনেক উকীল মোক্তারের সঙ্গে মিশিয়াছে, তাহাদের কথাবার্ত্তার সুর ও ধরণ অন্য রকম। সে চশমার ভিতর দিয়া যেন সম্মুখের নারিকেল গাছের মাথার দিকে চাহিয়া আছে এমন ভাবে চশমাসুদ্ধ নাকের ডগাটি খুব উঁচু করিয়া বেপরোয়া ভাবে বলিল, ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে।

—ও! কোন্ বছর পাশ করেছেন?

—আজ তিন বছর হ'ল।

—এদিকে কতদূর পড়াশুনা করেছিলেন?

লোকটা নিতান্ত গেঁয়ো বটে। ভাল লেখা-পড়া জানা লোকে এসব কথা প্রথম পরিচয়ের সময় জিজ্ঞাসা করে না। মানীদের বাড়ী সে এতকাল বৃথাই কাটায় নাই। সে খুব চালের সহিত বলিল, আই এসসি পাশ করে ক্যাম্বেল স্কুলে ঢুকি।

যদু ডাক্তার যেন বেশ একটু ঘাবড়াইয়া গেল। বলিল, তা বেশ বেশ।

বিপিন মানীর প্রদত্ত ডাক্তারি বইগুলি পড়িয়া এটুকু বুঝিয়াছিল রোগ নির্ণয় জিনিসটা বড়

সহজ নয় এবং ইহা লইয়া ডাক্তারে ডাক্তারে মতভেদ ঘটিলে সাধারণ লোকের পক্ষে ইহা বোঝা শক্ত, যে কোন্ ডাক্তারের মত অভ্রান্ত।

সে বলিল, এ বাড়ীর পেশেণ্টের রোগটা কি ?

—রেমিটেণ্ট ফিভার। সঙ্গে রক্ত-আমাশা আছে, দেখুন আপনি একবার।

বিপিন ও যদু ডাক্তার বাড়ীর মধ্যে গেল। রোগীর বয়স উনিশ-কুড়ির বেশী নয়, চেহারা রোগের পূর্ব্বে ভাল ছিল, বর্ত্তমানে জীর্ণশীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

বিপিনকে যদু ডাক্তার বলিল, আপনি দেখুন আগে।

বিপিন অনেকক্ষণ ধরিয়া নাড়ী টিপিয়া বুকে পিঠে নল বসাইয়া পিঠ বাজাইয়া বুক বাজাইয়া দেখিয়া বলিল, একটু নিমোনিয়ার ভাব রয়েছে।

যদু ডাক্তার তাড়াতাড়ি বিপিনের মতেই মত দিয়া বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, ওটা আমি লক্ষ্য করেছি।

বিপিন সাহস করিয়া আন্দাজে বলিল, টাইফয়েডের দিকে যেতে পারে বলে মনে হচ্ছে। আজ ন' দিনের দিন বল্লেন না ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ন' দিন। টাইফয়েডের কথা আমারও মনে হয়েছে—

বিপিন দেখিল লোকটা ভড়্কাইয়া গিয়াছে, তাহার মতে মত দিতে খুবই আগ্রহ দেখাইতেছে। বলিল, আপনি একটা ভুল করেছেন যদুবাবু, কুইনেন্‌টা দেওয়া উচিত হয় নি। প্রেস্‌ক্রিপশনটা দেখি ক'দিনের।

যদু সত্যই ভয় খাইয়া গিয়াছিল। সে দুখানা প্রেস্‌ক্রিপশন বিপিনের হাতে দিল। ভয়ে ভয়ে বিপিনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে হাতুড়ে ডাক্তার আর এ তরুণ যুবক, ক্যাম্বেল স্কুল হইতে বছর দুই পাশ করিয়াছে, আধুনিক ধরণের কত রকমের চিকিৎসা-প্রণালীর সহিত পরিচিত। কি ভুলই না জানি বাহির করিয়া বসে! যদু ডাক্তারের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল।

কিন্তু বিপিন বুঝিল অনেক দূর আগাইয়াছে, আর বেশী উচিত নয়। যদু ডাক্তারকে হাতে রাখিলে এ সব পাড়াগাঁয়ে অনেক সুবিধা। এ-অঞ্চলে তাহার যথেষ্ট পসার, সলাপরামর্শ করিতেও দু চার টাকা ভিজিট জুটাইয়া দিতে পারা তাহার হাতের মধ্যে।

সে গম্ভীর স্বরে বলিল, চমৎকার প্রেসক্রিপ্‌শন। ঠিকই দিয়েছেন। কিছু বদ্‌লাবার নেই।

যদু ডাক্তার একবার সগর্ব্বে চারিধারের সমবেত লোকজনের দিকে চাহিল। তাহার মন হইতে বোঝা নামিয়া গিয়াছে।

—যদুবাবু, একটু গরম জলের ফোমেণ্ট করলে বোধ হয় ভাল হয়।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। আমিও কাল থেকে তাই ভাবছি—

—আর একবার জোলাপটা দেওয়ান—

—জোলাপ, নিশ্চয়ই। আমিও তা—

ফিরিবার পূর্ব্বেই দুজনে খুব বন্ধুত্ব হইয়া গেল। দুজনের কেহই বুঝিতে পারিল না, পরস্পরকে তাহারা বুঝিয়া ফেলিয়াছে কি না।

৩

হাটতলায় বিপিনকে রোগীর আশায় বসিয়া থাকিতে হয় প্রায় সারাদিনই। রোগী যদি আসিত, তবে চুপ করিয়া নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকিবার কষ্ট হয়তো পোষাইত, কিন্তু রোগী আসে না।

প্রথম মাস দুই রোগী হইয়াছিল, যদু ডাক্তারও কয়েকটি জায়গায় পরামর্শ করিবার জন্য তাহাকে ডাকাইয়া লইয়া গিয়াছিল, প্রথম মাসে কুড়ি এবং দ্বিতীয় মাসে পঁয়ত্রিশ টাকা আয় হইবার পরে বিপিনের মনে নতুন আশা, আনন্দ ও উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল। পাঁচ টাকা ব্যয় করিয়া সে কলিকাতা হইতে ডাকে একখানা বাংলা 'জ্বর-চিকিৎসা' বলিয়া বই আনাইল। ভারি উপকার হইল বইখানি পড়িয়া। যদু ডাক্তারের ইচ্ছা ছিল তাহাকে দিয়া অস্লারের বিখ্যাত বইখানা কেনাইবে। বিপিন বলিতে পারে না যে সে ইংরাজি এমন কিছু জানে না যাহাতে করিয়া সে অস্লারের বই বুঝিতে পারে। সুতরাং সে কোনোরূপে এড়াইয়া পাশ কাটাইয়া চলিতে লাগিল। তৃতীয় মাস হইতে কেন যে দুরবস্থা ঘটিল, তাহা সে বোঝে না।

'প্রথম দুই সপ্তাহ তো শুধু বসিয়া। কে একজন এক ডোজ ক্যাস্টর অয়েল লইয়া গিয়াছিল, দুই সপ্তাহের মধ্যে সে-ই একমাত্র রোগী ও খরিদ্দার।

মুদীর-দোকানে বাকী পড়িতে লাগিল, ডাক্তারবাবু বলিয়া খাতির করে তাই ধারে জিনিস দেয়, নতুবা কি বিপদেই পড়িতে হইত!

একদিন চুপ করিয়া বসিয়া আছে, প্রায় সন্ধ্যার সময় একজন লোক বিপিনের ডাক্তারখানার চালাঘরের সামনে দাঁড়াইয়া বলিল, এইটে কি ডাক্তারখানা?

বিপিনের বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এসো, কোত্থেকে আসচো বাপু?

—আপুনিই ডাক্তারবাবু? পেন্নাম হই। আপনাকে যাতি হবে নরোত্তমপুর। যদুবাবু ডাক্তার চিঠি দিয়েছেন, এই নিন্।

লোকটা একটা চিরকুট কাগজ বিপিনের হাতে দিল। বিপিন পড়িয়া দেখিল কলেরার রোগী, যদু ডাক্তার লিখিয়াছে তাহার স্যালাইন দিবার তোড়জোড় নাই, বিপিনকে সে সব লইয়া শীঘ্র আসিতে। বিলম্ব করিলে রোগী বাঁচিবে না।

স্যালাইন দিবার তোড়জোড় বিপিনেরও নাই। কিন্তু বিপিন একটা ব্যাপার বুঝিয়া ঠিক করিয়া লইল। জলে লবণ গুলিয়া শিরার মধ্যে ঢুকাইয়া দিতে বেশী বেগ পাইতে হইবে না। চিকিৎসা করিবার সাহস আছে বিপিনের। সে বাহির হইয়া পড়িল।

—শোনো, আমার বাক্সটা নিয়ে চল, পাচ টাকা দিতে হবে কিন্তু—

— চলেন বাবু আপুনি। যদুবাবু যা বলে দেবেন, তাই পাবেন।

রোগীর বাড়ীতে পৌছিয়া গৃহস্থের সাধারণ অবস্থা দেখিয়া বিপিন ভাবিল, ইহাদের নিকট হইতে পাচ টাকা তো দূরের কথা, এক টাকা কি আট আনা পয়সা লইতেও বাধে।

যদু ডাক্তার বলিল, স্যালাইন দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়, বিপিনবাবু।

রোগীর ব্যাপার খুব সুবিধা নয়, বিপিন নাড়ী দেখিয়া বুঝিল। বলিল, এ তো শেষ হয়ে এসেছে যদুবাবু। এরকম ঘাম হচ্ছে, নাড়ী নেমে যাচ্ছে, কতক্ষণ টিকবে?

যদু ডাক্তার বিপিনের অপেক্ষা অনেক অভিজ্ঞ লোক। সে আজ আট দশ বৎসর এই অঞ্চলে বহু রোগী ও বহু প্রকার রোগের অবস্থা দেখিয়া আসিতেছে। সে বলিল, স্যালাইন দিন আপনি—টিকে যেতে পারে।

বিপিনের জিদ্ চাপিয়া গেল। সে বলিল, নুন জলে গুলে ওর শির কেটে ঢুকিয়ে দিতে হবে। অন্য কিছু ব্যবস্থা নেই। কিন্তু রোগী তার মধ্যে মারা না যায়—

আপনি শির কেটে নুনজল ঢোকান, আমি ওর মধ্যে নেই।

বিপিন অসীম সাহসী মানুষ। যে আসুরিক চিকিৎসা করিতে অভিজ্ঞ পাস-করা ডাক্তার ভয় খাইত, বিপিন তাহা অনায়াসে বুক ঠুকিয়া করিয়া ফেলিল।

যদু বিপিনের কাণ্ড দেখিয়া ভয় খাইয়া বলিল—কত সি. সি. দেবেন বিপিন বাবু?

—সি. সি.-ফি. সি. কি মশাই এতে? বাংলা নুনগোলা জল, তার আবার সি. সি.। দেখুন আমি কি করি, আপনি যখন হাত দিচ্ছেন না।

এ পল্লীগ্রামের কোনো লোক এ ধরণের কাণ্ড দেখে নাই, ঘরের দোরের কাছে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া সবাই বিপিনের ক্রিয়াকলাপ দেখিতে লাগিল।

হঠাৎ রোগী একেবারে অসাড় হইয়া পড়িল।

যদু ডাক্তার বলিল, বিপিনবাবু, হয়ে গেল বোধ হয়।

—হয় নি। ভয় খাবেন না—

বিপিনের কথা কেহ বিশ্বাস করিল না। বাড়ীতে কান্নাকাটি পড়িয়া গেল। বিপিন হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া সতেজ রাখিবার জন্য একটা ইন্‌জেক্‌শন করিল, যদু ডাক্তারের বারণ শুনিল না।

যদু বলিল, আপনি যা হয় করুন বিপিনবাবু, আমায় যেন এর পরে কেউ দোষ না দেয় তা বলে রাখছি।

বিপিন বলিল, যদুবাবু, সব সময় বই পড়ে ডাক্তারি চলে না, অন্ধকারে লাফিয়ে পড়তে হয়। বাঁচে না বাঁচে রোগী—আমার যা ভাল মনে হচ্ছে, তা করে যাবো।

যদু ডাক্তার বাহিরে চলিয়া গেল।

রোগী আর নাই বলিলেই হয়। কান্নাকাটি বেজায় বাড়িয়াছে ঘরের বাহিরে। বিপিন আর দুবার ইন্‌জেক্‌শন করিল, রোগীর বিছানার পাশ ছাড়িয়া সে একটুও নড়িল না।

তাহাকে যেন কি একটা নেশায় পাইয়াছে, কিসের ঘোরে সে কাজ করিয়া যাইতেছে সে নিজেই জানে না। আরও আধ ঘণ্টা পরে রোগী চোখ মেলিয়া চাহিল। রোগীর চোখের চাহনি দেখিয়া বিপিনের মন আহ্লাদে নাচিয়া উঠিল যেন, সে লোকজন ঠেলিয়া বাহিরে গিয়া দেখিল যদু ডাক্তার উঠানের গোলার তলায় দাঁড়াইয়া বিডি টানিতেছে ও কয়েকজন গ্রাম্য লোকের সহিত কি কথা বলিতেছে।

—আসুন যদুবাবু, একবার নাড়ীটা দেখুন তো! আর ভয় নেই, সামলে নিয়েছে।

যদু ডাক্তার আসিয়া রোগী দেখিয়া বলিল. বেঁচে গেল এ যাত্রা। ওকে যমের মুখ থেকে টেনে বার করলেন মশাই।

যে ঘরে রোগী শুইয়া আছে, সে ঘরের মেঝেতে বন্যার জল কিছুদিন আগেও ছিল প্রায় একহাঁটু, বাঁশের মাচার উপর রোগী শুইয়া, ঘরের চারিদিকে চাহিয়া বিপিন দেখিল কয়েকটি দড়ির শিকা এবং ছেঁড়া কাঁথার পুঁটুলি ও হাঁড়িকুড়ি ছাড়া অন্য আসবাব নাই। ইহাদের কাছে ভিজিটের টাকা লইতে পারা যায়?

বিপিন ও যদু বাহিরে চলিয়া আসিল। যদু বলিল, একটা ডাব খাবেন? ওরে ব্যাটারা ইদিকে আয়, ডাক্তারবাবুকে একটা ডাব কেটে খাওয়া।

গ্রামসুদ্ধ লোক ঝুঁকিয়া পড়িয়া বিপিনের চিকিৎসা দেখিয়াছিল। সকলে বলাবলি করিতে লাগিল, এত বড় ডাক্তার বা এমন চিকিৎসা তাহারা জ্ঞানে কখনও দেখে নাই। যদু ডাক্তার লোকটা চালাক, দেখিল এ স্থানে বিপিনের প্রশংসা করিলেই সে নিজেও খাতির পাইবে, নতুবা লোকে ভাবিবে যদু ডাক্তারের হিংসা হইয়াছে। সুতরাং সে বক্তৃতার সুরে সমবেত লোকজনের সামনে বলিল, ডাক্তার অনেক দেখিচি, কিন্তু বিপিনবাবুর মত সাহস কোন ডাক্তারের দেখিনি। হাজার হোক পেটে বিদ্যে আছে কিনা? ভয়ডর নেই কিছুতেই।

একজন লোক গোটাচারেক কচি ডাব কাটিয়া আনিল। বিপিন বলিল. আমাদের ডাব তো দিচ্ছ, রোগীকে এখন অনবরত ডাবের জল দিতে হবে, সে তৈরী আছে তো?

—খান বাবু, আপনাদের ছিচরণ আশীর্ব্বাদে দশটা নারিকেলের গাছ বাড়ীতে। বাবু, শহর বাজার হ'লি এই গাছ কডার ফল বিক্রী করে বেশ কিছু প্যাতাম, এখানে জিনিসের দর নেই। কাপাসডাঙার হাটে ডাব একটা এক পয়সা তাও খদ্দের নেই।

৪

ফিরিবার সময় বিপিন ভিজিট লইতে চাহিল না। যদু ডাক্তার অনেক করিয়া বুঝাইল, পাড়াগাঁয়ে সবই এই রকম অবস্থার মানুষ। তাহা হইলে চলিবে কি করিয়া যদি ইহাদের নিকট ভিজিট না লওয়া যায়?

বিপিন বলিল তা হোক, যদুবাবু। আমি ডাক্তারি করছি শুধুই কি নিজের জন্যে, অপরের দিকটাও দেখি একটু। আচ্ছা যাই, আজ হাটবার। ডাক্তারখানা খুলি গিয়ে ওখানে। লোক এসে ফিরে যাবে।

বিপিন ভিজিট লইবে কি, মানীর কথা এসময় অনবরত মনে পড়িতেছে। মানী তাহাকে এ পথে নামাইয়াছে, যদি সে কোন গরীব রোগীর প্রাণ দান দিয়া থাকে তবে তাহার বাপমায়ের আশীর্ব্বাদ মানীর উপর গিয়া পড়ুক। মানীর লাভ হউক। এই অতি দুরবস্থাগ্রস্ত রোগীর নিকট সে মোচড় দিয়া টাকা আদায় করিলে মানীর স্মৃতির সম্মান ঠিকমত বজায় রাখা হইত না।

কাপাসডাঙার হাটতলায় যখন সে ফিরিয়া আসিল তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে।

আজ এখানকার হাটবার, পাড়াগাঁয়ের ছোট্ট হাট, সবসুদ্ধ একশো কি দেড়শো লোক জমিয়াছে, খুচরা ঔষধ কিছু কিছু বিক্রয় হইয়া থাকে।

কুমড়া বেগুন বিক্রয় করিয়া যে যেখানে চলিয়া গেল। বিপিন ডাক্তারখানা বন্ধ করিয়া পাশে বিষ্ণু নাথের মুদীর দোকানে হ্যারিকেন লণ্ঠনটি ধরাইতে গেল। বিষ্ণু খরিদ্দারকে খৈল আর ক্রাসিন তৈল মাপিয়া দিতেছে। বিপিন বলিল, বিষ্ণু, বাড়ী যাবে না?

বিষ্ণু বলিল, আমার এখনও অনেক দেরি ডাক্তারবাবু। এখন তবিল মেলাবো, কালকের তাগাদার ফর্দ্দ তৈরী করবো, আপনি যান। হ্যাঁ ভাল কথা, আপনার যে ভারি সুখ্যাত শোনলাম।

—কে করলে সুখ্যাত?

—ওই সবাই বলাবলি করছিল। আজ কোথায় রুগী দেখে এলেন, তাকে নাকি শির কেটে নুনগোলা জল ঢুকিয়ে কলেরার রুগী একেবারে বাঁচিয়ে চাঙ্গা করে দিয়ে এসেছেন, এই সব কথা বলছিল। সবারই মুখে ঐ এক কথা।

যাহারা প্রশংসা চিরকাল পাইয়া আসিতেছে, তাহারা জানে না জীবনে কত লোক আদৌ কখনো ও জিনিসটার আস্বাদ পায়ই না। বিপিনকে ভাল বলিয়াছিল কেবল একজন, সে গেল অন্য ধরণের ব্যাপার। কাজ করিয়া অনাদিবাবুর সুখ্যাতি সে কোনোদিনই অর্জ্জন করিতে পারে নাই। এই প্রথম লোকে অযাচিতভাবে তাহার কাজকে ভাল বলিতেছে, তাহার ব্যক্তিত্বকে সম্মান দিতেছে, মানুষের জীবনে এ অতি মূল্যবান ঘটনা।

বিষ্ণু আরও বলিল, ডাক্তারবাবু, আপনি নাকি ওরা গরীব বলে এক পয়সা নেন নি? সবাই বলছিল, কি দয়ার শরীর! মানুষ না দেবতা! গরীব বলে শুধু একটা ডাব খেয়ে চলে এলেন বাবু।

হ্যারিকেন লণ্ঠনটা জ্বালিয়া দুধারের ঘন বনের ভিতরকার সুঁড়িপথ বাহিয়া বিপিন প্রায় দেড় মাইল দূর রামনিধি দত্তের বাড়ী ফিরিল।

দত্ত মহাশয় চণ্ডীমণ্ডপেই বসিয়া বিষয়সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখিতেছিলেন। তক্তপোশের উপর মাদুর বিছানো, সামনে কাঠের বাক্স, তাহার উপরে লণ্ঠন।

বলিলেন, আসুন ডাক্তারবাবু, আজ বাড়ীতে আমার জামাই-মেয়ে এসেছে অনেক দিন পরে। আজ একটু খাওয়া-দাওয়া আছে, তা আপনাকে আর হাত পুড়িয়ে রাঁধতে হবে না। দুখানা লুচি না হয় অমনি গরীবের বাড়ী—

—বিলক্ষণ, সে কি কথা! তা হবে এখন। ওসব কি বলছেন? জামাইবাবু কই!

—বাড়ীর মধ্যে গিয়েচেন। এতক্ষণ বাঁওড়ের ধারে বেড়াচ্ছিলেন, চা খেতে ডাক দিলে তাই গেলেন। ওরে কেষ্ট, ডাক্তারবাবুকে চা দিয়ে যা, সন্দে-আহ্নিক সেরে ফেলুন হাত-পা ধুয়ে।

ইহারা কখনও চা খায় না। আজ জামাই আসিয়াছে, তাই চা খাওয়ার ও দেওয়ার ব্যস্ততা। বিপিনের হাসি পাইল।

একটু পরে দত্ত মশায়ের জামাই বাহিরে আসিল। বিপিনের সমবয়সী হইবে, দেখিতে শুনিতে খুব ভাল নয়, মুখে বসন্তের দাগ।

দত্ত মহাশয়ের কথায় সে বিপিনের পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া তক্তপোশের এক পাশে বসিল।

বিপিন বলিল, জামাইবাবু কোথায় থাকেন?

—আজ্ঞে কুলে-বয়ড়া। সেখানে তামাকের ব্যবসা করি।

—এখানে ক'দিন থাকবেন তো?

—থাকলে তো চলে না। এখন তাগাদা-পত্তরের সময়, নিজে না দেখলে কাজ হয় না। পরশু যাবো ভাবচি।

জামাইয়ের সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। আজ এবেলা রান্নার হাঙ্গামা নাই বলিয়াই বিপিন নিশ্চিন্ত মনে গল্প করিবার অবকাশ পাইয়াছে। দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে অন্যদিন যে গল্প হয় তাহা বিপিনের তেমন ভাল লাগে না, দত্ত মহাশয় শুধু রামায়ণ মহাভারতের কথা বলেন। আজ সমবয়সী একজন লোককে পাইয়া অনেকদিন পরে সে গল্প করিয়া বাঁচিল।

তামাক খাইবার উপায় নাই, দত্ত মহাশয় বসিয়া আছেন। অনেকক্ষণ পরে বোধ হয় তাঁর খেয়াল হইল তিনি উপস্থিত থাকাতে ইহাদের ধূমপানের অসুবিধা হইতেছে। বলিলেন, তাহলে বসুন ডাক্তারবাবু, আমি দেখি খাওয়া-দাওয়ার কতদূর হল, এদিকে রাতও হয়েছে।

৫

কিছুক্ষণ পর বাড়ীর ভিতর হইতে আহারের ডাক পড়িল।

পাশাপাশি খাইবার আসন পাতা হইয়াছে দত্ত মহাশয় ও জামাইয়ের। বিপিন ব্রাহ্মণ, সুতরাং তাহার আসন একটু দূরে পৃথকভাবে পাতা।

একটি চব্বিশ-পঁচিশ বছরের তরুণী লুচি লইয়া ঘরে ঢুকিয়া সলজ্জভাবে বিপিনের দিকে চাহিল।

দত্ত মহাশয় বলিলেন, এইটি আমার মেয়ে। শান্তি, ডাক্তারবাবুকে প্রণাম কর মা।

তরুণী লুচির চুপড়ি নামাইয়া রাখিয়া বিপিনের পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল। তারপর সকলের পাতে লুচি দিয়া চলিয়া গেল।

বিপিনের হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল আর এক দিনের কথা। মানীদের বাড়ী, সেও এই রকম জামাই আসিয়াছিল, রান্নাঘরে এই রকম জামাইবাবু, অনাদিবাবু ও সে খাইতে বসিয়াছিল। সেদিন আড়ালে ছিল মানী—দেড় বৎসর আগের কথা।

আর কি তাহার সঙ্গে দেখা হইবে? সম্ভব নয়। দেখাসাক্ষাতের সূত্র ছিঁড়িয়া গিয়াছে। আর সে সম্ভাবনা নাই।

ভাবিতেই বিপিনের বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়া উঠিল। লুচির ড্যালা গলায় আটকাইয়া গেল, কান্না ঠেলিয়া আসে। মন হু হু করিয়া উঠিল। ইহারা কে? ওই যে শ্যামা মেয়েটি আধ ঘোমটা দিয়া পরিবেশন করিতেছে, কে ও? বিপিন ইহাদের চেনে না। অতি সুপরিচিত পরিবেশের মধ্যে ইহারা সবাই অপরিচিত। কোন দিক দিয়াই বিপিনের সঙ্গে ইহাদের কোন যোগাযোগ নাই।

শান্তি আসিয়া পায়েসের বাটি প্রত্যেকের পাতের কাছে রাখিয়া সেই ঘরের মধ্যেই দাঁড়াইয়া রহিল। দত্ত মহাশয় বিপিনের ডাক্তারির প্রশংসা করিতেছিলেন, শান্তি একমনে যেন তাহাই শুনিতেছিল।

বিপিন একবার মুখ তুলিয়া চাহিতেই শান্তির সঙ্গে চোখাচোখি হইয়া গেল। শান্তি তাহারই দিকে চাহিয়া ছিল এতক্ষণ নাকি? বিপিন কেমন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

দত্ত মহাশয় তাঁহার মেয়েকে অনুযোগ করিতে লাগিলেন, তিনি লুচি খাইতে ভালবাসেন না, তবে কেন তাঁহাকে লুচি দেওয়া হইয়াছে। দত্ত মহাশয়ের আহারাদির বিশেষত্ব আছে, পূর্ব্বে অবস্থা ভাল থাকার দরুনই হউক বা যে জন্যই হউক, তাঁহার খাওয়া-দাওয়া একটু শৌখীন ধরনের। তাঁহার জমিতে সাধারণতঃ মোটা নাগরা ধান হয়, কিন্তু সে ধানের চাল তিনি খাইতে পারেন না বলিয়া সেই ধানের বদলে উৎকৃষ্ট সরু চামরমণি ধান সংগ্রহ করিয়া আনেন সোনাতনপুরের বিশ্বাসদের গোলাবাড়ী হইতে। বারমাস তিনি এই চামরমণি ধানের চাল ছাড়া খান না। বাড়ীর আর কেহ নয়, শুধু তিনি। অন্য সকলের জন্য ক্ষেতের মোট চালের ব্যবস্থা। তবে অথিতিসজ্জন আসিলে অবশ্য অন্য কথা।

বড় বগী থালায় চূড়ার আকারে ভাত বাড়িয়া চূড়ার মাথায় ক্ষুদ্র কাঁসার বাটিতে গাওয়া ঘি দিতে হইবে। ঢাকনিওয়ালা ঝকঝকে কাঁসার গ্লাসে তাঁহাকে জল দিতে হইবে। খুব বড় কাঁঠাল কাঠের সেকেলে পিঁড়ি পাতিয়া থালায় সুগোছালো করিয়া ভাত সাজাইয়া না দিলে তাঁহার খাওয়া হয় না।

অনেকদিন পরে মেয়ে আসিয়াছে, দত্ত মহাশয় একটু বেশী সেবা পাইতেছেন। পুত্রবধূরা শ্বশুরের সেবা যথেষ্ট করিলেও বিপত্নীক দত্ত মহাশয়ের তাহা মনে ধরে না। মেয়ে কেন ভাত সাজাইয়া না দিয়া লুচি খাওয়াইতেছে, ইহাই হইল দত্ত মহাশয়ের অনুযোগের কারণ।

খাওয়ার পর বিপিন বাহিরে যাইতে যাইতে দালানের পাশে জানালার দিকে চাহিল—মানী দাঁড়াইয়া আছে? কেহ নাই। রোজ তাহার খাওয়ার পরে বাহিরে যাইবার পথে এইরূপ জানালার ধারে সে দাঁড়াইয়া থাকিত। কি ছাইভস্ম সে ভাবিতেছে! এটা কি মানীদের বাড়ী যে মানী দাঁড়াইয়া থাকিবে জানালায়? বাহিরে সে একাই আসিয়া তামাক খাইতে বসিল।

বেশ অন্ধকার রাত্রি। উঠানের নারিকেল গাছের মাথায় জট পাকানো অন্ধকার কিন্তু ক্রমশঃ স্বচ্ছ তরল হইয়া উঠিতেছে, পূর্ব্ব দিগন্তে চাঁদ উঠিবার সময় হইল বোধ হয়। গোলার পাশে হাস্নুহানার ঝাড় হইতে অতি উগ্র সুগন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে। এমন রাত্রে ঘুম হয়?

শুধুই বসিয়া ভাবিতে ইচ্ছ করে।

আর কি কখনও তাহার সঙ্গে দেখা হইবে না?

আজ যে ডাক্তার হিসাবে তাহার এত খাতিরযত্ন, লোকমুখে এত সুখ্যাতি, এ সব কাহার দৌলতে?

যে তাহাকে এ পথ দেখাইয়া দিয়াছিল সে আজ কোথায়?

আজ বিশেষ করিয়া ইহাদের বাড়ীর এই জামাই আসার ব্যাপারে মানীদের বাড়ীর তিন বৎসর পূর্ব্বের সে ঘটনা তাহার বিশেষ করিয়া মনে পড়িয়াছে। এমন এক দিনেই মানীর সঙ্গে তাহার আলাপ হয় আবার নূতন করিয়া, বাল্যের দিনগুলির অনেক, অনেক পরে। মানীর জন্য এত মন-কেমন করে কেন?

বিপিন কত রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া বসিয়া রহিল। সে আরও বড় হইবে। ভাল করিয়া ডাক্তারি শিখিবে। মানীর যে দেওর বীজপুরে থাকিয়া ডাক্তারি করে, তাহার কাছে গেলে কেমন হয়? বিপিন নিজের মধ্যে একটা অদ্ভুত শক্তি অনুভব করে। সে ডাক্তারি খুব ভাল বোঝে। এ কাজে তাহার ঈশ্বরদত্ত স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে। কিন্তু আরও ভাল করিয়া শেখা চাই জিনিসটা।

৬

ভাবিতে ভাবিতে কখন সে ঘুমাইয়া পড়িল।

শেষরাত্রে বিপিন স্বপ্ন দেখিল মানী আসিয়াছে। হাসিমুখে তাহার দিকে চাহিয়া বলিতেছে, পোলাও কেমন খেলে বিপিনদা? তোমার জন্যে আমি নিজের হাতে—ভাল লাগল?

ঠিক তেমনি হাসি, সেই সুপরিচিত, অতি প্রিয় মুখ!

বিপিন বলিল, আমি মরে যাচ্ছি মানী, তোকে দেখতে না পেয়ে। তুই আমায় বাঁচা, আমায় ডাক্তারি শেখাবি নে বীজপুরে তোর দেওরের কাছে?

খুব ভোরে বিপিন হাত মুখ ধুইয়া সবে চণ্ডীমণ্ডপে এক ছিলিম তামাক সাজিয়া বসিয়াছে,

এমন সময় দত্ত মহাশয়ের মেয়ে শান্তি এক কাপ চা আনিয়া রোয়াকের ধারে রাখিয়াই বিন্দুমাত্র না দাঁড়াইয়া চলিয়া গেল।

বিপিন একটু অবাক হইয়া গেল। ইহাদের বাড়ীর আবরু বড় কড়া, এতদিন এখানে আছে সে, বাড়ীর কোন মেয়ে, অবশ্য মেয়ে বলিতে দত্ত মহাশয়ের দুই পুত্রবধূ, কখনও তাহার সামনে বাহির হয় নাই। শান্তি যে বড় বাহিরে আসিয়া চা দিয়া গেল? তবে হাঁ, শান্তি তো আর ঘরের বউ নয়, বাড়ীর মেয়ে। তাহার আসিতে বাধা কি? সেদিন সারাদিনের মধ্যে শান্তি আরও অনেকবার বিপিনের সামনে বাহির হইল। শান্তি মেয়েটি বেশ সেবা-পরায়ণা ও শান্ত। চেহারার মধ্যে একটা মিষ্টত্ব আছে, যদিও দেখিতে এমন কিছু সুশ্রী নয়।

এক জায়গায় ভালবাসা পড়িলে আর দু জায়গায় কিছু হয় না।

ভালবাসা এমন জিনিস, যাহা কখনও দুই নৌকায় পা দেয় না। হয় এ নৌকা, নয় ও নৌকা। কত মেয়ে তো আছে জগতে, কত মেয়ে তো সে নিজেই দেখিল, কিন্তু মানীর মত মেয়ে সে কোথাও দেখে নাই। আর কাহারও দিকে মন যায় না কেন?

পরবর্তী দুই তিন দিনের মধ্যে বিপিন অনেকগুলি রোগী হাতে পাইল। রোজ সকালবেলা ডাক্তারখানা খুলিতে গিয়া দেখে যে ডাক্তারখানার সামনে হাটচালায় রীতিমত রোগীর ভিড় জমিয়া গিয়াছে, সকলে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ম্যালেরিয়ার সিজ্‌ন্ পড়িয়া গিয়াছে। দুই তিন দিনের মধ্যে সে ভিজিটই পাইল সাত আট টাকা।

বিপিনের ডাক্তারখানা এই সপ্তাহ হইতেই বেশ জমিয়া উঠিল। গোগা, মল্লিকপুর, সরুলে প্রভৃতি দূর গ্রাম হইতেও তাহার ডাক আসিতে লাগিল। সকলে বলাবলি করিতে লাগিল, যদু ডাক্তারের পসার একেবারে মাটি হইয়া গেল নূতন ডাক্তারবাবু আসাতে।

দত্ত মহাশয় একদিন বলিলেন, আপনার চেহারাখানার গুণে আপনার পসার হবে ডাক্তারবাবু। ডাক্তারের এমন চেহারা হওয়া চাই যে তাকে দেখলেই রোগীর রোগ আদ্ধেক সেরে যাবে। আপনার সম্বন্ধেও সকলেই সেই কথা বলে। যদু ডাক্তার আর আপনি! হাজার হোক আপনি হলেন ব্রাহ্মণ। কিসে আর কিসে!

বিপিন হিসাব করিয়া দেখিল সে পাঁচ মাস আদৌ বাড়ী যায় নাই। অবশ্য এই পাঁচ মাসের মধ্যে প্রথম তিন মাস কিছুই হয় নাই, শেষ দুই মাসে প্রায় দেড়শত টাকা আয় হইয়াছে। ম্যালেরিয়ার সিজ্‌ন্ এখনও পুরাদমে চলিবে আরও অন্ততঃ এক মাস। এই সময়ে একবার বাড়ী ঘুরিয়া আসা দরকার।

দশম পরিচ্ছেদ

১

যেদিন বিপিন বাড়ী যাইবার ঠিক করিয়াছে, সেদিন সকালে দত্ত মহাশয়ের মেয়ে শান্তি তাহাকে চণ্ডীমণ্ডপে জলখাবার দিতে আসিল। একখানা কাঁসিতে চালভাজা ও নারিকেল-কোরা, ইহাই জলখাবার। চা ইহারা বাঁধা নিয়মে খায় না, কচিৎ কখনো সর্দি কাশি হইলে ঔষধ হিসাবে খাইয়া থাকে। সুতরাং মেয়েটি যখন জলখাবারের কাঁসি নামাইয়া সলজ্জ কুণ্ঠার সহিত বলিল, সে চা খাইবে কি না, বিপিন জিজ্ঞাসা করিল—চা হচ্চে ?

মেয়েটি মৃদুকণ্ঠে বলিল, যদি খান তো করে নিয়ে আসি।

—না, শুধু আমার খাওয়ার জন্যে দরকার নেই।

কেন দরকার নেই, নিয়ে আসচি।

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে চলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে এক পেয়ালা ধূমায়িত গরম চা আনিয়া দিল। দত্ত মহাশয়ের মেয়ে তাহার সহিত এত কথা ইহার পূর্ব্বে কখনো বলে নাই, যদিও আর দু-একবার তাহাকে জলখাবার দিতে অসিয়াছিল। বিপিন ইহাদের বাড়ীর আবরু কড়া বলিয়াই জানে।

মেয়েটি চা দিয়া তখনও দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া বিপিন ভাবিল পেয়ালা লইয়া যাইবার জন্যই সে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে ব্যগ্রভাবে গরম চায়ের পেয়ালায় প্রাণপণে চুমুকের পর চুমুক দিতে দেখিয়া মেয়েটি হঠাৎ হাসিয়া বলিল, অমন করে তাড়াতাড়ি অত গরম খাওয়ার দরকার কি ? আস্তে আস্তে খান—

বিপিন কথা বলিবার জন্যই বলিল, তুমি আর কত দিন আছ ?

—এ মাসটা আছি।

—ও!

—আপনি নাকি আজ বাড়ী যাবেন ?

—হ্যাঁ।

—ক'দিন থাকবেন ?

—দিন পনেরো হবে।

মেয়েটি হঠাৎ বলিয়া ফেলিল—অত দিন ?

পরক্ষণেই যেন কথাটা ও তাহার সুরটা ঢাকিয়া ফেলিবার জন্য বলিল—রুগীপত্তরও তো আছে আবার এদিকে—

—যদু ডাক্তার দেখবে আমার রুগী—একটা মোটে আছে।

—বাড়ীতে কে কে আছেন ?

—মা আছেন, আমার একটি বোন আর আমার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে।

—আপনার এখানে থাকতে খুব কষ্ট হয়, না ?

—নাঃ, কি কষ্ট! বেশ আছি, তোমার বাবা যথেষ্ট স্নেহ করেন, বড় ভাল লোক।

—তবে আমাদের এখানেই থাকুন।

—আছিই তো। কোথায় আর যাবো ধরো—

—যদি আমাদের গাঁয়ে বাস করেন, আমি বাবাকে বলে আপনাকে জমি দেওয়াবো। আসবেন?

বিপিন বিস্মিত হইল। কখনো এ মেয়েটি তাহার সম্মুখে এত দিন ভাল করিয়া কথাই কয় নাই—আজ এত কথায় তাহাকে পাইয়া বসিল কোথা হইতে? বলিল—তা কি করে হয়, পৈতৃক বাড়ী রয়েচে সেখানে—

—কিন্তু ডাক্তারি তো এখানেই করতে হবে—

—সে তো বটেই।

—আপনি আজ বাড়ী যাবেন কখন?

—খেয়েদেয়ে যাবো দুপুরে।

—আমি চলে যাবার আগে আসবেন কিন্তু—

—ঠিক আসবো—নিশ্চয়ই আসবো—

মেয়েটি চায়ের পেয়ালা ও কাঁসি লইয়া চলিয়া গেল।

বিপিন ভাবিল কেমন চমৎকার মেয়েটি। মনে বেশ মায়া আছে। হবে না কেন, কি রকম বাপের মেয়ে! দত্তমশায়ও চমৎকার মানুষ।

২

চা খাইয়া ডিস্পেন্সারিতে গিয়াই বিপিন যদু ডাক্তারের কাছে একখানি পত্র দিয়া একজন লোক পাঠাইয়া দিল—তাহার হাতের রোগীটি দেখিবার জন্য, যত দিন সে না ফেরে। তাহার পর দোর বন্ধ করিয়া বাহির হইবে, এমন সময়ে দরজার এক পাশে মেঝের উপর একখানা খামের চিঠি পড়িয়া আছে দেখিয়া সেখানা তুলিয়া লইল। ইতিমধ্যে কখন পিয়ন আসিয়া চিঠিখানা বোধ হয় দরজার ফাঁক দিয়া ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে। খামখানার উপরকার হস্তাক্ষর দেখিয়া তাহার বুকের রক্ত যেন দুলিয়া উঠিল। এ লেখা মানীর হাতের লেখার মত বলিয়া মনে হয় যেন! বাড়ীর ঠিকানা ছিল, গ্রামের পোস্টমাস্টার সে ঠিকানা কাটিয়া এখানে পাঠাইয়াছে। নিশ্চয়ই মানীর চিঠি নয়—সে অসম্ভব ব্যাপার।

চিঠি খুলিয়া প্রথম দুই চার ছত্র পড়িয়াও সে কিছু বুঝিতে পারিল না, নিচের নামটা একবার পড়িয়া লইতে গিয়া তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। মানীরই চিঠি। মানী লিখিয়াছে :—

আলিপুর

শ্রীচরণকমলেষু, সোমবার

বিপিনদা, কতদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি। কাল শেষ রাত্রে তোমাকে স্বপ্ন দেখেছি, যেন আমাদের বাড়ীর মাঝের ঘরের জানলার ধারে দাঁড়িয়ে তুমি আমার সঙ্গে কথা বলচো। মন ভারি খারাপ হয়ে গেল, তাই এই চিঠি লিখছি তোমার বাড়ীর ঠিকানায়। পাবে কিনা জানিনে।

বিপিনদা, কত দিন সারারাত জেগেছি তোমার কথা ভেবে। সর্বদা ভাবি, একটা কি যেন হারিয়েচি, আর কখনো পাবো না। যদি পলাশপুরের চাকুরী না ছাড়তে, তবে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা থাকতো। আমি শ্বশুরবাড়ী এসে বাবার চিঠিতে জানলাম তুমি আর আমাদের ওখানে নেই। আমার কথা তুমি রাখলে না, আমি বলেছিল'ম আমাকে না জানিয়ে চাকুরী ছেড়ে দিও না। কেনই বা রাখবে? আমার সত্যিই জানতে ইচ্ছে করে, তুমি আমার জন্যে কখনও কোনো দিন এতটুকু ভাবো কি না। হয়তো ভুলে গিয়েচ এতদিনে। হয়তো আমার এ চিঠি পাবেই না. যদি পাও, আমার কথা একটু মনে কোরো বিপিনদা। তুমি আজকাল কি করো, জানতে বড় ইচ্ছে হয়।

আমার ঠিকানা দিলাম না, এ পত্রের উত্তর চাই না। কত বাধা জানো তো সবই। তুমি যদি আমায় একটুও মনে করো চিঠিখানা পেয়ে, তাতেই আমার সুখ। আমার প্রণাম নিও। আশীর্ব্বাদ করো, আর বেশী দিন না বাঁচি। ইতি—

মানী

বিপিন চিঠিখানা পকেটে রাখিয়া ডিস্‌পেনসারির ভাঙা চেয়ারে বসিয়া পড়িল, এ কি অসম্ভব কাণ্ড সম্ভব হইয়া গেল। মানী তাহাকে চিঠি লিখিবে, একথা কখনও কি সে ভাবিয়াছিল? এতখানি মনে রাখিয়াছে তাহাকে সে!

অনেক দিন পরেই বটে। মানীর সঙ্গে কতকাল দেখা হয় নাই। আজ এই চিঠিখানার ভিতর দিয়া এতকাল পরে বহুদূরের মানীর সহিত আবার দেখা হইল। এতদিন কি নিঃসঙ্গ মনে করিয়াছে নিজেকে—সে নিঃসঙ্গতা যেন হঠাৎ এক মুহূর্তে দূর হইয়া গেল। মানী তাহার জন্য ভাবে, আর কি চাই সংসারে?

মানী লিখিয়াছে, সে কি করিতেছে জানিবার তাহার বড়ই আগ্রহ। যদি বলিবার সুবিধা থাকিত, তবে সে বলিত, মানী, কি করচি জানতে চেয়েচ, তুমি যে পথের সন্ধান আমায় দয়া করে দিয়েছিলে, সেই পথই ধরেচি। তোমার মুখ দিয়ে যে কথা বেরিয়েছিল, তাকে সার্থক করে তুলবো আমি প্রাণপণে। তুমি যদি এসে দেখতে, এখানে ডাক্তারিতে আমি কেমন নাম করেচি, তা হোলে কত আনন্দ পেতাম আজ। কিন্তু তা যে হবার নয়। কোনো রকমে যদি সে কথাটা জানাতে পারতাম!

বাড়ী ফিরিতেই দত্ত মহাশয়ের মেয়েটি তখনি আসিল। বলিল, উঃ কত বেলা হয়ে গেল, আপনি কখন আর রান্না করবেন, কখনই বা খাবেন আর কখনই বা বেরুবেন?

—এই এখুনি তাড়াতাড়ি নিচ্ছি।

—তার চেয়ে এক কাজ করি না কেন? আমি দুধ জ্বাল দিয়ে এনে দিচ্ছি, আর বাবার জন্যে সরু চিঁড়ে তোলা থাকে তাই এনে দিচ্ছি। রান্নার হাঙ্গামা এখন আর করবেন না।

—তাই হবে এখন তবে।

—নেয়ে আসুন, তেল দিয়ে যাই।

মেয়েটির এই নূতন ধরনের যত্ন বিপিনের ভাল লাগিতেছিল। বিদেশে বিভুঁয়ে এমন যত্ন কে করে?

স্নান করিতে গেল নদীতে—ক্ষীণকায় নদী, স্থানীয় নাম মাৎলা, কচুরিপানার দামে বুজিয়া আছে। ওপারে বাঁশবন আর ফাঁকা মাঠ, এপারে নদীর ঘাটে যাইবার সুঁড়িপথের দুধারে কেলে-কোঁড়া ও শাম্‌লা লতার ঝোপ। শাম্‌লা লতায় এ সময় ফুল ফোটে, ভারি সুগন্ধ বাতাসে। ওপারে বাঁশবনে কুকো পাখী ডাকিতেছে? ধোপাখালি কাছারি থাকিতে একজন প্রজা একজোড়া কুকো পাখী তাহাকে দিয়া গিয়াছিল, বেশ সুস্বাদু মাংস।

মাৎলা নদীর যতখানি কচুরিপানায় বুজিয়া গিয়াছে, ততখানি জুড়িয়া সবুজ দামের উপর নীলাভ বেগুনি রঙের ফুল ফুটিয়াছে বড় বড় ডাঁটায়—যতদূর দেখা যায়, ততদূর ফুল, কি চমৎকার দেখাইতেছে!

আজ যেন সবই সুন্দর লাগিতেছে চোখে। যে মানীর সঙ্গে জীবনে আর দেখা হইবে না, তারই হাতের লেখা চিঠিখানা! কি অপূর্ব্ব আনন্দ আর সান্ত্বনা বহন করিয়াই আনিয়াছে সেখানা আজ। সুপ্রভাত—কি অপূর্ব্ব সুপ্রভাত!

দত্ত মহাশয়ের মেয়ে একবার বাহিরের উঠানে আসিয়া বলিল—জায়গা করি?

—করো, আমি যাচ্ছি।

মেয়েটি যত্ন করিয়া আসন পাতিয়া জায়গা করিয়াছে, শুধু একখানা আসন দেখিয়া বিপিন বলিল, দত্ত মশায় খাবেন না?

—বাবা বাড়ী নেই, ওপাড়ায় বেরুলেন। তা ছাড়া এখনও রান্না হয়নি, শুধু আপনার চিঁড়ে দুধের ফলার—তাই আপনাকে খাইয়ে দিই। এতটা পথ আবার যাবেন—

সে একটি বড় কাঁসিতে ভিজানো চিঁড়ে লইয়া আসিল। বলিল, আপনি নাইতে গেলেন দেখে আমি চিঁড়েতে দুধ দিইচি—সরু ধানের চিঁড়ে, বেশি ভিজলে একেবারে ভাতের মত হয়ে যায়—দাঁড়ান, কলা নিয়ে আসি—

কত যত্নের সহিত সে কলা ছাড়াইয়া দিল, গুড়ের বাটি হইতে গুড় ঢালিয়া দিল।

বিপিন খাইতে আরম্ভ করিলে বলিল, তেঁতুলের ছড়া-আচার খাবেন? বেশ লাগবে চিঁড়ের ফলারে। বলিয়াই উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে চলিয়া গেল, আসিতে কিছু বিলম্ব হইতে লাগিল দেখিয়া বিপিন ভাবিল, বোধ হয় আচার ফুরাইয়া গিয়াছে—মেয়েটি জানিত না, লজ্জায় পড়িয়া গিয়াছে বেচারী।

কিন্তু প্রায় দশমিনিট পরে সে একটা ছোট্ট পাথরের বাটিতে দু'তিন রকমের আচার

আনিয়া সামনে রাখিয়া সলজ্জ কৈফিয়তের সুরে বলিল, আচারের হাঁড়ি, যে সে কাপড়ে তো ছোঁবার জো নেই, দেরি হয়ে গেল। এই যে করম্‌চার আচার, এ আমি আর বছর করে রেখে গিয়েছিলাম, বাবা খেতে বড় ভালবাসেন। দেখুন তো চেখে, ভাল আছে ?

—বাঃ, বেশ আছে। তুমি আচার করতে জানো বড় চমৎকার দেখচি যে—

মেয়েটি লাজুক হাসি হাসিয়া বলিল, এমন আর কি করতে জানি, মা থাকতে শিখিয়েছিলেন। শ্বশুরবাড়ীতে আমার শাশুড়ীও অনেক রকম আচার করতে জানেন। এঁচড়ের আচার পর্যন্ত।

—আর কি কি আচার জানো ?

—আমের জানি, নেবুর জানি, নংকার জানি—

—নংকার আচার বড় চমৎকার হয়, একবার খেয়েছিলাম –

—চিঁড়ে আর দুটো নেবেন ?

—পাগল ! পেট ভরে গিয়েচে, দুধ জাল দেওয়া হয়েছে একেবারে ঘন ক্ষীর করে—

খাওয়া শেষ করিয়া বিপিন বাহিরে আসিল। ভাবিল, বেশ মেয়েটি। এমন দয়া শরীরে, এমন মমতা, যেন নিজের বোনটির মত বসে বসে খাওয়ালে।

মানীর কথা মনে পড়িল। মানী ও এই মেয়েটি যেন এক ছাঁচে ঢালাই, তবে প্রভেদও আছে, মানী মনে প্রেম জাগায় আর এ জাগায় স্নেহ ও শ্রদ্ধা।

কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি একটা নেক্‌ড়ায় জড়ানো গোটাকতক পান আনিয়া বিপিনের হাতে দিয়া বলিল, পান ক'টা নিয়ে যান, রদ্দুরে জলতেষ্টা পাবে। পথের জল খাবেন না কোথাও। কবে ফিরবেন ?

বিপিন উঠানেই দাঁড়াইয়া ছিল, বলিল, আজ আর বাড়ী যাবো না ভাবচি।

মেয়েটি অবাক হইয়া বলিল, যাবেন না ?

—না, তাই বেলা দেখছিলাম এখানে দাঁড়িয়ে। এত দেরিতে বেরুলে পথেই রাত হবে।

—তবে যাবেন না আজ। মিছিমিছি চিঁড়ে খেলেন কেন, কষ্ট পাবেন সারাদিন।

—ফাঁকি দিয়ে চিঁড়ের ফলার করে নিলাম। রোজ তো অদৃষ্টে এমন ফলার জোটে না—

মেয়েটি সলজ্জ হাসিয়া বলিল, তা কেন, ভালবাসেন চিঁড়ের ফলার ? কালই আবার খাবেন।

বিপিনের ভারি ভাল লাগিল মেয়েটির এই কথাটা। এই অল্পক্ষণের মধ্যে মেয়েটি তার সরস মন ও কথাবার্ত্তার গুণে বিপিনকে আকৃষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।

মেয়েটি বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলেও বিপিনের মনে হইতে লাগিল, আবার যদি সে আসে, তবে বেশ ভাল হয়। বিপিনের এ ধরণের মনের ভাব হয় নাই অনেক দিন।

কিন্তু বহুক্ষণ সে আসিল না। না আসুক, বিপিন আর জালে জড়াইবে না। কেহই শেষ পর্য্যন্ত টেঁকে না ওরা। কেবল নাড়া দিয়া যায় এই মাত্র। কষ্টও দিয়া যায় খুব। মানী যেমন গিয়াছে, এও তেমনি চলিয়া যাইবে। দরকার কি এই সব আলেয়ার পিছনে ছুটিয়া ?

মানী আলেয়া বটে—কিন্তু তার আলো তাহার মত পথভ্রান্ত পথিককে পথ দেখাইয়াছে। খুবই কষ্ট হয় মানীর জন্য, কিন্তু সেই কষ্টের মধ্যেও কি ব্যথাভরা অপূর্ব্ব আনন্দ আসে তাহার মুখখানি, তাহার সেই সপ্রেম দৃষ্টি মনে করিলে। সর্ব্বদা তাহাকে দেখিতে পাইলে এ মনের ভাব থাকিত না, এ কথা এখন সে বোঝে।

৩

দত্ত মহাশয় দিবানিদ্রা হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিয়া বসিলেন। বলিলেন, শান্তি বলছিল,—আপনি বাড়ী যাবেন বলে শুধু দুটি চিঁড়ে খেয়ে কষ্ট পাচ্ছেন সারাদিন—

—বলেছে বুঝি? কষ্টটা কি? না না—বেলা বেশি হোল বলে আর যেতে পারলাম না। আপনার বড় মেয়ে যত্ন করেছে ওবেলা। বড় ভাল মেয়েটি—

—যত্ন আর কি করবে? আপনারা ব্রাহ্মণ, আমরা আপনাদের সেবাযত্ন করব সে তো আমাদের ভাগ্যি। সে আর এমন বেশি কথা কি—

দত্ত মহাশয় সেকেলে ধরণের গোঁড়া হিন্দু, ব্রাহ্মণের উপর তাঁহার অসাধারণ ভক্তি, কাজেই কথাটা তিনি অন্যভাবে লইলেন। কিছুক্ষণ বসিয়া জমিজমাসংক্রান্ত গল্প করিবার পর বলিলেন, এখানে কিছু ধানের জমি করে দিই আপনাকে। জমি সস্তা এখানে। বছরের ভাতের ভাবনা দূর হবে। ডাক্তারির ব্যাপার হচ্ছে, যেখানে পসার সেখানে বাস।

দত্ত মহাশয় উঠিয়া চলিয়া গেলেন বাড়ীর মধ্যেই। কিছুক্ষণ পরে দত্ত মহাশয়ের মেয়ে আসিয়া বলিল, বাবা বললেন, আপনি কিছু খেয়ে যান—

—কি খাব এখন?

—পরোটা ভেজেচি খানকতক, আপনি আর বাবা খাবেন—ভাত খান নি ওবেলা, খিদে পেয়েচে—

বিপিন স্বাস্থ্যবান যুবক, সত্যই তাহার ক্ষুধা পাইয়াছিল। এ সব ধরণের মেয়েমানুষে মনের কথা জানিতে পারে—মানীকে দিয়া সে দেখিয়াছে। অগত্যা সে বাড়ীর ভিতর উঠিয়া গেল। মেয়েটি ওবেলার মত যত্ন করিয়া খাওয়াইল—কিন্তু খুব বেশি কথা বলিল না, বোধ হয় দত্ত মহাশয় আছেন বলিয়াই।

দত্ত মহাশয় বলিলেন, আপনার ওবেলা খাওয়া হয় নি বলে আমি ঘুম থেকে উঠেই দেখি আমার মেয়ে ময়দা মাখতে বসেছে। আমি তো বিকেলে কিছু খাইনে। বললাম, কি হবে রে ময়দা এখন? তাই বললে, ডাক্তারবাবু ওবেলা ভাত খান নি, ওঁর জন্যে খানকতক পরোটা ভাজব। আমি তো তাতেই জানলাম।

ইতিমধ্যে গ্লাসে করিয়া একবার জল দিতে দত্ত মহাশয়ের মেয়ে কাছে আসিল। তাহার দিকে একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া বিপিনের মন শ্রদ্ধায় ও স্নেহে পূর্ণ হইয়া গেল।

মেয়েটি দেখিতে ভালই, মুখশ্রীও বেশ। এই নিঃসঙ্গ প্রবাস-জীবনে এমন একটি স্নেহপরায়ণা নারীর সান্নিধ্য পাওয়া সত্যই ভাগ্যের কথা।

বৈকালে সে নদীর ধার হইতে বেড়াইয়া আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়াছে, মেয়েটি আসিয়া বলিল, চা খাবেন? বার বার তাহাকে খাটাইতে বিপিনের কুণ্ঠা হইল। সে বলিল, না থাক। একটা পান বরং—

পান তো আনবই, চা-ও আনি। আপনি লজ্জা করেন কেন, চা তো আপনি খান—বললেই তৈরি করে দিই।

মিনিট কুড়ি পরে বিপিন চা খাইতে খাইতে মেয়েটির সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতেছিল। অত্যন্ত ইচ্ছা হইতে লাগিল, ইহার কাছে মানীর কথা বলিবার জন্য। এর মন সহানুভূতিতে ভরা, এ তাহার মনের কষ্ট বুঝিবে। বলিয়াও সুখ।

ইচ্ছা হইল বলে– শোন শান্তি, তোমার মত একটি মেয়ের সঙ্গে আমার খুব আলাপ। সে আমাকে খুব ভালবাসে, তোমার মতই করুণাময়ী, মমতাময়ী সে। আজ তোমার সেবাযত্ন দেখে তার কথা কত মনে হচ্ছে জান শান্তি?

শান্তি বলিবে, বলুন না তার কথা, বড় শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে --

তারপর চোখে আগ্রহভরা দৃষ্টি লইয়া শান্তি তাহার সামনে বসিয়া পড়িবে, আর সে মানীর সহিত তাহার বাল্যের পরিচয়ের কাহিনী হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার সহিত শেষ সাক্ষাতের দিন পর্য্যন্ত সব কথা বলিয়া যাইবে। বৈকাল উত্তীর্ণ হইয়া সন্ধ্যা নামিবে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া নামিবে জ্যোৎস্নারাত্রি, বাঁশবনের মাথায় জ্যোৎস্নালোকিত আকাশে দু'দশটা নক্ষত্র উঠিবে, গাছপালা হইতে টপ্‌ টপ্‌ করিয়া শিশির ঝরিয়া পড়িবে, গ্রাম নিষুতি নিস্তব্ধ হইয়া যাইবে, ডোবার ধারের জগডুমুর গাছের খোড়লে রোজকার মত লক্ষ্মীপেঁচাটা ডাকিবে, তখনও শান্তি গালে হাত দিয়া তন্ময় হইয়া এই অপূর্ব্ব কাহিনী শুনিয়া যাইতেছে ও মাঝে মাঝে আর্দ্র চক্ষু আঁচল দিয়া মুছিতেছে, আর সে অনবরত বলিয়াই চলিয়াছে—তবুও হয়তো বলা শেষ হইবে না, হয়তো বা বলিতে বলিতে পূবে ফরসা হইয়া যাইবে, কাক কোকিল ডাকিয়া উঠিবে, ভোরের কুয়াসায় মাৎলার ধারের আম-শিমুলের বাগান অস্পষ্ট দেখাইবে, অথচ শান্তি উঠিবে না, শেষ পর্য্যন্ত ঠায় বসিয়া শুনিবে।

একথা বলা যায় কার কাছে? যে মন দিয়া শোনে, যে ভালবাসে, সহানুভূতি দেখায়—যার মনে স্নেহ আছে, দয়া আছে, মায়া আছে। সে বুঝিবে, অন্যে কি বুঝিবে?

তেমনি মেয়ে এই শান্তি।

কোন্ দূর নক্ষত্রের দেবলোক হইতে শান্তির মত মেয়েরা, মানীর মত মেয়েরা, পৃথিবীতে জন্ম নেয়!

চা খাওয়া হইলে শান্তি পান আনিল।

বিপিন বলিল, তুমি এখানে আর কতদিন থাকবে শান্তি?

—এ মাসটা আছি।

—তুমি চলে গেলে আমার বড় খারাপ লাগবে—

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই কিন্তু বিপিনের মনে হইল, মেয়েটিকে এরূপ বলা উচিত হয় নাই। এ সব ধরণের কথা বলা হয়, যখন পুরুষ নারীমনের মুকুলিত প্রেমকে ফুটাইতে চায়। বিবাহিতা মেয়ে, কাল শ্বশুরবাড়ী চলিয়া যাইবে—প্রেম জাগিলে মেয়েটিই কষ্ট পাইবে। বিপিন আর ও পথে পা দিবে না। মেয়েটি বোধ হয় সহজ ভাবেই কথাটা গ্রহণ করিল, নতুবা তাহার চোখে লজ্জা ঘনাইয়া আসিত। মানীকে দিয়া বিপিন ইহা অনেকবার দেখিয়াছে।

সে সরল ভাবেই বলিল, কেন?

বিপিন ততক্ষণে সামলাইয়া লইয়াছে। হাসিয়া বলিল—দুধ চিঁড়ের ফলার ঘন ঘন যোগাড় হবে না।

বলিয়াই যেন পূর্ব্ব কথাটা পেটুক লোকের খেদোক্তি ছাড়া আর কিছুই নহে, প্রমাণ করিবার জন্য সে নিজেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

অনেক সময় প্রেম আসে করুণা ও সহানুভূতির ছদ্মবেশে। দত্ত মহাশয়ের মেয়ে সরলা পল্লীবালা, লোককে খাওয়াইয়া মাখাইয়া সে হয়তো খুশি—একটা লোক কোন একটা বিশেষ জিনিস খাইতে ভালবাসে, অথচ সে চলিয়া গেলে লোকটা তাহার প্রিয় সুখাদ্য হইতে বঞ্চিত হইবে ইহা তাহার মনে সত্যকার করুণা জাগাইল।

সে মনে মনে ভাবিল, আহা, ডাক্তারবাবু সরু ধানের চিঁড়ে খেতে এত ভালবাসেন! আমি চলে গেলে কে দেবে? উনি যে মুখচোরা, কাউকে বলতেও পারবেন না।

মুখে বলিল, আমার শ্বশুরবাড়ীতে কনকশালে ধানের চিঁড়ে হয়, খুব ভাল সরু চিঁড়ে আর কি সুগন্ধ! চিঁড়ে ভেজালে গন্ধ ভুর ভুর করে ঘরে। আমাদের বাড়ীর চেয়েও ভাল। আমি গিয়ে আপনার জন্যে পাঠিয়ে দেবো।

বিপিন ভাবিল, তা দেবে তা জানি! তোমাদের আমি চিনি।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল দেখিয়া শান্তি দ্রুতপদে সন্ধ্যাপ্রদীপ দিতে গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

১

সেই দিনের ব্যাপারের পর হইতে বছর খানেক কাটিয়া গিয়াছে, পটল আর বীণার সঙ্গে দেখা করিবার চেষ্টা করে নাই। ইহাতে প্রথম প্রথম বীণা খুব স্বস্তি অনুভব করিল। কিন্তু সপ্তাহ যখন পক্ষে এবং পক্ষ যখন মাসে এমন কি বৎসরে পরিবর্ত্তিত হইতে চলিল—পটলের টিকি কোনদিকে দেখা গেল না, তখন বীণার মনে হইল তাহার মনের এই যে নিরঙ্কুশ স্বস্তি,

ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সহজলভ্য জিনিস—বিধবা হইয়া পর্য্যন্ত এই বৈচিত্র্যহীন স্বস্তি সে বরাবর ইস্তকনাগাৎ পাইয়া আসিয়াছে—ইহার মধ্যে কিছু নূতনত্ব নাই। নূতনত্ব ও বৈচিত্র্য যাহার মধ্যে ছিল, তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে।

খুব অল্পদিনের জন্য—কতদিন? বছর দুই? হাঁ, প্রায় দুই বছরের জন্য তাহার জীবনে এই অনাস্বাদিতপূর্ব্ব বৈচিত্র্য দেখা দিয়াছিল। পটলদা তাহাদের বাড়ীতে আসে—আসিত, মায়ের সঙ্গে কি বলাইয়ের সঙ্গে গল্প করিয়া হয়তো বা একটা পান কিংবা একগ্লাস জল, কখনো বা দুইই, চাহিয়া খাইয়া চলিয়া যাইত।

মায়ের ডাকে বীণাই পান জল আনিয়া দিত—কেননা মনোরমা ঘরের বউ, স্বামীর বন্ধুস্থানীয় লোকের সম্মুখে বাহির হইবার নিয়ম তাহাদের সংসারে নাই।

হয়তো পান দিতে আসিয়া পটল দুই একটা কথা বলিত, বীণা জবাব দিত। হয়তো পটল এক আধটা ছোটখাটো গল্প করিল, বীণা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুনিত—ভাল লাগিত শুনিতে। হয়তো মা উঠিয়া যাইতেন সন্ধ্যাহ্নিক করিতে—বীণা ও পটল রোয়াকে পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিত।

ক্রমে পটলদা যেন একটু ঘন ঘন আসিতে আরম্ভ করিল। পটলের সাড়া পাইলে বীণারও যেন কি হয়। তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠে, রান্নাঘরে বউদিদির কাছে বসিয়া কুট্‌না কুটিতে, কি তেঁতুল কাটিতে, কি বাটনা বাটিতে আর ভাল লাগে না। ছুটিয়া গেলে কে কি মনে করিবে, ধীরে ধীরেই যাইত—অন্য ছুতায় যাইত।

—মা, আজ কি বেগুন পোড়াতে আছে? বউদিদি বলছিল, আমি বললাম, আজ বুধবার, দাঁড়াও, জিগ্যেস করে আসি।

—আচ্ছা মা, পাকানো সলতেগুলো কুলুঙ্গিতে রেখে দিইচি, তার কি একটাও নেই—তুমি নাও নি?

—তোমার কলসীতে জল আনতে হবে না মা? বলো তো এখুনি আনি, আবার সন্ধ্যে হয়ে গেলে তখন—

ইত্যাদি, ইত্যাদি।

তারপর কে জানে আধঘণ্টা, কে জানে একঘণ্টা, সে আর পটলদা গল্পই করিতেছে, গল্পই করিতেছে। যতক্ষণ পটলদা বাড়ীতে থাকিবে বীণা নড়িতে পারিত না সেখান হইতে।

ক্রমে পটলদা চাহিত একটু আড়ালে দেখা করিতে, বীণা তাহা বুঝিত।

বীণার কৌতুহল তখন বেশ বাড়িয়াছে, পুরুষ মানুষ একা থাকিলে কি রকম কথাবার্ত্তা চলে। পটলদা মজার মজার কথা বলে বটে। বীণার হাসি পায়, আনন্দও হয়। মা উপস্থিত থাকিলে পটলদা এ ধরণের কথা বলে না। হয়তো বীণার শোনা উচিত নয় এসব কথা, কিন্তু লাগে মন্দ নয়।

তারপর গ্রামে কথা উঠিল, দাদা বাড়ী আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া বুঝাইলেন, বউদিদিই

দাদার কানে উঠাইল এসব কথা, বলাই মারা গেল, পটলদা সন্ধ্যার সময় ছাদের পাশে বাগানে অন্ধকারে লুকাইয়া দেখা করিতে শুরু করিল, তাহাও একদিন বউদিদির চোখে গেল পড়িয়া—বীণার জীবনে সুখ নাই, আনন্দ নাই কোনদিক হইতে। একটুকু আলো আসিতে সবে আরম্ভ করিয়াছে যাই—অমনি সবাই মিলিয়া হৈ হৈ করিয়া জানালা সশব্দে বন্ধ করিয়া দিল।

২

সেদিন একাদশী।

বীণা সারাদিন মায়ের সঙ্গে নির্জলা একাদশী করিয়া সন্ধ্যাবেলা মায়ের অনুরোধে একটু দুধ ও দুই-একটা ফল খায়। একদিন ঘরে ফলের যোগাড় ছিল না—পাড়াগাঁয়ে থাকে না—মনোরমা বৈকালে বলিল, ও ঠাকুরঝি, মনুর মার কাছ থেকে এক পয়সার পাকা কলা নিয়ে এসো তো? আমি ঘাটে বলেছি ওকে। গিয়ে নিয়ে এস।

বীণা এ পাড়ার সকলের বাড়ীতেই একা যাতায়াত করে—ও পাড়ায় কখনও একা যায় না। মনুর মা থাকে এই পাড়ারই সর্ব্বশেষ প্রান্তে, মধ্যে পড়ে ছোট একটা আমবাগান, সেটা পূর্ব্বে ছিল বীণার বাবা বিনোদ চাটুজ্জের নীলাম-খরিদা সম্পত্তি, আবার ওপাড়ার শ্রীশ গাঙুজ্জে বিপিনের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। একটি আমগাছের নাম 'সোনাতলী', বীণা ছেলেবেলায় এখানে আম কুড়াইতে আসিত—যখন তাহাদের নিজেদের বাগান ছিল। যাইতে যাইতে সে ভাবিল—কি চমৎকার আম ছিল সোনাতলীর। কত বছর এ গাছের আম খাই নি—এবারে খুড়ীমাদের কাছ থেকে দুটো চেয়ে আনবো আমের সময়।

হঠাৎ সে দেখিল পটলদা বাগানের পথ দিয়া বাগানে ঢুকিতেছে। বীণার বুকের রক্ত যেন টল্ খাইয়া উঠিল। এখন সে কি করে? বাড়ী ফিরিয়া যাইবে? পটলদা তাহাকে দেখিতে পায় নাই—কারণ সে বাগানের কোণাকুণি পথটা বাহিয়া বোধ হয় মুচিপাড়ার দিকে যাইতেছে। পটলদার সঙ্গে কতকাল দেখা হয় নাই।

হঠাৎ বীণা নিজের অজ্ঞাতসারে ডাক দিল, ও পটলদা?

পটল চমকিয়া উঠিয়া চারিদিকে কেমন করিয়া চাহিতেছে দেখিয়া বীণার হাসি পাইল।

—এই যে, ও পটলদা!

পটল বিস্মিত ও আনন্দিত মুখে কাছে আসিল।

—তুমি? কোথায় যাচ্ছ?

—যেখানেই যাই। তুমি ভাল আছ?

—তাতে তোমার কি? আমি ম'রে গেলেই বা তোমার কি?

—বাজে বোকো না পটলদা। ওসব কথা বলতে নেই।

—কতদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হল!

বীণা চুপ করিয়া রহিল।

—আমার কথা একটুও ভাবতে বীণা? সত্যি বল।

—বলে লাভ কি পটলদা? যা হবার হয়ে গিয়েছে।

— আমিও তো সেইজন্যে আর যাই না। তোমার নামে কেউ কিছু বললে আমার ভাল লাগে না। তাই ভেবে দেখলাম, দেখা না করাই ভাল, কিন্তু তা বলে ভেবো না যে তোমায় ভুলে গিয়েছি।

বীণা কোন কথা বলিল না।

পটল বলিল, আচ্ছা বীণা, তুমি যেখানে যাচ্ছ যাও—আমবাগানের মধ্যে কথা কইতে দেখলে কে কি ভাববে—যে আমাদের গাঁয়ের লোক—এসো তুমি—

—তুমি আজকাল সেই কোথায় চাকরি করতে সেখানে করো না?

—সে চাকরি গিয়েছে। এখন ব'সে আছি।

—কতদিন চাকরি নেই?

—প্রায় তিন মাস। সংসারে বড় টানাটানি চলেছে—তাই যাচ্ছি মুচিপাড়ায় রঘু মুচির কাছে কিছু খাজনা পাব—গিয়ে বলি, খাজনা না দিস তো দুখানা গুড়ই দে।

—আচ্ছা, এসো পটলদা।

৩

বীণা বাড়ী ফিরিয়া সারাদিন কেমন অন্যমনস্ক রহিল। পটলদার চাকুরি গিয়াছে। তাহার সংসারে বড় কষ্ট। ইচ্ছা হয়—কিন্তু সে ইচ্ছায় কি কাজ হইবে? ইচ্ছা থাকিলেও বীণার এক পয়সা দিয়াও সাহায্য করিবার সামর্থ্য নাই।

তাহাকে কি পটলদা কিছু দিয়াছিল?

প্রথমে বীণা লইতে রাজী হয় নাই। বিধবা মানুষে সাবান কি করিবে? একশিশি গন্ধ তেল শেষ পর্য্যন্ত লইয়াছিল, লুকাইয়া লুকাইয়া নারিকেল তৈলের সঙ্গে মিশাইয়া একশিশি গন্ধতেল দুই তিন মাস চালাইয়াছিল।

এক আধটা সহানুভূতির কথা বলা উচিত ছিল। ভুল হইয়া গিয়াছে, অত তাড়াতাড়ি আমবাগানের মধ্যে কি সব কথা মনে আসে? পটলদার সংসারটি নিতান্ত ছোট নয়, বেচারী চালাইতেছে কি করিয়া? আহা!

সন্ধ্যাবেলার দিকে মনোরমা নদীর ঘাট হইতে আসিল। ছেলেমেয়ে খাই খাই করিয়া জ্বালাতন করিতেছে, মনোরমা বলিল, ঠাকুরঝি, ওদের জন্যে একখোলা চাল ভেজে দাও না? ভাত হতে এখন অনেক দেরি। থাক ততক্ষণ গুড় দিয়ে। মরছে খিদে খিদে করে।

বীণা বলিল, কোন্ চাল ভাজব বউদি ? সেদিনকের সেই মোটা নাগরা আছে। দিব্যি ফোটে—তাই ভাজি, হ্যাঁ ?

বীণার মা বলিলেন, আগে সন্ধ্যেটা দেখা না তোরা, অন্ধকার তো হয়ে গেল মা—আর কখন—

মনোরমা ভিজা কাপড় ছাড়িয়া ফর্সা কাপড় পরিয়া উঠানের তুলসীতলায় প্রদীপ দিতে গিয়া হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল, ও ঠাকুরঝি, আমায় কিসে কামড়াল, শীগগির এস—

বীণা রান্নাঘর হইতে ছুটিয়া গেল, কি হল বউদি ?

সে রোয়াক হইতে উঠানে পা দিবার পূর্ব্বেই মনোরমা আবার চীৎকার করিয়া উঠিল, সাপ! সাপ! অজগর গোখরো—গোলার পিঁড়ির মধ্যে, ও মা, ও ঠাকুরঝি—

বীণা ততক্ষণ ছুটিয়া মনোরমার কাছে গিয়া পৌঁছিয়াছে, কিন্তু সে কিছু দেখিতে পাইল না। মনোরমা উঠানে বসিয়া পড়িয়াছে তাহার হাতের সন্ধ্যাপ্রদীপ ছিটকাইয়া উঠানে পড়িয়া তেল সলিতা ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

মনোরমা বলিল, আমার গা ঝিম্ ঝিম্ করছে ঠাকুরঝি—আমায় ধর।

বীণার মা বলিলেন, শীগগির কেষ্ট ঠাকুরপোকে ডাক, জীবনের মাকে ডাক, ওমা, আমার কি হ'ল গো যা যা শীগগির যা, হে ঠাকুর হে হরি, রক্ষে কর বাবা—

বীণা বলিল, চেঁচিও না মা, আমি ডেকে আনছি, এখানে তার আগে দুটো বাঁধন দিই, গামছাখানা দাও—

মিনিট পনরো মধ্যে গাঁয়ে রাষ্ট্র হইয়া গেল বিপিনের বউকে সাপে কামড়াইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে এপাড়া ওপাড়ার লোক ভাঙিয়া পড়িল বিপিনদের উঠানে। ভীম জেলে ভাল ওঝা, সে আসিয়া গাঁটুলি করিল, মন্ত্র পড়িল, ঝাড়ফুঁক চালাইল, মনোরমা অসাড় হইয়া পড়িয়া আছে, তাহার মাথায় ঘড়া করিয়া জল ঢালা হইয়াছে, তাহার মাথার দীর্ঘ কেশরাশি জলে কাদায় লুটাইতেছে, সেদিকে তখন কাহারও লক্ষ্য করিবার অবকাশ ছিল না, রোগিণীর অবস্থা লইয়া সকলে ব্যস্ত।

কৃষ্ণলাল মুখুজ্জে বলিলেন, সতীশ ডাক্তারের কাছে কে গেল ? ও হরিপদ, তুমি একবার সাইকেলখানা নিয়ে ছোট।

পটলও আসিয়াছিল, সে ভাল সাইকেল চড়িতে জানে, বলিল, আমি যাচ্ছি কাকা। হরিপদ ভাই, তোমার সাইকেলখানা—

বীণা দেখা গেল খুব শক্ত মেয়ে। সে অমন বিপদে হাত-পা হারায় নাই, ছুটাছুটি করিয়া কখনও জল, কখনও নুন, কখনও দড়ি আনিতেছে, সম্প্রতি বৌদিদির মাথাটা উঠানে লুটাইতেছে দেখিয়া সে মাথা কোলে লইয়া শিয়রের কাছে আসিয়া বসিল।

বিপিন দুপুরের পূর্ব্বেই সোনাতনপুর হইতে রওনা হইয়া হাঁটিয়া আসিতেছিল, বেলা ছোট, আমতলীর বাঁওড়ের কাছে আসিতেই অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল।

বিড়ি নাই পকেটে, ফুরাইয়া গিয়াছে, পথের পাশেই শরৎ ঘোষের মুদির দোকান। এখনও প্রায় আধক্রোশ পথ বাকী তাহাদের গ্রামে পেঁছিতে, বিড়ি কিনিতে সে দোকানে ঢুকিল। শরৎ বলিল, দাদাঠাকুর এলেন নাকি আজ? তামাক ইচ্ছে করুন—বসুন, বসুন।

—না আর তামাক খাব না সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে, এক পয়সার বিড়ি দাও আমায়।

—তা দিচ্ছি, দাদাঠাকুর বসুন না। তামাকটা খেয়ে যান, এতটা হেঁটে এলেন।

বিপিন তামাক খাইতে খাইতে বলিল, আখের গুড়ে এবার কেমন হ'ল শরৎ?

—কিচ্ছু না, কিচ্ছু না দাদাঠাকুর। পুঁজিপাটা সব খেয়ে গেল—স' ন' আনা মণ কিনলাম, বেচলাম সাড়ে সাত, আট। সেদিন আর নেই দাদাঠাকুর, ডাহা লোকসান। তবে কি করি, লেখাপড়া তো শিখি নি আপনাদের মত। খাই কি ক'রে বলুন?

—আইনদ্দি চাচার খবর জান? ভাল আছে?

—বেশ আছে, পরশু বেলতার মাঠে বিচুলি তুলতে গিয়ে দেখি বুড়ো দিব্যি খুঁটির মত ব'সে ধানের শাল পাহারা দিচ্ছে।

—আচ্ছা, আসি শরৎ।

—দাঁড়ান দাদাঠাকুর, পাকাটির মশাল আমার করাই আছে, একটা জ্বেলে নিয়ে যান—ওরে, নিয়ে আয় তো গোলার তলা থেকে একটা মশাল! ক'দিন থাকবেন বাড়ী?

—থাকব আর কই? তিন চার দিনের বেশি—রুগীপত্তর ফেলে—

সদর রাস্তা দিয়া গেলে খুব ঘুর হয় বলিয়া সে গ্রামে ঢুকিয়াই নদীর ধারের রাস্তাটা ধরিল। এ দিকটা জনহীন, শুধু বৈঁচিবন, নিবিড় বাঁশবন ও আমবাগান। সন্ধ্যার পর বাঘের ভয়ে এ পথে বড় কেহ একটা হাঁটে না, যদিও বাঘ নাই, কিংবা কালেভদ্রে এক আধটা কেঁদো বাঘ বাহির হইবার জনশ্রুতি শোনা যায় মাত্র। সুতরাং বিপিনের সহিত কাহারও দেখা হইল না।

বাড়ীর কাছাকাছি তাহাদের নিজেদের জমির সীমানায় ঘাটের পথের চালতা গাছটার তলায় যখন সে পৌঁছিয়াছে, তখন একটা গোলমাল ও কান্নার রব তাহার কানে গেল। কোন্‌দিক হইতে শব্দটা আসিতেছে ভাল ঠাহর করিতে পারিল না। একটু আশ্চর্য্য হইয়া চারিদিকে চাহিয়া শুনিল।

এ কি! তাহাদেরই বাড়ীর দিক হইতে শব্দটা আসিতেছে না? তাহার বুকের ভিতরটা এক মুহূর্ত্তে যেন ভয়ে অসাড় হইয়া গেল। কি হইয়াছে তাহাদের বাড়ীতে? না—তাহাদের বাড়ী নয়, এ যেন কেষ্ট কাকাদের কিংবা পরান নাপিতের বাড়ীর দিক হইতে—তাই হইবে, তাহাদের বাড়ী নয়। পরক্ষণেই সে দ্রুতপদে দুরু দুরু বক্ষে বাড়ীর দিকে প্রায় ছুটিতে ছুটিতে চলিল।

আর কিছু দূর গিয়া বিপিনের আর কোনো সন্দেহ রহিল না। এ কান্নার রব যে তাহার মায়ের গলার! পাগলের মত ছুটিতে ছুটিতে সে বাড়ীর পিছনের পথে আসিতেই তাহাদের

উঠানে ভিড় দেখিতে পাইল। তাহাকেও দুই চারজন দেখিয়াছিল তাহারা ছুটিয়া আসিল তাহার দিকে। সর্ব্বাগ্রে ছুটিয়া আসিলেন কৃষ্ণলাল মুখুজ্জে।

—এসো এসো বিপিন, বড় বিপদ—এসো—

বিপিনের গলা দিয়া যেন কথা বাহির হইতেছে না, ভয়ে ও বিস্ময়ে সে কেমন হইয়া গিয়াছে। বলিল, কি—কি, কেষ্ট কাকা, ব্যাপার কি?

ভিড়ের ভিতর হইতে বীণা কাঁদিয়া উঠিল, ও দাদা, শীগগির এসো, বৌদিদি যে আমাদের ছেড়ে চলে গেল গো।

মনোরমা? মনোরমার কি হইয়াছে? বিপিন ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা না করিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া ইহার উহার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। দুই তিন জন হাত ধরিয়া তাহাকে লইয়া গেল।

কে একজন বলিয়া উঠিল, আহা, সতীলক্ষ্মী বউ বটে, স্বামীও একেবারে ঠিক সময়ে এসে হাজির—এদেরই বলে সতীলক্ষ্মী—

বিপিন গিয়া দেখিল উঠানে তুলসীতলার কাছেই মনোরমা মাটিতে শুইয়া। মাথার চুল মাটিতে লুটাইতেছে। সারাদেহ অসাড়, নিস্পন্দ।

বিপিন আর যেন দাঁড়াইতে পারিল না। বলিল, কি হয়েছে কেষ্ট কাকা?

—সাপে কামড়েছিল। যাচ্ছিলেন বৌমা পিদিম দিতে নাকি তুলসীতলায়—

চার পাঁচজন লোক একসঙ্গে ঘটনাটা বলিতে গিয়া পরস্পরকে বাধা দিতে লাগিল। বিপিনের মা তাহাকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বীণা কাঁদিতে লাগিল।

বিপিন নাড়ী দেখিয়া বলিল, নাড়ী নেই বটে—কিন্তু কেষ্ট কাকা, এ মরে নি এখনও। বীণা, শীগগির জল গরম করে নিয়ে আয়—সতীশ ডাক্তারের কাছে একজন যা তো কেউ—

বলিতে বলিতে সতীশ ডাক্তারকে লইয়া পটল আসিয়া উপস্থিত হইল।

সতীশ ডাক্তার ও বিপিন দুইজনে কিছুক্ষণ দেখিল। বিপিন বলিল, আশা আছে বলে মনে হচ্ছে না কি? ইথার ইন্ ক্লোরোফর্ম্ম দিয়ে দেখা যাক্ নাড়ী আসে কিনা—এ রকম রোগী আমি একটা দেখেছিলাম অবিকল এই লক্ষণ। এ মরে নি এখনও।

—ইথার ইন্ ক্লোরোফর্ম্ম দিয়ে কি হবে? দ্যাখো দিয়ে—

—এ মরে নি সতীশবাবু। কতকটা ভয়ে, কতকটা বিষের ক্রিয়ায় এমন হয়েছে—আমার মনে হয় গোখরো সাপ নয়—এ ঠিক শেকড়চাঁদা সাপ—এই রকম লক্ষণ সব প্রকাশ পায়। কেউ দেখেছিল সাপটা?

বীণা বলিল, বউদিদি বলেছিল অজগর গোখরো সাপ—গোলার পিঁড়িতে ছিল—আমি কিছু দেখিনি অন্ধকারে—

সতীশ ডাক্তার বলিলেন, ও কিছু না, ভয়ে অনেক সময় ও রকম হয়। উনি ভয়ে তখন চারিদিকে গোখরো সাপ তো দেখবেনই। অন্ধকারে কি দেখতে কি দেখেছেন—

মনোরমাকে ধরাধরি করিয়া রোয়াকে লইয়া যাওয়া হইল।

অনেক রাত পর্য্যন্ত সতীশ ডাক্তার রহিল। পটল যথেষ্ট উপকার করিল, ছোটাছুটি করা, ইহাকে উহাকে ডাকাডাকি করা। রাত দুপুর পর্য্যন্ত সে বিপিনদের বাড়ীতেই রহিল। বিপদের সময় অন্য কথা মনে থাকে না—গরম জল আনিতে পটল কতবার রান্নাঘরে গেল—বীণা যেখানে একাই ছিল, ছেলেমেয়েদের ও দাদার জন্য রান্না না করিলে তাহারা খাইবে কি ? বীণার মা বউয়ের শিয়রে সন্ধ্যা হইতে বসিয়া আছেন আর হাপুস নয়নে কাঁদিতেছেন।

৪

চারদিন পরে বিপিন মনোরমাকে বলিল—কাল যাব গো, এসেছিলাম দুটো দিন থাকবো বলে—তুমি যে ভয় দেখিয়ে দিলে, তাতে দেরি হয়েই গেল এমনি—

মনোরমা হাসিয়া বলিল, ম'লেই বেশ হোত, না ?

—না না, ওসব কথা বলতে নেই। ঘরের লক্ষ্মী মরতে যাবে কেন ? ছিঃ !

মনোরমা একটু অবাক হইয়া স্বামীর দিকে চাহিল। এত আদরের কথা সে স্বামীর মুখে কতকাল শোনে নাই। ভাগ্যিস সাপে কামড়াইয়াছিল ! উঃ—

মুখে বলিল, ছেলেমেয়ে দুটো ছোট ছোট—নয়তো আর কি ? তোমায় রেখে যেতে পারা তো ভাগ্যির কথা গো।

বিপিন বলিল. আর আমার জন্যে বুঝি কিছু না ?

মনোরমা হাসিল। সে গুছাইয়া কথা বলিতে পারে না কোনো কালেই, মনের মধ্যে কি আছে বুঝাইতে পারে না। সে বোঝে কাজকর্ম, খাওয়ানো মাখানো, নিখুঁতভাবে সংসার চালানো। স্বামীকে সে ভালবাসে কি না বাসে, তা কি মুখে বলা যায় ? ছেলেমেয়ের মা, এখন সে গিন্নিবান্নি মানুষ, অমন ইনাইয়া বিনাইয়া কথা বলা তাহার আসে না।

বলিল, না গো তা নয়। আমি মরে গেলে তুমি আর একটা বিয়ে করে সুখী হতে পারো - কিন্তু ওরা আর মা পাবে না।

বিপিন দুঃখিত হইল। সত্যই আজ যদি মনোরমা মারা যাইত ! কখনো সে মনোরমাকে একটা মিষ্টি কথা কি ভালবাসার কথা বলিয়াছে ? না পাইয়া না পাইয়া মনোরমার সহিয়া গিয়াছে। ও সব আর সে প্রত্যাশা করে না, পাইলে অবাক্ হইয়া যায়। মনে ভাবিল—আমার হাতে পড়ে ওর দুর্দশার একশেষ হয়েছে। ভাল খাওয়া কি ভাল কাপড় একখানা কোনদিন—বা কখনও কিছু দেখলেও না। সংসারের হাঁড়ি ঠেলে আর বাসন মেজে জীবনটা কাটলো ওর।

সে বলিল, হ্যাঁ, ভাল কথা। কাল দুটো ভাত সকালে সকালে যেন হয়। পিপ্‌লিপাড়া যাব কাল।

মনোরমা বলিল, তা কেন ? কাল যেও না। বিদেশে থাকো, একদিন একটু পিটে-নাটা করি, সেখানে কে করে দিচ্ছে, খেয়ে যেও।

বিপিন জানে মনোরমা মিষ্টি কথা কহিতে জানে না বটে, কিন্তু এ সব দিকে তাহার খুব লক্ষ্য। কিন্তু তাহার থাকিবার উপায় নাই। মনোরমাকে বুঝাইয়া বলিল, হাতে রোগী আছে, পিঠে খাইবার জন্ত বসিয়া থাকিলে চলিবে না।

হাসিয়া বলিল, যাবে আমার সঙ্গে সেখানে ? চল পিঠে খাওয়ানোর লোক নিয়ে যাই—

মনোরমা বলিল, ওমা, আমি আবার বুড়োমাগী সংসার ফেলে, গরুবাছুর ফেলে, মা বীণা এদের রেখে তোমার সঙ্গে বাসায় যাবো কি করে ?

যেন এ প্রস্তাবটা নিতান্তই আজগুবি।

মনোরমা বলিতে পারিত, চল তোমার সঙ্গেই যাই, তুমি যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই যাবো। তোমার কাছে আমার কেউ নয়।

বিপিনের খুব ভাল লাগিত তাহা হইলে।

বিপিন ভাবিল—মনোরমার শুধু সংসার আর সংসার ! ওই এক ধরণের মেয়েমানুষ—

৫

পিপ্‌লিপাড়ায় পৌছিল প্রায় সন্ধ্যাবেলা। দত্ত মশায় বাড়ী নাই, আজ দিন দুই হইল বড় ছেলের শ্বশুরবাড়ী কুমারপুরে গিয়াছেন কি কাজে। দত্ত মহাশয়ের ছেলে অবনী তাহাকে দেখিয়া বলিল, এই যে ডাক্তারবাবু! দুটো রুগী এসে ফিরে গিয়েছে কাল। এত দেরি হোল যে ? হাত পা ধুয়ে বিশ্রাম করুন।

অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে শান্তি এক হাতে একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন ও অন্য হাতে একটা বাটিতে মুড়ি ও নারিকেল-কোরা লইয়া আসিল। বাটিটা বিপিনের হাতে দিয়া হাসিমুখে বলিল, এত দেরি করলেন যে।

—উঃ, সে আর বোলো না শান্তি। কি বিপদেই পড়ে গিয়েছিলাম।

শান্তি উদ্বিগ্ন মুখে বলিল, কি ? কি ?

—আমার স্ত্রীকে সাপে কামড়েছিল।

—সাপে ! কি সাপ ?

—রক্ষে যে জাত সাপ নয়, শেকড়চাঁদা বলেই আমার ধারণা। সে কি ঘটনা হোল শোনো—সেদিন তো এখান থেকে গেলাম সেই—

বলিয়া বিপিন সেদিনকার তাহার বাড়ী যাওয়ার পথে কান্নাকাটির রব শোনা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ব্যাপারটা আনুপূর্ব্বিক বলিয়া গেল, শান্তি অবাক হইয়া বসিয়া শুনিতে লাগিল।

বর্ণনা শেষ হইয়া গেলে শান্তি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, উঃ, ভগবান রক্ষে করেছেন। নইলে কি হোত আজ বলুন দিকি? মুড়ি খান, আমি চা নিয়ে আসি—কি বিপদেই পড়ে গিয়েছিলেন!

শান্তি চা আনিয়া দিল। বলিল, আজ আর রাঁধতে হবে না আপনাকে—আমাদের তো রান্না হবেই—ওই সঙ্গে আপনাকে দুখানা পরোটা ভেজে দিতে এমন কিছু ঝঞ্ঝাট হবে না।

—রোজ রোজ তোমাদের ওপর—

—ওসব কথা বলবেন না ডাক্তারবাবু। আপনি পর ভাবেন, কিন্তু আমি—

—না না, সে কথা না—পর ভাববো কেন শান্তি? তা হবে এখন—দিও এখন—

শান্তি খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গল্প করিল। কথা বলিয়া আনন্দ পাওয়া যায় ইহার সঙ্গে। বেশির ভাগ কথা মনোরমাকে লইয়াই। মনোরমার কথা আজ আসিবার সময় বিপিন সারাপথ ভাবিয়াছে। তাহার আকস্মিক মৃত্যুর সম্ভাবনাটা যতই মনে হইতেছে, বিপিনের মন ততই মনোরমার প্রতি স্নেহে ও সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিতেছে।

শান্তি বলিল, দেখাবেন একদিন বৌদিদিকে?

—কি করে দেখাবো শান্তি! সে তো এখানে আসছে না।

—আমায় একদিন নিয়ে চলুন সেখানে।

—তুমি যাবে কি করে?

—আপনার সঙ্গে যাবো। গরুর গাড়ী একখানা না হয় দুটাকা ভাড়া নেবে।

—আমার সঙ্গে একা যাবে?

—কেন যাবো না?

বিপিন আশ্চর্য্য হইল শান্তির নিঃসঙ্কোচ ভাব দেখিয়া। মেয়েটি শুধু সরলা নয়, ইহার মনে সাহস আছে। অবশ্য সে শান্তিকে সত্যই লইয়া যাইতেছে না, বহু বাধা তাহাতে, সে জানে। তবুও শান্তি যে নিঃসঙ্কোচে তাহার সহিত যাইতে চাহিল—ইহাতেই উহার মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

হঠাৎ শান্তি একটি ভারি ছেলেমানুষি প্রশ্ন করিল।

—আচ্ছা, পটলের ক্ষেতে মেয়েমানুষ যাওয়া বারণ কেন জানেন?

—তা তো জানি না শান্তি। তবে শুনেছি বটে—

বিপিন কারণটা খুব ভাল রকমই জানে, সে পাড়াগাঁয়েরই ছেলে। কিন্তু শান্তির সামনে সে কথা বলিতে তাহার বাধিল।

শান্তি দুষ্টুমির হাসি হাসিয়া বলিল, আমি জানি। বলবো? মেয়েমানুষ অযাত্রা, পটলের ক্ষেতে ঢুকলে পটল ফলবে না—তাই নয়? আচ্ছা, মেয়েমানুষ কি সত্যিই অযাত্রা?

বিপিন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। বলিল, কে বলেছে ওসব কথা? এ কথা তোমার মাথায় উঠলো কেন হঠাৎ?

—না, কিছু না, এমনি মনে পড়ে গেল। আপনাদের গাঁয়ের দিকে এ নিয়ম আছে, না?

—শুনেছি বটে, বললাম তো। বলে বটে। তবে মেয়েরা অযাত্রা এ কথা যে কেউ বলুক, আমি বিশ্বাস করি না। মেয়েরা অনেক উপকার করেছে আমার জীবনে। এই ধরো, আমি তোমার দিয়েই বলি—কেমন চি ড়ের ফলার খাওয়ালে সেদিন—খেয়েদেয়ে নিন্দে করবো এমন মহাপাতকী আমি নই।

বলিয়া বিপিন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

শান্তি সলজ্জ হাসিমুখে বলিল, আপনার ওই এক কথা। যান।

—না, যাবো কেন, আমি অন্যেয্য কথা কি বলেছি বলো। তোমার যত্নের কথা যখন ভাবি শান্তি, তখন—সত্যিই বলচি—অমন খাওয়ানো অন্ততঃ—

—আচ্ছা, আচ্ছা থাক। আর আপনার ব্যাখ্যা করতে হবে না। আমি যাই, বৌদিদি একা রান্নাঘরে—গিয়ে ময়দা মাখবো—

—একটা পান পাঠিয়ে দিও গিয়ে। পেয়ালাটা নিয়ে যাও।

—না থাকুক। আপনার পান নিয়ে আসি, পেয়ালা নিয়ে যাবো।

বিপিনের মনে একটি অদ্ভুত তৃপ্তি। এ ধরণের সেবা সে চায়—মানীই কেবল সে সাধ মিটাইয়াছিল কিছু দিন—আবার এই শান্তি কোথা হইতে আসিয়া জুটিয়াছে।

বেচারী মনোরমা এ ধরণটা জানে না। সেও সেবা করে, কিন্তু সে অন্যরকমের। তাহা পাইয়া এমন আনন্দ হয় না কেন?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

১

সেদিন সকালে বিপিন রোদে পিঠ দিয়া বসিয়া ঔষধ বিক্রীর হিসাবের খাতা দেখিতেছে, এমন সময় শান্তি পিছন হইতে এক প্রকার চুপি চুপি আসিল—উদ্দেশ্য বোধ হয় বিপিনকে চমকাইয়া দেওয়া বা অপ্রত্যাশিত ভাবে তাহার সাহচর্য্যের আনন্দ দান করা। উদ্দেশ্য খুব সুস্পষ্ট না হইলেও সে এমনি প্রায়ই করে আজকাল। বিপিনও শান্তির সঙ্গে মিলিতে মিশিতে পূর্ব্বের মত সঙ্কোচ বা জড়তা অনুভব করে না।

সামনে ছায়া পড়িতেই বিপিন পিছন ফিরিয়া চহিয়া দেখিল শান্তি হাসিমুখে দাঁড়াইয়া। বিপিন কিছু বলিবার পুর্বে শান্তি বলিল—কি করচেন?

বিপিন বলিল—এসো শান্তি, হিসেব দেখচি—

—একটা কথা বলতে এলাম, কাল চলে যাচ্ছি এখান থেকে—

বিপিন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—কোথায়? কোথায় যাবে!

শান্তি হাসিতে হাসিতে বলিল--বাঃ, কোথায় কি! আমার যাবার জায়গা নেই! এখানে কি চিরকাল থাকবো? বলেচি তো সেদিন আপনাকে।

—ও! শ্বশুরবাড়ী যাবে?

—হুঁ, উনি আসবেন কাল সকালে।

বিপিন চুপ করিয়া রহিল। দু একটা কথা যাহা সে ঝোঁকের মুখে বলিতে যাইতেছিল চাপিয়া গেল। মেয়েদের ভালবাসা লইয়া সে আর নাড়াচাড়া করিবে না। যাহা হইয়াছে যথেষ্ট। শান্তি বিবাহিতা মেয়ে, তাহাকে সে কিছুই বলিবে না ওসব কথা। শেষ পর্য্যন্ত উভয় পক্ষই কষ্ট পায়। না, উহার মধ্যে আর নয়।

শান্তি যেন একটু দুঃখিত হইল। সে যাহা বিপিনের মুখে শুনিবার আশা করিয়াছিল তাহা না শুনিতে পাইয়া যেন নিরাশ হইয়াছে। বলিল– এখন আর অনেক দিন আসবো না—

বিপিন বলিল—কবে আসবে?

—তার কিছু কি ঠিক আছে? তা বেশ, যখনই আসি, আসি আর নাই আসি, আপনার আর কি!

শান্তি এ ধরণের কথা কেন বলিতে আরম্ভ করিল হঠাৎ! কি জবাব দিবে এ কথার সে?

তবুও বিপিন বলিল--না, আমার কিছু নয়, আমার কিছু নয়, তোমায় বলেচে! আমার খাওয়ার মজাটা তো সকলের আগে নষ্ট হোল।

—বৌদিদিদের বলে যাচ্চি, সে-সবের জন্য কিছু কষ্ট হবে না আপনার। তা বলে আর কোন কষ্ট রইল না তো?

বলা চলিত এবং বলিতেও ইচ্ছা হইতেছিল, শান্তি তুমি চলে গেলে আমার এ জায়গা আর ভাল লাগবে না। দিনের মধ্যে সব সময় তোমার কথা মনে হবে। কেন আমায় আবার এ ভাবে জড়ালে শান্তি?

বিপিন সে ধরণের কথার ধার দিয়াও গেল না। বলিল--তা তোমাদের বাড়ী যত্ন যথেষ্টই পেয়ে আসছি, তোমাদের বাড়ীতে আশ্রয় না পেলে আমার এখানে ডাক্তারি করাই হোত না—

শান্তি মুখ ভার করিয়া বলিল—আপনার কেবল ওই সব কথা। কি করচি আমরা? আপনি ব্রাহ্মণ, আমরা আপনাকে আশ্রয় দিইচি—অমন কথা বুঝি লোকে বলে? সত্যি, বলবেন না আর ও কথা। বলতে নেই।

পরদিন শান্তির স্বামী আসিয়া তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল। বিপিন ডিস্‌পেন্‌সারি হইতে ফিরিয়া দুপুরে নিজের ছোট্ট চালায় রাঁধিতে বসিয়াছে, শান্তি সেখানে আসিয়া গলায় আঁচল দিয়া দুই পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—যাচ্চি।

—যাচ্চি বলতে নেই, বলতে হয় আসচি।

—যদি আর না-ই আসি?

—বলতে নেই ও কথা। এসো, আসবে বৈ কি—

—বলচেন আসতে তো! তা হোলে আসবো, ঠিক আসবো। শান্তি কথা শেষ করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, বিপিনের মনে হঠাৎ বড় করুণা ও সহানুভূতি জাগিল ইহার উপর। যাইবার সময় একটা কথা শুনিয়া যদি সে খুশি হয়, আনন্দ পায়! মুখের কথা তো; কেন এত কৃপণতা!

সে বলিল—তুমি চলে যাচ্চ, সত্যি, মনটা খারাপ হয়ে গেল বড্ড।

শান্তি বিদ্যুৎবেগে ফিরিয়া দাঁড়াইল, বিপিনের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া এক ধরনের অদ্ভুত ভঙ্গিতে বলিল —আপনার মন খারাপ হবে? ছাই!

বিপিন অবাক হইয়া গেল শান্তির চমৎকার ফিরিবার ভঙ্গিটি দেখিয়া।

সে উত্তর দিল—ছাই না, সত্য সত্য বলচি।

শান্তি হাসিমুখে বলিল—আচ্ছা আসি।

কথা শেষ করিয়া সে আর দাঁড়াইল না।

পলকে প্রলয় ঘটাইয়া দিয়া গেল শান্তি। ইহাও ওই শান্ত মেয়েটির মধ্যে ছিল! বিপিন ভাবেও নাই কোন দিন। ওর এ অদ্ভুত নায়িকামূর্ত্তি এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল কেমন করিয়া? মেয়েরা পারে—ওদের ক্ষমতার সীমা নাই। অবস্থাবিশেষে দশমহাবিদ্যার মত এক রূপ হইতে কটাক্ষে অন্য রূপ ধরিতে উহারাই পারে।

শান্তি চলিয়া গেলে গোটা বাড়ীটা ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিতে লাগিল। রোজ সন্ধ্যার সময় শান্তি চা করিয়া আনিত সে ডাক্তারখানা হইতে ফিরিলেই। আজ সন্ধ্যায় আর কেহ আসিল না। দত্ত মহাশয়ের পুত্রবধূদের অত দায় পড়ে নাই। বিপিন নিজেই একটু চা করিয়া লইল। সংসারের ব্যাপারই এই, চিরদিন কেহ থাকে না। মানীকে দিয়াই সে জানে। জালে জড়াইব না বলিলেই কি না জড়াইয়া থাকা যায়? কোথা হইতে আসিয়া যে জোটে!

সন্ধ্যায় উনুনে হাঁড়ি চড়াইয়া বিপিন রান্নাঘরের বাহিরে আসিয়া খানিক বসিল। বেশ জ্যোৎস্না উঠিয়াছে—তিন চার দিন আগেও শান্তি এ সময়টা তাহাকে চা দিতে আসিয়া গল্প করিয়াছে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, রোজই করিত। আজ সত্যই ফাঁকা ঠেকিতেছে, কিছু ভাল লাগিতেছে না। নিজের মনের অবস্থা দেখিয়া সে নিজেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। শান্তি তাহার কে? কেউ নয়, দুদিনের আলাপ—এই তো কিছুদিন আগেও সে ভাবিত, মানীর মত ভালবাসা জীবনে আর কাহারও সঙ্গে কখনো হইবার নয়—হইবেও না। মানী ছাড়া আর কাহারও জন্য মন খারাপ হইতে পারে—এ কথা কিছুদিন পূর্ব্বেও কেহ বলিলে সে কি বিশ্বাস করিত? এখন সে দেখিয়া বুঝিতেছে মনের ব্যাপার বড়ই বিচিত্র, কেহই বলিতে পারে না কোন্ পথে কখন তাহার গতি।

বৃদ্ধ দত্ত মহাশয় ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে আজকাল সন্ধ্যার পর বাহিরে আসেন না। আজ কি মনে করিয়া তিনি বিপিনের রান্নাঘরে আসিয়া পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া খানিক গল্পগুজব করিলেন। শান্তির কথাও একবার তুলিলেন, মেয়েটি আজ চলিয়া গেল। কন্যা-সন্তানের মত সেবা-যত্ন কে করে, পুত্রবধূরাও তো আছে, তেমনটি আর কাহারও নিকট পাওয়া যায় না, ইত্যাদি।

বিপিন বলিল—শান্তি বড় ভাল মেয়েটি।

—অমন চমৎকার সেবা আর কারো কাছে পাইনে ডাক্তারবাবু। আমার এই বুড়ো বয়সে এক এক সময় সত্যিই কষ্ট পাই সেবার অভাবে। কিন্তু ও এখানে থাকলে—আর ব্রাহ্মণের ওপর বড় ভক্তি। আপনার চাটুকু, জলখাবারটুকু ঠিক সময়ে সব দেওয়া, সেদিকে খুব নজর। বাড়ীতে যদি কোন দিন ভাল কিছু খাবার তৈরি হয়েছে, তবে আগে আপনার জন্যে তুলে রেখে দিত।

দত্ত মহাশয় উঠিয়া গেলে বিপিন খাইতে বসিবার উদ্যোগ করিল। এ সময়টা দু-একদিন শান্তি দালানের জানালায় দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকিয়া বলিত, ও ডাক্তারবাবু, একটু দুধ আজ বেশী হয়েছে আমাদের, আপনার খাওয়া হয়েছে. না—হয় নি? নিয়ে আসবো?

মানী গেল, শান্তি গেল। এই রকমই হয়। কেহ টিকিয়া থাকে না শেষ পর্য্যন্ত।

২

পরদিন সকালে ডাক্তারখানায় আসিল ভাসানপোতা মাইনর স্কুলের সেই বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী। বিপিন তাহাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল। শেষবার যখন তাহার সঙ্গে দেখা, তখন মানীদের বাড়ী সে চাকুরী করে. মানীর গল্প করিয়াছিল ইহার কাছে। বিশ্বেশ্বর আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিল, তাহার অদৃষ্টে এ পর্য্যন্ত কোনো নারীর প্রেম জোটে নাই। বিশ্বেশ্বর কি করিয়া জানিল সে পিপ্‌লিপাড়ার হাটতলায় ডাক্তারখানা খুলিয়াছে।

বিশ্বেশ্বর বলিল—আপনি খবর রাখেন না বিপিনবাবু. আমি আপনার সব খবর রাখি। আপনাদের গাঁয়ের কৃষ্ণ চক্কোত্তির সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়—ভাসানপোতায় ওঁর বড়মেয়ের বিয়ে দিয়েচেন না? তাঁর মুখেই আপনার সব কথা শুনেচি। তা আপনার কাছে এসেচি একটা বড় দরকারী কাজে। আপনাকে একটি রুগী দেখতে এক জায়গায় যেতে হবে।

বিপিন বলিল—কোথায়?

—এখান থেকে ক্রোশ দুই হবে—জেয়ালা-বল্লভপুর।

—জেয়ালা-বল্লভপুর? সে তো চাষা-গাঁ। সেখানকার লোককে আপনি জানলেন কি করে? রুগী আপনার চেনা?

বিশ্বেশ্বর কেমন যেন ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—হ্যাঁ, তা জানা বই কি। চলুন একটু শীগগির করে তা হোলে।

দুপুরের কিছু পূর্ব্বে দুজনে হাঁটিয়া উক্ত গ্রামে পৌছিল। বিপিন পূর্ব্বে এ গ্রামে কখনো আসে নাই তবে জানিত জেয়ালার বিল এ অঞ্চলের খুব বড় বিল এবং গ্রামখানি বিলের পূর্ব্ব পাড়ে। বিলের মাছ ধরিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে এরূপ জেলে ও বাগ্দী এবং কয়েক ঘর মুসলমান ছাড়া এ গ্রামে কোনো উচ্চবর্ণের বাস নাই।

বিশ্বেশ্বর কিন্তু গ্রামের মধ্যে গেল না। বিলের উত্তর পাড়ে গ্রাম হইতে কিছু দূরে একটা বড় অশ্বত্থ গাছ। তাহার তলায় ছোট একটি চালাঘরের সামনে বিশ্বেশ্বর তাহাকে লইয়া গেল।

বিপিন বলিল রুগী এখানে নাকি ?

— হ্যাঁ, আসুন ঘরের মধ্যে। সোজা চলুন, অন্য কেউ নেই।

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বিপিন দেখিল একটি স্ত্রীলোক, জাতিতে বাগ্দী কিংবা দুলে, ঘরের মেজেতে পুরু বিচালির উপর ছেঁড়া কাঁথার বিছানায় শুইয়া আছে। স্ত্রীলোকটির বয়স চব্বিশ পঁচিশ হইবে, রং কালো, চুল রুক্ষ, হাতে কাচের চুড়ি, পরণে ময়লা শাড়ি। জ্বরের ঘোরে রোগিণী বিছানায় এপাশ ওপাশ করিতেছে।

বিপিন ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিল—এর নিমোনিয়া হয়েচে—দুদিকই ধরেচে। খুব শক্ত রোগ। খুব সেবা-যত্ন দরকার। বড্ড দেরীতে ডেকেচেন আমাকে—তবুও সারাতে পারি হয়তো কিন্তু এর লোক কই ? খুব ভাল নার্সিং চাই—নইলে—

বিশ্বেশ্বর হঠাৎ বিপিনের দুই হাত ধরিয়া কাঁদো কাঁদো স্বরে বলিল—বিপিনবাবু, আপনাকে বাঁচিয়ে তুলতে হবে রুগীকে—যে করেই হোক, আপনার হাতেই সব, আপনি দয়া করে—

বিপিন দস্তুরমত বিস্মিত হইল। বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তীর এত মাথাব্যথা কিসের তাহা ভাল বুঝিতে পারিল না। এ বাগ্দী মাগী মরে বাঁচে তা বিশ্বেশ্বরের কি ? ইহার আপন আত্মীয়-স্বজন কোথায় গেল ?

বিশ্বেশ্বর বলিল—চলুন গাছতলাটার ধারে মাদুরটা পেতে দি, ওখানটাতে বসুন—তামাক সাজবো ?

বিপিন গাছতলায় গিয়া বসিল। বিশ্বেশ্বর তামাক সাজিয়া আনিয়া হুঁকাটি বিপিনকে দিবার পূর্ব্বে মলিন জামার পকেট হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া বিপিনের হাতে দিতে গেল। বিপিন বলিল—আগে বলুন মেয়েটা কে—আপনি এর টাকা দেবেন কেন, এর লোকজন কোথায় ?

বিশ্বেশ্বর বলিল—কেন, আপনি শোনেন নি কোনো কথা ?

—না, কি কথা শুনবো ?

বিশ্বেশ্বর মাদুরের এক প্রান্তে বসিয়া পড়িল। বলিল—ওর নাম মতি। বাগ্দীদের মেয়ে বটে, কিন্তু অমন মানুষ আপনি আর দেখবেন না। ভাসানপোতায় ওর বাপের বাড়ী অল্প বয়সে বিধবা হয়। আপনি তো জানেন আপনাকে বলেছিলাম মেয়েমানুষের ভালবাসা কি জীবনে কখনও জানিনি। কিন্তু এখন আর সে কথা বলতে পারি নে ডাক্তারবাবু। ও বাগ্দী হোক, দুলে হোক ওই আমায় সে জিনিস দিয়েছে—যা আমি কারু কাছে পাইনি কোনো দিন। তারপর সে অনেক কথা। ভাসানপোতা ইস্কুলের চাকুরীটি সেই জন্যে গেল। ওকে নিয়ে আমি এই জেয়ালা-বল্লভপুরে এলাম। সামান্য কিছু টাকা পেয়েছিলাম ইস্কুলের

প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের, তাতেই চলছিল। আর ও মাছ বেচে, কাঠ ভেঙে, শাক তুলে আর কিছু রোজগার করতো। তারপর পুজোর আগে আমি পড়লাম অসুখে। টাকাগুলো ব্যয় হয়ে গেল। ও কি করে আমায় বাঁচিয়ে তুলেছে সে অসুখ থেকে! তারপর এই রোজ সকালে ঠাণ্ডা বিলের জলে শাক তুলে তুলে এই অসুখটা বাধিয়েচে! এখন ওকে আপনি বাঁচান—এ সব কথা নিয়ে ভাসানপোতায় তো খুব রটনা—আমায় গালাগাল আর কুচ্ছো না করে তারা জল খায় না। তাই বলচি আপনি শোনেন নি কিছু?

বিপিন অবাক হইয়া বিশ্বেশ্বরের কথা শুনিতেছিল। এমন ঘটনা সে কখনো শোনে নাই। শুনিয়া তাহার সারা মন বিশ্বেশ্বরের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিল। ছি, ছি, ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়া শেষকালে কি না বাগ্দী মাগীর সঙ্গে—নাঃ, আজ কি পাপই করিয়াছিল সে, কাহার মুখ দেখিয়া না জানি উঠিয়াছিল!

সে বলিল—টাকা রাখুন, টাকা দিতে হবে না। কিন্তু দামী ওষুধ কিছু লাগবে। য়্যান্টিফ্লজিস্টিন একটা কিনে আনুন, আমার কাছে নেই, লিখে দিচ্ছি আনিয়ে নিন। প্রেস্‌ক্রিপশন একটা করে দিই—শক্ত রোগ—

বিশ্বেশ্বর ব্যাকুল ভাবে বলিল—বাঁচবে তো ডাক্তারবাবু?

—নার্সিং চাই ভাল। আর পথ্যি—

বিশ্বেশ্বর বিপিনের হাতে ধরিয়া—ওষুধগুলো আপনি লিখে দিয়ে গেলে হবে না, আনিয়ে দিন। এ গাঁয়ের কোন লোক আমার কথা শুনবে না। এই ঘটনার জন্যে সবাই—বুঝলেন না? কেউ উঁকি মেরে দেখে যায় না। আপনিই ভরসা, ডাক্তারবাবু।

বিপিন বিরক্ত হইল। ভাল বিপদে পড়িয়াছে সে! সে নিজে এখন সেই রাণাঘাট হইতে য়্যান্টিফ্লজিস্টিন আনিতে যাইবে? টাকাই বা দিতেছে কে?

সে বলিল -আমার ডাক্তারখানায় যদি থাকতো তবে আলাদা কথা ছিল। আমার কাছে ও সব থাকে না। আপনি এক কাজ করুন, গরম খোলের পুলটিশ দিন। রাই সর্ষের খোল হলে খুব ভাল হয়। তাও যদি না পান, গরম ভাতের পুলটিশ দিন। আর আমার ডাক্তারখানায় আসুন, ওষুধ দিচ্ছি।

বিশ্বেশ্বর বিপিনের সঙ্গে আবার ডাক্তারখানায় আসিল। ডাক্তার হিসাবে বিপিন এ কথাও ভাবিল যে, ওই কঠিন রোগীর মুখে জল দিবার কেহই রহিল না কাছে, বিশ্বেশ্বর যাতায়াতে চার ক্রোশ হাঁটিয়া ঔষধ লইয়া যাইতে দুই ঘণ্টা তো নিশ্চয় লাগাইবে, এ সময়টা একা পড়িয়া থাকিবে ওই মেয়েটা?

পরক্ষণেই ভাবিল—তুমিও যেমন! দুলে বাগ্দী জাত, ওদের কঠিন জান্—ওদের এই অভ্যেস।

বিশ্বেশ্বর কিন্তু সারাপথ মতি বাগ্দিনীর নানা গুণ ব্যাখ্যা করিতে করিতে চলিল। অমন মেয়ে হয় না, যেমন রূপ, তেমনি গুণ। বিশ্বেশ্বরের গত অসুখের সময় বুক দিয়া সেবা করিয়াছে—প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের টাকা খরচ করিতে দেয় না, নিজে শাক পাতা তুলিয়া, ঘুনিতে

মাছ ধরিয়া বেচিয়া যাহা আয় করে, তাহাতেই সংসার চালাইতে বলে। অমন ভালবাসা বিশ্বেশ্বর কখনো কাহারও কাছে পায় নাই।

হঠাৎ বিপিন বলিল - রাঁধে কে ?

—ওই রাঁধে! আমি ওর হাতেই খাই— ঢাকবো কেন ? যে আমায় অত ভালবাসে, তার হাতে খেতে আমার আপত্তি কি ? ও আমার জন্যে কম ছেড়েচে ? ওর বাবা ভাসান-পোতা বাগ্দী পাড়ার মধ্যে মাতব্বর লোক, গোলায় ধান আছে, চাষী গেরস্থ। খাওয়া-পরার অভাব ছিল না, সে সব ছেড়ে আমার সঙ্গে এক কাপড়ে চলে এসেচে। আর এই কষ্ট এখানে —হিম জলে নেমে শাক তুলে রোজ চিংড়াঘাটায় বাজারে বিক্রি করে আসে কাঠ ভাঙে, মাছ ধরে, ধান ভানে। এত কষ্ট ওর বাপের বাড়ী ওকে করতে হোত না—তাও কি পেট পুরে খেতে পায় ? আর ওই তো ঘরের ছিরি দেখলেন—ইস্কুলের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে পঞ্চান্নটি টাকা পেয়েছিলাম—তা আর আছে মোট বাইশটি টাকা – আর ঘরখানা করেছিলাম দশ টাকা খরচ করে, আমার অসুখের সময় ব্যয় হয়েছে বারো তেরো টাকা – আর বাকী টাকা বসে বসে খাচ্ছি আজ চার মাস —তাহোলে বুঝুন পেট ভরে খাওয়া জুটবে কোথা থেকে !

লোকটার জাত নাই। বাগ্দিনীর হাতের রান্নাও খায়। স্ত্রীলোকের ভালবাসার দায়ে কিনা শেষে জাতিকুল বিসর্জ্জন দিল !

ঔষধ লইয়া বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী চলিয়া গেল। যাইবার সময় বার বার বলিয়া গেল, কাল একবার বিপিন যেন অবশ্য করিয়া গিয়া রোগী দেখিয়া আসে।

৩

বিপিন পরদিন একাই রোগী দেখিতে গেল। জেয়ালা পৌছিতে প্রায় বৈকাল হইয়া আসিল, সম্মুখে জ্যোৎস্না রাত—এই ভরসাতেই দুপুরে আহারাদি করিয়া রওনা হইয়াছে। ঘরখানার সামনে গিয়া বিশ্বেশ্বরের নাম ধরিয়া ডাকাডাকি করিয়া উত্তর পাইল না। অগত্যা সে ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, ঘরের মধ্যে রোগিণী কাল যেমন ছিল, আজও তেমনি অঘোর অবস্থায় বিচালি ও ছেঁড়া কাঁথার বিছানায় শুইয়া আছে। বিশ্বেশ্বরের চিহ্ন নাই কোথাও। ব্যাপার কি, মেয়েটিকে এ অবস্থায় ফেলিয়া গেল কোথায় ?

বিপিন বিছানার পাশে বসিয়া রোগিণীকে জিজ্ঞাসা করিল, কেমন আছ ?

মেয়েটি চোখ মেলিয়া চাহিল। চোখ দুটি জবাফুলের মত লাল। অস্ফুট স্বরে বলিল, ভাল আছি।

বিপিন থার্ম্মমিটার দিয়া দেখিল জ্বর প্রায় ১০৪-র কাছাকাছি। সে জানে, রোগীরা প্রায়ই এ অবস্থায় বলে যে সে ভাল আছে। মাথায় জল দেওয়া দরকার, তাই বা কে দেয় ?

সে জিজ্ঞাসা করিল—বিশ্বেশ্বর কোথায় ?

মেয়েটি বিপিনের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। তাহার পর টানিয়া টানিয়া বলিল —অ্যাঁ—অ্যাঁ—

—বিশ্বেশ্বর বাবু কোথায়—বিশ্বেশ্বর ?

রোগিণী এবার বোধহয় বুঝিতে পারিল। বলিল—ক'নে গিয়েচেন।

ইহাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করা নিরর্থক বুঝিয়া বিপিন একটা জলপাত্রের সন্ধানে ঘরের মধ্যে ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল। এখনি ইহার মাথায় জল দেওয়া দরকার। এককোণে একটা মেটে কলসীতে সম্ভবতঃ খাবার জল আছে, বিপিন সন্ধান করিয়া একখানা মানকচুর পাতা আনিয়া রোগিণীর মাথার কাছে পাতিয়া কলসীর জলটুকু সব উহার মাথায় ঢালিল। পরে বিল হইতে আরও জল আনিয়া আবার ঢালিল। বার কয়েক এরূপ করিবার পর রোগিণীর আচ্ছন্ন ভাব যেন খানিকটা কাটিল। বিপিন থার্মমিটার দিয়া দেখিল, জ্বর কমিয়াছে। ডাক্তারি করিতে আসিয়া এ কি বিপদ! এমন হাঙ্গামাতে তো সে কখনও পড়ে নাই।

হঠাৎ তাহার মনে পড়িল মানীর মুখখানা। এই সব দুঃখী, অসহায়, রোগার্ত্ত লোকদের ভাল করিবার জন্যই তো মানী তাহাকে ডাক্তারি পড়িতে বলিয়াছিল। মেয়েদের সেবা পাইয়া আসিয়াছে সে চিরকাল। ইহাকে ফেলিয়া গেলে মানীর, শান্তির, মনোরমার অপমান করা হইবে—কে যেন তাহার মনের মধ্যে বলিল। বিশ্বেশ্বর যদি ইহাকে ফেলিয়া পলাইয়া থাকে! তবে এখন উপায় ?

সে আবার রোগিণীকে জিজ্ঞাসা করিল—বিশ্বেশ্বরবাবু কোথায় গিয়েছে জান? কতক্ষণ গিয়েছে ?

মেয়েটি বলিল—জানিনে।

বিপিন আর এক কলসী জল আনিতে গেল। জেয়ালার বিস্তৃত বিলের উপর সূর্য্যাস্তের ঘন ছায়া নামিয়া আসিয়াছে। দক্ষিণ পাড়ের তালগাছের মাথায় এখনও রাঙা রোদ। দূর জলের পদ্মফুলের বনে পদ্মপাতা উলটিয়া আছে, যদিও এখন পদ্মফুল চোখে পড়ে না। বল্লভপুরের দিকে জেলেরা ডিঙি বাহিয়া মাছ ধরিতেছে। একদল জলপিপি ও পানকৌড়ি জলের ধারে শোলাগাছের বনে গুগ্‌লি খুঁজিতেছে। বিপিনের মনে কেমন এক অদ্ভুত ভাবের উদয় হইল। যদি বিশ্বেশ্বর ইহাকে ফেলিয়া পলাইয়াই থাকে, তবে তাহাকে থাকিতে হইবে এখানে সারারাত। অর্থ উপার্জন করিলেই কি হয় ? তাহার বাবা ৺বিনোদ চাটুয্যে কম উপার্জ্জন করেন নাই—অসৎ উপায়ে উপার্জ্জিত পয়সা বলিয়াই টেকে নাই। কাহারও কোন উপকার হয় নাই তাহা দিয়া।

ঘরে রোগীর পথ্য কিছু নাই। ডাব ও ছানার জল খাওয়ানো দরকার এরকম রোগীকে। কিছুই ব্যবস্থা নাই। বিপিন নিকটবর্ত্তী দুলেপাড়া হইতে একটি লোক ডাকিয়া আনিল। বলিল—গোটাকতক ডাব নিয়ে আসতে পারবে ? দাম দেবো।

লোকটা বলিল—বাবু, আপনাকে আমি চিনি। আপনি পিপলিপাড়ার ডাক্তারবাবু দাম আপনাকে দিতে হবে না। তবে বাবু ভাব রাত্তিরে পাড়া যাবে না তো? তা আপনি কেন—সে বামুনঠাকুর কোথায় গেল? দেখুন তো বাবু, মেয়েডারে টুইয়ে ঘরের বার করে নিয়ে এসে তিনি এখন পালালেন নাকি? এইডে কি ভদ্দরনোকের কাজ?

একপ্রহর রাত্রে বিশ্বেশ্বর আসিয়া হাজির হইল। সে ফেলিয়া পালায় নাই—চিংড়িঘাটার বাজার হইতে কিছু ফল, খৈল ও সাবু মিছরী কিনিতে গিয়াছিল। বিপিনকে দেখিয়া বলিল—আপনি এসেছেন? বড় কষ্ট দিলাম আপনাকে। আপনি বলে গেলেন খোলের পুলটিশ দিতে, এখানে পেলাম না—তাই বাজারে গিয়েছিলাম এই সব জিনিসপত্র আনতে। কতক্ষণ এসেছেন?

দুজনে মিলিয়া সারারাত রোগীর সেবা করিল। সকালের দিকে বিপিন বলিল—আমি ডাক্তারখানা খুলবো গিয়ে—বসুন আপনি—একে একা ফেলে কোথাও যাবেন না। আমি ওবেলা আবার আসব।

একটা অদ্ভুত আনন্দ লইয়া সে ফিরিল। এই সব পল্লী-অঞ্চলের যত অসহায়, দুঃস্থ লোকদের সাহায্য করিবার জন্যই যেন সে জীবন উৎসর্গ করিয়াছে—এই রকমের একটা মনোভাব সারাপথ তাহাকে তাহার নিজের চোখে মহৎ ও উদার করিয়া চিত্রিত করিল।

আবার ওবেলা যাইতে হইবে। বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তীর নীচ-জাতীয়া প্রণয়িনীকে বাঁচাইয়া তুলিতে হইবে—দুজনেই ওরা নিতান্ত দুঃস্থ অসহায়। যদি কখনো মানীর সঙ্গে দেখা হয়, তবে সে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কৃতজ্ঞতার সহিত বলিতে পারিবে—আমায় মানুষ করে দিয়েচ মানী। সেই গরীব, অসহায় মেয়েটির রোগশয্যার পাশে তুমিই আমার মনের মধ্যে ছিলে।

সেই দিনই রাত্রে বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তীর ক্ষুদ্র খড়ের ঘরে বসিয়া সে বিশ্বেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা বিশ্বেশ্বরবাবু, আত্মীয়-স্বজন ছাড়লেন এর জন্যে, চাকরীটা গেল, জেয়ালার বিলের ধারে এইভাবে রয়েছেন, এতে কষ্ট হয় না?

—কি আর কষ্ট! বেশ আছি, এখন যদি ও বেঁচে ওঠে তবে। ও আমায় যা দিয়েছে, আমার নিজের সমাজে বসে আমাকে তা কেউ দিয়েছে?

—দেয়নি মানে কি? বিয়ে করলেই তো পারতেন।

—আমার সাহস হয়নি ডাক্তারবাবু, সামান্য পণ্ডিতি করি—ভাবতাম সংসার চালাতে পারবো না। এ নিজের দিক মোটেই ভাবেনি বলেই আমার সঙ্গে চলে আসতে পেরেছে।

—শুধু তাই নয়, আপনি ব্রাহ্মণ, ও বাগ্দী। আপনাকে অন্য চোখেই দেখত, কারণ আপনি উচ্চবর্ণের। কি করে আপনি আলাপ করলেন এর সঙ্গে?

—আমাদের ইস্কুলের কাঁটাল গাছ ওর বাবা জমা রেখেছিল। তাই ও আসতো কাঁটাল পাড়তে। এই সূত্রে আলাপ। এখন ওর অসুখ—ওর চেহারা বেশ ভাল দেখতে, যদি বেঁচে ওঠে তবে দেখবেন ওর মুখের এমন একটা শ্রী আছে—

বিপিন অন্য কথা পাড়িল—সে নিজের অভিজ্ঞতা হইতেই জানে, প্রণয়ীদের মুখে

প্রণয়িনীদের রূপগুণের বর্ণনায় আদি-অন্ত নাই। হইলই বা বাগ্দী বা দুলে। প্রেম মানুষকে কি অন্ধই করে!

বিশ্বেশ্বরের উপরে বিপিনের করুণা হইল। তাহার সারাজীবনের তৃষ্ণা—এ অবস্থায় পানাপুকুরের জলও লোকে পান করে তৃষ্ণার ঘোরে।

বিপিন বলিল—এর বাড়ীতে আপনার লোকজনের কাছে খবর পাঠান। যদি ভালমন্দ কিছু হয়, তারা আপনাকে দোষ দেবে। এরও তো ইচ্ছে হয় আপনার লোকের সঙ্গে দেখা করতে।

—তারা কেউ আসবে না। ওর বাবা অবস্থাপন্ন চাষী গেরস্থ। তারা বলেচে ওর মুখ দেখবে না আর।

অনেক রাত্রে বিপিন একবার জল তুলিতে গেল বিলে। ধপধপে জ্যোৎস্না চারিদিকে, অদ্ভুত শোভা স্তব্ধ গভীর নিশীথিনীর। পদ্মবনে রাত-জাগা সরাল পাখী ডাকিতেছে। দূরে বিলের ধারে জেলেদের মাছ চৌকি দেওয়ার কুঁড়ের কাছে কাঠকুটো জ্বালিয়া আগুন করিয়াছিল, এখন প্রায় নিভিয়া আসিতেছে। বিশ্বেশ্বরের দুর্ভাগ্য, হয়তো মেয়েটি আজ শেষ-রাত্রে কাবার হইবে। বিশ্বেশ্বরকে বিপিন সে কথা বলে নাই, জ্বর অতি দ্রুত নামিতেছে, ক্রাইসিস্ আসিয়া পড়িল, নাড়ীর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। বিপিন যাহা করিবার করিয়াছে, আর করিবার উপযুক্ত তোড়জোড় নাই তাহার! বাঁচান যাইবে না।

এই স্তব্ধ রাত্রির সীমাহীন রহস্য তাহার মনকে অভিভূত করিল। বিপিন কখনো ও সব ভাবে না, তবুও মনে হইল, মেয়েটি আজ কোথায় কতদূরে চলিল, তখনো কি সে জাতে বাগ্দীই থাকিয়া যাইবে? উচ্চবর্ণের প্রতি প্রেমের দায়ে তাহার এই যে স্বার্থত্যাগ, ইহা কি সম্পূর্ণ বৃথা যাইবে? কোথাও কোনো পুষ্পমাল্য অপেক্ষা করিয়া নাই কি তাহার সাদর অভিনন্দনের জন্য?

মানী যদি থাকিত, এসব কথা তাহার সঙ্গে বলা চলিত। মানী সব বোঝে, সে বুদ্ধিমতী মেয়ে। শান্তি সেবাপরায়ণা বটে, কিন্তু তাহার শিক্ষা নাই, সে খাওয়াইতে জানে বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে কথা বলিয়া সে আনন্দ পাওয়া যায় না। মানী আজ কোথায়, কি ভাবে আছে? আর কখনো তাহার সঙ্গে দেখা হইবে না? যাক্, সে যেখানেই থাক, সে বাঁচিয়া আছে। নিমোনিয়ার ক্রাইসিস খড়্গ লইয়া বলি দিতে উদ্যত হয় নাই তাহাকে। সে বাঁচিয়া থাকুক। দেখিবার দরকার নাই। পৃথিবীর মাটি মানীর পায়ের স্পর্শ পায় যেন, মাটিতে মাটিতেও যেন যোগটা বজায় থাকে।

শেষরাত্রের চাঁদ-ডোবা অন্ধকারের মধ্যে এক দিকে বিপিন, অন্য দিকে বিশ্বেশ্বর ধরিয়া মৃতদেহকে কুটীরের বাহির করিল। বিলের চারিধারে ঘনীভূত কুয়াসা। শ্মশান বিলের ওপারে, প্রায় এক মাইল ঘুরিয়া যাইতে হয়। বিপিনের খাতিরে বল্লভপুরের বাগ্দীপাড়া হইতে দুজন লোক আসিল। বিপিন এবং বিশ্বেশ্বরও ধরিল। সৎকারের কোন ত্রুটি না হয়, প্রেমের মান রাখা চাই, বিপিনের দৃষ্টি সেদিকে।

স্নান করিয়া যখন বিপিন ফিরিল, তখন বেলা প্রায় এগারোটা।

দত্ত মহাশয় বলিলেন, ও ডাক্তারবাবু, কোথায় ছিলেন কাল রাত্রে? রুগী ছিল? শান্তি যে আপনার জন্যে শ্বশুরবাড়ী থেকে ক'রকমের আচার পাঠিয়ে দিয়েচে। যে গাড়োয়ান গাড়ী নিয়ে গিয়েছিল, সে কাল রাত্রে ফিরে এসেচে কিনা—সেই গাড়ীতেই আপনার জন্যে এক হাঁড়ি আচার আলাদা করে—ব্রাহ্মণের ওপর বড্ড ভক্তি আমার মেয়ের—

বিপিন যেন শক্ত মাটি পাইল অনেকক্ষণ পরে। শান্তি আছে, সে স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, সে দেহমুক্ত জীবাত্মা নয়—শান্তি তাহাকে আচার পাঠাইয়াছে। আবার হয়তো একদিন আসিয়া হাজির হইবে, আবার চা করিয়া আনিয়া দিবে তাহার হাতে।

হতভাগ্য বিশ্বেশ্বর!

সন্ধ্যার পূর্ব্বে সে আবার বল্লভপুর গেল। বিশ্বেশ্বর কি অবস্থায় আছে একবার দেখা দরকার। গিয়া দেখিল, ঘরের দোর খোলা; বাহির হইতে উঁকি মারিয়া দেখিল, ঘরের মধ্যে বিশ্বেশ্বর ভাত চড়াইয়াছে।

বিশ্বেশ্বর বলিল. কে?

বিপিন ঘরে ঢুকিয়া বলিল, আমি। এখন অবেলায় রাঁধছেন যে?

বিশ্বেশ্বরকে দেখিয়া মনে হয় না, সে কোনো শোক পাইয়াছে। বলিল, আসুন ডাক্তারবাবু। সারাদিন খাওয়া হয়নি। ঘরদোর গোবর দিয়ে নিকিয়ে নিলাম—রুগীর ঘর, বুঝলেন না? আবার নেয়ে এলাম এই সব করে, তখন বেলা তিনটে। তারপর এই ভাত চড়িয়েচি এইবার দুটো খাবো, বড় খিদে পেয়েচে।

বিপিন চাহিয়া দেখিল ঘরের কোথাও কোনো বিছানা নাই। যে ছেঁড়া কাঁথা ও বিচালির শয্যায় রোগিণী শুইয়া থাকিত, তাহা শবের সঙ্গে গিয়াছে, এখন এই ঠাণ্ডা রাত্রে বিশ্বেশ্বর শুইবে কিসে? ওই একটিমাত্র বিছানাই সম্বল ছিল নাকি?

বিশ্বেশ্বর ভাত নামাইয়া বড় একখানা কলার পাতায় ঢালিল। শুধু দুটি বড় বড় কয়লা সিদ্ধ ছাড়া খাইবার অন্য কোনো উপকরণ নাই। তাহা দিয়াই সে যেমন গোগ্রাসে ভাত গিলিতে লাগিল, বিপিন বুঝিল, লোকটার সত্যই অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছিল বটে। বেচারী চাকুরীটা হারাইয়া বসিল প্রেমের দায়ে পড়িয়া, এখন খাইবেই বা কি, আর করিবেই বা কি। তাও এমন অদৃষ্ট, একূল ওকূল দুকূলই গেল।

প্রথম যখন খাইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখন বিশ্বেশ্বর তত কথা বলে নাই, দুটি কয়লা সিদ্ধের মধ্যে একটা কয়লা সিদ্ধ দিয়া আন্দাজ অর্দ্ধেক পরিমাণ ভাত খাওয়ার পরে বোধ হয় তাহার কিঞ্চিৎ ক্ষুন্নিবৃত্তি হইল। বিপিনের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, আজ দিনটা কি বিপদের মধ্যে দিয়েই কেটে গেল। এক একদিন অমন হয়। বড্ড খিদে পেয়েছিল, কিছু মনে করবেন না।

বিপিন বলিল—তা তো হোল, কিন্তু আপনি এখন শোবেন কিসে? বিছানা তো নেই দেখচি।

—ও কিছু না, গায়ের কাপড়খানা আছে, বেশ মোটা, শীত ভাঙে খুব। আর দু আঁটি বিচালি চেয়ে আনবো এখন পাড়া থেকে।

—না চলুন, আমার ওখানে রাত্রে শুয়ে থাকবেন। এমন কষ্টে কি কেউ শুতে পারে?

—না, না, কোনো দরকার নেই ডাক্তারবাবু। ও আবার কষ্ট কিসের? ওসব কষ্টকে কষ্ট বলে ভাবিনে। দিব্যি শোবো এখন, একটু আগুন করবো ঘরে। তবে প্রথম দিনটা, হয়তো একটু ভয় ভয় করবে।

—আমি আপনার ঘরে থাকবো আজ আপনার সঙ্গে?

—কোনো দরকার নেই। আপনি না হয় একদিন শুয়ে রইলেন, কিন্তু আমাকে সইয়ে নিতে হবে তো? সে তো ভালবাসতো আমায়, তার ভূত এসে আর আমার গলা টিপবে না। আচ্ছা, সত্যি ডাক্তারবাবু, কোথায় সে গেল, বলুন তো?

—নিন, আপনি খেয়ে নিন। ওসব কথা পরে হবে এখন।

বিশ্বেশ্বর খাওয়া শেষ করিয়া তামাক সাজিল। নিজে দু চার বার টানিয়া বিপিনের হাতে হুঁকাটি দিল। বিপিন প্রথম দিন ইতস্তত, করিয়াছিল, লোকটা বাগ্‌দিনীর হাতের রান্না খায়, ইহার জাত নাই, এ হুঁকায় তামাক খাইবে কি না। কিন্তু কেমন একটা করুণা ও সহানুভূতি তাহার মনে আশ্রয় লইয়াছে, সে যেমন ইহার প্রতি, তেমনি ছিল ইহার মৃতা প্রণয়িনীর প্রতি। সুতরাং এখন ওকথা তাহার আর মনেই ওঠে না।

বিপিন বলিল, এখন কি করবেন ভেবেচেন?

—একটা পাঠশালা করবো ভাবচি, এই জেয়ালা-বল্লভপুরে অনেক নিকিরি আর জেলে-মালোর বাস। ওদের ছেলেপিলে নিয়ে একটা পাঠশালা খুললে, চলবে না?

—ওদের সঙ্গে কথা হয়েচে কিছু?

—কথা এখনো তুলিনি কিছু। কাল একবার পাড়ার মধ্যে গিয়ে দু-এক জনের কাছে পাড়ি কথাটা।

বিপিন বুঝিল, ইহা নিতান্তই অস্থির-পঞ্চকের ব্যাপার। কিছুই ঠিক নাই। কোথায় বা পাঠশালা, কোথায় বা ছাত্রদল! ইহার মস্তিষ্কে ছাড়া তাহাদের অস্তিত্ব নাই কোথাও।

—আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আপনি ভূত মানেন?

—না, যা কখনো দেখিনি, তা কি করে মানবো? ওসব আর ভেবে কি করবেন বলুন?

বিশ্বেশ্বর হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল। বিপিন অবাক হইয়া গেল পুরুষমানুষ এভাবে কাঁদিতে পারে, তাহা সে নিজেকে দিয়া অন্ততঃ ধারণাই করিতে পারিল না। ভাল বিপদে ফেলিয়াছে তাহাকে বিশ্বেশ্বর পাণ্ডিত।

দুঃখও হইল। লোকটার লাগিয়াছে খুব! লাগিবারই কথা বটে। কে জানে, হয়তো মনের দিক দিয়া মানীর সঙ্গে তাহার যে সম্বন্ধ, মৃতার সহিত ইহারও সেই সম্বন্ধ ছিল। হতভাগ্য

বিশেশ্বরের প্রতি সে অবিচার করিতে চায় না।

ইহাকে একা এই শোকের মধ্যে ফেলিয়া যাইতে তাহার মন সরিল না। রাত্রিটা বিপিন রহিয়া গেল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

১

বিপিনের ডাক্তারখানায় সম্প্রতি মাসখানেক একটিও রোগী আসে নাই।

রোজই সকালে বিকালে নিয়মিত ডাক্তারখানায় গিয়া তীর্থের কাকের মত বসিয়া থাকে। হাতের পয়সাকড়ি ফুরাইয়া গেল। কোনো দিকে রোগবালাই নাই, দেশটা হঠাৎ যেন মধুপুর কি শিমুলতলা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

জীবনটাও যেন বড় ফাঁকা ফাঁকা। সকাল সন্ধ্যা একেবারে কাটে না। দত্ত মশায় অবশ্য আছেন, কিন্তু তাঁহার মুখে ধর্মতত্ত্ব শুনিয়া শুনিয়া একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে, আর ভাল লাগে না।

মনোরমার জন্য মন কেমন করে আজকাল। মনোরমাকে সাপে কামড়ানোর পর হইতে বিপিন লক্ষ্য করিতেছে স্ত্রীর উপর তাহার মনোভাব অদ্ভুত ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। মনে হয় মনোরমা তো চলিয়া যাইতেছিল, একদিনও সে মনোরমাকে মুখের একটি মিষ্ট কথাও বলে নাই, এ অবস্থায় যদি সেদিন সে সত্যই মারা পড়িত বিপিনকে চিরজীবন অনুতাপ করিতে হইত সে সব ভাবিয়া। সুখের মুখ কখনো সে দেখে নাই, বিপিন তাহাকে এবার সুখী করিবে। মানুষের মনের এই বোধ হয় গতি, বড় বড় অবলম্বন যখন চলিয়া যায়, তখন যে আশ্রয়কে অতি তুচ্ছ, অতি ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হইত, তাহাই তখন হইয়া দাঁড়ায় অতি প্রিয়, অতি প্রয়োজনীয়। মনোরমার চিন্তা কখনো আনন্দ দেয় নাই, আজকাল দেয়। তাহার প্রতি একটা অনুকম্পা জাগে, স্নেহ হয়, তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা হয়। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার এ সব!

বিপিন মাস দুই বাড়ী যায় নাই, কিছু টাকা হাতে আসিলে একবার বাড়ী যাইত। কিন্তু এই সময়ই হাত একেবারে খালি।

দত্ত মহাশয় একদিন বলিলেন, ডাক্তারবাবু, শান্তি কাল পত্র লিখেচে, আপনার কথা জিগ্যেস করেচে, আপনি কেমন আছেন, ডাক্তারি কেমন চলচে। আর একটা লিখেচে, ওর শ্বশুরের চোখ অস্ত্র হবে কলকাতা বা রাণাঘাটের হাসপাতালে। আপনি সে সময়ে সময় করে দুদিনের জন্যে ওদের ওখানে থেকে শ্বশুরের সঙ্গে রাণাঘাট বা কলকাতা যেতে পারবেন কি না লিখেচে। শান্তি থাকবে, আমার জামাই থাকবে। অবিশ্যি আপনার ফি এবং যাতা-

য়াতের খরচা ওরা দেবে। একটা দিন কিংবা দুটো দিন লাগবে। আপনি থাকলে ওদের একটা বলভরসা। ওরা পাড়াগেঁয়ে মানুষ, হাসপাতালের সুলুক সন্ধান কিছুই জানে না। আপনার কত বড় বড় ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ, আপনি পড়েচেন সেখানে। তাই আপনাকে নিয়ে যেতে চায়।

বিপিন বলিল, বেশ লিখে দেবেন আমি যাবো. তবে ফি দিতে চাইলে যাবো না। যাতায়াতের খরচ দিতে চান, দেবেন তাঁরা, কিন্তু ফির কথা যেন না ওঠান।

দত্ত মশায় আর কিছু বলিলেন না।

দিন পাঁচ ছয় পরে দত্ত মশায় একদিন সকালে বিপিনকে ডাকিয়া ঘুম ভাঙাইলেন। পূর্ব্ব রাত্রে শান্তির শ্বশুরবাড়ী হইতে লোক আসিয়াছে, রাণাঘাট হাসপাতালে শান্তির শ্বশুরকে লইয়া যাওয়া হইবে, বিপিনকে আজ এখনি রওনা হইতে হইবে, বেশী রাত হইয়া গিয়াছিল বলিয়া দত্ত মশায় বিপিনকে গত রাত্রে কিছু বলেন নাই।

সাত ক্রোশ পথ গরুর গাড়ীতে অতিক্রম করিয়া প্রায় বেলা দুইটার সময় বিপিন শান্তির শ্বশুরবাড়ী গিয়া পৌঁছিল। শান্তির স্বামী গোপাল প্রথমেই ছুটিয়া আসিল। বলিল, ওঃ, এত বেলা হয়ে গেল ডাক্তারবাবু! বড্ড কষ্ট হয়েচে, এই রোদ্দুর! ও কতক্ষণ থেকে আপনার জন্যে নাইবার জল চায়ের যোগাড় করে নিয়ে বসে আছে। আমরা তো আশা ছেড়েই দিয়েছিলুম।

বিপিন গিয়া বাহিরের ঘরে বসিল। তাহার বুকের মধ্যে টিপ্ টিপ্ করিতেছে. এখনি আজ শান্তির সঙ্গে দেখা হইবে। বিপিন ভাবিয়া অবাক হইল, শান্তির সঙ্গে দেখা হইবার আগ্রহে মনের এই রকম অবস্থা—এ কি কল্পনা করা সম্ভব ছিল এক বছর পূর্ব্বেও? মানী নয়, শান্তি। কে শান্তি? ক'দিন তাহার সহিত পরিচয়? উত্তেজনা ও আনন্দের মধ্যেও কেমন এক প্রকার অস্বস্তিতে তাহার মন ভরিয়া উঠিল।

শান্তি একটু পরেই আধ ঘোমটা দিয়া ঘরে ঢু'কল এবং বিপিনের পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল। হাসিমুখে বলিল—আমি বেলা দশটা থেকে কেবল ঘরবার করচি—এত বেলা হবে তা ভাবিনি। একটু জিরিয়ে হাত মুখ ধুয়ে নিয়ে ডাব খান।

—তোমার শ্বশুর মহাশয়কে একবার দেখবো।

—এখন না। বাবা খেয়ে ঘুমুচ্চেন একটু, বুড়োমানুষ। আপনি নেয়ে নিয়ে রান্না চড়িয়ে দিন, তারপর—

বিপিন বিস্ময়ের সুরে বলিল—সে কি শান্তি! রান্না চড়িয়ে দেবো কি? এত বেলায়—

শান্তি হাসিয়া বলিল—ও সব চলবে না এখানে। ব্রাহ্মণ মানুষকে আমরা কিছু রেঁধে দিতে পারিনে। আমি সব যোগাড় করে দেবো, আপনি শুধু নামিয়ে দেবেন। আকাশ-পাতাল ভাবতে হবে না আপনার সেজন্যে।

শান্তির আশ্বাস দেওয়ার মধ্যে এমন একটা জিনিস আছে যাহাতে বিপিনের মন একেবারে লঘু ও নিশ্চিন্ত হইয়া উঠিল। শান্তি সেবাপরায়ণা মেয়ে বটে, কাজের মেয়েও

বটে, তাহার উপর নির্ভরশীলতা কেমন যেন আপনিই আসে।

গোপাল আসিয়া বলিল—চলুন, নদীতে নাইয়ে নিয়ে আসি।

বিপিন বলিল—নদী পর্য্যন্ত আপনার কষ্ট করে যাওয়ার কি দরকার। আমায় দেখিয়ে দিলেই তো…! গোপাল তাহাতে রাজি নয়, বিপিন বুঝিল শান্তিই বলিয়া দিয়াছে তাহাকে নদীর ঘাটে লইয়া গিয়া স্নান করাইয়া আনিতে। শান্তির প্রভাব ও প্রতিপত্তি এখানে খুব বেশী, এমন কি মনে হইল বাপের বাড়ী অপেক্ষা বেশী।

স্নানাহারের পর শান্তি বাহিরের ঘরে নিজে বিপিনের বিছানা করিয়া দিল। বিপিন বলিল—শান্তি, আমি দুপুরে ঘুমুই নে তুমি জানো, বিছানা কিসের—তার চেয়ে বোসো এখানে দুটো কথাবার্ত্তা বলি।

শান্তি হাসিয়া বলিল—না তা হবে না, একটু বিশ্রাম করে নিতেই হবে। কাল আবার এখান থেকে আট ক্রোশ রাস্তা গরুর গাড়ীতে গিয়ে ট্রেন ধরতে হবে।

—ও কষ্ট কিছু না, তোমার শ্বশুর উঠেচেন কি না দেখ। একবার তাঁর চোখটা দেখি। বিপিন চোখের সম্বন্ধে কিছুই জানে না, তবুও তাহাকে ভান করিতে হইল যে সে অনেক কিছু বুঝিতেছে। শান্তির শ্বশুরের দুই চারিটি চক্ষুপীড়া সংক্রান্ত অস্বস্তিকর প্রশ্নের উত্তরও তাহাকে দিতে হইল।

গ্রামখানি বিকালে ঘুরিয়া দেখিল, পিপলিপাড়া বা সোনাতনপুরের মতই জঙ্গলে ভরা, এ অঞ্চলের অধিকাংশ গ্রামই তাই। শান্তিদের বাড়ীর পিছনেই তো প্রকাণ্ড বাগান, চারিধার বাঁশবনে ঘেরা. দিনমানেও রোদ ওঠে না সেদিকটাতে বলিয়া মনে হয়।

সন্ধ্যাবেলা বেড়াইয়া ফিরিল। বাড়ীর পিছনে ঘন বন-বাগানের ধারে একটি বাতাবী লেবুতলায় ঢেঁকি পাতা। সেখানে শান্তি ও আর একটি প্রৌঢ়া বিধবা মেয়েমানুষ চিঁড়ে কুটিতেছে—শান্তি তাহাকে সেখানে ডাকিল। বিপিন সেখানে গিয়া দাঁড়াইল, প্রৌঢ়া বিধবা মেয়েমানুষটি ঢেঁকিতে পাড় দিতেছিল, শান্তি ঢেঁকির গড়ে ধান দিয়া যাইতেছে। তাহাকে বসিতে একখানা পিঁড়ি দিয়া হাসিয়া বলিল—বসুন। এখানে বসে গল্প করুন আমি সরু ধান দুটো ভেনে চাল করে নিচ্ছি, কাল সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। বাবা অন্য চাল খেতে পারেন না।

বিপিন চাহিয়া দেখিল বন-বাগানের আড়াল হইতে চাঁদ উঠিতেছে। কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া, প্রায় পূর্ণচন্দ্রের মতই বড় চাঁদখানা বাঁশবন নিস্তব্ধ, ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকিতেছে সন্ধ্যায়, খুব নির্জ্জন গ্রামখানা, লোকজন বেশী নাই, পিপলিপাড়ার হাটতলার চেয়েও নির্জ্জন।

কিন্তু বেশ লাগিল এই বন-বাগানের মধ্যে ঢেঁকিশালের জায়গাটা, চাঁদ-ওঠা এই সুন্দর সন্ধ্যা, শান্তির সুমিষ্ট অভ্যর্থনাটি, বাতাবী লেবুফুলের সুগন্ধ।

সে বলিল, তুমি ভারি কাজের মেয়ে কিন্তু শান্তি। আবার দিব্যি ধান ভানতেও পারো দেখচি।

শান্তি হাসিয়া ফেলিল। বিধবা মেয়েমানুষটি মুখে কাপড় দিয়া হাসিল। শান্তি বলিল,

এ না করলে গেরস্ত ঘরে চলে কি, বলুন আপনি? এখন ধরুন আমার শ্বশুরের তিন গোলা ধান হয় বছরে, রোজ ধান ভানা, চিঁড়ে কোটার জন্যে কাকে আবার খোশামোদ করে বেড়াবো? ওই মতির মা আছে আর আমি আছি—

—বেশ গাঁখানা তোমাদের, বেড়িয়ে এলাম—

—চড়কতলার দিকে গিয়েছিলেন?

—চিনি তো নে, কোন্ তলা। এমনি খানিকটা ঘুরলাম—

শান্তি উঠিয়া বলিল, দাঁড়ান, আপনার চা করে আনি, এখানে বসে খাবেন আর গল্প করবেন, মতির মা রাখো। আমি আসি আগে, যাবো আর আসবো—

চা ও খাবার লইয়া সে খুব শীঘ্রই ফিরিল বটে।

বিপিন বলিল, হালুয়া গরম রয়েচে, এখন করে আনলে নাকি?

—আমি না, মা করেচেন। আমি শুধু চা করে আনলাম, সেকেলে বুড়ী, চা করতে জানেন না। ভারি আমোদ হচ্ছে আমার, আপনি এসেচেন বলে।

—সত্যি?

—সত্যি না তো মিথ্যে? রাত্রে আপনাকে আর রাঁধতে হবে না, আমি লুচি ভেজে দেবো।

—কেন, আমি ভাত রেঁধেই নিতাম, আবার লুচির হাঙ্গামা—

—হাঙ্গামা কিছু না। আমার শ্বশুরবাড়ীরা বড়লোক, এদের এক কাঁড়ি টাকা আছে, খাইয়ে দিলাম বা কিছু টাকা বাপের বাড়ীর লোককে?

শান্তির কথার ভঙ্গি শুনিয়া বিপিন হাসিয়া উঠিল, প্রৌঢ়া মতির মাও অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া (কারণ বিপিনের সামনে হাসা তাহার পক্ষে অশোভন) হাসিয়া বলিল—কি যে বলেন বড় খুড়ীমা আমাদের! শুনতেই এক মজা।

শান্তি যে এমন হাসাইতে পারে, বিপিন তাহা জানিত না, রসিকা মেয়ে সে খুব পছন্দ করে; পছন্দ করে বলিয়াই এটুকু জানে, ভাল হাসাইতে পারে এমন মেয়ের সংখ্যা বেশী নয়। শান্তির একটা নূতন দিক যেন সে দেখিল।

শান্তি ছেলেমানুষের মত আবদারের সুরে বলিল, একটা ভূতের গল্প বলুন না?

—ভূতের গল্প! নাও ধান ভেনে, আর এখন রাত্তির দুপুরে ভূতের গল্প করে না।

—না বলুন।

বিপিন একটা গল্প বানাইয়া বলিল। অনেক দিন আগে কাহার মুখে একটা গল্প শুনিয়াছিল, সেটিও বলিল। চাঁদ এবার অনেকদূর উঠিয়াছে, বিপিন শান্তির সহিত গল্পের ফাঁকে ফাঁকে ভাবিতেছিল মানীর কথা, মৃতা বাগ্দী মেয়েটির কথা, মনোরমার কথা, কামিনী মাসীর কথা।

মানীর সঙ্গে এই রকম ভাবে গল্প করিতে পারিত এই রকম সন্ধ্যায়! না তাহা হইবার নয়। মানীর শ্বশুরবাড়ী এরকম পাড়াগাঁয়েও নয়, মানী এরকম বসিয়া বসিয়া ধানও ভানিবে না।

ইতিমধ্যে মতির মা কি কাজে একটু বাড়ীর মধ্যে ঢুকিতেই বিপিন জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা শান্তি—মতির মা বলে ডাকচো, ওর মতি বলে মেয়ে ছিল ?

শান্তি বিস্মিত হইয়া বলিল—আপনি ওকে চেনেন ?

—ও কি জাত ?

—বাগ্‌দী কিংবা দুলে। আপনি ওর কথা জানলেন কি করে ?

—বলচি। ওর বাড়ী কি ভাসানপোতা ছিল ?

শান্তি আরও অবাক হইয়া বলিল—ভাসানপোতা ওর শশুরবাড়ী। এ গাঁয়ে ওর বাপের বাড়ী। ওর স্বামী ওকে নেয় না অনেকদিন থেকে। ওর মেয়ে মতি ওর বাপের কাছেই ছিল, তার বিয়ে হয়েছে এই দিকে যেন কোথায়। আমি তাকে কখনো দেখিনি, সে এখানে আসে না।

—আচ্ছা, তুমি জানো মতির সঙ্গে ওর মার দেখা হয়েছিল কতদিন আগে ?

—না। কেন বলুন তো—এত কথা জিজ্ঞেস করচেন কেন ?

—ওকে কথাটা জিজ্ঞেস করবে ? নয়তো থাক্। আজ জিগ্যেস কোরো না—পরে বলবো এখন। ইতিমধ্যে মতির মা আসিয়া পড়াতে বিপিন কথা বন্ধ করিল। প্রৌঢ়া আবার ঢেঁকিতে পাড় দিতে আরম্ভ করিল। বিপিন ভাবিল, হয়তো এ জানে না তাহার মেয়ে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল এবং তাহার সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে। আজ কৃষ্ণা দ্বিতীয়া, ঠিক এই পূর্ণিমার আগের পূর্ণিমার রাত্রে। বল্লভপুরের বিলের ধারের সে ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাত বিপিন ভুলে নাই। সে রাতটিতে বাগ্‌দীর মেয়ে মতি তাহার মনে একটা খুব বড় দাগ রাখিয়া গিয়াছে। অন্ত এক জগতের সহিত পরিচয় করাইয়া গিয়াছে।

অভাগিনী বৃদ্ধা জানেও না তাহার মেয়ের কি ঘটিয়াছে।

পরদিন শান্তি যখন চা দিতে আসিল, তখন নির্জ্জনে পাইয়া বিপিন মতির কাহিনী শান্তিকে শুনাইয়া দিল। শান্তি যেমন বিস্মিত হইল, তেমনি দুঃখিত হইল। বলিল—আমার মনে হয় মেয়ে যে ঘর থেকে চলে গিয়েছে একথা ও জানে, কারো কাছে প্রকাশ করে না সেকথা—তবে সে যে মরে গিয়েচে একথা জানে না। জানবার কথাও নয়, বল্লভপুরে ওরা লুকিয়ে এসে ঘর বেঁধে থাকতো, কাউকে পরিচয় তো দেয়নি—কি করে জানবে কোথাকার কার মেয়ে ? ভাসানপোতা থেকে জেয়ালা-বল্লভপুর কতদূর ?

—তা আট ন' ক্রোশ খুব হবে।

—তা হোলে ও কিছুই জানে না, মেয়ে ঘর ছেড়ে বের হয়ে গিয়েচে, একথাও শোনে নি। এতদূর থেকে কে খবর দেবে! ওকে আর কোনো কথা জিগ্যেস করার দরকার নেই।

২

পরদিন বিকালে দুইখানি গরুর গাড়ীতে শান্তি, শান্তির স্বামী গোপাল, বিপিন ও শান্তির শ্বশুর স্টেশনে আসিল এবং সন্ধ্যার পরে রাণাঘাটে পৌছিয়া সিদ্ধান্তপাড়ার বাসায় গিয়া উঠিল। শান্তির এক মামাশ্বশুর বাসা পূর্ব হইতেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। দুখানি মাত্র ঘর, একখানা ছোট রান্নাঘর, ছোট একটু উঠান। ভাড়া পাঁচ টাকা।

শান্তি অজ পাড়াগাঁয়ের মেয়ে দরাজ জায়গায় হাত পা ছড়াইয়া খেলাইয়া বাস করা অভ্যাস, সে তো বাসা দেখিয়া স্বামীকে বলিল—এখানে কেমন করে থাকব হ্যাঁ গা—ওমা, এক উঠোন—আর এইটুকু রান্নাঘরে কি রাঁধা যায়? আর ঐ পাতকুয়োর জলে নাইবো?

রাণাঘাটে বিপিন আসিল অনেকদিন পরে। মানীদের বাড়ীতে কাজ করিবার সময় কোর্টে তখন আসিতেই হইত। এইজন্যই রাণাঘাটের অনেক জিনিসের সঙ্গে মানীর কথা যেন জড়ানো। গোপালের সহিত বাজার করিতে বাহির হইয়া বিপিন দেখিল পূর্বপরিচিত কত দৃশ্য তাহার মনে কষ্ট দিতেছে—মানীর কথা অনেকটা চাপা পড়িয়া গিয়াছিল, আবার অভ্যস্ত নূতন রূপে সে সব দিনের স্মৃতি মনের দ্বারে ভিড় করিতে লাগিল। কষ্ট হয়, সত্যই কষ্ট হয়।

সকালে গোপাল এবং শান্তির শ্বশুরকে লইয়া বিপিন রাণাঘাট হাসপাতালে ডাক্তার আর্চ্চারের কাছে গেল। বলাই যখন হাসপাতালে ছিল, তখন আর্চ্চার সাহেবের সঙ্গে বিপিনের আলাপ হয়। আর্চ্চার সাহেব বিপিনকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন। বলিলেন—আপনার ভাই কোথা? মারা গিয়েচে?' তা যাবে, বাঁচবার কোনো আশা ছিল না।

শান্তির শ্বশুরের চোখ দেখিয়া বলিলেন—এখন এঁকে দশ বারোদিন এখানে থাকতে হবে। চোখে একটা ওষুধ দিচ্চি—চোখ কেমন থাকে, কাল আমায় এসে জানাবেন। কাটাবার এখন দরকার নেই। বলাই যে জায়গাটাতে শুইয়া থাকিত খাটে—বিপিন সেখানটা গিয়া দেখিয়া আসিল। এখন অন্য রোগী রহিয়াছে!

বলাই মানী…কামিনী মাসী…স্বপ্ন…

হাসপাতাল হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিপিন দেখিল শান্তি বাসা বেশ চমৎকার গুছাইয়া লইয়াছে। দুটি ঘরের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ছোট ঘরটিতে বিপিনের একা থাকিবার এবং বড় ঘরটিতে উহারা তিনজনের একত্র থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে। দুটি ঘরই ইতিমধ্যে ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়াছে, মেঝে জল দিয়া ধুইয়া ফেলিয়া শুকনো নেকড়া দিয়া বেশ করিয়া মুছিয়া ফেলিয়াছে। বিছানাপত্র পাতিয়াছে দুটি ঘরেই, বাহিরে বসিবার জন্য একটি সতরঞ্চি পাতিয়া রাখিয়াছে। উহাদের দেখিয়া বলিল—কি হোল বাবার চোখের?

বিপিন বলিল—চোখ কাটতে হবে না—তবে এখানে দশ বারো দিন এখন থাকতে হবে। ওষুধ দিয়া ছানি নষ্ট করে দেবে বল্লে। ওঃ তুমি যে শান্তি, বেশ গুছিয়ে ফেলেছো ঘরদোর।

শান্তি হাসিয়া বলিল—এখন নেয়ে ধুয়ে নিন্ সব। আমি বাবাকে নাইয়ে নি।

শান্তির শ্বশুর চোখে ভাল দেখিতে পান না, শান্তি তাঁহাকে কি করিয়াই সেবা করিতেছে, দেখিয়া বিপিন মুগ্ধ হইল। মা যেমন অসহায় ছোট ছেলের সব কাজ নিজে করিয়া দেয়, সকল অভাব-অভিযোগের সমাধান নিজে করে, তেমনি করিয়া শান্তি অসহায় বৃদ্ধকে সকল দিক হইতে আগুলিয়া রাখিয়া দিয়াছে।

অথচ সে বালিকার মত খুশি শহরে আসিয়াছে বলিয়া। সোনাতনপুরের মত অজ পাড়াগাঁয়ে বাপের বাড়ী, শ্বশুরবাড়ীও ততোধিক অজ পাড়াগাঁয়ে—রাণাঘাট তাহার কাছে বিরাট শহর। এখানকার প্রত্যেক জিনিসটি তাহার কাছে অভিনব ঠেকিতেছে। সে চিরকাল সংসারে খাটিতেই জানে, কিন্তু বাহিরের আনন্দ কখনও পায় নাই—জীবনে বিশেষ কিছু দেখেও নাই, তাহার শ্বশুরবাড়ীর গ্রামে মনসাপুজার সময় মনসার ভাসান হয় প্রতি শ্রাবণ মাসে, বৎসরের মধ্যে এই দিনটিই তাহার কাছে পরম উৎসবের দিন। সাজিয়া গুজিয়া মনসাতলার পাড়ার অন্যান্য বৌঝিয়ের সঙ্গে সন্ধ্যাবেলা ভাসান শুনিতে যাইবে, এই আনন্দে শ্রাবণ মাসের পয়লা হইতে দিন গুনিত। তাহার মত মেয়ের রাণাঘাট শহরে আসিয়া অত্যন্ত খুশি হইবারই কথা।

শান্তির শ্বশুর বিপিনকে বলিলেন—ডাক্তারবাবু, এখানে টকি বায়োস্কোপ হয় তো?

বিপিনও পাড়াগাঁয়ের লোক, সেও কখনো ওসব দেখে নাই—কিন্তু ইহাদের কাছে সে কলিকাতার পাশ-করা ডাক্তারবাবু, তাহাকে পাড়াগাঁয়ের ভূত সাজিয়া থাকিলে চলিবে না। সে তখনই জবাব দিল—ও টকি? হয় বৈকি, খুব হয়।

—আপনি বৌমাকে নিয়ে গিয়ে একদিন দেখিয়ে আনুন। আমার কখন কি দরকার হয়, গোপাল থাকুক। বৌমা কখনও জীবনে ওসব দেখেনি—বেচারী দেখুক একটু—

—কেন গোপালও তো দেখে নি—সে-ই যাক শান্তিকে নিয়ে?

—গোপাল না থাকলে আমার কাজকর্ম—আপনি ব্রাহ্মণ, আপনাকে দিয়ে তো হবে না ডাক্তারবাবু, তারপর বৌমা আমার কাছে থাকলে—গোপাল একদিন যাবে এখন।

শান্তি রান্নাঘরে রান্না করিতেছে—গোপাল বসিয়া তরকারি কুটিতেছে, বিপিন গিয়া বলিল—শান্তি, টকি বায়োস্কোপ দেখতে যাবে? মিত্তির মশায় বললেন তোমাকে নিয়ে দেখিয়ে আনতে।

শান্তি বালিকার মত উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল—কোথায়, কোথায়, কখন হবে? চলুন না, আজই চলুন—কখন হয় সে? আমি কখনো দেখিনি। আমার মেজ ননদের মুখে টকির গল্প শুনেছি, সেই থেকে ভারি ইচ্ছে আছে দেখবার।

বিপিনও টকির খোঁজ বিশেষ কিছু জানে না—দুপুরের পর বাহির হইয়া সন্ধান করিয়া জানিল বড়বাজারে ফেরিফ্যান রোডের ধারে এক কোম্পানী কলিকাতা হইতে আসিয়া মাস দুই টকি দেখাইতেছে—অদ্যকার পালা 'নরমেধ যজ্ঞ', ছটায় সময় আরম্ভ।

বেলা চারিটার সময় সে শান্তির শ্বশুরের ঔষধ কিনিতে ডাক্তারখানায় গেল—যাইবার

সময় শান্তিকে তৈরী থাকিতে বলিয়া গেল। সাড়ে পাঁচটার সময় ফিরিয়া দেখিল, শান্তি সাজিয়া গুজিয়া অধীর আগ্রহে ঘর-বাহির করিতেছে। বলিল—উঃ, বাপরে, বেলা কি আর আছে। টকি শেষ হয়ে গেল এতক্ষণ। চলুন, শীগগির।

বিপিন বলিল—গাড়ী আনবো, না হেঁটে যেতে পারবে? মিত্তির মশাই কি বলেন?

শান্তির শ্বশুর বলিলেন—আপনিও যেমন, কে-ই বা ওকে চিনচে এখানে, হেঁটেই যাক না।

পথে বাহির হইয়াই শান্তি বলিল—উঃ, পায়ে বড্ড কাঁকর ফুটচে, খালি পায়ে এ পথে হাঁটা যায় না।

অগত্যা বিপিন একখানা গাড়ী করিল। শান্তি বলিল—বাবাকে বলবেন না গাড়ীর কথা, আমি পয়সা দিচ্চি, আমার কাছে আলাদা পয়সা আছে।

বিপিন হাসিয়া বলিল—তোমার সব দুষ্টুমি শান্তি, আমি সব বুঝি। তোমার ঘোড়ার গাড়ী চড়বার সাধ হয়েছিল কিনা বল সত্যি করে। কাঁকর ফোটা কিছু না, বাজে ছল। ধরে ফেলেচি, না?

শান্তি হাসিয়া ফেলিল।

—পয়সা তোমায় দিতে হবে—একথা ভাবলে কেন?

—আপনি দিতে যাবেন কেন? আমার সাধ হয়েছিল, আপনার তো হয় নি?

—যদি বলি আমারও হয়েছিল?

—বেশ তবে দিন আপনি।

টকি দেখিতে বসিয়া শান্তি বলিল—আচ্ছা বলুন তো আপনার সঙ্গে বসে এমনভাবে টকি দেখবো একথা কখনো ভেবেছিলেন?

—কি করে ভাববো বলো?

—আপনি খুশি হয়েচেন বলুন।

বিপিন প্রথম হইতেই নিজেকে অত্যন্ত সতর্ক করিয়া দিয়াছিল মনে মনে। শান্তিকে একা লইয়া বাড়ীর বাহির হইয়াছে—তাহার সঙ্গে কোনোপ্রকার ভালবাসার কথা বলা হইবে না। ও পথে আর নয়। বিশেষতঃ তাহার স্বামী ও শ্বশুর বিশ্বাস করিয়া তাহার সঙ্গে ছাড়িয়া দিয়াছে যখন, তখন শান্তিকে একটিও অন্য ধরনের কথা সে বলিবে না।

বিপিন জবাব দিতে পারিত—কেন, আমি খুশি হই না হই তোমার তাতে আসে যায় কিছু নাকি?

কিন্তু সে বলিল—খুশি না হবার কারণ কি? আমিও যে ঘন ঘন টকি দেখি তা তো নয়, থাকি তো সোনাতনপুরে। খুশি হবার কথাই তো। আর এই যে পালাটা হচ্ছে নতুন পালা একেবারে।

কথাটা অন্য দিক দিয়া ঘুরিয়া গেল।

বিপিন দেখিল শান্তি খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে। টকি কখনও না দেখিলেও সে গল্পের গতি

এবং ঘটনা তাহার অপেক্ষা ভাল বুঝিতেছে। অনেক জায়গায় শান্তি এমন আবিষ্ট ও মুগ্ধ হইয়া পড়িতেছে যে বিপিন কথা বলিলে সে শুনিতে পায় না। একবার দেখিল শান্তি আঁচল দিয়া চোখের জল মুছিয়া কাঁদিতেছে।

বিপিন হাসিয়া বলিল,—ও কি শান্তি? কান্না কিসের?

শান্তি হাসিকান্না মিশাইয়া বলিল,—আপনার যেমন কঠিন মন, আমার তো অমন নয়, ছেলেটার দুঃখ দেখলে কান্না পায় না?

—তা হবে। আমার চোখের জল অত সস্তা নয়।

—তা জানি। আচ্ছা, আমি মরে গেলে আপনি কাঁদবেন?

—ও কথা কেন? ও সব কথা থাক।

শান্তি খপ্ করিয়া বিপিনের হাত ধরিয়া অনেকটা আব্দার এবং খানিকটা আদরের সুরে বলিল,—না বলুন। বলতেই হবে।

বিপিন হাসিয়া বলিল—নিশ্চয়ই কাঁদবো।

—সত্যি?

—মিথ্যে বলচি?

পরক্ষণেই সে শান্তির সঙ্গে কোনো ভালবাসার কথা না বলিবার সঙ্কল্প ভুলিয়া গিয়া বলিয়া ফেলিল,—আমি মরে গেলে তুমি কাঁদবে?

শান্তি গম্ভীর মুখে বলিল,—অমন কথা বলতে নেই।

—না, কেন আমার বেলায় বুঝি বলতে নেই। তা শুনবো না, বলতেই হবে।

—না, ও কথার উত্তর নেই। অন্য কথা বলুন।

—এর উত্তর যদি না দাও, তোমার সঙ্গে আর কথা বলবো না।

—না বলবেন, না বলবেন।

—বলবে না?

—না, আমি তো বলে দিয়েচি।

অগত্যা বিপিন হাল ছাড়িয়া দিল। মনে মনে ভাবিল—শান্তি বেশ একটু একগুঁয়েও আছে, যা ধরিবে, তাই করিবে।

ইণ্টারভ্যালের সময় শান্তি বাহিরে আসিয়া বলিল—সবাই চা খাচ্ছে, আপনি চা খাননি তো বিকেলে, খান না চা, আমি পয়সা দিচ্চি—

—তুমি কেন দেবে! আমার কাছে নেই নাকি—চল দুজনে খাবো।

শান্তির একগুঁয়েমি আরও ভাল করিয়া প্রকাশ পাইল। সে বলিল,—সে হবে না, আপনার চা খাওয়ার পয়সা আমি দেবো, নয়তো আমি চা খাবো না।

বিপিন দেখিল ইহার সহিত তর্ক করা বৃথা, অগত্যা তাহাতেই রাজি হইয়া দুজনে চায়ের স্টলে একখানা বেঞ্চের উপর বসিল। শান্তি বলিল, আপনি ওই যে বোতলের মধ্যে কি রয়েচে, ওই দুখানা নিন্—শুধু চা আপনাকে খেতে দেবো না।

—তুমিও নাও, আমি একা খাবো বুঝি ?

বিপিনের এই সময়ে মনে হইল মনোরমার কথা। বেচারী কখনো টকি বায়োস্কোপ দেখে নাই—সংসারে শুধু খাটিয়াই মরে। একদিন তাহাকে রাণাঘাটে আনিয়া টকি দেখাইতে হইবে—বীণাকেও। সে বেচারীই বা সংসারের কি দেখিল! মা বুড়োমানুষ, তিনি এসব পছন্দ করিবেন না, বুঝিবেনও না, তিনি চান ঠাকুরদেবতা, তীর্থধর্ম।

৩

পুনরায় ছবি আরম্ভ হইবার ঘণ্টা পড়িল। দুজনে আবার গিয়া ভিতরে বসিল। শেষের দিকে ছবি আরও করুণ হইয়া আসিল। এক জায়গায় শান্তি ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে দেখিয়া বিপিন বলিল- ও কি শান্তি? তুমি এমন ছেলেমানুষ! কাঁদে না অমন করে—ছিঃ—চল বাইরে যাবে ?

শান্তি ঘাড় নাড়িয়া বলিল- উঁহু—

—উঁহু তো কেঁদো না। লোকে কি ভাববে ?

ছবি শেষ হইতে বাহিরে আসিয়া শান্তি চুপচাপ থাকিয়া পথ চলিতে লাগিল। স্টেশনের কাছে আসিয়া বিপিন বলিল, চলো—ইষ্টিশান দেখবে ?

- চলুন।

আলোকোজ্জ্বল প্ল্যাটফর্ম দেখিয়া শান্তি ছেলেমানুষের মত খুশি। শান্তিকে সুন্দরী মেয়ে বলা যায় না, কিন্তু তাহার নিজস্ব এমন কতকগুলি চোখের ভঙ্গি, হাসির ধরন প্রভৃতি আছে যাহা তাহাকে সুন্দরী করিয়া তুলিয়াছে। বাহির হইতে প্রথমটা তত চোখে পড়ে না এসব—বিপিন এতদিন শান্তিকে দেখিয়া আসিতেছে বটে, কিন্তু আজ প্রথম তাহার মনে হইল—শান্তি যে এমন সুন্দর দেখতে, এমন চোখের ভঙ্গি ওর—এ এতদিন তো ভাবিনি ?

আসল কথা, কোথা হইতে বিপিন এতদিন শান্তির রূপ দেখিবে? আজ ছাড়া পাইয়া মুক্ত, স্বাধীন অবস্থায় শান্তির নারীত্বের যে দিক ফুটিয়াছে তাহাই তাহাকে সুন্দরী করিয়া তুলিয়াছে। এ শান্তি এতদিন ছিল না। কাল হইতে আবার হয়তো থাকিবেও না। শান্তির মধ্যে যে নায়িকা এত কাল ছিল ঘন ঘুমে অচেতন, আজ সে জাগিয়াছে। অপরূপ তার রূপ, অদ্ভুত তার ঐশ্বর্য্য। বিপিন ইহা ঠিক বুঝিল না।

সে ভাবিল, আজ তাহার সহিত একা বাহির হইয়া শান্তি নিজের যে রূপ দেখাইতেছে—তাহা এতদিন ইচ্ছা করিয়াই ঢাকিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। এটুকু অভিজ্ঞতা বিপিনের বহুদিন হইয়াছে যে, মেয়েরা সকলকে নিজের রূপ দেখায় না—যখন যাহার কাছে ইচ্ছা করিয়া ধরা দেয়—সে-ই কেবল দেখিতে পায়।

বিপিন কিছু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

শান্তিকে একা লইয়া আর কোনোদিন সে বাহির হইবে না। শান্তি তাহাকে জালে জড়াইতে চায়।

কিন্তু বিপিন আর নিজেকে কোন বন্ধনের মধ্যে ফেলিতে চায় না। মনের দিক হইতে স্বাধীন না থাকিলে সে নিজের কাজে উন্নতি করিতে পারিবে না। এই তো, কাল আর্চার সাহেবকে বলিয়া আসিয়াছে, হাসপাতালে একটি শক্ত অস্ত্রোপচার করা হইবে একটি রোগীর, বিপিন কাল দেখিতে যাইবে। তবুও যতটুকু শেখা যায়।

শান্তিকে লইয়া খানিক এদিক ওদিক ঘুরিয়া বলিল,—চল এবার বাসায় যাই—

—আর একটুখানি থাকুন না? বেশ লাগচে।

একখানা ট্রেন কলিকাতার দিক হইতে আসিয়া দাঁড়াইল এবং কিছুক্ষণ পরে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। বহু যাত্রী উঠিল, বহু যাত্রী নামিল।

শান্তি এসব অবাক চোখে চাহিয়া দেখিতেছিল। সে এসব ভাল করিয়া কখনো দেখে নাই, দু-তিন বার সে রেলে চড়িয়া এখান ওখান গিয়াছে—একবার গিয়াছিল শিমুরালি গঙ্গাস্নানের যোগে মা-বাবার সঙ্গে, তখন তাহার বয়স মোটে এগার বছর, আর একবার স্বামীর সঙ্গে পিস্‌তুতো ননদের ছেলের বিবাহে এই লাইনে গিয়াছিল শ্যামনগর মূলাজোড়। সেও আজ দু-তিন বৎসর হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এমন করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে বেড়াইয়া কখনও সে এত বড় ইষ্টিশানের কাণ্ডকারখানা দেখে নাই।

বিপিনের নিজেরও বেশ লাগিতেছিল। কোথায় পড়িয়া থাকে বারো মাস, কোথা হইতে এ সব দেখিবে? রাণাঘাটের মত শহর বাজার জায়গায় থাকিতে পাইলে সামান্য টাকা রোজগার হইলেও সুখ। পাঁচ জনের সহিত মিশিয়া পাঁচটা জিনিস দেখিয়া সুখ।

সে কথা শান্তিকে সে বলিল।

শান্তি বলিল,—সত্যি। আচ্ছা, আমরা কোথায় পড়ে থাকি ডাক্তারবাবু, গরুর মত কিংবা মোষের মত দিন কাটাই। কি বা দেখলাম জীবনে, আর কি বা—

—সত্যি, কি দেখতে পাই?

—শুনতেই বা কি? এই যে ধরুন আজ টকি দেখলাম, এ কেউ দেখেছে আমাদের গাঁয়ে কি আমাদের শ্বশুরবাড়ীর গাঁয়ে? আহা, ও বোধ হয় দেখেনি, ও কাল দেখুক এসে।

—কে, গোপাল? গোপাল কখনো টকি দেখেনি?

—কোত্থেকে দেখবে! আপনিও যেমন! ওরা কেউ দেখেনি। কাল পাঠিয়ে দেবো বিকেলে।

—আমিও সত্যি বলচি শান্তি—এই প্রথম দেখলাম টকি। বায়োস্কোপ দেখেছি অনেক দিন আগে—সে তখনকার আমলে! বাবার পয়সা তখনও হাতে ছিল, একবার কলকাতায় গিয়ে বায়োস্কোপ দেখি। তখন টকি হয় নি। তারপর বহুকাল হাতে পয়সা ছিল না, নানা গোলমাল গেল—

বিপিন নিজের জীবনের কথা এত ঘনিষ্ঠ ভাবে কখনও শান্তির কাছে বলে নাই। শান্তির

বোধ হয় খুব ভাল লাগিতেছিল, সে আগ্রহের সহিত শুনিতেছিল এ সব কথা।

খানিকক্ষণ দুজনে চুপচাপ। মিনিট পাঁচ ছয় কাটিয়া গেল।

বিপিন হঠাৎ বলিল,—কি কথা মনে হচ্ছে জানো শান্তি?

শান্তি যেন সলজ্জ আগ্রহের সহিত বলিল,—কি?

—সেই মতি বাগ্দিনীর কথা।

শান্তির মুখে নিরাশা ও বিস্ময় একই সঙ্গে ফুটিল। অবাক হইয়া বলিল,—কেন, তার কথা কেন?

বিপিন ভাবিল, যদি মানী আজ থাকিত, এ প্রশ্ন করিত না। মনের খেলা বুঝিতে তার মত মেয়ে বিপিন আজও কোথাও দেখে নাই।

তবুও বলিল,—তুমি দেখনি শান্তি, কি করে সে মরেচে, সেই শীতের রাত, গায়ে লেপ কাঁথা নেই, খড় বিচুলি আর ছেঁড়া কাঁথার বিছানা। অথচ কত অল্প বয়সে···আমি এখানে দাঁড়িয়ে চোখ বুজলে সেই জেয়ালা-বল্লভপুরের বিল, সেই চাঁদের আলো, বিলের ধারে চিতা, চিতার এদিকে আমি, ওদিকে বিশ্বেশ্বর, এসব চোখের সামনে দেখতে পাই—

কিন্তু শান্তি বুঝিল। শান্তি যে উত্তর দিল, বিপিন তাহা আশা করে নাই। বলিল—ডাক্তারবাবু, সে জায়গাটা আমায় একবার দেখিয়ে আনবেন তো? সেদিন আপনার মুখে ওর সব কথা শুনে পর্য্যন্ত আমিও ভুলতে পারিনি। হোক নীচু জাত, ওই একটা জিনিসে বড্ড উঁচু হয়ে গেছে। চলুন, ওই বেঞ্চিখানায় বসি একটু।

—আবার বসবে কেন? রাত হোল, বাসায় ফিরি।

—আমার পা ধরে গিয়েচে। ওখানে কি বিক্রী হচ্চে? চা? আর একটু চা খান—

—আমি আর নয়। তোমার জন্যে আনবো।

—তবে পান কিনে আসুন, আমার জন্যে আমি বলিনি। আপনি চা ভালবাসেন, তাই বলছিলাম।

পানের দোকান নিকটে নাই, কিছু দূরে প্ল্যাটফর্ম্মের ওদিকে। শান্তিকে বেঞ্চে বসাইয়া বিপিন পান আনিতে গিয়া হঠাৎ এক জায়গায় দাঁড়াইয়া গেল। আপ্ প্ল্যাটফর্ম্ম হইতে কিছু সরিয়া ওভারব্রিজের কাছে একটি মেয়ে তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া একটা ট্রাঙ্কের উপর বসিয়া আছে তাহার আশেপাশে আরও দু-একটা ছোটখাট সুটকেস্, বিছানা, আরও কি কি। এইমাত্র যে ট্রেনখানা গেল, সেই ট্রেন হইতেই নামিয়া থাকিবে, বোধ হয় সঙ্গের লোক বাহিরে গাড়ী ঠিক করিতে গিয়াছে, মেয়েটি জিনিস আগুলিয়া বসিয়া আছে। মেয়েটি অবিকল মানীর মত দেখিতে পিছন হইতে। সেই ভঙ্গি, সেই সব।···কতকাল কাটিয়া গিয়াছে, এখনও তাহার মত অন্য মেয়ে দেখিলেও তাহারই কথা মনে পড়ে।···

এই সময় মেয়েটি একবার পিছনের দিকে চাহিল।

বিপিন চমকিয়া উঠিল।

পরম বিস্ময়ে ও কৌতূহলে সে স্থান কাল পাত্র সব কিছু ভুলিয়া গেল ওভারব্রিজের তলায়। তাহার বুকের মধ্যে কে যে হাতুড়ি পিটিতেছে!

৪

বিপিন নিজের চক্ষুকে যেন বিশ্বাস করিতে পারিল না, কারণ যে মেয়েটি পিছন ফিরিয়া চাহিয়াছিল, সে—মানী!

কয়েক মুহূর্তের জন্ত বিপিনের চলিবার শক্তি যেন রহিত হইল। মানী এদিকে চাহিয়া আছে বটে, কিন্তু তাহার দিকে নয়—তাহাকে সে দেখিতে পায় নাই। বিপিন অগ্রসর হইয়া মানীর সামনে গিয়া বলিল—এই যে মানী! তুমি এখানে?

মানী চমকিয়া উঠিয়া অন্ত দিক হইতে মুহূর্তে দৃষ্টি ফিরাইয়া তাহার দিকে চাহিল। তাহার মুখে বিস্ময়— গভীর, অবিমিশ্র বিস্ময়!

বিপিন হাসিয়া বলিল—চিনতে পারচ না? আমি

মানীর মুখ হইতে বিস্ময়ের ভাব তখনও কাটে নাই। পরক্ষণেই সে ট্রাঙ্কের উপর হইতে উঠিয়া হাসিমুখে বিপিনের দিকে আগাইয়া আসিয়া বলিল—বিপিনদা! তুমি কোথা থেকে?

বিপিন মানীকে 'তুই' বলিতে পারিল না, অনেক দিন পরে দেখা, কেমন সঙ্কোচ বোধ হইল। বলিল—আমি? আমি রাণাঘাটে এসেচি কাজে। বলচি। কিন্তু তুমি এমন সময় এখানে?

মানী চোখ নামাইয়া নীচু দিকে চাহিয়া ধরা গলায় বলিল—তুমি কি করেই বা জানবে। বাবা মারা গিয়েচেন—কাল চতুর্থীর শ্রাদ্ধ। তাই পলাশপুর যাচ্চি আজ। এই ট্রেনে নামলাম।

বিপিন বিস্ময়ের স্বরে বলিল—অনাদিবাবু মারা গিয়েচেন? কবে? কি হয়েছিল?

—কি হয়েছিল জানিনে। পরশু টেলিগ্রাম করেচে এখানকার নায়েব হরিবাবু। তাই আজ আমার দেওরকে সঙ্গে নিয়ে আসচি, উনি আসতে পারলেন না—কেস আছে হাতে। বোধ হয় কাজের দিন আসবেন। দেওর গাড়ী ডাকতে গিয়েচে—তাই বসে আছি।

বিপিন দুই চক্ষু ভরিয়া যেন মানীকে দেখিতেছিল। এখনও যেন তাহার বিশ্বাস হইতেছিল না যে, এই সেই মানী। সেই রকমই দেখিতে এখনও। একটুকু বদলায় নাই।

—বিপিনদা, ভাল আছ? কোথায় আছ, কি করচ এখন?

এখন যে আমি ডাক্তার, নাম-করা পাড়াগাঁয়ের ডাক্তার। রুগী নিয়ে রাণাঘাটের হাসপাতালে এসেচি, রুগীর বাসাতেই আছি। আমাদের দেশের ওই দিকে সোনাতনপুর বলে একটা গাঁ, সেখানেই থাকি। মনে আছে মানী, ডাক্তারি করার পরামর্শ তুমিই দিয়েছিলে প্রথম। তাই আজ দুটো ভাত করে খাচ্চি।

—সত্যি, বিপিনদা! সত্যি বলচো এসব কথা?

—সাক্ষী হাজির করতে রাজি আছি, মানী। বিশ্বাস করো আমার কথা।

—ভারী আনন্দ হোল শুনে। কিন্তু বিপিনদা, তোমার সঙ্গে যে এক রাশ কথা রয়েছে আমার। একটি রাশ কথা।

বিপিন ঠিকমত কথাবার্ত্তা বলিতে পারিতেছিল না। আজ কি সুন্দর দিনটা, কার মুখ দেখিয়া যে উঠিয়াছিল আজ! এই রাণাঘাট স্টেশনে জীবনের এমন একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা—মানীর সঙ্গে দেখা—

সে শুধু বলিল—আমারও এক রাশ কথা আছে, মানী।

মানী বলিল—আমার একটি কথা রাখবে বিপিনদা, পলাশপুরে এসো। বাবার কাজের দিন পড়েচে সামনের বুধবার, তুমি আর দুদিন আগে এসো। তোমার আসা তো উচিতও, এসময় তোমায় দেখলে মাও যথেষ্ট ভরসা পাবেন।

—যাওয়া আমার খুব উচিতও। বাবার আমলের মনিব, আমার একটা কর্ত্তব্য তো আছে; কিন্তু একটা কথা হচ্চে—

মানী ছেলেমানুষের মত মিনতি ও আবদারের সুরে বলিল—ও সব কিন্তু-টিন্তু শুনবো না …আসতেই হবে, তোমার পায়ে পড়ি, এসো বিপিনদা—আসবে না?

এই সময় শান্তি আসিয়া সলজ্জ ভাবে অদূরে দাঁড়াইল।

মানী বলিল—ও কে বিপিনদা?

বিপিন অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। মানী জানে সে কি রকম চরিত্রের লোক ছিল পূর্বে, হয়তো ভাবিতে পারে পয়সা হাতে পাইয়া বিপিনদা আবার আগের মত—যাহাই হোক, শান্তি কেন এ সময় এখানে আসিল। আর কিছুক্ষণ বেঞ্চিতে বসিলে কি হইত তাহার!

বলিল—ও গিয়ে আমাদের গাঁয়েরই—মানে ঠিক আমাদের গাঁয়ের নয়, আমি যেখানে ডাক্তারি করি সে গাঁয়েরই—ওর বাবা আমার রুগী।

মানী বলিল—ডাকো না এখানে! বেশ মেয়েটি।

বিপিন শান্তিকে ডাকিয়া মানীর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিল। মানী তাহার হাত ধরিয়া ট্রাঙ্কের উপর বসাইয়া বলিল—বসো না ভাই এখানে, তোমার বাবার কি অসুখ?

—চোখের অসুখ, তাই ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে করে আমরা রাণাঘাটের সায়েব ডাক্তারের কাছে দেখাতে এসেচি পরশু। আপনি বুঝি ডাক্তারবাবুর গাঁয়ের লোক?

—না ভাই, আমার বাপের বাড়ী পলাশপুর, এখান থেকে চার ক্রোশ—

এই সময় মানীর দেওর আসিয়া বলিল—বৌদি, গাড়ী এই রাত্তির বেলা যেতে চায় না—অনেক কষ্টে একখানা ঠিক করেচি। চলুন উঠুন।

মানী দেওরের সহিত বিপিনের পরিচয় করাইয়া দিল। মানীর দেওর বেশ ছেলেটি, কোন্ কলেজে বি. এ. পড়ে—এইটুকু মাত্র বিপিন শুনিল, তাহার মন তখন সে দিকে ছিল না।

মানী গাড়ীতে উঠিবার সময় বার বার বলিল—কবে আসচো পলাশপুরে বিপিনদা? কালই এসো।

—এরা এখানে ছদিন থাকবেন তো? তুমি সেই ফাঁকে ঘুরে এসো আমাদের ওখান। আসাই চাই; মনে থাকে যেন।

বাড়ী ফিরিবার পথে শান্তি যেন কেমন একটু বিমনা। সে জিজ্ঞাসা করিল—উনি কে ডাক্তারবাবু? আপনার সঙ্গে কি করে আলাপ?

বিপিন বলিল—আমি আগে যে জমিদার বাড়ী কাজ করতাম, সেই জমিদারবাবুর মেয়ে। আমার বাবাও ওখানে কাজ করতেন কিনা, ছেলেবেলায় ওদের বাড়ী যেতাম—ওর সঙ্গে একসঙ্গে খেলা করেছি—অনেক দিনের জানাশুনো।

শান্তি বলিল—বেশ লোক কিন্তু। অত বড় মানুষের মেয়ে, মনে কোনো ঠ্যাকার নেই। দেখতেও ভারি চমৎকার।

রাত্রে সেদিন বিপিনের ঘুম হইল না। মনের মধ্যে কি এক প্রকারের উত্তেজনা, কি যে আনন্দ, তাহা প্রকাশ করিয়া বলা যায় না—যত ঘুমাইবার চেষ্টা করে—বিছানা যেন গরম আগুন, মানীর সহিত দেখা হইয়াছে—আজ মানীর সহিত দেখা হইয়াছে—মানী তাহাকে পলাশপুর যাইতে বার বার অনুরোধ করিয়াছে—অনেকবার করিয়া বলিয়াছে—সেই মানী। এসব জিনিসও জীবনে সম্ভব হয়?

শুধু মানীর অনুরোধেই বা কেন—অনাদিবাবু তাহার বাবার আমলের মনিব। তাঁহার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া তাহার সেখানে একবার যাওয়াটা লৌকিক এবং সামাজিক উভয় দিক দিয়াই একটা কর্ত্তব্য বই কি।

৫

সকালে উঠিয়া সে শান্তির শ্বশুরকে লইয়া যথারীতি হাসপাতালে গেল। সেখান হইতে ফিরিয়া শান্তিকে বলিল—শান্তি, ভাত চড়িয়ে দাও তাড়াতাড়ি, আমি আজই পলাশপুর যাবো।

শান্তি নিজে ভাত রাঁধিয়া বিপিনকে দিত না, তবে হাঁড়ি চড়াইয়া দিত, বিপিন নামাইয়া লইত মাত্র। তরকারি রাঁধিবার সময়ে নিজে রান্না করিতে করিতে ছুটিয়া আসিয়া দেখাইয়া দিত কি ভাবে কি রাঁধিতে হইবে।

শান্তি মনমরাভাবে বলিল—আজই?

—হ্যাঁ, আজই যাই। বলে গেল কি না কাল—যাওয়া উচিত আজ। বাবার অন্নদাতা মনিব, বুঝলে না?

– আমাকে নিয়ে চলুন না সেখানে?

বিপিন অবাক হইয়া গেল। শান্তি বলে কি! সে কোথায় যাইবে?

শাস্তি আবার বলিল—যাবেন নিয়ে? চলুন না ওদের বাড়ীঘর দেখে আসি—কখনো তো কিছু দেখিনি—থাকি পাড়াগাঁয়ে পড়ে।

তা হয় না শান্তি, কে কি মনে করবে, বুঝলে না? আর তুমি চলে গেলে তোমার শ্বশুর কি করবেন?

—একদিনের জন্যে ও চালিয়ে নিতে পারবে এখন। ও সব কাজে মজবুত, আপনার মত অকেজো নয় তো কেউ!

—তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু কে কি ভাবতে পারে—গেলে গোপালকেও নিয়ে যেতে হয়। তা তো সম্ভব হচ্ছে না, বুঝলে না?

শাস্তি নিরুত্তর রহিল—কিন্তু বোঝা গেল সে মনঃক্ষুন্ন হইয়াছে।

বেলা তিনটার সময় শাস্তির স্বামী ও শ্বশুরকে বলিয়া কহিয়া দুদিনের ছুটি লইয়া সে পলাশপুর রওনা হইল। যাইবার সময় শাস্তি পান সাজিয়া একখানা ভিজা নেকড়ায় জড়াইয়া হাতে দিয়া বলিল—বড্ড রোদ্দুর, জলতেষ্টা পেলে মাঠের মধ্যে পান খাবেন। পরশু ঠিক চলে আসবেন কিন্তু। বাবা কখন কেমন থাকেন, আপনি না এলে মহা ভাবনায় পড়ে যাবো আমরা।

স্টেশনের পাশে সেগুন বাগান ছাড়াইয়া সোজা মেটে রাস্তা উত্তরমুখে মাঠের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। এখনও রৌদ্রের খুব তেজ, যদিও বেলা চারটা বাজিতে চলিল। এই পথ বাহিয়া আজ পাঁচ বছর পূর্ব্বে বিপিন ধোপাখালির কাছারি বা মানীদের বাড়ী হইতে কতবার কাগজপত্র লইয়া রাণাঘাটে উকীলের বাড়ী মোকর্দ্দমা করিতে আসিয়াছে, এই পথের প্রতিটি বৃক্ষলতা তাহার সুপরিচিত—শুধু সুপরিচিত নয়, সেই সময়কার কত স্মৃতি, মানীর কত হাসির ভঙ্গি, কত আদরের কথা ইহাদের সঙ্গে জড়ানো। কত কত! সে সব কথা আজ ভাবিয়া লাভ কি?

বেলা পাঁচটার সময় কলাধরপুরের বিশ্বাসদের বাড়ীর সামনে আসিতেই পথে হঠাৎ বিশ্বাসের বড় ছেলে মোহিতের সঙ্গে দেখা। মোহিত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—একি, নায়েব মশায় যে! এতদিন কোথায় ছিলেন? চলেচেন কোথায়? পলাশপুরেই? ও, তা আবার কি ওদের স্টেটে—অনাদিবাবু তো মারা গিয়েচেন—

বিপিন সংক্ষেপে বলিল, স্টেটে চাকুরী করিবার জন্য নয়, অনাদিবাবুর শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়াই সে পলাশপুর যাইতেছে—বর্ত্তমানে সে ডাক্তারি করে। মোহিত ছাড়ে না, বেলা পড়িয়াছে, একটু কিছু খাইয়া তবে যাইতে হইবে, পূর্ব্বে রাণাঘাট হইতে যাতায়াতের পথে তাহাদের বাড়ীতে বিপিনের কত পায়ের ধূলা পড়িত -ইত্যাদি।

অগত্যা কিছুক্ষণ বসিতে হইল।

কতকাল পরে আবার পলাশপুরের বাড়ীতে মানীর সঙ্গে দেখা হইবে! সেই বাহিরের ঘর, সেই দালান, সেই দালানের জানালাটি, যেখানটিতে মানী তাহার সহিত কথা বলিবার জন্য দাঁড়াইয়া থাকিত!

সন্ধ্যার পর সে অনাদিবাবুদের বাড়ীতে পৌঁছিয়া গেল! প্রথমেই বীরু হাড়ির সঙ্গে দেখা—সেই বীরু হাড়ি পাইক, যে ইহাদের স্টেটে এক হইয়াও বহু এবং বহু হইয়াও এক। তাহাকে দেখিয়া বীরু ছুটিয়া আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিল—নায়েববাবু যে! কনে থেকে আলেন এখন?

—ভাল আছিস্ রে বীরু?

—আপনার ছিচরণ আশীর্ব্বাদে—তা ঝান, মা-ঠাকরোণের সঙ্গে একবার দেখাডা করে আসুন। বিপিন বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া প্রথমে অনাদিবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করিল। তিনি বিপিনকে দেখিয়া চোখের জল ফেলিয়া অনেক পুরানো কথা পাড়িলেন। তাহার বাবা বিনোদবাবুর সময় স্টেটের অবস্থা কি ছিল, আর এখন কি দাঁড়াইয়াছে, আয় বড়ই কমিয়া গিয়াছে, বর্ত্তমান নায়েবটিও বিশেষ কাজের লোক নয়, তাহার উপর কর্ত্তা মারা গেলেন। এখন যে জমিদারী কে দেখাশুনা করিবে তাহা ভাবিয়াই তিনি নাকি কাঠ হইয়া যাইতেছেন। পরিশেষে বলিলেন—তা তুমি এখন কি করছ বাবা?

বিপিন এ প্রশ্নের উত্তর দিল। সে চারিদিকে চাহিতেছিল, সেই অতি সুপরিচিত ঘরদোর, আগেকার দিনের কত কথা স্বপ্নের মত মনে হয়—আবার সেই বাড়ীতে আসিয়া সে দাঁড়াইয়াছে—ওই সে জানালাটি—এসব যেন স্বপ্ন—সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা এখনও যেন শক্ত।

অনাদিবাবুর স্ত্রী বলিলেন—তা বাবা, কর্ত্তা নেই, আমি মেয়েমানুষ, আমার হাত পা আসচে না। তুমি বাড়ীর ছেলে, দেখ শোনো, যাতে যা হয় ব্যবস্থা করো। তোমাকে আর কি বলবো?

—মা, ওপরের চাবিটা একবার দাও তো—সিন্দুক খুলে রূপোর বাটিগুলো—

বলিতে বলিতে মানী বারান্দা হইতে বাহিরে আসিয়া রোয়াকে পা দিতেই বিপিনকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। বিস্মিত মুখে বলিল—ওমা, বিপিনদা, কখন এলে? এখন? কিছু তো জানিনে—তা একবার আমাকে খোঁজ করে খবর পাঠাতে হয়—এসো, এসো, এসে বসো দালানে।

মানীর মা বলিলেন—হ্যাঁ, বসো বাবা। মানী সেদিন বলছিল রাণাঘাট ইষ্টিশানে তোমার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়েছিল, তোমাকে আসতে বলেচে—আমি বল্লুম, তা একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে এলি নে কেন? কতদিন দেখিনি—

মানী বলিল—বোসো বিপিনদা, আমি একটু চা করে আনি—হেঁটে এলে এতটা পথ। কিছুক্ষণ পরে চা ও খাবার লইয়া মানী ফিরিল। বলিল—বিপিনদা, তোমায় এ বাড়ীতে আবার দেখে মনে হচ্ছে, তুমি কোথাও যাওনি, আমাদের এখানেই যেন কাজ কর। পুরোনো দিন যেন ফিরে এসেচে—না?

—সত্যি। বোস্ না এখানে মানী? তোর দেওর কোথায়?

মানী হাসিয়া বলিল—তবুও ভালো, পুরোনো দিনের মত ডাকচো। রাণাঘাট ইষ্টিশানে

যে 'আপনি' 'আজ্ঞে' সুরু করেছিলে! আমার দেওরকে কলকাতায় পাঠিয়েচি চতুর্থীর শ্রাদ্ধের জিনিসপত্র কিনতে। এখানে না এসে এষ্টিমেট ঠিক না করে তো আগে থেকে জিনিসপত্র কিনে আনতে পারিনে।

—সে কবে?

—কাল রাত পোয়ালেই। ভালোই হয়েচে তুমি এসেচ। আমার কাজের দিন তোমাকে পেয়ে আমার সাহস হচ্চে। দেখার কেউ নেই—তুমি দেখে শুনে যাতে ভালভাবে সব মেটে, নিন্দে না হয় তার ব্যবস্থা করো।

—তুই এখানে এসেছিলি আরও আমি চলে গেলে?

—হুঁ—কতবার এসেচি গিয়েচি—

—আমার কথা মনে হোত?

—বাপরে! প্রথম যখন আসি তখন টিঁকতে পারিনে বাড়ীতে। সেই যে আমি রাগ করে ওপরে গেলাম, তার পরেই সকালে উঠে দেখি তুমি রাণাঘাটে চলে গিয়েচ—আর কোনদিন দেখা হয়নি তারপর—সেই কথাই কেবল মনে পড়তো।

—আচ্ছা, কলকাতায় থাকলে আমার কথা মনে পড়ে?

—পড়ে না যে তা নয়। কিন্তু সত্যি বলতে গেলে কলকাতায় ভুলে থাকি পাঁচ কাজ নিয়ে। সেখানে তুমি কোনোদিন যাওনি, সেখানকার বাড়ীঘরের সঙ্গে যাদের যোগ বেশী, তাদের কথাই মনে হয়। কিন্তু এখানে এলে—বাপরে! আচ্ছা, চা খেয়ে একটু বাইরে গিয়ে দেখাশুনো কর, আমি এরপর তোমার সঙ্গে কথা বলবো আবার। এখন বড় ব্যস্ত—

রাত্রে বিপিন পুরানো দিনের মত রান্নাঘরে বসিয়া খাইল, পরিবেশন করিল মানী নিজে। আহারান্তে বাহির হইয়া আসিবার সময় বিপিন দেখিল, মানী কখন আসিয়া সেই জানালাটিতে দাঁড়াইয়াছে। হাসিমুখে বলিল—ও বিপিনদা!

সাধে কি বিপিনের মনে হয়, মানীর সঙ্গে তাহার পরিচিতা আর কোনো মেয়ের তুলনা হয় না; আর কোন্ মেয়ে তাহার মন বুঝিয়া এ রকম করিত? মানীর সঙ্গে ইহা লইয়া কোনো কথাই তো হয় নাই এ পর্য্যন্ত। অথচ সে কি করিয়া বুঝিল, বিপিনের মন কি চায়!

বিপিন হাসিয়া জবাব দিল- ও মানী!

—মনে পড়ে?

—সব পড়ে।

—ঠিক?

—নিশ্চয়! নইলে কি করে বুঝলুম। বাবা, তুমি অন্তর্য্যামী মেয়েমানুষ।

মানী জিব বাহির করিয়া দুই চোখ বুজিয়া মুখ ভ্যাঙ্গাইল।

—সত্যি মানী, তোর তুলনা নেই!

—সত্যি?

—নির্ভুল সত্যি।

– কথনো ভেবেছিলে বিপিনদা, এমন হবে আমার ?

—স্বপ্নেও না ! কিন্তু মানী, তোর সঙ্গে আমার কথা আছে, কথন হবে ?

—বাইরের ঘরে গিয়ে বসো। আমি পান নিয়ে যাচ্ছি।

একটু পরেই মানী বৈঠকখানায় ঢুকিয়া চৌকির উপর পানের ডিবাটি রাখিয়া কবাট ধরিয়া দাঁড়াইল। বলিল—তুমি এখন কি করচো, কোথায় আছ ভাল করে বল। সেদিন কিছুই শুনিনি। সেদিন কি আমার ওসব শোনবার মন ছিল বিপিনদা ? কতকাল পরে দেখা বল তো ?

বিপিন তাহার ডাক্তারি জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলিয়া গেল। সোনাতনপুরের দত্তবাড়ীর কথা, শান্তির কথা, মনোরমাকে সাপে কামড়ানোর কথা।

রাত হইয়াছে। ইতিমধ্যে দুবার মানী বাড়ীর মধ্যে গেল মায়ের ডাকে, আবার ফিরিল। সব কথা শুনিয়া বলিল—বিপিনদা, তুমি আমার চিঠি একখানা পেয়েছিলে একবার ?

—নিশ্চয়।

—ওই সময়টা আমার বড্ড খারাপ হয়েছিল পুরানো কথা ভেবে। তাই চিঠিখানা লিখেছিলুম। আমার কথা ভাবতে ? সত্যি বল তো—

—সর্ব্বদাই ! বেশী করে একদিন মনে পড়েছিল, সে দিনটির কথা বলি।

তারপর জেয়ালা-বল্লভপুরের বিলের ধারের সেই রাত্রির ব্যাপার বিপিন বলিল। মতি বাগ্‌দিনীর সর্ব্বত্যাগী প্রেমের কথা, তাহার অতীব দুঃখজনক মৃত্যুর কথা।

সব শুনিয়া মানী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—অদ্ভুত !

—তোকে বলবো বলে সেইদিনই ভেবেছি। তোর কথাই মনে হয়েছিল সকলের আগে সেদিন।

—আচ্ছা, কেন এমন হয় বিপিনদা ? দুঃখের সময় কেন এমন করে মনে পড়ে ? সত্যি বলচি, তবে শোনো। আমার খোকা যখন মারা গেল, এক বছর বয়েস হয়েছিল, আজ বাঁচলে তিন বছরেরটি হোত, রাত তিনটের সময় মারা গেল ভবানীপুরের বাড়ীতে। একশো কান্নাকাটির মধ্যে তোমার কথা মনে পড়লো কেন আমার ?

—এ রোগের ওষুধ নেই মানী। কেন, কি বলবো !

—অথচ ভেবে ছাখো, সে সময় কি তোমার কথা মনে পড়বার সময় ? তবে কেন মনে পড়লো ?

তারপর দুজনেই চুপচাপ। নীরবতার ভাষা আরও গভীর হয়, নীরবতার বাণী অনেক কথা বলে। কিছুক্ষণ পরে বিপিন বলিল—কাল সকালে আমি চলে যাবো মানী। ডাক্তার লোক, রুগী ফেলে এসেচি।

—বেশ। আমি বাধা দেবো না।

—তুই আমায় মানুষ করে দিয়েছিস মানী।

—শুনে সুখী হলুম।

—জানিস মানী, ওই যে তোর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি এখান থেকে চলে যাবার পরে, সেই দুঃখটা মনের মধ্যে বড্ড ছিল। আজ আর তা রইল না। সুতরাং চলে যাই।

—না, যেও না বিপিনদা। বাবার চতুর্থীর শ্রাদ্ধটা আমি করচি, থেকে যাও। একটু দেখাশুনা করতে হবে তোমাকে।

—তবে থাকি। তুই যা বলবি।

—তোমার সঙ্গে সেদিন যে বউটিকে দেখলুম, ও তোমার সঙ্গে বেড়ায় কেন?

—বেড়ায় না মানী। সিনেমা দেখতে এসেছিল সেদিন, শ্বশুর অন্ধ, তার কাছে কে থাকে, তাই ওর স্বামী ছিল।

—মেয়েমানুষের চোখ এড়ানো বড় কঠিন বিপিনদা, ও মেয়েটি তোমায় ভালবাসে।

—কে বললে?

—নইলে কক্ষনো তোমার সঙ্গে সিনেমা দেখতে আসতে চাইত না পাড়াগাঁয়ের বউ। তোমার বয়েসও বেশী নয় কিছু! আসতে পারতো না।

—ও!

—আমার কথা শোনো। তোমার স্বভাবচরিত্র ভাল না, ওর সঙ্গে আর মিশো না বেশী।

বিপিন হি হি করিয়া হাসিয়া বলিল—বেহ্মধম্মের লেকচার দিচ্চিস যে! পাদ্রি সাহেব!

মানীও হাসিয়া ফেলিল। পুনরায় গম্ভীর হইবার চেষ্টা করিয়া বলিল—না সত্যি বলচি, শোনো। ওকে কষ্ট দেবে কেন মিছিমিছি? ওর সঙ্গে মেলামেশা করো না। মেয়েমানুষ বড্ড কষ্ট পায়। মতি বাগ্‌দিনীর কথা ভাবো।

বিপিন বলিল—ধোপাখালিতে এক বুড়ী ছিল, সেও তোর সম্বন্ধে আমায় একথা বলেছিল।

—আমার সম্বন্ধে? কে বুড়ী? ওমা, সে কি! শুনিনি তো কক্ষনো?

বিপিন সংক্ষেপে কামিনীর কাহিনী বলিয়া গেল।

মানী নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—ঠিক বলেছিল বিপিনদা। এ কষ্ট সাধ করে কেউ যেন বরণ করে না! তবে কামিনী বুড়ী যখন বলেছিল, তখন আর উপায় ছিল কি?

—নাঃ।

—শান্তির সঙ্গে দেখাশুনো করবে না। সোনাতনপুর ওদের বাড়ী যদি ছাড়তে হয়, তাও করবে এজন্যে। বউদিদিকে নিয়ে যাও না? যেখানে থাকো সেখানে?

—বেশ। তুমি শান্তির বরের একটা চাকরী করে দাও না কলকাতায়? বড় ভাল ছেলেটি। শান্তির একটা উপায় করো অন্তত।

—চেষ্টা করবো। ওঁকে বলে দেখি—হয়ে যেতে পারে।

—জানিস মানী, শান্তির তোকে বড্ড ভাল লেগেছে। ও এখানে আসতে চাচ্ছিল।

—সে আমার জন্যে নয় বিপিনদা। সে তোমার জন্যে—তোমার সঙ্গ পাবে এই জন্যে। ওসব আর আমায় শেখাতে হবে না। আমি মনকে বোঝাচ্চি, তোমার সঙ্গে কাল শ্রাদ্ধের

কথাবার্ত্তা বলতে এসেছি। কিন্তু তাই কি এসেচি? এতক্ষণ বসে তোমার সঙ্গে বক্ বক্ করচি কি সেই জন্যে?

পরদিন সকাল হইতে কাজকর্ম্মের খুব ভিড়। জমিদারের বড় মেয়ে বড় মানুষের বউ, খুব জাঁক করিয়াই চতুর্থীর শ্রাদ্ধ হইবে। বিপিন খাটিতে লাগিয়া গেল সকাল হইতেই। আশেপাশের অনেকগুলি গ্রামের ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত। লোকজনের কোলাহলে বাড়ী সরগরম হইয়া উঠিল।

মানী একবার বলিল—আহা, শান্তিকে আনলে হোত বিপিনদা! নিজে মুখ ফুটে বলেছিলো, আনলে না কেন? সব তোমার দোষ।

—না এনেই অত মুখনাড়া শুনলাম, আনলে কি আর রক্ষে ছিল?

—কীর্ত্তনের দল আনতে রাণাঘাটে গাড়ী যাচ্চে, তুমি গিয়ে ওই গাড়ীতে তাকে নিয়ে আসবে?

—সে উচিত হয় না, মানী। অন্ধ শ্বশুর দু দিন পড়ে থাকবে কার কাছে? থাকগে ওসব।

ধোপাখালির অনেক প্রজা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া সকলেই খুব খুশি। নরহরি দাসও আসিয়াছিল। সে বিপিনকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—নায়েববাবু যে! অনেক দিনের পর আপনার সঙ্গে দ্যাখা। ভাল আছেন? আপনি চলে যাবার পর ধোপাখালি অনুপায় হয়ে গিয়েচে বাবু! সবাই আপনার কথা বলে।

বিপিন তাহার কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিল। বলিল—হ্যাঁরে, তোদের গাঁয়ে ডাক্তারি চলে? আমি আজকাল ডাক্তারি করি কিনা?

নরহরি দাস বলিল—আসুন, এখ্‌খুনি আসুন বাবু। ডাক্তারের যে কি কষ্ট, তা তো নিজের চোখে তুমি দেখেই এসেচ। আপনারে পেলি লোকে আর কোথাও যাবে না। ওষুধ খেয়েই মরবে।

সারাদিন বিপিন বাহিরের কাজকর্ম্মের ভিড়ে ব্যস্ত রহিল। মানীর সঙ্গে দেখাশুনা হইল না। অনেক রাত্রে যখন কীর্ত্তন বসিয়াছে, তখন মানী আসিয়া বলিল—বিপিনদা, খাবে এসো, রান্নাঘরে জায়গা করেচি।

রান্নাঘরের দাওয়ায় মানী নিজের হাতে তাহার পাতে লুচি তরকারি পরিবেশন করিতে করিতে বলিল—আমি জানি তুমি সারাদিন খাওনি, পেট ভরে খাও এখন।

বিপিন বিস্মিত হইয়া বলিল—তুই কি করে জানলি?

—আমি সব জানি।

—সাধে কি বলি, অন্তর্য্যামী মেয়ে?

—নাও, এখন ভাল করে খাও দিকি। বাজে কথা রাখো। দই আর ক্ষীর নিয়ে আসি—তুমি ক্ষীর ভালবাসতে খুব।

আরও ঘণ্টা দুই পরে নিমন্ত্রিতদের আহারের পর্ব্ব মিটিল। বাড়ী অনেক নিস্তব্ধ হইল।

বাহিরের উঠানে কীর্ত্তনসভা ভঙ্গ হইল।

বিপিন মানীকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া বলিল—মানী, কীর্ত্তনের দল গাড়ী করে রাণাঘাট যাচ্ছে, আমি ওই সঙ্গে চলে যাই।

—তাই যাবে! বেশ যাও। যা কিন্তু বলে দিয়েচি, মনে থাকবে?

—নিশ্চয়। তুই যা বলবি, তাই করবো।

—শান্তির সঙ্গে আর মিশবে না, ও ছেলেমানুষ—তার ওপর অজ পাড়াগাঁয়ের মেয়ে।

—মানী, সে কথা আমিও ভেবেছিলুম বহুদিন আগেই। তবে চালাবার লোক না পাওয়া গেলে আমাদের মত লোকে সব সময় ঠিক পথে চলে না। এবার থেকে সে ভুল আর হবে না। আমি ভাবছি, ধোপাখালিতে যদি ডাক্তারি করি তবে কেমন হয়?

—সত্যি ভেবেছ বিপিনদা? খুব ভাল হয়। তুমি ওখানে নায়েব ছিলে, সবাই চেনে, বেশ চলবে। ওদিকে ছেড়ে দিয়ে এদিকে এসো।

—তোর সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে মানী?

মানী হাসিয়া বলিল—আর জন্মে। এ জন্মে যাদের ওপর যা কর্ত্তব্য আছে, করে যাই বিপিনদা।

বিপিন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল- বেশ, ভুল হবে না?

মানী হাসিতে হাসিতে বলিল,—আবার ভুল? আমি নির্ব্বোধ, এ অপবাদ অন্ততঃ তুমি আমায় দিও না বিপিনদা। দাঁড়াও, প্রণামটা করি।

তারপর মানী গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া বলিল—আমার আর একটা কথা রেখো। যেখানেই থাকো, বৌদিদিকে নিয়ে এসো সেখানে। অমন করে কষ্ট দিও না সতীলক্ষ্মী মেয়েকে। যদি সাপের কামড়ে মারাই যেতেন, সে কষ্ট জীবনে কখনো দূর হোত ভেবেছ?

বিপিন বিদায় লইয়া গরুর গাড়ীতে উঠিতে যাইবে, মানী পিছন হইতে ডাকিল—শোন বিপিনদা!

—কি রে?

মানী কথা বলে না। বিপিন দেখিল, তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছে।

—মানী! ছিঃ, লক্ষ্মীটি—আসি।

মানী তখন কথা বলিল না। বিপিনও আধ-মিনিট চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল মানীর সামনে। তারপরে মানী চোখ মুছিয়া বলিল—আচ্ছা, এসো বিপিনদা!

গরুর গাড়ী ছাড়িল। অনেকখানি রাস্তা—মেঠো নির্জ্জন পথ, কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা চাঁদের জ্যোৎস্নায় মেটে পথের ধারের গ্রাম্য বাঁশবন, কচিৎ কোনো আমবাগান কিংবা বেগুন-পটলের ক্ষেত, আখের ক্ষেত, অস্পষ্ট ও অদ্ভুত দেখাইতেছে। বিপিনের মনে অন্য কোনো জগতের অস্তিত্ব নাই—কোথায় সে চলিয়াছে—এই আনন্দ ও বিষাদের আলোছায়া-ঘেরা পথে কত দূর-দূরান্তের উদ্দেশে তার যাত্রা যেন সীমাহীন লক্ষ্যহীন—সে চলায় বিজন পথে না আছে

শান্তি, না আছে মনোরমা। কেহ নাই, সেখানে সে একেবারে সম্পূর্ণ নিঃস্ব, সম্পূর্ণ একা। কিংবা যদি কেহ থাকে, মনের গহন গভীর গোপন তলায় যদি কেহ থাকে, ঘুমাইয়া থাকুক সে, গভীর সুষুপ্তির মধ্যে নিজেকে লুকাইয়া রাখুক সে।

৬

রাণাঘাটে যখন গাড়ী পৌছিল, তখন বেশ রোদ উঠিয়াছে।

শান্তি তাহাকে দেখিয়া বলিল—একি চেহারা হয়েচে আপনার ডাক্তারবাবু? রাত্তে ঘুম হয়নি বুঝি? আর হবেই বা কি করে গরুর গাড়ীতে। নেয়ে ফেলুন, আমি ঠাণ্ডা জল তুলে দিই।

দুপুরবেলা বিপিন চুপ করিয়া শুইয়া আছে, শান্তি ঘরে ঢুকিয়া বলিল—ওবেলা চলুন আর একবার টকি ছবি দেখে আসি—আর তো চলে যাচ্ছি দু-তিন দিনের মধ্যে। হয়তো আর দেখা হবে না।

—গোপাল ছবি দেখেছিল?

—উঃ দুদিন! আপনি যেদিন যান, আর যেদিন আসেন।

—চল যাই।

শান্তি খুশি হইয়া সকালে সকালে সাজিয়া-গুজিয়া তৈয়ারী হইল। বিপিন বেলা তিনটার সময় তাহাকে লইয়া বাহির হইল, কারণ বিপিনের ইচ্ছা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সে শান্তিকে বাসায় ফিরাইয়া আনিবে, নতুবা শান্তির শ্বশুরের খাওয়া-দাওয়ার বড় অসুবিধা হয়।

ছবি দেখিতে বসিয়া শান্তি অত্যন্ত খুশি। আজকার ছবিতে ভাল গান ছিল, সে ও ধরণের গান কখনো শোনে নাই—মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল।

ইন্টারভ্যালের সময়ে বলিল—চলুন বাইরে, চা খাবেন না?

তাহার ধারণা ছবিতে যাহারা আসে, তাহাদের চা খাইতেই হয় এবং চা খাওয়ার জন্য ছুটি দেওয়া হইয়াছে। শান্তি আবদারের সুরে বলিল—আমি কিন্তু পয়সা দেবো আজও।

বিপিন হাসিয়া বলিল—পয়সা ছড়াবার ইচ্ছে হয়েচে? বেশ ছড়াও—

শান্তি লজ্জিত হইল দেখিয়া বিপিন বলিল—না না, কিছু মনে কোরো না শান্তি। এমনি বল্লুম। আমি তোমাকে কিন্তু কোন একটা জিনিস খাওয়াবো—কি খাবে বল?

শান্তি বালিকার মত আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—ওই যে কাঁচের বোয়েমে রয়েচে ওকে কি বলে—কেক?…বেশ ওই কেক নিন তবে—আপনার জন্যেও নিন—

সিনেমার পরে শান্তি বলিল—চলুন, একটু ইস্টিশানে বেড়িয়ে যাই। আর তো দেখতে পাবো না ওসব—চলে যাচ্ছি পরশু।

ডাউন প্ল্যাটফর্মে একখানা বেঞ্চির উপরে নিজে বসিয়া বলিল—বসুন এখানে।

বিপিন বসিল।

—একটা সিগারেটের বাক্স কিনে আনুন, আমি পয়সা দিচ্চি।

—না, তুমি কেন দেবে ?

—আপনার পায়ে পড়ি—কটা আর পয়সা, দিই না কিনে !

সে এমন মিনতির সুরে বলিল যে, বিপিন তাহার অনুরোধ ঠেলিতে পারিল না। সিগারেট টানিতে টানিতে বিপিন শান্তির নানা প্রশ্নের জবাব দিতে লাগিল—এ লাইন কোথায় গিয়াছে, ও লাইন কোথায় গিয়াছে, সিগ্‌ন্যালে লাল আলো সবুজ আলো কেন, কি করিয়া আলো বদলায় ইত্যাদি। আধঘণ্টা বসিবার পরে বিপিন বলিল—চল আমরা যাই—দেরি হয়ে গেল।

—বসুন না আর একটু—আচ্ছা, আপনাকে একটা কথা জিগ্যেস্ করি—

—কি ?

—আমার জন্যে আপনার মন কেমন করে একটুও ?

বিপিন বড় মুশকিলে পড়িল। এ কথার জবাব কি ধরণের দেওয়া যায়। শান্তি আরও কয়েকবার এভাবের প্রশ্ন করিয়াছে ইতিপূর্ব্বে।

সে ইতস্তত করিয়া বলিল—তা করে বই কি—বিদেশে থাকি, তোমার মত যত্ন—

—ওসব বাজে কথা। ঠিক কথার জবাব দিন তো দিন—নইলে থাক।

—এ কথা কেন শান্তি ?

—আছে দরকার।

—করে বই কি।

—ঠিক বলছেন ?

—ঠিক।

শান্তি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—চলুন, যাই। রাত হয়ে যাচ্ছে।

বাসায় ফিরিয়া আহারাদির পরে অনেক রাত্রে বিপিন শুইল।

মাঝরাতে একবার কিসের শব্দে তাহার ঘুম ভাঙিল—বাহিরের রোয়াকে কিসের শব্দ হইতেছে। বিপিন জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল, শান্তি রোয়াকের পৈঠায় বাঁশের আলনার খুঁটি হেলান দিয়া একা বসিয়া আছে; এবং শুধু বসিয়া আছে নয়, বিপিনের মনে হইল, সে হাপুস্‌নয়নে কাঁদিতেছে—কারণ রোয়াকের পৈঠা বিপিনের ঘরের জানালার ঠিক কোণাকুণি।

বিপিন নিঃশব্দে জানালা হইতে সরিয়া গেল। শান্তি কেন কাঁদে এত রাত্রে ? তাহাকে কি দোর খুলিয়া ডাকিয়া শান্ত করিবে ? তাহাতে শান্তি লজ্জা পাইবে হয়তো। যে লুকাইয়া কাঁদিতে চায়, তাহাকে প্রকাশের লজ্জা দেওয়া কেন ?

বিপিনের আর ঘুম হইল না।

হয়তো ভোরের দিকে একটু তন্দ্রা আসিয়া থাকিবে, গোপালের ডাকে তাহার ঘুম

ভাঙিল। শান্তি চা লইয়া আসিল, সে সদ্য স্নান করিয়াছে, পিঠের উপর ভিজা চুলটি এলানো, মুখে চোখে রাত্রিজাগরণের কোনো চিহ্ন নাই। হাসিমুখে বলিল—উঃ, এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুম? কতক্ষণ থেকে থেকে শেষে ওকে বললুম ডেকে দিতে।

অদ্ভুত মেয়ে বটে শান্তি। বিপিনের মন দুঃখ, সহানুভূতি ও স্নেহে পূর্ণ হইয়া গেল। সে বুঝিয়া ফেলিয়াছে অর্দ্ধেক কথা।

শান্তিকে আর সে দেখা দিবে না। এইবারই শেষ।

মানী বুদ্ধিমতী মেয়ে, সে ঠিকই বলিয়াছিল।

ডাক্তারি চলুক না চলুক, সোনাতনপুরের নিকট হইতে তাহাকে চিরবিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। হয় ধোপাখালি, নয় যে কোন স্থানে—কিন্তু সোনাতনপুরে বা পিপ্‌লিপাড়ায় আর নয়। মানীর কথা সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিবে।

পরদিন দুপুরের পর সকলে দুইখানি গরুর গাড়ীতে করিয়া রাণাঘাট হইতে রওনা হইয়া গ্রামের দিকে ফিরিল। কাপাসপুরের মধ্য দিয়া পূর্ব্ব দিকে তাহাদের নিজেদের গ্রামের পথ বাহির হইয়া গিয়াছে—রাণাঘাট হইতে ক্রোশ চার পাঁচ দূরে। এই পর্য্যন্ত আসিয়া বিপিন বলিল—আপনারা যান তবে, আমি অনেকদিন বাড়ী যাই নি, একবার বাড়ী হয়ে যাব। সামান্য পথ, হেঁটে যাবো।

শান্তি বলিল—কেন ডাক্তারবাবু? আমাদের ওখানে আসুন আজ। তারপর না হয় কাল বাড়ী আসবেন?

বিপিন রাজি হইল না। বাড়ীর সংবাদ না পাইয়া মন খারাপ আছে, বাড়ী যাইতে হইবেই। বিপিন বুঝিল, শান্তি দুঃখিত হইল।

কিন্তু উপায় নাই, শান্তিকে বড় দুঃখ হইতে বাঁচাইবার জন্য এ দুঃখ তাহাকে দিতে হইবেই যে!

শান্তি গাড়ী হইতে নামিয়া বিপিনকে প্রণাম করিল, গোপালও করিল—উহাদের বংশের নিয়ম, ব্রাহ্মণের উপর যথেষ্ট ভক্তি চিরদিন।

একটা বড় পুষ্পিত শিমূলগাছতলায় গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে, শান্তি গাছের গুঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া আছে, গোপাল বৃদ্ধ বাপের হাত ধরিয়া নামাইয়া বিপিনের পরিত্যক্ত গাড়ীখানায় উঠাইতেছে—ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষত শান্তির সম্বন্ধে এই ছবিই বিপিনের স্মৃতিপটের বড় উজ্জ্বল, বড় স্পষ্ট, বড় করুণ ছবি। সেইজন্য ছবিটা অনেকদিন তাহার মনে ছিল।

অনুবর্ত্তন

বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ওয়েলেস্‌লি স্ট্রীটের আর পিটার লেনের মোড়ে ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুল-বাড়ীটা বেশ সরগরম হইয়া উঠিয়াছে। বেলা দশটা। ছাত্রের দল ইতিমধ্যে আসিতে শুরু করিয়াছে, বড়লোকের ছেলেরা মোটরে, মধ্যবিত্ত ও গরিব গৃহস্থের বাড়ীর ছেলেরা পদব্রজে। স্কুলের পুরানো চাকর মথুরাপ্রসাদ ছেঁড়া ও মলিন খাকির চাপকান পরিয়া তৈরী, চাপকানের হাতের কাছটাতে রাঙা সুতায় একটা ফুটবলের শিল্ডের মত নকশার মধ্যে ইংরেজী 'এম' ও 'আই' অক্ষর দুইটি জড়াপটি খাইয়া শোভা পাইতেছে; কারণ, স্কুলের নাম মর্ডান ইন্‌স্টিটিউশন, যদিও হেডমাস্টার ক্লার্কওয়েল সাহেবের ব্যক্তিগত চিঠির উপরে ছাপানো আছে "ক্লার্কওয়েল্‌'স মর্ডান ইন্‌স্টিটিউশন", আসলে সেটা ভুল; কারণ, স্কুলটি সাহেবের নিজের নয়, অনেক দিনের পুরানো স্কুল, কমিটির হাতে আছে, ক্লার্কওয়েল সাহেব আজ পনেরো বছর এখানকার বেতনভোগী হেডমাস্টার মাত্র।

এই স্কুল-বাড়ীর দোতলার পিছন দিকের তিনটি ঘর হেডমাস্টারের থাকিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে—ঘরের সামনেই ক্লাসরুম, কাজেই পর্দ্দা ফেলা। ক্লার্কওয়েলের বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি, মাথার চুল সাদা, মোটাসোটা, সর্ব্বদা ফিটফাট হইয়া থাকেন, টাইটা এদিক ওদিক নড়িবার জো নাই, শার্টের সামনেটা নিখুঁত ইস্ত্রি করা, চকচকে কলার, ভাল কাটছাঁটের কোট, পেণ্টালুনের পা দুটিতে চমৎকার ভাঁজ, যাহাকে বলে 'নাইফ্‌-এজ্‌-ক্রিজ্‌'—ছুরির ফলার মত সরু খাঁজ। সাহেব অবিবাহিত, কেউ কেউ বলে সাহেবের স্ত্রী আছে, কিন্তু সে সাহেবের কাছে থাকে না। তবে এখানে মিস্‌ সিবসন্‌ নামে একজন তরুণী ফিরিঙ্গী মেম সাহেবের সঙ্গেই থাকে, কেউ বলে সাহেবের শালী, কেউ বলে কী রকম বোন, কেউ বলে আর কিছু—মিস্‌ সিবসন্‌ও স্কুলের টীচার, নীচের ক্লাসে ইংরেজী পড়ায় ও উচ্চারণ শেখায়।

মিস্‌ সিবসনের নামে এ স্কুলে নীচের ক্লাসের দিকে ছোট ছোট ছেলের বেশ ভিড়। আশপাশের অবস্থাপন্ন গৃহস্থেরা মেমসাহেবের কাছে পড়িতে পাইবে ও নিখুঁত ইংরেজী উচ্চারণ শিখিতে পাইবে, এই লোভে ছেলেদের এই স্কুলে ভর্ত্তি করে। বেলা দশটা বাজিতে না বাজিতে ছোট ছোট ছেলেরা স্কুলের সামনের কম্পাউণ্ডে ছুটাছুটি করিতেছে, মারামারি করিতেছে, হৈ-চৈ চীৎকার লাফালাফি দাপাদাপি জুড়িয়া দিয়াছে।

হঠাৎ দোতলার জানালাপথে ক্লার্কওয়েল সাহেবের মুখখানা বাহির হইল ও বিষম বাজখাঁই চিৎকার শোনা গেল: ও, ইউ মথুরা, স্টপ দি নয়েজ্‌—বাবালোগকো চুপ করনে বোলো—

মুহূর্ত্তে সব চুপ।

ছেলেরা মুখ উঁচু করিয়া হেডমাস্টারকে দেখিয়া লইল, এবং এ ওর মুখের দিকে চাহিয়া যে যাহার মার্বেল পকেটের মধ্যে পুরিয়া ফেলিল ও উদ্যত ঘুষি নামাইল।

—মথুরা—এই মথুরা—

পুনরায় হেডমাস্টারের গম্ভীর আওয়াজ।

নীচের ছোট্ট কুঠুরির মধ্যে বসিয়া চাপকান-পরিহিত বৃদ্ধ মথুরা তামাক খাইতেছিল, সে তাড়াতাড়ি হুঁকা রাখিয়া বাহির হইয়া আসিয়া উপরের দিকে চাহিল।

—পহেলা ঘণ্টি মারো, সওয়া দশ হো গিয়া—

দিক্‌বিদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া দীর্ঘসময়ব্যাপী স্কুল বসিবার প্রথম ঘণ্টা বাজিয়া চলিল—থামিতে আর চায় না। অনেক ছোট ছোট ছেলের মন বিষণ্ণ হইয়া উঠিল—এই এখন সে স্কুল বসিবার ঘণ্টা পড়িতেছে, কলির সবে শুরু। এযাত্রা কি আর ছুটির ঘণ্টা বাজিবার সম্ভাবনা আছে? মোটে সওয়া দশ, আর কোথায় সেই সাড়ে তিন। সাড়ে তিনটাতে নীচের ছোট ছেলেদের ক্লাসের ছুটি।

ক্লার্কওয়েল তাড়াতাড়ি টেবিলে বসিয়া এক প্লেট সরু চালের ভাত, দুইটি কাঁচা টোমাটো, একটা বড় কাঁচকলা-সিদ্ধ, কিছু কাঁচা লেটুস্ শাক ও কপির পাতা কুচানো, একফালি নারিকেল ও দুইখানা মুর্গীর ঠ্যাং-সিদ্ধ খাওয়া শেষ করিয়া হাঁকিলেন, কেবলরাম!

বাবুর্চ্চী কেবলরাম হিন্দু। সাহেবের কাছে অনেক দিন আছে, সেও কায়দাদুরস্তভাবে সাদা উর্দ্দি পরিয়া, মাথায় সাদা পাগড়ি বাঁধিয়া তৈরী—সাহেবের বাবুর্চ্চীগিরি করে এবং স্কুলের সময়ে রেজিষ্ট্রি-খাতাপত্র এ-ক্লাস হইতে ও-ক্লাসে বহিয়া লইয়া যায়, জল তোলে, ছেলেদের জল দেয়—এজন্য স্কুল হইতেই সে বেতন পাইয়া থাকে, সাহেবের খানা পাকাইবার জন্য সে কেবল সাহেবের কাছে খোরাকি পায় মাত্র।

কেবলরাম শশব্যস্ত হইয়া বলিল, হুজুর!

—মেমসাহেব কাঁহা?

—এখনও আসতেছেন না কেন, অনেকক্ষণ তো গেছেন। আলেন বলে হুজুর, ধর্ম্মতলায় ওষুধ আনতি গেছেন।

কেবলরামের বাড়ী যশোর ও খুলনার সীমানায়।

—মেমসাহেবকো খানা টেবিলমে রাখ দো। আউর তুমি চলা যাও ইউনিভার্সিটি, পিওন-বুককা অন্দর দো লেফাফা হ্যায়—

—হুজুর, ইউনিভার্সিটি এখনো খোলে নি, এগারো বাজলি তবে বাবুরা আঁসবেন—মেমসাহেবের খানা দিয়ে তবে গেলি চলবে না হুজুর?

—বহুৎ আচ্ছা, চা দো।

সকালে ভাত খাওয়ার পর চা-পান ক্লার্কওয়েলের বহুদিনের অভ্যাস।

এই সময় উঁচু গোড়ালির জুতা খট খট করিতে করিতে মিস্ সিবসন্ ঘরে ঢুকিল। কৃশাঙ্গী, লম্বা, মুখে পুরু করিয়া পাউডার, ঠোঁটে লিপষ্টিক ঘষা, হাতে হ্যাণ্ডব্যাগ ঝোলানো। বয়স কম হইলেও গালে ইতিমধ্যেই মেছেতা পড়িতেছে। মুখ ফিরাইয়া চোখ ঘুরাইয়া বলিল, ডিয়ারি, ইউ হ্যাড্ ফিনিশড্ অলরেডি?

—ইয়েস্, ছু ইউ গবল্ আপ কুইক্‌লি, ফার্স্ট বেল্ ইজ গন্, ইউ আর রাদার লেট ফর্ মীল!

সরু গলায় গানের সুরে কথা বলিয়া মেমসাহেব পাশের ঘরে ঢুকিল।

ক্লার্কওয়েল উঠিয়া দাঁড়াইলেন, স্কুলের পোশাক পরিয়াই তিনি খানার টেবিলে বসিয়াছিলেন, বাহিরে চাহিয়া পর্দ্দার ফাঁক দিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেন, ক্লাসরুমে ছেলে আসিয়াছে কি না! ঢং ঢং করিয়া স্কুল বসিবার ঘণ্টা পড়িল। ক্লার্কওয়েল শশব্যস্ত হইয়া বাহির হইয়া নীচের গাড়ীবারান্দায় স্কুলের ছেলেদের সমবেত প্রার্থনায় যোগ দিতে নামিয়া গেলেন।

ক্লার্কওয়েল দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ জাঁহাবাজ হেডমাস্টার। ছাত্র ও মাস্টারেরা সমানভাবে ভয়ে কাঁপে তাঁর দাপটে—পুরো অটোক্র্যাট, কথা বলিলে তার নড়চড় হইবার জো নাই, হুকুমের বিরুদ্ধে কমিটীতে আপীল নাই—কমিটীর মেম্বাররা সবাই বাঙালী, সাহেবকে খাতির করিয়া চলা তাঁহাদের বহুদিনের অভ্যাস, স্কুলের মাস্টারদের ডিক্রি-ডিস্‌মিসের একমাত্র মালিক তিনিই।

সুতরাং আশ্চর্য্য না যে, তাঁহার সিঁড়ি দিয়া দুপ্‌ দুপ্‌ করিয়া নামিবার সময় দুই-একজন মাস্টার, যাঁহারা হেডমাস্টারের অলক্ষ্যে তাড়াতাড়ি হাজিরা-বই সই করিতে দোতলায় আপিস-ঘরে যাইতেছিলেন, তাঁহারা একটু সঙ্কুচিত সুরে 'গুড্‌ মর্নিং স্যার' বলিয়া এক পাশে রেলিং ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া হেডমাস্টরেকে নামিবার পথ বাধামুক্ত করিয়া দিলেন—যদিও তাহা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক; কারণ, চওড়া সিঁড়ি উভয় পক্ষের নামিবার ও উঠিবার পক্ষে যথেষ্ট প্রশস্ত। ইহা বিনয়ের একপ্রকার রূপ, প্রয়োজনের কার্য্য নহে।

ক্লাস বসিয়া গেল। ক্লার্কওয়েল হাজিরা-বই খুলিয়া দেখিয়া হাঁকিলেন, মিঃ আলম!

সফরুদ্দিন আলম এম-এ, স্কুলের য়্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার। বয়স ত্রিশের মধ্যে, আইন পাশ করিয়া আজ বছর চার-পাঁচ মাস্টারি করিতেছে, ধূর্ত্ত চোখ, চটপটে ধরনের চালচলন—লোক ভাল নয়। হেডমাস্টারের দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ, মাস্টারেরা ভয় করিয়া চলে, ভালবাসে না।

আলম বলিল, ইয়েস্ স্যার্।

—আজ প্রেয়ারের সময় শ্রীশবাবু আর যদুবাবু অনুপস্থিত। ওদের ডাকাও।

—স্যার্, যদুবাবু আর শ্রীশবাবুকে বলে বলে পারলাম না, রোজ লেট্ স্যার্, আপনি একটু বলে দিন ওদের।

লাগাইতে-ভাঙাইতে আলমের জুড়ি নাই বলিয়া মাস্টারের দল তাহাকে বিশেষ সমীহ করিয়া চলে।

আলম মাস্টারদের ঘরে গিয়া সুমিষ্ট স্বরে বলিল, যদুবাবু, শ্রীশবাবু, হেডমাস্টার আপনাদের স্মরণ করেছেন। শরৎবাবু কোথায়?

যদুবাবু বয়সে প্রবীণ, চালচলন ক্ষিপ্রতাবর্জ্জিত, রোগা, মাথার চুল কাঁচাপাকায় মিশানো। তিনি ধীরে ধীরে টানিয়া বলিলেন, কেন আমায় অসময়ে স্মরণ—

—আপনি প্রেয়ারের সময় কোথায় ছিলেন?

—আসতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। কেন?

—হেডমাস্টার নোট করেচেন—

যতুবাবু উম্মাসহকারে বলিলেন, ওঃ, তবেই আমার সব হল! নোট করেচেন তো ভারিই করেচেন! গেরস্ত মানুষ, কাঁটা ধরে আসা সব সময় চলে না।

মিঃ আলম চুপ করিয়া রহিল।

টিফিনের পর যতুবাবুর পুনরায় ডাক পড়িল আপিসে। ক্লার্কওয়েল বলিলেন, ওয়েল, যতুবাবু, আমার স্কুলে শুনলাম আপনার অসুবিধে হচ্ছে?

যতুবাবু আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, কেন স্যার?

বুঝিলেন, আলমের কাছে ওবেলা যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সাহেবের কানে উঠিয়াছে।

—আপনার রোজ লেট হচ্ছে স্কুলে, অথচ ঘরের কাজ ঠিকমত করতে পারছেন না শুনলাম।

—ঘরের কাজ? না স্যার্, ঘরের কাজ ঠিক—তার জন্যে কি—

ক্লার্কওয়েল সাহেব বলিলেন, বসুন ওখানে। এখন কোন ক্লাস আছে?

—আজ্ঞে, থার্ড ক্লাসে হিস্ট্রির ঘণ্টা।

—আচ্ছা, যাবেন এখন। আপনি আজ প্রেয়ারের সময় ছিলেন না, রোজই থাকেন না।

—আমি কেন স্যার্, শ্রীশ থাকে না, হীরেনবাবু থাকে না, ক্ষেত্রবাবু থাকে না।

—আমি জানি কে কে থাকে না। আপনার বলার আবশ্যক নেই। আপনি ছিলেন না কেন? লেট করেন কেন রোজ?

—খেতে একটু দেরি হয়ে যায় স্যার্।

—বেশ, মাই গেট্ ইজ্ ওপ্‌ন্। আপনার অসুবিধে হলে আপনি চলে যেতে পারেন।

যতুবাবু নিরুত্তর রহিলেন। সাহেবের আড়ালে যাহাই বলুন, সামনাসামনি কিছু বলিবার সাহস তাঁহার নাই। অন্তত এতদিন কেহ দেখে নাই।

—আচ্ছা, যান ক্লাসে। কাল থেকে আমার আপিসে এসে সই করবেন আগে।

যতুবাবু পরের ক্লাসের ঘণ্টা পড়িলে আপিসে আসিয়াই ক্ষেত্রবাবুকে সামনে দেখিতে পাইলেন। তখনও অন্য কোন শিক্ষক আপিস-ঘরে আসেন নাই।

ক্ষেত্রবাবু স্বর নীচু করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তলব হয়েছিল কেন?

যতুবাবু বলিলেন, ওঃ, অত আস্তে কথা কিসের? বলব সোজা কথা, তার আবার অত ঢাক-ঢাক গুড়-গুড়—

হঠাৎ যতুবাবুকে বাক্‌শক্তি রহিত হইতে দেখিয়া ক্ষেত্রবাবু সবিস্ময়ে পিছন ফিরিয়া চাহিতেই একেবারে য়্যাসিস্টাণ্ট হেডমাস্টার মিঃ আলমের সহিত চোখোচোখি হইয়া গেল।

আলম বলিল, ক্ষেত্রবাবু, ফোর্থ ক্লাসে একজামিনের পড়া দেখিয়ে দিয়েছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—যতুবাবু?

—কাল দেব।

—কেন, আজই দিন না।

—কাল দিলে ক্ষতি কিছু নেই।

অল্পক্ষণ পরে হেডমাস্টারের আপিসে যদুবাবুর আবার ডাক পড়িল।

হেডমাস্টার বলিলেন, যদুবাবু আপনি ফোর্থ ক্লাসে কী পড়ান ?

—হিষ্ট্রি স্যার্।

—ওদের উইকলি পরীক্ষা হবে এই শনিবার, পড়া দেখিয়ে দিয়েছেন ?

—না স্যার্, কাল দেব।

—ওরা কদিন সময় পাবে তৈরী হতে, তা ভেবে দেখলেন না! ছেলেদের কাজ যদি না হয়, তেমন মাস্টার এ স্কুলে রাখাও যা না রাখাও তাই। মাই ডোর ইজ্ ওপ্ন্—আপনার না পোষায়, আপনি চলে গেলে কেউ বাধা দেবে না।

যদুবাবু বিনীতভাবে জানাইলেন, তিনি এখনই ক্লাসে গিয়া পড়া বলিয়া দিতেছেন।

—তাই যান। পড়া দিয়ে এসে আমাকে রিপোর্ট করবেন।

—যে আজ্ঞে স্যার্।

আপিসে আসিয়া যদুবাবু লম্ফঝম্প আরম্ভ করিলেন। অন্য কেহ সেখানে ছিল না, শুধু হেডপণ্ডিত ও ক্ষেত্রবাবু।

—ওই আলম, ওটা একেবারে অন্ত্যজ—লাগিয়েছে গিয়ে অমনি হেডমাস্টারের কাছে। কথা পড়তে না পড়তে লাগাবে—এমন করলে তো এ স্কুলে থাকা চলে না দেখছি! বললাম যে ফোর্থ ক্লাসের একজামিনের পড়া দিচ্ছি দেখিয়ে—তা না, অমনি লাগানো হয়েছে। এ রকম করলে কি মানুষ টেঁকে মশাই ?

বলা বাহুল্য, যদুবাবু জানিতেন, য়্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাস্টার এ ঘণ্টায় নীচের হলে য়্যাডিশনাল হিষ্ট্রির ক্লাস লইতেছেন।

ক্ষেত্রবাবু নীরব সহানুভূতি জানাইয়া চুপ করিয়া থাকাই নিরাপদ মনে করিলেন। তিনি ছাপোষা মানুষ, আজ সতেরো বছর ত্রিশ টাকা বেতনে এই স্কুলে চাকরি করিতেছেন। বেলেঘাটা অঞ্চলে একটি মাত্র ঘর ভাড়া লইয়া আছেন, সকালে ও সন্ধ্যায় সামান্য একটু হোমিওপ্যাথি করিয়া আর কিছু উপার্জ্জন করেন। চাকুরিটুকু গেলে এ বাজারে পথে বসিতে হইবে।

হেডপণ্ডিত মশায় বৃদ্ধ লোক, তিনি ক্লার্কওয়েল সাহেবের পূর্ব্ব হইতে এ স্কুলে আছেন—তিনি আর নারাণবাবু। অনেক মাস্টার আসিল, চলিয়া গেল, তিনি ঠিক আছেন। মেজাজ দেখাইতে গেলে চাকরি করা চলে না। তবে তিনি ইহাও জানেন, লম্ফঝম্প করা যদুবাবুর স্বভাব, শেষ পর্য্যন্ত কোন দিক হইতেই কিছু দাঁড়াইবে না।

এই সময় নারাণবাবু ঘরে ঢুকিলেন। তিনিও বৃদ্ধ, এই স্কুলেরই একটি ঘরে থাকেন—নিজে রান্না করিয়া খান। আজ পঁয়ত্রিশ বছর এ স্কুলে আছেন এবং এইভাবেই আছেন। বৃদ্ধের নিকট কেহ কখনও তাঁহার কোন আত্মীয়স্বজনকে আসিতে দেখে নাই। রোগা, বেঁটে-

চেহারার মানুষটি, পাকশিটে গড়ন, গায়ে আধময়লা পাঞ্জাবি, ততোধিক ময়লা ধুতি, পায়ে চটি জুতা।

নারাণবাবু পকেট হইতে একটি টিনের কৌটা বাহির করিয়া একটি বিড়ি ধরাইলেন।

ক্ষেত্রবাবু হাত বাড়াইয়া বলিলেন, দিন একটা, কাঠিটা ফেলবেন না।

নারণবাবু বলিলন, কী হয়েছে, আজ যদুবাবুকে হেডমাস্টার ডাকিয়েচে কেন?

যদুবাবু চড়াগলায় মেজাজ দেখানোর সুরে বলিতে আরম্ভ করিলেন, সেই কথাই তো বলচি। শুধু শুধু ওই অন্ত্যজটা আমায় ডেকে নিয়ে গিয়ে—

নারাণবাবু বলিলেন, আস্তে, আস্তে—

যদুবাবু গলা আরও এক পর্দ্দা চড়াইয়া বলিলেন, কেন, কিসের ভয়? যদু মুখুজ্জে ওসব গ্রাহ্যি করে না। অনেক আলম দেখে এসেছি, থার্ড ক্লাস এম-এ—তার আবার প্রতাপটা কিসের হ্যা? কেবল লাগানো-ভাঙানো সব সময়! আর লাগানোর ধার ধারে কে? উনি ভাবেন, সবাই ওঁকে ভয় করে চলবে। যে চলে সে চলুক, যদু মুখুজ্জে সে রকম বংশের—

বাহিরে বুট জুতার শব্দ শোনা গেল—মিঃ আলমের পায়ে বুট আছে সবাই জানে—যদুবাবু হঠাৎ থামিয়া গেলেন। ক্ষেত্রবাবু বলিয়া উঠলেন, যাই, খড়িটা দিন নারাণবাবু দয়া করে, ক্লাস আছে।

নারাণবাবু বলিলেন, চল, আমিও যাই। ওরে কেবলরাম, ইণ্ডিয়ার বড় ম্যাপখানা দে তো—

কিন্তু দেখা গেল, যে ঘরে ঢুকিল সে মিঃ আলম নয়, বইয়ের দোকানের একজন ক্যানভাসার—এক হাতে ব্যাগ ঝোলানো, অন্য হাতে কিছু নতুন স্কুল-পাঠ্য বই। ক্যানভাসারের সুপরিচিত মূর্ত্তি। ক্যানভাসারের প্রশ্নের উত্তরে তাহাকে হেডমাস্টারের আপিস দেখাইয়া দিয়া যদুবাবু পুনরায় শুরু করিলেন, হ্যাঁ, আমি যা বলব এক কথা। কাউকে ভয় করে না এই যদু মুখুজ্জে। বলি বাবা, এ স্কুল গড়ে তুলেছে কে? ওই নারাণ বাঁড়ুজ্জে আর হেডপণ্ডিত। সাহেব এল তো কাল, উড়ে এসে জুড়ে বসেচে—আর ওই অন্ত্যজ—

মিঃ আলমের প্রবেশটা একটু অপ্রত্যাশিত ধরনে ঘটিল।

যদুবাবু হঠাৎ ঢোক গিলিয়া চুপ করিয়া গেলেন।

মিঃ আলমের ব্যবহার অত্যন্ত ভদ্র ও সংযত। মুখের উপর কেহ গালাগালি দিলেও মিঃ আলমের কথাবার্ত্তা বা ব্যবহারে কখনও রাগ প্রকাশ পায় না। আলম বলিল, ক্ষেত্রবাবুর একটা দরখাস্ত দেখলাম হেডমাস্টারের টেবিলে, কাল আসবেন না। কী কাজ?

ক্ষেত্রবাবু বললেন, আজ্ঞে, কাল আমার ভাগ্নীর বিয়ে—

—তা একদিন কেন, দুদিন ছুটি নিন না। আমি সাহেবকে বলে দেব এখন।

ক্ষেত্রবাবু বিনয়ে গলিয়া গিয়া বলিলেন, যে আজ্ঞে। তাই দেবেন বলে। আমার সুবিধে হয় তা হলে—থ্যাঙ্কস।

—নো মেন্‌শন্‌।

ছুটির ঘণ্টা এইবার পড়িবে। শেষের ঘণ্টাটা কি কাটিতে চায়? ক্ষেত্রবাবু ও যদুবাবু তিনবার ঘড়ি দেখিতে পাঠাইলেন। চারিটা বাজিতে পনেরো মিনিট, আট মিনিট এখনও চার মিনিট।

স্কুল-ঘরের নীচের তলায় একটা অন্ধকূপ ঘরে থার্ড পণ্ডিত জগদীশ ভট্‌চাজ জ্যোতির্ব্বিনোদ মশায় আছেন। বাড়ী পূর্ব্ববঙ্গে, দশ বৎসর এই স্কুলে আছেন, কুড়ি টাকায় ঢুকিয়াছিলেন, এখনও তাই—গত দশ বৎসরে এক পয়সাও মাহিনা বাড়ে নাই। অবশ্য অনেক মাস্টারেরই বাড়ে নাই—হেডমাস্টার ও য়্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাস্টার ছাড়া। হেডমাস্টারের মাহিনা গত চারি বৎসরের মধ্যে দুই শত টাকা হইতে দুই শত পঁচাত্তর এবং মিঃ আলমের মাহিনা ষাট হইতে পঁচাশি হইয়াছে।

ভুলিয়া যাইতেছিলাম, মিস সিম্পসনের মাহিনা গত দুই বৎসরে এক শত হইতে দেড় শত দাঁড়াইয়াছে।

উপরের তিন জনের মাহিনা বছর বছর বাড়িয়া চলিয়াছে, অথচ নীচের দিকের শিক্ষকগণের বেতনের অঙ্ক গত দশ পনেরো বিশ বৎসরেও দারুব্রহ্মবৎ অনড় ও অচল আছে কেন—এ প্রশ্ন উত্থাপন করিবার সাহস পর্য্যন্ত কোন হতভাগ্য শিক্ষকের নাই। সে কথা থাক্।

জগদীশ জ্যোতির্ব্বিনোদ সিক্‌স্‌থ্‌ ক্লাসে বাংলা পড়াইতেছিলেন। তিনি শেষ ঘণ্টার দীর্ঘতায় অতিষ্ঠ হইয়া একটি ছেলেকে ঘড়ি দেখিতে পাঠাইলেন। আপিস-ঘরে ঘড়ি। সিঁড়ির মুখে দাঁড়াইয়া ঘাড় বাড়াইয়া চালাক ছেলেরা ঘড়ি দেখিয়া ফিরিয়া আসে, যাহাতে হেডমাস্টারের চোখে না পড়িতে হয়। কিন্তু ভাঙা পা খানায় পড়ে। জগদীশ জ্যোতির্ব্বিনোদের প্রেরিত হতভাগ্য ছাত্রটি একেবারে হেডমাস্টারের সামনে পড়িয়া গেল—ঘড়ি দেখিতে চেষ্টা করিবার অবস্থায়।

ক্লার্কওয়েল ভীমগর্জ্জনে হাঁকিলেন, হোয়াট ইউ আর ট্রাইং টু লুক য়্যাট? ইউ! কাম্ আপ্!

ছোট ছেলেটি কাঁপিতে কাঁপিতে আপিস-ঘরে ঢুকিল। সেখানে মিঃ আলম বসিয়া ছিল। আলম জিজ্ঞাসা করিল, কী করছিলে নন্দ?

—ঘড়ি দেখছিলাম স্যার্।

—কেন? ক্লাসে কেউ নেই?

—আজ্ঞে, থার্ড পণ্ডিত মশাই আছেন। তিনি ঘড়ি দেখতে পাঠিয়ে দিলেন।

আলম ও হেডমাস্টার পরস্পরের দিকে চাহিলেন।

—আচ্ছা, যাও তুমি।

মিঃ আলম বলিলেন, চলবে না স্যার। কতকগুলো টীচার আছে, একেবারে অকর্ম্মণ্য, শুধু ঘড়ি দেখতে পাঠাবে ছেলেদের। কাজে মন নেই। এই থার্ড পণ্ডিত একজন, যদুবাবু,

হীরেনবাবু, আর ওই হেডপণ্ডিত—

একটা নোটিস লিখে দিন মিঃ আলম, স্কুল-ছুটির পরে মাস্টারেরা সব আমার সঙ্গে দেখা না করে না যায়। ঘণ্টা দিতে বারণ করে দিন, নোটিস ঘুরে আসুক।

মিঃ আলম হাঁকিল, কেবলরাম, ঘণ্টা দিয়ো না।

একে ঘণ্টা কাটে না, তাহার উপর ক্লাসে হেডমাস্টারের নোটিস গেল—ছুটির পর কোন মাস্টার চলিয়া যাইতে পারিবে না, হেডমাস্টার তাঁহাদের স্মরণ করিয়াছেন।

হেডমাস্টারের আপিস-ঘরে একে একে যদুবাবু, শরৎবাবু, নারাণবাবু, প্রভৃতি আসিয়া জুটিলেন। জ্যোতির্বিনোদ মশায় সকলের শেষে কম্পিত দুরু-দুরু বক্ষে প্রবেশ করিলেন; কারণ, তিনি সেই ছেলেটির মুখে শুনিয়াছেন সব কথা। তাঁহার জন্যই যে এই বিচার-সভার আয়োজন, তাহা তাঁহার বুঝিতে বাকি নাই।

হেডমাস্টার বলিলেন, ইজ্ এভ্রিবডি হিয়ার?

মিঃ আলম উত্তর দিলেন, ক্ষেত্রবাবু আর হেডপণ্ডিতকে দেখচি নে।

নারাণবাবু বলিলেন, ক্লাসে রয়েছেন, আসছেন।

কথা শেষ হইতেই তাঁহারাও ঢুকিলেন।

—এই যে আসুন, আপনাদের জন্যে সাহেব অপেক্ষা করছেন।

ক্লার্কওয়েল শিক্ষকদের সভায় অতি তুচ্ছ কথা বলিবার সময়ও জজ সাহেবের মত গাম্ভীর্য্য ও আড়ম্বর প্রদর্শন করিয়া থাকেন, বাজেট সভায় বাজেট পেশ করিবার সময় অর্থসচিব যত না বাগ্মিতা দেখান তদপেক্ষা বাগ্মিতা দেখাইয়া থাকেন। তিনি বর্ত্তমানে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া টাই ধরিয়া কখনও দক্ষিণে কখনও বামে হেলিয়া গম্ভীর স্বরে আরম্ভ করিলেন, টীচার্স, আজ আপনাদের ডেকেচি কেন, এখনি বুঝবেন। আমরা এখানে কতকগুলি তরুণ আত্মার উন্নতির জন্যে দায়ী (বড় বড় কথা বলিতে ক্লার্কওয়েল সাহেব খুব ভালবাসেন), আমরা শুধু মাইনে নিয়ে ছেলেদের ইংরেজী শেখাতে আসি নি, আমরা এসেছি দেশের ভবিষ্যৎ আশার স্থল বালকদের সত্যিকার মানুষ করে তুলতে। আমরা তাদের সময়নিষ্ঠা শেখাব, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা শেখাব—তবে তারা ভবিষ্যতে সুনাগরিক হয়ে দেশের বড় বড় কার্য্যভার হাতে নিয়ে নিজেদের জীবন সার্থক করে তুলতে পারবে, সেই সঙ্গে দেশেরও শ্রীবৃদ্ধি হবে!

দুই-একজন শিক্ষক বলিলেন, ঠিক কথা, ঠিক কথা।

—এখন দেখুন, যদি আমরাই তাদের সময়নিষ্ঠা ও কর্ত্তব্যানুরাগ না শিখিয়ে ফাঁকি দিতে শেখাই, যদি আমরা নিজেরা নিজেদের কর্ত্তব্য কাজে অবহেলা করি, তবে সে যে কত বড় অপরাধ, তা ধারণা করবার ক্ষমতা আমাদের মধ্যে অনেকের নেই দেখা যাচ্ছে। শিক্ষকতা শুধু পেটের ভাতের জন্যে চাকরি করা নয়, শিক্ষকতা একটা গুরুতর দায়িত্ব—এই জ্ঞান যাদের না থাকে, তারা শিক্ষক এই মহৎ নামের উপযুক্ত নয়।

দুই-চারিজন শিক্ষক মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিলেন।

—আমি জানি, এখানে এমন শিক্ষক আছেন, যাঁদের মন নেই তাঁদের কাজে। তাঁদের প্রতি আমার বলবার একটিমাত্র কথা আছে। মাই গেট্ ইজ্ ওপ্‌ন্ —তাঁরা দিব্যি তার মধ্যে দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে চলে যেতে পারেন, কেউ তাঁদের বাধা দেবে না।

হেডমাস্টার কটমট করিয়া যতুবাবু, থার্ড পণ্ডিত ও হেডপণ্ডিতের দিকে চাহিলেন।

—আজকের ঘটনাই বলি। আপনাদের মধ্যে কোন একজন শিক্ষক আজ আপিসে ঘড়ি দেখতে পাঠিয়েছিলেন একটি ছেলেকে। তিনি যে কতবড় গুরুতর অন্যায় করেছেন, তা তিনি বুঝতে পারছেন না। এতে প্রমাণ হল যে, কর্ত্তব্য কাজে তাঁর মন নেই, কখন ঘণ্টা শেষ হবে সে জন্য তাঁর মন উসখুস করছে—তাঁর দ্বারা সুচারুরূপে শিক্ষকের কর্ত্তব্য কখনই সম্পন্ন হতে পারে না। সুকুমারমতি বালকদের সামনে তিনি কী আদর্শ দাঁড় করাবেন? কাজে ফাঁকি দেবার আদর্শ, কর্ত্তব্যে অবহেলার আদর্শ—কী বলেন আপনারা?

সকলেই মাথা এক পাশে হেলাইয়া বলিলেন, ঠিক কথা।

—এখন আমি আপনাদের একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। সে শিক্ষকের প্রতি আর ভাল ব্যবহার করা চলে কি? তাঁর দ্বারা এ স্কুলের কাজ চলে কি? বলুন আপনারা? আমি মিঃ আলমকে এই প্রশ্ন করচি। মিঃ আলম একজন কর্ত্তব্যপরায়ণ শিক্ষক বলে আমি জানি। আর একজন ভাল শিক্ষক আছেন—নারাণবাবু, তাঁর প্রতিও আমি এই প্রশ্ন করচি।

ক্ষেত্রবাবু, যতুবাবু ও থার্ড পণ্ডিত তিনজনেরই মুখ শুকাইল। তিনজনেই ঘড়ি দেখিতে পাঠাইয়াছিলেন, তিনজনের প্রত্যেকেই ভাবিলেন তাঁহার উদ্দেশেই হেডমাস্টারের এই বক্তৃতা।

নারাণবাবু দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, একটা কথা আছে আমার স্যার্।

—কী, বলুন?

—এবার তাঁকে ক্ষমা করুন, তিনি যেই হোন, আমার নাম জানবার দরকার নেই, এবার তাঁকে ক্ষমা করুন। ওয়ার্নিং দিয়ে ছেড়ে দিন স্যার্।

হেডমাস্টারের কণ্ঠস্বর ফাঁসির হুকুম দিবার প্রাক্কালে দায়রা-জজের মত গম্ভীর হইয়া উঠিল।

—না নারাণবাবু, তা হয় না। আমি নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করতে পারব না—আমি এই ইন্‌স্টিটিউশনের হেডমাস্টার, আমার ডিউটি একটা আছে তো? আমি চোখ বুজে থাকতে পারি নে। আমার কর্ত্তব্য এখানে সুস্পষ্ট, হয়তো তা কঠোর, কিন্তু তা করতে হবে আমায়। আমি সেই টীচারকে সাস্পেণ্ড করলাম।

হঠাৎ যতুবাবু দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, স্যার, আমি ঘড়ি দেখতে কোনদিন পাঠাই নি—আজ পাঠিয়েছিলাম, তার একটা কারণ ছিল স্যার্, আমার স্ত্রী অসুস্থ, ডাক্তার আসবে চারটের পরেই—তাই—এবারটা আমায়—

তিনি এতক্ষণ বসিয়া বসিয়া এই কৈফিয়তটি তৈরি করিতেছিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁহারই উদ্দেশে হেডমাস্টার এতক্ষণ ধরিয়া বাক্যবাণ বর্ষণ করিলেন। বলা বাহুল্য,

কৈফিয়তটির মধ্যে সত্যের বালাই ছিল না।

হেডমাস্টারের চোখ কৌতুকে নাচিয়া উঠিল। তাহার একটা কারণ, যদুবাবু কোনদিনই বাগ্মী নহেন, বর্ত্তমানে ভয় পাইয়া যে কথাগুলি বলিলেন, সেগুলির ইংরেজী বারো আনা ভুল। অথচ যদুবাবু ব্যাকরণ পড়ান ক্লাসে—ইংরেজীর কী কী ভুল হইল, তিনি নিজেও তাহা বলিবার পরক্ষণেই বুঝিয়া লজ্জিত হইয়াছেন, কিন্তু বলিবার সময় কেমন হইয়া যায় সাহেবের সামনে।

হেডমাস্টার বলিলেন, আপনি প্রায়ই ও-রকম করে থাকেন কি না সে সব এখানে বিচার্য্য বিষয় নয়। আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা একবারও আমি ক্ষমা করতে পারি নে।

নারাণবাবু উঠিয়া বলিলেন, এবার আমাদের অনুরোধটা রাখুন স্যার্।

—আচ্ছা, আমি একজনের সম্বন্ধে সে অনুরোধ মানলাম। কারণ, তাঁর বাড়ীতে গুরুতর পারিবারিক কারণ আছে তিনি বলচেন। একজন শিক্ষক মিথ্যে কথা বলচেন, এ রকম ধরে নেওয়ার কোন কারণ নেই। কিন্তু আমি থার্ড পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করি, তাঁর কী কারণ ছিল ঘন ঘন ঘড়ি দেখবার? তিনি স্কুলেই থাকেন। তাঁর কোন তাড়াতাড়ি দেখি না। তাঁকে ক্ষমা করতে পারি না, তাঁকে আমি সাস্‌পেণ্ড করলাম।

থার্ড পণ্ডিত এবার দাঁড়াইয়া কাঁদো-কাঁদো স্বরে বাংলায় বলিলেন, (তিনি ইংরেজী জানেন না), সাহেব, এবার আমায় ক্ষমা করুন, আমি এমন আর কখনও করব না।

ক্ষেত্রবাবু ভাবিলেন, খুব বাঁচিয়া গিয়াছি এ যাত্রা! আমিও যে ঘড়ি দেখিতে পাঠাই, সেটা কেহ জানে না।

হেডমাস্টার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, আমার হুকুম নড়ে না। ছেলেদের প্রতি কর্ত্তব্যপালন আগে করতে হবে, তার পর ব্যক্তিগত দয়া দাক্ষিণ্য। সামনের বুধবারে স্কুল কমিটীর মীটিং আছে, সেখানে আমি আপনার কথা ওঠাব। কমিটীর অনুমতি নিয়ে আপনার শাস্তির ব্যবস্থা হবে। আপনি কাল থেকে আর ক্লাসে যাবেন না। কত দিন আপনাকে সাস্‌পেণ্ড করা হবে, সেটা কমিটী ঠিক করবেন।

সভা ভঙ্গ হইল। হেডমাস্টার গট গট করিয়া আপিস ছাড়িয়া নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। মাস্টারেরাও একে একে সরিয়া পড়িলেন—তাঁহারা যদি কিছু বলেন, ফুটপাথে গিয়া বলিবেন।

সন্ধ্যার সময় ক্লার্কওয়েল সাহেব মোটরে খয়রাগড়ের রাজকুমারকে পড়াইতে চলিয়া গেলেন ল্যান্সডাউন রোডে। মোটা টাকার টুইশানি, তাহারাই মোটর পাঠাইয়া লইয়া যায়। সাহেব বাহির হইয়া যাইবার পরে মিস্ সিবসন্ ঘরে বসিয়া সেলাই করিতেছে, এমন সময় দরজার বাহিরে খুস-খুস শব্দ শুনিয়া বলিল, হু? কোন্ হ্যায়?

বিনম্র সঙ্কোচে পর্দ্দা সরাইয়া থার্ড পণ্ডিত একটুখানি মুখ বাহির করিয়া উঁকি মারিয়া বলিলেন, আমি মেমসাহেব।

—ও,পাণ্ডিট্! কাম্ ইন্। হোয়াট্'স হোয়াট্?

থার্ড পণ্ডিত হাত জোড় করিয়া কাঁদো-কাঁদো সুরে বলিলেন, সাহেব আমাকে সাস্‌পেণ্ড করেচেন।

—বেগ ইওর পার্ডন্?

থার্ড পণ্ডিত 'সাস্‌পেণ্ড' কথাটার উপর জোর দিয়া কথা বলিয়া নিজের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিলেন—মি, হাম—

মিস্ সিবসন্ আস্‌লী বিলাতী, নানা দুর্ভাগ্যের মধ্যে পড়িয়া ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুলে চাকরি লইতে বাধ্য হইয়াছে। বুদ্ধিমতী মেয়ে, ব্যাপারটা বুঝিয়া হাসিয়া বলিল, ওয়েল—

—ইউ মাদার—আই সন্—সাহেবকে বলুন মা—

—ইয়েস্, আই প্রমিস টু—

—হ্যাঁ, মা, বুড়ো হয়েছি—ওল্ড ম্যান (থার্ড পণ্ডিত নিজের মাথার সাদা চুলে হাত দিয়া দিয়া দেখাইলেন) না খেয়ে মরে যাব—(মুখের কাছে হাত লইয়া গিয়া খাওয়ার অভিনয় করিয়া হাত নাড়িয়া না-খাওয়ার অভিনয় করিলেন) ইট্ নট—

মেমসাহেব হাসিয়া বলিলেন, আই আণ্ডারস্ট্যাণ্ড পাণ্ডিট্।

—নমস্কার মাদার।

থার্ড পণ্ডিত চলিয়া আসিলেন।

যদুবাবু ছুটি হইলে মলঙ্গা লেনের ছোট বাসাটায় ফিরিয়া গেলেন। দশ টাকা মাসিক ভাড়ায় একখানি মাত্র ঘর দোতলায়—এক বাড়ীতে আরও তিনটি পরিবারের সঙ্গে বাস। যদুবাবুর স্ত্রী দুইখানি রুটি ও একটু পেঁপের তরকারি আনিয়া সামনে ধরিলেন। যদুবাবু গোগ্রাসে সেগুলি গিলিয়া বলিলেন, আর একটু জল—

যদুবাবু নিঃসন্তান। ত্রিশ টাকা মাহিনায় ও দুই-একটি টুইশানির আয়ে স্বামী-স্ত্রীর কায়ক্লেশে চলিয়া যায়।

জলপান করিয়া যদুবাবু একটু সুস্থ হইয়া তামাক ধরাইলেন।

যদুবাবুর স্ত্রী একসময়ে রূপসী বলিয়া খ্যাত ছিল, এখন নানা দুঃখকষ্টে সে রূপের কিছুই প্রায় অবশিষ্ট নাই আর, প্রায় সকল বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের মতই স্বামীর উপর তাহার টানটা বেশী। স্বামীর কাছে বসিয়া বলিল, তোমার বড় শালীর বাড়ী থেকে চিঠি এসেছে, ছেলের অন্নপ্রাশন, যাবে নাকি?

এ যে একটু বক্রোক্তি, যদুবাবু সেটা বুঝিলেন। এটি যদুবাবুর স্ত্রীর বৈমাত্রেয় দিদি, সকলে বলে এই মেয়েটির রূপ দেখিয়া যদুবাবু নাকি একদিন মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাকে বিবাহ করিবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ঘটে নাই। যদুবাবুর স্ত্রী খোঁচা দিতে ছাড়ে না এখনও।

—তুমি যাও। এখন মুর্শিদাবাদ যাই সে সময় কই? ওরা নিতে আসবে?

—তা জানি নে। তারা এখন বড়লোক, যদিই ধরো গরিব কুটুম্বর অত তোয়াজ না

করে! চিঠি একখানা দিয়েছে, এই যথেষ্ট।

—তা হলে যাওয়া হবে না। ভাড়ার টাকা, তারপর ধর নকুতো কিছু একটা দিতে হবে—সে হয় না।

—আমার কাছে কিছু আছে—তবে তুমি যদি না যাও, আমি যাব না।

—আমি ছুটি পাব না। আলম ব্যাটা বড্ড লাগাচ্ছে আমার নামে সাহেবের কাছে। আজ তো এক কাণ্ডতে বেধে গিয়েছিলাম আর কি, অতি কষ্টে সামলেছি। আমার হয় না। তুমি বরং যাও।

এমন সময় বাহির হইতে নারাণবাবুর গলা শোনা গেল—ও যদু, আছ নাকি?

—আসুন, আসুন নারাণদা—

নারাণবাবু ঘরে ঢুকিয়া যদুবাবুর স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, বউঠাকরুন, একটু চা খাওয়াতে পার?

যদুবাবুর স্ত্রী ঘোমটার ফাঁকে যদুবাবুর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন—অর্থাৎ চা নাই, চিনি নাই, দুধ নাই। অর্থাৎ যদুবাবু বাড়ীতে চা খান না।

যদুবাবু বলিলেন, বসুন নারাণদা, আমি একটু আসচি।

নারাণবাবু হাসিয়া বলিলেন, আসতে হবে না ভায়া, আমি সব এনেছি পকেটে, এই যে—আমি খাই কিনা, সব আমার মজুত আছে। তোমার এখানে আসব বলে পকেটে করে নিয়েই এলাম। এই নাও বউঠাকরুন।

—তারপর, দেখলেন তো কাণ্ডখানা?

—ও তো দেখেই আসছি। নতুন আর কী বল?

—আমায় কী রকম অপমানটা—

—আরে, তুমি যে ভায়া, গায়ে পেতে নিলে, ওটা আসলে থার্ড পণ্ডিতকে লক্ষ্য করে বলছিল সাহেব।

—না না, আপনি জানেন না, আমাকেও বলছিল ওই সঙ্গে।

—কিছু না, তোমার হয়েচে—ঠাকুরঘরে কে? না, আমি তো কলা খাই নি। তুমি কেন বলতে গেলে ও-কথা?

—যাক, তা নিয়ে তর্ক করে কোন লাভ নেই। ও যেতে দিন।

চা-পান শেষ করিয়া দুইজনে উঠিলেন। টুইশানির সময় সমাগত।

যদুবাবু শাঁখারিটোলায় এক বাড়ীতে টুইশানিতে গেলেন। নীচের তলায় অন্ধকার ঘর, তিনটি ছেলে একসঙ্গে পড়ে। ভীষণ গরম ঘরের মধ্যে, কেমন একটা ভ্যাপ্‌সা গন্ধ আসে পাশের সিউয়ার্ড ডিচ্ হইতে! দুইটি ঘণ্টা তাহাদের পড়া বলিয়া ক্লাসের টাস্ক লিখাইয়া দিতে রাত আটটা বাজিল। আর একটা টুইশানি নিকটেই, যদু শ্রীমানীর লেনে। সেখানে একটি ছেলে—ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ে, বেশ একটু নির্ব্বোধ অথচ পড়াশুনায় মন খুব।

এমন ধরনের ছেলেরাই প্রাইভেট টিউটরকে ভোগায় বেশী। এ ছেলেরা এই অঙ্ক কষাইয়া লয়, ওটার ভাবাংশ লিখাইয়া লয়—খাটাইয়া ফরমাশ দিয়া যদুবাবুকে রীতিমত বিরক্ত করিয়া তোলে প্রতিদিন। ক্লার্কওয়েল সাহেবকে ফাঁকি দেওয়া চলে, কিন্তু প্রাইভেট টুইশানির ছাত্র বা ছাত্রের অভিভাবকদের ফাঁকি দেওয়া বড়ই কঠিন।

রাত পৌনে দশটার সময় যদুবাবু উঠিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় ছেলেটি বলিল, একটু বাকী আছে স্যার্। কাল ইংরেজী থেকে বাংলা রিট্রানস্লেশন (বারো আনা শিক্ষক ও ছাত্র এই ভুল কথাটি ব্যবহার করে) রয়েছে, বলে দিয়ে যান।

যদুবাবুর মাথা তখন ঘুরিতেছে। তিনি বলিলেন, আজ না হয় থাক্।

—না স্যার্। বকুনি খেতে হবে, বলে দিয়ে যান।

—কই, দেখি। এতটা? এ যে ঝাড়া আধ ঘণ্টা লাগবে! আচ্ছা, এস তাড়াতাড়ি। আমি বলে যাই, তুমি লিখে নাও।

নির্ব্বোধ ছাত্রকে লিখাইয়া দিতেও প্রায় আধ ঘণ্টা লাগিয়া গেল। রাত সাড়ে দশটার সময় ক্লান্ত বিরক্ত যদুবাবু আসিয়া বাড়ী পৌঁছলেন ও যা-হয় দুটি মুখে দিয়াই শয্যা আশ্রয় করিলেন।

পরদিন স্কুলে ক্লার্কওয়েল সাহেব জ্যোতির্ব্বিনোদ মহাশয়কে ডাকাইয়া বলিলেন, পণ্ডিত, তুমি মেমসাহেবের কাছে কেন গিয়েছিলে? চাকরি তোমার বন্ধ আছে আমার হুকুমে, তা রদ হবে না।

জ্যোতির্ব্বিনোদ ইংরেজী বোঝেন না, কিন্তু আন্দাজ করিয়া লইলেন, সাহেবকে মেমসাহেব কোন কথা বলিয়া থাকিবে, তাহার ফলেই এই ডাক। তিনি হাত জোড় করিয়া বলিলেন, সাহেব মা-বাপ, আপনি না রাখলে কে রাখবে? আমি এমন কাজ আর কখনও করব না।

হেডমাস্টারের মুখে ঈষৎ হাসির আভাস দেখিয়া জ্যোতির্ব্বিনোদের মনে আশ্বাস জাগিল।

সাহস পাইয়া তিনি হেডমাস্টারের টেবিলের সামনে আগাইয়া গিয়া বলিলেন, এবার আমায় মাপ করুন,—ব্রাহ্মণ—আমার অন্ন—

হেডমাস্টার টেবিলের উপর কিল মারিয়া বলিলেন, ব্রাহ্মণ আমি মানি না। আমার কাছে হিন্দু-মুসলমান সমান।

জ্যোতির্ব্বিনোদ চুপ করিয়া রহিলেন—ইংরেজী বুঝিয়াছিলেন বলিয়া নয়, টেবিলে কিল মারার দরুন ভাবিলেন, সাহেব যে কারণেই হোক চটিয়াছেন।

হেডমাস্টার ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, ওয়েল?

জ্যোতির্ব্বিনোদ পুনরায় হাত জোড় করিয়া বলিলেন, আমায় মাপ করুন এবার।

—আচ্ছা, যাও এবার, ও-রকম আর না হয়, তা হলে মাপ হবে না।

জ্যোতির্ব্বিনোদ সাহেবকে নমস্কার করিয়া আপিস হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

কিন্তু ব্যাপারটা অত সহজে মিটিল না। স্কুল বসিবার পর মিঃ আলম শুনিয়া হেডমাস্টারকে বুঝাইলেন, এরকম করিলেএ স্কুলে ডিসিপ্লিন রাখা যাইবে না—মাস্টাররা স্বভাবতই ফাঁকিবাজ

আরও ফাঁকি দিবে। অতএব সারকুলার বাহির করিয়া থার্ড পণ্ডিতকে মাপ করা হোক। কী জন্য সাস্‌পেণ্ড করা হইয়াছিল, তাহার কারণ এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্কতা অবলম্বন করিবার উপদেশ লিপিবদ্ধ করা থাক্ সারকুলার-বহিতে। ইহাতে পণ্ডিত জব্দ হইয়া যাইবে।

হেডমাস্টারের কর্ণদ্বয় মিঃ আলমের জিম্মায় থাকিত, সুতরাং সেই মর্মেই সারকুলার বাহির হইয়া গেল। অন্যান্য শিক্ষকেরা জ্যোতির্বিনোদকে ভয় দেখাইল, চাকুরি এবার থাকিল বটে, তবে বেশী দিনের জন্য নয়, এই সারকুলার স্কুলের সেক্রেটারি বা কমিটীর কোন মেম্বারের চোখে পড়িলেই চাকুরি যাইবে।

ক্ষেত্রবাবু পড়াইতেছেন, হেডমাস্টার সেখানে গিয়া পিছনের বেঞ্চির একটা ছেলেকে হঠাৎ ডাক দিয়া বলিলেন, তুমি কী বুঝেছ বল ?

সে কিছু শোনে নাই, পাশের ছেলের সঙ্গে গল্পে মত্ত ছিল, তীক্ষ্ণদৃষ্টি ক্লার্কওয়েলের নজর এড়ানো সহজ কথা নয়।

হেডমাস্টার ক্ষেত্রবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, ডোণ্ট্ সিট্ অন ইওর চেয়ার লাইক এ বাহাদুর—ছেলেরা কিছু শুনছে না। উঠে উঠে দেখুন, কে কী করচে না-করচে !

ক্ষেত্রবাবু ছেলেদের সামনে তিরস্কৃত হওয়ায় নিজেকে অপমানিত বিবেচনা করিলেন বটে ; কিন্তু সাহেবের কাছে বিনীতকণ্ঠে অঙ্গীকার করিতে হইল যে, তিনি ভবিষ্যতে দাঁড়াইয়া ও ক্লাসে পায়চারি করিতে করিতে পড়াইবেন।

সাহেবের জের এখানেই মিটিবার কথা নয়। সে দিন স্কুল ছুটির পর টীচারদের মীটিং আহূত হইল। সাহেবের উপদেশবাণী বর্ষিত হইল। ছেলেদের স্বার্থ বজায় রাখিয়া যিনি টিকিতে পারিবেন, এ স্কুলে তাঁহারই শিক্ষকতা করা চলিবে ; যাঁহার না পোষাইবে, তিনি চলিয়া যাইতে পারেন—স্কুলের গেট খোলা আছে।

বেলা সাড়ে পাঁচটায় হেডমাস্টারের সভা ভাঙিল। মাস্টারেরা বাহিরে আসিয়া নানা-প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। যদুবাবু লম্ফঝম্প শুরু করিলেন।

—রোজ রোজ এই বাজে হাঙ্গামা আর সহ্য হয় না—সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল—টিউ-শানিতে যাবার আগে আর বাসায় যাওয়া হবে না দেখছি, কবে যে আপদ কাটবে, নারায়ণের কাছে তুলসী দিই। আপনারা সব চুপ করে থাকেন, বলেনও না তো কোন কথা ! সবাই মিলে বললে কি সাহেবের বাবার সাধ্যি হয় এমন করবার ?

অন্য দুই-একজন বলিলেন, তা আপনিও তো কিছু বলুলেন না যদুদা !

—আমি বলব কি এমনি বলব ? আমি যে দিন বলব, সে দিন সাহেবকে ঠ্যালা বুঝিয়ে দেব, আর ঠ্যালা বুঝিয়ে দেব ওই অন্ত্যজটাকে—ও-ই কুপরামর্শ দেয়। আর সাহেবের মতে অমন আইডিয়াল টীচার আর হবে না ! মারো খ্যাংরা।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, সে তো বোঝাই যাচ্ছে, কিন্তু ওকে নড়ানো সোজা কথা নয়। সাহেব ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ, আর সবাই খারাপ, কেবল আলম ভাল—

হেডপণ্ডিত বৃদ্ধ লোক, স্মৃতিভ্রংশ ঘটায় অনেক সময় অনেকের নাম মনে করিতে পারেন না, বলিলেন : আর ভাল ওই মেমসাহেব—কী ওর যেন নামটা ?

—মিস সিবসন্।

—হ্যাঁ, ও খুব ভাল—

মাস্টাররা বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া পড়িলেন। ক্ষেত্রবাবু, যদুবাবু, নারাণবাবু ও ফণীবাবু প্রতিদিন ছুটির পরে নিকটবর্ত্তী ছোট চায়ের দোকানে চা খাইতেন। বহুদিনের যাতায়াতের ফলে পিটার লেনের মোড়ের এই চায়ের দোকানটির সঙ্গে তাঁহাদের অনেকের স্মৃতি জড়াইয়া গিয়াছে। নিকট দিয়া যাইবার সময় কেমন যেন মায়া হয়।

ক্ষেত্রবাবুর মনে পড়ে তাঁহার চার বছরের ছেলেটির কথা। সেবার একুশ দিন ভুগিয়া টাইফয়েড রোগে মারা গেল। কত কষ্টভোগ, কত চোখের জল ফেলা, কত বিনিদ্র রজনী যাপন! এই চায়ের দোকানে বসিয়া সহকর্মীদের সঙ্গে কত পরামর্শ করিয়াছেন, আজ পেট ফাঁপিল, কী করিতে হইবে; আজ কথা আড়ষ্ট হইয়া আসিতেছে, কী করিলে ভাল হয়! এই চায়ের দোকানের সামনে আসিলেই খোকার শেষের দিনগুলি চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে।

নারাণবাবুর স্মৃতি স্কুলের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট। আগের হেডমাস্টার ছিলেন অনুকূলবাবু। তিনি ছিলেন ঋষিকল্প পুরুষ। দুজনে মিলিয়া এই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন—খুব বন্ধুত্ব ছিল দুজনের মধ্যে। অনুকূলবাবুর অনুরোধে নারাণ চাটুজ্জে রেলের চাকরি ছাড়িয়া আসিয়া এই স্কুলে শিক্ষাব্রত গ্রহণ করেন। এই স্কুলকে কলিকাতার মধ্যে একটি নামজাদা স্কুল করিয়া তুলিতে হইবে, এই ছিল সঙ্কল্প। একদিন-দুইদিন নয়, দীর্ঘ পনেরো ষোলো বৎসর ধরিয়া সে কত পরামর্শ, কত আশা-নিরাশার দোলা, কত অর্থনাশের উদ্বেগ! একবার এমন সুদিনের উদয় হইল যে, নারাণবাবুদের স্কুল কলিকাতার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর স্কুল হইয়া গেল বুঝি। হেয়ার-হিন্দুকে ডিঙাইয়া সেবার এই স্কুলের এক ছাত্র ইউনিভার্সিটিতে প্রথম স্থান অধিকার করিল। নারাণবাবু দেড় শত টাকা বেতনে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইবেন, সব ঠিকঠাক—এমন সময় অনুকূলবাবু মারা গেলেন। সব আশা-ভরসা ফুরাইল। একরাশ দেনা ছিল স্কুলের, পাওনাদারেরা নালিশ করিল। গবর্নমেণ্ট-নিযুক্ত অডিটার আসিয়া রিপোর্ট করিল, স্কুলের রিজার্ভ ফণ্ডের টাকা ভূতপূর্ব্ব হেডমাস্টার তছরুপ করিয়াছেন। বাড়ীওয়ালা ভাড়ার দায়ে আসবাবপত্র বেচিয়া লইল। নতুন ছাত্র ভর্ত্তি হইবার আশা থাকিলে হয়তো এতটা ঘটিত না; কিন্তু ছাত্র আসিত অনুকূলবাবুর নামে, তিনিই চলিয়া গেলেন, স্কুলে আর রহিল কে? জানুয়ারি মাসে আশানুরূপ ছাত্রের আমদানি হইল না, কাজেই পাওনাদারদের উপায়ান্তর ছিল না।

হেডপণ্ডিত চা খান না, তবু মাস্টারদের সঙ্গে দোকানে বসিয়া গল্পগুজব করিয়া চা-পানের তৃপ্তি উপভোগ করেন আজ বহু বৎসর হইতে। বলিলেন, চলুন নারাণবাবু, চা খাবেন না? আসুন যদুবাবু, ক্ষেত্রবাবু—

মাস্টার মহাশয়দের এ দোকানে যথেষ্ট খাতির। নিকটবর্ত্তী স্কুলের মাস্টার বলিয়াও বটে, অনেক দিনের খরিদ্দার বলিয়াও বটে। দোকানী বেঞ্চ হইতে অন্য খরিদ্দারদের সরাইয়া দেয়, মাস্টার মহাশয়দের চায়ের প্রকৃতি কিরূপ হইবে, সে সম্বন্ধে খুঁটিনাটি প্রশ্ন করে, দুই-একটি ব্যক্তিগত প্রশ্নও করে আত্মীয়তা করিবার জন্য। অনেক সময় কাছে পয়সা না থাকিলে ধারও দেয়।

যদুবাবু বলিলেন, আমাকে একটু কড়া করে চা দিয়ো আদা দিয়ে।

নারাণবাবু বলিলেন, আমার চায়েও একটু আদা দিয়ো তো।

সকলের সামনে চা আসিল। সঙ্গে সঙ্গে পাশে একখানি করিয়া টোস্ট দিয়া গেল চায়ের পিরিচে প্রত্যেককে। দোকানীকে বলিতে হয় না, সে জানে, ইঁহারা কী খাইবেন, আজিকার খরিদ্দার তো নন।

স্কুলের হাড়ভাঙা খাটুনির পরে এবং যে যাহার টুইশানিতে যাইবার পূর্ব্বে এখানটিতে বসিয়া আধ ঘণ্টা ধরিয়া চা খাওয়া ও গল্পগুজব প্রত্যেকের পক্ষে বড় আরামদায়ক হয়। বস্তুত মনে হয় যে, সারাদিনের মধ্যে এই সময়টুকুই অত্যন্ত আনন্দের। যাঁহারা চারিটা বাজিবার পূর্ব্বে ঘড়ি দেখিতে পাঠান, তাঁহারা নিজেদের অজ্ঞাতসারে এই সময়টুকুরই প্রতীক্ষা করেন। তবে স্কুলমাস্টার হিসাবে ইঁহাদের দৃষ্টি সংকীর্ণ, জীবনের পরিধি সুপ্রশস্ত নয়, সুতরাং কথাবার্ত্তা প্রতিদিন একই খাত বাহিয়া চলে। সাহেব আজ অমুক ঘণ্টায় অমুকের ক্লাসে গিয়া কী মন্তব্য করিল, অমুক ছেলেটা দিন দিন খারাপ হইয়া যাইতেছে, অমুক অঙ্কটা এ ভাবে না করিয়া অন্য ভাবে কী করিয়া ব্ল্যাকবোর্ডে করা গেল ইত্যাদি।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, মাসটাতে ছুটিছাটা একেবারেই নেই, না নারাণবাবু ?

—কই আর। সেই ছাব্বিশে কী একটা মুসলমানদের পর্ব্ব আছে, তাও যে ছুটি দেবে কি না—

—ঠিক দেবে। মিঃ আলম আদায় করে নেবে।

—নাঃ, এক-আধ দিন ছুটি না হলে আর চলে না।

যদুবাবু বলিলেন, ওহে, হাফ কাপ একটা দাও তো। আজ চাটা বেশ লাগচে—

চার পয়সার বেশী খরচ করিবার সামর্থ্য কোন মাস্টারেরই নাই চায়ের দোকানে। যদুবাবুর এই কথায় দুই-একজন বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। নারাণবাবু বলিলেন, কি হে যদু, দমকা খরচ করে ফেললে যে !

—খাই একটু নারাণদা। আর কদিনই বা !

যদুবাবু একটু পেটুক ধরনের আছেন, এ কথা স্কুলে সবাই জানে। বাজার হাট ভাল করিয়া করিতে পারেন না পয়সার অভাবে, সামান্য বেতনে বাড়ীভাড়া দিয়া থাকিতে হয়—কোথা হইতে ভাল বাজার করিবেন ! তবে নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ পাইলে সেখানে দুইজনের খাদ্য একা উদরস্থ করেন, স্কুলে ইহা লইয়া নিজেদের মধ্যে বেশ হাসিঠাট্টা চলে।

নারাণবাবু বয়সে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবীণ, প্রবীণত্বের দরুণ অপেক্ষাকৃত বয়ঃকনিষ্ঠদের প্রতি

স্বাভাবিক স্নেহ জন্মিয়াছে তাঁহার মনে। তিনি ভাবিলেন, আহা, খাক, খেতে পায় না, এই তো স্কুলের সামান্য মাইনের চাকরি; ভালবাসে খেতে, অথচ কী ছাই বা খায়! মুখে বলিলেন, খাও আর একখানা টোস্ট। আমি দাম দেব। ওহে, বাবুকে একখানা টোস্ট দাও—এখানে।

যদুবাবু হাসিয়া বলিলেন, নারাণদা আমাদের শিবতুল্য লোক। তা দাও আর একখানা, খেয়ে নিই।

খাওয়া শেষ করিয়া সকলে বিড়ি বাহির করিলেন। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন দেশলাই পয়সায় দুইটা; তৎসত্ত্বেও কেহ দেশলাই রাখেন না পকেটে, দোকানীর নিকট হইতে চাহিয়া কাজ সারিলেন।

নারাণবাবু বলিলেন, চল যাই, ছটা বাজে।

যদুবাবু বলিলেন, বাসায় আর যাওয়া হল না, এখন যাই গিয়ে শাঁকারিটোলা, টুকি ছাত্রের বাড়ী।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, আমি যাব সেই ক্যানাল রোড, ইটিলি—আমার ছাত্রেরা আবার সেখানে উঠে গিয়েচে।

নারাণবাবুও ছেলে পড়ান, তবে বেশী দূরে নয়, নিকটেই প্রমথ সরকারের লেনে, সরকারদের বাড়ীতেই। বাহিরের ঘরে বুড়া যোগীন সরকার বসিয়া আছেন, নারাণবাবুকে দেখিয়া বলিলেন, আসুন, মাস্টারমশায় আসুন। তামাক খান। বসুন।

—চুনি পান্না খেলে বাড়ী ফিরেচে?

—চুনি ফিরেচে, পান্নার দেখা নেই এখনও। হতচ্ছাড়া ছেলে মাঠে একবার গেলে তো কাণ্ডজ্ঞান থাকে না—বলই পিটছে, বলই পিটছে! দুটো নাতিই সমান। বসুন, তামাক খান, আসচে।

কিন্তু ছাত্রেরা না-আসিলে চলে না। নারাণবাবুকে দুইটা টুইশানি সারিয়া আবার স্কুলে ফিরিতে হইবে, নিজের হাতে রান্নাবান্না করিতে হইবে, কিছুক্ষণ সাহেবের সঙ্গে বসিয়া মোসাহেবী গল্পও করিতে হইবে।

এমন সময়ে চুনি আসিয়া ডাকিল, মাস্টারমশায়, আসুন।

চুনি তেরো বছরের বালক, সিক্স্‌থ ক্লাসে পড়ে। নারাণবাবু নিঃসন্তান, বিপত্নীক—ছেলেটিকে বড় স্নেহ করেন। চুনি দেখিতেও খুব সুন্দর ছেলে, টক্‌টকে ফরসা রঙ, লাবণ্য-মাখা মুখখানি, তবে স্বভাব বিশেষ মধুর নয়। কথায় কথায় রাগ, স্নেহ-ভালবাসার ধার ধারে না—কেহ স্নেহ করিলে বোঝেও না, সুতরাং প্রতিদানেরও ক্ষমতা নাই। বড়লোকের ছেলে, একটু গর্ব্বিতও বটে।

চুনি নিজের পড়ার ঘরে আসিয়া বলিল, আজ একগাদা অঙ্ক দিয়েছেন ক্ষেত্রবাবু, আমায় সব বলে দিতে হবে।

—হবে, বার কর্ খাতা বই।

—আপনি কখন চলে যাবেন ?

—কেন রে ?

—আজ আধ ঘণ্টা বেশী থাকতে হবে স্যার্।

—থাকব, থাকব। তোর যদি দরকার হয়, থাকব না কেন ? তোর কথা ফেলতে পারি না—

—মাস্টার বাড়ীতে রাখা ওই জন্যেই তো। এতগুলো করে টাকা মাইনে দিতে হয় আমাদের ফি মাসে শুধু প্রাইভেট মাস্টারদের—কাকা বলছিলেন আজ সকালে।

কথাটা নারাণবাবুর লাগিল। তিনি আত্মীয়তা করিতে গেলে কি হইবে ? চুনি সে সব বোঝে না, উড়াইয়া দেয়—পয়সা দেখায়।

ধমক দিয়া বলিলেন, তোর সে কথায় থাকার দরকার কী চুনি ? অমন কথা বলতে নেই টীচারকে। ছিঃ !

চুনি অপ্রতিভ মুখে নিচু হইয়া খাতার পাতা উল্টাইতে লাগিল। সুন্দর মুখে বিজলির আলো পড়িয়া উহাকে দেববালকের মত লাবণ্য-ভরা অথচ মহিমময় দেখাইতেছে। ইহারা আসে কোথা হইতে, কোন্ স্বর্গ হইতে ? কে ইহাদের মুখ গড়ায় চাঁদের সব সুষমা ছানিয়া ছাঁকিয়া নিঙড়াইয়া ?

নারাণবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। কোথায় যেন পড়িয়াছিলেন, কোন্ কবির লেখা একটি ছত্র—'যৌবনেরে দাও রাজটিকা'—

সত্য কথা। যৌবন পার হইয়া গিয়াছে বহুদিন, আজ আটান্ন বছর বয়স—ষাটের দুই কম। ডাক তো আসিয়াছে, গেলেই হয়। কী করিলেন সারা জীবন ? স্কুল-স্কুল করিয়া সব গেল। নিজের বলিতে কিছু নাই। আজ যদি চুনির মত একটা ছেলে—

'যৌবনেরে দাও রাজটিকা'—সারা দুনিয়ার সমস্ত আশা-ভরসা আমোদ-আহ্লাদ আজ অপেক্ষমাণ বশ্যতার সঙ্গে এই বালকের সম্মুখে বিনম্রভাবে দাঁড়াইয়া, কত কর্ম্মভার-বিপুল দিবসের সঙ্গীত বাজিবে উহার জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, কত অজানা অনুভূতির বিকাশ ও কর্ম্ম-প্রেরণা ! চুনির সঙ্গে জীবন বিনিময় করা যায় না—এই তেরো বছরের বালকের সঙ্গে ?

—স্যার্, ছুটির ইংরিজি কী হবে ? আজ আমাদের ছুটি—এর কী ট্রান্স্লেশন করব স্যার্ ?

—আজ আমাদের ছুটি, আজ আমাদের ছুটি—কিসের মধ্যে আছে দেখি ? বেশ। কর। আজ—টু-ডে, আমাদের—আওয়ার, ছুটি—হলি-ডে—।

—টু-ডে আওয়ার হলি-ডে ?

—দূর, ক্রিয়া কই ! ইংরিজীতে ভার্ব না দিলে সেণ্টেন্স হয় কখনও ? কতবার বলে দিয়েছি না ?

এমন সময় ঘরে ঢুকিল পান্না—চুনির ছোট ভাই। তাহার বয়স এগারো, কিন্তু চুনির চেয়েও সে দুষ্ট ও অবাধ্য, বাড়ীর কাহারও কথা শোনে না, কেবল নারাণবাবুকে একটু

ভয় করিয়া চলে ; কারণ স্কুলে নারাণবাবুর হাতে বড় মার খায়। ইহাকে তিনি তত ভালবাসেন না।

পান্না ঘরে ঢুকিয়া অপরাধীর দৃষ্টিতে মাস্টারের দিকে চাহিল, তারপর শেল্ফের কাছে গেল বই বাহির করিতে।

নারাণবাবু কড়া স্বরে বলিলেন, কোথায় ছিলে ?

—খেলছিলাম স্থার্।

—কটা বেজেছে হুঁশ আছে ?

পড়ার ঘরেই ঘড়ি আছে দেওয়ালে। পান্না সে দিকে চাহিয়া দেখিল, সাড়ে ছয়টা বাজিয়াছে। সুতরাং সে বলিল, সাড়ে ছটা স্থার্।

—হুঁঃ, গাধা কোথাকার। সাড়ে ছটা, না, সাড়ে সাতটা ? বল্ কটা বেজেছে ? ভাল করে দেখে বল্।

—সাড়ে সাতটা।

—ঠিক হয়েচে। এই বল খেলে এলে ! কাল পড়া না হলে তোমার কী করি দেখো।

চুনি বলিল, স্থার্, আজ দুপুরে বেরিয়ে গিয়েচে, এই এল।

পান্না দাদার দিকে চাহিয়া বলিল, লাগানো হচ্ছে স্থারের কাছে ? তোর ওস্তাদি আমি বার করে দেব বলচি।

—দে না দেখি ? তোর বড় সাহস !

—এই মারলাম। কী করবি তুই ?

নারাণবাবু বৃদ্ধ, দুই বলিষ্ঠ বালকের মধ্যে পড়িয়া যুদ্ধ তো থামাইতে পারিলেনই না, অধিকন্তু চশমাটি চূর্ণবিচূর্ণ হইবার সম্ভাবনা প্রবল হইয়া উঠিল।

দেখিতে দেখিতে পান্না ড্রয়ারের ভিতর হইতে টর্চলাইট বাহির করিয়া চুনির মাথায় এক ঘা বসাইয়া দিল। ফিন্‌কি দিয়া রক্ত ছুটিল।

চুনি হাউমাউ করিয়া কাঁদিবার ছেলে নয়, সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল ; নারাণবাবু হাঁ-হাঁ করিয়া আসিয়া পড়িতে না পড়িতে এই কাণ্ডটি ঘটিয়া গেল।

গোলমাল শুনিয়া চুনি-পান্নার মা, বিধবা পিসী ও দুই ভাই-বউ অন্তঃপুরের দিকের ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। চুনিকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহারা কোন উত্তর না পাইয়া মাস্টারের উদ্দেশে নানাপ্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল—ও মা, মাস্টার তো বসে আছে, তার চোখের সামনে ছেলেটাকে একেবারে খুন করে ফেললে গো !

অন্য একটি বধূ মন্তব্য করিল, মাস্টারকে মানে না দিদি, ছেলেগুলো ভারি দুষ্টু।

চুনির মা বলিলেন, মাস্টার বসে বসে আফিম খেয়ে ঝিমোয়, তা ওকে মানবে কী করে ?

নারাণবাবু মনে মনে ক্ষুব্ধ হইলেও মুখে বাড়ীর স্ত্রীলোকদের উদ্দেশে কী বলিবেন ? কে তাঁহাকে আফিম খাওয়াইয়াছে শুনিবার তাঁহার বড় কৌতূহল হইল।

চুনিকে লইয়া তাহার মা ও পিসীমা চলিয়া গেলে নারাণবাবু রাগের মাথায় পান্নাকে গোটা দুই চড় কষাইলেন, সে চুপ করিয়া রহিল। বাড়ীর মধ্যে খুব একটা গোলমাল হইল কিছুক্ষণ ধরিয়া, তাহার পর ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মাথায় চুনি এক পেয়ালা চা হাতে বাহিরের ঘরে আসিয়া হাজির হইল। সব মিটিয়া গেল, দুই ভাইয়ের সম্মিলিত উচ্চ কণ্ঠস্বরে নৈশ-গগন বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

চুনির মুখের দিকে চাহিয়া নারাণবাবুর বড় মায়া হইল। অবোধ বালক! কেন মারামারি করে তাও জানে না, নিজের ভালমন্দ নিজেরা বোঝে না। মিছামিছি, সন্ধ্যার সময় মার খাইয়া মরিল!

স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, লেগেছে চুনি খুব?

চুনি বলিল, আধ ইঞ্চি ডিপ্ হয়ে কেটে গিয়েচে।

—ব্যাণ্ডেজ বাঁধলে কে?

—পিসীমা।

—উনি জানেন?

—চমৎকার জানেন। কেন, ভাল হয় নি?

নারাণবাবুর ইচ্ছা হইল, চুনিকে কোলে টানিয়া লইয়া আদর করেন, তাহাকে সান্ত্বনা দেন। কিন্তু লজ্জায় পারিলেন না। চুনি ঘ্যান্‌ঘেনে ধরনের ছেলে নয়; মার খাইয়া নালিশ করিতে জানে না। এই রকম 'স্টোইক' ধরনের ছেলে নারাণবাবু তাঁর দীর্ঘ শিক্ষক-জীবনে যতগুলি দেখিয়াছেন, এক অঙ্গুলির পর্ব্বগুলির মধ্যেই তাহাদের গণনার পরিসমাপ্তি ঘটে। চুনি সেই অতি অল্পসংখ্যক ছেলেদের একজন। চুনিকে এই জন্যই এত ভাল লাগে তাঁর!

এই সময় চুনির বাবা বাহির হইতে আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, মাস্টার যে। ও কী, ওর মাথায় কী?

নারাণবাবু সব কথা বলিলেন।

চুনির বাবার হৃদ্যতা কর্পূরের মত উবিয়া গেল। তিনি বিরক্তির সুরে বলিলেন, আপনি বসে থাকেন, আর প্রায়ই আপনার চোখের সামনে এ রকম কুরুক্ষেত্র কাণ্ড ঘটে, আপনি দেখেন না?

—আজ্ঞে, দেখব না কেন? সামান্য কথাবার্ত্তা থেকে মারামারি। আমি এসে পড়ে ছাড়িয়ে দিই, তবে—

—আপনি একটু ভাল করে দেখাশুনো করবেন বলেই তো রাখা। নইলে গ্র্যাজুয়েট মাস্টার দশ টাকাতেও পাওয়া যায়। দুবেলা পড়াবে।

—আজ্ঞে, আমি দেখি। দেখি না, তা ভাববেন না।

—আমি সব সময় দেখতে পারি নে, নানা কাজে ঘুরি। কিন্তু আপনার দ্বারা দেখচি—আপনার বয়স হয়েছে।

এই সময় চুনি যদি তাহার বাবাকে বলিত—বাবা, স্যারের কোন দোষ নেই, আমারই সব দোষ, তাহা হইলে নারাণবাবুর মনের মত কাজ হইত; নারাণবাবু এই ভাবিয়া সপ্তস্বর্গ প্রাপ্ত হইতেন যে, চুনি তাঁহার অগাধ স্নেহের প্রতিদান দিল।

কিন্তু যাহা আশা করা যায়, তাহা হয় না।

চুনি চুপ করিয়া রহিল। বাবাকে তাহারা দুই ভাই যমের মত ভয় করে।

চুনির বাবা বলিলেন, মাস্টার, বোস। আমি আসচি, চা খেয়েচ?

এইবার চুনি মুখ তুলিয়া বলিল, হাঁ বাবা, আমি এনে দিয়েছি।

চুনির এ কথাটা নারাণবাবুর ভাল লাগিল না। চুনি এ কথা কেন বলিতেছে, নারাণবাবু তাহা বুঝিতে পারিলেন। পাছে তাহার বাবা গিয়া আর এক কাপ চা মাস্টারের জন্য পাঠাইয়া দেন, সে জন্য। কেন এক পেয়ালা চা বেশী দেওয়া হইবে মাস্টারকে।

নারাণবাবু বাসায় ফিরিলেন, তখন রাত নয়টা। নিজের ছোট ঘরটার চাবি খুলিয়া রান্না চাপাইয়া দিলেন, তারপর যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণখানা লইয়া পড়িতে বসিলেন। এই সময়টাই বেশ লাগে সারাদিনের খাটুনির পরে। আজ স্কুলে এই ঘরে নারাণবাবু আছেন উনিশ বছর। বহুকাল হইল তাঁহার পত্নী স্বর্গগমন করিয়াছেন, নারাণবাবু আর বিবাহ করেন নাই—পত্নীর স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য যত না হোক, গরিব-স্কুল-মাস্টার-জীবনে খরচ চালাইতে পারিবেন না বলিয়াই বেশী।

উনিশ বৎসরের কত স্মৃতি এই ঘরের সঙ্গে জড়ানো।

যখন প্রথম এই স্কুলে অনুকূলবাবু তাঁহাকে লইয়া আসেন, তখন এই ঘরে আর একজন বৃদ্ধ মাস্টার ভুবনবাবু থাকিতেন। ভুবনবাবুর বাড়ী ছিল মুর্শিদাবাদ—ভদ্রলোক বিবাহ করেন নাই, সংসারে এক বিধবা ভগ্নী ছাড়া তাঁহার আর কেহ ছিল না। একদিন বিছানায় লোকটি মরিয়া পড়িয়া ছিল এই ঘরেই। স্কুলের খরচে ভুবনবাবুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

নারাণবাবু ভাবেন, তাঁহার অদৃষ্টেও তাহাই নাচিতেছে। তাঁহারও কেহ নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ভাই নাই, ভগ্নী নাই—এই ঘরটি আশ্রয় করিয়া আজ বহুদিন কাটাইয়া দিলেন। এখন এমন হইয়া গিয়াছে, এই ঘর ও এই স্কুলের বাহিরে তাঁহার যেন আর কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। জীবনের একমাত্র কর্ম্মক্ষেত্র এই স্কুল। স্কুলের বিভিন্ন ক্লাসে রুটিন অনুযায়ী কোন্‌দিন কী পড়াইবেন, নারাণবাবু সকালে বসিয়া ঠিক করেন।

কাল থার্ড ক্লাসে ললিত ছেলেটা ইংরেজী গ্রামারের 'দি'র ব্যবহার সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছে, নারাণবাবুর প্রাণে তাহাতে এমন একটা ধাক্কা লাগিয়াছে, সে বেদনা নিতান্ত বাস্তব। নারাণবাবু জানেন যে 'দি' ব্যবহার করিতে না পারিলে থার্ড ক্লাসের ছেলে হইয়া সে ইংরেজী ব্যাকরণ শিখিল কী? কাল নারাণবাবু তখনই নোট-বইতে লিখিয়া লইয়াছেন, "থার্ড ক্লাস, ললিতমোহন কর, ডেফিনিট্ আর্টিকল 'দি'।"—এইটুকু মাত্র দেখিলেই তাঁহার মনে পড়িবে।

তাহার পর আজ সেই ললিতকে ঝাড়া আধ ঘণ্টা ধরিয়া জিনিসটা শিখাইয়া দিলেন,

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কিছুই হইল না। ললিত কর 'যে আঁধারে সে আঁধারে'ই রহিয়াছে। কী করা যায় ? তাঁহার শিখাইবার প্রণালীর কোন দোষ ঘটিতেছে নিশ্চয়। কী করিলে ললিত ছোঁড়াটা 'দি'র ব্যবহার শিখিতে পারে ?

নারাণবাবু হুঁকায় তামাক খাইতে খাইতে চিন্তা করিতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল সেভেন্থ্ ক্লাসের পূর্ণ চক্রবর্ত্তী, মাত্র নয় বছরের ছেলে, এত মিথ্যা কথাও বলে ! কত দিন মারিয়াছেন, নিষেধ করিয়াছেন, হেডমাস্টারের আপিসে লইয়া যাইবার ভয় দেখাইয়াছেন ; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কোনও ফল হয় নাই। ছেলেটার সম্বন্ধে কি অভিভাবকের নিকট একখানা চিঠি দিবেন ? তাহাতেই বা কী সুফল ফলিবে ? না হয় চিঠি পাইয়া ছেলের বাপ ছেলেকে ধরিয়া ঠ্যাঙাইলেন, তাহাতেই ছেলে ভাল হইয়া যাইবে বলিয়া তো মনে হয় না। কী করা যায় ?

নারায়ণবাবুর সম্মুখে এই সব সমস্যা প্রতিদিন দুই-একটা থাকেই। মাঝে মাঝে এগুলি লইয়া তিনি ক্লার্কওয়েল সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করিতে যান।

সাহেব সন্ধ্যার সময় মোটরে ছেলে পড়াইতে বাহির হন, ফিরিবার অল্পক্ষণ পরেই রাত নয়টা কি সাড়ে নয়টার সময়ে নারাণবাবু সাহেবের দরজায় গিয়া কড়া নাড়িলেন।

—কে ? কী, নারাণবাবু ? ভেতরে এস।

—স্যার্, আপনার খাওয়া হয়েছে ?

—এই এখুনি খেতে বসব। এক পেয়ালা কফি খাবে ?

—তা—তা—

—বাবুকে এক পেয়ালা কফি দাও। বোস। কী খবর ?

—স্যার্, আপনার কাছে এসেছিলাম একটা খুব জরুরী দরকার নিয়ে। একবার আপনার সঙ্গে পরামর্শ করব। ওই থার্ড ক্লাসের ললিত কর বলে ছেলেটা—'দি'র ব্যবহার কিছুই জানে না, এত দিন পরে আবিষ্কার করলাম। কাল কত চেষ্টাই করেছি, কিন্তু শেখানো গেল না। কী করা যায় বলুন তো ?

ক্লার্কওয়েল সাহেব অত্যন্ত কর্ত্তব্যপরায়ণ হেডমাস্টার। এসব বিষয়ে নারাণবাবু তাঁহার শিষ্য হইবার উপযুক্ত। ক্লার্কওয়েল খাওয়া-দাওয়া ভুলিয়া গেলেন। নিজের টেবিলে গিয়া ড্রয়ার টানিয়া একখানা খাতা বাহির করিয়া নারাণবাবুকে দেখাইয়া বলিলেন, আমারও একটা লিস্ট আছে এই দেখ, ফার্স্ট ক্লাসের কত ছেলে ও-জিনিসটার ব্যবহার ঠিকমত জানে না আজও। আরও কত নোট করেছি দেখ। তবে একটা প্রণালীতে আমি বড় উপকার পেয়েছি, তোমাকে সেটা—এই পড়।—বলিয়া ক্লার্কওয়েল নিজের নোট-বইখানা নারাণবাবুর হাতে দিলেন।

মিস্ সিবসন্ ওদিকের দরজা দিয়া ঘরে ঢুকিয়া নারাণবাবুকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, ও নারাণবাবু ! আমাদের সঙ্গে ডিনার খাবে ? হাউ সুইট্ অফ্ ইউ !

নারাণবাবু বিনীতভাবে জানাইলেন, তিনি ডিনার খাইতে আসেন নাই।

ক্লার্কওয়েল মেমসাহেবের দিকে চাহিয়া বলিলেন, এই স্কুলে দুজন টীচার আছে, যারা টীচার নামের উপযুক্ত—নারাণবাবু আর মিঃ আলম। ইনি এসেছেন ললিতকে কী করে 'দি'র ব্যবহার শেখানো যায়, তাই নিয়ে। আর কজন আছে আমাদের স্কুলের মধ্যে, যাঁরা এ সব নিয়ে মাথা ঘামান?

মেমসাহেব হাসিয়া বলিল, ইউ ডিজার্ভ এ স্লাইস্ অফ্ মাই হোম-মেড্ কেক্ নারাণবাবু, ইউ ডু। একটা কেকের খানিকটা কাটিয়া প্লেটে নারাণবাবুর সামনে রাখিয়া মেমসাহেব বলিল, ইট্ ইট্ য়্যাণ্ড প্রেজ ইট্।

নারাণবাবু বিনয়ে বাঁকিয়া দুমড়াইয়া হাত কচলাইতে কচলাইতে বলিলেন, ধন্যবাদ ম্যাডাম, ধন্যবাদ! চমৎকার কেক্! বাঃ, বেশ—

ক্লার্কওয়েল বলিলেন, আর কে কি রকম কাজ করে নারাণবাবু? টীচারদের মধ্যে—

নারাণবাবুর একটা গুণ, কাহারও নামে লাগানো-ভাঙানো অভ্যাস নাই তাঁহার। মিঃ আলম যে স্থলে অন্তত তিন জন টীচারকে ফাঁকিবাজ বলিয়া দেখাইত, সেখানে নারাণবাবু বলিলেন, কাজ সবাই করে প্রাণপণে, আর সবাই বেশ খাটে।

হেডমাস্টার হাসিয়া বলিলেন, ইউ আর য়্যান্ ওল্ড ম্যান্ নারাণবাবু। তুমি কারও দোষ দেখ না—ওই তোমার মস্ত দোষ। আমি জানি, কে কে আমার স্কুলে ফাঁকি দেয়। আমি জানি নে ভাব? নাম আমি করছি নে—নাম করা অনাবশ্যক—কারণ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাদের নাম তোমার কাছেও অজ্ঞাত নয়। আচ্ছা, যাও—

মেমসাহেব বলিল, ভাল কেক্?

নারাণবাবু বলিলেন, চমৎকার কেক্ ম্যাডাম, অদ্ভুত কেক্।

মেমসাহেব বলিল, আমার বাপের বাড়ী শ্রপশায়ারে, শুধু সেইখানে এই কেক্ তৈরী হয় তোমায় বলছি। তাও দুখানা গাঁয়ে—নরউড্ আর বার্কলে-সেণ্ট-জন্—পাশাপাশি গাঁ। কলকাতার দোকানে যে কেক্ বিক্রি হয়, ও আমি খাই নে!

নারাণবাবু আর এক প্রস্থ বিনীত হাস্য বিস্তার করিয়া বিদায় লইলেন···আজ অনুকূলবাবু নাই, কিন্তু সাহেব ও মেম আসাতে নারাণবাবু খুশীই আছেন। স্কুলের কি করিয়া উন্নতি করা যায় সে দিকে সাহেবের সর্ব্বদা চেষ্টা, তবে দোষও আছে। টাকাকড়ি সম্বন্ধে সাহেব তেমন সুবিধার লোক নয়। মাস্টারদের মাহিনা দিতে বড় দেরি করে, নানা রকমে কষ্ট দেয়—তার একটা কারণ, স্কুলের ক্যাশ সাহেবের কাছে থাকে, সাহেবের বেজায় খরচের হাত—খরচ করিয়া ফেলে, অবশ্য স্কুলের বাবদই খরচ করে, শেষে মাস্টারদের মাহিনা দিতে পারে না সময়মত।

মোটের উপর কিন্তু সাহেব স্কুলের পক্ষে ভালই। বড় কড়াপ্রকৃতির বটে, শিক্ষকদের বিষয়ে অনেক সময় অন্যায় অবিচার যথেষ্ট করিয়া থাকে, যমের মত ভয় করে সব মাস্টার; কিন্তু স্কুলের স্বার্থ ও ছেলেদের স্বার্থের দিকে নজর রাখিয়াই সে-সব করে সাহেব। নারাণবাবু তাই চান, স্কুলের উন্নতি লইয়াই কথা।

যদুবাবুর আজ মোটে বিশ্রামের অবকাশ নাই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া খাটুনি চলিতেছে, দুইজন শিক্ষক আসেন নাই, তাঁহাদের ঘণ্টাতেও খাটিতে হইতেছে। একটা ঘণ্টার শেষে মিনিট পনেরো সময় চুরি করিয়া যদুবাবু তেতলায় শিক্ষকদের বিশ্রাম-কক্ষে ঢুকিলেন, উদ্দেশ্য ধূমপান করা।

গিয়া দেখিলেন, হেডপণ্ডিত ও ক্ষেত্রবাবু বসিয়া আছেন। তেতলার এই ঘরটি বেশ ভাল, বড় বড় জানালা চারিদিকে, চওড়া ছাদ, ছাদে দাঁড়াইলে সেণ্ট পলের চূড়া, জেনারেল পোস্ট আপিসের গম্বুজ, হাইকোর্টের চূড়া, ভিক্টোরিয়া হাউস প্রভৃতি তো দেখা যায়ই, বিশাল মহাসমুদ্রের মত কলিকাতা নগরী অসংখ্য ঘরবাড়ীর ঢেউ তুলিয়া এই ক্ষুদ্র স্কুল-বাড়ীকে যেন চারিধার হইতে ঘিরিয়াছে মনে হয়; নীচে ওয়েলেসলি স্ট্রীট দিয়া অগণিত জনস্রোত ও গাড়ীঘোড়ার ভিড়, ট্রামের ঘণ্টাধ্বনি, ফিরিওয়ালার হাঁক,—বিচিত্র ও বৃহৎ জীবনযাত্রার রহস্যে সমগ্র শহর আপনাতে আপনি-হারা—থমথমে দুপুরে যদুবাবু মাঝে মাঝে বিড়ি খাইতে খাইতে শিক্ষকদের ঘরের জানালা দিয়া চাহিয়া দেখেন।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, কী যদুদা, বিশ্রাম নাকি?

—না ভাই, পরিশ্রম। একটা বিড়ি খেয়ে যাই।

—আমাকেও একটা দেবেন।

হেডপণ্ডিতের দিকে চাহিয়া যদুবাবু বলিলেন, কাল একটা ছুটি করিয়ে নাও না দাদা, সাহেবের কাছ থেকে। কাল ঘণ্টাকর্ণপুজো—

হেডপণ্ডিত হাসিয়া বলিলেন, হ্যাঃ, ঘণ্টাকর্ণপুজোর আবার ছুটি—তাই কখনও দেয়!

—কেন দেবে না? তুমি বুঝিয়ে বোল, তুমিই তো ছুটির মালিক।

—না না, সে দেবে না।

—বলেই দেখ না দাদা। বল গিয়ে, হিন্দুর একটা মস্ত বড় পরব।

—ভাল, তোমাদের কথায় অনেক কিছুই বললুম। তোমরা শিখিয়ে দিলে যে, রামনবমী আর পুজো প্রায় সমান দরের পরব। রাস, দোল, ষষ্ঠীপুজো, মাকালপুজো—তোমরা কিছুই বাদ দিলে না। আবার ঘণ্টাকর্ণপুজোর জন্যে ছুটি চাই,—কী বলে—

—যাও যাও, বলে এস, তুমি বললেই হয়।

ক্ষেত্রবাবু ছাদের এক ধারে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, ওহে, খুকীর বর কাল এসে গেচে?

যদুবাবু ও হেডপণ্ডিত একসঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, সত্যি? এসে গেচে?

—ওই দেখুন না, বসে আছে।

—যাক, বাঁচা গেল। আহা, মেয়েটা বড্ড কষ্ট পাচ্ছিল!

এই উঁচু তেতলার ছাদের ঘরে বসিয়া চারিপাশের অনেক বাড়ীর জীবনযাত্রার সঙ্গে ইঁহাদের প্রত্যক্ষ পরিচয়। বাড়ির মালিকের নাম-ধাম পর্যন্ত জানা নাই—অথচ ক্ষেত্রবাবু জানেন, ওই হলদে রঙের তেতলা বাড়ীটার বড় ছেলে গত কার্ত্তিক মাসে মারা গেল, বেশ

কোট-প্যাণ্ট পরিয়া কোথায় যেন চাকুরি করিত, বাড়ীর গিন্নীর আছাড়িবিছাড়ি মর্ম্মভেদী, কান্না। টিফিনের অবকাশে এখানে বসিয়া দেখিয়া ক্ষেত্রবাবুর ও জ্যোতির্ব্বিনোদ মহাশয়ের চোখে জল আসিয়াছিল।

এই যে খুকীর বর আসিল, ইঁহারা জানেন, ষোল-সতেরো বছরের সুন্দরী কিশোরী, বাড়ীর ওই জানালাটিতে আনমনে বসিয়া পথের দিকে চাহিয়া থাকিত, আপন মনে চোখের জল ফেলিত। জ্যোতির্ব্বিনোদ মহাশয় এই ঘরেই থাকেন। তিনি বলেন, রাত্রে ছাদে মেয়েটি পায়চারি করিয়া বেড়াইত, এক-একবার কেহ কোন দিকে নাই দেখিয়া ছাদে উপুড় হইয়া প্রণাম করিয়া কী যেন মনে মনে মানত করিত। মেয়েটি যে অসুখী, সকলেই বুঝিতেন।—মেয়েটি বিবাহিতা, অথচ আজ এক বৎসরের মধ্যে তাহার স্বামীকে দেখা যায় নাই—কাজেই আন্দাজ করিয়াছিলেন, স্বামীর অদর্শনই মেয়েটির মনোদুঃখের কারণ। কী জাত, কী নাম, তাহা কেহই জানেন না ; অথচ এই অনাত্মীয়া, অজ্ঞাতকুলশীলা কিশোরীর দুঃখে প্রৌঢ় শিক্ষকদের মন সহানুভূতিতে ভরিয়া ছিল, যদিও অল্পবয়স্ক দুই-একজন শিক্ষক ইঁহাদের অসাক্ষাতে কিশোরীকে লক্ষ্য করিয়া এমন সব কথা বলিত, যাহা শোভনতার সীমা অতিক্রম করে।

মাঝে মাঝে জ্যোতির্ব্বিনোদ মহাশয় বলিতেন, আহা, কাল রাত্রে খুকী বড্ড কেঁদেছে একা একা ছাদে। হেডপণ্ডিত বলিতেন, ভাই, বড় তো মুশকিল দেখছি ! কী হয়েছে ওর বরের ? কোথায় গেল ?

কেহই কিছু জানেন না, অথচ মেয়েটির সুখদুঃখ তাঁহারা নিজের করিয়া লইয়াছেন। আজ ইঁহারা সত্যই খুশী—খুকীর বর আসিয়াছে। বিশেষ করিয়া হেডপণ্ডিত ও ক্ষেত্রবাবু।

হেডপণ্ডিতের মেয়ে রাধারাণী, প্রায় এই কিশোরীর সমবয়সী, আজ এক বৎসর হইল মারা গিয়াছে টাইফয়েড রোগে। মেয়েটির দিকে চাহিলেই নিজের মেয়ের কথা মনে পড়ে। বাপের অমন সেবা রাধারাণীর মত কেহ করিতে পারিত না। স্কুলের খাটুনির পরে বৈকালে বাড়ী ফিরিলে দেখিতেন, রাধা তাঁহার জন্য হাত-পা ধোয়ার জল ঠিক করিয়া রাখিয়াছে, হাত-পা ধোয়া হইলেই একটু জলখাবার আনিয়া দিবে, পাখা লইয়া বাতাস করিবে, কাছে বসিয়া কত গল্প করিবে—ঠিক যেন পাকা গিন্নী। তাহার একমাত্র দোষ ছিল, বায়োস্কোপ দেখিবার অত্যধিক নেশা। প্রায়ই বলিত, বাবা, আজ কিন্তু—

—না মা, এই সেদিন দেখলি, আজ আবার কী !

—তুমি বাবা জান না। কী সুন্দর ছবি হচ্ছে আমাদের এই চিত্রবাণীতে, সবাই দেখে এসে ভাল বলেছে বাবা।

—রোজ রোজ ছবি দেখতে গেলে চলে মা ? ক টাকা মাইনে পাই ?

—তা হোক বাবা, মোটে তো ন আনা পয়সা !

—ন আনা ন আনা—দেড় টাকা। তোর গর্ভধারিণী যাবে না ?

—মা কোথাও যেতে চায় না। তুমি আর আমি—

হেডপণ্ডিত ভাবিতেন, মেয়েটি তাঁহাকে ফতুর করিবে, বায়োস্কোপের খরচ কত যোগাইবেন তিনি এই সামান্য ত্রিশ টাকা বেতনের মাস্টারি করিয়া? উঃ, কী ভালই বাসিত সে ছবি দেখিতে। ছবি দেখিলে পাগল হইয়া যাইত, বাড়ী ফিরিয়া তিন দিন ধরিয়া তাহার মুখে অন্য কথা থাকিত না, ছবির কথা ছাড়া।

কোথায় আজ চলিয়া গেল! আজকাল দুই-একখানা ভাল বাংলা ছবি হইতেছে, ছবিতে কথাও কহিতেছে—এসব দেখিতে পাইল না মেয়ে। বায়োস্কোপের খরচ হইতে তাঁহাকে একেবারে মুক্তি দিয়া গিয়াছে।

যদুবাবু বলিলেন, তা যাও এ বেলা দাদা,—ছুটিটার জন্যে। তুমি গিয়ে বললেই হয়ে যাবে।

ইহাদের অনুরোধে হেডপণ্ডিত ভয়ে ভয়ে গিয়া হেডমাস্টারের আপিসে ঢুকিয়া টেবিলের সামনে দাঁড়াইলেন।

ক্লার্কওয়েল সাহেব কী লিখিতেছিলেন, মুখ তুলিয়া বলিলেন, হোয়াট? পাণ্ডিট্! সিওরলি ইট্ ইজ নট্ এ হলিডে ইউ হ্যাভ্ কাম টু আস্ক ফর্?

হেডপণ্ডিত বলিলেন, কাল ঘণ্টাকর্ণপুজো স্যার্

সাহেব বলিলেন, হোয়াট ইজ দ্যাট? ঘণ্টা—

—ঘণ্টাকর্ণ। হিন্দুর এত বড় পর্ব্ব আর নেই।

—ও ইউ নটি ফেলো, তুমি প্রত্যেক বারই বল এক কথা।

—না স্যার্, পাঁজিতে লেখে—

—ওয়েল, আই আণ্ডারস্ট্যাণ্ড ইট্,—হবে না, কী পুজো বললে? ওতে ছুটি হবে না।

হেডপণ্ডিত বুঝিলেন তাঁহার কাজ হইয়া গিয়াছে। সাহেব প্রত্যেক বারই ও-রকম বলেন, শেষ ঘণ্টায় দেখা যাইবে, স্কুলের চাকর সারকুলার-বই লইয়া ক্লাসে ক্লাসে ঘুরিতেছে।

হেডপণ্ডিত ফিরিয়া আসিলে মাস্টারেরা তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

ক্ষেত্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কী হল দাদা?

যদুবাবু বলিলেন, কার্যসিদ্ধি?

—দাঁড়াও দাঁড়াও, হাঁপ জিরিয়ে নিই। সাহেব বললে, হবে না।

—হবে না বলেছে তো? তা হলে ও হয়ে গিয়েচে। বাঁচা গেল দাদা, মলমাস যাচ্ছিল, তবুও ঘণ্টাকর্ণের দোহাই দিয়ে—

—এখনও অত হাসিখুশির কারণ নেই। যদি পাশের স্কুলে জিজ্ঞেস করতে পাঠায় তবেই সব ফাঁক। আমি বলেছি, হিন্দুর অত বড় পর্ব্ব আর নেই। এখন যদি অন্য স্কুলে জানতে পাঠায়?

ছোকরা উমাপদবাবু বলিলেন, যদি তারাও ঘণ্টাকর্ণপুজোয় ছুটি দেয়?

হেডপণ্ডিত হাসিয়া বলিলেন, ঘণ্টাকর্ণপুজোর ছুটি কে দেবে, রামোঃ!

কিন্তু সাহেবের ধাত সবাই জানে। শেষ ঘণ্টা পর্য্যন্ত মাস্টারের দল দুরু দুরু বক্ষে অপেক্ষা করিবার পরে সকলেই দেখিল, স্কুলের চাকর ছুটির সারকুলার লইয়া ক্লাসে ক্লাসে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে।

যদুবাবুর ক্লাস সিঁড়ির পাশেই। তিনি বলিলেন, কী রে, কী ওখানে?

চাকর একগাল হাসিয়া বলিল, কাল ছুটি আছে, সারকুলার বেরিয়েছে।

—সত্যি নাকি? দেখি, নিয়ে আয় এদিকে।

চোখকে বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু সত্যিই বাহির হইয়াছে:

The School will remain closed tomorrow the 9th inst. for the great Hindu festival, Ghanta Karan Puja."

কিছুক্ষণ পরে ছুটির ঘণ্টা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলের দল মহাকলরব করিয়া বাহির হইয়া গেল।

যদুবাবুকে ডাকিয়া হেডমাস্টার বলিলেন, আপনি আর ক্ষেত্রবাবু ফোর্থ ক্লাসের ছেলেদের মিউজিয়াম আর জু'তে বেড়াতে নিয়ে যেতে পারবেন?

—খুব স্যার।

—দেখবেন, যেন ট্রাম থেকে পড়ে না যায়—একটু সাবধানে নিয়ে যাবেন। আর এই টাকা, আনুষঙ্গিক খরচ আর ছেলেদের টিফিন। ছেলেদের বেশ করে বুঝিয়ে দেবেন। সব দেখাবেন।

যদুবাবু স্কুলের সামনের বারান্দাতে গিয়া দাঁড়াইলেন। ছেলেরা দুই সারিতে দাঁড়াইল হেডমাস্টারের বেতের ভয়ে। ড্রিল মাস্টারের আদেশ অনুযায়ী তাহারা মার্চ্চ করিয়া চলিল। কিন্তু খুব বেশীক্ষণের জন্য নয়, রাস্তার মোড়ে আসিয়া তাহারা আবার দাঁড়াইয়া গেল।

যদুবাবু অনেক পিছনে ছিলেন, ছেলেদের সঙ্গে সমান তালে আসিবার বয়স তাঁহার নাই। ক্ষেত্রবাবু আর একটু আগাইয়া ছিলেন, তিনি দৌড়িয়া গিয়া বলিলেন, দাঁড়ালি কেন রে?

—আমরা ট্রামে যাব স্যার্।

—ট্রামের পয়সা কাছে আছে সব?

দুই-একজন বড় ছেলে সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল, স্কুল থেকে পয়সা দেয় নি স্যার্?

—কুই, না। আমার কাছে তো দেয় নি। যদুবাবুর কাছে আছে কিনা জানি না, দাঁড়াও, দেখি।

ইতিমধ্যে যদুবাবু আসিয়া ইহাদের কাছে পৌছিলেন: কী ব্যাপার? দাঁড়িয়েচে কেন?

—আপনার কাছে ট্রামের ভাড়া দিয়েছেন হেডমাস্টার।

—হ্যা। কিন্তু সে চৌরঙ্গীর মোড় থেকে—এখানে চড়লে পয়সায় কুলুবে না। আপনি ওদের নিয়ে যান, আমি আর হাঁটতে পারছি নে। ট্রামে যাই।

—তবে আমিও ট্রামে যাই। ওরা হেঁটে যাক।

সেই ব্যবস্থাই হইল। যদুবাবু ও ক্ষেত্রবাবু ট্রামে চৌরঙ্গীর মোড়ে আসিয়া ছেলেদের জন্য অপেক্ষা করিলেন। ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, আমি কিন্তু কালীঘাট যাচ্ছি আমার বন্ধুর বাড়ী, আমি জু'তে যাব না।

ক্ষেত্রবাবু কালীঘাটের ট্রামে উঠিয়া পড়িলেন। যদুবাবু দলবল সমেত এদিকের গাড়িতে উঠিলেন। খিদিরপুরের ট্রাম হইতে নামিয়া ছেলেরা হৈ-হৈ করিয়া জু'র দিকে ছুটিল। যদুবাবু জু' অনেকবার দেখিয়াছেন, তিনি কি ছেলেদের দলে মিশিয়া হৈ-হৈ করিবেন এখন? একটা গাছের তলায় বসিলেন, পড়িয়া দেখিলেন, গাছের নাম 'পুত্রন্‌জীর রক্সবার্জি'—জীবপুত্রীকা বৃক্ষ। এই বৃক্ষের ফলের বীজ মৃতবৎসা নারীর গলায় পরাইয়া দিলে ছেলে হইয়া মরে না। তাঁহার স্ত্রীও মৃতবৎসা। এখন ফল লইয়া গেলে কেমন হয়? বয়স অনেক হইয়া গিয়াছে। বোধ হয় সুবিধা হইবে না।···কী চমৎকার ওই ছেলেটা! প্রজ্ঞাব্রত, যেমন নাম, তেমনই দেখিতে। ছেলে যদি হইতে হয়, প্রজ্ঞাব্রতের মত।

একটি ছেলের দল সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল, তাঁহাকে দেখিয়া বলিল, স্যার্, আমাদের একটু দেখাবেন?

—কী দেখাব?

—স্যার্, অনেক পাখি-জানোয়ারের নাম লেখা আছে, বুঝতে পারছি নে। একটু আসুন না স্যার্।

—হ্যাঁ, আমার এখন ওঠবার শক্তি নেই। তোরা নিজেরা গিয়ে দেখ্‌গে যা। প্রজ্ঞাব্রত কোথায় রে?

—অন্য দিকে গিয়েছে স্যার্, দেখছি নে। যাই তবে স্যার্।

যদুবাবু আপন মনে বসিয়া বসিয়া হিসাব করিলেন। সাহেব ছেলেদের টিফিনের জন্য পাঁচ টাকা দিয়াছে—ছেলে মোট ত্রিশ জন, ছেলে-পিছু দুই টুকরো রুটি আর একটু মাখন দিলে টাকা দেড়-দুই খরচ। বাকী টাকা পকেটস্থ করা যাইবে। নগদে আড়াই টাকা লাভ।

ফিরিবার পথে ছেলের দল অনেকে সরিয়া পড়িল এদিক ওদিক। কেহ গেল ময়দানে হকিখেলা দেখিতে, কেহ কাছাকাছি অঞ্চলে কোন মাসী-পিসীর বাড়ী গিয়া উঠিল। যদুবাবু মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিলেন, দেড় টাকার মধ্যে বাকী ছেলেদের রুটি মাখন ভাল করিয়াই চলিবে। নিউ মার্কেট হইতে নিজেই তিনখানা বড় রুটি ও কিছু মাখন কিনিলেন, মিউজিয়ম হইতে বাহির হইয়া মাঠে বসাইয়া ছেলেদের খাওয়াইয়া দিলেন।

ছেলেরা পাছে আবার ট্রামের পয়সা চাহিয়া বসে, এই ছিল যদুবাবুর ভয়। কিন্তু ছেলেরা বৈকালবেলা মুক্তির আনন্দে কে কোথায় চলিয়া গেল। ছেলেরা অত হিসাব বোঝে না, হেডমাস্টার ট্রামের পয়সা দিয়াছিলেন কি না—সে কৈফিয়ৎ কেহ লইল না। যদুবাবু একা বাসার দিকে চলিতে চলিতে সতৃষ্ণ নয়নে ধর্ম্মতলার মোড়ে গ্লোব রেস্টুরেণ্টের দিকে চাহিলেন। চপ-কাটলেট-ভাজার সুরুচি-ঘ্রাণ ফুটপাথের দক্ষিণ হাওয়াকে মাতাইয়াছে। পকেটে নগদ আড়াই টাকা উপরি-পাওনা—বাড়ীর একঘেয়ে সেই ডাঁটাচচ্চড়ি আর কুমড়োভাজা খাইতে খাইতে যৌবন চলিয়া গেল। যদি পেটে ভাল করিয়া না খাইলাম তবে চাকুরি করা কী জন্য? চক্ষু বুজিলে সব অন্ধকার। ছেলে নাই, পিলে নাই, কাহার জন্য খাটিয়া মরা!

রেস্টুরেণ্টে ঢুকিয়া দুইখানা ফাউল কাটলেট, দুইখানা চপ, এক প্লেট কোর্ম্মা, দুইখানা

ঢাকাই পরোটা অর্ডার দিয়া যদুবাবু মহাখুশির সহিত আপন মনে উদরসাৎ করিতেছেন, এমন সময় ফুটপাথ দিয়া প্রজ্ঞাব্রতকে যাইতে দেখিয়া ডাকিলেন, ও প্রজ্ঞা, ওরে শোন্ শোন্—

প্রজ্ঞাব্রত হকিখেলা দেখিয়া বাড়ী যাইতেছিল, উঁকি মারিয়া বলিল, স্যার্, আপনি এখানে ?

—শোন্ শোন্, বোস। খাবি ?

—না স্যার্, আপনি খান।

—কেন, বোস্ না। আয়। এই বয়, দুখানা চপ আর দুখানা কাটলেট দাও তো।

প্রজ্ঞাব্রত দুই-একবার মৃদু প্রতিবাদ করিয়া খাইতে বসিল। যদুবাবু তাহাকে জোর করিয়া এটা-ওটা আরও খাওয়াইলেন। যাইবার সময়ে তাহাকে বলিলেন, একটা সিগারেট কিনে আন্ তো, এই নে পয়সা।

সিগারেট ধরানো হইলে দুইজনে কিছুক্ষণ ধর্ম্মতলা ধরিয়া চলিলেন।

একটা গ্যাস-পোস্টের নীচে আসিয়া যদুবাবু বলিলেন, হ্যাঁ রে, তুই চাঁদা দিয়েছিলি ?

—কিসের স্যার্ ?

—এই আজ জু'তে আসবার জন্যে।

—হ্যাঁ স্যার্, চার আনা।

যদুবাবু একটা সিকি বাহির করিয়া প্রজ্ঞাব্রতের হাতে দিয়া বলিলেন, এই নে, নিয়ে যা—কাউকে বলিস নে—

প্রজ্ঞাব্রত বিস্মিত হইয়া বলিল, ও কী স্যার্ ? জু দেখলাম, ট্রামে গেলাম, রুটি মাখন খাওয়ালেন তখন—

—তুই নিয়ে যা না। তোর অত কথার দরকার কী ? কাউকে বলবি নে।

—না স্যার্, আমি নেব না—

—নে বলচি, ফাজলামো করিস নে,—নিয়ে নে—

প্রজ্ঞাব্রত আর দ্বিরুক্তি না করিয়া হাত পাতিয়া সিকিটি লইল।

—আমার এই গলি স্যার্, যাই আমি।

—চল্ না, আমায় একটু এগিয়ে দিবি। বেশ লাগে তোর সঙ্গে যেতে।

প্রজ্ঞাব্রত অনিচ্ছার সহিত আরও কিছু দূরে গিয়া ওয়েলিংটন স্ট্রীটের মোড়ে আসিয়া বলিল, যান স্যার্, আমি আর যাব না—

পরদিন যদুবাবু হেডমাস্টারের কাছে আট টাকা দশ আনার এক বিল দাখিল করিয়া বিনীতভাবে জানাইলেন, দশ আনা বেশী খরচ হইয়া গিয়াছে—ট্রামভাড়া, ছেলেদের খাওয়ানো, আনুষঙ্গিক খরচ।

হেডমাস্টার বলিলেন, ওয়েল, এই নাও দশ আনা।

ছেলেরা কিন্তু ক্লাসে বলাবলি করিতে লাগিল, যদুবাবু তাহাদের কিছুই খাওয়ান নাই। হেডমাস্টার কত টাকা যদুবাবুর হাতে দিয়াছেন, কেহ কেহ তাহাও অনুসন্ধান করিবার চেষ্টা করিতে ছাড়িল না।

প্রজ্ঞাব্রত সকলকে বলিল, যদুবাবু গ্লোব রেস্টুরেণ্টে বসিয়া মনের সাধে চপ-কাটলেট খাইতেছিলেন, সে পথ দিয়া যাইবার সময় দেখিয়াছে। তাহাকে যে খাওয়াইয়াছেন, সে কথা প্রকাশ করিল না।

যদুবাবু ফোর্থ ক্লাসে তৃতীয় ঘণ্টায় পড়াইতে গিয়া দেখিলেন, ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা আছে—গ্লোব রেস্টুরেণ্ট, চপ এক আনা, মুর্গির কাটলেট দশ পয়সা! জু হইতে ফিরিবার পথে সকলে খাইয়া যান!

যদুবাবু দেখিয়াও দেখিলেন না। টিফিনের ঘণ্টায় প্রজ্ঞাব্রতকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন, ওসব কে লিখেছে বোর্ডে? তুই কিছু বলেছিস?

সে বলিল, না স্যার্, আমি কাউকে বলি নি।

—আর কেউ দেখেছিল আমাকে, বললে কেউ?

—তাও স্যার্ আমি জানি না—

মিঃ আলমের চোখে লেখাটি পড়িল টিফিনের পরের ঘণ্টায়। মিঃ আলম কূটবুদ্ধিসম্পন্ন লোক, জিজ্ঞাসা করিল, এসব কী?

ছেলেরা পরস্পর গা-টেপাটিপি করিল। দুইজন বইয়ের আড়ালে মুখ লুকাইয়া হাসিল।

—কী, বল না। মনিটার!

একজন লম্বা ছেলে উঠিয়া বলিল, কী স্যার্?

—এ কে লিখেচে?

—দেখি নি স্যার্।

—হুঁ। কাল তোরা জু'তে গিয়েছিলি কার সঙ্গে?

—যদুবাবু ও ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে গিয়েছিলাম। তবে ক্ষেত্রবাবু কালীঘাট চলে গেলেন, যদুবাবু ছিলেন।

মিঃ আলম জেরা করিয়া সংগ্রহ করিলেন, তাহারা কী খাইয়াছিল, কত দূর ট্রামে গিয়াছিল ইত্যাদি। হেডমাস্টারকে আসিয়া বলিলেন, কাল ক টাকা দিয়েছিলেন স্যার্ যদুবাবুকে? ছেলেরা তো দু টুকরো রুটি আর মাখন খেয়েচে, যাবার সময় একবারই ট্রামে গিয়েছিল, আর এসেছিল মিউজিয়াম পর্য্যন্ত। আর কোনও খরচ হয় নি।

—তিন টাকা ট্রামভাড়া আর পাঁচ টাকা টিফিন—যদুবাবু আট টাকা দশ আনার বিল দিয়েচে।

—স্যার্, আপনি অনুসন্ধানের ভার যদি আমার ওপর দেন, আমি প্রমাণ করব—যদুবাবু স্কুলের টাকা চুরি করেছেন। উনি নিজে ফেরবার পথে চপ-কাটলেট খেয়েচেন দোকানে বসে, ফোর্থ ক্লাসের প্রজ্ঞাব্রত দেখেচে। সে আপনার কাছে সব বলতে রাজী হয়েচে। ডেকে নিয়ে আসি তাকে যদি বলেন। যদুবাবু শিক্ষকের উপযুক্ত কাজ করেন নি, ছেলেদের খাওয়ান নি অথচ স্কুলে বাড়তি বিল দিয়েচেন—এ একটা গুরুতর অপরাধ। আমার ধারণা

উনি এ রকম আরও কয়েক বার করেছেন—জু'তে ছেলেদের নিয়ে যাবার সময় তাই উনি সকলের আগে পা বাড়ান। ব্ল্যাকবোর্ডে ছেলেরা যা-তা লিখচে ওঁর নামে।

হেডমাস্টার হাসিয়া বলিলেন, লেট্ গো মিঃ আলম। এ বিষয়ে আর কিছু উত্থাপন করবেন না। হাজার হলেও আমাদেরই একজন টীচার, সহকর্মী—ছেড়ে দিন ও-কথা। আই ডোণ্ট গ্রাজ দি পুওর ফেলো এ কাটলেট অর টু—

গ্রীষ্মের ছুটির আর দেরি নাই। অন্য সব স্কুলে মর্নিং-স্কুল আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এ স্কুলে হেডমাস্টারের কাছে বহু দরবার করা সত্ত্বেও আজো মর্নিং-স্কুল হয় নাই। হেডমাস্টারের ধারণা, মর্নিং-স্কুল হইলে লেখাপড়া ভাল হয় না ছেলেদের। ক্লাসে ক্লাসে পাখা আছে, মর্নিং-স্কুলের কী দরকার।

ডেপুটেশনের পর ডেপুটেশন হেডমাস্টারের আপিসে গিয়া ব্যর্থকাম হইয়া ফিরিল। অবশেষে সকলে মিঃ আলমকে গিয়া ধরিল। হেডপণ্ডিত বলিলেন, যান মিঃ আলম, বুঝিয়ে বলুন একবারটি।

আলমের দ্বারা স্কুলের ক্ষতিজনক কোনও কার্য্য হওয়া সম্ভব নয়, তিনি জানাইলেন।

অবশেষে অন্য সব মাস্টার জোট পাকাইয়া হেডমাস্টারের আপিসে গেলেন। ক্লার্কওয়েল একগুঁয়ে প্রকৃতির মানুষ, যাহা ধরিয়াছেন তাহা নড়চড় হইবার জো নাই। কাহারও কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। বরং ফল হইল, যে সব মাস্টার দরবার করিতে গিয়াছিলেন তাঁহাদের উপর নানারকম বেশী খাটুনির চাপ পড়িল।

ছুটির পর প্রায়ই স্কুল হইতে মাস্টারদের চলিয়া যাইবার উপায় থাকিত না। প্রশ্নপত্র লিথো করিতে হইবে, ক্লাসের ট্রানস্লেশন দেখিয়া ভুল-ভ্রান্তি শুদ্ধ করিয়া তাহা হেডমাস্টারের টেবিলে পেশ করিতে হইবে। হেডমাস্টার দেখিবেন, ঠিকমত খাতা দেখা হইয়াছে কি না!

আজ হুকুম হইল, প্রত্যেক শিক্ষক প্রতি দিন প্রত্যেক ক্লাসে কী পড়াইবেন তাহা নোট করিবেন, সে নোট আবার সাহেবের কাছে দাখিল করিতে হইবে।

হেডমাস্টার বলিলেন, স্কুলে পাখা আছে, মর্নিং-স্কুল কী জন্যে? যে সব মাস্টারের না পোষাবে, তিনি চলে যেতে পারেন। মাই গেট ইজ ওপ্‌ন্—

গলদঘর্ম্ম হইয়া মাস্টারেরা আর দিন-চারেক স্কুল করিলেন। তারপর একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে হঠাৎ সারকুলার বাহির হইল, কাল হইতেই মর্নিং-স্কুল। ক্লার্কওয়েলের সব কাজই ওই রকম—পরের কথায় বা বুদ্ধিতে তিনি কিছুই কাজ করিবেন না, নিজের খেয়ালমত চলিবেন।

মর্নিং-স্কুল বসিবে ছ'টায়। দূরে যে সব মাস্টার থাকেন, তাঁহারা শেষরাত্রে উঠিয়া রওনা না হইলে আর ছয়টায় আসিয়া হাজিরা দিতে পারেন না। তাহার উপর সাড়ে দশটার ছুটির পর রোজ বেলা সাড়ে এগারোটা পর্য্যন্ত শিক্ষকদের লইয়া পরামর্শ-সভা বসিবে।

সভার কার্য্য-প্রণালী নিম্নোক্ত রূপ :—

১। সেভেন্‌থ্ ক্লাসে কী করিয়া হাতের লেখার উন্নতি করা যায়?

২। থার্ড ক্লাসে ছেলেরা শ্রুতিলিখনে কাঁচা—কী ভাবে তাহারা শ্রুতিলিখনে উন্নতি করিতে পারে?

৩। একজন টীচার কাল ক্লাসে বাজে গল্প করিয়াছিলেন—তাঁহার সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা করা যায়?

হেডমাস্টার প্রথমে বলিলেন, আচ্ছা, সেভেন্‌থ্‌ ক্লাসের হাতের লেখা সম্বন্ধে কার কী মত?

ক্ষুৎ-পিপাসায় পীড়িত টীচারের দল মনের বিরক্তি চাপিয়া চাকুরির খাতিরে মুখে কৃত্রিম উৎসাহ ও গভীর চিন্তার ভাব আনিয়া একে একে আলোচনায় যোগ দিলেন।

কাহারও ফাঁকি দিবার উপায় নাই, কেহ চুপ করিয়া উদাসীন হইয়া বসিয়া থাকিবেন, তাহার জো কী? হেডমাস্টার অমনি বলিবেন, যদুবাবু, হোয়াই ইউ আর সাইলেন্ট?

সর্ব্বশেষে মিঃ আলমের দিকে চাহিয়া হাসিমুখে সাহেব বলিলেন, নাউ ল্যাট্‌ লাস্ট লেট্‌ আস হিয়ার মিঃ আলম।

মিঃ আলম গম্ভীর মুখে উঠিলেন। যেন 'প্রাইম মিনিস্টার' কোনো গুরুতর বিল আলোচনা করিবার জন্য ট্রেজারি বেঞ্চ হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মিঃ আলমের হাতে তিন পাতা লেখা কাগজ, সেভেন্‌থ্‌ ক্লাসের হাতের লেখা ভাল করা সম্বন্ধে এক গুরুগম্ভীর নিবন্ধ। তাহার মধ্যে কত উদাহরণ, কত প্রস্তাব, কত মহাজন-বাণী উদ্ধৃত।

মিঃ আলম মাথা দুলাইয়া সতেজ উচ্চারণের সহিত গোটা নিবন্ধটা পড়িয়া গেলেন, "অন্‌ দি বেটারমেন্ট্‌ অফ্‌ হ্যাণ্ডরাইটিং অফ্‌ সেভেন্‌থ্‌ ক্লাস বয়েজ"—ঝাড়া দশ মিনিট লাগিল।

টীচারদের সভা চুপ। হেডমাস্টার বলিলেন, মিঃ আলম একজন আদর্শ শিক্ষক। এ কথা আমি কতদিন বলেছি। মানুষের মত মানুষ একজন। কারও কিছু বলবার আছে মিঃ আলমের প্রবন্ধ সম্বন্ধে? নারায়ণবাবু?

বৃদ্ধ নারায়ণবাবু একটা কী সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন।

—ওয়েল, যদুবাবু?

যদুবাবু বিনীতভাবে জানাইলেন, তাঁহার কিছু বলিবার নাই। মিঃ আলমের প্রবন্ধের পর আর বলিবার কী থাকিতে পারে।

—ওয়েল, ক্ষেত্রবাবু?

—না স্যার, আমার কিছু বলবার নেই।

এক পর্ব শেষ হইল। বেলা সাড়ে এগারোটা বাজে, জ্যৈষ্ঠের রৌদ্রে রাস্তার পিচ গলিয়া গিয়াছে। অনেকে চিন্তা করিতেছেন, বাড়ী ফিরিয়া আঁর স্নানের জল পাওয়া যাইবে না। চৌবাচ্চায় দুই ইঞ্চি জলও থাকে না এত বেলায়। অথচ কিছু বলিবার জো নাই, সাহেব বলিবেন, মাই গেট ইজ ওপ্‌ন্‌—

ঠিক বারোটার সময় 'টীচার্স মিটিং' সাঙ্গ হইল।

বাহিরে পা দিয়াই যদুবাবু বলিলেন, ব্যাটা কী খোশামুদে! দেখলে তো একবার! আবার এক প্রবন্ধ লিখে এনেছে! কাজের আঁট কত।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, একেবারে লর্ড বেকন্—"অন দি বেটারমেণ্ট অফ্ হ্যাণ্ডরাইটিং অফ সেভেন্‌থ্ ক্লাস বয়েজ"। হামবাগ্ কোথাকার!

যদুবাবু বলিলেন, আর এক খোশামুদে ওই নারাণবাবু। তোর কোনো কুলে কেউ নেই, সন্নিসি হয়ে যা। দরকার কী তোর খোশামুদির?

নীচের ক্লাসের একজন টীচার মেসে থাকিতেন। তিনি সামান্ত মাহিনা পান, মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে সাহস পান না। তিনি কতকটা আপন মনেই বলিলেন, কোনদিন নাইতে পারি নে—আজ মর্নিং-স্কুল হয়ে পাঁচ দিন নাই নি।

যদুবাবু বলিলেন, এই বলে কে! কই, তুমি তো মুখ ফুটে কথাটা বলতে পারলে না ভায়া সাহেবকে।

—আপনারা সিনিয়র টীচার রয়েচেন, কিছু বলতে পারেন না। আমি চুনো-পুঁটি—আমার সাহস কী?

—ওই তো দোষ ভায়া। ওতেই তো পেয়ে বসে। প্রোটেস্ট করতে হয়—মেনে নিলেই বিপদ।

—আপনারা প্রোটেস্ট করুন গিয়ে দাদা, আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

গ্রীষ্মের ছুটি পর্য্যন্ত প্রায়ই এই রকম চলিল। গ্রীষ্মের ছুটি আসিয়া পড়িবার দেরি নাই। ছেলেরা সে দিন গান গাহিবে, আবৃত্তি করিবে। দুই-একজন শিক্ষক তাহাদের তালিম দিবার ভার লইয়া স্কুলের কাজ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন।

হঠাৎ শোনা গেল, গ্রীষ্মের বন্ধের পূর্ব্বে মাস্টারদের মাহিনা দেওয়া হইবে না।

দুই মাসের বেতন এই সময়ে একসঙ্গে পাওয়ার কথা। মোটেই পয়সা দেওয়া হইবে না। শুনিয়া মাস্টারদের মুখ শুকাইয়া গেল। হেডমাস্টারের কাছে দরবার শুরু হইল। হেডমাস্টার বলিলেন, আমি বা মিস্ সিবসন্ এক পয়সা নেব না—কেউ কিছু নিচ্ছি না। মাইনে আদায় যা হয়েছিল, কর্পোরেশনের ট্যাক্স আর বাড়ী-ভাড়াতে গেল।

দুই-একজন শিক্ষক একটু ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন, আমরা তবে খাব কি?

—আমি জানি না। আপনাদের না পোষায়, মাই গেট ইজ ওপ্‌ন্—

গ্রীষ্মের ছুটিতে প্রত্যেক মাস্টারের উপর দুই-তিনটি প্রবন্ধ লিখিয়া আনিবার ভার পড়িল—ছাত্রদের প্রতি কর্ত্তব্য, বিভিন্ন বিষয় পড়াইবার প্রণালী প্রভৃতি সম্বন্ধে। মাস্টারদের দল মুখে কিছু বলিতে পারিলেন না। মনে মনে কেহ চটিলেন, কেহ ক্ষুব্ধ হইলেন।

যদুবাবু বলিলেন, ওঃ, ভাত দেবার কেউ নয়, কিল মারবার গোসাঁই! মাইনের সঙ্গে খোঁজ নেই, প্রবন্ধ লিখে নিয়ে এস—দায় পড়েচে—

ক্ষেত্রবাবু অনেক দিন পরে গ্রামের বাড়ীতে আসিলেন, সঙ্গে স্ত্রী নিভাননী ও দুই-তিনটি ছেলে-মেয়ে।

আজ প্রায় ছয় বছর পৈতৃক ভিটাতে আসেন নাই। চারিধারে জঙ্গল, বাড়ীঘরে গাছ গজাইয়াছে। জমিজমা, আম-কাঁঠালের বাগান যাহা আছে, বারোভূতে লুটিয়া খাইতেছে।

গ্রামের নাম আস্‌সিংড়ি—কয়েক ঘর গোয়ালার ব্রাহ্মণ এ গ্রামে বেশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন গৃহস্থ, ধান পুকুর জমিজমা যথেষ্ট তাহাদের। অন্য কোন ভাল ব্রাহ্মণ গ্রামে নাই, কায়স্থ আছে কিছু, গোয়ালা জেলে ছুতার কর্ম্মকার এবং বাট-সত্তর ঘর মুসলমান—এই লইয়া গ্রাম।

গ্রামে জঙ্গল খুব, বড় বড় আম-কাঁঠালের বাগান। ক্ষেত্রবাবুর পৈতৃক বাড়ী কোঠা, বড় বড় চার-পাঁচখানা ঘর; কিন্তু মেরামতের অভাবে ছাদ দিয়া জল পড়ে। বাড়ীর উঠানে বড় বড় কাঁঠালগাছে অনেক কাঁঠাল ফলিয়াছে, নারিকেলগাছে ডাবের কাঁদি ঝুলিতেছে। বাড়ীর সামনে পুকুর, সেখানে কর্ত্তাদের আমলে বড় বড় মাছ জাল দিয়া ধরা হইত, আজ কিছু নাই। শরিক এক জ্যাঠতুতো ভাই এতদিন সব খাইতেছিল, আজ বছর দুই হইল সে উঠিয়া গিয়া শ্বশুর-বাড়ী বাস করিতেছে।

সকালে উঠিয়া ক্ষেত্রবাবু গ্রামের প্রজাদের ডাকাইলেন। সকলে আসিয়া প্রণাম করিল এবং এতদিন পরে তিনি গ্রামে আসিয়াছেন ইহাতে যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করিল।—বাপ-পিতামহের ভিটা ছাড়িয়া বাহিরে না গেলে কি অন্ন হয় না? বাবু এখানে থাকুন, তাহারা ধানের জমি করিয়া দিবে, চলিবার সব ব্যবস্থা করিয়া দিবে। ক্ষেত্রবাবুও ভাবিলেন, সাহেবের তাঁবে থাকিয়া দিনরাত্রি দাসত্ব করার চেয়ে এ কত ভাল। 'টীচার্স মীটিং' নাই, দুই ঘণ্টা করিয়া প্রতি দিন খাতা কারেক্ট করিবার হাঙ্গামা নাই, মিঃ আলমের ধূর্ত্ত চক্ষুর চাহনিতে আর ভয় খাইতে হইবে না—এই তো কত চমৎকার! নাকে মুখে গুঁজিয়া স্কুলে দৌড়িবার তাড়া থাকিবে না।

নিভাননী হাসিয়া বলিল, দুধ এখানকার কী চমৎকার গো! ইটিসিতে এমন দুধ কিন্তু দেয় না গোয়ালা।

ক্ষেত্রবাবু বলেন, কোত্থেকে সেখানকার গোয়ালারা ভাল দুধ দেবে? তা দিতে পারে কখনও?

দিনকতক ভাল দুধের পায়েস পিঠে খাওয়া হইল। বাড়ীতে সত্যনারায়ণের সিন্নি দেওয়া হইল একদিন। ইতিমধ্যে আম-কাঁঠাল পাকিয়া উঠিল, ছেলে-মেয়েরা প্রাণ পুরিয়া আম খাইল।

গ্রামের দক্ষিণে জোলের মাঠ, অনেক খেজুর পাকিয়াছে গাছে গাছে, ক্ষেত্রবাবু ছেলে-মেয়েদের হাত ধরিয়া মাঠে গিয়া খেজুর কুড়াইয়া বাল্যের আনন্দ আবার উপভোগ করেন—যখন এ গ্রাম ছাড়া আর কোথাও বৃহত্তর দুনিয়ায় স্থান ছিল না, এই গ্রামের আম আমড়া কুল বেল খাইয়া একদিন মানুষ হইয়া উঠিয়াছিলেন, যখন এ গ্রামের মাটি ছিল পৃথিবীর জীবনের একমাত্র নোঙর, ক্ষুদ্রের মধ্যেও সে পরিধি ছিল অসীম—সে সব দিনের কথা মনে হয়।

তারপর তিনি বি-এ পাস করিলেন, এখানে আর থাকা চলিল না, বিদেশে চাকুরি লইতে হইল। কর্ত্তারাও সব পরলোকে চলিয়া গেলেন—গ্রামের সঙ্গে সংযোগ-সূত্র ছিন্ন হইল। সন্ধ্যায় শিয়ালের ডাকে পিতৃপুরুষের ভিটা মুখরিত হইতে লাগিল। মধ্যে বার-দুই এখানে আসিয়াছেন—তাও বছর পাঁচ-ছয় আগেকার কথা, আর আসা ঘটে নাই। পনেরো টাকা

ভাড়ায় কলিকাতার গলিতে একখানা ঘর ভাড়া করিয়া থাকা, বারান্দায় ছোট্ট এতটুকু রান্নাঘর, ধোঁয়া দিলে বাড়ীতে টেকা দায়। এমন দুধ টাটকা তরকারি চোখে দেখা যায় না। ক্ষেত্রবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবেন, কী হইলে আবার আসিয়া গ্রামে বাস করিতে পারেন! পুরানো দিনের সুখ আবার ফিরিয়া আসে যদি, ক্ষেত্রবাবু তাঁহার জীবনের অনেকখানিই যে-কোন দেবতাকে দানপত্র করিয়া দিতে রাজী আছেন। ক্ষেত্রবাবু গ্রামের প্রজাদের সঙ্গে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। গ্রামে থাকিলে তাঁহার সংসার চলিবার বন্দোবস্ত হয় কি না! সকলেই উৎসাহ দিল, ধানের জমি আছে তাহাতে বছরের ভাতের টানাটানি হইবে না—ক্ষেত্রবাবু গ্রামেই থাকুন।

একদিন নিভাননী বলিল, আর কদিন ছুটি আছে তোমার গো?

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, কেন

—না, তাই বলছি।

দিন উনিশ কাটিয়াছে সবে, এখনো প্রায় একমাস। সত্য কথা যদি স্বীকার করিতে হয়, ছুটিটা একটু বেশীই হইয়া গিয়াছে। এতদিন ছুটি না দিলেও চলিত।

নিভাননীর দিন আর কাটে না। এখানে সে কথা বলিবার মানুষ খুঁজিয়া পায় না, ঘুরিয়া-ফিরিয়া সেই বড়-গিন্নী আর তাহার মেয়ে সরলা। আর আছে কয়েকটি গোয়ালার মেয়ে। কোন আমোদ নাই, আহ্লাদ নাই—বন-জঙ্গলের মধ্যে আর দিন কাটিতে চায় না। তাহার উপর উনি নাকি এখানে থাকিবার ব্যবস্থা করিতেছেন, এখানে মানুষ বারমাস থাকিলে পাগল, নয় তো ভূত হইয়া যায়। বাড়ীর পিছনে বাঁশবনের নীচেই, মিনিট কয়েকের পথ দূরে শীর্ণকায় চূর্ণি নদী, টলটলে কাচের মত জল—রোজ এই বাগানের ভিতর দিয়া স্নানে যাইবার সময় নিভাননীর ভয় হয়। উঁচু উঁচু আমগাছে পরগাছা ঝুলিতেছে, কালপ্যাঁচার গম্ভীর স্বরে দিন দুপুরেও বুকের মধ্যে কেমন করে। স্নান করিতে নামিয়া কিন্তু মনে বেশ আনন্দ হয়, এত জল এবং এমন কাকের চোখের মত জল কলিকাতায় কল্পনাও করা যায় না।

বাঁশের চ্যালা পুড়াইয়া উনানে রান্না—কয়লা নাই, বাড়ীতে জল নাই, নিভাননীর এসব অভ্যাস নাই। কলিকাতায় রান্নাঘরের মধ্যেই কলের জলের পাইপ। এখানে মানুষ থাকে না। সময় যেখানে কাটিতে চাহে না, সে জায়গা আর যাহাই হউক, ভদ্রলোকের বাসের উপযুক্ত নয়।

ছেলেমেয়েদেরও এ জায়গা ভাল লাগে না। বড় ছেলে পাঁচু কেবল বলে, মা, কলকাতায় কবে যাওয়া হবে?

তাহাদের বাড়ীর সামনে ছোট্ট পার্কটাতে প্রতি বৈকালে টুনু হাবু রণজিৎ হীরু, মঙ্গল সিং বলিয়া একটা শিখের ছেলে, সুরেশ ভানু কত ছেলে আসিয়া জোটে! পাঁচুর সঙ্গে উহাদের সকলের খুব ভাব। পার্কে দোলনা টাঙানো আছে। গড়াইয়া পড়িবার লোহার ডোঙা খাটানো আছে, রোজ রোজ সেখানে কত কী খেলা, কত আমোদ-আহ্লাদ!

রণজিতের বাড়ীর কাছেই—প্রসাদ বড়াল লেনে। পাঁচুর সঙ্গে রণজিতের খুব বন্ধুত্ব—

প্রায়ই তাহার বন্ধুর বাড়ী পাঁচু যাইত, রণজিতের মা খাইতে দিতেন, তারপরে রণজিতের বোন সুসি আর হিমির সঙ্গে তাহারা দুইজনে বসিয়া ক্যারম খেলিত। সুসির অদ্ভুত টিপ, সরু সরু ফরসা আঙুল দিয়া স্ট্রাইকার ছটকাইয়া সামনের কাঠে রিবাউণ্ড করাইয়া কেমন অদ্ভুত কৌশলে সে গুটি ফেলিত। পাঁচু সুসির গুণে মুগ্ধ। অমন অদ্ভুত মেয়ে সে যদি আর কোথাও দেখিয়া থাকে!

হারিয়া গেলে সুসি হাসিয়া বলে, পারলে না পাঁচু, এইবার লালখানা ফেলেও হেরে গেলে!

লাল ফেলিলে কী হইবে, পয়েন্ট হইল কই? বোর্ডে যখন সাতখানা গুটি মজুত, তখন ওদিকে সুসির হাতের গুণে স্ট্রাইকার অসম্ভব সম্ভব করিয়া তুলিতেছে পাঁচুর বিস্মিত ও মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে। দেখিতে দেখিতে বোর্ড ফাঁকা, প্রতিপক্ষ সব গুটি পকেটে ফেলিয়াছে।

কী মজার খেলা! কী মজার দিন!

এখানে ভাল লাগে না। কী আছে এখানে? কুমোরপাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া গেঁয়ো খেলা যত সব! কথা সব বাঙালে ধরনের, এখানে আর কিছুদিন থাকিলে পাঁচু বাঙাল হইয়া উঠিবে।

নিভাননী বলে, আজ পঁচিশ দিন হল, না?

ক্ষেত্রবাবু হাসিয়া বলেন, দিন গুনছ নাকি?

—ভাল লাগছে না আর, সত্যি!

—তা বটে। আমারও তেমন ভাল লাগছে না—বসে বসে আর দিনে ঘুমিয়ে শরীর মাটি হল। একটা কথা বলবার লোক নেই, আছে ওই নন্দী মশায় আর জগহরি ঘোষ—ওরা ধানচালের দর নিয়ে কথাবার্তা বলে কেবল। কাঁহাতক ওদের সঙ্গে বসে গল্প করি?

—আর কদিন আছে তোমার?

—তা এখনও আঠারো-উনিশ দিন—কি তারও বেশী।

নিভাননী বলিল, ছেলেমেয়েদেরও আর ভাল লাগচে না। কানু আমায় বলচে, মা, আমরা কলকাতা যাব কবে?

ক্ষেত্রবাবুও নিজের মনের ভাব দেখিয়া নিজেই অবাক হইলেন। যে ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুলের নাম শুনিলে গায়ের মধ্যে জ্বালা ধরে, চাকুরির সময় যাহাকে কারাগার বলিয়া বোধ হইত, সেই স্কুলের কথা এখন যখন মনে হয় তখন যেন সে প্রশান্ত মহাসাগরের নারিকেল-দ্বীপপুঞ্জ-ঘেরা পাগো-পাগো দ্বীপ, চিরবসন্ত যেখানে বিরাজমান, পক্ষি-কাকলীতে যাহার শ্যাম তীরভূমি মুখর—ইংরেজী টকি-ছবিতে যা দেখিয়াছেন কতবার। সেই সিঁড়ির ঘর, তেতলার ছাদে মাস্টারদের সেই বিশ্রামকক্ষ, হেডমাস্টারের আপিসের ঘণ্টাধ্বনি, মথুরা চাকরের সারকুলার-বই লইয়া ছুটাছুটি করিবার সেই সুপরিচিত দৃশ্য—এসব কল্পনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। না, আর ভাল লাগে না, স্কুল খুলিলেই বাঁচা যায়।

নারাণবাবুর অবস্থা ইহা অপেক্ষাও খারাপ।

নারাণবাবু স্কুলের ঘরটিতে বারো মাস আছেন, কোথাও যাইবার স্থান নাই। সেই ঘর আশ্রয় করিয়া বহুদিন থাকিবার ফলে যখন টুইশানি সারিয়া নিজের ঘরটিতে ফেরেন, তখন সমস্ত মন প্রাণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠে, বাড়ী এসে বাঁচা গেল! কত কালের পিতৃ-পিতামহের বাসভূমি যেন সাহেবের বাথরুমের পূর্ব্বদিকের সেই এক-জানালা এক-দরজা-ওয়ালা কুঠুরিটা।

এ ছুটিতে নারাণবাবু গিয়াছিলেন তাঁহার এক দূর-সম্পর্কের ভাগ্নীর বাড়ী বরিশালে। চিরকাল কলিকাতায় কাটাইয়াছেন, বরিশালের পল্লীগ্রামে কিছুদিন থাকিয়াই তিনি হাঁপাইয়া উঠিলেন। গরীব স্কুল-মাস্টার হইলেও নাগরিক মনোবৃত্তি তাঁহার মজ্জাগত—সত্যিকার শহুরে মানুষ। এখানে সকালে উঠিয়া কেহ চা খায় না, লেখাপড়া-জানা মানুষ নাই। এক বাঙাল মোক্তার আছে, পঞ্চানন লাহিড়ী—বয়সে নারাণবাবুর সমান, গ্রামে সে-ই একমাত্র লেখাপড়া জানা লোক। হইলে হইবে কি, লোকটার কথাবার্ত্তায় বরিশালের টান তিনি ক্ষমা করিতে প্রস্তুত ছিলেন—কিন্তু সে গোঁড়া বৈষ্ণব, ধর্ম্মবাতিকগ্রস্ত বৈষ্ণব।

তাহার কাছে গিয়া বসিতে হয়, উপায় নাই। সন্ধ্যাবেলাটা কোথায় কাটানো যায় আর!

অমনি সে আরম্ভ করিবে—গোপিনীদের ভাব সম্বন্ধে উদ্ধব দাস কী বলিতেছেন—এটা বলিয়া লই—

নারাণবাবুকে বাধ্য হইয়া বসিয়া শুনিতে হয়। তিনি ধার্ম্মিক লোক নন, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের দার্শনিক অংশ ছাড়া আর কিছু ভাল লাগে না তাঁর। লেস্‌লি ষ্টিফেন এবং মিলের ছাত্র তিনি। পঞ্চানন মোক্তার কথা বলিতে বলিতে যখন দুই হাত তুলিয়া 'আহা' 'আহা' বলে, তখন নারাণবাবু ভাবেন, এই একটা নিতান্ত অজ-মূর্খের পাল্লায় পড়ে প্রাণটা গেল দেখচি!

মনে হয় শরৎ সান্যালের কথা। শরৎ সান্যাল অবসরপ্রাপ্ত এঞ্জিনীয়ার, নারাণবাবুর বহুদিনের বন্ধু—পাশের গলিতে এক সময় বড় বাড়ী ছিল, ছেলেরা রেস খেলিয়া বাড়ী উড়াইয়া দিয়াছে, এখন দুর্গাচরণ ডাক্তার রোডে ছোট ভাড়াটে বাড়ীতে বাস করেন, ছুটিছাটার দিনে সন্ধ্যার দিকে ধোপ-দোরস্ত পাঞ্জাবি গায়ে, ছড়ি হাতে প্রায়ই নারাণবাবুর ঘরে আসিয়া বসেন ও নানাবিধ উঁচু ধরনের কথাবার্ত্তা বলেন।

উঁচু ধরনের কথা নারাণবাবু পছন্দ করেন, গোপীভাবের কথা নয়।

কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা, ওয়াশিংটন-চুক্তির ভিতরের রহস্য, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরের বক্তৃতা, শিক্ষাসমস্যা সংক্রান্ত কথা প্রভৃতি আলোচনাকেই নারাণবাবু উচ্চ বিষয় বলিয়া থাকেন। বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত লোকে রাসলীলার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা লইয়া মাথা ঘামায় না।

পঞ্চাননবাবু নিজে ইংরেজী-শিক্ষিত নহেন, সেকালের ছাত্রবৃত্তি-পাস মোক্তার, সুতরাং

ইংরেজী শিক্ষার উপর হাড়ে চটা। পশ্চিম হইতে যাহা কিছু আসিয়াছে সব খারাপ, এ দেশে যাহা ছিল সব ভাল। কৃষ্ণদাস কবিরাজের (পঞ্চানন মোক্তার বলেন, কবিরাজ গোস্বামী) চৈতন্যচরিতামৃত তাঁহার মতে বাংলা সাহিত্যের শেষ ভাল গ্রন্থ।

পঞ্চানন মোক্তার গদ্‌গদ কণ্ঠে বলেন, কী সব ইংরেজী বলেন আপনারা বুঝি না। কিন্তু কবিরাজ গোস্বামীর পর আর বই হয় না। বাংলায় আর বই নাই, লেখা হয় নাই তার পরে—

এ রকম লোকের সঙ্গে লেস্‌লি স্টিফেন ও মিলের ছাত্র নারাণবাবু কী তর্ক করিবেন !

জীবনে তিনি একজন খাঁটি দার্শনিক দেখিয়াছিলেন—অনুকূলবাবু। নিজের জন্য কখনও কিছু করেন নাই, স্কুল গড়িয়া তুলিবেন মনের মত করিয়া, ভাল শিক্ষা দিবেন তাঁহার স্কুলে, কলিকাতার মধ্যে একটি আদর্শ বিদ্যালয়ে পরিণত করিবেন স্কুলকে। ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহার যত কল্পনা, যত আলোচনা—কত বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়াছেন স্কুলের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ! অমন সাধুপুরুষ জন্মায় না।

এই সব তিলক-কণ্ঠিধারী গোপীভাবে বিভোর লোকের মেরুদণ্ডহীন ব্যক্তিত্বের তুলনায় অনুকূলবাবু একটা পুরা মানুষ। আর এই সাহেবটাও মন্দ নয়, অনুকূলবাবুর মত এও স্কুল বলিতে পাগল। স্কুলের স্বার্থ, ছাত্রদের স্বার্থ সবচেয়ে বড় ওর কাছে। তবে অনুকূলবাবু ছিলেন খাঁটি স্টোইক্ আর সাহেব এপিকিউরিয়ান্—এই যা তফাত।

যা হোক, নারাণবাবুর ভাল লাগে না—পঞ্চানন মোক্তারকে না, বরিশালের এ পাড়াগাঁ না। পঞ্চানন ছাড়া গ্রামে আরও অনেক মানুষ আছে বটে, কিন্তু তাহাদের সঙ্গে নারাণবাবুর খাপ খায় না। নারাণবাবু ভাবেন, তাহারা ছেলে-ছোকরা, তাহাদের সঙ্গে কী মিশিবেন ! তা ছাড়া যাচিয়া তিনি কাহারও সঙ্গে দেখা করিতে যাইবেন না। কলিকাতার লোক, একটু লাজুক ধরনেরও আছেন।

একদিন গ্রামের বাঁশবনে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে খুব বর্ষা নামিয়া বাঁশঝাড়ের রঙ্‌ কালো দেখাইতেছে। চারিদিক মেঘে ঘিরিয়াছে গ্রামখানিকে, টারাসাদের ঘন জঙ্গলে বৃষ্টির ধারার শব্দ। গ্রামে এক জায়গায় গান-বাজনার মজলিশ হইবে, খুব আগ্রহ লইয়া নারাণবাবু সেখানে গিয়া দেখিলেন—পঞ্চানন মোক্তার, দীনবন্ধু স্যাকরা গলায় ত্রিকণ্ঠি তুলসীর মালা ঝুলাইয়া মজলিশ জুড়িয়া বসিয়া। আরও অনেক উহাদের শিষ্য-প্রশিষ্য বসিয়া আছে। কিছুক্ষণ পরে কীর্তন শুরু হইল, নারাণবাবু চলিয়া আসিলেন—তাঁহার ভাল লাগে না।

কীর্তন কেন তাঁহার ভাল লাগে না, ইহা লইয়া পঞ্চানন মোক্তারের সঙ্গে তর্ক করিয়া একদিন তিনি হার মানিয়াছেন। পঞ্চানন মোক্তার বলে, কীর্তন বাংলার নিজস্ব জিনিস, সঙ্গীতে বাংলার প্রধান দান—এমন মধুর রসের জিনিস যে উপভোগ করিতে না শিখিল, তার শ্রবণেন্দ্রিয়ই মিথ্যা।

নারাণবাবু বলেন, তিনি বোঝেন না, তাঁহার ভাল লাগে না—মিটিয়া গেল। যে ভাল

অত তর্ক করিয়া বুঝাইতে হয়, তাহার মধ্যে তিনি নাই। 'বাংলাদেশের দান, বাংলাদেশের দান' বলিয়া চেঁচাইলে কী হইবে! বাংলাদেশ, বাংলাদেশ—তিনি নিজে নিজে। ইহার চেয়ে কথা আছে? মিটিয়া গেল।'

সেদিন সেখান হইতে বাহির হইয়া পল্লীগ্রামের উপর বিতৃষ্ণা ধরিয়া গেল নারাণবাবুর। কী বিশ্রী জায়গা এ সব, বৃষ্টির পরে বাঁশবনের চেহারা দেখিলে মনে হয়, কোথায় যেন পড়িয়া আছেন। এমন জায়গায় কি মানুষ থাকে! কলিকাতার ফুটপাথে কোথাও এতটুকু ধূলাকাদা নাই—কি বিশাল জনস্রোত ছুটিয়াছে নিজের নিজের কাজে, সুইচ টিপিলেই আলো, কল টিপিলেই জল। সন্ধ্যার সময় যখন চারিদিকে বাড়ীতে আলো জ্বলিয়া ওঠে, 'বঙ্গবাণী' প্রেসে ফ্ল্যাট মেশিনের শব্দ হয়, ওয়েলেস্‌লি স্ট্রীট দিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া ট্রাম চলে, তখন এক অদ্ভুত রহস্যের ভাবে মন পূর্ণ হইয়া যায়; মনে হয়, চিরজীবন এ কর্মব্যস্ত জনস্রোতের মধ্যে কাটাইলেও ক্লান্তি আসে না, প্রাণ নবীন হয়, এতটুকু সময়ের জন্য অবসাদ আসে না মনে।

এখান হইতে চলিয়া যাইতেন, কিন্তু ভাগ্নী যাইতে দেয় না, জোর করিয়াও যাইতে মন সরে না।

জ্যোতির্ব্বিনোদ মহাশয়ও বাড়ী গিয়া খুব শান্তিতে নাই। তাঁহার বাড়ী নোয়াখালি জেলায়। তিন বৎসরে এই একবার বাড়ী আসেন, বাড়ীতে স্ত্রীপুত্র সবাই আছে। দুই-তিন ভাই, খুব বড় পরিবার—এমন কিছু বেশী মাহিনা পান না, যাহাতে স্ত্রীপুত্র লইয়া কলিকাতায় থাকিতে পারেন। বাড়ীতে আসিয়াই জ্যোতির্ব্বিনোদ এবার এক মোকদ্দমায় পড়িয়া গেলেন, জমিজমা সংক্রান্ত শরিকী মোকদ্দমা। তাহার পর হইল বড় ছেলেটির টাইফয়েড, সে সতেরো দিন ভুগিয়া এবং পয়সা খরচ করাইয়া ঠেলিয়া উঠিল তো স্ত্রী পা পিছলাইয়া হাঁটু ভাঙিয়া শয্যাগত হইয়া পড়িল।

এই রকম নানা মুশকিলে জ্যোতির্ব্বিনোদ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। এদিকে কলিকাতায় থাকিলে লোকের হাত দেখিয়া, ঠিকুজি কুষ্টি তৈরী করিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জনও হয়। এখানে সে উপার্জ্জন নাই, শুধু খরচ আর খরচ।

কলিকাতায় একরকম থাকেন ভাল, একা ঘরে একা থাকেন, কোন গোলমাল নাই। সাহেবের দাপট সহ্য করিয়া থাকিতে পারিলে আর কোন হাঙ্গামা নাই। নিজে যা-খুশি দুইটি রান্না করিলেন, অভাব-অভিযোগ হইলে নারাণবাবুর কাছে টাকাটা সিকিটা ধার করিয়া দিন চলিয়া যায়। বাড়ীর এত ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হয় না। যে চিরকাল একা কাটাইয়া আসিয়াছে, তাহার পক্ষে এসব বড় বোঝা বলিয়া মনে হয়।

ছুটি ফুরাইলে যেন বাঁচা যায়।

* * * *

যদুবাবু ছিলেন কলিকাতায়, একটা মাত্র টুইশানি সন্ধ্যার সময়—অন্য অন্য টুইশানির ছাত্র কলিকাতার বাহিরে গিয়াছে। দিবানিদ্রা হইতে উঠিয়া বেলা পাঁচটার সময় চা খাইয়া তিনি

টুইশানিতে যান। সময় কাটাইবার ওই একমাত্র উপায়। পথে এক কবিরাজ-বন্ধুর ওখানে বসিয়া কিছুক্ষণ গল্প-গুজব করেন। স্কুল-মাস্টারদের জগৎ সংকীর্ণ, বৃহত্তর কলিকাতা শহরে চেনেন কেবল টুইশানির ছাত্র ও তাহাদের অভিভাবকদের, কিংবা স্কুল-কমিটির দু-একজন উকিল কিংবা ডাক্তারকে। তাঁহাদের বাড়ীতেও মাঝে মাঝে যদুবাবু গিয়া থাকেন, কমিটির মেম্বারদের তোয়াজ করা ভাল—কী জানি, কখন কী ঘটে!

একঘেয়ে ভাবে সময় আর কাটিতে চায় না, দিবানিদ্রার অভ্যাস ক্রমশ পাকা হইয়া আসিতেছে। স্কুল-বাড়ীর সামনে দিয়া আসিবার সময় চাহিয়া দেখেন সাহেবের ঘরে আলো জ্বলিতেছে কি না! সাহেব দার্জিলিং বেড়াইতে গিয়াছে মেম সিবসন্‌কে লইয়া—ছুটি ফুরাইবার আগের দিন বোধ হয় ফিরিবে।

অবশেষে দীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশ ফুরাইল। সব মাস্টার একত্র হইলেন।

যদুবাবু বলিলেন, এই যে জ্যোতির্বিনোদ মশায়, নমস্কার! বেশ ভাল ছিলেন? কবে এলেন?

হেডপণ্ডিত যদুবাবুর সঙ্গে কোলাকুলি করিয়া বলিলেন, ভাল যদু? এখানেই ছিলে?

সকলে মিলিয়া বৃদ্ধ নারাণবাবুর পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিলেন। নারাণবাবুর স্বাস্থ্য ভাল হইয়া গিয়াছে। যেখানে গিয়াছিলেন, সেখানে দুধ ঘি মাছ সস্তা, খাওয়া-দাওয়া এখানকার চেয়ে ভাল অনেক, এখানে হাত পুড়াইয়া ভাতে-ভাত রাঁধিয়া খাইয়া থাকিতে হয়। এ বয়সে সেবাযত্ন পাওয়া আবশ্যক—সকলে এসব কথা বলিয়া নারাণবাবুকে আপ্যায়িত করিল।

মাস্টারদের মধ্যে পরস্পর প্রীতি ও আত্মীয়তার বন্ধন স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়াছে দীর্ঘদিন পরস্পর অদর্শনের পর—হিংসা বা মনোমালিন্যের চিহ্নও নাই। এমন কি মিঃ আলমকে দেখিয়াও যেন সকলে খুশী হইল।

হেডমাস্টার বলিলেন, ওয়েল-কাম জেন্টলমেন। আশা করি, আপনারা সব ভাল ছিলেন। এবার হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষা সামনে, সকলে তৈরী হোন, প্রশ্নপত্র তৈরী করুন। আজই সারকুলার বার হবে।

আলম নিজের দেশ হইতে হেডমাস্টারের জন্য প্রায় দুই ডজন মুর্গির ডিম একটা টিনের কৌটা ভরিয়া আনিয়াছে। সিবসন্ ডিম পাইয়া খুব খুশী।

—ও, মিঃ আলম, ইট ইজ সো গুড অফ ইউ! ম্যাচ্ নাইস্ এগস্ অ্যাণ্ড সো ফ্রেশ!

কিন্তু পরক্ষণেই সাহেব ও মেম দুইজনকেই আশ্চর্য করিয়া মিঃ আলম কাগজ-জড়ানো কী একটা বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিল।

মেম বলিল, কী ওটা?

সাহেব বলিয়া উঠিলেন, গুড হেভন্স্! শিওরলি দ্যাট ইজ নট এ শোলডার অফ মাটন?

মিঃ আলম মৃদু হাসিয়া বলিল, ইয়েস স্যার্, ইট ইজ স্যার্। এ লিট্ল্ শোলডার অফ মাটন—ফ্রম মাই হোম স্যার্।

বিস্মিত ও আনন্দিত মিস্ সিবসন্ বলিল, থ্যাঙ্কস্ অ-ফুলি মিঃ আলম !

যদুবাবু টীচারদের ঘরে আড়ালে বলিলেন, ঢের ঢের খোশামুদে দেখেচি বাবা, কিন্তু এ দেখছি সকলের উপর টেক্কা দিলে—আবার বাড়ী থেকে বয়ে ভেড়ার দাপনা এনেচে !

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, বাড়ী থেকে না ছাই। আপনিও যেমন ! ওর বাড়ীতে একেবারে দলে দলে ভেড়া চরচে ! ক্ষেপেছেন আপনি ! ওসব চাল দেখানো আমরা বুঝি নে ? মিউনিসিপ্যাল মার্কেট থেকে কিনে এনেছে মশাই।

ছেলেরা ক্লাসে ক্লাসে প্রণাম করিল মাস্টারদের। আজ বেশী পড়াশুনা নাই, সকাল সকাল ছুটি হইয়া গেলে সকলে মিলিয়া পুরানো চায়ের দোকানে চা পান করিতে গেলেন। দোকানী তাঁহাদের দেখিয়া লাফাইয়া উঠিল : আসুন বাবুরা, আসুন—ভাল ছিলেন সব ? আজ স্কুল খুলল বুঝি ? ওরে, বাবুদের চা দে। আবার সেই পুরানো ঘরে বসিয়া বহুদিন পরে পুরোনো সঙ্গীদের সঙ্গে চা পান। সকলেরই খুব ভাল লাগে।

যদুবাবু বলেন, নারাণদা, গল্প করুন সে দেশের !

—আরে রামো, সে আবার দেশ ! মোটে মন টেঁকে না। দুধ ঘি খেতে পেলেই কি হল ! মানুষের মন নিয়ে হল ব্যাপার—মন যেখানে টেঁকে না, সে দেশ আবার দেশ !

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, যা বলেচেন দাদা। গেলাম পৈতৃক বাড়ীতে। ভাবলাম, অনেক দিন পরে এলাম, বেশ থাকব। কিন্তু মশাই, দু দিন যেতে না-যেতে দেখি আর সেখানে মন টিকচে না।

—কলকাতার মতন জায়গা আর কোথাও নেই রে ভাই।

—খুব সত্যি কথা।

—মানুষের মুখ যেখানে দেখা যায়, দুটো বন্ধুর সঙ্গে গল্প করে সুখ যেখানে, খাই না-খাই সেখানে পড়ে থাকি।

নারাণবাবু অনেকদিন পরে চুনিদের বাড়ী পড়াইতে গেলেন।

চুনিরা দেওঘর না কোথায় গিয়াছিল, বেশ মোটাসোটা হইয়া ফিরিয়াছে। অনেকদিন পরে চুনির সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াতে নারাণবাবু বড় আনন্দ পাইলেন।

চুনি আসিয়া প্রণাম করিল। নারাণবাবু প্রথম দিনটা তাহাকে পড়াইলেন না, বরিশালে যে গ্রামে গিয়াছিলেন সে গ্রামের গল্প করিলেন, পঞ্চানন মোক্তারের কথা বলিলেন। চুনি তাঁহার কাছে দেওঘরের গল্প করিল।

নারাণবাবু বলিলেন, পান্না কোথায় রে ?

—সে স্যার, মাসীমার বাড়ী গিয়েছে কালীঘাটে কাল আসবে। মাসীমার বড় ছেলের পৈতে কিনা।

—তুই যাস নি যে ?

—স্যার, আজ প্রথম দিনটা—আপনি আসবেন। রাত্রে যাব।

উত্তর শুনিয়া নারাণবাবু আহ্লাদে আটখানা হইয়া গেলেন। নিজের ছেলেপিলে নাই,

পরের ছেলেকে মানুষ করা, তাহাদের নিজের সন্তানের মত দেখিয়া অপত্যস্নেহের ক্ষুধা নিবারণ করা যাহাদের অদৃষ্টলিপি—তাহাদের এ-রকম উত্তরে খুশী হইবার কথা। চুনি বলিল, চা খাবেন স্যার্‌? আনি—

নারাণবাবু ভাবেন—নিজের নাই, তাতে কী! আমার ছেলেমেয়ে এই ওয়েলেস্‌লি অঞ্চলে সর্ব্বত্র ছড়ানো—আমার ভাবনা কী! একটা করে টাকা যদি দেয় প্রত্যেকে, বুড়ো বয়সে আমার ভাবনা কী?

—স্যার্‌, আজ পড়ব না।

—বেশ, গল্প শোন্‌—এই বরিশালের গাঁয়ে—

—না স্যার্‌, একটা ভূতের গল্প করুন।

—ভূত-টুত সব মিথ্যে। ও-সব নিয়ে মাথা ঘামাস নে ছেলেবেলা থেকে।

—কিন্তু স্যার্‌, কুণ্ডাতে একটা বাড়ী আছে—

—কোথায়?

—কুণ্ডা—দেওঘরের কাছে স্যার্‌। সেখানে একটা বাড়ীতে ভূতের উপদ্রব ব'লে কেউ ভাড়া নেয় না। সত্যি, আমরা জানি স্যার্‌।

নারাণবাবু আর এক সমস্যায় পড়িলেন। মিথ্যা ভয় এক বালকের মন হইতে কী করিয়া তাড়ানো যায়? নানা কুসংস্কার বালকদের মনে শিকড় গাড়িবার সুযোগ পায় শুধু অভিভাবকদের দোষে। তিনি শিক্ষক, তাঁহার কর্ত্তব্য, বালকদের মন হইতে সে সমস্ত কুসংস্কার উচ্ছেদ করা।

নারাণবাবু নিজের নোট-বইয়ে লিখিয়া লইলেন। সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করা আবশ্যক, এ বিষয়ে কী করা যায়!

চুনির মা আসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বলিলেন, বলি ও দিদি, মাস্টারকে বল না—ছেলে যে মোটে বই হাতে করতে চায় না।

(দেওঘরে গিয়ে বেড়িয়ে আর খেলে বেড়াবে—তার কী করবেন উনি?)

নারাণবাবু বলিলেন, বউমা, চুনি ছেলেমানুষ, একদিনে দুদিনে ও স্বভাব ওর যাবে না। আমি ওকে বিশেষ স্নেহ করি, সেদিকে আমার যথেষ্ট নজর আছে, আপনি ভাববেন না।

চুনির মা বলিলেন, ও দিদি, বল যে, পরীক্ষা সামনে আসছে, চুনিকে দু বেলা পড়াতে হবে। এক মাস দেড় মাস তো বসিয়ে মাইনে দিয়েছি। এখন মাস্টার যেন দু-বেলা আসে।

নারাণবাবু মেয়েমানুষের কাছে কী প্রতিবাদ করিবেন? ভাষ্য পড়াইয়া এখানে মাহিনা আদায় করিতে গায়ের রক্ত জল হইয়া যায়, ছুটির মাসে বসাইয়া কে তাঁহাকে মাহিনা দিল? ছুটির আগের মাসের মাহিনা এখনও বাকী।

মুখে বলিলেন, বউমা, সকালে আজকাল সময় বেশী পাওয়া যায় না। আমারও নিজের একটু কাজ আছে। আচ্ছা, তা বরং দেখব—

—দেখাদেখি চলবে না, বলে দাও দিদি। আসতেই হবে—না পারেন, আমরা অন্য

মাস্টার রাখব। ওই তো সে দিন পাশের মেসের ছেলে—তিনটে পাসের পড়া পড়ছে—বলছিল, আমায় দশ টাকা দেবেন, দু বেলা পড়াব।

এই সময় চুনি মাকে ধমক দিয়া বলিল, যাও না এখান থেকে, তোমার আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিকনেস কাটতে হবে না।

নারাণবাবু বলিলেন, ছিঃ, মাকে অমন কথা বলতে আছে?

মনে মনে কিন্তু খুশী হইলেন।

চুনি বলিল, স্যার, আপনি মার কথা শুনবেন না। দু বেলা আপনি পড়ালেও আমি পড়ব না। আমার দু বেলা পড়তে ইচ্ছে করে না।

নারাণবাবুর আনন্দ অনেকখানি উবিয়া গেল। তাঁহার অসুবিধা দেখিয়া তাহা হইলে চুনি কথা বলে নাই, সে দেখিয়াছে নিজের সুবিধা! পাছে নারাণবাবু স্বীকার করিলে দুই বেলা পড়িতে হয়, তাই মাকে ধমক দিয়াছে হয়তো।

বাড়ীতে ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁহার এঞ্জিনীয়ার-বন্ধুটি তাঁহার জন্ত অপেক্ষা করিতেছেন।

—কী নারাণবাবু, কবে ফিরলেন?

—আজ দিন-তিনেক। ভাল সব? বসুন, বসুন শরৎবাবু।

মনের মতন সঙ্গী পাইয়াছেন তিনি। উঃ, কোথায় বরিশালের অজ-পাড়াগাঁয়ের পঞ্চানন মোক্তার, আর কোথায় তাঁহার এই বন্ধু শরৎ সান্ন্যাল!

দুইজনে যেমন একত্র হইয়াছেন, অমনি উঁচু বিষয়ের আলোচনা শুরু। এই জন্যই কলিকাতা এত ভাল লাগে। এ সব লইয়া কথা বলিবার লোক কি বাংলাদেশের অজ-পাড়াগাঁয়ে মিলিবে?

নারাণবাবুর বন্ধু বলিলেন, ভাল কথা দাদা, আপনাকে দেখাব বলে রেখে দিয়েছি।

—কী?

—'রিডার্স ডাইজেস্ট'-এ একটা আর্টিক্‌ল্ বেরিয়েছে বর্ত্তমান চায়নার ব্যাপার নিয়ে। কাল এনে দেখাব।

—আচ্ছা, কাল আনবেন। কিন্তু আমার ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ আছে তো ওয়াশিংটন-চুক্তি সম্বন্ধে?

—আপনার ও-কথা টেঁকে না। রামানন্দবাবুর মন্তব্য পড়ে দেখবেন এ মাসের 'মডার্ন রিভিউ'-এ।

—আলবত্ত টেঁকে। আমি কারও কথা মানি নে।

এ কথা নারাণবাবু বলিলেন একটা খাঁটি ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল আলোচনা জমাইয়া তুলিবার জন্ত। তর্ক না হইলে আলোচনা জমে না।

কলিকাতা না হইলে এমন মনের খোরাক কোথায় জোটে?

দুই বন্ধুতে মিলিয়া মনের খেদ মিটাইয়া রাত এগারোটা পর্য্যন্ত ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল আলোচনা চলিল। দুই জনেই সমান তার্কিক। কোন কথায়ই মীমাংসা হইল না। তা না

হউক। মীমাংসার জন্য কেহ তর্ক করে না। তর্কের খাতিরেই তর্ক করিতে হয়। আফিমের নেশার মত তর্কের নেশাও একবার পাইয়া বসিলে আর ছাড়িতে চায় না।

নারাণবাবু বলিলেন, আজ একটু যোগবাশিষ্ট পড়া হল না!

—তা বেশ তো, পড়ুন না। আরও রাত হোক।

অনেক রাত্রে নারাণবাবুর বন্ধু রায় বাহাদুর শরৎ সান্যাল বিদায় গ্রহণ করিলে নারাণবাবু রান্না চড়াইলেন। মনে এত আনন্দ, ও-বেলার বাসি পুঁটিমাছ-ভাজা ছিল, তাই দিয়া ঝোল চড়াইলেন আর ভাত—আর কিছু না। মনের আনন্দই মানুষকে তাজা রাখে, খাইয়া মানুষ বাঁচে না শুধু।

খাওয়া শেষ হইলে সাহেবের ঘরের দিকে উঁকি মারিয়া দেখিলেন, সাহেবের টেবিলে আলো জ্বলিতেছে, অত রাত্রে সাহেব লেখাপড়া করিতেছেন নাকি? নারাণবাবুর ইচ্ছা হইল, ঘরে ঢুকিয়া দেখেন সাহেব কী পড়িতেছেন!

সাহেব বলিলেন, কাম ইন্।

নারাণবাবু বিনীত হাস্যের সহিত ঢুকিলেন।

—ইয়েস?

—না, এমনি দেখতে এলাম, আপনি কী পড়ছেন!

—আমি আপিসের কাজ করছিলাম। বোস।

—স্যার, কলকাতার মত জায়গা নেই।

—আমাদের মত লোক অন্য জায়গায় গিয়ে থাকতে পারে না। আমার এক ভাই চায়নাতে আছে—মিশনারি। ক্যান্টন থেকে নদীপথে যেতে হয়—অনেক দূর। আগে সে ব্রিটিশ গানবোটে মেডিক্যাল অফিসার ছিল, এখন মিশনারি হয়েছে। সে কিন্তু চীনদেশের একটা অজ-পাড়াগাঁয়ে মিশনে থাকে। আমি একবার গিয়েছিলাম সেখানে, গিয়ে আমার মন হাঁপিয়ে উঠল।

—আমিও স্যার্ বরিশালে গিয়েছিলাম ছুটিতে, আমার মন টেঁকে নি।

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, স্কুলটাকে আরও ভাল করতে হবে স্যার্।

—আমিও তাই ভাবছি। একটা বিজ্ঞাপন দেব কাগজে, আরও ছেলে হোক!

দুজনে বসিয়া স্কুলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা হইল।

নারাণবাবু বিদায় লইয়া শয়নের জন্য গেলেন।

শ্রাবণ মাসের দিকে স্কুলের কাজ ভয়ানক বাড়িল।

এই সময় একজন নতুন মাস্টার স্কুলে নেওয়া হইল—বেশী বয়স নয়, ত্রিশের মধ্যে। লোকটি কবিতা লেখে, বড় বড় কথা বলে, অবস্থাও বোধ হয় ভাল। কারণ, সাধারণ স্কুলমাস্টারদের অপেক্ষা ভাল সাজগোজ করিয়া স্কুলে আসে, বেশির ভাগ আপন মনে বসিয়া থাকে, কাহারও সঙ্গে কথাবার্তা বলে না। ফট ফট করিয়া ইংরেজী বলে যখন-তখন। নাম

—রামেন্দুভূষণ দত্তগুপ্ত, বাড়ী—নৈহাটির কাছে কী একটা জায়গায়।

যদুবাবু চায়ের দোকানে বলিলেন, ওহে, এ নবাবটি কে এল হে? নরলোকের সঙ্গে বাক্যালাপ করে না যে!

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, করার উপযুক্ত মনে করলেই করবে।

নারাণবাবু চুপ করিয়া ছিলেন। যদুবাবু বলিলেন, কী দাদা! চুপ করে আছেন যে?

—কী বলি বল? কী রকম লোক, কিছু জানি নে তো?

—কী রকম বলে মনে হয়? বেজায় গুমুরে?

—তা হতে পারে। তবে ছেলেমানুষ, শাইও হতে পারে।

—শাই, না ছাই। কারও সঙ্গে কথা বলে না, টিচারস-রুমে একলাটি বসে কী যেন ভাবে!

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, লোকটা কবি, তাই বোধ হয় আপন মনে ভাবে—

যদুবাবু কাহারও প্রশংসা সহ্য করিতে পারেন না, তিনি বলিলেন, হ্যাঃ, কবি—একেবারে রবি ঠাকুর। ভেঁপো কোথাকার!

সে দিন টিফিনের পর কিছুক্ষণ ক্লাসে নূতন শিক্ষক নাই। দশ মিনিট কাটিয়া গেল, তখনও তাঁহার দেখা নাই।

হেডমাস্টার কটমট দৃষ্টিতে ক্লাসের শূন্য চেয়ারের দিকে চাহিয়া বলিলেন, কার ক্লাস?

মনিটার দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, নিউ টিচার স্যার্।

হেডমাস্টার চলিয়া গেলেন।

অনেকক্ষণ পরে নতুন মাস্টার আসিয়া বসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মথুরা চাকর আসিয়া একটা স্লিপ দিল তাঁহার হাতে, হেডমাস্টার আপিসে ডাকিয়াছেন।

নতুন মাস্টার উঠিয়া আপিসে গেলেন।

—আমাকে ডেকেছেন স্যার্?

—হ্যাঁ। আপনি ক্লাসে ছিলেন না?

—আমি ক্লাস থেকেই আসছি।

—দশ মিনিট পর্য্যন্ত আপনি ক্লাসে ছিলেন না।

—আমি দুঃখিত। চা খেতে গিয়ে একটু দেরি হয়ে গেল।

—কোথায় চা খেতে গিয়েছিলেন? আমায় না বলে বাইরে যাবেন না।

—কেন স্যার্?

হেডমাস্টার ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া নতুন মাস্টারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, আমার স্কুলের নিয়ম।

নতুন মাস্টার কিছু না বলিয়া ক্লাসে গিয়া পড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার হেডমাস্টারের আপিসে আসিয়া বলিলেন, স্যার্, একটা কথা—

—কী?

—আমি স্কুলের একজন টীচার, ছাত্র নই—হেডমাস্টারের কাছে অনুমতি নিয়ে স্কুলের ফটকের বাইরে যেতে হয় ছাত্রদের, টীচারদের নয়। আমার দেরি হয়েছিল ফিরতে, সে জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু আপনাকে না বলে যাওয়ার জন্যে আপনি অনুযোগ করলেন, এটা ঠিক করেছেন বলে মনে করি না।

হেডমাস্টারের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে নতুন টীচার গটগট করিয়া ক্লাসে চলিয়া গেলেন। দোর্দণ্ডপ্রতাপ ক্লার্কওয়েল তো অবাক, তাঁহার অধীনস্থ কোন মাস্টার যে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া এ কথা বলিতে পারে, তাহা তাঁহার কল্পনার অতীত। তিনি তখনই মিঃ আলমকে ডাকিলেন।

—ইয়েস স্যার্‌।

—নতুন টীচার বেশ ভাল পড়ায়?

—জানি না স্যার্‌। বলেন তো দৃষ্টি রাখি।

—রাখো।

—কী রকম একটু অসামাজিক ধরনের—

—শুনলাম নাকি, কবি। বাংলা কবিতা পড় তোমরা—পড়েছ কী রকম কবিতা লেখে?

মিঃ আলম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হাত কড়িকাঠের দিকে উঠাইয়া থিয়েটারী ভঙ্গি করিলেন। তারপর স্বর নীচু করিয়া বলিলেন, কিসের কবি! বাংলাদেশে সবাই কবিতা লেখে আজকাল। কবি!

—তুমি বাংলা কবিতা পড় মিঃ আলম?

—পড়ি বইকি স্যার্‌।

আলমের এ কথা সত্য নয়, বাংলা সাহিত্যের কোন খবর কোনদিনও তিনি রাখেন না।

মিঃ আলমের সঙ্গে একদিন নতুন মাস্টারের ঠোকাঠুকি বাধিল।

ব্যাপারটা খুব সামান্য বিষয় অবলম্বন করিয়া। ক্লাসে কী একটা পরীক্ষার কাগজে নতুন মাস্টার নম্বর দিয়া ছেলেদের নিকট ফেরত দিয়াছেন। মিঃ আলম সে ক্লাসে পড়াইতে গিয়া সামনের বেঞ্চির উপর একটি ছেলের পরীক্ষার খাতা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কিসের খাতা রে?

ছেলেটি বলিল, এবারকার উইকলি এক্সারসাইজের খাতা স্যার্‌, নতুন স্যার্‌ দেখে ফেরত দিয়েছেন।

—কী সাব্‌জেক্ট?

—হিষ্ট্রি।

—দেখি খাতাখানা।

মিঃ আলম খাতাখানা লইয়া উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া বলিলেন, নম্বর দেওয়া সুবিধে হয় নি।

—কেন স্যার্‌?

—এর নাম কি মার্ক দেওয়া! এ আনাড়ীর মার্ক দেওয়া। এই খাতায় তুমি ষাট নম্বর কখনও পাও না—আমার হাতে চল্লিশের বেশী নম্বর উঠত না।

নতুন টীচারের কাছে ছেলেরা অন্যভাবে ঘুরাইয়া বলিল, স্যার্, আপনার হাতে বড় নম্বর ওঠে।

—কেন রে?

—স্যার্, ওই সতীশকে ষাট দিয়েছেন, ও চল্লিশের বেশী পায় না।

—কে বলেছে তোকে?

—মিঃ আলম বলে গেলেন স্যার।

—কী বললেন?

—বললেন, এ আনাড়ীর মার্ক দেওয়া হয়েছে।

নতুন টীচার তখনই গিয়া হেডমাস্টারের আপিসে মিঃ আলমকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন। হেডমাস্টার নাই, ক্লাসে পড়াইতে গিয়াছেন। বলিলেন, আপনার সঙ্গে একটা কথা—এক মিনিট—

—কী বলুন?

—আপনি কি ফোর্থ ক্লাসে আমার খাতা দেখা সম্বন্ধে কিছু বলেছেন?

—কেন বলুন তো?

—না, তাই বলছি। ছেলেরা বলছিল, আপনি খাতা দেখে বলেছেন যে খাতা ভাল দেখা হয় নি।

—হ্যাঁ—তা—না—সে কথা ঠিক না—তবে হ্যাঁ, একটু বেশী নম্বর বলেই আমার মনে হল কিনা—

খুব ভাল কথা। আপনি অভিজ্ঞ টীচার, আমার ভুল ধরবার সম্পূর্ণ অধিকারী। আমায় দয়া করে যদি খাতা দেখাটা সম্বন্ধে একটু বলে-টলে দেন—আমার অনেক ভুল সংশোধন হতে পারে। আমরা আনাড়ী কিনা আবার এ বিষয়ে?

আলমের মুখ লাল হইয়া উঠিল। বলিলেন, তা আমার যা মনে হয়েছে, তাই বলেছি। আপনার নম্বর দেওয়াটা একটু বেশী বলেই মনে হয়েছিল।

আমি মোটেই তার প্রতিবাদ করছি না। আমি কেবল বলতে চাই ক্লাসে ছেলেদের সামনে মন্তব্য না করে আমাকে আড়ালে ডেকে বললেই ভাল হত।

ন্যায্য কথা। এ কথার উপর কোন কথা চলে না। মিঃ আলমের চুপ করিয়া থাকা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে হেডমাস্টারকে একা পাইয়া মিঃ আলম সাত-খানা করিয়া তাঁহার কাছে লাগাইলেন, নতুন টীচারকে খাতা দেখতে দেবেন না স্যার।

—নতুন টীচারকে? কেন, মিঃ আলম?

—উনি খাতা মনোযোগ দিয়ে দেখেন না।

—দেখেছিলে নাকি কোন খাতা?

হ্যাঁ স্যার্। ফোর্থ ক্লাসের সতীশকে উনি ষাট নম্বর দিয়েছেন যে খাতায়, তাতে চল্লিশের বেশী নম্বর ওঠে না। ভুল কাটেনও নি সব জায়গায়।

এই কথার মধ্যে মুশকিল আছে। সব ভুল নিখুঁতভাবে কাটিয়া কোন মাস্টারই খাতা দেখেন না—স্বয়ং মিঃ আলমও না। এখানে মিঃ আলম নতুন টীচারের উপর বেশ এক চাল চালিলেন। হেডমাস্টার খাতা চাহিয়া পাঠাইয়া সত্যই দেখিলেন, প্রত্যেক পাতায় এক-আধটা ভুল রহিয়া গিয়াছে, যাহা কাটা হয় নাই। নতুন মাস্টারের ডাক পড়িল ছুটির পর।

হেডমাস্টার বলিলেন, ফোর্থ ক্লাসের হিস্ট্রির খাতা দেখেছিলেন আপনি ?

—হ্যাঁ স্যার্।

—খাতা ভাল করে দেখেন নি তো। সব ভুলে লাল দাগ দেন নি।

—বেশীর ভাগ দিয়েছি স্যার্। দু-একটা ছুটে গিয়েছে হয়তো।

—না, আমার স্কুলে ওভাবে কাজ করলে চলবে না। খাতা সব আপনি ফিরিয়ে নিয়ে যান। আবার দেখতে হবে।

—যে আজ্ঞে স্যার্।

পরদিন নতুন মাস্টার সারকুলার-বই দেখিয়া বাহির করিলেন—মিঃ আলম ফার্স্ট ক্লাসের ইংরাজী গ্রামার ও রচনার খাতা দেখিয়াছেন। তিনখানি খাতা চাহিয়া লইয়া দেখিতে দেখিতে বাহির করিলেন, মিঃ আলম গড়ে প্রত্যেক পাতায় অন্তত তিনটি করিয়া ভুলের নীচে লাল দাগ দেন নাই।

নতুন টীচার খাতা কয়খানি হাতে করিয়া হেডমাস্টারের কাছে না গিয়া মিঃ আলমের কাছে গেলেন। খাতা দেখাইয়া বলিলেন, আপনার খাতা দেখা যদি আদর্শ হিসেবে নিতে হয়, তা হলে প্রত্যেক পাতায় আমার তিনটি ভুলে লাল দাগ না দিয়ে রাখা উচিত ছিল। দেখুন খাতা কখানা।

মিঃ আলম উল্টাইয়া খাতাগুলি দেখিল। যুক্তি অকাট্য। গড়ে তিনটি করিয়া ভুলে লাল দাগ দেওয়া হয় নাই—খাঁটি কথা।

মিঃ আলমের মুখ লাল হইয়া উঠিল অপমানে, কিন্তু কোন কথা বলিলেন না।

নতুন টীচার বলিলেন, আপনি বললেন কিনা হেডমাস্টারের কাছে আমার বড্ড ভুল থাকে খাতায়, তাই দেখালুম—ভুল সকলেরই থাকে। ওগুলো ওভারলুক করতে হয়। সব কথায় হেডমাস্টারের কাছে—

মিঃ আলম রাগিয়া বলিলেন, আপনি কী করে জানলেন, আমি হেডমাস্টারের কাছে বলেছি।

—মনের অগোচর পাপ নেই। আপনি জানেন, আপনি বলেছেন কিনা—বলিয়াই নতুন টীচার বেশ কায়দার সহিত ঘর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

এ ব্যাপার কী করিয়া যেন অন্য টীচারেরা জানিতে পারিলেন, টীচারদের বসিবার ঘরে

টিফিনের সময় এ কথা লইয়া বেশ গুলজার হইল। মিঃ আলমের অপমানে সকলেই খুশী।

যদুবাবু বলিলেন, বেশ হয়েছে অন্ত্যজটার। থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিয়েছে নতুন টীচার। কী ওর নাম, রামেন্দুবাবু বুঝি?

নারাণবাবু সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার একটা গুণ, পরের কথায় বড় একটা থাকেন না। বলিলেন, বাদ দাও ভায়া ও-কথা।

যদুবাবু বলিলেন, বাদ দেব কেন? আপনি তো দাদা, দেবতুল্য লোক। তা বলে দুষ্ট লোকও তো আছে পৃথিবীতে। তাদের শাস্তি হওয়াই ভাল।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, জানেন দাদা, একটা কথা বলি। ওই আলমটা সবার নামে হেডমাস্টারের কাছে লাগিয়ে বেড়ায়—এ কথা আপনি অস্বীকার করতে পারেন? অমন হিংসুক লোক আর দুটি দেখি নি, এই আপনাকে বলে দিচ্ছি।

জ্যোতির্ব্বিনোদ নীচু ক্লাসের পণ্ডিত—বড় বড় ক্লাসে যাঁহারা পড়ান, তাঁহাদের সমীহ করিয়া চলেন, তিনি কাহারও বিরুদ্ধে কোন সমালোচনা হইলে বিশেষ যোগ দেন না। তিনি বলেন, আমি চুনোপুঁটি, আপনারা সকলেই রুই-কাতলা—আমার কোন কথায় থাকা সাজে না। তিনিও আজ বলিলেন, একটা ভাল বলতে হয় রামেন্দুবাবুকে—তিনি ওই খাতা নিয়ে হেডমাস্টারের কাছে না গিয়ে মিঃ আলমের কাছে গিয়েছেন।

যদুবাবু কাহারও ভাল দেখিতে পারেন না। তিনি বলিলেন, আরে, সেটা কিছু নয় হে ভায়া, হেডমাস্টারের কাছে যেতে সাহস কি হয় সবারই?

নারাণবাবু বলিলেন, তা হয়। অতখানি যে করতে পারে, সাহেবের কাছে যাওয়ার সাহস তার খুবই আছে। লোকটি ভদ্রলোক।

যদুবাবু বলিলেন, তবে একটু গুমুরে। যাক, সব গুণ মানুষের থাকে না। এ কাজটা করে যা শিক্ষা দিয়েছে আলমকে, ভারি খুশী হয়েছি—হা-হা, কী বল ক্ষেত্র-ভায়া?

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, স্পিরিট আছে ভদ্রলোকের।

—ডেকে নিয়ে এস না। ওই তো ওদিকের ছাদে বসে থাকে একলাটি। টিফিনে টীচারদের ঘরে কোনদিন তো আসে না।

নারাণবাবু বলিলেন, বসে বসে বই পড়ে লাইব্রেরি থেকে নিয়ে। সেদিন বঙ্কিমের বই পড়ছিল। পকেটে একদিন শেলির কবিতা ছিল। তোমরা ওকে গুমুরে ভাব, ও তা নয়। কবি কিনা, একটু আনমনে ভাবতে ভালবাসে।

—যাও না ক্ষেত্র-ভায়া, ডেকে নিয়ে এস না।

—আমি পারব না দাদা। কিছু যদি বলে বসে! তার চেয়ে চলুন, আজ চায়ের দোকানের আড্ডায় নিয়ে যাওয়া যাক ওকে। আলাপ-সালাপ করা যাক।

ছুটির পর গেটের বাহিরে মাস্টারের দল নতুন মাস্টারের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন; কারণ, এ ঘনিষ্ঠতা হেডমাস্টার বা মিঃ আলমের চোখের আড়ালে হওয়াই ভাল। মিঃ আলম

বা হেডমাস্টারের নেকনজরে যে ব্যক্তি নাই, তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে যাওয়ার বিপদ আছে।

নতুন টীচার চোখে চশমা লাগাইয়া ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে নব্য কবির স্টাইলে আকাশ-পানে মুখ করিয়া যেই গেটের বাহিরে পা দিয়াছেন, অমনি যদুবাবু এদিক-ওদিক চাহিয়া বলিলেন, এই যে শুনছেন, রামেন্দুবাবু—এই যে—

রামেন্দুবাবু হঠাৎ যেন চমকিয়া উঠিয়া পিছনে ফিরিয়া বিস্ময়ের সঙ্গে বলিলেন, আমাকে বলছেন ?

যেন তিনি ইহা প্রত্যাশা করেন নাই, তাঁহাকে কেহ ডাকিবে।

যদুবাবু বলিলেন, আমরাই ডাকছি, আসুন, একটু চা খেয়ে আসি।

—ও ! আচ্ছা—তা চলুন।

সকলেই খুব আগ্রহান্বিত। নতুন টীচারের সঙ্গে এত দিন আলাপ ভাল করিয়া হয়ই নাই, অনেকের সঙ্গে একটা কথাও হয় নাই। আজ ভাল করিয়া আলাপ করা যাইবে। লোকটার অদ্ভুত কার্য্যে তাহার সম্বন্ধে মাস্টারদের কৌতূহলের অন্ত নাই। আলমকে যে অপমান করিয়া ছাড়িয়াছে, সে সকলের বন্ধু।

চায়ের দোকানে গিয়া প্রতিদিনের মত মজলিস জমিল। স্কুল-মাস্টারদের অবশ্য যতটা হওয়া সম্ভব, তাহার বেশী ইঁহাদের ক্ষমতা নাই। নতুন টীচারকে খাতির করিয়া দুইখানা টোস্ট দেওয়া হইল, বাকী সবাই একখানা করিয়া টোস্ট লইলেন। পরস্পর একটা মানসিক বোঝাপড়া হইল যে, নতুন টীচারের খাবারের বিলটা সকলে মিলিয়া চাঁদা করিয়া দিবেন।

নারাণবাবু আলাপের ভূমিকাস্বরূপ প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন, মশায়ের বাড়ী কোথায় ?

—আমার বাড়ী ছিল গিয়ে নদে জেলায় সুবর্ণপুর। এখন কলকাতায় আছি অনেক দিন।

—কলকাতায় কোথায় থাকেন ?

—মেসে।

—ও !

যদুবাবু একটু ঘনিষ্ঠতা করার জন্য বলিলেন, অনেক দিন কলকাতায় আর কী আছ, ভায়া, তোমার বয়েসটা কা আর এমন ? আমাদের চেয়ে কত ছোট—

নতুন টীচার এ ঘনিষ্ঠতায় বিশেষ ধরা দিলেন না। খুব ভদ্রতার সঙ্গে বিনীতভাবে জানাইলেন, তাঁহার বয়স খুব কম নয়, প্রায় চৌত্রিশ পার হইতে চলিল। 'দাদা' কথাটার ব্যবহার একবারও করিলেন না। বেশ একটু ভদ্র ও বিনীত ব্যবধান বজায় রাখিয়া চলিলেন কথাবার্ত্তায় ও চালচলনে।

একথা-ওকথার পর যদুবাবু হঠাৎ বলিলেন, আজ আমরা খুব খুশী হয়েছি, বেশ শিক্ষা দিয়েছেন (মাথামাথি করিবার সাহস তাঁহার উবিয়া গিয়াছিল) ওই ব্যাটাকে—

নতুন টীচার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, কার কথা বলছেন ?

—আরে, ওই যে ওই আলমটাকে—ও ব্যাটা হেডমাস্টারের কাছে প্রত্যেকের বিষয়ে লাগাবে। আমাদের উস্তন-কুস্তন করে মেরেচে মশাই। উঃ, ও একেবারে অন্ত্যজ—ওর যা অপমান করেচেন আজ! দেখুন তো, আপনার নামে কিনা লাগাতে—

নতুন টীচারের মুখ কঠিন হইয়া উঠিল। তিনি বিরস কণ্ঠে বলিলেন, ও আলোচনা নাই বা করলেন এখন। মিঃ আলমের ভুল হতে পারে। ভুল সবারই হয়। আমি তাঁর ভুল পয়েন্ট আউট করেছি মাত্র। আদারওয়াইজ হি ইজ এ ভেরি গুড টীচার—ভেরি অনেস্ট অ্যাণ্ড সিন্‌সিয়ার টীচার! যাক্ ওসব কথা।

কঠিন ভদ্র স্বরের গাম্ভীর্য্যে চায়ের দোকানের হাল্‌কা আবহাওয়া যেন থমথম করিয়া উঠিল।

যদুবাবু আর মাথামাখি করিবার সাহস পাইলেন না। অন্য কথা উঠিল। নতুন টীচার বিশেষ কোন কথা বলিলেন না। মজলিস জমিল না, যতটা আশা করা গিয়াছিল।

চায়ের মজলিস শেষ হইলে নতুন টীচার বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। সকলের পয়সা তিনি নিজেই দিয়া দিলেন।

যদুবাবু বলিলেন, গভীর জলের মাছ, দেখলে তো?

ক্ষেত্রবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, হুঁ।

—বেশ চালবাজ।

—তা একটু আছে বইকি।

নারাণবাবু বলিলেন, তোমরা কারুর ভালো দেখ না—ওই তোমাদের দোষ। এ চালবাজ, ও গভীর জলের মাছ—এই সব তোমাদের কথা।

জ্যোতির্ব্বিনোদ বলিলেন, না না, ভদ্রলোক ভালই! আমি তো দেখচি বেশ উদার লোক।

যদুবাবু বলিলেন, ওই তো ভায়া, ওই জন্যেই তো বলচি গভীর জলের মাছ। আমাদের পয়সাটি পর্য্যন্ত নিজে দিয়ে গেল, যেন কত ভদ্রতা! অথচ—

নারাণবাবু বলিলেন, অথচ কী? তুমি সব জিনিসের মধ্যে একটা 'অথচ' না বের করে ছাড়বে না ভায়া!

—অথচ মনের কথাটা প্রকাশ করলে না।

—অথচ নয়, অর্থাৎ তোমার মত পেটপাতলা নয়।

—আপনি তো দাদা আমার সবই দোষ দেখেন।

—রাগ কোর না ভায়া। আমি তো ও-ছোকরার কোন দোষই দেখলাম না। বসে বসে মিঃ আলমের নামে কুৎসা গাইলেই কি ভাল লোক হত?

নারাণবাবুকে সকলেই তাঁহার বয়সের জন্য একটু সমীহ করিয়া চলে। যদুবাবু ইহা লইয়া নারাণবাবুর সঙ্গে আর তর্ক করিলেন না।

মোটের উপর সে দিন চায়ের মজলিস হইতে বাহির হইয়া সকলেই অসন্তোষ লইয়া বাড়ী ফিরিলেন।

মাসের শেষে ছেলেদের প্রোগ্রেস-রিপোর্ট ইত্যাদি লেখার ভিড় পড়িয়া গেল। হেডমাস্টারের কড়া হুকুম আছে, মাসের শেষদিন কোন টীচার ছুটির পর বাড়ী যাইতে পারিবে না—বসিয়া বসিয়া সব প্রোগ্রেস-রিপোর্ট লিখিয়া হেডমাস্টারের সই করাইয়া বিভিন্ন ক্লাসের মার্কের খাতায় ছেলেদের মার্ক জমা করিয়া, ক্লাসের হাজিরা-বহিতে ছেলেদের গর-হাজিরা বাহির করিয়া তবে যাইতে পারিবে।

এই সব কেরানীর কাজ সাঙ্গ করিয়া বাড়ী ফিরিতে রাত সাড়ে সাতটা বাজিয়া যায়।

স্কুলের প্রথানুযায়ী মাস্টারদের এদিন জলখাবার দেওয়া হয় স্কুলের খরচে। যদুবাবু ছুটির পর সাহেবের কাছে জলখাবারের টাকা আনিতে গেলেন—বরাবর তিনিই যান ও কোন দোকান হইতে খাবার কিনিয়া আনেন।

বরাদ্দ আছে সাড়ে পাঁচ টাকা। সাহেব যদুবাবুর হাতে সাতটি টাকা দিয়া বলিলেন, আজ ভাল করে খাও সকলে—লাড্ডু রসগোল্লা বেশী করে নিয়ে এস।

যদুবাবু প্রথমে একটি রেস্টুরেন্টে গিয়া দুই পেয়ালা চা খাইলেন, তারপর ছয় টাকার খাবার কিনিলেন এক দোকান হইতে। বাকী একটি টাকা তাঁহার উপরি-পাওনা। অন্য অন্য বার আট আনা পয়সা উপরি-পাওনা হয় অর্থাৎ পাঁচ টাকার খাবার কিনিয়া আট আনা পকেটস্থ করেন।

স্কুলে আসিতে প্রায় সন্ধ্যা হইল।

মাস্টারেরা অধীর আগ্রহে জলখাবারের প্রত্যাশায় বসিয়া আছেন। একজন বলিলেন, এত দেরি কেন যদুবাবু?

—আরে, গরম গরম ভাজিয়ে আনচি। আমার কাছে বাবা ফাঁকি দিতে পারবে না কোন দোকানদার। বসে থেকে তৈরী করিয়ে ষোল আনা দাঁড়ি ধরে ওজন করিয়ে তবে—

অন্যান্য মাস্টারদের অগাধ বিশ্বাস যদুবাবুর উপরে। সকলেই বলেন, যদুবাবুর মত কিনতে-কাটতে কেউ পারে না—পাকা লোক একেবারে যাকে বলে।

টীচারদের ঘরে বেঞ্চির উপর ছোট ছোট পাতা পাতিয়া খাবার পরিবেশন করা হইল। যদুবাবু এখানে খাইবেন না, তিনি বাড়ী লইয়া যাইবেন। জ্যোতির্বিনোদ মশায় ঘিয়ে-ভাজা জিনিস খাইবেন না, তিনি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, তাঁহার জন্য শুধু সন্দেশ-রসগোল্লা আনা হইয়াছে। নতুন টীচার বেঞ্চির এক পাশে খাইতে বসিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে বড় সাধারণত কাহারও মেশামেশি নাই। তিনি নিঃশব্দে ঘাড় গুঁজিয়া খাইতেছিলেন। যদুবাবু সামনে গিয়া বলিলেন, আর দু-একখানা লুচি দেব?

—না না, আর দেবেন না।

—একটা রসগোল্লা?

অন্যান্য টীচার সকলেই বিভিন্ন বেঞ্চি হইতে নতুন টীচারকে খাওয়ার জন্য, দুই-একটা অতিরিক্ত মিষ্টি লওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন।

মিঃ আলম ভোজসভায় প্রতিবার উপস্থিত থাকেন ; কিন্তু স্বীয় পদের আভিজাত্য বজায় রাখিবার জন্য সাধারণ মাস্টারদের সঙ্গে খাইতে বসেন না। মাস্টারেরা বরং খোশামোদ করিয়া প্রতিবার ভোজসভাতেই তাঁহাকে খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করিত। মিঃ আলম হাসিমুখে প্রত্যাখ্যান করিতেন।

আজ তাঁহার প্রাপ্য সেই আপ্যায়ন নতুন টীচারের উপর গিয়া পড়িতে দেখিয়া মিঃ আলম মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইলেন, বিস্মিত হইলেন, নতুন টীচারের উপর হিংসায় মন পরিপূর্ণ হইল।

নতুন টীচার বলিলেন, মিঃ আলম, আপনি খেলেন না ? আসুন।

মিঃ আলম গম্ভীরমুখে উত্তর দিলেন, না, আপনারা খান। আমি এখন খাই নে।

নতুন টীচার আর কোন কথা বলিলেন না।

মাসে এই একদিন করিয়া স্কুলের খরচে খাওয়া—এমন বেশী কিছু খাওয়া নয়, হয়তো খান পাঁচ-ছয় লুচি, দুইটি রসগোল্লা, একটু তরকারি, এক মুঠা বোঁদে। এই খাওয়াটুকুর জন্য মাস্টারেরা মাসের শেষ দিনটির প্রতীক্ষায় থাকেন, সে দিন সারা দিনটা খাটিবার পর সন্ধ্যায় সকলে বসিয়া একটু খাওয়াদাওয়া—

পরদিন মিঃ আলম হেডমাস্টারকে গিয়া বলিলেন, স্যার্, একটা কথা—মাসের শেষে মাস্টারদের পিছনে পাঁচ টাকা ছ টাকা মিথ্যে খরচ, ও বন্ধ করে দেওয়াই ভাল। ধরুন, কমিটী থেকে আপত্তি তুলতে পারে। মাস্টারদের ডিউটি তারা করবে, তার জন্যে খাওয়ানো কেন স্কুলের খরচে ? আমি তো ভাল বুঝছি নে স্যার্।

কমিটীর নামে হেডমাস্টার একটু ভয় পাইয়া গেলেন। তবুও বলিলেন, তা খায় খাকগে। খাটতেও হয় তো।

মিঃ আলম জানিত, কমিটীর নামে সাহেব একটু ভয় পায়। সে গিয়া কমিটীর একজন মেম্বারকে কথাটা লাগাইল। কমিটীর মীটিংয়ে অমূল্যবাবু সাহেবকে প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা, শুনলাম আপনি টীচারদের জলখাবার খেতে দেন মাসের শেষে, সে কার পয়সায় ?

—স্কুলের খরচে।

—কেন ?

—মাস্টারদের খাটুনি বেশী হয়—প্রোগ্রেস-রিপোর্ট লেখা, রেজিস্টার ঠিক করা—

—এ তো তাঁদের ডিউটি। এর জন্যে জলখাবার দেওয়া কেন ?

ক্লার্কওয়েল তর্ক করিয়া তখনকার মতো নিজের কাজের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু পরের মাস হইতে মাস্টারদের জলযোগ বন্ধ হইয়া গেল।

◆

ক্ষেত্রবাবু সেদিন স্কুল হইতে বাড়ী ফিরিয়া দেখিলেন, স্ত্রী বিছানায় শুইয়া আছে, ভয়ানক জ্বর। এঁটো বাসন রান্নাঘরের এক পাশে জড়ো হইয়া আছে—ওবেলাকার এঁটো পরিষ্কার করা হয় নাই, ছেলেমেয়েগুলো ঘরময় দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতেছে, চারিদিকে বিশৃঙ্খলা। ক্ষেত্রবাবুর মাথা ঘুরিয়া গেল। সারাদিন পরে আসিয়া এ সব কি সহ্য হয় ? স্ত্রীর ব্যবস্থামত

ঠিকা-ঝিকে আজ মাস-তিনেক হইল ছাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। স্ত্রীই বলিয়াছিল, কেন মিছিমিছি ঝির পেছনে আড়াই টাকা তিন টাকা খরচ—আজ একটু নুন দাও মা, আজ খিদে পেয়েছে জলখাবার দাও মা, আজ মাখবার একটু তেল দাও মা—এই সব ঝক্কি রোজ লেগেই আছে। দাও ছাড়িয়ে, কাজকর্ম্ম সব করব আমি। হাসিয়া বলিয়াছিল, কিন্তু মাসে মাসে আড়াইটে করে টাকা আমায় দিয়ো গো, ফাঁকি দিয়ো না যেন।

কিন্তু শরীর খারাপ, মন খাটিতে চাহিলে কী হইবে, তিন মাসের মধ্যে এই তিনবার অসুখে পড়িল। ডাক্তার ও ওষুধ-খরচে ঠিকা-ঝিয়ের ডবল খরচ হইয়া গেল।

ক্ষেত্রবাবু নিজে বড় মেয়েটির সাহায্যে রান্নাঘর পরিষ্কার করিলেন। মেয়েকে বলিলেন, বাসন মাজতে পারবি হাবি?

হাবি মাত্র সাত বছরের মেয়ে। ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হুঁ, খু-উ-ব।

—যা দিকি, আমি কলতলায় দিয়ে আসচি।

ঘরের ভিতর হইতে নিভাননী চিঁ-চিঁ করিয়া বলিল, ও পারবে না—একটা ঠিকে-ঝি দেখে নিয়ে এস। ওই সদ্‌গোপ-বাবুদের পাশের গলিতে মুংলির মা বুড়ী থাকে, খোঁজ করে দেখগে।

ক্ষেত্রবাবু ধমক দিয়া বলিলেন, তুমি চুপ করে শুয়ে থাক। আমি বুঝছি। কেন ও পারবে না? শিখতে হবে না কাজ? কানু কোথায় রে?

হাবি বলিল, না বাবা, আমি পারব। দাদা খেলা করতে গিয়েচে।

—সুজি কোথায় আছে? ঘি?

নিভাননীর ধমক খাইয়া রাগ হইয়াছিল। সে কথা বলিল না।

—আঃ, বলি—সুজিটা কোথায়? সারাদিন খেটে খিদেতে মরছি, যা হয় কিছু খাব তো?

নিভাননী পূর্ব্ববৎ চিঁ-চিঁ করিতে করিতে বলিল, আমার কী দরকার কথায়? যা বোঝ করো তুমি।

হাবি বলিল, আমি জানি বাবা, আমি দিচ্চি।

তখন নিভাননী মেয়েকে ডাকিয়া বলিয়া দিল, সুজি করিবার দরকার নাই, ও-বেলার রুটি করা আছে শিকেয় হাঁড়িতে। নিয়ে খেতে বল্‌। চা করে দিতে পারবি?

হাবি 'না' বলিতে জানে না। ঘাড় লম্বা করিয়া বলিল, হুঁ—উ—উ—

সে চায়ের কাপ ইত্যাদি লইয়া রান্নাঘরের দিকে যাইতে যাইতে বলিল, মা, উনুনে আঁচ দিয়ে দেবে কে?

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, তোমাকে ওসব করতে হবে না। হয়েছে, থাক্‌, আর আমার চায়ে দরকার নেই। তারপর চা করতে গিয়ে জামায় আগুন লেগে মরুক—

নিভাননী বলিল, আহা, মুখের কী মিষ্টি বাক্যি!

ক্ষেত্রবাবু এক গ্লাস জল ঢকঢক করিয়া খাইয়া ফেলিলেন। তারপর হাবির সাহায্যে রুটি

বাহির করিয়া গুড় দিয়া এক-আধখানা নিজে খাইলেন, বাকি ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়া টুইশানিতে বাহির হইলেন।

হাবি বলিল, বাবা, মা বলছে রাত্রে কী খাবে ? একখানা পাউরুটি কিনে এনো—

ক্ষেত্রবাবু কথা কানে তুলিলেন না। ছাত্রের বাড়ী গিয়া মনে পড়িল, স্ত্রীর অসুখের জন্য একবার বেলেঘাটায় রামসদয় ডাক্তারের ওখানে যাইতে হইবে। খানিকটা আলাপ-পরিচয় আছে ; স্কুল-মাস্টার বলিয়া ভিজিটটা কম লইয়া থাকে তাঁহার কাছে।

ছেলের বাপ আসিয়া কাছে বসিয়া ছেলের পড়ার তদারক করিতে লাগিল। ফলে ক্ষেত্রবাবু যে একটু সকাল সকাল বিদায় লইবেন, তাহার উপায় রহিল না। অভিভাবকের মনস্তুষ্টির দরুন বরং একটু বেশী সময় বসিয়া থাকিতে হইল। রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় ছাত্রের বাড়ী হইতে পদব্রজে বেলেঘাটা চলিলেন। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করিয়া কাজ শেষ করিতে সাড়ে দশটা বাজিয়া গেল, কাজেই আসিবার পথে ছয়টি পয়সা বাসভাড়া দিয়া ফিরিতে হইল।

বাসায় ফিরিয়া দেখেন, ছেলেমেয়েরা অঘোরে ঘুমাইতেছে। স্ত্রীর আবার জ্বর আসিয়াছিল সন্ধ্যার পরেই, সে বিছানায় পড়িয়া এপাশ-ওপাশ করিতেছে।

ভীষণ ক্ষুধা পাইয়াছে। কিন্তু এত রাত্রে কী খাইবেন ? ভাত চড়াইবার ধৈর্য্য থাকে না আর এখন।

নিভাননী জ্বরে বেহুঁশ, তবুও সে জিজ্ঞাসা করিল, পাউরুটি এনেচ ?

ঐ যাঃ ! পাউরুটি কিনিতে ভুলিয়া গিয়াছেন, অত কি ছাই মনে থাকে ? বলিলেন, না, আনতে মনে নেই।

নিভাননী উদ্বিগ্নকণ্ঠে বলিল, তবে কী খাবে এখন ? দুটো চিঁড়ে কিনে আন না হয়—

ক্ষেত্রবাবু বিরক্তির সহিত বলিলেন, হ্যাঃ, এখন এগারোটা বাজে, আমার জন্যে চিঁড়ের দোকান খুলে রেখেছে তারা !

—দেখই না গো, মোড়ের দোকানটা অনেক রাত পর্য্যন্ত খোলা থাকে।

ক্ষেত্রবাবু সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া কলসী হইতে এক গ্লাস জল গড়াইয়া ঢকঢক করিয়া খাইয়া আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িলেন, অর্থাৎ সমস্ত অসুবিধা ও অনাহারের দায়িত্বটা রুগ্ন স্ত্রীর ঘাড়ে চাপাইয়া দিলেন বিনাবাক্যব্যয়ে।

নিভাননী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

পরদিন সকালে ডাক্তার আসিয়া বলিল, রোগ বাঁকা পথ ধরিয়াছে। বাড়ীতে ভাল চিকিৎসা হইবে না, হাসপাতালে পাঠাইতে পারিলে ভাল হয়। ক্ষেত্রবাবুর প্রাণ উড়িয়া গেল। হাসপাতালে স্ত্রীকে পাঠাইলে ছেলেমেয়েদের বাড়ীতে দেখাশোনা করে কে ? হাসপাতালে যাওয়ার ব্যবস্থাই বা তিনি কখন করেন ?

ডাক্তারের হাতে-পায়ে ধরিয়া একটা চিঠি লিখাইয়া লইলেন ক্যাম্বেল হাসপাতালের এক ডাক্তারের নামে। খাইতে গেলে ক্যাম্বেল হাসপাতালে গিয়া কাজ মিটাইয়া আবার

ঠিক সময়ে স্কুলে যাইতে পারেন না। সুতরাং হাবিকে তাহার ভাইবোনের জন্য রান্না করিতে বলিয়া, না খাইয়াই বাহির হইলেন। ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুলে পাঁচ মিনিট লেট হইবার জো নাই।

হাসপাতালে গিয়া শুনিলেন, ডাক্তারবাবু দশটার আগে আসেন না। বসিয়া বসিয়া সাড়ে দশটার সময় ডাক্তারের মোটর আসিয়া গেটে ঢুকিল। ক্ষেত্রবাবুর হাত হইতে চিঠি পড়িয়া বলিলেন, আচ্ছা, আপনি ও-বেলা আমার সঙ্গে একবার দেখা করবেন, এই—ছটার সময়। এ-বেলা বলতে পারচি নে।

ক্ষেত্রবাবু প্রমাদ গনিলেন। ছয়টা পর্য্যন্ত এখানে অপেক্ষা করিবেন তো বাসায় যাইবেন কখন, ছেলে পড়াইতেই বা যাইবেন কখন?

স্কুলের কাজ শেষ হইয়া আসিয়াছে, বেলা চারিটা বাজে, এমন সময় সাহেবের ঘরে ডাক পড়িল।

ক্ষেত্রবাবু সাহেবের টেবিলের সামনে দাঁড়াইতেই সাহেব বলিলেন, ক্ষেত্রবাবু, তুটো ক্লাসের প্রশ্নপত্র লিথো করতে হবে—আপনি ছুটি হলে কাজটা করে বাড়ী যাবেন।

হেডমাস্টারের কথার উপর কথা চলে না, অগত্যা তাহাই করিতে হইল। ছুটির পর মাস্টারদের মধ্যে দুই-একজন বলিলেন, চলুন ক্ষেত্রবাবু, চা খেয়ে আসি।

—মনে সুখ নেই, চা খাব কী, চলুন—

সেখানে গিয়া মাস্টারের দল প্রস্তাব করিলেন, স্কুলে একদিন ফিস্ট্ করা হোক। হেড-পণ্ডিত চা না খাইলেও এখানে উপস্থিত থাকেন রোজ। তিনি ফর্দ্দ করিলেন, প্রত্যেক মাস্টারকে এক টাকা করিয়া চাঁদা দিতে হইবে। তাহা হইলে একদিন পোলাও রাঁধিয়া সবাই আমোদ করিয়া খাওয়া যায়। যদুবাবু বলিলেন, এক টাকা বড় বেশী হইয়া পড়ে—বারো আনার মধ্যে যাহা হয় হউক।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, মনে সুখ নেই দাদা, এখন ওসব থাক্।

যদুবাবু বলিলেন, কেন, কী হয়েছে?

—বাড়ীতে বড় অসুখ। হাসপাতালে পাঠাতে হচ্চে কাল।

সকলেই নানারূপ ব্যগ্র প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। দুই-একজন ক্ষেত্রবাবুর বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়া দেখিতে চাহিলেন। ফিস্ট্ খাইবার প্রস্তাব আপাতত মুলতুবী রহিল। সকলেই কম মাহিনায় সংসার চালান, এক পরিবারের মত মনে করেন পরস্পরকে, একজনের দুঃখ সবাই বোঝেন বলিয়াই চায়ের এ মজলিসের বন্ধুদের মধ্যে প্রীতির বন্ধন ঘনিষ্ঠ ও নির্ভেজাল।

ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে নারাণবাবু হাসপাতাল পর্য্যন্ত গেলেন। ক্ষেত্রবাবু বলিয়াছিলেন, আপনি বুড়োমানুষ, এতটা আর যাবেন না হেঁটে।

—বুড়োমানুষ বলে কি মানুষ নই? ও কী ভায়া, চল, গিয়ে দেখে আসি।

দুজনে গিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করিয়া হাসপাতালের সব ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলেন এবং পরদিনই নিভাননীকে হাসপাতালে আনা হইল।

নারাণবাবু রোজ বিকালে টুইশানিতে যাইবার আগে তুইটি কমলালেবু, কোনদিন বা এক গুচ্ছ আঙুর লইয়া নিভাননীকে দেখিয়া যান। স্কুলে পরদিন বলেন, ও ক্ষেত্র-ভায়া, বউমা কাল বলছিলেন, তুমি হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাচ্ছ, তোমার কে এক শালী আছেন, তাঁকে এনে তুদিন রাখ না—

—আপনাকে বললে বুঝি ?

—হ্যাঁ, কাল উনি বলছিলেন। তোমার কষ্ট হচ্ছে। কবে যে সেরে উঠব, কবে যে বাড়ী যাব—বলছিলেন বউমা।

—ওই রকম বলে। শালীকে আনা কী সহজ দাদা ? নিয়ে এস খরচ করে, দিয়ে এস খরচ করে—খাওয়াও লুচি-পরোটা। সে কি আমাদের সাধ্যি ?

নারাণবাবুকে নিভাননী 'দাদা' বলিয়া ডাকে। আড়ালে 'বট্‌ঠাকুর' বলিয়া ডাকে স্বামীর কাছে। নারাণবাবু কত রকম মজার গল্প করেন তাহার কাছে, রোগীর মনে আনন্দ দিতে চান! একদিন নিভাননী বলিল, দাদা, আমি ভাল হলে আপনাকে ছোট বোনের বাড়ী একদিন খেতে হবে।

নারাণবাবু শশব্যস্ত হইয়া বলেন, নিশ্চয় বউমা, নিশ্চয়, এর আর কথা কী ?

—আপনি কী খেতে ভালবাসেন দাদা ?

—আমি ? আমার—বউমা—বুড়ো হয়েছি—যা হয় সব ভাল লাগে। একলা থাকি, রেঁধে খাই—

—কতদিন আছেন একা ?

—তা আজ সাতাশ বছর বউমা।

—একা আছেন ?

—তা থাকতে হয় বইকি বউমা। নিজেই রাঁধি—এই বয়সে কি রান্না করতে ইচ্ছে করে ? বেশী কিছু রাঁধি না, যা হয় একটা তরকারি করি।

—আপনি মাছ খান ?

—তা খাই বউমা। ও বোষ্টমদের ঢঙ নেই আমার। পুরুষ মানুষ, মাছ-মাংস কেন খাব না ? ও বোষ্টমদের মেয়েলিপনার ঢঙ দেখলে আমি হাড়ে চটি।

—আমি আপনাকে ইলিশমাছের দই-মাছ রেঁধে খাওয়াব। আমি দিদিমার কাছে রাঁধতে শিখেছি, জানেন ?

পিতৃসম স্নেহময় বৃদ্ধের সঙ্গে কথা বলিবার সময় নিভাননীর কণ্ঠে আপনিই যেন আবদারের সুর আসিয়া পড়ে। তাহার বালিকা-বয়সে যে বাবা স্বর্গে গিয়াছেন, যাঁহার কথা ভাল মনে পড়ে না—এই প্রাণখোলা সরল বৃদ্ধের মধ্যে নিভাননী তাঁহাকেই যেন আবার দেখিতে পায়, নিজের কণ্ঠে কখন যে কন্যার মত আবদার-অভিমানের সুর আসিয়া পড়ে সে বুঝিতেও পারে না।

নারাণবাবু বসিয়া সুখ-তুঃখের কথা বলেন। নারীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আজ ত্রিশ বছর

আসেন নাই—স্নেহ-ভালবাসার পাট উঠিয়া গিয়াছে। এমন দরদী শ্রোতা পাইয়া তাঁহারও মনের উৎস-মুখ খুলিয়া যায়। প্রথম জীবনের চাকুরির কথা বলেন। বহুকাল-পরলোকগতা পত্নীর সম্বন্ধে বলেন, অনুকূলবাবুর কথাও পাড়েন। নিভাননী সহানুভূতি জানায়, একমনে শুনিতে শুনিতে কখন তাহার চোখ ছলছল করিয়া উঠে।

ক্ষেত্রবাবু সবদিন আসিতে পারেন না। টুইশানি, বাড়ীতে ছেলে-মেয়েদের দেখাশোনা—এসব সারিয়া রোজ হাসপাতালে আসা চলে না। নারাণবাবু আসেন বলিয়া হয়তো তেমন দরকারও হয় না।

সেদিন নারাণবাবু টুইশানি সারিয়া বউবাজারের মোড় হইতে একটা বেদানা ও দুইটি কমলালেবু কিনিলেন। অনেকদিন কিছু হাতে করিয়া যাইতে পারেন নাই, আজ টুইশানির মাহিনা পাইয়াছেন। হাসপাতালের হলে দেখিলেন, হলের কোণে নিভাননীর সে বিছানাটা খালি, লোহার খাটটা হাড়পাঁজরা বাহির করা পড়িয়া আছে।

নারাণবাবু ভাবিলেন, তাঁহার ভুল হইয়াছে। কোন্ ঘরে আসিতে কোন্ ঘরে আসিয়াছেন, বৃদ্ধবয়সে মনে থাকে না। বাহির হইতে গিয়া বারান্দায় জলের না কিসের ড্রামটি চোখে পড়িল। না, এই ড্রাম রহিয়াছে—এই তো ঘর। আবার তিনি ঘরে ঢুকিলেন।

পাশের বিছানার এক রোগী বলিল, আপনি কাকে খুঁজছেন বলুন তো? ও, সেই বউটির আপনি কেউ—আহা, আপনি জানেন না! ও তো আজ দুপুরে হয়ে গিয়েছে। বউটির স্বামী এল, আরও কে কে এল—নিয়ে গেল, প্রায় তখন তিনটে। আহা, আমরা সবাই—কথা কইতে কইতে পাশ ফিরল আর অমনি হয়ে গেল। হার্টে কিছু ছিল না। আহা, আপনি কে হতেন ওঁর—ইত্যাদি।

নারাণবাবু কিছু না বলিয়া ফলগুলি হাতে করিয়া বাহিরে আসিলেন।

আজ ক্ষেত্রবাবুকে কি স্কুলে দেখেন নাই? না বোধ হয়। এখন মনে পড়িল, সারাদিন স্কুলে ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে দেখা হয় নাই বটে। আজ হাসপাতালে আসিবেন বলিয়া টুইশানিতে গিয়াছিলেন ছুটির পরেই, সুতরাং চায়ের দোকানেও যান নাই। নতুবা ক্ষেত্রবাবুর অনুপস্থিতি চোখে পড়িত।

নিজের ছোট ঘরের নিঃসঙ্গ শয্যায় শুইয়া বৃদ্ধ কত রাত পর্য্যন্ত ঘুমাইতে পারিলেন না।

স্কুলের দুর্দ্দশা উপস্থিত হইল এপ্রিল মাস হইতে। এপ্রিল মাসে মাস্টারদের বেতন ঠিক সময় দেওয়ার উপায় রহিল না; কারণ, এবার জানুয়ারি মাসে আশানুরূপ ছেলে ভর্ত্তি হয় নাই, বরং অনেক ছেলে ট্রান্সফার লইয়া চলিয়া গিয়াছে। এ স্কুলে ছেলেদের মাহিনা অন্য স্কুল হইতে বেশী, এই সব দুঃসময়ে লোক বেশী মাহিনা দিতে আর চায় না। পূর্ব্বে ভাবা গিয়াছিল, সাহেব-মেম স্কুলে পড়াইবে বলিয়া পাড়ার বড়লোকেরা ছেলে এখানেই ভর্ত্তি করিবে; কিন্তু গত ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল তেমন ভাল না হওয়ায় এ স্কুলে পড়াইতে অনেকেই দ্বিধা বোধ করিল। ফলে ছেলে অনেক কমিয়া গিয়াছে এবার।

মাস্টাররা সাতাশে এপ্রিল মার্চ মাসের মাহিনার কিছু অংশ মাত্র পাইল। গরমের ছুটির পূর্ব্বে মে মাসে মার্চ মাসের প্রাপ্ত বেতনের বাকী অংশ শোধ করিয়া দেওয়া হইল। দেড় মাস গরমের ছুটি, গরীব শিক্ষকেরা বাড়ী গিয়া খায় কী? হেডমাস্টারের কাছে দরবার করিয়া ফল হইল না। সকলে বলিল, সাহেব মেম ঠিক ওদের পুরো ছুটির মাইনে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদেরই বিপদ।

শোনা গেল, সাহেব দিল্লী না কোথায় যেন বেড়াইতে যাইতেছে।

স্কুলের কেরানী হরিচরণ নাগ কিন্তু বলিল, কথা ঠিক নয়—সাহেব এখনও মার্চ মাসের মাহিনা শোধ করিয়া লয় নাই। মেম এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত মাহিনা লইয়াছে বটে।

সাহেবের নিকট যাইয়া মাহিনা পাইবার জন্য বেশী পীড়াপীড়ি করিলে সাহেব বলিলেন, মাই ডোর ইজ ওপ্‌ন্—যাঁদের না পোষায় চলে যেতে পারেন। আমার স্কুলে কষ্ট করে যারা থাকতে না পারবে, তাদের দিয়ে এখানে কাজ হবে না। আমাদের অনেক কষ্টের মধ্যে দিয়ে এখনও যেতে হবে—স্বার্থত্যাগ চাই তার জন্যে। সামনের বছর থেকে স্কুল ভাল হয়ে যাবে। এই বছরটা তোমরা আমার সঙ্গে সহযোগিতা করো।

ক্লার্কওয়েল সাহেবের ব্যক্তিত্ব বলিয়া জিনিস ছিল, অন্তত গরীব টীচারদের কাছে। কারণ ব্যক্তিত্ব জিনিসটা ভীষণ রিলেটিভ, আমার গুরুদেবের ব্যক্তিত্ব তোমার কাছে হয়তো কিছুই নয়, কিন্তু আমার কাছে তা গুরুত্বপূর্ণ; তোমার জমিদার-মনিবের ব্যক্তিত্ব যতই গুরু হউক, আমার নিকটে তাহা নিতান্তই লঘু। সুতরাং মাস্টারের দল শুধু-হাতে গরমের ছুটিতে দেশে চলিয়া গেল।

যদুবাবু পড়িয়া গেলেন মুশকিলে। কলিকাতা ছাড়িয়া কোথাও একটা যাইবার স্থান নাই, অথচ ইচ্ছা করে কোথাও যাইতে। কতদিন কলিকাতার বাহিরে যাওয়া ঘটে নাই, হাতও এদিকে খালি। তাঁহার ছাত্রেরা দেশে যাইতেছে, নবদ্বীপের কাছে পূর্ব্বস্থলি নামে গ্রাম, বেশ নাকি ভাল জায়গা। কিন্তু যদুবাবু তো একা নহেন, স্ত্রীকে বাসায় রাখিয়া যাওয়া সম্ভব নয়।

পৈতৃক গ্রামে যাইতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু সেখানে ঘরবাড়ী নাই। জমিজমা শরিক কিনিয়া লইয়াছে আজ বহুদিন। তবুও যদুবাবু বলিলেন, বেড়াবাড়ী যাবে?

যদুবাবুর স্ত্রী বিবাহ হইয়া কিছুদিন যশোর জেলার এই ক্ষুদ্র গ্রামে শ্বশুরঘর করিয়াছিল, ম্যালেরিয়া ধরিয়া মাস দুই ভোগে। তাহার পর হইতেই স্বামীর সঙ্গে বর্দ্ধমান ও পরে কলিকাতায়। সে বেড়াবাড়ী যাইবার প্রস্তাবে বিস্মিত হইয়া কহিল, বেড়াবাড়ী! সেখানে কেমন করে যাবে গো? বাড়ীঘর কোথায় সেখানে?

—চলো না, অবনীদের বাড়ীতে গিয়ে উঠি। সেও তো কলকাতায় এসে আমার বাসাতে থেকে গিয়েছে দু-একবার।

—না বাপু, পরের ঘরকন্নার মধ্যে যাওয়া, সে বড় ঝঞ্ঝাট। হাতে তোমার টাকাই বা কই?

যদুবাবুর মতলব একটু অন্য রকম। হাতে প্রায় কিছুই নাই, স্ত্রীকে পাড়াগাঁয়ে জ্ঞাতিদের বাড়ী গছাইয়া রাখিয়া আসিয়া দিনকতক তিনি একটু হাল্‌কা হইবেন! এগারো টাকা করিয়া বাসাভাড়া আর টানিতে পারেন না। ওই থার্ড মাস্টার শ্রীশ রায় মেসে থাকে, আড়াই টাকা সীট্‌ রেণ্ট্‌, খোরাকী খরচ দশ টাকা, সাড়ে বারো টাকার মধ্যে সব শেষ।

যদুবাবু স্ত্রীকে বলিয়া-কহিয়া রাজী করাইলেন। কিন্তু যাইবার দিন বাড়ীওয়ালা গোলমাল বাধাইল।

—আজ পাঁচ মাসের বাড়ীভাড়া পাওনা মশাই, পাঁচ এগারোং পঞ্চান্ন টাকা—দশ টাকা মাত্র ঠেকিয়েছেন এ মাসে আর মাত্র পাঁচ টাকা ঠেকিয়ে চলে যাচ্ছেন? বাক্স-পেঁটরা-বিছানা সবই নিয়ে চললেন, রইল এখানে কী তবে? ওই একটা জারুল কাঠের সিন্দুক আর একখানা ভাঙা তক্তপোশ, আর তো দেখছি কয়লাভাঙা হাতুড়িটা আর মরচে-ধরা গোটা দুই কাচ-ভাঙা হ্যারিকেন। আপনি যদি আর না আসেন মশাই তো এতে আমার চল্লিশ টাকা আদায় হবে কিসে বুঝিয়ে দিয়ে তবে যান। আমি পাড়ার লোক ডাকি, তারা বলুক, আমার যদি অন্যায় হয়ে থাকে মশাই, আমায় দশ ঘা জুতো মারুক। আপনি ভদ্রলোকের ছেলে, বাড়ীতে জায়গা দিয়েছিলাম, ইস্কুলে মাস্টারি করেন, ছেলেদের লেখাপড়া শেখান, তা এই যদি আপনার ধরন হয়—না মশাই, আমি তা পারব না। মাপ করবেন। আপনি যেতে হয়, জিনিসপত্র রেখে যান, নইলে আমার ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে যান।

—কী হয়েছে, কী হয়েছে?—বলিয়া কলিকাতার হুজুকপ্রিয় কৌতূহলী লোক ভিড় পাকাইয়া তুলিল। কেহ হইল বাড়ীওয়ালার দিকে, কেহ হইল যদুবাবুর দিকে—উভয় দলে মারামারি হইবার উপক্রম হইল। যদুবাবুর স্ত্রী চট্‌ করিয়া উপরে গিয়া বাড়ীওয়ালার মায়ের কাছে কাঁদিয়া পড়িলেন—মা, আপনি বলে দিন। টাকা আমরা ফেলে রাখব না—পালাবও না। স্কুল খুললেই টাকা শোধ দেব।

দোতলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া বাড়ীওয়ালার মা ডাকিল, ও বদে, বলি শোন্‌, ওপরে আয়।

ব্যাপারটা মিটিল। স্ত্রী ও বাক্স বিছানা সমেত যদুবাবু মুক্তি পাইলেন; কিন্তু আর তিনি কোনদিন এ বাসা তো দূরের কথা, এ পাড়ার ত্রিসীমানাও মাড়ান নাই।

বেড়াবাড়ী বগুলা স্টেশনে নামিয়া সাত ক্রোশ গরুর গাড়ীতে যাইতে হয়। দুপুর ঘুরিয়া গেল সেখানে পৌছিতে। শরিক অবনী মুখুজ্জে আহারাদি সারিয়া দিবানিদ্রা দিতেছিলেন, বাহিরে শোরগোল শুনিয়া আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তিনি খুব সন্তুষ্ট হইলেন না। মুখে বলিলেন, কে, যদুদা? সঙ্গে কে? বউদি? বেশ, বেশ—তা এতকাল পরে মনে পড়েছে যে? না, ভাল না, বাড়ীর সব অসুখ ব্যায়রাম। আপনার বউমা তো কাল জ্বর থেকে উঠেছে—ছেলে দুটোর এমন পাঁচড়া যে, পঙ্গু হয়ে বসে থাকে—ও পুঁটি—ওগো—এই বউদিদি এসেছেন, নামিয়ে নাও—

রাত্রে যদুবাবু দেখিলেন, থাকিবার ভীষণ কষ্ট। ইহাদের দুইটি মাত্র ঘর আর এক ভাঙা

পূজার দালান, তার একখানায় কাঠকুঠা রহিয়াছে। একটি ঘরে ভদ্রতা করিয়া আজিকার জন্য থাকিবার জায়গা দিয়াছে বটে, কিন্তু বেশীদিনের জন্য এ ব্যবস্থা সম্ভব নয়, কারণ অবনীর তিনটি বড় মেয়ে, দুইটি ছেলে, স্ত্রী ও এক বিধবা দিদিকে লইয়া পাশের ওই একখানি মাত্র ঘরে কতদিন থাকিতে পারিবে?

দুই দিন গেল, এক সপ্তাহ গেল। গরমে বড় কষ্ট হয়—সেকেলে কোঠার ছোট ছোট জানালা, হাওয়া চ'লে না।

অবনীদের সংসারে প্রথম দুই দিন এক হাঁড়িতেই খাওয়া চলিয়াছিল, তারপর যদুবাবুর আলাদা রান্না হয়। জিনিসপত্র সস্তা, এক সের করিয়া দুধ যোগান করা হইয়াছে—বেশ খাঁটি দুধ। যদুবাবুর স্ত্রী বলে, এমন দুধ, যাই বল, শহরে বেশী পয়সা দিলেও মিলবে না।

কিন্তু দিন-পনেরো পরে থাকিবার বড় অসুবিধা হইতে লাগিল। অবনী একদিন ঘুরাইয়া কথাটা বলিয়াই ফেলিল। অর্থাৎ দেশ তো দেখা হইয়াছে, এবার যাইবার কী ব্যবস্থা? ভাবখানা এই রকম।

রাত্রে যদুবাবু স্ত্রীকে নিম্নকণ্ঠে বলিলেন, অবনী তো বলছিল, আর কদিন আছ দাদা? তা কী করি বল তো? এই গরমে কলকাতায়—

স্ত্রী বলিল, চল এখান থেকে বাপু। নানান অসুবিধে। মন টেকে না। বাবাঃ, যে জঙ্গল! ঘরদোরগুলো ভাল না, ছাদ যেমন—একটা বিষ্টি হলেই জল পড়বে। আর ওরাও আর তেমন ভাল ব্যবহার করছে না। আজ ঘাটে বড়দিদি কাকে বলছিল—আমাদের বাড়ী তো আর শরিকের ভাগ নেই, যে যেখানে আছে হুট্ করে এলেই তো হল না! এই রকম কী কথা! আমাদের যাওয়াই ভাল। যে মশা, রাত্তিরে ঘুম হয় না মশার ডাকে।

যদুবাবুর তাহা ইচ্ছা নয়। স্ত্রীকে এবার শরিকের ঘাড়ে কিছুদিন চাপাইয়া যাইবেন, এই মতলব লইয়াই এখানে আসিয়াছেন। তিনি কিছু বলিলেন না।

আর দুই-তিন দিন পরে যদুবাবু ফিরিবেন মনস্থ করিলেন।

অবনীকে বলিলেন, তোমার বউদিদি রইল এ মাসটা, দিদির সঙ্গে শোবে। আমার কলকাতায় না গেলে নয়, আমি পরশু নাগাদ যাই।

গ্রামের কাপালীপাড়া হইতে সিধু কাপালী আসিয়া বলিল, দাদাঠাকুর, এ গাঁয়ে একটা পাঠশালা খুলে বসুন। পঁচিশ-ত্রিশটা ছেলে দেব—চার আনা আট আনা করে রেট। আপনার বাড়ী বসে যা হয়! কলকাতা ছেড়ে দিয়ে এখানেই থেকে যান না কেন?

যদুবাবু হাসিয়া বলিলেন, কলকাতার স্কুলে পঁচাত্তর টাকা মাইনে পাই—সত্তর ছিল, ছেড়ে দেব বলে ভয় দেখিয়েছিলাম, অমনি সেক্রেটারি পাঁচ টাকা বাড়িয়ে বললে—যদুবাবু, আপনার মত টিচার আর কোথায় পাব, আপনি থাকুন। প্রাইভেট টুইশানিতে তাও ধরো পাই—পনেরো আর পঁচিশ সকালে—বিকেলে পনেরো আর কুড়ি। এই ছেড়ে আসব পাঠশালা খুলে চার আনা আট আনা নিয়ে ছেলে পড়াতে? তুমি হাসালে সিদ্ধেশ্বর।

অবনী সেখানে উপস্থিত ছিল। যদুদাদা যে স্কুলে এত মাহিনা পান, এই সে প্রথম শুনিল।

কিন্তু কই, তেমন তো আসবাব বাসনপত্র কিছুই নাই ! বউদিদি মোটে চারখানা শাড়ী আনিয়াছেন। দাদার দুইটি মলিন পিরান, গায়ে ভাল গেঞ্জি একটাও দেখা যায় না। বিছানা তো যা আনিয়াছেন, তাহা দেখিয়া একদিন অবনীর স্ত্রী বলিয়াছিল—বট্‌ঠাকুরের যা বিছানা-পত্র, ওই বিছানায় কী করে ওরা শোয় কলকাতা শহরে, তা ভেবে পাই নে। আমরা যে অজ-পাড়াগেঁয়ে—আমাদের বাড়ীর ছেলেমেয়েরা পর্য্যন্ত ও-বিছানায় শোবে না।

গ্রামের সকলে ধরিয়াছিল, এতকাল পরে দেশে এসেছ, গাঁয়ের ব্রাহ্মণ কটিকে ভাল করে একদিন মা-বাপের তিথিতে খাইয়ে দাও। কিছুই তো করলে না গাঁয়ে—

যদুবাবু তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই।

অথচ তিনি এত রোজগার করেন নিজের মুখেই তো বললেন। কী জানি কী ব্যাপার শহরের লোকের ! বেশ মোটা পয়সা হাতে নিয়ে এসেছে দাদা, অথচ খরচপত্র বিষয়ে কঞ্জুস—

কথাটা অবনী স্ত্রীকে বলিল।

স্ত্রী বলিল, কী জানি বাপু, দিদির গায়ে তো একরত্তি সোনা নেই—শাঁখা আর কাঁচের চুড়ি এই তো দেখছি, তা কেমন করে বলব বল ? হতে পারে।

—তুমি জান না, ওসব কলকাতার লোক, পাড়াগাঁয়ে আসবার সময় সব খুলে রেখে এসেছে। চুরি যাবার ভয় বড্ড ওদের।

ভাবিয়া-চিন্তিয়া পরদিন অবনী যদুবাবুর কছে দুপুরের পর কথাটা পাড়িল : দাদা, একটা কথা ছিল—

—কী হে ?

—নানা রকমে বড় জড়িয়ে পড়েছি, মেয়েটা বড় হয়ে উঠেছে, বিয়ে না দিলে আর নয়। বড়দা সেই সোনাদতির মোকদ্দমা করে আড়ালে বিল বিক্রি করে ফেললেন, জানেন তো সব। সেই নিজে মারাও গেলেন, আমাকে একেবারে পথে বসিয়ে গেলেন। পয়সা অভাবে ছেলেটাকে পড়াতে পারছি না। তা আমি বলচি কী, ছেলেটাকে আপনার বাসায় রেখে যদি দুটো দুটো খেতে দেন আর আপনার স্কুলে ফ্রী করে নেন দয়া করে, তবে গরীবের ছেলের লেখাপড়াটা হয়। আপনিও তো ওর জ্যাঠামশায়—

যদুবাবু বুঝিলেন, মাহিনা সম্বন্ধে ও-রকম বলা উচিত হয় নাই তখন। পাড়াগাঁয়ের গতিক ভুলিয়া গিয়াছেন বহুদিন না-আসার দরুন। এসব জায়গার লোকে সর্ব্বদা সুবিধা খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, চাহিতে-চিন্তিতে ইহাদের দ্বিধা নাই, লজ্জা নাই। কী বিপদেই ফেলিল এখন !

মুখে বলিলেন, তা আর বেশী কথা কী ! সুঁটো থাকবে, এ ভাল কথাই তো ! তবে এখন স্কুলে ভর্তি করার সময় নয়, সামনের জানুয়ারি মাসে নিয়ে যাব ওকে।

অবনী পল্লীগ্রামের লোক, পাইয়া বসিল। বলিল, তা কেন দাদা, ও বউদিদির সঙ্গেই যাক না। বাসায় থাকুক, সকালে বিকেলে আপনার কাছে একটু আধটু পড়লেও ওর যথেষ্ট বিদ্যে হবে পেটে। বংশের মধ্যে আপনি এল-এ পাস করেছেন—আমাদের বংশের চূড়ো

আপনি। আমরা সব মুখ্য-সুখ্যু। দেখুন, যদি আপনার দয়ায় একটু আধটু ইংরিজী পেটে যায় ওর, পরে করে খেতে পারবে।

যদুবাবু কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন, তা—তা, হবে। বেশ—বেশ।

স্ত্রীকে রাত্রে কথাটা বলিলেন। স্ত্রী বলিল, কে, ওই সুঁটো? ওই দেখতে পিলেরোগা পেটমোটা, ও আধসের চালের ভাত খায়। সেদিন একটা কাঁটাল একলা খেলে। ওর পেছনে, যা মাইনে পাও, সব যাবে। তা তুমি কিছু বলেচ নাকি?

—বলেচি বলেচি। কী আর করি! তোমাকে নিয়ে যাবার সময় এখন ছিনে-জোঁকের মত ধরে না বসে! ওসব লোককে বিশ্বাস নেই রে বাবা।

—কেন, বাহাদুরি করতে গিয়েছিলে যেঁ বড়? এখন সামলাও ঠ্যালা!

যদুবাবুকে আরও বেশী মুশকিলে পড়িতে হইল। যেদিন তিনি যাইবেন, সেদিন অবনী আসিয়া কুড়ি টাকা ধার চাহিয়া বসিল। না দিলে চলিবে না, সামনের মাসে সে বউদিদির হাতে কড়ায় গণ্ডায় শোধ করিয়া দিবে। এখন না দিলে জমিদারের নালিশের দায়ে আমন ধানের জমা বিক্রয় হইয়া যাইবে। সে (অবনী) তাঁহাকে বড় দাদার মত দেখে, তিনি না দিলে এ বিপদের সময় সে কোথায় দাঁড়ায়, কাহার কাছে বা হাত পাতে?

অবনী একেবারে যদুবাবুর পা জড়াইয়া ধরিল। দিতেই হইবে, যদুবাবুর বউমা পর্য্যন্ত নাকি বট্‌ঠাকুরের কাছে আসিবার জন্য তৈয়ারী হইয়া আছে টাকার জন্য।

যদুবাবু প্রমাদ গণিলেন। এমন বিপদে পড়িবেন জানিলে তিনি সাধু কাপালীককে কি ও কথা বলেন?

বলিলেন, তা একটা কথা। টাকাকড়ি ভায়া এখানে কিছু রাখি নি তো! সব ব্যাঙ্কে। তোমার বউদিদি বললে, পাড়াগাঁয়ে যাচ্ছ—সোনাদানা টাকাকড়ি সব এখানে রেখে যাও। হাতে কেবল যাবার ভাড়াটা রেখেছি ভায়া।

—আজই যাবেন?

—হ্যাঁ, এখুনি খাওয়া হলেই বেরুব! আজই দশটার গাড়িতে—

যদুবাবু মনে মনে বলিলেন, যাও বা থাকতাম আজকের এবেলাটা হয়তো, আর এক দণ্ডও এখানে থাকি! এখন বেরুতে পারলে হয় এখান থেকে!

কিন্তু অবনী মুখুজ্জে অভাবগ্রস্ত পাড়াগাঁয়ের লোক, তাহাকে তিনি চেনেন নাই কিংবা চিনিয়াও ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

অবনী বলিল, বেশ দাদা, চলুন আমিও আপনার সঙ্গে কলকাতা যাই তবে। না হয় যাতায়াতে সাত সিকে পয়সা খরচ হয়ে গেল, টাকাটা এনে জমিদারের দায় থেকে তো বেঁচে যাব এখন! সাত সিকে খরচ বলে এখন কী করব, না হয় গুনগার গেল।

যদুবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, তুমি কেন গাড়ীভাড়া করে যেতে যাবে? আমি গিয়েই মনিঅর্ডার করে পাঠাব। তা ছাড়া আজ—আজ আমি, কি বলে—একটু হালিশহরে নামব কিনা! আমার বড় শালীর বাড়ী। তারা কি গেলেই আজ ছাড়বে? একু আধ দিন

রাখবেই। তুমি মিছিমিছি পয়সা খরচ করবে, অথচ সেই দেরি হয়েই যাবে।

অবনী বলিল, ভালোই তো, চলুন না হয় বউদিদির বোনের বাড়ী দেখেই আসি। গাঁয়ে থাকি পড়ে, কুটুমবাড়ীর ভালটা মন্দটা না হয় খেয়েই আসি দুদিন।

কোথায় যাইবে অবনী তাঁহার সঙ্গে। তিনি এখন শ্রীশের মেসে গিয়া উঠিবেন। যদুবাবু কী যে বলেন, উপস্থিত বুদ্ধিতে আর কুলায় না। আকাশ-পাতাল ভাবাও যায় না সামনে দাঁড়াইয়া। বলিলেন, বেশ, বেশ, এ তো খুব ভাল কথা, তোমার মত কুটুম্ব যাবে আমার শালীর বাড়ী। তবে একটা কথাও ভাবছি আবার, যদি কলকাতায় গিয়ে আমাদের স্কুলের হেডমাস্টারের দেখা না পাই!

—হেডমাস্টার! কেন দাদা?

যদুবাবু এতক্ষণে ভাবিয়া বলিবার একটা রাস্তা খুঁজিয়া পাইয়াছেন। বলিলেন, হেডমাস্টারের কাছে ব্যাঙ্কের বইখানা রয়েছে কিনা! হেডমাস্টার না থাকলে টাকা তুলব কী করে?

—কারও কাছে চাইলে আপনি দুদিনের জন্যে ধার পেয়ে যাবেন দাদা। আপনার কত বন্ধুবান্ধব সেখানে। এ দায় উদ্ধার করতেই হবে আপনাকে। দিন একটা উপায় করে।

—অবিশ্যি তা পেতাম। কিন্তু আমার যে বন্ধুবান্ধব এখন গরমের সময় কেউ নেই কলকাতায়, দার্জ্জিলিং কি সিমলে পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছে গরমের সময়। কলকাতার বড়লোক উকিল ব্যারিস্টার সব—গরমের সময় সব পাহাড়ে চলে যাবে। এ কি তুমি-আমি?

—তাই তো দাদা, তবে আমার কী উপায় হবে?—অবনী মুখুজ্জে প্রায় কাঁদো-কাঁদো হইয়া পড়িল।

যদু বলিলেন, কিছু ভেবো না ভায়া। আমি যাচ্ছি কলকাতায়—গিয়ে একটা যা হয় হিল্লে লাগিয়ে দেব। কেন তুমি পয়সা খরচ করে অনর্থক যাবে আমার সঙ্গে? আমি চেষ্টা করে দেখে মনিঅর্ডার করে দেব হাতে পেলেই। আচ্ছা, চলি, দুটো খেয়ে নিই—আর দেরি করা চলে না।

যদুবাবু ঝড়ের বেগে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। মনে মনে বলিলেন, উঃ, কী ছিনেজোঁক রে বাবা! কিছুতেই বাগ মানে না, এত করে ভেবে ভেবে বলি। ভাগ্যিস মনে এল হেডমাস্টারের কাছে ব্যাঙ্কের খাতার ওই ফন্দিটা!

টিনের স্যুটকেস হাতে ঝুলাইয়া যদুবাবু তাড়াতাড়ি দুইটি খাইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। পাছে অবনী তাহার মত বদলাইয়া ফেলে! কী ঝঞ্ঝাট, এখন মেসে বসাইয়া উহাকে ফ্রেঞ্চচার্জ দিয়া খাওয়াও, থিয়েটার বায়স্কোপ দেখাও—কোথায় ব্যাঙ্ক, আর কোথায় বা টাকা!

যদুবাবু শ্রীশ রায়ের মেসে আসিয়া উঠিবার পরে অবনী মুখুজ্জের পর পর তিন-চারিখানা তাগাদার চিঠি পাইলেন। তিনি উত্তর লিখিয়া দিলেন, হেডমাস্টার অনুপস্থিত—টাকা

ধারের কোন উপায় হইল না, সে জন্য তিনি খুব দুঃখিত। তবুও চেষ্টায় আছেন। যদুবাবুর স্ত্রী বেচারীর খোঁটা খাইতে খাইতে প্রাণ যাইতেছে। সে বেচারী লিখিল, পরের বাড়ী এমন করিয়া ফেলিয়া রাখা কি তাঁহার উচিত হইতেছে? কবে তিনি আসিয়া লইয়া যাইবেন? আর সে এক দণ্ডও এখানে থাকিতে চায় না।

যদুবাবু স্ত্রীর পত্রের কোন উত্তর দিলেন না।

যদুবাবুরও খুব দোষ দেওয়া যায় না। স্কুল খুলিবার পর প্রত্যেক মাস্টার মাত্র পনেরো টাকা করিয়া পাইলেন ছুটির মাসের দরুন। তাহার মধ্যে মেসখরচ করিয়া আর হাতে কিছু থাকে না। এদিকে পুরাতন বাড়ীওয়ালা স্কুলে আসিয়া তাগাদা দিয়া গায়ের ছাল ছিঁড়িয়া খাইবার উপক্রম করিতেছে। হেডমাস্টারের সঙ্গে দেখা করিবার ভয় দেখাইয়া গিয়াছে, কেমন ভদ্রলোক সে দেখিয়া লইবে।

চায়ের দোকানের মজলিসে বসিয়া মাস্টারের দল পয়সাকড়ির টানাটানির কথা রোজই আলোচনা করে। কারণ, অবস্থা সকলেরই একরূপ। জ্যোতির্ব্বিনোদ বলিলেন, সামান্য ত্রিশটে টাকা, তাও দু মাস বাকি। সাহেবের কাছে বলতে গেলাম, সাহেব আজ দু টাকা দিলে মোটে।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, আমাদেরও তো তাই, সংসার অচল।

যদুবাবু বলিলেন, আমার দুর্দ্দশা তো দেখতেই পাচ্ছ। দু বেলা শাসিয়ে যাচ্ছে। ক্ষেত্রভায়া, তোমার ছেলেমেয়ে কোথায় এখন?

—রেখেছিলাম আমার শাশুড়ীর কাছে দু মাস। এখন আবার এনেছি।

নারাণবাবু বলিলেন, আহা, বউমার কথা ভাবলে কী কষ্ট যে পাই মনে। লক্ষ্মীস্বরূপিণী ছিলেন। আমি যেন তাঁর বাবা, তিনি মেয়ে—এমন ব্যবহার করতেন আমার সঙ্গে।

উপস্থিত সকলেই ক্ষেত্রবাবুর স্ত্রী-বিয়োগের কথা স্মরণ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

ক্ষেত্রবাবু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। তাহার নিগূঢ় কারণও ছিল। এই গ্রীষ্মের ছুটিতে তিনি বর্দ্ধমানে তাঁহার জাঠতুতো ভাইয়ের কাছে গিয়াছিলেন। জাঠতুতো ভাই বর্দ্ধমানে রেলে কাজ করেন। বউদিদি সেখানে তাঁহার জন্য একটি পাত্রী ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। পাত্রী-পক্ষ এজন্য তাঁহাকে অনুরোধও করিয়া গিয়াছে। তিনি এখনও মত দেন নাই বটে, কিন্তু এ শনিবার হঠাৎ তাঁহার মন বর্দ্ধমানে যাইতে চাহিতেছে কেন!

চায়ের দোকান হইতে বাহির হইয়া টুইশানিতে যাইবার পূর্ব্বে ক্ষেত্রবাবু ওয়েলেসলি স্কোয়ারে একটু বসিলেন। বেঞ্চিখানাতে আর একজন কে বসিয়া ছিল, তিনি বসিতেই সে উঠিয়া গেল। ক্ষেত্রবাবু একটু অন্যমনস্ক। পুনরায় বিবাহ করিবার অবশ্য তাঁহার ইচ্ছা নাই। করিবেনও না। তবে আর একটা কথাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বিশেষ কষ্ট। সেই কোন সকালে তিনি স্কুলে চলিয়া আসিয়াছেন। বড় মেয়েটার উপরে সব ভার—তার বয়স এই মাত্র সাড়ে সাত। সে-ই রান্নাবান্না, ছোট ভাই-বোনদের খাওয়ানো-মাখানোর ঝুঁকি ঘাড়ে লইয়া গৃহিণী সাজিয়া বসিয়া আছে। কিন্তু আজ

যদি একটা শক্ত অসুখবিসুখ হয় কাহারও—কে দেখাশোনা করিবে তাহাদের? এ সব ভাবিয়া দেখিবার জিনিস।

স্কুলের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হইয়া আসিতেছে। গ্রীষ্মের ছুটির পর দুই মাস চলিয়া গিয়াছে, অথচ ছুটির মাহিনা এখনও সম্পূর্ণ শোধ হয় নাই। সাহেবকে বার বার বলিয়াও কোন ফল হয় না। সাহেবের এক কথা, এ বছর কষ্ট সহ্য করিতে হইবেই। যাহার না পোষায়, সে চলিয়া যাইতে পারে।

একদিন সাহেবের সারকুলার-অনুযায়ী ছুটির পর সাহেবের আপিসে শিক্ষকদের হাজির হইতে হইল। সাহেব বলিলেন, আজ একটা বিশেষ জরুরী মীটিং করা দরকার। থার্ড ক্লাসে গণিতের ফল আদৌ ভাল হইতেছে না, এ বিষয়ে শিক্ষকদের লইয়া পরামর্শ করা নিতান্ত আবশ্যক।

মীটিং চলিল। হতভাগ্য টীচারের দল খালিপেটে শ্রান্তদেহে পাঁচটা পর্য্যন্ত নানারূপ কৌশল উদ্ভাবন করিতে ব্যস্ত রহিল—থার্ড ক্লাসে কী করিয়া অ্যালজেব্রা ভালরূপে শিখানো যায়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে কোন বৈদেশিক শক্তি যুদ্ধ ঘোষণা করিলে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী এতদপেক্ষা অধিক আগ্রহ ও উদ্যোগ দেখাইতে পারিতেন না তাঁহার ক্যাবিনেট মীটিংয়ে!

পাঁচটা বাজিয়া গেল। তখনও প্রস্তাবের অন্ত নাই। থার্ড ক্লাসের গণিত শিক্ষার ভারপ্রাপ্ত টীচার হতভাগ্য শেখরবাবু ম্লানমুখে বসিয়া শুনিয়া যাইতেছেন, কারণ এ অবস্থার জন্য তিনিই ধর্ম্মত দায়ী। তাঁহার দপ্তরেই এ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। উক্ত ক্লাসের গত দুইটি সাপ্তাহিক পরীক্ষায় গণিতের ফল আদৌ আশাপ্রদ হয় নাই।

সাড়ে পাঁচটার সময় হেডমাস্টার উঠিয়া ধীরে ধীরে গণিতশিক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় সম্বন্ধে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ পাঠ শুরু করিলেন—খাতার বহর দেখিয়া মনে হইল, সাড়ে ছয়টার কমে সে প্রবন্ধ শেষ হইবে না।

হঠাৎ নতুন টীচার দাঁড়াইয়া বলিলেন, স্যার্, আমার একটা কথা বলবার আছে।

হেডমাস্টার প্রবন্ধ পাঠ করিতেছিলেন, থামিয়া মুখ তুলিয়া বিস্মিতভাবে নতুন টীচারের দিকে চাহিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, ইয়েস?

—স্যার্, ছটা বাজে, মাস্টারেরা সকলেই ক্ষুধার্ত্ত। আজ এই পর্য্যন্ত থাকলে ভাল হয়।

নতুন টীচারের সাহস দেখিয়া সবাই বিস্মিত ও স্তম্ভিত।

হেডমাস্টার বলিলেন, জান মাস্টার, আমি আমার বক্তব্যের মধ্যে কোন বাধাসৃষ্টি পছন্দ করি না?

—স্যার্, আমায় ক্ষমা করবেন। স্পষ্ট কথা বলবার সময় এসেছে। আপনার এ রকম মীটিং মাস্টারদের পক্ষে বড় কষ্টদায়ক হয়। এতে স্কুলের কাজ হয় না।

—স্কুলের কাজ কি তোমার কাছে আমায় শিখতে হবে?

—আপনিই ভেবে দেখুন, এতে স্কুলের কী ভাল হচ্ছে? ছাত্র ছেড়ে গিয়েছে, রিজার্ভ ফণ্ড নেই, মাইনে পাই না আমরা নিয়মমত। অথচ আপনি এই সব শিক্ষককে নিয়ে আলোচনা-সভার প্রহসন করচেন! আপনিই ভেবে দেখুন, এতে কী উপকার হয়? এই সব টীচার মুখ ফুটে বলতে পারেন না; কিন্তু চারটের পর আপনি এঁদের কাছে থেকে ভাল কিছু আশা করতে পারেন কি?

এবার হেডমাস্টারের পালা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইবার। একজন সামান্য বেতনের টীচারের কাছে তিনি এ ধরনের সোজা ও স্পষ্ট কথা প্রত্যাশা করেন নাই। বলিলেন, আমি কতদিন হেডমাস্টারি করছি, তা তোমার জানা আছে?

—তা আমার জানবার দরকার নেই স্যার্। কিন্তু আপনার এই শাসনপ্রণালী যে আদৌ ফলপ্রদ নয়, তা আপনাকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়াতে আপনি আমায় শত্রু ভাববেন না। আমি বন্ধুভাবেই এ কথা বলছি। আপনাকে সদুপদেশ দেওয়ার লোক নেই।

মাস্টারেরা সকলে কাঠের মত বসিয়া আছেন। এমন একটা ব্যাপার তাঁহারা কখনও এ স্কুলে ঘটিতে পারে বলিয়া কল্পনাও করেন নাই। দুই-চারিজন সপ্রশংস দৃষ্টিতে নতুন টীচারের দিকে চাহিয়া রহিলেন। নতুন টীচার যে এমন চোস্ত ইংরেজী বলিতে পারদর্শী—এ তথ্য আজই তাঁহারা অবগত হইলেন।

হেডমাস্টারের মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি বলিলেন, তুমি কি বলতে চাও আমি স্কুল চালাতে জানি নে?

নতুন টীচার কী একটা উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে নারাণবাবু নতুন টীচারকে বলিলেন, ভায়া, ছেড়ে দাও। আর তর্ক-বিতর্ক ক'রো না। সাহেব যা বলছেন, ওনার ওপর আর কথা বলো না।

আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই সভাতেই সাহেবের সামনে দুই-তিনজন টীচার, তাঁহাদের মধ্যে ক্ষেত্রবাবু ও শ্রীশবাবু আছেন—নারাণবাবুর মধ্যস্থতা করিতে যাওয়ায় স্পষ্টতই বিরক্তি প্রকাশ করিলেন।

পিছন হইতে হেডমৌলবী বলিল, আহা, বলতে দেন ওনাকে নারাণবাবু, বাধা দেবেন না।

আলম বেঞ্চির কোণে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, মুখে কথাটি নাই।

নতুন টীচার বলিলেন, স্যার্, আপনি ভেটারান্ হেডমাস্টার, স্কুল চালাতে জানেন না, তাই কি বলছি? কিন্তু আপনি স্কুলের বাজেট দেখে ব্যয়সঙ্কোচের ব্যবস্থা করুন, দু মাসের মাইনে পাননি যে সব মাস্টার, তাঁদের নিয়ে ছটা পর্যন্ত মীটিং করা কি চলে স্যার্?

নারাণবাবু বলিলেন, থাম ভায়া, থাম।

দুই-তিনজন টীচার একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, নারাণদা, ওঁকে বলতে দিন।

হেডমাস্টার দেখিলেন, সভার সমবেত মত তাঁহারই বিরুদ্ধে—নতুন টীচারের স্বপক্ষে।

তাঁহার নিজের স্কুলে বসিয়া এই তাঁহার প্রথম পরাজয়।

একটা দুর্ব্বল কথা তিনি হঠাৎ বলিয়া বসিলেন। বলিলেন, কেন, চারটের পর আমি

মাস্টারদের জন্যে জলখাবারের ব্যবস্থা তো করে দিই। আজ যদি তোমাদের খিদে পেয়ে থাকে, আমাকে আগে জানালেই আমি ব্যবস্থা করতাম।

সকলেই বুঝিল, হেডমাস্টারের এ উক্তি দুর্ব্বলতাজ্ঞাপক।

নতুন টীচার বলিলেন, সামান্য দু-চারখানা লুচি জলখাবারের কথা ধরি নি স্যার্! সে যাঁরা খেতে চান, তাঁরা খেতে পারেন। আমার বলবার উদ্দেশ্য, মাস্টারদের উপর নানা দিক থেকে অন্যায় হচ্ছে—আপনি এর প্রতিকার করুন।

হেডমাস্টার যে আদৌ দমেন নাই, ইহা দেখাইবার জন্য মুখখানাতে গর্ব্বসূচক হাসি আনিয়া সকলের দিকে একবার চাহিয়া লইয়া বলিলেন, শীগগির তোমরা আমার মতলব জানতে পারবে স্কুলের উন্নতি সম্বন্ধে।—বলিয়াই চশমাটি খুলিয়া ধীরভাবে মুছিয়া ফেলিতে ফেলিতে কৃত্রিম উৎসাহের সঙ্গে বলিলেন, আচ্ছা, এখন আমরা আমাদের প্রবন্ধ পাঠ আরম্ভ করি—কোন্ পর্য্যন্ত পড়েছিলাম তখন? দেখি—

এমন ভাব দেখাইবার চেষ্টা করিলেন, যেন নতুন টীচারের মন্তব্য তিনি গায়েই মাখেন নাই। ও-রকম বহু অর্ব্বাচীনের উক্তি তিনি বহুবার শুনিয়াছেন, কিন্তু ওসব শুনিতে গেলে তাঁহার চলে না।

সাড়ে ছয়টার সময় প্রবন্ধ শেষ হইল। ইতিমধ্যে যদুবাবু কখন খাবারের টাকা লইয়া গিয়াছিলেন, কেহ লক্ষ্য করে নাই—তিন টুকরি লুচি কচুরি আলুর দম কখন আসিয়া পৌঁছিয়া গিয়াছে।

হেডমাস্টার নিজে দাঁড়াইয়া শিক্ষকদের খাওয়ার তদারক করিলেন।

নতুন টীচারের মর্যাদা যথেষ্ট বাড়িয়া গেল স্কুলে এই দিনটির পর হইতে। দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ক্লার্কওয়েল যার সামনে হঠাৎ নরম হইয়া সরু-সুতা কাটিতে লাগিলেন, তার ক্ষমতা আছে বৈকি।

মিঃ আলম হেডমাস্টারকে বলিলেন, স্যার্, আপনার মুখের উপর তর্ক করে, আপনি তাই সহ্য করলেন কাল? বলুন, আজই পড়ানোর ভুল ধরে রিপোর্ট করে দিচ্ছি, দিন ওর চাকরি খেয়ে।

—নতুন টীচার অত ভাল ইংরেজী বলে, আমি জানতাম না মিঃ আলম। আমি ওর ক্লাস-ওয়ার্ক আগেও দেখেচি। তাকে খারাপ বলা যায় না ঠিক।

—স্যার্, আমার কাল রাগ হচ্ছিল ওর বেয়াদবি দেখে। আর দেখলেন, মাস্টারেরা প্রায় অনেকেই ওকে সাপোর্ট করঁলে?

—সেটা নিয়ে আমিও ভেবেছি। মাস্টারেরা ঠিকমত মাইনে পায় না বলে অসন্তুষ্ট। অসন্তুষ্ট লোক দিয়ে কাজ হয় না। স্কুলের বাজেট্‌টা সামনের বছর থেকে ব্যালান্স্ না করাতে পারলে আর এরা সন্তুষ্ট হচ্ছে না।

—স্যার্, কাল কোন্ কোন্ টীচার ওকে সাপোর্ট করেছিল, তাদের নাম আমি লিখে রেখেচি।

—নামগুলো দিয়ো আমার কাছে।

—বলেন তো ওদের ক্লাস-ওয়ার্ক দেখি আজ থেকে। রিপোর্ট করি।

একদিন মিঃ আলম চুপি চুপি সাহেবের কাছে আসিয়া বলিল, স্যার্ মাস্টারেরা, নতুন টীচারকে নিয়ে দল পাকাচ্ছে।

—কে কে?

—স্যার্, ক্ষেত্রবাবু, যদুবাবু, শ্রীশবাবু, জ্যোতির্বিনোদ, দত্ত, বোস—কেবল নারাণবাবু নয়।

—নারাণবাবু ইজ অ্যান ওল্ড্ লয়্যালিস্ট।

—স্যার্, নতুন টীচারকে নিয়ে দল পাকায়—মোড়েই ওই চায়ের দোকানে রোজ ছুটির পর ওদের মীটিং হয়। নতুন টীচার ওদের দলপতি।

—তোমাকে কে বললে?

—ক্লার্ক সুবল দে আমায় সব কথা বলে। ও ওদের দলে যোগ দিয়ে শুনে এসে আমায় বলেছে। আমাদের স্কুলের সম্বন্ধে ইউনিভার্সিটিতে নাকি ওরা জানাবে। নতুন টীচারের কে আত্মীয় আছে ইউনিভার্সিটিতে।

—দেখ মিঃ আলম, যে যা পারে করুক। আর ও-সব স্পাইগিরি আমি পছন্দ করি নে। এটা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, এর মধ্যে ও-সব দলাদলি, ডার্টি পলিটিক্স,—আই হেট্। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছেলেদের শিক্ষা, স্কুলকে ভাল করব। গড্ ইজ্ অন্ মাই সাইড—

—আমার মনে হয়, ওই নতুন টীচারকে না তাড়ালে স্কুলে দলাদলি আরও বাড়বে। ও-ই ভাঙবে স্কুলটাকে। ও লোক সুবিধের নয়।

কিন্তু এ রিপোর্টে ফল উল্টা হইল। সাহেবের কাছে মাস দুইয়ের মধ্যে নতুন টীচারের প্রতিপত্তি বাড়িয়া গেল। মাস্টারেরা সব নতুন টীচারকে লিডার বানাইয়াছে, তাহাদের অভাব-অভিযোগের কথা নতুন টীচারের মুখে ব্যক্ত হয় হেডমাস্টারের কাছে। আজ ইহাকে দুই টাকা আগাম দিতে হইবে, কাল 'টীচার্স এড্ ফণ্ড' হইতে উহাকে পাঁচ টাকা ধার দিতে হইবে—নতুন টীচারকে মুখপাত্র করিয়া সবাই পাঠাইয়া দেয়।

সাহেব বলেন, কী, রামেন্দুবাবু?

—স্যার্, আজ যদুবাবুকে কিছু আগাম দিতে হবে।

—কেন? ও-মাসে দেওয়া হয়েছে সাত টাকা।

—ওঁর বড় ঠেকা! দেনা হয়েছে—

—বড় অবিবেচক লোক ওই যদুবাবু। আমি শুনেছি, ও রেস খেলে।

—না স্যার্। রেস খেলার পয়সা কোথায় পাবেন? মেসে থাকেন এখানে—

মিঃ আলমের কানে কথাটা উঠিল। আজকাল নতুন টীচার সাহেবের কাছে মাস্টারদের জন্য সুপারিশ করে এবং তাহাতে ফলও হয়। আলম একদিন সুবল দে কেরানীকে বাহিরে একটা চায়ের দোকানে লইয়া গেলেন। বলিলেন, সুবল, এ সব হচ্ছে কী?

—কী বলুন, স্যার্?

—সাহেব নাকি ওই নতুন টীচারের কথা খুব শুনছেন!

—তাই মনে হয় স্যার্। সেদিন জ্যোতির্ব্বিনোদকে দু দিন ছুটি দিলেন ওঁর সুপারিশে।

—কেন, কেন?

—জ্যোতির্ব্বিনোদের ভাগ্নীর বিয়ে।

—জ্যোতির্ব্বিনোদের ক্যাজুয়াল লিভের হিসেবটা চেক করে কাল আমায় জানিও তো! বুঝলে?

—বেশ, স্যার্।

—স্কুলে যা-তা হচ্চে, না?

কেরানী চুপ করিয়া রহিল। কেরানী মানুষ, বড় টীচারের সামনে যা-তা বলিয়া কি শেষে বিপদে পড়িবে? মিঃ আলম বলিলেন, তোমার কি মনে হয়?

—স্যার্, আমরা চুনোপুঁটির দল, আমাদের কিছু না বলাই ভাল।

—নতুন টীচার বড় বাড়িয়েচে, না?

—হুঁ। তবে একটা কথা—

—কী?

—স্যার্, নতুন টীচার রামেন্দুবাবু কিন্তু লোকের অসুবিধে বা উপকার এই ধরনের ছাড়া অন্য কথা নিয়ে সাহেবের কাছে যায় না।

—তুমি কি করে জানলে?

—আমি জানি স্যার্। সেই জন্যেই মাস্টারবাবুরা ওর খুব বাধ্য হয়ে পড়েছেন।

—থাক। তোমায় আর ব্যাখ্যা করতে হবে না। তুমি কাল জ্যোতির্ব্বিনোদের ক্যাজুয়াল লিভটা চেক করে আমায় জানাবে, কেমন তো?

—হ্যাঁ স্যার্, তা করে দেব। বলেন তো আজই দিই।

—কালই দেবে।

পরদিন হিসাব করিয়া ধরা পড়িল, জ্যোতির্ব্বিনোদের তিন দিন ছুটি বেশী লওয়া হইয়া গিয়াছে এ বছর। মিঃ আলম সাহেবের কাছে রিপোর্ট করিলেন। জ্যোতির্ব্বিনোদের তিন দিনের বেতন কাটা গেল। মিঃ আলম হাসিয়া নিজের দলের মাস্টারদের বলিলেন, লিডার হলেই হল না। সব দিকে দৃষ্টি রেখে তবে লিডার হতে হয়। স্কুলটাকে এবার উচ্ছন্ন দেবে আর কি! সাহেবেরও আজকাল হয়েচে যেমন!

•

হেডপণ্ডিত ছুটিপ্রার্থী হইয়া সাহেবের টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়াছেন।

সাহেব মুখ তুলিয়া বলিলেন, হোয়াট পাণ্ডিট্?

—স্যার্, কাল তালনবমী, টীচারেরা ও ছেলেরা ছুটি চাচ্ছে।

—টালনব—হোয়াট ইজ্ ছাট পাণ্ডিট্? নেভার হার্ড দি নেম্।

—স্যার্, মস্ত বড় পরব হিন্দুর। দুর্গাপুজোর নিচেই—মস্ত পরব।

সাহেব চিন্তা করিয়া বলিলেন, না পণ্ডিত, এ বছর এক শো দিন ছাড়িয়েছে। ইন্‌স্‌পেক্টর-আপিসে গোলমাল করবে। কী তুমি বলছ টাল—কী?

—তালনবমী।

—ফানি নেম। যাই হোক, এতে ছুটি দেওয়া চলে না।

হেডপণ্ডিত মাস্টারদের শেখানো ইংরেজী আওড়াইয়া বলিলেন, নেক্‌সট্‌ টু দুর্গাপূজা সার্‌—গ্রেট্‌—গ্রেট্‌—ইয়ে—

'ফেস্টিভ্যাল' কথাটা ভুলিয়া গিয়াছেন, অত বড় কথা মনে আনিতে পারিলেন না।

সাহেব হাসিয়া বলিলেন, ইয়েস্‌, আণ্ডারস্ট্যাণ্ড্‌—ইউ মিন ফেস্টিভ্যাল—আমি বুঝেছি। হবে না। ক্লাসে পড়াওগে যাও।

সকলেই জানিল, ছুটি হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ঠিক শেষ ঘণ্টায় মথুরা চাপরাসীকে সারকুলার-বই লইয়া ক্লাসে ক্লাসে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে দেখা গেল। তালনবমীর ছুটি হইয়া গিয়াছে।

মনে সকলেরই খুব স্ফূর্ত্তি। জ্যোতির্ব্বিনোদের ঘরে ছাদের উপর অনেকে আড্ডা দিতে গেলেন। জ্যোতির্ব্বিনোদ বলিলেন, বাব্বা, কাল সেই পাগল বউটার কী কাণ্ড রাত্রে—

হেডপণ্ডিত বলিলেন, কী হয়েছিল?

—আরে, কখনও কাঁদে কখনও হাসে। রাত্রে ছাদে কতক্ষণ বসে রইল। ওর দুই দেওর এসে শেষে ধরে নিয়ে গেল। মারলেও যা।

নারাণবাবু বলিলেন, বড় কষ্ট হয় মেয়েটার জন্যে। ওর অদৃষ্টটাই খারাপ।

যে বাড়ীর বধূর কথা বলা হইতেছে, বাড়ীটা বেশ বড়লোকের, স্কুলের পশ্চিম দিকে, গত ছয় মাসের মধ্যে বাড়ীটাতে অনেকগুলি বিবাহ হইয়াছিল খুব জাঁকজমকের সঙ্গে। সেই হিড়িকে এই মেয়েটিও বধূরূপে ও-বাড়ীতে ঢোকে, কারণ তাহার পূর্ব্বে মাস্টারেরা আর কোন দিন উহাকে দেখেন নাই ও-বাড়ীতে। কিন্তু বিবাহের মাসখানেক পর হইতেই বধূটি কেন যে পাগল হইয়া গিয়াছে, তাহা ইহারা কী করিয়াই বা জানিবেন! তবে বধূটি যে আগে ভাল ছিল, এ ব্যাপার ইহারা স্বচক্ষেই দেখিয়াছেন।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, হ্যাঁ হে, সেই পার্শী মেয়েটাকে আর তো দেখা যায় না ও-বাড়ীতে!

শ্রীশবাবু বলিলেন, ও-বাড়ীতে অন্য ভাড়াটে এসে গিয়েছে। তারা চলে গিয়েছে।

—কি করে জানলে?

—এই দিন-পনরো থেকে দেখছি, ছাদে বাঙালী মেয়ে গিন্নী পুরুষমানুষ ঘোরে।

পার্শী মেয়েটিকে ইহারা সকলেই প্রায় দুই-বছর ধরিয়া দেখিয়া আসিতে ছিল। তাহার আগে বছর পাঁচেক ও-বাড়ীতে অন্য ভাড়াটে দেখিয়াছিলেন। মেয়েটি ছাদের লোহার চৌবাচ্চার ছায়ায় বসিয়া একমনে পিঠের উপর বেণী ফেলিয়া বসিয়া পড়িত—যেন সাক্ষাৎ সরস্বতী প্রতিমা। কোন স্কুল বা কলেজের ছাত্রী হইবে। দুপুরে বা বিকালে শতরঞ্চির উপর

একরাশ বই ছড়াইয়া পড়িত—কী একাগ্র মনে পড়িত!

তাহাকে লইয়া মাস্টারদের কত জল্পনা-কল্পনা!

—আচ্ছা, ও কি স্কুলের ছাত্রী?

—কিন্তু ওর বয়স হিসেবে কলেজের বলেই মনে হয়।

—খুব বড়লোক,—না?

—এমন আর কী! ফ্ল্যাট নিয়ে তো থাকে। ওদের চাল খুব বেশী—পার্শী জাতটার—

—বিয়ে হয়েছে বলে মনে হয়?

এই রকম কত কথা! সে তরুণী পার্শী ছাত্রীটি বিবাহিতা হইলেই বা কাহার কী, না হইলেই বা তাহাতে মাস্টারদের কী লাভ! তবু আলোচনা করিয়া সুখ।

অধিকাংশ মাস্টার এ স্কুলে বহুদিন ধরিয়া আছেন—দশ, তেরো, আঠারো, বিশ বছর। এই উঁচু তেতলার ছাদ হইতে চারি পাশের বাড়ীগুলিতে কত উত্থান পতন পরিবর্ত্তন দেখিলেন। অনেকে বাড়ী যাইতে পান না পয়সার অভাবে, যেমন জ্যোতির্ব্বিনোদ, কি নারাণবাবু, কিংবা মেস্-পালিত শ্রীশবাবু—গৃহস্থবাড়ীর মা, বোন, মেয়ে, ইহাদের চলচ্চিত্র মাত্র এত উঁচু হইতে দেখিতে পান এবং দেখিয়া কখনও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন নিজেদের নিঃসঙ্গ জীবনের কথা ভাবিয়া, কখনও আনন্দ পান, কখনও পরের দুঃখে দুঃখিত হন, উদ্বিগ্ন হন। এই চলিতেছে বহুদিন ধরিয়া।

এ এক অদ্ভুত জীবনানুভূতি—দূর হইয়াও নিকট, পর হইয়াও আপন, অথচ যে দূর সে দূরই, যে পর সে পরই। অনেক কুশ্রী ঘটনাও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ওই লাল বাড়ীটাতে নয় বৎসর আগে এক মেয়ে একটি ছেলের সঙ্গে পলাইয়া গিয়াছিল, এদিকের ওই বাড়ীটাতে প্রৌঢ়া গৃহিণীকে প্রত্যেকদিন—থাক, সে সব কথায় দরকার নাই।

কত দুঃখের কাহিনীও এই সঙ্গে মনে পড়ে। ওই পুবদিকের হলদে দোতলা বাড়ীটাতে আজ প্রায় সাত-আট বছর আগে স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে আত্মহত্যা করে। এতদিন পরেও সে কথা টিফিনের ছুটির সময় মাঝে মাঝে উঠে। বেকার স্বামী, পরিবার প্রতিপালন করিতে না পারিয়া স্ত্রীর সঙ্গে মিলিয়া বেকার-জীবনের অবসান করে।

সে সব দিনে ক্লার্কওয়েল সাহেব ছিল না। ছিলেন সুধীর মজুমদার হেডমাস্টার। অনুকূলবাবুর পরের কথা।

হেডপণ্ডিত বলেন, অনেকদিন হয়ে গেল এ স্কুলে যদু ভায়া, কী বল? সেই বউবাজার স্কুল ভেঙে এখানে আসি—মনে পড়ে সে-কথা? হেডমাস্টারের নাম কী ছিল যেন—শশিপদ কী যেন? আমার আজকাল ভুল হয়ে যায়, নাম মনে আনতে পারি নে।

যদুবাবু বলেন, শশিপদ রায় চৌধুরী। বউবাজার থেকে তারপর রাণী ভবানীতে গিয়েছিলেন, মনে নেই?

'—আমরা তো স্কুল ভেঙে গেলে চলে এলুম। শশীবাবুর আর কোন খোঁজ রাখি নে। এ স্কুলে তখন অনুকূলবাবু হেডমাস্টার। ওঃ অমন লোক আর হয় না। আমাদের নারাণদাদা

সেই আমলের লোক, না দাদা ?

নারাণবাবু বলেন, আমি তারও কত আগের। তুমি আর যদু এসেচ এই আঠারো বছর, আমি তারও বারো বছর আগে থেকে এখানে। অনুকূলবাবুতে আমাতে মিলে স্কুল গড়ি।

ক্ষেত্রবাবু বলেন, আপনারা গড়লেন স্কুল, এখন কোথা থেকে মিঃ আলম আর সাহেব এসে নবাবী করচে দেখ।

নারাণবাবু বলেন, আমি কিছু নই, অনুকূলবাবু গড়েন স্কুল। তাঁর মত ক্ষমতা যার-তার থাকে না। অনুকূলবাবুর মত লোক হচ্ছে এই সাহেব। সত্যিকার ডিউটিফুল হেডমাস্টার হিসেবে সাহেব অনুকূলবাবুর জুড়িদার। লেখাপড়া শেখে সবাই, কিন্তু অন্যকে শেখানো সবাই পারে না। যে পারে, তাকে বলে টীচার। তুমি আমি টীচার নই—টীচার ছিলেন অনুকূলবাবু, টীচার হল এই সাহেব।

হেডপণ্ডিত বলেন, না, দাদা, আপনি টীচার নিশ্চয়ই। আমরা না হতে পারি—

নারাণবাবু বলেন, অত সহজে টীচার হয় না। এই শুনবে তবে অনুকূলবাবুর দু-একটা ঘটনা ? একবার একটা ছেলে এল, তার বাবা বর্ম্মায় ডাক্তারি করে, দু'পয়সা পায়। ছেলেটাকে আমাদের স্কুলে দিয়ে গেল বাংলা শিখবে বলে। বর্ম্মী ভাষা জানে, বাংলা ভাল শেখে নি। পয়সাওলা লোকের ছেলে, বদমাইশও খুব। স্কুল পালায়, বাবা মোটা টাকা পাঠায়—সেই টাকায় থিয়েটার দেখে, হোটেলে খায়, পড়াশুনোয় মন দেয় না।

—এখানে থাকে কোথায় ?

—থাকে তার আত্মীয়-বাড়ী। সেই ছেলের জন্যে অনুকূলবাবুকে রাতের পর রাত বসে ভাবতে দেখেচি। আমায় বললেন—নারাণ, মারধোর বা বকুনিতে ওকে ভাল করা যাবে না। উপায় ভাবচি। তারপর ভেবে করলেন কী, রোজ সেই ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বার হতেন আর মুখে মুখে গল্প করতেন পাপের দুর্দ্দশা, অধঃপতনের ফল—এই সব সম্বন্ধে। গল্প নিজেই বসে বসে বানাতেন রাত্রে। আমায় আবার শোনাতেন পয়েণ্টগুলো। সেই ছেলে ক্রমে শুধরে উঠল, ম্যাট্রিক পাস করে বেরুল। তার বাবা এসে অনুকূলবাবুকে একটা সোনার ঘড়ি দেয় ছেলে পাস করলে। অনুকূলবাবু ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, আমায় এ কেন দিচ্ছেন ? আমার একার চেষ্টায় ও পাস করে নি, আমার স্কুলের অন্যান্য মাস্টারের কৃতিত্ব না থাকলে আমি একা কী করতে পারতাম ? তা ছাড়া, আমি কর্ত্তব্য পালন করেছি, ভগবানের কাছে আপনার ছেলের জন্যে আমি দায়ী ছিলাম, কারণ আমার স্কুলে তাকে ভর্ত্তি করেছিলেন। সে দায়িত্ব পালন করেচি, তার জন্যে কোন পুরস্কারের কথা ওঠে না।—আজকাল ক'জন শিক্ষক তাঁদের ছাত্রের সম্বন্ধে একথা ভাবেন বলুন দিকি ? আদর্শ শিক্ষক বলতে যা বোঝায়, তা ছিলেন তিনি। আমাদের সাহেবকে দেখি, অনেকটা সেইরকম ভাব ওঁর মধ্যে।

ক্ষেত্রবাবু ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, দাদা, এতক্ষণ অনুকূলবাবুর কথা বলছিলেন, বেশ লাগছিল। আবার তাঁর সঙ্গে সাহেবের নাম করতে যান কেন ?

নারাণবাবু গম্ভীর মুখে বলিলেন, কেন করি, তোমরা জান না—আই নো এ রিয়াল টীচার হোয়েন দেয়ার ইজ ওয়ান—আমার কথা শোন ভায়া, সাহেবকে তোমরা অনেকেই চেন নি।

শিক্ষকের দল পরস্পরের কাছে বিদায় গ্রহণ করিলেন; কারণ সকলেরই টুইশানির সময় হইয়াছে।

পূজার ছুটির মাসখানেক দেরি। স্কুলের অবস্থা খুবই খারাপ। হেডমাস্টার সারকুলার দিলেন যে, যে মাস্টারের নিতান্ত দরকার, তাহারা আসিয়া জানাইলে কিছু কিছু টাকা দেওয়া হইবে, বাকী শিক্ষকদের ছুটির পর স্কুল খোলা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে মাহিনা লওয়ার জন্য।

স্কুলে শিক্ষকদের মধ্যে হট্টগোল পড়িয়া গেল।

যদুবাবু বলিলেন, এ সারকুলারের মানে কী হে ক্ষেত্র-ভায়া? আমাদের মধ্যে কে তালেবর আছে, যার টাকার দরকার নেই?

ক্ষেত্রবাবু সে সব কিছু জানেন না, তবে তাঁহার নিজের টাকার দরকার এটুকু জানেন।

শ্রীশবাবু বলিলেন, তোমার যেমন দরকার, গরীব মাস্টার—পূজোর সময় শুধু হাতে বাড়ী যেতে হবে সারা বছর খেটে—সকলেরই দরকার। রামেন্দুবাবুকে সকলে বলা যাক।

কিন্তু শোনা গেল, টাকা আদৌ নাই! আশামত আদায় হয় নাই। যা আদায় হইয়াছে, বাড়ীভাড়া আর কর্পোরেশন-ট্যাক্স দিতেই হইবে, যাহা কিছু উদ্বৃত্ত থাকিবে নিতান্ত অভাবগ্রস্ত শিক্ষকদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে।

সেদিন টীচারদের ঘরে হঠাৎ মিঃ আলমের আগমনে সকলে বিস্মিত হইল। মাস্টারদের বসিবার ঘরে মিঃ আলম বড় একটা আসেন না।

মিঃ আলমকে দেখিয়া মাস্টারেরা সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। যে বসিয়াছিল সে উঠিয়া দাঁড়াইল, যে শুইয়াছিল সে সোজা হইয়া বসিল।

মিঃ আলম হাসিমুখে চারদিকে চাহিয়া বলিলেন, বসুন, বসুন।

তারপর ধীরে ধীরে নিজের আগমনের উদ্দেশ্য পাড়িলেন। হেডমাস্টারের এই যে সারকুলার, এ নিতান্ত জুলুমবাজি। কাহার টাকার জন্য কে এখানে খাটিতে আসিয়াছে?

সকলে এ উহার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। মিঃ আলম সাহেবের বিশ্বাসী লেফটেন্যাণ্ট, তাহার মুখে এ কী কথা? সাহেবের স্পাই হিসাবেও মিঃ আলম প্রসিদ্ধ। কে কী কথা বলিবে তাহার সামনে?

মিঃ আলম বলিলেন, না, সাহেবকে দিয়ে এ স্কুলের আর উন্নতি নেই। আমি আপনাদের কো-অপারেশন চাই। আমার সঙ্গে মিলে সবাই সাহেবের বিরুদ্ধে সেক্রেটারির কাছে আর প্রেসিডেণ্টের কাছে চলুন। স্কুলের যা আয়, তাতে মাস্টারদের বেশ চলে যায়। সাহেব আর মেম পুষতে সাড়ে চার শো টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে। এ স্কুলের হাতী পোষার ক্ষমতা

নেই। আসুন, আমরা ম্যানেজিং কমিটীকে জানাই।

যদুবাবু প্রথমে কথা বলিলেন। তাঁহার ভাব বা আদর্শ বলিয়া জিনিস নাই কোন কালে, সুবিধা বা স্বার্থ লইয়া কারবার। তিনি বলিলেন, ঠিক বলেছেন মিঃ আলম। আমিও তা ভেবেছি।

মিঃ আলম বলিলেন, আর কে কে আমাকে সাহায্য করতে রাজী?

জ্যোতির্ব্বিনোদের রাগ ছিল হেডমাস্টারের উপর, বলিলেন, আমি করব।

যদুবাবু বলিলেন, আমিও।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, আমিও।

শ্রীশবাবুও সাহায্য করিতে রাজী।

কেবল নতুন টীচার ও নারাণবাবু চুপ করিয়া রহিলেন।

মিঃ আলম বলিলেন, কী রামেন্দুবাবু, আপনি কী বলেন?

নতুন টীচার বলিলেন, আমি দু বছর প্রায় হল এ স্কুলে এসেছি, যা বুঝেছি এ স্কুলের উন্নতি নেই। স্কুলের বাজেট যিনি দেখেছেন, তিনিই এ কথা বলবেন। মিঃ আলম যা বলেছেন, তা খুবই ঠিক।

—তা হলে আপনি আমাকে সাহায্য করুন।

—কী জন্যে সাহায্য চান?

—টু রিমুভ্ দি প্রেজেণ্ট হেডমাস্টার। আশী টাকার হেডমাস্টার রাখলে স্কুল চলে যায়, মেমের কী দরকার? ওতে ছেলে বাড়চে না যখন, তখন হাতী পোষা কেন? আমরা অনাহারে আছি, আর সাহেব মেম সাড়ে চারশো টাকা নিয়ে যাচ্ছে!

—ঠিক কথা।

—তবে আপনি কি করবেন?

—আমি এতে নেই।

—কেন?

—প্রকাশ্য ভাবে প্রতিবাদ করি বলে গোপনে শত্রুতা করতে পারব না, মাপ করবেন মিঃ আলম। তবে আমি নিউট্রাল থাকব, কারও দিকে হব না—এ কথা আপনাকে দিতে পারি।

—বেশ, তাই থাকুন। নারাণবাবু?

—আমি বুড়ো মানুষ, আমায় নিয়ে কেন টানাটানি করেন মিঃ আলম? আপনি জানেন, আমি নির্ব্বিরোধী লোক। আমায় আর এর মধ্যে জড়াবেন না।

—অন্য সব টীচারের মুখের দিকে চেয়ে রাজী হোন নারাণবাবু। আপনি হেডমাস্টার হোন, খুব খুশী হব সবাই। এঁদের মধ্যে কেউ নেই, যিনি তাতে অমত করবেন। কিংবা রামেন্দুবাবু হেডমাস্টার হোন—কারও আপত্তি হবে না।

সকলে সমস্বরে এ প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

এই দিনটির পরে মিঃ আলমের চক্রান্ত রোজই চলিতে লাগিল। মাস্টারদের মধ্যে

স্বার্থান্বেষী, প্রিন্সিপল-বিহীন যাহারা (যেমন যদুবাবু), মিঃ আলমের দলে যোগ দিয়াছেন ; ক্ষেত্রবাবু ও শ্রীশবাবু মনে মনে মিঃ আলমের দলে আছেন, মুখে কিছু বলেন না। কেবল নারাণবাবু ও নতুন টীচার রামেন্দু দত্ত নিরপেক্ষ, কোন দলেই নাই।

ইহাদের মিটিং প্রতি দিন ছুটির পর তেতলার ঘরে হয়—নতুন টীচার ও নারাণবাবু সেখানে থাকেন না।

এই অবস্থার মধ্যে আসিল পূজার ছুটির সপ্তাহ। শনিবারে ছুটি হইবে। ছেলেরা ক্লাসে ক্লাসে ছুটির দিন শিক্ষকদের জলযোগের ব্যবস্থা করিতেছে। শিক্ষকদের মধ্যে কেহ কেহ গোপনে তাহাদের উসকাইয়া না দিতেছেন এমন নয়।

—কী রে, পড়াশুনা কিছুই হয় নি কেন? গ্রামার মুখস্থ ছিল, টাস্ক ছিল, কিছু করিস নি? খাওয়াতে ব্যস্ত আছিস বুঝি? কি ফর্দ্দ করলি এবার?

ফর্দ্দ শুনিয়া যদুবাবু উদাসীন ভাবে বলিলেন, এ আর তেমন কী হল—এবার থার্ড ক্লাসে যা করবে, শুনে এলুম—

ক্লাসের চাঁই বালকেরা সাগ্রহ কলরবে বলিয়া উঠিল, কী স্যার্—কী স্যার্—?

—আইস্‌ক্রীম, লুচি, আলুর দম, হরি ময়রার কড়াপাকের সন্দেশ—

—স্যার্, আমরাও করব আইস্‌ক্রিম।

—হরি ময়রার সন্দেশ স্যার্, কোথায় পাওয়া যায়?

—সে আমি তোদের এনে দেব, ভাবনা কী! পয়সা দিস আমার হাতে।

—কালই দেব চাঁদা তুলে।

—স্যার্, আপনার হাতে আমরা দশ টাকা দেব, আপনি যাতে থার্ড ক্লাসের চেয়ে ভাল হয়, তা কিন্তু করবেন।

থার্ড ক্লাসে গিয়া যদুবাবু বলিলেন, ওঃ, ছুটির টাস্কটা সবাই লিখে নে, ভুলে গিয়েচি একেবারে। তোদের এবার কী বন্দোবস্ত হচ্ছে রে? কিন্তু এবার ফোর্থ ক্লাসে যা হচ্ছে, তার কাছে তোরা পারবি নে।

শ্রীশবাবু ও জ্যোতির্ব্বিনোদ অন্য অন্য ক্লাসে উস্‌কাইলেন। প্রতি বৎসর ক্লাসে ক্লাসে টেক্কা দিবার চেষ্টা করে।

ছুটির পর হেডমাষ্টারের ঘরে নতুন টীচার গিয়া টেবিলের সামনে দাঁড়াইলেন।

—স্যার্, আপনার সঙ্গে গোপনীয় কথা আছে—কখন আসব?

—ও, মিঃ দত্ত! তুমি সন্ধ্যার পর এসো—আজ আর টুইশানিতে যাব না।

—বেশ।

ছুটির পর প্রায় দেড় ঘণ্টা মাস্টারেরা থাকিয়া ছেলেদের সেকেণ্ড টার্মিনাল পরীক্ষার ফল লিপিবদ্ধ করিলেন, প্রোগ্রেস্-রিপোর্ট লিখিলেন, বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সিজিল-মিজিল করিলেন—বড় একটা ছুটির আগে অনেক কাজ। অথচ সকলেই জানে, ছুটির মাহিনা কেহ পাইবে না। এই শারদীয় পূজার সময়ে সকলকে শুধু হাতে বাড়ী যাইতে হইবে—উপায় নাই।

ইহা যে স্বার্থত্যাগ-প্রণোদিত ব্যাপার তাহা নহে, নিরুপায়ে পড়িয়া মার খাওয়া মাত্র। এ চাকরি ছাড়িলে কোন্ স্কুলে হঠাৎ চাকরি মিলিতেছে?

সন্ধ্যার পর নতুন টীচার হেডমাস্টারের নিজের বসিবার ঘরের দরজায় কড়া নাড়িলেন।

—হ্যাঁ, এস। কাম্ ইন্—

নতুন টীচার ঢুকিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

—বোস মিঃ দত্ত, বোস। এক পেয়ালা চা?

—না, ধন্যবাদ। এই খেয়ে আসছি। মিস্ সিবসন্ কোথায়?

—উনি আজকাল পড়াতে বেরোন। ভাল টুইশানি পেয়েছেন—পঞ্চকোটের রাজকুমারীকে এক ঘণ্টা ইংরিজী পড়াতে—

—ও!

—কী কথা বলবে বলছিলে?

নতুন টীচার পকেট হইতে একটা কাগজ বাহির করিলেন। গলা ঝাড়িয়া বলিলেন, স্যার্, আপনি এবার কি কিছু দেবেন না আমাদের মাইনে?

—তোমায় তো সব দেখিয়েছি মিঃ দত্ত। স্কুলের আর্থিক অবস্থা তুমি আর মিঃ আলম জান, আর জানে নারাণবাবু। বেশী লোককে বলে কোনও লাভ নেই। স্কুলকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করছি প্রাণপণে। বাড়ীওলা নালিস করবে শাসিয়েছিল—তার পাঁচ শো টাকা দিতে হয়েছে। মিস্ সিবসন্কে দেড় শো টাকা দিতে হবে, উনি দার্জ্জিলিং যাচ্ছেন। কিন্তু তার মধ্যে মোটে পঁচাত্তর দিতে পারছি। আমি এক পয়সা নিচ্ছি নে। এ আমাদের স্ট্রাগলের বছর, এ বছর যদি সামলে উঠি—সামনের বছরে হয়তো সুদিন আসবে। সকলকেই স্বার্থত্যাগ করতে হবে, কষ্ট স্বীকার করতে হবে এ বছরটাতে। বুঝলে না?

—হ্যাঁ স্যার্।

—তুমি কিছু চাও? কত দরকার বল?

—না স্যার্। আমি একরকম ম্যানেজ করে নেব। ধন্যবাদ স্যার্। এই ক'জনকে কিছু কিছু দিতেই হবে, যে করে হোক ম্যানেজ করুন।

নতুন টীচার হাতের কাগজ দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, ক্ষেত্রবাবু কুড়ি টাকা, জ্যোতির্ব্বিনোদ পনেরো টাকা, শ্রীশবাবু আঠারো টাকা, হেডপণ্ডিত দশ টাকা, যদুবাবু কুড়ি—

সাহেব কুইনাইন সেবনের পরের অবস্থার মত মুখখানা করিয়া বলিলেন, ও, দীজ আর দি ট্রাবল্-মেকারস্—

—না স্যার্, এদের না হলে চলবে না। এদের অবস্থা সত্যিই খারাপ—প্রত্যেকেরই বিশেষ দরকার আছে। জ্যোতির্ব্বিনোদের বাড়ী পৈতৃক পুজো, তাঁকে বাড়ী যেতে হবে ভাড়া চাই। ক্ষেত্রবাবুর আবশ্যক আমি ঠিক জানি নে, তবে তাঁরও দরকার জরুরী। হেডপণ্ডিত পুজো করতে যাবেন দক্ষিণে শিষ্যবাড়ী। কাপড়চোপড় নেই, কিনবেন। যদুবাবু—

—দি কানিং ওল্ড্ ফক্স্—

—যদুবাবুর স্ত্রী আজ তিন-চার মাস পড়ে আছেন জ্ঞাতির বাড়ী, তাঁদের সেখান থেকে না আনলে নয়—তাঁরা চিঠি লিখছেন কড়া কড়া। ট্রেনভাড়া খরচ চাই—

সাহেব হাসিয়া বলিলেন, তোমার কাছে সবাই বলে, তোমাকে ধরেছে আমাকে বলতে। বুঝলাম।

—হাঁ, স্যার্।

—টাকা আমি যে করে হয় ম্যানেজ করব, তুমি যখন বলছ। তুমি নিজের জন্যে কিছু নেবে না?

—না স্যার্। আমার দুটো টুইশানির টাকা পাব—একরকম করে চালিয়ে নেব এখন। এখনও তো কত মাস্টারকে কিছু দেওয়া হচ্ছে না। শুধু এই ক'জনের নিতান্ত জরুরী দরকার, তাই—

—বেশ, কাল ওদের ব'লো, টাকা দিয়ে দেব যে করেই হোক।

—আর একটা কথা স্যার্, যদি জানুয়ারি মাসে সুবিধে হয়, জ্যোতির্বিনোদের কিছু মাইনে বাড়িয়ে দিতে হবে। বড় গরীব।

—কেন, ওকে আমরা যা দিই, ওর বিদ্যাবুদ্ধির পক্ষে তা যথেষ্ট নয় কি?

—না স্যার্। ওর প্রতি অবিচার করবেন না। গরীব বড়—

—কিন্তু বড় ফাঁকিবাজ, ক্লাসে কিছু করে না। আরও দু-চার জন আছে ফাঁকিবাজ। তুমি ভাব, আমি তাদের চিনি নে? স্কুলের অবস্থা ভাল না বলে কিছু বলি নে। আচ্ছা, তোমার কথা মনে রইল, জানুয়ারি মাসে বেশী ছেলে ভর্ত্তি হলে থার্ড পণ্ডিতের কেস আমি বিবেচনা করব।

নতুন টীচার বিদায় লইলেন।

যদুবাবু সত্যই বিপদে পড়িয়াছেন।

গত গ্রীষ্মের ছুটিতে স্ত্রীকে সেই যে গ্রামে শরিকের বাড়ী রাখিয়া আসিয়াছিলেন, অর্থাভাবে তাহাকে আনিতে পারেন নাই। অবনী মুখুজ্জেকে টাকা ধার দিবেন বলিয়াছিলেন, সে অন্ত তিন মাস ধরিয়া তাগাদার উপর তাগাদা দিয়া আসিয়াছে—নানা ছল-ছুতা, সত্য-মিথ্যা নানারূপ স্তোকবাক্যে তাহাকে কতদিন ঠেকাইয়া রাখিয়াছেন। যদুবাবুর স্ত্রী লিখিল, তুমি অবনী ঠাকুরপোকে টাকা দিবার কথা নাকি বলিয়া গিয়াছিলে, সে একদফা নিজে, একদফা তাহার দিদি ও স্ত্রীর দ্বারা আমার গায়ের ছাল খুলিয়া ফেলিতেছে, তোমার কাছে টাকা ধারের সুপারিশ করিতে। তুমি কোথা হইতে টাকা দিবে জানি না। তবে এমন বলিলেই বা কেন, তাহাও ভাবিয়া পাই না। যদি টাকা দিতে না পার, তবে আমাকে এখান হইতে সত্বর লইয়া যাইবে। ইহাদের খোঁটা ও গঞ্জনা আর আমার সহ্য হয় না।

যদুবাবু স্ত্রীকে স্তোকবাক্য দিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, সে আজ দেড় মাসের কথা। তারপর স্ত্রীর যত চিঠি আসিয়াছে, তাহার কোন উত্তর দেন নাই।

দিবেনই বা কী করিয়া, স্কুলে দুই মাস খাটিয়া এক মাসের মাহিনা পাওয়া যায়—মাসের উনত্রিশ তারিখে গত মাসের মাহিনা যদি হইল, তবে মাস্টারেরা ভাগ্য প্রসন্ন বিবেচনা করেন! মেসের দেনা ঠিকমত দেওয়া যায় না—টুইশানি ছিল, তাই চলে! স্ত্রীকে ইহার মধ্যে আনেন কোথায়, বাসা করিবার খরচ জুটাইবেন কোথা হইতে, বলিলেই তো হইল না!

শনিবার পূজার ছুটি হইবে, আজ বৃহস্পতিবার। যদুবাবু টুইশানি করিয়া ফিরিবার পথে ভাবিতেছিলেন, ছুটিতে কি বেড়াবেড়ী যাইবেন? রামেন্দুবাবুকে ধরিয়াছেন, হেডমাস্টারকে বলিয়া-কহিয়া অন্তত কুড়ি টাকা যাহাতে পাওয়া যায়। রামেন্দুবাবুর কথা আজকাল সাহেব বড় শোনে।

কিন্তু তা যেন হইল। এই সামান্য টাকা হাতে সেখানে গিয়া কী করিবেন? স্ত্রীকে আনিয়া কোথায়ই বা রাখেন? অর্থকষ্টের বাজারে বাসা করিবেনই বা কোন্ সাহসে, হাওয়ায় ভর করিয়া দাঁড়াইয়া এত ঝুঁকি লওয়া চলে না।

আকাশ-পাতাল ভাবিতে ভাবিতে যদুবাবু মেসের দরজায় ঢুকিতেই মেসের একটি লোক বলিয়া উঠিল—একটি ভদ্রলোক আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন অনেকক্ষণ থেকে। শ্রীশদা এখনও ছেলে পড়িয়ে ফেরেন নি, আপনাদের ঘরে আমি বসিয়ে রেখেছি আপনার সীটে।

যদুবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, আমার জন্যে? কোথা থেকে—

—তা তো জিগ্যেস করি নি। দেখুন না গিয়ে, আপনার সীটেই বসে আছেন। বললেন—এখানে খাব। আমি আবার ঠাকুরকে বলে দিলাম যদুবাবুর ফ্রেণ্ড খাবে। নইলে রান্নাবান্না হয়ে যাবে, আপনি যখন ফিরবেন।

যদুবাবু দুরু দুরু বক্ষে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া নিজের ঘরে ঢুকিতেই সম্মুখের সীট হইতে অবনী মুখুজ্জে দাঁত বাহির করিয়া একগাল হৃদ্যতার হাঁসি হাসিয়া বলিল, আসুন দাদা—এই যে! প্রণাম। ওঃ, কতক্ষণ থেকে বসে আছি!

যদুবাবুর হৃদ্‌স্পন্দন যেন এক সেকেণ্ডের জন্য থামিয়া গেল। চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। তখনই কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন, আরে, অবনী যে! এস এস ভায়া। তার পর, সব ভাল? তোমার বউদিদি ভাল তো?

—হেঁ হেঁ দাদা, সব একরকম আপনার আশীর্ব্বাদে—

—বেশ বেশ।

—তারপর দাদা এলাম, বলি, যাই দাদার কাছে। জঙ্গলে পড়ে থাকি, দুদিন মুখ বদলানো হবে, আর শহরে দেখে-শুনে আসিগে যাই থিয়েটার বায়োস্কোপ। দিন পনেরো কাটিয়ে আসি পুজোর মহড়াটা। ম্যালেরিয়ায় শরীর জরজর, একটু গায়ে লাগুক—দাদা যখন আছেন।

যদুবাবু পুনরায় কাষ্ঠহাসি হাসিলেন, তা বেশ তা বেশ ! তবে—

—তারপর, আপনার কাছে বলতে লজ্জা নেই দাদা—ধার করে গাড়ীর ভাড়াটি কোনক্রমে যোগাড় করে তবে আসা। হাতে কানা-কড়িটি নেই। বাড়ীতে আপনার বউমার, ছেলেপুলের পরনে কাপড় নেই কারও—বছরকার দিন, পুজো আসচে। নিজেরও—দাদা, এই দেখুন না, সাত পুরনো ধুতি, তাই পরে তবে—। বলি, যাই—দাদার কাছে, একটা হিল্লে হয়েই যাবে। আপাতত গোটা কুড়ি টাকা নিয়ে কাপড়গুলো তো কিনে রাখি। এর পর বাজার আক্রা হয়ে যাবে কিনা !

যদুবাবুর কপাল ঘামিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার রুদ্ধ কণ্ঠ হইতে কী একটা কথা অস্ফুটভাবে উচ্চারিত হইল, ভাল বোঝা গেল না। অবনী তাহাকেই সম্মতিসূচক বাণী ধরিয়া লইয়া বলিল, না, কালই সকালে টাকাটা নিয়ে বাজার করে নিয়ে আসি। আর আপনি না দিলেই বা যাচ্ছি কোথায় বলুন। আপনার ওপর জোর খাটে বলেই তো আসা। না হয় বকবেন, না হয় মারবেন—কিন্তু ছোট ভাইয়ের আবদার না রেখে তো পারবেন না—হেঁ হেঁ—

যদুবাবু বেচারী সারাদিন খাটিয়াছেন, সেই কোন্ সকালে দুইটি খাইয়া বাহির হইয়াছিলেন। রাত দশটা, এখন কোথায় খাইয়া ঘুমাইবেন, এ উপসর্গ কোথা হইতে আসিয়া জুটিল বল তো !

পাড়াগাঁয়ের দূরসম্পর্কের জ্ঞাতি, দেখাশুনা ঘটিত কালেভদ্রে, এখন মাখামাখি করিতে গিয়া মুশকিলেই পড়িয়া গেলেন। পাড়াগাঁয়ের লোকের সঙ্গে বেশী মাখামাখি করিতে নাই—ইহারা হাত পাতিয়াই আছে। পাড়াগাঁয়ের লোকের এ স্বভাব তিনি জানিতেন না যে তাহা নয়, কিন্তু বহুদিন কলিকাতায় থাকার দরুন ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তাই আজ এ দুর্দশা। বলিলেন, চল, এস খাবে।

যদুবাবুর ঘরে সাতটি সীট—অর্থাৎ মেঝেতে ঢালা বিছানা পাতিয়া পাশাপাশি সাতটি ক্লান্ত প্রাণী শয়ন করে। তাহার মধ্যে অবনীকে গুঁজিয়া কোন রকমে শোওয়া চলিল। কিন্তু পাড়াগাঁয়ের লোক, সকলের সম্মুখে অভাব অভিযোগের কথা উচ্চৈঃস্বরে ব্যক্ত করিতে লাগিল। আর এত বকিতেও পারে ! 'হাঁ হাঁ' দিতে দিতে যদুবাবুর মুখ ব্যথা হইয়া গেল।

সকালে উঠিয়া অবনীর জন্য চা ও খাবার আনাইয়া দিয়া যদুবাবু মেসের বাজার করিতে বাহির হইলেন, কারণ বাজার জিনিসটা তিনি করেন ভালই, এবং ইহা হইতে দুই-চারি আনা লাভও রাখিতে জানেন নিজের জন্য।

স্কুলে বাহির হইতে যাইবেন অবনী জিজ্ঞাসা করিল, দাদা, কখন আসচেন ?

—কাল যে সময় এসেছিলাম, রাত হবে।

অবনী সকলের সামনেই বলিয়া বসিল, তা হলে দাদা, কাপড়ের টাকাটা আমায় দিয়ে যান, আজই কাপড়গুলো কিনে রাখি। আর ওবেলা ভাবছি বায়োস্কোপ দেখব, তার দরুনও কিছু দিন, আমার ট্যাক যাকে বলে গড়ের মাঠ কিনা ! হ্যা—হ্যা—

যদুবাবু তিন-চারজন মেস্‌-বন্ধুর সামনে কী বলিবেন! বলিলেন, আমি এসে দেব এখন, এখন তো—। ইহাতে অবনী চেঁচাইয়া আবদারের সুরে বলিয়া উঠিল, না দাদা, তা হবে না। আপনি দিয়েই যান—

যদুবাবু ফাঁপরে পড়িলেন। টাকা দিবেন কোথা হইতে? কুড়ি টাকা স্কুল হইতে লইবার সুপারিশ ধরিয়াছেন—হয়ত শনিবারের আগে সেই একমাত্র সম্বল কুড়িটি টাকাও হাতে পাওয়া যাইবে না। টুইশানির টাকা হয়তো ও-বেলা মিলিবে। অবশ্য টাকা হাতে আসিলে অবনীকে তিনি দিবেন না নিশ্চয়ই, তাঁহার নিজের খরচ নাই? বলিলেন, এস, বাইরে আমার সঙ্গে।

পথে গিয়া বলিলেন, অমন করে সকলের সামনে বলতে আছে, ছিঃ! টাকা হাতে থাকলে তোমায় দিতাম না?

অবনী অনুযোগের সুরে বলিল, খা রে! আপনাকে তো কাল রাত থেকে বলছি। সত্যি দাদা, হাতে কিছুই নেই, চা-জলখাবারের পয়সাটি পর্য্যন্ত নেই। শুধু আপনার ভরসায় এখানে আসা—

—এই রাখ দু আনা পয়সা—চা খাবার খেয়ো। আমি স্কুল থেকে ফিরি, তারপর বলব। চললাম, বেলা হয়ে যাচ্ছে—

স্কুলে বসিয়া যদুবাবু আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলেন। যখন আসিয়া পড়িয়াছে অবনী, তখন হঠাৎ এক-আধ দিনে চলিয়া যাইবে না। উহার স্বভাবই ওই, টাকা না লইয়া যাইবে না। দুই বেলা আট আনা ফ্রেণ্ড-চার্জ দিয়া উহাকে বসাইয়া খাওয়াইতে গেলে যদুবাবু স্কুল হইতে যে কয়টি টাকা পাইবেন, তাহা উহার পিছনেই ব্যয় হইয়া যাইবে। আর কেনই বা উহাকে তিনি এখানে জামাই-আদরে বসাইয়া খাওয়াইতে যাইবেন, কে অবনী? কিসের খাতির তাহার সঙ্গে?

আচ্ছা, যদি মেসে না ফিরিয়া তিনি পলাইয়া দুই দিন অন্যত্র গিয়া থাকেন, তবে কেমন হয়? মেসে শ্রীশকে দিয়া বলিয়া পাঠাইয়া দেন যদি—বিশেষ কাজে তিনি অন্যত্র যাইতেছেন, এখন দিন-বারো মেসে ফিরিবেন না! কেমন হয়! হইবে আর কী, অবনী সেই দশ দিন বসিয়া বসিয়া দিব্য খাইবে এখন তাঁহার খরচে।

সামনের শনিবার ছুটি। একদিন আগে কি ছুটি লইবেন?

সাত-পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে টুইশান-শেষে যদুবাবু মেসে গিয়া দেখিলেন, অবনী নাই। চলিয়া গেল নাকি?

পাশের ঘরের সতীশবাবু বলিলেন, যদুবাবু, আসুন। আপনার ছোট ভাই সিনেমা দেখতে গিয়েছে, এখুনি আসবে। ছ'টার শোতে গিয়েছে।

—সিনেমা! আমার ছোট ভাই?

সতীশবাবু যদুবাবুর কথার সুরে বিস্মিত হইয়া বলিলেন, হ্যাঁ, যিনি কাল এসেছিলেন। আমায় বললেন, দাদার স্কুল থেকে আসতে দেরি হচ্ছে। বায়োস্কোপ দেখতে যাবার ইচ্ছে

ছিল। তা বোধ হয় হল না। আমি বললাম—কেন হল না? উনি বললেন, টাকা নেই সঙ্গে, দাদার কাছে চাবি। মনে করে নিয়ে রাখতে ভুলে গিয়েছিলাম। আমি বললাম—তা আর কী! যদুবাবুর ফিরতে রাত হবে দশটা। আপনার কত দরকার, নিয়ে যান। পরস্পর বন্ধুবান্ধবের মধ্যে এসব—মেস-মেটের ভাই, আপনার কাছে নেই বলে কি আর অভাব ঘটবে?

—কত নিয়ে গেল?

—দু টাকা বললেন দরকার। আর দু টাকা নিয়েচেন বুঝি আপনার পিসিমার জন্যে কী ওষুধ কিনতে হবে—দোকান বন্ধ হলে আজ আর পাওয়া যাবে না—কাল সকালেই বুঝি উনি চলে যাবেন। তা থাক, তার জন্যে কী, এখন দেবার তাড়া নেই। মাইনে পেলে শনিবার দেবেন, এখন কাজটা তো হয়ে গেল।

যদুবাবু অতিকষ্টে রাগ সামলাইয়া ঘরে ঢুকিলেন এবং একটু পরেই অবনী সিনেমা হইতে ফিরিয়া ঘরে ঢুকিল। দাঁত বাহির করিয়া বলিল, এই যে দাদা, দেখে এলাম সিনেমা। থাকি গাঁয়ে পড়ে, ওসব দেখা অদৃষ্টে ঘটেই না তো। সতীশবাবুর কাছ থেকে গোটাচারেক টাকা নিয়ে গেলাম। কুড়ি টাকার মধ্যে চার টাকা সতীশবাবুকে আর ষোলটা দেবেন আমায়।

যদুবাবু দেখিলেন, অবনী ধরিয়াই লইয়াছে—কুড়ি টাকা তাহার হাতের মুঠার মধ্যে আসিয়া গিয়াছে। কুড়ি টাকা তো দূরের কথা, এই বহু-কষ্টার্জ্জিত টাকার মধ্যে চার টাকা এভাবে বাজে ব্যয় হওয়াই কি কম কষ্টকর? এ চার টাকা দিতেই হইবে ভদ্রতার খাতিরে। যদুবাবুর বহু ভাগ্য যে, সে কুড়ি টাকা ধার করে নাই!

এমন মুশকিলে তিনি জীবনে কখনও পড়েন নাই। কেন মিছামিছি শরিক-জ্ঞাতিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিতে গিয়াছিলেন! এখন তাহার ধাক্কা সামলাইতে প্রাণ যে যায়! যদুবাবুর ইচ্ছা হইল, তিনি হঠাৎ চিৎকার করিয়া উঠিয়া হাত-পা ছোঁড়েন, অবনীকে ধরিয়া দুমদাম করিয়া কিল মারেন, কিংবা একদিকে ছুটিয়া বাহির হইয়া যান। কিন্তু মেসের ভদ্রলোকদের মধ্যে কিছুই করিবার জো নাই। তিনি শান্তমুখে তামাক সাজিতে বসিয়া গেলেন।

অবনী উৎসাহের সঙ্গে সিনেমায় কী দেখিয়া আসিয়াছে, তাহার গল্প সবিস্তারে আরম্ভ করিল। গল্প তার আর শেষ হয় না। যদুবাবু বলিলেন, চল, খেয়ে আসি।

অবনী হাসিয়া বলিল, আজ এখনও হয় নি। আজ যে আপনাদের মেসে ফিস্ট! আমি খোঁজ নিয়ে এলাম রান্নাঘরে, এখনও দেরি আছে।

সর্ব্বনাশ! আট আনা ক্রেগুচার্জ্জ আজ ফিষ্টের দিনে! এ ভূতভোজন করাইয়া লাভ কী তাঁহার রক্ত-জলকরা পয়সায়!

অবনী পরের দিনও নড়িতে চাহিল তো না-ই, টাকার তাগাদা করিয়া যদুবাবুকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিল। রাত দশটায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, অবনী কাহার কাছে খবর পাইয়াছে,

আগামী কাল শনিবার স্কুল বন্ধ হইবে, সুতরাং ওৎ পাতিয়া বসিয়া ছিল, বলিল, দাদা, কাল মাইনে পাবেন ছ'মাসের, না? কাল চলুন, আপনার সঙ্গেই স্কুলে যাই—টাকা ষোলটা দিয়ে দিন, তিনটের গাড়িতে বাড়ী যাই। যদুবাবুর ভয়ানক রাগ হইল, কিন্তু এখানে স্পষ্ট কথা বলিতে গেলেই অবনী ঝগড়া বাধাইবে, তাহাও বুঝিলেন। পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত লোক, কাণ্ডজ্ঞানহীন। কেলেঙ্কারি একটা না বাধাইয়া ছাড়িবে না।

পরদিন ক্লাসের ছেলেরা খাওয়াইল। অবনী গিয়া জুটিল যদুবাবুর সঙ্গে।

যদুবাবু কুড়িটি টাকা বেতন পাইলেন—তাও রামেন্দুবাবুর সুপারিশে। ছুটির সারকুলার বাহির হইয়া গেল। সকলে কে কোথায় যাইবেন, পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিলেন। মাষ্টারেরা চায়ের দোকানে গিয়া মজলিশ করিবে ঠিক ছিল, কিন্তু সাহেব তাহাদের লইয়া পাঁচটা পর্য্যন্ত মীটিং করিলেন।

মীটিংয়ের কার্য্যতালিকা নিম্নলিখিতরূপ :—

(১) ছুটির পরেই বার্ষিক পরীক্ষা—কী ভাবে পড়াইলে ছেলেরা বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে।

(২) দেখা গিয়াছে, তৃতীয় শ্রেণীর ছেলেরা ইংরেজী ব্যাকরণে বড় কাঁচা। এই সময়ের মধ্যে কী প্রণালীতে শিক্ষা দিলে তাহারা উক্ত বিষয়ে পারদর্শী হইয়া উঠিতে পারে।

(৩) টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্নপত্রগুলি পড়া ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা।

(৪) সপ্তম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় শ্রুতিলিখন থাকিবে কি না। থাকিলে তাহাতে কত নম্বর থাকিতে পারে।

মিঃ আলম ক্ষেত্রবাবুর প্রশ্নপত্রের দুই স্থানে দুইটি ভুল বাহির করিলেন। পাঠ্যতালিকার বাহিরে সেই দুইটি প্রশ্ন করা হইয়াছে—এ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় ওই দুইটি বিষয় নাই। সাহেবের আদেশে পাঠ্য-তালিকা দেখা হইল, ভুলই বটে। ক্ষেত্রবাবু অপ্রতিভ হইলেন।

ধরা পড়িল, যদুবাবু ষষ্ঠ শ্রেণীর ইতিহাসের প্রশ্ন এখনও তৈয়ারী করেন নাই। মিঃ আলম ধরিয়া দিলেন।

সাহেব বলিলেন, কী যদুবাবু?

যদুবাবু মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, অত্যন্ত দুঃখিত স্যার্। এখুনি করে দিচ্ছি—

—মিঃ আলম ধরে না দিলে কী মুশকিলেই পড়তে হত!

—স্যার্, বড় ব্যস্ত ছিলাম। মন ভাল ছিল না।

—সে সব কথা আমি জানি না। কর্ত্তব্য কাজে অবহেলা করে যে তার স্থান নেই আমার স্কুলে। মাই গেট্ ইজ—

—এবার মাপ করুন স্যার, আর কখনও এমন হবে না।

দোতলা হইতে নামিতেই অবনীর সহিত দেখা। সে সিঁড়ির নীচে তাঁহারই অপেক্ষায়

দাঁড়াইয়া আছে। দাঁত বাহির করিয়া বলিল, মাইনে পেলেন দাদা?

যদুবাবুর বড় রাগ হইল—একে সাহেবের কাছে অপমান, অপরের সুপারিশে মাত্র কুড়ি টাকা প্রাপ্তি, তার ওপর এইসব হাঙ্গামা সহ্য হয়?

যদুবাবু বলিলেন, না।

—মাইনে পান নি? পেয়েছেন দাদা।

—না, পাই নি। কেউই পায় নি।

অবনী একগাল হাসিয়া বলিল, দাদার যেমন কথা! দু মাসের মাইনে একসঙ্গে পেলেন বুঝি?

যদুবাবু বলিলেন, সত্যিই পাই নি। তুমি মাস্টারমশায়দের জিগ্যেস করে দেখ না?

—এক মাসের মাইনে দেবে না পুজোর সময়—তা কি কখনও হয়?

—এ স্কুলে এমনি নিয়ম। সাহেবের স্কুল, পুজোটুজো মানে না।

অবনী কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া রহিল, তারপর বলিল, 'তবে আমার টাকা দেবেন বললেন যে ও-বেলা?

—কোথা থেকে দেব বল? স্কুলের মাইনে যখন হল না, টাকা পাব কোথায়?

অবনী কথাটা উড়াইয়া দিবার মত তাচ্ছিল্যের সুরে বলিল, আপনার আবার টাকার ভাবনা! না হয় ডাকঘর থেকে তুলে কিছু দিন দাদা, এখনও সময় যায় নি—

যদুবাবু অবনীর মুখের দিকে চাহিয়া নীরস কণ্ঠে কহিলেন, ডাকঘরে এক পয়সাও নেই আমার। দিতে পারব না।

অবনী আরও কিছুক্ষণ কাকুতি-মিনতি করিল, রাগ করিল, ঝগড়া করিল, যদুবাবুকে কৃপণ বলিল, তাঁহার স্ত্রীকে এতদিন বাড়ীতে জায়গা দিয়া রাখিয়াছে সে খোঁটাও দিতে ছাড়িল না। যদুবাবুর এক কথা—তিনি টাকা দিতে পারিবেন না।

তিনি মাত্র কুড়ি টাকা মাহিনা পাইয়াছেন, তাহা হইতে কিছু দেওয়ার উপায় নাই।

অবনীর হৃদ্যতা আগেই উবিয়া গিয়াছিল, সে বলিল, তা হলে টাকা দেবেন না আপনি?

কথা যেন ছুঁড়িয়া মারিতেছে।

যদুবাবু বলিলেন, না।

—বেশ। কিন্তু আপনাকে চিনে রাখলাম, বিপদে-আপদে লাগব না কি আর কখনও? আচ্ছা, চলি।

কিছু দূর গিয়া তখনই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, হ্যাঁ, বউদিদিকে ওখানে রাখার আর সুবিধে হচ্ছে না। কালই গিয়ে তাঁকে নিয়ে আসবেন, বলে দিচ্ছি। এত অসুবিধে করে পরের বউকে জায়গা দেবার ভারি তো লাভ! সব চিনি, এক কড়ার উপকারে কেউ লাগে না। কেবল মুখে লম্বা লম্বা কথা—

অবনী চলিয়া গেল। যদুবাবু স্কুলের বাহিরে আসিলেন ভাবিতে ভাবিতে। ক্ষেত্রবাবু পিছন হইতে আসিয়া বলিলেন, চল হে যদুদা, একটু চা খাই সবাই মিলে।

—আর চা খাব কী, মন বড় খারাপ।

—কী হল ? তুমি তবুও কুড়ি টাকা পেলে। আমাদের তো এক পয়সাও না।

—না হে, তোমার বউদিদি রয়েছে বেড়াবাড়ী—সেই পাড়াগাঁ। তাকে এবার না আনলেই নয়। কিন্তু এনে কোথায় বা রাখি ?

—এখন না-ই বা আনলে দাদা। নিজের বাড়ীতেই তো রয়েছেন। থাকুন না। এখন পূজোর সময়, দেশে পূজো দেখুন না। গাঁয়ে পূজো হয় তো ?

যদুবাবু গর্ব্বের সহিত বলিলেন, আমার বাড়ীতেই পূজো। শরিকী পূজো। আর, বেড়াবাড়ীর জমিদার তো আমরা। মস্ত বাড়ী, আমার অংশেই এখনও (যদুবাবু মনে মনে গণনা করিলেন) পাঁচখানা ঘর, ওপর নীচে। বাড়ীতেই পুকুর, বাঁধা ঘাট। আমার স্ত্রী সেখানেই রয়েছে, আসতে চায় না, বলে—বেশ আছি। হয়েছে কী ভায়া, নামে তালপুকুর, ঘটি ডোবে না। আছে সবই, এখনও দেশে গেলে লোকজন ছুটে দেখা করতে আসে, বলে—বড়বাবু বিদেশে পড়ে থাকেন কেন ? দেশে আসুন, আপনার ভাবনা কী ? কিন্তু ম্যালেরিয়া বড্ড। তেমন আয়ও নেই পুরনো আমলের মত। নামটাই আছে। নইলে কি আর বত্রিশ টাকা সাত আনায় পড়ে থাকি এই স্কুলে, রামোঃ !

যদুবাবু ওয়েলেস্‌লি স্কোয়ারের বেঞ্চিতে বসিয়া মনে মনে বহু আলোচনা করিলেন। স্ত্রীকে এখন কলিকাতায় আনা অসম্ভব।

কুড়ি টাকা মাত্র সম্বলে বাসা করিয়া এক মাসও চালাইতে পারিবেন না। বেড়াবাড়ী এখন গেলে অবনী দস্তুরমত অপমান করিবে তাঁহাকে। সুতরাং তিনি কলিকাতায় মেসেই থাকিবেন, স্ত্রী কাঁদাকাটা করিলে কী হইবে ?

যদুবাবুর স্ত্রী পূজার মধ্যে স্বামীকে পাঁচ-ছয়খানা লম্বা লম্বা পত্র লিখিল। সে সেখানে টিকিতে পারিতেছে না, অবনীর দিদির ও স্ত্রীর খোঁটা এবং দুর্ব্ব্যবহারে তাহার জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে, সেখানে আর থাকিতে হইলে সে গলায় দড়ি দিবে, ইত্যাদি।

যদুবাবু লিখিলেন, তিনি এখন রামপুরহাটের জমিদারের বাড়ীতে টুইশানি পাইয়াছেন, ছুটি লইয়া এখন দেশে যাইবার কোনও উপায় নাই। তাহারা তাঁহাকে বড় ভালবাসে, ছাড়িতে চায় না।

সর্ব্বৈব মিথ্যা।

স্কুলে ঢুকিবার পূর্ব্বে গেটের কাছে একদল ছাত্র ভিড় জমাইয়া তুলিয়াছে। যদুবাবুকে দেখিয়া ক্লাস নাইনের একটি বড় ছেলে আগাইয়া আসিয়া বলিল, আজ স্কুলে ঢুকবেন না স্যার, আজ আমাদের স্ট্রাইক, কেউ যাবে না স্কুলে।

যদুবাবুর মুখ অপ্রত্যাশিত আনন্দে উজ্জ্বল দেখাইল। এও কি সম্ভব হইবে ? আজ কাহার

মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলেন! স্ট্রাইক হওয়ার অর্থ সারাদিন ছুটি। এখনই বাসায় ফিরিয়া দুপুরে দিবানিদ্রা দিবেন, তারপর বিকালের দিকে উঠিয়া তাঁহার এক বন্ধুর বাড়ী আছে মলঙ্গা লেনে, সেখানে সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দাবা খেলিবেন। মুক্তি।

এই সময় শ্রীশবাবু ও মিঃ আলম একসঙ্গে গেটের কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে ছেলেরা তাঁহাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইল। আজ রামতারক মিত্র গ্রেপ্তার হওয়ার দরুন—দেশবিখ্যাত নেতা রামতারক মিত্র—কলিকাতার সমগ্র ছাত্রসমাজে দারুণ চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে, স্কুল-কলেজের ছাত্রদল মিলিয়া বিরাট শোভাযাত্রা বাহির করিবে ও-বেলা।

মিঃ আলম বলিলেন, আমাদের যেতে হবেই। আর তোমাদেরও বলি, আমি চাই না যে, এ স্কুলের ছাত্রেরা কোন পলিটিক্যাল আন্দোলনে যোগ দেয়। চলুন যদুবাবু, শ্রীশবাবু—

যদুবাবু মনে মনে ভাবিলেন, গিয়ে সইটা করেই ছুটি, কেউ আসছে না স্কুলে।

হেডমাস্টার স্ট্রাইকের কথা জানিতেন না। তিনি সকালে উঠিয়া খয়রাগড়ের রাজবাড়ীতে টুইশানিতে গিয়াছিলেন, ফিরিয়া সব শুনিলেন। নিজে গেটে দাঁড়াইয়া ছেলেদের বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন অনেক—তাঁহার কথা কেহ শুনিল না। টীচার্স-রুমে বসিয়া বসিয়া মাস্টারেরা উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। যদুবাবু বলিলেন, হ্যাঁঃ, শুনছে আজ ক্লার্কওয়েল সাহেবের কথা! তুমিও যেমন! কোথায় রামতারক মিত্তির—অত বড় লীডার আর কোথায় ক্লার্কওয়েল—ফোতো স্কুলের ফোতো হেডমাস্টার!

কিন্তু মাস্টারদের আশা পূর্ণ হইল না। একটু পরেই হেডমাস্টারের স্লিপ লইয়া মথুরা চাপরাসী আসিল, নীচু দিকের ক্লাসে ছোট ছোট ছেলেরা অনেক সকালেই আসে—বিশেষত তাহারা দেশনেতা রামতারক মিত্রের বিরাট ব্যক্তিত্বের বিষয়ে কিছুই জানে না; সুতরাং মাস্টার ও অভিভাবকের ভয়ে যথারীতি ক্লাসে আসিয়াছে। তাহাদের লইয়া ক্লাস করিতে হইবে।

উপরের দিকের ক্লাসের মাস্টার যাঁহারা, এ আদেশে তাঁহাদের কোন অসুবিধা হইল না, কেন না, উপরের কোন ক্লাসে একটি ছাত্রও আসে নাই। ধরা পড়িয়া গেলেন শ্রীশবাবু প্রভৃতি, যাঁহাদের প্রথম ঘণ্টায় নীচের দিকে ক্লাস আছে।

যদুবাবু চতুর্থ শ্রেণীতে ঢুকিয়া দেখিলেন, জন পাঁচ-ছয় ছোট ছেলে বসিয়া আছে। ওপাশে ক্লাস সেভেন্-এ জনপ্রাণীও আসে নাই, সুতরাং প্রথম ঘণ্টার শিক্ষক হেডপণ্ডিত দিব্য উপরের ঘরে বসিয়া আড্ডা দিতেছেন, অথচ তাঁহার—

রাগে দুঃখে যদুবাবু ধপ্ করিয়া চেয়ারে বসিয়া কটমট করিয়া চারিদিকে চাহিলেন। এই হতভাগাগুলোর জন্যই এই শাস্তি—যদি এই বদমাইসগুলা না আসিত, তবে আজ তাঁহার দিবানিদ্রা রোধ করে কে?

কড়া বাজখাঁই সুরে হাঁকিলেন, আজ পুরনো পড়া ধরব—নিয়ে আয় বই—ছাল তুলব আজ পিঠের, যদি পড়া ঠিকমত না পাই—

ছোট ছোট ছেলেরা তাঁহার রাগের কারণ ঠাহর করিতে না পারিয়া গা টেপাটিপি করিতে

লাগিল পরস্পর। একটি ছেলে ভয়ে ভয়ে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, আজ তো পুরনো পড়ার কথা ছিল না স্যার্!

যদুবাবু দাঁত খিঁচাইয়া বলিলেন, পুরনো পড়া আবার বলা থাকবে কী? ও যে দিন ধরব, সেই দিনই বলতে হবে—দেখাচ্ছি সব মজা, কোন ক্লাসের ছেলে স্কুলে আসেনি, ওঁরা এসেছেন—ওঁদের পড়বার চার কত! ছাল তুলছি আজ পড়া না পারলে—

দুই-একটি বুদ্ধিমান ছেলে ততক্ষণ তাঁহার রাগের কারণ খানিকটা বুঝিয়াছে। একজন বলিল, স্যার্, না এলে বাড়ীতে বকে, বলে—ওপরের ক্লাসের ছেলেরা স্ট্রাইক করেছে তা তোদের কী? সেই আষাঢ় মাসে স্ট্রাইকের সময় এরকম হয়েছিল—

আর একটি অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান ছেলে বলিল, স্যার্, বলেন তো পালাই।

যদুবাবু স্বর নরম করিয়া বলিলেন, পালাবি কোথা দিয়ে? ইস্কুলের গেটে হেডমাস্টার তালা দিয়ে রেখেছেন।

ক্লাসসুদ্ধ ছেলে বলিয়া উঠিল প্রায় সমস্বরে, গেটের দরকার কী স্যার্? আপনি বলুন, টিনের বেড়া রয়েছে পেছনে, ওর তলা দিয়ে গলে বেরিয়ে যাব।

—তবে তাই যা। কাউকে বলিস নে। রেজেস্ট্রি হয় নি তো এখনও—পালা। একে একে যা।

নীচের তলায় আশপাশের ক্লাসে ছেলে নাই, কারণ সেগুলি বড় ছেলেদের ক্লাস। কেবল পূর্ব্বদিকের কোণে হল-ঘরের পাশের ক্লাসে গুটি-কয়েক ছোট ছেলে লইয়া জ্যোতির্ব্বিনোদ বিরক্তমুখে বসিয়া আছে। যদুবাবু বলিলেন, ওহে জ্যোতির্ব্বিনোদ, ওগুলোকে যেতে দাও না।

জ্যোতির্ব্বিনোদ যেন দৈববাণী শুনিল, এরূপভাবে লাফাইয়া উঠিয়া আগ্রহের সুরে বলিল, দেব ছেড়ে? সাহেব কিছু বলবে না তো?

যদুবাবু মুখে কোনদিন খাটো নহেন, ব্যঙ্গের সুরে বলিলেন, ও সব ভাবলে তবে বসে ক্লাস করো সেই বেলা তিনটে পর্য্যন্ত (ছোট ছেলেদের তিনটার সময় ছুটি হইয়া যায়)। এই তো আমি ছেড়ে দিলাম—

—আপনারা সব বড় বড়, আমরা হলাম চুনোপুঁটি, সব তাতেই দোষ হবে আমাদের।

—কিছু না, ছেড়ে দাও সব। এই, যা সব পালা—টিনের পার্টিশনের তলা দিয়ে পালা। স্ট্রাইকের দিন স্কুল করতে এসেছে! ভারি পড়ার চাড়!

জ্যোতির্ব্বিনোদও সুরে সুর মিলাইয়া বলিল, দেখুন দিকি কাণ্ড যত—পড়ে তো সব উল্টে যাচ্ছেন একেবারে। যা সব একে একে! রোতো, গোল করবি তো হাড় ভাঙব মেরে, কেউ টের না পায়—

কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ক্লাস প্রায় খালি হইয়া গেল।

যদুবাবু উপরে গিয়া বলিলেন, কোথায় ছেলে? দু-একটা এসেছিল, কে কোথা দিয়ে পালিয়ে গেল ধরতেই পারা গেল না—

ক্ষেত্রবাবু ছুটির দিনই রাত্রির ট্রেনে বর্দ্ধমান রওনা হইলেন।

পরদিন সকালের দিকে বর্দ্ধমান স্টেশনে নামিয়া প্লাটফর্ম্মের উত্তর দিকে মালগুদামের ও পার্শেল-আপিসের পিছনে দাদার কোয়ার্টারে গিয়া ডাক দিলেন, ও বউদি!

—এস এস ঠাকুরপো। মনে পড়ল এত দিন পরে? তা ভাল আছ বেশ? আমায় শশীবাবুর বউ রোজই বলেন—হ্যাঁ দিদি, তোমার সে ঠাকুরপো কবে আসবেন? আমি বলি—তা কী জানব? কলেজে কাজ করেন, বড় চাকরি, ছুটি না হলে তো আসতে পারেন না। তা ছেলেমেয়েদের কোথায় রেখে এলে?

—ওরা তাদের পিসীমার কাছে রইল কালীঘাটে—মেজদিদির কাছে।

—বেশ, এসেছ ভালই হয়েছে। এবার একটা যা হয় ঠিক করে ফেল। ওঁদের মেয়ে বড় হয়েছে, তোমার ভরসাতেই আছে। আর তোমাকে সংসার যখন করতেই হবে, তখন আর দেরি করা কেন, আমি বলি। ব'সো হাত-পা ধোও, চা করি।

ক্ষেত্রবাবু এইরূপ একটা অস্পষ্ট আশার গুঞ্জনধ্বনি সারারাত ট্রেনের মধ্যে কানের কাছে শুনিয়াছেন—চলমান বাতাসে সে আভাস আসিয়াছিল! বাসায় পা দিতেই এমন কথা শুনিবেন, তাহা কিন্তু ভাবেন নাই। ক্ষেত্রবাবু পুলকিত হইয়া উঠিলেন।

তাঁহার জ্যাঠতুতো দাদা গোবর্দ্ধনবাবু সন্ধ্যার সময় ডিউটি হইতে ফিরিয়া বলিলেন, এই যে, ক্ষেত্র কখন এল? চা খেয়েছ? স্কুল কবে—কাল বন্ধ হ'ল? বেশ।

গোবর্দ্ধনবাবু পাকা লোক। যে খুড়তুতো ভাই আজ সাত-আট বছরের মধ্যে কখনও ঘনিষ্ঠতা করা দূরের কথা, বছরে দুইখানি পোস্টকার্ডের পত্র দিয়া খোঁজ-খবর লইত কি না সন্দেহ, সেই ভাই কাল স্কুল বন্ধ হইতে না হইতে কলিকাতা হইতে বর্দ্ধমানে আসিয়া হাজির, এ নিশ্চয়ই নিছক ভ্রাতৃ-প্রেম নয়। গোবর্দ্ধনবাবু মনে মনে হাসিলেন।

চা-জলখাবার-পর্ব্বান্তে ক্ষেত্রবাবু তাঁহারই সমবয়সী শ্রীগোপাল মজুমদার অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন-মাস্টারের বাড়ী বেড়াইতে গেলেন। রেলওয়ে সমাজে পরস্পরকে উপাধি দ্বারা সম্বোধন করাই প্রচলিত।

ক্ষেত্রবাবুকে সেখানেও একদফা চা খাবার খাইতে হইল। মজুমদার বলিল, তারপর ক্ষেত্রবাবু, শুনছিলাম একটা কথা—

ক্ষেত্রবাবুর বুকের মধ্যে টিপ টিপ করিয়া উঠিল। বুঝিয়াও না-বুঝিবার ভান করিয়া বলিলেন, কী কথা?

—আমাদের মুখুজ্জের ভাইঝির সঙ্গে নাকি আপনার—

ক্ষেত্রবাবু সলজ্জ হাসিয়া বলিলেন, না না, কই না—আমার তো—

—না, আমি বলি, দ্বিতীয় সংসার করার ইচ্ছে যদি থাকে, তবে এখানেই করে ফেলুন—মেয়েটি বড় ভাল।

ক্ষেত্রবাবু দুই-একবার বলি-বলি করিয়া অবশেষে বলিলেন, মেয়ে? ও দেখেছেন নাকি?

—কে, অনিলা? অনিলাকে ফ্রক পড়ে বেড়াতে দেখেছি। আমাদের বাসায় আমার ভাগ্নী বিমলার সঙ্গে খুব আলাপ।

—ও!

—বেশ মেয়ে। দেখতে তো ভালই, ঘরের কাজকর্ম্ম সব জানে। চলুন না, পায়ে পায়ে মুখুজ্জের বাসায় যাই। আপনি এসেছেন, বোধ হয় জানে না।

ক্ষেত্রবাবু জিভ কাটিয়া বলিলেন, আরে, তা কখনও হয়? না না। আমি যাব কেন?

—আমরা যে ক'জন আছি স্টেশনের কোয়াটারে—সব এক ফ্যামিলির মত। এখানে কুটুম্বিতে করি না কেউ কারও সঙ্গে। সেবারে ঐ মল্লিকবাবুর মা মারা গেল, আটাত্তর বছর বয়সে। রাত দেড়টা, আমি এইট্টিন ডাউন সবে পাস্ করে টিকিটের হিসেব চালানে এনট্রি করেছি, এমন সময় বাসা থেকে লোক গিয়ে বললে—শীগগির চল, এই রকম ব্যাপার। সেই রাত্তিরে মশাই রেলওয়ে কোয়ার্টারের ক'টি প্রাণী, বলি ব্রাহ্মণ আর কায়স্থ কী, হিন্দু তো বটে—ঘাড়ে করে নিয়ে গেলুম শ্মশানে; তা এখানে ওসব নেই। চলুন, যাওয়া যাক।

ক্ষেত্রবাবুর যাওয়ার ইচ্ছা যে না হইয়াছিল তাহা নয়, কিন্তু দাদা কী মনে করিবেন, এই ভয়ে মজুমদারের কথায় রাজী হইতে পারিলেন না।

পরদিন বেলা দশটার সময় ক্ষেত্রবাবু বাসায় বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন, এমন সময় একটি মেয়ে এক বাটি তেল আনিয়া সামনে রাখিয়া সলজ্জ স্বরে বলিল, দিদি বললেন আপনাকে নেয়ে আসতে।

ক্ষেত্রবাবু চাহিয়া দেখিলেন, সতেরো-আঠারো বছরের মেয়েটি। বেশী ফরসাও নয়, বেশী কালোও না। মুখশ্রী ভাল।

—ও! বউদিদি বললেন?

ক্ষেত্রবাবু যেন একটু থতমত খাইয়া গিয়াছেন, কথার স্বরে ধরা পড়িল।

মেয়েটি হাসি চাপিতে চাপিতে বলিল, হ্যাঁ।—এই কথা বলিয়াই সে চলিয়া গেল।

ক্ষেত্রবাবু ভাবিলেন, কে মেয়েটি, কখনও 'তো দেখেন নাই একে! এ সেই মেয়েটি নয় তো?

স্নান করিয়া খাইতে বসিয়াছেন, সেই মেয়েটিই আসিয়া ভাতের থালা সামনে রাখিল। আবার ফিরিয়া গিয়া ডালের বাটি আনিয়া দিল। খাওয়ার মধ্যে মেয়েটি অনেক বার যাতায়াত করিল। ক্ষেত্রবাবু দুই-একবার মেয়েটির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, মুখখানি ভাল ছাড়া মন্দ বলিয়া মনে হইল না তাঁহার কাছে। ভাল করিয়া চাহিতে পারিলেন না, দাদা পাশে বসিয়া খাইতেছেন। আহারাদির পর ক্ষেত্রবাবু বিশ্রাম করিতেছেন, সেই মেয়েটিই আসিয়া পান দিয়া গেল। ক্ষেত্রবাবুর কৌতূহল হইল জানিবার জন্য মেয়েটি কে, কিন্তু কখনও অপরিচিতা মেয়ের সঙ্গে কথা কওয়ার বা মেলামেশার অভিজ্ঞতা না থাকায় চুপ করিয়া রহিলেন। গরীব স্কুলমাস্টার, তেমন সমাজে কখনও যাতায়াত নাই।

এ দিন এই পর্য্যন্ত। মেয়েটি আর আসিল না সারাদিনের মধ্যে। কিন্তু ক্ষেত্রবাবুর মন যেন তাহার জন্য উৎসুক হইয়া রহিল সারাদিন। মুখখানি বেশ।' সেই মেয়েটি নাকি? কী জানি! লজ্জায় কথাটা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। পরে আরও দুই দিন গেল, মেয়েটির কোন চিহ্ন নাই কোন দিকে। হঠাৎ তৃতীয় দিনে মেয়েটি সকালে চায়ের পেয়ালা রাখিয়া গেল সামনে। ক্ষেত্রবাবুর বুকের মধ্যে কিসের একটা ঢেউ চলকিয়া উঠিল। মেয়েটি দোরের কাছে একটুখানি দাঁড়াইয়া চলিয়া গেল এবং আর কিছুক্ষণ পরে আবার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনাকে কি আর এক পেয়ালা চা দোব?

—চা! তা বেশ।

—আনব?

—হ্যাঁ।

মেয়েটি এবার চলিয়া যাইতেই ক্ষেত্রবাবু ভাবিলেন, লজ্জা কিসের—এবার তিনি জিজ্ঞাসা করিবেনই। সেই মেয়েটি নয়, ও অন্য কেউ, পাশের কোন বাসার মেয়ে। কী জাতি, তাহারই বা ঠিক কী। তা হোক, একটু আলাপ করিতে দোষ নাই।

এবার চা আনিতেই ক্ষেত্রবাবু লাজুকতা প্রাণপণে চাপিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি বুঝি পাশের বাসাতেই থাকেন?

মেয়েটি যেন এতদিন ক্ষেত্রবাবুর কথা কহিবার আশায় ছিল, বহুবিলম্বিত ব্যাপারের অপ্রত্যাশিত সংঘটনে প্রথমটা নিজে যেন কিছু থতমত খাইয়া গেল। পরে বেশ সপ্রতিভ ভাবেই আঙুল তুলিয়া অনির্দ্দিষ্ট একটা বাসার দিকে দেখাইয়া বলিল, পাশে না, ও-ই দিকে আমাদের বাসা।

—ও!

ক্ষেত্রবাবু আর কথা খুঁজিয়া পান না। মেয়েটি যেন আশা করিয়াই দাঁড়াইয়া আছে, তিনি আবার কথা বলিবেন। ক্ষেত্রবাবু পুনরায় মরীয়া হইয়া বলিলেন, আপনার বাবা বুঝি রেলে কাজ করেন?

—পার্সেল-আপিসে কাজ করেন।

—বেশ।

মেয়েটি তখনও দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া ক্ষেত্রবাবু আকাশ-পাতাল ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি পড়েন বুঝি?

—এখন বাড়ীতেই পড়ি, গার্লস্ স্কুলে থার্ড ক্লাস পর্য্যন্ত পড়েছিলাম, এখন বড় হয়েছি তাই আর স্কুলে যাই নে।

মেয়েটি যে কয়টি ইংরেজী কথা বলিল, সবগুলির উচ্চারণ স্পষ্ট ও জড়তাশূন্য, অশিক্ষিত উচ্চারণ নয়। ইংরেজী-জানা মেয়ে ক্ষেত্রবাবু এ পর্য্যন্ত দেখেন নাই, মেয়েটির প্রতি সপ্রশংস দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, এখানে বুঝি গার্লস্ স্কুল আছে?

—বেশ বড় স্কুল তো, আড়াইশো মেয়ে পড়ে।

—হেডমিস্ট্রেস্ কে ?

—আমাদের সময়ে ছিলেন মিস্ সুকুমারী দত্ত বি-এ, বি-টি। এখন কে এসেছেন জানি নে।

বা রে, মেয়েটি 'বি-টি'র খবর পর্য্যন্ত রাখে। স্কুলমাস্টার ক্ষেত্রবাবু প্রশংসায় বিগলিত হইয়া উঠিলেন মনে মনে। যেন কোনও অদৃষ্টপূর্ব্ব কিছু দেখিতেছেন। বেশ মেয়েটি তো ?

—আপনাদের স্কুলে পুরুষমানুষ টীচার নেই বুঝি ?

—নীচের দিকে একজন আছেন ভুবনবাবু বলে, বুড়োমানুষ। আমরা দাদু বলে ডাকতাম।

—পড়ানো বেশ ভাল হত স্কুলে ? অঙ্ক কষাতেন কে ?—ক্ষেত্রবাবু এবার কথা কহিবার বিষয় খুঁজিয়া পাইয়াছেন।

—নীহার-দি—মিস্ নীহার তালুকদার, ওঁরা ব্রাহ্ম।

বাঃ, মেয়েটি ব্রাহ্মদের খবরও রাখে ! এত বাহিরের খবর-জানা মেয়ে সাধারণ গৃহস্থঘরে বড় একটা দেখা যায় না, অন্তত ক্ষেত্রবাবু তো দেখেন নাই। ইচ্ছা হইল, খানিকক্ষণ মেয়েটির সঙ্গে গল্প করেন ; কিন্তু সাহসে কুলাইল না। কে কী মনে করিতে পারে !

পরদিন বৈকালে ক্ষেত্রবাবুর বউদিদি বলিলেন, শশীবাবুদের বাসায় তোমার আর ওঁর নেমন্তন্ন।

ক্ষেত্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, শশীবাবু কে ? সেই তাঁরা ?

বউদিদি হাসিমুখে বলিলেন, হ্যাঁ গো, সেই তারাই তো।

—সেখানে কি যাওয়া উচিত হবে ?

—কেন ?

—একটা আশা দেওয়া হবে, কিন্তু—

—কিন্তু কী ? তুমি বিয়ে করবে কি না, এই তো ?

—হ্যাঁ—তা—সেই রকমই ভাবছিলাম—

—কেন, মেয়ে পছন্দ হয় নি ?

ক্ষেত্রবাবু আকাশ হইতে পড়িলেন। তিনি তখনই ব্যাপারটা আগাগোড়া বুঝিয়া ফেলিলেন। বউদিদির ষড়যন্ত্র। তাহা হইলে শশীবাবুদের বাসার সেই মেয়েটি ! হাসিয়া বলিলেন, সব আপনার কারসাজি। তখন তো ভাবি নি যে, ওই মেয়ে ! ও !

—মেয়ে খারাপ ?

ক্ষেত্রবাবু দেখিলেন, হঠাৎ নিজেকে অত্যন্ত খেলো করিয়া লাভ নাই, ওজনে ভারী থাকা মন্দ নয়। বলিলেন, মেয়ে ? হ্যাঁ—না, তা খারাপ নয়। তবে 'আহা মরি'ও কিছু নয়।

—মনের কথা বলছ ঠাকুরপো ? সত্যি বল, তোমার পছন্দ হয় নি ? অনিলার কিন্তু তোমাকে পছন্দ হয়েছে।

ক্ষেত্রবাবুর সতর্কতার বাঁধ হঠাৎ ভাঙিয়া গেল। তিনি তাড়াতাড়ি আগ্রহপূর্ণ কণ্ঠে

জিজ্ঞাসা করিলেন, কী, কী, কী রকম ?

ক্ষেত্রবাবুর বউদিদি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, তবে নাকি ঠাকুরপোর মন নেই ? আমাদের কাছে চালাকি ? সত্যি তা হলে ভাল লেগেছে ? তবে আমিও বলছি শোন, অনিলা তোমাকে দেখতেই এসেছিল আসলে। অবিশ্যি ছুতো করে এসেছিল। আমি যেন কিছু বুঝি নি, এই ভাবে বললাম, কলকাতা থেকে আমাদের একজন আত্মীয় এসেছে, বাইরে বসে আছে, চা-টা দিয়ে এস—ভাতটা দিয়ে এস। একা পারছিনে। তাই ও গিয়েছিল। বার বার পাঠালে ভাল হয়, এমনি মনে হল। আজকালকার সব বড়সড় মেয়ে। ওদের ধরনই আলাদা। যেয়ো কিন্তু।

রাত্রে সেই মেয়েটিই ক্ষেত্রবাবুদের পরিবেষণ করিল। কিন্তু করিলে কী হইবে, দাদা পাশেই বসিয়া। ক্ষেত্রবাবু লজ্জায় মুখ তুলিয়া চাহিতেও পারিলেন না। খাওয়াদাওয়া মিটিয়া গেল। ছোট রেলওয়ে-কোয়ার্টারের বাহিরের ঘরে ক্ষুদ্র তক্তোপোশে শতরঞ্জির উপর ক্ষেত্রবাবু আসিয়া বসিলেন। বাড়ির কর্ত্তা হঠাৎ ক্ষেত্রবাবুর দাদাকে কোথায় ডাকিয়া লইয়া গেলেন। অল্প পরেই সেই মেয়েটি একটা চায়ের পিরিচে চারটি পান আনিয়া তক্তাপোশের এক কোণে রাখিল। ক্ষেত্রবাবু একটা বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিলেন, ও, এটা আপনাদের বাসা ? আমি প্রথমটা বুঝতে পারি নি—

মেয়েটি চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু চলিয়া গেল না।

ক্ষেত্রবাবু আর কথা খুঁজিয়া পান না। মেয়েটি যখন সামনেই দাঁড়াইয়া, তখন বেশীক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলে বড় খারাপ দেখায়। চট করিয়া মাথায় কিছু আসেও না ছাই। তখন যে কথাটা আজ দুই দিন হইতে মনে হইতেছে প্রায় সব সময়েই, সেটাই বলিলেন, রেলের বাসাগুলো বড় ছোট, না ?

—হ্যাঁ।

—এতে আপনাদের অসুবিধে হয় না ?

—আমাদের অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। এই তো রেলে রেলেই বেড়াচ্ছি কতদিন থেকে —ও সয়ে গিয়েছে ! জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত এই রকমই দেখছি।

—এর আগে কোথায় ছিলেন আপনারা ?

—আসানসোলে। তার আগে পাকুড়। তার আগে ছিলাম সক্রিগলি জংশন। তখন আমার বয়স সাত বছর, কিন্তু সব মনে আছে আমার।—

মেয়েটি বেশ সহজ সুরেই কথা বলিতে লাগিল, যেন ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে তার অনেক দিনের পরিচয়।

—আচ্ছা আপনাদের দেশ কোথায় ?

—হুগলী জেলায় আরামবাগ সাব-ডিভিশনে। কিন্তু সে বাড়ীতে আমরা যাই নি কোনদিন। রেলের চাকরিতে ছুটি পান না বাবা। আমার ভাইয়ের পৈতের সময় বাবা বলেছেন যাবেন

মেয়েটি তাঁহাকে কোন প্রশ্ন করে না, নিজে হইতেও কোনও কথা বলে না ; কিন্তু তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য যেন উন্মুখী হইয়া থাকে। এ এমন এক অবস্থা, ক্ষেত্রবাবুর পক্ষে যাহা সম্পূর্ণ নূতন। নিভাননীর সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল, তখন তাঁহার বয়স উনিশ, নিভাননীর দশ। তখন নারীর মনের আগ্রহ বুঝিবার বয়স হয় নাই তাঁহার।

এতকাল পরে—এসব নূতন ব্যাপার জীবনের।

—আচ্ছা, আপনারা অনেক দেশ ঘুরেছেন, পাহাড় দেখেছেন ?

—তিনপাহাড়ী বলে একটা স্টেশন আছে লুপ লাইনে। সেখানে বাবা কিছুদিন রিলিভিং-এ ছিলেন, সেখানে পাহাড় দেখেছি।

—আপনি তো দেখেছেন, আমি এখনও দেখি নি।

মেয়েটি বিস্ময়ের স্বরে বলিল, আপনি পাহাড় দেখেন নি ?

ক্ষেত্রবাবু হাসিয়া বলিলেন, নাঃ, কোথায় দেখব ? বরাবর কলকাতাতেই আছি। স্কুলের ছুটি থাকলেও টুইশানির ছুটি নেই। যাতায়াত বড় একটা হয় না। আপনাদের বড় মজা, পাসে যাতায়াত করতে পারেন।

মেয়েটি বিস্ময়ের স্বরে বলিল, ওঃ ওঃ! খু-উ-ব।

—গিয়েছেন কোথাও ?

—তুম্‌কায় আমার এক পিসেমশায় চাকরি করেন, তুম্‌কা রাজস্টেটে। সেখানে মার সঙ্গে গিয়ে মাসখানেক ছিলাম একবার। আর একবার পুরী যাওয়ার সব ঠিকঠাক, আমার ছোট ভাইয়ের অসুখ হল বলে বাবা পাস ফেরত দিলেন। সামনের বছর যাবেন বলেছেন। ও, আপনাকে আর দুটো পান দি—

—না না, আমি বেশী পান খাই নে। বরং খাবার জল এক গ্লাস যদি—

—আনি—বলিয়াই মেয়েটি বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল এবং দুর্ভাগ্যের বিষয় (অথও সুখ জীবনে পাওয়া যায় না), তখনই বাহির হইতে শশীবাবুর সহিত ক্ষেত্রবাবুর দাদা গোবর্দ্ধনবাবু ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, ক্ষেত্র, তা হলে চল যাই।

একটু পরে জলের গ্লাস হাতে মেয়েটি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া নিঃশব্দে গ্লাসটি তক্তাপোশের কোণে রাখিয়া কিঞ্চিৎ দ্রুতপদেই চলিয়া গেল। ক্ষেত্রবাবু ও তাঁহার দাদাও বিদায় লইয়া আসিলেন।

সেই দিনই রাত্রে ক্ষেত্রবাবু বউদিদির কাছে প্রকারান্তরে বিবাহের মত প্রকাশ করিলেন। পরবর্ত্তী তিন-চারি দিনের মধ্যে সব ঠিকঠাক হইয়া গেল, সামনের অগ্রহায়ণ মাসের দোসরা ভাল দিন আছে। বরপণ একশো এক টাকা নগদ ও দশ ভরি সোনার গহনা। ঠিকুজী কোষ্ঠী মিলিলে কথাবার্ত্তা পাকা হইবে।

ক্ষেত্রবাবু দাদাকে বলিলেন, দাদা, তা হলে কাল যাব।

—এখনই কেন ? আর দু-চার দিন থাক না ?

—না দাদা, খোকাখুকী রয়েছে পড়ে সেখানে! যাই একবার।

যাইবার পূর্বদিন পুনরায় শশীবাবুর বাড়ী তাহার নিমন্ত্রণ হইল। এ দিন কিন্তু ক্ষেত্রবাবুর উৎসুক দৃষ্টি চারিদিক খুঁজিয়াও মেয়েটির টিকি দেখিতে পাইল না।

বার্ষিক পরীক্ষা চলিতেছে। হেডমাস্টারের তাড়নায় মাস্টারেরা অতিষ্ঠ। বড় হলে যদুবাবু ও শরৎবাবু পাহারা দিতেছেন, হঠাৎ মিঃ আলম তদারক করিতে আসিয়া ধরিয়া ফেলিলেন, দুইজন ছাত্র টোকাটুকি করিতেছে।

মিঃ আলম বলিলেন, আপনারা কী দেখছেন যদুবাবু! কত ছেলে টুকছে—

যদুবাবু দেখিতেছিলেন না সত্যই—এ স্কুলে উনিশ বৎসর হইয়া গেল তাঁহার। সাহেব আসিবার অনেক আগে হইতে এখানে ঢুকিয়াছেন। নতুন মাস্টার যাহারা, খুব উৎসাহের সঙ্গে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে, তাঁহার সে বয়স পার হইয়া গিয়াছে। তিনি চেয়ারে বসিয়া ঢুলিতেছিলেন।

সাহেবের টেবিলের সামনে দাঁড়াইতে হইল দুইজনকেই। সাহেব ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দুইজনের দিকে চাহিলেন।

—কী যদুবাবু, আপনার হলে এই দুজন ছাত্র টুকছিল—আপনি দেখেন না, আপনাদের কৈফিয়ত কী?

—দেখছিলাম স্যার্।

—দেখলে এ রকম হল কেন?

—ছেলেরা বড় দুষ্টু স্যার্—কী ভাবে যে টোকে—

—চেয়ারে বসে পাহারা দেওয়ায় কাজ হয় না। বিশেষ করে যদুবাবু, আপনার আর মনোযোগ নেই স্কুলের কাজে, অনেকদিন থেকে লক্ষ্য করছি। এ স্কুলে আপনার আর পোষাবে না।

যদুবাবু চুপ করিয়া রহিলেন।

—আর শরৎবাবু, আপনি নতুন এসেছেন, আজ দু বছর। কিন্তু এখনি এমনি গাফিলতি কাজের, এর পরে কী করবেন? আপনাদের দ্বারা স্কুলের কাজ আর চলবে না। এখন যান আপনারা, ছুটির পরে একবার আমার সঙ্গে দেখা করবেন।

যদুবাবু রাগ করিয়া হলে ঢুকিয়া প্রত্যেক ছাত্রের পকেট খানাতল্লাশ করিলেন, ফলে প্রকাশ পাইল (১) থার্ড ক্লাসের এক ছেলের পকেট হইতে একখানা ইতিহাসের বইয়ের পাতা, (২) ক্লাসের আর একটি ছেলের কোঁচায় লুকানো একখানি আস্ত ইতিহাসের বই, (৩) নারাণবাবুর ছাত্র চুনির খাতার মধ্যে চার-পাঁচখানা কাগজে নানারূপ নোট লেখা, (৪) সেভেনথ্ ক্লাসের একটি ছেলের ডেস্ক হইতে দুইখানি বই—একখানি ইংরেজী ইতিহাসের বই (এবেলা আছে ইতিহাসের পরীক্ষা), আর একখানি হইল ভূগোল, যাহার পরীক্ষা ওবেলা আছে। বোঝা গেল, ইতিহাসের বই হইতে কিছু আগেও সে টুকিতেছিল।

সব কয়জনকে হেডমাস্টারের কাছে হাজির করা হইল। সাহেবের হুকুমে তাহাদের

এবেলা পরীক্ষা দেওয়া রহিত হইয়া গেল। বাড়ীতে তাহাদের অভিভাবকদের কাছে পত্র গেল। নারাণবাবুর ছাত্র চুনি বাড়ী যাইতেছিল, নারাণবাবু ডাকিয়া পাঠাইলেন।—হ্যাঁ চুনি, তুমি নোট লিখে এনেছিলে ?

চুনি চুপ করিয়া রহিল।

—কেন এনেছিলে ? কার কাছ থেকে লিখে এনেছিলে ? ও লিখে আনা কি তোমার উচিত হয়েছে ?

—না স্যার।

—তবে আনলে কেন ?

—আর কখনও আনব না।

—তা তো আনবে না বুঝলাম। এদিকে একটা পেপার পরীক্ষা দিতে পারলে না। পাস-নম্বর থাকবে কী করে, তাই ভাবছি।···চুনি, খিদে পেয়েছে ? কিছু খাবি ? আয় আমার ঘরে।

নিজের ছোট ঘরটাতে লইয়া গিয়া নারাণবাবু তাহার পিঠে হাত দিয়া কত ভাল ভাল কথা বুঝাইলেন—মিথ্যা দ্বারা কখনও মহৎ কাজ হয় না, ইত্যাদি। গীতার শ্লোক পড়িয়া শোনাইলেন। ছোলা-ভিজা ও চিনি এবং আধখানা পাঁউরুটি খাওয়াইলেন। চুনি যাইবার সময় বলিল, স্যার, একটা কথা বলব ? বাড়ী গিয়ে কোন কথা বলবেন না যেন—

—না, আমার যেচে বলবার দরকার কী ! কিন্তু হেডমাস্টারেব চিঠি যাবে তোমার বাবার নামে।

চুনির মুখ শুকাইল। বলিল, কেন স্যার ?

—তাই সাহেবের নিয়ম।

—আপনি হেডস্যারকে বুঝিয়ে বলুন না। আপনি বললেই—

—যা, বাড়ী যা এখন। দেখি আমি।

চুনি চলিয়া গেলে নারাণবাবু ভাবিতে লাগিলেন, চুনির এ অসাধু প্রকৃতিকে কী করিয়া ভিন্ন পথে ঘুরাইবেন ! আজ যেভাবে বলিলেন, ও ঠিক পথ নয়। গীতার শ্লোক বলা উচিত হয় নাই—অতটুকু ছেলে গীতার কথা কী বুঝিবে ? তাঁহার নোটবুকে টুকিয়া রাখিলেন—চুনি—মিথ্যা ব্যবহার, হাউ টু কারেক্ট, অনুকূলবাবু হইলে কী করিতেন ? নারাণবাবু গভীর দুশ্চিন্তায় মগ্ন হইলেন।

চায়ের দোকানে বসিয়া সে দিন যদুবাবু আস্ফালন করিতেছিলেন : এক পয়সার মুরোদ নেই স্কুলের—আবার লম্বা লম্বা কথা ! ডিউটি, ট্রুথ ! আরে মশাই, পূজোর ছুটির মাইনে দু টাকা এক টাকা করে সে দিন শোধ হল। গরীব মাস্টারেরা কী খায় বল তো ?

ক্ষেত্রবাবু হাসিয়া বলিলেন, না পোষায়, চলে যেতে পারেন দাদা। সাহেবের গেট ইজ ওপ্‌ন্—

রামেন্দুবাবু আর নতুন টীচার নন—দু-তিন বছর হইয়া গেল এ স্কুলে, তিনি সব দিন এ মজলিসে থাকেন না, আজ ছিলেন। বলিলেন, জানুয়ারি মাস থেকে মাইনে কাটা হবে,

জানেন না বোধ হয় ?

সকলেই চমকিয়া উঠিলেন। যদুবাবু ও জগদীশ জ্যোতির্ব্বিনোদ একসঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, কে বললে ? অ্যাঁ, আবার মাইনে কাটা !

—জানুয়ারি মাসে ছাত্র ভর্ত্তি না হলে মাইনে কাটা হবেই।

—এই সামান্য মাইনে, এও কাটা হবে ! আপনি একটু বলুন হেডমাস্টারকে—

—বলেছিলাম। কিন্তু বাজেট যা, তাতে মাইনে না কাটলে মাস্টারদের মধ্যে দু-একজনকে জবাব দিতে হবে কাজ থেকে। তার চেয়ে সকলকে রেখে মাইনে কাটা ভাল।

জ্যোতির্ব্বিনোদ বলিলেন, সে যাকগে, যা হয় হবে। এখন সাহেবের কাছে একটা দরখাস্ত দেওয়া যাক আসুন, যাতে মাসের মাইনেটা ঠিক সময় পাই। আড়াই মাস খেটে এক মাসের মাইনে নিয়ে এভাবে তো আর পারা যাচ্ছে না।

রামেন্দুবাবু বলিলেন, ও করতে যাবেন না। তাতে ফল হবে না। আমি কি ও নিয়ে বলি নি ভাবচেন ?

যদুবাবু বলিলেন, না, আপনি যা বলেন, তার ওপর আমাদের কথা কওয়ার দরকার কী ! যা ভাল হয় করবেন।

চায়ের দোকান হইতে বাহির হইয়া কে একজন বলিলেন, আজ যে নারাণদাকে দেখছি নে ?

জ্যোতির্ব্বিনোদ বলিলেন, যখন আসি, ঘরে উঁকি মেরে দেখি, তিনি লিখছেন বসে বসে একমনে। আমি আর ডাকলাম না।

রামেন্দুবাবু বলিলেন, ওই একজন বড় খাঁটি সিনসিয়ার লোক, সেকালের গুরুর মত। ও টাইপ আজকাল বড় একটা দেখা যায় না এ ব্যবসাদারির যুগে। আচ্ছা, আমি এখন চলি —বসুন।

বসিবার সময় নাই কাহারও। সকলকেই এখনই টুইশানিতে যাইতে হইবে।

ক্ষেত্রবাবু চায়ের দোকান হইতে পাশেই শ্রীনাথ পালিতের লেনে বাসায় গেলেন। পনেরো টাকা ভাড়ায় দুইখানি ঘর· একতলায়, ছোট্ট রান্নাঘর। এক দিকে সিঁড়ির নিচে কয়লা রাখিবার জায়গা। অন্ধকার কলঘরে একজন লোক দিনমানে ঢুকিলেও বাহির হইতে হঠাৎ দেখিবার জো নাই। তারের আলনায় কাপড় শুকাইতেছে। বাড়ীওয়ালী শুচিবেয়ে বুড়ী গামছা পরিয়া ঝাঁটা হাতে উঠানে জল দিয়া ঝাঁট দিতেছে ও ধুইতেছে।

অনিলা বাহিরে আসিয়া হাসিমুখে বলিল, দেরি হল যে ?

—কোথায় দেরি ? কানু কই ?

—সে বল খেলা দেখতে গিয়েচে, ইণ্টার-স্কুল ম্যাচ আছে কোথায়। চা খাবে ?

—না, এই খেয়ে এলাম দোকান থেকে।

অনিলা হাত-পা ধুইবার জল আনিয়া একটা ছোট টুল পাতিয়া দিল, একখানা গামছা টুলের উপর রাখিল। তারপর একটা বাটিতে মুড়ি মাখিয়া এক পাশে একটু গুড় দিয়া

স্বামীকে খাইতে দিল। ক্ষেত্রবাবু হাত মুখ ধুইয়া জলযোগ সমাপনান্তে টুইশানিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

অনিলা বলিল, একটু জিরোবে না ?

—না, দেরি হয়ে যাবে।

—অমনি বাজার থেকে ছোট খুকীর জন্যে একটা বালি কিনে এনো, আর জিরে মরিচ।

—আর কী কী নেই দেখ।

—আর সব আছে, আনতে হবে না।

বড় খুকী এই সময়ে বলিল, বাবা, আমার জন্যে একটা পেন্সিল কিনে এনো—আমার পেন্সিল নেই।

অনিলা বলিল, পেন্সিল আমার কাছে আছে, দেব এখন। মনে করে দিস কাল সকালে।

ক্ষেত্রবাবু মাসখানেক হইল, নতুন বাসায় উঠিয়া আসিয়া নতুন সংসার পাতিয়াছেন। মন্দ লাগিতেছে না। নিভাননীর মৃত্যুর পরে দিনকতক বড় কষ্ট গিয়াছিল, এখন আবার একটু সেবাযত্নের মুখ দেখিতেছেন। চিরকাল স্ত্রী লইয়া সংসার-ধর্ম্ম করায় অভ্যস্ত, স্ত্রী-বিয়োগের পর সব যেন ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকিত। অসুবিধাও ছিল বিস্তর, আট বছরের খুকীকে গৃহিণী সাজিতে হইয়াছিল, কিন্তু খুকী যতই প্রাণপণে চেষ্টা করুক, অনভিজ্ঞা শিশু মেয়ে কি তাহার মায়ের স্থান পূর্ণ করিতে পারে ?

আবার সংসারে আয়না-চিরুনির দরকার হইতেছে, সিঁদুরের ব্যবস্থা করিতে হইতেছে, স্নো পাউডার কিনিবার প্রয়োজন তো আসিয়া পড়িল। চিরকাল যে গরুর কাঁধে জোয়াল, ছাড়া পাইলে অনভ্যস্ত মুক্তির অভিজ্ঞতা তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তোলে। মনে হয়, সংসার হইল না, কাহার জন্য খাটিয়া মরিব, কে আমার অসুখ হইলে মুখে একটু জল দিবে—ইত্যাদি। যে বলিষ্ঠ ও শক্তিমান মন মুক্তির পরিপূর্ণতাকে ভোগ করিতে পারে, নির্জ্জনতার ও উদাস মনোভাবের মধ্য দিয়া জীবনে নব নব দর্শন ও অনুভূতিরাজির সম্মুখীন হয়—নিরীহ স্কুলমাস্টার ক্ষেত্রবাবুর মন সে ধরনের নয়। কিন্তু না হইলে কী হয় ? যে ভাবে যে জীবনকে ভোগ করিতে পারে, সেই ভাবেই জীবন তাহার নিকট ধরা দেয়—ইহাতেই তাহার সার্থকতা। বাঁধা-ধরা নিয়ম কী-ই বা আছে জীবনকে ভোগ করিবার ?

ক্ষেত্রবাবু ছাত্রদের একতলা কুঠুরির অন্ধকূপে গিয়া ভীষণ গরমের মধ্যে পাখার তলায় অবসন্ন দেহ একখানা ইংরেজী ডিক্‌শনারির উপর এলাইয়া দিয়া পড়ানো শুরু করিলেন। আগে বেশ সময় কাটিত এখানে। এখন মনে হয়, অনিলার সঙ্গে গিয়া কতক্ষণে দুইদণ্ড কথা বলিবেন! ছাত্রও ছাড়ে না, এটা বুঝাইয়া দিন, ওটা বুঝাইয়া দিন, করিতে করিতে রাত সাড়ে নয়টা বাজাইয়া দিল। তারপর আসিল ছাত্রের কাকা। সে এফ-এ ফেল, কিন্তু তাহার বিশ্বাস ইংরেজীতে তাহার মত পণ্ডিত আর নাই, ভুল ইংরেজীতে সে ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে আলোচনা করিতে লাগিল, কী ভাবে ছেলেদের ইংরেজী শিখাইতে হয়। আজকালকার

প্রাইভেট মাস্টারেরা ফাঁকিবাজ, পড়াইতে জানে না, কেবল মাহিনা বাড়াও—এই শব্দ মুখে। তারপর সে আবার দেখিতে চাহিল, আজ ক্ষেত্রবাবু ছেলেদের কী পড়াইয়াছেন, কালকার পড়া বলিয়া দিয়াছেন কি না, টাস্ক্ দিয়াছেন কি না!

লোকটার হাত এড়াইয়া রাত দশটার সময় ক্ষেত্রবাবু বাসার দিকে আসিতেছেন, এমন সময়ে পথে রাখাল মিত্তিরের সঙ্গে দেখা। ক্ষেত্রবাবু পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিয়াও পারিলেন না, রাখাল মিত্তির ডাকিয়া বলিল, এই যে! ক্ষেত্রবাবু যে! শুনুন, শুনুন—

—রাখালবাবু যে। ভাল আছেন?

—কই আর ভাল, খেতেই পাই নে, তার ভাল! আপনারা তো কিছু করবেন না।—বলিতে বলিতে রাখালবাবু ক্ষেত্রবাবুর দিকের ফুটপাথে আসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, আসুন না, কাছেই আমার বাসা। একটু চা খেয়ে যান। সে দিন আপনাদের স্কুলে গিয়েছিলাম আমার বই দুখানা নিয়ে। সাহেব তো কিছু বোঝে না বাংলা বইয়ের, আপনারা একটু না বললে আমার বই ধরানো হবে না।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, এত রাত্তিরে আর যাব না রাখালবাবু, এখন চা খায় কেউ? আমি যাই—

—তবে আসুন, এই মোড়েই চায়ের দোকান, খাওয়া যাক একটু!

অগত্যা ক্ষেত্রবাবুকে যাইতে হইল। রাখালবাবু নাছোড়-বান্দা লোক, অনেক দিনের অভিজ্ঞতায় ক্ষেত্রবাবু জানেন, ইহার হাতে পড়িলে নিস্তার নাই। চা খাইতে খাইতে রাখালবাবু বলিলেন, এবার মশাই, ধরিয়ে দিতে হবে আমার বই দুখানা। আপনাদের মিঃ আলম ভারী বদ লোক, আমায় বলে কি না—ও সব চলবে না, আজকাল অনেক ভাল বই বেরিয়েচে। আমি বলি, তোমার বাবা আমার বই পড়ে মানুষ হয়েচে, তুমি আজ এসেচ রাখাল মিত্তিরের বইয়ের খুঁত ধরতে?

রাখাল মিত্তিরকে ক্ষেত্রবাবু বহুদিন জানেন। বয়স পঁয়ষট্টি, জীর্ণ অতিমলিন লংক্লথের পিরান গায়ে, তাতে ঘাড়ের কাছে ছেঁড়া, পায়ে সতের-তালি জুতা। রাখালবাবু কলিকাতার স্কুলসমূহে অতি পরিচিত, পনেরো বছর হইল স্কুল-মাস্টারি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য বই স্কুলে স্কুলে শিক্ষকদের ধরিয়া চালাইয়া দেন। তাতেই কায়ক্লেশে সংসার চলে।

ক্ষেত্রবাবুর দুঃখ হয় রাখালবাবুকে দেখিয়া। এই বয়সে লোকটা রৌদ্র নাই, বৃষ্টি নাই, টো-টো করিয়া স্কুলে স্কুলে সিঁড়ি ভাঙিয়া উঠানামা করিয়া বই চালানোর তদ্বির করিয়া বেড়ায়। কিন্তু বিশেষ কিছু হয় না। লোকটার পরন-পরিচ্ছদেই তাহা প্রকাশ।

বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দিবার জন্য ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, না না আপনার বই খারাপ কে বলে! চমৎকার বই!

রাখাল মিত্তির খুশী হইয়া বলিল, তাই বলুন দিকি! সকলে কি বোঝে? আপনি একজন সমজদার লোক, আপনি বোঝেন! আরে, এ কালে ব্যাকরণ জানে কে? আমি

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষাতে ব্যাকরণে ফার্স্ট হই, আবার মেডেল আছে, দেখাব।

—বলেন কী!

—সত্যি। আপনি আমার বাসায় কবে আসচেন বলুন, দেখাব।

—না, দেখাতে হবে কেন! আপনি কি আর মিথ্যে বলছেন!

—সে দিন অমনি এক স্কুলের হেডমাস্টার বললে—মশাই, আপনার বই পুরনো মেথডে লেখা। ও এখন আর চলে না। এখন নতুন অথর বেরিয়েচে, তাদের বইয়ের ছাপা, ছবি, কাগজ অনেক ভাল। আপনার বই আজকাল ছেলেরাই পছন্দ করে না। শুনলেন? আরে, রাখাল মিত্তিরের বই পড়ে কত অথর সৃষ্টি হয়েচে। অথর! আমাকে এসেছেন মেথড শেখাতে। পয়সা হাতে পাই তো ভাল ছাপা ছবি আমিও করতে পারি। কিন্তু কী করব, খেতেই পাই নে, চলেই না। বুড়ো বয়সে লোকের দোরে দোরে ঘুরে বই কখানা ধরাই, তাতেই কোন রকমে—ছেলেটা আজ যদি মরে না যেত, তবে এত ইয়ে হত না। ধরুন, পঁচিশ বছরের জোয়ান ছেলে, আজ বাঁচলে চৌত্রিশ বছর বয়স হত। আমার ভাবনা কী?

—আচ্ছা, আমি দেখব চেষ্টা করে। এখন উঠি রাখালবাবু, রাত অনেক হল।

- এই শুনুন, নব ব্যাকরণ-সুধা প্রথম ভাগ—ফোর্থ ক্লাসের জন্যে। নব ব্যাকরণ-সুধা দ্বিতীয় ভাগ থার্ড ক্লাসের উপযুক্ত, আর এবার নতুন একখানা বাংলা রচনা লিখেছি, রচনাদর্শ প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। খুব ভাল বই, পড়ে দেখবেন। সব রকমের রচনা আছে তাতে। কী ভাষা! ব্যাটারা সব বই লিখেছে, রচনা হয় কারও? কোনও ব্যাটা বাংলা সেন্টেন্স শুদ্ধ করে লিখতে জানে? নিয়ে আসুন বই, আমি পাতায় পাতায় ভুল বের করে দেব—একবার ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় 'কৃৎ' প্রত্যয়ের—চললেন যে, ও ক্ষেত্রবাবু, আচ্ছা। তাহলে শনিবারে বই নিয়ে যাব, শুনুন—মনে থাকবে তো? দেবেন একটু বলে হেডমাস্টারকে। আর শুনুন, বাংলা রচনাও একখানা নিয়ে যাব—যাতে হয়, একটু দেবেন বলে—নমস্কার—

ক্ষেত্রবাবু শেষের কথাগুলি ভাল শুনিতে পাইলেন না, তখন তিনি একটু দূরে গিয়া পড়িয়াছেন।

বাসায় অনিলা তাঁহার ভাত ঢাকা দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ক্ষেত্রবাবু ভাবেন, ছেলেমানুষ এত রাত পর্যন্ত জাগিয়া থাকার অভ্যাস নাই, সারাদিন খাটিয়া বেড়ায়। স্ত্রীকে ডাক দেন। অনিলা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসে, স্বামীকে দেখিয়া অপ্রতিভ হয়! বলে, এত রাত আজ?

—ঘুমুচ্ছিলে বুঝি?

অনিলা হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ, খোকাখুকীদের খাইয়ে দিলাম, তারপর একখানা বই পড়তে পড়তে কখন ঘুম এসে গিয়েছে—

ক্ষেত্রবাবু আহারাদি করিলেন। অনিলা বলিল, হ্যাঁ গা, রাগ কর নি তো, ঘুমুচ্ছিলাম বলে?

—বাঃ, বেশ! রাগ করব কেন?

—আমার বার্লি আর জিরে-মরিচ এনেছ ?

—ওই যাঃ ! একদম ভুলে গিয়েচি। ভুলব না ? যদি বা ছাত্রের কাকার হাত এড়িয়ে বেরুলাম, তো পড়ে গেলাম রাখাল মিস্তিরের হাতে। সব স্কুলের সব মাস্টার ওকে এড়িয়ে চলে। একবার পাকড়ালে আর নিস্তার নেই।

—সে কে ?

—অথর।

—কী কী বই আছে ? কই, নাম শুনি নি তো ?

—শুনবে কি—বঙ্কিমবাবু, না রবি ঠাকুর, না শরৎ চাটুজ্জে ? স্কুলের—স্কুলের বই লেখে, নব কবিতাপাঠ, বাল্যবোধ—এই সব। বড্ড গরীব, হাতে পায়ে ধরে বই চালায়। ছিনে জোঁক।

—একদিন এনো না বাসায়, দেখব। আমি অথর কখনও দেখি নি—একদিন চা খাওয়াব।

—রক্ষে কর। তুমি চেন না রাখাল মিস্তিরকে। বাসায় আনলে আর দেখতে হবে না। সে কথাই তুলো না।

—বড়লোক ?

—খেতে পায় না। বই চলে না। সেকেলে ধরনের বই, একালে অচল। ওই যে বললাম, নাছোড়বান্দা হয়ে ধরে-পেড়ে চলায়।

অনিলার লেখাপড়ার উপর খুব অনুরাগ দেখিয়া ক্ষেত্রবাবুর আনন্দ হয়। নিভাননী লেখাপড়া জানিত সামান্যই ; অনিলা মন্দ লেখাপড়া জানে না, ইংরেজীও জানে। বই পড়িতে ভালবাসে বলিয়া শাঁখারিটোলার লাইব্রেরী হইতে ক্ষেত্রবাবু গত মাস হইতে বই আনিয়া দেন, দুইখানা বই একদিনেই কাবার। সম্প্রতি স্কুলের লাইব্রেরী হইতে ছোট ছোট ইংরেজী বই আনেন—অনিলার সেগুলি পড়িতে একটু সময় লাগে।

অনিলা সব সময় সব কথার মানে বুঝিতে পারে না। বলে, হ্যাঁ গা, হপ মানে কী ? বইয়েতে আছে এক জায়গায়—

—লাফিয়ে লাফিয়ে চলা।

—উঁহু, লাফানো নয়, কোন গাছপালা হবে। লাফানো হলে সে জায়গায় মানে হয় না।

—ওহো, ও একরকমের লতা, চাষ হয় ইংলণ্ডে, বিশেষ করে স্কটল্যাণ্ডে। মদ চোলাই হয় ঐ লতা থেকে, হুইস্কি বিশেষ করে—

ছোট খুকী ঘুমের ঘোরে ভয় পাইয়া কাঁদিয়া উঠিতে অনিলা ছুটিয়া গেল।

বেলা চারিটা বাজে। হেডমাস্টারের সারকুলার বাহির হইল, ছুটির পরে জরুরী মীটিং, কোন মাস্টার যেন চলিয়া না যায়। মাস্টারদের মুখ শুকাইল। দুইদিন আগে সাহেব ক্লাসে ঘুরিয়া পড়ানোর তদারক করিয়া গিয়াছেন, আজ সেই সব ব্যাপারের আলোচনা

হইবে, কাহার না জানি কী খুঁত বাহির হইয়া পড়িল।

যদুবাবু ফাঁকিবাজ মাস্টার, তাঁহার খুঁত বাহির হইবেই তিনি জানেন। অনেক দিন অনেক তিরস্কার খাইয়াছেন, বড় একটা গ্রাহ্য করেন না।

মীটিংয়ে হেডমাস্টার বলিলেন, সে দিন আপনাদের ক্লাসে পড়ানো দেখে খুব আনন্দিত হওয়ার আশা করেছিলাম; দুঃখের বিষয়, সে আনন্দলাভ ঘটে নি। টীচারদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আপনাদের অনেকবার বলেছি, কিন্তু তবুও এমন কতকগুলি টীচার আছেন, যাঁদের বার বার সে কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়ে দিতে হয়, এটা বড় দুঃখের কথা। রামবাবু?

একটি ছিপছিপে ছোকরা গোছের মাস্টার দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, স্যার্?

—আপনি ফিফ্‌থ ক্লাসে জিওগ্রাফি পড়াচ্ছিলেন, কিন্তু ম্যাপ নিয়ে যান নি কেন?

রামবাবু নিরুত্তর।

—কতবার না বলেছি, ম্যাপ না দেখালে জিওগ্রাফি পড়ানো—

এইবার রামবাবু সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিলেন, স্যার্, দেশের কথা পড়ানো হচ্ছিল না, বাংলা দেশের উৎপন্ন দ্রব্য পড়াচ্ছিলাম, তাই—

—ও! উৎপন্ন দ্রব্য পড়ালে ম্যাপ নিয়ে যেতে হবে না? কেন, বাংলা দেশের ম্যাপ নেই?—আর ক্ষেত্রবাবু?

ক্ষেত্রবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

—আপনি রচনা শেখাচ্ছিলেন থার্ড ক্লাসে। কিন্তু শুধু সামনের বেঞ্চিতে যারা বসে আছে, তাদের দিকে চেয়ে কথা বলছিলেন, পেছনের বেঞ্চিতে ছাত্ররা তখন গল্প করছিল। ক্লাসসুদ্ধ ছেলের মনোযোগ আকর্ষণ করতে না পারলে আপনার পড়ানো বৃথা হয়ে গেল, বুঝতে পারলেন না? তা ছাড়া ব্ল্যাকবোর্ড আদৌ ব্যবহার করেন নি সে ঘণ্টায়। পাণ্ডিট্?

পণ্ডিত বলিতে কোন্ পণ্ডিত, বুঝিতে না পারিয়া দুই পণ্ডিতই উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সাহেব জ্যোতির্ব্বিনোদের দিকে আঙুল দিয়া বলিলেন, আপনি বাংলা পড়াচ্ছিলেন ফোর্থ ক্লাসে। আপনি কি ভাবেন, খুব চেঁচিয়ে পড়ালেই ভাল পড়ানো হল! আপনি নিজের প্রশ্নের নিজেই উত্তর দিচ্ছিলেন, নামতা পড়ানোর সুরে চিৎকার করে পড়াচ্ছিলেন, ফলে, ইউ ফেল্‌ড্ টু ক্যারি দি ক্লাস উইথ ইউ।

পরে হেডপণ্ডিতের দিকে বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া রহস্যের সুরে বলিলেন, তা বলে ভাববেন না, আপনার পড়ানো নিখুঁত। আপনি এক জায়গায় বসে পড়ান, সামনের বেঞ্চিতে দৃষ্টি রাখেন এবং মাঝে মাঝে অবান্তর গল্প করেন। যদুবাবু?

যদুবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

—আপনার কোন দোষই গেল না। আমার মনে হয়, আপনার কাজে মন নেই। আপনার দোষের লিস্ট এত লম্বা হয়ে পড়ে যে, তা বলা কঠিন। আপনি কোনদিন ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহার করেন না, ক্লাসে ছেলেদের প্রশ্ন করেন না, টাস্ক্ দেন না—সে দিন বায়ুপ্রবাহের গতি বোঝাচ্ছিলেন, গ্লোব নিয়ে যান নি ক্লাসে। গ্লোব না নিয়ে গেলে—

এমন সময়ে একটি ছাত্রকে মীটিংয়ের ঘরের মধ্যে উঁকি মারিতে দেখিয়া হেডমাস্টার ধমক দিয়া বলিলেন, কি চাই ? এখানে কেন ?

ছাত্রটি মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বলিল, স্যার্, ফোর্থ ক্লাসের ধীরেনের চোখে বল লেগে চোখ বেরিয়ে এসেছে—

সকলেই লাফাইয়া উঠিলেন।

হেডমাস্টার বলিলেন, চোখ বেরিয়ে এসেছে, কোথায় সে ?

সকলে নীচের তলায় ছুটিলেন। স্কুলের বারান্দায় একটা তেরো-চোদ্দ বছরের ছেলেকে শোয়াইয়া আরও অনেক ছেলে ঘিরিয়া মাথায় জল দিতেছে, বাতাস করিতেছে। হেডমাস্টারকে দেখিয়া ভিড় ফাঁকা হইয়া গেল। সত্যই চোখ বাহির হইয়া আধ ইঞ্চি পরিমাণ ঝুলিয়া পড়িয়াছে। বীভৎস দৃশ্য !

তখনই মেমসাহেব খবর পাইয়া আসিয়া ছেলেটিকে কোলে লইয়া বসিল। সাহেব দারোয়ানকে ছেলের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। বড়লোকের ছেলে, বাড়ীতে মোটর আছে। মোটর আসিতে দেরি দেখিয়া সে স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে বল খেলিতেছিল, তাহার ফলেই এ দুর্ঘটনা।

দেখিতে দেখিতে ছেলের বাড়ীর লোক মোটর লইয়া ছুটিয়া আসিল। তাহার পূর্বেই স্কুলের পাশের ডাঃ বসু হেডমাস্টারের আহ্বানে আসিয়া ছেলেটিকে প্রাথমিক চিকিৎসা করিতেছিলেন। ছেলের বাবা, হেডমাস্টার ও ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ছেলেকে মোটরে মেডিক্যাল কলেজে লইয়া গেল। হেডমাস্টার সঙ্গে দুইজন মাস্টার দিলেন, শরৎবাবু ও গেমমাস্টার বিনোদবাবুকে যাইতে হইল।

পরের কয়দিন হেডমাস্টার নিজে এবং আরও তিন-চারজন মাস্টার হাসপাতালে গিয়া ছেলেটিকে দেখিতে লাগিলেন। যে চোখে চোট লাগিয়াছিল, সে চোখটা অস্ত্র করিয়া বাহির করিয়া ফেলিতে হইল, তবুও কিছু হইল না। ছেলেটির অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকে যায়। মেমসাহেব প্রায়ই গিয়া বসিয়া থাকে, সাহেবও এক-আধ দিন অন্তর যান, নারাণবাবু টুইশানিফেরতা প্রায় রোজই যান।

একদিন বিকালে হেডমাস্টারকে দেখিয়া ছেলেটি কাঁদিয়া ফেলিল। তখনও তাহার বাড়ী হইতে লোকজন আসে নাই। সাহেব গিয়া বসিয়া বলিলেন, ডোণ্ট্ ইউ ক্রাই মাই চাইল্ড্—দেয়ার ইজ এ লিট্ল্ ডিয়ার—বি এ হিরো—এ লিট্ল্ হিরো।

মুশকিল এই যে, সাহেব বাংলা বলিতে পারেন না ভাল, ছোট ছেলে তাঁহার ইংরেজী বুঝিতে পারে না। মুখে কথা বলিতে বলিতে হেডমাস্টার বিপন্ন মুখে ছেলেটির মাথায় ও পিঠে সান্ত্বনাসূচক ভাবে হাত বুলাইতে লাগিলেন : কান্না করে না, কান্না লজ্জার কঠা আছে—ইট্ ইজ এ শেম্ ফর এ বয় টু ক্রাই, বুঝেছ ? ভাল বালক আছে, সারিয়া যাইবে। কিচ্ছু হইবে না—

এমন সময় ছেলের মা ও বাড়ীর মেয়েদের আসিতে দেখিয়া সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইতে

দাঁড়াইতে বলিলেন, টোমার মার সামনে কান্না করে না। দেয়ার ইজ এ গুড বয়—আমার স্কুলের বালক কাঁদিবে না—আই নো ইউ উইল কিপ আপ দি প্রেস্টিজ অফ ইওর স্কুল—আই ব্লেস ইউ মাই চাইল্ড—

ছেলেটি খানিকটা বুঝিল, খানিকটা বুঝিল না; কিন্তু সে কান্না বন্ধ করিল, আর কখনও কাহারও সামনে কাঁদে নাই। এমন কি, মৃত্যুর দুই দিন পূর্বে তাহার সংজ্ঞা লোপ হওয়ার পূর্ব পর্য্যন্ত ভয় কি দুর্ব্বলতাসূচক একটি কথাও তাহার মুখে কেহ শোনে নাই।

মাস্টারদের বেতন আরও কমিয়া গিয়াছে; কারণ, জানুয়ারী মাসে নতুন ছেলে ভর্তি হয় নাই আশানুরূপ। এই মাসের মাহিনা লইতে গিয়া মাস্টারেরা ব্যাপারটা জানিতে পারিলেন।

চায়ের আসরে যদুবাবু বলিলেন, আর তো চলে না হে, একে এই মাইনে ঠিকমত পাওয়া যায় না, তাতে আরও পাঁচ টাকা কমে গেল। কলকাতা শহরে চালাই কী করে?

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, তবুও তো দাদা, আপনি বউদিকে পাড়াগাঁয়ে রেখেছেন আজ দু বছর। আমি আর-বছর বিয়ে ক'রে কী মুশকিলেই পড়ে গিয়েছি, বাসার খরচ কখনও চলত না, যদি টুইশানি না থাকত।

জ্যোতির্ব্বিনোদ বলিলেন, খোকার অন্নপ্রাশন দেবে কবে ক্ষেত্রবাবু?

—আর অন্নপ্রাশন! খেতে পাই নে তার অন্নপ্রাশন! বাসা-খরচ চলে না, বাসাভাড়া আজ তিন মাস বাকি।

—আমার কথা যদি শোনেন, তবে অবাক হয়ে যাবেন। স্কুলের ঘরে থাকি,—ঘরভাড়া লাগে না, তাই রক্ষে। আজ ছ মাস বাড়ীতে পাঁচটা করে টাকা মাসে, তাও পাঠাতে পারি নে। পঁচিশ ছিল, হল বাইশ। এখানেই বা কী খাই, বাড়ীতেই বা কী দিই?

যদুবাবু বলিলেন, আমার ভাবনা কিসের শুনবে? বউটাকে এক জ্ঞাতি শরিকের বাড়ী ফেলে রেখেছি দেশে। সেখানে তার কষ্টের সীমা নেই। কতবার লিখেছে, কিন্তু আনি কোথায় বলো? বত্রিশ থেকে আটাশ হল। মেসে খাই, তাই কুলোয় না।

শরৎবাবু বলিলেন, কোথাও চলে যাই ভাবি, কিন্তু এ বাজারে যাই-ই বা কোথায়?

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, আচ্ছা শরৎ, তোমায় একটা কথা বলি। আমাদের না হয় বয়েস হয়েছে, স্কুল-মাস্টারি ধরেচি অনেক দিন থেকে, কোথায় আর এ বয়েসে যাব! কিন্তু তুমি ইয়ং ম্যান, কেন মরতে এ লাইনে পচে মরবে? স্কুল-মাস্টারি কি কেউ শখ ক'রে করে? সমস্ত জীবনটা মাটি। এখনও সময় থাকতে অন্য পথ দেখে নাও—তুমি, কি ওই গেম-টীচার বিনোদবাবু, কেন যে তোমরা এখানে আছ! পিওর লেজিনেস্—

শরৎবাবু বলিলেন, লেজিনেস্ নয় দাদা। এখানে পঁচিশ পেতাম, হল বাইশ। অনেক চেষ্টা করেছি, হেন আপিস নেই যেখানে দরখাস্ত-হাতে যাই নি, হেন লোক নেই যাকে ধরি নি। আমরা গরীব, নিজের লোক না থাকলে হয় না! আমাদের কে ব্যাক্ করচে, বলুন না দাদা?

—কিন্তু তা তো হল, এ স্কুলের অবস্থা দিন দিন হয়ে দাঁড়াল কী ?

—কে জানে কেমন ! সাহেবের অত কড়াকড়ি, অমন পড়ানোর মেথড্—কিছুতেই কিছু হচ্ছে না !

যদুবাবু বলিলেন, তা নয়, কী হয়েছে জান ? পাশের স্কুলগুলো ছেলে ভাঙিয়ে নেয়, ওরা বাড়ী বাড়ী গিয়ে ছেলে যোগাড় করে। হেডমাস্টার মাস্টারদের সঙ্গে নিয়ে বাড়ী বাড়ী যায়।

—আমাদেরও যেতে হবে।

—হেডমাস্টার যে রাজী নন। ওতে মাস্টারদের প্রেস্টিজ থাকে না, ওসব ব্যবসাদারি ক'রে স্কুল রাখার চেয়ে না রাখা ভাল—এ সব বিলিতী মত এখানে খাটবে না। আমি জানি, লালবাজারে একটা স্কুল থেকে ছেলে ট্রান্সফার নেবে বলে দরখাস্ত দিল—হেডমাস্টার দুজন টীচার নিয়ে তাদের বাড়ী গিয়ে পড়ল, গার্জেনকে বোঝালে—কেন ট্রান্সফার নেবেন, কী অসুবিধে হচ্ছে বলুন—কত খোশামোদ ! কিছুতেই ছেলেকে নিতে দিলে না।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, আমাদের স্কুলে যেমন ট্রান্সফারের দরখাস্ত পড়েছে, আর সাহেব অমনি তখনই ক্লার্ককে ডেকে বলবে—কত বাকি আছে দেখ, দেখে ট্রান্সফার দিয়ে দাও।

—এ রকম ক'রে কি কলকাতার স্কুল চলে ? সাহেবকে বোঝালেও বুঝবে না।

—প্রেস্টিজ যাবে ! প্রেস্টিজ ধুয়ে জল খাই এখন।

পরদিন স্কুলে মিঃ আলম টীচারদের লইয়া এক গুপ্ত-সভা করিলেন, স্কুলের ছুটির পর তেতলার ঘরে। উদ্দেশ্য, এ হেডমাস্টারকে না তাড়াইলে স্কুলের উন্নতি নাই। একা দুই শত টাকা মাহিনা লইবে, তাহার উপর ছেলে আসে না স্কুলে। মাস্টারদের এই দুর্দ্দশা। হেডমাস্টার ও মেম বিতাড়ন না করিলে স্কুল টিকিবে না।

যদুবাবু বলিলেন, কী উপায়ে সরানো যায় বলুন ? হিমালয় পর্ব্বত কে সরায় ?

—কমিটীর কাছে দরখাস্ত পেশ করি সবাই মিলে। আমাদের ভিউজ আমরা লিখি।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, কিছু হবে না মিঃ আলম। কমিটী ওতে কানও দেবে না, উল্‌টো বিপত্তি হবে।

মিঃ আলম বলিলেন, দেখুন, কী হয় ! আমি বলছি, ওতে ফল হ'তেই হবে।

এ মীটিংয়ে নারাণবাবু ছিলেন না, কিন্তু রামেন্দুবাবু ছিলেন। তিনি বলিলেন, আমি এ অপোজ করছি। হেডমাস্টার বিতাড়ন ক'রে ফল ভাল হবে কে বলেছে ? সেটা উচিতও নয়।

মিঃ আলম বলিলেন, তবে কিসে ফল ভাল হবে ?

—তা আমি জানি নে, তবে হেডমাস্টার কড়া বটে, কিন্তু এ ভেরি গুড টীচার। অমন লোককে বুড়ো বয়সে তাড়ালে ধর্ম্মে সইবে না, আর তাড়াতে পারবেনও না।

—কেন ?

—কমিটীর কাছে হেডমাস্টারের পোজিশন খুব সিকিওর। তারা ওঁকে মেনে চলে, শ্রদ্ধা করে।

—শত্রুও আছে, যেমন ডাক্তার গাঙ্গুলী, সাতকড়ি দত্ত, মিঃ সেন—এঁরা স্বদেশী কিনা, সাহেবকে দেখতে পারেন না। আপনারা বলুন, আমি তদ্বিরতদারক আরম্ভ করি, মেম্বরদের —বিশেষ ক'রে স্বদেশী মেম্বরদের বাড়ী যাই।

রামেন্দুবাবু বলিলেন, আমি এর মধ্যে নেই। তবে আমি সাহেবকেও কিছু বলব না। আপনাদের এর মধ্যেও থাকব না, আপনারা যা হয় করুন।

মিঃ আলম বলিলেন, একটা কথা আছে এর মধ্যে।

—কী ?

—আপনারা সবাই কিন্তু বলুন, এর পরে আমাকে হেডমাস্টার করবেন আপনারা।

মাস্টারেরা দণ্ডমুণ্ডের মালিক নহেন, বেশ ভাল রকমই তাহা জানেন, তবুও ঘাড় নাড়িয়া কেহ সায় দিলেন, কেহ উৎসাহের সহিত বলিলেন, বেশ, বেশ।

অর্থাৎ যে ক্ষমতা তাঁহাদের নাই, অপর একজনের মুখে তাহা তাঁহাদের আছে শুনিয়া মাস্টারের দল খুশী ও উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন।

রামেন্দুবাবুর দলের দুই-একজন মাস্টার নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিলেন, তাঁহারা রামেন্দুবাবুকে হেডমাস্টার করিবেন।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, মিঃ আলম, তবে আপনাকে মাইনে কম নিতে হবে।

—কত বলুন ?

—একশোর বেশী নয়—

—সে আপনাদের বিবেচনা, যা ভাল হয় করবেন।

যদুবাবু বলিলেন, আচ্ছা, আপনাকে যদি আর পঁচিশ বেশী দেওয়া যায়, তবে আপনি আমাদের মাইনের বিষয়টাও দেখবেন। এই স্কেল করুন না, গ্র্যাজুয়েট পঞ্চাশ টাকা। আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট চল্লিশ।

মাহিনার কত স্কেল হইবে, তাহা লইয়া কিছুক্ষণ মাস্টারদের তুমুল তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল, যদুবাবুর প্রস্তাব গ্র্যাজুয়েটদের পক্ষে ঠিকই রহিল, তবে আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েটদের ত্রিশের বেশী আপাতত দেওয়া চলিবে না।

জ্যোতির্বিনোদ বলিলেন, পণ্ডিতদের সম্বন্ধে একটা বিবেচনা করুন।

মিঃ আলম বলিলেন, আপনারা কত হলে খুশী হন ?

যদুবাবু বিষম আপত্তি উঠাইলেন। আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট আর পণ্ডিত এক স্কেলে মাহিনা পাইবে, তাহা হয় না। হেডপণ্ডিত পঁয়ত্রিশ, অন্য পণ্ডিত ত্রিশ ও পঁচিশ।

হেডমাস্টার হওয়ার আসন্ন সম্ভাবনায় উৎফুল্ল মিঃ আলম যদুবাবুর প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ রাজী হইয়া গেলেন। মাস্টারেরা বলাবলি করিতে লাগিলেন, ব্যবস্থা ভালই হইয়াছে।

যদুবাবু বলিলেন, আজ দু বছর ধরে আড়াই মাস খেটে এক মাসের টাকা পাচ্ছি—আজ এক টাকা, কাল দু টাকা, এ আর সহ্য হয় না। তার ওপর মাইনে গেল কমে। ইন্‌ক্রিমেণ্ট তো হলই না আধ পয়সা আজ চোদ্দ বছরের মধ্যে।

হেডপণ্ডিত বলিলেন, আমার উনিশ বছরের মধ্যে—

জ্যোতির্ব্বিনোদ বলিলেন, আমার সতেরো বছরের মধ্যে—

বোঝা গেল, সকলেই বর্ত্তমান ব্যবস্থার উপর অসন্তুষ্ট। নতুন কিছু হইলেই খুশী। সকলেরই উন্নতি হইবে, বাজার-খরচ সচ্ছলভাবে করিতে পারিবেন, বাসায় ফিরিয়া পরোটা জলখাবার খাইতে পারিবেন, দুই-একটা জামা বেশী করাইতে পারিবেন, বাড়ীতে অনেকেরই বাসনপত্র কম—কিছু থালা বাটি কিনিবেন, কন্যার বিবাহের দেনা কেহ বা কিছু শোধ করিতে পারিবেন।

কাল হইতে স্কুলে ছেলেদের জন্য টিফিনের বন্দোবস্ত হইবে। 'ডি. পি. আই'-এর সারকুলার অনুযায়ী ছেলেদের নিকট হইতে কিছু কিছু খরচা লইয়া স্কুল ছেলেদের টিফিনের সময় জলখাবারের আয়োজন করিবে। সাহেব ঠিক করিয়াছেন—লাল আটার রুটি আর ডাল, ঠাকুর রাখিয়া তৈরি করানো হইবে, প্রত্যেক ছেলেকে দুটি পয়সা দিতে হইবে খাবার বাবদ—দুইখানা রুটি ও ডাল মাথা-পিছু।

মিঃ আলম বলিলেন, শুনুন, মীটিং ভাঙবার আগে আর একটা কথা আছে। কাল থেকে টিফিন দেওয়া হবে ছেলেদের, ওর হিসেবপত্র আর ছেলেদের দেওয়া-খাওয়ার তদারক করতে হবে একজন টীচারকে, আপনাদের মধ্যে কে রাজী আছেন? সাহেব আমাকে লোক ঠিক করতে বলেচেন।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, কে আবার ওই হাঙ্গামা ঘাড়ে নেবে, থাকি টিফিনের সময় একটু শুয়ে—

হেডপণ্ডিত বলিলেন, আমাদের শরৎ-ভায়া বরং করো—ইয়ং ম্যান। তুমি কি বিনোদ—

হিসাবপত্র করিতে হইবে এবং তিনশো ছেলেকে ডাল রুটি দেওয়ার ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হইবে বলিয়া কেহই রাজী হয় না। মিঃ আলম বলিলেন, তাই তো, একটা যা হয় ঠিক করে ফেলতে হবে।

যদুবাবু চুপ করিয়া ছিলেন। বলিলেন, তা, তবে—যখন কেউ রাজী হয় না, তখন আর কী হবে, আমাকেই করতে হবে। সাহেবের অর্ডার, না মেনে তো উপায় নেই!

—আপনি নেবেন তা হলে?

—তাই ঠিক রইল মিঃ আলম। কী আর করি, একটু কষ্ট হবে বটে কিন্তু চাকরি যখন করছি—

কর্ত্তব্যকার্য্যে এতখানি অনুরাগ যদুবাবুর বড় একটা দেখা যায় না, সুতরাং অনেকে বিস্মিত হইলেন।

মিঃ আলম বলিলেন, আপনারা নির্ভয়ে নেমে যান। সাহেব টুইশানিতে বার হয়েছে, মেমসাহেবও নেই। কেউ টের পাবে না।

সকলে ভয়ে ভয়ে নীচে নামিয়া গেল।

চায়ের মজলিসে রামেন্দুবাবু বলিলেন, আমাকে আপনারা এর মধ্যে কিন্তু টানবেন না।

সকলে বলিলেন, কেন, কেন, কী বলুন?

—মিঃ আলম হেডমাস্টার হোন, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু সাহেবের বিরুদ্ধে এ ধরনের ষড়যন্ত্র আমি পছন্দ করি নে। এ ঠিক নয়।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, তা ছাড়া আপনি কি ভেবেছেন, এ কখনও হবে? এ হল 'কালনেমির লঙ্কাভাগ'।

বাহিরে আসিয়া সকলেরই মন হাওয়া-বার-হওয়া বেলুনের মত চুপ্‌সিয়া গিয়াছিল। এতক্ষণ বড় বড় কথা, প্রস্তাব গ্রহণ-প্রত্যাখ্যান প্রভৃতি ব্যাপারের মধ্যে থাকিয়া নিজেদের পার্লামেণ্টের মেম্বরের মত পদস্থ বলিয়া মনে হইতেছিল। সাহেব-তাড়ানো, সাহেব-বাঁচানো প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ কর্ম্মে ডিক্রি-ডিসমিসের মালিক বুঝি তাঁহারাই—বর্তমানে ওয়েলেসলি স্ট্রীটের কঠিন পাষাণময় ফুটপাথে পা দিয়েই সে ঘোর তাঁহাদের কাটিতে শুরু করিয়াছে।

যদুবাবু, যিনি অতগুলি প্রস্তাব আনয়নকারী উৎসাহী মেম্বর, তিনিও টানিয়া টানিয়া বলিলেন, হয় বলে তো বিশ্বাস হচ্ছে না, তবে দেখ—সাহেবকে তাড়াবে কে?

শরৎবাবু বলিলেন, আপনি কখন কোন্‌দিকে থাকেন যদুদা, আপনাকে বোঝা ভার। এই মিঃ আলমকে গালাগাল না দিয়ে জল খান না, আবার দিব্যি ওকে হেডমাস্টার করার প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন! কেন, আমরা সকলে ঠিক করেছি রামেন্দুবাবুকে ছাড়া আর কাউকে হেডমাস্টার করা হবে না।

জ্যোতির্ব্বিনোদ বলিলেন, আমিও তাই বলি।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, আমারও তাই মত।

যদুবাবু রাগিয়া বলিলেন, বেশ তোমরা! আমিও বলি, রামেন্দুবাবুই উপযুক্ত লোক। আমি ওখানে না বলে করি কী? আলম যখন ও-রকম ক'রে বললে, না বলি কী ক'রে?

রামেন্দুবাবু বলিলেন, আপনাদের কারও লজ্জা বা কিছুর কারণ নেই। ক্ষেত্রবাবু ঠিক বলেছেন, এ সব কালনেমির লঙ্কাভাগ হচ্ছে। ক্লার্কওয়েল সাহেব যথেষ্ট উপযুক্ত লোক, যদি তিনি চলে যান, তা হলে যে-কেউ হতে পারেন, আমার কোনও লোভ নেই ওতে।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, তা নিয়ে এখন আর তর্কাতর্কি করে কী হবে? তবে আমার এই মত সাহেবের জায়গায় যদি কেউ হেডমাস্টার হওয়ার উপযুক্ত থাকেন স্টাফের ভেতর, তবে রামেন্দুবাবু আছেন।

যদুবাবু বলিলেন, আমি কি বলেচি নয়?

—বলছিলেন তো দাদা, আমি সোজা কথা বলব।

—না, এ তোমার অন্যায় ক্ষেত্র ভায়া। তুমি আমার কথা না বুঝে আগেই—

রামেন্দুবাবু হাসিয়া উভয়ের বিবাদ থামাইয়া দিলেন।

সেদিনকার চায়ের মজলিস শেষ হইল।

দিন তিনেক পরে জ্যোতির্ব্বিনোদ ছুটির ঘণ্টা পড়িতেই বাহিরে যাইতেছেন, যদুবাবু ফোর্থ ক্লাস হইতে ডাক দিয়া বলিলেন, কোথায় যাচ্ছ, ও জ্যোতির্ব্বিনোদ ভায়া ?

—একটু কাজ আছে। কেন দাদা ?

—না তাই বলছি, এখনই ফিরবে ?

—ফিরতে দেরি হবে। শ্যামবাজারে যাব একবার।

—ও !

কিন্তু কী কারণে ওয়েলেস্‌লির মোড় পর্য্যন্ত গিয়া জ্যোতির্ব্বিনোদের শ্যামবাজার যাওয়ার প্রয়োজন হইল না। সুতরাং তিনি ফিরিয়া তেতলায় নিজের ঘরে ঢুকিলেন। টীচার্স-রুমের পাশেই ছোট ঘর, যাইবার সময় দেখিলেন, যদুবাবু টীচার্স-রুমে কী করিতেছেন। কৌতূহলী হইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, কী, একা এখানে বসে এখনও দাদা ?

যদুবাবু চমকিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি কী যেন একটা ঢাকিতে চেষ্টা করিলেন, এবং পরে কথা বলিবার প্রাণপণ চেষ্টায় চোখ ঠিক্‌রাইয়া অস্পষ্টভাবে গোঙরাইয়া কী যেন বলিতে গেলেন।

জ্যোতির্ব্বিনোদ দেখিলেন, যদুবাবুর সামনে টেবিলের উপর শালপাতায় খান পাঁচ-ছয় লাল আটার রুটি ও কিছু ডাল—যদুবাবুর মুখ রুটি ও ডালে ভর্ত্তি। আশ্চর্য্য নয় যে, এ অবস্থায় তাঁহার মুখ দিয়া স্পষ্ট কথা উচ্চারিত হইতেছে না। যদুবাবু ভীষণ আয়াসে ডালরুটির দলাকে জব্দ করিয়া কোন রকমে গিলিয়া ফেলিলেন এবং স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া অপ্রতিভ মুখে বলিলেন, এই টিফিনের পরে এক-আধখানা বাড়তি রুটি ছিল, তাই বলি ফেলে দিয়ে কী হবে! ঠাকুরকে বললাম, দাও ঠাকুর—

—বেশ বেশ, খান না।

—তা ইয়ে—তুমি যদি খাও, কাল থেকে যদি বাড়তি থাকে, তোমার জন্যেও না হয়—

জ্যোতির্ব্বিনোদ কী ভাবিয়া বলিলেন, কেউ আবার লাগাবে মিঃ আলমের কানে !

যদুবাবু ষড়যন্ত্র করিবার সুরে ও ভঙ্গিতে নিচু গলায় চোখ টিপিয়া বলিলেন, কেউ টের পাবে ! তুমিও যেমন ! যেখানে আধ মণ ময়দা মাখা হয় ডেলি, সেখানে ছখানা কি আটখানা রুটির হিসেব কে রাখছে ? আর আমার হাতেই তো হিসেব। তুমি নাও।

জ্যোতির্ব্বিনোদও নির্ব্বোধ নন। তিনি বুঝিলেন, যদুবাবুর এ রুটি খাইতে হইলে ছুটির পরে নির্জন টীচার্স-রুম ভিন্ন আর স্থান নাই। সে রুমের পরেই জ্যোতির্ব্বিনোদের থাকিবার ক্ষুদ্র কুঠুরি, তাঁহাকে অংশীদার না করিলে যদুবাবু উহা একা একা আত্মসাৎ কি করিয়া করিবেন ? সেই জন্যই যদুবাবু অত আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, জ্যোতির্ব্বিনোদ কোথায় যাইতেছে, অর্থাৎ এখনই ফিরিবে কিনা !

ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, তা যদি বাড়তি থাকে, তবে না হয়—

যদুবাবু উৎসাহের সঙ্গে বলিলেন, বাড়তি আছে—বাড়তি আছে—হয়ে যাবে। খান আষ্টেক করে রুটি তোমার জন্যে, তা সে এক রকম হবে এখন। জলখাবারটা বিকেলবেলার, বুঝলে না ? পেটে খিদে মুখে লাজ—না ভায়া, ও কোন কথা নয়।

তিন-চার দিন বেশ খাওয়া-দাওয়া চলিল দুইজনের।

জ্যোতির্ব্বিনোদ দেখিলেন, যদুবাবু ক্রমশ রুটির সংখ্যা ও ডালের পরিমাণ বাড়াইতেছেন। একদিন শালপাতা খুলিলে দেখা গেল, বাইশখানা রুটি ও প্রায় সের খানেক ডাল তাহার ভিতরে।

জ্যোতির্ব্বিনোদ ভয় পাইয়া বলিলেন, এ নিয়ে কথা হবে দাদা। এত কেন?

—আরে, নাও না খেয়ে। রাত্রের খাওয়াটাও এই সঙ্গে না-হয়—সে পয়সাটা তো বেঁচে গেল—এ পেনি সেভ্ড্ ইজ এ পেনি গট্, অর্থাৎ—

—কিন্তু দাদা, আমার শরীর খারাপ, আমি এত খেতে পারব না যে।

—বেশ, বেশ, যা পার খাও! না-হয় যা থাকবে, আমিই খাব—ফেলা যাচ্ছে না।

এদিকে মিঃ আলমের ষড়যন্ত্র বেশ পাকিয়া উঠিল। মিঃ আলম কয়েকজন মেম্বরের বাড়ী গিয়া তাঁহাদের বুঝাইলেন, সাহেবকে না তাড়াইলে স্কুলের উন্নতি সম্ভব নয়। মীটিংয়ের দিন পর্যন্ত ধার্য্য হইয়া গেল। স্থির হইল, ডাক্তার গাঙ্গুলী সে দিন সাহেবকে সরাইবার প্রস্তাব কমিটীতে উঠাইবেন; কমিটীর অন্যতম স্বদেশী মেম্বর সাতকড়ি দত্ত, জনৈক লোহাপটির দালাল সে প্রস্তাব সমর্থন করিবে।

রামেন্দুবাবু গোপনে ক্ষেত্রবাবুকে বলিলেন, মিঃ আলম এদিকে বেশ হেসে কথা বলে হেডমাস্টারের সঙ্গে, আর একদিকে এ রকম ষড়যন্ত্র করে—এ অত্যন্ত খারাপ। আমার মনে হয়, হেডমাস্টারকে ওয়ার্নিং দিয়ে দিলে ভাল হয়।

—কে দেবে?

—আমি দিতে পারতাম, কিন্তু আমার উচিত হবে না। আমি মিঃ আলমের মীটিংয়ে প্রথম দিন ছিলাম।

—তাই কী? আর তো ছিলেন না। আপনিই গিয়ে বলুন।

—সেটা ভদ্রলোকের কাজ হয় না। আর কাউকে দিয়ে বলাতে পারেন তো বলান।

—আর কে যাবে? এক আপনি, নয় তো নারাণবাবু।

—বুড়ো মানুষকে আর এর মধ্যে জড়িয়ে লাভ নেই। হি ইজ্ টু গুড্ এ ম্যান ফর অল দীজ—নিরীহ বেচারী ওঁকে আর এ বয়সে কেন এর মধ্যে?

—আমি বলব?

—আপনার উচিত হবে না। দু-মুখো সাপের কাজ হবে।

—তবে লেট্ ফেট্ টেক্ ইট্স্ কোর্স—

—তাই হোক।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ক্ষেত্রবাবু ও জ্যোতির্ব্বিনোদ রাত দশটার পরে হেডমাস্টারের দোরে ঘা দিলেন।

সাহেব খয়রাগড়ের রাজকুমারকে পড়াইয়া সবে ফিরিয়াছেন। বলিলেন, কে নারাণবাবু?

ক্ষেত্রবাবু কাশিয়া বলিলেন, না স্যার্, আমি ক্ষেত্রবাবু।

—ও! ক্ষেত্রবাবু? এস এস। এত রাত্রে?

ক্ষেত্রবাবু ঘরে ঢুকিয়া সামনের চেয়ারে মেমসাহেবকে দেখিয়া বলিলেন, গুড্ ইভ্নিং মিস্ সিবসন্!

বুদ্ধিমতী মেমসাহেব প্রীতিসম্ভাষণ-বিনিময়ান্তে অন্য ঘরে চলিয়া গেল। ক্ষেত্রবাবু সাহেবকে সব খুলিয়া বলিলেন।

সাহেব তাচ্ছিল্যের স্বরে বলিলেন, এই! তা আমি রিজাইন দিতে প্রস্তুত আছি, তাতে যদি স্কুল ভাল হয়—হোক।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, না স্যার্, তা হলে স্কুল একদিনও টিকবে না।

—না, যদি মেম্বরেরা আমার কাজে সন্তুষ্ট না হন, তবে আমার থাকার দরকার নেই।

—স্যার্, আপনি যদি বলেন, তবে আমরাও অন্য অন্য মেম্বরের বাড়ী গিয়ে উল্টো তদ্বির করি, আপনাকে পছন্দ করে এমন মেম্বর সংখ্যায় কম নয় কমিটীতে।

সাহেব নিতান্ত উদাসীন ভাবে বলিলেন, আমি এই স্কুল গড়ে তুলেছি, যখন এ স্কুলের ভার আমি নিই, তখন স্কুলে দেড় শো ছেলে ছিল। আমি হাতে নিলে চার শো দাঁড়ায় ছাত্রসংখ্যা। তারপর আবার কমে গেল। নতুন প্রণালীতে স্কুল চালাব ভেবেছিলাম, অক্সফোর্ড থেকে শিখে এসেছিলাম, আমার সব নোন্ করা আছে। এক গাদা নোন্—দেখতে চাও দেখাব একদিন। কিন্তু যদি কমিটী আমাকে না চায়, রিজাইন দিয়ে চলে যাব। এই অঞ্চলে সবাই আমার ছাত্র—চোদ্দ বছর ধরে এই স্কুলে কত ছাত্র আমার হাত দিয়ে বেরিয়েছে! বুড়ো বয়সে খেতে না পাই, এর বাড়ী একদিন ব্রেকফাস্ট খেলাম, আর-এক ছাত্রের বাড়ী একদিন ডিনার খাওয়ালেও এই রকম করে চলে যাবে। নারাণবাবু কোথায়?

—বোধ হয় এখন টুইশানিতে।

—ওই একজন সাধুপ্রকৃতির মানুষ। এ সব কথা নারাণবাবু জানে?

—আমাদের মনে হয় শোনেন নি। ওঁর কানে এ কথা কেউ ইচ্ছে ক'রেই ওঠায় না।

—দেখে এস তো। যদি এসে থাকে, ডেকে নিয়ে এস—

নারাণবাবু কিছুক্ষণ পরে জ্যোতির্বিনোদের সঙ্গে ঘরে ঢুকিলেন।

সাহেব বলিলেন, শুনেছেন নারাণবাবু, আমাকে কমিটী থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার পরামর্শ হচ্ছে।

নারাণবাবু বিস্মিত মুখে অবিশ্বাসের স্বরে বলিলেন, কে বললে স্যার্?

—জিজ্ঞেস করুন এঁদের। আমার বিশ্বস্ত লেফ্টেনাণ্ট্ মিঃ আলম এই চক্রান্ত করছে। এত্ তু ব্রুতি!

নারাণবাবু হাসিয়া বলিলেন, জগতে ব্রুটাসের সংখ্যা কম নেই স্যার্। কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি যে, এত দিন আমি কিছুই শুনি নি এ কথা!

—কোথা থেকে শুনবেন? আপনি থাকেন আপনার কাজ নিয়ে।

—স্যার্, আপনি নির্ভয়ে থাকুন। আপনার কিচ্ছু হবে না।

—ভয় কিসের? আমি রিজাইন দিতে রাজী আছি এই মুহূর্ত্তে।

—আমার মত শুনুন। কাউন্টার প্রোপ্যাগাণ্ডা একটা করতে হয়—

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, আমি তা বলেছি। আসুন—আপনি, আমি, শরৎবাবু, গেম্-টীচার সব মেম্বরদের বাড়ী বাড়ী যাই—

—আমার আপত্তি নেই।

হেডমাস্টার বলিলেন, না, নারাণবাবুকে আমি কোথাও নিয়ে যেতে বলি নে। লিভ্ হিম্ এলোন। আমি আপনাদেরও যেতে বলি নে। আমি ও-সব জিনিসকে বড় ঘৃণা করি। এটা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, রাজনীতির আসর নয়, এর মধ্যে দল-পাকানো, ষড়যন্ত্র—এ সবের স্থান নেই। না হয় চলেই যাব।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, স্যার্, আমাদের অনুমতি দিন। আমরা দেখি—

নারাণবাবু বৃদ্ধ বটে কিন্তু বেশ তেজী লোক, তাহা বোঝা গেল। তিনি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বলিলেন, একটা কথা বলে যাচ্ছি স্যার্, আপনাকে কেউ তাড়াতে পারবে না এ স্কুল থেকে। কিন্তু একটা ভবিষ্যদ্বাণী করি, মিঃ আলম এ স্কুলে আর বেশীদিন নয়।

সাহেব বলিলেন, ভাল কথা, রামেন্দুবাবুর কি মত?

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, তিনি নিরপেক্ষ। তিনি কোন দলেই যেতে রাজী নন।

—হি ইজ্ এ বর্ন জেণ্টল্ম্যান—দুজন লোক দেখলাম এ স্কুলে, একজন সামনেই বসে, আর একজন ওই রামেন্দুবাবু।

পরে হাসিয়া ক্ষেত্রবাবুদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, মাই অ্যাপোলজি টু ইউ, আপনাদের ওপর কোন মন্তব্য করি নি এতদ্দ্বারা।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, স্যার্, আমাকে তিনটে টাকা দিন—আমি একবার এই রাত্রেই দু-একজন মেম্বরের বাড়ী যাই—ডাঃ সেনের বাড়ী যাওয়া বিশেষ দরকার। সেক্রেটারী বিপিনবাবু আমাদের দিকে আছেন। মীটিংয়ের দেরি নেই, একটু চট্‌পট্ চেষ্টা করা দরকার।

সাহেব টাকা বাহির করিয়া দিলেন।

ক্ষেত্রবাবু বাহিরে আসিয়া নারাণবাবুকে ইঙ্গিতে তাঁহার সঙ্গে আসিতে বলিলেন।

হেডমাস্টার তখনই দোরের কাছে দাঁড়াইয়া তিরস্কারের সুরে বলিলেন, ক্ষেত্রবাবু, আশা করি আপনি আমার আদেশ শুনবেন, আমি এখনও এ স্কুলের হেডমাস্টার মনে রাখবেন। নারাণবাবুকে কোথাও নিয়ে যাবেন না, আমার ইচ্ছা নয়, এই সরল-প্রাণ বৃদ্ধকে আপনারা এ সব কাজে জড়ান। আপনি একা চলে যান—

মীটিংয়ের আগে ক্ষেত্রবাবুর দল মেম্বরদের বাড়ী বাড়ী গেলেন! যেখানেই যান, সেখানেই শোনা যায়, অপর পক্ষ কিছুক্ষণ আগে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

স্বদেশীভাবের লোক গাঙ্গুলীর কাছে ক্ষেত্রবাবুর দল অপমানিত হইলেন।

ডাঃ গাঙ্গুলী বলিলেন, মশাই, আপনারা কী রকম লোক জিজ্ঞেস করি? পান ছো

পচিশ-ত্রিশ মাইনে। সাহেবের খোশামুদি করতে ইচ্ছে হয় এতে? একেবারে অপদার্থ সব! কী শিক্ষা দেবেন আপনারা ছেলেদের? নিজেদের এতটুকু আত্মসম্মান জ্ঞান নেই? সাহেবের হয়ে তদ্বির করতে এসেছেন, লজ্জা করে না? সাহেবকে এ মীটিংয়ে তাড়াবই—তারপর আপনাদের মত অপদার্থ দু-একজন টীচারকেও সরাতে হবে, তবে যদি এবার স্কুলটা ভাল হয়, ইত্যাদি।

মীটিংয়ের দিন ক্ষেত্রবাবু দল লইয়া আর-একবার দুই-একজন মেম্বরের বাড়ী গেলেন। মেম্বরদের বিশ্বাস নাই, হয়তো ভুলিয়া বসিয়া আছে, ঘন ঘন মনে না করাইয়া দিলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। সকলেই বলিল, তাহাদের মনে করাইয়া দিতে হইবে না।

ছয়টার সময় মীটিং। বেলা চারটার সময় হইতে উভয় দল আসিয়া স্কুলে বসিয়া রহিল; অথচ কেহ কাহারও প্রতি অসম্মান দেখাইল না। মিঃ আলম হেডমাস্টারের ঘরে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, খাতাপত্র কী কী দরকার আছে মীটিংয়ে নিয়ে যাবার জন্য, বলুন।

—বোস মিঃ আলম, চা খাবে এক পেয়ালা?

—থ্যাঙ্ক্‌স্‌ এখন আর থাক্‌।

মীটিং বসিল। সাহেবের অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব। মিঃ আলমের দলের অত তদ্বির, অত অনুরোধ, অত ধরাধরি সব বুঝি ভাসিয়া যায়। সাহেবকে সরাইবার সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব কেহ আনে না—কার্য্য-তালিকার মধ্যে এ প্রস্তাব নাই; সুতরাং 'বিবিধ' কতক্ষণে আসে, সেই অপেক্ষায় উভয়দল দুরুদুরু বক্ষে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ডাক্তার গাঙ্গুলী, যিনি অত লম্ফঝম্প করিয়াছিলেন সাহেব তাড়ানোর জন্য, তিনি মীটিংয়ের গতিক বুঝিয়া সরু মিহি সুরে প্রস্তাব আনিলেন যে সাহেবকে অত বেতন দিয়া এই গরীব স্কুলে রাখা পোষাইতেছে না, বিশেষতঃ নতুন ছাত্র যখন আশানুরূপ ভর্তিও হইতেছে না। অতএব সাহেবের বেতন কমানো হউক।

সে প্রস্তাব সমর্থন করিলেন অন্যতম স্বদেশী মেম্বর নৃপেন সেন। সভাপতি প্রস্তাব ভোটে ফেলিতে দেখা গেল, ডাঃ গাঙ্গুলী আর নৃপেনবাবু ছাড়া প্রস্তাবের পক্ষে আর কাহারও মত নাই; এমন কি, শিক্ষকদের প্রতিনিধি মিঃ আলম পর্য্যন্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিলেন।

ডাঃ গাঙ্গুলী মিঃ আলমকে ডাকিয়া আড়ালে বলিলেন, এটা কি রকম হল মশাই? আপনি আমাদের নাচালেন, শেষে কিনা আপনি নিজে—

মিঃ আলম বিনীতভাবে যাহা বলিলেন, তাহা সত্যই অসঙ্গত নয়। তিনি এখনও ক্লার্কওয়েল সাহেবের অধীনে চাকুরি করেন, প্রকাশ্যে তিনি কোনও মতেই তাঁহার বিরুদ্ধে যাইতে পারেন না; বরং শিক্ষকদের প্রতিনিধি হিসাবে শিক্ষকদের স্বার্থ বজায় রাখিয়া তিনি কর্তব্য পালনই করিয়াছেন।

নৃপেন সেন বলিলেন, জানি জানি, আপনাদের এই রকমই ময়াল কারেজ। ঘেন্না হয়, বাঙালী জাতটা এই রকমেই উচ্ছন্নয় গেল। আপনারা কী শেখাবেন ছেলেদের? ছ্যাঃ ছ্যাঃ—

মীটিং-অন্তে যে যাহার ঘরে চলিয়া গেল। ক্ষেত্রবাবুর দলকে সাহেব ডাকাইয়া বলিলেন,

কই যত শুনলাম তোমাদের মুখে, তার কিছুই তো নয় ?

ক্ষেত্রবাবুও একটু আশ্চর্য্য হইয়াছেন। বলিলেন, তাই তো ! কিছু বুঝতেও পারলাম না স্যার্।

—যত শুনেছিলে তোমরা, আমার মনে হয় অতখানি সত্যি নয়। মিঃ আলম অত খারাপ মানুষ নয়।

—স্যার্, আমাকে মাপ করবেন, আপনি অবিশ্যি মিঃ আলমকে সন্দেহ করেন না, সে খুব ভাল কথা। তবে আমার স্বচক্ষে দেখা এবং স্বকর্ণে শোনা স্যার্।

—যাক, সব ভাল যার শেষ ভাল। নারাণবাবুর কথাই খাটল। বলেছিল, অপর পক্ষের চেষ্টা ব্যর্থ হবে।

কমিটীর মেম্বরদের মধ্যে অনেকেই এই মীটিংয়ের পরে আলমের উপর চটিয়া গেলেন। ফলে এক মাসের মধ্যে মিঃ আলমের মাহিনা আরও কাটিবার প্রস্তাব উত্থাপিত হইল। কমিটীতে এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার কোন বাধা ছিল না, কিন্তু সাহেব এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যথেষ্ট আপত্তি করিলেন।

সেদিন সন্ধ্যায় মীটিংয়ের পরে ক্ষেত্রবাবু হেডমাস্টারের ঘরে ঢুকিলেন।

সাহেব বলিলেন, বসুন, ক্ষেত্রবাবু। কী খবর ?

—আর স্যার্ আপনি মিঃ আলমের পক্ষে অতটা না দাঁড়ালেও পারতেন।

—কেন বল তো ?

—আপনার খুব বন্ধু নয় ও।

সাহেব হাসিয়া বলিলেন, ও ! তা বলে আমি কি তার প্রতিশোধ নেব ওভাবে ? ওসব কাজ আমাদের দ্বারা হবে না। আমরা শিক্ষক—আমি চাই না ক্ষেত্রবাবু যে, স্কুলের মধ্যে এ ধরনের দলাদলি হয়। আমি চেয়েছিলাম স্কুলটাকে ভাল করতে। অক্সফোর্ড থেকে অনেক কিছু শিখে এসেছিলাম, নতুন প্রণালীতে শিক্ষা দেব ছেলেদের। এখানে এসে সব মিথ্যে হতে চলেছে দেখছি। এখানকার হাওয়াতে দলাদলি ভাসে।

এই সব ঘটনার পর কিছুদিন দলাদলি ও ষড়যন্ত্র ক্ষান্ত রহিল। আবার মাস দুই পরে মিঃ আলম নতুন ভাবে ষড়যন্ত্র শুরু করিল। এবার মেমসাহেবের বিরুদ্ধে। স্কুলে অত টাকা খরচ করিয়া মেম রাখিবার কোন কারণ নাই। বিশেষত ছেলের স্কুলে মেয়েমানুষ শিক্ষয়িত্রী কেন? এবার মিঃ আলমের ষড়যন্ত্র সফল হইল। স্বদেশী মেম্বরের দল টেবিল চাপড়াইয়া লম্বা বক্তৃতা করিল। ফলে মিস্ সিবসনের চাকরি গেল। ছেলেরা মিলিয়া চাঁদা তুলিয়া মেমসাহেবের বিদায়-অভিনন্দনজ্ঞাপক সভা করিল। মিস্ সিবসন্ ছোট ছোট ছেলেদের সত্যই ভালবাসিত, বিদায়-সভায় বেচারী প্রীতিভাষণ দিতে উঠিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

মেমসাহেব চলিয়া যাওয়াতে সাহেবের কষ্ট হইল খুব বেশী। সকলে বলে, বিলাত হইতে আসিবার সময় সাহেব মিস্ সিবসন্কে সঙ্গে করিয়া আনেন, গরীবের ঘরের মেয়ে, ইণ্ডিয়ায় একটি চাকরি জুটিয়া যাইবে—ইহাই ছিল উদ্দেশ্য।

এই স্কুলের ভার সাহেব যতদিন হইতে লইয়াছেন, মেমসাহেবেরও চাকরি এখানে ততদিন।

চায়ের মজলিসে সে দিন মাস্টারের সংখ্যা কিছু বেশী ছিল।

জ্যোতির্ব্বিনোদ বলিলেন, আজ আলমের মনস্কামনা পূর্ণ হল।

ক্ষেত্রবাবু যতখানি সাহেবের পক্ষ হইয়া তদ্বির করিয়াছিলেন, মিস. সিবসনের পক্ষ হইয়া তাহার অর্দ্ধেকও করেন নাই। মেমসাহেব যাওয়াতে তিনি ততটা দুঃখিত হন নাই, ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইবার কথা। তিনি বলিলেন, তা বটে, তবে আমার মত যদি জিগ্যেস কর—এ চালটা ওদের খুব গভীর।

শরৎবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কী রকম?

—এতে সাহেবকেও তাড়ানো হল।

সকলে একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন? কেন?

—সাহেব একা এখানে থাকতে পারবে না।

—তা ছাড়া মেম বেচারীই বা যায় কোথায়? ও তো খুব গরীব ছিল শুনেছি।

—শুনচি মেম দার্জ্জিলিং গিয়ে থাকবে।

—খরচ?

—দার্জ্জিলিং ল্যাঙ্গোয়েজ স্কুলে টিচার হবে। মিশনারী সোসাইটিকে সাহেব লিখেছিলেন ওর জন্যে, তারা সব ঠিক ক'রে দিয়েছে।

মেমসাহেব যে খুব ভাল টীচার ও ভাল লোক এ বিষয়ে সকলেই দেখা গেল একমত। স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মিস্. সিবসন্‌কে খুব ভালবাসে, তাহারা নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলিয়া নিজেদের ক্লাসের এক গ্রুপ ফটো মেমসাহেবকে উপহার দিয়াছে।

একজন কে বলিল, ও ভালই হয়েছে, আমাদের মাইনে পঁচিশ-ত্রিশ—আর মেমসাহেবের মাইনে আশী। অথচ তিনি ইন্‌ফ্যান্ট ক্লাসে পড়াবেন। কেন, আমরা কি বানের জলে ভেসে এসেচি! তোমাদের স্লেভ মেণ্টালিটি কতদূর হয়েচে, তা বুঝতে পারছ না। এ কাজটা মিঃ আলম ঠিকই করেচে।

ক্ষেত্রবাবু বোধ হয় এইটুকুর অপেক্ষা করিতেছিলেন। বলিলেন, আমারও তাই মত। এবার মিঃ আলমের এতটুকু অন্যায় হয় নি। তাই বুঝে এবার তদ্বিরও করি নি। এটা আলমের ন্যায্য কাজ।

চায়ের দোকান হইতে ক্ষেত্রবাবু বাসায় ফিরিলেন। অনিলা স্বামীকে চা করিয়া দিয়া বলিল, কী খাবার যে দেব? মুড়ি রোজ রোজ খেতে পার কি? ভেবেছিলাম একটু হালুয়া—

—হ্যাঁ, হালুয়া! ঘিটুকু সব খরচ ক'রে না ফেললে তোমার—

—তুমি তো আধ সের ক'রে মাসে দেবে বলেছ, তার মধ্যেই আমি—

—গত মাসের মাইনের মধ্যে দশটি টাকা আজ পাওয়া গেল, এতে তুমি কত ঘি খাবে, আর কী করবে ?

অনিলা দুঃখ ও রাগের সুরে বলিল, আমি কি তোমার ঘি খাই ! ছেলেমেয়েরা মুড়ি চিবুতে পারে না রোজ, তাও কোনদিন ওদের জন্যে একটু হালুয়া, কি দুখানা পরোটা—

ক্ষেত্রবাবু ঝাঁঝের সঙ্গে বলিলেন, না, কেন মুড়ি খেতে পারবে না ? বিদ্যাসাগর মশায় যে না খেয়ে পরের বাসায় থেকে লেখাপড়া শিখেছিলেন ! তবে ওসব হয়। যখন যেমন অবস্থা, তখন তেমনি থাকবে।

—আধ সের ঘি তুমি বরাদ্দ করেছ কি না মাসে, আমি তাই শুনতে চাই।

—করেছিলাম। এ মাস থেকে হয়তো খরচ কমাতে হবে। পাচ্ছি কোথায় ? ঘির আইটেম্ই হয়তো তুলে দিতে হবে।

অনিলা সামনে গালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল, হ্যাঁ গা, সেই সাড়ে নটায় খেয়ে বেরোও আর সাড়ে পাচটায় ফেরো। যদি কিছু না হয় ওতে, তবে ও ছাইপাঁশ চাকরি কেন ছেড়ে দাও না।

—ছেড়ে তো দেব, তার পর ?

—ছেলে পড়াও যেমন পড়াচ্ছ—তাতে হয় না ? আর নয়তো চল বাবার কাছে। ওদিকে অনেক কিছু জুটে যাবে। ডিহিরি-অন্-সোনে আমার সেই শৈলেনকাকা থাকেন, দেখেছ তো তাঁকে ? এক মাড়োয়ারীর ফার্মে কাজ করেন। ধরে পেড়ে বললে— সেখানে চাকরি হতে পারে। যদি বল তো বাবাকে লিখি।

—তা না হয় হল। কলকাতা ছেড়ে কোথাও যেতে মন সরে না। এতদিন এখানে আছি -আর কি জান, স্কুলের ওপরও বড় মায়া। আমার বলে নয়, সব মাস্টারেরই। সুখে দুঃখে আজ বারো ষোলো বিশ বছর এক জায়গায় আছি। ওই কেমন একটা নেশা—স্কুলবাড়ীটা, ছেলেগুলো, ওই চায়ের দোকানের মজলিসটা, হেডমাস্টার—বেশ লাগে। যত কষ্টই পাই তবুও যেতে পারি নে কোথাও যে, তাই এক এক সময় ভাবি—

—ভাবাভাবির কোনও দরকার নেই, চল বেরুই। কলকাতার খরচ বেশী অথচ খাওয়া হচ্ছে কী, একটু দুধ তোমার পেটে পড়ে না, একটু ঘি না। আমাদের গয়ায় এগারো সের করে খাঁটি দুধ—

—বুঝি সবই। কিন্তু কোথাও গিয়ে থাকতে পারি নে যে। তোমাদের গয়া কেন, আমার নিজের পৈতৃক গ্রামে চোদ্দ সের করে দুধ টাকায়। পাঁচ সিকে উৎকৃষ্ট গাওয়া ঘিয়ের সের—কিন্তু সেবার তোমার দিদি থাকতে নিয়ে গেলুম— মন টেকে না মোটে। ছেলেমেয়েদের মন মোটে টেকে না—সব কলকাতায় মানুষ। তোমার দিদি তো ছট্‌ফট করতে লাগল দেশে। তা ছাড়া ম্যালেরিয়াও আছে—

এই সময় বাহির হইতে কে ডাকিল, ক্ষেত্রবাবু আছেন ?

—কে ডাকচে দেখ তো জানলা দিয়ে ?

অনিলা দেখিয়া আসিয়া বলিল, একটা ছেলে। তোমার স্কুলের ছেলে নাকি, দেখ না ?

ক্ষেত্রবাবু বাহিরে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরে আবার ঢুকিয়া বলিলেন, সেই তোমার অথর গো, সেই যে সেদিন বলেছিলাম—অথর রাখাল মিত্তির। তিনি তাঁর ছেলের হাত দিয়ে চিঠি দিয়েছেন, তাঁর অসুখ, বড় কষ্ট পাচ্ছেন, আমি যেন গিয়ে দেখা করি—

অনিলা ব্যগ্রভাবে বলিল, আহা, তা যাও ! কষ্ট পাচ্ছেন, সত্যি তো—অথর একজন—যাও—

ক্ষেত্রবাবু ছেলেটির পিছু পিছু ইটিলি সাউথ রোডের মধ্যে এক অন্ধ গলির ভিতরে গিয়া পড়িলেন। ছেলেটি তাঁহাকে একটা দরজার সামনে দাঁড় করাইয়া বলিল, আপনি দাঁড়ান, দরজা খুলে দি।

সে কোন্ দিক দিয়া চলিয়া গেল। ক্ষেত্রবাবু ভাবিলেন, আমি নিজেও ঠিক চৌরঙ্গীতে থাকি নে, কিন্তু এ কী গলি, বাপ্ !

দরজা খুলিল। দরজার পাশে ক্ষুদ্র একটা রোয়াকের সামনে অন্ধকার এক ঘরে ছেলেটি তাঁহাকে লইয়া গেল। এত অন্ধকার যে, প্রথমে বোঝা যায় না, ঘরের মধ্যে কিছু আছে কি না ! অন্ধকারেব ভিতর হইতে একটা ক্ষীণ স্বর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, কে ? ক্ষেত্রবাবু এসেচেন ?

ক্ষেত্রবাবু দেখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া চোখ ঠিক্‌রাইয়া একটা বিছানা বা কিছুর অস্পষ্ট আভাস ও একটি শায়িত মনুষ্যমূর্তি-গোছ যেন দেখিতে পাইলেন। আর অগ্রসর না হইয়া দাঁড়াইলেন, কিছু বাধিয়া ঠোকর খাইয়া পড়িয়া না যান।

ক্ষীণস্বর চিঁ চিঁ করিয়া বলিল, ওই জানলার ওপরটাতে বসুন। ওরে, একটা কিছু পেতে দে না ! ও রাধু—

—থাক্ থাক্, পেতে দিতে হবে না। আপনার কী হয়েছে ?

—আর কী হবে ! জ্বর আর কাশি আজ পনেরো দিন। পড়ে আছি। উত্থানশক্তি-রহিত—

—তাই তো দেখতে পাচ্ছি। বড় কষ্ট পাচ্ছেন তো।

এইবার ক্ষেত্রবাবু ঘরের ভিতরটা বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। ওই যে রাখালবাবু তাকিয়া ঠেস দিয়া মলিন বিছানায় কাত হইয়া আছেন, পাশে একটা ততোধিক মলিন লেপ, বিছানার এক পাশে দড়িব আলনাতে দু-চারখানা ময়লা ও আধময়লা কাপড় ঝুলিতেছে, বিছানার সামনে একটা তাক, তাকের উপর অনেক বই কাগজ। এক পাশে একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন। দেওয়ালে কয়েকখানি সস্তা ধরনের ক্যালেণ্ডার—বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক বিক্রেতাদের নাম ও বিজ্ঞাপন ছাপানো। ঘরের আসবাবপত্রের বীভৎস দারিদ্র্যে গরীব স্কুলমাস্টার ক্ষেত্রবাবুও যেন শিহরিয়া উঠিলেন।

—কতদিন অসুখ বললেন ?

—তা আজ দিন পনেরো।

—কেউ দেখচে ?

—না, দেখে নি। পয়সা নেই, সত্যি কথা বলতে কি ক্ষেত্রবাবু, আজ তিন দিন ঘরে এক পয়সাও নেই। ছেলেকে পাঠিয়েছিলাম রাধাকৃষ্ণ কর অ্যাণ্ড সন্সের দোকানে। আমার সেই—সেই—সেই—(রাখালবাবু একটু হাঁপ জিরাইলেন) রচনার বইখানা দশ কপি পাঠিয়ে দিযে একখানা লিখে দিলাম, বলি—এখন বইগুলো রেখে দাম দাও, আমি পঁয়ত্রিশ পার্সেণ্ট কমিশন দেব, এখন আমার হাত বড্ড টানাটানি যাচ্ছে—তা ব্যাটারা বই ফেরত দিয়েছে। ও বই নাকি কম বিক্রি—ও এখন বিক্রি হবে না। আপনি তো জানেন, চেতলা স্কুলের হেডমাস্টার—নব ব্যাকরণ সুধা প্রথম ভাগ—

- আচ্ছা, আপনি একটু বিশ্রাম করুন।

—বিশ্রাম আমি করছি সারাদিনই। কিন্তু আমি বলি, দেখুন ক্ষেত্রবাবু, যারা জিনিস চেনে, তাদের কাছে জিনিসের কদর! চেতলা স্কুলের হেডমাস্টার নব ব্যাকরণ সুধা দেখে বললে, মিত্তির মশাই, এমন বই একালে কে লিখছে আপনি ছাড়া ? আপনাকে বলেছি বোধ হয় ক্ষেত্রবাবু, ব্যাকরণে ছাত্রবৃত্তিতে ফার্স্ট স্ট্যাণ্ড করি, মেডেল আছে। দেখতে চান তো দেখাতে পারি।

—না, দেখাতে হবে কেন ? আপনি ঠিকই বলছেন। তা চেতলা স্কুলে বই ধরালে আপনার ?

—না। বললে—আগে যদি আসতেন! কাকে বুঝি কথা দিয়ে ফেলেছে। আসছে বারে প্রমিস্ করেছে ধরিয়ে দেবে। আর ওই শাঁকারিটোলা হাই স্কুলে রচনাদর্শখানা পাঠাতে বলেছিল—নমুনা। কিন্তু নমুনা পাঠিয়ে হয়রান। বই ধরাবেন না, নমুনা পাঠাও—

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, ওসব আমরাও জানি। বই ধরাবার ইচ্ছে নেই, বই পাঠান—

রাখালবাবু উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিয়া পাশের তাকে হাত বাড়াইতে গেলেন।

—আপনাকে দেখাই, আর একখানা নীচের ক্লাসের ব্যাকরণ লিখচি—আপনাকে দেখাই—খাতাখানাতে লিখছিলাম—

কাশির বেগে রাখালবাবুর খাতা বাহির করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, থাক্ থাক্, এখন রাখুন।

—বড় কষ্ট পাচ্ছি। কেউ নেই, কাকে বলি! তাই ছেলেটাকে প্রথমে আপনার স্কুলে পাঠাই, সেখানে দরোয়ান আপনার বাসার ঠিকানা বলে দিয়েছে, তাই বাসায় গিয়েছিল।·· এখন কী করি, একটি পরামর্শ দিন দিকি ক্ষেত্রবাবু!

—তাই তো। খুবই বিপদ। বাসাতে কে কে আছেন ?

—আমার স্ত্রী, দুটি ছোট ছোট ছেলে, এক বিধবা ভগ্নী, তাঁর একটি মেয়ে—এই। রোজ দুটি করে টাকা হলে তবে সংসার বেশ চলে। এক পয়সা আয় নেই, তার দু টাকা—কী করা যায় বলুন! খেতে পায় নি বাড়ীতে আজ দু দিন। আপনার কাছে খুলে বলতে লজ্জা নেই—

ক্ষেত্রবাবুর মনে যথেষ্ট দুঃখ ও সহানুভূতির উদ্রেক হইল। নিজেকে তিনি ওই অবস্থায় ফেলিয়া দেখিলেন কল্পনায়। কিন্তু তিনি কী করিবেন! তাঁহার হাতে বাড়তি পয়সা এমন নাই, যাহা দিয়া তিনি এই দুঃস্থ বৃদ্ধ গ্রন্থকারকে সাহায্য করিতে পারেন। পরামর্শই বা তিনি কী দিবেন? একমাত্র পরামর্শ হইতেছে পয়সাকড়ির পরামর্শ। কিন্তু কে এই বৃদ্ধকে অর্থ-সাহায্য করিবে, সে কথাই বা তিনি কী করিয়া জানিবেন? বাধ্য হইয়া দুঃখের সঙ্গে ক্ষেত্রবাবু সে কথা জানাইলেন। তাঁহার এ ক্ষেত্রে করিবার কিছু নাই। কোন পথই তিনি খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতেছেন না।

মুশকিল হইল যে, এই সময় রাখাল মিত্তিরের ছেলেটি ভাঙা পেয়ালায় চা আনিয়া ক্ষেত্রবাবুর হাতে দিল। রাখালবাবুর স্ত্রী শুনিয়াছেন, তাঁহার স্বামীর একজন বিশিষ্ট প্রতিপত্তিশালী বন্ধু আসিবেন। চিঠি লইয়া ছেলে তাঁহার কাছে গিয়াছে। তিনি আসিলে দুঃখের একটা কিনারা হইবেই। এখন সেই ভদ্রলোকটি আসিয়াছেন শুনিয়া গৃহিণী তাড়াতাড়ি যথাসাধ্য অতিথি-সংকার করিয়াছেন। গরীবের ঘরে এই ভাঙা পেয়ালায় একটু চায়ের পিছনে যে কত ভরসা নির্ভরতা আবেদন নিহিত, ক্ষেত্রবাবু তাহা বুঝিলেন বলিয়াই চায়ের চুমুক যেন গলায় বাধিতেছিল। এখানে না আসিলেই হইত। পকেটে আছে মাত্র আট আনা পয়সা। তাই কি দিয়া যাইবেন! সে-ই বা কেমন দেখাইবে!

রাখালবাবু স্বয়ং এ দ্বিধা ঘুচাইয়া দিলেন: তা হলে উঠবেন? আচ্ছা, কিছু কি আপনার পকেটে আছে? যা থাকে। বাড়ীতে খাওয়া হয় নি ও-বেলা থেকে—দুটো একটা টাকা—এমন বিপদে পড়ে গিয়েছি।

ক্ষেত্রবাবু ছেলেটির হাতে একটা আট-আনি দিয়া বাহির হইয়া আসিলেন।

সমস্ত সন্ধ্যাটা যেন বিস্বাদ হইয়া গেল। সামনেই একটা ছোট পার্ক, ছেলেমেয়েরা দোলনায় দোল খাইতেছে, লাফালাফি করিতেছে, আনন্দকলরবমুখর পার্কের সবুজ ঘাসের উপর দুই-একটি অফিস-প্রত্যাগত কেরানী বসিয়া বিড়ি টানিতেছে, সোঁদালি ফুলের ঝাড় দুলিতেছে রেলিংয়ের ধারের গাছে, আলু-কাবলির চারি পাশে উৎসাহী অল্পবয়স্ক ক্রেতার ভিড় লাগিয়াছে। ক্ষেত্রবাবু একখানা বেঞ্চের এক কোণে গিয়া বসিলেন। বেঞ্চির উপর দুইটি লোক বসিয়া ঘরভাড়া আদায় করার অসুবিধা সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলিতেছে।

ক্ষেত্রবাবু ভাবিলেন, রাখালবাবুও তাঁহার মত স্কুলমাস্টার ছিলেন একদিন। আজ অক্ষম ও পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাই এই দুর্দ্দশা। বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, টুইশানিও জোটে না আর। স্কুলমাস্টারের এই পরিণাম।

বেশী দূর যাইতে হইবে না, তাঁহাদের স্কুলেই রহিয়াছেন নারাণবাবু—তিন কুলে কেহ নাই, আজীবন পূতচরিত্র, আদর্শ শিক্ষক, কিন্তু স্কুলের চোর-কুঠুরির ঘরে নির্জ্জন আত্মীয়হীন জীবন যাপন করিতেছেন আজ আঠারো বছর কি বাইশ বছর, কে খবর রাখে? আজ যদি চাকুরি যায়, কাল আশ্রয়টুকুও নাই। ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্ক অবস্থায় ক্ষেত্রবাবু টুইশানিতে চলিয়াছেন, কে পিছন হইতে বলিল, স্যার, ভাল আছেন?

ক্ষেত্রবাবু পিছন ফিরিয়া চাহিলেন, একটি সুবেশ তরুণ যুবক। বেশ দামী সুট পরনে, চোখে কাঁচকড়ার চশমা! মৃদু হাসিয়া বলিল, চিনতে পারছেন না স্যার্?

—না, কই, ঠিক—তুমি আমাদের স্কুলের?

—হ্যাঁ, স্যার্। অনেক দিন আগে, এগার বছর আগে—পাশ করি। আমার নাম সুরেশ।

—সুরেশ বসু?

—না স্যার্, সুরেশ মুখার্জ্জি, সেবার সেই সরস্বতীপূজোর সময়ে আমাদের বারে ভাঁড়ার লুঠ করে ছেলেরা, মনে আছে? হেডমাস্টার ফাইন করেছিলেন সব ছেলেদের। মনে হচ্ছে স্যার্?

—হ্যাঁ, একটু একটু মনে হচ্ছে যেন। তোমাদের ছেলেবেলার কথা হিসেবে এসব যত মনে থাকে আমাদের তত মনে রাখবার ব্যাপার নয় বাবা। বুঝতেই পারছ! কী কর এখন?

—আজ্ঞে স্যার্, রাঁচিতে চাকরি করি, এঞ্জিনীয়ার।

—ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করেছিলে বুঝি বাবা?

—আজ্ঞে, শিবপুর থেকে পাশ করে বিলেতে যাই। আজ তিন বছর বিলেত থেকে ফিরে গভর্মেণ্ট সার্ভিস করছি রাঁচিতে—পি. ডবলিউ. ডি.-তে য়্যাসিস্ট্যাণ্ট এঞ্জিনীয়ার।

—কী নাম বললে, সুরেশ মুখার্জ্জি? এখন চেনা-চেনা মুখ বলে মনে হচ্ছে। অনেক দিনের কথা—আর কত ছেলে আসে-যায়, কাজেই সব মনে রাখা—

—নিশ্চয় স্যার্, ঠিক কথা। পুরোনো মাস্টারদের মধ্যে কে কে আছেন স্যার্? যদুবাবু আছেন?

—হ্যাঁ, শ্রীশবাবু, থার্ড পণ্ডিত আছেন, নারাণবাবু আছেন—

—নারাণবাবু আজও আছেন স্যার্? উঃ, অনেক বয়স হল তাঁর! তিনি কি স্কুলের সেই ঘরেই থাকেন—আচ্ছা, একবার দেখা করে আসব। বড্ড ইচ্ছে হয়। চাকরটা আছে? কেবলরাম?

—হ্যাঁ, আছে বইকি। যেও না একদিন স্কুলে।

যুবকটি পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। ক্ষেত্রবাবু সগর্বে একবার চারিদিকে চাহিলেন—লোকে দেখুক, এমন একজন সুট-পরা তরুণ যুবক তাঁহার পায়ের ধূলা লইতেছে। তাহাকে বেশ সুন্দর দেখিতে, সাহেবের মত চেহারা। কবে হয়তো ইহাকে পড়াইয়াছিলেন মনে নাই, তবুও তো তাঁহাদের স্কুলের ছাত্র। আজ দু পয়সা করিয়া খাইতেছে। বিলাত-ফেরত য়্যাসিস্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনীয়ার—এরকম হয়তো কত ছাত্র কত দিকে আছে, সকলের সন্ধান তো জানা নাই।

এইটুকু ভাবিয়াই সুখ। এই ছাত্রের দল তাহাদের বাল্যজীবনের শত সুখস্মৃতির আধার তাহাদের স্কুল ও স্কুলের শিক্ষকদের ভুলে নাই; কেহ আছে বর্ম্মায়, কেহ আছে সিমলায়,

কেহ বা কুমায়ুন, শিলং, মসলিপত্তনে। তবুও দেশের আশা-ভরসাস্থল পুত্রপ্রতিম এই সব তরুণ দল একদিন তাঁহাদেরই হাতে চড়টা-চাপড়টা খাইয়া ইংরেজী ব্যাকরণের নিয়ম শিখিয়াছে, বীজগণিতের জটিল রহস্য বুঝিয়াছে—ভাবিয়াও আনন্দ হয়।

ক্ষেত্রবাবু পাশের গলিতে ঢুকিয়া টুইশানি-পড়া ছাত্রের বাড়ী কড়া নাড়িলেন।

চৈত্র মাস। ইস্টারের ছুটি আজই হইয়া গেল। যদুবাবু মেসে ফিরিয়া দেখিলেন, অবনী চিঠি লিখিয়াছেন তিনি যদি এই মাসের মধ্যে বউদিদিকে এখান হইতে লইয়া না যান, তবে সে বউদিদিকে কলিকাতায় আনিয়া যদুবাবুর মেসে রাখিয়া যাইবে।

মাত্র পাঁচটি টাকা হাতে—স্কুলের টাকা এ মাসে সামান্যই পাওয়া গিয়াছিল, কোন্ কালে খরচ হইয়া গিয়াছে মেসের দুই মাসের দেনা মিটাইতে। সামান্য কিছু স্ত্রীকে পাঠাইয়াছিলেন, এ পাঁচটা টাকা টুইশানির অগ্রিম আদায়ী আংশিক মাহিনা। স্ত্রীকে রাখিবার কোন অসুবিধা হইত না বেড়াবাড়ী, যদি নিজের বাড়ীঘর সেখানে থাকিত। কিন্তু পৈতৃক বাড়ী ভূমিসাৎ হওয়ার পরে যদুবাবু সেখানে আর যান নাই, সেই হইতেই পথে পথে, বাসায়। আজ দেড় বৎসরের উপর, স্ত্রীকে বেড়াবাড়ী পরের সংসারে ফেলিয়া রাখিয়াছেন,—ইচ্ছা করিয়া কি? তাহা নয়। নিরুপায় হিসাবে।

এখন স্ত্রীকে গিয়া ওখান হইতে সরাইতে হইবে।

নতুবা ইতর অবনীটা সত্য সত্যই হয়তো স্ত্রীকে একদিন মেসে আনিয়া হাজির করিবে। লোকটা কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞানহীন কিনা।

সাত-পাঁচ ভাবিয়া যদুবাবু টিকিট কাটিয়া সিরাজগঞ্জ-প্যাসেঞ্জারে রাত্রে রওনা হইলেন এবং শেষরাত্রে বগুলা নামিয়া, স্টেশনে রাত কাটাইয়া, পরদিন সকালে সাত ক্রোশ হাঁটিয়া বেলা আড়াইটার সময় গলদ্‌ঘর্ম্ম ও অভুক্ত অবস্থায় বেড়াবাড়ী পৌঁছিলেন।

অবনী বলিল, আসুন দাদা, তা একেবারে ঘেমে—এঃ ওরে নিতে কাপালীকে ডেকে এনে গাছ থেকে দুটো ডাব পাড়ার ব্যবস্থা কর। হাত পা ধুয়ে নিন—তারপর ভাল সব?

যদুবাবু ঠাণ্ডা হইলেন। স্ত্রীকে দেখিয়া কিন্তু চমকিয়া উঠিলেন। অবনীর বিধবা দিদি ক্ষান্ত বলিল, বউ প্রায় কেবল জ্বরে ভুগেছে ওদিকে—এই মাসখানেক ফাগুনে হাওয়া পড়ে একটু ভাল আছে। তাও দুবার পড়ল। ঘোর মেলেরিয়া এ সব দিকে। দেখ না, ওই অবনীর ছেলেমেয়েগুলো ভুগে ভুগে হাড্ডি-সার। না একটু ওষুধ, না চিকিচ্ছে—কোথায় পাবে? সামান্য আয়, এদিকে সকালে উঠে দু কাঠা চালের খরচ। বোস, একটা ডাব কেটে আনি ভাই—

যদুবাবুর স্ত্রী কাঁদিতে লাগিল। বেচারীর ভাগ্যে আজ প্রায় এক বছর পরে তাঁহার দর্শনলাভ ঘটিল।

যদুবাবু বলিলেন, কেঁদো না। এঃ তোমার চেহারা দেখতে বড্ডই—

—হ্যাঁ, বড্ডই! মরে যাচ্ছিলাম কার্ত্তিক মাসে। মরে বেঁচে উঠেছি। আচ্ছা, মানুষ

কী করে এমন হতে পারে ? এত করে চিঠি দিলাম, একবার চোখের দেখা –

—তুমি তো বললে চোখের দেখা। হাতে পয়সা না থাকলে তো আর—

—হ্যাঁ গো, যদি মরেই যেতাম, তা হলে একবার তোমার সঙ্গে দেখাটাও যে হত না !

—সে সবই বুঝলাম। আমার অবস্থাটা তোমরা দেখবে না তো ? তোমাদের কেবল—

যদুবাবুর স্ত্রী ঝাঁজের সহিত বলিল, অমন কথা বলো না। মুখে পোকা পড়বে। আমি যেমন নীরবে সয়ে গেলাম এমন কেউ সহ্যি করবে না, তা বলে দিচ্ছি। রাত্রে জ্বরে পুড়েচি, শুধু মন হাঁপিয়েচে—মরে গেলে তোমাকে একটিবার চোখের দেখাটা হল না বুঝি, তাও কাউকে আমি বিরক্ত করি নি। চারিদিক চাহিয়া স্বর নিচু করিয়া বলিল, আর এমন চামার ! এমন চামার ! এক পয়সার সাবু না, এক পয়সার মিছরি না। বরং তুমি যে টাকা পাঠাতে মাসে মাসে, তা থেকে কেবল আজ দাও এক টাকা, কাল দাও আট আনা—ওই অবনী ঠাকুরপো। না দিলেও চক্ষুলজ্জা, ওদের বাড়ী, ওদের ঘরে জায়গা দিয়েচে। জায়গা দিয়েচে কি অমনি। ওই টাকাটা সিকেটা তো আছেই—আর এদিকে বাক্যির জ্বালা কী ! এক-একদিন ইচ্ছে হত—এই সত্যি বলচি দুপুরবেলা—ব্রাহ্মণের সামনে মিথ্যে বলি নি—যে, গলায় দড়ি দিয়ে মরি—

এই সময়ে অবনীর বিধবা দিদি (তিনি যদুবাবুরও বড়) ডাব কাটিয়া আনিয়া বলিলেন, বউ, এক গ্লাস জল নিয়ে এস, আর এই রেকাবিতে দুখানা বাসোতা—কোথায় কী পাব বল ভাই ! বাসোতা দুখানা খেয়ে একটু জল—আমি গিয়ে ভাত চড়াই।

যদুবাবুর স্ত্রী জলহাতে আসিয়া বলিল, ঠাকুরঝি লোকটা এই বাড়ীর মধ্যে ভাল লোক। নইলে বউ—ও বাবাঃ—খুরে নমস্কার। বলিয়া উদ্দেশে প্রণাম করিয়া জলের গ্লাসটা যদুবাবুর সম্মুখে নামাইয়া রাখিল।

বৈকালের দিকে অবনী বলিল, দাদার কি এখন গুড্ ফ্রাইডের ছুটি ?

—হ্যাঁ।

—কদিন ?

—মঙ্গলবার খুলবে। ওই দিনই ওকে নিয়ে যাব ভাবচি।

—তাই নিয়ে যান। এখানে বউদিদির শরীরও টিকচে না, মনও টিকচে না। তাই কখনও টেকে ? আপনি রইলেন পড়ে কলকাতায়, উনি রইলেন এখানে। ছেলে নেই, পিলে নেই। আপনার বউমার কাছে কেবল কান্নাকাটি করেন, দুঃখু করেন। নিয়ে যান, সেই ভাল। তা ছাড়া আমাদের এখানে অসুবিধে। ঘরদোর নেই – দুখানি মাত্র ঘর। আবার আমার ছোট ভগ্নীপতি শিশির নাকি আসবে শুনছি ছেলেমেয়ে নিয়ে—কতদিন আসে নি। তারা এলেই বা কোথায় থাকে ? তাই বলি দাদাকে চিঠি লিখি, দাদা এসে ওঁকে নিয়েই যান।

—না, তুমি যা করেছ, যথেষ্ট উপকার করেছ। এতদিন কে রাখে ! যাই, একটু বেড়িয়ে আসি—

এ বেড়াবাড়ী গ্রামের বাহিরে খুব বড় বড় মাঠ—আধ মাইল, কি তারও কম দূরে চূর্ণী নদী। নদীর ধারে খেজুরগাছ, নিমগাছ ও ভাঁটসেওড়ার বন। এখন নিমফুলের সময়, চৈত্রের তপ্ত বাতাসে নিমফুলের সুবাস-মাখানো। ঘেঁটুফুলের দল কিছুদিন আগে ফুটিয়া শেষ হইয়া গিয়াছে—এখন শুধু রাঙা রাঙা সুঁটির মেলা ভাঁটগাছের মাথায় মাথায়। উত্তর দিকের মাঠে প্রকাণ্ড একটা কচিপাতা-ভরা বটগাছের শীর্ষদেশ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া। কিছুদিন আগে সামান্য বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, চষা-ক্ষেতের মাঝে মাঝে জল জমিয়া ছিল, এখনও আধশুকনো কাদায় তার চিহ্ন আছে। একটা তুঁতগাছের তলায় অনেক শুকনো তুঁতফল পড়িয়া আছে। যদুবাবু একটা তুঁতফল কুড়াইয়া মুখে দিলেন—মনে পড়িল, বাল্যকালে এই সময় তুঁতফল খাওয়ার সে কত আগ্রহ। কোথায় গেল সে সব সুখের দিন। বাবা গোয়াড়ী কোর্টে কাজ করিতেন, শনিবারে শনিবারে গ্রামের বাড়ীতে আসিতেন, হাঁড়ি-ভর্ত্তি খাবার আনিতেন ছেলেমেয়ের জন্য। তাঁদের বাড়ীতে মোংলা বলিয়া এক গোয়ালা-ছোঁড়া থাকিত। সরভাজা খাইবার লোভে সে ছুটিয়া গিয়া রাস্তায় দাঁড়াইত—কর্ত্তা হাঁড়ি-হাতে আসিতেছেন, না শুধু হাতে আসিতেছেন দেখিবার জন্য।

নদীতে ডিঙি-নৌকায় জেলেরা মাছ ধরিতেছে! যদুবাবু বলিলেন, কী মাছ রে?

—আজ খয়রা আছে কর্ত্তা।

—দিবি চার পয়সার, যাব? অনেক দিন দেশের খয়রা মাছ খাই নি। টাটকা খয়রা মাছটা—

যদুবাবু অবনীর দিদির হাতে মাছ দিয়া বলিলেন, ও দিদি, এই নাও। দেশের খয়রা মাছ কত কাল খাই নি!

রাত্রে পাড়ার এক জায়গায় সত্যনারায়ণের সিন্নি উপলক্ষে যদুবাবু অবনীর সঙ্গে তাহাদের বাড়ী গেলেন। বাড়ীর কর্ত্তা যদুবাবুকে যথেষ্ট খাতির করিয়া বসাইল, তামাক সাজিয়া আনিল নিজের হাতে। তাহার বড় ছেলের একটা চাকরি হইতে পারে কি না কলিকাতায়? ছেলেটিকে ডাকিয়া আনিয়া পরিচয় করাইয়া দিল। ম্যাট্রিক দুইবার ফেল করিয়া সম্প্রতি আজ বছর খানেক বসিয়া আছে। পূর্ব্বেকার অভিজ্ঞতা হইতে যদুবাবু সাবধান হইয়াছিলেন, আবার কলিকাতার মেসে, কি বাসায় জুটিয়া উৎপাত করিতে শুরু করিলেই চক্ষুস্থির। পাড়াগাঁয়ের লোককে বিশ্বাস নাই। সুতরাং তিনি বলিলেন, তিনি চেষ্টা করিবেন, তবে এখন কিছু বলিতে পারেন না—আজকাল কত বি. এ., এম. এ. পাস ফ্যা-ফ্যা করিতেছে, তা ম্যাট্রিক।

রাত্রে স্ত্রীকে বলিলেন, তা হলে আর একটা মাস এখানে—

—না, তা হবে না। আমায় নিয়ে যাও এবার।

—কিন্তু কোথায় নিয়ে যাই বল তো?

—তা তুমি বোঝ।

যদুবাবু মুখ ভ্যাংচাইয়া বলিলেন, তুমি বোঝ! বুঝি। কী, সেটা আমায় দেখিয়ে দাও। কলকাতায় কি বাসা ঠিক করে রেখে এসেছি যে, তোমায় নিয়ে ওঠাব? উঠবে কোথায়?

শেয়ালদা ইষ্টীশানে বসে থাকবে ?

যদুবাবুর স্ত্রী কাঁদিতে লাগিল।

—আঃ কী মুশকিলেই পড়েছি বিয়ে করে ! ঝাড়া হাত-পা থাকলে আজ আমার ভাবনা কি ? তোমার ভাবনা ভাবতে ভাবতেই প্রাণ গেল।

যদুবাবুর স্ত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, আমার ভাবনা কী ভাবতে হচ্ছে তোমায় ? ফেলে রেখেছ এখানে আজ দেড় বছর—জ্বরে ভুগে ভুগে আমার শরীরে কিছু নেই, তাও তোমাকে কি কিছু বলেছি ? মুখনাড়া আর খোঁটা দুটি বেলা হজম করতে হত যদি আমার মত, তবে বুঝতে ! এততেও তোমার কাছে ভাল হলাম না। তার চেয়ে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরি, তুমি ঝাড়া হাত-পা হও, আপদ চুকে যাক।

—আচ্ছা, থাম থাম, রাত-দুপুরে কান্নাকাটি ভাল লাগে না। ঘুম আসচে। ওরা শুনতে পাবে—এক ঘর, এক দোর, দেখি যা হয়—

—তুমি এবার না নিয়ে গেলে অবনী ঠাকুরপো শুনবে নাকি ? স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ হয়েছে এবার আমাকে তোমার সঙ্গে ওরা পাঠিয়ে দেবেই। ওদের বাড়ীতে জায়গা হচ্চে না—ওর ভগ্নিপতি নাকি আসবে শুনছি এ মাসের শেষে। সত্যিই তো, ঘরদোর নেই, ওদের অসুবিধে হয় বইকি। এতদিন তো রাখলে।

—হ্যাঁ, রেখেছে তো মাথা কিনেচে কি না ! ভারি করেচে ! আর আমার মেসে গিয়ে যে সাত দিন থেকে এল, আজ সিনেমা রে, কাল ইয়ে রে, তখন ?

—তুমি বুঝি অবনী-ঠাকুরপোকে টাকা দাও নি সেবার, সে কী খোঁটা আর তোমার নামে কী সব কথা আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে দিনরাত ! আমি বলি, আর তো আমার সহ্য হয় না, এক দিকে চলেই যাই, কি, কী করি ! এত কষ্ট গিয়েছে সে সময়।

—আচ্ছা, থাক্ সে-সব কথা এখন। রাত হয়েচে ঘুম আসচে—সারাদিন খাটুনি আর রাত্তির কালে ভ্যাজর-ভ্যাজর ভাল লাগে না।

যদুবাবু বোধ হয় ঘুমাইয়া পড়িলেন। তাঁহার স্ত্রী নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল। কিছুকাল পরে বলিল, ঘুমুলে নাকি ? ওগো !

যদুবাবু বিরক্তির সুরে বলিলেন, আঃ, কী ?

—তোমার পায়ে পড়ি, আমায় এবার এখানে রেখে যেয়ো না। আমি আর সহ্যি করতে পারছি নে—তুমি বোঝ। কখনও তো তোমায় এমন করে বলি নি—কেবল ওই ঠাকুরঝির জন্যে এখানে এতদিন থাকতে পেরেচি। নইলে কোন্ কালে এতদিন—একবার রটিয়ে দিলে, তুমি নাকি বিয়ে করেছ, আমার ছেলেপিলে হল না বলে। 'বলে, দাদা সেইজন্যেই বউদিদিকে ত্যাগ করে আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে রেখে গিয়েছে। সে কত কথা ! আমি ভেবে কেঁদে মরি। শুধু ঠাকুরঝি আমায় বোঝাত, বউ, তার কি এখন বিয়ের বয়স আছে যে, বিয়ে করবে ? তুমি ওসব শুনো না।

—তুমিও কি ভাব নাকি আমার বিয়ের বয়স নেই ?

—বয়েস থাকলে কী হবে, একটা বিয়ে করে তাই খেতে দিতে পার না, দুটো বিয়ে করে তোমার উপায় হবে কী ? কুঁজোর সাধ হয় চিত হয়ে শুতে—

এই কথায় যদুবাবুর পৌরুষের অভিমান ভীষণভাবে আহত হওয়ায় তিনি আর কোন কথা না বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন এবং বোধ হয় খানিকক্ষণ পরেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

চুনি এবার থার্ড ক্লাসে উঠিল। চেহারা আরও সুন্দর হইয়াছে, ওষ্ঠে গোঁফের ঈষৎ রেখা দেখা দিয়াছে।

নারাণবাবু পড়াইতে গিয়া তাহার সঙ্গে গল্প করেন নানা বিষয়ে—চুনিকে ছাড়িয়া যেন উঠিতে ইচ্ছা হয় না। চুনির মধ্যে একটি সুদুর্লভ রহস্য ও বিস্ময়ের ভাণ্ডার যেন গুপ্ত আছে, নারাণবাবু নানা কথায় ও প্রশ্নে সেই রহস্যভাণ্ডারের সন্ধান খুঁজিয়া বেড়ান। চুনি আসিবা-মাত্র নারাণবাবু কেমন আত্মহারা হইয়া যান—ভাল করিয়া পড়াইতেও যেন পারেন না, কেবল তাহার সহিত গল্প করিতে ইচ্ছা করে ! অথচ চুনি তাঁহাকে কী দিতে পারে ? তাঁহাকে সে রাজা করিয়া দিবে না, নারাণবাবু তাহা ভালই জানেন ; তবুও কেন এমন হয়, কে জানে ? মাস্টার পড়াইতে আসিয়া ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকায়, উঠিতে পারিলে বাঁচে ; অথচ নারাণবাবুর উঠিতে ইচ্ছা করে না, রাত্রি বেশী হইয়া যায়, চুনি পান্না ঘুমে ঢলিয়া পড়ে, কলিকাতার কলকোলাহল নীরব হইয়া আসে। নারাণবাবু ধমক দিয়া বলেন, এই চুনি, এই পান্না, ঢুলছিস নাকি ? পান্না চমকিয়া উঠিয়া বইয়ের পাতায় মন দিবার চেষ্টা করে, নিচু সলজ্জ সুরে বলে, ঘুম আসছে স্যার্, রাত অনেক হল—

চুনির মায়ের সুর খোলা দ্বারপথে ভাসিয়া আসে : আজ তোদের কি হবে না নাকি ? সারা রাত বসে ভ্যাজর ভ্যাজর করলেই বুঝি ভাল পড়ানো হয় ?

পরে ঈষৎ নেপথ্য হইতে শ্রুত হইল সেই একই কণ্ঠের সুর : বুড়ো মাস্টারটা বসে বসে করে কী এত রাত পর্য্যন্ত ? এত করে বলি ওঁকে, বুড়ো মাস্টার বদলে ফেল—বুড়ো দিয়ে কি নেকাপড়া হয় ?

চুনি লাফাইয়া উঠিয়া বাড়ীর মধ্যে মাকে হয়তো বা মারিতে ছোটে।

নারাণবাবু ধমক দিয়া চিৎকার করিয়া বলেন, এই চুনি কোথায় যাস্ ? পান্না যা তো, তোর দাদাকে ধরে নিয়ে আয়।

কিছুক্ষণ পরে চুনি ঘর্ম্মাক্ত রাঙা মুখে আসিয়া হাঁপাইতে থাকে।

—কোথায় গিয়েছিলি ?

—কোথাও না স্যার্।

—এই সব জ্ঞান হচ্চে তোমার, না ?

—না স্যার্। আপনি তাই সহ্য করেন, আপনার খেয়াল নেই কোনও দিকে। আমাদের বাড়ীতে আসেন, তা আমাদের কত ভাগ্যি। রোজ রোজ, মা এরকম করবে আমি—

—ছিঃ, মার সম্বন্ধে কোন কথা বলতে নেই ছেলের। মায়ের বিচার কি ছেলে করবে? আমারই দেরি হয়ে গিয়েছে আজ, উঠি বরং—

—না স্যার্, বসুন না আপনি।

চুনির মার কণ্ঠস্বর পুনরায় দ্বারপথে শ্রুত হইল: খাবি নে পোড়ারমুখো ছেলে? বামনী কি এত রাত পর্য্যন্ত তোমাদের ভাত নিয়ে বসে থাকবে নাকি?

নারাণবাবু লজ্জিত কৈফিয়তের সুরে অন্তরালবর্ত্তিনীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, বউমা, আমি এই যে যাই—যাচ্ছি—একটু দেরি হয়ে গেল আজ—

ঈষৎ নম্রসুরে উদ্দেশে উত্তর আসিল, ভাত নিয়ে থাকতে হয় ঠাকুরঝি, তাই বলি। নইলে মাস্টার পড়াচ্ছে, পড়াক না—আমি কি বারণ করি?

নারাণবাবু গলির ভিতর দিয়া চলিয়া আসিলেন, মনে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ। চুনি তাঁহার দিকে হইয়া মাকে মারিতে গিয়াছিল, তাঁহাকেই চুনি তবে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে, ভক্তি করে! কেন এ আনন্দ রাখিবার জায়গা নাই, বৃদ্ধ নারায়ণবাবু তা বুঝিতে পারেন। তাঁহার কেহ আপনার জন নাই এ বিশাল দুনিয়ায়, তবু চুনি আছে, বড় হইলে তাঁহাকে দেখিবে।

স্কুল-বাড়ীর বড় ছাদে রাত্রে আহারাদির পর নারাণবাবু পায়চারি করেন—বহুকালের অভ্যাস। আকাশে নক্ষত্ররাজি এই তেতলার ছাদ হইতে বেশ দেখা যায় বলিয়াই নারাণবাবু এই সময়ে উন্মুক্ত আকাশতলে বেড়াইতে ভালবাসেন। ডাকিলেন, ও জগদীশ ভায়া, খাওয়া-দাওয়া হল?

টীচারদের ঘরের পাশে ক্ষুদ্র টিনের একখানি চালায় জ্যোতির্ব্বিনোদ মাছ ভাজিতেছিলেন, উত্তর দিলেন, না দাদা, এই ছেলে পড়িয়ে এসে রান্না চড়িয়েছি। ও দাদা, আজ কী হয়েছিল জানেন?—বলিতে বলিতে জ্যোতির্ব্বিনোদ বাহিরে আসিলেন:—আজ এই লাল বাড়ীর সেই যে ছেলেটা ছাদে উঠে ডন্ কষত, সে আজ নতুন বউ নিয়ে বাড়ী এসেছে—পাড়াগাঁয়ের বাড়ীতে বিয়ে হয়েছিল, আজ বউ নিয়ে এল।

নারাণবাবু আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন বউ হল?

—খাসা বউ হয়েছে—ওরই মত ফরসা, দুজনে ছাদে বেড়াচ্ছিল, খুব হাসিখুশি—

—আহা, তা হোক, তা হোক—

—যাই দাদা, মাছ পুড়ে গেল কড়ায়।

কী জানি কেন, নারাণবাবুর হঠাৎ মনে পড়িল একটা ছবি। চুনি বিবাহ করিয়া বউ আনিয়াছে, যেমন চমৎকার রূপবান ছেলে, তেমনি লক্ষ্মী-প্রতিমার মত বধূ। পুত্রবধূ সাধ তাঁহার মিটিয়াছে। চুনি বলিতেছে, আমার বউ স্যার্ আপনার সেবা করবে না তো কার সেবা করবে? চুনি পুরীতে বউ লইয়া বেড়াইতে গিয়াছে, সঙ্গে তাঁহাকে লইয়া গিয়াছে, কারণ তাঁহার শরীর খারাপ। পুত্রের কর্ত্তব্য করিয়াছে সে।

চুনির বউ বলিতেছে, বাবা, আপনার পায়ে কি এ বেলা তেল মালিশ করতে হবে?

স্বপ্নাচ্ছন্ন অতীত দিবসগুলির কুয়াশা ভেদ করিয়া কত অস্পষ্ট মুখ উঁকি মারে! দুপুরের

সময় টিফিনের ছুটিতে কিংবা বেলা পড়িলে কতবার তিনি এই রকম ছাদে বেড়াইতেন, এই ছাদটিতে উঠিলেই সেই পুরানো দিন, তাহাদের সঙ্গে জড়িত কত মুখ মনে পড়ে !

একখানি মুখ মনে পড়ে—সুন্দর মুখখানি, ডাগর চোখে নিষ্পাপ দৃষ্টি, আট-ন বছরের ছেলে, নাম ছিল সুদেব। মুখের মধ্যে লেবেনচুষ পুরিয়া দিত, তখন নারাণবাবুর মাথার চুলে সবে পাক ধরিয়াছে, টিফিনের সময় রোজ পাকা চুল আটগাছি দশগাছি তুলিয়া দিত। বলিত, আপনাকে ছেড়ে কোন স্কুলে যাব না স্যার্।

তারপর আর ভাল মনে হয় না—অগণিত ছাত্রসমুদ্রে দূর হইতে দূরান্তরে তাহাদের অপস্রিয়মাণ মুখ কখন যে হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল, তার হিসাব মনের মধ্যে খুঁজিয়া মেলে না আর। জীবনের পথ বহু পথিকের আসা-যাওয়ার পদচিহ্নে ভরা, কোথাও স্পষ্ট, কোথাও অস্পষ্ট।

ঘরে আসিয়া শুইবার ইচ্ছা হইল না, নারাণবাবু আবার ডাকিলেন, ও জগদীশ, কী করলে রান্নাবান্না ?

জ্যোতির্বিনোদ অন্নপিণ্ডরুদ্ধ স্বরে বলিলেন, খেতে বসেছি দাদা।

—আচ্ছা, খাও খাও—

এই স্কুলবাড়ীর ছোট ঘরটিতে কত কাল বাস ! কত সুপরিচিত পরিবেশ, কত দূর অতীতের স্মৃতিভরা মাস, বৎসর, যুগ ! আশপাশের বাড়ীর গৃহস্থ জীবনের কত সুখ, আনন্দ, সঙ্কট তাঁহার চোখের উপর ঘটিয়া গিয়াছে। মনে মনে তিনি এই অঞ্চলের পাড়াসুদ্ধ ছেলে মেয়ে, তরুণী কন্যা বধূদের বুড়ো দাদু, যদিও তাহাদের মধ্যে কেহই তাঁহাকে জানে না, চেনে না। আদর্শ শিক্ষক অনুকূলবাবুর স্মৃতিপূত এই বিদ্যালয়গৃহ, এ জায়গা যে কত পবিত্র—কী যে এখানে একদিন হইয়া গিয়াছে, তার খোঁজ রাখেন শুধু নারাণবাবু।

আজ মনে এত আনন্দ কেন ?

কী অপূর্ব আনন্দ, একটা তরুণ মনের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি আজ তিনি আকর্ষণ করিতে পারিয়া ধন্য হইয়াছেন। অনুকূলবাবু বলিতেন, দেখ নারাণ, একটা বেলগাছে বছরে কত বেল হয় দেখেচ ? একটা বেলের মধ্যে কত বিচি থাকে, প্রত্যেক বিচিটি থেকে এক হাজার মহীরুহ জন্মাতে পারে। কিন্তু তা জন্মায় না। একটা বেলগাছের ষাট-সত্তর বৎসর-ব্যাপী জীবনে অত বিচি থেকে গাছ জন্মায় না—অন্তত দুটি বেলচারা মানুষ হয়, বড় হয়, আবার বহু বেল ফল দেয়। বহু অপচয়ের হিসেব কষেই এই পুষ্টির ইঞ্জিনীয়ারীং দাঁড় করিয়ে রেখেছেন ভগবান্। তার মধ্যেই অপচয়ের সার্থকতা। স্কুলের সব ছেলে কি মানুষ হয় ? একটা স্কুল থেকে ষাট বছরে দুটো-একটা মানুষ বার হলেও স্কুলের অস্তিত্ব সার্থক। এই ভেবেই আনন্দ পাই নারাণ। প্রত্যেক শিক্ষক, যিনি শিক্ষক নামের যোগ্য—এই ভেবেই তাঁর আনন্দ ও উৎসাহ। দেশের সেবার সব চেয়ে বড় অর্ঘ্য তাঁরা যোগান—মানুষ।

জ্যোতির্বিনোদ নারাণবাবুর সামনে বিড়ি খান না। আড়ালে দাঁড়াইয়া ধূমপান শেষ করিয়া ছাদের এধারে আসিয়া বলিলেন, দাদা, এখনও খান নি ? রাত অনেক হয়েছে।

—না, খাব না, শরীরটা আজ তেমন ভাল নেই।

—কী হয়েছে দাদা? দেখি, হাত দেখি? তাই তো, আপনার যে জ্বর হয়েছে। ছাদে ঠাণ্ডা লাগিয়ে বেড়াবেন না, বেশ গা গরম। চলুন নীচে দিয়ে আসি।

—বোস বোস। এ একটু-আধটু গা-গরমে কিছু আসবে-যাবে না। আকাশের নক্ষত্র চেন? তুমি তো জ্যোতিষ নিয়ে ব্যবসা কর। য়্যাস্ট্রনমি জান? ওই যে এক-একটা নক্ষত্র দেখছ—এক-একটা সূর্য্য। আমি যদি বলি, এই পৃথিবীর মত বহু হাজার পৃথিবী ওই সব নক্ষত্রের মধ্যে আছে, তা হলে তুমি কি তার প্রতিবাদ করতে পার?

—আজ্ঞে না দাদা, প্রতিবাদ তো দূরের কথা—আমি কথাটি বলব না, আপনি যত ইচ্ছে বলে যান। যখন ও নিয়ে কখনও মাথা ঘামাইনি—আপনি যেমন জ্যোতিষ আলোচনা করেন নি কখনও—বলেন, ওসব মিথ্যে।

—মিথ্যে বলি নে, আন্‌সায়েন্টিফিক্ বলি।

—ওই একই কথা দাদা। দু পয়সা করে খাই, কাজেই বিশ্বাস করি।

নারাণবাবু ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িলেন। রাত্রে ভয়ানক পিপাসা। সমস্ত গায়ে ব্যথা। ঘুমের ঘোরে আর জ্বরের ঘোরে কত কী অস্পষ্ট স্বপ্ন দেখিলেন—চুনির মুখ, তাঁহার ছেলে নাই, কেহ কোথাও নাই। কেন! এত ছাত্র আছে, চুনি আছে, শিয়রে চুনি বসিয়া তাঁহার সেবা করিতেছে।

পরদিন নারাণবাবু সকালে বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে পারিলেন না। দুইচার দিন গেল, তবুও জ্বর কমে না। ক্ষেত্রবাবু ও রামেন্দুবাবু প্রায়ই আসিয়া বসিয়া থাকেন। হেডমাস্টার প্রথমে নিজের ঔষধের বাক্স হইতে বাইওকেমিক দিলেন, তারপর ডাক্তার ডাকাইলেন। জ্যোতির্ব্বিনোদ কোথা হইতে নিজের দেশের এক কবিরাজ আনিলেন। ছাত্রেরা কেহ কেহ দেখিয়া গেল। পালা করিয়া রাত জাগিতেও লাগিল।

সকালে স্কুলের মাস্টারেরা দেখিতে আসিয়া খবরের কাগজে একটা খুনের সংবাদ শুনাইয়া গিয়াছিল। নারাণবাবু শুইয়া ভাবিতেছিলেন, মানুষে কী করিয়া খুন করে? একবার তিনি এই স্কুলের ঘরেই রাত্রে আলো জ্বালিয়া পড়িতেছিলেন, ডেয়ো-পিঁপড়ের দল আসিয়া জুটিল লণ্ঠনের আশেপাশে—চাপড় মারিয়া গোটা তিনেক ডেয়ো-পিঁপড়ে মারিয়াছিলেন। তারপর সে কী দুঃখ তাঁহার মনে! একটা ডেয়ো-পিঁপড়ে আধ-মরা অবস্থায় ঠ্যাং নাড়িয়া চিত হইয়া ছটফট করিতেছিল, সেটাকে বাঁচাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কিছুতেই সেটাকে বাঁচানো গেল না। নারাণবাবুর মনে হইল, তিনি জীবহত্যা করিয়াছেন—দুঃখ ও অনুতাপে নিজেকে অতি নীচ বলিয়া বিবেচনা হইল। কী জানি, মানুষের বিচার করার ভার মানুষের উপর নাই। তিনি যে খুনী নহেন, তাহা কে বলিবে?

নারাণবাবু শুইয়া যেন সমস্ত জীবনের একটা ছবি চোখের সামনে খেলিয়া যাইতে দেখিতে পান। তারাজোল গ্রামের উত্তরে প্রকাণ্ড তালদীঘি, তাহার পাড়ে ঘন তালের বন, কোনকালে রাঢ় অঞ্চলের ঠ্যাঙাড়ে ডাকাতেরা সেই দীঘির পাড়ে মানুষ মারিত। কাঁটা-

জঙ্গলের ঝোপ, আঁচোড় বাসক ফুলের গাছ নিবিড় হইয়া উঠিয়া মানুষের উগ্র লোলুপতার লজ্জা শ্যামল শান্তি ও বনকুসুমের গন্ধে ঢাকিয়া দিয়াছে। চীনা পর্য্যটক আই সিং যেমন বলিয়াছেন—মন ও অন্তঃকরণের তৃষ্ণা হইতে দুঃখ আসে, পুনর্জ্জন্ম আসে। কিন্তু তৃষ্ণা দূর কর, লোভকে ঢাকিয়া মনে শান্তি স্থাপন কর—ভ্রমসমুদ্রে মানবাত্মার পরিভ্রমণ শেষ হইবে। না, কী যেন ভাবিতেছিলেন—তারাজোল গ্রামের তালদীঘির কথা। মনের মধ্যে উল্টা-পাল্টা ভাবনা আসিতেছে।

পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের সেই হুগলী জেলার অন্তঃপাতী ক্ষুদ্র গ্রামখানি আজ আবার স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, মুখুজ্জেবাড়ীর ছেলে ছুনু ছিল সঙ্গী, ছুনুর সঙ্গে বাঁশতলায় বাঁশের শুকনা খোলা কুড়াইয়া আনিয়া নৌকা করিতেন। একবার তেঁতুলগাছে উঠিয়া তেঁতুল পাড়িতে গিয়া হাত ভাঙিয়াছিলেন, সাত ক্রোশ হাঁটিয়া দামোদরের বন্যা দেখিতে গিয়া পথে এক গ্রামে কামারবাড়ী রাত্রে তিনি ও তাঁহার দুইজন বালক সঙ্গী চিঁড়া-দুধ খাইয়া তাহাদের দাওয়ায় শুইয়া ছিলেন—যেন কালিকার কথা বলিয়া মনে হইতেছে। কতকাল তারাজোল যাওয়া হয় নাই!

কেহ নাই আপনার লোক সে গ্রামে। বহুদিন আগে পৈতৃক বাড়ী ভাঙিয়া চুরিয়া লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর আগে তিন দিনের জন্য তারাজোল গিয়া প্রতিবেশীর বাড়ী কাটাইয়া আসিয়াছিলেন, আর যান নাই। তখনই বাল্যদিনের সে বাড়ীঘর জঙ্গলাবৃত ইষ্টকস্তূপে পরিণত হইয়াছে দেখিয়াছিলেন—হ্যাঁ, প্রায় ত্রিশ বৎসর হইবে।

নারাণবাবু মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেন।

জ্যোতির্ব্বিনোদ ও যদুবাবু একসঙ্গে ঘরে ঢুকিলেন।

যদুবাবু বলিলেন, কেমন আছেন দাদা? এই দুটো কমলালেবু—ওহে জ্যোতির্ব্বিনোদ, দাও না রস ক'রে।

শ্রীশবাবু উঁকি মারিয়া বলিলেন, কে ঘরে বসে?

যদুবাবু বলিলেন, এই আমরাই আছি। এস শ্রীশ ভায়া।

—দাদা কেমন?

—এই একটু কমলালেবুর রস খাওয়াচ্ছি।

নারাণবাবুর তৃষিত দৃষ্টি দোরের দিকে চাহিয়া থাকে। দুই দিন, তিন দিন, কোন দিনই চুনিকে দেখতে পান না। চুনি আসে না কেন? বোধ হয় সে শোনে নাই তাঁহার অসুখের কথা।

সকলে চলিয়া যায়। গভীর রাত্রি। টিমটিম করিয়া আলো জ্বলিতেছে।

উত্তর মাঠে গ্রামের বাঁশবনের ও-পারে দুইটি লোক আকন্দ গাছের পাকা ও ফাটা ফল সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতেছে—তুলা বাহির করিয়া খেলা করিবে। তিনি আর ছুনু। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের তারাজোল গ্রাম। ছুনু বাঁচিয়া নাই—প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে মারা গিয়াছে!...

—কে ?

—আমি কমলেশ স্যার, আমাদের নাইট-ডিউটি আজ। বিমলও আসছে।

—নারাণবাবু বলিলেন, হ্যাঁ কমলেশ, চুনিকে চিনিস ?

—না স্যার।

—থার্ডক্লাসে পড়ে—ভাল নামটা কী যেন! দীপ্তি বোধ হয়।

—হ্যাঁ স্যার।

—কাল একবার বলবি বাবা—

নারাণবাবু হাঁপাইতে লাগিলেন। কথা বলিবার শ্রম সহ্য হয় না।

—বলব স্যার, আপনি বেশী কথা বলবেন না—গরম জলটা করি। মালিশটা—

পরদিন সকাল হইতে নারাণবাবু আর মানুষ চিনিতে পারেন না।

কমলেশ ও বিমল চুনিকে গিয়া বলিল। চুনি মহাব্যস্ত, আজ তাহাদের পাড়ার ম্যাচ, তাহাকে ব্যাকে খেলিতে হইবে। আচ্ছা, খেলার পর বরং—রাত্রেই সে চেষ্টা করিয়া দেখিবে।

চুনি আসিয়াছিল, কিন্তু নারাণবাবু আর তাহাকে চিনিতে পারেন নাই। লোকে বলিতেছিল, তাঁহার জ্ঞান নাই। সে কথা আসলে ঠিক নয়। তিনি তখন তারাজোল গ্রামের মাঠে, বনে, দামোদরের বাঁধে বাল্যসঙ্গী ছুনু আর গদাই নাপিতের সঙ্গে আকন্দগাছের ফলের তুলা সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত ছিলেন, পঞ্চাশ বৎসর আগের দিনগুলির মত। চুনির কণ্ঠস্বরও তাঁহাকে সেখান হইতে ফিরাইতে পারিল না।

কখনও বা অনুকূলবাবু তাঁহাকে বলিতেছিলেন, নারাণ, মানুষ তৈরী করতে হবে। তুমি আর আমি দুজনে যদি লাগি—।…বউবাজারে এই স্কুলের একটা ব্রাঞ্চ খুলব সামনের বছর থেকে। তুমি হবে য়্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাস্টার। সব বেলফলের বিচি থেকে কি চারা হয় ? বহু অপচয়ের অঙ্ক হিসেবে ধরেই ভগবানের এই সৃষ্টি। ভগবানের গৃহস্থালী কৃপণের গৃহস্থালী নয় নারাণ।…

স্কুল-মাস্টারের মধ্যে সবাই তাঁহার খাটিয়া বহন করিয়া নিমতলায় লইয়া গেল। হেড-মাস্টার নিজের পয়সায় ফুল কিনিয়া দিলেন। অনেক ছাত্রও সঙ্গে গেল। শুধু ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুল নয়, আশেপাশে দুই-তিনটি স্কুলও এই আদর্শ শিক্ষাব্রতীর মৃত্যুতে একদিন করিয়া বন্ধ রহিল।

•

যদুবাবু বাজার করিয়া বাসায় ফিরিলেন। স্কুলের সময় হইয়া গিয়াছে। স্ত্রীকে বলিলেন, মাছটা ভেজে দাও, নটা বেজে গিয়েছে—আজ একজামিন আরম্ভ হবে কিনা! ঠিক টাইমে না গেলে সাহেব বকাবকি করবে।

শীতকালের বেলা। বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হইবে বলিয়া যদুবাবু সকালে উঠিয়া বাসার অতি ক্ষুদ্র দাওয়াটাতে দাড়ি কামাইতে বসিয়াছিলেন। দাড়ি কামানো শেষ করিয়া বাজারে গিয়াছিলেন।

দৈর্ঘ্যে সাত ফুট, প্রস্থে সাড়ে তিন ফুট ঘর—দাওয়ার এক পাশে রান্নাঘর। ঘরের জানলা খুলিলে পিছনের বাড়ীর ইট-বাহির-করা দেওয়াল চোখে পড়ে। ভাগ্যে শীতকাল, তাই রক্ষা—সারা গরমকাল ও বর্ষাকালের ভীষণ গুমটে অধিকাংশ দিন রাত্রে ঘুম হইত না। তাই সাড়ে আট টাকা ভাড়া।

ভাত খাইতে খাইতে যদুবাবু বলিলেন, বাসা বদলাব, এখানে মানুষ থাকে না, তার ওপর অবনীটা এ বাসার ঠিকানা জানে। ও যদি আবার এসে জোটে—

যদুবাবুর স্ত্রী বলিল, তা অবনী ঠাকুরপো তোমার স্কুলে যাবে, স্কুল তো চেনে। বাসা বদলালে কী হবে! কা বুদ্ধি!

—ওগো, না না। স্কুলে আমাদের যার-তার ঢোকবার জো নেই। দারোয়ানকে বলে রেখে দেব, হাঁকিয়ে দেবে। এ বাড়ীর ভাড়াটাও বেশী।

—এর চেয়ে সস্তা আর খুঁজো না। টিকতে পারবে না সে বাসায়। এখানে আমি যে কষ্টে থাকি! তুমি বাইরে কাটিয়ে আস, তুমি কি জানবে?

—কলকাতার বাইরে ডায়মণ্ডহারবার লাইনে গড়িয়া কি সোনারপুরে বাসা ভাড়া পাওয়া যায়—সস্তা, কিন্তু ট্রেনভাড়াতে মেরে দেবে।

স্কুলে যাইতে কিছু বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। মিঃ আলম ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, ক্লাসে পেপার দেওয়া হয় নি। এত দেরি করে এলেন প্রথম দিনটাতেই?

একটু পরেই হেডমাস্টারের টেবিলের সামনে গিয়া যদুবাবুকে দাঁড়াইতে হইল। সাহেব বলিলেন, যদুবাবু, বড়ই দুঃখের কথা—কাজে আপনার আর মন নেই দেখা যাচ্ছে।

—না স্যার, বাড়ীতে অসুখ।

—ওসব ওজর এখানে চলবে না—মাই গেট্ ইজ ওপ্‌ন্—যদি আপনার না পোষায়—

—স্যার, এবার আমায় মাপ করুন—আর কখনও এমন হবে না।

ব্যাপার মিটিয়া গেল। যদুবাবু আসিয়া হলে পরীক্ষারত ছেলেদের খবরদারি আরম্ভ করিলেন।

—এই দেবু, পাশের ছেলের খাতাব দিকে চেয়ে কী হচ্ছে?

একটি ছেলে উঠিয়া বলিল, তিনের কোশ্চেনটা স্যার, একটু মানে করে দেবেন?

—কই, দেখি কী কোশ্চেন! এ আর বুঝতে পারলে না? বুড়ো ধারি ছেলে—তবে পড়াশুনোর দরকার কী?

—স্যার, এ ধারে ব্লটিং পেপার পাই নি—একখানা দিয়ে যাবেন।

হেডমাস্টার একবার আসিয়া চারিদিক ঘুরিয়া দেখিয়া গেলেন। গেম-টীচার পাশের ঘরে চেয়ারে বসিয়া একখানা নভেল পড়িতেছিল, হেডমাস্টারকে হলে ঢুকিতে দেখিয়া, বইখানা টেবিলে রক্ষিত ছেলেদের বইয়ের সঙ্গে মিশাইয়া দিল। পিছনের বেঞ্চিতে দুইটি ছেলে পাশাপাশি বসিয়া বই দেখিয়া টুকিতেছিল, হেডমাস্টারকে পাশের হলে ঢুকিতে শুনিয়া বইখানা একজন ছেলে তাহার শার্টের তলায় পেট্‌কোঁচড়ে বেমালুম গুঁজিয়া ফেলিল।

জিনিসটা এবার গেম-মাস্টারের চোখ এড়াইল না, কারণ তাহার দৃষ্টি আর নভেলের পাতায় নিবদ্ধ ছিল না, ধীরে ধীরে কাছে গিয়া ছেলেটির পিঠে হাত দিয়া গেম-টীচার কড়াস্বরে হাঁকিল, কী ওখানে ? দেখি, বার কর—

ছেলেটির মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। সে বলিল, কিছু না স্যার্—

—দেখি কেমন কিছু না—

বলা বাহুল্য, বই নিছক জড়পদার্থ, যেখানে রাখ সেখানেই থাকে, টানিতেই বাহির হইয়া পড়িল, ছেলেটি বিষণ্ণমুখে দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল। তাহার অপকার্য্যের সাথী পাশের ছেলেটি তখন একমনে খাতার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া নিতান্ত ভালমানুষের মত লিখিয়া চলিয়াছে।

দণ্ডায়মান ছাত্রটি হঠাৎ তাহার দিকে দেখাইয়া বলিল, স্যার্, ক্ষিতীশও তো এই বই দেখে লিখছিল।

ক্ষিতীশ বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, আমি ! আমি টুকছিলাম ?

গেম-টীচার বইখানি ক্ষিতীশকে দেখাইয়া বলিলেন, এই বই দেখে তুমিও টুকছিলে ?

ক্ষিতীশ অবাক হইয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া বইখানির দিকে চাহিয়া রহিল, যেন জীবনে সে এই প্রথম সে-বইখানা দেখিল।

—আমি স্যার্ টুকব বই দেখে ! আমি !

তাহার মুখের ক্ষুব্ধ, অপমানিত ও বিস্মিত ভাব দেখিয়া মনে হয়, যেন গেম মাস্টার তাহাকে চুরি বা ডাকাতি কিংবা ততোধিক কোন নীচ কার্য্যে অপরাধী স্থির করিয়াছেন।

সুতরাং সে বাঁচিয়া গেল ! তাহার বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ নাই—এক আসামী ছাত্রের উক্তি ছাড়া গেম-মাস্টার কিছু দেখেন নাই। আসামী হেডমাস্টারের টেবিলের সম্মুখে নীত হইল, সেখানেও সে তাহার সঙ্গীর নাম করিতে ছাড়িল না।

হেডমাস্টার হাঁকিলেন, বি এ স্পোর্ট, আর ইউ নট্ অ্যাশেম্‌ড্ অফ নেমিং ওয়ান অফ ইওর ক্লাস মেট্‌স্—কাম, হাভ্ ইট্—

সপাসপ বেতের শব্দে আশেপাশের ঘরের ও হলের ছাত্রেরা ভীত ও চকিত দৃষ্টিতে হেডমাস্টারের আপিস-ঘরের দিকে চাহিল।

ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা পড়িল।

পাহারাদার শিক্ষকেরা হাঁকিলেন, ফিফ্‌টিন্ মিনিট্‌স্ মোর—

একটি ছেলে ও-কোণে দাঁড়াইয়া বলিল, স্যার্, আমাদের ক্লাসে দেরিতে কোশ্চেন্ দেওয়া হয়েছে—

যদুবাবুই এজন্য দায়ী। তিনি হাঁকিয়া বলিলেন, এক মিনিটও সময় বেশী দেওয়া হবে না—

কারণ, তাহা হইলে আরও খানিকক্ষণ তাঁহাকে সে ক্লাসের ছেলেগুলিকে আগলাইয়া বসিয়া থাকিতে হয়। ছেলেরা কিন্তু অনেকেই আপত্তি জানাইল। মিঃ আলমের কাছে

আপীল রুজু হইল অবশেষে। আপীলে ধার্য্য হইল, সেই ক্লাসের ছেলেরা আরও পনেরো মিনিট বেশী সময় পাইবে। যদুবাবুকে অপ্রসন্নমুখে আরও কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিতে হইল।

কেরানী প্রত্যেক টীচারের কাছে স্লিপ পাঠাইয়া দিল,—মাহিনা আজ দেওয়া হইবে, যাইবার সময় যে যার মাহিনা লইয়া যাইবেন।

প্রায় সব টীচারই সারা মাস ধরিয়া কিছু কিছু লইয়া আসিয়াছেন—বিশেষ কিছু পাওনা কাহারও নাই। কাটাকাটি করিয়া কেহ বারো টাকা, কেহ পনেরো টাকা হাতে করিয়া বাড়ী ফিরিলেন। ইহার মধ্যে যদুবাবুর অভাব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, তাঁহার পাওনা দাঁড়াইল পাঁচ টাকা কয়েক আনা।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, চা খাবেন নাকি যদুদা? চলুন।

যদুবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আর চা! যা নিয়ে যাচ্ছি এ দিয়ে স্ত্রীর এক জোড়া কাপড় নিয়ে গেলেই ফুরিয়ে গেল!

দুইজনে চায়ের দোকানে গিয়া ঢুকিলেন।

ক্ষেত্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কী খাবেন যদুদা? আর এখন তো স্কুলের মধ্যে আপনিই বয়সে বড়, নারাণবাবু মারা যাওয়ার পরে।

—দেখতে দেখতে প্রায় দু বছর হয়ে গেল। দিন যাচ্চে, না, জল যাচ্চে! মনে হচ্চে সে দিন মারা গেলেন নারাণদা।

—হেডমাস্টারকে বলে নারাণবাবুর একটা ফোটো, কি অয়েলপেণ্টিং—

—পাগল হয়েছ ভায়া, পুওর স্কুল, মাস্টারদের মাইনে তাই আজ পনেরো বছরের মধ্যে বাড়া তো দূরের কথা, ক্রমে কমেই যাচ্চে—তাও দু মাস খেটে এক মাসের মাইনে নিতে হয়। এ স্কুলে আবার অয়েলপেণ্টিং ঝুলনো হবে নারাণবাবুর—পয়সা দিচ্চে কে?

দোকানের চাকর সামনে দুই পেয়ালা চা ও টোস্ট রাখিয়া গেল। যদুবাবু বলিলেন, না না টোস্ট না, শুধু চা।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, খান দাদা আমি অর্ডার দিয়েচি, আমি পয়সা দেব ওর।

—তুমি খাওয়াচ্চ? বেশ বেশ, তা হলে একখানা কেক্‌ও অমনি—

দুইজনে চা খাইতে খাইতে গল্প করিতেছেন, এমন সময়ে খবরের কাগজের স্পেশাল লইয়া ফিরিওয়ালাকে ছুটিতে দেখা গেল—কী একটা মুখে চিৎকার করিয়া বলিতে বলিতে ছুটিতেছে। ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, কী বলচে দাদা? কী বলচে?

দোকানী ইতিমধ্যে কখন্ বাহিরে গিয়াছিল। সে একখানা কাগজ আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল, দেখুন না পড়ে বাবু—জাপান, ইংরেজ আর মার্কিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করচে—

দুইজনেই একসঙ্গে বিস্ময়সূচক শব্দ করিয়া কাগজখানা উঠাইয়া লইলেন। যদুবাবুই চশমাখানা তাড়াতাড়ি বাহির করিয়া পড়িয়া বিস্ময়ের সঙ্গে বলিলেন, য়্যাঁ—এ কী! এই তো লেখা রয়েছে জাপান য়্যাটাক্‌স্ পার্ল হারবার—এ কী! গ্রেট্ ব্রিটেন আর মার্কিন—

যদুবাবু 'গ্রেট ব্রিটেন' কথাটা বেশ টানটোন দিয়া লম্বা করিয়া গালভরা ভাবে উচ্চারণ করিলেন।

—উঃ! গ্রেট ব্রিটেন আর ইউনাইটেড স্টেট্‌স্ অব আমেরিকা!

ক্ষেত্রবাবু 'ইউনাইটেড স্টেট্‌স্ অব আমেরিকা' কথাটা উচ্চারণ করিতে ঝাড়া এক মিনিট সময় লইলেন। দুইজনেই বেশ পুলকিত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন হঠাৎ। কেন, তাহার কোন কারণ নাই। একঘেয়ে দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে যেন বেশ একটা নূতনত্ব আসিয়া গেল —নারাণবাবুর মৃত্যুর কিছুদিন পরেই ইউরোপে যুদ্ধ বাধিয়াছে, এবং এতদিন, আজ প্রায় দুই বৎসর, চায়ের আসর নিত্যনূতন যুদ্ধের খবরে মশগুল হইয়া ছিল। কিন্তু আজ এ আবার এক নূতন ব্যাপারের অবতারণা হইল তাহার মধ্যে।

যদুবাবু বলিলেন, আরে চল চল, স্কুলে ফিরে যাই—এত বড় খবরটা দিয়ে যাই সকলকে—

—তা মন্দ নয়, চলুন যদুদা। ওহে, তোমার কাগজখানা একটু নিয়ে যাচ্চি। দিয়ে যাব এখন ফেরত।

যে স্কুলের বাড়ী ছুটির পরে কারাগারের মত মনে হয়, ইঁহারা মহা উৎসাহে কাগজখানা হাতে করিয়া সেই স্কুলে পুনরায় ঢুকিলেন। মিঃ আলম, শ্রীশবাবু, জ্যোতির্বিনোদ, হেড-পণ্ডিত, রামেন্দুবাবু প্রভৃতির এ বেলা ডিউটি। তাঁহাদের মধ্যে সকলেই বিভিন্ন ঘরে পাহারাদি দিতেছেন—উৎসাহের আতিশয্যে উভয়ে কাগজখানা লইয়া গিয়া একেবারে হেডমাস্টারের টেবিলে ফেলিয়া দিলেন।

হেডমাস্টার বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, কী?

—দেখুন স্যার, জাপান হাওয়াই দ্বীপ আর পার্ল হারবার হঠাৎ আক্রমণ করেছে—মিটমাটের কথা হচ্ছিল—হঠাৎ—

হেডমাস্টার সে কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। বলিলেন, কই দেখি?

খবরটা বিদ্যুদ্বেগে স্কুলের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া গেল। ছেলেরা অনেকে টীচারদের নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিল। স্কুলের অটুট শৃঙ্খলা ভঙ্গ হইয়া বিভিন্ন ঘরে ছেলেদের উত্তেজিত কণ্ঠের প্রশ্ন ও মধ্যে মধ্যে দুই-একজন শিক্ষকের কড়া সুরে হাঁকডাক শ্রুত হইতে লাগিল —এই! স্টপ্ দেয়ার! উইল ইউ? ইউ, রমেন, ডোণ্ট বি টকিং—হু টক্‌স্ দেয়ার? ইত্যাদি ইত্যাদি।

যদুবাবু ও ক্ষেত্রবাবু স্কুল হইতে বাহির হইলেন, কিন্তু চায়ের দোকানে কাগজ ফেরত দেওয়া হইল না, কারণ স্কুলের টীচারদের ব্যূহ ভেদ করিয়া কাগজখানা বাহির করিয়া আনা গেল না।

পড়াইতে গিয়া যদুবাবু আজ আর ছেলেকে ক্লাসের পড়া বলিয়া দিতে পারিলেন না। ছেলের বাবা ও কাকাকে জাপানের ও প্রশান্ত মহাসাগরের ম্যাপ দেখাইতে দেখাইতে সময় কাটিয়া গেল।

বাসায় ফিরিবার মুখে গলিতে বৃদ্ধ প্রতিবেশী মাখন চক্রবর্ত্তী রোয়াকের উপর অন্যান্য

উৎসাহী শ্রোতাদের মধ্যে বসিয়া আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতির গুহ্য তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন, যদুবাবুকে দেখিয়া বলিলেন, কে? মাস্টার মশায়? কী ব্যাপার শুনলেন? খিদিরপুরে পাঁচশো জাপানী গুপ্তচর ধরা পড়েচে জানেন তো?

—সে কী! কই, তা তো কিছু শুনি নি। না বোধ হয়—

চক্রবর্ত্তী মশায় বিরক্তির সুরে বলিলেন, না কী ক'রে জানলেন আপনি? সব পিঠমোড় করে বেঁধে চালান দিয়েছে লালবাজারে। যারা দেখে এল, তারা বললে!

—কে দেখে এল?

—এই তো এখানে বসে বলছিল—ওই ওপাড়ার—কে যেন—কে হে? সুরেশ বলে গেল?

শেষ পর্য্যন্ত শোনা গেল, কথাটা কে বলিয়াছে, তাহার খবর কেহই দিতে পারে না।

যদুবাবু বাসায় আসিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, শুনেছ, আজ জাপানের সঙ্গে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের যুদ্ধ বেধেচে?

—সে কোথায় গো?

—বুঝিয়ে বলি তবে শোন—ম্যাপ বোঝ? দাঁড়াও, এঁকে দেখাচ্ছি।

—ওগো, আগে একটা কথা বলি শোন। অবনী ঠাকুরপো এসেচে আজ।

যদুবাবুর উৎসাহ ও উত্তেজনা এক মুহূর্ত্তে নিবিয়া গেল। বলিলেন, য়্যাঁ! অবনী? কোথায় সে?

—আমায় বললে, চা করে দাও বউদি। চা করে দিলাম, তারপর তোমার আসবার দেরি আছে শুনে সন্ধ্যের সময় কোথায় বেরুল।

—তা তো বুঝলাম! শোবে কোথায় ও? বড্ড জ্বালালে দেখচি। এইটুকু তো ঘর—ওই বা থাকে কোথায়, তুমি আমিই বা যাই কোথায়? রাঁধছ কী?

—কী রাঁধব, তুমি আজ বাজার করবে বললে এ বেলা। বাজার তো আনলে না, আমি ভাত নামিয়ে বসে আছি। দুটো আলু ছিল, ভাতে দিয়েছি, আর কিচ্ছু নেই।

—নেই তো আমি কী জানি? আমি কি কাউকে আসতে বলেচি এখানে!

—তা বললে কি হয়! আসতে বলে নি, তুমিও না, আমিও না—কিন্তু উপায় কী? নিয়ে এস কিছু।

যদুবাবু নিতান্ত অপ্রসন্নমুখে বাজার করিতে চলিলেন। তাঁহার মনে আর বিন্দুমাত্র উত্তেজনা ছিল না—এ কী দুর্দ্দৈব! অবনী আবার কোথা হইতে আসিয়া জুটিল।

রাত্রি নয়টার পরে অবনী একগাল হাসিয়া হাজির হইল: এই যে দাদা, একটু পায়ের ধুলো—ভাল আছেন বেশ?

—হ্যাঁ, ভাল। তোমরা সব ভাল? বউমা, ছেলেপিলে? নন্তু ভাল? আমি শুনলাম তোমার বউদিদির মুখে যে তুমি এসেচ, শুনে আমি ভারী খুশী হলাম। বলি—বেশ, বেশ। কতদিন দেখাটা হয় নি—আছ তো দু-একদিন?

—তা দাদা, আমি তো আর পর ভাবি নে। এলাম একটা চাকরি-টাকরি দেখতে। সংসার আর চলে না। বলি—যাই, দাদার বাসা রয়েছে। নিজের বাড়ীই। সেখানে থাকি গে, একটা হিল্লে না করে এবার আর হঠাৎ বাড়ী ফিরছি নে। কিছুদিন ধরে কলকাতায় না থাকলে কিছু হয় না।

অবনীর মতলব শুনিয়া যদুবাবুর মুখের ভাব অনেকটা ফাঁসির আসামীর মত দেখাইল! তবুও ভদ্রতাসূচক কী একটা উত্তর দিতে গেলেন, কিন্তু গলা দিয়া ভাল স্বর বাহির হইল না।

আহারাদির পর যদুবাবুর স্ত্রী বলিল, আমি বাড়ীওলার পিসীর সঙ্গে গিয়ে না হয় শুই, তুমি আর অবনী ঠাকুরপো—

যদুবাবু চোখ টিপিয়া বলিলেন, তুমি পাথুরে বোকা। কষ্ট ক'রে শুতে হচ্ছে এটা অবনীকে দেখাতে হবে, নইলে ও আদৌ নড়বে না। কিছু না, এই এক ঘরেই সব শুতে হবে।

যদুবাবুর আশা টিকিল না। সেই ভাবে হাত-পা গুটাইয়া ছোট ঘরে শুইয়া অবনী তিন দিন দিব্য কাটাইয়া দিল। যাওয়ার নামগন্ধ করে না।

একদিন বলিল, দাদা, চলুন, আজ বউদিদিকে নিয়ে সব সুদ্ধু টকি দেখে আসি। পয়সা রোজগার করে তো কেবল সঞ্চয় করছেন, কার জন্যে বলতে পারেন? ছেলে নেই, পুলে নেই।

যদুবাবু হাসিয়া বলিলেন, তা তোমার বউদিদিকে তুমি নিয়ে গিয়ে দেখাও না কেন?

—হ্যাঁঃ, আমার পয়সাকড়ি যদি থাকবে—

অবনী একেবারে নাছোড়বান্দা। অতি কষ্টে যদুবাবু আপাতত তাহার হাত এড়াইলেন।

কয়েক দিন কাটিয়া গেল। যুদ্ধের খবর ক্রমশই ঘনীভূত। বৈকালে চায়ের মজলিসে ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, শুনেছেন একটা কথা? রেঙ্গুনে নাকি কাল বোমা পড়েচে!

জ্যোতির্ব্বিনোদ বলিলেন, বল কী ক্ষেত্র ভায়া?

—কাগজে এখনও বেরোয় নি, তবে এই রকম গুজব।

শ্রীশবাবু চায়ের পেয়ালা হাতে আড়ষ্ট হইয়া থাকিয়া বলিলেন, আমার ছোট ভগ্নীপতি যে থাকে সেখানে! তা হলে আজই একটা তার করে—

যদুবাবু ও জ্যোতির্ব্বিনোদ দুইজনেই ব্যস্তভাবে বলিলেন, হ্যাঁ ভায়া, দাও—এখুনি একটা তার করা আবশ্যক।

—দাদা, আমার হাতে একেবারে কিছু নেই—কত লাগে রেঙ্গুনে তার করতে, তাও তো জানি নে।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, তার জন্যে কী, আমরা সবাই মিলে দিচ্ছি কিছু কিছু। তার তুমি ক'রে দাও ভায়া, দেখি, কার কাছে কী আছে!

যদুবাবু বিপন্নমুখে বলিলেন, আমার কাছে একেবারেই কিন্তু কিছু নেই—

—আচ্ছা, না থাকে না থাক্। আমরা দেখছি—দেখি হে, বিনোদ ভায়া—

সকলের পকেট কুড়াইয়া সাড়ে তিন টাকা হইল। শ্রীশবাবু তাহাই লইয়া ডাকঘরে চলিয়া গেলেন।

যদুবাবু বলিলেন, তাই তো হে, এ হল কী? এমন তো কখনও ভাবিও নি।

ক্ষেত্রবাবু ও জ্যোতির্বিনোদ টুইশানিতে বাহির হইয়া গেলেন। গলির মোড়ে ইংরেজী কাগজের সদ্য প্রকাশিত সংস্করণ লইয়া ফিরিওয়ালা ছুটিতেছে—ভারি খবর বাবু—ভারি কাণ্ড হয়ে গেল—

ক্ষেত্রবাবু পকেট হাতড়াইলেন, পয়সা আছে দুইটি মাত্র! তাহাই দিয়া কাগজ একখানা কিনিয়া দেখিলেন, কাগজে বিশেষ কিছুই খবর নাই। রেঙ্গুনের বোমার তো নাম-গন্ধও নাই তাহাতে, তবে জাপানী সৈন্য ব্রহ্মের দক্ষিণে টেনাসেরিম প্রদেশে অবতরণ করিয়াছে বটে।

মনটা ভাল নয়, পয়সার টানাটনি! পুনরায় চা এক পেয়ালা খাইলে অবসাদগ্রস্ত মন একটু চাঙ্গা হইত। কিন্তু তার উপায় নাই। এমন সময়ে রামেন্দুবাবুর সঙ্গে দেখা।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, কী আজ যে চায়ের মজলিসে ছিলেন না?

—না, সাহেবের সঙ্গে দরকার ছিল। এই তো স্কুল থেকে বেরুলাম।

—যুদ্ধের খবর দেখেছেন? খুব খারাপ।

—কী রকম?

—শুনলাম নাকি রেঙ্গুনে বোমা পড়েছে।

—তা আশ্চর্য নয়! কিন্তু গুজব রটে নানারকম এ সময়ে—কাগজে কিছু লিখেছে এ বেলা?

যদুবাবুকে কাহার সহিত যাইতে দেখিয়া দুইজনেই ডাকিয়া বলিলেন, ওই যে, ও যদুদা, শুনে যান—

যদুবাবুর সঙ্গে অবনী। বাজার করিয়া অবনীকে দিয়া বাসায় পাঠাইয়া দিবেন বলিয়া যদুবাবু তাহাকে লইয়া বাহির হইয়াছেন।

—এটি কে যদুদা?

—এ—ইয়ে আমার খুড়তুতো—দেশ থেকে এসেছে—

—বেশ, বেশ। কার কাছে পয়সা আছে? রামেন্দুবাবু?

—আছে। কত?

—সবাই চা খাওয়া যাক। হবে?

—খুব হবে। চলুন সব।

যদুবাবু বলিলেন, রামেন্দু ভায়ার কাছে চার আনা পয়সা বেশী হতে পারে? বাজার করতে যাচ্ছি কিনা!

রামেন্দুবাবু সকলকে ভাল করিয়া চা ও টোস্ট খাওয়াইলেন। যদুবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দাদা, আর কী খাবেন বলুন? কেক্ একখানা দেবে?

—না, ভায়া, বরং একখানা মাম্‌লেট—

—ওহে, বাবুকে একটা ডবল ডিমের মাম্‌লেট দিয়ে যাও।

চায়ের দোকান হইতে বাহির হইয়া সকলে যে যাহার টুইশানিতে বাহির হইলেন। যদুবাবু পথে যাইতে যাইতে হঠাৎ দেখিলেন, প্রজ্ঞাব্রত ওপারের ফুটপাথ দিয়া যাইতেছে। সে এবার ম্যাট্রিক দিয়া স্কুল হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে, কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। কয়েকটি সমবয়সী বন্ধুর সঙ্গে বোধ হয় মাঠের দিকে খেলা দেখিতে যাইতেছে।

যদুবাবু ডাকিলেন, প্রজ্ঞাব্রত, ও প্রজ্ঞাব্রত—

প্রজ্ঞাব্রত এদিকে চাহিয়া দেখিল, এবং কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন মুখে ও অনিচ্ছার সহিত এপারে আসিয়া বলিল, কী স্যার্?

যদুবাবু সপ্রশংস দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন, ছেলেটির কী সুন্দর উন্নত চেহারা, খেলোয়াড়ের মত সাবলীল দেহভঙ্গী, গায়ে সিল্কের হাফ-শার্ট, কাবুলী ধরনের পায়জামার মত করিয়া কাপড় পরা, পায়ে লাল, শুঁড়ওয়ালা চটি। স্কুলের নিচের ক্লাসের সে প্রজ্ঞাব্রত আর নাই।

—ভাল আছ বাবা?

—হ্যাঁ স্যার্।

—যাচ্ছ কোথায়?

প্রজ্ঞাব্রত এমন ভাব দেখাইল যে, যেখানেই যাই না কেন, তোমার সে খোঁজে দরকার কী? মুখে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উত্তর দিল, এই একটু ওদিকে—

—হ্যাঁ বাবা, একটা কথা বলব ভাবছিলাম। তোমাদের বাড়ী একবার যাব আজই ভাবছিলাম—তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে। তোমার ভাই দেবব্রতকে আজকাল পড়াচ্চে কে?

—শিববাবু বলে এক ভদ্রলোক। আপিসে চাকরি করেন—আমাদের বাড়ির সামনের মেসে থাকেন—

—ক'টাকা দাও?

—দশ টাকা বোধ হয়—কী জানি, ও-সব খবর আমি ঠিক জানি নে।

—আমি বলছিলাম কি, আমায় টুইশানিটা করে দাও না কেন। স্কুলের মাস্টার ভিন্ন ছেলে পড়াতে পারে? আমি তোমাদের স্নেহ করি নিজের ছেলের মত, আমি যেমন পড়াব—এমনটি কারও দ্বারা হবে না, তা বলে দিচ্চি—

—কিন্তু এখন তো আমরা সব চলে যাচ্ছি কলকাতা থেকে।

যদুবাবু বিস্ময়ের সুরে বলিলেন, কলকাতা থেকে? কেন?

—শোনেন নি, জাপানীরা কবে এসে বোমা ফেলবে—এর পরে রাস্তাঘাট সব বন্ধ হয়ে

যাবে হয়তো। আমরা বুধবারে বাড়ীসুদ্ধ সব যাচ্ছি শিউড়ি, আমার দাদামশায়ের ওখানে। আমাদের পাড়ার অনেকে চলে যাচ্ছে।

—তাই নাকি ?

প্রজ্ঞাব্রত ধীরভাবে বলিল, কেন, আপনি কাগজ দেখেন না ? হাওড়া স্টেশনে গেলেই বুঝবেন, লোক অনেক চলে যাচ্ছে। আচ্ছা, আসি স্যার্—

—আচ্ছা বাবা, বেঁচে থাক বাবা।

প্রজ্ঞাব্রত চলিয়া গিয়া যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। দেখ দেখি বিপদ্! যাইতেছি বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াইতে, রাস্তার মাঝখানে ডাকিয়া অনর্থক সময় নষ্ট—কে এখন বুড়োমানুষের সঙ্গে বকিয়া মুখ ব্যথা করে! মানুষের একটা কাণ্ডজ্ঞান তো থাকা দরকার, এই কি ডাকিয়া গল্প করিবার সময় মশায় ?

যদুবাবু কিন্তু অন্য রকম ভাবিতেছিলেন। প্রজ্ঞাব্রতের কথায় তিনি একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। কলিকাতা হইতে লোক পলাইতেছে জাপানী বিমানের ভয়ে ? তবে কি জাপানী বিমান এত নিকটে আসিয়া পড়িল ?

ছোট একটা টুইশানি ছিল। ভাবিতে ভাবিতে যদুবাবু ছাত্রের বাড়ী গিয়া উঠিলেন। দুইটি ছেলে, রিপন স্কুলে পড়ে—ইহাদের জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে যদুবাবু এক সময়ে কলেজে পড়িয়াছিলেন, সেই সুপারিশেই টুইশানি। যদুবাবু গিয়া দেখিলেন, বাহিরের ঘরে আলো জ্বালা হয় নাই। ডাকিলেন, ও হরে, নরে! ঘর অন্ধকার কেন।

হরেন নামক ছাত্রটি ছুটিয়া দরজার কাছে আসিয়া বলিল, স্যার্ ?

—আলো জ্বালিস নি যে বড় ?

—স্যার্, আজ আর পড়ব না।

—কেন রে ?

—আমাদের বাড়ীর সবাই কাল সকালের গাড়ীতেই দেশে চলে যাচ্ছে—মা জ্যেঠীমা, দুই দিদি—সবাই যাবে। জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা হচ্ছে, বড় ব্যস্ত সবাই। আজ আর—আপনি চলে যান স্যার্!

অন্যদিন টুইশানির পড়া হইতে রেহাই পাইলে যদুবাবু স্বর্গ হাতে পাইতেন, কিন্তু আজ কথাটা তেমন ভাল লাগিল না। যদুবাবু বলিলেন, তোরাও যাবি নাকি ?

—একজামিনের এখনও দু দিন বাকী আছে, একজামিন হয়ে গেলে আমরাও যাব।

—কোথায় যেন তোদের দেশ ?

—গড়বেতা, মেদিনীপুর।

—আচ্ছা, চলি তা হলে।

আজ খুব সকাল। সবে সন্ধ্যা হইয়াছে। এ সময় বাড়ী ফেরা অভ্যাস নাই। বিশেষত এখনই সে কোটরে ফিরিতে ইচ্ছাও করে না। তার উপর অবনী রহিয়াছে, জ্বালাইয়া মারিবে।

ক্রীক লেনে এক বন্ধুর বাড়ী ছুটি-ছাটার দিন যদুবাবু সন্ধ্যাবেলা গিয়া চাটা-আসটা খান, গল্প-গুজব করেন। ভাবিতে ভাবিতে সেখানেই গিয়া পৌছিলেন।

বন্ধু বাহিরের ঘরে বসিয়া নিজের ছেলেদের পড়াইতেছেন। যদুবাবুকে দেখিয়া বলিলেন, এস ভায়া। বোস। আজ অসময়ে যে? ছেলে পড়াতে বেরোও নি?

—সেখান থেকেই আসছি।

—একটু চা করতে বলে আয় তো তোর কাকাবাবুর জন্যে। আমার আবার বাড়ীর সবাই কাল যাচ্ছে মধুপুর। সব ব্যস্ত রয়েছে। বাঁধা-ছাঁদা—

যদুবাবুর বুকের মধ্যে ছাঁত করিয়া উঠিল। বলিলেন, কেন? কেন?

—সবাই বলছে, জাপানীরা যে-কোন সময়ে নাকি এয়ার রেড করতে পারে, তাই মেয়েদের সরিয়ে দিচ্ছি।

যদুবাবুর মনে বড় ভয় হইল, জিজ্ঞাসা করিলেন, কে বললে?

—বললে কেউ না। কিন্তু গতিক সেই রকমই। এর পরে রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে যাবে।

—বলো কী!

—তাই তো সবাই বলচে! কলকাতা থেকে অনেকে যাচ্ছে চলে। হাওড়া স্টেশনে গিয়ে দেখ গে লোকের ভিড়।

যদুবাবু আর সেখানে না দাঁড়াইয়া বাড়ী চলিয়া আসিলেন। বাসার দরজায় দেখিলেন, দুইখানি ঘোড়ার গাড়ী দাঁড়াইয়া। বাড়ীওলার বড় ছেলে ধরাধরি করিয়া বিছানার মোট ও ট্রাঙ্ক গাড়ীর মাথায় উঠাইতেছে।

যদুবাবু বলিলেন, এসব কী হে যতীন, কোথায় যাচ্চ?

যতীন বাইশ-তেইশ বছরের ছোকরা, কলেজে পড়ে। বলিল, ও, আমরা—দেশে যাচ্চি মাস্টার মশায়। সকলে বলছে, কলকাতাটা এ সময় সেফ্ নয়। তাই মা আর বউদিদিদের—

—তুমি, তোমার বাবা, এরাও নাকি?

—আমি পৌছে দিয়ে আবার আসব। কী জানেন, পুরুষমানুষ আমরা দৌড়েও এক দিকে না এক দিকে পালাতে পারব। হাই এক্সপ্লোসিভ বম্ব্ পড়লে এ বাড়ীঘর কিছু কি থাকবে ভাবছেন? বোমার ঝাপ্টা লেগেই মানুষ দম ফেটে মারা যায়। সে সব অবস্থায়—

যদুবাবুর পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। বলিলেন, বল কী?

—বলি তো তাই। গবর্মেন্ট বলছে, একখানা করে পেতলের চাকতিতে নামধাম লিখে প্রত্যেকে যেন পকেটে করে বেড়ায়। এয়ার রেডের পরে ওইখানা দেখে ডেড্ বডি সনাক্ত করা—

যদুবাবুর তালু শুকাইয়া গিয়াছে। এখনই যেন তাঁহার মাথায় জাপানী বোমা পড়্-পড় হইয়াছে। বলিলেন, আচ্ছা যতীন, তোমরা তো ইয়ং ম্যান, পাঁচ জায়গায় বেড়াও। তোমার কি মনে হয়, বোমা শীগগির পড়তে পারে?

—এনি মোমেণ্ট পড়তে পারে। আজ রাতেই পড়তে পারে। স্ট্রে রেড্‌ করার কি সময়-অসময় আছে ?

—তাই তো !

যদুবাবু নিজের ঘরে ঢুকিতেই তাঁহার স্ত্রী তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিয়া ব্যস্তভাবে বলিলেন, হ্যাঁ গা, হিম হয়ে তো বসে আছ—এদিকে ব্যাপার কী শোন নি ? আজ রাত্রে নাকি জাপান বোমা ফেলবে কলকাতায়। বাড়ীওলারা সব পালাচ্চে—পাশের বাড়ীর মটরের বউ আর মা চলে গিয়েছে দুপুরের গাড়ীতে। আমি কাঠ হয়ে বসে আছি—তুমি কখন ফিরবে ! কী হবে, হ্যাঁ গা, সত্যি সত্যি আজ কিছু হবে নাকি ?

যদুবাবু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলিলেন, হ্যাঃ—ভারি—কোথায় কী তার ঠিক নেই।

ভাবিলেন, মেয়েদের সামনে সাহস দেখানোই উচিত—নতুবা মেয়েমানুষ হাউমাউ করিয়া উঠিবে।

—হ্যাঁ গা, বাইরে আজ এত অন্ধকার কেন ?

—আজ ব্ল্যাক-আউট একটু বেশী। রাস্তার অনেক গ্যাসই নিবিয়ে দিয়েছে।

—তবুও তুমি বলছ—কোনও ভয় নেই ?

এমন সময় অবনী আসিয়া ডাকিল, দাদা ফিরেছেন ?

—হ্যাঁ, এস।

—আচ্ছা, দাদা, আজ রাস্তা এত অন্ধকার কেন ?

—ও, আজ রাত দশটার পরে কম্‌প্লিট ব্ল্যাক্‌-আউট। মানে, রাস্তার সব আলো নিবুনো থাকবে।

—কেন ?

—তুমি কিছু শোন নি যুদ্ধের খবর ?

—না, কী ?

যদুবাবুর মাথায় একটা বুদ্ধি আসিয়া গেল। বলিলেন, শোন নি তুমি ? জাপানীরা যে, যে-কোনো সময়ে এয়ার রেড্‌—মানে বোমা ফেলতে পারে। সব লোক পালাচ্চে। আজ বাড়ীওলারা চলে গেল। আমার ছাত্রেরা চলে গেল—সব পালাচ্চে। হয়তো আজ রাত্রেই ফেলতে পারে বোমা—কে জানে ? এখন একটা কথা। তুমি তোমার বউদিদিকে কাল নিয়ে যাও দেশে। আমি তো এখানে আর রাখতে সাহস করি নে—

অবনী পাড়াগেঁয়ে ভীতু লোক। তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। দাদার বাসায় স্ফূর্তি করিতে আসিয়া এ কী বিপদে পড়িয়া গেল সে ! বলিল, হ্যাঁ দাদা, আজ কী দেখলেন ? জাপান কি কাছাকাছি এল ?

—তা কাছাকাছি বইকি। মোটের ওপর আজ রাতেই বোমা পড়া বিচিত্র নয়, জেনে রাখ।

—তাই তো !

—তুমি তা হলে কাল সকালেই তোমার বউদিদিকে নিয়ে যাও—

—তা—তা দেখি।—অবনী গুম্ খাইয়া গিয়া আপন মনে কী খানিকটা ভাবিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল, হ্যাঁ দাদা, সত্যি সত্যি আজ রাতে কিছু হতে পারে?

—কথার কথা বলচি। হতে পারবে না কেন, খুব হতে পারে। বাধা কী? তুমি বোস, আমি দু ভাঁড় দই নিয়ে আসি।

যদুবাবুর স্ত্রী কী কাজে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া দেখিল, অবনী নিজের ছোট্ট টিনের সুটকেসটি খুলিয়া কাপড়চোপড় বাহিরে নামাইয়া আবার তুলিতেছে। তাহাকে দেখিয়া বলিল, বউদিদি, আমার গামছাখানা কোথায়?

আহারাদির পরে যদুবাবু অবনীর সঙ্গে পরামর্শ করিলেন। এখানে তিনি স্ত্রীকে আর রাখিতে চান না। কাল দুপুরে অবনী তাহাকে লইয়া যাক।

অবনী নিমরাজী হইল।

সকালে উঠিয়া ঘরের দোর খুলিয়া দালানে পা দিয়া যদুবাবু দেখিলেন, অবনার বিছানাটা গুটানো আছে বটে, কিন্তু সে নাই। অবনীকে ডাকিয়া তুলিতে হয়—অত সকালে তো সে ওঠে না। কোথায় গেল?

অবনী আর দেখা দিল না। টিনের সুটকেসটি কখন সে রাত্রে মাথার কাছে রাখিয়াছিল, ভোরে উঠিয়া গিয়াছে কি রাতেই পলাইয়াছে, তাহারই বা ঠিক কী?

পরদিন স্কুলে শিক্ষকদের মধ্যে একটা উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য দেখা গেল। ক্ষেত্রবাবুর বাসার আশেপাশে যাহারা ছিল, সকলেই নাকি কাল বাসা ছাড়িয়া পলাইয়াছে। ক্ষেত্রবাবু স্ত্রীকে লইয়া তেমন বাসায় কী করিয়া থাকেন। যদুবাবুর বিপদ আরও বেশী, তাঁহার যাইবার জায়গা নাই। জ্যোতির্বিনোদের বাড়ী হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে—কলিকাতায় আর থাকিবার আবশ্যক নাই, এখনই চলিয়া এস, প্রাণ বাঁচিলে অনেক চাকুরি মিলিবে। হেডমাস্টার মীটিং করিলেন—অভিভাবকেরা চিঠি লিখিতেছে, স্কুলের প্রমোশন তাড়াতাড়ি দেওয়া হউক, ছেলেরা সব বাহিরে যাইবে—এ অবস্থায় মাস্টারদের কাছে যে সমস্ত পরীক্ষার খাতা আছে, সেগুলি যত শীঘ্র হয় দেখিয়া ফেরত দেওয়া উচিত।

মিঃ আলম বলিলেন, অনেক ছেলে ট্রান্সফার চাইছে, কী করা যায়?

সাহেব বলিলেন, একে স্কুলে ছেলে নেই, এর উপর ট্রান্সফার নিলে স্কুল টিকবে না। তার চেয়েও বিপদ দেখছি, মাইনে তেমন আদায় হচ্ছে না। বড়দিনের ছুটির আগে মাইনে দেওয়া যাবে না।

যদুবাবু উদ্বিগ্নকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, দেওয়া যাবে না স্যার্?

—না।

—নভেম্বর মাসের মাইনে হয় নি এখনও! আমরা কী করে চালাব স্যার্, একটু বিবেচনা করুন। দুমাসের মাইনে যদি বাকী থাকে—

সাহেব হাসিয়া বলিলেন, আমায় বলা নিষ্ফল, আমি ঘর থেকে আপনাদের মাইনে দেব না তো। না পোষায় আপনার, চলে যাওয়াতে আমি বাধা দেব না—মাই গেট ইজ অল্‌ওয়েজ ওপ্‌ন্—

রামেন্দুবাবুকে সব মাস্টার মিলিয়া ধরিল। অন্তত নভেম্বর মাসের দরুণ কিছু না দিলে চলে কিসে? যদুবাবু কাতরস্বরে জানাইলেন, তিনি সম্পূর্ণ নিরুপায়, এ বিপদকালে কোথায় গিয়া উঠিবেন ঠিক নাই, হাতে পয়সা নাই, টুইশানির মাহিনা আদায় হয় কি না-হয়, টুইশানি থাকিবে কি না তাহারও স্থিরতা নাই—কারণ, ছেলেরা অন্যত্র যাইতেছে। কতদিনে তাহারা আসিবে কে জানে? টুইশানি না থাকিলে একেবারেই অচল।

রামেন্দুবাবুকে সাহেব বলিলেন, অবস্থা কী রকম বলে মনে হয়?

—কিছুই বুঝতে পারছি না স্যার্।

—এবার জানুয়ারী মাসে নতুন ছাত্র বেশী পরিমাণে ভর্ত্তি না হলে স্কুল চলবে না। তারপর এই গোলমাল—

—ও কিছু না স্যার্, জানুয়ারী মাসে সব ঠিক হয়ে যাবে।

—হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছে। এ একটা হুজুগ, কী বল? ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের রাজ্যে আবার বাইরের শত্রুর ভয়!

—হুজুগ বইকি স্যার্! পিওর হুজুগ। ও কিছু না। একটা কথা—

—কী?

—মাস্টারদের মাইনে কিছু কিছু দিতেই হবে স্যার্।

—কোথা থেকে দেব? মাইনে আদায় নেই। তবে নিতান্ত ধরছে—দাও কিছু কিছু। আর একটা কথা, যে সব ছেলে ট্রান্সফারের দরখাস্ত করেচে, তাদের বাড়ী গিয়ে অভিভাবকদের অনুরোধ করতে হবে, তাদের যেন ছাড়িয়ে না নিয়ে যায়। ক্লাস এইটের একটা ছেলে—নাম সুধীর দত্ত, তার বাড়ী সন্ধ্যার পর একবার যেয়ো।

সন্ধ্যায় সুধীর দত্তের বাড়ী রামেন্দুবাবু অভিভাবকদের ধরিতে যাইয়া বেশ দুই কথা শুনিলেন। ছেলেটি এবার প্রমোশন পায় নাই। ছেলের অভিভাবক চটিয়া খুন, ছেলে তিনি ও-স্কুলে আর রাখিতে চাহেন না। তিনি স্কুল ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন—অনুরোধ বৃথা।

রামেন্দুবাবু বলিলেন, কেন, কী অসুবিধে হল এ স্কুলে বলুন! আমি গ্যারাণ্টি দিচ্ছি, তা দূর করে দেওয়া হবে।

—পড়াশুনো কিছু হয় না মশাই আপনাদের স্কুলে। ওদের ক্লাসে যদুবাবু বলে একজন মাস্টার পড়ান, একেবারে ফাঁকিবাজ। কিছু করান না ক্লাসে।

—আপনি ও-রকম নাম করে বলবেন না। ছেলেদের মুখে শুনে বিচার করা সব সময়ে ঠিক নয়। এবার আমি বলছি, ওর পড়াশুনো আমি নিজে দেখব।

—তা, ওরা তো কাল যাচ্ছে নবদ্বীপে। ওর মাসীর বাড়ী কবে আসবে ঠিক নেই। হ্যাঁ মাস্টারবাবু, এ হাঙ্গামা কতদিন চলবে বলতে পারেন?

—বেশী দিন চলবে বলে মনে হয় না।

—সুধীরকে জানুয়ারি মাসে ক্লাসে উঠিয়ে দেন যদি, তবে ট্রান্সফার এবার না হয় থাক্।

—তাই হবে। ওকে ক্লাস নাইনে উঠিয়ে দেওয়া যাবে।

রামেন্দুবাবু হৃষ্টমনে ফিরিতেছিলেন ; কারণ, কর্ত্তব্য নিখুঁতভাবে সম্পাদন করিবার একটা আনন্দ আছে। পথের ধারে একস্থানে দেখিলেন অনেকগুলি লোক জটলা করিয়া উঁচু মুখে কী দেখিতেছে। রামেন্দুবাবু গিয়া বলিলেন, কী হয়েছে মশায় ?

একজন আকাশের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল, দেখুন তো স্যার, ওই একখানা এরোপ্লেন—ওখানা যেন কী রকমের না ?

রামেন্দুবাবু কিছু দেখিতে পাইলেন না। বলিলেন, কই মশায়, কিছু তো—

দুই-তিন জন অধীরভাবে বলিল, আঃ, দেখতে পেলেন না ? এই ইদিকে সরে আসুন—ওই—ওই—

তবুও রামেন্দুবাবু দেখিতে পাইলেন না, একটা নক্ষত্র তো ওটা !

সবাই বলিয়া উঠিল, ওই মশায়, ওই। নক্ষত্র দেখছেন তো একটা ? ওই ! ও নক্ষত্র নয়—জাপানী বিমান।

রামেন্দুবাবু সাহসে ভর করিয়া বলিলেন, কিন্তু নক্ষত্র তো আরও অনেক—

লোকগুলি রামেন্দুবাবুর মূঢ়তা দেখিয়া দস্তুরমত বিরক্ত হইল ! একজন বলিল, আচ্ছা, এটা কি নক্ষত্র ? নীল মত আলো দেখলেন না ? চোখের জোর থাকা চাই। ও হল সেই, বুঝলেন ? চুপি চুপি দেখতে এসেছে—

আর একজন চিন্তিত মুখে বলিল, তাই তো, এ যে ভয়ানক কাণ্ড হল দেখছি।

পূর্ব্বের লোকটি বলিল, কলকাতায় থাকা আর সেফ্ নয় জানবেন আদৌ।

সবাই তাহাতে সায় দিয়া বলিল, সে তো আমরা জানি। যে-কোন সময়—এনি মোমেণ্ট বোমা পড়তে পারে।

রামেন্দুবাবু সে স্থান হইতে সরিয়া পড়িলেন।

পরদিন স্কুলে মাস্টারদের মধ্যে যথেষ্ট ভয় ও চাঞ্চল্য দেখা গেল। যে যে পাড়ায় থাকেন, সেই সেই পাড়া প্রায় খালি হইতে চলিয়াছে, মাস্টারদের মধ্যে অনেকের যাইবার স্থান নাই।

যদুবাবু চায়ের মজলিসে বলিতেছিলেন, সবাই তো যাচ্ছে, আমি যে কোথায় যাই !

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, আমারও তাই দাদা। আমার গ্রামে বাড়ীঘর সারানো নেই—কতকাল যাই নি। সেখানে গিয়ে ওঠা যাবে না।

—তবুও তোমার তো আস্তানা আছে ভায়া, আমার যে তাও নেই। চিরকাল বাসায় থেকে বাড়ীঘর সব গিয়েছে। এখন যাই কোথায় ?

জ্যোতির্বিনোদ বলিল, আমার বাড়ী থেকে টেলিগ্রাম এসেছে, চিঠির পর চিঠি আসছে—বাড়ী যাবার জন্যে। বাড়ী থেকে লিখছে, চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে এস।

হেডপণ্ডিত বলিলেন, কাল শেয়ালদা ইষ্টিশানে কী ভিড় গিয়েছে, হে ! গাড়ীতে উঠতে

পারি নে—বুড়ো মানুষ, কত কষ্টে যে ঠেলে-ঠুলে উঠলাম!

—স্কুল বন্ধ হলে যে বাঁচি। সাহেবকে সবাই মিলে বলা যাক, স্কুল বন্ধ করবার জন্যে।

সারারাত্রি ধরিয়া গাড়ীঘোড়ার শব্দ শুনিয়া যদুবাবু বিশেষ 'নার্ভাস' হইয়া উঠিয়াছিলেন। পাড়াসুদ্ধ লোক বিছানা-বোঁচকা বাঁধিয়া হয় হাওড়া, নয় শেয়ালদহ স্টেশনে ছুটিতেছে। কে বলিতেছিল, ঘোড়ার গাড়ীর ভাড়া অসম্ভব ধরনে বৃদ্ধি পাইতেছে।

জ্যোতির্বিনোদ বলিল, কোন ভয় নেই দাদা। বোঁচকা মাথায় নিয়ে ঠেলে উঠব ইস্টিশানে—আমরা বাঙাল মানুষ, কিছু মানি নে।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, আস্‌সিংড়িই চলে যাই ভাবছি, ভাঙা ঘরে গিয়ে আপাতত উঠি। এখানে থাকলে এর পরে আর বেরুতে পারব না।

যদুবাবু সভয়ে বলিলেন, তাই তো, কী যে করি উপায়!

—কালই সাহেবকে গিয়ে আগে ধরা যাক, স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হোক।

ক্ষেত্রবাবু চায়ের দোকান হইতে বাহির হইয়া ধর্মতলার মোড়ে আসিলেন। দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে দুই-তিনখানি ঘোড়ার গাড়ী ছাদের উপর বিছানার মোট চাপাইয়া শেয়ালদহ স্টেশনের দিকে চলিয়া গেল। ক্ষেত্রবাবু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন—আস্‌সিংড়ি গ্রামে যাইবেন বটে, কিন্তু সেখানে বাড়ীঘরের অবস্থা কী রকম আছে, তাহার ঠিক নাই। আজ পাঁচ-ছয় বছর পূর্ব্বে নিভাননী বাঁচিয়া থাকিতে সেই একবার গিয়াছিলেন, তাহার পর আর যাওয়া ঘটে নাই। কোন খবরও লওয়া হয় নাই, কারণ এতদিন প্রয়োজন ছিল না।

একটিমাত্র টুইশানি অবশিষ্ট ছিল, সেখানে গিয়া দেখা গেল, আজ বৈকালে তাহারাও দেশে চলিয়া গিয়াছে। বাড়ীর কর্ত্তা আপিসে চাকরি করেন। বলিলেন, মাস্টার মশায়, আপনার এ মাসের মাইনেটা আর এখন দিতে পারছি নে—খরচপত্র অনেক হয়ে গেল কিনা! জানুয়ারি মাসে শোধ করব।

—আমায় না দিলে হবে না বোস মশায়, ফ্যামিলি আমাকে দেশে নিয়ে যেতে হবে—

—তা তো বুঝতে পারছি। কিন্তু এখন কিছু হবে না।

ক্ষেত্রবাবুর রাগ হইল। এখানে দুই মাসের কমে এক মাসের মাহিনা কোনদিনই দেয় না—তাও আজ পাঁচ টাকা, কাল দুই টাকা। নিতান্ত নিরুপায় বলিয়াই লাগিয়া থাকা। কিন্তু এই বিপদের সময় এত অবিবেচনার কাজ করিতে দেখিলে মানুষের মনে মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, না বোস মশায়, এ সময় আমায় দিতেই হবে। ছ মাস ধরে ছাত্র পড়ালাম, ছেলে ক্লাসে উঠল। এখন বলছেন, আমার মাইনে দেবেন না। তা হয় না—

বসু মহাশয়ও চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, মশাই, এত কাল তো পড়িয়েছেন—মাইনে পান নি কখনও বলতে পারেন কি? যদি এ মাসটাতে ঠিক সময়ে না-ই দিতে পারি—

—ঠিক সময়ে কোনদিনই দেন নি বোস মশায়, ভেবে দেখুন। তাগাদা না করলে কোন মাসেই দেন নি।

—বেশ মশাই, না-দিয়েছি তো না-দিয়েছি। মাইনে পাবেন না এখন। আপনি যা পারেন, করুন গিয়ে।

ক্ষেত্রবাবু ভদ্রস্বভাবের লোক, টুইশানির মাহিনা লইয়া একজন বৃদ্ধ ব্যক্তির সহিত ঝগড়া করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার হইল না। কিছু না বলিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া আসিলেন। কলিকাতায় বাড়ি আছে, আপিসে মোটা চাকুরিও করেন শোনা যায়, অথচ এই তো সব বিচার! ছিঃ!

অন্যমনস্কভাবে গলির মোড়ে আসিতেই ব্ল্যাক আউটের কলিকাতায় কাহার সঙ্গে ঠোকাঠুকি হইল! ক্ষেত্রবাবু বলিয়া উঠিলেন, মাপ্ করবেন মশাই, দেখতে পাই নি—ছুটো গ্যাসই নিবিয়েছে—

লোকটি বলিল, কে ক্ষেত্রবাবু নাকি?

—ও! রাখালবাবু?

—আমিই। ভালই হল, দেখা হল এ ভাবে। আপনাদের স্কুলে কাল যাব ভাবছিলাম—

—ভাল আছেন মিত্তির মশায়?

—আমাদের আবার ভাল-মন্দ! বই দিয়ে এসেছি পাঁচ-ছটা স্কুলে—এখন ধরায় যদি, তবে বুঝতে পারি। আপনাদের স্কুলে আমার সেই নব ব্যাকরণবোধখানা ধরানোর কী করলেন? চমৎকার বই! ক্লাস ফাইভ আর ফোরের উপযুক্ত বই। সন্ধি আর সমাস যে ভাবে ওতে দেওয়া—। বইয়ের লিস্ট হয়েচে আপনাদের?

—এখনও হয় নি।

—কেন, প্রমোশন হয় নি? তবে বইয়ের লিস্ট হয় নি কেমন কথা?

—না, প্রমোশন হবে বুধবার। শুক্রবারে ছুটি হবে।

—আমার বইয়ের কী হল?

—হেডমাস্টারের কাছে দেওয়া হয়েছে—কী হয়, বলতে পারি নে!

—আমার যে এদিকে অচল ক্ষেত্রবাবু। এই অবস্থায় প্রায় দেড়শো টাকা ধার করে বই ছাপালাম। প্রেসের দেনা এখনও বাকি। দপ্তরীর দেনা তো আছেই। বাসা ভাড়া তিন মাসের বাকী। বই যদি না চলে, তবে খেতে পাব না ক্ষেত্রবাবু। আপনারাই ভরসা।

—বুঝলাম সবই রাখালবাবু, কিন্তু এ তো আর আমার হাতে নয়। আমি যতদূর বলবার বলেচি।

কথার মধ্যে সত্যের কিছু অপলাপ ছিল। ক্ষেত্রবাবু বলেন নাই! রাখাল মিত্তিরের বই আজকাল অচল। তবুও হয়তো চলিত, কিন্তু বড় বড় প্রকাশকের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া বই চালানো রাখাল মিত্তিরের কর্ম নয়। তাহারা লাইব্রেরির জন্য বিনামূল্যে কিছু বই দেয়, প্রাইজের সময় বই কিনিলে মোটা কমিশন দেয়।

রাখাল মিত্তির ক্ষেত্রবাবুর পিছু ছাড়ে না। বলিল, আসুন না আমার ওখানে, একটু চা খাবেন—

শেষ পর্য্যন্ত যাইতেই হইল—নাছোড়বান্দা রাখাল মিস্তিরের হাতে পড়িলে না গিয়া উপায় নাই। সেই ছোট একতলার কুঠুরি। এই অগ্রহায়ণ মাসেও যেন গরম কাটে না। একখানা নীচু কেওড়া কাঠের তক্তাপোশের উপর মলিন বিছানা। কেরোসিন কাঠের একটা আলমারিভর্ত্তি বই। ঘরখানা অগোছালো, অপরিষ্কার, মেঝের উপরে পড়িয়া আছে দুইটা ছেঁড়া জামা ছেলেপুলেদের, এক বোতল আঠা, একটা আলকাতরা মাখানো মালসা।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, কী বই রাখালবাবু, আলমারিতে!

—দেখবেন? এ সব বই—এই দেখুন—

রাখালবাবু সগর্ব্বে বই নামাইয়া দেখাইতে লাগিলেন।

—এই দেখুন প্রকৃতিবোধ অভিধান। পুরনো বইয়ের দোকান থেকে তিন টাকায়—আর এই দেখুন মুগ্ধবোধ—মশাই, সংস্কৃত ব্যাকরণ না পড়লে কি ভাষার ওপর দখল দাঁড়ায়? সহর্ণেঘঃ থেকে আরম্ভ করে সব সূত্র তিনটি বছর ধরে মুখস্থ করে ভোঁতা হয়ে গিয়েছে, তাই আজ দু-এক পয়সা ক'রে খাচ্চি। রাখাল মিস্তিরের ব্যাকরণের ভুল ধরে, এমন লোক তো দেখি নে। গোয়ালটুলি স্কুলের হেডপণ্ডিত সেদিন বললে—মিস্তির মশাই, আপনার ব্যাকরণ পড়লে ছেলেদের সন্ধি আর সমাস গুলে খাওয়া হয়ে গেল। পড়া চাই—পেটে বিদ্যে না থাকলে—

—আপনার বই ধরিয়েচে নাকি?

—না, হেডমাস্টার বললে, শশিপদ কাব্যতীর্থের ব্যাকরণ আর-বছর থেকে রয়েছে ক্লাসে। এ বছর যুদ্ধের বছরটা, বই বদলালে গার্জ্জেনরা আপত্তি করবে—তাই এ বছর আর হল না। সামনের বছর থেকে নিশ্চয়ই দেবে।

একটি বারো-তেরো বছরের রোগা মেয়ে, একটা থালায় দুটি আংটাভাঙা পেয়ালা বসাইয়া চা আনিল। রাখালবাবু বলিলেন, ও পাঁচী! এটি আমার ভাগ্নী—আমার যে বোন এখানে থাকে, তার মেয়ে—প্রণাম কর মা, উনি ব্রাহ্মণ।

—আহা, থাক্ থাক্। এস মা, হয়েছে—কল্যাণ হোক। বেশ মেয়েটি।

—অসুখে ভুগছে। বর্দ্ধমানে দেশ, কেউ নেই। এবার এক জ্ঞাতি কাকা নিয়ে গিয়েছিল, ম্যালেরিয়ায় ধরেচে। যাও মা, দুটো পান নিয়ে এস তোমার মামীমার কাছ থেকে। চা মিষ্টি হয়েছে? চিনি নেই, আখের গুড় দিয়ে—

—না না, বেশ হয়েছে।

দুধচিনিবিহীন বিস্বাদ চা, তামাক-মাখা গুড়ের গন্ধ, এক চুমুক খাইয়া বাকিটুকু গলাধঃকরণ করিতে ক্ষেত্রবাবুর বিশেষ কসরৎ করিতে হইল।

রাখালবাবু বলিলেন, তা তো হল, কী হাঙ্গামা বলুন দিকি! পাড়া যে খালি হয়ে গেল অর্দ্ধেক!

—আপনাদের এ পাড়াতেও?

—হ্যাঁ মশাই, আশেপাশে লোক নেই। সব পালাচ্ছে। পাশের বাড়ীর ঘোষালেরা

আজ সকালে সব পালাল—এখন ওরা বড়লোক, এই দিনকতক আগেও পুতুলের বিয়েতে হাজার টাকা খরচ করেছে। ফুলশয্যের তত্ত্ব করেছিল, দশজন ঝি চাকর মাথায় করে নিয়ে গেল, মায় রূপোর দান-সামগ্রী, খাট বিছানা এস্তোক! ওদের কথা বাদ দিন। এখন আমরা যাব কোথায়?

—সেই ভাবনা তো আমারও, ভাবছি তো। গরীব স্কুল-মাস্টার—

—গরীব তো বটেই, যাবার জায়গাও তো নেই।

—আপনার দেশে বাড়ীঘর—

রাখালবাবু হাসিয়া বলিলেন, দেশই নেই, তার বাড়ীঘর! দেশ ছিল ন'দে জেলায়, কাঁচড়াপাড়া নেমে যেতে হয়। ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে গিয়েছিলাম। সে সব কিছু নেই। বড় হয়ে আর যাই নি, এই কলকাতাতেই—

—আমারও তো তাই।

পাঁচী পান আনিয়া রাখিয়া গেল।

—অনেক পয়সা খরচ করে বই ছাপালাম, চার-পাঁচ শো টাকা দেনা এখনও বাজারে। এই হাঙ্গামাতে যদি বই বিক্রি কমে যায়, তবে তো পথে বসতে হবে। আপনাদের ভরসাতেই—

—কিছুই বুঝছি নে, কী যে হবে!

—আমাদের এখানে কিছু হবে না, কী বলেন? যুদ্ধ হচ্ছে ফিলিপাইনে আর হংকংয়ে, তার এখানে কী?

—সিঙ্গাপুর ডিঙিয়ে আসা অত সোজা নয়।

—তবে লোক পালাচ্চে কেন?

—প্যানিক—ভয়! প্যানিক একেই বলে। আচ্ছা উঠি, রাত হল মিত্তির মশাই।

—আর একটু বসবেন না? আচ্ছা, তা হলে—হ্যাঁ, একটা কথা। আনা আষ্টেক পয়সা হবে?

পকেটে যাহা কিছু খুচরা ছিল, তক্তাপোশের উপর রাখিয়া ক্ষেত্রবাবু বাহিরের মুক্ত বাতাসে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া যেন বাঁচিলেন।

'স্পেশাল টেলিগ্রাফ' কাগজ বাহির হইয়াছে, কাগজওয়ালা ফুটপাথ ধরিয়া ছুটিতেছে। ক্ষেত্রবাবু একজনের হাত হইতে কাগজ লইয়া দেখিলেন—হংকং অবরুদ্ধ।…চীনসমুদ্রে ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ ধ্বংস!

ক্ষেত্রবাবু কেমন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন।

পরদিন স্কুলে হেডমাস্টার সব মাস্টারকে আপিসে ডাকিলেন। জরুরী মীটিং।

হেডমাস্টার এ বছরের পরীক্ষার লম্বা রিপোর্ট লিখিয়াছেন, সকলকে পড়িয়া শোনাইলেন। প্রত্যেক শিক্ষকের নিকট হইতে রিপোর্ট লওয়া হয়, পরীক্ষার কাগজ দেখার পর। সেই

সব রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া হেডমাস্টার নিজে রিপোর্ট লিখিয়া অভিভাবকদের মধ্যে ছাপাইয়া বিলি করেন। তাঁহার ধারণা, ইহাতে স্কুলে ছেলে বাড়িবে।

রিপোর্ট পড়িয়া সকলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, কী রকম হয়েছে ?

সকলেই বলিলেন, চমৎকার রিপোর্ট হইয়াছে, এমনধারা হয় না।

—থার্ডক্লাসের ইংরিজী নিতেন কে ?

যদুবাবু বলিলেন, আমি স্যার্।

—ভীষণ খারাপ ফল এবার আপনার সাবজেক্টে। আপনি লিখিত কৈফিয়ত দেবেন—

—যে আজ্ঞে স্যার্।

—ক্লাস সেভেনের ইতিহাস কে নেয় ?

শ্রীশবাবু বলিলেন, আমি স্যার্।

—সকলের চেয়ে ভাল ছেলে মোটে ষাট পেয়েছে।

—স্যার, প্রশ্ন বড় কঠিন হয়েছিল—সিলেবাস ছাড়া প্রশ্ন হলে কী করে ছেলেরা—

—না। এমন কিছু কঠিন নয়। প্রশ্নপত্র সব আমি আর মিঃ আলম দেখে দিয়েছি। কমিটীতে এ কথা আমায় রিপোর্ট করতে হবে। লিখিত কৈফিয়ত দেবেন। আর এবার বাড়ী বাড়ী গিয়ে একটু ক্যানভাস করা দরকার হবে ছুটির পরে। নইলে ছেলে হবে না।

ক্ষেত্রবাবু ভয়ে ভয়ে বলিলেন, কিন্তু স্যার্, এদিকে শহর যে খালি হয়ে গেল—

সাহেব তাচ্ছিল্যের সুরে বলিলেন, কে বললে ?

যদুবাবু ও শ্রীশবাবু দাঁড়াইয়া বলিলেন, সেই রকমই দেখা যাচ্ছে স্যার্। ক্ষেত্রবাবু ঠিক বলেছেন।

গেম্ মাস্টার বিনোদবাবু বলিলেন, আমাদের পাড়াতে তো আর লোক নেই।

জগদীশ জ্যোতির্বিনোদ বলিল, আমি এক জায়গায় ছেলে পড়াই, তারা চলে গিয়েছে। তাদের পাড়া খালি।

সাহেব মিঃ আলমের দিকে চাহিয়া বলিলেন, কী মিঃ আলম, আপনি কি দেখেছেন ? এই রকম হয়েছে নাকি ?

মিঃ আলম উঠিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, না স্যার্। এখানে ওখানে দু-একটা বাড়ী খালি হয়েছে বটে। কিছুই নয়।

ক্ষেত্রবাবু প্রতিবাদের সুরে বলিলেন, কিছু না কী রকম মিঃ আলম। হাওড়া স্টেশনে নাকি বেজায় ভিড় হচ্চে—কুলি আর ঘোড়ার গাড়ীর দর্ বেজায় বেড়েছে—

—ওসব গুজব। কই, আমি তো রোজ বেড়াই, কিছু দেখি নি।

এমন সময় রামেন্দুবাবু বাহির হইতে একখানা খবরের কাগজ লইয়া ঘরে ঢুকিয়া সাহেবের টেবিলে রাখিয়া বলিলেন, দেখুন স্যার্, হংকং যায় যায়—জাপানীরা সিঙ্গাপুরে দূর-পাল্লার কামানের গোলা ছুঁড়েচে।

হেডমাস্টারের কড়া ডিসিপ্লিনের নিগড় বুঝি টুটিল! ক্ষেত্রবাবু ও শ্রীশবাবু টেবিলের

উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া খবরের কাগজ পড়িতে গেলেন। সমবেত শিক্ষকদের মধ্যে একটা গুঞ্জনধ্বনি উথিত হইল।

—তাই তো!

—তাই তো!

—দেখ না ভায়া কাগজটা।

—সিঙ্গাপুর বিপন্ন!

—ব্যাপার কি?

সাহেব কাগজ হাতে তুলিয়া পড়িয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, বাজে গুজব। সিঙ্গাপুর পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভেদ্য।

মিঃ আলম বলিলেন, বাজে গুজব—হেঁঃ—

সাহেব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কাগজখানা একদিকে সরাইয়া বলিলেন, যাক এসব! তা হলে বাড়ী বাড়ী ক্যানভাসিংয়ের জন্যে কে কে রাজী আছেন বলুন? সকলের সাহায্যই আমি চাই। যদুবাবু? ক্ষেত্রবাবু? মিঃ আলম?

ইঁহারা সকলেই দাঁড়াইয়া উঠিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুলের ডিসিপ্লিন পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইল। জাপানী বোমার হুজুগে পড়িয়া সে কঠোর ডিসিপ্লিনের ভিত্তি সামান্য একটু নড়িয়া উঠিয়াছিল মাত্র—তাহাও অতি অল্পক্ষণের জন্য।

হেডপণ্ডিত বলিলেন, স্যার্, ছুটি ক'দিন হচ্চে?

সাহেব গম্ভীরস্বরে বলিলেন, পাণ্ডিট, ছুটি বেশী দিন দিতে চাই না। দোসরা জানুয়ারি খুলবে। কিন্তু তার আগে ক্যানভাসিং কববার জন্যে চার-পাঁচজন টীচারকে এখানে থাকতে হবে। আমি তাদের নামে সারকুলার করব।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, আমাদের মাইনেটা স্যার্—

—স্কুল খুললে দেওয়া হবে।

যদুবাবু মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বলিলেন, কিছু না দিলে স্যার্, আমরা দাঁড়াই কোথায়? হাতে কিছু নেই—

—যার না পোষাবে, তিনি চলে যেতে পারেন—মাই গেট্—

যদুবাবু শিক্ষক কর্ত্তৃক তিরস্কৃত স্কুলের ছাত্রের মত ঘাড় নীচু করিয়া পুনরায় আসনে বসিয়া পড়িলেন!

হেডমাস্টার বলিলেন, আমি ছুটির কদিন মিঃ আলম, রামেন্দুবাবু আর ক্ষেত্রবাবুকে চাই। তাঁরা রোজ আসবেন আপিসে। নতুন বছরের রুটিনে অনেক অদলবদল করতে হবে। সিলেবাস তৈরি করতে হবে প্রত্যেক ক্লাসের। আপনারা তিন জন আমাকে সাহায্য করবেন। যদুবাবু?

যদুবাবু আবার দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

—আপনিও আসবেন। আপনাকে ক্লাস-টাস্কের একটা চার্ট করতে হবে গ্রীষ্মের ছুটি পর্যন্ত।

যদুবাবুর মুখ শুকাইয়া গেল। আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, আমি স্যার্, আমার শালীর, মানে—বিয়ে—দেশে যেতে হবে সেখানে। আমিই সব দেখাশুনো করব—

হঠাৎ মনে পড়িল পৌষ মাসে বিবাহ হয় না হিন্দুর, এ কথা সাহেব না জানিলেও অন্যান্য মাস্টারেরা সবাই জানে, হয়তো আলমও জানে। আলম সাহেবকে বলিয়া দিতেও পারে। তাই তাড়াতাড়ি সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, বিয়ে এই সামনের বুধবারে, কিন্তু ছুটিতে আমার না গেলে—

—ইয়েস্, ইয়েস্, আই আণ্ডারস্ট্যাণ্ড।

সভা ভঙ্গ হইল। সাহেবের ঘর হইতে বাহির হইয়া যদুবাবু রামেন্দুবাবুকে পাকড়াও করিলেন।

—ও রামেন্দুবাবু, আমায় গোটা দশেক টাকা দিতে বলুন সাহেবকে। করে দিতেই হবে। না হলে মারা যাব। হাতে কিচ্ছু নেই। টুইশানির ছেলে পালিয়েচে। কোথায় পয়সা পাই বলুন তো?

ক্ষেত্রবাবু বাড়ী ফিরিতেই অনিলা ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিল, এসেছ? শোন, সব পালাচ্ছে। পাড়া ফাঁক হয়ে গেল যে? সোমবার থেকে নাকি হাওড়ার পুল খুলে দেবে, রেলগাড়ী বন্ধ ক'রে দেবে?

—কে বললে?

—কে বলল আবার—সবাই বলছে। তোমার ছুটির কদিন দেরি? এর পর যাওয়া যাবে না কোথাও—ঘোড়ার গাড়ির ভাড়া নাকি দশ টাকা ক'রে হয়েছে—বোমা নাকি শীগ্‌গির পড়বে। সিঙ্গাপুর ব্লকেড্ করেছে, দেখেচ তো?

ক্ষেত্রবাবুর ভয় হইয়া গেল। তাই তো, ঘোড়ার গাড়ীর ভাড়া চড়িয়া গেলে কী করিয়া কলিকাতা ত্যাগ করিবেন? বলিলেন, কিন্তু কোথায় যাওয়া যায় বল তো? জায়গা তো দেখছি এক আস্‌সিংড়ি। কতকাল সেখানে যাই নি। নিভা বেঁচে থাকতে একবার গরমের ছুটিতে সেখানে গিয়েছিলাম। বাড়িঘর এতদিনে ইটের স্তূপ হয়েছে পড়ে। বেজায় জঙ্গল সে গাঁয়ে।

—চল, গয়া যাই।

—পয়সা? অত টাকা কোথায়? স্কুলে এক পয়সা দিলে না।

—আমার বাক্সে পাঁচ-ছটা টাকা আছে। আর কিছু ধার কর।

—কে দেবে ধার? সে বাজার নয়।

—কিন্তু যা হয় কর তাড়াতাড়ি। এর পর আর কলকাতা থেকে বেরুনো যাবে না সবাই বলচে।

—রান্না হয়ে থাকে, দাও। আমি একবার যদুদার বাসা থেকে আসি। দেখে আসি, কি করছে ওরা!

যদুবাবু বাসায় পা দিতেই তাঁহার স্ত্রী বলিল, ওগো, কী হবে গো? সবাই চলে যাচ্ছে, কী করবে কর। কোন্‌দিন ঝুপ করে বোমা পড়বে, তখন—

—দাঁড়াও, একটু স্থির হতে দাও। চা কর, আগে খাই। তারপর সব শুনছি।

চা করিয়া যদুবাবুর গৃহিণী কাঁসার গ্লাসে আঁচল জড়াইয়া লইয়া আসিল।

যদুবাবু বলিলেন, কেন, পেয়ালা?

—সে ও-বেলা ধুতে গিয়ে হাত থেকে পড়ে গুঁড়ো হয়ে গেল।

যদুবাবু রাগিয়া উঠিলেন: তা ভাঙবে বইকি, তোমাদের তো ভেবে খেতে হয় না। জিনিসপত্র নষ্ট করলেই হল—লাগে টাকা, দেবে গৌরী সেন! একটা পেয়ালার দাম কত আজকালকার বাজারে, তার খোঁজ রাখ?

এমন সময় বাহিরে ক্ষেত্রবাবুর গলা শোনা গেল: ও যদুদা, বাসায় আছেন নাকি?

যদুবাবু তাড়াতাড়ি চা-সুদ্ধ কাঁসার গ্লাসটা স্ত্রীর হাতে দিয়া বলিলেন, এটা নিয়ে যাও—নিয়ে যাও। দেখে ফেলবে, বলবে কী? গলার স্বর বাড়াইয়া বলিলেন, এস ক্ষেত্র ভায়া—এস এস—

—কী হচ্চে?

—এই সবে এলাম ভাই। সবে মিনিট দশেক। তারপর কী মনে করে? বোস এইটেতে।

—বউদিদি কোথায়? ও বউদিদি, বলি, একটু চা-টা না হয় করেই খাওয়ান—

যদুবাবু হাসিয়া বলিলেন, চা খাবে কি ভাই, পেয়ালা ভেঙে বসে আছে তোমার বউদিদি—কাঁসার গেলাসে চা খাচ্ছিলাম, তা তোমাকে কি আর তাতে—

—খুব দেওয়া যাবে। তাতেই দিন না বউদিদি।

—দাও তা হলে, ওগো, ওই চা-ই দিয়ে যাও—ক্ষেত্র ভায়া আমাদের ঘরের লোক।

চা আসিল। চা খাইতে খাইতে ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, তা তো হল। এখন কী উপায় করা যাবে বলুন দিকি? কলকাতার যা অবস্থা! লোক সব পালাচ্চে—

—হেডমাস্টার তা বুঝবেন না। তাঁর মতে কোন বিপদের কারণ নেই। আবার বাড়ী বাড়ী ঘুরে ক্যান্‌ভাসিং করতে হবে ছেলের জন্য! ছেলে কোথায়? কলকাতা শহর তো ফাঁকা হয়ে গেল।

—তা কি আর সাহেবকে বোঝানো যাবে দাদা? কাল থেকে ক্যান্‌ভাসিংয়ে না বেরুলে সাহেব রাগ করবে। আপনারও তো ডিউটি আছে।

—তাই তো, কী করা যায় ভাবচি। মুশকিল আসলে কী হয়েছে জান ভায়া, হাতে নেই পয়সা। রামেন্দু ভায়াকে ধরেছি, সাহেবকে বলে গোটাদশেক টাকা আমায় না দেওয়ালে চলবে না।

—কোথায় যাবেন ভাবচেন ?

—কোথায় যে যাই !—হাতে পয়সা নেই, দেশঘর নেই। তোমার তবুও তো দেশে বাড়ীঘর আছে, আমার যাবার স্থান নেই। এক আছে জ্ঞাতি-ভাইয়ের বাড়ী, বেড়াবাড়ী বলে গ্রাম, তা সেখানে তারা যে রকম ব্যবহার করেচে—পরের বাড়ী, কোন জোর তো সেখানে খাটে না ! তুমি কোথায় যাবে ভাবচ ?

—আমারও সেই একই অবস্থা। আস্‌সিংড়িতে—মানে আমাদের দেশে—কতকাল যাই নি। বাড়ীঘর এতদিনে ভূমিসাৎ—নয়তো একগলা জঙ্গল, সাপ-ব্যাঙের আড্ডা হয়ে আছে। মেয়েছেলে নিয়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়াই কী করে ? আমার স্ত্রী বলছিল, গয়াতে—শ্বশুরবাড়ী—

—সেই সব চেয়ে ভাল আমার মতে। তাই কেন যাও না ?

—পয়সা ? পয়সা কোথায় ? স্কুলে খাটব, দু মাস পরে এক মাসের মাইনে নেব—এই তো অবস্থা। জানেন তো সবই।

—আচ্ছা, তোমার কী মনে হয় ভায়া ? জাপানীরা কি এতদূর আসবে ? সিঙ্গাপুর নিতে পারবে ?

—কী করে বলব ? তবে আমার এক জানাশোনা গবর্মেণ্ট অফিসার বলছিল, সিঙ্গাপুর হঠাৎ নিতে পারবে না। ওখানে যুদ্ধ হবে দারুণ, এবং সে যুদ্ধ কিছুকাল চলবে।

—তবে কলকাতাতে বোমা ফেলতে পারে, কী বল ?

—ফেলতে পারে। সাহেব যাই বলুক, কলকাতা খুব সেফ্‌ হবে না।

—স্কুলটাতে দু দিন বেশী ছুটির কথা বলে দেখলে হয় না ?

—সাহেবকে তা বলা যাবে না। সাহেব ভিজবে না।

ক্ষেত্রবাবু আর কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়া বিদায় লইলেন। ব্ল্যাক-আউটের কলিকাতা, ঘুটঘুটে অন্ধকার—কাল হইতে আলো আরও কমাইয়া দিয়াছে। মোড়ের কাছে এক জায়গায় ঘোড়ার গাড়ির আড্ডা। ক্ষেত্রবাবুর কৌতূহল হইল, গাড়ির ভাড়া কেমন হাঁকে একবার দেখিবেন।

রাস্তা পার হইতে ভয় করে। অন্ধকারের মধ্যে দূরে বা নিকটে বহু আলো তাঁহার দিকে আসিতেছে—ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে বোঝা যায় না, কত বেগে সেগুলি এদিকে আসিতেছে। ক্ষেত্রবাবু সন্তর্পণে সন্তর্পণে রাস্তা পার হইয়া গাড়ীর আড্ডার কাছে গিয়া বলিলেন, ওরে গাড়োয়ান, ভাড়া যাবি ?

একখানা গাড়ির ছাদে একটা লোক শুইয়া ছিল। উঠিয়া বলিল, কাঁহা যানে হোগা বাবুজি ?

—হাওড়া ইষ্টিশানে।

—আভি যাইয়েগা ?

—হ্যাঁ, এখুনি।

—ক আদমী আছে ?

—তিন চার জন আছে—মালপত্তর। কত ভাড়া নিবি ?

—এক বাত বোলেগা বাবুজি ? চার রূপেয়া।

—কত?

—চার রূপেয়া বাবুজি। কাল ইস্‌সে আউর বাঢ়েগা বাবুজি। কাল পান্-ছ রুপেয়া হোগা। দিন দিন বাঢ়তে যাতা হায়—যাবেন আপনি ? সওয়ারী কোথা থেকে যাবে ?

ক্ষেত্রবাবু কী একটা অজুহাত দেখাইয়া সেখান হইতে সরিয়া পড়িলেন। তাঁহার হাত-পা যেন অবশ হইয়া আসিতেছে—সম্মুখে যেন ঘোর বিপদ ঘনাইয়া আসিতেছে, প্রলয় অথবা মৃত্যু, স্ত্রীপুত্র লইয়া এই ব্ল্যাক-আউটের ঘুটঘুটে অন্ধকারাচ্ছন্ন কলিকাতা শহরে তিনি বোতলের ছিপি আঁটা অবস্থায় বুঝি মারা পড়িলেন ! ঘোড়ার গাড়ীর ভাড়া দিনে দিনে যদি অসম্ভব অঙ্কের দিকে ছোটে, তবে তাঁর মত গরীব স্কুল-মাস্টার তো নিরুপায়।

মোড়ের মাথায় বিষ্ণু ভট্‌চাজের সঙ্গে অন্ধকারে প্রায় মাথা ঠুকিয়া গেল। পরস্পরকে চিনিয়া পরস্পর ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বিষ্ণু হাওড়ার রেলওয়ে মালগুদামে কাজ করে, বলিল, ওঃ, জানেন ক্ষেত্রদা, কী কাণ্ড আজ হাওড়া স্টেশনে ! প্রত্যেক ট্রেন ছাড়ছে, লোকে লোকারণ্য। লোক গাড়ীতে উঠতেপাচ্ছেনা—দশ টাকা, পনেরো টাকা করে কুলিরা নিচ্ছে। আবার শুনছি, হাওড়া ব্রিজ দিয়ে গাড়ী-ঘোড়া যাওয়া বন্ধ করে দেবে। এত ভিড় যে, স্ট্র্যাণ্ড রোড একেবারে জ্যাম্—ই. আই. আর.-এর গাড়ীতে ওঠবার উপায় নেই।

—তুমি এখনও আছ যে ?

—আমি আর কোথায় যাব ? ফ্যামিলি পাঠিয়ে দিয়েছি বীরভূম—মামাশ্বশুর-বাড়ী।

ক্ষেত্রবাবু বাসায় ঢুকিলেন। অনিলা বলিল, কী হল গো ? যদুবাবু কী বললে ?

—বলবে আর কী ! সব একই অবস্থা। সেও ভাবছে কোথায় যাবে—জায়গা নাই—

—গয়া যাবে ?

—যাব কি, ই. আই. আর-এর গাড়ীতে নাকি যাওয়ার উপায় নেই।

—তবে কী করবে ? স্কুল তো এখনও বন্ধ হল না !

—বন্ধ হলে কী হবে ? আমার ছুটির মধ্যে ডিউটি পড়েছে—আমার যাবার জো নেই—

অনিলা স্বামীর হাত ধরিয়া মিনতির সুরে বলিল, ওগো, আমার মুখের দিকে চেয়ে তুমি চাকরি ছেড়ে দাও। এই বোমার হিড়িকে তোমাকে এখানে ফেলে রেখে আমার কোথাও গিয়ে শান্তি হবে না। ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে চাইতে হবে লক্ষ্মীটি, শুধু তোমার-আমার কথা ভাবলে হবে না।

ক্ষেত্রবাবুর মনে হইল, তাঁহার মাথার উপরে ভীষণ বিপদ সমাগত। স্ত্রীর গলার সুরে, নিজের মুখের কথায় যেন কোন মহা ট্রাজেডির ইঙ্গিত দিতেছে, সে ট্রাজেডির বেড়াজাল এড়াইয়া কোথাও পলাইবার পথ নাই।

সারারাত্রি বড় রাস্তা দিয়া ঘড়-ঘড় করিয়া ঘোড়ার গাড়ী আর ঠুনঠুন করিয়া রিক্শা ছুটিতেছে—ক্ষেত্রবাবু বিনিদ্র চক্ষে সারারাত্রি ধরিয়া শুনিয়াই চলিলেন। অনিলা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, ছেলেমেয়েরা ঘুমাইতেছে, সম্মুখে কী বিপদ, ইহাদের সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই নাই। কী করিয়া উন্মত্ত জাপানী বোমার হাত হইতে ইহাদের বাঁচাইবেন ? বাঁচাইতে পারিবেন কি শেষ পর্যন্ত ? হাতে টাকা পয়সা কোথায় ?

সারারাত্রি ক্ষেত্রবাবু বিছানায় এপাশ ওপাশ করিলেন।

পরদিন স্কুলের প্রমোশন। সাহেব খুব সকালে উঠিয়া—অভিভাবকদের পড়িয়া শোনাইবার জন্য যে রিপোর্ট লিখিয়াছেন, তাহা আর-একবার পড়িয়া দেখিতে বসিলেন। আজ ছেলেদের প্রমোশনের পর অভিভাবকদের সভায় এই রিপোর্ট পড়া হইবে—প্রতি বৎসর হইয়া থাকে, অভিভাবকদের নিমন্ত্রণ করা হয়, এবারও হইয়াছে।

“বড়ই আনন্দের কথা সপ্তম শ্রেণীর ইংরেজী পরীক্ষার ফল এবার যথেষ্ট আশাপ্রদ , যদিও ক্লাসের সর্ব্বোচ্চ নম্বর শত-করা বাহান্ন, তবুও এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, প্রত্যেক উত্তরের খাতা আমাকে যথেষ্ট সন্তোষ দান করিয়াছে। ক্লাসের ছেলেদের মধ্যে হরিচরণ এবার গ্রামারে বিশেষ উন্নতি করিয়াছে, যদিও ক্রিয়াপদের যথার্থ প্রয়োগ এখনও সে শিক্ষা করে নাই। গ্রামার-শিক্ষার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক এজন্য যত্ন লইতেছেন। শ্রীমান নবীনচন্দ্র গুঁই ইংরেজী আর্টিকৃলের ব্যবহারে বালকসুলভ ভ্রম প্রদর্শন করা সত্ত্বেও তাহার গ্রামারের জ্ঞান উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। নবম শ্রেণীর অঙ্কের ফল এ বৎসর আশাতীত ভাল। শ্রীমান গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় নব্বুই নম্বর পাইয়া অঙ্কে ক্লাসের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। আমি এই বালকের গত বৎসরের অঙ্ক পরীক্ষার ফলের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি—বিগত বৎসরের ষান্মাসিক ও বার্ষিক পরীক্ষায় শ্রীমান গোপাল বীজগণিত ও জ্যামিতিতে যথাক্রমে আটচল্লিশ ও বত্রিশ নম্বর মাত্র পায়—এক বৎসরের মধ্যে সেই বালকের এই উন্নতি শুধু যে কেবল অঙ্কশিক্ষকের কৃতিত্বের পরিচায়ক তাহা নহে, বালকের নিজের অধ্যবসায় ও আগ্রহেরও নিদর্শন বটে। আমি এজন্য তাহাকে একটি স্বাক্ষরিত প্রশংসাপত্র দিব স্থির করিলাম। শ্রীমান লালগোপাল ধর ইতিহাসে এ বৎসর···”ইত্যাদি।

অভিভাবকদের কাছে এই ধরনের রিপোর্ট পাঠ কোন স্কুলেই হয় না—কিন্তু সাহেবের বিশ্বাস, ইহাতে অভিভাবকেরা সন্তুষ্ট থাকে, স্কুলের ছাত্রসংখ্যা বাড়ে। এই ধরণের রিপোর্ট পাঠ নাকি ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুলের একটি বৈশিষ্ট্য। কৃতী বালকদিগকে স্বাক্ষরিত প্রশংসাপত্র দান আর একটি বৈশিষ্ট্য ; যদিও ছেলেরা আড়ালে বলাবলি করে, রৌপ্যপদক দিতে অর্থব্যয় আছে, প্রশংসাপত্র দিতে খরচ শুধু কাগজের।

মাস্টারেরা বেলা নয়টার মধ্যে আসিয়া গেল। কাল সারকুলার দেওয়া হইয়াছিল—বিভিন্ন মাস্টারের বিভিন্ন কাজ। কেহ প্রমোশন-প্রাপ্ত ছেলেদের নাম, ক্লাস ও সারি তালিকা করিতেছে, কেহ ভাল ছাত্রদের পরীক্ষার খাতাগুলি আলাদা করিয়া রাখিতেছে, কেহ নতুন

ক্লাসের বইয়ের লিস্টগুলি তৈয়ারি করিতেছে। দুইজনে মিলিয়া একখানা বিজ্ঞাপন লিথো করিতেছে [এই স্কুলে আধুনিকতম শিক্ষাবিজ্ঞান অনুমোদিত পদ্ধতিতে ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হয়, হেডমাস্টার মিঃ জি. বি. ক্লার্কওয়েল এম. এ. (লিড্‌স্) বি. এড. (লণ্ডন) এল. টি. (কর্ক) এস. সি. এম. এস. (অমুক) স্বয়ং নবম ও দশম শ্রেণীতে ইংরাজী পড়ান এবং শিশু শ্রেণীতে কথ্য ইংরেজী শিক্ষা দেন। আমরা স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি—]।

বিজ্ঞাপন ছাপাইবার পয়সা নাই—তাই লিথো করা। অভিভাবকদের হাতে বিলি করা হইবে। হেডমাস্টারের নানা ফাইফরমাশ খাটিতে খাটিতে মাস্টারেরা হিমসিম খাইয়া গেল।

বেলা দশটা বাজিল। এ কয়দিন ছেলেরা তেমন নাই—কারণ, পরীক্ষার পর একরকম ছুটিই ছিল। আজ প্রমোশনের দিন, অন্য অন্য বছর বেলা সাড়ে নয়টার সময় হইতে ছেলেদের ভিড় হয়—এবার জনপ্রাণীর দেখা নাই। বেলা এগারোটা বাজিল, কেহই নাই। সাড়ে এগারোটার সময় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জন মাত্র ছাত্র আসিল—তিন শো সাড়ে তিন শো ছেলের মধ্যে। দুইজন মাত্র অভিভাবক দেখা দিলেন প্রায় বারোটার সময়। আর কেহই আসিল না। হেডমাস্টার রীতিমত নিরাশ হইলেন—কত কষ্ট করিয়া লেখা রিপোর্ট কাহার সামনে পাঠ করিবেন? তবুও তিনি ছাড়িবার পাত্র নহেন, নিজের ঘর হইতে গাউন ঝুলাইয়া ও স্লেটের মত দেখিতে হ্যাট মাথায় দিয়া সাজিয়া-গুজিয়া মাস্টারদের লইয়া ক্লাসে ক্লাসে প্রমোশন দিতে গেলেন।

মিঃ আলম বলিলেন, স্যার্, নীচের তলায় কোন ক্লাসে ছেলে নেই—ছোট ছোট ছেলেদের ক্লাস একেবারে ফাঁকা! সেখানে কি যেতে হবে?

সাহেব হাইকোর্টের জজের মত গম্ভীর স্বরে বলিলেন, নিয়ম যা, তার একটুকু ব্যতিক্রম হবার জো নেই আমার স্কুলে। শূন্য ক্লাসের সামনেই প্রমোশনের লিস্ট পড়া হবে।

সুতরাং উপরের ক্লাসের প্রমোশন লিস্ট পড়া শেষ করিয়া হেডমাস্টার দলবল লইয়া নীচেকার শূন্য ক্লাসগুলিতে অবতীর্ণ হইলেন।

হেডমাস্টার ডাকিলেন, রমেন্দ্র বোস প্রোমোটেড্ টু নেক্‌সট্ হাইয়ার ক্লাস, অমুক প্রোমোটেড্ টু নেক্‌সট্ হাইয়ার ক্লাস, ইত্যাদি।

ফাঁকা হাওয়া এ-জানালায় ও-জানালায় হা-হা করিতেছে। কাড়কাঠে টিক্‌টিকি টিক্‌টিক্ করিয়া উঠিল; হাসি পাইলেও কোন মাস্টারের হাসিবার জো নাই। শ্রীশবাবু গেম মাস্টার বিনোদবাবুর পাঁজরায় আঙুলের গুঁতা মারিল। যদুবাবু ক্ষেত্রবাবুকে চিম্‌টি কাটিলেন।

উপরে আসিয়া রিপোর্ট পড়িবার সময় দেখা গেল, সেই দুইজন অভিভাবক আপিসে বসিয়া আছে। তাহারা সাহেবের বার্ষিক প্রোগ্রেস রিপোর্ট শুনিতে আসে নাই, আসিয়াছে তাহাদের ছেলেদের ট্রান্সফার সার্টিফিকেট লইতে।

সাহেবের ইঙ্গিতে মিঃ আলম তাহাদের আড়ালে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা এ স্কুল থেকে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন কেন? ওদের এ বছরের ফল বেশ ভালই। হেডমাস্টারের রিপোর্টটা শুনুন না—

একজন বলিল, রিপোর্ট শুনে কী করব মশাই, আমাদের ফ্যামিলি সব এখান থেকে চলে গিয়েছে কাটোয়ায়, আজ আট-দশ দিন হল। সেখানে এখন সবাই থাকবে। এখানে বাড়ী চাবিবন্ধ, ছেলে থাকবে কার কাছে? সেখানেই ভর্ত্তি ক'রে দেব।

অন্য লোকটি বলিল, আমাদের দেশ মশাই বর্দ্ধমানে। আমাদের দোকান ছিল, উঠিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছি। দেশের স্কুলে ভর্ত্তি করব। আপনি সাহেবকে বলুন, ট্রান্সফার আজই দিতে হবে। আমাদের পাড়ায় লোক নেই, থাকব কী ভরসায়?

—রিপোর্টটা শুনুন না।

—না মশাই, মন ভাল না। ওসব শোনবার সময় নেই। আমার ব্যবস্থাটা করে দিন তাড়াতাড়ি।

মিঃ আলম ফিরিয়া আসিলে সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, কী হল?

—স্যার, ওরা শোনে না। ট্রান্সফার না নিয়ে ছাড়বে না মনে হচ্ছে!

—ছেলে এল না কেন আজ?

রামেন্দুবাবু বলিলেন, ছেলে কোথায় যে আসবে স্যার? সব ভেগেছে।

নমো-নমো করিয়া মীটিং শেষ হইল। রিপোর্ট পাঠ হইল স্কুলের মাস্টারদের সামনে। মীটিং অন্তে হেডমাস্টারের নানারকম সারকুলার বাহির হইল—এ মাস্টারকে এ করিতে হইবে, ও মাস্টারকে ও করিতে হইবে। ছুটির সারকুলার বাহির হইল—দোসরা জানুয়ারী স্কুল খুলিবে। হেডমাস্টারের নিকট মাস্টারেরা বিদায় লইলেন। অতি সাধের লিথো-করা বিজ্ঞাপন কাহাদের মধ্যে বিলি করা হইবে? স্কুলের বোর্ডে খানকতক আঠা দিয়া জুড়িয়া দেওয়া হইল।

চায়ের দোকানে যদুবাবু আর শ্রীশবাবু হাসিয়া বাঁচেন না।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, সাহেবের কী কাণ্ড! কোনো ত্রুটি হবার জো নেই।

যদুবাবু বলিলেন, নাঃ, হেসে আর বাঁচি নে—হাসতে হাসতে পেট ফুলে উঠল। হাসতেও পারি নে সাহেবের সামনে—

এই সময় জ্যোতির্ব্বিনোদ একটা পুঁটুলি হাতে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, আজ শেষ দিনটা, ভাল করে খাওয়া-দাওয়া করা যাক যদুদা।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, হাতে পোঁটলা কিসের হে?

—আজ বাড়ী যাচ্ছি রাত্রের গাড়ীতে।

—এ কদিনের জন্যে?

—না দাদা, বাড়ী থেকে চিঠি এসেছে। যাই চলে, যা হয় হবে। এখন কলকাতা আসা বোধ হয় হবে না।

—সাহেব কি ছুটি দে'ব?

—না হয় চাকরি ছেড়ে দেব। দেশে ঘর আছে, ভিক্ষে করে খাব। বামুনের ছেলে, তাতে লজ্জা নেই।

যদুবাবুর বুকের ভিতরটা ছ্যাঁত করিয়া উঠিল। এই জ্যোতির্বিনোদের মত সামান্য দরের লোকে যদি চাকরি ছাড়িয়া দিবার মত মরীয়া হইয়া উঠিতে পারে, তবে বিপদ কত বেশী!

কে একজন বলিল, ক্ষেত্রদার হোমিওপ্যাথিটা যা হোক চলছিল—

—আর হোমিওপ্যাথি ভায়া! পাড়ায় নেই লোক, ডাক্তারি করতাম একটু-আধটু অবসরমত, তাও গেল—পাড়া খালি।

যদুবাবু হঠাৎ হেন শীতকালেও ঘামিয়া উঠিতে লাগিলেন। শ্রীশবাবু, শরৎবাবু, গেম্‌মাস্টার বিনোদবাবু, হেডপণ্ডিত, সবাই আজ উপস্থিত। বড়দিনের ছুটি হইয়া যাইতেছে—তাহার উপর এই গোলমাল। কী হইবে কে জানে? একটু ভাল করিয়া খাওয়া-দাওয়া করিয়া লওয়া যাক। ইঁহাদের ভাল খাওয়ার দৌড়—চার পয়সা হইতে ছয় পয়সা বা আট পয়সা। একখানা টোস্টের জায়গায় দুইখানা টোস্ট। তাহাই সকলে আমোদ করিয়া খাইলেন। ইঁহারা অল্পেই সন্তুষ্ট, অভাবের মধ্যে সারা জীবন এবং যৌবনের প্রথম অংশ অতিবাহিত করিয়া সংযম ও মিতব্যয়ে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

ইঁহাদের মধ্যে জগদীশ জ্যোতির্বিনোদ অমিতব্যয়িতার প্রথম উদাহরণ দেখাইয়া বলিল, ওহে দোকানদার, যদুবাবুকে আরও একখানা কেক্ দাও, শ্রীশবাবুকে একখানা টোস্ট দাও, বিনোদকে—

যদুবাবু একগাল হাসিয়া বলিলেন, আমাদের জ্যোতির্বিনোদের হার্টটা যাই বল বেশ ভাল।

—আর দাদা, হার্ট! এবার কলকাতা থেকে চলে যাচ্ছি। বোধ হয় এই শেষ দেখা—চাকরি আর করব না—

—কেন, কেন?

—বাড়ীর সকলে বলছে, প্রাণ বাঁচলে অনেক চাকরি মিলবে—চলে এস বাড়ী।

যদুবাবু কথাটা এই কিছুক্ষণ আগেই একবার শুনিয়াছেন ইঁহার মুখ হইতে, তবুও আর একবার জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিয়া বিপদের গুরুত্বটা ভাল করিয়া যেন বুঝিতে চাহিলেন।

ক্ষেত্রবাবুকে বলিলেন, তারপর ক্ষেত্র ভায়া, ব্যাপার কী দাঁড়াল বল তো? সত্যি কি কলকাতা ছেড়ে যেতে হবে?

ক্ষেত্রবাবুও ঠিক এই কথাই ভাবিতেছেন। চা খাইতে খাইতে এইমাত্র ভাবিতেছিলেন, আস্‌সিংড়ি যাওয়া ভাল, না, গয়ার দিকে—শ্বশুরবাড়ীতে? যদুবাবুর কথায় যেন একটু বিস্মিত হইলেন। ভয়ানক বিপদ নিশ্চয় সম্মুখে, নতুবা যদুদার মনেও ঠিক একই সময়ে সেই একই কথা উঠিল কেন? বলিলেন, তা যেতে হবে বইকি। সবাই যখন পালাল—

গেম্‌-মাস্টার বলিলেন, আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে রেডিও আছে। টোকিও থেকে নাকি বলেছে, সাতাশে তারিখে কলকাতায় নিশ্চয়ই বোমা ফেলবে—

যদুবাবু সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, য়্যাঁ!

ক্ষেত্রবাবুর নিজের স্নায়ুসমূহের উপর কর্তৃত্ব আরও দৃঢ়তর। তিনি বলিলেন, কোন্ সাতাশে? এই সাতাশে?

—এই সামনের সাতাশে দাদা। আজ হল সতরো।

যদুবাবুর সামনে এইবার দোকানী জ্যোতির্ব্বিনোদের অর্ডারী সেই কেক্‌খানা দিয়া গেল। যদুবাবুর তখন আর কেক্ খাইবার রুচি নাই অন্য সময়ে হইলে পরের দেওয়া চার পয়সা দামের ভাল কেক্‌খানা কী তৃপ্তির সঙ্গেই একটু একটু করিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া চায়ের সঙ্গে খাইয়া শেষ করিতে অন্তত দশ-পনেরো মিনিট করিতেন—পাছে তাড়াতাড়ি ফুরাইয়া যায়! আজ কিন্তু যদুবাবুর মনে হইল, তিনি মিউনিসিপ্যালিটির জবাইখানার মধ্যে বসিয়া আছেন, চারি ধারে গরুর বদলে মানুষের কাটা হাত, পা, ঘিলু-বার-হওয়া শূন্যগর্ভ নরমুণ্ড, চাপ চাপ রক্ত, থেঁতলানো ধড়, ছটকিয়া পড়া দন্তপাটি—শবের উপরে শব, রক্তমাখা চুলের বোঝা, উগ্র কর্ডাইটের গন্ধ, মৃত্যু, আর্ত্তনাদ!

যদুবাবু নিজের অজানিতে শিহরিয়া উঠিলেন।

কোথায় যাইবেন তিনি? যাইবার কোন জায়গা নাই। বেড়াবাড়ী গিয়া উঠিবেন অবনীকে খোশামোদ করিয়া, হাতে পায়ে ধরিয়া? এ বিপদসঙ্কুল স্থানে মরণের ফাঁদের মধ্যে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকার চেয়ে তাও যে ভাল। ভাগ্যে আজ রামেন্দুবাবুকে ধরিয়া-কহিয়া গোটাকতক টাকা সাহেবের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইয়াছেন!

সম্মুখের টেবিলস্থ পাত্রের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, ইতিমধ্যে কখন কেক্‌খানা খাইয়া ফেলিয়াছেন অন্যমনস্ক অবস্থায়। টেবিল হইতে উঠিয়া বলিলেন, তোমরা তা হলে বোস, আমি আসি—

জ্যোতির্ব্বিনোদ বলিল, আরে বসুন বসুন যদুবাবু, আর এক পেয়ালা চা দেবে? আর একখানা কেক্?

—আরে, না হে না। আমার সময় নেই সত্যি। একটা জরুরী কাজ আছে, আমি চলি—

অপরের চা ও খাবার যদুবাবু বোধ হয় জীবনে এই সর্ব্বপ্রথম প্রত্যাখ্যান করিলেন।

বেলা সাড়ে পাঁচটা। শীতের বেলা, সন্ধ্যার বেশী দেরি নাই। ব্ল্যাকআউটের কলিকাতায় বেশী ঘোরাঘুরি চলিবে না, তবুও যদুবাবু শ্যামবাজারে তাঁহার এক জানা-শোনা লোকের আড়তে গিয়া কিছু টাকা ধারের চেষ্টা একবার দেখিলেন। যদি কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতে হয়, বেশ কিছু রেস্ত থাকা দরকার হাতে।

টালার পুলের পাশ দিয়া গলিটা নামিয়া গেল। যদুবাবু দুরু দুরু বক্ষে আড়তের নিকটবর্ত্তী হইলেন, কী জানি কী ঘটে! কত টাকা চাহিবেন? দশ, না, ত্রিশ? পাওয়া যাইবে কি এ বাজারে? বিশেষত এ স্থলে আলাপ-পরিচয় তেমন ঘনিষ্ঠ নয়। লোকটি তাঁহার শালার সহপাঠী, শালার সঙ্গে কয়েকবার ইতিপূর্ব্বে এখানে আসিয়াছেন—একসময়ে

যাতায়াত ছিল, এখন কমিয়া গিয়াছে?

আড়তের টিনের চালা নজরে পড়িতেই যদুবাবুর বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল, জিভ শুকাইয়া আসিল।

পথের ধারে খালের জলে একটা হাঁড়ি-বোঝাই ভড় হইতে লোকজন হাঁড়ি নামাইতেছিল। যদুবাবু লক্ষ্য করিলেন, অনেকগুলি মাটির তোলোহাঁড়ি ডাঙায় সাজাইয়া এক পাশে রাখিয়া দিয়াছে। এক পাশে স্তূপাকার কলিকা। লুঙ্গি-পরা এক মাঝি আরও কলিকা নামাইতেছে।

যদুবাবু ভাবিলেন, এ হাঁড়িতে আর কি কেউ ভাত রেঁধে খাবে? কলকাতা শহর তো ফাঁকা—এত কল্কেতেই বা তামাক খাবে কে?

তখন একেবারে আড়তের সামনে তিনি পৌঁছিয়া গিয়াছেন।

সামনেই একজন ভদ্রলোক বসিয়া আছেন, বছর পঞ্চাশেক বয়স, মাথায় টাক, রঙ খুব গৌরবর্ণ, গায়ে হাত-কাটা বেনিয়ান। লোকটি গুড়গুড়িতে তামাক খাইতেছিলেন।

যদুবাবু পৈঠা দিয়া উঠিতে উঠিতে হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন, এই যে সীতানাথবাবু, ভাল আছেন?

—এই যে যদুবাবু আসুন—বসুন। তারপর কোথা থেকে? রমানাথ কোথায়?

রমানাথ যদুবাবুর শ্যালক, আজ বছর কয়েক যদুবাবু তাহার কোন খবর জানেন না; সেও ভগ্নীপতির খবরাখবর রাখে না। কিন্তু সে কথা এ স্থলে বলা ঠিক হইবে না। যাহার সুবাদে আড়তের মালিকের সঙ্গে পরিচয়, সে-ই যদি খোঁজখবর না রাখে, তবে ইহার নিকটও যদুবাবুকে কিঞ্চিৎ খেলো হইতে হয় বইকি। সুতরাং তিনি বলিলেন, রামু সেইখানেই আছে। মধ্যে আসবে লিখেছিল, ছুটি পাচ্ছে না—

—সেই জব্বলপুরেই আছে? আছে ভাল?

—হ্যাঁ, তা ভাল আছে।

—আপনাদের স্কুল ছুটি হয়ে যায় নি? আপনি এখনও স্কুলে আছেন তো?

—আছি বইকি। নয়তো কী আর করব বলুন? আপনাদের মতন তো ব্যবসা-বাণিজ্য শিখি নি।

আড়তের মালিক হাসিয়া বলিলেন, আপনাদের তো ভাল, বিছানা বাক্স বাঁধলেন, কলকাতা থেকে পালালেন, আমাদের কী হয় বলুন তো? গুদোমভরা মাল নিয়ে এখন যাই কোথায়? বোমা পড়ে, এখানেই যা হয় হোক। বসুন, চা খাবেন? ওরে দু পেয়ালা চা করতে বল ঠাকুরকে।

চা খাইয়া এ-কথা ও-কথার পরে যদুবাবু আসল কথাটি উত্থাপন করিবার পূর্ব্বে যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করিয়া লইলেন। তাহার পর শুষ্কমুখে বার দুই-তিন ঢোঁক গিলিয়া বলিলেন, আপনার কাছে এসেছিলাম সীতানাথবাবু, হাতে বিশেষ কিছু নেই, একেবারেই খালি। কলকাতার বাইরে যেতে হলে কিছু হাতে রাখা দরকার। গোটা কুড়ি টাকা যদি আমাকে ধার দেন এসময় তবে বড়ই উপকার করা হয়, আমি অবিশ্যি যত সত্বর হয়, আপনার ধার

শোধ করব, জানুয়ারী মাসের মাইনে থেকে—

চাহিবার ভাবা অবশ্য ইহাই। আড়তদার সীতানাথবাবু স্কুল-মাস্টার নহেন, লোক চরাইয়া খান। টাকা ধার লইলে কেহ স্বেচ্ছায় শোধ দিয়া যায় বাড়ী বহিয়া, ইহা বিশ্বাস করেন না। যদুবাবুর সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ঠতাও তাঁহার নাই, এ অবস্থায় যদুবাবু একেবারে কুড়ি টাকা ধার চাওয়াতে কিঞ্চিৎ বিস্মিতও হইয়াছিলেন। বেশ অমায়িকভাবে হাসিয়া, কথার সঙ্গে কিছুমাত্র ডালপালা না জুড়িয়া যথেষ্ট ভদ্রতা ও বিনয়ের সহিত বলিলেন, টাকা হবে না। এ সময় নয়—

যদুবাবু আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। সীতানাথবাবুর গলার সুরে হৃদ্যতা বা আত্মীয়তার লেশমাত্র নাই। চাঁচাছোলা কেতাদুরস্ত ভাবের ভদ্রতার সুর। শুনিলে ভয় হয়, দ্বিতীয় বার আর যাচ্‌ঞা করা চলে না। তবুও প্রাণের দায় বড় দায়—কাল সকালে তিনি কলিকাতা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবেনই, যে দিকে দুই চোখ যায়, এখানে লজ্জা করিলে চলিবে না। সুতরাং আবার বলিলেন, তা দেখুন সীতানাথবাবু, একটু দেখুন। হয়ে যাবে এখন। আমার বড্ড দরকার। কলকাতা থেকে চলে যাবার উপায় নেই, আমাকে একটু সাহায্য করুন—

—হবে না। পারব না। মাপ করুন—

সীতানাথবাবু হাতজোড় করিলেন এমন ভঙ্গিতে, যেন তিনি বিশেষ কোন অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছেন যদুবাবুর কাছে।

তবুও যদুবাবু আবার বলিলেন, তবে না হয় আমায় পনেরোটা কি দশটা টাকা দিন—যা পারেন—আমি যে বড় টানাটানিতে পড়েছি কিনা—জানুয়ারী মাসের মাইনে পেলেই—

সীতানাথবাবু কী ভাবিয়া বলিলেন, পাঁচটা নিয়ে যান, এসেছেন যখন। ও গোপাল, ক্যাশ থেকে পাঁচটা টাকা দাও তো!

ওদিকে একজন বৃদ্ধলোক বসিয়া খাতাপত্র লিখিতেছিল, সে বলিল, খাতায় কী লিখব বাবু।

—আমার নিজ নামে হাওলাতে লিখে রাখ। এই নিন্—আসুন।

যদুবাবু নমস্কার করিয়া সীতানাথবাবুর আড়ত হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। শ্যামবাজারের মোড় পর্য্যন্ত আর আসিতে পারেন না, রাস্তা পার হইতে পারেন না, ঘুটঘুটে অন্ধকার। ওখানা কী আসে—রিক্‌শা, না, মোটর?

আলো চলিয়া আসিতেছে—অন্ধকারের মধ্যে কত জোরে আসিতেছে বোঝা যায় না, ঘাড়ে পড়িবে নাকি?

বাড়ী আসিলেন তখন দশটা-রাত্রি।

যদুবাবুর স্ত্রী বলিল, এলে? আমি ভেবে মরি, এত রাত পর্যন্ত এই অন্ধকারে—

—শোন, বিছানা-বাক্স গুছিয়ে নাও—কাল সকালের ট্রেনেই বেরুতে হবে আর নয় এখানে—

যদুবাবুর স্ত্রী অবাক হইয়া যদুবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, সে কী গো! যাবে কোথায় একটা ঠিক কর আগে।

—অত ঠিক করার সময় নেই। চল, বেড়াবাড়ী যাই।

যদুবাবুর স্ত্রী শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, ওগো, তুমি মাপ কর। সেখানে আমি যাব না।

যদুবাবু মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন, তবে মর গে যাও—যাবে কোথায়। দাঁড়াবার জায়গা আছে কোথায় জিগ্যেস করি? এখানে মর বোমা খেয়ে।

—তা সেও ভাল। অবনী ঠাকুরপোর বউ আর মায়ের খিটিং খিটিং দাঁতের বাদ্যি আমার সহ্য হবে না। তার চেয়ে মরি বোমা খেয়েই মরি।

—তবে মর, যা হয় কর। আমি কিচ্ছু জানি নে—

—তুমি যাও না নিজে। রেখে যাও আমায় এখানে—

আহারাদি করিয়া যদুবাবু মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলেন। বেড়াবাড়ী যদি না যাওয়া যায়, তবে কোথায় গিয়া উঠিবেন? দিদির বাড়ী? হুগলী জেলার যে পল্লীগ্রামে তাঁহার দিদির বাড়ী, ভগ্নীপতির মৃত্যুর পরে বহুদিন কেন, বহুকাল সেখানে যাওয়া হয় নাই। বাড়ীঘরের কী আছে না আছে, তিনি জানেনও না। সেইখানেই অগত্যা যাইতে হয়। মোটের উপর যেখানে হয়, কাল সকালেই পলাইতে হয়। ভাবিবার সময় নাই।

একবার কী একটা শব্দ হইল, যদুবাবু চমকিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। এরোপ্লেনের শব্দ, সাইরেন বাজিল নাকি?

পোঁ—ও—ও—ও—

ক্রমশ শব্দটা মাথার উপরে আসিতেছে। যদুবাবুর প্লীহা চমকাইয়া গেল। জাপানী প্লেন যে নয়, তাহা কে বলিল? যদুবাবুর স্ত্রী বলিল, এই দেখ একখানা উড়ো জাহাজ আলো জ্বালিয়ে মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে।

যদুবাবু তাড়াতাড়ি বলিলেন চুপ, চুপ, হ্যারিকেনটা ঘরের মধ্যে নিয়ে যাও—ঘরের মধ্যে নিয়ে যাও—বোমা! বোমা! জাপানী বোমা!

আবার সেই রক্তাক্ত জবাইখানার দৃশ্য তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া উঠিল—রক্ত, চুল, অস্থি, মাংস। স্ত্রীকে বলিলেন, বেঁধে নাও, বিছানা-টিছানা বেঁধে ফেল—কটা বেজেছে দেখ তো, ওখানেই যাব ঠিক করলাম। মঙ্গলাদের দেশে।

আজ রাতটা কি কোন রকমে কাটিবে না?

সকাল হইতে না হইতে যদুবাবু ঘোড়ার গাড়ীর আড্ডায় গাড়ী ভাড়া করিতে গেলেন। হাওড়া স্টেশনে যাইতে কেহ হাঁকিল তিন টাকা, কেহ হাঁকিল সাড়ে তিন টাকা। একজন বলিল, হাওড়া পুল বন্ধ হয়ে গিয়েছে বাবু, কোন গাড়ী যেতে দিচ্ছে না—

যদুবাবু চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, কে বললে?

—হামরা সব জানি বাবু।

দুইখানা রিক্‌শা ঠুন্ ঠুন্ করিয়া যাইতেছিল। তাহাদের থামাইয়া, বারো আনায় রিক্‌শা ঠিক করিয়া তাহাদের বাসার সামনে আনিলেন। তখনও ভাল করিয়া ভোর হয় নাই। যদি হাওড়ার পুল বন্ধ থাকে, বালি ব্রিজ হইয়া রিক্‌শা ঘুরাইয়া লইবেন—যত টাকা লাগে।

কলিকাতা হইতে বাহির হইতেই হইবে। এ মৃত্যুর ফাঁদ হইতে বাহির হইতে পারিবেন না কি কোন রকমে? জাপানী বোমা!!

জিনিসপত্র রিক্‌শায় বোঝাই দিয়া মলঙ্গা লেন হইতে সেণ্ট্রাল য়্যাভেনিউতে পড়িয়া বউবাজার দিয়া হাওড়ার পুলের দিকে চলিলেন। একটু একটু ফরসা হইয়াছে। পুল নির্ব্বিঘ্নে পার হইয়া গেল, অত ভোরেও দলে দলে ছ্যাকরা গাড়ী, মোটর, রিক্‌শা, ঠ্যালা-গাড়ী, মোট-মাথায় মুটে, পথচারীর দল চলিয়াছে পুল বাহিয়া। যদুবাবু নিজের চোখকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, তবে কি পুল পার হইতে পারিয়াছেন সত্যই? বোধ হয় এ-যাত্রা তবে রক্ষা পাইয়া গেলেন।

স্টেশনে লোকে লোকারণ্য অত সকালেও। বউ-ঝি, ছেলে-মেয়ে, লটবহর, মুটে, বিছানা, ধামা, ট্রাঙ্ক, গুড়ের ভাঁড়, তেলের টিন, ছাতালাঠির বাণ্ডিল, চ্যা-ভ্যাঁ, হৈ-চৈ। টিকিট কাটিতে গিয়া দেখিলেন, টিকিটের জানালা খোলে নাই। অথচ সেখানে সার বাঁধিয়া লোক দাঁড়াইয়া। গেটে ঢুকিবার উপায় নাই, পিষিয়া তালগোল পাকাইয়া কোন রকমে প্ল্যাটফর্মে ঢুকিলেন। গাড়ির দরজায় চাবি—লোকজন জানালা দিয়া লাফাইয়া ডিঙাইয়া কামরার মধ্যে ঢুকিতেছে। যদুবাবু এক ভদ্রলোককে বলিলেন, মশায় একটু দয়া করে যদি সাহায্য করেন মেয়েদের।

যদুবাবুর স্ত্রী বসিবার জায়গা পাইলেন, কিন্তু তিনি নিজে অতি কষ্টে দাঁড়াইবার স্থানটুকু পাইলেন। এই সময় যদুবাবুর স্ত্রী বলিলেন, ওগো, সেই ছোট বালতিটা? সেটা সেই টিকিট ঘরের সামনে—সেখানেই পড়ে আছে—

সর্ব্বনাশ! যদুবাবু অমনি ছুটিলেন। আছে, ঠিক আছে। বালতিটা কেহই লয় নাই। ভিড়ের মধ্যে জিনিসপত্র চুরি যায় না। কাছে কাছে সর্ব্বদাই লোক। সকলেই ভাবে, তাহার মধ্যে কাহারও জিনিস।

গেটে পুনরায় ঢুকিবার সময় বেজায় ভিড়। সারি সারি মুটে মোটঘাট মাথায় দাঁড়াইয়া, পিছনে বউ ঝি, ছেলে মেয়ে, পুরুষ। গেট আবার বন্ধ করিয়া দিয়াছে। একটু পরে কেন যে হঠাৎ গেট খুলিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না। নরনারীর দল ধীর মন্থর গতিতে গেটের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। একটি অল্পবয়সী বধূ দুই হাতে দুইটি ভারী পোঁটলা ঝুলাইয়া ভিড়ে পিষিয়া যাইতেছে। যদুবাবুর মনে সেবা-প্রবৃত্তি জাগিল। আহা, কতটুকু মেয়ে, এই ভিড় সহ্য করা কি ওদের কাজ? যদুবাবু গিয়া বলিলেন, মা, আপনার পুঁটুলিটা দিন আমার হাতে—

বউটিকে সামনে দিয়া হাত দিয়া প্রায় বেড়িয়া ভিড়ের সংস্পর্শ হইতে বাঁচাইয়া, তাহাকে গেট পার করিয়া দিলেন। বউটির সঙ্গে উনিশ-কুড়ি বছরের ছোকরা, তাহার দুই হাতে দুইটি ভারী ট্রাঙ্ক। সে যদুবাবুকে বলিল, স্যার্, আপনি কোন্ গাড়ীতে যাবেন? শেওড়াফুলি? তা হলে এক গাড়ীতেই—

যদুবাবু বধূটিকে অনেক কষ্টে স্ত্রীর পাশে একটু জায়গা করিয়া বসাইয়া দিলেন।

ট্রেন ছাড়িল।

পুনর্জ্জন্ম।

যদুবাবু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। জাপানী বোমার পাল্লা হুগলী জেলা পর্য্যন্ত পৌঁছিবে না।

ক্ষেত্রবাবু শেষ পর্য্যন্ত আস্‌সিংড়ি গ্রামে যাওয়াই স্থির করিলেন। প্রায় আজ দশ বছর পরে যাওয়া। বহু কষ্টে ভিড়, অসুবিধা, অতিরিক্ত খরচ, ধাক্কাধুক্কি সহ্য করিয়া গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলেন সন্ধ্যার কিছু আগে। গিয়া দেখিলেন, পৈতৃক বাড়ীর পশ্চিম দিকের কুঠুরিতে গ্রামের এক গরীব গৃহস্থ আশ্রয় লইয়াছে, তাহারা জাতিতে কৈবর্ত্ত। তাহারা মনের আনন্দে গাছের ডাব ইঁচড় ইত্যাদি খাইতেছে, বাঁশঝাড়ের বাঁশ কাটাইতেছে, উঠানে প্রকাণ্ড তরিতরকারির ক্ষেত করিয়াছে। কোন কালে কেহ আসিয়া এ-সব কাজের কৈফিয়ত চাহিবে, তাহারা কোনদিনও ভাবে নাই। হঠাৎ সন্ধ্যাবেলা বাড়ীর মালিকদের আকস্মিক আবির্ভাবে তাহারা সন্ত্রস্ত তটস্থ হইয়া পড়িল।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, কে হে! ও, পাঁচু না? তোমরাই আছ?

পাঁচু হাত কচলাইয়া বলিল, আজ্ঞে আমরাই। বাড়ীঘর সেবার পড়ে গেল ঝড়ে, তা বলি বাবুর বাড়ী পড়ে রয়েছে, তাই আমরা—

—আছ, ভালই। বাপের ভিটেতে সন্ধ্যে পড়ছে। তা ওদিকে অত জঙ্গল করে রেখেছ কেন? নিজেরাই থাক, একটু ভাল করে রাখলে পার। ওদিকের ঘরগুলো ভাল আছে?

—না বাবু। ওই একখানা ঘর ভাল ছিল, আমরাই থাকি। ওদিকের ঘরের ছাদ দিয়ে জল পড়ে।

—যাই হোক, এখন রাত্তিরটা থাকার ব্যবস্থা কী করা যায়?

—ওদিকের ঘর দুটো পরিষ্কার করে দিই বাবুকে। এখন আসুন।

সেই ভাঙা ঘরের স্যাঁতসেতে মেঝেতে জিনিসপত্র স্ত্রীপুত্র লইয়া ক্ষেত্রবাবু সেই সন্ধ্যা হইতে অধিষ্ঠিত হইলেন। অনিলার আদৌ ইচ্ছা ছিল না এখানে আসিবার। শুধু টাকা পয়সার অভাবে গ্রামে আসিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে!

অনিলা বলে, সাপখোপ কামড়াবে নাকি! মেঝের ওপর শোয়া—তোমার এখানে তক্তাপোশ নেই?

—ছিল—সবই। আজ দশ বছর আসি নি, লোকে চুরিই করুক বা উইয়েই খাক—

পাঁচ-ছয় দিন কাটিয়া গেল।

গ্রামে আসিয়া নূতন জীবন শুরু হইয়াছে ক্ষেত্রবাবুর। সকালে উঠিয়া জেলেপাড়া হইতে মাছ সংগ্রহ করিয়া আনেন, বন-বাগান হইতে এঁচড় ডুমুর পাড়িয়া আনেন, কয়লা পাওয়া যায় না—সুতরাং কাঠ কুড়াইয়া আনেন। সকালে সাড়ে নয়টায় খাওয়ার পরিবর্ত্তে বেলা বারোটায় খান।

অনিলা বলে, প্রাণ গেল বাপু, একটু কথা বলি কার সঙ্গে, এমন লোক খুঁজে মেলা দুর্ঘট।

—কেন, কাকাদের বাড়ী যাও, দত্তদের বাড়ী যাও—

—কী যাব? কেউ কথা বলতে পারে না। শুধু গেঁয়ো কথা—কী রাঁধলে ভাই? কতক্ষণ রান্নার কথা বলা যায় বল তো? এর চেয়ে ভিহিরি গেলে খুব ভাল হত। শুনলে না আমার কথা।

গ্রামের একটা বাড়ীতে কলিকাতা হইতে এক ঘর গৃহস্থ আসিল। ক্ষেত্রবাবুর মত তাহারাও এই গ্রামের বাসিন্দা, কলিকাতায় বাড়ী আছে, বড়বাজারে মসলার ব্যবসা করিয়া বেশ সঙ্গতিপন্ন অবস্থা। তাহারা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে আরও দুই ঘর বোমা-ভীত পরিবার। শেষোক্ত দলের একটি পরিবারের থাকিবার স্থান নাই, পূর্ব্বোক্ত গৃহস্থের প্রাচীন ঠাকুরদালানে দরমার বেড়া দিয়া আবরু সৃষ্টি করিয়া এক ঘর সেখানে রহিল। অপর পরিবারের জন্য গ্রামে ঘর খুঁজিয়া মিলিল না। সকলেই গরীব, কোটাবাড়ী বেশী নাই—যাহা দুই-একখানা আছে, তাহাতে মালিকদের নিজেদেরই কুলায় না।

ক্ষেত্রবাবুর কাছে লোক আসিয়া বলিল, আপনার একখানা ঘর ভাড়া দেবেন?

ক্ষেত্রবাবু অবাক হইলেন। গ্রামের ভাঙা কুঠুরি কেহ ভাড়া লইবে, একথা কে কবে শুনিয়াছে? ভরসা করিয়া বলিলেন, তা দিতে পারি।

—কী নেবেন?

ক্ষেত্রবাবু ভাবিয়া বলিলেন, তিন টাকা।

লোকটি এই গ্রামেরই লোক। বলিল, তিন টাকা কেন? পনেরো টাকা হাঁকুন না। তাই দেবে।

ক্ষেত্রবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, পনেরো টাকা বাড়ীভাড়া কে দেবে? এই ভাঙা বাড়ীর একখানা ঘরের ভাড়া তিন টাকা, তা-ই বেশী। পাগল!

—আপনি জানেন না। ওরা টাকার আণ্ডিল, কারে না পড়লে কি করতে এসেছে এই পাড়াগাঁয়ে? ঠিক দেবে। নইলে বাড়ী পাচ্ছে কোথায়?

ক্ষেত্রবাবু হাজার হোক স্কুল-মাস্টার, অত ব্যবসাবুদ্ধি মাথায় খেলিলে আজ সতেরো আঠারো বছর ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুলে পঁয়ত্রিশ টাকা বেতনে মাস্টারি করিবেন কেন? তিনি স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করিতে গেলেন। অনিলা বলিল, সে কী গো, ওই ঘর আবার ভাড়া! ওর আছে কী যে, ভাড়া দেবে? তারা বিপদে পড়ে এসেছে, ওই ভাঙা দুটো ঘরে থাকতে চাইছে, এতেই বোঝ। এমনি থাকতে দাও, কথা বলবার মানুষ পাওয়া যাচ্ছে এক ঘর, এই না কত!

ক্ষেত্রবাবু ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, তিনটে টাকা দিতে চাচ্ছে—আর বাড়াচ্ছি নে অবিশ্যি। দিক তিনটে টাকা। নিই।

—নাও গে যাও, কিন্তু আর এক পয়সা বেশী বোল না।

পরদিন ক্ষেত্রবাবুর ভাঙা ঘরে ভাড়াটেরা আসিয়া গেল—একটি বধূ, তিন ছেলে মেয়ে, প্রৌঢ়া ননদ। শোনা গেল, বধূটির স্বামী কাজ করে ইছাপুরে বন্দুকের কারখানায়। ছুটি পাইলেই একবার আসিয়া দেখিয়া যাইবে। অনিলা বধূটির সঙ্গে খুব ভাব করিয়া ফেলিল, তার নাম কুসুমকুমারী, বাপের বাড়ী বাগবাজার—বৃন্দাবন মল্লিকের গলি। কলিকাতা

ছাড়িয়া বাহিরে আসা এই প্রথম, বিশেষ করিয়া আসৃসিংড়ির মত অজ পল্লীগ্রামে। প্রত্যেক কাজেই অসুবিধা, না আছে দেওয়াল টিপিলেই আলো, কল টিপিলেই জল, না আছে ভাল রাস্তাঘাট, না আছে একটা টকি-বায়স্কোপ।

তবুও দিন যায় কায়ক্লেশে। মেয়েছেলে, কেহ নিজের বাপের বাড়ী শ্বশুরবাড়ীকে অপর মেয়ের কাছে ছোট হইতে দিতে চায় না। কুসুম বাগবাজারের গল্প করে তো অমিলা ডিহিরি-অন-সোনের গল্পে তাহাকে ছাড়াইয়া যাইতে চায়।

শীত কাটিয়া বসন্ত পড়িল। ক্ষেত্রবাবুর মনে পড়িল, আমের বউলের গন্ধ কতদিন এমন পান নাই, বাঁশবন, মাঠে ঘেঁটুফুল ফোটার দৃশ্য কতকাল দেখেন নাই। বহুদিন পূর্ব্বের বিস্মৃত শৈশকালের স্মৃতি অতীত মাধুর্য্যে মণ্ডিত হইয়া শৈশবের মাতাপিতার কত হাসি ও কথার টুকরা ভুলিয়া-যাওয়া স্নেহস্বর লইয়া মনের মধ্যে উঁকি মারে।

•

হাতের পয়সা ফুরাইয়া গেল। অনিলা পিতৃগৃহ হইতে আসিবার সময় লুকাইয়া সামান্য কিছু অর্থ আনিয়াছিল, তাই দিয়াই এতদিন চলিল, নতুবা ক্ষেত্রবাবু স্কুল হইতে বিশেষ কিছু আনেন নাই। ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুল আর খোলে নাই, আঠারোই ডিসেম্বরের পরে কলিকাতার কোন স্কুলই খুলে নাই—ক্ষেত্রবাবু স্কুল হইতে পত্র পাইয়া জানিয়াছেন, খবরের কাগজেও দেখিয়াছেন।

স্কুল কি উঠিয়া গেল! হেডমাস্টারের নামে দুই-তিনখানা পত্র দিয়াও উত্তর না পাওয়াতে বৈশাখ মাসের প্রথমে ক্ষেত্রবাবু নিজেই কলিকাতা গেলেন। সে কলিকাতা আর নাই, রাস্তা দিয়া কত কম লোকজন চলিতেছে, তেল বন্ধ হওয়ার দরুন মোটর গাড়ীর সংখ্যা বহু কমিয়া গিয়াছে, রাত আটটার পর ঘুটঘুটে অন্ধকার।

পিটার লেনের মোড়ে ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুল-বাড়ীটার আর সে শ্রীছাঁদ নাই। গেট ভিতর হইতে ভেজানো ছিল। ঢুকিয়া ক্ষেত্রবাবু ডাকিলেন, ও মথুরা—মথুরা!

নীচের তলার ঘর হইতে কেবলরাম বাহির হইয়া আসিল। ক্ষেত্রবাবুকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি দুই হাত জোড় করিয়া মাথা নীচু করিয়া বলিল, কেমন আছেন বাবু?

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, ও কেবলরাম, সাহেব কোথায়?

কেবলরাম হতাশার সুরে দুই হাত তুলিয়া বলিল, তিনি কলকাতায় নেই। নাগপুরে গেছেন। আমার মাইনে চুকিয়ে দিয়ে গেলেন যাবার সময়।

—স্কুল!

—উঠে গিয়েছে বাবু।

—তবে তোকে মাইনে দিচ্ছে কে এখানে?

—হেডমাস্টার বললেন, তুই এখানে থাক্। চিঠিপত্র এলে তাঁর নামে পাঠাতে বলে দিয়েছেন। যদি এর পরে স্কুল চলে—কিন্তু তা চলবে না বাবু, বাড়ীওলার পাঁচ মাসের ভাড়া বাকী, শুনছি নাকি নোটিশ দিয়েছে।

—ছেলেপিলে কেউ আসে না?

—কে আসবে বাবু, কে আছে কলকাতায়? ওই পাশের গলির কেষ্ট আসে, আর আসে শিবরাম—ওই কুণ্ডু লেনের বাবুদের বাড়ীর সেই ছেলেটা। ওরা এসে খোঁজ নেয়, কবে স্কুল খুলবে। আমি বলি—যাও ছেলেরা, স্কুল যদি খোলে, খবর পাবে।

—মাস্টারেরা?

—কেবল হেডপণ্ডিত এসেছিলেন সাহেবের ঠিকানা নিতে। আর শ্রীশবাবু এসেছিলেন টাকার কী হল জানতে। আর কেউ আসে না! শ্রীশবাবু ঢাকায় চাকরি পেয়েছেন, জ্যোতির্ব্বিনোদ মশাই দেশেরই স্কুলে চাকরি নিয়েছেন।

—নাগপুরে সাহেব কী করছেন জান? তাঁর ঠিকানা কী?

—তিনি কী করছেন তা জানি নে। ঠিকানা নিয়ে যান, আমার কাছে সে দিনও চিঠি দিয়েছেন।

ক্ষেত্রবাবু ঠিকানা লইয়া বিষণ্ণ মনে স্কুল হইতে বাহির হইলেন। আজ সতেরো বৎসরের কত সুখ-দুঃখের লীলাভূমি, কত ছেলে এই দীর্ঘ সতেরো বছরে আসিয়াছে গিয়াছে, কত অস্পষ্ট কাঁচা উৎসুক মুখ মনে পড়ে এখানকার মাটিতে আসিয়া দাঁড়াইলে। মুখই মনে পড়ে, মুখের অধিকারীর নাম মনে পড়ে না। ক্লার্কওয়েল সাহেব, যদুবাবু, জ্যোতির্ব্বিনোদ, মিঃ আলম—আজ সকলের সঙ্গেই আর একবার দেখা করিতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু কে কোথায় আজ ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছে!

পুরানো চায়ের দোকানটিতে ঢুকিয়া ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, ওহে, চা দাও এক পেয়ালা।

দোকানী দেখিয়া ছুটিয়া আসিল: মাস্টারবাবু যে! আসুন, আসুন। ভাল সব?

—ভাল। তোমাদের সব ভাল?

—আর কী করে ভাল হবে বাবু! আপনারা সব চলে গেলেন, তিন-তিনটে স্কুল কাছে, সব বন্ধ। বিক্রি-সিক্রি নেই, দোকান চলে কী করে বলুন?

ক্ষেত্রবাবু বসিয়া বসিয়া আপন মনে চা খাইতে লাগিলেন। কোথায় গেল সে পুরানো দিন। ওইখানটাতে বসিত জ্যোতির্ব্বিনোদ, এখানটাতে রামেন্দুবাবু, ক্ষেত্রবাবুর পাশে সব সময়েই বসিত যদুদা, আর ওই হাতলহীন চেয়ারটা ছিল নারাণদার (আহা বেচারী! ভালই হইয়াছে স্বর্গে গিয়াছে, স্কুলের এ দুর্দশায় বেচারীর প্রাণে বড়ই কষ্ট হইত।) বাঁধা-ধরা আসন। এখানে বসিয়া দুঃখের মধ্যেও কত আনন্দ, কত মজলিস করা গিয়াছে। গত দশ-বারো চৌদ্দ বছর! আজ কেউ নাই কোন দিকে। সর্ব্ব ছত্রভঙ্গ।

স্কুল আর বসিবে না। কলিকাতার সব স্কুল যদিও দুই পাঁচ মাস পরে খোলে, তাঁহাদের স্কুল আর বসিবে না। বসিতে পারে না—আর্থিক অবস্থা খারাপ। বাড়ীওয়ালা আর মাসখানেক দেখিয়া 'টু লেট' ঝুলাইয়া দিবে। মাস্টারেরা পেটের ধান্ধায় যে যেখানে পারিয়াছে, চাকুরিতে ঢুকিয়া পড়িয়াছে, নয়তো তাঁর মত সুদূর পল্লীগ্রামে আত্মগোপন করিয়াছে।

ক্লার্কওয়েল সাহেবের মত একনিষ্ঠ শিক্ষাব্রতীর আজ কী দুরবস্থা, তাহার খবর কে রাখে?

—ক পয়সা ?

—মাস্টারবাবু, আপনাদের খেয়েই মানুষ। এতদিন পরে পায়ের ধুলো দিলেন—এক পেয়ালা চা খেয়েছেন, ওর আর কী দাম নেব ? না মাস্টারবাবু, মাপ করবেন।

—আচ্ছা, আমাদের স্কুলের আর কোন মাস্টার যদি এখানে চা খেতে আসে, তবে আমার কথা বোল তাকে, কেমন তো ? মনে থাকবে ? আমার নাম ক্ষেত্রবাবু। বোল—আমি তাদের কথা ভুলি নি, কেমন তো ?

চায়ের দোকান হইতে বাহির হইয়া দুই-একটি টুইশানির ছাত্রদের বাড়ী গেলেন। বাড়ী তালাবন্ধ। মেয়েছেলে নাই, ভাবে মনে হইল। পুরুষেরা যদি বা থাকে, কর্ম্মস্থল হইতে সকাল সকাল ফিরিবার তাগিদ নাই। ক্ষেত্রবাবু অন্যমনস্কভাবে পথ চলিতে লাগিলেন। ধর্ম্মতলার কাছাকাছি আসিলে একটি তরুণ যুবক আসিয়া খপ করিয়া তাঁহার পায়ের উপর পড়িয়া ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া হাসিমুখে বলিল, স্যার্, ভাল আছেন ? চিনতে পারেন ?

—হ্যাঁ, রাজেন দেখচি যে ! তা আর চিনতে পারব না। তুই কাদের সঙ্গে সঙ্গে যেন পাস করিস্, কোন বছর ?

—বছর পাঁচ হয়ে গেল স্যার্। মনে রেখেছেন, এই যথেষ্ট ! আমি শিবুদের ব্যাচে পাস করি। শিবুকে মনে আছে ? শিবনাথ ভট্‌চাজ্জি—ক্ষীরোদ ডাক্তারের ছেলে।

ক্ষেত্রবাবু ভাল মনে করিতে পারিলেন না ; কিন্তু বলিলেন, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কী করচিস্ ?

—এ. আর. পি.তে ঢুকেছি স্যার্। বেকার বসেছিলাম, আজ অনেক দিন। এবার—

—বেশ, বেশ। আচ্ছা, চলি।

সন্ধ্যার দেরি নাই। আবার সেই ব্ল্যাক-আউটের কলিকাতা। আর কলিকাতায় থাকিয়া লাভ নাই। রাত সাড়ে আটটায় গাড়ী আছে শিয়ালদহে। ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু সস্তার বিস্কুট ও লেবেঞ্চুস কিনিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ক্ষেত্রবাবু স্টেশনে আসিয়া জমিলেন।

যদুবাবু আজ মাস দুই শয্যাগত।

হাওড়া জেলার যে পল্লীগ্রামে তিনি গিয়াছিলেন, সেখানে গিয়া দেখিলেন, ভগ্নীপতির ঘরবাড়ীর অবস্থা যা, তাহাতে সেখানে মানুষের বাস করা চলে না। তবুও থাকিতে হইল, কী করিবেন—অভাব। কিন্তু মাসখানেক পরে যদুবাবুর ম্যালেরিয়া ধরিল। অর্থের অভাব, তদুপরি থাকিবার কষ্ট—এ গ্রামে আত্মীয়বন্ধু কেহ নাই, হাতেও নাই পয়সা।

গ্রামের নাম কমলাপুর, তারকেশ্বর লাইন হইয়া যাইতে হয়—শেওড়াফুলি হইতে পাঁচ-ছয় ক্রোশ দূরে। গ্রামের ভদ্রলোকেরা সকলেই ডেলি-প্যাসেঞ্জার, সকালে কেহ আটটা চল্লিশ, কেহ নয়টা দশের ট্রেন ধরিয়া কলিকাতায় ছোটে, আবার ঝাড়নে বাজারহাট বাঁধিয়া বাড়ী ফেরে। যেটুকু গল্পগুজব করে—হয় আপিস, নয়তো ফুটবল, আজকাল অবশ্য যুদ্ধের গল্প।

পাশেই অবিনাশ বাঁড়ুজ্জের বাড়ী। কলিকাতা হইতে রাত নয়টার সময় প্রৌঢ় ভদ্রলোক বাড়ী ফিরিলে যদুবাবু উদ্বেগের সুরে জিজ্ঞাসা করেন, আজ যুদ্ধের খবর কী অবিনাশবাবু ?

অবিনাশবাবু যুদ্ধের আলোচনা করিতে বসেন। তোজো বা ওয়াভেল বা চার্চ্চিল যাহা না ভাবিয়াছেন, অবিনাশবাবু তাহা ভাবিয়া বুঝিয়া বিজ্ঞ হইয়া বসিয়া আছেন। সিঙ্গাপুর বা ব্রহ্মদেশ কী করিলে রক্ষা পাইতে পারিত, ব্রিটিশের কী ভুল হইল, কোন্ পথ ধরিয়া কী ভাবে যুদ্ধ করিলে আপার বর্ম্মা এখনও রক্ষা হয়—এসব কথা অবিনাশবাবু খুব ভালই জানেন। কলিকাতায় দিন পনেরোর মধ্যে বোমা পড়িবে, এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। বোমারু বিমানের আক্রমণের চিত্র তাঁহার মত কেহ আঁকিতে পারে না।

শুনিয়া শুনিয়া যদুবাবুর কী হইয়াছে, আজকাল তিনি যেন সর্ব্বদাই সশঙ্ক।

একদিন রাত্রে আহার করিতে বসিয়া হঠাৎ উৎকর্ণ হইয়া শুনিলেন, এরোপ্লেনের শব্দের মত একটা শব্দ না?

স্ত্রীকে বলিলেন, দাঁড়াও, ও কিসের শব্দ গো?

—কই?

—ওই যে শোন না—আলো সরাও, আলো ঘরে নিয়ে যাও, ঘরে নিয়ে যাও। জাপানী প্লেন হতে পারে—

—তোমার হল কী? ও তো গুবরে পোকা উড়ছে জানালার বাইরে।

—না না, গুবরে পোকা কে বললে? দেখে এস আগে—দুধ দিতে হবে না, আগে দেখে এস—

যদুবাবুর স্ত্রী ঝাঁটার আগায় পোকাটাকে উঠানে ফেলিয়া দিয়া বলিল, জাপানী এরোপ্লেন ঝাঁট দিয়ে তফাত করে রেখে এলাম গো। এখন নিশ্চিন্দি হয়ে বসে দুধ দিয়ে ভাত দুটি খাও। এক চাকলা আম দিই।

সংসারের বড় কষ্ট, অথচ ভয়ে যদুবাবু কলিকাতায় গিয়া স্কুলে প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের টাকার খোঁজখবর করিতে পারেন না। স্কুলে চিঠি লিখিয়াও জবাব পাইলেন না। ম্যালেরিয়া-প্রধান স্থান, শরীরের মধ্যে অসুখ ঢুকিল—প্রায়ই অসুখে ভোগেন। অথচ ঔষধ নাই, পথ্য নাই। থাকিবারও খুব কষ্ট।

যদুবাবু বলেন, এর চেয়ে বেড়াবাড়ী ছিল ভাল।

যদুবাবুর স্ত্রী বলে, সেখানেও যে সুখ, তা নয়; তবে তুমি সঙ্গে থাকলে আমি বনেও থাকতে পারি। সে বার তুমি আমায় ফেলে এলে একা—কী করে থাকি বল তো?

যদুবাবু বলেন, তুমি অবনীর দিদিকে একখানা চিঠি লেখো। আম-কাঁঠালের সময় আসছে, চল যাই। কতকাল বেড়াবাড়ী বাস করি নি। আসল কথা কী জান, কলকাতা ছাড়া কোন জায়গায় মন টেঁকে না। কথা বলবার মানুষ নেই—আমার যে সব বন্ধু ছিল কলকাতায়, তাদের কেউ পোস্ট-মাস্টার, কেউ মার্চেণ্ট অফিসের বড় কেরানী, দু শো টাকার কম মাইনে নয়। স্কুল-মাস্টারকে সবাই খাতির করত। শিক্ষিত লোক শিক্ষিত লোকের মর্ম্ম বোঝে।

—কেন, ওই অবিনাশবাবু—উনিও তো ভাল চাকরি করেন।

—ওই অবিনাশটা? আরে রামোঃ, রেল-আপিসে কাজ করে, সেকালের এণ্ট্রান্স পাস

—ওর দরের লোকের সঙ্গে কি আমাদের বনে ? ওই দেখ না কেন, দুটো ছেলে রয়েছে, আমি তার বাড়ীর পাশে একজন কলকাতার বড় স্কুলের মাস্টার, পড়া না কেন টুইশানি ? দে না দশটা টাকা মাসে ? এমন পাবি কোথায় তোদের এই পাড়াগাঁয়ে ? পেটে বিদ্যে থাকলে তবে তো ! রেল-আপিসের কেরানী আর কত ভাল হবে !

অবনীর দিদিকে চিঠি লেখা হইল, কিন্তু কোন উত্তর-পাওয়া গেল না। ইতিমধ্যে যদুবাবু একদিন হঠাৎ জ্বর হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। যদুবাবুর স্ত্রী গিয়া অবিনাশবাবুর স্ত্রীর কাছে কাঁদিয়া পড়িলেন। অবিনাশবাবু তখন অফিস হইতে ফেরেন নাই, তাঁহার চাকর পাঠাইয়া পাশের গ্রামের ভূষণ ডাক্তারকে ডাকাইয়া আনিলেন। ভূষণ ডাক্তার আসিয়া রোগী দেখিয়া বলিলেন, মাথায় হঠাৎ রক্ত উঠিয়া এমন হইয়াছে। খুব সাবধানে থাকা দরকার। চিকিৎসাপত্র করিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ করিতে যদুবাবুর স্ত্রীকে শেষ সম্বল হাতের রুলি বিক্রয় করিতে হইল।

এই সময় হঠাৎ একদিন অবনী আসিয়া হাজির। সে একটা পুঁটুলি হইতে গোটাকয়েক কমলালেবু ও পোয়াটাক মিছরি যদুবাবুর বিছানার একপাশে রাখিয়া একগাল হাসিয়া বলিল, নিতে এসেছি দাদা, চলুন। বউদিদি দিদিকে পত্র লিখেছিলেন আপনার অসুখের খবর দিয়ে। দিদি বললেন—যাও ওদের গিয়ে এখানে নিয়ে এস।

যদুবাবু মিনতির স্বরে বলিলেন, তাই নিয়ে চল ভায়া, এখানে আমার মন টেঁকে না।

—বউদিদি কই ?

বোধহয় ঘাটে গিয়েছে। বোস, আসছে এখুনি।

অবনীকে দেখিয়া যদুবাবু যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। নির্ব্বান্ধব স্থানে তবুও একজন দেশের লোক, জ্ঞাতির সান্নিধ্যলাভ কম কথা নয়।

অবনী ইহাদের সঙ্গে করিয়া বেড়াবাড়ী আনিয়া ফেলিল। যে ঘরে পূর্ব্বে যদুবাবুর স্ত্রীর স্থান হইয়াছিল, সেই ঘরখানাতেই এবারও যদুবাবুরা আসিয়া উঠিলেন। ঘরখানা সেই রকমই আছে, বরং আরও খারাপ, আরও স্যাঁতসেতে। দেওয়ালে নোনা লাগার ছোপ আরও পরিস্ফুট হইয়াছে।

গ্রামে ডাক্তার নাই, আশপাশের ষোলখানা গ্রামের মধ্যে কুত্রাপি ডাক্তার নাই, দুই-এক জন হাতুড়ে বদ্যি ছাড়া। তাদেরই একজন আসিয়া যদুবাবুকে দেখিল। পুরাতন জ্বরে ভাত খাওয়ার পরামর্শ দিল। বলিল, নাতি-খাতি সেরে যাবে অখন, ও গরম হয়েছে, গরমের দরুন অসুখডা সারচে না।

রুলি বিক্রয়ের টাকা ফুরাইয়া আসিতেছে দেখিয়া যদুবাবুর স্ত্রী স্বামীকে বলিল, হ্যাঁ গো, কাল তো ওরা বলছিল—এক মণ চাল কিনতে হবে, অবনীর হাতে এখন টাকা নেই, তা তোমার ইয়েকে একবার বল। আমি তোমাকে আর কী বলব, সব বিত্তে তো জানি। এক মণ চালের দাম দিতে গেলে তোমার ওষুধপথ্যির পয়সা থাকে না। অথচ ওদের হাঁড়িতে খাওয়াদাওয়া, না দিলেও তো মান থাকে না। কী করি ?

যদুবাবু বিরক্তির সুরে বলিলেন, তোমাদের কেবল পয়সা আর পয়সা, একটা লোক ভুগছে বিছানায়—জানি নে ও-সব, যাও এখান থেকে—

যদুবাবুর স্ত্রীর আর কোন গহনাপত্র নাই, স্বামী বিশেষ কিছু দেন নাই, বরং বাপের বাড়ী হইতে আনীত যাহা কিছু ধুলাগুঁড়ো ছিল, তাহাও স্বামী ফুঁকিয়া দিয়াছেন অনেকদিন পূর্ব্বে।

এখন উপায়? ভাবিয়া-চিন্তিয়া বিবাহের সময় শ্বশুরের দেওয়া বেনারসী শাড়িখানা লুকাইয়া গ্রামের মধ্যে অবস্থাপন্ন রায়বাড়ীর গিন্নীর কাছে লইয়া গেল।

রায়-বাড়ীর গিন্নী বলিলেন, এস এস ভাই। কবে এলে? শুনলাম নাকি ঠাকুরপোর বড্ড অসুখ?

যদুবাবুর স্ত্রী কাঁদিয়া বলিল, সেই জন্যেই আসা। কলকাতার স্কুল উঠে গিয়েছে, হাতে এক পয়সা নেই, অথচ ওঁর অসুখ। আমার এই ফুলশয্যের বেনারসীখানা বিক্রি করে দিন। নইলে উপায় নেই। এই দেখুন ভাল কাপড়, এখনও নষ্ট হয় নি—এক জায়গায় কেবল একটু পোকায় কেটেচে—

রায়গিন্নীর অবস্থা ভাল! দুই ছেলে চাকুরি করে, জমিজমাও আছে। বাড়ীর কর্ত্তা আগে কোর্টের নাজির ছিলেন সে কালের নাজির, দুই পয়সা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। একটি মেয়ে বিধবা, বাপের বাড়ী থাকে, কিন্তু তাহার শ্বশুরবাড়ীর অবস্থা ভালই—স্ত্রীধন হিসাবে কিছু কোম্পানির কাগজও আছে।

রায়গিন্নী বলিলেন, ফুলশয্যের বেনারসী কেন বিক্রী করবে ভাই? দু-পাঁচ টাকা দরকার থাকে, নিয়ে যাও। আবার যখন তোমার হাতে আসবে দিয়ে যেয়ো।

যদুবাবুর স্ত্রী বলিল, না, আপনি একেবারে বিক্রি করিয়েই দিন। ধার করলে একদিন শোধ দিতে হবে, তখন কোথায় পাব?

স্ত্রীর মুখে এ কথা শুনিয়া যদুবাবু চটিয়া গেলেন। বলিলেন, ধার দিতে চাচ্ছিল, নিলেই হত। কাপড়খানা থাকত, টাকাও চার-পাঁচটা আসত। কাপড়খানা ঘুচিয়ে দিয়ে এলে? এমন পাথুরে বোকা নিয়ে কি সংসার করা চলে?

যদুবাবুর স্ত্রী কোনও প্রতিবাদ করিল না। অবুঝ স্বামী, রোগ হইয়া আরও অবুঝ হইয়া গিয়াছে। তাহাকে মিষ্টি কথায় ভুলাইয়া রাখিতে হইবে, ছেলেমানুষকে যেমন লোকে ভোলায়। টাকাকড়ির বিষয়ে মানুষের সঙ্গে সোজাসুজি ব্যবহার ভাল। ফাঁকি দিয়া, ঠকাইয়া কতদিন চলে? স্বামীকে সে কথা বোঝানো শক্ত।

এদিকে অবনীদের ধারণা, যদুবাবু প্রভিডেন্ট ফণ্ডের মোটা টাকা আনিয়াছেন সঙ্গে। স্বামী স্ত্রী লইয়া সংসার, এতদিন কলকাতায় চাকরি করিয়াও দুই-পাঁচ হাজার বা ব্যাঙ্কে কোন্ না জমাইয়া থাকিবেন? বাইরের লোকের সামনে অবনী বলে, দাদার হাতে পয়সা আছে। গভীর জলের মাছ, এ কি আর তুমি আমি?

যদুবাবুকে বলে, দাদা, টাকা ব্যাঙ্কে রাখা ভাল না, যে বাজার!

যদুবাবু বলেন, তা তো বটেই।

—তা আপনি যদি রেখে এসে থাকেন ব্যাঙ্কে, একদিন না হয় আমিই যাই—চেক লিখে দিন, টাকাটা উঠিয়ে আনি।

যদুবাবু ভাঙেন তবু মচকান না। ব্যাঙ্কের ত্রিসীমানা দিয়া যে তিনি কস্মিন্‌কালে হাঁটেন নাই, অবনীকে এই সোজা কথাটা বলিলেই হাঙ্গামা চুকিয়া যায়; কিন্তু তা তিনি বলিলেন না। এমন ভাবের কথা বলিলেন, যাহাতে অবনীর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল, দাদার অনেক টাকা কলিকাতার ব্যাঙ্কে মজুত।

সেই দিন হইতে উঁহাদের দিক হইতে নানা ধরনের তাগিদ আসিতে লাগিল। আজ অবনীর মেয়ে উমার কাপড় নাই, কাল কাছারীর খাজনা না দিলে মান থাকে না, পরশু অবনীর নিজের জুতা এমন ছিঁড়িয়াছে যে একজোড়া নতুন জুতা ভিন্ন ভদ্রসমাজে সে মুখ দেখাইতে পারিতেছে না। তা ছাড়া, সংসারের বাজার-খরচের প্রায় সমুদায় ভার পড়িল যদুবাবুদের অর্থাৎ যদুবাবুর স্ত্রীর উপর। ফলে বেনারসী শাড়ী বিক্রির পঁচিশ টাকা, দিন-কুড়ির মধ্যেই কয়েক আনা পয়সায় আসিয়া দাঁড়াইল।

যদুবাবুর স্ত্রী জানে, স্বামীর কাছে কিছু চাওয়া ভুল। তোরঙ্গের তলায় একটা সিঁদুরের কৌটার মধ্যে বহুকালের দুল ভাঙা, নথের টুকরা, এক কুচি চুড়ির গুঁড়া, দুই-চারিটা সিঁদুর-মাখানো লক্ষীর টাকা ইত্যাদি ছিল। সব গৃহিণীই এগুলি লুকাইয়া কুড়াইয়া রাখিয়া দেন, যদুবাবুর স্ত্রীও তাহা করিয়াছিল। কত কালের স্মৃতি-জড়ানো এই অতিপ্রিয় দ্রব্যগুলির দিকে চাহিয়া তাহার চোখে জল আসিল। শেষ সম্বল সোনার কুচি—লোকে কথায় বলে। সত্যিই সেই শেষ সম্বলটুকুও কি হাতছাড়া করিতে হইবে, অবস্থা এত মন্দ হইয়া আসিয়াছে?

অবনী একদিন যদুবাবুর কাছে ভূমিকা ফাঁদিয়া বলিল, দাদা একটা কথা বলি। এ মাসে আমায় কিছু টাকা দিন। একটা গরু বিক্রী আছে আদাড়ী জেলেনীর, বাইশ টাকা দাম চায়—এবেলা এক সের ওবেলা এক সের দুধ দিচ্ছে। আপনার অসুখের জন্যে দুধের তো দরকার। গরুটা কিনে রাখি, সব হাঙ্গামা মিটে যায়।

যদুবাবু স্বভাবসিদ্ধভাবে উত্তর দিলেন, তা—তা—বেশ। মন্দ কী? হ্যাঁ, সে ভালই।

অবনী উৎসাহ পাইয়া বলিল, কবে দিচ্ছেন টাকাটা? আজ না হয় পাঁচটা টাকা দিন, বায়না করে আসি। হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে—

আসলে সেদিন আড়ংঘাটার বাজারে অবনীর পাঁচ টাকা ধার শোধ দেওয়ার ওয়াদা ছিল, কুণ্ডুদের দোকানে অনেক দিনের দেনা, নতুবা তাহারা নালিশ রুজু করিবে বলিয়া শাসাইয়াছে।

যদুবাবু বলিলেন, তা এখন তো হয় না। তোমার বউদিদির কাছে চাবি। সে ঘাটে গিয়েছে।

যদুবাবুর উপর হইতে চাপ গিয়া পড়িল এবার তাঁহার বেচারী স্ত্রীর উপর। বউদিদি কেন দিবেন না, দাদা যখন বলিয়া দিয়াছেন? আসল কথা, দাদা তো কঞ্জুস আছেনই,

বউদিদি হাড়-কঞ্জুস। হাত দিয়া জল গলে না।

করট ও ফিঙে পাখী গ্রীষ্মের দীর্ঘ দিন ধরিয়া বাঁশঝাড়ে ডাকে, প্রস্ফুটিত তুঁতপুষ্পের ঘন সুবাসে যদুবাবুর জানালার বাহিরের বাতাস ভরপুর, রোগগ্রস্ত যদুবাবু নিজের বিছানায় বালিশ ঠেসান দিয়া বসিয়া বসিয়া শোনেন। সামনের নারিকেল গাছের গায়ে একটা গিরগিটি, যখনই যদুবাবু চাহিয়া দেখেন, সেই গিরগিটি ওই গাছের গায়ে একই জায়গায়। দেখিয়া দেখিয়া রুগ্ন উদ্‌ভ্রান্ত যদুবাবুর মনে হয়, ওই গিরগিটি তাঁহার এই বর্ত্তমান শয্যাশায়ী অবস্থার প্রতীক। ওটাও যেমন নারিকেল গাছের গায়ে অচল অনড়, তিনিও তেমনিই এই আলো-আনন্দহীন কক্ষে, পুরানো ভাঙা কোঠার কেমন একপ্রকার নোনা-ধরা গন্ধের মধ্যে শয্যাগত, উত্থানশক্তিরহিত।

কবে শরীর সারিবে কে জানে? যেদিন ওই গিরগিটিটা ওখান হইতে সরিয়া যাইবে?

অবনীর বড় ছেলে কালীকে ডাকিয়া বলিলেন, এই শোন, ওই গিরগিটিটাকে ওখান থেকে তাড়াতে পারবি?

বালক অবাক্ হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কেন জ্যাঠামশাই?

—দে না, দরকার আছে।

—একটা কঞ্চি নিয়ে আসি জ্যাঠামশায়। খোঁচা দিয়ে তাড়াই। আপনি উঠবেন না, শুয়ে শুয়ে দেখুন।

তাড়ানো হইল বটে, কিন্তু আবার পরদিন সকালে উঠিয়া যদুবাবু সভয়ে চাহিয়া দেখিলেন, গিরগিটিটা আবার সেই নারিকেলগাছের গায়ে স্বস্থানে জাঁকিয়া বসিয়া আছে। যদুবাবু হতাশ হইয়া বালিশের গায়ে ঠেস দিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

অসুখ সারে না। দিন দিন দুর্বল হইয়া আসিতেছে দেহ, পাড়াগাঁয়ের হাতুড়ে ডাক্তারের ওষুধে ফল হয় না। জ্যৈষ্ঠ মাস গিয়া আষাঢ় মাস পড়িল। বর্ষার জলের সঙ্গে সঙ্গে হু হু করিয়া মশককুল দেখা দিল, ফুটা-ছাদ দিয়া জল পড়িতে লাগিল রোগীর বিছানায়, এক-এক দিন রাত্রে বিছানা গুটাইয়া ঘরের কোণে জড়সড় হইয়া স্বামী-স্ত্রীতে রাত কাটাইতে হয়।

যদুবাবুর স্ত্রী বলে, কপালে এতও ছিল!

যদুবাবু চটিয়া বলেন, তুমি ও-রকম নাকে কেঁদো না বলে দিচ্ছি! কথায় বলে, পুরুষের দশ দশা। রেখেছিলাম তো কলকাতায় বাসা করে এতাবৎ কাল। জাপানীদের তো আমি ডেকে আনি নি। পড়ে গিয়েছি বিপদে, তা এখন কী করি বল? সুদিন আসে, কলকাতায় গিয়ে উঠব আবার—তা বলে নাকে কেঁদে কী হবে?

যদুবাবুর স্ত্রী বলিল, আমার জন্যে কিছু বলিনি, তোমার জন্যেই বলি। তোমার কি এত কষ্টকরা অভ্যেস আছে কখনও? চিরকাল টুইশানি করে এসেছ, শীতকালে গরম জল করে দিয়েছি হাত-পা ধুতে, তোমার ঠাণ্ডা সহ্যি হয় না কোন কালে—

—আচ্ছা, থাক্ থাক্, তার জন্তে নাকে কেঁদে কী হবে ? আবার হবে সব—কেবল ওই অবনীটার জ্বালায়—

কিন্তু লক্ষণ ক্রমশ খারাপ দেখা দিল। আষাঢ় মাস পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই যদুবাবু যেন আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। জ্বর রোজ আসে, কোন দিন ছাড়ে, কোনদিন ছাড়ে না।

সে দিন জগন্নাথের স্নানযাত্রা। সকালের দিকে বৃষ্টি হইয়া দুপুরের পর বৃষ্টিধৌত সুনীল আকাশে ঝলমলে সোনালী রোদ উঠিল। আতাগাছটাতে, ফুটন্ত ফুলে ভরা আকন্দগাছটাতে, বাঁশঝাড়ের মাথায় অদ্ভুত রঙের রোদ মাখানো। আতাফুলের কুঁড়ির মৃদু সুবাস শৈশবের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

অবনীর মেয়ে টুনি বলিতেছে, মা আমি পঞ্চমীর পালুনি করে পান্ত ভাত খেতে পারব না কিন্তু বলে দিচ্ছি, চিঁড়ে খাব।

যদুবাবুর মনে পড়িল, তাঁহার মা যদুবাবুর বাল্যদিনে মনসার পালুনি করিয়া পাতে যে চিঁড়ার ফলার রাখিয়া উঠিতেন, তাহা খাইবার জন্ত তাঁহাদের দুই ভাইবোনের কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইত। কোথায় সে বাল্যকালের মা, কোথায় বা সেই ছোট বোন মঙ্গলা। চল্লিশ বছরের ঘন কুয়াশায় তাহাদের মুখ মনের দর্পণে আজ অস্পষ্ট।

তারপর কতকাল গ্রামছাড়া। ১৯০০ সালের পর আর গ্রামে এভাবে বাস করা হয় নাই। সেই সালেই যদুবাবু এণ্ট্রান্স পাশ করেন বোয়ালমারি হাই স্কুল হইতে। দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ রামকিঙ্কর বসু ছিলেন হেডমাস্টার। যেমন পাণ্ডিত্য, তেমনই বেতের বহর ছিল তাঁহার। রামকিঙ্কর বোসের বেত খাইয়া অনেক ডেপুটি মুন্সেফ পয়দা হইয়া গিয়াছে সেকালে।

যদুবাবুকে বলিয়াছেন—যদু, তুমি বড় ফাঁকিবাজ, টেস্ট পরীক্ষায় টুকে পাস করলে, চিরকালই পরের টুকে পাস করলে, জীবনের পরীক্ষায় যেন এ রকম ফাঁকি দিয়ো না, বড্ড ফাঁকে পড়ে যাবে।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। কী সুন্দর অপরাহ্ণের নীল আকাশ ! কী সুন্দর সোনার রঙের সূর্য্যালোক ! ছোট গোয়ালে-লতার ঝোপে একজোড়া বনটিয়া আসিয়া বসিল। ছেলে বেলায় যদুবাবু পাখী বড় ভালবাসিতেন। পদা বুনো নামে তাঁহাদের এক পৈতৃক প্রজা ছিল, তাহার সঙ্গে মিশিয়া ফাঁদ পাতিয়া জলচর পক্ষী ধরিতেন—সরাল, পানকৌড়ি, বক, শামুকুড়—কত কাল এসব দেখেন নাই ! গানের তাল কবে কাটিয়াছিল, স্মরণ নাই। বর্ত্তমানের সঙ্গে অতীতের অনতিক্রমণীয় ব্যবধান।

যেন তাঁহার নবদৃষ্টি জাগ্রত হইয়াছে এই রোগশয্যায় ! টুইশানির ছুটাছুটি নাই, সারাদিন ঠেসান দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকা। কতকাল এত দীর্ঘ অবকাশ ভোগ করেন নাই। ভগবানের কথা কখনও ভাবেন নাই, আজ মনে হইল—তিনি আছেন। না থাকিলে এই সুন্দর রোদ, বনটিয়া, তাঁহার মনের এই অকারণ আনন্দ, শত অভাবের মধ্যেও মায়ের স্নেহময়ী স্মৃতির বাস্তবতা কোথা হইতে আসিল ? ভগবান না থাকিলে ওই অনাথা নিঃসম্বল বিধবাকে

কে দেখিবে ? তাঁহার দিন ফুরাইয়াছে তিনি জানেন।

জীবন কি ফাঁকি দিয়া কাটাইলেন !

সুদীর্ঘ জীবনের বহু কথা আজ যেন মনে পড়িতেছে, গত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসরের কর্ম্মজীবনের ইতিহাস—না, ফাঁকি কেন দিবেন ? ফাঁকি দেন নাই। নারাণদা সাধু-পুরুষ ছিলেন—স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন—নারাণদা বলিতেন, জীবনকে সার্থক করিতে হইলে তাহাকে মানুষের কোন না কোন কাজে, সমাজের কোন না কোন উপকারে লাগানো চাই।

তিনিও জীবনকে বৃথা যাইতে দেন নাই। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কত ছাত্র লেখাপড়া শিখিয়া তাঁহার হাতে মানুষ হইয়াছে। হয় নাই কি ? নিশ্চয়ই হইয়াছে। সেই সব ছেলেই সাক্ষী আজ, পরকালের মৃত্যুপারের দেশের বড় দরবারে তাহারা সে সাক্ষ্য দিবে একদিন, যদুবাবু আশা করেন।

দুই-একটা অন্যায় কাজ, দুই-একটা—চুরি ঠিক বলা যায় না—চুরি নয় তবে হাঁ, একটু-আধটু খারাপ কাজ যে না করিয়াছেন, এমন নয়। তিনি তাহা স্বীকারই করিতেছেন। ভগবান গরীব মানুষের অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

বেলা গেল।···

গিরগিটিটা নারিকেলগাছের গুঁড়িতে ঠায় বসিয়া আছে।···

ভগবান দয়াময়, গরীবের অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

যদুবাবুর স্ত্রী এক বাটি বার্লি লইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, নেবু দিয়ে বার্লি দেব, না, মিছরি দেব ? পরে থামিয়া বলিল আজ গুণে দেখলাম, এগারোখানা আমসত্ত্ব হয়েছে, বুঝলে ? কলকাতার বাসায় নিয়ে যাব হাঙ্গামা মিটে গেলে। তুমি দুধ দিয়ে খেতে ভালবাস বলে আমসত্ত্ব দিলাম মরে-কুটে—সেরে ওঠো তুমি।

স্ত্রীকে হঠাৎ বিস্মিত করিয়া দিয়া তিনি তাহাকে পুরানো আমলের আদরের সুরে অনেক দিন পরে বলিলেন, বিছানায় এসে কাছে একটুখানি বোস না ! এস—

ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুল দিন পাঁচ-ছয় খুলিয়াছে। দুই-তিন জন ব্যতীত অন্য সব শিক্ষক আসিয়াছেন। আসেন নাই কেবল জ্যোতির্বিনোদ আর শ্রীশবাবু ! তাঁহারা দেশের স্কুলে চাকুরি পাইয়াছেন। ছেলেরাও বেশী নাই, এ-ক্লাসে পাঁচ জন ও-ক্লাসে দশ জন। অনেকে বলিতেছে—স্কুল টিকিবে না।

আর আসেন নাই যদুবাবু। সাহেবের সারকুলার-বই লইয়া কেবলরাম ক্লাসে ক্লাসে ফিরিতেছে—স্কুলের সুযোগ্য প্রবীণ শিক্ষক যদুগোপাল মুখুজ্যের পরলোকগমনে স্কুল দুই দিন বন্ধ রহিল। মুখোপাধ্যায় মহাশয় একাদিক্রমে উনিশ বৎসর এই স্কুলে শিক্ষকতা করিয়া ছাত্র ও শিক্ষক সকলেরই শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে স্কুলের যে অপরিসীম ক্ষতি হইল···ইত্যাদি ইত্যাদি।

দুই বাড়ী

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রামতারণ চৌধুরী সকালে উঠিয়া বড় ছেলে নিধুকে বলিলেন—নিধে, একবার হরি বাগ্‌দীর কাছে গিয়ে তাগাদা করে ছাখ দিকি। আজ কিছু না আনলে একেবারেই গোলমাল।

নিধুর বয়স পঁচিশ, এবার সে মোক্তারী পরীক্ষা দিয়া আসিয়াছে, সম্ভবত পাশও করিবে। বেশ লম্বা দোহারা গড়ন, রঙ খুব ফরসা না হইলেও তাহাকে এ পর্য্যন্ত কেউ কালো বলে নাই। নিধু কি একটা কাজ করিতেছিল, বাবার কথায় আসিয়া বলিল—সে আজ কিছু দিতে পারবে না।

—দিতে পারবে না তো আজ চলবে কি করে? তুমি বাপু একটা উপায় খুঁজে বার কর, আমার মাথায় তো আসচে না।

—কোথায় যাব বলুন না বাবা? একটা উপায় আছে—ও পাড়ার গোঁসাই-খুড়োর বাড়ীতে গিয়ে ধার চেয়ে আনি না হয়—

—সেখানে বাবা আর গিয়ে কাজ নেই—তুমি একবার বিন্দুপিসীর বাড়ী যাও দিকি।

গ্রামের প্রান্তে গোয়ালাপাড়া। বিন্দু গোয়ালিনীর ছোট্ট চালাঘরখানি গোয়ালাপাড়ার একেবারে মাঝখানে। তাহার স্বামী কৃষ্ণ ঘোষ এ গ্রামের মধ্যে একজন অবস্থাপন্ন লোক ছিল—বাড়ীতে সাত-আটটা গোলা, পুকুর, প্রায় একশোর কাছাকাছি গরু ও মহিষ—কিছু তেজারতি কারবারও ছিল সেই সঙ্গে। দুঃখের মধ্যে ছিল এই যে কৃষ্ণ ঘোষ নিঃসন্তান—অনেক পূজামানত করিয়াও আসলে কোনো ফল হয় নাই। সকলে বলে স্বামীর মৃত্যুর পর বিন্দুর হাতে প্রায় হাজার পাঁচেক টাকা পড়িয়াছিল।

বিন্দুর উঠানে দাঁড়াইয়া নিধু ডাকিল—ও পিসী, বাড়ী আছ?

বিন্দু বাড়ীর ভিতর বাসন মাজিতেছিল, ডাক শুনিয়া আসিয়া বলিল—কে গা? ও নিধু! কি বাবা কি মনে করে?

—বাবা পাঠিয়ে দিলে।

—কেন বাবা?

—আজ খরচের বড় অভাব আমাদের। কিছু ধার না দিলে চলছে না পিসী।

বিন্দু বিরক্তমুখে পিছন ফিরিয়া প্রস্থানোদ্যত হইয়া বলিল—ধার নিয়ে বসে আছি তোমার সকালবেলা। গাঁয়ে শুধু ধার দাও আর ধার দাও—টাকাগুলো বারোভূতে দিয়ে না খাওয়ালে আমার আর চলছে না যে! হবে না বাপু, ফিরে যাও—

নিধু দেখিল এই বুড়িই অদ্যকার সংসার চলিবার একমাত্র ভরসা, এ যদি এভাবে মুখ ঘুরাইয়া চলিয়া যায়—তবে আজ সকলকে উপবাসে কাটাইতে হইবে। ইহাকে যাইতে দেওয়া হইবে না। নিধু ডাকিল—ও পিসী, শোনো একটা কথা বলি।

—না বাপু, আমার এখন সময় নেই।

—একটা কথা শোনো না।

বিন্দু একটু থামিয়া অর্দ্ধেকটা ফিরিয়া বলিল—কি বল না ?

—কিছু দিতে হবে পিসী। নইলে আজ বাড়ীতে হাঁড়ি চড়বে না বাবা বলে দিয়েচে।

—হাঁড়ি চড়বে না তো আমি কি করব ? এত বড়-বড় ছেলে বসে আছ চৌধুরী মশাইয়ের, টাকা-পয়সা আনতে পার না ? কি হলে হাঁড়ি চড়ে ?

—একটা টাকার কমে চড়বে না পিসী।

—টাকা দিতে পারব না। ধামা নিয়ে এস—দু-কাঠা চাল নিয়ে যাও।

—বা রে ! আর তেল-নুন মাছ-তরকারির পয়সা ?

—চাল জোটে না—মাছ-তরকারি ! লজ্জা করে না বলতে ? চার-আনা পয়সা নিয়ে যাও আর দু'কাঠা চাল।

—যাকগে পিসী, দাও তুমি আট-আনা পয়সা আর চাল।

বিন্দু মুখ ভারি করিয়া বলিল তোমাদের হাতে পড়লে কি আর ছাড়ান-কাড়ান আছে বাবা ? যথাসর্ব্বস্ব না শুষে নিয়ে এ গাঁয়ের লোক আমায় রেহাই দেবে কখনো ? যাও তাই নিয়ে যাও—আমায় এখন ছেড়ে দাও যে বাঁচি।

নিধু হাসিয়া বলিল—তোমায় বেঁধে রাখিনি তো পিসী—টাকা ফেল—ছেড়ে দিচ্ছি।

বিন্দু সত্যিই বাড়ীর ভিতর হইতে একটা টাকা আনিয়া নিধুর হাতে দিয়া বলিল—যাও, এখন ঘাড় থেকে নেমে যাও বাপু যে আমি বাঁচি—

নিধু হাসিয়া বলে—তা দরকার পড়লে আবার ঘাড়ে এসে চাপব বৈকি।

—আবার চাপলে দেখিয়ে দেব মজা। চেপে দেখ কি হয়—

নিধু বাড়ী আসিয়া বাবার হাতে টাকা দিয়া বলিল—বিন্দুপিসীর সঙ্গে একরকম ঝগড়া করে টাকা নিয়ে এলাম বাবা। এখন কি ব্যবস্থা করা যাবে ?

পিতাপুত্রের কথা শেষ হয় নাই এমন সময় পথের মোড়ে গ্রামের ছনু জেলেকে মাছের ডালা মাথায় যাইতে দেখা গেল। রামতারণ হাঁক দিলেন—ও বাবা ছনু, শুনে যা—কি মাছ, ও ছনু ?

ছনু জেলে ইহাদের বাড়ীর ত্রিসীমা ঘেঁষিয়া কখনো যায় না। সে বহুদিনের তিক্ত অভিজ্ঞতা দিয়া বুঝিয়াছে এ বাড়ীতে ধার দিলে পয়সা পাইবার কোনো আশা নাই। আজ রামতারণের একেবারে সামনে পড়িয়া বড় বিব্রত হইয়া উঠিল। রামতারণ পুনর্ব্বার হাঁক দিলেন—ও ছনু, শোনো বাবা—কি মাছ ?

ছনু অগত্যা ঘাড় ফিরাইয়া এদিকে চাহিয়া বলিল—খয়রা মাছ—

—এদিকে এস, দিয়ে যাও—

গ্রামের মধ্যে ভদ্রলোকের সঙ্গে বেয়াদবি করা ছনুর সাহসে কুলাইল না, নয়তো মনের মধ্যে অনেক কড়া কথা রামতারণ চৌধুরীর বিরুদ্ধে জমা হইয়া ছিল।

সে কাছে আসিয়া ডালা নামাইয়া কহিল—কত সের মাছ নেবেন ?

—দাও আনা দুইয়ের—দেখি—বলিয়া রামতারণ চুপড়ির ভিতর হইতে নিজেই বড়-বড়

মাছ বাছিয়া তুলিতে লাগিলেন ছমু বলিল—আর নেবেন না বাবু, দু-আনার মাছ হয়ে গিয়েচে—

—বলি ফাউ তো দিবি? দু-আনার মাছ একজায়গায় এক সঙ্গে নিচ্ছি, ফাউ দিবিনে?

মাছ দিয়া ডালা তুলিতে-তুলিতে ছমু বিনীতভাবে বলিল—বাবু, পয়সাটা?

রামতারণ বিস্ময়ের সুরে বলিলেন—সে কি রে? সকালবেলা নাইনি ধুইনি, এখন বাক্স ছুঁয়ে পয়সা বার করব কি করে? তোর কি বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়ে গেল রে ছমু?

ছমু মাথা চুলকাইতে-চুলকাইতে বলিল—না, না, তা বলিনি বাবু, তবে আর-দিনের পয়সাটা তো বাকি আছে কিনা। এই সবসুদ্ধ সাড়ে-চার আনা পয়সা এই দুদিনের—আর ওদিকের দরুন ন-আনা।

রামতারণ তাচ্ছিল্যের ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—যা, এখন যা—ওসব হিসেবের সময় নয় এখন।

গ্রামের ভদ্রলোক বাসিন্দা যারা, তাঁরা চিরকাল এইভাবে গ্রামের নিম্নশ্রেণীর নিকট হইতে কখনো চোখ রাঙাইয়া কখনো মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া ধারে জিনিসপত্র খরিদ করিয়া চালাইয়া আসিতেছেন—ইহা এ গ্রামের সনাতন প্রথা। ইহার বিরুদ্ধে আপীল নাই। সুতরাং ছমু মুখ বুজিয়া চলিয়া যাইবে ইহাই নিশ্চিত, কিন্তু সন্ধ্যাবেলা রামতারণ চৌধুরী কাছারীবাড়ীর ডাক পাইয়া তথায় উপস্থিত হইয়া বিস্ময়ের সহিত দেখিলেন ছমু তাহার প্রাপ্য পয়সার জন্য কাছারীতে নালিশ করিয়াছে। কাছারীর নায়েব দুর্গাচরণ হালদার—ব্রাহ্মণ, বাড়ী নদীয়া জেলায়। এই গ্রামের কাছারীতে আজ দশ-বারো বছর আছেন। নায়েবমহাশয়ের হাঁকডাক এদিকে খুব বেশি, সুবিবেচক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি থাকায় জেলা কোর্টে আজ বছর কয়েক জুরি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

অজ্ঞ প্রজাদের কাছে তিনি গল্প করেন—বাপু হে, সাতদিন ধরে জেলায় ছিলাম—মস্ত বড় খুনী মামলা। আসামীর ফাঁসি হয়-হয়, কেউ রদ করতে পারত না। আমি সব দিক শুনে ভেবে-চিন্তে বললাম, তা হয় না, এ লোক নির্দ্দোষ। জজসাহেব বললেন, নায়েবমশায়ের কথা ঠিক, আমি আসামীকে খালাস দিলাম, এক কথায় খালাস হয়ে গেল—

রামতারণ কিছু বলিবার পূর্ব্বেই নায়েবমহাশয় বলিলেন—চৌধুরীমশায়, এসব সামান্য জিনিস আমাদের কাছে আসে, এটা আমরা চাইনে। ছমু বলছিল, সে নাকি আপনার কাছে অনেকদিন থেকে মাছের পয়সা পাবে?

রামতারণ গলা ঝাড়িয়া লইয়া বলিলেন—তা আমি কি দেব না বলেচি?

—না, তা বলেননি। কিন্তু ও বেচারাও তো গরীব, কতদিন ধার দিয়ে বসে থাকতে পারে? দু-একদিনের মধ্যে শোধ করে দিয়ে দিন। আচ্ছা, যা, ছমু তোর হয়ে গেল, তুই যা—

ছিহু চলিয়া গেলে রামতারণ বলিলেন—দেব তো নিশ্চয়ই, তবে আজকাল একটু ইয়ে—একটু টানাটানি যাচ্ছে কিনা—

—সে আমার দেখবার দরকার নেই চৌধুরীমশায়। নালিশ করতে এসেছিল পয়সা পাবে, আমি নিষ্পত্তি করে দিলাম দুদিনের মধ্যে ওর পয়সা দিয়ে দেবেন—মিটে গেল।

—দুদিন নয়, এক হপ্তা সময় দিন নায়েবমশায়, এই সময়টা বড় খারাপ যাচ্ছে—

—কত পয়সা পাবে? দাঁড়ান, সাড়ে-বারো আনা মোট বোধ হয়। এই নিন একটা টাকা—ওর দাম চুকিয়ে দিন। ও ছোটলোক, একটা কড়া কথা যদি বলে, ভদ্রলোকের মানটা কোথায় থাকে বলুন তো? ওর দেনা শোধ করুন, আমার দেনা আপনি যখন হয় শোধ করবেন।

রামতারণ হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হইল নায়েবমশায়কে তাঁহার সংসারের সব দুঃখ খুলিয়া বলেন। বলেন—নায়েবমশায় কি করব, বড় কষ্টে পড়েছি। দুবেলা খেতে অনেকগুলি পুষ্যি, বড় ছেলেটি সবে পাশ করেচে, এখনো কিছু রোজগার করে না। আমি বুড়ো হয়ে পড়েচি—জমিজমাও এমন কিছু নেই তা আপনি জানেন—যা সামান্য আছে তাতে সংসার চলে না। এই সব কারণে অনেক হীনতা স্বীকার করতে হয়, নইলে সংসার চলে না নায়েবমশায়—

মনে-মনে এই কথাগুলি কল্পনা করিয়া রামতারণের চক্ষে জল আসিল। মুখে অবশ্য তিনি কিছু বলিতে পারিলেন না, নায়েবমহাশয়কে নমস্কার করিয়া চলিয়া আসিলেন।

এমন অপমান তিনি জীবনে কখনো হন নাই—শেষে কিনা জমিদারী-কাছারীতে ছিহু জেলে তাঁহার নামে করিল নালিশ!

কালে-কালে সবই সম্ভব হইয়া উঠিল—রামতারণের বাল্যকালে বা যৌবন-বয়সে গ্রামে এরূপ একটি ব্যাপার সম্ভবই ছিল না। সে দিন আর নাই।

নিধু পিতার পদধূলি লইয়া বলিল—তাহলে যাই বাবা—

রামতারণের চোখে জল আসিল। বলিলেন—এস বাবা, সাবধানে থেকো। যা তা খেও না—আমি যদুবাবুকে লিখে দিলাম তিনি তোমাকে দেখিয়ে-টেখিয়ে দেবেন, হুলুক-সন্ধান দেবেন। অত বড়লোক যদিও আজ তিনি, এক সময়ে দুজনে একই বাসায় থেকে পড়াশুনো করেচি। তিনিও গরীবের ছেলে ছিলেন, আমিও তাই। গাড়ী যেন একটু সাবধানে চালিয়ে নিয়ে যায় দেখো।

কথাটা ঠিক বটে, তবে রামতারণ যে গরীব সেই গরীবই রহিয়া গিয়াছেন, যদু বাঁড়ুয্যে আঙুল ফুলিয়া কলাগাছ হইয়া খ্যাতি-প্রতিপত্তি, বিষয়-আশয় এবং নগদ টাকায় বর্ত্তমানে মহকুমা আদালতের মোক্তার-বারের শীর্ষস্থানীয়। যদু বাঁড়ুয্যের বাড়ী প্রাসাদোপম না হইলেও নিতান্ত ছোট নয়, যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন সারা টাউনের মধ্যে অমন

ফ্যাশানের বাড়ী একটিও ছিল না—আজকাল অবশ্য অনেক হইয়াছে।

নিধু ফটকের সামনে গরুর গাড়ী রাখিয়া কম্পিতপদে উঠান পার হইয়া বৈঠকখানাতে ঢুকিল। মহকুমার টাউনে তার যাতায়াত খুবই কম—কারণ সে লেখাপড়া করিয়াছে তাহার মামা-বাড়ীর দেশ ফরিদপুরে। যদু বাঁড়ুয্যে মহাশয়কে সে কখনো দেখে নাই।

সকালবেলা। পসারওয়ালা মোক্তার যদু বাঁড়ুয্যের সেরেস্তায় মক্কেলের ভিড় লাগিয়াছে। কেহ বৈঠকখানার বাহিরের রোয়াকে বসিয়া তামাক খাইতেছে, কেহ-কেহ নিজ সাক্ষীদের সঙ্গে মকদ্দমা সম্বন্ধে পরামর্শ করিতেছে।

নিধু ভিড় দেখিয়া ভাবিল, ভগবান যদি মুখ তুলিয়া চান, তবে তাহারও মক্কেলের ভিড় কি হইবে না?

যদুবাবু সামনেই নথি পড়িতেছিলেন, নিধু গিয়া তাঁহার পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল। যদুবাবু নথি হইতে মুখ তুলিয়া বলিলেন—কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

—আজ্ঞে আমি কুড়ুলগাছির রামতারণ চৌধুরীর ছেলে। এবার মোক্তারী পাশ করে প্র্যাকটিস করব বলে এসেছি এখানে। বাবা আপনার নামে একটা চিঠি দিয়েচেন—

যদুবাবু একটু বিস্ময়ের সুরে বলিলেন—রামতারণের ছেলে তুমি? মোক্তারী পাশ করেচ এবার? লাইসেন্স পেয়েচ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বাসা ঠিক আছে?

—কিছুই ঠিক নেই। আপনার কাছে সোজা আসতে বলে দিলেন বাবা। আমাদের অবস্থা সব তো জানেন—

যদুবাবু চিন্তিতভাবে বলিলেন—তাইতো, বাসা ঠিক কর নি? তোমার জিনিসপত্র নিয়ে এসেচ নাকি? কোথায় সেসব?

—আজ্ঞে, গাড়ীতে রয়েচে।

যদুবাবু হাঁকিয়া বলিলেন—ওরে লক্ষ্মণ, ও লক্ষ্মণ, বাবুর জিনিসপত্তর কি আছে নামিয়ে নিয়ে আয়। বাবাজি তুমি এখানেই এবেলা খাওয়া-দাওয়া কর, তারপর যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে।

নিধু বিনীতভাবে জানাইল যে সে বাড়ী হইতে আহারাদি করিয়াই রওনা হইয়াছে।

—এত সকালে? এর মধ্যে খাওয়া-দাওয়া শেষ? রাত থাকতে উঠে না খেলে তো তুমি কুড়ুলগাছি থেকে এতটা পথ গরুর গাড়ী করে আসতে পারোনি।

—আজ্ঞে, মা বললেন দধিযাত্রা করে বেরুতে হয়, তাই ঘরে পাতা দই দিয়ে দুটো ভাত খেয়ে ভোরবেলা—

—হুঁ, তা বটে। তবে কথা কি জানো বাবা, সব বরাত। ও দধিযাত্রাও বুঝিনে, কিছুই বুঝিনে—বরাতে না থাকলে দধিযাত্রা কেন, তোমার ও ঘোলযাত্রা, মাখনযাত্রাতেও কিছু করার যো নেই, বুঝলে বাবা?

কথা শেষ করিয়া যদু বাঁড়ুয্যে চারিপাশে উপবিষ্ট মুহুরী ও মক্কেলবৃন্দের প্রতি সগর্ব্ব দৃষ্টি ঘুরাইয়া আনিলেন। পরে আবার বলিলেন—এই মহকুমায় প্রথম যখন প্র্যাকটিস করতে এসেছিলাম—সে আজ পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার কথা। একটা ঘটি আর একটা বিছানা সম্বল ছিল। কেউ চিনত না, শ্যাম সাউদের খড়ের বাড়ী তিন টাকা মাসিক ভাড়ায় এক বছরের জন্য নিয়ে মোক্তারী শুরু করি। তারপর কত এল কত গেল আমার চোখের সামনে, আমি তো এখনো যাহোক টিকে আছি।

একজন মক্কেল বলিল—বাবু, আপনার সঙ্গে কার কথা? আপনার মতো পসার জেলার কোর্টে কজনের আছে?

অনেকেই মোক্তারবাবুর মন যোগাইবার জন্য একথায় সায় দিল।

যদু-মোক্তার নিধুর দিকে চাহিয়া বলিলেন—বাবাজি, সারা পথ গরুর গাড়ীতে এসেচ, তোমাদের গ্রাম তো এখেনে নয় সেখানে যাওয়ার চেয়ে কলকাতায় যাওয়া সোজা। একটু বিশ্রাম করে নাও, তারপর কথাবার্ত্তা হবে এখন বিকেলে।

মহকুমার টাউন থেকে কুড়ুলগাছি পাঁচ মাইল পথ। নিধু মাঝে-মাঝে ম্যালেরিয়ায় ভোগে, স্বাস্থ্য তত ভালো নয়, এইটুকু পথ আসিয়াই সত্যই সে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। যদু বাঁড়ুয্যের বৈঠকখানায় ফরাসের উপর শুইবামাত্র সে ঘুমাইয়া পড়িল।

বৈকালের দিকে যদুবাবু কোর্ট হইতে ফিরিলেন, গায়ে চাপকান, মাথায় শামলা, হাতে এক তাড়া কাগজ। নিধুকে বলিলেন—চা খাও তো হে? বস, চা দিতে বলি—

নিধু সলজ্জভাবে বলিল—থাক, আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না কাকাবাবু।

—বিলক্ষণ, বস আসচি—

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে চাকর আসিয়া নিধুকে বলিল—কর্ত্তাবাবু ডাকচেন বাড়ীর মধ্যে।

নিধু সসঙ্কোচে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল চাকরের পিছু-পিছু। যদুবাবু রান্নাঘরের দাওয়ায় পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার পাশে আর একখানা পিঁড়ি পাতা।

যদুবাবু রান্নাঘরের খোলা দরজার দিকে চাহিয়া বলিলেন—ওগো, এই এসেচে ছেলেটি। খাবার দাও।

মোক্তারগৃহিণী আধ-ঘোমটা দিয়া বাহির হইয়া আসিতেই নিধু তাঁহার পায়ের ধুলো লইয়া প্রণাম করিল। তিনি তাহার পাতে গরম লুচি, বেগুনভাজা ও আলুর তরকারি দিয়া গেলেন। নিধু চাহিয়া দেখিল, যদুবাবু মাত্র এক বাটি সাবু খাইতেছেন।

নিধু ভাবিল, ভদ্রলোকের নিশ্চয় আজ জ্বর হইয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল—কাকাবাবু, আপনার শরীর খারাপ হয়েছে নাকি? সাবু খাচ্ছেন যে?

মোক্তারগৃহিণী এবার জবাব দিলেন—বাবা, ওঁর কথা বাদ দাও। বারোমাস সাবু জলখাবার দুবেলা।

যদুবাবু বলিলেন—হজম হয় না বাবাজি, আর হজম হয় না। আর কি তোমাদের বয়েস

আছে ? এই এক বাটি সাবু খেলাম, রাত্রে আর কিছু না। বড্ড খিদে পায় তো দুখানি সুজির রুটি আর একটু মাছের ঝোল। তা সব দিন নয়।

নিধু এবার সত্যিই অবাক হইল। সে পাড়াগাঁয়ের ছেলে, শখ করিয়া যে কেউ সাবু খায়, ইহা সে দেখে নাই। তাহার বাবাও তো যদুবাবুর সমবয়সী, তিনি এখনো যে পরিমাণে আহার করেন, যদুবাবু দেখিলে নিশ্চয়ই চমকাইয়া যাইবেন।

জলযোগের পরে বাহিরের ঘরে আসিতেই চাকর করসিতে তামাক সাজিয়া দিয়া গেল। যদুবাবু তামাক টানিতে-টানিতে বলিলেন—তারপর একটা কথা জিগ্‌গেস করি বাবাজি, কিছু মনে কোরো না, মোক্তারী করতে এলে, সঙ্গে কত টাকা এনেচ ?

নিধু প্রশ্নের উত্তর ভালো বুঝিতে না পারিয়া বলিল—আজ্ঞে টাকা ? কিসের টাকা ?

—বসে-বসে খেতে হবে তো, খরচ চালাতে হবে না ?

—আজ্ঞে তা বটে। টাকা সামান্য কিছু—ইয়ে—মানে হাতে আছে কিছু। চাল এনেচি দশ সের বাড়ী থেকে—তাই খাব।

যদুবাবু হাসিয়া বলিলেন—বাবাজি, একেই বলে ছেলেমানুষ। দশ সের চাল তোমার বাবা তোমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েচেন খাবার জন্যে। অর্থাৎ এই চাল কটা ফুরোবার আগেই তুমি রোজগার করতে আরম্ভ করে দেবে, এই কথা তো ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—তা বাবা সেই ভেবেই দিয়েচেন।

নিধু সব কথা ভাঙিয়া বলিল না। এক টাকার ধান ধারে কিনিয়া আনিয়া নিধুর সৎমা চালগুলি কাল সারা বিকেলবেলা ধরিয়া ভানিয়া কুটিয়া তৈরি করিয়া দিয়াছেন। নিধুর আপন মা নাই, আজ প্রায় পনেরো-ষোলো বৎসর পূর্ব্বে নিধুর বাল্যকালেই মারা গিয়াছেন।

যদুবাবু বলিলেন—বাবা, খেজুর গাছ তেলপানা নয়। তোমার বাবা যা ভেবেচেন তা নয়। সেকাল কি আর আছে বাবাজি ? আমরা যখন প্রথম বসি প্র্যাক্‌টিসে—সে কাল গিয়েচে। এখন ওই কোর্টের অশথতলায় গিয়ে দ্যাখো—একটা লাঠি মারলে তিনটে মোক্তার মরে। কারো পসার নেই। আবার কেউ-কেউ কোটপ্যাণ্ট পরে আসে—মক্কেল কিছুতেই ভোলে না—

নিধুর মুখে নিরাশার ছায়া পড়িতে দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—না, না, তুমি তা বলে বাড়ী ফিরে যাও আমি তা বলিনি। ছেলে-ছোকরা, দমবে কেন ? আমি বলচি কাজ খুব সহজ নয়। হঠাৎ বড়লোক হওয়ার কাল গিয়েচে। লেগে যাও কাজে—আমি যতদূর পারি সাহায্য করব। তবে একটি বছর কলসীর জল গড়িয়ে খেতে হবে।

—আজ্ঞে, কলসীর জল ?

—তাই। বাড়ী থেকে জমানো টাকা এনে খরচ করতে হবে বাবাজি। দশ সের চালে কুলুবে না। রাগ কোরো না বাবাজি। অবস্থা গোপন করে তোমাকে মিথ্যে আশা না দেওয়াই ভালো। আমি স্পষ্টবাদী লোক। বাসা ভাড়া দিতে পারবে কত ?

—আজ্ঞে, দু-তিন টাকার মধ্যে যাতে হয় তাই করে নেব। তার বেশি দেবার ক্ষমতা

নেই। বাবার অবস্থা সব জানেন তো আপনি।

যদুবাবু বলিলেন—আচ্ছা, সস্তায় একটা বাসা তোমায় দেখে দেব এখন। দু-চারদিন এখান থেকে কোর্টে যাতায়াত করতে পারতে অনায়াসেই কিন্তু তাতে তোমার পসার হবে না। উকীল মোক্তার নিজের বাসায় না থাকলে সম্মান হয় না। তোমার ভবিষ্যৎটা তো দেখতে হবে।

সেদিন যদুবাবু নিধুর জন্যে একটা ছোট বাসা পাঁচ টাকা ভাড়ায় ঠিক করিয়া দিলেন।

যদু বাঁড়ুয্যের খাতিরে নিধু দু-একটি মক্কেল পাইতে আরম্ভ করিল। নিধু বড় মুখচোরা ও লাজুক, প্রথম-প্রথম কোর্টে দাঁড়াইয়া হাকিমের সামনে কিছু বলিতে পারিত না—মনে হইত এজলাস সুদ্ধ মোক্তারের দল তাহার দিকে চাহিয়া আছে বুঝি। ক্রমে ক্রমে তাহার সে ভাব দূর হইল। যদুবাবু তাহাকে কাজকর্ম সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন। বলিলেন—ভাখ, জেরা ভাল না করতে পারলে ভালো মোক্তার হওয়া যায় না। জেরা করাটা ভাল করে শেখবার চেষ্টা কর। যখন আমি কি হরিহর নন্দী জেরা করব, তুমি মন দিয়ে শুনো, উপস্থিত থেকে সেখানে।

নিধু কিন্তু এক বিষয়ে বড় অসুবিধায় পড়িল।

যদুবাবুর সেরেস্তায় সকালে সে প্রায়ই উপস্থিত থাকিয়া দেখিত—মক্কেলকে তিনি বড় মিথ্যা কথা বলিতে শেখান। আসামী, ফরিয়াদী বা সাক্ষীদের তিনঘণ্টা ধরিয়া মিথ্যা কথায় তালিম না দিয়া তাঁহার কোনো মোকর্দ্দমা তৈরি হয় না।

একদিন সে বলিল—কাকাবাবু, একটা কথা বলব ?

—কি বল ?

—ওদের অত মিথ্যা কথা শেখাতে হয় কেন ?

—না শেখালে জেরায় মার খেয়ে যাবে যে।

—সত্যি কথা যা তাই কেন বলুক না ?

—তাতে মোকর্দ্দমা হয় না বাবাজি। তা ছাড়া অনেক সময় সত্যি কথাই ওদের বার বার শেখাতে হয়। শিখিয়ে না দিলে ওরা সত্যি কথা পর্য্যন্ত গুছিয়ে বলতে পারে না। আমাদের ওপর অবিচার কোরো না তোমরা—এমন অনেক সময় হয়, মক্কেলে বাপের নাম পর্য্যন্ত মনে করতে পারে না কোর্টে দাঁড়িয়ে। না শেখালে চলে ?

—আমাকেও অমনি করে শেখাতে হবে ?

—যখন এ পথে এসেচ, তা করতে হবে বৈকি। আর একটা কথা শিখিয়ে দিই, হাকিম চটিও না কখনো। হাকিম চটিয়ে তোমার খুব ইন্‌স্পিরিট দেখানো হল বটে, কিন্তু তাতে কাজ পাবে না। হাকিম চটালে নানা অসুবিধে। মক্কেল যদি জানে, অমুক মোক্তারের ওপর হাকিম সন্তুষ্ট নয়—তার কাছে কোনো মক্কেল ঘেঁষবে না।

নিধু মাসখানেক মোক্তারী করিয়া যদুবাবুর দৌলতে গোটা পনেরো টাকা রোজগার করিল। তার বেশির ভাগই জামিন হওয়ার ফি বাবদ রোজগার। যদুবাবু দয়া করিয়া তাহাকে দিয়া জামিন-নামা সই করিয়া লইয়া মক্কেলের নিকট ফি পাওয়াইয়া দিতেন।

একদিন একটি মক্কেল আসিয়া তাহাকে মারপিটের এক মোকর্দ্দমায় নিযুক্ত করিতে চাহিল।

নিধু জিজ্ঞাসা করিল—অপরপক্ষে কে আছে জানো?

—আজ্ঞে যদু বাঁড়ুয্যে—

নিধু মুখে কিছু না বলিলেও মনে-মনে আশ্চর্য্য হইল। প্রবল প্রতাপ যদু বাঁড়ুয্যের বিপক্ষে তাহার মতো জুনিয়র মোক্তার দেওয়ার হেতু কি? লোকটি তো অনায়াসে যদু বাঁড়ুয্যের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবীণ মোক্তার হরিহর নন্দী কিংবা অন্নদা ঘটক অভাবপক্ষে মোজাহার হোসেনের কাছেও যাইতে পারিত।

কথাটা ভাবিতে-ভাবিতে সে কোর্টে গিয়া যদু বাঁড়ুয্যেকে আড়ালে ডাকিয়া বলিয়া ফেলিল।

যদুবাবু বলিলেন—ও, ভালোই তো বাবাজি। কিন্তু তোমার মক্কেলের মনের ভাব কি জানো না তো? আমি বুঝেচি।

—কি কাকাবাবু?

—আমি তোমাকে স্নেহ করি, এটা অনেকে জেনে ফেলেচে। তোমাকে কেস দেওয়ার মানে—আমি বিপক্ষের মোক্তার, কেসে মিটমাটের সুবিধে হবে।

—কেস মেটাতে চায়?

—নিশ্চয়ই। নইলে তোমাকে মোক্তার দিত না। অন্য মোক্তারের কথা যদি আমি না শুনি? যদি কেস চালাবার জন্যে মক্কেলকে পরামর্শ দিই? এই ভয়ে তোমাকে মোক্তার দিয়েচে। ভালো তো। ওর কাছে থেকে বেশ করে দু-চারদিন ফি আদায় কর, দু-চারদিন তারিখ পাল্টে যাক—হাতে কিছু আসুক—তারপর মিটমাটের চেষ্টা দেখলেই হবে।

—বড্ড অধর্ম্ম হবে কাকাবাবু—আজই কেন কোর্টে মিটমাটের কথা হোক না?

—তাহলেই তুমি মোক্তারী করেচ বাবা! মাইনর পাশ করে সেকালে মোক্তারীতে ঢুকেছিলাম—আর চুল পাকিয়ে ফেললাম এই কাজ করে। তুমি এখনো কাঁচা ছেলে—যা বলি তাই শোনো। তোমার মক্কেল মিটমাটের কথা কিছু বলেচে?

—আজ্ঞে না।

—তবে তুমি ব্যস্ত হও কেন এখুনি? আগে বলুক, তারপর দেখা যাবে।

একমাস শহরে মোক্তারী করিয়া নিধু বাড়ী যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। যদু মোক্তার বলিলেন—বাবাজি, সোমবার যেন কামাই করো না। শনিবারে যাবে, সোমবারে আসবে। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লেও আসবে। নতুন প্র্যাকটিসে ঢুকে কামাই করতে নেই একেবারে।

নিধু 'যে আজ্ঞে' বলিয়া বিদায় লইয়া মোক্তার-লাইব্রেরী হইতে বাহির হইয়া নিজের বাসায় আসিল। অনেকদিন পরে বাড়ী যাইতেছে কাল—ভাইবোনগুলির জন্য কি লইয়া যাওয়া যায়? বাবার জন্য অবশ্য ভালো তামাক খানিকটা লইতেই হইবে। মায়ের জন্যই বা কি লওয়া উচিত?

সারাদিন ভাবিয়া-চিন্তিয়া সে সকলের জন্যই কিছু না কিছু সস্তাদামের সওদা করিল এবং শনিবার কোর্টের কাজ মিটিলে বড় একটি পুঁটুলি বাঁধিয়া হাঁটাপথে বাড়ী রওনা হইল। পাঁচ-ছ ক্রোশ পথ—গাড়ী একখানা দুই-টাকা আড়াই-টাকার কমে যাইতে চাহিবে না—অত পয়সা নিজের সুখের জন্য ব্যয় করিতে সে প্রস্তুত নয়।

বর্ষাকাল।

সারাদিন কালো মেঘে আকাশ অন্ধকার, সজল বাদলার হাওয়ায় ভ্রমণে ক্লান্তি আনে না—পথের দুপাশে ঘন সবুজ দিগন্তপ্রসারী ধানক্ষেত,- আউশ ধানের কচি জাওলার প্রাচুর্য্যে চোখ জুড়াইয়া যায়। তবে কয়েকদিনের বৃষ্টিতে কাঁচা রাস্তায় বড় কাদা—জোরে পথ হাঁটা যায় না মোটেই।

এক জায়গায় পথের ধারে বড় একটা পুকুর। পুকুরে অন্য সময় তত জল থাকে না, এখন বর্ষার জল পাড়ের কানায়-কানায় ঘাসের জমি ছুঁইয়া আছে, জলে কচুরিপানার নীলফুল, ওপারে ঘন নিবিড় বনঝোপে তিৎপল্লার হলুদ রঙের ফুল।

নিধুর ক্ষুধা পাইয়াছিল—সঙ্গে একটা ঠোঙায় নিজের জন্য কিছু মুড়কি কিনিয়া আনিয়াছিল। মোক্তারবাবুর যেখানে-সেখানে বসিয়া খাওয়া উচিত নয়—সে এদিক-ওদিক চাহিয়া ঠোঙা হইতে মুড়কি বাহির করিয়া জলযোগ সম্পন্ন করিল।

বেলা পড়িয়া আসার সঙ্গে-সঙ্গে সে তাহাদের গ্রামের পাশের গ্রাম সন্দেশপুরে ঢুকিল।

সন্দেশপুর চাষা গাঁ—রাস্তার ধারে তালের গুঁড়ির খুঁটি লাগানো মক্তবঘর, মক্তবের মৌলবী সাহেব তখনো ছাত্রদের ছুটি দেন নাই—যদিও আজ শনিবার—তাহারা মক্তবঘরের সামনের প্রাঙ্গণে সারি দিয়া দাঁড়াইয়া তারস্বরে নামতা পড়িতেছে।

মৌলবী ডাকিলেন—ও নিধিরাম, শুনে যাও হে—

মৌলবী শাদা-দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ ব্যক্তি, তাহার বাবার চেয়েও বয়সে বড়। নিধিরামকে তিনি এতটুকু দেখিয়াছেন।

নিধিরাম দাঁড়াইয়া বলিল—আর বসব না মৌলবী সাহেব, যাই—বেলা নেই আর। এখনো ইস্কুল ছুটি দাওনি যে?

—আরে এস না—শুনে যাও।

—নাঃ, যাই।

মৌলবী সাহেব স্কুল-প্রাঙ্গণ ছাড়িয়া আসিয়া নিধিরামের রাস্তা আটকাইলেন।

—চল, বস না একটু। এস—ওরে একখানা টুল বের করে দে মাঠে। আরে তোমরা শহরে থাক, একবার শহরের খবরটা নিই—

নিধিরাম অগত্যা গেল বটে—তাহার দেরি সহিতেছিল না—কতক্ষণে বাড়ী পৌঁছিবে ভাবিতেছে না আবার এই উপসর্গ। সে ঈষৎ বিরক্তির সুরে বলিল—কি আবার খবর ?

—কি খবর আমরা জানি ? তুমি বল শুনি। মোক্তারি করচ শুনলাম সেদিন কার কাছে যেন। তারপর কেমন হচ্চে-টচ্চে ?

—নতুন বসেচি, এখুনি কি হবে বল! যদু-মোক্তার খুব সাহায্য করচে।

—যদু-মোক্তার ? ওঃ, অনেক পয়সা কামাই করে। সবই নসীব বুঝলে ? মাইনর পাস করি আমরা একই ইস্কুল থেকে। অবিশ্যি আমার চেয়ে সাত-আট বছরের ছোট। দ্যাখ আমি কি করচি—আর যদু কি করচে!

—বাবারও তো ক্লাসফ্রেণ্ড—বাবাই বা কি করচেন তাও দ্যাখ—

—তাই বলচি সবই নসীব। একটা ডাব খাবে ?

—পাগল! শ্রাবণ মাসের সন্দেবেলা ডাব খাব কি! ঠাণ্ডা লেগে যাবে যে!

—তুমি তো তামাকও খাও না। তোমাকে দিই কি ?

—তামাক খেলেই কি তোমার সামনে খেতাম মৌলবী সাহেব, তুমি আমার বাবার চেয়ে বড়।

—তোমরা মান খাতির রেখে চল তাই—নইলে নাতির বয়সী ছোকরারা আজকাল বিড়ি খেয়ে মুখের ওপর ধোঁয়া ছেড়ে দ্যায়। সেদিন আটঘরার দাশরথি ডাক্তারের ডাক্তারখানায় বসে আছি—

সন্ধ্যার অন্ধকার নামিবার বেশি দেরি নাই, নিধিরাম ব্যস্ত হইয়া বলিল—আমি আসি মৌলবী সাহেব, সন্দের পর যাওয়ার কষ্ট হবে—সুমুখে আঁধার রাত—

—আরে, তোমাদের গাঁয়ের পাঁচ-ছটা ছেলে পড়ে এখানে। দাঁড়াও না, নামতাটা পড়ানো হয়ে গেলেই ওরাও যাবে। এক সঙ্গে যেও।

—এখনো আজ ইস্কুল ছুটি দাওনি যে! রোজই এমন নাকি ? আজ তার ওপর শনিবার।

—আরে বাড়ী গিয়ে তো চাষার ছেলে ছিপ নিয়ে মাছ মারতে বসবে, নয়তো গরুর জাব কাটতে বসবে তার চেয়ে এখানে যতক্ষণ আটকানো থাকে—একটু এলেমদার লোকের সঙ্গে তো থাকতে পারে। দুটো ভালো কথাও তো শোনে! বুঝলে না ? আমার রোজই সন্দের আগে ছুটি।

সন্ধ্যার পর নিধু গ্রামে ঢুকল।

নিজের বাড়ী পৌঁছিবার আগে সে একবার থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের বাড়ীর ঠিক সামনে সরু গ্রাম্য-রাস্তার এপাশে লালবিহারী চাটুয্যেদের যে বাড়ী সে ছেলেবেলা হইতে জনশূন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছে—সে বাড়ীতে আলো জ্বলিতেছে! এক-আধটা আলো নয়, দোতলার প্রত্যেক জানালা হইতে আলো বাহির হইতেছে—ব্যাপার কি ?

সে বাড়ীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া চাহিয়া দেখিল বৈঠকখানায় অনেক গ্রাম্য ভদ্রলোক

জড় হইয়াছেন, তাহার বাবা রামতারণ চৌধুরীও আছেন তাহাদের মধ্যে। একজন স্থূলকায় প্রৌঢ় ভদ্রলোক সকলের মাঝখানে বসিয়া হাত নাড়িয়া কি বলিতেছেন।

নিধু নিজের বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

তাহাকে দেখিয়া প্রথমে ছুটিয়া আসিল নিধুর ভাই রমেশ।

—ওমা, ও কালী, দাদা বাড়ী এসেচে—দাদা—

তখন বাকি সবাই ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, সম্মিলিত ভাবে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিল। নিধুর মা আসিয়া বলিলেন—তোরা সরে যা, ওকে আগে একটু জিরুতে দে—বস নিধু, পাখা নিয়ে আয় কালী—

নিধু জিজ্ঞেসা করিল—মা কারা এসেচে ও বাড়ীতে?

—জজবাবু বাড়ী এসেচেন ছুটি নিয়ে। এবার নাকি পুজো করবেন বাড়ীতে—

—লালবিহারীবাবু!

—হ্যাঁ। তোর কাকা হন, কাকাবাবু বলে ডাকবি। বড়লোক। এতে কি?

—ভালো কথা। ওতে একটা মাছ আছে, দে-গঙ্গার বিলে ধরছিল, কিনে এনেচি।

—ও পুঁটি, তোর দাদা মাছ এনেচে—আগে কুটে ফ্যাল দিকি, পচে যাবে—বলিয়া নিধুর মা ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন এবং অল্পক্ষণ পরে একঘটি জল ও গামছা আনিয়া নিধুর সামনে রাখিয়া বলিলেন—হাত মুখ আগে ধুয়ে ফেল বাবা, বলচি সব কথা।

নিধুর আপন মা নাই, ইনি সৎমা এবং রমেশ নিধুর বৈমাত্রেয় ভাই। রমেশ বলিল—দাদা একটা ডাব খাবে? আমি একটা ডাব এনেছিলাম বন্ধুদের গাছ থেকে।

নিধুর মা ধমক দিয়া বলিলেন—যাঃ, বর্ষাকালের রাত্তিরে এখন ডাব খায় কেউ? তারপর জ্বর হোক। তুই হাত মুখ ধুয়ে নে—আমি খাবার নিয়ে আসি—

খাবার অন্য কিছু নয়, চাল ভাজা আর শহর থেকে সে বাড়ীর জন্য যে ছানার গজা আনিয়াছে তাহাই দুখানা। জলপান শেষ করিয়া নিধু কৌতুহলবশত লালবিহারীবাবুর বৈঠকখানার বাহিরে গিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। সেই স্থূলকায় ভদ্রলোকটি তাহাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন—ওখানে দাঁড়িয়ে কে? ভেতরে এস না—

নিধু সসঙ্কোচে বৈঠকখানার ভেতরে ঢুকিতে রামতারণ চৌধুরী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিলেন—নিধু কখন এলে? এটি আমার ছেলে—এরই কথা বলছিলাম তোমাকে। মোক্তারীতে ঢুকেচে এই সবে—

স্থূলকায় ভদ্রলোকটিই লালবিহারী চাটুয্যে—নিধু তাহা বুঝিল। সে বাবাকে ও লালবিহারীকে আগে প্রণাম করিয়া পরে একে-একে অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠ প্রতিবেশীদেরও প্রণাম করিল।

লালবিহারী চাটুয্যে বলিলেন—বস, বস। তারপর পসার কেমন হচ্ছে?

নিধু বিনীত ভাবে বলিল—আজ্ঞে, এক রকম হচ্ছে। সবে তো বসেচি—

লালবিহারী পূর্বস্মৃতি মনে আনিবার ভাবে বলিলেন—তোমার মতো আমিও একদিন

প্র্যাকটিস করতে বসেছিলাম বহরমপুরে। তিনবছর ওকালতি করেছিলাম। সে সব দিনের কথা আজও মনে আছে—বেশ ভালো করে খেটো হে মক্কেলের জন্যে। ফাঁকি দিও না। তাহলেই পসার হবে। মক্কেল নিয়ে ব্যবসা তোমার মতো আমিও একদিন করেচি, জানি তো।

পুত্রগর্ব্বে রামতারণের বুক ফুলিয়া উঠিল। এত বড় একজন লোক, একটা মহকুমার তিক্রি-ডিসমিসের মালিক—তাঁহার ছেলে নিধুর সহিত সমানে সমানে কথা কহিতেছেন। কই, আরও তো কত লোক গাঁয়ের বসিয়া আছে, কজনের ছেলে আছে—উকীল মোক্তার?

লালবিহারী পুনরায় বলিলেন—তুমি কাল যাবে না পরশু যাবে?

নিধু উত্তর দিল—পরশু সকালে উঠেই চলে যাব—

—তাহলে কাল আমার বাড়ী দুপুরে খেও, দু-একটা কথা বলব।

রামতারণ একবার সগর্ব্বে সকলের দিকে চাহিয়া লইলেন। ভাবটা এইরূপ—কই, তোমাদের কাউকে তো লালবিহারী খেতে বললে না? মানুষেই মানুষ চেনে।

নিধু বিনীতভাবে বলিল—আজ্ঞে তা বেশ।

—আমার ছেলে অরুণকে তুমি ভাখ নি—আলাপ করিয়ে দেব এখন—সেও ল' পড়চে। সামনের বছর এম. এ. দেবে। তোমার বয়সী হবে।

নিধু বলিল—আচ্ছা, এখন তাহলে আসি কাকাবাবু—

নিধুর মা শুনিয়া বলিলেন—বড়লোক কি আর এমনি হয়! মন ভালো না হলে কেউ বড়লোক হয় না। তবে কর্ত্তা যেমন, গিন্নি কিন্তু তেমন নয়! একটু ঠ্যাকারে আছে—তা থাক, আমরা গরীব মানুষ, আমাদের তাতে কিই বা আসে যায়! আমরা সকলের চেয়ে ছোট হয়েই তো আছি। থাকবও চিরকাল—

পরদিন সকালে রমেশ ছুটিয়া আসিয়া নিধুকে বলিল—দাদা, শিগগির এস, জজবাবুর ছেলে তোমায় ডাকচে—

নিধুদের বাহিরের ঘর নাই—তবে রোয়াকের উপর একখানা খড়ের চালা আছে, নিধু বাহিরে গিয়া দেখিল একটি ষোলো-সতেরো বছরের ছেলে চালার নিচে রোয়াকে বসিয়া কি একখানা বইয়ের পাতা উল্টাইতেছে।

নিধু ছেলেটিকে রোয়াকে মাদুর পাতিয়া বসাইল। ছেলেটি বলিল—আপনাদের বাড়ীতে কোনো বাংলা বই আছে?

নিধু ভাবিয়া দেখিয়া বলিল—না, বই তেমন কিছু নেই তো? বাংলা রামায়ণ মহাভারত আছে—

—ও সব না। আমার বোন মধু বড্ড বই পড়ে। তার জন্যে দরকার—সে পাঠিয়ে দিলে—

—তোমাদের বাড়ী বই নেই ?

—সব পড়া শেষ। মঞ্জু একদিনে তিনখানা করে বই শেষ করে—সিমলে বান্ধব লাইব্রেরী অত বড় লাইব্রেরী তার জন্যে ফেল—বই যুগিয়ে উঠতে পারে না—

—তোমার বোন কি কলকাতায় থাকে ?

—ও যে মামার বাড়ী থেকে পড়ে—এবার সেকেন ক্লাসে উঠল। সামনের বার ম্যাট্রিক দেবে। বাবা মফঃস্বলে বেড়ান, সব জায়গায় মেয়েদের হাইস্কুল তো নেই, তাই ওকে মামারবাড়ী কলকাতায় রেখেছেন পড়ার জন্যে।

দুপুরে সেই ছেলেটিই তাহাকে খাইবার জন্য ডাকিয়া লইয়া গেল। নিধু উহাদের বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া অবাক হইয়া গেল। বড়লোকের বাড়ী বটে। চক-মিলানো দোতলা বাড়ীর বারান্দা হইতে দামী-দামী সুদৃশ্য ভিজা শাড়ী ঝুলিতেছে, বারান্দায় সুবেশা সুন্দরী মেয়েরা ঘোরাফেরা করিতেছে, কোন ঘরে গ্রামোফোন বাজিতেছে—লোকজনে, ভিড়ে, হৈচৈয়ে সরগরম। এই বাড়ীটি সে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া আসিতেছে বাল্যকাল হইতে। কখনো ইহারা দেশে আসেন নাই—নিধু বাড়ীটার মধ্যে কখনও ঢুকিয়া দেখে নাই এর আগে। বাবার মুখে সে শুনিয়াছে তাহার যখন বয়স চারি বৎসর, তখন একবার ইহারা দেশে আসিয়া ঘরবাড়ী মেরামত করে ও নতুন করিয়া অনেকগুলি ঘর বারান্দা তৈরি করে—কিন্তু সে কথা নিধুর স্মরণ হয় না।

একটি প্রৌঢ়া মহিলা তাহাকে যত্ন করিয়া আসন পাতিয়া বসাইলেন এবং কিছুক্ষণ পরে একটি পনেরো-ষোলো বছরের সুন্দরী মেয়ে তাহার সামনে ভাতের থালা রাখিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে মহিলাটি আবার আসিয়া তাহার সামনে বসিলেন। নিধু লজ্জায় মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিতেছিল না। মহিলাটি বলিলেন—লজ্জা করে খেও না বাবা। তোমাকে সেবার এসে দেখেছিলাম এতটুকু ছেলে, এর মধ্যে কত বড়টি হয়েচ। ও মঞ্জু, এদিকে আয় তোর দাদার খাওয়া ছাখ, এখানে দাঁড়া এসে, আমি আবার ওদিকে যাব। মেয়েটি আসিয়া মায়ের পাশে দাঁড়াইল। বলিল—বা রে, আপনি কিছু খাচ্ছেন না যে!

নিধু সলজ্জভাবে বলিল—আপনাকে বলতে হবে না—আমি ঠিক খেয়ে যাব—

মেয়ের মা বলিলেন—ওকে 'আপনি' বলতে হবে না বাছা। ও তোমার ছোট বোনের মতো—এক গাঁয়ে পাশাপাশি বাড়ী, থাকা হয় না, আসা হয় না তাই। নইলে তোমরা প্রতিবেশী, তোমাদের চেয়ে আপন আর কে আছে ? তোমার মাকে ওবেলা আসতে বোলো। বসে খাও বাবা—মঞ্জু, দাঁড়া এখানে—

গৃহিণী উঠিয়া চলিয়া গেলেন। মেয়েটি বলিল—আমি মাংস এনে দিই—

—মাংস আমি খাইনে তো।

মেয়েটি আশ্চর্য্য হইবার সুরে বলিল—খান না ? ওমা, তবে মাকে বলে আসি। কি দিয়ে খাবেন ?

নিধু এবার হাসিয়া বলিল—সেজন্যে তোমায় ব্যস্ত হতে হবে না। এই আয়োজন হয়েছে,

আমার পক্ষে এত খেয়ে ওঠা শক্ত। সঙ্গে-সঙ্গে সে ভাবিল, ইহার অর্দ্ধেক রান্নাও তাহাদের বাড়ীতে বিশেষ কোনো পূজাপার্ব্বণ কি উৎসবেও কোনোদিন হয় না। বড়লোকেরা, প্রত্যহ কি এইরূপ খাইয়া থাকে?

মহকুমায় যদু-মোক্তারের বাড়ী সে খাইয়াছে—ইহার অপেক্ষা সে অনেক খারাপ। বহুলোক সেখানে খায়—সে একটা হোটেলখানা বিশেষ।

খাওয়ার পরে সে বাহিরে আসিতেছিল, ছেলেটি তাহাকে বলিল—আসুন, আমার আঁকা ম্যাপ আর মঞ্জুর হাতে-গড়া মাটির পুতুল দেখে যান।

এই সময়ে লালবিহারীবাবু কোথা হইতে বেড়াইয়া ফিরিলেন। নিধুকে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—খাওয়া হয়েচে বাবা?

—আজ্ঞে এই উঠলাম খেয়ে।

—বেশ পেট ভরেচে তো? আমি তো দেখতে পারলুম না, মাঠে একটি পৈতৃক জমি আজ তিন-চার বছর বেদখল করেচে, তাই দেখতে গিয়েছিলুম—

—না কাকাবাবু, সেজন্যে ভাববেন না। অতিরিক্ত খাওয়া হয়ে গেল। খুড়ীমা ছিলেন বসে—

লালবিহারীবাবু ঘরের মধ্যে ঢুকিলেন—ছেলেটির নাম বীরেন, সে নিধুকে অন্তঃপুরের একটা ছোট ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া বসাইল। কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া তাহার হাতে পানের ডিবা দিয়া বলিল—পান খান দাদা—আমার পুতুল দেখেন নি বুঝি? দাঁড়ান দেখাই—

মঞ্জু একটা আলমারির ভিতর হইতে এক রাশ মাটির কুমির, কুকুর, রাধাকৃষ্ণ, সিপাই প্রভৃতি বাহির করিয়া বলিল—দেখুন, কেমন হয়েচে?

—ভারি চমৎকার। বাঃ—

মঞ্জু হাসিমুখে বলিল—আমাদের স্কুলে এসব তৈরি করতে শেখায়। আরও একটা জিনিস দেখাব—কাল আসবেন তো?

নিধু বলিল—না, সকালেই যেতে হবে। এখন নতুন মোক্তারীতে ঢুকে কামাই করা চলবে না। তা ছাড়া কেস রয়েচে।

—বিকেলে এসে চা খাবেন কিন্তু।

—চা তো আমি খাইনে—

—চা না খান, জলখাবার খাবেন—সেই সময় দেখাব। আসবেন কিন্তু দাদা অবিশ্যি—

এই সময় বীরেন ঘরে ঢুকিয়া বলিল—মঞ্জু কিন্তু বেশ গান গাইতে পারে। শোনেন নি বুঝি নিধুদা? ওবেলা গান শুনিয়ে দে না মঞ্জু—

মঞ্জু বেশ সপ্রতিভ মেয়ে। বেশ নিঃসঙ্কোচেই বলিল—উনি ওবেলা জল খেতে আসবেন নেমন্তন্ন করেচি—সেই সময় শোনাব।

নিধু বাড়ী আসিলেই তাহার মা জিগগেস করিলেন—ভালো খেলি?

—খুব ভালো।

—কি কি খেলি বল্। গিন্নির সঙ্গে দেখা হল?

—হ্যাঁ, তিনি তো খাবার সময়ে বসে ছিলেন।

—আর কার সঙ্গে আলাপ হল?

—আর ওই যে বীরেন বলে ছেলেটি, বেশ ছেলে।

আশ্চর্য্যের বিষয়, নিধুর মনের প্রবলতম ইচ্ছা যে সে মায়ের কাছে মঞ্জুর কথা বলে, সেটাই কিন্তু সে বলিতে পারিল না। মঞ্জুর সম্পর্কিত কোনো উল্লেখই সে করিতে পারিল না।

নিধুর মা বলিলেন—গিন্নির সঙ্গে আমার ইচ্ছে যে একটু আলাপ করি। বড়লোকের বউ আলাপ রাখা ভালো।

—তা তুমি গিয়ে আলাপ করলেই পার—তিনি কি তোমার এখানে আসবেন, তোমায় যেতে হবে।

—একা যেতে ভয় করে—

—তুমি যেন একটা কি! প্রতিবেশীর বাড়ী যাবে এতে ভয় কি? বাঘ না ভাল্লুক? তোমায় টপ করে মেরে ফেলবে নাকি?

—তুই যদি যাস, তোর সঙ্গে যাই—

—তা চল না। আমায় তো—ইয়ে—ওরা বিকেলে জল খেতে বলেচে ওখানে—

নিধুর মা আগ্রহের সহিত বলিলেন—কে, কে বললে তোকে? গিন্নি বললে নাকি?

—হাঁ তাই—ওই গিয়ে ঠিক গিন্নি ছিলেন না সেখানে, তবে ওই গিন্নিই বলে পাঠালেন আর কি।

—তোকে বোধহয় গিন্নির খুব ভালো লেগেচে—

মায়ের এই সব কথা বড় অস্বস্তিকর। নিধু দেখিতেছে চিরকাল তার মায়ের ব্যাপার—বড়লোক দেখিলে অত ভাঙিয়া-নুইয়া পড়িবার যে কি আছে! তাহাকে ভালো লাগিলেই বা কি, উহারা তো তাহার সহিত মেয়ের বিবাহ দিতে যাইতেছে না! সুতরাং ভাবিয়া লাভ কি এসব কথা? মুখে উত্তর দিল—তা কি জানি! হয়তো তাই।

নিধুর মা সগর্ব্বে বলিলেন—ভালো লাগতেই হবে যে! না লেগে উপায় কি?

নাঃ, মা'র জ্বালায় আর পারিবার যো নাই। এত সরল আর ভালোমানুষ লোক হইলে আজকালকার কালে জগতে তাহাকে লইয়া চলাফেরা করাও মুশকিল।

পৃথিবীতে যে কত খারাপ, জুয়াচোর, বদমাইস লোক থাকে, নিধুর ইতিপূর্ব্বে কোনো ধারণা ছিল না সে সম্বন্ধে। কিন্তু সম্প্রতি মোক্তারীতে সে ঢুকিয়া সে দেখিতেছে। মা'র মতো সরলা এ পৃথিবীতে চলে না।

বেলা ছটার সময় বীরেন বাহির হইতে ডাকিল—নিধু-দা, আসুন—ও নিধু-দা—

নিধু বাহিরে আসিতেই বলিল—দেরি করে ফেললেন যে! মঞ্জু কতক্ষণ থেকে খাবার সাজিয়ে বসে—আমায় বললে ডাক দিতে।

নিধুর মনে হঠাৎ বড় আনন্দ হইল। এ অকারণ পুলকের হেতু প্রথমটা সে নির্ণয় করিতে পারিল না—পরে ভাবিয়া দেখিল, মঞ্জু তাহার জন্ত খাবার লইয়া বসিয়া আছে—এই কথাটা তাহার আনন্দানুভূতির উৎস।

—বেশ দাদা, এই বুঝি আপনার বিকেল?

নিধু রোয়াকের একপাশে গিয়া গো-চোরের মতো বসিল। এবার সে আরও বেশি সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিল—কারণ বিকালে আরও দু-তিনটি মহিলা সাজগোজ করিয়া এদিক-ওদিক ত্রস্ত লঘুপদে ঘোরাফেরা করিয়া সংসারের ও রান্নাঘরের কাজকর্ম দেখিতেছেন।

—চা খাবেন না ঠিক?

—না, শরীর খারাপ হয় খেলে। অভ্যেস নেই তো—

—তবে থাক। একটু শরবৎ করে দেব?

—ও সবের দরকার নেই, থাক। কিন্তু আমি সেই জন্যে আরও এলাম—

মঞ্জু বিস্ময়ের সুরে বলিল—কি জন্যে?

এটা মঞ্জুর ভান। নিধু কি বলিতেছে তাহা সে কথা পাড়িতেই বুঝিয়াছে।

নিধু বলিল—তোমার গান শুনব—তা ছাড়া আমার মা আসবেন এক্ষুনি –

—জ্যাঠাইমা! বাঃ একথা তো বলেন নি এতক্ষণ?

মঞ্জু মাকে ডাক দিয়া বলিল—ওমা, শুনচো জ্যাঠাইমা পাশের বাড়ীর, আজ এক্ষুনি আসবেন আমাদের বাড়ী। গিয়ে নিয়ে আসব?

—না, তোকে যেতে হবে কেন? তুই বরং নিধুকে খাবার দে—পাশের বাড়ী, তিনি ঠিক আসবেন এখন।

মঞ্জু নিধুকে খাবার দিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল এবং পরক্ষণেই আবার আসিয়া সামনে দাঁড়াইল।

নিধু জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কোন্ ক্লাসে পড়?

—সেকেন ক্লাসে।

—কোন স্কুলে?

—সিমলে গার্লস হাইস্কুল।

নিধু শিক্ষিতা মেয়ের সঙ্গে কখনো মেশে নাই। এসব পাড়াগাঁয়ে মেয়েরা হাইস্কুলে পড়া দূরের কথা অনেকে বাংলা লেখাপড়াই ভালো জানে না। নিধুর মনে হইল সে এমন একটি জিনিস দেখিতেছে, যাহা সে কখনো পূর্ব্বে দেখে নাই। তাহার মনে চিরকাল সাধ ছিল ভালো লেখাপড়া শিখিবে—কিন্তু দারিদ্র্য বশত সে সাধ পূর্ণ হইল না। তবুও লেখাপড়ার কথা বলিতে সে ভালোবাসে। এ পাড়াগাঁয়ে লেখাপড়াজানা লোক নাই, কলা কুমড়া চাষের কথা শুনিতে বা বলিতে তাহার ভালো লাগে না, অথচ এখানকার গ্রাম্য মজলিসে ওসব কথা ছাড়া অন্ত বিষয়ের আলোচনা করিবার লোক নাই।

নিধু বলিল—আচ্ছা, তোমার হিষ্ট্রি আছে? এ্যাডিশনাল কি নিয়েচ?

—এ্যাডিশনাল হিষ্ট্রিই তো নিয়েচি, আর সংস্কৃত।

—অঙ্ক না?

—উঁহু, ও সুবিধে হয় না আমার।

নিধু হাসিয়া বলিল—আমার মতন। আমারও তাই ছিল ম্যাট্রিকে। অঙ্ক আমারও ভত সুবিধে হত না।

মঞ্জু হাসিয়া বলিল—সেদিক থেকে বেশ মিলেচে বটে! আপনি কোন বছর ম্যাট্রিক দিয়েছিলেন?

—আজ ছ-বছর হল—

—কোথায় পড়তেন?

—মামার বাড়ী থেকে।

এই সময় মায়ের গলার আওয়াজ পাইয়া নিধু ব্যস্তভাবে বলিল—মা এসেচেন—

মঞ্জু বলিল—আপনি থান—আমি দেখচি—

খানিক পরে গিন্নির সহিত নিধুর মাকে রান্নাঘরের সামনের রোয়াকে বসিয়া কথা বলিতে দেখা গেল। নিধুর মা অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত কথা বলিতেছেন, পাছে তাঁহার কথার মধ্যে অত বড়লোকের গিন্নি কোনো দোষ-ত্রুটি ধরিয়া ফেলেন এই ভয়েই যেন তিনি জড়সড়।

গিন্নি বলিলেন—আচ্ছা এখানে ম্যালেরিয়া কেমন?

নিধুর মা বলিলেন—আছে বই কি দিদি। ভয়ঙ্কর ম্যালেরিয়া—

—এখানে বারোমাস কিন্তু বাস করা চলে না, যাই বলুন—

—আমাকে 'আপনি' বলবেন না দিদি, আমরা কি তার যুগ্যি? আপনি বয়সেও বড়, মানেও বড়।

গিন্নি খুশি হইয়া বলিলেন—সে আবার কি কথা? আচ্ছা তাই হবে। তুমিই বলব এর পরে—

নিধুর মা বলিলেন—আপনি বলচেন বারো মাসবাস করা চলে না—বাস না করে যায় কোথায় সব। এ গাঁয়ে কারো কি ক্ষমতা আছে?

—সে যাই বল। আমি তো এই সাতদিনও আসি নি, এর মধ্যেই হাঁপিয়ে পড়েচি। ওঁকে বলছিলাম চল এখান থেকে যাই—উনি বলেন পৈতৃক ভিটেটা—এবার পুজোটা করব ভেবেচি তা আমি বলি—চোখ-কান বুজে থাকি একটা মাস, আর কি করব?

—আপনারা রাজা লোক দিদি, আপনাদের কথা আলাদা। আমরা আর যাব কোথায়, তেমন ক্ষমতাও নেই, সুবিধেও নেই। কাজেই কাদায় গুণ পুঁতে পড়ে থাকা—

—ওকে বলি, বালিগঞ্জে একটা বাড়ী করে ফেল এই বেলা।

—সে কোথায় দিদি?

—বালিগঞ্জ কলকাতায়। খুব ভালো জায়গা। আমার কাকা আলিপুরে বদলি হলেন এবার—সবজজ ছিলেন দিনাজপুরে—আমায় বললেন হৈম, জামাইকে বল আমার বাড়ীর

পাশে একটু জমি নিয়ে বাড়ী করতে। কাকা আজ বছর দুই বাড়ী কিনেচেন কিনা বালিগঞ্জে, দুই খুড়তুতো ভাই বড় চাকরী করে, একজন মুন্সেফ, একজন সবডেপুটি—খুব বড় ঘরে বিয়েও হয়েচে দুজনের। দান সামগ্রি আর ফার্নিচার দুখানা ঘরে ধরে না—

এই সময় মঞ্জু আসিয়া নিধুর মাকে পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল।

গিন্নি বলিলেন—এই আমার বড় মেয়ে। কলকাতায় পড়ে—

নিধুর মা মঞ্জুর দিকে চাহিলেন এবং সম্ভবত তাহার সাজগোজের পারিপাট্য ও রূপের ছটায় এমন আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন যে আশীর্ব্বাদ দূরে থাক, কোনো কিছু কথা পর্য্যন্ত বলিতে ভুলিয়া গেলেন।

গিন্নি বলিলেন—নিধুকে খাবার দিয়েচিস?

মেয়ে বলিল—নিধুদা খাচ্চে বসে। খুড়ীমা, আপনি চা খান তো?

নিধুর মা বলিলেন—না মা, চা খাওয়ার অভ্যেস তো নেই।

নিধুর মায়ের প্রত্যেক কথায় ও ব্যবহারে প্রকাশ পাইতেছিল যেন ইহাদের বাড়ী আসিয়া এবং ইহাদের সঙ্গে মিশিবার সুযোগ পাইয়া তিনি কৃতার্থ হইয়া গিয়াছেন।

মঞ্জু খানিকটা নিধুর মা'র কাছে থাকিয়া আবার নিধুর কাছে চলিয়া গেল। বীরেন সেখানে বসিয়া গল্প করিতেছিল।

বীরেন মঞ্জুকে দেখিয়া বলিল—নিধুদা তোকে কি গান করতে বলচেন—

নিধু বলিল—ও বেলা বলেছিলে যে! জল খাওয়ার সময়ে গান করবে—

মঞ্জু বেশ সহজ সুরে বলিল—বেশ, করব এখন। খুড়ীমা তো শুনবেন—ওঁরা গল্প করচেন যে।

—আমি মাকে ডাকব?

—না, না, এখন থাক্! আমি করব এখন গান, ততক্ষণ ওঁদের গল্প হয়ে যাক।

নিধুর আগ্রহ বেশি হইতেছিল—মেয়েদের মুখে গান সে কখনো শোনে নাই! এ সব দেশে মেয়েরা গান গাহে না। মেয়ে হারমোনিয়ম বাজাইয়া পুরুষের সামনে গাহিতেছে, এ একটা নূতন দৃশ্য যাহা সে কখনো দেখে নাই।

কিছুক্ষণ পরে মঞ্জু সত্যিই হারমোনিয়ম বাজাইয়া গান গাহিল। অনেকগুলি গান। তাহার কোনো লজ্জা সঙ্কোচ নাই, বেশ সহজ, সরল ব্যবহার। নিধুর মা তো একেবারে মুগ্ধ। মেয়েটির দিক হইতে তিনি আর চোখ ফিরাইতে পারেন না।

গান যে ধরনের, সে ধরনের গান তিনি কখনো শোনেন নাই—অনেক জায়গায় কথা বুঝিতে পারা যায় না—কি লইয়া গান—তাহাও বোঝা যায় না। শ্যামা-বিষয় বা রামপ্রসাদী গান নয়। দেহতত্ত্বও নয়। অবিশ্যি এতটুকু মেয়ের মুখে দেহতত্ত্বের গান ভালোও লাগিত না।

শুনিতে-শুনিতে নিধুর মায়ের মনে হইল—তিনি যেন কোথায় মেঘলোকে চলিয়া যাইতেছেন উড়িয়া। সেখানে যেন—বাল্যকালে তাঁহার বাপের বাড়ীতে যেমন ফাল্গুন-চৈত্র মাসে শুকনো ধুধুলের উড়ন্ত পাপড়ি ধরিয়া আনন্দ পাইতেন—বাবুর হাটের সেই পুকুরের

ধারে, সেই ফুলগাছতলায় বসিয়া বারো বছরের বালিকাটির মতো আবার ধুধুফুলের পাপড়ি ধরিতেছেন—আবার সেই আনন্দভরা বাল্যকাল তাঁহার স্নেহময় পিতাকে লইয়া ফিরিয়াছে, যে পিতার মুখ মনের মধ্যে স্পষ্ট হইয়া এখন আর ফোটে না। কথাবার্তাও অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে।

নিজের অজ্ঞাতসারে কখন নিধুর মা'র চোখে জল আসিয়া গেল।

ইতিমধ্যে হারমোনিয়মের আওয়াজ পাইয়া পাড়ার আরও অনেকগুলি ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে ছুটিয়া আসিয়াছিল; কিন্তু তাহারা বাড়ীর মধ্যে ঢুকিতে সাহস না করিয়া দরজার সামনে ভিড় করিতেছে দেখিয়া মঞ্জু বীরেনকে বলিল—দাদা, ওদের ডেকে নিয়ে এস বাড়ীর মধ্যে—

নিধুও মুগ্ধ। মঞ্জুর মুখের গান শুনিয়া তাহার মনে হইল এ এমন এক ধরনের জীবন, যাহার মধ্যে সে এই প্রথম প্রবেশ করিল। জীবনে এত ভালো জিনিসও আছে। শুধু সাক্ষী শেখানো, কেস সাজানো, বড়মোক্তারের ব্যবসার সম্বন্ধে উপদেশ—মক্কেল ও হাকিমকে তুষ্ট রাখিবার নানা কলাকৌশল সম্বন্ধে বক্তৃতা—বাড়ীর দারিদ্র্য, অভাব অভিযোগ—এ সবের ঊর্দ্ধেও এমন জগৎ আছে—আকাশ যেখানে নীল, সূর্য্যোদয় অরুণরাগারক্ত, সারাদিনমান বিহঙ্গ-কাকলীমুখর। যেখানে উদ্বেগ নাই, গাউনপরা উকীল-মোক্তারের ভিড় নাই, হাকিমদের গম্ভীর গলার আওয়াজ নাই, জেরায় প্রতিপক্ষের মোক্তারের ধূর্ত্ত চোখের দৃষ্টি নাই! নিধু বাঁচিল, সে বাঁচিয়া গেল আজ, জগতের সম্বন্ধে তাহার বিশ্বাস বদলাইয়া গেল—সৌন্দর্য্যের অস্তিত্ব সে খুঁজিয়া পাইল এতদিনে।

ইতিমধ্যে কখন নিধুর ছোট ভাই রমেশ আসিয়া দাদার কাছে দাঁড়াইয়াছে।

নিধু বলিল—তুই কখন এলি রে?

রমেশ হাসিয়া বলিল—এই এলাম—

আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—দিদির গলা শুনে—একবার ভাবলাম যাব কি না যাব, তারপর আর পারলাম না—

নিধু বলিল—তা আসবিনে কেন? বেশ করেচিস—

সে আরও তৃপ্তি পাইল যে তাহার মা ও রমেশ এমন গান শুনিতে পাইল, কখনো শোনে না তো এ সব!

মঞ্জু বলিল—আপনার ছোট ভাই বুঝি?

নিধু ঘাড় নাড়িল।

—পড়ে?

—পড়ার সুবিধে হয় না এখানে, তবে ওকে মামার বাড়ী রেখে কিংবা নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে এবার পড়াব—খুব বুদ্ধিমান ছেলে।

—আমরা যদি কলকাতায় বাড়ী করি, আমাদের বাড়ীতে রেখে দেবেন না?

মঞ্জুর উদারতায় নিধু মুগ্ধ হইয়া গেল। এ রকম কেহ বলে না। মঞ্জু ছেলেমানুষ, মন এখনো

সরল—তাই বোধ হয় বলিল। পরের ঝঞ্ঝাট কে সহজে আজকাল ঘাড়ে করিতে চায় ?

রমেশ লজ্জায় ঘাড় গুঁজিয়া বসিয়া রহিল।

বীরেন বলিল—রমেশ ফুটবল খেলতে পার ? একটা ফুটবল টিম করব ভাবচি।

নিধু রমেশের হইয়া উত্তর দিল—ফুটবল এখানে কে খেলবে ? অনেকে চোখেও দেখেনি। তবে ও খেলা শিখে নিতে পারবে চট করে। গাছে উঠতে, সাঁতার দিতে, দৌড়াদৌড়িতে ও খুব মজবুত।

বাড়ী ফিরিয়া পর্য্যন্ত নিধুর মায়ের মন ছটফট করিতে লাগিল, জজবাবুর বাড়ী যে তিনি ও তাঁহার ছেলেরা এত খাতির পাইয়া আসিলেন, কথাটা কাহার কাছে গল্প করেন!

তাঁহার জীবনে এত বড় সম্মান আর কখনো কেহ তাঁহাকে দেয় নাই। ওদের ঘরের লোকের সঙ্গে মিশিয়াছেনই বা কবে ?

পুকুরের ঘাটে গা ধুইতে গিয়া দেখিলেন পুবপাড়ার প্রৌঢ়া জগোঠাকরুণ বাসন মাজিতেছেন।

জগোঠাকরুণ গর্ব্বিতা ও ঝগড়াটে প্রকৃতির বলিয়া গ্রামের সকলেই তাঁহাকে সমীহ করিয়া চলে। তাহার উপর জগোঠাকরুণের অবস্থাও ভালো। কিন্তু কথাটা যে না বলিলেই নয়। নিধুর মা সহজভাবে ভূমিকা ফাঁদিলেন।

—ও দিদি, আজ যে এত দেরিতে বাসন মাজচ ?

জগোঠাকরুণ বাসনের দিকে চোখ রাখিয়াই বলিলেন—সময় পাই নি। আজ ওবেলা দুজন কুটুম এল বাড়ীতে, তাদের জন্যে রান্নাবান্না করতে দেরি হয়ে গেল। তারপর বড় ছেলে এসে বললে—মা, খাবার তৈরি করে দাও, আটঘরার হাটে যাব। এই সব করতে বেলা গেল একেবারে—

নিধুর মা বলিলেন—আমারও আজ বড্ড দেরি হয়ে গেল। অন্য দিন এর আগেই ঘাট সেরে চলে যাই—

জগোঠাকরুণ চুপ করিয়া আপন মনে বাসন মাজিতে লাগিলেন।

নিধুর মা পুনরায় বলিলেন—মঞ্জু কি চমৎকার গান করলে দিদি!

জগোঠাকরুণ মুখ তুলিয়া বলিলেন—কে ?

—ওই যে জজবাবুর মেয়ে মঞ্জু। ওরা আজ খুব খাতির করেচে নিধুকে। ওকে চা দিয়ে খাবার দিয়ে জজবাবুর মেয়ে নিজের কাছে বসে গান শোনালে। বেশ লোক জজগিন্নিও—তিনি তো ভারি ব্যস্ত, বলেন—নিধুকে আগে দে জলখাবার, ও আমার ছেলের মতো। আমায় তো কাছে বসিয়ে কত সুখদুঃখের কথা—

কথাটা জগোঠাকরুণের তেমন ভালো লাগিল না।

তিনি মুখ ঘুরাইয়া বলিলেন—বাদ দাও ওসব বড়মানুষের কথা। বলে, বড়র পীরিতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ। কারও বাড়ী যাইওনে, সময়ও নেই। ওদের

সঙ্গে মেলামেশা কি আমার সাজে? তুমি বড়লোক আছ, বড়লোক আছ। আমি কেন যাব তোমার বাড়ী খোশামোদ করতে? আমার ও স্বভাব নেই—তা তোমরা বুঝি দেখা করতে গিয়েছিলে?

—ওমা, এমনি দেখা করতে যাব কেন? নিধুকে যে জজবাবু নেমন্তন্ন করে নিয়ে গিয়ে দুপুরবেলা কত যত্ন করে খাওয়ালে। আবার বিকেলে জলখাবারের নেমন্তন্ন করলে তার ওপর। নিধু তো লাজুক ছেলে—কিছুতেই যাবে না, ওরাও ছাড়বে না। শেষে জজবাবুর ছেলে নিজে এসে আমাকে, নিধুকে ডেকে নিয়ে গেল। একেবারে নাছোড়বান্দা—

জগোঠাকরুণ সংক্ষেপে বলিলেন—বেশ।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। পরে নিধুর মা-ই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন—না, বেশ লোক কিন্তু ওরা।

জগোঠাকরুণ মুখ খিঁচাইয়া কহিলেন—কি জানি বাপু, কারো ছন্দাংশেও কোনোদিন থাকিনি—থাকবও না। বেশ হোক, খারাপ হোক, যারা আছে, তারাই আছে। মেয়েটার নাম কি বললে?

—মঞ্জু। কি চমৎকার মেয়ে দিদি।

—বয়েস কত?

—এই পনেরো-ষোলো হবে। ধপধপে ফরসা রঙ্ কি! চেহারা কি!

—তাতে তোমারই বা কি আর আমারই বা কি? বেল পাকলে কাকের কি? ওরা নিধুর সঙ্গে ওদের মেয়ের বিয়ে দেবে?

—না, না—তা আমি বলচিনে। তাই কি কখনো দেয়?

—তবে চুপ করে থাক। চেহারা হবে না কেন বল? তোমার মতো আমার মতো পুঁই শাক খেয়ে তো মানুষ নয়? নির্ভাবনায় দুধ-ঘি খেলে তোমারও চেহারা ভালো হত, আমারও চেহারা ভালো হত।

—সে কথা তো ঠিক দিদি।

—অত বড় পনেরো-ষোলো বছরের ধিঙ্গী মেয়ে যে নিধুর সামনে মা-বাপের সামনে হারমোনি বাজিয়ে গান করবে—এতেই দেখ না কেন? তোমার বাড়ীর মেয়ে আমার বাড়ীর মেয়ে করুক দিকি, কালই গাঁয়ে ঢি-ঢি পড়ে যাবে এখন। বড়মানুষের ওপর কথা বলে কে? ওরা জানচে আজ এসেচি এগাঁয়ে, কাল যাব চলে হিল্লি-দিল্লি—আমাদের নাগাল পায় কে? তাই বলি ওদের সঙ্গে আমাদের মিশতে যাওয়াই বেকুবি—আমি যাচ্ছি দেখাশুনো করচি ভেবে, ওরা ভাবে খোশামোদ করতে আসচে।

শেষের দিকের কথায় বেশ কিছু শ্লেষ মিশাইয়া জগোঠাকরুণ তাঁহার বক্তৃতা সমাপ্ত করিলেন এবং মাজা বাসনের গোছা তুলিয়া লইয়া পুকুরের ঘাট ত্যাগ করিলেন।

সকালে নিধু চলিয়া যাইবে বলিয়া নিধুর মা ভোরে রান্না চড়াইয়াছিলেন। বড় মেয়েকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তোর দাদাকে নেয়ে আসতে বল, ও পুঁটি—

পুঁটি বলিল—বড়দা এখনও বিছানা থেকে ওঠে নি—

—সে কি রে? ওকে উঠতে বল্। কখন নাইবে, কখন খাবে—বেলা দেখতে-দেখতে হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে নিধু স্নান সারিয়া আসিয়া খাইতে বসিল।

নিধুর মা বলিলেন—যাবার সময় একবার ওদের সঙ্গে দেখা করে যা না?

নিধু বিস্ময়ের সুরে বলিল—কাদের সঙ্গে?

জজবাবুদের—ওই ওদের—গিন্নীর সঙ্গে, মঞ্জুর সঙ্গে?

—হ্যাঁ, আমি আবার যাই এখন? কি মনে করবে, ভাববে জলখাবার খেতে এসেচে সকালবেলা।

—তোর যেমন কথা! তা আবার কেউ ভাবে বুঝি? যা না?

—আমার সময় নেই। ক' কোশ রাস্তা যেতে হবে জানো?

মুখে একথা বলিলেও নিধু মনে-মনে ভাবিতেছিল মঞ্জুর সঙ্গে একবার যাওয়ার সময় দেখাটা হইলে মন্দ হইত না। কিন্তু মা বলিলেই তো সেখানে যাওয়া যায় না।

নিধুর মা বলিলেন—সামনের শনিবারে আসবি কিন্তু। আর পুটির জন্যে দু-গজ ফিতে কিনে আনিস—রমেশের জন্যে এক দিস্তে কাগজ। ও ভয়ে তোকে বলতে পারে না। আমায় এসে চুপি-চুপি বলচে, আমি বললাম—তুই গিয়ে তোর দাদার কাছে বল না? বললে—না মা আমার ভয় করে।

নিধু মায়ের পায়ের ধুলা লইয়া রওনা হইবার পূর্ব্বে ছোট ভাই-বোনেরা আসিয়া কাড়াকাড়ি করিয়া পায়ের ধুলা লইবার চেষ্টায় পরস্পর ধাক্কাধাক্কি করিতে লাগিল। নিধু শাসনের সুরে বলিল—রমু, চব্বিশখানা ইংরিজি-বাংলা হাতের লেখার কথা যেন মনে থাকে। শনিবারে এসে না দেখলে পিঠের ছাল তুলব।

রমেশ দাদার সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল। বড় লোকের সম্মুখে পড়িলেই যত বিপদ, আড়ালে থাকিলে বহু হাঙ্গামার হাত হইতে রেহাই পাওয়া যায়।

পথে পা দিয়াই নিধু একবার জজবাবুর বাড়ীর দিকে চাহিল। এখনো বোধ হয় কেউ ওঠে নাই—বড়লোকের বাড়ী, তাড়াতাড়ি উঠিবার গরজই বা কিসের।

ছায়াভরা পথে শরৎ-প্রভাতের স্নিগ্ধ হাওয়ায় যেন নবীন আশা, অপরিচিত অনুভূতি সারা দেহের ও মনের নব পরিবর্ত্তন আনিয়া দেয়। গাছের ডালে বন্য মটরলতা দুলিতেছে, ভিৎ-পল্লার ফুল ফুটিয়াছে—এবার বর্ষায় যেখানে সেখানে বনকচুর ঝাড়ের বৃদ্ধি অত্যন্ত যেন বেশি। নিধু আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিল—এসব জিনিসের দিকে তাহার মন তো কখনো তেমন যায় না, আজ ওদিকে এত নজর পড়িল কেন?

শরৎ-প্রভাতের স্নিগ্ধ হাওয়ার সঙ্গে মিশিয়া আছে কাল বিকালে শোনা মঞ্জুর গানের সুর।

সে সুর তাহার সারারাত কানে ঝঙ্কার দিয়াছে—শুধু মঞ্জুর গানের সুর নয়—তাহার সুন্দর ব্যবহার, তাহার মুখের সুন্দর কথা—ঘাড় নাড়িবার বিশেষ ভঙ্গিটি। বড়-বড় কালো চোখের চপল চাহনি।

সত্যই রূপসী মেয়ে মঞ্জু। মহকুমার টাউনে তো কত মেয়ে দেখিল—অমন মুখ এ পর্য্যন্ত কোনো মেয়েরই সে দেখে নাই জীবনে। মঞ্জুর সঙ্গে দেখা না হইলে অমন ধারা রূপ যে মেয়েদের হইয়া থাকে—ইহার মধ্যে অসাধারণত্ব কিছু নাই—ইহা সে ধারণা করিতে পারিত না।

মঞ্জু স্কুলে পড়ে। স্কুলে-পড়া মেয়ে সে এই প্রথম দেখিল। মেয়েদের এমন নিঃসঙ্কোচ ধরন-ধারণ সে কখনো কল্পনা করিতে পারিত না। এসব গ্রামের অশিক্ষিত কুরূপা মেয়েগুলা এমন অকালপক্ক যে বারো-তেরো বছরের পরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বা পিতৃব্য সমতুল্য প্রতিবেশীর সামনে দিয়া চলাফেরা করিতে বা তাহাদের সম্মুখে বাহির হইতে সঙ্কোচ বোধ করে।

নিধুর কি ভালোই লাগিয়াছে মেয়েটিকে।

আচ্ছা, অত বড় লোকের মেয়ে সে—তাহার মতো সামান্য অবস্থার লোকের প্রতি অত আদর যত্ন দেখাইল কেন? জীবনে এধরণের ব্যবহার কোনো অনাত্মীয় মেয়ের নিকট হইতে সে কখনো পায় নাই।

মঞ্জুর সহিত আবার যদি দেখা হইতে আজ সকালটিতে!

সামনের শনিবারে—তবে একটা কথা। সামনের শনিবারে মঞ্জু নাও থাকিতে পারে। সে স্কুলের ছাত্রী, কতদিন স্কুল কামাই করিয়া বসিয়া থাকিবে? যদি চলিয়া যায়?

কথাটা ভাবিতে নিধুর যেন রীতিমত বেদনা বোধ হইতে লাগিল। পরের মেয়ের প্রতি এ ধরণের মনোভাব তাহার এই প্রথম। সারাপথ নেশায় আচ্ছন্নভাবে কাটিয়া গেল নিধুর। সামনে ওই সারি-সারি আড়ত দেখা দিয়াছে—টাউন আর আধমাইল পথ।

নিজের বাসায় পৌঁছিয়া সে দেখিল বাড়ীওয়ালার সরকার তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

নিধুকে দেখিয়া বলিল—মোক্তারবাবু, বাড়ী থেকে আসচেন?

—হ্যাঁ, কালীবাবু কি ভাড়ার জন্যে বসে আছেন?

—আজ বাবু বললেন মোক্তারবাবুর কাছ থেকে ভাড়াটা নিয়ে আসতে।

—আর দুদিন যাক। বাড়ী থেকে আসচি, হাতে কিছু নেই। বুধবারে আসবেন—

কোর্টে যদু-মোক্তার তাহাকে বলিলেন—ওহে একটা জামিননামায় সই করতে হবে।

—জামিন মুভ্ করলে কে?

—আমি করলাম। পাঁচশো টাকার জামিন। যা আদায় করতে পার।

—আপনি বলে দিন। ভালো লোক তো?

—কপাল ঠুকে জামিন হয়ে যাও। কি ছাড় কেন?

—তা নয়, আমি বলচি না পালায় শেষকালে। বেশি টাকার জামিন তাই ভয় হয়।

—কোনো ভয় নেই।

নতুন মোক্তার সে, জামিননামায় কি প্রধান সম্বল। যদুবাবু অনুগ্রহ করেন বলিয়া তা মেলে—নতুবা তাহাই কি সুলভ? এক মাসের মধ্যে একটিবার সে জুনিয়ার হইয়া একটি মোকর্দ্দমায় জামিনের দরখাস্ত দাখিল করিয়া ছিল। এ ব্যবসা চলিবে কিনা কে জানে? বুধবার বাড়ীভাড়া দিবে তো বলিল—কিন্তু দিবে কোথা হইতে?

মোক্তার-বারের ঘরের এক কোণে সাধন-মোক্তার সাক্ষী পড়াইতেছেন, অর্থাৎ যে মিথ্যার তালিম একবার সকালে দিয়া আসিয়াছেন—এখন আবার তাহা সাক্ষীদের মনে আছে কিনা তাহারই পরীক্ষা লইতেছেন।

সাধনবাবু বলিলেন—এই যে নিধিরাম! বাড়ী থেকে এলে নাকি?

নিধু নীরসকণ্ঠে বলিল—এই এখন এলাম। সব ভালো?

—ভালো আর কই তেমন? বাতে ভুগচি। তোমার সঙ্গে কথা আছে একটা।

—কি বলুন?

—এখন নয়। তিনটের পর ঘর একটু নিরিবিলি হলে তখন বলব। চলে যেও না যেন।

—আচ্ছা, আমি একবার যদুবাবুর সঙ্গে দেখা করে আসি। কাজ আছে।

তিনটার পর ব্রিফহীন মোক্তারের দল বড়-কেউ বার-লাইব্রেরীতে উপস্থিত থাকে না। থাকেন দু-একজন প্রবীণ ও পসারওয়ালা মোক্তার, তাঁহাদের কেস থাকে—মক্কেলকে শিখাইতে পড়াইতে হয়। হাকিমের এজলাসে অকারণেও দু-একবার ঢুকিয়া অনাবশ্যক মিষ্ট কথাও দু-একটা বলিতে হয়।

নিধুর আজ মন তত ভালো ছিল না। সে তিনটার কিছু পূর্ব্বে লাইব্রেরীতে ফিরিয়া দেখিল—হরিবাবু মোক্তার বসিয়া-বসিয়া ধরণী-মোক্তারের সঙ্গে কোর্টে সেদিন প্রতিপক্ষের সাক্ষীকে কি করিয়া জেরায় জব্দ করিয়াছেন—তাহারই বিস্তারিত বর্ণনা দিয়া যাইতেছেন। ধরণী জুনিয়ার মোক্তার, হরিবাবুর কাছে জামিনটা-আসটার আশা রাখে—সে বেচারী ঘন-ঘন সমর্থনসূচক ঘাড় নাড়িতেছে।

হরিবাবু বলিলেন—আরে নিধিরাম যে! কোর্টে দেখলাম না?

—কোর্টে দেখবেন কি বলুন হরিদা। আমরা হলুম তৃণভোজী জীব—আপনারা বাঘ ভালুক, আপনাদের ছেড়ে আমাদের কাছে কি মক্কেল ঘেঁষে যে হাকিমের এজলাসে সওয়াল-জবাব করতে যাব?

হরিবাবু সহাস্যবদনে বলিলেন—তোমার উপমাটা লাগসই হল না যে! তৃণভোজী জীবের মধ্যে হাতিও যে পড়ে।

—আজ্ঞে তা পড়ে। তবে আমাদের ওজন কম, কাজেই হাতি নই একথা বুঝতে দেরি

হয় না। যাঁদের ওজন বেশি, তাঁরা ওটা হবার দাবী করতে পারেন।

—চল হে ধরণী যাওয়া যাক, বলিয়া হরিবাবু উঠিলেন।

কিছুক্ষণ পরে সাধন ভট্টাচার্য্য ঘরে ঢুকিয়া এদিক-ওদিক চাহিয়া বলিলেন—কেউ নেই ঘরে? হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

—কি বলুন?

—তুমি বিয়ে করবে?

নিধু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—কেন, বলুন তো?

—আমার একটি ভাইঝি আছে—দেখতে-শুনতে—মানে—গেরস্তঘরের উপযুক্ত। রান্নাবান্না—

নিধু বাধা দিয়া বলিল—খুব ভালো পারে বুঝলাম। কিন্তু আমি বিয়ে করে খেতে দোব কি? পসার কি রকম দেখচেন তো?

সাধন ভট্টাচার্য্য হাসিয়া বলিলেন—ওহে, ওসব কথা ছোকরা মাত্রেই বিয়ের আগে বলে থাকে। আর মোক্তারীর পসার একদিনে হয় না। আমি চব্বিশ বছর এই কাজ করে চুল পাকিয়ে ফেললাম, আমি সব জানি। তুমি যখন যদুদার মতো মুরুব্বি পেয়েচ, তোমার পসার গড়ে উঠতে দুবছরও লাগবে না। ঢুকেচ তো মোটে একমাস। এখুনি বিগ্ ফাইভদের অন্ন মারবার আশা কর?

—যদুবাবুর ওপর ভরসা করে আমার মতো ব্রিফ্‌লেস্ মোক্তারের বিয়ে করা চলে না।

—খুব চলে—তা ছাড়া আমি তোমায় সাহায্য করব—আমার জামাইকে আমি দেখতে পারব।

ইহাতে নিধু খুব আশান্বিত হইল না, কারণ সাধন-মোক্তারের পসার এমন কিছু লোভনীয় ধরনের নয়। সে বলিল—না দাদা, ওসব আমাদের সাজে না—আপনিই ভেবে দেখুন না?

—তোমার সংসারে কে-কে আছেন?

—বুড়ো বাবা, মা—মানে আমার সৎমা, একটি বৈমাত্র ভাই, আর আমার কটি ভাই-বোন।

—বৈমাত্র ভাইয়ের বয়েস কত?

বুদ্ধিমান নিধু বুঝিল সাধন-মোক্তার আসলে তাহার সৎমা'র বয়স জানিবার জন্য এই প্রশ্নটি করিয়াছেন সুতরাং সে বলিল—তার বয়েস এই চোদ্দ-পনেরো, তবে আমার সৎমা আমাকে মানুষ করে এসেচেন ছেলেবেলা থেকে। মা'র কথা আমার মনেই পড়ে না।

—তুমি এই রবিবারে আমার বাড়ী খাবে।

—সে তো হয় না। শনিবারে যে বাড়ী যেতে হবে—

—না, না, এই শনিবারে তো গিয়েছিলে। যেতেই হবে—না গেলে শুনব না। এক

শনিবার না হয় নাই গেলে বাড়ী ?

নিধিরাম আরও দু-একবার আপত্তি করিল—কিন্তু সাধন মোক্তার তাহার কথায় আমল দিলেন না। নিধিরাম ভালোমানুষ ও লাজুক, বারের অন্যতম প্রবীণ মোক্তার সাধন ভট্টাচার্য্যের মুখের উপর জোর করিয়া না বলিতে পারিল না। ঠিক হইয়া গেল নিধিরাম রবিবার সকালে উঠিয়া তাঁহার বাসায় যাইবে, সেখানেই চা খাইবে—তারপর মধ্যাহ্ন ভোজন করিয়া চলিয়া আসিবে।

বাসায় আসিয়া নিধিরাম মনমরা হইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। এ আবার কোথা হইতে কি উপসর্গ আসিয়া জুটিল দেখ! কোথায় সে শনিবারের অপেক্ষায় আঙুলে দিন গুনিতেছে, কোথা হইতে বুড়ো সাধন ভটচাজ কি বাদ সাধিল।

সে বুঝিতে পারিয়াছে মঞ্জুর সহিত আর তাহার দেখা হইবে না। হয়তো সামনের সোমবারেই সে কলকাতায় তাহার মামার বাড়ী চলিয়া যাইবে। এ শনিবারে গেলে দেখাটা হইত। এবার যদি দেখা না হয়, তবে আবার সেই পূজার ছুটি ছাড়া মঞ্জু নিশ্চয়ই বাড়ী আসিবে না।

তাহার এখনো তো কতদিন বাকি।

মাথাটা একটু প্রকৃতিস্থ হইলে সে ভাবিল, মঞ্জুকে এমন করিয়া সে দেখিতে চায় কেন? কেন তাহার মন এত ব্যাকুল সেজন্য? মঞ্জুর সঙ্গে দেখা করিয়া লাভ কি? আচ্ছা, এবার না হয় সে দেখাই পাইল—কিন্তু জজবাবু যদি আর গ্রামে পাঁচ বছর না আসেন, যদি আদৌ আর না আসেন—তবে মঞ্জুর সঙ্গে দেখাশোনা তো এমনিই বন্ধ হইয়া যাইবে। কিসের মিথ্যা মোহে সে রঙিন স্বপ্ন বুনিতেছে?

রবিবারে সাধন-মোক্তার আটটা বাজিতে না বাজিতে নিধুর বাসায় আসিয়া হাজির হইলেন। নিধু বসিয়া-বসিয়া যদু-মোক্তারের বাড়ী হইতে আনা ক্যালকাটা ল' রিপোর্ট পড়িতেছিল। সাধন দেখিয়া বলিলেন—কি পড়ছ হে? বেশ, বেশ। নিজের উন্নতি নিয়েই থাকতে হবে। যদুদার বই? তা ছাড়া আর কে এখানে বই কিনবে বল?

নিধু বলিল—বসুন, একটু চা খাবেন না?

—না, না, তুমিও আমাদের বাড়ী গিয়েই চা খাবে—সব ঠিক করে রেখেচে মেয়েরা। ওঠ—

সাধন-মোক্তারের বাড়ী টাউনের পূর্বপ্রান্তে টিকাপাড়ায়। দুজনে হাঁটিয়া আসিলেন, নিধু বাসার চেহারা ও আসবাবপত্র দেখিয়া বুঝিল সাধন-মোক্তারের অবস্থা যে বিশেষ ভালো তাহা নয়। বাহিরের ঘরে একখানা ভাঙা তক্তপোশের আধ-ময়লা ফরাশের উপর বসিয়া সাধনের মুহুরী কৃপারাম বিশ্বাস লেখাপড়া করিতেছে—একদিকে মক্কেলদের বসিবার নিমিত্ত একখানি কাঠের বেঞ্চি পাতা। একটা পুরোনো আলমারিতে সামান্য দামের টিপকলের তালা লাগানো—ঘরের দোরের বাঁ দিকে তামাক খাইবার সরঞ্জাম, জায়গাটা টিকের গুঁড়ো

তামাকের গুল, আধপোড়া দেশলাই-কাঠি পড়িয়া রীতিমতো নোংরা। দেয়ালে স্থানে-স্থানে পানের পিচের দাগ।

নিধু বাহিরে গিয়া বসিতেই কৃপারাম বিশ্বাস অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে দাঁত বাহির করিয়া বলিল—আসুন বাবু, এ শনিবারে বুঝি বাড়ী যান নি? বেশ। বাবু, সোনাতনপুরের মারামারির কেসে কি আপনার কাছে লোক গিয়েছিল?

নিধু বলিল—না, যদুবাবুর কাছে গিয়েচে এক পক্ষ শুনেচি—আমাদের জামিননামা সম্বল, সেটা পাবই। পক্ষ কি আমাদের মতো জুনিয়ার মোক্তারের কাছে যায়?

কৃপারাম বিনয়ে গলিয়া গিয়া দুহাত কচলাইয়া বলিতে লাগিল—হেঁ-হেঁ বাবু, ওটা কি কথা—আপনার মতো লোক—ইত্যাদি।

নিধুর মনে হইল কৃপারাম যে তাহাকে অতখানি বিনয় প্রদর্শন করিয়া খাতির করিতেছে—ইহার মূলে রহিয়াছে তাহার সহিত সাধন-মোক্তারের পরিবারের বৈবাহিক সম্বন্ধের সম্ভাবনা। নতুবা প্রবীণ সাধন-মোক্তারের মুহুরী ঘুঘু কৃপারাম বিশ্বাসের কথা নয় তাহার প্রতি এতটা হাত কচলাইয়া সম্ভ্রম দেখানো। কই, বার লাইব্রেরীতে গত দেড় মাসের মধ্যে কৃপারাম কোনোদিন তাহার সঙ্গে দুটি কথাও বলে নাই তো!

সাধন বাড়ীর ভিতর হইতে আসিয়া বলিলেন—একটা বালিশ দেবে কি নিধিরাম? কষ্ট হচ্ছে বসতে!

নিধিরাম হাসিয়া বলিল—আজ্ঞে না, বালিশ কি হবে আমার? আপনি বরং একটা আনান—

এই সময়ে চাকরে একখানা রেকাবিতে লুচি, আলুভাজা, পটলভাজা, দুটি সন্দেশ এবং এক বাটি চা আনিয়া নিধুর সামনে রাখিল। সাধন ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—জল, জল নিয়ে আয় এক গ্লাস—আর ওরে শোন্, পান দুটো অমনি—পান—

নিধু জানাইল সকালবেলা সে পান খায় না। সাধনকে জিজ্ঞাসা করিল—আপনি খাবেন না?

—নাঃ, আমার অম্বল। কিছু সহ্যি হয় না, কাল রাতে খেয়েচি এখনো পেট ভার। তুমি খাও—তোমরা ছেলে-ছোকরা মানুষ! আরও লুচি দেবে?

—কি যে বলেন! আর কিছু দিতে হবে না। আর দিলে খাওয়া যায়?

চা পানের পরে এ-গল্পে ও-গল্পে বেলা প্রায় দশটা সাড়ে-দশটা হইয়া গেল। সাধন বলিলেন—তাহলে নিধিরাম এবার স্নানটা করে নাও এখানেই। ও, নেয়ে এসেচ? তবে আমি একবার বাড়ীর মধ্যে থেকে আসি।

কিছুক্ষণ পরে আসিয়া তিনি নিধুকে বাড়ীর মধ্যে ডাকিয়া লইয়া গেলেন।

ক্ষুদ্র বাসা, দু-তিনখানি মাত্র ঘর, কিন্তু বাসায় লোকজন ও ছেলেমেয়ে নিতান্ত মন্দ নয় সংখ্যায়। নিধু মনে-মনে ভাবিল—বাবা, এ পঙ্গপাল সব থাকে কোথায় এই কটা ঘরে?

বারান্দায় দুখানি কার্পেটের আসন পাতা। একখানিতে নিধুকে বসাইয়া সাধন তাহার পাশের আসনটিতে বসিয়া বলিলেন—ও মুক্তি, নিয়ে এস মা—

একটি চৌদ্দ-পনেরো বছরের না-ফরসা না-কালো রঙের রোগা গড়নের মেয়ে দুজনের সামনে ভাতের থালা নামাইয়া চলিয়া গেল এবং পুনরায় আর একখানা থালার ওপর বাটি সাজাইয়া ঘরে ঢুকিয়া দুজনের সামনে তরকারির বাটিগুলি স্থাপন করিল। তখন সে চলিয়া গেল বটে, কিন্তু সাধন তাহাকে বেশিক্ষণ চোখের আড়ালে থাকিতে দিলেন না। কখনো নুন, কখনো লেবু, কখনো জল ইত্যাদি এটা-সেটা আনিবার আদেশ করিয়া সব সময় তাহাকে ঘর-বার করাইতে লাগিলেন। সে এই থাকে এই যায়, আবার আসে সাধনের ডাকে। নিধু মনে-মনে হাসিল, সে ব্যাপারটা আগেই বুঝিয়া লইয়াছে—এই সেই ভাইঝিটি, যাহাকে কৌশল করিয়া দেখাইবার জন্যই আজ এখানে তাহাকে খাওয়াইবার এই আয়োজন। এমন কি নিধুর ইহাও মনে হইল পাশের ঘরের কবাটের ফাঁক দিয়া বাড়ীর মেয়েরা তাহাকে দেখিতেছেন। একবার তো একজোড়া কৌতুহলী চোখের সহিত অতি অল্পক্ষণের জন্য তাহার চোখোচোখিই হইয়া গেল।

সাধন বাহিরে আসিয়া বলিলেন—নিধিরাম, আমার সামনে লজ্জা কোরো না, তামাক খাও তো চাকরে দিয়ে যাচ্ছে—কৃপারাম, যাও গিয়ে নেয়ে নাও গে—বেলা হয়েছে অনেক।

নিধিরাম বিড়িটি পর্য্যন্ত খায় না। সে বলিল—আমি খাইনে, আমি বরং পান আর একটা—

—একটা কেন তুমি চারটা খাও—ওরে ও ইয়ে—আরও পান নিয়ে—

সাধন-মোক্তার খুব ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

কৃপারাম মুহুরীকে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে, ঘরে কেহ নাই—সাধন একটু উসখুস করিয়া নিধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তাহলে নিধিরাম আমার ভাইঝিকে কেমন দেখলে?

নিধিরাম আশ্চর্য্য হইবার ভান করিয়া বলিল—কৈ, কে বলুন তো?

সাধন-মোক্তার বলিলেন—বেশ, ওই তো তোমাকে পরিবেশন করলে।

—ও! তা—তা বেশ, ভালোই। দিব্যি মেয়েটি।

এটা অবশ্য নিধু বলিল নিছক ভদ্রতা ও শোভনতার দিক লক্ষ্য করিয়া, কোনো প্রকার বৈবাহিক মনোভাব ইহার মধ্যে আদৌ ছিল না। সাধন কথা শুনিয়া খুশি হইলেন বলিয়া মনে হইল নিধুর। কিন্তু এ সম্বন্ধে তিনি আপাতত কোনো কথা না উঠাইয়া কয়েকদিন পরে আবার তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

নিধু গিয়া দেখিল সাধন-মোক্তার আসামী পড়াইতেছেন। সকালবেলা মক্কেলের ভিড় যাহাকে বলে তাহা না থাকিলেও দু-পাঁচটি মক্কেল গরুর গাড়ী করিয়া দূর গ্রাম হইতে আসিয়াছে।

—বস নিধিরাম, একটু বস। আমি কাজ সেরে নিই—তারপর বল তোমায় মেরেছিল কেন?

যাহাকে শিখানো হইতেছে সে বৃদ্ধা, মারপিটের নালিশ করিতে আসিয়াছে, সঙ্গে দু-তিনটি প্রতিবেশীও আনিয়াছে। বৃদ্ধা শিক্ষা মতো বলিয়া যাইতে লাগিল। আমার বাছুর ওনার

ধানখেতে গিয়ে নেমেছিল, তাই উনি মারামারি করে বাছুরতাকে, আমি তাই দেখে বকি ওনাকে—

—দাঁড়াও-দাঁড়াও, সব ভুলে মেরে দিলে? তুমি বকবে কেন? তুমি কি বললে?

—আমি দু একটা গালমন্দ দেলাম, বুড়োমানুষ, মুখি এখন তো আর ছুট নেই—

—ওকথা বললে তোমার মোকর্দ্দমা কাৎ হবে—কি শিখিয়ে দিলাম? বলবে, আমি বললাম ওঁকে, তুমি বাছুর মারছ কেন? তোমার ধান খেয়ে থাকে তুমি পণ্টঘরে দাওগে যাও—মারো কেন?

বুড়ী বলিল—হুঁ।

সাধন-মোক্তার মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন—কি বিপদেই পড়েচি রে। 'হুঁ' কি? কথাটা বলে যাও আমার সঙ্গে-সঙ্গে। তুমি কি বললে বল?

—এই বললাম, তুমি বাচুর মারচ কেন, আমার আজ দুই জোয়ান বেটা যদি বেঁচে থাকত, তবে কি তুমি আমার বাচুরের গায়ে হাত দিতি—তোমারও যেন একদিন এমনি হয়—

—আহা হা—কোথাকার আপদ রে! জোয়ান বেটার কথায় কি দরকার আছে? জোয়ান বেটা মরুক বাঁচুক কোর্টের তাতে কি? বল আমি বললাম—বাছুর তুমি মারচ কেন, পণ্টঘরে দাও যদি অনিষ্ট করে থাকে—

—হুঁ—

—আবার বলে হুঁ! আমি যা বলে দিলাম তা বলে যাও না বাপু। এখানে আমার সময় নষ্ট করবে আর কতক্ষণ, দু-ঘণ্টা তো হয়ে গেল। তারপর যা শিখিয়ে দিলাম, কোর্টে গিয়ে এজাহারের সময় সব ভুলে তাল পাকিয়ে—ভোঁতা মুখ নিয়ে বাড়ী ফিরে যেও এখন। তুমি ওকথা বলতে সে তোমায় কি বললে?

—বললে—ধান আমার যা লোকসান হয়েচে পণ্টঘরে দিলি তা পূরণ হবে না—ওর দাম দিতি—

—ওরে না বাপু না। ও কথা বললে মোকর্দ্দমা সাজানো যাবে না। বলে দিলাম হাজার বার করে যে! কতবার শেখাব এক কথা? বল—আমার কথার উত্তরে সে আমায় অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দিলে—

—কি বলব বাবু—সে আমায় কি বললে?

—এমন গালাগালি দিলে যা হুজুরের সামনে বলা যায় না। বল?

—এমনি গালাগালি দিলে যা হুজুরের সামনে উশ্চারণ করা যায় না—

—হুঁ। বেশ হয়েচে—যাও, এখন কোথায় খাওয়া-দাওয়া করবে করে ঠিক বেলা এগারোটার সময় কাছারী যাবে। সকালে কাছারীতে না গেলে মোকর্দ্দমা রুজু হবে না—তারপর হ্যাঁ নিধিরাম, চা খাবে একটু? এই একটু অবসর পেলাম সকাল থেকে।

—আজ্ঞে না, চা খাব না। কি বলছিলেন আমায়?

সাধন-মোক্তার কিছু ভূমিকা ফাঁদিয়া পুনরায় ভাইঝির বিবাহের প্রস্তাব তুলিলেন।

নিধিরাম বড় লজ্জিত ও বিব্রত হইয়া পড়িল—বিবাহের সম্বন্ধে সে এ পর্য্যন্ত কোনো কথাই ভাবে নাই, তাহার মাথার মধ্যেই একথা নাই। কি কুক্ষণেই সাধনের বাড়ী নিমন্ত্রণ খাইতে আসিয়াছিল।

সে বলিল—দেখুন আমি তো এ বিষয়ে কিছু ঠিক করি নি, তা ছাড়া আমার বাবা রয়েচেন—

সাধন ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—আহা হা, তোমার মত আছে যদি বুঝি তবে তোমার বাবার কাছে এক্ষুনি যাচ্ছি। তোমার কথা আগে বল—

নিধু মহা বিব্রত হইয়া পড়িল। অন্তত দুদিন সময় নেওয়া দরকার—তারপর ভাবিয়া একটা ভদ্রতাসঙ্গত উত্তর অন্তত দেওয়া যাইতে পারে।

সে বলিল—আচ্ছা কাল শনিবার বাড়ী যাচ্ছি, মা'র কাছে একবার বলে দেখি, সোমবার আপনাকে—

সাধন খপ করিয়া হঠাৎ নিধিরামের হাত দুটি ধরিয়া বলিলেন—একাজ করতেই হবে নিধিরাম। আমাদের বাড়ীসুদ্ধ সব মেয়েদের তোমাকে দেখে বড্ড পছন্দ হয়েছে। আর ও টাকাকড়ি, পসার-টসারের কথা ছেড়ে দাও। কপালে থাকে হবে, না থাকে না হবে। বলি বদু-দার কি ছিল? ভাঙ্গা থালা সম্বল করে এসেছিলেন এখানকার বারে মোক্তারী করতে। কপাল খুলে গেল, এখন লক্ষ্মী উছলে উঠচে ঘরে! অমনিই হয়। তাহলে সোমবারে যেন পাকা মত পাই—একটু কিছু মুখে দিয়ে যাবে না?

শনিবারে দীর্ঘ পথ হাঁটিয়া বাড়ী যাইবার সময় ছায়াস্নিগ্ধ ভাদ্র অপরাহ্ণে সুনীল আকাশের গায়ে নানা রঙের মেঘস্তর দেখিতে দেখিতে নিধুর মন কিসের আনন্দে ও নেশায় যেন ভরপুর হইয়া উঠিল। মঞ্জুকে আজ সে দেখে নাই দীর্ঘ তেরো দিন—যদি সে থাকে, যদি তাহার সঙ্গে দেখা হয়! কথাটা ভাবিতেই নিধুর বুকের মধ্যে যেন কেমন তোলপাড় করিতে লাগিল। দেখা হওয়া কি সম্ভব? নাও তো হইতে পারে। মঞ্জু কি আর তাহার জন্য গ্রামে বসিয়া থাকিবে পড়াশুনা ছাড়িয়া?

ভাবিতে-ভাবিতে গ্রামের কাছে সে আসিয়া পড়িল।

আর বেশি দূর নাই। ওই কেঁদেটির বিলের আগাড় দেখা যাইতেছে।

নিধু অনুভব করিল তাহার বুকের ভিতরটাতে যেন কেমন এক অশান্ত, চঞ্চল আবেগ, এতদিন এ ধরনের আবেগের অস্তিত্ব সে অবগত ছিল না। বাড়ী পৌছিয়াই প্রথমে নিধুর চোখে পড়িল তাহার মা বসিয়া-বসিয়া কচুর ডাঁটা কুটিতেছেন। তাহাকে দেখিয়াই হাসিমুখে বলিলেন—ওই ভাখ এয়েচে! আমি ঠিক বলেচি সে এ শনিবার আসবেই। তাই তো কচুর শাক তুলে বেছে ধুয়ে—ওরে ও পুঁটি, শিগগির তোর দাদাকে হাত-পা ধোয়ার জল এনে দে—

হাতমুখ ধুইয়া সুস্থ হইয়া ও কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া নিধু মায়ের সহিত গল্প করিতে

বলিল। প্রথমে এ কেমন আছে, সে কেমন আছে জিজ্ঞাসা করিয়া সে বলিল—জজবাবুদের বাড়ী সব ভালো ?

নিধুর মা বলিলেন—হ্যাঁ, ভালো কথা—তোকে যে মঞ্জু একদিন ডেকে পাঠিয়েছিল, গেল শনিবারে। তা আমি বলে পাঠালাম সে এ হপ্তাতে আসবে না লিখেচে। এই তো পরশু না কবে আবার জজবাবুর ছেলে এসে জিগ্‌গেস করে গেল তুই আসবি কি না।

নিধু বলিল—ও।

—তা একবার যাবি না কি ?

—আজ এখন ? সন্দে হয়ে গেল যে একেবারে। কাল সকালে বরং—

কথা শেষ না হইতেই বাহিরে মঞ্জুর ছোট ভাই নৃপেনের গলা শোনা গেল—ও নিধুবাবু, এসেচেন নাকি ?

নিধু বাহিরে গিয়া দাঁড়াইতেই ছেলেটি বলিল—আপনি এসেছেন ? বেশ, বেশ। আসুন আমাদের বাড়ী, মঞ্জুদিদি ডেকে পাঠিয়েচে। আমায় বললে—দেখে আসতে আপনি এসেচেন কিনা—যদি আসেন তবে ডেকে নিয়ে যেতে বলেচে।

—বীরেন কোথায় ?

—মেজদা কাল কলকাতা চলে গেল।

নিধু ছেলেটির পিছু-পিছু মঞ্জুদের বাড়ী গিয়া বাহিরের ঘর পার হইয়া ভিতরের বাড়ী ঢুকিল। সেদিনকার সেই ঘরের সামনে প্রথমেই তাহার চোখে পড়িল মঞ্জু দাঁড়াইয়া বাড়ীর ঝিকে কি বলিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া মঞ্জুর মুখ আনন্দে উজ্জল হইয়া উঠিল। সে ছুটিয়া রোয়াক হইতে উঠানে নামিয়া বলিল—একি! নিধুদা যে! আসুন আসুন—ও মা—নিধুদা এসেছে—

মঞ্জুর মা রান্নাঘরের ভিতর হইতে বলিলেন—নিয়ে গিয়ে বসা দালানে—যাচ্চি আমি—

নিধুর বুকের ভিতর যেন ঢেঁকির পাড় পড়িতেছে। সে কি একটা বলিবার চেষ্টা করিয়া মঞ্জুর পিছু-পিছু দালানে গিয়া বসিল।

মঞ্জু কাছেই একটা টুলের উপর বসিয়া বলিল—তারপর, ও শনিবারে এলেন না যে!

—বিশেষ কাজ ছিল একটা—

—আমি ডাকতে পাঠিয়েছিলাম আপনাকে, জানেন ?

—হ্যাঁ শুনলাম।

—কেন জানেন না নিশ্চয়ই। আচ্ছা, চা খেয়ে নিন আগে তারপর—ও তার মধ্যে আপনি তো চা খান না আবার। জলযোগ করুন বলতে হবে আপনার বেলা। না ?

—যা খুশি বলুন—

—সেদিন যে বলে দিলাম আমাকে 'আপনি' 'আজ্ঞে' করবেন না ? ভুলে গেলেন এরি মধ্যে ?

—আচ্ছা বেশ, এখন থেকে তাই হবে।

—বসুন আপনি, আমি আসচি—

একটু পরে মঞ্জু একটা রেকাবিতে লুচি, আলুভাজা ও হালুয়া লইয়া আসিল, নিধুর হাতে দিয়া বলিল—খেয়ে নিন আগে—

নিধু রেকাবির দিকে তাকাইয়া বলিল—এত ?

—ও কিছু না। খান আগে—আমি জল আনি—

জলযোগের পাট চুকিয়া গেলে মঞ্জু বলিল—শুনুন। কাল রবিবার বাবার জন্মদিন। বাবা জন্মদিনের অনুষ্ঠান করতে চান না, আমরা মাকে ধরেচি বাবার জন্মদিন আমরা করবই। আপনি এসেছেন খুব ভালো হল। আপনি অবিশ্যি আসবেন, জ্যাঠাইমাকেও কাল বলে আসব—আমরা একটা লেখা পড়ব, সেটা একবার আপনি শুনে বলুন কেমন হয়েছে—এই জন্যেই আমি ও-শনিবার থেকে—

নিধু হাসিয়া বলিল—বা রে, আমি কি লেখক নাকি ? লেখার আমি কি বুঝি ?

মঞ্জু বলিল—ইস্! আমি বুঝি জানিনে—আপনার ভাই রমেশ আপনার একটা খাতা দেখিয়েচে আমাদের—তাতে আপনি কবিতা লিখেচেন দেখলাম যে! বেশ কবিতা, আমার খুব ভালো লেগেচে—মাও শুনেচেন—

নিধু লজ্জায় সঙ্কোচে অভিভূত হইয়া পড়িল। রমেশ বাঁদরটার কি কাণ্ড! ছেলেমানুষ আর কাকে বলে! দাদাকে সব দিক হইতে ভালো প্রতিপন্ন না করিতে পারিলে তাহার মনে যেন আর স্বস্তি নাই।

কি দরকার ছিল ইহাদের সে খাতা টানিয়া বাহির করিয়া দেখাইবার ? নিধু আমতা-আমতা করিয়া বলিল—সে আবার লেখা! তা—সে সব—রমেশের কথা বাদ—

—কেন সে কিছু অন্যায় করে নি।

—সে সব কবিতা স্কুলে থাকতে লিখতাম—কাঁচা হাতের লেখা—

মঞ্জু প্রতিবাদের সুরে বলিল—কেন, আমাদের বেশ ভালো লেগেচে কবিতাগুলো। খুকুকে উদ্দেশ করে যে সিরিজ, ওগুলো সত্যিই চমৎকার! খুকু কে ?

নিধু লজ্জিতভাবে বলিল—ও আমার ছোট বোন—ওর ডাক নাম নেবু। তিনবছর বয়েস ছিল তখন, এখন বছর আট-নয় বয়েস। দেখো নি তাকে ?

—না আমি দেখি নি। এখুনি তাকে ডাকতে পাঠাচ্ছি—আজ দেখতেই হবে। কবির প্রেরণা যে যোগায়, সে বড় ভাগ্যবতী।

—সে তো এখানে নেই। মামার বাড়ী রয়েচে দিদিমার কাছে—দিদিমা বড় ভালোবাসেন কিনা! পুজোর সময় আসবে।

—তবে আর কি হবে! আমাদেরই কপাল। দেখা অদৃষ্টে থাকলে তো!

এই সময়ে মঞ্জুর মা আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—নিধু এসেচ বাবা ? মঞ্জু তো কেবল তোমার কথা বলচে কদিন তোমার কবিতা পড়ে। ওঁ নাকি কি কাগজ বার করবে, তাতে তোমায় লিখতে হবে।

মঞ্জু কৃত্রিম ক্রোধের সহিত মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল—মা সব কথা ফাঁস করে ফেললে তো! আমি সে কথা বুঝি এখনও বলেচি নিধুদাকে! যেমন তোমার কাণ্ড!

নিধু বলিল—কেন, কাকীমা ঠিক বলেচেন। শুনতেই তো পেতাম একটু পরেই—

মঞ্জু হাসিয়া বলিল—একখানা হাতের লেখা কাগজ বের করব ভাবচি, তাতে আপনাকে লিখতে হবে কিন্তু।

মঞ্জুর মা কন্যার গুণাবলীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে ব্যগ্র হইয়া বলিলেন—ও একখানা কাগজ আগেই বের করেছিল, ওঁর সঙ্গে কাজ করেন বি. দাসগুপ্ত নাম শুনেচ তো? সবজজ—খুব পণ্ডিত লোক, তিনি দেখে বলেছিলেন এমন লেখা—

মঞ্জু সলজ্জ প্রতিবাদের সুরে বলিল—আচ্ছা, মা—

—কেন আমায় বললি, সব কথা ফাঁস করে ফেলি যে! যখন করলাম ফাঁস, তখন ভালো করেই ফাঁস করা ভালো।

মঞ্জু আবদারের সুরে বলিল—মা, নিধুদাকে রাত্তিরে এখানে খেতে বল না? আমরা সব একসঙ্গে—

মঞ্জুর মা বলিলেন—আজ তো খাবার তেমন কিছু ভালো নেই—কি খাওয়াবি নিধুদাকে? তার চেয়ে কাল দুপুরে ওঁর জন্মদিনে পোলাও মাংস হবে, ভালো খাওয়া-দাওয়া আছে, কাল নিধু এখানে তো খাবেই—

—না মা, মাংস দরকার নেই শুভদিনে, তোমার পায়ে পড়ি মা। বাবাকে আমি বলব এখন—আর আমি বলি শোন মা। নিধুদা ঘরের ছেলে, আজও খাবে ডাল ভাত—কাল যা খাবে তা তো খাবেই—

তাহাকে লইয়া মাতাপুত্রীর এত কথা হওয়াতে প্রথমটা নিধু কেমন অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। কিন্তু ইহারা এত সহজ ভাবে সে কথা বলিতেছে যে নিধুর ক্রমশ বোধ হইতে লাগিল যে এই পরিবারের সঙ্গে তাহার বহুদিনের পরিচয়—সত্যই সে যেন তাহাদের ঘরের ছেলেই। এখানে আজ রাত্রে খাইতে কিন্তু নিধুর যে আপত্তি ছিল—তাহা অন্য কারণে। সে বাড়ী ফিরিয়াই বিকালে দেখিয়াছে তাহার জন্য মা বসিয়া-বসিয়া কচুর শাক কুটিতেছেন। কোনো কিছুর বিনিময়েই সে মা'র রান্না কচুর শাককে উপেক্ষা করিয়া মা'র প্রাণে কষ্ট দিতে পারিবে না। কথাটা সে অন্য ভাবে ঘুরাইয়া মঞ্জুকে বলিল।

মঞ্জু ইহা লইয়া বেশি নির্ব্বন্ধাতিশয্য দেখাইল না, নিধু সেজন্য এই বুদ্ধিমতী মেয়েটিকে মনে-মনে প্রশংসা না করিয়া পারিল না।

আরও ঘণ্টাখানেক পরে নিধু চলিয়া আসিবার সময় মঞ্জু বলিল—কাল সকালে উঠেই এখানে আসবেন কিন্তু। আপনার পরামর্শ নিয়ে আমরা সব সাজাব—অনুষ্ঠান কি রকম হবে না হবে সব তাতেই আপনার সাহায্য না পেলে—

—সে জন্যে ভাবনা নেই। আমি আসব এখন—

—শুধু আপনি নন নিধুদা—আপনাদের বাড়ীসুদ্ধ সব কাল নেমতন্ন। মা বলে দিলেন

আপনাকে বলতে—কাল সকালে আমি গিয়ে নেমন্তন্ন করে আসব।

রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া আহারাদি করিয়া শুইয়া পড়িতেই নিধুর মা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কি বললে ওরা? কাল ওদের বাড়ী কি রে নিধু, রমেশ বলছিল—

—জজবাবুর জন্মদিন।

—ওমা, ওই বুড়োর আবার জন্মদিন!

—পয়সা থাকলে সব হয় মা—তোমার পয়সা থাকলে তোমারও জন্মদিন হত।

—আমার জন্মদিন মাথায় থাকুক বাবা—পয়সার অভাবে তোর, রমেশের, পুঁটুর জন্মদিন কখনো করতে পারিনি। এ দেশে ওর চলনই নেই। থাকবে কি, অবস্থা সব সমান।

নিধু কি সব বলিয়া গেল খানিকক্ষণ ধরিয়া ইহার উত্তরে—কিন্তু নিধুর মা কি যেন ভাবিতেছিলেন—তাঁহার কানে সম্ভবত কোনো কথাই ঢোকে নাই।

নিধুর কথা শেষ হইলে তিনি অন্যমনস্কভাবে বলিলেন—আচ্ছা, তোর জন্মদিন কবে মনে আছে তোর? আশ্বিন মাসে তোঁ জানি—কিন্তু তারিখটা—

মায়ের কথা শুনিয়া নিধুর হাসি পাইল। বলিল—কেন মা, জন্মদিন করবে নাকি?

—না, তাই বলচি—বলিয়াই নিধুর মা ঘর হইতে চলিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—জল আছে ঘরে? এক গ্লাস জল হবে তো রে? আমি যাই?

পরদিন সকালে প্রায় সাড়ে-আটটায় সময় মঞ্জুই তাহার ভাইয়ের সঙ্গে নিধুদের বাড়ী আসিল। নিধুর মা তাহাদের দেখিয়া শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন—কোথায় বসান, কি করেন যেন ভাবিয়া পান না এমন অবস্থা। তাড়াতাড়ি একখানা আসন পাতিয়া দিয়া বলিলেন—এস মা বস। এস বাবা—বড় ভাগ্যি যে তোমরা এলে—

মঞ্জু কুন্ঠিত ভাবে বলিল—আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না জ্যাঠাইমা। নিধুদা কোথায়?

—সে এইমাত্র যে কোথায় বেরুল—এখুনি আসবে, বস মা।

—আপনারা সবাই পায়ের ধুলো দেবেন আমাদের বাড়ী মা বলে দিলেন। ওখানেই দুপুরে খাবেন সবাই কিন্তু—জ্যাঠাবাবুকে বলবেন।

নিধুর মা চোখমুখ ও কথার ভাবে বিনয় ও সৌজন্য প্রকাশ করিতে গিয়া যেন গলিয়া পড়িলেন।

মঞ্জু খানিক বসিয়া চলিয়া যাইবার সময় বার-বার করিয়া বলিয়া গেল, নিধুদা আসিলেই যেন সে তাহাদের বাড়ী যায়।

বেলা সাড়ে-নটায় সময় নিধু মঞ্জুদের বাড়ী গেল। ওই সময় হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সমস্ত দিনটা যে বিচিত্র অনুষ্ঠান, আমোদ ও পান-ভোজনের ভিতর দিয়া কাটিয়া গেল—নিধু বা তাহাদের বাড়ীর কেহই জীবনে ওরকম কিছু কখনো দেখে নাই। মঞ্জুর বিশেষ অনুরোধে নিধু ছোট একটি কবিতাও লিখিয়া দিল মঞ্জুর বাবার জন্মদিন উপলক্ষে। তাহাতে তাঁহাকে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণের সঙ্গে তুলনা করা হইল, যুগপ্রবর্ত্তক ঋষিদের সঙ্গে তুলনা করা হইল, মহামানব বলা হইল—বলিবার বিশেষ কিছু বাদ রহিল না। মঞ্জু নিজের একটি ক্ষুদ্র রচনা

পাঠ করিল, কয়েকটি গান গাহিল, একটি কবিতা আবৃত্তি করিল। সে যেন এই অনুষ্ঠানের প্রাণ, সে যেখানে থাকে তাহাই মাধুর্য্যে ও সৌন্দর্য্যে ভরিয়া তোলে—সে যেখানে নাই—তাহা হইয়া উঠে প্রাণহীন—অন্তত নিধুর তাহাই মনে হইল।

মঞ্জুর বাবাকে মঞ্জু নিজের হাতে স্নান করাইয়া শুভ্র গরদ পরাইয়া পিঁড়িতে বসাইল। গলায় নিজের হাতে তৈরি ফুলের মালা দিয়া কপালে নিজের হাতে চন্দন লেপন করিল। তাহার পর যাহা কিছু অনুষ্ঠান হইল, সবই তাঁহাকে ঘিরিয়া।

নিধুর মা এমন ধরনের উৎসব কখনো দেখেন নাই—দেখিয়া-শুনিয়া তাঁহার মুখে কথা সরে না এমন অবস্থা। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর নিমন্ত্রিতের দল চলিয়া গেল—নিধুকে কিন্তু মঞ্জু যাইতে দিল না। বৈকালে তাহারা ছোট একটি মূক অভিনয় করিবে, নিধুর বসিয়া এখনই দেখিতে হইবে তাহাদের তালিম দেওয়া। কোথায় কি খুঁত হইতেছে তাহা দেখিবার ভার পড়িল নিধুর উপর।

মঞ্জুর অভিনয় দেখিয়া নিধু মুগ্ধ হইয়া গেল। সুঠাম দেহযষ্টির কি লীলা, হাত-পা নাড়ার কি সুললিত ভঙ্গি, হাসির কি মাধুর্য্য—সামান্য একটি তক্তপোশ ও দড়ির গায়ে ঝুলানো কয়েকখানি রঙিন শাড়ী ও ফুলের মালার সাহায্যে যে এমন মায়া সৃষ্টি করা যায় দর্শকদের সামনে—তা নিধু এই প্রথম দেখিল। অবশ্য অভিনয়ের সময় নিধুর মা উপস্থিত ছিলেন।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে নিধু মঞ্জুকে বলিল—যাই তাহলে এখন—

—এখনই কেন?

—সারাদিন তো আছি—

—আরও থাকতে যদি বলি?

—থাকতে হবে তাহলে—তবে কাল সকালেই তো আবার—

—কাল ছুটি নেই?

—কিসের ছুটি কাল—না।

—সামনের শনিবার আসবেন তো?

—তা ঠিক বলা যায় না—সব শনিবার তো—

—শুনুন নিধুদা—ওসব শুনচিনে। আসতেই হবে শনিবার—আমাদের হাতের লেখা কাগজের ওই দিন একটা উৎসব করব ভাবচি।

—বেশ তাহলে আসব—

—আজ রাত্রে এখানে কেন খেয়ে যান না?

—দুপুরে ওই বিরাট খাওয়ার পরে রাত্রে কিছু চলবে না মঞ্জু, ও অনুরোধ কোরো না—

—সে হবে না। মাকে বলি—

—লক্ষ্মীটি, ছেলেমানুষি কোরো না—বলি শোনো—

—তাহলে এখন যাবেন না বলুন—

নিধুও বোধহয় মনে-মনে তাহাই চাহিয়াছিল। সে কেবল বলিল—থাকতে পারি, কিন্তু

তোমার মূক অভিনয়টি আর একবার দেখাতে হবে—

মঞ্জু উৎসাহের সঙ্গে বলিল—বেশ দেখাব। ভালো লেগেচে আপনার?

—চমৎকার।

—সত্যি বলচেন নিধুদা?

—মন থেকে বলচি বিশ্বাস কর—

—তা যখন বললেন—তখন ওর চেয়েও ভালো একটা করি আমি। স্কুলে প্রাইজ পেয়েছিলাম করে—সেটা করব এখন।

—তাহলে রইলাম আমি। না দেখে যাচ্ছিনে—

সন্ধ্যার কিছু পরে 'কচ ও দেবযানী'র মূক অভিনয় মঞ্জু করিল। ছোট ভাইকে কচের ভূমিকায় সহযোগী করিয়াছিল। নিধুর মনে হইল মঞ্জুর ভাই জিনিসটাকে নষ্ট করিল—মঞ্জুর অভিনয় সর্বাঙ্গসুন্দর হইত যদি সে ছোট ভাইয়ের কাছে বাধার পরিবর্তে সাহায্য পাইত।

অনেক রাত্রে নিধু যখন মঞ্জুদের বাড়ী হইতে ফিরিল—তখন মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করিতেছে—কিসের নেশা যেন তাহাকে মাতাল করিয়া দিয়াছে, কত ধরনের চিন্তা ও অনুভূতির জটিল স্রোত তখন তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, কোনো কিছু ভালোভাবে ভাবিয়া ও বুঝিয়া দেখিবার অবসর ও ক্ষমতা নাই তখন।

নিধুর মা বলিলেন—এলি বাবা? কেমন হল বল দিকি? একেই বলে বড়লোক। বড়লোক যে হয়, তাদের সব ভালো না হয়ে পারে না। জন্মদিন যে আবার ওভাবে করা যায়—তা তুমি-আমি জানি?

নিধু হাসিয়া বলিল—জানব কোত্থেকে মা? পয়সা আছে?

—আর কি চমৎকার মঞ্জু মেয়েটা! কেমন পালা গাইলে হাত পা নেড়ে? মুখে কিছু না বললেও সব বোঝা গেল।

—সব বুঝেছিলে মা?

—ওমা, ঠাকুর-দেবতার কথা কেন বুঝব না?

—কোনটা ঠাকুর-দেবতার কথা হল মা? তুমি কিছুই বোঝনি। ও আমাদের ঠাকুর-দেবতার নয় তুমি যা ভাবচ। বুদ্ধ নাম শুনেচ? ও সেই বুদ্ধদেবের—

—তা যাক গে, দেবতা তো, তাহলেই হল। কিন্তু যাই বল, মঞ্জু চমৎকার মেয়ে। না! কি সুন্দর দেখতে?

মঞ্জুর কথায় নিধু বিশেষ কোনো উৎসাহ দেখাইল না। একবার সমর্থনসূচক ঘাড় নাড়িয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে উঠিয়া নিধু মনের মধ্যে কেমন যেন একটা বেদনা অনুভব করিল। কিসের বেদনা ভালো করিয়া বোঝাও যায় না; অথচ মনে হয় যেন সারা দুনিয়া শূন্য হইয়া গিয়াছে; অন্য কোথাও গেলে কিছু নাই কোথাও। আছে কেবল এখানে মঞ্জুদের বাড়ী।

মঞ্জুদের বাড়ি ছাড়িয়া বিশ্বের কোথাও গিয়া সুখ নাই।

বাড়ী হইতে বিদায় লইয়া নিধু উদাস মনে পথ চলিতে লাগিল। ভাদ্রমাসের মাঝামাঝি, পথের ধারে ঝোপে বনকলমী ফুটিয়াছে—বাঁশঝাড়ের ও বড়-বড় বিলিতি চটকা গাছের মাথায় সকালের নীল আকাশ, পূজার আর বেশি দেরি নাই, স্থলে, জলে, আকাশে, বাতাসে আসন্ন পূজার আভাস যেন। পাড়াগাঁয়ের ছেলে নিধুর তাহাই মনে হইল।

কৃষকেরা পাট কাটিতে শুরু করিয়াছে, পথের ধারে যেখানে যত খানা ডোবা তাহাতেই পচানো পাটের আঁটি। দুর্গন্ধে এখন হইতেই পথ চলা দায়। নিধু অন্যমনস্কভাবে চলিতে-চলিতে প্রায় নোনাখালির বাঁওড়ের কাছে আসিয়া পড়িল। এখান হইতে টাউন আর মাইল দুই—নিধু বাঁওড়ের ধারে ঘাসের উপর বসিল। আজ এখনো সকাল আছে। তাড়াতাড়ি কোর্টে হাজির হইয়া কি হইবে? মক্কেলের তো বড় ভিড়!

মহকুমা টাউনে তাহার কেহ নাই। একেবারে আত্মীয়স্বজনশূন্য মরুভূমি এটা। জগতের যাহা কিছু সে চায়, তাহার প্রিয়, তাহার কাম্য—পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে। তাহাদের গ্রামে। মনের মধ্যে দারুণ শূন্যতা—তা কে পূরণ করিবে? যদু-মোক্তার না তার মুহুরী বিনোদ?

নিধু বুদ্ধিমান লোক, সে কথাটা ভালো করিয়া ভাবিল। মঞ্জুর প্রতি তাহার মনোভাব এমন হওয়ার হেতু কি? মঞ্জু সুন্দরী মেয়ে, কিন্তু সুন্দরী সে একেবারে দেখে নাই তাহা তো নয়, সেজন্য সে আকৃষ্ট হয় নাই। তাহাকে আকৃষ্ট করিয়াছে—তাহার প্রতি মঞ্জুর দরদ ও মধুর ব্যবহার, মঞ্জুর আদর, সৌজন্য—অত বড়লোকের মেয়ে সে, শিক্ষিতা ও রূপসী, তাহার উপর এত দরদ কেন তার?

এ এমন একটা জিনিস—নিধুর জীবনে যাহা আর কখনো ঘটে নাই, একেবারে প্রথম। তাই মঞ্জুর কথা ভাবিলেই, তাহার মুখ মনে করিলেই নিধুর মন মাতিয়া ওঠে—তাহাকে উদাস ও অন্যমনস্ক করিয়া তোলে—

সব কিছু তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর মনে হয়।

অথচ ইহার পরিণাম কি? শুধু কষ্ট ছাড়া?

বুদ্ধিমান নিধু সে কথাও ভাবিয়া দেখিয়াছে।

মঞ্জুকে সে চায় কিন্তু মঞ্জুর বাবা কি কখনো তাহার সহিত মঞ্জুর বিবাহ দিবেন? মঞ্জুকে পাইবার কোনো উপায় নাই তাহার। মঞ্জুকে আশা করা তাহার পক্ষে বামন হইয়া চাঁদে হাত দিবার সমান।

কেন এমন হইল তাহার মনের অবস্থা?

অত্যন্ত ইচ্ছা হয়, মঞ্জুর মনের ভাব কি জানিতে। মঞ্জুও কি তাহাকে এমন করিয়া ভাবিতেছে ? একথা কিন্তু মনে-প্রাণে বিশ্বাস করা শক্ত। কি তাহার আছে, না রূপ, না গুণ, না অর্থ—মঞ্জু তাহার কথা কেন ভাবিবে ? সে গরীবের ছেলে, মোক্তারী করিতে আসিয়া পাঁচটাকা ঘরভাড়া দিয়া নিজে দুটি রাঁধিয়া খাইয়া মক্কেল শিখাইয়া, যদু-মোক্তারের দয়ার জামিননামা সই করিয়া গড়ে মাসে আঠারো-উনিশ টাকা রোজগার করে—কোনো সম্ভ্রান্ত ঘরের শিক্ষিতা মেয়ে যে তাহার মতো লোকের দিকে চাহিয়া দেখিতেও পারে—ইহা বিশ্বাস করা শক্ত।

নিধু বাসায় পৌছিয়া দেখিল বিনোদ-মুহুরী তাহার অপেক্ষায় বারান্দার বেঞ্চিতে বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া বিনোদ-মুহুরী বলিল—বাবু এলেন ? বড্ড দেরী করে ফেললেন যে !

—কেন বল তো ?

—দুটো মক্কেল এসেচে—চুরির কেস। আমি ধরে রেখে দিয়েচি কত চালাকি খেলে। তাহা হরিহর নন্দীর কাছে কি মোজাহার হোসেনের কাছে যাবেই। আজই এজাহার করাতে হবে—বলেচি বাবু আসচেন, বস—এই এলেন বলে। ধরে কি রাখা যায় ?

—আসামী না ফরিয়াদী—

—ফরিয়াদী, বাবু। আসামী গিয়েচে যদুবাবুর কাছে। এদের অনেক করে ধরে রেখেচি, বাবু। খেতে গিয়েচে হোটেলে।

নিধু নির্ব্বোধ নয়, বিনোদ-মুহুরীর চালাকি বুঝিতে পারিল। বিনোদ-মুহুরী টাউটগিরি করিয়া কিছু কমিশন আদায় করিবে, এই তাহার আসল উদ্দেশ্য। নতুবা আসামী পক্ষ যখনই যদু-মোক্তারের কাছে গিয়াছে, অপরপক্ষ নিধুর কাছে আসিবেই—তাহাই আসিতেছে আজ দুমাস ধরিয়া। বিনোদের টাউটগিরি না করিলেও তাহারা এখানে আসিত। বিনোদের খোশামোদ করা ইত্যাদি সব বাজে কথা।

নিধু বলিল—টাকার কথা কিছু বলেছিলে ?

বিনোদ বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিল—না বাবু, আপনি এসে যা বলবেন ওদের বলুন—আমি টাকার কথা বলবার কে ?

—আচ্ছা, আমি কোর্টে চললাম। তুমি ওদের নিয়ে এস—

—বাবু, ওদের এজাহারটা একটু শিখিয়ে নেবেন কখন ?

—কোর্টেই নিয়ে এস—যা হয় হবে।

বার-লাইব্রেরীতে ঢুকিতে প্রথমেই সাধন-মোক্তারের সঙ্গে দেখা। সাধন তাহাকে দেখিয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন—আরে এই যে! আমি ভাবচি, আজ কি আর এলে না ? দেরি হচ্ছে যখন, তখন বোধ হয়—শরীর বেশ ভালো ? বাড়ীর সব ভালো ?

তাহার স্বাস্থ্য ও তাহার পরিবারের কুশল সম্বন্ধে সাধন-মোক্তারের এ অকারণ ঔৎসুক্য নিধুকে বিরক্ত করিয়াই তুলিল। সে বিরস মুখে বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, সব মন্দ নয়।

সাধন ভট্চাজ বলিলেন—ভালো কথা, একটা জামিননামায় সই করিতে হবে তোমায়।

মক্কেল পাঠিয়ে দেব এখন—

নিধু ইহার ভিতর সাধন ভট্‌চাজের স্বার্থসিদ্ধির গন্ধ পাইয়া আরও বিরক্ত হইয়া উঠিল—কিন্তু বিরক্ত হইলে ব্যবসা চলে না অন্তত একটা টাকা তো ফি পাওয়া যাইবে জামিননামায় সই করিয়া, সুতরাং সে বিনীতভাবে বলিল—দেবেন পাঠিয়ে।

—আজ একবার নতুন সাবডেপুটির কোর্টে তোমায় নিয়ে যাই চল—আলাপ হয়নি বুঝি?

—না, উনি তো শুক্রবারে এসেচেন, সেদিন আমার কেস ছিল না, ওঁকে চক্ষেও দেখিনি—

—হাকিমদের সঙ্গে আলাপ রাখা ভালো। চল যাই—

নবাগত সবডেপুটির নাম সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, বয়স বেশি নয়। লম্বা ধরনের গড়ন, চোখে চশমা, গায়ের রঙ বেশ ফরসা। এজলাসে কোনো কাজ ছিল না, সুনীলবাবু একা বসিয়া নথির পাতা উল্টাইতেছিলেন, সাধন ভট্‌চাজ ঘরে ঢুকিয়া হাসিমুখে বলিলেন—হুজুরের এজলাস যে আজ ফাঁকা?

—আসুন সাধনবাবু, আসুন। এ মহকুমায় দেখচি কেস বড় কম—ভাবচি দাবা খেলা শিখব না ছবি আঁকা শিখব—সময় কাটা তো চাই? ইনি কে?

হুজুরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব বলে নিয়ে এলাম, এঁর নাম নিধিরাম রায় চৌধুরী—মোক্তার। এই সবে মাস দুই হল—

—বেশ, বেশ। বসুন নিধিরামবাবু, কেস নেই, বসে একটু গল্পগুজব করা যাক—

নিধিরাম নমস্কার করিয়া বসিল। এজলাসে হাকিমদের সামনে বসিতে এখনো যেন তাহার ভয়-ভয় করে। কথা বলিতে তো পারেই না।

সুনীলবাবু বলিলেন—নিধিরামবাবুর বাড়ী কি এই সবডিভিসনেই?

নিধিরাম গলা ঝাড়িয়া লইয়া সসম্ভ্রমে বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ—এখান থেকে ছ ক্রোশ, কুড়ুলগাছি—

সুনীলবাবু চোখ কড়িকাঠের দিকে তুলিয়া কথা মনে·আনিবার ভঙ্গি করিয়া বলিলেন—কুড়ুলগাছি? কুড়ুলগাছি? আচ্ছা, আপনাদের গ্রামেই কি লালবিহারীবাবুর বাড়ী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—উনি বুঝি আজকাল কণ্টাইয়ের মুন্সেফ—না?

—কণ্টাই থেকে বদলি হয়েছেন মেদিনীপুর সদরে। দেশে এসেছেন তিন মাসের ছুটি নিয়ে—

—ছুটিতে আছেন? কেন অসুখ-বিসুখ নাকি?

—না শরীর বেশ ভালোই। বাড়ীতে এবার পূজো করবেন শুনচি—আর বোধ হয় বাড়ীঘর সারাবেন—

—তাই নাকি? বেশ, বেশ। আমার বাবার সঙ্গে ওঁর খুব বন্ধুত্ব কিনা। কলকাতায় আমাদের বাড়ীর পাশেই ওঁর শ্বশুরবাড়ী। সিমলে স্ট্রীটে—আমাদের সঙ্গে খুব জানাশোনা—ওঁরা ভালো আছেন সব?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—ভালোই দেখে এসেছি।

—আমার নাম করবেন তো লালবিহারীবাবুর কাছে।

—নিশ্চয়ই করব—এ শনিবারে গিয়েই করব—

—বলবেন একবার সময় পেলে আমি যাব—কি গাঁয়ের নামটা বললেন? কুড়ুলগাছি—ও হ্যাঁ, কুড়ুলগাছিতে।

—সে তো আমাদের সৌভাগ্য, হুজুরের মতো লোক যাবেন আমাদের গ্রামে।

নিধুর বিনয়ে সুনীলবাবু পরম আপ্যায়িত হইয়াছেন বলিয়া মনে হইল তাঁহার মুখ দেখিয়া। নিধুর দিকে তাকাইয়া খুশির সুরে বলিলেন—আজ আসবেন আমার ওখানে? আসুন না—একটু চা খাবেন বিকেলে? সাধনবাবু আপনিও আসুন না?

নিধু মুগ্ধ হইয়া গেল হাকিমের শিষ্টতায় ও সৌজন্যে। সাধনবাবুর তো মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। তিনি বিনয়ে সম্ভ্রমে বিগলিত হইয়া বলিলেন—আজ্ঞে, নিশ্চয়ই যাব। হুজুর যখন বলছেন—নিশ্চয়ই যাব—

—হ্যাঁ আসুন—এই ধরুন—ছ-টার সময়—

এই সময় হরিবাবু মোক্তার দুজন মক্কেল লইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—হুজুর, কি ব্যস্ত আছেন? একটা এজাহার করতে হবে আমার মক্কেলের—

নিধু ও সাধন ভট্টচাজ নমস্কার করিয়া বিদায় লইতে উদ্যত হইলে সাবডেপুটিবাবু বলিলেন—তা হলে মনে থাকে যেন নিধুবাবু—

—আজ্ঞে হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

বাহিরে আসিয়া সাধন ভট্টচাজ বলিলেন—সব হুজুরের সঙ্গে আমার খাতির—বুঝলে? তোমায় সব এজলাসে একে-একে নিয়ে যাব। তবে কি জানো—এস. ডি. ও. আর সবডেপুটি—এঁদের নিয়েই আমাদের কারবার। দেওয়ানী কোর্টে আমাদের তত তো হয় না, ফৌজদারী হাকিমদের সঙ্গে ভাব রাখলেই চলে যায়—

বার-লাইব্রেরীতে আসিবার পূর্ব্বে সাধন ভট্টচাজ নিম্ন সুরে বলিলেন—ভালো কথা, আমার সেই প্রস্তাবটার কি হল হে?

নিধুর গা জ্বলিয়া গেল। সে এতক্ষণ ইহারই অপেক্ষা করিতেছিল। ইতস্তত করিয়া বলিল—এখনো তো ভেবে দেখিনি—

—বাড়ীতে কিছু বল নি?

—আজ্ঞে না—

—তোমার মেয়ে পছন্দ হয়েছে কি না বলো—আসল কথা সেটা।

নিধু ভদ্রতার খাতিরে বলিল—আজ্ঞে না, মেয়ে ভালোই।

—তোমার সঙ্গে সামনের শনিবারে তোমাদের বাড়ী যাই না কেন?

—আপনি যাবেন আমার বাড়ীতে সে তো ভাগ্যের কথা। বে আমি বলচি কি এ শনিবারে না হয় আমি একবার জিগগেস করেই আসি বাবাকে—

—খুব ভালো। তাই কোরো। সোমবারে যেন আমি নিশ্চয়ই জানতে পারি—

বিকালে স্নীলবাবুর বাসায় নিধু গিয়া দেখিল সাধন ভট্‌চাজ পূর্ব্ব হইতেই সেখানে বসিয়া আছেন। স্নীলবাবু তখনো কাজ শেষ করিয়া বাসায় ফেরেন নাই। চাকরে তাহাকে অভ্যর্থনা করাইয়া বসাইল।

সাধন বলিলেন—এ. ডি. ও. নেই কিনা—স্নীলবাবু ট্রেজারীর কাজ শেষ করে আসবেন বোধ হয়।

আরও ঘণ্টাখানেক বসিবার পরে স্নীলবাবুকে ব্যস্তসমস্ত ভাবে আসিতে দেখা গেল।

উঁহাদের বাহিরের ঘরে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন—বড্ড দেরি হয়ে গেল—সো সরি! আজ আবার বড় কর্ত্তা নেই—টুরে বেরিয়েচেন মফস্বলে—ট্রেজারির কাজ দেখে আসতে হল কিনা। বসুন—আসচি—

বাইরের ঘরটিতে দুখানা বেতের কৌচ, দুখানা টেবিল, খান চার-পাঁচ চেয়ার পাতা। একটা ছোট আলমারিতে অনেকগুলি বাংলা ও ইংরাজি বই—দেওয়ালে কয়েকখানি ফটো, কয়েকখানি ছবি। তাহার মধ্যে একখানি ছবি নিধুর বেশ ভালো লাগিল। একটা গাছের তলায় দুটি হরিণ ক্রীড়ারত—দূরে কোনো স্রোতস্বিনী, অপর পারে কাননভূমি, আকাশে মেঘের ফাঁকে চাঁদ উঁকি মারিতেছে।

সে সাধন ভট্‌চাজকে ছবিখানি আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—দেখুন, কি চমৎকার না?

সাধন ভট্‌চাজ মোক্তারী করিয়া ও মক্কেল শিখাইয়া বহুকাল অতিবাহিত করিয়াছেন, কিন্তু কোন জিনিস দেখিতে ভালো, কোনটা মন্দ, ইহা লইয়া কখনো মাথা ঘামান নাই। সুতরাং তিনি অনাসক্ত ও উদাসীন দৃষ্টিতে দেওয়ালের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিয়া বলিলেন—কোনটা? ও-খানা? হ্যাঁ তা বেশ।

এমন সময় স্নীলবাবু একটা সিগারেটের টিন লইয়া ঘরে ঢুকিয়া নিধুর সামনের টেবিলে টিনটি রাখিয়া বলিলেন—খান—

নিধু তো এমনি কখনো ধূমপান করে না, সাধন ভট্‌চাজ করেন বটে কিন্তু হাকিমের সামনে কি করিয়া সিগারেট টানিবেন? সে ভরসা তাঁহার হয় না। সুতরাং যেখানকার সিগারেটের টিন সেখানেই পড়িয়া রহিল। সাধন ভট্‌চাজ কৃত্রিম খুশির ভাব মুখে আনিয়া বলিলেন—চমৎকার ছবিগুলো আপনার ঘরে—

স্নীলবাবু বলিলেন—এখানে ভালো ছবি কিছু আনিনি। হয়েচে কি, ভালো ছবি কিনবার রেওয়াজ আমাদের বাঙালীর মধ্যে নেই বললেই হয়। আমরা ছবির ভালোমন্দ প্রায়ই বুঝিনে। অনেক সময় নিকৃষ্ট বিলিতি ওলিওগ্রাফ কিনে এনে বৈঠকখানায় জাঁক করে বাঁধিয়ে রাখি—সাধনবাবু যেখানা দেখালেন, ওখানা সত্যিই ভালো ছবি। নন্দলাল বসুর আঁকা একখানা ছবির প্রিন্ট। নন্দলাল বসুর নাম নিশ্চয়ই—

কে নন্দলাল বসু, সাধন ভট্‌চাজ জীবনে কখনো শোনেন নাই, হাকিম খুশি করিবার জন্য সজোরে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব—খুব—আমাদের বাড়ীর মা-বাবা সবাই

নন্দলাল বসুর ছবির ভক্ত—

—আজ্ঞে তা হবেই তো! কত বড় শিক্ষিত বংশ আপনাদের—

নিধু আলমারির বই দেখিতেছে দেখিয়া সুনীলবাবু বলিলেন—বই প্রায় সব এখানে পাবেন, আজকাল যা-যা বেরুচ্চে—বই পড়তে ভালোবাসেন দেখচি আপনি—

নিধু বলিল—বই ভালোবাসি, কিন্তু এসব জায়গায় ভালো বই মেলেই না।

—কেন আপনাদের বার-লাইব্রেরীতে?

—মোক্তার বারে দু-দশখানা বাঁধানো ল' রিপোর্ট আর উইক্‌লি নোটস্ ছাড়া আর তো বই দেখিনে।

—আপনি আমার কাছ থেকে বই নিয়ে যাবেন, আবার পড়া হলে ফেরত দিয়ে নতুন বই নিয়ে যাবেন।

—তাহলে তো বেঁচে যাই—

—আচ্ছা, কুড়ুলগাছি এখান থেকে ক-মাইল হবে বললেন?

—ছ-ক্রোশ রাস্তা হবে—

—যাবার কি উপায় আছে?

—গরুর গাড়ী করে যাওয়া যায়—নয় তো হেঁটে—

—সাইকেলে যাওয়া যায় তো? আমাকে নিয়ে যাবেন?

—সে তো আমাদের ভাগ্য, কবে যাবেন বলুন?

—লালবিহারীবাবুদের সঙ্গে আমাদের ফ্যামিলির খুব জানাশোনা—আমি এখানে নতুন এসেচি, উনি জানেন না, জানলে এতদিন ডেকে নিয়ে যেতেন।

—বেশ, বেশ। আমি গিয়ে বলব এ শনিবারেই।

এই সময় ভৃত্য চা ও খাবার আনিয়া সামনের টেবিলে রাখিয়া দিল।

সুনীলবাবু বলিলেন—আসুন, চা খেয়ে নিন—চাকরে-বাকরে যা করে, তেমন কিছু ভালো হয় নি। বাসায় আমি একা, মেয়েমানুষ কেউ নেই তো। সাধন ভট্টচাজ সম্ভ্রমের সুরে জিজ্ঞাসা করিলেন—হুজুর কি আপাতত এখানে একা আছেন?

—একাই থাকি বই কি।

—কেন আপনার স্ত্রীকে বুঝি নিয়ে আসেননি?

সুনীলবাবু হাসিয়া বলিলেন—মাথা নেই তার মাথা ব্যথা! স্ত্রী কোথায়? এখনো বিয়ে করিনি—

সাধন ভট্টচাজ অপ্রতিভের সুরে বলিলেন—ও, তা তো বুঝতে পারিনি! তা হুজুরের আর বয়েস কি? আপনি তো ছেলেমানুষ—করে ফেলুন এইবারে বিয়ে। এই আমাদের এখানে থাকতে-থাকতেই—

—ভালোই তো। দিন না একটা যোগাড় করে—

সাধন ভট্টচাজ ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—যোগাড় করার ভাবনা? হুজুরের মুখ থেকে কথা

বেরুলে একটা ছেড়ে দশটা পাত্রী কালই যোগাড় করে দেব।

—নিধিরামবাবু আপনি বিবাহিত?

নিধু সলজ্জভাবে বলিল—আজ্ঞে না, এখনো করি নি—

—আপনি তো আমাদের চেয়েও বয়সে ছোট—আপনার যথেষ্ট সময় আছে এখনো।

সাধন ভট্‌চাজ ব্যগ্রভাবে নিধুর মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন—আর হুজুরেরই কি সময় গিয়েচে নাকি! বলুন তো দেখি চেষ্টা কাল থেকেই—

সুনীলবাবু হাসিয়া বলিলেন—হবে, হবে, ঠিক সময়ে বলব বইকি।

লঘু হাস্য-পরিহাসের মধ্য দিয়া চা-মজলিস শেষ হইলে উভয়ে সুনীলবাবুর বাসা হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া আসিলেন। পথে সাধন ভট্‌চাজকে একটু অন্যমনস্ক মনে হইল। নিধুর কথার উপরে সাধন দু-একটা অসংলগ্ন উত্তর দিলেন। নিধুর বাসার কাছে আসিয়া সাধন একবার মাত্র বলিলেন—তাহলে নিধু তুমি এ শনিবার বাড়ি যাচ্ছ নাকি?

নিধু বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ—যাব বই কি—

—আচ্ছা তা হলে সোমবার দেখা হবে। আসি আজ—

নিধু মনে-মনে হাসিল। সাধন-মোক্তারকে সে ইতিমধ্যে বেশ চিনিয়া ফেলিয়াছে। স্বার্থ ছাড়া তিনি এক পাও চলেন না। আশ্চর্য্য! ওই মেয়েকে সাবডেপুটি সুনীলবাবুর হাতে গছাইবার দুরাশা সাধনের মনে স্থান পাইল কি করিয়া? যাক, পরের কথায় থাকিবার তাহার দরকার নাই। সে নিজে আপাতত সাধন-মোক্তারের তাগিদের দায় হইতে রেহাই পাইয়াছে ইহাই যথেষ্ট।

ভাদ্রমাসের দিন ছোট হইয়া আসিতেছে ক্রমশ—নিধুর সকল ব্যস্ততাকে ব্যর্থ করিয়া দিয়া কামারগাছির দীঘির পাড়ে আসিতেই সন্ধ্যা হইয়া গেল। বাড়ী পৌঁছিল সে সন্ধ্যার প্রায় আধঘণ্টা পরে। আজ মঞ্জুর সঙ্গে দেখা হওয়ার আর কোনো উপায় নাই। এত রাত্রে সে কোন ছুতায় মঞ্জুদের বাড়ী যাইবে?

বাড়ীতে সে পা দিতেই তাহার মা বলিলেন—তুই এলি? জজবাবুর ছেলে তোকে বিকেল থেকে তিনবার খোঁজ করে গিয়েচে। এই তো খানিক আগেও এসেছিল—বলে গিয়েচে এলেই পাঠিয়ে দিতে—মঞ্জু কি দরকারে তোর খোঁজ করেচে—

নিধু উদাসীন ভাবে বলিল—ও! আচ্ছা দেখি—আবার রাত হয়ে গেল এদিকে—

—রাত তাই কি! মঞ্জুর ভাই বলে গেল, যত রাত হয় জ্যাঠাইমা, নিধুদা এলে পাঠিয়ে দেবেনই—

—বেশ যাব এখন। হাত মুখ ধুই—

ঘরে ছোট্ট একখানা আরশি ছিল। নিজের মুখ তাহাতে দেখিয়া নিধু বিশেষ খুশি হইল না। পথশ্রমে ও ধূলায় মুখের চেহারা—নাঃ, হোপলেস্! ভদ্রমহিলাদের সামনে

এ চেহারা লইয়া দাঁড়ানো অসম্ভব।

কিছুক্ষণ পরে নিধুর মা ছেলেকে গামছা কাঁধে ভিজা কাপড়ে পুকুরের ঘাট হইতে আসিতে দেখিয়া বিস্ময়ের সুরে বলিলেন—হ্যাঁরে, ওকি, তুই নেয়ে এলি নাকি এই সন্দেবেলা?

—হ্যাঁ মা, বড্ড ধুলো আর গরম—তাই নেয়ে সাবান দিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে এলাম—

—অসুখ-বিসুখ না করলে বাঁচি এখন! কক্ষনো তো সন্দেবেলা নাইতে দেখিনে তোকে—কাপড় ছেড়ে এসে জল খেয়ে নে। চা খাবি?

নিধু জানে মা চা করিতে জানে না। তাছাড়া ভালো চা বাড়ীতে নাইও, কারণ তাহাদের বাড়ীতে কখনো কালে-ভদ্রে কেহ শখ করিয়া হয়তো চা খায়—তাহাও ঔষধ হিসাবে; সর্দি টর্দি লাগিলে তবে।

সে বলিল—না মা চা থাক—তুমি খাবার দাও বরং—

নিধুর মা ছেলেকে রেকাবিতে করিয়া তালের ফুলুরি ও গুড় আনিয়া দিলেন। নিধু খাইতে ভালোবাসে বলিয়া দ্বিপ্রহরে রন্ধন সারিয়া এগুলি নিজ হস্তে করিয়া রাখিয়াছেন। বলিলেন—খা তুই—আর লাগে আরও দেব, আছে।

এমন এক সময় আসে জীবনে, আসল মাতৃস্নেহও মনকে তৃপ্তি দিতে পারে না, বরং উত্যক্ত করিয়া তোলে। নিধুর জীবনে সেই সময় সমাগত। সে এতগুলি তেলে-ভাজা তালের বড়া এখন বসিয়া-বসিয়া খাইতে রাজী নয়। তাহাতে প্রথমত তো সময় যাইবে, তারপর যদি মঞ্জুরা জল খাবার খাইবার জন্য বলে—কিছুই খাওয়া যাইবে না।

গোগ্রাসে কতক বড়া খাইয়া কতক বা ফেলিয়া নিধু তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া মুখ ধুইয়া বাহিরে যাইতে উদ্যত হইল।

নিধুর মা ডাকিয়া বলিলেন—হ্যাঁরে, ওমা এ কি করে খেলি তুই? সবই যে ফেলে গেলি? ভালোবাসিস বলে বসে-বসে করলাম—তা পান খাবি নে?

উত্তরে দরজার বাহির হইতে নিধু কি-যে বলিল—ভালো বোঝা গেল না।

মঞ্জুদের বাড়ীর দরজাতে পা দিতেই নৃপেনের সঙ্গে দেখা।

—ও দিদি, নিধুদা এসেচে—এই যে—ওমা—বলিতে-বলিতে সে তাহার হাত ধরিয়া টানিতে-টানিতেই বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেল।

মঞ্জু হাসিমুখে ঘর হইতে রোয়াকে আসিয়া বলিল—এই যে আসুন নিধুদা, আমি আজ তিনবার নৃপেনকে পাঠিয়েচি আপনার খোঁজে। এই মাত্তর বলছিলাম ওকে আর একবার গিয়ে দেখে আসতে এলেন কিনা। কতক্ষণ এসেচেন?

—এই ঘণ্টাখানেক। সন্দের পর এসেচি—এসে নেয়ে এলাম পুকুরে—

—আসুন বসুন। কিছু মুখে দিন—

—সব সেরে এসেচি বাড়ী থেকে—

—এটাও তো বাড়ী নিধুদা। সেরে এসেচেন বলে কি রেহাই পাবেন? বসুন—

মঞ্জুকে নিধুর আজ বড় ভালো লাগিল। সে একখানা ফিকে ধূসর রঙের জরির কাজ করা ঢাকাই শাড়ী ও ঘন-বেগুনি রঙের সাটিনের ব্লাউজ পরিয়াছে, পিঠে লম্বা চুলের বিনুনির অগ্রভাগে বড়-বড় টাসেল দোলানো, খালি পায়ে আলতা, সুন্দর ফরসা মুখে ঈষৎ পাউডারের আমেজ—বড়-বড় চোখে প্রসন্ন বন্ধুত্বের হাসি।

নৃপেন বলিল—কাল আপনি আছেন তো? আমাদের আবৃত্তি প্রতিযোগিতা জানেন না?

নিধু বিস্ময়ের সুরে বলিল—কোথায়, কে করবে—

—বাবা এখানকার পাঠশালার ছেলেদের আর মেয়েদের মেডেল দিচ্চেন। অবিশ্যি যে ফার্স্ট হবে তাকে দেবেন। বাবা সভাপতি, স্কুল সাব-ইনস্পেক্টার বিচার করবেন। বাবা মেডেল দেবেন, বাবা তো বিচার করতে পারেন না?

—কাল কখন হবে?

—এই বেলা ছটো থেকে আরম্ভ হবে, আমাদের বাড়ীর বৈঠকখানাতেই হবে। বেশি তো ছেলে নয়, ত্রিশ না বত্রিশটি ছেলেতে মেয়েতে—

এই সময় মঞ্জু খাবারের প্লেট হাতে ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিল—অমনি সব ফাঁস করে দেওয়া হচ্চে! কোথায় আমি ভাবচি খাবার খাইয়ে সুস্থ করে নিধুদাকে সব বলব—না উনি অমনি—

নৃপেন অভিমানের সুরে বলিল—বাঃ, তুমি কি আমায় বারণ করে দিয়েছিলে? তাছাড়া আসল কথাটা তো এখনো বলি নি, সেটা তুমিই বল!

নিধু মঞ্জুর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিল।

মঞ্জু হাসিয়া বলিল—অন্য কিছু নয়, আপনাকেও একজন জজ হতে হবে, বাবাকে আমি বলিচি বিশেষ করে। আপনাকে নিতেই হবে। কেমন রাজী?

নিধু বিস্ময়ের সুরে বলিল—তুমি কি যে বল মঞ্জু! আমি ভালো আবৃত্তি করেচি কোনো কালে যে জজ হতে যাব! সব বাজে।

—ওসব বললে আমি শুনচিনে—হতেই হবে আপনাকে!

—কি রকম কি করতে হবে তাই জানিনে!

—সব বলে দেব, তা হলেই হল তো?

মঞ্জুদের বাড়ী আসিলেই তাহার ভালো লাগে। সপ্তাহের সমস্ত পরিশ্রম, যদু-মোক্তারের পেছনে-পেছনে জামিননামার উমেদারী করা, মক্কেলদের মিথ্যা কথা শেখানো—সব শ্রমের সার্থকতা হয় এখানে। সারা সপ্তাহের দুঃখ, একঘেয়েমি কাটিয়ে যায় যেন। ইহাদের বাড়ীতে সব সময় যেন একটা আনন্দের স্রোত বহিতেছে—যে আনন্দের স্বাদ সে সারাজীবনে কোনোদিন পায় নাই—এখানে আসিয়াই তাহার প্রথম সন্ধান পাইল। কিন্তু মঞ্জু আছে বলিয়াই এই বাড়ীটি সজীব হইয়া আছে, মঞ্জু যেন ইহার অধিষ্ঠাত্রী।

নিধু বলিল—কি কবিতা আবৃত্তি হবে শুনি।

—রবীন্দ্রনাথের 'দুইবিঘা জমি' আর মাইকেল মধুসূদনের 'রসাল ও স্বর্ণলতিকা'—

—আমি নিজে কখনোই ও দুটো ভালো করে আবৃত্তি করতে পারিনে—

—তাহলেই তো আপনি সব চেয়ে ভালো জজ হতে পারবেন—

—আমি কেন তবে? আমাদের গাঁয়ের হরি কলুকে জজ কর না কেন তবে?

মঞ্জু হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। নিধুর মনে হয় এমন বীণার ঝঙ্কারের মতো সুমিষ্ট হাসি সে কখনো শোনে নাই।

নৃপেন বলিল—নিধুদা, দিদিকে একবার বলুন না ও দুটো আবৃত্তি করতে?

নিধু বলিল—কর না মঞ্জু, কখনো শুনিনি তোমার মুখে—

মঞ্জুর একটা গুণ, বেশিক্ষণ ধরিয়া তাহাকে কোনো বিষয়ের জন্যই সাধিতে হয় না—যদি তাহার অভ্যাস থাকে, সেটা সে তখনি করে। মঞ্জুর চরিত্রের এ দিকটা নিধুর সব চেয়ে ভালো লাগে—এমন সপ্রতিভ মেয়ে সে কখনো দেখে নাই।

মঞ্জু দুটি কবিতাই আবৃত্তি করিল। নিধু মুগ্ধ হইয়া শুনিল—এমন গলার সুর, এমন হাত নাড়িবার সুকুমার ভঙ্গি এসব পল্লী অঞ্চলে মেয়েদের মধ্যে কল্পনা করাও কঠিন।

মঞ্জু বলিল—নিধুদা, আমরা একটা অভিনয় করব সেদিন বলেছিলুম—থাকবেন আপনি?

—নিশ্চয়ই থাকব—

—কি বই প্লে করা যায় বলুন না?

—আমি কি বইয়ের কথা বলব বল? আমি কখনো কিছু দেখিনি—

নিধুর এই সরলতা মঞ্জুর বড় ভালো লাগে। চাল-দেওয়া ছোকরা সে তাহার মামার বাড়ীর আশে-পাশে অনেক দেখিল, কিন্তু নিধুদার মধ্যে বাজে চাল এতটুকু নাই, মঞ্জু ভাবে।

নৃপেন বলিল—রবীন্দ্রনাথের একটা বই করা যাক—ধর 'মুক্তধারা'—

মঞ্জু বলিল—বড় শক্ত হবে—সে আমাদের স্কুলে মেয়েরা করেছিল সেবার, অনেক লোক দরকার—বড্ড শক্ত। নিধুদা একটা লিখুন—

নিধু এ ধরনের কথায় বড় লজ্জা পায়। তাহাকে ইহারা ভাবিয়াছে কি? কোন কালে সে বাংলা লিখিল?

সে সঙ্কোচের সহিত বলিল—আমাকে কেন মিথ্যে বলা? আমি লিখতে জানি?

মঞ্জু বলিল—আপনার কবিতা তো দেখেচি—দেখি নি?

—সে ঝোঁকের মাথায় লেখা বাজে কবিতা—তাকে লেখা বলে না।

—তাই আমাদের লিখে দিন, সেই বাজে বই-ই আমরা প্লে করব।

—তার চেয়ে তুমি কেন লেখ না মঞ্জু?

—আমি! তাহলেই হয়েচে! আমি এইবার কলম ধরে অনুরূপা দেবী হব আর কি!

—ভালো কথা, মঞ্জু, আমি বই পড়তে পাই নে—আমায় খান-দুই বই দিয়ো—এবার যাবার সময় নিয়ে যাব।

—এতদিন বলেননি কেন? বই অনেক আছে। দিয়ে দিতাম—যখন যা দরকার হবে

নিয়ে যাবেন।

—কি-কি বই আছে?

—অনেক, অনেক—কত নাম করব? রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ বারো ভল্যুম আছে—মাইকেল আছে—

—কবিতা নয়, উপন্যাস আছে?

—তাও আছে। মা'র কাছ থেকে চাবি আনব? দেখবেন?

—না এখন থাক, রাত হয়ে গিয়েচে। কাল সকালে আসব—

—আচ্ছা, নিধুদা আপনি কেন ছুটি নিন না দিন-কতক?

নিধু বিস্ময়ের সুরে বলিল—কেন বল তো?

—আপনি থাকলে বেশ লাগে। এই অজ পাড়াগাঁয়ে মিশবার লোক নেই আর কেউ। আপনি আসেন তবু দুদিন বেশ আনন্দে কাটে।

—আমার আবার ছুটি কি? আমি তো কারো চাকরি করি না?

—তবে ভালোই তো। এ হপ্তায় আর যাবেন না—কেমন?

—না গেলে পসার নষ্ট হয়ে যাবে যে। নতুন প্র্যাকটিসে বসে কামাই করা চলে না।

সেদিন রাত্রে বাড়ী আসিয়া নিধুর আর ঘুমই হয় না।

মঞ্জু তাহাকে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছে। সে থাকিলে নাকি মঞ্জুর ভালো লাগে—মঞ্জুর মুখে এ কথা সে কোনোদিন শুনিবে, ইহা বহুদূর নীল সমূদ্রের পারে স্বপ্নদ্বীপের মতো অবিশ্বাস্য ও অবাস্তব। তবুও সে নিজের কানে শুনিয়াছে মঞ্জুই একথা বলিয়াছে।

ভোরে উঠিয়া সে বাড়ীতে থাকিতে পারিল না। গ্রামের পথে-পথে কিছুক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইল। তাহার পর বাড়ী ফিরিয়া পুকুরে স্নান করিয়া আসিল।

নিধুর মা বলিলেন—না খেয়ে বেরিও না যেন—

—মা, ধোপার-বাড়ী থেকে কাপড় এসেচে?

—কই না বাবা, বিষ্টির জন্যে ধোপা তো আসেনি এ কদিন।

—আমার ফরসা কাপড় তোমার বাক্সে আছে?

—ছেলের আমার সব বিদঘুটে। কাপড় সব নিয়ে গেলি রামনগরের বাসায়। আমার বাক্সে তোর কাপড় থাকবে কোথা থেকে? তোর কিছু খেয়াল যদি থাকে! নিজের কাপড়-চোপড়ের পর্য্যন্ত খেয়াল নেই। একটি বৌমা বাড়ীতে না আনলে—

নিধু ঘরের মধ্যে পালাইবার উপক্রম করিতে মা বলিলেন—দাঁড়া,—যাসনে কোথাও যেন। একটু মিছরি ভিজিয়ে রেখেচি, আর শশা কেটে—

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া নিধু দেখিল তাহার ফরসা কাপড় নিজের কাছেও কিছু নাই। আজ সভায় মোক্তারগিরি করিবে কি করিয়া তবে? মাকে সেকথা জানাইল। নিধুর মা বলিলেন—তা আমি এখন কি করি বাপু! এ যে অন্যায় কথা হল! কর্তার একটা সেকেলে পাঞ্জাবী আছে—সেটা তোর গায়ে হয়?

—তা বোধ হয় হতে পারে। বাবা তো মোটামানুষ নন, আমারই মতো—দেখি কেমন?

কিন্তু শেষে দেখা গেল সে পাঞ্জাবীর গলার কাছে পোকায় কাটিয়া ফেলিয়াছে অনেকখানি। তাহা পরিয়া কোথাও যাওয়া চলে না।

নিধুর মা স্মৃতিবিহ্বল দৃষ্টিতে পাঞ্জাবীটার দিকে চাহিয়া বলিলেন—উনি তৈরি করিয়েছিলেন তখন এই তিন-চার মাস আমাদের বিয়ে হয়েচে। তখন কি চেহারা ছিল কর্ত্তার! চুয়োড্যাঙার জমিদারী সেরেস্তায় চাকরি করতেন। তোর মত শনিবার-শনিবার বাড়ী আসতেন—

মায়ের চোখে এমন অতীতের স্বপ্নভরা দৃষ্টি নিধু আরও দু-একবার দেখিয়াছে। তখন সে নিজে চুপ করিয়া থাকে, কোনো কথা বলে না। তাহার মন কেমন করে মায়ের জন্য। বড় ভালোমানুষ। সৎমা বলিয়া নিধু বাল্যকাল হইতেই কখনো ভাবে নাই—তিনিও সৎছেলে বলিয়া দেখেন নাই। নিজের মায়ের কথা নিধুর মনেই হয় না। মা বলিতে সে ইহাকেই বোঝে।

—চারুর জামা তোর গায়ে হয় না? দেখি গিয়ে না হয় চারুর মা'র কাছে চেয়ে?

—থাক মা, তোমার এখানে-ওখানে বেড়াতে হবে না আমার জন্যে। আমি যা আছে তাই গায়ে দিয়ে যাব এখন। কি খেতে দেবে দাও—

হঠাৎ মা ও ছেলে যেন কি দেখিয়া যুগপৎ আড়ষ্ট হইয়া গেল। ভূত নয় অবিশ্যি—সকালবেলা। মঞ্জু সদর দরজা পার হইয়া উঠানে পা দিয়াছে—সঙ্গে কেহ নাই। সদ্য স্নান করিয়া ভিজে চুল পিঠে এলাইয়া দিয়াছে, চওড়া জরিপাড় ফিকে নীল রঙের শাড়ী পরনে, তার সঙ্গে ঘোর বেগুনি রঙের ব্লাউজ, খালি পা, হাতে খানকতক বই, মুখে হাসি।

—এস মা-মণি এস, এস—

—কই, সকালে এলুম জ্যাঠাইমা, খাবার কই! খিদে পেয়েচে—নিধুদা কোথায়?

—এই তো এখানে—বোধ হয় ঘরের মধ্যে—বস মা বস।

—নিধুদা কাল বই পড়তে চেয়েছিলেন তাই নিয়ে এলাম।

—তুমি আমাদের লক্ষ্মী মা-টি। বোস আমি আসচি—

ইতিমধ্যে নিধু চুল আঁচড়াইয়া ফিটফাট হইয়া ঘর হইতে বাহির হইল।

তাহার পালানোর কারণ তাহার অসংস্কৃত কেশ। বলিল—এই যে মঞ্জু! কখন এলে? ওগুলো কি?

—এগুলো আপনার জন্যে এনেছি—বই—

—দেখি কি-কি বই—

—এখন থাক। আপনি জজ হবেন আবৃত্তি কমপিটিশনে, তা গাঁ সুদ্ধ সবাই জেনে গিয়েচে জানেন?

—কি রকম?

—বাবার কাছে সব এসে জিগ্যেস করছিল সে আজ সকালে।

নিধুর মা এই সময় এক বাটি মুড়ি মাখিয়া আনিয়া মঞ্জুর হাতে দিয়া বলিলেন—খেতে চাইলে, কিন্তু তোমার গরীব জ্যাঠাইমার আর কিছু দেওয়ার—

মঞ্জু কথা শেষ করিতে না দিয়াই প্রতিবাদের সুরে বলিল্—অমন যদি বলবেন জ্যাঠাইমা, তাহলে আপনাদের বাড়ী কক্ষনো আসবো না—তাহলে ভাববো পর ভাবেন তাই ভদ্রতা করচেন। বাড়ীর মেয়ের সঙ্গে আবার ভদ্রতা কেন? সে যা জুটবে তাই খাবে—কি বলেন নিধুদা? কই নিধুদার কই?

—এই যে ওকেও দিই—মিছরীর জলটা আগে—

—খেয়ে নিধুদা চলুন আমাদের বাড়ী—আবৃত্তির কবিতাগুলো একবার পড়ে নেবেন তো?

—হ্যাঁ ভালোই তো, চল।

নিধুর মা বলিলেন– যাবে এখন মা, এখানে একটু বস। ও পুঁটি, মঞ্জুকে জল দিয়ে যা মা। পান খাবে?

—না জ্যাঠাইমা—পান খেলেও আমি সকালবেলা খাইনে। একটা পান খাই দুপুরে খাওয়ার পর, আর বিকেলে একটা। রাত্রে খাইনে—আমার বড় মামীমার দাঁত খারাপ হয়ে গিয়েচে অতিরিক্ত পান দোক্তা খাওয়ার দরুন। আমি দেখে-শুনে ভয়ে ছেড়ে দিয়েচি।

মঞ্জু আরও আধঘণ্টা বসিয়া নিধুর মা ও বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে গল্পগুজব করিল। সে যে নিধুকে দুপুরে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছে, সে কথা প্রকাশ করিল উঠিবার কিছু পূর্ব্বে।

মঞ্জু চলিয়া গেলে নিধুর মা বলিলেন—সামনের রবিবারে ওদের দুই ভাই-বোনকে খাওয়াতে হবে নেমন্তন্ন করে। রোজ-রোজ ওদের বাড়ী খাওয়া হচ্চে—মান থাকে না নইলে—

—বেশ তো মা, তাই কোরো। আমি আসবার সময় রামনগর থেকে কিছু ভালো সন্দেশ আর রসগোল্লা নিয়ে আসব—কি বল?

—তাই আনিস বাবা। যা ভালো বুঝিস।

সারাদিন হৈ-হৈ করিয়া কোথা দিয়া কাটিয়া গেল। নিমন্ত্রণ খাওয়া, মঞ্জুর হাসি, আলাপ, আবৃত্তি-প্রতিযোগিতায় সমগ্র গ্রামবাসীর ঈর্ষা-প্রশংসা-মিশ্রিত দৃষ্টির সম্মুখে মঞ্জুর বাবার ও স্কুল ইনস্পেক্টরের পাশে চেয়ারে বসিয়া আবৃত্তির ভালোমন্দ বিচার করা, আবার সন্ধ্যায় মঞ্জুদের বাড়ী জলখাবার খাওয়া, আবার আড্ডা, গল্প, মঞ্জুর গান, মঞ্জুর হাসি, মঞ্জুর স্নেহবর্ষী-দৃষ্টির প্রসন্ন আলো।

নিধুর মা রাত্রে বলিলেন—হ্যাঁরে তুই নাকি জজবাবুর পাশে বসে কি করেছিলি স্কুলে?

—কে বললে?

—পালিতদের বাড়ী শুনে এলাম। তোর বড্ড সুখ্যাতি করছিল সেখানে সবাই।

বললে···হীরের টুকরো ছেলে হায়চে নিধু, অত বড়-বড় লোকের পাশে বসে ঐটুকু ছেলে—

—তা তোমার ছেলে কম কেন হবে বল না?

—আমার বুকখানা শুনে বাবা দশ হাত হল।

নিধুর বাবা বাড়ীতে থাকিয়াও বড় কাহারো একটা খোঁজ-খবর রাখেন না। তিনি পর্য্যন্ত ডাকিয়া নিধুকে জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন সভা সম্বন্ধে।

তিনি লোকের মুখে শুনিয়াছেন। সভায় যান নাই—কোথাও বড় যান না।

সোমবার সকাল। সপ্তাহে এমন দিন কেন আসে?

অত ভোরে মঞ্জুর সঙ্গে দেখা হওয়ার কোনোই সম্ভাবনা ছিল না। নিধুর মা রাত্রি থাকিতে উঠিয়া ভাত চড়াইয়াছিলেন। স্নান করিয়া দুটি ভাত মুখে দিয়া নিধু পথে বাহির হইল।

কি আশ্চর্য্য! চোখকে বিশ্বাস করা শক্ত। অত সকালে গ্রামের বাহিরের পাকা রাস্তা দিয়া নৃপেন, বীরেন ও মঞ্জু বেড়াইয়া ফিরিতেছে।

নিধু বলিল—বীরেন যে! কখন এলে?

—কাল অনেক রাত্রে। রাত দশটার ট্রেনে স্টেশনে নেমে বাড়ী পৌছতে একটা হয়ে গেল।

—তারপর মঞ্জু যে বড় বেড়াতে বেরিয়েচ? কখনো তো—

—বেড়াতে বেরুই নি। মেজদা কাল রাত্রে ফাউণ্টেন পেন হারিয়ে এসেচে—তাই ভোরে কেউ উঠবার আগে আমরা তিনজনে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম। পাওয়া গেল না।

—স্টেশন পর্য্যন্ত সারা পথ না খুঁজলে—

বীরেন বলিল—তা নয়, পুব-পাড়ার শাম বাগ্দীর বাড়ী পর্য্যন্ত ফাউণ্টেন পেন পকেটে ছিল। শাম বাগ্দী রামনগরের হাটে গিয়েছিল, তার গাড়ী ফিরছিল—সেই গাড়ীতে এলাম। তাকে পয়সা দিতে গিয়ে দেখেচি পেনটা তখনও পকেটে আছে। বাড়ী এসে আর দেখলাম না।

মঞ্জু বলিল—চলো মেজদা, নিধুদাকে একটু এগিয়ে দিই।

নিধু সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে মঞ্জুর দিকে চাহিল। মঞ্জু বলিল—খেয়ে যাবেন না নিধুদা?—

মা কি না খাইয়ে ছেড়েছেন? সেটি হবার যো নেই তাঁর কাছে। সেই কোন ভোরে উঠে—

—চমৎকার মানুষ বটে জ্যাঠাইমা। সামনের শনিবারে আসা চাই নিধুদা।

—আসব বই কি—

—পুজো তো এসে গেল, পুজোর সময় আমরা সবাই মিলে একটা ছোটখাটো প্লে করব—আপনি আসুন, সামনের রবিবারে তার পরামর্শ করা যাবে। মেজদা এসেচে, বড়দাও সামনের হপ্তায় আসবে। বেশ মজা হবে।

—কে অরুণবাবু? তাঁকে কখনো দেখিনি।

—দেখবেন এখন সামনের রবিবারে।

—তোমরা যাও মঞ্জু, আর আসতে হবে না।

—আর একটু যাই—ওই সাঁকোটা পর্য্যন্ত—ভারি ভালো লাগে শরতের সকালে বেড়াতে। কি সবুজ গাছপালা! চোখ জুড়িয়ে যায়। আমার কাছে এসব নতুন।

—তুমি এর আগে পাড়াগাঁ দেখ নি বুঝি মঞ্জু?

—মধুপুর দেখেছি দুমকা দেখেছি। বাঙলাদেশের পাড়াগাঁয়ে এই প্রথম—

সাঁকোর কাছে গিয়া সকলে সাঁকোর উপর কিছুক্ষণ বসিল। বীরেন বলিল—মঞ্জু একটা গান কর তো? বেশ লাগছে সকালটা। নিধুও সে অনুরোধে যোগ দিল। মঞ্জু দু-তিনটি গান গাহিল। ক্রমে বেলা উঠিয়া গেল। দুধারের গাছপালার মাথায় শরতের রৌদ্র ঝলমল করিতে লাগিল। নিধু উহাদের কাছে বিদায় লইয়া জোর পায়ে পথ হাঁটিতে লাগিল।

সেদিন এজলাসে ঢুকিতেই সাবডেপুটি সুনীলবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—কি নিধিরামবাবু, লালবিহারীবাবুকে আমার খবরটা দিয়েছিলেন তো? সর্ব্বনাশ! নিধু তাহা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে! সে কথা একেবারেই তাহার মনে ছিল না? মঞ্জুর সঙ্গে দেখা হইলে তাহার কোনো কথাই ছাই মনে থাকে না।

সে আমতা-আমতা করিয়া বলিল—হুজুর—খবরটা দেওয়া হয় নি। আমার বাড়ীতে অসুখবিসুখ—উনিও স্কুলে কি সব কাজে বড় ব্যস্ত—বড়ই দুঃখিত—

—না, না, সেজন্যে কি? সেজন্যে কিছু মনে করবেন না। দেখি যদি সুবিধে পাই—সামনের রবিবারে আমি নিজেই সাইকেল করে যাব। সামনের শনিবারে আপনি শুধু জানিয়ে দেবেন দয়া করে যে আমি রবিবারে যেতেও পারি। তাহলেই হল।

সাধন-মোক্তার ফৌজদারী কোর্টের বটতলা হইতে নিধুকে দেখিতে পাইয়া তাহার দিকে আসিতেছিলেন, সাবডেপুটির এজলাসের বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে নিধু একেবারে সাধনের সামনে গিয়া পড়িল।

—আরে এই যে নিধিরাম, আজ এলে সকালে? বেশ, বেশ। চল একটা জামিননামা আছে, যদুদা তোমায় খুঁজছিলেন যে, দেখা হয়েছে?

—আজ্ঞে না—এই তো আমি পা দিয়েছি কোর্টে। কারো সঙ্গে এখনো—

—সুনীলের এজলাসে কি কেস ছিল?

সাধন-মোক্তার প্রবীণ লোক—সাবডেপুটির সামনাসামনি যদিও কখনো 'হুজুর' ছাড়া সম্বোধন করেন না কিন্তু সেই সাবডেপুটি বা অন্য জুনিয়ার হাকিমদের প্রথম পুরুষে উল্লেখ করিবার সময় তাহাদের নামের শেষে 'বাবু' পর্য্যন্ত যোগ করেন না—ইহাতে সাধন ভাবেন তাঁহার চরিত্রের নির্ভীকতা প্রকাশ পায়।

নিধু তাঁহার প্রশ্নের জবাব দিয়া যদু-মোক্তারের খোঁজে গেল। বার লাইব্রেরীতে যদু বাঁড়ুয্যে, ধরণী পাল ও হরিবাবু বসিয়া কি লইয়া তর্কবিতর্ক করিতেছেন—এমন সময় নিধুকে

ঢুকিতে দেখিয়া যদু বলিলেন—আরে নিধিরাম যে, এস! সেদিনের রূপনারাণপুরের মারামারির কেসের রায় আজ বেরুবে—আসামী দুজন এখনো এসে পৌঁছল না। ওদের টাকা আগে হাত করতে হবে—নয়তো কিছু দেবে না—তুমি এখানে বসে থাক। তুমিও তো কেসে ছিলে, তোমারও পাওনা আছে। ওরা এলে কোর্ট-মুখো যেন না হয়।

—কেন?

—আসামী সব বেকসুর খালাস হয়েচে রায়ে। আমি খবর নিয়েচি।

—এ তো ভালো কথা। তবে তারা এলে—যা টাকা বাকি আছে—

ধরণী ও হরি-মোক্তার নিধুর কথা শুনিয়া হাসিলেন। যদু বাঁড়ুয্যে মুখে হতাশার ভাব আনিয়া বলিলেন—জুনিয়ার মোক্তার কিনা, এখনো গায়ে ইস্কুল কলেজের বেঞ্চির গন্ধ। বুঝতে তোমার এখনো অনেক দেরি, বাবা।

নিধু জিনিসটা এখনো ভালো করিয়া বুঝিতে পারে নাই দেখিয়া প্রবীণ হরি-মোক্তার বলিলেন—নিধিরামবাবু, বুঝলেন না? আসামী যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে সে খালাস পাবে, তবে সে আপনাকে বা যদুদাকে আর সিকি পয়সাও ঠ্যাকাবে না। কোর্টের ওদিকে গেলে ওই পেস্কার-টেস্কার পয়সা আদায় করার জন্যে খবরটা শুনিয়ে দেবে—কারণ সবাই তো ওৎ পেতে আছে পরের ঘাড় ভাঙবার—

—আজ্ঞে বুঝেচি হরিদা—এই যে এরা এসেচে। রূপনারাণপুরের সেই মক্কেল দুজন—

যদুবাবু অমনি তাহাদের উপর যেন ছোঁ মারিয়া পড়িয়া বলিলেন—এই যে, এলে? এস বস বাবা। খবর তো বড় খারাপ।

আগন্তুক মক্কেল দুটি পল্লীগ্রামের লোক, পরনে হাঁটু পর্য্যন্ত তোলা ময়লা কাপড়, পায়ে কাদা, গায়ে ময়লা আকার-প্রকার-হীন পিরাণ বা ফতুয়ার উপর গামছা ফেলা—বগলে ছোট পুঁটুলি। ইহাদের মধ্যে একজনের চেহারা খুব লম্বা-চওড়া, একমুখ দাড়ি, গোল-গোল ভাঁটার মতো চোখ—দেখিলে মনে হয় বেশ বলবান, তবে নিরীহ ও নির্ব্বোধ ধরনের।

দুজনেই উৎসুক ভাবে বলিল—কি খবর বাবু?

—খবর খারাপ। হাকিম খুব চটেচেন—

—কার ওপর চটলেন বাবু?

—তোমাদের দুজনের ওপর। জেলে যেতে হবে। রায়ের গতিক ভালো নয়। আজ একবার হদ্দমুদ্দ শেষ চেষ্টা করে দেখি যদি খালাস করতে পারি—কিন্তু—

এই সময় যদু বাঁড়ুয্যে নিধুর হাতে একটা স্লিপে কি লিখিয়া দিলেন।

নিধু স্লিপটা পড়িয়া বলিল—বাবু আজ বিশেষ চেষ্টা করবেন তোমাদের জন্যে, তিন টাকা তেরো আনা ন' পাই প্রত্যেকের খরচ চাই—

—বাবু, ট্যাকা তো অত মোরা আনি নি? মোরা জানি রায় বেরুবে—

যদু বাঁড়ুয্যে মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন—রায় বেরুবে? রায়ে তোমাকে একেবারে বেকসুর খালাস দিয়ে দেবে যে! যাও গিয়ে এখন দুটি বছর ঘানি টানো গে যাও জেলে—তবে

তোমাদের চৈতন্য হবে। সেদিন কি বলে দিয়েছিলাম ?

—তা বাবু, বলে তো দেলেন—কিন্তু ইদিকি যে মোদের দিন চলে না এমনডা হয়েচে। এই মোকর্দ্দমায় এপর্য্যন্ত বাইশ-তেইশ টাকা উকীল-মোক্তারের দেনা, আর পুলিশ—

—ওসব প্যানপ্যানানি রাখ্‌গে যা তুলে। টাকা না আনিস, এক পা নড়ব না এখান থেকে—দেখি কি হয়—ক-বছর ঘানি টানতে হয় দেখি একবার—

—না বাবু আপনি একবার চেষ্টা করে দেখুন—আমি ট্যাকার সন্ধান করে আসচি—বাজারের দিকি যাই—আমাদের গাঁয়ের দুটো লোক এসেচে—তাদের কাছে—

—তা যা শিগগির যা—আর শোন্, একটা কথা—কাছে আয়—

তাহারা কাছে সরিয়া আসিলে যদু-মোক্তার গলার স্বর নিচু করিয়া বলিলেন—খবরদার যেন কোর্টের দিকে যাবিনে—তোদের দেখলে হাকিমের রাগ হবে—শেষকালে বাঁচাতে পারব না তোদের—টাকা এনে আমার হাতে দিয়ে চুপটি করে এই বার লাইব্রেরীতে বারান্দায় বসে থাকবি, বুঝলি ?

—বেশ বাবু, যা বলবেন।

লোক দুটি চলিয়া গেলে হরি ও ধরণী-মোক্তার হো-হো করিয়া হাসিয়া ঘর ফাটাইবার উপক্রম করিলেন। হরি-মোক্তার বলিলেন—বাবা, পাকা-লোক যদু-দা! ওঁর কাছে মক্কেলের চালাকি ? না কোর্টের আমলাদের চালাকি ?

যদু সগর্ব্বে বলিলেন—আরে ভায়া, টাকা রয়েচে ওদের কাছে। দেবে না—দিতে চায় না! এই কাজ করচি এই রামনগরের কোর্টে আজ চল্লিশ বছর প্রায়। দেখে-দেখে ঘুণ হয়ে গেলাম। এখুনি দেখ এসে টাকা দিয়ে যাবে। বাইরে দুজনে পরামর্শ করতে গেল আর কাছা থেকে টাকা খুলতে গেল। আমি জ্ঞান হয়ে অবধি এই দেখে আসচি—কত হাকিম এল, কত হাকিম গেল! রমেশ দত্তকে এই কোর্টে দেখেচি—তখন তিনি জয়েন্ট ম্যাজেস্ট্রেট—সিভিলিয়ান রমেশ দত্ত—আমি আজকের লোক নই!

নিধুকে ডাকিয়া যদু বাঁড়ুয্যে বলিলেন—তুমি বস এখানে। আমি এজলাসে যাব একবার। কোথাও যেও না টাকা আদায় না করে।

আজ বারো মাসের মোক্তারী জীবনে নিধু এরকম অনেক দেখিল। এক-একবার তাহার মনে হয় এর চেয়ে স্কুল-মাস্টারি করা অনেক ভালো ছিল। এ দুঃখের কথা—পলে-পলে মনুষ্যত্বের এই মরণ—কাহার কাছে এসব কথা ব্যক্ত করিবে সে ?

একজন মাত্র মানুষ আছে। সে মঞ্জু। মঞ্জুর কাছে সামনের শনিবারে সব সে খুলিয়া বলিবে। এ জীবন আর ভালো লাগে না।

কোর্টের কাজ সারিয়া বাহির হইতে প্রায় পাঁচটা বাজিল। সাধন-মোক্তার তাহাকে বাসায় যাইবার পথে ধরিয়া বসিলেন—ওহে নিধিরাম শোনো শোনো। আমার সে ব্যাপারটা—

—আজ্ঞে, বুঝেচি। সে এখন হবে না।

—কেন বল তো? জিগ্‌গেস করেছিলে বাড়ীতে?

—বাড়ীতে আর জিগগেস করব? এখন নিজেরই মন নেই। এই তো রোজগারের দশা—দেখচেন তো সব।

—ওসব কথা কাজের নয় হে। তুমি ছেলেমানুষ এখুনি কি রোজগার করতে চাও? দিন যাক, সিনিয়র মোক্তারগুলো আগে পটল তুলুক।

—ততদিনে আমাকেও পটল তুলতে হবে দাদা।

—তুমি ভুল করচো ভায়া। ভেবে দেখ আগে। তোমাকে এ কাজ করতেই হবে—বাড়ীতে এরা তোমাকে পছন্দ—

নিধু বাসায় আসিয়া দোর খুলিল। এখানে নিজেরই রাঁধিতে হয়, একটা ছোকরা চাকর কাজকর্ম্ম করে। ঘর-দোর বড় অপরিষ্কার দেখিয়া সে চাকরটিকে ডাকিয়া ধমক দিল। বলিল—উনুনে আঁচ দে, রান্না চড়িয়ে দেব। ভালো বিপদে ফেলিয়াছে সাধন-মোক্তার! বাড়ীতে পছন্দ করিয়াছে তো তাহার কি? কাল সকালে স্পষ্ট জবাব দিয়া দিবে।

হাত-মুখ ধুইয়া রান্না চাপাইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় সাবডেপুটির আরদালি আসিয়া একখানা পত্র তার হাতে দিল।

সুনীলবাবু তাহাকে একবার এখনি দেখা করিতে লিখিয়াছেন। সেখানেই সে চা খাইবে।

সন্ধ্যা তখনো হয় নাই। সুনীলবাবু বৈঠকখানায় বসিয়া মুন্সেফবাবুর সঙ্গে গল্প করিতেছেন।

—আসুন নিধিরামবাবু, বসুন। আপনার জন্য আমরা অপেক্ষা করচি, কেউ চা খাই নি—

—আজ্ঞে, আমি তো চা খাইনে—আপনারা খান। নমস্কার মুন্সেফবাবু, বেশ ভালো আছেন?

মুন্সেফবাবুটি নবাগত। সুনীলবাবু নিধুর পরিচয় করাইয়া দিয়া বলিলেন—এঁর কথাই বলছিলাম। বেশ প্রমিসিং মুকটিয়ার, যদিও এই সবে—

মুন্সেফবাবু বলিলেন—আপনার নাম শুনেচি এঁর মুখে নিধিরামবাবু। আপনার বাড়ী বুঝি লালবিহারীবাবুর স্বগ্রামে?

—আজ্ঞে। আপনি তাঁকে চেনেন?

—হ্যাঁ—আলাপ নেই—তবে একই সার্ভিসের লোক, যদিও তিনি আমাদের চেয়ে সিনিয়র। নাম খুব জানি। আচ্ছা, আপনাকে একটা কথা জিগগেস করব—

—আজ্ঞে বলুন—

—লালবিহারীবাবুর বড় ছেলে অরুণকে আপনি জানেন?

—দেখি নি তবে নাম শুনেচি—তিনি এখানে আসেন নি—তবে শুনচি সামনের রবিবার নাকি আসবেন।

সুনীলবাবু বলিলেন—তবে তো ভালো হল অমরবাবু, চলুন আপনিও সামনের রবিবারে

ওঁদের ওখানে। অরুণবাবুকে দেখে আসবেন—কি বলেন নিধিরামবাবু ?

—আজ্ঞে এ তো খুব ভালো কথা।

মুন্সেফবাবু বলিলেন—আপনাকে বলি, আমার একটি ভাগ্নীর সঙ্গে অরুণবাবুর বিবাহের প্রস্তাব হয়েচে—মানে এখনোও ফরম্যালি করা হয়নি ওঁদের সঙ্গে—আমরা দেখে এসে—

—আজ্ঞে খুব ভালো কথা।

সুনীলবাবু বলিলেন—আমরা রবিবারে যাব দুজনে। আপনি দয়া করে শুধু লালবিহারীবাবুকে যদি জানিয়ে রাখেন—

—এ আর বেশি কথা কি বলুন—আমি নিশ্চয়ই বলব এখন। আজ্ঞে না, আমি তো চা খাইনে—এ কাপ নিয়ে যাও—

—আচ্ছা বাড়তি কাপ আমাদের এখানে দিয়ে যা, চা ফেলা যাবে না আমাদের কাছে—কি বলেন অমরবাবু—আপনাকে কি ওভালটিন দেবে ?

—আজ্ঞে না, আমি শুধু এই খাবার— একগ্লাস জল দিলেই—

—ওরে বাবুকে একগ্লাস জল—আর পান নিয়ে আয় তিন খিলি—

আরও আধঘণ্টা কথাবার্ত্তার পরে নিধিরাম বিদায় লইয়া বাসায় আসিল। তাহার মনটা বেশ প্রফুল্ল। এত বড়-বড় অফিসারের সঙ্গে বসিয়া চা খাইয়া আড্ডা দিবে—সে কখনো ভাবিয়াছিল ? গ্রামে তাহারা অত্যন্ত গরীব—তাহার বাবা তো কোথাও মুখ পান না গরিব বলিয়া। কাছারীর নায়েব দুবেলা ডাকিয়া শাসন করে। আর আজ সে কি না মহকুমার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তাদের সঙ্গে সমানে-সমানে বসিয়া জলখাবার খাইল, গল্পগুজব করিল। গ্রামে গিয়া একটা গল্প করিবার জিনিস হইয়াছে বটে! কিন্তু তাহার চেয়েও—এ সবের চেয়েও গর্ব্বের বিষয় তাহার জীবনে—মঞ্জুর সঙ্গে আলাপ, মঞ্জুর মতো শিক্ষিতা, সুন্দরী, বড় দরের গভর্ণমেণ্ট অফিসারের মেয়ের সঙ্গে তাহার আলাপ, তাহার বন্ধুত্ব।

তাহার এ সৌভাগ্যের তুলনা হয় ? কজনের ভাগ্যে এমন ঘটে ?

কিন্তু মুশকিল ঘটিয়া গেল। সামনের রবিবারে যদি ইহারা গিয়া উপস্থিত হন, তবে গোলমালে এমন সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিবে যে মঞ্জুর সহিত দেখা-শোনা হয়তো ঘটিয়াই উঠিবে না। তাহাদের গ্রামে যখন ইহারা যাইতেছেন—তখন তাহাকে ইহাদের লইয়াই ব্যস্ত থাকিতে হইবে—মঞ্জুর সহিত সে দেখা করিবে কখন ? মঞ্জু যে বলিয়াছিল আগামী রবিবারে অভিনয়ের সম্বন্ধে পরামর্শ করিবে—সে সব গেল উল্টাইয়া। তাহার সময় কই ? সামনের রবিবার একেবারে মাটি।

পরদিন যদু বাঁড়ুয্যে কতকটা অবিশ্বাস, কতকটা আগ্রহের সুরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁ হে নিধু, সুনীলবাবু আর মুন্সেফবাবু নাকি সামনের হপ্তায় তোমাদের গাঁয়ে তোমাদের বাড়ী যাচ্ছেন ?

নিধু হাসিয়া বলিল—কে বললে ?

—সব শুনতে পাই হে, সব কানে আসে। পেশকারবাবুর মুখে শুনলাম। সুনীলবাবুর

চাপরাশি বলেচে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ কাকা, তবে আমাদের বাড়ী তো নয়—আমাদের প্রতিবেশী লালবিহারীবাবু মুন্সেফ—তাঁদেরই বাড়ী।

—সে যাই হোক, তুমিও একটু তোমার বাড়ীতে নিয়ে যেও, খাতির-যত্ন কোরো হে। হাকিমদের বাড়ী যাতায়াত করলে বা হাকিম বাড়ীতে যাতায়াত করলে মক্কেলের চোখে উকীল-মোক্তারের কদর বেড়ে যায়—ও একটা মস্ত খাতির হে!

যদু-মোক্তার যেন একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন মনে হইল।

তিনি এতকাল রামনগরে মোক্তারি করিতেছেন—তাঁহার এখানে শহরের বাসায় নিমন্ত্রণ উপলক্ষে অনেকবার হাকিমদের পদধূলি যে না পড়িয়াছে তাহা নয়—কিন্তু কই, কোনো হাকিম তো তাঁহার পৈতৃক গ্রামের বাঁশবনের অন্ধকারে কখনো যান নাই? এ মান অনেক বড়, এর মূল্য অনেক বেশি। এই অর্ব্বাচীন জুনিয়ার মোক্তারটার অদৃষ্টে কিনা শেষে এই সম্মান জুটিল!

শনিবার সুনীলবাবু নিধুকে এজলাসে বলিলেন—লালবিহারীবাবুর নামে চিঠি আর দিলাম না, বুঝলেন? যদি না যাওয়া হয়? আপনি মুখেই বলবেন—

বাড়ী যাইবার পথে নিধু কতবার ভাবিল—তাই যেন হয় হে ভগবান! ওদের যাওয়া যেন না ঘটে!

যদু মোক্তারের বর্ণিত মান খাতির বা মক্কেলের চোখে মূল্যবৃদ্ধি সে চায় না বর্ত্তমানে—শনি-রবিবারগুলি যেন এ ভাবে নষ্ট না হয়—ভগবানের কাছে এই তাহার প্রার্থনা। মক্কেলের মান খাতিরে কি হইবে?

বাড়ী পৌঁছিয়া বিপদের উপর বিপদ—তাহার এক বৃদ্ধ মেসোমশাই আসিয়াছেন, তাঁহার বকুনিরও বিরাম নাই, তামাক খাওয়ারও বিরাম নাই। নিধুকে দেখিয়া তিনি যেন তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিলেন, বাজে বকুনিতে নিধুর কান ঝালাপালা হইয়া উঠিল। নিধুর মাকে দেখাইয়া বলিলেন—চিনু তো কালকের মেয়ে। আমি যখন ওর জ্যাঠতুতো দিদিকে বিয়ে করি, তখন চিনুর বয়স কত—এতটুকু মেয়ে। রাঙা ছোট্ট শাড়ী পরে গুটগুট করে হাঁটত! বস হে নিধুবাবু, তোমরা হলে আমার নাতির বয়সী।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটিল। মেসোমশায় তাহাকে আর ছাড়েন না। তিনি কোন্ কালে চা-বাগানে কাজ করিতেন সেই আমলের সব গল্প। নিধুর মা তাহার পিতার বয়সী ভগ্নীপতির ঘন-ঘন তদারক করিতেছেন—বাড়ীসুদ্ধ সরগরম। আজ কি মঞ্জুও একবার খোঁজ লইল না?

নিধুর মন রীতিমতো দমিয়া গেল।

সন্ধ্যার প্রায় ঘণ্টা দুই পরে নিধু একবার বাড়ীর বাহির হইল। লালবিহারীবাবুর বাড়ীতে যাইবার খুব ভালো অজুহাত তাহার রহিয়াছে। হাকিমবাবুদের আসিবার সংবাদটা দেওয়া। সে চাহিয়া দেখিল উহাদের বৈঠকখানায় তাহার বাবা বসিয়া আছেন- পাড়ার আরও দু-একটি

বৃদ্ধ সেখানে উপস্থিত। দাবা খেলা চলিতেছে।

নিধু ঘরে ঢুকিতেই লালবিহারীবাবু বলিলেন—আরে নিধু যে! এখন এলে? এস-এস—

—আজ্ঞে কাকাবাবু, একটা কথা বলতে এলাম। আমাদের সাবডেপুটি সুনীলবাবু আর মুন্সেফ অমরবাবু কাল আপনার বাড়ী বেড়াতে আসবেন বলে দিয়েচেন—

—ও! সুনীল। সিমলে তাঁতিপাড়ার সুনীল—বুঝেচি! জগৎতারণের ছেলে সুনীল।—তবে অমরবাবুকে তো আমি ঠিক চিনি নে। নাম শুনেচি বটে। ছোকরা মতো—না? হ্যাঁ তাই হবে—আমাদের সার্ভিসের সিনিয়ার লোকদের অনেককেই জানি কিনা! অমরবাবু ছোকরাই হবে—

আজ্ঞে হ্যাঁ, বয়েস বেশি নয়—নতুনও খুব নয়, পাঁচ-ছ বছরের সার্ভিস।

—ওই হল—আমাদের সার্ভিসে ওসব জুনিয়ারের দল। তা তুমি একবার বাড়ীর মধ্যে গিয়ে তোমার কাকীমাকে কথাটা বোলো হে—

নিধু দুরু-দুরু বক্ষে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল। রান্নাঘরের দাওয়ায় ঝি বসিয়া কি করিতেছে, দু-একটা চাকর ঘুরিতেছে—আর কেহ নাই। নিধু ঝিকে বলিল—কাকীমা কোথায়?

—এই তো এখানে ছিলেন—দেখুন বোধ হয় ঘরের মধ্যে কি দোতলায়—

—ও কাকীমা—

দোতলার জানালায় মুখ বাড়াইয়া মঞ্জুই জিজ্ঞাসা করিল—কে?

নিধুর বুকে কিসের ঢেউ হঠাৎ যেন উদ্বেল হইয়া উঠিল—বুক হইতে গলা পর্য্যন্ত যেন অবশ হইয়া গেল। সে দিশাহারা ভাবে উত্তর দিতে গেল—এই যে আমি-- আমি নিধু?

—নিধুদা? বেশ, বেশ লোক যা হোক— দাঁড়ান যাচ্চি—

মঞ্জু জানালা হইতে মুখ সরাইয়া লইল। চক্ষের পলকে সে একেবারে নিচের বারান্দার দোরের কাছে আসিয়া হাসিমুখে বলিল—বা রে, আপনি কেমন লোক বলুন তো নিধুদা? কখন এলেন বাড়ী?

—সন্দের আগে এসেচি তো—

—এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? আমি আপনার জন্যে কতক্ষণ বসে। নিজে চপ করলাম বাবা খেতে চেয়েছিলেন বলে—আপনার জন্যে রেখে বসে-বসে এই আসেন, এই আসেন—ও মা, একেবারে রাত নটার সময় এলেন?

নিধু অভিমানের সুরে বলিল—তা তুমিও তো খোঁজ কর নি মঞ্জু?

—আমি দুবার নৃপেনকে পাঠিয়েচি যে—কেন জ্যাঠাইমা বলেন নি?

—কৈ, না তো?

—বাঃ, সন্ধের আগে বিকেলের দিকে দুবার নৃপেন গিয়েচে—আপনাদের বাড়ী কে এক ভদ্রলোক এসেচেন, তিনি ওকে ডেকে গল্প করলেন—কাছে বসালেন—ও বলছিল

আমায়—তাহলে জ্যাঠাইমা বলতে ভুলে গিয়েচেন। ব্যস্ত আছেন কিনা অতিথি নিয়ে। আসুন বসুন—দালানের মধ্যে বসবেন না রোয়াকে? আজ বড্ড গরম—ভাদ্র মাসের গুমট—

—রোয়াকেই বসি, বেশ হাওয়া আছে—

মঞ্জু যেন খানিকটা আপন মনেই বলিল—দেখুন তো চপগুলো সব জুড়িয়ে জল হয়ে গেল—এখন কি খেতে ভালো লাগে? বিকেলে বেশ গরম ছিল—খেয়ে কিন্তু নিন্দে করতে পারবেন না।

নিধু হাসিয়া বলিল—কেন, নিন্দেই তো করব, খারাপ হলেও ভালো বলতে হবে?

—খারাপ কক্ষনো হয় নি। রান্নায় আমি স্কুলে সার্টিফিকেট পেয়েছি—জানেন তা? তবে জুড়িয়ে গেল—আপনি বসুন, আমি ওগুলো গরম করে নিয়ে আসি—

আধঘণ্টা পরে মঞ্জু, নৃপেন, বীরেন ও নিধু বসিয়া গল্প করিতেছিল। হঠাৎ মঞ্জু বলিল—চলুন ছাদে যাই নিধুদা, বড় গরম এখানে—চল মেজদা—

সবাই মিলিয়া খোলা ছাদে শতরঞ্জি পাতিয়া আসর জমাইল। নানা ভূতের গল্প, শহরের গল্প, বীরেনের মুখে উৎসাহের সহিত বর্ণিত গত সপ্তাহে কলিকাতায় ফুটবল খেলার গল্প ইত্যাদিতে আড্ডা মুখর হইয়া উঠিল। ছাদের উপরে নুইয়া পড়া বাঁশঝাড়ে রাতচরা কোনো পাখির ডানা-ঝটাপটি। পরিষ্কার শরতের আকাশে সুস্পষ্ট জলজলে নক্ষত্ররাজি ও টের্চা ছায়াপথ।

নিধু যেন নূতন মানুষ হইয়া গিয়াছে। জীবনে যেন সে এই প্রথম আনন্দ কাহাকে বলে জানিয়াছে। এরা কত ভালো-ভালো জায়গার গল্প বলিতেছে, কখনো নিধু সে সব দেশে যায়ও নাই—কলিকাতায় গেলেও সেখানকার শিক্ষিত বড়লোকদের সঙ্গে এদের মতো মেশেও নাই—জজ-মুন্সেফের বাড়ীতে শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এত রাত্রি পর্য্যন্ত বসিয়া গল্পগুজব করিবে—আর বছর এমন সময় সে-ই কি সে কথা ভাবিতে পারিত?

হঠাৎ তাহার মনে পড়িল—যেজন্য সে বাড়ীর ভিতর আসিয়াছিল—সুনীলবাবু ও মুন্সেফ্ বাবুর আসার কথা বলিতে—সেকথা এখনো বলা হয় নাই। মঞ্জুকে দেখিয়া সে সব ভুলিয়া গিয়াছে। কথাটা সে এ আসরেই বলিল। বীরেন বলিল—ও! সুনীলবাবু এখানে এসেচেন নাকি সাবডেপুটি হয়ে? তা তো জানিনে।

—তাঁর সঙ্গে আলাপ আছে বুঝি?

—খুব। শিমলেতে আমাদের মামার বাড়ীর পাশের বাড়ীতেই—

মঞ্জু বলিল—ওঁর বোন তাহু আমার সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ত—গত বছর বিয়ে হয়ে গেল। খুব জাঁকের বিয়ে। সুনীলবাবুর বাবা বেশ বড়লোক—তিনিও রিটায়ার্ড সাবজজ—

—কাল এলে কখন আসবেন?

—বোধহয় সকালের দিকেই—কাকীমাকে বোলো বীরেন। আমি বলতে ভুলেই গিয়েচি—

রাত্রে নিধুর মা জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁরে কাল বলব নাকি খেতে মঞ্জুদের? বীরেনও যে এসেচে—তাকেও বলতে হয়।

—কিন্তু মা, কাল একটু গোলমাল আছে। সাবডেপুটি আর মুন্সেফবাবু আসবেন বেড়াতে ওদের বাড়ী। কাল দরকার নেই—সেই সব নিয়ে ওরা কাল ব্যস্ত থাকবে।

সকালে উঠিয়া নিধু রামনগরের পাকা রাস্তার উপর পায়চারি করিল বেলা আটটা পর্য্যন্ত। তখনো পর্য্যন্ত কাহাকেও আসিতে দেখা গেল না। না আসিলেই ভালো। দিনটা একেবারে মাটি হইয়া যাইবে উহারা আসিলে। এত বেলা যখন হইয়া গেল—হয়তো আর আসিবে না। সাড়ে-আটটা পর্য্যন্ত রাস্তার উপর অপেক্ষা করিয়া নিধু বাড়ী ফিরিতেছে, পথে নৃপেনের সঙ্গে দেখা। সে বলিল—বা রে, কোথায় গিয়েছিলেন বেড়াতে? আপনার বাড়ী বসে-বসে—

—কেন?

—দিদি সেই সাড়ে-সাতটার সময় আপনাকে ডাকতে পাঠিয়েচে—জলখাবার খাবেন বলে খাবার সাজিয়ে বসে আছে—

—আচ্ছা, তুমি যাও নৃপেন। আমি নেয়ে নিই পুকুরে—তারপর যাচ্ছি—স্নান সারিয়া ফিটফাট হইয়া মঞ্জুদের বাড়ী যাইতে নটা বাজিয়া গেল।

বাড়ীর ভিতর পা না দিতেই মঞ্জু রান্নাঘরের দাওয়া হইতে বলিল—আজকাল আপনার হয়েচে কি? লুচি জুড়িয়ে জল হয়ে গেল। কখন ডাকতে পাঠিয়েচি নৃপেনকে—বেশ লোক যা হোক!

মঞ্জুর মা বসিয়া নিজের হাতেই ওল কুটিতেছেন, তিনিও বলিলেন—এস বাবা। মঞ্জু এখনো খায় নি, বলে—অতিথিকে না খাইয়ে আগে খেতে নেই। আমি বললাম, ও তো ঘরের ছেলে, ও আবার অতিথি কোথায় মা, তুই খেয়ে নে। মেয়ের সবই বাড়াবাড়ি।

নিধু অপ্রতিভ হইল। সঙ্গে-সঙ্গে এক অপূর্ব্ব উত্তেজনা ও আনন্দে তাহার সারা শরীর যেন ঝিমঝিম করিয়া উঠিল। মঞ্জু না খাইয়া আছে সে খায় নাই বলিয়া—কেন? কই, কোনো মেয়ে তো এ পর্য্যন্ত তাহার না খাওয়ার জন্ত নিজেকে অভুক্ত রাখে নাই! অন্তত কোনো শিক্ষিতা তরুণী বড়লোকের মেয়ে তো নয়ই। নিজের সৌভাগ্যকে সে যেন বিশ্বাস করিতে পারে না। মঞ্জু তাহাকে ভিতরের ঘরের বারান্দায় খাইতে দিয়া কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। বলিল—আজ যে সেই প্লে সিলেক্ট করার দিন—তাও আপনি ভুলে বসে আছেন নিধুদা?

—কেন ভুলব? তবে আজ অরুণবাবুর আসার কথা ছিল না?

—বড়দা বেলা বারোটার কম কি পৌঁছবেন এখানে? যদি আসেন তো ওবেলা সবাই মিলে বসে—

—আচ্ছা, মঞ্জু একটা কথা বলব?

—কি?

তুমি না খেয়ে রইলে কেন এত বেলা পর্য্যন্ত ? অন্যায় নয় তোমার ? কাকীমা কি ভাবলেন ?

—মা আবার কি ভাববেন—বা রে !

নিধুর একটু দুষ্টুমি বুদ্ধি আসিয়া জুটিল—কেউ কোনো দিকে নাই দেখিয়া সে সুর নামাইয়া বলিল—ভাবচেন কি শুনবে ? ভাবচেন মঞ্জুর সঙ্গে নিধুর খুব ভাবসাব হয়েচে কিনা, তাই ও না খেলে মেয়েও খায় না—

মঞ্জু চোখ পাকাইয়া বলিল—ভদ্রলোকের বাড়ীতে বসে ভদ্রলোকের মেয়েদের সম্বন্ধে এ সব কি কথাবার্ত্তা হচ্চে ?

নিধু হাসিমুখে বলিল—বেশ করচি যাও। কাকীমা ভাবতে পারেন কিনা বল ?

—পাড়াগাঁয়ের ভূত কি আর সাধে বলে ?

—আর তোমার পৈতৃক ভিটেও তো এই পাড়াগাঁয়েই—বিলেত থেকে তো আস নি ?

—না এসেচি তো না এসেচি—যান্—কি হবে তার ?

—পাড়াগাঁয়ের ভূত বলে তাহলে আমায় গালাগাল দেওয়াটা কি ভালো তবে ?

এমন সময় হঠাৎ বীরেন ও নৃপেন এক সঙ্গে ব্যস্তসমস্ত ভাবে ঘরে ঢুকিয়া বলিল—ও নিধুদা, ও দিদি—ওঁরা সব এসেচেন—মুন্সেফ অমরবাবু আর সাবডেপুটি—বাইরের ঘরে বাবার সঙ্গে—আসুন শিগগির—

—আমার কথা ওঁরা জিগগেস করলেন নাকি ?

—না তা কিছু বলেন নি, তবে বলছিলেন আপনাকে দিয়ে খবর দেওয়া ছিল—

মঞ্জু বলিল—অত তাড়াতাড়ি গোগ্রাসে গিলতে হবে না। এমন তো লাটসাহেব কেউ আসে নি—ও লুচি দুখানা খেয়ে নিয়েই—একটু পরেই না হয়—আপনাকে তো তাঁরা ডেকে পাঠান নি—

কিন্তু নিধুর পক্ষে ধীরে সুস্থে বসিয়া-বসিয়া লুচি খাওয়া আর সম্ভব নয়। যাঁহারা আসিয়াছেন—তাঁহারা তাহার পক্ষে লাটসাহেবই বটে। এ অবস্থায় আর থাকা চলে না।

নিধু একপ্রকার ছুটিতে-ছুটিতে বাহিরে আসিল।

বৈঠকখানায় অনেক লোক। লালবিহারীবাবু, নিধুর বাবা, সাবডেপুটি ও মুন্সেফবাবু, উপেন হালদার ও স্থানীয় স্কুলের পণ্ডিত উমাপদ ভট্টাচার্য্য সকলে মিলিয়া বসিয়া পল্লীগ্রামের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কথা আলোচনা করিতেছেন।

সুনীলবাবু নিধুকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—আরে এই যে নিধিরামবাবু। মশাই, রাস্তা বড় ভয়ানক, জায়গায়-জায়গায় এমন কাদা যে সাইকেল চলে না—কাঁধে তুলে আনতে হয়েচে—বসুন।

মুন্সেফবাবু বলিলেন—আপনাদের বাড়ীটা কোন দিকে ? আমরা সেখানেও যাব—

নিধুর বাবা রামতারণ বিনয়ে ভাঙিয়া পড়িয়া বলিলেন—যাবেন বই কি! গরীবের কুঁড়েতে আপনাদের মতো মহৎ লোকের পায়ের ধুলো পড়বে এ আমরা আশা করতে পারিনে—লালবিহারী ভায়া আমাদের গ্রামের চূড়ো—উনি আজ এসেচেন বলেই আপনাদের মতো লোকের—

সকলে মিলিয়া গ্রাম দেখিতে বাহির হইল। গ্রামে দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে একটা ভাঙা শিবমন্দির ছাড়া অন্য কিছুই নাই। উমাপদ পণ্ডিত সেটির মধ্যে নিজে ঢুকিয়া সকলকে ভিতরে আসিতে বলিলেন। সাপের ভয়ে কেহই ভিতরে গেল না—কবাটহীন দরজার কাছে দাঁড়াইয়া উঁকি মারিয়া দেখিল।

নিধুর বাড়ীর বাহিরের ঘরেও সকলে একবার আসিয়া বসিলেন। নিধু চা ও খাবারের ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতেই করিয়া রাখিয়াছিল—সকলকে রেকাবি করিয়া খাবার দেওয়া হইল—সুনীলবাবু ও মুন্সেফবাবু ছাড়া আর কেহ খাইতে চাহিলেন না। কারণ বাকি সকলে বৃদ্ধ—উঁহারা সন্ধ্যাহ্নিক না করিয়া খাইবেন না। সকলে মিলিয়া আবার মঞ্জুদের বাড়ী ফিরিল। সুনীলবাবুকে মঞ্জুর মা বাড়ীর ভিতরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বীরেন তাঁহাকে লইয়া গেল। নিধু সঙ্গেই দাঁড়াইয়া ছিল—কিন্তু তাহাকে বীরেন যেন দেখিতেই পাইল না আজ।

নিধু বাড়ী ফিরিয়া আসিতেই তাহার মা বলিলেন—হ্যাঁরে, মোহনভোগ খারাপ হয় নি তো?

—কেন খারাপ হবে? বেশ হয়েছিল—

—ওঁরা খেয়েছিলেন তো? হাকিমবাবুরা?

—সবটা খেয়েছিল। ভালো হলে খাবে না কেন?

—হ্যাঁ রে তুই এখানে খাবি, না জজবাবুদের বাড়ী খেতে বলেচে?

এ ধরনের সোজা প্রশ্নের উত্তরে নিধু প্রথমটা কি বলিবে ঠিক করিতে পারিল না। পরে বলিল—না—বাড়ীতেই খাব। ওরা খেতে বলেছিল, কিন্তু আমার লজ্জা করে মা রোজ-রোজ ওদের বাড়ী—

নিধুর মা ক্ষুণ্ণস্বরে বলিলেন—তা আজকের দিনটা কেন খেলি নে—ভালোটা-মন্দটা হত—বড়-বড় বাবুরা এসেছে বাড়ীতে—

—তা হোক মা—কি রবিবারেই তো ওখানে খাচ্চি। তোমার হাতের রান্না খাওয়া বরং হয়েই ওঠে না আজকাল।

নিধুর মা মনে-মনে খুশি হইলেন। ছেলের মতো ছেলে নিধু। এখন বাঁচিয়া থাকিলে হয়। আজ তাহার দৌলতেই তো তাঁহাদের খড়ের ঘরে হাকিম-হুকুমের পায়ের ধুলা পড়িল! বংশের মুখ উজ্জ্বল-করা ছেলে বটে।

দুপুরের পরেই তিনি পুকুরের ঘাটে বাসন মাজিতে গিয়া বুঝিলেন কথাটা সারা গ্রামে রাষ্ট্র হইয়াছে।

তিনুর মা বুড়ো রায়গিন্নি বলিলেন—হ্যাঁরে ও নতুন বৌ, তোদের বাড়ী নাকি রামনগর

থেকে ডিপ্‌টিবাবু আর মন্‌সববাবু এসেছিল ?

—হ্যাঁ দিদি—কার মুখে শুনলে ?

—ওমা এই দক্ষ পিসি বললে—জগোঠাকরুণ তাকে বলেছে। সকলেই তো বলচে। তা বেশ, ভালো-ভালো।

—জজবাবুদের বাড়ী এসেছিলেন। তা নিধুকে খুব ভালোবাসেন কিনা তাই এখানেও এলেন। বড় ভালো লোক—

ইতিমধ্যে আরও দু-তিনটি পাড়ার ঝি-বৌ পুকুরের ঘাটে বাসন হাতে আসিলেন। সকলের মুখেই ওই এক প্রশ্ন। হাকিমদের বয়স কত ? নিধুর মা কি খাইতে দিল তাহাদের ?

বুড়ো রায়গিন্নি বলিলেন—তা বেঁচে থাক নিধু। ওকে সবাই ভালোবাসে—অমন ছেলে গাঁয়ে নেই—

—তাই এখন বল দিদি—তোমাদের আশীর্ব্বাদে, তোমাদের মা-বাপের আশীর্ব্বাদে নিধু এখন—

নিধুকে কিন্তু সারাদিনের মধ্যে ও-বাড়ী হইতে কেহই ডাকিতে আসিল না। বৈকালের দিকে সে নিজেই একবার মজুদের বৈঠকখানায় গিয়া খোঁজ লইয়া জানিল সুনীলবাবু ও মুন্সেফবাবু বাড়ীর মধ্যে জলযোগ করিতেছেন—এখনি রামনগরে ফিরিবেন। লালবিহারীবাবুকেও বাহিরে দেখা গেল না—সম্ভবত অন্তঃপুরে অতিথিদের আদর-আপ্যায়নে নিযুক্ত আছেন।

কিছু ভালো লাগিল না। পৃথিবীটা হঠাৎ যেন ফাঁকা হইয়া গিয়াছে।

রামনগরের পাকা রাস্তার উপরে খানিকটা উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে পায়চারি করিতে-করিতে সে একটা সাঁকোর উপরে আসিয়া বসিল। হঠাৎ সে দেখিল দূরে দুখানা সাইকেলে সুনীলবাবু ও মুন্সেফবাবু আসিতেছেন।

তাঁহারাও তাহাকে দেখিয়াছেন মনে করিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল—নতুবা হয়তো গাছের আড়ালে লুকাইয়া পড়িত।

সুনীলবাবু কাছে আসিয়া বলিলেন—নিধিরামবাবু বেড়াতে বেরিয়েছেন বুঝি ? খুঁজলাম আপনাকে আসবার সময়, পেলাম না। আপনি কাল সকালে যাবেন ?

দুজনেই সাইকেল হইতে নামিয়াছিলেন। নিধু কিছুদূর পর্য্যন্ত তাঁহাদের সঙ্গে হাঁটিয়া আগাইয়া দিয়া আসিল।

সন্ধ্যার পরে সে বাড়ী ফিরিল। নিধুর মা বলিলেন—বিকেলবেলা কিছু খেলিনে—জজবাবুদের বাড়ী খাবার খেয়েছিস বুঝি ?

—হ্যাঁ।

—সে আমি তখনই বুঝেচি—তোকে না খাইয়ে কি ওরা ছাড়ে কখনো ? হাকিমবাবুরা চলে গেল বুঝি ?

—গেল।

এমন সময় একটা লণ্ঠনের আলো তাহাদের উঠানে পড়িল—এবং আলোর পিছনে লণ্ঠন ধরিয়া যে দুজন মেটে পাঁচিলের ছোট্ট দরজা দিয়া বাড়ীর ভিতরে ঢুকিল—তাহাদের দেখিয়া নিধু বিস্ময়ে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মঞ্জু আগাইয়া আসিয়া বলিল—ও জ্যাঠাইমা, কি করচেন? নিধুদা কোথায়? ওমা এই যে নিধুদা!

হতভম্ব নিধু কিছু জবাব দিবার পূর্ব্বেই মঞ্জু বলিল—বড়দা এসেছেন, আপনাকে খুঁজচেন কখন থেকে। জ্যাঠাইমা, নিধুদা আজ রাত্রে ওখানে খাবে কিন্তু—চলুন নিধুদা—আসুন—বলিয়া নিধুকে বিশেষ কিছু বলিবার সুযোগ না দিয়াই মঞ্জু ও নৃপেন তাহাকে লইয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। নৃপেন আগে, মঞ্জু ও নিধু পিছনে। পথে মঞ্জু বলিল—কি হয়েচে আপনার? সারাদিন দেখি নি কেন? ছিলেন কোথায়?

—বাড়িতেই ছিলাম—যাব আবার কোথায়?

—আমাদের ওখানে যাননি যে বড়?

—সব সময়েই যে যেতে হবে তার মানে কি?

মঞ্জু নিধুর উত্তর শুনিয়া অবাক হইয়া তাহার দিকে অল্পক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল—কি হয়েচে আপনার?

—কিছুই না। আমরা গরীব মানুষ আমাদের আবার হবে কি?

—কেন, রাগ হল কেন হঠাৎ শুনি? কি হয়েচে?

—কিছুই না। কি আবার হবে?

—রাগ হয়েচে তা বুঝতে আমার বাকি নেই। কিন্তু আমি কি করব নিধুদা, বাড়ীতে আজ সবাই ওদের নিয়ে ব্যস্ত। আমি ওদের সামনে কবার বেরিয়েচি? ডাকবার সুবিধে থাকলে ডাকতাম।

নিধুর রাগ নিবিয়া জল হইয়া গেল। বেচারী মঞ্জু! সে কি করিবে?

বাড়ী ঢুকিয়া মঞ্জু মাকে ডাকিয়া বলিল—নিধুদা রাত্রে আমাদের এখানে খাবে বলে এসেছি মা—আজ সারাদিন আমাদের বাড়ীতে আসে নি মা—এখন গিয়ে ধরে আনলাম—আসুন বড়দার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিই—

পাশের ঘরে মঞ্জুর বড়দা অরুণের সঙ্গে আলাপ হইল। অরুণকে নিধুর তেমন ভালো লাগিল না। কথার মধ্যে বেশির ভাগ বাঁকা সুরে ইংরাজি বলে, ঘনঘন সিগারেট খায়—একটু নাক সিঁটকানো গর্ব্বের ভাব কথা-বার্ত্তার মধ্যে। অরুণের প্রতি কথায় পাড়াগাঁয়ের সব কিছুর উপর একটা ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের ভাব বেশ সুস্পষ্ট।

—উঃ, কাল কি সোজা কষ্ট গিয়েচে এখানে পৌঁছতে! বাবারও যেমন কাণ্ড। বলেছিলুম দেশে পুজো করে কি হবে? ছুটি নিয়ে এই অজ পাড়াগাঁয়ে বসে আছেন—তারপর যখন ম্যালেরিয়াতে ধরবে তখন বুঝবেন! বাপ্‌বাঃ—এই জঙ্গলে মানুষ থাকে?

—তা বটে। আমরা উপায় নেই বলে পড়ে আছি—

—আপনি বুঝি রামনগরে প্র্যাকটিস্ করেন? ফিল্ড কি রকম?

—আগে ভালোই ছিল। এখন দেশে নেই পয়সা—আপনিও 'ভো ল' পড়চেন শুনলাম—

—আমি যদি বসি, আলিপুরে বেরুব। এ সব জায়গায় লাইফটা নষ্ট করে কোনো লাভ নেই। পয়সা পেলেও না—

—না, আপনাদের মতো লোক কেন এখানে থাকতে যাবেন?

আর আধঘণ্টা পরে মঞ্জুকে সে কিছুক্ষণের জন্য একা পাইল।

মঞ্জু বলিল—বড়দার সঙ্গে আলাপ হল? বেশ লোক বড়দা। কাল সকালে যাবেন নাকি আপনি?

—যাব না তো কি? এখানে থাকলে তো চলবে না—

—এখনো আপনার রাগ যায়নি নিধুদা—

—আমরা গরীব মানুষ, আমাদের আবার রাগ—

—ও রকম বলবেন না নিধুদা—আমার মনে কষ্ট হয় না ওতে?

—হলে কি সারাদিন না ডেকে থাকতে পারতে?

—কিছু লাভ ছিল না ডেকে। সামনে বেরুতে পারতাম না তো?

—কেন?

—ওঁরা সব সময় ঘরের মধ্যে। অমরবাবুর সামনে আমি বেরুই নি—ওঁর সঙ্গে আলাপ নেই আমার।

—আমি ভাবলুম আমাকে ওদের সামনে কি করে বার করবে ভেবে আর ডাকলে না—

—দুষ্টু বুদ্ধি আপনার হাড়ে-হাড়ে। কুটিল মন কিনা।

—সে তো জানোই—পাড়াগাঁয়ের মানুষের মন কখনো সরল হয়?

—হয়ই না তো। সেটা মিথ্যে কথা নাকি?

—তার প্রমাণ পেয়েই গেলে। হাতে-হাতেই পেলে—

—এমন আড়ি দেব আপনার সঙ্গে যে আর কখনো কথা বলব না—

—না তা করো না লক্ষ্মীটি—তাহলে থাকতে পারব না—

—তবে! তবে ও রকম করেন কেন? এখন বলুন, আর ওসব কথা বলবেন না?

—কক্ষনো না।

—পুজোর সময় প্লে করার কি হবে?

—ঠিক করে ফেল—অরুণবাবু তো আছেন—

—বড়দা বলছিলেন রবি ঠাকুরের 'ফাল্গুনী' প্লে করতে—কলকাতায় সম্প্রতি হয়েচে—উনি দেখে এসেচেন—

—উনি যা বলেন। বইখানা আনতে বোলো—

—আপনি কি বলেন?

—আমি ওসবের কি জানি ? আমরা জানি যাত্রার প্লে—রামনগরের উকীল-মোক্তারদের একটা থিয়েটার আছে—তারা পুজোর সময় গিরিশ ঘোষের 'জনা' করবে। আমাকে পার্ট নিতে বলেচে—

—কি পার্ট নেবেন ?

—তা এখনো ঠিক হয়নি—

—ভালো পার্ট করতে পারেন ?

—কখনো করি নি, কি করে বলি ? তবে চেষ্টা করলে মন্দ হবে না—

—আমার মনে হয় খুব ভালোই হবে।

—তুমি পার্ট করবে তো ?

—আমি তো স্কুলে পার্ট করে এসেছি ফি বছর। আমার অভ্যেস আছে। গান যাতে আছে এমন পার্ট আমায় দিত।

—এখানেও তাই নিতে হবে আমায়, গান তুমি ছাড়া কে গাইবে ?

—আচ্ছা, একটা কথা। পাড়াগাঁয়ে কেউ কিছু বলবে না তো ?

—তোমরা করলে কেউ বলবে না। কাকাবাবুর নামে সবাই তটস্থ, অন্য কেউ হলে রক্ষে রাখত না—

—সে আমি জানি। আচ্ছা, গাঁয়ের আর কোনো মেয়ে পার্ট নিতে পারে ?

—আমার তো মনে হয় না—তবে ভুবন গাঙ্গুলির এক মেয়ে এসেচে বাপের বাড়ী। বিয়ে হয়েচে, জামাই রেলের আফিসে ভালো চাকরি করে—তুমি ডাকিয়ে জিগগেস কোরো—ও বিয়ের আগে গোয়াড়ী গার্লস্ স্কুলে পড়ত মামারবাড়ী থেকে—সেখানে পার্ট করত—

—কি নাম ? আমি তো জানিনে—কালই আলাপ করব—

—নাম হৈমবতী। এখন শুনচি নাম হয়েচে হেমপ্রভা—ও চিরকাল মামারবাড়ীতে মানুষ, এখানে বড় একটা আসত না। তা ছাড়া ওর বাবাও নাকি এখানে থাকত না। যাক—সে কথা বাদ দাও মঞ্জু। ডেকে নিয়ে আসতে পার তো এস—

—তারপর সেই কাগজ বার করার কথা মনে আছে তো ?

—সে তো পুজোর পর ?

—না, পুজোর সময় প্রথম সংখ্যা বার করব।

—যা তোমার ইচ্ছা। তুমি যা বলবে আমি তাই করব।

—মনের কথা বলচেন নিধুদা ?

—মনের কথা নিশ্চয়ই। বিশ্বাস কর মঞ্জু।

রাত্রে আহারাদির পরে নিধু চলিয়া আসিল।

আসিবার সময় মঞ্জু দরজায় দাঁড়াইয়া বলিল—সামনের শনিবারে আসবেন তো ?

—কেন আসব না ?

—না এলে আপনার সঙ্গে আড়ি দেব—

—দেখ আসি কিনা।

সারা সপ্তাহ ধরিয়া নিধু একটি পয়সা রোজগার করিতে পারিল না। মক্কেলের যেন দুর্ভিক্ষ লাগিয়া গিয়াছে—সকাল হইতে তীর্থের কাকের মতন বাসায় বসিয়া ঘন-ঘন হাই তুলিয়া ও বাহিরের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকিয়া নিধুর মোক্তারী ব্যবসাটার উপরই অশ্রদ্ধা ধরিয়া গেল। নিধুর মুহুরী বলে—বাবু, এ হপ্তাটায় হল কি? মক্কেলের যেন আকাল পড়েচে দেখচি—

—চল, কোর্টে আসতে পারে।

কিন্তু কোর্টেও কেহ আসে না। যদু-মোক্তার একদিন বলিলেন—ওহে সুনীলবাবুর কোর্টে তো তোমার খাতির আছে—এই জামিনের জন্যে মুভ্ করে জামিনটা করিয়ে দাও না?

নিধু কেস শুনিয়া বুঝিল এ ক্ষেত্রে জামিন হওয়া অসম্ভব। বাড়ীতে চোরাই মাল পাওয়া গিয়াছে—পুলিশ যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছে—তাহার গতিকও খুব খারাপ। যদু-মোক্তার নিজের নাম খারাপ করিতে রাজী নন, তিনি খুব ভালোই জানেন কোর্ট জামিন দিতে রাজী হইবে না। খাতিরে পড়িয়া যদি সুনীলবাবু জামিন মঞ্জুর করেন—ইহাই যদুবাবুর ভরসা।

সে বলিল—কাকাবাবু, এ আমার দ্বারা সুবিধে হবে না—

—কেন হবে না? যাও না একবার—

—মাপ করুন কাকাবাবু, সুনীলবাবু কি মনে করবেন?

—চেষ্টা করতে দোষ কি? যাও একবার—

যদুবাবুর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া নিধু গিয়া জামিনের দরখাস্ত দিয়া জামিনের প্রার্থনা করিল।

সুনীলবাবু জামিন মঞ্জুর করিলেন।

মক্কেল নিধুকে দুইটি টাকা দিল। নিধু সে দুটি টাকা লইয়া গিয়া যদুবাবুর হাতে দিতে তিনি কোনো কথা না বলিয়া তাহা পকেটস্থ করিলেন—কারণ মক্কেল আসলে তাঁহার। অবশ্য জামিননামার টাকাটা নিধু পাইল।

বাসায় আসিয়া সে দেখিল সাধন-মোক্তার তাহার জন্যে রোয়াকে বসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। তাহাকে দেখিয়া সাধন বলিলেন—তোমার জন্যে বসে আছি হে নিধিরাম—

—আজ্ঞে, বসুন-বসুন। বড় কষ্ট হয়েছে?

—কিছু কষ্ট নয়। তুমি জামা কাপড় ছেড়ে সুস্থ হও—আমি একটা বিশেষ দরকারে এসেচি। ওবেলা তোমার কেসটা বেশ ভালো হয়েচে—কিন্তু যদু-দা নাকি তোমায় টাকা দেননি?

—কে বলল আপনাকে?

—আমি সব জানি হে—আমার কাছে কি লুকোনো থাকে কিছু? তাই কিনা?

—আজ্ঞে না, তা নয়। তবে ওঁরই মক্কেল—

—কিসে ওঁর মক্কেল? তুমি জামিনের দরখাস্ত দিয়ে জামিন মুভ্ করে জিতলে—তবে ওঁর মক্কেল হল কি করে? মক্কেলের গায়ে লেখা আছে নাকি কার মক্কেল?

—আজ্ঞে ওঁর কাছেই প্রথম তারা গিয়েছিল, আমার কাছে তো আসে নি? ভাই—

—তবেই ওঁর মক্কেল হয়ে গেল? অত সূক্ষ্ম ওজন-জ্ঞান করে মোক্তারী ব্যবসা চলে না ভায়া। হরি আমায় বলছিল, যদুদার আক্কেলটা দেখলে? ছোকরা জামিন মঞ্জুর করিয়ে দিলে—আর যদুদা দিব্যি টাকাটা গাপ করে ফেললে বেমালুম। ঘোর কলি! আমার পরামর্শ শোনো আমি বলি—

—আজ্ঞে কি?

—সুনীলবাবুর কোর্টে তোমার খাতির হয়ে গিয়েচে সবাই জানে। ইতিমধ্যে প্রচার হয়ে গিয়েচে। তুমি এখন যদুদার হাত থেকে কেস পেলেও ফি-এর টাকা তাঁকে দিও না। যদুদা চিরকাল ওই করে এলেন—যার সঙ্গে যার খাতির, তাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়ে নাম কেনেন নিজে।

নিধিরাম দেখিল সাধন-মোক্তারের কথায় সামান্য মাত্র সায় দিলেও আর রক্ষা নাই—ইনি গিয়া এ কথা অন্য কোথাও গল্প করিবেন। সে ব্যক্তি যদুবাবুর কানে কথা উঠাইলে তাহার উপর যদুবাবু চটিয়া যাইবেন। তাহার ব্যবসার প্রথম দিকে তাঁহার মতো প্রধান মোক্তারের সাহায্য ও উপদেশ হইতে বঞ্চিত হইলে নিজের সমূহ ক্ষতি। সে একটু বেশ জোরের সঙ্গেই বলিল—না সাধনবাবু—আমি তা মনে করি না। যদুবাবু খুব বিচক্ষণ মোক্তার—সত্যিকার কাজের লোক। আমার তিনি পিতৃবন্ধু—আমায় ছেলের মতো দেখেন।

সাধন বিদ্রূপের সুরে বলিলেন—ছেলের মতন দেখেন—তা তো বেশ বোঝাই গেল। মুখে ছেলের মতন দেখি বললেই তো হয় না—সে রকম দেখাতে হয়—দুটো টাকার লোভ ছাড়তে পারলেন না—ছেলের মতো দেখেন!

—যাক ও নিয়ে আর—

—তুমি আমার দুটো মক্কেলের কেস কাল নাও না? আমার প্রাপ্য টাকার অর্দ্ধেক তোমায় দেব। করবে?

—কেন করব না বলুন! দেবেন আপনি—

নিধু একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেল যে সাধন এবার তাহাকে বিবাহ সংক্রান্ত কোনো কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন না।

হঠাৎ সাধন বলিলেন—হ্যাঁ হে, সেদিন ওঁরা বুঝি তোমার বাড়ীতে—

—আমার বাড়ী কোথায়? লালবিহারীবাবু মুন্সেফ আছেন আমার প্রতিবেশী—তাঁর বাড়ীতে গিয়েছিলেন।

—তুমি বাড়ী নিয়ে গিয়ে খাতির করেছিলে তো?

—হ্যাঁ তা অবিশ্যি সামান্য—আমার আর কি ক্ষমতা—

—বেশ! বেশ! সেই কথাই বলচি—ভালো কথাই তো। তোমার সঙ্গে সুনীলবাবুর

বেশ আলাপ হয়ে গিয়েচে, একথা শুনে অনেকেরই খুব হিংসে তোমার ওপর জানো তো?

নিধু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—সে কি! এর জন্যে কিসের হিংসে?

—তুমি কেন হাকিমদের সঙ্গে আলাপ করবে, বাড়ী নিয়ে যাবে—যখন বারে এত প্রবীণ মোক্তার রয়েচে—কই আর কারো বাড়ী তো হাকিম যায় নি?

—এসব নিয়ে কথাবার্ত্তা হয় নাকি?

—তুমি শুনলে অবাক হয়ে যাবে বারের প্রবীণ মোক্তারেরা পর্য্যন্ত এই নিয়ে বলাবলি করচে। সবারই হিংসে।

—করুক গিয়ে। ভালোই তো, আমার একটু পসার হবে হয়তো ওতে।

—না ভায়া—মক্কেল ভাঙিয়ে নিতেও পারে। হিংসে করে যদি তোমার পেছনে সবাই লাগে—তবে তোমার মক্কেল পাওয়া মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে। আমি তোমার হিতৈষী বলেই তোমায় বলে গেলাম।

সাধন কি মতলবে আসিয়াছিল নিধু বুঝিতে পারিল না। কিন্তু তাহার মনে হইল সাধনের কথার মূলে হয়তো সত্য আছে। বার-লাইব্রেরী সুদ্ধ সব মোক্তার তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইল নাকি? নতুবা সারা সপ্তাহে সে একটি পয়সা পাইল না কেন?

শনিবার দিন সকালে বাড়ীওয়ালার লোক ও গোয়ালা আসিয়া তাগাদা দিল। নিধু তাহাদের বুঝাইয়া দিল এ চাকুরি নয় যে মাসকাবারে মাহিনা হাতে আসে—টাকা দিতে দু-চার দিন বিলম্ব হইবে। কিন্তু বাড়ীওয়ালার লোক যেন তাড়াইল—বাড়ীতে আজ যাইবার সময় জিনিসপত্র সওদা করিয়া লইয়া যাইতে হইবে—হাতে এদিকে একটি পয়সা নাই। তাহার আয়ের উপরই আজকাল সংসার চলে—খরচ দিয়া না আসিলে পরবর্ত্তী সপ্তাহে সংসার অচল।

নিধুর মুহুরী এই সময় আসিয়া বলিল—বাবু আজ বাড়ী যাবেন?

—তাই ভাবচি। কি নিয়ে যাই, একটা পয়সা তো নেই হাতে—

—মোক্তারী ব্যবসার এই মজা। মাঝে-মাঝে এমন হবেই বাবু। মক্কেল কি সব সময়ে জোটে। যদুবাবুর কাছে একবার যান না?

—কোথাও যাব না। ওতে আরো ছোট হয়ে যেতে হয়। না হয় আজ বাড়ী যাব না, সেও ভালো।

শুধু সে শনিবার নয়, পরের শনিবারেও নিধুর বাড়ী যাওয়া হইল না। মক্কেলের দেখা নাই আদৌ, মুদী ধারে জিনিসপত্র দেয়, তাই বাসা খরচ একরূপ চলিল, কিন্তু অন্যান্য পাওনাদারের তাগাদায় নিধু অস্থির হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে সে বাড়ী হইতে বাবার চিঠি পাইল—শনিবার বাড়ী কেন আসে নাই—সংসারে খুব কষ্ট যাইতেছে—বাড়ী সুদ্ধ লোককে অনাহারে থাকিতে হইবে যদি সে সামনের শনিবারে না আসে—আসিবার সময় যেন তেল আনে তেল আনে—জিনিসপত্রের একটা লম্বা ফর্দ্দ পত্রের শেষে জুড়িয়া দেওয়া আছে। চিঠিখানা ছাড়া হইয়াছে শুক্রবার—রবিবার সকালে সে চিঠি পাইল। সে সম্পূর্ণ নিরুপায়—হাতে পয়সা না আসিলে বাড়ী গিয়া লাভ কি?

সোমবার সে কি কাজে একবার স্থনীলবাবুর কোর্টে গিয়াছিল, তাহাকে দেখিয়া স্থনীলবাবু বলিলেন—নিধিরামবাবু, আপনি এ শনিবারে বাড়ী যান নি তো।

—না, একটু অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম।

—আমি গিয়ে আপনাকে কত খুঁজলাম, তা সবাই বললে আপনি যান নি।

—ও! আপনি গিয়েছিলেন বুঝি?

—হ্যাঁ—আমি গিয়েছিলাম মানে যাবার জন্যে বিশেষ করে পত্র দিয়েছিলেন পিসিমা—মানে লালবিহারীবাবুর স্ত্রী—আমাদের এক পাড়ার মেয়ে কিনা।

—ও! আপনি একা গিয়েছিলেন?

—এবার একাই। সেই জন্যেই তো বিশেষ করে আপনার খোঁজ করলাম। কার সঙ্গে বসে দুদণ্ড কথা বলি। লালবিহারীবাবু প্রবীণ লোক—তাঁর সঙ্গে কতক্ষণ গল্প বলা যাবে—আপনি যে যাবেন না—আমার সে কথা মনেই হয় নি। আপনিও তো গত সপ্তাহে আমার কোর্টে একদিনও আসেন নি কিনা।

নিধু মনে-মনে ভাবিল—কেস থাকিলে তো কোর্টে আসিবে। মক্কেল নামক জীব হঠাৎ পৃথিবীতে যে কত দুর্লভ-দর্শন হইয়া উঠিয়াছে—তাহার খবর হাকিমের চেয়ারে বসিয়া কি করিয়া রাখিবেন আপনি?

মুখে বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ—আমি যদি জানতাম আপনি যাচ্ছেন, তাহলে নিশ্চয়ই যেতাম। তা তো জানি না—

সন্ধ্যার সময় স্থনীলবাবুর আরদালি আসিয়া নিধুর হাতে একখানি চিঠি দিল—বিশেষ দরকার, নিধিরামবাবু কি দয়া করিয়া একবার তাঁহার বাসার দিকে আসিতে পারেন?

নিধু গিয়া দেখিল বাহিরের ঘরে একা স্থনীলবাবুই বসিয়া আছেন—মুন্সেফবাবু এ সময় এখানে বসিয়া আড্ডা দেন, আজ তিনি আসেন নাই। নিধুকে দেখিয়া স্থনীলবাবু চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বলিলেন—আস্থন আস্থন—সেদিন আপনাদের বাড়ী গিয়ে আদর-যত্নে বড় আনন্দ পেয়েছিলাম। বস্থন—

নিধু লজ্জিত মুখে বলিল—আমাদের আবার আদর যত্ন! আপনাদের মতো লোককে কি আমরা উপযুক্ত আদর-অভ্যর্থনা করতে পারি? সামান্য অবস্থার মানুষ আমরা—

—ও সব বলবেন না নিধিরামবাবু। ওতে মনে কষ্ট পাই—বস্থন, আমি দেখি চায়ের কি হল—আপনার সঙ্গে খাব বলে বসে আছি—আপনি চা খান না বুঝি আবার? একটু মিষ্টিমুখ করে—

চা ও জলযোগ পর্ব্ব চুকিয়া গেলে স্থনীলবাবু বলিলেন—আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

নিধু একটু বিস্মিত হইলেও মুখে তাহা প্রকাশ করিল না। তাহার মতো লোকের সঙ্গে কি কথা আছে একটা মহকুমার সেকেণ্ড অফিসারের, সে ভাবিয়াই পাইল না।

লালবিহারীবাবুকে আপনি তো ভালো করেই জানেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তা জানি বৈকি! এক গাঁয়ের লোক। তবে উনি এবার অনেকদিন পরে গাঁয়ে এলেন। একবার দেখেছিলাম ছেলেবেলায়—আর এই দেখলাম এবার—বাবার সঙ্গে খুব আলাপ—

—তা তো হবেই। আপনার বাবাকে এ রবিবারেও দেখলাম লালবিহারীবাবুর বৈঠকখানাতেই। ওঁরা সমবয়সী প্রায়—

—ঠিক সমবয়সী নয়, বাবার বয়েস বেশি।

—আচ্ছা, আপনি লালবিহারীবাবুর মেয়ে মঞ্জরীকে দেখেছেন তো?

নিধু প্রায় চমকাইয়া উঠিয়া সুনীলবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—

—মঞ্জরী?—ও মঞ্জু? আজ্ঞে হ্যাঁ, তাকে দেখেচি বই কি, তা—

সুনীলবাবু সম্ভবত নিধুর ভাবান্তর লক্ষ্য করিলেন না। তিনি সহজ সুরেই বলিলেন—তাকে দেখেচেন তাহলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—দেখেচি বই কি। কেন বলুন তো?

সুনীলবাবু সলজ্জ হাসিয়া বলিলেন—সেদিন লালবিহারীবাবু ওর সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব করলেন কিনা। তাই বলচি।

—কার বিবাহ?

—মানে আমার সঙ্গেই।

—ও!

—আপনি কি রকম মনে করেন? মেয়েটি ভালোই—কি বলেন? আপনার গাঁয়ের মেয়ে তাই জিগগেস কচ্চি।

—ইয়ে—হ্যাঁ—ভালো বৈকি! বেশ ভালো।

—অবিশ্যি আমার মতে হবে না। আমার বাবা কর্ত্তা, তাঁকে জিগগেস না করে কোনো কাজ হতে পারে না। তাঁরা মেয়েটি দেখেচেন কারণ একই পাড়ায় ওর মামারবাড়ী, সেখানে থেকে স্কুলে পড়ে। আমাদের বাড়ীও ওদের যাতায়াত আছে—তবে আমি কখনো দেখি নি—কারণ আমি থাকি বিদেশে। কলকাতায় থাকি আর কদিন?

—কেন রবিবারে তাকে দেখলেন না?

—ঠিক মেয়ে দেখানো উদ্দেশ্য ছিল না। তা ছাড়া বাবা মেয়ে না দেখে গেলে আমার দেখায় কিছু হবেও না। তবুও ওঁরা একবার মেয়েটিকে দেখাতে চাইলেন তাই দেখলাম। দেখতে ভালোই অবিশ্যি—সে আমি আগেও শুনেছিলুম। কিন্তু শুধু বাইরে দেখে—

নিধুর মনের ভিতর হইতে কে যেন বলিল, একথার উত্তর তাহার দেওয়া উচিত। মঞ্জুকে সে সব সময় সর্ব্বত্র বড় করিয়াই রাখিতে চায়। কাহারও মনে তাহার সম্বন্ধে ছোট ধারণা না হয়, এটা দেখা তাহার সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। সুতরাং সে বলিল—আজ্ঞে না শুধু বাইরে নয়—মেয়েটি সত্যিই ভালো।

সুনীলবাবু একটু আগ্রহের সুরে বলিলেন—আপনার তাই মনে হয়?

—আমার কেন শুধু, আমাদের গ্রামের সকলেরই তাই মত। সত্যিই ওরকম মেয়ে আজকাল বড় একটা দেখা যায় না—

—বেশ, বেশ। আপনার মুখে একথা শুনে খুব খুশি হলাম। দেখুন মশাই, কিছু মনে করবেন না—যার সঙ্গে সারা জীবন কাটাতে হবে—তাকে অন্তত একটু যাচাই না করে নিয়ে—আমার অন্তত তাই মত। বাবা যা দেখবেন, সে তো দেখবেনই।

নিধু একথায় বিশেষ কোনো জবাব দিল না।

নিধুর মনের মধ্যে কেমন এক প্রকার অব্যক্ত যন্ত্রণা। সুনীলবাবুর শেষ কথাটা তাহার কানে যেন অনবরত বাজিতেছিল—সারাজীবন মঞ্জুর সঙ্গে থাকিবেন কে? না সুনীলবাবু।

মঞ্জু সুনীলবাবুর জীবনসঙ্গিনী?

বাসায় ফিরিবার পথে সুনীলবাবু তাহার সহিত গল্প করিতে-করিতে খানিক দূর পথ আসিলেন। শুধু মঞ্জুর সম্বন্ধেই কথা। নানা ধরনের আগ্রহভরা প্রশ্ন, কখনো খোলাখুলি, কখনো প্রশ্নের উদ্দেশ্য নিধুর কাছে ঠিক বোধগম্য হইল না।

—আচ্ছা, নিধিরামবাবু, মঞ্জু কিরকম লেখাপড়া জানে বলে আপনার মনে হয়?

—বেশ জানে। এবার তো ফার্স্ট ক্লাসে উঠবে—

—আমি তা বলচি নে—পড়াশুনোতে কেমন বলে মনে হয় আপনার? বেশ কালচার্ড?

—নিশ্চয়ই। হাতের লেখা কাগজ বার করবে শিগগির। লেখাটেখার ঝোঁক আছে, গান করে ভালো—

—গান শুনেচেন আপনি?

এখানে কি ভাবিয়া নিধু সত্যকথা বলিল না। তাহার সামনে বসিয়া মঞ্জু গান গাহিয়াছে, এ কথা এখানে বলিবার আবশ্যক নাই, না বলাই ভালো। সে বলিল—কেন শুনব না। দেখেচেন তো আমাদের বাড়ীর সামনেই ওদের বাড়ী। মাঝে-মাঝে গান করে ওদের বাড়ীতে, আমাদের বাড়ী থেকে শোনা যায় বই কি।

মোটের উপর নিধুর মনে হইল মঞ্জুকে দেখিয়া সুনীলবাবু মুগ্ধ হইয়াছেন। মঞ্জুর চিন্তাই এখন তাঁহার ধ্যান-জ্ঞান—ইহার প্রশ্নোত্তর ও কথাবার্তা সবই এখন রূপমুগ্ধ তরুণ প্রেমিকের প্রলাপের পর্য্যায়ভুক্ত।

বাসায় আসিয়া নিধু মোটেই স্থির হইতে পারিল না। মনের সেই যন্ত্রণাটা যেন বড় বাড়িয়াছে। মঞ্জু সুনীলবাবুর সারাজীবনের সাথী হইবে—একথা যেন সে কিছুতেই সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেছিল না।

সেদিন আর রাঁধিল না। চাকর জিজ্ঞাসা করিল—কি খাওয়ার যোগাড় করে দেব বাবু?

—তুই দুটো পয়সা নিয়ে গিয়ে বরং চিঁড়ে কিনে আন—তাই খাব এখন। শরীর ভালো নয়, রান্না আজ পারব না।

—সে কি বাবু? চিঁড়ে খেয়ে কষ্ট পাবেন কেন? আমি সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি—

—না, না—তুই যা এখন। আমার শরীর ভালো না—আর কিছু খাব না।

আহারাদির পরে তিনঘণ্টা কাটিয়ে গেল। রাত প্রায় একটা। নিধু দেখিল সে মাথামুণ্ড কি যে ভাবিতেছে! নানা অদ্ভুত চিন্তা। জীবনে সে কখনো এরকম ভাবে নাই।

গভীর রাত্রে ঠাণ্ডা হাওয়ায় তাহার উত্তপ্ত মস্তিষ্ক একটু শীতল হইল। আচ্ছা, সে এত রাত পর্য্যন্ত কি ভাবিয়া মরিতেছে? কেন তাহার চক্ষে ঘুম নাই? মঞ্জু যাহারই জীবনের সাথী হউক—তাহার তাহাতে আসে-যায় কি?

আজ একটি সপ্তাহের মধ্যে যে একটি পয়সা আয় করিতে পারে নাই—তাহার পক্ষে মঞ্জুর চিন্তা করাও অন্যায়। কখনো কি সম্ভব হইবে মঞ্জুকে তাহার জীবনসঙ্গিনী করা?

আকাশকুসুমের আশা ত্যাগ করাই ভালো।

মঞ্জুর বাপ-মা তাহার সঙ্গে কখনো কি মঞ্জুর বিবাহ দিবেন বলিয়া সে ভাবিয়াছিল? সে নিজের মনের মধ্যে ডুবিয়া দেখিল এমন কোনো দুরাশা তাহার মনে কোনোদিনই জাগে নাই। তবে আজ কেন সে সুনীলবাবুর কথায় এত বিচলিত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে? মঞ্জুর সঙ্গে মুখের আলাপ আছে মাত্র। ইহার অতিরিক্ত অন্য কিছুই নয়।

অপর পক্ষে মঞ্জু বড়মানুষের মেয়ে—সে লালিত হইয়াছে সচ্ছলতার মধ্যে, প্রাচুর্য্যের মধ্যে, অন্য ধরনের জীবনের মধ্যে! সুনীলবাবুর সঙ্গে বিবাহ হইলে মঞ্জু জল হইতে ডাঙায় পড়িবে না—নিজেদের শ্রেণীর মধ্যেই সে থাকিতে পারিবে; চিরাভ্যস্ত জীবনযাত্রায় জোর করিয়া পরিবর্ত্তন নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িবে না।

সুনীলবাবুর ঘরে সে মঙ্গলময়ী গৃহলক্ষ্মী রূপে—

না, কথাটা ভাবিতে গেলে আবার যেন বুকের মধ্যে খচ করিয়া বাজে।

পরদিন সকালে জন দুই মক্কেল আসিল। ধানের জমি লইয়া মারপিটের মোকর্দ্দমা, তবে নিধুর মনে হইল ইহারা যাচাই করিয়া বেড়াইতেছে কোন মোক্তারের কত দর—শেষ পর্য্যন্ত যদুবাবুর কাছে গিয়াই ভিড়িবে।

নিধু নিজের দর কিছুমাত্র কমাইল না—কিন্তু বিস্ময়ের সহিত দেখিল লোক দুটি তাহাকেই মোক্তার নিযুক্ত করিল। ঘণ্টাখানেক ধরিয়া তাহাদের লইয়া ব্যস্ত থাকিবার পর নিধু বলিল—তোমরা যাও বাজার থেকে খাওয়া-দাওয়া সেরে এস—প্রথম কাছারীতেই তোমাদের মোকর্দ্দমা রুজু করে দেব—আমার টাকা আর কোর্টের খরচটা দিয়ে যাও—

—কত ট্যাকা বাবু?

—এই যে বললাম সবসুদ্ধ চারটাকা সাড়ে ন' আনা—

—বাবু, ট্যাকা কাছারীতেই দেবানু—

—না বাপু, ও সব দেবানু-টেবানু শুনচিনে—টাকা দিয়ে যাও—ডেমি কিনতে হবে, আর্জির স্ট্যাম্প কিনতে হবে—সে সব কে কিনবে ঘরের পয়সা দিয়ে?

—বাবু, এখন তো মোদের কাছে নেই—

—কাছে নেই তো মোকর্দ্দমা করতে এলেচ কেন মরতে? জানো না যে রামনগরে

একেই পয়সা সঙ্গে করে আনতে হয় ?

—তবে বাবু যদি আপনি একটা ঘণ্টা সময় দেন—প্রথম কাছারীতেই মোরা ট্যাকা দেবানু—ট্যাকা না পেলে আপনি মোদের মোকর্দ্দমা করবেন না—

ইহারা চলিয়া কিছুদূর যাইবার পরেই আরও জন চারেক মক্কেল আসিয়া হাজির হইল। তাহাদের সহিত কথা কহিয়া নিধু বুঝিল—ইহারা পূর্ব্বের মারপিটের মোকর্দ্দমারই ফরিয়াদী পক্ষ। ইহারাই মার খাইয়াছে। একজন প্রহৃত ব্যক্তি মাথায় লাঠির দাগ সমেত আসিয়াছে।

ইহাদের মোড়ল বলিল—বাবু, আমাদের হক মোকর্দ্দমা—মাথায় এই দেখুন লাঠির দাগ—ট্যাকা যা লাগে আপনাকে দেবানু—এখুনি এই পাঁচটা টাকা রাখুন আপনি—মোকর্দ্দমার এজাহারটা করিয়ে দিন—

যদিও ইহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া নিধুর মনে হইল ইহারাই ঠিক কথা বলিতেছে—টাকাও দিতে এখুনি প্রস্তুত—তবুও নিধু দুঃখিতচিত্তে বলিল—বাপু আমি অপর পক্ষের কেস নিয়ে ফেলেচি—তোমাদেরটা নিতে পারব না—

—বাবু, আপনি যা লাগে নেন মোদের কাছ থে। ক-ট্যাকা দিতে হবে বলুন আপনারে মোরা দিয়ে যাই। মোদের গাঁয়ের একটা মোকর্দ্দমায় আপনি জামিন করিয়ে দিয়েছিলেন—বড্ড সুখ্যাতি পড়ে গিয়েচে। মোক্তার যদি দিতে হয় তবে আপনারেই দেব—

—না, সে হবে না। আমি তাদের কথা দিয়েচি—

নিধুর মুহুরী আড়ালে ডাকিয়া লইয়া বলিল—নিয়ে ফেলুন ওদের কেস বাবু, মনে হল পয়সা দেবে—পয়সা হাতে আছে এদের। অপরপক্ষ তো আপনাকে টাকা দেয়নি তবে কিসের বাধ্য-বাধকতা তাদের সঙ্গে ?

—না হে, যখন কথা দিয়ে ফেলেচি, কেস নেব বলেচি—তখন কি আর টাকার লোভে অন্যদিকে ঘুরে দাঁড়ানো চলে ?

—টাকা পেলে না হয় সে কথা বলতে পারতেন বাবু—কিন্তু টাকা তো আপনি হাত পেতে নেননি তাদের কাছে ?

—ও একটা কথা হে। মুখের কথা টাকার চেয়েও বড়—

—বাবু, এ মহকুমায় এমন কোনো উকিল-মোক্তার নেই যিনি এমনধারা করেন। মক্কেল টাকা দিলে না তো কিসের মক্কেল ?

—না সে আমার দ্বারা হবে না। অপরে যা করেন, তাঁদের খুশি। আমি তা করতে পারব না—

অগত্যা ইহারা চলিয়া গেল। কিন্তু কোর্টে গিয়া নিধু সবিস্ময়ে শুনিল ধরণী-মোক্তার পূর্ব্বপক্ষের মোকর্দ্দমা রুজু করিতে সুনীল বাবুর কোর্টে ছুটিতেছেন।

নিধুর মুহুরীই বলিল—দেখলেন বাবু, বললাম তখন আপনাকে। ধরণীবাবুকে ওরা মোক্তার দিয়েচে—আপনার কাছে যাচাই করতে এসেছিল—টাকার কথা বলতেই পিছিয়ে পড়েচে—

—এ তো ভারি অন্যায় কথা। ধরণীবাবুই বা আমার কেস নিতে গেলেন কেন?

—ওরা তো ধরণীবাবুকে আপনার কথা কিছু বলে নি? তিনি হয়তো কম টাকাতে রাজী হয়েচেন—

—ওদের একজনকে আমার কাছে ডেকে আনতে পার?

—তারা বাবু আসবে না। আমি কত খোশামোদ করলাম ওদের। ধরণীবাবু মোক্তারনামায় সই করেছেন—তাঁর মুহুরী ডেমি লিখে ফেলেচে—

—এ পক্ষ?

—তারা যদুবাবুকে মোক্তার দিয়েচে। যদুবাবু সাবডেপুটি বাবুর এজলাসে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর মক্কেল নিয়ে—

—এ কিরকম ব্যাপার হল হে?

—এই রকমই হয় এখানে। আপুনি নতুন লোক, এসব জানবেন কোথা থেকে? তাইতো তখন আপনাকে বললাম ওদের টাকা নিয়ে ফেলুন—

—টাকার জন্যে একটা অন্যায় কাজ আমি তো করতে পারিনে? তাহলেও ধরণীবাবুকে আমি একবার বলব—

—বলবেন না বাবু, তাতে উল্টে ধরণীবাবু ভাববেন মক্কেলের জন্যে আমার সঙ্গে ঝগড়া করচে। সেটা বড় খারাপ দেখাবে। ধরণীবাবুর তো কোনো দোষ নেই—তিনি না জেনেই কেস নিয়েচেন। আমার কথাটা শুনবেন বাবু, এই কাজ করে-করে আমার মাথার চুল পেকে গেল—এখানে মোক্তারে-মোক্তারে কম্‌পিটিশন্—উকিলে-উকিলে কম্‌পিটিশন্—যিনি যত কম হাঁকবেন, টাকা বাকি রাখবেন, তাঁর কাছে তত মক্কেল যাবে।

—তাহলে তুমি কি ভাব না যে ধরণীবাবু আমার মক্কেল ভাঙিয়ে নিয়েচেন?

—মোক্তারনামায় সই যখন করেন নি, টাকা তারা যখন দেয় নি—শুধু মুখের কথায় কি কেউ কারো মক্কেল হয় বাবু? আপনি মুখের কথায় দাম দিলেন, আর কেউ যদি না দেয়? সবাই কি আপনার মতো? সত্যি কথায় এসব লাইনে কাজ হবে না বাবু সে আপনাকে আমি আগেই বলেচি। মফস্বলে সর্ব্বত্রই এই অবস্থা দেখবেন।

বারের মধ্যে নিধুর বয়সী আর একজন ছোকরা মোক্তার ছিল। তাহার নাম নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়—সেও নিধুর মতোই গরীব গৃহস্থ পরিবারের ছেলে—নিধু তবুও কিছু-কিছু উপার্জ্জন করিত—সে বেচারীর অদৃষ্টে তাহাও জুটিত না—বেচারী তাহার মাসীমার বাড়ী থাকিয়া মোক্তারী করে বলিয়া অনাহারের কষ্টটা ভোগ করিতে হয় না—কিন্তু কিছু করিতে পারিতেছে না বলিয়া তাহার মন বড় খারাপ। নিধুর কাছে মাঝে-মাঝে সে মনের কথা বলিত। নিধুর মনে খুব দুঃখ হইয়াছিল এই ব্যাপারে—সে নিরঞ্জনের কাছে ঘটনাটি সব বলিল।

নিরঞ্জন হাসিয়া বলিল—তোমার মতো লোকের মোক্তারী করতে আসা উচিত হয়নি নিধিরাম—

—কেন হে? কি দেখলে আমার অনুপযুক্ততা?

—এত সরল হলে এ ব্যবসা চলে? যে কোনো ঘুঘু মোক্তার হলে কৌশলে তার কাছে টাকা বার করে নিতো।

—আমি ভেবেচি যদুকাকাকে কথাটা বলব। তিনি কেন আমার মক্কেল নিলেন?

—তোমার কথা শুনে আমার হাসি পাচ্চে হে! ছেলেমানুষের মতো কথা বলচ যে। একথার মানে হয়? মক্কেলের গায়ে কি নামের ছাপ আছে নাকি? শোনো আমার পরামর্শ। যদুবাবু তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী—তাঁকে মিথ্যে চটিও না। তুমি তবুও কিছু-কিছু পাও—আমার অবস্থাটা ভেবে দেখো তো? মাসীমার বাড়ী না থাকলে না খেয়ে মরতে হত—

—আর ব্যবসা চলে না—অচল হয়েচে ভাই। এক পয়সা আয় নেই আজ দু-হপ্তা—

—দু-হপ্তা তো ভালো। আমি তোমার এক বছর আগে বসেচি, এ পর্য্যন্ত তেত্রিশ টাকা মোট উপার্জ্জন হয়েচে। তবুও ভাবচি, ভবিষ্যতে হতে পারে—নইলে কোথায় যাব?

—বুড়োগুলো না ম'লে আমাদের কিছু হবে না। যদুবাবু, ধরণীবাবু, শিব ভট্‌চাজ, হরিহর নন্দী—এগুলো পলাশীর যুদ্ধের বছর জন্মে আজও বার জুড়ে বসে আছে। এরা সরলে তবে যদি আমাদের—তা সবাই অশ্বত্থামার পরমায়ু নিয়ে এসেচে—

—সেই ভরসাতেই থাক—ওহে, একটা কথা শুনেছ?

—কি?

—সাধনবাবু নাকি ওর ভাইঝির সঙ্গে সাবডেপুটিবাবুর বিয়ের চেষ্টা করচে—

নিধু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—সে কি!

নিরঞ্জন হি-হি করিয়া হাসিয়া বলিল—সে বড় মজা। সাধন-মোক্তার আর তার মামা দুর্গাপদ ডাক্তার দুজনে গিয়ে আজ সকালে সুনীলবাবুর বাসায় খুব ধরাধরি করেচে—আজ ওবেলা বাড়ীতে চায়ের নেমন্তন্ন করেচে—উদ্দেশ্য মেয়ে দেখানো।

—তুমি জানলে কি করে?

—দুর্গাপদ ডাক্তারের ছেলে আমার ক্লাসফ্রেণ্ড, সে বলছিল—সে আবার একটু বোকা মতো, তার বিশ্বাস এ বিয়ে হয়ে যাবে। মেয়ে নাকি ভালো।

নিধু আপন মনেই বলিল—ও তাই!

—তাই কি?

—কিছু না এমনি বলচি—

—আমি একটা কথা বলি শোনো। সিরিয়াসলি বলচি। তুমি বার ছেড়ো না, তোমার হবে। তোমার মধ্যে ধর্ম্মজ্ঞান আছে, তোমার ধরনের মোক্তার বারে নেই। বুড়োগুলো সব বদমাইস, স্বার্থপর। তোমার অনেষ্টি আছে, বুদ্ধিও আছে, তুমি এরপরে নাম করবে, তোমার গুণ বেশিদিন চাপা থাকবে না।

—বই নেই যে?

—বরাত ভাই, সব বরাত—নইলে সি. ডবলিউ. এন. আর. সি. এল. জে-র লাইব্রেরী নিয়ে বসে থাকলেও কিছু হয় না। যতুবাবু বা হরিহর নন্দী এরা ইংরিজি পড়ে বুঝতে পারে না, সেকালের ছাত্রবৃত্তি পাশ মোক্তার—ওদের হচ্ছে কি করে? তবে আমাকে বোধ হয় শিগগির ছাড়তে হবে—

—ছাড়বে কেন? বুড়োগুলো মরুক—অপেক্ষা কর—

—ততদিনে আমার বাড়ীর সব না খেয়ে মরে যাবে—বিষয় সম্পত্তি বেচে চলচে এখন—

—যতুকাকাকে বলে তোমায় দুচারটে জামিননামা দেব—জামিনের ফি'টা পাবে এখন।

—তোমার নিজের পেলে তাতে উপকার হবে—তুমি আমায় দেবে কেন?

—যদি আমি দিই—

—সেই জন্যেই তো বলচি। তোমার মতো অনেস্ট লোক বারে আসে নি—অন্তত রামনগরের বারে। তুমি অনেক দূর যাবে—

নিধু বাসায় আসিবার পথে সাধন-মোক্তারের কাণ্ডটা ভাবিয়া আপন মনেই হাসিল। তাই আজকাল তাহার সঙ্গে এতবার দেখা হওয়া-সত্ত্বেও বিবাহের কথা একবারও মুখে আনে না—এমন বড় গাছে বাসা বাঁধিবার দুরাশায় তাহার মতো নগণ্য জুনিয়ার মোক্তারের কথা ভুলিয়াই গেল বেমালুম। ভালোই হইয়াছে—নতুবা একে পয়সার টানাটানি—তাহার উপর সাধন-বুড়োর বিবাহের ঘটকালির উৎপীড়নে ও তাগাদায় তাহাকে রামনগর ছাড়িয়া পলাইতে হইত এতদিন। সপ্তাহের বাকি দিনগুলিও ক্রমে কাটিয়া আসিল। একটি মক্কেলও আসিল না।

আশ্বিন মাসের প্রথম সপ্তাহ। পূজা আসিয়া পড়িল। রামনগরে পূজাকমিটি দুদিন মিটিং করিল, তাহার পাঁচ টাকা চাঁদা ধরিয়াছে—তাহার নামেও চিঠিও আসিয়াছে। এদিকে বাড়ীওয়ালা তাগাদার উপর তাগাদা করিয়া হয়রান হইয়া গেল—এখনও ভদ্রতা দেখাইয়া চলিতেছে বটে—কিন্তু পূজার ছুটির আগেও যদি টাকা না দিতে পারে—তবে হয়তো বাড়ী ছাড়িবার নোটিশ আসিয়া হাজির হইবে একদিন।

শনিবার।

আগের দিন যতু-মোক্তারের অনুগ্রহে একটা জামিনের ফি পাওয়া গিয়াছে—আরও অন্তত দুটি টাকা হইলে আজ বাড়ী যাওয়া চলে। নইলে শুধুহাতে বাড়ী গিয়ে লাভ কি?

বার-লাইব্রেরীতে বসিয়া-বসিয়া নিধু ফন্দি আঁটিতেছে—কি উপায়ে তাহার মহুরীর কাছে দুটি টাকা ধার লওয়া যায়—কারণ নিধুর অপেক্ষা তাহার মুহুরীর অবস্থা ভালো—বাড়ীতে জায়গা জমি, চাষবাস—এখানেও তাহার দাদা স্ট্যাম্পভেণ্ডারি করিয়া এই কোর্টের প্রাঙ্গন হইতেই মাসে দেড়শো-দুশো টাকা রোজগার করে—দুটি টাকা দিতে তাহার কষ্ট হইবার কথা নয়—কিন্তু বাবু হইয়া ভৃত্যের কাছে সোজাসুজি টাকা ধার করা চলিবে না—কোনো একটা কৌশল খাটাইতে হইবে।

এমন সময় সাধন-মোক্তার ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বলিলেন—এই যে নিধু বসে আছ। ওহে একটা জামিনের দরখাস্ত মুভ করবে? তিনটে টাকা পাবে যদি মঞ্জুর করে দিতে পার। মক্কেলের সঙ্গে আমি ঠিক করে ফেলেচি। ছেলে আসামী, বাপ টাকা দিয়ে কেস চালাচ্ছে, টাকা নির্ঘাত আদায় হবে।

নিধু নির্বোধ নয়—সাধন-মোক্তারের আসল উদ্দেশ্য সে বুঝিয়া ফেলিল। বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কার কোর্টের কেস?

—সাবডেপুটির কোর্টে।

এই কথাই নিধু ভাবিয়াছিল। শক্ত কেসের আসামী, জামিন সহজে মঞ্জুর হইবার সম্ভাবনা কম, সুনীলবাবুর সঙ্গে আজকাল নিধুর খাতির জমিতেছে একথা বারে রাষ্ট্র হইতে দেরি হয় নাই। তাহার খাতিরের চাপে যদি জামিন মঞ্জুর হইয়া যায়—জামিননামা সই করিয়া শতকরা সাড়ে বারোটাকা জামিনের ফি মারিবেন সাধন-মোক্তার।

সে বলিল—কত টাকার জামিন হবে মনে হয়?

—যা মঞ্জুর করাতে পার—পাঁচশো টাকার কম হবে বলে মনে হয় না।

অনেকগুলি টাকা জামিনের ফি। সাধন-মোক্তার তাহাকে ভাগ দিবে না বা তাহার চাওয়াও উচিত নয়—তবে সে যদি জামিন মঞ্জুর করাইতে পারে—সে নিজেই জামিন দাঁড়াইবে না কেন? কথাটা সে বলিয়া ফেলিল। সাধন বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিলেন—তুমি জামিন দাঁড়াবে অত টাকার? বড্ড রিস্ক। তারপর ধর যদি পালিয়ে-টালিয়ে যায়—বেলবণ্ড বাজেয়াপ্ত হলে অতগুলো টাকা গুনোগার দিতে হবে—

—তা সে তখন পরে দেখা যাবে—

—না হে না—আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী, আমি তোমায় সে রিস্কের মধ্যে যেতে দিতে পারি নে—এ লোকটা বদমাইশ, যদি পালিয়ে যায় তোমাদের মতো জুনিয়ার মোক্তারের এখন এ সব বিপদের মধ্যে যাওয়া ঠিক নয়।

নিধু আর বেশি কিছু বলিতে পারিল না—টাকার ভাগ লইয়া প্রবীণ সাধন-মোক্তারের সঙ্গে ইতরের মতো তর্কাতর্কি করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সে শুধু বলিল—বেশ, তাই হবে। তবে জামিন মুভ করার ফি আমায় কিছু বেশি করিয়ে দেন, তিন টাকায় পারব না—

সাধন নিধুর দিকে চাহিয়া বিস্ময়ের সুরে বলিলেন—বল কি হে? জুনিয়র মোক্তারেরা কেন, অনেক সিনিয়র মোক্তার দু-টাকায় এ কেস করবে—তুমি বেশি পাচ্ছ শুধু আমার বলা কওয়ায়, নইলে যদুদা বা হরিবাবু রয়েছেন কি জন্যে? তোমায় স্নেহ করি বলে আমি ওদের বুঝিয়ে-সুজিয়ে তোমার কাছে নিয়ে আসচি—ভাবলাম—যদি পায় তো, আমাদের আপনার লোকেই টাকাটা পাক—

নিধুর রাগ হইল। সাধন সবদিক হইতেই তাহাকে ফাঁকি দিতে চাহিবেন—এ তাহার পক্ষে অসহ্য। সে দৃঢ় কণ্ঠে বলিল—আজ্ঞে না, আমি পাঁচ টাকার কমে পারব না—আপনি

আসামীদের বলে দেবেন—

—সে কি হে! তুমি আবার কি ডিকটেট্ করতে আরম্ভ করলে নাকি?

—আজ্ঞে মাপ করবেন। আমি ওর কমে পারব না—আর একটা কথা, ফিয়ের টাকা আগাম দিতে হবে—

—নাঃ, তোমাদের মতো ছোকরাদের নিয়ে দেখচি মহাবিপদ। তোমরা বুঝলেও বুঝবে না। তা নিও, তাই নিও। কি আর করব? আপনার লোকের মতো দেখি তোমাকে—

সুনীলবাবুর এজলাসে জামিন মঞ্জুর করাইতে বেলা তিনটা বাজিয়া গেল।

তাহার সাফল্য দেখিয়া হয়তো বা কোনো-কোনো প্রবীণ মোক্তার কিছু ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিবেন ভাবিয়া নিধু এজলাসে উপস্থিত হরিহর নন্দীর কাছে গিয়া বলিল—হরিবাবু, কোনো ভুল করি নি তো?

হরিহর মোক্তার বলিলেন—কেন ভুল করবে? চমৎকার সওয়াল জবাব—

নিধু বিনীতভাবে বলিল—আপনাদের কাছেই শিখেছি হরিদা। আপনাদের দেখে-দেখেই শেখা—এখন আশীর্ব্বাদ করুন—

হরিহর নন্দী অতিমাত্রায় উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন—না, না, আশীর্ব্বাদ তোমায় কি করব—তুমি ব্রাহ্মণ, ওকথা বলতে নেই। তোমরা ছেলে-ছোকরা তাই বোঝ না। তোমরা আমাদের প্রণম্য;—তবে তোমার কল্যাণ কামনা করচি, উন্নতি তুমি একদিন করবে—

কোর্ট হইতে চলিয়া আসিবার সময় সুনীলবাবু বলিলেন—নিধিরামবাবু আজ দেশে যাবেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—

—আমার খাসকামরায় একবারটি আসেন যদি, একটা কথা আছে—

কোর্টে উপবিষ্ট অনেকগুলি তরুণ ও প্রবীণ মোক্তারের ঈর্ষান্বিত দৃষ্টির সম্মুখে নিধু ত্রস্তপদে সুনীলবাবুর খাসকামরায় প্রবেশ করিল।

সুনীলবাবু বলিলেন—আপনার সঙ্গে একটা চিঠি দেব।

—বেশ, দিন না—আমি দেব এখন।

—আর একটা কথা—আপনি সাধনবাবুকে কতটা জানেন?

—ভালোই জানি। কেন বলুন তো স্যর?

—উনি লোক কেমন?

—লোক মন্দ নয়।

সুনীলবাবু একটু ভাবিয়া বলিলেন—তাই জিগ্‌গেস করচি। আচ্ছা, আপনি সোমবারে আসুন, একটা কথা বলব আপনাকে।

—বেশ, স্যর।

—লালবিহারীবাবুকে আমার প্রণাম জানাবেন—আর আপনি তো বাড়ীর মধ্যে যান,

পিসিমাকে বলবেন সামনের শনিবারে আমায় নেমন্তন্ন করেছেন, কিন্তু ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আসবেন সেদিন—দুদিন থাকবেন—সুতরাং কোথাও যাওয়া-আসা যাবে না। আপনারও যাওয়া হবে না।

—আমার? কেন?

—আপনার সঙ্গে ইণ্টারভিউ করিয়ে দেব ম্যাজিস্ট্রেটের।

—আমার মতো লোকের সঙ্গে ইণ্টারভিউ?

—এসব ভালো। আপনার পসারের পক্ষে এগুলো বড় কাজের হবে।

—আপনার যা ইচ্ছে, স্যর।

শনিবারে কোর্ট বন্ধ হইতে চারিটা বাজিল। নিধু সঙ্গে-সঙ্গে বাসায় আসিয়া কোর্টের পোশাক ছাড়িয়া সাধারণ পোশাক পরিয়া কিছু খাইয়া লইল। পরে বাসার চাবি চাকরের হাত দিয়া কুড়ুলগাছি রওনা হইল।

এতদিন সে ভাবিবার অবসর পায় নাই। নানা গোলমালে দিন কাটিয়াছে। জামিন মুভ করিবার ফি না পাইলে আজ বাড়ী যাওয়াই ঘটিয়া উঠিত না। এতদূর রাস্তা হাঁটিয়া বাড়ী পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া যাইবে। তা হইলেই বা কি? মঞ্জুর সঙ্গে সে আর দেখা করিবে না। তাহার সঙ্গে মঞ্জুর আর দেখাশোনা হওয়া ভুল। দুদিন পরে সে পরস্ত্রী হইতে চলিয়াছে—এখন তাহার সঙ্গে মেলামেশা মানে কষ্ট ডাকিয়া আনা। অতএব আর গিয়া সে মঞ্জুর সহিত দেখা করিবে না। মিটিয়া গেল। কিন্তু সে যতই গ্রামের নিকট আসিতেছিল—তাহার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা সম্বন্ধে নিজের মনেই সন্দেহ জাগিল। মঞ্জুকে না দেখিয়া থাকিতে পারিবে তো? কেন পারিবে না? কতদিনেরই বা আলাপ? খুব পারিবে এখন। পারিতেই হইবে।

নিধুর মা বলিলেন—বাবা! কি ছেলে তুমি! এতদিন পরে মনে পড়ল?

—কি করি বল। এক পয়সা রোজগার নেই, এসে কি করব?

—না-ই বা থাকলে রোজগার। তোকে দেখতে ইচ্ছে করে না আমাদের? কালী, জল নিয়ে আয়।

নিধু হাত ধুইয়া খাবার খাইয়া মায়ের সঙ্গে রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া গল্প করিতে লাগিল। হঠাৎ নিধুর মা মনে পড়িয়া যাওয়ার সুরে বলিয়া উঠিলেন—ভালো কথা! তোকে যে মঞ্জু কতবার আজ ডেকে পাঠিয়েছিল! আগের দু শনিবারও ঠিক সন্ধের আগে লোক পাঠিয়েচে খোঁজ নিতে তুই এসেচিস কিনা। একবার গিয়ে দেখা করিস্ সকালে। আজ বড্ড রাত হয়ে গেল।

কথা ভালো করিয়া শেষ হয় নাই, এমন সময় বাহির হইতে নৃপেনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—ও কালী, ও পুঁটি-দিদি, নিধুদা আসে নি? নিধু তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া বলিল—এই তো এলাম। এস, এস, ভালো আছ নৃপেন?

—আমি আসব না, আপনি আসুন নিধুদা। বাবাঃ, আপনাকে খুঁজে খুঁজে—

—এতরাত্রে যাব? নটা সাড়ে-নটা হবে যে।

—দিদি পাঠিয়ে দিলে দেখতে আপনি এসেচেন কিনা—

—কিন্তু নিয়ে যেতে তো বলে নি ? কাল সকালে যাব—

—আসুন আপনি—কিছু রাত হয় নি। আমাদের বাড়ীর খাওয়া-দাওয়া মিটতে রাত বারোটা বাজে রোজ। এখন আমাদের সঙ্গে।

মঞ্জু অনেক অনুযোগ করিল। এতদিন কি হইয়াছিল—গ্রামের কথা কি এমন করিয়া ভুলিতে হয় ? কি হইয়াছিল তাহার ?

নিধু বলিল—পয়সার অভাব মঞ্জু। বাড়ীভাড়া দিতে পারি নি বলে দুবেলা তাগাদা সইচি। কি করে বাড়ী আসি বল। কথাটা ঝোঁকের মাথায় বলিয়া ফেলিয়াই নিধু ভাবিল টাকা-পয়সা বা নিজের কষ্ট-দুঃখের কথা মঞ্জুর কাছে বলা উচিত হয় নাই। কিন্তু নিধুর উক্তি মঞ্জুর মুখে কেমন এক পরিবর্ত্তন আনিল। সে সহানুভূতির সুরে বলিল—সত্যি নিধুদা ?

—মিথ্যে বলব কেন ?

—আপনি চলে এলেন না কেন ? টাকা আমি দিতাম—আমায় বললেন না কেন এসে, মঞ্জু আমার টাকার দরকার, দাও।

সেখানে অন্য কেহ তখন ছিল না—থাকিলে মঞ্জু একথা বলিতে পারিত না। নিধু বলিল—কেন তোমাকে অনর্থক বিরক্ত করব ?

মঞ্জু তীব্রকণ্ঠে বলিল—অনর্থক বিরক্ত করা ভাবেন এতে নিধুদা ? বেশ তো আপনি ?

মঞ্জুর রাগ দেখিয়া নিধু অপ্রতিভ হইল—কিন্তু পরক্ষণেই তাহার কথার মধ্যে একটা অভিমানের সুর আসিয়া পৌঁছিয়া গেল। সে বলিল—সে জন্যে না মঞ্জু। তোমার টাকা নেব—তারপর পুজোর পর এখান থেকে চলে যাবে তোমরা, টাকাটা শোধ দিতে হয়তো দেরি হবে—

—এ ধরনের কথা আপনি বললেন আমায় ! বলতে পারলেন আপনি ?

—কেন পারব না ? তোমার সঙ্গে আর দেখা করা উচিত নয় আমার—জানো মঞ্জু ?

মঞ্জু বিস্ময়ের সুরে বলিল—কেন ?

—জানো না কেন ? আর দুদিন পরে তোমরা চলে যাবে এখান থেকে। আবার হয়তো আসবে না কতদিন। হয়তো দু-দশ বছর। আমরা সামান্য অবস্থার মানুষ—বিদেশে যাওয়ার পয়সা নেই—দেখাই হবে না আর।

—ওঃ এই ! নিশ্চয়ই দেখা হবে। আমরা আসব মাঝে-মাঝে।

—তাতে কি ? তোমার আর কতদিন ? দুদিন পরে পরের ঘরে চলে গেলেই ফুরিয়ে গেল।

—কেন নিধুদা, এসব কথা আপনার মাথার মধ্যে আজ এল কেন শুনি ?

—কারণ না থাকলে কার্য্য হয় না। ভেবে দ্যাখ—

মঞ্জু ব্যস্তসমস্ত আগ্রহে বলিল—কি হয়েচে নিধুদা ? কি অন্যায় করে ফেলেচি আমি ? এমন কি কথা—

—আমি কিছু বলতে চাইনে। তুমি বুদ্ধিমতী—বুঝে দেখ—

মঞ্জু অল্প কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিল—বুঝেচি নিধুদা।

—ঠিক বুঝেচ ?

—হ্যাঁ।

—তবেই ভেবে ছাখ তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হওয়া উচিত মঞ্জু ? তুমি বড়লোকের মেয়ে—ভুলে যাবে। কিন্তু আমি গরীব জুনিয়ার মোক্তার—আমার প্রথম জীবনে যদি উৎসাহ ভেঙে যায়—উদ্যম নষ্ট হয়ে যায়—আর কিছু করতে পারব না বার-এ। সব ফিনিশ—

মঞ্জু নিরুত্তর রহিল। নিধু চাহিয়া দেখিল তাহার বড়-বড় চোখ দুটি জলে টসটস করিয়া আসিতেছে—এখনি বুঝি বা গড়াইয়া পড়িবে।

নিধু বলিল—রাগ আমি করি নি, তোমার কোনো দোষ নেই তাও আমি জানি। দোষ আমারই, আমারই বোঝা উচিত ছিল। ভুল আমার।

মঞ্জু এবারও কিছু বলিল না, নতমুখে সিমেন্টের মেঝের দিকে চাহিয়া রহিল। নিধু বলিল—ও কথা আর তুলব না, থাক গে। তোমাদের প্রতিমা কই মঞ্জু ? পুজো তো এসে গেল।

মঞ্জু জলভরা চোখে নিধুর দিকে চাহিল। কোনো একটা অন্যায় কাজ করিয়া ফেলিলে ছোট মেয়ে বকুনি খাইবার ভয়ে যেমন ভাবে গুরুজনের দিকে চায়—মঞ্জুর চোখে তেমনি মিনতি মাখানো ভয়ের দৃষ্টি। যেন সে এখনি বলিয়া ফেলিবে—যা হয়ে গিয়েচে, হয়ে গিয়েচে—আমায় আর বকো না তুমি।

নিধুর মন এক অপরূপ দয়া ও সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিল।

তাহার কপালে যাহাই থাক—এই সরলা করুণাময়ী বালিকাকে সকল প্রকার ব্যথা ও লজ্জার হাত হইতে বাঁচাইয়া লইয়া চলাই যেন তাহার জীবনের কাজ।

সে বলিল—বললে না প্রতিমা হচ্চে না কেন ? পুজো হবে না ?

—প্রতিমা এখানে হচ্চে ন' তো। দেউলে-সরাবপুরের কুমোরবাড়ী ঠাকুর গড়া হচ্চে—সেখান থেকে দিয়ে যাবে।

—তোমরা সেই প্লে করবে তো ?

—আপনি যে রকম বলেন—

মঞ্জু যেন হঠাৎ ভরসাহারা ও অসহায় হইয়া পড়িয়াছে। যে মঞ্জু চিরকাল হুকুম করিতে অভ্যস্ত, নিজের ইচ্ছার পথে কোনো বাধা যে কোনোদিন পায় নাই, বাপ-মায়ের আদরের মেয়ে বলিয়াও বটে, সচ্ছল অবস্থার মধ্যে লালিত-পালিত বলিয়াও বটে—আজ যেন সে তাহার সমস্ত কাজের জন্যে নিধুর পরামর্শ খুঁজিতেছে। নিধু মঞ্জুর করিলে তবে যেন সে কাজে উৎসাহ পাইবে। একথা ভাবিতেই নিধুর মন আবার যেন সতেজ হইয়া উঠিল, মধ্যের দুঃখ ও অবসাদের ভাবটা কাটিয়া গেল।

—তা তুমি কর না মঞ্জু, আমি পেছনে আছি—

—পেছনে থাকলে চলবে না, আপনাকে পার্ট নিতে হবে—

—যদি বল, তাও নেব।

—আপনি পার্ট নেবেন না, প্লে-র মধ্যে থাকবেন না শুনলে আমার ওতে আর মন যায় না। উৎসাহ চলে যায়।

—কেন এরকম হল মঞ্জু? কোথায় তোমরা ছিলে, কোথায় আমরা ছিলাম ভাব তো!

—সে তো সব জানি। কিন্তু তা বললে মন কি বোঝে নিধুদা? মনে যা হয়, তাই হয়। বোঝালে কি কিছু বোঝে?

—কি বই করবে ঠিক করলে!

—বড়দা বলে গিয়েচেন রবি ঠাকুরের 'ফাল্গুনী' করতে—ওঁদের কলেজে এবার করবে। উনি শিখিয়ে দেবেন। পড়েচেন আপনি?

—পাগল তুমি মঞ্জু? আমাদের বিদ্যেবুদ্ধি জানতে তোমার আর বাকি নেই। নাম শুনেচি, এই পর্য্যন্ত।

—কবিতা পড়েন নি তাঁর?

—খুব কম।

—আমার কাছে, 'চয়নিকা' আছে—নিয়ে যাবেন। ভালো বই—

—সে তো জানি। তাই থেকে সেবার 'কচ ও দেবযানী' করেছিলে—চমৎকার হয়েছিল, এখনো যেন দেখতে পাই চোখের সামনে।

—আর লজ্জা দেবেন না নিধুদা। ওকথা থাক। আপনাকে পার্ট নিতে হবে—নেবেন তো?

—তুমি বললেই নেব। কবে থেকে মহলা দেবে?

—কি দেব?

—তোমরা যাকে বল রিহার্স্যাল—কবে থেকে শুরু করবে?

—আপনার কথা শুনে এমন হাসি পায় আমার নিধুদা। দুঃখের মধ্যেও হাসি পায়। আমার মনে হয় আপনি সব সময় আমাদের মধ্যে থাকুন—আপনি যখন নিজের বাড়ী চলে যান জ্যাঠাইমার কাছে খেতে—আমি তখন কতদিন মাকে বলেচি, নিধুদা এখানেই তো দুপুরবেলা পর্য্যন্ত থাকে, বাড়ী যাবে কেন খেতে, তার চেয়ে এখানে কেন খেতে বললে না? মা বলতেন—দূর, রোজ-রোজ ও যদি তোদের বাড়ী না খায়? আমার কিন্তু মনে হত, বা রে, আমরা নিধুদার পর হলাম কি করে? তা কেন লজ্জা করবে নিধুদার?

—আমিও তাই ভাবতাম কিন্তু। যদি যেতে না হয়, যদি সব সময় তোমাদের বাড়ীর আমোদ-আহ্লাদের মধ্যে থাকি—

—আচ্ছা, রায়নগরে থাকবার সময়ে আমাদের বাড়ীর কথা আপনার মনে পড়ে না?

—পড়ে।

—কার-কার কথা মনে পড়ে?

—কাকাবাবুর কথা, কাকীমার কথা, বীরেনের কথা, নৃপেনের কথা, বুড়ো ঝিটার কথা, কুকুরটার কথা, বেড়ালটার কথা।

মঞ্জু মুখে আঁচল দিয়া ছেলেমানুষের মতো খুশিতে খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—উঃ, মোক্তারী আপনি করতে পারবেন বটে নিধুদা। কথার ঝুড়ি সাজিয়ে ফেললেন যে! এদের সকলের কথা মনে পড়ে—না?

—যা পড়ে, তাই বলেচি।

—ভালোই তো। আমি কি বলেচি আপনি তা না বলেচেন? আমি আর কে, যে আমার কথা মনে পড়বে?

—তা, পড়লেই বা কি?

—আপনি মনে ব্যথা দিয়ে বড্ড কথা বলেন কিন্তু—সত্যি বলচি নিধুদা—কেন ওরকম করেন? আমার মন তো পাথরে তৈরি নয়?

মঞ্জু এইমাত্র হাসিবার সময় সে আঁচল মুখে দিয়াছিল—তাহাই তুলিয়া চোখে দিল। নিধু দেখিল সত্যই তাহার চোখ জলে ভরিয়া আসিতেছে। সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে, শিক্ষিতা মেয়ে—অথচ কি ছেলেমানুষ মেয়ে মঞ্জু! আর কি অদ্ভুত লীলাময়ী। হাসি অশ্রু একই সময়ে মুখে চোখে বিরাজমান।

নিধু হাসিয়া বলিল—আচ্ছা, সত্যি মঞ্জু তুমি ভাবলে এসব সত্যি? আর সকলের কথা মনে পড়েচে—আর তোমার কথাই পড়ল না? এ তুমি বিশ্বাস কর?

—দেখুন মন যা বলে, মাঝে-মাঝে মানুষের কাছ থেকে তার জন্যে উৎসাহ পাওয়া চাই। তবেই মন খুশি হয়ে ওঠে। মুখে শোনা এজন্যে বড় দরকার। বলুন এবার?

—না, যা বলেচি, তার বেশি আর কিছু শুনতে পাবে না আমার কাছে মঞ্জু।

নিধু সে রাত্রে বাড়ী আসিয়া একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিল।

কোথায় যেন সে একটা পথ বাহিয়া চলিয়াছে—তাহার সামনে একটা বড় পুকুর—পুকুরে একরাশ পদ্মফুল ফুটিয়া আছে, পুকুরের পাড়ের ছোট্ট একটা কুঁড়েঘর হইতে হাস্যমুখী মঞ্জু বাহির হইয়া আসিল, অথচ দুজনেই দুজনকে জানে ও চিনিতে পারিয়াছে। মঞ্জু যেন দুলে-বাড়ীর মেয়ে, ব্রাহ্মণের মেয়ে নয়, দুজনে অবাধে অসঙ্কোচে পুকুরপাড়ে বসিয়া জলে ঢিল ফেলিতেছে ও অনর্গল বকিয়া যাইতেছে—মঞ্জু জজের মেয়ে নয়, তাহার সঙ্গে মেশার কোনো বাধা নাই যেন।

স্বপ্নের মধ্যেই নিধুর মন আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছে যখন, ঠিক সেই সময় শাঁখের আওয়াজে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে সে বাহিরের রোয়াকে কালীকে দেখিয়া বলিল—কি রে কালী, শাঁখ বাজে কোথায়?

—পুকুরঘাটে। আজ যে ওদের ঠাকুর-পুজোর ঘট পাতা হচ্চে—মা গেল—

—কাদের ঘট পাতা হচ্চে?

—জজবাবুদের বাড়ীর দুর্গাপুজোর ঘট আজ পাততে হবে না? এয়োস্ত্রী মেয়ে চাই, মা

গিয়েচে অনেকক্ষণ—

—আর কে-কে এসেচে ?

—কাকীমা তো আছেন, ওপাড়া থেকে হৈম-দিদি এসেচে—

পুকুরঘাট হইতে শাঁখের আওয়াজ যখন আবার পথের দিকে আসিল, তখন নিধু কিসের টানে উঠিয়া জানালা দিয়া চাহিয়া দেখিল আগে-আগে মঞ্জুর মা, তাহার পিছনে মঞ্জু, তাহার মা, হৈম, ভুবন গাঙ্গুলির স্ত্রী আরও পাড়ার দু-চারজন ঝি-বৌ জল লইয়া ফিরিতেছে। মঞ্জুর পরনে লালপাড় সাদা শাড়ি, অনাড়ম্বর সাজগোজ—এতগুলি মেয়ের মধ্যে তাহার দিকে চোখ পড়ে আগে, কি চমৎকার গতিভঙ্গি, কি সুন্দর মুখশ্রী, সারাদেহের কি অনবদ্য লাবণ্য—

নিধুর মনটা হঠাৎ বড় খারাপ হইয়া গেল।

নিজেকে সে বুঝাইবার চেষ্টা করিল।

কেন এমন হয় ? কোনদিন কি সে ভাবিয়াছিল মুন্সেফবাবু তাহার সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিবেন ? তাহার মতো জুনিয়ার মোক্তারের সঙ্গে ? গ্রামের মধ্যে যাহারা সব চেয়ে দরিদ্র, যাহার বাবা সর্ব্বদা মুন্সেফবাবুর বৈঠকখানায় বসিয়া তোষামোদ বর্ষণ করিয়া বড়লোকের মন রাখিতে চেষ্টা করেন—যাহার মা জজগিন্নি বলিতে ভয়ে সঙ্কোচে এতটুকু হইয়া যায়—মুখ তুলিয়া সমানে-সমানে কথা বলিতে ভরসা পায় না—এই বাড়ী, এই ঘর চোখে দেখিয়াও উহারা সে বাড়ীর ছেলের সঙ্গে অমন সুন্দরী, শিক্ষিতা মেয়ের বিবাহ দিবে—এ কি কখনো সে ভাবিয়াছিল ?

যদি এ আশা সে না করিয়া থাকে, তবে আজ তাহার দুঃখ পাইবার কি কারণ আছে ?

মঞ্জু দুদিনের জন্যে এ গ্রামে আসিয়াছে—বড়লোক পিতার খেয়াল এবার গ্রামে তিনি পূজা করিবেন, খেয়াল মিটিয়া গেলে হয়তো আর দশ বৎসর তিনি এদিক মাড়াইবেন না—ততদিনে মঞ্জু কোথায়। তাহার বিবাহ হইয়া ছেলেপুলে বড় হইয়া স্কুলে পড়িবে। মিথ্যা আশার কুহক।

সে উঠিয়া হাতমুখ ধুইয়া কালীকে বলিল—কালী, একটু তেল দে, নেয়ে আসি পুকুর থেকে—

—এত সকালে দাদা ?

—তা হোক—দে তুই—

এমন সময় নিধুর মা বাড়ী ঢুকিয়া বলিলেন—নিধু, ওদের বাড়ী যা—দুজন ব্রাহ্মণকে জল খাইয়ে দিতে হয় দুর্গাপুজোর পিঁড়ি পাতবার পরে। জজগিন্নি তোকে এখুনি যেতে বলে দিলেন।

নিধু স্নান সারিয়া আসিয়া ওবাড়ী গেল। মঞ্জুও ইতিমধ্যে স্নান সারিয়া খাবার সাজাইয়া বসিয়া আছে—একজন ব্রাহ্মণ সে, অপর জন ভুবন গাঙ্গুলি।

ভুবন গাঙ্গুলি বলিলেন—এস বাবা, তোমার জন্যে বসে আছি—এঁরা ব্রাহ্মণকে না খাইয়ে কেউ জল খাবেন না কিনা!

—কাকা বেশ ভালো আছেন? হৈম এসেচে দেখলাম না?

—হৈম তো এ বাড়ীতেই আছে, বোধ হয়—

মঞ্জু বলিল—হৈমদি তো রান্নাঘরে, ডাকব নাকি? কাকাবাবুকে বলছিলাম হৈমদি আমাদের থিয়েটারে পার্ট করবে—

ভুবন গাঙ্গুলি ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—করবে না কেন? আমি তো বলেচি। লালবিহারী-দাদার বাড়ীতে মেয়েদের সঙ্গে থিয়েটার করবে, এ তো ওর ভাগ্যি। আমার আপত্তি নেই—ও হৈম, হৈম—

হৈম আসিয়া দোরের কাছে দাঁড়াইল। কুড়ি-একুশ বছর বয়েস, রঙ তত ফরসা না হইলেও দেহের গড়ন ও মুখশ্রী ভালো। সে যে বেশ সচ্ছল ঘরে পড়িয়াছে তাহার সিল্কের শাড়ি, দুহাতে মোটা সোনার বালা ও বাহুতে আড়াই পেঁচের তাগা দেখিলে তাহা বোঝা যায়—এ ছাড়া আছে কানে ইয়ারিং, গলায় মোটা শিকলি হার।

নিধু বলিল—চিনতে পার হৈম?

হৈম হাসিয়া বলিল—কেন পারব না? এ গাঁয়ের মেয়ে নই?

—কবে এলে?

—মাসখানেক হল এসেচি। তুমি ভালো আছ নিধুদা?

—হ্যাঁ, এক রকম মন্দ নয়।

মঞ্জু বলিল—আমি হৈমদিকে বলেচি আমাদের সঙ্গে থিয়েটার করতে।

হৈম হাসিয়া বলিল—তা করব না কেন? বাবা তো বলেচেনই। নিধুদা, বই ঠিক করেচ?

—সে করবে মঞ্জু।

মঞ্জু তাড়াতাড়ি বলিল—আমি পারব না নিধুদা, আপনি ঠিক করে দিন না। রবি ঠাকুরের ‘ফাল্গুনী’র কথা বড়দা বলেছিলেন—

হৈম দেখা গেল ‘ফাল্গুনী’র নামও শোনে নাই, সে বলিল—সে কি ভালো বই?

—সে খুব ভালো বই। এবার কলকাতায় হৈ-হৈ করে প্লে হয়ে গিয়েচে।

—তা তোমরা যেমন বল। নিধুদা আমাদের শিখিয়ে দেবেন—

—আমি আর কদিন আছি? কাল তো সকালেই—

—দুদিন কেন ছুটি নাও না?

মঞ্জুও সঙ্গে-সঙ্গে বলিয়া উঠিল—তাই কেন করুন না নিধুদা?

—সে কি করে হয়? তোমরা বোঝ না। এ কি কারো চাকুরি যে ছুটি নিতে হবে? না গেলে আমারই লোকসান—

হৈম বলিল—তাহলে আজ ওবেলা বইটা দেখিয়ে একটু পড়ে দিয়ে যাও—

—মঞ্জু তো রয়েচে। ও সব পারে। ওর ‘কচ ও দেবযানী’ সেদিন শোনো নি হৈম, সে একটা শোনবার জিনিস!

মঞ্জু সলজ্জ সুরে বলিল—ছাই! নিধুদার যেমন কথা! না ভাই হৈমদি—

ভুবন গাঙ্গুলি জলযোগান্তে উঠিয়া বিদায় লইলেন। হৈম বলিল—বাবা, তুমি যাও—আমি এর পরে যাব। নিধুদা না হয় দিয়ে আসবে এখন।

মঞ্জু বলিল—হৈমদি, আমার ভাইয়েরা আর নিধুদা কিন্তু পার্ট নেবে—

হৈম চিন্তিত মুখে বলিল—তাই তো ভাই, এ শুনলে আমার কি বাড়ীতে প্লে করতে দেবে ভাই?

—কেন দেবে না?

—পাড়াগাঁয়ের গতিক তো জানো না—কে কি বলবে সেই ভয়ে বাড়ীর লোক যদি আপত্তি করে, তাই ভাবচি।

নিধু বলিল—তাতে কি? আমি না হয় না-ই করলাম—

মঞ্জু বলিল—তবে হবে কি করে? পুরুষমানুষের পার্ট মেয়েরা করতে গেলে অত মেয়ে কোথায় পাব এখানে!

—কেন, তোমাদের বাড়ীতে তো অনেকে আসবেন পুজোর সময়—

—তাদের সকলকে দিয়ে এ কাজ হবে না—দু-একজনকে দিয়ে হতে পারে। তাছাড়া রিহার্স্যাল দেওয়া না থাকলে তারা প্লে করবে কি করে? এ তো ছেলে খেলা নয়! তুমি ভাই হৈমদি, বাড়ীতে বলে এস ওবেলা—জিগগেস করে দেখ—

হৈম বলিল—এতে আমার ওপর যেন রাগ কোরো না নিধুদা, হয়তো ভাববে—

—আমি কিছু ভাবব না হৈম—মঞ্জু শহরে থাকে, ও পাড়াগাঁয়ের অনেক খবরই রাখে না —ওকে বরং বল—

মঞ্জু বলিল—চা হয়ে গিয়েচে—বসো হৈমদি—নিয়ে আসি—

মঞ্জুর কথা শেষ হইতেই মঞ্জুর বিধবা খুড়ীমা ট্রে-র উপর চায়ের পেয়ালা সাজাইয়া লইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—এই নে চা, ওদের দে—মঞ্জু—

—তিন পেয়ালা কেন কাকীমা, নিধুদা তো চা খায় না—

—নিধু তুমি চা খাও না? আমি তা জানিনে বাবা—গরম দুধ খাবে? এখনি দুধ দিয়ে গেল—

—না কাকীমা—দুধ চুমুক দিয়ে খাব, ছেলেমানুষ নাকি? আমার দরকার নেই—ব্যস্ত হবেন না মিছিমিছি—

নৃপেন আসিয়া বলিল—বাবা একবার নিধুদাকে বাইরে ডাকচেন দিদি—

বাইরের বৈঠকখানায় লালবিহারীবাবু ও ভুবন গাঙ্গুলি বসিয়া। লালবিহারীবাবু প্রকাণ্ড গড়গড়াতে তামাক টানিয়া বৈঠকখানা প্রায় অন্ধকার করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি সনাতনপন্থী লোক—বাড়ীতে ন-হাত কাপড় পরিয়া থাকেন—গায়ে সব সময় জামা বা ফতুয়া থাকেও না। কোনো প্রকার বড়লোকী চালচলন বা সাহেবিয়ানা এ গ্রামের লোক দেখে নাই তাঁহার। সাধারণ লোকের সঙ্গে গ্রামের পাঁচজনের মতোই মেশেন।

নিধু বলিল—আমায় ডাকচেন কাকাবাবু ?

—হ্যাঁ হে, সুনীল কি সামনের শনিবারে আসবে না ?

—আজ্ঞে না—চিঠি লিখেচেন তো সেই বলেই বোধহয়—পরের শনিবারে আসবার চেষ্টা করবেন—

—তুমি কি কাল যাচ্চ ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—

—তাহলে একবার বিশেষ করে অনুরোধ কোরো ওকে এখানে আসবার জন্যে—

—নিশ্চয়ই বলব—

—তুমি সুনীলের সঙ্গে মেশো তো ?

—আজ্ঞে মিশি—তবে আমরা হলাম জুনিয়ার মোক্তার—আর তিনি হলেন আমাদের হাকিম—বুঝতেই তো পারেন—

—একখানা চিঠি দেব নিয়ে গিয়ে ওর হাতে দিও—

—আজ্ঞে নিশ্চয়ই দেব—

নিধু পুনরায় বাড়ীর মধ্যে ফিরিয়া দেখিল হৈম ওরফে হেমপ্রভা দালানে বসিয়া নাই। মঞ্জু একা বসিয়া অনেকগুলো শিশিবোতল জড়ো করিয়া কি করিতেছে। মুখ তুলিয়া বলিল—আসুন নিধুদা, হৈমদি ওপরে গিয়েচে কাকীমার সঙ্গে কথা বলতে—বসুন—

—ওসব কি ?

—মা'র কাণ্ড। আসবার সময় আচার এনেছিলেন, জ্যাম, জেলি— বর্ষায় সব নষ্ট হয়ে গিয়েচে—দু-একটা যা ভালো আছে দেখে-দেখে তুলচি—বাকি ফেলে দিতে হবে —খাবেন নিধুদা ? এই একরকম জিনিস আছে—মাদ্রাজি জিনিস—একে বলে ম্যাঙ্গো পার্ল—চিনির মতো দেখতে। একটু খেয়ে দেখুন, ল্যাংড়া আমের গন্ধ—আম খাচ্চি মনে হবে—

নিধু একটু চিনির মতো গুঁড়া হাতে লইয়া মুখে ফেলিয়া বলিল—বাঃ, সত্যিই তো আমের গন্ধ ! আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক, এসব কোথায় পাব বল।

মঞ্জুর বড়-বড় চোখে যেন বেদনার ছায়া পড়িল—সে নিধুর দিকে চাহিয়া বলিল—ওসব বলতে আছে—ছিঃ—কষ্ট হয় না ?

মঞ্জুর সুর হঠাৎ এমন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় মাখানো, এমন স্নেহপূর্ণ মনে হইল নিধুর —যে তাহার বুকের ভিতরটা যেন কেমন করিয়া উঠিল। নিজের অজ্ঞাতসারেই তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল যে কথা—তাহার জন্য সে সারাদিন অনুতাপ করিয়াছিল মনে-মনে। দোষও নাই—নিধু তরুণ যুবক, এই তাহার জীবনে অনাত্মীয়া প্রথম নারী, যে তাহাকে স্নেহের ও প্রীতির চোখে দেখিয়াছে। জীবনের এক সম্পূর্ণ নূতন অভিজ্ঞতা তাহার। নিধু বলিয়া ফেলিল—আর আমার কষ্ট হয় না মঞ্জু ? তোমার জন্যে আমার মন কাঁদে না বুঝি ?

মঞ্জু পাথরের মূর্ত্তির মতো অবাক ও নিশ্চেষ্ট ভাবে নিধুর দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। নিধু আবার বলিল—আমি এখন দু-শনিবার আসব না—

—কেন নিধুদা?

—সামনের শনিবারে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আসবেন—তার পরের শনিবারে তোমাদের এখানে সুনীলবাবু আসবেন—এই মাত্র কাকাবাবু ডেকে বললেন—

—কি বললেন?

—সেই শনিবারে আসবার জন্যে বললেন—আমি আর কক্ষনো আসব না মঞ্জু। আমার বুঝি মন বলে জিনিস নেই, না? আমি আসতে পারব না—তুমি কিছু মনে কোরো না।

মঞ্জু অপলক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ নিধুর মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। তাহার পদ্মের পাপড়ির মতো ডাগর চোখ দুটি বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। নিধুর কথার সে কোনো জবাব দিল না—হঠাৎ যেন সব কাজে সে উৎসাহ হারাইয়া ফেলিল—জ্যাম জেলির শিশি-বোতল অগোছালো ভাবে ইতস্তত পড়িয়াই রহিল—তাহার মধ্যে ভরসাহারা ক্ষুদ্র বালিকার মতো মঞ্জু বসিয়া চোখের জল ফেলিতেছে—ছবিটা চিরকাল নিধুর মনে গাঁথিয়া গিয়াছিল।

নিধু বলিল—ওঠ মঞ্জু, আমার ভুল হয়ে গিয়েচে—আর কিছু বলব না।

মঞ্জু জলভরা চোখে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—আসবেন তো ওবেলা—এখানে কিন্তু খাবেন।

—খাওয়ানোর লোভে তোমার নিধুদা ভুলবে ভেবেচ তুমি? অমন লোক পাও নি—

—আমি কি তাই ভাবচি? গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধান আপনি—

—আমি এখন আসি; ওবেলা আবার আসব—

—না বসুন, এখুনি গিয়ে কি করবেন? আপনাদের বন্ধ হবে কবে?

—এখনো চোদ্দ-দিন বাকি, মহালয়ার দিন থেকে বন্ধ হবে শুনচি—

—কোর্ট বন্ধ হলে এখানে চলে আসবেন তো?

—ঐ যে বললাম, নয় তো আর যাব কোথায়। বড়লোক নই যে হিল্লি-দিল্লি-মক্কা যাব। এই বাঁশবনেই কাটল চিরকাল, এই বাঁশবনেই আসতে হবে।

—এক কালে বড়লোক হবেন তো, তখন কোথায় যাবেন?

—আমি হব বড়লোক! তবেই হয়েচে! তুমি হাসালে দেখচি মঞ্জু!

মঞ্জু গম্ভীর ভাবে বলিল—কে বলেচে আপনি বড়লোক হবেন না? আমি বলচি দেখবেন আপনি খু—উ—ব বড়লোক হবেন।

—তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক মঞ্জু—

—তা যদি হয়, আজকের দিনের কথা আপনার মনে থাকবে? দাঁড়ান আজ কি তারিখ, ক্যালেণ্ডারটা দেখে আসি ওঘর থেকে—

কথা শেষ করিয়াই মঞ্জু লঘুগতি হরিণীর মতো ত্রস্তভঙ্গিতে ছুটিয়া গেল পাশের ঘরে—এবং তখনি হাসিমুখে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—আপনার ডায়েরী আছে? লিখে রাখবেন গিয়ে সতেরোই সেপ্টেম্বর—আমি বলেছিলুম আপনি বড়লোক হবেন—আমি, মঞ্জরী দেবী—

নিধু হাসিতে-হাসিতে বলিল—বয়েস ষোলো, সাকিন কুড়ুলগাছি মহকুমা রামনগর—থানা—ওই—পিতার নাম শ্রীযুক্ত বাবু লালবিহারী—

মঞ্জু খিল-খিল করিয়া হাসিতে-হাসিতে বলিল—থাক, থাক—ওকি কাণ্ড! বাবারে আপনি এতও জানেন! আমি ভাবি নিধুদা বড় ভালোমানুষ, নিধুদা আমাদের মোটে কথা বলতে জানে না। নিধুদা দেখচি কথার ঝুড়ি।—

—কথার ঝুড়ি না হলে কি মোক্তার হয় মঞ্জু? তবে আর ব্যবসাতে উন্নতি করব কি করে বড়লোকই বা হব কি করে বল!

—আচ্ছা, যদি বড়লোক হন, আমার কথা মনে থাকবে?

হঠাৎ তাহার মুখ হইতে তরল কৌতুকের হাসি অপসৃত হইল—চোখের কোণে বেদনার ছায়াপাতে মুখখানি অপরূপ ব্যথাভরা লাবণ্যে ও শ্রীতে মণ্ডিত হইয়া উঠিল—এক মুহূর্তে যেন মনে হইল এ মঞ্জু ষোড়শী বালিকা নয়, বহুযুগের প্রৌঢ়া জ্ঞানময়ী, বহু অভিজ্ঞতা ও বহু-ক্ষয়-ক্ষতি-দ্বারা লব্ধশক্তি পুরাতন নারী—বালিকা হইয়া আজ আসিয়াছে যে, সে ইহার নিতান্তই লীলা—আরও কতবার এইভাবে আসিয়াছে।

নিধু মুগ্ধ হইয়া গেল, তাহার বুকের মধ্যে যেন কেমন করিয়া উঠিল। মঞ্জুকে সে আর খোঁচা দিয়া কথা বলিবে না, বালিকার মনে কেন সে মিছামিছি কষ্ট দিতে গিয়াছিল? মঞ্জু চপলা বটে, কিন্তু সে গভীর, সে ধীর বুদ্ধিমতী, অতলস্পর্শ তাহার মনের রহস্য। এতদিন সে মঞ্জুকে ঠিক চিনতে পারে নাই। নিধু কোনো কথা বলিতে পারিল না, কথার সে উত্তর দিতে পারিল না। জীবনে এমন সময় আসে, এমন মুহূর্তের সন্ধান মেলে—যখন কথা মুখ দিয়া বাহির হইলেই মনে হয় এই অপরূপ মুহূর্তটির জাদু কাটিয়া যাইবে, ইহার পবিত্রতায় ব্যাঘাত ঘটিবে। তাহার বুকের মধ্যে কিসের যেন ঢেউ উপরের দিকে ধাক্কা দিতেছিল—সেটাকে আর একটু প্রশ্রয় দিলেই সেটা কান্নারূপে চোখ দিয়া গড়াইয়া সব ভাসাইয়া ছুটিবে।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ—নিস্তব্ধতা যে একটা মনোরম মায়া সৃষ্টি করিয়াছে এই ঘরের মধ্যে—তা যত কম সময়ের জন্যেই হোক না কেন, কেহ চাহে না যে আগে কথা বলিবার রূঢ় আঘাতে তাহা ভাঙিয়া দেয়।

এমন সময় হঠাৎ ঘরে ঢুকিলেন নিধুর মা।

—হ্যাঁরে, ও নিধু—এখানে বসে? মঞ্জু মা কি করচ শিশি-বোতল নিয়ে? ওগুলো কি মা?

—আসুন, আসুন, জ্যাঠাইমা—সকালে যে!

—তোমাদের পুজোর পাটাপাতা দেখতে এলাম—তা এত সকালে পাটা পাতলে যে

তোমরা! এখনো তো পুজোর সতেরো দিন বাকি—

—তা তো জানিনে জ্যাঠাইমা, পুরুতমশাই কাল নাকি কাকাকে বলে গিয়েচেন—

—দিদি কোথায় দেখচিনে যে?

—মা? ওপরের ঘরে পুজো করচেন বোধ হয়—ডাকব?

—না, না, মা পুজো করচেন, ডাকতে হবে কেন—থাক। আমি এমনি দেখতে এলাম—

—জ্যাঠাইমা, একটু চা খাবেন না?

—না মা, আমি এখনো নাই নি-ধুই নি—বেলা হয়ে গেল। এইবার নাইতে যাব গিয়ে। নিধু থাকবি নাকি না আসবি?

মঞ্জু হাসিয়া বলিল—জ্যাঠাইমা, নিধুদা যেন আপনার ছোট্ট খোকাটি, ওকে কোথাও ছেড়ে দিয়ে ঠাণ্ডা থাকতে পারেন না, বাইরে-কোথাও দেখলে সঙ্গে করে বাড়ী নিয়ে যেতে হবে!

নিধু সলজ্জমুখে বলিল—তুমি যাও না মা, আমি যাব এখন। নিধুর মা কিন্তু তখনি চলিয়া গেলেন না, তিনি আরও আগাইয়া আসিয়া বলিলেন—ওগুলো কিসের শিশি-বোতল মা? খালি আছে?

—এগুলো জ্যাম-জেলি—ইয়ে—আচারের-মোরোব্বার শিশি—জ্যাঠাইমা, বর্ষায় খারাপ হয়ে গিয়েছিল তাই বেছে রাখছিলাম—

—আমি ভাবলাম বুঝি খালি আছে।

—কি হবে খালি শিশি? দরকার জ্যাঠাইমা?

—এই জিনিসটা পত্তরটা রাখতে—এসব জায়গায় তো পাওয়া যায় না—বেশ শিশিগুলো—

নিধু সঙ্কোচে এতটুকু হইয়া গেল। সে বুঝিল রঙচঙ্‌ওয়ালা শিশিগুলি দেখিয়া মা'র লোভ হইয়াছে—মেয়েমানুষের কাণ্ড! তা দরকার থাকে, এখানে চাহিবার দরকার কি? মাকে লইয়া আর পারা যায় না! ঘটে যদি কিছু বুদ্ধি থাকে এদের!

মঞ্জু শশব্যস্ত হইয়া বলিল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, জ্যাঠাইমা—শিশির দরকার? আমি ভালো শিশি এনে দিচ্চি। বিলিতি জেলির খালি বোতল আছে মা'র ঘরে দোতলায়। আমি আসচি এখুনি—বসুন জ্যাঠাইমা।

মঞ্জু ঘর হইতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরেই দুটি সুদৃশ্য লেবেলমারা খালি বোতল আনিয়া নিধুর মা'র হাতে দিয়া বলিল—এতে হবে জ্যাঠাইমা?

নিধুর মা বোতল দুটি হাতে পাইয়া যেন স্বর্গ পাইলেন এমন ভাব দেখাইয়া বলিলেন—খুব হবে মা, খুব হবে। আশীর্ব্বাদ করি বেঁচে-বর্ত্তে থাক—রাজরানী হও মা—আমি আসি তাহলে এবেলা—

নিধুও মায়ের পিছু-পিছু বাড়ী আসিল। বাড়ীতে পা দিয়াই সে একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া মাকে বলিল—আচ্ছা, মা, তোমার কি একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই? কি বলে দুটো

খালি বোতল ভিক্ষে করতে গেলে ও-বাড়ী থেকে ? তোমার এই মাগুন্‌তুড়ে স্বভাবের জন্যে আমার মাথা হেঁট হয় তোমার সে জ্ঞান আছে ? ছিঃ-ছিঃ—এতটুকু কি কাণ্ডজ্ঞান ভগবান দেন নি ?

নিধুর মা বুঝিতে না পারিয়া বিস্ময়ের সুরে বলিলেন—ওমা, তা তুই আবার বকিস কেন ? কি করেচি আমি !

—তোমার মুণ্ডু করেচ, নেও—এখন শিশিবোতল সাজিয়ে রেখে ঘরে ধুনো দেও। ওতে তোমার কি মালমসলা, অপরূপ সম্পত্তি থাকবে শুনি ?

—তুই তার কিছু বুঝবি ? লবঙ্গ, ধনের চাল, হল গিয়ে গোটার গুঁড়ো কত কি রাখা যায় ! কেমন চমৎকার বোতল দুটো ! এখানে কোথায় পাবি ওরকম ?

নিধু আর কিছু বলিল না। মাকে বুঝাইয়া পারা যাইবে না—নিতান্ত সরলা, নিধুর লজ্জা যে কোথায়—তাহা তিনি বুঝিবেন না।

জগোঠাকরুণ পুকুরঘাটে নিধুর মাকে বলিলেন—বলি বড় বাড়ীর পুজোর কতদূর, ও নিধুর মা ?

—পিরতিমে গড়ানো হচ্ছে—আজ পাটা পাতা হল ওবেলা—

—পাটা এখন আবার কে পাতে ? বিধেন দিলে কে গা ?

—কি জানি—তবে মঞ্জু বলছিল ওদের ভটচাজ্জি দিয়েচেন। আমিও ওকথা বলেছিলাম ওবেলা।

—হ্যাঁগা নিধুর মা, একটা কথা শুনলাম, কি সত্যি ? নাকি মেয়ে-পুরুষে মিলে থিয়েটার করবে ? ওদের বাড়ীর মেয়েরা আর ওই ভুবন গাঙ্গুলির মেয়ে হৈম, তোমাদের নিধু—আরও নাকি কে-কে ?

—তা তো দিদি বলতে পারলাম না—আমি কিছু শুনি নি—

বাস্তবিকই নিধুর মা একথার কিছুই জানিতেন না ?

জগোঠাকরুণ বলিতে লাগিলেন—আর কি সেদিন আছে গাঁয়ের ! ছোটঠাকুরের প্রতাপে এক সময়ে এ গাঁয়ে যা খুশি করে পার পাবার উপায় ছিল না—তা সবাই গেল মরে হেজে—এখন টাকা যার, সমাজ তার। নইলে এ সব খিরিস্টানি কাণ্ড কি হতে পারত কখনে এখানে ? আমি ভুবনকে আচ্ছা করে শুনিয়ে দিইচি ওবেলা। বললাম—মেয়েকে যে থিয়েটার করতে দিচ্চ ওরা না হয় জজ মেজেস্টার লোক, টাকার জোরে তরে যাবে—তোমার মেয়ের কুচ্ছো রটলে যদি শ্বশুরবাড়ী থেকে না নেয় ?

—ভুবন ঠাকুরপোকে বললেন ?

—কেন বলব না শুনি ? জগোঠাকরুণ—কারো এক চালে বাসও করে না, কাউকে কুকুরের মতো খোশামোদও করে বেড়ায় না—কারো কাছে কোনো পিত্যেশ রাখি নে কোনোদিন—

শেষের কথাটা নিধুর মাকে লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় বলা—কিন্তু নিধুর মা তাহা বুঝিতে

পারিলেন না—খুব সূক্ষ্ম উক্তি বা একটু বাঁকা ধরনের কথাবার্ত্তা হইলে নিধুর মা তাহা আর বুঝিতে পারেন না।

কথাটা তিনি নিধুকে আসিয়া বলিলেন। নিধু বৈকালের দিকে মঞ্জুদের বাড়ী গেল মঞ্জুর বাবাকে দেখিতে—কারণ তাঁহার রক্তের চাপ হঠাৎ বৃদ্ধি হওয়ায় দুপুরের পর হইতেই তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন—সেখানে গিয়া দেখিল মঞ্জু বাবার ঘরের বাহিরে দোতলার বারান্দাতে বসিয়া সেলাই করিতেছে। নিধুকে দেখিয়া বলিল—আস্তে-আস্তে নিধুদা, বাবা এবার একটু ঘুমিয়েচেন। চলুন আমরা নিচে যাই বরং—

—একবার ওঁকে দেখে যাব না?

—এখন থাক। ঘুম যদি সন্দের আগে ভাঙে, তবে দেখতে আসবেন এখন। সিঁড়িতে নামিবার সময় নিধু মায়ের কাছে যাহা শুনিয়াছিল, সব বলিল। মঞ্জু শুনিয়া বিশেষ আশ্চর্য্য হইল না, বলিল—হৈমদি নিজেই একথা তো ওবেলা বলে গেল। আমরা যদি পুরুষ না নিই—তবুও তাঁরা বাড়ীতে করতে দেবেন না?

—তাও বলতে পারি নে—আপত্তি যদি করে তাতেও করতে পারে—

বলিতে-বলিতে হৈমের গলা শোনা গেল, বাহির হইতে ডাকিতেছে—ও মঞ্জু ও নৃপেন—

মঞ্জু ছুটিয়া আগাইয়া লইয়া আসিতে গেল। এবেলাও হৈম খুব সাজগোজ করিয়া মুখে ঘন করিয়া পাউডার মাখিয়া, চুলে ফ্যান্সি খোপা বাঁধিয়া ও ফুল গুঁজিয়া আসিয়াছে। বাড়ী ঢুকিয়াই সে বলিল—নিধুদা আসে নি?

—এসে বসে আছেন। এস দালানে হৈমদি—

—আজ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রিহার্স্যাল দিতে হবে কিন্তু—

—শোনেন নি হৈমদি, বাবার বড় অসুখ যে—

হৈম বিস্ময়ের সুরে বলিল—জ্যাঠামশায়ের অসুখ? কি অসুক?

—ব্লাড প্রেসার বেড়েচে—ওই নিয়েই তো ভুগচেন। তাই আজ আর রিহার্স্যাল হবে না।

—না, তা আর কি করে হবে! এখন কেমন আছেন উনি?

—এখন একটু ভালো। এসব কলকাতার রোগ হৈমদি, পাড়াগাঁয়ে এসব নেই বলে মনে হয় আমার।

হৈম একটু পরেই বলিল—তাহলে আজ যাই মঞ্জু—আমি—

হঠাৎ মঞ্জুর মনে পড়িয়া গেল কথাটা। বলিল—হৈমদি, তোমার বাবা কিছু বলেচেন নাকি তোমায় এ বিষয়ে?

—কি বিষয়ে?

—এই থিয়েটার করা নিয়ে।

—তা তিনি বলতে পারেন না। আমার শ্বশুরবাড়ী থেকে আপত্তি না করলেই হল। আমি ওসব মানিনে—

—সে কথা নয় হৈমদি—গাঁয়ের কে এক বুড়ি (নিধু নাম বলিয়া দিল)—হ্যাঁ সেই

জগোঠাকরুণ আপনার বাবাকে কি সব বলেচেন। পুরুষের সঙ্গে মিশে থিয়েটার করলে বা এমনিই থিয়েটার করলে তোমার মেয়ের বদনাম রটবে।

হৈম তাচ্ছিল্যের সুরে বলিল—ওঃ, এই কথা! ও আমি গ্রাহ্যি করি নে। আমি যা খুশি করব—তাতে বাবা পর্য্যন্ত কি বললে শুনচি নে তো জগোঠাকরুণ! আচ্ছা এখন তাহলে আসি—

—বা রে, চা খেয়ে যান হৈমদি—

—না ভাই, আর একদিন এসে খাব। নিধুদা আমায় একটু এগিয়ে দাও না? নিধু মঞ্জুকে বলিল—বস মঞ্জু, আমি ওই তেঁতুল-তলার মোড় পর্য্যন্ত হৈমকে এগিয়ে দিয়ে আসচি—

পথে পড়িয়া হৈম বলিল—তুমি থিয়েটার করবে তো নিধুদা?

—আমার আর করা হয় হৈম? গাঁয়ের মধ্যে যদি কথা ওঠে এ নিয়ে—

—ওঃ, ভারি কথা। তুমি না করলে আমিও করব না নিধুদা, তুমি আছ তাই করচি।

নিধু আশ্চর্য্য হইয়া হৈমর মুখের দিকে চাহিল। হৈম বলে কি!

হৈম পুনরায় বলিল—আমার কথা মনে হয় নিধুদা? বল না নিধুদা—

নিধু একটু বিব্রত হইয়া পড়িল। হৈমর এ সব কথায় সে কি উত্তর দিবে?

হৈম একটু গায়ে-পড়া ধরনের মেয়ে তাহা সে পূর্ব্বেই জানিত। ভাবিয়াছিল, আজকাল বিবাহ হইয়া ও বয়স হইয়া বোধ হয় সারিয়া গিয়াছে। এখন দেখা যাইতেছে তা নয়।

পরে মুখে বলিল—হ্যাঁ—তা মনে হত না কি আর? গাঁয়ের মেয়ে—ছোটবেলা থেকে দেখে আসচি—

—আজ সন্দেবেলা আমাদের বাড়ী এস না কেন নিধুদা—ওখানে চা খাবে—বেশ গল্প করা যাবে এখন—

—আমি চা তো খাইনে হৈম—তা ছাড়া সন্দেবেলা মঞ্জুদের বাড়ী থিয়েটার সম্বন্ধে হেস্তনেস্ত একটা করে ফেলতে হবে, যাই কি করে?

—কাল আসবে? না—ও, কাল তো তুমি চলেই যাবে। কাল দিনটা নাই বা গেলে নিধুদা?

কি বিপদ! ইহার এত জোর আসিল কোথা হইতে? নিধু বলিল—না গেলে চলে হৈম? কত দরকারি কেস সব হাতে রয়েচে। যেতেই হবে।

হৈম অভিমানের সুরে বলিল—আমার কথা রাখবে কেন? মঞ্জুর কথা হত তো রাখতে—

আচ্ছা, সামনের শনিবার এসে তোমাদের ওখানে যাব, হৈম।

হৈম হাসিয়া নিধুর দিকে চাহিয়া বলিল—ঠিক যাবে তো? তাহলে কথা রইল কিন্তু। এ গাঁয়ে এসে আমার মন মোটে টেকে না নিধুদা—মোটে মিশবার মানুষ নেই—আমি চিরকাল গোয়াড়ী স্কুলে থেকে পড়েচি—জানো তো? আমি গাঁয়ে এসে যেন হাঁপিয়ে উঠি—একটু আমোদ নেই, আহ্লাদ নেই—এমন একটা লোক নেই, যার সঙ্গে দুদণ্ড কথা বলে সুখ হয়। তবুও মঞ্জুরা এসেছিল, ওরা শহরের মেয়ে, আমোদ করতে জানে। ও-ই বলচে থিয়েটার

করবে—আমার ওতে ভারি উৎসাহ। সময়টা তো বেশ কাটবে? তাই আমি—তুমি থাক—আমার বেশ ভালো লাগে—হৈম নিধুর দিকে অপাঙ্গ দৃষ্টিতে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল। বলিল—সত্যি কিন্তু আসবে সামনের শনিবারে নিধুদা, আমার মাথার দিব্যি—সেদিন কিন্তু আমাদের বাড়ীতে চা খাবে—

—চা আমি খাই নে হৈম—

—চা না খাও, খাবার খেও। আর আমরা গল্প করব, ঠিক রইল কিন্তু—

—থিয়েটার তাহলে তুমি করবে। কিন্তু জগোঠাকরুণ কি বলেচে আজ মা'র কাছে শুনেচ তো?

—বলুক গে। আমি ওসব মানি নে। আমার শ্বশুরবাড়ী তেমন নয়—কেউ কিছু বলবে না।

—সে তুমি বোঝ, আমার কানে কথাটা উঠেচে যখন তোমাদের কাছে বলা আমার উচিত। মঞ্জুদের কেউ কোনো দোষ ধরবে না, কেন না ওরা হল বড়লোক—ওরা এখানে থাকবেও না। ওদের কে কি করবে?

—আমারও কেউ কিছু করতে পারবে না। জীবনে ফুর্তি আমোদ করব না, আহ্লাদ করব না—মুখ বুজিয়ে বসে থাকব এই অজ পাড়াগাঁয়ের মধ্যে, সে আমার দ্বারা হবে না।

—আচ্ছা, তুমি এস হৈম—

—কোথায় যাবে এখন? মঞ্জুদের বাড়ী?

—না বেলা হয়েচে—এখন বাড়ী যাব।

—ওবেলা যাবে ওখানে—তাহলে আমিও আসি।

নিধু মনে-মনে বিরক্ত হইলেও বলিল—তার এখন কিছু ঠিক নেই—আসতেও পারি। এখন বলতে পারি নে—

বৈকালের দিকে নিধু ভাবিল সে মঞ্জুদের বাড়ী যাইবে কিনা। মন সেখানে যাইবার জন্যই উন্মুখ হইয়া আছে যেন। অথচ বেশ বোঝা যাইতেছে সেখানে আর তাহার যাওয়া উচিত নয়। বেলা পড়িয়া আসিল—তবুও নিধু ইতস্তত করিতে লাগিল—এবং তারপরই সে হঠাৎ কিসের টানে সব কিছু দ্বিধা ভুলিয়া কখন উহাদের বাড়ীর দিকে রওনা হইল।

মঞ্জুদের বৈঠকখানার কাছে গিয়া মনে হইল—আজ মঞ্জু তাহাকে ডাকিয়া পাঠায় নাই তো! অথচ রোজই ডাকিয়া পাঠায়। মনের মধ্যে কোথা হইতে অভিমান আসিয়া জুটিল। নিধু আর মঞ্জুদের বাড়ী না ঢুকিয়া গ্রামের বাহির রাস্তার দিকে বেড়াইতে গেল।

পূজার আর বেশি দেরি নাই। আকাশে বাতাসে যেন আসন্ন শারদীয়া পূজার আভাস, আকাশ মেঘমুক্ত, সুনীল—পাকা রাস্তার ধারে ঝোপে-ঝোপে মটরলতায় থোকা-থোকা ফল ধরিয়াছে—আউশ ধান কাটা হইয়া গিয়াছে—আমন ধানের নারাল খেত ভিন্ন মাঠ প্রায় শূন্য। পনেরোদিন বৃষ্টি হয় নাই—গুমট্ গরম, কোনোদিকে একটু হাওয়া নাই।

একটা সাঁকোর উপর বসিয়া নিধু ভাবিতে লাগিল—মঞ্জু আজ তাহাকে কেন ডাকিল না?

ওবেলা তাহার কথাবার্ত্তায় হয়তো মনে দুঃখ পাইয়াছে। শিশিবোতলের মাঝখানে উপবিষ্ট মঞ্জুর ভরসাহারা করুণ মুখের ছবি মনে আসিল। মঞ্জুকে সে কোনো দুঃখ দিবে না। এ ব্যাপার লইয়া আর কোনো কথা সে মঞ্জুকে বলিবে না।

কিন্তু রবিবার তো ফুরাইয়া আসিল। সন্ধ্যার দেরি নাই। আর কতক্ষণ? সত্যিই কি সে মঞ্জুদের বাড়ী দেখা করিতে যাইবে না? তাহা হয় না। এখন গেলে তবুও রাত নটা পর্য্যন্ত থাকিতে পারিবে। নয় তো আবার সাতদিন অদর্শন। থাকা অসম্ভব তাহার পক্ষে।

নিজের বাড়ীর সামনে আসিয়া নিধু ইতস্তত করিতেছে—এমন সময় সে দেখিল মঞ্জু এবং তাহার পিসতুতো বৌদিদি ওদিকের পথ দিয়া আসিতেছে। নিধুকে দূর হইতে দেখিয়া মঞ্জু বলিল—ও নিধুদা, দাঁড়ান—

নিধু বলিল—তোমরা কোথাও গিয়েছিলে নাকি, মঞ্জু?

—আমি আর বৌদি হৈমদির বাড়ী, আর ওদের পাশে পরেশকাকাদের বাড়ী বেড়াতে গিয়েছিলাম যে। সেই কখন বেলা দুটোর সময় গিয়েচি—আসব-আসব করচি—কিন্তু হৈমদি'র মা চা খাবার না খাইয়ে ছাড়লেন না—তাই একেবারে সন্দে হয়ে গেল।

—তা তো জানি নে—ও!

—আপনি গিয়েছিলেন আমাদের বাড়ী?

—আমি একটু বেড়িয়ে ফিরচি—তোমাদের ওখানে যাওয়া হয় নি—

—আমিও ভাবচি নিধুদা এসে কি বসে আছে? আরও তাড়াতাড়ি করচি। জিগ্‌গেস করুন বৌদিকে—না বৌদি?

মঞ্জুর বৌদিদি বলিলেন—হ্যাঁ, ও তো অনেকক্ষণ থেকে আসবার ঝোঁক করচে—তা একজনের বাড়ী গেলে কি তক্ষুনি আসা ঘটে? বিশেষ কখনো যখন যাই নে—

মঞ্জু বলিল—আসুন নিধুদা, চলুন আমাদের বাড়ী—

নিধুর অভিমান অনেক আগেই কাটিয়া গিয়াছিল। মঞ্জু যে আজ তাহাকে ডাকিয়া পাঠায় নাই, তাহার সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত কারণ বিদ্যমান।

বাড়ীতে পৌঁছিয়া মঞ্জু বলিল—কি খাবেন বলুন নিধুদা—

মঞ্জুকে আজ ভারি সুন্দর দেখাইতেছে। নিজের বাড়ীতে বসিয়া থাকে বলিয়া মঞ্জু কখনো সাজগোজ করে না—আজ পাড়ায় বেড়াইতে বাহির হইয়াছে বলিয়া সে চওড়া শাদা জরির পাড় বসানো চাঁপা রঙের ভালো সিল্কের শাড়ী ও ফিকে গোলাপী রঙের ব্লাউজ পরিয়াছে—কপালে টিপ, চমৎকার ঢিলে খোঁপা বাঁধিয়াছে—পায়ে মাদ্রাজি স্যাণ্ডেল—খুব মৃদু এসেন্সের সৌরভ তাহার চারিপাশের বাতাসে। মুখশ্রীতে প্রগল্‌ভতা নাই, অথচ বুদ্ধি ও আনন্দের দীপ্ত সজীব ভঙ্গি তাহার মুখে, হাত-পা নাড়ার ভঙ্গিতে, কথা বলিবার ধরনে।

নিধু আমতা-আমতা করিয়া বলিল—তা—যা খাওয়াবে—

—আপনার জন্যে কি খাবার করে রেখেছিলাম জানেন? বলুন তো?

নিধু বিস্মিত কণ্ঠে বলিল—আমার জন্যে?

—হ্যাঁ, আপনার জন্যেই। নিমকি ভেজেছিলুম নিজে বসে, দুপুরের পর একঘণ্টা ধরে। বৌদি বেলে দিলে আমি ভাজলাম—গরম গরম দেব বলে আপনাকে ডাকতে পাঠাচ্ছি নৃপেনকে—এমন সময় হৈমদির মা, হৈমদি সবাই এলেন ওঁদের বাড়ী নিয়ে যেতে—

—ও, ওঁরা এসেছিলেন বুঝি ?

—তবে আর বলচি কি ? এসে কিছুতেই ছাড়লেন না—যেতে হবে। মা বললেন—তবে তুই যা, আমি নিধুকে ডেকে খাওয়াব এখন। আমি বললাম—তা হবে না মা। আমি ফিরে এসে ডেকে পাঠাব।

—এত কথা কিছুই জানি নে আমি।

—কি করে জানবেন ? একবার ভাবলাম আপনাদের বাড়ী হয়ে যাই—কিন্তু ওঁরা সব ছিলেন—হৈমদি কিন্তু বলেছিল—

—কি বলেছিল হৈম ?

—হৈমদি বললে নিধুদাকে ডেকে নিয়ে গেলে হত। ওর মা বারণ করলেন।

—হৈমর মা বারণ করে ঠিকই করেচেন। হৈম শহরে-বাজারে কাটিয়েচে, পাড়াগাঁয়ের ব্যাপার ও কিছু বোঝে না। মেয়েরা যাচ্ছে বেড়াতে, তার মধ্যে একজন পুরুষমানুষ সঙ্গে যাওয়া—লোকে কি বলবে ?

মঞ্জুর উপর অভিমানের বিন্দুমাত্রও এখন আর নিধুর মনে নাই বরং মঞ্জুর স্নেহে ও প্রীতিতে অযথা সন্দেহ করার দরুন নিধু মনে-মনে যথেষ্ট লজ্জিত ও দুঃখিত হইল। মঞ্জু বলিল—বসুন, নিমকি নিয়ে আসি গরম করে, ঠাণ্ডা হয়ে গেছে খেতে পারবেন না।

—শোনো-শোনো, অত-শত করে কাজ নেই—যা আছে তাই ভালো।

মঞ্জু কিন্তু কিছুক্ষণ বিলম্ব করিয়াই গরম-গরম নিমকি আনিয়া দিল নিধুকে। বলিল—আমার ভারি মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল নিধুদা, আপনাকে না খাওয়াতে পেরে। ভাবলাম সন্দে হয়ে গেল—আপনার সঙ্গে আর কখনই বা দেখা হবে! সকালে উঠে তো চলেই যাবেন—

নিধু হাসিয়া বলিল—সত্যি বলতে গেলে আমার রাগ হয়েছিল তোমার ওপর—

—কেন, কি অপরাধ হল ?

—রোজ বিকেলে ডাকতে পাঠাও, আজ কেউ গেল না ডাকতে। আমি বড় রাস্তার দিকে বেড়াতে বার হলাম—

মঞ্জু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল—ওইখানে আপনার দোষ। আমাদের পর ভাবেন কিনা তাই না ডাকলে আসেন না—

—সে জন্য নয় মঞ্জু, তোমরা বড়লোক, যখন তখন ঢুকতে ভয় করে—

—ওই ধরনের কথা শুনলে আমার কষ্ট হয় বলেচি না ?

—মঞ্জু, তুমি আমায় ক্ষমা কর। ওবেলা তোমার মনে বড় কষ্ট দিয়েচি চোখের জল ফেলিয়েচি। সেই থেকে আমার মন মোটেই ভালো নেই! তুমি ছিলে কোথায় আর

আমি ছিলাম কোথায়, এতদিন তোমার নামও জানতাম না। কিন্তু আলাপ হয়ে পর্য্যন্ত তোমাকে আর পর বলে মনে হয় না। তাই এমন কথা বলে ফেলি যা হয়তো পরকে বলা যায় না। তুমি জজবাবুর মেয়ে বলে তোমায় সবাই সমীহ করে চলবে—কিন্তু আমি ভাবি ও তো মঞ্জু।

মঞ্জু চুপ করিয়া রহিল।

সে কিছুক্ষণ যেন আপন মনে কি ভাবিল। পরে ধীরে ধীরে বলিল—কিছু মনে করি নি নিধুদা, আপনিও কিছু মনে করবেন না। ও কথা আর তুলবেন না।

তাহার কণ্ঠস্বর ঈষৎ বেদনাক্লিষ্ট। অল্পক্ষণ পূর্ব্বের সে হালকা সুর আর তাহার কথার মধ্যে নাই।

নিধু অন্য কথা পাড়িবার জন্য জিজ্ঞাসা করিল—তাহলে কি প্লে করা ঠিক করলে এবার ?

মঞ্জু যেন নিধুর প্রশ্ন শুনিতে পাইল না—সে অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছে। তাহার পর হঠাৎ নিধুর মুখের দিকে ব্যথাম্লান ডাগর চোখের পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—নিধুদা, আমার কথা বিশ্বাস করবেন ?

—কি, বল ?

—আপনার জন্যে আমার মন কেমন করে, আপনি এখান থেকে চলে গেলেই—

নিধু কি একটা বলিতে যাইতেছিল, মঞ্জু বাধা দিয়া বলিল—আরও জানেন, ছ-শনিবার আপনি আসেন নি, ভেবেছিলুম আপনাকে চিঠি লিখে দিই আসবার জন্যে—কিন্তু বাড়ীর কেউ সেটা পছন্দ করত না বলে কিছু করি নি—

—আমার সৌভাগ্য মঞ্জু—কিন্তু সেই জন্যেই মনে হয় আর তোমার সঙ্গে মেশা উচিত নয় আমার—

—কিছু ভাববেন না, নিধুদা। আমি ছেলেমানুষ নই—কষ্ট করতে পারব জীবনে। ও জিনিস কষ্টের জন্যেই হয়। আপনি আশীর্ব্বাদ করবেন যেন সহ্য করতে পারি—

নিধুর মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। তেঁতুলগাছে সন্ধ্যার অন্ধকারে বাদুড়দল ডানা ঝটাপট করিতেছিল। সম্মুখে আঁধার রাত।

বাড়ী হইতে ফিরিতে নিধুর দেরি হইয়াছিল। বাসায় তালা খুলিতেছে, এমন সময় বিনোদ মুহুরী আসিয়া বলিল—বাবু, এত দেরি করে ফেললেন ? প্রায় দশটা বাজে—কেস আছে।

—মক্কেল কোথায় ?

—কোর্টের অশথতলায় বসিয়ে রেখেছি—তা আপনি এত বেলা করে ফেললেন।

—চল যাই। এজাহার করিয়ে দিতে হবে ?

—হ্যাঁ, বাবু। আমি তাহলে যাই—বেহাত্তি হয়ে যাবে। হরিহর নন্দীর দালাল ঘুরচে। আমি ছুটে দেখতে এলাম আপনি এলেন কিনা বাড়ী থেকে—

—টাকা দেবে ?

—দু-টাকা দেবে কথা হয়েচে—

—তবে তো ভারি মক্কেল ধরেচ দেখচি—হরিহর নন্দী দু-টাকায় এজাহার করবে ?

—বাবু, এক টাকাতেও করবে। আপনি জানেন না—সাধনবাবু আট আনায় করবে। ওই নিরঞ্জন-মোক্তার আট আনায় করবে—আপনার একটু নাম বেরিয়ে গিয়েচে—তাই। আমি যাই বাবু, সামলাই গিয়ে আগে—

পথে নিরঞ্জন-মোক্তারের সঙ্গে দেখা। নিধু বলিল—শুনেচ হে, মক্কেল একে নেই—তার ওপর দালালে বোধ হয় ভাঙিয়ে নেয়—তাই ছুটচি—

নিরঞ্জন হাসিয়া বলিল—ছুটো না হে, বিনোদ যতটা বলেচে অতটা নয়। কেউ কারো মক্কেল ভাঙয়ে না ওভাবে।

—কি করে জানব—বিনোদ বললে তাই শুনলাম—

—হরিহরবাবু দালাল লাগিয়ে তোমার-আমার দু-টাকার মক্কেল ভাঙিয়ে নেবেন—সে লোক তিনি নন। ছুটো না, হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবে—আস্তে আস্তে চল।

না ভাই, বিশ্বাস নেই কিছু। মক্কেল বেহাতি হয়ে গেলে তখন কেউ দেখবে না—আমি এগুই—

না, মক্কেল ঠিক হাতেই আছে, বিনোদ দাঁত বাহির করিয়া আসিয়া জানাইল। নিরঞ্জন অল্পক্ষণ পরে কোর্টের প্রাঙ্গণে পৌঁছিয়া বলিল—কি হে হাঁপাচ্চ যে। মক্কেল পেলে ?

—হ্যাঁ ভাই—

—ওসব মুহুরীদের চালাকি। কোথায় যাবে মক্কেল ? মুহুরীরা কাজ দেখাচ্চে তোমার কাছে। নিজের বাহাদুরী করবার সুযোগ কি কেউ ছাড়ে ?

সাধন-মোক্তার দূর হইতে নিধুকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন—ও নিধিরাম, বাড়ী থেকে এলে কখন ? ভালো সব ? শোনো—

—কি বলুন সাধনবাবু—

—ওহে ইণ্টারভিউ-লিস্টে তোমার নাম উঠেচে দেখলাম যে! কে নাম দিলে হে ?

—তা তো জানিনে। তবে আমার মনে হয় সাবডেপুটিবাবু—উনিই এস. ডি. ও.-কে বলে করিয়েছেন।

—বেশ, বেশ—দেখে খুশি হলাম।

বেলা তিনটার সময় নিরঞ্জন গোপনে নিধুকে বলিল—একটা কথা আছে, বেরুবার সময় আমার সঙ্গে একা যাবে। জরুরী কথা। কাউকে সঙ্গে নিও না।

—কি এমন জরুরী কথা হে ?

—এখন বলব না। কে শুনে ফেলবে।

আরও আধঘণ্টা পরে দুজনে বাহির হইয়া চলিয়া যাইতেছে—এমন সময় বার-লাইব্রেরীর চাকর ফিরিঙ্গি আসিয়া বলিল—বাবু ছুটি তো এসে গেল—হামার বখশিস্ ? এবার পুজোতে

নিধিরামবাবুর কাছে ধুতি-টুতি নিবো। ফিরিঙ্গির বাড়ী ছাপরা জেলায়—আজ প্রায় চল্লিশ বছর রামনগরে আছে—কথাবার্তায় ও চালচলনে যতদূর বাঙালী হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব তাহা সে হইয়াছে। ফিরিঙ্গির ছেলে-মেয়েরা বড়-বড় হইয়াছে, তাহাদেরও বিবাহ হইয়া ছেলে-মেয়ে হইয়া গিয়াছে ; ফিরিঙ্গির বাড়ীর ছেলে-মেয়ে ভালো বাংলা বলে।

নিধিরাম বলিল—কেন, এত বড় বড় বাবু থাকতে আমার কাছে কেন রে ?

—আপনিও একদিন বড় হবেন বাবু। বার-লাইবিরিতে হামি আজ তিশ বছর নোকরি করছি, কত বাবু এল, কত বাবু গেল। ওই হরিবাবু নেংটি পিন্‌হে এসেছিল—আজকাল বড় সওয়াল-জবাব করনেওয়ালা। সব দেখনু, আপনারও হোবে নিধিরামবাবু। একটা ধুতি নিব আপনার কাছ থেকে -মেজিস্ট্রেটের সঙ্গে আপনার মোলাকাৎ হবে শুননু শনিবারে—

—তুই কোথা থেকে শুনলি রে ফিরিঙ্গি ?

—সব কানে আসে, বাবু, সব শুনতে পাই—

ফিরিঙ্গি হাসিতে-হাসিতে চলিয়া গেল। আর কিছু আগাইয়া নিরঞ্জন বলিল—তোমার সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেটের ইণ্টারভিউ আছে শনিবারে। তার জন্যে অনেকে তোমার ওপর বড় চটেচে হে—বিগ ফাইভদের মধ্যেও কেউ-কেউ আছেন। ওঁদের অনেকের নাম ইণ্টারভিউ লিস্টে নেই—অথচ তুমি জুনিয়ার মোক্তার তোমার নাম উঠল—ভয়ানক চটেচে অনেকে—

নিধু বিস্মিত হইয়া বলিল—তাতে আমার হাত কি হে! তা আমি কি করব!

—সবাই বলে, বড্ড হাকিমের খোশামোদ করে বেড়াও নাকি। চোখ টাটিয়েচে অনেকের। হাকিমে তোমার কথা বেশি শোনে আজকাল—এই সব। বিশেষ করে এই ইণ্টারভিউয়ের ব্যাপারে তুমি কি কারো কারো নাম দিতে বারণ করেছিলে ? এ সম্বন্ধে কোনো কথা হয়েছিল তোমার সুনীলবাবুর সঙ্গে ?

—আমি! আমার সঙ্গে পরামর্শ করবেন সাবডেপুটি বাবু! আমি বারণ করেছি নাম দিতে!

—অনেকের তাই ধারণা।

—কার-কার নাম দিতে বারণ করেচি ?

—এই ধর হরিহর নন্দীর নাম নেই, শিববাবুর নাম নেই—বড়দের মধ্যে। আর ছোটদের মধ্যে তো কারো নাম নেই—এক তুমি ছাড়া।

—তুমি বিশ্বাস কর আমি বারণ করেচি ?

—আমার কথা ছেড়ে দাও। আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কিছু আসবে যাবে না—কিন্তু বার-লাইব্রেরীর সবাই তোমার ওপর একজোট হলে তোমার বড্ড অসুবিধা হবে। মক্কেলের কানে মন্ত্র ঝাড়বে, জামিন পাবে না—নানাদিক থেকে গোলমাল—

—যদুকাকাও কি এর মধ্যে আছেন নাকি ?

নিরঞ্জন জিভ কাটিয়া বলিল—আরে রামোঃ—নাঃ। তা ছাড়া তিনি মানী লোক,

তিনি ইণ্টারভিউ লিস্টে প্রথম দিকে আছেন—কোনো ছ্যাচড়া কাজে তিনি নেই।

—আমি এর কিছুই জানি নে ভাই। সুনীলবাবু সেদিন বললেন, আপনার সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেটের ইণ্টারভিউ করিয়ে দেব—আমার ইচ্ছে ছিল না। উনি হাকিম মানুষ, অনুরোধ করলেন—কি করি বল। আর আমি দিয়েছি বারণ করে তাঁকে! নিজের জন্যেই বলি নি, অপরের জন্যে বারণ করতে গেলাম?

—আমায় বলে কি হবে ভাই? আমি তো চুনো-পুঁটির দলে। কথাটা কানে গেল তোমাকে বললাম। আমি বলেচি, কারো কাছে যেন বলো না হে—

সন্ধ্যার পর তাহার বাসায় হঠাৎ সাধন-মোক্তারকে আসিতে দেখিয়া নিধু একটু আশ্চর্য্য হইল। সাধন বলিলেন—এই যে বসে আছ নিধিরাম? বেড়াতে বার হওনি যে?

নিধু বুঝিল ইহা ভূমিকা মাত্র। আসল কথা এখনও বলেন নাই সাধন। অবশ্য অল্প পরেই তিনি তাহা প্রকাশ করিলেন। ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত তাঁহার ইণ্টারভিউ করাইয়া দিতে হইবে নিধিরামের। তাঁহার নামে যেন একখানা কার্ড আসে।

নিধু অবাক হইয়া গেল। সে সাধনকে যথেষ্ট বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে এ ব্যাপারের মধ্যে সে নাই। এ কি কখনো সম্ভব—সাধনবাবুর মতো প্রবীণ মোক্তার কি একথা ভাবিতে পারেন যে এস. ডি. ও. তাহার মতো একজন জুনিয়ার মোক্তারের পরামর্শ লইয়া লিস্ট তৈরি করিবেন? এসব কথা ভিত্তিহীন। তাহার কোনো হাত নাই, সে জানেও না কিছু। একথা সাধন কতদূর বিশ্বাস করিলেন তাহা বলা যায় না—বিদায় লইবার সময় বলিলেন—আর ভালো কথা, ওহে আমি আর একটা অনুরোধ তোমায় করচি, এই অঘ্রাণে এইবার শুভ কাজটা হয়ে যাক—তোমার আশাতে বাড়ীসুদ্ধ বসে আছে। বাড়ীতে এদের তো তোমাকে বড্ড পছন্দ—আমায় কেবল খোঁচাচ্চে। কোর্ট বন্ধের দিন তোমায় যেতেই হবে।

নিধু মনে-মনে ভাবিল—বোধ হয় তাহলে বড় ডাল আঁকড়াতে গিয়ে ফসকে গিয়েচে। তাই গরীবের ওপর কৃপাদৃষ্টি পড়েচে আবার। মুখে বলিল—আপনার বাড়ী যাব, সে আর বেশি কথা কি—বলব এখন পরে। তবে ইণ্টারভিউর ব্যাপারে আপনি একেবারে সত্যি জেনে রাখুন সাধনবাবু, ধর্ম্মত বলচি, এর বিন্দুবিসর্গের মধ্যে নেই আমি। বিশ্বাস করুন আমার কথা।

সাধন-মোক্তার দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

শুক্রবার রাত্রে সাবডেপুটির চাপরাশি আসিয়া নিধুকে ডাকিয়া লইয়া গেল সকাল-সকালই।

সুনীলবাবু বলিলেন—খবর সব ভালো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—

—লালবিহারীবাবুদের বাড়ীর সব—চিঠি দিয়েছিলেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কাল শনিবার যেতে পারব না—পরের শনিবারে যাব—আপনিও থাকবেন। এবার বোধ হয়, আপনাকে বলি—

সুনীলবাবু হঠাৎ সলজ্জকণ্ঠে বলিলেন—বাবা বোধ হয় আসবেন রবিবারে। উনিও মেয়ে দেখতে যাবেন—উনি লিখেচেন—আপনার শরীর অসুস্থ নাকি ?

নিধু আড়ষ্ট সুরে বলিল—না, এই—আজকাল কাজের চাপ 'ছুটির আগে, তা ছাড়া মাঝে-মাঝে ম্যালেরিয়াতে ভুগি—

—একটু গরম চা করে দেবে ? ও আপনি চা খান না, ইয়ে কোকো খাবেন ?

—থাক গে। বরং জল এক গ্লাস—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—ওরে বাবুকে এক গ্লাস জল। তারপর শুনুন একটা কথা—

—আজ্ঞে বলুন—

—ভদ্রলোকের কাণ্ড! কি করি—সাধনবাবু সেদিন এসেছিলেন ওঁর বাড়ী আমাকে নিয়ে যেতে মেয়ে দেখতে—শুনেচেন সে কথা ? শোনেন নি ?

—না। আপনি গিয়েছিলেন নাকি ?

—যাই নি। আমি ওঁকে খুলে বললুম—কুড়ুলগাছির লালবিহারীবাবুদের সঙ্গে এ নিয়ে কথাবার্ত্তা এগিয়েচে। বোধ হয় সেখানেই—বাবা নিজে আসচেন মেয়ে দেখতে। এ অবস্থায় অন্যত্র আর—

তাই। নিধু আগেই আন্দাজ করিয়াছিল সাধন বুড়োর দরদের আসল কারণ। কথাটা নিরঞ্জনকে বলিতে হইবে! ওই একজন সমবয়সী বন্ধু আছে রামনগরে—সুখদুঃখের কথা যাহার কাছে বলিয়া সুখ পাওয়া যায়। যে বুঝিতে পারে, দরদ দিয়া শোনে।

শনিবার ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত ইণ্টারভিউ পর্ব্ব বেলা দেড়টার মধ্যে মিটিয়ে গেল। মহকুমার অনেক বিশিষ্ট লোক উপস্থিত। ভিড়ও খুব। এ যে সময়ের কথা বলা হইতেছে—তৎকালে ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে করমর্দ্দন করা সুখবিরল ও যশবিরল পৃথিবীর একটা প্রধান সুখ, একটা প্রধান সম্মান। ম্যাজিস্ট্রেট আহেলা বিলাতী আই. সি. এস.। নাম রবিনসন—লম্বা বলিষ্ঠ চেহারা। চেহারার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে।

এস. ডি. ও. হাসিয়া নিধুকে আগাইয়া দিয়া বলিলেন—বাবু নিধিরাম চৌধুরী—মুক্টিয়ার—

ঠিক পূর্ব্বে সরিয়া গিয়াছেন লোকাল বোর্ডের মেম্বর শশিপদ বাবু। সাহেব সহাস্যবদনে হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন—গুড্ আফটারনুন, বাবু, সো গ্ল্যাড্ টু মিট ইউ—

নিধু ঘামিয়া উঠিয়াছে। সে হাত বাড়াইয়া ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে দিবার সঙ্গে-সঙ্গে মাথা নিচু করিয়া সেলাম ঠুকিল। মুখে বলিল—গুড্ আফটারনুন, স্যর—ইয়োর অনার—

ম্যাজিস্ট্রেট তাহার দিকে চাহিয়া ভদ্রতা-সূচক হাসিলেন। ইণ্টারভিউ শেষ হইয়া গেল। আজ আর কাজকর্ম্ম নেই।

ডাক-বাংলা হইতে বাসায় আসিবার পথে নিধু ভাবিয়া ঠিক করিল আজ সে কুড়ুলগাছি

যাইবে। যদিও বলিয়া আসিয়াছিল যাইবে না, কিন্তু যখন সকাল-সকাল কাজ মিটিয়া গেল—তখন আজই এখনি বাহির হইয়া পড়িতে হইবে। সামনের শনিবারে বরং যাইবে না বাড়ী—সুনীলবাবু এবং তাঁহার বাবা যেদিন মেয়ে দেখিতে যাইবেন—সেদিন তাহার না থাকিলেও কোনো পক্ষের ক্ষতি নাই।

আজ শরীরটা কিন্তু সকাল হইতেই ভালো নয়। জ্বরজাড়ি হইতে পারে। সারা গায়ে যেন বেদনা। তবুও বাড়ী আজ তাহার যাওয়া চাই-ই। আজ মঞ্জুকে সে পাইবে পুরানো দিনের মতো। বাড়ীতে ভাবী আত্মীয়-কুটুম্বেরা ভিড় করিবে না আজ।

শরতের রৌদ্র নীল আকাশের পেয়ালা বাহিয়া উপ্‌চাইয়া পড়িতেছে। পথের ধারে ছায়া, ঝোপে সেই দিনের মতো মটরলতার দুলুনি। ছোট গোয়ালে লতায় ফুল ধরিয়াছে। শালিক ও ছাতারে পাখির কলরব মাথার উপরে।

পথ হাঁটিতে আরম্ভ করিয়াই নিধু দেখিল তাহার শরীর যেন ক্রমশ খারাপ হইয়া আসিতেছে। শরতের ছায়াভরা বাতাস গায়ে লাগিলে যেন গা শিরশির করে। নিধু মাঝে মাঝে কেবলই বসিতে লাগিল—এ সাঁকোয় বসে, আবার ও সাঁকোয় বসে। সাঁকোর নিচেই গত বর্ষার বদ্ধ জল, অন্য সময় তাহার যে একটা গন্ধ আছে—ইহাই নিধুর নাকে লাগিত না—আজ গন্ধটায় তাহার শরীরের মধ্যে যেন পাক দিতেছিল। সাঁকোয় বসিয়া অন্যমনস্কভাবে বাঁশবনের মাথার উপরে মেঘমুক্ত নীল আকাশে শরতের শুভ্র মেঘের খেলা লক্ষ্য করিতেছিল। মেঘের দল লঘুগতিতে উড়িয়া চলিতে-চলিতে কত কি জিনিস তৈরি করিতেছে—কখনো দুর্গ, কখনো পাহাড়, কখনো সিংহ, কখনো বহুদূরের কোন অজানা দেশ—উপরের বায়ুস্রোত আবার পর-মুহূর্তে সেগুলাকে চূর্ণ করিয়া উড়াইয়া দিতেছে—এই আছে, এই নাই—আবার নব-নব শুভ্র মেঘসজ্জা, আবার কল্পনার কত কি নতুনের সৃষ্টি। ভঙ্গুর মেঘের সৃষ্টি—সে আবার টেকে কতক্ষণ?

কে একজন ডাকিয়া বলিল—বাবু, আপনি এখানে শুয়ে আছেন সাঁকোর ওপর? কনে যাবেন?

পথ-চলতি চাষা লোক। নিধু বলিল—যাব কুড়ুলগাছি। জ্বর এসেচে ভাই একটু শুয়ে আছি।

—আমি আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবানু, উঠুন আনি—কতক্ষণ শুয়ে থাকবেন?

—না বাপু। আমি একটু জিরিয়ে নিলেই আবার ঠিক হাঁটব—তুমি যাও।

লোকটা চলিয়া গেল—কিন্তু যাইবার সময় বার-বার পিছনে তাহার দিকে চাহিতে চাহিতে গেল। লোকটা ভালো। শরীর ভালো না থাকিলে কিছুই ভালো লাগে না। ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে ইণ্টারভিউ হইল—কোথায় মন বেশ খুশি হইবে, গাঁয়ে গিয়া গল্প করিবার মতো একটা জিনিস হইল—তা না, সে যেন মনে কোনো দাগই দেয় নাই। কিন্তু এই জ্বরের ঘোরে মঞ্জু যেন কোন অপার্থিব দেশের দেবী হইয়া তাহার সম্মুখে আসিতেছে। মঞ্জুদের একদিন খাওয়ানো হইল না—পয়সা জমে না হাতে তা কি করা যায়? সামনের শনিবারে তো বাড়ী

যাইবে না—পরের শনিবারে হইবে। আচ্ছা, বার-লাইব্রেরীর সকলে কি তাহাকে বয়কট করিবে? যদি করে সে তো নিরুপায়। তাহার কোনো দোষ নাই, আর কেউ না জানে, সে তো জানে! সে স্বেচ্ছায় কাহারো অনিষ্ট করিতে যাইবে না।

অতি কষ্টে আরও কয়েক মাইল পথ সে অতিক্রম করিল।

পথ তাহাকে যে করিয়াই হোক, অতিক্রম করিতেই হইবে। এই দীর্ঘ, ক্লান্ত পথের ওপ্রান্তে হাস্যমুখী মঞ্জু যেন কোথায় তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। আজ না গেলে আর তাহার সহিত যেন দেখাই হইবে না। দুদিনের জন্য আসিয়াছিল—আবার বহু, বহু দূরে চলিয়া যাইবে।

সন্ধ্যার আর দেরি নাই। ওই সন্দেশপুর—সেই মৌলবীসাহেবের পাঠশালা সন্দেশপুর বাঁওড়ের ধারে। বাঁওড়ের বর্ষার জল রাস্তায় কিনারা ছুঁইয়াছে—ওদিকে গাছের গুঁড়ির সাঁকোর উপর দিয়া ধান বোঝাই মহিষের গাড়ী পার হইতেছে।

আর এইটুকু গেলেই তাহাদের গ্রাম। সন্ধ্যার শাঁখ বাজিবার সঙ্গে-সঙ্গেই গ্রামের পথে সে পা দিবে।

অমনি মা আগাইয়া আসিয়া বলিবে—এই যে নিধু এলি বাবা! বলেছিলি আজ যে আসবি নে?

হয়তো বা বাড়ী পৌঁছিলে একথা তাহার মা তাহাকে বলিয়াও থাকিবেন—কিন্তু আচ্ছন্ন ঘোর-ঘোর ভাবে সন্ধ্যার অন্ধকারে কখন সে বাড়ী ঢুকিয়াছিল টলিতে-টলিতে—কখন বাড়ীর লোকে তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিয়াছিল—এ সকল কথা বলিয়া তাহার মনে নাই।

দুইমাস রোগের ঘোরে কখনও চেতন, কখনও অচেতন বা অর্দ্ধচেতন ভাবে কাটিবার পর নিধুর জীবনের আশা হইল। ক্রমে সে বিছানার উপর উঠিয়া বসিতে পারিল। ডাক্তার গিয়াছে আর ভয় নাই।

নিধুর মা পুত্রের সেবা করিতে-করিতে রোগা হইয়া পড়িয়াছেন। সে চেহারা আর নাই মায়ের।

নিধুর সামনে সাবুর বাটি রাখিয়া বলিলেন—আঃ বাবা, রামগড় থেকে শশধরবাবু ডাক্তার পর্য্যন্ত এসেছিলেন দুদিন—

নিধু ক্ষীণ স্বরে বলিল—শশধরবাবু! সে তো অনেক টাকার ব্যাপার!

—টাকা কি লেগেছে আমাদের? আহা, আর জন্মে পেটের মেয়ে ছিল ওই মঞ্জু—দিন-রাতের মধ্যে যে কতবার আসত, বসে থাকত—সে-ই তো সব যোগাড়যন্ত্র করে দিলে জজবাবুকে বলে—জজবাবুও হামেশা আসতেন—গাঁয়ের সবাই আসত-যেত। সেদিনও জজগিন্নি বলে গেলেন—টাকা খরচ সার্থক হয়েচে, প্রাণ পাওয়া গেল এই বড় কথা। মিথ্যে কথা বলব কেন, সবাই দেখেচে, শুনেচে, কয়েচে। ভুবন গাঙ্গুলির মেয়ে হৈম পর্য্যন্ত শ্বশুর-বাড়ী যাওয়ার আগে রোজ একবার করে আসত। মা সিদ্ধেশ্বরী কালী মুখ তুলে চেয়েচেন।

সকলে তো বলেছিল এই বয়সে টাইফয়েড্—

মঞ্জু! অনেক দিন পরে নিধুর রোগক্ষীণ স্মৃতিপটে একখানি আনন্দময়ী বালিকামূর্ত্তি অস্পষ্ট ভাসিয়া উঠিল। অনেক দিন এ নাম কানে যায় নাই। কঠিন রোগ তাহাকে মৃত্যুর যে ঘনান্ধকার রহস্যের পথে বহুদূর টানিয়া লইয়া গিয়াছিল, হয়তো সে পথের কোথাও কোনোদিন চেতনাহীন মুহূর্ত্তে সে একটি বালিকা-কণ্ঠের সহানুভূতিমাখা উৎসুক স্বর শুনিয়া থাকিবে, হয়তো তাহার দয়ালু হস্তের মৃদু পরশ অঙ্গে লাগিয়া থাকিবে—নিধু তাহা চিনিতে পারে নাই—ধারণাও করিতে পারে নাই।

সে কিছু বলিবার আগেই তাহার মা বলিলেন—ও শনিবারে যাবার দিনটাতেও মঞ্জু এসে কতক্ষণ বসে রইল। বললে, বাবার ছুটি ফুরিয়ে গেল তাই যেতে হচ্চে জ্যাঠাইমা, নইলে নিধুদাকে এ ভাবে দেখে যেতে কি মন সরে! বাবার কোর্ট খুলবে জগদ্ধাত্রী পূজোর পরে, আর থাকবার যো নেই। চোখের জল ফেললে সেদিন বাছা আমার! একেবারে যেন আমার পেটের মেয়ে—বললাম যে। অমন মেয়ে কি হয় আজকালকার বাজারে! তাই তো বলি—

মায়ের বাকি কথা নিধুর কানে গেল না।

আরও দিন পনরো কাটিয়া গিয়াছে।

নিধু এখন লাঠি ধরিয়া সকালে-বিকালে একটু করিয়া বাড়ীর কাছের পথে বেড়ায়।

মঞ্জুদের বাড়ী তালাবন্ধ। কেহ কোথাও নাই।

আগেও তো কেহ ছিল না এ বাড়ীতে, কখনো কেহ থাকিত না, এখনো কেহ নাই, ইহাতে নতুন কি আছে?

এই শেষ হেমন্তের ঈষৎ শীতল অপরাহ্ণগুলিতে আগে-আগে বন ছোট গোয়ালে-লতার জঙ্গলে জজবাবুদের বাড়ীর সদর-দরজা ঢাকিয়া থাকিত—সে আবাল্য দেখিয়া আসিতেছে—বছরের পর বছর কাটিবার সঙ্গে-সঙ্গে সে বন আবার গজাইবে। মধ্যে যে আসিয়াছিল, সে তো দুদিনের স্বপ্ন।

ছনুজেলে মাছের ডালা মাথায় করিয়া চলিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া বলিল—এই যে দাদাঠাকুর, আজকাল একটু বল পাচ্ছেন?

—হ্যাঁ ছনু, ডাক্তার বলেচে একটু বেড়াতে সকাল-বিকেল।

—তা যান, বেলা গিয়েচে, আর ঠাণ্ডা লাগাবেন না—কার্ত্তিকে হিম—আপনার তো পুনরজন্ম গেল এবার।

—কপালে ভোগ থাকলে—

—তাই দাদাঠাকুর তাই। কপালই সব। এখন পুজোডা গেল জজবাবুদের বাড়ী। কি খাওয়ান-দাওয়ান, আমাদের এস্তক হেল চেল। জজবাবু নিজে সামনে দাঁড়িয়ে—ছনু,

ভাল করে খাও বাবা, যা ভালো লাগে মুখে চেয়ে নিও। অমন মানুষ আর হয় না।

নিধু বাড়ীর দিকে ফিরিবার আগে কেহ কোনোদিকে নাই দেখিয়া বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়া জজবাবুর বাড়ীর মধ্যে একবার উঁকি দিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল।

ভালো দেখা গেল না। হেমন্ত সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে গাছপালায়।